



وَتَرْجَمَةُ مَعَانِيهِ وَتَفْسِيرُهُ
إِلَى اللُّغَةِ الْبَنْغَالِيَّةِ

পবিত্র

কোরআনুল করীম

(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর)

মূল : তফসীর মাআরেফুল কোরআন

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ)

অনুবাদ ও সম্পাদনা :

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

সূচী পত্র

পৃষ্ঠা				পৃষ্ঠা			
ক্রমিক নং	সূত্রার নাম	লোকরআল	তফসীল	ক্রমিক নং	সূত্রার নাম	লোকরআল	তফসীল
১।	সূত্রা—আল-ফাতেহা	২	১	৫৮।	সূত্রা—আল-মুজাদালাহ্	৫৪৩	১৩৪৩
২।	সূত্রা—আল-বাকারাহ্	৩	১১	৫৯।	সূত্রা—আল-হাশর	৫৪৬	১৩৪৮
৩।	সূত্রা—আল-ইমরান	৫১	১৬৩	৬০।	সূত্রা—আল-মুমতাহিনা	৫৫০	১৩৫৮
৪।	সূত্রা—আন-নিসা	৭৮	২২৭	৬১।	সূত্রা—আহ্‌হাক্‌ফ	৫৫২	১৩৬৪
৫।	সূত্রা—আল-মায়দা	১০৭	৩০২	৬২।	সূত্রা—আল-জুমআহ্	৫৫৪	১৩৬৮
৬।	সূত্রা—আল-আনআম	১২৯	৩৬৬	৬৩।	সূত্রা—মুনাক্কিন	৫৫৫	১৩৭০
৭।	সূত্রা—আল-আ র্রাফ	১৫২	৪২৯	৬৪।	সূত্রা—আততাগাবুন	৫৫৭	১৩৭৬
৮।	সূত্রা—আনফাল	১৭৮	৫১৪	৬৫।	সূত্রা—আত্-তলাহ্	৫৫৯	১৩৭৯
৯।	সূত্রা—আততওবাহ্	১৮৮	৫৫২	৬৬।	সূত্রা—আততাহরীম	৫৬১	১৩৮৬
১০।	সূত্রা—ইউনুস	২০৯	৫৯৯	৬৭।	সূত্রা—আল-মুনক	৫৬৩	১৩৯০
১১।	সূত্রা—হুদ	২২২	৬১৯	৬৮।	সূত্রা—আল-কলম	৫৬৫	১৩৯৪
১২।	সূত্রা—ইউসুফ	২৩৬	৬৫০	৬৯।	সূত্রা—আল-হাক্বাহ্	৫৬৮	১৩৯৯
১৩।	সূত্রা—রা দ	২৫০	৬৯৬	৭০।	সূত্রা—আল-মআরীজ	৫৭০	১৪০১
১৪।	সূত্রা—ইবরাহীম	২৫৬	৭১০	৭১।	সূত্রা—নূহ	৫৭২	১৪০৫
১৫।	সূত্রা—হিজর	২৬২	৭২৩	৭২।	সূত্রা—আল-জিন	৫৭৪	১৪০৮
১৬।	সূত্রা—নাহল	২৬৮	৭৩৩	৭৩।	সূত্রা—আল-মুযাশ্শিল	৫৭৭	১৪১৩
১৭।	সূত্রা—বনী-ইসরাঈল	২৮৩	৭৬৩	৭৪।	সূত্রা—আল-মুদদসির	৫৭৯	১৪১৯
১৮।	সূত্রা—কাহফ	২৯৪	৭৯৬	৭৫।	সূত্রা—আল-কিয়ামাহ্	৫৮১	১৪২২
১৯।	সূত্রা—মারইয়াম	৩০৬	৮২৯	৭৬।	সূত্রা—আদ-দাহর	৫৮৩	১৪২৬
২০।	সূত্রা—হোয়া-হা	৩১৩	৮৪৩	৭৭।	সূত্রা—আল-মুরসালাত	৫৮৫	১৪২৯
২১।	সূত্রা—আশ্বিয়া	৩২৩	৮৭১	৭৮।	সূত্রা—আননাবা	৫৮৭	১৪৩১
২২।	সূত্রা—হজ্জ	৩৩২	৮৯১	৭৯।	সূত্রা—আন-নাযিয়াত	৫৮৮	১৪৩৩
২৩।	সূত্রা—আল-মু মিনুন	৩৪৩	৯১১	৮০।	সূত্রা—আবাসা	৫৯০	১৪৩৬
২৪।	সূত্রা—আন-মুর	৩৫১	৯২৪	৮১।	সূত্রা—আত-তাক্বীর	৫৯১	১৪৩৮
২৫।	সূত্রা—আল-ফুরকান	৩৬০	৯৫৪	৮২।	সূত্রা—আল-ইনফিতার	৫৯২	১৪৪০
২৬।	সূত্রা—আশশোআ রা	৩৬৭	৯৭১	৮৩।	সূত্রা—আত্-তাতকীফ	৫৯৩	১৪৪১
২৭।	সূত্রা—আন-নামল	৩৭৭	৯৮৬	৮৪।	সূত্রা—আল-ইনশিকাক	৫৯৫	১৪৪৪
২৮।	সূত্রা—আল-কাসাস্	৩৮৬	১০০৫	৮৫।	সূত্রা—আল-বুরজ্	৫৯৬	১৪৪৬
২৯।	সূত্রা—আল-আনকাবুত	৩৯৭	১০২৩	৮৬।	সূত্রা—আত-তারিক্	৫৯৭	১৪৪৭
৩০।	সূত্রা—আররাম	৪০৫	১০৩৫	৮৭।	সূত্রা—আল-আ না	৫৯৮	১৪৪৯
৩১।	সূত্রা—লোকমান	৪১২	১০৫১	৮৮।	সূত্রা—আল-গাশিয়াহ্	৫৯৮	১৪৪৯
৩২।	সূত্রা—সেজদা	৪১৬	১০৬২	৮৯।	সূত্রা—আল-ফজর	৫৯৯	১৪৫২
৩৩।	সূত্রা—আল-আহযাব	৪১৯	১০৬৮	৯০।	সূত্রা—আল-বালাদ	৬০১	১৪৫৭
৩৪।	সূত্রা—সাবা	৪২৯	১০৭২	৯১।	সূত্রা—আশশাম্শ	৬০১	১৪৫৭
৩৫।	সূত্রা—ফাতির	৪৩৫	১১১৬	৯২।	সূত্রা—আল-লাইল	৬০২	১৪৫৯
৩৬।	সূত্রা—ইয়া-সীন	৪৪১	১১২৬	৯৩।	সূত্রা—আদ-দোহা	৬০৩	১৪৬১
৩৭।	সূত্রা—আসসাফফাত	৪৪৬	১১৩৮	৯৪।	সূত্রা—আল-ইন্শিরাহ্	৬০৩	১৪৬১
৩৮।	সূত্রা—হোয়াদ	৪৫৩	১১৫৮	৯৫।	সূত্রা—তীন	৬০৪	১৪৬৪
৩৯।	সূত্রা—আয-যুমার	৪৫৯	১১৭২	৯৬।	সূত্রা—আলাক	৬০৪	১৪৬৪
৪০।	সূত্রা—আল-মু মিন	৪৬৮	১১৭৪	৯৭।	সূত্রা—কদর	৬০৫	১৪৬৭
৪১।	সূত্রা—হা-মীম-সেজা	৪৭৮	১১৯৭	৯৮।	সূত্রা—বাহিয্যিনাহ্	৬০৫	১৪৬৭
৪২।	সূত্রা—আশ-সূরা	৪৮৪	১২১০	৯৯।	সূত্রা—যিলখাল	৬০৬	১৪৭০
৪৩।	সূত্রা—আয-যুখরুফ	৪৯০	১২২৩	১০০।	সূত্রা—আ দিয়াত	৬০৬	১৪৭০
৪৪।	সূত্রা—আদ-দোখান	৪৯৬	১২৩৪	১০১।	সূত্রা—ক্বারৈআহ্	৬০৭	১৪৭২
৪৫।	সূত্রা—আল-জাশিয়া	৪৯৯	১২৪০	১০২।	সূত্রা—তাকাসুর	৬০৭	১৪৭২
৪৬।	সূত্রা—আল-আহক্বাফ	৫০৩	১২৪৬	১০৩।	সূত্রা—আসর	৬০৮	১৪৭৪
৪৭।	সূত্রা—মুহাম্মদ	৫০৭	১২৫৩	১০৪।	সূত্রা—হাযাযাহ্	৬০৮	১৪৭৪
৪৮।	সূত্রা—আলফাতহ্	৫১২	১২৬৪	১০৫।	সূত্রা—ফীল	৬০৮	১৪৭৪
৪৯।	সূত্রা—আল-জুজুরাত	৫১৬	১২৭৩	১০৬।	সূত্রা—কোরাইশ	৬০৯	১৪৭৬
৫০।	সূত্রা—কব্বাফ	৫১৯	১২৮৭	১০৭।	সূত্রা—মউল	৬০৯	১৪৭৬
৫১।	সূত্রা—আযযারিয়াত	৫২১	১২৯২	১০৮।	সূত্রা—কাউসার	৬০৯	১৪৭৬
৫২।	সূত্রা—আত্-তুর	৫২৪	১২৯৮	১০৯।	সূত্রা—কাফেরুন	৬১০	১৪৮০
৫৩।	সূত্রা—আন-নাযম	৫২৭	১৩০২	১১০।	সূত্রা—নসর	৬১০	১৪৮০
৫৪।	সূত্রা—আল-কামার	৫২৯	১৩১০	১১১।	সূত্রা—লাহাব	৬১০	১৪৮০
৫৫।	সূত্রা—আর-রাহমান	৫৩২	১৩১৫	১১২।	সূত্রা—এখলাস	৬১০	১৪৮০
৫৬।	সূত্রা—আল-ওয়াক্বিয়াহ্	৫৩৫	১৩২৩	১১৩।	সূত্রা—ফালাক	৬১১	১৪৮৪
৫৭।	সূত্রা—আল-হাদীদ	৫৩৮	১৩৩০	১১৪।	সূত্রা—নাস	৬১১	১৪৮৪



وَتَرْجَمَةُ مَعَانِيهِ وَتَفْسِيرُهُ
إِلَى اللُّغَةِ الْبَنْغَالِيَّةِ

পবিত্র

কোরআনুল করীম

(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর)

মূল : তফসীর মাআরেফুল কোরআন

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী' (রহঃ)

অনুবাদ ও সম্পাদনা :

মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

الفاتحة

২

سورة



সূরা আল-ফাতিহা

মকায় অবতীর্ণঃ আয়াত সাত।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। (২) যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৩) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৫) আমাদেরকে সরল পথ দেখাও, (৬) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। (৭) তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

সূরা আল-ফাতিহা

ক্ষয়ীলত ও বৈশিষ্ট্য : সূরা আল-ফাতিহা কোরআনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সূরা। প্রথমতঃ এ সূরা দু'রাই পবিত্র কোরআন আরম্ভ হয়েছে এবং এ সূরা দিয়েই সর্বশ্রেষ্ঠ এবাদত নামায আরম্ভ হয়। অবতরণের দিক দিয়েও পূর্ণাঙ্গ সূরা রূপে এটিই প্রথম নাযিল হয়। সূরা 'ইকরা', 'মুযাশ্শিল' ও সূরা 'মুদাসসিরে'র ক'টি আয়াত অবশ্য সূরা আল-ফাতিহার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সূরা রূপে এ সূরার অবতরণই সর্বপ্রথম। যে সকল সাহাবী (রাঃ) সূরা আল-ফাতিহা সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের সে বক্তব্যের অর্থ বোধহয় এই যে, পরিপূর্ণ সূরা রূপে এর আগে আর কোন সূরা নাযিল হয়নি। এ জনাই এ সূরার নাম 'ফাতিহাতুল-কিতাব' বা কোরআনের উপক্রমণিকা রাখা হয়েছে।

'সূরা-ফাতিহা' এদিক দিয়ে সমগ্র কোরআনের সার-সংক্ষেপ। এ সূরায় সমগ্র কোরআনের সারমর্ম সর্গক্ষিপ্তাকারে বলে দেয়া হয়েছে। কোরআনের অবশিষ্ট সূরাগুলো প্রকারান্তরে সূরা ফাতিহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা। কারণ, সমগ্র কোরআন প্রধানতঃ ঈমান এবং নেক আমলের আলোচনাতেই কেন্দ্রীভূত। আর এ দু'টি মূলনীতিই এ সূরায় সর্গক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। তফসীরে রুহুল মা'আনী ও রুহুল বয়ানে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাই এ সূরাকে সহীহ হাদীসে 'উম্মুলকোরআন', 'উম্মুলকিতাব', 'কোরানে আযীম' বলেও অভিহিত করা হয়েছে। - (কুরতুবী)

অথবা এ জন্য যে, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত বা অধ্যয়ন করবে তার জন্য এ মর্মে বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সে যেন প্রথমে পূর্বযোষিত যাবতীয় ধ্যান-ধারণা অন্তর থেকে দূরীভূত করে একমাত্র সত্য ও সঠিক পথের সন্ধানের উদ্দেশ্যে এ কিতাব তেলাওয়াত আরম্ভ করে এবং আল্লাহর নিকট এ প্রার্থনাও করে যে, তিনি যেন তাকে সিরাতুল মুস্তাকীমের হেদায়েত দান করেন।

হযরত রসুলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে— যার হাতে আমার জীবন-মরণ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, সূরা আল-ফাতিহার দৃষ্টান্ত তওরাত, ইনজীল, যাবুর প্রভৃতি অন্য কোন আসমানী কিতাবে তো নেই-ই, এমনকি পবিত্র কোরআনেও এর দ্বিতীয় নেই। ইমাম তিরমিযী আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন যে— সূরায় ফাতিহা প্রত্যেক রোগের ঔষধবিশেষ।

হাদীস শরীফে সূরা আল-ফাতিহাকে সূরায় শেফাও বলা হয়েছে। — (কুরতুবী)

বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, — সমগ্র কোরআনে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সূরা হচ্ছে الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ — (কুরতুবী)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

بِسْمِ اللَّهِ কোরআনের একটি আয়াত :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ কোরআন শরীফের সূরা নাম্বলের

একটি আয়াত বা অংশ। সূরা তওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমে একটি আয়াত বা অংশ। সূরা আল-ফাতিহা অংশ, না অন্যান্য সকল সূরারই অংশ, এতে ইমামগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) বলেছেন **بِسْمِ اللَّهِ** সূরা নাম্বল ব্যতীত অন্য কোন সূরার অংশ নয়। তবে এটি এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াত যা প্রত্যেক সূরার প্রথমে লেখা এবং দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।

কোরআন তোলাওয়াত ও প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ্‌সহ আরম্ভ করার আদেশ : জাহেলিয়াত যুগে লোকদের অভ্যাস ছিল, তারা তাদের প্রত্যেক কাজ উপাস্য দেব-দেবীদের নামে শুরু করতো। এ প্রথা রহিত করার জন্য হযরত জিব্রাইল পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম যে আয়াত নিয়ে এসেছিলেন, তাতে আল্লাহর নামে কোরআন তোলাওয়াত আরম্ভ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। যথা **اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ** অর্থাৎ, পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে।

কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায়, স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-ও প্রথমে প্রত্যেক কাজ **بِسْمِ اللَّهِ** বলে আরম্ভ করতেন এবং কোন কিছু লেখাতে হলেও এ কথা প্রথমে লেখাতেন। কিন্তু **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** অবতীর্ণ হওয়ার পর সর্বকালের জন্য বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে সব কাজ শুরু করার নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে।

— (কুরতুবী, রুহুল মা'আনী)

কোরআন শরীফের স্থানে স্থানে উপদেশ রয়েছে যে, প্রত্যেক কাজ বিসমিল্লাহ্‌ বলে আরম্ভ কর। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন, “যে কাজ বিসমিল্লাহ্‌ ব্যতীত আরম্ভ করা হয়, তাতে কোন বরকত থাকে না।”

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ করতে বিসমিল্লাহ্‌ বলবে, বাতি নেভাতেও বিসমিল্লাহ্‌ বলবে, পাত্র আবৃত করতেও বিসমিল্লাহ্‌ বলবে। কোন কিছু খেতে, পানি পান করতে, ওয়ু করতে, সওয়ারীতে আরোহণ করতে এবং তা থেকে অবতরণকালেও বিসমিল্লাহ্‌ বলার নির্দেশ কোরআন-হাদীসে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। — (কুরতুবী)

বিসমিল্লাহর তফসীর : বিসমিল্লাহ্‌ বাক্যটি তিনটি শব্দ দ্বারা গঠিত। প্রথমতঃ ‘বা’ বর্ণ, দ্বিতীয়তঃ ‘ইসম’ ও তৃতীয়তঃ ‘আল্লাহ’। আরবী ভাষায় ‘বা’ বর্ণটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে তিনটি অর্থ এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে এবং এ তিনটির যে কোন একটি অর্থ এ

ক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক — সংযোজন। অর্থাৎ, এক বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে মিলানো বা সংযোগ ঘটানো অর্থে। দুই— এস্তেয়ানাত — অর্থাৎ, কোন বস্তুর সাহায্য নেয়া। তিন— কোন বস্তু থেকে বরকত হাসিল করা।

‘ইসম’ শব্দের ব্যাখ্যা অত্যন্ত ব্যাপক। মোটামুটিভাবে এতদুই জেনে রাখা যথেষ্ট যে, ‘ইসম’ নামকে বলা হয়। ‘আল্লাহ’ শব্দ সৃষ্টিকর্তার নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে মহত্বের ও তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর সম্মিলিত রূপ। কোন কোন আলম একে ইসমে আ’যম বলেও অভিহিত করেছেন।

এ নামটি আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। এজন্যই এ শব্দটির দ্বিচন বা বহুচন হয় না। কেননা, আল্লাহ্‌ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। মোটকথা, আল্লাহ্‌ এমন এক সত্তার নাম, যে সত্তা পালনকর্তার সমস্ত গুণাবলীর এক অসাধারণ প্রকাশবাচক। তিনি অদ্বিতীয় ও নজীরবিহীন। এজন্য বিসমিল্লাহ্‌ শব্দের মধ্যে ‘বা’-এর তিনটি অর্থের সামঞ্জস্য হচ্ছে আল্লাহর নামের সাথে, তাঁর নামের সাহায্যে এবং তাঁর নামের বরকতে।

তাআবুজ শব্দের অর্থ **اعوذ بالله من الشيطان الرجيم** পাঠ করা।

আল-কোরআনে এরশাদ হয়েছে— যখন কোরআন পাঠ কর, তখন শয়তানের প্রতারণা থেকে আল্লাহ্‌ তা’আলার নিকট আশ্রয় চাও। দ্বিতীয়তঃ কোরআন পাঠের প্রাক্কালে আ’উযুবিল্লাহ্‌ পাঠ করা ইজমায়-উস্মত দ্বারা সুনত বলে স্বীকৃত হয়েছে। এ পাঠ নামাযের মধ্যেই হোক বা নামাযের বাইরেই হোক। কোরআন তোলাওয়াত ব্যতীত অন্যান্য কাজে শুধু বিসমিল্লাহ্‌ পাঠ করা সুনত, আ’উযুবিল্লাহ্‌ নয়। তোলাওয়াত কালে উভয়টি পাঠ করা সুনত। তবে একটি সূরা শেষ করে শুধুমাত্র সূরা তওবা ব্যতীত অপর সূরা আরম্ভ করার পূর্বে যখন কোরআন তোলাওয়াত আরম্ভ করা হয় তখন আউযুবিল্লাহ্‌ ও বিসমিল্লাহ্‌ উভয়টিই পাঠ করতে হয়। তোলাওয়াত করার সময় মধ্যে সূরা-বারাআত আসলে তখন বিসমিল্লাহ্‌ পড়া নিষেধ। কিন্তু প্রথম তোলাওয়াতই যদি সূরা বারাআত দ্বারা আরম্ভ হয়, তবে আ’উযুবিল্লাহ্‌ ও বিসমিল্লাহ্‌ উভয়টিই পাঠ করতে হবে। — (আলমগীরী)

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’, কোরআনের সূরা নামল-এর একটি আয়াতের অংশ এবং দু’টি সূরার মাঝখানে একটি পূর্ণাঙ্গ আয়াত। তাই অন্যান্য আয়াতের ন্যায় এ আয়াতটির সম্মান করাও গুয়াজিব। অযু হাড়া এটি স্পর্শ করা জায়েয নয়। অপবিত্র অবস্থায় যথা হয়েয-নেকাসের সময়, (পবিত্র হওয়ার পূর্বে) তোলাওয়াতরূপে পাঠ করাও না জায়েয। তবে কোন কাজ কর্ম আরম্ভ করার পূর্বে (যথা—পানাহার) দোয়ারূপে পাঠ করা সব সময়ই জায়েয।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরাতুল-ফাতিহার বিষয়বস্তু : সূরাতুল-ফাতিহার আয়াত সংখ্যা সাত। প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহর প্রশংসা এবং শেষের তিনটি আয়াতে মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও দরখাস্তের বিষয়বস্তুর সর্বেশ্বরণ। মধ্যের একটি আয়াত প্রশংসা ও দোয়া মিশ্রিত।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন — নামায (অর্থাৎ, সূরাতুল ফাতিহা) আমার এবং আমার বান্দাদের মধ্যে দু'ভাগে বিভক্ত। অর্ধেক আমার জন্য আর অর্ধেক আমার বান্দাদের জন্য। আমার বান্দাগণ যা চায়, তা তাদেরকে দেয়া হবে। অতঃপর রসূল (সাঃ) বলেছেন যে, যখন বান্দাগণ বলে **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** তখন আল্লাহ বলেন যে, আমার বান্দাগণ আমার প্রশংসা করছে। আর যখন বলে **الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ** তখন তিনি বলেন যে, তারা আমার মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করছে। আর যখন বলে **مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ** তখন তিনি বলেন, আমার বান্দাগণ আমার গুণগান করছে। আর যখন বলে **اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ** তখন তিনি বলেন, এ আয়াতটি আমার এবং আমার বান্দাগণের মধ্যে সংযুক্ত। কেননা, এর এক অংশ আমার প্রশংসা এবং অপর অংশ বান্দাগণের দোয়া ও আরম্ভ রয়েছে। এ সংক্ষেপে এক কথাও বলা হয়েছে যে, বান্দাগণ যা চাইবে তারা তা পাবে।

অতঃপর বান্দাগণ যখন বলে **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ** (শেষ পর্যন্ত) তখন আল্লাহ বলেন, এসবই আমার বান্দাগণের জন্য এবং তারা যা চাইবে তা পাবে। — (মাহহারী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার)। অর্থাৎ, দুনিয়াতে যে কোন স্থানে যে কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, বাস্তবে তা আল্লাহরই প্রশংসা। কেননা, এ বিশ্ব চরাচরে অসংখ্য মনোমম দৃশ্যাবলী, অসংখ্য মনোমুগ্ধকর সৃষ্টিরাজি আর সীমাহীন উপকারী বস্তুসমূহ সর্বদাই মানব মনকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে এবং তাঁর প্রশংসায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, সকল বস্তুর অন্তরালেই এক অদৃশ্য সত্তার নিপুণ হাত সदा সক্রিয়।

যখন পৃথিবীর কোথাও কোন বস্তুর প্রশংসা করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তা উক্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তার প্রতিই বর্তায়। যেমন, কোন চিত্র, কোন ছবি বা নির্মিত বস্তুর প্রশংসা করা হলে প্রকৃতপক্ষে সে প্রশংসা প্রস্তুতকারকেরই করা হয়।

এ ব্যাকটি প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামনে বাস্তবতার একটি নতুন দূর উন্মুক্ত করে দেখিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের সামনে যা কিছু রয়েছে এ সব কিছুই একটি একক সত্তার সাথে জড়িত এবং সকল প্রশংসাই সে অনন্ত অসীম শক্তির। এসব দেখে কারো অন্তরে যদি প্রশংসাবাহীর উদ্বেগ হয় এবং মনে করে যে, তা অন্য কারো প্রাপ্য, তবে এ ধারণা জ্ঞান-বুদ্ধির সংকীর্ণতারই পরিচায়ক। সুতরাং নিঃসন্দেহে একথাই বলতে হয় যে, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** যদিও প্রশংসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে অতি সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সকল সৃষ্টবস্তুর উপাসনাই নিষিদ্ধ করা হলো। তাছাড়া এ দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে এক-ত্ববাদের শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। আল-কোরাআনের এ ক্ষুদ্র ব্যাকটিতে একদিকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা হয়েছে এবং অপরদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে নিমগ্ন মানব মনকে এক অতিবাস্তবের দিকে আকৃষ্ট

করতঃ যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর পূজা-অর্চনাকে চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এতদসঙ্গে অতি হেকমতের সাথে বা অক্যাটিভাবে ঈমানের সর্বপ্রথম স্তম্ভ 'তওহীদ' বা একত্ববাদের পরিপূর্ণ নকশাও তুলে ধরা হয়েছে। একটু চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, ব্যাকটিতে যে দাবী করা হয়েছে, সে দাবীর স্বপক্ষে দলীলও দেয়া হয়েছে।

رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এ ক্ষুদ্র ব্যাকটির পরেই আল্লাহ তা'আলার প্রথম গুণবাচক নাম 'রাব্বুল আলামীন'—এর উল্লেখ করা হয়েছে। আরবী ভাষায় **رَبِّ** শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পালনকর্তা। লালন-পালন বলতে বুঝায়, কোন বস্তুকে তার সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে বা পর্যায়ক্রমে সামনে এগিয়ে নিয়ে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়া।

এ শব্দটি একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। সম্বন্ধপদ রূপে অন্যের জন্যও ব্যবহার করা চলে, সাধারণভাবে নয়। কেননা, প্রত্যেকটি প্রাণী বা সৃষ্টিই প্রতিপালিত হওয়ার মুখাপেক্ষী, তাই সে অন্যের প্রকৃত প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে পারে না।

اَلْعَالَمِيْنَ শব্দটি **عَالَم** শব্দের বহুবচন। এতে পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত। যথা— আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, তারকা-নক্ষত্ররাজি, বিজলী, বৃষ্টি, ফেরেশতাকুল, জ্বীন, জমীন এবং এতে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে। জীবজন্তু, মানুষ, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব **رَبِّ الْعَالَمِيْنَ** এর অর্থ হচ্ছে— আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির পালনকর্তা। তাছাড়া একথাও চিন্তার উদ্বেগ নয় যে, আমরা যে দুনিয়াতে বসবাস করছি এর মধ্যেও কোটি কোটি সৃষ্টবস্তু রয়েছে। এ সৃষ্টিগুলোর মধ্যে যা কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং যা আমরা দেখি না সে সবগুলোই এক একটা আলম বা জগত।

তাছাড়া আরো কোটি কোটি সৃষ্টি রয়েছে, যা সৌরজগতের বাইরে, যা আমরা অবলোকন করতে পারি না। ইমাম রাযী তফসীরে-কবীরে লিখেছেন যে, এ সৌরজগতের বাইরে আরো সীমাহীন জগত রয়েছে। যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত এবং একথা সর্বজনবিদিত যে, সকল বস্তুই আল্লাহর ক্ষমতার অধীন। সুতরাং তাঁর জন্য সৌরজগতের অনুরূপ আরো সীমাহীন কতকগুলো জগত সৃষ্টি করে রাখা অসম্ভব মোটেই নয়।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, **رَبِّ الْعَالَمِيْنَ** - এর নিখুঁত প্রতিপালন নীতিই পূর্বের ব্যাক্য **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** -এর দলীল বা প্রমাণ। সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালনের দায়িত্ব একই পবিত্র সত্তার; তাই তারিফ-প্রশংসারও প্রকৃত প্রাপক তিনিই; অন্য কেউ নয়। এজন্য প্রথম আয়াত **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ** -এ তারিফ-প্রশংসার সাথে ঈমানের প্রথম স্তম্ভ আল্লাহ তা'আলার একত্ব বা তওহীদের কথা অতি সূক্ষ্মভাবে এসে গেছে।

দ্বিতীয় আয়াতে তাঁর গুণ, দয়ার প্রসঙ্গ **رَحِيْمٌ وَرَحْمٰنٌ** শব্দদ্বয়ের দ্বারা বর্ণনা করেছেন। উভয় শব্দই 'গুণের আধিক্যবোধক বিশেষণ' যাতে আল্লাহর দয়ার অসাধারণত্ব ও পূর্ণতার কথা বুঝায়। এ স্থলে এ গুণের উল্লেখ সম্ভবতঃ এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা যে সমগ্র সৃষ্টিজগতের লালন-পালন ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এতে তাঁর নিজস্ব কোন প্রয়োজন নেই বা অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েও নয়; বরং তাঁর রহমত বা দয়ার তাগিদেই করেছেন। যদি

সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্বও না থাকে, তাতেও তাঁর কোন লাভ-ক্ষতি নেই, আর যদি সমগ্র সৃষ্টি অবাধ্যও হয়ে যায় তবে তাতেও তাঁর কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ

—এর অর্থ কোন বস্তুর উপর এমন অধিকার থাকে, যাকে ব্যবহার, রদবদল, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সব কিছু করার সকল অধিকার থাকবে। مَالِكِ অর্থ প্রতিদান দেয়া।

এর শাব্দিক অর্থ প্রতিদান-দিবসের মালিক বা অধিপতি। অর্থাৎ, প্রতিদান - দিবসের অধিকার ও আধিপত্য কোন বস্তুর উপরে হবে, তার কোন বর্ণনা দেয়া হয়নি। তফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে যে, এতে ‘আম’ বা অর্থের ব্যাপকতার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিদান-দিবসে সকল সৃষ্টিরাঞ্জি ও সকল বিষয়ই আল্লাহ তা’আলার অধিকারে থাকবে।

প্রতিদান-দিবসের স্বরূপ ও তার প্রয়োজনীয়তা : প্রথমতঃ প্রতিদান দিবস কাকে বলে এবং এর স্বরূপ কি? দ্বিতীয়তঃ সমগ্র সৃষ্টির উপর প্রতিদান-দিবসে যেমনিভাবে আল্লাহ তা’আলার একক অধিকার থাকবে, অনুরূপভাবে আজও সকল কিছুর উপর তাঁরই তো একক অধিকার রয়েছে; সুতরাং প্রতিদান-দিবসের বৈশিষ্ট্য কোথায়?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, প্রতিদান-দিবস সে দিনকেই বলা হয়, যেদিন আল্লাহ তা’আলা ভাল-মন্দ সকল কাজ-কর্মের প্রতিদান দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। রোযে-জাযা শব্দ দ্বারা বোঝান হয়েছে যে, দুনিয়া ভাল-মন্দ কাজ-কর্মের প্রকৃত ফলাফল পাওয়ার স্থান নয়; বরং এটি হল কর্মস্থল; কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জায়গা। যথার্থ প্রতিদান বা পুরস্কার গ্রহণেরও স্থান এটা নয়। এতে একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, পৃথিবীতে কারও অর্থ-সম্পদের আধিক্য ও সুখ-শান্তির ব্যাপকতা দেখে বলা যাবে না যে, এ লোক আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়েছেন বা তিনি আল্লাহর প্রিয়পাত্র। অপর পক্ষে কাকেও বিপদাপদে পতিত দেখেও বলা যাবে না যে, তিনি আল্লাহর অভিশপ্ত। যেমনি করে কর্মস্থলে বা কারখানার কোন কোন লোককে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যস্ত দেখে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে বিপদগ্রস্ত বলে ভাবে না; বরং সে এ ব্যস্ততাকে জীবনের সাফল্য বলেই গণ্য করে এবং যদি কেহ অনুগ্রহ করে তাকে এ ব্যস্ততা থেকে রেহাই দিতে চায়, তবে তাকে সে সবচেয়ে বড় ক্ষতি বলে মনে করে। সে তার এ ত্রিশ দিনের পরিশ্রমের অন্তরালে এমন এক আরাম দেখতে পায়, যা তার বেতনস্বরূপ সে লাভ করে।

এ জনাই নবীগণ এ দুনিয়ার জীবনে সর্বপেক্ষা বেশী বিপদাপদে পতিত হয়েছেন এবং তারপর ওলী-আওলিয়াগণ সবচেয়ে অধিক বিপদে পতিত হন। কিন্তু দেখা গেছে, বিপদের তীব্রতা যত কঠিনই হোক না কেন, দৃঢ়পদে তাঁরা তা সহ্য করেছেন। এমনকি আনন্দিত চিত্তেই তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন। মোটকথা, দুনিয়ার আরাম আয়েশকে সত্যবাদিতা ও সঠিকতা এবং বিপদাপদকে খারাপ কাজের নিদর্শন বলা যায় না।

অবশ্য কখনো কোন কোন কর্মের সামান্য ফলাফল দুনিয়াতেও প্রকাশ করা হয় বটে, তবে তা সেকাজের পূর্ণ বদলা হতে পারে না। এগুলো সাময়িকভাবে সতর্ক করার জন্য একটু নিদর্শন মাত্র।

مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ

বাক্যটিতে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই একথা জানেন যে, সেই একক সত্তাই প্রকৃত মালিক, যিনি সমগ্র জগতকে সৃষ্টি করেছেন এবং এর লালন-পালন ও বর্ধনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং যার মালিকানা পূর্ণরূপে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই

সর্বাবস্থায় পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ— প্রকাশ্যে, গোপনে, জীবিতাবস্থায় ও মৃতাবস্থায় এবং যার মালিকানার আরম্ভ নেই, শেষও নেই। এ মালিকানার সাথে মানুষের মালিকানা তুলনাযোগ্য নয়। কেননা, মানুষের মালিকানা আরম্ভ ও শেষের চৌহদ্দীতে সীমাবদ্ধ। এক সময় তা ছিল না; কিছু দিন পরেই তা থাকবে না। অপরদিকে মানুষের মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য। বস্তুর বাহ্যিক দিকের উপরই বর্তায়; গোপনীয় দিকের ওপর নয়। জীবিতের ওপর; মৃতের ওপর নয়। এজন্যই প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তা’আলার মালিকানা কেবলমাত্র প্রতিদান দিবসেই নয়, বরং পৃথিবীতেও সমস্ত সৃষ্টজগতের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা’আলা। তবে এ আয়াতে আল্লাহ তা’আলার মালিকানা বিশেষভাবে প্রতিদান দিবসের এ কথা বলার তাৎপর্য কি? আল-কোরআনের অন্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, যদিও দুনিয়াতেও প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ তা’আলারই, কিন্তু তিনি দয়াপরবশ হয়ে আর্থিক বা ক্ষণস্থায়ী মালিকানা মানবজাতিকেও দান করেছেন এবং পার্শ্বব জীবনের আইনে এ মালিকানার প্রতি সম্মানও দেখানো হয়েছে। বিশুচরাচরে মানুষ ধন-সম্পদ, জায়গা-জমি, বাড়ী-ঘর এবং আসবাব-পত্রের ক্ষণস্থায়ী মালিক হয়েও এতে একেবারে ডুবে রয়েছে। আল্লাহ তা’আলা مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ একথা ঘোষণা করে এ অহংকারী ও নিবোধ মানব-সমাজকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তোমাদের এ মালিকানা, আধিপত্য ও সম্পর্ক মাত্র কয়েক দিনের এবং ক্ষণিকের। এমন দিন অতি সত্ত্বরই আসছে, যে দিন কেউই জাহেরী মালিকও থাকবে না, কেউ কারো দাস বা কেউ কারো সেবা পাবার উপযোগীও থাকবে না। সমস্ত বস্তুর মালিকানা এক ও একক সত্তার হয়ে যাবে।

সূরা আল-ফাতিহার প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সূরার প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহর প্রশংসা ও তারীফের বর্ণনা করা হয়েছে এবং এর তফসীরে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, তা’রীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে ঈমানের মৌলিক নীতি ও আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনাও সুস্ভাভাবে দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতের তফসীরে আপনি অবগত হলেন যে, এর দু’টি শব্দে তারীফ ও প্রশংসার সাথে সাথে ইসলামের বিপ্লবাত্মক মহোত্তম আকীদা যথা কিয়ামত ও পরকালের বর্ণনা প্রমাণসহ উপস্থিত করা হয়েছে।

এখন চতুর্থ আয়াতের বর্ণনা : اِنَّكَ تَعْبُدُ اِيَّاكَ تَسْعُوْنِ এ আয়াতের এক অংশে তা’রীফ ও প্রশংসা এবং অপর অংশে দোয়া ও প্রার্থনা। تَعْبُدُ — عبادت শব্দ থেকে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে : কারো প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দরুন তাঁর নিকট নিজের আন্তরিক কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা। تَسْعُوْنِ — استعانت হতে গঠিত। এর অর্থ হচ্ছে কারো সাহায্য প্রার্থনা করা। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, ‘আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করি।’ মানবজীবন তিনটি অবস্থায় অতিবাহিত হয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। পূর্বের তিনটি আয়াতের মধ্যে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ এবং الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এ দু’টি আয়াতে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, অতীতে সে কেবল মাত্র আল্লাহ তা’আলার মুখাপেক্ষী ছিল, বর্তমানেও সে একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী। অস্তিত্বহীন এক অবস্থা থেকে

তিনি তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন।

তাকে সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর আকার-আকৃতি এবং বিবেক ও বুদ্ধি দান করেছেন। বর্তমানে তার লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের নিয়মিত সুব্যবস্থাও তিনিই করেছেন। অতঃপর **مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ** -এর মধ্যে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতেও সে আল্লাহ তা'আলারই মুখাপেক্ষী। প্রতিদান দিবসে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য পাওয়া যাবে না।

প্রথম তিনটি আয়াতের দ্বারা যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, মানুষ তার জীবনের তিনটি কালেই একান্তভাবে আল্লাহর মুখাপেক্ষী, তাই সাধারণ যুক্তির চাহিদাও এই যে, ইবাদতও তাঁরই করতে হবে। কেননা, ইবাদত যেহেতু অশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে নিজের অক্ষুরস্ত কাকুতি-মিনতি নিবেদন করার নাম, সুতরাং তা পাওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোন সত্তা নেই। ফলকথা এই যে, একজন বুদ্ধিমান ও বিবেকবান ব্যক্তি মনের গভীরতা থেকেই এ স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি উচ্চারণ করছে যে, আমরা তোমাকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করি না। এ মৌলিক চাহিদাই **إِلَّا تَعْبُدَ** তে বর্ণনা করা হয়েছে।

যখন স্থির হলো যে, অভাব পূরণকারী একক সত্তা আল্লাহ তা'আলা, সুতরাং নিজের যাবতীয় কাজে সাহায্যও তাঁর নিকটই প্রার্থনা করবে। এ মৌলিক চাহিদারই বর্ণনা **وَأِلَّا تَسْتَعِينُ** এ করা হয়েছে। মোটকথা, এ চতুর্থ আয়াতে একদিকে আল্লাহর তা'আলারই ও প্রশংসার সাথে একশ্রাবণ ও স্বীকৃতি রয়েছে যে, ইবাদত ও শ্রদ্ধা পাওয়ার একমাত্র তিনিই যোগ্য। অপরদিকে তাঁর নিকট সাহায্য ও সহায়তার প্রার্থনা করা এবং তৃতীয়তঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করার শিক্ষাও দেয়া হয়েছে। এতদসঙ্গে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, কোন বান্দাই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোও অভাব পূরণকারী মনে করবে না। অপর কারো নিকট প্রার্থনার হাত প্রসারিত করা যাবে না। অবশ্য কোন নবী বা কোন গুলীর বরাত দিয়ে প্রার্থনা করা এ আয়াতের মর্মবিরোধী নয়।

এ আয়াতে এ বিষয়ও চিন্তা করা কর্তব্য যে, 'আমরা তোমারই নিকট সাহায্য চাই।' কিন্তু কোন কাজের সাহায্য চাই, তার কোন উল্লেখ নেই। জমহুর মুফাসসিরীদের অভিমত এই যে, নির্দিষ্ট কোন ব্যাপারে সাহায্যের কথা উল্লেখ না করে আ'ম বা সাধারণ সাহায্যের প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, আমি আমার ইবাদত এবং প্রত্যেক ধর্মীয় ও পার্শ্বিক কাজে এবং অন্তরে পোষিত প্রতিটি আশা-আকাঙ্ক্ষায় কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

শুধু নামায রোযারই নাম ইবাদত নয়। ইমাম গায্বালী স্বীয় গ্রন্থ আরবাব্বিন-এ দশ প্রকার ইবাদতের কথা লিখেছেন। যথা - নামায, যাকাত, রোযা, কোরআন তিলাওয়াত, সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণ, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা, প্রতিবেশী এবং সাধীদের প্রাপ্য পরিশোধ করা, মানুষকে সংকাজের আদেশ ও খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার উপদেশ দেয়া, রসুলের সুন্নত পালন করা।

একই কারণে ইবাদতে আল্লাহর সাথে কাকেও অংশীদার করা চলে না। এর অর্থ হচ্ছে, কারো প্রতি ভালবাসা, আল্লাহর প্রতি ভালবাসার

সমতুল্য হবে না। কারো প্রতি ভয়, কারো প্রতি আশা-আকাঙ্ক্ষা পোষণ আল্লাহর ভয় ও তাঁর প্রতি পোষিত আশা-আকাঙ্ক্ষার সমতুল্য হবে না। আবার কারো ওপর একান্ত ভরসা করা, কারো আনুগত্য ও খেদমত করা, কারো কাজকে আল্লাহর ইবাদতের সমতুল্য আবশ্যকীয় মনে করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে মানত করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে স্বীয় কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করা এবং যে কাজে অন্তরের আবেগ-আকৃতি প্রকাশ পায়, এমন কাজ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা- যথা রুকু বা সেজদা করা ইত্যাদি কোন অবস্থাতেই বৈধ হবে না।

শেষ তিনটি আয়াতে মানুষের দোয়া ও আবেদনের বিষয়বস্তু এবং এক বিশেষ প্রার্থনাপদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে—

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

অর্থঃ, 'আমাদিগকে সরল পথ দেখাও; সে সমস্ত মানুষের পথ, যারা তোমার অনুগ্রহ লাভ করেছে। যে পথে তোমার অভিশপ্ত বান্দারা চলেছে সে পথ নয় এবং ঐ সমস্ত লোকের রাস্তাও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।'

এ তিনটি আয়াতে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন, সরল পথের হেদায়েতের জন্য যে আবেদন এ আয়াতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, এর আবেদনকারী যেমনিভাবে সাধারণ মানুষ, সাধারণ মুমিনগণ, তেমনি আওলিয়া, গাউস-কুতুব এবং নবী-রসুলগণও বটে। নিঃসন্দেহে যারা হেদায়েত প্রাপ্ত, বরং অন্যের হেদায়েতের উৎসস্বরূপ, তাঁদের পক্ষে পুনরায় সে হেদায়েতের জন্যই বারবার প্রার্থনা করার উদ্দেশ্য কি? এ প্রশ্নের উত্তর হেদায়েত শব্দের তাৎপর্য পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করার ওপরে নির্ভরশীল।

ইমাম রাগেব ইস্ফাহানী 'মুফরাদাতুল-কোরাআনে' হেদায়েত শব্দের অতি সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এর সারমর্ম হচ্ছে— 'কাউকে গন্তব্যস্থানের দিকে অনুগ্রহের সাথে পথ প্রদর্শন করা'। তাই হেদায়েত করা প্রকৃত প্রস্তাবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই কাজ এবং এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। হেদায়েতের একটি স্তর হচ্ছে সাধারণ ও ব্যাপক। এতে সমগ্র সৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত। জড়পদার্থ, উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগৎ পর্যন্ত এর আওতাধীন। প্রসঙ্গতঃ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রাণহীন জড়পদার্থ বা ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে হেদায়েতের সম্পর্ক কোথায়?

কোরআনের শিক্ষায় স্পষ্টতঃই এ তথ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, এমনকি প্রতিটি অপূ-পরমাণু পর্যন্ত নিজ নিজ অবস্থানমুযায়ী প্রাণ ও অনুভূতির অধিকারী। স্ব-স্ব পরিমণ্ডলে প্রতিটি বস্তুর বুদ্ধি-বিবেচনা রয়েছে। অবশ্য এ বুদ্ধি ও অনুভূতির তারতম্য রয়েছে। কোনটাতে তা স্পষ্ট এবং কোনটাতে নিতান্তই অনুল্লেক্য। যে সমস্ত বস্তুতে তা অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান সেগুলোকে প্রাণহীন বা অনুভূতিহীন বলা যায়। বুদ্ধি ও অনুভূতির ক্ষেত্রে এ তারতম্যের জন্যই সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষ ও জ্বিন জাতিকেই শরীয়তের হুকুম-আহকামের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। কারণ, সৃষ্টির এ দু'টি স্তরের মধ্যেই বুদ্ধি ও অনুভূতি পূর্ণ মাত্রায় দেয়া হয়েছে। কিন্তু, তাই বলে একথা বলা যাবে না যে, একমাত্র মানুষ ও জ্বিন জাতি ছাড়া সৃষ্টির অন্য কোন কিছু মধ্যে বুদ্ধি

ও অনুভূতির অস্তিত্ব নেই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন :

وَلَنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعِيشُهُمْ حَيَاتَهُ الْكَافَّةَ وَلَئِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا تَعْلَمُونَهُ سُبْحَانَكَ

অর্থ— এমন কোন বস্তু নেই যা আল্লাহর প্রশংসার তসবীহ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ বুঝতে পার না। (সূরা বনী-ইসরাঈল)

সূরা নূর এরশাদ হয়েছে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْئَلُهُ لِمَ مَنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالظَّالِمُ ضَلُّوا كُلُّ ذِي
عِلْمٍ صِلَانَهُ وَتَحِيَّتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

অর্থ— ‘তোমরা কি জান না যে, আসমান-জমিনে যা কিছু রয়েছে, সকলেই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা ও গুণগান করে? বিশেষতঃ পাকীকুল যারা দু’পাখা বিস্তার করে শূন্যে উড়ে বেড়ায়, তাদের সকলেই স্ব-স্ব দোয়া তসবীহ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আল্লাহ তা'আলাও ওদের তসবীহ সম্পর্কে খবর রাখেন।’

একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ তা'আলার পরিচয়ের ওপরই তাঁর তারীফ ও প্রশংসা নির্ভরশীল। আর এ কথাও স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহর পরিচয় লাভ করাই সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞান। এটা বুদ্ধি-বিবেক ও অনুভূতি ব্যতীত সম্ভব নয়। কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই প্রাণ ও জীবন আছে এবং বুদ্ধি ও অনুভূতি রয়েছে। তবে কোন কোনটির মধ্যে এর পরিমাণ এত অল্প যে, সাধারণ দৃষ্টিতে তা অনুভব করা যায় না। তাই পরিভাষাগতভাবে ওগুলোকে প্রাণহীন ও বুদ্ধিহীন জড়পদার্থ বলা হয়। আর এ জন্যই ওদেরকে শর'য়ী আদেশের আওতাভুক্ত করা হয়নি। গোটা বস্তুজগত সম্পর্কিত এ মীমাংসা আল-কোরআনে সে যুগেই দেয়া হয়েছিল, যে যুগে পৃথিবীর কোথায়ও আধুনিক কালের কোন দার্শনিকও ছিল না, দর্শনবিদ্যার কোন পুস্তকও রচিত হয়নি। পরবর্তী যুগের দার্শনিকগণ এ তথ্যের যথার্থতা স্বীকার করেছেন এবং প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যেও এ মত পোষণ করার মত অনেক লোক ছিল। মোটকথা, আল্লাহর হেদায়েতের এ প্রথম স্তরে সমস্ত সৃষ্টিজগত যথা— জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, প্রাণীজগৎ, মানবমন্ডলী ও জ্বিন প্রভৃতি সকলেই অন্তর্ভুক্ত। এ সাধারণ হেদায়েতের উল্লেখই আল-কোরআনের

أَسْمَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ تَعْلَمُ هَذِي

হয়েছে।

অর্থ, যিনি সমস্ত সৃষ্টিজগতের জন্য বিশেষ অভ্যাস এবং বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব নিধারণ করেছেন এবং সে মেযাজ ও দায়িত্বের উপযোগী হেদায়েত দান করেছেন। এ ব্যাপারে হেদায়েতের পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুই অতি নিপুণভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে চলেছে। যে বস্তুকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সেই কাজ অত্যন্ত গুরুত্ব ও নৈপুণ্যের সাথে পালন করছে। যথা — মুখ হতে নির্গত শব্দ নাক বা চক্ষু কেউই শ্রবণ করতে পারে না, অথচ এ দু'টি মুখের নিকটতম অঙ্গ। পক্ষান্তরে এ দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা যেহেতু কানকে অর্পণ করেছেন, তাই একমাত্র কানই মুখের শব্দ শ্রবণ করে ও

বোঝে। অনুকূপভাবে কান দ্বারা দেখা বা ঘ্রাণ লওয়ার কাজ করা চলে না। নাক দ্বারা শ্রবণ করা বা দেখার কাজও চলে না।

হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তর এর তুলনায় অনেকটা সংকীর্ণ। অর্থ, সে সমস্ত বস্তুর সাথে জড়িত, পরিভাষায় যাদেরকে বিবেকবান বুদ্ধিসম্পন্ন বলা হয়। অর্থ— মানুষ এবং জ্বিন জাতি। এ হেদায়েত নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌঁছেছে। কেউ এ হেদায়েতকে গ্রহণ করে মুমিন হয়েছে আবার কেউ একে প্রত্যাখান করে কাফির-বে-দ্বীনে পরিণত হয়েছে।

হেদায়েতের তৃতীয় স্তর আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তা শুধু মু'মিন ও মুস্তাকী বা ধর্মভীরুদের জন্য। এ হেদায়েত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন প্রকাশ মাধ্যম ব্যতীতই মানুষকে প্রদান করা হয়। এরই নাম তওকীক। অর্থ, এমন অবস্থা, পরিবেশ ও মনোভাব সৃষ্টি করে দেয়া যে, তার ফলে কোরআনের হেদায়েতকে গ্রহণ করা এবং এর ওপর আমল করা সহজসাধ্য হয় এবং এর বিরুদ্ধাচরণ কঠিন হয়ে পড়ে। এ তৃতীয় স্তরের পরিসীমা অতি ব্যাপক। এ স্তরই মানবের উন্নতির ক্ষেত্র। নেক কাজের সাথে এ হেদায়েতের বৃদ্ধি হতে থাকে। কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ বৃদ্ধির উল্লেখ রয়েছে :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ صُرُوفًا

অর্থ— ‘যারা আমার পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে, আমি তাদেরকে আমার পথে আরো অধিকতর অগ্রসর হওয়ার পথ অবশ্যই দেখিয়ে থাকি।’ এটি সেই কর্মক্ষেত্র যেখানে নবী-রসূল এবং বড় বড় গুলী-আওলিয়া, কুতুবগণকেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আরো অধিকতর হেদায়েত ও তওকীকের জন্য চেষ্টায় রত থাকতে দেখা গেছে।

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, হেদায়েত এমন এক বস্তু যা সকলেই লাভ করেছে এবং এর আধিক্য লাভ করার জন্য বড় হতে বড় ব্যক্তির পক্ষেও কোন বাধা-নিষেধ নেই। এজন্যই সূরা আল-ফাতেহায় গুরুত্বপূর্ণ দোয়ায় হেদায়েত প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। যা একজন সাধারণ মুমিনের জন্যও উপযোগী, আবার একজন বড় হতে বড় রসূলের জন্যও উপযোগী। এজন্যই হযরত রসূল আকরাম (সঃ)-এর শেষ জীবনে সূরা ফাতিহাত মক্কাবিজয়ের ফলাফল বর্ণনা করতে গিয়ে একথাও বলা হয়েছে যে,

وَهَدَيْتُكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

অর্থ, মক্কা বিজয় এজন্যই আপনার দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে যাতে সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত লাভ হয়।

রসূলুল্লাহ (সঃ) কেবল নিজেই হেদায়েতপ্রাপ্ত ছিলেন না ; বরং অন্যের জন্যও ছিলেন হেদায়েতের উৎস। এমতাবস্থায় তাঁর হেদায়েত লাভের একমাত্র অর্থ হতে পারে, এ সময় হেদায়েতের কোন উচ্চতর অবস্থা তিনি লাভ করেছেন।

হেদায়েতের এ ব্যাখ্যা পবিত্র কোরআন বুঝবার ক্ষেত্রে যে সব ফায়দা প্রদান করবে সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ :

(এক) পবিত্র কোরআনের কোথাও কোথাও মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবার জন্যই হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও শুধুমাত্র মুস্তাকীদের জন্য বিশেষ অর্থে হেদায়েত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতদ্বারা অল্প লোকদের পক্ষে সন্দেহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় কিন্তু হেদায়েতের সাধারণ ও বিশেষ স্তরসমূহ জানার পর এ সন্দেহ

আপনা-আপনিতেই দূরীভূত হয়ে যাবে। বুঝতে হবে যে, কারো বেলায় ব্যাপক অর্থে এবং কারো বেলায় বিশেষ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

(দুই) আল-কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এরশাদ হয়েছে যে, জালাম ও ফাসেকদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়েত দান করেন না। অন্যত্র বারবার এরশাদ হয়েছে যে, তিনি সকলকেই হেদায়েত দান করেন। এর উত্তরও হেদায়েতের স্তরসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলে দেয়া হয়েছে যে, হেদায়েতের ব্যাপক অর্থে সকলেই হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং বিশেষ অর্থে জালাম ও ফাসেকরা বাদ পড়েছে।

(তিন) হেদায়েতের তিনটি স্তরের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় স্তর সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ পর্যায়ের হেদায়েত একান্তভাবে একমাত্র তাঁরই কাজ। এতে নবী-রসূলগণেরও কোন অধিকার নেই। নবী-রসূলগণের কাজ শুধু হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরে সীমিত। কোরআনের যেখানে যেখানে নবী-রসূলগণকে হেদায়েতকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হেদায়েতের দ্বিতীয় স্তরের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে। আর যেখানে এরশাদ হয়েছে : **إِنَّكَ لَأَكْفِي ذِي مَنَاجِي** অর্থাৎ, আপনি যাকে চাইবেন তাকেই হেদায়েত করতে পারবেন না — এতে হেদায়েতের তৃতীয় স্তরের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, কাউকে তওফীক দান করা আপনার কাজ নয়।

মোটকথা, **إِمْدَانِ الْوَسْطِ السَّقِيمِ** একটি ব্যাপক ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দোয়া, যা মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মানবসমাজের কোন ব্যক্তিই এর আওতার বাইরে নেই। কেননা, সরল-সঠিক পথ ব্যতীত দ্বীন-দুনিয়া কোনটিরই উন্নতি ও সাফল্য সম্ভব নয়। দুনিয়ার আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যেও সিরাত-মুস্তাকীমের প্রার্থনা পরশপাথরের ন্যায়, কিন্তু মনুষ্য তা লক্ষ্য করে না। আয়াতের অর্থ হচ্ছে—‘আমাদিগকে সরল পথ দেখিয়ে দিন।’

সরল পথ কোনটি? ‘সোজা সরল রাস্তা’ সে পথকে বলে, যাতে কোন মোড় বা ঘোরপ্যাঁচ নেই। এর অর্থ হচ্ছে, ধর্মের সে রাস্তা যাতে ‘ইফরাত বা তফরীত’ এর-অবকাশ নেই। ইফরাতের অর্থ সীমা অতিক্রম করা এবং তফরীত অর্থ মজ্জিমত কাট-ছাট করে নেয়া। এরশাদ হয়েছে :

وَصِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ, যে সকল লোক আপনার অনুগ্রহ লাভ করেছে তাদের রাস্তা। যে সকল ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেছে, তাদের পরিচয় অন্য একটি আয়াতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْقِدِّينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالصَّالِحِينَ

অর্থাৎ — যাদের প্রতি আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন, নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎকর্মশীল সালেহীন। আল্লাহর দরবারে মকবুল উপরোক্ত লোকদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর নবীগণের। অতঃপর নবীগণের উম্মতের মধ্যে যারা সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী, তাঁরা হলেন সিদ্দীক। যাদের মধ্যে রূহানী কামালিয়াত ও পরিপূর্ণতা রয়েছে, সাধারণ ভাষায় তাঁদেরকে ‘আওলিয়া’ বলা হয়। আর যারা দ্বীনের প্রয়োজনে স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন, তাঁদেরকে বলা হয় শহীদ। আর সালেহীন

হচ্ছেন যারা ওয়াজিব-মুস্তাহাব প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ও আমলকারী। সাধারণ পরিভাষায় এদেরকে দ্বীনদার বলা হয়।

এ আয়াতের প্রথম অংশে ইতিবাচক বাক্য ব্যবহার করে সরল পথের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরোক্ত চার স্তরের মানুষ যে পথে চলেছেন তাই সরল পথ। পরে শেষ আয়াতে নেতিবাচক বাক্য ব্যবহার করেও এর সমর্থন করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

অর্থাৎ, যারা আপনার অভিসম্পত্তগ্রস্ত তাদের পথ নয় এবং তাদের পথও নয়, যারা পথহারা হয়েছে।

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ বলতে ঐ সকল লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা ধর্মের হুকুম-আহকামকে বুঝে-জানে, তবে স্বীয় অহমীকা ও ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যারা আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ মান্য করতে গাফলতি করেছে। যেমন, সাধারণভাবে ইহুদীদের নিয়ম ছিল, সামান্য স্বার্থের জন্য দ্বীনের নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে তারা নবী-রসূলগণের অবমাননা পর্যন্ত করতে দ্বিধাবোধ করত না। **ضَالِّينَ** — তাদেরকে বলা হয়, যারা না বুঝে অজ্ঞতার দরুন ধর্মীয় ব্যাপারে ভুল পথের অনুসারী হয়েছে এবং ধর্মের সীমালঙ্ঘন করে অতিরঞ্জন পথে অগ্রসর হয়েছে। যথা-নাসারাগণ। তারা নবীর শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদানের নামে এমনি বাড়াবাড়ি করেছে যে, নবীদিগকে আল্লাহর স্থানে উন্নীত করে দিয়েছে। ইহুদীদের বেলায় এটা অন্যান্য এজন্য যে, তারা আল্লাহর নবীদের কথা মানেনি; এমনকি তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে। অপরদিকে নাসারাগণের বেলায় অতিরঞ্জন হচ্ছে এই যে, তারা নবীদিগকে আল্লাহর পর্যায়ে পৌছিয়ে দিয়েছে।

আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে— আমরা সে পথ চাই না, যা নফসানী উদ্দেশ্যের অনুগত হয় এবং মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে ও ধর্মের মধ্যে সীমালঙ্ঘনের প্রতি প্ররোচিত করে। সে পথও চাই না, যে পথ অজ্ঞতা ও মুর্থতার দরুন ধর্মের সীমারেখা অতিক্রম করে এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সোজা-সরল পথ চাই যার মধ্যে না অতিরঞ্জন আছে, আর না কম-কছুরী আছে এবং যা নফসানী প্রভাব ও সল্ফের উর্ধ্বে।

সূরা আল-ফাতিহার আয়াত সাতটির তফসীর শেষ হয়েছে। এখন সমগ্র সূরার সারমর্ম হচ্ছে এই দোয়া— ‘হে আল্লাহ্! আমাদিগকে সরল পথ দান করুন। কেননা, সরল পথের সন্ধান লাভ করাই সবচাইতে বড় জ্ঞান ও সর্বাপেক্ষা বড় কামিয়াবী। বস্তুতঃ সরল পথের সন্ধানে ব্যর্থ হয়েই দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে। অন্যথায় অ-মুসলমানদের মধ্যেও সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করার আগ্রহ-আকৃতির অভাব নেই। এজন্যই কোরআন পাকে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় পদ্ধতিতেই সিরাত-মুস্তাকীমের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

দোয়া করার পদ্ধতি : এ সূরায় একটা বিশেষ ধরনের বর্ণনাত্মক মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যখন আল্লাহর নিকট কোন দোয়া বা কোন আকৃতি পেশ করতে হয়, তখন প্রথমে তাঁর তা'রীফ কর, তাঁর দোয়া সীমাহীন নেয়ামতের স্বীকৃতি দাও। অতঃপর একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কাকেও দাতা ও অভাব পূরণকারী মনে করো না কিংবা অন্য কাকেই এবাদতের যোগ্য বলে স্বীকার করো না। অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্যের জন্য আরম্ভ পেশ কর। এ নিয়মে যে দোয়া করা হয়, তা কবুল হওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আশা করা যায়। দোয়া করতেও এমন ব্যাপক পদ্ধতি অবলম্বন

কর, যাতে মানুষের সকল মকসুদ তার অন্তর্ভুক্ত থাকে। যথা, সরল পথ লাভ করা এবং দুনিয়ার যাবজ্জীয় কাজে সরল-সঠিক পথ পাওয়া, যাতে কোথাও কোন ক্ষতি বা পদশূলনের আশংকা না থাকে। যেটুকু, এখানে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর তা'রীফ-প্রশংসা করার প্রকৃত উদ্দেশ্যই হল মানবকুলকে শিক্ষা দেয়া।

আল্লাহর তা'রীফ-প্রশংসা করা মানুষের মৌলিক দায়িত্ব : এ সূরার প্রথম বাক্যে আল্লাহর তা'রীফ বা প্রশংসা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তা'রীফ বা প্রশংসা সাধারণতঃ কোন গুণের বা প্রতিদানের পরিশ্রেক্ষিতে উল্লেখ হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে কোন গুণের বা প্রতিদানের উল্লেখ নেই। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর নেয়ামত অগণিত। কোন মানুষ এর পরিমাপ করতে পারে না। কোরআনে এরশাদ হয়েছে : **وَلَا تَدْرِي لَعْنَتُ اللَّهِ لَكُمُ الْفُتُورَ** অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতের গণনা করতে চাও, তবে তা পারবে না। মানুষ যদি সারা বিশৃঙ্খল হতে মুখ ফিরিয়ে শুধুমাত্র নিজের অস্তিত্বের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তবে বুঝতে পারবে যে, তার দেহই এমন একটি ক্ষুদ্র জগত যাতে বৃহৎ জগতের সকল নিদর্শন বিদ্যমান। তার দেহ যমীন তুলা। কেশরাজি উদ্ভিদ তুলা। তার হাড়গুলো পাহাড়ের মত এবং শিরা-উপশিরা যাতে রক্ত চলাচল করে, সেগুলো নদী-নালা বা সমুদ্রের নমুনা। দু'টি বস্তুর সংমিশ্রণে মানুষের অস্তিত্ব। একটি দেহ ও অপরটি আত্মা। এ কথাও স্বীকৃত যে, মানবদেহে আত্মা সর্বাপেক্ষা উত্তম অংশ আর তার দেহ হচ্ছে আত্মার অনুগত এবং অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের অধিকারী। এ নিকৃষ্ট অংশের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকারী চিকিৎসকগণ বলেছেন যে, মানবদেহে আল্লাহ তা'আলা পাঁচ হাজার প্রকার উপাদান রেখেছেন। এতে তিন শতেরও অধিক জোড়া রয়েছে। প্রত্যেকটি জোড়া আল্লাহর কুদরতে এমন সুন্দর ও মজবুতভাবে দেয়া হয়েছে যে, সর্বদা নড়া-চড়া করা সম্ভব ও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না এবং কোন প্রকার মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ মানুষের বয়স ষাট-সত্তর বছর হয়ে থাকে। এ দীর্ঘ সময় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সর্বদা নড়াচড়া করছে, অথচ এর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন—

عَنِ عَقْلِهِمْ وَشَدَائِمْ أَسْرِهِمْ অর্থাৎ, 'আমিই মানুষকে সৃষ্টি

করেছি এবং আমিই তাদের জোড়াগুলোকে মজবুত করেছি।' এ কুদরতী মজবুতির পরিণাম হয়েছে এই যে, সাধারণভাবে তা অত্যন্ত নরম ও নড়বড়ে অথচ এ নড়বড়ে জোড়া সত্ত্বর বছর বা এর চাইতে অধিক সময় পর্যন্ত কর্মরত থাকে। মানুষের অঙ্গগুলোর মধ্য শুধু চক্ষুর কথাই চিন্তা করলে দেখা যাবে, এতে আল্লাহ তা'আলার অসাধারণ হেকমত প্রকাশিত হয়েছে। সারা জীবন সাধনা করেও এ রহস্যটুকু উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

এ চোখের এক পলকের কার্যক্রম লক্ষ্য করলে বুঝতে পারা যাবে যে, এর এক মিনিটের কার্যক্রমে আল্লাহ তা'আলার কত নেয়ামত যে কাজ করছে, তা ভেবে অবাক হতে হয়। কেননা চক্ষু খুলে এ দ্বারা কত বস্তুকে সে দেখছে। এতে যেভাবে চক্ষুর ভেতরের শক্তি কাজ করছে, অনুরূপভাবে বহির্জগতের সৃষ্টিরাজিও এতে বিশেষ অংশ নিচ্ছে। সূর্যের কিরণ না থাকলে চোখের দৃষ্টিশক্তি কোন কাজ করতে পারে না। সূর্যের জন্য আকাশের প্রয়োজন হয়। মানুষের দেখার জন্য এবং চক্ষু দ্বারা কাজ করার জন্য আহাৰ্য ও বায়ুর প্রয়োজন হয়। এতে বুঝা যায়, চোখের এক

পলকের দৃষ্টির জন্য বিশুর সকল শক্তি ব্যবহৃত হয়। এ তো একবারের দৃষ্টি এখন দিনে কতবার দেখে এবং জীবনে কতবার দেখে তা হিসাব করা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে। এমনভাবে কান, জিহ্বা, হাত ও পায়ের যত কাজ এতে সমগ্র জগতের শক্তি যুক্ত হয়ে কার্য সমাধা হয়। এ তো সে মহা দান যা প্রতিটি জীবিত মানুষ ভোগ করে। এতে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্রের কোন পার্থক্য নেই। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নেয়ামত এমন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে যা প্রতিটি প্রাণী ভোগ করেও উপকৃত হয়। আকাশ-জমিন এবং এ দু'টির মধ্যে সৃষ্ট সকল বস্তু চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বায়ু প্রভৃতি প্রতিটি প্রাণীই উপভোগ করে।

এরপর আল্লাহর বিশেষ দান যা মানুষকে হেকমতের তাকিদে কম-বেশী দেয়া হয়েছে, ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, আরাম-আয়েশ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যদিও একথা অত্যন্ত মৌলিক যে, সাধারণ নেয়ামত যা সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সমভাবে উপভোগ্য; যথা — আকাশ, বাতাস, জমিন এবং বিরাট এ প্রকৃতি, এ সমস্ত নেয়ামত বিশেষ নেয়ামতের (যথা ধন-সম্পদ) তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম। অথচ এসব নেয়ামত সকল মানুষের মধ্যে সমভাবে পরিব্যাপ্ত বলে, এত বড় নেয়ামতের প্রতি মানুষ দৃষ্টিপাত করে না। ভাবে, কি নেয়ামত! বরং আশপাশের সামান্য বস্তু যথা, আহাৰ্য, পানীয়, বসবাসের নির্ধারিত স্থান, বাড়ী-ঘর প্রভৃতির প্রতিই তাদের দৃষ্টি সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ থাকে।

যেটুকু, সৃষ্টিকর্তা মানবজাতির জীবন-ধারণ এবং দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকার সুবিধার্থে যে অক্ষুরস্ত নেয়ামত দান করেছেন, তার অতি অল্পই এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। সেই পরিশ্রেক্ষিতে মানুষের পক্ষে দুনিয়ার জীবনে চোখ মেলেই মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই মহান দাতার প্রশংসায় পক্ষমুখ থাকা ছিল স্বাভাবিক। বলাবাহুল্য যে, মানবজীবনের সে চাহিদার শ্রেক্ষিতে কোরআনের সর্ব প্রথম সূরার সর্বপ্রথম বাক্যে **الْحَمْدُ** ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই মহান সত্তার তা'রীফ ও প্রশংসাকে এবাদতের শীর্ষস্থানে রাখা হয়েছে।

রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন নেয়ামত কোন বান্দাকে দান করার পর যখন সে **الْحَمْدُ لِلَّهِ** বলে, তখন বুঝতে হবে, যা সে পেয়েছে, এ শব্দ তা অপেক্ষা অনেক উত্তম।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি বিশৃ-চরাচরর সকল নেয়ামত লাভ করে এবং সেজন্য সে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে, তবে বুঝতে হবে যে, সারা বিশুর নেয়ামতসমূহ অপেক্ষা তার **الْحَمْدُ** বলা অপেক্ষা অতি উত্তম। — (কুরতুবী)

কোন কোন আলোমের মন্তব্য উদ্ধৃত করে কুরতুবী লিখেছেন যে, মুখে **الْحَمْدُ لِلَّهِ** বলা একটি নেয়ামত এবং এ নেয়ামত সারা বিশুর সকল নেয়ামত অপেক্ষা উত্তম। সহীহ হাদীসে আছে যে, **الْحَمْدُ لِلَّهِ** পরকালের তৌলদগুণ অর্ধেক পরিপূর্ণ করবে।

হযরত শফীক ইবনে ইব্রাহীম **الْحَمْدُ** —এর ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদিগকে কোন নেয়ামত দান করেন, তখন প্রথমে দাতাকে জানো এবং পরে তিনি যা দান করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাক। আর তাঁর দেয়া শক্তি ও ক্ষমতা তোমাদের দেহে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর অবাধ্যতার নিকটেও যেও না।

দ্বিতীয় শব্দ **اللَّهُ**—এর সাথে **لَمْ** বর্ণটি যুক্ত। যাকে আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী **খাস** **لَمْ** বলা হয়। যা কোন আদেশ বা শুণের বিশেষত্ব বুঝায়। এখানে অর্থ হচ্ছে যে, শুধু তারীফ—প্রশংসাই মানবের কর্তব্য। বরং এ তারীফ—প্রশংসা তাঁর অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত। বাস্তব পক্ষে তিনি ব্যতীত এ জগতে অন্য কেউ তারীফ-প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য নয়। এর বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। এতদসঙ্গে এও তাঁর নেয়ামত যে, মানুষকে চরিত্র গঠন শিক্ষাদানের জন্য এ আদেশ দেয়া হয়েছে যে, আমার নেয়ামতসমূহ যে সকল মাধ্যম অতিক্রম করে আসে, সেগুলোরও শুকরিয়া আদায় করতে হবে। আর যে ব্যক্তি এহুসানকারীর শুকরিয়া আদায় করে না সে বাস্তবপক্ষে আল্লাহ তা'আলারও শুকরিয়া করে না।

إِنَّكَ تَعْبُدُ إِلَٰهًا مُّسْتَعِينٌ — এর অর্থ মুফাসসিরকুল—

শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আমরা তোমারই এবাদত করি, তুমি ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করি না। আর তোমারই সাহায্য চাই, তুমি ব্যতীত অন্য কারো সাহায্য চাই না।—(ইবনে জরীর, ইবনে আবি হাতেম)

সলফে-সালেহীনের কেউ কেউ বলেছেন যে, সূরা আল-ফাতেহা কোরআনের সারমর্ম এবং **إِنَّكَ تَعْبُدُ إِلَٰهًا مُّسْتَعِينٌ** সূরা আল-ফাতেহার সারমর্ম। কেননা, এর প্রথম বাক্য রয়েছে শিরক থেকে মুক্তির ঘোষণা এবং দ্বিতীয় বাক্যে তার পরিপূর্ণ শক্তি ও কুদরতের স্বীকৃতি। মানুষ দুর্বল, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোন কিছুই সে করতে পারে না। তাই সকল ব্যাপারে আল্লাহর উপর একান্তভাবে নির্ভর করা ব্যতীত তার গত্যন্তর নেই। এ উপদেশ কোরআনের বিভিন্ন স্থানে দেয়া হয়েছে।

(এক) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এবাদত জ্ঞায়েব নয় : ইতিপূর্বে এবাদতের পরিচয় দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কোন সত্তার অসীমতা, মহত্ত্ব এবং তাঁর প্রতি ভালবাসার ভিত্তিতে, তাঁর সামনে অশেষ কাকুতি-মিনতি পেশ করার নামই এবাদত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে অনুরূপ আচরণ করাই শিরক। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, মূর্তিপূজার মত প্রতীকপূজা বা পাখরের মূর্তিকে ষোদায়ী শক্তির আধার মনে করা বা কারো প্রতি সম্প্রদায় বা ভালবাসা এ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া, যা আল্লাহর জন্য করা হয়, তাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম ঘোষণা করা একমাত্র আল্লাহরই কাজ। যে ব্যক্তি এ কাজে অন্যকে অংশীদার করে, হালাল ও হারাম জ্ঞানা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কথাকে অবশ্য করণীয় মনে করে, তবে প্রকারান্তরে সে তার এবাদতই করে এবং শিরকে পতিত হয়। সাধারণ মুসলমান যারা কোরআন-হাদীস সরাসরি বুঝতে পারে না, শরীয়তের হুকুম-আহকাম নির্ধারণের যোগ্যতাও রাখে না, এ জন্য কোন ইমাম, মুজতাহিদ, আলেম বা মুফতীর কথার উপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে; তাদের সাথে এ আয়াতের মর্মের কোন সম্পর্ক নেই। কেননা, প্রকৃত পক্ষে তারা কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে; আল্লাহর নিয়ম-বিধানেরই অনুকরণ করে। আলেমগণের নিকট থেকে তারা

আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহর ব্যাখ্যা গ্রহণ করে মাত্র। কোরআনই তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে:

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, ‘যদি আল্লাহর আদেশ তোমাদের জ্ঞানা না থাকে, তবে আলেমদের নিকট জেনে নাও।’

হালাল-হারাম নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কাউকেই অংশীদার করা শিরক। অনুরূপভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে মন্ত্রত্ব করাও শিরক। প্রয়োজন মিটানো বা বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট দোয়া করাও শিরক। কেননা, হাদীসে দোয়াকে এবাদতরূপে গণ্য করা হয়েছে। কাজেই যেসব কার্যকলাপে শিরকের নিদর্শন রয়েছে, সেসব কাজ করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আদী ইবনে হাতেম বলেন,—ইসলাম কবুল করার পর আমি আমার গলায় ক্রস পরিহিত অবস্থায় রসূল (সাঃ)—এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলাম। এটা দেখে হযুর আদেশ করলেন, এ মূর্তিটা গলা থেকে ফেলে দাও। আদী ইবনে হাতেম যদিও ক্রস সম্পর্কে তখন নাসারাদের ধারণা পোষণ করতেন না, এতদসত্ত্বেও প্রকাশ্যভাবে শিরকের নিদর্শন থেকে বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যকীয় বলে রসূল (সাঃ) তাঁকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এমনিভাবে কারো প্রতি রুকু বা সেজদা করা, বাইতুল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর তওয়াফ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এসব থেকে বেঁচে থাকার স্বীকারোক্তি এবং আনুগত্যের অঙ্গীকারই **إِنَّكَ تَعْبُدُ** তে করা হয়েছে।

কারো সাহায্য চাওয়ার বিষয়টি কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। কেননা, বৈষয়িক সাহায্য তো একজন অপরজনের কাছ থেকে সব সময়ই নিয়ে থাকে। এ ছাড়া দুনিয়ার কাজ-কারবার চলতেই পারে না। যথা—প্রস্তুতকারক, দিন-মজুর, নির্মাতা, কর্মকার, কুন্ডকার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কারিগরই অন্যের সাহায্যে নিয়োজিত, অন্যের খেদমতে সর্বদা ব্যস্ত এবং প্রত্যেকেই তাদের সাহায্যপ্রার্থী ও সাহায্য গ্রহণে ব্যাধ্য। এরূপ সাহায্য নেয়া কোন ধর্মমতে বা কোন শরীয়তেই নিষেধ নয়। কারণ, এ সাহায্যের সাথে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থিত সাহায্য কোন অবস্থাতেই সম্পৃক্ত নয়। অনুরূপভাবে কোন নবী বা ওলীর বরাতে দিয়েও আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা কোরআনের নির্দেশ ও হাদীসের বর্ণনায় বৈধ প্রমাণিত হয়েছে। এরূপ সাহায্য প্রার্থনাও আল্লাহর সম্পর্কযুক্ত সাহায্য প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কোরআন ও হাদীসে শিরকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আল্লাহর নিকট বিশেষভাবে প্রার্থিত সাহায্য দু'প্রকার। এক—আল্লাহ ব্যতীত কোন ফেরেশতা, কোন নবী, কোন ওলী বা কোন মানুষকে একক ক্ষমতালালী বা একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে তাদের নিকট কিছু চাওয়া, — এটি প্রকাশ্য কুফরী। একে কাফের-মুশরিকরাও কুফরী বলে মনে করে। তারা নিজদের দেবীদেরকেও আল্লাহর ন্যায় সর্বশক্তিমান একক ইচ্ছাশক্তির অধিকারী মনে করে না।

দুই — সাহায্য প্রার্থনার যে পন্থা কাফেরগণ গ্রহণ করে থাকে, কোরআন তাকে বাতিল ও শিরক বলে ঘোষণা করেছে। তা হচ্ছে কোন ফেরেশতা, নবী, ওলী বা দেবদেবী সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করা যে,

প্রকৃত শক্তি ও ইচ্ছার মালিক তো আল্লাহ তা'আলাই, তবে তিনি তাঁর কুদরতে সে ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির কিছু অংশ অমুককে দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাকে ক্ষমতা দান করেছেন এবং সে ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে সশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোরআনের **إِنَّا كَسَبْنَاهُ** দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এরূপ সাহায্য আমরা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো নিকট চাইতে পারি না।

সাহায্য-সহায়তা সম্পর্কিত এ ধারণা মুমিন ও কাফের এবং ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। কোরআন একে হুরাম ও শিরক ঘোষণা করেছে এবং কাফেরগণ একে সমর্থন করে এ অনুযায়ী আমল করছে। এ ব্যাপারে যেখানে সংশয়ের উদ্ভব হয় তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তার কোন কোন ক্রেশণতার উপর পার্থিব ব্যবস্থা পরিচালনার অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেছেন বলে বর্ণনা রয়েছে। এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয় যে, ক্রেশণতাগণকে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনে আল্লাহ নিজেই তো ক্ষমতা দিয়েছেন, তদনুরূপ নবীগণকেও এমন কিছু কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন যা অন্য মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে; যথা, মু'জ্জিয়া। অনুরূপ আওলিয়াগণকেও এমন কিছু কাজের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, যা সাধারণ মানুষ করতে পারে না। যেমন, কারামত। সুতরাং স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ধারণায় পতিত হওয়া বিচিত্র নয় যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার কিয়দংশ যদি তাদের মধ্যে না-ই দিতেন, তবে তাঁদের দ্বারা এমন সব কাজ কি করে হয়ে থাকে? এতে নবী ও ওলীগণের প্রতি কর্মে স্বাধীন হওয়ার বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। বরং মু'জ্জিয়া এবং কারামত একমাত্র আল্লাহরই কাজ। এর প্রকাশ নবী ও ওলীগণের মাধ্যমে করে থাকেন শুধু তাঁর হেকমত ও রহস্য বুঝাবার জন্য। নবী ও ওলীগণের পক্ষে সরাসরি এসব কাজ করার ক্ষমতা নেই। এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। যথা, — এরশাদ হয়েছে :

وَمَا مِيَّتَ إِدْرِيَّتَ وَكَرِيَّتَ اللَّهُ

বদরের যুদ্ধে রসূল (সাঃ) শত্রুসৈন্যদের প্রতি একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন এবং সে কঙ্কর সকল শত্রু, শত্রুসৈন্যের চোখে গিয়ে পড়েছিল। সে মু'জ্জিয়া সম্পর্কে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'হে মুহাম্মদ (সাঃ) ! এ কঙ্কর আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং আল্লাহ তা'আলাই নিক্ষেপ করেছেন।' এতে বুঝা যায় যে, নবীগণের মাধ্যমে মু'জ্জিয়ারূপে যেসব অস্বাভাবিক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল আল্লাহরই কাজ। অনুরূপ, হযরত নূহ (আঃ)—কে তাঁর জাতি বলেছিল যে, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে যে শান্তি সম্পর্কে আমাদের কাছে ভীতি প্রদর্শন করছেন, তা এনে দেখান। তখন তিনি বলেছিলেন :

إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ

মু'জ্জিয়ারূপে আসমানী বালা নিয়ে আসা আমার ক্ষমতার উর্ধ্বে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে আসবে। তখন তোমরা তা থেকে পালাতে পারবে না।

সূরা ইবরাহীমে নবী ও রসূলগণের এক দলের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

তারা বলেছেন :

وَمَا كُنَّا لَنَآتِيَنَّكَ لَوْلَا أَنَّ لَنَا بَدَلًا

অর্থঃ, 'কোন মুজ্জিয়া দেখানো আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হতে পারে না।' তাই কোন নবী বা ওলী কোন মু'জ্জিয়া বা কারামত যখন ইচ্ছা বা যা ইচ্ছা দেখানেন, এরূপ ক্ষমতা কাউকেই দেয়া হয়নি।

রসূল ও অন্যান্য নবীগণকে মুশরিকরা কত রকমের মু'জ্জিয়া দেখাতে বলেছে, কিন্তু যেগুলোতে আল্লাহর ইচ্ছা হয়েছে সেগুলোই প্রকাশ পেয়েছে। আর যেগুলোতে আল্লাহর ইচ্ছা হয়নি, সেগুলো প্রকাশ পায়নি। কোরআনের সর্বত্র এ সম্পর্কিত তথ্য বিদ্যমান।

তাই এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে এবং এতদসঙ্গে নবী-রসূল ও ওলী-আওলিয়াগণের গুরুত্বের বিশেষভাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। এ বিশ্বাস এবং স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর বিধানের অনুসরণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যেভাবে কোন ব্যক্তি বাল্ব ও পাখার গুরুত্ব অনুশ্রবণ না করে একে নষ্ট করে দিয়ে আলো-বাতাস পাওয়ার আশা করতে পারে না, তেমনি নবী-রসূল ও ওলী-আওলিয়াগণের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা করা যায় না।

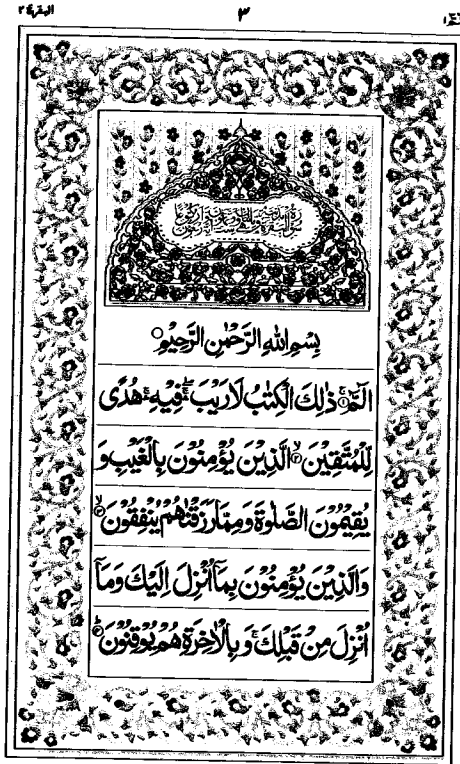
সাহায্য প্রার্থনা ও ওসীলা তাল্লাশ করা এবং তা গ্রহণ করার প্রাশ্নে নানা প্রকার প্রশ্ন ও সংশয়ের উৎপত্তি হতে দেখা যায়। আশা করা যায় যে, উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা সে সংশয় ও সন্দেহের নিরসন হবে।

সিরাত-মুস্তাকীমের হেদায়েতেই দুই-দুনিয়ার সাফল্যের চাবিকাঠি : আলোচ্য তফসীরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যে দোয়াকে সর্বকণ সফল লোকের সকল কাজের জন্য নির্ধারিত করেছেন তা হচ্ছে সিরাতুল-মুস্তাকীমের হেদায়েতখান্দির দোয়া। এমনভাবে আশেরাতের মুক্তি যেমন সে সরল পথে রয়েছে যা মানুষকে জন্মতে নিয়ে যাবে, অনুরূপভাবে দুনিয়ার যাবতীয় কাজের উন্নতি-অগ্রগতিও সিরাতুল-মুস্তাকীম বা সরল পথের মাধ্যমে নিহিত। যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করলে উদ্দেশ্য সফল হয়, তাতে পূর্ণ সফলতাও অনিবার্যভাবেই হয়ে থাকে।

যে সব কাজে মানুষ সফলতা লাভ করতে পারে না, তাতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সে কাজের ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতিতে নিকচরই কোন ভুল হয়েছে।

সারকথা, সরল পথের হেদায়েতে কেবল পরকাল বা দুই জীবনের সাফল্যের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং দুনিয়ার সকল কাজের সফলতাও এরই উপর নির্ভরশীল। এজন্যই প্রত্যেক মুমিনের এ দোয়া তসবীহস্বরূপ সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। তবে মনোযোগ সহকারে স্মরণ রাখতে ও দোয়া করতে হবে, শুধু শব্দের উচ্চারণ যথেষ্ট নয়।

সূরা আল ফাতেহা সমাপ্ত



সূরা আল বাক্বারাহ

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত ২৮৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(১) আলিফ লাম মীম। (২) এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, (৩) যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুখী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে (৪) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।

সূরা আল বাক্বারাহ

সূরা বাক্বারার কবীলত : এ সূরা বহু আহকাম সম্বলিত সবচাইতে বড় সূরা। নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, সূরা বাক্বারাহ পাঠ কর। কেননা, এর পাঠে বরকত লাভ হয় এবং পাঠ না করা অনুতাপ ও দুর্ভাগ্যের কারণ। যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করে তার উপর কোন আহলে-বাতিল তথা জাদুকরের জাদু কখনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

নবী করীম (সাঃ) এ সূরাকে **سَمَاءُ الْقُرْآنِ** (সেনামূল - কোরআন) ও **ذُرَّةُ الْقُرْآنِ** (যারওয়াতুল-কোরআন) বলে উল্লেখ করেছেন। সেনাম ও যারওয়াহ বস্তুর উৎকৃষ্টতম অংশকে বলা হয়। সূরায় বাক্বারায় আয়াতুল কুরসী নামে যে আয়াতখানা রয়েছে তা কোরআন শরীফের অন্যান্য সকল আয়াত থেকে উত্তম। — (ইবনে-কাসীর)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, এ সূরায় এমন দশটি আয়াত রয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি সে আয়াতগুলো রাতে নিয়মিত পাঠ করে, তবে শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না এবং সে রাতের মত সকল বাল্য-মুসীবত, রোগ-শোক ও দুর্দৃষ্টি ও দুর্ভাবনা থেকে নিরাপদে থাকবে। তিনি আরো বলেছেন, যদি বিকৃতমস্তিষ্ক লোকের উপর এ দশটি আয়াত পাঠ করে দম করা হয়, তবে সে ব্যক্তি সুস্থতা লাভ করবে। আয়াত দশটি হচ্ছে : সূরার প্রথম চার আয়াত, মধ্যের তিনটি অর্থাৎ, আয়াতুল-কুরসী ও তার পরের দু'টি আয়াত এবং শেষের তিনটি আয়াত।

আহকাম ও মাসায়েল : বিষয়বস্তু ও মাসায়েলের দিক দিয়েও সূরা বাক্বারাহ সমগ্র কোরআনে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। এ সূরায় এক হাজার আদেশ, এক হাজার নিষেধ, এক হাজার হেফযত এবং এক হাজার সংবাদ ও কাহিনী রয়েছে।

আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হরফে মুকাত্তাআত : অনেকগুলো সূরার প্রারম্ভে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন বর্ণ দ্বারা গঠিত এক-একটা বাক্য উল্লেখিত হয়েছে। যথা **بِسمِ اللَّهِ** এগুলোকে কোরআনের পরিভাষায় 'হরফে মুকাত্তাআত' বলা হয়। এ অক্ষরগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে সাকিন পড়া হয়। যথা - **الف - الم - الميم** (আলিফ-লাম-মীম)।

কোন কোন তফসীরকার এ হরফগুলোকে সপ্তশ্লিষ্ট সূরার নাম বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এগুলো আল্লাহর নামের তত্ত্ব বিশেষ।

অধিকাংশ সাহাবী, তাবয়ী এবং ওলামার মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত মত হচ্ছে যে, হরফে-মুকাত্তাআতগুলো এমনি রহস্যপূর্ণ যার মর্ম ও মাহাত্ম্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। অন্য কাহকেও এ বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন : হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত ওসমান গনী (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবিগণ এ সম্বন্ধে অভিমত পাষণ করেন যে, এগুলো আল্লাহ তা'আলার রহস্যজনিত বিষয় এবং তাঁর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। এ বিশ্বাস রেখে এগুলোর তেলাওয়াত করতে

হবে। কিন্তু এগুলোর রহস্য উদ্ধারের ব্যাপারে এবং তফ-সংগ্রহে আমাদের ব্যস্ত হওয়া উচিত হবে না।

ইবনে-কাসীরও কুরতুবীর বরাতে দিয়ে এ মন্তব্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কোন কোন আলোম এ শব্দগুলোর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, সেগুলোকে ভুল প্রতিপন্ন করাও উচিত হবে না। কেননা, তাঁরা উপমাস্থলে এবং এগুলোকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যেই এসব অর্থ বর্ণনা করেছেন।

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ সাধারণতঃ ذَلِكَ কোন দূরবর্তী বস্তুকে ইশারা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। الْكِتَابُ দ্বারা কোরআন মজীদকে বোঝানো হয়েছে। رَبِّ অর্থ সন্দেহ-সংশয়। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, এটি এমন এক কিতাব যাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। এটি বাহ্যতঃ দূরবর্তী ইশারার স্থল নয়। কারণ, এ ইশারা কোরআন শরীফের প্রতিই করা হয়েছে, যা মানুষের সামনেই রয়েছে। কিন্তু দূরবর্তী ইশারার শব্দ ব্যবহার করে একথাই বোঝানো হয়েছে যে, সূরাতুল-ফাতেহাতে যে সিরাতুল-মুস্তাকীমের প্রার্থনা করা হয়েছিল, সমগ্র কোরআন শরীফ সে প্রার্থনারই প্রত্যুত্তর। এটি সিরাতুল-মুস্তাকীমের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও বটে। অর্থ হচ্ছে— আমি তোমাদের প্রার্থনা শুনেছি এবং হেদায়েতের উজ্জ্বল সূর্যসদৃশ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছি। যে ব্যক্তি হেদায়েত লাভে ইচ্ছুক সে যেন এ কিতাব অনুধাবন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে।

এতদসঙ্গে এ কথাও বলে দেয়া হচ্ছে যে, এতে কোন সন্দেহ নেই। কোন কালোমে বা বক্তব্যে সন্দেহ ও সংশয় দু' কারণে হতে পারে। কারো বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতার দরুন সন্দেহ উপস্থিত হতে পারে। যার উল্লেখ কয়েক আয়াতে পরেই খোদ কোরআন শরীফে রয়েছে যেমন وَأَنَّ كَيْفَ تَتَذَكَّرُونَ - যদি তোমরা এতে সন্দেহ পোষণ কর। (অতএব বুদ্ধির স্বল্পতাহেতু কারো মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও এরূপ বলা ন্যায্যসঙ্গত যে, এ কিতাবে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।)

هٰذَا لِلَّذِينَ - যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে, তাদের জন্য হেদায়েত। অর্থাৎ, যে বিশেষ হেদায়েত পরকালের মুক্তির উপায়, তা কেবল মুস্তাকীমেরই প্রাপ্য। অবশ্য কোরআনের হেদায়েত মানবজাতির জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমস্ত বিশৃঙ্খলাচরের জন্য ব্যাপক। সূরাতুল-ফাতেহার তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হেদায়েতের তিনটি স্তর রয়েছে। (এক)— সমগ্র মানবজাতি, প্রাণীজগত তথা সমগ্র সৃষ্টির জন্যই ব্যাপ্ত। (দুই)— মুসলমানদের জন্য খাস। (তিন)— যারা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নৈকট্য লাভ করেছে, তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তথাপি হেদায়েতের স্তরের কোন সীমারেখা নেই।

কোরআনের কোথাও 'আম' বা সাধারণ এবং কোথাও বিশেষ হেদায়েতের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এখানে বিশেষ বা সুনির্দিষ্ট হেদায়েতের কথা বলা হয়েছে। এজন্যই হেদায়েতের সঙ্গে মুস্তাকিগণকে বিশেষভাবে যুক্ত করা হয়েছে বলেই এরূপ সংশয় প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। হেদায়েতের বেশী প্রয়োজন তো সে সমস্ত লোকেরই ছিল, যারা মুস্তাকী নয়। কেননা, ইতিমধ্যে হেদায়েতের স্তর বিন্যাস করে এসব সংশয়ের অবসান করে দেয়া হয়েছে। তাই এখন আর একথা বলা ঠিক নয় যে, কোরআন শুধু মুস্তাকীদের জন্যই হেদায়েত বা পঞ্চপ্রদর্শক, — অন্যের জন্য নয়।

মুস্তাকিগণের গুণাবলী : পরবর্তী দু'টি আয়াতে মুস্তাকিগণের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত, তাদের পথই হচ্ছে সিরাতুল-মুস্তাকীম। যারা সরল-সঠিক পূণ্যপন্থা লাভ করতে চায়, তাদের উচিত সে দলে শরীক হয়ে তাদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং সে সকল লোকের স্বভাব-চরিত্র, আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে জীবনের পাথ্যরূপে গ্রহণ করা। আর এজন্যই মুস্তাকিগণের বিশেষ গুণাবলীর সঙ্গে সঙ্গে এরশাদ হচ্ছে :

البقرة

২

الْحَمْدُ

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থঃ তারাই আল্লাহ প্রদত্ত সৎপন্থাপ্রাপ্ত এবং তারাই পূর্ণ সফলকাম। উপরোক্ত দু'টি আয়াত দ্বারা মুশাক্কীদের গুণাবলীর বর্ণনার মধ্যে ঈমানের সৎকিষ্ট পরিচয়, এর মূলনীতিগুলো এবং তৎসঙ্গে সৎকর্মের মূলনীতিগুলোও স্থান পেয়েছে। তাই ঐ সমস্ত গুণাবলীর বিশ্লেষণ পরবর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে।

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

অর্থঃ আল্লাহকে যারা ভয় করে, তারা এমন লোক যে, অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং স্বীয় জীবিকা থেকে সৎপন্থে ব্যয় করে।

আলোচ্য আয়াতে মুশাক্কীদের তিনটি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন, নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং স্বীয় জীবিকা থেকে সৎপন্থে ব্যয় করা। উপরোক্ত আলোচনার মধ্যে বেশ কতকগুলো জরুরী বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্রথমতঃ ঈমানের সংজ্ঞা : ঈমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পবিত্র কোরাআনে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। **يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ** ঈমান এবং গায়ব। শব্দ দু'টির অর্থ যথার্থভাবে অনুশ্রবণ করলেই ঈমানের পুরোপুরি তাৎপর্য ও সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে।

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, কারো কথাকে তার বিশুদ্ধতার নিরিখে মনে-প্রাণে মেনে নেয়া। এজন্যই অনুভূতিগ্ৰাহ্য ও দৃশ্যমান কোন বস্তুতে কারো কথায় বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ঈমান নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি এক টুকরো সাদা কাপড়কে সাদা এবং এক টুকরো কালো কাপড়কে কালো বলে এবং আর এক ব্যক্তি তার কথা সত্য বলে মেনে নেয়, তাহলে একে ঈমান বলা যায় না। এতে বক্তার কোন প্রভাব বা দখল নেই। অপরদিকে রসূল (সঃ) এর কোন সংবাদ কেবলমাত্র রসূলের উপর বিশ্বাসবজ্ঞ মেনে নেয়াকেই শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান বলে। **غَيْبٍ** - এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এমনসব বস্তু যা বাস্তবিকভাবে মানবকুলের জ্ঞানের উর্ধ্বে এবং যা মানুষ পক্ষ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারে না, চক্ষু দ্বারা দেখতে পারে না, কান দ্বারা শুনেতে পারে না, নাসিকা দ্বারা স্পর্শ নিতে পারে না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না, হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারে না, — ফলে সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভও করতে পারে না।

কোরআনে **غَيْبٍ** শব্দ দ্বারা সে সমস্ত বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে যেগুলোর সংবাদ রসূল (সঃ) দিয়েছেন এবং মানুষ যে সমস্ত বিষয়ে স্বীয় বুদ্ধিবলে ও ইন্দ্রিয়গ্ৰাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম।

غَيْبٍ শব্দ দ্বারা ঈমানের সৎকিষ্ট বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব ও সত্তা, সিকাত বা গোপালী এবং তকদীর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, বেহেশত-দোযখের অবস্থা, কেয়ামত এবং কেয়ামত অন্তর্নিহিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশতাকুল, সমস্ত আসমানী কিতাব, পূর্ববর্তী সকল নবী ও রসূলগণের বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত। যা সূরা বাক্বারার **أَمَّا السُّورَةُ** আয়াতে দেয়া হয়েছে। এখানে ঈমানের সৎকিষ্ট বর্ণনা এবং শেষ আয়াতে ঈমানের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন ঈমান বিল-পায়ব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) যে হেদায়েত এক শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন, সে সবগুলোকে আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া। তবে

(৫) তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাি যথার্থ সফলকাম। (৬) নিশ্চিতই যারা কাকের হয়েছে তাদেরকে আপনি ভয় প্রদর্শন করুন আর নাই করুন তাতে কিছুই আসে যায় না, তারা ঈমান আনবে না। (৭) আল্লাহ তাদের অন্তরকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (৮) আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। (৯) তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না। (১০) তাদের অন্তরকরণ ব্যমিশ্রিত আর আল্লাহ তাদের ব্যমি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। বস্তৃতঃ তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে ভয়াবহ আযাব, তাদের মিথ্যাচারের দরুন। (১১) আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো মীমাংসার পথ অবলম্বন করেছি। (১২) মনে রেখো, তারাি হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না। (১৩) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলেন, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত। মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাি বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না। (১৪) আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একাত্রে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি— আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি যাত্র। (১৫) বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে।

শর্ত হচ্ছে যে, সেগুলো রসুলের (সাঃ) শিক্ষা হিসেবে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে হবে। আহ্লে-ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ইমানের এ সংজ্ঞাই দিয়েছেন। ‘আকায়েদে-তাহবী’ ও ‘আকায়েদে-নসফী’-তে এ সংজ্ঞা যেনে নেয়া কেই ইমান বলে অভিহিত করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু জ্ঞানার নামই ইমান নয়। কেননা, খোদ ইবলীস এবং অনেক কাফেরও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত যে সত্য তা আন্তরিকভাবে জানতো, কিন্তু না মানার কারণে তারা ইমানদারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

দ্বিতীয়তঃ ইক্বামতে-সালাত : ইক্বামত বা প্রতিষ্ঠা অর্থ শুধু নামায আদায় করা নয়, বরং নামাযকে সকল দিক দিয়ে ঠিক করাকে প্রতিষ্ঠা করা বলা হয়। ‘ইক্বামত’ অর্থে নামাযে সকল ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব পরিপূর্ণভাবে আদায় করা, এতে সব সময় সুদৃঢ় থাকা এবং এর ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ় করা সবই বোঝায়। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল প্রভৃতি সকল নামাযের জন্য একই শর্ত। এক কথায় নামাযে অভ্যস্ত হওয়া ও তা শরীয়তের নিয়ম মত আদায় করা এবং এর সকল নিয়ম-পদ্ধতি যথাযথভাবে পালন করাই ইক্বামতে-সালাত।

তৃতীয়তঃ আল্লাহর পথে ব্যয় : আল্লাহর পথে ব্যয় অর্থে এখানে ফরয যাকাত, ওয়াজিব সদকা এবং নফল দান-খয়রাত প্রভৃতি যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হয় সে সবকিছুই বোঝানো হয়েছে। কোরআনে সাধারণত : **انفاق** শব্দ নফল দান-খয়রাতের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। যেখানে ফরয যাকাত উদ্দেশ্যে সেসব ক্ষেত্রে **زَكَاة** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

وَيَذَرُونَ - এ সংকিপ্ত বাক্যটিতে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহর রাস্তায় তথা সংপথে অর্থ ব্যয় করার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক সং মানুষের মধ্যে বিশেষভাবে জাগ্রত করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। একজন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা করবে যে, আমাদের নিকট যা কিছু রয়েছে, তা সবই তো আল্লাহর দান ও আমানত। যদি আমরা সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করি, তবেই মাত্র এ নেয়ামতের হক আদায় হবে। পরন্তু এটা আমাদের পক্ষ থেকে কারো প্রতি কোন এহসান বা অনুগ্রহ হবে না। তবে এ আয়াতে **ما** শব্দ যোগ করে একথা বোঝানো হয়েছে যে, যে ধন-সম্পদ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে তা সবই ব্যয় করতে হবে এমন নয়, বরং কিয়দংশ ব্যয় করার কথাই বলা হয়েছে।

মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথমে অদৃশ্যে বিশ্বাস, এরপর নামায প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমানের গুরুত্ব সকলেরই জানা যে, ইমানই প্রকৃত ভিত্তি এবং সকল ‘আমল কবুল হওয়া ইমানের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু যখনই ইমানের সাথে ‘আমলের কথা বলা হয়, তখন সেগুলোর তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হতে থাকে। কিন্তু এখানে শুধু নামায এবং অর্থ ব্যয় পর্যন্ত ‘আমলকে সীমাবদ্ধ রাখার কারণ কি? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, যত রকমের ‘আমল রয়েছে তা ফরযই হোক অথবা ওয়াজিব, সবই হয় মানুষের দেহ অথবা ধন-দৌলতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এবাদতে-বদনী তথা দৈহিক এবাদতের মধ্যে নামায সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে নামাযের বর্ণনায় এবং যেহেতু আর্থিক ইবাদত সবই **انفاق** শব্দের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এ উভয় প্রকার এবাদতের বর্ণনার মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় এবাদতের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। পূর্ণ আয়াতের অর্থ হচ্ছে : তারাই মুত্তাকী যাদের ইমান পূর্ণাঙ্গ এক ‘আমলও পূর্ণাঙ্গ ইমান এক ‘আমল এ দুয়ের সমন্বয়েই ইসলাম। এ আয়াতে ইমানের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেয়ার সাথে সাথে ইসলামের

বিষয়বস্তুর প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমান ও ইসলামের পার্থক্য : অভিধানে কোন বস্তুতে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ইমান এবং কারো অনুগত হওয়ায় ইসলাম বলে।

ইমানের আধার হল অন্তর, ইসলামের আধার অন্তরসহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কিন্তু শরীয়তে ইমান ব্যতীত ইসলাম এবং ইসলাম ব্যতীত ইমান গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ, আল্লাহ, তা’আলা ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এ বিশ্বাসের মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে কর্মের দ্বারা আনুগত্য ও তাবেদারী প্রকাশ করা না হয়।

মোটকথা, আভিধানিক অর্থে ইমান ও ইসলাম স্বতন্ত্র অর্থবোধক বিষয়বস্তুর অন্তর্গত। অর্থগত পার্থক্যের পরিশ্রেক্ষিতে কোরআন-হাদীসে ইমান ও ইসলামের পার্থক্যের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু শরীয়ত ইমানবিহীন ইসলাম এবং ইসলামবিহীন ইমান অনুমোদন করে না।

প্রকাশ্য আনুগত্যের সাথে যদি অন্তরের বিশ্বাস না থাকে, তবে কোরআনের ভাষায় একে ‘নেফাক্ব’ বলে। নেফাক্বকে কুফর হতেও বড় অন্যায় সাব্যস্ত করা হয়েছে।

বলা হয়েছে— ‘মুনাফিক্বদের স্থান জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর।’ অনুরূপভাবে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে যদি মৌখিক স্বীকৃতি এবং আনুগত্য না থাকে, কোরআনের ভাষায় একেও কুফরী বলা হয়।

বলা হয়েছে “কাফেরগণ রসূল (সাঃ) এবং তাঁর নবুওয়তের যথাযথতা সম্পর্কে এমন সুস্পষ্টভাবে জানে, যেমন জানে তাদের নিজ নিজ সম্ভানদেরকে।”

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে—

وَحَدُّوا بِهَا وَاسْتَفْتُوا بِهَا فَمَنْ تَلَاوَعَهَا

অর্থাৎ, তারা আমার নিদর্শন বা আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, অথচ তাদের অন্তরে এর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তাদের এ আচরণ কেবল অন্যায় ও অহংকারপ্রসূত।

ইমান ও ইসলামের ক্ষেত্র এক, কিন্তু আরম্ভ ও শেষের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। — অর্থাৎ, ইমান যেমন অন্তর থেকে আরম্ভ হয় এবং প্রকাশ্য ‘আমলে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে, তদ্রূপ ইসলামও প্রকাশ্য ‘আমল থেকে আরম্ভ হয় এবং অন্তরে পৌঁছে পূর্ণতা লাভ করে। অন্তরের বিশ্বাস প্রকাশ্য ‘আমল পর্যন্ত না পৌঁছালে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। অনুরূপভাবে প্রকাশ্য আনুগত্য ও তাবেদারী আন্তরিক বিশ্বাসে না পৌঁছালে গ্রহণযোগ্য হয় না। ইমাম গায়ালী এবং ইমাম সুবকীও এ মত পোষণ করেছেন।

অন্য আয়াতে মুত্তাকীদের এমন আরো কতিপয় গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে, যাতে ইমান বিলগায়ব এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসের প্রসঙ্গটা আরো একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, রসূল (সাঃ)-এর যমানায় মুমিন ও মুত্তাকী শ্রেণীর লোক বিদ্যমান ছিলেন, একশ্রেণী তাঁরা যারা প্রথমে মুশরিক ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অন্য শ্রেণী হল যারা প্রথমে আহ্লে-কিতাব ইহুদী-নাসারা ছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এখানে পূর্ববর্তী আয়াতে প্রথম

শ্রেণীর বর্ণনা ছিল। আর অন্য আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাই এ আয়াতে কোরআনের প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে বিশ্বাস করার কথাও বলা হয়েছে। হাদীসের বর্ণনানুযায়ী এ দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা যারা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোন না কোন আসমানী কিতাবের অনুসারী ছিলেন, তারা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী ছিলেন। প্রথমতঃ কোরআনের প্রতি ঈমান এবং ‘আমলের জন্য, দ্বিতীয়তঃ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার জন্য। তবে পার্থক্য এই যে, সেগুলো সম্পর্কে বিশ্বাসের বিষয় হবে এই যে, কোরআনের পূর্বে আল্লাহ তা’আলা যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলো সত্য ও হক এবং সে যুগে এর উপর আমল করা ওয়াজিব ছিল। আর এ যুগে কোরআন অবতীর্ণ হবার পর যেহেতু অন্যান্য আসমানী কিতাবের হুকুম-আহকাম এবং পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহ মনসূখ হয়ে গেছে, তাই এখন ‘আমল একমাত্র কোরআনের আদেশানুযায়ীই করতে হবে।

ষতমে নবুওয়ত সম্পর্কিত একটি দলীল : এ আয়াতের বর্ণনা রীতিতে একটা মৌলিক বিষয়ের মীমাংসাও প্রসঙ্গক্রমে বলে দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই শেষনবী এবং তাঁর নিকট প্রেরিত ওহীই শেষ ওহী। কেননা, কোরআনের পরে যদি আরো কোন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো, তবে পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর প্রতি যেভাবে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে, পরবর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনার কথাও একইভাবে বলা হতো; বরং এর প্রয়োজনই ছিল বেশী। কেননা, তাওরাত ও ইনজীলসহ বিভিন্ন আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান তো পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল এবং এগুলো সম্পর্কে কম-বেশী সবাই অবগতও ছিল। তাই হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরেও যদি ওহী ও নবুওয়তের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা আল্লাহর অভিপ্রায় হতো, তবে অবশ্যই পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ এবং নবী-রসূলগণের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টির মত পরবর্তী কিতাব ও নবী-রসূলের প্রতি ঈমান আনার বিষয়টিরও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন হতো, যাতে পরবর্তী লোকেরা এ সম্পর্কে বিভ্রান্তির কবল থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

কিন্তু কোরআনের যেসব জায়গায় ঈমানের উল্লেখ রয়েছে, সেখানেই পূর্ববর্তী নবিগণের এবং তাঁদের প্রতি প্রেরিত কিতাবসমূহেরও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কোথাও পরবর্তী কোন কিতাবের উল্লেখ নেই। কোরআন মজীদে এ বিষয়ে অনুন পঞ্চাশটি স্থানে উল্লেখ রয়েছে। সর্বত্রই হযরতের (সাঃ) পূর্ববর্তী নবী ও ওহীর কথা বলা হলেও কোন একটি আয়াতেও পরবর্তী কোন ওহীর উল্লেখ তো দূরের কথা, কোন ইশারা-ইঙ্গিতও দেখা যায় না।

আখেরাতের প্রতি ঈমান : এ আয়াতে মুস্তাকিগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা আখেরাতে বিশ্বাস রাখে। এখানে আখেরাত বলতে পরকালের সে আবাসস্থলের কথা বোঝানো হয়েছে, যাকে কোরআন পাকে ‘দারুল-ক্বারার’, ‘দারুল-হায়াওয়ান’, এবং ‘ওকবা’ নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র কোরআন তার আলোচনা ও তার ভাববহতার বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

আখেরাতের প্রতি ঈমান একটি বৈপ্লবিক বিশ্বাস : আখেরাতের প্রতি ঈমান প্রসঙ্গটি ঈমান বিল-গায়ব-এর আলোচনায় কিছুটা বর্ণিত

হয়েছে। পুনরায় এ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে এ জন্য যে, যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ঈমান অনুযায়ী আমল করার প্রকৃত প্রেরণা ও এখান থেকেই সৃষ্টি হয়।

ইসলামী আকায়েদগুলোর মধ্যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনা একটা বৈপ্লবিক বিশ্বাস, যা দুনিয়ার রূপই পাল্টে দিয়েছে। এ বিশ্বাসে, উদ্বুদ্ধ হয়েই ওহীর অনুসারিগণ প্রথমে নৈতিকতা ও কর্মে এবং পরবর্তীতে ব্যক্তিগত, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পর্যন্ত দুনিয়ার অন্যান্য সকল জাতির মোকাবেলায় একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আসনে উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হয়েছে। পরন্তু তওহীদ ও রেসালতের ন্যায় এ আকীদাও সমস্ত নবী-রসূলের শিক্ষা ও সর্বপ্রকার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যেই সর্বসম্মত বিশ্বাসরূপে চলে আসছে। যেসব লোক জীবন ও এর ভোগ-বিলাসকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে গণ্য করে, জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে তিক্ত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে তিক্ততাকেই সর্বাপেক্ষা কষ্ট বলে মনে করে, আখেরাতের জীবন, সেখানকার হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও পুরস্কার প্রভৃতি সম্পর্কে যাদের এতটুকুও আস্থা নেই, তারা যখন সত্য-মিথ্যা কিংবা হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করাকে তাদের জীবনের সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে বাধা রূপে দেখতে পায়, তখন সামান্য একটু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে সকল মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে এতটুকুও কষ্টবোধ করে না, এমতাবস্থায় এ সমস্ত লোককে যে কোন দুর্কর্ম থেকে বিরত রাখার মত আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যাকিছু অন্যায়, অসুন্দর বা সামাজিক জীবনের শাস্তি-শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর, সেসব অন্যায় কার্যকরভাবে উৎখাত করার কোন শক্তি সে আইনেরও নেই, এ কথা পরীক্ষিত সত্য। আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কোন দুরাচারের চরিত্রশুদ্ধি ঘটানোও সম্ভব হয় না। অপরাধ যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, আইনের শাস্তি সাধারণতঃ তাদের ধাত-সওয়া হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত আর তাদের মধ্যে শাস্তিকে ভয় করার মত অনুভূতিও থাকে না। অপরপক্ষে, আইনের শাস্তিকে যারা ভয় করে, তাদের সে ভয়ের আওতাও শুধুমাত্র ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে, যতটুকুতে ধরা পড়ার ভয় বিদ্যমান। কিন্তু গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে যেখানে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে না, সেখানে পরিবেশে এ সমস্ত লোকের পক্ষ্যেও যে কোন গর্হিত কাজে লিপ্ত হওয়ার পথে কোন বাধাই থাকে না।

প্রকারান্তরে আখেরাতের প্রতি ঈমানই এমন এক কার্যকর নিয়ন্ত্রণবিধি, যা মানুষকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বত্রই যে কোন গর্হিত আচরণ থেকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে বিরত রাখে। তার অন্তরে এমন এক প্রত্যয়ের অম্লান শিখা অবিরাম সমুজ্জ্বল করে দেয় যে, আমি প্রকাশ্যেই থাকি আর গভীর নির্জনেই থাকি, রাজপথে থাকি কিংবা কোন বন্ধঘরে লুকিয়েই থাকি, মুখে বা ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ করি আর নাই করি, আমার সকল আচরণ, আমার সকল অভিব্যক্তি, এমনকি অন্তরে লুক্কায়িত প্রতিটি আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত সর্বত্র বিরাজমান এক মহাসত্তার সামনে রয়েছে। তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টির সামনে কোন কিছুই আড়াল করার সাধ্য আমার নেই। আমার সত্তার সঙ্গে মিশে রয়েছে এমনসব প্রহরী, যারা আমার প্রতিটি আচরণ এবং অভিব্যক্তি প্রতিমুহূর্তেই লিপিবদ্ধ করছেন।

উপরোক্ত বিশ্বাসের মাধ্যমেই প্রাথমিক যুগে এমন মহোত্তম চরিত্রের

অগণিত লোক সৃষ্টি হয়েছিলেন, যাদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ দেখেই মানুষ ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন করে পড়ে।

এখন লক্ষ্যীয় আর একটি বিষয় হচ্ছে, আয়াতের শেষে **يُؤْمِنُونَ** শব্দ ব্যবহার না করে **يُؤْمِنُوا** ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, বিশ্বাসের বিপরীতে অবিশ্বাস এবং ইয়াহুদীদের বিপরীতে সন্দেহ-সংশয়। এ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হলেই শুধু উদ্দেশ্য সফল হয় না, বরং এমন দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে, যে প্রত্যয় স্বচক্ষে দেখা কোন বস্তু সম্পর্কেই হতে পারে।

মুত্তাকীদেব এই গুণ পরকালে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান এবং সবকিছুরই একটি পরিপূর্ণ নকশা তার সামনে দৃশ্যমান করে রাখবে। যে ব্যক্তি অন্যের হক নষ্ট করার জন্য মিথ্যা মামলা করে বা মিথ্যা সাক্ষী দেয়, আল্লাহর আদেশের বিপরীত পথে হারাম ধন-দৌলত উপার্জন করে এবং দুনিয়ার হীন উদ্দেশ্য সফল করার জন্য শরীয়ত বিরোধী কাজ করে, সে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাসী হয়ে, প্রকাশ্যে ঈমানের কথা যদি স্বীকার করে এবং শরীয়তের বিচারে তাকে মুমিনও বলা হয়, কিন্তু কোরআন যে ইয়াহুদীদের কথা ঘোষণা করেছে, এমন লোকের মধ্যে সে ইয়াহুদীন থাকতে পারে না। আর সে কোরআনী ইয়াহুদীনই মানবজীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিতে পারে। আর এর পরিণামেই মুত্তাকীগণকে হেদায়েত এবং সফলতার সে পুরস্কার দেয়া হয়েছে, যা পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে যে, তারাই সরল-সঠিক পথের পথিক, যা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে আর তারাই সম্পূর্ণ সফলকাম হয়েছে।

সূরা বাক্বারার প্রথম পাঁচটি আয়াতে কোরআনকে হেদায়েত বা পথপ্রদর্শনের গ্রন্থরূপে ঘোষণা করে সকল সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে স্থান দেয়ার পর সে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এ গ্রন্থের হেদায়েতে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত ও লাভবান হয়েছেন এবং যাদেরকে কোরআনের পরিভাষায় মুমিন ও মুত্তাকী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। তাদের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং পরিচয়ও বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পনেরটি আয়াতে সে সমস্ত লোকের বিষয় আলোচিত হয়েছে, যারা এ হেদায়েতকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

এরা দু'টি দলে বিভক্ত। একদল প্রকাশ্যে কোরআনকে অস্বীকার করে বিরুদ্ধাচরণের পথ অবলম্বন করেছে। কোরআন তাদেরকে কাকের বলে আখ্যায়িত করেছে। অপর দল হচ্ছে, যারা হীন পার্থিব উদ্দেশ্যে অন্তরের ভাব ও বিশ্বাসের কথাটি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি, বরং প্রতারণার পথ অবলম্বন করেছে; মুসলমানদের নিকট বলে, আমরা মুসলমান; কোরআনের হেদায়েত মানি এবং আমরা তোমাদের সাথে আছি। অথচ তাদের অন্তরে লুক্কায়িত থাকে কুফর ও অস্বীকৃতি। আবার কাকেরদের নিকট গিয়ে বলে, আমরা তোমাদের দলভুক্ত, তোমাদের সাথেই রয়েছি। মুসলমানদিগকে ধোঁকা দেয়ার জন্য এবং তাদের গোপন কথা জানার জন্যই তাদের সাথে মেলোমেশা করি। কোরআন তাদেরকে 'মুনাক্কি' বলে আখ্যায়িত করেছে। এ পনেরটি আয়াত যারা কোরআন অমান্য করে তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে ৬ ও ৭ আয়াতে অমান্য করে তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে ৬ ও ৭ আয়াতে প্রকাশ্যে যারা অস্বীকার করে তাদের কথা ও স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। আর পরবর্তী তেরটি আয়াতেই মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এতে তাদের স্বরূপ, নিদর্শন, অবস্থা ও পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

এ আয়াতগুলোর বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করলে বোঝা যায়

যে, কোরআন সূরা বাক্বারার প্রথম বিশটি আয়াতে একদিকে হেদায়েতের উৎসের সন্ধান দিয়ে বলেছে যে, এ উৎস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এই কোরআন; অপরদিকে বিশ্ববাসীকে এ হেদায়েত গ্রহণ করা ও না করার নিরিখে দু'টি ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। যারা গ্রহণ করেছে, তাদেরকে মুমিন-মুত্তাকী বলেছে, আর যারা অগ্রাহ্য করেছে তাদেরকে কাকের ও মুনাক্কি বলে আখ্যা দিয়েছে।

কোরআনের এ শিক্ষা থেকে একটি মৌলিক জ্ঞাতব্য বিষয় এও প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ববাসীকে এমনভাবে দু'টি ভাগ করা যায়, যা হবে আদর্শভিত্তিক। বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা ও বর্ণ এবং ভৌগোলিক বিভক্তি এমন কোন ভেদবৈধতা নয়, যার ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভক্ত করা যেতে পারে।

আলোচ্য ৬ ও ৭ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ তা'আলা সেসমস্ত কাকের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যারা তাদের কুফরী দরুন বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতার পথ বেছে নিয়েছে। আর যারা এ বিরুদ্ধাচরণের বশীভূত তারা কোন সত্য কথা শুনতে এবং কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে প্রস্তুত ছিল না। এ সমস্ত লোকের জন্য আল্লাহর বিধান হচ্ছে যে, তাদেরকে দুনিয়াতেই একটি নগদ শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তঃকরণে সীল-মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে। তাদের চোখ-কান থেকে হক বা সত্য গ্রহণের যোগ্যতা রহিত করে দেয়া হয়েছে। তাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, সত্যকে উপলব্ধি করার মত বুদ্ধি, দেখবার মত দৃষ্টিশক্তি এবং শোনার মত শ্রবণশক্তি আর তাদের অবশিষ্ট নেই। আয়াতে এ সমস্ত লোকের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

কাকিদের সংজ্ঞা : **كُفْرٌ** এর শাস্তিক অর্থ গোপন করা। না-শুকরী বা ক্তরুতাকেও কুফর বলা হয়। কেননা, এতে এহসানকারীর এহসান গোপন করা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় কুফর বলতে বোঝায়, যে সমস্ত বিষয়ে বিশৃঙ্খল স্থাপন করা ক্ষরয়, এর যে কোনটিকে অস্বীকার করা।

যথা— ঈমানের সারকথা হচ্ছে যে, রসূল (সাঃ) আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যমে উম্মতকে যে শিক্ষাদান করেছেন এবং যেগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলোকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করা এবং সত্য বলে জানা। কোন ব্যক্তি যদি এ শিক্ষামালার কোন একটিকে হক বলে না মানে, তাহলে তাকে কাকের বলা যেতে পারে।

'এনযার' শব্দের অর্থ : 'এনযার' শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সংবাদ দেয়া যাতে ভয়ের সঞ্চার হয়। আর **إِشَارٌ** এমন সংবাদকে বলা হয়, যা শুনে আনন্দ লাভ হয়। সাধারণ অর্থে এনযার বলতে ভয় প্রদর্শন করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু ভয় প্রদর্শনকে 'এনযার' বলা হয় না, বরং শব্দটি দ্বারা এমন ভয় প্রদর্শন বোঝায়, যা দয়ার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। যেভাবে মা সন্তানকে আগুন, সাপ, বিছা এবং হিংস্র জীবজন্তু হতে ভয় দেখিয়ে থাকেন! 'নাযির' বা ভয়-প্রদর্শনকারী এ সমস্ত ব্যক্তি যারা অনুগ্রহ করে মানবজাতিকে যথার্থ ভয়ের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। এজন্যই নবী-রসূলগণকে খাসভাবে নাযির বলা হয়। কেননা, তাঁরা দয়া ও সতর্কতার ভিত্তিতে অবশ্যজ্ঞারী বিপদ হতে ভয় প্রদর্শন করার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। নবীগণের জন্য 'নাযির' শব্দ ব্যবহার করে একদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা তবলীগের দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে — সাধারণ মানুষের প্রতি যথার্থ মমতা ও সমবেদনা সহকারে কথা বলা।

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাহাবা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে যে,

এ সমস্ত জেদী-অহংকারী লোক, যারা সত্যকে জেনে-শুনেও কুফরী ও অস্বীকৃতির উপর দৃঢ় অনড় হয়ে আছে, অথবা অহংকারের বশবর্তী হয়ে কোন সত্য কথা শুনেও কিংবা সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দেখতেও প্রস্তুত নয়, তাদের পক্ষে এনে ঈমানের আলোকে আলোকিত করার উদ্দেশে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে বিরামহীন চেষ্টা করছেন তা ফলপ্রসূ হওয়ার নয়। এদের ব্যাপারে চেষ্টা করা না করা একই কথা।

পাপের শাস্তি পার্থিব সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া : এ দু'টি আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল, কুফর ও অন্যান্য সব পাপের আসল শাস্তি তো পরকালে হবেই; তবে কোন কোন পাপের আর্থিক শাস্তি দুনিয়াতেও হয়ে থাকে। দুনিয়ার এ শাস্তি ক্ষেত্রবিশেষে নিজের অবস্থা সংশোধন করার সামর্থ্যকে ছিনিয়ে নেয়া হয়। শুভবুদ্ধি লোপ পায়।

মানুষ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে গাফেল হয়ে গোমরাহীর পথে এমন দ্রুততার সাথে এগুতে থাকে; যাতে অন্যায়ের অনুভূতি পর্যন্ত তাদের অন্তর থেকে দূরে চলে যায়। এ সম্পর্কে কোন কোন বুয়ুর্গ মস্তব্য করেছেন যে, পাপের শাস্তি এরূপও হয়ে থাকে যে, একটি পাপ অপর একটি পাপকে আকর্ষণ করে, অনুরূপভাবে একটি নেকীর বদলায় অপর একটি নেকী আকৃষ্ট হয়।

হাদীসে আছে, মানুষ যখন কোন একটি গোনাহর কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। সাদা কাপড়ে হঠাৎ কালো দাগ লাগার পর যেমন তা খরাপ লাগে, তেমনি প্রথমাবস্থায় অন্তরে পাপের দাগও অস্বস্তির সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি তওবা না করে, আরো পাপ করতে থাকে, তবে পর পর দাগ পড়তে পড়তে অন্তঃকরণ দাগে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তার অন্তর থেকে ভাল-মন্দের পার্থক্য সম্পর্কিত অনুভূতি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়।

উপদেশ দান করা সর্বাবস্থায় উপকারী : এ আয়াতে সনাতন কাকেরদের প্রতি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নসীহত করা না করা সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সাথে **عليهم** - এর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ সমতা কাকেরদের জন্য, রসূলের জন্য নয়। তবে তাদেরকে জানানোর এবং সংশোধন করার চেষ্টা করার সওয়াব অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাই সমগ্র কোরআনে কোন আয়াতেই এসব লোককে ঈমান ও ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া নিষেধ করা হয়নি। এতে বোঝা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেয়ার কাজে নিয়োজিত, তা ফলপ্রসূ হোক বা না হোক, সে এ কাজের সওয়াব পাবেই।

একটি সঙ্গেহের নিরসন : এ আয়াতের বিষয়বস্তুর অনুরূপ ভাষা সূরায়ে মুতাফিক্কীনের এক আয়াতেও উল্লেখিত হয়েছে যথা :

كَذَلِكَ يَضِلُّ الْمُتَكِبُّونَ

অর্থঃ, এমন নয়; বরং তাদের অন্তরে তাদের কর্মের মরিচা গাঢ় হয়ে গেছে। তাতে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের মন্দ কাজ ও অহংকারই তাদের অন্তরে মরিচার আকার ধারণ করেছে। এ মরিচাকে আলোচ্য আয়াতে ‘সীলমোহর’ বা আবরণ শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এরূপ সংশয় সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, যখন আল্লাহই তাদের অন্তরে সীলমোহর এঁটে দিয়েছেন এবং গ্রহণ-ক্ষমতাকে রহিত করেছেন, তখন তারা কুফরী করতে বাধ্য। কাজেই তাদের শাস্তি হবে কেন? এর জওয়াব হচ্ছে যে, তারা নিজেরাই অহংকার ও বিরুদ্ধাচরণ করে নিজদের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তাই এজন্য তারা ই দায়ী। যেহেতু বান্দাদের সকল

কাজের সৃষ্টি আল্লাহই করেছেন, তিনি এখানে সীলমোহরের কথা বলে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তারা নিজেরাই যখন সত্য গ্রহণের ক্ষমতাকে রহিত করতে উদ্যত হয়েছে, তখন আমি আমার কর্ম-পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের এ খরাপ যোগ্যতার পরিবেশ তাদের অন্তরে সৃষ্টি করে দিয়েছি।

উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে দু'টি আয়াতে মুনাফিকদের সম্পর্কে মস্তব্য করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক আছে, যারা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি, অথচ তারা আদৌ ঈমানদার নয়, বরং তারা আল্লাহ তা'আলা ও মুমিনদের সাথে প্রতারণা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নিজদেরকে ব্যতীত অন্য কাউকেই প্রতারিত করছে না।

এতে তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, তাদের এ দাবীও মূলতঃ প্রতারণামূলক। এটা বাস্তব সত্য যে, আল্লাহকে কেউ ধোকা দিতে পারে না এবং তারাও একথা হয়তো ভাবে না যে, তারা আল্লাহকে ধোকা দিতে পারবে, বরং রসূল (সাঃ) এবং মুসলমানদের সাথে ধোকাবাজি করার দরুনই বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সাথে ধোকাবাজি করছে। - (কুরতুবী)।

এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক প্রকৃত প্রস্তাবে আত্ম-প্রবঞ্চনায় লিপ্ত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত ধোকা ও প্রতারণার উর্ধ্বে। অনুরূপ তাঁর রসূল এবং মুমিনগণও ওহীর দৌলতে ছিলেন সমস্ত ধোকা-প্রতারণা থেকে নিরাপদ। কারো পক্ষে তাঁদের কোন ক্ষতি করা ছিল অস্বাভাবিক। পরন্তু তাদের এ ধোকার ক্ষতিকর পরিণতি দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় ক্ষেত্রে তাদেরই উপর পতিত হতো। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাদের অন্তর রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের এ রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।

রোগ সে অবস্থাকেই বলা হয়, যে অবস্থায় মানুষ স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে চলে যায় এবং তাদের কাজ-কর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। যার শেষ পরিণাম ধ্বংস ও মৃত্যু। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন, — যেভাবে অসতর্কতার দরুন মানুষের শরীরে রোগের সৃষ্টি হয়, তেমনিভাবে প্রবৃত্তির প্ররোচনার অনুকরণের দ্বারা মানুষের অন্তরেও রোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এ আয়াতে তাদের অন্তর্নিহিত কুফরকে রোগ বলা হয়েছে যা আত্মিক ও দৈহিক উভয় বিবেচনায়ই বড় রোগ। রূহানী ব্যাধি তো প্রকাশ্য; কেননা, প্রথমতঃ এ থেকে স্বীয় পালনকর্তার না-শুকরি ও অবাধ্যতা সৃষ্টি হয়। যাকে কুফর বলা হয়, তা মানবাত্মার জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন ব্যাধি। এতদসঙ্গে মানবসভ্যতার জন্যও অত্যন্ত কৃপা দোষ। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার ইন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সত্যকে গোপন করা এবং স্বীয় অন্তরের কথা প্রকাশ করার হিম্মত না করা — এ ব্যাপারটিও অন্তরের বড় রোগ। মুনাফিকদের দৈহিক রোগ এজন্য যে, তারা সর্বদাই এ ভয়ের মধ্যে থাকে যে, না জানি কখন কোথায় তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। দিবারাত্র এ চিন্তায় ব্যস্ত থাকার একটা মানসিক তথা শারিরিক ব্যাধিই বটে। তাছাড়া এর পরিণাম অনিবার্যভাবেই ঝগড়া ও শত্রুতা। কেননা, মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতি দেখে তারা সব সময়ই হিংসার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে, কিন্তু সে হতভাগা নিজের অন্তরের কথাটুকুও প্রকাশ করতে পারে না। ফলে সে শারিরীক ও মানসিকভাবে অসুস্থ থাকে।

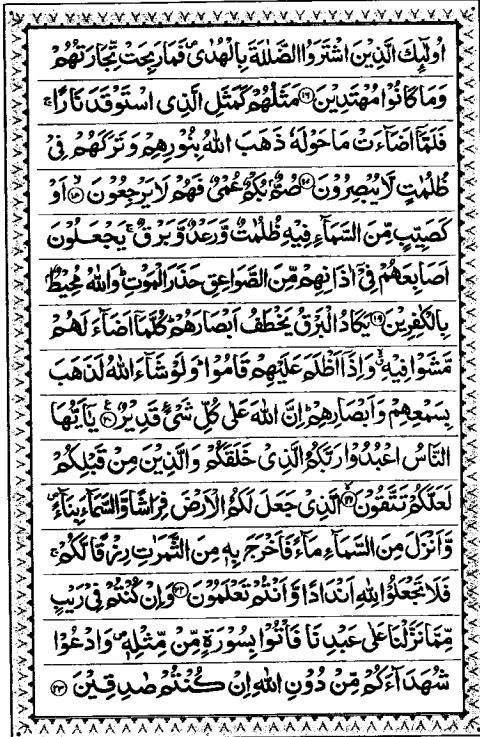
‘আল্লাহ তাদের রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন।’ এর অর্থ এই যে, তারা ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতি দেখে জ্বলে-পুড়ে দিন দিন ছাই হতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা দিন দিন তার দ্বীনের উন্নতি দিয়েই যাচ্ছেন।

১১ ও ১২ নং আয়াতে মুনাফিকদের সে ভুলের আলোচনা করা হয়েছে

البقرة

৫

الآ



(১৬) তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে। বস্ত্ত তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং তারা হেদায়েতও লাভ করতে পারেনি। (১৭) তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালানো এবং তার চার দিককার সবকিছুকে যখন আগুন স্পষ্ট করে তুললো, ঠিক এখনি সময় আল্লাহ তার চারদিকের আলোকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। ফলে, তারা কিছুই দেখতে পায় না। (১৮) তারা বধির মুক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। (১৯) আর তাদের উদাহরণ সেসব লোকের মত যারা দুর্যোগ্যপূর্ণ ঝড়ো রাতে পথ চলে, যাতে থাকে অঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আকুল দিয়ে রক্ত পোতে চায়। অথচ সমস্ত কাকেরই আল্লাহ কর্তৃক পরিবেষ্টিত। (২০) বিদ্যুতালোকে যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের প্রবণভক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বময় ক্ষমতালীল। (২১) হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগামী অর্জন করতে পারবে। (২২) যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্ত্ত : এসব তোমরা জান। (২৩) এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকে।

যে, তারা ফেনা-ফাসাদকে মীমাংসা এবং নিজেদেরকে মীমাংসাকারী মনে করে। কোরআন পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, ফাসাদ ও মীমাংসা মৌখিক দাবীর উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যথায় কোন চোর বা ডাকাতও নিজেকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলতে রাজী নয়। এ ব্যাপারে একান্তভাবে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির আচরণের উপর নির্ভরশীল। স্পষ্ট ব্যক্তির আচরণ যদি ফেনা-ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়, তবে এসব কাজ যারা করে তাদেরকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুফসিদই বলতে হবে। চাই একাজে ফেনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য হোক বা না'ই হোক।

১৩ নং আয়াতে মুনাফিকদের সামনে সত্যিকার ঈমানের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে - **اُولَئِكَ اَمِّنَ النَّاسُ** - অর্থাৎ, অন্যায় লোক যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও অনুরূপভাবে ঈমান আন। এখানে 'নাস' শব্দের দ্বারা সাহাবিগণকে বোঝানো হয়েছে। কেননা কোরআন অবতরণের যুগে তাঁরাই ঈমান এনেছিলেন। আর আল্লাহ তা'আলার দরবারে সাহাবিগণের ঈমানের অনুরূপ ঈমানই গ্রহণযোগ্য। যে বিষয়ে তাঁরা যেভাবে ঈমান এনেছিলেন অনুরূপ ঈমান যদি অন্যেরা আনে তবেই তাকে ঈমান বলা হয়; অন্যথায় তাকে ঈমান বলা চলে না। এতে বোঝা গেল যে, সাহাবিগণের ঈমানই ঈমানের কঠি পাথর। যার নিরিখে অবশিষ্ট সকল উম্মতের ঈমান পরীক্ষা করা হয়। এ কঠিপাথরের পরীক্ষায় যে ঈমান সঠিক প্রমাণিত না হয়, তাকে ঈমান বলা যায় না এবং অনুরূপ ইমানদারকে মুমিন বলা চলে না। এর বিপরীতে যত ভাল কাজই হোক না কেন, আর তা যত নেক-নিয়তেই করা হোক না কেন, আল্লাহর নিকট তা ঈমানরূপে স্বীকৃতি পায় না। সে যুগের মুনাফিকরা সাহাবিগণকে বোকা বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্ত্তঃ এ ধরনের গোমরাহী সর্বযুগেই চলে আসছে। যারা বস্ত্তকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারণতঃ বোকা, অশিক্ষিত, মূর্খ প্রভৃতি আখ্যায়ি জুটে থাকে। কিন্তু কোরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এসব লোক নিজেরাই বোকা। কেননা, এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী থাকা সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি।

১৪ নং আয়াতে মুনাফিকদের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা যখন মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা মুসলমান হয়েছি; ঈমান এনেছি। আর যখন তাদের দলের কাকেরদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি, মুসলমানদের সাথে উপহাস করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের বোকা বানাবার জন্য মিশেছি।

১৫ নং আয়াতে তাদের এ বোকাঘীর উত্তর দেয়া হয়েছে। তারা মনে করে, আমরা মুসলমানদিগকে বোকা বানাচ্ছি। অথচ বাস্তবে তারা নিজেরাই বোকা সাজছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একটু টিল দিয়ে উপহাসের পাঠে পরিণত করেছেন। প্রকাশ্যে তাদের কোন শাস্তি না হওয়াতে তারা আরো গাফলতিতে পতিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপহাস ও ঠাট্টার প্রত্যুত্তরে তাদের প্রতি এরূপ আচরণ করেছেন বলেই একে উপহাস বা বিদ্রোপ বলা হয়েছে।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৬ নং আয়াতে মুনাফিকদের সে অবস্থার বর্ণনা রয়েছে যে, তারা ইসলামকে কাছে থেকে দেখেছে এবং তার স্বাদও পেয়েছে, আর সত্যি তো পূর্ব থেকেই লিপ্ত ছিল। অতঃপর ইসলাম ও কুফর দেখে-বুঝে তাদের দুনিয়ার ঘৃণা উদ্দেশ্যে হাসিলের জ

البقرة

آلَمَ

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الصَّلَاةَ بِالْهَيْدَىٰ فَتَجَازَىٰهُمْ
 وَمَا كَانُوا مُعْتَبِرِينَ ۖ مَثَلَهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا
 فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي
 ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ ۚ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي يَرْجِعُونَ ۚ أَوْ
 كَمَثَلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَنُورُهُ يَكُونُ
 أَضَاءَ لَهُمْ فِي آيَاتِهِمْ مِنَ الصَّوَارِعِ ۚ وَنُورُهُ يَكُونُ
 بِأَلْوَحْيٍ ۚ وَكَأَنَّ الَّذِي يَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي
 مَسَّوْفِيَةٌ ۚ وَإِذَا ظَلَمَ عَلَيْهِ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ
 بِبَصَرِهِمْ ۚ وَأَبْصَارُهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ يَا أَيُّهَا
 النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
 وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ
 فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَإِنْ تَسْتَفْتُوا فِي شَيْءٍ
 فَمَثَلُ زَيْنَبِ عَٰبٍ ۚ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ۚ وَادْعُوا
 شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

(১৬) তারা সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করে। বস্তৃতঃ তারা তাদের এ ব্যবসায় লাভবান হতে পারেনি এবং তারা হেদায়েতও লাভ করতে পারেনি। (১৭) তাদের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালানো এবং তার চার দিককার সবকিছুকে যখন আগুন স্পষ্ট করে তুললো, ঠিক এমনি সময় আল্লাহ তার চারদিকের আলোকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন। ফলে, তারা কিছুই দেখতে পায় না। (১৮) তারা বমির মুক ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসবে না। (১৯) আর তাদের উদাহরণ সেসব লোকের মত যারা দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ো রাতে পথ চলে, যাতে থাকে আঁধার, গর্জন ও বিদ্যুৎচমক। মৃত্যুর ভয়ে গর্জনের সময় কানে আঁকুল দিয়ে রক্ষা পেতে চায়। অথচ সমস্ত কাকেরই আল্লাহ কড়ক পরিবেষ্টিত। (২০) বিদ্যুতালোকে যখন সামান্য আলোকিত হয়, তখন কিছুটা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায়, তখন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের শ্রবশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ের উপর সর্বযয় ক্ষমতামণ্ডলী। (২১) হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদিগকে এবং তোমাদের পূর্বকর্তাদিগকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পারবে। (২২) যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তৃতঃ এসব তোমরা জান। (২৩) এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বালায় প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকেও সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকে।

যে, তারা ফেনা-ফাসাদকে বীমাংসা এবং নিজেদেরকে বীমাংসাকারী মনে করে। কোরআন পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, ফাসাদ ও বীমাংসা যৌথিক দাবীর উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যথায় কোন চোর বা ডাকাতও নিজেই ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলতে রাজী নয়। এ ব্যাপারটি একান্তভাবে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির আচরণের উপর নির্ভরশীল। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আচরণ যদি ফেনা-ফাসাদ সৃষ্টির কারণ হয়, তবে এসব কাজ যারা করে তাদেরকে ফাসাদ সৃষ্টিকারী মুফসিদই বলতে হবে। চাই একাজে ফেনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা তার উদ্দেশ্য হোক বা না'ই হোক।

১৩ নং আয়াতে মুনাফিকদের সামনে সত্যিকার ঈমানের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে - **اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ** - অর্থাৎ, অন্যান্য লোক যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও অনুরূপভাবে ঈমান আন। এখানে 'নাস' শব্দের দ্বারা সাহাবীগণকে বোঝানো হয়েছে। কেননা কোরআন অবতরণের যুগে তাঁরাই ঈমান এনেছিলেন। আর আল্লাহ তা'আলার দরবারে সাহাবীগণের ঈমানের অনুরূপ ঈমানই গ্রহণযোগ্য। যে বিষয়ে তাঁরা যেভাবে ঈমান এনেছিলেন অনুরূপ ঈমান যদি অন্যেরা আনে তবেই তাকে ঈমান বলা হয়; অন্যথায় তাকে ঈমান বলা চলে না। এতে বোঝা গেল যে, সাহাবীগণের ঈমানই ঈমানের কষ্টি পাথর। যার নিরিখে অবশিষ্ট সকল উম্মতের ঈমান পরীক্ষা করা হয়। এ কষ্টিপাথরের পরীক্ষায় যে ঈমান সঠিক প্রমাণিত না হয়, তাকে ঈমান বলা যায় না এবং অনুরূপ ইমানদারকে মুমিন বলা চলে না। এর বিপরীতে যত ভাল কাজই হোক না কেন, আর তা যত নেক-নিয়তেই করা হোক না কেন, আল্লাহর নিকট তা ঈমানরূপে স্বীকৃতি পায় না। সে যুগের মুনাফিকরা সাহাবীগণকে বোকা বলে আখ্যায়িত করেছে। বস্তৃতঃ এ ধরনের গোমরাহী সর্বযুগেই চলে আসছে। যারা ঐক্যকে পথ দেখায়, তাদের ভাগ্যে সাধারণতঃ বোকা, অশিক্ষিত, মুর্থ প্রভৃতি আখ্যাই জুটে থাকে। কিন্তু কোরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এসব লোক নিজেরাই বোকা। কেননা, এমন উজ্জ্বল ও প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী থাকা সত্ত্বেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হয়নি।

১৪ নং আয়াতে মুনাফিকদের কপটতা ও দ্বিমুখী নীতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, তারা যখন মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা মুসলমান হয়েছি; ঈমান এনেছি। আর যখন তাদের দলের কাকেরদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি, মুসলমানদের সাথে উপহাস করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের বোকা বানাবার জন্য মিশেছি।

১৫ নং আয়াতে তাদের এ বোকাখীর উদ্ভব দেয়া হয়েছে। তারা মনে করে, আমরা মুসলমানদিগকে বোকা বানাচ্ছি। অথচ বাস্তবে তারা নিজেরাই বোকা সাজছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একটু টিল দিয়ে উপহাসের পাঠে পরিণত করেছেন। প্রকাশ্যে তাদের কোন শাস্তি না হওয়াতে তারা আরো গাফলতিতে পতিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপহাস ও ঠাট্টার প্রত্যুত্তরে তাদের প্রতি এক্রূপ আচরণ করেছেন বলেই একে উপহাস বা বিদ্রোহ বলা হয়েছে।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৬ নং আয়াতে মুনাফিকদের সে অবস্থার বর্ণনা রয়েছে যে, তারা ইসলামকে কাছে থেকে দেখেছে এবং তার স্বাদও পেয়েছে, আর কুফরীতে তো পূর্ব থেকেই লিপ্ত ছিল। অতঃপর ইসলাম ও কুফর উভয়কে দেখে-বুঝেও তাদের দুনিয়ার ধৃণ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইসলামের

পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করেছে। তাদের এ কাজকে ব্যবসায়ের সাথে তুলনা করে জানানো হয়েছে যে, তাদের ব্যবসায়ের কোন যোগ্যতাই নেই। তারা উত্তম ও মূল্যবান বস্তু ঈমানের পরিবর্তে নিকট ও মূল্যহীন বস্তু কুফর খরিদ করেছে।

১৭ - ২০ এই চার আয়াতে দু'টি উদাহরণ দিয়ে মুনাফিকদের কার্যকলাপকে দৃষ্ট আচরণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুনাফিকদের দু'শ্রেণীর লোকের পরিপ্রেক্ষিতেই এখানে পৃথক দু'টি উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

মুনাফিকদের একশ্রেণীর লোক হচ্ছে তারা, যারা কুফরীতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের কাছে থেকে আর্থিক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করতো। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক হচ্ছে তারা, যারা ইসলামের সত্যতায় প্রভাবিত হয়ে কখনো প্রকৃত মুমিন হতে ইচ্ছা করতো, কিন্তু দুনিয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে এ ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতো। এভাবে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দিনাতিপাত করতো।

আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে তাদেরকে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র নাগালের উর্ধ্বে নয়। সব সময়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাক তাদের ধ্বংসও করতে পারেন। এমনকি তাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তিকে পর্যন্ত রহিত করে দিতে পারেন। এই তেরটি আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থার পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এতে অনেক আহকাম ও মাসআলা এবং গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত বা উপদেশ রয়েছে। যথা—

কুফর ও নেকাক সেবুগেই ছিল, না এখনও আছে : আলোচ্য আয়াতগুলোতে আমরা জানতে পারি যে, মুনাফিকদের কপটতা নির্ধারণ করা এবং তাদেরকে মুনাফিক বলে চিহ্নিত করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর রসুলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মুসলমান নয়; বরং মুনাফিক। দ্বিতীয়তঃ এই যে, তাদের কথা-বার্তা ও কার্যকলাপে ইসলাম ও ঈমানবিরোধী কোন কাজ প্রকাশ পাওয়া।

হুযর (সাঃ)-এর তিরোধানের পর ওহী বন্ধ হওয়ায় প্রথম পদ্ধতিতে মুনাফিকদের সনাক্ত করার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় পদ্ধতিটি এখনও রয়েছে। যে ব্যক্তি কথা-বার্তায় ঈমান ও ইসলামের দাবীদার, কিন্তু কার্যকলাপে তার বিপরীত, তাকে মুনাফিক বলা হবে।

ইমান ও কুফরের তাৎপর্য : আলোচ্য আয়াতে চিন্তা করলে ঈমান ও ইসলামের পূর্ণ তাৎপর্যটি পরিষ্কার হয়ে যায়। অপরদিকে কুফরের হাকিকতও প্রকাশ পায়। কেননা, এ আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের ঈমানের দাবী **اٰمَنَّا بِاللّٰهِ** এবং কোরআনের পক্ষ থেকে এই দাবীর খণ্ডনে ঘোষিত **وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ** বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে আরো কিছু বিশেষ চিন্তা-ভাবনার অপেক্ষা রাখে : যে সমস্ত মুনাফিকের বর্ণনা কোরআনে দেয়া হয়েছে, সাধারণতঃ তারা ছিল ইহুদী। আল্লাহ তা'আলার অন্তিত্ব ও রোজ কেয়ামতে বিশ্বাস করা তাদের ধর্মমতেও প্রমাণিত ছিল, তাদেরকে রসুল (সাঃ)-এর রিসালত ও নবুওয়তের প্রতি ঈমান আনার কথা এখানে বলা হয়নি। বরং মাত্র দু'টি বিষয়ে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। তা হচ্ছে, আল্লাহ্র প্রতি ও শেষবিচার দিনের প্রতি। এতে তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা চলে না। তা সত্ত্বেও কোরআন কর্তৃক তাদেরকে মিথ্যাবাদী এবং তাদের ঈমানকে অস্বীকার করার কারণ কি? আসল কথা হচ্ছে যে, কোন না কোন প্রকারে

নিজ নিজ ধারণা ও ইচ্ছা মাফিক আল্লাহ এবং পরকাল স্বীকার করাকে ঈমান বলা যায় না। কেননা, মুশরিকরাও তো কোন না কোন দিক দিয়ে আল্লাহকে যেনে নেয় এবং কোন একটি নিয়ামক সত্তাকে সবচাইতে বড় একক ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকার করে। আর ভারতের মুশরিকগণ 'পরলোক' নাম দিয়ে আখেরাতের একটি ধারণাও পোষণ করে থাকে। কিন্তু কোরআনের দৃষ্টিতে একেও ঈমান বলা যায় না। বরং একমাত্র সে ঈমানই গ্রহণযোগ্য, যাতে আল্লাহ্র প্রতি তাঁর নিজের বর্ণনাকৃত সকল গণাগুণসহ যে ঈমান আনা হয় এবং পরকালের ব্যাপারে আল্লাহ ও রসুলের বর্ণনাকৃত অবস্থা ও গুণাগুণের সাথে যে বিশ্বাস স্থাপন করা হয়।

কুফর ও ঈমানের সংজ্ঞা : কোরআনের ভাষায় ঈমানের তাৎপর্য বলতে গিয়ে সূরা বাক্বারার ত্রয়োদশতম আয়াতে বলা হয়েছে **اٰمَنُوْا بِكُلِّ مِّنْ اِلٰهٍ** যাতে বোঝা যাচ্ছে যে, ঈমানের যথার্থতা যাচাই করার মাপকাঠি হচ্ছে সাহাবিগণের ঈমান। এ পরীক্ষায় যা সঠিক বলে প্রমাণিত না হবে, তা আল্লাহ ও রসুলের নিকট ঈমান বলে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে না।

যদি কোন ব্যক্তি কোরআনের বিষয়কে কোরআনের বর্ণনার বিপরীত পথে অবলম্বন করে বলে যে, আমি তো এ আকীদাকে মানি, তবে তা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। যথা — আজকাল কাদিয়ানীরা বলে বেড়ায় যে, আমরা তো খতমে-নবুওয়তে বিশ্বাস করি। অথচ এ বিশ্বাসে তারা রসুল (সাঃ)-এর বর্ণনা ও সাহাবিগণের ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে। আর এ পর্দার অন্তরালে মির্জা গোলাম আহমদের নবুওয়ত প্রতিষ্ঠার পথ বের করছে। তাই কোরআনের বর্ণনায় এদেরকেও **وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ** - এর আওতাভুক্ত করা হয়।

শেষকথা, যদি কোন ব্যক্তি সাহাবিগণের ঈমানের পরিপন্থী কোন বিশ্বাসের কোন নতুন পথ ও মত তৈরী করে সে মতের অনুসারী হয় এবং নিজেকে মুমিন বলে দাবী করে, মুসলমানদের নামায-রোযা ইত্যাদিতে শরীকও হয়, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের প্রদর্শিত পথে ঈমান আনয়ন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের ভাষায় তাদেরকে মুমিন বলা হবে না।

একটি সন্দেহের নিরসন : হাদীস ও ফেকাহশাস্ত্রের একটা সুপরিচিত সিদ্ধান্ত এই যে, আহলে-কেবলাকে কাফের বলা যাবে না। এর উত্তরও এ আয়াতেই বর্ণিত হয়েছে যে, আহলে-কেবলা তাদেরকেই বলা হবে যারা দ্বীনের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ে স্বীকৃতি জানায় ; কোন একটি বিষয়েও অবিশ্বাস পোষণ করে না বা অস্বীকৃতি জানায় না। পরন্তু শুধু কেবলামুখী হয়ে নামায পড়লেই কেউ ঈমানদার হতে পারে না। কারণ, তারা সাহাবিগণের ন্যায় দ্বীনের যাবতীয় যকরীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

মিথ্যা একটি জঘন্য অপরাধ : **اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ** আয়াতে মুনাফিকদের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তারা প্রথম স্তরের কাফের হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের জানামতে মিথ্যাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইত। তাই তারা ঈমানের ব্যাপারে আল্লাহ এবং রোজ কেয়ামতের কথা বলেই ক্ষান্ত হতো, রসুলের প্রতি ঈমানের প্রসঙ্গ দূততার সাথে পাশ কাটিয়ে যেতো। কেননা, এতে করে তাদের পক্ষে সরাসরি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার ভয় ছিল। এতে বোঝা যায় যে, মিথ্যা এমন একটি জঘন্য ও নিকট অপরাধ যা কোন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন লোকই পছন্দ করে না — সে কাফের-ফাসিকই হোক না কেন।

নবী এবং ওলীগণের সাথে দুর্ব্যবহার করা প্রকারান্তরে আল্লাহর সাথে দুর্ব্যবহারেরই শামিল : উপরোক্ত আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে একথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, **يُخَيَّرُونَ اللَّهَ** অর্থাৎ, এরা আল্লাহকে ধোকা দেয়। অথচ এ মুনাফিকদের মধ্যে হয়তো একজনও এমন ছিল না, যে আল্লাহকে ধোকা দেয়ার মনোভাব পোষণ করত। বরং তারা রসূল (সাঃ) এবং মুমিনগণকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে এ সমস্ত কৃপা কাজ করেছে।

আলোচ্য আয়াতে তাদের এ আচরণকে আল্লাহকেই ধোকা দেয়া বলে উল্লেখিত হয়েছে এবং প্রকারান্তরে বলে দেয়া হয়েছে যে, যারা আল্লাহর রসূল বা কোন ওলীর সাথে দুর্ব্যবহার করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা আল্লাহর সাথেই মন্দ আচরণ করে। প্রসঙ্গতঃ আল্লাহর রসূলের সাথে বে-আদবী করায় আল্লাহর সাথেই বে-আদবী করা হয়, একথা উল্লেখ করে আল্লাহর রসূল এবং তাঁর অনুসারিগণের বিপুল মর্যাদার প্রতিও ইশারা করা হয়েছে।

মিথ্যা বলার পাপ : আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের কঠোর শাস্তির কারণ **بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ**—অর্থাৎ, তাদের মিথ্যাচারকে স্থির করা হয়েছে। অথচ তাদের কুফর ও নিকাকুর অন্যান্যই ছিল সবচাইতে বড়। দ্বিতীয় বড় অন্যান্য হচ্ছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা। কিন্তু এতদসঙ্গেও কঠোর শাস্তির কারণ তাদের মিথ্যাচারকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মিথ্যা বলার অভ্যাসই তাদের প্রকৃত অন্যান্য। এ বদ-অভ্যাসই তাদেরকে কুফর ও নিকাকু পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে। এ জনাই অন্যায়ের পর্যায়ে যদিও কুফর ও নিকাকুই সর্বাপেক্ষা বড়, কিন্তু এসবের ভিত্তি ও বুনিনাদ হচ্ছে মিথ্যা। তাই কোরআন মিথ্যা বলাকে মূর্তিপূজার সাথে যুক্ত করে এরশাদ করেছে :

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْر

অর্থাৎ—মূর্তিপূজার অপবিত্রতা ও মিথ্যা বলা হতে বিরত থাক।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর হেদায়েতকে মানা না মানার ভিত্তিতে মানবজাতিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে, প্রত্যেকের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর আলোচ্য আয়াতে তিনটি দলকেই সমগ্র কোরআনের মৌল শিক্ষার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। এতে সৃষ্টিজগতের সবকিছুর আরাধনা পরিহার করে এক আল্লাহর এবাদতের প্রতি এমন পদ্ধতিতে দাওয়াত দেয়া হয়েছে যাতে সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও একটি চিন্তা করলেই তওহীদের প্রতি স্বীকৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়।

ناس (নাস) আরবী ভাষায় সাধারণভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে পূর্বে আলোচিত মানব সমাজের তিন শ্রেণীই এ আহ্বানের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, **الْحَيْدُ وَالْكَافِرُ** এবাদত শব্দের অর্থ নিজের অন্তরে মাহাত্ম্য ও ভীতি জাগ্রত রেখে সকল শক্তি আনুগত্য ও তাবেদারীতে নিয়োজিত করা এবং সকল অবাধ্যতা ও নাকরমানী থেকে দূরে থাকা। (রুহুল বয়ান পৃঃ ৭৪) ‘রব’ শব্দের অর্থ পালনকর্তা। ইতিপূর্বে এর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তদনুসারে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়,—স্বীয় পালনকর্তার এবাদত কর।

এ ক্ষেত্রে ‘রব’ শব্দের পরিবর্তে ‘আল্লাহ বা তাঁর গুণবাচক নামসমূহের মধ্য থেকে অন্য যে কোন একটা ব্যবহার করা যেতে পারতো, কিন্তু তা না করে ‘রব’ শব্দ ব্যবহার করে বোঝানো হয়েছে যে, এখানে দাবীর সাথে দলীলও পেশ করা হয়েছে। কেননা, এবাদতের যোগ্য একমাত্র

সে সত্যই হতে পারে, যে সত্তা তাদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। যিনি বিশেষ এক পালননীতির মাধ্যমে সকল গুণে গুণান্বিত করে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করেছেন এবং পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকার স্বাভাবিক সকল ব্যবস্থাই করে দিয়েছেন।

মানুষ যত মুখই হোক এবং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি যতই হারিয়ে থাকুক না কেন, একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, পালনের সকল দায়িত্ব নেয়া আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। আর সাথে সাথে একথাও উপলব্ধি করতে পারবে যে মানুষকে এ অগণিত নেয়াযত না পাথর-নির্মিত কোন মূর্তি দান করেছে, না অন্য কোন শক্তি। আর তারা করবেই বা কিরূপে? তারা তো নিজেরদের অস্তিত্ব রক্ষার বা বেঁচে থাকার জন্য নিজেরাই সে মহাশক্তি ও সত্তার মুখাপেক্ষী। যে নিজেই অন্যের মুখাপেক্ষী সে অন্যের অভাব কি করে দূর করবে? যদি কেউ বাহ্যিক অর্থে কারো প্রতিপালন করেও, তবে তাও প্রকৃতপ্রস্তাবে সে সত্তার ব্যবস্থাপনার সাহায্য ছাড়া সম্ভব নয়।

এর সারমর্ম এই যে, যে সত্তার এবাদতের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা আদৌ এবাদতের যোগ্য নয়।

আমল নাজাত ও বেহেশত পাওয়ার নিশ্চিত উপায় নয় : **لَكُمْ** লَكُمْ বাক্যটিতে **لَمْ** শব্দ আশা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি এমন ক্ষেত্রে বলা হয়, যেখানে কোন কাজ হওয়া নিশ্চিত হয়ে থাকে। ঈমান তওহীদের পরিণাম নাজাত সম্বন্ধে আল্লাহর ওয়াদা নিশ্চিত, কিন্তু সে বস্তুকে আশারূপে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, মানুষের কোন কাজই মুক্তি ও বেহেশতের মূল্য বা বিনিময় হতে পারে না। বরং একমাত্র আল্লাহর মেহেরবানীতেই মুক্তি সম্ভব। ঈমান আনা ও আমল করার তৌফীক হওয়া আল্লাহর মেহেরবানীর নমুনা, কারণ নয়।

তওহীদের বিশ্বাসই দুনিয়াতে শান্তি ও নিরাপত্তার জামিন : ইসলামের মৌলিক আকীদা তওহীদ বিশ্বাস শুধু একটি ধারণা বা মতবাদমাত্রই নয়; বরং মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানুষরূপে গঠন করার একমাত্র উপায়ও বটে। যা মানুষের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দেয়, সকল সংকটে আশ্রয় দান করে এবং সকল দুঃখ-দুর্বিপাকের মর্মসাহী। কেননা, তওহীদ বিশ্বাসের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, সৃষ্ট সকল বস্তুর পরিবর্তন-পরিবর্তন একমাত্র একক সত্তার ইচ্ছাশক্তির অনুগত এবং তাঁর কুদরতের প্রকাশ।

এ দু’টি আয়াতে এমন এক কালাম পেশ করা হচ্ছে, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোই হতে পারে না। ব্যক্তিগত মেধা কিংবা দলগত উদ্যোগের দ্বারাও এ কালামের অনুরূপ রচনা করা সম্ভব নয়। সমগ্র মানবজাতির এ অপার গতীর আলোকেই এ সত্য প্রমাণিত যে, এ কালাম আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নয়। এ আয়াতে আল্লাহ তা’আলা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে উদ্দেশ্য করে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা এ কালামকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মানুষের কালাম বলে মনে কর, তবে যেহেতু তোমরাও মানুষ, তোমাদেরও অনুরূপ কালাম রচনা করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা থাকা উচিত। কাজেই সমগ্র কোরআন নয় বরং এর ক্ষুদ্রতম একটি সুরাই রচনা করে দেখাও। এতে তোমদিগকে আরো সুযোগ দেয়া যাবে যে, একা না পারলে সমগ্র পৃথিবীর মানুষ মিলে, যারা তোমাদের সাহায্য-সহায়তা করতে পারে এমন সব লোক নিয়েই ছোট একটি সুরা রচনা করে দেখাও। কিন্তু না, তা পারবে না। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের সে যোগ্যতাই নেই। তারপর বলা হয়েছে, কেয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা

করেও যখন পারবে না, তখন দোষখের আগুন ও শাস্তিকে ভয় কর। কেননা, এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এটা মানব রচিত কালাম নয়, বরং এমন অসীম শক্তিশালী সত্তার কালাম যা মানুষের ধরা-ছোঁয়া ও নাগালের উর্ধ্বে। যার শক্তি সকলের উর্ধ্বে এমন এক মহা সত্তা ও শক্তির কালাম। সুতরাং তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত থেকে দোষখের কঠোর শাস্তি হতে আত্মরক্ষা কর।

মোটকথা, এ দুটি আয়াতে কোরআনুল-করীমকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সর্বাপেক্ষা বড় মু'জেযা হিসাবে অভিহিত করে তাঁর রিসালত ও সত্যবাদিতার দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। রসূল (সাঃ)-এর মু'জেযার তো কোন শেষ নেই এবং প্রত্যেকটিই অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু তা সত্ত্বেও এস্থলে তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যার মু'জেযা অর্থাৎ, কোরআনের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ রেখে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জেযা হচ্ছে কোরআন এবং এ মু'জেযা অন্যান্য নবী রসূলগণের সাধারণ মু'জেযা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার কুদরতে রসূল প্রেরণের সাথে সাথে কিছু মু'জেযাও প্রকাশ করেন। আর এসব মু'জেযা যে সমস্ত রসূলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো তাঁদের জীবন কাল পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু কোরআনই এমন এক বিচিত্র মু'জেযা যা কেয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে।

وَأَن نُّنَكِّرَ فِي رَيْبٍ

১১) শব্দের অর্থ সন্দেহ, সংশয়। কিন্তু ইমাম রাগিব ইসফাহানীর মতে ১১) এমন সন্দেহ ও ধারণাকে বলা হয়, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সামান্য একটু চিন্তা করলেই যে সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। এজন্য কোরআনে অমুসলিম জ্ঞানী সমাজের পক্ষেও ১১) -এ পতিত হওয়া স্বাভাবিক নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআন একটি গতিশীল ও কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী মু'জেযা :

অন্যান্য সমস্ত নবী ও রসূলগণের মু'জেযাসমূহ তাঁদের জীবন পর্যন্তই মু'জেযা ছিল। কিন্তু কোরআনের মু'জেযা হযুর (সাঃ)-এর তিরোধানের পরও পূর্বের মতই মু'জেযা সুলভ বৈশিষ্ট্যসহই বিদ্যমান রয়েছে। আজ পর্যন্ত একজন সাধারণ মুসলমানও দুনিয়ার যে কোন জ্ঞানী-গুণীকে চ্যালেঞ্জ করে বলেত পারে যে, কোরআনের সমতুল্য কোন আয়াত ইতিপূর্বেও কেউ তৈরী করতে পারেনি, এখনও কেউ পারবে না, আর যদি সাহস থাকে তবে তৈরী করে দেখাও।

সুতরাং কোরআনের রচনাকৌশল, যার নমুনা আর কোনকালেই কোন জাতি পেশ করতে পারেনি, সেটাও একটি গতিশীল দীর্ঘস্থায়ী মু'জেযা। হযুরের যুগে যেমন এর নথীর পেশ করা যায়নি, অনুরূপভাবে আজও তা কেউ পেশ করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে না।

অন্য কোরআন : উপরোক্ত সাধারণ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়ার প্রয়োজন যে, কিসের ভিত্তিতে কোরআনকে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বাপেক্ষা বড় মু'জেযা বলা হয়? আর কি কারণে কোরআন শরীফ সর্বযুগে অনন্য ও অপারাজেয় এবং সারা বিশ্ববাসী কেন এর নথীর পেশ করতে অপারাগ?

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের এ দাবী যে, চৌদ্দ শত বৎসরের এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও কেউ কোরআনের বা এর একটি সূরার অনুরূপ কোন রচনাও পেশ করতে পারিনি, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দাবীর যথার্থতা কতটুকু এ দুটি বিষয়ই দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ।

কোরআনের মু'জেযা হওয়ার আন্যান্য কারণসমূহ : প্রথম কথা হচ্ছে যে, কোরআনকে মু'জেযা বলে অভিহিত করা হলো কেন, আর কি কি কারণে সারা বিশ্ব এর নথীর পেশ করতে অপারাগ হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাচীনকাল থেকেই আলোচনা বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর প্রত্যেক মুফাসসিরই স্ব স্ব বর্ণনা ভিত্তিতে এর বিবরণ দিয়েছেন। এখানে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হল।

সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ আশ্চর্য এবং সর্ববিধ জ্ঞানের আধার মহান গ্রন্থটি কোন পরিবেশে এবং কার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আরো লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, সে যুগের সমাজ পরিবেশে কি এমন কিছু জ্ঞানের উপকরণ বিদ্যমান ছিল, যার দ্বারা এমন পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচিত হতে পারে, যাতে সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় উপকরণ সন্নিবেশিত করা স্বাভাবিক হতে পারে? সমগ্র মানব সমাজের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল দিক সম্মিলিত নির্ভুল পথ-নির্দেশ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার মত কোন সূত্রের সন্ধান কি সে যুগের জ্ঞান-ভাণ্ডারে বিদ্যমান ছিল, যদ্বারা মানুষের দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিকেরই সূক্ষ্ম বিকাশের বিধানাবলী থেকে শুরু করে পারিবারিক নিয়ম-শৃঙ্খলা, সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তথা দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম ও সর্বযুগে সমভাবে প্রযোজ্য আইন-কানুন বিদ্যমান থাকতে পারে?

যে ভূ-খণ্ডে এবং যে মহান ব্যক্তির প্রতি এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, এর ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা জানতে গেলে সাক্ষ্য ঘটবে এমন একটা উষ্মর শুষ্ক মরুময় এলাকার সাথে যা ছিল বাত্বা বা মক্কা নামে পরিচিত। যে এলাকার ভূমি না ছিল কৃষিকাজের উপযোগী, না ছিল এখানে কোন কারিগরি শিল্প। আবহাওয়াও এমন স্বাস্থ্যকর ছিল না, যা কোন বিদেশী পর্যটককে আকৃষ্ট করতে পারে। রাস্তা-ঘাটও এমন ছিল না, যেখানে সহজে যাতায়াত করা যায়। সেটি ছিল অবশিষ্ট দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন এমন একটি মরুময় উপদ্বীপ, যেখানে শুষ্ক পাহাড়-পর্বত এবং ধু-ধু বালুকাময় প্রান্তর ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়তো না। কোন জনবসতি বা বৃক্ষলতার অস্তিত্বও বড় একটা দেখা যেতো না।

এ বিরাট ভূ-ভাগটির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য শহরেরও অস্তিত্ব ছিল না। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম এবং তার মধ্যে উট-ছাগল প্রতিপালন করে জীবনধারণকারী কিছু মানুষ বসবাস করতো। ছোট ছোট গ্রামগুলো তো দূরের কথা, নামেমাত্র যে কয়টি শহর ছিল, সেগুলোতেও লেখাপড়ার কোন চর্চাই ছিল না। না ছিল কোন স্কুল কলেজ, না ছিল কোন বিশ্ববিদ্যালয়। শুধুমাত্র ঐতিহ্যগতভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এমন একটা সুসমৃদ্ধ ভাষাসম্পদ দান করেছিলেন, যে ভাষা গদ্য ও পদ্য বাক-রীতিতে ছিল অনন্য। আকাশের মেঘ-গর্জনের মতো সে ভাষার মাধুরী অপূর্ব সাহিত্যরসে সিক্ত হয়ে তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসতো। অপূর্ব রসময় কাব্যসম্ভার বৃষ্টিধারার মত আবৃত্ত হতো পথে-প্রান্তরে। এ সম্পদ ছিল এমন এক বিস্ময় আজ পর্যন্তও যার রসাস্বাদন করতে গিয়ে যে কোন সাহিত্য প্রতিভা হতবাক হয়ে যায়। কিন্তু এটি ছিল তাদের স্বভাবজাত এক সাধারণ উত্তরাধিকার। কোন মক্তব-মাদরাসার মাধ্যমে এ ভাষাজ্ঞান অর্জন করার রীতি ছিল না। অধিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের কোন আগ্রহও পরিলক্ষিত হতো না। যারা শহরে বাস করতো, তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। পণ্যসামগ্রী একস্থান থেকে অন্যস্থানে আমদানী-রপ্তানীই ছিল তাদের একমাত্র পেশা।

সে দেশেই সর্বপ্রাচীন শহর মক্কার এক সম্প্রদায় পরিবারে সে মহান

ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব, যার প্রতি আল্লাহর পবিত্রতম কিতাব কোরআন নাযিল করা হয়। প্রসঙ্গতঃ সে মহামানবের অবস্থা সম্পর্কেও কিছুটা আলোচনা করা যাক।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই তিনি পিতৃহারা হন, জন্মগ্রহণ করেন অসহায় এতীম হয়ে। মাত্র সাত বছর বয়সেই মাতৃবিয়োগ ঘটে। মাতার স্নেহ-মমতার কোলে লালিত-পালিত হওয়ার সুযোগও তিনি পাননি! পিতৃ-পিতামহাংশ ছিলেন এমন দরাজদিল যার ফলে পারিবারিক সূত্র থেকে উত্তরাধিকারগ্ৰে সামান্য সম্পদও তাঁর ভাগ্যে জুটেনি যার দ্বারা এ অসহায় এতীমের যোগ্য লালন-পালন হতে পারতো। পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় নিতান্ত কঠোর দারিদ্র্যের মাঝে লালিত-পালিত হন। যদি তখনকার মক্কায় লেখাপড়ার চর্চা থাকতো তবুও এ কঠোর দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে লেখাপড়া করার কোন সুযোগ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হতো না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তদানিন্তন আরবে লেখাপড়ার কোন চর্চাই ছিল না, যে জন্য আরব জাতিতে উম্মী তথা নিরক্ষর জাতি বলা হতো। কোরআন পাকেও এ জাতিতে উম্মী জাতি নামেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সে মহান ব্যক্তি বাল্যকালাবধি যে কোন ধরনের লেখাপড়া থেকে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন রয়ে যান। সে দেশে তখন এমন কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরও অস্তিত্ব ছিল না, যার সাহচর্যে থেকে এমন কোন জ্ঞান-সূত্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হতো, যে জ্ঞান কোরআন পাকে পরিবেশন করা হয়েছে। যেহেতু একটা অনন্য সাধারণ মুজ্জেয প্রদর্শনই ছিল আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য, তাই মামুলী একটু অক্ষর জ্ঞান যা দুনিয়ার যে কোন এলাকার লোকই কোন না কোন উপায়ে আয়ত্ত করতে পারে, তাও আয়ত্ত করার কোন সুযোগ তাঁর জীবনে হয়ে উঠেনি। অদৃশ্য শক্তির বিশেষ ব্যবস্থাতেই তিনি এমন নিরক্ষর উম্মী রয়ে গেলেন যে, নিজের নামটুকু পর্যন্ত দস্তখত করতে তিনি শিখেননি।

তদানিন্তন আরবের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বিষয় ছিল কাব্য চর্চা। স্থানে স্থানে কবিদের জলসা-মজলিস বসতো। এসব মজলিসে অংশগ্রহণকারী চারণ ও স্বভাব কবিত্বের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা হতো। প্রত্যেকেই উত্তম কাব্য রচনা করে প্রাধান্য অর্জন করার চেষ্টা করতো। কিন্তু তাঁকে আল্লাহ তা'আলা এমন রুচি দান করেছিলেন যে, কোনদিন তিনি এধরনের কবি জলসায় শরীক হননি। জীবনেও কখনও একছত্র কবিতা রচনা করারও চেষ্টা করেননি।

উম্মী হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রতা-নব্রতা, চরিত্রমার্ঘ্য ও অত্যন্ত প্রখর ঐশিকি এবং সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর অসাধারণ গুণ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হতো, ফলে আরবের ক্ষমতাদর্পী বড়লোকগুলাও তাঁকেই শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখতো সমগ্র মক্কা নগরীতে তাঁকে আল-আমীন বলে অভিহিত করা হতো।

এ নিরক্ষর ব্যক্তি চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মক্কা নগরীতে অবস্থান করেছেন। ভিন্ন কোন দেশে ভ্রমণও যাননি। যদি এমন ভ্রমণও করতেন, তবুও ধরে নেয়া যেত যে, তিন সেসব সফরে অভিজ্ঞতা ও বিদ্যার্জন করেছেন। মাত্র সিরিয়ায় দুটি বাণিজ্যিক সফর করেছেন, যাতে তাঁর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত মক্কায় এমনভাবে জীবনযাপন করেছেন যে, কোন পুস্তক বা লেখনী স্পর্শ করেছেন বলেও জানা যায় না, কোন মন্তব্যও যাননি, কোন কবিতা বা ছড়াও রচনা করেননি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মুখ থেকে সে বাণী নিঃসৃত হতে লাগল, যাকে কোরআন বলা হয়। যা শাদিক ও অর্থের গুণগত দিক দিয়ে মানুষকে স্তম্ভিত করতো। সুস্থ বিবেকবান লোকদের জন্য কোরআনের এ গুণগত মান

মু'জ্জেযা হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাতেই তো শেষ নয়! বরং এ কোরআন সারা বিশ্ববাসীকে বরাংবার চ্যালেঞ্জ সহকারে আহবান করেছে যে, যদি একে আল্লাহর কলাম বলে বিশ্বাস করতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে এর নবীর পেশ করে দেখাও।

একদিকে কোরআনের আহবান অপরদিকে সমগ্র বিশ্বের বিরোধী শক্তি যা ইসলাম ও ইসলামের নবীকে ধ্বংস করার জন্য স্বীয় জ্ঞান-মাল, শক্তি-সামর্থ্য ও মান-ইযত তথা সবকিছু নিয়োজিত করে দিন-রাত চেষ্টা করছিল। কিন্তু এ সামান্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে কেউ সাহস করেনি। ধরে নেয়া যাক, এ গ্রন্থ যদি অদ্বিতীয় ও অনন্য সাধারণ নাও হতো, তবু একজন উম্মী লোকের মুখে এর প্রকাশই কোরআনকে অপরাধেয় বলে বিবেচনা করতে যে কোন সুস্থবিরেক সম্পন্ন লোকই বাধ্য হতো। কেননা, একজন উম্মী লোকের পক্ষে এমন একটা গ্রন্থ রচনা করতে পারা কোন সাধারণ ঘটনা বলে চিন্তা করা যায় না।

দ্বিতীয় কারণ : পবিত্র কোরআন ও কোরআনের নির্দেশাবলী সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এর প্রথম সন্মোচন ছিল প্রত্যক্ষভাবে আরব জনগণের প্রতি। যাদের অন্য কোন জ্ঞান না থাকলেও ভাষা শৈলীর উপর ছিল অসাধারণ বুৎপত্তি। এদিক দিয়ে আরবরা সারাবিশ্বে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। কোরআন তাদেরকে লক্ষ্য করেই চ্যালেঞ্জ করেছে যে, কোরআন যে আল্লাহর কলাম তাতে যদি তোমরা সন্দিহান হয়ে থাক, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সাধারণ সুরা রচনা করে দেখাও। যদি আল-কোরআনের এ চ্যালেঞ্জ শুধু এর অন্তর্গত গুণ, নীতি, শিক্ষাগত তথ্য এবং নিগূঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হতো, তবে হয়তো এ উম্মী জাতির পক্ষে কোন অজুহাত পেশ করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারতো, কিন্তু ব্যাপার তা নয়, বরং রচনা-শৈলীর আঙ্গিক সম্পর্কেও এতে বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্য অন্যান্য জাতির চাইতে অরববাসীরাই ছিল বেশী উপযুক্ত। যদি এ কলাম মানব ক্ষমতার উর্ধ্বে কোন অলৌকিক শক্তির রচনা না হতো, তবে অসাধারণ ভাষাজ্ঞান সম্পন্ন আরবদের পক্ষে এর মোকাবেলা কোন মতেই অসম্ভব হতো না, বরং এর চাইতেও উন্নতমানের কলাম তৈরী করা তাদের পক্ষে সহজ ছিল। দু'একজনের পক্ষে তা সম্ভব না হলে, কোরআন তাদেরকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এমনটি রচনা করারও সুযোগ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সমগ্র আরববাসী একেবারে নিচ্চুপ হয়ে গেল কয়েকটি ব্যাক্যও তৈরী করতে পারলো না।

আরবের নেতৃস্থানীয় লোকগুলো কোরআন ও ইসলামকে সম্পূর্ণ উৎখাত এবং রসূল (সাঃ)-কে পরাজিত করার জন্য যেভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, তা শিক্ষিত লোকমাত্রই অবগত। প্রাথমিক অবস্থায় হযরত রসূল করীম (সাঃ) এবং তাঁর স্বল্পসংখ্যক অনুসারীর প্রতি নানা উপদ্রবের মাধ্যমে ইসলাম থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়ে তারা তোষামোদের পথ ধরলো। আরবের বড় সরদার ওতবা ইবনে রাবীয়া সকলের প্রতিনিধিরূপে হযর (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলো, আপনি ইসলাম প্রচার থেকে বিরত থাকুন। আপনাকে সমগ্র আরবের ধন-সম্পদ, রাজত্ব এবং সুন্দরী মেয়ে দান করা হবে। তিনি এর উত্তরে কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। হিজরতের পূর্বে ও পরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। কিন্তু কেউই কোরআনের

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে অগ্রসর হল না—তারা কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা এমনকি কয়েকটি ছত্রও তৈরী করতে পারল না। ভাষাশৈলী ও পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে কোরআনের মোকাবেলা করার ব্যাপারে আরবদের এহেন নীরবতাই প্রমাণ করে যে, কোরআন মানবরচিত গ্রন্থ নয়, বরং তা আল্লাহরই কলাম। মানুষ তো দূরের কথা, সমগ্র সৃষ্টিজগত মিলেও এ কালামের মোকাবেলা করতে পারে না।

আরববাসীরা যে এ ব্যাপারে শুধু নির্বাকই রয়েছে তাই নয়, তাদের একান্ত আলোচনায় এরূপ মন্তব্য করতেও তারা কৃষ্টিত হয়নি যে, এ কিতাব কোন মানুষের রচনা হতে পারে না। আরবদের মধ্যে যাদের কিছুটা সুস্থ্য বিবেক ছিল তারা শুধু মুখেই একথা প্রকাশ করেনি, এরূপ স্বীকৃতির সাথেসাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেকেই ইসলাম গ্রহণও করেছে। আবার কেউ কেউ পৈত্রিক ধর্মের প্রতি অন্ধ আবেগের কারণে অথবা বনী-আব্দে মনাকের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কোরআনকে আল্লাহর কলাম বলে স্বীকার করেও ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে।

কুরায়েশদের ইতিহাসই সে সমস্ত ঘটনার সাক্ষী। তারই মধ্য থেকে এখানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে, যাতে অতি সহজে বুঝা যাবে যে, সমগ্র আরববাসী কোরআনকে অদ্বিতীয় ও নবীরবিহীন কলাম বলে স্বীকার করেছে এবং এর নবীর পেশ করার বার্ষ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হওয়ার ঝুঁকি নিতে সচেতনভাবে বিরত রয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং কোরআন নাযিলের কথা মক্কার গণ্ডী ছাড়িয়ে হেজাজের অন্যান্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার পর বিরুদ্ধবাদীদের অন্তরে এরূপ সংশয়ের সৃষ্টি হলো যে, আসন্ন হজ্জের মওসুমে আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজীগণ যখন মক্কায় আগমন করবে, তখন তারা রসূল (সাঃ)—এর কথাবার্তা শুনে প্রভাবান্বিত না হয়ে পারবে না। এমতাবস্থায় এরূপ সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করার পন্থা নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরায়েশরা একটি বিশেষ পরামর্শ সভার আয়োজন করলো। এ বৈঠকে আরবের বিশিষ্ট সরদারগণও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে ওলীদ ইবনে মুগীরা বয়সে ও বিচক্ষণতায় ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। সবাই তার নিকট এ সমস্যার কথা উপস্থাপন করলো। তারা বললো, এখন চারদিকে থেকে মানুষ আসবে এবং মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে। তাদের সেসব প্রশ্নের জবাবে আমরা কি বলবো? আপনি আমাদেরকে এমন একটি উত্তর বলে দিন, যেন আমরা সবাই একই কথা বলতে পারি।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর তিনি উত্তর দিলেন, যদি তোমাদের কিছু বলতেই হয়, তবে তাঁকে জাদুকর বলতে পার। লোকদেরকে বলো যে, এ লোক জাদু-বলে পিতা-পুত্র ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেন। সমবেত লোকেরা তখনকার মত প্রস্তাবে একমত ও নিশ্চিত হয়ে গেল। তখন থেকেই তারা আগন্তুকদের নিকট একথা বলতে আরম্ভ করলো, কিন্তু আল্লাহর জ্বালানো প্রদীপ কারো ফুৎকারে নির্বাপিত হবার নয়। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সাধারণ লোকদের অনেকেই কোরআনের অমীম্ব বাণী শুনে মূলমান হয়ে গেল। ফলে মক্কার বাইরেও ইসলামের বিস্তার সূচিত হলো।—(খাসায়েসে-কুবরা)

এমনিভাবে বিশিষ্ট কুরাইশ সরদার নযর ইবনে হারেস তার স্বজাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, আজ তোমরা এমন এক বিপদের সম্মুখীন হয়েছ, যা ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায়নি। মুহাম্মদ (সাঃ) তোমাদেরই মধ্যে যৌবন অভিযাহিত করেছেন, তোমরা তাঁর চরিত্রমাধুর্যে বিমুগ্ধ ছিলে, তাঁকে তোমরা সবার চাইতে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করতে,

আমানতদার বলে অভিহিত করতে! কিন্তু যখন তাঁর মাথার চুল সাদা হতে আরম্ভ করেছে, আর তিনি আল্লাহর কলাম তোমাদেরকে শোনাতে শুরু করেছেন, তখন তোমরা তাঁকে জাদুকর বলে অভিহিত করছ। আল্লাহর কসম; তিনি জাদুকর নন। আমি বহু জাদুকর দেখেছি, তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি, তাদের সঙ্গে মেলাশো করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ) কোন অবস্থাতেই তাদের মত নন। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। আরও জেনে রেখো! আমি অনেক জাদুকরের কথাবার্তা শুনেছি, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা জাদুকরের কথাবার্তার সাথে কোন বিচারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তোমরা তাঁকে কবি বল, অথচ আমি অনেক কবি দেখেছি, এ বিদ্যা আয়ত্ত করেছি, অনেক বড় বড় কবির কবিতা শুনেছি, অনেক কবিতা আমার মুখস্থও আছে, কিন্তু তাঁর কালামের সাথে কবিদের কবিতার কোন সাদৃশ্য আমি খুঁজে পাইনি। কখনও কখনও তোমরা তাঁকে পাগল বল, তিনি পাগলও নন। আমি অনেক পাগল দেখেছি, তাদের পাগলামীপূর্ণ কথাবার্তাও শুনেছি, কিন্তু তাঁর মধ্যে তাদের মত কোন লক্ষণই পাওয়া যায় না। হে আমার জাতি! তোমরা ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এ ব্যাপারে চিন্তা কর, সহজে এড়িয়ে যাওয়ার মত ব্যক্তিত্ব তিনি নন।

হযরত আবু যর (রাঃ) বলেছেন, আমার ভাই আনীস একবার মক্কায় গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে আমাকে বলেছিলেন যে, মক্কায় এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে দাবী করছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সেখানকার মানুষ এ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে? তিনি উত্তর দিলেন, তাঁকে কেউ কবি কেউ পাগল, কেউবা জাদুকর বলে। আমার ভাই আনীস একজন বিশিষ্ট কবি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞ লোক ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আমি যতটুকু লক্ষ্য করেছি, মানুষের এসব কথা ভুল ও মিথ্যা। তাঁর কলাম কবিতাও নয়, জাদুও নয়, আমার ধারণায় সে কলাম সত্য।

আবু যর (রাঃ) বলেন যে, ভাইয়ের কথা শুনে আমি মক্কায় চলে এলাম। মসজিদে হারামে অবস্থান করলাম এবং ত্রিশ দিন শুধু অপেক্ষা করেই অভিযাহিত করলাম। এ সময় যমযম কূপের পানি ব্যতীত আমি অন্য কিছুই পানাহার করিনি। কিন্তু এতে আমার ক্ষুধার কষ্ট অনুভব হয়নি। দুর্বলতাও উপলব্ধি করিনি। শেষ পর্যন্ত কাবা প্রাঙ্গন থেকে বের হয়ে লোকের নিকট বললাম, আমি রোম ও পারস্যের বড় বড় স্ক্রানী-গুণী লোকদের অনেক কথা শুনেছি, অনেক জাদুকর দেখেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ)—এর বাণীর মত কোন বাণী আজও পর্যন্ত কোথাও শুনিনি। কাজেই সবাই আমার কথা শোন এবং তাঁর অনুসরণ কর। আবু যরের এ প্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়েই মক্কা বিজয়ের বছর তাঁর কণ্ঠের প্রায় এক হাজার লোক মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম ও হযরতের সবচাইতে বড় শত্রু আবু জাহল এবং আখ্নাস ইবনে শোরাইকও লোকচক্ষুর অগোচরে কোরআন শুনত, কোরআনের অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গি এবং অনন্য রচনারীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতো। কিন্তু গোত্রের লোকেরা যখন তাদেরকে বলতো যে, তোমরা যখন এ কালামের গুণ সম্পর্কে এতই অবগত এবং একে অদ্বিতীয় কলামরূপে বিশ্বাস কর, তখন কেন তা গ্রহণ করছ না? প্রত্যুত্তরে আবু জাহল বলতো, তোমরা জান যে, বনি আব্দে মনাক এবং আমাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই বিরামহীন শত্রুতা চলে আসছে; তারা যখন কোন কাজে অগ্রসর হতে চায়, তখন আমরা তার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বাধা দেই। উভয় গোত্রই সমপর্যায়ের। এমতাবস্থায় তারা যখন বলছে যে, আমাদের মধ্যে এমন এক নবীর আভির্ভাব হয়েছে, হাঁর নিকট আল্লাহর বাণী আসে, তখন আমরা

কিভাবে তাদের মোকাবেলা করব, তাই আমার চিন্তা। আমি কখনও তাদের একথা মেনে নিতে পারি না।

মোটকথা কোরআনের এ দাবী ও চ্যালেঞ্জে সারা আরববাসী যে পরাজয় বরণ করেই ক্ষান্ত হয়েছে তাই নয়, বরং একে অদ্বিতীয় ও অনন্য বলে প্রকাশ্য ভাবে স্বীকারও করেছে। যদি কোরআন মানব রচিত কালাম হতো, তবে সমগ্র আরববাসী তথা সমগ্র বিশ্ববাসী অনুরূপ কোন না কোন একটি ছোট সূরা রচনা করতে অপারগ হতো না এবং এ কিতাবের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকারও করতো না। কোরআন ও কোরআনের বাহক পয়গাম্বরের বিরুদ্ধে জান-মাল, ধন সম্পদ, মান-ইজ্জত সবকিছু ব্যয় করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কোরআনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে দুটি শব্দও রচনা করতে কেউ সাহসী হয়নি।

এর কারণ এই যে, যে সমস্ত মানুষ তাদের মুখতাজনিত কার্যকলাপ ও আমল সম্বন্ধে কিছুটা বিবেকসম্পন্ন ছিল মিথ্যার প্রতি তাদের একটা সহজাত ঘৃণাবোধ ছিল। কোরআন শুনে তারা যখন বুঝতে পারলো যে, এমন কলাম রচনা আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, তখন তারা কেবল একগুয়েমীর মাধ্যমে কোন বাক্য রচনা করে তা জনসমক্ষে তুলে ধরা নিজেদের জন্য লজ্জার ব্যাপার বলে মনে করতো। তারা জানতো যে, আমরা যদি কোন বাক্য পেশ করিও, তবে সমগ্র আরবের শুদ্ধভাষী লোকেরা তুলনামূলক পরীক্ষায় আমাদেরকে অকৃতকার্যই ঘোষণা করবে এবং এজন্য অনর্থক লজ্জিত হতে হবে। এজন্য সমগ্র জাতিই চুপ করে ছিল। আর যারা কিছুটা ন্যায্যপথে চিন্তা করেছে, তারা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নিতেও কষ্টিত হয়নি যে, এটা আল্লাহুর কলাম।

এসব ঘটনার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, আরবের একজন সরদার আস'আদ ইবনে যেরার হযরতের চাচা আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট স্বীকার করেছেন যে, তোমরা অনর্থক মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধেচারণ করে নিজেদের ক্ষতি করছ এবং পারস্পারিক সম্পর্কচ্ছেদ করছ। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রসূল এবং তিনি যে কলাম পেশ করেছেন তা আল্লাহর কলাম এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

তৃতীয় কারণ : তৃতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআন কিছু গায়েবী সংবাদ এবং ভবিষ্যৎ ঘটবে এমন অনেক ঘটনার সংবাদ দিয়েছে, যা হুবহু সংঘটিত হয়েছে। যথা—কোরআন ঘোষণা করেছে, রোম ও পারস্যের যুদ্ধে প্রথমতঃ পারস্যবাসী জয়লাভ করবে এবং দশ বছর যেতে না যেতেই পুনরায় রোম পারস্যকে পরাজিত করবে। এ আয়াত নাথিল হওয়ার পর মক্কার সরদারগণ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)—এর সাথে এ ভবিষ্যদ্বাণীর যথার্থতা সম্পর্কে বাজী ধরল। শেষ পর্যন্ত কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রোম জয়লাভ করলো এবং বাজীর শর্তনুযায়ী যে মাল দেয়ার কথা ছিল, তা তাদের দিতে হলো। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অবশ্য এ মাল গ্রহণ করেননি। কেননা, এক্সর বাজী ধরা শরীয়ত অনুমোদন করে না। এমন আরো অনেক ঘটনা কোরআনে উল্লেখিত রয়েছে, যা গায়েবের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং নিকট অতীতে হুবহু ঘটেছেও।

চতুর্থ কারণ : চতুর্থ কারণ এই যে, কোরআন শরীফে পূর্ববর্তী উম্মত, শরীয়ত ও তাদের ইতিহাস এমন পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে যুগের ইহুদী-খৃষ্টানদের পন্ডিতগণ, যাদেরকে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের বিজ্ঞ লোক মনে করা হতো, তারাও এতটা

অবগত ছিল না। রসুল (সাঃ)-এর কোন প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা ছিল না। কোন শিক্ষিত লোকের সাহায্যও তিনি গ্রহণ করেননি। কোন কিতাব কোনদিন স্পর্শও করেননি। এতদসত্ত্বেও দুনিয়ার প্রথম থেকে তাঁর যুগ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ববাসীর ঐতিহাসিক অবস্থা এবং তাদের শরীয়ত সমপর্কে অতি নিখুঁতভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা আল্লাহুর কলাম ব্যতীত কিছুতেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই যে তাঁকে এ সংবাদ দিয়েছেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পঞ্চম কারণ : পঞ্চম কারণ হচ্ছে এই যে, কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের অন্তর্নিহিত বিষয়াদি সম্পর্কিত যেসব সংবাদ দেয়া হয়েছে পরে সংশ্লিষ্ট লোকদের স্বীকারোক্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সব কথাই সত্য। একাজও আল্লাহ তা'আলারই কাজ, তা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

যষ্ঠ কারণ : যষ্ঠ কারণ হচ্ছে যে, কোরআনে এমন সব আয়াত রয়েছে যাতে কোন সম্প্রদায় বা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তাদের দ্বারা অমুক কাজ হবে না; তারা তা করতে পারবে না। ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি তারা নিজেদেরকে আল্লাহুর প্রিয় বান্দা বলেই মনে করে, তবে তারা নিশ্চয়ই তাঁর নিকট যেতে পছন্দ করবে। সুতরাং এমতাবস্থায় তাদের পক্ষে মৃত্যু কামনা করা অপছন্দনীয় হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে :

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا - তারা কখনও তা চাইবে না।

মৃত্যু কামনা করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা কোরআনকে মিথ্যা বলে অভিহিত করতো। কোরআনের এরাশাদ মোতাবেক তাদের মৃত্যু কামনা করার ব্যাপারে ভয় পাওয়ার কোন কারণ ছিল না। ইহুদীদের পক্ষে মৃত্যু কামনার (মোবাহলা) এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার অত্যন্ত সুবর্ণ সুযোগ ছিল। কোরআনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গেই তাতে সম্মত হওয়া তাদের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু ইহুদী ও মুশরিকরা মুখে কোরআনকে যতই মিথ্যা বলুক না কেন, তাদের মন জানতো যে, কোরআন সত্য, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সুতরাং মৃত্যু কামনার চ্যালেঞ্জে সাড়া দিলে সত্য-সত্যই তা ঘটবে। এজন্যই তারা কোরআনের এ প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি এবং একটি বারের জন্যও মুখ দিয়ে মৃত্যুর কথা বলেনি।

সপ্তম কারণ : কোরআন শরীফ শ্রবণ করলে মুমিন, কাফির, সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবার উপর দু'ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যেমন, হযরত জুবাইর ইবনে মোতআম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে একদিন হযুর (সাঃ)—কে মাগরিবের নামাযে সূরা তুর্গ পড়তে শুনে। হযুর (সাঃ) যখন শেষ আয়াতে পৌছলেন, তখন হযরত জুবাইর (রাঃ) বলেন যে, মনে হলো, যেন আমার অন্তর উড়ে যাচ্ছে। তাঁর কোরআন পাঠ শ্রবণের এটাই ছিল প্রথম ঘটনা। তিনি বলেন, সেদিনই কোরআন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল। আয়াতটি হচ্ছে :

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ
أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بَلْ لَّا يَذَّكَّرُونَ
أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رِزْقِ رَبِّهِمْ
أَمْ هُمُ الْمُضْطَرُونَ .

المُضَيَّرُونَ -

অর্থাৎ—তারা কি নিজেরাই সৃষ্ট হয়েছে, না তারাই আকাশ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? কোন কিছুতেই ওরা ইয়াকীন করছে না। তাদের নিকট কি তোমার পালনকর্তার ভাণ্ডারসমূহ গচ্ছিত রয়েছে, না তারাই রক্ষক?

অষ্টম কারণ : অষ্টম কারণ হচ্ছে, কোরআনকে বারংবার পাঠ করলেও মনে বিরক্তি আসে না। বরং যতই বেশী পাঠ করা যায়, ততই তাতে আগ্রহ বাড়তে থাকে। দুনিয়ার যত ভাল ও আকর্ষণীয় পুস্তকই হোক না কেন, বড়জোড় দু-চারবার পাঠ করার পর তা আর পড়তে মন চায় না, অন্যে পাঠ করলেও তা শুনতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু কোরআনের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, যত বেশী পাঠ করা হয়, ততই মনের আগ্রহ আরো বাড়তে থাকে। অন্যের পাঠ শুনতেও আগ্রহ জন্মে।

নবম কারণ : নবম কারণ হচ্ছে, কোরআন ঘোষণা করেছে যে, কোরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এর মধ্যে বিন্দুবিবর্গ পরিমাণ পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হয়ে তা সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা এ ওয়াদা এভাবে পূরণ করছেন যে, প্রত্যেক যুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিলেন এবং রয়েছেন, যারা কোরআনকে এমনভাবে স্বীয় স্মৃতিপটে ধারণ করছেন যে, এর প্রতিটি যের-যবর তথা স্বরচিহ্ন পর্যন্ত অবিকৃত রয়েছে। নাথিলের সময় থেকে চৌদ্দ শতাব্দিক বছর অতিবাহিত হয়েছে; এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও এ কিতাবে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়নি। প্রতি যুগেই স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে কোরআনের হাফেয ছিলেন ও রয়েছেন। বড় বড় আলেম যদি একটি যের-যবর বেশ-কম করেন, তবে ছোট বাচ্চারাও তাঁর ভুল ধরে ফেলে। পৃথিবীর কোন ধর্মীয় কিতাবের এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা সে ধর্মের লোকরা এক দশমাংশও শেখ করতে পারবে না। আর কোরআনের মত নির্ভুল দৃষ্টান্ত বা নথীর স্থাপন করা তো অন্য কোন গ্রন্থ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ সমুদ্রে এটা স্থির করাও মুশকিল যে, এ কিতাব কোন ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাতে কয়টি অধ্যায় ছিল।

গ্রন্থাকারে প্রতি যুগে কোরআনের যত প্রচার ও প্রকাশ্য হয়েছে, অন্য কোন ধর্ম-গ্রন্থের ক্ষেত্রে তা হয়নি। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, প্রতি যুগেই মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমাগত-মুশরিকদের তুলনায় কম ছিল এবং প্রচার-মাধ্যমও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের তুলনায় কম ছিল। এতদসত্ত্বেও কোরআনের প্রচার ও প্রকাশের তুলনায় অন্য কোন ধর্মগ্রন্থের প্রচার ও প্রকাশনা সম্ভব হয়নি। তারপরেও কোরআনের সংরক্ষণ আল্লাহ তা'আলা শুধু গ্রন্থ ও পুস্তকেই সীমাবদ্ধ রাখেননি যা জ্বলে গেলে বা অন্য কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেলে আর সংগ্রহ করার সম্ভাবনা থাকে না। তাই স্বীয় বান্দাগণের স্মৃতিপটেও সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। খোদানাস্তা সমগ্র বিশ্বের কোরআনও যদি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, তবু এ গ্রন্থ পূর্বের ন্যায়ই সংরক্ষিত থাকবে। কয়েকজন হাফেয একত্রে বসে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা লিখে দিতে পারবেন। এ অদ্ভুত সংরক্ষণও আল কোরআনেরই বিশেষত্ব এবং এ যে আল্লাহ্রই কালাম তার অন্যতম উজ্জ্বল প্রমাণ। যেভাবে আল্লাহ্র সত্তা সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে, তাতে কোন সৃষ্টির হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা নেই, অনুরূপভাবে তাঁর কালাম সকল সৃষ্টির রদ-বদলের উর্ধ্বে এবং সর্বযুগে বিদ্যমান থাকবে। কোরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যতা বিগত চৌদ্দশত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এ প্রকাশ্য মু'জ্জেযার পর কোরআন আল্লাহ্র কালাম হওয়াতে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয় থাকতে

পারে না।

দশম কারণ : কোরআনে এলুম ও জ্ঞানের যে সাগর পুঞ্জীভূত করা হয়েছে, অন্য কোন কিতাবে আজ পর্যন্ত তা করা হয়নি। ভবিষ্যতেও তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত শব্দসম্ভাবরের মধ্যে এত জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর সমাবেশ ঘটেছে যে, তাতে সমগ্র সৃষ্টির সর্বকালের প্রয়োজন এবং মানবজীবনের প্রত্যেক দিক পরিপূর্ণভাবে আলোচিত হয়েছে। আর বিশ্বপরিচালনার সুন্দরতম নিয়ম এবং ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নির্ভুল বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ ছাড়া মাথার উপরে ও নীচে যত সম্পদ রয়েছে সে সবের প্রসঙ্গ ছাড়াও জীব-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান এমনকি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির সকল দিকের পথনির্দেশ সমুলিত এমন সমাহার বিশ্বের অন্য কোন আসমানী কিতাবে দেখা যায় না।

শুধু আপাতদৃষ্টিতে পথনির্দেশই নয়, এর নমুনা পাওয়া এবং সে সব নির্দেশ একটা জাতির বাস্তব জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়ে তাদের জীবনধারা এমনকি ধ্যান-ধারণা, অভ্যাস এবং রুচিরও এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন দুনিয়ার অন্য কোন গ্রন্থের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে এমন নথীর আর একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা নিরক্ষর উম্মী জাতিকে জ্ঞানে, রুচিতে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে এত অল্পকালের মধ্যে এমন পরিবর্তিত করে দেয়ার নথীরও আর দ্বিতীয়টি নেই।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে কোরআনের সেই বিস্ময় সৃষ্টিকারী প্রভাব, যাতে কোরআনকে আল্লাহ্র কালাম বলে প্রতিটি মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা বিদ্রোহের কালিমায় সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে যায়নি, এমন কোন লোকই কোরআনের এ অনন্যসাধারণ মু'জ্জেযা সম্পর্কে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করতে কার্পণ করেনি। যারা কোরআনকে জীবনবিধান হিসাবে গ্রহণ করেনি, এমন অনেক অ-মুসলিম লোকও কোরআনের এ নথীরবিহীন মু'জ্জেযার কথা স্বীকার করেছেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত মণীষী ডঃ মারডেক্সে ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে কোরআনের বাষ্পটি সূরা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর স্বীকারোক্তিও এ ব্যাপারে প্রাধান্যযোগ্য। তিনি লিখেছেন,—‘নিশ্চয়ই কোরআনের বর্ণনাত্তিক সৃষ্টিকর্তার বর্ণনাত্তিরই স্বাক্ষর। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কোরআনে যেসব তথ্যাদি বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্র বাণী ব্যতীত অন্য কোন বাণীতে তা থাকতে পারে না।’

এতে সন্দেহ পোষণকারীরাও যখন এর অনন্যসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করে, তখন তারাও এ কিতাবের সত্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়। বিশ্বের সর্বত্র শতাব্দিক কোটি মুসলমান ছড়িয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে কোরআনের বিশেষ প্রভাব দেখে খৃষ্টান মিশনগুলোতে কর্মরত সকলেই একব্যাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, যেসব মুসলমান কোরআন বুঝে পড়ার সুযোগ লাভ করেছে, তাদের মধ্যে একটি লোকও ধর্মত্যাগী-মুরতাদ হয়নি।

মোট কথা, কোরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যথাযোগ্য বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব না হলেও সংক্ষিপ্তভাবে যতটুকু বলা হলো, এতেই সুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিগতভাবে একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, কোরআন আল্লাহ্রই কালাম এবং রসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জ্জেযা।

البقرة

৭

الْحَمْدُ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জান্নাতবাসীদেরকে একই আকৃতি বিশিষ্ট বিভিন্ন ফলমূল পরিবেশনের উদ্দেশ্য হবে পরিতৃপ্তি ও আনন্দ সঞ্চার। কোন কোন ভাষ্যকারের মতে ফলসমূহ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অর্থ বেহেশতের ফলাদি আকৃতিগতভাবে ইহজগতে প্রাপ্ত ফলের অনুরূপই হবে। সেগুলো যখন জান্নাতবাসীদের মাঝে পরিবেশন করা হবে, তখন তারা বলে উঠবে, অনুরূপ ফল তো আমরা দুনিয়াতেও পেতাম। কিন্তু স্বাদ ও গন্ধ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। দুনিয়ার ফলের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলবে না, শুধু নামের মিল থাকবে।

জান্নাতে পুত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্ত্রী লাভের অর্থ, তারা হবে পার্শ্বি যাবতীয় বাহ্যিক ও গঠনগত ত্রুটি-বিচ্ছাদিত ও চরিত্রগত কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং প্রস্রাব পায়খানা, রজঃপ্রস্রাব, প্রসবোত্তর স্রাব প্রভৃতি যাবতীয় ঘৃণ্য বিষয়ের উর্ধ্বে। অনুরূপভাবে নীতিভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা, অবাধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও কর্দমতার লেশমাত্রও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে না।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের উপকরণসমূহকে যেন দুনিয়ার পতনশীল ও ক্ষীয়মান উপকরণসমূহের ন্যায় মনে না করা হয় যাতে যে কোন মুহূর্তে বিলুপ্তি ও ধ্বংসপ্রাপ্তির আশঙ্কা থাকে। বরং জান্নাতবাসীগণ অনন্তকাল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের এই অক্ষুরন্ত উপকরণসমূহ ভোগ করতঃ বিমল আনন্দস্ফূর্তি ও চরম তৃপ্তি লাভ করতে থাকবেন।

আলোচ্য আয়াতে মুমিনদের জান্নাতের সুসংবাদ লাভের জন্য ঈমানের সাথে সাথে সংকাজেরও শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাই সংকম্মহীন ঈমান মানুষকে এ সুসংবাদের অধিকারী করতে পারে না। যদিও কেবলমাত্র ঈমানই স্থায়ী দোযখবাস হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারে। সুতরাং মুমিন যত পানীই হোক না কেন, এক না এক কালে দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু সংকাজ ভিন্ন কেউ দোযখের শাস্তি থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভের অধিকারী হতে পারবে না। — (রাহুল-বয়ান)

কয়েক আয়াত পূর্বে দাবী করা হয়েছে যে, কোরআন করীমে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। এ যে আল্লাহর বাণী এ সম্পর্কে কেউ যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করে, তবে তাকে কোরআনের ক্ষুদ্রতম সূরার অনুরূপ একটি সূরা প্রণয়ন করে পেশ করতে আহবান করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে কোরআন অবিশ্বাসীদের এক অমূলক সন্দেহ বর্ণনাপূর্বক তা অপনোদন করা হয়েছে। সন্দেহটি এই যে, কোরআন শরীফে মশা-মাছির ন্যায় তুচ্ছ বস্তুর আলোচনাও স্থান লাভ করেছে। বস্তুতঃ এটা মহান আল্লাহ ও তাঁর পবিত্র কালামের মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ গ্রন্থ প্রকৃতই যদি আল্লাহর বাণী হতো, তবে এরূপ নিকট ও তুচ্ছ বস্তুর আলোচনা স্থান পেত না। কারণ, কোন মহান সত্তা এ ধরনের নগণ্য বস্তুর আলোচনা করতে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন।

প্রত্যুত্তরে বলা হয়েছে যে, কোন তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উপমা অনুরূপ নগণ্য বস্তুর মাধ্যমে দেয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও বিবেকসম্মত। এতদুদ্দেশ্যে কোন ঘৃণ্য ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ সম্প্রদ ও আত্মমর্যাদাবোধের মোটেও পরিপন্থী নয়। এ কারণেই আল্লাহ পাক এ ধরনের বস্তুসমূহের উল্লেখ মোটেও লজ্জাবোধ করেন না। সাথে সাথে এও ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, এ ধরনের নির্বুদ্ধিতামূলক সন্দেহের উদ্বেগ শুধু তাদের মনেই

(২৪) আর যদি তা না পার—অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টার, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাখর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাকেরদের জন্য। (২৫) আর হে নবী (সাঃ), যারা ঈমান এনেছে এবং সংকাজসমূহ করেছে, আপনি তাদেরকে এমন বেহেশতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান থাকবে। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এতো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুতঃ তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে। এবং সেখানে তাদের জন্য শুদ্ধচারিত্রী রমণীকূল থাকবে। আর সেখানে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (২৬) আল্লাহ পাক নিঃসন্দেহে মশা বা তদুর্ধ্ব বস্তু দ্বারা উপমা পেশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। বস্তুতঃ যারা মুমিন তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে যে, তাদের পালনকর্তা কর্তৃক উপস্থাপিত এ উপমা সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক। আর যারা কাকির তারা বলে, এরূপ উপমা উপস্থাপনে আল্লাহর মতলবই বা কি ছিল। এ দ্বারা আল্লাহ তাআলা অনেককে বিপথগামী করেন, আবার অনেককে সঠিক পথও প্রদর্শন করেন। তিনি অনুরূপ উপমা দ্বারা অসং ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন কাকেও বিপথগামী করেন না। (২৭) (বিপথগামী ওরাই) যারা আল্লাহর সঙ্গে অস্বীকারাবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ পাক যা অবিচ্ছিন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তা ছিন্ন করে, আর পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। ওরা যথার্থই ক্ষতিগ্রস্ত। (২৮) কেমন করে তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে কুফরী অবলম্বন করছ? অথচ তোমরা ছিলে নিক্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে প্রাণ দান করেছেন আবার মৃত্যু দান করবেন। পুনরায় তোমাদেরকে জীবনদান করবেন। অতঃপর তারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে। (২৯) তিনিই সে সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত। তারপর তিনি মনোসংযোগ করেছেন আকাশের প্রতি। বস্তুতঃ তিনি তৈরী করেছেন সাত আসমান। আর আল্লাহ সবিসেষে অবহিত।

হতে পারে, যাদের মন-মস্তিষ্ক অবিরাম খোদাদ্রোহিতার ফলে সম্পূর্ণ ভাবে বুদ্ধি-বিবেচনা ও অনুধাবনশক্তি বিবর্জিত হয়ে পড়েছে। মুমিনদের মন-মস্তিষ্কে এ ধরনের অবাস্তব সন্দেহের উদ্বেগ কখনো হতে পারে না।

অতঃপর এর অন্য এক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, অনুরূপ উপমার মাধ্যমে মানুষের এক পরীক্ষাও হয়ে যায় — এসব দৃষ্টান্ত দূরদর্শী চিন্তাশীলদের জন্য যোগ্য হেদায়েতের উপকরণ। আর চিন্তাশক্তি বিবর্জিত দুর্বিনীতদের পক্ষে অধিকতর পথভ্রষ্টতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পরিশেষে এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মহান কোরআনে বর্ণিত এসব উপমার দ্বারা এমন উদ্ধত ও অবধাঞ্জনই বিপথগামী হয়, যারা আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অস্বীকার ভংগ করে এবং যেসব সম্পর্ক আল্লাহ পাক অক্ষুণ্ণ রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা তা ছিন্ন করে। যার পরিণামস্বরূপ ধরার বুকে অশান্তি বিস্তার লাভ করে।

উপমার ক্ষেত্রে কোন তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তুর উল্লেখ দুষ্টবীর্য নয় :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا

প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে কোন নিকট, নগণ্য ও ঘৃণ্য বস্তুর উল্লেখ কোন ত্রুটি বা অপরাধ নয় কিংবা বস্তুর মহানর্যাদার পরিপন্থীও নয়। কোরআন, হাদীস এবং প্রথম যুগের ওলামায়ে কোরাম ও প্রখ্যাত ইসলাম বিশেষজ্ঞগণের বাণী ও রচনাকলীতে এ ধরনের বহু উপমার সন্ধান মেলে, যা সাধারণভাবে একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হয়। কোরআন-হাদীস এসব তথাকথিত লজ্জা ও সন্দেহের তোয়াক্কা না করে প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এরূপ উপমা বর্জন মোটেও বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেনি। يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ (আল্লাহর সঙ্গে কৃত অস্বীকার ভঙ্গ করে —) এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন অস্বীকার ভঙ্গ করা বা চুক্তি লঙ্ঘন করা জঘন্য অপরাধ। এর পরিণতিতে সে যাবতীয় পুণ্য থেকে বঞ্চিতও হয়ে যেতে পারে। وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ (এবং আল্লাহ

পাক যে সব সম্পর্ক অটুট রাখতে বলেছেন, তারা তা ছিন্ন করে)। এতে বুঝা যায়, যে সব সম্পর্ক শরীয়ত অক্ষুণ্ণ রাখতে বলেছে, তা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যিক এবং তা ছিন্ন করা সম্পূর্ণ হারাম। গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, একজন মানুষের প্রতি আল্লাহর এবং অন্যান্য মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টিকূলের অধিকার ও প্রাপ্য আদায় করার নির্ধারিত পদ্ধতি ও তৎসংশ্লিষ্ট সীমা ও বাধানের সমষ্টির নামই দ্বীন বা ধর্ম। বিশুর শান্তি ও অশান্তি এসব সম্পর্ক যথাযথভাবে বাজায় রাখা বা না রাখার ওপরই নির্ভরশীল। এজন্যই وَيُقْسِمُونَ فِي الْأَرْضِ (তারা ভূপৃষ্ঠে অশান্তির সৃষ্টি করে) বাক্যাংশের মাধ্যমে উল্লেখিত সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ করাকেই বিশুশান্তি বিঘ্নিত হওয়ার একমাত্র কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এ

হল যাবতীয় অশান্তি ও কলহের মূল কারণ। أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (তারা প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতিগ্রস্ত)। —এ ব্যাক্যের মাধ্যমে যারা উল্লেখিত নির্দেশাবলী অমান্য করবে তাদেরকে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পরকালের ক্ষতিই প্রকৃত ক্ষতি। সে তুলনায় পার্থিব ক্ষতি উল্লেখযোগ্য কোন বিষয়ই নয়।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার করুণা ও অনুগ্রহসমূহ বর্ণনার পর বিস্ময় প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর অগণিত দয়া ও সুখ-সম্পদে পরিবেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও অবধ্যতা প্রদর্শনে কিভাবে লিপ্ত থাকতে পারে। এতে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব প্রমাণাদি সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে চিন্তা করার জন্য

প্রয়োজনীয় কষ্টটুকু স্বীকার করতে তারা যদি প্রস্তুত না থাকে, তবে অন্ততঃ দাতার দানের স্বীকৃতি এবং তার প্রতি যথাযোগ্য ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করা তো প্রত্যেক সভ্য ও রুচিজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের স্বাভাবিক ও অবশ্য কর্তব্য।

প্রথম আয়াতে সেসব বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহাদির বর্ণনা রয়েছে, যা মানুষের মূল সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যা প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরে উপস্থিত। যথা—প্রথমাবস্থায় সে ছিল নিষ্শাণ অনুকণা, পরে তাতে আল্লাহ পাক প্রাণ সঞ্চার করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে সেসব সাধারণ অনুগ্রহের বিবরণ রয়েছে, যদ্বারা সমগ্র মানবজাতি ও গোটা সৃষ্টি যথাযথভাবে উপকৃত হয় এবং যা মানুষের টিকে থাকার জন্য একান্ত আবশ্যিক। এসবের মধ্যে প্রথমে ভূমি ও তার উৎপন্ন ফসলের আলোচনা রয়েছে, যার সাথে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। অতঃপর যে আসমানসমূহের সাথে ভূমির সজীবতা ও উৎপাদন ক্ষমতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সে গুলোর আলোচনা করা হয়েছে।

وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ এখানে তোমরা ছিলে নিষ্শাণ। অতঃপর তিনিই

তোমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। এখানে اموات শব্দটি ميت এর বহুবচন। মৃত ও নিষ্শাণ বস্তুকে ميت বলা হয়। আয়াতের মর্ম এই যে, মানুষ তার সৃষ্টির মূল উৎস সম্পর্কে নিবিষ্ট মনে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সৃষ্টির সূচনা ঐ নিষ্শাণ অণুকণাসমূহ থেকেই হয়েছে, যা আংশিকভাবে জড়বস্তুর আকৃতিতে, আংশিকভাবে প্রবহমান বস্তুর আকৃতিতে এবং আংশিকভাবে খাদ্যের আকৃতিতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। মহান আল্লাহ সেসব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নিষ্শাণ অণুকণাসমূহকে বিভিন্ন স্থান থেকে একত্রিত করেছেন। অবশেষে সেগুলোতে প্রাণ সংযোগ করে জীবন্ত মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। এহলো মানব সৃষ্টির সূচনাপর্বের কথা।

ثُمَّ رَوَّيْنَاهُم مِّنْ دُمِّهِمْ ثُمَّ جَعَلْنَاهُمْ نَجْلًا (অনন্তর তোমাদের মৃত্যু ঘটবেন আবার পুনরুজ্জীবিত করবেন।) অর্থাৎ— যিনি তোমাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য অণুকণা সমন্বয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তিনিই মরজগতে তোমাদের আয়ুর নির্ধারিত কাল পেরিয়ে গেলে তোমাদের জীবনশিখা নিভিয়ে দেবেন এবং এক নির্ধারিত সময়ের পর কেয়ামতের দিন তোমাদের দেহের নিষ্শাণ বিক্ষিপ্ত কণাগুলোকে আবার সমন্বিত করে তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

প্রথম মৃত্যু হল তোমাদের সৃষ্টিধারায় সূচনাপর্বের, নিষ্শাণ ও জড় অবস্থা যা থেকে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন। আর দ্বিতীয় মৃত্যু হল মরজগতে মানুষের আয়ু শেষ হয়ে যাওয়াকালীন মৃত্যু। বস্তুতঃ তৃতীয়বার জীবন লাভ হবে কিয়ামতের দিন।

মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবনের মধ্যবর্তী সময় : আলোচ্য আয়াতে ইহলৌকিক জীবন ও মৃত্যুর পরবর্তী এমন এক জীবনের বর্ণনা রয়েছে, যার সূচনা হবে কিয়ামতের দিন থেকে। কিন্তু যে কবরদেশের প্রশান্তির এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে এবং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত — এখানে তার কোন উল্লেখ নেই। মানুষ ইহকালে যে জীবন লাভ করে এবং পরকালে যে জীবন লাভ করবে, কবরের জীবন অনুরূপ কোন জীবন নয়, বরং তা কল্পনাময় স্বাপ্নিক জীবনের মতই এক মধ্যবর্তী অবস্থা। একে ইহলৌকিক জীবনের পরিসমাপ্তি এবং পারলৌকিক জীবনের প্রারম্ভও বলা যেতে পারে। সুতরাং এটি এমন স্বতন্ত্র জীবন নয়, পৃথকভাবে যার আলোচনা করার প্রয়োজন

البقرة ٢

4

15

وَأَذَى قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاءُكَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا
أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ
آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي
بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ أَنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَعَلَّكَ تَعْلَمُ
الْأَسْمَاءَ مَا عَشَبْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَادُمُ إِنِّي أَعْلَمُ
بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ
غَيْبَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
وَأَذَى فَلَمَّا لِلْمَلِكَةِ أَصْحَابُ الْأَدَمِ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَ
اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ
وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ قَالَا لَهُمَا الشَّيْطَانُ
عَنَّا فَخَرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدَاؤُكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْفَرًّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ فَتَنَّا
آدَمَ مِنْ رَبِّهِ وَلَمَّا قَاتَلَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

(৩০) আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন : আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা নিয়ত তোমার গুণকীর্তন করছি। হে তোমার পবিত্র সন্তোকে শ্রদ্ধা কর। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে আমি জানি, যা তোমরা জান না। (৩১) আর আল্লাহ তাঁ আলা শিখালেন আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম। তারাপর সেমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমারা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক। (৩২) তারা বলল, তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদিগকে শিক্ষিয়েছে সেগুলো বাতীত। নিচয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়াল। (৩৩) তিনি বললেন, হে আদম, ফেরেশতাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তাপর যখন তিনি বলে দিলেন সে সেরে আসল, তখন তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বানিনি যে, আমি আসমান ও যমীনে যাবতীয় গোপন বিষয় সম্পর্কে খুব ভাল করেই অবগত রয়েছি? এবং সেসব বিষয়ও জানি যা তোমরা প্রকাশ কর, আর যা তোমরা গোপন কর! (৩৪) এবং যখন আমি হযরত আদম (আঃ)-কে সজ্জা করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইব্রাহীম ব্যতীত সবাই সিজদা করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অংকার প্রদর্শন করল। ফলে সে কাদিরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (৩৫) এবং আমি আদমকে হুকুম করলাম যে, তুমি ও তোমার স্ত্রী জন্মান্তে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ে না। অন্যথায় তোমরা যালিমগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। (৩৬) অনন্তর শয়তান তাদের ডায়াকে ওখানে থেকে পদশ্লিষ্ট করছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সঞ্গ্রহ করতে হবে। (৩৭) অতঃপর হযরত আদম (আঃ) রীতি পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর প্রতি (করুণাভরে) নম্রা করলেন। নিচয়ই তিনি মহা-কামশীল ও অসীম দয়াল।

থাকতে পারের।

হুَوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (তিনিই সে মহান
নি তোমাদের উপকারার্থ পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুসমগ্রী সৃষ্টি
এখানে এমন এক সাধারণ ও ব্যাপক অনুগ্রহের বর্ণনা দেয়া
শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ নয়; বরং সমগ্র প্রাণিজগত
দ্বারা উপকৃত। এ জগতে মানুষ যত অনুগ্রহই লাভ করেছে বা
র সংক্ষেপে তা এই একটি শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।
মানুষের আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ওষুদ-পত্র বসবাস ও
অন্দের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপকরণ এ মাটি থেকেই
প্রস্তুত হয়ে থাকে।

জগতের কোন বস্তুই অহেতুক নয় : বিশ্বের সব কিছুই যে মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট, আলাচ্য আয়াতে এ তথ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের উপকার সাধন করে না— তা সে উপকার ইহলৌকিক হোক, বা পরকাল সম্পর্কিত উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ সক্রোম্ব হোক। অনেক জিনিস সরাসরি মানুষের আহাৰ ও গুৰু হিঁসেবে ব্যবহৃত হয় বলে সেগুলোর উপকার সহজেই অনুশাবনযোগ্য। আবার এমনও অগণিত বস্তু রয়েছে, যার আবেদন ও উপকরিতা মানুষ অলক্ষ্যে ভোগ করে যাচ্ছে, অথচ তা অনুভব করতে পারছে না। এমনকি বিযাক্ত দ্রব্যাদি বিষধর জীবজন্তু প্রভৃতি যেসব বস্তু দৃশ্যতঃ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায়, সেগুলোও কোন না কোন দিক দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণকরও বটে। যেসব জন্তু একদিকে মানুষের জন্য হারাম, অপরদিকে তদুারা তারা উপকৃতও হয়ে চলেছে।

প্রখ্যাত সাধক আরিফ বিল্লাহ ইবনে আ'তা এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এরশাদ করেন যে, আল্লাহ পাক সারা বিশ্বে এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন যেন জগতের যাবতীয় বস্তু তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে; আর তোমরা যেন সর্বতোভাবে আল্লাহর আরাধনায় নিয়োজিত থাক। তবেই যেসব বস্তু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা তা নিঃসন্দেহে লাভ করবে। সূত্রান্তে বুদ্ধিমানের কাজ হবে সেসব বস্তুর অনুেষণে ও সাধন চিন্তায় নিয়োজিত থেকে সে মহান সত্তাকে ভুলে না বসা, যিনি এগুলোর একক স্রষ্টা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতের সারসংক্ষেপ এই—মহান পরওয়াদোগার আল্লাহ্ পাক যখন আদম (আঃ)—কে সৃষ্টি করেন এবং বিশ্বে তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করেন, তখন এ সম্পর্ক ফেরেশতাদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য তাঁর এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, তাঁরা যেন এ ব্যাগারে নিজেদের অতিমত ব্যক্ত করেন। কাজেই ফেরেশতাগণ অতিমত প্রকাশ করলেন যে, মানব জাতির মাঝে এমনও অনেকে লোক হবে, যারা শুধু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে। সুতরাং এদের উপর খেলাফত ও শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব অর্পণের হেতু তাঁদের পুরোপুরি বোদগম্য নয়। এ দায়িত্ব পালনের জন্য ফেরেশতাগণই যোগ্যতম বলে মনে হয়। কেননা, পুণ্য ও সততা তাঁদের প্রকৃতিগত গুণ। তাঁদের দ্বারা পাপ ও অকল্যাণ সাধন আদৌ সম্ভব নয়—তাঁরা সদা অনুগত। এ জগতের শাসনকার্য পরিচালনা ও শৃঙ্খলা বিধানের কাজও হয়তো তাঁরাই সুস্থভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। তাঁদের এ ধারণা যে ভুল ও অমূলক, তা আল্লাহ্

পাক শাসকোচিত ভংগীতে বর্ণনা করে বলেন যে, বিশু খেলাফতের প্রকৃতি ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তোমরা ষোটো ওয়াকফহাল নও। তা কেবল আমিই পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত।

অতঃপর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর অনুপম মর্যাদার বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় উত্তরটি দেয়া হয়েছে যে, বিশু খেলাফতের জন্য তু-পুস্তের অন্তর্গত সৃষ্ট বস্তুসমূহের নাম, গুণাগুণ, বিস্তারিত অবস্থা ও যাবতীয় লক্ষণাদি সম্পর্ক সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যিক। বস্তুতঃ ফেরেশতাগণের এ যোগ্যতা ও গুণাবলী নেই।

আদম সৃষ্টি প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সাথে আলোচনার তাৎপর্য : একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, ফেরেশতাদের সমাবেশে আল্লাহ পাকের এ ঘটনা প্রকাশ করার তাৎপর্য কি এবং এতে কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল? তাঁদের থেকে পরামর্শ গ্রহণ, না তাদেরকে এ সম্পর্কে নিছক অবহিত করা? না ফেরেশতাদের ভাষায় এ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করানো?

একথা সুস্পষ্ট যে, কোন বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তা তখনই দেখা দেয়, যখন সমস্যার সমস্ত দিক কারো কাছে অস্পষ্ট থাকে; নিজস্ব অভিজ্ঞান ও জ্ঞান সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা না থাকে। আর তখনই কেবল অন্যান্য জ্ঞানী-গুণীদের সাথে পরামর্শ করা হয়। অথবা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সেখানেও হতে পারে, যেখানে অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ সমঅধিকার সমপন্ন হয়। তাই তাদের অভিমত জ্ঞানার উদ্দেশ্যে পরামর্শ করা হয়। যেমনটি বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সাধারণ পরিষদসমূহে প্রচলিত। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এ দু'টোর কোনটাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মহান আল্লাহ গোটা বস্তুজগতের স্রষ্টা এবং প্রতিটি বিন্দুবিপর্য সম্পর্কে তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। তাঁর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার সামনে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সবকিছুই সমান। তাই তাঁর পক্ষে কারো সাথে পরামর্শ করার কি প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে!

অনুরূপভাবে এখানে এমনও নয় যে, সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত - যেখানে প্রত্যেক সদস্য সমঅধিকার সম্পন্ন বলে প্রত্যেকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যিক হতে পারে। কেননা, আল্লাহ পাকই সবছির স্রষ্টা ও মালিক। ফেরেশতা ও মানব-দানব সবই তাঁর সৃষ্টি এবং সবই তার আয়ত্তাধীন। তাঁর কোন কাজ বা পদক্ষেপ সম্পর্কে কারো কোন প্রশ্ন তোলার অধিকার নেই যে, এ কাজ কেন করা হলো বা কেন করা হলো না। **لَيْسَ لَكَ عَنِ الْقَوْلِ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكَ** আল্লাহ পাকের কাজ সম্পর্কে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই, কিন্তু অন্যান্য সবাইকে তাদের কৃত কর্ম সম্পর্কে প্রশ্নের সুস্থান হতে হবে।

সারকথা প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে পরামর্শ গ্রহণ উদ্দেশ্যও নয় এবং এর কোন অবশ্যকতাও ছিল না। কিন্তু রূপ দেয়া হয়েছে পরামর্শ গ্রহণের যাতে মানুষ পরামর্শরীতি এবং তার প্রয়োজনীয়তার শিক্ষা লাভ করতে পারে। যেমন কোরআন পাকে রসুলে করীম (সাঃ)-কে বিভিন্ন কাজে ও ক্ষেত্রে সাহায্যে কোরাযের সাথে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অথচ তিনি ছিলেন ওহীর বাহক। তাঁর সব কাজকর্ম এবং তাঁর প্রত্যেক অধ্যায় ও দিক ওহীর মাধ্যমেই বিশ্লেষণ করে দেয়া হতো। কিন্তু তাঁর মাধ্যমে পরামর্শ গ্রহণ রীতির প্রচলন করা এবং উম্মতকে তা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকেও পরামর্শ গ্রহণের তাকীদ দেয়া হয়েছে।

যেহেতু হযরত আদম (আঃ)-এর মাঝে ফেরেশতা ও জ্বিন উভয় সম্প্রদায়ের যাবতীয় জ্ঞানের সমাহার ঘটেছে, সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ পদমর্যাদা একেবারে সুস্পষ্ট। এখন আল্লাহ পাক এ বিষয়টি কার্যকরভাবে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলেন যে, ফেরেশতা ও জ্বিনদের দ্বারা হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি এমন বিশেষ ধরনের সম্মান প্রদর্শন করানো হোক, যদ্বারা কার্যতঃ স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি তাদের উভয়ের চাইতে উত্তম ও পূর্ণতর। এ জন্য যে সম্মান প্রদর্শনমূলক কাজের প্রস্তাব করা হয়েছে, তারই বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, “আমি ফেরেশতাদেরকে হুকুম করলাম, তোমরা আদমকে সেজদা কর। সমস্ত ফেরেশতা সেজদায় পতিত হল, কিন্তু ইবলীস সেজদা করতে অস্বীকার করলো এবং অহঙ্কারে স্কীত হয়ে উঠলো।”

সেজদার নির্দেশ কি জ্বিনদের প্রতিও ছিল? এ আয়াতে বাহ্যতঃ যে কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই যে, আদম (আঃ)-কে সেজদা করার হুকুম ফেরেশতাদেরকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন একথা বলা হলো যে, ইবলীস ব্যতীত সব ফেরেশতাই সেজদা করলেন, তখন তাতে প্রমাণিত হলো যে, সেজদার নির্দেশ সকল বিবেকসম্পন্ন সৃষ্টির প্রতিই ছিল। ফেরেশতা ও জ্বিন সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নির্দেশ প্রদান করতে গিয়ে শুধু ফেরেশতাগণের উল্লেখ এজন্য করা হলো যে, তারাই ছিল সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। যখন তাদেরকে হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়া হলো, তাতে জ্বিন জাতি অতি উত্তম রূপে এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে জানা গেল।

সম্মানসূচক সেজদা ইসলামে নিষিদ্ধ : এ আয়াতে হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করতে ফেরেশতাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতা-মাতা ও ভাইগণ মিশর পৌঁছার পর হযরত ইউসুফকে সেজদা করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এটা সুস্পষ্ট যে, এ সেজদা এবাদতের উদ্দেশ্যে হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ ব্যতীত অপরের উপাসনা শিরক ও কুফরী। কোন কালে কোন শরীয়তে এরূপ কাজের বৈধতার কোন সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। সুতরাং এর অর্থ এছাড়া অন্য কোন কিছুই হতে পারে না যে, প্রাচীন কালের সেজদা আমাদের কালের সালাম, মুসাফাহা, মুআনাকা, হাতে চুমো ঝাওয়া এবং সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়ার সমার্থক ও সমতুল্য ছিল। ইমাম জাসাসাস আহ্‌কামুল কোরআন গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, পূর্ববর্তী নবিগণের শরীয়তে বড়দের প্রতি সম্মানসূচক সেজদা করা বৈধ ছিল। শরীয়তে মুহাম্মদীতে তা রহিত হয়ে গেছে। বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতি হিসাবে এখন শুধু সালাম ও মুসাফাহার অনুমতি রয়েছে। রুকু-সেজদা এবং নামাযের মত করে হাত বৈধে দাঁড়ানোকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এর বিশ্লেষণ এই যে, শিরক, কুফর এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করা কোন শরীয়তেই বৈধ ছিল না। কিন্তু কিছু কিছু কাজ এমনও রয়েছে, যা মূলতঃ শিরক বা কুফর নয়। কিন্তু মানুষের অজ্ঞানতা ও অসাবধানতার দরুন সে সমস্ত কার্যাবলী শিরক ও কুফরের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এসব কার্যাবলী পূর্ববর্তী নবিগণের শরীয়তে আদৌ নিষিদ্ধ ছিল না। বরং সেগুলোকে শিরকরূপে প্রতিপন্ন করা থেকে মানুষকে বিরত রাখা হত মাত্র। যেমন, প্রাণীদের ছবি আঁকা ও ব্যবহার করা মূলতঃ কুফর বা শিরক নয়। এজন্য পূর্ববর্তী শরীয়তে তা বৈধ ছিল। যেমন, হযরত সূলায়মান (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে **يَعْلَمُونَ لَكُمَا**

يَسْتَأْذِنُ مِمَّنْ دُونِهِ (এবং জ্বিনেরা তার জন্য বড় বড় মিহরাব তৈরী করতো এবং ছবি অঙ্কন করতো)।

অনুরূপভাবে সন্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সেজদা করা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে বৈধ ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে মানুষের অজ্ঞানতার ফলে এ সব বিষয়ই শিরক ও পৌত্তলিকতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পথেই নবিশের দ্বীন ও শরীয়তে বিকৃতি ও মূলচ্যুতি ঘটেছে। পরবর্তী নবি ও শরীয়ত এসে তা একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। শরীয়তে মুহাম্মদী যেহেতু অবিশ্বাস ও চিরন্তন শরীয়ত—রসুলে করীম (সাঃ)—এর মাধ্যমে যেহেতু নবুওয়ত ও রিসালতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তাঁর শরীয়তই যেহেতু সর্বশেষ শরীয়ত, সেহেতু একে বিকৃতি ও মূলচ্যুতি থেকে বাচাবার জন্য এমন প্রতিটি ছিদ্রপথই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যাতে শিরক ও পৌত্তলিকতা প্রবেশ করতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সেসব বিষয়ই এ শরীয়তে হারাম করে দেয়া হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কোন যুগে শিরক ও মূর্তি পূজার উৎস বা কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছবি ও চিত্রাঙ্কন এবং তার ব্যবহারও এজন্যই হারাম করা হয়েছে। সন্মানসূচক সেজদা একই কারণে হারাম হয়েছে। আর এমন সব সময়ে নামায পড়াও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, যে সব সময়ে মুশরিক ও কাফিরগণ নিজেদের তথাকথিত উপাস্যদের পূজা ও উপাসনা করত। কারণ, এ বাহ্যিক সাদৃশ্য পরিণামে যেন শিরকের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

কোন কোন আলেম বলেছেন, এবাদতের মূল যে নামায, তাতে চার রকমের কাজ রয়েছে। যথা— দাঁড়ানো, বসা, রুকু ও সেজদা করা। তন্মধ্যে প্রথম দু'টি মানুষ অভ্যাসগতভাবে নিজস্ব প্রয়োজনেও করে এবং নামাযের মধ্যে এবাদত হিসাবেও করে। কিন্তু রুকু— সেজদা এমন কাজ, যা মানুষ কখনো অভ্যাসগতভাবে করে না, বরং তা শুধু এবাদতের জন্যই নির্দিষ্ট। এ জন্য এ দু'টোকে শরীয়তে মুহাম্মদীতে এবাদতের পর্যায়ভুক্ত করে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে তা করা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, সেজদায়ে তা'জিমী বা সন্মানসূচক সেজদার বৈধতার প্রমাণ তো কোরআন পাকের উল্লেখিত আয়াতসমূহে পাওয়া যায়, কিন্তু তা রহিত হওয়ার দলীল কি?

উত্তর এই যে, রসুলে করীম (সাঃ)—এর অনেক 'মোতাওয়াতির' ও মশহুর হাদীস দ্বারা সেজদায়ে—তা'জিমী হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে। হযুর (সাঃ) এরশাদ করেছেন, “যদি আমি আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো প্রতি সেজদায়ে—তা'জিমী করা জায়েয মনে করতাম, তবে স্বামীকে সেজদা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম, কিন্তু এই শরীয়তে সেজদায়ে—তা'জিমী সম্পূর্ণ হারাম বলে কাউকে সেজদা করা কারো পক্ষে জায়েয নয়।”

এই হাদীসটি বিশ জন সাহাবীর রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'তাদরীবুররাবী'তে বর্ণনা করা হয়েছে, যে রেওয়ায়েত দশ জন সাহাবী নকল করে থাকেন, সেটি হাদীসে মোতাওয়াতাের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় যা (হাদীসে মোতাওয়াতির) কোরআন পাকের ন্যায়ই অকাটা ও নির্ভরযোগ্য।

এটা আদম (আঃ)—এর ঘটনার সমাপ্তিপর্ব। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের উপর হযরত আদম (আঃ)—এর শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশু খিলাফতের যোগ্যতা যখন স্পষ্ট করে বলে দেয়া হলো এবং ফেরেশতাগণও তা মেনে নিলেন আর ইবলীস যখন অত্মসন্ত্রিতা ও

হঠকারিতার দরুন কাফির হয়ে বেরিয়ে গেল, তখন হযরত আদম (আঃ) এবং তাঁর সহধর্মিণী হাওয়া (আঃ) এ নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন যে, তোমরা জন্মাতে বসবাস করতে থাক এবং সেখানকার নেয়ামত পরিতৃপ্তিসহ ভোগ করতে থাক। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট গাছ সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হলো যে, এর ধারে কাছেও যেও না। অর্থাৎ, সেটির ভোগে পূর্ণভাবে পরিহার করবে। শয়তান আদম (আঃ)—এর কারণে মিক্ত ও অভিশপ্ত হয়েছিল, সুতরাং সে কোন প্রাকারে সুযোগ পেয়ে এবং এ গাছের উপকারাদি বর্ণনা করে তাদের উভয়কে সে গাছের ফল খেতে প্ররোচিত করল। নিজেদের বিচ্যুতির দরুন তাঁদেরকেও পৃথিবীতে নেমে যেতে নির্দেশ দেয়া হলো। তাঁদেরকে বলে দেয়া হলো যে, পৃথিবীতে বাসবাস জন্মাতের মত নির্বঙ্কট ও শান্তিপূর্ণ হবে না, বরং সেখানে মতানৈক্য ও শত্রুতার উদ্বেগ ঘটবে। ফলে বেঁচে থাকার স্বাদ পূর্ণভাবে লাভ করতে পারবে না।

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ (এবং আমি আদম (আঃ)—কে সম্প্রদীপ জন্মাতে অবস্থান করতে নির্দেশ দিলাম)। এটা আদম সৃষ্টি ও ফেরেশতাদের সেজদার পরবর্তী ঘটনা। কোন কোন বিশেষজ্ঞ এ নির্দেশ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আদম সৃষ্টি ও সেজদার ঘটনা জন্মাতের বাইরে অন্য কোথাও ঘটেছিল। এর পরে তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়েছে। কিন্তু এ অর্থও সুনিশ্চিত নয়। বরং এমনও হতে পারে যে, সৃষ্টি ও সেজদা উভয় ঘটনা বেহেশতেই ঘটেছিল, কিন্তু তাঁদের বাসস্থান কোথায় হবে সে সম্পর্কে তাঁদেরকে কোন সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি। তাঁদের বাসস্থান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত এ ঘটনার পর শোনানো হলো।

رِغْدًا - وَكَلِمَةً بِأَعْدَائِهِمْ شَتِيمًا আরবী অভিধান অনুযায়ী সেসব নেয়ামত ও আহাৰ্যবস্তুকে বলা হয়, যা লাভ করতে কোন শ্রম সাধনার প্রয়োজন হয় না এবং এত পর্যাপ্ত ও ব্যাপক পরিমাণে লাভ হয় যে, তাতে হ্রাসপ্রাপ্তি বা নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার কোন আশঙ্কাই থাকে না। অর্থাৎ— আদম ও হাওয়া (আঃ)—কে বলা হলো যে, তোমরা জন্মাতের ফল—মূল পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করতে থাক। ওগুলো লাভ করতে হবে না এবং তা হ্রাস পাবে কিংবা শেষ হয়ে যাবে, এমন কোন চিন্তাও করতে হবে না।

مَنْزُورًا مِنَ الظَّالِمِينَ - কোন বিশেষ গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছিল যে, এর ধারে কাছেও যেও না। প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, সে গাছের ফল না খাওয়া। কিন্তু তাকীদের জন্য বলা হয়েছে, কাছেও যেও না। সেটি কি গাছ ছিল, কোরআন করীমে তা উল্লেখ করা হয়নি। কোন নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারাও তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। কোন কোন মুফাস্সির সেটিকে গমের গাছ বলেছেন, আবার কেউ কেউ আপুর গাছ বলেছেন। অনেকে বলেছেন, আঞ্জীরের গাছ। কিন্তু কোরআন ও হাদীসে যা অনির্দিষ্ট রেখে দেয়া হয়েছে, তা নির্দিষ্ট করার কোন প্রয়োজন পড়ে না।

مَنْزُورًا مِنَ الظَّالِمِينَ অর্থাৎ— যদি এই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাও, তবে তোমরা উভয়েই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

فَاَرَكُمُهَا الشَّيْطَانُ عَصَا - زِلَّة - শব্দের অর্থ বিচ্যুতি বা পদস্থলন। অর্থাৎ, শয়তান আদম ও হাওয়াকে পদস্থলিত করেছিল বা তাঁদের বিচ্যুতি ঘটিয়েছিল। কোরআনের এ—সব শব্দে পরিষ্কার এ—কথা বোঝা যায় যে, আদম ও হাওয়া কর্তৃক আল্লাহ পাকের হুকুম লঙ্ঘন সাধারণ পাপীদের মত ছিল না, বরং শয়তানের প্রভাবগায় প্রভাবিত হয়েই তাঁরা এ

ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। পরিণামে যে গাছের ফল নিষিদ্ধ ছিল, তা খেয়ে বসলেন।

মাধ্যমসমূহ নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয় : وَلَقَدْ كَرَّمْنَا هَذَا الشَّجَرَةَ وَارْتَبْنَا فِيهِ زُكُوفًا وَجُفًى وَغُلًّا مُتَرَاوِعًا ۖ وَجَعَلْنَاهُ رُحْمًا يُحْتَفَىٰ بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحِيمُ ۝۱۰ ‘এ গাছের ধারে-কাছেও যেও না’। এ নিষেধাজ্ঞার ফলে একথা সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, সে বৃক্ষের ফল না খাওয়া ছিল এই নিষেধাজ্ঞার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু সাবধানতা-সূচক নির্দেশ ছিল এই যে, সে গাছের কাছেও যেও না। এর দ্বারাই ফিকাহশাস্ত্রের কারণ-উপকরণের নিষিদ্ধতার মাসআলাটি প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ, কোন বস্তু নিষিদ্ধভাবে অবৈধ বা নিষিদ্ধ না হলেও যখন তাতে এমন আশঙ্কা থাকে যে, ঐ বস্তু গ্রহণ করলে অন্য কোন হারাম ও অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, তখন ঐ বৈধ বস্তুও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। যেমন, গাছের কাছে যাওয়া তার ফল-ফসল খাওয়ার কারণও হতে পারতো। সেজন্য তাও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। একে ফিকাহশাস্ত্রের পরিভাষায় উপকরণের নিষিদ্ধতা বলা হয়।

নবিগণের নিষাপ হওয়া : এ বর্ণনার দ্বারা হযরত আদম (আঃ)-কে বিশেষ গাছ বা তার ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদেরকে পাশে লিপ্ত করে না দেয়। এতদসত্ত্বেও হযরত আদম (আঃ)-এর তা খাওয়া বাহ্যিকভাবে পাপ বলে গণ্য। অথচ নবিগণ পাপ থেকে বিমুক্ত ও পবিত্র। সঠিক তথ্য এই যে, নবিগণের যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পরিতৃপ্ত থাকার কথা যুক্তি-বুদ্ধির দ্বারা এবং লিখিত ও বর্ণনাগতভাবে প্রমাণিত। চার ইমাম ও উম্মতের সম্মিলিত অভিমতেও নবিগণ ছোট-বড় যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কারণ, নবিগণ (আঃ)-কে গোটা মানব জাতির অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল। যদি তাদের দ্বারাও আল্লাহ পাকের ইচ্ছার পরিপন্থী ছোট বড় কোন পাপ কাজ সম্পন্ন হত, তবে নবিগণের বাণী ও কার্যাবলীর উপর আস্থা ও বিশ্वास উঠে যেত। যদি নবিগণের উপর আস্থা ও বিশ্वास না থাকে, তবে দীন ও শরীয়তের স্থান কোথায়? অবশ্য কোরআন পাকের বহু আয়াতে অনেক নবি (আঃ) সম্পর্কে এ ধরনের ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদের দ্বারাও পাপ সংঘটিত হয়েছে এবং আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এজন্য তাঁদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনাও এ শ্রেণীভুক্ত।

এ ধরনের ঘটনাবলী সমপর্কে উম্মতের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, কোন ভুল বুঝাবুঝি বা অনিচ্ছাকৃত কারণে নবিদের দ্বারা এ ধরনের কাজ সংঘটিত হয়ে থাকবে। কোন নবি (আঃ) জেনে শুনে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ পাকের হুকুমের পরিপন্থী কোন কাজ করেননি। এ ক্রটি ইজতেহাদগত ও অনিচ্ছাকৃত এবং তা ক্ষমার যোগ্য। শরীয়তের পরিভাষায় একে পাপ বলা চলে না এবং এ ধরনের ভাঙ্গিজনক ও অনিচ্ছাকৃত ক্রটি সেসব বিষয়ে হতেই পারে না, যার সম্পর্ক শিক্ষা-দীক্ষা এবং শরীয়তের প্রচারের সাথে রয়েছে, বরং তাঁদের ব্যক্তিগত কাজ-কর্মে এ ধরনের ভুলক্রটি হতে পারে।

কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাকের দরবারে নবিগণের স্থান ও মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ এবং যেহেতু মহান ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্রটি বিচ্যুতি সংঘটিত হলেও তাকে অনেক বড় মনে করা হয়, সেহেতু কোরআন হাকীমে এ ধরনের ঘটনাবলীকে অপরাধ ও পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও প্রকৃতপক্ষে সেগুলো আদৌ পাপ নয়।

হযরত আদম (আঃ)-এর এ ঘটনা সম্পর্কে তফসীরবিদগণ বহু কারণ বর্ণনা করেছেন এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

১। হযরত আদম (আঃ)-কে যখন নিষেধ করা হয়েছিল, তখন এক নির্দিষ্ট গাছের প্রতি ইঙ্গিত করেই তা করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে শুধুমাত্র সে গাছটিই উদ্দেশ্য ছিল না, বরং সে জাতীয় যাবতীয় গাছই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদিন রসুলুল্লাহ (আঃ) এক ঋণ রেশমী কাপড় ও একখণ্ড স্বর্ণ হাতে নিয়ে এরশাদ করলেন, এ বস্তু দু’টি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্যে হারাম। একথা সুস্পষ্ট যে, ঐ বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণখণ্ডের ব্যবহারই শুধু হারাম ছিল না, যে দু’টি হুযরের (সাঃ) হাতে ছিল বরং যাবতীয় রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ সম্পর্কেই ছিল এ হুকুম। কিন্তু এখানে হয়তো এ ধারণাও হতে পারে যে, এ নিষেধাজ্ঞার সম্পর্ক সেই বিশেষ কাপড় ও স্বর্ণখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, যেগুলো সে সময় তাঁর (সাঃ) হাতে ছিল। অনুকূপভাবে হযরত আদম (আঃ)-এর হয়তো এ ধারণা হয়েছিল যে, যে গাছের প্রতি ইঙ্গিত করে নিষেধ করা হয়েছিল, এ নিষেধের সম্পর্ক ঐ বিশেষ গাছটিতেই সীমাবদ্ধ। শয়তান এ ধারণা তাঁর অন্তরে সঞ্চার করে বদ্ধমূল করে দিয়েছিল এবং কসম খেয়ে খেয়ে বিশ্वास জন্মালো যে, ‘আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী, তোমাদেরকে এমন কোন কাজের পরামর্শ দিচ্ছি না, যা তোমাদের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। যে গাছ সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে, সেটি অন্য গাছ।’

তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, শয়তান এ প্রবঞ্চনা তাঁর অন্তঃকরণে সঞ্চারিত করেছিল যে, এ গাছ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা আপনার সৃষ্টির সূচনা পর্বের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। যেমন, সদ্যজাত শিশুকে জীবনের প্রথম পর্যায়ে শক্ত ও গুরুপাক আহার থেকে বিরত রাখা হয়। কিন্তু সময় ও শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে সব ধরনের আহার্য গ্রহণেরই অনুমতি দিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং আপনি এখন শক্ত-সমর্থ হয়েছেন ; এখন সে বিধি-নেবিধ কার্যকর নয়।

আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, শয়তান যখন হযরত আদম (আঃ)-কে সে গাছের উপকারিতা ও গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছিল, যেমন—সে গাছের ফল খেলে আপনি অনন্তকাল নিশ্চিন্তে জ্ঞানাতের নেয়ামতাদি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারবেন, তখন তাঁর সৃষ্টির প্রথম পর্বে সে গাছ সম্পর্কে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কথা তাঁর মনে ছিল না। কোরআন মজীদে فَسَوَىٰ وَأَوْفَىٰ ۚ (অর্থাৎ, আদম (আঃ) ভুলে গেলেন এবং আমি তাঁর মধ্যে (সংকল্পের) দৃঢ়তা পাইনি।) আয়াতও এ সম্ভাব্যতা সমর্থন করে।

যাহোক, এ ধরনের বহু সম্ভাবনা থাকতে পারে। তবে সারকথা এই যে, হযরত আদম (আঃ) বুঝে-শুনে, ইচ্ছাকৃতভাবে এ হুকুম অমান্য করেননি, বরং তাঁর দ্বারা ভুল হয়ে গিয়েছিল বা ইজতেহাদগত বিচ্যুতি ঘটেছিল, যা প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ নয়। কিন্তু হযরত আদম (আঃ)-এর শানে-নবুওয়ত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চ-মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচ্যুতিকেও যথেষ্ট বড় মনে করা হয়েছিল। আর কোরআন মজীদ সেজন্যই একে পাপ বলে অভিহিত করেছে। অবশ্য আদম (আঃ)-এর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার পর তা মাফ করে দেয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এ বিতর্ক অনাবশ্যক যে, শয়তান জন্মাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর আদম (আঃ)-কে প্রতারিত করার জন্য কিভাবে আবার সেখানে প্রবেশ করল? কারণ, শয়তানের প্রবঞ্চনার জন্যে জন্মান্তে প্রবেশের কোন

প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ্ পাক শয়তান ও জ্বিন জাতিকে দূর থেকেও প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে এ প্রশ্ন যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে পূর্বাঙ্কেই সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল যে, শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তোমাদেরকে দিয়ে যেন এমন কোন কাজ করিয়ে না বসে, যে কারণে তোমাদেরকে জ্ঞানাত থেকে বিতাড়িত হতে হয়। এতদসত্ত্বেও হযরত আদম (আঃ) শয়তান কর্তৃক কেমন করে প্রতারিত হলেন? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ পাক জ্বিন ও শয়তানকে বিভিন্ন আকার অবয়বে আত্মপ্রকাশের শক্তি দিয়েছেন। হতে পারে, সে এমন রূপ ধারণ করে সামনে এসেছিল যে, হযরত আদম (আঃ) বুঝতেই পারেননি যে, সে 'ই শয়তান।

হযরত আদম (আঃ) ইতিপূর্বে কখনও এ ধরনের শাসন ও কোপদৃষ্টির সন্মুখীন হননি। তিনি এমন পাষণাচিত্তও ছিলেন না যে, বেমানম্য তা সয়ে যেতে পারেন। তাই চরমভাবে বিচলিত হয়ে মনে মনে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে লাগলেন। কিন্তু নবিসূলত প্রাজ্ঞদৃষ্টি এবং সে কারণে চরমভাবে সঞ্চারিত ভীতির দরুন মুখ থেকে কোন কথাই বের হচ্ছিল না। ক্ষমা-ভিক্ষা মর্যাদার পরিপন্থী বিবেচিত হয়ে অধিক শক্তি ও কোপানলের কারণ রূপে পরিগণিত হতে পারে এমন আশঙ্কায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতবাক হয়ে বসে থাকেন। মহান আল্লাহ্ অন্তর্যামী এবং অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়। এ করুণ অবস্থা দেখে আল্লাহ্ পাক নিজেই ক্ষমা প্রার্থনারীতি সমূলিত কয়েকটি বচন তাঁদেরকে শিখিয়ে দিলেন। তারই বর্ণনা এ আয়াতসমূহে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আঃ) স্বীয় প্রভুর কাছ থেকে কয়েকটি শব্দ লাভ করলেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাঁদের প্রতি করুণাভরে লক্ষ্য করলেন। (অর্থাৎ, তাঁদের তওবা গ্রহণ করে নিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি মহা ক্ষমাশীল এবং অতি মেহেরবান)। কিন্তু যেহেতু পৃথিবীতে আগমনের মধ্যে ক্ষমাশীল এবং অতি মেহেরবান।) কিন্তু যেহেতু পৃথিবীতে আগমনের মধ্যে আরও অনেক তাৎপর্য ও কল্যাণ নিহিত ছিল — যেমন, তাঁদের বংশধরদের মধ্য থেকে ফেরেশতা ও জ্বিন জাতির মাঝে এক নতুন জাতি — ‘মানব’ জাতির আবির্ভাব ঘটা, তাদেরকে এক ধরনের কর্ম-স্বাধীনতা দিয়ে তাদের প্রতি শরীয়তী বিধান প্রয়োগের যোগ্য করে গড়ে তোলা, বিশ্বে খোদায়ী খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং অপরাধীর শাস্তি বিধান, শরীয়তী আইন ও নির্দেশাবলী প্রবর্তন। এই নতুন জাতি উন্নতি সাধন করে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়ে এমন এক স্তরে পৌছবে, যা ফেরেশতাদের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে। এসব উদ্দেশ্য সম্পর্কে আদম সৃষ্টির পূর্বে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছিল।

এজন্য অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার পরও পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ রহিত করা হয়নি, অবশ্য তার রূপ পাল্টে দেয়া হয়েছে। আর এখানকার এ নির্দেশ মহাজ্ঞানী ও রহস্যবিদসূলত এবং পৃথিবীতে আগমন খোদায়ী খেলাফতের সম্মানসূচক। পরবর্তী আয়াতসমূহে উক্ত পদ-সংশ্লিষ্ট সেসব দায়িত্ব ও কর্তব্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা আল্লাহ্ পাকের একজন খলীফা হিসাবে তাঁর উপর অপিত হয়েছিল। এজন্য পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ পূর্নাব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমি তাদের সবাইকে নীচে নেমে যেতে নির্দেশ দিলাম। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন পথ-নির্দেশ বা হেদায়েত (অর্থাৎ, ওহীর মাধ্যমে শরীয়তী বিধান) আসে, তখন যেসব লোক আমার সে হেদায়েতের অনুসরণ করবে, তাদের না থাকবে কোন ভয়, না তারা সন্তুষ্ট হবে। (অর্থাৎ, কোন অতীত বস্ত্ত হারাবার গ্লানিও থাকবে না এবং ভবিষ্যতে কোন কষ্টেরও আশঙ্কা থাকবে না।)

تلقى শব্দের অর্থ আগ্রহ ও উৎসাহসহ কাউকে সৎবর্ননা জানানো এবং তাকে গ্রহণ করা। এর মর্ম এই যে, আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে যখন তাদেরকে তওবার বাক্যগুলো শিখিয়ে দেয়া হলো, তখন হযরত আদম (আঃ) যথোচিত মর্যাদা ও গুরুত্বসহ তা গ্রহণ করলেন।

كلمات তথা যে সব বাক্য হযরত আদমকে তওবার উদ্দেশে বলে দেয়া হয়েছিল, তা কি ছিল? এ সম্পর্কে মুফাস্সির সাহাবাগণের কয়েক ধরনের রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমতই এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যা কোরআন মজীদের অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে।

رَبِّكَ أَفَلَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

مِنَ الْمَلَكُوتِ

অর্থাৎ, হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন, তবে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পরিগণিত হয়ে যাব।

توبه (তওবা) এর প্রকৃত অর্থ, ফিরে আসা। যখন তওবার সম্বন্ধ মানুষের সঙ্গে হয়, তখন তার অর্থ হবে তিনটি বস্তুর সমষ্টি :

- ১। কৃত পাপকে পাপ মনে করে সেজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া।
- ২। পাপ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা।
- ৩। ভবিষ্যতে আবার এরূপ না করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করা।

এ তিনটি বিষয়ের যে কোন একটির অভাব থাকলে তওবা হবে না। সুতরাং মৌখিকভাবে ‘আল্লাহ্ তওবা’ বা অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করা নাজাত লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। فَتَلَبَّ عَزَّوَجَلَّ এর মধ্যে তওবার সম্বন্ধ আল্লাহর সাথে। এর অর্থ তওবা গ্রহণ করা।

প্রথম যুগের কোন কোন মনীষীর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কারো দ্বারা পাপ সৎঘটিত হলে সে কি করবে? উত্তরে বলা হয়েছিল যে, তাই করবে যা আদি পিতা-মাতা হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত মুসা (আঃ) নিবেদন করেছিলেন -

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ (হে আমার পরওয়ারদেগার, আমি আমার নফসের উপর অত্যাচার করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন)

হযরত ইউনুস (আঃ) পদস্থলনের পর নিবেদন করেন لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তুমি অতি পবিত্র। আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি।

জ্ঞাতব্য : হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর দ্বারা যে ইজতেহাদগত বিচ্যুতি বা ত্রুটি সাধিত হয়েছিল, প্রথমতঃ কোরআন করীম তার সম্বন্ধ উভয়ের সাথে করেছে। বলা হয়েছে فَكَانَ هُمَا الشَّيْطَانُ عَنَّا وَكُفَرَاً (অতঃপর শয়তান উভয়কে পদস্থলিত করে দেয়)।

পৃথিবীতে অবতরণের হুকুমও হযরত হাওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে فَهَيَّؤُوا (তোমরা নেমে যাও)। কিন্তু পরে তওবা ও তা কবুলের ক্ষেত্রে একবচন ব্যবহার করে শুধু হযরত আদম (আঃ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত হাওয়ার উল্লেখ নেই। এছাড়া অন্যত্রও এ পদস্থলন প্রসঙ্গে শুধু হযরত আদম (আঃ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে : عَصَى آدَمُ (অর্থাৎ, আদম (আঃ) স্বীয় পালনকর্তার হুকুম লঙ্ঘন করলেন।

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَعِيبًا يَا آدَمُ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ قَدْ هَدَىٰ قَبْلَ هَذَا ۖ فَكَوَفُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرُجُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّا لَنَنصِفُهُمْ فِيهَا وَلَهُمْ فِيهَا جَذَابٌ ۝ يَبْقَىٰ إِسْرَءِيلُ أَذْكَرٌ وَأَعْيَبِي ۖ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي وَأَوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۖ وَإِنِّي فَارَهِمُونَ ۝ وَإِنَّمَا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَاذِبِينَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ وَإِنِّي فَالِقُ حَبُّونَ ۝ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ ۖ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَاسْتَبِينَ بِالْبَرِّ وَالصَّلَاةِ وَآيَاتِ الْكِبِيرَةِ ۖ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ۖ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۖ إِنِّي إِسْرَءِيلُ أَذْكَرٌ وَأَعْيَبِي ۖ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنْ فَضَّلْتُ عَلَى الْعَالَمِينَ ۖ وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُكْفَىٰ فِيهِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ۖ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝

(৩৮) আমি হুকুম করলাম, তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। (৩৯) আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নির্দশনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; অনন্তকাল সেখানে থাকবে। (৪০) হে বনী - ইসরাঈলগণ, তোমরা স্মরণ কর আমার সে অনুগ্রহ যা আমি তোমাদের প্রতি করেছি এবং তোমরা পূরণ কর আমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা, তাহলে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করব। আর ভয় কর আমাকেই। (৪১) আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্যবক্তা হিসেবে তোমাদের কাছে। বস্তুতঃ তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ে না আর আমার আয়াতের অশ্ল মূল্য দিও না। এবং আমার (আযাব) থেকে বাঁচ। (৪২) তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বে সত্যকে তোমরা গোপন করো না। (৪৩) আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয়। (৪৪) তোমরা কি মানুষকে সংকল্পের নির্দেশ দাও এবং নিজেরা নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিভাবে পাঠ কর? তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? (৪৫) যের্বের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব (৪৬) যারা একথা খেয়াল করে যে, তাদেরকে সম্প্রদায় হতে হবে স্থায়ী পরওয়ারদেগারের এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। (৪৭) হে বনী-ইসরাঈলগণ! তোমরা স্মরণ কর আমার অনুগ্রহের কথা, যা আমি তোমাদের উপর করেছি এবং (স্মরণ কর) সে বিষয়টি যে, আমি তোমাদেরকে উচ্চমর্যাদা দান করেছি সমগ্র বিশ্ব উপর। (৪৮) আর সে দিনের ভয় কর, যখন কেউ কারও সামান্য উপকারে আসবে না এবং তার পক্ষে কোন সুপারিশও কবুল হবে না; কারও কাছ থেকে ক্ষতিপূরণও নেয়া হবে না এবং তারা কোন রকম সাহায্যও পাবে না।

এর কারণ হয়তো আল্লাহ তা'আলা নারী জাতির প্রতি বিশেষ রেয়াত প্রদর্শন করে হযরত হাওয়ার বিষয়টি গোপন রেখেছেন এবং পাপ ও ভৎসনার ক্ষেত্রে সরাসরি তাঁর উল্লেখ করেননি। এক জায়গায় উভয়ের তওবারও বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا (হে আমাদের প্রভু, আমরা আমাদের নফসের উপর জুলুম করেছি)। এ ব্যাপারে কারো সংশয় থাকে উচিত নয় যে, হযরত হাওয়ার অপরাধও ক্ষমা হয়েছে। এছাড়া স্ত্রী যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষের অধীন সূতরাং স্বতন্ত্রভাবে তাঁর (হাওয়ার) উল্লেখের প্রয়োজনবোধ করা হয়নি। — (কুরত্বী)

তওবা গ্রহণের অধিকার আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নেই :

এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তওবা গ্রহণের অধিকারী আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কেউ নয়। স্বীকৃত ও ইহুদিগণ এক্ষেত্রে মারাত্মক ভুলে পড়ে আছে। তারা পাদ্রী-পুরোহিতদের কাছে কিছু হাদিয়া উপঢৌকনের বিনিময়ে পাপ মোচন করিয়ে নেয় এবং মনে করে যে, তারা মাফ করে দিলেই আল্লাহর নিকটেও মাফ হয়ে যায়। বর্তমানে বহু মুসলমানও এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে। অথচ কোন পীর বা আলেম কারো পাপ মোচন করিয়ে দিতে পারেন না; তাঁরা বড়জোর দোয়া করতে পারেন।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আদম (আঃ)-এর পৃথিবীতে অবতরণ শাস্তিস্বরূপ নয় : قُلْنَا

اهْبِطُوا مِنْهَا جَعِيبًا (তোমরা জান্নাত থেকে নেমে যাও)- এর পূর্ববর্তী আয়াতেও জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশ ছিল। এখানে পুনরায় এর উল্লেখ করার মাঝে সম্ভবতঃ এ উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে যে, প্রথম আয়াতে পৃথিবীতে অবতরণের হুকুম ছিল শাস্তিমূলক। সেইজন্যই তার সাথে সাথে মানবের পারম্পরিক শত্রুতারও বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে পৃথিবীতে অবতরণের নির্দেশে বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। আর তা হলো বিশ্বে খোদায়ী খেলাফতের পূর্ণতাসাধন। এজন্য এর সাথে হেদায়েত প্রেরণের উল্লেখও রয়েছে, যা খোদায়ী খেলাফতের সমুদায়ী কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এতে বুঝা গেল যে, পৃথিবীতে অবতরণের প্রথম নির্দেশটি যদিও শাস্তিমূলক ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হলো, তখন অন্যান্য মঙ্গল ও হেকমতসমূহের বিবেচনায় পৃথিবীতে প্রেরণের হুকুমের রূপ পরিবর্তন করে মূল হুকুম বহাল রাখা হলো এবং তাদের অবতরণ হলো বিশ্বের শাসক খলীফা হিসেবে।

শোক-সন্তাপ থেকে শুধু তারাই মুক্তি পেতে পারে যারা

قُلْنَا هَذَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَفَرُوا (যারা আমার হেদায়েতের অনুসরণ করবে; তাদের আশঙ্কা নেই এবং কোন চিন্তাও করতে হবে না)। এ আয়াতে আসমানী হেদায়েতের অনুসারিগণের জন্য দু'ধরনের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথমতঃ তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং দ্বিতীয়তঃ তারা চিন্তাগ্রস্ত হবে না।

خوف আগত দুঃখ-কষ্টজনিত আশঙ্কার নাম। আর حزن বলা হয়, কোন উদ্দেশ্য সফল না হওয়ার কারণে সৃষ্ট গ্লানি ও দুশ্চিন্তাকে। লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এ দু'টি শব্দে যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত করে দেয়া হয়েছে যে, স্বাচ্ছন্দ্যের একবিন্দুও এর বাইরে নেই।

অতঃপর এ দু'টি শব্দের মধ্যে তৎপত্ত ব্যবধানও রয়েছে। এখানে

فَكَرِهْتُمْ عَلَيْهِمُ এর ন্যায় لاحزن عليهم - না বলে ক্রিয়াবাচক শব্দ

وَلَا كَرِهْتُمْ এর ব্যবহারের মধ্যে এ ইংগিতই রয়েছে যে, কোন উদ্দেশ্য

সফল না হওয়া জনিত গ্রানি ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুধু তাঁরাই মুক্ত থাকতে পারেন, যারা আল্লাহর ওলীর স্তরে পৌছতে পেরেছেন। যারা আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েতসমূহের পূর্ণ অনুসরণকারী, তাঁরা ব্যতীত অন্য কোন মানুষ এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। তা' সে সারা বিশ্বে রাজাখিরাজই হোক, বা সর্বোচ্চ শনী ব্যক্তিই হোক। কেননা, এদের মধ্যে কেউই এমন নয়, যার স্বভাব এ ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোন অবস্থার সম্মুখীন হবে না এবং সেজন্য দৃষ্টিভঙ্গি লিপ্ত হবে না। অপরপক্ষে আল্লাহর ওলিগণ নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহর ইচ্ছার মাঝে বিলীন করে দেন। এজন্য কোন ব্যাপারে তাঁরা সফলকাম না হলে মোটেও বিচলিত হন না। কোরআন মজীদে অন্যত্র একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিশিষ্ট জ্ঞানাতবাসিগণের অবস্থা হবে এই যে, তাঁরা জ্ঞানাতবাসিগণের পর আল্লাহর সেসব নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করবেন, যার দ্বারা তিনি তাঁদের সন্তাপ ও দৃষ্টিভঙ্গি দূর করে দিয়েছেন।

আয়াতসমূহের পূর্বাপর সম্পর্ক : সূরা বাক্বারাহ কোরআন সংক্রান্ত আলোচনা দিয়ে আরম্ভ করা হয়েছে এবং তাতে বলে দেয়া হয়েছে যে, কোরআনের হেদায়েত যদিও গোটা সৃষ্টিজগতের জন্য ব্যাপক, কিন্তু এর দ্বারা শুধু মুমিনগণই উপকৃত হবে। এর পরে যারা এর প্রতি ঈমান আনেনি, তাদের জন্য নির্ধারিত কঠিন শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে এক শ্রেণী ছিল সরাসরি কাকের ও অবিশ্বাসীদের। অপর একটা শ্রেণী ছিল মুনাক্কি ও কপটদের।

জ্ঞাতব্য : সূরা বাক্বারাহ যেহেতু মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে, সুতরাং এতে মুরশিক ও মুনাক্কিদের বিবরণের পর যে কোন আসমানী গ্রন্থে বিশ্বাসী আহলে-কিতাবদেরকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সূরার চল্লিশতম আয়াত থেকে আরম্ভ করে একশত তেইশতম আয়াত পর্যন্ত শুধু এদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সেখানে তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রথমে তাদের বংশগত কোলিন্য, বিশ্বে বৃকে তাদের যশ-খ্যাতি, মান-মর্যাদা এবং তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের অগণিত অনুকম্পাধারার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অতঃপর তাদের পদচ্যুতি ও দুষ্কৃতির জন্য সাবধান করে দেয়া হয়েছে এবং সঠিক পথের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। প্রথম সাত আয়াতে এসব বিষয়েরই আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে প্রথম তিন আয়াতে ঈমানের দাওয়াত এবং চার আয়াতে সংকাজের শিক্ষা ও প্রেরণা রয়েছে। তৎপর অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বিস্তারিত সম্বোধনের সূচনা ও সমাপ্তিপূর্বে গুরুত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে يُنذِرُ (হে ইসরাঈলের বংশধর) শব্দসমষ্টি দ্বারা সংক্ষিপ্ত সম্বোধনের সূচনা হয়েছিল, সেগুলোই পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

يُنذِرُ (হে ইসরাঈল) হিব্রু ভাষার শব্দ। এর

অর্থ 'আবদুল্লাহ' (আল্লাহর দাস)। ইয়া'কুব (আঃ)-এর অপর নাম। ওলামায়ে কেরামের মতানুসারে হুযুর পাক (সাঃ) ব্যতীত অন্য কোন নবির একাধিক নাম নেই। কেবল - হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর দু'টি নাম রয়েছে— ইয়া'কুব ও ইসরাঈল। কোরআন পাক এক্ষেত্রে তাদেরকে বনী-ইয়াকুব (بنى يعقوب) বলে সম্বোধন না করে বনী-ইসরাঈল নাম

ব্যবহার করেছে। এর তাৎপর্ষ্য এই যে, স্বয়ং নিজেদের নাম ও উপাধি থেকেই যেন তারা বুঝতে পারে যে, তারা 'আবদুল্লাহ' অর্থাৎ, আল্লাহর আরাধনাকারী দাসের বংশধর এবং তাদের তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে হবে। এ আয়াতে বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে :

'এবং তোমরা আমার অঙ্গীকার পূরণ কর।' অর্থাৎ, তোমরা আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা পূরণ কর। হযরত কাতাদাহ (রাঃ)-এর মতে তত্ত্বারাতে বর্ণিত সে অঙ্গীকারের কথাই কোরআনের এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে :

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكُتِبَ عَلَيْهِمُ اسْمُهُمْ أَشْيَ عَسْرَ مِائَةٍ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক বনী-ইসরাঈল থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মাঝে থেকে ১২ জনকে দলপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলাম - (সূরা মায়েদাহ ৩ রুকু)। সমস্ত রসুলের উপর ঈমান আনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাদের মধ্যে আমাদের হুযুর পাক (সাঃ)-ও বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এছাড়া, নামায, যাকাত এবং অন্যান্য সদকা-খয়রাতও এ অঙ্গীকারভুক্ত। যার মূল মর্ম হল রসুলে করীম (সাঃ)-এর উপর ঈমান ও তার পুরোপুরি অনুসরণ। এ জন্যই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, অঙ্গীকারের মূল অর্থ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ।

'আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করব।' অর্থাৎ, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ এ ওয়াদা করেছেন যে, যারা এ অঙ্গীকার পালন করবে, আল্লাহ পাক তাদের যাবতীয় পাপ মোচন করে দেবেন এবং তাদেরকে জ্ঞানাতবাসি প্রবেশ করানো হবে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদেরকে জ্ঞানাতবাসি সুখ-সম্পদের দ্বারা গৌরবান্বিত করা হবে।

মূল ব্যক্ত্য এই যে, হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসরণ করার ব্যাপারে আমার সাথে যে অঙ্গীকার করেছ, তা পূরণ কর, তবে আমিও তোমাদের সাথে কৃত ক্ষমা ও জ্ঞানাতবাসি অঙ্গীকার পূরণ করবো। আর শুধু আমাকেই ভয় কর। একথা ভেবে সাধারণ ভক্তদেরকে ভয় করো না যে, সত্য কথা বললে তারা আর বিশ্বাসী থাকবে না, ফলে আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে।

মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের বিশেষ মর্যাদা : তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক বনী-ইসরাঈলকে প্রদত্ত সুখ-সম্পদ ও অনুগ্রহরাজির কথা সুরণ কিরিয়ে দিয়ে তাঁর যিক্র ও অনুসরণের আহ্বান করেছেন এবং উম্মতে মুহাম্মদিয়াকে তাঁর দয়া ও করুণার উদ্ধৃতি না দিয়েই একই কাজের উদ্দেশ্যে আহ্বান করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে : فَادْعُوا إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ (তোমরা আমাকে সুরণ কর, আমি তোমাদেরকে সুরণ করব)। এখানে উম্মতে-মুহাম্মদীর এক বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, দাতা ও করুণাময়ের সাথে তাদের সম্পর্ক মাধ্যমহীন—একবারে সরাসরি। এরা দাতাকে চেনে।

অঙ্গীকার পালন করা ওয়াজিব এবং তা লঙ্ঘন করা হারাম : এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, অঙ্গীকার ও চুক্তির শর্তাবলী পালন করা অবশ্য কর্তব্য আর তা লঙ্ঘন করা হারাম। সূরা মায়েদা'-তে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। اَوْفُوا بِالْعُقُودِ (তোমরা কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তি পালন কর)।

রসুলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদিগকে নির্ধারিত শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে এই শাস্তি দেয়া হবে যে, হাশরের

ময়দানে যখন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবজাতি সমবেত হবে, তখন অঙ্গীকার লঙ্ঘনকারীদের মাথার উপর নিদর্শনস্বরূপ একটি পতাকা উত্তোলন করে দেয়া হবে এবং যত বড় অঙ্গীকার করবে, পতাকাও তত উচু ও বড় হবে এভাবে তাদেরকে হাশরের ময়দানে লজ্জিত ও অপমানিত করা হবে।

পাপ বা পুণ্যের প্রবর্তকের আমলনামায় তার সম্পাদনকারীর সমান পাপ-পুণ্য লেখা হয় : **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتِنَا** - যে কোন পর্যায়ে কাফের হওয়া চরম অপরাধ ও জ্বলুম। কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রথম কাফেরে পরিণত হয়ো না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে ব্যক্তি প্রথম কুফরী গ্রহণ করবে, তার অনুসরণে পরবর্তীকালে যত লোক এ পাপে লিপ্ত হবে, তাদের সবার কুফরী ও অবিশ্বাসজনিত পাপের বোঝার সমতুল্য বোঝা তাকে একাই বহন করতে হবে। কারণ, সে-ই কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য এ অবিশ্বাস-প্রসূত পাপের মূল কারণ ও উৎস। সুতরাং তার শাস্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

এতে বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্য কারও পাপের কারণে পরিণত হয়, তবে কেয়ামত পর্যন্ত যত লোক তার কারণে এ পাপে জড়িত হবে, তাদের সবার সমতুল্য পাপ তার একাই হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি অন্য কারও পুণ্যের কারণ হয়, তাকে অনুসরণ করে কেয়ামত পর্যন্ত যত লোক সংকাজ সাধন করে যে পরিমাণ পুণ্য লাভ করবে, তাদের সবার সমতুল্য পুণ্য সে ব্যক্তির আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে দেয়া হবে। এ মর্মে কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াত এবং রসূল (সাঃ)-এর অগণিত হাদীস রয়েছে।

وَلَكُمْ فِيهَا نِكَاحٌ غَيْرُ الْمُنْكَاحِ (এবং তোমরা আমার আয়াতসমূহ কোন নগণ্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করো না।) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো মানুষের মজ্জি ও স্বার্থের তাগিদে আয়াতসমূহের মর্ম বিকৃত বা ভুলভাবে প্রকাশ করে কিংবা তা গোপন রেখে ঢাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা। এ কাজটি উন্মত্তের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

কোরআন শিখিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয : এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহ ঠিক ঠিকভাবে শিক্ষা দিয়ে বা ব্যক্ত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সঙ্গত কিনা? এই প্রশ্নটির সম্পর্ক উল্লেখিত আয়াতের সঙ্গে নয়। স্বয়ং এ মাসআলাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ও পর্যালোচনা সাপেক্ষ। কোরআন শিক্ষা দিয়ে বিনিময় বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয কি না, এ সম্পর্কে ফেকাহশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আহম আবু হানীফা (রাঃ) প্রমুখ কয়েকজন ইমাম তা নিষেধ করেছেন। কেননা, রসূল করীম (সাঃ) কোরআনকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে পরিণত করতে বারণ করেছেন।

অবশ্য পরবর্তী হানাফী ইমামগণ বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, পূর্বে কোরআনের শিক্ষকমণ্ডলীর জীবনযাপনের ব্যয়ভার ইসলামী ব্যয়তুলমাল (ইসলামী ধনভাণ্ডার) বহন করত, কিন্তু বর্তমানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষকমণ্ডলী কিছুই লাভ করেন না। ফলে যদি তাঁরা জীবিকার অনুরোধ চাকরী-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে ছেলেমেয়েদের কোরআন শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্য কোরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রয়োজনানুপাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে ইমামতি, আযান, হাদীস ও ফেকাহ শিক্ষাদান প্রভৃতি যে সব কাজের উপর দ্বীন ও শরীয়তের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে সেগুলোকেও কোরআন শিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজনমত এগুলোর বিনিময়েও বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। — (দুরেরে-মুখতার, শামী)

ঈসালে সওয়াব উপলক্ষে খতমে-কোরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না জায়েয : আল্লামা শামী 'দুরেরেমুখতারের শরাহ' এবং 'শিফাউল-আলীল' নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং অকাট্য দলীলাদিসহ একথা প্রমাণ করেছেন যে, কোরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের ফকীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরীয়তের বিধান ব্যবস্থার মূল আঘাত আসবে। সুতরাং এ অনুমতি এ সব বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যিক। এ জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদের ঈসালে-সওয়াবের উদ্দেশে কোরআন খতম করানো বা অন্য কোন দোয়া-কলাম ও অযিফা পড়ানো হারাম। কারণ, এর উপর কোন ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন পড়া হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে, তারা উভয়ই গোনাহ্গার হবে। বস্তুতঃ যে পড়েছে সে-ই যখন কোন সওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌছাবে? কবরের পাশে কোরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন খতম করানোর রীতি সাহাবী, তাবয়ীন এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বেদ'আত।

সত্য গোপন করা এবং তাতে সংযোজন ও সর্ঘমিশ্রণ হারাম :

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُنْكَاحِ (সত্যকে অসত্যের সাথে মিশ্রিত করো না।)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শ্রোতা ও সম্মুখিত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে উপস্থাপন করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। অনুরূপভাবে কোন ভয় বা লোভের বশবর্তী হয়ে সত্য গোপন করাও হারাম।

জ্ঞাতব্য : ধৈর্য ধারণ করার জন্য কেবল অপ্রয়োজনীয় কামনা-বাসনাগুলোই পরিহার করতে হয়। কিন্তু নামাযের ক্ষেত্রে অনেকগুলো কাজও সম্পন্ন করতে হয় এবং বহু বৈধ কামনাও সাময়িক ভাবে বর্জন করতে হয়। যেমন— পানাহার, কথাবার্তা, চলাফেরা এবং অন্যান্য মানবীয় প্রয়োজনাদি, যেগুলো শরীয়তানুসারে বৈধ ও অনুমোদিত, সেগুলোও নামাযের সময় বর্জন করতে হয়। তাও নির্ধারিত সময়ে দিন রাতে পাঁচবার করতে হয়। এজন্য কিছু সংখ্যক নির্দিষ্ট কার্যবলী সম্পন্ন করা এবং নির্ধারিত সময়ে যাবতীয় বৈধ ও অবৈধ বস্তু থেকে দৈর্ঘ্য ধারণ করার নাম নামায।

মানুষ অপ্রয়োজনীয় কামনাসমূহ বর্জন করতে সংকল্পবদ্ধ হলে কিছু দিন পর তার স্বাভাবিক চাহিদাও লোপ পেয়ে যায়, কোন প্রতিবন্ধকতা ও জটিলতা থাকে না। কিন্তু নামাযের সময়সূচীর অনুসরণ এবং তৎসম্পর্কিত যাবতীয় শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন এবং এসব সময়ে প্রয়োজনীয় আশা-আকাংখা থেকে বিরত থাকা প্রভৃতি মানব স্বভাবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ও আয়াসসাধ্য। এজন্য এখানে সন্দেহের উদ্ভব হতে পারে যে, ঈমানকে সহজলব্ধ করার জন্য ধৈর্য ও নামাযরূপ ব্যবস্থাপত্রের যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তার অনুশীলনও কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে নামায

সম্পর্কিত শর্তাবলী ও নিয়মাবলী পালন ও অনুসরণ করা নামায সংক্রান্ত এসব জটিলতার প্রতিবিধান প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে, নিঃসন্দেহে নামায কঠিন ও আয়াসসাধ্য কাজ। কিন্তু যাদের অন্তঃকরণে বিনয় বিদ্যমান, তাদের পক্ষে এটা মোটেও কঠিন কাজ নয়। এতে নামাযকে সহজসাধ্য করার ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে।

নামায কঠিন বোধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মানবমন কম্পনারাজ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। আর মানুষের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও মনেরই অনুসরণ করে। কাজেই যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনেরই অনুসরণে মুক্তভাবে বিচরণ করতে প্রয়াসী। নামায এরূপ স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। না বলা, না হাসা, না খাওয়া, না চলা প্রভৃতি নানাবিধ বাধ্যবাধকতার ফলে মন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এবং মনের অমুগত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এথেকে কষ্ট বোধ করতে থাকে।

সারকথাঃ নামাযের মধ্যে ক্লান্তি ও শ্রান্তি বোধের একমাত্র কারণ হচ্ছে মনের বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারার অব্যাহত বিচরণ। এর প্রতিবিধান মনের স্থিরতার দ্বারাই হতে পারে। **سكون قلب** বা বিনয়ের অর্থ মূলতঃ **خشوع** বা মনের স্থিরতা। কাজেই বিনয়কে নামায সহজসাধ্য হওয়ার কারণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠে যে, মনের স্থিরতা অর্থাৎ বিনয় কিভাবে লাভ করা যায়? একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যদি কোন ব্যক্তি তার অন্তরের বিচিত্র চিন্তাধারা ও নানাবিধ কম্পনাকে তার মন থেকে সরাসরি দূরীভূত করতে চায়, তবে এতে সফলতা লাভ করা প্রায় অসম্ভব। বরং এর প্রতিবিধান এই যে, মানবমন যেহেতু একই সময়ে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হতে পারে না, সুতরাং যদি তাকে একটি মাত্র চিন্তায় মগ্ন ও নিয়োজিত করে দেয়া যায়, তবে অন্যান্য চিন্তা ও কম্পনা আপনা থেকেই বেরিয়ে যাবে। এজন্য **خشوع** বা বিনয়ের বর্ণনার পর এমন এক চিন্তার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যাতে নিমগ্ন থাকলে অন্যান্য চিন্তা ও কম্পনা প্রদমিত ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এগুলো দমে যাওয়ার ফলে হৃদয়ের অস্থিরতা দূর হয়ে স্থিরতা জন্মাবে। স্থিরতার দরুন নামায আনায়ালব্ব হবে এবং নামাযের উপর স্থায়িত্ব লাভ হবে। আর নামাযের নিয়মানুবর্তিতার দরুন গর্ব-অহঙ্কার ও যশ-খ্যাতির মোহও হ্রাস পাবে। তাছাড়া ঈমানের পথে যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে তা দূরীভূত হয়ে পূর্ণ ঈমান লাভ সম্ভব হবে।

صلوة - اقيموا الصلوة - এর শাব্দিক অর্থ প্রার্থনা বা দোয়া। শরীয়তের পরিভাষায় সে বিশেষ এবাদত, যাকে নামায বলা হয়। কোরআন করীমে যতবার নামাযের তাকীদ দেয়া হয়েছে— সাধারণতঃ **اقامت** শব্দের মাধ্যমেই দেয়া হয়েছে। নামায পড়ার কথা শুধু দু'এক জায়গায় বলা হয়েছে। এজন্য **اقامت صلوٰة** (নামায প্রতিষ্ঠা)-এর মর্ম অনুধাবন করা উচিত। **اقامت** - এর শাব্দিক অর্থ সোজা করা, স্থায়ী রাখা। সাধারণতঃ যেসব খুঁটি দেয়াল বা গাছ প্রভৃতির আশ্রয়ে সোজাভাবে দাঁড়ানো থাকে, সেগুলো স্থায়ী থাকে এবং পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। এজন্য **اقامت** স্থায়ী ও স্থিতিশীলকরণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় **صلوة اقامت** অর্থ, নির্ধারিত সময় অনুসারে যাবতীয় শর্তাদি ও নিয়মাবলী রক্ষা করে নামায আদায় করা। শুধু নামায পড়াকে **صلوة اقامت** বলা হয় না। নামাযের যত গুণাবলী, ফলাফল, লাভ ও বরকতের কথা কোরআন-হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তা সবই **صلوة اقامت** (নামায প্রতিষ্ঠা) - এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন,

কোরআন করীমে আছে - **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** (নিশ্চয়ই নামায মানুষকে যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে)।

নামাযের এ ফল ও ফ্রিয়ার তখনই প্রকাশ ঘটবে, যখন নামায উপরে বর্ণিত অর্থে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এজন্য অনেক নামাযীকে অশ্লীল ও ন্যাকারজনক কাজে জড়িত দেখে এ আয়াতের মর্ম সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা ঠিক হবে না। কেননা, তারা নামায পড়েছে বটে কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেনি।

وَأَتُوا আভিধানিকভাবে যাকাতের অর্থ দু'রকম - পবিত্র করা ও বর্ধিত হওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় সম্পদের সে অংশকে যাকাত বলা হয়, যা শরীয়তের নির্দেশানুসারে সম্পদ থেকে বের করা হয় এবং শরীয়ত মোতাবেক খরচ করা হয়।

যদিও এখানে সমসাময়িক বনী-ইসরাঈলদিগকে সম্মোদন করা হয়েছে, কিন্তু তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, নামায ও যাকাত ইসলাম পূর্ববর্তী বনী-ইসরাঈলদের উপরই ফরয ছিল। কিন্তু সূরা মায়দায় বর্ণিতঃ “নিশ্চই আল্লাহ পাক বনী-ইসরাঈল থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন দলপতি মনোনীত করে প্রেরণ করলাম। আর আল্লাহ পাক বললেন, যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর, তবে নিশ্চয়ই আমার সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে।” এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বনী-ইসরাঈলের উপর নামায ও যাকাত ফরয ছিল। অবশ্য তার রূপ ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন।

وَأَتُوا রুকূর শাব্দিক অর্থ ঝুঁকা বা প্রণত হওয়া। এ অর্থের পরিশ্রেঙ্কিতে এ শব্দ সেজদার স্থলেও ব্যবহৃত হয়। কেননা, সেটাও ঝুঁকারই সর্বশেষ স্তর। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় ঐ বিশেষ ঝুঁকাকে রুকূ বলা হয়, যা নামাযের মধ্যে প্রচলিত ও পরিচিত। আয়াতের অর্থ এই যে, রুকূকারীগণের সাথে রুকূ কর'। এখানে প্রাধিকানযোগ্য যে, নামাযের সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে রুকূকে বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করা হলো? উত্তর এই যে, এখানে নামাযের একটি অংশ উল্লেখ করে গোটা নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন, কোরআন মজীদে এক জায়গায় **وَأَنذَرُوا** (ফজর নামাযের কোরআন পাঠ) বলে সম্পূর্ণ ফজরের নামাযকে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের কোন কোন রেওয়ায়েতে ‘সেজদা’ শব্দ ব্যবহার করে পূর্ণ এক রাক'আত বা গোটা নামাযকেই বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর মর্ম এই যে, নামাযিগণের সাথে নামায পড়। কিন্তু এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নামাযের অন্যান্য অংশের মধ্যে বিশেষভাবে রুকূর উল্লেখের তাৎপর্য কি?

উত্তর এই যে, ইহুদীদের নামাযে সেজদাসহ অন্যান্য সব অঙ্গই ছিল, কিন্তু রুকূ ছিল না। রুকূ মুসলমানদের নামাযের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম। এজন্য **رُكْعَيْنِ** শব্দ দ্বারা উন্মতে মুহাম্মদীর নামাযিগণকে বুঝানো হবে, যাতে রুকূও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোমরাও উন্মতে মুহাম্মদীর নামাযিগণের সাথে নামায আদায় কর। অর্থাৎ, প্রথম ঈমান গ্রহণ কর, পরে জামাতের সাথে নামায আদায় কর।

নামাযের জামাত সম্পর্কিত নির্দেশাবলী : নামাযের শুরু এবং তা ফরয হওয়া তো **وَأَتُوا الصَّلَاةَ** শব্দের দ্বারাই বুঝা গেল। এখানে **مَعَ الرُّكُوعِ** (রুকূকারীদের সাথে) শব্দের দ্বারা নামায জামাতের সাথে

আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এ হুকুমটি কোন ধরনের? এ ব্যাপারে ওলামা ও ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাহাবা (রাঃ), তায়েয়ীন এবং ফুকাহাদের মধ্যে একদল জামাতকে ওয়াজেব বলেছেন এবং তা পরিত্যাগ করাকে কঠিন পাপ বলে অভিহিত করেছেন। কোন কোন সাহাবা (রাঃ) তো শরীয়তসম্মত ওয়র ব্যতীত জামাতহীন নামায জায়েয নয় বলেও মন্তব্য করেছেন। যারা জামাত ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা এ আয়াতটি তাঁদের দলীল।

অধিকাংশ ওলামা, ফুকাহা, সাহাবা ও তাবেঈনের মতে জামাত হল সুনতে মোয়াক্কাদাহ। কিন্তু ফজরের সুনতের ন্যায় সর্বাধিক তাকীদপূর্ণ সুনত। ওয়াজিবের একেবারে নিকটবর্তী।

আমলহীন উপদেশ প্রদানকারীর নিন্দা : **أَتْمُرُونَ النَّاسَ بِالْإِيمَانِ وَكُنْتُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ كُفْرًا** (তোমরা অনেকে সংকাজের নির্দেশ দাও, অথচ নিজেদেরকে ভুলে বস।) এ আয়াতে ইহুদী আলেমদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে তাদেরকে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, তারা তো নিজেদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসরণ করতে এবং ইসলামের উপর স্থির থাকতে নির্দেশ দেয়। (এ থেকে বুঝা যায়, ইহুদী আলেমগণ দ্বীন ইসলামকে নিশ্চিতভাবে সত্য বলে মনে করত।) নিজেরা প্রবৃত্তির কামনার দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত ছিল যে, ইসলাম গ্রহণ করতে কখনো প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু যারাই অপরকে পুণ্য ও মঙ্গলের প্রেরণা দেয়, অথচ নিজের ক্ষেত্রে তা কার্যে পরিণত করে না, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা সবাই ভর্ৎসনা ও নিন্দাবাদের অন্তর্ভুক্ত। এ শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে হাদীসে করুণ পরিণতি ও ভয়ঙ্কর শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযুর (সাঃ) এরশাদ করেন, যে'রাজের রাতে আমি এমন কিছুসংখ্যক লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের জিহ্বা ও ঠোট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরাঈল বললেন, এরা আপনার উম্মতের পার্শ্বি স্বার্থপঞ্জরী উপদেশদানকারী— যারা অপরকে তো সংকাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু নিজের খবর রাখত না।— (কুরতুবী)

নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, কতিপয় জান্নাতবাসী কতক নরকবাসীকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেখে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমরা কিভাবে দোযখে প্রবেশ করলে, অথচ আল্লাহর কসম, আমরা তো সেসব সংকাজের দৌলতেই জান্নাত লাভ করেছি, যা তোমাদেরই কাছে শিখেছিলাম? দোযখবাসীরা বলবে, আমরা মুখে অবশ্য বলতাম কিন্তু নিজে তা কাজে পরিণত করতাম না।

পাপী ওয়াজেজ উপদেশ প্রদান করতে পারে কিনা : উল্লেখিত বর্ণনা থেকে একথা যেন বোঝা না হয় যে, কোন আমলহীন বিরুদ্ধাচারীর পক্ষে অপরকে উপদেশ দান করা জায়েয নয় এবং কোন ব্যক্তি যদি কোন পাপে লিপ্ত থাকে, তবে সে অপরকে উক্ত পাপ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে পারে না। কারণ, সংকাজের জন্য ভিন্ন নেকী ও সংকাজের প্রচার-প্রসারের জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্র নেকী। আর এটা সুস্পষ্ট যে, এক নেকী পরিহার করলে অপর নেকীও পরিহার করতে হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন, কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে অপরকেও নামায পড়তে বলতে পারবে না, এমন কথা নয়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি নামায না পড়লে রোযাও রাখতে পারবে না, এমন কোন কথা নেই। তেমনিভাবে কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়া ভিন্ন পাপ এবং নিজের অধীনস্থ লোকদিগকে ঐ অবৈধ কাজ থেকে বারণ না করা পৃথক পাপ।

একটি পাপ করেছে বলে অপর পাপও করতে হবে এমন কোন ব্যাধ বাধকতা নেই।

যদি প্রত্যেক মানুষ নিজে পাপী বলে সংকাজের নির্দেশ দান ও অসং কাজ থেকে বাধাদান করা ছেড়ে দেয় এবং বলে যে, যখন সে নিজে নিশাপ হতে পারবে, তখনই অপরকে উপদেশ দেবে, তাহলে ফল দাঁড়াবে এই যে, কোন তবলীগকারীই অবিশষ্ট থাকবে না। কেননা, এমন কে আছে, যে পরিপূর্ণ নিশাপ? হযরত হাসান (রাঃ) এরশাদ করেছেন— শয়তান তো তাই চায় যে, মানুষ এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তবলীগের দায়িত্ব পালন না করে বসে থাক।

মূল কথা এই যে, **أَتْمُرُونَ النَّاسَ بِالْإِيمَانِ وَكُنْتُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ كُفْرًا** (তোমরা কি অপরকে সংকাজের নির্দেশ দাও এবং নিজেদেরকে ভুলে বস?) আয়াতের অর্থ এই যে, উপদেশদানকারী (ওয়াজেজকে) আমলহীন থাকা উচিত নয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে, ওয়াজেজ কিংবা ওয়াজেজ নয় এমন কারো পক্ষেই যখন আমলহীন থাকা জায়েয নয়, তাহলে এখানে বিশেষভাবে ওয়াজেজের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা কি? উত্তর এই যে, বিষয়টি উভয়ের জন্য নাজায়েয, কিন্তু ওয়াজেজ বহির্ভূতদের তুলনায় ওয়াজেজের অপরাধ অধিক মারাত্মক। কেননা, ওয়াজেজ অপরাধকে অপরাধ মনে করে জেনে-শুনে করছে। তার পক্ষে এ ওয়র গ্রহণযোগ্য নয় যে, এটা যে অপরাধ তা আমার জানা ছিল না। অপরপক্ষে ওয়াজেয বহির্ভূত মুখদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এছাড়া ওয়াজেজ ও আলেম যদি কোন অপরাধ করে, তবে তা হয় ধর্মের সাথে এক প্রকারের পরিহাস। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযুর (সাঃ) এরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক অশিক্ষিত লোকদেরকে যত ক্ষমা করবেন, শিক্ষিতদেরকে তত ক্ষমা করবেন না।

দু'টি মানসিক ব্যাধি ও তার প্রতিকার : সম্পদ-প্রীতির ও যশ-খ্যাতির মোহ এমন ধরনের দু'টি মানসিক ব্যাধি যদ্বন্ধন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনই নিস্তাভ ও অসার হয়ে পড়ে। গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, মানবেতিহাসে এযাবৎ যতগুলো মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং যত বিশৃংখলা ও অশান্তি বিস্তার লাভ করেছে, সেগুলোর উৎপত্তিই হয়েছিল উল্লেখিত এ দু'টি ব্যাধি থেকে।

সম্পদ প্রাপ্তির পরিণতি ও ফলাফল :

(১) অর্থগুণ্ডা ও কপণতার অন্যতম জাতীয় ক্ষতির দিক হল এই যে, তার সম্পদ জ্ঞাতির কোন উপকারে আসে না। দ্বিতীয় ক্ষতিটি তার ব্যক্তিগত। এ প্রকৃতির লোককে সমাজে কখনও সু-নজরে দেখা হয় না।

(২) স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা : তার সম্পদলিপ্সা পূরণার্থ জিনিসে ভেজাল মেশানো, মাপে কম দেয়া, মজুদদারী, মুনাফাখোঁরী, প্রবঞ্চনা-প্রতারণা প্রভৃতি ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন তার মজ্জাগত হয়ে যায়। স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে সে অপরের রক্ত নিড়ে নিতে চায়। পরিশেষে গুঁজিপতি ও মজুরদের পারস্পারিক বিবাদের উৎপত্তি হয়।

(৩) এমন লোক যত সম্পদই লাভ করুক, কিন্তু আরো অধিক উপার্জনের চিন্তা তাকে এমনভাবে পেয়ে বসে যে, অবকাশ ও অবসর বিনোদনের সময়েও তার একই ভাবনা থাকে যে, কিভাবে তার গুঁজি আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে যে সম্পদ তার সুখ-সাম্রাজ্যের মাধ্যমে পরিণত হতে পারত, তা পরিণামে তার জীবনের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াই।

(৪) সত্য কথা যত উজ্জ্বল হয়েই সামনে উদ্ভাসিত হোক না কেন,

তার এমন কোন কথা মেনে নেয়ার সংসাহস থাকে না, যাকে সে তার উদ্দেশ্য সাধন ও সম্পাদলাভের পথে প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। এসব বিষয় পরিশেষে গোটা সমাজের শান্তি ও স্বস্তি বিঘ্নিত করে।

গভীরভাবে চিন্তা করলে যশ-খ্যাতির মোহের অবস্থাও প্রায় একই রকম বলে পরিলক্ষিত হবে। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ অহঙ্কার, স্বার্থান্বেষা, অধিকার হরণ, ক্ষমতা লিপ্সা এবং এর পরিণতিতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও অনুরূপ আরো অগণিত অমানবিক সমাজবিরোধী ও নৈতিকতা বিবর্জিত দাঙ্গা-হাঙ্গামার উৎপত্তি ঘটে, যা পরিণামে গোটা বিশৃঙ্খল নরকে পরিণত করে দেয়। এই উভয় ব্যাধির প্রতিকার কোরআন পাক এ ভাবে উপস্থাপন করেছে— বলা হয়েছে **وَأَسْبَغُوا فِي الْمَوَاقِفِ وَالصَّلَاةِ** (তোমরা যের্থ ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর)। অর্থাৎ, যের্থ ধারণ করে ভোগ-বিলাস ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে বশীভূত করে ফেলো। তাতে সম্পদপ্রীতি হ্রাস পাবে। কেননা, সম্পদ বিভিন্ন আবাদ ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার মাধ্যম বলেই ধন-প্রেমের উদ্ভব হয়। যখন এসব আবাদ ও কামনা-বাসনার অঙ্ক অনুসরণ পরিহার করতে দৃঢ়-সংকল্প হবে, তখন প্রাথমিক অবস্থায় খানিকটা কষ্ট বোধ হলেও ধীরে ধীরে এসব কামনা যথোচিত ও ন্যায্যসঙ্গত পর্যায়ে নেমে আসবে এবং ন্যায় ও মধ্যমপন্থা তোমাদের স্বভাব ও অভ্যাসে পরিণত হবে। তখন আর সম্পদের প্রাচুর্যের কোন আবশ্যকতা থাকবে না। সম্পদের মোহও এতে প্রবল হবে না যে, নিজস্ব লাভ-ক্ষতির বিবেচনা ও নেশা তোমাকে অঙ্ক করে দেবে।

আর নামায দ্বারা যশ-খ্যাতির আকর্ষণও দমে যাবে। কেননা, নামাযের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সব ধরনের বিনয় ও নম্রতা ই বিদ্যমান। যখন যথা নিয়মে ও যথাযথভাবে নামায আদায় করার অভ্যাস গড়ে উঠবে, তখন সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের সামনে নিজের অক্ষমতা ও ক্ষুদ্রতার ধারণা বিরাজ করতে থাকবে। ফলে অহঙ্কার, আত্মগ্লানি ও মান-মর্যাদার মোহ হ্রাস পাবে।

বিনয়ের নিশ্চয় তত্ত্ব : **إِذْعَالُ الْخُشُوعِ** (কিন্তু বিনয়ীদের পক্ষে মোটেও কঠিন নয়)। কোরআন ও সুন্নাহ যেকোনো **خُشُوع** বা বিনয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে এর অর্থ অক্ষমতা ও অপারগতাজনিত সেই মানসিক অবস্থাকেই বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ পাকের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর সামনে নিজের ক্ষুদ্রতা ও দীনতার অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয়। এর ফলে এবাদত-উপাসনা সহজতর হয়ে যায়। কখনও এর লক্ষণাদি দেহও প্রকাশ পেতে থাকে। তখন সে শিষ্টাচারসম্পন্ন বিনয় ও কোমলমন বলে পরিদৃষ্ট হয়। যদি হৃদয়ে খোদাভীতি ও নম্রতা না থাকে, মানুষ বাহ্যিকভাবে যতই শিষ্টাচারের অধিকারী ও বিনয় হোক না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে সে বিনয়ের অধিকারী হয় না। বিনয়ের লক্ষণাদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ করাও বাঞ্ছনীয় নয়।

হযরত ওমর (রাঃ) একবার এক যুবককে নতশিরে বসে থাকতে দেখে বললেন, “মাথা উঠাও, বিনয় হৃদয়ে অবস্থান করে।”

হযরত ইব্রাহীম নখরী (রাঃ) বলেন যে, মোটা কাপড় পরা, মোটা খাওয়া এবং মাথা নত করে থাকার নামই বিনয় নয়।

خُشُوع বা বিনয় অর্থ **حَق** বা অধিকারের ক্ষেত্রে ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে সবার সংগে একই রকম ব্যবহার করা এবং আল্লাহ পাক তোমার উপর যা ফরয করে দিয়েছেন তা পালন করতে গিয়ে হৃদয়কে শুধু তারই জন্য নির্দিষ্ট ও কেন্দ্রীভূত করে নেয়া।

সারকথা— ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বিনয়ীদের রূপ ধারণ করা শয়তান ও প্রবৃত্তির প্রতারণা মাত্র। আর তা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তবে তা ক্ষম্য।

জ্ঞাতব্য : **خُشُوع** এর সাথে সাথে অপর একটি শব্দ **خُضُوع** - ও ব্যবহৃত হয়। কোরআন করীমের বিভিন্ন জায়গায় তা রয়েছে। এ শব্দ দু’টি প্রায় সমার্থক। কিন্তু **خُشُوع** শব্দ মূলতঃ কঠ ও দৃষ্টির নিম্নমুখিতা ও বিনয় প্রকাশার্থ ব্যবহৃত হয়— যখন তা কৃত্রিম হবে না বরং অন্তরের ভীতি ও নম্রতার ফলশ্রুতিস্বরূপ হবে। কোরআন করীমে আছে **وَخُشَعَتِ** (শব্দ নীচু হয়ে গেল)। এবং **خُضُوع** শব্দে দৈহিক ও বাহ্যিক বিনয় ও ক্ষুদ্রতাকে বোঝায়। কোরআন করীমে আছে **فَكَذَّبْتَ عَنْهَا جَحِشًا** (অতঃপর তাদের কাঁধ তার সামনে ঝুকিয়ে দিল)।

নামাযে বিনয়ের ফেকাহগত মর্যাদা : নামাযে **خُشُوع** বিনয়ের তাকীদ বার বার এসেছে। এরশাদ হয়েছে **وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِلَّهِ** (আমার সুরণে নামায প্রতিষ্ঠা কর)। এবং একথা স্পষ্ট যে, **غفلت** (অমনোযোগিতা) সুরণের পরিপন্থী। যে ব্যক্তি আল্লাহ থেকে **غافل** (অমনোযোগী) সে আল্লাহকে সুরণ করার দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ নয়। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে, **وَلَا تُكِنُّ مِنَ الظُّلُمَاتِ** (এবং অমনোযোগীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া না)। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন— নামায বিনয় ও ক্ষুদ্রতা প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়। অন্য কথায়, অন্তরে বিনয় ও ক্ষুদ্রতাবোধ না থাকলে তা নামাযই নয়। অপর এক হাদীসে আছে— যার নামায তাকে অঙ্গীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত না রাখে, সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। আর গাফেল বা অমনোযোগীর নামায তাকে অঙ্গীলতা ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। এ থেকে বুঝা গেল, যে লোক অন্যান্যমন্স্ক হয়ে নামায পড়ে, সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। ইমাম গাযালী (রাঃ) উল্লেখিত আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহ এবং অন্যান্য প্রমাণাদির উদ্ধৃতি দিয়ে এরশাদ করেছেন, এগুলোর দ্বারা বুঝা যায় যে, **خُشُوع** বা বিনয় নামাযের শর্ত এবং নামাযের বিশুদ্ধতা এরই উপর নির্ভরশীল। হযরত মু’আয ইবনে জাবাল (রাঃ), সুফিয়ান সওরী ও হাসান বসরী (রাঃ) প্রমুখের অভিমত এই যে, খুশু বা বিনয় ব্যতীত নামায আদায় হয় না, বরং তা ভণ্ড হয়ে যায়।

কিন্তু ইমাম চতুইয় এবং অধিকাংশ ফকীহগণের মতে ‘খুশু’ নামাযের শর্ত না হলেও তাঁরা একে নামাযের রূহ বা আত্মা বলে মন্তব্য করে এ শর্ত আরোপ করেছেন যে, তকবীরে-তাহরীমার সময় বিনয়সহ মনের একাগ্রতা বজায় রেখে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামাযের নিয়ত করতে হবে। পরে যদি খুশু বিদ্যমান না থাকে তবে যদিও সে নামাযের অতটুকু অংশের সন্ধ্যাব লাভ করবে না যে অংশে খুশু উপস্থিত ছিল না, তবে ফেকাহ অনুযায়ী তাকে নামায পরিত্যাগকারীও বলা চলবে না এবং নামায পরিত্যাগকারীর উপর যে শাস্তি প্রযোজ্য, তার জন্য সে শাস্তিবিধানও করা যাবে না।

খুশুহীন নামাযও সম্পূর্ণ নিরর্থক নয় : সবশেষে ‘খুশু’র এ অসাধারণ গুরুত্ব সত্ত্বেও মহান পরওয়ারদেরগারের দরবারে আমাদের এই কামনা যেন অন্যমনস্ক ও গাফেল নামাযীও সম্পূর্ণভাবে নামায পরিত্যাগকারীর পর্যায়ভুক্ত না হয়। কেননা, যে অবস্থায়ই হোক সে অন্ততঃ ফরয আদায়ের পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সামান্য সময়ের জন্য হলেও অন্তরকে যাবতীয় আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে আল্লাহর প্রতি নিয়োজিত করেছে। কমপক্ষে নিয়তের সময় শুধু সে আল্লাহ পাকেরই

وَأَذِّنْ لَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُونُوا عَلَيْكُمْ عَذَابًا
يُذَكِّرُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعْيِفُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكَ بَلَاءٌ مِمَّنْ
رَبُّكُمْ عَظِيمٌ ۝ وَإِذْ قَرَّبْنَا بِلْحَافٍ أَجْنِبَكُمْ وَأَخْرَجْنَا آلَ
فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
لَّكَ الْاِخْتِارُ الْعِجْلُ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝ لَمْ يَخَفْ بَلْ
عَذَّبْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ
الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَادِكُمُ الْعِجْلَ تَتَذَكَّرُونَ
إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْضُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ
بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ وَإِذْ
قُلْتُمْ يَوْمُي لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْدًا فَأَخْلَعْنَا
الطَّبْعَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ لَمْ يَخْشَ لَكُمْ وَعْدًا مِنْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَظَلَمْنَا عَلَيْكَ الْغَمَامَ وَانزَلْنَا
عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلًّا مِنْ طَلِبَاتِ مَا رَزَقْنَاهُمْ
وَمَا ظَلَمْنَاهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

(৪৯) আর (সুরাণ কর) সে সময়ের কথা, যখন আমি তোমাদিগকে মুক্তিদান করেছি ফেরআউনের লোকদের কবল থেকে যারা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দান করত; তোমাদের পুত্রসন্তানদেরকে জবাই করত এবং তোমাদের স্ত্রীদিগকে অব্যাহতি দিত। বস্তুতঃ তাতে পরীক্ষা ছিল তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে, মহা পরীক্ষা। (৫০) আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে বাচিয়ে দিয়েছি এবং ডুবিয়ে দিয়েছি ফেরআউনের লোকদিগকে অথচ তোমারা দেখছিলে। (৫১) আর যখন আমি মুসার সাথে ওয়াশা করছি চল্লিশ রাত্রির অভঃপর তোমারা গোবৎস বানিয়ে নিয়েছ মুসার অনুপস্থিতিতে। বস্তুতঃ তোমারা ছিলে যালেম। (৫২) তারপর আমি তাতেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি, যাতে তোমারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও। (৫৩) আর (সুরাণ কর) যখন আমি মুসাকে কিভাবে এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্য বিধানকারী নির্দেশ দান করেছি, যাতে তোমারা সরল পথ প্রাপ্ত হতে পার। (৫৪) আর যখন মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমারা তোমাদেরই ক্ষতিসাধন করছে এই গোবৎস নির্মাণ করে। কাজেই তোমারা তোমাদের জন্য স্ট্রার প্রতি এবং নিম্ন নিম্ন প্রাণ বিসর্জন দাও। এখন তুমি যাবার পর স্বীয় স্ট্রার প্রতি এবং নিম্ন নিম্ন প্রাণ বিসর্জন দাও। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর তোমাদের স্ট্রার প্রাণ বিসর্জন দাও। তোমাদের প্রতি লক্ষ্য করা হল। নিঃসন্দেহে তিনিই ক্ষমাকারী, অত্যন্ত মেহেরবান। (৫৫) আর যখন তোমারা বললে, হে মুসা, কশ্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্রাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে (প্রকাশ্য) দেখতে পাব। বস্তুতঃ তোমাদিগকে পাকড়াও করল বিদূষ। অথচ তোমারা তা প্রত্যক্ষ করছিলে। (৫৬) তারপর মরে যাবার পর তোমাদিগকে আমি তুলে দাঁড় করিয়েছি, যাতে করে তোমারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নাও। (৫৭) আর আমি তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি ‘যম্বু’র দানওয়া। সেসব পবিত্র বস্তু তোমারা ভক্ষণ কর, যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি। বস্তুতঃ তারা আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে।

ধ্যানে নিমগ্ন ছিল। এধরনের নামাযে অন্ততঃ এতটুকু উপকার অবশ্যই হবে যে, তাদের নাম অবাদ্য ও বেনামীদের তালিকা-বহির্ভূত থাকবে।

স্রাব্য : আলাচ্য আয়াতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে, সেটি হল কেয়ামতের দিন। দাবী আদায় করে দেয়ার অর্থ—যেমন, কেউ নামায-রোযা সঙ্ক্রান্ত হিসাবের সম্প্রদায়ন হলে, তখন অপর কেউ যদি বলে যে, আমার নামায-রোযার বিনিময়ে তাকে হিসাবমুক্ত করে দেয়া হোক, তবে তা গৃহীত হবে না। বিনিময় অর্থ, টাকা-পয়সা বা ধন-সম্পদের বিনিময়ে দায়মুক্ত করে দেয়া। এ দু'টির কোনটিই গ্রহণ করা হবে না। ঈমান ব্যতীত সুপারিশ গৃহীত না হওয়ার কথা কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও বোঝা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে এদের পক্ষে কোন সুপারিশই হবে না। ফলে তা গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই উঠবে না।

মোটকথা, দুনিয়াতে সাহায্য করার যত পদ্ধতি আছে ইমান ব্যতীত সেগুলোর কোনটাই আখেরাতে কার্যকর হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জ্ঞাতব্য : কোন ব্যক্তি ফেরআউনের নিকট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ইসরাঈল বংশে এমন এক ছেলের জন্ম হবে, যার হাতে তোমার রাজ্যের পতন ঘটবে। এজন্য ফেরআউন নবজাত পুত্রসন্তানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করলো। আর যেহেতু মেয়েদের দিক থেকে কোন রকম আশঙ্কা ছিল না, সুতরাং তাদের সম্পর্কে নিশ্চুপ রইলো। দ্বিতীয়তঃ এতে তার নিজস্ব একটি মতলবও ছিল যে, সে স্ত্রীলোকদেরকে দিয়ে ধাত্রী-পরিচারিকার কাজও করানো যাবে। সুতরাং এ অনুকম্পাও ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

এই ঘটনার দ্বারা হয় উল্লেখিত হত্যাকাণ্ডকে বুঝানো হয়েছে, কিংবা
বিপদে মৈত্রের পরীক্ষা অথবা অব্যাহতি দানের কথা বুঝানো হয়েছে, যা
এক অনুগৃহ ও নেয়ামত। আর নেয়ামতের ক্ষেত্রেই শুকরিয়া বা
কৃতজ্ঞতার পরীক্ষা হয়। পরবর্তী আয়াতে অব্যাহতি দানের বিস্তারিত
বিবরণ রয়েছে।

জ্ঞাতব্য : এটানা ঐ সময়ের, যখন ফেরআউন সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী-ইসরাঈলরা কারো কারো মতে মিশরে ফিরে এসেছিল-আবার কারো কারো মতে অন্য কোথাও বসবাস করছিল। তখন মুসা (আঃ)-এর খেদমতে বনী-ইসরাইলরা আরম্ভ করলো যে, আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিত। যদি আমাদের জন্য কোন শরীয়ত নির্ধারিত হয়, তবে আমাদের জীবন বিধান হিসাবে আমরা তা গ্রহণ ও বরণ করে নেবো। মুসা (আঃ)-এর আবেদনের পরিস্ফেটিকিতে আল্লাহ পাক অঙ্গীকার প্রদান করলেন যে, তুমি তুর-পর্বতে অবস্থান করে এক মাস পর্যন্ত আমার আরাধনা ও অতুল্য সাধনায় নিমগ্ন থাকার পর তোমাকে এক কিতাব দান করবো। মুসা (আঃ) তাই করলেন। ফলে তওয়ারত লাভ করলেন। কিন্তু অতিরিক্ত দশ দিন উপাসনা-আরাধনায় মগ্ন থাকার নির্দেশ দেয়ার কারণ ছিল এই যে, হযরত মুসা (আঃ) একমাস রোযা রাখার পর ইচ্ছার করে ফেলেছিলেন। আল্লাহ তাআলার কাছে রোযাদারের মুখের গন্ধ অত্যন্ত পছন্দনীয় বলে মুসা (আঃ)-কে আরো দশ দিন রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন, যাতে পুনরায় সে গন্ধের উৎপত্তি হয়। এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হলো। মুসা (আঃ) তো ওদিকে তুর-পর্বতে রইলেন, এদিকে সামেরী নামক এক ব্যক্তি সোনা-রূপা দিয়ে গোবৎসের একটি প্রতিমূর্তি তৈরী

করলো এবং তার কাছে পূর্ব থেকে সংরক্ষিত জিবরাঈল (আঃ)—এর ঘোড়ার খুরের তলার কিছু মাটি প্রতিমূর্তির ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়ায় সেটি জীবন্ত হয়ে উঠলো এবং অশিক্ষিত বনী-ইসরাঈলরা তারই পূজা করতে আরম্ভ করে দিল।

এ তওবার বর্ণনা পরবর্তী তৃতীয় আয়াতে রয়েছে। আর ‘আশার’ অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ পাকের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল, বরং এর অর্থ এই যে, মাফ করে দেয়া এমনই এক জিনিস যার প্রতি লক্ষ্য করে বনী-ইসরাঈল আল্লাহ্ পাকের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে বলে দর্শকদের মনে আশার সঞ্চার হতে পারে।

জ্ঞাতব্য : মীমাংসার বস্তু দ্বারা হয়ত তওরাতের অন্তর্ভুক্ত শরীয়তী বিধানমালাকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, শরীয়তের মাধ্যমে যাবতীয় বিশ্বাসগত ও কর্মগত মতবিরোধের মীমাংসা হয়ে যায়। অথবা মু’জ্জযা বা অলৌকিক ঘটনাবলীকে বোঝানো হয়েছে— যদ্বারা সত্য ও মিথ্যা দাবীর ফয়সালা হয়। অথবা স্বয়ং তওরাতই এর অর্থ। কেননা, এর মধ্যেও মীমাংসাকারীর জন্য প্রয়োজনীয় উভয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ রয়েছে।

জ্ঞাতব্য : এটা তাদের তওবার জন্যে প্রস্তাবিত পদ্ধতির বর্ণনা— অর্থাৎ, অপরাধিগণকে হত্যা করে দেয়া। আমাদের শরীয়তেও এমন কোন কোন অপরাধের জন্য তওবা করা সত্ত্বেও মৃত্যুদণ্ড বা শারীরিক দণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন, ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি হত্যা। সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত যিনার (ব্যভিচার) শাস্তি ‘রজ্ম’ বা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। তওবার দ্বারা এ শাস্তি থেকে অব্যাহতি নেই। বস্তুতঃ তারা এই নির্দেশ কার্যে পরিণত করেছিল বলে পরকালে দয়া ও করুণার অধিকারী হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : ঘটনা এই — যখন হযরত মুসা (আঃ) তুর-পর্বত থেকে তওরাত নিয়ে এসে বনী-ইসরাঈলের সামনে পেশ করে বললেন যে, এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত কিতাব, তখন কিছুসংখ্যক উদ্ধত লোক বললো, যদি আল্লাহ্ স্বয়ং বলে দেন যে, এ কিতাব তাঁর প্রদত্ত, তবে অবশ্যই আমাদের বিশ্বাস এসে যাবে। মুসা (আঃ) আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে এতদুদ্দেশে তাদেরকে তুর-পর্বতে যেতে বললেন। বনী-ইসরাঈলরা সন্তর জন লোককে মনোনীত করে হযরত মুসা (আঃ)—এর সঙ্গে তুর-পর্বতে পাঠাল। সেখানে পৌঁছে তারা আল্লাহ্র বাণী স্বয়ং শুনতে পেল। তখন

তারা নতুন ভান করে বললো, শুধু কথা শুনে তো আমাদের তৃপ্তি হচ্ছে না— আল্লাহ্‌ই জানেন এ কথা কে বলছে। যদি আল্লাহ্‌কে দেখতে পাই, তবে অবশ্যই মেনে নেবো। কিন্তু যেহেতু এ মরজ্জগতে আল্লাহ্‌কে দেখার ক্ষমতা কারো নেই, কাজেই এ ধৃষ্টতার জন্য তাদের উপর বজ্রপাত হলো এবং সবাই ধ্বংস হয়ে গেল। তাদের এ ধ্বংস-প্রাপ্তির বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে রয়েছে।

জ্ঞাতব্য : ‘মউত’ শব্দ দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় যে, তারা বজ্রপাতের ফলে মৃত্যুবরণ করেছিল। তাদের পুনর্জীবিত হওয়ার ঘটনা এরূপ — মুসা (আঃ) আল্লাহ্র দরবারে নিবেদন করলেন, বনী-ইসরাঈল এমনভিত্তিই আমার প্রতি কু-ধারণা পোষণ করে থাকে। এখন তারা ভাববে যে, এ লোকগুলোকে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোন উপায়ে আমিই স্বয়ং ধ্বংস করে দিয়েছি। সুতরাং আমাকে মেহেরবানীপূর্বক এ অপবাদ থেকে রক্ষা করুন। তাই আল্লাহ্ পাক দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনর্জীবিত করে দিলেন।

জ্ঞাতব্য : উভয় ঘটনাই ঘটেছিল তীহ্ প্রান্তরে। তার বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, বনী-ইসরাঈলের আদি বাসস্থান ছিল শাম দেশে। হযরত ইউসুফ (আঃ)—এর সময়ে তারা মিশরে এসে বসবাস করতে থাকে। আর ‘আমালেকা’ নামক এক জাতি শাম দেশ দখল করে নেয়। ফেরআউনের ডুবে মরার পর যখন এরা শাস্তিতে বসবাস করতে থাকে, তখন আল্লাহ্ পাক আমালেকাদের সাথে জেহাদ করে তাদের আদি বাসস্থান পুনর্দখল করতে নির্দেশ দিলেন। বনী-ইসরাঈল এতদুদ্দেশে মিশর থেকে রওয়ানা হল। শামের সীমান্তে পৌঁছার পর আমালেকাদের শৌর্য-বীর্যের কথা জেনে তারা সাহস হারিয়ে হীনবল হয়ে পড়লো এবং জেহাদ করতে পরিস্কার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলো। তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এ শাস্তি প্রদান করলেন, যাতে তারা একই প্রান্তরে চল্লিশ বছর হতবুদ্ধি হয়ে দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্যভাবে বিচরণ করতে থাকে। ঘরে ফেরা আর তাদের ভাগ্যে জোটেনি।

এ প্রান্তর কোন বিশাল ভূ-খণ্ড ছিল না। ‘তীহ্’ প্রান্তর মিশর ও শাম দেশের মধ্যবর্তী দশ মাইল এলাকা বিশিষ্ট একটি ভূ-ভাগ। বর্ণিত আছে, এরা নিজেদের বাসস্থান মিশরে পৌঁছার জন্য সারাদিন চলার পর রাতে কোন মঞ্জিলে অবস্থান করত, কিন্তু ভোরে ওঠে দেখতে পেত— যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানেই রয়ে গেছে। এভাবে চল্লিশ বছর পর্যন্ত এ প্রান্তরে ক্রৈক্যবিষম হয়ে শ্রান্ত ও ক্লান্তভাবে বিচরণ করছিল।

البقرة

১০

الْحَمْدُ

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

জ্ঞাতব্য : শাহ আবদুল কাদের (রহঃ) — এর বক্তব্যানুসারে এ ঘটনা তীহ উপত্যকায় বসবাসকালে সংঘটিত হয়েছিল। যখন বনী-ইসরাঈলের একটানা ‘মান্না ও সালওয়া’ খেতে খেতে বিষাদ এসে গেল এবং স্বাভাবিক খাবারের জন্য প্রার্থনা করল (যেমন, পরবর্তী চতুর্থ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে), তখন তাদেরকে এমন এক নগরীতে প্রবেশ করতে হুকুম দেয়া হল, যেখানে পানাহারের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহার্য দ্রব্যাদি পাওয়া যাবে। সুতরাং এ হুকুমটি সে নগরীতে প্রবেশ করা সম্পর্কিত। এখানে নগরীতে প্রবেশকালে কর্মজনিত ও বাক্যজনিত দু’টি আদবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। (‘তওবা তওবা’ বলে প্রবেশ করার মধ্যে বাক্যজনিত এবং প্রণত মস্তকে প্রবেশ করার মধ্যে কার্যজনিত আদব)। এ প্রসঙ্গে বড় জোর একথা বলা যাবে যে, ঘটনার পরের অংশটি আগে এবং আগের অংশটি পরে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে জটিলতা তখনই হত, যখন কোরআন মজীদে ঘটনাই মুখ্য উদ্দেশ্য হত। কিন্তু যখন ফলাফল বর্ণনাই মূল লক্ষ্য, তখন যদি একটি ঘটনার বিভিন্ন অংশের মধ্যে প্রত্যেক অংশের ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং ফলাফলগুলোর কোন প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবের কথা বিবেচনা করে যদি আগের অংশকে পরে এবং পরের অংশকে আগে বর্ণনা করা হয়, তবে এতে কোন দোষের কারণ নেই এবং কোন আপত্তিরও কারণ থাকতে পারে না।

অন্যান্য তফসীরকারদের মতে এ হুকুম ঐ নগরী সংক্রান্ত ছিল, যেখানে তাদেরকে জেহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তীহ উপত্যকায় তাদের অবস্থানকাল শেষ হওয়ার পর আবার সেখানে জেহাদ সংঘটিত হয়েছিল এবং সে নগরীর উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় হযরত ইউশা (يوشع) (আঃ) নবী ছিলেন। সে নগরীতে জেহাদের হুকুমটি তাঁরই মাধ্যমে এসেছিল।

প্রথম অভিমত অনুসারে ‘মান্না’ ও ‘সালওয়া’ বর্জন করে সাধারণ খাবার সংক্রান্ত বনী-ইসরাঈলের আবেদনকেও পূর্ববর্তী অপরাধগুলোর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া উচিত। তখন মর্ম দাঁড়াবে এই যে, আবেদনটি তো ষ্টুতাপূর্ণই ছিল, কিন্তু তবুও তারা যদি এ শিষ্টাচার (আদব) ও নির্দেশ পালন করে, তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। এই উভয় অভিমত অনুযায়ী এ ক্ষমা সকল বক্তার জন্য তো সাধারণভাবে প্রযোজ্য হবে। তদুপরি যারা নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে সংকর্ষাবলী সম্পন্ন করবে, তাদের জন্য এছাড়াও অতিরিক্ত পুরস্কার থাকবে।

বাক্যের শব্দগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান : এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, বনী-ইসরাঈলকে উক্ত নগরীতে **حَنَظَةَ** বলতে বলতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। তারা দুটামুই করে সে শব্দের পরিবর্তে **حَنَظَةَ** বলতে থাকে। ফলে তাদের উপর আসমানী শাস্তি অবতীর্ণ হল। এই শব্দগত পরিবর্তন এমন ছিল— যাতে শুধু শব্দই পরিবর্তিত হয়ে যায়নি, বরং অর্থও সম্পূর্ণভাবে পাল্টে গিয়েছিল। **حَنَظَةَ** অর্থ তওবা ও পাপ বর্জন করা। আর **حَنَظَةَ** অর্থ গম। এ ধরনের শব্দগত পরিবর্তন, তা কোরআনেই হোক বা হাদীসে কিংবা অন্য কোন খোদায়া বিধানে নিঃসন্দেহে এবং সর্ববাদিসম্মতভাবে হারাম। কেননা, এটা এক ধরনের **تَحْرِيف** তথা শব্দগত ও অর্থগত বিকৃতিসাধন।

এখন রইল এই যে, অর্থ ও উদ্দেশ্য পুরোপুরি রক্ষা করে নিছক শব্দগত পরিবর্তন সম্পর্কে কি হুকুম? ইমাম কুরতুবী এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, কোন কোন বাক্যাংশে বা বক্তব্যে শব্দই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে

وَأَدْخَلْنَا فِيهَا آلَ الْفِرْعَوْنَ كُلَّآ وَمِنْهَا حَيْثُ شِئْنَا
رَعَدًا وَأَدْخَلْنَا الْيَابَ سَعِيدًا وَأَوْفَوْا حَظَّهُ نَغْفِرْ لَكُمْ
خَطِيئَتَكُمْ وَسَيِّئَاتِ الْمُحْسِنِينَ ۝ كَذَّبَ الَّذِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَقْوَالَ
غَيْرِ الذِّكْرِ وَيَقِيلُ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْرًا
مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ إِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَا
فُتْلِكَ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ
عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ
اللَّهِ وَلَا تَعْتَوُوا الْأَرْضَ مَفْسِدِينَ ۝ وَإِذْ قُلْنَا لِمُوسَىٰ
لَنْ نُّصِيبَكَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا
بَصَلَتْهُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّيَاهَا وَفُؤُوهَا وَعَدَسُهَا وَ
بَصِلَهَا أَفَأَلِ اسْتَسْقَىٰ الذِّكْرِ هُوَ أَذْنِي يَأْتِي هُوَ
حَبِيرٌ إِيهَاطًا وَمَصْرَافًا لِّكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ
الذِّكَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاءَ وَيَعْصِبُ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ
يَعْبُرُ الْحَقُّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

(৫৮) আর যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে এবং এতে যেখানে খুশী খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে থাক এবং দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার সময় সেজদা করে ঢুক, আর বলতে থাক— ‘আমাদিগকে ক্ষমা করে দাও’ — তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সংকমশীলদেরকে অতিরিক্ত দানও করব। (৫৯) অতঃপর যালেমরা কথা পাল্টে দিয়েছে যা কিছু তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল তা থেকে। তারপর আমি অবতীর্ণ করেছি যালেমদের উপর আযাব আসমান থেকে নির্দেশ লঙ্ঘন করার কারণে। (৬০) আর মুসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্টির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে। অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রাব। তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। আল্লাহর দেয়া রিযিক খাও, পান কর আর দুনিয়ার বুকে দাংগা-হাংগামা করে রেড়িও না। (৬১) আর তোমরা যখন বললে, হে মুসা, আমরা একই ধরনের খাদ্য-দ্রব্যে কখনও ঐর্ষধারণ করব না। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন বস্ত্রসামগ্রী দান করেন, যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তরকারী, কাকড়ী, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি। মুসা (আঃ) বললেন, তোমরা কি এমন বস্ত্র নিতে চাও যা নিকট সে বস্ত্র পরিবর্তে যা উত্তম? তোমরা কোন নগরীতে উপনীত হও, তাহলেই পাবে যা তোমরা কামনা করছ। আর তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর রোযানলে পতিত হয়ে দূরতে থাকল। এমন হলো এ জন্য যে, তারা আল্লাহর বিধি-বিধান মানতো না এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান সীমালঙ্ঘনকারী।

এবং মর্ম ও ভাব প্রকাশের জন্য শব্দই অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। এ ধরনের উক্তি ও বাণীর ক্ষেত্রে শব্দগত পরিবর্তনও জায়েয নয়। যেমন, আযানের জন্য নির্ধারিত শব্দের স্থলে সমার্থবোধক অন্য কোন শব্দ পাঠ করা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে নামাযের মাঝে নির্দিষ্ট দোয়াসমূহ। যেমন, সানা, আস্তাহিয়াত, দোয়ায়ে-কুনূত ও রুকু-সেজদার তসবীহসমূহ। এগুলোর অর্থ সম্পূর্ণভাবে ঠিক রেখেও কোন রকম শব্দগত পরিবর্তন জায়েয নয়। তেমনভাবে সমগ্র কোরআন মজিদের শব্দাবলীরও একই হুকুম। অর্থাৎ, কোরআন তেলাওয়াতের সংগে যেসব হুকুম সম্পর্কযুক্ত, তা শুধু ঐ শব্দাবলীতেই তেলাওয়াত করতে হবে, যাতে কোরআন নাখিল হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি এসব শব্দাবলীর অনুবাদ অন্য এমন সব শব্দের দ্বারা করে পাঠ করতে থাকে, যাতে অর্থ পুরোপুরিই ঠিক থাকে, তবে একে শরীয়তের পরিভাষায় কোরআন তেলাওয়াত বলা যাবে না। কোরআন পাঠ করার জন্য যে সওয়াব নির্দিষ্ট রয়েছে, তাও লাভ করতে পারবে না। কারণ, কোরআন শুধু অর্থের নাম নয় বরং অর্থের সাথে সাথে যে শব্দাবলীতে তা নাখিল হয়েছে, তার সমষ্টির নামই কোরআন। আলোচ্য আয়াতের ভাষ্য দৃশ্যতঃ বোঝা যায় যে, তাদেরকে তওবার উদ্দেশ্যে যে শব্দটি ব্যতলে দেয়া হয়েছিল, তার উচ্চারণও করণীয় ছিল; সেগুলোতে পরিবর্তন সাধন ছিল পাপ। আর তারা যে পরিবর্তন করেছিল তা ছিল শব্দের সাথে সাথে অর্থেরও পরিপন্থী। কাজেই তারা আসমানী আযাবের সম্মুখীন হয়েছিল।

কিন্তু যে উক্তি ও ব্যাক্যাংশে অর্থই মূল উদ্দেশ্য শব্দ নয়, যদি সেগুলোতে শব্দগত এমন পরিবর্তন করা হয় যাতে অর্থের ক্ষেত্রে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দেসীন ও ফুকাহার মতে এ পরিবর্তন জায়েয। ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও ইমাম আযম (রাঃ)-থেকে ইমাম কুবতুবী উদ্ধৃত করেন যে, হাদীসের অর্থভিত্তিক বর্ণনা জায়েয, কিন্তু শর্ত হচ্ছে এই যে, বর্ণনাকারীকে আরবী ভাষায় পারদর্শী হতে হবে এবং হাদীস বর্ণনার স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত থাকতে হবে—যাতে তার ভুলের কারণে অর্থের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য সৃষ্টি না হয়।

উল্লেখিত ৬০ তম আয়াতে বলা হয়েছে, হযরত মুসা (আঃ) নিজ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনে পানির জন্য দোয়া করলে আল্লাহ পাক পানির ব্যবস্থা করে দিলেন। পাথরের উপর লাঠির আঘাতের সাথে সাথে প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়ে পড়ল। এতে বোঝা গেল যে, এস্তেসকা (পানির জন্য প্রার্থনা)—এর মূল হল দোয়া। মুসা (আঃ)—এর শরীয়তেও বিষয়টিকে শুধু দোয়াতেই সীমিত রাখা হয়েছে। যেমন, ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন যে, এস্তেসকার মূল হলো পানির জন্য দোয়া করা। এ দোয়া কোন কোন সময়ে এস্তেসকার নামাযের আকারেও করা হয়েছে। যেমন, এস্তেসকার নামাযের উদ্দেশ্যে হযুর (সাঃ)—এর ঈদগাহে তশরীফ নেয়া এবং সেখানে নামায, খুঁবা ও দোয়া করার কথা বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। আবার কখনও নামায বাদ দিয়ে শুধু বাহ্যিক অর্থে দোয়া করেই ক্ষান্ত করেছেন। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযুর (সাঃ) জুমার খুঁবায় পানির জন্য দোয়া করেন— ফলে আল্লাহ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

একথা সর্ববাদিসম্মত যে, এস্তেসকা নামাযের আকারে হোক বা দোয়া রূপে হোক তা ক্রীয়াশীল ও গুরুত্ববহ হওয়ার জন্য পাপ থেকে তওবা, নিজের দীনতা-হীনতা ও দাসত্বসুলভ আচরণের অভিযুক্তি একান্ত আবশ্যিক। পাপে অটল এবং আল্লাহর অবধ্যতায় অনড় থেকে দোয়া করলে তা ক্রীয়াশীল হবে বলে আশা করার অধিকার কারো নেই।

জ্ঞাতব্য : ৬১ তম আয়াতে বর্ণিত ঘটনাও তীহ উপত্যকাসংশ্লিষ্ট। মান্না ও সালওয়ার প্রতি বীতশুদ্ধ হয়েই তারা ওসব সঙ্কী ও শস্যের জন্য আবেদন করল। এ প্রান্তরের সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি শহর ছিল। সেখানে গিয়ে চাষাবাদ করে উৎপন্ন ফসলাদি ভোনের নির্দেশ দেয়া হলো।

তাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে এটাও একটা যে, কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য ইহুদীদের থেকে রাজ্য ছিনিয়ে নেয়া হলো। অবশ্য কেয়ামতের অব্যবহিত পূর্বে, সর্বমোট চল্লিশ দিনের জন্য নিছক লুটেরা দলের ন্যায় অনিয়মিত ও আইন-শৃংখলা বিবর্জিত, ইহুদীদের কিস্তি ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। একে কোন বুদ্ধিমান ও বিবেকবানই রাজ্য বলেত পারবে না। আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আঃ)—এর মাধ্যমে পূর্বেই তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, যদি নির্দেশ অমান্য কর, তবে চিরকাল তোমরা অন্য জাতির দ্বারা শাসিত হতে থাকবে। যেমন—সূরা আরাফে বলা হয়েছে—

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ الَّذِي يُؤْتِيكَ لِيَعْلَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَنْ تَبُوءُ
سُورَةُ الْعَادِيَّاتِ

‘এবং সে সময়টি স্মরণ করুন, যখন আপনার পালনকর্তা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় তিনি ইহুদীদের উপর কেয়ামত পর্যন্ত এমন শাসক প্রেরণ (নিয়োগ) করতে থাকবেন, যারা তাদের প্রতি কঠিন শাস্তি পৌছাতে থাকবে।’ বস্তুতঃ বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের মর্যাদাও আমেরিকা ও বটেনের গোলাম বৈ আর কিছু নয়।

তাছাড়াও বহু নবী বিভিন্ন সময়ে ইহুদীদের হাতে নিহত নিগৃহিত হয়েছেন— যা নিতান্ত অন্যায় বলে তারা নিজেরাও উপলব্ধি করত, কিন্তু প্রতিহিংসা ও হঠকারিতা তাদেরকে অন্ধ করে রেখেছিল।

ইহুদীদের চিরস্থায়ী লাঞ্ছনার অর্থ, বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের ফলে উদ্ধৃত সন্দেহ ও তার উত্তর : উল্লেখিত আয়াতসমূহে ইহুদীদের শাস্তি, ইহকালে চিরস্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এবং ইহকাল ও পরকালে খোদার গণ্য ও রোষের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট তফসীরকারগণ, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবয়ীনের বর্ণনানুসারে ওদের স্থায়ী লাঞ্ছনা-গঞ্জনার প্রকৃত অর্থ, কোরআনের প্রখ্যাত ভাষ্যকার ইবনে কাসীরের ভাষায় : “তারা যত ধন-সম্পদের অধিকারীই হোক না কেন, বিশৃ-সম্প্রদায়ের মাঝে তুচ্ছ ও নগণ্য বলে বিবেচিত হবে। যার সম্পর্কে আসবে সেই তাদেরকে অপমানিত করবে এবং তাদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে জড়িয়ে রাখবে।”

বিশিষ্ট তফসীরকার ইমাম হাফসহকের ভাষায় এ লাঞ্ছনা-অবমাননার অর্থ : ইহুদীরা সর্বদা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে।

একই মর্মে সূরা ‘আলে-ইমরানের’ এক আয়াতে রয়েছে :

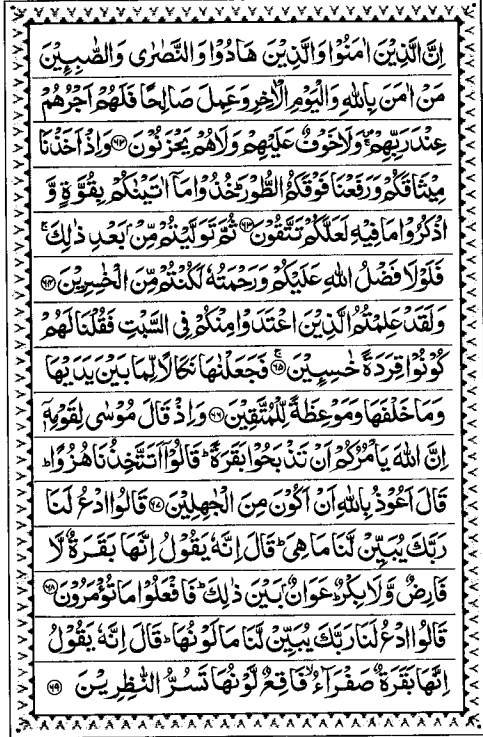
وَرَبِّكَ عَلَيْهِمْ ذِلَّةٌ أَلَيْنَ مَا تُفْتَمِرُونَ
وَكَيْفَ يُؤْتِي النَّاسَ

“আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যম ব্যতীত, তারা যেখানে যাবে সেখানেই তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননা পুষ্পীভূত হয়ে থাকবে।” আল্লাহ প্রদত্ত ও মানব প্রদত্ত মাধ্যমের অর্থ এই যে, যাদেরকে আল্লাহ পাক নিজের বিধান অনুসারে আশ্রয় ও অভয় দিয়েছেন। যেমন—অগ্রাণ্ড বয়স্ক বালকগণ বা রমণীকুল বা এমন সাধক ও উপাসক যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না, তারা নিরাপদে থাকবে। আর মানবপ্রদত্ত

البقرة

۱۱

الْحَمْدُ



(৬২) নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাসারা ও সাবঈঈন, (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সংকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। আর তাদের কোনই ভয়-ভীতি নেই, তারা দুঃখিতও হবে না। (৬৩) আয় আমি যখন তোমাদের কাছ থেকে অসীকার নিয়েছিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের মাথার উপর তুলে ধরেছিলাম এই বলে যে, তোমাগিকে যে কি তাব দেয়া হয়েছে তাকে ধর সুদৃঢ়ভাবে এবং এতে যা কিছু রয়েছে তা মনে রেখো যাতে তোমরা ভয় কর। (৬৪) তারপরেও তোমরা তা থেকে ফিরে গেছ। কাজেই আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী যদি তোমাদের উপর না থাকত, তবে অবশ্যই তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে। (৬৫) তোমরা তাদেরকে ভালরূপে জেনেছ, যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করেছিল। আমি বলেছিলাম : তোমরা লালিত্ব বানর হয়ে যাও। (৬৬) অতঃপর আমি এ ঘটনাকে তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ্‌তীকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপাদান করে দিয়েছি। (৬৭) যখন মুসা (আঃ) শীঘ্র সম্প্রদায়কে বললেন : আল্লাহ্ তোমাদের একটি গুরু জবাই করতে বলেছেন। তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? মুসা (আঃ) বললেন, মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (৬৮) তারা বলল, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন সেটির রূপ বিশ্লেষণ করা হয়। মুসা (আঃ) বললেন, তিনি বলছেন, সেটা হবে একটা গাভী, যা বৃদ্ধ নয় এবং কুমারীও নয়— বার্থক্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সের। এখন আদিত কাজ করে ফেল। (৬৯) তারা বলল, তোমার পালনকর্তার কাছে আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর যে, তার রং কিরূপ হবে? মুসা (আঃ) বললেন, তিনি বলেছেন যে, গাঢ় পীতবর্ণের গাভী— যা দর্শকদের চমৎকৃত করবে।

মাধ্যম অর্থ শাস্তিচুক্তি। যার একটি রূপ এও হতে পারে যে, মুসলমানদের সাথে শাস্তিচুক্তির মাধ্যমে বা অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবে জিযিয়া কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে তাদের দেশে বসবাসের সুযোগ লাভ করবে। কিন্তু কোরআনের আয়াতে **لَا يَزِيدُ الْإِسْلَامَ وَلَا يَنْقُصُ** বলা হয়েছে **لَا يَزِيدُ الْإِسْلَامَ وَلَا يَنْقُصُ** বলা হয়নি। সুতরাং এমন হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, অন্যান্য অমুসলিমদের সাথে শাস্তিচুক্তির মাধ্যমে তাদের আশ্রয়ধীন হয়ে সাময়িক শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

সারকথা, ইহুদীরা উপরোক্ত দু' অবস্থা ব্যতীত সর্বত্র ও সর্বদাই লালিত্ব ও অপমানিত হবে। (১) আল্লাহ প্রদত্ত ও অনুমোদিত আশ্রয়ের মাধ্যমে, যার ফলে তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি, নারী প্রভৃতি এই লালত্বনা ও অবমাননা থেকে অব্যাহতি পাবে। কিংবা (২) শাস্তিচুক্তির মাধ্যমে নিজেদেরকে এ অবমাননা থেকে মুক্ত রাখতে পারবে। এ চুক্তি মুসলমানদের সাথেও হতে পারে। কিংবা অন্যান্য অমুসলিম জাতির সাথেও হতে পারে।

এমনিভাবে সূরা 'আলে-ইমরানের' আয়াত দ্বারা সূরা-বাক্বারার আয়াতের বিশদ বিশ্লেষণ হয়ে যায়। অধুনা ফিলিস্তিনে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে সন্দেহের অবতারণা হয়েছে, এ দ্বারা তাও দূরীভূত হয়ে যায়। তা এই যে, কোরআনের আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, ইহুদীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব হবে না। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, ফিলিস্তিনে তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উত্তর সুস্পষ্ট— কেননা, ফিলিস্তিনে ইহুদীদের বর্তমান রাষ্ট্রের গুঢ়তম সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত, তারা ভালভাবেই জানেন যে, এ রাষ্ট্র প্রকৃত প্রস্তাবে ইসরাঈলের নয়, বরং আমেরিকা ও বৃটেনের একটি ষাঁট ছাড়া অন্য কিছু নয়। এ রাষ্ট্র নিজস্ব সম্পদ ও শক্তির উপর নির্ভর করে একমাসও টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্যের ব্রিটান শক্তি ইসলামী বিশ্বকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তাদের মাঝখানে ইসরাঈল নাম দিয়ে একটি সামরিক ষাঁট প্রতিষ্ঠা করেছে। এ রাষ্ট্র আমেরিকা-ইউরোপীয়দের দৃষ্টিতে একটা অনুগত আঙ্গাবহ ষড়যন্ত্র কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোন গুরুত্ব বহন করে না। এ যেন কোরআনের বাণী **وَيَحْيِيَنَّ الْوَيْلَاتِ**—এরই বাস্তব রূপ। পাশ্চাত্য শক্তিবলয়, বিশেষ করে আমেরিকার সাথে নানা ধরনের প্রকাশ্য ও গোপন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের পক্ষপুষ্ট ও আশ্রিত হয়ে নিছক ক্রীড়নক রূপে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তাও অত্যন্ত লালত্বনা ও অবমাননার ভেতর দিয়ে। সুতরাং বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দরুন কোরআনের কোন আয়াত সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে না।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

জ্ঞাতব্য : নীতি বা আইনের মর্ম সুস্পষ্ট। আল্লাহ পাক বলেছেন যে, আমার দরবারে কোন ব্যক্তির বিশেষ মর্যাদা নেই। যে ব্যক্তি বিশৃঙ্খল ও কর্মে পুরোপুরি আনুগত্য স্বীকার করবে, সে পূর্বে যেমনই থাকুক না কেন, আমার নিকট গ্রহণযোগ্য এবং তার আমল পছন্দনীয় ও প্রশংসনীয়। আর এটাও সুস্পষ্ট যে, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর 'পূর্ণ আনুগত্য' মুহাম্মদ (সাঃ)—এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে মুসলমান হওয়াতেই সীমাবদ্ধ। যার অর্থ এই যে, যে মুসলমান হবে, সে-ই পরকালে নাজাতের অধিকারী হবে। এখানে পূর্ববর্তী ধারণার উত্তর হয়ে গেল। অর্থাৎ, এতসব অনাচার ও গর্হিত আচরণের পরেও কেউ যদি মুসলমান হয়ে যায়, তবে আমি সব মাফ করে দেব।

জ্ঞাতব্য : যখন হযরত মুসা (আঃ)—কে তুর পর্বতে তওরাত প্রদান করা হল, তখন তিনি ফিরে এসে তা বনী-ইসরাঈলকে দেখাতে ও শোনাতে আরম্ভ করলেন। এতে হুকুমগুলো কিছুটা কঠোর ছিল— কিন্তু তাদের অবস্থানুযায়ী ছিল। এ সম্পর্কে প্রথম তারা একথাই বলেছিল যে, যখন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলে দেবেন যে, ‘এটা আমার কিতাব’ তখনই আমরা মেনে নেব। (যে বর্ণনা উপরে চলে গেছে) মোটকথা, যে সন্তর জন লোক মুসা (আঃ)—এর সাথে গিয়েছিল, তারাও ফিরে এসে সাক্ষী দিল। কিন্তু তাদের সাক্ষ্যের সাথে এ এখাটিও নিজেদের পক্ষ হতে সংযুক্ত করে দিল যে, আল্লাহ তাআলা সর্বশেষে একথাও বলে দিয়েছেন, ‘তোমরা যতটুকু পার আমল কর, আর যা না পার, তা আমি ক্ষমা করে দেব।’

তখন তা কতকটা তাদের স্বভাবগত দুরন্তপনা ও হঠকারিতা, হুকুমগুলোর কিছুটা কঠোরতা এবং কতকটা এ সংযোগের ফলে তাদের এক সুবর্ণ সুযোগ হয়ে গেল। তারা পরিষ্কারভাবে বলে দিল, আমাদের দ্বারা এ গ্রন্থের উপর আমল করা সম্ভব হবে না। ফলে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে হুকুম করলেন, ‘তুর পর্বতের একটি অংশ তুলে নিয়ে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে দাও এবং বল, হয় কিতাব মেনে নাও, নইলে এক্ষুণি মাথার উপর পড়ল। অবশেষে নিরুপায় হয়ে মেনে নিতে হল।

জ্ঞাতব্য : আল্লাহর সাধারণ রহমত পৃথিবীতে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সবার জন্যই ব্যাপক। তারই প্রভাব হল পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শারীরিক সুস্থতা। তবে বিশেষ রহমতের বিকাশ ঘটবে আখেরাতে, যার ফলে মুক্তি ও আল্লাহর নৈকট্যলাভ সম্ভব হবে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে অয়াযের ৬৪ শেযাংশের লক্ষ্য হল সে সমস্ত ইহুদী, যারা মহানবী (সাঃ)—এর সময়ে উপস্থিত ছিল। হযূরে আকরাম (সাঃ)—এর উপর ঈমান না আনাও যেহেতু উল্লেখিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু তাদেরকে পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীদের আওতাভুক্ত করে উদাহরণসরূপ বলা হয়েছে যে, ‘এতদসত্ত্বেও আমি দুনিয়াতে তোমাদের উপর যেমন কোন আযাব অবতীর্ণ করিনি, যেমনটি পূর্বকালে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীদের উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকত। এটা একান্তই আল্লাহর রহমত।

আর হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে আযাব অবতীর্ণ না হওয়াটা যেহেতু মহানবী (সাঃ)—এরই বরকত, কাজেই কোন কোন তফসীরকার মহানবী (সাঃ)—এর আবির্ভাবকেই আল্লাহর রহমত ও করুণা বলে বিশ্লেষণ করেছেন।

এ বিষয়টির সমর্থনকল্পে বিগত বেঈমানদের একটি ঘটনা পরবর্তী আয়াতে বিবৃত হচ্ছে :

৬৫ আয়াতে বর্ণিত এ ঘটনাটিও হযরত দাউদ (আঃ)—এর আমলেই সংঘটিত হয়। বনী-ইসরাঈলের জন্যে শনিবার ছিল পবিত্র এবং সাপ্তাহিক উপাসনার জন্যে নির্ধারিত দিন। এ দিন মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। তারা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ছিল বলে মৎস্য শিকার ছিল তাদের প্রিয় কাজ।

ফলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা মৎস্য শিকার করে। এতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ‘মৎস্য’ তথা বিকৃতি বা রূপান্তরের শাস্তি নেমে আসে। তিন দিন পর এদের সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ ঘটনার দর্শক ও শ্রোতা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। অবাধ্য শ্রেণী ও অনুগত শ্রেণী। অবাধ্যদের জন্যে এ ঘটনাটি ছিল অবাধ্যতা থেকে তওবা করার উপকরণ। এ কারণে একে **نكاح** ‘শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত’ বলা হয়েছে। অপরদিকে অনুগতদের জন্যে এটা ছিল আনুগত্যে অটল থাকার কারণ। এজন্যে একে **موعظه** ‘উপদেশপ্রদ’ ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আকৃতি রূপান্তরের ঘটনা : তফসীরে কুরত্ববীতে বলা হয়েছে, ইহুদীরা প্রথম প্রথম কলা-কৌশলের অন্তরালে এবং পরে সাধারণ পদ্ধতিতে ব্যাপকভাবে মৎস্য শিকার করতে থাকে। এতে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল ছিল সং ও বিজ্ঞ লোকদের। তারা এ অপকর্মে বাধা দিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ বিরত হল না। অবশেষে তারা এদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হয়ে গেলেন। এমনকি বাসস্থানও দুই ভাগে ভাগ করে নিলেন। একভাগে অবাধ্যরা বসবাস করত আর অপর ভাগে সং ও বিজ্ঞ জনেরা বাস করতেন। একদিন তারা অবাধ্যদের বসতিতে অস্বাভাবিক নীরবতা লক্ষ্য করলেন। অতঃপর সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, সবাই বিকৃত হয়ে বানরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। হযরত কাতাদাহ্ (রাঃ) বলেন, তাদের যুবকরা বানরে এবং বৃদ্ধরা শূকরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। রূপান্তরিত বানররা নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনকে চিনত এবং তাদের কাছে এসে অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করত।

রূপান্তরিত সম্প্রদায়ের বিলুপ্তি : সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, কয়েকজন সাহাবী একবার রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন : হযূর! আমাদের যুগের বানর ও শূকরগুলো কি সেই রূপান্তরিত ইহুদী সম্প্রদায়? তিনি বললেন, আল্লাহ তা’আলা যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর আকৃতি রূপান্তরের আযাব নাযিল করেন, তখন তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তিনি আরও বললেন, বানর ও শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। এদের সাথে রূপান্তরিত বানর ও শূকরদের কোন সম্পর্ক নেই।

জ্ঞাতব্য : ঘটনার বিবরণ এই যে, বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে একটি হত্যাগণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। মিশকাতের টীকা গ্রন্থ মিরকাতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল বিবাহজনিত। জনৈক ব্যক্তি নিহত ব্যক্তির কন্যার পাণিগ্রহণ করার প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হয় এবং এই পাণিপ্রার্থী কন্যার পিতাকে হত্যা করে গা ঢাকা দেয়। ফলে হত্যাকারী কে? তা জানা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

মাআলী (রহঃ) কাল্বী (রাঃ)—এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, তখন পবিত্র তওরাত হত্যা সম্পর্কে কোন আইন বিদ্যমান ছিল না। এতে বোঝা যায়, ঘটনাটি তওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বকাল।

البقرة

১২

الْحَقُّ

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْهَا
وَإِنَّ شَاءَ اللَّهُ لَمُتَدُونٌ ۖ قَالَ إِنِّي يَقُولُ إِنَّمَا بَقَرَةٌ لَا
ذَلُولٌ بِثَمَرٍ الْأَرْضُ وَالْأَصْحَابُ لَا شَيْءَ لَهَا بِهَا
قَالُوا أَلَمْ يَجْعَلْ يَالْحَقُّ قَدْ يَجْعَلُهَا وَمَا كَادُوا يَفْقَهُونَ ۖ وَ
إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مِمَّا تُكْتُمُونَ
تَكْتُمُونَ ۖ فَقَالُوا ضَرَبُوهُ بِمِصْرَاهَا لَئِنْ لَمْ يَنْجِ اللَّهُ أَمْوَالَنَا
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۖ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ فَفِي كَالْجِبَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَابَةِ
لَمَّا يَنْفَعُكُمْ مِنْهَا الْأَنْفُسُ ۖ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْفُقُ فَيُخْرِجُكُمْ مِنْهَا
الْمَاءُ ۖ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهَيِّطُ مِنْ حَشِيَّةِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ۖ فَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا الْكُفْرَ وَقَدْ كَانَ
فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يَلْمِزُوكَ مِنْ بَعْدِ
مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۖ وَإِذَا قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا
أَمَّا إِذَا هَلَّاخَ بَعْضُهم إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُوكُمْ رِيسًا
فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِيسًا جُئْتُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ

(৭০) তারা বলল, আপনি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন— তিনি বলে দিন যে, সেটা কিরূপ? কেননা, গরু আমাদের কাছে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়। ইনশাআল্লাহ্ এবার আমরা অবশ্যই পঞ্চাপ্ত হব। মুসা (আঃ) বললেন, তিনি বলেন যে, এ গাভী ভূকর্ষণ ও জল সোচনের প্রমে অভ্যস্ত নয়— হবে নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পুত। (৭১) তারা বলল, এবার সঠিক তথ্য এনেছ। অতঃপর তারা সেটা জবাই করল, অথচ জবাই করবে বলে মনে হচ্ছিল না। (৭২) যখন তোমরা একজনকে হত্যা করে পরে সে সম্পর্কে একে অপরকে অভিযুক্ত করেছিলে। যা তোমরা গোপন করছিলে, তা প্রকাশ করে দেয়া ছিল আল্লাহর অভিপ্রায়। (৭৩) অতঃপর আমি বললাম : গরুর একটি ঋণ দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন— যাতে তোমরা চিন্তা কর। (৭৪) অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমনও আছে যা থেকে রক্তা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তা থেকে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে, যা আল্লাহর ভয়ে ঋণে পড়তে থাকে। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। (৭৫) হে মুসলমানগণ, তোমারা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত; অতঃপর বুকে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল। (৭৬) যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে : আমরা মুসলমান হয়েছি। আর যখন পরস্পরের সাথে নিভৃত অবস্থান করে, তখন বলেঃ পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যা প্রকাশ করেছেন, তা কি তাদের কাছে বলে দিচ্ছ? তাহলে যে তারা এ নিয়ে পালনকর্তার সামনে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তোমরা কি তা উপলব্ধি কর না?

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয় :

হাদীসে বর্ণিত আছে, বনী-ইসরাঈল কোন বাদনুবাদে প্রবৃত্ত না হলে এতসব শর্তও আরোপিত হত না, বরং যে কোন গরু জবাই করলেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারত। বস্তুতঃ মৃতদেহে গরুর গোশতের টুকরো স্পর্শ করাতেই সে জীবিত হয়ে যায় এবং হত্যাকারীর নাম বলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু বরণ করে।

এক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, মুসা (আঃ) ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, নিহত ব্যক্তি সত্য বলবে। নতুবা শরীয়তসম্মত সাক্ষী ছাড়া নিহত ব্যক্তির জবানবন্দীই হত্যা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হতে পারে না।

৭৪ আয়াতে পাথরের তিনটি ক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে : (১) পাথর থেকে বেশী পানি প্রসারণ, (২) কম পানির নিঃসরণ। এ দুটি প্রভাব সবারই জানা। (৩) আল্লাহর ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়া। এ তৃতীয় ক্রিয়াটি কারও কারও অজানা থাকতে পারে। কারণ, পাথরের কোনরূপ জ্ঞান ও অনুভূতি নেই। কিন্তু জানা উচিত যে, ভয় করার জন্যে জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। জন্তু-জানোয়ারের জ্ঞান নেই, কিন্তু আমরা তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি প্রত্যক্ষ করি। তবে চেতনার প্রয়োজন অবশ্য আছে। জড় পদার্থের মধ্যে এতটুক চেতনাও নেই বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না। কারণ, চেতনা প্রাণের উপর নির্ভরশীল। খুব সম্ভব জড় পদার্থের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম প্রাণ আছে যা আমরা অনুভব করতে পারি না। উদাহরণতঃ বহু পণ্ডিত মস্তিষ্কের চেতনশক্তি অনুভব করতে পারেন না। তারা একমাত্র যুক্তির ভিত্তিতেই এর প্রবক্তা। সুতরাং ধারণাপ্রসূত প্রমাণাদির চাইতে কোরআনী আয়াতের যৌক্তিকতা কোন অংশেই কম নয়।

এছাড়া আমরা এরূপ দাবীও করি না যে, পাথর সব সময় ভয়ের দরুনই নীচে গড়িয়ে পড়ে। কারণ, আল্লাহ তাআলা ‘কতক পাথর’ বলেছেন। সুতরাং নীচে গড়িয়ে পড়ার অন্য আরও বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তন্মধ্যে একটি হল আল্লাহর ভয়।

এখানে তিন রকমের পাথরের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সাবলীল ভঙ্গিতে এদের শ্রেণীবিন্যাস ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। কতক পাথরের প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা এত প্রবল যে, তা থেকে নদী-নালা প্রবাহিত হয়ে যায় এবং তদুপা সৃষ্ট জীবের উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর এমন নয় যে, সৃষ্ট জীবের দুঃখ-দুর্দশায় অশ্রুসজ্জল হবে। কতক পাথরের মধ্যে প্রভাবান্বিত হওয়ার ক্ষমতা কম। ফলে সেগুলোর দ্বারা উপকারও কম হয়। এ ধরনের পাথর প্রথম ধরনের পাথরের তুলনায় কম নরম হয়। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর এ দ্বিতীয় ধরনের পাথর অপেক্ষাও বেশী শক্ত।

কতক পাথরের মধ্যে উপরোক্তরূপ প্রভাব না থাকলেও এতটুকু প্রভাব অবশ্যই আছে যে, খোদার ভয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ে। এ পাথর উপরোক্ত দুই প্রকার পাথরের তুলনায় অধিক দুর্বল। কিন্তু ইহুদীদের অন্তর এ দুর্বলতম প্রভাব থেকেও মুক্ত।

জ্ঞাতব্য : উদ্দেশ্য এই যে, যারা এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ ও স্বার্থান্বেষী, তারা অন্যের সদুপদেশে কখনও মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে না।

এখানে ‘আল্লাহর বাণী’ অর্থ তওরাত। ‘শ্রবণ করা’ অর্থ পয়গম্বরের মাধ্যমে শ্রবণ করা। ‘পরিবর্তন করা’ অর্থাৎ, কোন কোন বাক্য অথবা ব্যাখ্যা অথবা উভয়টিকে বিকৃত করে ফেলা।

البقرة

১৩

الْبَقَرَةِ



(৭৭) তারা কি এতটুকুও জানে না যে, আল্লাহ্ সেশব বিষয়ও পরিজ্ঞাত যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে? (৭৮) তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর। তারা মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আল্লাহ্ গ্রহণের কিছুই জানে না। তাদের কাছে কম্পনা ছাড়া কিছুই নেই। (৭৯) অতএব তাদের জন্যে আফসোস। যারা নিজ হাতে গ্রহ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহ্ পক্ষ থেকে অবতীর্ণ—যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্যে এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে। (৮০) তারা বলে : আগুন আমাদেরকে কখনও স্পর্শ করবে না; কিন্তু গণাগণতি কয়েকদিন। বলে দিন : তোমরা কি আল্লাহ্ কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে, আল্লাহ্ কখনও তার খেলাফ করেন না — না তোমরা যা জান না, তা আল্লাহ্ সাথে জুড়ে দিচ্ছ। (৮১) হাঁ, যে ব্যক্তি পাপ অর্জন করেছে এবং সে পাপ তাকে পরিবেষ্টিত করে নিয়েছে, তারাই দোষের অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। (৮২) পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সংকল্প করেছে, তারাই জন্মান্তরে অধিবাসী। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। (৮৩) যখন আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্যবহার করবে, মানুষকে সং কথাবার্তা বলবে, নামায প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে, তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।

অথবা ‘আল্লাহ্ বানী’ অর্থাৎ, ঐ বানী, যা মুসা (আঃ)-এর সত্যায়নের উদ্দেশ্যে তাঁর সাথে গমনকারী সত্তর জন ইহুদী তুর পর্বতে শুনেছিল। ‘শ্রবণ’ অর্থ মাধ্যমবিহীনভাবে সরাসরি শ্রবণ। ‘পরিবর্তন’ অর্থ স্বগোত্রের কাছে প্রসঙ্গক্রমে এরূপ বর্ণনা করা যে, আল্লাহ্ তাআলা উপসংহারে বলে দিয়েছেন : তোমরা যেসব নির্দেশ পালন করতে না পার, তা মাফ।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আমলে যেসব ইহুদী ছিল, তাদের দ্বারা উল্লেখিত কোন কুর্কম সংঘটিত হয়নি সত্য, কিন্তু পূর্ববর্তীদের এসব কুর্কমকে তারা অপছন্দ ও ঘৃণা করত না। এ কারণে তারাও কার্যতঃ পূর্ববর্তীদেরই মত।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জনগণের সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখে ভুল বিষয় পরিবেশন করলে তারা কিছু নগদ অর্থ-কড়িও পেয়ে যেত এবং মান-সম্মানও বজায় থাকত। এ কারণে তারা তওরাতের শাস্তিক ও মর্মগত উভয় প্রকার পরিবর্তন করারই চেষ্টা করত। উল্লেখিত আয়াতে এ বিষয়ের উপরই কঠোর হুসিয়ায়ী উচ্চারিত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : তফসীরবিদগণ ইহুদীদের এ বক্তব্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি হল এই যে, ঈমানদার ব্যক্তি গোনাহ্গার হলে গোনাহ্ পরিমাণে দোষখ ভোগ করবে। কিন্তু ঈমানের ফলস্বরূপ চিরকাল দোষখে থাকবে না। কিছুকাল পরই তা থেকে মুক্তি পাবে।

অতএব, ইহুদীদের দাবীর সারমর্ম এই যে, তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত মুসা (আঃ) প্রচারিত ধর্ম রহিত হয়নি। কাজেই তারা ঈমানদার ; ঈসা (আঃ) ও হুম্মের আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত অঙ্গীকার করার পরও তারা কাফের নয়। সুতরাং যদি কোন পাপের কারণে তারা দোষখে চলেও যায়, কিন্তু কিছু দিন পরই মুক্তি পাবে। বলাবাহুল্য, এ দাবীটি একটি অসত্যের উপর অসত্যের ভিত্তি বৈ নয়। কেননা, মুসা (আঃ) কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম চিরকালের জন্যে—এরূপ দাবীই অসত্য। অতএব ঈসা (আঃ) ও হুম্মের আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তে অঙ্গীকার করার কারণে ইহুদীরা কাফের। কাফেরও কিছুদিন পর দোষখ থেকে মুক্তি পাবে, এমন কথা কোন আসমানী গ্রন্থে নেই—যা আলোচ্য আয়াতে অঙ্গীকার শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, ইহুদীদের দাবীটি যুক্তিহীন, বরং যুক্তিবিরুদ্ধ।

গোনাহ্ দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া শুধু কাফেরদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে। কারণ, কুফরের কারণে কোন সংকর্মই গ্রহণযোগ্য থাকে না। কুফরের পূর্বে কিছু সংকর্ম করে থাকলেও তা নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণেই কাফেরদের মধ্যে আপাদমস্তক গোনাহ্ ছাড়া আর কিছুই কম্পনা করা যায় না। ঈমানদারদের অবস্থা কিন্তু তা নয়। প্রথমতঃ তাদের ঈমানই একটি বিরাট সংকর্ম। দ্বিতীয়তঃ আন্যান্য নেক আমল তাদের আমলনামায় লেখা হয়। সে জন্য ঈমানদার সংকর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। সুতরাং উল্লেখিত বেটনী তাদের বেলায় অবাস্তর।

জ্ঞাতব্য : ‘অঙ্গ কয়েকজন’ অর্থ, তারাই যারা তওরাতের পুরোপুরি অনুসরণ করত, তওরাত রহিত হওয়ার পূর্বে তারা মুসা (আঃ) প্রবর্তিত শরীয়তের অনুসারী ছিল এবং তওরাত রহিত হওয়ার পর ইসলামী শরীয়তের অনুসারী হয়ে যায়। আয়াত দৃষ্টে বোঝা যায় যে, একত্ববাদে ঈমান এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন এতীম বালক-বালিকা ও দীন-দরিদ্রদের সেবায়ত্ত্ব করা, মানুষের সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বলা,

وَاذْأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَاسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ
 أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَوْنَ ۝
 ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءُ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ
 مَنْ دِيَارِهِمْ تَنْظَهُرُونَ عَلَيْهِمْ بِآلَاتِهِمُ وَالْعَذَابِ وَإِنْ
 يَأْتُواكُمْ أَسْرَى فَقُتِلَ هُمْ وَهُوَ مُؤْمَرٌ عَلَيْهِمْ أَنْ رَاجِعَهُمْ
 أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ
 مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْآخِزِينَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
 الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
 تَعْمَلُونَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
 فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ وَ
 لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
 وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ
 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْهَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ
 فَفَرِّقُوا كَذِبُكُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۝ وَقَالُوا مَلَاؤْنَا عُلُفًا
 بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَفَعَلْنَا مَا يُدْرِكُونَ ۝

(৮৪) যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অস্বীকার নিলাম যে, তোমরা পরস্পর খুনখুনি করবে না এবং নিজদিগকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে না, তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে। (৮৫) অতঃপর তোমরাই পরস্পর খুনখুনি করছ এবং তোমাদেরই একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিস্কার করছ। তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে অক্রমণ করছ। আর যদি তারাও কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিস্কার করাও তোমাদের জন্যে অবৈধ। তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দশে বিশ্বাস কর এবং কিয়দশে অবিশ্বাস কর। যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। কিয়মতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-শ্বর নন। (৮৬) এরাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব এদের শাস্তি লম্বা হবে না এবং এরা সাহায্যও পাবে না। (৮৭) অবশ্যই আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি। এবং তার পরে পরায়ক্রমে রসূল পাঠিয়েছি। আমি মরিয়ম তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট আঁজিয়া দান করছি এবং পবিত্র রূহের মাধ্যমে তাকে শক্তিদান করেছি। অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে, যা তোমাদের মনে ভাল লাগেনি, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। শেষ পর্যন্ত তোমরা একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছ এবং একদলকে হত্যা করেছ। (৮৮) তারা বলে, আমাদের হৃদয় অধঃপতন। এবং তাদের কুফরের কারণে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তারা অস্পষ্ট ঈমান আনে।

নামায পড়া এবং যাকাত দেয়া ইসলামী শরীয়তসহ পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও ছিল।

শিক্ষা ও প্রচার ক্ষেত্রে কাফেরের সাথেও অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করা বৈধ নয় :

وَقُولُوا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ حَسْبُكُمْ ۝ আয়াতে এমন কথাকে বুঝানো হয়েছে, যা সৌন্দর্যমণ্ডিত। এর অর্থ এই যে, যখন মানুষের সাথে কথা বলবে, নম্রভাবে হাসিমুখে ও খোলা মনে বলবে— যার সাথে কথা বলবে, সে সং হউক বা অসং, সুন্নী হউক বা বেদাতী। তবে ধর্মের ব্যাপারে শৈথিল্য অথবা কারও মনোরঞ্জননের জন্য সত্য গোপন করবে না। কারণ, আল্লাহ তাত্ত্বাল যখন মুসা ও হারুন (আঃ)-কে নবুওয়ত দান করে ফেরাউনের প্রতি পাঠিয়েছিলেন, তখন এ নির্দেশ দিয়েছিলেন
 قُلْ لِلَّهِ الْوَلَايَةُ ۝ অর্থাৎ, তোমারা উভয়েই ফেরাউনকে নরম কথা বলবে। আজ যারা অন্যের সাথে কথা বলে, তারা হযরত মুসা (আঃ)-এর চাইতে উত্তম নয় এবং যার সাথে কথা বলে, সেও ফেরাউন অপেক্ষা বেশী মন্দ ও পাপিষ্ঠ নয়।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জ্ঞাতব্য : কোন কোন সময় কারও বক্তব্যের ভেতরই কোন কিছু অস্বীকারও বোঝা যায় যদিও তা সুস্পষ্ট নয়। আলোচ্য আয়াতে অস্বীকারও বোঝা যায় যদিও তা সুস্পষ্ট নয়। অস্বীকারও বোঝা যায় যদিও তা সুস্পষ্ট নয়। অস্বীকারও বোঝা যায় যদিও তা সুস্পষ্ট নয়।

দেশত্যাগ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই যে, কাউকে এমন উৎপীড়ন করবে না, যাতে সে দেশত্যাগে বাধ্য হয়।

বনী-ইসরাঈলকে তিনটি নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। প্রথমতঃ খুনখুনি না করা, দ্বিতীয়তঃ বহিস্কার অর্থাৎ, দেশ ত্যাগে বাধ্য না করা এবং তৃতীয়তঃ স্বগোত্রের কেউ কারও হাতে বন্দী হলে অর্থের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করা। কিন্তু তারা প্রথমোক্ত দু'টি নির্দেশ অমান্য করে তৃতীয় নির্দেশ পালনে বিশেষ ভৎসনা ছিল। ঘটনার বিবরণ এরূপঃ মদীনাবাসীদের মধ্যে 'আওস' ও 'খায়রাজ' নামে দু'টি গোত্রের মধ্যে শত্রুতা লেগেই থাকত। মাঝে মাঝে যুদ্ধও বাধত। মদীনার আশে-পাশে ইহুদীদের দু'টি গোত্র 'বনী কোরায়যা' ও 'বনী-নুযায়ের' বসবাস করত। আওস গোত্র ছিল বনী-কোরায়যার মিত্র এবং খায়রাজ ছিল বনী-নুযায়েরের মিত্র। আওস ও খায়রাজের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে মিত্রতার ভিত্তিতে বনী-কোরায়যা আওসের সাহায্য করত এবং নুযায়ের খায়রাজের পক্ষ অবলম্বন করত। যুদ্ধে আওস ও খায়রাজের যেমন লোকসংখ্যা ও ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হত, তাদের মিত্র বনী নুযায়েরেরও তেমনি হত। বনী-কোরায়যাকে হত্যা ও বহিস্কারের ব্যাপারে শত্রুপক্ষের মিত্র-নুযায়েরেরও হাত থাকত। তেমনি নুযায়েরের হত্যা, বাস্তবিকভাবে থেকে উৎখাত করার কাজে শত্রুপক্ষের মিত্র বনী কোরায়যারও হাত থাকত। তবে তাদের একটি আচরণ ছিল অদ্ভুত। ইহুদীদের দুই দলের কেউ আওস অথবা খায়রাজের হাতে বন্দী হয়ে গেলে প্রতিপক্ষীয় দলের ইহুদী স্বীয় মিত্রদের অর্থে বন্দীকে মুক্ত করে দিত। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতঃ বন্দীকে মুক্ত করা আমাদের উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে যুদ্ধে সাহায্য করার ব্যাপারে কেউ আপত্তি করলে তারা বলতঃ কি করব, মিত্রদের সাহায্যে এগিয়ে না আসা লজ্জার ব্যাপার। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাদের এ আচরণেরই নিন্দা করেছেন এবং তাদের এ অপকৌশলের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন।

عَدُوَانِ (গোনাহ ও অন্যায়) -আয়াতে ব্যবহৃত এ দু'টি শব্দ

البقرة

১৫

الآية

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا
لَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا لَأَكْفِرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
يَسْمَا شُرَآئِهِمْ أَن تَقُولُوا لَا نَفَعُ مِنَّا إِلَّا اللَّهُ بَلْ يَسْمَا
أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنَ قَوْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
قَبَاً يُعْصِبُ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
مُّهِينٌ ۝ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ امْكُثُوا إِنَّمَا أَنزَلَ اللَّهُ الْقَوْلَ
وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ
أَن تَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ
مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهَا وَأَنتُمْ
ظَالِمُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا
وَعَصَيْنَا وَأَشْرَكُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ
قُلْ يَسْمَا يَا مَعْزُومِي إِنَّمَا كُنتُمْ مَوْمِنِينَ ۝

(৮৯) যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব এসে পৌঁছাল, যা সে বিষয়ের সত্যায়ন করে, যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে করত। অবশেষে যখন তাদের কাছে পৌঁছল যাকে তারা চিনে রেখেছিল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। অতএব, অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। (৯০) যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করেছে, তা খুবই মন্দ; যেহেতু তারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তা অস্বীকার করেছে— এই হঠকারিতার দরুন যে, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ নাযিল করেন। অতএব, তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করেছে। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (৯১) যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা পাঠিয়েছেন তা মেনে নাও, তখন তারা বলে, আমরা মানি যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে। অথচ এ গ্রন্থটি সত্য এবং সত্যায়ন করে ঐ গ্রন্থের যা তাদের কাছে রয়েছে। বলে দিন, তবে তোমরা ইতিপূর্বে পয়গম্বরদের হত্যা করতে কেন যদি তোমরা বিশ্বাসী ছিলে? (৯২) সুস্পষ্ট মূ'জেসাহ মূসা তোমাদের কাছে এসেছেন। এরপর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা গোবৎস বানিয়েছ। বাস্তবিকই তোমরা অত্যাচারী। (৯৩) আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তুর পর্বতকে তোমাদের উপর তুলে ধরলাম যে, শত্ৰু করে ধর, আমি যা তোমাদের দিয়েছি আর শোন। তারা বলল, আমরা শুনেছি আর অমান্য করেছি। কুফরের কারণে তাদের অন্তরে গোবৎসপ্রীতি পান করানো হয়েছিল। বলে দিন, তোমরা বিশ্বাসী হলে, তোমাদের সে বিশ্বাস মন্দ বিষয়াদি শিক্ষা দেয়।

দ্বারা দু'রকম হক বা অধিকার নষ্ট করার প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তারা একদিকে আল্লাহর হক নষ্ট করেছে এবং অপরকে কষ্ট দিয়ে বান্দার হকও নষ্ট করেছে।

ঘটনায় বর্ণিত ইহুদীরা নবী করিম (সাঃ)—এর নবুওয়ত স্বীকার না করায় নিঃসন্দেহে কাফের। কিন্তু এখানে তাদের কুফর উল্লেখ করা হয়নি, বরং কতিপয় নির্দেশ পালন না করাকে কুফর বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথচ যতক্ষণ কেউ হারামকে হারাম মনে করে, ততক্ষণ কাফের হয় না। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, শরীয়তের পরিভাষায় কঠোর শুনাহকে শুধু কঠোরতার প্রেক্ষিতেই কুফর বলে দেয়া হয়। আমরা নিজেদের পরিভাষায়ও এর দৃষ্টান্ত অহরহ দেখতে পাই। উদাহরণতঃ কাউকে কোন নিকট কাজ করতে দেখলে আমরা বলে দেই : তুই একেবারে চামার। অথচ সে মোটেই চামার নয়। এ ক্ষেত্রে তীব্র ঘৃণা এবং সংশ্লিষ্ট কাজটির নিকটতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। *من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر* (যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেয়, সে কাফের হয়ে যায়।) এবং এ জাতীয় অন্যান্য হাদীসের বেলায়ও এ অর্থই বুঝতে হবে।

আয়াতে উল্লিখিত দু'টি শাস্তির প্রথমটি হল পার্শ্বব জীবনে লাল্পনা ও দুর্গতি। তা এভাবে বাস্তব রূপ লাভ করেছে যে, নবী করিম (সাঃ)—এর আমলেই মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিভঙ্গের অপরাধে বনী-কুরায়যা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ও বন্দী হয়েছে এবং বনী-নুযায়রকে চরম অপমান ও লাল্পনার সাথে সিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছে।

কোরআন-হাদীসের বিভিন্নস্থানে হযরত জিবরাঈল (আঃ)—কে ‘রাহুল কুদুস’ (পবিত্রতা) বলা হয়েছে। কোরআনের আয়াতে *قُلْ زَكَاةً وَسُورَةُ الْقُدُسِ* এবং হাদীসে হযরত হাসসান ইবনে সাবতের কবিতা রয়েছে—

জিবরাঈল (আঃ)—এর মাধ্যমে ঈসা (আঃ)—কে কয়েক রকম শক্তি দান করা হয়েছে। প্রথমতঃ জন্মগ্রহণের সময় শয়তানের স্পর্শ থেকে রক্ষা করা হয়েছে। এছাড়া জিবরাঈলের দম করার ফলেই মরিয়মের উদরে হযরত ঈসার গর্ভ সঞ্চারিত হয়। বহু ইহুদী ঈসা (আঃ)—এর শত্রু ছিল। এ কারণে দেহরক্ষী হিসাবে জিবরাঈল তাঁর সাথে থাকতেন। এমনকি, শেষ পর্যন্ত জিবরাঈলের মাধ্যমেই তাঁকে আকাশে তুলে নেয়া হয়। ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)—সহ অনেক পয়গাম্বরকে মিথ্যাবাদী বলেছে এবং হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহুয়া (আঃ)—কে হত্যা পর্যন্ত করেছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

জ্ঞাতব্য : কোরআনকে তওরাতের ‘মুসাফিক’ (সত্যায়নকারী) বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, তওরাতে মুহাম্মদ (সাঃ)—এর আবির্ভাব ও কোরআন অবতরণের যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, কোরআনের মাধ্যমেও সেগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং যারা তওরাতকে স্বীকার করে, তারা কিছুতেই কোরআন ও মুহাম্মদ (সাঃ)—কে অস্বীকার করতে পারে না। তা করতে গেলে প্রকারান্তরে তওরাতকেই অস্বীকার করা হয়।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, তারা যখন সত্যকে সত্য বলেই জানত, তখন তাদেরকে ঈমানদার বলাই উচিত, কাফের বলা হল কেন?

এর উত্তর এই যে, শুধু জানাকেই ঈমান বলা যায় না। শয়তানের

সত্যজ্ঞান সবার চাইতে বেশী। তাই বলে সে ঈমানদার হয়ে যাবে কি? জানাসত্ত্বে অস্বীকার করার কারণে কুফরের তীব্রতাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের শত্রুতাকে কুফরের কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এখানে এক ক্রোধ কুফরের কারণে এবং অপর ক্রোধ হিংসার কারণে। এ জন্যেই ক্রোধের উপর ক্রোধ বলা হয়েছে। শাস্তির সাথে অপমানজনক শব্দ যোগ করে বলা হয়েছে যে, এ শাস্তি কাফেরদের জন্যেই নির্দিষ্ট। কেননা, পাপী ঈমানদারকে যে শাস্তি দেয়া হবে, তা হবে, তাকে পাপমুক্ত করার উদ্দেশ্যে, অপমান করার উদ্দেশ্যে নয়। পরবর্তী আয়াতে তাদের যে উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে কুফর প্রমাণিত হয় এবং হিংসাও বুঝা যায়।

‘আমরা শুধু তওরাতের প্রতিই ঈমান আনব, অন্যান্য গ্রন্থের প্রতি ঈমান আনব না,’ ইহুদীদের এ উক্তি সুস্পষ্ট কুফর। সেই সাথে তাদের উক্তি ‘যা (তওরাত) আমাদের প্রতি নায়িল করা হয়েছে’— এ থেকে প্রতিহিংসা বোঝা যায়। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে এই যে, অন্যান্য গ্রন্থ যেহেতু আমাদের প্রতি নায়িল করা হয়নি, কাজেই আমরা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনব না। আল্লাহ তাআলা তিন পন্থায় তাদের এ উক্তি খণ্ডন করেছেন।

প্রথমতঃ অন্যান্য গ্রন্থের সত্যতা ও বাস্তবতা যখন অকাটা দলীল দ্বারা প্রমাণিত, তখন সেগুলো অস্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। অবশ্য দলীলের মধ্যে কোন আপত্তি থাকলে তারা তা উপস্থিত করে দূর করে নিতে পারত। অহেতুক অস্বীকারের কোন অর্থ হয় না।

দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে একটি হচ্ছে কোরআন মজীদ, যা তওরাতেরও সত্য্যন কর। সুতরাং কোরআন মজীদকে অস্বীকার করলে তওরাতের অস্বীকৃতিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ সকল খোদায়ী গ্রন্থের মতেই পয়গম্বরদের হত্যা করা কুফর। তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা কয়েকজন পয়গম্বরকে হত্যা করেছে। অথচ তারা বিশেষভাবে তওরাতের শিক্ষাই প্রচার করতেন। তোমরা সেসব হত্যাকারীকেই নেতা ও পুরোহিত মনে করছ। এভাবে কি তোমরা তওরাতের সাথেই কুফরি করনি? সুতরাং তওরাতের প্রতি

তোমাদের ঈমান আনার দাবী অসার প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, কোন দিক দিয়েই তোমাদের কথা ও কাজ শুদ্ধ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

পরবর্তী আয়াতে আরও কতিপয় যুক্তি দ্বারা ইহুদীদের দাবী খণ্ডন করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটে তওরাত অবতরণের পূর্বে। তখন মুসা (আঃ)—এর নবুওতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে যেসব যুক্তি প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল, আয়াতে بينات বলে সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। যেমন, লাঠি, জ্যোতির্ময় হাত, সাগর দ্বি-খন্ডিত হওয়া ইত্যাদি।

ইহুদীদের দাবীর খণ্ডনে আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা একদিকে ঈমানের দাবী কর, অন্যদিকে প্রকাশ্য শিরকে লিপ্ত হও। ফলে শুধু মুসা (আঃ)—কেই নয়, আল্লাহকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলেছ। কোরআন অবতরণের সময় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)—এর আমলে যেসব ইহুদী ছিল, তারা গোবৎসকে উপাস্য নির্ধারণ করেনি সত্য; কিন্তু তারা নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের সমর্থক ছিল। অতএব তারাও মোটামুটিভাবে এ আয়াতের লক্ষ্য।

আয়াতে বর্ণিত কারণ ও ঘটনাসমূহের সারমর্ম এই যে, ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেয়ার পর তারা একটি কুফরী বাক্য উচ্চারণ করে। পরে মুসা (আঃ)—এর শাসনোর ফলে যদিও তওবা করে নেয়, কিন্তু তওবারও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। উচ্চস্তরের তওবার অভাবে তাদের অন্তরে কুফরের কালিমা থেকেই যায়। পরে সেটাই বেড়ে গিয়ে গোবৎস পূজার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোন কোন টীাকাকারের বর্ণনা মতে গোবৎস পূজা থেকে তওবা করতে গিয়ে তাদের কিছু লোককে হত্যা বরণ করতে হয় এবং কিছু লোক ক্ষমা প্রাপ্ত হয়। এদের তওবাও সম্ভবতঃ দুর্বল ছিল। এছাড়া যারা গোবৎস পূজায় জড়িত ছিল না, তারাও অন্তরে গোবৎস পূজারীদের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণা পোষণ করতে পারেনি। ফলে তাদের অন্তরে শিরকের প্রভাব কিছু না কিছু অবশিষ্ট ছিল। মোটকথা, তওবার দুর্বলতা ও শিরকের প্রতি প্রয়োজনীয় ঘৃণার অভাব—এতদুভয়ের প্রতিক্রিয়ায় তাদের অন্তরে ধর্মের প্রতি শৈথিল্য দানা বেঁধে উঠেছিল। এ কারণেই অস্বীকার নেওয়ার জন্য তুর পর্বতকে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ دَارُ الْآخِرَةِ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ
 دُونِ النَّاسِ فَتَمَتَّعُوا بِالْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَ
 لَنْ يَتَمَتَّعُوا أَبَدًا إِيَّاهُ فَدَمَّتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 بِالظَّالِمِينَ ۝ وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ
 مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمَئِذٍ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ
 مَا هُوَ بِمُدَّخِرٍ جِوَارٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ لِمَا
 يَمْشُونَ ۝ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَنَّةِ فَإِنَّهُ نَزَلَ
 عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى
 وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَ
 رُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝
 وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۝ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا الْكَافِرُ
 الْفٰسِقُونَ ۝ أَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدٌ أَوْ عَهْدٌ أَيْنَ أَنْزَلْنَا
 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَوْلَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ
 اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْآيَاتِ لَافْتَرَوْا
 الْكُتُبَ لِيُكَذِّبَ اللَّهُ وَرَأَاهُ ظُهُورُهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(১৪) বলে দিন, যদি আখেরাতের বাসস্থান আল্লাহর কাছে একমাত্র তোমাদের জন্যই বরাদ্দ হয়ে থাকে— অন্য লোকদের বাদ দিয়ে, তবে মৃত্যু কামনা কর, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক। (১৫) কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না ঐসব গোনাহর কারণে, যা তাদের হাত পাড়িয়ে দিয়েছে। আল্লাহ গোনাহগারদের সম্পর্কে সত্যক অবগত রয়েছেন। (১৬) আপনি তাদেরকে জীবনের প্রতি সবার চাইতে এমন কি, মুশরিকদের চাইতেও অধিক লোভী দেখবেন। তাদের প্রত্যেককে কামনা করে, যেন হাজার বছর আয়ু পায়। অথচ এরূপ আয়ুপ্রাপ্তি তাদেরকে শান্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহ্ দেখেন যা কিছু তারা করে। (১৭) আপনি বলে দিন, যে কেউ জিবরাঈলের শত্রু হয়— যেহেতু তিনি আল্লাহর আদেশে এ কলাম আপনার অন্তরে নাযিল করেছেন, যা সত্যায়নকারী তাদের সম্মুখস্থ কলামের এবং মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা। (১৮) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতা ও রসূলগণ এবং জিবরাঈল ও মিকাইলের শত্রু হয়, নিশ্চিই আল্লাহ্ সেসব কাফেরের শত্রু। (১৯) আমি আপনার প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ অবতীর্ণ করেছি। অবাখরা ব্যতীত কেউ এগুলো অস্বীকার করে না। (১০০) কি আশ্চর্য, যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়, তখন তাদের একদল তা ছুঁড়ে ফেলে, বরং অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। (১০১) যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল আগমন করলেন— যিনি ঐ কিতাবের সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন আহলে কেতাবদের একদল আল্লাহর গ্রন্থকে পচ্চাতে নিক্ষেপ করল— যেন তারা জানেই না।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম যে সত্যধর্ম, তা প্রমাণ করার জন্যে এ ঘটনাটি যথেষ্ট। এখানে আরও দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য :

প্রথমত : নবী করীম (সাঃ)—এর আমলে বিদ্যমান ইহুদীদের সঙ্গে উপরোক্ত যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল—যারা তাঁকে নবী হিসাবে চেনার পরেও শত্রুতা ও হঠকারিতাবশতঃ অস্বীকার করেছিল, সকল যুগের ইহুদীদের সঙ্গে নয়।

দ্বিতীয় : এখানে এরূপ সন্দেহ করা ঠিক নয় যে, মন ও জিহ্বা উভয়টি দ্বারাই কামনা হতে পারে। ইহুদীরা সম্ভবতঃ মনে মনে মৃত্যুর কামনা করেছে। উত্তর এই যে, প্রথমতঃ আল্লাহুর উক্তি وَلَنْ يَتَمَتَّعُوا (কস্মিনকালেও তারা মৃত্যু কামনা করবে না) এ সম্ভাবনাকে নাচক করে দিচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ তারা মনে মনে মৃত্যু কামনা করে থাকলে, তা অবশ্যই মুখেও প্রকাশ করত। কারণ, এতে তাদেরই জয় হত এবং নবী করীম (সাঃ)—কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার একটা সুযোগ পেয়ে যেত।

এরূপ সন্দেহও অমূলক যে, বোধ হয় তারা কামনা করেছে; কিন্তু তার প্রচার হয়নি। কারণ, সর্বযুগেই ইসলামের শত্রু ও সমালোচকদের সংখ্যা ইসলামের মিত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যার চাইতে বেশী ছিল। এরূপ কোন ঘটনা ঘটে থাকলে তারা কি একে ফলাও করে প্রচার করত না যে, দেখ, তোমাদের নিখারিত সত্যের মাপকাঠিতেও আমরা পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছি।

আরবের মুশরিকরা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না। তাদের যতে বিলাস-বাসন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই ছিল পার্থিব। এ কারণে তারা দীর্ঘায়ু কামনা করলে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কিন্তু ইহুদীরা শুধু পরকালে বিশ্বাসীই ছিল না; বরং তাদের ধারণামতে পরকালের যাবতীয় আরাম-আয়েস ও নেয়ামতরাজি তাদেরই প্রাপ্য ছিল। এরপরও তাদের পৃথিবীতে দীর্ঘায়ু কামনা করা বিস্ময়কর ব্যাপার নয় কি ?

সুতরাং পরকালে বিশ্বাস সত্ত্বেও তাদের দীর্ঘায়ু কামনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পারলৌকিক নেয়ামত সম্পর্কিত তাদের দাবী সম্পূর্ণ অন্তঃসারন্য। প্রকৃত ব্যাপার তাদেরও ভালভাবে জানা রয়েছে যে, সেখানে পৌছলে জাহান্নামই হবে তাদের আবাসস্থল। তাই যতদিন বেঁচে থাকা যায়, ততদিনই মঙ্গল।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লেখিত আয়াতসমূহের তফসীর ও শানে-নযুল প্রসঙ্গে অনেক অসমর্থিত ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়। সেসব রেওয়ায়েত পাঠ করে অনেক পাঠকরে মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। হাকীমুল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী খানবী (রাহঃ) সুস্পষ্ট ও সহজভঙ্গিতে এসব প্রশ্নের উত্তর দান করেছেন। তাঁর বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করে এখানে হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম।

(১) নির্বোধ ইহুদীরাই হযরত সূলায়মান (আঃ)-কে জাদুকর বলে আখ্যায়িত করত, তাই আল্লাহ তাআলা আয়াতের মাঝখানে তাঁর নিষ্কলুষতাও প্রকাশ করে দিয়েছেন।

(২) বর্ণিত আয়াতসমূহে ইহুদীদের নিন্দা করাই উদ্দেশ্য। কারণ, তাদের মধ্যে জাদুবিদ্যার চর্চা ছিল। এসব আয়াত সম্পর্কে পরামাসুন্দরী যোহরার একটি মুখরোচক কাহিনীও সুবিদিত রয়েছে। কাহিনীটি কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত নয়। শরীয়তের নীতি বিরুদ্ধ মনে করে অনেক আলেম কাহিনীটিকে নাকচ করে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ একে সদর্পে ব্যাখ্যা করা শরীয়ত বিরুদ্ধ মনে না করে নাকচ করেননি। বাস্তবে কাহিনীটি সত্য কি মিথ্যা, এখানে তা আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে এটা ঠিক যে, আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা কাহিনীর উপর নির্ভরশীল নয়।

(৩) সবকিছু জানা সম্ভবে ইহুদীরা আমল বা কাজ করত, ‘এলম’ বা জ্ঞানার বিপরীত এবং এ ব্যাপারে তারা মোটেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিত না। তাই আয়াতে প্রথমে তাদের জ্ঞানার সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং পরিশেষে ‘যদি তারা জানত !’ বলে না জ্ঞানার কথাও বলা হয়েছে। কারণ, যে জ্ঞানার সাথে তদনুরূপ কাজ ও বিচক্ষণতা যুক্ত হয় না, তা না জ্ঞানারই শামিল।

(৪) ঠিক কখন, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য জানা না থাকলেও এক সময়ে পৃথিবীতে বিশেষ করে বাবেল শহরে জাদু-বিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। জাদুর অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া দেখে মুগ্ধ লোকদের মধ্যে জাদু ও পয়গম্বরগণের মু’জেযার স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্তি দেখা দিতে থাকে। কেউ কেউ জাদুকরদেরও সজ্জন ও অনুসরণযোগ্য মনে করতে থাকে। এই বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা বাবেল শহরে ‘হারাত’ ও ‘মারাত’ নামে দু’জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাদের কাজ ছিল জাদুর স্বরূপ ও ভেঙ্কিবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা— যাতে বিভ্রান্তি দূর হয় এবং জাদুর আমল ও জাদুকরদের অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকতে পারে। পয়গম্বরগণের নবুওয়তকে যেমন মু’জেযা ও নিদর্শনাদি দ্বারা প্রমাণ করে দেয়া হয়, তেমনি হারাত ও মারাত যে ফেরেশতা, তার উপর যুক্তি-প্রমাণ ঝাড়া করে দেয়া হল, যাতে তাদের নির্দেশাবলী জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

একাজে পয়গম্বরগণকে নিযুক্ত না করার কারণ এই যে, প্রথমতঃ এতে পয়গম্বর ও জাদুকরদের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল। এদিক দিয়ে তারা যেন ছিলেন একটি পক্ষ। কাজেই উভয়পক্ষকে বাদ দিয়ে তৃতীয় পক্ষকে বিচারক নিযুক্ত করাই বিধেয়।

দ্বিতীয়তঃ জাদুর বাক্যাবলী মুখে উচ্চারণ ও বর্ণনা ব্যতীত এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিল না। যদিও ‘কুফরে’র বর্ণনা কুফর নয়, এই স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী পয়গম্বরগণ তা করতে পারতেন, তথাপি হেদায়েতের প্রতীক হওয়ার কারণে একাজে তাঁদের নিযুক্তি সমীচীন মনে

(১০২) তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সূলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সূলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারাত ও মারাত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কান্দিস হয়ে না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহর আদেশ ছাড়া তদ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ—যদি তারা জানত ! (১০৩) যদি তারা ঈমান আনত এবং খোদাতীক হত, তবে আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত। যদি তারা জানত। (১০৪) হে মুমিনগণ, তোমরা ‘রাযিনা’ বলো না— ‘উনযুরনা’ বল এবং শুনতে থাক। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (১০৫) আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের মনঃপূত নয় যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ মহান অনুগ্রহদাতা।

অর্থাৎ— আপনি যে একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহ নিক্ষেপ করেছিলেন। অর্থাৎ, এক মুষ্টি কঙ্কর যে সমবেত সবার চোখে পৌছে গেল, এতে আপনার কোন হাত ছিল না। এটা ছিল একান্তভাবেই আল্লাহর কাজ। এই যু'জ্জেয়াটি বদর

আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আপনার কোন জায়েয কাজ থেকে যদি অন্যরা নাজায়েয কাজের আশংকা পায়, তবে সে জায়েয কাজটিও আপনার পক্ষে জায়েয থাকবে না। উদাহরণতঃ কোন আলোমের কোন জায়েয কাজ দেখে যদি সাধারণ লোকেরা বিভ্রান্ত হয় এবং নাজায়েয কাজে লিপ্ত হয়, তবে সে আলোমের জন্য সে জায়েয কাজটিও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। তবে শর্ত এই যে, সংশ্লিষ্ট কাজটি শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী না হওয়া চাই। কোরআন ও হাদীসে এর ভরি ভরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

مَا تَسْعُرُ مِنْ يَتِيمٍ أَوْ يُنْفَسُ مِنْ يَتِيمٍ أَوْ يُنْفَسُ مِنْ يَتِيمٍ أَوْ يُنْفَسُ مِنْ يَتِيمٍ
تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ أَمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا
سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْأَمْرَ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ صَلَ سَوَاءَ السَّيْلِ ۝ وَكَتَبْنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَوْ رَدُّوهُمُ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَمَّا أَفْضَدُوا مِنْ عِنْدِ
أَنْفُسِهِمْ مَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا
وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۝ وَاقْبَلُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقَدَّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَقَدْ أَفْضَدَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَسْتَعْلَمُ
بَصِيرٌ ۝ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا
أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانَتُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ۝ بَلْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ
أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

(১০৬) আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ সব কিছুর উপর শক্তিমান? (১০৭) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌র জন্যই নেভোমণল ও ভূমণলের আধিপত্য? আল্লাহ্‌র বাজীত তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (১০৮) ইতিপূর্বে মুসা (আঃ) যেমন জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, (মুসলমানগণ), তোমরাও কি তোমাদের রসূলকে তেমনি প্রশ্ন করতে চাও? যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (১০৯) আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশতঃ চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোন রকমে কাকির বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)। যাক তোমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (১১০) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে যে সংকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহ্‌র কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষ করেন। (১১১) ওরা বলে, ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা ওদের মনের বাসনা। বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর। (১১২) হাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সমর্পণ করেছে এবং সে সংকর্মশীলও বটে তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

ইহুদীদের দাবী ছিল দু'টি : (এক) ইহুদীবাদ ইসলামের চাইতে শ্রেষ্ঠ। (দুই) তারা মুসলমানদের শুভাকাঙ্ক্ষী। প্রথম দাবীটি তারা প্রমাণ করতে পারেনি। নিছক দাবীতে কিছু হয় না। এছাড়া দাবীটি নিরর্থকও বটে। কারণ, 'নাসিখ' (যে রহিত করে) আগমন করলে 'মনসুখ' (যাকে রহিত করা হয়) বর্জনীয় হয়ে যায়। তা উত্তম ও অধমের পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল নয়। এই উত্তরটি সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত, এ কারণে আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়নি। আয়াতে শুধু দ্বিতীয় দাবীটি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুকে শক্তিশালী ও জোরদার করার উদ্দেশ্যে আহলে-কিতাবদের সাথে মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুশরিকরা যেমন নিশ্চিতরূপেই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী নয়, তাদেরকেও তেমনি মনে কারো।

আনুশঙ্গিক স্রাতব্য বিষয়

—এই আয়াতে কোরআনী আয়াত রহিত হওয়ার সম্ভাব্য সকল প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে। অভিধানে 'নসুখ' শব্দের অর্থ দূর করা, লিখা। সমস্ত মুসলিম টীকাকার এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে 'নসুখ' শব্দ দ্বারা বিধি-বিধান দূর করা —অর্থাৎ, রহিত করাকে বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হাদীস ও কোরআনের পরিভাষায় এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে 'নসুখ' বলা হয়। 'অন্য বিধানটি' কোন বিধানের বিলুপ্তি ঘোষণাও হতে পারে, আবার এক বিধানের পরিতর্কে অপর বিধান প্রবর্তনও হতে পারে।

আল্লাহ্‌র বিধানে নসুখের স্বরূপ : জগতের রাষ্ট্র ও আইন-আদালতে এক নির্দেশকে রহিত করে অন্য নির্দেশ জারী করার ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত। রচিত আইনে 'নসুখ' বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। (১) ভুল ধারণার উপর নির্ভর করে প্রথমে যদি কোন আইন প্রবর্তন করা হয়, তবে পরে বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হলে পূর্বকার আইন পরিবর্তন করা হয়। (২) ভবিষ্যৎ অবস্থার গতি-প্রকৃতি জানা না থাকার কারণে কোন কোন সাময়িক আইন জারী করা হয়। পরে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সে আইনও পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু এ ধরনের নসুখ আল্লাহ্‌র আইনে হতে পারে বলে ধারণা করা যায় না।

তৃতীয় প্রকার 'নসুখ' এরূপ : আইন-রচয়িতা আগেই জানে যে, অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন এই আইন আর উপযোগী থাকবে না, অন্য আইন জারী করতে হবে। এরূপ জ্ঞানার পর সাময়িকভাবে এই আইন জারী করে দেন, পরে পূর্বজ্ঞান অনুযায়ী যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তখন পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনও পরিবর্তন করেন। উদাহরণতঃ রোগীর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দেন। তিনি জানেন, যে, এই ওষুধ দু'দিন সেবন করার পর রোগীর অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন অন্য ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে। অবস্থার এহেন পরিবর্তন জানার ফলেই চিকিৎসক প্রথম দিন এক ওষুধ এবং পরে অন্য ওষুধ দেন।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথম দিনেই পরিবর্তনসহ চিকিৎসার পূর্ণ প্রোগ্রাম কাগজে লিখে দিতে পারে যে, দুদিন এই ওষুধ, তিন দিন অন্য ওষুধ এবং এক সপ্তাহ পর অমুক ওষুধ সেব্য। কিন্তু এরূপ করা হলে রোগীর পক্ষে জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এতে ভুল বোঝাবুঝির

কারণে ক্রটিরও আশঙ্কা থাকে। তাই ডাক্তার প্রথম দিনেই পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন না।

আল্লাহর আইনে এবং আসমানী গ্রন্থসমূহে শুধুমাত্র তৃতীয় প্রকার নসখই হতে পারে এবং হয়ে থাকে। প্রতিটি নবুওয়ত ও প্রতিটি আসমানী গ্রন্থ পূর্ববর্তী নবুওয়ত ও আসমানী গ্রন্থের বিধান নসখ তথা রহিত করে নতুন বিধান জারী করেছে। এমনভাবে একই নবুওয়ত ও শরীয়তে এমন রয়েছে যে, এক বিধান কিছু দিন প্রচলিত থাকার পর খোদায়ী হেকমত অনুযায়ী সেটি পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে : **لَمْ تَكُنْ نَبْوَةُ قُطْ لَا تَنَاسَخْ** - অর্থাৎ, এমন নবুওয়ত কখনও ছিল না, যাতে নসখ ও পরিবর্তন করা হয়নি। - (কুরতুবী) বিধান পরিবর্তন সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য উসূলে ফেকাহ দ্রষ্টব্য)

এখানে ‘অন্যায় আবদার’ বলার কারণ এই যে, প্রতিটি কাজেই আল্লাহ তাআলার হেকমত ও উপযোগিতা নিহিত থাকে। তাতে পন্থা নির্দেশ করার কোন অধিকার বান্দার নেই যে, সে বলবে, একাজটি এভাবে করা হোক।

জ্ঞাতব্য : তখনকার অবস্থানুযায়ী ক্ষমার নির্দেশই ছিল বিধেয়। পরবর্তীকালে আল্লাহ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং জেহাদের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর ইহুদীদের প্রতিও আইন বলবৎ করা হয় এবং অপরাধের ক্রমানুপাতে দুষ্কদের হত্যা, নির্বাসন, জিযিয়া আরোপ ইত্যাদি শাস্তি দেয়া হয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের পারস্পরিক মতবিরোধের উল্লেখ করে তাদের নিবৃদ্ধিতা ও মতবিরোধের কুফল বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আসল সত্য উদ্ঘাটন করেছেন। এসব ঘটনায় মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত (পথনির্দেশ) নিহিত রয়েছে যা পরে বর্ণিত হবে।

খ্রীষ্টান ও ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মের প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে

ধর্মের নাম-ভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে তুলেছিল এবং তারা প্রত্যেকেই স্বজাতিকে জান্নাত ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র বলে দাবী করতো এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য সমস্ত জাতিকে জাহান্নামী ও পথভ্রষ্ট বলে বিশ্বাস করত।

এ অবৈতিক মতবিরোধের ফলশ্রুতিতেই মুশরিকরা একথা বলার সুযোগ পেল যে, খ্রীষ্টধর্ম ও ইহুদীধর্ম উভয়টিই মিথ্যা ও বানোয়াট এবং ওদের মূর্তি পূজাই একমাত্র সত্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম।

আল্লাহ তাআলা উভয় সম্প্রদায়ের মূর্খতা সম্পর্কে মন্তব্য করছেন যে, এরা উভয় জাতিই জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে উদাসীন; তারা শুধু ধর্মের নাম ভিত্তিক জাতীয়তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ ইহুদী-খ্রীষ্টান অথবা ইসলাম যে কোন ধর্ম হোক, সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে দু’টি বিষয় :

(এক) বান্দা মনে-প্রাণে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করবে। তাঁর আনুগত্যকেই নিজের মত ও পথ মনে করবে। এ উদ্দেশ্যটি যে ধর্মে অর্জিত হয় তা’ই প্রকৃত ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে পেছনে ফেলে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান জাতীয়তাবাদের ধ্বংস ধরে থাকা ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

(দুই) যদি কেউ মনে-প্রাণে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের সংকল্প গ্রহণ করে কিন্তু আনুগত্য ও এবাদত নিজ খেয়াল-খুশীমত মনগড়া পন্থায় সম্পাদন করে, তবে তাও জান্নাতে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়, বরং এক্ষেত্রেও আনুগত্য ও এবাদতের সে পন্থাই অবলম্বন করতে হবে, যা আল্লাহ তাআলা রসুলের মাধ্যমে বর্ণনা ও নির্ধারণ করেছে।

প্রথম বিষয়টি **يَلْزَمَنَّ اسْلَمًا** বাক্যাংশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি **وَفَوْضَلِي** বাক্যাংশের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এতে জানা গেল যে, পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য আনুগত্যের সংকল্পই যথেষ্ট নয়, বরং সংকর্মও প্রয়োজন। বস্তুতঃ কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্যাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা ও পন্থাই সংকর্ম।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহর কাছে বংশগত ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানের কোন মূল্য নেই; গ্রহণীয় বিষয় হচ্ছে ঈমান ও সংকর্ম : ইহুদী হউক, অথবা খ্রীষ্টান কিংবা মুসলমান— যে কেউ উপরোক্ত মৌলিক বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন একটি ছেড়ে দেয়, অতঃপর শুধু নামভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নিজেদেরকে জন্মান্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী মনে করে নেয়, সে আত্ম প্রবঞ্চনা বৈ কিছুই করে না; আসল সত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব নামের উপর ভরসা করে কেউ আল্লাহর নিকটবর্তী ও মকবুল হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার মধ্যে ঈমান ও সংকর্ম থাকে।

প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তেই ঈমানের মূলনীতি এক ও অভিন্ন। তবে সংকর্মের আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন ও পরিবর্তন হয়েছে। তওরাতের যুগে যেসব কাজকর্ম মুসা (আঃ) ও তওরাতের শিকার অনুরূপ ছিল, তা'ই ছিল সংকর্ম। তদ্রূপ ইঞ্জিলের যুগে নিশ্চিতরূপে তা'ই ছিল সংকর্ম, যা হযরত ঈসা (আঃ) ও ইঞ্জিলের শিকার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এখন কোরআনের যুগে এসব কার্যকলাপই সংকর্ম রূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, যা সর্বশেষ পয়গম্বুর (সাঃ)-এর বাণী ও তৎকর্তৃক আনীত গ্রন্থ কোরআন মজীদে হেদায়েতের অনুরূপ।

মোটকথা, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মতবিরোধ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ফয়সালা এই যে, উভয় সম্প্রদায় মূর্ত্তাসূলভ কথাবার্তা বলেছে, তাদের কেউই জন্মান্তের ইজারাদার নয়। তাদের কারও ধর্ম ভিত্তিহীন ও বানোয়াট নয়; বরং উভয় ধর্মের নির্ভুল ভিত্তি রয়েছে। ভুল বোঝাবুঝির প্রকৃত কারণ হচ্ছে এই যে, ওরা ধর্মের আসল প্রাণ অর্থাৎ বিশ্वास, সংকর্ম ও সত্য মতবাদকে বাদ দিয়ে বংশ অথবা দেশের ভিত্তিতে কোন সম্প্রদায়কে ইহুদী আর কোন সম্প্রদায়কে খ্রীষ্টান নামে অভিহিত করেছে।

যারা ইহুদীদের বংশধর অথবা ইহুদী নগরীতে বাস করে অথবা আদমশুমারীতে নিজেদের ইহুদী বলে প্রকাশ করে, তাদেরকেই ইহুদী মনে করে নেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে খ্রীষ্টানদের পরিচিতি ও সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ঈমানের মূলনীতি ভঙ্গ করে এবং সংকর্ম থেকে বিমুখ হয়ে কোন ইহুদীই ইহুদী এবং কোন খ্রীষ্টানই খ্রীষ্টান থাকতে পারে না।

কোরআন মজীদে আহলে-কিতাবদের মতবিরোধ ও আল্লাহর ফয়সালা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের সতর্ক করা, যাতে তারাও ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ে একথা না বলে যে, আমরা পুরুষানুক্রমে মুসলমান, প্রত্যেক অফিসে ও রেজিষ্টারে আমাদের নাম মুসলমানদের কোটায় লিপিবদ্ধ এবং আমরা মুখেও নিজেদের মুসলমান বলি, সুতরাং জন্মান্ত এবং নবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে ওয়াদাকৃত সকল পুরস্কারের যোগ্য হকদার আমরাই।

এই ফয়সালা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু দাবী করলে, মুসলমানরূপে নাম লিপিবদ্ধ করলে অথবা মুসলমানের ওরসে কিংবা মুসলমানদের আবাসভূমিতে জনগ্রহণ করলেই প্রকৃত মুসলমান হয় না, বরং মুসলমান হওয়ার জন্যে পরিপূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ করা অপরিহার্য। ইসলামের অর্থ আত্মসমর্পণ। দ্বিতীয়তঃ সংকর্ম অর্থাৎ, সুন্যাহ অনুযায়ী আমল করাও জরুরী।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কোরআন মজীদে এই হুশিয়ারী সত্ত্বেও অনেক মুসলমান উপরোক্ত ইহুদী ও খ্রীষ্টানী আশ্রির শিকার হয়ে পড়েছে। তারা আল্লাহ, রসুল, পরকাল ও কেয়ামতের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে বংশগত মুসলমান হওয়াটাই যথেষ্ট মনে করতে শুরু করেছে। কোরআন

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرُ
لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ
مَنْعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسُئِلَ فِي خَرَابِهِ
أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَتَّخِذُوا هَؤُلَاءِ خَائِفِينَ لَهُمْ فِي
الدُّنْيَا خِزْيٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَلِلَّهِ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ ۝ قَالَ يَمَّا كُنْتُمْ تُؤَافِقُونَ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا لَوْلَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
وَالْأَرْضُ ۝ قُلْ لَهُ فُتُونٌ ۝ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝
إِذَا قُضِيَ أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُحْيِيهِ اللَّهُ أَوْ تَأْتِيهِ آيَةٌ كَذَلِكَ
قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ
قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۝ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝

(১১৩) ইহুদীরা বলে, খ্রীষ্টানরা কোন ভিত্তির উপরেই নয় এবং খ্রীষ্টানরা বলে, ইহুদীরা কোন ভিত্তির উপরেই নয়। অর্থাৎ ওরা সবাই কিতাব পাঠ করে। এমনভাবে যারা মুখ, তার ও ওদের মতই উক্তি করে। অতএব, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল। (১১৪) যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় যালেম আর কে? এদের পক্ষে মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয়, অবশ্য ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। ওদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। (১১৫) পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। (১১৬) তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব কিছু থেকে পবিত্র; বরং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর আজ্ঞাশীল (১১৭) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও', তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। (১১৮) যারা কিছু জানে না, তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না। অথবা আমাদের কাছে কোন নির্দেশ কেন আসে না? এমনভাবে তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও তাদেরই অনুরূপ কথা বলেছে। তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয় আমি উজ্জ্বল নির্দেশসমূহ বর্ণনা করেছি তাদের জন্যে, যারা প্রত্যয়শীল। (১১৯) নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আপনি দোষখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না।

ও হাদীসে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য সম্পর্কে মুসলমানদের সাথে যেসব অস্বীকার করা হয়েছে, তারা নিজেকে সেগুলোর যোগ্য হকদার মনে করে সেগুলোর পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করছে। অতঃপর সেগুলো পূর্ণ হওয়ার লক্ষণ দেখতে না পেয়ে কোরআন ও হাদীসের অস্বীকার সম্পর্কে সন্দেহান হয়ে পড়েছে। তারা লক্ষ্য করে না যে, কোরআন নিছক বংশগত মুসলমানদের সাথে কোন অস্বীকার করেনি—যতক্ষণ না তারা নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল (সাঃ)—এর ইচ্ছার অধীন করে দেয়। **يَا مَنْ أَسْلَمَ** আয়াতের সারমর্ম তাই।

আজকাল সমগ্র বিশ্বে মুসলমান নানাবিধ বিপদাপদ ও সঙ্কটে নিমজ্জিত। অনেক অর্বাচীনের ধারণা, এ অবস্থার জন্যে সম্ভবতঃ আমাদের ইসলামই দায়ী। কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলাম নয় বরং ইসলামকে পরিহার করাই এর জন্য দায়ী। আমরা ইসলামের শুধু নামটুকু রেখেছি; আমাদের মধ্যে ইসলামের বিশ্বাস, চরিত্র, আমল ইত্যাদি কিছুই নেই।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আমরা যাই আছি, ইসলামেরই নাম নেই এবং আল্লাহ তাআলা ও রসূল (সাঃ)—কেই স্মরণ করি। পক্ষান্তরে যেসব কাফের খোলাখুলিভাবে আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ইসলামের নাম মুখে উচ্চারণ করাও পছন্দ করে না, তারাই আজ বিশ্বের বুকে সব দিক দিয়ে উন্নত, তারাই বিশাল রাষ্ট্রের অধিকারী এবং তারাই বিশ্বের শিল্প ও ব্যবসায়ের একচ্ছত্র অধিপতি। দুষ্কর্মের শাস্তি হিসেবেই যদি আজ আমরা সর্বত্র লাক্ষিত ও পদদলিত, তবে কাফের ও পাপাচারীদের সাজা আরও বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলেই এ প্রশ্নেরও অবসান হয়ে যায়।

প্রথমতঃ এর কারণ এই যে, মিত্র ও শত্রুর সাথে একই রকম ব্যবহার করা হয় না। মিত্রের দোষ পদে পদে ধরা হয়। নিজ সন্তান ও শিষ্যকে সামান্য বিষয়ে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু শত্রুর সাথে তেমনি ব্যবহার করা হয় না। তাকে অবকাশ দেয়া হয় এবং সময় আসলে হঠাৎ পাকড়াও করা হয়।

মুসলমান যতক্ষণ ঈমান ও ইসলামের নাম উচ্চারণ করে, আল্লাহর মাহাত্ম্য ও ভালবাসা দাবী করে, ততক্ষণ সে বন্ধুরই তালিকাভুক্ত থাকে। ফলে তার মন্দ আমলের সাজা সাধারণতঃ দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়—যাতে পরকালের বোঝা কিছুটা হলেও হালকা হয়ে যায়। কাফেরের অবস্থা এর বিপরীত। সে বিদ্রোহী ও শত্রুর আইনের অধীন। দুনিয়াতে হালকা শাস্তি দিয়ে তার শাস্তির মাত্রা হ্রাস করা হয় না। তাকে পুরোপুরি শাস্তির মধ্যেই নিষ্ক্ষেপ করা হবে। ‘দুনিয়া মুমিনের জন্যে বন্দীশালা, আর কাফেরদের জন্যে জাহান্নাম।’—মহানবী (সাঃ)—এর এ উক্তির তাৎপর্যও তাই।

মুসলমানদের অবনতি ও অস্থিরতা এবং কাফেরদের উন্নতি ও প্রশান্তির মূলে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক কর্মের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এক কর্ম দ্বারা অন্য কর্মের বৈশিষ্ট্য অর্জিত হতে পারে না। উদাহরণতঃ ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আর্থিক উন্নতি আর গুণধন্যত্বের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শারীরিক সুস্থতা। এখন যদি কেউ দিব্যরূপে ব্যবসায়ে মগ্ন থাকে, অসুস্থতা ও তার চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ না দেয়, তবে শুধু ব্যবসায়ের কারণে সে রোগের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে না। এমনভাবে কেউ গুণধন্যত্ব ব্যবহার করেই ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ, আর্থিক উন্নতি লাভ করতে পারে না। কাফেরদের পার্শ্ব উন্নতি এবং আর্থিক প্রাচুর্য তাদের কুফরের ফলশ্রুতি নয়, যেমন মুসলমানদের দারিদ্র্য

ও অস্থিরতা ইসলামের ফলশ্রুতি নয়। বরং কাফেররা যখন পরকালের চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে পরিপূর্ণভাবে জাগতিক অর্থ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশের পেছনে আত্মনিয়োগ করেছে—ব্যবসা শিল্প, কৃষি ও রাজনীতির লাভজনক পন্থা অবলম্বন করেছে এবং কৃতিকর পন্থা থেকে বিরত থাকে, তখনই তারা জগতে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে। তারাও যদি আমাদের মত ধর্মের নাম নিয়ে বসে থাকত এবং জাগতিক উন্নতির লক্ষ্যে যথাবিহিত চেষ্টা-সাধনা না করত, তবে তাদের কুফর তাদেরকে অর্থ-সম্পদ ও রাষ্ট্রের মালিক বানাতে পারত না। এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে, আমাদের (তথাকথিত নামের) ইসলাম আমাদের সামনে সকল বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে? ইসলাম ও ঈমান সঠিক মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তার আসল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতের অফুরন্ত শান্তি। উপযুক্ত চেষ্টা-সাধনা না করা হলে ইসলাম ও ঈমানের ফলশ্রুতিতে জগতে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের প্রাচুর্য লাভ করা অব্যাহতাবী নয়।

একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যে কোন দেশে যে কোন মুসলমান যদি ব্যবসা, শিল্প ও রাজনীতির বিশুদ্ধ মূলনীতি শিক্ষা করে তদনুযায়ী কাজ করে, তবে সেও কাফেরদের অর্জিত জাগতিক ফলাফল লাভে বঞ্চিত হয় না।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমান ও সংকর্ম পূর্ণরূপে অবলম্বন না করলে শুধু বংশগতভাবে ইসলামের নাম ব্যবহারের দ্বারা কোন শুভ ফল আশা করা যায় না।

আলোচ্য ১১৪ ও ১১৫ নং আয়াতদ্বয়ে দু’টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে নাথিল হয়েছে।

ঘটনাটি এই যে, ইসলাম-পূর্বকালে ইহুদীরা হযরত ইয়াহুয়া (আঃ)—কে হত্যা করলে খ্রীষ্টানরা তার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। তারা ইরাকের একজন অগ্নি-উপাসক সম্রাটের সাথে মিলিত হয়ে সম্রাট তায়তাসের নেতৃত্বাধীন সিরিয়ার ইহুদীদের উপর অক্রমণ চালায়—তাদের হত্যা ও লুণ্ঠন করে, তওরাতের কপিসমূহ জ্বালিয়ে ফেলে, বায়তুল মোকাদ্দাসে আবর্জনা ও শূকর নিক্ষেপ করে, মসজিদের প্রাচীর ক্ষত-বিক্ষত করে সমগ্র শহরটিকে জন-মানবহীন বিরানায় পরিণত করে দেয়। এতে ইহুদীদের শক্তি পদদলিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মহানবী (সাঃ)—এর আমল পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাস এমনভাবে পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল।

ফারুকে আযম হযরত ওমর (রাঃ)—এর খেলাফত আমলে যখন সিরিয়া ও ইরাক বিজিত হয়, তখন তাঁরই নির্দেশক্রমে বায়তুল-মোকাদ্দাস পুনঃনির্মিত হয়। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমস্ত সিরিয়া ও বায়তুল-মোকাদ্দাস মুসলমানদের অধিকারে ছিল। অতঃপর বায়তুল-মোকাদ্দাস মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয় এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের অধিকারে থাকে। অবশেষে হিজরী ষষ্ঠ শতকে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বায়তুল-মোকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন।

এ আয়াত থেকে কতিপয় প্রয়োজনীয় মাসআলা এবং বিধানও প্রমাণিত হয়।

প্রথমতঃ শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। বায়তুল-মোকাদ্দাস, মসজিদে-হরাম ও মসজিদে-নবতীর অবমাননা, যেমনি বড় যুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা

সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্ম্য ও সন্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত। মসজিদে-হারামে এক রাকাআত নামাযের সওয়াব একলক্ষ রাকাআত নামাযের সমান এবং মসজিদেনবভী ও বায়তুল-মোকাদ্দাসে পঞ্চাশ হাজার রাকাআত নামাযের সমান। এই তিন মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে সেখানে পৌঁছা বিরাট সওয়াব ও বরকতের বিষয়। কিন্তু অন্য কোন মসজিদে নামায পড়া উত্তম মনে করে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসতে বারণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদে যিকর ও নামাযে বাধা দেয়ার যত পন্থা হতে পারে সে সবগুলোই হারাম। তনুধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা এই যে, মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে নামায ও তেলাওয়াত করতে পরিস্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মসজিদে হটগোল করে অথবা আশে-পাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের নামায ও যিকরে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

এমনিভাবে নামাযের সময়ে যখন মুসল্লীরা নফল নামায, তসবীহ, তেলাওয়াত ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকেন, তখন মসজিদে সরবে তেলাওয়াত ও যিকর করা এবং নামাযীদের নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করাও বাধা প্রদানেরই নামাশূর। এ কারণেই ফিকাহবিদগণ একে না-জায়েয আখ্যা দিয়েছেন। তবে, মসজিদে যখন মুসল্লী না থাকে, তখন সরবে যিকর অথবা তেলাওয়াত করায় দোষ নেই।

এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, যখন মুসল্লীরা নামায, তসবীহ ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে, তখন মসজিদে নিজের জন্যে অথবা কোন ধর্মীয় কাজের জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করাও নিষিদ্ধ।

তৃতীয়তঃ মসজিদ জনশূন্য করার জন্য সন্তবপর যত পন্থা হতে পারে সবই হারাম। খোলাখুলিভাবে মসজিদকে বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা যেমন এর অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে। মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ এই যে, সেখানে নামায পড়ার জন্যে কেউ আসে না কিংবা নামাজীর সংখ্যা হ্রাস পায়।

মোটকথা, **وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا** আয়াতটিতে কেলামুখী হওয়ার পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য (নাইযুবিল্লাহ) বায়তুল্লাহ অথবা বায়তুল-মোকাদ্দাসের পূজা করা নয়, কিংবা এ'দুটি স্থানের সাথে আল্লাহর পবিত্র সত্তাকে সীমিত করে নেয়াও নয়। তাঁর সত্তা সমগ্র বিশ্বকে বেঁধে রাখার রেখাচ্ছে এবং সর্বত্রই তাঁর মনোযোগ সমান। এরপরও বিভিন্ন তাৎপর্যের কারণে বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

আয়াতের এই বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট ও অন্তরে বদ্ধমূল করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ হযুরে আকরাম (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামকে হিজরতের প্রথম

দিকে ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার আদেশ দেয়া হয়। এভাবে কার্যতঃ বলে দেয়া হয় যে, আমার মনোযোগ সর্বত্র রয়েছে। নফল নামাযসমূহের এক পর্যায়ে এই নির্দেশ অব্যাহত রাখা হয়েছে। সফরে কোন ব্যক্তি উট, ঘোড়া ইত্যাদি যানবাহনে সওয়ার হয়ে পথ চললে তাকে তদবস্থায় ইশারায় নফল নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার জন্য যানবাহন যেদিকে চলে সেদিকে মুখ করাই যথেষ্ট।

কোন কোন মুফাসীর **فَالْيَمَامَةُ كَالْمَدِينَةِ وَجِهَةُ اللَّهِ** আয়াতকে এই নফল নামাযেরই বিধান বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু সুরণ রাখা দরকার যে, এই বিধান সে সমস্ত যানবাহনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে সওয়ার হয়ে চলার সময় কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন। পক্ষান্তরে যেসব যানবাহনে সওয়ার হলে কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন নয়, যেমন রেলগাড়ী, সামুদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে নফল নামাযেও কেবলার দিকেই মুখ করতে হবে। তবে নামাযরত অবস্থায় রেলগাড়ী অথবা জাহাজের দিক পরিবর্তন হয়ে গেলে এবং আরোহীর পক্ষে কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ না থাকলে তদবস্থায়ই নামায পূর্ণ করবে।

এমনিভাবে কেবলার দিক সম্পর্কে নামাযীর জানা না থাকলে, রাত্রির অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা কঠিন হলে এবং বলে দেয়ার লোক না থাকলে সেখানেও নামাযী অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকেই তার কেবলা বলে গণ্য হবে। নামায আদায় করার পর যদি দিকটি ভ্রান্তও প্রমাণিত হয়, তবুও তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে— পূর্ণবার পড়তে হবে না।

জ্ঞাতব্য : (১) বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ফেরেশতা নিযুক্ত করা— যেমন, বৃষ্টিবর্ষণ ও রিমিক পৌছানো ইত্যাদি কোন না কোন রহস্যের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন উপকরণ ও শক্তিকে কাজে লাগানোও তেমনি। এর কোনটিই এজন্যে নয় যে, মানুষ এগুলোকে ক্ষমতালী স্বীকার করে তাদের কাছে সাহায্য চাইবে।

(২) ইমাম বায়যাতী বলেন : পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে আদি কারণ হওয়ার দরুন আল্লাহকে 'পিতা' বলা হত। একেই মূর্খেরা জন্মদাতা অর্থে বুঝে নিয়েছে। ফলে এরূপ বিশ্বাস করা অথবা বলা কুফর সাব্যস্ত হয়েছে। অনিষ্টের ছিদ্রপথ বন্ধ করার লক্ষ্যে বর্তমানেও এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের অনুমতি নেই।

জ্ঞাতব্য : ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা ছিল আসামানী কিতাবের অধিকারী। তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকও ছিল। তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাদের মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, প্রচুর অকাটা ও শক্তিশালী নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করা সত্ত্বেও সেগুলো অস্বীকার মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কারণেই আল্লাহ তাদেরকে মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক পয়গম্বর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বিভিন্ন পরীক্ষা, তাতে তাঁর সাফল্য এবং পুরস্কার ও প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। হযরত খলীলুল্লাহ যখন স্নেহপরবশ হয়ে স্বীয় সন্তান-সন্ততির জন্যেও এ পুরস্কারের প্রার্থনা জানালেন, তখন পুরস্কার লাভের জন্যে একটি নিয়ম-নীতিও বলে দেয়া হল। এতে হযরত খলীলুল্লাহর প্রার্থনাকে শর্তসাপেক্ষে মঞ্জুর করে বলা হয়েছে যে, আপনার বেশধরগণও এই পুরস্কার পাবে, তবে তাদের মধ্যে যারা অব্যাহ্য ও যালেম হবে, তারা এ পুরস্কার পাবে না।

হমরত খলীলুল্লাহর পরীক্ষাসমূহ ও পরীক্ষার বিষয়বস্তু : এখানে
কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমতঃ যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ। কারও কোন অবস্থা অথবা গুণ-বৈশিষ্ট্যই তাঁর অজানা নয়। এমতাবস্থায় এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল?

দ্বিতীয়ত : কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে?

তৃতীয়তঃ কি ধরনের সাফল্য হয়েছে?

চতুর্থতঃ কি পুরস্কার দেয়া হল ?

পঞ্চমতঃ পুরস্কারের জন্য নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতির কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। এই পাঁচটি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর লক্ষ্য করুন :

প্রথমতঃ পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল? কোরআনের একটি শব্দ (তঁার পালনকর্তা) এ প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এ পরীক্ষার পরীক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা। আর তঁার 'আসমায়ে হুসনা'র মধ্য থেকে এখানে 'রব' (পালনকর্তা) নামটি ব্যবহার করে রব্বিবিয়াতের (পালনকর্তৃত্বের) দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর অর্থ কোন বস্তুকে ধীরে ধীরে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌছানো।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এই পরীক্ষা কোন অপরাধের সাক্ষ্য হিসেবে কিংবা অজ্ঞাত যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং এর উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষার মাধ্যমে স্বীয় বন্ধুর লালন করে তাঁকে পূর্ণাঙ্গের স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো। অতঃপর আয়াতে কর্মকে পূর্বে এবং কারককে পরে উল্লেখ করে ইবরাহীম (আঃ)-এর মহত্বকে আরও ফটিয়ে তোলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে? এ সম্পর্কে কোরআনে শুধু **كَلَامَاتٍ** (বাক্যসমূহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবয়ীদের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ খোদায়ী বিধানসমূহের মধ্য থেকে দশটি, কেউ ত্রিশটি এবং কেউ কমবেশী অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এতে কোন বিরোধ নেই, বরং সবগুলোই ছিল হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পরীক্ষার বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত তফসীরকার ইবনে-জরীর ও ইবনে কাসীরের অভিমত তাই।

আল্লাহর কাছে সুস্বদর্শিতার চাইতে চারিত্রিক দৃঢ়তার মূল্য বেশী; পরীক্ষার এসব বিষয়বস্তু পাঠশালায় অধীত জ্ঞান-অভিজ্ঞতার যাচাই কিংবা তৎসম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ছিল না, বরং তা ছিল চারিত্রিক মূল্যবোধ এবং কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়তা যাচাই করা। এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহর দরবারে যে বিষয়ের মূল্য বেশী, তা শিক্ষাবিষয়ক সুস্বদর্শিতা নয়, বরং কার্যগত ও চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব।

[illegible]

(২২০) ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত যা আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হল সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্ক্ষাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই। (১২১) আমি যাদেরকে গ্রহ দান করেছি, তারা তা যথাযথভাবে পাঠ করে। তারা ই তত্ত্বটি বিশ্বাস করে। আর যারা তা অবিশ্বাস করে, তারা ই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (১২২) হে বনী-ইসরাঈল! আমার অনুগ্রহ কব্জা সূর্য কব্জা, যা আমি তোমাদের দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে বিশ্বাবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (১২৩) তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (১২৪) যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করছি। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও। তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না। (১২৫) যখন আমি কা বাগুহকে মানুষের জন্যে সম্মিলন স্থল ও শান্তির আলেয় করলাম, আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাইলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকু-সেজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখ। (১২৬) যখন ইবরাহীম বললেন, পরওয়ানদেগার! এ স্থানকে তুমি শাস্তিধাম কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ফলের দ্বারা রিযিক দান কর। বললেন : যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দেবো, অতঃপর তাদেরকে বলপ্রয়োগে দোযখের আযাবে ঠেলে দেবো; স্টোনিষ্ট বাসস্থান।

এ ধরনের পরীক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই :

আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ছিল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে স্বীয় বন্ধুত্বের বিশেষ মূল্যবান পোশাক উপহার দেয়া। তাই তাঁকে বিভিন্ন রকম কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। সমগ্র জাতি, এমন কি তাঁর আপন পরিবারের সবাই মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। সবার বিশ্বাস ও রীতিনীতির বিপরীত একটি সনাতন ধর্ম তাঁকে দেয়া হয়। জাতিকে এ ধর্মের দিকে আহ্বান জানানোর গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে অর্পন করা হয়। তিনি পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মাধ্যমে নির্ভয়ে জাতিকে এক আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান। বিভিন্ন পন্থায় তিনি মূর্তি পূজার নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে কার্যক্ষেত্রে তিনি মূর্তিসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ফলে সমগ্র জাতি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। বাদশাহ নমরুদ ও তার পারিষদবর্গ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহর খলীল প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যে এসব বিপদাপদ স্বেচ্ছা হসিমুখে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপের জন্যে পেশ করেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় বন্ধুকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখে আশ্বনকে নির্দেশ প্রদান করলেন :

فَلْيَايُزُوتُونِي بِرُؤْسِهِ عَلَىٰ آتْرُوقِهِ

অর্থাৎ, আমি হুকুম দিয়ে দিলাম : হে অগ্নি, ইবরাহীমের উপর সূশীতল ও নিরাপত্তার কারণ হয়ে যাও।

নমরুদের আগুন সম্পর্কিত এ নির্দেশের মধ্যে ভাষা ছিল ব্যাপক। বস্তুতঃ কোন বিশেষ স্থানে আগুনকে নির্দিষ্ট করে এ নির্দেশ দেয়া হয়নি। এ কারণে সমগ্র বিশ্বে যেখানেই আগুন ছিল, এ নির্দেশ আসা মাত্রই স্ব স্ব স্থানে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নমরুদের আগুন-এর আওতায় পড়ে শীতল হয়ে গেল।

কোরআনে بِرُؤْسِهِ (শীতল) শব্দের সাথে سَلَّمَ (নিরাপদ) শব্দটি যুক্ত করার কারণ এই যে, কোন বস্তু সীমিতরিত্ত শীতল হয়ে গেলে তাও বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়ক, বরং মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। سَلَّمَ বলা না হলে আগুন বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়কও হয়ে যেতে পারত।

এ পরীক্ষা সমাপ্ত হলে জন্মভূমি ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া হয়। ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় স্বগোত্র ও মাতৃভূমিকেও হাসিমুখে ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনসহ সিরিয়ায় হিজরত করলেন।

মাতৃভূমি ও স্বজাতি ত্যাগ করে সিরিয়ায় অবস্থান শুরু করতেই নির্দেশ এল, বিবি হাজেরা (রাঃ) ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকেও স্থানান্তরে গমন করুন। — (ইবনে-কাসীর)

জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং তাঁদের সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে কোন শস্যশ্যামল বনানী আসলেই হযরত খলীল বলতেন, এখানে অবস্থান করানো হোক। জিবরাঈল (আঃ) বলতেন, এখানে অবস্থানের নির্দেশ নেই—গন্তব্যস্থল সামনে রয়েছে। চলতে চলতে যখন শুষ্ক পাহাড় ও উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তর এসে গেল (যেখানে ভবিষ্যতে বায়তুল্লাহ নির্মাণ ও মক্কা নগরী আবাদ করা লক্ষ্য ছিল), তখন সেখানেই তাঁদের ধামিয়ে দেয়া হল। আল্লাহর বন্ধু স্বীয় পালনকর্তার মহব্বতে মত্ত হয়ে এই জনশূন্য তৃণতাহীন প্রান্তরেই বসবাস আরম্ভ

করলেন। কিন্তু পরীক্ষার এখানেই শেষ হল না। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) নির্দেশ পেলেন যে, বিবি হাজেরা ও শিশুকে এখানে রেখে নিজে সিরিয়ায় ফিরে যাও। আল্লাহর বন্ধু নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা পালন করতে তৎপর হলেন এবং সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ‘আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক আমি চলে যাচ্ছি’—বিবিকে এতটুকু কথা বলে যাওয়ার দেহীও তিনি সহ্য করতে পারলেন না। হযরত হাজেরা তাঁকে চলে যেতে দেখে কয়েকবার ডেকে অবশেষে কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ জন-মানবহীন প্রান্তরে আমাদের একা ফেলে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? কিন্তু হযরত ইবরাহীম নির্বিকার—কোন উত্তর নেই। অবশ্য হাজেরাও ছিলেন খলিলুল্লাহরই সহধর্মিণী। ব্যাপার বুঝে ফেললেন। ডেকে বললেন, আপনি কি আল্লাহর কোন নির্দেশ পেয়েছেন? হযরত ইবরাহীম বললেন, হ্যাঁ! খোদায়ী নির্দেশের কথা জ্ঞানতে পেরে হযরত হাজেরা খুশীমনে বললেন,—যান। যে প্রভু আপনাকে চলে যেতে বলেছেন, তিনি আমাদের ক্ষৎস হতে দেবেন না।

অতঃপর হযরত হাজেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে জন-মানবহীন প্রান্তরে কালতিপাত করতে থাকেন। এক সময় দারুণ পিপাসা তাঁকে পানির খোঁজে বের হতে বাধ্য করল। তিনি শিশুকে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে ‘সাফা’ ও ‘মারওয়া’ পাহাড়ে বার বার ওঠানামা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পানির চিহ্নমাত্র দেখলেন না এবং এমন কোন মানুষ দৃষ্টিগোচর হল না, যার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে পারেন। সাত বার ছোট্টাছুটি করার পর তিনি নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন। এ ঘটনাকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যেই ‘সাফা’ ও ‘মারওয়া’ পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাত বার দৌড়ানো কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে হজ্জের বিধি-বিধান অত্যাাবশ্যকীয় করা হয়েছে। হযরত হাজেরা যখন দৌড়াদৌড়ি শেষ করে নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন, তখন আল্লাহর রহমত নাযিল হল। জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং শুষ্ক মরুভূমিতে পানির একটি কণাধারা বইয়ে দিলেন। বর্তমানে এ ধারার নামই যমযম। পানির সন্ধান পেয়ে প্রথমে জীব-জন্তু আগমন করল। জীব-জন্তু দেখে মানুষ এসে সেখানে আস্তানা গাড়ল। এভাবে মক্কায় জনপদের ভিত্তি রচিত হয়ে গেল। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্রও সংগৃহীত হল।

হযরত ইসমাইল (আঃ) নামে খ্যাত এই সদ্যজাত শিশু লালিত-পালিত হয়ে কাজ-কর্মের উপযুক্ত হয়ে গেলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর ইঙ্গিতে মাঝে মাঝে এসে বিবি হাজেরা ও শিশুকে দেখে যেতেন। এ সময় আল্লাহ তাআলা স্বীয় বন্ধুর তৃতীয় পরীক্ষা নিতে চাইলেন। বালক ইসমাইল অসহায় ও দীন-হীন অবস্থায় বড় হয়েছিলেন এবং পিতার স্নেহ-বাৎসল্য থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। এমনভাবে পিতা খোলাখোলি নির্দেশ পেলেন : এ ছেলেকে নিজ হাতে জবাই করে দাও। কোরআনে বলা হয়েছে : —‘বালক যখন পিতার কাছে কিছু সাহায্য করার যোগ্য হয়ে উঠল, তখন ইবরাহীম (আঃ) তাকে বললেন : হে বৎস, আমি স্বপ্নে তোমাকে জবাই করতে দেখেছি। এখন বল, তোমার কি অভিপ্রায়? পিতৃতত্ত্ব বালক আরম্ভ করলেন :’ পিতঃ, আপনি যে আশেপাশে পেয়েছেন, তা পালন করুন। আপনি আমাকেও ইনশাআল্লাহ এ ব্যাপারে ধৈর্যশীল পাবেন।’

এর পরবর্তী ঘটনা সবাই জ্ঞাত আছেন যে, হযরত খলীল (আঃ) পুত্রকে জবাই করার উদ্দেশ্যে মিনা প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। অতঃপর আল্লাহর আদেশ পালন নিজের পক্ষ থেকে যা করণীয় ছিল, তা প্রোগুরিই সম্পন্ন করলেন। কিন্তু প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে উদ্দেশ্য

পুত্রকে জবাই করানো ছিল না, বরং পুত্রবৎসল পিতার পরীক্ষা নেয়া উদ্দেশ্য ছিল। স্বপ্নের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বপ্নে ‘জবাই করে দিয়েছেন’ দেখেন নি, বরং জবাই করছেন অর্থাৎ, জবাই করার কাজটি দেখেছেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) তা’ই বাস্তবে পরিণত করেছিলেন। প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে কাজটি দেখানো হয়েছে। এ কারণেই **صَدَقْتُ الرُّؤْيَا** বলা হয়েছে যে, স্বপ্নে যা দেখেছিলেন আপনি তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ তাআলা বেহেশত থেকে এর পরিপূরক নামিল করে তা কোরবানী করার আদেশ দিলেন। এ রীতিটিই পরে ভবিষ্যতের জন্য একটি চিরন্তন রীতিতে পরিণতি লাভ করে।

এগুলো ছিল বড়ই কঠিন পরীক্ষা, যার সম্মুখীন হযরত খলীলুল্লাহকে করা হয়। এর সাথে সাথেই আরও অনেকগুলো কাজ এবং বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতাও তাঁর উপর আরোপ করা হল। তন্মধ্যে দশটি কাজ ‘খাসায়েলে ফিতরত’ (প্রকৃতিসুলভ অনুষ্ঠান) নামে অভিহিত। এগুলো হলো শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত ভবিষ্যত উম্মতের জন্যও এগুলো স্থায়ী বিধি-বিধানে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)—ও তাঁর উম্মতকে এসব বিধি-বিধান পালনের জোর তাকিদ দিয়েছেন।

ইবনে-কাসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়যাতে উদ্ধৃত করেছেন। এতে বলা হয়েছে : সমস্ত ইসলাম ত্রিশটি অংশে সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে দশটি সূরা বারাআতে, দশটি সূরা আহযাবে এবং দশটি সূরা মু’মিনুনে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এগুলো পূর্ণরূপে পালন করেছেন এবং সব পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সূরা বারাআতে মু’মিনদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলমানের দশটি বিশেষ লক্ষণ ও গুণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

—“তারা হলেন তওবাকারী, এবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোযাদার, রুকু-সেজদাকারী, সংকাজের আদেশকারী, অসংকাজে বাধা-দানকারী, আল্লাহর নির্ধারিত সীমার হেফাজতকারী— এহেন ঈমানদারদের সুসংবাদ শুনিতে দিন।”

সূরা মু’মিনুনে বর্ণিত দশটি গুণ হল এই :

“নিশ্চিতরূপেই এসব মুসলমান ক্তকার্য, যারা নামাযে বিনয় ও নয়তাবলম্বন করে, যারা অনর্থক বিষয় থেকে দূরে সরে থাকে, যারা নিয়মিত যাকাত প্রদান করে, যারা স্বীয় লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে, কিন্তু আপন স্ত্রী ও যাদের উপর বিমিসম্মত অধিকার রয়েছে তাদের ব্যতীত। কারণ, এ ব্যাপারে তাদের অভিযুক্ত করা হবে না। যারা এদের ছাড়া অন্যকে তালাশ করে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। যারা স্বীয় আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে, যারা নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায পড়ে, এমন লোকেরাই উত্তরাধিকারী হবে। তারা হবে জন্মভুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী। সেখানে তারা অনন্তকাল বাস করবে।”

সূরা আহযাবে বর্ণিত দশটি গুণ হল :

—“নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, আনুগত্যশীল পুরুষ ও আনুগত্যশীলা নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও দৈর্ঘ্যশীলা নারী, বিনয় অবলম্বনকারী পুরুষ ও বিনয় অবলম্বনকারিনী নারী, খয়রাতকারী পুরুষ ও

খয়রাতকারিনী নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণকারিনী নারী, অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারিনী নারী— তাদের সবার জন্যে আল্লাহ তাআলা মাগফেরাত ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।”

কোরআনের মুফাসসির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের উপরোদ্ধৃত উক্তি দ্বারা বোঝা গেল যে, মুসলমানদের জন্যে যেসব জ্ঞান এবং কর্মগত ও নৈতিক গুণ অর্জন করা দরকার, তার সবই এ তিনটি সূরার কয়েকটি আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোই কোরআনোক্ত **كُلِّيات** যেসব বিষয়ে হযরত খলীলুল্লাহর পরীক্ষা নেয়া হয়েছে।

وَأَذَانُكَ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ يَبْكُ আয়াতের ইঙ্গিতও এসব বিষয়ের দিকেই।

এ পর্যন্ত আয়াত সম্পর্কিত পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে দু’টির উত্তর সম্পন্ন হল।

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল এ পরীক্ষায় হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর সাফল্যের প্রকার ও শ্রেণী সম্পর্কে। এর উত্তর এই যে, স্বয়ং কোরআনই বিশেষ ভঙ্গিতে তাঁকে সাফল্যের স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করেছে :

وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى আর ইবরাহীম পরীক্ষায় পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। অর্থাৎ, প্রতিটি পরীক্ষায় সম্পূর্ণ ও একশ’ ভাগ সাফল্যের ঘোষণা আল্লাহ দিয়েছেন।

চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, এই পরীক্ষার পুরস্কার কি পেলেন? এরও বর্ণনা এই আয়াতেই রয়েছে— বলা হয়েছে : **إِنِّي جَاعِلُكَ لِلدُّنْيَا إِمَامًا** - পরীক্ষার পর আল্লাহ বলেন— “আমি তোমাকে মানব সমাজের নেতৃত্বদান করব।”

এ আয়াত দ্বারা একদিকে বোঝা গেল যে, হযরত খলীল (আঃ)—কে সাফল্যের প্রতিদানে মানবসমাজের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে, অপরদিকে মানবসমাজের নেতা হওয়ার জন্যে যে পরীক্ষা দরকার, তা পার্শ্ব পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার অনুরূপ নয়। পার্শ্ব পাঠশালাসমূহের পরীক্ষায় কতিপয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণকেই সাফল্যের মাপকাঠি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু নেতৃত্ব লাভের পরীক্ষায় আয়াতে বর্ণিত ত্রিশটি নৈতিক ও কর্মগত গুণে পুরোপুরি গুণান্বিত হওয়া শর্ত। কোরআনের অন্য এক জায়গায় এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

— “যখন তারা শরীয়তবিরুদ্ধ কাজে সংযমী হল এবং আমার নির্দেশনাবলীতে বিশুদী হল, তখন আমি তাদেরকে নেতা করে দিলাম, যাতে আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করে।”

এই আয়াতে **صَبِرَ** (সংযম) ও **يَقِينِ** (বিশ্বাস) শব্দদ্বয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত ত্রিশটি গুণ সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে। **صَبِرَ** হল শিক্ষাগত ও বিশ্বাসগত পূর্ণতা আর **يَقِينِ** কর্মগত ও নৈতিক পূর্ণতা।

পঞ্চম প্রশ্ন ছিল এই যে, পাপাচারী ও যালেমকে নেতৃত্বলাভের সম্মান দেয়া হবে না বলে ভবিষ্যত বংশধরদের নেতৃত্বলাভের জন্যে যে বিধান ব্যক্ত হয়েছে, তার অর্থ কি?

এর ব্যাখ্যা এই যে, নেতৃত্ব এক দিক দিয়ে আল্লাহ তাআলার খেলাফত তথা প্রতিনিষিদ্ধ। আল্লাহর অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে এ পদ দেয়া যায় না। এ কারণেই আল্লাহর অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে স্বেচ্ছায় নেতা বা প্রতিনিষিদ্ধ নিযুক্ত না করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

হযরত খলীলুল্লাহর মক্কার হিজরত ও কা'বা নির্মাণের ঘটনা : এই আয়াতে কা'বা গৃহের ইতিহাস, হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইল (আঃ) কর্তৃক কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ, কা'বা ও মক্কার কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং কা'বা গৃহের প্রতি সন্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছে। এ বিষয়টি কোরআনের অনেক সূরায় ছড়িয়ে রয়েছে।

হরম সম্পর্কিত মাসায়েল

(১) مَكْرَمَةٌ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা কা'বা গৃহকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। ফলে তা সর্বদাই মানবজাতির প্রত্যাবর্তনস্থল হয়ে থাকবে এবং মানুষ বরাবর তার দিকে ফিরে যেতে আকাক্ষী হবে। মুফাসসির শ্রেষ্ঠ হযরত মুজাহিদ বলেন : لَا يَقْضِي أَحَدٌ مِنْهَا وَطَرًا অর্থাৎ, কোন মানুষ কা'বা গৃহের যেয়ারত করে তৃপ্ত হয় না, বরং প্রতি বারই যেয়ারতের অধিকতর বাসনা নিয়ে ফিরে আসে। কোন কোন আলেমের মতে কা'বা গৃহ থেকে ফিরে আসার পর আবার সেখানে যাওয়ার আগ্রহ হজ্জ কবুল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ। সাধারণভাবে দেখা যায়, প্রথমবার কা'বাগৃহ যেয়ারত করার যতটুকু আগ্রহ থাকে, দ্বিতীয়বার তা আরও বৃদ্ধি পায় এবং যতবারই যেয়ারত করতে থাকে, এ আগ্রহ উত্তরোত্তর ততই বেড়ে যেতে থাকে।

এবিস্ময়কর ব্যাপারটি একমাত্র কা'বারই বৈশিষ্ট্য। নতুন জগতের শ্রেষ্ঠতম মনোরম দৃশ্যও এক-দু'বার দেখেই মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। পাঁচ-সাতবার দেখলে আর দেখার ইচ্ছাই থাকে না। অথচ এখানে না আছে কোন মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপট, না এখানে পৌছা সহজ এবং না আছে ব্যবসায়িক সুবিধা, তা সত্ত্বেও এখানে পৌছার আকুল আগ্রহ মানুষের মনে অবিরাম ঢেউ খেলতে থাকে। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে অপরিণীম দৃশ্য-কষ্ট সহ্য করে এখানে পৌছার জন্যে মানুষ ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

(২) এখানে مَأْمَنُ শব্দের অর্থ مأمن অর্থাৎ, শান্তির আবাসস্থল بيت শব্দের অর্থ শুধু কা'বা গৃহ নয়, বরং সম্পূর্ণ হরম। অর্থাৎ, কা'বা গৃহের পবিত্র প্রাঙ্গণ। কোরআনে الله وبيت كعبة শব্দ বলে যে সম্পূর্ণ হরমকে বোঝানো হয়েছে, তার আরও বহু প্রমাণ রয়েছে। যেমন, এক জায়গায় বলা হয়েছে : هَذِهِ الْبَيْتُ الْكَبِيرُ এখানে কعبة বলে সমগ্র হরমকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, এতে কোরবানীর কথা আছে। কোরবানী কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে হয় না এবং সেখানে কোরবানী করা বৈধও নয়। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে যে, ‘আমি কা'বার হরমকে শান্তির আলয় করেছি।’ শান্তির আলয় করার অর্থ মানুষকে নির্দেশ দেয়া যে, এ স্থানকে সাধারণ হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি আশান্তজনিত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। — (ইবনে-আরাবী)।

(৩) وَاتَّقُوا زَوَانَ مَقَرِّمًا وَمُصَلًّى এখানে মকামে-ইবরাহীমের অর্থ ঐ পাথর, যাতে মু'জ্জেযা হিসাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। কা'বা নির্মাণের সময় এ পাথরটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন। — (সহীহ বুখারী)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি এই পাথরে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পদচিহ্ন দেখেছি। যেয়ারতকারীদের উপর্যুপরি স্পর্শের দরুন চিহ্নটি এখন অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। — (কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে মকামে-ইবরাহীমের

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে যে, সমগ্র হরমটিই মকামে-ইবরাহীম। এর অর্থ বোধ হয় এই যে, তওয়াফের পর যে দু'রাকআত নামায মকামে-ইবরাহীমে পড়ার নির্দেশ আলাচ্য আয়াতে রয়েছে, তা হরমের যে কোন অংশে পড়লেই চলে। অধিকাংশ ফিকাহ শাস্ত্রবিদ এ ব্যাপারে একমত।

(৪) আলাচ্য আয়াতে মকামে-ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিতে বলা হয়েছে। স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জের সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি তওয়াফের পর কা'বা গৃহের সম্মুখে অনতিদূরে রক্ষিত মকামে-ইবরাহীমের কাছে আগমন করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন وَاتَّقُوا زَوَانَ مَقَرِّمًا وَمُصَلًّى অতঃপর মকামে-ইবরাহীমের পেছনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে দু'রাকআত নামায পড়লেন যে, কা'বা ছিল তাঁর সম্মুখে এবং কা'বা ও তাঁর মাঝখানে ছিল মকামে-ইবরাহীম। — (সহীহ মুসলিম)

এ কারণেই ফিকাহশাস্ত্রবিদগণ বলেছেন : যদি কেউ মকামে-ইবরাহীমের পেছনে সৎগু স্থানে জায়গা না পায়, তবে মকামে-ইবরাহীম ও কা'বা উভয়টিকে সামনে রেখে যে কোন দূরত্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে নির্দেশ পালিত হবে।

(৫) আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তওয়াফ পরবর্তী দুই রাকআত নামায ওয়াজিব। — (জাসসাস, মোল্লা আলী ক্বারী)

তবে এ দু'রাকআত নামায বিশেষভাবে মকামে-ইবরাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত। হরমের অন্যত্র পড়লেও আদায় হবে। কারণ, রসুলুল্লাহ (সাঃ) এ দু'রাকআত নামায কা'বা গৃহের দরজা সৎগু স্থানে পড়েছেন বলেও প্রমাণিত রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও তাই করেছেন বলে বর্ণিত আছে (জাসসাস)। মোল্লা আলী ক্বারী মানাসেক গ্রন্থে বলেছেন, এ দু'রাকআত মকামে-ইবরাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত। যদি কোন কারণে সেখানে পড়তে কেউ অক্ষম হয়, তবে হরম অথবা হরমের বাইরে যে কোন স্থানে পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

(৬) وَكَلِمَاتٍ بَيْنِي وَكَالْمُحَرِّمِينَ এখানে কা'বা গৃহকে পাক-সাফ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যিক অপবিত্রতা ও আবর্জনা এবং আত্মিক অপবিত্রতা উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, কুফর, শিরক, দুচ্চরিত্রতা, হিংসা, লালসা, কুপ্রবৃত্তি, অহঙ্কার, রিয়া, নাম-যশ ইত্যাদির কলুষ থেকেও কা'বা গৃহকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশে بَيْنِي শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ আদেশ যে কোন মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, সব মসজিদই আল্লাহর ঘর। কোরআনে বলা হয়েছে :

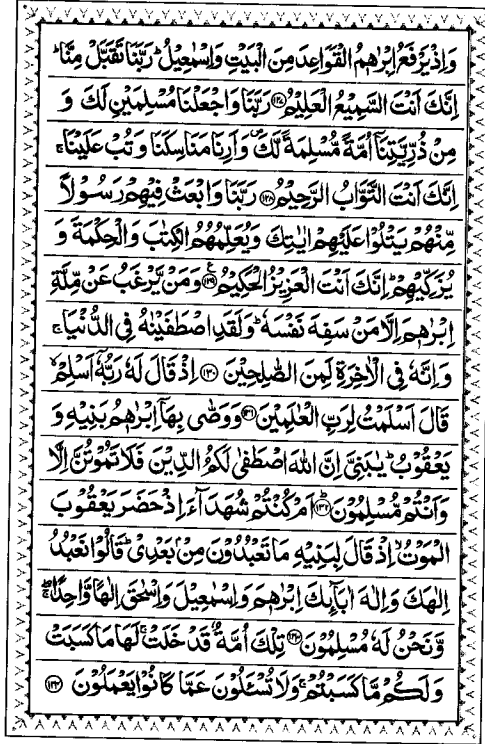
وَيَذَرُونَ الْمَلَأَانَ نَجَسًا

হযরত ফারুকে আ'যম (রাঃ) মসজিদে এক ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে শুনে বললেন : তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ, জান না ? (কুরতুবী) অর্থাৎ, মসজিদের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করা উচিত, এতে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা উচিত নয়। মোটকথা, আলাচ্য আয়াতে কা'বা গৃহকে যেমন যাবতীয় বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখতে বলা হয়েছে, তেমনি অন্যান্য মসজিদকেও পাক-পবিত্র রাখতে হবে। দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদকে যাবতীয় অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধমুক্ত বস্তু থেকে পাক-সাফ করে এবং অন্তরকে কুফর, শিরক, দুচ্চরিত্রতা, অহঙ্কার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে মসজিদে প্রবেশ করা কর্তব্য। রসুলুল্লাহ (সাঃ) পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দুর্গন্ধমুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। তিনি ছোট শিশু এবং

البقرة

২১

التة



(১২৭) স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাইল কা বাগহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করেছিল : পরওয়ারদেগার ! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই, তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। (১২৮) পরওয়ারদেগার ! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অশুভ দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্বের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি ড়ওবা কবুলকারী, দয়ালু। (১২৯) হে পরওয়ারদেগার ! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন— যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়াল। (১৩০) ইবরাহীমের ধর্ম থেকে কে মুখ ফেরায়? কিন্তু সে ব্যক্তি, যে নিজেকে বোকা পতিপন্ন করে। নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং সে পরকালে সংকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (১৩১) স্মরণ কর, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন : অনুগত হও। সে বলল : আমি বিশৃপালকের অনুগত হলাম। (১৩২) এরই ওচরিত করেছে ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্যে এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মত্বাবরণ করো না। (১৩৩) তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বলল : আমার পর তোমরা কার এবাদত করবে? তারা বললো, আমরা তোমার, পিতৃ-পুত্র ইবরাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব। তিনি একক উপাস্য। (১৩৪) আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। তারা ছিল এক সম্প্রদায়— যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদেরই জন্যে। তারা কি করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

পাগলদেরও মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। কারণ, তাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(৭) لِلْعَالَمِينَ وَالْعَالَمِينَ وَالْعَالَمِينَ

আয়াতের শব্দগুলো

থেকে কতিপয় বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ কা' বা গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে তওয়াফ, এ'তেকাফ ও নামায। দ্বিতীয়তঃ তওয়াফ আগে আর নামায পরে। (হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমত তাই)। তৃতীয়তঃ, বিশ্বের বিভিন্ন কোণ থেকে আগমনকারী হাজীদের পক্ষে নামাযের চাইতে তওয়াফ উত্তম। চতুর্থতঃ ফরয হোক অথবা নফল কা' বা গৃহের অভ্যন্তরে যে কোন নামায পড়া বৈধ। — (জাসাস)

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত খলীলুল্লাহ (আঃ) আল্লাহর পথে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজন এবং কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর আদেশ পালনে তৎপর হওয়ার যেসব অক্ষয় কীর্তি তিনি স্থাপন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ও নজীরবিহীন।

সন্তানের প্রতি স্নেহ ও মমতা শুধু একটি স্বাভাবিক ও সহজাত বৃত্তিই নয়; বরং এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলারও নির্দেশ রয়েছে। উল্লেখিত আয়াতসমূহ এর প্রমাণ। তিনি সন্তানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-স্বাস্থ্যের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া : رَبُّ শব্দ দ্বারা দোয়া আরম্ভ করেছেন। এর অর্থ, 'হে আমার পালনকর্তা।' তিনি এই শব্দের মাধ্যমে দোয়া করার রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ, এ জাতীয় শব্দ আল্লাহর রহমত ও কৃপা আকৃষ্ট করার ব্যাপারে খুবই কার্যকর ও সহায়ক। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রথম দোয়া এই : "তোমার নির্দেশে আমি এই জনমানবহীন প্রান্তরে নিজ পরিবার-পরিজনকে রেখে যাচ্ছি। তুমি একে একটি শান্তিপূর্ণ শহর বানিয়ে দাও— যাতে এখানে বসবাস করা আতঙ্কজনক না হয় এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য হয়।"

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বিতীয় দোয়ায় বলা হয়েছে : পরয়ারদেগার ! শহরটিকে শান্তিধাম করে দাও। অর্থৎ, হত্যা, লুটন, কাফেরদের অধিকার স্থাপন, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখ।

হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কবুল হয়েছে। মক্কা মুকাররমা শুধু একটি জনবহুল নগরীই নয়, সারা বিশ্বের প্রত্যাবর্তনস্থলও বটে। বিশ্বের চার দিক থেকে মুসলমানগণ এ নগরীতে পৌছাতে সর্ববৃহৎ সৌভাগ্য মনে করে। নিরাপদ ও সুরক্ষিতও এতটুকু হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত কোন শত্রুজাতি অথবা শত্রুসম্রাট এর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। 'আসহাবে-ফীলের' ঘটনা স্বয়ং কোরআনে উল্লেখিত রয়েছে। তারা কা' বা ঘরের উপর আক্রমণের ইচ্ছা করতেই সমগ্র বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিল।

এ শহরটি হত্যা ও লুটতরাজ থেকেও সর্বদা নিরাপদ রয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা অগণিত আনাচার, কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কা' বা ঘর ও তার পার্শ্ববর্তী হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত। তারা প্রাণের শত্রুকে হাতে পেয়েও হরমের মধ্যে পাল্টা হত্যা অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করত না। এমনকি, হরমের অধিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের রীতি সমগ্র আরবে প্রচলিত ছিল। এ

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী লেখেন : এ শব্দটি আল্লাহর জন্যে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সকল বস্তুর পূর্ণজ্ঞান এবং সুদৃঢ় উদ্ভাবন। অন্যের জন্যে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয়, বিদ্যমান বস্তুসমূহের বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সৎকর্ম। বিশুদ্ধ জ্ঞান, সৎকর্ম, ন্যায়, সুবিচার, সত্য কথা ইত্যাদি। — (কামুস ও রাগেব)

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, আয়াতে হেকমতের কি অর্থ? তফসীরকার সাহাবীগণ হযুরে আকরাম (সাঃ)-এর কাছ থেকে শিখে কোরআনের ব্যাখ্যা করতেন। এখানে হেকমত শব্দের অর্থে তাঁদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবগুলোর মর্মই এক। অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সূন্য। ইবনে কাসীর ও ইবনে জরীর কাতাদাহ থেকে এ ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত করেছেন। হেকমতের অর্থ কেউ কোরআনের তফসীর, কেউ ধর্মে গভীর জ্ঞান, কেউ শরীয়তের বিধি-বিধানের জ্ঞান, কেউ এমন বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন বলেছেন, যা শুধু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বর্ণনা থেকেই জানা যায়। নিম্নোক্তে এসব উক্তির সারমর্ম হল রসূল (সাঃ)-এর সূন্য।

وَيُؤْتِي زَكَاةً — **زَكَاةٌ** শব্দ থেকে উদ্ধৃত। এর অর্থ পবিত্রতা। বাহ্যিক ও আত্মিক সর্বপ্রকার পবিত্রতার অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

উপরোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ভবিষ্যত বংশধরদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন যে, আমার বংশধরের মধ্যে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন— যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের তোলাওয়াত করে শোনাবেন, কোরআন ও সূন্যাহর শিক্ষা দেবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদের পবিত্র করবেন। দোয়ায় নিজের বংশধরের মধ্য থেকেই পয়গম্বর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ প্রথমতঃ এই যে, এটা তাঁর সন্তানদের জন্যে গৌরবের বিষয়। দ্বিতীয়তঃ এতে তাদের কল্যাণও নিহিত রয়েছে। কারণ, স্বগোষ্ঠ থেকে পয়গম্বর হলে তাঁর চল-চলন ও অভ্যাস-আচরণ সম্পর্কে তারা উত্তমরূপে অবগত থাকবে। ঠোঁকাবাচ্চি ও প্রবন্ধনার সম্ভাবনা থাকবে না। হাদীসে বলা হয়েছেঃ প্রত্যুত্তরে ইবরাহীম (আঃ)-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দেয়া হয় যে, আপনার দোয়া কবুল হয়েছে এবং কাঙ্ক্ষিত পয়গম্বরকে শেষ যমানায় প্রেরণ করা হবে।’ — (ইবনে-জরীর, ইবনে-কাসীর)

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মের বৈশিষ্ট্য : মুসনাদে-আহমদ গ্রন্থে উদ্ধৃত এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সাঃ) বলেন : ‘আমি আল্লাহর কাছে তখনও পয়গম্বর ছিলাম, যখন আদম (আঃ)-ও পয়দা হননি ; বরং তাঁর সৃষ্টির জন্য উপাদান তৈরী হচ্ছিল মাত্র। আমি আমার সূচনা বলে দিচ্ছি : আমি পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া, ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ এবং স্বীয় জননীর স্বপ্নের প্রতীক। ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদের অর্থ তাঁর এ উক্তি

وَيُؤْتِي زَكَاةً — আমি এমন এক পয়গম্বরের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন। তাঁর নাম আহমদ। তাঁর জননী গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর পেট থেকে একটি নূর বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে। কোরআনে হযুর (সাঃ)-এর আবির্ভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে দু’জায়গায় সূরা আলে-ইমরানের ১৬৪ তম আয়াতে এবং সূরা জুমু’আয় ইবরাহীমের দোয়ায় উল্লেখিত ভাষারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে পয়গম্বরের জন্যে দোয়া করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)।

পয়গম্বর প্রেরণের অর্থ তিনটি : সূরা বাক্বারার আলাচ্য আয়াতে এবং সূরা আলে-ইমরান ও সূরা জুমু’আর বিভিন্ন আয়াতে হযুর (সাঃ) সম্পর্কে একই বিষয়বস্তু অভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতে মহানবী (সাঃ)-এর পৃথিবীতে পদার্পণ ও তাঁর রেসালতের তিনটি লক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ কোরআন তোলাওয়াত, দ্বিতীয়তঃ আসমানী গ্রন্থ ও হেকমতের শিক্ষাদান এবং তৃতীয়তঃ মানুষের চরিত্রশুদ্ধি।

প্রথম উদ্দেশ্য কোরআন তোলাওয়াত : এখানে সর্বপ্রথম প্রাধান্যযোগ্য যে, তোলাওয়াতের সম্পর্ক শব্দের সাথে এবং শিক্ষাদানের সম্পর্ক অর্থের সাথে। তোলাওয়াত ও শিক্ষাদান পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হওয়ার মর্মার্থ এই যে, কোরআনের অর্থসম্ভার যেমন উদ্দেশ্য, শব্দসম্ভারও তেমনি একটি লক্ষ্য। এসব শব্দের তোলাওয়াত ও হেফাযত ফরয ও গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। এখানে আরও একটি প্রাধান্যযোগ্য বিষয় এই যে, যারা মহানবী (সাঃ)-এর প্রত্যক্ষ শিষ্য ও সম্প্রদায়িত ছিলেন তাঁরা শুধু আরবী ভাষা সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল ছিলেন না, বরং অলংকারপূর্ণ আরবী ভাষার একেকজন বাগ্মী কবিও ছিলেন। তাঁদের সামনে কোরআন পাঠ করাই বাহ্যতঃ তাঁদের শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট ছিল, পৃথকভাবে অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। এমতাবস্থায় কোরআন তোলাওয়াতকে পৃথক উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থ শিক্ষাদানকে পৃথক উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করার কি প্রয়োজন ছিল? অথচ কার্যক্ষেত্রে উভয় উদ্দেশ্যই এক হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ থেকে দু’টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদ্ভব হয়। প্রথম এই যে, কোরআন অপরাপর গ্রন্থের মত নয়— যাতে শুধু অর্থসম্ভারের উপর আমল করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং শব্দসম্ভার থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ঃ; শব্দে সামান্য পরিবর্তন পরিবর্তন হয়ে গেলেও ক্ষতির কারণ মনে করা হয় না। অর্থ না বুঝে এসব গ্রন্থের শব্দ পাঠ করা একেবারেই নিরর্থক, কিন্তু কোরআন এমন নয়। কোরআনের শব্দের সাথে বিশেষ বিশেষ বিধি-বিধান সম্পৃক্ত রয়েছে। ফেকাহশামের মূলনীতিসংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে কোরআনের সংজ্ঞা এভাবে **هو النظم والمعنى جميعا** বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, শব্দসম্ভার ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমন্বিত গ্রন্থের নামই কোরআন। এতে বুঝা যায় যে, কোরআনের অর্থসম্ভারকে অন্য শব্দ অথবা অন্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হলে তাকে কোরআন বলা যাবে না, যদিও বিষয়বস্তু একেবারে নির্ভুল ও ক্রটিমুক্ত হয়। কোরআনের বিষয়বস্তুকে পরিবর্তিত শব্দের মাধ্যমে কেউ নামায়ে পাঠ করলে তার নামায হবে না। এমনিভাবে কোরআন সম্পর্কিত অপরাপর বিধি-বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। এ কারণেই ফেকাহশাম্প্রবিদগণ কোরআনের মূল শব্দ বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ লিখতে ও মুদ্রিত করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ পরিভাষায় এ জাতীয় অনুবাদকে ‘উর্দু কোরআন, বাংলা কোরআন অথবা ইংরেজী কোরআন’ বলা হয়। কারণ, ভাষান্তরিত কোরআন প্রকৃতপক্ষে কোরআন বলে কবিত হওয়ারই যোগ্য নয়।

অর্থ না বুঝে কোরআনের শব্দ পাঠ করা নিরর্থক নয়— সওয়াবের কাজ :

একথা বলা কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, অর্থ না বুঝে তোতাপাখীর মত শব্দ পাঠ করা অর্থহীন। বিষয়টির প্রতি বিশেষ জোর দেয়ার কারণ এই যে, আজকাল অনেকেই কোরআনকে অন্যান্য গ্রন্থের সাথে তুলনা করে মনে করে যে, অর্থ না বুঝে কোন গ্রন্থের শব্দাবলী পড়া ও পড়ানো বৃথা কালক্ষেপণ বৈ কিছুই নয়। কোরআন সম্পর্কে তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, শব্দ ও অর্থ উভয়টির সমন্বিত আসমানী গ্রন্থের নামই কোরআন। কোরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং তার বিধি-বিধান পালন করা যেমন ফরয ও উচ্চস্তরের এবাদত, তেমনিভাবে তার শব্দ তোলাওয়াত করাও একটি স্বতন্ত্র এবাদত ও সওয়াবের কাজ।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য গ্রন্থ শিক্ষাদান : রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরাম কোরআনের অর্থ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু উপরোক্ত কারণেই তাঁরা শুধু অর্থ বোঝে ও তা বাস্তবায়ন করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি। বরোা এবং আমল করার জন্যে একবার পড়ে নেয়াই যথেষ্ট

ছিল, কিন্তু তাঁরা সারা জীবন কোরআন তেলাওয়াতকে ‘অন্ধের যষ্টি’ মনে করেছেন। কতক সাহাবী দৈনিক একবার কোরআন খতম করতেন, কেউ দু’দিনে এবং কেউ তিন দিনে কোরআন খতমে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে কোরআন খতম করার রীতি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কোরআনের সাত মনযিল এই সাপ্তাহিক তেলাওয়াত রীতিরই চিহ্ন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-করামের এ কার্যধারাই প্রমাণ করে যে, কোরআনের অর্থ বোঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করা যেমন এবাদত, তেমনিভাবে শব্দ তেলাওয়াত করাও স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে একটি উচ্চস্তরের এবাদত এবং বরকত, সৌভাগ্য ও মুক্তির উপায়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)- কর্তব্যসমূহের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াতকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন। উদ্দেশ্য এই যে, যে মুসলমান আপাততঃ কোরআনের অর্থ বোঝে না, শব্দের সওয়াব থেকেও বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে উচিত নয়। বরং অর্থ বোঝার জন্যে চেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরী, যাতে কোরআনের সত্যিকার নূর ও বরকত প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং কোরআন অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। (মা’আয়াল্লাহ) কোরআনকে তন্ত্র-মন্ত্র মনে করে শুধু ঝাড়-ফুঁকে ব্যবহার করা উচিত নয় এবং আল্লামা ইকবালের ভাষায় ‘সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে শুধু এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নয় যে, এ সূরা পাঠ করলে মরণোন্মুখ ব্যক্তির আত্মা সহজে নির্গত হয়।’

তৃতীয় উদ্দেশ্য পবিত্রকরণ : মহানবী (সাঃ)-এর তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে পবিত্রকরণ। এর অর্থ বাহ্যিক ও আত্মিক না-পাকী থেকে পবিত্র করা। বাহ্যিক না-পাকী সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানরাও ওয়াকিফহাল। আত্মিক না-পাকী হচ্ছে কুফর, শেরক, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর পুরোপুরি ভরসা করা, অহংকার, হিংসা, শত্রুতা দুনিয়া প্রীতি ইত্যাদি। কোরআন ও সুন্নাহতে এসব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। পবিত্রকরণকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন শাস্ত্র পৃথগিতভাবে শিক্ষা করলেই তার প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জিত হয় না। প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জন করতে হলে গুরুজনের শিক্ষাধীনে থেকে তাঁর অনুশীলনের অভ্যাসও গড়ে তুলতে হয়। সূফীবাদে কামেল পীরের দায়িত্বও তাই। তিনি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে অর্জিত শিক্ষাকে কার্যক্রেতে অনুশীলন করে অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করেন।

হেদায়েত ও সংশোধনের দু’টি ধারা : আল্লাহর গ্রন্থ ও রসূল : এ প্রসঙ্গে আরও দু’টি বিষয় প্রাধান্যযোগ্য। প্রথম এই যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির আদিকাল থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত মানুষের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য দু’টি ধারা অব্যাহত রেখেছেন। একটি খোদায়ী গ্রন্থসমূহের ধারা এবং অপরটি রসূলগণের ধারা। আল্লাহ তাআলা শুধু গ্রন্থ নাযিল করাই যেমন যথেষ্ট মনে করেননি, তেমনি শুধু রসূল প্রেরণ করেও ক্ষান্ত হননি। বরং সর্বদা উভয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এতদুভয় ধারা সমভাবে প্রবর্তন করে আল্লাহ তাআলা একটি বিরাট শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তা এই যে, মানুষের নির্ভুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্যে শুধু গ্রন্থ কিংবা শুধু শিক্ষাই যথেষ্ট নয়; বরং একদিকে খোদায়ী হেদায়েত ও খোদায়ী সংবিধানেরও প্রয়োজন, যাকে কোরআন বলা হয় এবং অপরদিকে একজন শিক্ষাগুরুও প্রয়োজন যিনি স্বীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে খোদায়ী হেদায়েতে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ, মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষাগুরু হতে পারে। গ্রন্থ কখনও গুরু বা অভিভাবক হতে পারে না—তবে শিক্ষা-দীক্ষায় সহায়ক অবশ্যই হতে পারে।

ইসলামের সূচনা একটি গ্রন্থ ও একজন রসূলের মাধ্যমে হয়েছে। এ দু’য়ের সম্মিলিত শক্তির জগতে একটি সূন্য ও উচ্চস্তরের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনিভাবে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যেও একদিকে পবিত্র শরীয়ত ও অন্যদিকে কৃত্রী পুরুষগণ রয়েছে। কোরআনও নানা স্থানে এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে : ‘হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।’

সমগ্র কোরআনের সারমর্ম হল সূরা ফাতেহ। আর সূরা ফাতেহের সারমর্ম হল সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত। এখানে সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান দিতে গিয়ে কোরআনের পথ, রসূলের পথ অথবা সুন্নাহর পথ বলার পরিবর্তে কিছু খোদাভক্তের সন্ধান দেয়া হয়েছে যে, তাদের কাছ থেকে সিরাতে-মুস্তাকীমের সন্ধান জেনে নাও। বলা হয়েছে :

‘সিরাতে-মুস্তাকীম হল তাদের পথ, যাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে। তাদের পথ নয়, যারা গযবে পতিত ও গোমরাহ।’ অন্য এক জায়গায় নেয়ামত প্রাপ্তদের আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْقِدِّينَ
وَالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ

— এমনিভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)- ও পরবর্তীকালের জন্যে কিছুসংখ্যক লোকের নাম নির্দিষ্ট করে তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে :

— ‘হে মানবজাতি, আমি তোমাদের জন্যে দু’টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। এতদুভয়কে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি আমার সন্তান ও পরিবার-পরিজন। সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে : ‘আমার পরে তোমারা আবু বকর ও ওমরের অনুসরণ করবে।’ অন্য এক হাদীসে আছে, ‘আমার সুনুত ও খোলাফায়ে-রাশেদীনের সুনুত অবলম্বন করা তোমাদের কর্তব্য।’

মোটকথা, কোরআনের উপরোক্ত নির্দেশ ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শিক্ষা থেকে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষের হেদায়েতের জন্যে সর্বকালেই দু’টি বস্তু অপরিহার্য। (১) কোরআনের হেদায়েত এবং (২) তা হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে ও আমলের যোগ্যতা অর্জনের জন্যে শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও আল্লাহ-ভক্তদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এ রীতি শুধু ধর্মীয় শিক্ষার বেলাতেই প্রযোজ্য নয়; বরং যে কোন বিদ্যা ও শাস্ত্র নিখুঁতভাবে অর্জন করতে হলে এ রীতি অপরিহার্য। একদিকে শাস্ত্রসম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি থাকতে হবে এবং অন্যদিকে থাকতে হবে শাস্ত্রবিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। প্রত্যেক শাস্ত্রের উন্নতি ও পূর্ণতার এ দু’টি অবলম্বন থেকে উপকার লাভের ক্ষেত্রে বহু মানুষ ভুল পন্থার আশ্রয় নেয়। ফলে উপকারের পরিবর্তে অপকার এবং মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই ঘটে বেশী।

কেউ কেউ কোরআনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে শুধু ওলামা ও মাশায়েখকেই সবকিছু মনে করে বসে। তারা শরীয়তের অনুসারী কি না, তারও খোজ নেয় না। এ রোগটি আসলে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের থেকেই সংক্রামিত হয়েছে। কোরআন বলে :

إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعْنًا بَلَاءٍ مَنْ دُونَ اللَّهِ

অর্থৎ, ‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ওলামা ও মাশায়েখকে স্বীয় উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে।’ এটা নিঃসন্দেহে শিরক ও কুফরের রাস্তা। লক্ষ

লক্ষ মানুষ এ রাস্তায় বের হয়েছে এবং হচ্ছে। পক্ষান্তরে এমন কিছু লোক রয়েছে; যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা অর্জনের জন্য কোন ওস্তাদ ও অভিভাবকের প্রয়োজনই মনে করে না। তারা বলে : ‘আল্লাহর কিতাব কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট।’ এটাও আরেক পথব্রততা। এর ফল হচ্ছে ধর্মচ্যুত হয়ে মানবীয় প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হওয়া। কেননা, বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ব্যতিরেকে শাস্ত্র অর্জন মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। এরূপ ব্যক্তি অবশ্যই ভুল বোঝাবুঝির শিকারে পরিণত হয়। এ ভুল বোঝাবুঝি কোন কোন সময় তাকে ধর্মচ্যুতও করে দেয়।

কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে :

إِنَّا نَحْنُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

অর্থাৎ, ‘আমিই

কোরআন নাখিল করেছি এবং আমিই এর হেফাযত করব।’

এ ওয়াদার ফলেই কোরআনের প্রতিটি যের ও যবর পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুন্নাহর ভাষা যদিও এভাবে সংরক্ষিত নয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সুন্নাহ্‌এবং হাদীসেরও সংরক্ষিত হওয়া উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে অপরিহার্য। বাস্তবে সুন্নাহ্‌ এবং হাদীসও সংরক্ষিত রয়েছে। যখনই কোন পক্ষ থেকে এতে কোন বাধা সৃষ্টি অথবা মিথ্যা রেওয়াজে সংবিশ্রিত করা হয়েছে, তখনই হাদীস বিশেষজ্ঞরা এগিয়ে এসেছেন এবং দুঃ ও পানিকে পৃথক করে দিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত এ কর্মধারা অব্যাহত থাকবে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমার উম্মতে কেয়ামত পর্যন্ত সত্যপন্থী এমন একদল আলেম থাকবেন, যারা কোরআন ও হাদীসকে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত রাখবেন এবং সকল বাধা-বিপত্তির অবসান ঘটাবেন।

মোটকথা, কোরআন বাস্তবায়নের জন্যে রসুলের শিক্ষা অপরিহার্য। কোরআনের বাস্তবায়ন কেয়ামত পর্যন্ত ফরয। কাজেই রসুলের শিক্ষাও কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকা অবশ্যজ্ঞাবী। অতএব, উল্লেখিত আয়াতে কেয়ামত পর্যন্ত রসুলের শিক্ষা সংরক্ষিত হওয়ারও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একে হাদীস বিশারদ ওলামা ও বিশুদ্ধ গ্রন্থাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত রেখেছেন। সাম্প্রতিককালে কিছু লোক ইসলামী বিধি-বিধান থেকে গা বাঁচানোর উদ্দেশ্যে একটি অভ্যুত্থান আবিষ্কার করেছে যে, হাদীসের বর্তমান ভাণ্ডার সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য নয়। উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের ধর্মদ্রোহিতার স্বরূপই ফুটে উঠেছে। তাদের বোঝা উচিত যে, হাদীসের ভাণ্ডার থেকে আস্থা উঠে গেলে কোরআনের উপরও আস্থা রাখার উপায় থাকে না।

সংশোধনের নিমিত্ত বিশুদ্ধ শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, চারিত্রিক প্রশিক্ষণও আবশ্যিক : পবিত্রকরণকে একটি স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত দান করা হয়েছে যে, শিক্ষা যতই বিশুদ্ধ হোক না কেন, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুকব্বীর অধীন কার্যতঃ প্রশিক্ষণ লাভ না করা পর্যন্ত শুধু শিক্ষা দ্বারাই চরিত্র সংশোধিত হয় না। কারণ, শিক্ষার কাজ হল প্রকৃতপক্ষে সরল ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন। এ কথা সুস্পষ্ট যে, পথ জানা থাকাই গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জন্যে যথেষ্ট নয়। এ জন্যে সাহস করে পা বাড়তে হবে এবং চলতেও হবে। সাহসী বুয়ুগদের সংসর্গ ও আনুগত্য ছাড়া সাহস অর্জিত হয় না। যে সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে শিক্ষা অর্জন করেছেন, শিক্ষার সাথে সাথে তাঁদের আত্মিক পরিশুদ্ধিও সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে তাঁর প্রশিক্ষার্থীনে সাহায্যগণের যে একটি দল তৈরী হয়েছিল, একদিকে তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির

গভীরতা ছিল বিস্ময়কর; বিশ্বের দর্শন তাঁদের সামনে হার মেনেছিল এবং অন্যদিকে তাঁদের আত্মিক পবিত্রতা, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক এবং আল্লাহর উপর ভরসাও ছিল অভাবনীয়। স্বয়ং কোরআন তাদের প্রশংসায় বলে :

‘যারা পয়গম্বরের সঙ্গে রয়েছে, তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পর সদয়। তুমি তাদের রুদু-সেজদা করতে দেখবে। তারা আল্লাহর কৃপা ও সম্ভ্রুতি অনুগ্রহ করে।’

এ কারণেই তাঁরা যে দিকে পা বাড়াতেন, সাফল্য ও কৃতকার্যতা তাঁদের পদচুম্বন করত এবং আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন তাঁদের সাথে থাকত। তাঁদের বিস্ময়কর কীর্তিসমূহ আজও জাতিভিন্ন নির্বিশেষে সবার মস্তিস্ককে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। বলাবাহুল্য, এগুলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেরই ফল। বর্তমান পৃথিবীতে শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের চিন্তা সবাই করেন। কিন্তু শিক্ষার প্রাণ সংশোধনের দিক মোটেই মনোযোগ দেয়া হয় না। অর্থাৎ, শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রদাতার চারিত্রিক সংশোধন এবং সংস্কারক সুলভ প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া হয় না। ফলে হাজারো চেষ্টাযত্নের পরও এমন কৃতী পুরুষের সৃষ্টি হয় না, যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বলিষ্ঠতা অন্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং অন্যকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষকবর্গ যে ধরনের জ্ঞানগরিমা ও চরিত্রের অধিকারী হবেন, তাদের শিক্ষার্থী ছাত্রসমাজও বেশীর চেয়ে বেশী তাদের মতই হতে পারবে। একারণে শিক্ষাকে কল্যাণকর ও উন্নত করতে হলে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন-পরিবর্ধনের চাইতে শিক্ষকদের শিক্ষাগত, কর্মগত ও চরিত্রগত অবস্থার প্রতি অধিক নজর দেয়া আবশ্যিক।

এ পর্যন্ত নবুওয়ত ও রিসালতের তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হল। পরিশেষে সংক্ষেপে আরও জানা প্রয়োজন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর অর্পিত তিনটি কর্তব্য তিনি কতদূর বাস্তবায়িত করেছেন; এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্য কতটুকু হয়েছে? এর জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, তাঁর তিরোধানের সময় সমগ্র আরব উপত্যকার ঘরে ঘরে কোরআন তোলাওয়াত হত। হাজার হাজার হাফেজ ছিলেন। শত শত লোক দৈনিক অথবা প্রতি তৃতীয় দিনে কোরআন খতম করতেন। কোরআন ও হিকমত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

বিশ্বের সমগ্র দর্শন কোরআনের সামনে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল। তওরাত ও ইঞ্জিলের বিকৃত সংকলনসমূহ গম্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছিল, কিন্তু কোরআনের নীতিমালাকে সম্মান ও শিষ্টাচারের মানদণ্ড গণ্য করা হত। অপরদিকে ‘তায়কিয়া’ তথা পবিত্রকরণও চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এককালের দুচ্চরিত্র ব্যক্তিরাও চরিত্র-দর্শনের শ্রেষ্ঠ গুরু আসনে আসীন হয়েছিলেন। চরিত্রহীনতার রোগীরা শুধু রোগমুক্তই হয়নি, সফল চিকিৎসকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। যারা দস্যু ছিল তারা পশুপ্রদর্শক হয়ে গেল। মূর্তিপূজারীরা মূর্তমান ত্যাগ ও সহনভূতি হয়ে গিয়েছিল। কঠোরতা ও যুদ্ধলিপ্সার স্থলে নম্রতা ও পারস্পরিক শান্তি বিরাজমান ছিল। এক সময় ডাকাতিই যাদের পেশা ছিল, তাগাই মানুষের ধন-সম্পদের রক্ষকে পরিণত হয়েছিল।

মোটকথা, হযরত খলীলুল্লাহ (আঃ)-এর দোয়ার ফলে যে তিনটি কর্তব্য রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর অর্পিত হয়েছিল, তাতে তিনি স্বীয় জীবদ্দশায়ই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর সহচরণ এগুলোকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে তথা সারা বিশ্বে স্পষ্টসারিত করে দিয়েছিলেন।

আলাচ্য আয়াতসমূহে সম্মানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের

প্রতি পয়গম্বরগণের বিশেষ মনোযোগের কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ আয়াতে ইবরাহীমী দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর দৌলতেই ইহকাল ও পরকালে ইবরাহীম (আঃ) এর সম্মান লাভের কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এ ধর্ম থেকে বিমুখ হয়, সে নির্বোধদের স্বর্গে বাস করে।

وَمَنْ يُزَيِّدْ عَنْ فِطْرَتِ رَبِّهِ لَإِيْمًا سَفُوءًا كَذِبًا

অর্থঃ, ইবরাহীমী ধর্ম থেকে সে ব্যক্তিই মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, যার বিন্দুমাত্রও বোধশক্তি নেই। কারণ, এ ধর্মটি হুবহু স্বভাব-ধর্ম। কোন সুস্থস্বভাব ব্যক্তি এ ধর্মকে অস্বীকার করতে পারে না। পরবর্তী আয়াতে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এতেই এ ধর্মের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা এ ধর্মের দৌলতেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে ইহকালে সম্মান ও মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং পরকালেও। ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্ম্য সারা বিশ্বই প্রত্যক্ষ করেছে। নমরূদের মত পরাক্রমশালী সম্রাট ও তার পারিষদবর্গ একা এই মহাপুরুষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে এবং সর্বশেষে ভয়াবহ অগ্নিকুন্ডে তাঁকে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু জগতের যাবতীয় উপাদান ও শক্তি যে অসীম ক্ষমতাবানের আজ্ঞাধীন, তিনি নমরূদের সমস্ত পরিকল্পনাকে ধূলিস্মাৎ করে দিলেন। আল্লাহ তাআলা প্রচণ্ড আশুপনকেও তাঁর বন্ধুর জন্যে পুষ্পাদ্যানে পরিণত করে দিলেন। ফলে বিশ্বের সমগ্র জাতি তাঁর অপারিসীম মাহাত্ম্যের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হল। বিশ্বের সমস্ত মুমিন ও কাফির, এমনকি পৌত্তলিকেরাও এ মূর্তিসংহারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে। আরবের মুশরিকরা আর যাই হোক, হযরত ইবরাহীমেরই সন্তান-সন্ততি ছিল। এ কারণে মূর্তিপূজা সত্ত্বেও হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর সম্মান ও মাহাত্ম্য মনে-প্রাণে স্বীকার করত এবং তাঁরই ধর্ম অনুসরণের দাবী করত। ইবরাহীমী ধর্মের কিছু অস্পষ্ট চিহ্ন তাদের কাজে-কর্মেও বিদ্যমান ছিল। ইজু, ওমরা, কেরবানী ও অতিথি পরায়ণতা এ ধর্মেরই নিদর্শন। তবে তাদের মূর্ত্যতার কারণে এগুলো বিকৃত হয়ে পড়েছিল। বলাবাহুল্য, এটা ঐ নেয়ামতেরই ফলশ্রুতি— যার দরুন খলীল্লাহকে (আঃ) ‘মানব নেতা’ উপাধি দেয়া হয়েছিল :

إِنِّي جَاعِلٌكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর ধর্মের অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য ছাড়াও এ ধর্মের জনপ্রিয়তা ও স্বভাবধর্ম হওয়ার বিষয়টি সারা দুনিয়ার সামনে প্রতিভাত হয়ে গেছে। ফলে যার মধ্যে এতটুকুও বোধশক্তি ছিল, সে এ ধর্মের সামনে মাথা নত করেছিল। এই ছিল ইবরাহীম (আঃ) এর ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা। পারলৌকিক ব্যাপারটি আমাদের সামনে উপস্থিত নেই, কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) এর মর্যাদা কোরআনের সে আয়াতেই ফুটে উঠেছে, যাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ইহকালে তাঁকে যেমন সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তেমন পরকালেও তাঁর উচ্চাঙ্গ নির্ধারিত রয়েছে।

ইবরাহীমী ধর্মের মৌলনীতি আল্লাহর আনুগত্য শুধু মাত্র ইসলামেই সীমাবদ্ধ : অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে ইবরাহীমী ধর্মের ইবরাহীমী মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে :

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থঃ, ‘ইবরাহীমকে (আঃ) যখন তাঁর পালনকর্তা বললেন : আনুগত্য অবলম্বন কর, তখন তিনি বললেন : আমি বিশ্বপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম।’ এ বর্ণনা—ভঙ্গিতে একটি বিষয় প্রশিক্ষানযোগ্য। আল্লাহ তাআলার (أَسْلَمَ আনুগত্য অবলম্বন কর।) সম্মোহনের উত্তরে

সম্মোহনেরই ভঙ্গিতে اسلمت لك (আমি আপনার আনুগত্য অবলম্বন করলাম) বলা যেত, কিন্তু হযরত খলীল (আঃ) এ ভঙ্গি ত্যাগ করে বলেছেন, اسلمت لرب العالمين অর্থঃ, আমি বিশ্বপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম। কারণ, প্রথমতঃ এতে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর স্থানোপযোগী গুণকীর্তনও করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়টিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আমি আনুগত্য অবলম্বন করে কারো প্রতি অনুগ্রহ করিনি; বরং এমন করাই ছিল আমার জন্যে অপরিহার্য। কারণ, তিনি রাব্বুল আলামীন তথা সারা জাহানের পালনকর্তা। তাঁর আনুগত্য না করে বিশ্ব তথা বিশ্ববাসীর কোনই গত্যন্তর নেই। যে আনুগত্য অবলম্বন করে, সে স্বীয় কর্তব্য পালন করে লাভবান হয়। এতে আরও জানা যায় যে, ইবরাহীমী ধর্মের মৌলনীতির যথার্থ স্বরূপ ও এক ‘ইসলাম’ শব্দের মধ্যেই নিহিত—যার অর্থ আল্লাহর আনুগত্য। ইবরাহীম (আঃ) এর ধর্মের সারমর্মও তাই। ঐসব পরীক্ষার সারমর্মও তাই, যাতে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর এ দোস্ত মর্যাদার উচ্চস্তর শিখরে পৌঁছেছেন। ইসলাম তথা আল্লাহর আনুগত্যের খাতিরেই সমগ্র সৃষ্টি। এরই জন্যে পয়গম্বরগণ শ্রেণিত হয়েছিলেন এবং আসমানী গ্রন্থসমূহ নাথিল করা হয়েছে। এতে আরও বোঝা যায় যে, ইসলামই সমস্ত পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং একেই কেন্দ্রবিন্দু। হযরত আদাম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত রসূল ইসলামের দিকেই মানুষকে আহবান করেছেন এবং তাঁরা এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে পরিচালনা করেছেন। কোরআন স্পষ্টভাষায় বলেছে :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

‘ইসলামই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অনুশ্রবণ করে, তা কখনও কবুল করা হবে না।’

জগতে পয়গম্বরগণ যত ধর্ম এনেছেন, নিজ নিজ সময়ে সে সবই আল্লাহর কাছে মকবুল ছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে সেসব ধর্মও ছিল ইসলাম—যদিও সেগুলো বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। যেমন, মুসা (আঃ) এর ধর্ম, ইসা (আঃ) এর ধর্ম, তথা ইহুদী ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু সবগুলোর স্বরূপ ছিল ইসলাম, যার মর্ম আল্লাহর আনুগত্য। তবে এ ব্যাপারে ইবরাহীমী ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি নিজ ধর্মের নাম ‘ইসলাম’ রেখেছিলেন এবং স্বীয় উম্মতকে ‘উম্মতে-মুসলিমাহ’ নামে অভিহিত করেছিলেন। তিনি দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

رَبِّانَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَوَنُؤَيِّدُكَ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

অর্থঃ, ‘হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উভয়কে (ইবরাহীম ও ইসমাইলকে) মুসলিম (অর্থঃ, আনুগত্যশীল) কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও এক দলকে আনুগত্যকারী কর।’ হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তানদের প্রতি ওসীয়াত প্রসঙ্গে বলেছেন :

فَلَا تَتَّبِعُوا دِينَ الْإِنْسَانِ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

‘তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া অন্য ধর্মের উপর মতুবরণ করো না।’

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর পর তাঁরই প্রস্তাবক্রমে মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মত এ বিশেষ নাম লাভ করেছে। ফলে এ উম্মতের নাম হয়েছে ‘মুসলমান’। এ উম্মতের ধর্মও ‘মিল্লাতে-ইসলামিয়াহ’ নামে

অভিহিত। কোরআনে বলা হয়েছে :

وَمَلَكًا مِّنْ أَمْرِ إِسْرَائِيلَ وَمَوْلًىٰ لِّدَاوُدَ وَالْأَسْلَمِينَ ۚ وَمِنْ قَبْلِ هَٰذَا

‘— এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনিই ইতিপূর্বে তোমাদের ‘মুসলমান’ নামকরণ করেছেন এবং এতেও (অর্থাৎ, কোরআনেও) এ নামই রাখা হয়েছে।’

ধর্মের কথা বলতে গিয়ে ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং আরবের মুশরিকরাও বলে যে, তারা ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী, কিন্তু এসব তাদের ভুল ধারণা অথবা মিথ্যা দাবী মাত্র। বাস্তবে মুহাম্মদী ধর্মই শেষ যমানায় ইবরাহীমী ধর্ম তথা স্বভাব-ধর্মের অনুরূপ।

মোটকথা, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যত পয়গম্বর আগমন করেছেন এবং যত আসমানী গ্রন্থ ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে ইসলাম তথা, আল্লাহর আনুগত্য। এ আনুগত্যের সারমর্ম হল রিপূর কামনা-বাসনার বিপরীতে আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ ত্যাগ করে হেদায়েতের অনুসরণ।

পরিতাপের বিষয়, আজ ইসলামের নাম উচ্চারণকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমান এ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা ধর্মের নামেও স্বীয় কামনা-বাসনারই অনুসরণ করতে চায়। কোরআন ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যাই তাদের কাছে পছন্দ, যা তাদের কামনা-বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা শরীয়তের পরিচ্ছদকে টেনে ছিন্-বিছিন্ করে নিজেদের কামনার মূর্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করে—যাতে বাহ্যদৃষ্টিতে শরীয়তেরই অনুসরণ করছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কামনারই অনুসরণ।

গাফেলরা জানে না যে, এসব অপকৌশল ও অপব্যাক্যার দ্বারা সৃষ্টিকে প্রতারণিত করা গেলেও স্রষ্টাকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয়; তাঁর জ্ঞান প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। তিনি মনের গোপন ইচ্ছা ও ভেদকে পর্ষস্ত দেখেন ও জানেন। তাঁর কাছে খাঁটি আনুগত্য ছাড়া কোনকিছুই গ্রহণীয় নয়।

এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, ইবরাহীমের ধর্ম বলুন, আর ইসলামই বলুন, তা সমগ্র জাতি বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যেই এক অনন্য নির্দেশনামা। এমতাবস্থায় আয়াতে যে বিশেষভাবে ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আঃ) কর্তৃক সন্তানদের সম্বোধন করার কথা বলা হয়েছে এবং উভয় মহাপুরুষ ওসীয়াতের মাধ্যমে স্বীয় সন্তানদেরকে যে ইসলামে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ কি?

উত্তর এই যে, এতে বুঝা যায় যে, সন্তানের ভালবাসা ও মঙ্গলচিন্তা রেসালত এমনকি বন্ধুত্বের স্তরেরও পরিপন্থী নয়। আল্লাহর বন্ধু যিনি এক সময় পালনকর্তার ইঙ্গিতে স্বীয় আদরের দুলালকে কোরবানী করতে কোমর বেঁধেছিলেন, তিনিই অন্য সময় সন্তানের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্যে তাঁর পালনকর্তার দরবারে দোয়াও করেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় সন্তানকে এমন বিষয় দিয়ে যেতে চান, যা তাঁর দৃষ্টিতে সর্ববৃহৎ নেয়ামত অর্থাৎ, ইসলাম। উল্লেখিত আয়াত

إِذْ حَضَرَ يَاقُوبُ ۚ وَوَضَىٰ لَهُ الْإِسْلَامَ ۚ وَوَضَىٰ لَهُ الْإِسْلَامَ ۚ وَوَضَىٰ لَهُ الْإِسْلَامَ ۚ

الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَدْعُونَ مِنْ بَيْنِي ۖ এর সারমর্মও তাই। পার্থক্য

এতটুকু যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নেয়ামত ও ধন-সম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার ধ্বংসশীল ও নিকট বস্তু নিশ্চয়। অথচ পয়গম্বরগণের দৃষ্টি অনেক উর্ধ্বে। তাঁদের কাছে প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম তথা ইসলাম।

সাধারণ মানুষ মৃত্যুর সময় সন্তানকে বৃহত্তম ধন-সম্পদ দিয়ে যেতে চায়। আজকাল একজন বিপুলশালী ব্যবসায়ী কামনা করে, তার সন্তান মিল-ফ্যাক্টরীর মালিক হোক, আমদানী ও রফতানীর বড় বড় লাইসেন্স লাভ করুক, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স গড়ে তুলুক। একজন চাকুরীজীবী চায়, তার সন্তান উচ্চপদ ও মোটা বেতনে চাকুরী করুক। অপরদিকে একজন শিল্পপতি মনে-প্রাণে কামনা করে, তার সন্তান শিল্পক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করুক। সে সন্তানকে সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ কলা-কৌশল বলে দিতে চায়।

এমনিভাবে পয়গম্বর এবং তাঁদের অনুসারী ওলীগণের সর্ববৃহৎ বাসনা থাকে, যে বস্তুকে তাঁরা সত্যিকার চিরস্থায়ী এবং অক্ষয় সম্পদ মনে করেন, তা সন্তানরাও পুরোপুরিভাবে লাভ করুক। এজন্যেই তাঁরা দোয়া করেন এবং চেষ্টাও করেন। অন্তিম সময়ে এরই জন্য ওসীয়াত করেন।

ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা, সন্তানের জন্য বড় সম্পদ : পয়গম্বরগণের এই বিশেষ আচরণের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্যেও একটি নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, তারা যেভাবে সন্তানদের লালন-পালন ও পার্শ্বি আরা-আয়শের ব্যবস্থা করে, সেভাবে; বরং তার চাইতেও বেশী তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার। মন্দ পথ ও মন্দ কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যিক। এরই মধ্যে সন্তানদের সত্যিকার ভালবাসা ও প্রকৃত শুভেচ্ছা নিহিত। এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, সন্তানকে রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচাবার জন্যে সর্ষশক্তি নিয়োগ করবে, কিন্তু চিরস্থায়ী অগ্নি ও আঘাবের কবল থেকে রক্ষা করার প্রতি দ্রুতচেষ্টাও করবে না। সন্তানের দেহ থেকে কাঁটা বের করার জন্যে সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে বন্দুকের গুলি থেকে রক্ষা করবে না।

পয়গম্বরদের কর্মপদ্ধতি থেকে আরও একটি মৌলিক বিষয় জানা যায় যে, সর্বপ্রথম সন্তানদের মঙ্গলচিন্তা করা এবং এর পর অন্য দিকে মনোযোগ দেয়া পিতা-মাতার কর্তব্য। পিতা-মাতার নিকট থেকে এটাই সন্তানদের প্রাপ্য। এতে দু’টি রহস্য নিহিত রয়েছে— প্রথমতঃ প্রাকৃতিক ও দৈহিক সম্পর্কের কারণে তারা পিতা-মাতার উপদেশ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করবে। অতঃপর সংস্কার প্রচেষ্টায় ও সত্য প্রচারে তারা পিতামাতার সাহায্যকারী হতে পারবে।

দ্বিতীয়তঃ এটাই সত্য প্রচারের সব চাইতে সহজ ও উপযোগী পথ যে, প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনদের সংশোধনের কাজে মনে-প্রাণে আত্মনিয়োগ করবে। এভাবে সত্য প্রচার ও সত্য শিক্ষার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে পরিবারের লোকজনের শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র জাতিরও শিক্ষা হয়ে যায়। এ সংগঠন-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই কোরআন বলেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَشْكُرُونَ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ

— ‘হে মুমিনগণ, নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে আশুন থেকে রক্ষা কর।’

মহানবী (সাঃ) ছিলেন সারা বিশ্বের রসূল। তাঁর হোদায়েত কিয়ামত পর্যন্ত সবার জন্যে ব্যাপক। তাঁকেও সর্বপ্রথম নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ

وَأَنْتُمْ شَرُّ النَّاسِ ۚ وَآخِرُهُمْ ۚ وَآخِرُهُمْ ۚ وَآخِرُهُمْ ۚ

শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। আরও বলা হয়েছেঃ

وَأَمَّا هَٰذَا فَالْقَوْلُ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهِمَا ۚ

নামায পড়ার নির্দেশ দিন এবং নিজের নামায অব্যাহত রাখুন।

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُولُوا الْمَثَلُ لِلَّهِ وَالْآخِرُ
 إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَّا إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ وَأَسْمِعِلْ وَأَسْمِعْ وَيَعْقُوبُ وَ
 الْأَسْبَاطُ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ
 رَبِّهِمْ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ كَانَ
 إِبْرَاهِيمُ إِسْلَامًا مِمَّا آمَنَتْ بِهِ قَبْلُ هَذَا وَأَن تَوَكَّلْ فَإِنَّمَا
 هُمُ فِي شِقَاقٍ مِّمَّنْ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
 صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ
 عِبَادُونَ ۝ قُلْ إِنَّمَا حُجَّتِي إِلَى اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَلَكُمْ
 أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَجْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ خَاشِعُونَ ۝ أَمْ تَقُولُونَ
 إِنَّا إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ وَالْأَسْبَاطُ كَانُوا
 هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ إِنَّا نَعْلَمُ أَوَّلَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِعَاقِلٍ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ
 مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(১৩৫) তারা বলে, তোমরা ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। আপনি বলুন, কখনই নয়; বরং আমরা ইবরাহীমের ধর্মে আছি যাতে বরতা নেই। সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১৩৬) তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী। (১৩৭) এতএব তারা যদি ঈমান আনে, তোমাদের ঈমান আনার মত, তবে তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা ইহকারণেই রহিত। সুতরাং এখন তাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী (১৩৮) আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রং-এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে? আমরা তাঁরই এবাদত করি। (১৩৯) আপনি বলে দিন, তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করছ? অথচ তিনিই আমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। আমাদের জন্যে আমাদের কর্ম, তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম। এবং আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ। (১৪০) অথবা তোমরা কি বলছ যে, নিশ্চয়ই ইবরাহীম, ঈসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁদের সন্তানগণ ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান ছিলেন? আপনি বলে দিন, তোমরা বেশী জান, না আল্লাহ বেশী জানেন? (১৪১) তার চাইতে অত্যাচারী কে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে? আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন। সে সম্প্রদায় অতীত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদের জন্যে এবং তোমরা যা করছ, তা তোমাদের জন্যে। তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না।

মহানবী (সাঃ) সর্বদাই এ নির্দেশ পালন করেছেন।

তৃতীয়তঃ আরও একটি রহস্য এই যে, কোন মতবাদ ও কর্মসূচীতে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন সহযোগী ও সমমনা না হলে সে মতবাদ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ কারণেই প্রাথমিক যুগে মহানবী (সাঃ)-এর প্রচারকার্যের জওয়াবে সাধারণ লোকদের উত্তর ছিল যে, প্রথমে আপনি নিজ পরিবার কোরায়েশকে হিক করে নিন; এরপর আমাদের কাছে আসুন। হযর (সাঃ)-এর পরিবারে যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করল এবং মক্কা বিজয়ের সময় তা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করল, তখন এর প্রতিক্রিয়া কোরাআনের ভাষায় এরূপ প্রকাশ পেল—
 يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا অর্থাৎ, মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে।

আজকাল ধর্মহীনতার যে সয়লাব শুরু হয়েছে, তার বড় কারণ এই যে, পিতামাতা ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী ও ধার্মিক হলেও সন্তানদের ধার্মিক হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করে না। সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টি সন্তানের পার্থিব ও স্বল্পকালীন আরাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা এর ব্যবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি। অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দেই না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তওফীক দিন, যাতে আমরা আখেরাতের চিন্তায় ব্যাপৃত হই এবং নিজের ও সন্তানদের জন্যে ঈমান ও নেক আমলকে সর্ববৃহৎ পুঞ্জ মনে করে তা অর্জনে সচেষ্ট হই।

বাপ-দাদার কৃতকর্মের ফলাফল সন্তানরা ভোগ করবে না :

لَهَا مَا كَسَبَتْ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, বাপ-দাদার সংকর্ম সন্তানদের উপকারে আসে না—যতক্ষণ না তারা নিজেরা সংকর্ম সম্পাদন করবে। এমনিভাবে বাপ-দাদার কুকর্মের শাস্তিও সন্তানরা ভোগ করবে না, যদি তারা সংকর্মশীল হয়। এতে বোঝা যায় যে, মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি সাবালক হওয়ার পূর্বে মারা গেলে পিতা-মাতার কুফর ও শিরকের কারণে তারা শাস্তি ভোগ করবে না। এতে ইহুদীদের সে দাবীও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় যে, আমরা যা ইচ্ছা তা'ই করব, আমাদের বাপ-দাদার সংকর্মের দ্বারা আমাদের মাগফেরাত হয়ে যাবে। কিন্তু তা নয়।

কোরাআন এ বিষয়টি বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে :

“প্রত্যেকের আমলের দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।” অন্য এক দায়াতে আছে : “কিয়ামতের দিন একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে না।” রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন : “হে বনী-হাশেম, এমন যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোক নিজ নিজ সংকর্ম নিয়ে আসবে আর তোমরা আসবে সংকর্ম থেকে উদাসীন হয়ে শুধু বংশ গৌরব নিয়ে এবং আমি বলব যে, আল্লাহর আযাব থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব না। অন্য এক হাদীসে আছে : “আমল যাকে পেছনে ফেলে দেয়, বংশ তাকে এগিয়ে নিতে পারে না।”

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরাআন ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধরকে اسباط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এটা سبط - এর বহুবচন। এর অর্থ গোত্র ও দল। তাদের سبط বলার কারণ এই যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর ঔরসজাত পুত্রদের সংখ্যা ছিল বার জন। পরে প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা এক-একটি গোত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বংশে বিশেষ বরকত দান করেছিলেন। তিনি যখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে মিসরে যান, তখন সন্তান ছিল বার জন। পরে ফেরাউনের সাথে মোকাবলার পর মুসা

(আঃ) যখন মিসর থেকে বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে বের হলেন, তখন তাঁর সাথে ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান হাজার হাজার সদস্যের সমন্বয়ে একটি গোত্র ছিল। তাঁর বংশে আল্লাহ তা'আলা আরও একটি বরকত দান করেছেন এই যে, দশজন নবী ছাড়া সব নবী ও রসূল ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধরের মধ্যেই পয়দা হয়েছেন। বনী-ইসরাঈল ছাড়া অবশিষ্ট পয়গম্বরগণ হলেন, আদম (আঃ)-এর পর হযরত নূহ, শোয়াইব, হুদ, সালেহ, লূত, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, ইসমাঈল ও মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

وَإِنَّمَا يُشِيطُ مَا مَنَعَهُ (যদি তারা তজপ ঈমান আনে, যেরূপ তোমরা ঈমান এনেছ) - সূরা বাক্বারার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ঈমানের স্বরূপ কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতের বর্ণনা সর্গক্ষিপ্ত হলেও তাতে বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। কেননা, 'তোমরা ঈমান এনেছ' বাক্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামকে সম্মুখন করা হয়েছে। আয়াতে তাঁদের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ঈমান হচ্ছে সে রকম ঈমান, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন। যে ঈমান ও বিশ্বাস এ থেকে চুল পরিমাণও ভিন্ন, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

এর ব্যাখ্যা এই যে, যে সব বিষয়ের উপর তাঁরা ঈমান এনেছেন, তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারবে না। তাঁরা যেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ঈমান এনেছেন, তাতেও প্রভেদ থাকতে পারবে না। নিষ্ঠায় পার্থক্য হলে তা 'নিফাক' তথা কপট বিশ্বাসে পর্যবসিত হবে। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ফেরেশতা, নবী-রসূল, আল্লাহর কিতাব ও এ সবার শিক্ষা সমুদ্রে যে ঈমান ও বিশ্বাস রসূলুল্লাহ (সাঃ) অবলম্বন করেছেন, একমাত্র তাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। এ সবার বিপরীত ব্যাখ্যা করা অথবা ভিন্ন অর্থ নেয়া আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ফেরেশতা ও নবী-রসূলগণের যে মর্তবা, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারিত হয়েছে, তা হ্রাস করা অথবা বাড়িয়ে দেওয়াও ঈমানের পরিপন্থী।

এ ব্যাখ্যার ফলে কতিপয় ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ঈমানের ক্রটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা ঈমানের দাবীদার, কিন্তু ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঈমানের মৌখিক দাবী মূর্তিপূজক, মুশরিক, ইহুদী, খ্রীষ্টানরাও করত এবং প্রতিটি যুগে ধর্মভ্রষ্ট বিপখগামীরাও করেছে। যেহেতু আল্লাহ, রসূল, ফেরেশতা, কিয়ামত-দিবস ইত্যাদির প্রতি তাদের ঈমান তেমন নয়, যেমন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঈমান, এ কারণে আল্লাহর কাছে তা খিঁকত ও গ্রহণের অযোগ্য সাব্যস্ত হয়ে যায়।

ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের কোন কোন দল পয়গম্বরদের অবাধ্যতা করেছে। এমনকি কোন কোন পয়গম্বরকে হত্যাও করেছে। পক্ষান্তরে কোন কোন দল পয়গম্বরদের সম্মান ও মহত্ত্ব বৃদ্ধি করতে গিয়ে তাঁদেরকে 'খোদা' অথবা 'খোদার পুত্র' অথবা খোদার সমপর্যায়ে নিয়ে স্থানপন করেছে। এ উভয় প্রকার ক্রটি ও বাড়াবাড়িকেই পথভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। وَبِشَى مَا مَنَعَهُ আয়াতে।

ইসলামী শরীয়তে রসূলের মহত্ত্ব ও ভালবাসা ফরয তথা অপরিহার্য কর্তব্য। এর অবর্তমানে ঈমানই শুদ্ধ হয় না। কিন্তু রসূলকে এলেম, কুদরত ইত্যাদি গুণে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা একান্তই পথভ্রষ্টতা ও শিরক। আজকাল কোন কোন মুসলমান রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 'আলেমুল-গায়েব' 'আল্লাহর মতই সর্বত্র বিজ্ঞান' উপস্থিত ও দর্শক (হাযির ও নাযির) বলেও বিশ্বাস করে। তারা মনে করে যে, এভাবে তারা মহানবী (সাঃ)-এর মহত্ত্ব ও মহব্বত ফুটিয়ে তুলছে। অথচ এটা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশ ও আজীবন সাধনার প্রকাশ্য বিরোধিতা। আলোচ্য আয়াতে এসব মুসলমানের জন্যেও শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহর কাছে মহানবী (সাঃ)-এর মহত্ত্ব ও মহব্বত এতটুকু কাম্য যতটুকু সাহাবায়ে-কেরামের অন্তরে তাঁর প্রতি ছিল। এতে ক্রটি করাও অপরাধ এবং একে বাড়িয়ে দেয়াও বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা।

নবী ও রসূলের যেকোন রকম মনগড়া প্রকারভেদই পথভ্রষ্টতা : এমনিভাবে কোন কোন সম্প্রদায় খতমে নবুওয়ত অস্বীকার করে নতুন নবীর আগমনের পথ খুলে দিতে চেয়েছে। তারা কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা 'খাতামুলনাবীয়েন' (সর্বশেষ নবী)-কে উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধক মনে করে নবী ও রসূলের অনেক মনগড়া প্রকার আবিষ্কার করেছে। এসব প্রকারের নাম রেখেছে 'নবী-যিল্লী' (ছায়া-নবী) 'নবী-বুক্বী' (প্রকাশ্য-নবী) ইত্যাদি। আলোচ্য আয়াতটি তাদের অবিম্যাকারিতা ও পথভ্রষ্টতার মুখোশটিকেও উন্মোচিত করে দিয়েছে। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রসূলগণের উপর যে ঈমান এনেছেন, তাতে 'যিল্লী-বুক্বী' বলে কোন নাম-গন্ধও নেই। সুতরাং এটা পরিস্কার ধর্মদ্রোহিতা।

আখেরাতের উপর ঈমান সম্পর্কে কোন অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় : কিছুসংখ্যক লোকের মস্তিস্ক ও চিন্তা-ভাবনা শুধু বস্তু ও বস্তুবাচক বিষয়াদির মধ্যেই নিমজ্জিত। অদৃশ্যজগত ও পরজগতের বিষয়াদি তাদের মতে অবাস্তব ও অযৌক্তিক। তারা এসব ব্যাপারে নিজে থেকে নানাবিধ ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয় এবং একে দ্বীনের খেদমত বলে মনে করে। তারা এসব জটিল বিষয়কে বোধগম্য করে দিয়েছে বলে মনে করে গর্বও করে। কিন্তু এসব ব্যাখ্যা وَبِشَى مَا مَنَعَهُ উক্তির পরিপন্থী হওয়ার কারণে বাতিল ও অ-গ্রহণযোগ্য। আখেরাতের অবস্থা ও ঘটনাবলী কোরআন ও হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, বিনা দ্বিধায় ও বিনা ব্যাখ্যায় তা বিশ্বাস করাই প্রকৃতপক্ষে ঈমান। হাশরের পুনরুত্থানের পরিবর্তে আত্মিক পুনরুত্থান স্বীকার করা এবং আযাব, সওয়াব, আমল, ওজন ইত্যাদি বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা বর্ণনা করা সবই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণ।

এখলাসের তাৎপর্য وَنَحْنُ لَهُ خَاشِعُونَ বাক্যাটিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। নিষ্ঠা বা এখলাসের অর্থ হযরত সায়ীদ ইবনে হুবারের (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে ধর্মে নিষ্ঠাবান হওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না করা এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যে সংকর্ম করা, মানুষকে দেখানোর জন্যে অথবা মানুষের প্রশংসা অর্জনের জন্যে নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য ১৪২ তম আয়াতে কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে বিরোধিতাকারীদের আপত্তি বর্ণনা করে তার জওয়াব দেয়া হয়েছে। আপত্তি ও জওয়াবের পূর্বে কেবলার স্বরূপ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জেনে নেয়া বাঞ্ছনীয়।

কেবলার শাস্তিক অর্থ মুখ করার দিক। প্রত্যেক এবাদতে মুমিনের মুখ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর দিকেই থাকে। আল্লাহ পবিত্র সত্তা; পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বন্ধন থেকে মুক্ত, তিনি কোন বিশেষ দিকে অবস্থান করেন না। ফলে কোন এবাদতকারী ব্যক্তি যদি যে দিকে ইচ্ছা সেদিকেই মুখ করত কিংবা একই ব্যক্তি এক সময় একদিকে অন্য সময় অন্যদিকে মুখ করত, তবে তাও স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী হতো না।

কিন্তু অপর একটি রহস্যের কারণে সমস্ত এবাদতকারীর মুখ একদিকেই হওয়া উচিত। রহস্যটি এই,— এবাদত বিভিন্ন প্রকার। কিছু এবাদত ব্যক্তিগত, আর কিছু এবাদত সমষ্টিগত। আল্লাহর যিকির, রোযা প্রভৃতি ব্যক্তিগত এবাদত। এগুলো নিজনে গোপনভাবে সম্পাদন করতে হয়। নামায ও হজ্জ সমষ্টিগত এবাদত। এগুলো সংঘবদ্ধভাবে এবং প্রকাশ্যে সম্পাদন করতে হয়। সমষ্টিগত উপাসনার বেলায় উপাসনার সাথে সাথে মুসলমানদের সংঘবদ্ধ জীবনের রীতি-নীতিও শিক্ষা দেয়া লক্ষ্য থাকে। এটা সবারই জানা যে, সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থার প্রধান মৌলনীতি হচ্ছে বহু ব্যক্তি ভিত্তিক ঐক্য ও একাত্মতা। এ ঐক্য যত দৃঢ় ও মজবুত হবে, সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থাও ততই শক্ত ও সুদৃঢ় হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং বিচ্ছিন্নতা উভয়টিই সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থার পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর। এরপর ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু কি হবে, তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে বিভিন্ন যুগের মানুষ বিভিন্ন মত পোষণ করেছে। কোন কোন সম্প্রদায় বংশকে কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে, কেউ দেশ ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে এবং কেউ বর্ষ ও ভাষাকে।

কিন্তু আল্লাহর ধর্ম এবং পয়গম্বরদের শরীয়ত এ সব এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়কে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু করার যোগ্য মনে করেনি। প্রকৃতপক্ষে এসব বিষয় সমগ্র মানবজাতিকে একই কেন্দ্রে সমবেত করতে সমর্থও নয়। বরং চিন্তা করলে দেখা যায়, এ ধরনের ঐক্য প্রকৃতপক্ষে মানব জাতিকে বহু ভাঙা বিভক্ত করে দেয় এবং পারস্পরিক সংঘর্ষ ও মতানৈক্যই সৃষ্টি করে বেশী।

সকল পয়গম্বরের ধর্ম ইসলাম ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের ঐক্যকেই ঐক্যের মানদণ্ড ও কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে এবং কোটি কোটি উপাস্যের উপসনায় বিভক্ত বিশ্বকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্যের প্রতি আহবান জানিয়েছে। বলাবাহুল্য, একমাত্র এ কেন্দ্রবিন্দুতেই পূর্ব ও পশ্চিম, ভূত ও ভবিষ্যতের মানবমণ্ডলী একত্রিত হতে পারে। অতঃপর এ ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের ঐক্যকে বাস্তবে রূপায়ন এবং শক্তিদানের উদ্দেশ্যে তৎসঙ্গে কিছু বাহ্যিক ঐক্যও যোগ করা হয়েছে। কিন্তু এসব বাহ্যিক ঐক্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, ঐক্যের বিষয়বস্তু কার্যগত ও ইচ্ছাশীল হতে হবে— যাতে সমগ্র মানবমণ্ডলী স্বেচ্ছায় তা অবলম্বন করে ঐক্যসূত্রে গ্রহিত হতে পারে। বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ প্রভৃতি ঐচ্ছিক বিষয় নয়। যে ব্যক্তি এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, সে অন্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পারে না। যে ব্যক্তি পাকিস্তানে অথবা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছে, সে বিলেতে অথবা অফ্রিকায় জন্মগ্রহণে সক্ষম নয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণকায়, সে যেমন স্বেচ্ছায়

سَيَقُولُ الشُّعْبَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمُ
الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا آيَةً وَسَطًا لِّتَذَكَّرُوا أَهْلَ
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۖ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي
كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِمَعْلَمٍ مِّن تَجْمِيعِ الرُّسُلِ ۚ وَمِن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
وَأَن كَانَتْ لِكَيْدِكُمُ الْاَعْلَى الَّذِي هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضَيِّعَ أَمْرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَوِّفٌ ۚ وَمَن تَزَيَّ
وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ فَتَتَوَلَّى يَدُكَ قِبَلَهُ يَتَّصِفُ ۚ قَوْلٍ وَهُوَ سَطْرُ
السُّجُودِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَأَنَّ الَّذِي
أُوتِيَ الْكِتَابَ لِيُعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ ۚ وَمِن رَّحْمَةٍ وَاللَّهُ بِعَاقِبِ
يَعْمَلُونَ ۚ وَلَئِن أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ
قِبْلَتِكَ وَمَا نَتَّ بِتَابِعِهِمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِأَعْيُنِهِمْ قِبَلَهُ بَعْضٌ
وَلَئِن أَتَيْتَ أَهْلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ لَمِنَ الْعِلْمِ لَأَنكَ
إِذْ أَلَيْنَ الظُّلُمِينَ ۚ الَّذِينَ أَنَا فِيهِمُ الْكَذِبُ يَصْرِفُونَ أَمْ يَرْفُونَ
أَبْنَاءَهُمْ ۚ وَلَئِن رَّقِيتُمْ بِهِمْ لَيَكُونَنَّ الشَّقَّ ۚ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

(১৪২) এখন নির্বোধেরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের ঐ কেবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? আপনি বলুন : পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান। (১৪৩) এমনভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি— যাতে করে তোমরা সাক্ষাদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল সাক্ষাদাতা হন তোমাদের জন্যে। (১৪৪) আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এভাবেই কেবলা করেছিলাম, যাতে একধা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই এটা কোঠারতর বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ পঞ্চদশদর্শন করেছেন। আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ, মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুণাময়। (১৪৫) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। যারা আহলে-কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এটা ঐ ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ বেখবর নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে যা তারা করে। (১৪৬) যদি আপনি আহলে-কিতাবদের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কেবলা মেনে নেবে না এবং আপনিও তাদের কেবলা মানেন না। তারাও একে অন্যের কেবলা মানে না। যদি আপনি তাদের বাসনার অনুসরণ করেন, সে জ্ঞানলাভের পর, যা আপনার কাছে পৌছেছে, তবে নিশ্চয় আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(১৪৬) আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করে।

শ্রুতকায় হতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে একজন শ্রুতকায় ব্যক্তিও স্বৈচ্ছায় কৃষ্ণকায় হতে পারে না।

এমন বিষয়কে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করা হলে মানবতা শতধা, এমনকি সহস্রধা বিভক্ত হয়ে পড়া অপরিহার্য হয়ে যাবে। এ কারণে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে জড়িত এ সব বিষয়কে ইসলাম পরিপূর্ণ সম্মান দান করলেও, মানব ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হতে দেয়নি। তবে ইসলাম ইচ্ছাধীন বিষয়সমূহে চিন্তাগত ঐক্যের সাথে সাথে কার্যগত ও আকারগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে। এতেও এমন বিষয়কে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা স্বৈচ্ছায় অবলম্বন করা প্রত্যেক পুরুষ-স্ত্রী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে-গামা, ধনী-দরিদ্রের পক্ষে সমান সহজ। কাজেই ইসলামী শরীয়ত সারা বিশ্বের মানুষকে পোশাক, বাসস্থান ও পানাহারের ব্যাপারে কোন এক নিয়মের অধীন করেনি। কারণ, প্রত্যেক দেশের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে প্রয়োজনাদিও ভিন্ন ভিন্ন। এমতাবস্থায় সবাইকে একই ধরনের পোশাক ও ইউনিফর্মের অধীন করে দিলে নানা অসুবিধা দেখা দেবে। যদি ন্যূনতম কোন ইউনিফর্মেরও অধীন করে দেয়া হয়, তাতেও মানবিক সমতার প্রতি অবিচার করা হবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত উৎকৃষ্ট পোশাক ও বস্ত্রের অবমাননা হবে। পক্ষান্তরে আরও বেশী দামের ইউনিফর্মের অধীন করে দেয়া হলে দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এ কারণে ইসলামী শরীয়ত মুসলমানদের জন্যে কোন বিশেষ পোশাক বা ইউনিফর্ম নির্দিষ্ট করেনি, বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব পন্থা ও পোশাক প্রচলিত ছিল, সবগুলো যাচাই করে অপব্যয়, অযথা গর্ব ও বিজাতীয় অনুকরণ-ভিত্তিক পন্থা ও পোশাক-পরিচ্ছদকে নিষিদ্ধ করেছে। অবশিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এমনি বিষয়াদিকে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা ইচ্ছাধীন সহজলভ্য ও সস্তা। উদাহরণতঃ জামা'তের নামাযে কাতারবন্দি হওয়া, ইমামের উঠাবসার পূর্ণ অনুকরণ, হজ্বের সময় পোশাক ও অবস্থানের অভিন্নতা ইত্যাদি।

এমনিভাবে কেবলার ঐক্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহর পবিত্র সত্তা যদিও যাবতীয় দিকের বন্ধন থেকে মুক্ত; তাঁর জন্য সবদিকই সমান, তথাপি নামাযে সমষ্টিগত ঐক্য সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববাসীর মুখমণ্ডল একই দিকে নিবদ্ধ থাকা একটি উত্তম, সহজ ও স্বাভাবিক ঐক্য পদ্ধতি। এতে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের সমগ্র মানবমণ্ডলী সহজেই একত্রিত হতে পারে। এখন সমগ্র বিশ্বের মুখ করার দিক কোনটি হবে এর মীমাংসা মানুষের হাতে ছেড়ে দিলে তাও বিরাট মতানৈক্য এবং কলহের কারণ হয়ে যাবে। একারণে এর মীমাংসা আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়াই বিশেষ। হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেই ফেরেশতাদের দ্বারা কা' বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। আদম ও আদম-সন্তানদের জন্যে সর্বপ্রথম কেবলা কা' বাগহকেই সাব্যস্ত করা হয়। বলা হয়েছে :

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

অর্থাৎ, মানুষের জন্যে সর্বপ্রথম যে গৃহ নির্মিত হয়, তা মকায় অবস্থিত এবং এ গৃহ বিশ্ববাসীর জন্যে হেদায়েত ও বরকতের উৎস।

নামাযে কা'বার দিকে মুখ করাই যথেষ্ট : এখানে একটি ফেকাহ-বিষয়ক সুন্নাহ তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। আয়াতে কা' বা অথবা বায়তুল্লাহ বলার পরিবর্তে 'মসজিদে-হারাম' বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বসবাসকারীদের পক্ষে হুবহু কা' বাগৃহ বরাবর দাঁড়ানো জরুরী নয়, বরং পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের মধ্য থেকে যে দিকটিতে কা' বা অবস্থিত সেদিকে মুখ করলেই যথেষ্ট হবে। তবে যে ব্যক্তি মসজিদে-হারামে উপস্থিত রয়েছে কিংবা নিকটস্থ কোন স্থান বা পাহাড় থেকে কা' বা দেখতে পাচ্ছে, তার পক্ষে এমনভাবে দাঁড়ানো জরুরী যাতে কা' বাগৃহ তার চেহারার বরাবরে থাকে। যদি কা' বাগৃহের কোন অংশ তার চেহারা বরাবরে না পড়ে, তবে তার নামায শুদ্ধ হবে না। কা' বাগৃহ যাদের চোখের সামনে নেই এ বিধান তাদের জন্যে নয়। তারা কা' বাগৃহ কিংবা মসজিদে-হারামের দিকে মুখ করলেই যথেষ্ট।

وسط শব্দের অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়। আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : মহানবী (সাঃ) على شمسٍ وسط - এর ব্যাখ্যা করেছেন।—এর অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট। (কুরতুবী) আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি শ্রেষ্ঠত্ব ও ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত করা হয়েছে। এর ফলে তারা হাশরের ময়দানে একটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে। সকল পয়গম্বরের উম্মতরা তাঁদের হেদায়েত ও প্রচারকার্য অধীকার করে বলতে থাকবে, দুনিয়াতে আমাদের কাছে কোন আসমানী গ্রন্থ পৌঁছেনি এবং কোন পয়গম্বরও আমাদের হেদায়েত করেননি। তখন মুসলিম সম্প্রদায় পয়গম্বরগণের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে উপস্থিত হবে এবং সাক্ষ্য দেবে যে, পয়গম্বরগণ সব যুগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে আনিত হেদায়েত তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্যে তাঁরা সাধ্যমত চেষ্টাও করেছেন। বিবাদী উম্মতরা মুসলিম সম্প্রদায়ের সাক্ষ্য গ্রহণ তুলে বলবে : আমাদের আমলে এই সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আমাদের ব্যাপারাদি তাদের জ্ঞানার কথা নয়, কাজেই আমাদের বিপক্ষে তাদের সাক্ষ্য কেমন করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে ?

মুসলিম সম্প্রদায় এ প্রশ্নের উত্তরে বলবে : নিঃসন্দেহে তখন আমাদের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু আমাদের নিকট তাদের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কিত তথ্যাবলী একজন সত্যবাদী রসূল ও আল্লাহর গ্রন্থ কোরআন সরবরাহ করেছে। আমরাও সে গ্রন্থের উপর ঈমান এনেছি এবং তাদের সরবরাহকৃত তথ্যাবলীকে চাঞ্চল্য দেখার চাইতেও অধিক সত্য মনে করি ; তাই আমাদের সাক্ষ্য সত্য। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) উপস্থাপিত হবেন এবং সাক্ষীদের সমর্থন করে বলবেন : তারা যাকিছু বলেছে, সবই সত্য। আল্লাহর গ্রন্থ এবং আমার শিক্ষার মাধ্যমে তারা এসব তথ্য জানতে পেরেছে।

হাশরের ময়দানে সংঘটিতব্য এ ঘটনার বিবরণ সহীহ বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী ও মুসন'দে-আহমদের একাধিক হাদীসে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করা হয়েছে। তাই এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

মধ্যপন্থার রূপরেখা, তার গুরুত্ব ও কিছু বিবরণ : (১) মধ্যপন্থার অর্থ ও তাৎপর্য কি ? (২) মধ্যপন্থার এত গুরুত্বই বা কেন যে, এর উপরই শ্রেষ্ঠত্বকে নির্ভরশীল করা হয়েছে ? (৩) মুসলিম সম্প্রদায় যে মধ্যপন্থী,

বাস্তবতার নিরিখে এর প্রমাণ কি? ধারাবাহিকভাবে এ তিনটি প্রশ্নের উত্তরঃ

(১) اعتدال (ভারসাম্য)–এর শাব্দিক অর্থ সমান হওয়া। عدل মূল ধাতু থেকে এর উৎপত্তি, আর عدل এর অর্থও সমান হওয়া।

(২) যে গুরুত্বের কারণে ভারসাম্যকে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হয়েছে তা একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বিষয়টি প্রথমে একটি স্থূল উদাহরণ দ্বারা বুঝুন। ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ইত্যাদি যত নতুন ও পুরাতন চিকিৎসা-পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে, সে সবই এ বিষয়ে একমত যে, ‘মেযাজে’র বা স্বভাবের ভারসাম্যের উপরই মানবদেহের সুস্থতা নির্ভরশীল। ভারসাম্যের ত্রুটিই মানবদেহে রোগ-বিকার সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির মূলনীতিই মেজাজ-পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল। এ শাস্ত্র মতে মানবদেহ চারিটি উপাদান—রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল ও পিত্ত দ্বারা গঠিত। এ চারিটি উপাদান থেকে উৎপন্ন চারিটি অবস্থা শৈত্য, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা মানবদেহে বিদ্যমান থাকা জরুরী। এ চারিটি উপাদানের ভারসাম্যই মানবদেহের প্রকৃত সুস্থতা নিশ্চিত করে। পক্ষান্তরে যে কোন একটি উপাদান মেজাজের চাহিদা থেকে বেড়ে অথবা কমে গেলেই তা হবে রোগ-ব্যাধি। চিকিৎসা দ্বারা এর প্রতিকার না করলে এক পর্যায়ে তাই মৃত্যুর কারণ হবে।

এই স্থূল উদাহরণের পর এখন আধ্যাত্মিকতার দিকে আসুন। আধ্যাত্মিকতায় ভারসাম্যের নাম আত্মিক সুস্থতা এবং ভারসাম্যহীনতার নাম আত্মিক ও চারিত্রিক অসুস্থতা। এ অসুস্থতার চিকিৎসা করে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা না হলে পরিণামে আত্মিক মৃত্যু ঘটে। চক্ষুস্থান ব্যক্তি মাত্রই জানে যে, যে উৎকৃষ্টতার কারণে মানুষ সমগ্র সৃষ্টিজীবনের সেরা, তা তার দেহ অথবা দেহের উপাদান অথবা সেগুলোর অবস্থা, তাপ-শৈত্য নয়। কারণ, এসব উপাদান ও অবস্থার ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্যান্য জীব-জন্তুও মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত; বরং তাদের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে এসব উপাদান মানুষের চাইতেও বেশী থাকে।

যে বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ ‘আশরাফুল-মাখলুকাত’ তথা সৃষ্টির সেরা বলে গণ্য হয়েছে, তা নিশ্চিতই তার রক্ত-মাংস চর্ম এবং তাপ-শৈত্যের উর্ধ্বে অন্য কোন বিষয় যা মানুষের মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান—অন্যান্য সৃষ্টিজীবনের মধ্যে ততটুকু নেই। এ বস্তুটি নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করাও কোন সৃষ্টি ও কঠিন কাজ নয়। বলাবাহুল্য, তা হচ্ছে মানুষের আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠা বা পরিপূর্ণতা।

আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠাই যখন মানুষের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি, মানবদেহের মত মানবাত্মাও যখন ভারসাম্য ও ভারসাম্যহীনতার শিকার হয় এবং মানবদেহের সুস্থতা যখন মেজাজ ও উপাদানের ভারসাম্য আর মানবাত্মার সুস্থতা যখন আত্মা ও চরিত্রের ভারসাম্য, তখন কামেল মানব একমাত্র তিনিই হতে পারেন, যিনি দৈহিক ভারসাম্যের সাথে সাথে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যেরও অধিকারী হবেন। এ উভয়বিধ ভারসাম্য সমস্ত পয়গম্বুরকে বিশেষভাবে দান করা হয়েছিল এবং আমাদের রসূল (সাঃ) তা সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ কারণে তিনি সর্বপ্রধান কামেল মানব।

আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বুর প্রেরণ ও গ্রহণ অবতরণের রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলোর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চারিত্রিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা হবে এবং লেন-দেন ও পারস্পারিক আদান-প্রদানে বৈষয়িক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মানদণ্ড নাযিল করা হয়েছে।

মানদণ্ড অর্থ প্রত্যেক পয়গম্বুরের শরীয়ত হতে পারে। শরীয়ত দ্বারা সত্যিকার ভারসাম্য জানা যায় এবং ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, মানবমণ্ডলীকে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করাই পয়গম্বুর ও আসমানী গ্রন্থ প্রেরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য, এটাই মানব মণ্ডলির সুস্থতা।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্বপ্রকার ভারসাম্য নিহিত : মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

وَكُنَّا لَكُمْ جَنَّاتٍ وَوُجَّهًا

অর্থাৎ— আমি তোমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় করেছি। উপরোক্ত বর্ণনা থেকেই অনুমান করা যায় যে, وَجَّهًا শব্দটি উচ্চারণ ও লেখায় একটি সাধারণ শব্দ হলেও তাৎপর্যের দিকে দিয়ে কোন সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তির মধ্যে যত পরাকাষ্ঠা থাকা সম্ভব, সে সবগুলোকে পরিব্যাপ্ত করেছে।

আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী, ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান। যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে এবং পয়গম্বুর ও আসমানী গ্রন্থসমূহ প্রেরিত হয়েছে, তাতে এ সম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ।

কোরআন বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করেছে। সূরা আ’রাফের শেষভাগে এ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَمِنْ خَلْقِنَا لَهُمْ بَأْتِي وَيُؤْتُونَ

অর্থাৎ, আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা সম্পৎ প্রদর্শন করে এবং তদনুযায়ী ন্যায়বিচার করে। এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্য বিধৃত হয়েছে যে, তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আসমানী গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেরাও চলে এবং অন্যদেরকেও চালাবার চেষ্টা করে। কোন ব্যাপারে কলহবিবাদ সৃষ্টি হলে তার মীমাংসাও তারা গ্রন্থের সাহায্যেই করে, যাতে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার কোন আশঙ্কা নেই।

সূরা আল-ইমরানে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ভারসাম্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْتُونَ بِأَلْفٍ

অর্থাৎ, তোমরাই সে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখবে।

অর্থাৎ, মুসলমানরা যেমন সব পয়গম্বুরের শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বুর প্রাপ্ত হয়েছে, সব গ্রন্থের সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত ও পূর্ণতর গ্রন্থ লাভ করেছে, তেমন সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ মেজাজ এবং ভারসাম্যও সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে তারাই সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের সামনে জ্ঞানবিজ্ঞান ও তত্ত্ব-রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করা

হয়েছে। ঈমান, আমল ও খোদাভীতির সমস্ত শাখা-প্রশাখা তাদের ত্যাগের দৌলতে সজীব ও সতেজ হয়ে উঠবে। তারা কোন বিশেষ দেশ ও ভৌগলিক সীমার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না। তাদের কর্মক্ষেত্র হবে সমগ্র বিশ্ব এবং জীবনের সকল শাখায় পরিব্যপ্ত। তাদের অস্তিত্বই অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষা ও তাদের বেহেশতের দ্বারে উপনীত করার কাজে নিবেদিত।

أَشْرَحَ لِلدَّائِرِ বাকাৎশে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়টি গণ মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষা ও উপকারের নিমিত্তই সৃষ্ট। তাদের অভীষ্ট কর্তব্য ও জাতীয় পরিচয় এই যে, তারা মানুষকে সংকাজের দিকে পথ দেখাবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে।

বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় হওয়ার প্রমাণ কি? এখন এ প্রশ্নটি আলোচনাসাপেক্ষ। এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে হলে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র ও কীর্তিসমূহ যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে নমুনাস্বরূপ কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে :

বিশ্বাসের ভারসাম্য : সর্বপ্রথম বিশ্বাসগত ভারসাম্য নিয়েই আলোচনা করা যাক। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা পয়গম্বরগণকে আল্লাহর পুত্র মনে করে তাদের উপাসনা ও আরাধনা করতে শুরু করেছে। যেমন, এক আয়াতে রয়েছে : “ইছদীরা বলেছে, ওযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং খ্রীষ্টানরা বলেছে, মসীহ আল্লাহর পুত্র”। অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অনেকে পয়গম্বরের উপর্যুপরি মো’জেযা দেখা সত্ত্বেও তাদের পয়গম্বর যখন তাদেরকে কোন ন্যায়যুদ্ধে আহবান করেছেন, তখন পরিস্কার বলে দিয়েছে : “আপনি এবং আপনার পালনকর্তাই যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব।” আবার কোথাও পয়গম্বরগণকে স্বয়ং তাদের অনুসারীদের হাতেই নির্যাতিতও হতে দেখা গেছে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা তা নয়। তারা একদিকে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি এমন আনুগত্য ও মহক্বত পোষণ করে যে, এর সামনে জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, ইজ্জত-আবরু সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুষ্ঠিত হয় না। অপরদিকে রসুলকে রসুল এবং আল্লাহকে আল্লাহই মনে করে। এতসব পরাকাষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে তারা আল্লাহর দাস ও রসুল বলেই বিশ্বাস করে এবং মুখে প্রকাশ করে। তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে গিয়েও তারা একটা সীমার ভেতরে থাকে।

কর্ম ও এবাদতের ভারসাম্য : বিশ্বাসের পরই শুরু হয় আমল ও এবাদতের পালা। এক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা শরীয়তের বিধি-বিধানকে কানাকড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, ঘুষ-উৎকোচ নিয়ে আসমানী গ্রন্থকে পরিবর্তন করে অথবা

মিথ্যা ফতোয়া দেয়, বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান পরিবর্তন করে এবং এবাদত থেকে গা ঝাটিয়ে চলে। অপরদিকে তাদের উপাসনালয়সমূহে এমন লোকও দেখা যায়, সংসারধর্ম ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছে। তারা খোদাপ্রদত্ত হালাল নেয়ামত থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখে এবং কষ্ট সহ্য করাকেই সওয়াব ও এবাদত বলে মনে করে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায় একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি জুলুম বলে মনে করে এবং অপরদিকে আল্লাহ ও রসুলের বিধি-বিধানের জন্যে জীবন বিসর্জন দিতেও কৃষ্ঠাবোধ করে না। তারা রোম ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসনের অধিপতি ও মালিক হয়েও বিশুকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ধর্মনীতি ও রাজনীতির মধ্যে কোন বৈরিতা নেই এবং ধর্ম মসজিদ ও খানকায় আবদ্ধ থাকার জন্যে আসেনি ; বরং হাট-ঘাট, মাঠ-ময়দান, অফিস-আদালত এবং মন্ত্রণালয়সমূহে এর সাম্রাজ্য অপ্রতিহত। তাঁরা বাদশাহীর মাঝে ফকিরী এবং ফকিরীর মাঝে বাদশাহী শিক্ষা দিয়েছে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য : এরপর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা মানবাধিকারের প্রতি পরওয়াও করেনি ; ন্যায়-অন্যায়ের তো কোন কথাই নেই। নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাউকে যেতে দেখলে তাকে নিপীড়ণ, হত্যা ও লুণ্ঠন করাকেই বড় কৃতিত্ব মনে করেছে। জটনক বিত্তশালীর চারপাশেই অপরদের উট প্রবেশ করে কিছু ক্ষতিসাধন করায় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায়। এতে কত মানুষ যে নিহত হয়, তার কোন ইয়ত্তা নেই। মহিলাদের মানবাধিকার দান করা তো দূরের কথা, তাদের জীবিত থাকার অনুমতি পর্যন্ত দেয়া হত না। কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবন্ত সমাহিত করার প্রথা এবং কোথাও মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে দাহ করার প্রথা। অপরদিকে এমন নির্বোধ দয়্যার্দারও প্রচলন ছিল যে, পোকা-মাকড় হত্যা করাকেও অবৈধ জ্ঞান করা হত। জীব-হত্যাকে তো দণ্ডনীয় মহাপাপ বলে সাব্যস্ত করা হত। আল্লাহর হালাল করা প্রাণীর গোশত ভক্ষণকে মনে করা হত অন্যায়।

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরীয়ত এসব ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটিয়েছে। তারা একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে ধরেছে। শুধু শান্তি ও সন্ধির সময়ই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক কাজের একটা সীমা নির্ধারণ করেছে, যা লঙ্ঘন করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। নিজ অধিকারের ব্যাপারে ক্ষমা, মার্জনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং অপরদের অধিকার প্রদানে যত্নবান হওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য : এরপর অর্থনীতি বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রেও অপরদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তার ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা। এতে হালাল-হারাম এবং অপরদের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুরবস্থা থেকে চক্ষু বন্ধ করে অধিকতর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকেই সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি মালিকানাধীন অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, উভয় অর্থব্যবস্থার সারমর্মই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপাসনা, ধন-সম্পদকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান করা এবং এরই জন্যে যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত করা।

মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরীয়ত এক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব

অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামী শরীয়ত একদিকে ধন-সম্পদকে জীবনের লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্পদ, ইজ্জত ও কোন পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল রাখেনি ; অপরদিকে সম্পদ বন্টনের নিষ্কলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে যাতে কোন মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ ও সাধারণ ওয়াক্ফের আওতায় রেখেছে। বিশেষ বস্তুর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। হালাল মালের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

সাক্ষ্যদানের জন্যে ন্যায়ানুগ হওয়া শর্ত : $\text{يُؤْتِي الشَّاهِدَ عَلَىٰ$

مُسْلِمٌ মুসলিম সম্প্রদায়কে ভারসাম্যপূর্ণ তথ্য ন্যায়ানুগ করা হয়েছে যাতে তারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়। এতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি আদেল বা ন্যায়ানুগ নয়, সে সাক্ষ্যদানেরও যোগ্য নয়। আদেলের অর্থ সাধারণতঃ ‘নির্ভরযোগ্য’ করা হয়। এর সম্পূর্ণ শর্ত ফেকাহ গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত রয়েছে।

ইজ্জমা শরীয়তের দলীল : ইমাম কুরতুবী বলেন, ইজ্জমা (মুসলিম ঐকমত্য) যে শরীয়তের একটি দলীল, আলোচ্য আয়াতটি তার প্রমাণ। কারণ, আল্লাহ তা’আলা এ সম্প্রদায়কে সাক্ষ্যদাতা সাব্যস্ত করে অপরাপর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে তাদের বক্তব্যকে দলীল করে দিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের ইজ্জমা বা ঐকমত্যও একটি দলীল এবং তা পালন করা ওয়াজিব। সাহাবীগণের ইজ্জমা তাবেয়িগণের জন্যে এবং তাবেয়িগণের ইজ্জমা তাঁদের পরবর্তীদের জন্যে দলীল স্বরূপ।

তফসীরে মাযহরীতে বর্ণিত আছে : এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের যেসব ক্রিয়াকর্ম সর্বসম্মত, তা আল্লাহর কাছে প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয়। কারণ, যদি মনে করা হয় যে, তারা ভ্রান্ত বিষয়ে একমত হয়েছে, তবে তাদের নির্ভরযোগ্য সম্প্রদায় বলার কোন অর্থ থাকে না।

ইমাম জাসাস বলেন : এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক যুগের মুসলমানদের ইজ্জমাই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয়। ‘ইজ্জমা শরীয়তের দলীল’ — এ কথাটি প্রথম শতাব্দী অথবা বিশেষ কোন যুগের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। কারণ, আয়াতে সমগ্র সম্প্রদায়কেই সম্মোদন করা হয়েছে। যারা আয়াত নাযিলের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁরাই শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নন ; বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান আসবে, তারা সবাই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং প্রতি যুগের মুসলমানই ‘আল্লাহর সাক্ষ্যদাতা’। তাদের উক্তি দলীল। তারা কোন ভুল বিষয়ে একমত হতে পারে না।

কা’বা শরীফ সর্বপ্রথম কখন নামাযের কেবলা হয় : হিজরতের পূর্বে মক্কা মোকাররমায় যখন নামায ফরয হয়, তখন কা’বা গৃহই নামাযের জন্যে কেবলা ছিল, না বায়তুল-মোকাদ্দাস ছিল— এ প্রশ্নে সাহাবী ও তাবেয়িগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : ইসলামের শুরু থেকেই কেবলা ছিল বায়তুল-মোকাদ্দাস। হিজরতের পরও ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসই কেবলা ছিল। এরপর কা’বাকে কেবলা করার নির্দেশ আসে। তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় অবস্থানকালে হাজরে-আসওয়াদ ও রোকনে-ইয়ামানীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায

পড়তেন যাতে কা’বা ও বায়তুল-মোকাদ্দাস উভয়টিই সামনে থাকে। মদীনায় পৌঁছার পর এরূপ করা সম্ভবপর ছিল না। তাই তাঁর মনে কেবলা পরিবর্তনের বাসনা দানা বাঁধতে থাকে। — (ইবনে-কাসীর)

অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়িগণ বলেন : মক্কায় নামায ফরয হওয়ার সময় কা’বা গৃহই ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক কেবলা। কেননা, হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) — এর কেবলাও তাই ছিল। মহানবী (সাঃ) মক্কায় অবস্থানকালে কা’বাগৃহের দিকে মুখ করেই নামায পড়তেন। মদীনায় হিজরতের পর তাঁর কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাস সাব্যস্ত হয়। তিনি মদীনায় ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। এরপর প্রথম কেবলা অর্থাৎ, কা’বাগৃহের দিকে মুখ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়।

বনু-সালমার মুসলমানরা যোহর অথবা আসরের নামায থেকেই কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ কার্যকর করে নেন। কিন্তু কেবার মসজিদে এ সংবাদ পরদিন ফজরের নামাযে পৌঁছালে তারাও নামাযের মধ্যেই বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে কা’বার দিকে মুখ করে নেন। — (ইবনে-কাসীর, জাসাস)।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ رِجَالَهُ - এখানে ‘ঈমান’ শব্দ দ্বারা ঈমানের

প্রচলিত অর্থ নেয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধেরা মনে করতে থাকে যে, এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা’আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না।

কোন কোন হাদীসে এবং মনীযীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে নামায। মর্মার্থ এই যে, সাবেক কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যেসব নামায পড়া হয়েছে, আল্লাহ তা’আলা সেগুলো নষ্ট করবেন না ; বরং তা শুদ্ধ ও মকবুল হয়েছে।

সহীহ বোখারীতে ইবনে-আ’যেব (রাঃ) এবং তিরমিযীতে ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কা’বাকে কেবলা করার পর অনেকেই প্রশ্ন করে যে, যেসব মুসলমান ইতিমধ্যেই ইস্তিকাল করেছেন, তাঁরা বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে নামায পড়ে গেছেন— কা’বার দিকে নামায পড়ার সুযোগ পাননি, তাঁদের কি হকে ? এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এতে নামাযকে ‘ঈমান’ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সব নামাযই শুদ্ধ ও গ্রহণীয়। তাদের ব্যাপারে কেবলা পরিবর্তনের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না।

আলোচ্য ১৪৪ তম আয়াতের প্রথম বাক্যে কা’বার প্রতি রসূলুল্লাহ (সাঃ) — এর আকর্ষণ এবং এর বিভিন্ন কারণ বর্ণিত হয়েছে। এসব কারণের মধ্যে কোন বিরোধ নেই — সবই সম্ভবপর। উদাহরণতঃ : মহানবী (সাঃ) ওহী অবতরণ ও নবুওয়ত-প্রাপ্তির পূর্বে স্বীয় স্বভাবগত ঝোঁকে দ্বীনে-ইবরাহীমীর অনুসরণ করতেন। ওহী অবতরণের পর কোরআনও তাঁর শরীয়তকে দ্বীনে-ইবরাহীমীর অনুরূপ বলেই আখ্যা দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) — এর কেবলাও কা’বাই ছিল।

আরও কারণ ছিল এই যে, আরব গোত্রগুলো মৌখিকভাবে হলেও দ্বীনে-ইবরাহীমী স্বীকার করত এবং নিজেদেরকে তার অনুসারী বলে দাবী করত। ফলে কা’বা মুসলমানদের কেবলা হয়ে গেলে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারত। সাবেক কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাস দ্বারা

আহ্লে-কিতাবদের আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু হোল/সতের মাসের অভিজ্ঞতার পর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ, মদীনার ইহুদীরা এর কারণে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে দূরেই সরে যাচ্ছিল।

মোটকথা, কা'বা মুসলমানদের কেবলা সাব্যস্ত হোক—এটাই ছিল মহানবী (সাঃ)—এর আন্তরিক বাসনা। তবে আল্লাহর নৈকট্যশীল পয়গম্বরগণ কোন দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করার অনুমতি আছে বলে, না জানা পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে কোন দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করেন না। এতে বুঝা যায়, যে, মহানবী (সাঃ) এ দোয়া করার অনুমতি পূর্বাঙ্কেই পেয়েছিলেন। এজন্য তিনি কেবলা পরিবর্তনের দোয়া করেছিলেন এবং তা কবুল হবে বলে আশাবাদীও ছিলেন। একারণেই তিনি বারবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখতেন যে, ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছে কিনা। আলোচ্য আয়াতে এ দৃশ্যটি বর্ণনা করার পর প্রথমে দোয়া কবুল করার ওয়াদা করা হয়—**فَلَوْلَيْدَكَ** অর্থাৎ—আমি আপনার চোহরা-মোবারক সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে আপনি পছন্দ করেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ সে দিকে মুখ করার আদেশ নাযিল করা হয়, যথা, **فَوَلِّ وَجْهَكَ** এর বর্ণনা পদ্ধতিটি বিশেষ আনন্দদায়ক। এতে প্রথমে ওয়াদার আনন্দ ও পরে ওয়াদা পূরণের আনন্দ একই সাথে উপভোগ করা যায়।

নামাযে কেবলামুখী হওয়ার মাসআলা : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ রাবুলু আলামীনের কাছে সবদিকিই সমান **قُلْ لِلَّهِ الشَّرْقُ وَالْمَغْرِبُ** পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহরই মালিকানাধীন। কিন্তু উম্মতের স্বার্থে সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যে একটি দিককে কেবলা হিসাবে নির্দিষ্ট করে সবার মাঝে ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তবে এ দিকটি বায়তুল-মোকাদ্দাসও হতে পারত। কিন্তু মহানবী (সাঃ)—এর আন্তরিক বাসনার কারণে কা'বাকে কেবলা সাব্যস্ত করে আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে **فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى الْكَعْبَةِ** অর্থাৎ, 'কা'বার দিকে অথবা বায়তুল্লাহর দিকে মুখ কর' বলার পরিবর্তে **فَوَلِّ وَجْهَكَ إِلَى الْكَعْبَةِ** (অর্থাৎ মসজিদে হারামের দিকে) বলা হয়েছে। এতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

প্রথমতঃ যদিও আসল কেবলা বায়তুল্লাহ তথা কা'বা; কিন্তু কা'বার দিকে মুখ করা সেখান পর্যন্তই সম্ভব, যেখান থেকে তা দৃষ্টিগোচর হয়। যারা সেখান থেকে দূরে এবং কা'বা তাদের দৃষ্টির আগোচরে থাকে, তাঁদের উপরও হুবহু কা'বার দিকে মুখ করার কড়াকড়ি আরোপ করা হলে, তা পালন করা খুবই কঠিন হতো। বিশেষ যন্ত্রপাতি ও অঙ্কের মাধ্যমেও নির্ভুল দিক নির্ণয় করা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে অনিশ্চিত হয়ে পড়তো। অথচ শরীয়ত সহজ-সরল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে বায়তুল্লাহ অথবা কা'বা শব্দের পরিবর্তে মসজিদুল-হারাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

বায়তুল্লাহ অপেক্ষা মসজিদুল হারাম অনেক বেশী স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এ বিস্তৃত স্থানের দিকে মুখ করা দূর-দূরান্তের মানুষের জন্যেও সহজ।

সংক্ষিপ্ত শব্দ **إِلَى**—এর পরিবর্তে **شَطْر** শব্দটি ব্যবহার করায় কেবলার দিকে মুখ করার ব্যাপারটি আরও সহজ হয়ে গেছে। **شَطْر** দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়—বস্তুর অর্ধাংশ ও বস্তুর দিক। আলোচ্য আয়াতে এর অর্থ হচ্ছে বস্তুর দিক। এতে বুঝা যায় যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বা অঞ্চলে বিশেষভাবে মসজিদে-হারামের দিকে মুখ করাও জরুরী নয়; বরং মসজিদে-হারাম যেদিকে অবস্থিত সে দিকের প্রতি মুখ করাই যথেষ্ট।—(বাহরে-মুহীত)

وَأَنَّكَ بِدَارِ الْوَعْدِ—আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে,

খানায়ে-কা'বা কিয়ামত পর্যন্ত আপনার কেলা থাকবে। এতে ইহুদী-নাসারাদের সে মতবাদের খণ্ডন করাই ছিল উদ্দেশ্য যে, মুসলমানদের কেবলার কোন স্থিতি নেই; ইতিপূর্বে তাদের কেবলা ছিল খানায়ে-কা'বা, পরিবর্তিত হয়ে বায়তুল-মোকাদ্দাস হল,

আবার তাও বদলে গিয়ে পুনরায় খানায়ে-কা'বা হলো। আবারও হয়তো বায়তুল-মোকাদ্দাসকেই কেবলা বানিয়ে নেবে।—(বাহরে-মুহীত)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ—এখানে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নিয়ে স্বয়ং

(সাঃ)—কে সম্বোধন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টির দ্বারা উম্মতে-মুহাম্মদীকে অবহিত করাই উদ্দেশ্য যে, উল্লেখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ এতই কঠিন ব্যাপার যে, স্বয়ং রসুলে-করীম (সাঃ)—ও যদি এমনটি করেন, (অবশ্য তা অসম্ভব), তবে তিনিও সীমা লঙ্ঘনকারী বলে সাব্যস্ত হবেন।

১৪৬ নং আয়াতে রসুলে-করীম (সাঃ)—কে রসুল হিসাবে চেনার উদাহরণ সন্তানদের চেনার সাথে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এরা যেমন কোনরকম সন্দেহ-সংশয়হীনভাবে নিজেদের সন্তানদেরকে জানে, তেমনিভাবে তওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত রসুলে করীম (সাঃ)—এর সুসংবাদ, প্রকৃত লক্ষণ ও নির্দেশাবলীর মাধ্যমে তাঁকেও সন্দেহহীনভাবেই চেনে। কিন্তু তাদের যে অস্বীকৃতি তা একান্তভাবেই হঠকারিতা ও বিদ্বেষপ্রসূত।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পরিপূর্ণভাবে চেনার উদাহরণ পিতা-মাতাকে চেনার সাথে না দিয়ে সন্তান-সন্ততিকে চেনার সাথে দেয়া হয়েছে। অথচ মানুষ স্বভাবতঃ পিতা-মাতাকেও অত্যন্ত ভাল করেই জানে। এহেন উদাহরণ দেয়ার কারণ হল এই যে, পিতা-মাতার নিকট সন্তানাদির পরিচয় সন্তানের নিকট পিতা-মাতার পরিচয় অপেক্ষা বহুগুণ বেশী হয়ে থাকে। কারণ, পিতা-মাতা জন্মগত থেকে সন্তান-সন্ততিকে স্বহস্তে লালন-পালন করে। তাদের শরীরের এমন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, যা পিতা-মাতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে পিতা-মাতার গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্তানরা কখনও দেখে না।

[illegible]

(১৪৭) বাস্তব সত্য পেটাই যা তোমার পালনকর্তা বলেন। কাজেই তুমি সন্দ্বিহন হয়ো না। (১৪৮) আর সবার জন্যই রয়েছে কেবলা একেক দিকে, যে দিকে সে মুখ করে (এবাদত করবে)। কাজেই সংকাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাকবে, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব বিষয়ে কৃপামূলী। (১৪৯) আর যে স্থান থেকে তুমি বের হও, নিজের মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও—নিশ্চয়দেবে এটাই হলো তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ব্যস্ত সত্য। বস্তুতঃ তোমার পালনকর্তা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবহিত নন। (১৫০) আর তোমরা যেখান থেকেই বেরিয়ে আস এবং যেখানেই অবস্থান করে সেদিকেই মুখ ফেরাও, যাতেকরে মানুষের জন্য তোমাদের সাথে ঝগড়া করার অবকাশ না থাকে। অবশ্য যারা অবিবেচক, তাদের কথা আলাদা। কাজেই তাদের আপত্তিতে ভীত হয়ো না। আমাকেই ভয় কর। যাতে আমি তোমাদের জন্যে আমার অনুগ্রহসমূহ পূর্ণ করে দেই এবং তাতে যেন তোমরা সরলপথ প্রাপ্ত হও। (১৫১) যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিভাবে ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না। (১৫২) সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ে না। (১৫৩) হে মুমিনগণ! তোমরা ধর্ম ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ্ খৈয়ালদানের সাথে রয়েছেন। (১৫৪) আর যারা আল্লাহ্ রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলা না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। (১৫৫) এবং অবশ্যই আমি তোমাঙ্গিককে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জ্ঞানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুংসবাদ দাও সবারকারীদের— (১৫৬) যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্ র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ বর্ণনার দ্বারা এ কথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, এখানে সন্তানকে শুধু সন্তান হিসাবে চেনাই উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তার পৈতৃক সম্পর্ক ক্ষেত্রবিশেষে সন্দেহজনকও হতে পারে। স্ত্রীর খেয়ানতের দরুন সন্তান তার নিজের নাও হতে পারে। বরং এখানে আকার-অবয়বের পরিচয় জানা হলো উদ্দেশ্য। পুত্র-কন্যা প্রকৃতপক্ষে নিজের হোক বা নাই হোক, কিন্তু মানুষ সন্তান হিসাবে যাকে প্রতিপালন করে, তার আকার-অবয়ব চেনার ব্যাপারে কখনও সন্দেহ হয় না।

আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বলতে গিয়ে
قَوْلَ وَجْهَكَ سُطْرَ السُّجْدِ الْحَرَامِ বাক্যটি তিনবার এবং وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ

فَوَلَوْ اَوْجُوْهُكُمْ سُطْرَةٌ বাক্যটি দু'বার করে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর

একটা সাধারণ কারণ এই যে, কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশটি বিরোধীদের জন্য তো এক হৈ-চৈয়ের ব্যাপার ছিলই, স্বয়ং মুসলমানদের জন্যও তাদের এবাদতের ক্ষেত্রে ছিল একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। কাজেই এই নির্দেশটি যদি যথার্থ তাকীদ ও গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করা না হতো, তাহলে মনের প্রশান্তি অর্জন হয়ত যথেষ্ট সহজ হতো না। আর সেজন্যই নির্দেশটিকে বার বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তদুপরি এতে একরূপ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, কেবলার এই যে পরিবর্তন, এটাই সর্বশেষ পরিবর্তন। এরপর পুনঃপরিবর্তনের আর কোন সম্ভাবনাই নেই। প্রথমবারের নির্দেশঃ

“অতঃপর তুমি তোমার মুখমণ্ডল মসজিদুল-হারামের দিকে ফেরাও এবং যেখানেই তুমি থাক না কেন, এরপর থেকে তুমি তোমার চেহারা সেদিকেই ফেরাবে”, - এ নির্দেশটি মুকীম অবস্থায় থাকার সময়ের। অর্থাৎ, যখন আপনি আপনার স্থায়ী বাসস্থানে অবস্থান করেন, তখন নামাযে মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন। এরপর সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে— وَحُذِّيرُكُمْ مِنْكُمْ নিজের দেশে বা সফরে যেখানেই থাক না কেন, নামাযে বায়তুল্লাহর দিকেই মুখ ফেরাবে, এ নির্দেশ শুধু মসজিদে-নব্বীতে নামায পড়ার বেলাতেই নয়; বরং যেকোন স্থানের লোকেরা নিজ নিজ শহরে যখন নামায পড়বে, তখন তারা মসজিদুল-হারামকেই কেবলা বানিয়ে নামায পড়বে।

এ নির্দেশ দ্বিতীয়বার পুনরুল্লেখ করার পূর্বে **وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ** অর্থাৎ, “যেখানেই তুমি বের হয়ে যাও না কেন” কথাটা যোগ করে বুঝানো হয়েছে যে, নিজ নিজ বাসস্থানে মুকীম থাকা অবস্থায় যেমন তোমরা মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করে নামায পড়বে, তেমনি কোথাও সফরে বের হলেও নামাযের সময় মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করেই দাঁড়াবে।

তৃতীয়বারের পুনরুল্লেখের যৌক্তিকতা বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে বিরেণীরা যাতে কথা বলতে না পারে যে, তওরাত এবং ইঞ্জিলে তো বলা হয়েছিল যে, তওরাত এবং ইঞ্জিলে উল্লেখিত নির্দেশসমূহের মধ্যে আখেরী যমানার প্রতিশ্রুত নবীর কেবলা মসজিদুল-হারাম হওয়ার কথা, কিন্তু এ রসূল (সাঃ) কা'বার পরিবর্তে বায়তুল-মোকদ্দাসকে কেবলা করে নামায পড়ছেন কেন?

وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ شব্দটির আভিধানিক অর্থ

এমন বস্তু, যার দিকে মুখ করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ কেবলা। এক্ষেত্রে হযরত উবাই ইবনে কা'ব—

﴿قُلْ﴾—এর স্থলে قُلْ ও পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে।

তফসীরের ইমামগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই,—প্রত্যেক জাতিই এবাদতের সময় মুখ করার জন্য একটা নির্ধারিত কেবলা চলে আসছে। সে কেবলা আল্লাহর তরফ হতে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, অথবা তারা নিজেরাই তা নির্ধারণ করে নিয়েছে। মোটকথা, এবাদতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিই কোন না কোন দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় আখেরী নবীর উম্মতগণের জন্য যদি কোন একটা বিশেষ দিককে কেবলা নির্ধারণ করে দেয়া হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কি আছে?

এ পর্যন্ত কেবলা পরিবর্তনসংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা হযরত ইবরাহীমের দোয়ার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী (সাঃ)—এর আবির্ভাব। এতে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসুলে করীম (সাঃ)—এর আবির্ভাবে কা'বা নির্মাতার দোয়ারও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তাঁর কেবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছুই নেই।

﴿كَأَنَّهُمْ﴾ —বাক্যে উদাহরণসূচক যে, ‘কাফ’ (ك) বর্ণটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটি ব্যাখ্যা তো উল্লেখিত তফসীরের মাধ্যমেই বুঝা গেছে। এছাড়াও আরেকটি বিশ্লেষণ রয়েছে, যা কুরতুবী গ্রহণ করেছেন। তা হল এই যে, ‘কাফ’—এর সম্পর্ক হল পরবর্তী আয়াত ﴿قُلْ﴾—এর সাথে। অর্থাৎ, আমি যেমন তোমাদের প্রতি কেবলাকে একটি নেয়ামত হিসাবে দান করেছি এবং অতঃপর দ্বিতীয় নেয়ামত দিয়েছি রসুলের আবির্ভাবের মাধ্যমে, তেমনি আল্লাহর যিকিরও আরেকটি নেয়ামত। এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যাতে এসব নেয়ামতের অধিকতর প্রবৃদ্ধি হতে পারে। কুরতুবী বলেন, এখানে ﴿كَأَنَّهُمْ﴾—এর ‘কাফ’টির ব্যবহার ঠিক তেমনি, যেমনটি সূরা আনফালের ﴿كَمَا أَخْرَجْنَا﴾ এবং সূরা হেজরের ﴿كَأَنَّهُمْ عَلَى الْمَقْسِمِ﴾—এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। ﴿قُلْ﴾—এতে ‘যিকির’—এর অর্থ হল স্মরণ করা, যার সম্পর্ক হল অন্তরের সাথে। তবে জিহ্বা যেহেতু অন্তরের মুখপাত্র, কাজেই মুখে স্মরণ করাকেও ‘যিকির’ বলা যায়। এতে বুঝা যায় যে, সে যৌথিক যিকিরই গ্রহণযোগ্য, যার সাথে মনেও আল্লাহর স্মরণ বিদ্যমান থাকবে।

তবে এতদসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন লোক যদি মুখে তসবীহ জপে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার মন যদি অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ, যিকিরে না লাগে, তবুও তা একেবারে ফায়দাহীন নয়। হযরত আবু ওসমান (রাঃ)—এর কাছে জনৈক ভক্ত এমনি অবস্থায় অভিযোগ করেছিল যে, মুখে মুখে যিকির করি বটে, কিন্তু অন্তরে তার কোনই মাধুর্য অনুভব করতে পারি না। তখন তিনি বললেন,—তবুও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর যে, তিনি তোমার একটি অঙ্গ জিহ্বাকে তো অন্তঃস্থ তাঁর যিকিরে নিয়োজিত করেছেন।—(কুরতুবী)

যিকিরের ফযীলত : যিকিরের ফযীলত অসংখ্য। তন্মধ্যে এটাও কম ফযীলত নয় যে, বান্দা যদি আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে আল্লাহ

তাকে স্মরণ করেন। আবু ওসমান মাহদী (রঃ) বলেছেন যে, আমি সে সময়টির কথা জানি, যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের স্মরণ করেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি তা কেমন করে জানতে পারেন? বললেন, তা এজন্যে যে, কোরআন করীমের ওয়াদা অনুসারে যখন কোন মুমিন বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ নিজেও তাকে স্মরণ করেন। কাজেই বিষয়টি জানা সবার জন্যই সহজ যে, আমরা যখন আল্লাহর স্মরণে আত্মনিয়োগ করব, আল্লাহ তা'আলাও আমাদের স্মরণ করবেন।

আর আয়াতের অর্থ হল এই যে, তোমরা যদি আমাকে আমার হুকুমের আনুগত্যের মাধ্যমে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে সওয়াব ও মাগফেরাত দানের মাধ্যমে স্মরণ করব।

হযরত সাদী ইবনে জুবাইর (রঃ) ‘যিকিরুল্লাহ’র তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যিকিরের অর্থই হচ্ছে আনুগত্য এবং নির্দেশ মান্য করা। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে : “যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে আল্লাহর যিকিরই করে না; প্রকাশ্যে যত বেশী নামায এবং তসবীহই সে পাঠ করুক না কেন।”

যিকিরের তাৎপর্য : মুফাস্সের কুরতুবী ইবনে-খোয়াইয়—এর আহ্কামুল কোরআনের বরাত দিয়ে এ সম্পর্কিত একখানা হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে যে, রসুল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে অর্থাৎ, তাঁর হালাল ও হারাম সম্পর্কিত নির্দেশগুলোর অনুসরণ করে, যদি তার নফল নামায—রোযা কিছু কমও হয়, সেই আল্লাহকে স্মরণ করে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে, সে নামায—রোযা, তসবীহ—তাহলীল প্রভৃতি বেশী করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহকে স্মরণ করে না।

হযরত যুন্নুন মিসরী বলেন : “যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহকে স্মরণ করে সে অন্যান্য সব কিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই সবদিক দিয়ে তাকে হেফযত করেন এবং সব কিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন।”

হযরত মু'আয (রাঃ) বলেন : “আল্লাহর আযাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোন আমলই যিকিরুল্লাহর সমান নয়।” হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে—কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,—“বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার চোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি।

ধৈর্য ও নামায যাবতীয় সংকেটের প্রতিকার : اسْتَوْيُوا رُءُوسَكُمْ لِلذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ “ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর,” — এ আয়াতে

বলা হয়েছে যে, মানুষের দুঃখ—কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকেটের নিশ্চিত প্রতিকার দু'টি বিষয়ের মধ্যেই নিহিত। একটি ‘সবর’ বা ধৈর্য এবং অন্যটি ‘নামায’। বর্ণনারীতির মধ্যে اسْتَوْيُوا শব্দটিকে বিশেষ কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার ফলে এখানে যে মর্মার্থ দাঁড়ায় তা এই যে, মানব জাতির যে কোন সংকেট বা সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকারই ধৈর্য ও নামায। যে কোন প্রয়োজনেই এ দু'টি বিষয়ের দ্বারা মানুষ সাহায্য লাভ করতে পারে। তফসীরে মাযহারীতে শব্দ দু'টির ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের তাৎপর্য এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্বতন্ত্রভাবে দু'টি বিষয়েরই তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে।

সবর—এর তাৎপর্য : ‘সবর’ শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযম অবলম্বন ও

নফস-এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ।

কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় ‘সবর’-এর তিনটি শাখা রয়েছে। (এক) নফসকে হারাম এবং না-জায়েয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা (দুই) এবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং (তিন) যে কোন বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ, যে সব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহর বিধান বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর তরফ থেকে প্রতিদিন প্রাপ্তির আশা রাখা। অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোন কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায়, কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয়, তবে, তা ‘সবর’-এর পরিপন্থী নয়। -(ইবনে কাসীর, সাযীদ ইবনে জুবায়ের থেকে)।

‘সবর’-এর উপরোক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সাধারণ মানুষের ধারণায় সাধারণতঃ তৃতীয় শাখাকেই সবর হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রথম দু’টি শাখা যে এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। এমনকি এ দু’টি বিষয়ও যে ‘সবর’-এর অন্তর্ভুক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই। কোরআন-হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী বা ‘সাবের’ সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরোক্ত তিন প্রকারেই ‘সবর’ অবলম্বন করে। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, “ধৈর্যধারণকারীরা কোথায়?” একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেসব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা তিন প্রকারেই সবর করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। এসব লোককে প্রথমেই বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে। ‘ইবনে-কাসীর’ এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে, কোরআনের অন্যত্র —

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَوْمَةٌ مِّنْهَا وَهُمْ عَلَىٰ سَبِيلٍ

অর্থাৎ, সবরকারী বান্দাগণকে তাদের পুস্কার বিনা হিসাবে প্রদান করা হবে— এ আয়াতে সন্দেহেই ইশারা করা হয়েছে।

নামায : মানুষের যাবতীয় সমস্যা ও সংকট দূর করা এবং যাবতীয় প্রয়োজন মোটামোটে ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পছাতি হচ্ছে নামায।

‘সবর’-এর তফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার এবাদতই সবরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এরপরেও নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যে, নামায এমনই একটি এবাদত, যাতে ‘সবর’ তথা ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা বিদ্যমান। কেননা, নামাযের মধ্যে একাধারে যেমন নফস তথা রিপুকে আনুগত্যে বাধ্য রাখা হয়, তেমনি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ, নিষিদ্ধ চিন্তা এমনকি অনেক হালাল ও মোবাহ বিষয় থেকেও সরিয়ে রাখা হয়। সেমতে নিজের ‘নফস’-এর উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সর্বপ্রকার গোনাহ ও অশোভন আচার-আচরণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নিজেকে আল্লাহর এবাদতে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে ‘সবর’-এর যে অনুশীলন করতে হয়, নামাযের মধ্যেই তার একটা পরিপূর্ণ নমুনা ফুটে উঠে।

যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে মুক্তিলাভ করার ব্যাপারে নামাযের একটা বিশেষ ‘তাহীরা’ বা প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ বিশেষ রোগে কোন কোন অস্থী গুল্ম-লতা ও ডাল-শিকড় গলায় ধারণ করায় বা মুখে রাখায় যেমন বিশেষ ফল লক্ষ্য করা যায়, লোহার প্রতি চুম্বকের বিশেষ আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক, কিন্তু

কেন এরূপ হয়, তা যেমন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না, তেমনি বিপদ মুক্তি এবং যাবতীয় প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে নামাযের তাহীরও ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যথাযথ আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করলে যেমন বিপদমুক্তি অবধারিত, তেমনি যেকোন প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারেও এতে সুনিশ্চিত ফল লাভ হয়।

হযুর (সাঃ)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, যখনই তিনি কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখনই নামায আরম্ভ করতেন। আর আল্লাহ তা’আলা সে নামাযের বরকতেই তাঁর যাবতীয় বিপদাপদ দূর করে দিতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে—

إِذَا حَزَبَهُ امْرُؤٌ إِلَى الصَّلَاةِ

অর্থাৎ, মহানবী (সাঃ)-কে যখনই কোন বিষয় চিন্তিত করে তুলত, তখনই তিনি নামায পড়তে শুরু করতেন।

আল্লাহর সান্নিধ্য : নামায এবং ‘সবর’র মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হওয়ার কারণ এই যে, এ দু’পছাযই আল্লাহ তা’আলার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয়। إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ বাক্যের দ্বারা এদিকে ইশারা করা

হয়েছে যে, নামাযী এবং সবরকারিগণের সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য তথা খোদায়ী শক্তির সমাবেশ ঘটে। যেখানে বা যে অবস্থায় বান্দার সাথে আল্লাহর শক্তির সমাবেশ ঘটে, সেখানে দুনিয়ার কোন শক্তি কিংবা কোন সংকটই যে টকিতে পারে না, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না। বান্দা যখন আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মত শক্তি কারও থাকে না। বলাবাহুল্য, মকসুদ হাসিল করা এবং সংকট উত্তরণের নিশ্চিত উপায় একমাত্র আল্লাহর শক্তিতে শক্তিমান হওয়াই হতে পারে।

আলমে-বরখ্ষে নবী এবং শহীদগণের হায়াত : ইসলামী রেওয়াজে মোতাবেক প্রত্যেক মৃতব্যক্তি আলমে-বরখ্ষে বিশেষ ধরনের এক হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের আযাব বা সওয়াব অনুভব করে থাকে। এই জীবন-প্রাপ্তির ব্যাপারে মুমিন-কাফের এবং পুণ্যবান ও গোনাহগারের কোন পার্থক্য নেই। তবে বরখ্ষের এ জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক স্তরে সর্বশ্রেণীর লোকই সমানভাবে শরীক। কিন্তু বিশেষ এক স্তর নবী-রসূল এবং বিশেষ নেকার বান্দাদের জন্য নির্ধারিত। এ স্তরেও অবশ্য বিশেষ পার্থক্য এবং পরস্পরের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

যেসব লোক আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন তাঁদেরকে শহীদ বলা হয়। সাধারণভাবে অবশ্য তাঁদের মৃত বলাও জায়েয। তবে তাঁদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভূক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরখ্ষের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনে অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। তাহল অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাঁদের বেশী অনুভূতি দেয়া হয়। যেমন, মানুষের পায়ের গোঁড়ালী ও হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ, উভয় স্থানেই অনুভূতি থাকে, কিন্তু গোঁড়ালীর তুলনায় আঙ্গুলের অনুভূতি অনেক বেশী তীক্ষ্ণ। তেমনি, সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদগণ বরখ্ষের জীবনে বহুগুণ বেশী অনুভূতি প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এমনকি শহীদদের এ জীবনানুভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জড়দেহেও এসে পৌছে

থাকে। অনেক সময় তাঁদের হাড়-মাংসের দেহ পর্যন্ত মাটিতে বিনষ্ট হয় না, জীবিত মানুষের দেহের মতই অবিকৃত থাকতে দেখা যায়। হাদীসের বর্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে। তবে সাধারণ নিয়মে তাঁদেরকেও মৃতই ধরা হয় এবং তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পদ গুয়ারিসগণের মধ্যে বন্টিত হয়, তাঁদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুনর্বিবাহ করতে পারে।

এ আয়াতের ক্ষেত্রে নবী-রসূলগণ শহীদগণের চাইতেও অনেক বেশী মর্তবার অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁদের পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকার পরও বাহ্যিক হুকুম, আহ্বায়ে তার কিছু প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। যথা, তাঁদের পরিত্যক্ত কোন সম্পদ বন্টন করার রীতি নেই। তাঁদের শত্রুগণ দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারেন না।

মোটকথা, বরষখের এ জীবনে সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হচ্ছেন নবী-রসূলগণ, অতঃপর শহীদগণ এবং তারপর অন্যান্য সাধারণ মৃত ব্যক্তিবর্গ। অবশ্য কোন কোন হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, ওলী-আওলিয়া এবং নেকার বান্দাগণের অনেকেই বরষখের হায়াতের ক্ষেত্রে শহীদগণের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। কেননা, আত্মশুদ্ধির সাধনায় রত অবস্থায় যারা মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের মৃত্যুকেও শহীদে মৃত্যু বলা যায়। ফলে তাঁরাও শহীদগণেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান। আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী নিম্নসন্দেহে অন্যান্য নেকার সালেহগণের তুলনায় শহীদগণের মর্যাদা বেশী।

যদি কোন শহীদের লাশ মাটিতে বিনষ্ট হতে দেখা যায়, তাহলে এমন ধারণা করা যেতে পারে যে, আল্লাহর পথে সে নিহত হয়েছে সত্য, তবে হয় তো নিয়ত বিশুদ্ধ না থাকায় তার সে মৃত্যু যথার্থ শহীদের মৃত্যু হয়নি। কিন্তু এমন কোন শহীদের লাশ যদি মাটির নীচে বিনষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার ব্যাপারে যার নিষ্ঠায় কোন সন্দেহ নেই, তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, তিনি শহীদ নন অথবা কোরআনের আয়াতের মর্মার্থ এখানে টিকছে না। কেননা, মানুষের লাশ যে কেবলমাত্র মাটিতেই বিনষ্ট হয় তাই নয়। অনেক সময় ভূমিস্থ অন্যান্য গাভু কিংবা অন্য কোন কিছু প্রভাবেও জড়দেহ বিনষ্ট হওয়া সম্ভব। নবী-রসূল ও শহীদগণের লাশ মাটিতে ভক্ষণ করে না বলে হাদীসে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে একথা বুঝা যায় না যে, মাটি ছাড়া তাদের লাশ অন্য কোন গাভু কিংবা রাসায়নিক প্রভাবেও বিনষ্ট হতে পারে না।

নবী-রসূলগণের পবিত্র দেহও যে সাধারণ মানব-দেহের মত বিভিন্ন উপকরণের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে একবার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁদের দেহও অস্ত্রের আঘাত কিংবা গুলুধের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবান্বিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, নবী-রসূলগণের মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবনের তুলনায় শহীদগণের মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবন বেশী শক্তিসম্পন্ন হতে পারে না। নবী-রসূলগণের জীবিত দেহে অস্ত্র এবং

অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং মাটির সাথে মিশ্রিত অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ কিংবা অন্য কোন উপাদানের প্রভাবে যদি শহীদে লাশে কোন প্রকার বিকৃতি ঘটে যায়, তবে এর দ্বারা ‘মাটি শহীদে লাশে বিকৃতি ঘটতে পারে না’—এ হাদীসের যথার্থতা বিঘ্নিত হয় না।

সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদের লাশ অধিককাল পর্যন্ত মাটির দ্বারা প্রভাবান্বিত না হওয়ায় তাদের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দু’অবস্থাতেই হতে পারে। প্রথমতঃ চিরকাল জড়দেহ অবিকৃত থাকার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়তঃ অন্যান্যের তুলনায় অনেক বেশীদিন অবিকৃত থাকার মাধ্যমে। যদি বলা হয় যে, তাঁদের দেহও সাধারণ লোকের দেহের তুলনায় আশ্চর্যজনকভাবে বেশীদিন অবিকৃত থাকে এবং হাদীসের দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে, তবে তাও অবাস্তব হবে না। যেহেতু বরষখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পক্ষেস্থিতির মাধ্যমে অনুভব করা যায় না, সেহেতু কোরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে **لَا تُمَيِّتُونَ** (তোমরা বুঝতে পার না,) বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হল এই যে, সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মত অনুভূতি তোমাদের দেয়া হয়নি।

বিপদে ধৈর্যধারণ : **وَإِذَا نَزَلَ بِكَ الْقُرْآنُ فَذَكَرْهُ** আয়াতের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে। কোন বিপদে পতিত হওয়ার আগেই যদি সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়, তবে সে বিপদে ধৈর্যধারণ সহজতর হয়ে যায়। কেননা, হঠাৎ করে বিপদ এসে পড়লে পেরেশানী অনেক বেশী হয়। যেহেতু আল্লাহ তা’আলা সমগ্র উম্মাতকে লক্ষ্য করেই পরীক্ষার কথা বলেছেন, সেহেতু সবার পক্ষেই অনুধাবন করা উচিত যে, এ দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট সহ্য করারই স্থান। সুতরাং এখানে যেসব সম্ভাব্য বিপদ-আপদের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে না করলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হতে পারে। পরীক্ষায় সমগ্র উম্মাত সমষ্টিগতভাবে উত্তীর্ণ হলে পর সমষ্টিগতভাবেই তার পুরস্কার দেয়া হবে; এছাড়াও সবার পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা যতটুকু উত্তীর্ণ হবেন, তাদের ততটুকু বিশেষ মর্যাদাও প্রদান করা হবে।

বিপদে ‘ইন্সালিল্লাহ’ পাঠ করা : আয়াতে সবারকারিগণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা বিপদের সম্মুখীন হলে—‘ইন্সা লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ পাঠ করে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পড়লে যেন এ দোয়াটি পাঠ করে। কেননা, একরূপ বলাতে একাধারে যেমন অসীম সওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি যদি অর্থের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে পাঠ করা হয়, তবে বিপদে আন্তরিক শান্তিলাভ এবং তা থেকে উত্তরণও সহজতর হয়ে যায়।

সাফা মারওয়া দৌড়ানো :

‘সাফা’ এবং ‘মারওয়া’ বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী দু’টি পাহাড়ের নাম। হজ্জ কিংবা ওমরার সময় কা’বা ঘর তওয়াফ করার পর এ দু’টি পাহাড়ের মধ্যে দৌড়াতে হয়। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় ‘সায়ী’। জাহেলিয়াত যুগেও যেহেতু এ সায়ীর রীতি প্রচলিত ছিল এবং তখন এ দু’টি পাহাড়ের মধ্যে কয়েকটি মূর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, এজন্য মুসলমানদের কারো কারো মনে একটা দ্বিধার ভাব জাগ্রত হয়েছিলো যে, বোধহয় এ ‘সায়ী’ জাহেলিয়াত যুগের কোন অনুষ্ঠান এবং ইসলাম যুগে এর অনুসরণ করা হয় তো গোনাহর কাজ।

কোন কোন লোক যেহেতু জাহেলিয়াত যুগে একে একটা অর্থহীন কুসংস্কার বলে মনে করতেন, সেজন্য ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁরা একে জাহেলিয়াত যুগের কুসংস্কার হিসেবেই গণ্য করতে থাকেন। এরূপ সন্দেহের নিরসনকল্পে আল্লাহ পাক যেভাবে বায়তুল্লাহ শরীফের কেবলা হওয়া সম্পর্কিত সমস্ত দ্বিধাদুশ্চর্য অবসান ঘটিয়েছেন, তেমনিভাবে পরবর্তী আয়াতে বায়তুল্লাহ সংশ্লিষ্ট আরো একটি সংশয়ের অপনোদন করে দিয়েছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দ বিশ্লেষণ : شَعِيرَةٌ — এখানে شَعِيرَةٌ শব্দটি شعيرة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন বা নির্দশন। شَعِيرَةٌ — বলতে সেসব আমলকে বুঝায়, যেগুলোকে আল্লাহ তা’আলা দুইনের নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

حج — এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য স্থির করা। কোরআন-সুন্নাহর পরিভাষায় বায়তুল্লাহ শরীফের উদ্দেশ্যে গমন এবং সেখানে বিশেষ সময়ে বিশেষ ধরনের কিছু কর্ম সম্পাদন করাকে বলা হয় হজ্জ।

عمره — শব্দের আভিধানিক অর্থ দর্শন করা। শরীয়তের পরিভাষায়, বায়তুল্লাহ শরীফে হাবির হয়ে তওয়াফ-সায়ী প্রভৃতি বিশেষ ধরনের কয়েকটি এবাদত সম্পাদন করার নামই ওমরা।

‘সায়ী’ ওয়াজিব : হজ্জ, ওমরা এবং সায়ীর বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহর কিতাবসমূহে আলোচিত হয়েছে।

সায়ী’ করা ইমাম আহমদ (রঃ)—এর মতে সুন্নত, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে ফরয, ইমাম আবু হানীফা (রঃ)—এর মতে ওয়াজিব। যদি কোন কারণে তা ছুটে যায়, তবে একটা ছাগল জবাই করে ফাফফারা দিতে হবে।

উপরোক্ত আয়াতের শব্দবিন্যাস থেকে এরূপ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, আয়াতে তো ‘সাফা এবং মারওয়ান মধ্যে সায়ী করাতে গোনাহ হবে না’ বলা হয়েছে। এর দ্বারা বড়জোর এটা একটা মোস্তাহাব কাজ বলে সাব্যস্ত হতে পারে, ওয়াজিব হওয়ার কারণ কি ?

এখানে বুঝা দরকার যে, فَلَا جُنَاحَ (অর্থাৎ, গোনাহ হবে না) কথাটা প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বলা হয়েছে। কেননা, প্রশ্ন ছিল, যেহেতু সাফা ও মারওয়াতে মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল এবং জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা সায়ীর মাধ্যমে সে মূর্তিরই পূজা-অর্চনা করতো, সেহেতু এ কাজটি হারাম হওয়া উচিত। এরূপ প্রশ্নের জবাবেই বলা হয়েছে যে, এতে কোন গোনাহ নেই। আর যেহেতু এটা হযরত ইবরাহীমের প্রবর্তিত সুন্নত, কাজেই কারো কোন বর্বরসুলভ আমল দ্বারা এটা গোনাহর কাজ বলে

(১৫৭) তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত। (১৫৮) নিঃসন্দেহে ‘সাফা’ ও ‘মারওয়া’ আল্লাহ তা’আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা’বা ঘরে হজ্জ বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দু’টিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ তা’আলা অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মূল্য দেবেন। (১৫৯) নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাথিক করেছি মানুষের জন্য, কিভাবেই মধ্য বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও ; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও। (১৬০) তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু। (১৬১) নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহর ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র মানুষের লা নত। (১৬২) এরা চিরকাল এ লা নতের মাঝেই থাকবে। তাদের উপর থেকে আশাব কখনও হালকা করা হবে না এবং এরা বিরামও পাবে না। (১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য, একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই (১৬৪) নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ তা’আলা আকাশ থেকে যে পানি নাথিক করেছেন, তদ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে— নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিশ্বের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।

সাব্যস্ত হতে পারে না। প্রশ্নের জবাবে এরূপ বলাতে এ আমলটি ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী বুঝা যায় না।

এলমে-দ্বীনের প্রকাশ ও প্রচার করা ওয়াজিব এবং গোপন করা হারাম : উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর যে সমস্ত প্রকৃষ্ট হেদায়েত অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে গোপন করা এত কঠিন হারাম ও মহাপাপ, যার জন্য আল্লাহ তা'আলা নিজের লা'নত বা অভিসম্পাত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও অভিসম্পাত করে। এতে কয়েকটি বিষয় জানা যায় :

প্রথমতঃ যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জরুরী, তা গোপন করা হারাম। রসূল-করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন— 'যে লোক দ্বীনের কোন বিধানের বিষয় জানা সত্ত্বেও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।' - হাদীসটি হযরত আবু-হুরায়রা ও আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে ইবনে মাজা রেওয়ায়েত করেছেন।

ফেকাহবিদগণ বলেছেন, এ অভিসম্পাত আরোপিত হবে তখনই, যখন অন্য কোন লোক সেখানে উস্থিত থাকবে না। যদি অন্যান্য আলেম লোকও সেখানে উপস্থিত থাকেন, তবে একথা বলে দেয়া যেতে পারে যে, অন্য কোন আলেমকে জিজ্ঞেস করে নাও।—(কুরতুবী, জাসসাস)

দ্বিতীয়তঃ জানা যায় যে, 'জ্ঞানকে গোপন করার' অভিসম্পাত সে সমস্ত জ্ঞান ও মাসআলা গোপন করার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, যা কোরআন ও সুন্নাহতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে এমন সুন্নাহ ও জটিল মাসআলা সাধারণে প্রকাশ না করাই উত্তম, যদ্বারা সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তখন তা كتمان علم বা জ্ঞানকে গোপন করার হুকুমের আওতায় পড়বে না। উল্লেখিত আয়াতে وَالْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ বাক্যের দ্বারাও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তেমনিভাবে মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যদি সাধারণ মানুষকে এমনসব হাদীস শোনাও যা তারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবে তাদেরকে ফেতনা-ফাসাদেরই সম্মুখীন করবে।—(কুরতুবী)

সহীহ বোধারীতে হযরত আলী (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত রয়েছে, তিনি বলেছেন যে,— 'সাধারণ মানুষের সামনে এলেমের শুধুমাত্র ততটুকু প্রকাশ করবে, যতটুকু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ধারণ করতে পারে। মানুষ আল্লাহ ও রসূলের কথা প্রতিপন্ন করুক; তোমরা কি এমন কামনা কর? কারণ, যেকথা তাদের বোধগম্য নয়, তাতে তাদের মনে নানারকম সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে এবং তাতে করে তারা আল্লাহ ও রসূলের অস্বীকারও করে বসতে পারে।

কোন কোন পাপের জন্য সমগ্র সৃষ্টি লা'নত করে : وَلِلَّهِ يُسَبِّحُ —আয়াতে কোরআনে-করীম লা'নত বা অভিসম্পাতকারীদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেনি। তফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ ও ইকরিমা (রাঃ) বলেছেন, এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের উপর অভিসম্পাত করে থাকে। এমনকি জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। কারণ, তাদের অপকর্মের দরুন সেসব সৃষ্টিরও ক্ষতিসাধিত হয়। হযরত বারাহ ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসেও

তার সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ —এর অর্থ হল সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণশীল সমস্ত জীব।—(কুরতুবী)

কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি লা'নত করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয় যতক্ষণ না তার কাকের অবস্থায় মৃত্যুবরণের বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায় : وَمَا تَوْأَمُّهُ إِلَّا بِسُلَيْمٍ —বাক্যাংশের দ্বারা জাসসাস ও কুরতুবী প্রমুখ উস্তাবন করেছেন যে, যে কাকের কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি লা'নত করা বৈধ নয়। আর আমাদের পক্ষে যেহেতু কারও শেষ পরিণতির (মৃত্যুর) নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোন উপায় নেই, সেহেতু কোন কাকের নাম নিয়ে তার প্রতি লা'নত বা অভিসম্পাত করাও জায়েয নয়। বস্তুতঃ রসূলে করীম (সাঃ) যে সমস্ত কাকের নামোল্লেখ করে লা'নত করেছেন, কুফর অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। অবশ্য সাধারণ কাকের ও জালেমদের প্রতি অনির্দিষ্টভাবে লা'নত করা জায়েয।

এতে একথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, লা'নতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও নাযুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোন কাকের প্রতি লা'নত করা বৈধ নয়, তখন কোন মুসলমান কিংবা কোন জীব-জন্তুর উপর কেমন করে লা'নত করা যেতে পারে? পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ আমাদের নারী সম্প্রদায় একান্ত গাফলতিতে পড়ে আছে। তারা কথায় কথায় নিজদের আপনজনদের প্রতিও অভিসম্পাত বা লা'নত বাক্য ব্যবহার করতে থাকে এবং শুধু লা'নত বাক্য ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট হয় না; বরং তার সমার্থক যে সমস্ত শব্দ জানা থাকে সেগুলোও ব্যবহার করতে কসুর করে না। লা'নতের প্রকৃত অর্থ হল, আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। কাজেই কাউকে 'মরদুদ', 'আল্লাহর অভিশপ্ত' প্রভৃতি শব্দে গালি দেয়াও লা'নতেরই সমপর্যায়ভূক্ত।

আরবের মুশরিকরা যখন নিজদের বিশ্বাসের পরিপন্থী আয়াত وَالْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ শুনল, তখন বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, সারা বিশ্বেই কি একজন মাত্র উপাস্য হতে পারে? যদি এ দাবী যথার্থ হয়ে থাকে, তবে তার কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তারই প্রমাণ পেশ করেছেন আলোচ্য আয়াতে।

তওহীদের মর্মার্থ : وَالْأَنْبِيَاءُ وَالرُّسُلُ বিভিন্নভাবেই আল্লাহ তাআলার তওহীদ বা একত্ববাদ সপ্রমাণিত রয়েছে। উদাহরণতঃ তিনি একক, সমগ্র বিশ্বে না আছে তাঁর তুলনা, না আছে কোন সমকক্ষ। সুতরাং একক উপাস্য হওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।

দ্বিতীয়তঃ উপাস্য হওয়ার অধিকারেও তিনি একক। অর্থাৎ, তাঁকে ছাড়া অন্য আর কেউই এবাদতের যোগ্য নয়।

তৃতীয়তঃ সত্তার দিক দিয়েও তিনি একক। অর্থাৎ অশ্লী-বিশিষ্ট নন। তিনি অশ্লী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র। তাঁর বিভক্তি কিংবা ব্যবচ্ছেদ হতে পারে না।

চতুর্থতঃ তিনি তাঁর আদি ও অনন্ত সত্তার দিক দিয়েও একক। তিনি তখনও বিদ্যমান ছিলেন, যখন অন্য কোন কিছুই ছিল না এবং তখনও বিদ্যমান থাকবেন যখন কোন কিছুই থাকবে না। অতএব, তিনিই একমাত্র

সত্তা যাকে وَاحِدٌ বা ‘এক’ বলা যেতে পারে। وَاحِدٌ শব্দটিতে উল্লেখিত যাবতীয় দিকের একত্বই বিদ্যমান রয়েছে।— (জাসাসাস)

তারপর আল্লাহ তা’আলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা জ্ঞানী-নিজ্ঞান নির্বিশেষে যে কেউই বুঝতে পারে। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরচরিত বিবর্তন তাঁরই ক্ষমতার পরিপূর্ণতা ও একত্ববাদের প্রকৃত প্রমাণ।

তেমনিভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। পানিকে আল্লাহ তা’আলা এমন এক তরল পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, একান্ত তরল ও প্রবাহমান হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ ওজনবিশিষ্ট বিশালকায় জাহাজ বিরাট ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে। তদুপরি এগুলোকে গতিশীল করে তোলার জন্য বাতাসের গতি ও নিত্যন্ত রহস্যপূর্ণভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভূতি বিষয়ও এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পেছনে এক মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞান সত্তা বিদ্যমান। পানীয় পদার্থগুলো তরল না হলে যেমন এ কাজটি সম্ভব হতো না, তেমনি বাতাসের মাঝে গতি সৃষ্টি না হলেও জাহাজ চলতে পারতো না; এগুলোর পক্ষে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করাও সম্ভব হতো না। এ বিষয়টিই কোরআনে-হাকীম এভাবে উল্লেখ করেছে:

إِنِّي أَنزَلْنَاهُ فِطْرًا فَلْيَنْظُرْنَ رَوَادِكُمْ عَلَى ظُهُورِهِ

অর্থাৎ, “আল্লাহ ইচ্ছা করলে বাতাসের গতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন এবং তখন এ সমস্ত জাহাজ সাগর পৃষ্ঠে ঠায় দাঁড়িয়ে যাবে।”

بَيِّنَاتٍ لِّلنَّاسِ

শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এক দেশের মালামাল অন্য দেশে আমদানী-রফতানী করার মাঝেও মানুষের এত বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা গণনাও করা যায় না। আর এ উপকারিতার ভিত্তিতেই যুগে-যুগে, দেশে-দেশে নতুন নতুন বাণিজ্যপন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে।

এমনিভাবে আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, যাতে কোনকিছুর ক্ষতিসাধিত না হয়। যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আসত, তাহলে কোন মানুষ, জীব-জন্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই থাকত না। অতঃপর পানি বর্ষণের পর ভূ-পৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার ছিল না। যদি তাদেরকে বলা হতো, তোমাদের সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ছ’মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথকভাবে কি সে ব্যবস্থা করতে পারত? আর কোনক্রমে রেখে দিলেও সেগুলোকে পচন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে কেমন করে রক্ষা করত? কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল-আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে:

فَأَسْكَنْتُ فِي الزَّكِيِّ وَأَنَا عَلَى ذُنُوبٍ لَّعَنُونَ

অর্থাৎ, “আমি পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছি, যদিও বৃষ্টির পানি পড়ার পর তাকে প্রবাহিত করেই নিঃশেষ করে দেয়ার ক্ষমতা আমার ছিল।”

কিন্তু আল্লাহ তা’আলা পানিকে বিশ্ববাসী মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য কোথাও উন্মুক্ত খাদ-খন্দে সংরক্ষিত করেছেন, আবার কোথাও ভূমিতে বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। তারপর এমন এক ক্ষণস্থায়ী সমগ্র যমীনে বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যে কোনখানে খনন করে পানি বের করে নিতে পারে। আবার এই পানিরই একটা অংশকে জমাট বাঁধা সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় চাপিয়ে দিয়েছেন যা পতিত কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একান্ত সংরক্ষিত; অথচ ধীরে ধীরে গলে প্রাকৃতিক বর্ণাধারার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সারকথা, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা’আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের বর্ণনার মাধ্যমে তওহীদ বা একত্ববাদই প্রমাণ করা হয়েছে।

البقرة ২

২৭

سيقول ২

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দ বিশ্লেষণ : حَلَّ - خَلَّاطِيًا শব্দের প্রকৃত অর্থ হল গিঠ

খোলা। যেসব বস্তু-সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল বা বৈধ করে দেয়া হয়েছে, তাতে যেন একটা গিঠই খুলে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর থেকে বাধ্যবাধকতা সরিয়ে নেয়া হয়েছে। হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল- (১) হালাল খাওয়া, (২) ফরয আদায় করা এবং (৩) রসুল করীম (সাঃ)-এর সুন্নতসমূহের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। طيب শব্দের অর্থ পবিত্র। শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল এবং মানসিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় সমস্ত বস্তু-সামগ্রীও এরই অন্তর্ভুক্ত।

خطوة (খুতওয়াত) خطوة (খুতওয়াতুন) -এর বহুবচন। خطوة বলা হয় পায়ের দুই ধাপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে। সুতরাং خطوت الشيطان -এর অর্থ হচ্ছে শয়তানী কাজকর্ম।

يا شؤء والفحشاء -এর অর্থ হল শয়তানী কাজকর্ম। يا شؤء والفحشاء -এর অর্থ হল শয়তানী কাজকর্ম। يا شؤء والفحشاء -এর অর্থ হল শয়তানী কাজকর্ম।

হচ্ছে মনের মাঝে গুণ্ডগায়সা বা সন্দেহের উদ্ভব করা। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- আদম-সন্তানদের অন্তরে একাধারে শয়তানী প্রভাব এবং ফেরেশতার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। শয়তানী গুণ্ডগায়সার প্রভাবে অসৎ কাজের কল্যাণ এবং উপকারিতাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং তাতে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথগুলো উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের এলহামের প্রভাবে সৎ ও নেক কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে কল্যাণ ও পুরস্কার দানের ওয়াদা করেছেন, সেগুলোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সত্য ও সঠিক পথে চলতে গিয়ে অন্তরে শান্তি লাভ হয়।

এ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষের অঙ্ক অনুকরণ-অনুসরণের যেমন নিন্দা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্যে কতিপয় শর্ত এবং একটা নীতিও জানা যাচ্ছে। যেমন, দু'টি শব্দে বলা হয়েছে لَا يَتَّبِدُونَ এবং لَا يَتَّبِدُونَ এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাপ-দাদা পূর্ব-পুরুষদের আনুগত্য ও অনুসরণ এ জন্য নিষিদ্ধ যে, তাদের মধ্যে না ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি, না ছিল কোন খোদায়ী হেদায়েত। হেদায়েত বলতে সে সমস্ত বিধি-বিধানকে বোঝায়, যা পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে। আর জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে সে সমস্ত বিষয়কে বোঝানো হয়েছে, যা শরীয়তের প্রকৃষ্ট 'নহ' বা নির্দেশ থেকে গবেষণা করে বের করা হয়।

অতএব, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি সাব্যস্ত হল এই যে, তাদের কাছে না আছে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কোন বিধি বিধান, না আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বাণীর পর্যালোচনা-গবেষণা করে তা থেকে বিধি-বিধান বের করে নেয়ার মত কোন যোগ্যতা। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন আলমের

(১৬৫) আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হ'ত যদি এ জ্বালেমরা পার্শ্বি কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর। (১৬৬) অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক (১৬৭) এবং অনুসারীরা বলবে, কতইনা ভাল হ'ত, যদি আমাদেরকে পার্শ্বিতে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হ'ত। তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতাপ করার জন্যে। অথচ, তারা কস্টিনকালেও আশুন থেকে বের হ'ত পারবে না। (১৬৮) যে মানবমণ্ডলী, পার্শ্বীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৬৯) সে তো এ নির্দেশই তোমাদিগকে দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক এবং আল্লাহর প্রতি এমনসব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর যা তোমরা জান না। (১৭০) আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে ক্বুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও। (১৭১) বস্তুতঃ এহেন কাকেরদের উদাহরণ এমন, যেন কেউ এমন কোন জীবকে আহ্বান করছে যা কোন কিছুই শোনে না, হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া-বহির মুক, এবং অন্ধ। সুতরাং তারা কিছুই বোঝে না। (১৭২) যে ঈমানদাগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুখী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহর, যদি তোমরা তাঁরই বন্দগী কর।

ব্যাপারে এমন নিশ্চিত বিশ্বাস হলে যে, কোরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের সাথে সাথে তাঁর মধ্যে একতাহাদ (উদ্ভাবন)-এর যোগ্যতাও রয়েছে, তবে এমন মুজতাহেদ আলেমের আনুগত্য-অনুসরণ করা জায়েয। অবশ্য এ আনুগত্য তাঁর ব্যক্তিগত হুকুম মানার জন্যে নয়, বরং আল্লাহর এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মানার জন্যেই হতে হবে। যেহেতু আমরা সরাসরি আল্লাহর সম্পর্কে ওয়াক্ফহাল হতে পারি না, সেহেতু কোন মুজতাহেদ আলেমের অনুসরণ করি, যাতকরে আল্লাহর বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করা যায়।

অন্ধ অনুসরণ এবং মুজতাহেদ ইমামগণের অনুসরণের মধ্যে পার্থক্য : উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা সাধারণভাবে মুজতাহেদ ইমামদের অনুসরণের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি উদ্ধৃত করেন, তারা নিজেরাই এ আয়াতের আসল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ওয়াক্ফহাল নন।

এ আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, এ আয়াতে যে পূর্ব-পুরুষের আনুগত্য ও অনুসরণের কথা নিষেধ করা হয়েছে, তার প্রকৃত মর্ম হল ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষের অনুসরণ। যথার্থ ও সঠিক বিশ্বাস এবং সংকর্মে তাদের অনুসরণ করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, সূরা ইউসুফে হযরত ইউনুস (আঃ)-এর সৎলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ দু'টি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে :

—‘আমি সে জাতির ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে না এবং যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে আমি অনুসরণ করেছি আমাদের পিতা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ)-এর ধর্মবিশ্বাসের।’

এ আয়াতের দ্বারা প্রকটভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয়ে বাপ-দাদাদের অনুসরণ করা হারাম, কিন্তু বৈধ ও সংকর্মের বেলায় তা জায়েয; বরং প্রশংসনীয়।

ইমাম কুরতুবী এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজতাহেদ ইমামগণের

আনুগত্য ও অনুসরণ সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল এবং অন্যান্য বিধি-বিধানেরও উল্লেখ করেছেন।

হালাল খাওয়ার বরকত ও হারাম খাদ্যের অকল্যাণ : আলোচ্য আয়াতে যেমন হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুক্কিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কারণ, হারাম খেলে যেমন মন্দ অভ্যাস ও অসচ্চরিত্রতা সৃষ্টি হয়, এবাদতের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং দোয়া কবুল হয় না, তেমনিভাবে হালাল খানায় অন্তরে এক প্রকার নূর সৃষ্টি হয়। তদ্বারা অন্যান্য-অসচ্চরিত্রতার প্রতি ঘৃণাবোধ এবং সততা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়; এবাদত-বন্দেগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে, পাপের কাজে মনে ভয় আসে এবং দোয়া কবুল হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী-রসূলগণের প্রতি হেদায়েত করেছেন যে -

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

‘হে আমার রসূলগণ! তোমরা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর।’

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দোয়া কবুল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার আশঙ্কাই থাকে বেশী। রসূল (সাঃ)-এরশাদ করেছেন,— বহু লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে বলতে থাকে, ইয়া পরওয়ারদেগার! ইয়া রব! কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় তার দোয়া কি করে কবুল হতে পারে? - (মুসলিম, তিরমিযী, - ইবনে-কাসীর-এর বরাতে)

জন্তকে খাওয়ানোও জায়েয নয়। বরং সেগুলো এমন কোন স্থানে ফেলে দিতে হবে, যেন কুকুর-বিড়ালে খেয়ে ফেলে। নিজ হাতে উঠিয়ে কুকুর-বিড়ালকে খাওয়ানোও জায়েয হবে না।— (জাসাস, কুরতুবী)

মাসআলাঃ ‘মৃত’ শব্দটির অন্য কোন বিশেষণ ছাড়া সাধারণভাবে ব্যবহার করতে প্রতীয়মান হয় যে, হারামের হুকুমও ব্যাপক এবং তন্মধ্যে মৃত জন্তুর সমুদয় অংশই शामिल। কিন্তু অন্য এক আয়াতে **عَلَى طَائِفَةٍ** শব্দ দ্বারা এ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে।

গতে বুঝা যায় যে, মৃত জন্তুর শুধু সে অংশই হারাম যেটুকু খাওয়ার গায়া। সুতরাং মৃত জন্তুর হাড়, পশম প্রভৃতি যেসব অংশ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলো ব্যবহার করা হারাম নয়; সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা, কোরআনের অন্য এক আয়াতে আছেঃ

وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَكْثَاكًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

এতে হালাল জানোয়ারসমূহের পশম প্রভৃতির দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে যবেহ করার শর্ত আরোপ করা হয়নি।— (জাসাস)

চামড়ার মধ্যে যেহেতু রক্ত প্রভৃতি নাপাকীর সংমিশ্রণ থাকে, সেজন্য জানোয়ারের চামড়া শুকিয়ে পাকা না করা পর্যন্ত নাপাক এবং বাবহার হারাম। কিন্তু পাকা করে নেয়ার পর ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েয। সহীহ মুসলীমে এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।— (জাসাস)

মাসআলাঃ মৃত জানোয়ারের চর্বি এবং তদ্বারা তৈরী যাবতীয় স্তন্যগ্রন্থী হারাম। এসবের ব্যবহার কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। এমনকি এসবের ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম।

রক্তঃ আলোচ্য আয়াতে যেসব বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করা হয়েছে, তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে রক্ত। এ আয়াতে শুধু রক্ত উল্লেখিত হলেও সূরা আলেমের এক আয়াতে **أَوْ دَمًا مُّسْكُونًا** অর্থাৎ ‘প্রবাহমান রক্ত’ বর্ণিত রয়েছে। রক্তের সাথে ‘প্রবাহমান’ শব্দ সংযুক্ত করার ফলে শুধু রক্তকেই হারাম করা হয়েছে, যা যবেহ করলে বা কেটে গেলে প্রবাহিত হয়। এ কারণেই কলিজা-যকৃৎ প্রভৃতি জমাট ঝাড়া রক্তে গঠিত প্রত্যঙ্গ ফেকাহবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী পাক ও হালাল।

মাসআলাঃ যেহেতু শুধুমাত্র প্রবাহমান রক্তই হারাম ও নাপাক, তাই যবেহ করা জন্তুর গোশতের সাথে রক্তের যে অংশ জমাট বেঁধে যায়, সেটুকু হালাল ও পাক। ফেকাহবিদ সাহাবী ও তাবয়ীসহ আরো সমাজ এ ব্যাপারে একমত। একই কারণে মশা-মাছি ও পোকার রক্ত নাপাক নয়। তবে যদি রক্ত বেশী হয় এবং ছড়িয়ে যায়, তা হলে শুয়ে ফেলা উচিত।— (জাসাস)

মাসআলাঃ রক্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোন উপায়ে তা খাওয়াও হারাম। অন্যান্য নাপাক রক্তের ন্যায় রক্তের ক্রয়-বিক্রয় তদ্বারা অর্জিত লাভালাভ ও হারাম। কেননা, কোরআনের আয়াতে **وَمِنْ أَشْيَاءِ الْحَرَامَاتِ ذَرْبُ الْأَعْيَانِ** শব্দটি অন্য কোন বিশেষণ ব্যতীতই ব্যবহৃত হওয়ার কারণে রক্ত খাওয়া বা বুঝা, তার সম্পূর্ণটিই হারাম প্রতিপন্ন হয়ে গেছে।

কপীর গায়ে অন্যের রক্ত দেয়ার মাসআলাঃ এই মাসআলার মূল নিয়মঃ রক্ত মানুষের শরীরের অংশ। শরীর থেকে বের করে

নেওয়ার পর তা নাপাক। তদনুসারে প্রকৃত প্রস্তাবে একজনের রক্ত অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করানো দু’কারণে হারাম হওয়া উচিত, প্রথমতঃ মানুষের যেকোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্মানিত এবং আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত। শরীর থেকে পৃথক করে নিয়ে তা অন্যর সংযোজন করা সে সম্মান ও সংরক্ষণ বিধানের পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ এ কারণে যে, রক্ত ‘নাজাসাতে-গলীয়া’ বা জঘন্য ধরনের নাপাকী। আর নাপাক বস্তুর ব্যবহার জায়েয নয়।

তবে নিরুপায় অবস্থায় এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ রক্ত যদিও মানুষের শরীরেরই অংশ, তথাপি এটা অন্য মানুষের শরীরে স্থানান্তরিত করার জন্য যার রক্ত, তার শরীরে কোন প্রকার কাটা-ছেঁড়ার প্রয়োজন হয় না,— কোন অঙ্গ কেটে পৃথক করতে হয় না। সুই-এর মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে রক্ত বের করে অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। তদনুসারে রক্তকে দুধের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যা অঙ্গ কর্তন ব্যতিরেকেই একজনের শরীর থেকে বের হয়ে অন্যের শরীরের অংশে পরিণত হতে থাকে। শিশুর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করেই ইসলামী শরীয়ত মানুষের দুধকে শিশু খাদ্য হিসাবে নির্ধারিত করেছে এবং স্বীয় সন্তানকে দুধ-পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত করে দিয়েছে।

“অমুখ হিসাবে স্ত্রীলোকের দুধ পুরুষের পক্ষে নাকে প্রবেশ করানো কিংবা পান করায় দোষ নেই।”— আলমগীরি

ইবনে কুদামাহ রচিত ‘মুগনী’ গ্রন্থে এ মাসআলা সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।— (মুগনী, - কিতাবুস সাইদ, ৮ম খণ্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা)

রক্তকে যদি দুধের সাথে তুলনা করা হয়, তবে তা সামঞ্জস্যহীন হবে না। কেননা, দুধ রক্তেরই পরিবর্তিত রূপ এবং মানব-দেহের অংশ হওয়ার ব্যাপারেও একই পর্যায়ভুক্ত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, দুধ পাক এবং রক্ত নাপাক। সুতরাং হারাম হওয়ার প্রথম কারণ অর্থাৎ, মানবদেহের অংশ হওয়ার ক্ষেত্রে তো নিষিদ্ধ হওয়ার ধারণা যুক্তিতে টেকে না। অবশিষ্ট থাকে দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ, নাপাক হওয়া। এক্ষেত্রেও চিকিৎসার বেলায় অনেক ফেকাহবিদ রক্ত ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় মানুষের রক্ত অন্যের দেহে স্থানান্তর করার প্রশ্নে শরীয়তের নির্দেশ দাঁড়ায় এই যে, সাধারণ অবস্থায় এটা জায়েয নয়। তবে চিকিৎসার্থে, নিরুপায় অবস্থায় অমুখ হিসাবে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে জায়েয। ‘নিরুপায় অবস্থায়’ অর্থ হচ্ছে রোগীর যদি জীবন-সংশয় দেখা দেয় এবং অন্য কোন অমুখ যদি তার জীবন রক্ষার জন্য কার্যকর বলে বিবেচিত না হয়, আর রক্ত দেয়ার ফলে তার জীবন-রক্ষার সম্ভাবনা যদি প্রবল থাকে, তবে সে অবস্থায় তার দেহে অন্যের রক্ত দেয়া কোরআন শরীফের সে আয়াতের মর্মানুযায়ীও জায়েয হবে, যে আয়াতে অনন্যোপায় অবস্থায় মৃত জন্তুর গোশত খেয়ে জীবন বাঁচানোর সরাসরি অনুমতি দেয়া হয়েছে।

আর যদি অনন্যোপায় না হয় এবং অন্য অমুখ ব্যবহারে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়, তবে সে অবস্থায় রক্ত ব্যবহারের প্রশ্ন মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফেকাহবিদ একে জায়েয বলেছেন এবং কেউ কেউ না-জায়েয বলেছেন। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহর কিতাবসমূহে ‘হারাম

বস্তুর দ্বারা চিকিৎসা' শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে।

শুকর হারাম হওয়ার বিবরণ : আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় যে বস্তুটি হারাম করা হয়েছে, সেটি হল শুকরের গোশত। এখানে শুকরের সাথে 'লাহ্ম' বা গোশত শব্দ সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এর দ্বারা শুধু গোশত হারাম একথা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং শুকরের সমগ্র অংশ অর্থাৎ, হাড়, গোশত, চামড়া, চর্বি, রগ, পশম প্রভৃতি সবকিছুই সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে 'লাহ্ম' তথা গোশত যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শুকর অন্যান্য হারাম জন্তুর ন্যায় নয়, তাই এটি যবেহ করলেও পাক হয় না। কেননা, গোশত খাওয়া হারাম এমন অনেক জন্তু রয়েছে যাদের যবেহ করার পর সেগুলোর হাড়, চামড়া প্রভৃতি পাক হতে পারে। কিন্তু যবেহ করার পরও শুকরের গোশত হারাম তো বটেই, নাপাকও থেকে যায়। কেননা, এটি একাধারে যেমনি হারাম তেমনি 'নাঙ্গাসে-আইন' বা সম্পূর্ণ নাপাক। শুধুমাত্র চামড়া সেলাই করার কাজে শুকরের পশম দ্বারা তৈরী সূতা ব্যবহার করা জায়েয বলে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।— (জাসাস, কুরতুবী)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুই নামে যা যবেহ করা হয় : আয়াতে উল্লেখিত চতুর্থ হারাম বস্তু হচ্ছে সেসব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ অথবা উৎসর্গ করা হয়। সাধারণতঃ এর তিনটি উপায় প্রচলিত রয়েছে।

প্রথমতঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয় এবং যবেহ করার সময়ও সে নাম নিয়েই যবেহ করা হয়, যে নামে তা উৎসর্গিত। এমতাবস্থায় যবেহকৃত জন্তু সমস্ত মত-পন্থের আলোম ও ফেকাহবিদগণের দৃষ্টিতেই হারাম ও নাপাক। এর কোন অংশের দ্বারাই ফায়দা গ্রহণ জায়েয হবে না। কেননা, وَمَا أَوْلَىٰ لَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ

আয়াতে যে অবস্থার কথা বুঝানো হয়েছে এ অবস্থা এর সরাসরি নমুনা, যে ব্যাপারে কারো কোন মতভেদ নেই।

দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা যবেহ করা হয়, তবে যবেহ করার সময় তা আল্লাহ্র নাম নিয়েই যবেহ করা হয়। যেমন, অনেক অজ্ঞ মুসলমান পীর-বুয়ুর্গগণের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি মান্নত করে তা যবেহ করে থাকে। কিন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়েই তা যবেহ করা হয়। এ সূরতটিও ফকীহগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী হারাম এবং যবেহকৃত জন্তু মৃতের শামিল।

তবে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সূরতটি সম্পর্কে কিছুটা মত-পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন মুফাস্সের এবং ফেকাহবিদ এ সূরতটিকেও আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুই নামে যবেহকৃত জীবের বিধানের অনুরূপ বিবেচনা করেছেন। যেমন, তফসীরে বায়যাবীর টীকায় বলা হয়েছে :

‘সে সমস্ত জন্তুই হারাম, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুই নামে উৎসর্গ করা হয়। যবেহ করার সময় তা’ আল্লাহ্র নামেই যবেহ করা হোক না কেন। কেননা, আলোম ও ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোন জন্তুকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুই নৈকট্য হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোন মুসলমানও যবেহ করে, তবে সে ব্যক্তি ‘মুরতাদ’ বা ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে এবং তার যবেহকৃত পশুটি মুরতাদের যবেহকৃত পশু বলে বিবেচিত হবে।’

দূরে মুখতার কিতাবুয-যাবায়েহ অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

“— যদি কোন আমীরের আগমন উপলক্ষে তাঁরই সম্মানার্থ কোন পশু যবেহ করা হয়, তবে যবেহকৃত সে পশুটি হারাম হয়ে যাবে। কেননা, এটাও তেমনি, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুই নামে যা যবেহ করা হয়”— এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত ; যদিও যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম নিয়েই তা যবেহ করা হয়। শামীও এ অভিমত সমর্থন করেছেন।— (দুররে-মুখতার, ৫ম খঃ, ২১৪ পৃঃ)

কেউ কেউ অবশ্য উপরোক্ত সূরতটিকে وَمَا أَوْلَىٰ لَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ

আয়াতের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন না। কেননা, আয়াতের বর্ণনাবাদি অনুসারে একেবারে সরাসরি তা বুঝায় না। তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই নৈকট্য বা সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত দ্বারা ‘আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুই উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ করা হয়’ সে আয়াতের প্রতি যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এ সূরতটিকেও হারাম করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠা শুদ্ধ ও সাবধানতাপ্রসূত।

উপরোক্ত সূরতটি হারাম হওয়ার সমর্থনে কোরআনের অন্য আর একটি আয়াতও দলীল হিসেবে পেশ করা যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে

وَأَذْكُرْ عَلَى النَّسَبِ বাতেলপন্থীরা যেসব বস্তুর পূজা করে থাকে,

সেই সবকিছুকে نصب বলা হয়। সেমতে আয়াতের অর্থ হয় : সে সমস্ত পশু, যেগুলোকে বাতেল উপাস্যের উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়েছে।

‘আরবদের স্বভাব ছিল যে, যার উদ্দেশ্যে যবেহ করা হতো, যবেহ করার সময় তারস্বরে সে নামই উচ্চারণ করতে থাকতো। ব্যাপকভাবে তাদের মধ্যে এ রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুই সন্তুষ্টি ও নৈকট্য প্রত্যাশা— যা সংশ্লিষ্ট পশু হারাম হওয়ার মূল কারণ, সেটাকে ‘এহলাল’ অর্থাৎ, ‘তারস্বরে নামোচ্চারণ’ শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

ইমাম মুসলিম তাঁর ওস্তাদ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়ার সনদে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসের শেষভাগে রয়েছে যে, একজন স্ত্রীলোক হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হে উম্মুল মুমিনীন। আজমী লোকদের মধ্যে আমাদের কিছুসংখ্যক দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তাদের মধ্যে সব সময় কোন না কোন উৎসব লেগেই থাকে। উৎসবের দিনে কিছু হাদীয়া-তোহফা তারা আমাদের কাছেও পাঠিয়ে থাকে। আমরা তাদের পাঠানো সেসব সামগ্রী খাবো কিনা? জবাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন—

‘সে উৎসব দিবসের জন্যেই যেসব পশু যবেহ করা হয়, সেগুলো খেয়ো না, তবে তাদের ফলমূল খেতে পার।’— (তফসীরে-কুরতুবী, ২য় খঃ, ২০৭ পৃঃ)।

মোটকথা, দ্বিতীয় সূরতটি, যাতে নিয়ত থাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুই নৈকট্য লাভ, কিন্তু যবেহ করা হয় আল্লাহ্র নামেই, সেটিও হারাম হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুই সন্তুষ্টি বা নৈকট্য অর্জন, এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার দরুন وَمَا أَوْلَىٰ لَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ

আয়াতের হকুম দ্বিতীয় আয়াত وَأَذْكُرْ عَلَى النَّسَبِ —এরও প্রতিপাদ্য সাব্যস্ত হওয়ায় এ শ্রেণীর পশুর গোশতও হারাম।

তৃতীয় সূরত হচ্ছে পশুর কান কেটে অথবা শরীরের অন্য কোথাও কোন চিহ্ন অঙ্কিত করে কোন দেব-দেবী বা পীর-ফকীরের নামে ছেড়ে

দেয়া হয়। সেগুলো দ্বারা কোন কাজ নেয়া হয় না, যবেহ করাও উদ্দেশ্য থাকে না। বরং যবেহ করাকে হারাম মনে করে। এ শ্রেণীর পশু আলোচ্য দু'আয়াতের কোনটিরই আওতায় পড়ে না। এ শ্রেণীর পশুকে কোরআনের ভাষায় 'বহীরা' বা 'সায়েবা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের পশু সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে যে, এ ধরনের কাজ অর্থাৎ, কারো নামে কোন পশু প্রভৃতি জীবন্ত উৎসর্গ করে ছেড়ে দেয়া কোরআনের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী হারাম। যেমন বলা হয়েছে :

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنَ بَحَائِرِهِ وَلَا سَمَكًا

“আল্লাহ তাআলা বাহীরা বা ‘সায়েবা’ সম্পর্কে কোন বিধান দেননি। তবে এ ধরনের হারাম আমল কিংবা সর্গশ্রষ্ট পশুটিকে হারাম মনে করার দ্বারা বিশ্বাসের কারণেই সেটি হারাম হয়ে যাবে না। বরং হারাম মনে করাতেই তাদের একটা বাতিল মতবাদকে সমর্থন এবং শক্তি প্রদান করা হয়। তাই এরূপ উৎসর্গকৃত পশু অন্যান্য সাধারণ পশুর মতই হালাল।”

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সর্গশ্রষ্ট পশুর উপর তার মালিকের মালিকানা বিনষ্ট হয় না, যদিও সে দ্বারা বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরূপ মনে করে যে, এটি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে যে নামে উৎসর্গ করা হয়েছে তারই মালিকানায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু শরীয়তের বিধানমতে যেহেতু তার সে উৎসর্গকরণই বাতিল, সুতরাং সে পশুর উপর তারই পরিপূর্ণ মালিকানা কায়ম থাকে। সে মতে উৎসর্গকারী যদি সে পশু দ্বারা নিকট বিক্রয় করে থাকে বা অন্য কাউকে দান করে, তবে তা ক্রেতা ও দানগ্রহীতার জন্য হালাল। পৌত্তলিক সমাজের অনেকেই মন্দির বা দেব-দেবীর নামে পশু-পাখী উৎসর্গ করে সেগুলো পূজারী বা সেবায়তদের হাতে তুলে দেয়। সেবায়তরা সেসব পশু বিক্রয় করে থাকে। এরূপ পশু ক্রয় করা সম্পূর্ণ হালাল।

এক শ্রেণীর কুসংস্কারগ্রস্ত মুসলমানকেও পীর-বুয়ূর্গের মাজারে মুগল-মুরগী ইত্যাদি ছেড়ে আসতে দেখা যায়। মায়ারের খাদেমরাই সাধারণতঃ উৎসর্গকৃত সেসব জন্তু ভোগ-দখল করে। যেহেতু মূল মালিক খাদেমদের হাতে এগুলো ছেড়ে যায় এবং এগুলোর ব্যাপারে খাদেমদের পূর্ণ অধিকার থাকে, সেহেতু এ শ্রেণীর জীব-জন্তু ক্রয় করা, যবেহ করে খাওয়া, বিক্রয় করে লাভবান হওয়া সম্পূর্ণ হালাল।

গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় : এ ক্ষেত্রে কোরআন করীম মরণাপন্ন ব্যক্তির হারাম বস্তু খাওয়াকে হালাল বা বৈধ বলেনি; বরং লেহে **فَلَا يَحِلُّ لَهُ** “তাতে তার কোন পাপ নেই।” এর মর্ম এই যে, মরণ বস্তু তখনও যথারীতি হারামই রয়ে গেছে, কিন্তু যে লোক খাচ্ছে তার মনোপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য গ্রহণের পাপ থেকে তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের দ্বারা শরীয়তের হুকুম-আহকাম পরিবর্তিত করে এবং তার বিনিময়ে যে ধন-সম্পদ গ্রহণ করে, তা যেন সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরে। কারণ, এ কাজের পরিণতি তাই। কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির মতে প্রকৃতপক্ষে হারাম মাল বা ধন-সম্পদ সবই দোষখের পদার্থ। অবশ্য তা যে আগুন, সে-কথা পার্থিব জীবনে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু মৃত্যুর পর তার সে কর্মই আগুনের রূপ ধরে উপস্থিত হবে।

মুসলমানদের কেবলা যখন বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে

পরিবর্তিত করে বায়তুল্লাহর দিকে নির্ধারণ করা হলো, তখন ইহুদী, খ্রীষ্টান, পৌত্তলিক প্রভৃতি যারা সর্বদা মুসলমানদের মধ্যে ত্রুটি তালিশ করার ফিকিরে থাকতো, তারা তৎপর হয়ে উঠলো এবং নানাভাবে রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও ইসলামের প্রতি অবিরাম নানা প্রশ্রুণ নিষ্ক্ষেপ করতে শুরু করল। এসব প্রশ্রুণের জবাব পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য একটি আয়াতে বিশেষ বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে এ বিতর্কের যতি টেনে দেয়া হয়েছে। যার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, নামাযে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে কি পশ্চিমদিকে, এ বিষয় নির্ধারণকেই যেন তোমরা দুইনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছ এবং এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই তোমাদের যাবতীয় আলোচনা-সমালোচনা আবর্তিত হতে শুরু করেছে। মনে হয়, তোমাদের ধারণায় শরীয়তের অন্য কোন হুকুম-আহকামই যেন আর নেই।

অন্য অর্থে এ আয়াতের লক্ষ্য মুসলমান, ইহুদী, নাসারা নির্বিশেষে সবাই হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই যে, প্রকৃত পূণ্য বা নেকী আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের ভেতরেই নিহিত। যদিকে মুখ করে তিনি নামাযে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন, সেটাই শুদ্ধ ও পূণ্যের কাজে পরিণত হয়ে যায়। অন্যথায়, দিক হিসাবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের কোনই বৈশিষ্ট্য নেই। দিকবিশেষের সাথে কোন পূণ্যও সর্গশ্রষ্ট নয়। পূণ্য-একান্তভাবেই আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের সাথে সম্পৃক্ত। তাই আল্লাহ তাআলা যতদিন বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রতি মুখ করে নামায পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন, ততদিন সেদিকে মুখ করাই ছিল পূণ্য। আবার যখন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর হুকুম হয়েছে, এখন এ হুকুমের আনুগত্য করাই পূণ্যে পরিণত হয়েছে।

আলোচ্য ১৭৭ তম আয়াত থেকে সূরা-বাক্বারার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে তা'লীম ও হেদায়েত প্রদানই মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গতঃ এতে বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্রুণের জবাবও দেয়া হয়েছে। সে হিসেবে আলোচ্য এ আয়াতটিকে ইসলামের বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবহ আয়াত বলে অভিহিত করা যায়।

অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আলোচ্য এ আয়াতে এ'তেকাদ বা বিশ্বাস, এবাদত, মোআমালাত বা লেনদেন এবং নৈতিকতা ও আখলাক সম্পর্কিত বিধি-বিধানের মূলনীতিসমূহের আলোচনা মোটামুটিভাবে এসে গেছে। প্রথম বিষয় — ই'তেকাদ বা মৌলবিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনা **مِنْ أَمَانٍ** শীর্ষক আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবাদত এবং মোআমালাত সম্পর্কিত। তার মধ্যে এবাদত সম্পর্কিত আলোচনা **وَأَنِ الْمَرْكُوزَةِ** পর্যন্ত উল্লেখিত হয়েছে। অতঃপর মোআমালাতের আলোচনা **وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ** শীর্ষক আয়াতে করা হয়েছে। এরপর আখলাক সম্পর্কিত আলোচনা **وَالْمُؤْتُونَ** থেকে বর্ণিত হয়েছে।

সবশেষে বলা হয়েছে যে, সে সমস্ত লোকই সত্যিকার মুমিন, যারা এসব নির্দেশাবলীর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে এবং এসব লোককেই প্রকৃত মোস্তাকী বলা যেতে পারে।

অতঃপর আলোচ্য আয়াতে প্রথমে ধন-সম্পদ ব্যয় করার দুটি গুরু

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ وَالْحَرْ
 بِالْحَرْ وَالْعَبْدَ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُتِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
 شَيْءٌ فَأَبَىءَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّى إِلَى يَدِ الْإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
 رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ تَعْتَدُونَ ٥
 كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا لَّوَصِيَّةً
 لِّلَّذِينَ وَالِ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٦ فَمَنْ
 بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَبَىءَ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
 إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٧ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوَسٍ جَنَافًا أَوْ نَجَسًا
 فَاصْلَحْ بِهِنَّ مَا بَيْنَهُنَّ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٨ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الضِّيَاعُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ
 مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ٩ أَيَا مَاعْدُودَتٍ فَمَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ قَرِيبًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى
 الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
 فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠

(১৭৮) হে ঈমানদারগণ। তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (১৭৯) হে বুদ্ধিমানগণ। কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার।

(১৮০) তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ওসীয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাতীর্থদের জন্য ইনসাফের সাথে। পরহেয়গারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সবকিছু শোনে ও জানেন। (১৮১) যদি কেউ ওসীয়ত শোনার পর তাতে কোন রকম পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করে তাদের উপর এর পাপ পতিত হবে। (১৮২) যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশংকা করে পক্ষপাতিত্বের অথবা কোন অপরায়মূলক সিদ্ধান্তের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন গোনাহ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (১৮৩) হে ঈমানদারগণ। তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেকোন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেয়গারী অর্জন করতে পার— (১৮৪) গণনার কয়েকটি দিনের জন্য। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোযা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সংকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি রোযা রাখ, তবে তা তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।

ত্বপূর্ণ খাত বর্ণনা করে পরে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, এ দুটি খাত যাকাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথমেই এ দু'টি খাতের কথা বর্ণনা করার পরে যাকাতের কথা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, সাধারণতঃ মানুষ আলোচ্য দু'টি খাতে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কৃতাবোধ করে, কিন্তু তা উচিত নয়।

মাসআলা : এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির দ্বারাই এ তথ্যও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, ধন-সম্পদের ফরয শুধুমাত্র যাকাত প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয় না, যাকাত ছাড়া আরোও বহু ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা ফরয ও ওয়াজিব হয়ে থাকে। — (জাসাস, কুরতুবী)।

যেমন, রুমী-রোযগারে অক্ষম আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কারো সামনে যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, তবে যাকাত প্রদান করার পরেও সে দরিদ্রের জীবন রক্ষার্থে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ফরয হয়ে পড়ে।

অনুরূপ, যেসব স্থানে প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ তৈরী করা এবং দ্বিমী-শিক্ষার জন্য মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করাও আর্থিক ফরযের অন্তর্গত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যাকাতের একটা বিশেষ বিধান রয়েছে, সে বিধান অনুযায়ী যে কোন অবস্থায় যাকাত প্রদান করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য খরচের বেলায় প্রয়োজন দেখা দেয়া শর্ত।

অতঃপর পূর্ববর্তী বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে অতীতকাল বাচক শব্দের স্থলে وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَدُوِّهِمْ ব্যাকটিতে কারক পদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তির মধ্যে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার অভ্যাস সব সময়ের জন্য থাকতে হবে, ঘটনাক্রমে কখনো কখনো অঙ্গীকার পূরণ করলে চলবে না। কেননা, এরূপ মাঝে-মাঝে কাফের-গোনাহগাররাও ওয়াদা- অঙ্গীকার পূরণ করে থাকে। সুতরাং এটা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না।

তেমনিভাবে মোআমালাতের বর্ণনায় শুধুমাত্র অঙ্গীকার পূরণ করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়, অশ্লীলদ্রব্য, ভাড়া-ইজারা প্রভৃতি বৈষয়িক দিকসমূহের সুস্থতা ও পবিত্রতাই অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল।

এরপরই আখলাক বা মন-মানসিকতার সুস্থতা বিধান সম্পর্কিত বিধি-বিধানের আলোচনায় একমাত্র ‘সবর’-এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, সবর-এর অর্থ হচ্ছে মন-মানসিকতা তথা নফসকে বশীভূত করে অন্যায়-অনাচার থেকে সর্বতোভাবে সুরক্ষিত রাখা। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, মানুষের হৃদয়-বৃত্তিসহ আভ্যন্তরীণ যত আমল রয়েছে, সবরই সেসবের প্রাণস্বরূপ। এরই মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় ও কদাচার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

الْأَصَاوِي ‘কেসাসুন’-এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ, অন্যের প্রতি যতটুকু জুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ তার পক্ষে জায়েয। এর চাইতে বেশীকিছু করা জায়েয নয়। এ সূরারই পর্ববর্তী এক আয়াতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ وَيُؤْتِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

অনুরূপ সূরা নহলের শেষ আয়াতে রয়েছে :

وَأَن عَاقِبَتُهُمْ فَاقِبَتُهُمْ وَمَا يُؤْتِيهِمْ

এতে আলাচ্য বিষয়ই আরো বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সেমতে শরীয়তের পরিভাষায় ‘কেসাস’ বলা হয় হত্যা এবং আঘাতের সে শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান করা হয়।

মাসআলা : ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় কোন অস্ত্র কিংবা এমন কোন কিছু দ্বারা হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করা, যার দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা হত্যা সংঘটিত হয়—‘কেসাস’ অর্থাৎ, ‘জানের বদলায় জান’ এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মাসআলা : এ ধরনের হত্যার অপরাধে যেমন স্বাধীন ব্যক্তির হত্যাকারী অন্য স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, তেমনি কোন ক্রীতদাসের বদলায়ও স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। অনুরূপ শ্রীলোক হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ হত্যার অপরাধে শ্রীলোককেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

এ আয়াতে স্বাধীন ব্যক্তির বদলায় স্বাধীন ব্যক্তি এবং শ্রীলোকের বদলায় শ্রী লোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার যে কথা উল্লেখিত হয়েছে, তা সেই একটা বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, যে ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

মাসআলা : ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেয়া হয়, — যেমন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস মাত্র দুই পুত্র, সে দুজনেই যদি মাফ করে দেয়, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পূর্ণ মাফ না হয়, অর্থাৎ, উপরোক্ত ক্ষেত্রে এক পুত্র মাফ করে, কিন্তু অপর পুত্র তা না করে, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারী কেসাস- এর দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে সত্য, কিন্তু এক পুত্রের দাবীর বদলায় অর্ধেক দিয়াত প্রদান করতে হবে।

শরীয়তের বিধানে হত্যার বদলায় যে দিয়াত বা অর্থদণ্ড প্রদান করতে হয়, তার পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম আকৃতির একশ’ উট, অথবা একহাজার পীনার কিংবা দশ হাজার দেরহাম। বর্তমানকালের প্রচলিত ওজন অনুপাতে এক দেরহাম—সাড়ে তিন মাসা রৌপ্যের সমপরিমাণ। সেমতে পূর্ণ দিয়াত—এর পরিমাণ হবে দু’ হাজার নয়শ’ তোলা আট মাসা রৌপ্য।

মাসআলা : কেসাস—এর আংশিক দাবী মাফ হয়ে গেলে যেমন মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়ে দিয়াত ওয়াজিব হয়, তেমনি উভয়পক্ষ যদি কোন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে আপোষ—নিশ্চিন্তি করে ফেলে, তবে সে অবস্থাতেও, ‘কেসাস’ মওকুফ হয়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যা ফেকাহর কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

মাসআলা : নিহত ব্যক্তির যে ক’জন ওয়ারিস থাকবে, তাদের প্রত্যেকেই ‘মীরাস’—এর অংশ অনুপাতে ‘কেসাস’ ও দিয়াত—এর মালিক হবে এবং দিয়াত হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ ‘মীরাস’—এর অংশ অনুপাতে বন্টিত হবে। তবে কেসাস যেহেতু কটনযোগ্য নয়, সেহেতু ওয়ারিসগণের মধ্য থেকে যে কোন একজনও যদি কেসাস—এর দাবী তাগ করবে, তবে তার উপর কেসাস ওয়াজিব হবে না; বরং দিয়াত ওয়াজিব হবে এবং প্রত্যেকেই অংশ অনুযায়ী দিয়াতের ভাগ পাবে।

মাসআলা : ‘কেসাস’ গ্রহণ করার অধিকার যদিও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণের, তথাপি নিজেরা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। অর্থাৎ, নিহত ব্যক্তির বদলায় হত্যাকারীকে তারা নিজেরা হত্যা করতে

পারবে না। এ অধিকার আদায় করার জন্য আইন কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা, কোন অবস্থায় কেসাস ওয়াজিব হয় এবং কোন অবস্থায় হয় না, এ সম্পর্কিত অনেক সূক্ষ্ম দিকও রয়েছে, যা সবার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রাগের মাথায় বাড়াবাড়িও করে ফেলতে পারে, এজন্য আলেম ও ফেকাহবিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী ‘কেসাস’—এর হক আদায় করার জন্য ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে।—(কুরতুবী)

১৮০ নং আয়াতে মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি (যদি সে কিছু ধন-সম্পদ রেখে যায়,) যে ওসীয়াত ফরয করা হয়েছে সে নির্দেশের তিনটি অংশ বর্ণিত হয়েছে

(এক) মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের কোন অংশ যেহেতু নির্ধারিত নেই, সুতরাং তাদের হক মৃত ব্যক্তির ওসীয়াতের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

(দুই) এ ধরনের নিকটাত্মীয়দের জন্য ওসীয়াত করা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির উপর ফরয।

(তিন) এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির বেশী ওসীয়াত করা জায়েয নয়।

উপরোক্ত তিনটি নির্দেশের মধ্যে প্রথম নির্দেশটি অধিকাংশ সাহাবী ও তাবয়িগণের মতে ‘মীরাস’—এর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ‘মনসুখ’ বা রহিত হয়ে গেছে। ইবনে-কাসীর ও হাকেম প্রমুখ সহীহ সনদের সাথে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর মতে ওসীয়াত-সম্পর্কিত এ নির্দেশটি মীরাস—এর আয়াত দ্বারা রহিত করে দেয়া হয়েছে। মীরাস-সম্পর্কিত আয়াতটি হচ্ছে :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ

نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মীরাসের আয়াত সে মসন্ত আত্মীয়দের জন্য ওসীয়াত করা রহিত করে দিয়েছে, যাদের মীরাস নির্ধারিত ছিল। এছাড়া অন্যান্য যেসব আত্মীয়ের অংশ মীরাসের আয়াতে নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য ওসীয়াত করার হুকুম এখনো অবশিষ্ট রয়েছে।—(জাসসাস, কুরতুবী)

তবে আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের জন্য মীরাসের আয়াতে কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য ওসীয়াত করা মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে ফরয বা জরুরী নয়। সে ফরয রহিত হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজনবিশেষে এটা মুস্তাহাবে পরিণত হয়েছে।—(জাসসাস, কুরতুবী)

ওসীয়াত ফরয হওয়া প্রসঙ্গে : ওসীয়াত সম্পর্কিত এ আয়াতের নির্দেশ একাধারে যেমন কোরআনের মীরাস-সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে, তেমনি বিদায় হজ্জের সময় রসুলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশের মাধ্যমেও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর বর্ণিত হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। বিদায় হজ্জের বিখ্যাত খোতবায় রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছিলেন :

ان الله اعطى لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

“আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক হকদারের হক নির্ধারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে কোন গুয়ারিসের পক্ষে ওসীয়াত করা জায়েয নয়।— (তিরমিযী)

একই হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় একথাও যুক্ত হয়েছে :
لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ إِلَّا أَنْ تَحْجِيزَهُ الْوَرِثَةُ

“কোন গুয়ারিসের জন্য সে পর্যন্ত ওসীয়াত জায়েয হবে না, যে পর্যন্ত অন্যান্য গুয়ারিসগণ অনুমতি না দেয়।”— (জাসাস)

হাদীসের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলাই যেহেতু প্রত্যেক গুয়ারিসের হিসসা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সুতরাং এখন আর ওসীয়াত করার অনুমতি নেই। তবে যদি অন্যান্য গুয়ারিসগণ ওসীয়াত করার অনুমতি দেন, তবে যে কোন গুয়ারিসের জন্য বিশেষভাবে কোন ওসীয়াত করা জায়েয হবে।

তৃতীয় নির্দেশ : এক- তৃতীয়াংশ সম্পদের ওসীয়াত সম্পর্কে : আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী মৃত্যুপথ্যাত্মী ব্যক্তিগণের পক্ষে এখনো তাদের মোট সম্পদের এক- তৃতীয়াংশ পরিমাণ ওসীয়াত করা জায়েয। এমনকি উত্তরাধিকারীগণের অনুমতিক্রমে সমগ্র সম্পত্তিও ওসীয়াত করা জায়েয এবং গ্রহণযোগ্য।

মাসআলা : উপরোক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হচ্ছে যে, যেসব আত্মীয়ের হিসসা কোরআন ক্রমী নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের জন্যে ওসীয়াত করা ওয়াজিব নয়। এমনকি গুয়ারিসগণের অনুমতি ব্যতীত এক- তৃতীয়াংশ সম্পদের অতিরিক্ত ওসীয়াত করা জায়েযই নয়। তবে যেসব আত্মীয়ের হিসসা কোরআন নির্ধারণ করেনি, তাদের জন্য মোট সম্পত্তির এক- তৃতীয়াংশ পরিমাণের মধ্যে ওসীয়াত করার অনুমতি রয়েছে।

মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তির উপর অন্যের ঋণ বা আমানত থাকে এবং তা পরিশোধ করার জন্যে তার সমগ্র সম্পত্তির ওসীয়াত করতে হয়, তবুও তার পক্ষে তা করতে হবে এবং সমস্ত সম্পত্তির ওসীয়াতই বৈধ হবে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, — কারো উপর অন্যের হক থাকলে তার পক্ষে সে সম্পর্কে লিখিত ওসীয়াত করা ব্যতীত তিনটি রাতও কাটানো উচিত নয়।

মাসআলা : এক- তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসীয়াত করার যে অধিকার দেয়া হয়েছে, সেসব ওসীয়াত করার পর জীবিতাবস্থায় তা পরিবর্তন কিংবা বাতিল করে দেয়ারও অধিকার রয়েছে।— (জাসাস)

সুম—এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম ‘সওম’। তবে সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে একাধারে এ ভাবে বিরত থাকলেই তা রোযা বলে গণ্য হবে। সূর্যাস্তের এক মিনিট আগেও যদি কোন কিছু খেয়ে ফেলে, পান করে, কিংবা সহবাস করে, তবে রোযা হবে না। অনুরূপ উপায়ে সবকিছু থেকে পূর্ণ দিবস বিরত থাকার পরও যদি রোযার নিয়ত না থাকে, তবে তাও রোযা হবে না।

সওম বা রোযা ইসলামের মূলভিত্তি বা আরকানের অন্যতম। রোযার অপরিসীম ফযীলত রয়েছে।

পূর্ববর্তী উম্মতের উপর রোযার হুকুম : মুসলমানদের প্রতি রোযা ফরয হওয়ার নির্দেশটি একটি বিশেষ নবীর উল্লেখসহ দেয়া হয়েছে।

নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোযা শুধুমাত্র তোমাদের প্রতিই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল। এর দ্বারা যেমন রোযার বিশেষ গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে, তেমনি মুসলমানদের এ মর্মে একটা সাস্তুনাও দেয়া হয়েছে যে, রোযা একটা কষ্টকর এবাদত সত্য, তবে তা শুধুমাত্র তোমাদের উপরই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপরও ফরয করা হয়েছিল। কেননা, সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন একটা ক্লেশকর কাজে অনেক লোক একই সাথে জড়িত হয়ে পড়লে তা অনেকটা স্বাভাবিক এবং সাধারণ বলে মনে হয়।— (ক্বল-মা’আনী)

কোরআনের বাক্য وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ أَرَبًا, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল, — ব্যাপক অর্থবোধক। এর দ্বারা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল উম্মত এবং শরীয়তকেই বোঝায়। এতে বোঝা যায় যে, নামাযের এবাদত থেকে যেমন কোন উম্মত বা শরীয়তই বাদ ছিল না, তেমনি রোযাও সবার জন্যই ফরয ছিল।

যারা উল্লেখ করেছেন যে, وَمِنْ قَبْلِكَ বাক্য দ্বারা পূর্ববর্তী উম্মত ‘নাসারা’দের বুঝানো হয়েছে, তাঁরা বলেন — এটা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে অন্যান্য উম্মতের উপর রোযা ফরয ছিল না, তাঁদের কথায় এ তথ্য বোঝায় না।— (ক্বল-মা’আনী)

আয়াতের মধ্যে শুধু বলা হয়েছে যে, — ‘রোযা যেমন মুসলমানদের উপর ফরয করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল’; একথা দ্বারা এ তথ্য বুঝায় না যে, আগেকার উম্মতগণের রোযা সমগ্র শর্ত ও প্রকৃতির দিক দিয়ে মুসলমানদের উপর ফরযকৃত রোযারই অনুরূপ ছিল। যেমন, রোযার সময়সীমা, সংখ্যা এবং কখন তা রাখা হবে, এসব ব্যাপারে আগেকার উম্মতদের রোযার সাথে মুসলমানদের রোযার পার্থক্য হতে পারে, বাস্তব ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। বিভিন্ন সময়ে রোযার সময়সীমা এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়েছে।— (ক্বল-মা’আনী)

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ বাক্যে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, ‘তাকওয়া’ বা পরহেযগারীর শক্তি অর্জন করার ব্যাপারে রোযার একটা বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। কেননা, রোযার মাধ্যমে প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে বিশেষ শক্তি অর্জিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সেটাই ‘তাকওয়া’ বা পরহেযগারীর ভিত্তি।

কল্প ব্যক্তির রোযা : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا বা ক্যো উল্লেখিত ‘কল্প’ সে ব্যক্তিকে বোঝায়, রোযা রাখতে যার কঠিন কষ্ট হয় অথবা রোগ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। পরবর্তী আয়াত وَلَا تَزِرُ وَازِرَتَهُ يُكْرِهِ الْفَقْرُ—এর মধ্যে সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে। ফেকাহুদিন আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত তাই।

মুসাফেরের রোযা : آَوَّلَى سَفَرٍ—এর মধ্যে مسافر না বলে آَوَّلَى سَفَرٍ শব্দ ব্যবহার করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রথমতঃ শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থের সফর যথা, বাড়ীঘর থেকে বের হয়ে কোথাও গেলেই রোযার ব্যাপারে সফর-জনিত ‘ক্বখসত’ তথা عَلَى سَفَرٍ অব্যাহতি পাওয়া যাবে না; সফর দীর্ঘ হতে হবে। কেননা, عَلَى سَفَرٍ

শব্দের মর্মার্থ হচ্ছে, যে সফরের অবস্থায় থাকে। এতে বোঝা যায় যে, বাড়ীঘর থেকে পাঁচ-দশ মাইল দূরে গেলেই তা সফর বলে গণ্য হবে না। তবে সফর কতটুকু দীর্ঘ হতে হবে, সে সীমারেখা কোরআনে উল্লেখিত হয়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস এবং সাহাবীগণের আমলের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) এবং অন্যান্য কিছুসংখ্যক ফেকাহীদের মতে এ সফর কমপক্ষে তিন মনযিল দূরত্বের হতে হবে। অর্থাৎ, একজন লোক স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেঁটে তিন দিনে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, ততটুকু দূরত্বের সফরকে সফর বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগের আলেমগণ ‘মাইল’-এর হিসাবে এ দূরত্ব আটচল্লিশ মাইল নির্ধারণ করেছেন।

দ্বিতীয় মাসআলা : **عَلَى سَفَرٍ** শব্দ দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, মুসাফির, এর প্রতি রোযার ব্যাপারে সফরজনিত ‘রুখসত’ ততক্ষণই প্রযোজ্য হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সফর অবস্থায় থাকে। তবে স্বভাবতঃই সফর চলা অবস্থায় কোথাও সাময়িক যাত্রাবিরতি সফরের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটায় না। নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীস মতে এ যাত্রাবিরতির মেয়াদ ঊর্ধ্বপক্ষে পনের দিনের কম সময় হতে হবে। কেউ যদি সফরের মধ্যেই কোথাও পনের দিন অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে সে আর ‘সফরের মধ্যে’ থাকে না। ফলে সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে সফরজনিত ‘রুখসত’ ও প্রযোজ্য হবে না।

মাসআলা : উল্লেখিত বাক্যাংশ দ্বারা একথাও বোঝায় যে, কেউ যদি সফরের মধ্যে কোন এক জায়গায় নয়; বরং বিভিন্ন জায়গায় যেটি পনের দিনের যাত্রাবিরতি করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তার সফরের ধারাবাহিকতা রূপ হবে না। সে সফর-জনিত রুখসত পাওয়ার অধিকারী হবে।

রোযার কাযা : **فَوَدَّ أَنْ يَنْتَرِخَ** অর্থাৎ, রুগ্ন বা মুসাফির ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় কিংবা সফরে যে কয়টি রোযা রাখতে পারবে না, সেগুলো ক্যা সময় হিসাব করে কাযা করা ওয়াজিব। এতে বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের অসুবিধায় পতিত হয়ে যে ক’টি রোযা ফুটতে হয়েছে, সে ক’টি রোযা অন্য সময় পূরণ করে নেয়া তাদের উপর ওয়াজিব। এ কথাটি বোঝানোর জন্যে **فَعَلِيهِ الْقَضَاءُ** “তার উপর কাযা ওয়াজিব,” এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তা না বলে **فَوَدَّ أَنْ يَنْتَرِخَ** বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রুগ্ন এবং মুসাফিরদের অপরিহার্য রোযার মধ্যে শুধু সে পরিমাণ রোযার কাযা করাই ওয়াজিব, রুগ্নী সুস্থ রোযার পর এবং মুসাফির বাড়ী ফেরার পর যে কয় দিনের সুযোগ পাবে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি এতটুকু সময় না পায় এবং এর আগেই মৃত্যুবরণ করে, তবে তার উপর কাযা কিংবা ‘ফিদইয়া’র জন্য ওসীয়াত করা জরুরী।

মাসআলা : **فَوَدَّ أَنْ يَنْتَرِخَ** বাক্যে যেহেতু এমন কোন শর্তের উল্লেখ নেই, যদ্বারা বোঝা যেতে পারে যে, এ রোযা একই সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে রাখতে হবে, না মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে রাখলেও চলবে,

সুতরাং যার রমযানের প্রথম দশ দিনের রোযা ফুটত হয়েছে সে যদি প্রথমে দশ তারিখের কাযা করে, পরে নয় তারিখের, তারপর আট তারিখের কাযা হিসাবে করতে থাকে, তবে তাতে কোন অসুবিধা হবে না। অনুরূপভাবে দশটি রোযার মধ্যে দু’চারটি করার পর বিরতি দিয়ে দিয়ে অবশিষ্টগুলো কাযা করলেও কোন অসুবিধা হবে না। কেননা, আয়াতের মধ্যে এরূপভাবে কাযা করার ব্যাপারেও কোন নিষেধাজ্ঞা উল্লেখিত হয়নি।

রোযার ফিদইয়া : **وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ** আয়াতের স্বাভাবিক অর্থ দাঁড়ায়, যেসব লোক রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের দরুন নয়; বরং রোযা রাখার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না, তাদের জন্যেও রোযা না রেখে রোযার বদলায় ‘ফিদইয়া’ দেয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই এতটুকু বলে দেয়া হয়েছে যে, **وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ** অর্থাৎ, রোযা রাখাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

উপরোক্ত নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের, যখন লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে লোকজনকে রোযায় অভ্যস্ত করে তোলা। এরপর অবতীর্ণ আয়াত **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ**—এর দ্বারা প্রাথমিক এ নির্দেশ সুস্থ-সবল লোকদের ক্ষেত্রে রহিত করা হয়েছে। তবে যেসব লোক অতিরিক্ত বার্ষিক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অপারক কিংবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছে, অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব লোকের বেলায় উপরোক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। সাহাবী ও তাবয়ীগণের সর্বসম্মত অভিমত তাই।—(জাসসাস, মাঘহারী)

বোখারী মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী প্রমুখ হাদীসের সমস্ত ইমামগণই সাহাবী হযরত সালামা – ইবনুল আকওয়া (রাঃ)-এর সে বিখ্যাত হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে, যখন **وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ** শীর্ষক আয়াতটি নাযিল হয়, তখন আমাদেরকে এ মর্মে এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল যে, যার ইচ্ছা হয় সে রোযা রাখতে পারে এবং যে রোযা রাখতে না চায়, সে ‘ফিদইয়া’ দিয়ে দেবে। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** নাযিল হলো, তখন ‘ফিদইয়া’ দেয়ার এখতিয়ার রহিত হয়ে সুস্থ-সমর্থ লোকদের উপর শুধুমাত্র রোযা রাখাই জরুরী সাব্যস্ত হয়ে গেল।

ফিদইয়ার পরিমাণ এবং আনুষঙ্গিক মাসআলা : একটি রোযার ফিদইয়া অর্থ সা’ গম অথবা তার মূল্য। আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলা র সের হিসাবে অর্থ সা’ একসের সাড়ে বার হটাক হয়। এই পরিমাণ গম অথবা নিকটবর্তী প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী তার মূল্য কোন মিসকীনকে দান করে দিলেই একটি রোযার ‘ফিদইয়া’ আদায় হয়ে যায়। ফিদইয়া কোন মসজিদ বা মাদ্রাসায় কার্যরত কোন লোকের খেদমতের পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া জায়েয নয়।

البقرة

২৭

سيقول

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ
بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُكْمِلَ الْعِدَّةَ
وَلِيُبَيِّنَ وَاللَّهُ عَلَى مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَإِذَا
سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ يُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَا فَلْيَسْتَوِي بِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝
أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ
لِيَابِسٌ لَّكُمْ وَأَن تُمْسَسُوا عَلَيْكُمْ فَمَنِ اعْتَصَمَ عَلَيْكُمْ
فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَأُولَٰئِكَ يَكُونُ لَكُمْ أَعْتَابٌ
يَكُونُ لَكُمْ أَعْتَابٌ مِّنَ اللَّيْلِ إِلَى الْفَجْرِ لَمَّا جَاءَ
تُمْ أَتَيْتُمُ الصِّيَامَ إِلَى الْكَلْبِ وَلَا تَبَاشَرُوا فِيهِ
عَلَيْكُمْ فِي الْمَسْجِدِ وَالْذِّكْرِ وَلَا تَقْرَبُوا فِيهَا
كُنْ لَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَتَمِ الْيَتَمِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

(১৮৫) রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না— যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (১৮৬) আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে— বস্ততঃ আমি রয়েছি সন্নিহিত। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে। (১৮৭) রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যাকিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ দান করেছেন, তা আহরণ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ রেখা পরিস্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা ঐতিহ্যক অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশে না। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছ থেকে যেও না। এমনভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে।

আনুযিকি জাতব্য বিষয়

إِنَّمَا مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ বাক্যটি ছিল সৎকিন্দ। তারই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ আয়াতে যে, সে কতিপয় দিন হল রমযান মাসের দিনগুলো। আর এর ফযীলত হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা এ মাসটিকে স্বীয় গুহী এক আসমানী কিতাব নাযিল করার জন্য নির্বাচিত করেছেন। কোরআনও (প্রথম) এ মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, রসুলে করীম (সঃ) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (খঃ)—এর সইকা রমযান মাসের ১লা তারিখে নাযিল হয়েছিল। আর রমযানের ৬ তারিখে তওরাত, ১০ তারিখে ইঞ্জীল এবং ২৪ তারিখে কোরআন নাযিল হয়েছে। হযরত জাবের (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, 'হবুর' রমযানের ১২ তারিখে এবং ইঞ্জীল ১৮ তারিখে নাযিল হয়েছে।—(ইবনে-কাসীর)

উল্লিখিত হাদীসে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অবতরণ সম্পর্কিত যেসব তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব তারিখে সেসব কিতাব গোটা নাযিল করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কোরআনের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা সম্পূর্ণভাবে রমযানের কোন এক রাতে লগুই মাহফুয থেকে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ করে দেয়া হলেও হবুর আকরাম (সঃ)—এর উপর ধীরে ধীরে তেইশ বছরে তা অবতীর্ণ হয়।

فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ - এই একটি মাত্র বাক্যে রোযা

সম্পর্কিত বহু হুকুম-আহকান ও মাসআলা-মাসায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। শহদ শব্দটি শহুদ থেকে গঠিত। এর অর্থ উপস্থিতি ও বর্তমান থাকা। আরবী অভিধানে الشهر অর্থ মাস। এখানে অর্থ হল রমযান মাস। কাজেই বাক্যটির অর্থ দাঁড়াল এই যে, 'তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি রমযান মাসে উপস্থিত থাকবে, অর্থাৎ, বর্তমান থাকবে, তার উপর গোটা রমযান মাসের রোযা রাখা কর্তব্য।' ইতিপূর্বে রোযার পরিবর্তে কিংদইয়া দেয়ার যে সাধারণ অনুমতি ছিল এ বাক্যের দ্বারা তা মনসুখ বা রহিত করে দিয়ে রোযা রাখাকেই গুয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে।

রমযান মাসে উপস্থিত বা বর্তমান থাকার মর্ম হল রমযান মাসটিকে এমন অবস্থায় পায়ায়, যাতে রোযা রাখার সামর্থ্য থাকে। অর্থাৎ, মুসলমান, বুজ্জিমান, সাবালক, মুকীম এবং হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র অবস্থায় রমযান মাসে বর্তমান থাকা।

মাসআলা : এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার জন্য রোযার যোগ্য অবস্থায় রমযান মাসের উপস্থিতি একটি শর্ত। এমতাবস্থায় যে লোক পূর্ণ রমযান মাসকে পাবে, তার উপর গোটা রমযান মাসের রোযা ফরয হয়ে যাবে। যে লোক এ অবস্থায় কিছু কম সময় পাবে, তার উপর ততদিনই ফরয হবে। কাজেই রমযান মাসের মাঝে যদি কোন কাকের ব্যক্তি মুসলমান হয়, কিংবা কোন নাবালেগ যদি বালেগ হয়, তবে তার উপর পরবর্তী রোযাগুলোই ফরয হবে; বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা করার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য উমাদ ব্যক্তি মুসলমান ও বালেগ হওয়ার শ্রেণিতে যেহেতু ব্যক্তিগত যোগ্যতার অধিকারী হয়, সেহেতু সে যদি রমযানের কোন অংশে সুস্থ হয়ে উঠে, তবে এ রমযানের বিগত দিনগুলোর কাযা করাও তার উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়বে। তেমনিভাবে হায়েয-নেফাসগ্রস্ত স্ত্রীলোক যদি রমযানের মাঝে পাক হয়ে যায় অথবা কোন অসুস্থ লোক যদি সুস্থ হয়ে উঠে কিংবা কোন মুসাফির যদি মুকীম হয়ে যায়, তবে বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা

করা তার পক্ষে জরুরী হবে।

মাসআলা : যেসব দেশে রাত ও দিন কয়েক মাস দীর্ঘ হয়ে থাকে সেসব দেশে বাহ্যতঃ মাসের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় না। অর্থাৎ রমযান মাসের প্রকাশ্য আগমন ঘটে না। কাজেই সেদেশের অধিবাসীদের উপর রোযা ফরয না হওয়াই উচিত। হানাফী মাযহাব অবলম্বী ফেকাহ রিপণের মধ্যে হালওয়ানী, কেবালী প্রমুখ নামাযের ব্যাপারেও এমনি ফতোয়া দিয়েছেন যে, তাদের উপর নিজেদের দিন-রাত অনুযায়ী নামাযের হুকুম বর্তাবে। অর্থাৎ, যে দেশে মাগরিবের সাথে সাথেই সুবহে-সাদেক হয় যায়, সেদেশে এশার নামায ফরয হয় না।-(শাযী)

এর তাকাদা হল এই যে, যে দেশে ছয় মাসের দিন হয় সেখানে শুধু ষাট গুণ্যাকের নামায ফরয হবে। রমযান আদৌ আসবে না। হযরত হুসাইনুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী খানবী (রঃ)-ও 'এমদাদুল ফাতাওয়া' গ্রন্থে রোযা সম্পর্কে এ মতই গ্রহণ করেছেন।

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ - আয়াতে কব্বা

কিবা মুসাফিরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে যে, সে তখন রোযা না রেখে রময হওয়ার পর অথবা সফর শেষ হওয়ার পর ততদিনের রোযা কায্য রেখে নিবে, এ হুকুমটি যদিও পূর্ববর্তী আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া দেয়ার ঐচ্ছিকতাকে হিত করে দেয়া হয়েছে, কাজেই সন্দেহ হতে পারে যে, হয় তো কব্বা কিবা মুসাফিরের বেলায়ও হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে তার দৃষ্টান্ত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে রমযানের হুকুম-আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর একটি সুদীর্ঘ আয়াতে রোযা ও এ'তেকাফর বিবরণ দিত হয়েছে। এখানে মাঝখানে বর্তমান সর্বশেষ আয়াতটিকে বান্দাদের ন্যায় প্রতি মহান পরওয়ারদেগারের অনুগ্রহ এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ ও কবল করার বিষয় আলোচনা করে নির্দেশ পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। রময, রোযা-সংক্রান্ত এবাদতে অবস্থাবিশেষে অব্যাহতি দান এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সন্তোষ কিংবা কষ্ট বিদ্যমান রয়েছে। এ কষ্টকে সহজ করার দৃষ্টে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যি আমার বান্দাদের সন্নিহিত রয়েছে, যখনই তারা আমার কাছে কোন প্রার্থনা বা দোয়া করে, আমি তাদের সে দোয়া কবুল করে নেই এবং তাদের বাসনা পূরণ করে দেই।

এব্যতাবস্থায় আমার হুকুম-আহকাম মেনে চলা বান্দাদেরও একান্ত সন্তোষ। তাতে কিছুটা কষ্ট হলেও তা সহ্য করা উচিত। ইমাম হানাফী-কাসীর দোয়ার প্রতি উৎসাহদান সংক্রান্ত এই মধ্যবর্তী বাক্যটির সূত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতের দ্বারা রোযা রাখার পর কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে জন্যই রোযার ফতোয়ার পর দোয়ার ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা উচিত। (শাযী) এরশাদ করেছেন-

لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ

অর্থাৎ, রোযার ইফতার করার সময় রোযাদারের দোয়া-কবুল হয়ে থাকে।-(আবু দাউদ)

সে জন্যই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ইফতারের সময় রমযাহকে সমবেত করে দোয়া করতেন।

মাসআলা : এ আয়াতে قُلْتُ قَوْلِي (আমি নিকটেই রয়েছি) বলে

ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ধীরে-সুস্থে ও নীরবে দোয়া করাই উত্তম, উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করা পছন্দনীয় নয়। ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) এ আয়াতের শানে-নুয়ল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, কোন গ্রামের কিছু অধিবাসী রসুলে-করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিল যে, 'যদি আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের নিকটেই থেকে থাকেন, তবে আমরা আস্তে আস্তে দোয়া করব। আর যদি দূরে থেকে থাকেন তবে উচ্চৈঃস্বরে ডাকব।' এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

أَحِلُّ لَكُمْ বাক্যাংশটি দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, যে বিষয়টিকে এ আয়াত

দ্বারা হালাল করা হয়েছে, তা ইতিপূর্বে হারাম ছিল। বোখারী এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবে সাহাবী হযরত বারা ইবনে আ'যেবের বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রথম যখন রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছিল, তখন ইফতারের পর থেকে শয্যাগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা ও স্ত্রী-সহবাসের অনুমতি ছিল। একবার শয্যাগ্রহণ করে ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথেই এ সবকিছু হারাম হয়ে যেতো। কোন কোন সাহাবী এ ব্যাপারে অসুবিধায় পড়েন। কায়স ইবনে-সারমাহ আনসারী নামক জনৈক সাহাবী একবার সমগ্র দিন কঠোর পরিশ্রম করে ইফতারের সময় ঘরে এসে দেখেন, ঘরে খাওয়ার মত কোন কিছুই নেই। স্ত্রী বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি কোনখান থেকে কিছু সংগ্রহ করে আনার চেষ্টা করি। স্ত্রী যখন কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরে এলেন ততক্ষণে সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়ার দরুন খানা-পিনা তাঁর জন্য হারাম হয়ে যায়। ফলে পরদিন তিনি এ অবস্থাতেই রোযা রাখেন। কিন্তু দুপুর বেলায় শরীর দুর্বল হয়ে তিনি বেঁইট হয়ে পড়ে যান।-(ইবনে-কাসীর)

অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবী গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর স্ত্রীদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে মানসিক কষ্টে পতিত হন। এসব ঘটনার পর এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে পূর্ববর্তী হুকুম রহিত করে সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে সুবহে - সাদেক উদ্দিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র রাতেই খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। ঘুমাবার পূর্বে কিবা ঘুম থেকে উঠার পর সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতাও এতে আর অবশিষ্ট রাখা হয়নি। এমনকি হাদীস অনুযায়ী শেষরাতে সেহরী খাওয়া সুনন সাব্যস্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কিত নির্দেশই প্রদান করা হয়েছে।

حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْوَيْسُ : সেহরী খাওয়ার শেষ সময়সীমা :

আয়াতে রাতের অন্ধকারকে কালো রেখা এবং ভোরের আলো ফোটাতে সাদা রেখার সাথে তুলনা করে রোযার শুরু এবং খানা-পিনা হারাম হওয়ার সঠিক সময়টি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু এ সময়সীমার মধ্যে বেশ-কম হওয়ার সম্ভাবনা যাতে না থাকে সেজন্য

حَتَّى يَبَيِّنَ শব্দটিও যোগ করে দেয়া হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সন্দেহগ্রহণ লোকদের ন্যায় সুবহে-সাদেক দেখা দেয়ার আগেই খানা-পিনা হারাম মনে করো না অথবা এমন অসাবধানতাও অবলম্বন করো না যে, সুবহে-সাদেকের আলো ফুটে উঠার পরও খানা-পিনা করতে থাকবে। বরং খানা-পিনা এবং রোযার মধ্যে সুবহে-সাদেকের উদয় সঠিকভাবে নির্ণয়ই হচ্ছে সীমারেখা। এ সীমারেখা উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা বন্ধ করা জরুরী মনে করা যেমন জায়েয নয়, তেমনি সুবহে-সাদেক উদয় হওয়ার ব্যাপারে একীন হয়ে

যাওয়ার পর খানা-পিনা করাও হারাম এবং রোযা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ, তা এক মিনিটের জন্য হলেও। সুবহে-সাদেক উদয় সম্পর্কে একীকৃত হওয়া পর্যন্তই সেহরীর শেষ সময়।

মাসআলা : উপরোক্ত আলোচনাগুলো শুধুমাত্র সেসব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের নিজের চোখে ‘সুবহে-সাদেক’ দেখে সময় নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। যেমন, আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে এবং সময় সম্পর্কেও যদি তাদের সঠিক জ্ঞান থাকে। কিন্তু যাদের তেমন সুযোগ নেই, অর্থাৎ, আকাশ ঠিকমত দেখবার সুযোগ নেই, সুবহে-সাদেকের উদয় সম্পর্কে সঠিক ধারণাও নেই, কিংবা আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে সেসব লোকের পক্ষে অন্যান্য লক্ষণ কিংবা জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য নিয়ে সেহরী-ইফতারের সময় নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্য এসব হিসাবের মধ্যেও এমন সময় আসতে পারে, যে সময়সীমার মধ্যে সুবহে-সাদেকের উদয় হওয়ার ব্যাপারে একীকৃত বা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। এমনভাবেই সন্দেহযুক্ত সময়ে কি করা উচিত, এ সম্পর্কে ইমাম জাসাস ‘আহকামুল-কোরআন’ গ্রন্থে বলেন—এরূপ ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে খানা-পিনা না করাই কর্তব্য। তবে এরূপ সন্দেহপূর্ণ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ, সুবহে-সাদেক উদয় হওয়ার পূর্বকণে যদি কেউ প্রয়োজনবশতঃ খানা-পিনা করে ফেলে, তবে সে গোনাহ্গার হবে না। কিন্তু পরে তাহকীক বা যাচাই করে যদি দেখা যায়, যে সময় সে খানা-পিনা করেছে সে সময় সুবহে-সাদেক হয়ে গিয়েছিল, তবে তার পক্ষে সেদিনের রোযার কায্য করা ওয়াজিব হবে। যেমন, রমযানের এক তারিখে চাঁদ না দেখার কারণে লোকেরা রোযা রাখল না, কিন্তু পরে জানা গেল যে, ২৯শে শাবানেই রমযানের চাঁদ উদিত হয়েছিল। তবে এমনভাবেই যারা সে দিনটিকে ৩০শে শাবান মনে করে রোযা রাখেনি, তারা গোনাহ্গার হবে না, তবে তাদের এ দিনের রোযা সকল ইমামের মতেই কায্য করতে হবে। অনুরূপভাবে যেখানো দিনে কেউ সূর্য অস্ত গেছে মনে করে ইফতার করে ফেললো, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল এমনভাবেই এ ব্যক্তি গোনাহ্গার হবে না সত্য, তবে তার উপর ঐ রোযা কায্য করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম জাসাসের উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বোঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি ঘুম ভাঙার পর শুনতে পায় যে, ফজরের আযান হচ্ছে, তখন তার পক্ষে সুবহে-সাদেক উদয় হওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহে একীকৃত হয়ে যায়। এরপরও যদি সে জেনে শুনে কিছু খেয়ে নেয়, তবে সে গোনাহ্গারও হবে এবং তার উপর সে রোযা কায্য করাও ওয়াজিব হবে। অপরপক্ষে যদি সে সন্দেহযুক্ত সময়ে খায় এবং পরে সুবহে-সাদেক এ সময়েই উদিত

হয়েছিল বলে জানতে পারে, তবে তার উপর থেকে গোনাহ্ রহিত হয়ে যাবে বটে, কিন্তু রোযার কায্য করতে হবে।

এ’তেকাফ : এ’তেকাফ-এর শাবিক অর্থ কোন একস্থানে অবস্থান করা। কোরআন-সুন্নাহর পরিভাষায় কতকগুলো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট মসজিদে অবস্থান করাকে এ’তেকাফ বলা হয়। **فِي الْمَسْجِدِ** বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, এ’তেকাফ যে কোন মসজিদেই হতে পারে। কেননা, এখানে মসজিদ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শুধুমাত্র যেসব মসজিদে নিয়মিত জামাত হয়, সেসব মসজিদেই এ’তেকাফ করা বৈধ। অন্যান্য মসজিদ যেখানে নিয়মিত জামাত হয় না, সেগুলোতে এ’তেকাফ না হওয়ার ব্যাপারে ফেকাহবিদগণ যে শর্ত আরোপ করে থাকেন, তা ‘মসজিদ’ শব্দের সংজ্ঞা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, যেখানে নিয়মিত জামাতে নামায হয়, তাকেই কেবল মসজিদ বলা যেতে পারে। বাসস্থান বা দোকান-পাট সর্বত্রই বিচ্ছিন্নভাবে নামায পড়া জায়েয এবং তা হয়েও থাকে, কিন্তু তাই বলে সেগুলোকে মসজিদ বলা হয় না।

মাসআলা : এ’তেকাফের অবস্থায় খানা-পিনার হুকুম সাধারণ রোযাদারদের প্রতি প্রযোজ্য নির্দেশেরই অনুরূপ। তবে স্ত্রী-সহবাসের ব্যাপারে এ অবস্থায় পৃথক নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ’তেকাফ অবস্থায় এটা রাতের বেলায়ও জায়েয নয়। এ আয়াতে সে নির্দেশই ব্যক্ত হয়েছে।

রোযার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ : সর্বশেষ আয়াত **رَبِّكَ حَذَرُكَ لِلَّهِ فَلَا تَحْكُمُوا** বলে ইশারা করা হয়েছে যে, রোযার মধ্যে খানা-পিনা এবং স্ত্রী-সহবাস সম্পর্কিত যেসব নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এগুলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, এর ধারে-কাছেও যেয়ো না। কেননা, কাছে গেলেই সীমালঙ্ঘনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। একই কারণে রোযা অবস্থায় কুলি করতে বাড়াবাড়ি করা, যক্ষ্মণ গলার ভেতরে পানি প্রবেশ করতে পারে, মুখের ভিতর কোন অম্ল ব্যবহার করা, স্ত্রীর অতিরিক্ত নিকটবর্তী হওয়া প্রভৃতি মকরুহ। তেমনিভাবে সময় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য সময়ের কিছুটা আগেই সেহরী খাওয়া শেষ করে দেয়া এবং ইফতার গ্রহণে দু’চার মিনিট দেরী করা উত্তম। এসব ব্যাপারে অসাবধানতা এবং শৈথিল্য প্রদর্শন আল্লাহ্ এই নির্দেশের পরিপন্থী।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُّوا بِهَا
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٥٦ وَتَعْلَمُونَ أَنَّ
قُلُوبَ هَٰؤُلَاءِ لِلنَّاسِ وَالْحَيَّةِ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِن الْبِرُّ مَنِ اتَّقَىٰ
وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ١٥٧ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ
يَقَاتِلْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا إِلَّا الْكَافِرِينَ لَا يُحِبُّ
الْمُتَعَدِّينَ ١٥٨ وَأَمَّا تُولَاهُمُ حَيْثُ يَقْتُلُوكُمْ وَتُخْرِجُوكُمْ
مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا
تُقَاتِلُوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يَفْتُلُوكُمْ
فِيهِ فَإِنْ فُتِلُوكُمْ فَأْمَلُوا لَهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ
الْكُفْرَانِ ١٥٩ فَإِنْ اتَّخَذُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٦٠
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ
بِلَهُوَ فَإِنْ اتَّخَذُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ١٦١

(১৫৮) তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-জেনে পাশ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না। (১৫৯) তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। বলে দাও যে, এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম। আর পেছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোন নেকী বা কল্যাণ নেই। অবশ্য নেকী হল আল্লাহকে ভয় করার মধ্যে। আর তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা নিজেদের বাসনায় কৃতকার্য হতে পার। (১৬০) আর লড়াই কর আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (১৬১) আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাণ্ডা সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখানে থেকে যেখানে থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্ত্রতঃ ফেতনা-কসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তোমাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি। (১৬২) আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু। (১৬৩) আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোন জ্বরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তোমাদের ব্যাপার আলাদা)।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইতিপূর্বে সূরা বাক্বারাহ ১৬৮-তম আয়াতে হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। পূর্ববর্তী সে আয়াতে বলা হয়েছিল :

“হে মানবমণ্ডলী! জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্ত্রসমূহ খাও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুষমন।”

অনুরূপ সূরা-নাহলে এরশাদ হয়েছে -

“তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা যে পবিত্র ও হালাল রুমী দান করেছেন, তা থেকে খাও এবং আল্লাহর নেয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই উপাসক হয়ে থাক।”

প্রথম আয়াতে সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ)-এর একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে তার জওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসেরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে-কেরামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি সম্পদ ও সমীহ বোধের কারণে খুব কমই প্রশ্ন করতেন। তাঁরা এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যমানার উম্মতদের ব্যতিক্রম ছিলেন। পূর্ববর্তী উম্মতগণ এ আদর্শের প্রতি সচেতন ছিল না। তারা সব সময় নানা অবাস্তর প্রশ্ন করতো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সাহাবীগণের যেসব প্রশ্নের উল্লেখ কোরআন মজীদে বিদ্যমান রয়েছে, তা সংখ্যায় মাত্র চৌদ্দটি। এ চৌদ্দটি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي** (যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমার কাছে প্রশ্ন করে।) দ্বিতীয় প্রশ্নটি আলোচ্য চন্দ্রের হাস-বন্ধি সম্পর্কিত। এই দু'টি প্রশ্ন ছাড়াও সূরা বাক্বারায় আরও ছয়টি প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে। বাকী ছয়টি প্রশ্ন পরবর্তী বিভিন্ন সূরায় বিদ্যমান।

উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে ‘আহ্লিয়া’ বা নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ, চাঁদের আকৃতি-প্রকৃতি সূর্য থেকে ভিন্নতর। সেটা এক সময় সরু বাঁকা রেখার আকৃতি ধারণ করে অতঃপর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে; অবশেষে সম্পূর্ণ গোলাকের মত হয়ে যায়। এরপর পুনরায় ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে। এই হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ অথবা এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন। এই দুই প্রকার প্রশ্নেরই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যে উত্তর প্রদান করা হয়েছে, তাতে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে। যদি প্রশ্নই এই হয়ে থাকে যে, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? তবে তো প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর হয়েই গেছে। আর যদি প্রশ্নে এই হ্রাস-বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত রহস্য জানবার উদ্দেশ্য থেকে থাকে, যা ছিল সাহাবায়ে-কেরামের স্বভাববিরুদ্ধ, তবে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মৌল-তত্ত্ব বর্ণনার পরিবর্তে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনার দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশের গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর মৌলিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে। আর মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন বিষয়ই এই জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য ও জবাব এই যে, চন্দ্রের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি এবং উদয়াস্তের মধ্যে আমাদের কোন কোন মঙ্গল নিহিত? সেজন্য আল্লাহ

তাআলা প্রশ্নের উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, চাঁদের সঙ্গে তোমাদের যেসব মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পৃক্ত তা এই যে, এতে তোমাদের কাজ-কর্ম ও চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ এবং হজ্জের দিনগুলোর হিসাব জেনে রাখা সহজতর হবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে চান্দ্র ও সৌর-হিসাবের গুরুত্ব : এ আয়াতে এতটুকু বোঝা গেল যে, চন্দ্রের দ্বারা তোমরা তারিখ ও মাসের হিসাব জানতে পারবে, যার উপর তোমাদের লেন দেন আদান-প্রদান এবং হজ্জ প্রভৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গটিই সূরা ইউনুসে বিবৃত হয়েছে :

وَقَدْ رَكَّ نَزْلَ الْوَحْيِ عِنْدَ الْبَيْنِ وَالْحِسَابِ

এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, বিভিন্ন পর্যায় ও বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে চন্দ্রের পরিক্রমণের উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা বর্ষ, মাস ও তারিখের হিসাব জানা যায়, কিন্তু সূরা বনী-ইসরায়েলের আয়াতে বর্ষ, মাস ও দিন-ক্ষণের হিসাব যে সূর্যের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত তাও বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে :

مَنْ مَوَاقِدَ آيَةِ الْيَوْمِ وَجَعَلْنَا آيَةَ الْيَوْمِ مِثْقَالَ الْمِيزَانِ

فَضْلًا لَكُمْ مِنْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ عِنْدَ الْبَيْنِ وَالْحِسَابِ

অর্থাৎ, “অতঃপর আমি রাতের চিহ্ন তিরোহিত করে দিনের চিহ্নকে দর্শনযোগ্য করলাম, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের দান রুখী-রোযগারের অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষপঞ্জী ও দিন-ক্ষণের হিসাব অবগত হতে পার।”-(বনী-ইসরায়েল)

এই তৃতীয় আয়াত দ্বারা যদিও প্রমাণিত হলো যে, বর্ষ, মাস ইত্যাদির হিসাব সূর্যের আঙ্গিক গতি এবং বার্ষিক গতি দ্বারাও নির্ণয় করা যায়। কিন্তু চন্দ্রের ক্ষেত্রে কোরআন যে ভাষা প্রয়োগ করেছে, তাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরীয়তে চান্দ্রমাসের হিসাবই নির্ধারিত। রমযানের রোযা, হজ্জের মাস ও দিনসমূহ, মররম, ঈদ, শবে-বরাত ইত্যাদির সঙ্গে যেসব বিধি-নিষেধ সম্পৃক্ত, সেগুলো সবই ‘রুইয়াতে-হেলাল’ বা নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। কেননা, এই আয়াতে ‘مِنْ مَوَاقِدَ آيَةِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلِ وَالْحِسَابِ’ - ‘এটি মানুষের হজ্জ ও সময় নির্ধারণের উপায়’ বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যদিও এই হিসাব সূর্যের দ্বারাও অবগত হওয়া যায়, তবুও আল্লাহর নিকট চান্দ্রমাসের হিসাবই নির্ভরযোগ্য।

ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক চান্দ্রমাসের হিসাব গ্রহণ করার কারণ এই যে, প্রত্যেক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিই আকাশে চাঁদ দেখে চান্দ্রমাসের হিসাব অবগত হতে পারে। পণ্ডিত, মুখ, গ্রামবাসী, মরুবাসী, পার্বত্য উপজাতি ও সভ্য-অসভ্য নির্বিশেষে সবার জন্যই চান্দ্রমাসের হিসাব সহজতর। কিন্তু সৌরমাস ও সৌরবৎসর এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এর হিসাব জ্যোতির্বিদদের ব্যবহার্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং ভৌগোলিক, জ্যামিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যার সূত্র ও নিয়ম-কানূনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এই হিসাব প্রত্যেকের পক্ষে সহজে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসের হিসাব বাধ্যতামূলক করা হলেও সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এ

হিসাবেরই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। চাঁদ ইসলামী এবাদতের অবলম্বন। চাঁদ এক হিসেবে ইসলামের প্রতীক বা ‘শে’আরে ইসলাম। ইসলাম যদিও সৌরপঞ্জী ও সৌর-হিসাবকে এই শর্তে নাজায়েয বলেনি, তবুও এতটুকু সাবধান অবশ্যই করেছে, যেন সৌর হিসাব এত প্রাধান্য লাভ না করে, যাতে লোকেরা চান্দ্রপঞ্জী ও চান্দ্রমাসের হিসাব ভুলেই যায়। কারণ, এরূপ করাতে রোযা, হজ্জ ইত্যাদি এবাদতে ত্রুটি হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী।

মাসআলা (‘ঘরের

পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করাতে তোমাদের জন্য কোন পুণ্য নেই’) এই আয়াত দ্বারা এই মাসআলা জানা গেল যে, যে বিষয়কে ইসলামী শরীয়ত প্রয়োজনীয় বা এবাদত বলে মনে করে না, তাকে নিজেদের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় বা এবাদত মনে করা জায়েয নয়। এমনভাবে যে বিষয় শরীয়তে জায়েয রয়েছে, তাকে পাপ মনে করাও গোনাহ। মক্কার কাফেররা তাই করছিল। তারা ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা শরীয়তসম্মতভাবে জায়েয থাকা সত্ত্বেও না-জায়েয মনে করতো এবং পাপ বলে গণ্য করতো, ঘরের পিছন দিক দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে বা বেড়া কেটে বা সিঁধ কেটে ঘরে প্রবেশ করাকে (শরীয়তে যার কোন আবশ্যকতাই ছিল না) নিজেদের জন্য অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করেছিল। এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

‘বেদআত’-এর না-জায়েয হওয়ার বড় কারণই তাই যে, এতে অপ্ৰয়োজনীয় বিষয়সমূহকে ফরয- ওয়াজিবের মতই অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয় অথবা কোন কোন জায়েয বস্তুকে না-জায়েয ও হারাম বলে গণ্য করা হয়। আলোচ্য আয়াতে এরূপ শরীয়ত-বহির্ভূত নিয়মে জায়েযকে না-জায়েয মনে করা অথবা হারামকে হালাল মনে করা বা ‘বেদআত’-এর প্রচলন করার নিষেধাজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

জেহাদ বা ন্যায়ের সংগ্রাম : গোটা মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, মদীনায় হিজরতের পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে ‘জেহাদ’ ও ‘কেতাল’ তথা যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে অবতীর্ণ কোরআন মজীদের সব আয়াতেই কাফেরদের অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়। রবী’ ইবনে-আনাস (রাঃ)-এর উক্তি অনুসারে মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

এই আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কেবলমাত্র সে সব কাফেরদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে যারা তাদের বিপক্ষে সম্পূর্ণ-সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় কাজে সংসারত্যাগী, উপাসনারত সন্ন্যাসী-পাদরী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, অসমর্থ অথবা যারা কাফেরদের অধীনে মেহনত মজদুরী করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হয় না—সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়েয নয়। কেননা, আয়াতের নির্দেশে কেবলমাত্র তাদেরই সঙ্গে যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু উল্লেখিত শ্রেণীর লোকদের কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এজন্য ফেকাহশাশ্রুঈ ইমামগণ বলেন, যদি কোন নারী, বৃদ্ধ অথবা ধর্মপ্রচারক বা ধর্মী মিশনারীর লোক কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অথবা কোন প্রকারে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা

জায়েয। কারণ, তারা **الَّذِينَ يُعَاتِلُونَ** 'যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে'

এই আয়াতের আওতাভুক্ত। (মায়হারী, কুরত্বী ও জাসাস) যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর তরফ থেকে মুজাহিদদেরকে যেসব উপদেশ দেয়া হতো, সেগুলোর মধ্যে এ নির্দেশের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে **وَلَا تَجِدُوا** (এবং সীমা অতিক্রম করো না)—বাক্যটির অর্থ অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই যে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে সীমা অতিক্রম করো না।

وَأَقْتُلُوهُمْ حَتَّى تَقُتْلُوهُمْ وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُمْ

— (আর তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর এবং যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও।) হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত মোতাবেক হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে—কেরাম (রাঃ)—সহ সে গুমরার কাবা আদায়ের উদ্দেশ্যে যাত্রার নিয়ত করেন, আগের বছর মক্কার কাফেররা যে গুমরা দখলপাশে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু সাহাবায়ে—কেরামের মনে তখন মুদাহের উদ্বেগ হয় যে, কাফেররা হয় তো তাদের সন্ধি ও চুক্তির মর্যাদা লঙ্ঘন করবে না। যদি তারা এ বছরও তাঁদেরকে বাধা দেয়, তবে তাঁরা কি করবেন? এ প্রসঙ্গেই উল্লেখিত আয়াতে অনুমতি প্রদান করা হলো যে, যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তোমাদেরও তার সমুচিত জবাব দেয়ার অনুমতি থাকলো।

পুরো মক্কী যিন্দেগীতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জ্যোপায়ে বাধা দান করা হয়েছিল এবং সর্বদা ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। কাজেই এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবিগণের ধারণা হয়েছিল যে, হয় তো কোন কোন ক্ষেত্রে কাফেরদিগকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ও দোষাভীষ্য হয়ে থাকবে। এ ধারণার অপনোদনকল্পে এরশাদ হলো : **وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ**—(এবং ফেতনা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও কঠিন অপরাধ)। অর্থাৎ, একথা তো অবশ্যই সত্য ও সর্জনবিদিত যে, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম, কিন্তু মক্কার কাফেরদের কুফরী ও শিরকের উপর অটল থাকা এবং মুসলমানদিগকে গুমরা ও হজ্বের মত ঐশ্বর্যের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ। জ্ঞান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করা হলো। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত **فِتْنَةٌ** (ফেতনা) শব্দটির অর্থ কুফর, শিরক এবং মুসলমানদের এবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই বোঝানো হয়েছে।—(জাসাস, কুরত্বী প্রমুখ)

অবশ্য এ আয়াতের ব্যাপকতার দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেররা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে হত্যা করা শরীয়তসিদ্ধ। আয়াতের

এই ব্যাপকতাকে পরবর্তী বাক্যে এই বলে সীমিত করা হয়েছে—

وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُفْتَلُوا مِنْكُمْ فِيهِ

অর্থাৎ, 'মসজিদুল-হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকা তথা পুরো হরমে মক্কায় তোমরা তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হয়।

মাসআলা : হরমে-মক্কার বা মক্কার সম্মানিত এলাকায় মানুষ তো দূরের কথা, কোন হিঙ্গ্র পশু হত্যা করাও জায়েয নয়। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, যদি কেউ অপরকে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তাখন তার প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা জায়েয। এই মর্মে সমস্ত ফেকাহবিদগণ একমত।

মাসআলা : এ আয়াত দ্বারা আরও বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথম অভিযান আক্রমণ বা আগ্রাসন কেবলমাত্র মসজিদুল-হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা 'হরমে মক্কা'—ই নিষিদ্ধ। অপরূপ এলাকায় যেমন প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ অপরিহার্য, তেমনি প্রথম আক্রমণ বা অভিযানও জায়েয।

সপ্তম হিজরী সনে যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিগত বছরের গুমরার কাবা আদায় করার নিয়তে সাহাবিগণ (রাঃ)—সহ মক্কা অভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন হযরত (সাঃ)—এর সাহাবিগণ জানতেন যে, কাফেরদের কাছে চুক্তি ও সন্ধির কোনই মর্যাদা নেই। এমনও হতে পারে, তারা সন্ধির প্রতি কক্ষপ না করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। তখন সে ক্ষেত্রে সাহাবিগণের মনে এই আশঙ্কার উদ্ভব হয় যে, এতে করে হরম-শরীফেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। উপরের আয়াতে সাহাবিগণের এ আশঙ্কার জবাব দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : মক্কার হরম-শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মুসলমানদের অবশ্যই অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু যদি কাফেররা হরম-শরীফের এলাকায় মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার মোকাবেলায় মুসলমানদের পক্ষেও যুদ্ধ করা জায়েয।

সাহাবিগণের মনে দ্বিতীয় সন্দেহ এই ছিল যে, এটা মিলকদ মাস এবং সে চার মাসেরই অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোকে 'আশহর-হারাম' বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এই মাসসমূহে কোথাও কারও সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে আমরা এই মাসে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করবো? তাঁদের এই দ্বিধা দূর করার জন্যই আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে। অর্থাৎ, মক্কার হরম-শরীফের সম্মানার্থ শত্রুর হামলা প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা যেমন শরীয়তসিদ্ধ, তেমনিভাবে হারাম মাসের (সম্মানিত মাসেও) যদি কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েয।

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ مُصَاصٌ قَبْلَ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ قَاعَتًا وَأَعْيَوْ بِبَيْتٍ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ وَأَنْفِقُوا لِلَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا يَكْفُرُ إِلَى التَّهْكِيمِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَأَرْسَلْنَا الْحَبَّةَ وَالْعَبْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْرِجْنَاهُمْ مِمَّا اسْتَبَسَّرُوا مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْفَظُوا أَرْسَلْنَاهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا الْهَدْيَ مَحَلَّةً فَكُنْ كَانَ مِنْكُمْ قُرَيْشًا أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ رَأْسَهُ فَوَدَّاهُ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ فَإِذَا أَوْفَرْنَا فَكُنْ تَكُنَّ بِالْعَبْرَةِ إِلَى الْحَبَّةِ فَمَا اسْتَبَسَّرُوا مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَيَمِيزْ لَثَمَةً أَيْلًا فِي الْحَبَّةِ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرًا فِي السَّجْدِ الْحَرَامِ وَالْقَوْلُ لِلَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ الْحَبَّةُ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتٍ قَبْلَ قُرْصِ فَيُفَوِّتُ الْحَبَّةَ فَلَا رَيْبَ أَنْ تَقُصَّ وَلَا كَيْدًا فِي الْحَبَّةِ وَتَقَعُوا مِنْ حَيْزٍ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرِّزْقِ الْقَوْلَى وَتَقُولُونَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۝
--

(১৯৪) সম্প্রদানিত মাসই সম্প্রদানিত মাসের বদলা। আর সম্প্রদানিত রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুতঃ যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছে। (১৯৫) আর ব্যয় কর আল্লাহ পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্প্রদানিত করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহর অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন। (১৯৬) আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পরিপূর্ণভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধ্যপ্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যাকিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর থাও। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুগুন করবে না, যতক্ষণ না কোরবানী যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাধ্যম যদি কোন কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোযা করবে কিংবা খয়রাতে দেবে অথবা কুরবানী করবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা হজ্জ ও ওমরাহ একত্রে একই সাথে পালন করতে চাও, তবে যাকিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কুরবানী করাই তার উপর কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা কোরবানীর পশু পাবে না, তারা হজ্জের দিনগুলোর মধ্যে রোযা রাখবে তিনটি আর সাতটি রোযা রাখবে ফিরে যাবার পর। এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ নির্দেশটি তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদুল-হারামের আশে-পাশে বসবাস করে না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। সন্দেহাতীতভাবে জেনে যে, আল্লাহর আখ্যাব বড়ই কঠিন। (১৯৭) হজ্জের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীও সাথে নিরাভরণ হওয়া জায়েজ নয়। না আশোভন কোন কাজ করা, না ঝগড়া-বিবাদ করা হজ্জের সেই সময় জায়েজ নয়। আর তোমরা যাকিছু সৎকাজ কর, আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা পাথের সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথের হজ্জ আল্লাহর ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাক, হে বুঝিনামগণ। তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অব্রূণ করায় কোন পাপ নেই।

জেরাহে অর্থ ব্যয় : وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (এবং তোমরা আল্লাহর পথে খরচ কর) - এই আয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে প্রয়োজনমত ব্যয় করা মুসলমানদের প্রতি ফরয হয়েছে। এই আয়াত থেকে ফেকাহশাঈবিদ আলমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুসলমানদের উপর ফরয যাকাত ব্যতীত আরও এমন কিছু দায়-দায়িত্ব ও ব্যয় খাত রয়েছে, যেগুলো ফরয। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোন খাত নয় বা সেগুলোর জন্য কোন নির্ধারিত নেসাব বা পরিমাণ নেই। বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকুই খরচ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। আর যদি প্রয়োজন না হয়, তবে কিছুই ফরয নয়। জেরাহে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়েভুক্ত।

وَلَا تَقُولُوا يَكْفُرُ إِلَى التَّهْكِيمِ - (এবং স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংসের

মুখে ঠেলে দিও না।) আয়াতাত্ত্বের শাসনিক অর্থ অত্যন্ত দৃষ্টান্তমূলক ও স্পষ্ট। এতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে। এখন কথা হলো যে, 'ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা' বলতে এক্ষেত্রে কি বোঝানো হয়েছে? এ প্রশ্নে কোরআন মজীদে ব্যাখ্যাভাগের অভিমত বিভিন্ন প্রকার। ইমাম জাসাসাস ও ইমাম রায়ী (রাঃ) বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন উক্তি মাঝে কোন বিরোধ নেই। প্রত্যেকটি উক্তিই গৃহীত হতে পারে। হয়রত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাথিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপেই জানি। কথা হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শোনা করি। এ প্রশ্নেই এই আয়াতটি নাথিল হলো। এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, 'ধ্বংসের' দ্বারা এখানে জেরাহ পরিভাষা করাকেই বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জেরাহ পরিভাষা করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ। সেজন্যই হয়রত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) সারা জীবনই জেরাহ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইন্তাযুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন।

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আকবাস (রাঃ), হুযায়ফা (রাঃ), কাতাদা (রাঃ) এবং মুজাহিদ ও যাহ্যাক (রাঃ) প্রমুখ তফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের কাছ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

হয়রত বার' ইবনে আ'যেব (রাঃ) বলেছেন - পাপের কারণে আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। এজন্যই মাগফেরাত সম্পর্কে নিরাশ হওয়া হারাম।

ইমাম জাসাসাস (রাঃ)-এর ভাষ্য অনুযায়ী উপরোক্ত সমস্ত নির্দেশই এ আয়াত থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ - এই বাক্য প্রত্যেক কাজ

সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে। সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করাকে কোরআন 'ইহসান' احسان শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছে। ইহসান দু'রকম : (১) এবাদতে ইহসান ও (২) দৈনন্দিন কাজ কর্ম, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহসান। এবাদতের ইহসান সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'হাদীসে-জিবরাঈল'- এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে,

এমনভাবে এবাদত কর, যেন তুমি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছ। আর যদি সে পর্যায় পর্যন্ত পৌছতে না পারে, তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।

এছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে (খু' আমালাত ও খু' আশারাতে) ইহসানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত মা' আয হুসনে জাবাল বর্ণিত মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে হযরত রসূল-করীম (সাঃ) বলেছেন : 'তোমরা নিজেদের জন্যে যাকিছু পছন্দ কর, অন্যান্য লোকদের জন্যেও তাই পছন্দ কর। আর যা তোমরা নিজেদের জন্যে ন-পছন্দ কর, অন্যের জন্যেও তা না-পছন্দ করবে।'—(মায়হারী)

হজ্ব সর্বসম্মতভাবে ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে একটি রুকুন এবং ইসলামের ফরায়েয বা অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কোরআনের বহু আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এর প্রতি তাকীদ ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অধিকাংশ ওলামায়ে-কেরামের মতে হিজরী তৃতীয় বছর, যে বছর হুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সে বছরই সূরা আল ইমরানের একটি আয়াতের মাধ্যমে হজ্ব ফরয করা হয়েছে।—(ইবনে কাসীর)

এ আয়াতেই হজ্ব ফরয হওয়ার শর্তসমূহ এবং মর্মার্থ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্ব না করার কঠিন পরিশ্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য আটটি আয়াতের প্রথম আয়াত **وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ** ফুফাসেরীনের ঐকমত্য অনুযায়ী হোদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যা ৬ষ্ঠ হিজরী সালে সংঘটিত হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হজ্ব ফরয হওয়ার বিষয় বাতলানো নয়, তা পূর্বেই বাতল দেয়া হয়েছে, বরং এখানে উদ্দেশ্য হল হজ্ব ও ওমরার কিছু বিশেষ নির্দেশ বর্ণনা করা।

ওমরার আহকাম : সূরা আল-ইমরানের যে আয়াতের মাধ্যমে হজ্ব ফরয করা হয়েছে তাতে যেহেতু শুধুমাত্র হজ্বের কথাই বলা হয়েছে, ওমরার কোন আলোচনাই করা হয়নি, আর এই আয়াতে যাতে শুধু ওমরার কথাই আলোচনা করা হয়েছে, এর ফরয কিংবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন কথাই বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে যে, কোন লোক যদি এহরামের মাধ্যমে হজ্ব অথবা ওমরা আরম্ভ করে, তাহলে তার পক্ষে তা সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন, সাধারণ নফল নামায-রোযার ব্যাপারে এই হুকুম যে, তা আরম্ভ করলে সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। কাজেই এই আয়াতের দ্বারা ওমরা ওয়াজিব কিনা তা বুঝায় না। রং আরম্ভ করলে শেষ করতে হবে, তাই বুঝায়।

ইবনে-কাসীর হযরত জাবরের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন : তিনি রসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হুযর! ওমরা কি ওয়াজিব? তিনি লেছিলেন : ওয়াজিব নয়, তবে যদি কর, খুবই ভাল। তিরমিযী বলেছেন, ঐ হাদীসটি সহীহ ও হাসান। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক ধর্ম ওমরাকে ওয়াজিব বলেননি, সুন্নত বলে গণ্য করেছেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্ব অথবা ওমরা শুরু করলে তা আদায় করা ওয়াজিব। তবে প্রশ্ন উঠে, যদি কোন ব্যক্তি ওমরা শুরু করার পর কোন অসুবিধায় পড়ে তা আদায় করতে না পারে, তাহলে কি হবে? এর উত্তর পরবর্তী **فَإِنْ أُوْخِرَ** - বাক্যে দেওয়া হয়েছে।

এ আয়াতটি হোদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন রসূল

(সাঃ) এবং সাহাবিগণ এহরাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু মক্কার কাকফেররা তাঁদেরকে হরমের সীমায় প্রবেশ করতে দেয়নি। ফলে তাঁরা ওমরা আদায় করতে পারেননি। তখন আদেশ হলো, এহরামের ফিদইয়াস্বরূপ একটি করে কুরবানী কর। কুরবানী করে এহরাম ভেঙে ফেল। কিন্তু সাথে সাথে পরবর্তী আয়াত **وَلَا تَحْضُوا رُبُّكُمْ** - এ বলে দেয়া হয়েছে যে, এহরাম খোলার শরীয়তসম্মত ব্যবস্থা মাথা মুড়ানো ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয়, যতক্ষণ না এহরামকারীর কুরবানী নির্ধারিত স্থানে পৌছবে।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতে নির্ধারিত স্থানের সীমানা হচ্ছে হরমের এলাকায় পৌছে কুরবানীর পশু যবেহ করা। তা নিজে না পারলে, অন্যের দ্বারা জবাই করতে হবে। এ আয়াতে অপারকতা অর্থ হচ্ছে, রাস্তায় কোন শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকা। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য কোন কোন ইমাম অসুস্থতাকেও অপারকতার আওতাভুক্ত করেছেন। তবে রসূল (সাঃ)-এর আমল দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরবানী করেই এহরাম ছাড়তে হবে। কিন্তু বাতিলকৃত হজ্ব বা ওমরা কাযা করা ওয়াজিব। যেমন, হুযর (সাঃ) এবং সাহাবায়ে-কেরাম হোদায়বিয়া সন্ধির পরবর্তী বছর উল্লেখিত ওমরার কাযা আদায় করেছিলেন।

এ আয়াতে মাথা মুগুনকে এহরাম ভঙ্গ করার নিদর্শন বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এহরাম অবস্থায় মাথা মুগুন বা চুল ছাটা অথবা কাটা নিষিদ্ধ। এ হিসাবে পরবর্তী নির্দেশ বলা হয়েছে যে, কেউ যদি হজ্ব ও ওমরা আদায় করতে গিয়ে কোন অসুবিধার সম্মুখীন নাও হয়, কিন্তু অন্য কোন অসুবিধার দরুন মাথা মুগুন করতে বা মাথার চুল কাটাতে বাধ্য হয়, তবে তাকে কি করতে হবে?

এহরাম অবস্থায় কোন কারণে মাথা মুগুন করলে কি করতে হবে? **فَقِنْ كَانَ مِنَ الْمُحْرِمِينَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ** - এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি কোন অসুস্থতার দরুন মাথা বা শরীরের অন্য কোন স্থানের চুল কাটাতে হয়, অথবা মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তবে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোন স্থানের লোম কাটা জায়েয। কিন্তু এর ফিদইয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর তা হচ্ছে রোযা রাখা বা সদকা দেয়া বা কুরবানী করা। কুরবানীর জন্যে হরমের সীমা রেখা নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু রোযা রাখা বা সদকা দেয়ার জন্যে কোন বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই। তা যে কোন স্থানে আদায় করা চলে। কোরআনের শব্দের মধ্যে রোযার কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকাও কোন পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রসূল করীম (সাঃ) সাহাবী কা'ব ইবনে ওজরার এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে এরশাদ করেছেন, — তিনটি রোযা এবং ছয় জন মিসকীনকে মাথাপিছু অর্ধসা' গম দিতে হবে।— (বোখারী)

হজ্ব মৌসুমে হজ্ব ওমরা একত্রে আদায় করার নিয়ম : ইসলাম পূর্ব যুগে আরববাসীদের ধারণা ছিল, হজ্বের মাস আরম্ভ হয়ে গেলে অর্থাৎ, শাওয়াল মাস এসে গেলে হজ্ব ও ওমরা একত্রে আদায় করা অত্যন্ত পাপ।

এ আয়াতে তাদের এ ধারণার নিরসন করে বলা হয়েছে যে, মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্যে এ সময়ের মধ্যে হজ্ব ও ওমরা একত্রে সমাধা করা নিষেধ। কারণ, তাদের পক্ষে হজ্বের মাস অতিক্রান্ত হওয়ার

পরও ওমরার জন্যে দ্বিতীয়বার মীকাতে গমন করা তেমন অসুবিধার ব্যাপার নয়। কিন্তু এ সীমারেখার বাইরে থেকে যারা হজ্জ করতে আসে, তাদের জন্যে দু'টিকেই একত্রে আদায় করা জায়েয করে দেয়া হয়েছে। কেননা, এত দূর-দূরান্ত থেকে ওমরার জন্যে পৃথকভাবে ভ্রমণ করা খুবই কঠিন ও অসুবিধাজনক। সে সমস্ত নির্ধারিত স্থানসমূহকে মীকাত বলা হয়, যা সারা বিশ্বের হজ্জযাত্রিগণ যিনি যে দিক থেকে আগমন করেন, সেসব রাস্তার প্রত্যেকটিতে একটি স্থান আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। যখনই মক্কায় আগমনকারীরা এ স্থানে আসবে, তখন হজ্জ অথবা ওমরার নিয়তে এহরাম করা আবশ্যক। এহরাম ব্যতীত নির্ধারিত এ স্থান অতিক্রম করা গোনাহর কাজ। যেমন, বলা হয়েছে **لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ حَافِظُونَ السُّبُحَةَ الْقَرِيبَةَ** - এর অর্থ তাই। অর্থাৎ,

যাদের পরিবার-পরিজন মীকাতের সীমারেখার অভ্যন্তরে বসবাস করে না, তাদের জন্যে হজ্জ ও ওমরা হজ্জের মাসে একত্রে করা জায়েয।

অবশ্য যারা হজ্জের মৌসুমে হজ্জ ও ওমরাকে একত্রে আদায় করে, তাদের উপর এ দু'টি এবাদতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তা হচ্ছে, কুরবানী করার সামর্থ্য যাদের রয়েছে তারা বকরী, গাভী, উট প্রভৃতি যা তাদের জন্যে সহজলভ্য হয় তা থেকে কোন একটি পশু কুরবানী করবে। কিন্তু যাদের কুরবানী করার মত আর্থিক সংগতি নেই তারা দশটি রোযা রাখবে। হজ্জের ৯ তারিখ পর্যন্ত তিনটি আর হজ্জ সমাপনের পর সাতটি রোযা রাখতে হবে। এ সাতটি রোযা যেখানে এবং যখন সুবিধা, তখনই আদায় করতে পারে। হজ্জের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি রোযা পালন করতে না পারে, ইমাম আবু-হানীফা এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীর মতে তাদের জন্যে কুরবানী করাই ওয়াজিব। যখন সামর্থ্য হয়, তখন কারো মাধ্যমে হরম শরীফে কুরবানী আদায় করবে।

তামাযু ও কেৱান : হজ্জের মাসে হজ্জের সাথে ওমরাকে একত্রিতকরণের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে, মীকাত হতে হজ্জ ও ওমরার জন্যে একত্রে এহরাম করা। শরীয়তের পরিভাষায় একে 'হজ্জ-কেৱান' বলা হয়। এর এহরাম হজ্জের এহরামের সাথেই ছাড়তে হয়, হজ্জের শেষদিন পর্যন্ত তাকে এহরাম অবস্থায়ই কাটাতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, মীকাত হতে শুধু ওমরার এহরাম করবে। মক্কা আগমনের পর ওমরার কাজ-কর্ম শেষ করে এহরাম খুলবে এবং ৮ই মিলহজ্জ তারিখে মিনা যাবার প্রাকালে হরম শরীফের মধ্যেই এহরাম বেঁধে নেবে। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় 'তামাযু' কিন্তু **فَكُنْ تَمَكَّةً** এ সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

হজ্জ ও ওমরার আহকামের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাতে গাফলতি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ : শেষ আয়াতটিতে প্রথমে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেয়া হয়েছে; যার অর্থ এসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত, সতর্ক ও ভীত থাকা বুঝায়। অতঃপর বলা হয়েছে

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَدِيدُ الْعِقَابِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জেনে শোনে আল্লাহর

নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আজকাল হজ্জ ও ওমরাকারিগণের অধিকাংশই এ সম্পর্কে অসতর্ক। তারা প্রথমতঃ হজ্জ ও ওমরার নিয়মাবলী জানতেই চেষ্টা করে না। আর যদিও বা জেনে নেয়, অনেকেই তা যথাযথভাবে পালন করে না। অনেকেই দায়ি ত্র-জ্ঞানহীন মোয়াল্লেম ও সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে অনেক ওয়াজিব ও পরিত্যাগ করে। আর সুনত ও মুস্তাহাবের তো কথাই নেই। আল্লাহ

সবাইকে নিজ নিজ আমল যথাযথভাবে পালন করার তওফীক দান করুন।

হজ্জসংক্রান্ত ৮ টি আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় আয়াত ও তার মাসআলাসমূহ : **الْحَجَّ أَشْهُرٌ مُّكْتُمَاتٍ** - 'আশহরুন' শব্দটি শাহরুন শব্দের বহুবচন। এর অর্থ, মাস। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, যারা হজ্জ অথবা ওমরা করার নিয়তে এহরাম বাঁধে, তাদের উপর এর সকল অনুষ্ঠানক্রিয়ায় সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এ দু'টির মধ্যে, ওমরার জন্যে কোন সময় নির্ধারিত নেই। বছরের যে কোন সময় তা আদায় করা যায়। কিন্তু হজ্জের মাস এবং এর অনুষ্ঠানাদি আদায়ের জন্যে সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই এ আয়াতের শুরুতেই বলে দেয়া হয়েছে যে, হজ্জের ব্যাপারটি ওমরার মত নয়। এর জন্যে কয়েকটি মাস রয়েছে, সেগুলি প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। জাহেলিয়াতের যুগ থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত এ মাসগুলোই হজ্জের মাসরূপে গণ্য হয়ে আসছে। আর তা হচ্ছে শাওয়াল, মিলকদ ও মিলহজ্জের দশ দিন। আবু উমামাহ ও ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে তা'ই বর্ণিত হয়েছে। - (মায়হারী)

হজ্জের মাস শাওয়াল হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে হজ্জের এহরাম বাঁধা জায়েয নয়। কোন কোন ইমামের মতে শাওয়ালের পূর্বে হজ্জের এহরাম করলে হজ্জ আদায়ই হবে না। ইমাম আবু হানীফার মতে হজ্জ অবশ্য আদায় হবে, কিন্তু মাকরুহ হবে। - (মায়হারী)

فَمَنْ قَرَضَ فُتُوْنَ الْحَجَّةِ فَلَا يَفُكَّ وَلَا يَتُوبُ وَكَانَ فِي الْحَجَّةِ

- এ আয়াতে হজ্জের এহরামকারীদের জন্য নিষিদ্ধ কাজ-কর্মের কিছুটা বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এহরাম অবস্থায় যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য ও ওয়াজিব তা হচ্ছে 'রাফাস' 'ফুসুক' ও 'জিদাল'। **رَفَأَ** 'রাফাস' একটি ব্যাপক শব্দ, যাতে স্ত্রী-সহবাস ও তার আনুষঙ্গিক কর্ম, স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত। এহরাম অবস্থায় এ সবই হারাম। অবশ্য আকার-ইঙ্গিত দুষ্পণ্য নয়।

فُتُوْنٌ 'ফুসুক' -এর শাব্দিক অর্থ বের হওয়া। কোরআনের ভাষায় নির্দেশ লঙ্ঘন বা নাফরমানী করাকে 'ফুসুক' বলা হয়। সাধারণ অর্থে যাবতীয় পাপকেই 'ফুসুক' বলে। তাই অনেকে এস্থলে সাধারণ অর্থই নিয়েছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) 'ফুসুক' শব্দের অর্থ করেছেন - সে সকল কাজ-কর্ম যা এহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। স্থান অনুসারে এই ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, সাধারণ পাপ এহরামের অবস্থাতেই শুধু নয়; বরং সব সময়ই নিষিদ্ধ।

যে সমস্ত বিষয় প্রকৃতপক্ষে না-জায়েয ও নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু এহরামের জন্য নিষেধ ও না-জায়েয - তা হচ্ছে ছয়টিঃ

(১) স্ত্রী-সহবাস ও এর আনুষঙ্গিক যাবতীয় আচরণ; এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস-সংক্রান্ত আলাপ -আলোচনা। (২) স্থলভাগের জীবজন্তু শিকার করা বা শিকারীকে বলা দেয়া। (৩) নখ বা চুল কাটা। (৪) সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার। এ চারটি বিষয় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যেই এহরাম অবস্থায় হারাম বা নিষিদ্ধ।

অবশিষ্ট দু'টি বিষয় পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত। (৫) সেলাই করা কাপড় পরিধান করা। (৬) মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা। অবশ্য মুখমণ্ডল আবৃত করা স্ত্রীলোকদের জন্যেও না-জায়েয।

আলাচ্য ছ'টি বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী-সহবাস যদিও 'ফুসুক' শব্দের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি একে 'রাফাস' শব্দের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে এজন্যে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এহ্রাম অবস্থায় এ কাজ হতে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এর কোন ক্ষতিপূরণ বা বদলা দেয়ার ব্যবস্থা নেই। কোন কোন অবস্থায় এটা এত মারাত্মক যে, এতে হজ্জ্বই বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য অন্যান্য কাজগুলোর কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আরাফাতে অবস্থান শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রী-সহবাস করলে হজ্জ্ব ফাসদ হয়ে যাবে। গাভী বা উট দ্বারা এর কাফফারা দিয়েও পর বছর পুনরায় হজ্জ্ব করতেই হবে। এজনেই **فَكَذَّبْتَ** শব্দ ব্যবহার করে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

حِدَال শব্দের অর্থ একে অপরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করা। এজনেই বড় রকমের বিবাদকে **حِدَال** বলা হয়। এ শব্দটিও অতি ব্যাপক। কোন কোন মুফাসসের এ শব্দের ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করেছেন। আবার অনেকে হজ্জ্ব ও এহ্রামের সম্পর্ক হেতু এখানে 'জিদাল'-এর অর্থ করেছেন যে, জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা অবস্থানের স্থান নিয়ে মতানৈক্য করতো; কেউ কেউ আরাফাতে অবস্থান করাকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করতো, আবার কেউ কেউ মুয়দালে ফাতে অবস্থানকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করতো। তারা আরাফাতে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করতো না। পথিমধ্যে অবস্থিত একটি স্থানকেই ইবরাহীম (আঃ)-এর নির্ধারিত অবস্থানস্থল বলে মনে করতো। এমনভাবে হজ্জ্বের সময় সম্পর্কেও তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতো। কেউ কেউ যিলহজ্জ্ব মাসে হজ্জ্ব করতো, আবার কেউ কেউ যিলকদ মাসে। এসব ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হতে থাকতো এবং এ জন্যে একে অপরকে পঞ্চদষ্ট বলে অভিহিত করতো।

তাই কোরআনে করীম **وَكَذَّبْتَ** বলে এসব বিবাদের মূলোৎপাটন করেছে। আর আরাফাতে অবস্থানকে ফরয এবং মুয়দালিফাতে অবস্থানকে ওয়াজিব করা হয়েছে। এটাই হক ও সঠিক। উপরন্তু যিলহজ্জ্ব মাসের নির্ধারিত দিনগুলোতেই হজ্জ্ব আদায় করতে হবে, এ ঘোষণা করে এর বিরুদ্ধে ঝগড়া করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ এ স্থলে 'ফুসুক ও জিদাল' শব্দদ্বয়কে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে এ অর্থ নিয়েছেন যে, 'ফুসুক' ও 'জিদাল' সর্বক্ষেত্রেই পাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু এহ্রামের অবস্থায়

এর পাপ গুরুতর। পবিত্র দিনসমূহে এবং পবিত্র স্থানে, যেখানে কেবল আল্লাহর এবাদতের জন্যে আগমন করা হয়েছে এবং 'লাক্বাইকা লাক্বাইকা' বলা হচ্ছে, এহ্রামের পোশাক তাদেরকে সব সময় একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা এখন এবাদতে ব্যস্ত, এমতাবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি অত্যন্ত অন্যায ও চরমতম নাক্ষরমানীর কাজ।

কোরআনের ভাষালঙ্কার : **فَكَذَّبْتَ وَكَفَرْتَ وَكَانَ** আয়াতের শব্দগুলো নেতিবাচক। হজ্জ্বের মধ্যে এসব বিষয় নেই, অথচ উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সকল বিষয়ের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করা; যার জন্যে **لَا تَرْفَعُوا** **وَلَا تَنَافَسُوا** শব্দ ব্যবহার করার কথা ছিল। কিন্তু এখানে নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হজ্জ্বের মধ্যে এসব বিষয়ের কোন অবকাশ নাই। এমনকি এ সবেবের কম্পনাও হতে পারে না। **وَمَا تَعْلَمُونَ خَيْرًا لِّعَلَّاهُ** —এহ্রামকালে নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্ণনা করার পর উল্লেখিত বাক্যে হেদায়েত করা হচ্ছে যে, হজ্জ্বের পবিত্র সময়ে ও পূতঃ স্থানগুলোতে শুধু নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আল্লাহর যিকির ও এবাদত এবং সংকাজে সদা আত্মনিয়োগ কর। তুমি যে কাজই কর না কেন, তা আল্লাহ তাআলা জানেন; আর এতে তোমাদেরকে অতি উত্তম বখশিশও দেয়া হবে।

وَرَزَقُوا فَإِنْ خَيْرَ الزَّكَاةِ - এ আয়াতে ঐ সমস্ত ব্যক্তির

সংশোধনী পেশ করা হয়েছে যারা হজ্জ্ব ও ওমরা করার জন্য নিঃস্ব অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে। অথচ দাবী করে যে, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করছি। পক্ষান্তরে পথে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। নিজেও কষ্ট করে এবং অন্যকেও পেরোশান করে। তাদেরই উদ্দেশে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হজ্জ্বের উদ্দেশে সফর করার আগে প্রয়োজনীয় পাথের সাথে নেয়া বাঙ্কনীয়, এটা তাওয়াক্কুলের অন্তরায় নয়। বরং আল্লাহর উপর ভরসা করার প্রকৃত অর্থই হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত আসবাবপত্র নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ ও জমা করে নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করা। হযর (সাঃ) থেকে তাওয়াক্কুলের এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। নিঃস্বতার নাম তাওয়াক্কুল বলা মুখতারই নামান্তর।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে হজ্জ সৎকাজ অন্যান্য বহু বিষয়েরই আলোচনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে প্রার্থনাকারীদিগকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এক শ্রেণী হচ্ছে কাফের ও পরকালে অবিশ্বাসী। এদের প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হচ্ছে দুনিয়া; দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে মুমিন; পরকালের প্রতি বিশ্বাসে অটল। এরা পার্থিব কল্যাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের কল্যাণও সমভাবে কামনা করে। পরবর্তী আয়াতসমূহে 'নেফাক' বা কপটতা ও 'এখলাছ' বা আন্তরিকতার ভিত্তিতে বিভক্ত মানব শ্রেণী সম্পর্কে বলা হচ্ছে, কেউ মুনাফেক বা কপট আর কেউ মুখলেছ বা আন্তরিকতাপূর্ণ।

আয়াতের শেষাংশে, যাতে নিষ্ঠাবান মুমিনগণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মবিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, তা সে সমস্ত নিষ্ঠাবান সাহাবায়ে কেরামের শানে নাখিল হয়েছে, যারা আল্লাহর রাস্তায় অনুক্ষণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মুস্তাদরাকে হাকেম, ইবনে-জরীর, মুসনাদে ইবনে আবী-হাতেম প্রভৃতি গ্রন্থে সহী, সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ আয়াতটি হযরত সোহাইব রুমী (রাঃ)-এর এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজ্রত করছে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন পশ্চিমঘো একদল কোরাইশ তাঁকে বাধা দিতে উদ্যত হলে তিনি সওয়ালী থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং তাঁর তুনীরে রক্তিত সবগুলো তীর বের করে দেখালেন এবং কোরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, —হে কোরাইশগণ! তোমরা জান, আমার তীর লক্ষ্যব্রষ্ট হয় না। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তুনীরে একটি তীরও থাকবে, ততক্ষণ তোমরা আমার ধারেকাছেও পৌছতে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তলোয়ার চালিয়ে যাব। তারপর তোমরা যা চাও করতে পারবে। আর যদি তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা কর, তাহলে শোন, আমি তোমাদিগকে মক্কায় রক্তিত আমার ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। তাতে কোরাইশদল রাহী হয়ে গেল এবং হযরত সোহাইব রুমী নিরাপদে রসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রসূল (সাঃ) দু'বার এরশাদ করলেনঃ—

ريح البيع ابا يحيى - ريح البيع ابا يحيى

‘হে আবু ইয়াহইয়া, তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।’

কোন কোন তফসীরকার অন্যান্য কতিপয় সাহাবীর বেলায় সংঘটিত একই ধরনের কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন।—(মাযহরী)

পূর্ববর্তী আয়াতে নিষ্ঠাবানদের প্রশংসা করা হয়েছিল। অনেক সবার এই নিষ্ঠার মধ্যেও ভুলবশতঃ বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। যদিও উদ্দেশ্য থাকে অধিক আনুগত্য, কিন্তু সে আনুগত্য শরীয়ত ও সুন্নাহের সীমারেখা অতিক্রম করে বেদ'আতে পরিণত হয়। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ প্রথমে ইহুদী আলোম ছিলেন এবং সে ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী শনিবার ছিল সপ্তাহের পবিত্র দিন, আর উটের মাংস ছিল হারাম। হিজরত গ্রহণের পর সে সাহাবীর ধারণা হয় যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর ধর্ম শনিবারকে পবিত্র দিন হিসাবে সম্মান করা ছিল ওয়াজিব। কিন্তু মুসলিম

(১৯৮) তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অব্রূষণ করায় কোন পাপ নেই। অতঃপর যখন তওয়াফের জন্য ফিরে আসবে আরাফাত থেকে, তখন মাল' আরে-হারামের নিকটে আল্লাহকে স্মরণ কর। আর তাঁকে স্মরণ কর তোমনি করে, যেমন তোমাদিগকে হেদায়েত করা হয়েছে— আর নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে অস্ত্র। (১৯৯) অতঃপর তওয়াফের জন্যে দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে আস, যেখান থেকে সবাই ফিরে। আর আল্লাহর কাছেই মাগফেরাত কামনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাকারী, করুণাময়। (২০০) আর অতঃপর যখন হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সমাপ্ত করে সারবে, তখন স্মরণ করবে আল্লাহকে, যেমন করে তোমরা স্মরণ করতে নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে, রবং তার চেয়েও বেশী স্মরণ করবে। তারপর অনেকে তো বলে যে, হে পরওয়াদেগার! আমাদিগকে দুনিয়াতে দান কর। অথচ তার জন্যে পরকালে কোন অংশ নেই। (২০১) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে —হে পরওয়াদেগার! আমাদিগকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতও কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (২০২) এদেরই জন্য অংশ রয়েছে নিজেদের উপার্জিত সম্পদের। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (২০৩) আর স্মরণ কর আল্লাহকে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিনে। অতঃপর যে লোক তাড়াহুড়া করে চলে যাবে শুধু দু'দিনের মধ্যে, তার জন্যে কোন পাপ নেই। আর যে লোক থেকে যাবে তার উপর কোন পাপ নেই, অবশ্য যারা ভয় করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং নিশ্চিত জেনে রাখ, তোমরা সবাই তাঁর সামনে সমবেত হবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ
 اللَّهُ عَلَيْهِ مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْجَهَنَّمَ ۚ وَآذَانُ سَوِيَّةٍ
 فِي السَّمْعِ ۚ لِيُشْفِيَ فِيهَا ۖ وَيُحِبُّكَ الْحَرُّ وَالْقَلْبُ ۚ وَاللَّهُ
 لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۚ وَآذَانُ قَلِيلٍ لَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ آخِذٌ بِذُنُوبِهِ
 الْعَظِيمِ ۚ بِالْأَنفُسِ يَحْسِبُهُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ بِالْهَادِ ۚ وَمِنَ
 النَّاسِ مَن يُكْثِرُ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ
 سَرُوفٌ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ
 الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ
 بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ ۚ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي
 ظُلُمٍ مِّنَ اللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ أَوْ أَثَرِ الْمَوْتِ ۚ وَتُضَى الْأَرْضُ
 وَاللَّهُ شَرِيعَةُ السُّبُحِ ۚ وَسَلَّمَ لَكُمْ فِي الْأَنْفُسِ ۚ وَاللَّهُ
 آتِيهِمْ مِنْ أَيْنَ لَا يَحْسَبُونَ ۚ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

(২০৪) আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। (২০৫) যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হান্সা পছন্দ করেন না। (২০৬) আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহঙ্কারে উদ্দীকৃত করে। সুতরাং তার জন্যে দোষখই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা। (২০৭) আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে—যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে নিজদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। (২০৮) যে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না— নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২০৯) অতঃপর তোমাদের মাঝে পরিষ্কার নির্দেশ এসে গেছে বলে জানার পরেও যদি তোমরা পক্ষপালিত হও, তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (২১০) তারা কি সে দিকেই তাকিয়ে রয়েছে যে, মেঘের আড়ালে তাদের সামনে আসবেন আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ? আর তাতেই সব ঈমান্দার হয়ে যাবে। বস্তুতঃ সব কার্য-কলাপই আল্লাহর নিকট গিয়ে পৌছবে। (২১১) বনী-ইসরাঈলদিগকে জিজ্ঞেস কর, তাদেরকে আমি কত স্পষ্ট নির্দেশাবলী দান করেছি। আর আল্লাহর নেয়ামত পৌছে যাওয়ার পর যদি কেউ সে নেয়ামতকে পরিবর্তিত করে দেয়, তবে আল্লাহর আযাব অতি কঠিন।

শরীয়তে তার অসম্মান করা ওয়াজিব নয়। তেমনিভাবে মুসা (আঃ)—এর শরীয়তে উটের মাংস ছিল হারাম, কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ)—এর শরীয়তে তা ভক্ষণ করা ফরয নয়। সুতরাং আমরা যদি যথারীতি শনিবারের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করতে থাকি এবং উটের মাংসকে হালাল জেনেও কার্যতঃ তা বর্জন করি, তা'হলে তো দু'কূলই রক্ষা পায়—মুসা (আঃ)—এর শরীয়তের প্রতিও আস্থা রইলো, অথচ মুহাম্মদ (সাঃ)—এর শরীয়তেরও কোন বিরোধিতা হলো না। পক্ষান্তরে এতে আল্লাহর অধিকতর আনুগত্য এবং ধর্মের ব্যাপারে বেশী বিনয় প্রকাশ পাবে বলে মনে হয়। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই এ ধারণার সংশোধন উচ্চারণ করেছেন। তারই সার-সংক্ষেপ হচ্ছে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। আর ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা তখনই সম্বিত হবে, যখন এমন কোন বিষয়কে ধর্ম হিসাবে পালন করা না হবে; যা ইসলামে পালনযোগ্য নয়। বস্তুতঃ এমনসব বিষয়কে ধর্ম গণ্য করা হোল একটি শয়তানী প্রতারণাজনিত পদস্খলন। আর পাপ হিসাবে তার শাস্তি কঠোরতর হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِدْخُلُوا فِي السِّلْمِ - শব্দটি যের ও যবরসহযোগে (সিলম ও সালম) দুটি পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটির অর্থ হচ্ছে 'শান্তি' অপরাট ইসলাম'। এখানে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে ইসলাম অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।—(ইবনে কাসীর) عَزَّوَجَلَّ শব্দটি 'পরিপূর্ণভাবে' এবং সাধারণভাবে এই দু'ই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী এখানে বাক্যটির গঠন হচ্ছে অবস্থা-জ্ঞাপক। এতে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে, একটি হচ্ছে ادْخُلُوا (তোমরা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও) শব্দে যে সর্বনাম রয়েছে, তার অবস্থা জ্ঞাপন করছে। অথবা ইসলাম অর্থে শব্দটির অবস্থা জ্ঞাপন করছে। প্রথম ক্ষেত্রে অনুবাদ দাঁড়াবে এই যে,— তোমরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ, তোমাদের হাত-পা, চোখ-কান, মন-মস্তিস্ক সবকিছুই যেন ইসলামের আওতায় এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়, এমন যেন না হয় যে, হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে যাচ্ছে অথচ তোমাদের মন-মস্তিস্ক তাতে সন্তুষ্ট নয়। কিংবা মন-মস্তিস্ক ইসলামের অনুশাসনে সন্তুষ্ট বটে, কিন্তু হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ তার বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আয়াতটির অনুবাদ এই যে,— তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। অর্থাৎ, এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের কিছু বিষয় যেনে নিলে আর কিছু মনেতে গিয়ে গড়িমসি করতে থাকলে। তাছাড়া কোরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও এবাদতের সাথেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সাথেই হোক অথবা রাজনীতির সাথে হোক, এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সাথেই হোক কিংবা শিল্পের সাথে,— ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দিয়েছে তোমরা তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

এতদুভয় দিকের মূল প্রতিপাদ্যই মোটামুটিভাবে এই যে, ইসলামের বিধানসমূহ—তা মানবজীবনের যে কোন বিভাগের সাথেই সম্পৃক্ত হোক না কেন, যে পর্যন্ত তার সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না দেবে, সে পর্যন্ত মুসলমান যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না।

البقرة ২

২২

سيفول ২

رَبِّنَ لِلَّذِينَ نَفَرُوا وَالْحَيَوَةُ الدُّنْيَا وَيَسْعَوْنَ مِنَ الَّذِينَ
 أَمْوَالُ الَّذِينَ اتَّفَقُوا فَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ يَرُدُّ
 مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۝
 فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا
 فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا
 جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا لِيَبْهِتَهُمْ فَعَدَّى اللَّهُ الَّذِينَ أَمْوَالُ
 لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِأُذُنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
 إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ أَحْصِيئَهُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ
 لَكُمْ بِأَنْتَهُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْزِئُهُمُ
 الْيَاسَاءُ وَالْقَدَاءُ وَرُزُلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
 وَالَّذِينَ أَمْوَالُهُ مَعَهُ مَتَى تَصْرُلُونَ ۝ أَلَمْ تَصْرُلُوا
 قَرِيبٌ ۝ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۝ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ
 خَيْرٍ قَبْلُ لِلَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالسَّكِينِ وَإِنَّ
 السَّيْلَ وَمَا تَقَعُّوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

(২১২) পার্শ্বব জীবনের উপর কাফেরদিগকে উদ্বৃত্ত করে দেয়া হয়েছে। আর তারা ঈমানদারদের প্রতি লক্ষ্য করে হাসাহাসি করে। পক্ষান্তরে যারা পরহেযগার তারা সেই কাফেরদের তুলনায় কেয়ামতের দিন অত্যন্ত উচ্চমর্যাদায় থাকবে। আর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সীমাহীন রুখী দান করেন। (২১৩) সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বর পাঠানো সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশতঃ তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে হেদায়েত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন। (২১৪) তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জ্ঞানাতো চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহ্র সাহায্য। তোমরা শোনে নাও, আল্লাহ্র সাহায্য একাডুই নিকটবর্তী। (২১৫) তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও—যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্যে, আত্মীয়-আপনজনদের জন্যে, এতীম-অনাথদের জন্যে, অসহায়দের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। আর তোমরা যে কোন সংকাজ করবে, নিঃসন্দেহে তা অত্যন্ত ভালভাবেই আল্লাহ্র জানা রয়েছে।

এ আয়াতের যে শানে-নুযুল উপরে বলা হয়েছে। মূলতঃ তার মূল বস্তু এই যে, শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষাই তোমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে। একে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিলে সে তোমাদেরকে অন্যান্য সমস্ত ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেবে।

সতর্কতা : যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং এবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামী সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না, তাদের জন্যে এ আয়াতে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তথাকথিত দ্বীনদারদের মধ্যেই ক্রটি বেশীরভাগ দেখা যায়। এরা দৈনন্দিন আচার-আচরণ, বিশেষতঃ সামাজিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক যে অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয়, এরা যেন এসব রীতি নীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করে না। তাই এগুলো জানতে শিখতেও যেমন এদের কোন আগ্রহ নেই, তেমনিভাবে এর অনুশীলনেও তাদের কোন আগ্রহ নেই। নাউযবিল্লাহ্। অন্ততঃপক্ষে হাকীমুল-উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (রাঃ) রচিত ‘আদাবে মো’ আশাযাত’ পুস্তিকটি পড়ে নেয়া প্রতিটি মুসলমানের উচিত।

আল্লাহ্ ও ফেরেশতা মেঘের আড়ালে করে তাদের নিকট আগমন করবেন, এমন ঘটনা কেয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। এমনিভাবে আল্লাহ্র আগমন দুর্ঘটবোধক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবী ও তাব্বী এবং বুয়ুর্গানে দ্বীনের রীতি হচ্ছে, বিষয়টিকে সঠিক ও সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়া, কিন্তু কিভাবে তা সংঘটিত হবে, তা জ্ঞানার প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তাঁর সমস্ত গুণাবলী ও অবস্থা জানা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর নির্ভর করে অহংকার করা এবং দরিদ্র লোকের প্রতি উপহাস করার পরিণতি কেয়ামতের দিন চোখের সামনে ভেসে উঠবে। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, —যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষকে তার দারিদ্র্যের জন্যে উপহাস করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে কেয়ামতের দিন সমগ্র উম্মতের সামনে লালিত ও অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুমিন স্ত্রী বা পুরুষের উপর এমন অপবাদ আরোপ করবে, যে দোষে সে দোষী নয়, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে একটি উচ্চ অগ্নিকুণ্ডের উপর দাঁড় করাবেন; যতক্ষণ না সে তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে রাখা হবে।— (যিকরুল-হাদীস, কুরতুবী)

এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন এককালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই মতাদর্শ ও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবাই একই ধরনের বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ করত। তা ছিল প্রকৃতির ধর্ম। অতঃপর তাদের মধ্যে আকীদা, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিভিন্না দেখা দেয়। ফলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা বা পরিচয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ্ তাআলা সত্য ও সঠিক মতবাদকে প্রকাশ করার জন্যে এবং সঠিক পথ দেখাবার লক্ষ্যে নবী ও রসুলগণকে প্রেরণ করেন, তাঁদের প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেন। নবীগণের চেষ্টা, পরিশ্রম ও তবলীগের ফলে মানুষ দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আল্লাহ্র প্রেরিত রসুল এবং তাঁদের প্রদর্শিত সত্য-সঠিক পথ ও মতকে গ্রহণ করে নেয়। আর একদল তা প্রত্যাখ্যান করে নবীগণকে মিথ্যা বলে। প্রথমেই দল নবীগণের অনুসারী এবং মুমিন বলে পরিচিত, আর শেষোক্ত দলটি নবীগণের অবাধ্য ও অবিশ্বাসী এবং কাফের বলে পরিচিত। এ আয়াতের

প্রথম বাক্যে এরশাদ হয়েছে—

كَانَ الْإِنْسَانُ أُمَّةً وَاحِدَةً

ইমাম রাগেব ইম্পাহানী 'মুফরাদতুল কোরআনে' বলেছেন, আরবী অভিধান অনুযায়ী এমন মানবগোষ্ঠীকে উদ্ভূত বলা হয়, যাদের মধ্যে কোন বিশেষ কারণে সংযোগ, ঐক্য ও একতা বিদ্যমান থাকবে। সে ঐক্য মতাদর্শ ও বিশ্বাসজ্ঞানিতই হোক অথবা একই যুগে একই এলাকা বা দেশের অধিবাসী হওয়ার দরুনই হোক অথবা অন্য কোন অঞ্চলের বংশ, রূপ ও ভাষার সমতার কারণেই হোক।

'কোন এককালে সকল মানুষ পরস্পর একতাবদ্ধ ছিল'—এতে দু'টি কথা প্রশিধানযোগ্য। প্রথমতঃ 'একতা' বলতে কোন ধরনের একতাকে বোঝানো হয়েছে? দ্বিতীয়তঃ এই একতা কখন ছিল? প্রথম বিষয়ের মীমাংসা এ আয়াতের শেষ বাক্যটির দ্বারা হয়ে যায়। এতে একতার মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার এবং বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে হক ও সত্য মতবাদ নির্ধারণের ব্যাপারে নবী ও রসুল প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এ মতাদর্শের মধ্যে মীমাংসা করার জন্যে নবী ও রসুলগণের প্রেরণ এবং আসমানী কিতাব অবতরণ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, সে মতবিরোধ রূপ, ভাষা বর্ণ বা অঞ্চল অথবা যুগের মতানৈক্য ছিল না, বরং মতাদর্শ, আকায়েদ ও ধ্যান-ধারণার পার্থক্য ছিল। এতেই বোঝা যায় যে, এ আয়াতে একত্ব বলতে ধ্যান-ধারণা, চিন্তা এবং আকীদার একত্বকেই বোঝানো হয়েছে।

সূত্রাং এ আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এমন এক সময় ছিল, যখন প্রতিটি মানুষ একই মত ও আদর্শ এবং একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রশ্ন উঠে, সে মত ও বিশ্বাসটি কি ছিল? এতে দু'টি সম্ভাবনা বিদ্যমান। (১) হয় তখনকার সব মানুষ তওহীদ ও ঈমানের বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ ছিল। নতুবা (২) বলাই মিথ্যা ও কুফরীতে ঐক্যবদ্ধ ছিল। অধিকাংশ তফসীরকারের মর্মে মত হচ্ছে যে, সে আকীদাটি ছিল সঠিক ও যথার্থতা ভিত্তিক। অর্থাৎ, তওহীদ ও ঈমানের ঐকমত্য।

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, 'এক' বলতে আকীদা ও তরীকার একত্ব এবং সত্য-ধর্ম বলে আল্লাহর একত্ববাদ ও ঈমানের ব্যাপারে ঐকমত্যের কথাই বলা হয়েছে।

এখন দেখতে হবে, এ সত্য দ্বীন ও ঈমানের উপর সমস্ত মানুষের ঐকমত্য কোন যুগে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তা কোন যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল? তফসীরকার সাহাবিগণের মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব এবং ইবনে রুয়দ (রাঃ) বলেছেন যে, এ ঘটনাটি 'আলমে-আয়ল' বা আত্মার সত্তার ব্যাপার। অর্থাৎ, সমস্ত মানুষের আত্মাকে সৃষ্টি করে যখন জ্ঞান প্রদান করা হয়েছিল, **كُنْتُ بَرِيَّةً** (আমি কি তোমাদের পালনকর্তা?) তখন একবাক্যে সকল মানুষ একই আকীদাতে বিশ্বাসী ছিল, যাকে মুসলিম ও ইসলাম বলা হয়।—(কুহতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এই একত্বের সূচনা তখনকার, যখন হযরত আদম (আঃ) সম্প্রদীক দুনিয়াতে আগমন করেন এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি জন্মতে আরম্ভ করল আর মনুষ্যগোষ্ঠী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে শুরু করলো। তাঁরা সবাই হযরত আদম (আঃ) এর ধর্ম, তাঁর শিক্ষা ও শরীয়তের অনুগত ছিল। একমাত্র কাবীল সবারই তওহীদের সমর্থক ছিলেন।

'মুসনাদে বাযযার' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতির সাথে সাথে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, একত্বের ধারণা হযরত আদম (আঃ) থেকে আরম্ভ হয়ে হযরত ইদ্রিস (আঃ) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সে সময় সবাই মুসলমান এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এতদুভয় নবীর মধ্যবর্তী সময় হল দশ 'করন'। বাহাতঃ এক 'করন' দ্বারা এক শতাব্দী বোঝা যায়। সুতরাং মোট সময় ছিল এক হাজার বছর।

কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, এই একক বিশ্বাসের যুগ ছিল হযরত নূহ (আঃ)—এর তুফান পর্যন্ত। নূহ (আঃ)—এর সাথে যারা নৌকায় আরোহণ করেছিলেন, তারা বাতীত সমগ্র বিশ্ববাসী এতে ডুবে মরেছিল। তুফান বন্ধ হওয়ার পর যারা জীবিত ছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান; সত্য ধর্ম ও একত্ববাদে বিশ্বাসী।

বাস্তবপক্ষে এ তিনটি মতামতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তিনটি যুগই এমন ছিল, যেগুলোতে সমস্ত মানুষ একই মতবাদ ও একই উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সত্য ধর্মের উপর কায়ম ছিল। পরবর্তী আয়াতে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, পূর্ববর্তী বাক্যটিতে সমস্ত মানব জাতিকে একই মত ও ধর্মের অনুসারী বলে উল্লেখ করার পর মতবিরোধের কোন কারণ বর্ণনা না করেই বলা হয়েছে—'আমি নবী-রসুলগণ ও কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে মতবিরোধের মীমাংসা করা যায়।'

এ দু'টি বাক্যে আপাত দৃষ্টিতে গরমিল মনে হয়। কারণ, নবীগণ এবং কিতাবসমূহ প্রেরণের কারণ ছিল মানুষের মতানৈক্য। পক্ষান্তরে সে সময় কোন মত-পার্থক্য ছিল বলেই উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য এর অর্থ অত্যন্ত পরিস্কার। যারা কোরআনের বর্ণনাবঙ্গি সম্পর্কে একটু চিন্তা করেন, তাদের জন্যে এর মর্ম উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়। কোরআন কখনও অতীতের বর্ণনা দিতে গিয়ে গম্প, কাহিনী কিংবা ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে উল্লেখিত যাবতীয় কাহিনীরই অবতারণা করেনি; বরং মধ্য থেকে সেসব অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছে, যা এই কালামের প্রেক্ষাপটের দ্বারা বোঝা যায়। ফলে তা'ই বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে তা বিশ্ববাসী স্বচক্ষে দেখেছে। তাই এর পুনরাবলোচনা ছিল নিষ্প্রয়োজন। তবে এতটুকু বলা হয়েছে যে, এসব মতানৈক্যের মীমাংসা করার জন্য আল্লাহ তাআলা কি ব্যবস্থা করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ

করলেন।' তাঁরা সত্য ধর্মের অনুসারীদেরকে স্থায়ী আরাম ও সুখ-শান্তির সুসংবাদ দিতেন, আর তা থেকে যারা বিমূখ হয়েছিল, তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখাতেন। আর তাদের নিকট ওহী ও আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন যা বিভিন্ন মতাদর্শের নিরসন করে সত্য ও সঠিক মতাদর্শ জানিয়ে দেয়। অতঃপর এরশাদ হয়েছে, নবী-রসুল এবং আসমানী গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ্য ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করার পরেও বিশ্ববাসী দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিছু লোক এ হেদায়েতকে গ্রহণ করেনি। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, যাদের কাছে নবীগণ ও দলীলসমূহ এসেছে, তাদেরই একদল তা অগ্রাহ্য করেছে। অর্থাৎ, ইহুদী ও নাসারাগণ। আরো বিস্ময়কর বিষয়, আসমানী কিতাবে কোন সন্দেহ-সংশয়ের সম্ভাবনা ছিল না যে, তা বোঝা যায় না বা বোঝাতে ভুল হয়। বরং প্রকৃতপক্ষে জেনে-বোঝেও শুধুমাত্র গোঁড়ামী ও জেদবশতঃ তারা এসবের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

দ্বিতীয় দল হচ্ছে তাদের, যারা আল্লাহর দেয়া হেদায়েতকে গ্রহণ

করেছে এবং নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবসমূহের মীমাংসাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিয়েছে। **كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً**—এর সারমর্ম হচ্ছে এই যে, প্রথমে বিশ্বের সমস্ত মানুষ সত্য ও সঠিক ধর্মের মধ্যে ছিল। অতঃপর মতের পার্থক্য ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার দরুন মতানৈক্য আরম্ভ হয়। দীর্ঘদিন পর আমল ও বিশ্বাসের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হতে থাকে, এমনকি সত্য-মিথ্যার মধ্যেও সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। সবাইকে সঠিক ধর্মের উপর পুনর্বর্ধাল করার জন্য প্রকাশ্য প্রমাণের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তা মেনে নিয়েছে, আবার কেউ কেউ জেদবশতঃ অস্বীকার করেছে এবং বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে।

এ আয়াতের দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা যায়। প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহ তাআলা যে অসংখ্য নবী-রসূল ও আসমানী কিতাব প্রেরণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল ‘মিল্লাতে-ওয়াহেদা’ ত্যাগ করে যে মানব সমাজ বিভিন্ন দল ও ফেরকাতো বিভক্ত হয়েছে, তাদেরকে পুনরায় পূর্ববর্তী ধর্মের আওতায় ফিরিয়ে আনা। নবীগণের আগমনের ধারাটিও এভাবেই চলেছে। যখনই মানুষ সংপথ থেকে দূরে সরে গেছে, তখনই হেলায়েতের জন্য আল্লাহ তাআলা কোন না কোন নবী প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাখিল করেছেন, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয়। আবার যখন তারা পথ হারিয়েছে, তখন অন্য আর একজন নবী পাঠিয়েছেন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

আর যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে পরিবর্তন-পরিবর্তনের মাধ্যমে সেন্স নবী-রসূলের শিক্ষাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বলেই আরো নবী-রসূল এবং কিতাব প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেহেতু কোরআনকে পরিবর্তন হতে হেফাজতে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং কোরআনের শিক্ষাকে ক্যামত পর্যন্ত এর প্রকৃত রূপে বহাল রাখার জন্য উম্মতে-মুহাম্মদীর মধ্য হতে এমন এক দলকে সঠিক পথে কায়ম রাখার ওয়াদা করেছেন, যে দল সব সময় সত্য ধর্মে জটল থেকে মুসলমানদের মধ্যে কোরআন ও সুন্নাহর সঠিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করতে থাকবে। কারো শত্রুতা বা বিরোধিতা তাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এ জনোই তাঁর পরে নবুওয়ত ও ওহীর দ্বার বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যস্বাবী বিষয়। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই সর্বোপরি খতমে-নবুওয়ত ঘোষণা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বোঝা গেল যে, ধর্মের ভিত্তিতেই জাতীয়তা নির্ধারিত হয়। মুসলমান ও অমুসলমানকে দু’টি জাতি হিসাবে চিহ্নিত করাই এর উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে **فَيَذَرُكَ رَازٍ وَنُفُورٍ** আয়াতটিও একটি প্রমাণ। এতদসঙ্গে একথাও পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে, ইসলামের মধ্যে এ দু’টি জাতীয়তা সৃষ্টির ব্যবস্থাও একটি একক জাতীয়তা সৃষ্টি করার জন্যই, যা সৃষ্টির আদিতে ছিল। যার বুনয়াদ দেশ ও ভৌগোলিক সীমার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না, বরং একক বিশ্বাস ও একক ধর্মের অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরশাদ হয়েছে যে **كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً** সৃষ্টির আদিতে সঠিক বিশ্বাস এবং সত্যধর্মের অনুসারীরূপে একক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরে মানুষ বিভেদ সৃষ্টি করেছে। নবীগণ মানুষকে এ প্রকৃত একক জাতীয়তার দিকে আহ্বান করেছেন। যারা তাঁদের এ আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তারা এক জাতীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্বতন্ত্র জাতি গঠন করেছে।

এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মন্দ লোকেরা প্রেরিত

নবীগণের এবং আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং ঈমানদারদের পক্ষে তাদের এহেন দুরাচারের জন্য মনোবশত নেয়া উচিত নয়। যেভাবে কাফেররা তাদের পূর্বপুরুষদের পথ অবলম্বন করে নবীগণের বিরুদ্ধাচরণের পথ ধরেছে, তেমনিভাবে মুমিন ও সালেহগণের উচিত নবীগণের শিক্ষা অনুসরণ করা, তাঁদের অনুসরণে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা এবং যুক্তিগ্রাহ্য মনোমুগ্ধকর ওয়াজ্ঞ এবং নম্রতার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করতে থাকা।

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রশ্ণানযোগ্য। প্রথমতঃ পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই বেহেশত লাভ করতে পারবে না। অথচ কোরআন ও হাদীসের বর্ণনায় প্রমাণ রয়েছে যে, অনেক পাণ্ডী ব্যক্তিও আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার দৌলতে জন্মাত লাভ করবে; এতে কোন কষ্ট সহ্যের প্রয়োজনই হবে না। কারণ, কষ্ট ও পরিশ্রমের স্তর বিভিন্ন। নিম্নস্তরের পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে স্বীয় জৈবিক কামনা-বাসনা ও শয়তানের তাড়না থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিংবা সত্য ধর্মের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিশ্বাস ও আকীদাকে ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মুমিনেরই অর্জন করতে হয়। অতঃপর মধ্যম ও উচ্চ স্তরের বর্ণনা—যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম হবে, সে স্তরেরই জন্মাত লাভ হবে। এভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম হতে কেউই রেহাই পায়নি। এক হাদীসে রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন—

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل

“সবচাইতে অধিক বলা-মুসীবেতে পতিত হয়েছেন নবী-রসূলগণ।

তারপর তাঁদের নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ।”

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, নবীগণ ও তাঁদের সাধীদের প্রার্থনা যে, ‘আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে’ তা কোন সন্দেহের কারণ নয় যা তাঁদের শানের বিরুদ্ধে। বরং এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদিও আল্লাহ তাআলা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, এর সময় ও স্থান নির্ধারণ করেননি। অতএব, এ অশান্ত অবস্থায় এ ধরনের প্রার্থনার অর্থ ছিল এই যে, সাহায্য তাড়াতাড়ি অবতীর্ণ হোক। এমন প্রার্থনা আল্লাহর প্রতি ভরসা ও শানে নবুওয়তের খেলাফ নয়, বরং আল্লাহ তাআলা স্বীয় বাদাদের সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। বস্তুতঃ নবী এবং সালেহীনগণই এরূপ প্রার্থনার অধিক উপযুক্ত।

প্রথমোক্ত আয়াতগুলোতে স্বাভাবিকভাবে বিষয়টি একান্ত গুরুত্ব ও তাকীদের সাথে বলা হয়েছে যে, কুফরী ও মোনাফেকী ত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী হলে কারো কথাই মানবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জান-মাল কোরবান করে দাও এবং যাবতীয় দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ কর। এখান থেকে সে নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল কোরবান করার ছোট-খাটো বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে, যা জান-মাল এবং বিয়ে-তালাক প্রভৃতিসহ জীবনের অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পূর্ব থেকে যে বর্ণনাপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে এখানেও সে রীতিই রক্ষা করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক এ বিষয়গুলোর আলোচনাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং এরও একটা বিশেষ রীতি রয়েছে। এসব বিষয়ের অধিকাংশই হচ্ছে এমন-যার সম্পর্কে সাহাবীগণ রসূল করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং

সেগুলোর উত্তর রসূল (সাঃ)—এর মাধ্যমে সরাসরি আরশে মোয়াল্লা থেকে আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন। সেমতে এসব ফতোয়া বা প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন বলেও যদি মনে করা হয়, তাও ভুল হবে না। কোরআন শরীফে রয়েছে :

قُلِ اللَّهُ يُبَيِّنُكَ فَيُؤَيِّدُكَ

— এতে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ তাআলা ফতোয়া দেয়ার কাজটিকে নিজেরই সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। কাজেই এতে কোন প্রকার রূপক বিশ্লেষণ চলে না। তাছাড়া বলা যেতে পারে যে, এ ফতোয়া রসূল (সাঃ) দিয়েছেন, যা তাঁকে ওহীর মাধ্যমে শেখানো হয়েছে। এ রূকূতে শরীয়তের যেসব হুকুম—আহকাম সাহাবীগণের প্রশ্নের উত্তরে বর্ণনা করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র কোরআনে এমনিভাবে প্রশ্নোত্তরের আকারে বিশেষ বিধানের বর্ণনা প্রায় সতেরটি জায়গায় রয়েছে। তন্মধ্যে সাতটি সূরা বাক্বারায়, একটি সূরা মায়দায়, একটি সূরা আনফালে। এ নয়টি স্থানে প্রশ্ন করা হয়েছে সাহাবায়ে-কোরামের পক্ষ থেকে। এছাড়া সূরা আ'রাফে দু'টি এবং সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা কাহাফ, সূরা তা-হা ও সূরা নাহেআতে একটি করে ছয়টি স্থানে কাকেরদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন ছিল—যার উত্তর কোরআনে কবীমে উত্তরের আকারেই দেয়া হয়েছে। মুফাসসের হযরত ইবনে আক্বাস (রাঃ) বলেছেন, মুহাম্মদ (সাঃ)—এর সাহাবীগণের চাইতে কোন উত্তম দল আমি দেখিনি; ধর্মের প্রতি তাঁদের অনুরাগ ছিল অত্যন্ত গভীর আর হৃদয়ে আকরাম (সাঃ)—এর প্রতি তাঁদের এহেন ভালবাসা ও সম্পর্ক সত্ত্বেও তাঁরা প্রশ্ন করতেন খুব অস্পষ্ট। তাঁরা সর্বমোট তেরটি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন করেছিলেন। সেগুলোর উত্তর কোরআন কবীমে দেয়া হয়েছে। তবে তাঁরা প্রয়োজন ছাড়া কোন প্রশ্ন করতেন না। — (কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতগুলোর প্রথমটিতে সাহাবীগণের প্রশ্নের বিষয়টি নিম্নলিখিতভাবে উদ্ধৃত হয়েছে وَسَيُلَوِّظُكَ مَاذَا تُؤْفُقُونَ অর্থাৎ, মানুষ কি ব্যয় করবে এ সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে। এ প্রশ্নই দু'টি আয়াতের পর পুনরায় একই বাক্যের মাধ্যমে করা হয়েছে।

وَسَيُلَوِّظُكَ مَاذَا تُؤْفُقُونَ

কিন্তু প্রথমবার এই প্রশ্নের যে উত্তর উল্লেখিত আয়াতে দেয়া হয়েছে, দু'আয়াতের পর এর উত্তর অন্যভাবে দেয়া হয়েছে। এজন্য বোঝতে হবে যে, একই রকম প্রশ্নের দু'টি উত্তরের একটি তাৎপর্য অবশ্যই রয়েছে। আর সে তাৎপর্যটি সে সমস্ত অবস্থা ও ঘটনার বিষয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যায়, যেগুলোর প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল। যেমন, আলোচ্য আয়াতের শানে—নূহুল হচ্ছে এই যে, আমরা ইবনে নূহ রসূল (সাঃ)—কে প্রশ্ন করেছিলেন, যে مَا نَنْفَعُ مِنْ أَمْرِنَا وَإِنْ نَضَعَهَا অর্থাৎ, আমাদের সম্পদ হতে কি পরিমাণ ব্যয় করব এবং কোথায় ব্যয় করব? ইবনে জরীরের বর্ণনামতে এ প্রশ্নটির দু'টি অংশ রয়েছে। একটি হচ্ছে অর্থ-সম্পদের মধ্য থেকে কি বস্তু এবং কত পরিমাণ খরচ করা হবে? দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই দানের পাত্র কারা?

দু'আয়াত পরে যে একই প্রশ্ন করা হয়েছে, তার শানে—নূহুল ইবনে হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এই যে, মুসলমানগণকে যখন বলা হলো যে, তোমরা স্বীয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় কর, তখন কয়েকজন সাহাবী রসূল (সাঃ)—এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহর পথে ব্যয় করার যে আদেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, আমরা এর বিস্তারিত আলোচনা শোনতে চাই, কি বস্তু কি পরিমাণে আল্লাহর পথে ব্যয় করব? এখানে এ প্রশ্নের একটি মাত্র অংশ বিদ্যমান। অর্থাৎ, কি ব্যয় করা হবে। এভাবে এ দু'টি প্রশ্নের ধারা ও রূপের কিছুটা বিভিন্মতা দেখা দিয়েছে। প্রথম প্রশ্নে কি ব্যয় করবে এবং কোথায় ব্যয় করবে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে কি ব্যয় করব। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কোরআন মজীদ যা বলেছে, তাতে বোঝা যায় যে, প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, 'কোথায় ব্যয় করবে' একে অধিক গুরুত্ব দিয়ে পরিষ্কারভাবে এর উত্তর দেয়া হয়েছে এবং প্রথম অংশ 'কি খরচ করব'—এর উত্তর দ্বিতীয় উত্তরের আওতায় বর্ণনা করা যথেষ্ট বলে মনে করা হয়েছে। এখন কোরআন মজীদে বর্ণিত দু'টি অংশের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথম অংশে অর্থাৎ, কোথায় ব্যয় করবে সে সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে : 'আল্লাহর রাস্তায় তোমরা যা-ই ব্যয় কর তার হকদার হচ্ছে— তোমাদের পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন ও মুসাফিরগণ।' আর দ্বিতীয় অংশের জবাব অর্থাৎ, কি ব্যয় করবে? এ প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে এরশাদ করা হয়েছে 'তোমরা যেসব কাজ করবে তা আল্লাহ তাআলা জানেন।' বাক্যটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি যে, এতদুপাধ্যাত্মিকভাবেই তোমাদের ব্যয় করতে হবে এবং স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী যাকিছু তোমরা ব্যয় কর, আল্লাহর নিকট এর প্রতিদান পাবে।

মোটকথা, প্রথম আয়াতে হয় তো প্রশ্নকারীদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই প্রশ্নের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, আমরা যা ব্যয় করবো তা কাকে দেব? কাজেই উত্তর দিতে গিয়ে দানের 'মাসরাফ' বা পাত্র সম্পর্কে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া দানের বস্তু ও পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যাপারটিকে প্রাসঙ্গিক বলে ধরে নেয়া হয়েছে। পরবর্তী প্রশ্নে শুধু জিজ্ঞাসা ছিল যে, কি খরচ করবো? এর উত্তরে বলা হয়েছে قُلِ الْمَعْلُومُ 'আপনি বলে দিন যে, যা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই খরচ কর।' এতে বোঝা গেল যে, নফল সদকার বেলায় নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই ব্যয় করতে হবে। নিজের সন্তানাদিকে কষ্টে ফেলে, তাদেরকে অধিকার হতে বঞ্চিত করে সদকা করার কোন বিধান নেই। এতে সওয়াব পাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, ঋণ পরিশোধ না করে তার পক্ষ নফল সদকা করাও আল্লাহর পছন্দ নয়।

البقرة

২৫

سيفول

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জেহাদের কয়েকটি বিধান : উল্লিখিত আয়াতের প্রথমটিতে জেহাদ ফরয হওয়ার আদেশ নিম্নলিখিত শব্দগুলো দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ‘তোমাদের উপর জেহাদ ফরয করা হোল।’ এ

শব্দগুলোর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর সব সময়ই জেহাদ করা ফরয। তবে কোরআনের কোন কোন আয়াত ও রসূল (সাঃ)-এর হাদীসের বর্ণনাতে বোঝা যায় যে, জেহাদের এ ফরয, ফরযে-আইনরূপে প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাব্যস্ত হয় না, বরং এটা ফরযে-কেফায়া। যদি মুসলমানদের কোন দল তা আদায় করে, তবে সমস্ত মুসলমানই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়। তবে যদি কোন দেশে বা কোন যুগে কোন দলই জেহাদের ফরয আদায় না করে, তবে ঐ দেশের বা ঐ যুগের সমস্ত মুসলমানকেই ফরয থেকে বিমুখতার দায়ে পাণী হতে হবে। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন :

الجهاد ماض الى يوم القيامة —এর মর্ম হচ্ছে এই যে, কেয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকা আবশ্যিক, যারা জেহাদের দায়িত্ব পালন করবে। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

كَفَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَوْدَيْنِ دَرَجَةً
وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى

অর্থাৎ, ‘আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞান এবং মালের দ্বারা জেহাদকারিগণকে জিহাদ বর্জনকারীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং উভয়কে পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন।’

এতে যেসব ব্যক্তি কোন অসুবিধার জন্যে বা অন্য কোন ধর্মীয় খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তাদেরকেও আল্লাহ্ তাআলা সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, জেহাদ যদি ফরযে-আইন হতো তবে তা বর্জনকারীদেরকে সুফল দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হতো না।

এমনিভাবে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

لَوْلَا كَثْرٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ لَطَمَتْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

অর্থাৎ, ‘কেন তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি ছোট দল ধর্মীয় ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে বেরিয়ে গেলো না।’ এ আয়াতে কোরআন নিজেই ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব বন্টন করে দিয়ে বলছে যে, কিছুসংখ্যক মুসলমান জেহাদের ফরয আদায় করবে, আর কিছুসংখ্যক মুসলমান মানুষকে ধর্মীয় তা’লীমদানে নিয়োজিত থাকবে। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন জেহাদ ফরযে-আইন না হয়ে ফরযে-কেফায়া হবে।

তাছাড়া বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট জেহাদে অংশগ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার পিতা-মাতা কি বেঁচে আছেন? উত্তরে সে বললো, জি, বেঁচে আছেন। তখন রসূল (সাঃ) তাকে উপদেশ দিলেন, তুমি পিতা-মাতার খেদমত করেই জেহাদের সওয়াব হাসিল কর। এতেও বোঝা যায় যে, জেহাদ ফরযে-কেফায়া। যখন মুসলমানদের একটি

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَلَى أَنْ تَكُونُوا شِيعَةً
وَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَعَلَى أَنْ تُحِبُّوا شِيعَةً وَهُوَ شُرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ يُسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ
قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَالسَّيِّئَاتِ وَالْحَرَامِ وَالْخُرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ
اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُعَاتِلُونَكَ
حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرُدَّكُمْ
مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَبَّحْهُ وَهُوَ كَاذِبٌ ۚ وَأُولَئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا
وَجِهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ يُسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
قُلْ فِيهِمَا أَثَمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافَعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مَنْ تَعْلَمُهُمَا ۚ وَاسْأَلُوا مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْمَقُورُ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ

(২১৬) তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয় তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আর হয় তো বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্ততঃ আল্লাহ্ জ্ঞানেন, তোমরা জান না। (২১৭) সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও, এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহ্র নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ। বস্ততঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দুীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে, যদি তা সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দুীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারা ই হলো দোষখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। (২১৮) আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহ্র পথে লড়াই (জেহাদ) করেছে, তারা আল্লাহ্র রহমতের প্রাপ্য। আর আল্লাহ্ হচ্ছে ক্ষমাকারী, করুণাময়। (২১৯) তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্যে উপকারিতাও রয়েছে, তবে এ-গুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, কি তারা ব্যয় করবে? বলে দাও, নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর যা বাঁচে তাই খরচ করবে। এভাবেই আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করতে পার।

দল জেহাদের ফরয আদায় করে, তখন অন্যান্য মুসলমানগণ অন্য খেদমতে নিয়োজিত হতে পারে। তবে যদি মুসলমানদের নেতা প্রয়োজনে সবাইকে জেহাদে অংশগ্রহণ করার আহবান করেন, তখন জেহাদ ফরযে আইনে পরিণত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কোরআন-হাকীমের সূরা তওবায় এরশাদ হয়েছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَوَارَوْا صُبُلَ اللَّهِ
أَقَالَكُمْ

— অর্থাৎ, “হে মুসলমানগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্র পথে বেরিয়ে যাও, তখনই তোমরা মনমরা হয়ে পড়।”

এ আয়াতে আল্লাহ্র রাস্তায় বের হওয়ার সার্বজনীন নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এমনভাবে আল্লাহ্ না করুন, যদি কোন ইসলামী দেশ জমুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সে দেশের লোকের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশবাসীর উপরেও সে ফরয আপত্তি হয়। তারাও যদি প্রতিহত করতে না পারে, তবে এর নিকটবর্তী মুসলিম দেশের উপর, এমনি সারা বিশুর প্রতিটি মুসলমানের উপর এ ফরয পরিব্যাপ্ত হয় এবং ফরযে আইন হয়ে যায়। কোরআনের আলোচ্য আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহ ও মোহাদ্দেসগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জেহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে ফরযে-কেফায়া।

যতক্ষণ পর্যন্ত জেহাদ ফরযে কেফায়া পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভানদের পক্ষে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জেহাদে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়। কিংবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত এ ফরযে কেফায়াতে অংশগ্রহণ করা জায়েয নয়। আর যখন এ জেহাদ প্রয়োজনের তাকীদে ফরযে-আইনে পরিণত হয়, তখন পিতা-মাতা, স্বামী বা স্ত্রী অথবা ঋণদাতা কারোই অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে জেহাদের প্রতি উৎসাহ দানের লক্ষ্যে এরশাদ হয়েছে যে, - ‘যদিও জেহাদ স্বাভাবিকভাবে বোঝা বলে মনে হয়, কিন্তু স্মরণ রেখো, মানুষের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেষ্টা পরিণামে অনেক সময় অকৃতকার্য হয়। ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করা বিজ্ঞ ও বড় বুদ্ধিমানের পক্ষেও আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রতিটি মানুষই তার জীবনের যাবতীয় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, তার জীবনেই অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে সে কোন কাজকে অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী মনে করেছিল, কিন্তু পরিণামে তা অত্যন্ত অনিষ্টকর হয়েছে। অথবা কোন বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেছিল এবং তা থেকে দূরে সরেছিল, কিন্তু পরিণামে দেখা গেল, তা অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী ছিল। মানুষের বুদ্ধি ও চেষ্টার অন্তত পরিণাম অনেক ব্যাপারেই ধরা পড়ে। তাই বলা হয়েছেঃ “জেহাদ ও ধর্মযুদ্ধে যদিও আপাতদৃষ্টিতে জ্ঞান ও মালের ক্ষতির আশংকা মনে হয়, কিন্তু যখন পরিণাম সামনে আসবে, তখন বোঝা যাবে যে, এ ক্ষতি বাস্তবে মোটেও ক্ষতি ছিল না; বরং সোজাসৃজি লাভ, উপকার এবং চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছিল।”

নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধসংক্রান্ত নির্দেশাবলী : আলোচ্য আয়াতের দ্বারা দ্বিতীয় যে বিষয়টি প্রমাণিত হচ্ছে, তা হলো নিষিদ্ধ মাস অর্থাৎ, রজব,

যিলকদ, যিলহজ্ব এবং মহাররম মাসে যুদ্ধ - বিগ্রহ করা হারাম। এমনভাবে কোরআনের অনেকগুলো আয়াতেই এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষেধ করা হয়েছে। যথা : مِّنْهُنَّ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
ارْبَعَةٌ حَرَمٌ ثَلَاثُ مَتَوَالِيَاتٍ وَرَجَبُ
হুযর (সাঃ) ঘোষণা করেছেন যে, এসব আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, উল্লেখিত চারটি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের এ নিষেধাজ্ঞা সর্বকালের জন্যই প্রযোজ্য।

ইমামে-তফসীর আতা ইবনে আবী-রাবাহ কসম খেয়ে বলেছেন যে, এ আদেশ সর্বযুগের জন্য। তাবেরীগণের অনেকেও এ আদেশকে স্থায়ী আদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ এবং ইমাম জাসাসের মতে এ আদেশ রহিত হয়ে গেছে। ফলে এখন কোন মাসেই প্রয়োজনীয় যুদ্ধ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ আয়াত দ্বারা এ আদেশ রহিত করা হয়েছে? এ সম্পর্কে ফকীহগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً আয়াতটি উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ রহিতকারী। আবার অধিকাংশের মতে রহিতকারী সেই আয়াত হচ্ছেঃ

فَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

যে শব্দটি এ স্থলে কাল ব্যাক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, মুশরিকদের যে মাসে এবং যে কালেই (মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত) পাও, হত্যা কর। কারো কারো মতে এ আদেশ রসূল (সাঃ)-এর কর্ম দ্বারা রহিত হয়েছে। তিনি নিষিদ্ধ মাসেই তায়েফ অবরোধ করেছিলেন এবং নিষিদ্ধ মাসেই হযরত ‘আমের আশআরীকে’ আওতাসের যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহগণ এ আদেশকে রহিত বলে উল্লেখ করেছেন।

রাহুল-মা’আনী এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এবং বায়যাবী সূরা বরা’আতের প্রথম রুকূর তফসীর প্রসঙ্গে এ আদেশ রহিত হওয়ার ব্যাপারে ‘এজমায়ে উস্মতের’ কথা উল্লেখ করেছেন।— (বয়ানুল-কোরআন)

কিন্তু তফসীরে মায়হারী এসব দলীলের জবাবে বলেছেন যে, নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত আলোচনা এ আয়াতে রয়েছে। একে বলা হয়, ‘আয়াতুস সাইফ’। অর্থাৎ,

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ

يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

পরন্তু এ আয়াতটি জেহাদ বা যুদ্ধ-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর মধ্যে সর্বশেষে অবতীর্ণ হয়েছে। হুযর (সাঃ)-এর ওফাতের মাত্র আশি দিন পূর্বে প্রদত্ত বিদায় হজ্জের ভাষণেও নিষিদ্ধ মাসের বিস্তারিত আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিদ্যমান। কাজেই এর দ্বারা আলোচ্য আয়াতকে রহিত বলা চলে না। তাছাড়া রসূল (সাঃ)-এর তায়েফ অবরোধ যিলকদ মাসে নয়, বরং শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এ অভিযানের দ্বারাও উল্লেখিত আয়াতকে মনসুখ বলা যায় না। অবশ্য একথা বলা যায় যে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহের নিষেধাজ্ঞা থেকে এ এব্যাপারটি স্বতন্ত্র যে, যদি কাকেররা এসব মাসেই আক্রমণ করে, তবে প্রতিরক্ষামূলক আক্রমণ মুসলমানদের

জন্মেও বৈধ্য হবে। কাজেই আয়াতের শুধুমাত্র এ অংশটুকুকেই রহিত বলা যেতে পারে, যার ব্যাখ্যা রয়েছে—
الشُّهُرُ الْحَرَامُ بِالشُّهُرِ الْحَرَامِ
আয়াতটিতে।

মোটকথা, এসব মাসে নিজে থেকে যুদ্ধ আরম্ভ করা সর্বকালের জন্যেই নিষিদ্ধ। তবে কাকেররা যদি এসব মাসে আক্রমণ করে, প্রতিরক্ষামূলক প্রতি-আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্যেও জায়েয। যেমন, ইমাম জাসাস হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, রসূল (সাঃ) নিষিদ্ধ মাসে যতক্ষণ পর্যন্ত কাকেরদের দূরা আক্রান্ত না হতেন, ততক্ষণ আক্রমণ করতেন না।

মুরতাদের পরিণাম : উল্লেখিত আয়াত

এর শেষে মুসলমান হওয়ার পর তা ত্যাগ করা বা মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুকুম বলা হয়েছে।

অর্থাৎ, ‘তাদের আমল দুনিয়া ও আখেরাতে তথা ইহ ও পরকালের জন্যে বরবাদ হয়ে গেছে।’ এ বরবাদ হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, পার্শ্ব জীবনে তাদের শত্রী তাদের বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যদি তার কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু হয়, তাহলে সে ব্যক্তির উত্তরাধিকার বা মীরাসের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়, ইসলামে থাকাকালীন নামায-রোযা যত কিছু করেছে সব বাতিল হয়ে যায়, মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া হয় না এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফনও করা হবে না।

আর পরকালে বরবাদ হওয়ার অর্থ হচ্ছে এবাদতের সওয়াব না পাওয়া এবং চিরকালের জন্যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

মাসআলা : যদি এমন ব্যক্তি পুনরায় মুসলমান হয় তাহলে পরকালে দোষ থেকে রেহাই পাওয়া এবং দুনিয়াতে তার উপর পুনরায় শরীয়তের হুকুম জারি হওয়া নিশ্চিত। তবে যদি সে প্রথম মুসলমান থাকা অবস্থায় হত্যা করে থাকে, তবে সামর্থ্যবান হয়ে থাকলে দ্বিতীয়বার তা ফরয হওয়া না হওয়া, পূর্বের নামায-রোযার পরকালে প্রত্যাবর্তন হওয়া না হওয়া প্রভৃতি বিষয়ে ইমামগণ মতানৈক্য পোষণ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা দ্বিতীয়বার হত্যা করে ফরয বলেন এবং পূর্বের নামায-রোযার সওয়াব পাবে না বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী দু’টি বিষয়েই মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন।

মাসআলা : যদি কোন ব্যক্তি প্রথম থেকেই কাকের হয়ে থাকে এবং সে অবস্থায় কোন কাজ করে থাকে, কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বকৃত যাবতীয় সংকল্পের সওয়াবই সে পাবে। আর যদি সে কাকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সবই বরবাদ হয়ে যাবে।

মাসআলা : মোটকথা, মুরতাদের অবস্থা কাকেরদের অবস্থা অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর। এজন্যে কাকেরদের থেকে জিহাদ কর গ্রহণ করা যায়, কিন্তু পুনরায় ইসলাম গ্রহণ না করলে মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আর যদি মুরতাদ শত্রীলোক হয়, তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। কেননা, মুরতাদের কার্যকলাপের দরুন সরাসরিভাবে ইসলামের অবমাননা করা হবে। কাজেই তারা সরকার অবমাননার শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

সাহাবিগণের প্রশ্নসমূহ এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর যে পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এ আয়াতও অন্তর্ভুক্ত। এতে শরাব ও জুয়া সম্পর্কে

সাহাবিগণের প্রশ্ন এবং আদ্বাহুর তরফ থেকে তার উত্তর দেয়া হয়েছে। এ দু’টি বিষয়ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, বিস্তারিতভাবে এ দু’টির তাৎপর্ষ ও বিধানগুলো লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

শরাব হারাম হওয়া এবং এতদসংক্রান্ত বিধান : ইসলামের প্রথম মুগে জাহেলিয়াত আমলের সাধারণ রীতি-নীতির মত মদ্যপানও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ)-এর হিজরতের পরেও মদীনাবাসীদের মধ্যে মদ্যপান ও জুয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণ মানুষ এ দু’টি বস্তুর শুধু বাহ্যিক উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করেই এতে মগ্ন ছিল। কিন্তু এগুলোর অন্তর্নিহিত অকল্যাণ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। তবে আদ্বাহুর নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক অঞ্চলে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তিও থাকেন যারা বিবেক-বুদ্ধিকে অভ্যাসের উর্ধ্বে স্থান দেন। যদি কোন অভ্যাস বুদ্ধি বা যুক্তির পরিপন্থী হয়, তবে সে অভ্যাসের ধারে-কাছেও তাঁরা যান না। এ ব্যাপারে নবী-করীম (সাঃ)-এর স্থান ছিল সবচেয়ে উর্ধ্বে। কেননা, যেসব বস্তু কোন কালে হারাম হবে, এমন সব বস্তুর প্রতিও তাঁর অন্তরে একটা সহজাত ঘৃণা ছিল। সাহাবিগণের মধ্যেও এমন কিছুসংখ্যক লোক ছিলেন, যারা হালাল থাকা কালেও মদ্য পান তে দূরের কথা, তা স্পর্শও করেননি।

মদীনায় পৌছার পর কতিপয় সাহাবী এসব বিষয়ের অকল্যাণগুলো অনুভব করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ফারুক-আযম, হযরত মা’আয ইবনে জাবাল এবং কিছুসংখ্যক আনসার রসূলে-করীম (সাঃ)-এর দরবারে উস্থিত হয়ে বললেন : “মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবং ধন-সম্পদও ধ্বংস করে দেয়। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?” এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ হচ্ছে প্রথম আয়াত যা মুসলমানদেরকে মদ ও জুয়া থেকে দূরে রাখার পদক্ষেপ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, মদ ও জুয়াতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু দু’টির মাধ্যমেই অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয়; যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বড় ও ক্ষতিকর। পাপ অর্থে এখানে সেসব বিষয়ও বোঝানো হয়েছে, যা পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, মদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দোষ হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের সবচাইতে বড় গুণ, বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কান্স, বুদ্ধি এমন একটি গুণ যা মানুষকে মদ কাজ থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে যখন তা থাকে না, তখন প্রতিটি মদ কাজের পথই সুগম হয়ে যায়।

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় মদকে হারাম করা হয়নি, কিন্তু এর অনিষ্ট ও অকল্যাণের দিকগুলোকে তুলে ধরে বলা হয়েছে যে, মদ্যপানের দরুন মানুষ অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। বলতে গেলে আয়াতটিতে মদ্যপান ত্যাগ করার জন্যে এক প্রকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কোন কোন সাহাবী এ পরামর্শ গ্রহণ করে তৎক্ষণাৎ মদ্যপান ত্যাগ করেছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেছেন, এ আয়াতে মদকে তো হারাম করা হয়নি, বরং এটা দু’নির পক্ষে ক্ষতির কাজে ধাবিত করে বিধায় একে পাপের কারণ বলে স্থির করা হয়েছে, যাতে ফেতনায় পড়তে না হয়, সেজন্যে পূর্ব থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

মদের ব্যাপারে পরবর্তী আয়াতটি নাযিল হওয়ার ঘটনা নিম্নরূপঃ একদিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) সাহাবিগণের মধ্যে হতে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন। আহারাদির পর যথারীতি

মদ্যপানের ব্যবস্থা করা হলো এবং সবাই মদ্যপান করলেন। এমতাবস্থায় মগরিবেরে নামাযের সময় হলে সবাই নামাযে দাঁড়ালেন এবং একজনকে ইমামতি করতে এগিয়ে দিলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন তিনি **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** সূরাটি ভুল পড়তে লাগলেন, তখনই মদ্যপান থেকে পুরোপুরি বিরত রাখার জন্যে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল। এরশাদ হলঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ

অর্থাৎ, ‘হে ঈমানদারগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের—কাছেও যেও না।’ এতে নামাযের সময় মদ্যপানকে হারাম করা হয়েছে। তবে অন্যান্য সময় তা পান করার অনুমতি তখনও পর্যন্ত বহাল রয়ে গেল। পরবর্তীতে বহুসংখ্যক সাহাবী এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরই মদ্যপান সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। ভেবেছিলেন, যে বস্তু মানুষকে নামায থেকে বিরত রাখে, তাতে কোন কল্যাণই থাকতে পারে না। যখন নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, তখন এমন বস্তুর ধারে—কাছে যাওয়া উচিত নয়, যা মানুষকে নামায থেকে বিরত করে। যেহেতু নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ের জন্যে মদ্যপানকে পরিষ্কারভাবে নিষেধ করা হয়নি, সেহেতু কেউ কেউ নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে মদ্যপান করতে থাকেন। ইতিমধ্যে আরো একটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। হযরত আতবান ইবনে মালেক কয়েকজন সাহাবীকে নিমন্ত্রণ করেন, যাদের মধ্যে সা’দ ইবনে আবী ওক্বাসও উপস্থিত ছিলেন। ষাওয়া—দাওয়ায় পর মদ্যপান করার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। আরবদের প্রথা অনুযায়ী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কবিতা প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বংশ ও পূর্ব-পুরুষদের অহংকারমূলক বর্ণনা আরম্ভ হয়। সা’দ ইবনে আবী ওক্বাস একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন যাতে আনসারদের দোষারোপ করে নিজেদের প্রশংসাকীর্তন করা হয়। ফলে একজন আনসার যুবক রাগান্বিত হয়ে উঠে গণ্ডদেশের একটি হাড় সা’দ এর মাথায় ছুঁড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে সা’দ রসূল (সাঃ)—এর দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন হুম্বর (সাঃ) দোয়া করলেনঃ

اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا

অর্থাৎ, ‘হে আল্লাহ! শরাব সম্পর্কে আমাদেরকে একটি পরিষ্কার র্ণনা ও বিধান দান কর।’ তখনই সূরা মায়েদার উদ্ধৃত মদ ও মদ্যপানের বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে মদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয়েছে।

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنصَابُ وَالرُّكْمُ
رَجَسٌ مِّنْ عِندِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۚ إِنَّمَا
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْمِرِ وَيَصَدِّكُمْ عَنْ دُرِّ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ**

অর্থাৎ, ‘হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনো, মদ, জুয়া, মূর্তি এবং তীর নিক্ষেপ এসবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে থাক, যাতে তোমরা মুস্তিলাভ ও কল্যাণ পেতে পার।

মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে থাকে; আর আল্লাহর যিকর ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখাই হল শয়তানের একান্ত কাম্য, তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?

মদের অবৈধতা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক নির্দেশ : আল্লাহ নির্দেশাবলীর তাৎপর্য তিনিই জানেন। তবে শরীয়তের নির্দেশসমূহের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, ইসলামী শরীয়ত কোন বিষয়ে কোন হুকুম প্রদান করতে গিয়ে মানবীয় আবেগ-অনুভূতিসমূহের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেছে, যাতে মানুষ সেগুলোর অনুসরণ করতে গিয়ে বিশেষ কষ্টের সম্মুখীন না হয়। যেমন, কোরআন নিজেই ঘোষণা করেছে— **لَا يَكْفُرُ اللَّهُ تَفْسًا أَكْرًا وَسَعًا** ‘আল্লাহ তাআলা কোন মানুষকেই এমন আদেশ দেন না, যা তার শক্তি ও ক্ষমতার উর্ধ্বে।’ এই দয়া ও রহস্যের চাহিদা ছিল ইসলামী শরীয়তেও মদ্যপানকে হারাম করার ব্যাপারে পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

মদ্যপানকে পর্যায়ক্রমিকভাবে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কোরআনের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম হচ্ছে এই যে, মদ্যপান সম্পর্কে চারটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে আলাল্যা এ আয়াতটিই সর্বপ্রথম নির্দেশ। এতে মদ্যপানের দরুন যেসব পাপ ও ফাসাদ সৃষ্টি হয়, তার বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত করা হয়েছে; মদ্যপান হারাম করা হয়নি। বরং এ আয়াতটিকে এই মর্মে একটা পরামর্শ বলা যেতে পারে যে, এটা বজ্রনীয় বস্তু। কিন্তু বর্জন করার কোন নির্দেশ এতে দেয়া হয়নি।

দ্বিতীয় আয়াত সূরা নেসায় বলা হয়েছেঃ

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ —এতে বিশেষভাবে নামাযের সময়

মদ্যপানকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য সময়ের জন্যে অনুমতি রয়ে যায়। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াত রয়েছে সূরা মায়েদায়। এতে পরিষ্কার ও কঠোরভাবে মদ্যপান নিষিদ্ধ ও হারাম করে দেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে শরীয়তের এমন পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ ছিল এই যে, আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা বিশেষতঃ নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হতো।

আলেমগণ বলেছেন, ‘যেভাবে শিশুদেরকে মায়ের বুকের দুধ ছাড়ানো কঠিন ও কষ্টকর, তেমনি মানুষের কোন অভ্যাসগত কাজ ছাড়ানো এর চাইতেও কষ্টকর।’ এজন্যে ইসলাম একান্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমে শরাবের মন্দ দিকগুলো মানবমনে বদ্ধমূল করেছে। অতঃপর নামাযের সময়ে একে নিষিদ্ধ করেছে এবং সব শেষে বিশেষ বিশেষ সময়ের পরিবর্তে কঠোরভাবে সর্বকালের জন্যেই নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে।

তবে শরাব হারাম করার ব্যাপারে প্রথমতঃ ধীরমহুর গতিতে এগিয়ে যাওয়াটাই ছিল বৈজ্ঞানিক পন্থা। তেমনিভাবে কঠোরভাবে হারাম ঘোষণা করার পর এর নিষিদ্ধতার আইন-কানুনও শক্তভাবে জারি করাও বিজ্ঞতারই পরিচায়ক। এজন্যে রসূল (সাঃ) শরাব সম্পর্কে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন। এরশাদ হয়েছে—‘সর্বপ্রকার অপকর্ম এবং অশ্রীলতার জন্মদাতা হচ্ছে শরাব। এটি পান করে মানুষ নিকৃষ্টতার পাপে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে।’

নাসায়ী শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে,— ‘শরাব এবং

ইমান একত্রিত হতে পারে না।' তিরমিযীতে হযরত আনাস (রাঃ) হযুর (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযুর (সাঃ) মদের সাথে সম্পর্ক রাখে এমন দশ শ্রেণীর ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন।

(১) যে লোক নির্যাস বের করে, (২) প্রস্তুতকারক, (৩) পানকারী, (৪) যে পান করায়, (৫) আমদানীকারক, (৬) যার জন্যে আমদানী করা হয়, (৭) বিক্রেতা, (৮) ক্রেতা, (৯) সরবরাহকারী, এবং (১০) এর লভ্যাংশ ভোগকারী।

অতঃপর শুধু মৌখিক শিক্ষা ও প্রচারের উপরই ক্রান্ত হননি, বরং ফযায্ব আইনের মাধ্যমেও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যার নিকট কোন প্রকার মদ থেকে থাকে, তা অমুক স্থানে উপস্থিত কর।

সাহাবিগণের মধ্যে আদেশ পালনের অনুপম আগ্রহ : আদেশ পাওয়া মাত্র অনুগত সাহাবিগণ নিজ নিজ ঘরে ব্যবহারের জন্যে রক্ষিত মদ তৎক্ষণাৎ ফেলে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন রসুল-করীম (সাঃ)-এর প্রেরিত এক ব্যক্তি মদীনার অলি-গলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, মদ্য পান হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তখন যার হাতে শরাবের যে পাত্র ছিল, তা তিনি সেখানেই ফেলে দিয়েছিলেন। যার কাছে মদের কলস বা মটকা ছিল, তা ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ বের করে ভেঙ্গে ফেলেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) তখন এক মজলিসে মদ্যপানে সাক্ষীর কাজ সম্পাদন করছিলেন। আবু তালহা, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ, উবাই ইবনে কা'ব, সোহাইল (রাঃ) প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সাহাবিগণ সে মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। প্রচারকের ঘোষণা কানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে সবাই সম্মুখে বলে উঠলেন—এবার সমস্ত শরাব ফেলে দাও। এর পেয়ালা, মটকা, হাঁড়ি ভেঙ্গে ফেল। অন্য বর্ণনায় আছে—হারাম ঘোষণার সময় যার হাতে শরাবের পেয়ালা ছিল এবং তা ঠোঁট স্পর্শ করছিল, তাও তৎক্ষণাৎ সে অবস্থাতেই দূরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সেদিন মদীনায় এ পরিমাণ শরাব নিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, বৃষ্টির পানির মত শরাব প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদীনার অলি-গলির অবস্থা এমন ছিল যে, যখনই বৃষ্টি হতো তখন শরাবের গন্ধ ও রং মাটির উপর ফুটে উঠত।

যখন আদেশ হল যে, যার কাছে যে রকম মদ রয়েছে, তা অমুক স্থানে একত্রিত কর। তখন মাত্র সেসব মদই বাজারে ছিল যা ব্যবসার জন্যে রাখা হয়েছিল। এ আদেশ পালনকল্পে সাহাবিগণ বিনা দ্বিধায় নির্ধারিত স্থানে সব মদ একত্রিত করেছিলেন।

হযুর (সাঃ) স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে শরাবের অনেক পাত্র ভেঙ্গে ফেললেন এবং অবশিষ্টগুলো সাহাবিগণের দ্বারা ভাঙ্গিয়ে দিলেন। জনৈক সাহাবী মদের ব্যবসা করতেন এবং সিরিয়া থেকে মদ আমদানী করতেন। ঘটনাটিকে তখন তিনি মদ আনার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গিয়েছিলেন। যখন তিনি ব্যবসায়ের এ পণ্য নিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং মদীনায়ে প্রবেশ করার পূর্বেই মদ হারাম হওয়ার সংবাদ তাঁর কানে পৌঁছল, তখন সে সাহাবীও তাঁর সমুদয় মাল—যা অনেক মুনাফার আশায় আনা হয়েছিল, এক পাছাড়ের পাদদেশে রেখে এসে হযুরে-আকরাম (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এসব সম্পদের ব্যাপারে কি করতে হবে তৎসম্পর্কে নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। মহানবী (সাঃ) হুকুম করলেন—মটকাগুলো ভেঙ্গে সমস্ত শরাব ভাঙ্গিয়ে দাও। অতঃপর বিনা আপত্তিতে তিনি তাঁর সমস্ত পুজির বিনিময়ে সংস্খীত এ পণ্য স্বহস্তে মাটিতে ঢেলে দিলেন। এটাও ইসলামের মু'জেবা এবং সাহাবিগণের বিস্ময়কর আনুগত্যের নিদর্শন, যা এ ঘটনায়

প্রমাণ হল। যে জিনিসের অভ্যাস হয়ে যায়, সবাই জানে যে, তা ত্যাগ করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। মদ্যপানে তাঁরা এমন অভ্যাস ছিলেন যে, অল্পদিন তা থেকে বিরত থাকাও স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। কিন্তু নবী করীমের (সাঃ) একটিমাত্র নির্দেশই তাঁদের অভ্যাসে এমন অপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করল যে, তারপর থেকে তাঁরা শরাবের প্রতি তেমনি ঘৃণা পোষণ করতে লাগলেন, যেমন পূর্বে তাঁরা এর প্রতি আসক্ত ছিলেন।

ইসলামী রাজনীতি এবং সাধারণ রাজনীতির পার্থক্য : আলোচ্য আয়াতে ও ঘটনাসমূহে শরাব হারাম হওয়ার আদেশের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্যের একটা নমুনা দেখা গেল। একে ইসলামের মু'জেবা বা নবী করীম (সাঃ)-এর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অথবা ইসলামী রাজনীতির অপরিহার্য ফলশ্রুতিও বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ নেশার অভ্যাস ত্যাগ করা যে অত্যন্ত কঠিন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তদুপরি আরবদেশের কথা ভো স্বতন্ত্র, সেখানে এর প্রচলন এত বেশী ছিল যে, মদ ছাড়া কয়েক ঘণ্টা কাটানোও তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় তা কি পরিশোধ ছিল যে, মাত্র একটি ঘোষণার শব্দ কানে পৌঁছামাত্র তাঁদের স্বভাবে এ আমূল পরিবর্তন সাধিত হল। সে একটি মাত্র ঘোষণাই তাঁদের অভ্যাসে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি করেছিল যে, কয়েক মিনিট পূর্বে যে জিনিস এত প্রিয় এবং এত লোভনীয় ছিল, অল্প কয়েক মিনিট পরে তাই অত্যন্ত কৃপ্য ও পরিত্যাজ্য পরিগণিত হয়ে গেল।

অপরদিকে বর্তমান যুগের তথাকথিত উন্নত মানের রাজনীতির একটি উদাহরণ সামনে রেখে দেখা যাক। আজ থেকে কয়েক বৎসর পূর্বে আমেরিকার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং সমাজসংস্কারকগণ মদ্যপানের মারাত্মক ক্ষতিকর দিকগুলো অনুধাবন করে দেশে মদ্যপানকে আইন করে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। আর এজন্যে জনমত গঠনের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসাবে অভিহিত প্রচারের আধুনিকতম যন্ত্রগুলোও ব্যবহার করা হয়েছিল। সবগুলো প্রচার-মাধ্যমই মদ্যপানের বিরুদ্ধে প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। শত শত সংবাদপত্রে নিবন্ধ প্রকাশিত হলো, পুস্তক-পুস্তিকা রচিত হল, লক্ষ লক্ষ পুস্তক ছেপে প্রচার ও বিতরণ করা হল। তাছাড়া আমেরিকার সংসদেও এজন্য আইন পাশ করা হল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমেরিকার যে অবস্থা মানুষের সামনে এবং সেখানকার সরকারী প্রতিবেদনের মাধ্যমে পৃথিবীর সামনে এসেছে, তা হল এই যে, এই আধুনিক উন্নত ও শিক্ষিত জাতি সেই আইনগত নিষেধাজ্ঞার সময়টিতে সাধারণ সময়ের চাইতেও অধিক মাত্রায় মদ্যপান করেছে। এমনকি অবশেষে সরকার এ আইন বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়।

তদানীন্তন আরবের মুসলমান এবং আধুনিক আমেরিকার উন্নত জাতির মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তবে এখানে লক্ষ্যীয় বিষয় হচ্ছে এই বিরাট পার্থক্যের প্রকৃত কারণ ও রহস্য কি ?

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, ইসলামী শরীয়ত মানুষের সংশোধনের জন্য শুধু আইনকেই পর্যাপ্ত মনে করেনি। বরং আইনের পূর্বে তাদের মন-মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, এবাদত-আরাধনা এক পরকালের চিন্তা নামক পরশমণির পরশে মনোজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। যার ফলে রসুল (সাঃ)-এর একটিমাত্র আহবানেই তারা স্বীয় জ্ঞান-মাল, শান-শওকত সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। মক্কী জীবনে এই মানুষ তৈরীর কাজই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে। এভাবে আত্মত্যাগীদের একটা বিরাট দল তৈরী হয়ে গেল।

তারপর প্রণয়ন করা হলো আইন। পক্ষান্তরে মানুষের মনের পরিবর্তনের জন্য আমেরিকার সরকার অসংখ্য উপায় অবলম্বন করেছে। তাদের নিকট সবকিছুই ছিল, কিন্তু ছিল না পরকালের চিন্তা। অপরদিকে মুসলমানদের প্রতিটি শিরা-উপশিরাও ছিল পরকালের চিন্তায় পরিপূর্ণ।

আজও যদি সমস্যাকাতর দুনিয়ার মানুষ সে পরশমণি ব্যবহার করে দেখেন, তবে অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, অতি সহজেই সারা বিশ্বে শান্তি-শংখবলা ফিরে এসেছে।

মদ্যপানের অপকারিতা ও উপকারিতার তুলনা : এ আয়াতে মদ ও জুয়া উভয় বস্তু সম্পর্কেই কোরআন বলেছে যে, এতে কিছু উপকারিতাও রয়েছে, তবে বেশ কিছু অপকারিতাও বর্তমান—কিন্তু এর উপকারিতার তুলনায় অপকারিতার মাত্রা অনেক বেশী। তাই একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন, এর উপকারিতা এবং অপকারিতাগুলো কি কি? অতঃপর দেখতে হবে, উপকারিতার তুলনায় অপকারিতা বেশী হওয়ার কারণ কি? সবশেষে ফেকাহর কয়েকটি মূলনীতি বর্ণনা করা হবে, যেগুলো এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়।

প্রথমে শরাব সম্পর্কে আলোচনা করা যাক : এর উপকারিতার কথা বলতে গেলে—শরাব পানে আনন্দ লাভ হয়, সাময়িকভাবে শক্তিও কিছুটা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে কিছুটা লাভণ্যও সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ নগণ্য উপকারিতার তুলনায় এর ক্ষতির দিকটা এত বিস্তৃত ও গভীর যে, অন্য কোন বস্তুতেই সচরাচর এতটা ক্ষতি দেখা যায় না। শরাবের প্রতিক্রিয়ায় ধীরে ধীরে মানুষের হজমশক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, খাদ্যস্পৃহা কমে যায়, চেহারা বিকৃত হয়ে পড়ে, স্নায়ু দুর্বল হয়ে আসে। সামগ্রিকভাবে শারীরিক সক্ষমতার উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। একজন জার্মান ডাক্তার বলেছেন,—যারা মদ্যপানে অভ্যস্ত তারা চল্লিশ বছর বয়সে ষাট বছরের যুগের মত অকর্মণ্য হয়ে পড়ে এবং তাদের শরীরের গঠন এত হালকা হয়ে যায় যে, ষাট বছরের বৃদ্ধেরও তেমনটি হয় না। শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে অল্প বয়সে বৃদ্ধির মত বেকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া শরাব লিভার এবং কিডনীকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করে ফেলে। যক্ষ্মা রোগ মদ্যপানেরই একটা বিশেষ পরিণতি। ইউরোপের শহরাঞ্চলে যক্ষ্মার আধিক্যের কারণও অতিমাত্রায় মদ্যপান। সেখানকার কোন কোন ডাক্তার বলেছেন, ইউরোপে অধিক মৃত্যুর কারণই হচ্ছে যক্ষ্মা। যখন থেকে ইউরোপে মদ্যপানের আধিক্য দেখা দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে যক্ষ্মার প্রাদুর্ভাবও দেখা দিয়েছে।

এগুলো হচ্ছে মানবদেহে মদের সাধারণ প্রতিক্রিয়া। বস্তুতঃ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবাই অবগত। সবাই জানেন যে, মানুষ যতক্ষণ নেশাগ্রস্ত থাকে, ততক্ষণ তার জ্ঞান-বুদ্ধি কোন কাজই করতে পারে না। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানিগণের অভিমত হচ্ছে এই যে, নেশার অভ্যাস মানুষের বোধশক্তিকেও দুর্বল করে দেয়। যার প্রভাব চৈতন্য ফিরে পাবার পরেও ক্রিয়াশীল থাকে। অনেক সময় এতে মানুষ পাগলও হয়ে যায়। চিকিৎসাবিদগণের সবাই এতে একমত যে, শরাব কখনও শরীরের অংশে পরিণত হয় না, এতে শরীরে রক্তও সৃষ্টি হয় না, রক্তের মধ্যে একটা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মাত্র। ফলে সাময়িকভাবে শক্তির সামান্য আধিক্য অনুভূত হয়। কিন্তু হঠাৎ রক্তের এ উত্তেজনা অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যেসব শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে, মদ্যপানের দরুন সেগুলো শক্ত ও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে দ্রুতগতিতে

বার্ধক্য এগিয়ে আসতে থাকে। শরাবের দ্বারা মানুষের গলদেশ এবং শ্বাসনালীরও প্রচুর ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে স্বর মোটা হয়ে যায় এবং স্থায়ী কফ হয়ে থাকে, তারই ফলে শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি হয়। শরাবের প্রতিক্রিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তানদের উপরও পড়ে। মদ্যপায়ীদের সন্তান দুর্বল হয় এবং অনেকে তাতে বংশহীনও হয়ে পড়ে।

একথাও সুরাযোগ্য যে, মদ্যপানের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ নিজের মধ্যে চঞ্চলতা ও স্মৃতি এবং কিছুটা শক্তি অনুভব করে। ফলে তারা ডাক্তার-হাকীমদের মতামতকে পাঠ্য দিতে চায় না। কিন্তু তাদের জ্ঞান উচিত যে, শরাব এমন একটি বিষাক্ত দ্রব্য, যার বিষক্রিয়া পর্যায়ক্রমিকভাবে দৃশ্যমান হতে থাকে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়াগুলো প্রকাশ পায়।

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, এটা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে এবং এ শত্রুতা ও বিরোধ মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এই অনিষ্টকারিতাই সবচাইতে গুরুতর। সুতরাং কোরআন সূরা মায়দার এক আয়াতে বলেছে :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

অর্থাৎ, ‘শয়তান শরাব ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করতে চায়।’

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, মদ্যপান করে যখন মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তখন সে নিজের গোপন কথাও প্রকাশ করে দেয়। যার পরিণাম অনেক সময় অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ আকারে দেখা দেয়। বিশেষ করে সে ব্যক্তি যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে, তবে তার দ্বারা বৈধভাবে কোন গোপন তথ্য প্রকাশিত হওয়ার ফলে সারা দেশেই পরিবর্তন ও বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। দেশের রাজনীতি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের কৌশলগত গোপন তথ্য শত্রুর হাতে চলে যেতে পারে। বিচক্ষণ গুপ্তচররা এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে।

শরাবের আর একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে, সে মানুষকে পুতুলে পরিণত করে দেয়; যাকে দেখলে বাচ্চারা পর্যন্ত উপহাস করতে থাকে। কেননা, তার কাজ ও চাল-চলন সবই তখন অস্বাভাবিক হয়ে যায়। শরাবের আরও একটি মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে এই যে, এটি খেয়ানতের মতো।

শরাব মানুষকে সকল মন্দ থেকে মন্দতর কাজে চালিত করে। ব্যভিচার ও নরহত্যার অধিকাংশই এর পরিণাম। আর এ জন্য অধিকাংশ শরাবখানাই ব্যভিচার, যেনা ও হত্যাকাণ্ডের আখড়ায় পরিণত হয়। এসব হচ্ছে মানুষের শারীরিক ক্ষতি, আর রহানী ক্ষতি তো সুপরিজ্ঞাত যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া চলে না। অন্য কোন এবাদত অথবা আল্লাহর কোন যিকির করাও সম্ভব হয় না। সে জন্যই কোরআন করীমে এরশাদ হয়েছে—শরাব তোমাদিগকে আল্লাহ সুরণ ও নামায থেকে বিরত রাখে।

এখন রইল আর্থিক ক্ষতির দিকটি। যদি কোন এলাকায় একটি শরাবখানা খোলা হয়, তবে তা সমস্ত এলাকার টাকা-পয়সা লুটে নেয়, একথা সর্বজনবিদিত। এ ব্যয়ের পরিমাণ ও পর্যায় বহু রকমের। একজন বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদের সংগৃহীত তথ্যনুযায়ী শুধু একটি শহরে শরাবের মোট ব্যয় সামগ্রিক জীবনযাত্রার অন্যান্য সকল ব্যয়ের সমান।

এই হলো শরাবের ধর্মীয়, পার্শ্ব, শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ক্ষতির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা, যা রসূল (সাঃ) একটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন — *أَمِ الْفَوَاحِشِ وَأَمِ الْخِيَانَتِ* অর্থাৎ, ‘শরাব সকল মন্দ ও অশ্লীলতার জননী’ এ প্রসঙ্গে জনৈক জার্মান ডাক্তারের মন্তব্য প্রবাদ বাক্যের মতই প্রসিদ্ধ। তিনি বলেছেন, যদি অর্ধেক শরাবখানা বন্ধ করে দেয়া হয়, তবে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, অর্ধেক হাসপাতাল ও অর্ধেক জেলখানা আপনা থেকেই অপয়োজনীয় হয়ে যাবে।— (তফসীরে আল-মানারঃ মুফতী আবদুল-পূঃ ২২৬, জিলদ ২)

আল্লামা তানতাবী (রাহঃ) আল-জাওহারে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। তারই কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—ফ্রান্সের জনৈক বিশিষ্ট পণ্ডিত হেনরী তাঁর গ্রন্থ ‘খাওয়াতির ও সাওয়ানিহ ফিল ইসলাম’-এ লিখেছেন,—‘প্রাচ্যবাসীকে সমূলে উৎখাত করার জন্য সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র এবং মুসলমানদেরকে খতম করার জন্য নির্মিত দু’ধারী তলোয়ার ছিল এই ‘শরাব’। আমরা আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহার করেছি। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত আমাদের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের ব্যবহৃত অস্ত্রে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়নি’; ফলে তাদের বংশ বেড়েই চলেছে। এরাও যদি আমাদের সেই উপদ্রোহ গ্রহণ করে নিত, যেভাবে তাদের একটি বিশৃঙ্খলিত গোষ্ঠী তা গ্রহণ করে নিয়েছে, তাহলে তারাও আমাদের কাছে পদানত ও অপদস্থ হয়ে পড়ত। আজ যাদের ঘরে আমাদের সরবরাহকৃত শরাবের প্রবাহ বহিছে, তারা আমাদের কাছে এতই নিকট ও পদদলিত হয়ে গেছে যে, তারা মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারছে না।’

জনৈক বৃষ্টি আইনজ্ঞ ব্যাটাম লেখেন,—‘ইসলামী শরীয়তের অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এও একটি বৈশিষ্ট্য যে, এতে মদ্যপান নিষিদ্ধ। আমরা দেখেছি, আফ্রিকার লোকেরা যখন এর ব্যবহার শুরু করে, তখন থেকেই তাদের বংশ ‘উম্মাদনা’ সংক্রমিত হত শুরু করেছে। আর ইউরোপের যেসব লোক এই পদার্থটিতে চুম্বক দিতে শুরু করেছে, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিরও বিবর্তন ঘটেতে শুরু করেছে। কাজেই আফ্রিকার লোকদের জন্যে যেমন এর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন, তেমনি ইউরোপের লোকদের জন্যেও এ কারণে কঠিন শাস্তি বিধান করা দরকার।

সারকথা, যে কোন সংলোক যখনই শীতল মস্তিষ্কে এ ব্যাপারে চিন্তা করেছেন, তখনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে চিৎকার করে উঠেছেন যে, ‘এটি অপবিত্র বস্তু, এ যে শয়তানী কাজ, এ যে হলাহল—ধ্বংসের উপকরণ! এই ‘উম্মুল-খাবায়ের’ বা সকল অকল্যাণের মাতার ধারে-কাছেও যেয়ো না; ফিরে এসো *قُلْ أُنْتُمْ تُسْأَلُونَ*

মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত কোরআনের চারটি আয়াত উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা নাহলের আরো এক জায়গায় নেশাকর দ্রব্যাদির আলোচনা অন্য ভঙ্গিতে করা হয়েছে। সে বিষয়টিও এখানেই আলোচনা করে ফেলা বাঞ্ছনীয় হবে বলে মনে হয়। যাতে শরাব ও অন্যান্য যাবতীয় নেশাকর দ্রব্যাদি সম্পর্কে কোরআনী বর্ণনাগুলো মোটামুটিভাবে সামনে এসে যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে এই :

وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَالْخَبَابِ تَحْدِثُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرُؤْيَا

حَسَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

অর্থাৎ, আর খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা তোমরা নেশাকর দ্রব্য এবং উত্তম আহাৰ্য প্রস্তুত করে থাক; নিশ্চয়ই এতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য বড় প্রমাণ রয়েছে।

তফসীর ও ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার ঐ সমস্ত নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা মানুষের খাদ্যরূপে দান করে আল্লাহ তাআলা তাঁর অত্যাবশ্যক সৃষ্টি মহিমার পরিচয় দিয়েছেন। এতে প্রথমে দুধের কথা বলা হয়েছে। যাকে আল্লাহ তাআলা জন্তুর পেটের মধ্যে রক্ত ও মলমূত্রের সংমিশ্রণ থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন খাদ্য হিসাবে দান করেছেন। ফলে মানুষকে কোন কিছুই করতে হয় না। এজন্য এখানে *شُؤْبَكُ* শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমি তোমাদিগকে দুধ পান করিয়ে থাকি। অতঃপর বলা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের দ্বারাও মানুষ কিছু খাদ্যবস্তু তৈরী করে থাকে, যাতে তাদের উপকার হয়। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুর দ্বারা নিজেদের জন্য লাভজনক খাদ্য প্রস্তুতে মানুষের শিল্পজ্ঞানের কিছুটা হাত রয়েছে। আর এই দক্ষতার ফলে দূরকমের খাদ্য তৈরী হয়েছে। একটি হল নেশাজাত দ্রব্য, যাকে মদ বা শরাব বলা হয়। দ্বিতীয়টি হলো উৎকৃষ্ট খাদ্য। অর্থাৎ, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা অবস্থায় আহাৰ্য করা অথবা শুকিয়ে ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর পূর্ণ কুদরতের মাধ্যমে মানুষকে খেজুর ও আঙ্গুর দান করেছেন এবং তার দ্বারা নিজেদের খাদ্যদ্রব্য তৈরীর কিছুটা অধিকারও তিনি মানুষকে প্রদান করেছেন। এখন তাদের অভিপ্রায় ও ইচ্ছা, তারা কি প্রস্তুত করবে। নেশাজাত দ্রব্য তৈরী করে নিজেদের বুদ্ধিকে বিকল করবে, না উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে শক্তি অর্জন করবে?

এ তফসীরের পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত দ্বারা নেশাজাত দ্রব্যকে হলাল বলার দলীল দেয়া যাবে না। এখানে উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার দানসমূহ এবং তার ব্যবহারের বিভিন্ন দিক ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা, যা যে কোন অবস্থাতেই আল্লাহর নেয়ামত। যথা, সমস্ত আহাৰ্য এবং মানুষের জন্য উপকারী বস্তুকে অনেকে না-জায়েয পথে ব্যবহার করে। কিন্তু কারো ভুলের জন্য আল্লাহর নেয়ামত তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলতে পারে না। অতঃপর এখানে এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা নিম্নয়োজন,—কোন পথে ব্যবহার হলাল এবং কোন পথে ব্যবহার হারাম। তবু আল্লাহ তাআলা এভাবে সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, নেশার বিপরীতে ‘উৎকৃষ্ট খাদ্য’ বলা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, নেশা ভাল বিষয় নয়। অধিকাংশ মুফাসসের নেশায়ুক্ত বস্তুকেও ‘সুকর’ (سكر) বলেছেন।—(রুহুল মা’আনী, কুরতুবী, জাসসাস)

গোটা মুসলিম উম্মতের মতে এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মদ্যপান হারাম হওয়ার নির্দেশ সমুলিত আয়াত পরবর্তী সময়ে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় যদিও শরাব হলাল ছিল এবং মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই তা পান করতেন, কিন্তু তখনও এ আয়াতে এদিকে ইশারা করা হয়েছিল যে, এটি পান করা ভাল নয়। তারপর অত্যন্ত কঠোরতার সাথে শরাবকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।—(জাসসাস ও কুরতুবী)

জুয়ার অবৈধতা : মিসর একটি ধাতু। এর অভিধানিক অর্থ বন্টন করা। **ياسر** বলা হয় বন্টনকারীকে। জাহেলিয়াত আমলে নানা রকম জুয়ার প্রচলন ছিল। তন্মধ্যে এক প্রকার জুয়া ছিল এই যে, উট জবাই করে তার অংশ বন্ট করতে গিয়ে জুয়ার আশ্রয় নেয়া হতো। কেউ একাধিক অংশ পেতা আবার কড়ে বঞ্চিত হতো। বঞ্চিত ব্যক্তিকে উটের পূর্ণ মূল্য দিতে হতো, আর গোশত দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা হতো; নিজেরা ব্যবহার করতো না।

এ বিশেষ ধরনের জুয়ায় যেহেতু দরিদ্রের উপকার ছিল এবং খেলোয়াড়দের দানশীলতা প্রকাশ পেত, তাই এ খেলাতে গর্ববোধ করা হতো। আর যারা এ খেলায় অংশগ্রহণ না করতো, তাদেরকে কৃপণ ও হতভাগ্য বলে মনে করা হতো। বন্টনের সাথে সম্পর্কের কারণেই একরূপ জুয়াকে ‘মাইসির’ বলা হতো। সমস্ত সাহাবী ও তাবয়ীগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সব রকমের জুয়াই ‘মাইসির’ শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরে এবং জাসসাস ‘আহকামুল-কোরআনে’ লিখেছেন যে, মুফাসসেরে কোরআন হযরত ইবনে-আব্বাস, ইবনে ওমর, কাতাদা, মোআবিয়া ইবনে সালেহ, আতা ও তাউস (রাঃ) বলেছেন :

‘সব রকমের জুয়াই ‘মাইসির’ এমনকি কাঠের গুটি এবং আখরোট দ্বারা বাচ্চাদের এ ধরনের খেলাও।’ ইবনে আব্বাস বলেছেন : **من القمار المخاطرة** লটারীও জুয়ারই অন্তর্ভুক্ত।’ জাসসাস ও ইবনে-সিরীন বলেছেন : ‘যে কাজে লটারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তাও মাইসির এর অন্তর্ভুক্ত।’—(রুহুল-বয়ান)

مخاطرة ‘মুখাতিরা’ বলা হয় এমন লেনদেনকে, যার মাধ্যমে কেউ কেউ প্রচুর সম্পদ পেয়ে যায় এবং অনেকে কিছুই পায় না। আজকাল প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লটারীর সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে।

আজকাল নানা প্রকারের লটারী দেখা যায়। এসবই জুয়ার অন্তর্ভুক্ত ও হারাম। মোটকথা, মাইসির ও কেমারের সঠিক সংজ্ঞা এই যে, যে ব্যাপারে কোন মালের মালিকানায় এমন সব শর্ত আরোপিত হয়, যাতে মালিক হওয়া না হওয়া উভয় সম্ভাবনাই সমান থাকে। আর এরই ফলে পূর্ণ লাভ কিংবা পূর্ণ লোকসান উভয় দিকই বজায় থাকবে।—(শামী পৃঃ ৩৫৫, ৫ম খণ্ড)

উদাহরণতঃ এতে যাদের অথবা ওমরের যে কোন একজনকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। এ সবার যত প্রকার ও শ্রেণী অতীতে ছিল, বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টি হতে পারে, তার সবগুলোকে মাইসির, কেমার এবং জুয়া বলা যেতে পারে। বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের শব্দ-প্রতিযোগিতা এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে লটারীর যতগুলো পদ্ধতি রয়েছে, এ সবই কেমার ও মাইসির-এর অন্তর্ভুক্ত।

তবে যদি শুধু একদিক থেকে পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়—যেমন, যে ব্যক্তি অমুক কাজ করবে, তাকে পুরস্কার দেয়া হবে। আর এতে যদি কোন চাঁদা নেয়া না হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। কেননা, এটা লাভ ও লোকসানের মাঝে পরিক্রমশীল নয়, বরং লাভ হওয়া ও লাভ না হওয়ার মধ্যেই সীমিত।

এ জন্য সইহ হাদীসে দাবা ও ছক্কা-পাঞ্জা জাতীয় খেলাকেও হারাম বলা হয়েছে। কেননা, এসবের অনেক ক্ষেত্রেই টাকা-পয়সার বাজি ধরা

হয়ে থাকে। তাস খেলায় যদি টাকা-পয়সার হার-জিত শর্ত থাকে, তবে তাও হারাম।

মুসলিম শরীফে বারীদা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল-আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছক্কা-পাঞ্জা খেলে সে যেন শূকরের গোশত ও রক্তে স্বীয় হস্ত রঞ্জিত করে। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, ছক্কা-পাঞ্জাও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন যে,— দাবা ছক্কা-পাঞ্জা খেলা অপেক্ষাও খারাপ।—(ইবনে-কাসীর)

ইসলামের প্রাথমিক যুগে শরাবের ন্যায় জুয়াও হালাল ছিল। মক্কায যখন সূরা রামের **غَيْبِ الزُّوْمِ** আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং কোরআন ঘোষণা করে যে, এখন রোম যদিও তাদের প্রতিপক্ষ কেসরার কাছে পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তারা কয়েক বছরের মধ্যেই জয়লাভ করবে। তখন মক্কার মুশরিকরা তা অবিশ্বাস করে। সে সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) মুশরিকদের সাথে বাজি ধরলেন যে, যদি কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীরা জয়লাভ করে, তবে তোমাদেরকে এ পরিমাণ মাল পরিশোধ করতে হবে। এ বাজি মুশরিকরা গ্রহণ করল। ঠিক কয়েক বছরের মধ্যে রোমবাসীরা জয়লাভ করল। শর্তানুযায়ী হযরত আবু বকর (রাঃ) তাদের নিকট থেকে মাল আদায় করে রসূল (রাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। হযর (সাঃ) ঘটনা শুনে খুশী হলেন, কিন্তু মালগুলো সদকা করে দিতে আদেশ দিলেন।

কেননা, যে বস্তু আগত দিনে হারাম হবে, আল্লাহ তাআলা সেগুলো হালাল থাকাকালেও স্বীয় রসূল (সাঃ)-কে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এজন্যই তিনি শরাব ও জুয়া থেকে সর্বদা বেঁচে রয়েছেন এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীও তা থেকে সর্বদা নিরাপদে রয়েছেন। এক রেওয়াজেতে আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূল (সাঃ)-কে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, হযরত জাফর (রাঃ)-এর চারটি অভ্যাস আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। হযর (সাঃ) জাফর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন,—তোমার চারটি অভ্যাস কি কি? তিনি উত্তর দিলেন, আজ পর্যন্ত আমার এ চারটি অভ্যাস কাউকেই বলিনি। আল্লাহ যখন আপনাকে জানিয়েই দিলেন তখন বলতে হয়। তা হচ্ছে এই, আমি দেখেছি যে, শরাব মানুষের বুদ্ধি বিলুপ্ত করে দেয়, তাই আমি কোন দিনও শরাব পান করিনি। মূর্তির মধ্যে মানুষের ভাল-মন্দ কোনটাই করার ক্ষমতা নেই বলে জাহেলিয়াত আমলেও আমি কোন দিন মূর্তিপূজা করিনি। আমার স্ত্রী ও মেয়েদের ব্যাপারে আমার মধ্যে সম্প্রদোষ অত্যন্ত সক্রিয় রয়েছে, তাই আমি কোন দিনও যেনা করিনি। আমি দেখেছি যে, মিথ্যা বলা অত্যন্ত মন্দ কাজ, তাই আমি কোন দিনও মিথ্যা কথা বলিনি।—(রুহুল-বয়ান)

জুয়ার সামাজিক ও সামগ্রিক ক্ষতি : জুয়া সম্পর্কে কোরআন মজীদ শরাব বিষয়ে প্রদত্ত আদেশেরই অনুরূপ বিধান প্রদান করেছে যে, এতে কিছুটা উপকারও রয়েছে, কিন্তু ক্ষতি অনেক বেশী। এর লাভ সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। যদি খেলায় জয়লাভ করে, তবে একজন দরিদ্র লোক একদিনেই ধনী হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এর আর্থিক, সামাজিক এবং আত্মিক ক্ষতি সম্পর্কে অনেক কম লোকই অবগত। এর সৎক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেয়া হচ্ছে। জুয়া খেলা একজনের লাভ এবং

অপরজনের ক্ষতির উপর পরিক্রমশীল। জয়লাভকারীর কেবল লাভই লাভ, আর পরাজিত ব্যক্তির ক্ষতিই ক্ষতি। কেননা, এ খেলায় একজনের মাল অন্যজনের হাতে চলে যায়। এজন্য জুয়া সামগ্রিকভাবে জাতির ধ্বংস এবং মানব চরিত্রের অধঃপতন ঘটায়। যে ব্যক্তি এতে লাভবান হয়, সে পরোপকারের ব্রত থেকে দূরে সরে রক্ত-পিপাসুতে পরিণত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তির মৃত্যু এগিয়ে আসে, অথচ প্রথম ব্যক্তি আয়েশ বোধ করতে থাকে এবং নিজের পূর্ণ সামর্থ্য এতে ব্যয় করে। ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য এর বিপরীত। কেননা, এতে উভয়পক্ষের লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা থাকে। ব্যবসা দ্বারা মাল হস্তান্তরে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং উভয় পক্ষই এতে লাভবান হয়ে থাকে।

জুয়ার একটি বড় ক্ষতি হচ্ছে এই যে, জুয়াড়ী প্রকৃত উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকে। কেননা, তার একমাত্র চিন্তা থাকে যে, বসে বসে একটি বাজির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যেই অন্যের মাল হস্তগত করবে, যাতে কোন পরিশ্রমের প্রয়োজনই নেই। কোন কোন মনীষী সর্বপ্রকার জুয়াকেই ‘মাইসির’ বলেছেন। কারণস্বরূপ বলেছেন যে, এতে অতি সহজে অন্যের মাল হস্তগত হয়। জুয়া খেলা যদি দু’চার জনের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাতেও আলোচ্য ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বর্তমান যুগ, যাকে অনভিজ্ঞ, দূরদর্শিতাবিহীন মানুষ উন্নতির যুগ বলে অভিহিত করে থাকে, নতুন নতুন ও রকমারি শরাব বের করে নতুন নতুন নাম দিচ্ছে, স্বাদেরও নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে নানা পদ্ধতিতে তার প্রচলন ঘটচ্ছে, অনুরূপভাবে জুয়ারও নানা প্রকার পন্থা বের করা হয়েছে। এর মধ্যে অনেক দিক রয়েছে যা সামগ্রিক। এসব নতুন পদ্ধতিতে সম্মিলিতভাবে গোটা জাতির কাছ থেকে কিছু কিছু করে টাকা নেয়া হয় এবং ক্ষতিটা সকলের মধ্যে বন্টন করা হয়। ফলে তা দেখার মত কিছু হয় না। আর যে ব্যক্তি এ অর্থ পায়, তা সকলের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। ফলে অনেকেই তার ব্যক্তিগত লাভ লক্ষ্য করে জাতির সমষ্টিগত ক্ষতির প্রতি জ্ঞেপণও করে না। এ জন্য অনেকেই এ নতুন প্রকারের জুয়া জায়েয বলে মনে করে। অথচ এতেও সেসব ক্ষতিই নিহিত, যা সীমিত জুয়ায় বিদ্যমান। একদিক দিয়ে জুয়ার এই নতুন পদ্ধতি প্রাচীন পদ্ধতির জুয়া অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর এবং এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী ও সমগ্র জাতির পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এর ফলে জাতির সাধারণ মানুষের সম্পদ দিন দিন কমতে থাকে; আর কয়েকজন পুঞ্জিপতির মাল বাড়তে থাকে। এতে সমগ্র জাতির সম্পদ কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার পথ খুলে যায়।

পক্ষান্তরে ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার বিধান হচ্ছে এই যে, যেসব ব্যবস্থায় সমগ্র জাতির সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির হাতে জমা হওয়ার পথ খোলে, সে সবগুলো পন্থাই হারাম। এ প্রসঙ্গে কোরআন ঘোষণা করেছেঃ

لَا يَكُنْ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَبَيْنَ الْفُقَرَاءِ

অর্থাৎ, সম্পদ বন্টন করার যে নিয়ম কোরআন নির্ধারণ করেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, ধন-দৌলত যেন কয়েকজন পুঞ্জিপতির হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

তাছাড়া জুয়ার আরো একটা ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এই যে, জুয়াও শরাবের মত পারম্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করে। পরাজিত ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই জয়ী ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে এবং শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং জুয়া সমাজ ও সভ্যতার জন্য অত্যন্ত মারাত্মক বিষয়। কাজেই, কোরআন শরীফ বিশেষভাবে এ ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছে।

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

অর্থাৎ, শয়তান শরাব ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর যিকির ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়।

ফিকাহ শাস্ত্রের কয়েকটি নিয়ম : এ আয়াতে শরাব ও জুয়ার কিছু আপাত উপকারের কথা স্বীকার করেও তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। যার ফলে বোঝা গেল যে, কোন বস্তু কিংবা কোন কাজে দুনিয়ার সাময়িক উপকার বা লাভ থাকলেই শরীয়ত একে হারাম করতে পারে না, এমন কথা নয়। কেননা, যে খাদ্য বা অমুখে উপকারের চাইতে ক্ষতি বেশী, তাকে কোন অবস্থাতেই প্রকৃত উপকারী বলে স্বীকার করা যায় না। অন্যথায় পৃথিবীর সবচাইতে খারাপ বস্তুতেও কিছু না কিছু উপকার নিহিত থাকা মোটেও বিচিত্র নয়। প্রাণসংহারক বিষ, সাপ-বিছু বা হিংস্র জন্তুর মধ্যেও কিছু না কিছু উপকারিতার দিক অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে যেসব বস্তুতে উপকারের তুলনায় ক্ষতি বেশী, শরীয়ত সেগুলোকেও হারাম সাব্যস্ত করেছে। চুরি-ডাকাতি, যেনা-প্রতারণা এমন কি আছে, যাতে উপকার কিছুই নেই? কেননা, কিছু না কিছু উপকার না থাকলে কোন বুদ্ধিমান মানুষ এর ধারে-কাছেও যেতো না। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এসব কাজে তারাই বেশী লিপ্ত, যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলে বিবেচিত। তাতেই বুঝা যায় যে, প্রতিটি অন্যায্য কাজেও কিছু না কিছু উপকার অবশ্যই আছে। তবে যেহেতু এ সবার উপকারের চাইতে ক্ষতি মারাত্মক, এজন্য কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন লোক এগুলোকে উপকারী বা হালাল বলবে না। ইসলামী শরীয়ত শরাব ও জুয়াকে এই ভিত্তিতেই হারাম বলে ঘোষণা করেছে।

ফিকাহের আর একটি আইন : এ আয়াতের দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হয় যে, উপকার হাসিল করার চাইতে ক্ষতি রোধ করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া বিধেয়। অর্থাৎ, কোন একটি কাজে কিছু উপকারও হয়, আবার ক্ষতিও হয়, এক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লাভ ত্যাগ করতে হবে। এমন উপকার সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য যা ক্ষতি বহন করে।

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ
لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ عَاظَلْتُمْهُمْ فَقُلْ أَلَا لَكُمْ عِلْمٌ ۚ اللَّهُ يَعْلَمُ الْفُسْكَ
مِنَ الْفُضِيلَةِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَمَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠
وَلَا تَتَّبِعُوا الْبَشَرَ حَتَّىٰ يَدْعُوا زُيُومًا وَلَئِمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا الْبَشَرَ حَتَّىٰ يَدْعُوا زُيُومًا
وَلَعَلَّ زُيُومًا خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١١
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحْضِيِّ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْرِضُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
الْمَحْضِيَّ وَلَا تَقْرَبُوا هُوْنَ حَتَّىٰ يَبْطُرَ ۚ وَإِذَا تَطَهَّرَ فَأَوْفُوا
مِنَ حَبِثِ أَمْرِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ ١٢ نِسَاءٌ لَّكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَأَتُوا حُرَّتَكُمْ أَنْ يَشْكُمُوا
وَقَدْ مَوَّلَ الْأَنْفُسَكُمْ وَأَتُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُّكْفَرُونَ ١٣
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ عَاظَلْتُمْهُمْ فَقُلْ أَلَا لَكُمْ عِلْمٌ ۚ اللَّهُ يَعْلَمُ الْفُسْكَ مِّنَ الْفُضِيلَةِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَمَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١٠

(২২০) দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়ে। আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, এতীম সংক্রান্ত হুকুম। বলে দাও, তাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে শুছিয়ে দেয়া উত্তম আর যদি তাদের বায়ভার নিজের সাথে মিশিয়ে নাও, তাহলে মনে করবে তারা তোমাদের ভাই। বস্তুতঃ অমঙ্গলকামী ও মঙ্গলকামীদেরকে আল্লাহ্ জানেন। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের উপর জটিলতা আরোপ করতে পারতেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, মহাশক্তিশালী। (২২১) আর তোমরা মুশরেক নারীদেরকে বিয়ে করোনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরেক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভালো লাগে। এবং তোমরা (নারীরা) কোন মুশরেকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরেকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা দোষখের দিকে আস্থান করে, আর আল্লাহ্ নিজের হুকুমের মাধ্যমে আস্থান করেন জ্ঞানাত ও ক্ষমার দিকে। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (২২২) আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হয়েয (ফতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হয়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবেন না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ডোবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন। (২২৩) তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাত করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও। (২২৪) আর নিজদের শপথের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্যবস্ত্ত বানিও না মানুষের সাথে কোন আচার-আচরণ থেকে, পরহেযগারী থেকে এবং মানুষের মাঝে ঘীমাংশা করে দেয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্ সবকিছুই শুনে, জানেন।

যে জাতিকে তাদের প্রথা-পদ্ধতিতে আসমানী কিতাবের অনুসারী মনে হয়, কিন্তু বিশ্বাস ও আকীদার দিক দিয়ে খুঁজে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, তারা আহলে-কিতাব নয়, সে জাতির স্ত্রীলোক বিয়ে করা জায়েয নয়। যেমন, আজকাল ইংরেজদেরকে সাধারণ মানুষ খ্রীষ্টান বা নাসারা মনে করে; অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের কোন কোন আকীদা সম্পূর্ণ মুশরেকদের অনুরূপ। তাদের অনেকেই আল্লাহর অস্তিত্বও স্বীকার করে না, ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়ত কিংবা আসমানী গ্রন্থ ইঞ্জিলকেও আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এমন ব্যক্তিগণ আহলে-কিতাব ঈসায়ী নয়। এসব দলে যে সমস্ত স্ত্রীলোক রয়েছে, তাদের বিয়ে করা বৈধ নয়। মানুষ অত্যন্ত ভুল করে যে, খোঁজ-খবর না নিয়েই পাশ্চাত্যের মেয়েদেরকে বিয়ে করে বসে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে প্রকাশ্যভাবে মুসলমান মনে করা হয়, কিন্তু তার আকীদা কুফর পর্যন্ত গিয়ে পৌছেছে, তার সাথে মুসলমান নারীর বিয়ে জায়েয নয়। আর যদি হয়ে যাওয়ার পর তার আকীদা এমনি বিকৃত হয়ে পড়ে তবে তাদের বিয়ে হিন্ন হয়ে যাবে। আজকাল অনেকেই নিজের ধর্ম সম্পর্কে অন্ধ ও অজ্ঞ এবং সামান্য কিছুটা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেই স্বীয় ধর্মীয় আকীদা নষ্ট করে বসে। কাজেই প্রথমে ছেলের আকীদা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে তারপর বিয়ে সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা দেয়া মেয়েদের অভিভাবকদের উপর ওয়াজিব।

মুসলমান ও কাফেরের পারস্পরিক বিবাহ নিষিদ্ধ : আলাচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে যে, মুসলমান পুরুষের বিয়ে কাফির নারীর সাথে এবং কাফের পুরুষের বিয়ে মুসলমান নারীর সাথে হতে পারে না। কারণ, কাফের স্ত্রী-পুরুষ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কেননা, বৈবাহিক সম্পর্ক পরস্পরের ভালবাসা, নির্ভরশীলতা এবং একাত্মতায় পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তা ব্যতীত এ সম্পর্কে প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। আর মুশরেকদের সাথে এ জাতীয় সম্পর্কের ফলে ভালবাসা ও নির্ভরশীলতার অপরিহার্য পরিণাম পাঁড়ায় এই যে, তাদের অন্তরে কুফর ও শেরেকের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় অথবা কমপক্ষে কুফর ও শেরেকের প্রতি ঘৃণা তাদের অন্তর থেকে উঠে যায়। এর পরিণামে শেষ পর্যন্ত সেও কুফর ও শেরেকের জড়িয়ে পড়ে যার পরিণতি জাহান্নাম। এজন্যই বলা হয়েছে যে, এসব লোক জাহান্নামের দিকে আহবান করে। আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞানাত ও মাগফেরাতের দিকে আহবান করেন এবং পরিস্কারভাবে নিজের আদেশ বর্ণনা করেন, যাতে মানুষ উপদেশ মত চলে। এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন :

প্রথমতঃ মুশরেক শব্দ দ্বারা সাধারণ অমুসলমানকে বুঝানো হয়েছে। কারণ, কোরআন মজীদে অন্য এক আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত কিতাবে বিশাশী নারীরা এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়। এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْمُحْضَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

তাই এখানে মুশরেক বলতে ঐসব বিশেষ অমুসলমানকেই বুঝানো হয়েছে, যারা কোন নবী কিংবা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম করার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, তাদের সাথে এরূপ সম্পর্কের ফলে কুফর ও শেরেকের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা

রয়েছে। কারণটি তো আপাতঃ দৃষ্টিতে সমস্ত অমুসলমানের বেলায়ই খাটে, এতদসত্ত্বেও কিতাবীদেরকে এ আদেশের আওতামুক্ত রাখার কারণ কি? উত্তর অত্যন্ত পরিষ্কার যে, কিতাবীদের সাথে মুসলমানদের মতপার্থক্য অন্যান্য অমুসলমানদের তুলনায় ভিন্ন ধরনের। কেননা, ইসলামের আকীদার তিনটি দিক রয়েছে; তওহীদ, পরকাল ও রিসালত। তন্মধ্যে পরকালের আকীদার বেলায় কিতাবী নাসারা ও ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে একমত। তাছাড়া আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করাও তাদের প্রকৃত ধর্মমতে কুফর। অবশ্য তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি মহব্বত ও মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে যে শেরের পর্যন্ত পৌছেছে, তা ভিন্ন কথা।

এখন মৌলিক মতপার্থক্য শুধু এই যে, তারা হযর (সাঃ)-কে রসুল বলে স্বীকার করে না। অথচ ইসলাম ধর্মে এটি একটি মৌলিক আকীদা। এ আকীদা ব্যতীত কোন মানুষ মুসলমান হতে পারে না। এতদসত্ত্বেও অন্যান্য অমুসলমানদের তুলনায় কিতাবীদের মতপার্থক্য মুসলমানদের সাথে অনেকটা কম। কাজেই তাদের সংস্পর্শে পথভ্রষ্টতার ভয়ও তুলনামূলকভাবে কম।

তৃতীয়তঃ কিতাবীদের সাথে মতপার্থক্য তুলনামূলকভাবে কম বলে তাদের মেয়েদের সাথে মুসলমান পুরুষের বিয়েকে জায়েয করা হলেও তার বিপরীত দিকে মুসলিম নারীদের সাথে কিতাবী অমুসলমানদের বিয়ের ব্যাপারটিও জায়েয হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটু চিন্তা করলে পার্থক্যটা বোঝা যাবে। মেয়েরা প্রকৃতিগতভাবে কিছুটা দুর্বল। তাছাড়া স্বামীকে তার হাকেম বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। তার আকীদা ও পরিকল্পনা দ্বারা মেয়েদের আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কাজেই মুসলমান নারী যদি অমুসলমান কিতাবীদের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে এতে তার বিশ্বাস ও আকীদা নষ্ট হয়ে যাওয়া খুবই সহজ। অপরদিকে অমুসলমান কিতাবী মেয়ের মুসলমান পুরুষের সাথে বিয়ে হলে তার প্রভাবে স্বামী প্রভাবিত না হয়ে বরং স্বামীর প্রভাবে স্ত্রীর প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তবে কোন অনিয়ম বা আতিশয্যে যদি লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তা তার নিজস্ব ক্রটি।

চতুর্থতঃ বৈবাহিক সম্পর্ক যে প্রভাব বিস্তার করে তা উভয় পক্ষে একই রকম হয়ে থাকে। সুতরাং এতে যদি এরূপ আশা পোষণ করা হয় যে, মুসলমানদের আকীদায় অমুসলমানদের আকীদা প্রভাবিত হয়ে সে-ই মুসলমান হয়ে যাবে, তবে এর চাহিদা হচ্ছে এই যে, মুসলমান এবং অন্যান্য অমুসলমানদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক জায়েয হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, যখন কোন কিছুতে লাভের একটি দিকের পাশাপাশি ক্ষতিরও কারণ থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সুস্থবুদ্ধির চাহিদা অনুযায়ী কৃতি থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা এবং সফলতা লাভের কাম্পনিক সম্ভাবনাকে এড়িয়ে চলাই উত্তম। হয়তো সে

অমুসলমান প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, তবে সতর্কতার বিষয় হলো, মুসলমান প্রভাবিত হয়ে যেন কাকের না হয়ে যায়।

পঞ্চমতঃ কিতাবী ইহুদী ও নাসারা নারীদের সাথে মুসলমান পুরুষদের বিবাহের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদি তাদেরকে বিবাহ করা হয়, তবে বিবাহ ঠিক হবে এবং স্বামীর পরিচয়েই সন্তানের বংশ স্যাব্যস্ত হবে। কিন্তু হাদীসে রয়েছে, এ বিবাহও পছন্দনীয় নয়। হযর (সাঃ) এরশাদ করেছেন, -মুসলমান বিবাহের জন্য দুইদারও সং স্ত্রীর অনুসন্ধান করবে, যাতে করে সে তার ধর্মীয় ব্যাপারে সাহায্যকারিনীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে করে তাদের সন্তানদেরও দুইদার হওয়ার সুযোগ মিলবে। যখন কোন অধার্মিক মুসলমান মেয়ের সাথে বিবাহ পছন্দ করা হয়নি, সেক্ষেত্রে অমুসলমান মেয়ের সাথে কিভাবে বিবাহ পছন্দ করা হবে? এ কারণেই হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) যখন সংবাদ পেলেন যে, ইরাক ও শাম দেশের মুসলমানদের এমন কিছু স্ত্রী রয়েছে এবং দিন দিন তাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তখন তিনি ফরমান জারি করলেন যে, তা হতে পারে না। তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হলো যে, এটা বৈবাহিক জীবন তথা ধর্মীয় জীবনের জন্য যেমন অকল্যাণকর, তেমনি রাজনৈতিক দিক দিয়েও ক্ষতির কারণ। - (কিতাবুল-আসার, ইমাম মুহাম্মদ)

বর্তমান যুগের অমুসলমান কিতাবী, ইহুদী ও নাসারা এবং তাদের রাজনৈতিক ধোঁকা-প্রতারণা, বিশেষতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিবাহ এবং মুসলমান সংসারে প্রবেশ করে তাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করা এবং মুসলমানদের গোপন তথ্য জানার প্রচেষ্টা আজ স্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়েছে। তাদের রচিত অনেক গ্রন্থেও যার স্বীকারোক্তির উল্লেখ রয়েছে। মেজর জেনারেল আকবরের লেখা ‘হাদীসে-দেফা’ নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা উদ্ধৃতিসহ করা হয়েছে। মনে হয় হযরত ওমর ফারুকের সুদূর প্রসারী দৃষ্টিশক্তি বৈবাহিক ব্যাপার সংক্রান্ত এ বিষয়টির সর্বনাশা দিক উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। বিশেষতঃ বর্তমানে পাশ্চাত্যের দেশসমূহে যারা ইহুদী ও নাসারা নামে পরিচিত এবং আদম-শুমারীর খাতায় যাদেরকে ধর্মীয় দিক দিয়ে ইহুদী কিংবা নাসারা বলে লেখা হয়, যদি তাদের প্রকৃত ধর্মের অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, খ্রীষ্টান ও ইহুদীমতের সাথে তাদের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। তারা সম্পূর্ণতঃই ধর্ম বিবর্জিত। তারা ঈসা (আঃ)-কেও মানে না, তওরাতকেও মানে না, এমনকি আল্লাহর অস্তিত্বও মানে না, পরকালকেও মানে না। বলাবাহুল্য, বিবাহ হালাল হওয়ার কোরআনী আদেশ এমন সব ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে না। তাদের মেয়েদের সাথে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে ইহারাম। বিশেষতঃ

وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْأُنثِيَّاتِ أَزْوَاجُهُنَّ

আয়াতে যাদের বুঝানো হয়েছে আজকালকার ইহুদী-নাসারারা তার আওতায় পড়ে না। সে হিসেবে সাধারণ অমুসলমানদের মত তাদের মেয়েদের সাথেও বিবাহ করা হারাম।

আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় মাসআলা : (১) চরম যৌন উত্তেজনা বশতঃ ঋতুকালীন অবস্থায় সহবাস অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে খুব ভাল করে তওবা করে নেয়া ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে সাথে কিছু দান খয়রাত করে দিলে তা উত্তম।

(২) পশ্চাদ পথে (অর্থাৎ—যৌনিপথ ছাড়া গৃহদ্বার দিয়ে) নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও হারাম।

(৩) ‘লাগভ-কসম’-এর দু’টি অর্থ—একটি হচ্ছে এই যে, কোন অতীত বিষয়ে মিথ্যা শপথ অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে পড়া কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বলা বিষয়টিকে নিজের ধারণা মত সঠিক বলেই মনে করে না। উদাহরণতঃ—নিজের জ্ঞান ও ধারণা অনুযায়ী কসম করে বসল যে,— ‘যায়েদ এসেছে’। কিন্তু বাস্তবে সে আসেনি। অথবা কোন ভবিষ্যত বিষয়ে এভাবে কসম করে বসলো যে, উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু অথচ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ‘কসম’ বেরিয়ে গেছে এ রকম,— এতে কোন পাপ হবে না। আর সে জন্যই একে ‘লাগভ’ বা ‘অহেতুক’ বলা হয়েছে। আখেরাতে এজন্যে কোন জবাবদিহী করতে হবে না। যেসব কসমের জন্য জবাবদিহীর কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে সে সব কসম যা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা জেনেই করা হয়। একে বলা হয় ‘গুমস’ এতে পাপ হয়। তবে ইমাম আজম আবু হানিফার (রহঃ) মতের প্রেক্ষিতে কোন কাফফারা দিতে হয় না। আর উল্লেখিত অর্থে ‘লাগভ’ কসমের জন্যও কোন কাফফারা নাই। এ আয়াতে এ দুরকমের কসম সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে।

‘লাগভ’ এর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, যাতে কাফফারা দিতে হয় না। আর একে ‘লাগভ’ (অহেতুক) এজন্যে বলা হয় যে, এতে পার্শ্বিক কোন কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্য করতে হয় না। এ অর্থে ‘গুমস’ কসমও এরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তাতে পাপ হলেও কোন রকম কাফফারা দিতে হয় না। এতদুভয়ের তুলনায় যে কসমের প্রেক্ষিতে কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্য করতে হয়, তাকে বলা হয় ‘মুনআকেদাহ’। এর তাৎপর্য হলো যে, কেউ যদি— ‘আমি অমুক কাজটি করব’ কিংবা অমুক বিষয়টি সম্পাদন করব’ বলে কসম খেয়ে তার বিপরীত কাজ করে, তাহলে তাতে তাকে কাফফারা দিতেই হবে।

(৪) যদি কসম খেয়ে বলে যে, আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করব না, তবে তার চারটি দিক রয়েছে :

প্রথমতঃ কোন সময় নির্ধারণ করলো না।

দ্বিতীয়তঃ চার মাস সময়ের শর্ত রাখলো।

তৃতীয়তঃ চার মাসের বেশী সময়ের শর্ত আরোপ করলো। অথবা চতুর্থতঃ চার মাসের কম সময়ের শর্ত রাখলো। বস্তুতঃ ১ম, ২য়, ও ৩য় দিকগুলোকে ‘শরীয়তে’ ঈলা বলা হয়। আর তার বিধান হচ্ছে, যদি চার মাসের মধ্যে কসম ভেঙ্গে স্ত্রীর কাছে চলে আসে, তাহলে তাকে কসমের কাফফারা দিতে হবে, কিন্তু বিয়ে যথাস্থানে বহাল থাকবে। পক্ষান্তরে যদি চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও কসম না ভাঙ্গে, তাহলে সে স্ত্রীর উপর ‘তালাকে-কাতয়ী’ বা নিশ্চিত তালাক পতিত হবে। অর্থাৎ, পুনঃবার বিয়ে ছাড়া স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া জায়েয থাকবে না। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের ঐকমত্যে পুনরায় বিয়ে করে নিলেই জায়েয হয়ে যাবে। আর চতুর্থ অবস্থায় নির্দেশ হচ্ছে এই যে, যদি কসম ভঙ্গ করে, তাহলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কসম পূর্ণ করলেও বিয়ে যথাযথ অটুট

لَا يُؤْخَذُ كَلِمَةُ اللَّهِ بِالْعَذَابِ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ كَلِمَةُ
بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ لِّلَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِمْ تُرْثَوْنَ أَرْبَعَةً أَشْهُرًا وَإِنْ فَأَوْ فَإِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ۝ وَالطَّلَاقُ يَتَرَضَّانَ بِأَنْفُسِهِمْ تِلْكَ قُرُوءٌ وَلَا
يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِمْ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَعُولُنَّهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
ذَلِكَ إِنْ أَرَادَ الْأَصْلَاحَ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْعُرُوفِ وَاللَّيْجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۝ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ۝ الطَّلَاقُ مَرْثَنٌ وَمَأْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيَةٍ ۝ إِنْ خَسَنَ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
اتَّيَمُمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

(২২৫) তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে ধরবেন না, কিন্তু সেসব কসমের ব্যাপারে ধরবেন, তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, ধৈর্যশীল। (২২৬) যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবে না বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যদি পারস্পরিক মিল-মিশ্র করে নেয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু। (২২৭) আর যদি বর্জন করার সংকল্প করে নেয়, তাহলে নিচয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী। (২২৮) আর তালাকপ্রাপ্তা নারী নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে তিন হায়েয পর্যন্ত। আর যদি সে আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাত দিবসের উপর ঈমানদার হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ যা তার জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন তা লুকিয়ে রাখা জায়েয নয়। আর যদি সন্তান রেখে চলেতে চায়, তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীর সংরক্ষণ করে। আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনি ভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়ম অনুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছে পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (২২৯) তালাকে-‘রাজ্জ’ হ’ল দুবার পর্যন্ত— তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে। আর নিজের দেয়া সম্পদ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য জায়েয নয় তাদের কাছে থেকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোন পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, তারাই হলো জালেম।

থাকবে।—(বয়ানুল-কোরআন)

স্ত্রী ও পুরুষের পার্থক্য এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও মর্যাদা : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ আয়াতটি নারী ও পুরুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য এবং সেগুলোর স্তর নির্ণয় সম্পর্কে একটি শরীয়তী মূলনীতি হিসেবে গণ্য। এ আয়াতের পূর্বাঙ্গের কয়েকটি রুকুতে এ মূলনীতিই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা : ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে এখানে প্রথমেই তার যৎসামান্য বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। যা অনুধাবন করে নেয়ার পর নিঃসন্দেহে স্বীকার করতেই হবে যে, একটি ন্যায়ানুগ ও মধ্যমপন্থী জীবন ব্যবস্থার চাহিদাও ছিল তাই এবং এটাই হচ্ছে সে স্থান বা মর্যাদা, যার কম-বেশী করা কিংবা যাকে অস্বীকার করা মানুষের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টির জন্যেই বিরাট আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দু'টি বস্তু রয়েছে যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব, সংগঠন এবং উন্নয়নের স্তম্ভস্বরূপ। তার একটি হচ্ছে নারী, অপরটি সম্পদ। কিন্তু চিত্রের অপর দিকটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ দুটো বস্তুই পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত এবং নানা রকম অনিশ্চয় ও অকল্যাণেরও কারণ। আরও একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও কঠিন নয় যে, এ দুটো বস্তুই আপন প্রকৃতিতে পৃথিবীর গঠন, নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং উৎকর্ষের অবলম্বন। কিন্তু যখন এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেয়া হয়, তখন এগুলোই দুনিয়ার সবচাইতে ভয়াবহ ধ্বংসকারিতার রূপ পরিগ্রহ করে।

কোরআন মানুষকে একটা জীবন-বিধান দিয়েছে। তাতে উল্লেখিত দুটো বস্তুকেই নিজ নিজ স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাদের দ্বারা সর্বাধিক উপকারিতা ও ফলাফল হতে পারে এবং যাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহ্নটিও না থাকে। সম্পদের যথার্থ স্থান, তা অর্জনের পন্থা, ব্যয় করার নিয়ম-পদ্ধতি এবং সম্পদ বটনের ন্যায্যসঙ্গত ব্যবস্থা এসব একটা পৃথক বিষয় যাকে 'ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।

এখন নারী সমাজ এবং তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে,— নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে, এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরী, তেমনভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা অপরিহার্য। তবে এটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশী।

প্রায় একই রকম বক্তব্য সূরা নিসার এক আয়াতে এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে : “যেহুতু আল্লাহ একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, কাজেই পুরুষেরা হলো নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। আর এজন্য যে, তারা তাদের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।”

ইসলামপূর্ব সমাজে নারীর স্থান : ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশী ছিল না। তখন চতুশদ জীব-জন্তুর মত তাদেরও বেচা-কেনা চলত। নিজের বিয়ে-শাদীর

ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোন রকম মূল্য ছিল না; অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হতো। নারী তার আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ বা মীরাসের অধিকারিণী হতো না, বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায্য পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হতো। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন; কোন জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোন স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হতো, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার এতটুকু অধিকার তাদের ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশী, যেভাবে খুশী ব্যবহার করতে পারবে; তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ হিসাবে গণ্য করা হয়, সেগুলোতেও কোন কোন লোক এমনও ছিল, যারা নারীর মানব-সম্বন্ধকেই স্বীকার করতো না।

ধর্ম-কর্মেও নারীদের জন্য কোন অংশ ছিল না, তাদেরকে এবাদত-উপাসনা কিংবা বেহেশতের যোগ্যও মনে করা হতো না। এমনকি রোমের কোন কোন সংসদে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, এরা হল অপবিত্র এক জানোয়ার, যাতে আত্মার অস্তিত্ব নেই। সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেয়াকে কৌলিণ্যের নিরীহ বলে মনে করা হতো। অনেকের ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড কিংবা খুনের বদলা কোনটাও আরোপ করা ওয়াজিব হবে না। কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেই তার চিতায় আরোহণ করে জ্বলে মরতে হবে। মহানবী (সাঃ)-এর নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে ৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা এ প্রস্তাব পাশ করে যে, নারী প্রাণী হিসাবে মানুষই বটে, কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের সেবার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মেটকথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত অসহায়। তাদের ব্যাপারে বুদ্ধি ও মুক্তিসঙ্গত কোন ব্যবস্থাই নেয়া হতো না।

‘হযরত রাহমাতুল্লিল আলামীন’ ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছেন এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর ফরয করেছে। বিয়ে-শাদী ও ধন-সম্পদে তাদেরকে স্বত্বাধিকার দেয়া হয়েছে, কোন ব্যক্তি তিনি পিতা হলেও কোন প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না, এমনকি স্ত্রীলোকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোন পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষের। তাদের সন্ততিবিধানকেও শরীয়তে মোহাম্মদী এবাদতের মর্যাদা দান করেছে। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে।

বর্তমান ফেৎনা-ফাসাদের মূল কারণঃ স্ত্রীলোককে তাদের ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জঘন্য অন্যায়। ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ করেছে। আবার তাদেরকে বলগহীনভাবে ছেড়ে দেয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেওয়াও নিরাপদ নয়। সম্ভান-সম্ভতির লালন-পালন ও ঘরের কাজ কর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়াও নিতান্ত ভয়ের কারণ। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এজন্য কোরআনে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, **وَاللَّيْطُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ** “পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর উর্ধ্বে। অন্যকথায় বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। যেভাবে ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে দুনিয়ার মানুষ স্ত্রীলোককে ঘরের আসবাবপত্র ও চতুর্দিক জন্তুতুল্য বলে গণ্য করার ভুলে নিমগ্ন ছিল, অনুক্রপভাবে মুসলমানদের বর্তমান পতনের পর জাহেলিয়াতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এতে প্রথম ভুলের সংশোধন আর একটি ভুলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীনতা ও অশ্রীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র বিশ্ব ঝগড়া-বিবাদ ও ফেৎনা-ফাসাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্ধাতন এত বেড়ে গেছে যে, তা আজ সেই বর্বর যুগকেও হার মানিয়েছে। আরবদের মধ্যে একটা প্রবাদ রয়েছে—

الجاهل اما مغرط او مفرط “মূর্খ লোক কখনও মধ্যমপন্থা

অবলম্বন করে না। যদি সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকে, তবে হীনমন্যতা ও সর্কীর্ণতার পর্যায়ে চলে আসে।” বর্তমানে এমনি অবস্থা চলছে। যে নারীকে সব জাতি এক সময় মানুষ বলে গণ্য করতেও রাজী ছিল না, সে জাতিগুলোই এখন এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, পুরুষদের যে কর্তৃত্ব নারী সমাজ তথা গোটা দুনিয়ার জন্যেই একান্ত কল্যাণকর ছিল, সে কর্তৃত্ব বা তত্ত্বাবধায়কের ধারণাটুকুও একেবারে ঝেড়ে-মুছে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, যার অন্তত পরিণতি প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, যতদিন পর্যন্ত আল-কোরআনের এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ফেৎনা দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। বর্তমান বিশ্বের মানুষ শাস্তির অনুরোধ নিত-নতুন আইন প্রণয়ন করে চলছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, অগণিত অর্থ ব্যয় করছে, কিন্তু যে উৎস থেকে ফেৎনা-ফাসাদ ছড়িয়েছে সেদিকে কারো লক্ষ্যই নেই।

যদি আজ ফেৎনা-ফাসাদের কারণ উদ্ঘাটনের জন্য কোন নিরপেক্ষ উদন্ত পরিচালনা করা হয়, তবে শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী সামাজিক অশান্তির কারণই দাঁড়াবে স্ত্রীলোকের বেপরোয়া চাল-চলন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে অহংপূজার প্রভাব বড় বড় বুদ্ধিমান দার্শনিকের চক্ষুকেও ধাঁধিয়ে দিয়েছে। অঙ্গ-অভিলাষের বিরুদ্ধে যে কোন কল্যাণকর চিন্তা বা পন্থাকেও সহ্য করা হয় না। আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরকে ঈমানের আলোতে আলোকিত করে রসূল (সাঃ)-এর উপদেশ যথাযথভাবে পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

মাসআলা : এ আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করার পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। অপরদিকে নিজের অধিকার আদায় করার চাইতে প্রত্যেককে নিজ নিজ

দায়িত্ব পালনের প্রতি যত্নবান হবারও উপদেশ দেয়া হয়েছে। তা যদি হয়, তবে বিনা তাকিদেই প্রত্যেকের অধিকার রক্ষিত হবে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকেই স্বীয় অধিকার আদায় করতে তৎপর, অথচ নিজের দায়িত্বের প্রতি আদৌ সচেতন নয়। ফলে ঝগড়া-বিবাদই শুধু সৃষ্টি হতে থাকে।

যদি কোরআনের এ শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তবে ঘরে বাইরে অর্থাৎ, সারা বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করবে এবং ঝগড়া-বিবাদ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

নারী ও পুরুষের মর্যাদার পার্থক্য : সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা মানবচরিত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, সর্বোপরি স্ত্রীলোকদের সুবিধার্থেই পুরুষকে স্ত্রীলোকদের উপর শুধু কিছুটা প্রধান্যই দেয়া হয়নি বরং তা পালন করাও ফরয করে দেয়া হয়েছে। এরই বর্ণনা **أَرْجُلُ قَوْمٍ** **عَلَى النِّسَاءِ** আয়াতে দেয়া হয়েছে। তাই বলে সকল পুরুষই সকল স্ত্রীলোকের উপর মর্যাদার অধিকারী নয়। কেননা, আল্লাহর নিকট মর্যাদার নিরিখ হচ্ছে ঈমান ও নেক আমল। সেখানে মর্যাদার তারতম্য ঈমান ও নেক আমলের তারতম্যের উপর হয়ে থাকে। তাই, পরকালের ব্যাপারে দুনিয়ার মত স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কোন কোন স্ত্রীলোক অনেক পুরুষের চাইতেও অধিক মর্যাদার যোগ্য।

উল্লেখিত ভূমিকার পরে আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে চিন্তা করা যাক। এরশাদ হয়েছে : **وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأُؤْتُوا مِنْكُمْ** “তাদের অধিকার পুরুষের দায়িত্বে, যেভাবে পুরুষের অধিকার তাদের দায়িত্বে।” এতে স্ত্রীলোকের অধিকারের কথা পুরুষের অধিকারের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, পুরুষ তো নিজের ক্ষমতায় এবং খোদা প্রদত্ত মর্যাদার বলে নারীর কাছ থেকে নিজের অধিকার আদায় করেই নেয়, কিন্তু নারীদের অধিকারের কথাও চিন্তা করা প্রয়োজন। কেননা, তারা শক্তি দ্বারা তা আদায় করতে পারে না।

এতে আরো একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পুরুষের পক্ষে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নারীদের অধিকার প্রদান করা উচিত। তাই **مِنْكُمْ** শব্দ ব্যবহার করে উভয়ের অধিকার ও কর্তব্যের সমতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে, নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক হতে হবে। কেননা, প্রকৃতিগতভাবেই তা ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে যে, উভয়ের অধিকার ও কর্তব্য পালন সমভাবে ওয়াজিব। এ কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে অবহেলা করলে সমভাবে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

লক্ষ্যণীয় যে, কোরআনের ছোট একটি বাক্যে দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের মত বিরাট বিষয়কে সন্নিবেশ করা হয়েছে। কেননা, এ আয়াতেই নারীর সমস্ত অধিকার পুরুষের উপর এবং পুরুষের সমস্ত অধিকার নারীর উপর অর্পণ করা হয়েছে। - (বাহরে-মুহীত) এ বাক্য শেষে **بِالْمَعْرُوفِ** শব্দ ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে এমন সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। বলা হচ্ছে যে, অধিকার আদায় প্রচলিত ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে হতে হবে। কারণ, ‘মারুফ’ শব্দের অর্থ এমন বিষয় যা শরীয়ত অনুযায়ী নাজায়েয নয় এবং সাধারণ নিয়ম ও প্রচলিত প্রথানুযায়ী যাতে কোন রকম জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই। সারকথা, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য নিয়ম জারি করাই যথেষ্ট নয়, বরং প্রচলিত সাধারণ প্রথা-প্রচলনের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথা অনুযায়ী কারো আচরণ

অন্যের পক্ষে কষ্টের কারণ হলে তা জায়েয হবে না। যথা বদমেজাজী, অনুকম্পাহীনতা ইত্যাদি। এসব ব্যাপার আইনের আওতায় আসতে পারে না। কিন্তু **لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** শব্দটি দ্বারা এসব ব্যাপারই বুঝানো হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে— **وَالَّذِينَ لَا يَدْرُونَ بَالِ الْأَعْمَالِ إِنَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَكُونُونَ دَارٍ** এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, উভয় পক্ষের অধিকার ও কর্তব্য সমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের উপর এক স্তর বেশী মর্যাদা দান করেছেন। এতে একটি বিরাট দর্শন রয়েছে, যার প্রতি আয়াতের শেষ বাক্য **وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ** বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এ আয়াতের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের তুলনায় কিছুটা উচ্চমর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তাই তাদের অতি সতর্কভাবে ঐশ্বর্যের সাথে কাজ করা আবশ্যিক। যদি স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে কর্তব্য পালনের ব্যাপারে কিছুটা গাফেলতীও হয়ে যায়, তবে তারা তা সহ্য করে নেবে এবং স্ত্রীলোকের প্রতি কর্তব্য পালন করার ব্যাপারে মোটেই অবহেলা করবে না। (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত আদেশ বা হুকুম কোরআনের অনেক আয়াতেই এসেছে। তবে এ কয়টি আয়াতে তালাক সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আর তা বোঝবার জন্য প্রথমে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিয়ের তাৎপর্য বোঝতে হবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে বিয়ে ও তালাক : বিয়ের একটি দিক হচ্ছে এই যে, এটি পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্পাদিত একটি চুক্তি। যেমন, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে আদান-প্রদান হয়ে থাকে, অনেকটা তেমনি। দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, এটি একটি সুন্নত বা প্রথা ও এবাদত। তবে সমগ্র উম্মত এতে একমত যে, বিয়ে সাধারণ লেন-দেন ও চুক্তির উর্ধ্বে একটা পবিত্র বন্ধন ও বটে। যেহেতু এতে একটি সুন্নত ও এবাদতের গুরুত্ব রয়েছে, সেহেতু বিয়ের ব্যাপারে এমন কতিপয় শর্ত রাখা হয়, যা সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে রাখা হয় না।

প্রথমতঃ—যে কোন স্ত্রীলোকের সাথে যে কোন পুরুষের বিয়ে হতে পারে না। এক্ষেত্রে শরীয়তের একটি বিধান রয়েছে। সে বিধানের ভিত্তিতে কোন কোন স্ত্রীলোকের বিয়ে কোন কোন পুরুষের সাথে হওয়া নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয়তঃ—বিয়ে ব্যতীত অন্যসব ব্যাপার সমাধা করার জন্য সাক্ষী শর্ত নয়। একমাত্র মতবিরোধের সময়েই সাক্ষীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিয়ের ক্ষেত্রে এর সম্পাদনকালেই সাক্ষীর প্রয়োজন। যদি দু'জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক সাক্ষী ব্যতীত কোন নারী এবং পুরুষ পরস্পর বিয়ের কাজ সম্পাদন করে এবং উভয়পক্ষের কেউ তা অস্বীকারও না করে, তবুও শরীয়তের বিধানমতে এ বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে—যতক্ষণ পর্যন্ত অন্ততঃ দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে 'এজাব কবুল' না হয়। বিয়ের সুন্নত নিয়ম হল, সাধারণ প্রচারের মাধ্যমে সমুজ্জ্বল হির করা। এমনিভাবে এতে আরো অনেক শর্তাবলী ও নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহ অন্যান্য ইমামগণের মতে, বিয়ের ক্ষেত্রে লেন-দেন চুক্তির গুরুত্ব অপেক্ষা এবাদত ও সুন্নতের গুরুত্ব অনেক বেশী। এ মতের সমর্থনে তাঁরা কোরআন ও হাদীসের অনেক দলীল উদ্ধৃত করেছেন।

বিয়ের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তালাক সম্পর্কে

কিছু জ্ঞানলাভ করা দরকার। তালাক বিয়ের চুক্তি ও লেন-দেন বাতিল করাকে বোঝায়। ইসলামী শরীয়ত বিয়ের বেলায় চুক্তির চাইতে এবাদতের গুরুত্ব বেশী দিয়ে একে সাধারণ বৈষয়িক চুক্তি অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে স্থান দিয়েছে। তাই এ চুক্তি বাতিল করার ব্যাপারটিও সাধারণ ব্যাপারের চাইতে কিছুটা জটিল। যখন খুশী, যেভাবে খুশী তা বাতিল করে অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা চলবে না, বরং এর জন্য একটি সুস্থ আইন রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

ইসলামের শিক্ষা এই যে, বিয়ের চুক্তি সারা জীবনের জন্য সম্পাদন করা হয়, তা ভঙ্গ করার মত কোন অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা, এ সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম শুধু স্বামী-স্ত্রী পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এতে বংশ ও সন্তানদের জীবনও বরবাদ হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদও সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট অনেকেই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এজন্যই এ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে যেসব কারণের উদ্ভব হয়, কোরআন ও হাদীসের শিক্ষায় সে সমস্ত কারণ নিরসনের জন্য পরিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেকটি বিষয় ও অবস্থা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে যে উপদেশ রয়েছে, সেগুলোর সারমর্ম হচ্ছে, যাতে এ সম্পর্ক দিন দিন প্রগাঢ় হতে থাকে এবং কখনো ছিন্ন হতে পারে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। অসহযোগিতার অবস্থায় প্রথমে বুঝাবার চেষ্টা, অতঃপর সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শনের উপদেশ দেয়া হয়েছে। যদি এতেও সমস্যার সমাধান না হয়, তবে উভয় পক্ষের কয়েক ব্যক্তিকে সালিস সাব্যস্ত করে ব্যাপারটির মীমাংসা করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কোরআনুল করীমে এরশাদ হয়েছেঃ

عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ وَكُلُّكُمْ أَهْلٌ

আয়াতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পরিবার থেকে সালিস সাব্যস্ত করার নির্দেশটিও একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বিষয়টিকে যদি পরিবারের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তিক্ততা এবং মনের দূরত্ব আরো বেশী বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু অনেক সময় ব্যাপার এমন রূপ ধারণ করে যে, সংশোধনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্কের কার্যবিত্ত ফল লাভের স্থলে উভয়ের একত্রে মিলেমিশে থাকাও মস্ত আঘাতে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় এ সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়াই উভয় পক্ষের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। আর এ জন্যই ইসলামে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত অন্যান্য ধর্মের মত বৈবাহিক বন্ধনকে ছিন্ন করার পথ বন্ধ করে দেয়নি। যেহেতু চিন্তাশক্তি ও ঐশ্বর্যের সামর্থ্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অনেক বেশী, তাই তালাকের অধিকারও পুরুষকেই দেয়া হয়েছে। এ স্বাধীন ক্ষমতা স্ত্রীলোককে দেয়া হয়নি। যাতে করে সাময়িক, বিরক্তির প্রভাবে স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক বেশী তালাকের কারণ হতে না পারে।

তবে স্ত্রীজাতিকেও এ অধিকার থেকে একেবারে বঞ্চিত করা হয়নি। স্বামীর জুলুম-অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাদের জন্যও রয়েছে। তারা কাজীর দরবারে নিজেদের অসুবিধার বিষয় উপস্থাপন করে স্বামীর দোষ প্রমাণ করে বিবাহবিচ্ছেদ করিয়ে নিতে পারে। যদিও পুরুষকে তালাক দেয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কিন্তু এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, এ ক্ষমতার ব্যবহার আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার। একমাত্র অপারক অবস্থাতেই এ ক্ষমতার প্রয়োগ করা যায়। হাদীসে এরশাদ হয়েছে— **أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ** অর্থাৎ,

“অবলাহর নিকট নিকটতম হালাল বিষয় হচ্ছে তালাক।”

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে এই যে, রাগান্বিত অবস্থায় কিংবা সাময়িক বিরক্তি ও গরমিলের সময় এ ক্ষমতার প্রয়োগ করবে না। এ হেকমতের পরিপ্রেক্ষিতেই ঋতু অবস্থায় তালাক দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পবিত্র অবস্থায়ও যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হয়ে থাকে, তবে এমতাবস্থায় এজন্য তালাক দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে, এতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ হবে এবং তাতে তার কষ্ট হবে। কাজেই কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে **فَلْيُؤْتُواْ بِعِدَّتِهَا** অর্থাৎ, যদি তালাক দিতেই হয়, তবে এমন সময় তালাক দাও, যাতে স্ত্রীর ইদ্দত দীর্ঘ না হয়। ঋতু অবস্থায়ও তালাক দিলে চলতি ঋতু ইদ্দতে গণ্য হবে না। চলতি ঋতুর অন্তে পবিত্রতা লাভের পর পুনরায় যে ঋতু শুরু হয়, সে ঋতু থেকে ইদ্দত গণনা করা হবে। আর যে তত্ত্ব বা শুচিতায় সহবাস করা হয়েছে, যেহেতু সে তত্ত্বের স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, তাই তাতে ইদ্দত আরো দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে। তালাক দেয়ার জন্য এ নির্ধারিত তত্ত্ব ঠিক করার আরো একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, এ সময়ের মধ্যে রাগ কমেও যেতে পারে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ফিরে আসলে তালাক দেয়ার ইচ্ছাও শেষ হয়ে যেতে পারে। তৃতীয় শর্ত রাখা হয়েছে যে, বৈবাহিক বন্ধন ছিন্ন করার বিষয়টি সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় ও চুক্তি ছিন্ন করার মত নয়। বৈষয়িক চুক্তির মত বিয়ের চুক্তি একবার ছিন্ন করাতেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না। উভয়পক্ষ অন্যত্র দ্বিতীয় চুক্তি করার ব্যাপারে স্বাধীন ও নয়। বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তালাকের তিনটি স্তর ও পর্যায় রাখা হয়েছে এবং এতে ইদ্দতের শর্ত রাখা হয়েছে যে, ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের অনেক সম্পর্কই বাকী থাকে। যেমন, স্ত্রী অন্যত্র বিয়ে করতে পারে না। তবে পুরুষের জন্য অবশ্য বাধা-নিষেধ থাকে না।

চতুর্থ শর্ত এই যে, যদি পরিষ্কার কথায় এক বা দুই তালাক দেয়া হয়, তবে তালাক প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয় না। বরং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে। ইদ্দতের মধ্যে তালাক প্রত্যাহার করলে পূর্বের বিয়েই অক্ষুণ্ণ থাকে।

তবে এ প্রত্যাহারের অধিকার শুধু এক অথবা দুই তালাক পর্যন্তই

সীমাবদ্ধ, যাতে কোন অত্যাচারী স্বামী এমন করতে না পারে যে, কথায় কথায় তালাক দেবে এবং তা প্রত্যাহার করে পুনরায় স্ত্রী বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখবে। এজন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে, যদি কেউ তৃতীয় তালাক দিয়ে দেয়, তবে তার আর প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে না। এমনকি যদি উভয়ে রাজী হয়েও নিজেরা পুনরায় বিয়ে করতে চায়, তবুও বিশেষ ব্যবস্থা ব্যতীত তা করতে পারবে না।

আলোচ্য আয়াতে তালাক - ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আলোচ্য আয়াতের শব্দগুলোর প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রথমে এরশাদ হয়েছে - **الطَّلَاقُ مَرْطَبٌ** অর্থাৎ, তালাক হয় দু'বার। অতঃপর এ দু'তালাকের মধ্যে শর্ত রাখা হয়েছে যে, এতে বিবাহবন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায় না, বরং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তালাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্ত্রী বিবাহবন্ধনে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা স্বামীর থাকে। বস্তুতঃ ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যদি তালাক প্রত্যাহার করা না হয়, তবেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়। এ বিষয়কে — **فَامَسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيَةٌۢ بِاِحْسَانٍ** অর্থাৎ, হয় শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তালাক প্রত্যাহার করা হবে অথবা সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে তার ইদ্দত শেষ হতে দেয়া হবে, যাতে সে (স্ত্রী) মুক্তি পেতে পারে।

এখনও তৃতীয় তালাকের আলোচনা আসেনি। মধ্যখানে একটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে, যা এ অবস্থায় আলোচনায় আসতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, কোন কোন অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে রাখতেও চায় না, আবার তার অধিকার আদায় করারও কোন চিন্তা করে না, আবার তালাকও দেয় না। এতে স্ত্রী যখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, সেই সুযোগ নিয়ে স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু অর্থকড়ি আদায় করার বা মোহর মাফ করিয়ে নেয়ার বা ফেরত নেয়ার দাবী করে বসে। কোরআন-মজীদ এ ধরনের কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ سَفِيْثًا

অর্থাৎ, “তালাকের পরিবর্তে তোমাদের দেয়া অর্থ-সম্পদ বা মোহর ফেরত লওয়া হালাল নয়।”

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ
رَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَتَرَاجَعَا إِنْ كُنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ ۚ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا
لِتَبْتَغُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ
وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا عِقْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ ۖ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ
يُعْظِمُكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَالْعَالِمُونَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ۝ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا تَقْضُوا لَهُنَّ إِنْ يَكُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَمْ آذَنُ
لَكُمْ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

(২৩০) তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয়া হয়, তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোন স্বামীর সাথে বিয়ে করে না নেবে, তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করতে কোন পাপ নেই, যদি আল্লাহর হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা; যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য এসব বর্ণনা করা হয়। (২৩১) আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও, অতঃপর তারা নির্ধারিত ইদত সমাপ্ত করে নেয়, তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও, অথবা সহনভূতির সাথে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। আর তোমরা তাদেরকে স্থালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না। আর যারা এমন করবে, নিশ্চয়ই তারা নিজদেরই ক্ষতি করবে। আর আল্লাহর নির্দেশকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণত করো না। আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের উপর রয়েছে এবং তাও স্মরণ কর, যে কিতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে যার দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়। আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সর্ববিষয়েই জ্ঞানময়। (২৩২) আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদেরকে পূর্বস্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধ্যদান করো না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কেয়ামত দিনের উপর বিশৃঙ্খল স্থাপন করেছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধতা ও অনেক পবিত্রতা। আর আল্লাহ জ্ঞানেন, তোমরা জান না।

অবশ্য একটি ব্যাপারে তা থেকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে মোহর ফেরৎ নেয়া বা ক্ষমা করিয়ে নেয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রী এমন অনুভব করে যে, মনের গরমিলের দরুন আমি স্বামীর হক আদায় করতে পারিনি, এবং স্বামী যদি তাই বুঝে, তবে এমতাবস্থায় মোহর ফেরৎ নেয়া বা তা ক্ষমা করিয়ে নেয়া এবং এর পরিবর্তে তালাক নেওয়া জায়েয হবে। এই মাসআলা বর্ণনা করার পর এরশাদ হয়েছে : **فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ** অর্থাৎ এ ব্যক্তি যদি তৃতীয় তালাকও দিয়ে দেয়, তবে তখন বৈবাহিক বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে গেল। তা আর প্রত্যাহার করার কোন অধিকার থাকবে না। কেননা, এমতাবস্থায় এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সব দিক বুঝে - শুনেই সে স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দিয়েছে। তাই এর শাস্তি হবে এই যে, এখন যদি উভয়ে একমত হয়েও পুনর্বিবাহ করতে চায়, তবে তাও তারা করতে পারে না। তাদের পুনর্বিবাহের জন্য শর্ত হচ্ছে যে, স্ত্রী ইদতের পরে অন্য কাউকে বিয়ে করবে এবং সে স্বামীর সাথে সহবাসের পর কোন কারণে যদি এই দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয়, অথবা মৃত্যুবরণ করে, তবে ইদত শেষ হওয়ার পর প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

তিন তালাক ও তার বিধান : এ ক্ষেত্রে কোরআন মজীদে বর্ণনাভঙ্গি লক্ষ্য করলে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, তালাক দেয়ার শরীয়তসম্মত বিধান হচ্ছে বড় জোর দুই তালাক পর্যন্ত দেয়া যাবে। তৃতীয় তালাক দেয়া উচিত হবে না। আয়াতের শব্দ **الطَّلَاقِ مَرَّتَيْنِ** এরপর তৃতীয় তালাককে (যদি) শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে—এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। নতুবা বলা উচিত ছিল যে, অর্থাৎ, তালাক তিনটি। তাই এর অর্থ হচ্ছে যে, তৃতীয় তালাক পর্যন্ত পৌছা উচিত নয়। আর এ জন্যই ইমাম মালেক এবং অনেক ফকীহ তৃতীয় তালাক দেয়ার অনুমতি দেননি। তাঁরা একে তালাকে-বেদ'য়াত বলেন। আর অন্যান্য ফকীহগণ তিন তুহুরে আলাদা আলাদাভাবে তিন তালাক দেয়াও জায়েয বলেন। এসব ফকীহ একেই সুন্নত তালাক বলেছেন। কিন্তু কেউই একথা বলেননি যে, এটা ই তালাকের সুন্নত বা উত্তম পন্থা, বরং বেদ'য়াত তালাক এর স্থলে সুন্নত তালাক শুধু এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটা বেদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কোরআন ও হাদীসের এরশাদসমূহ এবং সাহাবী ও তাবীগগণের কার্যপদ্ধতিতে প্রমাণিত হয় যে, যখন তালাক দেয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না, তখন তালাক দেয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, এমন এক তুহুরে এক তালাক দেবে, যাতে সহবাস করা হয়নি। এ এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদত শেষ হলে পরে বিবাহসম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। ফকীহগণ একে আহসান বা উত্তম তালাক পদ্ধতি বলেছেন। সাহাবীগণও একেই তালাকের সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন।

ইবনে আবি-শাহাব তাঁর গ্রন্থে হযরত ইবরাহীম নাখসী (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবীগণ তালাকের ব্যাপারে এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন যে, মাত্র এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দিবে এবং এতেই ইদত শেষ হলে বিবাহবন্ধন স্বাভাবিকভাবে ছিন্ন হয়ে যাবে।

কোরআনের শব্দের দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, দুই তালাক পর্যন্ত দেয়া যায়। তবে **مَرَّتَيْنِ** শব্দ দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, এক শব্দে দুই

তলাক দেয়া উচিত নয়; বরং দুই তুহুরে পৃথক পৃথকভাবে দুই তলাক দিতে হবে। الطلاق طلاق এর দ্বারাই দুই তলাক প্রমাণিত হয়, কিন্তু مَرْثِي শব্দটি এ নিয়মের দিকে ইঙ্গিত করে যে, দুই তলাক পৃথক পৃথক শব্দে হওয়াই উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে একেবারে দু'টি টাকা দেয়, তবে তাকে দু'বার দিয়েছে বলা যায় না। তেমনি কোরআনের শব্দে দুই বারের অর্থই হচ্ছে পৃথক পৃথকভাবে দেয়া।—(রুহুল-মা'আনী)

যাহোক, কোরআন মজীদে শব্দের দ্বারা যেহেতু দুই তলাক পর্যন্ত প্রমাণিত হয়, এজন্য ইমাম ও ফকীহগণ একে সুনত তরিকা বলে অভিহিত করেছেন। তৃতীয় তলাক উত্তম না হওয়াও কোরআনের কৰ্নাভজিভেই বুঝা যায় এবং এতে কোন মতানৈক্য নেই। রসুলে আকরাম (সঃ)—এর হাদীস দ্বারাও তৃতীয় তলাক নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বলে প্রমাণিত হয়। ইমাম নাসায়ী মুহাম্মদ ইবনে লাবিদের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেনঃ—‘এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তলাক এক সাথে দিয়েছে—এ সংবাদ রসুল (সঃ)—এর নিকট পৌছলে তিনি রাগান্বিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের প্রতি উপহাস করছ? অথচ আমি এখনও তোমাদের মধ্যেই রয়েছি। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো— হে আল্লাহর রসুল! আমি তাকে হত্যা করব?’

ইবনে কাইয়্যেম এ হাদীসের সনদকে মুসলিম শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে সঠিক বলেছেন—(যাদুল-মা'আদ) আল্লামা মা-ওয়ায়দী, ইবনে-কাসীর, ইবনে হাজার প্রমুখ সবাই এ হাদীসের সনদকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য ইমাম মালেক এবং অন্যান্য ফকীহবৃন্দ তৃতীয় তলাককে নাজায়েয ও বেদ'আত বলেন। অন্যান্য ইমামগণ তিন তুহুরে তিন তলাক দেয়াকে সুনত তরিকা বলে যদিও একে বেদ'য়াত থেকে দূরে রেখেছেন, কিন্তু এটা যে তলাকের উত্তম পন্থা নয়, তাতে কারো দ্বিমত নেই।

মোটকথা, ইসলামী শরীয়ত তলাকের তিনটি পর্যায়কে তিন তলাকের আকারে স্থির করেছে। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তলাকের ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে হবে। বরং শরীয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে,— প্রথমতঃ তলাকের দিকে অগ্রসর হওয়াই অপছন্দনীয় কাজ। কিন্তু অপারকতাবশতঃ যদি এদিকে অগ্রসর হতেই হয়, তবে এর নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ, এক তলাক দিয়ে ইদত শেষ করার সুযোগ দেয়াই উত্তম, যাতে ইদত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যায়। একেই তলাকের উত্তম পদ্ধতি বলা হয়।

এতে আরো সুবিধা হচ্ছে এই যে, পরিষ্কার শব্দে এক তলাক দিলে পক্ষদ্বয় ইদতের মধ্যে ভাল-মন্দ বিবেচনা করার সুযোগ পায়। যদি তারা ভাল মনে করে, তবে তলাক প্রত্যাহার করলেই চলেবে। আর ইদত শেষ হয়ে গেলে যদিও বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায় এবং স্ত্রী বিবাহমুক্ত হয়ে যায়, তবুও সুযোগ থাকে যে, উভয়েই যদি ভাল মনে করে, তবে বিয়ের নবায়নই যথেষ্ট। কিন্তু কেউ যদি তলাকের উত্তম পন্থার প্রতি নজর না করে এবং ইদতের মধ্যেই আরো এক তলাক দিয়ে বসে, তবে সে বিবাহ ছিন্ন করার দ্বিতীয় পর্যায়ে এসিয়ে গেল, যদিও এর প্রয়োজন ছিল না। আর এ পদক্ষেপ শরীয়তও পছন্দ করে না। তবে এ দু'টি স্তরের অতিক্রান্ত হওয়ার পরও বিষয়টি পূর্বের মতই রয়ে যায়। অর্থাৎ, ইদতের মধ্যে তলাক প্রত্যাহারের সুযোগ থাকে। আর ইদত শেষ হলে উভয় পক্ষের একমত্যে বিয়ের নবায়ন হতে পারে। পার্থক্য শুধু এই যে, দুই তলাক দেয়াতে স্বামী

তার অধিকারের একাংশ হাত ছাড়া করে ফেলে এবং এমন সীমারেখায় পদার্পণ করে যে, যদি আর এক তলাক দেয়, তবে চিরন্তনে নবায়নের এ পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

যে ব্যক্তি তলাকের দু'টি পর্যায় অতিক্রম করে ফেলে তার জন্য পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেয়া হচ্ছে—وَأَسْأَلُ بِمَعْرُوفِي أَوْ تَعْرِيفِي وَأَشْأَلُ بِأَحْسَنِ এতে দু'টি আদেশ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হচ্ছে এই যে, ইদতের মধ্যে তলাক প্রত্যাহার করলে বিয়ে নবায়নের প্রয়োজন নেই, বরং তলাক প্রত্যাহার করে নেয়াই যথেষ্ট। এতে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিয়ের নবায়নের প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয় হচ্ছে এই যে, স্বামী যদি মিল-মহসনতের সাথে সঙ্গের জীবনযাপন করতে চায়, তবে তলাক প্রত্যাহার করবে। অন্যথায় স্ত্রীকে ইদত অতিক্রম করে বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ দেবে, যাতে বিবাহ বন্ধন এমনভাবেই ছিন্ন হয়ে যায়। আর তা যদি না হয়, তবে স্ত্রীকে অযথা কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে যেন তলাক প্রত্যাহার না করে। সেজন্যই বলা তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে—وَأَشْأَلُ بِمَعْرُوفِي بِأَحْسَنِ ইয়েছে। অর্থ বলে দেয়া বা ছেড়ে দেয়া। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য দ্বিতীয় তলাক দেয়া বা অন্য কোন কাজ করার প্রয়োজন নেই। তলাক প্রত্যাহার ব্যতীত ইদত পূর্ণ হয়ে যাওয়াই বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

হাদীস শাস্ত্রের ইমাম আবু দাউদ (রাঃ) আবু রজিন আসাদী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর এক ব্যক্তি রসুলে করীম (সঃ)—কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কোরআন مَرْثِي বলেছে, তারপর তৃতীয় তলাকের কথা বলেনি কেন? তিনি উত্তর দিলেন যে, পরে যে তৃতীয় পর্যায় বলা হয়েছে সেটিই তৃতীয় তলাক।—

(রুহুল-মা'আনী) অধিকাংশ আলেমের মতে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে তৃতীয় তলাক যে কাজ করে, এ কর্ম পদ্ধতিও তাই করে যা ইদতের মধ্যে তলাক প্রত্যাহার না করলেই হয়। আর যেভাবে اسك এর সাথে بِمَعْرُوفِي শব্দের শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যদি তলাক প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে ফিরিয়েই রাখতে হয়, তবে উত্তম পন্থায়ই ফিরিয়ে রাখা যাক। তেমনিভাবে بِمَعْرُوفِي এর সাথে احسان শব্দের শর্ত আরোপের মাধ্যমে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তলাক হচ্ছে একটি বন্ধনকে ছিন্ন করা। আর সংলোকের কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, কোন কাজ বা চুক্তি করতে হলে তারা তা উত্তম পন্থায়ই করে থাকেন। এমনভাবে যদি বিবাহ বন্ধনও ছিন্ন করার পর্যায়ে এসে যায়, তবে তা রাগান্বিত হয়ে বা ঝগড়া-বিবাদের মাধ্যমে করা উচিত নয়, এহংসান ও ভদ্রতার সাথেই তা সম্পন্ন করা উচিত। বিদায়ের সময় তলাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে উপহার-উপঢৌকন হিসাবে কিছু কাপড়-চোপড়, কিছু টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিয়ে বিদায় করবে।

এ ব্যাপারে কোরআনে এরশাদ হচ্ছে—

وَمِمَّا مَوْفُوقًا عَلَى التَّوْسِيعِ تَذَرُهُ وَكَأَنَّ الْمَغْفِرَ فَكَذَرَهُ

অর্থাৎ, তলাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে আর্থিক ক্ষমতানুযায়ী কিছু উপঢৌকন ও পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়ে বিদায় করা উচিত।

আর যদি সে এরূপ না করেই তৃতীয় তলাক দিয়ে দেয়, তাহলে সে শরীয়ত প্রদত্ত তার সমস্ত ক্ষমতা বিনা প্রয়োজনে হাত ছাড়া করে দিল। ফলে তার শাস্তি হচ্ছে এই যে, এখন আর সে তলাকও প্রত্যাহার করতে পারবে না এবং স্ত্রীর অন্যত্র বিয়ে হওয়া ব্যতীত উভয়ের মধ্যে আর

কখনো বিষে হতে পারবে না।

একত্রে তিন ভালকের প্রশ্ন : এ প্রশ্নের যুক্তিভিত্তিক উত্তর এই যে, কোন কাজের পাপ কক্ষ হওয়া তার প্রতিক্রিয়ার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করে না। অন্যভাবে হত্যা করা পাপ হলেও যাকে গুলী করে বা কোন অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হয়, সে নিহত হয়েই যায়। এই গুলী বৈধভাবে করা হলো, কি অবৈধভাবে করা হয়েছে, সে জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করে না। চুরি সব ধর্মযতেই পাপ, কিন্তু যে অর্থ-সম্পদ চোরাই পক্ষে পাচার করা হয়, তা তো হাতছাড়া হয়েই গিয়েছে। এমনভাবে যাবতীয় অন্যায্য ও পাপের একই অবস্থা যে, এর অন্যায্য ও পাপ হওয়া এর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করে না।

এই মূলনীতির ভিত্তিতে শরীয়ত-প্রদত্ত উত্তম নীতি-নিয়মের প্রতি বক্ষণ না করে প্রয়োজন ব্যতীত স্বীয় সমস্ত ক্ষমতাকে শেষ করে দেয়া এবং একই সঙ্গে তিন তালাক দিয়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যদিও রসূল (সাঃ)-এর অসম্মতির কারণ, যা পূর্ববর্তী বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, এজন্য সমগ্র উম্মত এক বাক্যে একে নিষ্কৃত পন্থা বলে উল্লেখ করেছে এবং কেউ কেউ নাজায়েযও বলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কেউ এ পদক্ষেপ নেয়, তবে এর ফলাফলও তাই হবে, বৈধ পথে অগ্রসর হলে যা হয়। অর্থাৎ, তিন তালাক হয়ে যাবে এবং শুধু প্রত্যাহার নয়, বিবাহ বন্ধন নবায়নের সুযোগও আর থাকবে না।

হুমুর (শাঃ)-এর শীঘ্রাংসাই এ ব্যাপারে বড় ভ্রমাপন্ন যে, তিনি অসম্ভব হয়েও তিন তলাক কার্যকরী করেছেন। হাদীস গ্রন্থে অনুরূপ বহু ঘটনা বর্ণনা রয়েছে। আর যারা এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতেও তাঁরা হাদীসের সেসব ঘটনা সংগ্রহ করেই একত্রিত করেছেন। সম্প্রতি, জনাব মাওলানা আবু যাহেদ সফররাজ তাঁর 'উমদাতুল-আসার' গ্রন্থে এ মাসআলা বিশদভাবে উল্লেখ করেছেন। এখানে এ সম্পর্কিত মাত্র দু'তিনটি হাদীস উদ্ধৃত হলো।

ইতিপূর্বেও দু'তালক সংক্রান্ত আইন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ইসলামে তালকের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থাসমূহ কোরআনের দার্শনিক বর্ণনাসহকারে বিবৃত হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে আরো কিছু বিষয় এবং তার আধিক্য বর্ণিত হয়েছে।

তালাকের পর তা প্রত্যাহার ও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা : প্রথম আয়াতের বর্ণিত প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে এই যে, যখন তালাকপ্রাপ্ত শরীলোক তার ইচ্ছত অতিক্রম করার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছে, তখন স্বামীর দু'টি অধিকার থাকে। একটি হচ্ছে তালাক প্রত্যাহার করে তাকে স্বীয় বিবাহেই রেখে দেয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তালাক প্রত্যাহার না করে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলা।

এ দু'টি অধিকার সম্পর্কে কোরআন শর্ত আরোপ করেছে যে, রাখতে হলে কিংবা ছিন্তা করতে হলে নিয়মানুযায়ী করতে হবে। এতে **المُؤَبَّر** শব্দটি দু'জায়গায়ই পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রত্যাহারের জন্যও কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন রয়েছে এবং ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারেও কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন বর্তমান। উভয় অবস্থায় যেটাই প্রশ্ন করা হোক, শরীয়তের নিয়মানুযায়ী করতে হবে। শুধু সাময়িক খেয়াল-খুশী বা আবেগের ভাগিদে কোন কিছু করা চলবে না। উভয় দিক সম্পর্কেই শরীয়তের কিছু বিধান কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। আর তারই বিশ্লেষণ করেছেন মহানবী (সাঃ) - তাঁর হাদীসে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, তালুক দেয়ার পর এই বিচ্ছিন্নতার ভয়াবহ অবস্থা ও পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে যদি তালুক প্রত্যাহার করে শ্রীকে স্বীয় বিয়েতে বহল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তবে এ জন্য শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে মনোমালিক্যকে অন্তর থেকে দূর করে সুন্দর ও সুখী জীবনযাপন এবং পরস্পরের অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে আদায় করার মানসে করতে হবে, শ্রীকে যত্না দেয়ার উদ্দেশ্যে তা করা চলবে না। এ জন্য আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে—

وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ أَصْرَارًا لِّتَعْتَدُوا

অর্থাৎ, স্ত্রীকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়ার উদ্দেশ্যে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আটকে রেখে না।

এ পৃথিবীতেও চিন্তা করলে দেখা যায়, কোন অত্যাচারী ব্যক্তি কারো প্রতি অত্যাচার করে সাময়িকভাবে আত্মতৃপ্তি লাভ করে বাটে, কিন্তু তার অন্তঃ পরিতাপিত্তে তাকে অধিকাংশ সময় অপমানিত ও লাঞ্চিত হতে হয়। সে অনুধাবন করুক বা নাই করুক, অনেক সময় এমন বিপদে পতিত হয় যে, অত্যাচারের ফলাফল দুনিয়াতেই তাকে কিছু না কিছু ভোগ করতে হয়।

কোরআনে –হাকীমের নিজস্ব একটা দার্শনিক বর্ণনাবাদি রয়েছে।
দুনিয়ার আইন-কানুন ও শান্তির বর্ণনার ন্যায় কোরআন শুধুমাত্র
আইন-কানুন ও শান্তির কথাই বর্ণনা করে না; বরং একান্ত গুরুগম্ভীরভাবে
তার বিধি-বিধানের দার্শনিক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ এবং তার বিরোধিতার
দরুন মানুষের যে অকল্যাণ হতে পারে, তার এমন ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়,
যা দেখে যে লোক মানবতার আবরণ সম্পূর্ণভাবে খুলে ফেলেনি, সে
কখনো এসবের দিকে অগ্রসরই হতে পারে না। কেননা, প্রত্যেকটি
আইন-কানুনের সঙ্গে আল্লাহর ভয় ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কথাও
স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

বিয়ে ও তালাককে খেলায় পরিণত করো না : দ্বিতীয় মাসআলা হচ্ছে এই, এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহর আয়াতকে খেলায় পরিণত করো না।

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا - খেলায় পরিণত করার একটি তফসীর

হচ্ছে এই যে, বিয়ে ও তালাক সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা যে সীমারেখা ও শর্তাবলী নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধাচরণ করা। আর দ্বিতীয় তফসীর হযরত আবুদ্বারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, জাহেলিয়াত যুগে কোন কোন লোক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বা বাদীকে মুক্ত করে দিয়ে পরে বলতো যে, আমি তো উপহাস করেছি মাত্র, তালাক দেয়া বা মুক্তি দিয়ে দেয়ার কোন উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়। এতে কয়সালা দেয়া হয়েছে যে, বিয়ে ও তালাককে যদি কেউ খেলা বা তামাশা হিসাবেও সম্পাদন করে, তবুও তা কার্যকরী হয়ে যাবে। এতে নিয়তের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন,— তিনটি বিষয় এমন রয়েছে যে, হাসি-তামাশার মাধ্যমে করা এবং বাস্তবে করা দুই-ই সমান। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তালাক, দ্বিতীয়টি দাস মুক্তি এবং তৃতীয়টি বিয়ে। হাদীসটি ইবনে-মাদুবিয়্যাহ উদ্ধৃত করেছেন ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে, আর ইবনুল-মুনযির বর্ণনা করেছেন ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীসটি নিম্নরূপঃ

“তিনটি বিষয় রয়েছে, যেগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে বলা আর হাসি-তামাশাচ্ছলে বলা একই সমান। (এক) বিবাহ, (দুই) তালাক (তিন) রাজ্ য়াত বা তালাক প্রত্যাহার।”

এ তিনটি বিষয়ে শরীয়তের আদেশ হচ্ছে এই যে, যদি দু’জন স্ত্রী ও পুরুষ বিয়ের ইচ্ছা ব্যতীতও সাক্ষীর সামনে হাসতে হাসতে বিয়ের এজ্বাব ও কবুল করে নেয়, তবুও বিয়ে হয়ে যাবে। তেমনি তালাক প্রত্যাহার এবং দাসকে মুক্তিদানের ব্যাপারেও শরীয়তের এই বিধান। এসব ক্ষেত্রে হাসি-তামাশা কোন ওজররূপে গণ্য হবে না।

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে অন্য বিয়েতে বাধা দেওয়া হারাম ঃ দ্বিতীয় আয়াতে সে সমস্ত উৎপীড়নমূলক ব্যবহারের প্রতিরোধ করা হয়েছে, যা সাধারণতঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের সাথে করা হয়। তাদেরকে অন্য লোকের সাথে বিয়ে করতে বাধা দেয়া হয়। প্রথম স্বামীও তার তালাক দেয়া স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে দেয়াতে নিজের ইচ্ছাত ও মর্যাদার অবমাননা মনে করে। আবার কোন কোন পরিবারে মেয়ের অভিভাবকগণও দ্বিতীয় বিয়ে থেকে বিরত রাখে। আবার কেউ কেউ এসব মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে কিছু মালামাল হাসিল করার উদ্দেশ্যে বাধার সৃষ্টি করে। অনেক সময় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার পূর্ব স্বামীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু স্ত্রীর অভিভাবক বা আত্মীয়-স্বজন তালাক দেয়ার ফলে স্বামীর সাথে সৃষ্ট বৈরিতাবশতঃ উভয়ের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাধার সৃষ্টি করে। স্বাধীন স্ত্রীলোককে তার মর্জিমত শরীয়ত বিরোধী কার্য ব্যতীত বিয়ে হতে বাধা দেয়া একান্তই অন্যায়, তা তার প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকেই হোক, অথবা তার অভিভাবকদের পক্ষ থেকেই হোক। কিন্তু শর্ত হচ্ছে **إِذَا تَرَائُوا بَيْنَهُمْ بِلَا مَعْرُوفٍ** তবে এ হুকুম তখন বর্তাবে, যখন উভয়ে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী রাজী হবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি উভয়ে রাজী না হয়, তবে কোন এক পক্ষের উপর জোর বা চাপ সৃষ্টি করা বৈধ হবে না। যদি উভয়ে রাজীও হয় আর তা শরীয়তের আইন মোতাবেক না হয়, যথা, বিয়ে না করেই পরস্পর স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করতে আরম্ভ করে, অথবা তিন তালাকের পর অন্যত্র বিয়ে না করেই যদি পুনর্বিবাহ করতে চায়, অথবা ইদতের মধ্যেই অন্যের সাথে বিয়ের ইচ্ছা করে, তখন সকল মুসলমানের এবং বিশেষ করে ঐ সমস্ত লোকের যারা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে সম্মিলিতভাবে বাধা দিতে হবে, এমনকি শক্তি প্রয়োগ করতে হলেও তা করতে হবে।

এমনিভাবে কোন মেয়ে যদি স্বীয় অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত

পারিবারিক ‘কুফু’ বা সামঞ্জস্যহীন স্থানে বা বংশের প্রচলিত মোহরের কম মোহরে বিয়ে করতে চায়, যার পরিমাণ বা কু-প্রভাব বংশের উপর পতিত হতে পারে, তবে এমন ক্ষেত্রে তারা তাকে বাধা দিতে পারেন। তবে **إِذَا تَرَائُوا** বলে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েকে তার অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দেয়া যায় না।

আয়াতের শেষে তিনটি বাক্যের প্রথমটিতে এরশাদ হয়েছে—

ذَلِكَ يُوعِظُ بِهٖ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

অর্থাৎ, “এ আদেশ সেসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ তাআলা ও কেয়ামতের উপর বিশ্বাস করে।” এতেই ইশারা করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ তাআলা ও পরকালের বিশ্বাস করে তাদের জন্যে এসব আহকাম যথাযথভাবে পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আর যারা এ আদেশ পালনে শিথিলতা প্রদর্শন করে তাদের বোঝা উচিত যে, তাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে।

ذٰلِكُمْ اَنْزَلْنٰ لَكُمْ وَاَنْظُرْ এসব হুকুমের আনুগত্য তোমাদের জন্য

পবিত্রতার কারণ— এতে ইশারা করা হয়েছে যে, এর ব্যতিক্রম করা পাপ-মগ্নতা এবং ফেৎনা-ফাসাদের কারণ। কেননা, বয়ঃপ্রাপ্তা বুদ্ধিমতী যুবতী মেয়েকে সাধারণভাবে বিয়ে থেকে বিরত রাখা একদিকে তার প্রতি অত্যাচার, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং অপরদিকে তার সতিত্ব, পবিত্রতা ও মান-ইচ্ছাতকে আশঙ্কায় ফেলারই নামান্তর। তৃতীয়তঃ সে যদি এই বাধার ফলে কোন পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তার সে পাপের অংশীদার তারাও হবে যারা তাকে বিয়ে থেকে বিরত রেখেছে।

আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে কোরআনের অনুপম দার্শনিক নীতি ঃ কোরআন করীম এখানে একটি বিধান উপস্থাপন করেছে যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছামত বিয়ে করতে বাধা দেয়া অন্যায়। এ বিধান স্থির করার পর তার বাস্তবায়নকে সহজ করার জন্য এর প্রতি সাধারণ মানুষের মন-মস্তিষ্কে তৈরী করার উদ্দেশ্যে তিনটি বাক্য উল্লেখ করেছে। প্রথম বাক্যে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং পরকালে শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে সে বিধান বাস্তবায়নের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে এ আইন অমান্য করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে এ আইনের আনুগত্যের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তৃতীয় বাক্যে বলে দিয়েছে যে, এই আনুগত্যের মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। এর বিরুদ্ধাচরণের মাঝে কোন কল্যাণ আছে বলে যদিও তোমরা কখনও ধারণা কর, কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং পরিণতি সম্পর্কে তোমাদের অজ্ঞতারই ফল।

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ
تَقْرَضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً مِمَّا تَعَوُّهُنَّ عَلَى النِّسَاءِ وَقَدْ رُفِعَ
عَنْ الْمُفْرَقَاتِ وَقَدْ رُفِعَ عَنِ الْمَعْرُوفِ حَقَّ عَلَى الْمُتَّحِينَ ۝
وَإِنْ طَلَقْتُمْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرَضُوا مِمَّا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوا
الَّذِي بَيْنَهُمَا عَفْدًا ذِكْرًا وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَ
لَا تَسْأَلُوا الْقَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ
قَانِتِينَ ۝ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرَاجَ أَوْ ذِيهَا أَوْ فِئَادَ أَوْ فِئَادَ
اللَّهِ كَمَا عَلَيْكُمْ مَا لَكُمْ تَوْكَدُورُ تَعْلَمُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ
مِنْكُمْ وَكَانُوا زَوَاجًا وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مَوَاطِنُ إِلَى
الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۝ فَإِنْ خَرَجْتُمْ فَرِحْنَا عَنْكُمْ فِي مَا
فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝
وَالْمُطَلَّاتُ مِمَّا رِجَالُهُنَّ يَتَّبِعْنَ عَلَيْكُمْ تَعْلَمُونَ ۝
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(২০৬) স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সামর্থ অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী। যে খরচ প্রচলিত রয়েছে তা সংকমশীলদের উপর দায়িত্ব। (২০৭) আর যদি মোহর সাব্যস্ত করার পর স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিয়ে দাও, তাহলে যে মোহর সাব্যস্ত করা হয়েছে তার অর্ধেক দিয়ে দিতে হবে। অবশ্য যদি নারীরা ক্ষমা করে দেয় কিংবা বিয়ের বন্ধন যার অধিকারে সে (অর্থাৎ, স্বামী) যদি ক্ষমা করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর তোমরা পুরুষরা যদি ক্ষমা কর, তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী। আর পারস্পরিক সহনভূতির কথা বিস্মৃত হয়ে না। শিশুর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহর সেন্সবই অত্যন্ত ভাল করে দেখেন। (২০৮) সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে। আর আল্লাহর প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে দাঁড়াও। (২০৯) অতঃপর যদি তোমাদের কারো ব্যাপারে ভয় থাকে, তাহলে পদচরী অবস্থাতেই পড়ে নাও অথবা সওয়ারীর উপরে। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না। (২১০) আর যখন তোমাদের মধ্যে যারা মৃত্যুবরণ করবে তখন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে ওসিয়ত করে যাবে। অতঃপর যদি সে স্ত্রীরা নিজেকে থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে সে নারী যদি নিজের ব্যাপারে কোন উত্তম ব্যবস্থা করে, তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞতাসম্পন্ন। (২১১) আর তালাকপ্রাপ্ত নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেয়া পরহেযগারদের উপর কর্তব্য। (২১২) এভাবেই আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তা বুঝতে পার।

একটি বিশেষ তাৎপর্য এই যে, সমগ্র কোরআনেরই এক বিশেষ বর্ণনাবিজ্ঞি রয়েছে যে, —কোরআন কোন বিধানকে দুনিয়ার আইনের বর্ণনা-পদ্ধতি অনুযায়ী বিবৃত করে না; বরং অভিভাবক সুলভ সহনভূতির ভঙ্গিতে এমনভাবে বর্ণনা করে, যাকে গ্রহণ করা এবং সেমতে কাজ করা মানুষের পক্ষে সহজ হবে।

শিশুকে স্তন্যদান মাতার দায়িত্ব আর মাতার ভরণ-পোষণ পিতার দায়িত্ব : এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, শিশুকে স্তন্যদান করা মাতার দায়িত্ব, আর মাতার ভরণ-পোষণ ও জীবনধারণের অন্যান্য যাবতীয় খরচ বহন করা পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বলবৎ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত শিশুর মাতা স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ বা তালাক-পরবর্তী ইন্দ্রের মধ্যে থাকে। তালাক ও ইন্দ্রত অতিক্রান্ত হয়ে গেলে স্ত্রী হিসাবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় সত্য, কিন্তু শিশুকে স্তন্য দানের পরিবর্তে মাতাকে পারিশ্রমিক দিতে হবে।— (মাহহারী)

স্ত্রীর খরচ স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী হবে, না স্ত্রীর মর্যাদা অনুসারে : শিশুর পিতা-মাতা উভয়ই যদি ধনী হয়, তবে ভরণ-পোষণও ধনী ব্যক্তিদের মত হওয়া উচিত। আর দু'জনই গরীব হলে গরীবের মতই ভরণ-পোষণ দিতে হবে। দু'জনের আর্থিক অবস্থা যদি ভিন্ন ধরনের হয়, তবে এক্ষেত্রে ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। হেদায়া প্রণেতা বলেছেন, — যদি পুরুষ ধনী হয় এবং স্ত্রী দরিদ্র হয়, তবে এমন মানের খোরপোষ দিতে হবে, যা দরিদ্রদের চাইতে বেশী এবং ধনীদের চাইতে কম।

ইমাম কারখী বলেছেন যে, স্বামীর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে খোরপোষ নির্ধারণ করতে হবে।

ফতুল্ল-কাদীরে এ মতের সমর্থনে বহু ফকীহর ফতোয়া উদ্ধৃত করা হয়েছে। আলাচ্য আয়াতে স্তন্যদান সংক্রান্ত বিধি-বিধান বর্ণনার পর এরশাদ হয়েছে :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِئَادَ وَلَوْ كُنْتُمْ يَتَّبِعْنَ عَلَيْكُمْ تَعْلَمُونَ ۝

অর্থাৎ, কোন মাতাকে তার শিশুর জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না। আর কোন পিতাকেও এর জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না। অর্থাৎ, শিশুর পিতা-মাতা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করবে না। যেমন, মাতা যদি স্তন্যদান করতে অপারক হয় আর যদি পিতা মনে করে, যেহেতু শিশু তারও বটে, কাজেই তার উপর চাপ সৃষ্টি করা চলে। কিন্তু না, অপারক অবস্থায় মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা যাবে না। অথবা পিতা দরিদ্র এবং মাতার কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও স্তন্যদানে অস্বীকার করে যে, শিশু যেহেতু পিতার, কাজেই অন্য কারো দ্বারা দুগ্ধ পান করানোর ব্যবস্থা করা হোক, এমন মানসিকতা প্রদর্শন করাও সঙ্গত হবে না।

মাতাকে স্তন্যদানে বাধ্য করা না করার বিবরণ : পঞ্চম মাসআলা (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِئَادَ وَلَوْ كُنْتُمْ يَتَّبِعْنَ عَلَيْكُمْ تَعْلَمُونَ) এতে বোঝা যায় যে, মা যদি কোন অসুবিধার কারণে শিশুকে স্তন্যদান করতে অস্বীকার করে, তবে শিশুর পিতা তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য শিশু যদি অন্য কোন স্ত্রীলোকের বা কোন জীবের দুগ্ধ পান না করে, তবে মাতাকে বাধ্য করা চলে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

মোহর ও স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস ও সহবাসের প্রেক্ষিতে তালকের

বারটি অবস্থা নির্ধারিত হয়েছে। তন্মধ্যে এ আয়াতে দু'টি অবস্থার হুকুম বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে এই, যদি মোহর ধার্য করা না হয়। দ্বিতীয়টি, মোহর ধার্য করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু স্ত্রীর সাথে নির্জনবাস বা সহবাস হয়নি। তৃতীয়তঃ মোহর ধার্য হয়েছে এবং সহবাসও হয়েছে। এক্ষেত্রে ধার্যকৃত মোহর সম্পূর্ণই পরিশোধ করতে হবে। কোরআন করীমে অন্য জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণিত। চতুর্থতঃ মোহর ধার্য করা হয়নি, অথচ সহবাসের পর তালাক দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর পরিবারে প্রচলিত মোহর পরিশোধ করতে হবে। এর বর্ণনাও অন্য এক আয়াতে এসেছে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথম দুই অবস্থার আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম অবস্থার নির্দেশ হচ্ছে, মোহর কিছুই ওয়াজিব নয়। তবে নিজের পক্ষ থেকে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেয়া স্বামীর কর্তব্য। ন্যূনপক্ষে তাকে এক জোড়া কাপড় দিয়ে দেবে। কোরআন-মজীদ প্রকৃতপক্ষে এর কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। অবশ্য একথা বলেছে যে, ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের মর্যাদানুযায়ী দেয়া উচিত, যাতে অন্যেরাও অনুপ্রাণিত হয় যে, সামর্থ্যবান লোক এহেন ব্যাপারে কার্পণ্য করে না। হযরত হাসান (রাঃ) এমনি এক ব্যাপারে বিশ হাজারের উপটোকন দিয়েছিলেন। আর কাযী শোরাইহ পাঁচশ দেহরাম (রৌপ্য মুদ্রা) দিয়েছেন। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেছেন, নিম্নতম পরিমাণ হচ্ছে এক জোড়া কাপড়।—(কুরতুবী)

দ্বিতীয় অবস্থায় হুকুম হচ্ছে এই যে, যদি স্ত্রীর মোহর বিয়ের সময় ধার্য করা হয়ে থাকে এবং তাকে সহবাসের পূর্বে তালাক দেয়া হয়, তবে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী তা ক্ষমা করে দেয় কিংবা স্বামী পুরো মোহরই দিয়ে দেয়, তবে তা হচ্ছে তাদের ঐচ্ছিক ব্যাপার। যেমন, আয়াতে বলা হয়েছেঃ

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَوْ يَتَّبِعُونَ الْأَمْرَ بَيْنَهُمَا وَيُعْطُوا الْكِفَاةَ

পুরুষের পূর্ণ মোহর দিয়ে দেওয়াকেও হয়তো এজন্য মাফ করা বলা হয়েছে যে, আরবের সাধারণ প্রথা অনুযায়ী বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মোহরের অর্থ দিয়ে দেয়া হতো। সুতরাং সহবাসের পূর্বে তালাক দিলে অর্ধেক স্বামীর প্রাপ্য হয়ে যেতো। যদি সে বদন্যাতার প্রেক্ষিতে অর্ধেক না নেয়, তবে তাও ক্ষমার পর্যায়ে পড়ে এবং ক্ষমা করাকে উত্তম ও তাকওয়ার পক্ষে অনুকূল বলা হয়েছে। কেননা, তালাকটি যে ভদ্রোচিত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ক্ষমা তারই নিদর্শন — যা শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম এবং সওয়াবের কাজ। তাই ক্ষমা স্ত্রীর পক্ষ থেকেও হতে পারে, স্বামীর পক্ষ হতেও হতে পারে।

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَوْ يَتَّبِعُونَ الْأَمْرَ بَيْنَهُمَا وَيُعْطُوا الْكِفَاةَ

এর তফসীর রসূল (সাঃ) নিজে বর্ণনা করেছেন। বিবাহ বন্ধনের মালিক হচ্ছে স্বামী। এ হাদীসটি দারুতুনী গ্রন্থে আমর ইবনে শো'আইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত আলী (রাঃ) এবং ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকেও উদ্ধৃত করেছেন।—(কুরতুবী)

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, বিয়ে সমাধা হওয়ার পর তা বহাল রাখা বা ভঙ্গ করার মালিক স্বামী। সে-ই তালাক দিতে পারে। স্ত্রীলোকের পক্ষে তালাক দেয়ার সুযোগ সীমিত।

কতিপয় হাদীসের প্রমাণ অনুসারে অধিকাংশ আলোমের মতে মধ্যবর্তী নামায অর্থ হচ্ছে আসরের নামায। কেননা, এর একদিকে দিনের দু'টি নামায— ফজর ও মোহর এবং অপরদিকে রাতের দু'টি নামায — মাগরিব ও এশা রয়েছে। এ নামাযের প্রতি তাগিদ এ জন্য দেয়া হয়েছে যে, অনেক লোকেরই এ সময় কাজকর্মে ব্যস্ততা থাকে। আর হাদীসে 'কানেতীন বা আনুগত্যের' সাথে বাক্যাটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'নিরবতার সাথে'।

এ আয়াতের দ্বারা নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে জায়েয ছিল। আর এ নামায দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইশারার দ্বারা পড়া তখনই শুদ্ধ হবে যখন একই স্থানে দাঁড়িয়ে পড়া সম্ভব। ইশারার ক্ষেত্রে সেজদার ইশারা রুকুদ ইশারার চেয়ে একটু বেশী নীচ করবে। চলতে চলতে নামায হবে না। যখন এমনভাবে পড়াও সম্ভব হবে না। (যেমন যুদ্ধ চলাকালে) তখন নামায কায্য করতে হবে এবং অন্য সময় আদায় করবে।—(বয়ানুল-কোরআন)

(১) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْكُمْ ... وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

আমলে স্বামীর মৃত্যুর দরুন ইদত ছিল এক বৎসর। কিন্তু ইসলামে এক বৎসরের স্থলে চার মাস দশ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন—পূর্ববর্তী আয়াতে বলে দেয়া হয়েছেঃ

—কিন্তু এতে স্ত্রীকে এতটুকু সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যে, যেহেতু তখনও পর্যন্ত মিরাসের বিধান নাথিল হয়নি এবং মিরাসে কোন অংশ স্ত্রীলোকের জন্য নির্ধারণ করা হয়নি, বরং তাদের ভাগ্য পুরুষের ওসিয়্যতের উপর নির্ভরশীল ছিল যা পূর্ববর্তী আয়াত كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ عَظِيمٌ এর তফসীরে বোঝা গেছে। কাজেই নির্দেশ হয়েছিল যে, যদি স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নিজের সুবিধার জন্য স্বামীর পরিত্যক্ত বাড়ীতে থাকতে চায়, তবে এক বৎসর পর্যন্ত থাকার অধিকার রয়েছে এবং তারই পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ থেকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ইদতের সময় পর্যন্ত দিতে হবে।

এ আয়াতে সেই নির্দেশটিই বর্ণনা করা হয়েছে আর স্বামীদেয়কে সেভাবেই ওসিয়্যত করতে বলা হয়েছে। আর যেহেতু এ অধিকারটি ছিল স্ত্রীর তাই তা আদায় করা না করার অধিকারও ছিল তারই। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের জন্য তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়া জায়েয ছিল না। ইদত শেষ হওয়ার পর সে তার অংশ ছেড়েও দিতে পারতো। আর অন্যত্র বিয়ে করাও জায়েয ছিল। এখানে 'নিয়মানুযায়ী' শব্দের অর্থ তাই। কিন্তু ইদতের মধ্যে ঘর থেকে বের হওয়া বা বিয়ে করা ইত্যাদি ছিল পাপের কাজ। স্ত্রীলোকের জন্যও এবং বাধা দিতে পারা সম্বন্ধে যারা বাধা না দেয় তাদের জন্যও। পরে যখন মিরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন বাড়ী-ঘর এবং অন্যান্য সব কিছুর মধ্যেই যেহেতু স্ত্রীকেও অংশ দেয়া হয়েছে, কাজেই সে তার নিজের অংশে থাকার এবং নিজের অংশ থেকে ব্যয় করার পূর্ণ অধিকারী হয়ে গেছে। ফলে এ আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে।

(২) وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاءٌ بِالْعُرْوَةِ

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের উপকার করার কথা এর পূর্ববর্তী আয়াতেও এসেছে। তবে তা ছিল শুধু দু'রকম তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য। সহবাস কিংবা নির্জনবাসের পূর্বে যাদেরকে তালাক দেয়া হয়েছে, তাদের একটি উপকার ছিল কমপক্ষে একজোড়া কাপড় দেয়া। আর দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে অর্ধেক মোহর দেয়া। বাকী রইল সে সমস্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যাদের সাথে স্বামী নির্জনবাস কিংবা সহবাস করেছে। তাদের মধ্যে যাদের মোহর ধার্য করা হয়েছে, তাদের উপকার করা অর্থ, তার ধার্যকৃত পূর্ণ মোহর দিয়ে দেয়া। আর যার মোহর ধার্য করা হয়নি তার জন্য মোহরে-মিসাল দেয়ার কথা বলা হয়েছে। আর যদি مَتَاء শব্দের দ্বারা 'বিশেষ ফায়দা' বলতে একজোড়া কাপড় বোঝানো হয়, তবে একজনকে তা দেয়া ওয়াজিব, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর অন্যান্যদের বেলায় তা মোস্তাহাব। আর যদি مَتَاء শব্দের দ্বারা খোর-পোষ বোঝানো হয়ে থাকে, তবে যে তালাকের পর ইদত অতিক্রান্ত করতে হয়, তাতে ইদত পর্যন্ত তা দেয়া ওয়াজিব তালাকে-রাজ্জীই হোক আর তালাকে-বায়নই হোক ব্যাপক অর্থে সব ধরনের তালাকই এর অন্তর্ভুক্ত।

أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَدَيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْعُتَى
 فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا فَذُكِّرُوا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا إِنَّا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يَنْهَى
 قَوْمًا حَسَنًا قِيَصُوعَهُمْ أَنْ أَضَاعُوا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَبْذُلُ
 الْيُسْرَ وَيَرْجُوْنَ ﴿٢٢﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ الْكَاذِبِينَ بَنَى إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ
 مُوسَى إِذْ قَالَ لِلَّذِينَ لَهُمْ لَكُمْ لَعْنَتُكُمْ لَنَا مِلْكٌ نَتَّقِيكُمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ أَنْ تَكُونَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ الْآفَتُ أَنْ تَدَّ
 قَالُوا وَمَا لَنَا أَنْ نَتَّقِيكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجَنَا مِنْ
 دِيَارِنَا وَاتَّبَعْنَا قَتْلَ كَتِّبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا كَلِيلًا
 وَمَنْهُمْ رَاوِيٌّ عَلَيْهِمُ الْظُلْمِ ﴿٢٣﴾ وَقَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ
 قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا إِنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ
 عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ
 قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ
 الْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلِكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

(২৩৩) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে
 বেরিয়ে গিয়েছিলেন? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ
 তাদেরকে বললেন, মরে যাও। তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন।
 নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক
 শুকরিয়া প্রকাশ করে না। (২৪৪) আল্লাহর পথে লড়াই কর এবং জেনে রাখ,
 নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু শুনে। (২৪৫) এমন কে আছে
 যে আল্লাহকে করজ দেবে উত্তম করজ; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-
 বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আল্লাহই সংকটিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা
 দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে। (২৪৬) যুসার পরে
 তুমি কি বনী-ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের
 নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করে দিন যাতে
 আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি
 এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা
 লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে
 লড়াই করব না? অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও
 সম্ভান-সম্পত্তি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য
 কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ তাআলা
 জালেমদের ভাল করেই জানেন। (২৪৭) আর তাদেরকে তাদের নবী
 বললেন,— নিশ্চয়ই আল্লাহ তালুকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত
 করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে
 আমাদের উপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই
 অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সম্বল নয়। নবী বললেন,—
 নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের
 দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাকেই রাজা দান করেন,
 যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত।

উল্লেখিত তিনটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ
 বর্ণনাভিষিক্তে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি হেদায়েত
 করেছেন। জেহাদের বিধান বর্ণনার পূর্বে ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা
 বর্ণনা করেছেন যাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হায়াত-মউত বা
 জীবন-মরণ একান্তভাবেই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তির অধীন। যুদ্ধ বা
 জেহাদে অংশ নেয়াই মৃত্যুর কারণ নয়। তেমনী তীরুতার সাথে
 আত্মগোপন করা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নয়। তফসীরে
 ইবনে-কাসীরে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবীর উদ্ধৃতিসহ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে
 উল্লেখিত ঐতিহাসিক ঘটনাটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,—কোন এক শহরে
 বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করতো। তাদের সংখ্যা ছিল
 প্রায় দশ হাজার। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়।
 তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক
 প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগলো। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে
 এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে একথা অবগত করাবার জন্য যে,—মৃত্যুর
 ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না—তাদের কাছে দু'জন
 ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা দু'জন সে ময়দানের দু'ধারে দাঁড়িয়ে
 এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই একসাথে মরে গেল,
 একটি লোকও জীবিত রইল না; পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে
 পারলো, তখন সেখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের দাফন-কাফন করার
 ব্যবস্থা করা যেহেতু খুব সহজ ব্যাপার ছিল না তাই তাদেরকে চারিদিকে
 দেয়াল দিয়ে একটি বন্ধন কূপের মত করে দিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের
 মৃতদেহগুলো পচে-গলে গেল এবং হাড়-গোড় তেমনী পড়ে রইল।
 দীর্ঘকাল পর বনী-ইসরাঈলের হিমযীল (আঃ) নামক একজন নবী সেখান
 দিয়ে যাওয়ার পথে সেই বন্ধ জায়গায় বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়-গোড় পড়ে
 থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাকে মৃত লোকদের
 সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো। তিনি দোয়া করলেন, হে
 পরওয়ারদেগার, তাদের সবাইকে পুনর্জীবিত করে দাও। আল্লাহ তাঁর
 দোয়া কবুল করলেন এবং বিক্ষিপ্ত সেই হাড়গুলোকে আদেশ দিলেন :

অর্থাৎ, ওহে পুরাতন হাড়সমূহ! আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নিজ
 নিজ স্থানে সমবেত হতে আদেশ করছেন। আল্লাহর নবীর যবানীতে এসব
 হাড় আল্লাহর আদেশ শ্রবণ করলো। অনেক জড়বস্তুকে হয়ত মানুষ
 অনুভূতিহীন মনে করে, কিন্তু দুনিয়ার প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুও আল্লাহর
 অনুগত ও ফরমানবিরদার এবং নিজ নিজ অস্তিত্ব অনুযায়ী বুদ্ধি ও অনুভূতির
 অধিকারী। কোরআন করীম أَنطَلِقُ لَكُم مِّنْهُنَّ ذُرِّيَّةً
 এদিকেই ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি
 করেছেন এবং তাদেরকে তার উপযুক্ত হেদায়েত দান করেছেন।

মোটকথা, একটি মাত্র শব্দে প্রত্যেকটি হাড় নিজ নিজ স্থানে
 পুনঃস্থাপিত হলো। অতঃপর সে নবীর প্রতি নির্দেশ হলো, সেগুলোকে বল
 : ‘ওহে হাড়সমূহ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা
 মাংস পরিধান কর এবং রং ও চামড়া দ্বারা সজ্জিত হও।’

সাথে সাথে হাড়ের প্রতিটি কঙ্কাল একেবারেই পরিপূর্ণ লাশ হয়ে গেল।
 অতঃপর রূহকে আদেশ দেয়া হলো : হে আত্মাসমূহ! আল্লাহ তাআলা
 তোমাদিগকে যার যার শরীরে ফিরে আসতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ শব্দ
 উচ্চারিত হতেই সে নবীর সামনে সমস্ত লাশ জীবিত হয়ে দাঁড়ালো এবং

বিষ্মিত হয়ে চারদিকে তাকাতে আরম্ভ করলো। আর সবাই বলতে লাগলো سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ “তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোন মা’বুদ নেই”।

এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীকে সৃষ্টিবলয় সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা কেয়ামত ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য একটা অকাট্য প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে থাকা তা জেহাদ হোক কিংবা প্লেগ মহামারীই হোক, আল্লাহ্ এবং তাঁর নির্ধারিত নিয়তির প্রতি যারা বিশ্বাসী তাদের পক্ষে সমীচীন নয়। যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে, নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মুহূর্ত পরেও তা আসবে না, তাদের পক্ষে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।

এখন ঘটনাটি কোরআনের ভাষায় লক্ষ্য করুন। কোরআন-মজীদ এরশাদ করেছে :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ

লোকের ঘটনা লক্ষ্য করেননি, যারা মৃত্যুর ভয়ে বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল?

লক্ষণীয় যে, এ ঘটনা হুম্বুর (সাঃ)-এর যুগের হাজার হাজার বছর পূর্বেকার। হুম্বুর (সাঃ)-এর পক্ষে এ ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। তাই এখানে أَلَمْ تَرَ বলার উদ্দেশ্য কি? মুফাসসেরগণ বলেছেন, এমনিভাবে যেসব ঘটনা সম্পর্কে أَلَمْ تَرَ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে অথচ ঘটনা হুম্বুর (সাঃ)-এর যুগের বহু পূর্বেকার, যা হুম্বুর (সাঃ)-এর দেখার কথা কল্পনাও করা যায় না, সেসব ক্ষেত্রে দেখা দ্বারা উদ্দেশ্য আত্মার দর্শন। এসব ক্ষেত্রে أَلَمْ تَرَ দ্বারা أَلَمْ تَعْلَمْ (আপনি কি জানেন না?) বোঝানো হয়। তবুও أَلَمْ تَرَ শব্দে একথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ ঘটনা যে সবারই জানা, সুপ্রসিদ্ধ একটি ব্যাপার, এদিকে ইঙ্গিত করা। বোঝানো হচ্ছে যে, ঘটনাটি এমনি সুপ্রসিদ্ধ এবং বহুল আলোচিত যেন এখনও ইচ্ছা করলে তা দেখা যেতে পারে কিংবা দেখার যোগ্য। أَلَمْ تَرَ -র পরে إِلَى শব্দ যোগ করায় ভাষাগত দিক দিয়ে এদিকেই ইঙ্গিত বোঝায়। অতঃপর কোরআন করীম তারা সংখ্যায় অনেক ছিল বলে উল্লেখ করেছে। وَهُمْ أَزْوَاجٌ অর্থাৎ, সংখ্যায় ছিল তারা হাজার হাজার। এ সংখ্যা নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী এ শব্দটি অধিকতা বাচক বহুবচন। এতে বোঝা যায় যে, তাদের সংখ্যা দশ হাজারের কম ছিল না।

অতঃপর এরশাদ হয়েছে : فَتَنَّا لَهُمُ اللَّهُ مَوْتَهُمْ

তাআলা তাদেরকে বললেন,— “তোমরা মরে যাও” আল্লাহর এ আদেশ প্রত্যক্ষও হতে পারে, কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে।

অতঃপর বলেছেন : إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ - অর্থাৎ, আল্লাহ্

তাআলা মানুষের প্রতি অত্যন্ত করুণাময়। এতে সে করুণাও অন্তর্ভুক্ত যা বনী-ইসরাঈলদের উল্লেখিত দলটির প্রতি পুনর্জীবন দানের মাধ্যমে দেখানো হয়েছিল এবং সে দয়াও শামিল যাতে উম্মতে-মুহাম্মদীকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং তাদের জন্য উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন।

অতঃপর পথভোলা মানুষকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এরশাদ হয়েছে -

وَلَيْكَ الْغَلْظُ الْغَلِيظُ - অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার শত সহস্র

দয়া ও করুণার নির্দশন মানুষের সামনে অহর্নিশ উপস্থিত হতে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

প্রাসঙ্গিকভাবে এ আয়াত অন্য কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করে দিয়েছে। প্রথমত : আল্লাহর নির্ধারিত তকদীরের উপর কোন তদবীর কার্যকর হতে পারে না। জেহাদ অথবা মহামারীর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাচানো যায় না, আর মহামারীগ্রস্ত স্থানে অবস্থান করাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। মৃত্যুর একটি সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যার কোন ব্যতিক্রম হওয়ার নয়।

দ্বিতীয়তঃ কোনখানে কোন মহামারী কিংবা কোন মারাত্মক রোগ-ব্যধি দেখা দিলে সেখানে থেকে পালিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়া বৈধও নয়। রসূল (সাঃ)-এর এরশাদ মোতাবেক অন্য এলাকার লোকের পক্ষেও মহামারীগ্রস্ত এলাকায় যাওয়া বৈধ নয়। হাদীসে বলা হয়েছে : ‘সে রোগের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতের উপর আযাব নাযিল করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা শুনবে যে, কোন শহরে প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দিয়েছে, তখন সেখানে যেও না। আর যদি কোন এলাকাতে এ রোগ দেখা দেয় এবং তুমি সেখানেই থাক, তবে সেখান থেকে পলায়ন করবেনা।’

প্লেগ সম্পর্কে মহানবীর উক্তির দর্শন : এ সম্পর্কে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, ‘কোথাও যাওয়া মৃত্যুর কারণ হতে পারে না, আবার কোনখান থেকে পালিয়ে যাওয়াও মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নয়।’ এ মৌলিক বিশ্বাসের পাশাপাশি আলোচ্য নির্দেশটি নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমতঃ মহামারীগ্রস্ত এলাকার বাইরের লোককে আসতে নিষেধ করার একটি তাৎপর্য এই যে, এমনও হতে পারে যে, সেখানে গমন করার পর তার হায়াত শেষ হওয়ার দরুনই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করলো; এতদসত্ত্বেও আক্রান্ত ব্যক্তির মনে এমন ধারণা হতে পারে যে, সেখানে না গেলে হয়তো সে মারা যেতো না। তাছাড়া অন্যান্য লোকেরও হয়তো এ ধারণাই হবে যে, এখানে না এলে মৃত্যু হতো না। অথচ যা ঘটেছে তা পূর্বেই নির্ধারিত ছিল। যেখানেই থাকতো তার মৃত্যু এ সময়েই হতো। এ আদেশের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় থেকে রক্ষা করা হয়েছে, যাতে করে তারা কোন ভুল বোঝাবুঝির শিকার না হয়।

দ্বিতীয় তাৎপর্য হল এই যে, এতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন যে, যেখানে কষ্ট হওয়ার বা মৃত্যুর আশংকা থাকে, সেখানে যাওয়া উচিত নয়; বরং সাধ্যমত ঈসব বস্তু থেকে বিরত থাকতে চেষ্টা করা কর্তব্য, যা তার জন্য ধ্বংস বা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া নিজের জানের হেফাজত করা প্রত্যেক মানুষের জন্য ওয়াজিব যোগা করা হয়েছে।

এ নিয়মের চাহিদাও তাই যে, আল্লাহর দেয়া তকদীরে পূর্ণ বিশ্বাস রেখে যথাসাধ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। যেসব স্থানে প্রাণ নাশের আশংকা থাকে, সেসব স্থানে না যাওয়াও এক প্রকার সতর্কতামূলক তদবীর।

এমনিভাবে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদেরকে সে স্থান থেকে পলায়ন

করতে নিষেধ করার মাঝেও বহু তাৎপর্য নিহিত। একটি হচ্ছে এই যে, যদি এ পলায়নের প্রথা চলতে থাকে, তবে সাধারণভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা সক্ষম ও সবল তারা তো সহজেই পালাতে পারে, কিন্তু যারা দুর্বল তাদের অবস্থা কি হবে? আর যারা রোগাক্রান্ত তাদের সেবা-শুশ্রূষা কিংবা মারা গেলে দাফন-কাফনেরই বা কি ব্যবস্থা হবে?

দ্বিতীয়তঃ যারা সেখানে ছিল, তাদের মধ্যে হয়তো রোগের জীবাণু প্রবেশ করে থাকবে। এমতাবস্থায় তারা যদি বাড়ী-ঘর ছেড়ে বের হয়ে থাকে, তবে তাদের দুঃখ-দুর্দশা আরো বেড়ে যাবে। কারণ, প্রবাসজীবনে রোগাক্রান্ত হলে যে কি অবস্থা হয় তা সবারই জানা।

তৃতীয়তঃ যদি তাদের মধ্যে রোগের জীবাণু ক্রিয়া করে থাকে, তবে তা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। আর যদি নিজের জায়গায় আল্লাহর উপর ভরসা করে পড়ে থাকে, তবে হয়তো নাজাত পেতে পারে। আর যদি এ রোগে মারা যাওয়াই তার ভাগ্য থাকে, তবে ঐশ্বর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করার বদলায় শহীদের মর্যাদা লাভ করবে।

ইমাম বোখারী (রহঃ) ইয়াহুইয়া ইবনে ইয়া'মার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে জানিছেন যে, তিনি রসূল (সাঃ)-কে প্লেগ-মহামারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রসূল (সাঃ) তাঁকে বলেছেন, এ রোগটি আসলে শান্তিরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যে জাতিকে শান্তি দেয়া উদ্দেশ্য হতো তাদের ভেতরে পাঠানো হতো। অতঃপর আল্লাহ তাআলা একে মুমিনদের জন্য রহমতে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন। আল্লাহর যেসব বান্দা এরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়া সত্ত্বেও নিজ এলাকায়ই দৈর্ঘ্যসহকারে বসবাস করে এবং এ বিশ্বাস রাখে যে, তার শুধু সে বিপদই হতে পারে, যা আল্লাহ তাআলা তার জন্য লিখে রেখেছেন, তবে এমন ব্যক্তি শহীদের মত সওয়াব পাবে। হুমর (সাঃ)-এর বাণী- 'প্লেগ শাহাদত এবং প্লেগে আক্রান্ত ব্যক্তি শহীদ'—এর ব্যাখ্যাও তাই।

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, মৃত্যুর ভয়ে জেহাদ থেকে পলায়ন করা হারাম। এ বিষয়টি কোরআনের অন্যত্র অত্যন্ত বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য কোন কোন বিশেষ অবস্থাকে নির্দেশের আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

এটা একান্তই আল্লাহর কুদরত যে, সাহাবিগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় সিপাহসালার আল্লাহর অসি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ (রাঃ) যার সমগ্র ইসলামী জীবনই জেহাদে অতিবাহিত হয়েছে, তিনি কোন জেহাদে শহীদ হননি; বরং রোগাক্রান্ত হয়ে বাড়ীতে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুর থাকলে বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করার আক্ষেপে তিনি অনুতাপ করেছিলেন এবং পরিবারের লোকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন : 'আমি অমুক অমুক বিরাট বিরাট জেহাদে অংশগ্রহণ করেছি। আমার শরীরের এমন কোন জায়গা নেই যা তীর-বল্লম অথবা অন্য কোন মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে যখম হয়নি। কিন্তু অনুতাপের বিষয় এই যে, আজ আমি গাধার মত বিছানায় পড়ে মৃত্যুবরণ করছি। আল্লাহ যেন আমাকে তীক্ষ্ণ-কাপুরুষের প্রাপ্য শান্তি না দেন। মৃত্যু ভয়ে যারা জেহাদ থেকে সরে থাকতে চায়, তাদেরকে আমার জীবনের এ উপদেশমূলক ঘটনাটি শুনিয়ে দিও।'

يُفْرَضُ عَلَى اللَّهِ قَوْلًا حَسَنًا - করজ বা ঋণ অর্থ নেক আমল

আল্লাহর পথে ব্যয় করা। এখানে করজ বা ঋণ শব্দটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। অন্যথায় সবকিছুরই তো একমাত্র মালিক তিনিই। উদ্দেশ্য হচ্ছে

এই যে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা গুয়াজিব, এমনিভাবে তোমাদের সদ্ব্যয়ের প্রতিদান অবশ্যই দেয়া হবে।

বৃদ্ধি করার কথা এক হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহর পথে একটি খেজুর দানা ব্যয় করলে, আল্লাহ তাআলা একে এমনভাবে বৃদ্ধি করে দেবেন যে, তা পরিমাণে ওষুধ পাছাড়ের চেয়েও বেশী হবে।

আল্লাহকে ঋণ দেয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে ঋণ দেয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। তাই হাদীসে অভাবীদেরকে ঋণ দেয়ারও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন :

(১) "কোন একজন মুসলমান অন্য মুসলমানকে একবার ঋণ দিলে এ ঋণদান আল্লাহর পথে সে পরিমাণ সম্পদ দু'বার সৎকা করার সমতুল্য।"

(২) ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন, এ আয়াত শুনে মানুষের মধ্যে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তন্মধ্যে একদল দুর্ভাগ্য বলাবলি করতে যে, মুহাম্মদের রব্ অভাবী এবং আমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে; আর আমরা অভাবমুক্ত। এর উত্তরে এরশাদ হয়েছে :

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْكَافِرِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ قَيَّرَ وَحَسَنَ أَعْيُنَا

দ্বিতীয় দল হচ্ছে সে সমস্ত লোকের, যারা এ আয়াত শুনে এর বিরুদ্ধাচরণ এবং কার্পণ্য অবলম্বন করেছে। ধন-সম্পদের লোভ তাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার তৌফিক তাদের হয়নি।

তৃতীয় দল হচ্ছে সেসব নিষ্ঠাবান মুসলমানদের, যারা এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথেই সাড়া দিয়েছিলেন এবং নিজের পছন্দ করা সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিয়েছিলেন। যেমন— আবুদ দারদাহ (রাঃ) প্রমুখ। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আবুদ দারদাহ রসূল (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন,— হে আল্লাহর রসূল (সাঃ) ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক ! আল্লাহ তাআলা কি আমাদের নিকট ঋণ চাচ্ছেন? তাঁর তো ঋণের প্রয়োজন নেই ! আল্লাহর রসূল (সাঃ) উত্তর দিলেন যে, আল্লাহ তাআলা এর বদলে তোমাদিগকে বেহেশতে প্রবেশ করতে চাচ্ছেন। আবুদ দারদাহ একথা শুনে বললেন,— হে আল্লাহর রসূল (সাঃ), হাত বাড়ান। তিনি হাত বাড়লেন। আবুদ দারদাহ বলতে লাগলেন— 'আমি আমার দু'টি বাগানই আল্লাহকে ঋণ দিলাম। রসূল (সাঃ) বললেন, একটি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দাও এবং অন্যটি নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য রেখে দাও। আবুদ দারদাহ বললেন যে, আপনি সাক্ষী থাকুন, এ দু'টি বাগানের মধ্যে যেটি উত্তম— যাতে খেজুরের ছয় শ' ফলশত বৃক্ষ রয়েছে, সেটা আমি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করলাম। আল্লাহর রসূল (সাঃ) বললেন, এর বদলে আল্লাহ তোমাকে বেহেশত দান করবেন।

আবুদদারদাহ (রাঃ) বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে বিষয়টি জানানলেন। স্ত্রীও তাঁর এ সংকল্পের কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন : 'খেজুরে পরিপূর্ণ অসংখ্য বৃক্ষ এবং প্রশস্ত অট্টালিকা আবুদদারদাহর জন্য তৈরী হয়েছে।'

(৩) ঋণ দেয়ার বেলায় তা ফেরত দেয়ার সময় যদি কিছু অতিরিক্ত দেয়ার কোন শর্ত করা না থাকে এবং নিজের পক্ষ থেকে যদি কিছু বেশী দিয়ে দেয়া হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন : 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে তার (ঋণের) হককে উত্তমরূপে পরিশোধ করে।'

তবে, যদি অতিরিক্ত দেয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা সুদ এবং হারাম বলে গণ্য হবে।

البقرة ২

২৭

سجود ২

আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

إِذْ قَالَ الْإِبْرَاهِيمُ لَكُمْ إِعْتِكَلْنَا مِلْكًا نَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

সে বনী-ইসরাঈলরা আল্লাহর বিধান লব্ধন করেছিল বলে আমালেকার কাফিরদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তখন তাদের সংশোধনের চিন্তা হলো। এখানে যে নবীর কথা বলা হয়েছে, তিনি ‘শামঈল’ নামে পরিচিত। **أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْكَافُورُ** - বনী-ইসরাঈলদের মধ্যে একটি সিন্দুক পূর্ব থেকেই ছিল, তা বংশানুক্রমে চলে আসছিল। তাতে হযরত মুসা (আঃ) ও অন্যান্য নবীগণের পরিত্যক্ত কিছু বরকতপূর্ণ বস্ত্রসামগ্রী রক্ষিত ছিল। বনী-ইসরাঈলরা যুদ্ধের সময় এ সিন্দুকটিকে সামনে রাখতো, আল্লাহ তাআলা এর দৌলতে তাদেরকে বিজয়ী করতেন। জালুত বনী-ইসরাঈলদেরকে পরাজিত করে এ সিন্দুকটি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ যখন এ সিন্দুক ফিরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, কাফেররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ। এমনিভাবে পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে দু’টি গরুর উপর সেটি উঠিয়ে হাকিয়ে দিল। ফেরেশতাগণ গরুগুলোকে তড়া করে এনে তালুতের দরজায় পৌছে দিলেন। বনী-ইসরাঈলরা এ নিদর্শন দেখে তালুতের রাজত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করলো এবং তালুত জালুতের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। তখন মৌসুম ছিল অত্যন্ত গরম।

عَلَّالِ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ - এ পরীক্ষার কারণ আমার মতে এই

যে, অনুরূপভাবে মানুষের জ্ঞেয় ও উত্তেজনা অনেক গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু প্রয়োজনের সময় খুব নগণ্যসংখ্যক লোকই এগিয়ে আসে। উপরন্তু তখন কিছু লোকের অসহযোগ অন্যান্য লোকদেরকেও বিচলিত করে। এসব লোকদেরকে দূরে সরানোই ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। তাই তাদের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন যা অত্যন্ত উপযোগী ছিল। কেননা, যুদ্ধের সময় দৃঢ়তা ও কষ্টসহিষ্ণুতারই বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন। অতএব, পিপাসার তীব্রতার সময় পানি পাওয়া সত্ত্বেও পান করা থেকে বিরত থাকা দৃঢ়তার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে এ অবস্থায় অন্ধের মত ঝাঁপিয়ে পড়া অস্থিরতার লক্ষণ।

পরবর্তীতে একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার বর্ণনা করা হয়েছে যে, অতিমাত্রায় পানি পানকারীগণ শারীরিক দিক দিয়ে বেকার হয়ে পড়লো এবং তারা দ্রুত চলাফেরা করতে অপারক হয়ে গেলো। রুহুল-মা’আনীতে ইবনে আবী হাতেমের বরাতে দিয়ে হযরত ইবনে-আব্বাসের রেওয়াজেতে উদ্ধৃতিতে ঘটনার যে পরিণতি বর্ণিত হয়েছে তাতে বোঝা যায়, এতে তিন ধরনের লোক ছিল।

একদল অসম্পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। দ্বিতীয় দল পূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের সংখ্যা কম বলে চিন্তা করেছে এবং তৃতীয় দল ছিল পরিপূর্ণ ঈমানদার, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং নিজেদের সংখ্যালঘিতার কথাও চিন্তা করেননি।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ الْإِلهَ مَلِكُهُمْ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْكَافُورُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن كَانَ لَهُمْ قُوَّةٌ وَمُؤْمِنِينَ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ طَالُوتُ يَاجُودٌ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۖ فَفَرَّوْا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا لَّهُمْ فَلَئِمَّا جَاوَزُوا ۖ قَالُوا لَئِن لَّمْ أَكَلْنَا الْكَفَّاءَ لَكِنَّا الْيَوْمَ بِجَاوِرِينَ ۚ وَجُودٌ قَالَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ كَثْرَةً مِّنَ الْمَالِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ ۖ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَاوِلٍ وَجُودٌ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا مَبِيعًا وَنَبَتْ أَقْدَامُنَا وَالصِّرَاطُ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۖ فَفَرَّوْهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَاوِلًا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَتَىٰ يَشَاءُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَئِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۖ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ يَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَتَأْتِكَ لِيُنَبِّئَكَ ۖ

(২৪৮) বনী-ইসরাঈলীদেরকে তাদের নবী আরো বললেন, তালুতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্ত। আর তাতে থাকবে মুসা, হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। (২৪৯) অতঃপর তালুত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালুত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বার বার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ঐশ্বরীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। (২৫০) আর যখন তালুত ও তার সেনাবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হল, তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকে দৃঢ়দান রাখ— আর আমাদের সাহায্য কর সে কাফের জাতির বিরুদ্ধে। (২৫১) তারপর ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে জালুতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা চাইলেন শেখালেন। আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়। (২৫২) এগুলো হলো আল্লাহর নিদর্শন, যা আমরা তোমাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে থাকি। আর আপনি নিশ্চিতই আমার রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَمِنْهُمْ
 مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ ذِكْرًا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ
 مَرْيَمَ الْبَيْنَتَ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَلَكُمُ
 الْآدَمِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَفَوْا
 فَيَذَرُوكُم مِّنْ أَمْنٍ وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَفْتَلَكُمُ
 وَلَكِنْ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا
 مِمَّا رَزَقَكُم مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ يَوْمَ لَا يَبْعَثُ فِيهِ وَلَاحِقَةٌ وَلَا
 سَفَاحَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
 الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
 الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
 أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا
 شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ
 الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا تَرْكَبُوا الدَّارَةَ فِي الدِّينِ قَدْ تَسَيَّرَ اللَّهُ لَكُمْ
 الْيُسْرَىٰ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْكَافِرِينَ وَلَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 بِالْغُرُوبِ وَالْوَضْعِ لَا أَنْفُسًا لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠

(২৫৩) এই রসূলগণ— আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ তো হলো তারা যার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেছেন, আর কারও মর্যাদা উচ্চতর করেছেন এবং আমি মরিয়ম-তনয় ঈসাকে প্রকৃষ্ট মূর্জেয়া দান করেছি এবং তাকে শক্তিদান করেছি 'রহুল-কুদুস' অর্থাৎ জিবরাঈলের মাধ্যমে। আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর পয়গম্বরদের পেছনে যারা ছিল তারা লড়াই করতো না। কিন্তু তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের কেউ তো ঈমান এনেছে, আর কেউ হয়েছে কাফের। আর আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো, কিন্তু আল্লাহ্ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন। (২৫৪) হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রক্মী দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম। (২৫৫) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তদ্ভাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও নয়। আসমান ও যমীনে যাকিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আহ এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যাকিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনি সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (২৫৬) ঈমানের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এখন যারা গোমরাহকারী 'তাওত' দেরকে মানবে না এবং আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংগবার নয়। আর আল্লাহ্ সবই শুনে এবং জানেন।

(১) আয়াত **تِلْكَ الرُّسُلُ**—এর বক্তব্যে নবী করীম (সাঃ)—কে এক প্রকার সান্ত্বনা দান করা উদ্দেশ্য। কেননা, তাঁর নবুওয়ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পরও অর্থাৎ, যা **وَأَنَّكَ لَمِنَ الرُّسُلِ** আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে, তা সত্ত্বেও কাফেররা তা মেনে নিচ্ছিল না। ফলে এটি তাঁর পক্ষে দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা একথা শুনিয়ে দিয়েছেন যে, ইতিপূর্বেও বিভিন্ন পদমর্যাদা সম্পন্ন বহু নবী অতিক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু কারোই সমগ্র উম্মত ঈমানদার হয়নি। কিছুসংখ্যক লোক আনুগত্য প্রদর্শন করেছে, আবার অনেকে বিরুদ্ধাচারণও করেছে। অবশ্য এতেও আল্লাহ্‌র বহু তাৎপর্য রয়েছে, যদিও তা সবার বুঝে আসে না, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এতটুকু বিশ্বাস রাখা কর্তব্য যে, এর মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন বিশেষ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে।

(২) **تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ** এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে; আয়াতটিতে পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নবিগণের মধ্যে কেউ কেউ অন্য নবী অপেক্ষা মর্যাদায় বড় ছিলেন, অথচ হাদীসে রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্‌র নবিগণের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য করা না।' তিনি আরো বলেছেন— 'আমাকে মুসা (আঃ)—এর চাইতে বড় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করো না।' আরো উক্ত হয়েছে, 'আমি বলতে পারি না যে, কেউ ইউনুস ইবনে মাতা অপেক্ষা উত্তম।'।

(৩) **وَمِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ**—হযরত মুসা (আঃ)—এর সাথেই আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যম ব্যতীত কথা বলেছেন। কিন্তু তাও অন্তরালমুক্ত ছিল না। কেননা, সূরা শুরার **مَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ**—(কোন মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলা বাস্তবসম্মত নয়)—আয়াতে অন্তরালমুক্তভাবে আল্লাহ্ তাআলার সাথে কথা বলার বিষয়টিকে নাকচ করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, হযরত মুসা (আঃ)—এর সাথে আল্লাহ্‌র কথা বলা অন্তরাল থেকেই হয়েছে। অবশ্য মৃত্যুর পরে কোন রকম অন্তরাল বা যবনিকা ছাড়াই কথাবার্তা হওয়া সম্ভব। তাই শুরার সে আয়াতটি পার্থিব জীবন সম্পর্কে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়।

এ সূরায় এবাদত এবং বৈষয়িক আচার-আচরণের বেশ কিছু বিধান এবং রীতি-নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলোর বাস্তবায়ন করতে গিয়ে মনের উপর চাপ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। যাবতীয় সংকাজের মধ্যে জান-মাল ব্যয় করাটাই মানুষের কাছে সবচাইতে কঠিন মনে হয়। অথচ আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের অধিকাংশই জান অথবা মাল সম্পর্কিত। তা'ছাড়া অধিকাংশ মানুষই পাশে লিপ্ত হয়, এই জ্ঞানের মহব্বত অথবা মালের প্রতি আসক্তির কারণেই। সুতরাং বলতে গেলে এ দু'টিই সমস্ত পাপের মূল উৎস। আর তা থেকে মুক্তিলাভই হল যাবতীয় এবাদত-বন্দেগীর লক্ষ্য। কাজেই এসব বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর যুদ্ধ-বিগ্রহের আলোচনা একান্তই যুক্তিযুক্ত।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ—শীর্ষক আয়াতে জ্ঞানের মহব্বত ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পরবর্তী আয়াত—**مَنْ دَانَ يَوْمَهُ يُؤْخَذُ مِنَ اللَّهِ**—এর মধ্যে সম্পদের মোহ ত্যাগ করে তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথে বিলিয়ে দেয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এরপরে বর্ণিত তালুতের কাহিনী দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, মর্যাদা ও কর্তৃত্বপ্রাপ্তি ধন-সম্পদের উপর নির্ভরশীল নয়। এটা একান্তভাবেই আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। পরন্তু যারা জানের পরোয়া না করেই আল্লাহ্র পথে জীবন উৎসর্গ করে, তাদের নজীর এবং প্রতিফলও তালুতের ঘটনাতে বিধৃত হয়েছে। অতঃপর সম্পদ আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে দিয়ে জীবনের প্রকৃত সাফল্য লাভ করার উপদেশ দিয়ে বলা হয়েছে **أَفْئُتُوا وَمَا وَزَكَّاكُمْ** - অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি, তা থেকে ব্যয় কর।

যেহেতু সম্পদ ব্যয় করার উপর অনেক এবাদত ও মোমালাত নির্ভরশীল, তাই এ বিষয়টি সমধিক বিস্তারিতভাবে এবং গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী রুকুতেও বেশীর ভাগ আলোচনা সম্পদ ব্যয় প্রসঙ্গেই করা হয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, এখনই কাজ করার সময়। পরকালে কোন কাজ বা ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, আর বন্ধুত্বের খাতিরেও কেউ দেবে না। পক্ষান্তরে কেউ এসে সুপারিশ করে মুক্ত করবে, তাও সম্ভব হবে না; যতক্ষণ আল্লাহ্ নিজে না ছাড়বেন।

আয়াতুল কুরসীর বিশেষ ফযীলত : এ আয়াতটি কোরআনের সর্ববৃহৎ আয়াত। হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সাঃ) এটিকে সবচাইতে উত্তম আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, রসূল (সাঃ) উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কোরআনের মধ্যে কোন্ আয়াতটি সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কা'ব আরম্ভ করলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল-কুরসী। রসূল (সাঃ) তা সমর্থন করে বললেন— হে আবুল মান্শার! তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।

নাসারী শরীফের এক বর্ণনাতে রয়েছে যে, হুযুরে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন,— ‘যে লোক প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল-কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না।’ অর্থাৎ, মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের ফলাফল এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে।

এ আয়াতে মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ্ জাল্লা- শানুহর একক অস্তিত্ব, তওহীদ ও গুণাবলীর বর্ণনা এক অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহ্র অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া, তাঁর সত্তার অপরিহার্যতা, তাঁর অসীম-অনন্তকাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের অধিকারী হওয়া যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে কেউ কোন কথা বলতে না পারে, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় বস্তুনিচয়কে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে কোন ক্লান্তি বা পরিশ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয় না এবং এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, কোন প্রকাশ্য কিংবা গোপন বস্তু কিংবা কোন অণু-পরমাণুর বিন্দু-বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে না পারে। এই হচ্ছে আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এ আয়াতটিতে দশটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য—

أَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ এতে ‘আল্লাহ্’ শব্দটি অস্তিত্ববাচক নাম। অর্থ, সে

সত্তা যা সকল পরাকাষ্ঠার অধিকারী ও সব কিছু থেকে মুক্ত। **أَلَمْ يَلِدْ** সে সত্তারই বর্ণনা, যে সত্তা এবাদতের যোগ্য। ‘ইলাহ্’ সে সত্তা ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

দ্বিতীয় বাক্য **أَلَمْ يَكُنْ لَهَا قَبْلُ مَلْجَأٌ** আরবী ভাষায় **حَى** অর্থ হচ্ছে জীবিত। আল্লাহ্র নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দিয়েছে যে, তিনি সর্বদা জীবিত ও বিদ্যমান থাকবেন; মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। **قِيم** শব্দ কেয়াম শব্দ হতে উৎপন্ন, ইহা ব্যুৎপত্তিগত আধিক্যের অর্থ ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকেও বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। ‘কাইয়ুম’ আল্লাহ্র এমন এক বিশেষ গুণ যাতে কোন সৃষ্টি অংশীদার হতে পারে না। তাঁর সত্তা স্থায়িত্বের জন্য কারো মুখোপেক্ষী নয়। কেননা, যে নিজের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখোপেক্ষী, সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ কি করে করবে? সে জন্যই কোন মানুষকে ‘কাইয়ুম’ বলা জায়েয নয়। যারা ‘আবদুল কাইয়ুম’ নামকে বিকৃত করে শুধু ‘কাইয়ুম’ বলে তারা গোনাহগার হবে।

আল্লাহ্র গুণবাচক নামের মধ্যে **حَى** অনেকের মতে ‘ইসমে-আযম’। হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন যে, বদরের যুদ্ধে আমি একবার চেয়েছিলাম যে, রসূল (সাঃ)-কে দেখবো তিনি কি করছেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, তিনি সেজদায় পড়ে **حَى** বা **قِيم** বলছেন।

তৃতীয় বাক্য **لَا تَأْخُذُ بِهِ سِنَةٌ** সীন-এর যের দ্বারা উচ্চারণ করলে এর অর্থ হয় তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব। **نَوْمٌ** পূর্ণ নিদ্রাকে বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পূর্ববর্তী বাক্যে ‘কাইয়ুম’ শব্দে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমিনের যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ্ তাআলা। সমস্ত সৃষ্টিরাজি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান। এতে করে হয়তো ধারণা হতে পারে যে, যে সত্তা এত বড় কার্য পরিচালনা করছেন, তাঁর কোন সময় ক্লান্তি আসতে পারে এবং কিছু সময় বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য থাকা দরকার। দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহকে নিজের বা অন্য কোন সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করবে না, নিজের মতো মনে করবে না। তিনি সমকক্ষতা ও সকল তুলনার উর্ধ্বে। তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে এসব কাজ করা কঠিন নয়। আবার তাঁর ক্লান্তিরও কোন কারণ নেই। আর তাঁর সত্তা যাবতীয় ক্লান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

চতুর্থ বাক্য **لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ** বাক্যের প্রারম্ভ ব্যবহৃত **لَهُ** অক্ষর মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ এবং যমিনে যা কিছু রয়েছে সে সবই আল্লাহ্র মালিকানাধীন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির মালিক। যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

পঞ্চম বাক্য— **مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ** অর্থ হচ্ছে, এমন কে আছে, যে তাঁর সামনে কারো সুপারিশ করতে পারে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত? এতে কয়েকটি মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম হচ্ছে এই যে, যখন আল্লাহ্ তাআলা যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর মালিক এবং কোন বস্তু তাঁর চাইতে বড় নয়, তাই কেউ তাঁর কোন কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। তিনি যা কিছু করেন, তাতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। তবে এমন হতে পারতো যে, কেউ কারো জন্য

সুপারিশ করে, তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ক্ষমতাও কারো নেই। তবে আল্লাহর কিছু খাস বান্দা আছেন, যারা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, অন্যথায় নয়। হাদীসে এরশাদ হয়েছে, রসূল (সাঃ) বলেছেন : হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম আমি সমস্ত উম্মতের জন্য সুপারিশ করবো। একে ‘মাকামে-মাহমুদ’ বলা হয়, যা হুম্মুর (সাঃ)-এর জন্য খাস। অন্যের জন্য নয়।

ষষ্ঠ বাক্য— **يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা অগ্রপশ্চাত্ যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত। অগ্রপশ্চাত্ বলতে এ অর্থও হতে পারে যে, তাদের জন্মের পূর্বে ও জন্মের পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী আল্লাহর জ্ঞান রয়েছে। আর এ অর্থও হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বোঝানো হয়েছে যা মানুষের জন্য প্রকাশ্য, আর পশ্চাত্ বলতে বোঝানো হয়েছে যা অদৃশ্য। তাতে অর্থ হবে এই যে, কোন কোন বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতায় রয়েছে কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। তাঁর জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের উপরই পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এ দুটিতে কোন বিরোধ নেই। আয়াতের ব্যাপকতায় উভয় দিকই বোঝানো হয়।

সপ্তম বাক্য **وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ** অর্থাৎ, মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের কোন একটি অংশবিশেষকেও পরিবেষ্টিত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেন শুধু ততটুকুই সে পেতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টির অণু-পরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের আওতাভুক্ত, এটা তাঁর বেশিষ্ট। মানুষ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এতে অংশীদার নয়।

অষ্টম বাক্য — **وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ** অর্থাৎ, তাঁর কুরসী এত বড়, যার মধ্যে সাত আকাশ ও যমিন পরিবেষ্টিত রয়েছে। আল্লাহ উঠা-বসা আর স্থান-কাল থেকে মুক্ত। এ ধরনের আয়াতকে মানুষের কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের সাথে তুলনা করা উচিত নয়। এর অবস্থা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা মানবজ্ঞানের উর্ধ্বে। তবে হাদীসের বর্ণনা দ্বারা এতটুকু বোঝা যায় যে, আরশ ও কুরসী এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও যমিনকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। ইবনে কাসীর হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হুম্মুর (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, কুরসী কি এবং কেমন? তিনি বলেছেন, যার এখতিয়ারে আমার প্রাণ তাঁর কসম, কুরসীর সাথে সাত আকাশ ও সাত যমিনের তুলনা একটি বিরাট ময়দানে ফেলে দেয়া একটি আংটির মত। অন্য এক বর্ণনাতে আছে যে, আরশের তুলনায় কুরসীও অনুন্নত।

নবম বাক্য **وَلَا يَرُدُّوهُ خُفُّهُمَا** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার পক্ষে এ দু’টি বৃহৎ সৃষ্টি, আসমান ও যমিনের হেফায়ত করা কোন কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। কারণ, এই অসাধারণ ও একক পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষে এ কাজটি একান্তই সহজ ও অনায়াসসাধ্য।

দশম বাক্য **هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ** তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান। পূর্বের নয়টি বাক্যে আল্লাহর সত্তা ও গুণের পূর্ণতা বর্ণনা করা হয়েছে। তা দেখার এবং বোঝার পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, সকল শান-শওকত, বড়ত্ব ও মহত্ত্ব এবং শক্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ

তাআলা। এ দশটি বাক্যে আল্লাহর ‘যাত’ ও সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

ইসলামকে যারা সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে তারা যেহেতু ধ্বংস ও প্রবঞ্চনা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, সেজন্য তাদেরকে এমন লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, কোন শক্ত দড়ির বেটনকে সুদৃঢ়ভাবে ধরে পতন থেকে মুক্তি পায়। আর এমন দড়ি ছিড়ে পড়ার যেমন ভয় থাকে না, তেমনিভাবে ইসলামেও কোন রকম ধ্বংস কিংবা ক্ষতি নেই। তবে দড়িটি যদি কেউ ছিড়ে দেয় তা যেমন স্বতন্ত্র কথা, তেমনিভাবে কেউ যদি ইসলামকে বর্জন করে, তবে তাও স্বতন্ত্র ব্যাপার — (বয়ানুল-কোরআন)

এ আয়াত দেখে কোন কোন লোক প্রশ্ন করে যে, আয়াতের দ্বারা বোঝা যায়, ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। অথচ ইসলাম ধর্মে জেহাদ ও যুদ্ধের শিক্ষা দেয়া হয়েছে?

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এমন প্রশ্ন যথার্থ নয়। কারণ, ইসলামে জেহাদ ও কেতালের শিক্ষা মানুষকে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে বাধ্য করার জন্য দেয়া হয়নি। যদি তাই হতো, তবে জিমিয়া করার বিনিময়ে কাফেরদেরকে নিজ দায়িত্বে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। ইসলামের জেহাদ ও কেতাল ফেৎনা-ফাসাদ বন্ধ করার লক্ষ্যে করা হয়। কেননা, ফাসাদ আল্লাহর পছন্দনীয় নয়, অথচ কাফেররা ফাসাদের চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকে। তাই আল্লাহ এরশাদ করেছেন: **وَيَسْئَلُونَكَ فِي الْأَرْضِ مَاذَا أَرْثُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَقِيُوا الشُّعْبَةَ** “তারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা ফাসাদকারীদেরকে পছন্দ করেন না।”

এজন্য আল্লাহ তাআলা জেহাদ এবং কেতালের মাধ্যমে এসব লোকের সৃষ্ট যাবতীয় অনাচার দূর করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেমতে জেহাদের মাধ্যমে অনাচারী জ্বালোমদের হত্যা করা সাপ-বিছু ও অন্যান্য কষ্টদায়ক জীবজন্তু হত্যা করারই সমতুল্য।

ইসলাম জেহাদের ময়দানে স্ত্রীলোক, শিশু, বৃদ্ধ এবং অচল ব্যক্তিদের হত্যা করতে বিশেষভাবে নিষেধ করেছে। আর এমনভাবে সে সমস্ত মানুষকেও হত্যা করা থেকে বিরত করেছে, যারা জিমিয়া কর দিয়ে আইন মান্য করতে আরম্ভ করেছে।

ইসলামের এ কার্য-পদ্ধতিতে বোঝা যায় যে, সে জেহাদ ও কেতালের দ্বারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না, বরং এর দ্বারা দুনিয়া থেকে অনায়াস-অত্যাচার দূর করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আদেশ দিয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) একজন বৃদ্ধা নাসারা স্ত্রীলোককে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন সে স্ত্রীলোক উত্তর দিল আমি মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধা। শেষ

জীবনে নিজের ধর্ম কেন ত্যাগ করবো? হযরত ওমর (রাঃ) একথা শুনেও তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি বরং এ আয়াত পাঠ করলেন

لَا يُكْرَهُ فِي الدِّينِ অর্থাৎ, ধর্মে কোন বল প্রয়োগের নিয়ম নেই। বাস্তব পক্ষে ঈমান গ্রহণে বল প্রয়োগ সম্ভবও নয়। কারণ ঈমানের সম্পর্ক বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে নয়। আর জেহাদ ও কেতাল দ্বারা শুধু বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই প্রভাবিত হয়। সুতরাং এর দ্বারা ঈমান গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভবই নয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জেহাদ কেতালের নির্দেশ **لَا يُكْرَهُ فِي الدِّينِ** আয়াতের পরিপন্থী নয়। — (মাহহারী)

البقرة

২২

تلك الوسل

আনুঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اللَّهُ وَلِىُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ
 إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ جَاءَ إِزْرَهُمْ فِي رِيَّةٍ أَنِ اشْءَ اللَّهُ
 إِلَهُكَ إِذْ قَالَ إِزْرُهُمْ رَبِّىَ الَّذِى يُعْبَى وَيُيْتَّى قَالَ أَتَا
 أَنبِىءُ وَأُمِيتَ قَالَ إِزْرُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِى بِالشَّيْءِ مِنَ
 الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ وَاللَّهُ
 لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ٢ وَأَوَّلَ الَّذِى مَرَعَى قَرْيَةً وَ
 هِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُهْدِى هَٰذَا اللَّهُ بَعْدَ
 مَوْتِهَا قَامَاةَ اللَّهِ وَآلَهُ عَامِلٌ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَكَ
 قَالَ لَكَ ثَلَاثُ يَوْمٍ أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَكَ ثَلَاثُ مِائَةٍ
 عَامٍ فَأَنْظَرُوا إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ كَمْ يَسْتَكْفِى وَانْظُرْ
 إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى
 الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهُهَا عِظَامًا تَبْكِينَ
 لَهُ ٣ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤

(২৫৭) যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তামুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে। (২৫৮) তুমি কি সে লোককে দেখনি, যে পালনকর্তার ব্যাপারে বাদানুবাদ করেছিল ইবরাহীমের সাথে এ কারণে যে, আল্লাহ সে ব্যক্তিকে রাজ্য দান করেছিলেন? ইবরাহীম যখন বললেন, আমার পালনকর্তা হলেন তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকি। ইবরাহীম বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সূর্যকে উদ্ভিত করেন পূর্ব দিক থেকে, এবার তুমি তাকে পশ্চিম দিক থেকে উদ্ভিত কর। তখন সে কাফের হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে সরল পথ প্রদর্শন করেন না। (২৫৯) তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাগ্নীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ মরশের পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল, আমি ছিলাম, একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে—সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখ নিজের গাথাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল—আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতামণ্ডল।

এ ২৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইসলাম সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত এবং কুফর সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য। এতদসঙ্গে কাফের বা বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বন্ধুত্ব করার বিপদ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, এরা মানুষকে আলো থেকে অন্ধকারে টেনে নেয়।

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, যখন আল্লাহ তাআলা কোন কাফের ব্যক্তিকে দুনিয়াতে মান-সম্মান এবং রাজত্ব দান করেন, তখন তাকে সে নামে অভিহিত করা জায়েয। এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রয়োজনবোধে তার সাথে তর্ক-বিতর্ক করাও জায়েয, যাতে সত্য-বিখ্যার পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

কেউ কেউ এরূপ সন্দেহ পোষণ করেছেন যে, সে হয়তো বলতে পারতো যে, যদি আল্লাহ বলতে কেউ থাকেন, তবে তিনিই পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদ্ভিত করুন। এর উত্তর হচ্ছে এই যে, তার অন্তরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একথা জেগে উঠলো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আছেন এবং পূর্ব দিক হতে সূর্য উদয় করা তাঁর কাজ এবং তিনি পশ্চিম দিক হতেও উদয় করতে পারেন। আর এ ব্যক্তি নবী হয়ে থাকলে অবশ্যই এমন হবে। আর এমন হলে বিশুময় এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি হয়ে যাবে। তাতে না আবার লাভের পরিবর্তে ক্ষতি বেড়ে যায়। যেমন, মানুষ এ মু'জ্জেবা দেখে যদি আমার দিক থেকে ফিরে তার দিকে ঝুঁকে যায়। সামান্য বাড়াবাড়িতে না আবার রাজত্বই চলে যায়। কাজেই সে উত্তরও দেয় নাই। তার কাছে এ প্রশ্নের কোন উত্তরও ছিল না। এ জন্য হতভম্ব হয়ে পড়ে।—(বয়ানুল-কোরআন)

وَلَا قَالِ إِيَّاهُمْ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُنْزِلُ الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِكَ
 تُؤْمِنُونَ قَالِ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكَ قَالَ فَعَنْدَ أَرْبَعَةٍ
 مِنَ الظَّالِمِينَ فَصَرَّفَهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ
 جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
 حَكِيمٌ ثُمَّ مَكَدَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 كَمَثَلِ خَيْلٍ أَتَيْتَ سَعِيرًا لِّئَلَّا تَسْتَأْذِنَ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ وَنَافِثَةٍ
 وَاللَّهُ يَضَعُ لِمَنْ يَشَاءُ أَوَّلَهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ
 يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا
 مَتًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ
 يَتَّبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ عَنِ حُلُمٍ عَظِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
 تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَالِ وَالْأَدْنَىٰ كَالْأَدْنَىٰ يَتَّبِعُ مَالَهُ
 رِثَاءُ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ
 صَعْوَانٍ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَاصَّةٌ وَإِلَىٰ فَتْرَتِهِ صَدَقَاتُ الْفُقَرَاءِ
 عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

(২৬০) আর সূর্য কর, যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে দেখাও, কেমন করে তুমি মৃতকে জীবিত করবে। বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? বলল, অবশ্যই বিশ্বাস করি, কিন্তু দেখতে এজন্যে চাইছি যাতে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতে পারি। বললেন, তাহলে চারটি পাখী ধরে নাও! পরে সেগুলোকে নিজের পোষ মানিয়ে নাও, অতঃপর সেগুলোর দেহের একেকটি অংশ বিভিন্ন পাহাড়ের উপর রেখে দাও। তারপর সেগুলোকে ডাক, তোমার নিকট দৌড়ে চলে আসবে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, অতি জ্ঞানসম্পন্ন। (২৬১) যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আল্লাহ্ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। (২৬২) যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। (২৬৩) নব্বু কথা বলে দেয়া এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐ দান-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ্ তাআলা সম্পদশালী, সহিষ্ণু। (২৬৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না সে ব্যক্তির মত যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব, এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি মসৃণ পাথরের মত যার উপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর উপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে দিল। তারা ঐ বস্তুর কোন সওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন করেছে। আল্লাহ্ কাকের সন্তানদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিবেদন ও পুনর্জীবনদান প্রত্যক্ষীকরণ : এটি হলো তৃতীয় কাহিনী যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আর্য্য করলেন, আপনি কিভাবে মৃতকে পুনর্জীবিত করবেন, তা আমাকে প্রত্যক্ষ করান। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করলেন, এরূপ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার কারণ কি? আমার সর্বময় ক্ষমতার প্রতি কি তোমার আস্থা নেই? ইবরাহীম (আঃ) নিজের আস্থা বিবৃত করে নিবেদন করলেন, আস্থা ও বিশ্বাস তো অবশ্যই আছে। কেননা, আপনার সর্বময় ক্ষমতার নিদর্শন সর্বদা, প্রতি মুহূর্তেই দেখতে পাচ্ছি এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই তার নিজের সত্তা থেকে শুক্র করে এ বিশ্ব জাহানের প্রতিটি অশু-পরমাণুতে এর প্রমাণ দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মানব-প্রকৃতির সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে যে, অন্তরের বিশ্বাস যতই দৃঢ় হোক, চোখে না দেখা পর্যন্ত অন্তরে পূর্ণ প্রশান্তি আসতে চায় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে, এটা কি করে হবে, না জানি এর প্রতিক্রিয়া কেমন? মনের মাঝে এ ধরনের প্রশ্ন উদয় হওয়ার ফলে পূর্ণ প্রশান্তি লাভ হতে চায় না। নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) এরূপ নিবেদন করেছিলেন, যাতে মৃতব্যক্তিকে জীবিতকরণ সংক্রান্ত চিন্তা দূিখাপ্ত না হয়ে পড়ে। অধিকন্তু মনে যাতে স্থিরতা আসে; নানা প্রশ্নের জাল যেন অন্তরে বাসা বাঁধতে না পারে এবং মনের দৃঢ়তা যাতে বজায় থাকে।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রার্থনা কবুল করলেন এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষ করাবার জন্য এক অভিনব ব্যবস্থা করলেন, যাতে মুশরেকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়ও দূর হয়ে যায়। প্রতিক্রিয়াটি ছিল এই যে, ইবরাহীমকে চারটি পাখী ধরে নিজের কাছে রেখে সেগুলোকে এমনভাবে লালন-পালন করতে নির্দেশ দেয়া হলো, যাতে সেগুলো সম্পূর্ণরূপে পোষ মেনে যায় এবং ডাকমাত্র হাতের কাছে চলে আসে। তদুপর তিনি যেন সেগুলোকে ভালভাবে চিনতেও পারেন। পরে নির্দেশ হল, পাখীগুলোকে জব্বাই করে এর হাড়-মাংসে, পাখা ইত্যাদি সবগুলোকেই কিম্বায় পরিণত কর, তারপর সেগুলোকে ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নিজে পছন্দমত কয়েকটি পাহাড়ে এক একটি ভাগ রেখে দাও। তারপর এদেরকে ডাক। তখন এগুলো আল্লাহর কৃদরতে জীবিত হয়ে দৌড়ে তোমার কাছে চলে আসবে।

তফসীরে রূহুল-মা'আনীতে ইবনুল-মানযারের উদ্ধৃতিতে হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাই করলেন। অতঃপর এদের যখন ডাকলেন, সঙ্গে সঙ্গে হাড়ের সাথে হাড়, পাখার সাথে পাখা, গোশতের সাথে গোশত রক্তের সাথে রক্ত মিলে পূর্বের রূপ ধারণ করল এবং তাঁর কাছে দৌড়ে এসে উপস্থিত হলো। তখন আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করলেন-হে ইবরাহীম! কেয়ামতের দিন এমনভাবে সবাইকে তাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্রিত করে এক মুহূর্তে সেগুলোতে প্রাণ সঞ্চারিত করে দেব। কোরআনের ভাষায় يَأْتِينَكَ سَعْيًا বলা হয়েছে যে, এসব পাখী দৌড়ে আসবে, যাতে বোঝা যায়, সেগুলো উড়ে আসবে না। কেননা, আকাশে উড়ে আসলে দৃষ্টির অগোচরে যেতে পারে এবং তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। পক্ষান্তরে মাটির উপরে দৌড়ে আসলে তা দৃষ্টির মধ্যে থাকবে। এ ঘটনাতো আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতের পরে পুনর্জীবনের এমন এক নিদর্শন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দেখালেন, যাতে মুশরেকদের যাবতীয় সন্দেহ-সংশয়েরও

অবসান হতে পারে। পুনর্জীবন এবং পরকালীন জীবন সম্পর্কে মুশরেকদের এটাই ছিল বড় প্রশ্ন। মানুষ মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যায়, আর এ মাটি বাতাসের সাথে কোথায় কোথায় উড়ে যায়। আবার কখনো পানির স্রোতের সাথে গড়িয়ে যায়, কখনো বা বৃক্ষ ও শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে আবার এর রেণু-কণা, দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিক্ষিপ্ত রেণু-কণা একত্রিত করে তাতে প্রাণসঞ্চার করার বিষয়টি সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকদের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়। সব বিষয়কেই তারা নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের তুলনাদেশে ওজন করতে চায়। তারা তাদের বোধশক্তির বাইরের কোন ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তাও করতে পারে না। অথচ তারা যদি নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কেই একটু চিন্তা করে, তবেই বুঝতে পারবে যে, তাদের অস্তিত্বও সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণুর একটা সমষ্টি।

আলোচ্য ঘটনার উপর কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর : আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথমতঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর মনে এ প্রশ্নই বা কেন জেগেছিল? অথচ তিনি আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতার উপর বিশ্বাসীরাপে তৎকালীন বিশ্বে সর্বাধিক দৃঢ় ছিলেন।

এর উত্তর এই যে, প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর প্রশ্ন কোন সন্দেহ-সংশয়ের কারণে ছিল না। বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ তাআলা কেয়ামতে মৃতদেহকে জীবিত করবেন, তা তাঁর সর্বময় ক্ষমতার জন্য কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু মৃতকে জীবিত করা মানুষের শক্তির উর্ধ্বে, তারা কখনো কোন মৃতকে জীবিত হতে দেখেনি। পরন্তু মৃতকে জীবিত করার পদ্ধতি ও রূপ বিভিন্ন রকম হতে পারে। মানুষের স্বভাব হচ্ছে এই যে, যে বস্তু সে দেখেনি তার অনুসন্ধান করার জন্য তার মনে একটা সহজাত কৌতূহল জন্ম নেয়। এতে তার ধারণা, বিভিন্ন পথে এগিয়ে যেতে থাকে। তাতে চিন্তাজনিত কষ্টও সহ্য করতে হয়। এ চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে রেহাই পেয়ে অন্তরে স্থিরতা লাভ করাকেই ‘এতমিনান’ বা প্রশান্তি বলা হয়। এই এতমিনান লাভের উদ্দেশ্যেই ছিল হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর এ প্রার্থনা।

এতে একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, ঈমান ও এতমিনান—এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঈমান সে ইচ্ছাধীন দৃঢ়বিশ্বাসকে বলে, যা মানুষ রসূল (সাঃ)—এর কথায় কোন অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অর্জন করে। আর ‘এতমিনান’ অন্তরের সে দৃঢ়তাকে বলা হয় যা প্রত্যক্ষ কোন ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে। অনেক সময় কোন দৃশ্যমান বিষয়েও দৃঢ়বিশ্বাস জন্মায়, কিন্তু অন্তরের এতমিনান বা প্রশান্তি লাভ হয় না এজন্য যে, এর স্বরূপ জানা থাকে না। এতমিনান শুধু চাক্ষুষ দর্শনে লাভ হয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী অবশ্যই ছিলেন; তবে প্রশ্নটি ছিল শুধু তার স্বরূপটি জানার জন্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) মৃতকে জীবিত করার স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন বটে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে তাঁর মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে **أَوَلَمْ نُؤْتِكْ** অর্থঃ, তুমি কি বিশ্বাস কর না, বলার হেতু কি?

উত্তর এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক উত্থাপিত এ প্রশ্নটি দু’ধরনের অর্থ হতে পারে।

(এক) তিনি জীবিত করার স্বরূপ জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলেন। তবে মূল প্রশ্ন অর্থঃ, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন সম্পর্কে সন্দেহান ছিলেন না।

(দুই) পুনর্জীবিত করার ক্ষমতায় সন্দেহ কিংবা অস্বীকৃতি থেকেও এ

প্রশ্ন জন্ম নিতে পারে। প্রশ্নের ভাষা এ সম্ভাবনার প্রতিকূল নয়। উদাহরণতঃ কোন বোঝা সম্পর্কে আপনার বিশ্বাস এই যে, অমুক ব্যক্তি এটি বহন করতে পারবে না। তখন আপনি তার অপারকতা প্রকাশ করার জন্যে বললেন : দেখি, তুমি কেমন করে বোঝাটি বহন কর। ইবরাহীম (আঃ)—এর প্রশ্নের এ ভুল অর্থও কেউ কেউ গ্রহণ করতে পারতো। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ বাস্তব ধারণা থেকে মুক্ত প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে বললেন **أَوَلَمْ نُؤْتِكْ** যাতে ইবরাহীম (আঃ) উত্তরে **بَلَىٰ** হ্যাঁ, বিশ্বাস করি’ বলে ভুল বোঝার অবকাশ থেকে মুক্ত হয়ে যান।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে : **إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ** অর্থঃ,

আল্লাহ তাআলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। পরাক্রমশালী হওয়ার মধ্যে সর্বশক্তিমানতা বিধৃত হয়েছে; আর প্রজ্ঞাময় বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন বিশেষ হেকমতের কারণেই প্রত্যেককে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন প্রত্যক্ষ করানো হয় না। নতুবা প্রত্যেককে এটা প্রত্যক্ষ করানো আল্লাহ তাআলার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু এতে ‘ঈমান-বিল-গায়েব’ তা অদৃশ্য বিশ্বাস স্থাপন করার বেশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ হয়।

এটি সূরা বাক্বারার ৩৬ তম রুকু, যা ২৬২ নম্বর আয়াত থেকে শুরু হয়। এখনও এ সূরার পাঁচটি রুকু বাকী রয়েছে। তন্মধ্যে শেষ রুকুতে সামগ্রিক ও গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ববর্তী চার রুকুতে ২৬২ তম আয়াত থেকে ২৮৩ তম আয়াত পর্যন্ত মোট ২২টি আয়াত। এগুলোতে অর্থনীতি সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশ ও বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। এসব নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে বর্তমান বিশ্ব যেসব অর্থনৈতিক সমস্যা হাবুডুবু খাচ্ছে সেগুলোর সমাধান আপনা-আপনিই বের হয়ে আসবে। আজ কোথাও পুঁজিবাদী অর্থনীতি এবং কোথাও এর জ্বায়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তিত রয়েছে। এসব নীতির পারস্পরিক সংঘাতের ফলে গোটা বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তপ্ত লাভায় পরিপূর্ণ হয়ে আগুয়গিরির রূপ ধারণ করেছে। এসব আয়াতে ইসলামী অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বর্ণিত হয়েছে। এটি দু’ভাগে বিভক্ত :

(১) প্রয়োজনানির্ভর অর্থ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে অভাবগ্রস্ত, দীন-দুঃখীদের জন্যে ব্যয় করার শিক্ষা,— একে সদকা ও খয়রাত বলা হয়।

(২) সুদের লেন-দেনকে হারাম করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ।

প্রথম দু’রুকুতে দান-খয়রাতের ফযীলত, তৎপ্রতি উৎসাহদান এবং তৎসম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ দু’রুকুতে সুদভিত্তিক কারবারের অবৈধতা, নিষেধাজ্ঞা এবং ঋণদানের বৈধ পন্থার বর্ণনা রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর দান-খয়রাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এমন কতিপয় বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা দান-খয়রাতকে বরবাদ ও নিষ্ফল প্রয়াসে পরিণত করে।

এরপর বর্ণনা করা হয়েছে দু’টি উদাহরণ। একটি আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় দান খয়রাতের এবং অপরটি অগ্রহণীয় ও ফাসেদ দান-খয়রাতের।

এ রুকুতে এ পাঁচটি বিষয়বস্তু উল্লেখিত হয়েছে।

এসব বিষয়বস্তুর পূর্বে জানা দরকার যে, আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়

وَمِثْلَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِهَيْبَةٍ مِّنْ وَجْهِِ اللَّهِ وَتَرْغِيبًا مِّنْهُ يَتَّبِعُهُمُ الْخَيْرُ لَمْ يُحِصُوا بِهَا أَمْوَالَهُمْ لِيَتَنَبَّأُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْهَدْيِ وَالنَّافِثَةِ وَالْوَهْدِيِّ وَالْخَلِيقِ وَالْمُنْعِيِّ وَإِنَّ أَلْفًا مِّنْ ذَلِكَ لَكَنَفْسٍ وَلَهُمْ عِشْرَتُ مِثْلَ الْوَقْعِ ۚ وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ مَقَالَتَ الْفِتْنَةِ وَلَهُمْ فِيهَا أَصَابٌ بِهَا قَاتُوا لَهَا ضَعْفَ ثَلَاثِينَ وَلَئِنْ لَّمْ يَلْحَظُوا لَهَا ضَعْفَ ثَلَاثِينَ وَلَا لِيَلْجَأَنَّ الْفِتْنَةُ إِلَى الْكَافِرِينَ وَلَهُمْ فِيهَا أَصَابٌ بِهَا قَاتُوا لَهَا ضَعْفَ ثَلَاثِينَ وَلَئِنْ لَّمْ يَلْحَظُوا لَهَا ضَعْفَ ثَلَاثِينَ وَلَا لِيَلْجَأَنَّ الْفِتْنَةُ إِلَى الْكَافِرِينَ وَلَهُمْ فِيهَا أَصَابٌ بِهَا قَاتُوا لَهَا ضَعْفَ ثَلَاثِينَ وَلَئِنْ لَّمْ يَلْحَظُوا لَهَا ضَعْفَ ثَلَاثِينَ وَلَا لِيَلْجَأَنَّ الْفِتْنَةُ إِلَى الْكَافِرِينَ وَلَهُمْ فِيهَا أَصَابٌ بِهَا قَاتُوا لَهَا ضَعْفَ ثَلَاثِينَ

(২৬৫) যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে এবং নিজের মনকে সুদৃঢ় করার জন্যে তাদের উদাহরণ লিখায় অবস্থিত বাগানের মত, যাতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, অতঃপর দ্বিগুণ ফসল দান করে। যদি এমন প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে হাল্কা বর্ষাবর্ষি যথেষ্ট। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম যথার্থই প্রত্যক্ষ করেন। (২৬৬) তোমাদের কেউ পছন্দ করে যে, তার একটি খেজুর ও আনারুর বাগান হবে, এর উল্লেখ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে, আর এতে সর্ষৎকার ফল-ফসল থাকবে এবং সে যথাক্রমে পৌছাবে, তার দুর্বল সম্ভান-সম্ভতিও থাকবে, এমনভাবেই এ বাগানে একটি ঘূর্ণিবায়ু আসবে, যাতে আশ্রয় রয়েছে, অনন্তর বাগানটি তম্বীভূত হয়ে যাবে? এমনভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে নির্দমসমূহ কর্না করেন—যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা কর। (২৬৭) হে ইমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্যে ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট জিনিস ব্যয় করতে মনন্বহ করো না। কেননা, তা তোমরা কখনও গ্রহণ করবে না, তবে যদি তোমরা চোখ বন্ধ করে নিয়ে নাও! জেনে রেখো, আল্লাহ অব্যবহৃত, প্রতাপিত। (২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে অব্যবহৃতের ভিত্তি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে কমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ। (২৬৯) তিনি যাকে ইচ্ছা বিশেষ জ্ঞান দান করেন এবং যাকে বিশেষ জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশে তরাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান।

করাকে কোরআন পাক কোথাও انفاق শব্দে, কোথাও اطعام শব্দে, কোথাও صدقه শব্দে এবং কোথাও زِيَادَةُ الشَّوْكَ শব্দে ব্যক্ত করেছে। কোরআনের এসব শব্দ এবং বিভিন্ন স্থানে এগুলোর ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, صدقه - انفاق - اطعام প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যাপক অর্থবোধক এবং সঙ্গতি অর্জনের লক্ষ্যে সর্বপ্রকার দান-খয়রাত ও ব্যয়কেই বোঝায়; তা ফরয, গুয়াজিব, কিংবা নফল, মুস্তাহাব যাই হোক। ফরয যাকাত বোঝাবার জন্যে কোরআন একটি স্বতন্ত্র শব্দ زِيَادَةُ الشَّوْكَ ব্যবহার করেছে এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ বিশেষ সদকাটি আদায় করা ও ব্যয় করার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এ রুকুতে বেশীর ভাগ انفاق শব্দ এবং কোথাও صدقة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এখানে সাধারণ দান-খয়রাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক স্ফাতব্য বিষয়

আল্লাহর পথে ব্যয় করার একটি দৃষ্টান্ত : প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, —অর্থহীন, হতু, জিহাদ কিংবা ফকীর, মিসকীন, বিধবা ও এতীমদের জন্যে কিংবা সাহায্যের নিয়তে আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে অর্থ ব্যয় করে, তাদের দৃষ্টান্ত এমন যেমন, কেউ গমের একটি দানা সরস জমিতে বপন করল। এ দানা থেকে একটি চারা গাছ উৎপন্ন হল, যাতে গমের সাতটি শীষ এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' করে দানা থাকে। অতএব, এর ফল দাঁড়ালে এই যে, একটি দানা থেকে সাতশ' দানা অর্জিত হয়ে গেল।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার সওয়াব এক থেকে শুরু করে সাতশ' পর্যন্ত পৌছে। এক পয়সা ব্যয় করলে সাতশ' পয়সার সওয়াব অর্জিত হতে পারে।

সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, একটি সংকর্মের সওয়াব দশগুণ পাওয়া যায় এবং তা সাতশ' গুণে পৌছে।

দান গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী : কিন্তু কোরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি সর্বাঙ্গীণ ও পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করার পরিবর্তে গম-বীজের দৃষ্টান্তের আকারে বর্ণনা করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কৃষক গমের এক দানা থেকে সাতশ' দানা তখনই পেতে পারে, যখন দানাটি হবে উৎকৃষ্ট। কৃষকও কৃষি বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকফুহাল হবে এবং জমিও হবে সরস। কেননা, এ তিনটির যেকোন একটি বিষয়ে অভাব হলেও হয় দানা বেকার হয়ে যাবে অর্থাৎ, একটি দানাও উৎপন্ন হবে না, কিংবা এক দানা থেকে সাতশ' দানার মত ফলনশীল হবে না।

এমনিভাবে সাধারণ সংকর্ম এবং বিশেষ করে আল্লাহর পথে কৃত ব্যয় গ্রহণীয় ও অধিক সওয়াব পাওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। (১) পবিত্র ও হালাল ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা। হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না।

(২) যে ব্যয় করবে তাকেও সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সৎ হতে হবে। কোন খারাপ নিয়তে কিংবা নাম-যশ অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যয় করে, সে ঐ অশুভ কৃষক সদস্য, যে বীজকে অনুর্বর মাটিতে বপন করে, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়।

(৩) যার জন্য ব্যয় করবে, তাকেও সদকার যোগ্য হতে হবে। অযোগ্য ব্যক্তির জন্যে ব্যয় করলে সদকা ব্যর্থ হবে। এভাবে বর্ণিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মাহার পথে ব্যয় করার ফযীলতও জানা গেল এবং সাথে সাথে তিনটি শর্তও জানা গেল যে, হালাল ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হবে, ব্যয়

করার রীতিও সুন্নত অনুযায়ী হতে হবে এবং যোগ্য ব্যক্তির প্রতি ব্যয় করতে হবে। শুধু পকেট থেকে বের করে দিয়ে দিলেই এ ফজীলত অর্জিত হবে না।

দ্বিতীয় আয়াতে দান-খয়রাতের নির্ভুল ও সুন্নত তরীকা বর্ণনা করে বলা হয়েছে : যারা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর অনুগ্রহ প্রকাশ করে না এবং যাকে দান করে, তাকে কষ্ট দেয় না, তাদের সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য তাদের কোন বিপদাশঙ্কা নেই এবং অতীতের ব্যাপারেও তাদের কোন চিন্তা নেই।

সদকা গ্রহণীয় হওয়ার শর্তাবলী : এ আয়াতে সদকা কবুল হওয়ার জন্যে দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। (১) দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং (২) গ্রহীতাকে দ্বিগত মনে করা যাবে না। অর্থাৎ, তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করতে পারবে না, যাতে সে নিজেই দ্বিগত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

তৃতীয় আয়াতে **قُلْ مَعْرُوفٍ** অর্থাৎ, সদকা-খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্যে পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত দু'টি শর্তের আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে কারও প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং দ্বিতীয়তঃ যাকে দান করা হবে তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে সে নিজেই দ্বিগত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে যে, আর্থিক অক্ষমতা কিংবা গণের সময় যাক্ষকারীর জওয়াবে কোন যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত অজুহাত বলে দেয়া এবং যাক্ষকারী অশোভন আচরণ করে রাগান্বিত করলে তাকে ক্ষমা করা বহুশ্রেয়। সে দান খয়রাতের চাইতে যার পর দান গ্রহীতাকে কষ্ট দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সম্পদশালী ও সহিষ্ণু। তিনি কারও অর্থের মুখাপেক্ষী নন। যে ব্যক্তি ব্যয় করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে। অতএব, ব্যয় করার সময় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষ্য রাখা উচিত যে, কারও প্রতি তার অনুগ্রহ নেই, নিজের উপকারের জন্যেই সে ব্যয় করছে। দান গ্রহীতার পক্ষ থেকে কোনরূপ অকৃতজ্ঞতা অনুভব করলেও তাকে খোদায়ী রীতির অনুসারী হয়ে ক্ষমা করা দরকার।

চতুর্থ আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই অন্যভাবে আরও তাকীদসহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে, মুখে অনুগ্রহ প্রকাশ করে কিংবা আচার-আচরণের মাধ্যমে গ্রহীতাকে কষ্ট দিয়ে নিজের দান-খয়রাতকে বরবাদ করো না।

এতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যে দান-খয়রাতের পর অনুগ্রহ প্রকাশ কিংবা গ্রহীতাকে কষ্ট দেয়ার মত কোন কাজ করা হয়, তা বাতিল এবং না করার শামিল। এরূপ দান-খয়রাতে কোন সওয়াব নেই। এ আয়াতে দান কবুল হওয়ার আরও একটি শর্ত বর্ণনা করে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও কৈয়ামতের প্রতি বিশ্वास রাখে না, তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন মসৃণ পাখরের উপর মাটি জমে যায় এবং তাতে কেউ বীজ বপন করে। অতঃপর এর উপর মুহলধারে বারিপাত হয়। ফলে মাটি কেটে গিয়ে পাখরটি সম্পূর্ণ মসৃণ হয়ে যায়। এরূপ লোক স্বীয় উপার্জন হস্তগত করতে সক্ষম হবে না এবং আল্লাহ তাআলা কাকেরদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না। এতে সদকা-খয়রাত কবুল হওয়ার এ শর্ত জানা গেল যে, নির্ভেজালভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পরকালের সওয়াবের নিয়তে ব্যয় করতে হবে—লোকদেখানো কিংবা নাম-যশের নিয়ত করা যাবে না। নাম-যশের নিয়তে ব্যয় করা ধন-সম্পদ জলাঞ্জলি দেয়ারই নামান্তর। যদি পরকালে বিশ্वासী মুমিনও নাম-যশের উদ্দেশ্যে কোন দান-খয়রাত করে,

তবে তার অবস্থায় তদ্রূপ হবে এবং বিনিময়ে কোন সওয়াবই সে পাবে না। এমতাবস্থায় এখানে **لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ** যোগ করে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে কাজ করা আল্লাহ তাআলা ও কৈয়ামতে বিশ্वासী ব্যক্তির পক্ষে অক্ষমণীয়। লোকদেখানো কাজ করা বিশ্वासী ক্রটিরই লক্ষণ।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞ-কাকেরদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না। এর তাৎপর্ষ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার হেদায়েত ও আয়াত সব মানুষের জন্যেই প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু কাকেররা এ সবের প্রতি ক্রোধ না করে বরং ঠাট্টা-মিছ্রপ করে। এর পরিণতিতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভগবৎকী তথা সংকাজের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেন। ফলে তারা কোন হেদায়েত কবুল করতে পারে না।

পঞ্চম আয়াতে গ্রহণযোগ্য দান-খয়রাতের একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। যারা স্বীয় ধন-সম্পদকে মনে দৃঢ়তা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ কোন টিলায় অবস্থিত বাগানের মত। প্রবল বৃষ্টিপাত না হলেও হাল্কা বারিবর্ষাই যার জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে খুব পরিজ্ঞাত।

এ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ষাঁটি নিরুত ও উপরোক্ত শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার ফজীলত অনেক। সংনিয়ত ও আন্তরিকতার সাথে অল্প ব্যয় করলেও তা যথেষ্ট এক পারলৌকিক সাফল্যের কারণ।

ষষ্ঠ আয়াতে উপরোক্ত শর্তাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে দান-খয়রাত বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বিষয়টিও একটি উদাহরণ দ্বারা কুড়িয়ে তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে : তোমাদের কেউ পছন্দ করবে কি যে, তার একটি আম্র ও খেজুরের বাগান হবে, বাগানের নীচ দিয়ে গাছের নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, বাগানে সব রকম ফল থাকবে, সে নিজে বৃষ্টি হয়ে যাবে এবং তার দুর্বল ও শক্তিহীন ছেলে সন্তানও বর্তমান থাকবে, এমতাবস্থায় বাগানে দাবানল আঘাত হানবে এবং বাগানটি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? আল্লাহ তাআলা এমনভাবে তোমাদের জন্যে নজীর বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর।

এ উদাহরণে কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত যোগ করা হয়েছে, অর্থাৎ, সে বৃদ্ধ হয়ে গেল, তার সন্তান-সন্ততিও আছে এক সন্তানগুলো অক্ষমবয়স্ক, ফলে দুর্বল ও শক্তিহীন। এসব শর্তের উদ্দেশ্য এই যে, যৌবনে কয়টি বাগান ও শস্যক্ষেত্র জ্বলে গেলে সে পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশা করতে পারে, কিংবা যার সন্তান-সন্ততি নেই এক পুনরায় বাগান করে নেয়ার আশাও নেই, বাগান জ্বলে যাওয়ার পরও তার পক্ষে ভীষিকার ব্যাপারে তেমন চিন্তিত হওয়ার কথা নয়। একটিমাত্র লোকের ভরণ-পোষণ, কষ্টে-স্ট্রে হলেও চলে যায়। পক্ষান্তরে যদি সন্তান-সন্ততিও থাকে এবং পিতার কাছে সহযোগিতা ও সাহায্য করার মত বলিষ্ঠ যুবক ও সংসন্তান-সন্ততি থাকে, তবুও বাগান ধ্বংস হওয়ার দরুন তেমন বেশী চিন্তা ও ব্যথার কারণ নেই। কেননা, সে সন্তান-সন্ততির চিন্তা থেকে মুক্ত। বরং সন্তানেরা তার বোঝাও বহন করতে সক্ষম। মোটকথা এ তিনটি শর্তই মুখাপেক্ষিতার তীব্রতা বর্ণনা করার জন্যে যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ, সে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করে বাগান করলো, বাগান ভৈরী হয়ে ফলও দিতে লাগলো, এমতাবস্থায় সে বৃদ্ধ হয়ে পড়লো। তার সন্তান-সন্ততিও বর্তমান এবং সন্তানগুলো অক্ষম বয়স্ক ও দুর্বল। এহেন মুহূর্তে যদি ভৈরী-বাগান জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তীব্র আঘাত ও অপরিণাম কষ্টেরই কথা।

পূর্ণ আয়াতের সারমর্ম এই যে, সদকা ও খয়রাত আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হওয়ার একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে এখলাস। অর্থাৎ, ঋণি নিয়তে ও অন্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই ব্যয় করতে হবে; নাম-যশের উদ্দেশ্যে নয়।

এখন সমগ্র রুক্কুর সবগুলো আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহর পথে ব্যয় ও সদকা খয়রাত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য ছয়টি শর্ত জানা যাবে।

প্রথমতঃ যে ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয়, তা হালাল হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সুন্যহ অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। তৃতীয়তঃ বিশুদ্ধ খাতে ব্যয় করতে হবে। চতুর্থতঃ খয়রাত দিয়ে অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাবে না। পঞ্চমতঃ যাকে দান করা হবে, তার সাথে এমন ব্যবহার করা যাবে না, যাতে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। ষষ্ঠতঃ যা কিছু ব্যয় করা হবে, ঋণি নিয়তের সাথে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই করতে হবে—নাম-যশের জন্যে নয়।

দ্বিতীয় শর্ত, অর্থাৎ, সুন্যহ অনুযায়ী ব্যয় করার অর্থ এই যে, আল্লাহর পথে ব্যয় করার সময় কোন হকদারের হক যাতে নষ্ট না হয়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বীয় পোষ্যদের প্রয়োজনীয় খরচাদি তাদের অনুমতি ছাড়া বন্ধ অথবা হ্রাস করে দান-খয়রাত করা কোন সওয়াবের কাজ নয়। জবাবগ্রস্ত ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করে সব ধন-সম্পদ খয়রাত করা কিংবা ওয়াকফ করে দেয়া সুন্যহর শিক্ষার পরিপন্থী। এ ছাড়া আল্লাহর পথে ব্যয় করার হাজারো পন্থা রয়েছে।

সুন্যত দান এই যে, গুরুত্ব ও প্রয়োজনের তীব্রতার দিকে লক্ষ্য রেখে ঋণি নির্বাচন করতে হবে। ব্যয়কারীরা সাধারণতঃ এ দিকে লক্ষ্য রাখে না।

তৃতীয় শর্তের সারমর্ম এই যে, নিজ ধারণা মতে কোন কাজকে স্বেচ্ছাক্রমে মনে করে সেই খাতে ব্যয় করাই সওয়াব হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নম্র বরং ঋণি শরীয়তের বিচারে বৈধ ও পছন্দনীয় কিনা, তা দেখাও দ্রষ্টব্য। যদি কেউ অবৈধ খেলাধুলার জন্যে স্বীয় সহায় সম্পত্তি ওয়াকফ করে দেয়, তবে সে সওয়াবের পরিবর্তে আযাবের যোগ্য হবে। শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়—এমন সব কাজের বেলায় এ কথাই প্রযোজ্য।

পূর্ববর্তী রুক্কুতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার বর্ণনা ছিল। এখন এর সাথেই সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আলোচ্য রুক্কুর সাতটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

এর বিবরণ নিম্নরূপঃ **غَيْرِ حَيْدٍ** **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** **طَبِيع** শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'উৎকৃষ্ট'। কেউ কেউ দান করার জন্যে নিকৃষ্ট বস্তু নিয়ে আসত। এর পরিশ্রেক্ষিতেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কোন কোন তফসীরকার শব্দের ব্যাপকতা দৃষ্টে এর অর্থ করেছেন 'হালাল'। কেননা, মাল পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট তখনই হয়, যখন তা হালাল হয়। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতে হালালেরও তাকীদ হবে। তবে ধর্মমতে তফসীর অনুযায়ী অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, খয়রাতের মাল হালাল এবং উৎকৃষ্ট দু'টোই হওয়া শর্ত। মনে রাখা দরকার যে, আয়াতে উৎকৃষ্ট মাল দেয়ার নির্দেশ ঐ ব্যক্তির জন্যে, যার কাছে উৎকৃষ্ট বস্তু থাকা সত্ত্বেও মন্দ ও নিকৃষ্ট বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করে। **مَكْسَبٌ** এবং **أَرْحَبٌ** শব্দ, দ্বারা বোঝা যায় যে, উৎকৃষ্ট বস্তু বিদ্যমান রয়েছে। আর **وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ** বাক্য দ্বারা বোঝা যায় যে, সে ইচ্ছাকৃতভাবে একেজো জিনিষ ব্যয় করে। পক্ষান্তরে যার কাছে মূলতঃই উৎকৃষ্ট বস্তু নেই, সে এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। সে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করলেও গ্রহণীয় হবে।

مَكْسَبٌ শব্দ থেকে কোন কোন আলেম মাসআলা চয়ন করেছেন যে, পিতা পুত্রের উপার্জন ভোগ করতে পারে, এটা জায়েয। কেননা, মহানবী (সাঃ) বলেন,—তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের উপার্জনের একটি পুত্রঃপবিত্র অংশ। অতএব, তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে সন্তান-সন্ততির উপার্জন ভক্ষণ কর।—(কুরতুবী)

শব্দ ক্ষেত্রের ওশর-বিধিঃ **وَمِمَّا أَرْحَبُ الْكَرْمِ الْكَرْمُ** বাক্যে **أَرْحَبُ** শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওশরী জমিতে (যে যমীনের উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ ইসলামী বিধান অনুযায়ী সরকারী তহবিলে জমা দিতে হয়) যে ফসল উৎপন্ন হয়, তার এক-দশমাংশ দান করা ওয়াজিব। আয়াতের ব্যাপকতাদৃষ্টে ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) বলেন যে, ওশরী জমিতে ফসল অল্প হোক বা বেশী হোক ওশর দেয়া ওয়াজিব। সূরা আন'আমের **وَالْأَوْحَاقِ يَوْمَ حَصَادٍ** আয়াতটি ওশর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশসূচক।

'ওশর' ও 'খেরাজ' ইসলামী শরীয়তের দু'টি পারিভাষিক শব্দ। এ দু'য়ের মধ্যে একটি বিষয় অভিন্ন। উভয়টিই ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভূমির উপর আরোপিত কর। পার্থক্য এই যে, 'ওশর' শুধু কর নয়, এতে আর্থিক এবাদতের দিকটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ; যেমন—যাকাত। একারণেই ওশরকে 'যাকাতুল'—'আরদ' বা ভূমির যাকাতও বলা হয়। পক্ষান্তরে খেরাজ শুধু করকে বোঝায়। এতে এবাদতের কোন দিক নেই। মুসলমানরা এবাদতের যোগ্য ও অনুসারী। তাই তাদের কাছ থেকে ভূমির উৎপন্ন ফসলের যে অংশ নেয়া হয়, তাকে 'ওশর' বলা হয়। অ-মুসলিমরা এবাদতের যোগ্য নয়। তাই তাদের ভূমির উপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে 'খেরাজ' বলা হয়। যাকাত ও ওশরের মধ্যে কার্যতঃ আরও পার্থক্য এই যে, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পণ্য সামগ্রির উপর বহুরাস্তে যাকাত ওয়াজিব হয়, কিন্তু ওশরী জমিনে উৎপাদনের সাথে সাথেই ওশর ওয়াজিব হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, জমিনে ফসল উৎপন্ন না হলে ওশর দিতে হয় না। কিন্তু পণ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ-রৌপ্যে মুনাফা না হলেও বহুরাস্তে যাকাত ফরয হবে। ওশর ও খেরাজের বিস্তারিত ফেকাহ গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য।

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَمَا يَكُورُ إِلَّا أُولُوكِ الْإِبَابِ

যখন কারও মনে এ ধারণা জন্মে যে, দান-খয়রাত করলে ফকীর হয়ে যাবে, বিশেষতঃ আল্লাহ তাআলার তাকীদ শুনেও স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করার সাহস না হয় এবং খোদায়ী ওয়াদা থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানী ওয়াদার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তখন বুঝে নেয়া উচিত যে, এ প্ররোচনা শয়তানের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। এখানে একরূপ বলা ঠিক নয় যে, আমরা তো শয়তানের চেহারাও দেখিনি—প্ররোচনা ও নির্দেশ নেয়া দূরের কথা। পক্ষান্তরে যদি মনে ধারণা জন্মে যে, সদকা-খয়রাত করলে গোনাহ্ মাফ হবে এবং ধন-সম্পত্তিও বৃদ্ধি পাবে ও বরকত হবে, তখন মনে করতে হবে, এ বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে। এমতাবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আল্লাহর ভাণ্ডারে কোন কিছুই অভাব নেই। তিনি সবার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং নিয়ত ও কর্ম সম্পর্কে সত্যক পরিজ্ঞাত।

মানত সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত। তিনি এগুলোর প্রতিদানও দেনেন। সীমা ও শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে উৎসাহিত করা এবং লক্ষ্য না রাখার জন্য গীতি-প্রদর্শন করার লক্ষ্যেই একথা শোনান হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা প্রয়োজনীয় শর্তাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখে না, তাদেরকে স্পষ্টভাবে স্মৃতিবাণী শুনিয়ে দেয়া হয়েছে।

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ بُعِثَآهَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

বাহ্যতঃ এ আয়াতে ফরয ও নফল সব রকম দান-খয়রাতকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রকার দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই উত্তম। এতে ধর্মীয় ও বৈষয়িক উভয় প্রকার উপকারিতাই বর্তমান। ধর্মীয় উপকারিতা এই যে, এতে রিয়া তথা লোক দেখানোর সম্ভাবনা নেই এবং দান গ্রহণকারীও লজ্জিত হয় না। বৈষয়িক উপকারিতা এই যে, স্বীয় অর্থের পরিমাণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। গোপনীয়তা উত্তম হওয়ার মানে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম হওয়া। সুতরাং অপবাদ খণ্ডন করা, অন্যে তা অনুসরণ করবে এমন আশা করা ইত্যাদি কারণে যদি কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম বিবেচিত হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়।

وَيَذْكُرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ গোপনে দান করার সাথেই গোনাহর হাফ্ফারও সম্পর্কযুক্ত নয়— শুধু এ বিষয়ে সতর্ক করার জন্যে গোপনীয়তার পার্শ্বে একে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, গোপন দান করার মধ্যে যদি তুমি কোন বাহ্যিক উপকার না দেখ, তবে বিষণ্ণ হওয়া উচিত নয়। কেননা, তোমার গোনাহ আল্লাহ মাফ করবেন। এটা তোমার বিরাট উপকার।

لَيْسَ عَلَيْكَ حُذُودُهُ وَأَن تُمْرَ لَا تَحْطُونَ

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতে আসলে তোমাদের নিয়তও থাকে নিজেদেরই উপকার লাভ করা এবং বাস্তবও এর দ্বারা বিশেষভাবে তোমাদেরই উপকার হবে। এমতাবস্থায় দান-খয়রাত করলে তা শুধুমাত্র মুসলমানকেই দেবে— কানফেরকে দেবে না, এ বিশেষ পথে এ উপকার লাভ করতে চাও কেন? এটি অতিরিক্ত বিষয়। এর প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়।

এখানে আরও বুঝে নেয়া দরকার যে, এ সদকা অর্থ নফল সদকা, যা ফিস্বী কানফেরকেও দেয়া জায়েয। এখানে সদকা বলতে ফরয সদকা বোঝান হয়নি। ফরয সদকা মুসলমান ছাড়া কাউকে দেয়া জায়েয নয়।— (মযহারী)

মাসআলা : দারুল-হরবের কানফেরদেরকে কোন প্রকার দান-খয়রাত দেয়া জায়েয নয়।

মাসআলা : ফিস্বী কানফের অর্থাৎ, যে দারুল-হরবের নয়, তাকে শুধু দাকাত ও ওশর দান করা জায়েয নয়, অন্যান্য সব ওয়াজিব ও নফল

সদকা দান করা জায়েয। আলোচ্য আয়াতে যাকাত অন্তর্ভুক্ত নয়।

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْسَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

এখানে ফকীর বলতে ঐ সকল লোককে বোঝান হয়েছে, যারা ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্য কোন কাজ করতে পারে না।

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ এ আয়াত থেকে জানা যায়

যে, কোন ফকীরকে যদি মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়, তবে এ কারণে তাকে ধনী মনে করা হবে না; বরং ফকীরই বলা হবে। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাত দান করাও দূরন্ত হবে।— (কুরতুবী)

تَرْتَفِعُهُم بِسَيِّئَاتِهِمْ এতে বোঝা যায় যে, লক্ষ্যাদি দেখে বিচার করা

অশুদ্ধ নয়। কাজেই যদি এমন কোন বেওয়াশির মৃতদেহ পাওয়া যায়, যার দেহে পৈতা আছে এবং সে খতনাকৃতও নয়, তবে তাকে মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করা যাবে না।— (কুরতুবী)

لَا يَسْتَوُونَ الْكَاثِرُ الْخَالِفُ এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে,

তারা পথ আগলিয়ে সওয়ালা করে না। কিন্তু পথ না আগলিয়েও সওয়ালা করে না— এরূপ বোঝা যায় না। কোন কোন তফসীরকার তাই বলেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরকারদের মতে এর অর্থ এই যে, তারা মোটেই সওয়ালা করে না। الْمَسْأَلَةُ عَنْ غَفَّةٍ تامة কারণ, তারা সওয়ালা করা থেকে নিজেদেরকে পুরোপুরি নিরাপদ দূরত্বে রাখে।— (কুরতুবী)

أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيُسِّدُوا لَهَا وَاللَّهُ

লোকের বিরাট প্রতিদান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা আল্লাহর পথে ব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা রাত্র-দিনে, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সবসময় ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, দান-খয়রাতের জন্যে কোন সময় নির্দিষ্ট নেই, দিবারাত্রিরও কোন প্রভেদ নেই। এমনিভাবে গোপনে ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে আল্লাহর পথে ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত এই যে, ঋণটি নিয়তে দান করতে হবে। নাম-যশের নিয়ত থাকলে চলবে না। প্রকাশ্যে ব্যয় করার কোন প্রয়োজন দেখা না দেয়া পর্যন্তই গোপনে দান করার শ্রেষ্ঠত্ব সীমাবদ্ধ। যেখানে এরূপ প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে প্রকাশ্যে দান করাই শ্রেয়।

ইবনে-আসাকের-এর বরাত দিয়ে রুহুল-মা'আনীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একবার দশ হাজার দেহরহাম দিনে, দশ হাজার দেহরহাম রাত্রে, দশ হাজার দেহরহাম গোপনে ও দশ হাজার দেহরহাম প্রকাশ্যে, এভাবে মোট চল্লিশ হাজার দেহরহাম আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। কোন কোন তফসীরকার হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর এ ঘটনাকে আয়াতের শানে-নুহুল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য এ আয়াতের শানে-নুহুল সম্পর্কে আরও বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে ‘রিবা’ অর্থাৎ সুদের অবৈধতা ও তার বিধি-বিধান সম্পর্কিত বর্ণনা শুরু হয়েছে। এ প্রশুটি কয়েকদিক দিয়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে সুদের কারণে কোরআন ও সুন্নাহ কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে সুদ বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। সুদের কবল থেকে মুক্তি লাভ করার পথে যেসব অসুবিধা ও জটিলতা বিদ্যমান, সেগুলোর তালিকা সুদীর্ঘ। তাই বিষয়টি কয়েক দিক দিয়েই আলোচনা সাপেক্ষ।

প্রথমে এ ব্যাপারে কোরআনী আয়াতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও সহীহ হাদীসসমূহের বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় সুদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে এবং দেখতে হবে সুদ কোন কোন ব্যবসা-বাণিজ্যে পরিব্যাপ্ত, এর অবৈধতা কোন রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল এবং এতে কি ধরনের অনিষ্ট বিদ্যমান?

সুদের দ্বিতীয় দিক হচ্ছে যৌক্তিক ও অর্থনৈতিক। অর্থাৎ, বাস্তবিকই কি সুদ বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নতির নিশ্চয়তা দিতে পেরেছে? একে উপেক্ষা করলে এর অবশ্যস্বাবী পরিণতি হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাধারণ অর্থনীতির প্রাচীর কি ধসে যাবে, না গোটা ব্যাপারটাই শুধু আল্লাহ ও পরকালে অবিশ্বাসী মস্তিস্কসমূহের উদ্ভট ফসল? নতুবা সুদ ছাড়াও সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে—শুধু সমস্যার সমাধানই নয়; বরং বিশ্বে অর্থনৈতিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুদ বর্জনের উপরই নির্ভরশীল, সুদই বিশ্বে অর্থনৈতিক অশান্তি ও অস্থিরতার মূল ও প্রধান কারণ?

এই আলোচনাটি একটি অর্থনৈতিক বিষয়। এর আগুয় অনেকগুলো মৌলিক ও আনুষঙ্গিক সুদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। কোরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এসব আলোচনাও কম দীর্ঘ নয়।

আলোচ্য ছয়টি আয়াতে সুদের অবৈধতা ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যে সুদখোরদের মন্দ পরিণতি এবং হাশরের ময়দানে তাদের লাজুনা ও ভ্রষ্টতার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা সুদ খায়, তারা দণ্ডায়মান হয় না; কিন্তু সে ব্যক্তির মৃত্যু, যাকে কোন শয়তান জিন আসর করে দিশেহারা করে দেয়। হাদীসে বলা হয়েছে : দণ্ডায়মান হওয়ার অর্থ হাশরের ময়দানে কবর থেকে উঠা। সুদখোর যখন কবর থেকে উঠবে, তখন ঐ পাগল বা উন্মাদের মত উঠবে, যাকে কোন শয়তান-জিন দিশেহারা করে দেয়।

এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, জিন ও শয়তানের আসরের ফলে মানুষ অজ্ঞান কিংবা উন্মাদ হতে পারে। অভিজ্ঞ লোকদের উপপূর্ণি অভিজ্ঞতাও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। হাকীম ইবনে কাইয়্যাম জওহী (রহঃ) লিখেছেন : চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকগণও স্বীকার করেন যে, মূগীরোগ, মূর্ছারোগ, কিংবা পাগলামী বিভিন্ন কারণে হতে পারে। মাঝে মাঝে জিন ও শয়তানের আসরও এর কারণ হয়ে থাকে। যারা বিষয়টি অস্বীকার করে, তাদের কাছে বাহ্যিক অসম্ভাব্যতা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ বর্তমান নেই।

আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সুদখোরেরা হাশরে উন্মাদ অবস্থায় উঠিত হবে— কোরআন পাক সোজাসুজি একথা বলেনি, বরং পাগলামী ও অজ্ঞানতার বিশেষ একটি প্রকার উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ, শয়তান আসর করে দিশেহারা করে দিলে যেভাবে উঠে, সেভাবে উঠবে। এতে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, অজ্ঞান ও পাগল ব্যক্তি মাঝে মাঝে যেমন চূপচাপ পড়ে থাকে তাদের অবস্থা তেমন হবে না; তারা শয়তান

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُوا الَّذِينَ
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا الْبَائِعُونَ
وَمَثَلُ الرِّبَا وَآخِلُ اللَّهِ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٨﴾
يَنْهَى اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَاقَاتِ وَاللَّهُ لَأَحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ آثِمٍ ﴿٢٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قُلْ
لَمْ تَكُنْ لَكُمْ فَاذَنٌ يَحْرِبُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَنْ تَكُونُوا
فَلَكُمْ دُؤْلٌ وَكُنْ لَكُمْ لُطْفٌ مِنَ اللَّهِ وَلَا تَكْفُرُوا ﴿٣٢﴾ وَلَا
كَانَ دُؤْلُهُمْ أَنْ يَكُونُوا إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ يَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ وَأَقْبَلُوا يَوْمَ تُنْفَخُ السُّورُ
إِلَى اللَّهِ تَكُونُ كُلُّ نَفْسٍ لَهَا سَكْبَةٌ وَهُمْ لَظُفْمُونَ ﴿٣٤﴾

(২৭৫) যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দণ্ডায়মান হবে, যেভাবে দণ্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছে : ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদ নেয়ারই মত। অথচ আল্লাহ তাআলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোষাচারে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে। (২৭৬) আল্লাহ তাআলা সুদকে নিষিদ্ধ করেন এবং দান-খরাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে। (২৭৭) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সংকাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্যে তাদের পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (২৭৮) হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। (২৭৯) অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না। (২৮০) যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (২৮১) ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।

কর্তৃক মাতাল করা লোকদের মত প্রলাপাতি ও অন্যান্য পাগলসুলভ
রাগ-কীর্তি দ্বারা পরিচিত হবে।

সম্ভবতঃ এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, রোগবশতঃ অজ্ঞান কিংবা
পাগল হওয়ার পর চেতনাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। এরূপ ব্যক্তিই কষ্ট
কিংবা শাস্তি অনুভব করতে পারে না। এমনি হবে সুদখোরদের অবস্থা।

এখন দেখতে হবে যে, অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে যে মিল থাকা দরকার,
তা এখানে আছে কি না? আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে শাস্তি কোন
ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে কোন অপরাধের কারণে দেয়া হয়, তার সাথে
অপরাধের অবশ্যই মিল থাকে। হাশরে সুদখোরদেরকে মাতাল অবস্থায়
উত্তিত করার মধ্যে সম্ভবতঃ এ বিষয়ের অভিব্যক্তি রয়েছে যে, সুদখোর
টাকা-পয়সার লালসায় এমন বিভোর হয়ে পড়ে যে, কোন দরিত্রের প্রতি
তার মনে সামান্য দয়ারও উদ্রেক হয় না এবং লজ্জা-শরম তাকে বাধা
দিতে পারে না। সে প্রকৃতপক্ষে জীবদশায়ও অজ্ঞানই ছিল। তাই হাশরেও
তাকে এ অবস্থায়ই উঠানো হবে। অথবা এ শাস্তি দেয়ার কারণ এই যে, সে
যেহেতু দুনিয়াতে স্বীয় নির্বুদ্ধিতাকে বুদ্ধির আবরণে প্রকাশ করেছে এবং
ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ আখ্যা দিয়েছে, তাই তাকে নির্বোধ করে
উঠানো হবে।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদ খাওয়ার কথা
বলা হয়েছে। অথচ এর অর্থ হচ্ছে সুদ-গ্রহণ করা ও সুদ ব্যবহার করা,
খওয়ার জন্য ব্যবহার করুক, কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী অথবা
আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহার করুক। কিন্তু বিষয়টি ‘খাওয়া’ শব্দ দ্বারা
ব্যক্ত করার কারণ এই যে, যে বস্তু খেয়ে ফেলা হয়, তা আর ফেরৎ
দেয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। অন্য রকম ব্যবহারে ফেরৎ দেয়ার
সম্ভাবনা থাকে। তাই পুরোপুরি আভাসাৎ করার কথা বোঝাতে গিয়ে
‘খেয়ে ফেলা’ শব্দ দ্বারা বোঝান হয়। শুধু আরবী ভাষা নয়, অধিকাংশ
ভাষার সাধারণ বাকপদ্ধতিও তাই।

এরপর দ্বিতীয় বাক্যে সুদখোরদের এ শাস্তির কারণ বর্ণিত হয়েছে,
তারা দু’টি অপরাধ করেছে : (এক) সুদের মাধ্যমে হারাম খেয়েছে। (দুই)
সুদকে হালাল মনে করেছে এবং যারা একে হারাম বলেছে, তাদের উত্তরে
বলেছে : “ক্রয়-বিক্রয়ও তো সুদেরই অনুরূপ। সুদের মাধ্যমে যেমন
মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেও মুনাফাই উদ্দেশ্য হয়ে
থাকে। অতএব, সুদ হারাম হলে ক্রয়-বিক্রয়ও তো হারাম হওয়া উচিত।”
অথচ কেউ বলে না যে, ক্রয়-বিক্রয় হারাম। এ ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ তাদের বলা
উচিত ছিল যে, সুদও তো ক্রয়-বিক্রয়ের মতই। ক্রয়-বিক্রয় যখন হালাল
তখন সুদও হালাল হওয়া উচিত। কিন্তু তারা বর্ণনাদৃষ্টি পাল্টিয়ে যারা
সুদকে হারাম বলতো, তাদের প্রতি এক প্রকার উপহাস করেছে যে,
তোমরা সুদকে হারাম বললে ক্রয়-বিক্রয়কেও হারাম বল।

তৃতীয় বাক্যে আল্লাহ তাআলা তাদের এ উক্তির জওয়াবে বলেছেন
যে, এরা ক্রয়-বিক্রয়কে সুদের অনুরূপ ও সমতুল্য বলেছে, অথচ
আল্লাহর নির্দেশের ফলে এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য
বিদ্যমান। কারণ, আল্লাহ তাআলা একটিকে হালাল এবং অপরটিকে
হারাম করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় উভয়টি কেমন করে সমতুল্য হতে
পারে?

এ জওয়াবে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, সুদখোরদের আপত্তি ছিল
যুক্তিগত। অর্থাৎ, মুনাফা উপার্জনই যখন উভয় লেন-দেনের লক্ষ্য, তখন
হারাম-হালালের ব্যাপারে উভয়টি একই রকম হওয়া উচিত। আল্লাহ

তাআলা তাদের যুক্তিনির্ভর আপত্তির জওয়াব যুক্তিগতভাবে পার্থক্য
বর্ণনার মাধ্যমে দেননি; বরং বিজ্ঞানোচিত ভঙ্গিতে দিয়েছেন যে, আল্লাহ
তাআলাই সব কিছু একমাত্র অধিপতি এবং বস্তুর লাভ-ক্ষতি ও ভালমন্দ
সম্পর্কে তিনি পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি যখন একটিকে হালাল ও
অপরটিকে হারাম করেছেন, তখন এতেই বুঝে নেয়া যায় যে, তিনি যে
বস্তুকে হারাম করেছেন, তার মধ্যে অবশ্যই কোন অনিষ্ট, ক্ষতি বা
অপবিপ্রতা রয়েছে—সাধারণ মানুষ তা অনুভব করুক বা নাই করুক।
কেননা, সমগ্র বিশু ব্যবহার পূর্ণ স্বরূপ ও লাভ-ক্ষতি পুরোপুরিভাবে
একমাত্র ঐ মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞই জানতে পারেন যার জ্ঞান থেকে পৃথিবীর
কণা পরিমাণ বস্তুও লুক্কায়িত নয়। বিশ্বেশ ব্যক্তিগণ ও সম্প্রদায়সমূহ নিজ
নিজ লাভ-ক্ষতি জানতে পারলেও সমগ্র বিশ্বেশের লাভ-লোকসান
পুরোপুরিভাবে জানতে পারে না। কোন কোন বস্তু কোন ব্যক্তি অথবা
সম্প্রদায়ের পক্ষে লাভজনক হয়, কিন্তু গোটা জাতি কিংবা গোটা দেশের
জন্যে তাতে ক্ষতি নিহিত থাকে।

এরপর তৃতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, সুদ হারাম হওয়ার পূর্বে যে
ব্যক্তি সুদের অর্থ অর্জন করেছিল, সুদ হারাম হওয়ার পর সে যদি
ভবিষ্যতের জন্যে তওবা করে নেয় এবং সুদ থেকে বিরত থাকে, তবে
পূর্বকার সঙ্কিত অর্থ শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী তারই অধিকারভুক্ত হয়ে
গেছে। পক্ষান্তরে, সে সর্বান্তকরণেই বিরত রয়েছে কি কপটতা সহকারে
তওবা করেছে— তার এ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারটি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল
থাকবে।

মনে প্রাণে তওবা করে থাকলে আল্লাহর কাছে তা উপকারী হবে,
অনাখ্যা তা তওবা না করারই মত। তার প্রতি সাধারণ লোকদের খারাপ
ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। যে উপদেশ শুনেও উপরোক্ত উক্তি ও
কার্যে পুনরায় লিপ্ত হয়, তার এ কার্যে (সুদ গ্রহণ করা) গোনাহ হওয়ার
কারণে সে দোষখে যাবে এবং তার এ উক্তিতে (অর্থাৎ, সুদ
ক্রয়-বিক্রয়েরই মত হালাল) কুফর হওয়ার কারণে সে চিরকাল দোষখে
অবস্থান করবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা সুদকে নিষিদ্ধ করেন
এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। এখানে একটি বিশেষ সামঞ্জস্যের
কারণে সুদের সাথে দান-খয়রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, সুদ ও
খয়রাত উভয়ের স্বরূপ যেমন পরস্পর বিরোধী, উভয়ের পরিণামও
তেমনি পরস্পর বিরোধী। আর সাধারণতঃ যারা এসব কাজ করে, তাদের
উদ্দেশ্য এবং নিয়তও পরস্পর বিরোধী হয়ে থাকে।

স্বরূপের বিরোধ এই যে, সদকা ও খয়রাতে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই
নিজ অর্থ-সম্পদ অপরকে দেয়া হয় এবং সুদে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই
অপরের অর্থ-সম্পদ নিয়ে নেয়া হয়। এ দু’টি কাজ যারা করে, তাদের
নিয়ত ও উদ্দেশ্য পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণ এই যে, খয়রাতকারী
ব্যক্তি শুধু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও পরকালীন সওয়াবের জন্যে স্বীয়
অর্থ-সম্পদ হ্রাস কিংবা নিঃশেষ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পক্ষান্তরে সুদ
গ্রহণকারী ব্যক্তি তার বর্তমান অর্থ-সম্পদকে অবৈধভাবে বৃদ্ধি করার উদগ্র
বাসনা পোষণ করে থাকে। পরিণতির পরস্পর বিরোধিতা কোরআন
পাকের আলোচ্য আয়াত থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলা হয়েছে :
আল্লাহ তাআলা সুদ দ্বারা অর্জিত ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত মিটিয়ে
দেন এবং খয়রাতকারীর ধন-সম্পদ কিংবা তার বরকত বাড়িয়ে দেন।
সারকথা এই যে, যারা ধন-সম্পদের লোভ করে না, সম্পদ হ্রাসে সম্মত
হওয়া সত্ত্বেও তাদের ধন-সম্পদ কিংবা ধন-সম্পদের ফলাফল, বরকত ও

উপকারিতা বেড়ে যায়।

এখানে প্রশিমানযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে সুদকে যেটোনা আর দান-খয়রাতকে বর্ধিত করার উদ্দেশ্য কি? কোন কোন তফসীরকার বলেন : এ যেটোনা ও বাড়ানো পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সুদখোরের ধন-সম্পদ পরকালে তার কোনই কাজে আসবে না; বরং তা তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে দান-খয়রাতকারীদের ধন-সম্পদ পরকালে তাদের জন্যে চিরস্থায়ী নেয়ামত ও শান্তিলাভের উপায় হবে। এ ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট। এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। সাধারণ তফসীরকারগণ বলেন : সুদকে যেটোনা এবং দান-খয়রাতকে বাড়ানো পরকালে তো হবেই, কিন্তু এর কিছু কিছু লক্ষণ দুনিয়াতেও প্রত্যক্ষ করা যায়।

যে সম্পদের সাথে সুদ মিশ্রিত হয়ে যায়, অধিকাংশ সময় সেগুলো তো ধ্বংস হয়ই, অধিকন্তু আগে যা ছিল, তাও সাথে নিয়ে যায়। সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে প্রায় সময়ই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হতে দেখা যায়। অজস্র পুঞ্জির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে দেউলিয়া ও ফকীরে পরিণত হয়। সুদবিহীন ব্যবসা-বাণিজ্যেও লাভ-লোকসানের সম্ভাবনা থাকে এবং অনেক ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্তও হয়; কিন্তু গতকাল যে কোটিপতি ছিল, আজ সে পথের ভিখারী, এমন ক্ষতি শুধু সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। লোক সমাজে অসংখ্য বর্ণনা-বিবৃতি এ ব্যাপারে সুবিদিত যে, সুদের মাল তাৎক্ষণিকভাবে যতই প্রবৃদ্ধি লাভ করুক না কেন, তা সাধারণতঃ স্থায়ী হয় না। সম্ভান-সন্ততি ও বংশধররা তা ভোগ করতে পারে না। প্রায়ই কোন না কোন বিপর্যের মুখে তা ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত মা' মার (রহঃ) বলেন : আমি বুয়ুর্গদের মুখে শুনেছি, চল্লিশ বছর যেতে না যেতেই সুদখোরের ধন-সম্পদে ভাটা আরম্ভ হয়ে যায়।

যদি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ধন-সম্পদের ধ্বংস দেখা নাও যায়, তবুও তার উপকারিতা, বরকত ও ফলাফল থেকে বঞ্চনা নিশ্চিত ও অবশ্যজ্ঞাবী। কেননা, এটা সুস্পষ্ট যে, স্বর্ণ-রৌপ্য স্বয়ং উদ্দেশ্যও নয় এবং উপকারীও নয়। স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা কারও ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটে না, কিংবা শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তা গায়ে জড়ানো কিংবা বিছানোও যায় না। তদুপরি এর উপার্জন ও সেরক্ষণে হাজারো কষ্ট স্বীকার করতে হয়। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির মতে এত সব কষ্ট স্বীকার করার কারণ এছাড়া অন্য কিছু নয় যে, স্বর্ণ-রৌপ্য এমন কতগুলো বস্তু অর্জন করার উপায়, যার সাহায্যে মানুষের জীবন সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয় এবং সে আরাম ও সম্মানজনক জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। মানুষ নিজে যে আরাম ও সম্মান অর্জন করেছে, তার সম্ভান সন্ততিও তা ভোগ করুক, এ বাসনা মানুষের স্বভাবজাত।

এগুলোই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপকারিতা ও ফলাফল। এরই পরিশ্রেক্ষিতে একথা বলা ভুল হবে না যে, যে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও ফলাফল লাভ করতে সক্ষম হয়, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে বেড়ে যায়; যদিও চর্মচক্ষে তা কম বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপকারিতা ও ফলাফল কম অর্জন করে, তার ধন-সম্পদ একদিক দিয়ে হ্রাস পায়; যদিও চর্মচক্ষে তা অধিক মনে হয়ে থাকে।

একথা উপলব্ধি করে নেয়ার পর এবার সুদের কারবারে দান-খয়রাতের ব্যাপারটি পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আপনি প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারবেন যে, সুদখোরের ধন-সম্পদ যদিও ক্রমবর্ধিষ্ণু দেখা যায়, কিন্তু এ বর্ধিষ্ণুতা পাণ্ডুরোগীর দেহ ফুলে মোটা হয়ে যাওয়ারই মত। ফুলে যাওয়ার ফলে যে বর্ধিষ্ণুতা আসে তাও দেহেরই বৃদ্ধি, কিন্তু কোন সমঝদার মানুষই

এ বর্ধিষ্ণুতাকে পছন্দ করতে পারে না। কেননা, সে জানে যে, এ বর্ধিষ্ণুতা মৃত্যুর বার্তাবহ। এমনভাবে সুদখোরের ধন-সম্পদ যতই ক্রমবর্ধমান দেখা যাক না কেন, সে এর উপকারিতা ও ফলাফল অর্থাৎ, আরাম ও সম্মান থেকে সর্বদাই বঞ্চিত থাকে।

এখানে হযরত কারও মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, আজকাল তো সুদখোরদেরই আধিপত্য বেশী। আরাম ও সম্মান তো দেখা যায় তাদেরই করায়ত্ত। দেখা যায়, তারাই প্রাসাদোপম বাড়ী-ঘরের মালিক। আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের যাবতীয় সামগ্রীও তাদেরই হাতের মুঠোয়। পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বসবাসের প্রয়োজনীয় এক প্রয়োজন্যতিরিক্ত আসবাব-পত্রেরও তাদের অভাব নেই। নকর, চাকর এবং শান-শওকতের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম তাদেরই কাছে বিনাম্যান। কিন্তু চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে, আরামের সাজ-সরঞ্জাম তো কারখানায় নির্মিত এবং তা বাজারেও বিক্রি হয়। স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে তা অর্জনও করা যায়। কিন্তু যার নাম আরাম ও শান্তি, তা কোন কারখানায় নির্মিত হয় না বরং বাজারেও বিক্রয় হয় না। তা এমন একটি রহমত, যা সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই আসে। অনেক সময় বিস্তারিত সরঞ্জাম সত্ত্বেও তা অর্জিত হয় না। একটি নিদ্রা-সুখের কথাই ধরুন। এর জন্যে মনোরম বাসগৃহ নির্মাণ করা যায়, সুখ আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা যায়, আসবাব-পত্র সুদৃশ্য ও মনোরম করা যায় এবং ইচ্ছামত নরম বিছানা ও খাট যোগাড় করা যায়, কিন্তু এতদস সাজ-সরঞ্জাম যোগাড় হলেই কি সুখ নিদ্রা অবশ্যজ্ঞাবী? আপনার হয়তো এ অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু হাজারো মানুষ এ প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলে—যাদের কোন বিপত্তির কারণে নিদ্রা আসে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হত সম্পদশালী দেশ সম্পর্কিত কোন কোন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, সেখানে শতকরা পঁচাত্তর জন মানুষ ঘুমের বড়ি ব্যবহার না করে ঘুমেতেই পারে না এবং মাঝে মাঝে বড়িও তাদের ঘুম আনতে ব্যর্থ হয়। ঘুমের সাজ-সরঞ্জাম আপনি বাজার থেকে কিনে আনতে পারেন, কিন্তু ঘুম কোন মূল্যেই কিনে আনতে পারেন না। অন্যান্য আরাম এবং সুখের অবস্থাও তাই।

বিষয়টি বুঝে নেয়ার পর সুদ-খোরদের অবস্থা পর্যালোচনা করুন। আপনি তাদের কাছে সবকিছু পাবেন, কিন্তু আরাম ও সুখ পাবেন না। এক কোটিকে দেড় কোটি এবং দেড় কোটিকে দু'কোটি করার চিন্তায় তাদেরকে এমন বিভোর দেখা যাবে যে, খাওয়া-পরা এবং বিবি-বান্ধাদের প্রতি লক্ষ্য করারও সময় নেই। কয়েকটি মিল-কারখানা চলছে, ভিনদেশ থেকে জাহাজ আসে—এসব নানাবিধ চিন্তার জ্বাল বোনার মধ্যেই তাদের সকাল থেকে বিকাল এবং বিকাল থেকে সকাল হয়ে যায়।

এ হচ্ছে তাদের আরাম ও সুখের অবস্থা। এখন তাদের সম্মানের অবস্থাটিও দেখে নিন। বলাবাহুল্য, সুদখোরেরা কঠোরপ্রাণ ও নির্দয়। দরিদ্রদের দারিদ্র্য এবং স্বল্প পুঞ্জিওয়ালাদের পুঞ্জির স্বল্পতার সুযোগ গ্রহণ করাই তাদের পেশা। দরিদ্রদের রক্ত চুষে তারা তাদের নিজেদের উন্নত স্ফীত করে তোলে। তাই জনগণের অন্তরে তাদের প্রতি ইযযত ও সম্বৎস থাকা অসম্ভব। নিজ দেশের মহাজন-ব্যবসায়ী এবং দুনিয়াজোড়া ছড়িয়ে থাকা ইহুদীদের ইতিহাস পাঠ করুন। তাদের সিন্দুক স্বর্ণ-রৌপ্যে ভরই পরিপূর্ণ হোক না কেন, জগতের কোন কোণে এবং মানবগোষ্ঠীর কোন স্তরেই তাদের সম্মান নেই। বরং তাদের এ কর্মের অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি এই যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের অন্তরে তাদের সম্পর্কে প্রতিহিংসা ও যুগপৎ ঘণারই সৃষ্টি হয়। বর্তমান বিশ্বের সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ

এ হিঙ্গা ও ঘণারই বহিঃপ্রকাশ। শ্রম ও পুঞ্জির মধ্যকার সঞ্চারই বিশেষ সমাজতান্ত্রিক মতবাদের জন্ম দিয়েছে। কম্যুনিজমের ধ্বংসাত্মক ত্বরণতা এ হিঙ্গা ও ঘণারই ফলশ্রুতি। ফলে সমগ্র বিশ্ব মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। এ হচ্ছে তাদের সুখ ও সম্পদের অবস্থা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সুদের ধন-সম্পদ সুখোরের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবনকেও কখনও সুখময় করে না। হয় তারা ধ্বংস হয়ে যায়, না হয় এর অমঙ্গলে তারাও ধন-সম্পদের সত্যিকার ফ্লাফল ভোগে বঞ্চিত হয়।

ইউরোপীয় সুদখোরদের দৃষ্টান্ত থেকে সম্ভবতঃ কেউ ঠোকা খেতে পারে যে, তারা তো সবাই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী। তাদের বংশধররাও সমৃদ্ধশালী হচ্ছে। কিন্তু প্রথমতঃ তাদের সমৃদ্ধির সংক্ষিপ্ত চিত্র এইমাত্র চুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ তাদের অবস্থা হচ্ছে এরূপঃ মনে করুন, কোন আদমখোর অন্যান্য মানুষের রক্ত চুষে নিজে দেহের লালন-পালন করে এবং এ জাতীয় কতিপয় আদমখোর কোন এক মহল্লায় বসতি স্থাপন করেছে। আপনি কাউকে এ মহল্লায় নিয়ে গিয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন। দেখা যাবে, তারা সবাই সুস্থ, সবল ও প্রফুল্ল। কিন্তু একজন দানবতার মঙ্গলকামী জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু এ মহল্লায়ই দেখবে না। সে এদের কিস্তিতে ঐসব বস্তুও দেখবে, যাদের রক্ত চুষে তাদেরকে অর্ধমৃত করে দেয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি আদম খোরদের মহল্লা এবং এসব বস্তির প্রতি লক্ষ্য করবে, সে কখনও মহল্লাবাসীদেরকে মোটা-তাজা দেখে তাদের প্রতি দৃষ্টিশীল হতে পারবে না এবং সামগ্রিক দিক দিয়ে এদের কর্মকে মানব দ্বারিত উন্নতির উপায়ও বলতে পারবে না; বরং একে মানবতার বিপর্যয় ও ধ্বংস বলে আখ্যায়িত করতে বাধ্য হবে।

এর বিপরীতে দান-খয়রাতকারীদেরকে দেখুন। তাদেরকে কখনও ধন-সম্পদের পেছনে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে দেখবেন না। সুখের সাজ-সরঞ্জাম যদিও তাদের কম, কিন্তু সাজ-সরঞ্জামওয়ালাদের চাইতে শান্তি, স্বস্তি এবং মানবিক স্বৈর্য তারা অনেকগুণ বেশী ভোগ করে থাকেন। লাবাঙ্ঘলা, এটাই প্রকৃত সুখ। দুনিয়াতে প্রত্যেকেই তাদেরকে সম্মান ও ভক্তির চোখে দেখে থাকে।

يَبْحَثُ اللَّهُ الْرَبُّوَالرُّبِّي الْقَدَّات - মোটকথা, এ আয়াতে আল্লাহ

তআলা বলেছেনঃ আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং দান-খয়রাতকে ধ্বংস করেন। এ উক্তি পরকালের দিক দিয়ে তো সম্পূর্ণ পরিষ্কার; যত্যাগপলব্বির সামান্য চেষ্টা করলে দুনিয়ার দিক দিয়েও সুস্পষ্ট। হযর (সাঃ)-এর এ উক্তির উদ্দেশ্যও তাইঃ “সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ পরিণতি হচ্ছে স্বল্পতা।”—(মুসনদে-আহমদ, ইবনে-মাজাহ)

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, وَاللَّهُ يُؤْتِي كُلَّ شَيْءٍ حَكْمًا। অর্থঃ, “আল্লাহ তাআলা কোন কাফের গোনাহ্গারকে পছন্দ করেন না।” এতে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা সুদকে হারামই মনে করে না, তারা হুকুরে লিপ্ত এবং যারা হারাম মনে করা সত্ত্বেও কার্যতঃ সুদ খায়, তারা গোনাহ্গার, পাপাচারী।

তৃতীয় আয়াতে নামায ও যাকাতের নির্দেশের প্রতি অনুগত থাকেনাশীল মুমিনদের বিরাট পুরস্কার ও পরকালীন সুখ-শান্তি বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ আয়াতের সারমর্ম হলো, সুদের নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হওয়ার পর সুদের যেসব বকেয়া অর্থ কারও কাছে প্রাপ্য ছিল, সেগুলোর লেনদেনও

হারাম।

এর ব্যাখ্যা এই যে, সুদের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবে ব্যাপকভাবে সুদী কারবারের প্রচলন ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এর নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হলে মুসলমানরা যথারীতি সুদের কাজ-কারবার পরিত্যাগ করেন। কিন্তু বনীছকীফ ও বনী-মখযুমের মধ্যে পরস্পর সুদের কারবার বহাল ছিল এবং বনী মখযুম মুসলমান হওয়ার পর সুদের টাকা পরিশোধ করাকে অবৈধ মনে করতে থাকে। আর এদিকে বনী-ছকীফ তাদের প্রাপ্য সুদ দাবী করতে থাকে। কারণ, তারা মুসলমান ছিল না, কিন্তু মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। বনী-মখযুমের বক্তব্য ছিল এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর আমরা যে হালাল উপার্জন করছি, তা সুদ পরিশোধে ব্যয় করবো না।

এ মতবিরোধের ঘটনাস্থল ছিল মক্কা মুকাররমা। তখন মক্কা বিজিত হয়ে গিয়েছিল। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে মক্কার শাসক ছিলেন হযরত মুআয (রাঃ)। অন্য রেওয়াজে মতে ইতাব ইবনে-উসায়দ (রাঃ)। তিনি নির্দেশ লাভের উদ্দেশে ঘটনার বিবরণ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট লিখে পাঠালেন। এরই প্রেক্ষিতে কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর সারমর্ম এই যে, ইসলাম গ্রহণ করার পর সুদের পূর্ববর্তী সব কাজ-কারবার অবিলম্বে মওকুফ করে দিতে হবে। অতীত সুদও গ্রহণ না করে শুধু মূলধন আদায় করতে হবে।

এই ইসলামী আইন কার্যকর হলে মুসলমানরা তো তা মানতে বাধ্য ছিলই, যেসব অমুসলিম গোত্র মুসলমানদের সাথে শান্তি-চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ইসলামী আইন কবুল করে নিয়েছিল, তারাও এই আইন মেনে নিতে বাধ্য হল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন বিদায়-হজ্জের ভাষণে এ আইন ঘোষণা করলেন, তখন একথাও প্রকাশ করলেন যে, এ আইন ব্যক্তিবিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ কিংবা মুসলমানদের আর্থিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করে নয়; বরং সমগ্র মানব সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই প্রবর্তন করা হয়েছে। তাই আমি সর্বপ্রথম অ-মুসলমানদের কাছে মুসলমানদের প্রাপ্য বকেয়া সুদের বিরাট অঙ্ক মওকুফ করে দিচ্ছি। এখন তাদেরও নিজ নিজ বকেয়া সুদের অঙ্ক ছেড়ে দিতে আপত্তি থাকা উচিত নয়।

নির্দেশটি পালন কষ্টসাধ্য ছিল বলেই নির্দেশের পূর্বে اللَّهُ أَتَى এবং নির্দেশের পরে إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ যুক্ত করা হয়েছে।

এরপর পঞ্চম আয়াতে এ নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে কঠোর শাস্তির কথা শুনানো হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা যদি সুদ পরিহার না কর, তবে আল্লাহ তাআলাও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কুফর ছাড়া অন্য কোন বৃহত্তম গোনাহের কারণে কোরআন পাকে এত বড় শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে—

وَأَنْ شَبَّهْتُمْ تِلْكَ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَحْلِلُونَهَا وَلَا تَنْظُمُونَ

অর্থাৎ, যদি তোমরা তওবা করে ভবিষ্যতের জন্যে বকেয়া সুদ ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প হও, তবে তোমরা আসল মূলধন ফেরত পেয়ে যাবে। মূলধনের অতিরিক্ত আদায় করে তোমরা কারও উপর যুলুম করতে পার না এবং কেউ মূলধন হ্রাস করে কিংবা পরিশোধে বিলম্ব করে তোমাদের উপরও যুলুম করতে পারবে না। আয়াতে মূলধন দেয়াকে তওবার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যদি তোমরা তওবা কর এবং ভবিষ্যতে সুদ ছেড়ে দিতে কৃতসংকল্প হও, তবেই তোমরা মূলধন ফেরত পাবে।

এ থেকে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, সুদ ছেড়ে দেয়ার সংকল্প করে তওবা না করলে মূলধনও পাবে না।

এরপর ষষ্ঠ আয়াতে সুদখোরীর মানবতা বিরোধী কাণ্ডকীর্তির বিপরীতে পুণঃপবিত্র চরিত্র এবং দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি কৃপামূলক ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে বলা হয়েছেঃ

وَاِنْ كَانَ دُوْعُهُمْ نَفْطُوْرًا اِلٰى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِمْ لَّكُمْ

- অর্থাৎ, তোমার খাতক যদি রিক্ত হস্ত হয়— ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হয়, তবে শরীয়তের নির্দেশ এই যে, তাকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া বিধেয়। যদি তাকে ঋণ থেকেই রেহাই দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্যে আরও উত্তম।

সুদখোরদের অভ্যাস এই যে, খাতক নির্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধে সক্ষম না হলে সুদের অঙ্ক আসলের সাথে যোগ করে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের কারবার চালায় এবং সুদের হারও আগের চাইতে বাড়িয়ে দেয়।

এখানে শ্রেষ্ঠতম বিচারক আল্লাহ তাআলা আইন প্রণয়ন করে দিয়েছেন যে, কোন খাতক বাস্তবিকই নিঃস্ব হলে এবং ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হলে তাকে অতিষ্ঠ করা জায়েয নয়; বরং তাকে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও উৎসাহিত করেছেন যে, যদি এ গরীবকে ক্ষমা করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্যে অধিক উত্তম।

এখানে ক্ষমা করাকে কোরআন পাক সদকা শব্দে ব্যক্ত করেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের জন্যে সদকা হয়ে যাবে এবং বিরাট সওয়াবের কারণ হবে। এছাড়াও আরও বলেছেনঃ ক্ষমা করা তোমাদের জন্য উত্তম।

সূরা আলে-এমরানের ১৩শ রুকূর ১৩০ তম আয়াতটি এইঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا رٰكِبًا عَلٰى اَعْصَافٍ مَّطْمَعَةٍ وَّتَاَنۡفِقُوْا
اِلٰى سَبِيْلٍ مَّكْرُوْرٍ مُّشۡرُوْنِ

অর্থাৎ, “হে ঈমানদারগণ, তোমরা সুদ খেয়ো না দ্বিগুণ চতুগুণ এবং আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায়, তোমরা সফল হবে।”

এ আয়াত অবতরণের একটি বিশেষ প্রেক্ষাপট রয়েছে। জাহেলিয়াত আমলের আরবে সুদ গ্রহণের সাধারণ রীতি ছিল এই যে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে সুদের উপর বাকী দেয়া হতো। মেয়াদ এসে গেলে দেনাদার যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে তাকে আরও সময় দেয়া হতো। এমনভাবে দ্বিতীয় মেয়াদেও যদি দেনা শোধ করতে অক্ষম হতো, তবে সুদের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেয়া হতো। সাধারণ তফসীর গ্রন্থসমূহে এবং বিশেষভাবে “লুবাবুনকুল” গ্রন্থে মুজাহিদের রেওয়ায়েতক্রমে এ বিবরণ উল্লেখিত আছে।

জাহেলিয়াত যুগের সে সর্বনাশা প্রথা বিলোপ করার জন্যেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ কারণেই আয়াতে اَصْعَافًا مَّطْمَعَةً (অর্থাৎ, কয়েকগুণ অতিরিক্ত) বলে তাদের প্রচলিত পদ্ধতির নিন্দা এবং অপরের চরম সর্বনাশ সাধন করে স্বার্থ উদ্ধার করার ঘৃণ্য মানসিকতা সম্পর্কে ইশিয়ার করে একে হারাম করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, কয়েকগুণ অতিরিক্ত না হলে সুদ হারাম হবে না। কেননা, সূরা বাক্বারা ও নিসায় যে কোন ধরনের সুদের

অবৈধতা পরিকার বর্ণিত হয়েছে কয়েকগুণ বেশী হোক বা না হোক। এর দৃষ্টান্ত যেমন কোরআনের স্থানে স্থানে বলা হয়েছে وَكَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ وَيُخْرِجُكَ مِنْهَا ۚ اَلَمْ تَعْلَمْ ۙ (আর্থঃ, আমার আয়াতের বিনিময়ে অল্পমূল্য গ্রহণ করো না।) এতে “অল্পমূল্য” বলার কারণ এই যে, খোদায়ী আয়াতের বিনিময়ে যদি সপ্তরাজ্যও গ্রহণ করা হয়, তবে অল্পমূল্যই হবে। এর অর্থ এই নয় যে, কোরআনের আয়াতের বিনিময়ে অল্পমূল্য গ্রহণ করা তো হারাম, বেশী মূল্য হারাম নয়। এমনভাবে এ আয়াতে اَصْعَافًا مَّطْمَعَةً শব্দটি তাদের লজ্জাকার পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি অবৈধতার শর্ত নয়।

‘রিবার’ আরও কিছু ব্যাখ্যা

আজকাল সুদ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণে কোরআন ও সুনায় যখন এর অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা দৃষ্টিগোচর হয় এবং এর স্বরূপ বোঝা ও বোঝানো হয়, তখন সাধারণ মন-মানস এর অবৈধতা মেনে নিতে ইতস্ততঃ করে এবং নানা রকম বাহানা সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই আলোচনাটিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে এর প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করেই এখানে এ সম্পর্কিত একটা ধারাবাহিক আলোচনার সূত্রপাত করা হচ্ছে।

প্রথমতঃ কোরআন ও সুনায় ‘রিবার’ স্বরূপ কি এবং এর প্রকার কি কি।

দ্বিতীয়তঃ রিবার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য ও উপযোগিতা কি?

তৃতীয়তঃ সুদ বা ‘রিবা’ যতই মন্দ হোক না কেন, এটি বর্তমান বিশ্বের অর্থনীতি ও বাণিজ্য নীতির প্রধান ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। যদি কোরআনী নির্দেশ অনুযায়ী একে পরিত্যাগ করা হয়, তবে ব্যাংক ও বাণিজ্যনীতি কিভাবে চালু থাকবে?

রিবা শব্দের ব্যাখ্যাঃ একটি বিদ্বাস্তিকর ঘটনা ও উত্তরঃ ‘রিবা’ আরবী ভাষার একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তপ্রাপ্তি এবং কোরআন অবতরণের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগের আরবেও এ শব্দটি প্রচলিত ছিল। শুধু প্রচলিতই নয়, বরং রিবার লেন-দেনও তখনকার সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল। সুতরাং সূরা নিসার আয়াত থেকে জানা যায় যে, ‘রিবা’ শব্দ এবং এর লেন-দেন তওরাতের আমলেও সুবিদিত ছিল এবং তওরাতের একে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

যে শব্দ প্রাচীনকাল থেকেই আরবে ও নিকটবর্তী দেশসমূহে সুবিদিত রয়েছে, যার লেন-দেনেরও প্রচলন রয়েছে এবং যার অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করার সাথে কোরআন পাক বলে যে, মুসা (আঃ)-এর উম্মতের জন্যেও সুদ বা ‘রিবা’ হারাম করা হয়েছিল, তখন এটা জানা কথা যে, সেই শব্দের স্বরূপ এমন ধরনের কোন অস্পষ্ট বিষয় হতে পারে না যে, তাকে বুঝতে গিয়ে অহেতুক জটিলতা দেখা দেবে।

এ কারণেই অষ্টম হিজরীতে যখন সুদ বা ‘রিবার’ অবৈধতা সম্পর্কে সূরা বাক্বারার আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়, তখন কোথাও বর্ণিত হয়নি যে, সাহাবায়ে-কেরাম ‘রিবা’ শব্দের স্বরূপ বোঝার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দিগ্ধতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং মহানবী (সাঃ)-এর কাছ থেকে অন্যান্য ব্যাপারের মত রিবার স্বরূপ সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। বরং দেখা গেছে যে, মদ্যপানের অবৈধতা অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে যেমন তাঁরা তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়েছিলেন, তেমনি রিবার অবৈধতার

কিয়ান নাহিল হওয়ার সাথে সাথেই তাঁরা রিবার যাবতীয় লেন-দেনও বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আরবরা যাকে রিবা বলতো এবং যার লেন-দেন করতো, কোরআন তাকেই হারাম করেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ বিধানকে শুধু নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই নয়, দেশের আইন হিসেবেও জারি করেন। তবে এমন কতকগুলো প্রকারকেও তিনি রিবার অন্তর্ভুক্ত করে দেন যেগুলোকে সাধারণভাবে রিবা মনে করা হতো না। এসব প্রকার নির্ধারণের ব্যাপারেই হয়ত ফারাক আযমের (রাঃ) মনে খটকা দেখা দিয়েছিল এবং এগুলোর ব্যাপারেই মুজতাহিদ ইমামগণ মতভেদে পোষণ করেছেন; প্রচলিত রিবা সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহ ছিল না এবং কেউ এ নিয়ে কোন মতভেদও করেননি।

তফসীরবিদ ইবনে-জরীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন : “জাহেলিয়াত আমলে প্রচলিত ও কোরআনে নিষিদ্ধ ‘রিবা’ হল কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে ঋণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা।” আরবরা তাই করতো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সুদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হতো।— (তফসীরে ইবনে-জরীর, ৩য় খণ্ড, ৬২ পৃঃ।)

স্পেনের খ্যাতনামা তফসীরবিদ আবু হাইয়ান গারনাতী রচিত ‘তফসীরে-বাহরেমুহীতে’ ও জাহেলিয়াত আমলে প্রচলিত রিবার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি এ রূপেই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা অর্থ লব্ধি করে মুনাফা গ্রহণ করতো এবং ঋণের মেয়াদ যতই বেড়ে যেতো, ততই চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ বাড়িয়ে দেয়া হতো। এরাই বলতো যে, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মুনাফা নেয়া কেমন জায়েয, তেমনি অর্থ ঋণ দিয়ে মুনাফা নেয়াও তদ্রূপ জায়েয হওয়া উচিত। কোরআন পাক একে হারাম করেছে এবং ক্রয়-বিক্রয় ও রিবার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : **كل قرض جر نفعاً فهو ربا** অর্থাৎ, যে ঋণ কোন মুনাফা টানে, তাই রিবা।— (জামে’-সগীর)

তবে নবী করীম (সাঃ) কয়েক রকম ক্রয়-বিক্রয়কেও রিবার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আরবরা এগুলোকে রিবা মনে করতো না। উদাহরণতঃ তিনি ছয়টি বস্তু সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এগুলো অদল-বদল করতে হলে সমান সমান এবং নগদে হওয়া দরকার। কম-বেশী কিংবা বাকী হলে তাও রিবা হবে। এ ছয়টি বস্তু হচ্ছে সোনা, রূপা, গম, যব, খেজুর ও আঙ্গুর।

আরবে ‘মুযাবানা’ ও ‘মুহাকাল’ নামে কাজ-কারবারের কয়েকটি প্রকার প্রচলিত ছিল। বৃক্ষস্থিত ফলকে বৃক্ষ থেকে আহরিত ফলের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে ‘মুযাবানা’ বলা হয় এবং ক্ষেতে অকর্তিত খাদ্যশস্য যথা— গম, বুট ইত্যাদিকে শুকনা পরিষ্কার করা খাদ্য যথা— গম, বুট ইত্যাদির বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রয় করাকে ‘মুহাকাল’ বলা হয়।

সুদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এগুলোকেও সুদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন।— (ইবনে-কাসীর)

এতে প্রাধান্যযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, বিশেষ করে উপরোক্ত ছয়টি বস্তুর মধ্যেই সুদ সীমাবদ্ধ, না এগুলো ছাড়া আরও কিছু বস্তু এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে? হয়ত ফারাক-আযম (রাঃ) এ সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েই নিম্নোক্ত উক্তি করেছিলেন যে,

‘সুদের আয়াত হচ্ছে কোরআন পাকের সর্বশেষ আয়াতসমূহের অন্যতম। এর পূর্ণ বিবরণ দান করার পূর্বেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাই এখন সতর্ক পদক্ষেপ জরুরী। সুদ তো অবশ্যই

বর্জন করতে হবে, ভদ্রপরি যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহও হয়, সেগুলোও পরিহার করা উচিত।— (আহকামুল-কোরআন-জাসাস, ইবনে-কাসীর)

ফারাক-আযম (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য ক্রয়-বিক্রয়ে এসব প্রকারকেও রিবার অন্তর্ভুক্তিকরণ ছিল, যেগুলোকে জাহেলিয়াত যুগের আরবে সুদ মনে করা হতো না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এগুলোকে সুদের অন্তর্ভুক্ত করে হারাম করেছিলেন। আসল ‘রিবা’ বা সুদ যা সমগ্র আরবে সুবিদিত ছিল, সাহাবায়ে কেরাম যা ত্যাগ করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সম্পর্কে আইন জারি করে বিদায় হজ্বের ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন, সে সুদ সম্পর্কে ফারাক আযমের মনে কোনরূপ খটকা বা সন্দেহ দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে এরূপ চিন্তাও করা যায় না। কিন্তু সুদের যেসব প্রকার সম্পর্কে তিনি সন্নিপ্ন ছিলেন, সেগুলোর ব্যাপারে তিনি সমাধান প্রদান করেন যে, যেসব ব্যাপারে সুদের সন্দেহ হয়, সেগুলোকেও পরিত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজকাল কিছু সংখ্যক লোক, যারা পাশ্চাত্যের বাহ্যিক জাঁকজমক, ধনাঢ্যতা এবং বর্তমান বাণিজ্যনীতি ইত্যাদিতে সুদের প্রাধান্য বিস্তারের মোহে মোহগ্রস্ত, তারা ফারাক-আযমের উপরোক্ত উক্তির ব্যাখ্যা এই বের করেছে যে, ‘রিবা’র অর্থই অস্পষ্ট ও অব্যক্ত ছিল। কাজেই এতে গবেষণার অবকাশ রয়েছে। তাদের এ অভিমত যে ভ্রান্ত, তার যথেষ্ট প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। ‘আহকামুল কোরআনে ইবনে আরাবী এ শ্রেণীর লোকের কঠোর সমালোচনা করেছেন, যারা ফারাকের-আযমের উপরোক্ত উক্তির ভিত্তিতে সুদের আয়াতকে অস্পষ্ট বলে অভিহিত করতে চেয়েছে। তিনি বলেন : ‘যারা রিবার আয়াতকে অস্পষ্ট বলেছেন, তারা শরীয়তের অকাট্য বিষয়সমূহ বোঝাতে সক্ষম হয়নি। কেননা, আল্লাহ তাআলা স্বীয় রসূলকে একটি মানবগোষ্ঠীর নিকট প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরই ভাষায় প্রেরণ করেছেন। স্বীয় গ্রন্থ সহজ করার জন্যে তাদেরই ভাষায় তা অবতীর্ণ করেছেন। তাদের ভাষায় ‘রিবা’ শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। আয়াতে ঐ অতিরিক্তটুকুকে বোঝানো হয়েছে, যার বিপরীতে কোন সম্পদ নেই বরং মেয়াদ আছে।

ইমাম রাযী তফসীর-কবীরে বলেন : রিবা দু’রকম : (এক) বাকী বিক্রয়ের রিবা এবং (দুই) নগদ ক্রয়-বিক্রয়ে বেশী নেয়ার রিবা। প্রথম প্রকার জাহেলিয়াত যুগে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল। সে যুগের লোকেরা এরূপ লেন-দেন করতো। দ্বিতীয় প্রকার রিবা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অমুক অমুক বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশী করা রিবার অন্তর্ভুক্ত।

জাসাসের আহকামুল-কোরআনে বলা হয়েছেঃ রিবা দু’রকমঃ একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে এবং অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। দ্বিতীয় প্রকারই ছিল জাহেলিয়াত যুগের রিবা। এর সংজ্ঞা এই যে, যে ঋণ মেয়াদের হিসাবে কোন মুনাফা নেয়া হয়, তা-ই রিবা। ইবনে-রুশদ ‘বেদায়াতুল-মুজতাহিদ’ গ্রন্থে তা-ই লিখেছেন। তিনি এ রিবার অবৈধতা কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

ইমাম তোয়াহাবী ‘শরহে মা’আনিউল-আসার’ গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন : কোরআনে উল্লিখিত ‘রিবা’ দ্বারা পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবে সে রিবাকেই বোঝান হয়েছে, যা ঋণের উপর নেয়া হতো। জাহেলিয়াত যুগেও একেই রিবা বলা হতো। এরপর রসূল (সাঃ)-এর বর্ণনা ও তাঁর সুনত্ন থেকে অন্য প্রকার রিবার বিষয় জানা

যায়, যা বিশেষ প্রকারে ক্রয়-বিক্রয়ে কম-বেশী করা কিংবা বাকী দেয়ার পরিবর্তে নেয়া হয়। এ রিবা হারাম হওয়া সম্পর্কেও অনেক সুপ্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে। কিন্তু এ প্রকার রিবাব বিস্তারিত বিবরণ না থাকার কারণে এতে কোন কোন সাহাবীর মনে খটকা দেখা দেয় এবং ফিকাহবিদরা পরস্পর মতভেদ করেন।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রাহঃ) ‘হুজ্জাতুল্লাহিল-বালেগাহ’ গ্রন্থে বলেন : এক প্রকার হচ্ছে সরাসরি ও প্রকৃত সুদ এবং অন্য এক প্রকার প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ ও নির্দেশগত। সত্যিকার সুদ ঋণ দিয়ে বেশী নেয়াকে বলা হয় এবং নির্দেশগত সুদ বলতে হাদীসে বর্ণিত সুদকে বোঝান হয়। অর্থাৎ, কিছু সংখ্যক বিশেষ বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে বেশী নেয়া। এক হাদীসে বলা হয়েছে : لا في النسيئة অর্থাৎ, রিবা বা সুদ শুধু বাকী দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এর অর্থও তা-ই যে সত্যিকার ও আসল সুদ, যাকে সাধারণভাবে সুদ মনে করা ও বলা হয়, তা বাকী দিয়ে মুনাফা নেয়াকেই বলা হয়। এ ছাড়া যত প্রকার সুদ এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে, সবগুলো নির্দেশগত সুদের অন্তর্ভুক্ত।

আজকাল যে সুদকে প্রচলিত অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভ মনে করা হয় এবং যে সুদের প্রশুটি এখানে আলোচনামূলক, সে সুদের অবৈধতা কোরআনের সাতটি আয়াত, চল্লিশটি রূক ও বেশী হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।

দ্বিতীয় প্রকার সুদ, যা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হয়, আজকাল এর ব্যাপক প্রচল নেই। কাজেই এ নিয়ে আলোচনা করারও তেমন প্রয়োজন নেই।

এ পর্যন্ত কোরআন ও সুন্নাহ সুদের স্বরূপ কি, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সুদ সর্বত্র আলোচনায় এটিই ছিল প্রধান বিষয়বস্তু।

সুদ নিষিদ্ধকরণের তাৎপর্য ও উপযোগিতা : এরপর দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় এই যে, সুদের অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞা কোন্ রহস্য ও উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল, এতে কি আত্মিক অথবা অর্থনৈতিক অপকারিতা রয়েছে, যে কারণে ইসলাম একে এত বড় গোনাহ সাব্যস্ত করেছে?

এ প্রসঙ্গে প্রথমে বোঝা দরকার যে, জগতের কোন স্ট্রবস্তু ও তার কাজ-কারবারই এমন নেই যাতে কোন না কোন বৈশিষ্ট্য বা উপকারিতা নেই। সাপ-বিছা, বাঘ-সিংহ এমনকি সংখিয়ার মত মারাত্মক বিষের মধ্যেও মানুষের হাজারো উপকারিতা নিহিত রয়েছে। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ঘুষ ইত্যাদির মধ্যেও কোন না কোন উপকার খুঁজে বের করা কঠিন নয়। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম ও জাতির চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যেই দেখা যায়, যে জিনিসের মধ্যে উপকার বেশী এবং ক্ষতি কম, তাকে উপকারী ও উত্তম মনে করা হয়। পক্ষান্তরে যেসব জিনিসের অনিষ্ট ও অপকারিতা বেশী এবং উপকারিতা কম, সেগুলোকে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে করা হয়। কোরআন পাকও সুদ ও জুয়াতে হারাম করার সময় দৃঢ়হীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, এগুলোর মধ্যে গোনাহ ও মানুষের উপকার দুই-ই রয়েছে, কিন্তু গোনাহর পরিমাণ উপকারের তুলনায় অনেক বেশী। তাই এগুলোকে উত্তম ও উপকারী বলা যায় না, বরং ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক মনে করে এগুলো থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

‘রিবা’ অর্থাৎ, সুদের অবস্থাও তদ্রূপ। এতে সুদখোরের সাময়িক উপকার অবশ্যই দেখা যায়। কিন্তু এর জাগতিক ও পারলৌকিক মন্দ পরিণাম এ উপকারের তুলনায় অত্যন্ত জঘন্য।

প্রত্যেক বস্তুর উপকার-অপকার ও লাভ-ক্ষতি তুলনা করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কাছে এ বিষয়টিও লক্ষ্যীয় হয়ে থাকে যে, যদি কোন বস্তুর উপকার অস্থায়ী ও সাময়িক হয় এবং অপকার দীর্ঘস্থায়ী কিংবা চিরস্থায়ী হয়, তবে একে কোন বুদ্ধিমান উপকারী বস্তুসমূহের তালিকায় গণ্য করতে পারে না। এমনভাবে যদি কোন বস্তুর উপকার ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় এবং ক্ষতি সমগ্র জাতির ঘাড়ের চাপ, তবে একেও কোন সচেতন মানুষ উপকারী বলতে পারে না। চুরি ও ডাকাতিতে চোর ও ডাকাতের উপকার অনস্বীকার্য। কিন্তু তা সমগ্র জাতির জন্যে ক্ষতিকর এবং তাদের শাস্তি ও স্বস্তি বিনষ্টকারী। তাই কোন মানুষই চুরি-ডাকাতিতে ভাল বলে না।

এ ভূমিকার পর সুদের প্রতি লক্ষ্য করুন। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, এতে সুদখোরের সাময়িক ও অস্থায়ী উপকারের তুলনায় তার আত্মিক ও নৈতিক ক্ষতি এত তীব্র যে, সুদ গ্রহণে অত্যন্ত ব্যক্তি মানবতার গতির ভেতরেই থাকতে পারে না। তার সাময়িক উপকারটিও শুধুমাত্র তার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত উপকার। কিন্তু এর ফলে গোটা জাতিতে বিরাট ক্ষতি ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থার শিকার হতে হয়। কিন্তু জগতের অবস্থা বিচিتر বটে! এখানে কোন বস্তু একবার প্রচলিত হয়ে গেলে তার যাবতীয় অনিষ্টকারিতা যেন দৃষ্টি থেকে উঠাও হয়ে যায় এবং শুধু তার উপকারিতাই লক্ষ্যপথে থেকে যায়—তা যতই নিকট ও ক্ষণস্থায়ী হোক না কেন। এর ক্ষতি ও অনিষ্টের প্রতি অধিকাংশ লোকই লক্ষ্য করে না—যদিও তা অত্যন্ত তীব্র ও ব্যাপক।

প্রথা ও প্রচলন মানব মনের জন্যে একটি সূক্ষ্ম বিস্ক্রিয়া যা মানুষকে অচেতন করে দেয়। অনেক কম ব্যক্তিত্বই প্রথা ও প্রচলন সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান প্রবৃত্তি হয়ে একথা বুঝতে চেষ্টা করে যে, এতে উপকার কতটুকু আর ক্ষতিই বা কতটুকু? বরং কারও সতর্ক করার দরুন যদি ক্ষতিগুলো কারও দৃষ্টিতে ধরাও পড়ে, তবুও প্রথা ও প্রচলনের অনুবর্তিতা তাকে সঠিক পথে আসতে দেয় না।

বর্তমান যুগে সুদ মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সমগ্র বিশ্ব এর রাহুগ্রাসে পতিত। এটি মানব রুচিকে বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে মানুষ যে বিষয়টি সমগ্র মানবতার জন্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ, তাকেই তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ভাবেতে শুরু করেছে। আজ কোন চিন্তাবিদ এর বিপক্ষে আওয়াজ তুললে তাকে অপরিণামদর্শী, আবাস্তব চিন্তা-ধারার সেকলে লোক বলেই অভিহিত করা হয়।

কিন্তু যে চিকিৎসক কোন দেশে ব্যাপকাকারে মহামারী ছড়িয়ে পড়তে এবং চিকিৎসা ব্যর্থ হতে দেখে মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এ রোগ রোগই নয়, বরং সুস্থতা ও সাক্ষাৎ আরাম, সে প্রকৃত অর্থে চিকিৎসকই নয়, বরং মানবতার সাক্ষাৎ শত্রু। পারদর্শী চিকিৎসকের কাজ এ সময়ও এ ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না যে, সে মানুষকে এ রোগ ও তার ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং প্রতিকারের পন্থা বলতে থাকবে।

আমিয়া আলাইহিমুস সালাম মানব চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব নিয়ে আগমন করেছেন। তাঁদের কথা কেউ শুনবে কি না, তাঁরা এর পরওয়া করেননি। তাঁরা যদি মানুষের শোনার ও মান্য করার অপেক্ষা করতেন, তবে সারা বিশ্ব কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ থাকতো। শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রচারকার্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন, তখন কলমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মান্যকারী কে ছিল? সুদকে যদিও বর্তমান অর্থনীতির মেরুদণ্ড মনে করা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব সত্য আজ কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও স্বীকার করছেন। তাঁদের মতে

সুদ অর্থনীতির মেরুদণ্ড নয় বরং মেরুদণ্ডে স্ট্রট এমন একটা দুষ্টকৃত, যা হঠাৎ তাকে খেয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকালকার অনেক বিচক্ষণ লোকও কোন সময় প্রথা ও প্রচলনের সঙ্গী গণ্ডি অতিক্রম করে এদিকে লক্ষ্য করেন না যে, সুদের অবশ্যস্বাবী পরিণতি কি? দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতাও এসব চিন্তাগুলোর দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করে না যে, সুদের অবশ্যস্বাবী দলপতিতে সাধারণ মানুষ এবং গোটা জাতি দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক জলাবস্থার শিকার হয়ে যায়। দরিদ্র আরও দরিদ্র হতে থাকে এবং গুটি কড়ক পুঁজিপতি সমগ্র জাতির অর্থ দ্বারা উপকৃত হয়ে বরং বলা উচিত যে, জাতির রক্ত শোষণ করে স্ফীত হতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, যখন এসব বুদ্ধিজীবীর সামনে এ সত্যটি তুলে ধরা হয়, তখন তারা একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্যে আমাদেরকে পাশ্চাত্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুদের উপকারিতা প্রত্যাশ করতে উপদেশ দেন এবং দেখাতে চান যে, তারা সুদভিত্তিক অর্থনীতির কল্যাণেই এমন সমৃদ্ধি অর্জন করেছে। কিন্তু এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন নরখাদক সম্প্রদায় তাদের এ অভ্যাসের উপকারিতা দেখানোর জন্যে আপনাকে নরখাদকদের মহল্লায় নিয়ে গেলে এবং দেখালো যে, এরা কেমন মোটা-তাজা, সবল ও সুস্থ। এরপর সে প্রমাণ করে যে, এদের অভ্যাস-আচরণই অনুসরণীয় ও উত্তম আচরণ।

কিন্তু কোন সমঝদার লোকের সাথে এ ব্যক্তির মোকাবিলা হলে সে লবে : তুমি এ নরখাদকদের ক্রিয়াকর্মের কল্যাণ এদের মহল্লায় নয়— অন্য মহল্লায় নিয়ে দেখ। দেখবে, শত শত, হাজার হাজার নরকংকাল গড়ে রয়েছে। এদের রক্ত, গোশত খেয়ে এ হিংস্রা তাজা হয়েছে। ইসলাম ও ইসলামী শরীয়ত কখনও এরূপ কার্যকে উপকারী বলে মনে নিতে পারে না, যার ফলশ্রুতিতে সমগ্র মানব সমাজ বিপর্যয়ের শিকার হবে আর কিছুসংখ্যক লোক ও তাদের ভল্লীবাহকরা সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকবে।

সুদের অর্থনৈতিক অনিষ্ট : সুদের ফলে গুটিকতক লোকের উপকার এবং সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের ক্ষতি হয়— এ ছাড়া সুদের মধ্যে যদি অন্য কোন দোষ নাও থাকতো তবুও এ দোষটিই সুদ নিষিদ্ধ ও ঘৃণিত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল। অথচ এতে এ ছাড়া আরও অর্থনৈতিক অনিষ্ট এবং আত্মিক বিপর্যয় বিদ্যমান রয়েছে।

সুদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির বিপর্যয় ঘটিয়ে বিশেষ একটি শ্রেণীর উপকার কিভাবে হয়, প্রথমে তাই দেখা যাক। সুদের মহাজনী ও আধুনিক পদ্ধতি এমন বিশ্রী যে, বৃহত্তম মানব সমাজের ক্ষতি ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের উপকারের বিষয়টি যে কোন খুল-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু আজকালকার নতুন প্রেক্ষাপটে যেভাবে মদকে মেশিনে পরিশোধিত করে, ডাকাতির নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে এবং ব্যাভিচার ও নির্লজ্জতার নতুন নতুন কৌশল বের করে এ সবগুলোকেই সভ্যতার খোলস পরিণয়ে দিয়েছে—যাতে এদের আভ্যন্তরীণ অনিষ্ট বাহ্যদর্শীদের দৃষ্টিগোচর না হয়, তেমনিভাবে সুদের জন্যে ব্যক্তিগত গদির পরিবর্তে যৌথ কোম্পানী গঠন করেছে— যাকে ব্যাঙ্ক বলা হয়। এখন জগদ্বাসীর চোখে ধুলি দেয়ার জন্যে বলা হয় যে, সুদের এ আধুনিক পদ্ধতি দ্বারা সমগ্র জাতিরই উপকার হয়। কেননা, যে জনগণ নিজের টাকা দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে জানে না, কিংবা স্বল্প পুঁজির কারণে করতে পারে না, তাদের সবার টাকা-পয়সা ব্যাঙ্কে জমা হয়ে প্রত্যেকেই অল্প হলেও কিছু না কিছু মুনাফা পেয়ে যায়। বড় বড় ব্যবসায়ীরাও ব্যাঙ্ক থেকে সুদের উপর ঋণ নিয়ে বড় ব্যবসা করে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পায়। এভাবে সুদ বর্তমানে একটি কল্যাণকর বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং গোটা জাতি এর

দ্বারা উপকার পাচ্ছে।

কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখলে এটি একটি প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। মদের দুর্গন্ধময় দোকানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটলে এবং পতিতালয়গুলোকে সিনেমা ও নৈশ ক্লাবে রূপান্তরিত করে, বিষকে প্রতিষেধক এবং ক্ষতিকরকে উপকারীরূপে দেখাবার প্রয়াসে এ প্রতারণাকে কাজে লাগানো হয়েছে। চক্ষুমান ব্যক্তিদের সামনে যেমন একথা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট যে, চরিত্রবিধ্বংসী অপরাধসমূহকে আধুনিক পাশাধার পরিণয়ে দেয়ার ফলে যেমন এসব অপরাধের ব্যাপকতা পূর্বের চাইতে বেড়েই গেছে, তেমনি সুদখোরীর এ নতুন পদ্ধতিতে-শতকরা কয়েক টাকা সুদ জনগণের পকেটে পুরে দিয়ে একদিকে তাদেরকে এ জঘন্য অপরাধে শরীক করেছে এবং অপরদিকে নিজদের জন্যে এ অপরাধের অসীম ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিয়েছে।

কে না জানে যে, জনগণ সেভিংস ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিস থেকে যে শতকরা কয়েক টাকা সুদ পায়, তদ্বারা কিছুতেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে না। তাই তারা ভরণ-পোষণের জন্যে কোন মজুরী কিংবা চাকুরী খুঁজতে বাধ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে প্রথমতঃ তাদের দৃষ্টি যায় না। যদি কেউ এদিকে মনোনিবেশও করে তবে গোটা জাতির পুঁজি ব্যাঙ্কে জমা হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য যে আকার ধারণ করেছে, তাতে কোন স্বল্প পুঁজির অধিকারীর পক্ষে ব্যবসায় প্রবেশ করা স্বপ্ন-বিলাসের পর্যায়েই থেকে যায়। কেননা, যে ব্যবসায়ীর বাজারে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে এবং বড় কারবার আছে, ব্যাঙ্ক তাকেই বড় পুঁজি ঋণ দিতে পারে। দশ লক্ষের মালিক এক কোটি ঋণ পেতে পারে। সে তার ব্যক্তিগত টাকার তুলনায় দশ গুণ বেশী টাকার ব্যবসা চালাতে পারে। পক্ষান্তরে স্বল্প পুঁজির অধিকারী ব্যক্তির কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকে না এবং ব্যাঙ্কও তাকে বিশ্বাস করে না যে, পুঁজির দশ গুণ বেশী দিয়ে দেবে। এক লক্ষ দূরের কথা, তার এক হাজার পাওয়াই কঠিন। মনে করুন, কেউ এক লাখ টাকা ব্যাঙ্কের পুঁজি খাটিয়ে দশ লাখ টাকার ব্যবসা করে যদি তার শতকরা এক টাকা মুনাফা হয়, তবে তার নিজস্ব এক লাখ টাকায় যেন শতকরা দশ টাকা মুনাফা হলো। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি শুধু ব্যক্তিগত টাকা দ্বারা এক লাখ টাকার ব্যবসা করে, তবে এক লাখের মুনাফা শতকরা এক টাকাই হবে। এ মুনাফা তার প্রয়োজনীয় খরচাদির জন্যেও হয়ত যথেষ্ট নয়। এদিকে বাজারে বড় পুঁজিপতি যে দর ও রেয়াতসহ কাঁচামাল পায়, ছোট পুঁজিপতি তা পায় না। ফলে স্বল্প পুঁজিওয়ালা পঙ্গু ও মুখাপেক্ষী হয়েই থাকে। যদি তার কপাল মন্দ হয় এবং সেও কোন বড় ব্যবসায় প্রবেশ করে, তবে বৃহৎ পুঁজিপতিরা তাকে অনধিকার প্রবেশকারী মনে করে নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও বাজার এমন পর্যায়ে নিয়ে আসে যে, ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা আসল ও মুনাফা উভয়ই খুইয়ে বসে। ফলে বৃহৎ পুঁজিপতিদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

জাতির প্রতি এটা কতবড় অবিচার যে, গোটা জাতি প্রকৃত ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধু বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তারা বখশিস হিসেবে যতটুকু ইচ্ছা তাদেরকে মুনাফা দেবে।

এর চাইতেও বড় আর একটি ক্ষতির কবলে সারাদেশ পড়ে আছে। তা এই যে, উপরোক্ত অবস্থায় বৃহৎ পুঁজিপতিরাই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের একচেটিয়া অধিকারী হয়ে যায়। তারা উচ্চতর মূল্যে বিক্রয় করে স্বীয় গাঁট মজবুত করে নেয় এবং জাতির গাঁট খালি করে দেয়। তারা মূল্য বৃদ্ধি করার জন্যে যখন ইচ্ছা মাল বিক্রি বন্ধ করে দেয়। যদি গোটা জাতির

পুঁজি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টেনে এসব স্বার্থপরদের লালন-পালন না করা হতো এবং সবাই বস্তুগত পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করতে বাধ্য হতো, তবে ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা এ বিপদের সম্মুখীন হতো না এবং এসব স্বার্থপর হিংস্ররাও গোটা ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্ণধার হয়ে বসতে পারতো না। ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের ব্যবসায়ের মুনাফা জমকালো হলে অন্যরাও সাহস করতো এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপক হয়ে যেতো। এতে করে প্রত্যেকের পক্ষেই কিছু কিছু লোক নিয়োগ করার সুযোগ হতো। এতে অনেক বেকার সমস্যারও সমাধান হতো এবং বাণিজ্যিক মুনাফাও ব্যাপক হয়ে পড়তো। এছাড়া দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতেও এর নিশ্চিত প্রভাব পড়ত। কেননা, পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই ব্যবসায়ীরা কম মুনাফা অর্জনে সক্ষম হয়। অথচ বর্তমান এ প্রতারণামূলক কর্মপদ্ধতি গোটা জাতিকে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত করে তাদের চিন্তাধারাকেও বিকৃত করে দিয়েছে। ফলে তারা এ রোগকেই সুস্থতা মনে করে বসেছে।

ব্যাংকের সুদ দ্বারা জাতির তৃতীয় অর্থনৈতিক ক্ষতিও লক্ষ্যীয়। যার পুঁজি দশ হাজার এবং সে ব্যাংক থেকে সুদের উপর কর্ত্ত নিয়ে এক লাখের ব্যবসা করে, যদি কোথাও তার পুঁজি ডুবে যায় এবং ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সে দেউলিয়া হয়ে যায়, তবে চিন্তা করুন, ক্ষতির শতকরা দশ ভাগ তার নিজস্ব এবং অবশিষ্ট শতকরা নব্বই ভাগই গোটা জাতির হয়েছে, যাদের পুঁজি ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে সে ব্যবসা করেছিল। যদি ব্যাঙ্ক নিজেই দেউলিয়ার ক্ষতি বহন করে, তবে ব্যাঙ্ক তো জাতিরই পকেট। পরিণামে এ ক্ষতি জাতিরই হবে। এর সারমর্ম হলো এই যে, যতক্ষণ মুনাফা হচ্ছিল, ততক্ষণ সে একা ছিল মুনাফার মালিক, তাতে জাতির কোন অংশ ছিল না এবং যখনই ক্ষতি হলো, তখন শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষতিই জাতির ঘাড়ে চেষ্টে বসলো।

সুদের আরো একটি অর্থনৈতিক ক্ষতি এই যে, সুদখোর যখন অবক্ষয়ে পড়ে, তখন সে পুনরায় মাথা তোলার যোগ্য থাকে না। কেননা, ক্ষতি বরাদ্দস্ত করার মত পুঁজি যে তার ছিলই না। ক্ষতির সময় তার উপর দ্বিগুণ বিপদ চাপে। একে তো নিজের মুনাফা ও পুঁজি গেল, তদুপরি ব্যাঙ্কের ঋণও চেষ্টে বসল। এ ঋণ পরিশোধের কোন উপায় তার কাছে নেই। সুদহীন ব্যবসায় যদি কোন সময় সমগ্র পুঁজিও বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে এর দ্বারা মানুষ ফকীর হয় না— ঋণী হয়।

আত্মসেবা ও জাতি হত্যার আরও একটি অপকৌশল :

সুদের মাধ্যমে সমগ্র জাতির সর্বনাশ সাধন করে কতিপয় ব্যক্তির আত্মসেবার সংক্ষিপ্ত চিত্র পেশ করা হলো। এর সাথে আরও একটি প্রতারণা লক্ষ্যীয়।

সুদখোররা যখন অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝতে পারল যে, কোরআনের উক্তি **وَالَّذِينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَهُمْ رِبًا** অর্থাৎ, মালের অবক্ষয় আসা অবশ্যজ্ঞাবী, যার ফলে দেউলিয়া হতে হয়, তখন এসব অবক্ষয়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তারা দু'টি সহযোগী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললো। একটি বীমা, অপরটি 'স্টক-এক্সচেঞ্জ'। কেননা, ব্যবসায়ে ক্ষতি হওয়ার দু'টি কারণ হতে পারে। একটি দৈব-দুর্বিপাক, যথা, জাহাজ ডুবি, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি এবং অপরটি পণ্যবোঝার দাম ক্রম-মূল্যের নীচে নেমে আসা। বিনিয়োগকৃত পুঁজি যেহেতু নিজস্ব নয়— জাতির যৌথ সম্পদ, তাই উভয় অবস্থাতে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি কম এবং জাতির বৈশী হয়। কিন্তু তারা এ অল্প ক্ষতির বোঝাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার জন্যে একদিকে বীমা কোম্পানী খুলেছে যাতে ব্যাঙ্কের মত সমগ্র জাতির পুঁজি নিয়োজিত

থাকে। দৈব-দুর্বিপাকে সুদখোরদের ক্ষতি হয়ে গেলে, বীমার মাধ্যমে সমগ্র জাতির যৌথ পুঁজি থেকে তা উদ্ধার করে নেয়া হয়।

জনগণ মনে করে, বীমা কোম্পানীগুলো আল্লাহর রহমত, ভুবন ব্যক্তির আশ্রয়স্থল। কিন্তু এদের স্বরূপ দেখলে ও বুঝলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এখানেও প্রতারণা ছাড়া কিছুই নেই। আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় সাহায্যের লোভ দেখিয়ে জাতির পুঁজি সঞ্চয় করা হয়, কিন্তু এর মোট অংকের টাকা দ্বারা বৃহৎ ব্যবসায়ীরাই উপকৃত হয়। তারা মাঝে মাঝে নিজেই স্বীয় ক্ষয়প্রাপ্ত মোটরে অগ্নিসংযোগ করে কিংবা কোন কিছু রাখা থাকলে লাগিয়ে ধ্বংস করে দেয় এবং বীমা কোম্পানী থেকে টাকা আদায় করে নতুন মোটর ক্রয় করে। শতকরা দু'একজন গরীব হয়তো আকস্মিক মৃত্যুর কারণে কিছু টাকা পেয়ে যায়। অপরদিকে দর কমে যাওয়ার বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তারা স্টক-এক্সচেঞ্জের বাজার গরম করেছে। এ বিশেষ প্রকার জুয়া দ্বারা গোটা জাতিকে প্রতাবান্বিত করা হয়েছে, যাতে মূল্য হ্রাসের কারণে যে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, তাও জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া যায়।

এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাংকের সুদ ও বাণিজ্যই গোটা মানব সমাজের দারিদ্র্য ও আর্থিক দুর্বস্থার কারণ। ঈ, গুটিকতক ধনীরা ধন-সম্পদ এর দৌলতে আরও বেড়ে যায়। জাতির ঋণে এবং গুটিকতক লোকের উন্নতিই এর ফলশ্রুতি। এ বিরাট অনিষ্ট সাধন সরকারসমূহের দৃষ্টি এড়ায়নি। এর প্রতিকারার্থে তারা বৃহৎ পুঁজিপতিদের আয়করের হার বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এমনকি, সর্বশেষ হার টাকায় সাড়ে পনের আনা করা হয়েছে— যাতে পুঁজি তাদের হাত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আবার জাতীয় তহবিলে পৌঁছে যায়।

কিন্তু সবাই জানেন যে, এ আইনের ফলেই সাধারণভাবে মিল-কারখানার হিসাবে জালিয়াতি হচ্ছে এবং সরকারের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য ও হিসাবাদি গোপন করার উদ্দেশ্যে অনেক পুঁজি গুপ্তধনে আকারে স্থানান্তরিত হচ্ছে।

মোটকথা, ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে কয়েক ব্যক্তির হাতে আবদ্ধ হওয়া যে দেশের অর্থনীতির জন্যে সমূহ ক্ষতির কারণ, এ সম্পর্কে সবাই পরিজ্ঞাত। এ কারণেই আয়করের হার বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এ কর্মপন্থাও রোগ নিরাময়ে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। রোগের আসল কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থতাই এর বড় কারণ। কাজেই এ প্রতিকার ঘে শত্রুকে ভিতরে রেখেই দরজা এঁটে দেয়ার মত হয়ে গেছে।

যতদিন পর্যন্ত ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সুদের কারবার বন্ধ করা না হয় এবং নিজ নিজ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করার নীতি প্রচলিত না হয়, ততদিন এ রোগের প্রতিকার অসম্ভব।

একটি সমস্হ ও তার উত্তর : এখানে প্রশ্ন উঠতে হতে পারে যে, ব্যাংকের মাধ্যমে গোটা জাতির পুঁজি সঞ্চিত হয়ে কিছু না কিছু উপকার তো জনগণেরও হয়েছে যদিও তা খুব কম। অবশ্য এটা সত্য যে বৃহৎ পুঁজিপতিরা এরদ্বারা বেশী উপকৃত হয়েছে তবে ঈ, যদি ব্যাংক সম্পদ সঞ্চিত করার রীতি বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে এর ফল আদেবকার যুগের মতই হবে, অর্থাৎ, জনগণের সম্পদ গুপ্তধন ও গুপ্তভাণ্ডারের আকারে ভূগর্ভে চলে যাবে। এতে না জনগণের উপকার হবে, না অন্য কারো।

এর উত্তর এই যে, ইসলাম সুদ হারাম করে যেমন সমগ্র জাতির সম্পদ বিশেষ বিশেষ পুঁজিপতির হাতে আবদ্ধ হওয়ার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, তেমনি পুঁজিকরের আকারে যাকাত আরোপ করে প্রত্যেক

পূজিক সম্পদ স্থাবর অবস্থায় না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত রাখতে চায় করেছে। কেননা, পূজিকরের আকারে যাকাত আরোপিত হওয়ার কারণে যদি কোন ব্যক্তি টাকা-পয়সা অথবা সোনা-রূপা মাটির নীচে পুতে রাখে, তবে প্রতি বছর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত যেতে যেতে তার পুণ্ড্র নিঃশেষ হয়ে যাবে। কাজেই প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই পূজিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত করে তদ্বারা নিজ উপকৃত হতে, অপরের উপকার করতে এবং মুনাফা থেকেই যাকাত আদায় করতে বাধ্য হবে।

যাকাত একমিক দিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির নিশ্চয়তা দেয় : এ থেকে আরও জানা গেল যে, যাকাত প্রদানের মধ্যে যেমন জাতির অক্ষম শ্রমীর সাহায্য করার মত বিরাট উপকার নিহিত, তেমনি মুসলমানদের ঐক্যনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যেও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি চমৎকার প্রক্রিয়া। কেননা, প্রত্যেকেই যখন চমৎকার, নগদ পুজি আবদ্ধ রাখার ফলে মুনাফা তো দূরের কথা, বছরান্তে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ক্রমান্বয়ে হারাই পেয়ে যাচ্ছে, তখন অবশ্যই সে পুজি কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত করার জন্যে সচেষ্ট হবে। হারাম সুদ থেকে বাঁচার জন্য ব্যবসায়ের আকার-প্রকৃতি এরূপ হবে না যে, লাঞ্ছনামুখের পুজি দ্বারা শুধু এক ব্যক্তিই ব্যবসা করবে; বরং প্রত্যেকেই নিজে নিয়োগের চিন্তা করবে। বৃহৎ পুজিপতিরাও যখন নিজ পুজি দ্বারা ব্যবসা করবে, তখন ক্ষুদ্র পুজিপতিরা ব্যবসা ক্ষেত্রে এসব অসুবিধার সম্পূর্ণ হ্রাস না যা ব্যাংক থেকে সুদের টাকা নিয়ে ব্যবসা করলে দেখা দেয়। এভাবে দেশের আনাচে-কানাচে প্রত্যন্ত এলাকাতেও ব্যবসা এবং বিভিন্ন-মুখী বিনিয়োগ প্রচেষ্টা ছড়িয়ে পড়বে যাতে সর্বশ্রেণীর মানুষই উপকৃত হবে।

(১) মানবচরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ হচ্ছে আত্মত্যাগ ও দানশীলতা। কর্ণাৎ, নিজে কষ্ট করে হলেও অপরকে সুখী করার প্রেরণা। সুদের ব্যবসায়ের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতিতে এ প্রেরণা লোপ পায়। সুদখোর ব্যক্তি ঋণের উপকার করা তো দূরের কথা অপরকে নিজ চেষ্টায় ও নিজ পুজি দ্বারা তার সমতুল্য হতে দেখলে তাও সহ্য করতে পারে না।

(২) সুদখোরেরা কোন বিদগ্ধ ব্যক্তির প্রতি দয়ালু হওয়ার পরিবর্তে ঋণ বিপদের সুযোগে অবৈধ মুনাফা লাভের চেষ্টায় মত্ত থাকে।

(৩) সুদ খাওয়ার ফলশ্রুতিতে অর্থহীনতা সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। এতে এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, ভালমন্দেরও পরিচয় থাকে না এবং সুদের অন্তঃ পরিণামের প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে।

সুদ ছাড়া কি কোন ব্যবসা চলতে পারে না? : সুদের স্বরূপ এর ঐচ্ছিক, পার্শ্বিক ও ধর্মীয় অনিষ্টকারিতা বিস্তারিতভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এখন তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হলো অর্থনৈতিক ও আর্থিক অনিষ্টকারিতা। র্তমান যুগে সুদই হচ্ছে কাজ-কারবারের প্রধান অবলম্বন। সারা বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য সুদের উপরই চলছে। এ থেকে মুফ্লিভার উপায় কি? র্তমান যুগে ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক বর্জন করার অর্থ ব্যবসায়ের উপাধীনতা গুটানো।

এর জওয়াব এই যে, কোন রোগ যখন ব্যাপক হয়ে মহামারীর আকার ধারণ করে, তখন তার চিকিৎসা কঠিন অবশ্যই হয়; কিন্তু নিষ্ফল কখনো হয় না। নিষ্ঠার সাথে যে কোন সংশোধন প্রচেষ্টাই পরিণামে সফল হয়। তবে এজন্যে ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং সাহসিকতা একান্ত প্রয়োজন। কোরআন পাকই আল্লাহ তাআলা বলেন : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَ فِي الدِّينِ مِنْ شَيْءٍ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَن تَحْبِسَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَيْثُ بُعِثُوا فِي الْبُيُوتِ وَتَتَكَلَّمُوا لَهُمْ حِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى الْوُضُوءِ فَأَتُوا بِأَنفُسِهِم مِّنَ الْمَسْجِدِ وَمِنَ الْمِهَادِ

সংকীর্ণতা ফেলে নি। তাই সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্যে এমন কোন কার্যকর ও ফলপ্রসূ পথ অবশ্যই রয়েছে, যাতে অর্থনৈতিক ক্ষতিও নেই, আত্মসন্ত্রাসী ও বহির্বাণিজ্যের দ্বারও রুদ্ধ হয় না এবং সুদ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা এই যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বর্তমান পদ্ধতি দেখে বাহ্যদৃষ্টিতে মনে করা হয় যে, সুদের উপরই ব্যাংক নির্ভরশীল; সুদ ছাড়া ব্যাংক চলতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা নিশ্চিতরূপে নির্ভুল নয়। সুদ ছাড়াও ব্যাংক ব্যবস্থা এমনভাবে ফলপ্রসূ ও কার্যকরী ভূমিকা সহকারেই কায়েম থাকতে পারে; শুধু তাই নয় বরং আরও উত্তম, ও উপকারী ভূমিকা নিয়েই তা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। তবে এর জন্যে কিছুসংখ্যক শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও কিছু সংখ্যক ব্যাংক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাঁরা নতুনভাবে এর পদ্ধতি নির্ধারণ করলে সাফল্য দূরে নয়। শরীয়তের নিয়মানুযায়ী ব্যাংক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ইনশাল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী প্রভাবিত করবে যে, এতে জাতির কিরূপ মঙ্গল সাধিত হয়। ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করার পদ্ধতি ও নীতি ব্যাখ্যা করার স্থান এটা নয়, তাই এ সম্পর্কে আলোচনা সক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে।

কিছু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সুদের প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্যাংকের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন করে এর ব্যবস্থা করা যায়। সুদের দ্বিতীয় প্রয়োজন অসহায় দরিদ্র লোকদের সাময়িক অভাব পূরণ করা। এর চমৎকার প্রতিকার ইসলামে পূর্ব থেকেই যাকাতও ওয়াজিব সদকার আকারে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ধর্ম ও ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা আজকাল যাকাত ব্যবস্থাকেও পঙ্গু করে দিয়েছে। অসংখ্য মুসলমান নামাযের মত যাকাতেরও ধারে কাছে যায় না। যারা যাকাত দেয়, তাদের মধ্যে অনেক বৃহৎ পুজিপতি হিসাব করে পূর্ণ যাকাতও প্রদান করে না। যারা সম্পূর্ণ যাকাত প্রদান করে, তারা শুধু যাকাত পকেট থেকে বের করতেই জানে। অথচ আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র যাকাত পকেট থেকে বের করারই নির্দেশ দেননি – তা আদায় করারও নির্দেশ দিয়েছেন। প্রদত্ত যাকাত যথার্থ হকদারকে পৌঁছে দিয়ে তার অধিকারভুক্ত করে দিলেই যাকাত আদায় করা শুদ্ধ হতে পারে। সুতরাং চিন্তা করার বিষয় হলো, এমন মুসলমান কয়জন আছে, যারা যথার্থ হকদার খুঁজে তাদের কাছে যাকাত পৌঁছে দিতে যত্নবান। মুসলমান জাতি যতই গরিব হোক, যাদের উপর যাকাত ফরয, তারা প্রত্যেকেই যদি পুরোপুরি যাকাত প্রদান করে এবং বিশুদ্ধ পন্থায় স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তবে কর্ত্তের তাগিদে সুদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন কোন মুসলমানেরই থাকতে পারে না। যদি শরীয়তের বিধি অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়, এর অধীনে বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানদের ধন-সম্পদের যাকাত এতে জমা হয়, তবে বায়তুল-মাল থেকে প্রত্যেক অভাব গ্রস্তেরই অভাব পূরণ করা সম্ভব। বেশী টাকার প্রয়োজন হলে সুদবিহীন কর্ত্তও প্রদান করা যেতে পারে। এভাবে বেকার ও কর্মহীনদের ছোট ছোট দোকান করে দিয়ে কিংবা কোন শিল্পকর্মে নিয়োগ করেও কাজে লাগানো যায়। জৈনিক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ঠিকই বলেছেন যে, মুসলমানরা যাকাত-ব্যবস্থার অনুবর্তী হয়ে গেলে তাদের মধ্যে কোন নিঃশ্রু ও অভাবগ্রস্ত লোক দেখা যাবে না।

মোটকথা, বর্তমান যুগে সুদকে মহামারী আকারে গ্রাসার লাভ করতে দেখে এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, সুদের ব্যবসা বর্জন করা অর্থনৈতিক আত্মহত্যার নামান্তর এবং এ যুগের লোক সুদের ব্যবসায়ের ব্যাপারে ক্ষমহী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَبَدِّلُوا إِلَى آخِلٍ مُّسَمًّى
فَإِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَبَدِّلْهُم بِمَا عَدِلْتُمْ وَلِيَّابَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَكُنِ اللَّهُ رَكِيعَهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا سُلْطَانَهُ أَنْ يُبَدِّلَهُمْ فَبَدِّلْ
وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ
لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَ
لَا يَبَاطِلُ الشَّهْدُ إِلَّا إِذَا دُعُوا وَلَا تَسْتَعْمِلُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى آخِلِهِ فَلَكُمْ أَمْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى الْأَرْتَابِ وَالْآلَاءُ أَنْ تَكُونُ بِحَاجَةِ حَافَةٍ
تُذَيِّرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلْيَسْ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ الْآلَاءِ
تَكْتُمُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا عَابَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ كَاتِبٍ
وَلَا شَهِيدَهُ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسَوْفَ يَكْمُرُ وَ
اسْتَعْوِ اللَّهَ وَتَوَعَّلَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٠﴾

(২৮২) হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে স্বপ্নের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ্ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া। এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজের লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে। দু' জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। যদি দু' জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু' জন মহিলা। এ সাক্ষীদের যদি থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর—তবে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা এটা লিখতে অলসতা করো না, তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধ করণ আল্লাহর কাছে সুবিচারকে অধিক কাম্যে রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।

এটা অবশ্য ঠিক যে, যতদিন সমগ্র জাতি কিংবা উল্লেখযোগ্য দল কিংবা কোন ইসলামী সরকার পূর্ণ মনোযোগ সহকারে একাজে সৰ্বশেষবদ্ধ না হয়, ততদিন দু'চার, দশ জনের গঞ্জে সুদ বর্জন করা কঠিন, কিন্তু ক্ষমার ভবুও বলা যায় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধার-কর্কের ক্ষেত্রে দলীল লেখার নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি :
আলোচ্য আয়াতসমূহে লেন-দেন সম্পর্কিত আইনের জরুরী মূল্যটি
ব্যক্ত হয়েছে। যাকে চুক্তিমাণও বলা যেতে পারে। এরপর সাক্ষ্য-বিধির
বিশেষ ধারা উল্লেখিত হয়েছে।

আজকাল লেখালেখির যুগ। লেখাই মুখের কথার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি চৌদ্দ শ' বছর পূর্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তখন দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে মুখেই চলতো। লেখালেখি এবং দলীল-দস্তাবেজের প্রথা প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম কোরআন পাক এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা হয়েছে:

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَالْكَبِيرُ

অর্থাৎ, ‘তোমরা যখন পরস্পর নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে ধার-কাজের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও’।

এতে প্রথম নীতি এই ব্যক্ত হয়েছে যে, খার-কর্জের লেন-দেন দলীল-দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করা উচিত—যাতে ভুল-ভ্রান্তি অথবা কোন পক্ষ থেকে অস্বীকৃতির কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে।

দ্বিতীয়তঃ ধার-কৰ্জের ব্যাপারে মোয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধার-কৰ্জের লেন-দেন জায়েয নয়। এতে কলহ-বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ কারণেই ফিকাহবিদগণ বলেছেন : মোয়াদও এমন নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। মাস এবং দিন তারিখসহ নির্দিষ্ট করতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্ট মোয়াদ, যেমন ‘ধানকাটার সময়’ নির্ধারিত করা যাবে না। কেননা, আবহাওয়ার পরিবর্তনে ধানকাটার সময় আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে। যেহেতু সে যুগে লেখার ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং আজও ব্যাপক প্রচলনের পর পৃথিবীর অধিকাংশ লোক লেখা জানে না, তাই সম্ভাবনা ছিল যে, লেখক কিসের স্থলে কি লিখে ফেলবে। ফলে কারও ক্ষতি এবং কারও লাভ হয় যাবে। এ সম্ভাবনার কারণেই অতঃপর বলা হয়েছে :

وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

অর্থাৎ, এটা জরুরী যে, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায্যসঙ্গতভাবে লিখবে।

এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, লেখক কোন একপক্ষের লোক হতে পারবে না; বরং নিরপেক্ষ হতে হবে— যাতে কারও মনে সন্দেহ বা খটকা না থাকে।

অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার করে নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না।

এরপর দলীল কোন পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে

দীকে সম্পদ স্থাবর অবস্থায় না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত রাখতে ক্যা করেছে। কেননা, পুঁজিকরের আকারে যাকাত আরোপিত হওয়ার কারণে যদি কোন ব্যক্তি টাকা-পয়সা অথবা সোনা-রূপা মাটির নীচে পুঁতে রাখে, তবে প্রতি বছর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত যেতে যেতে তার পুঁজি নিঃশেষ হয়ে যাবে। কাজেই প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই পুঁজিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত করে তদ্বারা নিজে উপকৃত হতে, অপরের উপকার করতে এবং মুনাফা থেকেই যাকাত আদায় করতে বাধ্য হবে।

যাকাত একদিক দিয়ে ব্যবসায়ের উন্নতির নিশ্চয়তা দেয় : এ থেকে আরও জানা গেল যে, যাকাত প্রদানের মধ্যে যেমন জাতির অক্ষম শ্রীর সাহায্য করার মত বিরাট উপকার নিহিত, তেমনি মুসলমানদের জ্ঞাননৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যেও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে এটি একটি চমৎকার প্রক্রিয়া। কেননা, প্রত্যেকেই যখন দেখবে, নগদ পুঁজি আবদ্ধ রাখার ফলে মুনাফা তো দূরের কথা, বছরান্তে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ক্রমান্বয়ে হ্রাসই পেয়ে যাচ্ছে, তখন অবশ্যই সে এ পুঁজি কোন ব্যবসায়ে নিয়োজিত করার জন্যে সচেষ্ট হবে। হারাম সুদ থেকে বাঁচার জন্যে ব্যবসায়ের আকার- প্রকৃতি এরূপ হবে না যে, লাখো মানুষের পুঁজি দ্বারা শুধু এক ব্যক্তিই ব্যবসা করবে; বরং প্রত্যেকেই নিজে বিনিয়োগের চিন্তা করবে। বৃহৎ পুঁজিপতিরাও যখন নিজ পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করবে, তখন ক্ষুদ্র পুঁজিপতিরা ব্যবসা ক্ষেত্রে ঐসব অসুবিধার সম্মুখীন হবে না যা ব্যাংক থেকে সুদের টাকা নিয়ে ব্যবসা করলে দেখা দেয়। এভাবে দেশের আনাচে-কানাচে প্রত্যন্ত এলাকাতেও ব্যবসা এবং বিভিন্ন-মুখী বিনিয়োগ প্রচেষ্টা ছড়িয়ে পড়বে যাতে সর্বশ্রেণীর মানুষই উপকৃত হবে।

(১) মানবচরিত্রের সর্বপ্রধান গুণ হচ্ছে আত্মত্যাগ ও দানশীলতা। জ্ঞান, নিজে কষ্ট করে হলেও অপরকে সুখী করার প্রেরণা। সুদের ব্যবসায়ের অবশ্যস্বাবী ফলশ্রুতিতে এ প্রেরণা লোপ পায়। সুদখোর ব্যক্তি জনরের উপকার করা তো দূরের কথা অপরকে নিজ চেষ্টায় ও নিজ পুঁজি দ্বারা তার সমতুল্য হতে দেখলে তাও সহ্য করতে পারে না।

(২) সুদখোরেরা কোন বিদগ্ধ ব্যক্তির প্রতি দয়্যার হওয়ার পরিবর্তে জর বিপদের সুযোগে অবৈধ মুনাফা লাভের চেষ্টায় মগ্ন থাকে।

(৩) সুদ খাওয়ার ফলশ্রুতিতে অর্থলালসা সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। এতে এমন মগ্ন হয়ে পড়ে যে, ভালমন্দেরও পরিচয় থাকে না এবং সুদের অন্তত পরিণামের প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে।

সুদ ছাড়া কি কোন ব্যবসা চলতে পারে না? : সুদের স্বরূপ এর বৈয়রিক, পার্শ্ব ও ধর্মীয় অনিষ্টকারিতা বিস্তারিতভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এখন তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হলো অর্থনৈতিক ও আর্থিক অনিষ্টকারিতা। বর্তমান যুগে সুদই হচ্ছে কাজ-কারবারের প্রধান অবলম্বন। সারা বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য সুদের উপরই চলছে। এ থেকে মুক্তির উপায় কি? বর্তমান যুগে ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক বর্জন করার অর্থ ব্যবসায়ের জটীলতাপা গুটানো।

এর জওয়াব এই যে, কোন রোগ যখন ব্যাপক হয়ে মহামারীর আকার ধারণ করে, তখন তার চিকিৎসা কঠিন অবশ্যই হয়; কিন্তু নিষ্ফল কখনো হয় না। নিকটর সাথে যে কোন সংশোধন প্রচেষ্টাই পরিণামে সফল হয়। অব এজন্যে ধর্ম, দৃঢ়তা এবং সাহসিকতা একান্ত প্রয়োজন। কোরআন

وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ شَيْءٍ

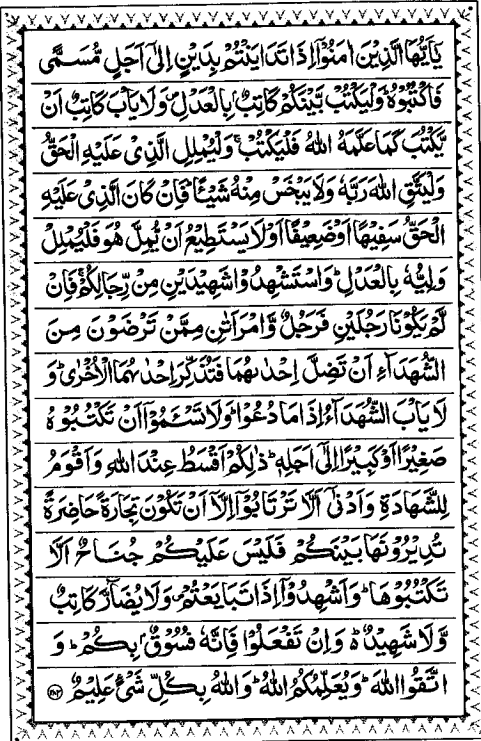
অর্থঃ, আল্লাহ তাআলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের কোনরূপ

সংকীর্ণতা ফেলে নি। তাই সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্যে এমন কোন কার্যকর ও ফলপ্রসূ পথ অবশ্যই রয়েছে, যাতে অর্থনৈতিক ক্ষতিও নেই, আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের দ্বারও রুদ্ধ হয় না এবং সুদ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা এই যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থার বর্তমান পদ্ধতি দেখে বাহ্যদৃষ্টিতে মনে করা হয় যে, সুদের উপরই ব্যাংক নির্ভরশীল ; সুদ ছাড়া ব্যাংক চলতে পারে না। কিন্তু এ ধারণা নিশ্চিতরূপে নির্ভুল নয়। সুদ ছাড়াও ব্যাংক ব্যবস্থা এমনভাবে ফলপ্রসূ ও কার্যকরী ভূমিকা সহকারেই কয়েম থাকতে পারে; শুধু তাই নয় বরং আরও উত্তম, ও উপকারী ভূমিকা নিয়েই তা প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। তবে এর জন্যে কিছুসংখ্যক শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও কিছু সংখ্যক ব্যাংক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাঁরা নতুনভাবে এর পদ্ধতি নির্ধারণ করলে সাফল্য দূরে নয়। শরীয়তের নিয়মানুযায়ী ব্যাংক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে ইনশাল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করবে যে, এতে জাতির কিল্লত মঙ্গল সাধিত হয়। ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনা করার পদ্ধতি ও নীতি ব্যাখ্যা করার স্থান এটা নয়, তাই এ সম্পর্কে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করতে হচ্ছে।

কিছু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সুদের প্রয়োজন দেখা দেয়। ব্যাংকের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন করে এর ব্যবস্থা করা যায়। সুদের দ্বিতীয় প্রয়োজন অসহায় দরিদ্র লোকদের সাময়িক অভাব পূরণ করা। এর চমৎকার প্রতিকার ইসলামে পূর্ব থেকেই যাকাতও গুয়াজিব সদকার আকারে বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ধর্ম ও ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা আজকাল যাকাত ব্যবস্থাকেও পঙ্গু করে দিয়েছে। অসংখ্য মুসলমান নামাযের মত যাকাতেরও ধারে কাছে যায় না। যারা যাকাত দেয়, তাদের মধ্যে অনেক বৃহৎ পুঁজিপতি হিসাব করে পূর্ণ যাকাতও প্রদান করে না। যারা সম্পূর্ণ যাকাত প্রদান করে, তারা শুধু যাকাত পকেট থেকে বের করতেই জানে। অথচ আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র যাকাত পকেট থেকে বের করারই নির্দেশ দেননি - তা আদায় করারও নির্দেশ দিয়েছেন। প্রদত্ত যাকাত যথার্থ হকদারকে পৌঁছে দিয়ে তার অধিকারভুক্ত করে দিলেই যাকাত আদায় করা শুদ্ধ হতে পারে। সুতরাং চিন্তা করার বিষয় হলো, এমন মুসলমান কয়জন আছে, যারা যথার্থ হকদার খুঁজে তাদের কাছে যাকাত পৌঁছে দিতে যত্নবান। মুসলমান জাতি যতই গরিব হোক, যাদের উপর যাকাত ফরয, তারা প্রত্যেকেই যদি পুরোপুরি যাকাত প্রদান করে এবং বিশুদ্ধ পন্থায় স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, তবে কব্বের তানিদে সুদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন কোন মুসলমানেরই থাকতে পারে না। যদি শরীয়তের বিধি অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হয়, এর অধীনে বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানদের ধন-সম্পদের যাকাত এতে জমা হয়, তবে বায়তুল-মাল থেকে প্রত্যেক অভাব গ্রস্তেরই অভাব পূরণ করা সম্ভব। বেশী টাকার প্রয়োজন হলে সুদবিহীন কব্জও প্রদান করা যেতে পারে। এভাবে বেকার ও কর্মহীনদের ছোট ছোট লোকান করে দিয়ে কিংবা কোন শিল্পকর্মে নিয়োগ করেও কাজে লাগানো যায়। জনৈক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ ঠিকই বলেছেন যে, মুসলমানরা যাকাত-ব্যবস্থার অনুবর্তী হয়ে গেলে তাদের মধ্যে কোন নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত লোক দেখা যাবে না।

মোটকথা, বর্তমান যুগে সুদকে মহামারী আকারে প্রসার লাভ করতে দেখে এরূপ মনে করা ঠিক নয় যে, সুদের ব্যবসা বর্জন করা অর্থনৈতিক আত্মহত্যার নামান্তর এবং এ যুগের লোক সুদের ব্যবসায়ের ব্যাপারে ক্ষমার।



(২৮২) হে মুমিনগণ। যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া। এবং ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। দু' জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু' জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু' জন মহিলা। এ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর—যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা এটা লিখতে অলসতা করো না, তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধ করণ আল্লাহর কাছে সুবিচারকে অধিক কায়ম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন।

এটা অবশ্য ঠিক যে, যতদিন সমগ্র জাতি কিংবা উল্লেখযোগ্য দল কিংবা কোন ইসলামী সরকার পূর্ণ মনোযোগ সহকারে একাজে সৎকেন্দ্রবদ্ধ না হয়, ততদিন দু'চার, দশ জনের পক্ষে সুদ বর্জন করা কঠিন, কিন্তু ক্ষমাই তবুও বলা যায় না।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধার-কর্জের ক্ষেত্রে দলীল লেখার নির্দেশ এবং সংশ্লিষ্ট বিধি; আলোচ্য আয়াতসমূহে লেন-দেন সম্পর্কিত আইনের জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। যাকে চুক্তিনামাও বলা যেতে পারে। এরপর সাক্ষ্য-বিধির বিশেষ ধারা উল্লেখিত হয়েছে।

আজকাল লেখালেখির যুগ। লেখাই মুখের কথার হ্রাসভিত্তিক হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি চৌদ্দ শ' বছর পূর্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন। তখন দুনিয়ার সব কাজ-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য মুখে মুখেই চলতো। লেখালেখি এবং দলীল-দস্তাবেজের প্রথা প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম কোরআন পাক এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বলা হয়েছে:

إِذَا قُتِلْتُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاتَّبِعُوهُ

অর্থাৎ, 'তোমরা যখন পরস্পর নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্যে ধার-কর্জের কারবার কর, তখন তা লিখে নাও'।

এতে প্রথম নীতি এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ধার-কর্জের লেন-দেন দলীল-দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করা উচিত—যাতে ভুল-ভ্রান্তি অথবা কোন পক্ষ থেকে অস্বীকৃতির কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তখন কাজে লাগে।

দ্বিতীয়তঃ ধার-কর্জের ব্যাপারে মেয়াদ অবশ্যই নির্দিষ্ট করতে হবে। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ধার-কর্জের লেন-দেন জায়েয নয়। এতে কলহ-বিবাদের দ্বার উন্মুক্ত হয়। এ কারণেই ফিকাহবিদগণ বলেছেন: মেয়াদও এমন নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে কোনরূপ অস্পষ্টতা না থাকে। মাস এবং দিন তারিখসহ নির্দিষ্ট করতে হবে। কোনরূপ অস্পষ্ট মেয়াদ, যেমন 'ধানকাটার সময়' নির্ধারিত করা যাবে না। কেননা, আবহাওয়ার পরিবর্তনে 'ধানকাটার সময়' আগে-পিছে হয়ে যেতে পারে। যেহেতু সে যুগে লেখার ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং আজও ব্যাপক প্রচলনের পর পৃথিবীর অধিকাংশ লোক লেখা জানে না, তাই সম্ভাবনা ছিল যে, লেখক কিসের স্থলে কি লিখে ফেলবে। ফল কারও ক্ষতি এবং কারও লাভ হয়ে যাবে। এ সম্ভাবনার কারণেই অতঃপর বলা হয়েছেঃ

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

অর্থাৎ, এটা জরুরী যে, তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখবে।

এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, লেখক কোন একপক্ষের লোক হতে পারবে না; বরং নিরপেক্ষ হতে হবে—যাতে কারও মনে সন্দেহ বা খটকা না থাকে।

অপরদিকে লেখককে ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অন্যের ক্ষণস্থায়ী উপকার করে নিজের চিরস্থায়ী ক্ষতি করা তার পক্ষে উচিত হবে না। এরপর লেখককে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তার এ লেখার বিদ্যা দান করেছেন। এর কৃতজ্ঞতা এই যে, সে লিখতে অস্বীকার করবে না।

এরপর দলীল কোন পক্ষ থেকে লিখতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে

وَلْيُؤْتِكُمُ اللَّهُ رِزْقًا وَلَا يَمْسَسْكُمْ سُوْرُهُمْ ۖ وَتُؤْتُوا لَهُمُ الْكُفْرَ ۚ

উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি সওয়া কিনে মূল্য বাকী রাখলো। এখানে যার দায়িত্বে দেনা হচ্ছে, সে দলীলের বিষয়বস্তু লেখাবে। কেননা, এটা হবে তার পক্ষ থেকে স্বীকৃতি বা অস্বীকারপত্র। লেখানোর মধ্যেও কমবেশীর সম্ভাবনা থাকতে পারে, তাই বলা হয়েছে :

وَلْيُؤْتِكُمُ اللَّهُ رِزْقًا وَلَا يَمْسَسْكُمْ سُوْرُهُمْ ۖ وَتُؤْتُوا لَهُمُ الْكُفْرَ ۚ

অর্থঃ, সে তার পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করবে এবং দেনা বিন্দুমাত্রও কম লেখাবে না। লেন-দেনের ব্যাপারে দেনাদার ব্যক্তি কখনও নির্বোধ অথবা অক্ষম, বৃদ্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বলক, মুক অথবা অন্য ভাষাভাষী হতে পারে। এ কারণে দলীলের বিষয়বস্তু বলে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। তাই অতঃপর বলা হয়েছে : এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে তার পক্ষ থেকে তার কোন অভিভাবক লেখাবে। পাগল ও নাবালগের তো অভিভাবক থাকেই। তাদের সব কাজ-কারবার অভিভাবক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মুক এবং অন্য ভাষাভাষীর অভিভাবকও এ কাজ করতে পারে। যদি তারা কাউকে টীকাল নিযুক্ত করে, তাতেও চলবে। এখানে কোরআন পাকের ‘ওলী’ শব্দটি উভয় অর্থই বুঝায়।

সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী মূলনীতি : এ পর্যন্ত লেন-দেনে লীল লেখা ও লেখানোর জরুরী মূলনীতি ব্যক্ত হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, দলীলের লেখাকেই যথেষ্ট মনে করবে না; বরং এতে সাক্ষ্যও রাখবে— যাতে কোন সময় পারস্পরিক কলহ দেখা দিলে আদালতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা ফয়সালা হতে পারে। এ কারণেই ফেকাহবিদগণ বলেছেন যে, লেখা শরীয়তসম্মত প্রমাণ নয়, তাই লেখার সমর্থনে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য বিদ্যমান না থাকলে শুধু লেখার উপর ভিত্তি করে ফয়সালা করা যায় না। আঙ্কালকার সাধারণ আদালতসমূহও এ রীতিই প্রচলিত রয়েছে। লেখার মৌখিক সত্যায়ন ও তৎসমর্থনে সাক্ষ্য ব্যতীত কোন ফয়সালা করা হয় না।

সাক্ষীর সংখ্যা : এরপর সাক্ষ্য-বিধির কতিপয় জরুরী নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণতঃ (১) সাক্ষী দু’জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু’জন মহিলা হওয়া জরুরী। একা একজন পুরুষ অথবা শুধু দু’জন মহিলা সাধারণ লেন-দেনের সাক্ষ্যের জন্যে যথেষ্ট নয়।

সাক্ষীদের শর্তাবলী : (২) সাক্ষী মুসলমান হতে হবে। وَمِنْ زَيْدٍ ۚ শব্দ এদিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। (৩) সাক্ষীকে নির্ভরযোগ্য ‘আদিল’ (বিশুদ্ধ) হতে হবে, যার কথার উপর আস্থা রাখা যায়। ফাসেক ও ফাজের (অর্থাৎ, পাপাচারী) হলে চলবে না। وَمِنْ تَرْوُتُونَ مِنَ الشُّرَكَاءِ ۚ বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে।

শরীয়ত সম্মত ওযর ব্যতীত সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করা গোনাহ :

নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যখন কোন ব্যাপারে কাউকে সাক্ষী করার জন্যে ডাকা হয়, তখন সে যেন আসতে অস্বীকার না করে। কেননা, সাক্ষ্যই হচ্ছে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার এবং বিবাদ মেটানোর উপায় ও পন্থা। কাজেই একে জরুরী জাতীয় কাজ মনে করে কষ্ট স্বীকার করবে। এরপর আবার লেন-দেনের দলীল লিপিবদ্ধ করার উপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে : লেন-দেন ছোট কিংবা বড় হোক—সবই লিপিবদ্ধ করা দরকার। এ ব্যাপারে বিরক্তিবোধ করা উচিত নয়। কেননা, লেন-দেন লিপিবদ্ধ করা

সত্য প্রতিষ্ঠিত রাখে, নির্ভুল সাক্ষ্য দিতে এবং সন্দেহ থেকে বৈধ থাকতে চমৎকাররূপে সহায়তা করে। যদি নগদ লেন-দেন হয়—বাকী না হয়, তবে তা লিপিবদ্ধ না করলেও ক্ষতি নেই। তবে এ ব্যাপারেও কমপক্ষে সাক্ষী রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা, উভয়পক্ষের মধ্যে কোন সময় মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। উদাহরণতঃ বিক্রোতা মূল্যপ্রাপ্তি অস্বীকার করতে পারে কিংবা ক্রোতা বলতে পারে যে, সে ক্রীতবস্তু বুঝে পায়নি। এ মতবিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সাক্ষ্য কাজে লাগবে।

সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করার মূলনীতি : আয়াতের শুরুতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন লিখতে ও সাক্ষী হতে অস্বীকার না করে। এমতাবস্থায় তাদেরকে হয়তো মানুষ বিরক্ত করে তুলতে পারতো। তাই আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে :

وَلَا يَصْنَعُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ

অর্থঃ, কোন লেখক বা সাক্ষীকে যেন কতিগ্নস্ত করা না হয়। অর্থাৎ, নিজের উপকারের জন্যে যেন তাদের বিব্রত না করা হয়। এরপর বলা হয়েছে : وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ ۚ অর্থঃ, তোমরা যদি লেখক বা সাক্ষীকে বিব্রত কর, তবে এতে তোমাদের গোনাহ হবে।

এতে বুঝা গেল যে, লেখক কিংবা সাক্ষীকে বিব্রত বা কতিগ্নস্ত করা হারাম। এ কারণেই ফকীহগণ বলেন : যদি লেখক লেখার পারিশ্রমিক দাবী করে কিংবা সাক্ষী যাতায়াত খরচ চায়, তবে এটা তাদের ন্যায্য অধিকার। তা না দেয়াও তাদেরকে কতিগ্নস্ত ও বিব্রত করার শামিল এবং অবৈধ। ইসলাম বিচার ব্যবস্থায় যেমন সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছে এবং সাক্ষ্য গোপন করাকে কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, তেমনি এ ব্যবস্থাও করেছে, যাতে কেউ সাক্ষ্য দেয়া থেকে গা ঝাটতে বাধ্য না হয়। এ দুবিধ সতর্কতার ফলেই প্রত্যেক মামলায় সত্যবাদী ও স্টিম্বার্ষ সাক্ষী পেতো এবং নিশ্চিন্তি দ্রুত, সহজ ও ন্যায্যনুগ হতো। বর্তমান বিশ্বে এ কোরআনী নীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে। ফলে সমগ্র বিচার ব্যবস্থা ভুলু হয়ে গেছে। ঘটনার আসল ও সত্য সাক্ষী পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকেই সাক্ষ্য দান থেকে গা ঝাটতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ এই যে, যার নাম সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়, পুলিশী ও কৌজদরী মোকদ্দমা হলে রোজই সময়ে-অসময়ে থানা পুলিশ তাদের ডেকে পাঠায়। মাঝে মাঝে কয়েক ঘণ্টা বসিয়ে রাখে। দেওয়ানী আদালতসমূহও সাক্ষীর সাথে অপরাধীর মত ব্যবহার করা হয়। এরপর রোজ রোজ মোকদ্দমার হাফিরা পরিবর্তিত হয়। তারিখের পর তারিখ পড়ে। যেচারা সাক্ষী নিজ কাজ-কারবার, মজুরী কিংবা প্রয়োজনীয় কাজকর্ম ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। অন্যথা হলে পরোয়ানা জারি করে শ্রেষ্ঠতার করা হয়। তাই কোন ভদ্র ও ব্যস্ত মানুষ কোন মামলার সাক্ষী হওয়াকে আশাব বলে মনে করে এবং যথাসাধ্য এ থেকে বৈধে থাকার চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। তবে শুধু পেশাদার সাক্ষীই এসব ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যাদের কাছে সত্য-মিথ্যার কোন পার্থক্য নেই। কোরআন পাক এ সম্পর্কিত মৌলিক প্রয়োজনাদি গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করে এসব অনিষ্টের দূর রুদ্ধ করে দিয়েছে। আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে :

وَأَتُوا اللَّهَ وَلَكُمْ اللَّهُ وَهُوَ يَكُنْ شَيْءًا

অর্থঃ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নির্ভুল নীতি শিক্ষা দেন। এটা তাঁর অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলা সববিষয়ে পরিপূর্ণ। এ আয়াতে অনেক বিশি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন ফেকাহবিদ এ আয়াত

البقرة

৫.

تِلْكَ الرُّسُلُ

وَأَن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَعْيٍ لَّمَّ يُدْوَكَابَرُوا مِن مَّقْصُودِكُمْ فَأَن
 أَوْ بَصُوكُمْ بَعْضًا فَأَيُّ الْوَيْلِ لِمَن أَمَانَتُهُ وَلَيْكِنَ اللَّهُ
 زَكِيٌّ وَلَا تُكَلِّمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْفُهَا فَاِنَّهُ إِسْمٌ عَلَيْهِ وَ
 اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
 وَإِن تُبْذَرُوا مَا فِي الْأَرْضِ لَنَنْصِلَنَّ أَهْلَهَا وَنُخَوِّضَهُ لِيَحْيَا بِكُمْ بِهِ
 اللَّهُ فَيَغْفِرَ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنَ الرَّسُولِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَ
 الْوَيْلُ لِمَن كَانَ مِنَ الْيَوْمِ وَمِنَ اللَّهِ وَمِنَ لَيْكَةِ وَكُتِبَ عَلَيْهَا
 لَا تُفَرِّقِي بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقُلْ وَاسْمِعْنَا وَاطْعِنَا
 عُمْرَانُكَ رَبَّنَا وَالْيَا لَيْكَ الْبَصِيرَةُ لَا يَكِلُ اللَّهُ تَعَالَىٰ
 وَسُعْمًا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
 تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا
 إِصْرَ الْكُفْرَةِ الَّتِي عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا
 مَا لَا حَاقَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٥

(২৬৩) আর তোমরা যদি প্রবাসে থাক এক কোন লেখক না পাও, তবে বন্ধকী বস্ত্র হস্তগত রাখা উচিত। যদি একে অন্যকে বিশ্বাস করে, তবে যাকে বিশ্বাস করা হয়, তার উচিত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করা এক স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভরসা করা! তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে কেউ তা গোপন করবে, তার অন্তর পাপপূর্ণ হবে। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। (২৬৪) যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে আছে, সব আল্লাহরই। যদি তোমরা মনের কথা প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিশালী। (২৬৫) রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও। সবাই বিশ্বাস রাখে আল্লাহর প্রতি, তাঁর কেরেশপাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরদের প্রতি। তারা বলে, আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। তারা বলে, আমরা শুনেছি এক কবুল করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (২৬৬) আল্লাহ কাউকে তার সাহায্যীত কোন কাজের তার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছে, হে আমাদের প্রভু। এক আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করিও না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর। আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্মুখদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

যে কে বিশটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ বাকীর ব্যাপারে যদি কেউ বিশৃঙ্খতার জন্যে কোন বস্ত্র বন্ধক নিতে চায়, তাও করতে পারে। কিন্তু এতে **مَقْصُودُهُ** শব্দ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বন্ধকী বস্ত্র দ্বারা উপকৃত হওয়া তার জন্যে জায়েয নয়। সে শুধু পাপ পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত একে নিজের অধিকারে রাখবে। এর যাবতীয় মুনাফা আসল মালিকের প্রাপ্য।

দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি কোন বিরোধ সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান রাখে, সে সাক্ষ্য গোপন করতে পারবে না। যদি সে গোপন করে, তবে তার অন্তর গোনাহগার হবে। 'অন্তর গোনাহগার' বলার কারণ এই যে, কেউ কে একে শুধু মুখের গোনাহ মনে না করে। কেননা, অন্তর থেকেই প্রথমে ইচ্ছা সৃষ্টি হয়। তাই অন্তরের গোনাহ প্রথম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

আলোচ্য আয়াত উপরোক্ত বিষয়বস্তুরই পরিশিষ্ট। এতে ইশিয়ার করা হয়েছে যে, সাক্ষ্য গোপন করা হারাম। তোমরা যদি ঘটনা জেনেও তা গোপন কর, তবে সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহ এর হিসাব গ্রহণ করবেন। এ ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইকরিমা (রাঃ), শা'বী (রাঃ) ও মুজাহিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।— (কুরতুবী)

শাদিক ব্যাপকতার দিক দিয়ে আয়াতটি ব্যাপক এবং যাবতীয় বিশ্বাস, এবাদত ও লেন-দেন এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতের তকসীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের প্রসিদ্ধ উক্তি তাই। আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সকল সৃষ্টির যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব গ্রহণ করবেন। যে কাজ করা হয়েছে এবং যে কাজের শুধু মনে মনে সংকল্প করা হয়েছে, সে সবগুলোরই হিসাব গ্রহণ করবেন। বোখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)—এর ভাষ্যে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কিয়ামতের দিন মুমিনকে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী করা হবে এবং আল্লাহ তাকে এক এক করে সব গোনাহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করবেন : এ গোনাহটি কি তোমার জানা আছে? মুমিন স্বীকার করবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন : আমি দুনিয়াতেও তোমার গোনাহ জনসমক্ষে প্রকাশ করিনি, আজও তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর নেক কাজের আমলনামা তার হাতে অর্পণ করা হবে। পক্ষান্তরে কাফের ও মুনাফিকদের পাপকাজসমূহ প্রকাশ্যে বর্ণনা করা হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বর্ণিত শেষ আয়াতদ্বয়ের বিশেষ ফযীলতঃ আলোচ্য আয়াত দু'টি সূরা বাক্বারার শেষ আয়াত। সীহ্ হাদীসসমূহে এ আয়াত দু'টির বিশেষ ফযীলতের কথা বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কেউ রাতের কোয়ায় এ আয়াত দু'টি পাঠ করলে তা তার জন্যে যথেষ্ট।

হযরত ইবনে - আব্বাস (রাঃ)—এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা এ দু'টি আয়াত জন্মান্তরের ভাগুর থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগৎ সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলা স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এশার নামাযের পর এ দু'টি আয়াত পাঠ করলে তা তাহাজ্জুদ নামাযের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়। মুত্তাদিরাক হাকেম ও বায়হকীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা এ দু'টি আয়াত দ্বারা সূরা বাক্বারার সমাপ্ত করেছেন। আরশের নিম্নস্থিত বিশেষ

গণ্ডার থেকে এ দু'টি আয়াত আমাদের দান করা হয়েছে। তোমরা বিশেষভাবে এ দু'টি আয়াত শিক্ষা কর এবং নিজেদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দাও।

এ কারণেই হযরত ফারুকে আযম ও আলী (রাঃ) বলেন, আমাদের রক্ত যার সামান্যও বুদ্ধিজ্ঞান আছে, সে এ দু'টি আয়াত পাঠ করা ব্যতীত ম্রিয় যাবে না। এ আয়াতদুয়ের অর্থগত বৈশিষ্ট্য অনেক। তন্মধ্যে একটি ইচ্ছুল বৈশিষ্ট্য এই যে, সূরা বাক্বারার অধিকাংশ বিধি-বিধান সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যথা বিশ্বাস, এবাদত, লেন-দেন, ঋণ-সামাজিকতা ইত্যাদি। সর্বশেষ এ আয়াতদুয়ের প্রথম আয়াতে ভ্রূগত মুমিনদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তাআলার যাবতীয় নিনা শিরোধার্য করে নিয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্যে উদ্যোগী হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্নের জওয়াব দেয়া হয়েছে, যা এ আয়াতদুয়ের পূর্ববর্তী আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের মনে দেখা দিয়েছিল। প্রশ্নটি ছিল হে—যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল :

وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِيْكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يَمَّاسِبْكُمۡ بِهِ اللّٰهُ

অর্থাৎ, 'তোমাদের অন্তরে যা আছে, প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর রহস্যহীন আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। জ্বায়াতের আল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যেসব কাজ করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার হিসাব নেবেন। অনিচ্ছাকৃত কু-চিন্তা ও কু-বিচ্যুতি এর অন্তর্ভুক্তই ছিল না। কিন্তু জ্বায়াতের ভাষা বাহ্যতঃ ব্যাপক ছিল। এতে বুঝা যেতো যে, অনিচ্ছাকৃত ধারণারও হিসাব নেয়া হবে। এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেলাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রসূল (সাঃ)-এর কাছে আরম্ভ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! এতদিন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হবে। মনে যেসব অনিচ্ছাকৃত কল্পনা আসে, সেগুলোর হিসাব হবে না। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি কল্পনারও হিসাব হবে। এতে তো শান্তির বল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়। মহানবী (সাঃ) জ্বায়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানতেন, কিন্তু উক্ত জ্বায়াতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাপকতার পরিস্রেক্ষিতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা সমীচীন মনে মনেলেন না, বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সাহাবায়ে-কেলামকে জাপাততঃ আদেশ দিলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, তা যজ্ঞ হোক কিংবা কঠিন—মুমিনের কাজ হল তা মেনে নেয়া। এ ব্যাপারে কিছুমাত্রও দ্বিধা করা উচিত নয়। আল্লাহ্ তাআলার প্রত্যেক আদেশ শুনে তোমাদের একথা বলা উচিতঃ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ অর্থাৎ, 'হে আমাদের পালনকর্তা। আমরা আপনার নির্দেশ গ্রহণ করি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রভু! যদি নির্দেশ পালনে আমাদের কোন ত্রুটি বা ভুল হয়ে থাকে, তবে তা ক্ষমা করুন। কেননা, আমাদের সবাইকে আপনাই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'

সাহাবায়ে-কেলাম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশ মত কাজ করলেন; যদিও তাঁদের মনে এ খটকা ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কু-চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এ ঘটনার পরিস্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাআলা এ দু'টি আয়াত নাযিল করেন। প্রথম জ্বায়াতে মুসলমানদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় জ্বায়াতে ঐ জ্বায়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যে জ্বায়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে-কেলামের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। প্রথম জ্বায়াতটি হচ্ছে :

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا تَقْرُبُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থাৎ, রসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ বিষয়ের প্রতি, যা তাঁর কাছে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মহানবী (সাঃ)-এর প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে 'রসূল' শব্দ ব্যবহার করে তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরপর বলেছেন : রসূল (সাঃ)-এর যেমন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রতি বিশ্বাস রয়েছে, তেমনি সাধারণ মুমিনদেরও রয়েছে। এতে প্রথমে পূর্ণ বাক্যে রসূল (সাঃ)-এর বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে, এরপর মুমিনদের বিশ্বাস পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বর্ণনা-ভঙ্গিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও আসল বিশ্বাসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সকল মুসলমান অভিন্ন, কিন্তু বিশ্বাসের স্তরে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিশ্বাস প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শ্রবণের ভিত্তিতে এবং অন্য মুসলমানগণের বিশ্বাস 'অদৃশ্য বিশ্বাস' এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেখার ভিত্তিতে।

এরপর মহানবী (সাঃ) ও অন্য মুমিনদের অভিন্ন ও সৎকণ্ড ঈমানের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্বের প্রতি, পূর্ণতার যাবতীয় গুণে তাঁর গুণান্বিত হওয়ার প্রতি, ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি এবং আল্লাহ্ তাআলার গ্রন্থাবলী ও সমস্ত পয়গম্বরগণের সকলেরই সত্য হওয়ার প্রতি।

এরপর বলা হয়েছে যে, এ উম্মতের মুমিনগণ পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মত আল্লাহ্ তাআলার পয়গম্বরগণের মধ্যে প্রভেদ করবে না যে, কাউকে পয়গম্বর মানবে এবং কাউকে মানবে না। যেমন, ইহুদীরা হযরত মুসা (আঃ)-কে এবং খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে পয়গম্বর মানে, কিন্তু শেষ নবী (সাঃ)-কে পয়গম্বর মানে না। এ উম্মতের প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তাআলার কোন পয়গম্বরকে অস্বীকার করে না। এরপর সাহাবায়ে-কেলামের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ, তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুখে বলেছিলেন :

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অতঃপর দ্বিতীয় জ্বায়াতে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে ঐ সন্দেহের নিরসন করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী জ্বায়াত থেকে দেখা দেয়ার সম্ভাবনা ছিল যে, অন্তরের গোপন ধারণার জন্যে দাবী করা হলে আযাব থেকে কিরণে বাঁচা যাবে। বলা হয়েছে - لَا يَكْفِيْكَ اللّٰهُ فَتَسْأَلُ اِلَّا وَسْعًا অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কাউকে তার সাধের বহির্ভূত কোন কাজের নির্দেশ দেন না। কাজেই অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব কল্পনা ও কু-চিন্তা অন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, এরপর সেগুলো কার্যে পরিণত করা না হয়, সেসব আল্লাহ্ তাআলার কাছে মাফ। যেসব কাজ ইচ্ছা করে করা হয়, শুধু সেগুলোরই হিসাব হবে।

এর বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, মানুষের যেসব কাজকর্ম হাত, পা, চক্ষু, মুখ ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোকে 'বাহ্যিক কাজকর্ম' বলা হয়। এগুলো দু'প্রকার : এক ইচ্ছাধীন—যা ইচ্ছা করে করা হয় ; যেমন ইচ্ছা করে কথা বলা, ইচ্ছা করে কাউকে প্রহার করা ইত্যাদি। দুই, অনিচ্ছাধীন, যা ইচ্ছা ছাড়াই ঘটে যায়। যেমন, এক কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা বলে ফেলা অথবা কাঁপুনি রোগে অনিচ্ছাকৃতভাবে হাত নড়ে যাওয়ার কারণে

কারণও কৃতি হয়ে যাওয়া। এখানে লক্ষণীয় যে, বিশেষভাবে ইচ্ছাধীন কাজ-কর্মেরই হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শান্তি হবে — অনিচ্ছাকৃত কাজের আদেশ মানুষকে দেয়া হয়নি এবং সেজন্যে সওয়াব বা আযাব হবে না।

এমনিভাবে যেসব কাজকর্ম মানুষের অন্তরে সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোও দু'প্রকার। এক, ইচ্ছাধীন। যেমন, ইচ্ছা করে অন্তরের কুফর ও শিরকের বিশৃঙ্খল পোষণ করা কিংবা জেনে বুঝে ইচ্ছা সহকারে নিজেকে বড় মনে করা। অর্থাৎ, অহংকার করা কিংবা মদ্য পানে কৃতসংকল্প হওয়া প্রভৃতি। দুই, অনিচ্ছাধীন। যেমন, ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মনে কু-ধারণা আসা। এ ক্ষেত্রেও হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শান্তি শুধু ইচ্ছাধীন কাজের জন্যেই হবে— অনিচ্ছাধীন কাজের জন্যে নয়।

কোরআনে বর্ণিত এ ব্যাখ্যার ফলে সাহাবায়ে-কেরামের মানসিক উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। আয়াতের শেষে এই বিষয়বস্তুটি আরও ফুটিয়ে তোলার জন্যে বলা হয়েছে:

لَهَا مَكْرَبٌ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

অর্থাৎ, মানুষ সওয়াবও সেকাজের জন্যেই পাবে, যা স্বেচ্ছায় করে এবং শাস্তিও সে- কাজের জন্যেই পাবে যা স্বেচ্ছায় করে।

এখানে সন্দেহ দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের সওয়াব অথবা আযাব হয়। যে ব্যক্তি কোন সংকাজ করে— যা দেখে অন্যরাও এ সংকাজে উদ্বুদ্ধ হয়, যতদিন পর্যন্ত অন্যেরা এ সংকাজ করতে থাকবে, ততদিন এর সওয়াব প্রথম ব্যক্তিও পেতে থাকবে। এমনিভাবে, যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ প্রবর্তন করে, ভবিষ্যতে যত লোক এ পাপকাজে লিপ্ত হবে, তাদের সমান পাপ প্রথম প্রচলনকারী লোক এ পাপকাজে লিপ্ত হবে, হাদীস দ্বারা আরও প্রমাণিত আছে যে, কেউ যদি নিজের সওয়াব অন্যকে দিতে চায়, তবে অন্য ব্যক্তি এ সওয়াব পায়। অতএব, বোঝা গেল যে, ইচ্ছা ছাড়াও মানুষের সওয়াব কিংবা আযাব হয়।

এ সন্দেহ নিরসনকল্প বলা যায় যে, প্রথমাবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে ঐ কাজের সওয়াব কিংবা আযাব হবে, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে। অতএব, পরোক্ষভাবে এমন কোন কাজের সওয়াব কিংবা আযাব হওয়া এর পরিপন্থী নয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করেনি। উপরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহে একথা

স্পষ্ট যে, প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সওয়াব কিংবা আযাব হয়নি, বরং অন্যের মধ্যস্থতায় হয়েছে। এছাড়া মধ্যস্থতার মধ্যে তার কার্য ও ইচ্ছার প্রভাব অবশ্যই রয়েছে। কেননা, যে ব্যক্তি কারণ ও উদ্ভাবিত ভাল কিংবা মন্দ পথ অবলম্বন করে, তার মধ্যে প্রথম ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত কাজের প্রভাব থাকে, যদিও প্রথম ব্যক্তি এ প্রভাবের ইচ্ছা করেনি। এমনিভাবে কেউ কোন ব্যক্তিকে সওয়াব তখনই পৌছায়, যখন সে তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করে থাকে। এ হিসেবে অপরের কাজের সওয়াব এবং আযাবও প্রকৃতপক্ষে নিজের কাজেরই সওয়াব ও আযাব।

উপসংহারে কোরআন পাক মুসলমানদেরকে একটি বিশেষ দোয়া শিক্ষা দিয়েছে। এতে ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ কোন কাজ হয়ে যাওয়ার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলা হয় :

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا سَيِّئَاتٍ وَلَا تَلْزَمْنَا

‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দায়ী করো না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি।’ এরপর বলা হয়েছে:

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ لَنَا فِتْنَةً عَلَى الْأَرْضِ وَلَا نَجْعَلْ لَنَا فِتْنَةً
وَلَا تَجْعَلْ لَنَا فِتْنَةً عَلَى الْأَرْضِ وَلَا تَجْعَلْ لَنَا فِتْنَةً

অর্থাৎ, ‘হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের উপর ভারী ও কঠিন কাজের বোঝা অর্পণ করো না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের (বনী-ইসরাঈলদের) উপর অর্পণ করেছিল এবং আমাদের উপর এমন ফরয কাজ আরোপ করো না, যা সম্পাদনের শক্তি আমাদের নেই।’

এর অর্থ সেসব কঠিন কাজকর্ম, যা বনী-ইসরাঈলের উপর আরোপিত ছিল। যেমন, না-পাক বস্ত্র ধৌত করলে পাক হতো না, বরং না-পাক অংশ কেটে ফেলতে হতো কিংবা পুড়িয়ে ফেলতে হতো এবং নিজেকে হত্যা করা ব্যতীত তাদের তওবা কবুল হতো না। কিংবা অর্থ এই যে, দুনিয়াতে আমাদের উপর আযাব নাযিল করো না; যেমন বনী-ইসরাঈলের কু-কর্মের জন্যে নাযিল করেছে। এসব দোয়া যে আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন, তা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

সূরা বাক্বারাহ সমাপ্ত

سُورَةُ آلِ اِمْرَانٍ مَّا تَلَوْتُمُوهَا وَلَا تَنْتَظِرُوهَا يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ آلِ اِمْرَانٍ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَنْفُسًا زَاكِيَةً وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْبُرْجَانَ وَاجْعَلُوا لِنَفْسِكُمْ اٰيَةً اِنْ كُنْتُمْ اٰمِنًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ اِلٰهًا اِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَیُّوْمُ ۝ نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَیْهِ وَاَنْزَلَ الْتَوْرَةَ وَالْاِنْجِیْلَ
مِنْ قَبْلُ هٰذَا لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا
بِاٰیٰتِ اللّٰهِ وَلَحَرَّ عَذَابٌ شَدِیْدٌ ۝ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُوْنُ عَرْشٍ مُّجِیْمٍ
اِنَّ اللّٰهَ لَکَیْفٌ عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ ۝
هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ کَیْفَ یَشَآءُ ۝ لَا اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝ هُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ
اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخْرٰى مُتَشٰبِهٰتٌ قَالَا الَّذِیْنَ
فِی قُلُوْبِهِمْ ذَرِّعٌ فَبَیِّنٌ مَّا نَتَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ
الْفِتْنَةِ وَاُبَیْنَةً تَاْوِیْلًا وَمَا یَعْلَمُوْنَ تَاْوِیْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَ
الرَّسُوْلُ فِی الْعُلُوْمِ یَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا
وَمَا یَذْكُرُ الْاَوَّلُوْنَ الْاَلْبَابِ ۝ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ فِی قُلُوْبِنَا بَعْدَ اِذْ
هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

সূরা আল-ইমরান

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত : ২০০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(১) আলিক-নাম-যীম। (২) আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরজীব, সবকিছুর ধারক। (৩) তিনি আপনার প্রতি কিতাব নামিল করেছেন সত্যতার সাথে, যা সত্যায়ন করে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের। (৪) নামিল করেছেন তওরাত ও ইঞ্জিল, এ কিতাবের পূর্বে, মানুষের হেদায়েতের জন্যে এক অবতীর্ণ করেছেন যীমাসো। নিম্নপক্ষেই যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ স্বীকার করে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশীল, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৫) আল্লাহর নিকট আসমান ও যমীনের কোন বিষয় গোপন নেই। (৬) তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মায়ের গর্ভে, যেমন তিনি চয়েছেন। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। (৭) তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নামিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কৃষ্ণতা রয়েছে, তারা অনুসরণ করে কিন্না বিস্তার এবং অপব্যবহার উদ্দেশ্যে তনুখেকার রূপকগুলোর। আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলেন : আমরা এর প্রতি ইমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধগতিসম্পন্নরা ছাড়া অপর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। (৮) হে আমাদের পালনকর্তা। সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লক্ষণে প্রবৃত্ত করোনা এবং তোমার নিকট থেকে আমাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দান করা। তুমিই সব কিছুই দাতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সর্বকালে সব পয়গম্বরই তওহীদের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন : দ্বিতীয় আয়াতে তওহীদের ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। যেমন, মনে করুন, কোন একটি বিষয়ে বিভিন্ন দেশের অধিবাসী ও বিভিন্ন সময়ে জনগ্রহণকারী সব মানুষ একমত। পূর্বাপর এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে শত শত, এমন কি হাজার হাজার বছরের ব্যবধান। একজনের উক্তি অন্য জনের কাছে পৌছারও কোন উপায় নেই। তা সত্ত্বেও যে-ই আসেন তিনিই যদি পূর্ববর্তীদের মত একই কথা বলেন এবং সবাই একই কর্ম ও একই বিশ্বাসের অনুসারী হন, তবে এমন বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করে নিতে মানব-স্বভাব বাধ্য। উদাহরণতঃ আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও তাঁর তওহীদের পরিচিতি সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ সর্বপ্রথম হযরত আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে পদার্পণ করেন। তাঁর ওফাতের পর তাঁর বংশধরদের মধ্যেও এই তথ্যের চর্চা প্রচলিত ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর এবং আদম সন্তানদের প্রাথমিক কালের আচার-অভ্যাস, সত্যতা-সংস্কৃতি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হওয়ার পর হযরত নূহ (আঃ) আগমন করেন। তিনিও মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কিত ঐসব তথ্যের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকেন, যেসব বিষয়ের প্রতি আদম আলাইহিস সালাম দাওয়াত দিতেন। অতঃপর সুদীর্ঘকাল অতীতের গর্ভে বিলীন হওয়ার পর ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক ও ইয়াকুব আলাইহিমুস সালাম ইরাক ও সিরিয়ায় জনগ্রহণ করেন। তাঁরাও হুহু একই দাওয়াত নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেন। এরপর মুসা ও হারুন আলাইহিমাস সালাম এবং তাঁদের বংশের পয়গম্বরগণ আগমন করেন। তাঁরা সবাই সে একই কলেমায়ে তওহীদের বাণী প্রচার করেন এবং এ কলেমার প্রতি মানুষজনকে দাওয়াত দিতে থাকেন। এর পরও দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে গেলে হযরত ঈসা (আঃ) সেই একই আহবান নিয়ে আগমন করেন। সবার শেষে খাতামুল-আম্মিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) একই তওহীদের দাওয়াত নিয়ে দুনিয়াতে আবির্ভূত হন।

মোটকথা, হযরত আদম থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন দেশে জনগ্রহণ করেন এবং সবাই একই বাণী উচ্চারণ করেন। তাঁদের অধিকাংশেরই পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয়নি। তাঁদের আবির্ভাবকালে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার আমলও ছিল না যে, এক পয়গম্বর অন্য পয়গম্বরের গ্রন্থাদি ও রচনাবলী পাঠ করে তাঁর দাওয়াতের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবেন। বরং সচরাচর তাঁদের একজন অন্যজন থেকে বহু শতাব্দী পরে জন্ম গ্রহণ করেছেন। জাগতিক উপকরণাদির মাধ্যমে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কোন অবস্থা তাঁদের জানা থাকারও কথা নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী লাভ করেই তাঁরা পূর্বসূরীদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকেই তাঁদেরকে এ দাওয়াত প্রচার করার জন্যে নিযুক্ত করা হয়।

এখন যে ব্যক্তি ইসলাম ও তওহীদের দাওয়াতের প্রতি মনে মনে কোনরূপ বৈরীভাব পোষণ করেন না, সে যদি খোলা মনে, সরলভাবে চিন্তা করেন যে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মানুষ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে একই সত্যের কথা বর্ণনা করলে তা মিথ্যা হতে পারে কি? তবে এতটুকু চিন্তাই তার পক্ষে তওহীদের সত্যতা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট। এক্ষেত্রে বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য কি না, তা যাচাই করারও প্রয়োজন থাকে না। বরং বিভিন্ন সময়ে জনগ্রহণকারী এত বিপুল

সংখ্যক লোকের এক বিষয়ে একমত হওয়াই বিষয়টির সত্যতা নিরূপণের জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু পয়গম্বরগণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, তাঁদের সত্যতা ও সাধুতার উচ্চতম মাপকাঠির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কারও পক্ষে এরূপ বিশ্বাস করা ছাড়া গতাস্তর নেই যে, তাঁদের বাণী ফোল আনাই সত্য এবং তাঁদের দাওয়াতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জগতেরই মঙ্গল নিহিত।

প্রথমদিকের দুই আয়াতে বর্ণিত তওহীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে যে,— কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টান একবার হযুর (সাঃ)—এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ধর্মীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। তিনি আল্লাহর নির্দেশে তাদের সামনে তওহীদের দু'একটি প্রমাণ উপস্থিত করলে খ্রীষ্টানরা নিরুত্তর হয়ে যায়।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতেও তওহীদের বিষয়বস্তু বিধৃত হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের বর্ণনা রয়েছে যে, এ জ্ঞান থেকে কোন জাহানের কোন কিছু গোপন নয়।

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তি এবং সর্ববিষয়ে সার্বিক সামর্থ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি মানুষকে জননীর উদরে তিনটি অঙ্ককার পর্যায়ে কিরূপ নিপুণভাবে গঠন করেছেন। তাদের আকার-আকৃতি ও বর্ণ বিন্যাসে এমন শিক্ষাসূচক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে, আকৃতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে একজনের আকার-আকৃতি অন্যজনের সাথে এমন মিল খায় না যে, স্বতন্ত্র পরিচয় দুরূহ হয়ে পড়ে। এহেন সর্বব্যাপী জ্ঞান ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের যুক্তিসঙ্গত দাবী এই যে, উপাসনা একমাত্র তাঁরই করতে হবে। তিনি ছাড়া আর কারো জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য এরূপ নয়। কাজেই অন্য কেউ উপাসনার যোগ্যও নয়।

এভাবে তওহীদ সপ্রমাণ করার জন্যে আল্লাহ তাআলার প্রধান চারটি 'সিফাত' চারটি আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে চিরঞ্জীব ও সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী হওয়ার সিফাত এবং তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ আয়াত পর্যন্ত সর্বব্যাপী জ্ঞান ও সার্বিক শক্তি-সামর্থ্যের সিফাত বর্ণিত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ চারটি গুণেই যে সত্য গুণান্বিত, তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা খ্রীষ্টানদের বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের মূলোৎপাটন করেছেন। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআনের এসব বাক্য 'মুতাশাবিহাত' অর্থাৎ, রূপক। এসব বাক্যের বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এগুলো আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুলের (সাঃ) মধ্যকার একটা গোপন রহস্য। এগুলোর প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সর্ব সাধারণ অবগত হতে পারে না, বরং এসব শব্দের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া সাধারণ মানুষের জন্যে বৈধ নয়। এগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী যে, এসব বাক্য দ্বারা আল্লাহ তাআলার যা উদ্দেশ্য, তা সত্য। এর অতিরিক্ত ঘাঁটা-ঘাঁটি করার অনুমতি নেই।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা কোরআনের সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট বা রূপক আয়াতের কথা উল্লেখ করে একটি সাধারণ মূলনীতি ও নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এ মূলনীতিটি বুঝে নেয়ার পর অনেক আপত্তি ও বাদানুবাদের অবসান ঘটে। এর ব্যাখ্যা এরূপ : কোরআন মজিদে দুই প্রকার আয়াত রয়েছে। এক প্রকারকে 'মুহকামাত' তথা সুস্পষ্ট আয়াত এবং অপর প্রকারকে 'মুতাশাবিহাত' তথা অস্পষ্ট ও রূপক আয়াত বলা হয়।

আরবী ভাষার নিয়মাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ব্যক্তি যে সব আয়াতের অর্থ সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারে, সে সব আয়াতকে মুহকামাত বলে এবং এরূপ ব্যক্তি যেসব আয়াতের অর্থ স্পষ্টরূপে বুঝতে সক্ষম না হয়, সেসব আয়াতকে মুতাশাবিহাত বলে। (মায়হরী, ২য় খণ্ড)

প্রথম প্রকার আয়াতকে আল্লাহ তাআলা 'উস্মুল কিতাব' আখ্যা দিয়েছেন। এর অর্থ এই যে, এসব আয়াতই সমগ্র শিক্ষার মূল ভিত্তি। এসব আয়াতের অর্থ যাবতীয় অস্পষ্টতা ও জটিলতা মুক্ত।

দ্বিতীয় প্রকার আয়াতে বক্তার উদ্দেশ্য; অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এগুলো সম্পর্কে বিশুদ্ধ পন্থা এই যে, এসব আয়াতকে প্রথম প্রকার আয়াতের আলোকে দেখতে হবে। যে অর্থ প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে যায়, তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বক্তার এমন উদ্দেশ্য বুঝতে হবে, যা প্রথম প্রকার আয়াতের বিপক্ষে নয়। এ ব্যাপারে স্বীকৃত মূলনীতি কিংবা কোন ব্যাখ্যা অথবা, কর্দর্শ করা বৈধ নয়। উদাহরণতঃ হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কোরআনের সুস্পষ্ট উক্তি এরূপ **إِن مُّوَاكِعِيَّتُكُم مِّنَ عَذَابِي** (সে আমার নেয়ামতপ্রাপ্ত বান্দা ছাড়া অন্য কেউ নয়)। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

إِن مَّكَلَّ عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ اللَّهُ كَيْفَ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ

অর্থাৎ, - আল্লাহর কাছে ঈসার উদাহরণ হচ্ছে আদমের অনুরূপ। আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে।

এসব আয়াত এবং এই ধরনের অন্যান্য আয়াত থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার মনোনীত বান্দা এবং তাঁর সৃষ্ট। অতএব 'তিনি উপাস্য, তিনি আল্লাহর পুত্র'— খ্রীষ্টানদের এসব দাবী সম্পূর্ণ বানোয়াট।

এখন যদি কেউ এসব সুস্পষ্ট প্রমাণ থেকে চোখ বন্ধ করে শুধু 'আল্লাহর বাক্য' এবং 'আল্লাহর আত্মা' ইত্যাদি অস্পষ্ট আয়াত সম্বল করে হঠকারিতা শুরু করে দেয় এবং এগুলোর এমন অর্থ নেয়, যা সুস্পষ্ট আয়াত ও পরস্পরাগত বর্ণনার বিপরীত, তবে একে তার বক্তা ও হঠকারিতা ছাড়া আর কি বলা যায় ?

কারণ, অস্পষ্ট আয়াতসমূহের নির্ভুল উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। তিনিই কৃপা ও অনুগ্রহপূর্বক যাকে যতটুকু ইচ্ছা জানিয়ে দেন। সুতরাং এমন অস্পষ্ট আয়াত থেকে কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়ে স্বমতের অনুকূলে কোন অর্থ বের করা শুদ্ধ হবে না।

وَلَا تَأْتِيكُمُ الْبَرَكَاتُ إِلَّا بِإِذْنِهِ - এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বর্ণিত

করেন যে, যারা সুস্থ স্বভাব-সম্পন্ন তারা অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে বেগী তথ্যানুসন্ধানে ও ঘাঁটাঘাটি করে না; বরং তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস করে যে, এ আয়াতটিও আল্লাহর সত্য কালাম। তবে তিনি কোন বিশেষ হেকমতের কারণে এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেননি প্রকৃতপক্ষে এ পর্যন্ত বিপদমুক্ত ও সতর্কতামুক্ত। এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক এমনও আছে, যাদের অন্তর বক্তাসম্পন্ন। তারা সুস্পষ্ট আয়াত থেকে চক্ষু বন্ধ করে অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে লিপ্ত থাকে এবং তা থেকে নিষ্কৃত মতলবের অনুকূলে অর্থ বের করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। এরূপ লোকদের সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

(১) আল্লাহর সত্যতার বিরুদ্ধে যে অবৈধ দাবীকার পরকল্পনা কোন কিছুতেই সত্যতার বিরুদ্ধে নয়। ইহন যোহর আল্লাহর সত্য লক্ষ্য নয়।

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ رَئِيبٍ فَيَذَرُ اللَّهُ لِكُلِّ فِرْقٍ خَلْقَهَا وَلَا يُبْعَادُ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ تَعْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۚ كَذَّابٌ
 آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ
 اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
 سَعْتٌ يَبُولُونَ وَيَحْسَبُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَيَسْأَلُونَ الْيَهُودَ ۝ قَدْ كَانَ
 لَكُمْ آيَةٌ فِي فَنَقِيْنِ الْفَتَنَاتِ فَيَقْتَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْأُخْرَى
 كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مُمِلَّةِجَةً إِلَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بَصَرَهُ
 مَنْ يَشَاءُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ ۝ رُفِيعٌ
 لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُتَمَدَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
 الْبَالِ ۝ قُلْ أُوْثِقْتُكُمْ بِعَهْدِي مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ
 رَبِّهِمْ جُنَّتْ نَجْوَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيلِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ
 مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝

(৯) হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ওয়াদার অনাধা করেন না। (১০) যারা কুফরী করে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনও কাজে আসবে না। আর তারা ই হচ্ছে দোষখের ইহ্ন। (১১) ফেরাউনের সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ধারা অনুযায়ীই তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে তাদের পাপের কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন আর আল্লাহর আযাব অতি কঠিন। (১২) কাফেরদিগকে বলে দিন, খুব শিগগীরই তোমরা পরাভূত হয়ে দোষখের দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে— সেটা কতই না নিকট অবস্থান (১৩) নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলায় মধ্যে তোমাদের জন্য নির্দশন ছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের, এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য। (১৪) মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশু, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্ত্রসামগ্রী। এ সবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়। (১৫) বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসবের গাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান বলবো?— যারা পরহেযগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে বেহেশত, যার তলদেশে প্রথম প্রবাহিত— তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পরিক্ষন্ন সঙ্গিনিগণ এবং আল্লাহর সন্ততি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সৃষ্টি রাখেন।

‘জ্ঞানে গভীরতার অধিকারী’ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

কারা? এ সম্পর্কে আলেমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। অধিকতর গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, এরা হলেন আলহুস সূনাত-ওয়াল-জমাআত। তাঁরা কোরআন ও সূনাহর সে ব্যাখ্যাই বিশুদ্ধ মনে করেন, যা সাহাবায়ে কেরাম, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমায় বর্ণিত রয়েছে। তাঁরা সুস্পষ্ট আয়াতসমূহকে কোরআনী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু মনে করেন এবং অস্পষ্ট আয়াতসমূহের যেসব অর্থ তাঁদের বোধগম্য নয়, নিজেদের জ্ঞানের দৈন্য স্বীকার করে সেগুলোকে তাঁরা আল্লাহর নিকটই সোপর্দ করেন। তাঁরা স্বীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও ঈমানী শক্তির জন্য গর্বিত নন; বরং সর্বদা আল্লাহর কাছে দৃঢ়তা ও অধিকতর জ্ঞান-গরিমা ও অন্তর-দৃষ্টি কামনা করতে থাকেন। তাঁদের মন-মস্তক অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে উৎসাহী নয়। তাঁরা সুস্পষ্ট ও অস্পষ্ট উভয় প্রকার আয়াতকে সত্য মনে করেন। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস এই যে, উভয় প্রকার আয়াত একই উৎস থেকে আগত। তবে এক প্রকার, অর্থাৎ, সুস্পষ্ট আয়াতের অর্থ জানা আমাদের জন্যে উপকারী ও জরুরী ছিল, এজন্যে আল্লাহ তাআলা তা গোপন রাখেন নি; বরং খোলাখুলি বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং অন্য প্রকার অর্থাৎ, অস্পষ্ট আয়াতের অর্থ আল্লাহ তাআলা বিশেষ হেকমতের কারণে বর্ণনা করেননি। কাজেই তা জানা আমাদের জন্যে জরুরী নয়। সংক্ষেপে এরূপ আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করাই যথেষ্ট।— (মাযহারী)

প্রথম আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, পথ-প্রদর্শন ও পথব্রততা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার অন্তরকে সংকাজের দিকে আকৃষ্ট করে দেন। আর যাকে পথব্রত করতে চান, তার অন্তরকে সোজাপথ থেকে বিচ্যুত করে দেন।

রসূল (সাঃ) বলেন : এমন কোন অন্তর নেই যা আল্লাহ তাআলার দুই অঙ্গুলীর মাঝখানে নয়! তিনি যতক্ষণ ইচ্ছা করেন, তাকে সংপথে কায়মে রাখেন এবং যখন ইচ্ছা করেন, সংপথ থেকে বিচ্যুত করে দেন।

তিনি যথেষ্ট ক্ষমতাশীল। যা ইচ্ছা, তাই করেন। কাজেই, যারা ধর্মের পথে কায়মে থাকতে চায়, তারা সর্বদাই আল্লাহর নিকট অধিকতর দৃঢ়চিত্ততা প্রদানের জন্যে দোয়া করে। হুম্বর (সাঃ) সর্বদাই অনুরূপ দোয়া করতেন। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিম্নরূপ একটি দোয়া বর্ণিত হয়েছে, يَا مُغْلِبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ دِينِكَ, হে অন্তর আবর্তনকারী, আমাদের অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখ।— (মাযহারী, ২য় খণ্ড)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتٌ يَسْتَعْلِبُونَ

কাফেররা পরাজিত ও পরাভূত হবে। এতে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, আমরা জগতের সব কাফেরকে পরাভূত দেখি না, এর কারণ কি? উত্তর এই যে, আয়াতে সারা জগতের কাফের বোঝানো হয়নি; বরং তখনকার মুশরিক ও ইহুদী জাতিকে বোঝানো হয়েছে। সেমতে মুশরিকদেরকে হত্যা ও বন্দী করার মাধ্যমে এবং ইহুদীদেরকে হত্যা, বন্দী, জিহিয়া কর আরোপ এবং নির্বাসনের মাধ্যমে পরাজিত করা হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতে বদর যুদ্ধের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ যুদ্ধে

কাফেরদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। তাদের কাছে সাত শত উট ও একশত অশু ছিল। অপরপক্ষে মুসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন শতের কিছু বেশী। তাদের কাছে সর্বমোট সত্তরটি উট, দুইটি অশু, ছয়টি লৌহবর্ম এবং আটটি তরবারী ছিল। মজার ব্যাপার ছিল এই যে, প্রত্যেক দলের দৃষ্টিতেই প্রতিপক্ষ দলের সংখ্যা নিজেদের চেয়ে দ্বিগুণ প্রতিভাত হচ্ছিল। এর ফলে মুসলমানদের আধিক্য কল্পনা করে কাফেরদের অন্তর উপরুপরি শঙ্কিত হচ্ছিল এবং মুসলমানগণও নিজেদের অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখে আল্লাহ তাআলার দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করছিলেন। তাঁরা পূর্ণ ভরসা ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর ওয়াদা

وَأَن يَكُنْ مِنكُمْ رَّائِيَةٌ مِّنَ رَبِّكَ وَيُؤْتِيَ الْأَمْثَلُ (যদি তোমাদের মধ্যে

একশত ঐশ্বর্যশীল যোদ্ধা থাকে, তবে তারা দুইশতের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে) — এর ওপর আস্থা রেখে আল্লাহর সাহায্যের আশা করছিলেন। কাফেরদের প্রকৃত সংখ্যা ছিল তিনগুণ। তা যদি মুসলমানদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে যেতো, তবে তাঁদের মনে ভয়-ভীতি সঞ্চার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। উভয়পক্ষের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের সংখ্যা দ্বিগুণ মনে হওয়ায় অবস্থাটা ছিল সাধারণ। আবার কোন কোন অবস্থায় উভয় দলই প্রতিপক্ষকে কম দেখেছিল। সূরা আনফালে এ সম্পর্কে বর্ণনা আসবে।

মোট কথা, মক্কায় প্রদত্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একটি স্বল্প সংখ্যক নিরস্ত্র দলকে বিরাট বাহিনীর বিপক্ষে জয়ী করা চম্চ্মান ব্যক্তিরদের জন্যে বিরাট শিক্ষণীয় ঘটনা। - (ফাওয়ায়েদে-আল্লামা ওসমানী)

দুনিয়ার মহব্বত : হাদীসে বলা হয়েছে **حب الدنيا رأس كل خطيئة** (দুনিয়ার মহব্বত সব অনিষ্টের মূল।) প্রথম আয়াতে দুনিয়ার কয়েকটি প্রধান কাম্যবস্তুর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে, — মানুষের দৃষ্টিতে এ সবার প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক করে দেয়া হয়েছে। তাই অনেক মানুষ এদের বাহ্যিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পরকালকে ভুলে যায়। আয়াতে যেসব বস্তুর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সাধারণভাবে মানুষের স্বাভাবিক কামনা-বাসনার লক্ষ্য। তন্মধ্যে সর্বপ্রথমে রমণী ও পরে সন্তান-সন্ততির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছুই অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, সবগুলোর মূল কারণ থাকে নারী অথবা সন্তান-সন্ততির প্রয়োজন। এর পর উল্লেখ করা হয়েছে সোনা, রূপা, পালিত পশু ও শস্যক্ষেতের কথা। কারণ, এগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ে মানুষের কাম্বিত ও প্রিয়বস্তু।

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের মনে এসব বস্তুর প্রতি স্বভাবগতভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এতে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। একটি এই যে, এসব বস্তুর প্রতি মানুষের স্বভাবগত আকর্ষণ বা মোহ না থাকলে জগতের সমুদয় শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠতো না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্যক্ষেতে কাজ করতে অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিশ্রম করতে অথবা ব্যবসায়ে অর্থ ও কায়িক শ্রম ব্যয় করতে কেউ প্রস্তুত হতো না। মানব স্বভাবে এসব বস্তুর প্রতি প্রকৃতিগত আকর্ষণ সৃষ্টি করার মধ্যেই জগতের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল করে দেয়া হয়েছে। ফলে মানুষ স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই এসব বস্তুর উৎপাদন ও সরবরাহ অব্যাহত রাখার চিন্তায় ব্যাপ্ত থাকে। ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠার পর শ্রমিক কিছু পয়সা উপার্জনের চিন্তায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। ধনী ব্যক্তি কিছু পয়সা খরচ করে শ্রমিক যোগাড় করার চিন্তায় বের হয়। ব্যবসায়ী উৎকৃষ্টতর পণ্যদ্রব্য সুন্দরভাবে সাজিয়ে

গ্রাহকের অপেক্ষায় বসে থাকে— যাতে কিছু পয়সা উপার্জন করা যায়। এদিককে গ্রাহক অনেক কটাক্ষিত পয়সা নিয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র কেনাকাটার উদ্দেশ্যে বাজারে পৌছে। চিন্তা করলে দেখা যায়; এসব প্রিয়বস্তুর ভালবাসাই সবাইকে নিজ নিজ গৃহ থেকে বের করে আনে এবং এ ভালবাসাই দুনিয়া জোড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৃষ্টি ও পরিচালনা-ব্যবস্থাকে মজবুত ও দৃঢ় একটা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় রহস্য এই যে, জাগতিক নেয়ামতের প্রতি মানুষের মনে আকর্ষণ ও ভালবাসা না থাকলে পারলৌকিক নেয়ামতের স্বাদ জানা যেতো না এবং তৎপ্রতি আকর্ষণও হতো না। এমতাবস্থায় সংকর্ম করে জন্মাত অর্জনের এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত হয়ে দোষ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনও কেউ অনুভব করতো না।

এখানে অধিকতর প্রশ্নাধনযোগ্য হলো তৃতীয় রহস্যটি। অর্থাৎ, এসব বস্তুর ভালবাসা স্বাভাবগতভাবে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে যে, কে এগুলোর আকর্ষণে মগ্ন হয়ে পরকালকে ভুলে যায় এবং কে এসবের আসল স্বরূপ ও ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয় অগত হয়ে শুধু যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু অর্জনে সচেষ্ট হয় ও পরকালীন কল্যাণ আহরণের লক্ষ্যে তার সুচারু ব্যবহার করে।

মোটকথা এই যে, জগতের সুখাদু ও মোহনীয় বস্তুগুলোকে আল্লাহ তাআলা কৃপাবশতঃ মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তৎপ্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এর অনেকগুলো রহস্যের মধ্যে অন্যতম রহস্য, মানুষের পরীক্ষা নেয়া। বাহ্যিক কাম্যবস্তু ও তার ক্ষণস্থায়ী স্বাদে মগ্ন হওয়ার পর মানুষ কিরূপ কাজ করে আল্লাহ তাআলা তা দেখতে চান। এসব বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহকে স্মরণ করে এবং এগুলোকে তাঁর মা'রেফত ও মহব্বত লাভের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে, তবে বলা যায় যে, সে দুনিয়াতেও লাভবান হয়েছে এবং পরকালেও সফলকাম হবে। জগতের লোভনীয় বস্তু তার পথের প্রতিবন্ধক হওয়ার পরিবর্তে তার পথ প্রদর্শক এবং সহায়ক হয়েছে। পক্ষান্তরে এসব বস্তু লাভ করার পর যদি মানুষ এগুলোর মধ্যেই আপাদমস্তক নিমজ্জিত হয়ে স্রষ্টাকে, পরকাল এবং হিসাব-নিকাশকে ভুলে যায়, তবে বলতে হবে যে, এসব বস্তুই তার পারলৌকিক জীবনের ধ্বংস ও অনন্তকাল শাস্তিভোগের কারণ হয়েছে। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে জগতেও এসব বস্তু তার শাস্তির কারণ ছিল।

আল্লাহ তাআলা যেসব বস্তুকে মানুষের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিয়েছেন, শরীয়ত অনুযায়ী সেগুলো পরিমিত উপার্জন করলে এক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সঞ্চয় করলে ইহকাল ও পরকালের কামিয়ারী হাসিল হবে। পক্ষান্তরে অবৈধ পন্থায় সেগুলো ব্যবহার করলে অথবা ঐ পন্থায় হলেও এগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত নিমজ্জিত হয়ে পরকাল বিস্মৃত হয়ে গেলে ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়বে।

এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি বিশেষ লোভনীয় বস্তুর কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছেঃ

ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حَسَنُ الْهَابِ

(৬) এর
করবে;
করেন
হাল্লাহ
ইকান
তার
করবে
করেন
দোষ
নিচ
দল
জাদে
যথায়
(১৪)
কর
আর
নিক
মাই
জাদে
পেখ
সব

অর্থাৎ, এসব বস্তু হচ্ছে পার্শ্ববর্তী জীবনে ব্যবহার করার জন্যে; মন সোনার জন্যে নয়। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা। অর্থাৎ, সেখানে চিরকাল থাকতে হবে এবং যার নেয়ামত ধ্বংস হবে না, হ্রাসও পাবে না।

১৫ নং আয়াতে এ সম্পর্কিত আরও ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :
 দ্বারা দুনিয়ার অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নেয়ামতে মত্ত হয়ে পড়েছে, আপনি তাদের বলে দিন যে, আমি তোমাদের আরও উৎকৃষ্টতর নেয়ামতের সন্ধান বল দিচ্ছি। যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং যারা আল্লাহর অনুগত, তারা এই নেয়ামত পাবে। সে নেয়ামত হচ্ছে সবুজ বৃক্ষলতাপূর্ণ বৈশেষত— যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরীর্ণসমূহ প্রবাহিত হবে। তাতে থাকবে সকল প্রকার আবিলতামুস্ত পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনিগণ এবং আল্লাহ তাআলার সন্ততি।

পূর্ববর্তী আয়াতে দুনিয়ার ছয়টি প্রধান নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। অর্থাৎ, রমণীকুল, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রূপার ভাণ্ডার, উৎকৃষ্ট ভূমি, পালিত জন্তু ও শস্যক্ষেত। এদের বিপরীতে পরকালের নেয়ামতরাজির মধ্যে বহুতঃ তিনটি বর্ণিত হয়েছে। প্রথম— জ্ঞানতের সবুজ কানন; দ্বিতীয়— পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনিগণ এবং তৃতীয়— আল্লাহর সন্ততি। অবশিষ্টগুলোর মধ্যে সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ এই যে, দুনিয়াতে দুই কারণে মানুষ সন্তান-সন্ততিকে ভালবাসে। প্রথমতঃ সন্তান-সন্ততি পিতার কাজকর্মে সাহায্য করে। দ্বিতীয়তঃ মৃত্যুর পর সন্তান-সন্ততি দ্বারা পিতার নামটুকু থেকে যায়। কিন্তু পরকালে কারও গাথাযের প্রয়োজন নেই এবং সেখানে মৃত্যুও নেই যে, কোন অভিভাবক জ্বা বা উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন হবে। এছাড়া দুনিয়াতে যার যত সন্তান-সন্ততি আছে, সে জ্ঞানতে তাদেরকে পাবে। পক্ষান্তরে দুনিয়ায় যার সন্তান নেই, প্রথমতঃ জ্ঞানতে তার মনে সন্তানের বাসনাই হবে না। আর কারও মনে বাসনা জাগ্রত হলে আল্লাহ তাকে তাও দান করবেন। ত্রিমিষীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কোন জ্ঞানতীর মনে সন্তানের বাসনা জাগ্রত হলে সন্তানের গর্ভাবস্থা, জন্মগ্রহণ ও বয়ঃপ্রাপ্তি মুহূর্তের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যাবে এবং তার মনের বাসনা পূর্ণ করা হবে।

এমনিভাবে জ্ঞানতে সোনা-রূপার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এই যে, দুনিয়াতে সোনা-রূপার বিনিময়ে দুনিয়ার আসবাবপত্র এবং প্রয়োজনীয় সবকিছুই যোগাড় করা যায়। কিন্তু পরকালে ক্রয়-বিক্রয়েরও প্রয়োজন হবে না এবং কোন কিছুর বিনিময়ও দিতে হবে না। বরং জ্ঞানতীর মন যখন চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা সরবরাহ করা হবে। এছাড়া জ্ঞানতে সোনা-রূপার কোন অভাব নেই। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জ্ঞানতে কোন কোন ধাসাদের একটি ইট সোনার ও একটি ইট রূপার হবে। মোটকথা, পরকালের হিসাবে সোনা-রূপাকে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তুই মনে করা হয়নি।

এমনিভাবে দুনিয়াতে ঘোড়ার কাজ হলো বাহন হয়ে পথের দূরত্ব

অতিক্রম করা। জ্ঞানতে সফর ও যানবাহন প্রভৃতি কোন কিছুই প্রয়োজন হবে না। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, শুক্রবার দিন জ্ঞানতীদের আরোহণের জন্যে উৎকৃষ্ট ঘোড়া সরবরাহ করা হবে। এগুলোতে আরোহণ করে জ্ঞানতীরা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা করতে যাবে।

মোট কথা, জ্ঞানতে ঘোড়ারও কোন উল্লেখযোগ্য স্তরুত্ব নেই। এমনিভাবে পালিত পশু কৃষিক্ষেত্রে কাজে আসে অথবা তা দুগ্ধ দান করে। জ্ঞানতে দুগ্ধ ইত্যাদি পশুর মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ তাআলা দান করবেন।

কৃষিকাজের অবস্থাও তদ্রূপ। দুনিয়াতে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে শস্যক্ষেত্রে পরিশ্রম করা হয়। জ্ঞানতে যাবতীয় শস্যই আপনা-আপনি সরবরাহ হবে। কাজেই সেখানে কৃষিকাজের প্রয়োজনই হবে না। তবুও যদি কেউ কৃষি কাজকে ভালবাসে, তবে তার জন্য সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। তিবরানীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জ্ঞানতে একব্যক্তি কৃষিকাজের বাসনা প্রকাশ করবে। তাকে তৎক্ষণাৎ যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করা হবে। অতঃপর শস্যের বপন, রোপন, পাকা ও কর্তন কয়েক মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। এসব কারণেই জ্ঞানতের নেয়ামতসমূহের মধ্যে শুধু জ্ঞানত ও জ্ঞানতের হরদের বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, জ্ঞানতীদের জন্যে কোরআনের ওয়াদাও রয়েছে যে, **وَأَنزَلْنَاكَ** অর্থাৎ, তারা যে বাসনাই প্রকাশ করবে, তাই পাবে। এহেন ব্যাপক ঘোষণার পর বিশেষ নেয়ামতের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে কি? তা সত্ত্বেও কয়েকটি বিশেষ নেয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো প্রত্যেক জ্ঞানতী চাওয়া ছাড়াই পাবে। এগুলোর পর আরও একটি সর্ববৃহৎ নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সাধারণভাবে মানুষ যার সম্পন্ন করে না। তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার আশেষ সন্ততি। হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন জ্ঞানতিগণ জ্ঞানতে তাআলার আশেষ সন্ততি। হাদীসে বর্ণিত আছে, যখন জ্ঞানতিগণ জ্ঞানতে পৌঁছে আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে এবং তাদের কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকবে না, তখন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাদের সমুদান করে বলবেন : এখন তোমরা সন্ততি ও নিশ্চিন্ত হয়েছ। আর কোন বস্তুর প্রয়োজন নেই তো? জ্ঞানতিগণ বলবেন : হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি এত নেয়ামত দান করেছেন যে, এরপর আর কোন নেয়ামতের প্রয়োজনই থাকতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলবেন : এখন আমি তোমাদের সব নেয়ামত থেকে উৎকৃষ্ট একটি নেয়ামত দিচ্ছি। তা এই যে, তোমরা সবাই আমার আশেষ সন্ততিলাভ করবে। এখন অসন্ততির আর কোন আশঙ্কা নেই। কাজেই জ্ঞানতের নেয়ামতরাজি ছিনিয়ে নেয়ার অথবা হ্রাস করে দেয়ারও কোন আশঙ্কা নেই।

এ দু'টি আয়াতের সারমর্মই হযুর (সাঃ) বলেছেন : “দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু এতে আছে তাও অভিশপ্ত; তবে ঐসব বস্তু নয়, যদ্বারা আল্লাহর সন্ততি অর্জন করা হয়।”

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّا كُنَّا ذُنُوبًا وَفَنَّا
عَذَابَ النَّارِ ۝ الظَّالِمِينَ وَالضَّالِّينَ وَالظَّالِمِينَ
وَالْمُتَّقِينَ ۝ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْاَسْحَارِ ۝ شَهِدَ اللَّهُ اَنَّهُ
لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلَكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا يَلْوُ سَطْرَهُ
لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ
الْاِسْلَامُ ۝ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ اِلَّا فِي
مَآ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعَثًا لِّبَنِيهِمْ وَمَنْ يُكْفُرْ يَالِيتَ اللَّهُ
فَاِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ فَاِنْ جَاءُوكَ فَقُلْ اسْمَلْتُ
وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۝ وَقُلْ لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ
وَالْاُمِّيْنَ ؕ اسْمَلْتُكُمْ فَاِنْ اسْمَلْتُمْ فَقَدْ اِهْتَكَا وَاَوْثَانَ
تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ يَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ۝ اِنَّ
الَّذِيْنَ يُكْفُرُوْنَ يَالِيتَ اللَّهُ وَيَقْسُوْنَ التَّيْبَانَ بِغَيْرِ
حَقٍّ ؕ وَيَقْسُوْنَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ
فَيَقْسِرُهُمْ بَعْدَ اِپْلَاقِ إِلَيْهِ ۝ وَاُولَئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ
اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصِيبٍ ۝

(১৬) যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও আর আমাদেরকে দোষের আযাব থেকে রক্ষা কর। (১৭) তারা বৈধব্যধারকারী, সত্যবাদী, নির্দেশ সম্পাদনকারী, সংপথে ব্যয়কারী এবং শেষরাত্রে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। (১৮) আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (১৯) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম। এবং যাদের প্রতি কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের নিকট প্রকৃত জ্ঞান আসার পরও ওরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ, যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি কুফরী করে তাদের জানা উচিত যে, নিশ্চিতরূপে আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত দ্রুত। (২০) যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও, “আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছি।” আর আহলে কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? তখন যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলা, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌঁছে দেয়া। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা। (২১) যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে এবং পয়গাম্বরগণকে হত্যা করে অন্যায়ভাবে, আর সেসব লোককে হত্যা করে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়, তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন। (২২) এরাই হলো সে লোক যাদের সমগ্র আমল দুনিয়া ও আখেরাত উভয়লোকেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

..... আল্লাহের কবীলত : এই আয়াতের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। ইমাম বগভী বলেন, সিরিয়া থেকে দু'জন বিশিষ্ট ইহুদী পণ্ডিত একবার মদীনায়া আগমন করেন। মদীনার আবাসিক এলাকা দেখে তারা মন্তব্য করেন যে, শেষ যমানার নবী যে রকম লোকালয়ে বসবাস করবেন বলে তওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে এটা ঠিক সে রকম বলেই মনে হচ্ছে। এরপর তারা জানতে পারেন যে, এখানে একজন মহান ব্যক্তি আছেন, যাঁকে সবাই নবী বলে আখ্যায়িত করে। তারা হযরত নবী করীম (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তওরাতে বর্ণিত আখেরী নবীর গুণাবলী তাঁদের সামনে ভেসে উঠে। তারা বললেন : আপনি কি মুহাম্মদ? তিনি বললেন : হাঁ। আমি মুহাম্মদ এবং আমি আহমদ। তারা আরও বললেন : আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করবো। যদি আপনি সঠিক উত্তর দেন, তবে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবো। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন : প্রশ্ন করুন। তারা বললেন, আসমাদী কিতাবসমূহের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য কোনটি? এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত নবী করীম (সাঃ) আয়াতটি তেলাওয়াত করে তাদের শুনিয়ে দিলে তারা তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে যান।

মুসনাদে আহমদে উদ্ধৃত হাদীসে আছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) আরাফাতের ময়দানে এ আয়াত পাঠ করার পর বললেন : “হে পরওয়ারদেগার আমিও এর সাক্ষ্যদাতা।”

‘দ্বীন ও ইসলাম শব্দের ব্যাখ্যা : আরবী ভাষায় دین শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে এক অর্থ রীতি ও পদ্ধতি। কোরআনের পরিভাষায় دین সেসব মূলনীতি ও বিধি-বিধানকে বলা হয় যা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সব পয়গম্বরের মধ্যে সমভাবেই বিদ্যমান রয়েছে। ‘শরীয়ত’ অথবা ‘মিনহাজ’ শব্দটি পরবর্তী পরিভাষা। ‘মায়হাব’ শব্দটি দ্বীনের বিভিন্ন শাখার বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উন্মত্তের মধ্যে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোরআন বলে :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا
তোমাদের জন্যে সে দ্বীনই প্রবর্তন করেছেন, যার নির্দেশ ইতিপূর্বে নূহ ও অন্যান্য পয়গম্বরকে দেয়া হয়েছিল।

এতে বোঝা যায়, সব পয়গম্বরের দ্বীনই এক ও অভিন্ন ছিল। অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তার যাবতীয় পরাকর্ষার অধিকারী হওয়া এবং সমুদয় দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়া এবং তাঁকে ছাড়া কেউ উপাসনার যোগ্য না হওয়ার প্রতি মনে প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকার করা, কোয়ামত দিবস, হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার ও শাস্তিদান এবং জ্ঞানাত ও দোষের প্রতি অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা ও মুখে স্বীকার করা, আল্লাহর প্রেরিত নবী-রসুল ও তাঁদের বিধানের প্রতিও তেমনভাবে ঈমান আনা। ‘ইসলাম’ শব্দের প্রকৃত অর্থ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা এবং তাঁর অনুগত হওয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং তাঁদের আনিত বিধি-বিধানের আনুগত্য

করেছে, তারা সবাই মুসলমান ও মুসলিম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিল এবং তাদের ধর্মও ছিল ইসলাম। এ অর্থের দিকে লক্ষ্য করেই হযরত নুহ (আঃ) বলেন : **وَأْمُرْنَا أَنْ أَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ** অর্থাৎ, আমি 'মুসলিম' হওয়ার জন্যে আদিষ্ট হয়েছি। - (সূরা ইউনুস) এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিজেকে ও নিজ উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমা' বলেছিলেন :

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

হযরত সৈসা (আঃ)-এর সহচরগণ এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিল : **وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ** 'সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম।'

মোটকথা এই যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে তাঁর আনীত দ্বীনই ছিল দ্বীনে ইসলাম এবং আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য। পরে এগুলো একের পর এক রহিত হয়েছে এবং পরিশেষে দ্বীনে-মুহাম্মদীই 'ইসলাম' নামে অভিহিত হয়েছে—যা কেয়ামত পর্যন্ত কায়ম থাকবে। যদি ইসলামের দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয় অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনীত ধর্ম, তবে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এ যুগে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। পূর্ববর্তী দ্বীনগুলোকেও তাদের সময়ে ইসলাম বলা হলেও এখন তা রহিত হয়ে গেছে। অতএব উভয় অবস্থাতে আয়াতের প্রকৃত অর্থ একই দাঁড়ায়।

তাই কোরআনের সম্মোহিত উম্মতের সামনে ইসলামের যে কোন জরী নেয়া হোক না কেন, সারমর্ম হবে এই যে, রসুলের (সাঃ) আবির্ভাবের পর কোরআন ও তাঁর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মই ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং এধর্মই আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য-অন্য কোন ধর্ম নয়। এ বিষয়বস্তুটি কোরআনের অসংখ্য আয়াতে বিভিন্ন শিরোনামে বিধৃত হয়েছে।

ইসলামেই মুক্তি নিহত : আজকাল ইসলামের উদারতার নামে কুফর ও ইসলামকে এক করার চেষ্টা করা হয় এবং বলা হয় যে, সৎকর্ম সম্পাদন করলে ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে যে কোন ধর্মাবলম্বীই মুক্তি পাবে—সে ইহুদী, খ্রীষ্টান, অথবা মূর্তিপূজারী যাই হোক। আলোচ্য আয়াত এ উদ্ভট মতবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এভাবে ইসলামের মূলনীতি বিধ্বস্ত করা হয়। কারণ, এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, ইসলামের বাস্তব কোন ভিত্তি নেই। এটা একটা কাম্পনিক বিষয়, যা কুফরের পোশাকেও সুন্দর মানায়। কোরআন মজীদে অসংখ্য আয়াত পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, আলো ও অন্ধকার যেকোন এক হতে পারে না, তদ্রূপ অবাধ্যতা ও আনুগত্য উভয়টি আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় হতে পারে না। যে ব্যক্তি ইসলামের কোন একটি মূলনীতি অস্বীকার করে, সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার প্রতি বিদ্রোহী ও পয়গম্বুরগণের শত্রু, প্রচলিত অর্থে সৎকর্ম বা নেক আমল ও প্রথাগত চরিত্রে সে যতই সুন্দর হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুলের আনুগত্যের উপরই পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত, তার কোন কর্ম ধর্মীয় নয়। কোরআনে এমন লোকদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। **فَلَا تَقْوِي لَهُمْ صُفُوفَ الْقِيَمَةِ وَرَبَّنَا** অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন আমি তাদের কোন আমল ওজন করব না।

পরিশেষে বলা হয়েছে : **وَمَنْ يَفْضُرْ يَأْتِ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ**

—অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে, আল্লাহ দ্রুত তার হিসাব গ্রহণ করবেন। মৃত্যুর পর প্রথমতঃ কবর তখা বরখ-জগতে পরকালের পাথে প্রথম পরীক্ষা নেয়া হবে। এরপর বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ হবে কেয়ামতে। এ হিসাব-নিকাশের সময়ই সব বিরোধের স্বরূপ ফুটে উঠবে। মিথ্যাপন্থীরা তাদের স্বরূপ জানতে পারবে এবং শাস্তিও আরম্ভ হয়ে যাবে।

آل عمران ৩

৫২

تلك الرسل ৩

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ
 اللَّهِ لِيَحْكُمَ بِهِمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فُرْقَانُ مَهُمْ وَمَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسُّنَا النَّارُ إِلَّا يَأْتِيَانَا مَعْدُودٌ ۚ وَعَسَى
 فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝ كَيْفَ إِذَا جُمِعَهُمْ لِيَوْمٍ لَا
 رَيْبَ فِيهِ ۚ وَوُعِدَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝
 قُلِ اللَّهُمَّ لَكَ الْمُلْكُ نَوْمًا الْمُلْكُ مَن شَاءَ وَتَنْزِيلُ الْمُلْكِ
 مَن شَاءَ وَتَعَزُّوهُنَّ شَاءَ وَتَوَلَّى مَن شَاءَ يُبْدِيكَ الْخَيْرُ
 إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ تُولِيهِ الْيَلَّ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّى تَوَلَّى
 فِي اللَّيْلِ وَتُخَوِّدُ الْبَنَاتِ وَتُخَوِّدُ الْبَنَاتِ مِنَ الْبَنَاتِ ۚ وَتُخَوِّدُ
 وَتُزْنُ مَن شَاءَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ لَا يَخْذِنُ الْمُؤْمِنُونَ
 الْكُفْرَيْنَ ۚ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ
 ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمُ تُقَاتُوا
 وَتُحِذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ تَوَلَّى إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝ قُلْ إِن
 تَخَفُوا مِافِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوهُ يُعَلِّمَكُمُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمَا
 فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(২৩) আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে—
আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের আহ্বান করা হয়েছিল যাতে তাদের মধ্যে
মীমাংসা করা যায়। অতঃপর তাদের মধ্যে একদল তা অমান্য করে মুখ
ফিরিয়ে নেয়। (২৪) তা এজন্য যে, তারা বলে থাকে যে, দোষখের আগুন
আমাদের স্পর্শ করবে না; তবে সামান্য হাতে গোনা কয়েকদিনের জন্য স্পর্শ
করতে পারে। নিজেদের উদ্ভাবিত ভিত্তিহীন কথায় তারা ঠোকা খেয়েছে।
(২৫) কিন্তু তখন কি অবস্থা! দাঁড়াবে যখন আমি তাদেরকে একদিন সমবেত
করবো—যে দিনের আগমনে কোন সন্দেহ নেই। আর নিজেদের কৃতকর্ম
তাদের প্রত্যেকেই পাবে—তাদের প্রাপ্য প্রদানে মোটেই অন্যায্য করা হবে না।
(২৬) বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে
ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং
যাকে ইচ্ছা সন্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর।
তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে
ক্ষমতাশীল। (২৭) তুমি রাতকে দিনের ভেতরে প্রবেশ করবে এবং দিনকে
রাতের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। আর তুমিই জীবিতকে মৃতের ভেতর
থেকে বের করে আন এবং মৃতকে জীবিতের ভেতর থেকে বের কর। আর
তুমিই যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর। (২৮) মুমিনগণ যেন অন্য
মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে
আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের
পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে
থাকবে আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন এবং
সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (২৯) বলে দিন, তোমরা যদি মনের
কথা গোপন করে রাখ অথবা প্রকাশ করে দাও, আল্লাহ সে সবই জানতে
পারেন। আর আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সেসবও তিনি জানেন।
আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিশালী।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহের শানে-নুযূল : মুসলমানদের অব্যাহত উন্নতি ও ইসলামের
ক্রমবর্ধমান প্রসার দেখে বদর যুদ্ধে পরাজিত এবং ওহুদ যুদ্ধে বিপর্যস্ত
মুশরেক ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তাই
সবাই মিলে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যথাসর্বশ্ব কোরবান করতে
প্রস্তুত হচ্ছিল। অবশেষে দেশময় গভীর মড়যন্ত্রের ফল স্বরূপ
মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরেক, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের একটি সম্মিলিত একা
গড়ে উঠলো। ওরা সবাই মিলে মদীনার উপর ব্যাপক আক্রমণ ও চূড়ান্ত
যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলো। সাথে সাথে তাদের অগণিত সৈন্য দুনিয়ার বুক
থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার সংকল্প নিয়ে মদীনা
অবরোধ করে বসলো। কোরআনে এ যুদ্ধ ‘গযওয়ায়ে-আহ্‌যাব’ অর্থাৎ,
সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ এবং ইতিহাসে ‘গযওয়ায়ে-খন্দক’ নামে উল্লেখিত
হয়েছে। রসুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণের সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করেছিলেন
যে, শত্রু সৈন্যের আগমন পথে মদীনার বাইরে পরিখা খনন করা হবে।

বায়হাকী, আবুনাযীম ও ইবনে খুযায়মার রেওয়াজেতে বলা হয়েছে যে,
প্রতি চল্লিশ হাত পরিখা খননের দায়িত্ব প্রতি দশজন মুজাহিদ সাহাবীর
উপর অর্পন করা হয়। পরিকল্পনা ছিল কয়েক মাইল লম্বা যথেষ্ট গভীর
ও প্রশস্ত পরিখা খনন করা হবে, যাতে শত্রু সৈন্যরা সহজে অতিক্রম
করতে না পারে। খনন কাজ দ্রুত সমাপ্ত করাও দরকার ছিল। তাই
নিবেদিতপ্রাণ সাহাবিগণ কঠোর পরিশ্রম সহকারে খননকার্যে মশগুল
ছিলেন। পেশাব-পায়খানা, পানাহার ইত্যাদি প্রয়োজনে কাজ বন্ধ রাখা
দুরূহ ছিল। তাই একটানা ক্ষুধার্ত থেকেও কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছিল।
বাস্তববেও কাজটি এমন ছিল যে, আজকালকার আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বিষ্ট
বাহিনীর পক্ষেও এত অল্প সময়ে এ কাজ সমাধা করা সহজ হতো না।
কিন্তু এখানে ঈমানী শক্তি কার্যকর ছিল। তাই অতি সহজেই কাজ সমাধা
হয়ে গেলো।

হযরত নবী করীম (সাঃ)ও একজন সৈনিক হিসেবে খননকার্যে
অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঘটনাক্রমে পরিখার এক অংশে একটি বিরাট
প্রস্তরখণ্ড বের হলো। এ অংশে নিয়োজিত সাহাবিগণ সর্বশক্তি ব্যয় করেও
প্রস্তরখণ্ডটি ভেঙ্গে অপসারণ করতে ব্যর্থ হলেন। তাঁরা মূল
পরিকল্পনাকারী হযরত সালমান ফারসীর মাধ্যমে হযরত নবী করীম
(সাঃ)—এর কাছে সংবাদ পাঠালেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত
হলেন এবং কোদাল দিয়ে প্রস্তরখণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত করতেই তা
খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেলো এবং একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ উথিত হলো। এ
স্ফুলিঙ্গের আলোকছটা বেশ দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। হযরত নবী
করীম (সাঃ) বললেন : এ আলোকছটায় আমাকে হীরা ও পারস্য
সাম্রাজ্যের রাজপ্রাসাদ দেখানো হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় বার আঘাত
করতেই আরেকটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিক্ষুব্ধিত হলো। তিনি বললেন : এ
আলোকছটায় আমাকে রোম সাম্রাজ্যের লাল বর্ণের রাজপ্রাসাদ ও
দালান-কোঠা দেখানো হয়েছে। অতঃপর তৃতীয়বার আঘাত করতেই
আবার আলোকছটা ছড়িয়ে পড়লো। তিনি বললেন : এতে আমাকে
সানুআ ইয়ামনের সুউচ্চ রাজ-প্রাসাদ দেখানো হয়েছে। তিনি আরও
বললেন : আমি তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি, জিবরাইল (আঃ) আমাকে

বলেছেন যে, আমার উম্মত অদূর ভবিষ্যতে এসব দেশ জয় করবে।

এ সংবাদে মদীনার মুনাফেকরা ঠাট্টা-বিদ্রোপের একটা সুযোগ পেয়ে বসলো। তারা বলতে লাগলো : দেখ, প্রাণ বাচানোই যাদের পক্ষে দায়; যারা শত্রুর ভয়ে আহা-নিদ্রা ত্যাগ করে দিবারাত্র পরিখা খননে ব্যস্ত, তারাই কিনা পারস্য, রোম ও ইয়ামন জয় করার দিবা-স্বপ্ন দেখছে। আল্লাহ্ তাআলা এসব নির্বোধ জালেমদের উত্তরেই আলোচ্য **قُلِ اللَّهُمَّ لَكَ** আয়াতটি নাযিল করেন।

এতে মুন্সাজাত ও দোয়ার ভাষায় অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে জ্বতিসমূহের উত্থান-পতন ও সাম্রাজ্যের পট পরিবর্তনে আল্লাহ্ তাআলার জ্বতিহিত শক্তি সামর্থ্যের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য বিজয় সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে জগতের বৈপ্লবিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ, জ্বতিসমূহের উত্থান-পতনের ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং কণ্ঠে নুহ, আদ, সামুদ প্রভৃতি অবাধ্য জ্বতিগুলোর ধ্বংসকাহিনী সম্পর্কে উদাসীন ও মূর্খ শত্রুদের ঘসিয়ার করা হয়েছে যে, এরা বাহ্যিক শান-শওকতের পূজা করে। এরা জানে না, জগতের সমস্ত শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার করায়ত্ত। সম্মান ও অপমান তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি দরিদ্র ও পথের ভিখারীকে রাজ সিংহাসন ও মুকুটের অধিকারী করতে পারেন এবং প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটদের হাত থেকে রাষ্ট্র ও ঐশ্বর্য ছিনিয়ে নিতে পারেন। আজ পরিখা খননকারী ক্ষুধার্ত ও নিঃশব্দের আগামীকাল সিরিয়া, ইরাক ও ইয়ামন সাম্রাজ্যের অধিকারী করে দেওয়া তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

ভাল ও মন্দে নিরিখ : আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে **بَيِّنَاتٍ** অর্থাৎ, তোমার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। আয়াতের প্রথমার্শে রাজত্ব দান করা ও ছিনিয়ে নেয়া এবং সম্মান ও অপমান উভয়দিক উল্লেখ করা হয়েছিল। এ কারণে এখানে **والشَّرِّ** (তোমার হাতেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণ) কিন্তু আয়াতে শুধু **خَيْرٍ** (কল্যাণ) শব্দ ব্যবহার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে বিষয়কে কোন ব্যক্তি অথবা জ্বতি অকল্যাণকর বা বিপজ্জনক মনে করে, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা জ্বতির জন্যে আপাতদৃষ্টিতে অকল্যাণকর ও বিপজ্জনক মনে হলেও পরিণামের সামগ্রিক ফলশ্রুতির দিক দিয়ে তা অকল্যাণকর নাও হতে পারে।

মোটকথা, আমরা যেসব বিষয়কে মন্দ বলি, সেগুলো পুরোপুরি মন্দ নয়— আংশিক মন্দ মাত্র। বিশৃঙ্খলা ও বিশৃ-পালকের দিকে সমৃদ্ধ এবং সামগ্রিক উপযোগিতার দিক দিয়ে কোন বস্তুই মন্দ নয়।

২৭ নং আয়াতে নভোমণ্ডলেও আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমতার ব্যাপ্তি বর্ণনা করা হয়েছে—

ثُمَّ لِيُكَفِّرَنَّ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ لِيُكَفِّرَنَّ فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ, আপনি ইচ্ছা করলেই রাত্রির অংশ দিনে প্রবিস্ত করে দিনকে বর্ধিত করে দেন এবং দিনের অংশ রাত্রিতে প্রবিস্ত করে রাত্রিকে বর্ধিত করে দেন।

সবাই জানেন যে, দিবারাত্রির ছোট বা বড় হওয়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই আয়াতের সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, নভোমণ্ডল, তৎসংশ্লিষ্ট সর্ববৃহৎ গ্রহ সূর্য এবং সর্বক্ষুদ্র উপগ্রহ চন্দ্র-সবই আল্লাহ্

তাআলার ক্ষমতাধীন। অতএব উপাদান-জগত ও অন্যান্য শক্তি যে, আল্লাহ্ তাআলাই ক্ষমতাধীন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

وَنُفِخُ فِي سُورٍ مِّنَ الْأَيْمَنِ وَنُفِخُ فِي السُّورِ الْأُخْرَىٰ আপনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন। যেমন, ডিম থেকে বাচ্চা অথবা বীর্ষ থেকে সন্তান অথবা বীজ থেকে বৃক্ষ বের করেন। পক্ষান্তরে আপনি মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। যেমন, পাখি থেকে ডিম, জীব থেকে বীর্ষ অথবা বৃক্ষ থেকে ফল ও শুষ্ক বীজ।

জীবিত ও মৃতের ব্যাপক অর্থ নেয়া হলে জ্ঞানী-মূর্খ পূর্ণ-অপূর্ণ এবং মুমিন ও কাফের সবাই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ্ তাআলার সর্বব্যাপী ক্ষমতা সমগ্র আত্মা-জগত ও আধ্যাত্মিক জগতের উপর সুস্পষ্টরূপে পরিব্যাপ্ত হয়। অর্থাৎ, তিনি ইচ্ছা করলেই কাফেরের গুঁরসে মুমিন অথবা মূর্খের গুঁরসে জ্ঞানী পয়দা করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলেই মুমিনের গুঁরসে কাফের এবং জ্ঞানীর গুঁরসে মূর্খ পয়দা করতে পারেন। তাঁরই ইচ্ছায় আয়রের গৃহে খলীলুল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন এবং নূহ (আঃ)-এর গৃহে তাঁর গুঁরসজাত পুত্র কাফের থেকে যায়, আলেমের সন্তান জাহেল থেকে যায় এবং জাহেলের-সন্তান আলেম হয়ে যায়।

আয়াতে সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর আল্লাহ্ তাআলার একচ্ছত্র ক্ষমতা কিরূপ প্রাঞ্জল ও মনোরম ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণিত হয়েছে, উপরোক্ত বিবরণ থেকে সহজেই তা বোঝা যায়। প্রথমেই উপাদান জগত এবং তার শক্তি ও রাজত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর নভোমণ্ডল ও তার শক্তিসমূহ উল্লেখিত হয়েছে। সবশেষে আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার বর্ণনা এসেছে। প্রকৃতপক্ষে এটাই সমগ্র বিশৃশক্তির সর্বোচ্চ শক্তি।

সবশেষে বলা হয়েছে : **وَنُفِخُ فِي سُورٍ مِّنَ الْأَيْمَنِ وَنُفِخُ فِي السُّورِ الْأُخْرَىٰ** অর্থাৎ, আপনি যাকেই ইচ্ছা অপরিমিত রিয়ক দান করেন। কোন সৃষ্টজীব জানতে পারে না— যদিও সৃষ্টার খাতায় তা কড়ায়-গণ্ডায় লিখিত থাকে।

আলোচ্য আয়াতের বিশেষ ক্ষমীলত : ইমাম বগভীর নিজস্ব সনদে বর্ণিত এক হাদীসে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফাতেহা, আয়াতুল-কুরসী, সূরা আলে-ইমরানের **شَهِدَ اللَّهُ** আয়াত শেষ পর্যন্ত এবং **قُلِ اللَّهُمَّ** আয়াত **يُغِيثُ الْحَيَاةَ** পর্যন্ত পাঠ করে, আমি তার ঠিকানা জান্নাতে করে দেব, আমার সকাশে স্থান দেব, দৈনিক সত্তর বার তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেব, তার সত্তরটি প্রয়োজন মিটাব, শত্রুর কবল থেকে আশ্রয় দেব এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাকে জয়ী করব।

অমুসলমানদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কি রূপ হওয়া উচিত কোরআনে এ সম্পর্কিত অনেক আয়াত রয়েছে। সূরা মুমতাহিনায় বলা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا دَعْوَىٰ وَعْدُوهُمْ أَتَأْتِيهِم بِالْحُكْمِ فَهُمْ بِالْهَمَّةِ

“হে মুমিনগণ। আমার ও তোমাদের শত্রু অর্থাৎ, কাফেরদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করো না যে, তাদের কাছে তোমার বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাবে।”

পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ হওয়া উচিত : এ বিষয়বস্তুটি কোরআনের বহু আয়াতে সংক্ষেপে এবং কোন কোন স্থানে বিস্তারিতভাবে

উল্লেখ করা হয়েছে। এসব আয়াতে অ-মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। এসব দেখে শুনে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ অমুসলিমদের মনে সন্দেহ জাগে যে, মুসলমানদের ধর্ম কি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে সদাচার প্রদর্শনেরও কোন অবকাশ নেই? পক্ষান্তরে এর বিপরীতে কোরআনের অনেক আয়াত, রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর অনেক বাণী এবং খোলাফায়ে-রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবিগণের আচরণ থেকে অমুসলিমদের সাথে দয়া, সদ্যবহার, সহানুভূতি এবং সমবেদনার নির্দেশও পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, এমনসব ঘটনাবলীও প্রমাণিত দেখা যায়, যা অন্যান্য জাতির ইতিহাসে একান্তই বিরল। এসব দেখে একজন স্থলবুদ্ধি মুসলমানও এক্ষেত্রে কোরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলীতে পরস্পর বিরোধিতা ও সন্দেহ অনুভব করতে পারে। কিন্তু উপরোক্ত উভয় প্রকার ধারণা সত্যিকার কোরআনী শিক্ষার প্রতি অগভীর মনোযোগ ও অসম্পূর্ণ তথ্যানুসন্ধানের ফল। কোরআনের বিভিন্ন স্থান থেকে এতদসম্পর্কিত আয়াতগুলো একত্রিত করে গভীরভাবে চিন্তা করলে অ-মুসলিমদের অভিযোগও দূর হয়ে যায় এবং আয়াত ও হাদীসসমূহের মধ্যে কোন প্রকার পরস্পর বিরোধিতাও অবশিষ্ট থাকে না। এ উদ্দেশ্যে বিষয়টির পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা হচ্ছে। এতে বন্ধুত্ব, অনুগ্রহ, সদ্যবহার, সহানুভূতি ও সমবেদনার পারস্পরিক পার্থক্য এবং প্রত্যেকটির স্বরূপ জানা যাবে। আরো জানা যাবে তার কারণ কি কি?

দুই ব্যক্তি অথবা দুই দলের মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। একটি স্তর হলো আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার। এই স্তরের সম্পর্ক একমাত্র মুসলমানদের সাথেই হতে পারে, অ-মুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করা কিছুতেই জায়েয নয়।

দ্বিতীয়তঃ সমবেদনার স্তর। এর অর্থ সহানুভূতি, শুভাকাঙ্ক্ষা ও উপকার করা। এই স্তরের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে এবং যুদ্ধরত অ-মুসলিম সম্প্রদায় ছাড়া সব অ-মুসলমানদের সাথেও স্থাপন করা জায়েয।

সূরা মুমতাহিনায় বলা হয়েছেঃ “যারা তোমাদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে যুদ্ধরত নয় এবং মাতৃভূমি থেকে তোমাদের বহিস্কার করেনি, তাদের সাথে দয়া ও ন্যায়বিচারের ব্যবহার করতে আলাহ তোমাদের নিষেধ করেন না।”

তৃতীয়তঃ সৌজন্য ও আতিথেয়তার স্তর। এর অর্থ বাহ্যিক সদাচার ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার। এই সম্পর্কের উদ্দেশ্য যদি ধর্মীয় উপকার সাধিত করা অথবা আতিথেয়তা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা হয়ে থাকে, তবে সব অ-মুসলমানের সাথেই এটা জায়েয। সূরা আলে-ইমরানের আলাচ্য আয়াতে **اَللّٰهُ يَهْدِيْ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبِيْلًا** বলে এ স্তরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা জায়েয নয়। তবে যদি তুমি তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করার লক্ষ্যে বন্ধুত্ব করতে চাও, তাহলে জায়েয। সৌজন্যভাবেও বন্ধুত্বের হয়ে থাকে। এজন্য একে বন্ধুত্ব থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে।—(বয়ানুল-কোরআন)

চতুর্থতঃ লেন-দেনের স্তর। অর্থাৎ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকুরী, শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপন করা। এ স্তরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাও সব অ-মুসলমানের সাথে জায়েয। তবে এতে যদি মুসলমানদের ক্ষতি হয়, তবে জায়েয নয়। রসূলুল্লাহ (সঃ), খোলাফায়ে-রাশেদীন ও অন্যান্য

সাহাবী কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ফিকাহবিদগণ এ কারণেই যুদ্ধরত কাফেরদের হাতে সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং শুধুমাত্র স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছেন। তাদের চাকুরী প্রদান করা অথবা তাদের কল-কারখানা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাকুরী করা সবই জায়েয।

এ আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কোন কাফেরের সাথে কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। তবে অনুগ্রহ সহানুভূতি ও উপকার সাধন যুদ্ধরত কাফের ছাড়া সবার বেলায়ই জায়েয। এমনভাবে বাহ্যিক সচ্চরিত্রতা ও সৌহার্দমূলক ব্যবহার সবার সাথেই জায়েয রয়েছে; তবে এর উদ্দেশ্য অতিথির আতিথেয়তা অথবা অ-মুসলমানকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করা অথবা তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা হতে হবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) ‘রাহ্মাতুল্লিল-আলামীন’ হয়ে জগতে আগমন করেন তিনি অ-মুসলমানদের সাথে যেরূপ অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছেন, তার নবীর ঝুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মক্কায দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে যে শত্রুরা তাঁকে দেশ থেকে বহিস্কার করেছিল, তিনি স্বয়ং তাদের সাহায্য করেন। এরপর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে সব শত্রু তাঁর করতলগত হয়ে যায়। কিন্তু তিনি একথা বলে সবাইকে মুক্ত করে দেন যে, **اَللّٰهُ يَهْدِيْ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبِيْلًا** অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের শুধু ক্ষমাই করা হচ্ছে না, বরং অতীত উৎপীড়নের কারণে তোমাদের কোনরূপ ভরসণাও করা হবে না। অ-মুসলিম যুদ্ধবন্দী হাতে আসার পর তিনি তাদের সাথে এমন ব্যবহার করতেন, যা অনেক পিতাও পুত্রের সাথে করেন না। কাফেররা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল, কিন্তু তাঁর হাত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে কখনও উদ্বিগ্ন হয়নি। মুখে বদদোয়াও তিনি করেন নি। অ-মুসলিম বনু-সাকীফের একটি প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি মসজিদে-নব বীতে তাদের অবস্থান করতে দেন—যা ছিল মুসলমানের দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ সম্মানের স্থান।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলমানদের মত অ-মুসলমান দরিদ্র যিম্মীদেরও সরকারী ধনাগার থেকে ভাতা প্রদান করতেন। খোলাফায়ে-রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের কাজ-কর্মের মধ্যে এ জাতীয় অসংখ্য ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো ছিল সহানুভূতি, সৌজন্য ও লেন-দেনমূলক ব্যবহার—নিষিদ্ধ বন্ধুত্ব নয়।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, ইসলামে অ-মুসলিমদের জন্যে কতটুকু উদারতা ও সদ্যবহারের শিক্ষা বর্তমান রয়েছে। অপরদিকে বন্ধুত্ব বর্জনের আয়াত থেকে স্ট বাহ্যিক পরস্পর বিরোধিতাও দূর হয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কোরআন কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন এত কঠোরভাবে নিষেধ করে কেন? কেন অবস্থাতেই এরূপ সম্পর্ক জায়েয না রাখার রহস্য কি? এর একটি বিশেষ কারণ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে জগতের বৃহৎ মানুষের অস্তিত্ব সমগ্র জিন-জানোয়ার অথবা জঙ্গলের বৃক্ষ ও লতা-পাতার মত নয় যে, জমলাত করবে, বড় হবে, এরপর মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বরং ইসলাম মনে করে যে, মানুষের জীবন একটি উদ্দেশ্যমূলক জীবন। মানুষের খাওয়া-পরা, উঠা-বসা, নিদ্রা-জাগরণ এমন কি, জন্ম-মৃত্যু সবই একটি উদ্দেশ্যের চারপাশে অবিরত ঘুরছে। এসব কাজকর্ম যতক্ষণ সে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে, ততক্ষণই তা নির্ভুল ও শুদ্ধ। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্যের

[illegible]

(৩০) সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভাল কাজ করেছে, চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ কাজ করেছে তাও, ওরা তখন কামনা করবে, যদি তার এবং এসব কর্মের মধ্যে ব্যবধান ঘুরের হতো। আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করলেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। (৩১) বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এক তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মাফনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (৩২) বলুন, আল্লাহ ও রসুলের অনুগত প্রকাশ কর। বস্ত্তঃ যদি তারা বিশ্বস্ততা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না। (৩৩) দ্বিসন্দেহে আল্লাহ আদম (আঃ), নূহ (আঃ) ও ইব্রাহীম (আঃ)—এর বংশের এবং এমরানের খান্দানকে নির্বাচিত করেছেন। (৩৪) যারা বংশের ছিলেন পরম্পরায়। আল্লাহ শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী। (৩৫) এমরানের স্ত্রী যখন বললো— হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত। (৩৬) অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো— বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি এগর কন্যা প্রসব করেছি। বস্ত্তঃ কি সে প্রসব করেছে আল্লাহ তা ভাইই জানেন। সেই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি—অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে। (৩৭) অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন—অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে যাকরিয়্যার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করলেন। যখনই যাকরিয়্যাহ্ মেহরাবের মধ্যে তাঁর কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন—‘মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো? তিনি বলতেন, ‘এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিখিক দান করেন।

বিপরীত হয়ে গেলেই তা অশুদ্ধ।

আল্লাহ রাব্বুল-আলামীনের আনুগত্য ও এবাদতই যখন মানব-জীবনের লক্ষ্য, তখন জগতের কাজ-কারবার, রাজ্যশাসন, রাজনীতি ও পারিবারিক সম্পর্ক সবই এ লক্ষ্যের অধীন। অতএব যে মানব এ লক্ষ্যের বিরোধী, সে মানবতার প্রধান শত্রু।

বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসে এ বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে : **من أحب لله واغض لله فقد استكمل ایمانه** “যে ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুত্ব ও শত্রুতাকে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন করে দেয়, সে স্বীয় ঈমানকে পূর্ণতা দান করে।” এতে বোঝা গেল যে, স্বীয় ভালবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা ও বিদ্বেষকে আল্লাহর ইচ্ছার অধীন করে দিলেই ঈমান পূর্ণতা লাভ করে। অতএব মুমিনের আন্তরিক বন্ধুত্ব এমন ব্যক্তির সাথেই হতে পারে, যে এ উদ্দেশ্য হাসিলে তার সঙ্গী এবং আল্লাহর অনুগত। এ কারণে কাকেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপনকারীদের সম্পর্কে কোরআনের উল্লেখিত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, ওরা কাকেরদেরই অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে : আল্লাহ্ স্বীয় মহান সন্তার প্রতি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। ক্ষণস্থায়ী স্বার্থের খাতিরে কাফেরদের আন্তরিক বুদ্ধিতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করবে না। বন্ধুত্বের সম্পর্ক অন্তরের সাথে। অন্তরের অবস্থা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং বাস্তবে কেউ কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব রেখে মুখে তা অস্বীকার করতে পারে। এ কারণে দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : “তোমাদের অন্তরের গোপন ভেদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা ওয়াকিফহাল। অস্বীকৃতি ও অপকৌশল তাঁর সামনে অচল।”

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ভালবাসা একটি গোপন বিষয়। কারও প্রতি কারও ভালবাসা আছে কি না, অল্প আছে কি বেশী আছে, তা জানার একমাত্র মাপকাঠি হলো, অবস্থা ও পারস্পরিক ব্যবহার দেখে অনুমান করা অথবা ভালবাসার চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখে জেনে নেয়া। যারা আল্লাহকে ভালবাসার দাবীদার এবং আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষী, আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা স্বীয় ভালবাসার মাপকাঠি তাদের বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ, জগতে যদি কেউ পরম প্রভুর ভালবাসার দাবী করে, তবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণের কষ্টপাথরে তা যাচাই করে দেখা অত্যাবশ্যকীয়। এতে আসল ও মেকী ধরা পড়বে। যার দাবী যতটুকু সত্য হবে, সে রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর অনুসরণে ততটুকু যত্নবান হবে এবং তাঁর শিক্ষার আলোকে পথের মশালরূপে গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে যার দাবী দুর্বল হবে, রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর অনুসরণে তার অলসতা ও দুর্বলতা সেই পরিমাণে পরিলক্ষিত হবে।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের আলোচনা : হযরত নবী করীম (সঃ-এর রেসালাতে সন্দেহ পোষণ করার কারণে যেসব লোক তাঁর আনুগত্য করতো না, আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের পথ প্রদর্শনের জন্যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কিছু নবীর বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তাদের সন্দেহ দূর হয়ে যায়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের আলোচনায় হযরত আদম, নূহ, আল-ইবরাহীম ও আল-ইমরানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছে।

আল এন'৩

৫৭

তলাক الرسل ৩

هٰذَا لَكَ دَعَاؤُكَ رَبِّ تَارَةً قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ فَدَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ
يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَيِّنِي مَصْدَقًا لِكَلِمَةٍ
مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا أَوْحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الرُّسُلِ ۝ قَالَ رَبِّ
أَنِّي كُنْتُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ
كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ
إِنِّي أَتُكِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَزِيدُ ۝ فَكَرَّرَ
كَيْدًا وَاسْتَمِعَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝ وَذَاتَ الْمَلَائِكَةِ
يَسْمِعُونَ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ وَأَصْطَفَاكَ عَلَى
نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ۝ يَسْمِعُ أَفْتِنِي لِرَبِّكَ وَاسْمِعْنِي وَادْعُنِي
مَعَ الرُّسُلِ ۝ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا
كَنتَ لَدَيْهِمْ أَذِيًّا فَبَقُوا أَكَلَامَهُمْ أَفْلَمْ مَرِيمَ وَمَا
كَنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِمَرْيَمُ
إِنَّ اللَّهَ يَبْشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
وَجِئْنَاكِ الذِّنْيَا وَالْأُخْرَىٰ ۝ وَمِنَ الْمُتَوَسِّلِينَ ۝

(৩৮) সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পুত্র-পবিত্র সন্তান দান কর—নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (৩৯) যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহুইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহ্র নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সম্পর্কে যাবেন না, তিনি অত্যন্ত সংকমল নবী হবেন। (৪০) তিনি বললেন, ‘হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র-সন্তান হবে, আমার যে বার্বকা এসে গেছে, আমার স্ত্রীও যে বন্ধ্যা’ বললেন, আল্লাহ্ এমনভাবেই যা ইচ্ছা করে থাকেন। (৪১) তিনি বললেন, হে পালনকর্তা! আমার জন্য কিছু নিদর্শন দাও। তিনি বললেন, তোমার জন্য নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলবে না। তবে ইশারা ইঙ্গিতে করতে পারবে এবং তোমার পালনকর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে আর সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। (৪২) আর যখন ফেরেশতারা বলল,—হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে পছন্দ করছেন এবং তোমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। তোমাকে বশু-নারী সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন। (৪৩) হে আর তোমাকে বশু-নারী সমাজের উপাসনা কর এবং রুকুকারীদের সাথে সেজদা ও রুকু কর। (৪৪) এ হলো গায়েবী সংবাদ, যা আমি আপনাকে পাঠিয়ে থাকি। আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন প্রতিযোগিতা করছিল যে, কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে এবং আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিলো। (৪৫) যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহা—মারইয়াম-ভনয় ঈসা; দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহ্র ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত।

এখানে হযরত ঈসা (আঃ)—এর আলোচনাই আসল উদ্দেশ্য। এর আগে তাঁর মাতা ও মাতামহীর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর রহস্য ও উপযোগিতা পরে বর্ণিত হবে। মোটকথা এই যে, শেষ জমানায় মুসলিম সম্প্রদায়কে হযরত ঈসা (আঃ)—এর সাথে একযোগে কাজ করতে হবে। এ কারণে তাঁর পরিচয় ও লক্ষণাদির বর্ণনায় কোরআন অন্যান্য পয়গম্বরের তুলনায় অধিক যত্নবান।

পূর্ববর্তী পয়গম্বুরগণের শরীয়তে প্রচলিত এবাদত-পদ্ধতির মধ্যে আল্লাহ্র নামে সন্তান উৎসর্গ করার রেওয়াজও ছিল। এসব উৎসর্গকৃত সন্তানদের পার্থিব কোন কাজকর্মে নিযুক্ত করা হতো না। এ পদ্ধতি অনুযায়ী মরিয়মের জননী নিজের গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে মানুত করলেন যে, তাকে বিশেষভাবে বায়তুল-মুকাদ্দাসের খেদমতে নিয়োজিত করা হবে এবং অন্য কোন পার্থিব কাজে নিয়োগ করা হবে না। কিন্তু যখন তিনি কন্যা প্রসব করলেন, তখন এই ভেবে অপেক্ষা করতে লাগলেন যে, কন্যা দ্বারা তো এ কাজ সম্ভবপর নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁর আশ্চর্যকর বরকতে কন্যাকেই কবুল করে নিলেন এবং সারা বিশ্বের কন্যাদের মধ্যে তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দান করলেন।

এতে বোঝা যায় যে, সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন-পালনের ব্যাপারে জননীর বিশেষ অধিকার রয়েছে। একরূপ না হলে মরিয়মের জননী মানুত করতেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هٰذَا لَكَ دَعَاؤُكَ رَبِّ হযরত যাকারিয়া (আঃ) তখনও পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন।

সময়ও ছিল বার্বকোর—যে বয়সে স্বাভাবিকভাবে সন্তান হয় না। তবে খোদায়ী শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, অলৌকিকভাবে এহেন বার্বকোর মধ্যেও তিনি সন্তান দিতে পারেন। তবে অসময়ে ও অস্থানে দান করার খোদায়ী মহিমা ইত্যপূর্বে তিনি কখনও প্রত্যক্ষ করেন নি। তাই এযাবৎ সাহস করে দোয়া করেননি। কিন্তু এসময় যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা ফলের মণ্ডসুম ছাড়াই মরিয়মকে ফল দান করেছেন, তখনই তাঁর মনের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো এবং তিনি দোয়া করার সাহস পেলেন; যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ মণ্ডসুম ছাড়াই ফল দিতে পারেন, তিনি বৃদ্ধ দম্পতিকে হযরত সন্তানও দেবেন। বললেন—

এতে বোঝা যায় যে, সন্তান হওয়ার জন্যে দোয়া করা পয়গম্বুর ও সন্তানদের সুনীত।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

অর্থাৎ, হযরত নবী করীম (সাঃ)—কে যেরূপ স্ত্রী ও সন্তান দান করা হয়েছে, তদ্রূপ এই নেয়ামত পূর্ববর্তী পয়গম্বুরগণকেও দেয়া হয়েছিল। এখন কেউ যদি কোন পন্থায় সন্তান জন্মগ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তবে সে শুধু স্বভাববধের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে না, বরং পয়গম্বুরের একটি সার্বজনীন ও সর্বসম্মত সুনীত থেকেও বঞ্চিত হয়।

হযরত নবী করীম (সাঃ) বিবাহ ও সন্তানের প্রশ্রুটিকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করেছেন। তাই যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহ কিংবা সন্তান গ্রহণে ক্রীড়া প্রকাশ করে, তাকে তিনি স্বীয় দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অনুমতি দেননি। তিনি বলেনঃ

“বিবাহ আমার সূনাত। যে ব্যক্তি এ সূনাত থেকে বিমুখ হয়, সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিবাহ কর। কেননা, তোমাদের আধিক্যের কারণে আমি অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করবো।”

কلمة الله (আল্লাহর বাণী) - হযরত ইসা (আঃ)-কে ‘কলেমাতুল্লাহ’ করার কারণ এই যে, তিনি শুধু আল্লাহর নির্দেশে চিরাচরিত প্রথার বিপরীতে পিতার মাধ্যম ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

وَحَصْرًا এটা হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর তৃতীয় গুণ। এর অর্থ দ্বিতীয় কামনা-বাসনা থেকে নিজে থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। উদাহরণতঃ উত্তম পানাহার, উত্তম পোশাক পরিধান এবং বিবাহ ইত্যাদি। এ গুণটি প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে উল্লেখ করায় বাহ্যতঃ মনে হয় যে, এটাই উত্তম পন্থা। অর্থাৎ বিভিন্ন হাদীসে বিবাহিত জীবন-যাপন করাই যে উত্তম একথা প্রমাণিত আছে। এ সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কারণও অবস্থা হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর মত হয়- অর্থাৎ, অন্তরে পরকালের চিন্তা প্রবল হওয়ার কারণে স্ত্রীর প্রয়োজন অনুভূত না হয় এবং স্ত্রী ও সন্তানদের হক আদায় করার মত অবকাশ না থাকে, তবে তার পক্ষে বিবাহ না করাই উত্তম। এ কারণেই যেসব হাদীসে বিবাহের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তাতে এ কথাও বলা হয়েছে، من استطاع منكم البائة، অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বিবাহের সামর্থ্য রাখে এবং স্ত্রীর হক আদায় করতে পারে, তার পক্ষেই বিবাহ করা উত্তম- অন্যথায় নয়।— (বয়ানুল-কোরআন)

হযরত যাকারিয়া (আঃ)-এর দোয়ার তাৎপর্য :

أَيُّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ

- হযরত যাকারিয়া (আঃ) খোদাযী শক্তি-সামর্থ্যে বিশ্বাসী ছিলেন। ইতিপূর্বে এর নমুনা প্রত্যক্ষ করে নিজে দোয়াও করেছিলেন। এছাড়া দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়ও তিনি অবগত ছিলেন। এতসবের পরেও ‘কিভাবে আমার পুত্র হবে’ বলার মানে কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, এ জিজ্ঞাসা আল্লাহর শক্তি-সামর্থ্যে সন্দেহের কারণে ছিল না। বরং তিনি পুত্র হওয়ার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন যে, আমরা স্বামী-স্ত্রী বর্তমানে কর্মকোর যে পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি, তা বহাল রেখেই পুত্র দান করা হবে, না এতে কোনরূপ পরিবর্তন করা হবে? আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলছিলেন যে, না তোমরা বার্ষিক্যবাহ্যই থাকবে এবং এ অবস্থাতেই তোমাদের সন্তান হবে। সুতরাং আয়াতের অর্থে কোনরূপ জটিলতা নেই।

قَالَ رَبِّكَ الْكَافِرُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ

প্রতিশ্রুত সেই সুসংবাদটি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতি এবং পুত্র জন্মগ্রহণের পূর্বেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে মশগুল হওয়ার উদ্দেশ্যে হযরত যাকারিয়া (আঃ) নির্দশন জননে চেয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ নির্দশন দিলেন যে, তিন দিন পর্যন্ত ভূমি মানুষের সাথে ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া কথা বলতে সক্ষম হবে না।

এ নির্দশনের মধ্যে সূক্ষ্মতা এই যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে নির্দশন চাপ্তা হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা এমন নির্দশন দিলেন যে, তাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া হযরত যাকারিয়া অন্য কোন কাজের যোগ্যই থাকবেন না। সুতরাং কাঙ্ক্ষিত নির্দশনও পাওয়া গেলো এবং উদ্দেশ্যও পূরণপূরি অর্জিত হলো।

إِلَّا زَوْجًا এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, কথা বলতে অক্ষম হলে ইশারা-ইঙ্গিত কথার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত নবী করীম (সাঃ) এক বাদীকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কোথায়? উত্তরে সে আকাশের দিকে ইশারা করলে হযরত (সাঃ) বললেনঃ এ বাদী মুসলমান।— (কুরতুবী)

ইসলামী শরীয়তে লটারী সম্পর্কিত বিধান এই যে, হানাকী মতাবলমতে যেসব হকের কারণ শরীয়তানুযায়ী নির্দিষ্ট ও জানা আছে, সেসব হকের মীমাংসা লটারীযোগে করা নাজায়েয এবং তা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণতঃ শরীকানাধীন বস্তুর মীমাংসা লটারীযোগে করা এবং লটারীতে যার নাম বের হয় তাকে সম্পূর্ণ বস্তুটি দিয়ে দেয়া অথবা কোন শিশুর পিতৃত্বে মতবিরোধ দেখা দিলে লটারীযোগে একজনকে পিতা মনে করে নেয়া। পক্ষান্তরে যেসব হকের কারণ জনগণের রায়ের ওপর ন্যস্ত, সেসব হকের মীমাংসা লটারীযোগে করা জায়েয। যখন-কোন শরীককে কোন অংশ দেয়া হবে, সে ব্যাপারে লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা করা। এক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে একজনকে পূর্বের অংশ ও অন্যজনকে পশ্চিমের অংশ দেয়া জায়েয। এর কারণ এই যে, লটারী ছাড়াই উভয়পক্ষ একমত হয়ে যদি এভাবে অংশ নিতো অথবা বিচারকের রায়ের ভিত্তিতে এভাবে নিতো, তবুও তা জায়েয হতো।— (বয়ানুল-কোরআন) অর্থাৎ, যেক্ষেত্রে সব শরীকের অংশ সমান হয়, সেখানে কোন এক দিককে এক শরীকের জন্যে নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে লটারী জায়েয।

হযরত ইসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের একটি প্রমাণ : আলোচ্য আয়াতে হযরত ইসা (আঃ)-এর একটি অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তিনি শৈশবে যে বয়সে কোন শিশু কথা বলতে সক্ষম হয় না, তখনই কথা বলবেন। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, জন্মের পর যখন ইহুদীরা মরিয়মের প্রতি অপবাদ আরোপ করতঃ ভর্ৎসনা করত থাকে, তখন সদাঙ্গত শিশু ইসা (আঃ) বলে ওঠেন : আমি আল্লাহর বন্দা। এতদসত্ত্বেও আলোচ্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, যখন তিনি শ্রৌচ বয়সের হবেন, তখনও মানুষের সাথে কথা বলবেন। এখানে প্রশ্নবিধানযোগ্য বিষয় এই যে, শৈশবাবস্থায় কথা বলা নিঃসন্দেহে একটি অলৌকিক ব্যাপার—যার উল্লেখ এক্ষেত্রে সমীচীন হয়েছে। কিন্তু শ্রৌচ বয়সে কথা বলা কোন অলৌকিক ব্যাপার নয়। মুমিন, কাকের, পশুত, মূর্খ সবাই এ বয়সে কথা বলে। কাজেই এক্ষেত্রে বিশেষ গুণ হিসাবে এটা উল্লেখ করার অর্থ কি?

এ প্রশ্নের এক উত্তর বয়ানুল-কোরআনে দেয়া হয়েছে যে, ‘শৈশবাবস্থায় কথা বলা’ বর্ণনা করাই আসল উদ্দেশ্য। তৎসঙ্গে ‘শ্রৌচ বয়সের কথা’ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর শৈশবাবস্থায় কথাবার্তাও শিশুসুলভ হবে না; বরং শ্রৌচ লোকদের মত জ্ঞানীসুলভ, যেথা সম্পূর্ণ প্রাজ্ঞ ও বিশুদ্ধ হবে।

العين ২

৫৫

تلك الرسل ২

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْبِطِ وَكَهُلًا وَمِنَ الصَّاحِقِينَ ۝ قَالَتْ رَبِّ أَلَيْسَ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَتْلُو دِيَانتَكُمْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ وَيَعْلَمُ الْكِنُفَ وَالْحَمِيَّةَ وَالنُّورَةَ وَالْإِشْجَالَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ إِنَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ إِنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفَعُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَالْبَرِيُّ إِلَى أَهْلِكِهِ وَالْأَرْضِ وَأُنْجِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَآتَيْتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمِمَّا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَصْدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حَيْلَ لَكُمْ بِغَضِّ الَّذِي خَرَجَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ فَلَمَّا أَصْحَى عَيْسَى مِنْهُمْ الْكَفَرُ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِثُونَ عَنْ أَنْصَارِ اللَّهِ أَمْكًا يَا اللَّهُ وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ ۝ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَسَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝

(৪৬) যখন তিনি মায়ের কোলে থাকতেন এবং পূর্ণ বয়স্ক হবেন তখন তিনি মানুষের সাথে কথা বলতেন। আর তিনি সংকমশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (৪৭) তিনি বলেন, ‘পরওয়ারদেগার! কেমন করে আমার সন্তান হতে, আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শ করেনি! বললেন, এ ভাবেই’। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, ‘হয়ে যাবে’ অমনি তা হয়ে যায়। (৪৮) আর তাকে তিনি শিখিয়ে দেবেন কিতাব, হিকমত, তওরাত ও ইঞ্জিল। (৪৯) আর বনী-ইসরাঈলদের জন্যে রসূল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেনঃ নিচয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায়—আল্লাহ্র হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্তক এবং শেত-কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই যতকালে আল্লাহ্র হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই—যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৫০) আর এটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহকে সত্যায়ন করে, যেমন তওরাত। আর তা এজন্য যাতে তোমাদের জন্য হালাল করে দেই কোন কোন বস্তু যা তোমাদের জন্য হারাম ছিল। আর আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের পালনকর্তার নিদর্শনসহ। কাজেই আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। (৫১) নিচয়ই আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা—তীর এবাদত কর, এটাই হলো সরল পথ। (৫২) অতঃপর ইসা (আঃ) যখন বনী-ইসরাঈলের কুফরী সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারলেন, তখন বললেনঃ কারা আছে আল্লাহ্র পথে আমাকে সাহায্য করবে? সাক্ষী-সাথীরা বললো, আমরা রয়েছি আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা হুকুম কবুল করে নিয়েছি। (৫৩) হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা সে বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যা তুমি নাযিল করেছ, আমরা রসূলের অনুগত হয়েছি। অতএব, আমাদেরকে মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নাও।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, এখানে শ্রৌত বয়সের কথাবার্তার উল্লেখ একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতস্বরূপ করা হয়েছে। অর্থাৎ যে, ইসলামী ও কোরআনী বিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ইসা (আঃ)-কে জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন রেওয়াজেও মুহা প্রমাণিত রয়েছে যে, আকাশে তুলে নেয়ার সময় তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মাঝামাঝি ছিল। অর্থাৎ, তিনি যৌবনের প্রারম্ভিক কালে উত্তোলিত হয়েছেন। অতএব শ্রৌত বয়স—যাকে আরবীতে ‘কুহুল’ কা হয়—তিনি এ জগতে সে বয়স পাননি। কাজেই শ্রৌত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলা তখনই সম্ভব, যখন তিনি আবার এ জগতে প্রত্যাবর্তন করবেন। এ কারণেই তাঁর শৈশবাবস্থায় কথাবার্তা বলা যেমন একটি আলৌকিক ব্যাপার, তেমনি শ্রৌত বয়সে দুনিয়ায় ফিরে এসে কথাবার্তা বলাও হবে একটা আলৌকিক ব্যাপার।

পাখীর আকৃতি গঠন করা তথা চিত্রাঙ্কন করা হযরত ইসা (আঃ)-এর শরীয়তে বৈধ ছিল। আমাদের শরীয়তে এর বৈধতা রহিত হয়ে গেছে।

قَالَ الْخَوَارِثُونَ - حور শব্দটি হারুথ থেকে ব্যুৎপন্ন। অভিযান এর অর্থ দেখালে চুনকাম করার চুন। পরিভাষায় হযরত ইসা (আঃ)-এর খাটি ভক্তদের উপাধি ছিল হাওয়ারী-তাদের আন্তরিকতা ও মনের স্বচ্ছতার কারণে অথবা যেহেতু তাঁরা সাদা পোশাক পরিধান করতেন এ জন্য তাঁদেরকে হাওয়ারী নামে অভিহিত করা হতো। যেমন, রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর ভক্ত ও সহচরণের উপাধি ছিল সাহাবী।

কোন কোন তফসীরবিদ হাওয়ারীদের সংখ্যা দুাদশ উল্লেখ করেছেন। ‘হাওয়ারী’ শব্দটি কোন সময় শুধু সাহায্যকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ অর্থেই এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ প্রত্যেক পয়গম্বরের একজন হাওয়ারী অর্থাৎ, খাটি সহচর থাকে আমার হাওয়ারী হলেন যুবায়ের।—(কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইসা (আঃ) যখন মানুষের অবিশ্বাস ও বিরোধিতা লক্ষ্য করলেন, তখন সাহায্যকারীদের খোঁজ নিলেন এবং مَنْ أَنْصَارِي বললেন। এর আগে তিনি একা একাই নবুওয়তের দায়িত্ব পালনে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সূচনা থেকেই কোন সাহায্যকারী দল গঠন করার চিন্তা করেননি। প্রয়োজন দেখা দিতেই দল গঠিত হয়ে যায়। বস্তুতঃ জগতের সব কাজই এমনি দৃঢ়তা ও সাহসিকতা চায়।

এ তফসীরের সারমর্ম এই যে, **توفى** শব্দের অর্থ মৃত্যু; কিন্তু আয়াতের শব্দ **رَافَعَكَ** প্রথমে ও **مَوْتَيْكَ** পরে হবে। এখানে **مَوْتَيْكَ** - কে পূর্বে উল্লেখ করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, নিজের কাছে উঠিয়ে নেয়া চিরতরে নয়; বরং এ ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্যে হবে। এরপর তিনি আবার দুনিয়াতে আসবেন, শত্রুদের পরাজিত করবেন এবং অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। এভাবে আকাশ থেকে পুনর্ব্যার

অবতরণ এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভের পর মৃত্যুবরণের ঘটনাটি একাধারে একটি মু'জ্জিয়া। এতদসঙ্গে ঈসা (আঃ)-এর সম্মান ও মর্যাদার পূর্ণত্বলাভ এবং খ্রীষ্টানদের এ বিশ্বাসের ঋণন যে, ঈসা (আঃ) অন্যতম উপাস্য। নতুবা জীবিত অবস্থায় আকাশে উষিত হওয়ার ঘটনা থেকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস আরও জোরদার হয়ে যেতো যে, তিনিও আল্লাহ্ তাআলার মতই চিরজীবী এবং তালমন্দের নিয়ামক। এ কারণে প্রথমে **مُتَوَكِّلِينَ** বলে এসব ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এরপর নিজের দিকে উঠিয়ে নেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

সত্যি কথা এই যে, কাকের ও মূশরেকেরা চিরকালই পয়গম্বরগণের বিরোধিতা ও তাঁদের সাথে শত্রুতা করে এসেছে। অপরদিকে আল্লাহ্ তাআলারও চিরাচরিত রীতি ছিল এই যে, যখনই কোন জাতি পয়গম্বরের বিরোধিতায় অনমনীয় হয়েছে এবং মু'জ্জিয়া দেখার পরও অস্বীকার ও অবিশ্বাস অব্যাহত রেখেছে, তখনই আল্লাহ্ তাআলা আসমানী আযাব পাঠিয়ে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। যেমন, 'আদ সামুদ এবং সালেহ ও লূত পয়গম্বরের কণ্ডেমের বেলায় করা হয়েছে। অথবা পয়গম্বরকেই কাকেরদের দেশ থেকে হিজরত করিয়ে অন্যদিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে তাঁকে শক্তি ও সৈন্যবল দান করে অব্যাহত কণ্ডেমের বিরুদ্ধে জয়ী করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইরাক থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। হযরত মুসা (আঃ) মিসর থেকে হিজরত করে সিরিয়ায় আগমন করেন এবং সবশেষে হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনাতে আগমন করেন। অতঃপর সেখান থেকে অভিযান পরিচালনা করে মক্কা জয় করেন। ইহুদীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে তুলে নেয়াও প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার হিজরতই ছিল— তারপর তিনি আবার দুনিয়াতে পদার্পণ করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে পুরোপুরি জয়লাভ করবেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, এ হিজরত সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে আকাশের দিকেই করানো হলো কেন? এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং বলেন যে, ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতই। অর্থাৎ, আদম (আঃ) যেমন সাধারণ সৃষ্টজীব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পন্থায় পিতা-মাতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, তেমনি ঈসা (আঃ)-এর জন্মও সাধারণ মানুষের জন্ম থেকে পৃথক পন্থায় হয়েছে এবং মৃত্যুও অভিনব পন্থায় শত শত বৎসর পর জগতে পুনরাগমনের পরেই হবে। সুতরাং তাঁর হিজরতও যদি ভিন্ন প্রকৃতিতে ও বিস্ময়কর পন্থায় হয়; তবে তাতে আশ্চর্য কি?

এসব বিস্ময়কর ঘটনার কারণেই মূর্খ খ্রীষ্টানরা ভ্রান্তবিশ্বাসে পতিত হয়ে তাঁকে খোদা বলতে শুরু করেছে। অথচ চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এসব ঘটনার মতোই তাঁর বন্দেগী, খোদায়ী নির্দেশের প্রতি আনুগত্য এবং মানবিক গুণে গুণান্বিত হওয়ার প্রমাণাদি রয়েছে। এ কারণেই কোরআন প্রতিটি ক্ষেত্রে গুণের উপরোক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস খন্ডনের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। আকাশে উষিত করার ফলে গুণের বিশ্বাস খুব জোরদার হয়ে যেতো। তাই **مُتَوَكِّلِينَ** শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের প্রধান উদ্দেশ্য ইহুদীদের খন্ডন। কারণ, ওরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করতে ও শূলীতে চড়াতে চেষ্টাছিল। আল্লাহ্ তাআলা গুণের সব পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করে দেন।

কিন্তু শব্দ আগে-পিছে করার ফলে আলোচ্য আয়াতে খ্রীষ্টানদের বিশ্বাসও খন্ডন হয়ে গেছে যে, ঈসা (আঃ) খোদা নন যে, তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবেন। এক সময় তাঁরও মৃত্যু হবে।

ইমাম রাযী তফসীরে-কবীরে বলেন : কোরআন মজীদে এমন ধরনের বিশেষ বিশেষ রহস্যের কারণে শব্দ আগে-পিছে করার ভুলি ভুলি নজির রয়েছে। পরবর্তী ঘটনাকে অগ্রে ও অগ্রবর্তী ঘটনাকে পরে বর্ণনা করা হয়েছে।— (তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা)

وَرَأَوْهُكَ এতে বাহ্যতঃ ঈসা (আঃ)-কেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনাকে উপরে উঠিয়ে নেব। সবাই জানেন যে, ঈসা শুধু আত্মার নাম নয়; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের নাম। কাজেই আয়াতে দৈহিক উত্তোলন বাদ দিয়ে শুধু আত্মিক উত্তোলন বোঝা সম্পূর্ণ ভুল। তবে একথা ঠিক যে, আরবী শব্দটি উচ্চ মর্যবর অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

যেমন — **يُرْهِمُ اللَّهُ الَّذِينَ** এবং **وَرَفَعَهُمْ فَوْقَ سَائِرِ**

مُتَوَكِّلِينَ ইত্যাদি আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু এটা জানা কথা যে, উচ্চ মর্যবর অর্থে **رَفَعَ** শব্দটির ব্যবহার রূপক। উল্লেখিত আয়াতসমূহে পূর্বাপর আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার ভিত্তিতে এ ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে আসল অর্থ ছেড়ে রূপক অর্থ বোঝার কোন কারণ নেই। এ ছাড়া আয়াতে **رَفَعَ** শব্দের সাথে **الِي** ব্যবহার করার কারণে রূপক অর্থের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়ে গেছে। এ আয়াতে **وَرَأَوْهُكَ** এবং সূরা নিসার আয়াতেও ইহুদীদের

ভ্রান্ত বিশ্বাস ঋণন প্রসঙ্গে **وَأَمَّا كَلِمَةٌ تَنْتَهِبُهَا زَكَاةُ اللَّهِ إِلَيْهِ** বলা হয়েছে। অর্থাৎ, ইহুদীরা নিশ্চিতই হযরত ঈসাকে হত্যা করেনি, বরং আল্লাহ্ তাঁকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। “নিজের কাছে তুলে নেয়া” শব্দটিতে তুলে নেয়াকেই বলা হয়।

ঈসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ্ পাঁচটি অঙ্গীকার : আলোচ্য ৫৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইহুদীদের বিপক্ষে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে পাঁচটি অঙ্গীকার করেছেন।

সর্বপ্রথম অঙ্গীকার এই যে, তাঁর মৃত্যু ইহুদীদের হাতে হত্যার মাধ্যমে হবে না, বরং প্রতিশ্রুত সময়ে স্বাভাবিক পন্থায় হবে। প্রতিশ্রুত সমস্যাটি কেয়ামতের নিকটতম যমানায় আসবে। তখন ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। বিভিন্ন সনীহ ও মুতাওয়াতিহ হাদীসে এর বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্গীকার ছিল যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে আপাততঃ উর্ক জগতে তুলে নেয়া হবে। সাথে সাথে এ অঙ্গীকার পূর্ণ করা হয়।

তৃতীয় অঙ্গীকার ছিল শত্রুদের অপবাদ থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে। এ অঙ্গীকার এভাবে পূর্ণ হয়েছে যে, শেষ নবী (সঃ) আগমন করে ইহুদীরা যাবতীয় অপবাদ দূর করে দেন। উদাহরণতঃ পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করার কারণে ইহুদীরা ঈসার (আঃ) জন্মবিষয়ে অপবাদ আরোপ করতো। কোরআন এ অভিযোগ ঋণন করে বলেছে যে, তিনি আল্লাহ্ র কদর ও নির্দেশে পিতা ব্যতিরেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এটা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। হযরত আদমের জন্মগ্রহণ ছিল আরো বেশী বিস্ময়কর

গ্যাপার। কারণ, তিনি পিতা ও মাতা উভয় ব্যতিরেকেই জন্মগ্রহণ করেন।

ইহুদীরা ঈসার (আঃ) বিরুদ্ধে খোদায়ী দাবী করার অভিযোগও এনেছিল। কোরআনের অনেক আয়াতে এর বিপরীতে ঈসা (আঃ)-এর রুহানী ও মানবত্বের স্বীকারোক্তি বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ অঙ্গীকার وَجَعَلْنَا الْإِنشَانَ كَبِيرًا আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, অবিশ্বাসীর বিপক্ষে আপনাদের অনুসারীদের কেয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী রাখা হবে। আয়াতে অনুসরণের অর্থ হয়রত ঈসার (আঃ) নবুওয়তে বিশ্বাস করা ও স্বীকারোক্তি করা। এর জন্য যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করা শর্ত নয়। এভাবে খ্রীষ্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মুসলমানরাও ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়তে বিশ্বাসী। এটা ভিন্ন কথা যে, এতটুকু বিশ্বাসই পরকালের মুক্তির জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং ঈসা (আঃ)-এর যাবতীয় বিধি-বিধানে বিশ্বাস করার উপর পরকালের মুক্তি নির্ভরশীল। হয়রত ঈসা (আঃ)-এর অকাটা বিধানাবলীর মধ্যে একটি ছিল এই যে, পরবর্তীকালে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিও ঈমান আনতে হবে। খ্রীষ্টানরা এটি পালন করেনি। ফলে তারা আখেরাতের মুক্তি থেকে বঞ্চিত। মুসলমানরা এটিও পালন করেছে। ফলে তারা পরকালের মুক্তির অধিকারী হয়েছে। কিন্তু জগতে ইহুদীদের বিপক্ষে বিজয়ী রাখার অঙ্গীকার শুণু হয়রত ঈসার (আঃ) নবুওয়তের উপর নির্ভরশীল ছিল। এ অঙ্গীকার অনুযায়ী ইহুদীদের বিপক্ষে খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের বিজয় সব সময় অর্জিত হয়েছে এবং নিকিতরাপেই কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এ অঙ্গীকারের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, ইহুদী জাতির বিপক্ষে খ্রীষ্টান ও মুসলমান জাতি সর্বদাই বিজয়ী রয়েছে। তাদের রাষ্ট্রই দুনিয়ার যত্রতত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র : ইসরাঈলের বর্তমান রাষ্ট্র দেখে এ ব্যাপারে সন্দেহ করা যায় না। কারণ, প্রথমতঃ এ রাষ্ট্রটি রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টানদের একটি সামরিক ছাউনী ছাড়া কিছুই নয়। ওরা এটিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। যদি একদিনের জন্যও এর মাথার উপর থেকে রাশিয়া, আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের অন্যান্য রাষ্ট্র হাত গুটিয়ে নেয়, তবে বিশ্বের মানচিত্র থেকে এর অস্তিত্ব মুছে যওয়া সুনিশ্চিত। একারণে বাস্তবধর্মী লোকদের দৃষ্টিতে ইসরাঈলের এ ইহুদী রাষ্ট্রটি একটি আশ্রিত রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কিছু নয়। যদি একে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রও ধরেও নেয়া হয়, তবুও খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের সমষ্টির বিপরীতে এ যে নেহাতই একটি আপাতজয়ের রাষ্ট্র, তা কোন সুস্থবুদ্ধি ব্যক্তি অঙ্গীকার করতে পারে না। এ থেকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে বলা যায় যে, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে কিছুদিনের জন্যে ইহুদীদের প্রাধান্য বিস্তারের স্ববাদ স্বয়ং ইসলামী রেওয়াজেয়তসমূহই দেয়া হয়েছে। যদি দুনিয়ার আয়ু ফুরিয়ে এসে থাকে এবং কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে থাকে, তবে এ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ইসলামী রেওয়াজেয়তের পরিপন্থী নয়। এহেন ক্ষণস্থায়ী আলোড়নকে সাম্রাজ্য অথবা রাষ্ট্র বলা যায় না।

পঞ্চম অঙ্গীকার এই যে, কেয়ামতের দিন সব ধর্মীয় মতবিরোধের মীমাংসা করা হবে। সময় এলে এ অঙ্গীকারও পূর্ণ হবে যে,

ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِهِمْ فَأُنشَرُ السِّبْرُ

হয়রত ঈসা (আঃ)-এর হায়াত ও অবতরণের প্রশ্ন : জগতে একমাত্র ইহুদীরাই একথা বলে যে, ঈসা (আঃ) নিহত ও শূলবিদ্ধ হয়ে সমাহিত হয়ে গেছেন এবং পরে জীবিত হননি। কোরআনে সূরা নিসার আয়াতে ওদের এ ধারণার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও وَمَكْرُوهًا وَمَكْرُوهًا ব্যাক্যাংশে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ঈসার (আঃ) শত্রুদের চক্রান্ত স্বয়ং তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ, যেসব ইহুদী তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘরে প্রবেশ করেছিল, আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে থেকেই এক ব্যক্তির আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে হুবহু ঈসার (আঃ) ন্যায় করে দেন। অতঃপর হয়রত ঈসাকে (আঃ) জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নেন। আয়াতের ভাষা এরূপ : وَإِنَّا نُبَشِّرُكَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ “তারা ঈসাকে হত্যা করেনি, শূলীতেও চড়ায়নি। কিন্তু আল্লাহর কৌশলে তারা সাদৃশ্যের ধাঁধায় পতিত হয় এবং নিজের লোককেই হত্যা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।”

এ দুই দলের বিপরীতে ইসলামের বিশ্বাস আলোচ্য আয়াত ও অন্যান্য কতিপয় আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইহুদীদের কবল থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে জীবিতাবস্থায় আকাশে তুলে নিয়েছেন। তাঁকে হত্যা করা হয়নি এবং শূলীতেও চড়ানো হয়নি। তিনি জীবিতাবস্থায় আকাশে বিদ্যমান রয়েছেন এবং কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আকাশ থেকে অবতরণ করে ইহুদীদের বিপক্ষে জয়লাভ করবেন, অবশেষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন।

এ বিশ্বাসের উপর সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজ্জত তথা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হাফেয ইবনে হজর ‘তালখীস’ গ্রন্থের ৩১৯ পৃষ্ঠায় এ ইজ্জা উদ্ধৃত করেছেন।

এখানে আমরা একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি চিন্তা করলে আলোচ্য প্রশ্নে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। তা এই যে, সূরা আল-ইমরানের একাদশতম রুকুতে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উল্লেখ প্রসঙ্গে হয়রত আদম, নূহ, ইবরাহীম ও ইমরানের বংশধরের উল্লেখ একটিমাত্র আয়াতে সংক্ষেপে করেছেন। এরপর প্রায় তিন রুকুর বাইশটি আয়াতে হয়রত ঈসা (আঃ) ও তাঁর পরিবারের উল্লেখ এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে যে, কোরআন হার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর উল্লেখও এমন বিস্তারিতভাবে করা হয়নি। হয়রত ঈসা (আঃ)-এর মাতামহীর উল্লেখ, তাঁর মানতের বর্ণনা, জননীর জন্ম, তাঁর নাম, তাঁর লালন-পালনের বিস্তারিত বিবরণ, ঈসা (আঃ)-এর জননীর গর্ভে আগমন, অতঃপর জন্মের বিস্তারিত অবস্থা, জন্মের পর জননী কি পানাহার করলেন, শিশু সন্তানকে নিয়ে গৃহে আগমন, পরিবারের লোকদের ভর্ৎসনা, জন্মের পরপরই ঈসা (আঃ)-এর বাকশক্তি প্রাপ্তি, যৌবনে পদার্পণ, স্বজাতিকে ধর্মের প্রতি আহ্বান, তাদের বিরোধিতা, সহচরদের সাহায্য, ইহুদীদের যড়যন্ত্র, জীবিতাবস্থায় আকাশে উষিত হওয়া প্রভৃতি। এরপর মৃত্যুওয়াতির হাদীসসমূহে তাঁর আরও গুণাবলী, আকার আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণও এমনিভাবে দেয়া হয়েছে যে, সমগ্র কোরআন ও হাদীসে কোন পয়গম্বরের জীবনালেখ্য এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়টিই সকলের পক্ষে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণযোগ্য যে, এরূপ কেন করা হয়েছে এবং এর তাৎপর্য কি?

সামান্য চিন্তা করলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায় যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) হলেন সর্বশেষ নবী, তাঁরপর আর কোন নবী আসবেন না। এ কারণে, তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই একদিকে তিনি পরবর্তীকালে অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং সাধারণ গুণাবলীর মাধ্যমে ও অনেকের বেলায় নাম উল্লেখ করে তাঁদের অনুসরণ করতে জোর তাকিদ করেছেন। অপরদিকে উম্মতের ক্ষতিসাধনকারী পথভ্রষ্ট লোকদের পরিচয়ও বলেছেন।

পরবর্তীকালে আগমনকারী পথভ্রষ্টদের মধ্যে সবচাইতে মারাত্মক হবে দাঙ্কাল। তার ক্ষেতনাই হবে সর্বাধিক বিভ্রান্তিকর। হযরত নবী করীম (সাঃ) তার এত বেশী হাল-হাকীকত বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তার আগমনের সময় সে যে পথভ্রষ্ট, এ বিষয়ে কারো মনে সন্দেহ থাকবে না। এমনিভাবে পরবর্তীকালে আগমনকারী সম্প্রদায় ও অনুসরণযোগ্য মনীষিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবেন হযরত ঈসা (আঃ)। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নবুওয়ত ও রিসালতের সম্মানে ভূষিত করেছেন; দাঙ্কালের ফিৎনার সময়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্যে আকাশে জীবিত রেখেছেন এবং কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে দাঙ্কাল হত্যার জন্যে নিয়োজিত হবেন। এ কারণে তাঁর জীবনালেখ্য ও গুণাবলী মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে দুঃখহীন ভাষায় ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজন ছিল, যাতে তাঁর অবতরণের সময় তাঁকে চেনার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ ও বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে।

এর রহস্য ও উপযোগিতা অনেক। প্রথম, তাঁর পরিচয়ে জটিলতা থাকলে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। মুসলিম সম্প্রদায় তাঁর সাথে সহযোগিতা করবে না। ফলে তিনি কিভাবে তাদের সাহায্য করবেন?

দ্বিতীয়, হযরত ঈসা (আঃ) সে সময় নবুওয়ত ও রিসালতের দায়িত্ব পালনে আদিত হয়ে জগতে আসবেন না; বরং মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃদ্বানের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করবেন, কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি স্বীয় নবুওয়তের পদ থেকে অপসারিতও হবেন না। তখন তিনি হবেন প্রাদেশিক শাসকের মত, যিনি নিজ প্রদেশের শাসক পদে অধিষ্ঠিত থেকেও প্রয়োজন বশতঃ অন্য প্রদেশে চলে যান। তিনি এ প্রদেশে শাসক হিসেবে না এলেও নিজ প্রদেশের শাসক পদ থেকে অপসারিতও নন। মোটকথা এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) তখনও নবুওয়ত ও রিসালতের গুণে গুণান্বিত হবেন। তাঁকে অস্বীকার করা পূর্বে যেকোন কুফর ছিল, তখনও কুফর হবে। এমতাবস্থায় মুসলিম সম্প্রদায় যারা কোরআনী নির্দেশের ভিত্তিতে পূর্ব থেকেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী—যদি অবতরণের সময় তাঁকে চিনতে না পারে, তবে অবিশ্বাসে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

তৃতীয়, ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের ঘটনা দুনিয়ার অন্তিম পর্যায়ে সংঘটিত হবে। এমতাবস্থায় তাঁর অবস্থা ও লক্ষ্যাদি অস্পষ্ট হলে অন্য কোন প্রত্যাহারের পক্ষ থেকে এরূপও দাবী করার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল যে, আমিহি মসীহ ঈসা ইবনে মরিয়ম। এখন কেউ এরূপ করলে লক্ষ্যাদির সাহায্যে তাকে প্রত্যাখান করা যাবে। উদাহরণতঃ হিন্দুস্থানে এক সময় মির্জা কাদিয়ানী দাবী করে বসে যে, সে-ই প্রতিশ্রুত মসীহ। মুসলমান ওলামাগণ এসব লক্ষণের সাহায্যেই তার এ ভ্রান্ত দাবী প্রত্যাখ্যান

করেছেন।

বিপদাপদ মুমিনদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ : **قُلْ**

عَذَابِ الشَّدِيدِ إِلَّا الَّذِينَ فِي الذُّلَىٰ وَالْأُولَىٰ এ আয়াতের বিষয়বস্তুর সামান্য একটা প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কিয়ামতের মীমাংসার বর্ণনায় একথা বলার মানে কি যে, ইহকাল ও পরকালে শাস্তি দেব? কারণ, তখন তো ইহকালের শাস্তি হবেই না।

এর সমাধান এই যে, এ কথাটি অপরাধীকে লক্ষ্য করে বিচারকের এরূপ উক্তি মতই যে, এখন তোমাকে এক বছর শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমতাবস্থায় পুনরায় অপরাধে লিপ্ত হলে নিশ্চিতরূপেই দুই বছরের সাজা হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে এক বছরের সাথে অতিরিক্ত এক বছর যুক্ত হয়ে মোট দুই বৎসর সাজা হবে।

আলোচ্য আয়াতেও তদ্রূপ বোঝা দরকার। ইহকালের সাজা তো হয়েই গেছে। এর সাথে পরকালের সাজা যুক্ত হয়ে কিয়ামতের দিন মোট সাজা পূর্ণ করা হবে। অর্থাৎ, ইহকালের সাজা পরকালের সাজার প্রায়শ্চিত্ত হবে না। কিন্তু মুমিনদের অবস্থা এর বিপরীত। ইহকালে তাদের উপর কোন বিপদাপদ এলে গোনাহ্ মাক্ হয়। এবং পরকালের দণ্ড লব্ধ অথবা রহিত হয়। সে কারণেই **لَا يُؤْخَذُ بِالْظُلْمِ** বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুমিনগণ ঈমানের কারণে আল্লাহ্র শ্রিয়। শ্রিয়জনের সাথে এমনি ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে কাকেররা কুফরের কারণে আল্লাহ্র ঘৃণার পাত্র। ঘৃণিতদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা হয় না।—(যমানুল কোরআন)

কিয়াসের প্রামাণ্যতা : **إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ**

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কিয়াসও শরীয়তসম্মত প্রমাণ। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন : ঈসা (আঃ)-এর জন্ম আদমের জন্মের অনুরূপ। অর্থাৎ, আদম (আঃ)-কে যেমন জনক (ও জননী) ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈসা (আঃ)-কেও তদ্রূপ জনক ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব এখানে আল্লাহ্ তাআলা ঈসা (আঃ)-এর সৃষ্টিকে আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির উপর কিয়াস করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।—(মাহহারী)

মুবাহালার সংজ্ঞা : **قُلْ تَكُونُوا كَالْأَنْدَادِ** এ আয়াত

আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সাঃ)-কে মুবাহালা করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুবাহালার সংজ্ঞা এই : যদি সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে দুই পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং মুক্তিভরক মীমাংসা না হয়, তবে তারা সকলে মিলে আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করবে, যে পক্ষ এ ব্যাপারে মিথ্যাবাদী, সে যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ল'নতের অর্থ আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া। আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে সরে পড়া মানেই খোদায়ী ক্রোধের নিকটবর্তী হওয়া। এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্র ক্রোধ বর্ষিত হোক। এরূপ করার পর যে পক্ষ মিথ্যাবাদী, সে তার প্রতিফল ভোগ করবে। সেসময় সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর পরিচয় অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতেও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এভাবে প্রার্থনা করাকে 'মুবাহালা' বলা হয়। এতে বিতর্ককারীরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করলেই চলে। পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে একত্রিত করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একত্রিত করলে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ۝ قُلْ يَٰ أَهْلَ
الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا نَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا
مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝
يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَخَاجُون فِي أَرْبِهِمْ وَمَا تَرْبِيتُ التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ إِلَّا مَن بَعْدَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ هَٰ أَنتُمْ
هَٰؤُلَاءِ حَاجِبُوهُمْ فَمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ قُلِمَ
ثُمَّ جُئْتُمْ فِيهَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْقِلُونَ ۝ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا
لَّكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝
إِنَّ أَوَّلَ الْإِنسَانِ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ لَكَذِّبِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا
السَّبِيحُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ۝
وَذَكَرَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ
وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ يَٰ أَهْلَ
الْكِتَابِ لِمَ تَقْرَأُونَ بَايَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝

(৬৩) তারপর যদি তারা গ্রহণ না করে, তাহলে প্রমাদ সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ জানেন। (৬৪) বলুন : ‘হে আহলে-কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস-যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান-যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও, ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, ‘সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।’ (৬৫) হে আহলে কিতাবগণ! কেন তোমরা ইবরাহীমের বিষয়ে বাদনুবাদ কর? অথচ তওরাত ও ইঞ্জীল তাঁর পরেই নাখিল হয়েছে। তোমরা কি বোঝ না? (৬৬) শোন। ইতিপূর্বে তোমরা যে বিষয়ে কিছু জানতে, তাই নিয়ে বিবাদ করত। এখন আবার যে বিষয়ে তোমরা কিছুই জান না, সে বিষয়ে কেন বিবাদ করছ? (৬৭) ইবরাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন ‘হানীফ’ অর্থাৎ, সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আত্মসমর্পণকারী, এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না। (৬৮) মানুষদের মধ্যে যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা, আর এই নবী এবং যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম-আর আল্লাহ্ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু। (৬৯) কোন কোন আহলে-কিতাবের আকাঙ্ক্ষা, যাতে তোমাদের গোমরাহ করতে পারে, কিন্তু তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকেই গোমরাহ করে না। অথচ তারা বুঝতে পারে না। (৭০) হে আহলে-কিতাবগণ, কেন তোমরা আল্লাহর কলামকে অস্বীকার কর, অথচ তোমরাই তাঁর প্রবক্তা?

মুবাহালার ঘটনা : এর পটভূমি এই যে, মহানবী (সাঃ) নাজরানের খ্রীষ্টানদের কাছে একটি ফরমান প্রেরণ করেন। এতে ধারাবাহিকভাবে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয় : (১) ইসলাম কবুল কর, (২) অথবা জিহাদ কর দাও, (৩) অথবা মুজ্জের জন্যে প্রস্তুত হও। খ্রীষ্টানরা পরস্পর পরামর্শ করে শোরাহবীল, আবদুল্লাহ ইবনে শোরাহবিল ও জিব্বার ইবনে ফয়েজকে হুযর (সাঃ)-এর কাছে পাঠায়। তারা এসে ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা শুরু করে। একপর্যায়ে তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে উপাস্য প্রতিপন্ন করার জন্যে প্রবল বাদানুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে মুবাহালার উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে রসুলে খোদা (সাঃ) প্রতিনিধিদলকে মুবাহালার আহবান জানান এবং নিজেও হযরত ফাতিমা, হযরত আলী এবং ইমাম হাসান-হোসাইনকে সঙ্গে নিয়ে মুবাহালার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আসেন। এ আত্মবিশ্বাস দেখে শোরাহবীল ভীত হয়ে যায় এবং সাখীদুয়কে বলতে থাকে : তোমরা জান যে, ইনি আল্লাহর নবী। আল্লাহর নবীর সাথে মুবাহালা করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই মুক্তির অন্য কোন পথ খোঁজ। সঙ্গীদুয় বললো : তোমার মতে মুক্তির উপায় কি? সে বলল : আমার মতে নবীর শর্তানুযায়ী সন্ধি করাই উত্তম উপায়। অতঃপর এতেই প্রতিনিধিদল সম্মত হয় এবং মহানবী (সাঃ) তাদের গুপ্ত জিহাদ করে ধার্য করে মীমাংসায় উপনীত হন।— (ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড)

তবলীগের মূলনীতি : আনুষঙ্গিক স্ফাতব্য বিষয় :

এ আয়াত থেকে

তবলীগ তথা দ্বীনের প্রতি আমন্ত্রণ জানানোর একটি মূলনীতি জানা যায়। তা এই যে, ভিন্ন মতাবলম্বী কোন দলকে দ্বীনের প্রতি আমন্ত্রণ জানাতে হলে প্রথমে তাকে শুধু এমন বিষয়ের প্রতিই আহবান জানানো উচিত, যে বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হতে পারে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন রোম সম্রাটকে ইসলামের দাওয়াত দেন, তখন এমন বিষয়ের প্রতি আহবান জানান, যাতে উভয়েই একমত ছিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার এক-ত্ববাদ। আমন্ত্রণলিপিতে নিম্নে উদ্ধৃত হল :

“আমি আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি—যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু। এ পত্র আল্লাহর বান্দা ও রসুল মুহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। যে হেদায়েতের পথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাই। মুসলমান হয়ে যান ; শান্তি লাভ করবেন। আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন। আর যদি বিমুখ হন, তবে আপনার প্রজা সাধারণের গোনাহ আপনার উপর পতিত হবে। হে আহলে কিতাবগণ! এমন এক বিষয়ের দিকে আস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। তা এই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইবাদত করবো না। তাঁর সাথে অংশীদার করবো না এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করবো না।”

এ আয়াতে ‘সাক্ষী থাক’ বলে

আমাদের শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যুক্তিপূর্ণ সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হওয়ার পরেও সত্যকে স্বীকার না করলে স্বীয় মতাদর্শ প্রকাশ করে বিতর্কে ইতি টানা উচিত—অধিক আলোচনা ও কথা কাটাকাটি সমীচীন নয়।

ال عمران ৩

৭০

تلك الرسل ৩

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اؤْتُوا بِالَّذِي
أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَحِجَّةَ الْهَيْهَاتِ وَالْهَيْهَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا إِلَّا مَنَاسِكَ دِينِكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى
هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحْجَظَ كُمْ
عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۖ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۖ وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن إِنْ تَأْمَنَهُ
بِقِطْرِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن إِنْ تَأْمَنَهُ بِيَدٍ لَّا
يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِنْ أَمَّا دُمْتُ عَلَيْهِ قَائِلًا ۚ ذَٰلِكَ يَأْتِيهِمْ قَوْلًا
لَّيْسَ عَلَيْهِمْ فِي الْأُمَمِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبُ وَ
هُمْ يَعْلَمُونَ ۖ كُلٌّ مِّنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَأَقْبَىٰ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَشْرُونَ عَهْدَ اللَّهِ وَأَيْمَانَهُمْ ثَمَنًا
قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَخَلَاقٌ لَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَجْعَلُهُمُ اللَّهُ وَلَا
يَنْظُرُ الْيَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ

(৭১) হে আহলে-কিতাবগণ, কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে সংমিশ্রিত করছ এবং সত্যকে গোপন করছ, অথচ তোমরা তা জান। (৭২) আর আহলে-কিতাবগণের একদল বললো, মুসলমানগণের উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে দিনের প্রথম ভাগে যেন নাও, আর দিনের শেষ ভাগে অস্বীকার কর, হয়তো তারা মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে। (৭৩) যারা তোমাদের ধর্মমতে চলবে, তাদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্রাস করবে না। বলে দিন, নিঃসন্দেহে হেদায়েত সেটাই, যে হেদায়েত আল্লাহ করেন। আর এসব কিছু এ জন্যে যে, তোমরা যা লাভ করেছিলে তা অন্য কেউ কেন প্রাপ্ত হবে, কিংবা তোমাদের পালনকর্তার সামনে তোমাদের উপর তারা কেন প্রবল হয়ে যাবে। বলে দিন, মর্যাদা আল্লাহরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ। (৭৪) তিনি যাকে ইচ্ছা নিজের বিশেষ অনুগ্রহ দান করেন। আর আল্লাহ মহা-অনুগ্রহশীল। (৭৫) কোন কোন আহলে-কিতাব এমনও রয়েছে, তোমরা যদি তাদের কাছে বহু ধন-সম্পদ আমানত রাখ, তাহলেও তা তোমাদের যথারীতি পরিশোধ করবে। আর তাদের মধ্যে অনেক এমনও রয়েছে যারা একটি দিনার গচ্ছিত রাখলেও ফেরত দেবে না— যে পর্যন্ত না তুমি তার মাথার উপর দাঁড়াতে পারবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে রেখেছে যে, উম্মীদের অধিকার বিনষ্ট করতে আমাদের কোন পাপ নেই। আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে জেনে শুনেই মিথ্যা বলে। (৭৬) যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং পরহেজ্জার হবে, অবশ্যই আল্লাহ পরহেজ্জারদেরকে ভালবাসেন। (৭৭) যারা আল্লাহর নামে কৃত অস্বীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ থেকে এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, তারা সত্যের স্বীকারোক্তি না করলে অথবা তাদের জানা না থাকলে অবিশ্রাস করা বৈধ হবে। কারণ, কুফরী তথা অবিশ্রাস এমনিতেই একটি মন্দ কাজ। এটা সর্বাবস্থায়ই অবৈধ। তবে স্বীকারোক্তির পর কুফর করলে তা অধিকতর ভীতঙ্কার ও শিকারের যোগ্য।

আনুষঙ্গিক সঙ্গাতব্য বিষয়

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ : অমুসলানের উত্তম গুণাবলীর প্রশংসা :

এ আয়াতে কিছুসংখ্যক লোকের আমানতে বিশৃঙ্খল হওয়ার কারণে প্রশংসা করা হয়েছে। আয়াতে ‘কিছু সংখ্যক লোক’ বলে যদি এসব আহলে-কিতাবকে বোঝানো হয়ে থাকে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তবে এ প্রশংসায় কোনরূপ জটিলতা নেই। কিন্তু যদি সাধারণ আহলে-কিতাব বোঝানো হয়ে থাকে, যারা অ-মুসলিম, তবে প্রশ্ন হয় যে, কাফেরের কোন আমলই গ্রহণযোগ্য নয়; এমতাবস্থায় তার প্রশংসার অর্থ কি ?

উত্তর এই যে, প্রশংসা করলেই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া বোঝায় না। এখানে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, ভাল কাজ কাফেরের হলেও তা এক পর্যায়ে ভালই। সে এর উপকার দুনিয়াতে সুখ্যাতির আকারে এবং আখেরাতে শান্তি দ্বারের আকারে পাবে।

এ বর্ণনায় একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা নেই, বরং সে খোলা মনে প্রতিপক্ষের সদগুণাবলীরও প্রশংসা করে।

إِلَّا مَا دُمْتُ عَلَيْهِ قَائِلًا - এ আয়াত দ্বারা ইমাম আবু হানিফা

(রহঃ) প্রমাণ করেছেন যে, ঋণদাতা ব্যক্তির প্রাপ্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতাকে তাগাদা করতে থাকার অধিকার তার রয়েছে। - (কুরতুবী, ৪র্থ খণ্ড)

অস্বীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী : উভয় পক্ষে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যা সাব্যস্ত হয় এবং যা পূর্ণ করা উভয় পক্ষের জন্যে জরুরী, এমন বিষয়কে অস্বীকার বলা হয়। ওয়াদা শুধু এক পক্ষ থেকে হয়। অতএব, অস্বীকার ব্যাপক এবং ওয়াদা সীমিত।

কোরআন ও সুন্নাহয় অস্বীকার পূর্ণ করার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপরোল্লিখিত ৭৭ তম আয়াতেও অস্বীকার ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে পাঁচটি সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছে :

(১) জান্নাতের নেয়ামতসমূহে তার কোন অংশ নেই। এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ দ্বারা কোন মুসলমানের অধিকার নষ্ট করে, সে নিজের জন্যে দোষখের শাস্তিকে অপরিহার্য করে নেয়। বর্ণনাকারী আরম্ব করলেন : যদি বিষয়টি সামান্য হয় তবুও কি দোষখ অপরিহার্য হবে? তিনি উত্তরে বললেন : তা গাছের একটা ডাল ডালই হোক না কেন? - (মুসলিম)

(২) আল্লাহ তাআলা তার সাথে অনুকম্পাসূচক কথা বলবেন না।

(৩) কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে রহমতের দৃষ্টিও দেখবেন না।

وَأَنَّ مِنْهُمْ لَفِرَاقًا ثَلَاثِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ إِلَّا حِسَابًا
وَمِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُمْ مِنَ الْكِتَابِ أَقْرَبُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ
اللَّهِ وَمَا هُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَقْرَبُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَ
هُمْ يَعْلَمُونَ ۝ مَا كَانَ لِشِرَارِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ ثُمَّ يَقُولَ لِلْمَلَكِ كُتُبُوا وَعِبَادُ اللَّهِ
دُونَ اللَّهِ وَلَكِنْ كُتُبُوا لِيُتَبَيَّنَ بَيْنَ أَعْيَادٍ مِنَ
وَمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَّخَذَ الْوَلَدُ
الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ
أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا
آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ
لِمَا كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَكُنَّ رُءُوسًا لِقَوْمٍ أَخَذُوا
عَلَىٰ ذُلِكُمْ أَضْمَارًا فَأَقْرَرْتُمَا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ
مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ۝ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَالْيَهُودُ يَرْجِعُونَ ۝

(৭৮) আর তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা বিকৃত উচ্চারণে মুখ ঝাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর যে, তারা কিতাব থেকেই পাঠ করছে। অথচ তারা যা আবৃত্তি করছে তা আদৌ কিতাব নয়। এবং তারা বলে যে, এসব কথা আল্লাহর তরফ থেকে আগত। অথচ এসব আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত নয়। তারা বলে যে, এটি আল্লাহর কথা অথচ এসব আল্লাহর কথা নয়। আর তারা জেনে-শুনে আল্লাহরই প্রতি মিথ্যারোপ করে। (৭৯) কোন মানুষকে আল্লাহ কিতাব, হেকমত ও নবুওয়ত দান করার পর সে বলে যে, 'তোমরা আল্লাহকে পরিহার করে আমার বান্দা হয়ে যাও' — এটা সম্ভব নয়। বরং তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহ ওয়াল্লা হয়ে যাও, যেমন, তোমরা কিতাব শিখাতে এবং যেমন তোমরা নিজেরাও পড়তে।' (৮০) তাছাড়া তোমাদেরকে একথা বলাও সম্ভব নয় যে, তোমরা ফেরেশতা ও নবীগণকে নিজেদের পালনকর্তা সাব্যস্ত করে নাও। তোমাদের মুসলমান হবার পর তারা কি তোমাদেরকে কুফরী শেখাবে? (৮১) আর আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, 'আমি যা কিছু তোমাদের দান করছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসূল আসেন তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে দেয়ার জন্য, তখন সে রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি অঙ্গীকার করছে এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহণ করে নিয়েছ?' তারা বললো, 'আমরা অঙ্গীকার করছি।' তিনি বললেন, 'তাহলে এবার সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।' (৮২) অতঃপর যে লোক এই ওয়াদা থেকে ফিরে দাঁড়াবে, সেই হলো নাসফরমান। (৮৩) তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তাল্লাশ করছে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সেখান থেকে হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তাঁরই অনুগত হবে এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাবে।

(৪) আল্লাহ তাআলা তার পাপ মার্জনা করবেন না। কেননা, অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে বান্দার হক নষ্ট হয়েছে। বান্দার হক নষ্ট করলে আল্লাহ মার্জনা করেন না।

(৫) তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে।

আনুগত্যিক ক্ষাতব্য বিষয়

পয়গম্বরগণের নিষ্পাপ হওয়ার একটি যুক্তি : مَا كَانَ لِشِرَارِ নাজরানের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কোন কোন ইহুদী ও খ্রীষ্টান বলেছিল : হে মুহাম্মদ (সাঃ) ! আপনি কি চান যে, আমরা আপনার তেমন উপাসনা করি, যেমন খ্রীষ্টানরা ঈসা ইবনে মরিয়মের উপাসনা করে? হযরত (সাঃ) বলেছিলেন : (মা'আযাল্লাহ) এটা কিরূপে সম্ভব যে, আমরা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যের এবাদত করি অথবা অপরকে এর প্রতি আহ্বান জানাই? আল্লাহ তাআলা আমাকে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেননি। এ কথোপকথনের পরই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যে উদ্ধুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা মানুষকে কিতাব, হেকমত ও পয়গম্বরের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেন। মানুষকে আল্লাহর এবাদত থেকে সরিয়ে স্বয়ং নিজের অথবা অন্য কোন সৃষ্টজীবের দাসে পরিণত করার চেষ্টা পয়গম্বরের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ, এর অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ যাকে যে পদের যোগ্য মনে করে প্রেরণ করেন, সে বাস্তবে সে কাজের যোগ্য নয়। জগতের কোন সরকার কোন ব্যক্তিকে দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করার পূর্বে দু'টি বিষয় চিন্তা করে নেয়:

(১) লোকটি সরকারের নীতি বোঝার ও স্বীয় কর্তব্য সম্পাদনের যোগ্যতা রাখে কি না?

(২) সরকারী আদেশ পালন ও জনগণকে সরকারের আনুগত্যের গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখার ব্যাপারে তার কাছ থেকে কতটুকু দায়িত্ববোধ আশা করা যায়? যার সম্পর্কে বিদ্রোহ অথবা সরকারী নীতি লঙ্ঘনের সামান্যতম সন্দেহ থাকে, তাকে কোন সরকারই প্রতিনিধি বা দূত নিযুক্ত করতে পারে না। তবে কোন ব্যক্তির যোগ্যতা ও আনুগত্যের সঠিক পরিমাপ করা জাগতিক সরকারের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার বেলায় এরূপ সম্ভাবনা নেই। যদি কোন মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ জানে যে, সে খোদারী আনুগত্যের সীমা চুল পরিমাণও লঙ্ঘন করবে না, তবে পরে এর ব্যতিক্রম হওয়া একেবারেই অসম্ভব। নতুবা আল্লাহর জ্ঞান ভ্রান্ত হয়ে যাবে। (নউমুবিলাহ)। এখান থেকেই পয়গম্বরগণের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। অতএব, পয়গম্বরগণ যখন সামান্যতম অবাধ্যতা থেকেও পবিত্র, তখন শিরক তথা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা কোথায় অবশিষ্ট থাকে?

আল্লাহ তাআলার তিনটি অঙ্গীকার : আল্লাহ তাআলা বান্দার কাছ থেকে তিনটি অঙ্গীকার নিয়েছেন। একটি সূরা আ'রাফের آسْتُزَكُّكُمْ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এ অঙ্গীকারের উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র মানবজাতি আল্লাহর অস্তিত্ব ও রব্বিয়াতে বিশ্বাসী হবে। কেননা, ধর্মের গোটা প্রাচীর এ ভিত্তির উপরই নির্মিত। এ বিশ্বাস না থাকলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিবেক ও চিন্তার পথ প্রদর্শন কোন উপকারেই আসে না। এ সম্পর্কে যথাস্থানে

আরও আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয় অঙ্গীকার **وَلَا تَأْخُذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ**

আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। অঙ্গীকার শুধু আহলে-কিতাব পণ্ডিতদের কাছ থেকেই নেয়া হয়েছে, যাতে তারা সত্য গোপন না করে। **لِلنَّاسِ**

তৃতীয় অঙ্গীকার আলোচ্য আয়াত **وَلَا تَأْخُذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ** এ উল্লেখিত হয়েছে। এর বিবরণ পরে আসবে। - (তফসীরে-আহমদী)

مِيثَاقٌ এর অর্থ কি এবং তা কোথায় নেয়া হয়েছে : এ অঙ্গীকার আত্মার জগতে অথবা পৃথিবীতে ওহীর মাধ্যমে নেয়া হয়েছে। - (বয়ানুল-কোরআন)।

কি অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল, তা কোরআনেই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কি সম্পর্কে নেয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে বিভিন্নজনের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত আলী ও হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা সব পয়গম্বরের কাছ থেকে মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে অঙ্গীকার নেন যে, তাঁরা স্বয়ং যদি তাঁর আমলে জীবিত থাকেন, তবে যেন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাঁকে সাহায্য করেন। স্বীয় উম্মতকেও যেন এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে যান।

হযরত তাউস, হাসান বসরী, কাতাদাহ প্রমুখ তফসীরবিদগণ বলেন : পয়গম্বরগণের কাছ থেকে এ অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল— যাতে তাঁরা পরস্পরকে সাহায্য ও সমর্থন দান করেন। - (তফসীরে ইবনে কাসীর)

নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা শেষোক্ত উক্তির সমর্থন হতে পারে—

**وَلَا تَأْخُذَ تَامِرُ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمَنْ ذَرَاهُمْ
وَمَوْسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَلَا تَأْخُذَ تَامِرُ مِيثَاقَهُمْ مِيثَاقًا غَائِبًا**

কেননা, এ অঙ্গীকার একে অন্যের সাহায্য ও সমর্থনের জন্যে নেয়া হয়েছিল। - (তফসীরে - আহমদী)

উভয় তফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ কারণে আয়াতের অর্থ উভয়টিই হতে পারে। - (ইবনে-কাসীর)

মহানবী (সাঃ)-এর বিশৃঙ্খলীন নবুওয়ত : **وَلَا تَأْخُذَ اللَّهُ مِيثَاقَ** আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সব পয়গম্বরের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নেন যে, আপনাদের মধ্য থেকে কোন

পয়গম্বরের পর যখন অন্য পয়গম্বর আগমন করেন— যিনি অবশ্যই পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও খোদায়ী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী হবেন, তখন পূর্ববর্তী নবীর জন্যে জরুরী হবে নতুন নবীর সত্যতা ও নবুওয়তের প্রতি নিজে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অন্যকেও বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ দিয়ে যাওয়া। কোরআনের এ সামগ্রিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কেও এমনি ধরনের অঙ্গীকার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কাছ থেকে নিয়ে থাকবেন। আল্লামা সুবকী বলেন : এ আয়াতে রসূল বলে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বোঝানো হয়েছে এবং এমন কোন পয়গম্বর অতিবাহিত হননি, যার কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে অঙ্গীকার নেয়া হয়নি। এমনভাবে এমন কোন পয়গম্বর অতিবাহিত হননি, যিনি স্বীয় উম্মতকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে ও সাহায্য সমর্থন করতে নির্দেশ দেননি। যদি মহানবী (সাঃ) সেসব পয়গম্বরের আমলেই আবির্ভূত হতেন, তবে তিনিই সবার নবী হতেন এবং তারা সবাই তাঁর উম্মত হতেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি শুধু নিজের উম্মতেরই নবী নন, নবীগণেরও নবী। এক হাদীসে এরশাদ করেছেন : “আজ যদি মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁরও গত্যস্তর ছিল না।”

অন্য এক হাদীসে বলেন : যখন ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন তিনিও কোরআন এবং তোমাদের নবীর বিধি-বিধানই পালন করবেন। - (তফসীরে ইবনে-কাসীর)

এতে বোঝা যায় যে, মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত বিশৃঙ্খলীন। তাঁর শরীয়তের মধ্যে পূর্ববর্তী সব শরীয়ত পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। এ বর্ণনা থেকে **يُبعث الى الناس كافة** (আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হইয়াছি।) হাদীসের বিশুদ্ধ অর্থও স্পষ্ট হয়ে গেছে। মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত শুধু তাঁর আমল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে—হাদীসের এরূপ অর্থ করা ঠিক নয়। বরং তাঁর নবুওয়তের যমানা এত বিস্তৃত যে, হযরত আদমের নবুওয়তেরও পূর্ব থেকে এর আরম্ভ। এক হাদীসে তিনি বলেন : আদমের দেহে আত্মা সঞ্চারের পূর্বেই আমি নবী ছিলাম। হাশরের ময়দানে শাফাআতের জন্যে অগ্রসর হওয়া, তাঁর পতাকাতে সমগ্র মানবজাতির একত্রিত হওয়া এবং মি'রাজ-রজনীতে বায়তুল-মুকাদ্দাসে সব পয়গম্বরের ইমামতি করা তাঁর বিশৃঙ্খলীন নেতৃত্বের অন্যতম লক্ষণ।

قُلْ اَمَّا اِلَهُكُمْ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ عَلَىٰ اٰبِهَيْمٍ وَ
اِسْمٰعِيلَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اَوْفَىٰ مُوسٰى وَ
عِيسٰى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ دَرَجَتٍ بَيْنَ اَحَدِهِمْ وَمَا وَخُنْ
لَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ تُقْبَلَ مِنْهُ
وَهُوَ مِنَ الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا
كَفَرًا وَاَبْعَدُ لِمَا يَنْهَوْنَ وَاَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ
اَنْ عَلَيْهِمْ عَذَابُ اللّٰهِ وَالنَّارِ وَاللَّكِيَّةُ وَالنَّارِ اَجْمَعِيْنَ ۝
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا لَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝
اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا سِرًّا اللّٰهُ
عَمُوْرُ رَحِيْمٍ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَبْعَدُ لِمَا يَنْهَوْنَ كُفْرًا
اَزْدَادُوْا كُفْرًا اَلَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰلِحُوْنَ ۝
اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَمَّا نُوْا وَاَهُمْ مُّكَرُّوْنَ كُنْ يُقْبَلَ
مِنْ اَحَدِهِمْ سُلُّ الْاَرْضِ ذَهَبًا ۝ لِّوَاَمْتَدٰى يَدُ
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نّٰصِرِيْنَ ۝

(৮৪) বলুন, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানবর্গের উপর আর যা কিছু পেয়েছেন মুসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবী রসূলগণ তাঁদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের কারো মাথো পাঠ্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত। (৮৫) যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কশ্মিকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (৮৬) কেমন করে আল্লাহ এমন জাতিকে হেদায়েত দান করবেন, যারা ঈমান আনার পর এবং রসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর কাফের হয়েছিল ও পরম দয়ালু। (৮৭) যারা ঈমান আনার পর অস্বীকার করেছে এবং অস্বীকৃতিতে বৃদ্ধি ঘটছে, কশ্মিকালেও তাদের তওবা কবুল করা হবে না— আর তারা হলো গোমরাহ। (৮৮) যদি সারা পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও তার পরিবর্তে দেয়া হয়, তবুও যারা কাফের হয়েছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের তওবা কবুল করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রশাদায়ক আযাব। পক্ষান্তরে তাদের কোনই সাহায্যকারী নেই।

ইসলামই মুক্তির পথ : ইসলামের শাসনিক অর্থ আনুগত্য করা। পরিভাষায় একটি বিশেষ ধর্মের আনুগত্য করার নাম ইসলাম, যা আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেছেন। কেননা, সব পয়গম্বরের শরীয়তে ধর্মের মূলনীতি এক ও অভিন্ন।

অতঃপর ইসলাম শব্দটি কখনও উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং কখনও শুধু সর্বশেষ শরীয়তের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা শেষ নবী (সাঃ)—এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআনে উভয় প্রকার ব্যবহারই বিদ্যমান। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ নিজেকে 'মুসলিম' এবং নিজ নিজ উম্মতকে 'উম্মতে মুসলিমাহ' বলেছেন—একথাও কোরআন থেকেই প্রমাণিত। শেষ নবী (সাঃ)—এর উম্মতকে বিশেষভাবে 'মুসলিম' বলাও কোরআনেই উল্লেখিত রয়েছে।

মোটকথা, যে কোন পয়গম্বর যে কোন খোদায়ী ধর্ম নিয়ে জগতে আগমন করেছেন, তাকেই ইসলাম বলা হয় এবং মুহাম্মদ (সাঃ)—এর উম্মতের বিশেষ উপাধি হিসেবেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখন প্রশ্ন হয় যে, আলোচ্য আয়াতে ইসলাম শব্দ দ্বারা কোন অর্থ বোঝানো হয়েছে।

বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, যে কোন অর্থই বোঝানো হোক, পরিণামের দিক দিয়ে তাতে কোন পার্থক্য হয় না। কেননা, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের ইসলাম একটি সীমিত শ্রেণীর জন্য এবং বিশেষ যমানার জন্যে ছিল। ঐ শ্রেণীর উম্মত ছাড়া অন্যদের জন্যে তখনও সেই ইসলাম গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেই নবীর পর যখন অন্য নবী প্রেরিত হন, তখন সে ইসলামও বিদায় নেয়। নতুন নবী যা নিয়ে আগমন করতেন, তাই হতো তখনকার ইসলাম। এতে অবশ্য মৌলিক কোন পরিবর্তন হতো না, শুধু শাখাগত বিধি-বিধান ভিন্ন হতো। শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)—কে যে ইসলাম দেয়া হয়েছে, তা অপরিবর্তনীয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। উল্লেখিত নীতি অনুযায়ী তাঁর আবির্ভাবের পর পূর্ববর্তী সব ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। এখন পূর্বকার ইসলাম আর ইসলাম নয়। বরং হযর (সাঃ)—এর মাধ্যমে যা পৃথিবীতে পৌঁছেছে, তাই হলো ইসলাম। এ কারণেই বিভিন্ন সহীহ হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেছেন : আজ যদি হযরত মুসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া গতাস্তর ছিল না। অন্য এক হাদীসে বলেন : কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হযরত ঈসা (আঃ) যখন অবতরণ করবেন, তখন নবুওয়তের পদে সমাসীন থাকা সত্ত্বেও তিনি আমার শরীয়তেরই অনুসরণ করবেন।

অতএব এ আয়াতে ইসলামের যে কোন অর্থই নেয়া হোক, পরিণাম উভয়েরই এক। অর্থাৎ, শেষ নবীর আবির্ভাবের পর একমাত্র তাঁর আনীত ধর্মকেই ইসলাম বলা হবে। এ ধর্মই বিশ্বাবাসীর মুক্তির উপায়। আলোচ্য আয়াতে এ ধর্ম সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অবলম্বন করে, তবে আল্লাহর কাছে তা গ্রহণীয় নয়।

একটি সন্দেহের অপনোদন : কَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ সন্দেহ হয় যে, ধর্মত্যাগী হওয়ার পর কেউ হেদায়েত পায় না। অথচ বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত। কেননা, অনেক লোক ধর্মত্যাগী হওয়ার পরেও ঈমান এনে হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে যায়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদের সাথে বিতর্কের বিষয় বর্ণিত হয়েছে— কোথাও ইহুদীদের সাথে এবং কোথাও খ্রীষ্টানদের সাথে। আলোচ্য আয়াতসমূহেও একটি বিতর্কের বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। রুহুল-মা'আনী গ্রন্থে কলবী থেকে বর্ণিত ঘটনায় বলা হয়েছে : রসুলুল্লাহ (সাঃ) একবার সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন যে, আমরা যাবতীয় মূলনীতিতে এবং অধিকাংশ শাখাগত বিধি-বিধানে ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী। একথা শুনে ইহুদীরা আপত্তি উত্থাপন করে বললোঃ আপনারা উটের গোশত খান, দুধ পান করেন। অথচ এগুলো হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর প্রতি হারাম ছিল। রসুলুল্লাহ (সাঃ) উত্তরে বললেন : ভুল কথা, এগুলো তাঁর প্রতি হালাল ছিল। ইহুদীরা বলল : আমরা যেসব বস্তু হারাম মনে করি, সবই হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীমের আমল থেকেই হারাম হিসাবে চলে এসেছে এবং আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ কথোপকথনের পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে ইহুদীদের মিথ্যাবাদিতা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বলা হচ্ছে : তওরাত অবতরণের পূর্বে উটের গোশত ব্যতীত সব খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং বনী-ইসরাঈলের জন্যেও হালাল ছিল। তবে উটের গোশত বিশেষ কারণবশতঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ) নিজেই নিজের জন্যে হারাম করে নিয়েছিলেন। পরে তাঁর বংশধরের জন্যেও তা হারাম ছিল।

বিশেষ কারণটি ছিল এই যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) 'ইরকুনিসা' (গাইটিকা বাত) রোগে আক্রান্ত হয়ে মানত করেছিলেন যে, আল্লাহ তআলা এ রোগ থেকে মুক্তি দিলে তিনি সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্য বস্তু পরিত্যাগ করবেন। এরপর তিনি রোগমুক্ত হয়ে যান এবং সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্যবস্তু উটের গোশত পরিত্যাগ করেন। (হাকেম, তিরমিযী, রুহুল-মা'আনী) মানতের কারণে যে উটের গোশত হারাম হয়েছিল, তা গৃহীর নির্দেশে বনী-ইসরাঈলের জন্যে পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল। এতে বোঝা গেল যে, তাদের শরীয়তে মানতের কারণে হালাল বস্তুও হারাম হয়ে যেতো। আমাদের শরীয়তেও মানতের কারণে জায়েয কাজ গুজ্জিব হয়ে যায়। কিন্তু মানত করে হালালকে হারাম করা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে মানত কসমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফকারা দেয়া ওয়াজিব হবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন :
لَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (তফসীরে-কবীর)

আলোচ্য ৯৬ নং আয়াতে সারা বিশ্বের সকল গৃহ এমন কি, মসজিদ ও উপাসনালয়সমূহের মোকাবিলায়ও কা'বা গৃহের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণ একাধিক :

কাবাগৃহের শ্রেষ্ঠত্ব ও নির্মাণ ইতিহাসঃ প্রথমতঃ এটি সারা বিশ্বে সর্বপ্রথম উপাসনালয়।

দ্বিতীয়তঃ এ গৃহ বরকতময় ও কল্যাণের আধার।

তৃতীয়তঃ এ গৃহ সারা বিশ্বের জন্য পথপ্রদর্শক।

আয়াতের সারমর্ম এই যে, মানবজাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে গৃহ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করা হয়, তা ঐ গৃহ, যা বাক্বায় (মক্কার অপর নাম ছিল বাক্বা) অবস্থিত। অতএব কা'বা গৃহই বিশ্বের সর্ব প্রথম উপাসনালয়। এর অর্থ এও হতে পারে যে, বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ এবাদতের জন্যেই নির্মিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে কোন উপাসনালয়ও ছিল না এবং বাস গৃহও ছিল না। হযরত আদম (আঃ) ছিলেন আল্লাহর নবী। তাঁর পক্ষে

এমনটি অবস্পন্দীয় নয় যে, পৃথিবীতে আগমনের পর তিনি নিজের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের আগেই আল্লাহর ঘর অর্থাৎ, ইবাদতের গৃহ নির্মাণ করেন। এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদী প্রমুখ সারাহী ও তাবৈরিগণের মতে কা'বাই বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ। পক্ষান্তরে এটাও সম্ভব যে, মানুষের বসবাসের গৃহ পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল; কিন্তু এবাদতের জন্যে কা'বা গৃহই সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল। এ মতটি হযরত আলী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত রয়েছে।

বায়হাকী বর্ণিত এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়ার পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ তাআলা জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁদের কা'বা গৃহ নির্মাণের আদেশ দেন। এ গৃহ নির্মিত হয়ে গেলে তাঁদেরকে তা তওয়াফ করার আদেশ দেয়া হয় এবং বলা হয়, আপনি সর্বপ্রথম মানব এবং এ গৃহ সর্বপ্রথম গৃহ— যা মানবমণ্ডলীর জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।— (ইবনে কাসীর)

কোন কোন হাদীসে আছে, হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত এ কা'বা গৃহ নূহের মহাপ্লাবন পর্যন্ত অক্ষত ছিল। মহাপ্লাবনে এ গৃহ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রাচীন ভিত্তির উপর এ গৃহ পুনঃনির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এক দুর্ঘটনায় প্রাচীর ধ্বংস গেলে জুরহাম গোত্রের লোকেরা একে পুনঃনির্মাণ করেন। এভাবে কয়েক বার বিধ্বস্ত হওয়ার পর একবার আমালেকা সম্প্রদায় ও একবার কোরাইশরা এ গৃহ নির্মাণ করে। সর্বশেষ এ নির্মাণে মহানবী (সাঃ)—ও শরীক ছিলেন এবং তিনিই 'হাজরে-আসওয়াদ' স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কোরাইশদের এ নির্মাণের ফলে ইবরাহীমী ভিত্তি সামান্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রথমতঃ কা'বার একটি অংশ 'হাতীম' কা'বা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।— দ্বিতীয়তঃ ইবরাহীম (আঃ)—এর নির্মাণে কা'বা গৃহের দরজা ছিল দু'টি—একটি প্রবেশের জন্য এবং অপরটি পশ্চাৎমুখী হয়ে বের হওয়ার জন্যে। কিন্তু কোরাইশরা শুধু পূর্বদিকে একটি দরজা রাখে। তৃতীয়তঃ তারা সমতল ভূমি থেকে অনেক উচুতে দরজা নির্মাণ করে— যাতে সবাই সহজে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। বরং তারা যাকে অনুমতি দেয় সে'ই যেন প্রবেশ করতে পারে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)—কে বলেন : আমার ইচ্ছা হয়, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু কা'বা গৃহ ভেঙ্গে দিলে নও-মুসলিম অঙ্ক লোকদের মনে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দেয়ার আশঙ্কার কথা চিন্তা করেই বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি। এ কথাবার্তার কিছুদিন পরেই মহানবী (সাঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।

কিন্তু হযরত আয়েশা রায়িয়াল্লাহু আনহার তাগেয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুযায়ের (রাঃ) মহানবী (সাঃ)—এর উপরোক্ত ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর যখন মক্কার উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি উপরোক্ত ইচ্ছাটি কার্যে পরিণত করেন এবং কা'বা গৃহের নির্মাণ ইবরাহীমী নির্মাণের অনুরূপ করে দেন। কিন্তু মক্কার উপর তাঁর কর্তৃত্ব বেশী দিন টেকেনি। অত্যাচারী হাফ্জাজ ইবনে ইউসুফ মক্কায় সৈন্যাভিযান করে তাঁকে শহীদ করে দেয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেই সে আবদুল্লাহ ইবনে যুযায়েরের এ চিরস্মরণীয় কীর্তিটিও মুছে ফেলতে মনস্থ করে। সেমতে সে জনগণের মধ্যে প্রচার করতে থাকে যে, আবদুল্লাহ ইবনে যুযায়েরের এ কাজ ঠিক হয়নি। রসুলুল্লাহ (সাঃ) কা'বা

গৃহকে যে অবস্থায় রেখে গেছেন, সে অবস্থায় রাখাই আমাদের কর্তব্য। এ অজুহাতে কা'বা গৃহকে আবার ভেঙ্গে জাহেলিয়াত আমলের কোরাইশরা যেভাবে নির্মাণ করেছিল, সেভাবেই নির্মাণ করা হলো। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পর কোন কোন বাদশাহ্ উল্লেখিত হাদীস দৃষ্টে কা'বা গৃহকে ভেঙ্গে হাদীস অনুযায়ী নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ইমাম হযরত মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) ফতোয়া দেন যে, এভাবে কা'বা গৃহের ভাঙ্গাগড়া অব্যাহত থাকলে পরবর্তী বাদশাহ্দের জন্যে একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়ে যাবে এবং কা'বা গৃহ তাদের হাতে একটি খেলনায় পরিণত হবে। কাজেই বর্তমানে যে অবস্থায় রয়েছে, সে অবস্থায়ই থাকতে দেয়া উচিত। সমগ্র মুসলিম সমাজ তাঁর এ ফতোয়া গ্রহণ করে নেয়। ফলে আজ পর্যন্ত হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের নির্মাণই অবশিষ্ট রয়েছে। তবে মেরামতের প্রয়োজনে ছোটখাট কাজ সব সময়ই অব্যাহত থাকে।

এসব রেওয়াজে থেকে জানা যায় যে, খানায় কা'বা জগতের সর্বপ্রথম গৃহ এবং কমপক্ষে সর্বপ্রথম উপাসনালয়। কোরআনে যেখানে আল্লাহর আদেশে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাইল কর্তৃক কা'বা গৃহ নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা কা'বা গৃহের প্রাথমিক ভিত নির্মাণ করেননি, বরং সাবেক ভিত্তির উপরই নির্মাণ করেন। আয়াত **وَأَذِّنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ مِّنَ الْقَوَاعِدِ مَنَاسِكُهَا** থেকেও বোঝা যায় যে, কা'বা গৃহের ভিত্তি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। সূরা হজ্বের এক আয়াতে বলা হয়েছে :

وَأَذِّنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ مِّنَ الْقَوَاعِدِ مَنَاسِكُهَا অর্থাৎ, যখন আমি ইবরাহীমের

জন্যে এ গৃহের স্থান ঠিক করে দিলাম। এতেও বোঝা যায় যে, কা'বা গৃহের স্থান পূর্ব থেকে নির্ধারিত ছিল।

কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে কা'বা গৃহ নির্মাণের আদেশ দেয়া হলে ফেরেশতার মাধ্যমে বালুর স্থূপের নীচে লুক্কায়িত সাবেক ভিত্তি চিহ্নিত করে দেয়া হয়।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কা'বা গৃহের একটি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হলো যে, এ হচ্ছে জগতের সর্ব প্রথম গৃহ অথবা সর্বপ্রথম উপাসনালয়। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, হযরত আবু যর (রাঃ) হযুর (সাঃ)-কে একবার জিজ্ঞেস করেন যে, জগতের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? উত্তর হলো : মসজিদে হারাম। আবার প্রশ্ন করা হলো : এরপর কোনটি? উত্তর হলো মসজিদে বায়তুল-মুকাদ্দাস। আবার জিজ্ঞেস করলেন : এই দু'টি মসজিদ নির্মাণের মাঝখানে কতদিনের ব্যবধান ছিল? উত্তর হলো : চল্লিশ বৎসর।

এ হাদীসে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর হাতে কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণের দিক দিয়ে বায়তুল-মুকাদ্দাস নির্মাণের ব্যবধান বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রামাণিত রয়েছে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রথম নির্মাণও হযরত ইবরাহীমের হাতে কা'বা গৃহ নির্মাণের চল্লিশ বৎসর পর সম্পন্ন হয়। এরপর হযরত সুলায়মান (আঃ) বায়তুল-মুকাদ্দাসের পুনঃনির্মাণ করেন। এভাবে বিভিন্ন হাদীসের পরস্পর বিরোধিতা দূর হয়ে যায়।

আদিকাল থেকেই কা'বা গৃহের প্রতি সন্মান প্রদর্শন অব্যাহত রয়েছে। আয়াতে **وُضِعَ لِلنَّاسِ** শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জাতিবর্ষ নির্বিশেষে সমগ্র মানবগোষ্ঠী এর প্রতি সন্মান প্রদর্শন করবে। আল্লাহ তাআলা এর প্রকৃতিতে এমন মাহাত্ম্য নিহিত রেখেছেন যে, মানুষের অন্তর আপনা-আপনিই এর দিকে আকৃষ্ট হয়। আয়াতে উল্লেখিত 'বাক্বা' শব্দের অর্থ মক্কা। এখানে 'মীম' অক্ষরকে 'বা' অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। অথবা উচ্চারণ ভেদে অপর নাম 'বাক্বা'।

কা'বা গৃহের বরকত : আয়াতে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে কা'বা গৃহকে 'মোবারক' (বরকতময়) বলা হয়েছে। 'মোবারক' শব্দটি বরকত থেকে উদ্ভূত। বরকত শব্দের অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। কোন বস্তু দু'ভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। (এক) প্রকাশ্যতঃ বস্তুর পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। (দুই) তদুপা এত বেশী কাজ হওয়া, যা তদপেক্ষা বেশী বস্তু দ্বারা সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। একেও অর্থগত দিক দিয়ে 'বৃদ্ধি পাওয়া' বলা যেতে পারে।

কা'বা গৃহের বরকতময় হওয়া বাহ্যিক এবং অর্থগত উভয় দিক দিয়েই রয়েছে। বাহ্যিক বরকত এই যে, মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা শুধু বালুকাময় অনূর্বর মরুভূমি হওয়া সত্ত্বেও এতে সব সময়, সব ঋতুতে, সব রকম ফল-মূল, তরী-তরকারী ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এত বিপুল পরিমাণে মজুদ থাকে, যা শুধু মক্কাবাসীর জন্যেই নয়—বহিরাগতদের জন্যেও যথেষ্ট। বহিরাগতদের অবস্থা সবাই জানে। বিশেষতঃ হজ্বের মওসুমে লক্ষ লক্ষ মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে সমবেত হয়। তাদের সংখ্যা মক্কার অধিবাসী অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী হয়ে থাকে। এ বিরাট জনসমাবেশ সেখানে দু'চার দিন নয়—কয়েক মাস অবস্থান করে। হজ্বের মওসুম ছাড়াও এমন কোন দিন যায় না, যখন সেখানে হাজার হাজার বহিরাগত মানুষের ভিড় না থাকে। বিশেষতঃ হজ্বের মওসুমে যখন সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয়, তখনও এমন কথা শোনা যায়নি যে, বাজারে জরুরী পণ্য সামগ্রীর অভাব দেখা দিয়েছে। মক্কায় পৌঁছে কোন কোন হাজ্জী শত শত ভেড়া-দুগ্ধাও কোরবানী করেন। গড়ে জনশ্রুতি একটি কোরবানী তো অবশ্যই হয়। এ লক্ষ লক্ষ ভেড়া-দুগ্ধা সেখানে সব সময়ই পাওয়া যায়। এগুলো বড় একটা বাইরে থেকে আমদানী করার ব্যবস্থা করতে হয় না।

এ হচ্ছে বাহ্যিক বরকতের অবস্থা—যা উদ্ভিষ্ট নয়। অর্থগত ও আধ্যাত্মিক বরকত যে কি পরিমাণ, তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কতিপয় প্রধান এবাদত, বিশেষ করে কা'বা গৃহেই করা যায়। এসব এবাদতে যে বিরাট সওয়াব ও কল্যাণ রয়েছে, তা কা'বা গৃহের কারণেই হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ হজ্ব ও ওমরা। আরও কিছু এবাদত আছে, যা মসজিদে-হারামে করলে সওয়াব বহুগুণে বেড়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, বাস গৃহে নামায পড়লে এক নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু মহল্লায় মসজিদে পড়লে পঁচিশ নামাযের, জামে মসজিদে পড়লে পাঁচ' নামাযের, মসজিদে আকসায় পড়লে এক হাজার নামাযের, আরাম মসজিদে পড়লে পঞ্চাশ হাজার নামাযের এবং মসজিদে-হারামে পড়লে এক লক্ষ নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়।—(ইবনে মাজাহ্, তাহাজ্জী)

হজ্বের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধভাবে হজ্বরত পালনকারী মুসলমান বিগত গোনাহ থেকে এমনভাবে মুক্ত ও পবিত্র হয়

গৃহ, যেন সদ্য মায়ের গর্ভ থেকে নিষ্কাশিত ভূমিষ্ট হয়েছে। এগুলো কা'বা গৃহেরই অর্ধগত ও আধ্যাত্মিক বরকত। আয়াতের শেষাংশে **هٰدٰى** বল এসব বরকতই ব্যক্ত করা হয়েছে।

কা'বা গৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য : আলাচ্য ৯৭ নং আয়াতে কা'বা গৃহের তিনটি বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ এতে আল্লাহর কুদরতের অনেক নিদর্শন রয়েছে। তদুপরে একটি হচ্ছে মকামে-ইবরাহীম। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ ও বিপদমুক্ত হয়ে যায়; কেউ তাকে হত্যা করতে পারে না। তৃতীয়তঃ সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্য এতে হজ্জ্বত পালন করা ফরয; যদি এ গৃহ পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি ও সামর্থ্য থাকে।

কা'বা গৃহ নির্মিত হওয়ার দিন থেকে অদ্যাবধি আল্লাহ তাআলা এর রকতে শত্রুর আক্রমণ থেকে মক্কাবাসীদের নিরাপদে রেখেছেন। বাদশাহ্ আবরাহা বিরাট হস্তীবাহিনীসহ কা'বা গৃহের প্রতি ধাবিত হয়েছিল। আল্লাহ্ স্বীয় কুদরতে পক্ষীকূলের মাধ্যমে তাদের নিকট করে দেন। মক্কার হরমে প্রবেশকারী মানুষ, এমনকি জীবজন্তু পর্যন্ত বিপদমুক্ত হয়ে যায়। জন্তু-জানোয়াররাও এ বিষয়ে সচেতন। এ সীমানায় প্রবেশ করে তারাও নিজের নিরাপদ মনে করে। সেখানে বন্য ও হিংস্র জন্তু মানুষ দেখে গালায় না। সাধারণভাবে দেখা যায়, কা'বা গৃহের যে পার্শ্বে বৃষ্টি হয়, সে গর্ভস্থিত দেশগুলোতে প্রচুর বারিষাত হয়। আরেকটি বিস্ময়কর নিদর্শন এই যে, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হাজ্জী সেখানে একত্রিত হয়। তারা জামরাত নামক স্থানে প্রত্যেকেই একেকটি প্রতীক লক্ষ্য করে দৈনিক সাতটি করে কঙ্কর তিন দিন পর্যন্ত নিক্ষেপ করে। যদি এসব কঙ্কর সেখানেই জমা থাকতো, তবে এক বৎসরেই কঙ্করের স্তুপের নীচে জামরাত অদৃশ্য হয়ে যেতো এবং কয়েক বৎসরে সেখানে কঙ্করের বিরাট পাহাড় গড়ে উঠত। অথচ হজ্জের তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সেখানে কঙ্করের খুব একটা স্তুপ দেখা যায় না। ইত্যন্তও বিক্ষিপ্ত কিছু কঙ্কর দেখা যায় মাত্র। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে হুযর (সাঃ)-বলেন : ফেরেশতারা এসব কঙ্কর তুলে নেয়। যাদের হজ্জ কোন কারণে কবুল হয় না, শুধু তাদের কঙ্করই এখানে থেকে যায়। এ কারণেই জামরাত থেকে কঙ্কর তুলে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এগুলো কবুল করা হয়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ উক্তির সত্যতা প্রত্যেকেই নিজ চোখে দেখেন। জামরাতের আশেপাশে সামান্য কঙ্করই দৃষ্টিগোচর হয়। অথচ সেগুলো সেখান থেকে সরানোর বা পরিষ্কার করার কোন ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকেও নেই; জনগণের পক্ষ থেকেও নেই।

এ কারণেই শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) খাসায়সে কুবরা নামক গ্রন্থ বলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কতক মু'জ্জিয়া তাঁর ওফাতের পরও দৌদ্যমান রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। প্রত্যেকেই তা অবলোকন করতে পারে। তদুপরে একটি হচ্ছে পবিত্র কোরআন। সমগ্র বিশ্ব এ অনন্য কিতাবটির সমতুল্য গ্রন্থ রচনা করতে অক্ষম। এ অক্ষমতা যেমন তাঁর জীবদ্দশায় ছিল, তেমনি আজও রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। প্রতি যুগের মুসলমান বিশৃঙ্খল একথা বলে চ্যালেঞ্জ করতে পারে যে, **هٰذَا سُوْرَةٌ مِّنْ وَّرَثٰى** কোরআনের সূরার মত একটি সূরা তৈরী কর দেখি। এমনভাবে জামরাত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : এসব জামরাতে নিক্ষিপ্ত কঙ্কর অদৃশ্যভাবে ফেরেশতারা তুলে নেয়। যাদের হজ্জ কবুল হয় না, শুধু সেসব হতভাগ্যদের কঙ্করই থেকে যায়। তাঁর এ উক্তির সত্যতা প্রতি যুগেই প্রমাণিত হচ্ছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত হবে। নিঃসন্দেহে ঐটা তাঁর অক্ষয় মু'জ্জিয়া এবং কা'বা গৃহ সম্পর্কিত একটি বিরাট নিদর্শন।

মকামে-ইবরাহীম : মকামে-ইবরাহীম কা'বা গৃহের একটি বড় নিদর্শন। এ কারণেই কোরআনে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মকামে-ইবরাহীম একটি পাথরের নাম। এর উপর দাঁড়িয়েই হযরত ইবরাহীম (আঃ) কা'বা গৃহ নির্মাণ করতেন। এক রেওয়াজে বলা হয়েছে : নির্মাণের উচ্চতার সাথে সাথে পাথরটিও আপন-আপনি উঠে হয়ে যেতো এবং নীচে অবতরণের সময় নীচু হয়ে যেতো। এ পাথরের গায়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর গভীর পদচিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান। একটি অচেতন ও জড় পাথরের পক্ষে প্রয়োজনানুসারে উঠে ও নীচু হওয়া এবং মোমের মত নরম হয়ে নিজের মধ্যে পদচিহ্ন গ্রহণ করা- এসবই আল্লাহর অপার কুদরতের নিদর্শন এবং এতে কা'বা গৃহের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়। এ পাথরটি কা'বা গৃহের নীচে দরজার নিকটে অবস্থিত ছিল। যখন কোরআনে মকামে-ইবরাহীমে নামায পড়ার আদেশ অবতীর্ণ হয়

وَاٰتَيْنَاوْاٰسْرَافَٰلْمَكَّيْمٰنِ তখন তওয়াফকারীদের সুবিধার্থে

পাথরটি সেখান থেকে অপসারিত করে কা'বা গৃহের সামনে সামান্য দূরে যমযম কূপের নিকট স্থাপন করা হয়। একে এ স্থানেই একটি নিরাপদ কক্ষে তালাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। কা'বা প্রদক্ষিণের পর দুই রাকআত নামায এর পেছনে দাঁড়িয়ে পড়া হয়। অধুনা কক্ষটি সরিয়ে নিয়ে মকামে-ইবরাহীমকে একটি কাঁচ-পাত্রে সংরক্ষিত করে দেয়া হয়েছে। আসলে এ বিশেষ পাথরটিকেই মকামে-ইবরাহীম বলা হয়। তওয়াফ-পরবর্তী নামায এর উপরে অথবা আশেপাশে পড়া উত্তম। কিন্তু শাব্বিক অর্থের দিক দিয়ে মকামে-ইবরাহীম সমগ্র মসজিদে-হারামকেও বোঝায়। এ কারণেই ফেকাহবিদগণ বলেন : মসজিদে-হারামের যে কোন স্থানে তওয়াফ পরবর্তী নামায পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

কা'বা গৃহে প্রবেশকারীর নিরাপত্তা : কা'বা গৃহের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়ে যায়। এ নিরাপত্তা একেত শরীয়তের আইন হিসেবে— অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি এতে প্রবেশ করে, তাকে কষ্ট দেবে না বা হত্যা করবে না। যদি কেউ এতে প্রবেশ করে, তাকে কষ্ট দেবে না বা হত্যা করবে না। যদি কেউ হত্যাকাণ্ড করে অথবা অন্য কোন অপরাধ করে এতে প্রবেশ করে, তবুও তাকে সেখানে শাস্তি দেবে না, বরং তাকে হরম থেকে বের হতে বাধ্য করবে। বের হওয়ার পর তাকে শাস্তি দেবে। এভাবে হরমে প্রবেশকারী ব্যক্তি শরীয়তের আইন অনুযায়ী নিরাপদ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ এ নিরাপত্তা সৃষ্টিগতভাবে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিগতভাবেই প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তরে কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ নিহিত রেখেছেন। ফলে বিস্তর মতবিরোধ সত্ত্বেও তারা সবাই এ বিশ্বাসে একমত যে, কা'বা গৃহে প্রবেশকারী ব্যক্তি যতবড় অপরাধী ও শত্রুই হোক না কেন, কা'বা গৃহের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য করে তাকে কিছুই বলা যাবে না; হরম শরীফকে সাধারণ কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। জাহেলিয়াত যুগের আরব ও তাদের বিভিন্ন গোত্র অসংখ্য পাপাচারে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কা'বা গৃহের সম্মান রক্ষার জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতেন ও কৃতিত্ব ছিল না। তাদের যুদ্ধপ্রিয়তা ও নিষ্ঠুরতা সমগ্র জগতে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে তারা পিতার হত্যাকারীকে দেখেও মাথা হেঁট করে চলে যেতো; কিছুই বলতো না।

মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে হরমের অভ্যন্তরে কিছুক্ষণ যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কা'বা গৃহকে পবিত্র করা। বিজয়ের পর হুযর (সাঃ) ঘোষণা করেন যে, এ অনুমতি কা'বা

আল عمران ৩

২৭

লن تنالوا

وَكَيْفَ تَقْرَأُونَ وَانْتُمْ تُكَلِّمُ عَلَى اللَّهِ آيَاتِ اللَّهِ وَمَعَكُمْ رَسُولُهُ
وَمَنْ يَتَصَصَّرْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَتَّى تَقْضِيَهُ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ ۝ وَأَعِصِمُوا أَنْ يَحْبِلَ اللَّهُ جَمِيعًا وَلَا تَتَّقُوا إِلَّا اللَّهَ
فَعَمَتِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِذْ أَنْتُمْ عِدَاءُ قَالَفَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ
بِعِصْيَةِ إخوانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ
مِنْهَا لَكُنْ لَكَ يَبْنَؤُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَلَكُنْ
مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعَمْرِو وَيُؤْتُونَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
تَقَرَّبُوا وَاتَّبَعُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وَجُوهٌ فَأَمَّا
الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَفَكَرْتُمْ بَعْدَ آيَاتِكُمْ أَنْ تَقُولُوا
الْعَذَابُ بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَأُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وَجُوهُهُمْ
فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ
تَنْزِلُهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ۝

(১০১) আর তোমরা কেমন করে কাফের হতে পার, অথচ তোমাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াতসমূহ এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর রসূল। আর যারা আল্লাহর কথা দৃঢ়ভাবে ধরবে, তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে সরল পথের। (১০২) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মূলমান না হয়ে সূত্রবরণ করা না। (১০৩) আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না। আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ তোমাদিগকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিল। অতঃপর তা থেকে তিনি তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ নিম্নের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হতে পার। (১০৪) আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকে উচিত যারা আহবান জানাবে সংকর্ষের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম। (১০৫) আর তাদের মত হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ আসার পরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছে— তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ঙ্কর আযাব। (১০৬) সেদিন কোন কোন মুখ উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো। বস্ত্তঃ যাদের মুখ কালো হবে, তাদের বলা হবে, ‘তোমরা কি ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গিয়েছিলে? এখার সে কুফরীর বিনিময়ে আযাবের আশাদ গ্রহণ কর। (১০৭) আর যাদের মুখ উজ্জ্বল হবে, তারা থাকবে রহমতের মাঝে। তাতে তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। (১০৮) এগুলো হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশ, যা তোমাদিগকে যথাযথ পাঠ করে শুনানো হচ্ছে। আর আল্লাহ বিশৃঙ্খলার প্রতি উৎসাহিত করেন না।

গৃহকে পবিত্রকরণের উদ্দেশ্যে কয়েক ঘণ্টার জন্যেই ছিল। এরপর পূর্বের ন্যায় চিরকালের জন্যে হরমে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন : আমার পূর্বে কারো জন্যে হরমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ করা হালাল ছিল না, আমার পরেও কারো জন্যে হালাল নয়। আমাকেও মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়েছিল, পরে আবার হারাম করে দেয়া হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর পর হাজ্জাহ ইবনে ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুযায়েরের বিরুদ্ধে মক্কার সৈন্য অভিযান এবং হত্যা ও লুণ্ঠন করছিলেন। এতে কা'বা গৃহের সাধারণ নিরাপত্তা আইন এতদুৎকৃষ্ট হইয়াছিল। কেননা মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা তথা সর্ব সম্মতিক্রমে হাজ্জাহের একাধি হারাম ও মহাপাপ ছিল। সমগ্র মুসলিম জাতি এজন্যে তাকে শিকার দিয়েছে। এ ঘটনাকে কা'বা গৃহের সৃষ্টিগত সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থীও বলা যায় না। কারণ, হাজ্জাহ স্বয়ং এ কাজের বৈধতায় বিশ্বাসী ছিল না। সে একে একটি জঘন্য অপরাধ মনে করতো। কিন্তু রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থ তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল।

একথা অনস্বীকার্য যে, সর্বশ্রেণীর মানবমণ্ডলীই কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধকে অত্যন্ত জরুরী মনে করে। তারা হরমের অভ্যন্তরে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও যুদ্ধাচারবীকে জঘন্যতম পাপ বলে গণ্য করে। এটা সারা বিশ্বে একমাত্র কা'বা গৃহেরই বৈশিষ্ট্য।

কা'বা গৃহের হজ্জ ফরয হওয়া : ৯৭ নং আয়াতে কা'বা গৃহের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : আল্লাহ তাআলা মানব জাতির প্রতি শর্তাধীন কা'বা গৃহের হজ্জ ফরয করেছেন। শর্ত এই যে, সে পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য থাকতে হবে। সামর্থ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ থাকতে হবে, যদ্বারা সে কা'বা গৃহ পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষাণেরও ব্যবস্থা থাকতে হবে। দৈহিক দিক দিয়ে হাত পা ও চক্ষু কৰ্মক্ষম হতে হবে। কারণ, যাদের এসব অঙ্গ বিকল, তাদের পক্ষে স্বীয় বাড়ী-ঘরে চলাফেরাই দুস্কর। এমতাবস্থায় সেখানে যাওয়া ও হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করা তার পক্ষে কিরণে সম্ভব হবে?

মহিলাদের পক্ষে মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া সফর করা শরীয়তের পরিভাষায় নাজায়েয। কাজেই মহিলাদের সামর্থ্য তখনই হবে, যখন তার সাথে কোন মাহরাম পুরুষ হজ্জে থাকবে; নিজ খরচে করুক অথবা মহিলাই তার খরচ বহন করুক। এমনিভাবে কা'বা গৃহে পৌছার জন্যে রাস্তা নিরাপদ হওয়ায়ও সামর্থ্যের একটি অংশ। যদি রাস্তা বিপজ্জনক হয় এক জান-মালের ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা থাকে, তবে হজ্জের সামর্থ্য নাই বলে মনে করা হবে।

হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা। শরীয়তের পরিভাষায় কা'বা গৃহ প্রদক্ষিণ, আরাক্যাত ও মুয়দালেফায় অবস্থান ইত্যাদি ক্রিয়াকর্মকে হজ্জ বলা হয়। এ ব্যাখ্যা কোরআন প্রদত্ত। হজ্জের অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি রসূলুল্লাহ (সঃ) মৌখিক উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমানদের শক্তির ভিত্তি : আলাচ্য ১০২ ও ৩ নং আয়াতে প্রথমটিতে প্রথম মূলনীতি এবং দ্বিতীয়টিতে দ্বিতীয় মূলনীতি ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথম মূলনীতিটি তাকওয়া বা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা। অর্থাৎ, তার অপছন্দনীয় কাজ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা।

‘তাকওয়া’ শব্দটি আরবী ভাষায় বেঁচে থাকা ও বিরত থাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ ‘ভয় করা’ ও করা হয়। কারণ, যেসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়, সেগুলো ভয় করারই বিষয়। তাতে গোদারী শাস্তির ভয় থাকে। এ তাকওয়া তথা বেঁচে থাকার কয়েকটি স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হলো কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এ অর্থে প্রত্যেক মুসলমানকেই ‘মুতাকী’ (আল্লাহ্‌ভীরু) বলা যায়—যদিও সে গোনাহে লিপ্ত থাকে। এ অর্থ বোঝানোর জন্যেও কোরআনে অনেক জায়গায় ‘মুতাকী’ ও ‘তাকওয়া’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তর যা আসলে কামা— তা হলো এমন সব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, যা আল্লাহ্‌ তাআলা ও তাঁর রসুলের পছন্দনীয় নয়। কোরআন ও হাদীসে তাকওয়ার যে সব কবীলিত ও কল্যাণ প্রতিশ্রুত হয়েছে, তা এ স্তরের ‘তাকওয়া’র উপর ভিত্তি করেই হয়েছে।

তৃতীয় স্তরটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। আমিয়া আল-ইহুস সালাম ও ঈদের বিশেষ উত্তরাধিকারী ওলীস ও স্তরের তাকওয়া অর্জন করে থাকেন। অর্থাৎ, অন্তরকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত সবকিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও তাঁর সন্তুষ্টি কামনার দ্বারা পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ রাখা। আলোচ্য আয়াতে **حَتَّى تَتَذَكَّرَ** বাকর পর **وَاللَّهُ** বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তাকওয়ার ঐ স্তর অর্জন কর, যা তাকওয়ার হক।

তাকওয়ার হক কি : এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ, রবী, কতাদাহ্‌ ও হাসান বসরী (রাঃ) বলেন : রসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) থেকেও এমন বর্ণিত হয়েছে যে, তাকওয়ার হক হল, প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, আনুগত্যের বিপরীতে কোন কাজ না করা, আল্লাহ্‌কে সর্বদা স্মরণে রাখা—কখনও বিস্মৃত না হওয়া এবং সর্বদা তাঁর কৃপাতা প্রকাশ করা—অকৃতজ্ঞ না হওয়া।—(বাহরে মুহীত)

কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে— ‘সাধ্যমত আল্লাহ্‌কে ভয় কর। হযরত ইবনে আব্বাস ও তাউস বলেন : এ আয়াতটি বাস্তবে তাকওয়ার হকরই ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে গোনাহ থেকে বেঁচে থাক। এভাবেই তাকওয়ার হক আদায় হবে। অতএব, কোন ব্যক্তি অবৈধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকার জন্যে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা সত্ত্বেও কোন অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়লে, তা তাকওয়ার হকের পরিপন্থী হবে না।

পরকর্তী বাক্যে বলা হয়েছে **وَلَا تَتَّبِعُوا الْاَوَّلَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** এতে বোঝা যায় যে, পূর্ণ ইসলামই প্রকৃতপক্ষে তাকওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তাআলা ও তাঁর রসুল (সঃ) এর পূর্ণ আনুগত্য করা এবং তাঁর অব্যাহতা থেকে বেঁচে থাকা।

মুসলমানদের জাতীয় শক্তির দ্বিতীয় ভিত্তি : **وَالْتَقَوُا يُغَايِلَ** আলোচ্য আয়াতে পারস্পরিক ঐক্যের বিষয়টি অত্যন্ত সাবলীল ও বিজ্ঞানোচিত ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, এতে সর্বপ্রথম মানুষকে পরস্পর ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, ঐক্য ও মৈত্রী যে প্রশংসনীয় ও কাম্য, তাতে ঈশ্বরের জ্ঞাতি, ধর্ম ও দেশ-কাল নির্বিশেষে সব মানুষই একমত। এতে ঈশ্বরের কোনই অবকাশ নেই। সত্তবলতঃ ঈশ্বরের কোণাও এমন কোন ব্যক্তি নেই যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিবাদ-বিসংবাদকে উপকারী ও উত্তম মনে

করে। এ কারণে বিশ্বের সব দল ও গোত্রই জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, ঐক্য উপকারী ও অপরিহার্য হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত হওয়া সত্ত্বেও মানব জাতি বিভিন্ন দল-উপদল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। এরপর দলের ভেতরে উপদল এবং সংগঠনের ভেতরে উপসংগঠন সৃষ্টি করার এমন এক কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে, যাতে সঠিক অর্থে দুই ব্যক্তির ঐক্য কম্প-কাহিনীতে পর্ববসিত হতে চলেছে। সাময়িক স্বার্থের অধীনে কয়েক ব্যক্তি কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়। স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে কিংবা স্বার্থোদ্ধারে অকৃতকার্য হলে শুধু তাদের ঐক্যই বিনষ্ট হয় না ; বরং পরস্পর শত্রুতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

এ কারণে কোরআন পাক শুধু মৈত্রী, একতা, শৃঙ্খলা ও দলবদ্ধ হওয়ার উপদেশই দান করেনি ; বরং তা অর্জন করা ও অটুট রাখার জন্যে একটি ন্যায্যনুগ মূলনীতিও নির্দেশ করেছে— যা স্বীকার করে নিতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। মূলনীতিটি এই যে, কোন মানুষের মস্তিস্কনিঃসৃত অথবা কিছুসংখ্যক লোকের রচিত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের কাছ থেকে এমন আশা করা যে, তারা এতে একতাবদ্ধ হয়ে যাবে—বিরোধ ও ন্যায্যবিচারের পরিপন্থী ও আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়। তবে বিশু-জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা ও পরিকল্পনায় অবশ্যই সব মানুষের একতাবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক ; একথা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিরই নীতিগতভাবে অস্বীকার করতে পারে না। এখন মতভেদের একটি মাত্র ছিদ্রপথ খোলা থাকতে পারে যে, বিশু-জাহানের পালনকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা কি এবং কেনটি? ইহদীরা তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থাকে এবং খ্রীষ্টানরা ইঞ্জিলের ব্যবস্থাকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত অবশ্যপালনীয় ব্যবস্থা বলে দাবী করে। এমনকি, মুশরিকদের বিভিন্ন দলও স্ব স্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত বিধান বলেই দাবী করে থাকে। এ ধরনের মতানৈক্য ও বিভেদকেই কোরআন পাক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। বর্তমানে এ কোরআনী মূলনীতিকে পরিত্যাগ করার কারণেই সমগ্র মুসলিম সমাজ শতষাণ্ডিত হয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ বিভেদ মেটানোর অযোধ্য ব্যবস্থাই **وَأَعِظُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** (আল্লাহ্‌র রজ্জুকে সবাই মিলে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর।) আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। এখানে ‘আল্লাহ্‌র রজ্জু’ বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদের রেওয়াজেতে হযুর (সঃ) বলেন :

كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض

অর্থাৎ, কোরআন হল আল্লাহ্‌ তাআলার রজ্জু যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত প্রলম্বিত।—(ইবনে কাসীর)

যায়েদ ইবনে আরকামের রেওয়াজেতে বলা হয়েছে **القرآن هو حبل الله** অর্থাৎ, ‘আল্লাহ্‌র রজ্জু হচ্ছে কোরআন।’—(ইবনে কাসীর)

আরবী বাচন পদ্ধতিতে ‘হাবল’ এর অর্থ অঙ্গীকারও হয় এবং এমন যে কোন বস্তুকেই বলা হয় যা উপায় বা মাধ্যম হতে পারে। কোরআন অথবা হাদীসকে ‘রজ্জু’ বলার কারণ এই যে, এটা একদিকে আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে বিশ্বাসী মানুষের সম্পর্ক কায়মে করে এবং অন্যদিকে বিশ্বাস স্থাপনকারীদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করে একদলে পরিণত করে।

মোটকথা, কোরআনের এ বাক্যে বিজ্ঞজ্ঞানোচিত মূলনীতিই বিধৃত হয়েছে। কেননা, প্রথমতঃ আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রেরিত জীবন-ব্যবস্থা কোরআনকে কাজে-কর্মে বাস্তবায়িত করা প্রত্যেক মানুষের জন্যে অবশ্য

কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ সব মুসলমান সম্মিলিতভাবে একে বাস্তবায়িত করবে। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হবে। উদাহরণতঃ একদল লোক একটি রজ্জুকে ধরে থাকলে তারা সবাই এক দেহে পরিণত হয়ে যাবে।

এছাড়া আয়াতে একটি সুস্বাদু দৃষ্টান্তও বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমানরা যখন আল্লাহর গ্রন্থকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে, তখন তাদের অবস্থা হবে ঐ ব্যক্তিদের অনুরূপ, যারা কোন উচ্চ স্থানে আরোহণ করার সময় শক্ত রজ্জু ধারণ করে নিশ্চিত পতনের সম্ভাবনা থেকে নিরাপদ থাকে। সুতরাং আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সবাই মিলে কোরআনকে শক্তরূপে ধারণ করে থাকলে শয়তান তার কোন অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হবে না এবং ব্যক্তিগত জীবনের মত মুসলিম জাতির শক্তিও সুদৃঢ় ও অজয়ের হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, কোরআনকে আঁকড়ে থাকলেই ইতস্ততঃ বিকশিত হয়ে থাকে। ইহা এবং মরশোমুখ জাতি নবজীবন লাভ করে। পক্ষান্তরে কোরআন থেকে সরে থাকলে জাতীয় ও দলগত জীবনে যেমন বিপর্যয় নেমে আসে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনও সুখকর হয় না।

ঐক্য একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতেই সম্ভব : ঐক্যের বিশেষ একটি কেন্দ্র বা ভিত্তি থাকা অত্যাবশ্যক। এ সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মত ও পথ রয়েছে। কোথাও বংশগত সম্পর্কে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে। উদাহরণতঃ আরব গোত্রসমূহের মধ্যে কোরায়শকে এক জাতি ও বনু-তামিমকে অন্য জাতি মনে করা হতো। কোথাও বর্ণগত পার্থক্যই ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ফলে কৃষ্ণাঙ্গদের এক জাতি এবং শ্বেতাঙ্গদের অন্য জাতি মনে করা হয়েছে। কোথাও দেশগত ও ভাষাগত একত্বকে কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হয়েছে। ফলে হিন্দীরা একজাতি ও আরবীরা অন্য জাতি হয়ে গেছে। আবার কোথাও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কিছু নিয়ম-প্রথাকে ঐক্যের কেন্দ্র বানানো হয়েছে। যারা এসব নিয়ম-প্রথা পালন করে না, তারা ভিন্নজাতি। উদাহরণতঃ ভারতের হিন্দু ও আর্থসমাজের কথা বলা যায়।

কোরআন পাক এগুলোকে বাদ দিয়ে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু ‘হাবলুল্লাহ’ অর্থাৎ, আল্লাহ প্রেরিত মজবুত জীবন-ব্যবস্থাকে সাব্যস্ত করেছে এবং দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীরা সবাই মিলে এক জাতি—যারা আল্লাহর রজ্জুর সাথে জড়িত এবং কাকেররা ভিন্ন জাতি—যারা এ শক্ত রজ্জুর সাথে জড়িত নয়।

মেটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদিগকে দু’টি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলার প্রেরিত জীবন-ব্যবস্থার অনুসারী হয়ে যাও। দ্বিতীয়তঃ একে সবাই মিলে শক্তভাবে ধারণ কর, যাতে মুসলিম সমাজদায়ের সুশৃঙ্খল ঐক্যবন্ধন স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে একবার তা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্যের ধনাত্মক দিক কৃটিয়ে তেলার পর বলা হয়েছে: **وَأَقْبِرُوا** পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করো না। কোরআন পাকের বিজ্ঞজ্ঞানোচিত বর্ণনানুসারে এই যে, যেখানে ধনাত্মক দিক কৃটিয়ে তেলা হয়, সেখানেই ঋণাত্মক দিক উল্লেখ করে বিপরীত রাস্তায় অগ্রসর হওয়া থেকে বারণ করা হয়।

এছাড়া কোরআন বিভিন্ন পয়গম্বরের উম্মতদের ঘটনাবলী বর্ণনা করে দেখিয়েছে যে, তারা কিভাবে পারস্পরিক মতবিরোধ ও অনৈক্যের কারণে জীবনের উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক লাঞ্ছনায় পতিত হয়েছে।

হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে তিনটি বিষয় পছন্দ করেছেন এক তিনটি বিষয় অপছন্দ করেছেন। পছন্দনীয় তিনটি বিষয় হলো : (এক)—তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে অঙ্গীদার করবে না। (দুই)—আল্লাহর সন্তান কোরআনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করবে এবং অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকবে। (তিন)—শাসনকর্তাদের প্রতি শুভেচ্ছার মনোভাব পোষণ করবে।

অপছন্দনীয় বিষয়গুলো এই : (এক)—অনাবশ্যক কথাবার্তা ও বিতর্ক অনুষ্ঠান। (দুই)—বিনা প্রয়োজনে কারও কাছে তিক্কা চাওয়া এক (তিন)—সম্পদ হিন্ট করা।—(ইবনে কাসীর)

এখন প্রশ্ন এই যে, প্রত্যেক মতভেদই কি নির্দনীয় এবং মতভেদের কোন দিকই কি অনির্দনীয় নেই? উত্তর এই যে, প্রত্যেক মতভেদই নির্দনীয় নয়। বরং যে মতভেদে প্রকৃতির তাড়নার ভিত্তিতে কোরআন থেকে দূরে সরে চিন্তা করা হয়, তাই নির্দনীয়। কিন্তু যদি কোরআনের নির্ধারিত সীমার ভেতরে থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যাখ্যা বীক্য করে নিজের যোগ্যতা ও মেবার আলোকে শাখা-প্রশাখায় মতভেদ করা হয়, তবে সে মতভেদ অস্বাভাবিক নয়, ইসলাম তা নিষেধও করে না। সাহাবায়ে কেরাম, তাবয়ীন এবং ফেকাহুদি আলোচনামণ্ডলের মতকর মতভেদ ছিল এমনি ধরনের। এমন মতভেদকে রহমত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অবশ্য যদি এসব শাখা বিষয়কই দ্বীনের মূল সাব্যস্ত করা হয়, তবে তাও নির্দনীয়।

পারস্পরিক ঐক্যের উত্তম দিক ব্যাখ্যা করার পর আয়াতে ঐ অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে ইসলাম পূর্বকালে আরবরা নিপু ছিল। গোত্রসমূহের পারস্পরিক শত্রুতা, কথায় কথায় অহরহ মুখারাবী ইত্যাদির কারণে গোটা আরব জাতি নিচিহ্ন হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। একমাত্র ইসলামাত্রণ আল্লাহর বিশেষ রহমতই তাদেরকে এহেন অশান্তির আগুন থেকে উদ্ধার করেছে।

মুসলমানদের ঐক্য আল্লাহর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল : কোরআন পাকের এ উক্তি থেকে আরও একটি সত্য প্রতিভাত হয়েছে যে, অস্তরের মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা। সঞ্জীতি বা সৃষ্টি করা তাঁরই কাজ। কোন দলের অন্তরে পারস্পরিক ভালবাসা ও সঞ্জীতি সৃষ্টি কর আল্লাহ তাআলারই অনুগ্রহের দান। আর একথা সবারই জানা যে, আল্লাহর অনুগ্রহ একমাত্র তাঁর আনুগত্যের দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। অবশ্যতা ও পোনাহ দুরা এ অনুগ্রহ অর্জিত হওয়া সুদূর পরাহত।

এর ফলশ্রুতি এই যে, মুসলমানরা যদি শক্তিশালী সংগঠন ও এক কামনা করে, তবে এর একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যকে অঙ্গের ভূষণ করে নেয়া। এদিকে ইশারা করার জন্যেই আয়াতের শেবাংশে বলা হয়েছে :

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الْكُرَىٰ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ অর্থাৎ, এমনভাবে

আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে সত্যাসত্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন—যাতে তোমরা বিতর্ক পথে থাক।

মুসলমানদের জাতীয় ও সমষ্টিগত কল্যাণ দু’টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল :

প্রথমে ষোদাভীতি ও আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার স্বাক্ষর আত্মসংশোধন এবং দ্বিতীয়তঃ প্রচার বা তকলীমের মাধ্যমে অপরের সংশোধন। আলোচ্য আয়াতে ১০৪ নং দ্বিতীয় নির্দেশটি বর্ণিত হয়েছে।

দু'টি আয়াতের সারমর্ম এই যে, নিজেও স্বীয় কাজকর্ম ও চরিত্র আল্লাহ প্রেরিত আইন অনুযায়ী সংশোধন কর এবং অন্যান্য ভাইয়ের কাজকর্ম সংশোধন করারও চিন্তা কর। এ বিষয়বস্তুটিই সূরা 'ওয়াল আসরে' বর্ণনা করা হয়েছে:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالنَّحْيِ وَتَوَّصُوا
بِالصَّبْرِ

অর্থাৎ, পরকালের ক্ষতি থেকে তারা মুক্ত, যারা নিজেরাও ইমান ও সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরকেও বিশুদ্ধ বিশ্রাস ও সংকর্মে নির্দেশ দেয়।

জাতীয় ও সমষ্টিগত জীবনের জন্যে একটি শক্তিশালী ঐক্য-সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য। পূর্ববর্তী আয়াতে 'আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর' বলে তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এমনিভাবে এ ঐক্য সম্পর্ককে স্থিতিশীল রাখার জন্যে দ্বিতীয় কাজটিও অপরিহার্য। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ, অপরাধের ভাইদেরকেও কোরআন ও সূন্যাহর নির্দেশ অনুযায়ী ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ করাকে প্রত্যেকেই আপন কর্তব্য মনে করবে যাতে আল্লাহর রজ্জু তার হাত থেকে ফসকে না যায়। ওস্তাদ মরহুম শায়খুল - ইসলাম মাওলানা শাকীর আহমদ ওসমানী বলতেন : আল্লাহর এ রজ্জু ছিড়ে যেতে পারে না। অবশ্য হাত থেকে ফসকে যেতে পারে। তাই এ রজ্জুটি ফসকে যাবার আশঙ্কার পরিত্রাণিত করে আন পাক নির্দেশ জারি করেছে যে, প্রত্যেক মুসলমান যেমন নিজে সংকর্ম করা ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকাকে জরুরী মনে করবে, তেমনি অপরকেও সংকাজে আদেশ ও অসংকাজে নিষেধ করাকে একটি কর্তব্য বলে মনে করবে।

'সংকাজে আদেশ দান ও অসংকাজে নিষেধ' করণের কর্তব্য প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তখনই আরোপিত হবে, যখন চোখের সামনে কাউকে অসংকাজ করতে দেখবে। উদাহরণতঃ কোন মুসলমানকে মদ্যপান করতে অথবা চুরি করতে কিংবা ভিন্ন নারীর সাথে অশালীন বোলামেশা করতে দেখলে সাধ্যানুযায়ী তা প্রতিরোধ করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু চোখের সামনে এসব কাজ না পড়লে, তা ওয়াজিব নয়; বরং এরূপ কাজ বন্ধ করার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের। সরকার অপরাধীর অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করে তাকে শাস্তি দেবে।

'সংকাজে আদেশ ও অসংকাজে নিষেধ' বাক্যের দ্বারা এরূপ বুঝার সম্ভাবনা ছিল যে, এ প্রয়োজন হয়তো বিশেষ বিশেষ স্থানেই হবে। অর্থাৎ, যখন চোখের সামনে অসংকাজ হতে দেখা যায়। কিন্তু **يُنَادِي إِلَى النَّحْيِ** বলে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়ের কাজ হবে কল্যাণের প্রতি আহবান করা; তখন অসংকাজ হতে দেখা যাক, বা না যাক অথবা কোন ক্ষয় আদায় করার সময় হোক বা না হোক। উদাহরণতঃ সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে পড়া পর্যন্ত মাঝের সময় নয়। কিন্তু এ সম্প্রদায় এ সময়ও এই বলে নামায পড়ার উপদেশ দেবে যে, সময় হলে নামায আদায় করা জরুরী। অথবা রোযার সময় আসেনি। রমযান মাস এখনও দূরে। কিন্তু এ সম্প্রদায় স্বীয় কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন হবে না; বরং পূর্ব থেকেই মানুষকে বলতে থাকবে যে, রমযান মাস এলে রোযা রাখা ফরয। মোটকথা, এ সম্প্রদায়ের কাজ হবে কল্যাণের প্রতি আহবান করতে থাকা।

কল্যাণের প্রতি আহবানেরও দু'টি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায়

অমুসলমানদেরকে 'খায়র' তথা ইসলামের প্রতি আহবান করা। প্রত্যেক মুসলমান সাধারণভাবে এবং উল্লেখিত সম্প্রদায়টি বিশেষভাবে জগতের সব জাতিকে ইসলামের প্রতি আহবান করবে মুখেও এবং কর্মের মাধ্যমেও। সেমতে জেহাদের আয়াতে সাদা মুসলমানের সংজ্ঞা এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّ لَهُمُ الرِّزْقُ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَمْرُوا بِالنَّعْرِفِ وَهُمْ عَنِ الْبُكَرِ

অর্থাৎ, তারা সাদা মুসলমান, যাদের আমি পৃথিবীতে শক্তি তথা

রাজত্ব দান করলে তারা প্রথমেই পৃথিবীতে আনুগত্যের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে— যার একটি প্রতীক হচ্ছে নামায। তারা নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তথা যাকাতের মূলনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে এবং 'সংকাজে আদেশ ও অসংকাজে নিষেধ' করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আজকাল মুসলিম সম্প্রদায় যদি কল্যাণের প্রতি আহবান করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে, তবে বিজ্ঞাতির অনুকরণের ফলে আমাদের মধ্যে যেসব ব্যক্তি সংক্রমিত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে যাবে। কারণ, মুসলিম জাতি এ মহান লক্ষ্যে একত্রিত হয়ে গেলে তাদের অনৈক্য দূর হবে। তারা যখন বুঝতে পারবে যে, জ্ঞান-গরিমা ও কর্মের দিক দিয়ে বিশুর অন্যান্য জাতির উপর আমাদের প্রাধান্য অর্জন করতে হবে এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং আল্লাহর আনুগত্যমুখী সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষা দানের দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে, তখন সমগ্র জাতি একটি মহান লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়ে যাবে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামের সাফল্যের চাবিকাঠি এর মধ্যেই নিহিত ছিল। হাদীসে আছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) **وَلَنْ يَكُنَّ رِزْقُكَ** আয়াত তিলাওয়াত করে বলেছিলেন : এ সম্প্রদায়টি হচ্ছে বিশেষভাবে সাহাবায়ে-কেরামের দল।— (হবনে-জারীর) কেননা, তাঁদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে এ কাজের জন্যে দায়ী মনে করতেন।

দ্বিতীয় পর্যায়টি হলো কল্যাণের প্রতি স্বয়ং মুসলমানদেরকে আহবান করা। অর্থাৎ, সব মুসলমান (সাধারণভাবে) এবং উল্লেখিত সম্প্রদায় (বিশেষভাবে) মুসলমানদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাবে। এ আহবানও দু'প্রকার। একটি ব্যাপক আহবান, অর্থাৎ, সব মুসলমানদেরকে শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও ইসলামী চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা এবং দ্বিতীয়টি বিশেষ আহবান। অর্থাৎ, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোরআন ও সূন্যাহর শিক্ষায় বিশেষজ্ঞ তৈরী করা।

পরবর্তী আয়াতে এ আহবানকারী সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এরূপ বলা হয়েছে : **وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ** অর্থাৎ, তারা সংকাজে আদেশ করে ও অসংকাজে নিষেধ করে।

ইসলাম যেসব সংকর্ম ও পুণ্যের নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে যেসব সংকর্মের প্রচলন করেছেন, তা সবই আয়াতের উল্লেখিত 'মারুফ' তথা সং কর্মের অন্তর্ভুক্ত। 'মারুফ' শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিচিত। এসব সংকর্মও সাধারণে পরিচিত। তাই এগুলোকে 'মারুফ' বলা হয়।

এমনিভাবে রসুলুল্লাহ (সাঃ) যেসব সংকর্মরূপী কাজকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন বলে খ্যাত, তা সবই আয়াতে উল্লেখিত 'মুনকার'—এর

অন্তর্ভুক্ত। এ স্থলে ‘ওয়াজেবাত’ (জরুরী করণীয় কাজ) ও ‘মআসী’ (গোনাহর কাজ)–এর পরিবর্তে ‘মারুফ’ ও ‘মুনকার’ বলার রহস্য সম্ভবতঃ এই যে, নিষেধ ও বাধাদানের নির্দেশটি শুধু সবার কাছে পরিচিত ও সর্বসম্মত মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারেই প্রযোজ্য হবে। ইজতেহাদী মাসআলায় শরীয়তের নীতি অনুসারেই বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত থাকতে পারে। এসব মাসআলায় নিষেধ ও বাধাদান সঙ্গত নয়। পরিতাপের বিষয়, এহেন বিজ্ঞানোচিত শিক্ষার প্রতি ইদানিং উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। আজকাল ইজতেহাদী মাসআলাকে বিতর্কের ক্ষেত্র হিসাবে গণ্য করে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করা হয় এবং একেই সর্ববৃহৎ পুণ্যের কাজ বলে সাব্যস্ত করা হয়। অথচ এর বিপরীতে সর্বসম্মত গোনাহর কাজে বাধা দানের প্রতি তোমন মনোনিবেশ করা হয় না। আয়াতের শেষাংশে এ আহবানকারী দলের প্রশংসনীয় পরিণামের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে : **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ** অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে তারা ই হলো সফলকাম। ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সৌভাগ্য তাদেরই প্রাপ্য।

আয়াতে বর্ণিত সম্প্রদায়ের সর্বপ্রথম প্রতীক ছিলেন সাহাবায়ে-কেরামের দল। তাঁরা কল্যাণের প্রতি আহবান এবং সংকাজে আদেশ ও অসংকাজে নিষেধ এর মহান লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে অল্পদিনের মধ্যে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। রোম ও পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্য পদানত করেন। বিশুকে নৈতিকতা ও পবিত্রতার শিক্ষা দেন এবং পুণ্য ও খোদাভীতির প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন।

কল্যাণের প্রতি আহবানকারী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয়তা ও তাদের গুণাবলী বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদের পারস্পরিক মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন :

**وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ**

অর্থাৎ— তাদের মত হয়ো না, যারা প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি আসার পর পরস্পর মতবিরোধ করেছে।

উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মত হয়ো না। তারা আল্লাহ তাআলার পরিষ্কার নির্দেশ পাওয়ার পর শুধু কুসংস্কার ও কামনা-বাসনার অনুসরণ করে ধর্মের মূলনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং পারস্পরিক দুন্দ-কলহের মাধ্যমে আঘাত পতিত হয়েছে। এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** আয়াতের পরিশিষ্ট। প্রথম আয়াতে একেবারে কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহর রজ্জুকে শক্তহাতে ধারণ করার প্রতি আহবান করা হয়েছে এবং ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, একাবদ্ধতা সমগ্র জাতিতে একক সত্তায় পরিণত করে দেয়। এরপর কল্যাণের প্রতি আহবান এবং ‘সংকাজের আদেশ ও অসংকাজে নিষেধ’ দ্বারা এ একাবদ্ধতাকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এরপর **وَلَا تَكُونُوا** এবং **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ** আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের কারণে পূর্ববর্তী জাতিসমূহ ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা তাদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং নিজেদের মধ্যে এ ব্যাধি অনুপ্রবেশ করতে দিও না।

আয়াতে যে বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা সে

সমস্ত মতবিরোধ যা দ্বীনের মূলনীতিতে করা হয় অথবা ষাফরতায় বশবর্তী হয়ে শাখা-প্রশাখায় করা হয়। আয়াতে ‘উচ্ছল নির্দেশালী আসার পর’ বাক্যটিই এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা, দ্বীনের মূলনীতি উচ্ছল ও সুস্পষ্ট হয়ে থাকে। কিছু শাখা প্রশাখাও এমন সুস্পষ্ট হয়ে থাকে, যাতে ষাফরতাতা না থাকলে মতবিরোধের অবকাশ নাই। কিন্তু যেসব শাখা-প্রশাখা অস্পষ্ট, সে সম্পর্কে কোন আয়াত ও হাদীস না থাকার কারণে অথবা আয়াতে ও হাদীসে বাহ্যিক বৈপরীত্য থাকার কারণে যদি ইজতেহাদে মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আয়াতে উল্লেখিত নিদার আগুতায় পড়বে না। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি সহীহ হাদীসে এ ধরনের মতবিরোধের সমর্থন এবং অনুমতি পাওয়া যায়। হাদীসটি এই : যদি কেউ ইজতেহাদ করে এবং সঠিক নির্দেশ প্রকাশ করে, তবে সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। আর যদি ইজতেহাদে ভুল করে তবুও একটি সওয়াব পাবে।

এতে বুঝা যায় যে, ইজতেহাদ সম্পর্কিত মতবিরোধ ভুল হলেও বন্ধ এক সওয়াব পাওয়া যায়, তখন তা নিন্দনীয় হতে পারে না। সুতরাং সাহাবায়ে-কেরাম ও মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে যেসব ইজতেহাদী মতবিরোধ হয়েছে, সে সবগুলোই কোনো না কোনো পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতের সাথে সম্পর্কহীন। হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ও হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয বলেন : সাহাবায়ে-কেরামের মতবিরোধ মুসলমানদের জন্যে রহমত ও মুক্তির কারণ স্বরূপ।—(রুহুল-মআনী)

ইজতেহাদী মতবিরোধে কোন পক্ষের নিন্দাবাদ জার্যের নয় ! এখান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ফুটে উঠেছে। তা এই যে, শরীয়ত সম্মত ইজতেহাদী মতবিরোধে যে ইমাম যে পক্ষ অবলম্বন করেন, তন্মধ্যে আল্লাহ তাআলার কাছে এক পক্ষ ভুল ও অপরপক্ষ সঠিক হলেও তা মীমাংসা করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তিনি হাযরের ময়দানে সঠিক ইজতেহাদকারী আলেমকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করেন এবং যার ইজতেহাদ ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে, তাকে একটি সওয়াব দান করেন। ইজতেহাদী মতবিরোধে কারণ একথা বলার অধিকার নাই যে, নিকিতরূপে এ পক্ষ সঠিক এবং ও পক্ষ ভ্রান্ত। অবশ্য কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় জ্ঞানবুদ্ধির আলোতে এক পক্ষকে কোরআন ও সুন্নাহর অবিক নিকটবর্তী মনে করে, তবে সে এরূপ বলতে পারে যে, আমার মতে এ পক্ষটি সঠিক; কিন্তু ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে এবং এ পক্ষটি ভ্রান্ত; কিন্তু সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। এ নীতিকথাটি ইমাম ও ফেকাহবিদগণের কাছে স্বীকৃত। এতে আরও বুঝা যায় যে, ইজতেহাদী মতবিরোধে কোন পক্ষ এরূপ অসৎ হয় না যে, ‘সংকাজে আদেশ ও অসংকাজে নিষেধ’–এর নীতি অনুযায়ী তাকে নিন্দা করা যেতে পারে। সুতরাং যা অসৎ নয়, তাকে নিন্দা করা থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক। আজকাল অনেক আলেমকেও এ ব্যাপারে গাফেল দেখা যায়। তাঁরা বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণকারীদের গালি-গালাজ করতঃ কুণ্ঠিত হন না। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে যত্রতত্র দুন্দ-কলহ, বিচ্ছিন্নতা ও মতানৈক্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

ইজতেহাদের নীতিমালা যথাযথভাবে গালন করার পরও যদি ইজতেহাদী মতবিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আলোচ্য **وَلَا تَكُونُوا** আয়াতের পরিপন্থী ও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু আজকাল মুসলমানদের মধ্যে কি হচ্ছে! আজকাল এতদসম্পর্কিত আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কেই দ্বীনের ভিত্তি মনে করা হচ্ছে এবং এ নিয়ে পারস্পরিক গালি-গালাজ, লড়াই-কলহ

এমনকি মারামারি পর্যন্ত সংঘটিত হচ্ছে। এ সমস্ত আচরণ অবশ্যই আলোচ্য আয়াতের সুস্পষ্ট বিরোধী, নিন্দনীয় এবং সাহায্যে-কেরাম ও জায়েগীশের রীতির পরিপন্থী। পূর্ববর্তী মনীষীগণের মধ্যে ইজতেহাদী মতবিরোধ নিয়ে বিপক্ষ দলের সাথে এরূপ ব্যবহারের কথা কখনও শোনা যায়নি।

মুখমগুল শ্রেতবর্ণ ও কক্ষবর্ণ হওয়ার অর্থ : মুখমগুল শ্রেতবর্ণ ও কক্ষবর্ণ হওয়ার কথা কোরআন মজীদে অনেক জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে।

এসব আয়াতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। নিশ্চিত তফসীরবিদগণের মতে শুভ্রতা দ্বারা ঈমানের নূরের শুভ্রতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মু' মিনদের মুখমগুল ঈমানের নূরে উজ্জ্বলিত, আনন্দাতিশয্যে উৎফুল্ল ও হাস্যোচ্ছল হবে। পক্ষান্তরে কক্ষবর্ণ দ্বারা কুফরের কালোবর্ণ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কাফেরদের মুখমগুল কুফরের পঙ্কিলতায় আচ্ছন্ন হবে। তদুপরি পাপাচারের অন্ধকারে আরও অন্ধকারময় হয়ে যাবে।

উজ্জ্বল মুখ ও কাল মুখ কারা : এরা কারা— এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন : আহলে সুনত সম্প্রদায়ের মুখমগুল শুভ্র হবে এবং বিদআতীদের মুখমগুল কালো হবে। হযরত আতা বলেন : মুহাজির ও আনসারগণের মুখমগুল সাদা হবে এবং বনী-কুরায়যা ও বনী নুযায়রের মুখমগুল কালো হবে।—(কুরতুবী)

তিরমিযী শরীফে হযরত আবু উমামাহ বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে : খারেজী সম্প্রদায়ের মুখমগুল কালো হবে। আর তারা যাদের হত্যা করবে, তাদের মুখমগুল সাদা হবে।

আবু উমামাকে জিজ্ঞেস করা হলো : আপনি এ হাদীস রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি অঙ্গুলি গুণে উত্তর দিলেন : হীসটি যদি অস্তিত্ব : সাত বার তাঁর কাছ থেকে না শুনতাম, তবে বর্ণনাই করতাম না।—(তিরমিযী)

হযরত ইকরিমাহ বলেন : আহলে কিতাবগণের এক অংশের মুখমগুল কালো হবে অর্থাৎ, যারা হযুর (সঃ)—এর নবুওয়ত লাভের পূর্বে তিনি নবী হবেন বলে বিশ্বাস করতো কিন্তু নবুওয়ত-প্রাপ্তির পর তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করার পরিবর্তে তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করে।—(কুরতুবী)

কতিপয় প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য : আলোচ্য আয়াত প্রসঙ্গে কতিপয় প্রয়োজনীয় বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। (এক)—আল্লাহ তাআলা **يَوْمَ نَبْيُشُّ وَيُجِوُّ وَنُشَوُّ وَنُجِوُّ** বাক্যের প্রথমে উজ্জ্বলতার উল্লেখ করে পরে মলিন হওয়ার কথা বলেছেন কিন্তু **أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ هُمْ**

বাক্যের বর্ণনাজ্ঞি পাশ্চ দিয়েছেন। অথচ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্যে এখানেও শুভ্রতাকে আগে উল্লেখ করাই উচিত ছিল। আয়াতের ধারাবাহিকতা পাশ্চ দিয়ে আল্লাহ তাআলা সম্ভবতঃ সৃষ্টির লক্ষ্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। সৃষ্টির লক্ষ্য হচ্ছে সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুকম্পা করা, শান্তি দেয়া নয়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম শুভ্র মুখমগুলের কথা বর্ণনা করেছেন; কারণ এরাই আল্লাহর অনুকম্পা ও সওয়াব লাভের যোগ্য। অতঃপর মলিন মুখমগুল উল্লেখ করেছেন। কারণ, এরা আল্লাহর শান্তির যোগ্য। এরপর আয়াতের শেষাংশে **فِي رَحْمَةِ اللَّهِ** বলে আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুকম্পাও প্রকাশ করেছেন। এভাবে আয়াতের শুরুতে ও শেষাংশে উভয় স্থানেই অনুকম্পা বর্ণনা করেছেন এবং মাঝখানে মলিন মুখমগুলের কথা উল্লেখ করেছেন। এভাবে অসীম অনুকম্পার প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে যে, মানবজাতিকে শান্তিদানের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আল্লাহ তাআলার অনুকম্পা লাভে ধন্য হওয়ার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(দুই)—শুভ্র মুখমগুলবিশিষ্টদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহর অনুকম্পার মধ্যে অবস্থান করবে। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন : এখানে আল্লাহর অনুকম্পা বলে জন্মাত বোঝানো হয়েছে। তবে জন্মাতকে অনুকম্পা বলার রহস্য এই যে, মানুষ যত এবাদতই করুক না কেন, আল্লাহর অনুকম্পা ব্যতীত জন্মাতে যেতে পারবে না। কারণ, এবাদত করা মানুষের নিজস্ব পরাকাষ্ঠী নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত সামর্থ্যের বলেই মানুষ এবাদত করতে পারে। সুতরাং ইবাদত করলেই জন্মাতে প্রবেশ অপরিহার্য হয়ে যায় না। বরং আল্লাহর অনুকম্পার দ্বারাই জন্মাতে প্রবেশ করা সম্ভব।—(তফসীরে-কবীর)

(তিন)—আল্লাহ তাআলা **فِي رَحْمَةِ اللَّهِ** বাক্যাংশের পর পর **مِنْهُمْ خَلِدُونَ** বলে একথা ব্যক্ত করেছেন যে, বিশ্রাসীরা আল্লাহ তাআলার যে অনুকম্পায় অবস্থান করবে, তা তাদের জন্যে সাময়িক হবে না বরং সর্বকালীন হবে। এ নেয়ামত কখনও বিলুপ্ত অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত করা হবে না। এর বিপরীতে মলিন মুখমগুলবিশিষ্টদের জন্যে একথা বলা হয়নি যে, তারা তাদের সে অবস্থায় চিরকালই থাকবে।

মানুষ নিজের গোনাহর শাস্তিই লাভ করে : **فَأَنذَرْتُ الْعَذَابَ بِنَا** আয়াতে বলা হয়েছে যে, আদ্যকার শাস্তি আমার পক্ষ থেকে নয়; বরং তোমাদের উপার্জিত। তোমরা পৃথিবীতে অবস্থানকালে এসব উপার্জন করেছিলে। কেননা জন্মাত ও দোষখের বিপদও নেয়ামত প্রকৃতপক্ষে তোমাদের কর্মেরই পরিবর্তিত চিত্র। এ বিষয়টি বোঝানোর জন্যেই আয়াতের শেষাংশে বলেছেন : **وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمَ الْمُتَكِبِينَ**

অর্থাৎ,—আল্লাহ তাআলা বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করার কোন ইচ্ছা করেন না। শাস্তি ও পুরস্কার যা কিছু দেয়া হয়, সুবিচার ও অনুকম্পার দাবী হিসেবেই দেয়া হয়।

আনুষ্ঠানিক জাতব্য বিষয়

মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তার কয়েকটি কারণ : মুসলিম সম্প্রদায়কে 'শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়' বলে ঘোষণা করার কারণসমূহ কোরআন পাক একাধিক আয়াতে বর্ণনা করেছে। এতদসম্পর্কিত প্রধান আয়াত সূরা বাকারায় উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ,

আয়াতটি। সেখানেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ মধ্যপন্থী হওয়া এবং জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের মধ্যপন্থার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। —(মা' আরেফুল কোরআন, ১ম খণ্ড)

আলোচ্য ১১০ নং আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা মানব জাতির উপকারার্থ সমুখিত হয়েছে। আর তাদের প্রধান উপকার এই যে, মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক সংশোধনের চেষ্টাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের তুলনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মাধ্যমে 'সৎকাজে আদেশ দান এবং অসৎকাজে নিষেধ' করার দায়িত্ব অধিকতর পূর্ণত্ব লাভ করেছে। সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, এ কর্তব্যটি পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের দায়িত্বেও ন্যস্ত ছিল, কিন্তু বিগত অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে জিহাদের নির্দেশ ছিল না। তাই তারা শুধু অন্তর ও মুখের দ্বারাই 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের কর্তব্য পালন করতে পারতো। মুসলিম সম্প্রদায় বাহুবলেও এ কর্তব্য পালন করতে পারে। সব রকমের জেহাদের এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির মাধ্যমে ইসলামী আইন কার্যকরী করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ব্যাপক ঔদাসীনের দরুন ধর্মের অন্যান্য বিশেষ কার্যাবলীর ন্যায় সৎকাজে আদেশ দান ও অসৎকাজে নিষেধ করার কর্তব্যটিও পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকবে—যারা 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ'—এর কর্তব্য পূরোপূরি পালন করে যাবে।

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ব্যাক্যাংশে মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পূর্ববর্তী সব পয়গাম্বর ও উম্মতেরও অভিনু গুণ। একে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে কিরাপে আখ্যা দেয়া হলো? উত্তর এই যে, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায় যে স্তরে উন্নীত হয়েছে, তা পূর্ববর্তী উম্মতগণের তুলনায় বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী।

আয়াতের শেষাংশে আহলে—কিতাবগণের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের কেউ কেউ মুমিন। বলা বাহুল্য, এরা হলেন হযরত আবুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ। এরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

কোরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। আয়াতে লক্ষ্য সাহায্যে—কেরামের সাথে নবুওয়তের যমানায় কোন ক্ষেত্রে মোকাবিলায় বিরুদ্ধবাদিরা জয়লাভ করতে পারেনি। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদী গোত্রগুলো সাহায্যে—কেরামের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিল। বিশেষ করে তারা পরিণামে মুসলমানদের হাতে লাজ্জিত ও অপমানিত হয়েছে। কতক নিহত হয়েছে, কতক নির্বাসিত হয়েছে এবং কিছু সংখ্যকের উপর জিমিয়া করা ধার্য করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়েরই পরিষ্টি বর্ণনা করা হয়েছে।

الْعِزْر

৭৫

لن تتأولوا

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ
الْاُمُوْرُ ۚ لَكُمْ خِيَرَةٌ اَمَّا الْاُخْرٰى فَلِلّٰهِ تَامُرُوْنَ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَكَوْنُوْا
اَمَنٌ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالَّذِيْنَ
الْفٰسِقُوْنَ ۚ لَنْ يُّظٰوْرُوْكُمْ اِلَّا اَذٰى وَاِنْ يُّغٰثِبُوْكُمْ فَوُوْكُمْ
اِلَّا ذٰبًا نَّصْرًا لَّا يَنْصُرُوْنَ ۝ صٰرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّيٰلَةُ اٰمِنٌ مَّا
تُفْعَلُوْا الْاِخْبٰىلُ مِنَ اللّٰهِ وَحٰبِلٌ مِنَ النَّاسِ وَبِاَوْفٰىضٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَصٰرَبَتْ عَلَيْهِمُ السَّنَكَةُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا
يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَآءَ يَغْيٰرُحَقِّ ذٰلِكَ
بِمَا عَصَوْا وَاَكَاوٰا يُعْتَدُوْنَ ۝ لَّيْسُوْا سَوَآءٌ مِّنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ اَمَّةٌ قٰلِمَةً يَتَشَلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِنَّا الْبَيْلُ وَ
هُمْ يَسْجُدُوْنَ ۝ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ
يَامُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ
فِي الْخَيْرٰتِ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ وَمَا يَفْعَلُوْا
مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ وَاَللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُفْعِلِيْنَ ۝

(১০৯) আর যা কিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে সে সবই আল্লাহর এবং আল্লাহর প্রতিই সবকিছু প্রত্যাবর্তনশীল। (১১০) তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সংকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর আহলে—কিতাবরা যদি ঈমান আনতো, তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলকর হতো। তাদের মধ্যে কিছু তো রয়েছে ঈমানদার আর অধিকাংশই হলো পাপাচারী। (১১১) যৎসামান্য কষ্ট দেয়া ছাড়া তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তারা পশ্চাদপসরণ করবে। অতঃপর তাদের সাহায্য করা হবে না। (১১২) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি কিংবা মানুষের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত ওরা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর ওরা উপার্জন করেছে আল্লাহর গণ্য। ওদের উপর চাপানো হয়েছে গলগ্রহতা। তা এজন্যে যে, ওরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অবনবরত অস্বীকার করেছে এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তার কারণ, ওরা নাফরমানী করেছে এবং সীমা লঙ্ঘন করেছে। (১১৩) তারা সবাই সমান নয়। আহলে—কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা অবিচলভাবে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং রাতের গভীরে তারা সেজদা করে। (১১৪) তারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং কল্যাণকর বিষয়ের নির্দেশ দেয়; অকল্যাণ থেকে বারণ করে এবং সংকাজের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে। আর এরাই হল সৎকর্মশীল। (১১৫) তারা যেসব সংকাজ করবে, কোন অবস্থাতেই সেগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হবে না। আর আল্লাহ পরহেযগারদের বিষয়ে অবগত।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَنْ تَغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ
مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠﴾
مَكَّنَّ مَا يَفْقَهُونَ فِي هَذِهِ الْحَبْرَةِ الدُّنْيَا كَيْتَلُ رِيحٍ فِيهَا
وَصِرَاصَاتٍ حَرَّتْ قَوْمَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكْتَهُ وَمَا
ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَتَّخِذُوا بِلِقَائِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذُرِّيَّةً وَلَا تُلَاقُوا خِيَالَائِهِمْ
عَيْنُهُمْ قَدْ بَاتَ الْبَغْضَاءُ مِثْلَ قَوْمِهِمْ وَأَخْفَى صُدُورُهُمْ
أَكْبَرُ قَدْ يَكْفِيكُمْ الْآيَاتُ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾ هَلَا تَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ
يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَهُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا الْقَوْمُ
قَالُوا الْمَنَاءُ وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَيْتَكُمْ الْأَتَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ
فُلْ مُؤْتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾
تَسْمِعُكُمْ حَسَنَتَهُ سَوَاهُمْ وَإِنْ تُصِيبُكُمْ سَيِّئَتُهُ يُمْرَحُوا
بِهَا وَإِنْ تُصِيبُوا وَتَقْتُلُوا الْإِصْرُ كُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ
اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٤﴾ وَإِذَا عَدَاوَتٌ مِّنْ أَهْلِكَ
تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥﴾

(১১৬) নিশ্চয় যারা কাফের হয়, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর সামনে কখনও কোন কাজে আসবে না। আর তারাই হলো দোষখের আগুনের অধিবাসী— তারা সে আগুনে চিরকাল থাকবে। (১১৭) এ দুনিয়ার জীবনে যাকিছু ব্যয় করা হয়, তার তুলনা হলো ঝড়ো হাওয়ায় মতো, যাতে রয়েছে তুষারের শৈত্য, যা সে জ্বাতির শস্যক্ষেত্রে গিয়ে লেগেছে যারা নিজের জন্য মন্দ করেছে। অতঃপর সেগুলোকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের উপর কোন অন্যায করেননি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজদের উপর অত্যাচার করছিল। (১১৮) হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রটি করে না— তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাশ্রুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরায়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নির্দশন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করত সমর্থ হও। (১১৯) দেখ। তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে — ‘আমরা ঈমান এনেছি’! পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ অঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আল্লাহ মনের কথা ভালই জানেন। (১২০) তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়; তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাহলে তাতে তারা আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই — তারা যা কিছু করে, সে সমস্তই আল্লাহর আয়ত্তে রয়েছে। (১২১) আর আপনি যখন পরিকল্পনাদের কাছ থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন, আর আল্লাহ সব বিষয়েই শোনে এবং জানেন।

ইহুদীদের প্রতি গষব ও লাঞ্ছনার অর্থ : সূরা বাক্বারার ৬১তম আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে কোন ব্যতিক্রম নেই। সূরা আল-ইমরানের আলোচ্য আয়াতের **الْحَبْرَةِ** এর ব্যতিক্রম সম্পর্কেও সেখানে পূর্ণ তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে। — (আ’ আরেফুল কোরআন ১ম খণ্ড) এখানে পুনর্বার উল্লেখনীয় বিষয় এই যে, কাশশাক গ্রন্থের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হচ্ছে ইহুদীদের সাথে লাঞ্ছনা ও অপমান লেগেই থাকবে। তবে তারা দুই উপায়ে এ লাঞ্ছনা থেকে বাচতে পারবে। (এক) — আল্লাহর অঙ্গীকার। উদাহরণতঃ : নাবালগ বালক অথবা মহিলা হলে আল্লাহর নির্দেশে সে হত্যা থেকে নিরাপদে থাকবে। (দুই) **وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ** অর্থঃ, — অন্যের সাথে সন্ধিচুক্তির কারণে তাদের লাঞ্ছনা ও অপমান প্রকাশ পাবে না **وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ** শব্দের মধ্যে মুসলমান ও কাফের উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই আয়াতের অর্থ মুসলমানদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে বিপদমুক্ত হওয়াও হতে পারে এবং কোন অমুসলিম শক্তির সাহায্যে চুক্তি করে নিরাপদ হওয়াও হতে পারে, বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের অবস্থা যে হুবহু তাই, তা জ্ঞানী মাত্রেই অজানা নয়। ইসরাঈল রাষ্ট্রটি প্রকৃতপক্ষে ব্রিটান পাক্ষাত্যের একটি সামরিক ছাউনি। এর যাকিছু শক্তিমদমত্ততা দেখা যায়, সবই অপরের কপায়। আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিবর্গ এর উপর থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নিলে এটি একদিনও স্থায়ী অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِلِقَائِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ — অর্থঃ, হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ মিথরূপে গ্রহণ করো না। **بِلِقَائِهِمْ** শব্দের অর্থ অভিভাবক, বন্ধু, বিশৃঙ্খল, রহস্যবিদ। কাপড়ের অভ্যন্তর ভাগকেও **بِلِقَائِهِمْ** বলা হয়, যা শরীরের সাথে মিশে থাকে। এ শব্দটি **بطن** শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর বিপরীত শব্দ **ظهر**। কোন বস্তুর বাহ্যিক দিককে **ظهر** এবং অভ্যন্তরীণ দিককে **بطن** বলা হয়। এমনিভাবে কাপড়ের উপরের অংশকে **ظهر** এবং ভেতরের যে অংশ শরীরের সাথে মিশে থাকে, তাকে **بِلِقَائِهِمْ** বলা হয়। আমরা নিজ ভাষায় বলি : সে তার জামা-চাদর। অর্থঃ, সে তার খুব প্রিয়। এমনিভাবে **بِلِقَائِهِمْ** বলে রূপক অর্থে বন্ধু, বিশৃঙ্খল, গোপন তথ্যের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য লোককে বোঝানো হয়। প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রন্থ লিসানুল-আরবে **بِلِقَائِهِمْ** শব্দের অর্থ এরূপ লিখিত আছে : ‘কোন ব্যক্তির অভিভাবক, বিশৃঙ্খল বন্ধু এবং যার সাথে পরামর্শ করে কাজ করা হয়, এরূপ ব্যক্তিকে তার **بِلِقَائِهِمْ** বলা হয়।’

অতএব, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, স্বধর্মাবলম্বীদের ছাড়া অন্য কাউকে এমন মুকব্বী ও উপদেষ্টারূপে গ্রহণ করো না, যার কাছে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে না।

ইসলাম স্বীয় বিশ্বব্যাপী করুণার ছায়াতলে মুসলিমগণকে অমুসলিমদের সাথে সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, মানবতা ও উদারতার অসাধারণ নির্দেশ দিয়েছে। এটা শুধু মৌখিক নির্দেশই নয়; বরং রসূলুল্লাহ (সাঃ) —এর আচরণ একে কার্যে পরিণত করেও দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু

মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কার্যাবলী সংরক্ষণের স্বার্থে ইসলাম এ নির্দেশও দিয়েছে যে, ইসলামী আইনে অবিশ্বাসী ও বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্ক একটি বিশেষ সীমার বাইরে এগিয়ে নেয়ার অনুমতি মুসলমানদের দেয়া যায় না। কারণ, এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই সমুহ ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি যুক্তিপূর্ণ, সঙ্গত ও জরুরী ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি ও জাতি উভয়েরই হেফাজত হয়। যেসব অমুসলিম মুসলিম রাষ্ট্রের বাসিন্দা কিংবা মুসলমানদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ, তাদের সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর শিক্ষা এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে জোরদার নির্দেশাবলী ইসলামী আইনের শুরুত্বপূর্ণ অংশ। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : “যে ব্যক্তি কোন যিশী অর্থাৎ, মুসলিম রাষ্ট্রের অ-মুসলিম বাসিন্দাকে কষ্ট দেয়, কেয়ামতের দিন আমি তার বিপক্ষে বাদী হবো। আর আমি যে মোকদ্দমায় বাদী হবো, তাতে জয়লাভ অবধারিত।” অন্য এক হাদীসে বলেন : “চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম বাসিন্দা অথবা অন্য কারও প্রতি অত্যাচার করতে আমার পালনকর্তা আমাকে নিষেধ করেছেন।” আর এক হাদীসে বলেন : “সাবধান। যে ব্যক্তি কোন চুক্তিবদ্ধ অ-মুসলিমের প্রতি অত্যাচার করে কিংবা তার প্রাপ্য হ্রাস করে কিংবা তার উপর সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয় অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার কাছ থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করে, তবে কেয়ামতের দিন আমি তার পক্ষ থেকে উকিল হবো।”

কিন্তু এসব উদারতার সাথে সাথে মুসলমানদের নিজস্ব জামাত ও জাতিসত্তার হেফাজতের স্বার্থে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা বিশুদ্ধ মুকুব্বীরূপে গ্রহণ করো না।

ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ফারাক (রাঃ)-কে বলা হলো যে, এখানে একজন হস্তলিপিতে সুদক্ষ অমুসলিম বালক রয়েছে। আপনি তাকে ব্যক্তিগত মুনসী হিসাবে গ্রহণ করে নিলে ভালই হবে। হযরত ওমর ফারাক (রাঃ) উত্তরে বলেন : “এরূপ করলে মুসলমানদের ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীকে বিশুদ্ধরূপে গ্রহণ করা হবে, যা কোরআনের নির্দেশের পরিপন্থী।”

ইমাম কুরতুবী হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম ও তফসীরবিদ। তিনি অত্যন্ত দৃষ্টি ও বেদনার সাথে মুসলমানদের মধ্যে এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ ও তার অন্তত পরিণাম এভাবে বর্ণনা করেন : “আজকাল অবস্থা এমন পাল্টে গেছে যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এভাবে ওরা মুখ বিস্তারিত ও শাসকদের ঘাড়ে চেপে বসেছে।”

অধুনা আধুনিক সভ্যতার যুগেও বিশেষ মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে সংশ্লিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী নয় — এমন কোন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা ও মুকুব্বীরূপে গ্রহণ করা হয় না।

আলোচ্য ১১৮ নং আয়াতে উপরোক্ত নির্দেশের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে : **لَا يَرْفَعُ يَدَهُ إِلَىٰ شَيْءٍ** অর্থাৎ, তারা তোমাদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করতে কসুর করবে না। তারা তোমাদের বিপদ কামনা করে। এ ধরনের কিছু বিষয় স্বয়ং তাদের মুখেও প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যে শত্রুতা গোপন রাখে, তা আরও মারাত্মক। আমি তোমাদের সামনে সব আলামত প্রকাশ করে দিয়েছি; এখন তোমরা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়

দিতে পার তবে তা থেকে উপকার পেতে পার।

উদ্দেশ্য এই যে, ইহুদী হোক কিংবা খ্রীষ্টান, কপট বিশ্বাসী মুশরেক হোক কিংবা মুশরেক — কেউ তোমাদের সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। তারা সর্বদাই তোমাদের বোকা বানিয়ে তোমাদের ক্ষতি সাধনে ব্যাপ্ত এক ধর্মীয় ও পার্শ্বব অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট থাকে। তোমরা কষ্টে থাক এবং কোন না কোন উপায়ে তোমাদের ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষতি হোক, এটাই হলো তাদের কাম্য। তাদের অন্তরে যে শত্রুতা লুক্কায়িত রয়েছে, তা খুবই মারাত্মক। কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্বলমণীয় জিহাসোয় উত্তেজিত হয়ে এমন সব কথাবার্তা বলে ফেলে, যা তাদের গভীর শত্রুতার পরিচায়ক। শত্রুতা ও প্রতিহিংসায় তাদের মুখ থেকে অসলগ্ন কথা বের হয়ে পড়ে। সুতরাং এহেন শত্রুদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল্লাহ তাআলা শত্রু-মিত্রের পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপনের বিধান বলে দিয়েছেন, সুতরাং মুসলমানদের এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া খুবই সমীচীন।

وَذُؤِلْمَا عَيْنُهُمْ বাক্যটি কাফেরসুলভ মনোভাবের পূর্ণ পরিচায়ক। এর মধ্যে এ বিষয়ের গভীর শিক্ষা নিহিত আছে যে, কোন অমুসলিম কোন অবস্থাতেই মুসলমানদের সত্যিকার বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না।

এরপর বলা হয়েছে **هَٰذَا نَتَمُوكُمْ وَأَلَا تَنُوتُنَا** অর্থাৎ — তোমরা তো তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তো তোমাদের মোটেই ভালবাসে না। এছাড়া তোমরা সব ঈশী গ্রহণে বিশ্বাস কর। তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে : আমরা মুসলমান। কিন্তু যখন একান্তে গমন করে, তখন তোমাদের প্রতি ক্রোধের আতিশয্যে আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বনে দিন, তোমরা ক্রোধে নিপাত যাও। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরের কথাবার্তা সম্পর্কে সম্যক অবগত। অর্থাৎ — এটা কেমন বেখান্না বিষয় যে, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলবে, অথচ তারা তোমাদের বন্ধু নয়, বরং মূলোৎপাটনকারী শত্রু। আশ্চর্যের বিষয় তোমরা সব খোদারী গ্রন্থ বিশ্বাসী; তা যে কোন জাতি, যে কোন যুগে, যে কোন পয়গম্বরের প্রতি অবতীর্ণ হোক না কেন; কিন্তু এর বিপরীতে তারা তোমাদের পয়গম্বরের গ্রন্থ কোরআনকে বিশ্বাস করে না। এমন কি তাদের নিজ গ্রন্থের প্রতিও তাদের শুদ্ধ বিশ্বাস নাই। এদিক দিয়ে তোমাদের সাথে ওদের অস্পষ্ট বন্ধুত্ব এবং তাদের প্রতি তোমাদের বিদ্বেষভাব থাকা উচিত ছিল, কিন্তু এখানে ব্যাপার হচ্ছে উল্টো।

এ কাফেরসুলভ মনোভাবের আরও ব্যাখ্যা এই যে, **لَا تَسْتَكْبِرُ** অর্থাৎ — তাদের অবস্থা এই যে, তোমরা কোন সুখকর অবস্থায় সম্মুখীন হলে তারা দুঃখিত হয়, আর তোমরা কোন বিপদে পতিত হলে তারা আনন্দে গদগদ হয়ে ওঠে।

অতঃপর কপট বিশ্বাসীদের চক্রান্ত এবং ঘোর শত্রুদের শত্রুতার অন্তত পরিণাম থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে একটি সহজ সুন্দর ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হচ্ছে : “তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে এবং পরহেযগারী অবলম্বন করলে ওদের চক্রান্ত তোমাদের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট করতে পারবে না।”

ধৈর্য ও পরহেযগারীর মধ্যেই মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য। যাবতীয় বিপদাপদ ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকার জন্যে কোরআন এ ও তাকওয়া-পরহেযগারীকে শুধু এ আয়াতেই নয়, অন্যান্য আয়াতে একটি কার্যকরী প্রতিষেধক হিসেবে বর্ণনা করেছে।

(১১৬)

আল্লাহ্
দেখতে
এ দুনিয়া
মতো,
লগ্নে
করে দি
তারা
ইমানদ
ন; তা
থাক,
যে
বকী জ
বলি তে
মলি
আর
সাথে
পৃথক
থাকে।
আনন
নাগে।
হয়। ত
আদের
কিছু ক
পরিজ
ববস্থা

إِذْ هَبَّتْ ظُلُفَيْنِ مِنْكُمْ أَنْ تَقْتُلَا وَاللَّهُ وَابِعُكُمْ عَلَى
 اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠٧﴾ وَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللَّهُ يُبَدِّلُ
 أُولَئِكَ مَا تَأْتُوا اللَّهَ لَعَنَ كُفْرَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٠٨﴾ إِذْ تَقُولُ
 لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آتٍ مِنَ الْمَلِكَةِ
 مُتْرَلِينَ ﴿١٠٩﴾ بَلْ لَنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا يَا أَتُوكُمْ مِنْ قُورَيْهِمْ
 هَذَا يُبَدِّلُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آتٍ مِنَ الْمَلِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١١٠﴾
 وَجَاعَلَهُ اللَّهُ الْآبِشْرَى لَكُمْ وَلَتُظْمِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا
 النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١١١﴾ لِيَقْطَعَ طَرَقًا مِنَ
 الدِّينِ لَكُمْ وَأَوْ يَكُونُ لَهُمْ يَنْقِبًا بِحَاكِبِينَ ﴿١١٢﴾ لَيْسَ لَكَ
 مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَأَعِيزُ لَهُمْ قَائِمٌ ظَلُمُونَ ﴿١١٣﴾
 وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ
 يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُتَّعِفَةً وَاتَّقُوا
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١١٥﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ
 لِلْكَافِرِينَ ﴿١١٦﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١١٧﴾

১২২) যখন তোমাদের দু'টি দল সাহস হারাবার উপক্রম করলো, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর আল্লাহর উপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিত। (১২০) বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। (১২৪) আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে—তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন। (১২৫) অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন। (১২৬) বস্তুতঃ এটা তো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুমার পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে, (১২৭) যাতে ধ্বংস করে দেন কোন কোন কাফেরকে অথবা লাঞ্চিত করে দেন—যেন ওরা বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায়। (১২৮) হয় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে আযাব দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নাই। কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর। (১২৯) আর যাকিছু আসমান ও যমীনে রয়েছে, সেসবই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা আযাব দান করবেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়। (১৩০) হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবাক্তি হারে সুদ খেয়ে না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো। (১৩১) এবং তোমরা সে আশুন থেকে বঁচে থাক, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (১৩২) আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রসুলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়।

ওহদ যুদ্ধের পটভূমি : আলোচ্য আয়াতের তফসীরের পূর্বে ওহদ যুদ্ধের পটভূমি হৃদয়ঙ্গম করে নেয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে বদর নামক স্থানে কোরাইশ বাহিনী ও মুসলিম মুজাহিদগণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে কোরাইশদের সত্তর জন খ্যাতনামা ব্যক্তি নিহত হয়। এবং এ পরিমাণই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। এ মারাত্মক ও অবমাননাকর পরাজয়টি ছিল প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী আযাবের প্রথম কিস্তি। এতে কোরাইশদের প্রতিশোধম্পূর্ণ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। নিহত সরদারদের আত্মীয়-স্বজনরা সমগ্র আরবকে ক্ষেপিয়ে তোলে। তারা প্রতিজ্ঞা করে : আমরা যতদিন এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করব, ততদিন স্বস্তির নিশ্বাস নেব না। তারা মক্কাবাসীদের কাছে আবেদন জানালো, তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া থেকে যে অর্থ-সম্পদ নিয়ে এসেছে, তা সবই যেন এ অভিযানে ব্যয় করা হয়—যাতে মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে নিহত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ আবেদনে সবাই যোগদান দিল। সেমতে তৃতীয় হিজরীতে কোরাইশদের সাথে অন্যান্য কয়েকটি গোত্রও মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। এমনকি, স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের সাথে যোগদান করলো—যাতে প্রয়োজনবোধে পুরুষদের উৎসাহিত করে পশ্চাদপসরণে বাধা দিতে পারে। তিন হাজার যোদ্ধার বিরাট বাহিনী অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যখন মদীনা থেকে তিন চার মাইল দূরে ওহদ পাহাড়ের সন্নিগটে শিবির স্থাপন করলো, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁর ব্যক্তিগত মত ছিল মদীনার ভেতরে থেকেই সহজে ও সাফল্যের সাথে শত্রু শক্তিকে প্রতিহত করা। তখন মুনাক্কেফ সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বাহ্যতঃ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে প্রথমবারের মত তার কাছেও পরামর্শ চাওয়া হলো। তার অভিমতও হযুর (সাঃ)—এর অভিমতের অনুরূপ ছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক উৎসাহী তরুণ সাহাবী যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি এবং শাহাদতের আগ্রহে পাগলপারা ছিলেন, জেদ ধরলেন যে, শহরের বাইরে গিয়েই শত্রু সৈন্যের মোকাবেলা করা উচিত। নতুবা শত্রুর আমাদের দুর্বল ও কাপুরুষ বলে মনে করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতে এ প্রস্তাবটিই গৃহীত হলো।

ইতিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং লৌহবর্ম পরিধান করে বের হয়ে এলেন। এতে কেউ কেউ মনে করলেন যে, আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছি। এটা ঠিক হয়নি। তাঁরা নিবেদন করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার ইচ্ছা না হলে এখানেই অবস্থান করুন। তিনি বললেন : একবার লৌহবর্ম পরিধান করে এবং অস্ত্রধারণ করার পর যুদ্ধ ব্যতিরেকেই তা আবার খুলে ফেলা পয়গামুরের জন্য শোভন নয়। এ বাক্যে পয়গামুর ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ, পয়গামুর কখনও দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারেন না। এতে উম্মতের জন্যেও বিরাট শিক্ষা রয়েছে।

মহানবী (সাঃ) যখন মদীনা থেকে বের হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রায় এক হাজার সাহাবী। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই প্রায় তিনশত লোকের একটি দল নিয়ে রাস্তা থেকে এই বলে ফিরে গেল যে, অন্যদের পরামর্শ

মত যখন কাজ করা হয়েছে, তখন আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। আমরা অনর্থক নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে চাই না। তার সঙ্গীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুনাফিক। তবে কিছুসংখ্যক মুসলমানও তাদের প্রতারণায় পড়ে তাদের সঙ্গে ফিরে গেল।

অবশেষে হুযর-আকরাম (সাঃ) সর্বমোট সাতশত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলেন। তিনি স্বয়ং সামরিক কায়দায় এমনভাবে সৈন্য সমাবেশ করলেন, যাতে ওহদ পাহাড়টি থাকলো পিছনের দিকে। তিনি হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরের হাতে পতাকা দান করলেন। হযরত যুযায়ের ইবনে আওয়ামকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। হযরত হামযার হাতে বর্মহীন সৈন্যদের পরিচালনভার অর্পণ করলেন। পশ্চাদিক থেকে আক্রমণের ভয় থাকায় পক্ষাশ্রয় জন তীরন্দাজের একটি বাহিনীকে সেদিকে নিযুক্ত করলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন পশ্চাদিকের টিলার উপর থেকে হেফাজতের দায়িত্ব পালন করেন। সৈন্যদের জয়-পরাজয়ের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং কোন অবস্থাতেই তারা স্থানচ্যুত হবে না। আবদুল্লাহ ইবনে যুযায়ের এ তীরন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। কোরাইশরা বদরযুদ্ধে তিন্ত অতিজ্ঞতা লাভ করেছিল। তাই তারাও শ্রেণীবদ্ধভাবে সৈন্য সমাবেশ করলো।

বিজ্ঞাতির দৃষ্টিতে মহানবীর (সাঃ) সামরিক প্রজ্ঞা : রসুলুল্লাহ (সাঃ) যেরূপ সামরিক কায়দায় সৈন্যদের সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ করেন, তা দেখে স্পষ্টতঃই মনে হয় যে, একজন কামেল পথপ্রদর্শক ও পুত-পবিত্র পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে নিপুণ সেনাধ্যক্ষ হিসেবেও তাঁর ভুলনা নাই। তিনি যেভাবে ব্যূহ রচনা করে সৈন্য সংস্থাপন করেছিলেন, তখনকার জগৎ সে সম্পর্কে মোটেই জ্ঞাত ছিল না। বর্তমান যুগে সমরবিদ্যা একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এ যুগের সমর-কুলীরাও মহানবী (সাঃ) প্রদর্শিত রণনৈপুণ্যকে প্রশংসার চোখে দেখে থাকে। জনৈক খ্রীষ্টান ঐতিহাসিকের ভাষায় : ‘একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা উচিত যে, অপারিসীম সাহস ও বীরত্বের অধিকারী মুহাম্মদ (সাঃ) শত্রুপক্ষের মোকাবেলায় সমরবিদ্যার ক্ষেত্রেও নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন। তিনি মক্কাবাসীদের বিশৃঙ্খল ও এলোপাখাড়ি যুদ্ধের মোকাবেলায় চমৎকার দূরদর্শিতা ও কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।’ এ কথাটি বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসবিদ টম এ্যাণ্ডারসনের। লেখকের ‘লাইফ অব মোহাম্মদ’ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

যুদ্ধের সূচনা : অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হলো। প্রথম দিকে মুসলমানদের পাল্লাই ভারী ছিল। শত্রুসৈন্য ইতস্ততঃ পলায়ন করতে লাগলো। বিজয় সমাপ্ত হয়েছে মনে করে মুসলমান সৈন্যরা গনীরমতের মালামাল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। শত্রুদের পলায়ন করতে দেখে ওহদ পাহাড়ের পেছন দিকে হুযর কর্তৃক নিযুক্ত তীরন্দাজ সৈন্যরাও স্থান ত্যাগ করে পাহাড়ের পাদদেশের দিকে আসতে লাগলেন। অধিনায়ক আবদুল্লাহ ইবনে যুযায়ের রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কঠোর নির্দেশ সুরণ করিয়ে দিয়ে তাদের স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। কিন্তু কয়েকজন ছাড়া সবাই বলল : হুযরের নির্দেশটি ছিল সাময়িক। এখন আমাদের সবার সাথে মিলিত হওয়া উচিত। এ সুযোগে কাফের বাহিনীর অধিনায়ক খালেদ ইবনে ওলীদ যিনি তখনও মুসলমান হননি, পাহাড়ের পেছন দিক থেকে ঘুরে এসে গিরগিথে আক্রমণ করে বসলেন। আবদুল্লাহ ইবনে যুযায়ের অস্পষ্ট কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এ

আক্রমণ প্রতিহত করতে চাইলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। খালেদের সৈন্যবাহিনী ঝড়ের বেগে হঠাৎ মুসলমানদের উপর পতিত হলো। অপরদিকে পলায়নপর শত্রুসৈন্যও ফিরে এসে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাপিয়ে পড়ল। এভাবে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পাশ্টে গেল। এ আকস্মিক বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুসলিম বাহিনীর একটি বৃহৎ অংশ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল। এতদসত্ত্বেও কিছুসংখ্যক সাহাবী অমিততেজঃ যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) শাহদত বরণ করেছেন। এ সংবাদে মুসলমানদের অবশিষ্ট চেতনাও বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হলো এবং তাঁরা সাহস হারিয়ে ফেললেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর চারপাশে তখন মাত্র দশ-বারো জন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী বিদ্যমান। হুযর স্বয়ং আহত। পরাজয়-পর্ব সম্পন্ন হওয়ার তেমন কিছুই আর বাকী ছিল না। এমনি সময়ে সাহাবীগণ জানতে পারে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) জীবিতই রয়েছেন। তখন তাঁরা চতুর্দিক থেকে এসে তাঁর চারপাশে সমবেত হলেন এবং তাঁকে নির্বিঘ্নে পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু পরাজয়ের দরুন মুসলমানরা অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন। মুসলমানদের এ সাময়িক পরাজয় ছিল কয়েকটি কারণের ফলশ্রুতি। কোরআন পাক প্রত্যেকটি কারণ সম্পর্কে একান্ত মাপা শব্দে পর্যালোচনা করেছে এবং ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক থাকতে আদেশ দিয়েছে।

এ যুদ্ধের বিশ্লেষণে অনেক অসাধারণ শিক্ষাপ্রদ ঘটনা রয়েছে — যা মুসলমানদের জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান।

ওহদের ঘটনার কয়েকটি শিক্ষা :

(১) পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কোরাইশরা এ যুদ্ধে পুরুষদের পঞ্চাদশসরগ রোধ করার জন্যে নারীদেরকে সঙ্গে এনেছিল। নবী করীম (সাঃ) দেখলেন, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দার নেতৃত্বে মহিলারা কবিতা আবৃত্তি করে পুরুষদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। এ সময় নবী করীম (সাঃ) —এর পবিত্র মুখে এ দোয়া উচ্চারিত হচ্ছিল : ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছ থেকেই শক্তি সঞ্চয় করি, তোমার নামেই আক্রমণ পরিচালনা করি এবং তোমার দ্বীনের জন্যেই লড়াই করি। আমার জন্যে আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট —তিনি উত্তম অভিভাবক।’ এ দোয়ার প্রত্যেকটি শব্দ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক নিবিড় করে এবং মুসলমানদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহকেও অন্যান্য জাতির যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে স্বতন্ত্র রূপ দান করে।

(২) দ্বিতীয় লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এ যুদ্ধে কতিপয় সাহাবী বীরত্ব ও আত্মনিবেদনের জ্বলন্ত স্বাক্ষর স্থাপন করেন, যার নজীর ইতিহাসে দুর্লভ। হযরত আবু দাজ্জনা নিজ দেহ দ্বারা রসুলুল্লাহ (সাঃ) —কে ঢালের ন্যায় আড়াল করে রেখেছিলেন। শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর তাঁর দেহে বিদ্ধ হয়েছিল। হযরত তালহাও এমনিভাবে নিজ দেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছিলেন; কিন্তু প্রিয়তম নবীর সঙ্গ ত্যাগ করেননি। হযরত আনাসের চাচা আনাস ইবনে নসর বদর যুদ্ধে অনুপস্থিতির কারণে অনুতপ্ত ছিলেন। তাঁর অভিলাষ ছিল, রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর নেতৃত্বে পরিচালিত কোন যুদ্ধে সুযোগ পেলে মনের অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করবেন। ওহদ যুদ্ধ সংঘটিত হলে তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করলেন। মুসলিম বাহিনী যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো এবং কাফের বাহিনী অমিত বিক্রমে অগ্রসর হলো, তখন তিনি তরবারী নিয়ে অগ্রসর হলেন। ঘটনাক্রমে হযরত সা’দ (রাঃ) —কে পলায়নপর মুসলমানদের মধ্যে দেখতে পেয়ে চীৎকার করে বললেন :

সাদ কোথায় যাচ্ছে? আমি ওহূদের পাদদেশে বেহেশতের সুগন্ধ অনুভব করছি, একথা বলে এগিয়ে গেলেন এবং তুমুল যুদ্ধের পর শাহাদত বরণ করলেন।—(ইবনে-কাসীর)

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন : মুসলমানদের ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) - এর কাছে মাত্র এগার জন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। হযরত তালহা (রাঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কোরাইশ সৈন্যরা তখন ঝড়ের বেগে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন : কে এদের প্রতিরোধ করবে? হযরত তালহা (রাঃ) বলে উঠলেন : আমি, ইয়া রসূলুল্লাহ্। অন্য একজন আনসার সাহাবী বলেন : আমি হাজির আছি, মহানবী (সাঃ) আনসারকে অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন। তিনি যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন। শত্রুপক্ষের আরেকটি দলকে অগ্রসর হতে দেখে তিনি আবার উপরোক্ত প্রশ্ন উচ্চারণ করলেন। এবারও হযরত তালহা (রাঃ) পূর্বের ন্যায় উত্তর দিলেন। তিনি নির্দেশ পেলেই সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যাকুল ছিলেন ; কিন্তু মহানবী (সাঃ) এবারও অন্য একজন আনসারকে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে হযরত তালহার বাসনা পূর্ণ হলো না। এভাবে সাত বার প্রশ্ন হলো এবং হযরত তালহা প্রত্যেকবার নির্দেশ লাভে ব্যর্থ হলেন। অন্যান্য সাহাবীকে পাঠিয়ে দেয়া হতো এবং তাঁরা শহীদ হয়ে যেতেন।

বদরযুদ্ধে সংখ্যাগুণতায় মুসলমানরা জয়লাভ করেন। ওহূদ যুদ্ধে বদরের তুলনায় সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশী ছিল। তবুও পরাজয় বরণ করতে হলো। এতে মুসলমানদের জন্যে শিক্ষা এই যে, সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্যের উপরই ভরসা করা উচিত নয়, বরং এরূপ মনে করা দরকার যে, বিজয় আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আসে। ফলে তাঁর সাথেই সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে হবে।

ইয়ারমুক যুদ্ধের সময় রণাঙ্গণ থেকে অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের প্রার্থনা ও মুসলমানদের সংখ্যাগুণতায় কথা ব্যক্ত করে লেখা একটি পত্র খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) - এর হস্তগত হয়েছিল। তিনি এর উত্তরে লিখেছিলেন :

قد جأني كتابكم تستمدونني وأني ادلكم على من هو
اعز نصرا واحصن جندا الله عزوجل فاستنصروه . فان محمدا
صلى الله عليه وسلم قد نصر في يوم بدر في اقل من
عدتكم فاذا جاءكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا ترجعوني

—‘তোমাদের পত্র হস্তগত হয়েছে। তোমরা অতিরিক্ত সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করছে। কিন্তু আমি তোমাদের এমন এক সত্তার ঠিকানা দিচ্ছি—যাঁর সাহায্য অধিকতর কার্যকরী এবং যাঁর সৈন্যবল অজ্ঞেয়। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন। তোমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। মুহাম্মদ (সাঃ) বদরযুদ্ধে তোমাদের চাইতেও কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তাঁর কাছ থেকে সাহায্য লাভ করেছিলেন। আমার এ পত্র পৌঁছা মাত্রই তোমরা শত্রু সৈন্যে উপর ঝাঁপিয়ে পড় এবং আমার কাছে এ ব্যাপারে অধিক কিছু লেখার প্রয়োজন নেই।’

এ ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন : এ পত্র পেয়ে আমরা আল্লাহ্ নাম উচ্চারণ করে অগণিত কাকের বাহিনীর উপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং শত্রুরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করল। হযরত ফারুকে আযম জানতেন,

মুসলমানের জয়-পরাজয় সংখ্যাগুণিক ও সংখ্যাগুণতায় উপর নির্ভরশীল নয়, বরং আল্লাহ্র প্রতি ভরসা ও তাঁর সাহায্যের দ্বারাই এর মীমাংসা হয়। হুনায়েন যুদ্ধ প্রসঙ্গে কোরআন পাক এ সত্যটিই ফুটিয়ে তুলেছে :

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كُنُفُؤُكُمْ فَذُلُّنْكُمْ عَنْكُمْ مَيْمَنُ

অর্থাৎ, “হুনায়েন যুদ্ধের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা স্বীয় সংখ্যাগুণিক্যে গর্বিত হয়ে পড়েছিলে। কিন্তু এ সংখ্যাগুণিক্য তোমাদের কোন উপকারেই আসেনি।” এবার আলোচ্য আয়াতসমূহের তফসীরের প্রতি লক্ষ্য করুনঃ

وَاذْعَنْزَلُوا مِنْ أَهْلِكَ - অর্থাৎ, “আপনি যখন সকাল বেলায় বের হয়ে যুদ্ধার্থ মুসলমানদের বিভিন্ন ব্যুহে সংস্থাপিত করেছিলেন।”

ঘটনা বর্ণনায় কোরআন পাকের একটি বিশেষ আলৌকিক পদ্ধতি এই যে, এতে কোন ঘটনা খুঁটিনাটিসহ সবিস্তারে বর্ণনা করা হয় না। তবে ঘটনায় যেসব বিশেষ নির্দেশ নিহিত থাকে, সেগুলো বর্ণনা করা হয়। আলোচ্য আয়াতে যেসব খুঁটিনাটি বিষয় রয়েছে, উদাহরণত : কখন গৃহ থেকে বের হয়েছিলেন, তা وَذْعَنْزَلُوا শব্দে ব্যক্ত হয়েছে। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, এটা ছিল তৃতীয় হিজরীর ৭ই শাওয়ালের সকাল বেলা।

এরপর বলা হয়েছে, এ সফর কোথা থেকে আরম্ভ হয়েছিল। وَذْعَنْزَلُوا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সে সময় তিনি পরিবার-পরিজনের মধ্যে ছিলেন এবং তাঁদের সেখানে রেখেই তিনি বের হয়ে পড়েছিলেন। অথচ আক্রমণটি মদীনার উপরই হওয়ার ছিল। এসব খুঁটিনাটি ঘটনায় এ নির্দেশ রয়েছে যে, আল্লাহ্র নির্দেশ এসে গেলে তা পালন করতে পরিবার-পরিজনের মায়ামমতা অন্তরায় না হওয়াই উচিত। এর পর গৃহ থেকে বের হয়ে রণাঙ্গন পর্যন্ত পৌঁছার খুঁটিনাটি ঘটনা বাদ দিয়ে রণাঙ্গনের প্রথম কাজ বর্ণনা করা হয়েছে :

تُبَيِّنُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاصِدَ الْقَوْمِ

অর্থাৎ, আপনি যুদ্ধার্থ মুসলমানদের উপযুক্ত স্থানে সংস্থাপিত করেছিলেন। অতঃপর আয়াতটি এভাবে শেষ করা হয়েছে : وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা খুব শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী, এই দুইটি গুণবাক্য শব্দ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তখন শত্রু ও মিত্র গুণবাক্য শব্দ নিজ নিজ অবস্থানে যা বলাবলি করছিল, তা সবই আল্লাহ্ তাআলার জানা হয়ে গেছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যা কিছু ঘটেছে তার কোনটিই তাঁর অজানা নয়। এমনভাবে এ যুদ্ধের পরিণামও তাঁর অজ্ঞাত নয়।

দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে— اِذْ هَمَّتْ كَلْبَابُ يُثَمُّوْنَ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا - অর্থাৎ, তোমাদের দুটি দল ভীরতা প্রকাশের সংকল্প করেছিল, অথচ আল্লাহ্ তাদের সহায় ছিলেন। এ দুই দল হলো আউস গোত্রের বনী হারেসা এবং খায়রাজ গোত্রের বনী সালমা। এরা উভয়েই আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের দেখাদেখি দুর্বলতা প্রদর্শন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে নিজেদের মধ্যে দুর্বলতা ছিল না, বরং স্বদলের সংখ্যাগুণতায় ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই তারা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক ইবনে হেশাম এ বিষয়টি যথাযথ বিশ্লেষণ করেছেন। وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ বাক্যটি তাদের ইমানের

পূর্ণাঙ্গতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ গেতদুয়ের কোন কোন বুয়ুর্গ বলতেন :
আয়াতে আমাদের প্রতি কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু
وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ব্যাক্যাংশের সুসংবাদও আমাদের লক্ষ্য করেই উক্ত
হয়েছে।

এ আয়াতের শেষভাবে বলা হয়েছে : আল্লাহ্র উপর ভরসা করাই
মুসলমানদের কর্তব্য। এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, সংখ্যাগিক ও
সাজ-সরঞ্জামের উপর ভরসা করা মুসলমানদের উচিত নয়। বরং সামর্থ্য
অনুযায়ী সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রাম করার পর ভরসা একমাত্র
আল্লাহ্ পাকের উপরই করা দরকার। সাজ-সরঞ্জামের অভাব দেখেই
বনী-হারেসা ও বনী সালমার মনে দুর্বলতা ও ভীকতা মাথাচাড়া দিয়ে
উঠেছিল। আল্লাহ্র প্রতি ভরসা দুরা এর প্রতিকার করা হয়েছে। আল্লাহ্র
প্রতি যথার্থ ভরসা ও আস্থা ই এ জাতীয় কুমন্ত্রণার অমোঘ প্রতিকার।

‘তাওয়াঙ্কুল’ (আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ভরসা) মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ
গুণ। সুফী বুয়ুর্গগণ এর স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।
এখানে এতদুটু বোঝা দরকার যে, বাহ্যিক উপায়-উপকরণ থেকে সম্পর্ক
ছিন্ন করে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বসে থাকার নাম তাওয়াঙ্কুল নয়।
বরং তাওয়াঙ্কুল হলো সামর্থ্য অনুযায়ী যাবতীয় বাহ্যিক উপায় অবলম্বন
করার পর ফলাফলের ব্যাপারটি আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করা এবং বাহ্যিক
উপায়াদির জন্যে গর্ব না করে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। এ ব্যাপারে নবী
করীম (সাঃ)-এর উত্তম নমুনা আমাদের সামনে রয়েছে। স্বয়ং মুসলিম
বাহিনীকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করা, সামর্থ্য অনুযায়ী অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য
সমরোপকরণ সংগ্রহ করা, রণক্ষেত্রে পৌঁছে স্থানোপযোগী যুদ্ধের মানচিত্র
তৈরী করা, বিভিন্ন ব্যুহ রচনা করে সাহায্যে কেরামকে তথায় সংস্থাপিত
করা ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠ ব্যবস্থা বৈ তো নয়। মহানবী (সাঃ) স্বহস্তে এসব
ব্যবস্থা সম্পন্ন করে প্রকারান্তরে এ কথাই বলে দিয়েছেন যে, বাহ্যিক
উপায়াদিও আল্লাহ্ তাআলার অবদান। এগুলো থেকে সম্পর্কেচ্ছেদ করা
তাওয়াঙ্কুল নয়। এক্ষেত্রে মুসলিম ও অ-মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য এতদুটু
যে, মুসলমানরা সব সাজ-সরঞ্জাম বৈষয়িক শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ
করার পরও ভরসা একমাত্র আল্লাহ্র উপরই করে। পক্ষান্তরে
অ-মুসলিমরা এ আধ্যাত্মিকতা থেকে বঞ্চিত। তারা বৈষয়িক শক্তির
উপরই ভরসা করে। সবগুলো ইসলামী যুদ্ধে এ পার্থক্যটি প্রকাশ পেতে
দেখা গেছে।

অতঃপর ঐ যুদ্ধের দিকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে - যাতে মুসলমানরা
পুরাপুরি তাওয়াঙ্কুলের পরিচয় দিয়েছিল এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদের
সাফল্য দান করেছিলেন। وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِدُونِ أَكْثَرِ الْمُؤْمِنِينَ
অর্থাৎ, সুরণ কর, যখন আল্লাহ্ তাআলা বদরে তোমাদের সাহায্য
করেছিলেন; অথচ তোমরা সংখ্যায় ছিলে অতি নগণ্য।

বদরের গুরুত্ব ও অবস্থান : মদীনা থেকে প্রায় ষাট মাইল
পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত একটি বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম বদর।

তখনকার দিনে এখানে পানির প্রাচুর্য থাকায় স্থানটির গুরুত্ব ছিল
অত্যধিক। এখানেই তওহীদ ও শেরেকের মধ্যে সর্বপ্রথম সংঘর্ষ ঘটে
দ্বিতীয় হিজরী, ১৭ই রমযান মোতাবেক ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে, ১১ই মার্চ শুক্রবার
দিন। এটি বাহ্যতঃ একটি স্থানীয় যুদ্ধ মনে হলেও বাস্তবে পৃথিবীর
ইতিহাসে এর ফলে একটি সুমহান বিপ্লব সূচিত হয়েছিল। এ কারণেই

কোরআনের ভাষায় একে ‘ইয়াওমুল-ফোরকান’ বলা হয়েছে। পাশ্চাত্যের
ইতিহাসবিদরাও এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন।

আমেরিকার প্রফেসর হিট্টি ‘আরব জাতির ইতিহাস’ গ্রন্থে বলেন
—এটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম প্রকাশ্য বিজয়।

وَأَنذَرْتُكُمْ دَارَ الْفُتُورِ - অর্থাৎ, তোমরা সংখ্যায় অল্প ও সাজ-সরঞ্জামে
নগণ্য ছিলে। সহীহ রেওয়ায়েতে অনুযায়ী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৩৩০
জন। তাদের সঙ্গে অশু ছিল মাত্র ২টি এবং উট ৭০টি। সৈন্যরা পালাক্রমে
এগুলোর উপর সওয়ার হয়ে যুদ্ধ করতেন।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে : فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় কর — যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

কোরআন পাক স্থানে স্থানে মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র ও শত্রুদের শত্রুতার
অশুভ পরিণাম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ধৈর্য ও খোদাভীতিতে প্রতিকার
হিসেবে বর্ণনা করেছে। বলাবাহুল্য, এ দুইটি বিষয়ের মধ্যেই সম্বন্ধ
সাংগঠনিক তৎপরতা ও প্রকাশ্য বিজয়ের রহস্য নিহিত। পূর্বেও একথা
বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ধৈর্য ও আল্লাহ্র প্রতি ভয় এ উভয়টিকে
উল্লেখ না করে শুধু তাকওয়া বা আল্লাহ্র প্রতি ভয় এর কথা উল্লেখ করা
হয়েছে। তার কারণ, তাকওয়া প্রকৃতপক্ষে একটি ব্যাপক গুণ। ধৈর্য ও এর
অন্তর্ভুক্ত।

ফেরেশতা প্রেরণের রহস্য : এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে যে,
আল্লাহ্ তাআলা ফেরেশতাদের প্রভূত শক্তি দান করেছেন। একজন
ফেরেশতা একাই গোটা জনপদ উষ্টে দিতে পারেন। উদাহরণত :
কওমে-লুতের বস্তি একা জিবরাঈলই (আঃ) উষ্টে দিয়েছিলেন।
এমতাবস্থায় এখানে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন
ছিল?

এছাড়া ফেরেশতারা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণই করেছিল, তখন
একটি কাকেরেরও প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এসব
প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং কোরআন পাক وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُرْهَانًا আয়াতে
দিয়েছে। অর্থাৎ, ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য তাঁদের দ্বারা যুদ্ধ জয়
করানো ছিল না; বরং উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম বাহিনীকে সান্ত্বনা প্রদান করা,
তাদের মনোবল দৃঢ় করা এবং বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া। আয়াতের শব্দ
وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُرْهَانًا থেকে এ কথাই ফুটে উঠেছে। এ ঘটনা
সম্পর্কেই সূরা আনফালে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে : فَكَرَّرْنَا
الَّذِينَ آمَنُوا ফেরেশতাদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমরা
মুসলমানদের অন্তর স্থির রাখ — অস্থির হতে দিয়ো না। অন্তর স্থির রাখার
বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সুফীবাদী সাধকগণের নিয়ম
মাফিক ‘তাসাররুফ’ তথা অবস্থান্তরকরণের মাধ্যমে অন্তরকে সুদৃঢ় করে
দেয়া।

আরেকটি পন্থা, কোন না কোন উপায়ে মুসলমানদের সামনে একথা
ফুটিয়ে তোলা যে, আল্লাহ্র ফেরেশতারা তাদের সাহায্যার্থে দাঁড়িয়ে
রয়েছেন। যেমন কখনও দৃষ্টির সন্মুখে আত্মপ্রকাশ করে, কখনও
আওয়াজ দিয়ে এবং কখনও অন্য কোন উপায়ে। বদরের রণক্ষেত্রে এসব
উপায়ই ব্যবহৃত হয়েছে। فَاصْبِرُوا فَوَاقِيَ الْكَفَّارِ — আয়াতের এক
তফসীর অনুযায়ী এতে ফেরেশতাদের সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন

হুদীসে আছে, ফেরেশতারা কোন মুশরিকের উপর আক্রমণ করার ইচ্ছা করতেই আপন-আপনি তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো।—
(হাকেম)

কোন কোন সাহাবী জিবরাঈলের আওয়াজ শুনেছেন যে, তিনি **اِذَا** **حِزْمٍ** বলেছেন। কেউ কেউ কতক ফেরেস্টাকে দেখেছেনও।—
(মুসলিম)

উপরোক্ত ঘটনাবলী এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, কিছু কিছু কাজের মাধ্যমে ফেরেশতাগণ মুসলমানদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, তারাও যেন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের কাজ ছিল মুসলমানদের মনোবল অটুট রাখা এবং সান্ত্বনা দেয়া। ফেরেশতাদের দ্বারা যুদ্ধ করানো কখনও উদ্দেশ্য ছিল না। এর আরও একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, এ জগতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও জেহাদের দায়িত্ব মানুষের স্ফক্ষে অর্পণ করা হয়েছে। সে কারণেই তারা সওয়াব, ফযীলত ও উচ্চমর্যাদা লাভ করে। ফেরেশতা-বাহিনী দ্বারা দেশ জয় করা যদি আল্লাহর ইচ্ছা হতো, তাহলে পৃথিবীতে কাফেরদের রাষ্ট্র দুরের কথা, তাদের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেতো না। এ বিশু চরাচরে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা তা নয়। এখানে কুফর, ইমান, ইবাদত ও গোনাহ মিশ্রিতভাবেই চলতে থাকবে। এদের পরিষ্কার পৃথকীকরণের জন্যে হাশরের দিন নির্ধারিত রয়েছে।

বদরের যুদ্ধে ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা প্রসঙ্গে ফেরেশতাদের সংখ্যা বিভিন্ন সূরায় বিভিন্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আনফালের আয়াতে এক হাজার, সূরা আল-ইমরানের আয়াতে প্রথমে তিন হাজার এবং পরে পাঁচ হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করা হয়েছে। এর রহস্য কি? উত্তর এই যে সূরা আনফালে বলা হয়েছে, বদর যুদ্ধে মুসলমানগণ (যাদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের) শত্রু সংখ্যা এক হাজার দেখে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। এতে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করার ওয়াদা করা হয়। অর্থাৎ, শত্রু সংখ্যা যত, ততসংখ্যক ফেরেশতা প্রেরণ করা হবে। আয়াতের ভাষা এরূপ :

اِذْ تَسْتَوِيُونَ رُكُومًا فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اٰتٰىكُمْ مِّمَّا لَا تُلْقُونَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مَزُوٰدِيْنَ

—যখন তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের জবাব দেন যে, আমি এক হাজার অনুসরণকারী ফেরেশতার দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবো। এ আয়াতের পরও ফেরেশতা প্রেরণের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে—মুসলমানদের মনোবল অটুট রাখা এবং বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করা। পরবর্তী আয়াতেই এ :

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُرْهٰنًا وَلِتُذَكِّرُوْا بِهِ ذُلُوْكُمْ

সূরা আল-ইমরানের আলোচ্য আয়াতে তিন হাজার ফেরেশতার ওয়াদা করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, বদরের মুসলমানদের কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, কুরয ইবনে জাবের মুহারেবী স্বীয় গোত্রের বাহিনী নিয়ে কোরাইশদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসছে। —(রুহুল-মা'আনী) পূর্বেই শত্রুদের সংখ্যা মুসলমানদের তিনগুণ বেশী ছিল। এ সংবাদ মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিলে তিন হাজার ফেরেশতা প্রেরণের ওয়াদা করা হয়—যাতে শত্রুদের চাইতে মুসলমানদের সংখ্যা তিন গুণ বেশী হয়ে যায়।

অতঃপর এ আয়াতের শেষ ভাগে কয়েকটি শর্ত যোগ করে এ সংখ্যাকে বৃদ্ধি করে পাঁচ হাজার করে দেয়া হয়। শর্ত ছিল দু'টি : (এক) মুসলমানগণ ধৈর্য ও আল্লাহুতীতির উচ্চস্তরে পৌঁছলে, (দুই) শত্রু আকস্মিক আক্রমণ চালালে। দ্বিতীয় শর্তটি অর্থাৎ, আকস্মিক আক্রমণ বাস্তবে ঘটেনি, তাই পাঁচ হাজারের ওয়াদা পূরণেরও প্রয়োজন হয়নি। আকস্মিক আক্রমণ না হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর ওয়াদা পাঁচ হাজারের আকারে পূর্ণ করা হয়েছে, না তিন হাজারের আকারে সে সম্পর্কে তফসীর ও ইতিহাসবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রুহুল-মা'আনী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاُمُوْرِ شَيْءٌ - এখান থেকে আবাবো ওহুদের ঘটনায় প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। মাঝখানে সংক্ষেপে বদর যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এ আয়াত অবতরণের হেতু এই যে, ওহুদ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মুখস্থ উপর ও নীচের চারটি দাঁতের মধ্য থেকে নীচের পাটির ডান দিকের একটি দাঁত শহীদ এবং মুখমণ্ডল আহত হয়ে পড়েছিল। এতে দুঃখিত হয়ে তিনি এ বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন : “যারা নিজেদের পয়গম্বরের সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে, তারা কেমন করে সাফল্য অর্জন করবে? অথচ পয়গম্বুর তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করেন।” এরই প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি কোন কোন কাফেরের জন্যে বদদোয়াও করেছিলেন। এতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে **اَضْعَفُا مَّطْفَعَةً** কয়েকগুণ বেশী, অর্থাৎ, চক্রবৃদ্ধি হারকে সুদ হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে অত্যন্ত কঠোরভাবে সর্বাবস্থায় সুদ হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। সূরা বাক্বারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। **اَضْعَفُا مَّطْفَعَةً** কে উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, সুদ গ্রহণে অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি চক্রবৃদ্ধি সুদ থেকে বেঁচেও থাকে, তবে সুদের উপার্জনকে যখন পুনরায় সুদে খাটাবে, তখন অবশ্যই দ্বিগুণের দ্বিগুণ হতে থাকবে—যদিও সুদখোরদের পরিভাষায় একে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হবে না। সারকথা, সব সুদই পরিণামে দ্বিগুণের ওপর দ্বিগুণ সুদ হয়ে থাকে। সুতরাং আয়াতে সর্বকম সুদকেই নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে।

আলোচ্য ১০২ নং আয়াতে দুইটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। (এক) প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের সাথে রসূলের আনুগত্যেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে প্রশিধানযোগ্য যে, রসূলের আনুগত্য যদি হুবহু আল্লাহর এবং আল্লাহর কিতাব কোরআনের আনুগত্য হয়ে থাকে, তবে একে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন কি? পক্ষান্তরে যদি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে, তবে তা কি?

(দুই) আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা মকবুল ও নিষ্ঠাবান পরহেযগার বান্দার গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য শুধু মৌখিক দাবীকে বলা হয় না, বরং গুণাবলী ও লক্ষণাদির দ্বারাই আনুগত্যকারীর পরিচয় হয়।

রসূলের আনুগত্যকে পৃথক করে বর্ণনা করার তাৎপর্য : **وَاطِيعُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَكُمْ** এ প্রথমোক্ত বিষয়টি প্রথম আয়াত **تُحْصَوْنَ** বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর,

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْتُونَ فِي السَّرَّاءِ
وَالضَّرَّاءِ وَالْكُلُمِينِ الْغَیْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَالَّذِينَ إِذَا أَفْعَلُوا فَأَحْسَنَ أَوْ ظَلَمُوا
أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا وَإِلَّا يُنُوبُوا ۖ وَمَنْ يُغْفِرِ
الذَّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ ۝ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ أَهْلِهِمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ
جَنَّةٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَتَىٰهُمُ الْأَنْفَرُ خِلَافَيْنِ فِيهَا وَاجْعَلِ
الْعِلَافَيْنِ ۖ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۝ هَذَا
بَيَٰنٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَلَا تَهِنُوا
لَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝ إِنْ
يَسْتَسْخِمَنَّ قَرْحٌ مِّنَ الْقَوْمِ قَرْحًا مِّثْلَهُ وَلَيْسَ
الْكَافِرُ بِكَافِرٍ فَتَاهَيْنِ النَّاسُ ۖ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝
وَيَتَذَكَّرُ مِنْكُمْ شُهَدَاءُ ۖ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝

(১৩৩) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কমা এবং জ্ঞানাতের দিকে ছুটে যাও যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও যমীন, যা তৈরী করা হয়েছে পরহেয্যারদের জন্য। (১৩৪) যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি কমা প্রদর্শন করে, বস্ত্তত তন্নাহ সংকশ্মলদিগকেই ভালবাসেন। (১৩৫) তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর জুলুম করে ফেললে আন্নাহকে সুরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য কমা প্রার্থনা করে। তন্নাহ ছাড়া আর কে পাপ কমা করবেন? তারা নিজের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শনে তাই করতে থাকে না। (১৩৬) তাদেরই জন্য প্রতিদান হলো তাদের পালনকর্তার কমা ও জ্ঞানাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রসবণ—যেখানে তারা থাকবে অনন্ডকাল। যারা কাজ করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান। (১৩৭) তোমাদের আগে অতীত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ। তোমরা পৃথিবীতে ব্রমণ কর এবং দেখ—যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (১৩৮) এই হলো মানুষের জন্য বর্ণনা। আর যারা ভয় করে তাদের জন্য উপদেশবাণী। (১৩৯) আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে। (১৪০) তোমরা যদি আহত হয়ে থাক, তবে তারাও তো তেমন আহত হয়েছে। আর এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন ঘটিয়ে থাকি। এভাবে তন্নাহ জ্ঞানতে চান—কারা ইম্যানদার আর তিনি তোমাদের কিছু লোককে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। আর তন্নাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না।

যাতে তোমাদের প্রতি করুণা করা হয়। এতে আল্লাহর করুণালাভের জন্যে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যকে যেমন অব্যাহতকারী ও অপরিহার্য করা হয়েছে, তেমনি রসূল (সাঃ) —এর আনুগত্যকেও জরুরী ও অপরিহার্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু এ আয়াতেই নয়, বরং সমস্ত কোরআনে বার বার এর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং সেখানেই আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই রসূলের আনুগত্যকেও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন পাকের এই উপবৃণ্ডটি ও অব্যাহত বাণী ইফসার ও ইমানের এ মুনীতিটির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, ইমানের ধ্বংস অংশ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, একত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করা এক দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে রসূল (সাঃ) —এর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য করা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৩৩ নং আয়াতে ক্বাও জন্মান্তের দিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ও রসুলের আনুগত্যের পর এটি দ্বিতীয় নির্দেশ। এখানে ক্বার অর্থ এমন সংকর্ম, যা আল্লাহ্ তাআলার ক্বা লাভ করার কারণ হয়। সাহাবী ও তাবয়ীগণ বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু সারমর্ম সবগুলোরই এক। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, ‘কর্তব্য পালন’, হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ‘ইসলাম’, আবুল আদ্বিয়া ‘হিজরত’, আনাস ইবনে-মালেক ‘নামাযের প্রথম তাকবীর’, সাদীদ ইবনে-জুবায়ের ‘এবাদত পালন’, যাহ্যাক ‘জেহাদ’ এবং ইকরিমা ‘তওবা’ বলেছেন। এসব উক্তির সারকথা এই যে, ক্বা বলে এমন সংকর্ম বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্র ক্বার কারণ হয়ে থাকে।

এখানে দুইটি বিষয় প্রশিক্ষানবোধ্য। (এক) এ আয়াতে ক্বা ও জ্ঞান্নাতের দিকে শাবিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ অন্য এক আয়াতে

وَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامَةُ - ৬

কাজের দৌলতে একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বাসনা করতে নিষেধও করা হয়েছে।

উত্তর এই যে, শ্রেষ্ঠত্ব দু'প্রকার (এক) ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা অর্জন করা মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির বাইরে। এগুলোকে অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। উদাহরণতঃ শ্বেতাক হওয়া, সূরী হওয়া, বুয়ুর্গ পরিবারভুক্ত হওয়া ইত্যাদি। (দুই) ঐ শ্রেষ্ঠত্ব, যা মানুষ অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা অর্জন করতে পারে। এগুলোকে ইচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্ব বলা হয়। অনিচ্ছাধীন শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে অন্যের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেষ্টা এবং বাসনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, ঐ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ্ স্বীয় হেকমত অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বন্টন করেছেন। এতে কারও চেষ্টার কোন দখল নাই। সুতরাং যত চেষ্টা ও বাসনা ই করা হোক না কেন ঐ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে না। চেষ্টাকরীর মনে হিংসা ও শত্রুতার আগুন জ্বলা ছাড়া আর কোন ফায়দা হবে না। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি কৃষ্ণাক। সে যদি শ্বেতাক হওয়ার বাসনা করতে থাকে, এতে লাভ কি? তবে যেসব শ্রেষ্ঠত্ব ইচ্ছাধীন সেগুলোকে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে অর্জন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা শুধু এক আয়াতে নয়— বহু আয়াতে ঐ নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে : **فَالْيَقِينُ الْخَالِقُ** পুনর্যর্জনে একে অন্যকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাও। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে : **فَإِنَّكَ فَلَيْتَانِ** **الْمُنْفِسُونَ** জনৈক বুয়ুর্গ বলেন : যদি কারও মধ্যে এমন কোন সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত ক্রটি থাকে, যা দূর করা তার সাধ্যাতীত, তবে ঐ ক্রটি স্বীকার

করে নিয়ে অন্যের গুণের দিকে না তাকিয়ে স্বীয় কাজ করে যাওয়াই তার উচিত। কেননা, সে যদি নিজ ক্রটির জন্যে অনুতাপ ও অন্যের গুণের জন্যে হিংসা করতে থাকে, তবে যতটুকু কাজ করা সম্ভব ততটুকুও করতে পারবে না এবং একেবারে অর্থহীন হয়ে পড়বে।

এখানে প্রশ্নবিধানযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আল্লাহ্ তাআলা আয়াতে ক্ষমাকে জ্ঞানাতের পূর্বে উল্লেখ করে সম্ভবতঃ এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, জ্ঞানাত লাভ করা আল্লাহর ক্ষমা ছাড়া সম্ভব নয়। কেননা, মানুষ যদি জীবনভর পুণ্য অর্জন করে এবং গোনাহ থেকে বৈতে থাকে, তবুও তার সমগ্র পুণ্যকর্ম জ্ঞানাতের মূল্য হতে পারে না। জ্ঞানাত লাভের পথ মাত্র একটি। তা'হুজ্জ আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমা ও অনুগ্রহ। রসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন :

—‘সত্যতা ও সত্য অবলম্বন কর মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের সুসংবাদ লাভ কর। কারও কর্ম তাকে জ্ঞানাত নিয়ে যাবে না। শ্রোতারা বললো : আপনাকেও নয়কি—ইয়া রসূলুল্লাহ! উত্তর হলো : আমার কর্ম আমাকেও জ্ঞানাতে নেবে না। তবে আল্লাহ্ যদি স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকে আবৃত করে নেন।’

মোটকথা এই যে, আমাদের কর্ম জ্ঞানাতের মূল্য নয়। তবে আল্লাহ্ তাআলার রীতি এই যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহে ঐ বান্দাকেই দান করেন, যে সৎকর্ম করে। বরং সংকর্মের সামর্থ্য লাভ হওয়াই আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির লক্ষণ। অতএব সংকর্ম সম্পাদনে ক্রটি করা উচিত নয়। আল্লাহর ক্ষমাই জ্ঞানাত প্রবেশের আসল কারণহেতু এর প্রতি গুরুত্বদানের উদ্দেশ্যে একে এককভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্যে **مَنْ عَمِلْ** বলা হয়েছে। ‘পালনকর্তা’ বিশেষণ উল্লেখ করার উদ্দেশ্য আরও কৃপা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করা।

আয়াতে জ্ঞানাত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর বিস্তৃতি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমান। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের চাইতে অধিক বিস্তৃত কোন বস্তু মানুষ কল্পনা করতে পারে না। এ কারণে বোঝাবার জন্যে জ্ঞানাতের প্রশস্ততাকে এ দু’টির সাথে তুলনা করে বোঝানো হয়েছে যে, জ্ঞানাত বৃহৎ বিস্তৃত। প্রশস্ততায় তা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে নিজের মধ্যে ধরে নিতে পারে। এর প্রশস্ততাই যখন এমন, তখন দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে, তা আল্লাহ্ মালুম। আয়াতের এ ব্যাখ্যা তখন হবে, যখন **عرض** শব্দের অর্থ **طول** তথা দৈর্ঘ্যের বিপরীত নেয়া হয়। কিন্তু যদি এর অর্থ হয় ‘মূল্য’ তবে আয়াতের অর্থ হবে যে, জ্ঞানাত কোন সাধারণ বস্তু নয়—এর মূল্য সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল। সুতরাং এহেন মূল্যবান বস্তুর প্রতি ধাবিত হও।

তফসীর-কবীরে বলা হয়েছেঃ

—‘আবু মুসলিম বলেন : আয়াতে উল্লেখিত **عرض** শব্দের অর্থ ঐ বস্তু যা বিক্রিত বস্তুর মোকবেলায় মূল্য হিসেবে পেশ করা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যদি জ্ঞানাতের মূল্য ধরা হয়, তবে সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের সবকিছু হবে এর মূল্য। এতে করে জ্ঞানাত যে বিশাল ও অমূল্য বিষয় তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য।’

জ্ঞানাতের দ্বিতীয় বিশেষণে বলা হয়েছে : **أُتِّدَّتِ لِلْيُسْرَىٰ** অর্থাৎ, জ্ঞানাত মোস্তাকীফগের জন্যে নির্মিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, জ্ঞানাত সৃষ্ট হয়ে গেছে। কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, জ্ঞানাত সপ্তম আকাশের উপরে অবস্থিত এবং সপ্তম আকাশই তার ঘর।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা বিশাসী মোস্তাকীদের বিশেষ গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা করেছেন। এসব গুণ ও লক্ষণের সাথে অনেক তাৎপর্য নিহিত। উদাহরণতঃ কোরআন পাক স্থানে স্থানে সংলোকদের সর্গ ও তাদের শিক্ষা থেকে উপকৃত হওয়ার প্রতি জোর দিয়েছে।

কোথাও **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** বলে দ্বীনের সরল ও বিশুদ্ধ পথ তাদের কাছ থেকে শিক্ষা করার প্রতি ইশারা করেছে এবং কোথাও

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ বলে তাদের সর্গের বিশেষ কার্যকারিতা নির্দেশ করেছে। জগতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার লোকই রয়েছে। ভাল লোকদের পোশাকে মন্দরাও অনেক সময় তাদের স্থান দখল করে বসে। এ কারণে সৎ ও মোস্তাকীদদের বিশেষ লক্ষণ ও গুণাবলী বর্ণনা করে একথা বুঝিয়ে দেয়ার প্রয়োজন ছিল যে, মানুষ যেন ব্রাহ্ম প্রপঞ্চদর্শক ও নেতাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে এবং সাক্ষাৎ লোকদের লক্ষণ চিনে নিয়ে তাদের অনুসরণ করে। বিশাসী মোস্তাকীদদের গুণাবলী ও লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও জ্ঞানাতের উচ্চস্তর বিধৃত করে সংলোকদের সুসংবাদ এবং অসৎ লোকদের জন্যে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদানের পথ খোলা হয়েছে। উপসংহারে **هَذَا يَكُونُ**

لِلْأَنفُسِ وَهَدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ বলে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের যেসব গুণ ও লক্ষণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে প্রাথমিক আয়াতসমূহে মানবীয় অধিকার ও পারস্পরিক জীবন-যাপন সম্পর্কিত গুণাবলী ব্যক্ত হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার এবাদত ও আনুগত্য সম্পর্কিত গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে। শব্দান্তরে প্রথমোক্ত গুণাবলীকে ‘হুকুল-ইবাদ’ (বান্দার হক) এবং শেষোক্ত গুণাবলীকে ‘হুকুল্লাহ’ (আল্লাহর হক) বলা যেতে পারে।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলী আগে এবং আল্লাহর অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলীকে পরে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আসলের দিক দিয়ে যদিও আল্লাহর অধিকার সব অধিকারের চাইতে অগ্রগণ্য, তবুও এতদুভয়ের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা বান্দার উপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন সত্য, কিন্তু এতে আল্লাহ্ তাআলার নিজস্ব কোন লাভ বা স্বার্থ নাই এবং এসব অধিকারের প্রয়োজনও তাঁর নাই। বান্দা এসব হক আদায় না করলে আল্লাহ্ তাআলার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। তাঁর সন্তা সব কিছুর উদ্দেশ্যে। তাঁর এবাদত দ্বারা স্বয়ং এবাদতকারীই উপকৃত। তদুপরি তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দাতাও বটে। তাঁর অধিকারে সর্বাধিক ক্রটিকারী ব্যক্তি যখনই স্বীয় কৃতকর্মের জন্যে অনুতাপ হয়ে তাঁর দিকে ধাবিত হয় এবং তওবা করে, তখনই তাঁর দয়ার দরবার থেকে এক নিমিষের মধ্যে তওবাকারীর সব গোনাহ মাফ হয়ে যেতে পারে। হুকুল-ইবাদ কিন্তু এমন নয়। কেননা, বান্দা স্বীয় অধিকারের প্রতি মুখাপেক্ষী। তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করা না হলে তার ভয়ানক ক্ষতি হয়। এ ক্ষতি মাফ করে দেয়াও বান্দার পক্ষে সহজ নয়। এ কারণেই বান্দার অধিকার বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

এতদ্ব্যতীত পারস্পরিক অধিকার আদায়ের উপরই বিশৃঙ্খলতার সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মানব সমাজের সংশোধন সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। এর সামান্য ক্রটিই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও গোলযোগের পথ খুলে দেয়। পক্ষান্তরে পারস্পরিক অধিকার আদায়ের মাধ্যমে উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতে পারলে শত্রু ও মিত্রে পরিণত হয়ে পড়ে এবং শতাব্দীকালের যুদ্ধ ও শান্তি

সম্ভাভ্যায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। এসব কারণেও মানবীয় অধিকার সম্পর্কিত গুণাবলীকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে :

الَّذِينَ يُؤْتُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

অর্থাৎ, মোতাকী তারাই,

যারা আল্লাহ তাআলার পথে স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত। স্বচ্ছলতা হোক কিংবা অভাব-অনটন হোক, সর্বাবস্থায় তারা সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখে। বেশী হলে বেশী এবং কম হলে কমই ব্যয় করে। এতে একদিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দরিদ্র ও নিঃস্ব ব্যক্তিও আল্লাহর পথে ব্যয় করতে নিজে থেকে মুক্ত মনে করবে না এবং এ সৌভাগ্য থেকে নিজে থেকে বঞ্চিত রাখবে না। কেননা, হাজার টাকা থেকে এক টাকা ব্যয় করার যে মর্তবা আল্লাহর কাছে হাজার পয়সার এক পয়সা ব্যয় করারও একই মর্তবা। কার্যক্ষেত্রে হাজার টাকার মালিকের পক্ষে এক টাকা আল্লাহর পথে ব্যয় করা যেমন কঠিন নয়, তেমনি হাজার পয়সার মালিকের পক্ষে এক পয়সা ব্যয় করতেও কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

অপরদিকে আয়াতে এ নির্দেশও রয়েছে যে, অভাব-অনটনেও সাধ্যানুযায়ী ব্যয়কার্য অব্যাহত রাখলে আল্লাহর পথে ব্যয় করার কল্যাণকর অভ্যাসটি বিনষ্ট হবে না। সম্ভবতঃ এর বরকতে আল্লাহ তাআলা আর্থিক স্বচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।

আয়াতে তৃতীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে। তা এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে অন্যের উপকার ও দরিদ্রদের সাহায্য করার অভ্যাস গড়ে তোলে, সে কখনও অপরের অধিকার স্বর্ষ করতে প্রবৃত্ত হবে না এবং অপরের সম্পদ সম্মতি ব্যতিরেকে হস্তগত করে ফেলার ইচ্ছা করবে না। অতএব প্রথমোক্ত এ গুণটির সারমর্ম হল এই যে, বিশ্বাসী, আল্লাহভীরু এবং আল্লাহর প্রিয়বান্দারা অপরের উপকার সাধনের চিন্তায় সদা ব্যাপৃত থাকেন; তারা স্বচ্ছলই হোক কিংবা অভাবগ্রস্ত। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একবার মাত্র একটি আঙ্গুরের দানা খয়রাত করেছিলেন। তখন তাঁর কাছে এ ছাড়া কিছুই ছিল না।

আল্লাহর পথে শুধু অর্থ ব্যয় করাই জরুরী নয় : আয়াতে আরও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ফোরআন **يُؤْتُونَ** বলে ব্যয় করার কথা উল্লেখ করেছে, কিন্তু কি ব্যয় করবে, তার কোন উল্লেখ নেই। এ ব্যাপকতা থেকে বোঝা যায় যে, শুধু অর্থ সম্পদই নয় বরং ব্যয় করার মত প্রত্যেক বস্তুই এর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণতঃ কেউ যদি তার সময়, কিংবা শ্রম আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তাহলে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

স্বচ্ছলতা ও অভাব-অনটন উল্লেখ করার আরও একটি রহস্য : এ দু'অবস্থায়ই মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য হলে আরাম-আয়েশে ডুবে মানুষ আল্লাহকে বিস্মৃত হয়। অপরদিকে অভাব-অনটন থাকলে প্রায়ই সে চিন্তায় মগ্ন হয়ে আল্লাহর প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা আরাম-আয়েশেও আল্লাহকে ভুলে না কিংবা বিপদাপদেও আল্লাহর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে না।

আলোচ্য সূর্য্য ওহুদ যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে জানা গেছে যে, কতিপয় ক্রটি-বিচ্যুতির কারণে এ যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করার পর অবশেষে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করে। সত্তরজন সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) আহত হন। কিন্তু এ সবার পর আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়।

এ সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ ছিল তিনটি। (এক) —রসূলুল্লাহ (সঃ) তীরন্দাজ বাহিনীর প্রতি যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত পালিত হয়নি। কেউ বলতো : আমাদের এখানেই অটল থাকা দরকার। অধিকাংশের মত ছিল এখন এ জায়গায় অবস্থান করার কোন প্রয়োজন নেই। সবার সাথে মিলিত হয়ে শত্রুদের পরিত্যক্ত সামগ্রী আহরণ করা উচিত। (দুই) —খোদ নবী করীম (সঃ) —এর নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই ভীত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। (তিন) —মদীনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবেলা করার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ) —এর আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমানদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ সাময়িক পরাজয় অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিল সত্য ; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জঞ্জরিত ছিলেন। মুসলিম বীরদের মৃতদেহ ছিল চোখের সামনে। রসূলুল্লাহ (সঃ) —কেও হতভাগারা আহত করে দিয়েছিল। সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। মুসলিম মুজাহিদগণ স্বীয় ক্রটি-বিচ্যুতির জন্যেও বেদনায় মুগ্ধে পড়েছিলেন। সার্বিক পরিস্থিতিতে দু'টি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। (এক) অতীত ঘটনার জন্যে দুঃখ ও বিষাদ। (দুই) আশঙ্কা যে, ভবিষ্যতের জন্যে মুসলমানগণ যেন দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব-নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এ জাতি অস্থিরেই না মনোবল হারিয়ে ফেলে। এ দুইটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্যে ফোরআন পাকের এ বাণী অবতীর্ণ হয়—

وَلَا تَهْزُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْغَالِبُونَ إِنَّكُمْ مُرْسِلُونَ

অর্থাৎ, 'ভবিষ্যতের জন্যে তোমরা দৌর্বল্য ও শৈথিল্যকে কাছে আসতে দিয়ো না এবং অতীতের জন্যেও বিমর্ষ বিষণ্ণ হয়ো না। যদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাক এবং আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপর ভরসা রেখে রসূলের (সঃ) আনুগত্য ও আল্লাহর পথে জেহাদে অনড় থাক, তবে পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।'

উদ্দেশ্য এই যে, অতীতে যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে, তার জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ সংশোধনের চিন্তা করা দরকার। ঈমান, বিশ্বাস ও রসূলের আনুগত্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিশারী। এগুলো হাতছাড়া হতে দিয়ো না। পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।

ফোরআন পাকের এ বাণী ভগ্ন হৃদয়কে জুড়ে দিল এবং মৃতপ্রায় দেহ সঞ্জীবনীর কাজ করল। চিন্তা করুন, আল্লাহ তাআলা কিভাবে সাহাবায়ে-কেরামের আত্মিক চেতনাকে সঞ্জীবিত করেছেন। তিনি চিরদিনের জন্যে তাদের একটি মূলনীতি দিয়ে দিলেন যে, অতীত বিষয়াদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় সময় নষ্ট না করে ভবিষ্যৎ শক্তি ও প্রভাব সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। সাথে সাথে একথাও বলে দিলেন যে, বিজয় ও প্রাধান্য অর্জনের মূল সহায়ক একটিই। অর্থাৎ, ঈমান ও তার দাবীসমূহ পূরণ করা। যুদ্ধের জন্যে যেসব প্রস্তুতি নেয়া হয়, সেগুলোও ঈমানের দাবীর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, সাময়িক শক্তির দৃঢ়তা, সাময়িক সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং বাহ্যিক উপায়াদি দ্বারা সামর্থ্য অনুপ্রাণী সুসজ্জিত হওয়া। ওহুদ যুদ্ধের সমগ্র ঘটনাবলী এসব বিষয়েরই সাক্ষ্য বহন করে।

এ আয়াতে ভিন্ন ভঙ্গিতে মুসলমানদের সাহসনা দিয়ে বলা হয়েছে এ যুদ্ধে তোমরা আহত ও নিহত হয়েছ ঠিকই, কিন্তু তোমাদের প্রতিপক্ষও তো ইতিপূর্বে এ ধরনের দুর্ভাগ্য পতিত হয়েছে। ওহুদে তোমাদের সত্তর জন শহীদ ও অনেক আহত হয়েছে। এক বৎসর পূর্বে তাদেরও সত্তর জন লোক জাহান্নামবাসী ও অনেক আহত হয়েছিল। স্বয়ং এ যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েও তাদের অনেক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। তাই কোরআন বলে :

إِنْ يَسْتَسْكُمُ فَتَرِ الْقَوْمَ فَفَرُّوا وَثَلَا وَتِلْكَ الْآيَاتُ
نُذِرًا وَلِقَاءِ الْيَوْمِ الْآخِرِ

অর্থাৎ, “তোমাদের গায়ে ক্ষত লেগে থাকলে তাদের গায়েও ইতিপূর্বে এমন ক্ষত গেলেছে। আমি এ দিনগুলোকে পাল্যক্রমে পরিক্রমণ করাই। এতে অনেক রহস্য নিহিত আছে।”

আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তাআলার চিরাচরিত রীতি হচ্ছে যে, তিনি কঠোরতা, নম্রতা, সুখ-দুঃখ, কষ্ট ও আরামের দিনগুলোকে মানুষের মধ্যে চক্রবৎ ঘুরিয়ে আনেন। যদি কোন কারণে কোন মিথ্যা শক্তি সাময়িকভাবে বিজয় ও সাফল্য অর্জন করে ফেলে, তবে তাতে সত্যপন্থীদের হতাদ্যম হয়ে পড়া সঙ্গত নয় এবং এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, এখন থেকে পরাজয়ই তাদের ভাগ্যলিপি হয়ে গেছে। বরং এ পরাজয়ের সঠিক কারণ খোঁজ করে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিশেষে সত্যপন্থীরাই জয়যুক্ত হবে।

আলোচ্য আয়াতগুলোও ওহুদ যুদ্ধের ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব ঘটনা অনেক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই কোরআন পাক সূরা আল-ইমরানের চার পাঁচ রুকু পর্যন্ত ওহুদ যুদ্ধের জয়-পরাজয় ও এতদুভয়ের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক নির্দেশাবলী অব্যাহতভাবে বর্ণনা করেছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে কতিপয় সাহাবীর একটি বিদ্রূতি জন্যে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে মৌলিক বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ বিষয়টিতে মুসলমানদের কার্যতঃ পাকাপোক্ত করার জন্যেও ওহুদ যুদ্ধে সাময়িক পরাজয়, হযর (সাঃ)—এর আহত হওয়া, তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়া, তজ্জন্যে কতিপয় সাহাবীর হতাদ্যম হয়ে পড়া প্রভৃতি ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে। বিষয়টি এইঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি ভালবাসা রাখা ও তাঁর মাহাত্ম্য স্বীকার করা মুসলমানের ইমানের অংশবিশেষ। ইসলামী মূলনীতিতে এ বিষয়টির গুরুত্ব অত্যধিক। এ ব্যাপারে সামান্য দুর্বলতাকেও কুফরের নামান্তর বলা হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এর সাথে সাথে এ বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, মুসলমানরাও যেন ঐ রোগে আক্রান্ত না হয়ে পড়ে, যাতে খ্রীষ্টান ও ইহুদীরা আক্রান্ত হয়েছিল। খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)—এর ভালবাসা ও মাহাত্ম্যকে এবাদত ও আরাধনার সীমা পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছে এবং তাঁকে আল্লাহর সাথে শরীক করে নিয়েছে।

ওহুদ যুদ্ধের সাময়িক পরাজয়ের সময় কেউ একথা রটিয়ে দিয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর গুফাত হয়ে গেছে। তখন সাহাবায়ে-কেরামের যে কি অবস্থা হয়েছিল এবং হওয়া উচিত ছিল, তা সামান্য অনুমান করাও

(১৪১) আর এ কারণে আল্লাহ ইমানদারদেরকে পাক-সাফ করতে চান এবং কাকেরদেরকে ধ্বংস করে দিতে চান। (১৪২) তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জ্ঞানভেদে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনও দেখছেন তোমাদের মধ্যে কারা জেহাদ করেছে এবং কারা বৈয়তীল? (১৪৩) আর তোমরা তো মৃত্যু আসার আগেই মরণ কামনা করতে, কাজেই এখন তো তোমরা তা চোখের সামনে উপস্থিত দেখতে পাছ। (১৪৪) আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ তো নয়। তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তাহলে কি তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুতঃ কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে তাল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সওয়াব দান করবেন। (১৪৫) আর তাল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না—সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে, আমি তাকে তা দুনিয়াতেই দান করব। পক্ষান্তরে—যে লোক আখেরাতে বিনিময় কামনা করবে, তা থেকে—আমি তাকে তাই দেবো। আর যারা কৃতজ্ঞ তাদেরকে আমি প্রতিদান দেবো। (১৪৬) আর বহু নবী ছিলেন; যাদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জেহাদ করেছে; আল্লাহর পথে—তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু তাল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (১৪৭) তারা আর কিছুই বলেনি—শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা। মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়ানো হয়েছে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদেরকে দৃঢ় রাখ এবং কাকেরদের উপর আমাদেরকে সাহায্য কর।

সবার পক্ষে সহজ নয়। রসুল্লাহ (সাঃ)-এর মহব্বতে যে সাহাবায়ে কেরাম স্বীয় ধন-দৌলত, সম্ভান-সম্ভতি, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করাকে জগতের সবচাইতে বড় সৌভাগ্য মনে করেছেন এবং কার্যক্ষেত্রে তার পরিচয়ও দিয়েছেন, তাঁদের আত্মনিবেদন ও এশাক-রসুলের স্বর যারা কিছুটা রাখেন, একমাত্র তারা-ই তাঁদের সে সময়কার মস্তুদ অবস্থা কিছুটা অনুমান করতে পারেন।

এসব আশেকানে রসুলের (সাঃ) কানে যখন এ সংবাদ প্রবেশ করেছিল, তখন তাঁদের অনুভূতি কোন পর্যায়ে পৌছেছিল, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। বিশেষ করে যখন যুদ্ধক্ষেত্রে উদ্ভেজনা বিরাজ করছে, বিজয়ের পর পরাজয়ের দৃশ্য চোখের সামনে ভাসছে, মুসলমান যোদ্ধাদের পা উপড়ে যাচ্ছে, এমনি সেক্টে মুহুর্তে যিনি ছিলেন সব প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের মূল কেন্দ্র, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, তিনিও তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। এর স্বাভাবিক ফলশ্রুতি ছিল এই যে, সাহাবায়ে কেরামের একটি বিরাট দল ভয়াবহ হয়ে রণাঙ্গন ত্যাগ করতে লাগলেন। এ পলায়ন জরুরী অবস্থা ও সাময়িক ভয় ভীতির পরিণতি ছিল। খোদা না-খাস্তা, এতে ইসলাম পরিত্যাগ করার কোন ইচ্ছা বা প্ররোচনা কার্যকর ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ স্বীয় রসুলের সাহাবীদের এমন পবিত্র কেরেশত-তুলা দল করতে চান, যারা হবে বিশ্বের জন্যে আদর্শ। এ কারণে তাদের সামান্য বিচ্যুতিকেও বিরাট আকারে দেখা হয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে ত্যাগ করার কারণে সাহাবীগণের এমন কঠোর ভাষায় সম্মোহন করা হয়েছে, যেমন ইসলাম ত্যাগ করার কারণে করা যেতে পারে। তীব্র অসন্তোষ প্রকাশের সাথেই এ মৌলিক বিষয়টির প্রতি হুশিয়ার করা হয়েছে যে, ধর্ম, এবাদত ও জেহাদ আল্লাহ্ তাআলার নিমিত্ত—যিনি চিরজীবী ও সদাশ্রুতিষ্ঠিত। মহাবনী (সাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ সত্য হলেও তাতে অসাধারণ কি? তাঁর মৃত্যু তো একদিন হবেই। এতে মনোবল হারিয়ে ফেলা এবং দ্বীনের কাজ ত্যাগ করা সাহাবায়ে-কেরামের পক্ষে শোভা পায় না। এ কারণেই বলা হয়েছে:

وَمَا مَحْزُونٌ لِّلرَّسُولِ আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, রসুল্লাহ (সাঃ) একদিন না একদিন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন। তাঁর পরও মুসলমানদের ধর্মের উপর অটল থাকতে হবে। এতে আরও বোঝা যায় যে, সাময়িক বিপর্যয়ের সময় হযুর (সাঃ)-এর আহত হওয়া এবং তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পেছনে যে রহস্য ছিল, তা হলো তাঁর

জীবদ্দশাতেই তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী সাহাবায়ে-কেরামের সম্ভাব্য অবস্থার একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলা—যাতে তাদের মধ্যে কোন ক্রটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে হযুর (সাঃ) স্বয়ং তা সংশোধন করে দেন এবং পরে সত্যসত্যই যখন তাঁর ওফাত হবে, তখন আশেকানে-রসুল যেন স্মৃতি হারিয়ে না ফেলেন। বাস্তবে তাই হয়েছে। হযুর (সাঃ)-এর ওফাতের সময় যখন প্রধান প্রধান সাহাবীগণও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রায়িয়াল্লাহু আনহু এ আয়াত তেলাওয়াত করেই তাদের সাব্বনা দেন।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতেও বিপদাপদের সময় অটল থাকার নীকা দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু আল্লাহ তাআলার কাছে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মৃত্যুর দিন, তারিখ, সময় সবই নির্ধারিত, নিশ্চিত সময়ের পূর্বে কারও মৃত্যু হবে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের পরও কেউ জীবিত থাকবে না। এমনতাবস্থায় কারও মৃত্যুতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার কোন অর্থ নেই।

وَمَنْ يُؤَدِّبُكَ رَبُّكَ فَاعْلَمْ

আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, গনীমতের মাল আহরণের চিন্তায় হযুর (সাঃ)-এর অপিত কাজ হেঁদে তারা ভুল করেছিল। স্মর্তব্য যে, গনীমতের মাল আহরণ করাও প্রকৃতপক্ষে নির্ভেজাল দুনিয়া কামনা নয়—যা শরীয়তে নিন্দনীয়, বরং যুদ্ধক্ষেত্রে গনীমতের মাল আহরণ করে সংরক্ষিত করা এবং নির্ধারিত স্থানে ব্যয় করাও জেহাদের অংশবিশেষ এবং এবাদত। উপরোক্ত সাহাবীগণ শুধু জাগতিক লালসার বশবর্তী হয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন নি। কেননা, তাঁরা যদি এ মাল আহরণে অংশগ্রহণ নাও করতেন, তবুও শরীয়তের আইন অনুযায়ী তাঁরা ঐ অংশই পেতেন, যা অংশ গ্রহণের পর পেয়েছেন। কাজেই তাঁরা জাগতিক লোভ-লালসার কারণে স্থান ত্যাগ করেছিলেন একথা বলা যায় না। কিন্তু পূর্বাভাস আয়াতের তফসীরেও বলা হয়েছে যে, বড়দের সামান্য বিচ্যুতিকেই অনেকে বড় মনে করা হয়। মানুষী অপরাধকে কঠোর অপরাধ গণ্য করে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। গনীমতের মাল আহরণ করার সাথে কিছু না কিছু জাগতিক কায়দার সম্পর্ক অবশ্য ছিল। এ সম্পর্কের মন্দ প্রভাব অন্তরে প্রতিফলিত হওয়াও অসম্ভব ছিল না। কাজেই সাহাবায়ে-কেরামের চারিত্রিক মানকে সমুন্নত রাখার জন্যে তাদের এ কার্যকে ‘দুনিয়া কামনা’ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে—যাতে জাগতিক লালসার সামান্য ধূলিকণা তাঁদের অন্তরে স্থান লাভ করতে না পারে।

قَاتِلْهُمْ اللَّهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن
طُيْعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يُزِيدُوا كُفْرَهُمْ وَعَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ فِتْنَةٌ يٰٓأَيُّهَا
خَيْرِينَ ۝ يٰٓلِلَّهِ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ۝
سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَهُمْ النَّادُو
بِشَىْءٍ مِّثْوَى الظَّالِمِينَ ۝ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ
إِذْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ يُبَادِلُكُمْ دَارَ الْآخِرَةِ إِذَا فِئْتَنُوكُمْ وَتَنَزَّاعْتُمْ
فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ
مِنْكُمْ مِّن يُّوْبَى الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ
فَتُصْرَفُ عَنْهُمْ فِئْتَنَتُهُمْ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ إِذْ تَضَعُونَ وَلَا
تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ
قَاتِلِكُمْ عَنَّا لِيُكْفِلَ تَخْرُوجًا عَلَى مَا قَاتَلَكُمْ
وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَيْرُ يُبَادِلُكُمْ ۝

(১৪৮) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ কাফেরদের সওয়াব। আর যারা সংকম্পীল আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।

(১৪৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফেরদের কথা শোন, তাহলে ওরা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। (১৫০) বরং আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য। (১৫১) খুব শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবো। কারণ, ওরা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে যে সম্পর্কে কোন সন্দেহ অবতীর্ণ করা হয়নি। আর ওদের ঠিকানা হলো দোষখের আগুন। বস্তুতঃ কালমদের ঠিকানা অত্যন্ত নিকট! (১৫২) আর আল্লাহর সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে। এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছ ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছ, আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করেছ, তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারো বা কাম্য ছিল আখেরাত। অতঃপর তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের উপর থেকে যাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। বস্তুতঃ তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহর মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। (১৫৩) আর তোমরা উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পেছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারো প্রতি, অথচ রসূল ডাকছিলেন তোমাদিগকে তোমাদের পেছন দিক থেকে। অতঃপর তোমাদের উপর এলো পোকার ওপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দৃষ্টি না কর এবং যার সম্মুখীন হচ্ছে সেজন্য বিমর্ষ না হও। আর আল্লাহ তোমাদের কাজের ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথে জেহাদে অংশগ্রহণকারী আল্লাহ ভক্তদের দৃঢ়তা, বিপদাপদে অস্থির ও দুর্বল না হওয়ার কথা বর্ণনা করার পর তাদের একটি বিরাট গুণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা এ অপূর্ব আত্মত্যাগের মধ্যেও আল্লাহ তাআলার দরবারে কয়েকটি দোয়া করতেন :

এক— আমাদের বিগত অপরাধমূহ ক্ষমা করুন। দুই—বর্তমান জেহাদকালে আমরা যেসব ক্রটি করেছি, তা মার্জনা করুন। তিন — আমাদের দৃঢ়তা বহাল রাখুন। চার — শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী করুন।

এসব দোয়ায় মুসলমানদের জন্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে।

নিজেদের সংকাজের জন্য পর্ব করা উচিত নয় : প্রথম এই যে, সত্যমর্মী মুমিন ব্যক্তি যত বড় সংকর্মই করুক এবং আল্লাহর পথে যত কর্মতৎপরতাই প্রদর্শন করুক, সংকর্মের জন্যে গর্ব করার অধিকার তার নেই। কারণ, তার সংকর্মও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপারই ফলশ্রুতি। এ কৃপা ব্যতীত কোন সংকর্ম হওয়াই সম্ভব নয়। হাদীসে বলা হয়েছে :

فَرَأَى اللَّهُ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَيْنَا
অনুগ্রহ ও কৃপা না হলে আমরা সরল পথ প্রাপ্ত হতাম না এবং আমরা যাকাত ও নামায আদায় করতে পারতাম না।

এতদ্ব্যতীত মানুষ যে সংকর্ম করে, তা যতই সঠিকভাবে করুক না কেন, আল্লাহর শানের উপযুক্ত করে সম্পাদন করা মানুষের সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় আল্লাহর প্রাপ্য আদায়ে ক্রটি-বিচ্যুতি অবশ্যগত। তাই কর্ম সম্পাদনের সময়ও মাগফেরাতের দোয়া করা প্রয়োজন।

এছাড়া উপস্থিত ক্ষেত্রে মানুষ যে সংকর্ম করছে ভবিষ্যতেও তা করার সামর্থ্য হবে এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কাজেই বর্তমান কর্মে ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতেও এর উপর কায়েম থাকার দোয়া মুসলমানদের দৈনিক প্রার্থনা হওয়া দরকার।

আল্লাহর কাছে সাহাবায়ে-কেরামের উচ্চ মর্যাদাঃ এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, ওহদ যুদ্ধে কতিপয় ছাহাবীর মতামত ভ্রান্ত ছিল! একারণে পূর্ববর্তী অনেক আয়াতে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্যে অব্যাহতভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এতসব অসন্তোষ প্রকাশ ও হুশিয়ারীর মধ্যেও সাহাবায়ে-কেরামের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ দর্শনীয়। প্রথমতঃ لَيَسِّرَنَّكُمْ বলে প্রকাশ করেছেন যে, সাময়িক পরাজয়টি সাজা হিসেবে নম্র; বরং পরীক্ষার জন্যে। অতঃপর وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ বলে পরিষ্কার ভাষায় ক্রটি মার্জনার কথা ঘোষণা করেছেন।

কতিপয় সাহাবীর ইহকাল কামনার অর্থ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে-কেরাম তখন দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদল ইহকাল কামনা করছিলেন এবং একদল শুধু পরকালের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কোন কর্মের ভিত্তিতে একদল সাহাবীকে ইহকালের প্রত্যাশী বলা হয়েছে? এটা জানা কথা যে,

এবং সংশোধনের জন্য ছিল, তা সুস্পষ্ট। যে কোন পিতা তার পুত্রকে এবং ওস্তাদ তাঁর শাগরেদকে যে যৎসামান্য শাসন করে থাকেন, তাকেও প্রলিভ পরিভাষায় শাস্তি বলেই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা প্রশিক্ষণ ও সংশোধনেরই একটা রূপ এবং শাসকসুলভ শাস্তি থেকে ভিন্নতর।

ওহুদের ঘটনায় মুসলমানদের উপর বিপদ আসার কারণ : উল্লেখিত বাক্য **لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ** থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তাতে তো একথাই বোঝা যায় যে, এসব বিপদের কারণ ছিল একাডুই আল্লাহর ইচ্ছা, কিন্তু পরবর্তী আয়াতে **إِنَّمَا سَرَّهُ** **الشَّيْطَانُ بَعْضُ مَا كَانُوا** বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, সেই সাহাবীগণের পূর্ববর্তী কোন কোন পদস্খলনই এই প্রতিক্রিয়ার কারণ।

এর উত্তর এই যে, বাহ্যিক কারণ অবশ্য সে পদস্খলনই ছিল, যার ভিত্তিতে তাদের দ্বারা আরো কিছু পাপ করিয়ে নেয়ার জন্য শয়তান প্রলুব্ধ হয় এবং ঘটনাক্রমে তার সে লোভ চরিতার্থও হয়ে যায়। কিন্তু এই পদস্খলন এবং তার পশ্চাদবর্তী ফলাফলের মাঝে নিহিত ছিল এই মৌলিক জগৎপার্থ **لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ** বাক্যে যা বর্ণনা করা হয়েছে। রুহুল-মা'আনী গ্রন্থে যুদ্ধ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, — শয়তান তাঁদেরকে এমন কতিপয় পাপের কথা সুরণ করিয়ে দেয়, যেগুলো নিয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হওয়া সমীচীন মনে হয়নি। সে কারণেই তারা জেহাদ থেকে সরে পড়েন, যাতে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করে পছন্দনীয় অবস্থায় জেহাদ করতে পারেন এবং শহীদ হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে পারেন।

এক পাপও অপর পাপের কারণ হতে পারে : উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা বোঝা গেল যে, একটি পাপ অপর একটি পাপকে টেনে আনে। যেমন একটি পুণ্য আরেকটি পুণ্যকে টেনে আনে। অর্থাৎ, পাপকর্ম ও পুণ্যকর্মের মধ্যে একটা আকর্ষণশক্তি বিদ্যমান রয়েছে। মানুষ যখন কোন একটা পুণ্য বা নেকী সম্পাদন করে, অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, তখন তার পক্ষে অন্যান্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা সহজ হয়ে যায়। তার মনে নেক কাজের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। তেমনিভাবে মানুষ যখন কোন পাপ কার্য সম্পাদন করে ফেলে তখন তা অন্যান্য পাপের পথও সুগম করে দেয়; মনের মধ্যে পাপের আগ্রহ বেড়ে যায়।

আল্লাহর নিকট সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদা : ওহুদের ঘটনায় কোন কোন সাহাবীর দ্বারা যেসব পদস্খলন ও অপরাধ সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত কঠিন। পক্ষাশ জন সাহাবীকে যে অবস্থানে দেখান থেকে না সরার নির্দেশ দিয়ে বসানো হয়েছিল, তাঁদের অধিকাংশই সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন। এই সরে পড়ার পেছনে যদিও তাঁদের এই ধারণা কার্যকর ছিল যে, এখন বিজয় অর্জিত হয়ে গেছে এবং এই নির্দেশ পালন করার প্রয়োজনীয়তা আর অবশিষ্ট নাই। কাজেই এখন নীচে নেমে গিয়ে মুসলমানদের সাথে মিলিত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ম্যানবী (সাঃ)—এর পরিস্কার হেদায়েতের বিরুদ্ধাচরণই ছিল। এই অন্যায় ও ক্রুর ফলেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের ভুলটি সংঘটিত হয়; যদিও এ ব্যাপারেও কোন কোন বিশ্লেষণের সাহায্য নেয়া হয়ে থাকে। যেমন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারপর এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এমন এক অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়, যখন রসুলে করীম (সাঃ) স্বয়ং তাদের সাথে রয়েছেন এবং পেছন থেকে তাদেরকে ডাকছেন। এসব বিষয়কে যদি ব্যক্তিগত এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে পৃথক করে দেখা

যায়, তবে নিঃসন্দেহে এটা এত কঠিন ও ভয়ানক অপরাধ ছিল যে, সাহাবীগণ সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীরা যেসব অপবাদ আরোপ করে থাকে, এটা সেসব অপবাদগুলোর মধ্যকার কঠিন অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে।

কিন্তু লক্ষ্যবীয় যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত ক্রটি-বিদ্রুতি ও পদস্খলন সম্বন্ধে এদের সাথে কি আচরণ করেছেন? উল্লেখিত আয়াতে সে প্রশ্নটি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ বাহ্যিক নেয়ামত তন্মাত্র অবতরণ করে তাদের ক্লান্তি শ্রান্তি ও হতাশা দূর করে দেয়া। তারপর বলে দেয়া হয় যে, তখন মুসলমানদের উপর যে বিপদ এসেছিল, তা শাস্তি কিংবা আযাব ছিল না; বরং তাতে কিছুটা অভিভাবকসুলভ শাসনের লক্ষ্যও নিহিত ছিল। অতঃপর পরিস্কার ভাষায় তাঁদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে একটি শিক্ষা : এখান থেকেই আহলে সুনত ওয়াল জামাআতের সেই আকীদা ও বিশ্বাসের সমর্থন হয় যে, যদিও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সম্পূর্ণভাবে নিশাপ নন, তাঁদের দ্বারা বড় কোন পাপ সংঘটিত হয়ে যাওয়া সম্ভব এবং হয়েছে; কিন্তু তা সম্বন্ধে উম্মতের জন্যে তাঁদের কোন দোষচর্চা কিংবা দোষ আরোপ করা জায়েয নয়। আল্লাহ ও তাঁর রসুলই (সাঃ) যখন তাঁদের এত বড় পদস্খলন ও অপরাধ মার্জনা করে তাঁদের প্রতি দয়া ও করুণাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং তাঁদেরকে 'রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়া রাসু আনহু' — এর মর্যাদায় ভূষিত করেছেন, তখন তাঁদেরকে কোন প্রকার অশালীন উক্তিভেদে সুরণ করার কোন অধিকার অপর কারো পক্ষে কেমন করে থাকতে পারে?

সে জন্যই এক সময় কোন এক সাহাবী যখন হযরত ওসমান ও অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী সম্পর্কে গুজব যুদ্ধের এই ঘটনার আলোচনায় বলেছেন যে, এরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন; তখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন, — আল্লাহ নিজে যে বিষয়ের ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছেন, সে বিষয়ে সমালোচনা করার কোন অধিকার কারো নেই।—(সহীহ বুখারী)

হাক্কেজ ইবনে-তাইমিয়াহ (রাঃ) আকীদায়ে-ওয়াস্তিয়া-গ্রন্থে বলেছেন :

—‘আহলে-সুনত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যেসব মতবিরোধ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে, সে সম্পর্কে কারো প্রতি কোন আপত্তি উত্থাপন কিংবা প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা। কারণ, ইতিহাসে যেসব রেওয়াজেতে তাঁদের ক্রটি-বিদ্রুতিসমূহকে তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যা ও ভ্রান্ত যা শত্রুরা রটিয়েছে। আর কোন কোন ব্যাপার রয়েছে যেগুলোতে কম-বেশী করে মূল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা সংযুক্ত করা হয়েছে। আর যেগুলো প্রকৃতই গুণ্ড সেগুলোও একাডুই সাহাবীগণের স্ব স্ব ইজতিহাদের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছে বিধায় তাঁদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা সমীচীন নয়। বস্তুতঃ ঘটনা বিশেষের মধ্যে যদি তারা সীমালঙ্ঘন করেও থাকেন, তবুও আল্লাহ তা'আলার রীতি হলো **إِنَّ الْحَسَبَ يَدْوِي السَّيِّئَاتِ** অর্থাৎ—সৎকাজের মাধ্যমে অসৎ কর্মের কাফফারা হয়ে যায়। বলাবাহুল্য সাহাবায়ে কেরামের সৎকর্মের সমান অন্য কারো কর্মই হতে পারে না। কাজেই তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমার যতটুকু যোগ্য, তেমন অন্য কেউ নয়। সে জন্যই তাদের আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকার অন্য কারো নেই। তাদের ব্যাপারে কটুক্তি বা অশালীন মন্তব্য করার অধিকারও অন্য কারো নেই।—(আকীদায়ে-ওয়াস্তিয়া)।

ওহুদ যুদ্ধে কোন কোন সাহাবীর যে পদস্থলন এবং তাঁদের যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়ার দরশন হযুরে আকরাম (সাঃ) অন্তরে যে আঘাত পেয়েছিলেন যদিও স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমা, করুণা ও চারিত্রিক কোমলতার দরুন তিনি সেজন্য সাহাবীগণের প্রতি কোন প্রকার ভরসনা করেননি এবং কোন রকম কঠোরতাও অবলম্বন করেননি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর রসুলের (সাঃ) সঙ্গী-সাহাবীগণের মনস্তাটীর উদ্দেশে এবং এই ভুলের দরুন তাঁদের মনে যে দুঃখ ও অনুতাপ হয়েছিল, সে সমস্ত বিষয় ধূয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয়ার লক্ষ্যেই আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে অধিকতর কোমলতা ও করুণা প্রদর্শনের হেদায়েত করা হয়েছে এবং কাজে-কর্মে সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মুর্শিদ ও অভিভাবকদের কয়েকটি গুণ : যে সাহাবায়ে (রাঃ) হযুরে আকরাম (সাঃ)-এর প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন এবং যারা তাঁকে নিজেদের জান-মাল অপেক্ষা অধিক প্রিয়জ্ঞান করতেন, তাঁর হৃদয়ে বিরুদ্ধে যখন তাঁদের দ্বারা একটি পদস্থলন ঘটে যায়, তখন একদিকে নিজেদের পদস্থলন ও বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে অবহিত হওয়ার পর তাঁদের অনুতাপ সীমাহীনভাবে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, যা তাঁদের মন-মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণভাবে অকেজো করে দিতে পারতো কিংবা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে নিরাশ করে তুলতে পারতো। এরই প্রতিকারে পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে **فَاذْكُرُوا الْفَيْحَةَ** এই পদস্থলনের শাস্তি দুনিয়াতেই দেওয়া হয়ে গেছে ; আশেরাতের পাজ পরিষ্কার।

অপরদিকে এই ক্রটি ও পদস্থলনের ফলে রসূল-করীম (সাঃ) আহত হয়ে পড়েন এবং দৈহিক কষ্টও হয়। আত্মিক কষ্ট তো পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিল। কাজেই দৈহিক ও আত্মিক কষ্টের কারণে সাহাবীগণের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল, যা তাঁদের হেদায়েত ও দীক্ষার পথে অন্তরায় হতে পারতো। সেজন্যে মহানবী (সাঃ)-কে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আপনি তাঁদের পদস্থলন ও ক্রটি-বিচ্যুতিসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং ভবিষ্যতের জন্যও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে থাকুন।

এ বিষয়টিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এক বিস্ময়কর বর্ণনাভঙ্গি মাধ্যমে বিবৃত করেছেন যাতে প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

(এক) - হযুরে আকরাম (সাঃ)-কে এসব বিষয়ের নির্দেশ এক ভঙ্গিতে দেয়া-হয়েছে যাতে তাঁর প্রশংসা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিকাশও ঘটে যে, এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য পূর্ব থেকেই আপনার মাঝে বিদ্যমান ছিল।

(দুই) -এর আগে **فَاذْكُرُوا الْفَيْحَةَ** শব্দটি বাড়িয়ে ব্যতলে দেয়া হয়েছে যে, এসব গুণ-বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে আপনার মধ্যে থাকা আমার রহমতের ফলশ্রুতি, কারো ব্যক্তিগত পরাক্রান্তি নয়। তদুপরি রহমত শব্দটিকে সাধারণভাবে ব্যবহার করে রহমতের মহত্ত্ব ও ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে একথাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ রহমত শুধু সাহাবায়ে কেরামের জন্যই নয়, বরং স্বয়ং রসূল-করীম (সাঃ)-এর জন্যও রয়েছে। সে কারণেই আপনাকে গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতা লাভ করা হয়েছে।

অতঃপর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি পরবর্তী বাক্যগুলোর দ্বারা প্রকাশ

وَلَيْنَ مُنَّمْ أَوْفَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ تَخَشُّوْنَ ۖ فَمَا رِجَالُهُمْ
اللَّهُ لَبِئْسَ لَهُمْ وَكَوْكَتُمْ فَطَّا عَلِيْظُ الْقَلْبِ لَا نَفَقُوا مِنْ
حَوْلِكَ قَاغَف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوْهُمْ فِي الْأَنْوَ
فَاذْأَعَزَمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝
إِنْ يَمْشُرْكَ اللَّهُ فَلَا قَالِبَ لَكَ وَإِنْ يَحْذِلْكَ فَمَنْ ذَا الَّذِي
يَنْصُرُكَ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا
كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَفْعَلَ وَمَنْ يَفْعَلْ يَأْتِ بِمَا عَمَلُ يَوْمِ الْآخِرَةِ
فَهُمْ فِي كُلِّ نَفْسٍ فَكَاسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ فَمَنْ آتَبَع
رِضْوَانُ اللَّهِ كَنْزٌ بَارٍ يَسْحَبُ مِنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمُ وَ
بِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَبْصُرُ بِيْسَاءِ
يَعْمَلُونَ ۝ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا
مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ وَلَقَدْ
أَصَابَكُمْ مُّصِيبَةٌ فَمَا أَصَابَكُمْ مِّثْلُهَا أَفْتَلَمْتُمْ أَنْ هَذَا أَقْلُ
هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(১৫৮) আর তোমরা মৃত্যুই বরণ কর অথবা নিহতই হও, অবশ্য আল্লাহ তা'আলার সামনেই সমবেত হবে। (১৫৯) আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন-হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন—আল্লাহর তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন। (১৬০) যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহর ওপরই মুসলমানগণের ভরসা করা উচিত। (১৬১) আর কোন বিষয় গোপন করে রাখা নবীর কাছ নয়। আর যে লোক গোপন করবে সে কিয়ামতের দিন সেই গোপন বস্তু নিয়ে আসবে। অতঃপর পরিপূর্ণভাবে পাবে প্রত্যেক, যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হয় না। (১৬২) যে লোক আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত, সে কি ঐ লোকের সমান হতে পারে, যে আল্লাহর রোষ অর্জন করেছে? বস্তুতঃ তার ঠিকানা হল দোষাক্ষ। আর তা কতইনা নিকট অবস্থান। (১৬৩) আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদা বিভিন্ন স্তরের আর আল্লাহ দেখেন যা কিছু তারা করে। (১৬৪) আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছে যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট। (১৬৫) যখন তোমাদের উপর একটি মুসীবত এসে পৌঁছাল, অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌঁছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে, এটা কোথা থেকে এল? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌঁছেছে তোমারই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিশ্বস্ত উপর ক্ষমতাশীল।

করা হয়েছে যে, এই কোমলতা, সদ্যুবহার, ক্ষমা প্রদর্শন এবং দয়া ও ক্ষমা করার সে গুণ যদি আপনার মধ্যে না থাকত, তবে মানুষের সূক্ষ্মধনের যে দায়িত্ব আপনার উপর সমর্পণ করা হয়েছে তা যথা উদ্দেশ্য সম্পাদিত হতো না। মানুষ আপনার মাধ্যমে আত্ম-সংশোধন ও চরিত্রিক সংস্কার সাধনের উপকারিতা লাভ করার পরিবর্তে আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেতো।

এ সমস্ত বিষয়ের দ্বারা দীক্ষাদান, সংস্কার সাধন এবং ধর্ম প্রচারের পদ্ধতি-পদ্ধতি সম্পর্কে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল। যে ব্যক্তি দীক্ষাদান, সমাজ-সংস্কার এবং ধর্ম প্রচারের কাজে আত্ম-নিয়োগ করার রূপ গ্রহণ করে, তার পক্ষে উল্লেখিত গুণ-বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে যখন আল্লাহ তাআলার শ্রিয়তম রসুলের রচনাতাই সহ্য করা হয়নি, তখন কোন প্রকার কঠোরতা বা চারিত্রিক জনমনীয়তার মাধ্যমে মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং তাদের সংস্কার ও দীক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতে পারবে এমন সাধ্য কার হতে পারে!

সবশেষে বলা হয়েছে **وَمَا يُفْرِيكَ إِلَّا** অর্থাৎ, ইতিপূর্বে যেমন রাজ-কর্ম এবং কোন সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাদের সাথে পরামর্শ করতেন, তেমনভাবে এখনও তাদের সাথে পরামর্শ করুন, যাতে তাঁদের মনে প্রশান্তি আসতে পারে। এতে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, কল্যাণ কামনার যে অনুরাগ তাঁদের অন্তরে বিদ্যমান, তা তাদেরকে পরামর্শের স্বত্বভুক্ত করার মাধ্যমে প্রকাশ করবেন।

এই সমুদয় আয়াতে সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম প্রচারকদের জন্য কয়েকটি বিষয়কে অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ আচার-ব্যবহার ও কথা-বার্তায় রূঢ়তা ও ককর্ষতা পরিহার করা। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোকদের দ্বারা কোন ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে কিংবা ঈমানদার কোন বিষয় সংঘটিত হলে সেজন্য প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে বরং ক্ষমা প্রদর্শন করা এবং সদয় ব্যবহার করা। তৃতীয়তঃ তাদের গণতন্ত্রন ও ভুলভ্রান্তির কারণে তাদের কল্যাণ কামনা থেকে বিরত না থাকা। তাদের জন্যে দোয়া-প্রার্থনা করতে থাকা এবং বাহ্যিক আচার-আচরণে তাদের সাথে সদ্যুবহার পরিহার না করা। উল্লেখিত আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে প্রথমে তো সাহাবীদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং অতঃপর আচরণ-পদ্ধতি সম্পর্কে হেদায়েত দেয়া হয়েছে। পরামর্শ গ্রহণ সম্পর্কে কোরআন-করীম বুজায়গায় সরাসরি নির্দেশ দান করেছে। একটি হলো এই আয়াতে এবং দ্বিতীয়টি হলো সূরা-শুরার সে আয়াতে যাতে সত্যিকার মুসলমানদের গণবৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি গুণ এই বলা হয়েছে যে, **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** অর্থাৎ, (যারা সত্যিকার মুসলমান) তাঁদের প্রতিটি কাজ হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে।

এতদুভয় আয়াতে যেভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শের অপরিহার্যতা ধর্মীয়মান হয়, তেমনভাবে এতে ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও বিধান সংক্রান্ত কয়েকটি মূলনীতিও সামনে এসে যায়। তা হলো এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র হলো একক পরামর্শ-ভিত্তিক রাষ্ট্র যাতে পরামর্শের ভিত্তিতে নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন সম্পন্ন হয়ে থাকে; বংশগত উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে নয়। অধুনা ইসলামী শিক্ষারই দৌলতে সমগ্র বিশ্বে এই মূলনীতি সর্বজনস্বীকৃত সত্যে পরিণত হয়ে গেছে। তদুপরি ব্যক্তি-শাসিত রাজতন্ত্রী সাম্রাজ্যসমূহও জোরে হোক জবরদস্তিতে হোক এ দিকেই চলে আসতে

বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু আজ থেকে চৌদ্দ শ বছর আগেকার যুগের প্রতি লক্ষ্য করুন, যখন সমগ্র বিশ্বে উপর বর্তমান তিন বৃহত্তর স্থলে দুই বৃহত্তর শাসন বিদ্যমান ছিল। তার একটি হলো কিসরার শাসন আর অপরটি হলো কায়সারের শাসন। এতদুভয়ের বিধি-বিধানই ব্যক্তি রাষ্ট্র ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাম্রাজ্য হিসাবে একই পর্যায়ভুক্ত ছিল। এতে এক ব্যক্তি লক্ষ-কোটি বনী-আদমের উপর শাসন করতে নিজের মেধা ও যোগ্যতার বলে নয়, বরং উত্তরাধিকারের নৃশংস ও উৎপীড়নমূলক নীতির ভিত্তিতে। আর মানুষকে গৃহপালিত জানোয়ারের মর্যাদা দেয়াকেও মনে করা হতো একান্ত রাষ্ট্রীয় সম্মান ও এনাম। রাষ্ট্রীয় এই মতবাদই দুনিয়ার অধিকাংশ এলাকার উপর চাপিয়ে রাখা হয়েছিল। শুধুমাত্র গ্রীস গণতন্ত্রের কিছু নমুনার একটা অসম্পূর্ণ রেখা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাও ছিল এতই অস্পষ্ট ও ক্ষীণ যে, তার উপর কোন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করা ছিল একান্তই দুরূহ ব্যাপার। সে কারণেই গ্রীক রাষ্ট্রনীতির ভিত্তিতে কোন স্থিতিশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়নি, বরং সে সমস্ত মূলনীতি এরিস্টটলের দর্শনের একটি শাখা হিসেবে বিদ্যমান রয়ে গেছে। পক্ষান্তরে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের অপ্ৰাকৃতিক নীতি-পদ্ধতিসমূহকে বাতিল করে দিয়ে রাষ্ট্রপ্রধানের নিয়োগ ও অপসারণের বিষয়টি একান্তভাবে জন-সাধারণের অধিকারে তুলে দিয়েছে। যে অধিকারকে তারা নিজেদের প্রতিনিধি এবং বিচক্ষণ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের পথে আটকে পড়া পৃথিবী ইসলামের শিক্ষারই দৌলতে এই ন্যায়সঙ্গত ও প্রকৃতিগ্রাহ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। আজকের পৃথিবী যাকে গণতন্ত্র নামে অভিহিত করেছে, সে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃত প্রাণই হলো এটি।

কিন্তু বর্তমান ধাতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ যেহেতু রাজতান্ত্রিক উৎপীড়ন-নিপীড়নেরই প্রতিক্রিয়ায় অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং তাও এত অসমঞ্জস্যভাবে বিকাশ লাভ করেছে যে, জনসাধারণকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী সাব্যস্ত করে দিয়ে রাষ্ট্রীয় আইন ও শাসন-বিধানের মুক্ত মালিকানা দান করেছে। ফলে তাদের মন-মস্তিষ্ক, আসমান, যমীন ও মানবজাতির দ্রষ্টা আল্লাহ এবং তাঁর প্রকৃত মালিকানা ও রাষ্ট্রাধিকারের কল্পনা থেকেও বিমুক্ত হয়ে পড়েছে। এখন তাদের গণতন্ত্র আল্লাহ তাআলারই দেয়া গণ অধিকারের উপর আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত ব্যাধাবধকতাসমূহকে পর্যন্ত মনের উপর কঠিন চাপ এবং ন্যায়ের পরিপন্থী বলে ধারণা করতে শুরু করেছে।

ইসলামী সংবিধান যেভাবে বনী-আদমকে ‘কাইসার’ ও ‘কিসরার’ এবং ব্যক্তি শাসনের নিপীড়ন-নির্যাতনের নিগড় থেকে মুক্ত করেছে, তেমনভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকেও দেখিয়েছে আল্লাহর আনুগত্যের পথ। কোন দেশের বিধিব্যবস্থা হোক কিংবা জনসাধারণ-সবাইকে একথা বাতলে দেয়া হয়েছে যে, তারা সবাই আল্লাহ তাআলার আইনেরই অনুগত। জনসাধারণ এবং গণসংসদের অধিকার, আইন প্রণয়ন, মনোনয়ন-অপসারণ সবই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখার ভিতরে হতে হবে। শাসক বা নেতার নির্বাচনে, পদ ও দফতর বটনের ব্যাপারে একদিকে তাদের সামর্থ্য ও যোগ্যতার প্রতি যেমন পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, তেমনভাবে তাদের আমানতদারী এবং বিশুস্ততারও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিতে হবে। এমন লোককেই নিজেদের শাসক বা নেতা নির্বাচন করতে হবে, যিনি এলেম ও পরহেযগারী, আমানতদারী ও বিশুস্ততা, সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে হবেন সর্বোত্তম। তদুপরি এ নেতা

নির্বাচন স্বেচ্ছাচারমূলক হবে না, বরং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সৎলোকদের পরামর্শের উপর নির্ভরশীল হবে। কোরআনে-করীমের উল্লেখিত আয়াত এবং রসুলে করীম (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের নীতিই তার প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ) এরশাদ করেছেন, لا خلافة الا عن مشورة অর্থ— পরামর্শকরণ ব্যতীত খোলাফত হতে পারে না।— (কানযুল-উম্মাল)

আলোচনা ও পরামর্শ করাকে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য একটি মৌলিক বিষয় হিসাবে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান যদি কোন সময় পরামর্শের উর্ধ্বে চলে যায় কিংবা এমন ধরনের লোকের সাথে পরামর্শ প্রবৃত্ত হয়, যারা শরীয়তের দৃষ্টিতে পরামর্শের যোগ্য নয়, তবে তাকে অপসারিত করা অপরিহার্য।

পরামর্শ অপরিহার্য হওয়ার কারণে ইসলামী রাষ্ট্র এবং তার অধিবাসীবৃন্দের যে সুফল লাভ হবে, তার অনুমান এভাবে করা যায় যে, রসুল করীম (সাঃ) পরামর্শকে ‘রহমত’ বলে অভিহিত করেছেন। ইবনে ‘আদী ও বায়হাকী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, উল্লেখিত আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, — আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের জন্য এ পরামর্শের কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু আল্লাহ্ এই পরামর্শকে আমার উম্মতের জন্য রহমত সাব্যস্ত করেছেন।—(বয়ানুল-কোরআন)

সারমর্ম এই যে, আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে তাঁর রসুলকে প্রতিটি কাজের ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে বলে দিতেন, পরামর্শের কোন প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট রাখতেন না। কিন্তু হযুরের মাধ্যমে পরামর্শ রীতির প্রচলন করার মাঝেই নিহিত ছিল উম্মতের কল্যাণ ও মঙ্গল। কাজেই আল্লাহ্ বহু বিষয় এমন রেখে দিলেন, যাতে সরাসরি কোন পরিস্কার ওহী নাযিল হয়নি। বরং সেগুলোর ব্যাপারে হযুর-আকরাম (সাঃ)-কে পরামর্শ করে নেয়ার নির্দেশ দান করা হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতে লক্ষ্যণীয় যে, এতে রসুলে করীম (সাঃ)-কে পরামর্শ করার নির্দেশ দেয়ার পর বলা হয়েছে **وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ** অর্থ, পরামর্শ করার পর আপনি যখন কোন একটি দিক সাব্যস্ত করে নিয়ে সেমতে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। এতে **عَزَمْتَ** শব্দে **عزم** অর্থ, নির্দেশ বাস্তবায়নে দৃঢ়সংকল্প হওয়াকে শুধুমাত্র মহানবী (সাঃ)-এর প্রতিই সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। **عزم** (আযামতুম) বলা হয়নি, যাতে সংকল্প ও তা বাস্তবায়নে সাহায্যে কোরামের সংযুক্ততাও বোঝা যেতে পারতো। এই ইঙ্গিতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরামর্শ করে নেয়ার পর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমীর যা করবেন তাই হবে গ্রহণযোগ্য। কোন কোন সময় হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে যদি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-আব্বাসের অভিমত বেশী শক্তিশালী হতো, তখন সেমতেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতেন। অথচ পরামর্শ সভায় অধিকাংশ সময় এমনসব মনীষী উপস্থিত থাকতেন, যারা ইবনে-আব্বাসের তুলনায় বয়স, জ্ঞান ও সংখ্যার দিক দিয়ে ছিলেন গরিষ্ঠ। হযুরে আকরাম (সাঃ) ও অনেক সময় ‘শায়খাইন’ অর্থ, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর মতকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবীদের মতের উপর প্রাধান্য দান করেছেন। এমন কি এমন ধারণাও করা হতে লাগলো যে, উল্লেখিত আয়াতটি এতদুভয়ের সাথে পরামর্শ করার জন্যই নাযিল হয়ে থাকবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, এটা জেগতাত্ত্বিক পদ্ধতির পরিপন্থী এবং ব্যক্তিশাসনের রীতি। তাহাজ্জা এত সংখ্যা গরিষ্ঠের ক্ষতির আশঙ্কাও বিদ্যমান।

উত্তর এই যে, ইসলামী আইন পূর্বাচ্ছেই এর প্রতি লক্ষ্য করেছে। কারণ, যাকে ইচ্ছা রাষ্ট্রপ্রধান বা আমীর বানিয়ে দেয়ার অধিকার জনসাধারণকে সে দেয়নি, বরং জ্ঞান-গরিমা, যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা, আল্লাহভীতি ও বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে যাকে সবচেয়ে ভাল মনে করা হবে, শুধুমাত্র তাকেই তো নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করা জনগণের জন্য অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে। তবে যে ব্যক্তিকে এ সমস্ত উচ্চ গুণ-বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে, তার উপর যদি এমন সন্দেহ দায়িত্ব আরোপ করা হয় যা অবিশ্বাসী, ফাসেক ও ফাজের ব্যক্তির উপর আরোপ করা হয়, তবে তা বুদ্ধি-বিবেচনা ও ন্যায়নীতিকে হত্যা করার নামান্তর এবং যারা কাজের লোক তাদের উৎসাহ ভঙ্গ করা ও রাষ্ট্র কাজকর্মে অন্তরায় সৃষ্টি করার শামিল হবে।

গনীমতের মাল চুরি করা মহাপাপ : কোন নবীর পক্ষে এমপাপের সম্ভাব্যতা নেই : **وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ** আয়াতটি এক বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গনীমতের মাল চুরি করার বিষয়টিও এসে গেছে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ঘটনাটি ছিল এই যে, বদরের যুদ্ধ পর যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মালের মধ্য থেকে একটি চাদর খোয়া যায়। কোন কোন লোক বলল, হয়তো সেটি রসুলুল্লাহ (সাঃ) নিয়ে থাকবেন। এক কথা যারা বলত, তারা যদি মুনাফেক হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্য কিছুই নেই। আর তা কোন অবুঝ মুসলমানের পক্ষে বলাও অসম্ভব না। তবে সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, সে হয়তো মনে করে থাকবে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর তা করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে এ খ্যার অবতীর্ণ হয়, যাতে **غُلُول** বা গনীমতের মালের ব্যাপারে অনধিকার চুরি মহাপাপ হওয়া এবং কেয়ামতের দিন সেজন্য কঠিন শাস্তির কথা আলোচনা করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, কোন নবী সম্পর্কে এমন ধারণা করা যে, তিনিই এহেন পাপ কাজ করে থাকবেন, একান্তই অর্পণীয়। কারণ, নবীগণ হলেন যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত।

غلول শব্দটি সাধারণভাবে খেয়ানত অর্থে এবং বিশেষ করে গনীমতের মালে খেয়ানত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর গনীমতের মাল চুরি কিংবা তাতে খেয়ানত করা সাধারণ চুরি অথবা খেয়ানত অপেক্ষা নীপাপের কাজ। তার কারণ, গনীমতের মালের সাথে গোটা ইসলামী সেনাবাহিনীর অধিকার সংযুক্ত থাকে। কাজেই যে লোক এতে চুরি করে সে চুরি করবে শত-সহস্র লোকের সম্পদ। যদি কখনও কোন সময় জা মনে তা সংশোধন করার খেয়াল হয়, তখন সবাইকে তাদের অধিকার প্রত্যাপণ করা কিংবা সবার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়া একান্তই মুখ্য ব্যাপার। পক্ষান্তরে অন্যান্য চুরির মালের মালিক (সাধারণতঃ) পরিচিত নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কখনও কোন সময় আল্লাহ যদি তওবা করার তওবা দান করেন, তবে তার হক আদায় করে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিয়ে মুক্ত হতে পারে। সে কারণেই কোন এক যুদ্ধে এক লোক যখন কিছু পশম নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছিল, গনীমতের মাল চুরি করার কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন তার মনে হল, ‘তখন সেগুলো বিক্রি গিয়ে হযুর (সাঃ)-এর সমীপে উপস্থিত হল। তিনি রহমতুললিল আলম এবং উম্মতের জন্য পিতা-মাতা অপেক্ষা সদয় হওয়া সত্ত্বেও তাকে বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, এখন এগুলো কেমন করে আমি

মানবাহিনীর মাঝে কটন করব? কাজেই কেয়ামতের দিনই তুমি এগুলো নিয়ে উপস্থিত হইও।

‘গলুল’ তথা গনীরামের মাল চুরি করার ব্যাপারটি অন্যান্য চুরি অপেক্ষা কঠিন পাপ এজন্যই যে, হাশরের ময়দানে যেখানে সমগ্র সৃষ্টি সমবেত হবে, সবার সামনে তাকে সেখানে এমনভাবে লালিত করা হবে যে, চুরি কার বস্ত্র-সামগ্রী তার কাছে চাপানো থাকবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূল করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন : দেখ, কেয়ামতের দিন কারো কাছে একটি উট চাপানো অবস্থায় থাকবে (এবং ঘোষণা করা হবে যে, এ লোক গনীরামের মালের উট চুরি করেছিল) এমন যেন না হয়। যদি সে লোক আমার শা’ফাআত কামনা করে, তবে আমি তাকে পরিষ্কার ভাষায় দাবা দিয়ে দেব যে, আমি আল্লাহর যা কিছু নির্দেশ পেয়েছিলাম, তা সেই পৌছে দিয়েছিলাম, এখন আমি কিছুই করতে পারব না।

আল্লাহ রক্ষা করুন। হাশর মাঠের এই লালনা এমনই কঠিন হবে যে, কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, যাদের সাথে এসব ঘটনা ঘটবে, তারা কামনা করবে যে, আমাদিগকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেয়া হোক, তবু কেন এহেন লালনা-গল্পনা থেকে বেঁচে যাই।

ওয়াকফ ও সরকারী ভাণ্ডারে চুরি করা ‘গলুল’েরই পর্যায়ভুক্ত : ক্ষমতা, মাদ্রাসা, খানকাহ এবং ওয়াকফের মালের অবস্থায় একই রকম, যাতে হাজার-হাজার মুসলমানের চাঁদা বা দান অন্তর্ভুক্ত। ক্ষমতা যদি ক্ষমতা হয়, তবে কার কাছ থেকে ক্ষমা করাবে? এমনভাবে রাষ্ট্রের সরকারী কোষাগার (বায়তুল-মাল) —এর ক্ষমতাও তাই। কারণ, এতে সমগ্র দেশবাসীর অধিকার অন্তর্ভুক্ত। যে লোক এতে চুরি করে, সে স্বায়ত্ত অধিকার চুরি করে থাকে। কিন্তু যেহেতু এ সমস্ত মালেরই কোন এক বা ব্যক্তি-মালিকানা থাকে না, বরং যারা রক্ষণাবেক্ষণ কাজে নিয়োজিত, তারা শৈথিল্য প্রদর্শন করে এবং চুরির সুযোগ-সুবিধাও অধিক থাকে, কাজেই ইদানিংকালে সমগ্র বিশ্বে সবচাইতে বেশী চুরি ও খেয়ানত এ সমস্ত মালেই হচ্ছে। পক্ষান্তরে মানুষ এর কঠিন পরিণতি ও ভয়াবহ পিঙ্গ সম্পর্কে একান্ত নিম্পূহ। তারা যেন এতটুকুও বুঝতে চায় না যে, এতে জাহান্নাম ছাড়াও হাশরের ময়দানে রয়েছে চরম লালনা। তদুপরি হুর আকরাম (সাঃ)—এর শাফাআত থেকে বঞ্চিত হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।—(নাউমুবিলাহ!)

মহানবী (সাঃ)—এর আগমন সমগ্র মানবতার জন্য সর্ববৃহৎ অনুগ্রহ : **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ** আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ধার অনুসরণ বিষয়েরই একটি আয়াত সূরা বাক্বারায় উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এ আয়াতে একটি শব্দ অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে —

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

এ প্রসঙ্গে প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন করীমের বিশ্লেষণ অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বের জন্য সবচাইতে বড় নেয়ামত ও মহা অনুগ্রহ। কিন্তু এখানে এই আয়াতে শুধুমাত্র মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট করাটা কোরআনের অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে কোরআন সমগ্র বিশ্বের জন্য হেদায়েত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত থাকা সত্ত্বেও **هَذِهِ الْبُشْرَى** লারই অনুরূপ যে, কোন কোন ক্ষেত্রে তাকে মুত্তাকীনদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তার কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই এক। তা হল এই যে, যদিও রসূল মকবুল (সাঃ)—এর অস্তিত্ব মুমিন-কাকের নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্বের

জন্যই মহা নেয়ামত এবং বিরাট অনুগ্রহ, তেমনভাবে কোরআন করীমও সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্য হেদায়েত, কিন্তু যেহেতু এই হেদায়েত ও নেয়ামতের ফল শুধু মুমিন-মুত্তাকীরাই উপভোগ করছে, সেহেতু কোন কোন স্থানে একে তাঁদেরই সাথে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল রসূল করীম (সাঃ)—কে মুমিনদের জন্য কিংবা সমগ্র বিশ্বের জন্য মহা নেয়ামত ও বিরাট অনুগ্রহ হিসাবে বিশ্লেষণ করা।

আধুনিককালের মানুষ যদি আধ্যাত্মিকতাবিশিষ্ট এবং বস্ত্রবাদের দাসে পরিণত না হত, তবে এ বিষয়টি কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখত না; যে কোন বুদ্ধিমান মানুষই এই মহা অনুগ্রহের তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারত। কিন্তু আধুনিককালের মানুষ যেহেতু পৃথিবীর জীব-জন্তুসমূহের মধ্যে একটি অতি বিচক্ষণ জীব অপেক্ষা অধিক কিছু নয়নি, কাজেই তাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ ও ইনআম বলতেও সে সমস্ত বস্ত্র-সামগ্রীকেই মনে করা হয়, যাতে তাদের পেট ও জৈবিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার উপকরণ মজুদ থাকে। তারা সেগুলোর অস্তিত্বের মূল তাৎপর্য বা তার প্রাণ ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। সে কারণেই এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মানুষকে প্রথম একথা বাতলে দেয়া দরকার হয়ে পড়েছে যে, তাদের মূল সন্তা শুধু কয়েকটি হাড় গোড় ও চর্ম-মাংশের সমষ্টি নয়, বরং মানুষের প্রকৃত তাৎপর্য হল সে আত্মা, যা তার দেহের সাথে যুক্ত। যতক্ষণ এ আত্মা তার দেহে বর্তমান রয়েছে, ততক্ষণই সে মানুষ এবং ততক্ষণই তার মানবধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে। সে যতই দুর্বল, সামর্থহীন ও মুমূর্ষ হোক না কেন, দেহে আত্মা থাকা পর্যন্ত তার সম্পত্তি করায়ত্ত করে নেয়ার কিংবা তার অধিকার ছিনিয়ে নেবার ক্ষমতা কারোরই নেই। পক্ষান্তরে যখনই তার দেহ থেকে এই আত্মা পৃথক হয়ে যায়, তখন সে যত বড় বীর-পাহেলায়ানই হোক না কেন, তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যতই সুগঠিত ও সুসংহত থাক না কেন, সে আর মানুষ থাকে না —নিজের বিষয়-সম্পত্তিতেও আর তার কোন অধিকার অবশিষ্ট থাকে না।

আমিয়া (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করেছেন, মানবাত্মার যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করার জন্যে, যাতে তাদের দেহের দ্বারা সম্পাদিত প্রতিটি কাজ-কর্ম মানবতার পক্ষে কল্যাণকর প্রতিপন্ন হতে পারে। তারা যেন বিষাক্ত হিংস্র জীব-জানোয়ারের মত অন্যান্য মানুষকে কষ্ট দিয়ে না বেড়ায় এবং নিজের পরিণতি সম্পর্কে অবহিত হয়ে আখেরাতের অনন্ত জীবনের জন্য নিজেই যেন উপাদান সংগ্রহ করে নিতে পারে। আর মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কাজেও মহানবী হযরত রসূল মকবুল (সাঃ)—এর মর্যাদা অন্যান্য নবী-রসূলগণ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। তিনি তাঁর মকী জীবনে শুধু মানব সমাজের জন্যে ক্যাডার গঠনের কাজই সম্পাদন করেছেন এবং মানব সম্প্রদায়কে এমন এক সমাজ গঠন করে দিয়েছেন, যার মর্যাদা ফেরেশতাদের চাইতেও উর্ধ্বে। সারা দুনিয়া এর পূর্বে আর কখনও এমন ধরনের মানুষ প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁদের একেকজন রসূল করীম (সাঃ)—এর প্রত্যক্ষ মু’জ্জযার ফসল প্রতীক্ষমান হয়েছেন। তাঁদের পরবর্তীদের জন্যও তিনি যে শিক্ষা এবং শিক্ষাদানপদ্ধতি রেখে গেছেন, তার পূর্ণ-বাস্তবায়ন করা হলে সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ স্থান লাভ করা যেতে পারে। আর যেহেতু এই শিক্ষা সারা বিশ্বেরই জন্য, সেহেতু তার অস্তিত্ব সমগ্র বিশ্বমানবের জন্যই অনুগ্রহ স্বরূপ। অবশ্য এর দ্বারা প্রকৃত মুমিনগণই পরিপূর্ণ উপকার লাভ করেছে।

العمل

২৩

لن تنالوا



(১৬৬) আর যেদিন দু' দল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছে; সেদিন তোমাদের উপর যা আপত্তি হয়েছে তা আল্লাহর হুকুমেরই হয়েছে এবং তা এজন্য যে, তাতে ঈমানদারদিগকে জানা যায় (১৬৭) এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে বলা হল এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই কর কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর। তারা বলেছিল, আমরা যদি জানতাম যে, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে বস্তুতঃ আল্লাহ ভালভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে। (১৬৮) ওরা হলো যে সব লোক, যারা বসে থেকে নিজেকে তাদের ভাইদের সমুদ্রে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না। তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমাদের নিজেকে উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (১৬৯) আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেকে পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। (১৭০) আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদ্‌যাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেন তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ, তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। (১৭১) আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের প্রযুক্ত বিনষ্ট করেন না। (১৭২) যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেয়গার, তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব। (১৭৩) যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, 'তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর।' তখন তাদের বিশ্রাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী।

দ্বিতীয় ও প্রকৃত উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করা হয়েছে আয়াতের শেষ বাক্যে। এতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, বিপাদপদ যাই এসেছে আসলে তা শত্রুর শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের কারণে আসেনি, বরং তোমাদের নিজেকেই কোন কোন ভ্রটি-বিচ্যুতির দরুন এসেছে। যেমন, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশ পালনে তোমাদের শৈথিল্য হয়ে যাওয়া।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অতঃপর **يَا ذُنَّ اللَّهِ** আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব যা কিছু হয়েছে, সবই আল্লাহর ইচ্ছা ও সমর্থনে হয়েছে যাতে নিহিত রয়েছে বহু হেকমত ও রহস্য। সেসব রহস্যের কিছু কিছু ইতিপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। তবে একটি রহস্য হচ্ছে এই যে, এভাবে আল্লাহ নিঃস্বার্থ মুমিনগণকে দেখে নেবেন। অর্থাৎ, যাতে মুমিনদের নিঃস্বার্থতা এবং মুনাফেকদের প্রতারণা এমনভাবে প্রকট হয়ে যায় যাতে যে কোন লোক তা দেখে নিতে পারে। এখানে আল্লাহর দেখে নেয়ার অর্থ হল এই যে, পৃথিবীতে দেখার যেসব উপায় প্রচলিত রয়েছে, সে অনুযায়ী দেখে নেয়া। অন্যথায় আল্লাহ তো সর্বক্ষণই প্রত্যেক বস্তু ও বিষয় দেখছেন। বস্তুতঃ এই রহস্যটি এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, কঠিন বিপদের সময় মুনাফেকেরা সরে দাঁড়িয়েছে, আর নিঃস্বার্থ মুমিনরা যুদ্ধে অনড়-অটল রয়েছেন।

এভাবে সান্ত্বনা দেয়ার আরো একটি কারণ এই যে, এ যুদ্ধে কেস মুসলমান শহীদ হয়েছেন, তাঁদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমনসব প্রতিদান দিয়েছেন, অন্যান্যদেরও তার প্রতি দ্বিধা সৃষ্টি হওয়া উচিত। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী **وَالْكَافِرِينَ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا** আয়াতে শহীদদের মর্যাদার কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহর রাহে শাহাদত বরণকারীদের বিশেষ মর্যাদা : এ আয়াতে শহীদানের বিশেষ মর্যাদার বিবরণ বিবৃত হয়েছে। এছাড়া ষষ্ঠ হাদীসেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেছেন, শহীদদের অবস্থা ও মর্যাদার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। কাজেই হাদীসের রেওয়াজেতে যেসব দিক বর্ণিত হয়েছে, তাও বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।

এ আয়াতে শহীদদের প্রথম বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে, তাঁদের অন্য জীবনলাভকে। অতঃপর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁদের রিযিকপ্রাপ্তি।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে **وَجَزَاءُ بَيَاتِهِمُ اللَّهُ** আয়াতে যে, তারা সদা-সর্বক্ষণ আনন্দমুখর থাকবেন। যে সমস্ত নেয়ামত আল্লাহ তাঁদেরকে দান করবেন সেগুলোর মধ্যে চতুর্থটি হল **وَسَيُؤْتُونَ**

بِالَّذِينَ لَا يَلْقَوْنَ অর্থাৎ, তাঁর নিজেকে যেসব উত্তরসূরিকে পৃথিবীতে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারেও তাদের এ আনন্দ অনুভূত হয় যে, তাঁরাও পৃথিবীতে থেকে সংকাজ ও জেহাদে নিয়োজিত রয়েছেন। ফলে তাঁরাও এখানে এসে এমনি সব নেয়ামত এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন।

আর সাদী (রাহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, শহীদদের যেসব আত্মীয়-স্বজন মৃত্যু সম্পর্কে তাদের পূর্বাহুই জানিয়ে দেয়া হয় যে, অমুক ব্যক্তি এক

কেরাম নিরুপিত আসছেন। তখন তিনি তেমনি আনন্দিত হন, যেমন পৃথিবীতে বহু দূরের কোন বন্ধুর সাথে সুদীর্ঘ সময়ের পর সাক্ষাৎ হলে যা হয় থাকে।

এ আয়াতের যে শানে নুযূল হয়রত আবু দাউদ (রহঃ) বিশুদ্ধ সনদের দ্বারা হয়রত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, তা হল এই-রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে বললেন যে, জেহদের ঘটনায় যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হন তখন আল্লাহ তাঁদের জাফাগুলোকে সবুজ পাখীর পালকের তেতরে স্থাপন করে মুক্ত করে দেবে। তাঁরা জান্নাতের বর্ণা ও উদ্যানসমূহ থেকে নিজেদের রিযিক আহরণ করেন এবং অতঃপর তারা সেই আলোক ধারায় ফিরে আসেন, যা তাঁর জন্য আল্লাহর আরশের নীচে টাঙ্গিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন তারা নিজেদের জন্য আনন্দ ও শান্তিময় এ জীবন প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, আমাদের আত্মীয়-আপনজনরা পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যুতে শোকার্ত; আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কি কেউ তাদের জানিয়ে দিতে পারে, “যাতে তারা আমাদের জন্য দুঃখ না করে এবং তারাও যাতে জেহাদে (শ্রেণীগ্ৰহণের) চেষ্টা করে।” তখন আল্লাহ বললেন, ‘তোমাদের এ সংবাদ তাদেরকে পৌছে দিচ্ছি।’ এরই প্রেক্ষিতে وَكَشَفْنَا لَكَ ذُنُوبَكَ وَأَيَّاتُ الْيَوْمِ আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(কুরত্বী)

এ মুজের ঘটনাটি এই, মক্কার কাফেররা যখন ওহুদের ময়দান থেকে ফিরে এল, তখন পথে এসে তাদের আক্ষোসাস হলো যে, আমরা বিজয় বর্জন করার পরিবর্তে অনর্থকই ফিরে এলাম। সবাই মিলে একটা কঠিন আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত মুসলমানকে খতম করে দেয়াই উচিত ছিল। আর এই কল্পনা তাদের মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল যে, পুনরায় মদীনা ফিরে যেতে ইচ্ছা করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহ তা’আলা তাদের ঘন গভীর ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তাতে তারা সোজা মক্কার পথ ধরল। কিন্তু যেতে যেতে মদীনাযাত্রী কোন কোন পথিকের কাছে বলে দিয়ে গেল যে, তোমরা সেখানে গিয়ে কোন প্রকারে মুসলমানদের মনে আমাদের ভয় বিস্তার করবে যে, তারা আবার এদিকে ফিরে আসছে। এ ব্যাপারটি ওহীর মাধ্যমে হযুর (সাঃ) জানতে পারলেন। কাজেই তিনি ‘হামরাউল-আসাদ’ পর্যন্ত তাদের পশ্চাচ্চাবন করলেন।—(ইবনে জরীর, রহুল-বয়ান)

আর সহীহ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘোষণা করলেন, কে আছে, যারা মুশরেকীদের পশ্চাচ্চাবন করবে? তখন সত্তর জন সাহাবী প্রস্তুত হলেন যাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যারা গত কলকের যুদ্ধে কঠিনভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন এবং অন্যের সাহায্যে লাফেরা করছিলেন। এরাই রসূলে মকবুল (সাঃ)—এর সাথে মুশরেকদের পশ্চাচ্চাবনে রওয়ানা হলেন। যখন তাঁরা ‘হামরাউল আসাদ’ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন, তখন সেখানে নোআইম ইবনে মাসউদের সাথে সাক্ষাত হল। সে সংবাদ দিল যে, আবু সুফিয়ান নিজের সাথে আরও সৈন্য সঞ্গ্রহ করে পুনরায় মদীনা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আহত-দুর্বল সাহাবায়ে কেরাম এই ভীতিজনক সংবাদ শুনে সমস্তের বলে উঠলেন, আমরা তা জানি না وَكَشَفْنَا لَكَ ذُنُوبَكَ অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের দোষে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।

এদিকে মুসলমানদেরকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এ সংবাদ দেয়া হলো, কিন্তু মুসলমানগণ তাতে কোনরূপ প্রভাবান্বিত হলেন না; অপরদিকে বনী খোযাআহ গোত্রের মা’বাদ ইবনে খোযাআহ নামক এক ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছিল। যদিও সে লোকটি মুসলমান ছিল না কিন্তু মুসলমানদের হিতাধী ছিল এবং তার গোত্র ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সাথে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ। কাজেই রাস্তায় মদীনা প্রত্যগত আবু সুফিয়ানকে যখন দেখতে পেল যে, সে নিজেদের প্রত্যাগমনের জন্য অপেক্ষা করছে এবং পুনরায় মদীনা আক্রমণের চিন্তা-ভাবনা করছে। তখন সে আবু সুফিয়ানকে বলল, তোমরা খোকায পড়ে আছ যে, মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি তাদের বিরাট বাহিনীকে হামরাউল আসাদে দেখে এসেছি, যারা কিনা পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে তোমাদের পশ্চাচ্চাবন উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। এ সংবাদ আবু সুফিয়ানের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিল।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে এ ঘটনারই বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রশ্নদায়ক যে, আল্লাহর উপর রসূলে করীম (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের চাইতে অধিক তাওয়াক্কুল তো দুনিয়ার অন্য কারো মধ্যে থাকতই পারে না, কিন্তু তাঁদের তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা এমন ছিল না যে, বাহ্যিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি পরিহার করে বসে থাকতেন এবং বলেতন যে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি বসিয়ে বসিয়েই আমাদের বিজয় দান করবেন। কিন্তু তা নয়। বরং তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সমবেত করলেন, আহত মানুষের মনে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত করলেন, জেহাদের জন্য তাদেরকে তৈরী করলেন এবং রওয়ানা হয়ে গেলেন। বস্তুতঃ নিজের আয়ত্তে যত রকম ব্যবস্থা ছিল সে সবই তিনি করলেন এবং তারপরে বললেন, ‘আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। এটাই হল সেই সঠিক ও যথার্থ তাওয়াক্কুল বা নির্ভরশীলতা, যার শিক্ষা কোরআনে দেওয়া হয়েছে। আর রসূলে করীম (সাঃ) ও এরই উপর আমল করেছেন এবং করিয়েছেন। তাছাড়া বাহ্যিক ও পার্শ্ব উপকরণসমূহও আল্লাহ তাআলারই অনুগ্রহের দান। এগুলোকে বর্জন করা তাঁর অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। তদুপর স্বাভাবিক উপকরণাদি বর্জন করে তাওয়াক্কুল করা রসূলে করীম (সাঃ) — এর সুনুত নয়।

রসূলে করীম (সাঃ) স্বয়ং কোন এক ঘটনার প্রেক্ষিতে سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ এ আয়াত সম্পর্কেই পরিস্কার ভাষায় এরশাদ করেছেন—

হয়রত আউফ ইবনে মালেক বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) — এর নিকট দু’ব্যক্তির মোকদ্দমা উপস্থিত হলে তিনি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিলেন। এই মীমাংসাতে যে লোকের বিরুদ্ধে গেল তিনি গভীর মনোযোগের সাথে তা শোনলেন এবং এ কথা বলতে বলতে চলে যেতে লাগলেন الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل হযুর (সাঃ) বললেন, তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আস। তারপর বললেন—“আল্লাহ হাত-পা ভেঙ্গে বসে থাকা পছন্দ করেন না। বরং তোমাদের উচিত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর নরম হয়ে যাওয়া এবং ‘আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কারক’ বলে ঘোষণা করা।”

আল عمران

৭১

লن تنالوا

فَأَنفَكُوا بَعِثُوا مَنَ اللَّهُ وَفَضَّلَ لَمْ يَسْأَلْهُمْ سَوْءَ وَبِشْرٍ
 رِضْوَانِ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۝ إِنَّمَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ
 يَخُوفُ أَزْوَاجَهُ ۚ فَلَا تَخَفُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
 وَلَا تَحْزَنْكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۚ لَمْ يَنْفَعُوا اللَّهَ شَيْئًا
 يُرِيدُ اللَّهُ لِيُجْزَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْأَخِرَةِ ۚ وَلَمْ يَنْفَعُوا اللَّهَ شَيْئًا ۝
 إِنَّ الَّذِينَ اسْتَرَوْا أَلْفًا بِأَلْفٍ لَّنْ يَمُرَّ بِاللَّهِ شَيْئًا ۚ وَلَمْ
 يَنْفَعُوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَلَمْ يَنْفَعُوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَلَمْ يَنْفَعُوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ
 لَمْ يَنْفَعُوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَلَمْ يَنْفَعُوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَلَمْ يَنْفَعُوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ
 مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ
 الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ۚ وَلَكِنَّ
 اللَّهَ يَجْتَبِي مَن يَرِئُهُ مَن يَشَاءُ ۚ قَالُوا يَا اللَّهُ وَإِلَهُنَا
 وَإِنْ تَوَلَّوْنَا وَتَوَلَّوْنَا فَكَلِمَةً عَظِيمَةً ۚ وَلَا يَحْسَبُنِ
 الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ
 لَّهُمْ نَبَلٌ هُوَ سَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلَوْنَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ
 يَلُومُونَ بَرَكَاتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

(১৭৪) অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ট হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তৃতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ অতি বিরাট। (১৭৫) এরা যে রয়েছে, এরাই হলে শয়তান, এরা নিজদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের এরা নিজদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর। (১৭৬) আর যারা কুফরের দিকে ধাবিত হচ্ছে তারা যেন তোমাদিগকে চিন্তান্বিত করে না তোলে। তারা আল্লাহ তাআলার কোন কিছুই অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না। আখেরাতে তাদেরকে কোন কল্যাণ দান না করাই আল্লাহর ইচ্ছা। বস্তৃতঃ তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। (১৭৭) যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফর ক্রয় করে নিয়েছে, তারা আল্লাহ তাআলার কিছুই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (১৭৮) কাফেররা যেন মনে না করে যে, আমি যে অবকাশ দান করি, তা তাদের পক্ষে কল্যাণকর। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে করে তারা পাপে উন্নতি লাভ করতে পারে। বস্তৃতঃ তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাজনক শাস্তি। (১৭৯) নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেয়া পর্যন্ত আল্লাহ এমন নন যে, ঈমানদারগণকে সে অবস্থাতেই রাখবেন যাতে তোমরা রয়েছে, আর আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদিগকে গায়বের সংবাদ দেবেন। কিন্তু আল্লাহ স্বীয় রসুলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর ওপর এবং তাঁর রসুলগণের ওপর তোমরা প্রত্যয় স্থাপন কর। বস্তৃতঃ তোমরা যদি বিশ্বাস ও পরহেযগারীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাক, তবে তোমাদের জন্যে রয়েছে বিরাট প্রতিদান। (১৮০) আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী বানিয়ে পরানো হবে। আর আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের পরম সত্বাধিকারী। আর যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে জানেন।

তৃতীয় আয়াতে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জেহাদের জন্য রওয়ানা হওয়া এবং ‘হাসবুনালাহ ওয়া নে’মাল ওয়াকীল’ বলার উপকারিতা, ফলশ্রুতি ও বরকত বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে—“এরা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এল। তাতে তাদের কোন রকম অসন্তোষ হলো না আর তারা হল আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত।”

আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে তিনটি নেয়ামত দান করেছেন। প্রথম নেয়ামত হল এই যে, কাফেরদের মনে তাঁদের ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, এতে তারা পালিয়ে গেল। ফলে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে নিরাপদ রইলেন। এ নেয়ামতকে আল্লাহ তাআলা ‘নেয়ামত’ শব্দেই উল্লেখ করলেন। দ্বিতীয় নেয়ামত এই যে, হামরাউল আসাদের বাজারে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে সুযোগ হয়েছিল এবং তাতে তাঁরা যে লাভবান হয়েছিলেন, তাকেই বলা হয়েছে ‘ফযল’।

তৃতীয় নেয়ামতটি হলো আল্লাহর রেহামত বা সন্তুষ্টি লাভ যা সমস্ত নেয়ামতের উর্ধ্বে এবং যা এই জেহাদে তাঁদেরকে বিশেষ ভঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে।

কোরআনে করীম **حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ** আয়াতে যেসব লাভ ও উপকারিতার কথা বর্ণনা করেছে, তা শুধুমাত্র সাহাবায়ে কেরামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না বরং যে কেউ পূর্ণ ঈমানী উদ্দীপনা সহকারে এর জপ করবে, সেই এ সমস্ত বরকত লাভে সমর্থ হবে।

‘হাসবুনালাহ ওয়া নে’মাল ওয়াকীল’ পাঠের উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে ওলামা ও মাশায়েখগণ লিখেছেন যে, এ আয়াতটি পূর্ণ ঈমানী উদ্দীপনা ও হির বিশ্রাসের সাথে এক হাজার বার পাঠ করে কোন দোয়া করা হল আল্লাহ তা প্রত্যাহ্বান করেন না। দৃষ্টিস্তা ও বিপদাপদের সময় ‘হাসবুনালাহ ওয়া নে’মাল ওয়াকীল’ পাঠ করা পরীক্ষিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফেরদের পার্থিব ভোগ-বিলাস ও প্রকৃতপক্ষে আযাবেরই পরিপূর্ণতা : এক্ষেত্রে কেউ যেন এমন কোন সন্দেহ না করে যে, আল্লাহ তাআলা কাফেরদিগকে অবকাশ, দীর্ঘায়ু, স্বাস্থ্য-সামর্থ্য ও আরাম-আয়েশের উপকরণ এ জন্যই দিয়েছেন, যাতে তারা নিজদের অপরাধ প্রবণতায় অধিকতর এগিয়ে যায়, তাহলে তো কাফেররা নির্দোষ। কারণ, আয়াতের উদ্দেশ্য হল এই যে, কাফেরদের সামান্য কয়েক দিনের এ অবকাশ ও ভোগ-বিলাসে যেন মুসলমানরা পেরেশান না হয়। কেননা, কুফর ও পাপ সত্ত্বেও তাদেরকে পার্থিব শক্তি-সামর্থ্য ও বৈভব দান করাটো তাদের শাস্তিরই একটি পন্থা, যার অনুভূতি আজকে নয় এই পৃথিবী থেকে যাবার পরই হবে যে, তাদেরকে দেওয়া পার্থিব ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ তারা পাপকর্মে ব্যয় করেছে প্রকৃত পক্ষে সেসবই ছিল নরকস্ফার। এ বিষয়টিই কতিপয় আয়াতে আল্লাহ এরশাদ করেছেন। বলা হয়েছে :

إِنَّمَا يَرْزُقُكَ اللَّهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, কাফেরদের ধন-সম্পদ

এবং ভোগ-বিলাস তাদের জন্য গৌরবের বস্তু নয়; এগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আযাবেরই একটা কিস্তি যা আখেরাতে তাদের আযাব বৃদ্ধির কারণ হবে।

ওহীর পরিবর্তে কার্যকর পদ্ধতিতে মুমিন ও মুনাফেকের পার্থক্য নিরূপণের তাৎপর্য : এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিঃস্বার্থ মুমিন ও মুনাফেকের মধ্যে পার্থক্য বিধানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা এমন জটিলতা ও দুর্ঘটনার অবতারণা করেন, যাতে বাস্তব ও কার্যকরভাবে মুনাফেকের প্রতারণা প্রকট হয়ে উঠতে পারে। এ পার্থক্য বিধান যদিও ওহীর মাধ্যমে মুনাফেকদের নামোল্লেখ করেও করা যেতে পারত, কিন্তু হেকমতের তাকাদা তা নয়। আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ হেকমত তিনিই জানেন। তবে এখানে একটি হেকমত এটাও হতে পারে যে, মুসলমানদিগকে যদি ওহীর মাধ্যমে বলে দেওয়া হত যে, অমুক ব্যক্তি মুনাফেক, তাহলে তার সাথে মুসলমানদের সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তার সাথে আচার-আচরণে সতর্কতার ব্যাপারে এমন কোন প্রকট প্রমাণ থাকত না, যা মুনাফেকরাও সমর্থন করতে পারত। তখন তারা বলত যে, তোমরা ভুল বলছ। আমরা প্রকৃতই মুসলমান।

পক্ষান্তরে বিপদাপদ ও জটিলতা আরোপের মাধ্যমে যে বাস্তব ও কার্যকর পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে, তাতে মুনাফেকরা সরে পড়তে বাধ্য হয়েছে, তাদের প্রতারণা স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর তাদের এ দাবী করার সুযোগ থাকেনি যে, তারাও নিঃস্বার্থ মুমিন।

এভাবে মুনাফেকী প্রকাশিত হয়ে পড়ায় একটি ফায়দা এও হয়েছে যে, তাদের সাথে মুসলমানদের বাহ্যিক মেলামেশাও বন্ধ হয়ে যায়। অন্যথায় মানসিক বিরোধ থাকা সত্ত্বেও বাহ্যিক মেলামেশা যদি বিদ্যমান থাকত, তবুও তা ক্ষতিকর হত।

গায়েবী ব্যাপারে কাউকে অবহিত করে দেওয়া হলে তা গায়েব থাকে না : এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা গায়েবী ব্যাপারে ওহীর মাধ্যমে যে কাউকে অবহিত করেন না। অবশ্য নিজের নবী-রসূল নির্বাচিত করে তাদেরকেই গায়েবী ব্যাপারে অবহিত করেছেন। এতে এমন সন্দেহ করা উচিত নয় যে, তাই যদি হয়, তবে নবীগণও তো এলমে গায়েবের অংশীদার এবং আলেমে-গায়েব। কারণ, এলমে-গায়েবে আল্লাহ রাসূল আলামীনের সত্তার সাথে সংযুক্ত, কোনও সৃষ্টিকে তার অংশীদার সাব্যস্ত করা শিরক। আর তা হল দু'টি শর্তসাপেক্ষে। (এক) সে এলমকে হতে হবে 'এলমে যাতী' যা অপর কারো মাধ্যমে আগত বা

শেখানো নয়। (দুই) সে এলমকে সমগ্র বিশৃঙ্খল ও ভূত-ভবিষ্যতের উপর পরিব্যপ্ত হতে হবে, যাতে কোন একটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত গোপন থাকবে না। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ওহীর মাধ্যমে তাঁর নবী-রসূলগণকে যে সমস্ত গায়েবী বিষয় অবহিত করেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে এলমে গায়েব নয় বরং গায়েবী বিষয়ের সংবাদ যা নবী-রসূলগণকে দেওয়া হয়েছে। কোরআনে করীমও একে কয়েক স্থানে **أَنبَاءُ الْغَيْبِ** (তথা গায়েবের সংবাদ বা অবগতি) শব্দে বিশ্লেষণ করেছে। বলা হয়েছে—
مِّنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِمْ إِلَيْكَ (অর্থ— সেগুলো ছিল গায়েবী সংবাদের অন্তর্ভুক্ত যা ওহীর মাধ্যমে আপনাকে অবহিত করা হয়েছে)।

উল্লেখিত সাতটি আয়াতের প্রথম আয়াতে কার্পণ্যের নিন্দাবাদ এবং তার উপর অভিসম্পাতের কথা আলোচনা করা হয়েছে।

কার্পণ্যের সংজ্ঞা এবং সে জন্য শাস্তি বিধানের বিস্তারিত বিশ্লেষণ : 'বোখল' বা কার্পণ্যের শরীয়ত নির্ধারিত অর্থ হল— 'যা আল্লাহর রাহে ব্যয় করা কারো উপর ওয়াজিব, তা ব্যয় না করা।' এ কারণেই কার্পণ্য বা বোখল হারাম এবং এজন্য জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব ক্ষেত্রে ব্যয় করা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব, তাতে ব্যয় না করা হারাম-কার্পণ্যের আওতাভুক্ত নয়। অবশ্য সাধারণ অর্থে তাকেও কার্পণ্যই বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের কার্পণ্য বা বোখল হারাম নয়। তবুও অনুত্তম।

'বোখল' বা কার্পণ্য অর্থেই আরও একটি শব্দ হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। তা হল **سُكْرٌ**—এর সংজ্ঞা হলো এই যে, যে ব্যয় নিজের দায়িত্বে ওয়াজিব ছিল, তা ব্যয় না করা। তদুপরি সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে লোভের বশবর্তী হওয়া। এটি কার্পণ্য অপেক্ষাও অধিক অপরাধ। সে কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন—

لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل مسلم أبدا

অর্থ— 'সুহ' বা কপণতা এবং 'ইমান' কোন মুসলমানের অন্তরে একত্রে অবস্থান করতে পারে না। - (কুরতুবী)

আল عمران

৫৫

লিতালোম

আনুমানিক আভ্য বিষয়

১৮১ নং আয়াতে ইহুদীদের একটি কঠিন ঔদ্ধত্যের ব্যাপারে সতর্কীকরণ ও শাস্তির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। তা এরূপ যে, মহানবী (সঃ) যখন কোরআনে হাকীম থেকে যাকাত ও সদকা বিধি-বিধান বর্ণনা করেন, তখন উদ্ধত ইহুদীরা বলতে আরম্ভ করে যে, আল্লাহ তাআলা ফকীর ও গরীব হয়ে গেছেন, আর আমরা হাফি নবী ও আমীর। সে জন্যেই তো তিনি আমাদের কাছে চাইছেন। কলামাহত, তাদের বিশ্বাস তাদের এ উক্তি সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ঘোটেই নয়। কিন্তু হুজুর আকরাম (সঃ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই হয়ত বলেছিল যে, কোরআনের এ আয়াত যদি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তার মর্ম এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ ফকীর ও পরমুখাপেক্ষী। তাদের এই অহেতুক প্রমাণটি সত্যস্বর্তভাবে বাতিল বলে সাব্যস্ত হওয়ার দরুন তার কোন উত্তরে প্রয়োজন ছিল না। কারণ, যাকাত ও সদকা সংক্রান্ত আদ্বাহর নির্দেশ উন্ন নিজেই কোন লাভের জন্য নয়, বরং যারা মালদার তাদেরই পার্শ্বি ও আশেপাশের ফায়দার জন্য ছিল। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এ বিষয়টি ‘আল্লাহকে ঋণদান’ শিরোনামে এ জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে এক্ষণ বুঝা যায় যে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা প্রত্যেক সম্প্রদায় লোকের জন্য অপরিহার্য ও সন্দেহহীন হয়ে থাকে, তেমনিভাবে যে সদকা মানুষ দিতে থাকে তার প্রতিদানও আল্লাহ নিজ দায়িত্বে পরিশোধ করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ রাবুল আলামীনকে সমস্ত সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক বলে জানে, তার মনে এ শব্দের ব্যবহারে কশ্মিনকালেও এমন কোন সন্দেহ উদয় হতে পারে না, যেমনটি উদ্ধত ইহুদীদের উক্তিতে বিন্দ্যমান। কাজেই কোরআনে করীম এই সন্দেহের উত্তর দান করেছে। শুধুমাত্র তাদের উদ্ধত ও হুজুর আকরাম (সঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ এবং তাঁর প্রতি উপহাস করার একাধিক অপরাধের শাস্তি হিসাবে বলা হয়েছে, আমি তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তিসমূহ লিখে রাখব যাতে কিয়ামতের দিন তাদের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ প্রমাণ উপস্থাপন করে আযাবের ব্যবস্থা করা যায়। অন্যথায় আল্লাহর জন্য লেখার কোনই প্রয়োজন নেই।

অতঃপর ইহুদীদের এ সমস্ত ঔদ্ধত্যের আলোচনার সাথে সাথে তাদের আরও একটি অপরাধের উল্লেখ করা হয়েছে যে, এরা হলো এমন লোক, যারা নবী-রসুলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কিংবা তাদের উপহাস করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং এরা তাদেরকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। কাজেই এমন লোকদের দ্বারা কোন নবীর প্রতি মিথ্যারোপ ও উপহাস করা যেমি আশ্চর্যের বিষয় নয়।

কুফরী ও পাপের ব্যাপারে মনে-প্রাণে সম্মত থাকাও মহাপাপ। এখানে এ বিষয়টি প্রশিধানযোগ্য যে, কোরআনের লক্ষ্য হলেন মহানবী (সঃ) ও মদীনাবাসী ইহুদীবর্গ। আর নবীদের হত্যার ঘটনাটি হল ফকর ইয়াহুইয়া ও যাকারিয়া (আঃ)-এর সময়ের। সুতরাং এ আয়াতে নবী হত্যার অপরাধ এ সময়ের ইহুদীদের উপর আরোপ করা হল কেন করে? তার কারণ এই যে, মদীনার ইহুদীরাও তাদের পূর্ববর্তী ইহুদীদের সে কাজের ব্যাপারে সম্মত এবং আনন্দিত ছিল বলে তারাও সেই হত্যাকারীদের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী তাঁর তফসীরে বলেছেন, এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কুফরের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপনও কুফরী ও মহাপাপের অন্তর্ভুক্ত। রসুল করীম (সঃ)-এর এক বাণীতে এ বিষয়ের অধিকতর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, যমীনের উপর যখন কোন পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, যে লোক সেখানে উপস্থিত থাকে এবং সে পাপের প্রতিবাদ করে

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ قَوِيْرٌ وَهْنٌ
أَغْيَاةٌ سَتُكُنُّ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْكَافِرِيَّةَ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَقَتْلَهُمُ الْكَافِرِيَّةَ بِغَيْرِ حَقٍّ
أَيُّدِيَكُمْ وَأَنَّ لِلَّهِ لَيْسَ بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ ۝ الَّذِينَ قَالُوا
إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَكْرَمُونَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا
بِهَرَبٍ نَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ قِبَلِ رَبِّكُم
وَالْبَيِّنَاتُ فَتَلَوْنَهُمْ فَتَلَوْنَهُمْ هُنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝
قَالَ كَذِبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قِبَلِكَ جَاءُوكَ
بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
الْمَوْزِ وَأَنشَأُكُم مِّنْ أَجْزَارِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ
رَّجُوعٌ عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا
الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝ لَتَبْلُوكَ فِي
أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ آتَوْكُمُ
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا
وَأَن تَصْغُرُوا وَتَتَنَفَّوْا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الْأُمُورِ ۝

(১৮১) নিম্নসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শোনেছেন, যারা বলেছে যে আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিস্তারন। এখন আমি তাদের কথা এবং যেসব নবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তা লিখে রাখব, অতঃপর বলব, ‘আম্বাদন কর ঈশ্বর আশ্বনের আযাব।’ (১৮২) এ হল তারই প্রতিফল যা তোমরা ইতিপূর্বে নিজের হাতে পায়েছ। বস্ততঃ আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না। (১৮৩) সে সমস্ত লোক যারা বলে যে, আল্লাহ আমাদিগকে এমন কোন রসুলের ওপর বিশ্বাস না করতে বলে রেখেছেন স্বতন্ত্র না তারা আমাদের নিকট এমন কোরবানী নিয়ে আসবেন যাকে আশ্বন গ্রাস করে নেবে। তুমি তাদের বলে দাও, ‘তোমাদের মাঝে আমার পূর্বে বহু রসুল নির্দলসমূহ এবং তোমরা যা আদার করেছ তা নিয়ে এসেছিলেন, তখন তোমরা কেন তাদেরকে হত্যা করলে যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক।’ (১৮৪) তাছাড়া এরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে তোমার পূর্বেও এরা এমন বহু নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে যারা নির্দলসমূহ নিয়ে এসেছিলেন এবং এনেছিলেন সহীফা ও প্রদীপ্ত গ্রন্থ। (১৮৫) প্রত্যেক প্রাণীকে আশ্বাদন করতে হবে যত্ন। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোষ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জন্মতে প্রবেশ করানো হবে, তার কার্যসিদ্ধি ঘটবে। আর পার্শ্বি জীবন ধোকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়। (১৮৬) অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনেবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরেকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ঈর্ষ ধারণ কর এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সংসাহসর ব্যাপার।

এ কাজকে মন্দ জ্ঞান করে, তখন সে যেন সেখানে উপস্থিত থাকে না।
কিন্তু, সে ব্যক্তি তাদের পাপের অংশীদার হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি
ঈমান স্থলে না থেকেও তাদের কৃত পাপের প্রতি সমর্থন দান করে, তাকে
ঈমানীদার বলেই গণ্য করা হবে।

এ আয়াতের শেষাংশে এবং তৃতীয় আয়াতে সে উদ্ধৃতদের শাস্তিস্বরূপ
করা হয়েছে যে, তাদের দোষকে নিক্ষেপ করে বলা হবে, এবার আগুনে
জ্বালান স্বাদ আশ্বাদন কর, যা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল; আল্লাহর পক্ষ
থেকে এটা কোন অন্যায় আচরণ নয়।

চতুর্থ আয়াতে সে ইহুদীদের অপবাদ ও মিথ্যারোপের বিষয়
জ্ঞানোদা করা হয়েছে। আর তাহল এই যে, তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর
প্রতি মিথ্যারোপকল্পে এই ছিল উদ্ভাবন করে যে, পূর্ববর্তী নবীদের
সদকার বস্ত্র-সামগ্রী কোন মাঠে কিংবা পাহাড়ে রেখে দেয়ার নিয়ম ছিল,
তখন আকাশ থেকে একটা আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। এটাই সদকা
কুল হওয়ার লক্ষণ। রসূলে করীম (সাঃ) এবং তাঁর উম্মতকে আল্লাহ
জ্ঞানোদা এই বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যে, সদকার দ্রব্যসামগ্রীকে আগুনের
গ্রাসে পরিণত করার পরিবর্তে তা মুসলমান গরীব-দুঃখীদিগকে দিয়ে দেয়া
হয়। যেহেতু পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণের রীতির সাথে এ রীতিটির কোন মিল
ছিল না, সেহেতু একে মুশরেকীনরা বাহানা বানিয়ে নিল যে, যদি আপনি
নবী হতেন, তাহলে আপনিও এমন মু'জ্জিয়া প্রাপ্ত হতেন, যাতে আকাশ
থেকে আগুন এসে সদকার বস্ত্র-সামগ্রীকে গ্রাস করে ফেলত। অধিকন্তু
জ্ঞানোদা প্রদর্শন করতে গিয়ে আল্লাহর প্রতিও অপবাদ আরোপ করেছে
যে, তিনি আমাদের নিকট থেকে এমন প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়েছেন যে, আমরা
যেন এমন কোন লোকের প্রতি ঈমান না আনি, যার দ্বারা আকাশ থেকে
আগুন এসে সদকার দ্রব্য-সামগ্রীকে জ্বালিয়ে দেয়ার মু'জ্জিয়া অনুষ্ঠিত
হবে না।

ইহুদীদের এ দাবী যেহেতু আদৌ প্রমাণভিত্তিক ছিল না যে, আল্লাহ
তাদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন, কাজেই তার কোন উত্তর দেয়াও
নিষেধাজ্ঞা। তাদের নিজেদের বক্তব্যের দ্বারাই তাদেরকে পরাজিত করার
উদ্দেশ্যে এরশাদ করা হয়েছে, তোমরা যদি এ দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাক
বে, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তবে পূর্ববর্তী
সেব নবী-রসূল তোমাদের কথা মত এই মু'জ্জিয়াও দেখিয়েছিলেন, তখন
তোমাদের কর্তব্য ছিল তাদের প্রতি ঈমান আনা, কিন্তু তোমরা তাদেরকেও
মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ, বরং তাদেরকে হত্যা পর্যন্ত করে দিয়েছ। তা কেমন
কর করলে?

এখানে এমন সন্দেহ করা যায় না যে, ইহুদীদের এ দাবী যদিও সর্বৈব
বাস্তব ছিল, কিন্তু যদি মহানবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে এ মু'জ্জিয়া প্রকাশিত ও
হত, তবে হয়তো তারা ঈমান এনে নিত। কারণ, আল্লাহ তাআলা
জানতেন যে, তারা শুধুমাত্র বিদ্রোহ ও হঠকারিতাবশতই এসব কথা
কাজে। কথামত মু'জ্জিয়া প্রকাশিত হলেও এরা ঈমান গ্রহণ করত না।
পক্ষম আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাক্ষ্যনা দেয়া হয়েছে যে, তাদের
মিথ্যাবাদের দরুন আপনি দুঃখিত হবেন না। তার কারণ, এমনি ধরনের
আচরণ সব নবী-রসূলের সাথেই হয়ে এসেছে।

আখেরাতের চিন্তা যাবতীয় দুঃখ-বেদনার প্রতিকার এবং সমস্ত
শেষের উত্তর : যষ্ঠ আয়াতে এই বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করে তুলে ধরা
হয়েছে যে, যদি কখনও কোথাও কাকেররা বিজয়ীও হয়ে যায় এবং

পরিপূর্ণ পার্শ্বি আরাম-আয়েশ লাভ করে আর তারই বিপরীতে
মুসলমানগণ যদি বিপদাপদ, জটিলতা ও পার্শ্বি উপকরণের সংকীর্ণতার
সম্মুখীন হয়, তাহলে তা তেমন বিষ্ময়কর কিছু নয়। তাতে দুঃখিত
হওয়ারও কিছু নেই। কারণ, এ বাস্তবতা সম্পর্কে কোন ধর্ম, কোন
মতাবলম্বী কিংবা কোন দার্শনিকই অস্বীকার করতে পারে না যে, পার্শ্বি
দুঃখ-কষ্ট বা আরাম-আয়েশ উভয়টিই কয়েকদিনের জন্য মাত্র। কোন
জানদার বা প্রাণীই মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে না।
তাছাড়া পার্শ্বি দুঃখ-কষ্ট কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৈশী ভাগ ক্ষেত্রে
পৃথিবীতেই আবর্তিত হয়ে শেষ হয়ে যায়। আর পৃথিবীতে যদি শেষ নাও
হয়, মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। কাজেই কয়েকদিনের
সুখ-দুঃখ নিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে থাকা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, বরং মৃত্যুর
পরবর্তী চিন্তা করাই উচিত যে, সেখানে কি হবে?

এজন্যই এ আয়াতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর
আশ্বাদ গ্রহণ করবে। আর আখেরাতে নিজের কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি
প্রাপ্ত হবে, যা কঠিনও হবে আবার দীর্ঘও হবে। সুতরাং বুদ্ধিমানের পক্ষে
সে চিন্তা করাই উচিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে সে লোকই সত্যিকার কৃতকার্য,
যে দোষ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে এবং জ্ঞানুতে প্রব্রিষ্ট হবে। তা
প্রাথমিক পর্যায়ে হোক—যেমন, সংকমশীল আবেদগণের সাথে যেরূপ
আচরণ করা হবে—অথবা কিছু শাস্তি ভোগের পরেই হোক—যেমন,
পাণী মুসলমানদের অবস্থা। কিন্তু সমস্ত মুসলমানই শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম
থেকে অব্যাহতি লাভ করে অনন্তকালের জন্য জান্নাতের আরাম-আয়েশ
ও সুখ-শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে কাকেরদের চিরস্থায়ী ঠিকানা
হবে জাহান্নাম। কাজেই তারা যদি সামান্য কয়েকদিনের পার্শ্বি
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে গর্বিত হয়ে ওঠে, তবে সেটা একান্তই ঠোকা।
সেজন্যই আয়াতে বলা হয়েছে—“দুনিয়ার জীবন তো হলো ঠোকার
উপকরণ।” তার কারণ এই যে, সাধারণতঃ এখানকার ভোগ-বিলাসই হবে
আখেরাতের কঠিন যন্ত্রণার কারণ। পক্ষান্তরে এখানকার দুঃখ-কষ্ট হবে
আখেরাতের সঞ্চয়।

সবর দুঃখ-কষ্টের প্রতিকার : সপ্তম আয়াতটি নাখিল হয়েছে
একটি বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে, যার মোটামুটি আলোচনা আলোচ্য
আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ এই যে,
কোরআন করীমে যখন

مَنْ ذَا الَّذِي يَنْفِرُ مِنَ اللَّهِ تَضَاعًا

আয়াতটি নাখিল হয় এবং যাতে অত্যন্ত সালঙ্কার বর্ণনাসঙ্গিতে সদকা ও
স্বয়রাতকে আল্লাহকে করম দেওয়া বলে অভিহিত করা হয় আর সে
বর্ণনায় ইঙ্গিত করা হয় যে, যাই কিছু এখানে দান করবে, আখেরাতে তার
প্রতিদান তেমনি নিশ্চিত—যেন অন্যের ঋণ পরিশোধ করা হয়।

একথা শুনে কোন মুর্খ বিদ্রোহপরায়ণ ইহুদী বলল—“আল্লাহ ফকীর
আর আমরা হলাম আমীর।” এতে হযরত আবু বকর (রাঃ) অত্যন্ত
রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং সে ইহুদীকে এক চড়ক বসিয়ে দিলেন। ইহুদী
এসে রসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে অভিযোগ পেশ করল। তারই
প্রেক্ষিতে নাখিল হল। لَسْجُورٌ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

এতে মুসলমানদিগকে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, দুইনের জন্য
জান-মালের কোরবানী দিতে হবে এবং কাকের, মুশরেক ও আহলে

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُقِيمُنَّ
لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُوا كَقَوْمِ قَيْنَ وَكَذَلِكَ ظُهُورُهُمْ
أَشْرَوْا بِهِ مَبْنًى فَلَمَّا قُضِيَ مَآئِيتُهُمْ لَتَقُصِبَنَّ
الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَوْفُوا لَهُمْ أَنْ يُعْذَبُوا بِمَا لَهُمْ
فَيَعْلَمُوا فَلَا تَحْسَبُ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَذَابَ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
وَإِخْلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَتَعُودُوا عَلَى جُودِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ تَبْدَأُ مَا تَشَاءُ
رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَالَّذِينَ
مِنْ أَضْوَارٍ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي
لِلْإِنْسَانَ أَنْ اؤْمُرْ بِرَبِّكَ وَأَمَّا تَرَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنا مَعَ الْبَاقِينَ ۝

(১৮৭) আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা সে প্রতিজ্ঞাকে নিজেদের পেছনে ফেলে রাখল আর তার কেনা-বেচা করল সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। সুতরাং কতই না মন্দ তাদের এ বেচা-কেনা! (১৮৮) তুমি মনে করো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা আমার আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা আমার নিকট থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (১৮৯) আর আল্লাহর জন্যই হল আসমান ও যমিনের বাদশাহী। আল্লাহই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতার অধিকারী। (১৯০) নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে। (১৯১) যারা দাঁড়িয়ে, বসে, ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে, (তারা বলে), পরওয়ারদেগার। এসব তুমি অনর্থক সৃষ্টি করনি। সকল পবিত্রতা তোমারই, আমাদিগকে তুমি দোষের শাস্তি থেকে বাঁচাও। (১৯২) হে আমাদের পালনকর্তা। নিশ্চয় তুমি যাকে দোষকে নিক্ষেপ করলে তাকে সবসময়ে অপমানিত করলে; আর জ্বালয়দের জন্যে তো কোন সাহায্যকারী নেই। (১৯৩) হে আমাদের পালনকর্তা। আমরা নিশ্চিতরূপে শুনেছি একজন আহবানকারীকে ঈমানের প্রতি আহবান করতে যে, তোমাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আন; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের পালনকর্তা। অতঃপর আমাদের সকল গোনাহ মাফ কর এবং আমাদের সকল দোষক্রটি দূর করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও নেক লোকদের সাথে।

কিতাবদের কটুক্তি এবং কষ্ট দানের কারণে ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয়। এ সমস্তই হলো তাদের জন্য পরীক্ষা। এতে ঐশ্বর্য ধারণ করা এবং নিজেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাকওয়ার পরাকাষ্ঠা সাধনে নিয়োজিত থাকাই হল তাদের পক্ষে উত্তম। তাদের সাথে বাদানুবাদ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধর্মীয় জ্ঞান গোপন করা হারাম এবং কোন কাজ না করেই তার জন্য প্রশংসার অপেক্ষা করা দুর্বলীয়; আলোচ্য আয়াতসমূহে আহলে কিতাবদের দু'টি অপরাধ এবং তার শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর জ হল এই যে, তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল কিতাবের বিধি-বিধানসমূহকে কোন রকম হেরফের বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করে জনসমক্ষে বিবৃত করে দেবে এবং কোন নির্দেশই গোপন করবে না। কিন্তু তারা নিজেদের পার্থক্য স্বার্থ ও লোভের বশবর্তী হয়ে সে প্রতিজ্ঞার কোন পরোয়াই করেনি, বরং বিধি-নিষেধ তারা গোপন করেছে।

দ্বিতীয়তঃ তারা সংকল্প তো করেছে না তদুপরি কামনা করে যে, সংকাজ না করা সত্ত্বেও তাদের প্রশংসা করা হোক।

তওরাতের বিধি-বিধান গোপন করার ঘটনা সম্পর্কে সুহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে উল্লিখ রয়েছে যে, রসুল্লাহ (সাঃ) ইহুদীদের কাছে একটি বিষয় জিজ্ঞেস করলেন যে, এটা কি তওরাতে আছে? তারা তা গোপন করল এবং যা তওরাতে ছিল, তার বিপরীত বলে দিল। আর তাদের এ অসৎকর্মের জন্য অন্যদিত হয়ে ফিরে এল যে, আমরা চমৎকার খোকা দিয়ে দিয়েছি। এ ঘটনা প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হল, যাতে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় ব্যাপার, না-করা কাজের জন্য প্রশংসার আশ্রয় হওয়া। তা হল মুনাফেক ইহুদীদের একটি কর্মপন্থা যে, কোন জেহাদ সমাপ্ত হলে তারা কোন ছলছুতারিগতিতে ঘরে বসে থাকত এবং এভাবে জেহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য আনন্দ উপভোগ করত। আর রসুল-করীম (সাঃ) যখন ফিরে আসতেন, তখন তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে মিথ্যা কসম খেয়ে নানা অজুহাত বর্ণনা করত এবং আশা করত যে, তাদের এহেন কাজের জন্য প্রশংসা করা হোক। — (বুখারী)

কোরআনে করীমে এতদুভয় বিষয়ে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। তার প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ধর্মীয় জ্ঞান ও আল্লাহ-রসুলের বিধি-বিধান গোপন করা হারাম। তবে এ গোপন করার ব্যাপারটি হল তেমনভাবে গোপন করা যা ইহুদীদের কাজ ছিল। অর্থাৎ, — পার্থক্য স্বার্থে আল্লাহর আঙ্গন বা ইহুদীদের কাজ ছিল। তারা তা করে মানুষের নিকট থেকে অর্থ-কড়ি গ্রহণ করত। গোপন করা। তারা তা করে মানুষের নিকট থেকে অর্থ-কড়ি গ্রহণ করত। অবশ্য কোন ধর্মীয় কল্যাণ বিবেচনায় যদি কোন বিশেষ দ্রব্য জনসাধারণের মাঝে প্রকাশ করা না হয়, তবে তা এর অন্তর্ভুক্ত না। যেমন, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) স্বতন্ত্র এক পরিচ্ছেদ এ ব্যাপারে হাদীসে উদ্ধৃতি সহকারে বিবৃত করেছেন যে, অনেক সময় কোন কোন দ্রব্য প্রকাশ করতে গেলে সাধারণ জনগণের মাঝে ভুল-বুঝাবুঝির সৃষ্টি হত পারে এবং এতে তাদের নানা ফিৎনা-ফাসাদে পতিত হয়ে পড়ত। তাহলে, তাতে কোন দোষ নেই।

কোন সংকাজ করে সেজন্য প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনের অপেক্ষা

মূল সাক্ষ্য করা সত্ত্বেও শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তা দৃশ্যীয় এবং কাজ করা সত্ত্বেও এরূপ আচরণ তো আরও বেশী দৃশ্যীয়। আর মনের দিক দ্বারা এমন বাসনা সৃষ্টি হওয়া যে, আমিও অমুক কাজটি করব এবং তাতে সুখ হবে, তাহলে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য যদি সুনামের জন্য ক্ষণিকনিমিত্তভাবে ব্যবস্থা করা না হয়।—(যয়নুল-কোরআন)

এ আয়াতগুলোতে চিন্তা-ভাবনার প্রসঙ্গেই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাখ্যার ভাবতে হয়।

(এক) ‘আসমান-যমীন সৃষ্টি বলতে কি বোঝায় : خَالِق শব্দের দ্বারা নতুন আবিষ্কার ও সৃষ্টি। অর্থ হচ্ছে,— আসমান এবং যমীন সৃষ্টির দ্বারা আল্লাহ তাআলার এক বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান। এ দুয়ের মধ্যে ক্ষয়িত আল্লাহ তাআলার অসংখ্য সৃষ্টিরাজিকেও এ আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে। এ বিরাট সৃষ্টজগতের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রতিটি বস্তুই স্ব স্ব সৃষ্টিকর্তার নিদর্শনরূপে দাঁড়িয়ে আছে।

আরো একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে السَّمَوَاتِ শব্দ দ্বারা যেমন উল্লিখিত তথা সকল উন্নতি বোঝায়, তেমনি اَرْض বলতে নিম্নজগত তথা নিম্নমুখী সব কিছুকেই বোঝায়। সেমতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ পক্ষ যেমন সকল উচ্চতা ও উন্নতির সৃষ্টিকর্তা, তেমনি নিম্নজগৎ তথা সকল নিম্নমুখিতারও সৃষ্টিকর্তা।

(দুই) দিন-রাত্রির আবর্তন : চিন্তা-ভাবনার দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, দিন-রাত্রির আবর্তন অর্থে কি বোঝানো হয়েছে। এখানে اَلْاَيَّاتِ শব্দটি দ্বারা পরিভাষায় اَخْلَفَ فُلَانٌ فَلَانًا (অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির পরে এসেছে) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। সেমতে اَلْاَيَّاتِ শব্দটি বাক্যের অর্থ হবে, রাত্রির গমন এবং দিবসের আগমন।

اَلْاَيَّاتِ শব্দ দ্বারা কম-বেশীও বোঝায়। যেমন, শীতকালে রাত্রি হয় দীর্ঘ এবং দিন হয় চোঁটা, গরমকালে দিন বড় এবং রাত্রি হয় ছোট। অনুরূপ এক দেশ থেকে অন্য দেশে দিবস এবং রাত্রির দৈর্ঘ্যে তারতম্য হয়ে থাকে। যেমন, উত্তর মেরুর সন্নিবিষ্টকর্তী দেশগুলোতে দিবাভাগ উত্তর মেরু থেকে দূরতী দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশী দীর্ঘ হয়। এসবগুলো বিষয়ই আল্লাহ তাআলার অপার কুদরতের একেকটি অতি উজ্জ্বল নিদর্শন।

(তিন) ‘আয়াত’ শব্দের অর্থ : তৃতীয় ভাবনার বিষয় হচ্ছে ‘আয়াত’ বা নিদর্শন বলতে কি বোঝায়? آيَاتُ - آية - এর বহুবচন। শব্দটি ময়কটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যথা, যু’জ্জযাকে যেমন ‘আয়াত’ বলা হয়, তেমনি কোরআন শরীফের বাক্যকেও ‘আয়াত’ বলা হয়। তৃতীয় অর্থ দলীল-প্রমাণও বোঝানো হয়ে থাকে। এখানে তৃতীয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, এসব বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ তাআলার বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে।

(চার) اَلْاَيَّاتِ - চতুর্থ বিবেচ্য বিষয়। اَلْاَيَّاتِ শব্দের অর্থ সম্পর্কে ভাবনার বিষয় হচ্ছে, এর দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে?

اَلْاَيَّاتِ শব্দটি اَيٍّ শব্দের বহুবচন। অর্থ মগজ। প্রত্যেক বস্তুরই মগজ অর্থাৎ তার সারবস্তুকে বোঝায় এবং সে সারবস্তু দ্বারা প্রস্তুত বস্তুর বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। এ কারণেই মানুষের বুদ্ধি ও মেধাকে اَيٍّ বলা হয়। কেননা, বুদ্ধিই মানুষের প্রধান সারবস্তু। সেমতে اَلْاَيَّاتِ শব্দের অর্থ হচ্ছে বুদ্ধিশালী লোকজন।

বুদ্ধিমান শুধুমাত্র তারাই যারা ঈমান গ্রহণ করে এবং সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করে : এ বিষয়টি ছিল লক্ষ্যণীয় যে, বুদ্ধিমান বলতে কাদেরকে বোঝায়? কারণ, সমগ্র বিশ্বে প্রতিটি মানুষই বুদ্ধিমান হওয়ার দাবীদার। কোন একজন একান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও নিজেই নির্বোধ বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। সেজন্যই কোরআনে করীম বুদ্ধিমানের এমন কয়েকটি লক্ষণ ব্যতলে দিয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষেই বুদ্ধির মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হতে পারে।

প্রথম লক্ষণটি হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অনুভূত বিষয়ের জ্ঞান কান, নাক, চোখ, জিহ্বা প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও লাভ করা যায়। নির্বোধ জীব-জন্তুর মধ্যেও তা রয়েছে। পক্ষান্তরে বুদ্ধির কাজ হলো, লক্ষ্যণীয় নিদর্শনাদির মধ্য থেকে গৃহীত দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে এমন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যা অনুভবযোগ্য নয় এবং যার দ্বারা বাস্তবতার সর্বশেষ উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।

এই মূলনীতির প্রেক্ষিতে সৃষ্ট-জগতের প্রতি লক্ষ্য করলে আসমান, যমীন এবং এর অন্তর্গত যাবতীয় সৃষ্টি ও সেগুলোর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সামগ্রীর সূচ্য ও বিস্ময়কর পরিচালনা-ব্যবস্থা বুদ্ধিকে এমন এক সন্তার সন্ধান দেয়, যা জ্ঞান-অভিজ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত এবং যিনি যাবতীয় বস্তু সামগ্রীকে বিশেষ হেকমতের দ্বারা তৈরী করেছেন। তাঁরই ইচ্ছায় এই সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। বস্তুতঃ সে সত্তা একমাত্র আল্লাহ জাল্লাহু-শানুহুরই হতে পারে।

মানুষের ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ব্যর্থতা সর্বদা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কাজেই তাকে এই ব্যবস্থার পরিচালক বলা চলে না। সেজন্যই আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তাতে উপপন্ন বস্তুনিচয়ের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুদ্ধির সামনে একটিমাত্র পরিণতি সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর তাহল আল্লাহর পরিচয় লাভ, তাঁর আনুগত্য এবং তাঁরই যিকর করা। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে সে বুদ্ধিমান বলে কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কাজেই কোরআন মজীদ বুদ্ধিমানদের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছে—

اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُوَّةً وَّاعْلَىٰ جُؤُودِهِمْ

অর্থাৎ, বুদ্ধিমান হলো সে সমস্ত লোক যারা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে বসে, শুনে, ডানে ও বায়ে। অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ আল্লাহ তাআলার সুরণে নিয়োজিত থাকে।

এতে বোঝা গেল যে, বর্তমান পৃথিবী যে বিষয়টিকে বুদ্ধি এবং বুদ্ধিমানের মাপকাঠি বলে গণ্য করে নিয়েছে, তা শুধুমাত্র একটা ঠোকা। কেউ ধন-সম্পদ গুটিয়ে নেওয়ায় বুদ্ধিমত্তা সাব্যস্ত করেছে, কেউ বিভিন্ন ধরনের কল-কস্কা তৈরী করা কিংবা বাশ্প-বিদ্যুৎকে প্রকৃত শক্তি মনে করার নামই রেখেছে বুদ্ধিমত্তা। কিন্তু সুস্থ বিবেক ও সুস্থ বুদ্ধির কথা হলো তাই, যা আল্লাহ তাআলার নবী-রসূলগণ নিয়ে এসেছেন। যাতে করে এলম ও হেকমতের আলোকে পাখি ব্যবস্থা পরস্পরা নিম্ন থেকে গুরু করে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়ে গিয়ে মধ্যবর্তী পর্যায়গুলোকে উপেক্ষা করেছে। বিজ্ঞান তোমাদিগকে কাঁচা মাল থেকে কল-কারখানা পর্যন্ত এবং কল-কারখানা থেকে বাশ্প-বিদ্যুতের শক্তি পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে। কিন্তু

বুদ্ধির কাজ হলো আরও একটু এগিয়ে দেওয়া যাতে তোমরা বুঝতে পার, উপলব্ধি করতে পার যে, আসল কাজটি কি মাটি, পানি বা লোহা-তামার, না মেশিনের; আর নাইবা সেগুলোর মাধ্যমে তৈরী বাষ্পের। বরং কাজটি তাঁরই যিনি আশুন, পানি ও বায়ুকে সৃষ্টি করেছেন— যার ফলে এই বিদ্যুৎ, এই বাষ্প তোমরা পেতে পারছ।

এ ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, সেসব লোকই শুধু বুদ্ধিমান বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য, যারা আল্লাহকে চেনবেন এবং সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ তাঁকে স্মরণ করবেন।

সারকথা, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও সৃষ্টজগতের উপর চিন্তা-গবেষণা করে তার মাহাত্ম্য ও কুদরত সম্পর্কে অবগত হওয়া একটি মহৎ ও উচ্চ পর্যায়ের এবাদত। সেগুলোর মধ্যে গভীর মনোনিবেশ করে তা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ না করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। উল্লেখিত আয়াতের শেষ বাক্যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহে চিন্তা গবেষণা করার ফলাফল বাতলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۖ اَرْثًا, আল্লাহ তাআলার সীমাহীন সৃষ্টির উপর যে লোক চিন্তা-ভাবনা করে সে লোক এই অবস্থায় না পৌছে পারে না যে, এসব বস্তু-সামগ্রীকে আল্লাহ নিরর্থক সৃষ্টি করেননি বরং এসবের সৃষ্টির পেছনে হাজারো তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। সে সমস্তকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়ে মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে যে, সমগ্র পৃথিবী তাদের কল্যাণের জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ তাআলার

এবাদত-আরাধনার উদ্দেশ্যে। এটাই হলো তাদের জীবনের নক্ষ্য। অল্পস্পর্শ চিন্তা-গবেষণা করে এই তাৎপর্য আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছে যে, পানি ও বিশু-সৃষ্টি নিরর্থক নয় বরং এগুলো সবই বিশুদ্ধ আল্লাহ রক্ষণ আলামীনের অসীম কুদরত ও হেকমতেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পরবর্তীতে সে সমস্ত লোকের কয়েকটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রার্থনা উল্লেখ করা হয়েছে যা তারা নিজেদের পালনকর্তাকে চিনে নিয়ে তাঁর মহান দরবারে পেশ করেছিলেন।

প্রথম আবেদনটি ছিল এই যে, قَوْلًا عَذَابِ النَّارِ অর্থ, আমাদিগকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।

দ্বিতীয় আবেদনে আমাদিগকে আশ্বেরাতে রান্না থেকে অব্যাহতি দান কর। কারণ, যাদেরকে তুমি জাহান্নামে প্রবিষ্ট করবে, তাদেরকে সমস্ত বিশ্বের সামনে লাজ্জিত করা হবে। কোন কোন গুলামা লিখেছেন, হাশরের মাঠের লাজ্জনা এমন এক আযাব হবে যার ফলে মানুষ কামনা করবে যে, হায়, যদি তাকে জাহান্নামেই দিয়ে দেয়া হতো; তবুও যদি তার অপকর্মে প্রচার গোটা হাশরের সামনে করা না হতো।

তৃতীয় আবেদন : আমরা তোমার পক্ষ থেকে আগত আহ্বানকারী রসুলে মকবুল (সহ) - এর আহ্বান শুনেছি এবং তাতে ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদের বড় গোনাহগুলো ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের অন্যান্য ও দোষ-ত্রুটির কাঙ্ক্ষার করে দাও আর আমাদিগকে নেককার ও সৎকর্মশীলদের সাথে মৃত্যু দান কর। অর্থ, তাঁদের শ্রেণীভুক্ত করে দাও।

رَبِّنَا وَإِنَّمَا وَعَدْنَا عَلَىٰ سُلَيْكٍ وَلَا نُؤْتِيكَ الْقِيَمَةَ
 إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْوَعْدَ ۖ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ
 عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ وَأُنْتِی بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ
 فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَآمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَآوَدُوا بِسَبِيلِ
 وَقْتُوا وَفَعَلُوا الْكَفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَٰذِ خَلَّاهُمْ
 جَدَّتْ تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَأَيَّامٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
 اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝ لَا يَغْفِرُكَ فَقَابِلِ الَّذِينَ
 كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۖ مَتَّاعٌ قَلِيلٌ ۖ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ
 بِشِ الْبَهَادِ ۖ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَدَّتْ تَحْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ لَا تَزُولُ عَنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا
 عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْكَارِ ۖ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ الْيَكْمُ وَمَا أُنْزِلَ الْيَوْمَ خَشِيعِينَ
 لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَلَيْكَ لَمْ أَجْزُهُمْ
 عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاطِبُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(১৫৪) হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে দাও, যা তুমি ওয়াদা করেছ তোমার রসূলগণের মাধ্যমে এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে তুমি জপমানিত করো না। নিশ্চয় তুমি ওয়াদা খেলাফ কর না। (১৫৫) অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের সোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সেসমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে ধকল্যাণকে অপসারিত করব এবং তাদেরকে প্রতিষ্ট করব জন্মতে যার জন্মদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়। (১৫৬) নগরীতে কাফেরদের চল-চলন যেন তোমাদিগকে ধোকা না দেয়। (১৫৭) এটা হলো সামান্য ক্ষয়—এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোখখ। আর সেটি হলো অতি নিকট স্বস্থান। (১৫৮) কিন্তু যারা ভয় করে নিজেদের পালনকর্তাকে তাদের জন্যে রয়েছে জন্মতে যার জন্মদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রবাহ। তাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সদ্দা আপ্যায়ন চলতে থাকবে। আর যা আল্লাহর নিকট রয়েছে, তা সংকম্পনীদের জন্যে একান্তই উত্তম। (১৫৯) আর আহলে কিতাবদের যথা কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর উপর ইমান আনে এবং যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয়, আর যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর উপর, আল্লাহর সামনে বিনয়বনত থাকে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে সওদা করে না, তারাই হলো সে লোক যাদের জন্যে পারিশ্রমিক রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ যথাস্থিতি হিসাব চুকিয়ে দেন। (১৬০) হে ইমানদারগণ! ঐশ্বর্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।

উপরোক্ত তিনটি আবেদন ছিল আযাব, কষ্ট এবং অনিষ্ট থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য। পরবর্তীতে চতুর্থ আবেদনটি করা হয়েছে কল্যাণ লাভ সম্পর্কে যে, নবী-রসূলগণের মাধ্যমে জন্মাতের নেয়ামতসমূহের যে প্রতিশ্রুতি তুমি দান করেছ তা আমাদেরকে দান কর। কিয়ামতের দিন যেন লাঞ্ছনাও না হয়। অর্থাৎ, — প্রাথমিক জবাবদাহী ও বদনামীর পর মাফ করার পরিবর্তে প্রথম পর্যায়েই আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তুমি তো ওয়াদা ভঙ্গ কর না, কিন্তু এই আবেদন-নিবেদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, আমাদেরকে এমন যোগ্যতা দান কর যাতে আমরা তোমার সে ওয়াদা লাভের অধিকারী হতে পারি এবং শেষ পর্যন্ত যেন তাতে স্থির থাকতে পারি। আমাদের মৃত্যু যেন ইমান ও আ'মালে ছালেহর সাথে হয়।

হিজরত ও শাহাদতের দ্বারা হকুল এবাদ ব্যতীত অন্যান্য সব গোনাহ মাফ হয়ে যায় :..... لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ আয়াতের আগত্যে তফসীরের সার- সংক্ষেপে এই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, আল্লাহর হকের বেলায় যে সমস্ত ক্রটি গাফলতী ও পাপ-তাপ হয়ে থাকবে তা হিজরত ও শাহাদতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। তার কারণ, স্বয়ং রসুলে করীম (সাঃ) হাদীসে ঋণ-ধারণকে এ থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। বরং তাঁর ক্ষমার নিয়ম হলো স্বয়ং পাওনাদার কিংবা তার ওয়ারিসানকে প্রাণ্য পরিশোধ করে দেবে অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেবে। অবশ্য যদি কারো প্রতি আল্লাহ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ করে পাওনাদারকে রাজী করিয়ে দেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। কারো কারো ব্যাপারে এমন হবেও বটে।

এ আয়াতটিতে মুসলমানগণকে তিনটি বিষয়ে নছিহত করা হয়েছে। (১) সবর, (২) মুসাবারাহ (৩) মুরাবাতা ও (৪) তাকওয়া, যা এ তিনের সাথে অপরিহার্যভাবে যুক্ত।

‘সবর’ এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা ও বাধা। আর কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় এর অর্থ নকসকে তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর জমিয়ে রাখা। এর তিনটি প্রকার রয়েছে।

(এক) ‘সবর আলাত্তাআত’। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুল যে সমস্ত কাজের হুকুম করেছেন, সেগুলোর অনুবর্তিতা মনের উপর যত কঠিনই হোক না কেন তাতে মনকে স্থির রাখা।

(দুই) ‘সবর আনিল মা’আসী’ অর্থাৎ, যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসুল নিষেধ করেছেন, সেগুলো মনের জন্য যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, যত স্বাদেই হোক না কেন, তা থেকে মনকে বিরত রাখা।

(তিন) ‘সবর আলাল-মাসায়েব’ অর্থাৎ, বিপদাপদ ও কষ্টের বেলায় সবর করা, ঐশ্বর্য ধারণ করা, অঐশ্বর্য না হওয়া এবং দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহরই পক্ষ থেকে আগত মনে করে মন-মস্তিস্ককে সেজন্য অঐশ্বর্য করে না তোলা।

‘মোসাবারাহ’ শব্দটি সবর থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ, শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা। আর ‘মোরাবাতা’ অর্থ হলো, ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এ অর্থেই কোরআনে করীমে বলা হয়েছে وَثَبَّ رِبَاطًا لِلْعَيْلِ কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি দু’টি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(১) ইসলামী সীমান্তের হেফাযতে সুসজ্জিত হয়ে থাকা অপরিহার্য, যাতে ইসলামী সীমান্তের প্রতি শত্রুর রক্তচক্ষু তুলে তাকাতোও সাহস না পায়।

(২) জামাতের নামাযের এমন নিয়ামানুবর্তিতা করা যে, এক নামাযান্তেই দ্বিতীয় নামাযের জন্য অপেক্ষামান থাকা। এ দু'টি বিষয়ই ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মকবুল ইবাদত। এর মাহাত্ম্য অসংখ্য অগণিত। এখানে কয়েকটি মাত্র লিখে দেয়া হলো।

রেবাত বা ইসলামী সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা : ইসলামী সীমান্তের হেফাযত করার লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষারত থাকাকেই 'রেবাত' ও মোরাবাতাহ বলা হয়। এর দু'টি রূপ হতে পারে। প্রথমতঃ যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নেই.. সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত, এমতাবস্থায় শুধুমাত্র অগ্রিম হেফাযত হিসাবে তার দেখা-শোনা করতে থাকা। এক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনসহ সেখানে (সীমান্তে) বসবাস করতে থাকা কিংবা চাষ-বাস করে রুখী-রোযগার করাও জায়েয। এমতাবস্থায় যদি সীমান্ত রক্ষাই নিয়ত হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থায় রুখী-রোযগার করা যদি তারই আনুশঙ্গিক বিষয় হয়, তবে এমন ব্যক্তিরও 'রেবাত ফী সাবিলিল্লাহ'র সওয়াব হতে থাকবে। তাকে যদি কখনও যুদ্ধ করতে না হয়, তবুও। কিন্তু প্রকৃত নিয়ত যদি সীমান্তের হেফাযত না হয়, বরং রুখী-রোজগারই হয় মুখ্য, তবে দৃশ্যতঃ সীমান্ত রক্ষার কাজ করে থাকলেও এমন ব্যক্তি 'মোরাবেত ফী-সাবিলিল্লাহ' হবে না। অর্থাৎ, সে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে সীমান্ত রক্ষাকারী বলে গণ্য হবে না।

দ্বিতীয়তঃ সীমান্তে যদি শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, তবে এমতাবস্থায় নারী ও শিশুদিগকে সেখানে রাখা জায়েয নয়। তখন সেখানে তারাই থাকবে, যারা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। - (কুরতুবী)

এতদূত্থ অবস্থাতে 'রেবাত' বা সীমান্তরক্ষার অসংখ্য ফযীলত রয়েছে। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, -

'আল্লাহর পথে একদিনের 'রেবাত' (সীমান্ত প্রহরা) সমগ্র দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে সে সমুদয় থেকেও উত্তম।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে হযরত সালমান কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন- 'একদিন ও একরাতের রেবাত (সীমান্ত প্রহরা) ত্র্যমাসের রোযা এবং সমগ্র রাত এবাদতে কাটিয়ে দেয়া অপেক্ষাও উত্তম। যদি এমতাবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার সীমান্ত প্রহরার পর্যায়ক্রমিক সওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহ পক্ষ থেকে তার রিয়িক জারী থাকবে এবং সে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকবে।

আবু দাউদ (রহঃ) ফুয়লাহ ইবনে ওবায়দ-এর রেওয়ায়েতক্রমে এ মর্মে এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রসুল করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন- প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় শুধুমাত্র মোরাবেত (ইসলামী সীমান্তরক্ষা) ছাড়া। অর্থাৎ, তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে। এবং সে কবরে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী থেকে নিরাপদ থাকবে।

এসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'রেবাত' বা সীমান্ত রক্ষার কাজটি সমস্ত সদকায়ে জারিয়া অপেক্ষাও উত্তম। কারণ, সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সদকাকৃত বাড়ী-ঘর, জমি-জমা, রচিত গ্রন্থরাজি কিংবা গুণ্যকবিত্ত জিনিসের দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে। যখন উপকারিতা বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার সওয়াব বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে সীমান্ত প্রহরার সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। কারণ, সমস্ত মুসলমানের সংকর্মে নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব, যখন তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকবে। ফলে একজন সীমান্তরক্ষীর এ কাজ সমস্ত মুসলমানের সংকাজের কারণ হয়। সে কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত তার 'রেবাত' কর্মে সওয়াব অব্যাহত থাকবে। তাছাড়াও সে যত নেক কাজ দুনিয়ায় করাত, সেগুলোর সওয়াবও আমল করা ছাড়াই সর্বদা জারী থাকবে।

সূরা আল - ইমরান সমাপ্ত

প্রথমোক্ত সূরায় বিভিন্ন যুদ্ধ-জৈহাদ, শত্রুশক্তির সাথে আচার-আচরণ, যুদ্ধলব্ধ বস্তু সামগ্রীর (গণিমতের মাল) অপচয় ও আত্মসাতের ভয়াবহ পরিণাম প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে। আর আলোচ্য সূরার শুরুতে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অন্যের অধিকার সংক্রান্ত বিধান জারি করা হয়েছে। যেমন— অনাধ-এতীমের অধিকার, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার ও স্ত্রীদের অধিকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, হকুল-এবাদ বা অন্যের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কতকগুলো অধিকার রয়েছে, যেগুলো সাধারণতঃ দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় পড়ে এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তা কার্যকর করা যেতে পারে।

সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ও শ্রমের মজুরী প্রভৃতি এ জাতীয় অধিকার যা মূলতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে থাকে। এসব অধিকার যদি কোন এক পক্ষ আদায় করতে ব্যর্থ হয় অথবা সেক্ষেত্রে কোন প্রকার ক্রটি-বিচ্ছৃতি হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার সুরাহা করা যেতে পারে।

কিন্তু সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, কারো নিজ বংশের এতীম ছেলে মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক অধিকার আদায় হওয়া নির্ভর করে সহনুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার উপর। এসব অধিকারকে তোলাদণ্ডে পরিমাপ করা যায় না। কোন চুক্তির মাধ্যমেও তা নির্ধারণ করা দুষ্কর। সূতরাং এসব অধিকার আদায়ের জন্য আল্লাহ-তীতি এবং পরকালের ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উত্তম উপায় নেই। আর একেই বলা হয়েছে ‘তাকওয়া’। বস্তুতঃ এই তাকওয়া দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক শক্তির চেয়ে অনেক বড়। তাই আলোচ্য সূরাটিও তাকওয়ার বিধান দিয়ে শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে : **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** **اتَّقُوا رَبَّكُمُ** অর্থাৎ, হে মানবমণ্ডলী। তোমরা তোমাদের

পালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণকে ভয় কর। সম্ভবতঃ এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিয়ের খোতবায় এ আয়াতটি পাঠ করতেন। বিয়ের খোতবায় এই আয়াতটি পাঠ করা সূনত।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এখানে ‘হে মানবমণ্ডলী’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে যাতে সমগ্র মানুষই-পুরুষ হোক অথবা মহিলা, কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের হোক অথবা দুনিয়ার প্রলয় দিবস পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী - প্রতিটি মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

তাকওয়ার হকুমের সাথে সাথে আল্লাহর অসংখ্য নামের মধ্যে এখানে ‘রব’ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। অর্থাৎ, এমন এক সত্তার বিরুদ্ধাচরণ করা কি করে সম্ভব হতে পারে, যিনি সমগ্র সৃষ্টিলোকের লালন-পালনের হিম্মাদার এবং যার রবুবিয়াত বা পালন-নীতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টির প্রতিটি স্তরে স্তরে দেদীপ্যমান।

এরপরই আল্লাহ তাআলা মানব সৃষ্টির একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, তিনি বিশেষ কৌশল ও দয়ার মাধ্যমে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। মানব সৃষ্টির বিভিন্ন প্রক্রিয়া হতে পারতো, কিন্তু আল্লাহ একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন। আর তা হচ্ছে এই যে,

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَمْسِكُوهَا أَغْلًا وَلَا تَبْلُغُوا إِلَىٰ مَوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَثِيرًا ۝ وَلَنْ خِفْتُمْ أَزْوَاجًا ثَمَنًا ۝ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَنْ لَهُمْ مَالٌ وَلَا نَفْسٌ ۝ فَأُولَٰئِكَ يَرْجُونَ أَمْوَالَهُمْ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَمْسِكُوهَا أَغْلًا وَلَا تَبْلُغُوا إِلَىٰ مَوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَثِيرًا ۝ وَلَنْ خِفْتُمْ أَزْوَاجًا ثَمَنًا ۝ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَنْ لَهُمْ مَالٌ وَلَا نَفْسٌ ۝ فَأُولَٰئِكَ يَرْجُونَ أَمْوَالَهُمْ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَمْسِكُوهَا أَغْلًا وَلَا تَبْلُغُوا إِلَىٰ مَوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَثِيرًا ۝ وَلَنْ خِفْتُمْ أَزْوَاجًا ثَمَنًا ۝ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَمَنْ لَهُمْ مَالٌ وَلَا نَفْسٌ ۝ فَأُولَٰئِكَ يَرْجُونَ أَمْوَالَهُمْ ۝

সূরা আন-নিসা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত : ১৭০

পরম করুণাময় মহান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(১) হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচাচাক করে থাক এবং আত্মীয়-স্বজ্ঞাতদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। (২) এতীমদেরকে তাদের সম্পদ বুঝিয়ে দাও। স্বাধীন মালিকদের সাথে ভালো মালিকদের অদল-বদল করো না। আর তাদের ধন-সম্পদ নিজেদের ধন-সম্পদের সাথে সংমিশ্রিত করে তা গ্রাস করো না। নিশ্চয় এটা বড়ই মন্দ কাজ। (৩) আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক স্বাধীনভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই-তিন, কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি একরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতবিহীন জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।

(৪) আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।

(৫) আর যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন-যাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অবচীনদের হাতে তুলে দিও না। বরং তা থেকে তাদেরকে খাওয়াও, পরাও এবং তাদেরকে সন্তানর বাণী শোনাও।

দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একটি মাত্র মানুষ তথা হযরত আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও আত্মীয়তার সুদৃঢ় বন্ধন তৈরী করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ ভীতি এবং পরকালের ভয় ছাড়াও এই ভ্রাতৃ বন্ধনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় উদ্বুদ্ধ হয়েই যেন একে অন্যের অধিকারের প্রতি পুরোপুরি সম্মান প্রদর্শন করে এবং উচু-নিচু, আশরাফ-আতরাফ তথা ইতর-ভিন্নের ব্যবধান ভুলে গিয়ে যেন সবাই একই মানদণ্ডে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরী করে নেয়।

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجًا وَبَنَىٰ
مِنْكُمْ آدَمَ وَالنُّصْرَةَ

অর্থঃ, — সে মহাসত্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদের সকলকে একটি মানুষ তথা আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। আদম থেকে সৃষ্টি করার অর্থ এই যে, প্রথমতঃ হযরত আদমের (আঃ) স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই যুগল থেকেই পৃথিবীর সকল মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

অতএব, বলা যেতে পারে যে, এই আয়াতটি মূলতঃ পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত আয়াতসমূহের ভূমিকা হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই ভূমিকায় একদিকে আল্লাহ্র অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণের পরিণাম সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার সমগ্র মানুষকে একই পিতার সন্তান হিসেবে গণ্য করে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

অতঃপর আরো বলা হয়েছে যে, আল্লাহকে ভয় করো, যার নাম উচ্চারণ করে তোমরা অন্যের থেকে অধিকার দাবী কর এবং যার নামে শপথ করে অন্যের কাছ থেকে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করে থাক। এ পর্যায়ে আরো বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার সম্পর্কে তা পিতার দিক থেকেই হোক, অথবা মায়ের দিক থেকেই হোক, তাদের অধিকার সম্পর্ক সচেতন থাক, তা আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন কর।

দ্বিতীয় আয়াতে এতীম শিশুদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তাকিদ করা হয়েছে এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণের বিধানও জারি করা হয়েছে।

আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক : আলোচ্য সূরার সূচনাতেই আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। ‘আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক’ কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর দ্বারা সব রকম আত্মীয়ই বোঝানো হয়েছে। কালামে-পাকে ‘আরহাম’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মূলতঃ একটি বহুবচনবোধক শব্দ। এর একবচন হচ্ছে ‘রেহম’। আর ‘রেহম’ অর্থ জরায়ু বা গর্ভাশয়। অর্থাৎ, জন্মের প্রাকালে মায়ের উদরে যে স্থানে সন্তান অবস্থান করে। জন্মসূত্রেই মূলতঃ মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বুনியাদকে ইসলামী পরিভাষায় ‘সেলায়ে-রেহমী’ বলা হয়। আর এতে কোন রকম ব্যত্যয় সৃষ্টি হলে তাকে বলা হয় ‘কেহময়ে-রেহমী’।

হাদীস শরীফে আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর বিশেষ জোর দেওয়া

হয়েছে। মহানবী (সাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি তার রিযিকের প্রাচুর্য এক দীন জীবনের প্রত্যাশা করে, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা। - (মেশকাত - ৪১৯ পৃঃ)

এ হাদীসে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখার দুটি উপকরণ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক রাখলে পরকালে তো কল্যাণ লাভ হবেই, ইহকালেও সম্পদের প্রাচুর্য এক আল্লাহ্র রসুলের (সাঃ) পক্ষ থেকে দীর্ঘ জীবন লাভের আশ্বাস সম্পর্কিত সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বলেন : মহানবী (সাঃ)-এর মদীনায় আগমনের প্রায় সাথে সাথেই আমিও তাঁর দরবারে গিয়ে হাযির হলাম। সর্বপ্রথম আমার কানে তাঁর যে কথাটি প্রবেশ করল, তা হলো এই :

- “হে লোক সকল ! তোমরা পরস্পর পরস্পরকে বেশী বেশী স্নান দাও। আল্লাহ্র সন্তান লাভের জন্য মানুষকে খাদ্য দান কর। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোল এবং এমন সময়ে নামায মনোনিবেশ কর, যখন সাধারণ লোকেরা নিদ্রামগ্ন থাকে। স্মরণ রেখো, এ কথাগুলো পালন করলে তোমরা পরম সুখ ও শান্তিতে জন্মতে প্রবেশ করতে পারবে।” - (মেশকাত পৃঃ ১০৮)

অন্য এক হাদীসে আছে : উম্মুল-মু’মিনীন হযরত মায়মুনাহ (রাঃ) তাঁর এক বান্দাকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর মহানবী (সাঃ)-এর নিকট যখন এ খবর পৌছালেন, তখন তিনি বললেন, তুমি যদি বান্দী তোমার মামাকে দিয়ে দিতে, তাহলে অধিক পুণ্য লাভ করতে পারতে। - (মেশকাত - পৃঃ ১৭১)

ইসলাম দাস-দাসীদের আয়াদ করে দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছে এবং একে অতীব পুণ্যের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখাকে তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন :

- “কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করলে সদকার সওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন নিকটাত্মীয়কে সাহায্য করলে একই সপ্তকে সদকা এক আত্মীয়তার হক আদায়ের দ্বৈত পুণ্য লাভ করা যায়। - (মেশকাত - পৃঃ ১৭১)

আয়াতের শেষাংশে মানুষের অন্তরকে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বলা হয়েছে, ‘আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে খুবই সচেতন ও পর্যবেক্ষণকারী’। আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে ইচ্ছার কথাও ভালোভাবে অবগত রয়েছেন। কিন্তু যদি লোকলজ্জার ভয় অথবা সমাজ ও পরিবেশের চাপে পড়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সুব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্র কাছে এর কোন মূল্য নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহকে ভয় করার কি তাৎপর্য রয়েছে, তাও অনুধাবন করতে বেশি বেগ পেতে হয় না। কারণ, তাঁকে কীকি দেয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তিনি সর্বক্ষণই মানুষের আচার-আচরণ ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

কোরআনে-করীমের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোকে দুনিয়ার সমগ্র

আইন-কানুনের মতো বর্ণনা করা হয়নি।

কোরআনে বর্ণিত আইন-কানুনগুলোকে জনগণের হৃদয়গ্রাহী করার জন্য বিশেষ আশ্রিতিকতার সাথে এবং প্রশিক্ষণমূলক পন্থায় বর্ণনা করা হয়েছে। আইনগুলো বর্ণনা করার সাথে সাথে মানুষের মন-মানসিকতারও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে তাদের মধ্যে সেগুলোর গ্রহণ ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে।

এতীমের অধিকার : আলাচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে : **وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ** এতীমের সম্পদ তাদেরকে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। আরবী 'এতীম' শব্দটির অর্থ হচ্ছে, নিঃসঙ্গ। একটি কিশোরীর মধ্যে যদি একটি মাত্র মুক্তা জন্ম নেয়, তখন একে 'দূরে-এতীম' বা নিঃসঙ্গ মুক্তা বলা হয়ে থাকে।

ইসলামী পরিভাষায় যে শিশু-সন্তানের পিতা ইচ্ছাকাল করে, তাকে এতীম বলা হয়ে থাকে। অবশ্য জীব-জন্তুর ব্যাপারে এর বিপরীতভাবে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন, যে সব জীব-জন্তুর মা মরে যায়, সেগুলোকে এতীম বলা হয়।

ছেলে-মেয়ে বালগ হয়ে গেলে তাদেরকে ইসলামী পরিভাষায় এতীম বলা হয় না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন : বালগ যার পর আর কেউ এতীম থাকে না। - (মেশকাত- পৃঃ ২৪৪)

এতীম যদি পারিতোষিক অথবা উপটোকন হিসেবে কিছু সম্পদপ্রাপ্ত হয়, তাহলে এতীমের অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে সেসব মালেরও রক্ষাভুক্ত করা। এতীমের মৃত পিতা অথবা দেশের সরকার যে-ই উক্ত অভিভাবকে মনোনীত করুক না কেন ; তার উপরই এতীমের সম্পত্তির রক্ষাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তায়। উক্ত অভিভাবকের উচিত, এতীমের দ্বিতীয় প্রয়োজন তার গচ্ছিত ধন-সম্পদ থেকে নির্বাহ করা। এবং তৎক্ষণ পর্বস্তু এতীম বালগ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট তার সম্পত্তি অর্পণ না করা। কারণ, বালগ হওয়ার পূর্বে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি বিবেচনা সম্পত্তি সংরক্ষণের মতো না হওয়াই স্বাভাবিক।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে যে, এতীমের ধন-সম্পদ তার নিকট পৌঁছে দাও। আর এর অর্থ হচ্ছে এই যে, সে বালগ হলেই কেবল তার নিকট তার গচ্ছিত মালামাল পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে।

অতএব, এতীমের মালামাল তার নিকট পৌঁছে দেয়ার পন্থা হল এতীমের মালামাল পুরোপুরিভাবে সংরক্ষণ করা এবং সে বালগ হলে ঋণময় তার নিকট তার সম্পত্তি হস্তান্তর করা।

কোরআনের এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন অভিভাবক ব্যক্তিগতভাবে এতীমের মাল অপচয় ও আতসাৎ করবে না, ঠাই যথেষ্ট নয়; বরং তার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে তার ধন-সম্পদের সার্বিক রক্ষাভাবনা করা এবং এতীম বালগ না হওয়া পর্যন্ত তার নিজস্ব দায়িত্বে তা সংরক্ষণ করা।

মেয়েদের অধিকার সংরক্ষণ : জাহেলিয়াত যুগে এতীম মেয়েদের অধিকার চরমভাবে ক্ষুণ্ণ করা হত। যদি কোন অভিভাবকের অধীনে কোন এতীম মেয়ে থাকতো আর তারা যদি সুন্দরী হতো এবং তাদের কিছু সম্পদ সম্পত্তিও থাকতো, তাহলে তাদের অভিভাবকরা নামমাত্র মোহর দিয়ে

তাদেরকে বিয়ে করে নিতো অথবা তাদের সম্ভানদের সাথে বিয়ে দিয়ে সম্পত্তি আতসাৎ করার ফিকির করতো। এসব অসহায় মেয়েদের পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থার কথা তারা চিন্তাও করতো না।

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সাঃ)-এর যুগে ঠিক এ ধরনের একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। জনৈক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি এতীম মেয়ে ছিল। সে ব্যক্তির একটি বাগান ছিল, যার মধ্যে উক্ত এতীম বালিকাটিরও অংশ ছিল। সে ব্যক্তি উক্ত মেয়েটিকে বিয়ে করে নিলো এবং নিজের পক্ষ থেকে 'দেন-মোহর' আদায় তো করলোই না, বরং বাগানে মেয়েটির যে অংশ ছিল তাও সে আতসাৎ করে নিলো। এ ঘটনার পরিলোকে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

وَأَنْ خِفْتُمْ مِنْ الزَّوْجِ

অর্থাৎ, মেয়ের তো অভাব নেই, বিয়ে যদি করতেই হয়, তবে অন্য স্ত্রীলোকদের মধ্য থেকে একাধিক বিয়ে করতে পার।

নাবালেগের বিয়ে প্রসঙ্গে : আলাচ্য আয়াতে যে 'ইয়াতামা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে এতীম মেয়ে। আর শরীয়তের পরিভাষায় সে বালক অথবা বালিকাকেই এতীম বলা হয়ে থাকে, যে এখনো বালগ হয়নি। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এতীমের অভিভাবকের এখতিয়ার রয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে বালগ হওয়ার আগেই তাদের বিয়ে-শাদী দিতে পারে। তবে তাদের ভবিষ্যত মঙ্গল ও কল্যাণকে সামনে রেখেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বয়সের সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। এমনকি অনেক বড় বড় মেয়েকেও ছোট ছোট ছেলেদের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। ছেলের স্বভাব-চরিত্র যাচাই-বাছাই না করেই কোন একটি মেয়েকে তার নিকট সোপর্দ করা হয়-এটা কোন ক্রমেই ঠিক হবে না।

এ ছাড়া এমন অনেক বালগ অবিবাহিতা মেয়েও পাওয়া যায়, বিয়ের পূর্বেই যাদের বাপ মারা গেছে। এসব মেয়ে বালগ হলেও মেয়ে-সুলভ লজ্জা-শরমের কারণে তাদের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের সামনে কোন প্রকার উচ্চ-বাচ্য করতে পারে না এবং অভিভাবক যা কিছু করে সেটাই তারা নতশিরে গ্রহণ করে নেয়। এমতাবস্থায় অভিভাবকদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে তাদের অধিকার কোনক্রমেই ক্ষুণ্ণ না হয়।

এ আয়াতে এতীম মেয়েদের বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সাধারণ আইন-কানুনের মতো তা শুধু প্রশাসনের উপর ন্যস্ত করার পরিবর্তে জনসাধারণের মধ্যে আল্লাহ-ভীরুর অনুভূতি জাগ্রত করা হয়েছে। তাই বলা হয়েছে যে, যদি ইনসাফ করতে পারবে না বলে মনে কর, তা হলে এতীম মেয়েদেরকে বিয়ে করবে না; বরং সে ক্ষেত্রে অন্য মেয়েকেই বিয়ে করে নেবে। এ কথা বলার সাথে সাথে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। যাতে এতীম ছেলে-মেয়েদের কোন প্রকার অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয় সে ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

বহু-বিবাহ : বহু-বিবাহের প্রথাটি ইসলামপূর্ব যুগেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্ম মতেই বৈধ বলে বিবেচিত হতো। আরব, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইরান, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি সব দেশেই এই প্রথার প্রচলন ছিল। বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্তমান যুগেও স্বীকৃত।

বর্তমানকালে ইউরোপের এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ বহু বিবাহ রহিত করার জন্য তাদের অনুসারীদেরকে উদ্ধুদ্ধ করে আসছেন বটে, কিন্তু তাতে কোন সফল হয়নি। বরং তাতে সমস্যা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফল রক্ষিতার রূপে প্রকাশ পেয়েছে। অবশেষে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ব্যবস্থারই বিজয় হয়েছে। তাই আজকে ইউরোপের দূরদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বহু-বিবাহ পুনঃপ্রচলন করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করছেন।

ইসলাম পূর্ব যুগে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন ধর্ম এবং দেশের ইতিহাস থেকে এটা জানা যায় যে, এর প্রতি কোন প্রকার বাধা-নিষেধও ছিল না। ইহুদী, খ্রীষ্টান, আর্য, হিন্দু এবং পারসিকদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও কোন সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই এই ব্যবস্থা চালু ছিল। তবে তৎকালে সীমা-সংখ্যাহীন বহু-বিবাহের জন্য অনেকের লোভ-লালসার অন্ত ছিল না। অন্য দিকে এ থেকে উদ্ধৃত দায়িত্বের ব্যাপারেও তারা সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারত না; বরং এসব স্ত্রীকে তারা রাখত দাসী-বাদীর মত এবং তাদের সাথে যথেষ্ট ব্যবহার করত। তাদের প্রতি কোন প্রকার ইনসাক করা হত না। চরম বৈষম্য বিরাজ্ঞ করত পারম্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

অনেক সময়, পছন্দসই দু'একজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে অবশিষ্টদের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন করা হত।

ইসলামের বিধান : কোরআন এই সামাজিক অনাচার এবং জুলুমের প্রতিরোধ করেছে। বহু-বিবাহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিধি-নিষেধও জারি করেছে। ইসলাম একই সময় চার এর অধিক স্ত্রী রাখাকে হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলাম এ ক্ষেত্রে ইনসাক কায়মের জন্য বিশেষ তাকিদ দিয়েছে এবং ইনসাকের পরিবর্তে জুলুম করা হলে তার জন্য শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, - তোমাদের পছন্দমত দুই, তিন, অথবা চারজন স্ত্রীও গ্রহণ করতে পার।

আলোচ্য আয়াতে **مَا لَكُمْ** (যা তোমাদের ভাল লাগে) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। হযরত হাসান বসরী, ইবনে জুবারের এবং ইবনে-মালেক (রাহঃ) শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন **ما حل** শব্দ দ্বারা; যার অর্থ হচ্ছে, যে সব মেয়ে তোমাদের জন্য বৈধ। আর অনেক তফসীরকার উপরোক্ত শব্দটির শাস্তিক অর্থ 'পছন্দ' দ্বারাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন। তবে উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে কোন প্রকার বৈপরীত্য নেই। অর্থাৎ, এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, যেসব মেয়ে প্রকৃতিগতভাবে তোমাদের মনঃপূত এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ হয় কেবল তাদেরকেই বিয়ে করতে পার।

আলোচ্য আয়াতে একাধিক অর্থাৎ, চারজন স্ত্রী গ্রহণ করার সুযোগ অবশ্য দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে এই চার পর্যন্ত কথাটি আরোপ করে তার উর্ধ্ব সংখ্যক কোন স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না বরং তা হবে সম্পূর্ণ

নিষিদ্ধ- তাও ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে।

যদি সমতা রক্ষা করা সম্ভব না হয় : চারটি পর্যন্ত কিয়র অনুমতি দেয়ার পর বলা হয়েছে :

— **فَإِنْ خِفْتُمْ أَكْثَرَ اللَّوَاوِحِدَةِ** —

অর্থাৎ, যদি আশঙ্কা কর

যে, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবে এক স্ত্রীতেই ভ্রূণ থাক।

পবিত্র কোরআনে চার জন স্ত্রীর কথা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এক সাথে সাথে এও বলে দেয়া হয়েছে যে, যদি তোমরা তাদের মধ্যে সমতা বিধান তথা ন্যায্য বিচার করতে না পার, তাহলে এক স্ত্রীর উপরেই নির্ভর কর। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, একাধিক বিয়ে ঠিক তখনই বৈধ হতে পারে, যখন শরীয়ত মোতাবেক সবার সাথে সমান আচরণ করা হবে; তাদের সবার অধিকার সমভাবে সুরক্ষণ করা সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে অপারক হলে এক স্ত্রীর ওপরই নির্ভর করতে হবে এবং এটাই ইসলামের নির্দেশ।

রসূলে করীম (সাঃ) একাধিক স্ত্রীর বেলায় সবার সাথে পরিপূর্ণ সমতার ব্যবহার করার ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকিদ করেছেন এবং যারা এর খেলাফ করবে, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির খবর দিয়েছেন। নিজের ব্যবহারিক জীবনেও তিনি এ ব্যাপারে সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করে দেখিয়েছেন। এমনকি তিনি এমন বিষয়েও সমতাपूर्ण ব্যবহারের আদর্শ স্থাপন করেছেন যে ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ছিল না।

এক হাদীসে হযুর (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী রয়েছে, সে যদি এদের মধ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্ণ সমতা ও ইনসাক করতে না পারে, তবে কিয়ামতের ময়দানে সে এমনভাবে উঠবে যে, তার শরীরের এক পাশ্বে অবশ্য হয়ে থাকবে। (মেশকাত শরীফ, ২৭৮ পৃঃ)

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভালবাসা ও অন্তরের আকর্ষণ মানুষ সাধ্যাত্ম ব্যাপার নয়। তাই অসাধ্য বিষয়টিতেও সমতা রাখার উদ্দেশ্যে অতঃপর বলা হয়েছে : **فَلَا تَيْبَسُوا فِي الْوَالِدَيْنِ** অর্থাৎ, কোন এক স্ত্রী প্রতি যদি তোমার আন্তরিক আকর্ষণ বেশী হয়ে যায়, তবে সেটা তোমার সাধ্যাত্ম ব্যাপার নয় বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও অন্যজনের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন করা জায়েয হবে না। আলোচ্য আয়াতে

خِفْتُمْ أَكْثَرَ اللَّوَاوِحِدَةِ অর্থাৎ, যদি ইনসাকपूर्ण ব্যবহার করার রাখতে পারবে না বলে ভয় কর, তবে এক স্ত্রীতেই ভ্রূণ থাক, বদলে সমস্ত ব্যাপারেই ইনসাকपूर्ण ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেগুলো মানুষের সাধ্যাত্ম। এসব ব্যাপারে বৈইনসাকী মহাপাপ। আর যাদের এরূপ পাপে জড়িত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাদের পক্ষে একাধিক বিয়ে না করাই কর্তব্য।

একটি সন্দেহ ও তার জবাব : সূরা নিসার এ আয়াতে ইনসাকपूर्ण ব্যবহার করতে না পারার আশঙ্কার ক্ষেত্রে এক বিয়েতেই ভ্রূণ থাক নির্দেশ এবং পরবর্তী আয়াতে 'তোমরা কোন অবস্থাতেই একাধিক স্ত্রী মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না' এ দু'আয়াতের মূল তাৎপর্য অনুমান করতে না পেরে অনেকেই এমন একটা ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ইনসাকपूर्ण ব্যবহার ক্ষুদ্র হওয়ার আশঙ্কার ক্ষেত্রে যেহেতু এক বিয়ে নির্দেশ এবং খোদ কোরআনই যখন বলে যে, তোমরা কোন অবস্থাতে

মৌখিক স্ত্রীর মধ্যে সমান ব্যবহার বজায় রাখতে সমর্থ হবে না, সুতরাং প্রাকৃতিকভাবে কোরআন এক বিয়েরই অনুমোদন দেয় এবং বহু বিবাহ হিতকর।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত যে ডুল তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। কেননা, একাধিক বিয়ে বন্ধ করাই যদি আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় হত, তবে “নারীদের মধ্যে যাদের ভাল লাগে তাদের মধ্য থেকে তোমরা দুই, তিন, চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পার” — এরূপ বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া **فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا** বলে ইনসাফ কায়ম না করার সন্দেহ বাক্য করারও কোন অর্থ হয় না।

এছাড়া খোদ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীগণের কর্মধারা ও মৌখিক বর্ণনা এবং পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে মুসলিম সমাজে বিনা দ্বিধায় একাধিক বিয়ের রীতি প্রচলিত থাকাই প্রমাণ করে যে, বহু বিবাহ বৈধ হওয়ার দ্বারায় প্রথম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন না।

প্রকৃত প্রস্তাবে সূরা নিসার এ আয়াত দ্বারা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপারে স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে মানুষের সাধারণ বাইরে অর্থাৎ, আন্তরিক আকর্ষণের ব্যাপারে সমতা বজায় রাখা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করা হয়েছে। সুতরাং দু’টি আয়াতের মর্মে যেমন কোন বৈপরীত্য নেই, তেমনি এ আয়াতের দ্বারা একাধিক বিবাহের প্রাধান্যও প্রমাণিত হয় না।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে : **ذَلِكَ أَدَّى إِلَيْتُكُمُوهَا** এর দু’টি শব্দ রয়েছে। একটি **أَدَّى** এটি **دَنُو** ধাতু থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ হয় নিকটতর। দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে **عَمِلَ** — **عَالَ** বন্ধুকে পড়া অর্থ ব্যবহৃত হয়। এখানে শব্দটি অসঙ্গতভাবে বন্ধুকে পড়া এবং দাম্পত্য জীবনে নির্ধাতনের পথ অবলম্বন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ হচ্ছে এই যে, এ আয়াতে তোমাদের যা বলা হলো যে, সমতা বজায় রাখতে না পারার আশঙ্কা থাকলে এক স্ত্রী নিয়েই সংসারযাত্রা নির্বাহ কর কিংবা স্ত্রীসত্ত্ব সম্মত ক্রীতদাসী নিয়ে সংসার কর; — এটা এমন এক পথ যা অবলম্বন করলে তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। বাড়িবাড়ি বা গীমা লব্ধনের সম্ভাবনাও দূর হবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে, এক স্ত্রী হলে তো আর অবিচার কিংবা জুলুমের কোন অবকাশই থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ‘তোমরা জুলুম না করার নিকটে থাকবে’ এরূপ বলার অর্থ কি? বরং এখানে বলা উচিত ছিল যে, এক বিবাহের ক্ষেত্রে তোমরা অবিচারের পথ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যাবে।

জবাব হচ্ছে এই যে, যেহেতু অনেক ক্ষেত্রে লোকেরা এক স্ত্রীকেও নানাভাবে জ্বালা-যন্ত্রণার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে রাখে সুতরাং এক স্ত্রীর সঙ্গার করলে তোমরা জুলুম বা সীমালংঘন থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে যাবে এরূপ না বলে **أَدَّى** (আদান) শব্দটি বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, এটা অবিচারের পথ পরিহার করার নিকটবর্তী পন্থা। এ পথ অবলম্বন করলে তোমরা ইনসাফের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবে। আর পরিপূর্ণ ইনসাফ তখনই হবে, যখন তোমরা স্ত্রীর বদ-মেজাজী, উদ্ধত আচরণ প্রভৃতি সবকিছু ধৈর্য সহকারে বরদাশত করতে পারবে।

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয় :

স্ত্রীদের মোহরের ব্যাপারে তখনকার দিনে অনেক ধরনের অবিচার ও জুলুমের পন্থা প্রচলিত ছিল।

(এক) স্ত্রীর প্রাপ্য মোহর তার হাতে পৌঁছাতো না; মেয়ের অভিভাবকগণই তা আদায় করে আত্মসাৎ করতো। যা ছিল নিতান্তই একটা নির্যাতনমূলক রেওয়াজ। এ প্রথা উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে কোরআন নির্দেশ দিয়েছে :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ

এতে স্বামীর প্রতি নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, স্ত্রীর মোহর তাকেই পরিশোধ কর; অন্যকে নয়। অন্যদিকে অভিভাবকগণকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মোহর আদায় হলে তা যার প্রাপ্য তার হাতেই অর্পণ করে। তাদের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন তা খরচ না করে।

(দুই) স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করার ক্ষেত্রে নানা রকম তিক্ততার সৃষ্টি হতো। প্রথমতঃ মোহর পরিশোধ করতে হলে মনে করা হতো যেন জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এ অনাচার রোধ করার লক্ষ্যেই **يُحِلُّ** আয়াতে শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত হৃষ্টমনে তা পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, অভিধানে **يُحِلُّ** বলা হয় সে দানকে যা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রদান করা হয়।

মোটকথা, আয়াতে বলা দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের মোহর অবশ্য পরিশোধ্য একটা ঋণ বিশেষ। এটা পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরী। পরন্তু অন্যান্য ওয়াজেব ঋণ যেমন সন্তুষ্ট চিত্তে পরিশোধ করা হয়, স্ত্রীর মোহরের ঋণও তেমনি হৃষ্টচিত্তে, উদার মনে পরিশোধ করা কর্তব্য।

(তিন) অনেক স্বামীই তার বিবাহিত স্ত্রীকে অসহায় মনে করে নানাভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মোহর মাফ করিয়ে নিতো। এভাবে মাফ করিয়ে নিলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হতো না। অথচ স্বামী মনে করতো যে, মৌখিকভাবে যখন স্বীকার করিয়ে নেয়া গেছে, সুতরাং মোহরের ঋণ মাফ হয়ে গেছে। এ ধরনের জুলুম প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে :

فَإِنْ طِئِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَرَوَءًا مَرَرًا

— অর্থাৎ, যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রস্তুত হয়ে মোহরের কোন অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবেই তোমরা তা হৃষ্টমনে ভোগ করতে পার।

অর্থ হচ্ছে, চাপ প্রয়োগ কিংবা কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি করে ক্ষমা করিয়ে নেয়ার অর্থ কোন অবস্থাতেই ক্ষমা নয়। তবে স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায়, খুশী মনে মোহরের অংশবিশেষ মাফ করে দেয় কিংবা পুরোপুরিভাবে বুঝে নিয়ে কোন অংশ তোমাদের ফিরিয়ে দেয়, তবেই কেবল তা তোমাদের পক্ষে ভোগ করা জায়েয হবে।

এ ধরনের বহু নির্যাতনমূলক প্রথা জাহেলিয়াত যুগে প্রচলিত ছিল। কোরআন এসব জুলুমের উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজও মুসলিম সমাজে মোহর সম্পর্কিত এ ধরনের নানা নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা প্রচলিত দেখা যায়। কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী এরূপ নির্যাতনমূলক পথ পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য।

আয়াতে ‘হুটচিস্তে’ প্রদানের শর্ত আরোপ করার পেছনে গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কেননা, মোহর স্ত্রীর অধিকার এবং তার নিজস্ব সম্পদ। হুটচিস্তে যদি সে তা কাউকে না দেয় বা দাবী ত্যাগ না করে, তবে স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষে সে সম্পদ কোন অবস্থাতেই হালাল হবে না। হযর (সাঃ) এ হাদীসে শরীয়তের মূল নীতিরূপে এরশাদ করেছেন।

الا لا تظلموا الا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه

- অর্থৎ, ‘সাবধান’! জুলুম করো না। মনে রেখো, কারো পক্ষে অন্যের সম্পদ তার আন্তরিক তৃষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল হবে না।’ - (মেশকাতেঃ ২৫৫ পৃঃ)

এ হাদীসটি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির নির্দেশ দেয় যা সর্বপ্রকার প্রাপ্য ও লেন-দেনের ব্যাপারে হালাল এবং হারামের সীমারেখা নির্দেশ করে।

সম্পদের হেফাজত জরুরী : এ আয়াতে ধন-সম্পদের গুরুত্ব এবং মানুষের জীবন ধারণ ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তদসঙ্গে সম্পদের হেফাজতের ক্ষেত্রে একটা সাধারণ ক্রটির সংশোধন নির্দেশ করা হয়েছে। তা হচ্ছে, অনেকেই স্নেহাঙ্ক হয়ে অস্পব্যয়স্ক, অনভিজ্ঞ ছেলে-মেয়ে অথবা স্ত্রীলোকদের হাতে ধন-সম্পদের দায়-দায়িত্ব তুলে দেয়। যার অবশ্যস্বাবী পরিণতি সম্পদের অপচয় এবং যা দারিদ্র্য ঘনিয়ে আসার আকারে দেখা দেয়।

অর্বাচীন ও অনভিজ্ঞদের হাতে সম্পদ তুলে দেয়া নিষিদ্ধ : মুফাসসিরে কোরআন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কোরআনে পাকের এ আয়াতে নির্দেশ করা হচ্ছে যে, তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ অপ্রাপ্তব্যয়স্ক সন্তান-সন্ততি কিংবা অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোকদের হাতে তুলে দিয়ে তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকো না, বরং আল্লাহ তাআলা যেহেতু তোমাকে অভিভাবক এবং দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন, সেজন্য

তুমি সম্পদ তোমার নিজের হাতে রেখে তাদের খাওয়া-পারার দায়-দায়িত্ব পালন করতে থাক। যদি তারা অর্থ সম্পদের দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে নেয়ার আঙ্গার করে, তবে তাদেরকে ভালভাবে বুঝিয়ে দাও যে, এসব তোমাদের জন্যই সংরক্ষণ করা হচ্ছে, যাতে তাদের মনোকষ্টের কারণ না হয়, আবার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও দেখা না দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-আব্বাসের এ ব্যাখ্যা মতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা এবং অনভিজ্ঞ যে কোন স্ত্রীলোকের হাতেই ধন-সম্পদ তুলে না দেয়ার নির্দেশ প্রমাণ হয়- যাদের হাতে পড়ে সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এতে এতীম শিশু বা নিজের সন্তানের কোন পার্শ্ব নেই। হযরত আবু মুসা আশআরীও এ আয়াতের এরূপ তফসীরই বর্ণনা করেছেন। ইমামে-তফসীর হাফেজ তাবারীও এ মতই গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যে এ আয়াতের নির্দেশ এতীমদের বেলাতেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়। কিন্তু আয়াতে যে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং ‘তোমাদের সম্পদ’ বলে যে ইশারা করা হয়েছে, তাতেও এতীম এবং সাধারণ বালক-বালিকা নির্বিশেষে সবার বেলাতেই এ নির্দেশ প্রযোজ্য বলে মনে হয়। মোট কথা, মালের হেফাজত অত্যন্ত জরুরী এবং অপচয় করা গোনাহের কাজ।

নিজের সম্পদের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদের মর্যাদা পাবে। যেমন, জীবন রক্ষা করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সেও শহীদের মর্যাদা পাবে বলে হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে। হযর (সাঃ) এরশাদ করেন : **من قتل دون ماله فهو شهيد** “নিজের মালের হেফাজত করতে গিয়ে যদি কেউ নিহত হয়, তবে সে শহীদ” অর্থাৎ, সওয়াবের দিক দিয়ে শহীদের মর্যাদা পাবে। - (বুখারী ও মুসলিম)

وَابْتَئُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ اسْتَمْتُمْ مِنْهُمْ رُسُودًا فَإِنْ دَفَعْتُمْ أَمْوَالَهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِظْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللهِ حَسِيبًا ۝ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۚ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْضُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلِيُشْفِيَ الْكَلْبَيْنِ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذَرْبَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝

(৬) আর এতীমদের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবে, যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের বয়সে পৌঁছে। যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি-বিবেচনার উন্মেষ আঁচ করতে পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পণ করতে পার। এতীমের মাল প্রয়োজনানুসারে খরচ করা না বা তারা বড় হয়ে যাবে মনে করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যারা স্বচ্ছল তারা অবশ্যই এতীমের মাল খরচ করা থেকে বিরত থাকবে। আর যে অভাবগ্রস্ত সে সঙ্গত পরিমাণ খেতে পারে। যখন তাদের হাতে তাদের সম্পদ প্রত্যাপণ কর, তখন সাক্ষী রাখবে। অবশ্য আল্লাহই হিসাব নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট। (৭) পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশী। এ অংশ নির্ধারিত। (৮) সম্পত্তি বন্টনের সময় যখন আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও মিসকীন উপস্থিত হয়, তখন তা থেকে তাদের কিছু খাইয়ে দাও এবং তাদের সাথে কিছু সদালাপ করো। (৯) তাদের ত্রয় করা উচিত, যারা নিজেদের পক্ষাতে দুর্বল-অক্ষম সন্তান-সন্ততি ছেড়ে গেলে তাদের জন্যে তারাও আশঙ্কা করে; সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে। (১০) যারা এতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সমুদ্রই তারা আগ্নিতে প্রবেশ করবে।

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথমতঃ আয়াত দ্বারা যখন বোঝা গেল যে, যে পর্যন্ত সাংসারিক ব্যাপারে নাবালেগদের বুদ্ধিমত্তা প্রমাণিত না হবে, সে পর্যন্ত তাদের হাতে ধন-সম্পদের দায়িত্ব অর্পণ করা সমীচীন নয়। সেজন্য দ্বিতীয় আয়াতে শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা ও যোগ্যতা যাচাই করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছেঃ বলা হয়েছেঃ

وَابْتَئُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

অর্থাৎ, বালেগ হওয়ার আগেই ছোট ছোট দায়িত্ব দিয়ে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছে অর্থাৎ, বালেগ হয়। মোটকথা, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে তাদের যোগ্যতা যাচাই করতে থাক এবং যখন দেখ যে, তারা দায়িত্ব বহন করার যোগ্য হয়ে উঠেছে, তখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে বুদ্ধিয়ে দাও। সারকথা হচ্ছে, শিশুদের বিশেষ প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশের মাপকাঠিতে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (এক) বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়, (দুই) বালেগ হওয়ার পরবর্তী সময়, (তিন) বালেগ হওয়ার আগেই জ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ট বিকাশ।

এতীম শিশুর অভিভাবকগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন তারা শিশুর লেখাপড়া ও জীবন গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। অতঃপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বুদ্ধির বিকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে ছোট ছোট কাজ কারবার এবং লেন-দেনের দায়িত্ব অর্পণ করে তাদের পরীক্ষা করতে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে وَابْتَئُوا الْيَتَامَىٰ বাক্যের অর্থ এটাই। এ থেকে হয়রত ইমাম আবু হানিফা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যদি তার অভিভাবকের অনুমতিক্রমে লেন-দেন বা ক্রয়-বিক্রয় করে, তবে তা বৈধ ও কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় নির্দেশ হচ্ছেঃ শিশু যখন বালেগ এবং বিয়ের যোগ্য হয়ে যায়, তখন তার অভিজ্ঞতা ও বিষয়-বুদ্ধি পরিমাপ করতে হবে। যদি দেখা যায়, সে তার ভালমন্দ বুঝবার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, তখন তার বিষয়-সম্পত্তি তার হাতে তুলে দাও।

বুদ্ধি-বিবেচনার সংজ্ঞাঃ আয়াতে উল্লেখিত اسْتَمْتُمْ

বাক্য দ্বারা কোরআনের এ নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, এতীম শিশুর মধ্যে যে পর্যন্ত বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ লক্ষ্য না কর, সে পর্যন্ত তাদের বিষয়-সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিও না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ 'বুদ্ধি-বিবেচনা' সময়সীমা কি? কোরআনের অন্য কোন আয়াতেও এর কোন শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এ জন্য কোন কোন ফিকাহবিদ মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি কোন এতীমের মধ্যে যথেষ্ট বয়স হওয়ার পরও বুদ্ধি বিবেচনার লক্ষণাদি দেখা না যায়, তবে অভিভাবক তার হাতে বিষয় সম্পত্তি তুলে দিতে পারবে না। সমগ্র জীবন এ সম্পত্তি তাঁর তত্ত্বাবধানে রাখতে হলেও না।

এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, এখানে বুদ্ধি-বিবেচনা না থাকার অর্থ হচ্ছে শিশুসুলভ চপলতা। বালেগ হওয়ার পরবর্তী দশ বছরের মধ্যে এ চপলতা স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়ে যায়। সেমতে বালেগ হওয়ার বয়স পনের বছর এবং তারপর দশ বছর, এভাবে

পঁচিশ বছর বয়স হওয়ার পর অভিভাবককে ধরে নিতে হবে যে, এতদিনে তার মধ্যে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ অবশ্যই ঘটেছে, সুতরাং তার বিষয় সম্পত্তি তখন তার হাতেই তুলে দিতে হবে। কেননা, অনেকের মধ্যে জীবনের শেষ সীমা পর্যন্তও বুদ্ধি-বিবেচনার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়নি। তাই বলে তাকে সারাজীবন তার বিষয়-সম্পত্তির দায়-দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। আর যদি সে লোক বদ্ধ পাগল কিংবা একেবারেই নির্বোধ হয়, তবে তার ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র। এ ধরনের লোকের ব্যাপারে নাবালগ শিশুদের ক্ষুদ্রই কার্যকর হবে। পাগলামীর এ অবস্থায় সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়ে গেলেও অভিভাবককে সারা জীবনই তার সহায় সম্পত্তির দেখা-শোনা করতে হবে।

ওলী কতটুকু গ্রহণ করতে পারে : শেষ আয়াত এতীমের বিষয়-সম্পত্তি হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি এ সম্পদ থেকে তার পারিশ্রমিক বাবদ কিছু গ্রহণ করতে পারে, এ সম্পর্কিত নির্দেশ বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে: **وَمَنْ كَانَ غَرِيْبًا فَلْيَسْتَنْفِذْ** অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অভিভাবী নয় কিংবা তার প্রয়োজনীয় খরচ-পত্রের ব্যবস্থা অন্যত্র থেকে সংস্থান করতে পারে, তার উচিত এতীমের মাল থেকে তার পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা। কেননা, ওলী হিসেবে এতীমের বিষয়-সম্পত্তি দেখা শোনা করার দায়িত্ব তার উপর 'ফরম' কর্তব্য। সুতরাং এ দায়িত্ব পালন করার বিনিময়ে তার পক্ষে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার স্বত্ব : ইসলাম-পূর্বকালে আরব ও অনারব জাতিসমূহের মধ্যে দুর্বল শ্রেণী, এতীম বালক-বালিকা ও অবলা নারী চিরকালই জুলুম নির্যাতনের শিকার ছিল। প্রথমতঃ তাদের কোন অধিকারই স্বীকার করা হতো না। কোন অধিকার স্বীকার করা হলেও পুরুষদের কাছ থেকে তা আদায় করে নেয়ার সাধ্য কারো ছিল না।

ইসলাম সর্বপ্রথম তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করে। এরপর এসব অধিকার সরেক্ষণেরও চমৎকার ব্যবস্থা করে। উত্তরাধিকার আইনেও জগতের সাধারণ জাতিসমূহ সমাজের উভয় প্রকার দুর্বল অঙ্গকে তাদের স্বাভাবিক ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। আরবদের নিয়মই ছিল এই যে, যারা অশ্লারোহণ করে এবং শত্রুদের মোকাবিলা করে তাদের অর্থ-সম্পদ লুট করার যোগ্যতা রাখে, তারাই শুধু মাত্র উত্তরাধিকারের যোগ্য হতে পারে। - (রুহুল-মা'আনী ২১০ পৃঃ ৪র্থ খণ্ড)

বলাবাহুল্য, বালক-বালিকা ও নারী উভয় প্রকার দুর্বল শ্রেণী এ নিয়মের আওতায় পড়ে না। তাই তাদের নিয়ম অনুযায়ী শুধুমাত্র যুবক ও বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রই ওয়ারিস হতে পারতো। কন্যা কোন অবস্থাতেই ওয়ারিস বলে গণ্য হতো না, প্রাপ্তবয়স্কা হোক অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা। পুত্র সন্তানও অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে সে উত্তরাধিকারের যোগ্য বলে বিবেচিত হতো না।

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে একটি ঘটনা সংঘটিত হলো এই, আউস ইবনে সাবেত (রাঃ) স্ত্রী, দুই কন্যা ও একটি নাবালগ পুত্র রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রাচীন আরবীয় পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁর দুই চাচাতো ভাই এসে তাঁর সম্পত্তি দখল করে নিল এবং সন্তান ও স্ত্রীকে কিছুই দিল না। কেননা, তাদের মতে প্রাপ্ত বয়স্কা হোক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা, নারী

সর্বাবস্থায় উত্তরাধিকারের যোগ্য গণ্য হতো না, ফলে স্ত্রী ও দুই কন্যা এমনিতেই বঞ্চিত হয়ে গেল। প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়ার কারণে পুত্রকেও বাদ দেয়া হলো এবং দুই চাচাতো ভাই সমগ্র বিষয়-সম্পত্তির ওয়ারিস হয়ে গেলো।

আউস ইবনে সাবেতের স্ত্রী এ প্রস্তাবও দিল যে, যে চাচাতো ভাই তাদের বিষয়সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে, তারা তার কন্যাদুয়কে বিবাহ করে নিক, যাতে সে তাদের চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু তারা এ প্রস্তাবেও স্বীকৃত হলো না। তখন আউস ইবনে সাবেতের স্ত্রী রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এ অবস্থা বর্ণনা করলো এবং সন্তানদের অসহায়ত্ব ও বঞ্চার অভিযোগ করলো। তখন পর্যন্ত উত্তরাধিকার সম্পর্কিত কোরআন পাকের কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তাই রসুলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দিতে বিলম্ব করলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ওহীর মাধ্যমে এই নিপীড়নমূলক আইনের অবশ্যই পরিবর্তন সাধন করা হবে। সেমতে তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এরপর উত্তরাধিকারের অন্যান্য আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে অংশসমূহের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এ সূরার দ্বিতীয় রুকুতে এসব বিবরণ রয়েছে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) কোরআনী বিধান অনুযায়ী মোট ত্যাক্য সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ স্ত্রীকে দিয়ে অবশিষ্ট সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে এভাবে বন্টন করলেন যে, অর্ধেক পুত্রকে এবং কন্যাদুয়কে সমান হারে দিলেন। চাচাতো ভাই সন্তানদের তুলনায় নিকটবর্তী ছিল না। তাই তাদের বঞ্চিত করা হলো। - (রুহুল-মা'আনী)

উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভের বিধি : আলাচ্য আয়াত উত্তরাধিকারের কতিপয় বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে উত্তরাধিকারের আইন ব্যক্ত করে দিয়েছে।

وَيَرْثُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ এর শব্দদ্বয় উত্তরাধিকারের দুই মৌলিক নীতি ব্যক্ত করেছে। (এক) - জন্মের সম্পর্ক, যা পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে রয়েছে এবং **وَالِدَانِ** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। (দুই) সাধারণ আত্মীয়তার, যা **اقربون** শব্দের মর্ম। বিশুদ্ধ মত অনুসারে **اقربون** শব্দটি সর্ব প্রকার আত্মীয়তার পরিবাণ্ড; পারস্পরিক জন্মের সম্পর্ক হোক, যেমন পিতা-মাতা সন্তানদের মধ্যে কিংবা অন্য প্রকার সম্পর্ক হোক, যেমন, সাধারণ পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক হোক— সবগুলোই **اقربون** শব্দের আওতাভুক্ত। কিন্তু পিতা-মাতার গুরুত্ব অধিক। তাই তাদের কথা বিশেষভাবে পৃথকভাবে উল্লেখিত হয়েছে। অতঃপর এ শব্দটি আরো ব্যক্ত করেছে যে, কোন আত্মীয়তার যে কোন সম্পর্কই ওয়ারিস হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়, বরং নিকটতম আত্মীয় হওয়া শর্ত। কেননা, নিকটতম হওয়াকে যদি মাপকাঠি করা না হয়, তবে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির ত্যাক্য সম্পত্তিই সমগ্র ভূগোল মানুষের মধ্যে বন্টন করা জরুরী হয়ে পড়বে। কেননা, সব মানুষই এক পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার সন্তান। মূল রক্তের দিক দিয়ে কিছু না কিছু সম্পর্ক সবার মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। এর বাস্তবায়ন প্রথমতঃ সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি কোনরূপে চেষ্টা করে এর ব্যবস্থা করেও নেয়া যায়, তবে ত্যাক্য সম্পত্তি বন্টন করতে করতে অবিভাজ্য অংশ পর্ব পৌছাবে, যা কারো কাছে আসবে না। তাই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া বদল আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, তখন এরূপ নীতি নির্ধারণ করে দেয়া

জরুরী ছিল, যার ফলে নিকট ও দূরের বিভিন্ন সম্পর্ক একত্রিত হলে নিকটের আত্মীয়কে দূরের আত্মীয়ের উপর অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আত্মীয় বিদ্যমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয়কে বঞ্চিত করতে হবে। অবশ্য যদি কিছু আত্মীয় এমন থেকে থাকে যে, একই সময়ে সবাই নিকটবর্তী সাব্যস্ত হয়, যদিও নিকটতম হওয়ার কারণে বিভিন্নভাবে সবাই ওয়ারিস হবে। যেমন, সন্তানদের সাথে পিতা-মাতা কিংবা স্ত্রী থাকে; এরা সবাই নিকটতম ওয়ারিস, যদিও ঐ নৈকট্যের কারণে বিভিন্ন।

اقربون শব্দটি আরো একটি বিষয় ব্যক্ত করেছে যে, পুরুষদেরকে যেমন উত্তরাধিকারের হকদার মনে করা হয়, তেমনি নারী ও শিশুদেরকেও এ হক থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কেননা, সন্তানের সম্পর্ক হোক কিংবা পিতা-মাতার সম্পর্ক হোক অথবা অন্য কোন সম্পর্ক হোক, প্রত্যেকটিতেই সম্পৃক্ততার মর্যাদা ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সমান। ছেলে যেমন পিতা-মাতা থেকে জন্মগ্রহণ করে, তেমনি মেয়েও পিতা-মাতারই সন্তান। উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্পর্কের উপর ভিত্তিশীল। কাজেই ছোট ছেলে কিংবা মেয়েকে বঞ্চিত করার কোন কারণই থাকতে পারে না।

اقربون শব্দ থেকে আরো একটি বিষয় জানা গেল যে, ত্যাজ্য সম্পত্তির বন্টন প্রয়োজনের মাপকাঠিতে নয়; বরং আত্মীয়তার মাপকাঠিতে হবে। তাই আত্মীয়দের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক দরিদ্র ও জীবগন্ত, তাকে বেশী হকদার মনে করা জরুরী নয়। বরং সম্পর্কে যে ব্যক্তি মৃতের অধিক নিকটবর্তী হবে, সে দূরবর্তীর তুলনায় অধিক হকদার হবে, যদিও প্রয়োজন ও অভাব দূরবর্তীর বেশী হয়। আর যদি নিকটতম আত্মীয়তার মাপকাঠির পরিবর্তে কোন কোন আত্মীয় অভাবগ্রস্ত ও উপকারী হওয়ায় মাপকাঠি করে নেয়া হয়, তবে তা কোন বিধানই হতে পারে না কিংবা একটি সুনির্দিষ্ট অটল আইনের আকার ধারণ করতে পারে না। কেননা, নিকটতম আত্মীয়তা ছাড়া অন্য যে কোন মাপকাঠি সাময়িক চিন্তাপ্রসূত হবে। কারণ, দারিদ্র্য ও অভাব চিরস্থায়ী নয়। অবস্থা ও স্তর স্বয়ং পরিবর্তিত হতে থাকে। এমতাবস্থায় হকের দাবীদার অনেক বের হয়ে আসবে এবং ফয়সালাকারীদের পক্ষে এর ফয়সালা করা কঠিন হবে।

এতীম পৌত্রের উত্তরাধিকারিদের প্রশ্ন : আজকাল এতীম পৌত্রের উত্তরাধিকারিদের প্রশ্নটিকে অহেতুক একটি বিতর্কিত প্রশ্নে পরিণত করা হয়েছে। অথচ কোরআনে উল্লেখিত মূলনীতির ভিত্তিতে এ প্রশ্নটির অকাট্য সমাধান আপন-আপনি বের হয়ে আসে। পুত্রের তুলনায় পৌত্র অধিক জীবগন্ত হলেও اقربون এর আইনের দৃষ্টিতে সে ওয়ারিস হতে পারে না। কেননা, পুত্রের উপস্থিতিতে সে নিকটতম আত্মীয় নয়। তবে তার অভাব দূর করার জন্যে অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এমনিক এক ব্যবস্থা দূরবর্তী আত্মীয়ের বর্ণিত হবে।

এ প্রশ্নে বর্তমান যুগের পাশ্চাত্যভক্ত নব্যশিক্ষিতদের ছাড়া কেউ দ্বিমত করেনি। সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় আজ পর্যন্ত কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট

বর্ণনা থেকে একথাই বুঝে এসেছে যে, পুত্র বিদ্যমান থাকা অবস্থায় পৌত্র উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না, তার পিতা বিদ্যমান থাকুক অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হোক।

উত্তরাধিকারের নির্ধারিত অংশ আত্মীয়ের পক্ষ থেকে মীমাংসিত : আত্মীয়ের শেষে বলা হয়েছে : **وَصِيْبًا مَّفْرُوضًا** এতে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, বিভিন্ন ওয়ারিসের জন্যে যে বিভিন্ন অংশ কোরআন নির্দিষ্ট করেছে, এগুলো আত্মীয়ের পক্ষ থেকে নির্ধারিত অংশ। এতে কারো নিজস্ব অভিমত ও অনুমানের ভিত্তিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার কোন অধিকার নেই।

উত্তরাধিকারিদের একটি বাধ্যতামূলক মালিকানা : **وَصَفْرُوضًا** শব্দ থেকে আরো একটি মাসআলা জানা যায় যে, উত্তরাধিকারের মাধ্যমে ওয়ারিসরা সে মালিকানা লাভ করে, তা বাধ্যতামূলক। এতে ওয়ারিসের কবুল করা এবং সম্মত হওয়া জরুরী ও শর্ত নয়, বরং সে যদি মুখে স্পষ্টতঃ বলে যে, সে তার অংশ নেবে না, তবুও আইনতঃ সে নিজের অংশের মালিক হয়ে যায়। এটা ভিন্ন কথা যে, মালিক হওয়ার পর শরীয়তের বিধি অনুযায়ী অন্য কাউকে দান, বিক্রি, অথবা বিলি-বন্টন করে দিতে পারবে।

বঞ্চিত আত্মীয়দের মনস্ত্বষ্টি বিধান করা জরুরী : মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের মধ্যে এমন কিছু লোকও থাকবে, যারা শরীয়তের বিধি অনুযায়ী তার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অংশ পাবে না। বলাবাহুল্য, ফারায়েযের বিস্তারিত আইন-কানুন সম্পর্কে প্রত্যেকেই জ্ঞাত নয়। সাধারণভাবে প্রত্যেক আত্মীয়ই অংশ পাওয়ার আশা পোষণ করতে পারে। তাই যেসব আত্মীয় নিয়মানুযায়ী বঞ্চিত সাব্যস্ত হয়, বন্টনের সময় তারা বিষন্ন ও দুঃখিত হতে পারে; যদি তারা বন্টনের সময় মজলিসে উপস্থিত থাকে এবং বিশেষতঃ যখন তাদের মধ্যে কিছু এতীম, মিসকীন ও অভাবগ্রস্ত থাকে। এমতাবস্থায় যখন অন্যান্য আত্মীয় নিজ নিজ অংশ নিয়ে যায় আর তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখে তখন তাদের বেদনা, নৈরাশ্য ও মনোকষ্ট ভুক্তভোগী মাত্রই অনুমান করতে পারে।

এখন কোরআনী ব্যবস্থার সৌন্দর্য ও লক্ষ্য করুন। একদিকে স্বয়ং কোরআনেরই বর্ণিত সুবিচারভিত্তিক বিধান এই যে, নিকটবর্তী আত্মীয় বর্তমান থাকলে দূরবর্তী আত্মীয় বঞ্চিত হবে, অপরদিকে বঞ্চিত দূরবর্তী আত্মীয়ের মনোবেদনা ও নৈরাশ্যকেও উপেক্ষা করা হয়নি। এর জন্য একটি স্বতন্ত্র আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :

“যেসব দূরবর্তী, এতীম, মিসকীন ত্যাজ্য সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যদি তারা বন্টনের সময় উপস্থিত থাকে, তবে অংশীদারদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এ মাল থেকে স্বেচ্ছায় তাদেরকে কিছু দিয়ে দেওয়া। এটা তাদের জন্যে এক প্রকার সদকা ও সওয়াবের কাজ।”

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সম্পদ বন্টনের পূর্বে করণীয় : শরীয়তের নীতি এই যে, যত ব্যক্তির সম্পত্তি থেকে প্রথমে শরীয়তানুযায়ী তার কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। এতে অপব্যয় ও কৃপণতা উভয়টি নিষিদ্ধ। এরপর তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। যদি ঋণ সম্পত্তির সম পরিমাণ কিংবা তারও বেশী হয়, তবে কেউ গুয়ারান্টি স্বত্ব পাবে না এবং কোন ওছিয়াত কার্যকর হবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণ পরিশোধের পর সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে কিংবা ঋণ একেবারেই না থাকে, তবে সে কোন ওছিয়াত করে থাকলে এবং তা গোনাহুর ওছিয়াত না হলে অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে জা কার্যকর হবে। যদি সে তার সমস্ত সম্পত্তি ওছিয়াত করে যায় তবুও এক তৃতীয়াংশের অধিক ওছিয়াত কার্যকর হবে না। এমনটি করা সীমিত নয় এবং গুয়ারীসদেরকে বঞ্চিত করার নিয়তে ওছিয়াত করা পাপ কাফর বটে।

ঋণ পরিশোধের পর এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওহিয়ার কার্যকর করে অবশিষ্ট সম্পত্তি শরীয়তসম্মত ওয়ারিসদের মধ্যে কটন করতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ ফারায়েম গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য। ওহিয়ার না থাকলে ঋণ পরিশোধের পর সমস্ত সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে কটন করতে হবে।

কন্যাদেরকে অংশ দেয়ার গুরুত্ব : কোরআন পাক কন্যাদেরকে অংশ দেয়ার প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, কন্যাদের অংশকে আসল ভিত্তি সাব্যস্ত করে এর অনুপাতে পুত্রদের অংশ ব্যক্ত করেছে।

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ كِسْفًا مِّنَ الذَّهَبِ يَسْفِكُونَ بِهِ لُحْمَ الرِّجَالِ وَيَسْفِكُونَ بِهِ لُحْمَ النِّسَاءِ (এক পুরো সমপরিমাণ) বলার পরিবর্তে (এক পুরো অংশ দুই কন্যার অংশের সমপরিমাণ) বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অনেকেই বোনদেরকে অংশ দেয় না এবং বোনরা একথা চিন্তা করে অনিচ্ছাস্বেচ্চে চক্ষুজ্বার খতিরে ক্ষমা করে দেয় যে, পাওয়া যখন যাবেই না, তখন ভাইদের সাথে মন কষাকষির দরকার কি। এক্ষণ ক্ষমা শরীয়তের আইনে ক্ষমাই নয়; ভাইদের জিম্মায় তাদের হক পাওনা থেকে যায়। যারা এভাবে গুয়ারিসী স্বত্ত্ব আতসাং করে, তারা কঠোর গোনাহ্গার। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নাবালোগা কন্যাও থাকে। তাদেরকে অংশ না দেয়া দুষ্ট গোনাহ্। এক গোনাহ্ শরীয়তসম্মত গুয়ারিসের অংশ আতসাং করার এবং দ্বিতীয় গোনাহ্ এতীমের সম্পত্তি হজ্জম করে ফেলার।

এরপর আরও ব্যাখ্যা সহকারে কন্যাদের অংশ বর্ণনা করে বলা হয়েছে: **فَإِنْ كُنْ نِسَاءً فَمَوْتٌ أَمْتٌ فَإِنْ تِلْكَ مَاتَرَا** অর্থাৎ,

যদি পুত্র সন্তান না থাকে, শুধু একাধিক কন্যাই থাকে, তবে তারা ত্যাগ সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে। এতে সব কন্যাই সমান অংশীদার হবে। অবশিষ্ট তিন ভাগের এক অন্যান্য ওয়ারিস যেমন মৃত ব্যক্তির পিতা-মাতা, স্ত্রী অথবা স্বামী প্রমুখ পাবে। কন্যাদের সংখ্যা দুই বা তার বেশী হলে দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে তারা সমান অংশীদার হবে।

স্বামী ও স্ত্রীর অংশ : উপরোক্ত বর্ণনায়ও স্ত্রীর অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথমে স্বামীর অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। একে প্রথমে বর্ণনা করা

(১১) আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সম্ভানদের সম্পর্কে আদেশ করেন : একজন পুরুষের অংশ দু' জন নারীর অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু'এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাগ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে, তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ ওছিয়াতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্যে অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ। (১২) আর, তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সম্ভান না থাকে। যদি তাদের সম্ভান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ঐ সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়; ওছিয়াতের পর, যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্যে এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সম্ভান না থাকে। আর যদি তোমাদের সম্ভান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওছিয়াতের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর। যে পুরুষের, ত্যাগ্য সম্পত্তি, তার যদি পিতা-পুত্র কিংবা স্ত্রী না থাকে এবং এই মৃতের এক ভাই কিংবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ছয়-ভাগের এক পাবে। আর যদি ততোধিক থাকে, তবে তারা এক তৃতীয়াংশ অংশীদার হবে ওছিয়াতের পর, যা করা হয় অথবা ঋণের পর এমতাবস্থায় যে, অঙ্গরের ক্ষতি না করে। এ বিধান আল্লাহর। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল।

ইচ্ছা সম্ভবতঃ এর গুরুত্ব প্রকাশ করা। কেননা, স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী দ্বি পরিবারের লোক হয়ে যায়। যদি পিত্রালয়ে স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং তার সম্পত্তি সেখানেই থাকে, তবে স্বামীর অংশ দেয়া থেকে গা বাঁচানোর চেষ্টা হত পারে। এ অন্যায়ের অবসান ঘটানোর জন্যেই বোধ হয় স্বামীর অংশ প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। মৃত স্ত্রীর যদি কোন সন্তান না থাকে, তবে প্রাথমিক পরিশোধ ও ওছিয়াত কার্যকর করার পর স্বামী তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে। অবশিষ্ট অর্ধেক থেকে অন্যান্য ওয়ারিস যেমন মৃতার পিতা-মাতা, চাচা-বোন যথারীতি অংশ পাবে।

মৃতার যদি সন্তান থাকে, এক বা একাধিক—পুত্র বা কন্যা, এ স্বামীর ঐসজ্জাত হোক বা পূর্ববর্তী কোন স্বামীর ঐসজ্জাত, তবে বর্তমান স্বামী প্রাথমিক পরিশোধ ও ওছিয়াত কার্যকর করার পর মৃতার সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। অবশিষ্ট তিন-চতুর্থাংশ অন্য ওয়ারিসরা পাবে।

পক্ষান্তরে যদি স্বামী মারা যায় এবং তার কোন সন্তান না থাকে, তবে প্রাথমিক পরিশোধ ও ওছিয়াত কার্যকর করার পর স্ত্রী মোট সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি মৃত স্বামীর সন্তান থাকে, এ স্ত্রীর সজ্জাত হোক কিংবা অন্য স্ত্রীর, তবে ঐ পরিশোধ ও ওছিয়াত কার্যকর করার পর স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ পাবে। স্ত্রী একাধিক হলেও ঐসজ্জাত বিবরণ অনুযায়ী এক অংশ সকল স্ত্রীর মধ্যে সমহারে বন্টন করা হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক স্ত্রীই এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশ পাবে না, বরং সবাই মিলে এক-চতুর্থাংশ কিংবা এক-অষ্টমাংশ অংশীদার হবে। উভয় অবস্থাতেই স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা তাদের অন্যান্য ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

মাসআলা : প্রথমে দেখা উচিত যে, যদি স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধ করা না হয়ে থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মতই প্রথমে মোট ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে মোহরানা পরিশোধ করার পর ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

মোহরানা দেয়ার পর স্ত্রী ওয়ারিসী স্বত্বে অংশীদার হবার দরুন এ অংশও নেবে। মোহরানা পরিশোধ করার পর যদি মৃত স্বামীর সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকে, তবে অন্যান্য ঋণের মত সম্পূর্ণ সম্পত্তি মোহরানা বাবদ স্ত্রীকে সমর্পণ করা হবে এবং কোন ওয়ারিসই অংশ পাবে না।

‘কালারা’র ওয়ারিসী স্বত্ব : আলাচ্য আয়াতে ‘কালারা’র পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিধান বর্ণিত হয়েছে। ‘কালারা’র অনেক সংজ্ঞা রয়েছে। আব্দুল্লাহ কুরতুবী এগুলো স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে,— অর্থাৎ, যে মৃত ব্যক্তির উর্ধ্বতন ও অশঃস্তন কেউ নেই, সে-ই ‘কালারা’।

কুহল-মা’আনীর গ্রন্থকার লিখেন : ‘কালারা’ শব্দটি আসলে ধাতু। এর অর্থ পরিশ্রান্ত হওয়া, যা দুর্বলতার পরিচায়ক। পিতা-পুত্রের আত্মীয়তা ব্যতীত অন্য আত্মীয়তাকে ‘কালারা’ বলা হয়েছে। কেননা, এ আত্মীয়তা পিতা-পুত্রের আত্মীয়তার তুলনায় দুর্বল।

عَرِضَاتُ এর তফসীর : ‘কালারা’র ওয়ারিসী স্বত্বের উপসংহারে এই ওয়ারিসী স্বত্ব ওছিয়াত ও ঋণ পরিশোধের পর কার্যকর হবে বলে উল্লেখ করার পর عَرِضَاتُ বলা হয়েছে। এ শর্তটি যদিও শুধু এখানেই উল্লেখ করা হয়েছে; কিন্তু এর পূর্বে অন্য যে দু’জায়গায় ওছিয়াত ও ঋণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও এ হুকুমই গ্রহণীয় ও কার্যকর হবে। এর উদ্দেশ্য এই যে, মৃত ব্যক্তির জন্যে ওছিয়াত কিংবা ঋণের মাধ্যমে ওয়ারিসদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বৈধ নয়। ওছিয়াত করা কিংবা নিজের যিম্মায় ভিত্তিহীন ঋণ স্বীকার করার মধ্যে ওয়ারিসদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা লুক্কায়িত থাকা এবং সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও কবিরী গোনাহ।

النساء

৪১

لن تتألموا

আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَعْتَدِ حُدُودَهُ
 يُدْخِلْهُ نَارَ الْخَالِدِ فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ وَالَّذِي
 يَأْتِيَنَّ مِنَ الْفَاحِشَةِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا
 عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
 الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَ الْوُتُّ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ
 سَبِيلًا ۝ وَالَّذِي يَأْتِيَهُمَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا
 وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝
 إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ
 ثُمَّ يَتَوَقَّوْنَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ
 عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ
 لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
 الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ إِلَكَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ
 وَهُمْ كُفَّاءُ أُولَئِكَ أَغْتَدَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

(১৩) এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও রসুলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য। (১৪) যে কেউ আল্লাহ ও রসুলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অগমানজনক শাস্তি। (১৫) আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার জন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সশ্রুতদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন। (১৬) তোমাদের মধ্য থেকে যে দু জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, দয়ালু। (১৭) অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হল সেসব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। (১৮) আর এমন লোকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে : আমি এখন তওবা করছি। আর তওবা নেই তাদের জন্য, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

কোরআন পাকের বর্ণনা-পদ্ধতি এই যে, বিধানাবলী বর্ণনা করার পর পরিশিষ্ট হিসেবে মান্যকারীদের জন্যে উৎসাহবাণী এবং তাদের ফকিরত উল্লেখ করা হয় আর অমান্যকারীদের জন্যে তীতি প্রদর্শন, শাস্তি ও তাদের নিন্দা উল্লেখ করা হয়।

এখানেও বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। তাই আলাচ্য ১৩ নং আয়াতে আনুগত্যকারী ও অবাধ্যতাকারীদের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে।

ওয়ারিসী স্বত্ত্বের বিধানাবলীর পরিশিষ্ট

মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হতে পারে না : ওয়ারিসী স্বত্ত্ব বন্টনের ভিত্তি বংশগত আত্মীয়তার উপর রচিত। কিন্তু কোন কোন বিষয়ের ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রথম, যার ওয়ারিস এবং যে ওয়ারিস আল ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হতে পারবে না। কাজেই মুসলমান কোন কাফেরে এবং কাফের কোন মুসলমানের ওয়ারিস হবে না, তাদের পরস্পরের মধ্য যে কোন ধরনের বংশগত সম্পর্কই থাক না কেন। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم অর্থাৎ, মুসলমান কাফেরের এবং কাফের মুসলমানের ওয়ারিস হতে পারবে না- (মেশকাত)

এ বিধান তখনকার জন্য যখন জন্মের পর থেকেই একজন ব্যক্তি মুসলমান অথবা কাফের হয়। কিন্তু কেউ যদি পূর্বে মুসলমান থাকে, এরপর নাউযবিলাহ ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে এরূপ ব্যক্তি মারা গেলে কিংবা নিহত হলে তার মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত ধন-সম্পদ মুসলমান ওয়ারিসরা পাবে। আর ধর্মত্যাগী অবস্থায় উপার্জিত মাল বায়তুল মালে জমা হবে।

কিন্তু কোন স্ত্রী লোক ধর্মত্যাগ করলে তার উভয় অবস্থার উপার্জিত ধন-সম্পদ মুসলমান ওয়ারিসরা পাবে। কিন্তু স্বয়ং ধর্মত্যাগী ব্যক্তি পুত্র কিংবা স্ত্রী কোন মুসলমানের কাছ থেকে অথবা ধর্মত্যাগীর কাছ থেকে ওয়ারিসী স্বত্ত্ব পাবে না।

হত্যাকারীর স্বত্ত্ব : যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, যার ত্যাক্য সম্পত্তিতে সে স্বত্বাধিকারী ছিল, তবে এ হত্যাকারী তার ওয়ারিসী স্বত্ত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন لا يرث التال لا يرث অর্থাৎ, হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না- (মেশকাত) তবে ভুলবশতঃ হত্যার কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে। বিস্তারিত তথ্য ফিকাহ গ্রন্থে দৃষ্টব্য।

গর্ভস্থ সন্তানের স্বত্ত্ব : যদি কোন ব্যক্তি কয়েকজন সন্তান রেখে যায় এবং স্ত্রীর গর্ভেও সন্তান থাকে, তবে এই গর্ভস্থ সন্তানও ওয়ারিসদের তালিকাভুক্ত হবে। কিন্তু সন্তানটি পুত্র না কন্যা, একজন না বেশী, জ্ঞানা যেহেতু দূস্কর, তাই গর্ভের এ সন্তান জন্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত কন্য মূলতবী রাখা উচিত। কোন কারণে যদি তাৎক্ষণিকভাবেই বন্টন করণীয় হয়, তবে গর্ভস্থ সন্তানকে এক পুত্র অথবা এক কন্যা উভয়ের মধ্য থেকে যা ধরে বন্টন করলে ওয়ারিসরা কম পায়, সেই প্রকার স্বত্ত্ব তাদের মধ্য বন্টন করতে হবে। অবশিষ্ট সম্পত্তি গর্ভস্থ সন্তানের জন্যে রেখে দিতে হবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এমন পুরুষ ও নারীদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে, যারা নির্ভঙ্ক কাজ অর্থাৎ, ব্যতিচারে লিপ্ত হয়। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : যেসব নারী দ্বারা এমন কুর্ম স্বস্বাধীন হয়, তাদের এ কাজ প্রশংসার জন্যে চার জন পুরুষ সাক্ষী তলব করতে হবে। অর্থাৎ, যেসব বিচারকের কাছে এই মামলা পেশ করা হয়, তারা প্রমাণের জন্যে চার জন যোগ্য সাক্ষী তলব করবেন এবং এই সাক্ষীদের পুরুষ শ্রেণীভুক্ত হওয়াও জরুরী। এ ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

ব্যতিচারের সাক্ষীদের ব্যাপারে শরীয়ত দু'রকম কঠোরতা করেছে যেহেতু ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এতে ইচ্ছাত ও আবহু আহত হয় এবং পরিবারিক মানস-অঙ্গের প্রশ্ন দেবা দেয়, তাই প্রথমে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এমন ক্ষেত্রে শুধু পুরুষই সাক্ষী হতে হবে- নারীদের সাক্ষ্য রচ্যে নয়। দ্বিতীয়তঃ চার জন পুরুষ হওয়া জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক্য, এ শর্তটি খুবই কঠোর। দেবাৎ ও কদাচিৎ তা পাওয়া যেতে পারে। এ শর্ত আরোপের কারণ, যাতে শত্রীর স্বামী, তার জননী অথবা দ্বা-স্ত্রী অথবা ভাই-বোন ব্যক্তিগত জিহাংসার কবর্তী হয়ে অহেতুক কলহাদ আরোপ করার সুযোগ না পায় অথবা অন্য অমঙ্গলকারী লোকেরা শত্রুতা-বশতঃ অপবাদ আরোপ করতে সাহসী না হয়। কেননা, চার জন পুরুষ সাক্ষীর কমে ব্যতিচারের সাক্ষ্য দিলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। এমনভাবে স্থায়ী বাদী ও সাক্ষীর সাবে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয় এবং একজন ফুলমানের চরিত্রে কলহ আরোপ করার দায়ে তাদেরকে 'হদ্দে-কয়ফ' বা অপবাদের শাস্তি ভোগ করতে হয়।

ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত গোনাহ মাক হয় কি না : এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কোরআন পাকে جَاهِلٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে বাহ্যতঃ গোনাহ যায়, অজ্ঞাতসারে এবং না জেনে-শুনে গোনাহ করলে তওবা কবুল হবে এবং জ্ঞাতসারে জেনে-শুনে গোনাহ করলে তওবা কবুল হবে না। কিন্তু সাহাবায়ে কোরাম এ আয়াতের যে তফসীর করেছে তা এই যে, এখানে এর جَاهِلٌ অর্থ এই নয় যে, সে গোনাহর কাজটি যে গোনাহ তা জানে না কিংবা গোনাহর ইচ্ছা নেই; বরং অর্থ এই যে, গোনাহর অন্তত প্রশিাম ও পারলৌকিক আধাবের প্রতি তার সাময়িক অনীহাই তার গোনাহর কাজ করার কারণ; যদিও গোনাহটি যে গোনাহ, তা সে জানে এবং তার ইচ্ছাও করে।

পক্ষান্তরে جَاهِلٌ শব্দটি এখানে নিবুজ্জিতা ও বোকাটির অর্থে ব্যবহৃত

হয়েছে। যেমন, তফসীরের সারসংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা ইউসুফ-এর নবীর বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) ভাইদেরকে বলেছিলেন : **مَلَّ عَلَيْهِمْ مَا فَتَحَتْ يَدُيْهِمْ وَأَخْلَتْ ذَاتُهُمْ جَاهِلُونَ** এতে ভাইদেরকে জাহেল বলা হয়েছে, অর্থাৎ তারা যে কাজ করেছিল, তা কোন ভুল অথবা ভুল যাওয়াবশতঃ ছিল না; বরং ইচ্ছাকৃতভাবে, জেনে-শুনেই করেছিল। কিন্তু এ কাজের পরিণতি সম্পর্কে গাফেল হওয়ার কারণে তাদেরকে জাহেল বলা হয়েছে।

আবুল-আলিয়া ও কাতাদাহর বর্ণনা মতে সাহাবায়ে কোরাম এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, **كُلُّ ذَنْبٍ أَصَابَهُ عَبْدٌ فَهُوَ جَاهِلٌ عَمَّا كَانَ أَوْ غَيْرِهِ** অর্থাৎ, বান্দা যে গোনাহ করে-অনিচ্ছাকৃত করুক কিংবা ইচ্ছাকৃত, সর্ববিশ্বাস্যই তা মুর্খতা।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : **كُلُّ عَامِلٍ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَهُوَ جَاهِلٌ** অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন কাজে আল্লাহর নাক্ষরমানী করছে, সে দৃশ্যতঃ বড় আলেম ও বিশেষ জ্ঞান-শোনা বিচক্ষণ হলেও সে কাজ করার সময় মুর্খই হয়ে যায়। - (ইবনে-কাসীর)

আবু হাইয়ান তফসীরে বাহুরে-মুহীতে বলেন : এটা এমনই, যেমন হাদীসে বলা হয়েছে : **لَا يَزْنِي الزَّانِي** অর্থাৎ, ব্যতিচারী ঈমানদার অবস্থায় ব্যতিচার করে না। উদ্দেশ্য এই যে, যখন সে এই কুর্মে লিপ্ত হয়, তখন সে ঈমানের তাগিদ থেকে দূরে সরে পড়ে।

তাই হযরত ইকরিমা বলেন :
দুনিয়ার যেসব কাজ আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে, সেগুলো সবই মুর্খতা। কারণ এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর না-ক্ষরমানী করে, সে ক্ষণস্থায়ী সুখকে চিরস্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। যে ব্যক্তি এই ক্ষণস্থায়ী সুখের বিনিময়ে চিরস্থায়ী কঠোর আযাব ক্রয় করে, তাকে বুদ্ভিমান বলা যায় না। তাকে সবাই মুর্খ বলবে, যদিও সে ভালভাবে জানা ও বোঝার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে সে কুর্ম সম্পাদন করে।

মোটকথা, গোনাহর কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা হোক, কিংবা ভুলক্রমে, উভয় অবস্থাতেই তা মুর্খতাবশতঃ সম্পন্ন হয়। এ কারণেই সাহাবা, তাবয়্বীন ও সমগ্র উম্মাতের এ ব্যাপারে ইজমা বা একমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গোনাহ করে, তার তওবাও কবুল হতে পারে। - (বাহুরে-মুহীত)

আনুবিকি জাতব্য বিষয়

ইসলাম পূর্বকালের নারী নির্ধাতন প্রতিরোধ : আলোচ্য আয়াত তিনটিতে সেসব নির্ধাতন প্রতিরোধ করা হয়েছে, যেগুলো ইসলাম-পূর্বকালে অবলাদের প্রতি নিতান্ত সাধারণ আচরণ বলে মনে করা হতো। তন্মধ্যে একটি সর্ববৃহৎ নির্ধাতন ছিল এই যে, পুরুষ নিজেকে শ্রীজন ও মালের মালিক মনে করতো। শ্রী যার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতো, সে তার প্রাণকে নিজের মালিকানাধীন মনে করতো। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিসরা যেমন তার ত্যাগ্য সম্পত্তির ওয়ারিস ও মালিক হতো, তেমনি তার শ্রীর ওয়ারিস ও মালিক বলে গণ্য হতো। ইচ্ছা করলে নিজেই তাকে বিয়ে করতে কিংবা অন্যের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে তাকে বিয়ে দিয়ে দিতো। স্বামীর (অন্য শ্রীর পরজাত) পূর্ব নিষেধ পিতার মৃত্যুর পর তাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারতো। শ্রী প্রাণেরই স্বধন এই অবস্থা, তখন তার ধন-সম্পদের ব্যাপারটি তো কান্না বাহুল্য। এই একটিমাত্র মৌলিক বাস্তবিক ফলশ্রুতিতে নারীদের উপর নানা ধরনের অগণিত নির্ধাতন চলতো। উদাহরণস্বরূপ :-

(এক) যেসব অর্থ-সম্পদ শ্রী উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা পিতার থেকে উপঢৌকন হিসেবে লাভ করতো, সেগুলো হজম করে ফেলা হতো।

(দুই) যদি কোন নারী তার নিজের অংশের ধন-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই নিতো, তবে পুরুষরা তাকে অন্যত্র বিয়ে করতে বাধ্য দিত, যাতে ধন-সম্পদ বাইরে নিয়ে যেতে না পারে, বরং এখানেই মারা যায় এবং ধন-সম্পদ তাদের অধিকারভূক্ত থেকে যায়।

(তিন) মাঝে মাঝে শ্রীর কোন দোষ না থাকার সত্ত্বেও শু স্বভাবসত্তাবে স্বামী তাকে অপছন্দ করতো এবং শ্রীর প্রাণ্য প্রদান করতো না। অপরপক্ষে তালাক দিয়ে তাকে মুক্তও করতো না, যাতে সে অতিষ্ঠ হয়ে অলংকার ও যোহরানা বাবদ প্রদত্ত টাকা ফেরত দেয় কিংবা অপ্রদত্ত যোহরানা কমা করে দেয়। মাঝে মাঝে স্বামী তালাক দিয়েও তালাকপ্রাপ্তকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিতো না, যাতে সে বাধ্য হয়ে দ্রব যোহরানা ফেরত দেয় কিংবা আদায়যোগ্য যোহরানা কমা করে দেয়।

(চার) কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর ওয়ারিসরা বিধবকে অন্যত্র বিয়ে করতে দিতো না—মূর্খতাপ্রসূত লজ্জার কারণে কিংবা কিছু অর্থ আদায় করার লোভে।

এসব নির্ধাতনের ভিত্তি ছিল এই যে, তারা নিজেদেরকে শ্রীর সম্পত্তি এমন কি, তার প্রাণেরও মালিক মনে করতো। কোরআন পাক এসব অনর্থের সে মূলটি উৎপাটন করে দিয়েছে এবং এর আওতায় স্বত্বাধিকার নির্ধাতনসমূহের প্রতিকারকল্পে ঘোষণা করেছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا

অর্থঃ “হে ইমানদারগণ! তোমাদের জন্যে হালাল নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের মালিক হয়ে বস।”

‘কলপূর্বক’ কথটি এখানে শর্ত হিসেবে বলা হয়নি, যাতে এমন মনে করে নেয়া যাবে যে, নারীদের সম্মতিক্রমে তাদের মালিক হওয়া হত শুদ্ধ হব, বরং বাস্তব ঘটনা বর্ণনার জন্যে সম্ভূত হয়েছে। শরীয়ত-সম্মত ও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই নারীদের মালিক হয়ে যাওয়া বলপূর্বকই হত

النِّسَاءُ

২৭

لِنَتَّالُوا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَقْضُوا لَهُنَّ إِنْ تَرِثْتُمْهُنَّ مِمَّا تَرِثْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَالِمُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَقَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ إِيْتِدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ مَتَّارًا
فَلَا تَأْخُذُوا بِمُونِهِ إِنَّكُمْ لَعَالَمُونَ ۚ وَبِهَذَا نَبِّئُكُمْ ۚ وَ
كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنُمُكُمْ
يَتِيمًا فَلَا عَلِيمَ لَهُمْ ۚ لَا تَسْأَلُونَهُمْ ۚ وَأَبَاؤُهُمُ مِنَ النِّسَاءِ ۚ إِنَّ مَا قَدْ
سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَخْلَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ ۚ وَ
أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي
وَلَعَلَّكُمْ يَتَّبِعُونَ ۚ وَإِنْ تَكُونُوا دَاخِلَةً بِهِنَّ فَلا مَسَاسَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

(১৯) হে ইমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদেরকে উত্তরাধিকারে গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে অটিক রেখে না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে। নারীদের সাথে সম্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন। (২০) যদি তোমরা এক শ্রীর স্থলে অন্য শ্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এক তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কি তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য পোনাহর মাধ্যমে গ্রহণ করবে? (২১) তোমরা কিরূপে তা গ্রহণ করতে পার, অথচ তোমাদের একজন অন্য জনের কাছে গমন এক নারীরা তোমাদের কাছ থেকে সুদূর অস্বীকার গ্রহণ করেছে। (২২) যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না, কিন্তু যা কিংগত হয়ে গেছে। এটি অশ্লীল, গম্বের কাছ এবং নিকট আচরণ। (২৩) তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের দুহু, তোমাদের খালা, ব্যাতৃকন্যা, ভগিনীকন্যা, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের শ্রীর মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছে সে শ্রীদের কন্যা-যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন পোনাহ নেই। তোমাদের ওরসজাত পুত্রদের শ্রী এক দুই বোনকে একত্রে বিবাহ কর; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিচর আল্লাহ কৃপাকারী, দয়ালু।

পারে। কোন বুদ্ধিমতি ও জ্ঞানী নারী এতে সম্মত হতে পারে না।—
(বাহর-মুহীত)

এ কারণেই শরীয়ত এ ব্যাপারে তার সম্মতিকে গুরুত্ব দেয়নি। কোন নারী নির্বুদ্ধিতাবশতঃ কারো মালিকানাধীন হতে রাখী হলেও ইসলামী আইন এতে রাখী নয় যে, কোন স্বাধীন মানুষ কারো মালিকানাধীন চলে যাবে।

আলাচ্য আয়াতসমূহে যাদের সাথে বিয়ে হারাম, এমন নারীদের বিবরণ দেয়া হয়েছে। কোন কোন হারাম নারী কোন অবস্থাতেই হালাল হয় না, তাদেরকে “মোহাররামাতে-আবাদীয়া” (চিরতরে হারাম) বলা হয়। কোন কোন নারী চিরতরে হারাম নয়, কোন কোন অবস্থায় তারা হালালও হয় যায়।

প্রথমোক্ত তিন প্রকার : (১) বংশগত হারাম নারী, (২) দুধের কারণে হারাম নারী এবং (৩) শিশুর সম্পর্কের কারণে হারাম নারী চিরতরে হারাম। শেষোক্ত এক প্রকার অর্থাৎ, পর-স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত পরের স্ত্রী থাকে তখন পর্যন্ত হারাম।

وَاصْنَاءَ الْاَبْوَانِ - জাহেলিয়াত যুগে পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে পুত্রেরা বিনাদ্বিধায় বিয়ে করে নিতো। এ আয়াতে আল্লাহ্ জালালা এই নিলম্বজ্ঞ কাজটি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন এবং ‘একে আল্লাহর দৃষ্টান্তের কারণ’ বলে অভিহিত করেছেন। বলাবাহুল্য, যাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মা বলা হয়, পিতার মৃত্যুর পর তাকে স্ত্রী করে রাখা মানব-চরিত্রের জন্য অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

মাসআলা : আয়াতে পিতার বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম বলা হয়েছে। এতে এরূপ কোন কথা নেই যে, পিতা যদি তার সাথে সহবাসও করে। কাজেই যে কোন স্ত্রীলোকের সাথে পিতার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলে পুত্রের পক্ষে তাকে বিয়ে করা কখনও হালাল নয়।

এমনিভাবে পুত্রের স্ত্রীকে পিতার পক্ষে বিয়ে করা হালাল নয়; যদিও পুত্র শুধু বিবাহই করে—সহবাস না করে। আল্লামা শামী বলেন :

وتحرم زوجة الاصل للفرع بمجرد العقد دخل بها ولا

মাসআলা : যদি পিতা কোন স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচার করে, তবুও তাকে বিয়ে করা পুত্রের পক্ষে হালাল নয়।

حُرِّمَتْ عَلَيْكَ اُمَّهَاتُكَ - অর্থাৎ, আপন জননীদেবকে বিয়ে করা কোনোমতে উপর হারাম করা হয়েছে। امهات শব্দের ব্যাপকতায় দাদী, নানী সই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

وَبَنَاتُكَ - স্বীয় ঔরসজাত কন্যাকে বিয়ে করা হারাম। কন্যার ম্যাকে এবং পুত্রের কন্যাকেও বিয়ে করা হারাম।

মোটকথা, কন্যা, পৌত্রী, প্রপৌত্রী, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী এদের সাহিবে বিয়ে করা হারাম এবং বিয়ে করা স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঔরসজাত ম্যাকে বিয়ে করা জায়েয কিনা ; সে সম্পর্কে পরে বর্ণনা করা হবে। যে পুত্র-কন্যা ঔরসজাত নয়; বরং পালিত, তাদের এবং তাদের সন্তানকে বিয়ে করা জায়েয— যদি অন্য কোন পথে অবৈধতা না থাকে। এমনিভাবে

ব্যভিচারের মাধ্যমে যে কন্যা অনুগ্রহণ করে, সেও কন্যারই পর্যায়ভুক্ত। তাদের বিয়ে করাও দুরন্ত নয়।

وَالْحَوَائِ - সহোদরা ভগিনীকে বিয়ে করা হারাম। এমনিভাবে বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রিয়া ভগিনীকেও বিয়ে করা হারাম।

وَوَسَائِلُ - পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয়া ও বৈপিত্রিয়া বোনকে বিয়ে করা হারাম। তিন প্রকার ফুফুকেই বিয়ে করা যায় না।

وَوَسَائِلُ - আপন জননীর তিন প্রকার বোন, প্রত্যেকের সাথেই বিয়ে করা হারাম।

وَبَنَاتُ الْاَلَةِ - ভাতৃশ্রীর সাথেও বিয়ে হারাম; আপন হোক, বৈমাত্রেয় হোক— বিয়ে হালাল নয়।

وَبَنَاتُ الْاَخِي - বোনের কন্যা অর্থাৎ, ভাগ্নেয়ীর সাথেও বিয়ে হারাম। এখানেও বোনকে ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে।

وَأُمَّهَاتُ الْاَبْنَاءِ الرَّضَعَةِ - যেসব নারীর স্তন্য পান করা হয়, তারা জননী না হলেও বিবাহ হারাম হওয়ার ব্যাপারে জননীর পর্যায়ভুক্ত এবং তাদের সাথে বিয়ে হারাম। অল্প দুধ পান করুক কিংবা বেশী, একবার পান করুক কিংবা একাধিকবার—সর্বাবস্থার তারা হারাম হয়ে যায়। ফিকাহবিদগণের পরিভাষায় একে “হরমতে-রেয়াআত” বলা হয়।

তবে এতটুকু সুরণ রাখা জরুরী যে, শিশু অবস্থায় দুধ পানের সময়ে দুধ পান করলেই এই ‘হরমতে-রেয়াআত’ কার্যকরী হয়। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : اِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ অর্থাৎ, দুধ পানের কারণে যে অবৈধতা প্রমাণিত হয়, তা সে সময়ে দুধ পান করলে হবে, যে সময় দুধ পান করে শিশু শারীরিক দিক দিয়ে বর্ধিত হয়।—(বোখারী, মুসলিম)

ইমাম আবু হানীফার মতে এই সময়কাল হচ্ছে শিশুর জন্মের পর থেকে আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত। ইমাম আবু হানীফার বিশিষ্ট শাগরেদ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদসহ অন্যান্য ফেকাহবিদগণের মতে মাত্র দুই বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করলে অবৈধতা প্রমাণিত হয়। ইমাম মুহাম্মদের ফতোয়াও তাই। কোন বালক-বালিকা যদি এ বয়সের পর কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করে, তবে এতে দুধ পানজনিত অবৈধতা প্রমাণিত হবে না।

وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ - অর্থাৎ, দুধ পানের সাথে সম্পর্কিত যেসব বোন আছে, তাদেরকে বিয়ে করা হারাম। এর বিশদ বিবরণ এই যে, দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়কালে কোন বালক অথবা বালিকা কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে সে তাদের মা এবং তার স্বামী তাদের পিতা হয়ে যায়। এছাড়া সে স্ত্রীলোকের আপন পুত্র-কন্যা তাদেরই ভাই-বোন হয়ে যায়। অনুরূপ সে স্ত্রীলোকের বোন তাদের খালা হয় এবং সে স্ত্রীলোকের জ্যেষ্ঠ-দেবররা তাদের চাচা হয়ে যায়। তার স্বামীর বোনেরা শিশুদের ফুফু হয়ে যায়। দুধ পানের কারণে তাদের সবার পরস্পর বৈবাহিক অবৈধতা স্থাপিত হয়ে যায়। বংশগত সম্পর্কের কারণে পরস্পর যেসব বিয়ে হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণে সেসব সম্পর্কীয়দের সাথে বিয়ে হারাম হয়ে যায়। মুসলিমের রেওয়াজেতে আছে : রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

النساء

৪২

والمحصد

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَحْتَبِ
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 عُيُونَكُمْ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَبَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَلَهُنَّ
 أَجُورُهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاوَعْتُمْ بَيْنَهُنَّ مِنْ بَعْدِ
 الرِّيسَةِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ
 طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 فَمِيتُكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ
 فَانكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْعَرَفِ فَحَصَدَ
 غَيْرُ مُسْفِحَةٍ وَلَا مَخْذُوتٍ أَحَدَانِ فَإِذَا أَحْبَبَ إِنْ أَتَيْنَ
 بِفَاحِشَةٍ فَقَدْ بَوَّحْنَ رِضْفًا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ
 لِمَنْ خَشِيَ الصَّغْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِدُّوا عَنْكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِينَ فِي
 قُلُوبِكُمْ وَيُتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُتُوبَ
 عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّوَاهِدَ أَنْ يُكَلِّمُوا مِمَّا خَلُفَ
 يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

(২৪) এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সখ্য স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ, তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায়—এটা তোমাদের জন্যে আল্লাহর কুফর। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য—ব্যভিচারের জন্যে নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান করা তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পরে সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ। (২৫) আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে। আল্লাহ তোমাদের ইমান সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা পরস্পর এক ; অতএব, তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে—ব্যভিচারিণী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারিণী হবে না। অতঃপর যখন তারা বিবাহ বন্ধনে এসে যায়, তখন যদি কোন অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদেরকে স্বাধীন নারীদের অর্থে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ব্যবস্থা তাদের জন্যে, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে। আর যদি সবর কর, তবে তা তোমাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ ক্রমশীল, করুণাময়। (২৬) আল্লাহ তোমাদের জন্যে সব কিছু পরিষ্কার বর্ণনা করে দিতে চান, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ প্রদর্শন করতে চান। এবং তোমাদেরকে কমা করতে চান, আল্লাহ মহাজ্ঞানী রহস্যবিদ। (২৭) আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্রমশীল হতে চান। এবং যারা কামনা-বাসনার অনুসারী, তারা চায় যে, তোমরা পথ থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়ে পড়। (২৮) আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষ দুর্বল সজ্জিত হয়েছে।

يَحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرَمُ مِنَ الْوَلَادَةِ إِنْ لَمْ يَحْرَمِ مِنَ الرِّضَاعَةِ
 مَا حَرَّمَ مِنَ النِّسَابِ

মাসআলা : একটি বালক ও একটি বালিকা কোন মহিলার দুধ পান করলে তাদের পরস্পরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না। এমনভাবে দুধ ভাই ও বোনের কন্যার সাথেও বিয়ে হতে পারে না।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর অর্থ শক্তি-সামর্থ্য। আয়াতের অর্থ এই যে, যার স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি-সামর্থ্য নেই কিংবা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই, সে ইমানদার দাসীদেরকে বিয়ে করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, যতটা সম্ভব স্বাধীন নারীকেই বিয়ে করা উচিত—দাসীকে বিয়ে না করা বাঞ্ছনীয়। অগত্যা যদি দাসীকে বিয়ে করতেই হয়, তবে ইমানদার দাসী খোঁজ করতে হবে।

হযরত ইমাম আবু হানীফার মতাবলম্বী তাই। তিনি বলেন : স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দাসীকে অথবা ইহুদী-খ্রীষ্টান দাসীকে বিয়ে করা মকরুহ।

হযরত ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য ইমামের মতে স্বাধীন নারীকে বিয়ে করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও দাসীকে বিয়ে করা হারাম এবং ইহুদী বা খ্রীষ্টান দাসী বিয়ে করা সর্বাবস্থায় অবৈধ।

মোটকথা, দাসীকে বিয়ে করা থেকে বেঁচে থাকা স্বাধীন পুরুষের জন্যে সর্বাবস্থায় উত্তম। যদি অগত্যা করতেই হয়, তবে ইমানদার দাসীকে করবে। কারণ, দাসীর গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে ঐ ব্যক্তির গোলাম হয়, যে দাসীর মালিক। অমুসলমান দাসীর গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে জননীরা চাল-চলন অনুযায়ী ভিন্ন ধর্মের অনুসারী হয়ে যেতে পারে। অতএব, সন্তানকে গোলামীর কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে এবং ইমানদার বানানোর জন্যে সন্তানের মাতার স্বাধীন হওয়া জরুরী। দাসী হলে কমপক্ষে ইমানদার হওয়া দরকার, যাতে সন্তানের ইমান সংরক্ষিত থাকে। এ কারণেই ওলামায়ে-কেরাম বলেন : স্বাধীন ইহুদী-খ্রীষ্টান নারীকে বিয়ে করা যদিও বৈধ, কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। বর্তমান যুগে এর গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা, ইহুদী ও খ্রীষ্টান রমণীরা আজকাল সাধারণতঃ স্বয়ং স্বামীকে ও স্বামীর সন্তানদেরকে স্বধর্মে আনার উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে বিয়ে করে।

বিয়ের অনেকগুলো বিধান বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহ বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ও খেলাখুলিভাবে তোমাদের বিধানাবলী বলে দেন এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও পুণ্যবানগণের অনুসৃত পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা মনে করবে না যে, হারাম ও হালালের এই বিকল শুধু তোমাদের জন্যই, বরং তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মাত অতিক্রম হয়েছে, তাদেরকেও এ ধরনের বিধান বলা হয়েছিল। তারা এসব বিধান পালন করে আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত হয়েছে।

কামপ্রবৃত্তির অনুসারী যেনাকার এবং মিথ্যা ধর্মাবলম্বীদের কাছে হারাম-হালাল বলে কোন কিছুই নেই। তারা তোমাদেরকেও সংপথ থেকে বিচ্যুত করে নিজেদের মিথ্যা পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট করতে চায়। তোমরা তাদের গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক থাকবে।

অর্থঃ - يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَوِّفَ عَنْكُمْ

এরপর বলা হয়েছে :

আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে হাঙ্কা ও সহজ বিধান দিতে চান। তোমাদের অসুবিধা দূর করার জন্যে বিয়ের ব্যাপারে এমন সরল বিধান তিনি দিয়েছেন, যা সবাই পালন করতে পার। স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার শক্তি না থাকার ক্ষেত্রে বাদীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দান করেছেন। উভয়পক্ষকে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে মোহর নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইনসাক ও সুবিচারের শর্তে একাধিক বিয়ে করার অনুমতিও দিয়েছেন।

এরপর বলা হয়েছে : وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল। তার মাঝে কাম-বাসনার উপাদানও নিহিত রয়েছে। যদি তাকে নারীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকার আদেশ দেয়া হতো, তবে সে আনুগত্য করতে অক্ষম হয়ে পড়তো। তার অক্ষমতা ও দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি ; বরং উৎসাহিত করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নিজের সম্পদও অন্যায় পন্থায় ব্যয় করা কৈশ নয় : আলোচ্য আয়াতের মধ্যে أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ - শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ “তোমাদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে”— এর দ্বারা তফসীরকারগণ সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পরস্পরের মধ্যে অন্যায় পন্থায় একের সম্পদ অন্যের পক্ষে ভোগ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

আবু হাইয়ান ‘তফসীরে-বাহরে মুহীত’-এ বলেন, আয়াতে এ শব্দগুলো দ্বারা নিজস্ব সম্পদও অন্যায় পথে ব্যয় করা কিংবা অপব্যয় করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আয়াতে وَلَوْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ বলা হয়েছে। যার অর্থ ‘খেয়ো না’। পরিভাষার বিচারে ‘খেয়ো না’ বলতে যে কোনভাবে ভোগদখল বা হস্তক্ষেপ করো না বোঝানো হয়েছে। সেটা খেয়ে, পরিধান করে কিংবা অন্য যে কোন পন্থায় ব্যবহার করেই হোক না কেন। কেননা, সাধারণ পরিভাষায় সম্পদে যে কোন হস্তক্ষেপকেই ‘খেয়ে ফেলা’ বলা হয়, যদি সংশ্লিষ্ট বস্তুটি আদৌ খাদ্যবস্তু নাও হয়।

পাঠ - শব্দটির তরজমা করা হয়েছে ‘অন্যায় পন্থায়’। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-মাসউদ (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীগণের মতে শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ এবং না-জায়েয সবগুলো পন্থাকেই বাতেল বলা হয়। যেমন, চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ, বিশাসভংগ, ঘুষ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি সকল প্রকার অন্যায় পন্থাই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। (বাহরে-মুহীত)

‘বাতেল’ পন্থায় খাওয়া : কোরআন পাক একটিমাত্র শব্দ يَأْكُلُ বলে অন্যায় পন্থায় অর্জিত সকল প্রকার সম্পদকে হারাম করে দিয়েছে। লেনদেন এর ব্যাপারে অন্যায় পন্থা কি কি হতে পারে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে সুপ্রাণ রাখতে হবে যে, লেনদেন এর ব্যাপারে আল্লাহর রসুল (সাঃ) যেসব বিষয়কে হারাম বলে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কোরআনে উল্লেখিত ‘বাতেল’ শব্দের ব্যাখ্যা মাত্র। ফলে হাদীসে উল্লেখিত অর্থনৈতিক লেনদেন বিষয়ক

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَأْتِيَا طَل
الْأَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ حَكِيمًا ۝ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدُوًّا وَظَلَمًا
فَسَوْفَ نُضَلِّيهِ تَأْوِيلًا ۝ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْإِنْسَانِ يَسِيرٌ ۝ إِنْ
تَجَدَّبُوا لِلْكَافِرِينَ وَلَهُمْ عَنْكُمْ كُفْرٌ سَيَايَاكُمْ وَنَدَّ خَلْقَكُمْ
مَنْ خَلَقَكُمْ مِنْكُمْ ۝ وَلَكُمْ أَنْتُمْ بَيْنَكُمْ ۝ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ
الَّذِينَ يَشَاءُ ۝ وَبَيْنَكُمْ ۝ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ
وَسَلُّوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ عَلِيمًا ۝ وَلَكُمْ
جَعَلْنَا مَوَالِيَّ وَمَتَارَكُ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۝ وَالَّذِينَ عَقَلَتْ
أَيْمَانَكُمْ فَاتُوهُمْ زِينَةً ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ ۝ وَبَيْنَكُمْ ۝ أَمْوَالُهُمْ وَالصَّالِحَاتُ قَدْ خُفِّضَتْ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۝ وَالَّذِي تَخَافُونَ سُوءَ مَنِّهِمْ
وَأَهْمُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرُوهُمْ ۝ فَإِنْ أَكَلَتْكُمْ
فَلَا تَعُوْا عَلَيْهِمْ ۝ سَيِّدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

(৯৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস
করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয়
তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে
আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি দয়ালু। (১০০) আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন
কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুন
নিষ্কাশ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য। (১০১) যেগুলো
সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সেসব বড় গোনাহগুলো
থেকে বেঁচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ক্রটি-বিদ্রুতিগুলো ক্ষমা
কর দেব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব। (১০২) আর
তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না এমনসব বিষয়ে যাতে আল্লাহ তাআলা
তোমাদের একের উপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন
করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ। আর
আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা
সর্ব-বিষয়ে জ্ঞাত। (১০৩) পিতা-মাতা এবং নিকটাত্মীয়গণ যা ভোগ করে
যদি সেসবের জন্যই আমি উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করে দিয়েছি। আর যাদের
সাথে তোমরা অসীকারবদ্ধ হয়েছ তাদের প্রাণ দিয়ে দাও। আল্লাহ তাআলা
নিঃসন্দেহে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করেন। (১০৪) পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃ
ত্বাল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন
এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে নেককার
তীলোকগণ হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন
লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অব্যাহতার
আশঙ্কা করে তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ভাগ কর এবং গ্রহণ
কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোন
পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার উপর শ্রেষ্ঠ।

বিধি-নিষেধগুলোও প্রকৃতপক্ষে কোরআনেরই নির্দেশ।

সং-রোযগারের শর্তাবলী : হযরত মুআয-ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন,— সর্বাপেক্ষা পবিত্র রোযগার হচ্ছে ব্যবসায়ীদের রোযগার। তবে শর্ত হচ্ছে, তারা যখন কথা বলবে তখন মিথ্যা বলবে না। কোন আমানতের খেয়ানত করবে না। কোন পণ্য ক্রয় করার সময় সেটাকে মন্দ সাব্যস্ত করে মূল্য কম দেয়ার চেষ্টা করবে না। নিজের মাল বিক্রয় করার সময় সে মালের অথবা তারিফ করে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করবে না। তার নিজের নিকট অন্যের ধার থাকলে পাওনাদারকে অথবা ঘুরাবে না। অপরপক্ষে, সে কারো কাছে কিছু পাওনা হলে তাকে উত্তম্যক্ত করবে না— (ইসফাহানী, তফসীরে— মাযহরী)

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে :

ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله وبر
وصدق - اخرجه الحاكم عن رفاعه بن رافع

অর্থাৎ— যারা আল্লাহকে ভয় করে, সংভাবে লেন-দেন করে এবং সত্য বলে—সেসব লোক ছাড়া কেয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা গোনাহ্গারদের কাতারে উঠিত হবে।”

অন্যের সম্পদ হালাল হওয়ার দুটি শর্ত : আলোচ্য আয়াতে عَنْ تَرَافِضٍ وَتَنْكُহ্ বাধ্যকটি সংযুক্ত করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব ক্ষেত্রে ব্যবসার নামে সুদ, জুয়া, ধোকা-প্রতারণা ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অন্যের সম্পদ হস্তগত করা হয়, সেসব পন্থায় সম্পদ অর্জন করা বৈধ ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং হারাম ও বাতিল পন্থা। তেমনি যদি স্বাভাবিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও লেনদেনের মধ্যে উভয় পক্ষের আন্তরিক সন্তুষ্টি না থাকে, তবে সেসকল ক্রয়-বিক্রয়ও বাতিল এবং হারাম।

পাপের প্রকারভেদ : উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, পাপের প্রকারভেদ দু’রকম। কিছু কবীরা অর্থাৎ, কঠিন ও বড় রকমের পাপ, আর কিছু সগীরা অর্থাৎ, হালকা ও ছোট পাপ। এ কথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যদি কেউ সাহস করে কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি তাদের সগীরা গোনাহ্গুলো নিজেই ক্ষমা করে দেবেন।

যাবতীয় ফরয-ওয়াজিবসমূহ সম্পাদন করাও কবীরা গোনাহ্ থেকে বাঁচার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ফরয-ওয়াজিবসমূহ ত্যাগ করাও কবীরা গোনাহ্। বস্তুতঃ যে লোক ফরয-ওয়াজিবসমূহ পালনের ব্যাপারে যথাযথ অনুবর্তিতা অবলম্বন করে এবং যাবতীয় কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে, আল্লাহ স্বয়ং তার সগীরা গোনাহ্সমূহের কাফফারা করে দেবেন।

সৎকর্মসমূহ সগীরা গোনাহ্‌র প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ : প্রায়শ্চিত্ত অর্থ এই যে, কর্তার সৎ-কর্মসমূহকে সগীরা গোনাহ্‌র ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেখিয়ে তার হিসাব সমান সমান করে দেয়া হবে। জাহান্নামের পরিবর্তে সে জান্নাত প্রাপ্ত হবে। বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন লোক যখন নামায পড়ার জন্য অযু করে, তখন প্রতিটি অঙ্গ ধৌত হওয়ার সাথে সাথে তার গোনাহ্‌র কাফফারা হয়ে যায়। মুখমণ্ডল ধুয়ে নিলে চোখ, কান ও নাক প্রভৃতি অঙ্গের পাপসমূহের কাফফারা হয়ে যায়। কুলি করার সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বার পাপের কাফফারা হয়ে যায়; আর পা ধোয়ার সাথে সাথে ধুয়ে

যায় পায়ের পাপসমূহ। তারপর যখন সে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়, তখন প্রতিটি পদক্ষেপে পাপের কাফফারা হতে থাকে।

কবীরা গোনাহ শুধু তওবা দ্বারাই মাফ হয় : আলোচ্য আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, অযু, নামায প্রভৃতি সৎকর্মের মাধ্যমে গোনাহ্‌র কাফফারা হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ হলো সগীরা গোনাহ্। কবীরা গোনাহ্ একমাত্র তওবা ছাড়া মাফ হয় না। বস্তুতঃ সগীরা গোনাহ্ মাফের শর্ত হল, সাহস ও চেষ্টার মাধ্যমে কবীরা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা। এতে প্রতীয়মান হচ্ছে, যদি কোন লোক কবীরা গোনাহ্‌তে লিপ্ত থেকেও অযু-নামায আদায় করতে থাকে, তবে শুধু মাত্র অযু-নামায কিংবা অন্যান্য সৎকর্মের দ্বারা তার সগীরা গোনাহ্‌র কাফফারাও হবে না—কবীরা গোনাহ্ তো থাকলই— কাজেই কবীরা গোনাহ্‌র একটা বিরাট অনিষ্ট স্বয়ং সে সমস্ত পাপের অস্তিত্ব, যার প্রতি কোরআন ও হাদীসে কঠোর সাবধানবাণী বর্ণিত হচ্ছে। সেগুলো সত্যিকার তওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না।

মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয় এমন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করা : এ আয়াতে অন্যের এমনসব বৈশিষ্ট্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা গোষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে যা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। কারণ, মানুষ যখন নিজেকে অন্যের চাইতে ধন-দৌলত, আরাম-আয়েশ, বিদ্যা-বুদ্ধি, শারীরিক সৌন্দর্য-সৌষ্ঠবে খাটো অনুভব করে, তখন স্বভাবগতভাবেই তার অন্তরে হিংসার বীজ উগু হতে শুরু করে। এতে কম করে হলেও তার মনে সেসব বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত লোকের সমপর্যায়ে উন্নীত হওয়া কিংবা তার চাইতেও কিছুটা উপরে উঠবার একটা বাসনা সৃষ্টি হতে থাকে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হওয়ার মত নয়। কেননা, তা অর্জন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। যেমন, কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা বা কোন সাধারণ ঘরের সন্তানের পক্ষে দেশের সেরা কোন পরিবারের সন্তান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কিংবা কারো পক্ষে অত্যন্ত সুশীল হওয়ার বাসনা ইত্যাদি। যদি কেউ আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে জন্মগতভাবে এসব বৈশিষ্ট্য লাভ করতে না পারে, তবে সারা জীবন সাধ্য-সাধনা করেও তার পক্ষে সেটা লাভ করা সম্ভব হবে না। উদাহরণস্বরূপ কোন বেঁটে কদাকার লোক সুন্দর-সুঠাম হওয়ার জন্য কিংবা কোন সাধারণ ঘরের সন্তান মহান সৈয়দ বংশের সন্তান হওয়ার জন্য যদি আজীবন সাধনা করে, তবে তার সে সাধনা সফল হওয়ার নয়। এটা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়, কোন দাওয়া-তদবীরও এ ব্যাপারে ফলপ্রসূ হওয়ার নয়। এমতাবস্থায় যদি তার অন্তরে এরূপ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় যে, আমার পক্ষে যখন এরূপটি হওয়া সম্ভব নয়, তখন অন্য আর একজন কেন এরূপ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হবে? এরূপ মনোভাবকে ‘হাসাদ’ বা হিংসা বলা হয়। এটা মানব-চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর ও লজ্জাজনক রোগবিশেষ। দুনিয়ার অধিকাংশ ঝগড়া-ফ্যাসাদ এবং হত্যা-লুণ্ঠনের উদগাতাই হচ্ছে মানব-চরিত্রের এ কুৎসিৎ ব্যাধি।

কোরআন-করীম সে অশান্তি অনাচারের পথ রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এরশাদ করেছে :

وَلَا تَسْتَوُوا مَنَافِعُ اللَّهِ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা বিশেষ কোন হেকমতের কারণেই মানুষের

মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিভিন্ন জনের মধ্যে বন্টন করেছেন। তার কল্যাণহস্তই এক একজনের মধ্যে এক এক ধরনের গুণ-বৈশিষ্ট্য বিতরণ করেছে। সুতরাং প্রত্যেককেই তার নিজের ভাগ্যের প্রতি তুষ্ট এবং রাজী থাকা উচিত। অন্যের গুণ-বৈশিষ্ট্যের আকাঙ্ক্ষায় অন্তর বিধিয়ে তোলা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নয়। কেননা, এতে নিজেকে অর্থহীন মানসিক গীড়া এবং হিংসারূপী কঠিন গোনাহে লিপ্ত করা ছাড়া আর কোন ফল লাভ হয় না।

আল্লাহ্ তাআলা যাকে নররূপে সৃষ্টি করেছেন তাতেই তার শেকরগুহারী করা কর্তব্য। অপরপক্ষে যাকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন তারও কর্তব্য এতে রাজী থাকা এবং চিন্তা করা যে, যদি তাকে পুরুষরূপে সৃষ্টি করা হতো তবে হয় তো সে পুরুষের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হতো না, বরং উল্টা গোনাহগার হতে হতো। যাকে আল্লাহ্ তাআলা পৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার পক্ষে এ নেয়ামতের শুকরিয়া করা উচিত। অপরপক্ষে যে কদাকার তার পক্ষেও অনর্থক দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয়ে বরং চিন্তা করা উচিত যে, হয় তো কোন মঙ্গলের জন্যই আল্লাহ্ পাক আমাকে এই চেহারা অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এরূপ না হয়ে যদি আমি স্ত্রী হতাম, তবে হয় তো কোন ফেৎনার সম্মুখীন হতে হতো। অনুরূপ সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করে যেমন কারো পক্ষে অহঙ্কারী হওয়া উচিত নয়, তেমনি সাধারণ বংশে জন্মগ্রহণকারী কোন লোকের পক্ষেও রক্ত-ধারার দিক দিয়ে সৈয়দ হওয়ার দুরাশা পোষণ করা উচিত নয়। কেননা, হাজার টো ও আকাঙ্ক্ষার দুরাও তা অর্জিত হওয়ার নয়। সুতরাং এরূপ অর্থহীন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে মানসিক যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। জাই বংশ মর্যাদা লাভের দুরাশার চাইতে নেক আমল ও সদগুণের মাধ্যমে যদি কেউ প্রাধান্য অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, তবেই তার সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। এটা মানুষের সাধ্যায়ত্ত। এ চেষ্টার মাধ্যমে মানুষ শুধু সাফল্যই লাভ করতে পারে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার স্তরকে হাড়িয়ে আরো অনেক উর্ধ্বে উঠতে পারে।

কোরআনের কোন কোন আয়াত এবং একাধিক সহীহ হাদীসের র্কনয় সংকর্মে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ, অন্যের চাইতে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হওয়ার নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপ অন্যের মধ্যে যে গুণ-গরিমা রয়েছে, তা অর্জন করার জন্যে সচেষ্ট হওয়ার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুল (সাহ) শুধু ঐ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই অন্যের সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত, যেগুলো চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে। যেমন, কারো গভীর জ্ঞান কিংবা চারিত্রিক মহত্ত্ব দেখে তাঁর কাছ থেকে তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা প্রশংসনীয় কাজ। আলোচ্য এ আয়াতে সেরাপ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে :

لِرَجُلٍ نَّصِيحٌ وَمِمَّا اكْتَسَبَ وَلِلْمَرْأَةِ نَصِيحٌ وَمِمَّا اكْتَسَبَ

অর্থাৎ, পুরুষরা যাকিছু সাধনার মাধ্যমে অর্জন করবে তারা তার অংশ পাবে এবং নারীরা যাকিছু অর্জন করবে তার অংশও তারা পাবে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং কর্মে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে

বৈশিষ্ট্য লাভ করার চেষ্টা বার্থ হবে না। প্রত্যেকেই তার প্রচেষ্টার ফল অবশ্যই লাভ করবে।

সূরা-নিসার শুরু থেকে এ পর্যন্ত অমিকাংশ হুকুম ও হেদায়েত ছিল নারী শ্রেণীর অধিকার সম্পর্কিত। ইসলাম-পূর্ব যুগে দুনিয়ার সর্বত্র অবলা নারীদের প্রতি ব্যাপকভাবে যেসব নির্যাতনমূলক অন্যায্য আচরণ প্রচলিত ছিল, এসব নির্দেশের মাধ্যমে কোরআন সেগুলোর উচ্ছেদ সাধন করেছে। বস্তুতঃ পুরুষেরা যেসব অধিকার ভোগ করে, ইসলাম নারীদেরকেও সেরূপ সমান অধিকার দিয়েছে। নারীদের যিস্মায় যেমন পুরুষের প্রতি কিছু বিশেষ ধরনের কর্তব্য আরোপ করেছে, তেমনি পুরুষদের উপরও নারীদের প্রতি কিছু বিশেষ দায়িত্ব পালন ফরয করেছে।

নাফরমান স্ত্রী ও তার সংশোধনের উপায় : অতঃপর সেসব স্ত্রীলোকের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যারা স্বামীদের আনুগত্য করে না কিংবা যারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। কোরআনে করীম তাদের সংশোধনের জন্যে পুরুষদের যথাক্রমে তিনটি উপায় বাতল দিয়েছে। বলা হয়েছে—

وَالَّذِي نَفَاوْنَ شُرُوكُكُمْ فَوَطُّوهُمْ وَأَقْبِرُوا فِي أُنْثَاهُمْ وَأَضْرِبُوا

অর্থাৎ, স্ত্রীদের পক্ষ থেকে যদি নাফরমানী সংঘটিত হয় কিংবা এমন আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে প্রথম পর্যায়ে তাদের সংশোধন হলো যে, নরমভাবে তাদের বোঝাবে। যদি তাতেও বিরত না হয়, তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বিছানা নিজের থেকে পৃথক করে দেবে। যাতে এই পৃথকতার দরুন সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতে পারে। কোরআন-করীমে এ প্রসঙ্গে فِي أُنْثَاهُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ এই মর্মেজ্ঞার করেছেন যে, পৃথকতা শুধু বিছানাতেই হবে, বাড়ী বা থাকার ঘর পৃথক করবে না— যাতে স্ত্রীকে সে ঘরে একা থাকতে হয়। কারণ, তাতে তার দুঃখও বেশী হবে এবং এতে কোন রকম অঘটন ঘটে যাওয়ারও সম্ভাবনা অধিক।

আয়াতের শেষাংশে এরশাদ হয়েছে যে, এই তিনটি পন্থা প্রয়োগে যদি স্ত্রী অনুগত হয়ে যায়, তবে তোমরাও সহনশীলতার আশ্রয় নাও; সাধারণ কথায় কথায় দোষারোপের পন্থা খুঁজে বেড়িয়ে না। আর জেনে রেখো, আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা সবার উপরেই পরিব্যাপ্ত।

বিষয় সংক্ষেপ : এই আয়াতের দ্বারা মূলনীতিরূপে যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় তা হচ্ছে এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের বক্তব্য অনুসারে পুরুষ ও নারীদের অধিকার পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ, বরং পুরুষের তুলনায় নারীদের দুর্বলতার কারণে তাদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ নারীরা বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায় করে নিতে পারে না। কিন্তু তথাপি এই সমতার অর্থ এই নয় যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে মর্যাদার কোন পার্থক্যও থাকবে না; বরং দু'টি ন্যায়সঙ্গত ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই পুরুষদেরকে নারীদের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে।

প্রথমতঃ পুরুষকে তার জ্ঞানৈশ্বর্য ও পরিপূর্ণ কর্মক্ষমতার কারণে নারী জাতির উপরে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, যা অর্জন করা নারী জাতির পক্ষে

আন্দো সম্ভব নয়। দৈবাৎ কিংবা ব্যক্তিবিশেষের কথা স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়তঃ নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষের নিজের উপাধন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকে।

প্রথম কারণটি হল, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও মানুষের নিজস্ব ক্ষমতা বহির্ভূত। আর দ্বিতীয় কারণটি নিজের উপার্জিত ও ক্ষমতাভিত্তিক। তাছাড়া একথাও বলা যেতে পারে যে, একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যে কাউকে শাসক, কাউকে শাসিত বানানোর জন্য বুদ্ধি ও ন্যায়ের আলোকে দু'টি বিষয় অপরিহার্য ছিল : (১) যাকে শাসক বানানো হবে, তার মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের নিরিখে শাসনকার্যের যোগ্যতা; (২) তার অভিভাবকত্বে শাসিতের সম্মতি। প্রথম কারণটি পুরুষের শাসকোচিত যোগ্যতার পরিচায়ক। আর দ্বিতীয় কারণ শাসিত হওয়ার ব্যাপারে নারীদের স্বীকারোক্তি। কারণ, নারীরা যখন বিয়ের সময় নিজের খোরশোষ ও মোহরের শর্তে বিয়ের অনুমতি দান করে, তখনই সে তাদের অভিভাবকত্ব মেনে নেয়।

সারকথা, এ আয়াতের প্রথম বাক্যে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-ব্যবস্থার একটি মূলনীতি বাতলে দেয়া হয়েছে। তাহল এই যে, অধিকাংশ বিষয়ে অধিকারের সমতাবিধান সত্ত্বেও নারীর উপর পুরুষের একটি শাসকোচিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নারীরা হল পুরুষের শাসিত ও অধীন।

এই মূলনীতির ভিত্তিতে পৃথিবীতে নারীদের দু'টি শ্রেণী রয়েছে। একটি হল তাদের শ্রেণী যারা আলোচ্য মূলনীতি এবং স্থিরীকৃত চুক্তির অনুবর্তী রয়েছে এবং পুরুষের অভিভাবকত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার আনুগত্য অবলম্বন করেছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হল সে সমস্ত নারীরা, যারা যথার্থভাবে এ মূলনীতির অনুবর্তী থাকেনি। প্রথম শ্রেণীর নারীরা পারিবারিক ও বৈষয়িক শান্তি ও স্বস্তির জন্য নিজেরাই যিস্মাদার। তাদের কোন সংশোধনের প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নারীদের সংশোধনকল্পে এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে এমন এক সুসূচ্য ব্যবস্থা বাতলানো হয়েছে, যার মাধ্যমে ঘরের বিষয় ঘরের

ভেতরেই সংশোধিত হয়ে যেতে পারে। এবং স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ-বিসম্বাদ তাদের দু'জনের মধ্যেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে; তৃতীয় কোন লোকের যেন প্রয়োজনই না হয়। এতে পুরুষদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি নারীদের অব্যাহত কিংবা অনুগত্যের কিছু অভাব অনুভব কর, তবে সর্বপ্রথমে বুঝিয়ে-শুনিয়ে তাদের মানসিক সংশোধন কর। এতেই যদি ফলোদয় হয়ে যায়, তবে বিষয়টি এখানেই মিটে গেল। এতে সন্তোষিত স্ত্রীলোকটি সব সময়ের জন্য পাপ থেকে বেঁচে গেল। আর পুরুষও মানসিক যাতনা থেকে রেহাই পেল। এভাবে উভয়ে দুঃখ-বেদনার কবল থেকে মুক্তি পেল। পক্ষান্তরে যদি বুঝিয়ে-শুনিয়ে কাজ না হয়, তখন দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদেরকে সতর্ক করার জন্য এবং নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে নিজে পৃথক বিধানায় শোবে। এটা একটা মামুলি শাস্তি এক উত্তম সতর্কীকরণ। এতে যদি স্ত্রী সতর্ক হয়ে যায়, তবে বিবাদটিও এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারে। আর যদি সে এ ভদ্রজনাচিতি শাস্তির পরেও স্বীয় অব্যাহত ও দুষ্কর্ম থেকে ফিরে না আসে, তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে সাধারণভাবে মারধোর করারও অনুমতি রয়েছে। আর তার সীমা হল এই যে, শরীরে যেন সে মারধোরের প্রতিক্রিয়া কিংবা জখম না হয়। কিন্তু এই পর্যায়ের শাস্তি দানকেও রসুলে করীম (সাঃ) পছন্দ করেননি, বরং তিনি বলেছেন, 'ভাল লোক এমন করে না'।

যাহোক, এ সাধারণ মারধোরের মাধ্যমেই যদি সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তবুও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল। এতে যেমন স্ত্রীদের সংশোধনকল্পে পুরুষদেরকে তিনটি অধিকার দান করা হয়েছে, তেমনভাবে আয়াতের শেষাংশে একথাও বলা হয়েছে **وَأَن أَطِئْتُمْ لَهُمْ فَلَاحُكُمْ وَأَعْلَىٰ قَوْلِكُمْ سَبِيلًا** অর্থাৎ, যদি এ তিনটি ব্যবস্থার ফলে তারা তোমাদের কথা মানতে আরম্ভ করে, তবে তোমরাও আর বাড়াবাড়ি করো না এবং দোষানুসন্ধান করতে যেও না, বরং কিছু সহনশীলতা অবলম্বন কর। আর একথা খুব ভাল করে জেনে রেখো যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নারীদের উপর তেমন কোন উচ্চ মর্যাদা দান করেননি। আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব তোমাদের উপরও বিদ্যমান রয়েছে, তোমরা কোন রকম বাড়াবাড়ি করলে তার শাস্তি তোমাদেরকেও ভোগ করতে হবে।

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدِ الْأَصْلَ حَاقِيقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا شِرْكَ لَهُ
بِهِ شَيْئًا وَيَالِ الَّذِينَ إِحْسَانًا وَبِذَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
السَّكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْحَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجَنُوبِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ مَن كَانَ خَفِيًّا لِّلْأَفْخُورِ ۝ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ قُضَايَاهُ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝ وَمَا ذَا
عَلَيْكُمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُمْ عَلِيمًا ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظِلُّهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ وَإنْ تَأَنَّ
حَسَنَةً يَّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ فَكَفَى
إِذَا جُنُوبًا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ وَجُنُوبًا عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدٌ

(৩৫) যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত। (৩৬) আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সং ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাষ্টিক-গর্বিতজনকে। (৩৭) যারা নিজেরাও কার্পণ্য করে এবং অন্যকেও কৃপণতা শিক্ষা দেয় আর গোপন করে সেসব বিষয় যা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দান করেছেন স্বীয় অনুগ্রহে-বস্তৃতঃ তৈরী করে রেখেছি কাকেরদের জন্য অপমানজনক আয়াব। (৩৮) আর সে সমস্ত লোক যারা ব্যয় করে স্বীয় ধন-সম্পদ লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে না, ঈমান আনে না কেয়ামত দিবসের প্রতি এবং শয়তান যার সাথী হয় সে হল নিকটতর সাথী। (৩৯) আর কি-ই বা ক্ষতি হত তাদের যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহর উপর, কেয়ামত দিবসের উপর এবং যদি ব্যয় করত আল্লাহ-প্রদত্ত রিযিক থেকে। অথচ আল্লাহ তাদের ব্যাপারে যথাযথভাবেই অবগত। (৪০) নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো প্রাপ্য হক বিন্দু-বিসর্গও রাখেন না; আর যদি তা সংকর্ম হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল সওয়াব দান করেন। (৪১) আর তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকব তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে।

বিবাদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উভয় পরিবারের সালিসের মাধ্যমে মীমাংসা করার বিধান : উল্লেখিত ব্যবস্থাটি ছিল- এ কারণে যাতে ঘরের ব্যাপার ঘরেই মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অনেক সময় মনোমালিন্য বা বিবাদ দীর্ঘায়িতও হয়ে যায়। তা স্ত্রীর স্বভাবের তিক্ততা ও অবাধ্যতা কিংবা পুরুষের পক্ষ থেকে অহেতুক কড়াকড়ি প্রভৃতি যে কোন কারণেই হোক এমনতরো ঘরের বিষয় আর ঘরে সীমিত থাকে না; বাইরে নিয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সাধারণতঃ এসব ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সমর্থকরা একে অপরকে মন্দ বলে এবং পারস্পরিক অপবাদারোপ করে বেড়ায়। যার ফলে উভয় পক্ষের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত দু'জনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিবাদই পারিবারিক বিসংবাদের রূপ পরিগ্রহ করে।

আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতে কোরআনে-করীম এ ধরনের বিবাদ-বিসংবাদের দরজা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সমসাময়িক শাসকবর্গ, উভয়পক্ষের সমর্থক ও পক্ষাবলম্বী এবং মুসলমান দলকে সম্বোধন করে এমন এক পূত-পবিত্র পন্থা বাতলে দিয়েছে, যাতে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে পরস্পর অপবাদারোপের পথও বন্ধ হয়ে গিয়ে আপোষ-মীমাংসার পথ বেরিয়ে আসতে পারে। আর ঘরের বিবাদ ঘরে মীমাংসা না হতে পারলেও অন্ততঃ পরিবারের মধ্যেই যেন তা হয়ে যায়; আদালতে মামলা-যোকদ্দমা রুজু করার ফলে যেন বিষয়টি হাটে-ঘাটে বিস্তার লাভ না করে।

আর তা হল এই যে, সরকার, উভয়পক্ষের মুরব্বী-অভিভাবক অথবা মুসলমানদের কোন শক্তিশালী সংস্থা তাদের (অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে আপোষ করিয়ে দেয়ার জন্য দু'জন সালিস নির্ধারণ করে দেবেন। একজন পুরুষের পরিবার থেকে এবং একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে। এতদুভয় ক্ষেত্রে সালিস অর্থে (হাকাম) শব্দ প্রয়োগ করে কোরআন নির্বাচিত সালিসদ্বয়ের প্রয়োজনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যের বিষয়টিও নির্ধারণ করে দিয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, এতদুভয়ের মধ্যেই বিবাদ মীমাংসা করার গুণ থাকতে হবে। বলাবাহুল্য, এ গুণটি সে ব্যক্তির মধ্যেই থাকতে পারে, যিনি বিজ্ঞও হবেন এবং তৎসঙ্গে বিশুদ্ধ, দীনদারও হবেন।

সারকথা, একজন সালিস পুরুষের (স্বামীর) পরিবার থেকে এবং একজন মহিলার (স্ত্রীর) পরিবার থেকে নির্বাচিত করে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছে পাঠানো হবে। যেখানে গিয়ে এতদুভয় কি কি কাজ করবেন এবং এদের দায়িত্বই বা কি হবে কোরআনে-করীম তা স্থির করে দেয়নি। অবশ্য বর্ণনাসেষে একটি বাক্য **إِنْ يُرِيدِ الْأَصْلَ حَاقِيقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا** অর্থাৎ, যদি এতদুভয় সালিস সমস্যার সমাধান এবং পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদের কাজে সহায়তা দান করবেন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্তাব সৃষ্টি করে দেবেন।

এ বাক্যটির দ্বারা দুটি বিষয় বোঝা যায় :

(এক) আপোষ-মীমাংসাকারী সালিসদ্বয়ের নিয়ত যদি সং হয় এবং সত্যিকারভাবেই যদি তারা স্বামী-স্ত্রীর সমঝোতা কামনা করেন, তাহলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের গায়বী সাহায্য হবে। ফলে তারা

নিজ্জদের উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হবেন। আর তাতেকরে তাদের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মনেও আল্লাহ তাআলা সম্প্রীতি ও মহব্বত সৃষ্টি করে দেবেন। এতে আরো একটি কথা প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোথাও পারস্পরিক মীমাংসা না হয়, তবে বুঝতে হবে, সালিসদুয়ের যে কোন একজনের মনে হয়তো নিঃস্বার্থতার অভাব ছিল।

(দুই) এ ব্যাক্যের দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, দু'পক্ষের সালিসকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হল স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মীমাংসা করা, এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। অবশ্য একথা স্বতন্ত্র যে, উভয়পক্ষ সম্মত হয়ে এতদুভয় ব্যক্তিকে নিজেদের উকীল, প্রতিনিধি অথবা সালিস নির্ধারণ করবে এবং একথা স্বীকার করে নেবে যে, তোমরা মিলেমিশে যে সিদ্ধান্ত নেবে, আমরা তাই মেনে নেব। এক্ষেত্রে এই সালিসদুয় সম্পূর্ণভাবে তাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকারী হয়ে যাবে। তারা দু'জনে তালাকের ব্যাপারে একমত হয়ে গেলে তালাকই হয়ে যাবে। আবার তারা 'খোলা' প্রভৃতি যে কোন সিদ্ধান্তে একমত হবে, তাই হবে এবং পুরুষের পক্ষ থেকে প্রদত্ত অধিকার অনুসারে যদি তারা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তবে তাই মেনে নিতে হবে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের মধ্যে হযরত হাসান বসরী ও হযরত আবু হানীফা (রহঃ) প্রমুখেরও এমন মত।—(ক্বল্ল ম' আনী)

হযরত আলী (রাঃ)—এর সামনে একবার এমন এক ঘটনা উপস্থিত হয়। তাতেও প্রমাণ হয় যে, একমাত্র আপোষ-মীমাংসা ছাড়া উল্লেখিত সালিসদুয়ের অন্য কোন অধিকার থাকে না, যতক্ষণ না উভয়পক্ষ তাদেরকে পূর্ণ অধিকার দান করে। ঘটনাটি সুনানে বায়হাকী গ্রন্থে হযরত ওবায়দা সালমানীর রেওয়ায়েতক্রমে নিম্নরূপ বর্ণিত রয়েছে :

একজন পুরুষ ও একজন মহিলা হযরত আলী (রাঃ)—এর খেদমতে হাযির হল। তাদের উভয়ের সাথেই ছিল বহু লোকের এক এক দল। হযরত আলী (রাঃ) নির্দেশ দিলেন যে, পুরুষের পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন 'হাকাম' বা সালিস নির্ধারণ করা হোক। অতঃপর সালিস নির্ধারিত হয়ে গেলে তাদের সম্বোধন করে হযরত আলী (রাঃ) বললেন, তোমরা কি তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জান? আর তোমাদেরকে কি করতে হবে সে ব্যাপারে কি তোমরা অবগত? শোন, তোমরা যদি এই স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে রাখার ব্যাপারে এবং তাদের পারস্পরিক আপোষ মীমাংসা করে দেয়ার ব্যাপারে একমত হতে পার, তবে তাই করো। পক্ষান্তরে তোমরা যদি মনে কর যে, তাদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করা সম্ভব নয়, কিংবা তা করে দিলে টিকতে পারবে না এবং তোমরা উভয়েই তাদের পৃথক করে দেয়ার ব্যাপারে একমত হয়ে এতেই মঙ্গল বিবেচনা কর, তবে তাই করবে। একথা শুনে মহিলাটি বলল, আমি এটা স্বীকার করি—এতদুভয় সালিস আল্লাহর আইন অনুসারে যে ফয়সালা করবে, তা আমার মতের পক্ষে হোক অথবা বিরোধী হোক, আমি তাই মানি।

কিন্তু পুরুষটি বলল, পৃথক হয়ে যাওয়া কিংবা তালাক হয়ে যাওয়া তো আমি কোনক্রমেই সহ্য করবো না। অবশ্য সালিসদের এ অধিকার দিচ্ছি যে, তারা আমার উপর যে কোন রকম আর্থিক জরিমানা আরোপ করে তাকে (স্ত্রীকে) সম্মত করিয়ে দিতে পারেন।

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, না তা হয় না। তোমারও সালিসদেরকে তেমনি অধিকার দেয়া উচিত যেমন স্ত্রী দিয়েছে।

এ ঘটনার দ্বারা কোন কোন মুক্ততাহিদ ইমাম উদ্ভাবন করেছেন যে, সালিসদের অধিকারসম্পন্ন হওয়া কর্তব্য। যেমন, হযরত আলী উভয়পক্ষকে বলে তাদেরকে অধিকারসম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু ইমাম আযম হযরত আবু হানীফা ও হযরত হাসান বসরী (রহঃ) সাব্যস্ত করেছেন যে, উল্লেখিত সালিসদুয়ের অধিকারসম্পন্ন হওয়াই যদি অপরিহার্য হতো, তবে হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক উভয়পক্ষের সম্মতি লাভের চেষ্টা করার কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। সুতরাং উভয়পক্ষকে সম্মত করার চেষ্টাই প্রমাণ করে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে এই সালিসদুয় অধিকারসম্পন্ন নয়। অবশ্য স্বামী-স্ত্রী যদি অধিকার দান করে, তবে অধিকারসম্পন্ন হয়ে যায়।

কোরআনে-করীমের এ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসার ক্ষেত্রে অতি চমৎকার এক নতুন পথের উন্মোচন হয়ে যায়।

হক বা অধিকার সংক্রান্ত বর্ণনার পূর্বে তওহীদের আলোচনার কারণ : হক বা অধিকার সংক্রান্ত আলোচনার পূর্বে আল্লাহর অনুগত, এবাদত-বন্দগী ও তওহীদের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে—

وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

অর্থঃ, আল্লাহর এবাদত কর এবং এবাদতের বেলায় তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না।

হক বা অধিকার সংক্রান্ত বর্ণনার পূর্বে এবাদত-বন্দগী ও তওহীদ সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করার বেশ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। তার একটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলার ভয় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের প্রতি যাদের মধ্যে নিষ্ঠা না থাকে, তাদের দ্বারা দুনিয়ার অন্য অধিকার রক্ষা নিষ্ঠাও আশা করা যায় না। মানবগোষ্ঠী, সমাজের রীতি-নীতি কিংবা রাষ্ট্রের আইন-কানুন থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে হাজারো পন্থা আবিষ্কার করে নেয়। কিন্তু যে বিষয়টি মানুষকে মানুষের অধিকারের প্রতি প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধ্য করতে পারে, তাহল আল্লাহর ভয় ও পরহেযগারী। আর এই খোদাভীতি ও পরহেযগারী শুধুমাত্র তওহীদের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। কাজেই বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক ও আত্মীয়-স্বজনের হক বা অধিকারসমূহের বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে তওহীদ ও এবাদত-বন্দগী সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা একান্তই সঙ্গত।

তওহীদের পর পিতা-মাতার অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা : অতঃপর সমস্ত আত্মীয়-আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বপ্রথম পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পীর এবাদত-বন্দগী ও হকসমূহের পর-পরই পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত বিবরণ দানের মাধ্যমে ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত নেয়ামত ও অনুগ্রহ একান্তই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, কিন্তু বাহ্যিক উপকরণের দিক দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহর পরে মানুষের প্রতি সর্বপ্রথম এইহাসান বা অনুগ্রহ থাকে পিতা-মাতার। সাধারণ উপকরণসমূহের মাঝে মানুষের অস্তিত্বের পেছনে পিতা-মাতাই বাহ্যিক কারণ। তাছাড়া জন্ম থেকে যৌবন প্রাপ্তি পর্যন্ত যে সমস্ত কঠিন বন্ধুর পথ ও স্তর রয়েছে, তাতে বাহ্যতঃ পিতা-মাতাই তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখেন, তার প্রতিপালন ও পরিবর্ধনের জামানতদার হয়ে থাকেন। সে জন্যই কোরআন-করীমের অন্যান্য জায়গায়ও পিতা-মাতার হকসমূহকে আল্লাহ তাআলার এবাদত ও

অনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

أَن تَشْكُرُوا لِلَّهِ

অর্থাৎ, আমার এবং তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর।

হযরত মা' আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রসুলে করীম (সাঃ) দশটি প্রসিদ্ধ করেছিলেন। তন্মধ্যে-(১) আল্লাহ্ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদি তোমাদেরকে সেজন্য হত্যা কিংবা অগ্নিদগ্ধও করা হয়। (২) নিজের পিতা-মাতার নাফরমানী কিংবা তাদের মনে কষ্ট দেবে না, যদি তারা এমন নির্দেশও দিয়ে দেন যে, তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ ত্যাগ কর। - (মুসনাদে আহমদ)

রসুলে করীম (সাঃ)-এর বাণীসমূহে যেমন পিতা-মাতার আনুগত্য ও তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকিদ রয়েছে, তেমনিভাবে তার সীমাহীন ফযীলত, মর্তবা ও সওয়াবের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন : যে লোক নিজের রিয়িক ও আয়ুতে বরকত কামনা করবে, তার পক্ষ সেলায়ে-রেহ্মী অর্থাৎ, নিজের আত্মীয়-স্বজনের হকসমূহ আদায় করা উচিত।

তিরমিযী শরীফের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

শোআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত বায়হাকী (রহঃ) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসুলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে পুত্র স্বীয় পিতা-মাতার অনুগত, সে যখনই নিজের পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায়, তখন প্রতিটি দৃষ্টিতে সে একটি করে মকবুল হজ্বের সওয়াব প্রাপ্ত হয়।

বায়হাকীর অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, সমস্ত গোনাহ্ আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করে দেন, কিন্তু যে লোক পিতা-মাতার নাফরমানী এবং তাঁদের মনে কষ্টদায়ক কাজ করে, তাকে আখেরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই বিভিন্ন বিপদাপদে লিপ্ত করে দেয়া হয়।

নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের তাকীদ :
ذِي الْقُرْبَىٰ
অর্থাৎ, — সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করার তাকীদ দেয়া হয়েছে। কোরআন-করীমের প্রসিদ্ধ এক আয়াতে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা হুম্বর (সাঃ) প্রায়শঃই বিভিন্ন ভাষণের পর তেলাওয়াত করতেন। বলা হয়েছে—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ

অর্থাৎ, “আল্লাহ্ সবার সাথে ন্যায্য ও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং নির্দেশ দিচ্ছেন আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করার জন্য।” এতে সামর্থ্যানুযায়ী আত্মীয়-আপনজনদের কায়িক ও আর্থিক সেবা-যত্ন করা, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তাঁদের খবরা-খবর নেয়াও অন্তর্ভুক্ত।

হযরত সালমান ইবনে ‘আমের (রাঃ) বলেন, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, সদকার মাল সাধারণ গরীব-মিসকীনকে দান করলে তাতে

তো শুধু সদকার সওয়াবই পাওয়া যায়, অথচ তা যদি নিজের রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-আপনজনকে দান করা হয়, তাহলে তাতে দু’টি সওয়াব পাওয়া যায়। একটি হল সদকার সওয়াব এবং আরেকটি হল সেলায়ে-রেহ্মীর সওয়াব। অর্থাৎ, আত্মীয়তার হক আদায় করার সওয়াব। - (মুসনাদে আহমদ, নাসাই, তিরমিযী)

উল্লেখিত আয়াতে প্রথমে পিতা-মাতার হকের ব্যাপারে তাকীদ দেয়া হয়েছে এবং তারপরেই আত্মীয়-স্বজনের হকের কথা বলা হয়েছে।

এতীম-মিসকীনের হক : তৃতীয় পর্যায়ে এরশাদ হয়েছে - وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ এতীম ও মিসকীনদের হক সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ যদিও সূরার প্রথমভাগে এসে গেছে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের হক বর্ণনা প্রসঙ্গে এখানে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লা-ওয়ালিস তথা অনাথ শিশু এবং অসহায় মানুষের সাহায্য-সহায়তাকেও এমনি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী বিবেচনা করবে, যেমন আত্মীয়-আপনজনদের বেলায় করে থাক।

প্রতিবেশীর হক : চতুর্থ পর্যায়ে বলা হয়েছে وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ (এবং নিকট প্রতিবেশীর) - পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে - وَالْجَارِ -

শব্দের অর্থ প্রতিবেশী। এ আয়াতে দু’রকম প্রতিবেশীর কথা বলা হয়েছে।

(১) جَارِ الْجَنْبِ (২) جَارِ الْقَرْبَىٰ এতদুভয় প্রকার প্রতিবেশীর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সাহায্যে কোরামের বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, جَارِ الْقَرْبَىٰ বলতে সেসব প্রতিবেশীকে বোঝায়, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়ও বটে। এভাবে এতে দু’টি হক সমন্বিত হয়ে যায়। আর جَارِ الْجَنْبِ বলতে শুধুমাত্র সে প্রতিবেশীকে বোঝায় যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। আর সেই জন্যই তার উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ে।

কোন কোন তফসীরকার মনীষী বলেছেন, ‘জারে-যিলকোরবা’ এমন প্রতিবেশীকে বলা হয়, যে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং মুসলমান। আর ‘জারে-জুনুব’ বলা হয় অমুসলমান প্রতিবেশীকে।

কোরআনে ব্যবহৃত শব্দে অবশ্য এসমুদয় সম্ভাব্যতাই বিদ্যমান। তাছাড়া বাস্তবতার দিক দিয়েও প্রতিবেশীদের মাঝে স্তরভেদ থাকটা একান্তই যুক্তিসঙ্গত এবং নির্ভরযোগ্যও বটে। আর প্রতিবেশীদের আত্মীয় অথবা অনাত্মীয় হওয়ার দিক দিয়েও। প্রতিবেশী চাই নিকটবর্তী হোক অথবা দূরবর্তী, আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়, মুসলমান হোক অথবা অমুসলমান, যে কোন অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের খবরা-খবর নেয়া কর্তব্য।

অবশ্য প্রতিবেশী হওয়া ছাড়াও যার অন্যান্য হক রয়েছে, অন্যান্য প্রতিবেশীদের তুলনায় তাকে মর্যাদাগত অগ্রাধিকার দিতে হবে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, স্বয়ং হুম্বরে আকরাম (সাঃ) এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে, “কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে, যাদের হক মাত্র একটি, কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক দু’টি এবং কোন কোন প্রতিবেশী রয়েছে যাদের হক তিনটি। এক হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হল এমন অমুসলমান যাদের সাথে কোন আত্মীয়তা নেই। দুই হকবিশিষ্ট

প্রতিবেশী হল তারা, যারা প্রতিবেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানও বটে। আর তিন হকবিশিষ্ট প্রতিবেশী হল তারা, যারা প্রতিবেশী ও মুসলমান এবং সেই সঙ্গে আত্মীয়ও বটে।’ (ইবনে-কাসীর)

সহকর্মীদের হক : যষ্ঠ পর্যায়ে বলা হয়েছে وَالْقَائِلِينَ بِأَرْبَابِهِمْ—এর শাব্দিক অর্থ হল সহকর্মী। এতে সেসব সফর সঙ্গীরাও অন্তর্ভুক্ত যারা রেল, জাহাজ, বাস, মোটর প্রভৃতিতে পাশাপাশি বসে ভ্রমণ করে এবং সে সমস্ত লোকও অন্তর্ভুক্ত যারা কোন সাধারণ বা বিশেষ বৈঠক বা অধিবেশনে আপনার সাথে উপবেশন করে থাকে।

ইসলামী শরীয়ত নিকটবর্তী ও দূরবর্তী স্থায়ী প্রতিবেশীদের অধিকার সংরক্ষণকে যেমন ওয়াজিব করে দিয়েছে, তেমনিভাবে সে ব্যক্তির সাহচর্যের অধিকার বা হককেও অপরিহার্য করে দিয়েছে, যে সামান্য সময়ের জন্য হলেও কোন মজলিস, বৈঠক অথবা সফরের সময় আপনার সমপর্যায়ে উপবেশন করে। তাদের মধ্যে মুসলমান, অমুসলমান, আত্মীয়, অনাত্মীয় সবাই সমান—সবার সাথেই সদ্যবহার করার হেদায়েত করা হয়েছে। এর সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে এই যে, আপনার কোন কথায় বা কাজে যেন সে কোন রকম কষ্ট না পায়। এমন কোন কথা বলবেন না, যাতে সে মর্মাহত হতে পারে। এমন কোন আচরণ করবেন না, যাতে তার কষ্ট হতে পারে। যেমন, সিগারেট পান করে তার দিকে ধোয়া ছাড়া, পান খেয়ে তার দিকে পিক ফেলা এবং এমনভাবে বসা যাতে তার বসার জায়গা সংকুচিত হয়ে যায় প্রভৃতি।

কোরআন-করীমের এ হেদায়েত অনুযায়ী যদি সবাই আমল করতে শুরু করে, তাহলে রেল, জাহাজ, বাস প্রভৃতির সফরক্ষেত্রে সংঘটিত সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। প্রত্যেকেরই লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, আমার শুধুমাত্র একজনের জায়গারই অধিকার রয়েছে; তার বেশী জায়গা দখল করে রাখার কোন অধিকার নেই। রেলে বা অন্যান্য যানবাহনে অন্য কোন যাত্রী পাশে বসতে গেলে একথা ভাবা উচিত যে, এখানে তারও ততটুকুই অধিকার রয়েছে যতটা রয়েছে আমার।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এমন প্রতিটি লোকই সাহেবে-বিল-জাম্ব-এর অন্তর্ভুক্ত যে কোন কাজে, কোন পেশায় বা কোন বিষয়ে আপনার সাথে জড়িত বা আপনার অংশীদার; তা শিল্পশ্রমেই হোক অথবা অফিস-আদালতের চাকরিতেই হোক কিংবা কোন সফরে বা স্থায়ী বসবাসেই হোক—(রুহুল-মা’আনী)

পথিকের হক : সপ্তম পর্যায়ে এরশাদ হয়েছে وَأَرْبَابُ السَّبِيلِ—অর্থঃ, পথিক। এতে এমন লোককে বোঝানো হয়েছে যে সফরের অবস্থায় আপনার নিকট এসে উপস্থিত হয় কিংবা আপনার মেহমান হয়ে যায়। যেহেতু এই অজ্ঞান-অচেনা লোকটির কোন আত্মীয় বা সম্পর্কীয় লোক এখানে উপস্থিত থাকে না, সেহেতু কোরআন ইসলামী তথা মানবীয় সম্পর্কের প্রেক্ষিতে তার হকও আপনার উপর অপরিহার্য বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছে। তাহল, সামর্থ্য ও সাধ্যানুযায়ী তার সাথে সদ্যবহার করা।

গোলাম-বান্দী ও কর্মচারীর হক : অষ্টম পর্যায়ে বলা হয়েছে وَمَا مَلَكَتْ أَيْدِيهِمْ—এতে অধিকারভুক্ত গোলাম-বান্দীকে বোঝানো হয়েছে।

তাদের ব্যাপারেও এ হক সাব্যস্ত ও অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সাথে সদ্যবহার করতে হবে। সাধ্যানুযায়ী তাদের খাওয়া-পানার ব্যাপারে কার্পণ করবে না। তাছাড়া তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ তাদের দ্বারা করা হবে না।

এখানে আয়াতের বাক্যগুলো যদিও সরাসরিভাবে অধিকারভুক্ত গোলাম-বান্দীকেই বোঝাচ্ছে, কিন্তু কারণ-উপকরণের সামঞ্জস্য এবং রকম করীম (সাঃ)—এর বিভিন্ন বক্তব্যের ভিত্তিতে আলোচ্য নির্দেশ ও বিধি-বিধান দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী ও অন্যান্য কর্মচারীর ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। তাদের হকও একই রকম। নির্ধারিত বেতন-ভাতা, খানাপিনা প্রভৃতির ব্যাপারে বিলম্ব বা কার্পণ করা যাবে না এবং তাদের উপর সাধ্যাতীত কোন কাজও চাপানো যাবে না।

অধিকার প্রদানে তারাই শৈথিল্য প্রদর্শন করে যাদের মন দান্তিকতা বিদ্যমান : আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে—إِنَّ اللَّهَ لَكَنُفٌ قَاتِلٌ—অর্থঃ, আল্লাহ এমন লোককে পছন্দ করেন না, যে দান্তিক এবং নিজেকে অন্যের চাইতে বড় প্রতিপন্ন করে।

আয়াতের এই শেষ বাক্যটি পূর্ববর্তী সমস্ত বক্তব্যের উপসংহার। কারণ, পূর্ববর্তী আটটি পর্যায়ে যে সমস্ত লোকের হক সম্পর্কে তাকীদ করা হয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে সেসব লোকই শৈথিল্য প্রদর্শন করে যাদের মন-মানসিকতায় আত্মগর্ব, অহমিকা, তাকাব্বুর ও দান্তিকতা বিদ্যমান। আল্লাহ সমস্ত মুসলমানকে এর অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখুন।

অতঃপর إِنَّ الَّذِينَ يَبِغُونَ—বাক্যে বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত লোক দান্তিক তারা ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রেও কার্পণ্য অবলম্বন করে। নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করে না এবং অন্যান্য লোককেও নিজের অশোভন কথা এবং কার্যকলাপের মাধ্যমে এহেন মন্দ অভ্যাস অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহিত করে।

আয়াতে যে بخل শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, প্রচলিত অর্থে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে সাধারণতঃ অর্থ-সম্পদ সংক্রান্ত অধিকার বা হক আদায়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে। কিন্তু আয়াতের শানে-মুল পর্য্যালোচনা করতে গেলে বোঝা যায়, এখানে بخل বা কার্পণ্য শব্দটি সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যাতে অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান ও অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্পণ্যই অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতটি মদীনায় বসবাসরত ইহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছিল। এরা ভীষণ দান্তিক ও অসম্ভব রকম কপণ ছিল। অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের বোঝা যেমন কপণতা করত, তেমনি সে সমস্ত জ্ঞানের বিষয়ও গোপন করত, যা তারা নিজেদের এলহামী গ্রন্থের মাধ্যমে অর্জন করেছিল এবং সে সমস্ত জ্ঞানও গোপন করতে মনোবী (সাঃ)—এর আগমন সংক্রান্ত সুসংবাদ ও লক্ষণসমূহের উল্লেখ ছিল। কিন্তু ইহুদীরা এসব বিষয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে নেয়ার পরেও কার্পণ্যের আশ্রয় নিত—না তারা নিজেরা সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করত, আর না অন্যকে সে অনুযায়ী আমল করতে বলত।

পরবর্তীতে বলা হয়েছে, যে সমস্ত লোক আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদের

বেলায়ও কার্পণ্য করে এবং এলেম ও ইমানের ব্যাপারেও কার্পণ্য করে, তারা আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ; তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে অপমানজনক আযাব।

দান-খয়রাতের ফযীলত এবং কার্পণ্যের ক্ষতি সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) প্রকাশ করেছেন -

“প্রতিদিন ভোর বেলায় দু’জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্, সংপথে ব্যয়কারীকে শুভ প্রতিদান দান কর। আর অন্যজন বলেন, হে আল্লাহ্, কৃপণকে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দাও।” - (বোখারী, মুসলিম)

অতঃপর **وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ** বাক্যের দ্বারা দাস্তিকের আরেকটি দোষের কথা বলা হয়েছে। তা হল এই যে, এসব লোক আল্লাহ্র পথে নিজেরাও ব্যয় করে না এবং অন্যকেও ব্যয় না করার অনুপ্রেরণা যোগায়। অবশ্য তারা ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। আর যেহেতু এরা আল্লাহ্ এবং আখেরাতের উপর বিশ্বাস রাখে না, সেহেতু তাদের পক্ষে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের সওয়াবের নিয়তে ব্যয় করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ ধরনের লোক শয়তানের দোসর। অতএব, তাদের পরিণতিও তাই হবে, যা হবে তাদের দোসর শয়তানের পরিণতি।

এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ওয়াজিব হকের ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও কার্পণ্য প্রদর্শন করা যেমন দুঃখীয়, তেমনিভাবে লোক দেখানোর জন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ব্যয় করাও নিতান্ত মন্দ কাজ। যারা একান্তভাবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ব্যয় না করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, তাদের আমল আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হয় না। হাদীসে এমন কাজকে শেরক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। যথাঃ

শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ‘যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ল সে শেরেকী করল। যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে রোযা রাখল সে শেরেকী করল এবং যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে সদকা-খয়রাত করল সে শেরেকী করল।’ - (মুসনাদে-আহমদ)

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে **وَمَا زَادُوا إِلَّا لَبًا** অর্থাৎ, তাদের ক্ষতিটা কি হবে এবং তাদের এমন কি বিপদই বা হবে, যদি তারা আল্লাহ্ ও আখেরাতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে নেয় এবং আল্লাহ্-প্রদত্ত ধন-সম্পদের মধ্য থেকে ব্যয় করে? এগুলো সবই যে একান্ত সহজ কাজ। এগুলো গ্রহণ করা বা বাস্তবায়ন করা কোনই কষ্টের বিষয় নয়, শুধু কেন নাফরমান ও অকৃতজ্ঞ থেকে আখেরাতে ধ্বংসের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিচ্ছে।

অতঃপর বলা হয়েছে **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** অর্থাৎ, আল্লাহ্ আলা কারো সৎকর্মের সওয়াব এবং অন্তত প্রতিদানের বেলায় কিছু-বিসর্গও অন্যায় করেন না। বরং নিজের পক্ষ থেকে এতে অধিকতর বৃদ্ধি করে দেন এবং আখেরাতে এগুলোকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে তার সওয়াব দান করবেন এবং নিজের পক্ষ থেকেও দেবেন মহান দান।

আল্লাহ্ তাআলার নিকট নিম্নতম সওয়াবের পরিমাণ হচ্ছে এই যে, সেখানে একটি সৎ কাজের জন্য দশ-দশটি সওয়াব লেখা হয়, তদুপরি

নানা বাহনায় বৃদ্ধির পরেও বৃদ্ধি হতে থাকে। কোন কোন রেওয়াজে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু সংকাজ এমনও রয়েছে, যেগুলোর সওয়াব বিশ লক্ষ গুণ পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে যায়। তাছাড়া আল্লাহ্ হলেন মহাদাতা। তিনি তাঁর অসীম রহমতে (সৎ কাজের বিনিময়) এমনভাবে বাড়িয়ে দেন, যা কোন হিসাব বা সীমা-পরিসীমায় আসে না। বলা হয়েছে— **وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ** কাজেই আল্লাহ্ তাআলার দরবার থেকে যে কি মহাদান হতে পারে, তার কি কম্পনা করা যেতে পারে?

আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত **دَرَجَاتٍ** শব্দের একটি অর্থ তো সুবিদিত, যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এছাড়া কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, লাল রঙের সর্বাধিক ক্ষুদ্র পিপড়াকে **دَرَجَاتٍ** (যারারাতুন) বলা হয়। আরবরা নিকৃষ্টতা ও গুজনহীনতা বোঝানোর জন্য শব্দটি উদাহরণস্বরূপ বলে থাকে।

كَفَيْتُمْ إِذْ أَجَمْتُمْ বলে আখেরাতের ময়দানের দৃশ্যকে সামনে উপস্থিত করার প্রতি লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে। এতে মক্কাবাসী কাফেরদের ভীতি প্রদর্শনও উদ্দেশ্য বটে।

তাদের কি অবস্থা হবে, যখন হাশরের ময়দানে প্রত্যেক উম্মতের নবীগণকে নিজ নিজ উম্মতের নেক-বদ ও সৎ-অসৎ আমলের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করা হবে এবং যখন আপনিও নিজের উম্মতের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। আর বিশেষ করে সেই কাফের-মুশরিকদের সম্পর্কে খোদায়ী আদালতে সাক্ষ্য দান করবেন যে, তারা প্রকাশ্যে সব মু’জেযা প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও মিথ্যারোপ করেছে এবং আল্লাহ্র তওহীদ ও আমার রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযূর (সাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে লক্ষ্য করে বলেছেন, আমাকে কোরআন শোনাও। হযরত আবদুল্লাহ্ নিবেদন করলেন, আপনি কি আমার কাছ থেকে শুনতে চান, অথচ কোরআন আপনারই উপর অবতীর্ণ হয়েছে। হযূর বললেন, হ্যাঁ পড়। হযরত আবদুল্লাহ্ বলেন, অতঃপর আমি সূরা আন-নিসা পড়তে আরম্ভ করলাম। **كَفَيْتُمْ إِذْ أَجَمْتُمْ** পর্যন্ত পৌছার পর তিনি বললেন, এবার থাম। তারপর যখন আমি তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকলাম, দেখলাম, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

আল্লামা কুস্তলানী (রহঃ) লিখেছেন, এ আয়াত পাঠে, হযূর (সাঃ)-এর সামনে আখেরাতের দৃশ্যাবলী উদ্ভাসিত হয়ে যায় এবং স্বীয় উম্মতের শৈথিল্যপরায়ণ ব্যক্তিদের কথা স্মরণ হয়। আর সে জন্যই তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে।

জ্ঞাতব্য : কোন কোন মনীষী বলেছেন, **هُؤُلَاءِ** -এর দ্বারা রসূল করীম (সাঃ)-এর সময়ে উপস্থিত কাফের-মুনাফেকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আবার অনেকের মতে কেয়ামত পর্যন্ত আগত গোটা উম্মতের প্রতিই এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, কোন কোন রেওয়াজে দ্বারা বোঝা যায় যে, হযূরের উম্মতের যাবতীয় আমল হযূরের সামনে উপস্থাপিত করা হতে থাকে।

যাহোক, এতে বোঝা গেল যে, বিগত উম্মতসমূহের নবী-রসূলগণ

النساء

৪৭

والصنف

يَوْمَئِذٍ يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ لِلَّهِ حَدِيثًا ۚ وَإِنَّمَا إِلَهُ الْإِنسَانِ الْمَوْتُ ۚ وَتَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَجَبًا ۚ يُسَبِّلُ حَتَّىٰ تَقْتَلَوْا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدًا مِنْكُمْ مِنَ الْمَاءِ فَاصْبُوا ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جُزْءٌ مِمَّا قَاتَلْتُمْ بِحَتِّ اللَّهِ ۚ وَكَانَ عَقُوبُهُمْ ۚ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُشْتَرُونَ الصَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ أَن يُضِلُّوا السَّبِيلَ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ تَعْوِيلًا ۚ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۚ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعُ غَيْرَ مَسْمُوعٍ ۚ وَرَاعَيْنَا لِكَلِمَاتِهِمْ ۚ وَطَعْنًا فِي الَّذِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَنُفَرًا لَّكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ ۚ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ

(৪২) সেদিন কামনা করবে সে সমস্ত লোক, যারা কাকের হয়েছিল এবং রসুলের নাকরমানী করেছিল, যেন যমীনের সাথে মিশে যায়। কিন্তু গোপন করতে পারবে না আল্লাহর নিকট কোন বিষয়। (৪৩) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন নামাযের ধারে-কাছেও যেও না, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (নামাযের কাছে যেও না) ফরয গোসলের অবস্থায়ও, যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু, মুসাফীর অবস্থার কথা স্বতন্ত্র। আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্ৰাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও— তাতে মুখমণ্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল। (৪৪) ভূমি কি ওদের দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ গ্রাণ্ড হয়েছে, (অঞ্চ) তারা পথভ্রষ্টতা খরিন করে এবং কামনা করে, যাতে তোমরাও আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাও। (৪৫) অঞ্চ আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে যথার্থই জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহই যথেষ্ট। (৪৬) কোন কোন ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুরিয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি। তারা আরো বলে, শোন, না শোনার মত। মুখ ঝিকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলে, ‘রায়েনা’ (আমাদের রাখাল)। অঞ্চ যদি তারা বলত যে, আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি এবং (যদি বলত,) শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে তাই ছিল তাদের জন্য উত্তম। আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি অতিসম্পাত করেছেন তাদের কুফরীর দরুন। অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তু অতি অশ্লসংস্থ।

নিজ নিজ উশ্মতের সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপিত হবেন এবং স্বয়ং মহানবী (সাঃ) ও স্বীয় উশ্মতের কৃতকর্মের সাক্ষাদান করবেন। কোরআন করীমের এই বর্ণনারীতির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযুর (সাঃ) এর পর আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না, যিনি স্বীয় উশ্মতের উপর সাক্ষাদান করতে পারেন। অন্যথায় কোরআন করীমে তাঁর (অর্থাৎ, সে নবীর এবং তাঁর সাক্ষাদানের) বিষয়ও উল্লেখ থাকত। এ হিসেবে উক্ত আয়াতটি স্বতঃনবুওয়তেরও একটি প্রমাণ।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

يَوْمَئِذٍ يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا আয়াতে ময়দানে-আখেরাতে কাকেরদের

দূরবস্থার বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এরা কেয়ামতের দিন কামনা করবে যে, হয়। আমরা যদি ভূমির সাথে মিশে যেতাম, ভূমি যদি দ্বিধা হয়ে যেত আর আমরা তাতে ঢুকে গিয়ে মাটি হয়ে যেতাম এবং এখনকার জিজ্ঞাসাবাদ ও হিসাব-নিকাশ থেকে যদি অব্যাহতি লাভ করতে পারতাম।

হাশরের ময়দানে কাকেররা যখন দেখবে, সমস্ত জীব-জন্তু একে অপরের কাছ থেকে কৃত অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়ার পর মাটিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, তখন তাদের আক্ষেপ হবে এবং কামনা করবে—হায়। আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। যেমন সূরা ‘নাবা’তে বলা হয়েছে **وَيُنْفُثُ** আয়াতে (আর কাকেররা বলবে, কতই না উত্তম হত যদি আমরা মাটি হয়ে যেতাম।)

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে **وَلَا يَكْتُمُونَ لِلَّهِ حَدِيثًا** অর্থাৎ,

এই কাকেররা নিজেদের বিশ্বাস ও কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহর কাছে কোন কিছুই গোপন রাখতে পারবে না। তাদের হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে, নবী-রসূলগণ সাক্ষ্য দান করবেন এবং আমলনামাসমূহও সবকিছু বিধৃত থাকবে।

হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কোরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে, ‘কাকেররা কোন কিছুই গোপন করতে পারবে না। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তারা কসম খেয়ে খেয়ে বলবে **وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا فِي شَيْءٍ مِّنْهُ** (আল্লাহর কসম আমরা শিরক করিনি।) বাহ্যতঃ এ দু’টি আয়াতের মাঝে যে বৈপরীত্য দেখা যায় তার কারণ কি? তখন হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ)-উত্তরে বললেন, ব্যাপারটি হবে এমন যে, যখন প্রথমে কাকেররা লক্ষ্য করবে শুধুমাত্র মুসলমান হাফা অন্য কেউ জান্নাতে যাচ্ছে না, তখন তারা একথা স্থির করে নেবে যে, আমাদেরকেও নিজেদের শেরক ও অসংকর্মের বিষয় অস্বীকার করা উচিত। হয় তো আমরা এভাবে মুক্তি পেয়েও যেতে পারি। কিন্তু এ অস্বীকৃতির পর স্বয়ং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করবে এবং গোপন করার যে মতলব তারা স্থির করেছিল, তাতে সম্পূর্ণভাবে অকৃতকার্য হয়ে পড়বে এবং তখন সবই স্বীকার করে নেবে। এজন্যই বলা হয়েছে **وَلَا يَكْتُمُونَ لِلَّهِ حَدِيثًا** কোন কিছুই গোপন করতে পারবে না।

শরার হারাম হওয়ার ধারাবাহিক নির্দেশাবলী : আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন ইসলামী শরীয়তকে একটি বৈশিষ্ট্য এই দান করেছেন যে, এর প্রতিটি বিধি-বিধানকে তিনি সরল ও সহজ করেছেন। তারই এক বিশেষ দিক হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন হাঁদের মন-মানসকে একান্ত নিশাপ করে তৈরী করেছিলেন এমন বিশেষ বিশেষ কিছু লোক ছাড়া মদ্যপান ছিল সমগ্র আরববাসীর পুরাতন অভ্যাস। কিন্তু বিশেষ বিশেষ লোকেরা কখনও এ দুই বস্তুর ধারে কাছেও যেতেন না। যেমন, মহানবী (সঃ) নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও কখনও মদ্য স্পর্শ করেননি। এছাড়া বলতে গেলে সমগ্র জাতিই ছিল এ বদভ্যাসে লিপ্ত। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, কোন বস্তু একবার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে মানুষের পক্ষে তা পরিহার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে মদ্যপান কিংবা জ্ঞান্য নেশাজনিত অভ্যাস মানুষকে এমনভাবে কাবু করে বসে যে, তা থেকে বেরিয়ে আসাকে মৃত্যুর শামিল মনে করতে থাকে।

আল্লাহ্ তাআলার নিকট মদ্যপান ও নেশা করা ছিল হারাম। বিশেষতঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলমানদেরকে এর অভিশাপ থেকে রক্ষা ছিল আল্লাহ্ তাআলার অভিপ্রায়। কিন্তু সহসা একে হারাম করে দেয়া হলে, মানুষের পক্ষে এ নির্দেশ পালন করা একান্তই কঠিন হত। কাজেই প্রথমে এর উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোল এবং এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্কীকরণের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিষ্কে একে পরিহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হল। সুতরাং আলোচ্য এ আয়াতে শুধুমাত্র এ হুকুমই দেয়া হয়েছে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের ধারে-কাছেও যেও না। যার মর্ম ছিল এই যে, নামাযের সময়ে নামাযের প্রতি মনোনিবেশ করা ফরয। এ সময় মদ্যপান করা যাবে না। এতে মুসলমানগণ উপলব্ধি করলেন যে, এটা এমন এক মন্দ বস্তু যা মানুষকে নামাযে বাধা দান করে। (কাজেই দেখা গেল) অনেকে তখন থেকেই স্বাধঃ এ নির্দেশ আসার সাথে সাথেই মদ্যপান পরিহার করলেন এবং

অনেকে এর মন্দ দিকগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে আরম্ভ করলেন। শেষ পর্যন্ত সূরা মায়েদার আয়াতে শরাবের অপবিত্রতা ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ অবতীর্ণ হল এবং যে কোন অবস্থায় মদ্যপান সম্পূর্ণভাবে হারাম হয়ে গেল।

মাসআলা : নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায পড়া যেমন হারাম, তেমনি কোন কোন মুফাসসির মনীষী এমনও বলেছেন যে, নিদ্রার এমন প্রবল চাপ হলেও নামায পড়া জায়েয নয়, যাতে মানুষ নিজের মুখের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

তায়্যাম্মুমের হুকুম একটি পুরস্কার--যা এ উম্মাতেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য : আল্লাহ্ তাআলার কতই না অনুগ্রহ যে, তিনি অযু-গোসল প্রভৃতি পবিত্রতার নিমিত্ত এমন এক বস্তুকে পানির স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন, যার প্রাপ্তি পানি অপেক্ষাও সহজ। বলাবাহুল্য, ভূমি ও মাটি সর্বত্রই বিদ্যমান। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এ সহজ ব্যবস্থাটি একমাত্র-উম্মতে মুহাম্মদীকেই দান করা হয়েছে। তায়্যাম্মুম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল ফেকাহর কিতাব ছাড়াও সাধারণ বাংলা-উর্দু পুস্তিকায় বর্ণিত রয়েছে। প্রয়োজনে সেগুলো পাঠ করা যেতে পারে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাকওয়া ও পরহেযগারীর বিষয় আলোচনা করা হয় এবং তাতে অধিকাংশই ছিল পারম্পরিক লেন-দেন সংক্রান্ত। এরই মাঝে প্রসঙ্গক্রমে নামায তার সাথে সম্পৃক্ত কিছু হুকুম-আহকামও বলে দেয়া হয়েছে, যা মানুষের মনে আল্লাহ্র ভয় ও আশ্রয়ের চিন্তা সৃষ্টি করে এবং তাতেকরে পারম্পরিক লেনদেনের সুস্থতা সূচিত হয়। উল্লেখিত আয়াতে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে পালনীয় কর্তব্য ও আচার-আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে ইহুদীদের দুর্কর্মের প্রতিকার এবং বাক্য প্রয়োগের রীতি-নীতি সম্পর্কেও মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

النساء

৯৫

والصحة

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহর বাণী **فَرَزَعْنَا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمَ** (অর্থাৎ, তাদের ঘুরিয়ে দেব পশ্চাদ্ধিক) ঘুরিয়ে দেয়া বা উল্টে দেয়ার মধ্যে দু'টি সম্ভাবনাই থাকতে পারে। মুখমণ্ডলের আকার-অবয়ব মুছে দিয়ে গোটা চেহারাকে পশ্চাদ্ধিক ফিরিয়ে দেয়াও হতে পারে, আবার মুখমণ্ডলকে গর্দানের মত সমান্তরাল করে দেয়াও হতে পারে।

অর্থাৎ, মুখমণ্ডলকে গর্দানের দিকে উল্টে না দিয়ে বরং গর্দানের মত পরিষ্কার ও সমান্তরাল করে দেয়া।— (মাযহারী, রুহুল মা'আনী)

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এমন ধরনের বিকৃতি সাধনের ব্যাপারটি কবে সংঘটিত হবে? কারো কারো মতে এ আঘাত কোয়ামতের প্রাকালে ইহুদীদের উপর অবতীর্ণ হবে। আবার কারো কারো মতে এ আঘাত সংঘটিত হবার নয়। কারণ, তাদের কেউ কেউ ইমান নিয়ে এসেছিল।

হযরত হাকীমুল উম্মত খানভী (রহঃ) বলেন, আমার মতে এ প্রশ্নই আসতে পারে না। কারণ, কোরআনে এমন কোন শব্দের উল্লেখ নেই যাতে বোঝা যায় যে, ইমান যদি না আন তবে অবশ্যই এ আঘাত আসবে, বরং সম্ভাবনার উল্লেখ রয়েছে মাত্র। অর্থাৎ, যদি তাদের অপরাধের প্রতি লক্ষ্য করা যায়, তবে মনে হয় তারা এমনি আঘাতের যোগ্য। যদি আঘাত দেয়া না হয়, তবে সেটা তাঁর একান্ত অনুগ্রহের ব্যাপার।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ শেরকের সংজ্ঞা ও তার কয়েকটি দিক : **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ** আয়াতে আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে যেসব বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে, তেমন কোন বিশ্বাস সৃষ্ট বস্তুর ব্যাপারে পোষণ করাই হল শেরক। এরই কিছু বিশ্লেষণ নিম্নরূপঃ

জ্ঞানের ক্ষেত্রে শরীক সাব্যস্ত করা : অর্থাৎ, (১) কোন বৃহৎ বা পীরের ব্যাপারে এমন বিশ্বাস পোষণ করা যে, আমাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে তিনি সর্বদা অবহিত। (২) কোন জ্যোতিষ-পণ্ডিতের কাছে গায়বের সংবাদ জিজ্ঞেস করা কিংবা (৩) কোন বৃহৎের বাক্যে মঙ্গল দেখে তাকে অনিবার্য মনে করে নেয়া অথবা (৪) কাউকে দূর থেকে ডাকা এক সাথে সাথে এ কথা বিশ্বাস করা যে, সে আমার ডাক শুনে নিয়েছে অথবা (৫) কারো নামে রোযা রাখা।

ক্ষমতার ক্ষেত্রে শরীক করা : অর্থাৎ, কাউকে হিত কিংবা অহিত তথা ক্ষতি-বৃদ্ধি সাধনের অধিকারী মনে করা। কারো কাছে উদ্দেশ্য যাচা করা। কারো কাছে রুখী-রোযাগার বা সন্তান-সন্ততি প্রার্থনা করা।

এবাদতে শরীক সাব্যস্ত করা : কাউকে সেজদা করা, কারো নামে কোন পশু মুক্ত করা, কারো নামে মানত করা, কারো কবর কিংবা বাড়ী-ঘরের তওয়াফ করা, আল্লাহ তাআলার কোন হুকুমের তুলনায় অপর কারো কথা কিংবা কোন প্রথাকে প্রাধান্য দেয়া, কারো সামনে রুকু করার মত অবনত হওয়া, কারো নামে জীবী কোরবানী করা, পার্শ্ব কাজ-কারবার কিংবা বিবর্তনকে নক্ষত্রের প্রভাব বলে বিশ্বাস করা এবং কোন কোন মাসকে অশুভ মনে করা প্রভৃতি।

আত্মপ্রশংসা করা এবং নিজেকে ক্রটিমুক্ত মনে করা বৈধ নয় :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ইহুদীরা নিজেদেরকে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ أَوْثَرًا مِمَّا تَرْتَأُونَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقِطَ وَجُوهًا وَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَمَهُمْ كَالْعَمَاءِ أَصْحَابِ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفُو مَا دُونَ ذَلِكَ لَئِنْ شِئْنَا لَنُغَيِّرَنَّ يَسْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۝
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ رَبُّهُمْ رَبُّهُمُ ذَلِكُمْ يَزْعُمُونَ عَلَىٰ شِئَاءٍ وَلَا ظُلْمُونَ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْظَرْنَاهُمْ تَفَافُتًا عَلَىٰ اللَّهِ الْكِتَابَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُبِينًا ۝
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَأَلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ لَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الْكَاذِبِينَ أَمْ أَسِئَلُهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ تَلْعَنَ اللَّهُ فَهُوَ لَعْنٌ عَدِيدٌ ۝
فَإِذَا لَا يُؤْمِنُونَ النَّاسَ فَقِيرًا ۝
أَلَمْ يَعْسُدُوا النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَاهُمُ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝

(৪৭) হে আসমানী গ্রন্থের অধিকারীবৃন্দ। যাকিছু আমি অবতীর্ণ করেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, যা সে গ্রন্থের সত্যায়ন করে এবং যা তোমাদের নিকট রয়েছে পূর্ব থেকে। (বিশ্বাস স্থাপন কর) এমন হওয়ার আগেই যে, আমি মুছে দেব অনেক চেহারাকে এবং অতঃপর সেগুলোকে ঘুরিয়ে দেব পশ্চাদ্ধিক দিয়ে কিংবা অভিসম্পাত করব তাদের প্রতি যেমন করে অভিসম্পাত করেছি। আচ্ছা হতে-সাব্যতের উপর। আর আল্লাহর নির্দেশ অবশ্যই কার্যকর হবে। (৪৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে লোক তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে লোক অঙ্গীদার সাব্যস্ত করল আল্লাহর সাথে, সে যেন অপবাদ আরোপ করল। (৪৯) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে থাকে, অথচ পবিত্র করেন আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকেই? বস্তুতঃ তাদের উপর সূতা পরিমাণ অন্যায়ও হবে না। (৫০) লক্ষ্য কর, কেমন করে তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অথচ এই প্রকাশ্য পাপই যথেষ্ট। (৫১) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও শয়তানকে এবং কাকেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে। (৫২) এরা হল সে সমস্ত লোক, যাদের উপর লা নত করেছেন আল্লাহ তা আলা স্বয়ং। বস্তুতঃ আল্লাহ যার উপর লা নত করেন, তুমি তার কোন সাহায্যকারী খুঁজে পাবে না। (৫৩) তাদের কাছে কি রাজ্যের কোন অংশ আছে? তাহলে যে এরা কাউকেও একটি তিল পরিমাণও দেবে না। (৫৪) নাকি যাকিছু আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন সে বিষয়ের জন্য মানুষকে হিংসা করে। অবশ্যই আমি ইবরাহীমের বংশধরদেরকে কিতাব ও হেকমত দান করেছিলাম আর তাদেরকে দান করেছিলাম বিশাল রাজ্য।

পূর্ব-পবিত্র বলে বর্ণনা করত। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলেছেন, তাদের দিকে একটু লক্ষ্য করে দেখ, যারা নিজেরাই নিজেদের পবিত্রতা বর্ণনা করে; তাদের ব্যাপারে বিস্মিত হওয়াই চিহ্নিত।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কারো পক্ষে নিজের কিংবা অন্য কারো পবিত্রতা বর্ণনা করা জায়েয নয়। এই নিষিদ্ধতার তিনটি কারণ রয়েছে—

(১) অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মপ্রশংসার কারণ হয়ে থাকে কেবর তথা জ্বহিকা বা আত্মগর্ব। কাজেই মূলতঃ এই নিষিদ্ধতাও কেবরেরই জন্য হয়ে থাকে।

(২) দ্বিতীয়তঃ শেষ পরিণতি সম্পর্কে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই জ্বগত যে, তা পবিত্রতা কিংবা পরহেযগারীর মধ্যেই হবে কিনা। কাজেই নিজে নিজে পবিত্র বলে আখ্যায়িত করা খোদাতীতির পরিপন্থী। এক গ্রন্থায়েতে হযরত সালমা বিনতে যয়নব (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত মুসল করীম (সাঃ) একবার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? তখন যেহেতু আমার নাম ছিল *برّة* (বাররাহ্ অর্থাৎ, পাপমুক্ত), কাজেই জ্বমি তাই বললাম। তাতে হযর (সাঃ) বললেন— *لَا تَكْرُوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ الْبِرِّ مِنْكُمْ* অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা নিজেকে পাপ-মুক্ত বলে বর্ণনা করো না। কারণ, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন, তোমাদের মধ্যে কে পবিত্র। অতঃপর বাররাহ্ নামটি পাল্টিয়ে তিনি যয়নব প্রাধে দিলেন।—(মায়হারী)

(৩) নিষিদ্ধতার তৃতীয় কারণটি হল এই যে, অধিকাংশ সময় এ ধরনের দাবী করতে গিয়ে মানুষের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে যে, সেলোক আল্লাহ তাআলার দরবারে এজন্য প্রিয় যে, সে যাবতীয় লোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত। অথচ কথাটি সর্বের মিথ্যা। কারণ, মানুষের মধ্যে জসখে ক্রটি-বিচ্যুতি বিদ্যমান থাকে।—(বয়ানুল-কোরআন)

মাসআলা : যদি উল্লেখিত কারণগুলো না থাকে, তাহলে নেয়ামতের প্রকাশকল্পে নিজের গুণ বর্ণনা করার অনুমতি রয়েছে।—(বয়ানুল-কোরআন)

‘জিব্বত’ ও ‘তাগুত’-এর মর্ম : উল্লেখিত একান্তম আয়াতে ‘জিব্বত’ ও ‘তাগুত’ শীর্ষক দু’টি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। শব্দ দু’টির মর্ম সম্পর্কে তফসীরকার মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আবিসিনীয় ভাষায় ‘জিব্বত’ বলা হয় জাদুকরকে। আর ‘তাগুত’ বলা হয় গণক বা জ্যোতিষীকে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন যে, ‘জিব্বত’ অর্থ জাদু এবং ‘তাগুত’ অর্থ শয়তান। হযরত মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত যে সমস্ত জিনিসের উপাসনা করা হয়, সে সবই ‘তাগুত’ বলে অভিহিত হয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন যে, মালেক ইবনে আনাস (রাঃ)-এর উক্তিটিই অধিক পছন্দনীয়। তার কারণ, কোরআন থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এরশাদ হয়েছে : *أَبِئْذٍ يَدْعُونَ اللَّهَ وَجُنُودَهُ الظَّالِمِينَ* (আল্লাহর এবাদত কর এবং ‘তাগুত’ থেকে বেঁচে থাক।) কিন্তু উল্লেখিত বিভিন্ন মতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কাজেই এর যে কোনটিই অর্থ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ‘জিব্বত’ প্রতিমাকেই বোঝাত, পরে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য

পূজ্য বস্তুতে এর প্রয়োগ হতে আরম্ভ করে।—(ফুহুল-মা’আনী)

আলোচ্য আয়াতের শানে নুহুল : হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ইহুদীদের সরদার হুইয়াই ইবনে আযতাব ও কা’ব ইবনে আশরাফ ওহুদ যুদ্ধের পর নিজেদের একটি দলকে সঙ্গে নিয়ে কোরাইশদের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশে মক্কায় এসে উপস্থিত হন। ইহুদী সরদার কা’ব ইবনে আশরাফ আবু সুফিয়ানের কাছে এসে হযুরে আকরাম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে তাদের সাথে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেয়। তখন মক্কাবাসীরা কা’ব ইবনে আশরাফকে বলল, তোমরা হলে একটি প্রতারক সম্প্রদায়। সত্য সত্যই যদি তোমরা তোমাদের এই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সত্য হয়ে থাক, তবে আমাদের এ দু’টি মূর্তির (জিব্বত ও তাগুতের) সামনে সোজদা কর।

সূতরাং সে কোরাইশদিকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশে তাই করল। তারপর কা’ব কোরাইশদিকে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন এবং আমাদের মধ্য থেকে ত্রিশ জন লোক এগিয়ে আস, যাতে আমরা সবাই মিলে কা’বার প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে এ ওয়াদা করে নিতে পারি যে, আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

কা’বের এ প্রস্তাব কোরাইশরাও পছন্দ করল এবং সেভাবে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি একাজেট গঠন করল। অতঃপর আবু সুফিয়ান কা’বকে বলল, তোমরা হলে শিকিত লোক; তোমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব রয়েছে, কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ মূর্খ। সূতরাং তুমিই আমাদেরকে বল, প্রকৃতপক্ষে আমরা ন্যায়ের উপর রয়েছি, নাকি মুহাম্মদ (সাঃ) ন্যায়ের উপর রয়েছেন?

তখন কা’ব জিজ্ঞেস করল, তোমাদের দ্বীন কি? আবু সুফিয়ান উত্তরে বলল, আমরা হজ্বের জন্য নিজেদের উট জবাই করি এবং সেগুলোর দুধ খাওয়াই, মেহমানদিকে দাওয়াত করি, নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখি এবং বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘর)-এর ভগ্নাফ করি, ওমরা আদায় করি। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর পৈত্রিক ধর্ম পরিহার করেছেন, নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে পৃথক হয়ে গেছেন এবং সর্বোপরি তিনি আমাদের সনাতন ধর্মের বিরুদ্ধে নিজের এক নতুন ধর্ম উপস্থাপন করেছেন। এসব কথা শোনার পর কা’ব ইবনে আশরাফ বলল, তোমরাই ন্যায়ের উপর রয়েছ। মুহাম্মদ (সাঃ) গোমরাহ হয়ে গেছেন।—(নাউমুবিলাহ)

এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিল করে ওদের মিথ্যা ও প্রতারণার নিন্দা করেন।—(ফুহুল-মা’আনী)

রিপূর কামনা-বাসনা অনেক সময় মানুষকে দ্বীন ও ঈমান থেকে বঞ্চিত করে দেয় : কা’ব ইবনে আশরাফ ছিল বিশিষ্ট ইহুদী পন্ডিত। সে আল্লাহ্ হতে বিশ্রাস পোষণ করত এবং তাঁরই এবাদত-বন্দেগী করত। কিন্তু তার মন-মস্তিষ্কে যখন রৈপিক কামনা-বাসনার পিশাচ চেপে বসল, তখন সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোরাইশদের সাথে একাবদ্ধ হতে প্ররোচিত হয়। কোরাইশরা তার সাথে একাজেট করার জন্য শর্ত আরোপ করল যে, তাদেরকে আমাদের দেব-দেবীর সামনে সোজদা করতে হবে। সে তা মেনে নিল, যা আগেই বলা হয়েছে। সে নিজের ধর্মের বিরুদ্ধে কোরাইশদের শর্ত বাস্তবায়িত করলো বটে, কিন্তু স্বীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে ঠিক রাখার জন্য তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া পছন্দ করলো না। কোরআনে-করীম অন্য

জাহায্য বাল্'আম বাড়ির ব্যাপারেও এমন ধরনের ঘটনা বিবৃত করেছে।
এরশাদ হয়েছে:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتِنَا فَاتَّبِعْنَاهَا وَأَمَّا قَوْلُكَ
الْشَّيْطَانُ كَانَ مِنَ الْمَعِينِينَ

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শুধু কিতাব সম্পর্কিত এলেম বা জ্ঞান থাকারাই কল্যাণ ও মঙ্গলকর হতে পারে না, যে পর্যন্ত না যথার্থভাবে তার অনুসরণ করা হবে এবং যে পর্যন্ত না ইন পার্শ্বি লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করতে পারবে। তা না হলে মানুষ তার ধর্ম হেন শ্রিয় বস্তুকেও স্বীয় রৈপিক কামনা-বাসনার কবীতে পরিণত করা থেকে বাঁচতে পারে না। ইদানীকালেও কেন কোন লোক এমন রয়েছে, যারা জৈবিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বীয় সত্য মতকে অতি সহজে বর্জন করে বসে এবং ধর্ম বিবর্জিত কিশাস ও মতবাদকে ইসলামের ছদ্মাবরণে উপস্থিত করার স্বাসাম্য চেষ্টা করে। না তাদের মনে আল্লাহ্র সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কোন পরোয়া থাকে, আর না থাকে আশ্চর্যের কোন রকম ভয়-ভীতি। বস্তুতঃ এ সমস্ত কিছুই সত্য সঠিক মতবাদকে বর্জন করে শয়তানের ইঙ্গিতে চলার পরিণতি।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, বাল্'আম-বাউরা একজন বিশিষ্ট ইহুদী আলেম ও উচ্চস্তরের দরবেশ ছিল। কিন্তু যখন সে নিজের রৈপিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য মুসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে অন্তত চক্রান্ত করতে আরম্ভ করল, তখন মুসা (আঃ)-এর কোনই ক্ষতি হলো না। কিন্তু সে নিজে গোমরাহ হয়ে চিরতরে প্রত্যাখ্যাত হল।

আল্লাহ্র অতিসম্পাত ইহ ও পরকালীন অপমানের কারণ :
লা'নত বা অতিসম্পাত অর্থ হলো আল্লাহ্র রহমত ও করুণা থেকে দূরে সরে পড়া—চরম অপমান-অপদহতা। যার উপর আল্লাহ্র লা'নত পতিত হয় সে কখনও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে পারে না। তাদের সম্পর্কে অতি কঠিন ভরসার কথা বলা হয়েছে। কোরআনে আছে—

مَنْ يُؤْتِكُمْ إِيمَانًا فَقَدْ آتَاكُمْهُ وَأَقْبَلْتُمْ إِلَيْهِ

অর্থাৎ, “যাদের উপর আল্লাহ্র অতিসম্পাত হয়েছে, তারা যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই নিহত অবস্থা বৃত্ত হবে।” এই তো পেল তাদের পার্শ্বি অপমান। আশ্চর্যের তাদের অপমান এর চেয়েও কঠিন হবে।

আল্লাহ্র লা'নতের অধিকারী কারা : وَمَنْ يُكْفِرْ بِاللَّهِ فَكَانَ
عَيْنًا لَهُ قَاصِدًا আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, যার উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হয়, তার কোন সাহায্যকারী থাকে না। এমন চিন্তা করার বিষয় এই যে, আল্লাহ্র লা'নতের ঘোষ্য কারা ?

এক হাদীসে আছে যে, রসুলে করীম (সঃ) সুদগ্রহীতা এবং সুদ দাতা, সুদ সংক্লেষ দলীল সম্পাদনকারী এবং সুদের লেনদেনের সাক্ষী সবার প্রতিই অতিসম্পাত করেছেন। এদের সবাই পাপের ক্ষেত্রে সমান।—
(মুসলিম)

অন্য এক হাদীসে মহানবী (সঃ) এরশাদ করেছেন, “যে লোক লুত (আঃ)-এর সন্তানদের অনুগ্রহ অপকর্মে নিপুণ হবে সে অভিশপ্ত হবে।” অতঃপর তিনি বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা চোরদের প্রতিও অতিসম্পাত

করেন। যে ডিম কিংবা রশির মত সাধারণ বস্তুও চুরি থেকে বিরত থাকে না, তারও হস্তকর্তন করা হয়।— (মেশকাত)

আরেক হাদীসে বলা হয়েছে ‘সুদগ্রহীতা ও দাতার উপর আল্লাহ্ তাআলার লা'নত এবং সে সমস্ত নারীর উপর যারা নিজের শরীর গোপন, যে অন্যের শরীরও শুদিয়ে দেয়, তেমনভাবে চিত্রকরের উপরও আল্লাহ্র লা'নত।’

অপর এক হাদীসে মহানবী (সঃ) এরশাদ করেছেন, “আল্লাহ্ তাআলা লা'নত করেন মদ্যপায়ীর প্রতি, মদ যে ব্যক্তি পান করায় তার প্রতি, জর বিক্রেতা ও ক্রেতার প্রতি, যে মদের জন্য নির্যাস বের করে তার প্রতি এক যারা মদ্য বহন করে তাদের সবার প্রতি।— (মেশকাত)

এক হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এরশাদ করেছেন,— ছয় প্রকার লোক রয়েছে যাদের প্রতি আমি অতিসম্পাত করেছি এবং আল্লাহ্ তাআলাও লা'নত করেছেন। আর প্রত্যেক নবীই মুত্তাজাবুদাওয়াত হয়ে থাকেন। সে ছয় প্রকার লোক নিম্নরূপ :

(১) আল্লাহ্র কিতাবে যারা কাট-ছাঁট করে, (২) যারা বলপূর্বক ক্ষমতা লাভ করে এবং এমনসব লোককে সম্মানে ভূষিত করে, যাদেরকে আল্লাহ্ অপদহ করছেন আর এমন সব লোককে অপমানিত করে যাদেরকে আল্লাহ্ সম্মান দান করেছেন (৩) যারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীর বা নিয়তিকে অবিশ্বাস করে। (৪) যারা আল্লাহ্ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুরাময়ীকে হালাল মনে করে। (৫) বিশেষতঃ আমার বংশধরগণের মধ্যে সে সমস্ত লোক যারা হারামকে হালাল করে নেয় এবং (৬) যে লোক আমার সন্নতকে বর্জন করে।— (বায়হাকী)

মাসআলা : নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি সম্পর্কে-যদি সে ফাসেকও হয়ে থাকে, যে পর্যন্ত একথা নিশ্চিতভাবে জানা না যায় যে, তার মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হয়েছে, সে পর্যন্ত তার উপর লা'নত করা জায়েয নয়। এই মূলনীতির ভিত্তিতেই আল্লামা শামী এযীদের উপর লা'নত করতে বাস করেছেন। তবে কুফরী অবস্থায় কোন ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত জানা থাকলে তার উপর লা'নত করা জায়েয। যেমন, আবু জাহ্ল, আবু লাহব প্রভৃতি।— (শামী, ২য় খণ্ড, ৮৩৬ পৃঃ)

মাসআলা : কারও নাম না করে এভাবে লা'নত করা জায়েয যে, জালেমদের উপর কিংবা মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত বর্ষিত হোক।

মাসআলা : লা'নতের আভিধানিক অর্থ আল্লাহ্র রহমত হতে দূর হয়ে যাওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ কাফেরদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে, রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর মুমিনদের ক্ষেত্রে হলে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভকারী (সংকমশীলদের) মর্যাদা থেকে নীচে পড়ে যাওয়া। সে জন্যই কোন মূলসমানের জন্য তার নেক আমল কমে যাওয়ার দোয়া করা জায়েয নয়।— (কাহতানী থেকে শামী কতৃক উদ্ধৃত : ২য় খণ্ড, ৮৩৬ পৃঃ)

ইহুদীদের হিসাব ও তার কঠোর নিন্দা : আল্লাহ্ রাক্বুল আলাদী নবী করীম (সঃ)-কে যে জ্ঞানৈশ্বর্য ও শান-শওকত দান করেছিলেন, তা দেখে ইহুদীরা হিসের অনলে জ্বল মরতো। আল্লাহ্ তাআলা আলাচ্য ৫৩ ও ৫৪তম আয়াতে ওদের সে হিসাব-বিদূষের কঠোর নিন্দা করেছেন এক তাদের বিদূষকে একান্ত আযোক্তিক বলে আখ্যায়িত করে তার দুঃ

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ
 سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَمَا
 نَصَّيْتُ جُلُودَهُمْ لِيُحْمَرَّ بِهَا لُحْمُهُمْ جُلُودًا غَيْرَ الْيَدِ وَكُنُوا الْعَذَابَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
 لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلَالٌ لَّا تَحِلُّ
 يَأْمُرُكَ أَنْ تُوَدَّعَ وَالْأَمْرُ إِلَىٰ آلِهِمَا وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ عِزٌّ عَظِيمٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
 الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
 إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اللَّهُ تَعَالَى الَّذِي يَرْغُمُونَ
 أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُتْرِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُتْرِلَ مِنْ قَوْلِكَ يُرِيدُونَ
 أَنْ يَتَّبِعُواكَ إِلَى الْخَاوِثِ وَقَدْ أَمَرُوا أَنْ تَكْفُرُوا
 بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ٥٠

(৫৫) অতঃপর তাদের কেউ তাকে মান্য করেছে আবার কেউ তার কাছ থেকে দূরে সরে রয়েছে। বস্তুতঃ (তাদের জন্য) দোষখের শিক্ষায়িত আশুনই যথেষ্ট। (৫৬) এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নির্দেশসমূহের প্রতি যেসব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আযাব আশ্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, হেকমতের অধিকারী। (৫৭) আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, অবশ্যই আমি প্রতিটি করাব তাদেরকে জান্নাতে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ। তাদেরকে আমি প্রতিটি করব ঘন ছায়ানীড়ে। (৫৮) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। আল্লাহ্ তোমাদিগকে সদুদ্দেশ্য দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী, দর্শনকারী। (৫৯) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রসুলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা বিচারক তাদের। তারপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে পড়, তাহলে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের প্রতি প্রত্যর্পণ কর—যদি তোমরা আল্লাহ্ ও কেয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (৬০) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা সে বিষয়ের উপর ঈমান এনেছি এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।

কারণ বর্ণনা করেছেন। একটি কারণ ব্যস্ত হয়েছে ৫০তম আয়াতে এবং দ্বিতীয় কারণটি ৫৪তম আয়াতে। কিন্তু এ দু'টির মর্ম মূলতঃ একই। তা হল এই যে, আল্লাহ্ বলেছেন যে, তোমাদের এই হিংসা, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ—এর কারণটা কি? যদি এ কারণে হয়ে থাকে যে, তোমরাই প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী অথচ তা তোমাদের হাতে না এসে তিনি পেয়ে গেছেন, তাহলে তোমাদের এ ধারণা যে একান্তই আশ্চর্য তা সুস্পষ্ট। কারণ, এখন তোমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার থেকে বঞ্চিত। কিন্তু তোমরা যদি তা থেকে কোন অংশ প্রাপ্ত হতে, তাহলে তোমরা তো জন্য কাউকে একটি কড়িও দিতে না। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের এ বিদ্বেষ এ কারণে হয়ে থাকে যে, রাজক্ষমতা না হয় আমরা না—ই পেলাম, কিন্তু তাঁর হাতে কেন যাবে? রাষ্ট্রের সাথে তাঁর কি সম্পর্ক! তাহলে তার উত্তর হল এই যে, ইনিও নবীগণেরই বংশধর, যাদের নিকট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পূর্ব থেকেই ছিল। কাজেই রাষ্ট্র কোন অপাত্রে অর্পিত হয়নি। অতএব, তোমাদের ঈর্ষা একান্তভাবেই অযৌক্তিক।

ইর্ষার সংজ্ঞা তার বিধান এবং অপকারিতাসমূহ : মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাতা আল্লামা নবভী (রহঃ) হাসাদ বা ঈর্ষার সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে বলেছেন—

“অন্যের প্রাপ্ত নেয়ামতের অপসারণ কামনা করার নামই হলো হাসাদ বা ঈর্ষা।” আর এটি হারাম।

মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন :

“তোমরা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রেখো না: বরং আল্লাহ্‌র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। আর কোন মুসলমানের পক্ষে অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রতি তিন দিনের বেশী সময় পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েয নয়।”—(মুসলিম, ২য় খণ্ড)

—“তোমরা হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাক। কারণ, হিংসা মানুষের সৎকর্মসমূহকে তেমনিভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন করে আগুন খেয়ে ফেলে কাঠকে।”—(আবু-দাউদ)

আনুবাদিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كَمَا نَصَّيْتُ جُلُودَهُمْ لِيُحْمَرَّ بِهَا لُحْمُهُمْ আয়াতে তফসীর প্রসঙ্গে হযরত

যু'আয (রাঃ) বলেছেন যে, তাদের শরীরের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন সেগুলো পাল্টিয়ে দেয়া হবে এবং এ কাজটি এত দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হবে যে, এক মুহূর্তে শতবার চামড়া পাল্টানো যাবে। আর হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন,

—“আগুন তাদের চামড়াকে একদিনে সত্তর হাজারবার খাবে। যখন তাদের চামড়া খেয়ে ফেলবে, অমনি সেসব লোককে বলা হবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাও। সাথে সাথে সেগুলো পূর্বের মত হয়ে যাবে।—(মাযহারী, ২য় খণ্ড)

আয়াতের শানে-নুহুলঃ আলোচ্য আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতটি নাযিল হওয়ার একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। তাহল এই যে, ইসলাম-পূর্বকালেও কা'বা ঘরের সেবাকে এক বিশেষ মর্যাদার কাজ মনে

করা হত। খানায়-কা'বার কোন বিশেষ খেদমতের জন্য যারা নির্বাচিত হত, তারা গোটা সমাজ তথা জাতির মাঝে সম্মানিত ও বিশিষ্ট বলে পরিগণিত হত। সে জন্যই বায়তুল্লাহর বিশেষ খেদমত বিভিন্ন লোকের মাঝে ভাগ করে দেয়া হত। জাহেলিয়াত আমল থেকেই হজ্বের মওসুমে হাজ্জীদিগকে 'যমযম' কূপের পানি পান করানোর সেবা মহানবী (সাঃ)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাসের (রাঃ) উপর ন্যস্ত ছিল। একে বলা হত 'সেকায়া।' এমনি করে অন্যান্য আরো কিছু কিছু সেবার দায়িত্ব হযুর (সাঃ)-এর অন্য পিতৃব্য আবু তালেবের উপর এবং কা'বা ঘরের চাবি নিজের কাছে রাখা এবং নির্ধারিত সময়ে তা খুলে দেয়া ও বন্ধ করার ভার ছিল ওসমান ইবনে তালহা হযুরের উপর।

এ ব্যাপারে স্বয়ং ওসমান ইবনে তালহা ভাষ্য হল এই যে, জাহেলিয়াত আমলে আমরা সোমবার ও বুহস্পতিবার দিন বায়তুল্লাহর দরজা খুলে দিতাম এবং মানুষ তাতে প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করত। হিজরতের পূর্বে একবার মহানবী (সাঃ) কতিপয় সাহাবীসহ বায়তুল্লাহ হতে প্রবেশের উদ্দেশ্যে তশরীফ নিয়ে গেলে ওসমান (যিনি তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি) তাঁকে ভেতরে প্রবেশে বাধা দিলেন এবং অত্যন্ত বিরক্তি প্রদর্শন করলেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) অত্যন্ত ধৈর্য ও গাভীর সহকারে ওসমানের কটুক্তিসমূহ সহ্য করে নিলেন। অতঃপর বললেন, হে ওসমান! হয়তো তুমি এক সময় বায়তুল্লাহর এই চাবি আমার হাতেই দেখতে পাবে। তখন যাকে ইচ্ছা এই চাবি অর্পণ করার অধিকার আমারই থাকবে। ওসমান ইবনে তালহা বলল, তাই যদি হয়, তবে সেদিন কোরাইশরা অপমানিত অপদস্থ হয়ে পড়বে। হযুর বললেন, না, তা নয়। তখন কোরাইশরা আঘাত হবে, তারা হবে যথার্থ সম্মানে সম্মানিত। এ কথা বলতে বলতে তিনি বায়তুল্লাহর ভেতরে তশরীফ নিয়ে গেলেন। (ওসমান বলেন), তারপর আমি যখন আমার মনের ভেতর অনুসন্ধান করলাম, তখন আমার মনে নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গেল যে, তিনি যাকিছু বললেন, তা অবশ্যই ঘটবে। সে মুহূর্তই আমি মুসলমান হয়ে যাবার সংকল্প নিয়ে নিলাম। কিন্তু আমি আমার সম্প্রদায়ের মতিগতি পরিবর্তিত দেখতে পেলাম। তারা আমাকে কঠোরভাবে ভৎসনা করতে লাগল। কাজেই আমি আর আমার (মুসলমান হওয়ার) সংকল্প বাস্তবায়িত করতে পারলাম না। অতঃপর মক্কা বিজিত হয়ে গেলে পর রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে ডেকে বায়তুল্লাহর চাবি চাইলেন। আমি তা পেশ করে দিলাম।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, ওসমান ইবনে তালহা চাবি নিয়ে বায়তুল্লাহর উপরে উঠে গেলেন এবং হযরত আলী (রাঃ) মহানবীর নির্দেশ পালনকল্পে তার নিকট থেকে বলপূর্বক চাবি ছিনিয়ে নিয়ে হযুরের হাতে অর্পণ করলেন। যাহোক, বায়তুল্লাহ প্রবেশ এবং সেখানে নামায আদায় করার পর মহানবী (সাঃ) যখন বাইরে বেরিয়ে এলেন, তখন পুনরায় আমার হাতেই সে চাবি ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন : এই নাও, এখন থেকে এ চাবি কেয়ামত পর্যন্ত তোমার বংশধরদের হাতেই থাকবে। অন্য যে কেউ তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নিতে চাইবে, সে হবে যালেম, অত্যাচারী। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের হাত থেকে এ চাবি ফিরিয়ে নেবার কোন অধিকার কারোরই থাকবে না। এতদসঙ্গে তিনি এই হেদায়েত করলেন যে, বায়তুল্লাহর এই খেদমত তথা সেবার বিনিময়ে তোমরা যে সম্পদ প্রাপ্ত হবে, তা শরীয়তের রীতি মোতাবেক ব্যবহার

করবে।

ওসমান ইবনে তালহা বলেন, যখন আমি চাবি নিয়ে হাটটিতে চলে আসছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। বললেন, ওসমান, আমি যা বলেছিলাম তাই হল নাকি? তৎক্ষণাৎ আমার সে কথাটি মনে হয়ে গেল, হিজরতের পূর্বে যা তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, “একদিন এ চাবি আমার হাতে দেখতে পাবে।” তখন আমি নিবেদন করলাম, নিঃসন্দেহে আপনার কথা বাস্তবায়িত হয়েছে—আর এক্ষেপে আমিও কল্যাণ পক্ষে মুসলমান হয়ে গেলাম।—(মাহহারী)

হযরত ফারুকে আ'যম ওমর ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সেদিন যখন মহানবী (সাঃ) বায়তুল্লাহ থেকে বেরিয়ে আসেন তখন তাঁর মুখ এ আয়াতটি আবৃত হচ্ছিল।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُوَدِّعَ الْأَمْثَلَ إِلَىٰ أَهْلِهَا

অর্থাৎ, “আল্লাহ তাআলা তোমাদিগকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তার অধিকারীর নিকট অর্পণ করে দাও।” এ হুকুমের লক্ষ্য সাধারণ মুসলমানরাও হতে পারে কিংবা বিশেষভাবে ক্ষমতাসীন শাসকবর্গও হতে পারেন। তবে সবচেয়ে স্পষ্ট বিষয় হল এই যে, এমন সবাই এর লক্ষ্য যারা আমানতের রক্ষক বা আমানতদার। এতে সামান্য জনগণ ও শাসকবর্গ সবাই অন্তর্ভুক্ত।

আমানত পরিশোধের তাকীদ : বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, যার দায়িত্বে কোন আমানত থাকবে, সে আমানত প্রাপককে পৌঁছে দেয়া তার একান্ত কর্তব্য। রসূলে করীম (সাঃ) আমানত প্রত্যর্পণের ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ প্রদান করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এমন কু কম হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) কোন ভাষণ দিয়েছেন অথচ তাতে একথা বলেননি—

“যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার মধ্যে ইমান নেই। “আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার নিয়মানুবর্তিতা নেই, তার ধর্ম নেই।”—(শোআবুল ইমান)

খেয়ানত মুনাক্ফেকীর লক্ষণ : বোখারী ও মুসলিমের হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন মুনাক্ফেকীর লক্ষণসমূহ বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি লক্ষণ ক্রোণ বলেছিলেন যে, যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয় তখন সে তাতে খেয়ানত করে।

আমানতের প্রকারভেদ : এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআন করীম আমানতের বিষয়টিকে امانات বহুবচনে উল্লেখ করেছে। এতে ইকিত প্রদান করা হয়েছে যে, কারো নিকট অপর কারো কোন বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাটাই শুধুমাত্র ‘আমানত’ নয়, যাকে সাধারণতঃ আমানত বলে অভিহিত করা হয় এবং মনে করা হয় : বরং আমানতের আরও কিছু প্রকারভেদ রয়েছে। আয়াতের শানে-মুযল প্রসঙ্গে এখনই যে কঠোর উল্লেখ করা হয়েছে, তাও কোন বস্তুগত আমানত ছিল না। কারণ, বায়তুল্লাহর চাবি বিশেষ কোন বস্তু নয়, বরং তা ছিল বায়তুল্লাহর খেদমতের একটা পদের নির্দশন।

রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাসমূহ আল্লাহ তা'আলার আমানতঃ এতে প্রতীয়মান হয়, রাষ্ট্রীয় যত পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে, সেসবই আল্লাহ তাআলার আমানত। যাদের হাতে নিয়োগ-বরখাস্তের অধিকার রয়েছে

সমস্ত কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ হলেন সে পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে কোন পদ এমন কাউকে অর্পণ করা জায়েয নয়, যে লোক তার যোগ্য নয়, বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করা কর্তব্য।

কোন পদে অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগকর্তা অভিসম্পাতযোগ্যঃ যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ শর্ত মোতাবেক কোন লোক পাওয়া না গেলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যোগ্যতা ও আমানতদারী তথা সততার দিক দিয়ে যে সবচেয়ে অগ্রবর্তী হবে, তাকেই অগ্রাধিকার দিত হবে।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যাকে সাধারণ মুসলমানদের কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তারপর যদি কাউকে তার যোগ্যতা যাচাই ছাড়াই একান্ত বন্ধুত্ব কিংবা সম্পর্কের কারণে কোন পদে নিয়োগ প্রদান করে, তবে তার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত হবে। না তার ফরয (এবাদত) কবুল হবে, না নফল। এমন কি সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে।—(জম'উল-ফাওয়ায়েদ, ৩২৫ পৃঃ)

ন্যায়বিচার বিশ্ব-শান্তির জামিনঃ আয়াতের প্রথম বাক্যটিতে আমানত পরিশোধের এবং দ্বিতীয় বাক্যে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে আমানত পরিশোধ বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এর অবর্তমানে কোথাও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতেই পারে না। কাজেই যাদের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা থাকবে, তাদেরকে প্রথমে গচ্ছিত এই আমানতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। জর্থাৎ, সরকারী পদসমূহে সেসব লোককেই নিয়োগ করতে হবে যাদেরকে সর্বাধিক যোগ্য বলে মনে করবে। কোন প্রকার স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়তার সম্পর্ক কিংবা কোন সুপারিশ অথবা ঘৃষ-উৎকোচ যেন কোনক্রমেই প্রণয় পেতে না পারে। অন্যথায় এর ফলে অযোগ্য, অর্থব, আত্মসাৎকারী ও অত্যাচারী লোক সরকারী পদের অধিকারী হয়ে আসবে। জতঃপর শাসকবর্গ যদি একান্তভাবেও দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কামনা করেন, তবুও তাদের পক্ষে সে লক্ষ্য অর্জন কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হবে না। কারণ, এসব সরকারী কর্মচারীই হলো সমগ্র রাষ্ট্রের হাত-পা। এরই যখন অন্যায্য ও আত্মসাৎকারী হবে, তখন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার আর কি উপায় থাকবে।

এ আয়াতে বিশেষভাবে একটি কথা সূরণযোগ্য যে, এতে মহান পরওয়ারদেগার সরকারী পদসমূহকেও আমানত বলে সাব্যস্ত করে ণ্থমেই একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমানত যেমন শুধুমাত্র তাদেরকে প্রত্যর্পণ করতে হয় যারা তার প্রকৃত মালিক, কোন ফকীর-মিসকীনকে কারো আমানত দয়াপরবশ হয়ে দিয়ে দেয়া কিংবা কোন আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধু-বান্ধবের প্রাপ্য হক আদায় করতে গিয়ে অন্য কারো আমানত তাদেরকে দিয়ে দেয়া জায়েয নয়। তেমনিভাবে সরকারী পদ-যার সাথে সর্বসাধারণের অধিকার জড়িত, তাও আমানতেরই অন্তর্ভুক্ত এবং একমাত্র সে সমস্ত লোকই এসব আমানতের অধিকারী, যারা নিজেদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে এসব পদের জন্য উপযোগী এবং উপস্থিত লোকদের মধ্যে উত্তম। আর বিশুদ্ধতা ও আমানতদারীর দিক দিয়েও যারা অন্যান্যদের তুলনার অগ্রগণ্য। এদের ছাড়া অন্য কাউকে এসব পদ অর্পণ করা হলে আমানতের মর্যাদা রক্ষিত হবে না।

এলাকার ভিত্তিতে সরকারী পদ বন্টনঃ এতদসঙ্গে কোরআনে হাকীম উল্লেখিত বাক্যের দ্বারা সেই সাধারণ ভুলেরও অপনোদন করে দিয়েছে, যা অধিকাংশ দেশের সংবিধানে প্রচলিত রয়েছে যে, সরকারী পদসমূহকে দেশের অধিবাসীবৃন্দের হক বা অধিকার বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

বস্তুতঃ এই মূলনীতিগত ভুলের ভিত্তিতে আইন রচনা করতে হয়েছে যে, সরকারী পদসমূহ জনসংখ্যার ভিত্তিতে বন্টন করা হবে। দেশের প্রত্যেক প্রদেশ বা জেলার জন্য পৃথক পৃথক কোটা নির্ধারিত থাকবে। এক এলাকার কোটায় অপর এলাকার লোক নিয়োগ করা যাবে না, তা প্রার্থী যতই যোগ্য হোক না কেন। পক্ষান্তরে নির্ধারিত এলাকার প্রার্থী যতই অযোগ্য ও অকর্মণ্য হোক না কেন, তাকেই নিয়োগ করতে হবে। কোরআনে হাকীম পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করে দিয়েছে যে, এসব পদ কারোই ব্যক্তিগত বা এলাকাগত অধিকার নয়, বরং এগুলো হলো রাষ্ট্রীয় আমানত, যা শুধুমাত্র এর যোগ্য প্রাপককেই অর্পণ করা যেতে পারে, তা সে যে কোন এলাকারই হোক। অবশ্য কোন বিশেষ এলাকা বা প্রদেশের শাসনকল্পে সে এলাকার মানুষকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে, যাতে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত থাকবে। কিন্তু তাতে শর্ত হলো এই যে, কাজের যোগ্যতা এবং আমানতদারীর ব্যাপারে তার উপর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে।

সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মূলনীতিঃ এভাবে এই সংক্ষিপ্ত আয়াতে সংবিধান সম্পর্কিত কয়েকটি মৌলিক নীতির আলোচনাও এসে গেছে। সেগুলো নিম্নরূপঃ

(১) প্রথমতঃ আয়াতের প্রথম বাক্য **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** -এর দ্বারা আরম্ভ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃত হুকুম ও নির্দেশ দানের মালিক আল্লাহ্‌ তাআলা। পৃথিবীর শাসকবর্গ তাঁর আজ্ঞাবহ। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শাসনক্ষেত্রে সার্বভৌমত্বের মালিকও একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই।

(২) দ্বিতীয়তঃ সরকারী পদসমূহ দেশের অধিবাসীদের অধিকার নয়, যা জনসংখ্যার হারে বন্টন করা যেতে পারে; বরং এগুলো হল আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আমানত, যা শুধুমাত্র সৎপ্রণীতি দায়িত্বের পক্ষে যোগ্য ও যথার্থ লোককেই দেওয়া যেতে পারে।

(৩) তৃতীয়তঃ পৃথিবীতে মানুষের যে শাসন, তা শুধুমাত্র একজন প্রতিনিধি ও আমানতদার হিসেবেই হতে পারে। তারা দেশের আইন প্রণয়নে সে সমস্ত নীতিমালার অনুসরণে বাধ্য থাকবে যা একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে বাতলে দেয়া হয়েছে।

(৪) চতুর্থতঃ তাদের নিকট যখন কোন মোকদ্দমা আসবে, তখন বংশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা এমন কি ধর্ম ও মতবাদের পার্থক্য না করে সঠিক ও ন্যায্যসঙ্গত মীমাংসা করে দেয়া শাসন কর্তৃপক্ষের উপর ফরয।

এ আয়াতে রাষ্ট্রীয় সংবিধানের এসব মূলনীতি বর্ণনার পর এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে যে উপদেশ দিয়েছেন, তা খুবই উত্তম। কারণ, আল্লাহ্‌ তাআলা সবার ফরিয়াদই শোনে এবং যে লোক বলার কিংবা ফরিয়াদ করার সামর্থ্য রাখে না, তিনি তার অবস্থাও উত্তমভাবে দেখেন। অতএব, তাঁর রচিত নীতিমালাই সর্বদা সকল রাষ্ট্রের জন্য সর্বযুগে উপযোগী হতে পারে। পক্ষান্তরে মানবরচিত নীতিমালা ও সংবিধান

শুধুমাত্র নিজেদের পরিবেশেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেগুলোরও পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রথম আয়াতের লক্ষ্য যেমন শাসনকর্তৃপক্ষ ছিল, তেমনি দ্বিতীয় আয়াতে সাধারণ মানুষকে সম্মুখীন করে বলা হয়েছে, হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্, রসূল এবং তোমাদের সচেতন নেতৃবর্গের অনুসরণ কর।

‘উলিল আমর’ কাকে বলা হয়? ‘উলিল-আমর’ আভিধানিক অর্থে সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। সে কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও হাসান বসরী (রাঃ) প্রমুখ মুফাসসেরগণ ওলামা ও ফোকাহা সম্প্রদায়কে ‘উলিল-আমর’ সাব্যস্ত করেছেন। তাঁরাই হচ্ছেন মহানবী (সাঃ)-এর নায়েব বা প্রতিনিধি। তাঁদের হাতেই দ্বীনী ব্যবস্থাপনা দায়িত্ব অর্পিত।

মুফাসসেরীনের অপর এক জমাআত—যাদের মধ্যে হযরত আবু হোয়ায়রা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেয়ামত রয়েছে—বলেছেন যে, ‘উলিল-আমর’-এর অর্থ হচ্ছে সে সমস্ত লোক যাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত।

এছাড়া তফসীরে-ইবনে-কাসীর এবং তফসীরে-মাহহারীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ শব্দটির দ্বারা (ওলামা ও শাসক) উভয় শ্রেণীকেই বোঝায়। কারণ, নির্দেশ দানের বিষয়টি তাঁদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত।

এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে একটি বিশেষ ঘটনা রয়েছে। তা এই যে, বিশ্র নামক এক মুনাক্ফে ছিল। কোন এক ইহুদীর সাথে তার বিবাদ বেধে যায়। ইহুদী লোকটি বলল, চল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে এর মীমাংসা করিয়ে নেই। কিন্তু মুনাক্ফে বিশ্র এ প্রস্তাবে সম্মত হল না। বরং সে কা’ব ইবনে আশরাফ নামক ইহুদীর কাছে গিয়ে মীমাংসা করাবার প্রস্তাব করল। কা’ব ইবনে আশরাফ ছিল ইহুদীদের একজন সর্দার এবং রসূলে করীম (সাঃ) ও মুসলমানদের কঠিন শত্রু। কাজেই বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিষয়টি ছিল একান্তই বিস্ময়কর যে, ইহুদী নিজেদের সর্দারকে বাদ দিয়ে মহানবী (সাঃ)-এর মীমাংসাকে পছন্দ করছিল, অথচ নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয়দানকারী বিশ্র হুযরের স্থলে ইহুদী সর্দারের মীমাংসা গ্রহণ করছিল! কিন্তু এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, তাদের উভয়ের মনেই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, রসূলে করীম (সাঃ) যে মীমাংসা করবেন তা একান্তই ন্যায়সঙ্গত করবেন। আর তাতে কারোই পক্ষপাতিত্বের কোন সন্দেহ-সংশয় ছিল না। কিন্তু যেহেতু বিরোধী বিষয়ে ইহুদী লোকটি ছিল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তার নিজেদের সর্দার অপেক্ষাও বেশী বিশ্বাস ছিল মহানবী (সাঃ)-এর উপর। পক্ষান্তরে মুনাক্ফে বিশ্র ছিল অন্যায়ের উপর। সে জন্য সে জানত যে, মহানবীর মীমাংসা তার বিরুদ্ধেই যাবে, যদিও আমি মুসলমান বলে পরিচিত।

যাহোক, এতদুভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির পর মহানবী (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিজেদের বিষয় তাঁরই মাধ্যমে মীমাংসা করার সিদ্ধান্ত হল। অতঃপর মহানবী (সাঃ) মোকদ্দমার বিষয় অনুসন্ধান করলেন। তাতে ইহুদীর অধিকার প্রমাণিত হয় এবং তিনি তারই পক্ষে ফয়সালা করে দিলেন। আর বাহ্যিকভাবে মুসলমান বিশ্রকে প্রত্যাহ্বান করলেন। এতে

সে এ মীমাংসা মেনে নিতে অসম্মত হল এবং নতুন এক পন্থা উদ্ভাবন করল যে, কোনক্রমে ইহুদীকে রাযী করিয়ে হযরত ওমর ইবনে আব্বাসের নিকট মীমাংসা করতে নিয়ে যাবে। ইহুদীও তাতে সম্মত হয়। এর পেছনে রহস্য ছিল এই যে, বিশ্র মনে করেছিল, যেহেতু হযরত ওমর কাকেরদার ব্যাপারে অত্যন্ত কঠিন, কাজেই তিনি ইহুদীর পক্ষে রায় দেয়ার পরিবর্তে আমারই পক্ষে রায় দেবেন।

তাদের দু’জনই হযরত ওমর ফারকের নিকট হাযির হল। ইহুদী লোকটি ফারকে আযমের নিকট সমগ্র ঘটনা বিবৃত করে জানাল যে, এ মোকদ্দমার ফয়সালা হুযুর (সাঃ)-ও করেছেন, কিন্তু তাতে এ লোকটি সম্মত নয়। ফলে আপনার নিকট এসেছি।

হযরত ওমর বিশ্রকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি তাই? সে বাক্য করল। তখন হযরত ফারকে আযম বললেন, তাহলে একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই আসছি। একথা বলে তিনি ঘরের ভেতর থেকে একটি তলোয়ার নিয়ে এলেন এবং মুনাক্ফে লোকটিকে সাবাড় করে দিলেন। তিনি বললেন, যে লোক রসূলের (সাঃ) ফয়সালা মানতে রাযী নয়, ঐ হল তার মীমাংসা। (ঘটনাটি ছা’লাবী, ইবনে আবী হাতেম ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতক্রমে রূহুল মা’আনীতে বর্ণিত রয়েছে।)

সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরকারগণ এতদসঙ্গে একথাও লিখেছেন যে, এরপর নিহত মুনাক্ফের ওয়ারিসানরা হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে মাকাল দায়ের করেছিল যে, তিনি শরীয়তসিদ্ধ কোন দলীল ছাড়াই একজন মুসলমানকে হত্যা করেছেন। তদুপরি নিহত লোকটিকে মুসলমান বলে প্রমাণ করার জন্য তার কথা ও কার্যগত কুফরীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য এক নিহত ব্যক্তির মুনাক্ফে হওয়ার কথা প্রকাশ করে হযরত ওমরকে মুক্ত করে দিয়েছেন।

طاغوت শব্দের অর্থ ঔদ্ধত্য প্রকাশকারী। আর প্রচলিত অর্থ ‘তাগুত’ বলা হয় শয়তানকে। এ আয়াতে বিরোধী বিষয়টিকে কা’ব ইবনে আশরাফের নিকট নিয়ে যাওয়ায় শয়তানের নিকট নিয়ে যাওয়া সাব্যস্ত করা হয়েছে। তা এ কারণে যে, কা’ব নিজেই ছিল এক শয়তান। কিংবা এ কারণে যে, শরীয়তের ফয়সালা বর্জন করে শরীয়ত বিরোধী মীমাংসার দিকে ধাবিত হওয়া শয়তানেরই শিক্ষা হতে পারে। বস্তুতঃ এ লোক সে শিক্ষার অনুসরণ করেছে সে শয়তানেরই নিকট যেন নিজ মোকদ্দমা নিয়ে গেছে। সেজন্য আয়াতের শেষাংশে হেদায়েত দান করা হয়েছে যে, যে লোক শয়তানের অনুসরণ করবে, শয়তান তার পথপ্রস্তার সুদূর প্রান্তে নিয়ে যাবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক বিবাদে বিসবাদের সময় রসূলে করীম (সাঃ) কৃত মীমাংসাকে অমান্য করা মুসলমানের কাজ হতে পারে না। যে কেউ এমন কাজ করলে সে মুনাক্ফে ছাড়া আর কিছু নয়। আর যখন সে মুনাক্ফের কাকেরদার কার্যভঃ এভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল যে, সে মহানবী (সাঃ) মীমাংসায় সম্মত হয়নি, তখন হযরত ফারকে আযম কর্তৃক তাকে হত্যা করাও বৈধ হয়ে যায়। কারণ, তখন আর সে মুনাক্ফে থাকেনি। প্রকাশ্য মূর্তদ হয়ে যায়। কাজেই বলা হয়েছে—এরা এমন লোক,

তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা সে নির্দেশের প্রতি চলে এসো, যা আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন এবং চলে এসো তাঁর রসুলের দিকে, তখন এসব মুনাফেক আপনার দিকে আসতে অনীহা প্রকাশ করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রসূল করীম (সাঃ)-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা কুফর : এ আয়াতে রসূল করীম (সাঃ)-এর মহত্ব ও সুউচ্চ মর্যাদার বিষয় প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের অসংখ্য আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত মহানবী (সাঃ)-এর আনুগত্যের অপরিহার্যতার বিষয়টি সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কসম খেয়ে বলেছেন যে, কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন কিংবা মুসলমান হতে পারে না যতক্ষণ না সে ধীরস্থির মস্তিষ্কে মহানবী (সাঃ)-কে এভাবে স্বীকার করে নেবে যাতে তাঁর কোন সিদ্ধান্তেই মনে কোন রকম সংকীর্ণতা না থাকে।

মহানবী (সাঃ) রসূল হিসাবে গোটা উম্মতের শাসক এবং যে কোন বিবাদের মীমাংসার যিস্মাদার। তাঁর শাসন ও সিদ্ধান্ত অপর কাউকে বিচারক সাব্যস্ত করার উপর নির্ভরশীল নয়। তার পরেও এ আয়াতে মুসলমানগণকে বিচারক সাব্যস্ত করে নিতে বলা হয়েছে। তার কারণ, সরকারীভাবে সাব্যস্তকৃত বিচারক এবং তার মীমাংসার উপর অনেকেরই সন্তুষ্টি আসে না, যেমনটি আসে নিজের মনোনীত বা সাব্যস্তকৃত সালিস বা বিচারকের উপর। কিন্তু মহানবী (সাঃ) শুধুমাত্র একজন শাসকই নন, বরং তিনি একজন নিষ্পাপ রসূল, রাহমাতুল লিল-আলামীন এবং উম্মতের জন্য একান্ত দয়ালু পিতাও বটে। কাজেই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, যখনই কোন বিষয়ে, কোন সমস্যার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখনই রসূলে মকবুল (সাঃ)-কে বিচারক সাব্যস্ত করে তার মীমাংসা করিয়ে নেয়া এবং অতঃপর তাঁর মীমাংসাকে স্বীকার করে নিয়ে সেমতে কাজ করা উভয় পক্ষের উপর ফরয।

মতবিরোধের ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ)-কে বিচারক সাব্যস্ত করা : কোরআনের তফসীরাকরণ বলেছেন যে, কোরআনের বাণীসমূহের উপর আমল করা মহানবী (সাঃ)-এর যুগের সাথেই সীমিত নয়। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পবিত্র শরীয়তের মীমাংসাই হল তাঁর মীমাংসা। কাজেই এ নির্দেশটি কেয়ামত পর্যন্ত তেমনিভাবে বলবৎ থাকবে, যেমন ছিল তাঁর যুগে। তখন যেমন সরাসরি (কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তকাম্পে) তাঁর কাছে উপস্থিত করা হত, তেমনি তাঁর পরে তাঁর শরীয়তের মীমাংসা নিতে হবে। আর এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁরই অনুসরণ।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল : প্রথমতঃ সে ব্যক্তি আদৌ মুসলমান নয়, যে নিজের যাবতীয় বিবাদ ও মোকদ্দমায় রসূলে করীম (সাঃ)-এর মীমাংসায় সন্তুষ্ট হতে পারে না। সে কারণেই হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) সে লোকটিকে হত্যা করে ফেলেছিলেন, যে মহানবী (সাঃ)-এর মীমাংসায় রাবী হয়নি এবং পুনরায় বিষয়টি ফারুকে আযমের দরবারে নিয়ে গিয়েছিল। এই নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসবর্গ রসূলে করীম (সাঃ)-এর আদালতে হযরত ওমর ফারুকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে যে, তিনি একজন মুসলমানকে অকারণে হত্যা করেছেন। এই মামলা হুম্মের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে **مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ عَمْرَ يَجْتَرِئَ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ** (অর্থাৎ, আমার ধারণা ছিল না যে, ওমর কোন মুমিনকে হত্যার সাহস করতে পারবে।) এতে প্রমাণিত হয় যে, উচ্চতর বিচারকের নিকট যদি কোন অধঃস্তন বিচারকের মীমাংসার ব্যাপারে আপীল করা হয়, তবে

(৬১) আর যখন আপনি তাদেরকে বলবেন, আল্লাহর নির্দেশের দিকে এসো-যা তিনি রসূলের প্রতি নাযিল করেছেন, তখন আপনি মুনাফেকদিগকে দেখবেন, ওরা আপনার কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে যাবে। (৬২) এমনবিশ্বাস যদি তাদের কৃতকর্মের দরুন বিদাদ আরোপিত হয়, তবে তাতে কী হল। অতঃপর তারা আপনার কাছে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে খেয়ে ফিরে আসবে যে, মজল ও সন্দীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। (৬৩) এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের মনের গোপন বিষয় সম্পর্কেও আল্লাহ তা আলা অবগত। অতএব, আপনি গুদরকে উপেক্ষা করুন এবং ওদেরকে সদুপদেশ দিয়ে এমন কোন কথা বলুন যা তাদের জন্য কল্যাণকর। (৬৪) বস্ততঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রসূল ধারণ করেছি, যাতে আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তাঁদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা হয়। আর সেসব লোক যখন নিজেরদের অনিষ্ট সাধন করেছিল, তখন যদি আপনার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রসূলও যদি তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দিতেন, অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত। (৬৫) অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হুটচিটে কবুল করে নেবে। (৬৬) আর যদি আমি তাদের নির্দেশ দিতাম যে, নিজেরদের প্রাণ ধ্বংস করে দাও কিংবা নিজেরদের নগরী ছেড়ে বেরিয়ে যাও, তবে তারা তা করত না; অবশ্য তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন। যদি তারা তাই করে যা তাদের উপদেশ দেয়া হয়, তবে তা অবশ্যই তাদের জন্য উত্তম এবং তাদেরকে নিজের ধর্মের উপর সুদৃঢ় রাখার জন্য তা উত্তম হবে। (৬৭) আর তখন অবশ্যই আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে মহান সওয়াব দেব। (৬৮) আর তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করব।

তাকে স্বীয় অধঃস্তন বিচারকের পক্ষপাতিত্ব করার পরিবর্তে ন্যায্যভিত্তিক মীমাংসা করা কর্তব্য। যেমন, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহানবী (সাঃ) হযরত ওমরের মীমাংসার বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেন। অতঃপর যখন এ আয়াত নাযিল হয়, তখন বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ আয়াতের ভিত্তিতে সে লোক মুমিনই ছিল না।

দ্বিতীয় মাসআলাঃ এ আয়াতের দ্বারা এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, **وَمِنْكُمْ** বাক্যটি শুধু আচার-অনুষ্ঠান কিংবা অধিকারের সাথেই সম্পৃক্ত নয়; আকীদা, মতবাদ এবং অপরাপার বৈষয়িক বিষয়েও ব্যাপক।—(বাহরে মুহীত) অতএব, কোন সময় কোন বিষয়ে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিলে বিবাদ পরিহার করে উভয়পক্ষকে রসুলে করীম (সাঃ) এর নিকট এবং তাঁর অবর্তমানে তৎপ্রবর্তিত শরীয়তের আশ্রয়ে গিয়ে মীমাংসা অবশ্যই করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয।

তৃতীয় মাসআলাঃ এতে একথাও জানা গেল যে, যে কাজ বা বিষয় মহানবী (সাঃ) কর্তৃক কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রমাণিত, তা সম্পাদন করতে গিয়ে মনে কোন রকম সংকীর্ণতা অনুভব করাও ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। উদাহরণতঃ যেক্ষেত্রে শরীয়ত তায়ামুম করে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তায়ামুম করতে কেউ যদি সম্মত না হয়, তবে একে পরহেযগারী বলে মনে করা যাবে না, বরং এটা একান্তই মানসিক ব্যাধি। রসুলে করীম (সাঃ) অপেক্ষা কেউ বেশী পরহেযগার হতে পারে না। যে অবস্থায় মহানবী (সাঃ) বসে নামায পড়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং নিজেও বসে নামায আদায় করেছেন, কারো মন যদি এতে সম্মত না হয় এবং অসহনীয় পরিশ্রম ও কষ্ট সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তবে তার জেনে রাখা উচিত যে, তার মন ব্যাধিগ্রস্ত। অবশ্য সাধারণ প্রয়োজন কিংবা কষ্টের সময় যদি প্রদত্ত অব্যাহতিকে পরিহার করে কষ্টের উপর আমল করে, তবে তা মহানবীর শিক্ষা অনুসারেই বৈধ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই শরীয়ত প্রদত্ত অব্যাহতির প্রতি সংকীর্ণতা অনুভব করা তাকওয়া নয়।

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ বিগত বিশেষণের দ্বারা এ বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রসুলে করীম (সাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য শুধুমাত্র একজন সৎস্কারক এবং নৈতিক পথপ্রদর্শকই ছিলেন না, বরং তিনি একজন ন্যায্যনিষ্ঠ বিচারকও ছিলেন। তদুপরি এমন শাসকও ছিলেন যার সিদ্ধান্তকে ঈমান ও কুফরের মানদণ্ড সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, মুনাফেক বিশ্রের ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হয়। আর এ বিষয়টি বিশ্লেষণের

উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তাআলা স্বীয় পবিত্র গ্রন্থের একাধিক জায়গায় স্বীয় আনুগত্যের সাথে সাথে রসুলে করীম (সাঃ) এর আনুগত্যকেও অপরিহার্য বলে অভিহিত করেছেন।

কা' আব ইবনে আশরাফ ইহুদীকে প্রস্তাব করে এবং পরে বাধ্য হয়ে মহানবী (সাঃ) এর নিকট উপস্থিত হয়। আর হযুর আকরাম (সাঃ) এর মীমাংসা যেহেতু তার বিরুদ্ধে হয়েছিল, সেহেতু সে তাতে আশুস্ত না হয়ে বরং পুনর্বীর মীমাংসা করার জন্য হযরত ওমর (রাঃ) এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হল। এ ঘটনা মদীনায় জানাজানি হয়ে গেলে ইহুদীরা মুসলমানগণকে ঝিকার দিতে লাগল। পূর্ব কারণে আলোচিত বিশুর ইবনে আহবারের ঘটনা মদীনায় জানাজানি হয়ে গেলে ইহুদীরা মুসলমানদেরকে এই বলে ভৎসনা করত যে, তোমরা কেমন মানুষ। যাকে তোমরা রসুল বলে মান্য কর এবং তার অনুসরণ কর বলেও দাবী কর, তাঁর মীমাংসাসমূহকে স্বীকার কর না। ইহুদীদের প্রতি লক্ষ্য কর, তাদের গোনাহের তওবাক্ষেপ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছিল যে, তোমাদের মধ্য থেকে একে অপরকে হত্যা কর, আমরা এহেন কঠিন নির্দেশ পর্যন্ত পালন করেছি। এমন কি এভাবে আমাদের সন্তর ব্যক্তি নিহত হয়। তোমাদেরকে যদি এমন কোন হুকুম দেয়া হত, তবে তোমরা কি করত? আয়াতটিতে তারও উত্তর দেয়া হয়েছে যে, এই অবস্থা মুনাফেকদেরই হতে পারে, পাকা মুসলমানদের নয়। তার প্রমাণ হলো, এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয়, তখন সাহাবায়ে-কেরামের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন) মধ্য থেকে একজন বললেন, আল্লাহ আমাদিগকে এহেন (কঠিন) পরীক্ষার সম্মুখীন করেননি। সাহাবীর এ বাক্যটি রসুলে করীম (সাঃ) এর নিকট পৌঁছেল তিনি বললেন, “আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যাদের অন্তরে পাহাড়ের মত সুদৃঢ় মজবুত ঈমান রয়েছে।” ইবনে ওহাব বলেন যে, এ বাক্য হল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর।

অপর এক রেওয়াজেতে আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এ আয়াত শুনে বলেছিলেন যে, আল্লাহর কসম, এ হুকুম নাযিল হলে আমি নিজেই এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে এর জন্য কোরবান করে দিতাম। অবশ্য সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দেশত্যাগের নির্দেশ আমল করে দেখিয়েও দিয়েছেন। তাঁরা স্বীয় জন্মভূমি মক্কা, নিজেদের সমস্ত সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করে মদীনা অভিমুখে হিজরত করেছিলেন।

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا ۚ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حِذْرَكُمْ فَاتْرُوا بُيُوتَكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ أَجْمَعًا ۚ وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّمَا أَكُنْ مَعَهُمْ شُهِيدًا ۚ وَلَكِنْ أَصَابَكُمْ قَضَلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلْبِسْنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُورَ قُوًّا عَظِيمًا ۚ فَلْيَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْىٰ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَعِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ أَهْلُهَا ۖ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيرًا ۚ

(৬৯) আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহ্ নেয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সংকমশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। (৭০) এটা হল আল্লাহ্-প্রদত্ত মহত্ত্ব। আর আল্লাহ্ মহত্ত্ব পরিজ্ঞাত। (৭১) হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অশ্রু তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়। (৭২) আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ্ আমাদের প্রতি ক্ষমতা করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি। (৭৩) পক্ষান্তরে তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ আসলে তারা এমনভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কোন মিত্রতাই ছিল না। (কোবে) হায়, আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমিও যে সফলতা লাভ করতাম। (৭৪) কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্শ্ববর্তী নবীকে আশ্রয়ভাঙের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জেহাদ করা ই কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণ্য দান করব। (৭৫) আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষলয়নকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ কর দাও।

জান্নাতের পদমর্যাদাসমূহ আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে : যে সমস্ত লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশিত বিষয়ের উপর আমল করবেন এবং আল্লাহ ও রসূলের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকবেন, তাঁদের পদমর্যাদা তাঁদেরই আমল তথা কৃতকর্ম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা নবী-রসূলগণের সাথে জান্নাতের উচ্চতর স্থানে জায়গা দেবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে নবীগণের পরবর্তী মর্যাদার লোকদের সাথে স্থান দেবেন। তাঁদেরকেই বলা হয় ছিদ্দীকীন। অর্থাৎ, তাঁরা হলেন সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবায়ে কেরাম, যারা কোন রকম দ্বিধা-সংকোচ ও বিরোধিতা না করে প্রাথমিক পর্যায়েই ঈমান এনেছেন। যেমন, হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রমুখ। অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা থাকবেন শহীদগণের সাথে। শহীদ সে সমস্ত লোককে বলা হয়, যারা আল্লাহর রাহে নিজেদের জান-মাল কোরবান করে দিয়েছেন। আর চতুর্থ শ্রেণীর লোকগণ থাকবেন সালেহীনদের সাথে। বস্তুতঃ সালেহীন হলেন সেসব লোক, যারা জাহের ও বাতেন, প্রকাশ্য ও গোপন সব ক্ষেত্রেই সংকর্মসমূহের যথাযথ অনুবর্তী।

সারকথা, আল্লাহ তাআলার আনুগত্যশীল বান্দাগণ সে সমস্ত মহান ব্যক্তিদের সাথে থাকবেন, যারা আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক সন্মানিত ও মকবুল।

জান্নাতে দেখা সাক্ষাতের কয়েকটি দিক : (১) নিজ নিজ অবস্থানে থেকেই একে অন্যকে দেখবেন। যেমন, মুয়াত্তা ইমাম মালেক গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন : জান্নাতবাসীরা নিজেদের জানালা দিয়ে উপরের শ্রেণীর লোকদেরকে তেমনভাবে দেখতে পাবে, যেমন পৃথিবীতে তোমরা তাদেরকে দেখ।

(২) উপরের শ্রেণীর লোকেরা নীচের শ্রেণীতে নেমে এসেও সাক্ষাৎ করবেন। যেমন, হযরত ইবনে জরীর (রহঃ) হযরত রবী' (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন যে, উপরের শ্রেণীর লোকেরা নীচের শ্রেণীতে নেমে আসবেন এবং তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও উঠা-বসা হবে।

তাছাড়া নীচের শ্রেণীর অধিবাসীদের জন্য উপরের শ্রেণীতে যাওয়ার অনুমতি লাভও হতে পারে। আলোচ্য আয়াতের প্রেক্ষিতে রসূলে করীম (সাঃ) বহু লোককে জান্নাতে নিজের সাথে অবস্থানের সুসংবাদ দিয়েছেন।

প্রেম নৈকট্যের শর্ত : হযুর আকরাম (সাঃ)-এর সান্নিধ্য ও নৈকট্য তাঁর সাথে প্রেম ও মহব্বতের মাধ্যমেই লাভ হবে। সহীহ বোখারীতে হাদীসে মুতাওয়াতেরায় সাহাবায়ে কেরামের এক বিপুল জামাআত কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে : রসূলে করীম (সাঃ)-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হল যে, “সে লোকটির মর্যাদা কেমন হবে, যে লোক কোন জামাত বা দলের সাথে ভালবাসা পোষণ করে, কিন্তু আমলের বেলায় এদলের নির্ধারিত মান পর্যন্ত পৌছতে পারেনি?” হযুর (সাঃ) বললেন, *المرء مع من أحب* অর্থাৎ, হাশরের মাঠে প্রতিটি লোকই যার সাথে তার ভালবাসা, তার সাথে থাকবে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, পৃথিবীতে কোন কিছুতেই আমি এতটা আনন্দিত হইনি যতটা এ হাদীসের কারণে আনন্দিত হয়েছি। কারণ, এ হাদীসে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে যাদের

গভীর ভালবাসা রয়েছে তাঁরা হাশরের মাঠেও হৃদয়ের সাথেই থাকবেন।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর সামিখা লাভ কোন বর্ণ-গোত্রের উপর নির্ভরশীল নয় : তিব্রানী (রাঃ) জামে কবীর গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর এ রেওয়াজেটি উদ্ধৃত করেছেন যে, জৈনক হাবশী ব্যক্তি মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে এসে নিবেদন করলেন,— “ইয়া রসূলান্নাহ্! আপনি আমাদের চাইতে আকার-আকৃতি, রং উভয় দিক দিয়েই সুন্দর ও অনন্য এবং নবুওয়তের দিক দিয়েও। এখন যদি আমি এ ব্যাপারেও ঈমান নিয়ে আসি, যাতে আপনার ঈমান রয়েছে এবং সেরূপ আমলও করি, যা আপনি করে থাকেন, তাহলে কি আমিও জান্নাতের মাঝে আপনার সাথে থাকতে পারব?”।

মহানবী (সাঃ) বললেন, “হাঁ, অবশ্যই। তুমি তোমার হাবশীসুলভ কদাকৃতির জন্য চিন্তিত হয়ো না। সে সত্তার কসম, হাঁর মুঠায় আমার প্রাণ, জান্নাতের মাঝে কাল রংয়ের হাবশীও সাদা ও সুন্দর হয়ে যাবে এবং এক হাজার বছরের দূরত্বে থেকেও চমকতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ (কেলমায়) বিশাসী হবে, তার মুক্তি ও কল্যাণ আল্লাহর দায়িত্বে এসে যায়। আর যে লোক ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি’ পড়ে, তার আমলনামায় একলক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হয়”।

সিদ্দীক-এর সংজ্ঞা : দ্বিতীয় স্তর হল সিদ্দীকীনের। আর সিদ্দীক হলেন সে সমস্ত লোক যারা মা’রেফত বা আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে নবীগণের কাছাকাছি। এর উদাহরণ এই যে, কোন লোক যেন কোন বস্তুকে দূর থেকে অবলোকন করছে। হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট কোন এক লোক জিজ্ঞেস করলেন যে, “আপনি কি আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন?” তিনি বলেছিলেন, “আমি এমন কোন কিছুই এবাদত করতে পারি না, যা আমি দেখিনি।” অতঃপর আরো বললেন,— “আল্লাহকে মানুষ স্বচক্ষে দেখেনি সত্য, কিন্তু মানুষের অন্তর ঈমানের আলোকে তাঁকে উপলব্ধি করে নেয়।” এখানে ‘দেখা’ বলতে হযরত আলী (রাঃ)-এর উদ্দেশ্য হল স্বীয় জ্ঞানের গভীরতা সূক্ষ্মতার মাধ্যমে দেখার মতই উপলব্ধি করে নেয়া।

শহীদদের সংজ্ঞা : তৃতীয় স্তর হল শহীদগণের। আর শহীদ হলেন সে সমস্ত লোক, যারা বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হন; তাঁরা তা প্রত্যক্ষ করেন না। তাঁদের উদাহরণ হল এমন, যেন কোন লোক কোন বস্তুকে আয়নার কাছে থেকে অবলোকন করছে। যেমন, হযরত হারেসা (রাঃ) বলেছেন, “আমার মনে হয় আমি যেন আমার মহান পরওয়ারদেগারের আরশ প্রত্যক্ষ করছি।”

তাছাড়া تراه الله كأنك تراه হাদীসটিতেও এমন ধরনের দেখার কথা বলা হয়েছে।

সালেহীদের সংজ্ঞা : চতুর্থ স্তর হল সালেহীদের। যারা নিজেদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্যকে অনুসরণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিশ্চিত জেনে নেন। তাদের উদাহরণ হলো, কোন বস্তুকে দূরে থেকে আয়নার মধ্যে দেখা। আর হাদীসে يراه فإنه يراك যে বলা হয়েছে, তাতেও দেখা বা প্রত্যক্ষ করার এই স্তরের কথাই বোঝানো হয়েছে। ইমাম রাগেব ইম্পাহানীর এই পর্যালোচনার সার-নির্ধারিত হচ্ছে, এগুলোই হল ‘মা’ রেফতে-রব’ বা আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভের স্তর। বস্তুতঃ এই মা’রেফতের স্তরের পার্থক্যহেতু মর্যাদা বিভিন্ন। যাহোক, আয়াতের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। এতে মুসলমানদিগকে এই সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্যশীল অনুসারীগণ তাঁদেরই

সাথে থাকবে যারা অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। যে পরওয়ারদেগার। তুমি আমাদের সবাইকে তোমার এমনি ভালবাসা লাভের তওফীক দান কর। আমীন।

কতিপয় অতি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য : **أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** আয়াতের প্রথমংশে জেহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের এবং অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে জেহাদে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে একটি বিষয় বোঝা যাচ্ছে এই যে, কোন ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। এ বিষয়টি আরও কয়েক জায়গায় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বোঝা যাচ্ছে, এখানে অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হলও এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেয়া হয়নি যে, এ অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিরাপদ হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করাটা মূলতঃ মানসিক স্বস্তিলাভের জন্যই হয়ে থাকে। বাস্তবে এগুলো লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এরশাদ হয়েছে—

لَنْ يَنْفِيَنَّكَ اللَّهُ إِلَىٰ شَيْءٍ لَّا يَكُفِّيَنَّكَ

অর্থাৎ, “হে নবী! আপনি বলে দিন, আমাদের উপর এমন কোন বিপদাপদই আসে না, যা আল্লাহ আমাদের তকদীর বা নিয়তিতে নির্ধারিত করে দেননি।”

১। এ আয়াতে প্রথমে জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ অতঃপর জেহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সুশৃঙ্খল নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দু’টি বাক্য **فَأَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ وَالْبُرِّ** ব্যবহার করা হয়েছে। **فَأَنْفِرُوا** শব্দটি **فَاتَّيَبُوا** এর বহুবচন। এর অর্থ ক্ষুদ্র দল। অর্থাৎ, তোমরা যখন জেহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে, তখন একা একা বেরোবে না, বরং ছোট ছোট দলে বেরোবে কিংবা (সংশ্লিষ্ট) বড় সৈন্যদল নিয়ে বেরোবে। তার কারণ, একা একা যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। শত্রুরা এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেই শৈথিল্য করে না।

উৎপীড়িতের সাহায্য করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বরব্দ : মক্কা নগরীতে এমন কিছু দুর্বল মুসলমান রয়ে গিয়েছিলেন, যারা দৈহিক দুর্বলতা এবং আর্থিক দৈন্যের কারণে হিজরত করতে পারছিলেন না। পরে কাকেররাও তাদেরকে হিজরত করতে বাধ্যদান করছিল এবং বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে আরম্ভ করেছিল, যাতে তারা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এদের কারো কারো নামও তফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস ও তাঁর মাতা, সালামা ইবনে হেশাম, ওলীদ ইবনে ওলীদ, আবু জানদাল ইবনে সাহল প্রমুখ—(কুরতুবী) এসব সাহাবী নিজেদের ঈমানী বলিষ্ঠতার দরুন কাকেরদের অসহনীয়-উৎপীড়ন সত্ত্বেও ঈমানের উপর স্থির থাকেন। অবশ্য তাঁরা এসব অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বরাবরই আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের দরবারে মোনাজাত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাঁদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেন এবং মুসলমানদিগকে নির্দেশ দেন, যাতে তাঁরা জেহাদে মাধ্যমে সেই নিপীড়িতদেরকে কাকেরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন।

এ আয়াতে বোঝা যায়, মুমিনরা আল্লাহ তাআলার দরবারে দু’টি বিষয়ের দোয়া করেছিলেন। একটি হলো এই যে, আমাদিগকে এই (মক্কা)

الَّذِينَ آمَنُوا يَتْلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
يَتْلُونَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ فَتَاتُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ
إِنْ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ
لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَكَلَّا كُتِبَ
عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذْ أَوْرِثُوا مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ
اللَّهِ أَوْ شَكَّ عَشْيَهُمْ وَقَالُوا إِنَّا لَمَكُتِبُ عَلَيْنَا الْقِتَالُ ۝ أَوَلَمْ
نَحْزَنْهُمْ إِلَى الْجَلِّ قَرِيبٍ ۝ قُلْ مَتَاءُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ
خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تَطْلُبُونَهَا فَعْنَاءَ ۝ آيُنَ مَا تَكُونُوا
يُذِرْكُمْ الْمَوْتَ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ
حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ
يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۝ فَمَالِ
هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكُونُونَ لِقَاءَهُمْ حَدِيثًا ۝ مَا أَصَابَكَ مِنْ
حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَسْلَمْنَاكَ
لِلنَّاسِ رَسُولًا ۝ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ
فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝

(৭৬) যারা ঈমানদার তারা যে জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালয়নকারীদের বিরুদ্ধে— (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। (৭৭) তুমি কি সেন্সব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। (হে রসূল), তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সূতা পরিমাপও খর্ব করা হবে না। (৭৮) তোমরা যেখানেই থাক না কেন; যত্ন কিম্বা তোমাদেরকে পাকড়াও করাই— যদি তোমরা সুদূর দূর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও। বস্তুতঃ তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও, এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। পক্ষান্তরে তাদের পরিণতি কি হবে, যারা কখনও কোন কথা বুঝতে চেষ্টা করে না। (৭৯) আপনার যে কল্যাণ হয়, তা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর আপনার যে অকল্যাণ হয়, সেটা হয় আপনার নিজের কারণে। আর আমি আপনাকে পাঠিয়েছি মানুষের প্রতি আমার পয়গামের বাহক হিসাবে। আর আল্লাহ সব বিষয়েই যথেষ্ট— সব বিষয়েই তাঁর সমুদ্রে উপস্থিত। (৮০) যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষাব্যবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।

নগরী থেকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা কর এবং দ্বিতীয়টি হলো যে, আমাদের জন্য কোন সহায় বা সাহায্যকারী পাঠাও। আল্লাহ তাঁদের দু'টি প্রার্থনাই কবুল করে নিয়েছিলেন। তা এভাবে যে, কিছু লোককে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যাতে তাদের প্রথম প্রার্থনাটি পূরণ হয়েছিল। অবশ্য কোন কোন লোক সেখানেই রয়ে যান এবং বিজয়ের পর রসূল মকবুল (সাঃ) ইতাব ইবনে উসায়দ (রাঃ)—কে সেসব লোকের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি এসব উৎপাদিতদেরকে অত্যাচারীদের উৎপাদন-অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন। আর এভাবেই পূর্ণ হয় তাদের দ্বিতীয় প্রার্থনাটি।

এ আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় জেহাদ করার নির্দেশ দানের পরিবর্তে وَمَا لَكُمْ لَا تُجَاهِدُونَ বাক্য ব্যবহার করার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন পরিস্থিতিতে জেহাদ করাটাই স্বাভাবিক দায়িত্ব, যা না করা কোন ভালো মানুষের পক্ষে একান্তই অসম্ভব।

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা সর্ববিপদের অমোঘ প্রতিকার :

يُفْعَلُونَ رَبِّ انْجُزِنَا আয়াতে বলা হয়েছে যে, জেহাদের নির্দেশ দানের পেছনে একটি কারণ ছিল সে সমস্ত অসহায় দুর্বল নারী-পুরুষের প্রার্থনা। মুসলমানগণকে জেহাদ করার নির্দেশ দানের মাধ্যমে সে প্রার্থনা মঞ্জুরী কথাই ঘোষণা হয়েছে। আর তাতে যথাশীঘ্র তাদের বিপাদাপদ শেষ হয়ে যায়।

আনুষ্ঠানিক জাতব্য বিষয় :

الَّذِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা মুমিন বা ঈমানদার তারা জেহাদ করে আল্লাহর পথে। আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পথে। এতে পরিষ্কারভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্যতঃ মুমিনদের যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্রের লক্ষ্য। কারণ, আল্লাহই সমগ্র সৃষ্টির মালিক এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান নির্ভেজাল ও ন্যায্যভিত্তিক। তাছাড়া ন্যায় ও কল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেই যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

বিশ্বশান্তির জন্যও সমগ্র বিশ্বে এমন সংবিধানের প্রচলন অপরিহার্য, যাকে আল্লাহর কানুন বা সংবিধান বলা হয়। সুতরাং পরিপূর্ণ কোন মুমিন ব্যক্তি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার সামনেই এ উদ্দেশ্য বিদ্যমান থাকে।

কিন্তু এর বিপরীতে যারা কাফের তাদের বাসনা থাকে কুফরের প্রচলন, কুফরের বিজয় এবং পৈশাচিক শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যাতে করে বিশৃঙ্খল কুফরী ও শেরকী বিস্তার লাভ করতে পারে। আর কুফরী ও শেরকী যেহেতু শয়তানের পথ, সুতরাং কাফেররা শয়তানের কাছের সাহায্য করে থাকে।

إِنْ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا শয়তানের চক্রান্তের দুর্বলতা :

আয়াতে বলা হয়েছে যে, শয়তানের চক্রান্ত ও কলকৌশল হয় দুর্বল। ফলে তা মুমিনের সামান্যতমও ক্ষতি করতে পারে না। অতঃপর, মুসলমানগণকে শয়তানের বদ্ধবর্গ অর্থাৎ, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোন রকম দ্বিধা করা উচিত নয়। তার কারণ, তাদের সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং। পক্ষান্তরে শয়তানের কলকৌশল কাফেরদের কিছুই মঙ্গল সাধন করবে না।

এ আয়াতে শয়তানের কলাকৌশলকে যে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেজন্য আয়াতের মাধ্যমেই দু'টি শর্তের বিষয়ও প্রতীয়মান হয়। (এক) যে লোকের বিরুদ্ধে শয়তান কলাকৌশল অবলম্বন করবে, তাকে মুসলমান হতে হবে এবং (দুই) সে যে কাজে নিয়োজিত থাকবে, তা একান্তভাবেই আল্লাহর জন্য হতে হবে; কোন পার্থিব বস্তুর আকাঙ্ক্ষা কিংবা আত্মস্বার্থ প্রণোদিত হবে না। প্রথম শর্ত **أَلَّا يَكُونُ لَكُمْ مَعَهُ** বাক্যের দ্বারা এবং দ্বিতীয় শর্ত **لِيُطَاعَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** বাক্যের দ্বারা বোঝা যায়। এ দু'টি শর্তের যে কোন একটির অবর্তমানে শয়তানের কলাকৌশল দুর্বল হয়ে পড়া অবশ্যস্বাভাবিক নয়।

জেহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলমানগণ কর্তৃক তা মূলতবীর আকঙ্কার কারণ : জেহাদের হুকুম অবতীর্ণ হবার পর মুসলমানদের পক্ষ থেকে তা স্থগিত থাকার বাসনা কোন আপত্তির কারণে ছিল না, বরং এটা ছিল একটি আনন্দমিশ্রিত অভিযোগ। তার কারণ, স্বভাবতঃ মানুষ যখন ব্যক্তিগতভাবে একা একা কোন চরম অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তখন তার উদ্বেজনা হঠাৎ উথলে উঠে এবং তখন কোন বিষয়ের প্রতিশোধ নেয়া তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। কিন্তু আরাম-আয়েশের সময়ে তাদের মন-মানস কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে উদ্বুদ্ধ হতে চায় না। এটা হল মানুষের একটা সহজাত বৃত্তি। সুতরাং এসব মুসলমান যখন মক্কা অবস্থান করছিলেন, তখন কাফেরদের অত্যাচার-উৎপীড়নে অসহ্য হয়ে তারা জেহাদের নির্দেশ কামনা করতেন। কিন্তু মদীনায় হিজরত করে চলে আসার পর যখন তারা শান্তি ও আরাম-আয়েশ লাভে সমর্থ হন, আর এমনই অবস্থায় যখন জেহাদের হুকুম অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের পুরাতন সে প্রতিশোধ স্পৃহা অনেকটা প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মন-মস্তিষ্কে সেই উদ্ভাবনা ও উদ্বেজনা বিদ্যমান ছিল না। সেজন্য তারা শুধু বাসনা করল যে, এক্ষণেই যদি জেহাদের নির্দেশটি না আসত, তবেই ভাল হত। এই বাসনাকে আপত্তি হিসাবে দাঁড় করিয়ে সে সমস্ত মুসলমানকে পাগী সাব্যস্ত করা আদৌ সমীচীন নয়। মুসলমানগণ যদি উল্লেখিত অভিযোগটি মুখেই প্রকাশ করে থাকেন, তবে উল্লেখিত বক্তব্যটি প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু যদি অভিযোগটি মুখে প্রকাশ না করে থাকেন এবং তা শুধু মনে মনেই কল্পনাস্বরূপ এসে থাকে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা অপরাধ বা পাপ বলে গণ্যই হয় না। এক্ষেত্রে উভয় অবস্থারই সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া আয়াতে উল্লেখিত **فَالرَّ** শব্দের দ্বারা এমন কোন সন্দেহ করা উচিত হবে না যে, তাঁরা মনের কল্পনাকে মুখেও প্রকাশ করেছিলেন। কারণ, এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, তাঁরা হয়ত মনে মনেই বলে থাকবেন।—(বয়ানুল-কোরআন) কোন কোন তফসীরকারের মতে এ আয়াতের সম্পর্ক মুসলমানদের সাথে নয়, বরং মুনাফেকদের সাথে। সেক্ষেত্রে কোন প্রশ্নই থাকে না।— (তফসীরে - কবীর)

রাষ্ট্রশক্তি অপেক্ষা আত্মশক্তি অগ্রবর্তী : **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا** **الزَّكَاةَ** আয়াতে আল্লাহ রাবুল্ আলামীন প্রথমে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন, যা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রশক্তির উপকরণ। অর্থাৎ, এতে অত্যাচার-উৎপীড়নের প্রশমন করা যায়। এতেই প্রতিষ্ঠিত হয় সমগ্র দেশময় শান্তি ও শৃংখলা। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষকে অপরের সংশোধন করার পূর্বে নিজের সংশোধন করা কর্তব্য। বস্তুতঃ মর্যাদার দিক দিয়েও প্রথম পর্যায়ের হুকুমটি হল ফরযে- আইন, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের হুকুম হচ্ছে ফরযে-কেফায়াহ্। এতে আত্মশক্তির গুরুত্ব ও অগ্রবর্তিতাই

প্রতীয়মান হয়।— (মায়হারী)

দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামতের পার্থক্য : আয়াতে দুনিয়ার নেয়ামতের তুলনায় আখেরাতের নেয়ামতসমূহকে উত্তম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। তা হল এই—

- (১) দুনিয়ার নেয়ামত অল্প এবং আখেরাতের নেয়ামত অধিক।
 - (২) দুনিয়ার নেয়ামত অনিত্য এবং আখেরাতের নেয়ামত নিত্য-অফুরন্ত।
 - (৩) দুনিয়ার নেয়ামতসমূহের সাথে নানা রকম অস্থিরতাও রয়েছে, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত এ সমস্ত জঞ্জালমুক্ত।
 - (৪) দুনিয়ার নেয়ামত লাভ অনিশ্চিত, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত প্রত্যেক মুস্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তির জন্য একান্ত নিশ্চিত।— (তফসীরে-কবীর)
- পাকা ও সুদৃঢ় বাসস্থান নির্মাণ করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয় :** **وَلَوْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا** আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা সুদৃঢ় প্রাসাদে হলেও মৃত্যু তোমাদেরকে বন্ড করতেই হবে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বসবাস করার জন্য কিলো ধন-সম্পদের হেফাজতের উদ্দেশ্যে সুদৃঢ় ও উত্তম গৃহ নির্মাণ করা তাওয়াক্কুল বা ভরসার পরিপন্থী কিংবা শরীয়তবিরুদ্ধ নয়।— (কুরত্বী)
- মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহেই নেয়ামত লাভ করে :** **مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ** (হাসানাতিন) -এর দ্বারা নেয়ামতকে বোঝানো হয়েছে।

এ আয়াতের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যে সমস্ত নেয়ামত লাভ করে তা তাদের প্রাপ্য নয়, বরং একান্ত আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহেই প্রাপ্ত হয়। মানুষ যত এবাদত-বন্দেগীই করুক না কেন, তাতে সে কোন নেয়ামত লাভের অধিকারী হতে পারে না। কারণ, এবাদত করার যে সামর্থ্য, তাও আল্লাহর পক্ষ থেকেই লাভ হয়। তদুপরি আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নেয়ামত তো রয়েছেই। এ সমস্ত নেয়ামত সীমিত এবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে কেমন করে লাভ করা সম্ভব? বিশেষ করে আমাদের এবাদত-বন্দেগী যদি আল্লাহ তাআলার শান মোতাবেক না হয়?

অতএব, মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন—

“আল্লাহ তাআলার রহমত ব্যতীত কোন একটি লোকও জন্মতে প্রবেশ করতে পারবে না।” বলা হল, “আপনিও কি যেতে পারবেন না”? তিনি বললেন, “না আমিও না।”— (মায়হারী)

বিপদাপদ মানুষের কৃতকর্মের ফল : **وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ** **سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ** -অর্থ হল বিপদাপদ।— (মায়হারী)

বিপদাপদ যদিও আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেন, কিন্তু তার কারণ হয় মানুষের কৃত অসৎকর্ম। মানুষটি যদি কাফের হয়ে থাকে, তবে তার উপর আপত্তি বিপদাপদ তার জন্য সে সমস্ত আযাবের একটা সামান্য নমুনা হয়ে থাকে যা আখেরাতে তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। বস্তুতঃ আখেরাতের আযাব এর চাইতে বহুগুণ বেশী। আর যদি লোকটি ঈমানদার হয়, তবে তার উপর আপত্তি বিপদাপদ হয় তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত, যা আখেরাতে

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَأْنَاهُ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝٦١ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۝٦٢ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝٦٣ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذًا عَوايِلَهُمْ وَأَوْرَدُوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْأُمُورِ لَهُمْ عَلِيمٌ ۝٦٤ يَسْتَنْظِرُونَ لَهُ مِنْهُمُ الذَّلِيلَ وَقَدْ قُضِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ لَئِنْ لَمْ يَنْتَظِرُوا لَكَ لَلِشَّيْطَانُ الْأَقْبَلُ ۝٦٥ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝٦٦ فَسَكَتَ الْحَرِيُّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَسَّ اللَّهُ أَنْ يَكُنْ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيدًا ۝٦٧ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝٦٨ وَإِذَا حُجِّبُوا بِحِجَّةٍ فَعِثُوا بِأَحْسَنِ مِنهَا أَوْرَدُوا وَهَارُونَ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝٦٩ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُصَوِّرُكُمْ فِي أَرْحَامِهِ كَيْدُ الْوَسْوَاسِ الْخَفِيِّ ۝٧٠ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۝٧١ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝٧٢

(৬১) আর তারা বলে, আপনার অনুগত্য করি। অতঃপর আপনার নিকট থেকে বেরিয়ে গেলেই তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পরামর্শ করে রাতের বেলায় সে কথার পরিপন্থী যা তারা আপনার সাথে বলেছিল। আর আল্লাহ লিখে নেন, সে সব পরামর্শ যা তারা করে থাকে। সুতরাং আপনি তাদের ব্যাপারে নিষ্পত্তি অবলম্বন করুন এবং ভরসা করুন আল্লাহর উপর, আল্লাহ হলেন যথেষ্ট ও কার্যসম্পাদনকারী। (৬২) এরা কি লক্ষ্য করে না কোরআনের প্রতি? পক্ষান্তরে এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও পক্ষ থেকে হত, তবে এতে অবশ্যই বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত। (৬৩) আর যখন তাদের কাছে পৌছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা তযের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শরয়তের অনুসরণ করতে শুরু করত। (৬৪) আল্লাহর রায়ে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিস্মাদার নন। আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা। (৬৫) যে লোক সংকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্য সে তার বোধারও একটি অংশ পাবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতালীল। (৬৬) আর তোমাদেরকে যদি কেউ দোয়া করে, তাহলে তোমরাও তার জন্য দোয়া কর; তারচেয়ে উত্তম দোয়া অথবা তারই মত ফিরিয়ে বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী। (৬৭) আল্লাহ ব্যতীত আর কোনোই উপাস্য নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন কেয়ামতের দিন—এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া আল্লাহর চাইতে বেশী সত্য কথা আর কার হবে!

তার মুক্তির কারণ। অতএব, এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেছেন : “কোন বিপদ এমন নেই, যা কোন মুসলমানের উপর পতিত হয়, অথচ তাতে আল্লাহ সে লোকের প্রায়শ্চিত্ত করে দেন না। এমন কি যে কাঁটাটি পায় ফোটে তাও।” — (মায়হারী)

“অপর এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—হযরত আবু মুসা (রাঃ) বলেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বান্দার উপর যে সমস্ত লম্বু বা গুরু বিপদ আসে, সে সবই হয় তাদের পাপের ফলে। অথচ তাদের বহু পাপ ক্ষমাও করে দেয়া হয়। — (মায়হারী)

মহানবী (সাঃ)—এর নবুওয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপকঃ وَأَوَّلُكُمْ لِلْكَافِرِينَ رَسُولُكَ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সাঃ)—কে সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য রসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তিনি শুধু আরবদের জন্যই রসূল ছিলেন না, বরং তাঁর রেশালত ছিল সমগ্র বিশৃমানবের জন্য ব্যাপক। তা তারা তখন উপস্থিত থাক অথবা না—ই থাক। কেয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষই এর আওতাভুক্ত।

আনুষঙ্গিক স্মার্তব্য বিষয়

ফَأَعْرِضْ عَنْهُمْ : নেতৃত্বদানকারীদের প্রতি বিশেষ হেদায়েত :

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

মুনাফেকরা যখন আপনার নিকট আসে, তখন বলে যে, আমরা আপনার নির্দেশ কবুল করে নিয়েছি। কিন্তু যখন তারা নাফরমানী করার উদ্দেশে নিজেরদের মধ্যে পরামর্শ করে, তখন রসূলে করীম (সাঃ) এর—বড় কষ্ট হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা মহানবী (সাঃ)—কে হেদায়েত দান করেছেন যে, এসব বিষয়ে আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আপনি আপনার যাবতীয় কাজ আল্লাহর উপর ভরসা করে চালিয়ে যেতে থাকুন। কারণ, আপনার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, যারা মানুষের নেতৃত্ব দান করতে যাবে, তাদেরকে নানা রকম জটিলতা অতিক্রম করতেই হবে। মানুষ তাদের প্রতি নানারকম উল্টা-সিঁধা অপবাদ আরোপ করবে। বন্ধুরাণী বহু শত্রুও থাকবে। এসব সত্ত্বেও সে নেতার পক্ষে সৎকল্প ও দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করে নিজের কাজে নিয়োজিত থাকা উচিত। যদি তার লক্ষ্য ও কর্মপন্থা সঠিক হয়, তবে ইনশাআল্লাহ কৃতকার্যতা অবশ্যই তার পদচুম্বন করবে।

আয়াতে কোরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা : أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ

আল্লাহ তাআলা কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য মানবকুলকে আহ্বান জানিয়েছেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহ তাআলা فَلَا يَذْكُرُونَ না বলে বলেছেন أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ এতে বাহ্যতঃ একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে বলেই বোঝা যায়। তা’হল এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তারা যদি গভীর মনোযোগের সাথে কোরআনের প্রতি লক্ষ্য করে, তাহলে তারা এর অর্থ ও বিষয়বস্তুর মাঝে কোন পার্থক্য যুজ্ঞ পাবে না। আর এ বিষয়টি একমাত্র চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। শুধুমাত্র তেলাওয়াত বা আবৃত্তির দ্বারা—যাতে তাদাকবুর বা চিন্তা-গবেষণা অনুপস্থিত থাকবে—বহুবৈধ বৈপরীত্য দেখা যাবে, যা বাস্তবের পরিপন্থী।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রতিটি মানুষ

কোরআনের উপর গভীর চিন্তা-গবেষণা করুক, এটাই হল কোরআনের চাহিদা। কাজেই কোরআন সম্পর্কিত চিন্তা-গবেষণা কিংবা তার পর্যালোচনা করা শুধুমাত্র ইমাম-মুজতাহিদগণেরই একক দায়িত্ব— এমন মনে করা যথার্থ নয়। জ্ঞান-বুদ্ধির পর্যায়ের মতই অবশ্য চিন্তা-গবেষণা এবং পর্যালোচনারও বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। ইমাম-মুজতাহিদগণের গবেষণা-পর্যালোচনা একটি আয়াত থেকে বহু বিষয় উদ্ভাবন করবে। ওলামা সম্প্রদায়ের চিন্তা-ভাবনা এসব বিষয় উপলব্ধি করবে। আর সাধারণ মানুষ যখন নিজের ভাষায় কোরআনের তরজমা-অনুবাদ পড়ে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন তাতে তাদের মনে সৃষ্টি হবে আল্লাহ তাআলার মহত্বের ধারণা ও ভালবাসা। এটাই হল কৃতকার্যতার মূল চাবিকাঠি। অবশ্য জনসাধারণের জন্য ভুল বোঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি থেকে অব্যাহতি লাভ করার জন্য পর্যায়ক্রমিকভাবে কোন বিজ্ঞ আলোমের নিকট কোরআন পাঠ করা উত্তম। আর তা সম্ভব না হলে কোন নির্ভরযোগ্য তফসীর অধ্যয়ন করবে এবং কোন জটিলতা বা সন্দেহ-সংশয় দেখা দিলে নিজের মনমতো তার কোন সমাধান করবে না, বরং বিজ্ঞ কোন আলোমের সাহায্য নেবে।

কোরআন ও সুন্নাহর তফসীরের কয়েকটি শর্ত : উল্লেখিত আয়াতের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কোরআন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-পর্যালোচনা করার অধিকার প্রতিটি লোকেরই রয়েছে। কিন্তু আমরা বলেছি যে, চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা-পর্যালোচনার স্তরভেদ রয়েছে, সেমতে প্রত্যেক স্তরের হুকুমও পৃথক পৃথক। যে মুজতাহিদসুলভ গবেষণার দ্বারা কোরআনে হাকীমের ভেতর থেকে বিভিন্ন জটিল বিষয়ের মীমাংসাজনিত সিদ্ধান্ত বের করা হয়, তার জন্য তার লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করে নেয়া অপরিহার্য, যাতে নির্ভুল মর্ম নির্ণয় করা সম্ভব হবে। পক্ষান্তরে যদি তার পটভূমিকা সঙ্কোচ জ্ঞান মোটেই না থাকে, কিংবা স্বল্প পরিমাণ থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, একজন মুজতাহিদের যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা তার মধ্যে নেই। বলাবাহুল্য, তাহলে সে আয়াতের দ্বারা যেসব মর্ম উদ্ভাবন করবে, তাও হবে ভ্রান্ত। এমতাবস্থায় আলোম সম্প্রদায় যদি সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে তা হবে একান্তই ন্যায়সঙ্গত।

যে লোক কোন দিন কোন মেডিক্যাল কলেজের ছায়াও মাড়ায়নি, সে যদি আপত্তি তুলে বসে যে, দেশের চিকিৎসা ক্ষেত্রে চিকিৎসা শাস্ত্র সনদপ্রাপ্ত ডাক্তারদের একক আধিপত্য কেন দেয়া হল? একজন মানুষ হিসাবে আমারও সে অধিকার রয়েছে। কিংবা কোন নির্বোধ যদি বলতে শুরু করে যে, দেশে নদীনালা, পুল-নর্দমা প্রভৃতি সম্প্রদায় ও নির্মাণের ঠিকাদার শুধুমাত্র বিজ্ঞ প্রকৌশলীদেরকেই কেন দেয়া হবে? আমিও তো একজন নাগরিক হিসাবে এ দায়িত্ব পালনের অধিকারী। অথবা বিকৃত-বুদ্ধি কোন লোক যদি এমন আপত্তি তুলতে আরম্ভ করে যে, দেশের সংবিধান বা আইন-কানূনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শুধু আইনবিদদের একছত্র অধিকার হবে কেন? আমিও একজন বুদ্ধিমান নাগরিক হিসাবে একাজ সম্পাদন করতে পারি! তখন নিঃসন্দেহে এসব লোককে বলা হবে যে, দেশের নাগরিক হিসাবে অবশ্যই এসব কাজ সমাধা করার অধিকার তোমারও রয়েছে, কিন্তু এ সমস্ত কার্য সম্পাদনের যোগ্যতা অর্জন করতে গিয়ে যে বছরের পর বছর মাথা ঘামাতে হয়, সুবিজ্ঞ শিক্ষকদের নিকট এসব শাস্ত্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় এবং সে জন্য যেসব সনদ হাসিল করতে হয়, তোমরাও প্রথমে সে কষ্টটুকু স্বীকার করে আস। তাহলে সন্দেহাতীতভাবে তোমরাও এ সমস্ত কার্য সম্পাদনে সমর্থ হবে।

কিন্তু এ কথাগুলোই যদি কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মত সুস্থ ও জটিল কাজের বেলায় বলা হয়, তাহলে তখন আলোম সমাজের একছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রোণা উদ্ভিত হয়। তাহলে কি সমগ্র বিশ্বে শুধুমাত্র কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞানটিই এমন লা-ওয়ারিস রয়ে গেছে যে, এ ব্যাপারে যে কোন লোক নিজ নিজ ভঙ্গিতে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অধিকার সংরক্ষণ করবে। যদি সে লোক কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞানার্জনে কয়েকটি মাসও ব্যয় না করে থাকে, তবুও কি?

কেয়াস একটি দলীল : এ আয়াতের দ্বারা এ কথাও বোঝা যাচ্ছে যে, কোন মাসআলার বিশ্লেষণ যদি কোরআন ও সুন্নাহর মধ্যে সরাসরি না পাওয়া যায়, তাহলে তাতেই চিন্তা-ভাবনা করে তার সমাধান বের করার চেষ্টা করা কর্তব্য। আর একেই শরীয়তের পরিভাষায় ‘কেয়াস’ বলা হয়।

বহু মতবিরোধ ও তার ব্যাখ্যা : وَلَوْ كُنَّا مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا لَمَّا وَجَدْنَا فِيهِ اٰيَاتٍ كَثِيْرًا (বা

বহু মতবিরোধ) এর মর্ম এই যে, যদি কোন একটি বিষয়ে মতবিরোধ একটি হয়, তবে বহু বিষয়ে মতবিরোধও বহু হয়ে থাকে। - (বয়ানুল-কোরআন) কিন্তু এখানে (অর্থাৎ, কোরআনে) কোন একটি বিষয়েও কোন মতবিরোধ বা মতপার্থক্য নেই। অতএব, এটা একান্তভাবেই আল্লাহর কলাম। মানুষের কালামে এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য হতেই পারে না। এর কোথাও না আছে ভাষালঙ্কারের কোন ক্রটি, না আছে তওহীদ, কুফর, কিংবা হারাম-হালালের বিবরণে কোন স্ববিরোধিতা ও পার্থক্য। তাছাড়া গায়বী বিষয়সমূহের মাঝেও এমন কোন সংবাদ নেই, যা প্রকৃত বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তদুপরী না আছে কোরআনের ধারাবাহিকতার কোন পার্থক্য যে, একটি হবে অলঙ্কারপূর্ণ আরেকটি হবে অলঙ্কারহীন। প্রত্যেক মানুষের ভাষা-বিস্তৃতি ও রচনা-সঙ্কলনে পরিবেশের কম-বেশী প্রভাব অবশ্যই থাকে— আনন্দের সময় তা এক ধরনের হয়, আবার বিষাদে হয় অন্য রকম। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হয় এক রকম, আবার আশঙ্কিপূর্ণ পরিবেশে অন্য রকম। কিন্তু কোরআন এ ধরনের যাবতীয় ক্রটি, পার্থক্য ও স্ববিরোধিতা থেকে পবিত্র ও উদ্ভেদ। আর এটাই হল কালামে-এলাহী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

যাচাই না করে কোন কথা রচনা করা মহাপাপ : এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, কোন শোনা কথা যাচাই, অনুসন্ধান ব্যতিরেকে বর্ণনা করা উচিত নয়। রসুলে করীম (সাঃ)-এর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, “কোন লোকের পক্ষে মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোন রকম যাচাই না করেই সমস্ত শোনা কথা প্রচার করে।”

অপর এক হাদীসে তিনি বলেছেন : “যে লোক এমন কোন কথা বর্ণনা করে, যার ব্যাপারে সে জানে যে, সেটি মিথ্যা, তাহলে সে দু’জন মিথ্যাবাদীর একজন মিথ্যাবাদী - (ইবনে - কাসীর)

উলুল-আমর কারা : وَرُوْدُوْا اِلَى الْوُثُوْلِ وَلٰٓئِىْ اَلْاَمْرُ اسْتَنْبَاطُ حُجَّةِ الْاَيِّمِ يَسْتَنْبِطُوْنَ مِنْهُم

শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কুপের গভীরতা থেকে পানি তোলা। সে জন্যই কুপ খননকালে প্রথম যে পানি বেরায় তাকে আরবীতে **ماء مستنبط** বলা হয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হল কোন বিষয়ের গভীরে গিয়ে তার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। - (কুরতুবী)

‘উলুল-আমর’ বা দায়িত্বশীল লোক নির্ণয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

হযরত হাসান, কাতাদা ও ইবনে আবী লায়লা (রহঃ) প্রমুখের মতে দায়ী দলীল লোক বলতে ওলামা ও ফকীহগণকে বোঝায়। হযরত সুদী (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা শাসনকর্তা ও কর্তৃপক্ষকে বোঝায়। আল্লাহ মা আবু বরর জাসসাস এতদুভয় মত উদ্ধৃত করার পর বলেছেন, সঠিক ব্যাপার হলো এই যে, এতদুভয় অর্থই ঠিক। কারণ, ‘উলুল-আমর’ শব্দটি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য এতে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন যে, ‘উলুল-আমর’ বলতে ফকীহগণকে বোঝানো যেতে পারে না। আর কারণ, اولو الامر (উলুল-আমর) শব্দটি তার শাসনিক অর্থের দিক দিয়ে সে সমস্ত লোককে বোঝায়, যাদের হুকুম বা নির্দেশ চলতে পারে। ক্বাবাহল্যা, এ কাজটি ফকীহগণের নয়। প্রকৃত বিষয় হল এই যে, হুকুম দ্বারা দু’টি প্রেক্ষিত রয়েছে। (এক) জবরদস্তিমূলক। এটা শুধুমাত্র শাসকগোষ্ঠী বা সরকার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। (দুই) বিশ্বাস ও আস্থার দ্বারা হুকুম মান্য করা। আর সেটা ফকীহগণই অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং যা সর্বযুগের মুসলমানদের অবস্থার দ্বারা প্রতিভাত হয়। ধর্মীয় ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানগণ নিজের ইচ্ছা ও মতামতের তুলনায় আলেম সম্প্রদায়ের নির্দেশকে অবশ্য পালনীয় বলে সাব্যস্ত করে থাকে। তাছাড়া শরীয়তের দৃষ্টিতেও সাধারণ মানুষের জন্য আলেমদের হুকুম মান্য করা গুরুত্বপূর্ণ বটে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রেও ‘উলুল আমর’-এর প্রয়োগ সঙ্গত হবে। - (আহকামুল কোরআন, জাসসাস)।

আধুনিক সমস্যাবলী সম্পর্কিত বিষয়ে কেয়াস ও ইজ্তেহাদ : এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা যাচ্ছে যে, যেসব বিষয়ে কোন ‘নস’ তথা কোরআন-হাদীসের সরাসরি কোন বিধান নেই, সেগুলোর হুকুম ‘ইজ্তেহাদ’ ও কেয়াসের রীতি অনুযায়ী কোরআনের আয়াত থেকে উদ্ভাবন করতে হবে। তার কারণ, এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আধুনিক কোন বিষয়ের সমাধানকল্পে রসুলে করীম (সাঃ)-এর বর্তমানে তাঁর নিকট যাও। আর যদি তিনি বর্তমান না থাকেন, তাহলে ফকীহগণের নিকট যাও। কারণ, তাঁদেরই মধ্যে বিধান উদ্ভাবন করার মত পরিপূর্ণ খোঁজা বিদ্যমান রয়েছে।

এই বর্ণনার দ্বারা কতিপয় বিষয় প্রতীয়মান হয়। যথা, ‘নস’ বা কোরআন-হাদীসের সরাসরি নির্দেশের অবর্তমানে ওলামাদের কাছে যেতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর নির্দেশ দু’রকম। কিছু হল সরাসরি ‘নস’ বা কোরআন-সনুহভিত্তিক এবং কিছু হল পরোক্ষ ও অস্পষ্ট, যা আল্লাহ তাআলা আয়াতসমূহের গভীরে নিহিত রেখেছেন।

তৃতীয়তঃ এ ধরনের অন্তর্নিহিত মর্মগুলো কেয়াস ও ইজ্তেহাদের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা আলেম সম্প্রদায়ের একান্ত দায়িত্ব।

চতুর্থতঃ এসব বিধানের ক্ষেত্রে আলেম সম্প্রদায়ের অনুসরণ করা সাধারণ মানুষের অবশ্য কর্তব্য। - (আহকামুল-কোরআন, জাসসাস)

রসুলে করীম (সাঃ)-ও প্রমাণ উদ্ভাবন সংক্রান্ত নির্দেশের আওতাভুক্তঃ لَوْلَا الَّذِي يَسْتَوِطُونَكُمْ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রসুলে করীম (সাঃ)-ও দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে হুকুম-আহকাম উদ্ভাবনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তার কারণ, আয়াতে দু’রকম লোকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদের একজন হলেন রসুলে-আকরাম (সাঃ) এবং অপরজন হচ্ছেন ‘উলুল-আমর’। অতঃপর বলা হয়েছে لَوْلَا الَّذِي يَسْتَوِطُونَكُمْ - আর এই

নির্দেশটি হল ব্যাপক। এতে উল্লেখিত দু’রকম লোকের মধ্যে কাকেও নির্দিষ্ট করা হয়নি। অতএব, এতে প্রমাণিত হয় যে, হুযুর (সাঃ) নিজের আহকাম উদ্ভাবন-সংক্রান্ত নির্দেশের আওতাভুক্ত। - (আহকামুল-কোরআন, জাসসাস)

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয় : (১) কারো মনে যদি এমন কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এ আয়াতের দ্বারা শুধুমাত্র এতদুই বোঝা যায় যে, শত্রুর ভয়-শঙ্কা সম্পর্কে তোমরা নিজে নিজে কোন রটনা করো না, বরং যারা জ্ঞানী ব্যক্তি এবং যারা সমাজের নেতৃস্থানীয় তাদের সাথে যোগাযোগ কর। তারা চিন্তা-ভাবনা করে যা করতে বলবেন তোমরা সে মতই কাজ করবে। বলাবাহুল্য, দুর্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই।

তাহলে তার উত্তর এই যে, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوْ الْخَوَافِ বাক্যে শত্রুর কোন উল্লেখ নেই। কাজেই এ নির্দেশ ভয় ও শঙ্কি উভয় অবস্থাতেই ব্যাপক। এ নির্দেশের সম্পর্ক যেমন শত্রুর সাথে, তেমনিভাবে দুর্যোগ সংক্রান্ত সমস্যার সাথেও বটে। কারণ, যখন কোন নতুন বিষয় বা মাসআলা সাধারণ মানুষের সামনে উদ্ভব হয়, যার হালাল হওয়া কিংবা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সরাসরি কোরআন বা হাদীসের কোন নির্দেশ নেই, তখন তারা বিরাট দৃষ্টিভঙ্গির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। তারা বুঝে উঠতে পারে না, কোন দিকটি তারা গ্রহণ করবে। অর্থাৎ উভয় দিকেই লাভ-ক্ষতি উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। এমন অবস্থায় শরীয়ত সবচেয়ে উত্তম পথ বাতলে দিয়েছে। তাহল উদ্ভাবন (استنباط) কর। উদ্ভাবনের মাধ্যমে যা পাওয়া যায়, তারই উপর আমল করবে। - (আহকামুল-কোরআন, জাসসাস)

ইজ্তেহাদ ও এস্তেযাত বলিষ্ঠ ধারণা সৃষ্টি করে, নিশ্চিত বিশ্বাস নয় : (২) এস্তেযাত এর মাধ্যমে আলেমগণ যে নির্দেশ উদ্ভাবন করেন, সে সম্পর্কে নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে একথা বলা যাবে না যে, আল্লাহ তাআলার নিকটও এটাই নিশ্চিতভাবে সত্য ও সঠিক। বরং এই নির্দেশ বা বিধানটি সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞান নাও হতে পারে। তবে তা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে থাকে, যা আমল করার জন্য যথেষ্ট। - (আহকামুল-কোরআন, জাসসাস)

কোরআনী বিধানের বর্ণনামূলকী : فَقَالُوا فِي سُبْحَانَ اللَّهِ - এ আয়াতের প্রথম বাক্যে রসুলে করীম (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, “আপনি একাই যুদ্ধের জন্যে তৈরী হয়ে পড়ুন; কেউ আপনার সাথে থাক বা নাই থাক।” কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যে একথাও বলা হয়েছে যে, অন্যান্য মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহদানের কাজটিও পরিহার করবেন না। এভাবে উৎসাহদানের পরেও যদি তারা যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ না হয়, তবে আপনার দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল; তাদের কর্মের জন্য আপনাকে জবাবদেহী করতে হবে না।

এতদসঙ্গে একা যুদ্ধ করতে গিয়ে যেসব বিপদাশঙ্কা দেখা দিতে পারে, তার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে— “আশা করা যায় আল্লাহ কাকেরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দেবেন এবং তাদেরকে ভীত ও পরাজিত করে দেবেন। আর আপনাকে একাই জয়ী করবেন।” অতঃপর এই বিজয় প্রসঙ্গে প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনার প্রতি যখন আল্লাহ তাআলার সমর্থন রয়েছে, যার সমর্থনশক্তি কাকেরদের শক্তি অপেক্ষা অসংখ্যগুণ বেশী, তখন আপনার বিজয়ই অবশ্যসম্ভাবী ও নিশ্চিত। তারপর এই সুদৃঢ় প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় শান্তির কঠোরতা বর্ণনা করা হয়েছে। এ

শান্তি কেয়ামতের দিনেই হোক, কিংবা পার্থিব জীবনেই হোক, যুদ্ধের ক্ষেত্রে যেমন আমার শক্তি অপরাধের, তেমনি শান্তি দানের ক্ষেত্রেও আমার শান্তি অত্যন্ত কঠোর।

সুপারিশের স্বরূপ, বিধি ও প্রকারভেদ : مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً —এ আয়াতে শাফাআত অর্থৎ, সুপারিশকে ভাল ও

মন্দ দু'ভাগে বিভক্ত করার পর এর স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক সুপারিশ যেমন মন্দ নয়, তেমনি প্রত্যেক সুপারিশ ভালও নয়। আরও বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ভাল সুপারিশ করবে, সে সওয়াবের অংশ পাবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে। আয়াতে ভাল সুপারিশের সাথে نَصِيب শব্দ এবং মন্দ সুপারিশের সাথে كُفْل শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধানে উভয় শব্দের অর্থই এক। অর্থৎ, কোন কিছুই অংশবিশেষ। কিন্তু সাধারণ পরিভাষায় نَصِيب শব্দটি ভাল অংশ এবং كُفْل শব্দটি মন্দ অংশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যদিও কখনও ভাল অংশেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোরআন পাকে كُفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ (তার রহমতের দু'টি অংশ) ব্যবহার করা হয়েছে।

شفاعة —এর শাব্দিক অর্থ মিলিত হওয়া বা মিলিত করা। এ কারণেই আরবী ভাষায় شُفْعَة শব্দ জোড় অর্থ এবং বিপরীতে وَتر শব্দ বিজোড় অর্থ ব্যবহার করা হয়। অতএব, شُفْعَة —এর শাব্দিক অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কোন দুর্বল অধিকার প্রার্থীর সাথে স্বীয় শক্তি যুক্ত করে তাকে দেয়া কিংবা অসহায় একা ব্যক্তির সাথে নিজে মিলিত হয়ে তাকে জোড় করে দেয়া।

এতে জানা গেল যে, বৈধ শাফাআত ও সুপারিশের একটি শর্ত এই যে, যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে, তার দাবী সত্য ও বৈধ হতে হবে এবং অপর শর্ত এই যে, দুর্বলতার কারণে সে স্বীয় দাবী প্রবলদের কাছে স্বয়ং উত্থাপন করতে পারবে না। এতে বোঝা গেল যে, অসত্য সুপারিশ করা অথবা অপরকে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে মন্দ সুপারিশ। নিজ সম্পর্কে ব্যবহার করলে কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তিজনিত চাপ ও জ্বরদস্তি প্রয়োগ করা হলে জুলুম হওয়ার কারণে তাও অবৈধ। কাজেই এরূপ সুপারিশও মন্দ সুপারিশেরই অন্তর্ভুক্ত।

এখন আলোচ্য আয়াতের সারবস্তু এই যে, যে ব্যক্তি কারো বৈধ অধিকার ও বৈধ কাজের জন্যে বৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সেও সওয়াবের অংশ পাবে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কোন অবৈধ কাজের জন্যে অথবা অবৈধ পন্থায় সুপারিশ করবে, সে আযাবের অংশ পাবে।

অংশ পাওয়ার অর্থ এই যে, যার কাছে সুপারিশ করা হয়, সে যখন এ উৎসাহিত করে কিংবা বক্তৃতের কার্যোদ্ধার করে দেবে, তখন কার্যোদ্ধারকারী ব্যক্তি যেমন সওয়াব পাবে, তেমনি সুপারিশকারীও সওয়াব পাবে।

এমনিভাবে কোন অবৈধ কাজের সুপারিশকারীও পোনাঙ্গার হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সুপারিশকারীর সওয়াব কিংবা আযাব তার সুপারিশ কার্যকরী ও সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং সর্বাবস্থায় সে নিজ অংশ পাবে।

রসূলে-করীম (সাঃ) বলেন : “যে, ব্যক্তি কোন সংকাজে অপরকে উদ্ধুদ্ধ করে, সেও ততটুকু সওয়াব পায়, যতটুকু সংকামী পায়।” — (মায়হাবী)

ইবনে মাজায় হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : “যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে হত্যার কাজে একটি বাক্য দ্বারা সাহায্য করে, তাকে কেয়ামতে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত করা হবে এবং তার কপালে লিখিত থাকবে : “এ ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত ও নিরাশ।” (মায়হাবী)

এতে জানা গেল যে, সংকাজে কাউকে উদ্ধুদ্ধ করা যেমন একটি সংকাজ তেমনি অসৎ ও পাপ কাজে কাউকে উদ্ধুদ্ধ করা কিংবা সহযোগিতা প্রদান করা সমান গোনাহ।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে: وَكَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُبِينًا

আভিধানিক দিক দিয়ে مقیت শব্দের অর্থ তিনটি : (এক) শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান, (দুই) উপস্থিত ও দর্শক এবং (তিন) রূষী বটনকারী। উল্লিখিত বাক্যে তিনটি অর্থই প্রযোজ্য। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের অর্থ হবে— আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। যে কাজ করে এবং যে সুপারিশ করে তাদেরকে প্রতিদান কিংবা শাস্তিদান উয় পক্ষে কঠিন নয়।

দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের উদ্দেশ্য হবে— আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর পরিদর্শক ও প্রত্যেক বস্তুর সামনে উপস্থিত। কে কেন নিয়তে সুপারিশ করে; আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যার্থে করে, না ঘৃষ হিসেবে তার কাছ থেকে কোন মতলব হাসিলের উদ্দেশ্য করে, তিনি সে সবই জানেন।

তৃতীয় অর্থের দিক দিয়ে বাক্যের মর্ম হবে রিষিক ও রূষী বটনের কাজে আল্লাহ স্বয়ং বিম্বাদার। যার জন্যে যতটুকু লিখে দিয়েছেন, সে ততটুকু অবশ্যই পাবে। কারো সুপারিশে তিনি প্রভাবিত হবেন না; বরং যাকে যতটুকু ইচ্ছা দেবেন। তবে সুপারিশকারী ব্যক্তি মাঝখান থেকে সওয়াব পেয়ে যাবে। কেননা, এটা হচ্ছে দুর্বলের সাহায্য।

হাদীসে বলা হয়েছে : “আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য অব্যাহত রাখেন, যতক্ষণ সে কোন মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে ব্যাপ্ত থাকে। তোমরা সুপারিশ কর, সওয়াব পাবে। অতঃপর আল্লাহ স্বীয় পয়গম্বরের মাধ্যমে যে ক্ষয়সালা করেন তাতে সন্তুষ্ট থাক।’

এ কারণেই কোরআন পাকের ভাষায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, সুপারিশের সওয়াব ও আযাব সুপারিশ সফল হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং সুপারিশ করলেই সর্বাবস্থায় সওয়াব অথবা আযাব হবে। আপনি ভাল সুপারিশ করলেই সওয়াবের অধিকারী হয়ে যাবেন এবং মন্দ সুপারিশ করলেই আযাবের যোগ্য হয়ে পড়বেন— আপনার সুপারিশ কার্যকরী হোক বা না হোক।

তফসীর বাহুরে মুহীত, বয়ানুল-কোরআন প্রভৃতি গ্রন্থে يَنْشَعُ مِنْ بَابِ شَعَبٍ শব্দটিকে সাব্যস্ত করে এদিকে ইঙ্গিত করে বলে বলা হয়েছে। তফসীরে মায়হাবীতে তফসীরবিদ মুজাহিদে উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুপারিশকারী সুপারিশের সওয়াব পাবে, যদি তার সুপারিশ গ্রহণ করা নাও হয়। এ বিষয়টি শুধু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং অন্যের কাছে সুপারিশ করেই সুপারিশকারী যেন ক্ষান্ত হয়ে যায়, তা গ্রহণ করতে বাধ্য করবে না। স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মুক্ত করা বাদী বরীরা স্বীয় স্বামী মুগীছের কাছ থেকে তালাক নিয়েছিলেন। তালাক দেয়ার পর মুগীছ

দ্বীয়ার ভালবাসায় পাগলপারা হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুগীছকে পুনরায় বিবাহ করার জন্য বরীয়ার কাছে সুপারিশ করেন। বরীরা আরয় করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! এটি আপনার নির্দেশ হলে শিরোমুখ্য, পক্ষান্তরে সুপারিশ হলে আমার মন তাতে সম্মত নয়। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : নির্দেশ নয়, সুপারিশই। বরীরা জানতেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) নীতির বাইরে অসম্মত হবেন না। তাই পরিস্কার ভাষায় প্ররয় করলেন : তাহলে আমি এ সুপারিশ গ্রহণ করব না। রসূলুল্লাহ (সঃ) হৃদয়গত তাকে তদবস্থায়ই থাকতে দিলেন।

এ ছিল সুপারিশের স্বরূপ। শরীয়তের দৃষ্টিকোণে এ জাতীয় সুপারিশ দূরই সওয়াব পাওয়া যায়। আত্মকাল বিকৃত আকারের যে সুপারিশ ক্ষুণ্ণের মধ্যে প্রচলিত আছে, তা প্রকৃতপক্ষে সুপারিশ নয়; বরং এ হচ্ছে সম্পর্ক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা। এ কারণেই আত্মকাল সুপারিশ গ্রহণ করা না হলে সুপারিশকারী অসম্মত হয়ে যায়; সৎ শত্রুতা সাধনে উদ্যত হয়। অথচ বিবেক ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে চাপ সৃষ্টি করা জবরদস্তির অন্তর্ভুক্ত এবং কঠোর গোনাহ। এটি করণ ও অর্থ সম্পদ কিংবা কায় ও অধিকার জবরদস্তি করায়ত্ত করে নেয়ার মতই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শরীয়ত ও আইনের দৃষ্টিতে স্বাধীন ছিল। আপনি জোর-জবরদস্তি করে তার স্বাধীনতা হরণ করেন। সুতরাং এ হচ্ছে একজনকে অত্যাচার দূর করার জন্যে অন্যের ধন-সম্পদ চুরি করে বিলিয়ে দেয়ার অনুরূপ। সুপারিশের বিনিময় গ্রহণ করা ঘৃণ্য। হাদীসে একে *سحت* বঃ হয়্যাম বলা হয়েছে। আর্থিক ঘৃণ্য হোক কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শ্রমের বিনিময়ে নিজের কোন কাজ হাসিল করা হোক—সর্বপ্রকার ঘৃণ্যই এর অন্তর্ভুক্ত।

কল্যাণ প্রভৃতি গ্রহণে বলা হয়েছে : এ সুপারিশ ভাল, যার উদ্দেশ্য কোন মুসলমানের অধিকার পূর্ণ করা অথবা তার কোন বৈধ উপকার করা অথবা ক্ষতির কবল থেকে তাকে রক্ষা করা হয়ে থাকে। এছাড়া এ সুপারিশটিও কোন জাগতিক লাভলাভ অর্জনের জন্যে না হওয়া চাই; সৎ আল্লাহর ওয়াস্তে দুর্বলের সমর্থনের লক্ষ্যে হওয়া উচিত এবং সুপারিশ করে কোন আর্থিক অথবা কায়িক ঘৃণ্য না নেয়া চাই। এ সুপারিশ কোন ঈর্ষা কাছের না হওয়া চাই এবং যে অপরাধের শাস্তি কোরআনে নির্ধারিত রয়েছে, এরূপ কোন অপরাধ মাফ করাবার জন্যেও না হওয়া চাই।

বাহরে মুহীত, মায়হারা প্রভৃতি গ্রহণে বলা হয়েছে : কোন মুসলমানের দাবা-অন্যন দূর করার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করাও ভাল সুপারিশের অন্তর্ভুক্ত। এতে দোয়াকারীও সওয়াব পায়। এক হাদীসে আছে, যখন কেউ মুসলমান ভাইয়ের জন্যে নেক দোয়া করে, তখন কেয়ামত বালেন : *وَلَك بئس* অর্থাৎ, আল্লাহ, তাআলা তোমারও অত্যাচার করুন।

সালাম ও ইসলাম : *وَأَلَا يَعْلَمُ بِسَجْدَةِ فَتْحِ وَأَيُّهَا* -

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সালাম ও তার জওয়াবের আদব বর্ণনা করেছেন।

تحية - এর تحية শব্দের ব্যাখ্যা ও এর ঐতিহাসিক পটভূমি : শাব্বিক অর্থ *حياتك* (আল্লাহ তোমাকে জীবিত রাখুন) বলা।

ইসলামপূর্ব কালে আরবরা পরস্পরের সাক্ষাৎকালে একে অন্যকে *حياتك* কিংবা *حياتك* ইত্যাদি সম্বোধনে সালাম করত। ইসলাম এ সালাম পদ্ধতি পরিবর্তন করে *السلام عليكم*

বলার রীতি প্রচলিত করেছে। এর অর্থ, তুমি সর্বপ্রকার কষ্ট ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাক।

ইবনে-আরাবী আহকামুল-কোরআন গ্রন্থে বলেন : ‘সালাম’ শব্দটি আল্লাহ তাআলার উত্তম নামসমূহের অন্যতম। *السلام عليكم* - এর অর্থ এই যে, *رقيب عليكم* অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের সংরক্ষক।

ইসলামী সালাম অন্যান্য জাতির সালাম থেকে উত্তম : জগতের প্রত্যেক সত্য জাতির মধ্যে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের সময় ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশার্থ কোন না কোন বাক্য আদান-প্রদান করার প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামী সালাম যতটুকু ব্যাপক অর্থবোধক, অন্য কোন সালাম ততটুকু নয়। কেননা, এতে শুধু ভালবাসাই প্রকাশ করা হয় না, বরং সাথে সাথে ভালবাসার যথার্থ হকও আদায় করা হয়। অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে দোয়া করা হয় যে, আল্লাহ আপনাকে সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদে রাখুন। এ দোয়াটি আরবদের প্রথা অনুযায়ী শুধু জীবিত থাকার দোয়া নয়; বরং পবিত্র জীবনের দোয়া। অর্থাৎ, সর্ববিধ বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া। এতে এ বিষয়েরও অভিব্যক্তি রয়েছে যে, আমরা ও তোমরা—সবাই আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী। তাঁর অনুমতি ছাড়া আমরা একে অপরের উপকার করতে পারি না। এ অর্থের দিক দিয়ে বাক্যটি একাধারে একটি এবাদত এবং মুসলমান ভাইকে আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেয়ার উপায়ও বটে।

ইবনে আরাবী আহকামুল-কোরআন গ্রন্থে ইমাম ইবনে উয়াইনার এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

اتدري ما السلام يقول انت امن مني - অর্থাৎ, সালাম কি বস্তু, তুমি জান? সালামকারী ব্যক্তি বলে যে, তুমি আমার পক্ষ থেকে বিপদমুক্ত।

মোটকথা এই যে, ইসলামী সালামে বিরাট অর্থগত ব্যাপ্তি রয়েছে। যথা,

(১) এতে রয়েছে আল্লাহ তাআলার মিকর, (২) আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দেয়া, (৩) মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি প্রকাশ, (৪) মুসলমান ভাইয়ের জন্য সর্বোত্তম দোয়া এবং (৫) মুসলমান ভাইয়ের সাথে এ চুক্তি যে, আমার হাত ও মুখ দ্বারা আপনার কোন কষ্ট হবে না। সহীহ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : “যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ সে-ই প্রকৃত মুসলমান।”

আয়াতে বিষয়বস্তুর উপসংহারে বলা হয়েছে :

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

“আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর হিসাব নিবেন।” মানুষ এবং ইসলামী অধিকার; যথা সালাম ও সালামের জওয়াব ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা এগুলোরও হিসাব নিবেন। এরপর বলা হয়েছে :

أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْآلَهُوَالْحُفُتُفُفُفُفُفُفُفُفُفُفُفُفُفُفُF - অর্থাৎ,

আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাকেই উপাস্য মনে কর এবং যে কাজই কর, তাঁর এবাদতের নিয়তে কর। তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে একত্রিত করবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। ঐ দিন সবাইকে প্রতিদান দেবেন। কেয়ামতের ওয়াদা, প্রতিদান ও শাস্তির সংবাদ সব সত্য।

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا - কেননা, এ সংবাদ আল্লাহর দেয়া। আল্লাহর চাইতে অধিক কার কথা সত্য হতে পারে ?

النَّارِ

৭২

وَالْبَحْمَتِ ۝

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَمَا لَكُمْ فِي النَّفِيْقِيْنَ وَفَتَنٍ ۚ وَاللّٰهُ اَرْكَسُهُمْ بِمَا كَسَبُوْا
 اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَهْدُوْا مَنْ اَصْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يُضِلِّ اللّٰهُ
 فَلَنْ يَّجِدَ لَهُ سَبِيْلًا ۚ وَذُوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا
 فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً ۚ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءَ سَخَّطَ اللّٰهُ
 فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اَنْ تَكُوْلُوْا فِحْدًا وَّهُمْ وَاَقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ
 وَجَدْتُمُوْهُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنْهُمْ وَّيْلًا ۚ وَلَا تَنْصُرُوْا الْاَكْثَرَ
 الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّمَّا تَوْفَىٰ اَوْ
 جَاءَ ۚ وَكُفِّرُوْا عَنْهُمْ اَوْ يَمُوتُوْا ۚ اَوْ يَغَيِّرُوْا
 قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَسَطَّحَهُمْ عَلَيْهِمْ وَقَلَتْ اُنْوَاعُ
 الْاَعْنٰمِ اَنْ تَكُوْلُوْا فَاَمَّا يَغَيِّرُوْا ۚ وَالْقَوَالِ الْيَكْمُ السَّلَامُ ۚ فَمَا
 جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا ۚ سَيُجَدُّونَ الْاٰخِرِيْنَ
 يَرِيْدُوْنَ اَنْ يَّامُنُوْكُمْ وَ يَأْمُرُوْا قَوْمَهُمْ فَاَمَّا اِلَى
 الْقُدْنَةِ اَرْكَسُوْا فِيْهَا ۚ اَنْ يَّامُنُوْكُمْ وَيُؤْمَرُوْا اِلَى الْيَكْمِ
 السَّلَامُ وَيَكْفُرُوْا اِيَّاهُمْ فَحَذُّوْهُمْ وَاَقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ
 تَقِفُوْهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مِّمَّا يَمِيْنًا ۝

(৮৮) অতঃপর তোমাদের কি হল যে, মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমরা দু' দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন তাদের মন্দ কাজের কারণে। তোমরা কি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে চাও, যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেছেন? আল্লাহ্ যাঁকে পথভ্রাস্ত করেন, তুমি তার জন্য কোন পথ পাবে না। (৮৯) তারা চায় যে, তারা যেমন কাকের, তোমরাও তেমনি কাকের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ্র পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না। (৯০) কিন্তু যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যে, তোমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে চুক্তি আছে অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং স্বজাতির সাথেও যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছে করতেন, তবে তোমাদের উপর তাদেরকে প্রবল করে দিতেন। ফলে তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতঃপর যদি তারা তোমাদের থেকে পৃথক থাকে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের সাথে সন্ধি করে, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ দেননি। (৯১) এখন তুমি আরও এক সম্প্রদায়কে পাবে। তারা তোমাদের কাছেও এবং স্বজাতির কাছেও নির্বিঘ্ন হয়ে থাকতে চায়। যখন তাদেরকে ফ্যাসাদের প্রতি মনোনিবেশ করানো হয়, তখন তারা তাতে নিপতিত হয়, অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়, তোমাদের সাথে সন্ধি না রাখে এবং স্বীয় হস্তসমূহকে বিরত না রাখে, তবে তোমরা তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে প্রকাশ্য যুক্তি-প্রমাণ দান করেছি।

আলোচ্য আয়াতসমূহে তিনটি দলের কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে দু'টি বিধান উল্লেখিত হয়েছে। এসব দলের ঘটনাক্রী নিম্নোক্ত রেওয়াজেগুলো থেকে জানা যাবে।

প্রথম রেওয়াজে : আবদুল্লাহ্ ইবনে হমাইদ মুজাহিদ থেকে বর্ণা করেন যে, একবার কতিপয় মুশরেক মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করে এবং প্রকাশ করে যে, তারা মুসলমান হিজরত করে মদীনায় এসেছে। কিছুদিন পর তারা ধর্মত্যাগী হয়ে যায় এবং রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে পণ্যদ্রব্য আনার অজুহাত পেশ করে পুনরায় মক্কা চলে যায়। এরপর তারা আর ফিরে আসেনি। এদের সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমত দেখা দেয়। কেউ কেউ বলল এরা কাকের, আর কেউ কেউ বলল এরা মুমিন। আল্লাহ্ তাআলা — فَمَا لَكُمْ فِي النَّفِيْقِيْنَ وَفَتَنٍ — আয়াতে এদের কাকের হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন এবং এদেরকে হত্যা করার বিধান দিয়েছেন।

দ্বিতীয় রেওয়াজে : ইবনে আবী শায়বা হাসান বসরী থেকে বর্ণা করেন যে, বদর ও গুহদ যুদ্ধের পর সুরাকা ইবনে মালেক মুদলানী রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জানান, আমাদের গোর বনী-মুদলাজের সাথে সন্ধি স্থাপন করুন। তিনি হয়রত খালেদকে সন্ধি সম্পন্ন করার জন্যে সেখানে প্রেরণ করলেন। সন্ধির বিষয়বস্তু ছিল এই:

আমরা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করব না। কোরায়েশরা মুসলমান হয়ে গেলে আমরাও মুসলমান হয়ে যাব। ফেন গোত্র আমাদের সাথে একতাবদ্ধ হবে, তারাও এ চুক্তিতে আমাদের অংশীদার।

এর পরিপ্রেক্ষিতে وَذُوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ থেকে لَا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

তৃতীয় রেওয়াজে : হয়রত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, سَيُجَدُّونَ الْاٰخِرِيْنَ — আয়াতে আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা মদীনাতে এসে বাহ্যতঃ নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করত এবং স্বগোত্রের কাছে বলতঃ আমরা তো বানর ও বিকৃদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তারাই আবার মুসলমানদের কাছে বলত, আমরা তোমাদের ধর্মে আছি।

যাহ্যাক, হয়রত ইবনে আব্বাস থেকে বনী আবদুদ্দারেরও একই অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়াজে রাসুল-মা'আনীতে এবং তৃতীয় রেওয়াজে মাআলেমে উল্লেখ করা হয়েছে।

হয়রত খানজী (রাঃ) বলেন : তৃতীয় রেওয়াজে বর্ণিত লোকদের অবস্থা প্রথম রেওয়াজে বর্ণিত লোকদের অবস্থার মতই হয়ে গেছে। অর্থাৎ, তারা যে পূর্ব থেকেই মুসলমান নয়, একথা রেওয়াজে থেকেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ কারণেই তারা সাধারণ কাকেরদের অনুরূপ। অর্থাৎ, সন্ধিচুক্তি থাকাকালে তাদের সাথে যুদ্ধ করা চলবে না। কিন্তু সন্ধিচুক্তি না থাকা অবস্থায় যুদ্ধ করা চলবে। সেমতে প্রথম রেওয়াজে বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ, وَلَنْ تَكُوْلُوْا فِحْدًا وَهُمْ — গ্রেফতার করা ও হত্যা করার নির্দেশ এবং তৃতীয় আয়াত

إِذَا الْكَافِرِينَ يَعْلَمُونَ - শাস্তি চুক্তির সময় তাদের ব্যতিক্রম বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয় রেওয়াজেতে তাদের শাস্তিচুক্তি উল্লেখিত হয়েছে। ব্যতিক্রমকে জোরদার করার জন্য পুনরায় وَلَئِنْ اعْتَرَضْتُمْ বলে দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় রেওয়াজেতে বর্ণিত লোকদের সম্পর্কে চতুর্থ আয়াত অর্থাৎ, ... سَيُجَادُونَ الْكَافِرِينَ - এ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যদি তোমাদের থেকে নিবৃত্ত না হয়; বরং লড়াই করে, তবে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ কর। এ থেকে বোঝা যায় যে, তারা সন্ধিচুক্তি করলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। - (বয়ানুল-কোরআন)

মোটকথা, এখানে তিন দল লোকের কথা উল্লেখিত হয়েছে :

(১) মুসলমান হওয়ার জন্যে যে সময় হিজরত করা শর্ত সাব্যস্ত হয়, সে সময় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হিজরত না করে কিংবা হিজরত করার পর দারুল ইসলাম ত্যাগ করে দারুল হরবে চলে যায়।

(২) যারা স্বয়ং মুসলমানদের সাথে 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি করে কিংবা এরূপ চুক্তিকারীদের সাথে চুক্তি করে।

(৩) যারা সাময়িকভাবে বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে শাস্তিচুক্তি করে অতঃপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানানো হলে তাকে অংশগ্রহণ করে এবং চুক্তিতে কায়ম না থাকে।

প্রথম দল সাধারণ কাকেরদের মত। দ্বিতীয় দল হত্যা ও ধরপাকড়ের জগত বহির্ভূত এবং তৃতীয় দল প্রথম দলের অনুরূপ শাস্তির যোগ্য। এসব আয়াতে মোট দু'টি বিধান উল্লেখিত হয়েছে: অর্থাৎ, সন্ধিচুক্তি না থাকা কালে যুদ্ধ এবং সন্ধিচুক্তি থাকাকালে যুদ্ধ নয়।

হিজরতের বিভিন্ন প্রকার ও বিধান : عَمَّا جَاءُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ - ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাকেরদের দেশ থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলমানদের উপর ফরয ছিল। (১) এ কারণে যারা এ ফরয

পরিত্যাগ করত, তাদের সাথে আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের মত ব্যবহার করতে নিষেধ করে দেন। মক্কা বিজিত হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘোষণা করেন : لا هجرة بعد الفتح অর্থাৎ, মক্কা বিজিত হয়ে যখন দারুল ইসলাম হয়ে গেল, তখন সেখান থেকে হিজরত করা ফরয নয়। - (বোখারী) এটা ছিল তখনকার কথা, যখন হিজরত ঈমানের শর্ত ছিল। তখন সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হিজরত করত না, তাকে মুসলমান মনে করা হত না। কিন্তু পরে এ বিধান রহিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার হিজরত কেয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التربة - অর্থাৎ, যতদিন তওবা কবুল হওয়ার সময় থাকবে, ততদিন হিজরত বাকী থাকবে। - (বোখারী)

এ হিজরত সম্পর্কে বোখারীর টীকাকার আল্লামা আইনী লিখেন : “স্থায়ী হিজরতের অর্থ হচ্ছে পাপকর্ম পরিত্যাগ করা।” যেমন, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : المهاجر من هجر ما نهى الله عنه - অর্থাৎ, এ ব্যক্তি মুহাজির, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করে। - (মেরকাত, প্রথম খণ্ড)

এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, পরিভাষায় হিজরত দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়- (১) ধর্মের খাতিরে দেশ ত্যাগ করা; যেমন সাহাবায়ে কেরাম স্বদেশ মক্কা ছেড়ে মদীনা ও আবিসিনিয়ায় চলে যান। (২) পাপ কাজ বর্জন করা।

وَلَا تَجِدُونَ دِينَكُمْ وَلَا نَسَبَكُمْ - এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাকেরদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হারাম। বর্ণিত আছে যে, আনসাররা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে কাকেরদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন :

এ, অরা দুরাচারী জাতি। তাদের প্রয়োজন আমাদের নেই। - (মায়হারী, ২য় খণ্ড)

আনুষ্ঠানিক জাতব্য বিষয়

বোণসূত্র : পূর্ব থেকে হত্যা ও যুদ্ধের আলোচনা চলে এসেছে। হত্যা সর্বমোট আট প্রকার। কেননা, নিহত ব্যক্তি হয় মুসলমান, না হয় যিশী, না হয় চুক্তিবদ্ধ ও অভয়প্রাপ্ত এবং না হয় দারুল হরবের কাকের হাং। এ চার অবস্থার কোন না কোন একটি হবেই। হত্যাকারী দুই প্রকার : হয় ইচ্ছাকৃত, না হয় ব্রমবশতঃ। অতএব, মোট প্রকার হল আটটি : (এক) মুসলমানকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (দুই) মুসলমানকে ব্রমবশতঃ হত্যা, (তিন) যিশীকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (চার) যিশীকে ব্রমবশতঃ হত্যা, (পাঁচ) চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃত হত্যা, (ছয়) চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে ব্রমবশতঃ হত্যা, (সাত) হরবী কাকেরকে ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং (আট) হরবী কাকেরকে ব্রমবশতঃ হত্যা।

এসব প্রকারের মধ্যে কিছু সংখ্যকের বিধান পূর্বে বলা হয়েছে, আর কিছু পরে বর্ণিত হবে এবং কিছু সংখ্যকের বিধান হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে। প্রথম প্রকারের পার্শ্ব বিধান অর্থাৎ, কেসাস ওয়াজেব হওয়া সূরা বাক্বারায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং পারলৌকিক বিধান পরবর্তী আয়াত **وَمُؤْمِرُونَ** —এ বর্ণিত হবে। দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা **وَمَنْ يَقْتُلْ** থেকে **وَمَنْ يَقْتُلْ** আয়াতে আসবে। তৃতীয় প্রকারের বিধান দার-কুতনীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যিশী হত্যার বিনিময়ে রশুলুল্লাহ (সাঃ) মুসলমানের কাছ থেকে কেসাস নিয়েছেন— (তাযবীরজে-হদায়্য)

চতুর্থ প্রকার **وَمَنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَنْتَهُونَ عَنْهُ** আয়াতে উল্লেখিত হবে। পঞ্চম প্রকার পূর্ববর্তী **فَأَجَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا** বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ প্রকারের বিধান চতুর্থ প্রকারের সাথে উল্লেখিত হয়েছে। কেননা, **يَنْتَهُونَ** তথা চুক্তি অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় প্রকারই হতে পারে। অতএব, যিশীও অভয়প্রাপ্ত কাকেরের অন্তর্ভুক্ত। দুরে-মোখতার গ্রন্থের ‘দিয়্যাত’ অধ্যায়ের শুরুতে অভয়প্রাপ্ত উভয় এর রক্ত-বিনিময় ওয়াজিব হওয়ার মাসআলা বিস্তৃতভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম প্রকারের বিধান স্বয়ং জেহাদ আইনসিদ্ধ হওয়ার মাসআলা থেকে পূর্ববর্তী জানা গেছে। কেননা, জেহাদে দারুল-হরবের কাকেরদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিহত করা হয়। অতএব, ব্রমবশতঃ হত্যার বৈধতা আরও সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হবে— (বয়ানুল-কোরআন)

তিন প্রকার হত্যা ও তার বিধান : **عَمْد** প্রথম প্রকার অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃত হত্যা। এর সংজ্ঞা এই বাহ্যতঃ ইচ্ছা করে এমন অশ্রুত দ্বারা হত্যা করা, যা লৌহনির্মিত অথবা অক্সিডেনের ব্যাপারে লৌহনির্মিত অস্ত্রের মত। যথা- বারাল বাশ, বারাল পাথর ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার **عَمْد** অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে ষা সাদৃশ্যপূর্ণ। এর সংজ্ঞা এই : ইচ্ছা করেই হত্যা করা, কিন্তু এমন অশ্রু দ্বারা নয়, যদ্বারা অক্সিডেন হতে পারে।

তৃতীয় প্রকার **خَطَا** অর্থাৎ, ব্রমবশতঃ হত্যা। ইচ্ছা ও গারপায় বশ হওয়া। যেমন, দূর থেকে মানুষকে শিকারী জন্তু কিংবা দারুল-হরবের কাকের মনে করে লক্ষ্য স্থির করতঃ গুলী করে ফেলা কিংবা লক্ষ্যচ্যুতি ঘটা। যেমন, জন্তুকে লক্ষ্য করেই তীর অথবা গুলী ছোঁড়; কিন্তু তা কেন মানুষের গায়ে লেগে যাওয়া। এগুলো সব ব্রমবশতঃ হত্যার অন্তর্ভুক্ত।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَدِيَرَتُهُ رِقَابُهُ وَمُؤْمِنَةٌ وَوَلَدُهَا حُرٌّ مَسْكِينٌ إِلَى أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَقْدُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُمْ مَوْسِرٌ فَتَجَرِيرُ رِقَابِهِ وَمُؤْمِنَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم بَيْنَاتٌ فَدِيَرَةُ مَسْكِينَةٍ إِلَى أَهْلِهَا وَتَجَرِيرُ رِقَابِهِ وَمُؤْمِنَةٌ وَمَنْ كَرِهَ جَدًّا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابَعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدِّيًا فْجَزَاءُ جَهَنَّمَ أَلَدًا فِيهَا وَغَسَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْتَنَاهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتُ مُؤْمِنًا لَبِثْتُمْ عَرَضَ السَّيْلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فَدِيَرَةُ ذَلِكَ كَلْبُكُمْ وَمَنْ قَبِلَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَتَبَيَّنُوا وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَا يَسْتَوِي الْقَتْلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْجَاهِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَادِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَادِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

(৯২) মুসলমানের কাছ নয় যে, মুসলমানকে হত্যা করে, কিন্তু ভুলক্রমে। যে ব্যক্তি মুসলমানকে ভুলক্রমে হত্যা করে, সে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে, কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে এবং যদি সে তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি না পায়, সে আল্লাহর কাছ থেকে গোনাহ মাফ করানোর জন্যে উপযুক্ত দুই মাস রোযা রাখবে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৯৩) যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে মুসলমানকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম, তাতেই সে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে ভীষণ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (৯৪) যে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে, তুমি মুসলমান নও। তোমারা পার্শ্ববর্তী জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তৃতঃ আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমারাও তো এমন ছিলে ইতিপূর্বে; অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করছেন। অতএব, এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কাজকর্মের খবর রাখেন। (৯৫) গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান— যাদের কোন সঙ্গত ওয়র নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করে— সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং এতাকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহেদীনের উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন।

এখানে ভ্রম বলে ‘ইচ্ছা নয়’ বোঝানো হয়েছে। অতএব, দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় প্রকার হত্যাই এর অন্তর্ভুক্ত। উভয় প্রকারের মধ্যে গোনাহ ও রক্ত-বিনিময়ের বিধান রয়েছে। তবে উভয় প্রকারের গোনাহ ও রক্ত-বিনিময় বিভিন্ন রকম। দ্বিতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময় হচ্ছে একশ টুট। উটগুলো চার প্রকারের হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রকারে পাঁচটি করে ঠোঁট থাকবে। তৃতীয় প্রকারের রক্ত-বিনিময়ও একশ টুট। কিন্তু উটগুলো হবে পাঁচ প্রকারের। অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রকারে বিশটি করে উট থাকবে। তবে রক্ত-বিনিময় মুদার মাধ্যমে দিলে উভয় প্রকারে দশ হাজার দেহহাম জম্বা এক হাজার দীনার দিতে হবে। ইচ্ছার কারণে দ্বিতীয় প্রকারের গোনাহ বেশী এবং তৃতীয় প্রকারের গোনাহ কম। অর্থাৎ, শুধু দাসবানততার গোনাহ হবে— (হেদায়া) ক্রীতদাস মুক্তকরণ ওয়াজেব হল্যা এবং তওবা শব্দ দ্বারা একথা বোঝা যায়। উপরোক্ত তিন প্রকারের হত্যার যে স্বরূপ বর্ণিত হল, তা পার্থিব বিধানের দিক দিয়ে। গোনাহর দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত হওয়া আন্তরিক ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। শক্তিবাদীও এরই উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তাআলা জানেন, এদিক দিয়ে প্রথম প্রকার অনিচ্ছাকৃত এবং দ্বিতীয় প্রকার ইচ্ছাকৃত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

০ রক্ত-বিনিময়ের উপরোক্ত পরিমাণ তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন নিহত ব্যক্তি পুরুষ হবে। পক্ষান্তরে মহিলা হলে এর পরিমাণ হবে অর্ধেক।— (হেদায়া)

০ মুসলমান ও যিশীির রক্ত-বিনিময় সমান। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :
دِيَةُ كُلِّ ذِي عَهْدٍ فِي عَهْدِ الْفِ دِينَار (হেদায়া, আবু-দাউদ)

০ কাফ্ফারা অর্থাৎ, ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোযা রাখা স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্ত-বিনিময় হত্যাকারীর স্বজনদের যিশ্মায় ওয়াজেব। শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে ‘আকেলা’ বলা হয়।— (বয়ানুল-কোরআন)

এখানে প্রশ্ন করা উচিত হবে না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা তার স্বজনদের উপর কেন চাপানো হয়? তারা তো নিরপরাধ। এর কারণ এই যে, হত্যাকারীর স্বজনরাও দোষী। তারা তাকে এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল কাজ-কর্মে বাধা দেয়নি। রক্ত-বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা তার দেখাশোনা করতে ক্রটি করবে না।

০ কাফ্ফারায় বাদী ও ক্রীতদাস সমান। ذُرِّيَّةُ শব্দে উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। তবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হতে হবে।

০ নিহত ব্যক্তির রক্ত-বিনিময় তার ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হবে। কোন ওয়ারিস স্বীয় অংশ মাফ করে দিলে সে পরিমাণ মাফ হয়ে যাবে। সবাই মাফ করে দিলে সম্পূর্ণ মাফ হয়ে যাবে।

০ যে নিহত ব্যক্তির কোন ওয়ারিস নেই; তার রক্ত-বিনিময় বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগারে জমা হবে। কেননা, রক্ত-বিনিময় ত্যাজ্য সম্পত্তি। ত্যাজ্য সম্পত্তির বিধান তাই।— (বয়ানুল-কোরআন)

চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায় (যিশীি অথবা অভয়প্রাপ্ত) —এর ক্ষেত্রে যে রক্ত-বিনিময় ওয়াজেব হয়, বাহ্যতঃ তা তখনই হয়, যখন যিশীি কিংবা অভয়প্রাপ্তের পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকে। পক্ষান্তরে যদি তার পরিবার-পরিজন বিদ্যমান না থাকে কিংবা তারা অমুসলমান হয়; মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হতে পারে না বলে এরূপ পরিবার-পরিজন বিদ্যমান থাকা না থাকারই শামিল— এমন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি যিশীি হলে তার

রক্ত-বিনিময় বায়তুল মালে জমা হবে। কেননা, যিশীি বে-ওয়ারিসের ত্যাজ্য সম্পত্তি রক্ত-বিনিময়সহ বায়তুল মালে যায়। (দূররে মোখতার) নিহত ব্যক্তি যিশীি না হলে রক্ত-বিনিময় ওয়াজেব হবে না।— (বয়ানুল-কোরআন)

০ কাফ্ফারার রোযায় যদি রোগ-ব্যধির কারণে উপরূপরিতা ক্ষুণ্ণ হয়, তবে প্রথম থেকে রোযা রাখতে হবে। অবশ্য মহিলাদের ঋতুস্রাবের কারণে যে রোযা ভাঙতে হয় তাতে উপরূপরিতা ক্ষুণ্ণ হবে না।

০ ওয়রবশতঃ রোযা রাখতে সক্ষম না হলে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তওবা করবে।

০ ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় কাফ্ফারা নেই— তওবা করা উচিত।— (বয়ানুল-কোরআন)

মুসলমান মনে করার জন্যে ইসলামী লক্ষ্যাদিই যথেষ্ট : উল্লেখিত তিনটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কেউ মুসলমান বলে নিজেকে পরিচয় দিলে অনুসন্ধান ব্যতিরেকে তার উক্তিকে কপটতা মনে করা কোন মুসলমানের জন্যেই বৈধ নয়। এ ব্যাপারে কোন কোন সাহাবী থেকে ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

তিরমিযী ও মুসনাদে-আহমদ গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, বনী-সুলায়মের এক ব্যক্তি একদিন ছাগলের পাল চরানো অবস্থায় একদল মুজাহিদ সাহাবীর সম্মুখে পতিত হয়। সে মুজাহিদ দলকে সালাম করল। তার পক্ষ থেকে এ বিষয়ের কার্যতঃ অভিব্যক্তি ছিল যে, সে একজন মুসলমান। কিন্তু মুজাহিদরা মনে করলেন যে, সে শুধু জীবন ও ছাগলের পাল রক্ষা করার জন্যেই এ প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে। এ সন্দেহে তাঁরা লোকটিকে হত্যা করে তার ছাগলের পাল অধিকার করে নিলেন এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর কাছে উপস্থিত করলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি ইসলামী পদ্ধতিতে তোমাকে সালাম করে, তার সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ করা না যে, সে প্রতারণাপূর্বক নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করেছে। তার অর্থ-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ মাল মনে করে অধিকারে নিও না।— (ইবনে-কাসীর)

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে এ দুটি ঘটনা ছাড়া আরও ঘটনাবলী বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সুবিজ্ঞ তফসীরবিদগণ বলেছেন, এসব রেওয়াজেতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। সমষ্টিগতভাবে কয়েকটি ঘটনাও আয়াতটি অবতরণের হেতু হতে পারে।

ঘটনার তদন্ত না করে সিদ্ধান্ত নেয়া বৈধ নয় : আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে একটি সাধারণ নির্দেশ রয়েছে যে, মুসলমানরা কোন কাজ সত্যাসত্য যাচাই না করে শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে করবে না। বলা হয়েছে :
إِذَا عَزَمْتَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْأُمُورِ فَتَبَيَّنْهُ
অর্থাৎ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন সত্যাসত্য অনুসন্ধান করে সব কাজ করো। শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করলে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়। সম্ভ্রান্ত ঘটনাবলী সফরে সংঘটিত হয়েছিল বলে আয়াতে সফর উল্লেখ করা হয়েছে। কিংবা এর কারণ এও হতে পারে যে, সাধারণতঃ সফরে থাকা অবস্থায় অন্যের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়। নিজ শহরে অন্যের অবস্থা সাধারণতঃ জানা থাকে। তাই আসল নির্দেশটি ব্যাপক। অর্থাৎ, সফরে হোক কিংবা বাসস্থানে হোক, সর্বত্রই খোঁজ-খবর না নিয়ে কোন

পদক্ষেপ গ্রহণ করা বৈধ নয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে : ভেবে-চিন্তে কাজ করা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তড়িঘড়ি কাজ করা শয়তানের পক্ষ থেকে — (বাহর-মুহীত)

কেবলার অনুসারীকে কাকের না বলার তাৎপর্য : এ আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা জানা গেল যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমানরূপে পরিচয় দেয়, কলেমা পাঠ করে কিংবা অন্য কোন ইসলামী বৈশিষ্ট্য যথা নামায, আযান ইত্যাদিতে যোগদান করে, তাকে মুসলমান মনে করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। তার সাথে মুসলমানদের মতই ব্যবহার করতে হবে এবং সে আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়েছে না কোন স্বাধসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, একথা প্রমাণ করার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

এছাড়া এ ব্যাপারে তার কাজকর্মের উপরও উপরোক্ত নির্দেশ নির্ভরশীল হবে না। মনে করুন, সে নামায পড়ে না, রোযা রাখে না এবং সর্বপ্রকার গোনাহে জড়িত, তবুও তাকে ইসলাম বহির্ভূত বলার কিংবা তার সাথে কাকের মত ব্যবহার করার অধিকার কারও নেই। এ কারণেই ইমাম আযম আবু-হানীফা (রহঃ) বলেন : “আমরা কেবলার অনুসারীকে কোন পাপ কার্যের কারণে কাকের সাব্যস্ত করি না।” কোন কোন হাদীসে এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত আছে যে, যত গোনাহ্গার দুশ্খমীই হোক, কেবলার অনুসারীকে কাকের বলা না।

কিন্তু এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রাধান্যযোগ্য ও স্মরণযোগ্য যে, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে, কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী তাকে কাকের বলা বা মনে করা বৈধ নয়। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কুফরের নিশ্চিত লক্ষণ, এরূপ কোন কথা বা কাজ যতক্ষণ তার দ্বারা সংঘটিত না হবে, ততক্ষণ তার ইসলামের স্বীকারোক্তিকে বিশুদ্ধ মনে করা হবে এবং তাকে মুসলমানই বলা হবে। তার সাথে মুসলমানের মতই

ব্যবহার করা হবে এবং তার আন্তরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করার অধিকার কারও থাকবে না।

কিন্তু যে ব্যক্তি ইসলাম ও ঈমান প্রকাশ করার সাথে সাথে কিছু কুফরী কলেমাও বকাবকি করে, অথবা প্রতিমাকে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করে কিংবা ইসলামের কোন অকাটা ও স্বতঃসিদ্ধ নির্দেশ অস্বীকার করে কিংবা কাকেরদের কোন ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করে; যেমন, পলায় পৈতা পরা ইত্যাদি, তবে তাকে সন্দেহাতীতভাবে কুফরী কাজকর্মের কারণে কাকের আখ্যা দেওয়া হবে। আলোচ্য আয়াতের শব্দে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। নতুবা ইহুদী ও খৃষ্টান সবাই নিজেকে মুমিন-মুসলমান বলত। মুসায়লামা কামযাব শুধু কলেমার স্বীকারোক্তিরই নয়, ইসলামী বৈশিষ্ট্য, যথা নামায, আযান ইত্যাদিরও অনুগামী ছিল। আযানে ‘আশহদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’—এর সাথে ‘আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ ও উচ্চারণ করত। কিন্তু সাথে সাথে সে নিজেকেও নবী-রাসূল ও ঈদার অধিকারী বলে দাবী করত, যা কোরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ। এ কারণেই তাকে ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত করা হয় এবং সাহাবায়ে কোরাসে এজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে জেহাদ করে তাকে হত্যা করা হয়।

মোটামুটি মাসআলা হল এই যে, প্রত্যেক কলেমা উচ্চারণকারী কেবলার অনুসারীকে মুসলমান মনে কর। তার অন্তরে কি আছে, তা খোঁজাখুঁজি করার প্রয়োজন নেই। অন্তরের বিষয় আল্লাহর হাতে সর্পদ কর। তবে ঈমান প্রকাশের সাথে সাথে ঈমান বিরোধী কোন কাজ সংঘটিত হলে তাকে মূর্তাদ অর্থাৎ, ধর্মত্যাগী মনে কর। এর জন্যে শর্ত এই যে, কাজটি যে ঈমান বিরোধী, তা অকাটা ও নিশ্চিত হতে হবে। এতে কোনরূপ দ্ব্যর্থতার অবকাশ না থাকা চাই।

دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا
رَحِيمًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُم بِالْحَيْكَةِ ظَالِمِينَ
أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ
فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَاجِرُوا
فِيهَا قَالُوا لَوْلَا مَا أُولَاهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝
إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝
قَالُوا لَكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُوًّا غَفُورًا ۝ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ
فِي الْأَرْضِ مُرْعًا كَثِيرًا وَاسِعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ
مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا ۝ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ تَفْتِكُمْ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا أَلْكُمُ عَدُوًّا مُبِينًا ۝

(৬৬) এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (৬৭) যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে : এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে : আল্লাহ্র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। (৬৮) কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না। (৬৯) অতএব, আশা করা যায়, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ মাজনাকারী, ক্ষমাশীল। (৭০) যে কেউ আল্লাহ্র পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সম্ভ্রলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অজ্ঞপ্ত মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহ্র কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৭০১) যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হিজরতের সংজ্ঞা : আলোচ্য চারটি আয়াতে হিজরতের ফযীলত, বরকত ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। অভিধানে হিজরত শব্দটি ‘হিজরান’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, অসম্পৃষ্টিচিন্তে কোন কিছুকে ত্যাগ করা। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় দেশত্যাগ করাকে হিজরত বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় দারুল-কুফর তথা কাফেরদের দেশ ত্যাগ করে দারুল-ইসলাম তথা মুসলমানদের দেশে গমন করার নাম হিজরত — (ক্বল-মা’ আনী)

মোল্লা আলী হারী মেশকাতের শরায় বলেন : ধর্মীয় কারণে কোন দেশ ত্যাগ করাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত — (মেরকাত, ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃঃ)

الَّذِينَ خَرَجُوا মুহাজির সাহাবীগণের সম্পর্কে অবতীর্ণ সূরা হাশরের আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন দেশের কাফেররা যদি মুসলমানকে মুসলমান হওয়ার কারণে দেশ থেকে জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে বহিস্কার করে তবে তাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত।

হিজরতের ফযীলত : জেহাদ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ যেমন সমগ্র কোরআন পাকে ছড়িয়ে রয়েছে, তেমনি হিজরতের বর্ণনাও কোরআন পাকের অধিকাংশ সূরায় একাধিকবার বিবৃত হয়েছে। সবগুলো আয়াত একত্রিত করলে জানা যায় যে, হিজরত সম্পর্কিত আয়াতসমূহে তিন রকমের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। (এক) হিজরতের ফযীলত, (দুই) হিজরতের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বরকত এবং (তিন) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দারুল-কুফর থেকে হিজরত না করার কারণে শাস্তিবানী।

হিজরতের ফযীলত সম্পর্কিত প্রথম বিষয়বস্তু সূরা বাক্বারার এক আয়াতে রয়েছে –

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجِهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ-প্রার্থী। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়।

দ্বিতীয় আয়াত – সূরা তওবায় আছে :

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجِهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে ও হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র পথে জ্ঞান ও মাল দ্বারা জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহ্র কাছে বিরাট পদমর্যাদার অধিকারী এবং তারাই সফলকাম।

তৃতীয় আয়াত— আলোচ্য সূরা নিসার :

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসুলের নিয়তে নিজ গৃহ থেকে বেরিয়ে

পাথেই মৃত্যুবরণ করে তার সওয়াব আল্লাহর যিম্মায় সাব্যস্ত হয়ে যায়।

কোন কোন রেওয়াজেহতে এ আয়াতটি হযরত খালেদ ইবনে হেযাম সম্পর্কে আবিসিনিয়ায় হিজরতের সময় অবতীর্ণ হয়। তিনি মক্কা থেকে হিজরতের নিয়তে আবিসিনিয়ার পাথে রওয়ানা হয়ে যান। পশ্চিমধ্যে সর্প-দংশনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মোটকথা, উপরোক্ত তিনটি আয়াতে দারুল-কুফর থেকে হিজরতে উৎসাহদান এবং এর বিরটি ফযীলত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : ‘হিজরত পূর্বকৃত সব গোনাহকে নিঃশেষ করে দেয়।

হিজরতের বরকতঃ হিজরত বরকত সম্পর্কে সূরা নাহলের এক আয়াতে বলা হয়েছে :

“যারা আল্লাহর জন্যে হিজরত করে নির্ধাতিত হওয়ার পর, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা দান করব এবং পরকালের বিরটি সওয়াব তো রয়েছেই, যদি তারা বুঝে।”

সূরা নিসার উল্লেখিত চার আয়াতে বলা হয়েছে : “যে ব্যক্তি আল্লাহর পাথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে অনেক জায়গা ও সুযোগ-সুবিধা পাবে।”

আয়াতে বর্ণিত مراغم শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া। স্থানান্তরিত হওয়ার জায়গাকেও অনেক সময় مَرْغَم বলে দেয়া হয়।

এ আয়াতদুয়ে হিজরতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বরকত বর্ণিত

হয়েছে। এতে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের জন্যে হিজরত করে, আল্লাহ তার জন্যে দুনিয়াতে অনেক পথ খুলে দেন। সে দুনিয়াতেও উত্তম অবস্থান লাভ করে এবং পরকালের সওয়াব ও পদমর্যাদা তো কম্পনাভীত।

মোটকথা এই যে, আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে মুহাজিরদের জন্যে যে ওয়াদা করেছেন, জগদদাসী তা স্বচক্ষে দেখে নিচ্ছে। তবে আলোচ্য আয়াতেই এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে যে, اَجْرًا ۖ وَآلِهًا ۚ আল্লাহর পাথে হিজরত হওয়া চাই। পার্থিব ধন-সম্পদ, রাজত্ব, সম্মান অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তির অনুেষায় হিজরত না হওয়া চাই। বোখারীর হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও রসুলের জন্যেই হয়। অর্থাৎ, এটিই বিশুদ্ধ হিজরত। এর ফযীলত ও বরকত কোরআন পাকে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে “যে ব্যক্তি অর্থের অনুেষণে কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরতের বিনিময়ে ই বস্ত্তই পাবে, যার জন্য সে হিজরত করে।”

আজকাল কিছুসংখ্যক মুহাজিরকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখা যায়। হয় তারা এখনও অন্তর্বর্তীকালে অবস্থান করছে, অর্থাৎ, হিজরতের প্রাথমিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে, না হয় তারা সঠিক অর্থে মুহাজির নয়। স্বীয় নিয়ত ও অবস্থা সংশোধনের প্রতি তাদের মনোনিবেশ করা উচিত। নিয়ত ও আমল সংশোধন করার পর তারা আল্লাহ তাআলার ওয়াদার সত্য স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

وَإِذْ أَكُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا آسِيحتَهُمْ وَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ زُرَّارِكُمْ وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَوْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا إِحْدَهُمْ وَآسِيحتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسِيحتِكُمْ وَأَمْتِيحتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسِيحتَكُمْ وَخُذُوا إِحْدَهُمْ بِكُلِّ مَنَاحٍ اللَّهُ أَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝ وَلَا تَهْجُرُوا فِي بُتْعَاءِ الْفَوْمِ ۚ إِنَّ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَالِئِينَ حَافِيًا ۝

(১০২) যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর নামাযে দাঁড়ান, তখন কেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর যখন তারা সেজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা নামায পড়েন। অতঃপর তারা কেন আপনার সাথে নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। ক্রফের চায় যে, তোমরা কোনরূপে অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোন গোনাহ নেই এবং সাথে নিয়ে নাও তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র। নিশ্চয় আল্লাহ ক্রফেরদের জন্যে অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (১০৩) অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদযুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (১০৪) তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত, তবে তারাও তো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং তোমরা আল্লাহর কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (১০৫) নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। আপনি বিশৃঙ্খলিতকদের পক্ষ থেকে বিতর্ককারী হবেন না।

যোগসূত্র : পূর্বে জেহাদ ও হিজরতের আলোচনা ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জেহাদ ও হিজরতের জন্যে সফর করতে হয় এবং এ জাতীয় সফরে শত্রুদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কাও থাকে। তাই সফর ও আতঙ্কবাহার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধা ও সংক্ষিপ্ততা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হচ্ছে।

সফর ও কসরের বিধান : তিন মনযিল থেকে কম দূরত্বের সফরে পূর্ণ নামায পড়া হয়।

০ সফর শেষ করে গন্তব্যস্থলে পৌছার পর যদি সেখানে পনের দিনের কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে সে অবস্থানও সফরের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় চার রাকআতবিশিষ্ট ফরয নামায অর্ধেক পড়তে হবে। একে শরীয়তের পরিভাষায় ‘কসর’ বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি একই জনপদে পনের দিন অথবা তদুর্ধ্ব সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে তা সাময়িক বাসস্থান হিসেবে গণ্য হবে। এমন জায়গায় অস্থায়ী বাসস্থানের মত কসর পড়তে হবে না— পূর্ণ নামায পড়তে হবে।

০ কসর শুধু তিন ওয়াক্তের ফরয নামাযে হবে। মাগরিব, ফজর, এবং সূর্য ও বেতরের নামাযে কসর নেই।

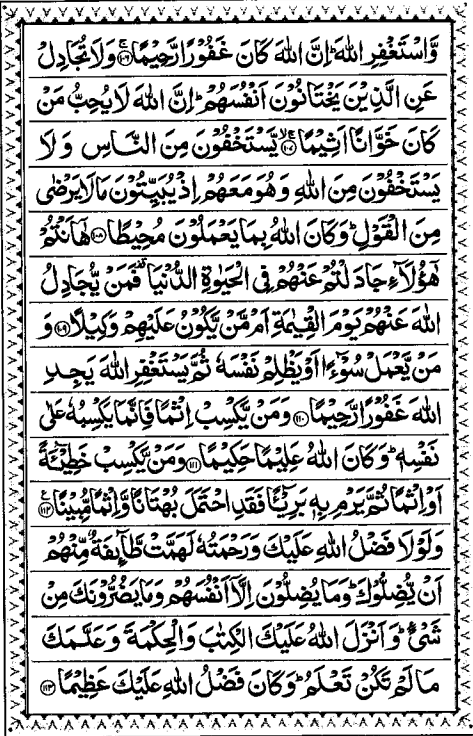
০ পূর্ণ নামাযের স্থলে অর্ধেক পড়ার মধ্যে কারণ মনে এরূপ ধারণা আনাগোনা করে যে, বোধহয় এতে নামায পূর্ণ হলো না, এটা ঠিক নয়। কারণ, কসরও শরীয়তেরই নির্দেশ। এ নির্দেশ পালনে গোনাহ হয় না; বরং সওয়াব পাওয়া যায়।

০ আয়াতে **وَإِذْ أَكُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ** বলা হয়েছে (অর্থাৎ, আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন), এতে এরূপ মনে করার অবকাশ নেই যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর তিরোধানের পর এখন ‘সালাতুল-খওফ’-এর বিধান নেই। কেননা, তখনকার অবস্থা অনুযায়ী আয়াতে এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে। নবী বিদ্যমান থাকলে ওয়র ব্যতীত অন্য কেউ নামাযে ইমাম হতে পারে না। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পর এখন যে ইমাম হবেন, তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং ‘সালাতুল-খওফ’ পড়বেন। সব ফেকাহবিদের মতে সালাতুল-খওফের বিধান এখনও অব্যাহত রয়েছে— রহিত হয়নি।

০ মানুষের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কার কারণে ‘সালাতুল-খওফ’ পড়া যেমন জায়েয, তেমনিভাবে যদি বায়-ভালুক কিংবা অজগর ইত্যাদির ভয় থাকে এবং নামাযের সময়ও সংকীর্ণ হয়, তাহলে তখনও ‘সালাতুল খওফ’ পড়া জায়েয।

০ আয়াতে উভয় দলের এক এক রাকআত পড়ার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রাকআতের নিয়ম হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) দু’ রাকআতের পর সালাম ফিরিয়েছেন।—(বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে দ্রষ্টব্য)

আয়াতের শানে নুযুল : সূরা নিসার ১০৫ থেকে সাতটি আয়াত এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু কোরআনের সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী এ ব্যাপারে প্রদত্ত নির্দেশাবলী এ ঘটনার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতে আগমনকারী মুসলমানদের জন্যে ব্যাপক। এছাড়া এসব নির্দেশের মধ্যে অনেক মৌলিক ও শাখাগত মাসআলাও রয়েছে।



(১০৬) এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমশীল, দয়ালু। (১০৭) যারা মনে বিশ্বাসঘাতকতা পোষণ করে তাদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করবেন না। আল্লাহ পছন্দ করেন না তাকে, যে বিশ্বাসঘাতক পাগী হয়। (১০৮) তারা মানুষের কাছে লজ্জিত হয় এবং আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয় না। তিনি তাদের সাথে রয়েছেন, যখন তারা রাতে এমন বিষয়ে পরামর্শ করে, যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট নন। তারা যাকিছু করে, সবই আল্লাহর আয়ত্তাধীন। (১০৯) শুনহ? তোমরা তাদের পক্ষ থেকে পার্শ্বি জীবনে বিবাদ করছ, অতঃপর কেয়ামতের দিনে তাদের পক্ষ হয়ে আল্লাহর সাথে কে বিবাদ করবে অথবা কে তাদের কার্যনির্বাহী হবে। (১১০) যে গোনাহ করে কিংবা নিজের অনিষ্ট করে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমশীল, করুণাময় পায়। (১১১) যে কেউ গাপ করে, সে নিজের পক্ষেই করে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (১১২) যে ব্যক্তি ভুল কিংবা গোনাহ করে, অতঃপর কোন নিরপরাধের উপর অপবাদ আরোপ করে সে নিজের মাধ্যম বহন করে জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গোনাহ। (১১৩) যদি আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা না হত, তবে তাদের একদল আপনাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল। তারা পথভ্রান্ত করতে পারে না কিন্তু নিজেদেরকেই এবং আপনার কোন অনিষ্ট করতে পারে না। আল্লাহ আপনার প্রতি ঐশীগ্রহ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, হিজরতের প্রাথমিক যুগে সাধারণ মুসলমানরা দারিদ্র্য ও অনাহারে দিনাতিপাত করতেন। তাঁদের সাধারণ খাদ্য ছিল যবের আটা কিংবা খেজুর অথবা গমের আটা। এগুলো খুব দুর্ভুত ছিল এক মদীনায় প্রায় পাওয়াই যেত না। সিরিয়া থেকে চালান এলে কেউ কেউ মেহমানদের জন্যে কিংবা বিশেষ প্রয়োজনের জন্য ক্রয় করে রাখত হযরত রেফাআহ্ এমনিভাবে কিছু গমের আটা কিনে একটি বস্তায় বেঁধে দিয়েছিলেন। এ বস্তার মধ্যেই কিছু অশ্রদ্ধশত্রুও রেখে একটি ছোট কক্ষে সংরক্ষিত রেখেছিলেন। বশীর কিংবা তো'মা সিম কেটে বস্তা বের করে নেয়। সকালে হযরত রেফাআহ্ ব্যাপার দেশে ভ্রাতৃস্পৃহ কাতাদার কাছে ঘটনা বিবৃত করলেন। সবাই মিলে মহল্লায় খোজাখুজি শুরু করলেন। কেউ কেউ বলল, আজ রাতে আমরা বনী-উবায়রাকের ঘরে আগুন জ্বলতে দেখেছি। মনে হয় সে খাদ্যই পাকানো হয়েছে। রহস্য কাঁস হয়ে পড়ার সংবাদ পেয়ে বনী-উবায়রাক নিজেরাই এসে হাযির হল এবং বলল এটা লবীদ ইবনে সাহ্লেদের কাজ। আমরা তো তাকে খাটি মুসলমান বলেই জানতাম। খবর পেয়ে লবীদ তরবারী কোষমুক্ত করে এলেন এবং বললেন : তোমরা আমাকে চোর বলছ? শুনে নাও, চুরির রহস্য উদ্ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ তরবারি কোষবদ্ধ করব না।

বনী-উবায়রাক আস্তে বলল : আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার নাম কেউ নেয় না। আপনার দ্বারা একাজ হতেও পারে না। বগতী ও ইবনে-জরীরের রেওয়ায়েতে এস্থলে বলা হয়েছে যে, বনী-উবায়রাক জনৈক ইহুদীর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। খুর্তাবশতঃ তারা আটার বস্তা সামান্য ছিঁড়ে ফেলেছিল। ফলে রেফাআহ্র গৃহ থেকে উপরোক্ত ইহুদীর গৃহ পর্যন্ত আটার লক্ষণ পাওয়া গেল। জানাজানির পর চোরাই অশ্রদ্ধশত্রু এবং লৌহ-বর্মও ইহুদীর কাছাকাছি রেখে দিল। তদন্তের সময় তার গৃহ থেকেই এগুলো বের হল। ইহুদী কসম খেয়ে বলল, ইবনে-উবায়রাক আমাকে লৌহ-বর্মটি দিয়েছে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েত ও বগতীর রেওয়ায়েতে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, বনী-উবায়রাক প্রথমে দেখল যে, এটা ধোঁপে টিকবে না, তখন ইহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। যাহোক, এখন বিষয়টি বনী-উবায়রাক ও ইহুদীর মধ্যে গিয়ে গড়ায়।

এদিকে বিভিন্ন পন্থায় হজরত কাতাদা ও রেফাআহ্র প্রবল ধার্মা জন্মেছিল যে, এটি বনী-উবায়রাকেরই কীর্তি। হযরত কাতাদা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে চুরির ঘটনা এবং তদন্তক্রমে বনী-উবায়রাকের প্রতি প্রবল ধারণার কথা আলোচনা করলেন। বনী-উবায়রাক সংবাদ পেয়ে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে রেফাআহ্ ও কাতাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে, শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়াই তারা আমাদের নামে চুরির অপবাদ আরোপ করছে। অথচ চোরাই মাল ইহুদীর ঘর থেকে বের হয়েছে। আপনি তাদেরকে বারণ করুন, তারা কে আমাদেরকে দোষারোপ না করে এবং ইহুদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এরও প্রবল ধার্মা জন্মে যে, এ কাজটি ইহুদীর। বনী-উবায়রাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ঠিক নয়। বগতীর রেওয়ায়েতে আছে, এমন কি, তিনি ইহুদীর উপর চুরির শাস্তি প্রয়োগ করার এবং হস্ত কর্তন করার বিষয়ও স্থির করে ফেলেন।

এদিকে কাতাদা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি কালেন : আপনি বিনা প্রমাণে একটি মুসলমান পরিবারকে চুরির জন্য দোষারোপ করছেন। এতে হযরত কাতাদা খুব দুঃখিত হলেন এবং দোষারোপ করে বললেন, আমার মাল গেলেও এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে কোন কিছু না বলাই ভাল ছিল। এমনিভাবে হযরত রেকাআহকেও তিনি এ ধরনের কথা বললেন। রেকাআহও ধৈর্যধারণ করলেন এবং বললেন : **وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ** (আল্লাহ সহায়)।

বেশীদিন অতিবাহিত না হতেই এ ব্যাপারে কোরআন পাকের পূর্ণ একটি রুকু অবতীর্ণ হয়। এর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে ঘটনার বস্তুরূপ তুলে ধরা হয় এবং এ জাতীয় ব্যাপারাদি সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ দান করা হয়।

কোরআন পাক বনী উবায়রাকের চুরি ফাঁস করে ইহুদীকে দোষমুক্ত করে দিল। এতে বনী-উবায়রাক বাধ্য হয়ে চোরাই মাল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে সমর্পণ করল। তিনি রেকাআহকে তা প্রত্যর্পণ করলেন। রেকাআহ সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র জেহাদের জন্যে ওয়াকফ করে দিলেন। এদিকে বনী-উবায়রাকের চুরি প্রকাশ হয়ে পড়লে বশীর ইবনে-উবায়রাক মদীনা থেকে পলায়ন করল এবং মক্কার কাফেরদের সাথে একাত্ম হয়ে গেল। সে পূর্বে মুনাক্কে থাকলে এবার প্রকাশ্য কাফের এবং পূর্বে মুসলমান থাকলে এবার ধর্মত্যাগী হয়ে গেল।

তফসীর বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের পাপ বশীরকে মক্কাযও শান্তিতে থাকতে দেয়নি। যে মহিলার গৃহে সে আশ্রয় নিয়েছিল, সে ঘটনা জানতে পেয়ে তাকে বহিস্কার করে দিল। এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সে এক ব্যক্তির গৃহে সিঁধ কাটে এবং প্রাচীর চাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এ পর্যন্ত ছিল ঘটনার বিবরণ; এবার এ সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য শুন। প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে চুরির ঘটনার আসল স্বরূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে : আমি আপনার প্রতি কোরআন ও ওহী এজন্যে অবতারণ করেছি, যাতে আপনি আল্লাহ-প্রদত্ত জ্ঞান ও তত্ত্ব অনুযায়ী ফয়সালা করেন এবং বিশ্বাসঘাতকদের অর্থাৎ, বনী-উবায়রাকের পক্ষপাতিত্ব না করেন। যদিও বাহ্যিক অবস্থা ও লক্ষণাদি দৃষ্টে চুরির ব্যাপারে ইহুদীর প্রতি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রবল ধারণা হওয়া কোন গোনাহ ছিল না; কিন্তু ছিল বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী। তাই দ্বিতীয় আয়াতে তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, পয়গম্বরগণের স্থান অনেক উর্ধ্বে। এতটুকু ব্যাপারও তাঁর পক্ষে শোভা পায় না।

তৃতীয় (অর্থাৎ, ১০৭) আয়াতে পুনরায় তাকিদ করা হয়েছে যে, আপনি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে পক্ষে কোন বিতর্ক করবেন না। কেননা, আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করে না।

চতুর্থ (অর্থাৎ, ১০৮) আয়াতে বিশ্বাসঘাতকদের জঘন্য অবস্থা ও নির্বুদ্ধিতা ব্যক্ত হয়েছে যে, তারা নিজেদের মত মানুষের কাছে তো লজ্জাবোধ করে এবং চুরি গোপন করে; কিন্তু আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয় না, যিনি সর্বদা তাদের সাথে রয়েছেন এবং তাদের প্রত্যেক কাজ নিরীক্ষণ করছেন; বিশেষ করে এ ঘটনাটি দেখেছেন যে, তারা পরস্পর পরামর্শ করে স্থির করে যে, ইহুদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ কর, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে রেকাআহ ও কাতাদার বিরুদ্ধে নালিশ কর এবং তাঁকে অনুরোধ কর তিনি যেন ইহুদীর বিরুদ্ধে আমাদিগকে সমর্থন করেন।

পঞ্চম (অর্থাৎ, ১০৯) আয়াতে বনী-উবায়রাকের সমর্থকদেরকে

ইশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে তো তোমরা তাদের সমর্থন করলে; কিন্তু ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। কেয়ামতে যখন আল্লাহর আদালতে মোকদ্দমার শুনানী হবে, তখন কে সমর্থন করবে? এ আয়াতে তাদেরকে একাধারে তিরস্কার করা হয়েছে এবং পরকালের ভীতি প্রদর্শন করে স্বীয় দুষ্কর্মের জন্যে তওবা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ (অর্থাৎ, ১১০) আয়াতে কোরআন পাকের সাধারণ বিজ্ঞোচিত পদ্ধতি অনুযায়ী অপরাধী-পাপীদেরকে নৈরাশ্য থেকে উদ্ধার করার জন্যে বলা হয়েছে যে, ছোট গোনাহ হোক বা বড় গোনাহ, গোনাহগার ব্যক্তি যখন আল্লাহর কাছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহকে ক্ষমাশীল করুণাময় পায়। এতেকরে উপরোক্ত গোনাহে যারা জড়িত ছিল, তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে যে, এখনও সময় আছে ফিরে এস। ঈশাটি মনে তওবা করলে কিছুই নষ্ট হয়নি, আল্লাহ তাআলা মাফ করবেন।

সপ্তম (অর্থাৎ, ১১১) আয়াতে ইশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা এখনও যদি তওবা না করে, তাহলে তাতে আল্লাহর রসূল কিংবা মুসলমানদের কোন ক্ষতি হবে না; বরং এ পাপের বোঝা তাদেরকেই বহন করতে হবে।

অষ্টম (অর্থাৎ, ১১২) আয়াতে একটি সাধারণ বিধির আকারে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজে কোন অপরাধ করে তা অন্য নিরপরাধ ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, (যেমন বর্ণিত ঘটনায় বনী-উবায়রাক নিজে চুরি করে হযরত লবীদ অথবা ইহুদীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল) সে জঘন্য অপবাদ এবং প্রকাশ্য গোনাহর বোঝা নিজে বহন করে।

নবম (অর্থাৎ, ১১৩) আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী না হলে তাঁরা আপনাকে বিভ্রান্ত করে দিত। তিনি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে সত্য ঘটনা বলে দিয়েছেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা আপনার সঙ্গী। তাই কখনও তারা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে না; বরং নিজেরাই পথভ্রষ্ট হবে। আপনার বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি করতে পারে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি ঐশীগ্রহ এবং জ্ঞানগর্ভ বিষয়াদি অবতারণ করেছেন, যা আপনি ইতিপূর্বে জানতেন না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইজতিহাদ করার অধিকার : **لِلرَّسُولِ الْاِجْتِهَادُ**

আয়াত থেকে পাঁচটি বিষয় প্রমাণিত হয়। (এক) যেসব বিষয় সম্পর্কে কোরআন পাকে কোন স্পষ্ট উক্তি বর্ণিত নেই সেগুলোতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিজ মতামত দ্বারা ইজতিহাদ করার অধিকার ছিল। জরুরী বিষয়াদিতে তিনি অনেক ফয়সালা স্বীয় ইজতিহাদ দ্বারাও করতেন।

(দুই) আল্লাহ তাআলার কাছে সে ইজতিহাদই গ্রহণযোগ্য, যা কোরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি থেকে গৃহীত। এব্যাপারে নিছক ব্যক্তিগত মতামত ও ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়, শরীয়তের পরিভাষায় একে ইজতিহাদ বলা যায় না।

(তিন) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইজতিহাদ অন্যান্য মুজতাহিদ ইমামের ইজতিহাদের মত ছিল না, যাতে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। তিনি যখন ইজতিহাদের মাধ্যমে কোন ফাসলা করতেন, তাতে কোন ভুল হয়ে গেলে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে সতর্ক করে ফয়সালাকে নির্ভুল ও সঠিক করিয়ে দিতেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন ইজতিহাদী ফয়সালায় পর আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি এ সম্পর্কে কোন ইশিয়ারী অবতীর্ণ না হত, তবে তাতে

প্রতিভাত হত যে, ফয়সালাটি আল্লাহর পছন্দনীয় ও নির্ভুল হয়েছে।

(চার) রসুলুল্লাহ (সাঃ) কোরআন থেকে যাকিছু বুঝতেন, তা ছিল আল্লাহ তাআলারই বোঝানো বিষয়। এতে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ ছিল না। অন্যান্য আলেম ও মুক্তাহিদের অবস্থা তেমন নয়। তাঁরা যা বোঝেন সে সম্পর্কে একথা বলা যায় না যে, আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে বলে দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন। এ কারণেই

فَاحْكُم بَمَا أَرَاكَ اللَّهُ (অর্থাৎ, আল্লাহ আপনাকে যা দেখিয়ে দেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন)। তখন তিনি শাসিয়ে দিয়ে বললেন : এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর, অন্য কারও নয়।

(পাঁচ) মিথ্যা মোকদ্দমা ও মিথ্যা দাবীর তদবীর করা, ওকালতি করা, সমর্থন করা ইত্যাদি সবই হারাম।

তওবার তাৎপর্য : ১১০ তম আয়াত অর্থাৎ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْهَرْ نَفْسَهُ থেকে জানা যায় যে, সংক্রামক গোনাহ ও অসংক্রামক গোনাহ, অর্থাৎ বান্দার হকের সাথে কিংবা আল্লাহর হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত সব গোনাহই তওবা ও এস্তেগফার দ্বারা মাফ হতে পারে। তবে তওবা ও এস্তেগফারের স্বরূপ জানা জরুরী। শুধু মুখে ‘আস্তাগফেরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাহিহি’ বলার নাম তওবা ও এস্তেগফার নয়। তাই আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি যদি সেজন্য অনুতপ্ত না হয় এবং তা পরিত্যাগ না করে কিংবা ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করতে কৃতসংকল্প না হয়, তবে মুখে মুখে ‘আস্তাগফেরুল্লাহ’ বলা তওবার সাথে উপহাস করা বৈ কিছু নয়।

তওবার জন্যে মোটামুটি তিনটি বিষয় জরুরী : (এক) অতীত গোনাহর জন্যে অনুতপ্ত হওয়া, (দুই) উপস্থিত গোনাহ অবিলম্বে ত্যাগ করা এবং (তিন) ভবিষ্যতে গোনাহ থেকে বৈতে থাকতে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। বান্দার হকের সাথে যেসব গোনাহর সম্পর্ক, সেগুলো বান্দার কাছ থেকেই মাফ করিয়ে নেয়া কিংবা হক পরিশোধ করে দেয়া তওবার অন্যতম শর্ত।

নিজের গোনাহর দোষ অন্যের উপর চাপানো দ্বিগুণ শাস্তির কারণ : ১১২ তম আয়াতে অর্থাৎ, وَمَنْ يُكِبْ عَثْرَةً أَوْ عَثْرَتَيْنِ থেকে জানা যায় যে, যে লোক নিজে পাপ করে এবং অপর নিরপরাধ ব্যক্তিকে সেজন্য অভিযুক্ত করে, সে নিজ গোনাহকে দ্বিগুণ ও অত্যন্ত কঠোর করে দেয় এবং নির্মম শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। একে তো নিজের আসল গোনাহর শাস্তি, দ্বিতীয়তঃ অপবাদের কঠোর শাস্তি।

কোরআন ও সুন্নাহর তাৎপর্য : وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ كُنْ تَعْلَمُ বাক্যে ‘কিতাব’-এর সাথে ‘হেকমত’ শব্দটি উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাহ ও শিক্ষার নাম যে ‘হেকমত’ তাও আল্লাহ তাআলারই অবতারিত। পার্থক্য এই যে, সুন্নাহর শব্দাবলী আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। এ কারণেই কোরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য কোরআন ও সুন্নাহ উভয়টিরই তথ্যসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। তাই উভয়ের বাস্তবায়নই ওয়াজেব।

এ থেকে কোন কোন ফেকাহবিদের এ উক্তির স্বরূপও জানা গেল যে, ওহী দুই প্রকার : (এক) مثل أو তেলাওয়াত করা হয় এবং (দুই) غير مثل أو তেলাওয়াত করা হয় না। প্রথম প্রকার ওহী কোরআনকে বলা হয়, যার অর্থ ও শব্দাবলী উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাথিলকৃত। দ্বিতীয় প্রকার ওহী হাদীস তথা সুন্নাহ। এর শব্দাবলী রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর এবং মর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে।

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জ্ঞান সমগ্র সৃষ্টজীবের চাইতে বেশী : وَمَا لَمْ كُنْ تَعْلَمُ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জ্ঞান আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের মত সর্বব্যাপী ছিল না; যেমন কতক মুখ বলে থাকে। বরং আল্লাহ যতটুকু দান করতেন, তিনি তাই পেতেন। তবে এতে বিতর্কের অবকাশ নেই যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা সমগ্র সৃষ্টজীবের জ্ঞানের চাইতে অনেক বেশী।

পারম্পরিক সলা-পরামর্শ ও মঙ্গলসের উত্তম পন্থা : বলা হয়েছে : **لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ** অর্থাৎ, মানুষের যেসব পারম্পরিক সলা-পরামর্শ পরকালের ভাবনা ও পরিণতির চিন্তা বিবর্জিত শুধু ক্ষণস্থায়ী পার্থিব ও সাময়িক উপকার লাভের জন্য হয়ে থাকে, সেগুলোতে কোন মঙ্গল নেই।

এরপর বলা হয়েছে : **لَا أَمِنْ أَمْرٍ صَدَقَ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ ضَلَّاهُ بَيْنَ النَّاسِ** অর্থাৎ, এসব সলা-পরামর্শ ও কানাকানিতে মঙ্গলের কোন কিছু থাকলে তা হচ্ছে একে অপরকে দান-খয়রাতে উৎসাহিত করা কিংবা সংকাজের আদেশ দেওয়া অথবা মানুষের মধ্যে পারম্পরিক শান্তি স্থাপনের পরামর্শ দান করা। এক হাদীসে বলা হয়েছে : মানুষের যেসব কথাবার্তায় আল্লাহর যিকির কিংবা সংকাজের আদেশ ও অসং কাজের নিষেধ থাকে, সেগুলো ছাড়া সবই তাদের জন্য ক্ষতিকর।

مَعْرُوفٍ এমন কাজকে বলা হয়, যা শরীয়তে প্রশংসিত এবং যা শরীয়তপন্থীদের কাছে পরিচিত। এর বিপরীতে **مَنْكَرٌ** ঐ কাজ, যা শরীয়তে অপছন্দনীয় এবং শরীয়তপন্থীদের কাছে অপরিচিত।

যে কোন সংকাজের আদেশ এবং উৎসাহদান ‘আমর বিল-মারাক্ফে’র অন্তর্ভুক্ত। উৎপীড়িতকে সাহায্য করা, অভাবীদের ঋণ দেয়া, পথভ্রান্তকে পথ বলে দেয়া ইত্যাদি সংকাজ ও ‘আমর বিল মারাক্ফে’র অন্তর্ভুক্ত। সদকা এবং মানুষের পরম্পরিক শান্তি স্থাপন যদিও এর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এতদুভয়ের উপকারিতা বহুলোকের মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং জাতীয় জীবন সংশোধিত হয়।

এ ছাড়া দুটি কাজ জনসেবার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়সমূহকে পরিব্যপ্ত করে। (এক) সৃষ্ট জীবের উপকার করা, (দুই) মানুষকে দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করা। সদকা উপকার সাধনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা, সৃষ্টজীবকে ক্ষতির কবল থেকে রক্ষা করার সর্বপ্রধান মাধ্যম। তাই তফসীরবিদগণ বলেন : এখানে সদকার অর্থ ব্যাপক। ওয়াজেব সদকা, জাকাত, নফল সদকা এবং যে কোন উপকার এর অন্তর্ভুক্ত।

শিরক ও কুফরের শাস্তি চিরস্থায়ী হওয়া : এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন করে যে, কর্ম পরিমাণে শাস্তি হওয়া উচিত। মুশরেক ও কাফেররা যে শিরক ও কুফরের অপরাধ করে, তা সীমাবদ্ধ আয়ুষ্কালের মধ্যে করে। অতএব, এর শাস্তি অনন্তকাল স্থায়ী হবে কেন? উত্তর এই যে, কাফের ও মুশরেকরা কুফর ও শিরককে অপরাধই মনে করে না; বরং পুণ্যের কাজ বলে মনে করে। তাই তাদের ইচ্ছা ও সংকল্প এটাই থাকে যে, চিরকাল এ অবস্থার উপরই কায়ম থাকবে। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত যখন সে অবস্থার উপরই কায়ম থাকে, তখন সে নিজ সাধ্যের সীমা পর্যন্ত চিরস্থায়ী অপরাধ করে নেয়। তাই শাস্তিও চিরস্থায়ী হবে।

জুলুম ও অবিচার তিন প্রকার : এক প্রকার জুলুম আল্লাহ তাআলা কখনও ক্ষমা করবেন না। দ্বিতীয় প্রকার জুলুম মাফ হতে পারে। তৃতীয় প্রকার জুলুমের প্রতিশোধ আল্লাহ তাআলা না নিয়ে ছাড়বেন না।

প্রথম প্রকার জুলুম হচ্ছে শিরক, দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহর হকে ক্রটি করা এবং তৃতীয় প্রকার বান্দার হক বিনষ্ট করা। — (ইবনে-কাসীর)

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمْرٍ صَدَقَ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ ضَلَّاهُ بَيْنَ النَّاسِ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يَتَّقِ النَّاسَ وَلَمْ يَتَّقِ اللَّهَ يَأْتِ اللَّهَ بِجَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيُغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا عَظِيمًا
إِن يَدْعُونَ لِلَّهِ وَالشَّيْطَانِ لَا تَعْبُدُهُمْ إِنَّ دُعَاءَ الْإِنْسَانِ لَهُ خِيفَةٌ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
وَقَالَ لَا تُخَدُّونَ مِن عِبَادِكُمْ صَيْبًا مَّعْرُوفًا
وَلَا تُضِلُّهُمْ وَلَا تَزَلِجْهُمْ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمْ فَالْيَقِينُ أَذَانُ الْأَنْعَامِ وَلَا لَمْ تُنَبِّهْهُمْ فَاغْفِرْ لَهُمْ خَلَقَ اللَّهُ وَفَضَّلَ الْإِنْسَانَ وَالْإِنْسَانُ أَعْيُنٌ
يَعْبُدُهُمْ وَيُخَيِّلُهُمْ وَمَا يَعْبُدُ هُمُ الشَّيْطَانُ الْأَفْرُوزُ
أُولَئِكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحْيَصًا

(১১৪) তাদের অধিকাংশ সলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে সলা-পরামর্শ দান খয়রাত করতে কিংবা সংকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপন কম্পে করতে তা স্বতন্ত্র। যে একাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি তাকে বিরাট ছওয়াব দান করব। (১১৫) যে কেউ রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐ দিকেই ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকটতর গন্তব্যস্থান। (১১৬) নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে। এছাড়া যাকে ইচ্ছা, ক্ষমা করেন। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভাঙিতে পতিত হয়। (১১৭) তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে (১১৮) যার প্রতি আল্লাহ অতিসম্পাত করেছেন। শয়তান বলল : আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব, (১১৯) তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে আশ্বাস দেব; তাদেরকে পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদেরকে আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। (১২০) সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা বৈ নয়। (১২১) তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। তারা সেখান থেকে কোথাও পালাবার জায়গা পাবেন না।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ
حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَا لَيْسَ بِأَمَانَةٍ لَهُمْ
وَلَا آمَانَةٍ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى وَ
لَا يُجَادَلُ مَنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ
مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أُولَئِكَ وَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأُولَئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَضَلُّ
ذِيًّا وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مَوْلَا
إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُخِطًا
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا
يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي نِسَاءِ النَّبِيِّ لَا
تُؤْتَوْنَ لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
وَالنِّسَاءُ فَتَنَاتٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِنْ تُكْفَرُوا لَيُكْفَرُنَّ
بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

(১২২) যারা বিশ্वास স্থাপন করেছে এবং সংকর্ম করেছে, আমি তাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবেশ করাব, যেগুলোর তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। তারা চিরকাল তথায় অবস্থান করবে। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সত্য সত্য। আল্লাহর চাইতে অধিক সত্যবাদী কে? (১২৩) তোমাদের আশার উপরও ভিত্তি নয় এবং আহলে-কিতাবদের আশার উপরও না। যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের কোন সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না। (১২৪) যে লোক পুরুষ হোক কিংবা নারী, কেন সংকর্ম করে এবং বিশ্বাসী হয়, তবে তারা জন্মাতো প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট হবে না। (১২৫) যে আল্লাহর নির্দেশের সাধনে মন্তক অবনত করে সংকাজে নিয়োজিত থাকে এবং ইবরাহীমের ধর্ম অনুসরণ করে—যদি একনিষ্ঠ ছিলেন, তার চাইতে উত্তম ধর্ম কার? আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (১২৬) যা কিছু নভোতলে আছে এবং যা কিছু ভূতলে আছে, সব আল্লাহরই। সব বস্তু আল্লাহর মুক্তি-কলয়ে। (১২৭) তারা আপনার কাছে নারীদের বিবাহের অনুমতি চায়। বলে দিন : আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে অনুমতি দেন এবং কোরআনে তোমাদেরকে যা যা পাঠ করে শুনানো হয়, তা ঐ সব শিউনী নারীদের বিধান, যাদেরকে তোমরা নির্ধারিত অধিকার প্রদান কর না অথচ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার বাসনা রাখ। আর অক্ষম শিশুদের বিধান এই যে, এতীমদের জন্যে ইনসাফের উপর কায়ম থাক। তোমরা যা ভাল কাজ করবে, তা আল্লাহ জানেন।

শিরকের তাৎপর্য : শিরকের তাৎপর্য হচ্ছে—আল্লাহ ব্যতীত কোন সৃষ্টবস্তুকে এবাদত কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহর সমতুল্য মনে করা। জাহান্নামে পৌঁছে মুশারেকরা যে উক্তি করবে, কোরআন পাক তা উদ্ধৃত করেছে :
- تَاللّٰهُ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

অর্থঃ, আল্লাহর কসম, আমরা প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার দ্বিত্ব ছিলাম যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বে-পালনকর্তার সমতুল্য দ্বিত্ব করেছিলাম।

জানা কথা যে, মুশারেকদেরও এরূপ বিশ্वास ছিল না যে, তাদের স্বনির্মিত প্রস্তরমূর্তি বিশ্বে-জাহানের স্রষ্টা ও মালিক। তারা অন্যান্য ভুল-বোঝাবোঝির কারণে এদেরকে এবাদত কিংবা মহব্বত ও সম্মান প্রদর্শনে আল্লাহ তাআলার সমতুল্য স্থির করে নিয়েছিল। এ শিরকই তাদেরকে জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছে।—(ফাতহুল মুলহিম) জানা গেল যে, স্রষ্টা রিযিকদাতা, সর্বশক্তিমান, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহ তাআলার ইত্যাকার বিশেষ গুণে কোন সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহর সমতুল্য মনে করাই শিরক।

আনুশঙ্গিক স্রষ্টাব্য বিষয় :

শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড : لَا لَيْسَ بِأَمَانَةٍ لَهُمْ وَلَا آمَانَةٍ أَهْلِ الْكِتَابِ - আয়াত মুসলমান ও আহলে-কিতাবদের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি কথোপকথন উল্লেখিত হয়েছে। এরপর এ কথোপকথন বিচার করে উভয় পক্ষকে বিশুদ্ধ হেলায়েতের পর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অবশেষে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার একটি মানদণ্ড ব্যক্ত করা হয়েছে, যা সাধনে রাখলে মানুষ কখনও ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার শিকার হবে না।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন : একবার কিছু সংখ্যক মুসলমান ও আহলে-কিতাবের মধ্যে গর্বসূচক কথাবার্তা শুরু হলে আহলে-কিতাবরা বলল : আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ ও সম্প্রসৃত। কারণ, আমাদের নবী ও আমাদের গ্রন্থ তোমাদের নবী ও তোমাদের গ্রন্থের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানরা বলল : আমরা তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা, আমাদের নবী সর্বশেষ নবী এবং আমাদের গ্রন্থ সর্বশেষ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ পূর্ববর্তী সব গ্রন্থকে রহিত করে দিয়েছে। এ কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

এতে বলা হয়েছে যে, এ গর্ব ও অহংকার কারও জন্য শোভা পায় না। শুধু কল্পনা, বাসনা ও দাবী দ্বারা কেউ কারও চাইতে শ্রেষ্ঠ হয় না, বরং প্রত্যেকের কাজ-কর্মই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। কারও নবী ও গ্রন্থ যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন, যদি সে ভ্রান্ত কাজ করে, তবে সেই কাজের শাস্তি পাবে। এ শাস্তির কবল থেকে রেহাই দিতে পারে—এরূপ কাউকে সে খুঁজে পাবে না।

এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। ইমাম মুসলিম তিরমিযী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ (রাঃ) হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى - অর্থঃ, যে কেউ কোন অসৎকাজ করবে, সেজন্যে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হল, তখন আমরা খুব দুঃখিত ও চিন্তাচ্যুত হয়ে পড়লাম এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) - এর কাছে আরয় করলাম যে, এ

وَرَأَى امْرَأَتَهُ تَحَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَكَلَّمَهَا عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا عَلَى كُلِّ الْمِيلِ فَوَتْدِ رُؤُوسُكَ كَالْمُتَعَلِّقَةِ ۝ وَإِنْ تَصِلُوا إِلَى اللَّهِ فَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّهُ يُحْيِيكُمْ وَلَنْ يُتَّفَقَ فَايُنْصَرِفَ إِلَيْكُمْ اللَّهُ كُلَّ مِثْقَلٍ مِنْ سَعْتِهِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ لَئِنْ تَأْتُوا بَشَاءً مِنْ اللَّهِ تَأْتُوا نَارًا ۝ وَإِنَّ اللَّهَ لَوَاقِعٌ لِمَا تَعْمَلُونَ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ۝ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ هَبِيمٌ ۝ أَيُّهَا النَّاسُ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا ذَكِيمًا ۝ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَوَيْدَ اللَّهِ أَنْ يُؤْتِيَهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝

(১৮) যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন মীমাংসা করে নাহলে তাদের উভয়ের কোন গোনাহ নাই। মীমাংসা উত্তম। মনের সামনে লোভ বিন্যাস আছে। যদি তোমরা উত্তম কাজ কর এবং খোদাতীক হও, তবে, আল্লাহ তোমাদের সব কাজের খবর রাখেন। (১২৯) তোমরা কখনও নারীদেরকে সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব, সম্পূর্ণ ঝুঁকোও পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখ দৌল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং খোদাতীক হও, তবে আল্লাহ ক্ষমশীল, করুণাময়। (১৩০) যদি উভয়েই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে আল্লাহ স্বীয় প্রশস্ততা দ্বারা প্রত্যেককে অমুখাপেক্ষী করে দিবে। আল্লাহ সুশ্রুত, প্রজ্ঞাময়। (১৩১) আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই আল্লাহর। বস্তৃতঃ আমি নির্দেশ দিয়েছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদেরকে এবং তোমাদেরকে যে, তোমরা সবাই ভয় করতে থাক আল্লাহকে। যদি তোমরা তা না মান, তবে জেনো, সে সব কিছুই আল্লাহ তখালার যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। আর আল্লাহ হচ্ছোন অভাবহীন, প্রসংশিত। (১৩২) আর আল্লাহরই জন্যে সে সবকিছু যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। আল্লাহই যথেষ্ট কرمবিধায়ক। (১৩৩) হে মানবকুল, যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সরিয়ে তোমাংয়ের ভাগ্যগায় অন্য কাউকে প্রতিষ্ঠিত করেন? বস্তৃতঃ আল্লাহর সে ক্ষমতা রয়েছে। (১৩৪) যে কেউ দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করবে, তার জেনে রাখা প্রয়োজন যে, দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ আল্লাহরই নিকট রয়েছে। আর আল্লাহ সব কিছু শোনে, দেখেন।

আয়াতটি তো কোন কিছুই ছাড়েনি। সামান্য মন্দ কাজ হলেও তার সাজা দেয়া হবে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : চিন্তা করো না, সামান্যত কাজ করে যাও। কেননা, (উল্লেখিত শাস্তি যে জাহান্নামই হবে, তা জরুরী নয়) তোমরা দুনিয়াতে যে কোন কষ্ট অথবা বিপদাপদে পড়, তাতে তোমাদের গোনাহর কাফকারা এবং মন্দ কাজের শাস্তি হয়ে থাকে। এমন কি যদি কারও পায়ে কাঁটা ফুটে, তাও গোনাহর কাফকারা বৈ নয়।

অন্য এক রেওয়াজেতে আছে, মুসলমান দুনিয়াতে যে কোন দূত-কষ্ট, অসুখ-বিসুখ অথবা ভাবনা-চিন্তার সম্মুখীন হয়, তা তার গোনাহর কাঙ্ক্ষার হায়ে যায়।

তিরমিযী ও তফসীরে ইবনে-জরীর হযরত আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাঁদেরকে **مَنْ يَحْمِلُ سَهْوًا** আয়াতটি শুনালেন, তখন তাঁদের যেন কোমর ভেঙ্গে গেল। এ প্রতিক্রিয়া দেখে তিনি বললেন : ব্যাপার কি? হযরত সিদ্দীক (রাঃ) আরম্ভ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কোন মন্দ কাজ করেন? অত্যন্ত কাজেরই যদি প্রতিফল ভোগ করতে হয়, তবে কে রক্ষা পাবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : হে আবুবকর! আপনারা মোটেই চিন্তিত হবেন না। কেননা, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টের মাধ্যমে আপনাদের গোনাহর কাফকারা হয়ে যাবে।

এক রেওয়াজেতে আছে, তিনি বললেন : আপনি কি অসুস্থ হন না ? আপনি কি কোন দুঃখ ও বিপদে পতিত হন না ? হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) আরম্ভ করলেন : নিশ্চয় এসব বিষয়ের সম্পৃক্ত নই। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : ব্যাস, এটাই আপনাদের প্রতিফল।

আবু দাউদ প্রমুখের বর্ণিত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর হাদীসে বলা হয়েছে, বান্দা জুরে কষ্ট পেলে কিংবা পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে তা তাঁর গোনাহুর কাফফারা হয়ে যায়। এমনকি, যদি কোন ব্যক্তি কোন বস্তু এক পকেটে তালিশ করে অন্য পকেটে পায়, তবে এতটুকু কষ্টও তার গোনাহুর কাফফারা হয়ে যায়।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যে, শুধু দাবী ও বাসনায় লিপ্ত হওয়া না; বরং কাজের চিন্তা কর। কেননা, তোমরা অমুক নবী কিংবা গ্রন্থের অনুসারী—শুধু এ বিষয় দুরাই তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পারবে না। বরং এ গ্রন্থের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান এবং তদনুযায়ী সংকর্ষ সম্পাদনের মধ্যেই প্রকৃত সাফল্য নিহিত রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَإِنْ امْرَأَةٌ দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কতিপয় পথনির্দেশ :

وَإِسْعَاقِيْنَا অত্র তিনটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষের দাম্পত্য জীবনের এমন একটি জটিল দিক সম্পর্কে পথনির্দেশ করেছেন, সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকটি দাম্পত্যিকাই যার সম্মুখীন হতে হয়। তা হলে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক মনোমালিন্য ও মন কষাকষি। আর এটি এমন একটি জটিল সমস্যা, যার সুষ্ঠু সমাধান যথাসময়ে না হলে শুধু স্বামী-স্ত্রীর জীবনই দুর্বিসহ হয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে এহেন পারিবারিক মনোমালিন্যই গোত্র ও বংশগত কলহ-বিবাদ তথা হানাহানি পরিস্থিতি সৃষ্টি দেয়। কোরআন পাক নব ও নারীর যাবতীয় অনুভূতি ও প্রেরণার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয় শ্রেণীকে এমন এক সার্থক জীবন ব্যবস্থা বাতলে দেয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, যার ফলে মানুষের পারিবারিক

জীবন সুখময় হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী। এর অনুসরণে পারস্পরিক তিক্ততা ও মর্ম-পীড়া, ভালবাসা ও প্রশান্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর যদি অনিবার্য কারণে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হয়, তবে তা করা হবে সম্মানজনক ও সৌজন্যমূলক পন্থায় যেন, তার পেছনে শত্রুতা, বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের মনোভাব না থাকে।

১২৮ তম আয়াতটি এমন সমস্যা সম্পর্কিত, যাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হয়। নিজ নিজ হিসাবে উভয়ে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও পারস্পরিক মনের মিল না হওয়ার কারণে উভয়ে নিজ নিজ ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করে। যেমন, একজন সুদর্শন সূঠামদেহী স্বামীর স্ত্রী স্বাস্থ্যহীনা, অধিক বয়স্কা অথবা সূত্রী না হওয়ার কারণে তার প্রতি স্বামীর মন আকৃষ্ট হচ্ছে না। আর এর প্রতিকার করাও স্ত্রীর সাধ্যাতীত। এমতাবস্থায় স্ত্রীকেও দোষারোপ করা যায় না, অন্যদিকে স্বামীকেও নিরপরাধ সাব্যস্ত করা যায়।

অত্র আয়াতের শানে নুযুল প্রসঙ্গে এ ধরনের কতিপয় ঘটনা তফসীরে-মাযহারী প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে কোরআন পাকের সাধারণ নীতি **وَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ كَسْرِ تِلْكَ الْأُضْغَالِ** - অর্থাৎ, উক্ত স্ত্রীকে বহাল রাখতে চাইলে তার যাবতীয় ন্যায্য অধিকার ও চাহিদা পূরণ করে রাখতে হবে। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে কল্যাণকর ও সৌজন্যমূলক পন্থায় তাকে বিদায় করবে। এমতাবস্থায় স্ত্রীও যদি বিবাহ বিচ্ছেদে সম্মত হয়, তবে ভ্রত্নতা ও শালীনতার সাথেই বিচ্ছেদ সম্পন্ন হবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি তার সন্তানের খাতিরে অথবা নিজের অন্য কোন আশ্রয় না থাকার কারণে, বিবাহ বিচ্ছেদে অসম্মত হয়, তবে তার জন্য সঠিক পন্থা এই যে, নিজের প্রাপ্য মোহর বা খোর-পোষের ন্যায্য দাবী আংশিক বা পুরোপুরি প্রত্যাহার করে স্বামীকে বিবাহ বন্ধন অটুট রাখার জন্য সম্মত করাবে। দায়দায়িত্ব ও ব্যয় ভার লাঘব হওয়ার কারণে স্বামীও হয়ত এ সমস্ত অধিকার থেকে মুক্ত হতে পেরে এ প্রস্তাব অনুমোদন করবে। এভাবে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে।

কোরআন করীমের অত্র আয়াতে এ ধরনের সমঝোতার সম্ভাব্যতার প্রতি পথ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে **وَأَحْزَبَتِ الْأَنْفُسَ الشَّرَّ** অর্থাৎ, “প্রত্যেক অন্তরেই লোভ বিদ্যমান রয়েছে।” কাজেই স্ত্রী হয়ত মনে করবে যে, আমাকে বিদায় করে দিলে সন্তানাদির জীবন বরবাদ হবে, অথবা অন্যত্র আমার জীবন আরো দুর্বিসহ হতে পারে। তার চেয়ে বরং এখানে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে পড়ে থাকাই লাভজনক। স্বামী হয়ত মনে করবে যে, দায়-দায়িত্ব হতে যখন অনেকটা রেহাই পাওয়া গেল, তখন তাকে বিবাহ বন্ধনে রাখতে ক্ষতি কি? অতএব, এভাবে অনায়াসে সমঝোতা হতে পারে। সাথে সাথে এরশাদ করা হয়েছে :-

وَأِنْ أَمْرًا كُنْتُمْ عَلَيْهِ مُتًّا وَتُرِيدُونَ خُرُوجًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

‘যদি কোন নারী স্বামীর পক্ষ থেকে কলহ-বিবাদ বা বিমুখ হওয়ার আশঙ্কা বোধ করে, তবে উভয়ের কারোই কোন গোনাহ হবে না, যদি তারা নিজেদের মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে পারস্পরিক সমঝোতায় উপনীত হয়। এখানে গোনাহ না হওয়ার কথা বলার কারণ এই যে, ব্যাপারটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ঘুষের আদান-প্রদানের মত মনে হয়। কারণ, স্বামীকে মোহরানা ইত্যাদি ন্যায্য দাবী হতে অব্যাহতির প্রলোভন দিয়ে দাম্পত্য বন্ধন অটুট

রাখা হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাকের এ ভাষ্যের দ্বারা স্পষ্টভাবে বৃষ্টি দেয়া হয়েছে যে, বস্ত্ততঃ এটা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং উভয় পক্ষ কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করে মধ্যপন্থা অবলম্বন ও সমঝোতার ব্যাপার। অতএব, এটা সম্পূর্ণ জায়েয।

দাম্পত্য কলহের মধ্যে অথবা অন্যের হস্তক্ষেপ অব্যাহীন। তফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, **أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا** স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে কোন সমঝোতা করে নেবে। এখানে **يُصْلِحَا** দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-কলহ বা সন্ধি-সমঝোতার মধ্যে অহেতুক কোন তৃতীয় ব্যক্তি নাক গলাবে না। ফর তাদের নিজেদেরকে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কারণ, তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতির ফলে স্বামী-স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি অন্য লোকের গোচরীভূত হয়, যা তাদের উভয়ের জন্যই লজ্জাকর ও বারো পরিপন্থী। তদুপর তৃতীয় পক্ষের কারণে সন্ধি-সমঝোতা দুষ্কর হয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। অত্র আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন—

وَأَنْ تُصْلِحُوا وَتُقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ كَانَتْ بِمَا تَصْلَحُونَ خَيْرًا

অর্থাৎ “আর যদি তোমরা কল্যাণ সাধন কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন।” এখানে বুঝানো হয়েছে যে, অনিবার্য কারণ বশতঃ স্বামীর অন্তরে যদি স্ত্রীর প্রতি কোন আকর্ষণ না থাকে এবং তার ন্যায্য অধিকার পূরণ করা অসম্ভব মনে করে তাকে বিদায় করতে চায়, তবে অহিনে দৃষ্টিতে স্বামীকে সে অধিকার দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছুটা স্বার্থ পরিত্যাগ করে সমঝোতা করাও জায়েয। কিন্তু এতদসত্ত্বেও স্বামী যদি সংযম ও খোদাভীতির পরিচয় দেয়, স্ত্রীর সাথে সহনুভূতি ব্যবহার করে, মনের মিল না হওয়া সত্ত্বেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ না করে বরং তার যাবতীয় অধিকার ও প্রয়োজন পূরণ করে, তবে তার এই ত্যাগ ও উদারতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ওয়াকিফহাল হয়েছেন। অতএব, তিনি এহেন ধৈর্য, উদারতা, সহনশীলতা ও মহানুভবতার এমন প্রতীক দেবেন, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। এখানে “আল্লাহ তাআলা তোমাদের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন” বলেই কাস্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিদান কি দেবেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ, এর প্রতিদান হবে কল্পনার উর্ধ্বে, ধারণার অতীত।

মোটকথা, কোরআন পাক উভয় পক্ষকে একদিকে বীর অভাব-অভিযোগ দূর করা ও ন্যায্য অধিকার লাভ করার আইনঙ্গ অধিকার দিয়েছে। অপর দিকে ত্যাগ, ধৈর্য, সংযম ও উন্নত চরিত্র আশ্রয় করার উপদেশ দিয়েছে। এখানে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, বিবাহবিচ্ছেদ হতে যথাসাধ্য বিরত থাকা কর্তব্য। বরং উভয়ের পক্ষেই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করে সমঝোতায় আসা বাঞ্ছনীয়।

لَهُمْ مَوَاقِفُ الْكَرَامَةِ وَمَوَاقِفُ الرَّغْبِ অর্থাৎ, আসমান ও যমীন

যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তাআলার। এখানে এই উক্তিটির তিন বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। প্রথমবার বোঝানো হয়েছে আল্লাহর সচ্ছলতা, প্রাচুর্য ও তাঁর দরবারে অভাবহীনতা। দ্বিতীয়বার বোঝানো হয়েছে যে, কারো অবাধ্যতায় আল্লাহ তাআলার কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। তৃতীয়বার আল্লাহ পাকের অপর রহমত ও সহায়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি খোদাভীতি ও আনুগত্য করো, তবে তিনি তোমাদের সর্ব কাজে সহায়তা করবেন, রহমত বর্ষণ করবেন, এবং অনায়াসে



(১০৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষাদান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে আল্লাহ্‌ তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী তোমাদের চাইতে বেশী। অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে রিপূর কাফনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে আল্লাহ্‌ তোমাদের যাবতীয় কাক-কর্ম সম্পর্কেই অবগত। (১০৬) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্‌র উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর এবং বিশ্বাস স্থাপন কর তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের উপর, যা তিনি নাযিল করেছেন স্বীয় রসূলের উপর এবং সেসমস্ত কিতাবের উপর, যেগুলো নাযিল করা হয়েছিল ইতিপূর্বে। যে আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর ও কিয়ামতদিনের উপর বিশ্বাস করবে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে গিয়ে পড়বে (১০৭) যারা একবার মুসলমান হয়ে পরে পুনরায় কাফের হয়ে গেছে, আবার মুসলমান হয়েছে এবং আবারো কাফের হয়েছে এবং কুফরীতেই উন্নতি লাভ করেছে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে না কখনও ক্ষমা করবেন, না পশু দেখাবেন। (১০৮) সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিও যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব—(১০৯) যারা মুসলমানদের বকন করে কাফেরদেরকে নিজদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অশ্রু যাবতীয় সম্মান শূন্যমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য। (১৪০) আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই বক্তৃতা জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্‌ তা আলাল আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতিজ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা ঈশ্বারপূজা চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ দোষের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।

সু-সম্পন্ন করে দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা অপরিসীম ক্ষমতাবান। তিনি ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে সব কিছু পরিবর্তন করে দিতে পারেন। তোমাদের সবাইকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ধরৎস ও নিকিহ করে তোমাদের স্থলে অন্যদেরকে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম। অব্যাহাদের পরিবর্তে তিনি অনুগত ও বাধ্য লোক অনায়াসে সৃষ্টি করতে পারেন। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌ তাআলার স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও অনির্ভরতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং অব্যাহাদেরকে ভীত প্রদর্শন করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুনিয়ার বৃক নবী প্রেরণ ও কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং এটাই বিশৃঙ্খলিত ও নিরাপত্তার চাবিকাঠি।

সূরা-নিসার এই আয়াতে সব মুসলমানকে ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার উপর অটল থাকতে এবং সত্য সাক্ষাদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাসমূহও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই বিষয় প্রসঙ্গে সূরা মায়দা ও সূরা হাদীদে দু'খানি আয়াত রয়েছে। সূরা মায়দার আয়াতের বিষয়বস্তু এমনকি শব্দাবলীও প্রায় অভিন্ন। সূরা হাদীদে আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত আদম (আঃ)-কে প্রতিনিধিত্বপূর্ণে দুনিয়ায় পাঠানো, অতঃপর একের পর এক নবী প্রেরণ এবং শতাধিক হযীফা ও আসমানী কিতাব নাযিল করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার বৃক শান্তি-শৃঙ্খলা এবং ইনসাফ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষমতার গতির মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা, ওয়াজ-নছিহত, তালিম ও তরবিয়তের মাধ্যমে যেসব অব্যাহ লোককে সত্য ও ন্যায়ের পথে আনা যাবে না, তাদেরকে প্রশাসনিক আইন অনুসারে উপযুক্ত শাস্তি দান করে সংপথে আসতে বাধ্য করা হবে।

কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও তার উপর অবিচল থাকা শুধু সরকার ও বিচার বিভাগেরই বিশেষ দায়িত্ব নয়, বরং প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন সে নিজে ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকে এবং অন্যকেও ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অবিচল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। অবশ্য ইনসাফ ও ন্যায়নীতির একটি পর্যায় সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষের বিশেষ দায়িত্ব। তা হচ্ছে দুই ও অব্যাহ লোকেরা যখন ন্যায়নীতিকে পদদলিত করবে নিজেরা তো ন্যায়-নীতির খার খারবেই না, বরং অন্যকেও ন্যায়নীতির উপর স্থির থাকতে দেবে না; তখন তাদেরকে দমন করার জন্য আইনের শাসন ও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এমতাবস্থায় একমাত্র ক্ষমতাসীন সরকার ও কর্তৃপক্ষই ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

বর্তমান বিশ্বের মূর্খ জনগণ তো দূরের কথা, শিক্ষিত সুধীরাও মনে করেন যে, ইনসাফ ও ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করা শুধু সরকার ও আদালতেরই দায়িত্ব, এ ব্যাপারে জনগণের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। এহেন ভ্রান্ত ধারণার কারণেই বিশ্বের সব দেশে সব রাজ্যে সরকার ও জনগণ দু'টি পরস্পর বিরোধী শক্তিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে দুষ্টের ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। সব দেশের জনগণ সরকারের কাছে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি দাবী করে, কিন্তু নিজেরা কখনো ন্যায়-নীতি পালন করতে প্রস্তুত নয়। এরই কুফল আজ সারা বিশ্বে গ্রাস করেছে। আইন

কানুন নিক্তিয় ও অপরাধ প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। আজকাল সব দেশেই আইন প্রণয়নের জন্য সংসদ রয়েছে। এখানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। আর তার সদস্য মনোনয়নের জন্য অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সারা দুনিয়ায় হৈ চৈ পড়ে যাচ্ছে। অতঃপর নির্বাচিত সদস্যগণ দেশবাসীর মন-মানসিকতা, আবেগ-অনুভূতি ও দেশের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আইন প্রণয়ন করছেন। তারপর জনমত যাচাই করার জন্য তার প্রকাশ ও প্রচার করা হয় এবং জনসমর্থন লাভের পর তা প্রবর্তন করা হয়। আর সেটা কার্যকরী করার জন্য সরকারের প্রশাসনযন্ত্র সচল হয়ে উঠে যার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা সারা দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক শাখার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন দেশের সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। দেশের শাস্তি-শৃঙ্খলা, কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য তার সক্রিয় কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করছেন। কিন্তু এত বিপুল আয়োজন সত্ত্বেও প্রচলিত তত্ত্ব-মন্ত্রের মোহমুক্ত হয়ে, তথাকথিত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঠিকাদারদের অন্ধ অনুকরণের ঊর্ধ্বে উঠে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে প্রত্যেকেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, ফলাফল অত্যন্ত নৈরাস্যজনক।

খোদাভীতি ও আশ্বেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্ব শান্তির চাবিকাঠি : সুস্থ বিবেকসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি চলমান সমাজের প্রথা ও রীতিনীতির বন্ধন ছিন্ন করে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রসূল আরাবী (সাঃ)-এর আনীত পয়গাম সম্পর্কে চিন্তা করলে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, শুধু আইন ও দণ্ডদান করেই পৃথিবীতে কখনো শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি বরং ভবিষ্যতেও অর্জিত হবে না। একমাত্র খোদাভীতি ও আশ্বেরাতের প্রতি বিশ্বাসই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। যার ফলে রাজা-প্রজা, শাসক ও শাসিত সর্বপ্রকার দায়-দায়িত্ব উপলব্ধি করতে, তা যথাযথভাবে পালন করতে সচেষ্ট হয়। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞানিয়ে জনসাধারণ একথা বলে দায়িত্ব এড়াতে পারে না যে, এটা সরকারের কাজ। কোরআন-মজীদের পূর্বোন্নিখিত আয়াতসমূহে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এক বৈপ্লবিক বিশ্বাসের প্রসিদ্ধির মাধ্যমে শেষ করা হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায়নীতির উপর অটল-অনড় ধাকা এবং অন্যকেও অটল রাখার চেষ্টা করার জন্য শাসক-শাসিত নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আয়াতসমূহের শেষ দিকে এমন এক তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা মানুষের ধ্যান-ধারণা ও প্রেরণার জগতে মহা-বিপ্লবের সূচনা করতে পারে। তা হলো, আল্লাহ তাআলার অপরিমিত ক্ষমতা ও পরাক্রম, তার সম্মুখে উপস্থিতি ও জাবাবদিহী এবং প্রতিদিন ও প্রতিফল লাভের বিশ্বাস। এটা এমন এক সম্পদ যার দৌলতে আজ থেকে সাতশত বছর পূর্ববর্তি অশিক্ষিত বিশ্বাসী লোকেরাও বিপুল শান্তি ও নিরাপত্তা ভোগ করতো এবং যার অভাবের কারণেই আজকের মহাশূন্যের অভিযাত্রী, কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী উন্নত বিশ্ববাসীরা শান্তি ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পূজারী ও তত্ত্ব-মন্ত্রের অন্ধ অনুসারীদের উপলব্ধি করা উচিত যে, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে তারা হয়তো মহাশূন্যে আরোহণ করতে, গ্রহ হতে গ্রহান্তরে ভেসে বেড়াতে এবং মহাশাগর পাড়ি দিতে পারবে, কিন্তু সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কারখানা, উপাদান-উপকরণ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের মূখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ, সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা কোথাও পাবে না। কোন অত্যাধুনিক আবিষ্কারের মাঝে কিংবা কোন গ্রহ-উপগ্রহেই তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং পাওয়া

যাবে একমাত্র রসূলে আরাবী (সাঃ)-এর পয়গাম ও শিকার মধ্য, খোদাভীতি ও আশ্বেরাতের বিশ্বাসের মধ্যে। এরশাদ হয়েছে—

اللَّهُ يَتَكَلَّمُ الْقُرْآنَ ۖ أَرْبَابٌ مَن رَّعَا، ۖ وَكَانَ الْإِنشَاءُ

মধ্যেই অন্তরসমূহের প্রশান্তি নিহিত। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ বস্তৃতঃপক্ষে আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত কুদরত ও কম্পনাভীত সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে ভাবের করে চলেছে, যার সামনে মানুষ তার অক্ষমতা ও অযোগ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু অনুভূতিশীল অন্তর ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ না হলে তাতেই বা কি লাভ।

কোরআন হাকীম একদিকে পৃথিবীতে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করেছে, অপরদিকে এমন এক অপূর্ব নীতিমালা ঘোষণা করেছে— যাকে পুরোপুরি গ্রহণ ও নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়ন করা হলে, যুলুম ও অন্যাচারে জর্জরিত দুনিয়া সুখ-শান্তি আধারে পরিণত হবে। আশ্বেরাতে বেহেশত লাভের পূর্বে দুনিয়াতেই জান্নাতী সুখের নমুনা উপভোগ করা যাবে।

..... إِنَّ الْآيَاتِ لَمُنْظُورًا ۖ - কারো মতে অত্র আয়াতে মুনাফিকদের

অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আর অনেকের মতে আয়াতটিতে ইহুদীকে সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা, প্রথমে তারা হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল তারপর গো-বৎসের পূজা করে কাকের হয়েছিল, অতঃপর তওবা করে আবার ঈমান এনেছিল, পুনরায় হযরত ঈসা (আঃ)-কে স্বীকার করে কুফরীর চরমে উপনীত হয়েছে। - (তফসীর রুহুল মা'আনী)

لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَكُمْ دِينًا وَلَا لَكُمْ دِينًا ۖ وَكَانَ الْإِنشَاءُ

এ আয়াতে তাৎপর্য এই যে, বার বার কুফরীর মধ্যে লিপ্ত হওয়ার ফলে সত্যকে উপলব্ধি করার এবং গ্রহণ করার যোগ্যতা রহিত হয়ে যায়। ভবিষ্যতে তওবা করা ও ঈমান আনার সৌভাগ্য হয় না। তবে কোরআন-হাদীসে অকাটা দলীলাদির দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যত বড় কট্টর কাকের বা যোরতাদই হোক না কেন, যদি সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে পূর্বের সমুদয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়। অতএব, বার বার কুফরী করার পরও যদি তারা সত্যিকারভাবে তওবা করে, তবে তাদের জন্য এখনো ক্ষমার আল-উম্মুক্ত রয়েছে।

এখানে প্রথম আয়াতে মুনাফেকদের জন্য মর্মস্বস্ত দায়িত্ব ইশারী দেওয়া হয়েছে। তবে এহেন দুঃসংবাদকে بَشَارَاتٍ অর্থাৎ, “সু-সংবাদ” বল ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন সু-সংবাদ শুধু জন্য প্রত্যেকেই উদ্ভীষ থাকে। কিন্তু মুনাফেকদের জন্য এছাড়া আর কোন সংবাদ নেই। বরং তাদের জন্য সু-সংবাদের পরিবর্তে এটাই একমাত্র ভবিষ্যদুশীল।

মানমর্যাদা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তীর্ণে কামনা কর বাহু-নীয় : দ্বিতীয় আয়াতে কাকের ও মুশরেকদের সাথে আন্তরিক বন্ধ ও সৌহার্দ স্থাপন করাকে নিষিদ্ধ করে এখরনের আচরণে লিপ্ত ব্যক্তির প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সাথে সাথে এই ব্যাধিতে আরো হওয়ার উৎস ও মূল কারণ বর্ণনা করতঃ একেও অযথা-অবাস্তব প্রতিদ্বন্দ্বী করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন -

لَقَدْ كَانَ عَنِ اللَّهِ وَعَدٌ ۖ وَكَانَ الْإِنشَاءُ

অর্থাৎ, “তারা কি ওদের কাছে গিয়ে ইচ্ছা-সম্মান লাভ করতে চায়? তবে ইচ্ছাকৃত-সম্মান তো সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার একান্তিয়্যারধীন।”

কাফের ও মুশরেকদের সাথে সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা এবং মেল-মেশার প্রধান কারণ এই যে, ওদের বাহ্যিক মান-মর্যাদা, সামর্থ্য, ধনবলে-প্রভাবিত হয়ে হীনমন্যতার শিকার হয় এবং মনে করে যে, ওদের সাহায্য-সহযোগিতায় আমাদেরও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তাহালা তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, তারা এমন লোকদের সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছে, যাদের নিজেদেরই সত্যিকার কোন মর্যাদা নেই। তাছাড়া যে শক্তি ও বিজয়ের মধ্যে ইজ্জত ও সন্মান নিহিত, তাতো একমাত্র আল্লাহ তাআলার নীতিরভূক্ত। অন্য কারো মধ্যে যখন কোন ক্ষমতা বা সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়, তা সবই আল্লাহ প্রদত্ত। অতএব, মান-মর্যাদা দানকারী মালিককে কলঙ্কিত করে তাঁর শত্রুদের থেকে ইজ্জত হাসিল করার অপচেষ্টা কত বড় লোকসাহী!

এ সম্পর্কে ‘সূরায়ে-মুনাক্কুন’ - এ এরশাদ হয়েছে :

وَلَوْلَا الْوَرَّةُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَكِنَّ الشَّافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, ইজ্জত-সন্মান একমাত্র আল্লাহ, রসূল এবং ঈমানদারদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুনাফেকরা তা অবগত নয়।

এখানে আল্লাহ তাআলার সাথে হযরত রসূল (সাঃ) ও মুমিনদের উল্লেখ করে বোঝানো হয়েছে যে, ইজ্জতের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তিনি যাকে ইচ্ছা আংশিক মর্যাদা দান করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুমিনগণ যেহেতু আল্লাহ তাআলার একান্ত অনুগত, পছন্দনীয় ও প্রিয়, তাই তিনি তাঁদেরকে সন্মান দান করেন। পক্ষান্তরে কাফের ও মুরেকদের ভাগ্যে সত্যিকার কোন ইজ্জত নেই। অতএব, তাদের সাথে গোয়ার্দের সম্পর্ক স্থাপন করে সন্মান অর্জন করা সুদূর পরাহত। ফলক-আযম হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন : যে ব্যক্তি বান্দাদের (কল্লেকের) সাহায্যে মর্যাদাবান হওয়ার বাসনা করে আল্লাহ তাআলা তাকে লাজ্জিত করেন।

হযরত আবুবকর জাসাস (রাঃ) ‘অহকামুল - কোরআনে’ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের মর্ম এই যে, কাফের, মুশরেক পাশ্চাত্য ও পশ্চিমদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে মর্যাদা ও প্রতিপত্তি অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টা করা অনায়াস ও অপরাধ। তবে এই উদ্দেশ্যে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন নিষেধ করা হয় নাই। কেননা, সূরা মুনাফেকুনের পূর্বোক্ত আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় রসূলকে (সাঃ) ও মমিনদেরকে ইজ্জত দান করেছেন।

এখানে মর্যাদার অর্থ যদি আখেরাতের চিরস্থায়ী ইজ্জত-সন্মান হয়, তবে তা আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র তাঁর রসূল (সাঃ) ও মুমিনদের জন্য পৌঁছান করে দিয়েছেন। কারণ, আখেরাতের আরাম-আয়েশ, ইজ্জত-সন্মান কোন কাফের বা মুশরেক কস্মিনকালেও লাভ করবে না। আর যদি এখানে পার্থিব মান-মর্যাদা ধরা হয়, তবে মুসলমানরা যতদিন সত্যিকার মুমিন থাকবে, ততদিন সন্মান ও প্রতিপত্তি তাদেরই করায়ত্ত থাকবে। অবশ্য তাদের ঈমানের দুর্বলতা, আমলের গাফলতি বা পাপাচারে

লিপ্ত হওয়ার কারণে তাদের সাময়িক ভাগ্যবিপর্যয় হলে বা ঘটনাচক্রে অসহায় হতমান হলেও পরিশেষে তারাই আবার মর্যাদা ও বিজয়ের গৌরব লাভ করবে। দুনিয়ার ইতিহাসে এর বহু নজীর রয়েছে। শেষ যুগে হযরত ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে মুসলমানরা আবার যখন সত্যিকার ইসলামের অনুসারী হবে, তখন তারাই দুনিয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكَ فِي الْكِتَابِ — অত্র আয়াতে ইতিপূর্বে মক্কা

মোকররমায় অবতীর্ণ সূরা আন-আমের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে,— আমি তো মানুষের সংশোধনের নিমিত্ত আগেই হুকুম নাযিল করেছিলাম যে, কাফের ও বদকারের ধারে কাছেও বসবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কপটাতারী মুনাফেকরা আদেশ লঙ্ঘন করে ওদের সাথে সৌহার্দ্য স্থাপন করতে শুরু করেছে এবং তাদেরকে ইজ্জত-সন্মানের মালিক মোখতার মনে করেছে।

সূরায়ে-নেসার আলোচ্য আয়াত এবং সূরায়ে আন-আমের যে আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এতদ্বয়ের সমন্বিত মর্ম এই যে, যদি কোন প্রভাবে কতিপয় লোক একত্রিত হয়ে আল্লাহ তা’আলার কোন আয়াত বা হুকুমকে অস্বীকার বা ঠাট্টা-বিদূষ করতে থাকে, তবে যতক্ষণ তারা এহেন গর্হিত ও অব্যাহিত কার্যে লিপ্ত থাকবে, ততক্ষণ তাদের মজলিসে বসা বা যোগদান করা মুসলমানদের জন্যে হারাম।

মোটকথা, বাতিল পন্থীদের মজলিসে উপস্থিতি ও তার হুকুম কয়েক প্রকার। প্রথমতঃ তাদের কুফরী চিন্তাধারার প্রতি সম্মতি ও সম্মতি সহকারে যোগদান করা। এটা মারাত্মক অপরাধ ও কুফরী। দ্বিতীয়তঃ গর্হিত আলোচনা চলাকালে বিনা প্রয়োজনে অপছন্দ সহকারে উপবেশন করা। এটা অত্যন্ত অনায়াস ও ফাসেকী। তৃতীয়তঃ পার্শ্বি প্রয়োজনবশতঃ বিরক্তি সহকারে বসা জায়েয। চতুর্থতঃ জোর-জবরদস্তির কারণে বাধ্য হয়ে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বসা ক্ষমার। পঞ্চমতঃ তাদেরকে সংপক্ষে আনয়নের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া সওয়াবের কাজ।

কুফরীর প্রতি যৌন সম্মতি ও কুফরী : আলোচ্য আয়াতের শেষে

এরশাদ হয়েছে— اِنَّهُمْ اِرَاؤُنْهُمْ অর্থাৎ, এমন মজলিস যেখানে আল্লাহ তা’আলার আয়াত ও আহকামকে অস্বীকার, বিদ্রূপ বা বিকৃত করা হয়, সেখানে হুটচিটে উপবেশন করলে তোমরাও তাদের সমতুল্য ও তাদের গোনাহর অংশীদার হবে। অর্থাৎ, খোদা না করুন, তোমরা যদি তাদের সমতুল্য ও তাদের গোনাহর অংশীদার হবে। অর্থাৎ, খোদা না করুন, তোমরা যদি তাদের কুফরী কথাবার্তা মনে-প্রাণে পছন্দ কর, তাহলে বশস্ততঃ তোমরাও কাফের হয়ে যাবে। কেননা, কুফরীকে পছন্দ করাও কুফরী। আর যদি তাদের কথাবার্তা পছন্দ না করা সত্ত্বেও বিনা প্রয়োজনে তাদের সাথে উঠা বসা কর এমতাবস্থায় তাদের সমতুল্য হওয়ার অর্থ হবে তারা যেভাবে শরীয়তকে হয় প্রতিপন্ন করা এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করার অপ্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, তোমরা তাদের আসরে যোগদান করে সহযোগিতা করায় তাদের মতই ইসলামের ক্ষতি সাধন করছ। নাউজ্ব বিল্লাহে যিনি যালেকা।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَامُوا كَالْإِنَّمَا - আল্লাহর বাণীতে যে শিখিলতার নিন্দা করা হয়েছে তা হচ্ছে বিশ্বাসের শিখিলতা। বিশ্বাস সুদৃঢ় থাকে সন্তোষ আমলের মধ্যে যদি কোন শৈথিল্য থাকে, তবে তা অত্র আয়াতের আওতাভুক্ত নয়। কিন্তু তখনও বিনা ওয়রে শিখিলতা করা নিন্দনীয়। আর রোগকষ্ট, নিম্নলিখিত প্রভৃতি কোন অনিবার্য কারণবশতঃ হলে ক্ষম্যাহ।

وَإِخْلَصُوا إِلَهُكُمْ - অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলার দরবারে একমাত্র ঐ সব আমলই গৃহীত ও কবুল হয় যা শুধু তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এবং কোনরূপ রিয়াকারী বা স্বার্থের লেশমাত্র যার মধ্যে নেই। মুখলেস শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরে-মাযহরীতে লিখিত আছে ان يحب ان يحمد الله تعالى، মুখলেস সে ব্যক্তিকে বলে যে শুধু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সর্বপ্রকার আমল করে এবং ঐ কাজের জন্য লোকের প্রশংসা কামনা করে না।

النساء

১০২

والصحة

الَّذِينَ يَرَبُّونَ بَيْنَكُمْ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا
أَنْتُمْ تَنْفَعُونَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ
نَسْتَحِدْكُمْ عَلَيْهِمْ وَنَسْتَعْلَمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا يَكْفُرُ بِكُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يُجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا
إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُزَازُونَ النَّاسَ وَلَئِنْ دُكِرُوا
اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ يُذِيبُ بَيْنَ بَيْنٍ ذَلِكَ الْآيَةُ هَؤُلَاءِ
إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا لِلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَهُكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ
لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَخَتَمُوا بِاللَّهِ
وَإِخْلَصُوا إِلَهُهُمْ قَالُوا لَيْكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي
اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ
إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

(১৪১) এরা এমনি মুনাফেক যারা তোমাদের কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতীকায় ঔৎপেতে থাকে। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তোমাদের যদি কোন বিজয় অর্জিত হয়, তবে তারা বলে, আমরাও কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? পক্ষান্তরে কাকেরদের যদি আংশিক বিজয় হয়, তবে বলে, আমরা কি তোমাদেরকে ঘিরে রাখিনি এবং মুসলমানদের কবল থেকে রক্ষা করিনি? সুতরাং আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কেয়ামতের দিন যীমাংসা করবেন এবং কিছুতেই আল্লাহ কাকেরদেরকে মুসলমানদের উপর বিজয় দান করবেন না।

(১৪২) অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিখিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। (১৪৩) এরা দোদুল্যমান অবস্থায় বুলন্ত; এদিকেও নয় ওদিকেও নয়। বস্তুতঃ যাকে আল্লাহ গোমরাহ করে দেন, তুমি তাদের জন্য কোন পথই পাবে না কোথাও। (১৪৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাকেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রাক্ষ্য দলীল কায়ম করে দেবে? (১৪৫) নিঃসন্দেহে মুনাফেকরা রয়েছে দোষের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তোমরা তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী কখনও পাবে না। (১৪৬) অবশ্য যারা তওবা করে নিয়েছে, নিজেদের অবস্থার সংস্কার করেছে এবং আল্লাহর পথকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর ফরমানবদার হয়েছে, তারা থাকবে মুসলমানদেরই সাথে। বস্তুতঃ আল্লাহ শীঘ্রই ঈমানদারগণকে মহাপুণ্য দান করবেন। (১৪৭) তোমাদের আখ্যাব দিয়ে আল্লাহ কি করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক! আর আল্লাহ হচ্ছেন সমুচিত মূল্যদানকারী, সর্বজ্ঞ।

আলোচ্য আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে দুনিয়া হতে জ্বোর-জুলুমের অবসান ঘটানোর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তা মানব-রচিত শাসক-সুলত আইনের মত নয়, বরং তীতিপ্রদর্শন ও আশ্বাসদানের মাধ্যমে এক অপূর্ব কানুন পেশ করা হয়েছে। যার মধ্যে একদিকে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমনের জন্য মজলুমকে অধিকার দেয়া হয়েছে যে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে, তাকে আদালতের কাণ্ডাড়া দাঁড় করাতে পারবে। অপরদিকে সূরায় নহল-এর আয়াতে একটি শর্ত আরোপ করে এরশাদ হয়েছে :

وَإِنْ عَاثِمَةُ صَوَّغَتْ إِبْرَاهِيمَ مَاعُوذُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّلظَّالِمِينَ

অর্থাৎ, আর যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও, তবে তোমাদের উপর যে পরিমাণ জুলুম করা হয়েছে, তোমরা ঠিক ততটুকুই প্রতিশোধ নিতে পার। তবে শর্ত হলো এই যে, প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তোমরা আবার জুলুম ও বাড়িবাড়ি করো না, বরং ইনসাফের গণ্ডীর মধ্যে থাকবে, অন্যথায় তোমরাও অত্যাচারী ও অপরাধী সাব্যস্ত হবে। সাথে সাথে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং ক্ষমা করে দাও, তবে নিঃসন্দেহে তা তোমাদের জন্য অতি উত্তম।

এ আয়াতে করিমার দ্বারা আরো বোঝা যায় যে, মজলুম ব্যক্তি যদি অত্যাচারীর অন্যায়-অত্যাচারের কাহিনী লোকের কাছে প্রকাশ করে বা আদালতে অভিযোগের ফরিয়াদ জানায়, তবে তা শেকায়েত ও হারাম গীবতের আওতায় পড়বে না। কারণ, জালামে নিজেই মজলুমকে অভিযোগ উত্থাপন করতে সুযোগ দিয়েছে ও বাধ্য করেছেন।

সারকথা, কোরআন পাক একদিকে মজলুমকে তার প্রতি জুলুমের সমতুল্য প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন। অপরদিকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার পরিবর্তে উন্নত চরিত্রের শিক্ষা ও ক্ষমার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য পরকালের উত্তম প্রতিদানের আশ্বাস শুনিয়ে ক্ষমা ও ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন :

إِنْ تَبُذَّ وَأَخَذُوا لَخُفُوهُ أَوْ تَعَفَّوْا عَنْ سُوءِ كَانَ عَفْوَ أَقْبَىٰ

অর্থাৎ, “যদি তোমরা কোন উত্তম কাজ প্রকাশ্যে কর, বা উহা গোপনে কর, অথবা কারো কোন অন্যায়কে ক্ষমা করে দাও, তবে তা অতি উত্তম। কেননা, আল্লাহ তাআলা অভিশয় ক্ষমা পরায়ণ, ক্ষমতাবান।”

অত্র আয়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য কারো অন্যায়কে ক্ষমা করার আদর্শ শিক্ষা দেওয়া। প্রকাশ্যে বা গোপনে নেক কাজ করার উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ক্ষমা করাও একটি বিশিষ্ট সংকার্য। যে ব্যক্তি অন্যের অপরাধ মার্জনা করবে, সে আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও কক্সার যোগ্য হবে।

আয়াতের শেষে وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوَ قَدِيرًا বলে জানিয়ে

(১৪৮) আল্লাহ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ। (১৪৯) তোমরা যদি কল্যাণ কর প্রকাশ্যভাবে কিংবা গোপনে অথবা যদি তোমরা অপরাধ ক্ষমা করে দাও, তবে জেনো, আল্লাহ নিজেও ক্ষমাকারী, মহাশক্তিশালী। (১৫০) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি অধীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাসে তরতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। (১৫১) প্রকৃতপক্ষে এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা সত্যপ্রত্যাখ্যানকারী তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব। (১৫২) আর যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর রসুলের উপর এবং তাদের কারও প্রতি ঈমান আনতে গিয়ে কাউকে বাদ দেয়নি, শীঘ্রই তাদেরকে প্রাপ্য সওয়াব দান করা হবে। বস্ততঃ আল্লাহ ক্ষমালীল, দয়ালু। (১৫৩) আপনার নিকট আহলে-কিতাবরা আবেদন জানায় যে, আপনি তাদের উপর আসমান থেকে লিখিত কিতাব অবতীর্ণ করিয়ে নিয়ে আসুন। বস্ততঃ এরা মুসার কাছে এর চেয়েও বড় জিনিস চেয়েছে। বলেছে, একেবারে সামান্যমনিভাবে আমাদের আল্লাহকে দেখিয়ে দাও। অতএব, তাদের উপর বস্তপাত হয়েছে তাদের পাপের দরুন; অতঃপর তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ-নিদর্শন প্রকাশিত হবার পরেও তারা গো-বৎসকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল; তাও আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং আমি মুসাকে প্রকট প্রভাব দান করেছিলাম। (১৫৪) আর তাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেবার উদ্দেশ্যে আমি তাদের উপর ত্বর পর্বতকে তুলে ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, অবনত মস্তকে দরজায় ঢোকা। আরো বলেছিলাম, শনিবার দিন সীমালংঘন করো না। এভাবে তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম।

দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, যাকে ইচ্ছা তিনি শাস্তি দিতে পারেন এবং যখন ইচ্ছা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। তথাপি তিনি অতি ক্ষমশীল। আর মানুষের শক্তি ও ক্ষমতা যখন সামান্য ও সীমাবদ্ধ, তাই ক্রমা ও মার্জনার পথ অবলম্বন করা তার জন্য অধিক বাঞ্ছনীয়।

এ হচ্ছে অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধ ও সামাজিক সম্প্রদায়ের ইসলামী মূলনীতি এবং অভিভাবক সুলভ সিদ্ধান্ত। এক দিকে ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার প্রদান করে ইনসাফ ও ন্যায়নীতিকে সমন্বিত রাখা হয়েছে, অপরদিকে উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতা শিক্ষা দিয়ে ক্রমা ও মার্জনা করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যার অনিবার্য ফলশ্রুতি সম্পর্কে কোরআন করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে :

وَأَذِّنْ لِلْبَيْنَةِ عَدَاوَةً وَبُغْضًا وَبُغْضًا

অর্থাৎ, “তোমার ও অন্য যে ব্যক্তির মধ্যে দূশমনী ছিল, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি আন্তরিক বন্ধু হয়ে যাবে।”

আইন-আদালত বা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মাধ্যমে যদিও অন্যায়-অত্যাচার প্রতিরোধ করা যায়, কিন্তু এর দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকে। যার ফলে পারস্পরিক বিবাদের সূত্রপাত হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু কোরআন করীম যে অপূর্ব নৈতিকতার আদর্শ শিক্ষা দিয়েছে, তার ফলে দীর্ঘকালের শত্রুতাও গভীর বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।

এখানে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে কোরআন পাক স্পষ্ট ফয়সালা দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে মান্য করে কিন্তু তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, অথবা কোন পয়গম্বরকে মান্য করে, আর কোন পয়গম্বরকে অমান্য করে আল্লাহ তাআলার সমীপে সে ঈমানদার নয়, বরং প্রকাশ্য কাকের, পরকালে তার পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় নেই।

একমাত্র ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে মুক্তি নেই : কোরআন হাকীমের উপরোক্ত স্পষ্ট ঘোষণা ঐ সব বিভ্রান্ত লোকদের হীনমন্যতা ও গৌজামিলকেও কাঁস করে দিয়েছে, যারা অন্যান্য ধর্মানুসারীদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজেদের ধর্মমত ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিজ্ঞাপিত পদমূলে উৎসর্গ করতে ব্যগ্র। যারা কোরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ফয়সালাকে উপেক্ষা করে অন্যান্য ধর্মানুসারীদেরকে বুঝাতে চায় যে, “মুসলমানদের মতেও শুধু ইসলামই একমাত্র মুক্তিসদন নয়, বরং ইহুদী ও খৃস্টানরাও তাদের নিজ নিজ ধর্ম-কর্মের স্থির থেকে পরকালে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। অথচ তারা অধিকাংশ রসূলকে অথবা অস্তিত্ব কোন কোন পয়গম্বরকে অমান্য করে। যার ফলে তাদের কাকের ও জাহান্নামী হওয়ার কথা অত্র আয়াতে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে।”

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অমুসলমানদের প্রতি ইনসাফ, ন্যায়নীতি, সমবেদনা, সহনভূতি, উদারতা ও এহসান বা হিতকামনার দিক দিয়ে ইসলাম নজীর বিহীন। কিন্তু উদারতা বা সহনভূতি ব্যক্তিগত অধিকারের আওতায় হয়ে থাকে যা আমরা যে কোন ব্যক্তিকে উৎসর্গ করতে পারি। অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ বা অনধিকার চর্চা করা যাবে না। ইসলাম একদিকে অমুসলমানদের প্রতি সদ্যবহার ও পরমসহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে যেমন উদার ও অব্যাহত দ্বার, অপরদিকে স্বীয় সীমারেখা সংরক্ষণের ব্যাপারে অতি সতর্ক, সজাগ ও কঠোর। ইসলাম অমুসলমানদের প্রতি উদারতার সাথে সাথে কুফরী ও কু-প্রচার প্রতি পূর্ণ ঘণা প্রকাশ করে। ইসলামের

দৃষ্টিতে মুসলমান ও অমুসলমানরা দু’টি পৃথক জাতি এবং মুসলমানদের জাতীয় প্রতীক ও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলে চলবে না, বরং সামাজিকতার ক্ষেত্রেও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে। একথা কোরআন ও হাদীসে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআন পাক ও ইসলামের অভিযত যদি এই হতো যে, যে কোন ধর্মমতের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করা সম্ভব, তাহলে ইসলাম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। হযরত রসূল করীম (সাঃ) ও খোলাফায়ে-রাশেদীনের জেহাদ পরিচালনা করা এমন কি রসূলগ্নাহ (সাঃ) - এর নবুওয়ত ও কোরআন নাযিল করা নিরর্থক হতো। - (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিকা)।

সূরা বাকারার ৬২ তম আয়াত দ্বারা কেউ কেউ হয়ত সন্দেহে পতিত হতে পারেন যে, এতে এরশাদ করা হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّالِحِينَ
مَنْ يَأْتِ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَغَيْرَ صَالِحًا فَلَهُمْ جَزَاءُ
عَذَابِهِمْ وَأَخْلَوْهُمْ عَلَيْهِمْ وَآلَهُمْ عَذَابٌ

অর্থাৎ - নিশ্চয় যারা সত্যিকারভাবে ঈমান এনেছে (মুসলমান হয়েছে) এবং যারা ইহুদী হয়েছে এবং নাসারা (খৃস্টান) ও সাবেরীয়নদের মধ্যে যারা আল্লাহ তাআলার প্রতি ও কেয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছে আর সংকাজ করেছে, তাদের পালনকর্তার সমীপে তাদের জন্য পূর্ণ প্রতিদান সংরক্ষিত রয়েছে। তাদের কোন শংকা নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

অত্র আয়াতে ঈমানদারীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়ার পরিবর্তে শুধু আল্লাহ তাআলার প্রতি ও কেয়ামতের প্রতি ঈমান আনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই যারা সামান্য পড়াশোনা করে কোরআন উপলব্ধি করতে চায়, তারা অত্র আয়াত দ্বারা ধারণা করে বসেছে যে, শুধু আল্লাহ তাআলা ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস করাই পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট; নবী-রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা মুক্তির পূর্বশর্ত নয়। কিন্তু তারা একথা জানে না যে, কোরআনের পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান তখনই শুধু গ্রহণযোগ্য ও ধর্তব্য হয় যখন তার সাথে পয়গম্বর, ফেরেশতা ও আসমী কিতাবের প্রতিও ঈমান আনা হয়। অন্যথায় শুধু আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদ তো স্বয়ং শয়তানও স্বীকার করে। কোরআন করীমের ভাষায় শুনুনঃ

وَأَنَّ آمَنُوا بِوَيْسٍ مَا مَنَعَهُمْ فَعَدَا هَتَاوًا وَلَوْ تَوَلَّوْا
فَأَنَّا لَهُمْ فِي شِقَاقِي فَسَيُفْلِكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থাৎ - তাদের ঈমান ঐ সময় গ্রহণযোগ্য ও তারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হবে, যখন তারা তোমাদের সাধারণ মুসলমানদের মত পুরোপুরি ঈমান আনবে। যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে নবীগণের প্রতিও ঈমান আনয়ন করা অপরিহার্য। আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে চিনে রাখো যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। অতএব, আপনার পক্ষে আল্লাহ তাআলাই তাদের মোকাবেলায় যথেষ্ট এবং তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।

সূরা নিসার আলোচ্য আয়াতে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার প্রেরিত কোন একজন নবীকেও যেব্যক্তি অধীকার

কবে সে প্রকাশ্য কাফের, তার জন্য জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব প্রদান করা হবে। রসূলের প্রতি ঈমান ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার প্রতি সত্যিকার ঈমান সাব্যস্ত হয় না।

শেষ আয়াতে পুনরায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহর সন্তান ও কামিয়াবী শুধু ঐ সব লোকের জন্যেই সংরক্ষিত যারা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ঈমানের সাথে সাথে তাঁর নবী ও রসূলগণের প্রতিও যথার্থ ঈমান ও আস্থা রাখে।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন—

ان القرآن يفسر بعضه بعضا

অর্থ— “নিশ্চয় কোরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের ব্যাখ্যা ও তفسীর করে।” অতএব, কোরআনী তফসীরের পরিপন্থী কোন তফসীর বলা কারো জন্য জায়েয নয়।

কতিপয় ইহুদী দলপতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে কল, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন, তবে হযরত মুসা (আঃ) এর প্রতি যেমন লিপিবদ্ধ আসমানী কিতাব নাথিল হয়েছিল, আপনিও তদ্রূপ একখানি লিপিবদ্ধ কিতাব আসমান থেকে নিয়ে আসুন। তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করবো। তারা আন্তরিকভাবে ঈমানের আগ্রহ বিবেচনা সত্যানুসঙ্গিৎসার কারণে এহেন আবদার করে নাই। বরং জিদ ও ঠক্করিতার কারণে একের পর এক বাহানার আশ্রয় নিতে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াত দ্বারা ইহুদীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তাদের ঠক্করী মনোভাব সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে ওয়াকিফহাল করেন এবং সাক্ষ্য দান করেন যে, এরা এমন এক জাতি-গোষ্ঠীর সদস্য যারা পূর্ববর্তী

রসূলগণকেও উত্যক্ত-বিরক্ত করতো, খোদাচ্ছোহিতামূলক বড় বড় অপরাধও নির্দিষ্ট করে বসতো। এদের পূর্বসূরীরা হযরত মুসা (আঃ) এর কাছে আবদার করেছিল যে, সরাসরি ও প্রকাশ্যভাবে আমাদেরকে আল্লাহ্ দেখাতে হবে। এহেন চরম স্পর্ধার কারণে তাদের উপর অকস্মাৎ বজ্রপাত হয়েছিল এবং তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তী ইহুদীরা অদ্বিতীয় মাবুদ আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন সত্তা ও একত্ববাদের অকাট্য প্রমাণাদি অর্থাৎ, হযরত মুসা (আঃ) এর প্রকাশ্য মোজাযাসমূহ ও ফেরাউনের শোচনীয় সলিল সমাধির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার পরও আল্লাহ্ তাআলাকে ত্যাগ করে গো-বৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছিল। এসব অপকর্মের কারণে তারা সমূলে উৎখাতযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমি তাদেরকে ক্ষমা করেছি এবং হযরত মুসা (সাঃ) কে কামিয়াব ও বিজয়ী করেছি। তারা তাওরাতের অনুশাসন মানতে স্পষ্ট অস্বীকার করায় আমি তুর পাহাড়কে তাদের উপর তুলে এনে ঝুলিয়ে দিয়েছি, যাতে হযরত তারা শরীয়তের বিধান মানতে বাধ্য হবে, অথবা তাদেরকে পাহাড়ের নীচে পিষে মারা হবে। আমি তাদেরকে আরো নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তারা যখন ‘ইলিয়া’ শহরের দারদেহ উপনীত হবে, তখন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত অন্তরে অবনত মস্তকে শহরে প্রবেশ করবে। আমি আরো জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, শনিবার দিন মৎস্য শিকার করবে না। এসব তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ। অতএব, এগুলো লঙ্ঘন করো না। এভাবে আমি তাদের থেকে দৃঢ় শপথ গ্রহণ নিয়েছিলাম কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তারা একে একে প্রত্যেকটি নির্দেশ অমান্য করেছে, অস্বীকার ভঙ্গ করেছে। অতএব, আমি দুনিয়াতেও তাদেরকে লাঞ্চিত করেছি এবং আখেরাতেও তাদের নিকৃষ্টতর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

وَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَوْ سَأَلْتَهُمْ لَمَنْ هُوَ مِنْ عِندِ الرَّبِّ
 اَسْتَبَءُ الظَّنِّ وَمَا تَقُولُوْنَ بَيِّنَاتًا .

অর্থাৎ, যারা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে নানা মতভেদ করে নিশ্চয় এ ব্যাপারে তারা সন্দেহে পতিত হয়েছে। তাদের কাছে এ সম্পর্কে কোন সত্যনির্ভর জ্ঞান নেই। তারা শুধু অনুমান করে কথা বলে। আর তারা যে হযরত ঈসা (আঃ)-কে হত্যা করেনি, এ কথা সুনিশ্চিত। বরং আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিরাপদে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন।

কোন কোন রেওয়াজেতে আছে যে, সম্মিত ফিরে পাওয়ার পর কিছু লোক বললো, আমরা তো নিজেদের লোককেই হত্যা করে ফেলেছি। কেননা, নিহত ব্যক্তির মুখমণ্ডল হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত হলেও তার ঞ্জ-প্রত্যঙ্গ অন্য রকম। তদুপর এ ব্যক্তি যদি ঈসা (আঃ) হয়, তবে আমাদের প্রেরিত লোকটি গেল কোথায়? আর এ ব্যক্তি আমাদের হলে হযরত ঈসা (আঃ)-ই বা কোথায় গেলেন?

وَكَانَ لِلَّهِ عِزٌّ عَزِيزًا অর্থাৎ- আল্লাহ্ জাল্লাশানুহ
 পরাক্রমশালী, রহস্যজ্ঞানী। ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে কতল করার যত যড়যন্ত্র ও চক্রান্তই করুক না কেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর হেফাজতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন তখন তাঁর অসীম কুদরত ও জ্ঞার হেকমতের সামনে ওদের অপচেষ্টার কি মূল্য আছে? আল্লাহ তাআলা প্রজ্ঞাময়, তাঁর প্রতিটি কাজের নিগূঢ় রহস্য বিদ্যমান রয়েছে। ঈদুপজারী বস্তুবাদীরা যদি হযরত ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আসমানে উত্তোলনের সত্যটুকু উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তা তাদেরই দুর্বলতার প্রমাণ।

পরিশেষে এ প্রসঙ্গটির উপসংহার টেনে বলা হয়েছে—

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ الْكَذِبِ إِلَّا كِبُورَهُنَّ يَوْمَ قِيَامٍ

- অর্থাৎ, ইহুদীরা ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে যদিও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে চিন্তা করে না, এবং হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, এমনকি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়তকে অস্বীকার করে, কিন্তু তাদের মৃত্যুর পূর্বে এমন এক সময় আসবে, যখন তাদের দৃষ্টির সম্মুখে সত্য উন্মোচিত হবে, তখন তারা যথার্থই বুঝতে পারবে যে, হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে তাদের ধারণা একান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল।

অত্র আয়াতের مَوْتِهِ অর্থাৎ, ‘তার মৃত্যুর পূর্বে’ শব্দে ইহুদীদের মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তফসীর এই যে, প্রত্যেক ইহুদীই তার অস্তিত্ব মুহূর্তে যখন পরকালের দৃশ্যাবলী অবলোকন করবে, তখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়তের সত্যতা ও নিজেদের বাতুলতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে এবং তার প্রতি ঈমান আনয়ন করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তখনকার ঈমান তাদের আদৌ কোন উপকারে আসবে না; যেমন লোহিত সাগরে ডুবে মরার সময় ফেরাউনের ঈমান ফলপ্রসূ হয়নি।

দ্বিতীয় তফসীর যা সাহাবায়ে কোরাম ও তাবয়ীগণের বিপুল জামাত কর্তৃক গৃহীত এবং সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত হয়েছে, তা হলো مَوْتِهِ ‘তার মৃত্যু’ শব্দের সর্বনামে হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের তফসীর হলো : আহলে-কিতাবরা এখন যদিও হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি সত্যিকার ঈমান আনে না, ইহুদীরা তো তাঁকে নবী বলে স্বীকারই করতো না, বরং ভণ্ড, মিথ্যাবাদী ইত্যাকার আপত্তিকর বিশেষণে ভূষিত করতো। (নাউমুল্লাহ মিন যালেকা)। অপর দিকে খৃষ্টানরা যদিও ঈসা মসীহ (আঃ)-কে ভক্তি ও মান্য করার দাবীদার; কিন্তু তাদের মধ্যে একদল ইহুদীদের মতই হযরত ঈসা (আঃ)-এর ক্রুশ বিদ্ধ হওয়ার এবং মৃত্যুবরণ করার কথায় স্বীকৃতি প্রদান করে চরম মুর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। তাদের আরেক দল অতিভক্তি দেখাতে গিয়ে হযরত ঈসা (আঃ)-কে স্বয়ং খোদা বা খোদার পুত্র বলে ধারণা করে বসেছে। কোরআন পাকের এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা বর্তমানে যদিও হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি যথাযথ ঈমান রাখে না, বরং শৈথিল্য বা বাড়াবাড়ি করে, কিন্তু কিয়ামতের নিকটবর্তী যুগে তিনি যখন পুনরায় পৃথিবীতে অবতরণ করবেন, তখন এরাও তাঁর প্রতি পুরোপুরি ঈমান আনয়ন করবে। খৃষ্টানরা মুসলমানদের মত সহীহ আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে ঈমানদার হবে। ইহুদীদের মধ্যে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে, তাদেরকে নিধন ও নিশ্চিহ্ন করা হবে, অবশিষ্টরা ইসলাম গ্রহণ করবে। তখন সমগ্র দুনিয়া থেকে সর্বপ্রকার কুফরী ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান উৎক্লিপ হয়ে যাবে; সর্বত্র ইসলামের একচ্ছত্র প্রাধান্য কায়ম হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ‘হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক রূপে অবশ্যই অবতরণ করবেন। তিনি দাঙ্গালকে কতল করবেন, শুরক নিধন করবেন এবং ক্রুশকে চূষামার করবেন। তখন একমাত্র পরোয়ারদেগার আল্লাহ তাআলার এবাদত করা হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) আরো বলেন— তোমরা ইচ্ছা করলে এখানে কোরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করতে পার যাতে বলা হয়েছে— “আহলে-কিতাবদের মধ্যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে না, বরং ওরা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।” হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন : এর অর্থ ‘হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পূর্বে’ এ বাক্যটি তিনি তিন বার উচ্চারণ করেন। - (তফসীর-কুরতুবী)

ইসলামী শরীয়তেও কোন কোন দ্রব্য পানাহার করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। তবে তা শারীরিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষতিকর হওয়ার কারণে। পক্ষান্তরে ইহুদীদের জন্য কোন দৈহিক বা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর হওয়ার কারণে পবিত্র দ্রব্য হারাম করা হয়নি, বরং তাদের অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ সেগুলো হারাম করা হয়েছিল।

এই আয়াতে কতিপয় মহান ব্যক্তির জন্য যে বিপুল প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়েছে তা তাঁদের ঈমান ও সংকল্পের কারণে। অন্যথায় শুধু জরুরী আকীদা-বিশ্বাসকে সংশোধনের উপরই আখেরাতের মুক্তি নির্ভরশীল। তবে অবশ্যই ঈমানের সাথে মৃত্যুর সৌভাগ্য হতে হবে।

النساء

১০৫

لا يعب الله

আনুষঙ্গিক স্রাস্তব্য বিষয়

إِنَّا وَحِيقًا إِلَيْكَ كَمَا وَحِيقًا إِلَىٰ نُوحٍ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِ

- এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, নবিগণের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ তাআলার বিশেষ নির্দেশ ও বাণীকে ওহী বলা হয়। পূর্ববর্তী নবিগণের প্রতি যেমন খোদায়ী ওহী নাযিল হয়েছিল, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতিও তেমনি আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিল করেছেন। অতএব, পূর্ববর্তী নবিগণকে যারা মান্য করে, তারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কেও মান্য করতে বাধ্য। আর যারা তাকে অস্বীকার করে, তারা যেন অন্যসব নবীকে এক তাদের প্রতি প্রেরিত ওহীকেও অস্বীকার করলো।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নূহ (আঃ) ও তৎপরবর্তী নবিগণের ওহীর সাথে তুলনা করার কারণ হয়ত এই যে, হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের। হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগেই তা পূর্ণতা লাভ করেছিল। হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহী ছিল প্রাথমিক শিক্ষাধরূপ, ক্রমে তা উন্নত হতে থাকে এবং পরীক্ষার স্তরে পৌছায়। যারা উত্তীর্ণ হলো, তাদের জন্য পুরস্কার, আর যারা অবাধ্যতা করলো তাদের জন্য আযাবের ব্যবস্থা করা হলো। অতএব, শরীয়তের আদেশ-নিষেধ সমুলিত ওহীপ্রাপ্ত নবিগণের আগমন হযরত নূহ (আঃ) থেকেই শুরু হয়েছিল। অপর দিকে ওহী অস্বীকারকারী বিরুদ্ধাচারীদের উপর সর্বপ্রথম আযাবও হযরত নূহ (আঃ)-এর কালেই আরম্ভ হয়।

সারকথা এই যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর পূর্বে আল্লাহর ওহীর অবাধ্য ও নবিগণের বিরুদ্ধাচরণকারীদের উপর কোন ব্যাপক আযাব বা গণ্য আপত্তি হতো না। বরং তাদেরকে মায়ুর সাব্যস্ত করে অব্যাহতি ও অবকাশ দেয়া হতো, বোঝাবার চেষ্টা করা হতো। হযরত নূহ (আঃ)-এর আমলে যখন ধর্মীয় শিক্ষার অধিকতর প্রচার-প্রসার হয়েছিল এক আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে মানুষের কাছে কোন অস্পষ্টতা ছিল না, তখন থেকেই অবাধ্যদের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হতে থাকে। হযরত নূহ (আঃ)-এর যমানার সর্বশাসা মহাপ্লাবনই সর্বপ্রথম ব্যাপক ঐতিহাসিক আযাব। পরবর্তী কালে হযরত হুদ (আঃ), হযরত ছালেহ (আঃ), হযরত শোয়ায়েব (আঃ), প্রমুখ পয়গম্বুগণের আমলেও অমান্যকারী নাস্তরমদ কাফেরদের প্রতি বিভিন্ন প্রকার আযাব ও গম্ব আপত্তি হয়েছে। অতএব, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে হযরত নূহ (আঃ) ও তৎপরবর্তীগণের ওহীর সাথে তুলনা করে মক্কার মুশরেক ও আহলে-কিতাব ইহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ ইশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, উল্লিখিত চিরাচরিত নিয়মানুসারে তারা যদি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ ওহী অর্থাৎ, কোরআনকে অস্বীকার বা অমান্য করে, তবে তারাও ভয়াবহ শাস্তির আওতা পড়বে।—(ফাওয়ায়েদ-ওসমানী)

হযরত নূহ (আঃ)-এর অন্তিমুই ছিল এক অনন্য মো'জ্জ্বা। তিনি সুদীর্ঘ সাড়ে নয় শত বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইস্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তার দৈহিক শক্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি, একটি দাঁতও পড়েনি, একগাছি চুলও পাকেনি। তিনি সারা জীবন দেশবাসীর নির্যাতন-নিপীড়ন অত্যধিক ঐশ্বর্য সহকারে সহ্য করেছেন।—(তফসীরে-মাহহারী)

وَرَسُولًا فَتَضَعُهُمْ عَلَيْكَ - “এবং আরো বহু রসূল আল্লাহ

ইতিবৃত্তান্ত আপনাকে শুনিবে।” এ আয়াতে হযরত নূহ (আঃ)-এর পর

إِنَّا وَحِيقًا إِلَيْكَ كَمَا وَحِيقًا إِلَىٰ نُوحٍ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِ
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْإِسْمَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَأَتَيْنَادَا وَدَّ وَزُورًا ۖ وَرُسُلًا قَدْ قَضَيْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن
قَبْلُ ۖ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْضُ صَهْمَهُمْ عَلَيْكَ ۖ وَكَرَّمُوا اللَّهَ مُوسَىٰ
تَحْلِيمًا ۖ رُسُلًا مُّتَّبِعِينَ وَمُنذِرِينَ لِّقَلِيلٍ لِّلنَّاسِ
عَلَىٰ اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝
لِّئِنْ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَاللَّيْلِ
يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ
صَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا كَبِيرًا ۝ إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلِلَّذِينَ يُمِ
طَرِيقًا ۖ الْأَطْرَافُ جَمْعٌ خَلِيدٌ ۖ فِيهَا أَكْبَادٌ وَأُكُنَ ذَلِكَ
عَلَىٰ اللَّهِ سَيِّئًا ۖ يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ بِالْحَقِّ
مِنْ رَبِّهِمْ قَامُوا خَائِرًا لِّأَمْوَالِهِمْ تَكْفُرُوا ۖ وَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي
السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

(১৬৩) আমি আপনার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি, যেমন করে ওহী পাঠিয়েছিলাম নূহের প্রতি এবং সে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি যারা তাঁর পরে প্রেরিত হয়েছেন। আর ওহী পাঠিয়েছি, ইসমাঈল, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানবর্গের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের প্রতি। আর আমি দাউদকে দান করেছি যবুর গ্রন্থ। (১৬৪) এছাড়া এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের ইতিবৃত্ত আমি আপনাকে শুনিবে। ইতিপূর্বে এবং এমন রসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শোনাগি। আর আল্লাহ মুসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি। (১৬৫) সুসংবাদদাতা ও তীতি-প্রদর্শনকারী রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রসূলগণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে। আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশীল, প্রাজ্ঞ। (১৬৬) আল্লাহ আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তিনি যে তা সজ্ঞানেই করেছেন, সে ব্যাপারে আল্লাহ নিজেও সাক্ষী এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষী। আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (১৬৭) যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, তারা বিভ্রান্তিতে সুদূরে পতিত হয়েছে। (১৬৮) যারা কুফরী অবলম্বন করেছে এবং সত্য চাপা দিয়ে রেখেছে, আল্লাহ কখনও তাদের ক্ষমা করবেন না এবং সরল পথ দেখাবেন না। (১৬৯) তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের পথ। সেখানে তারা বাস করবে অনন্তকাল। আর এমন করাটা আল্লাহর পক্ষ্যে সহজ। (১৭০) হে মানবজাতি! তোমাদের পালনকর্তার যথার্থ বাণী নিয়ে তোমাদের নিকট রসূল এসেছেন, তোমরা তা যেন নাও যাতে তোমাদের কল্যাণ হতে পারে। আর যদি তোমরা তা না মান, জেনে রাখ, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সে সবকিছুই আল্লাহর। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞ।

সেব পয়গম্বর আগমন করেছেন, তাদের সম্পর্কে প্রথমে সাধারণভাবে
ক্যার পর তন্মধ্যে বিশিষ্ট ও মর্যাদাসম্পন্ন কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে
উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝানো হয়েছে যে, ঐরা সবাই আল্লাহর
পয়গম্বর এবং নবিগণের নিকটে বিভিন্ন পন্থায় ওহী প্রেরিত হয়েছে। কখনো
ফেরেশতার মাধ্যমে ওহী পৌছেছে, কখনো লিপিবদ্ধ কিতাব আকারে
এসেছে, আবার কখনো আল্লাহ তাআলা রসূলের সাথে সরাসরি
স্বাধীনভাবে করেছেন। সারকথা যে কোন পন্থায় ওহী পৌছুক না কেন,
জনমদায়ী আমল করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। অতএব, ইহুদীদের এরূপ
স্বাধীনতা করা যে, তওরাতের মত লিখিত কিতাব নাথিল হলে আমরা মান্য
করবো, অন্যথায় নয়—সম্পূর্ণ আহমুকী ও স্পষ্ট কুফরী।

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ
(সঃ) বলেছেন— আল্লাহ তাআলা একলাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর প্রেরণ
করেছেন, যাদের মধ্যে স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী রসূলের সংখ্যা ছিল
তিন শতের জ্ঞান।— (তফসীরে-কুরতুবী)

رُسُلًا مُبْتَلَيْنَ وَمُؤْتَمِرِينَ — “পয়গম্বরগণ সুসংবাদ দানকারী এবং
ঐতি প্রদর্শনকারী।” আল্লাহ তাআলা ইমানদারদের ইমান ও
স্বকমলীতার পুরস্কারস্বরূপ বেহেশতের সুসংবাদ দান করার জন্য এবং
লক্ষের, বৈদমান ও দুরাচারদের কুফরী ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ
রাহনামার যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভীতি প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে, দেশে
দেশে অব্যাহতভাবে নবী প্রেরণ করেছেন যেন কেয়ামতের শেষ বিচারের
দিন অবাধ্য ব্যক্তির অজুহাত উত্থাপন করতে না পারে যে, ইয়া আল্লাহ,
কোন কাজে আপনি সন্তুষ্ট আর কোন কাজে বিরাগ হন, তা আমরা
ইঙ্গিত করতে পারিনি। জ্ঞানতে পারলে অবশ্যই আমরা আপনার স
ষ্টের পথ অবলম্বন করতাম। অতএব, আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি
মজবুত এবং আমরা নিরপরাধ। পথভ্রষ্ট লোকেরা যাতে এহেন অজুহাত
পেশ করতে বা বাহানার আশ্রয় নিতে না পারে, তজ্জন্ম আল্লাহ তাআলা

অলৌকিক মোজ্জ্যাসহ নবিগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তারা সর্বস্ব
উৎসর্গ করে সত্য পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, এখন আর সত্য দ্বীন
ইসলাম গ্রহণ না করার ব্যাপারে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না, কোন
বাহানারও অবকাশ নেই। আল্লাহর ওহী এমন এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ যার
মোকাবিলায় অন্য কোন প্রমাণই কার্যকর হতে পারে না। কোরআন পাক
এমন এক অকাটা দলীল যার সামনে কোন অযুক্তি টিকেতে পারে না।
আল্লাহ তাআলা হেকমত ও তদবীরের এটা এক কম্পনাতীত নিদর্শন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন— একদা হযরত
রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সমীপে একদল ইহুদী উপস্থিত হলো। রসূলুল্লাহ
(সঃ) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, — আল্লাহর কসম! তোমরা
সন্দেহাতীতভাবে জান যে, আমি আল্লাহ তাআলার সত্য রসূল। তারা
অস্বীকার করলো। তখনই ওহী নাথিল হল : لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْيَهُودُ عَنْ آلِهَتِهِمْ إِلَّا بِمَا نَحْنُ بِهِ أَعْيُنًا أَوْ يَدَايِهِمْ فُلَا نَنْزِلُ السَّمَاءَ بَنَاتٍ لَهُمْ كَبَاشِيرُ عَذَابٍ عَظِيمٍ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ঐ কিতাবের (আল-কোরআনের) মাধ্যমে
যা তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞানের নিদর্শন, আপনার নবুওতের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। তিনি
আপনাকে ঐ কিতাবেরযোগ্য জেনেই কিতাব নাথিল করেছেন। আর
ফেরেশতাগণও এর সাক্ষী। অধিকন্তু সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তাআলার
সাক্ষ্যদানের পর আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

মহানবী (সঃ) ও কোরআন পাকের সত্যতা প্রমাণের পর আল্লাহ
তাআলা বলেন : এখনও যারা কোরআন মজীদ ও রসূলে করীম (সঃ) কে
অস্বীকার করে এবং তওরাতের রসূল (সঃ) এর যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের
উল্লেখ রয়েছে তা গোপন করে এবং এক কথায় অন্য কথা লোকের কাছে
প্রকাশ করে এবং তাদেরকে সত্য দ্বীন হতে বিরত ও বঞ্চিত করে, এহেন
চরম অপরাধীদের কসিনকালেও ক্ষমা ও হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য হবে
না। এতদ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, একমাত্র হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) এর
আনুগত্যের মধ্যেই হেদায়েত সীমাবদ্ধ ; তাঁর অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ
করা চরম গোমরাহী। অতএব, ইহুদীদের-ধ্যান-ধারণা, ধর্ম-কর্ম শ্রান্ত ও
বাতিল।

الدَّسَاءِ

১০৭

لا يَجِبُ ٱللَّهُ

يَا هَٰلَكَ الْكَذِبُ لَا تَعْمَلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ
 إِلَّا الْحَقَّ إِنَّهُ ٱلسَّيِّئُ عَصَى ٱبْنِ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَكَذَّبَتْ
 ٱلْقَهْلَى ٱلَى مَرْيَمَ وَرُوْمُنَ فَأَمْنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَلَا
 تَقُولُوا لَكَدَّةٌ إِنَّهُمْ أَحْسَنُ ٱلْكَلِمَ إِنَّهُ ٱللَّهُ إِلَهُ وَ ٱحْدُ
 سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى
 ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۚ لَنْ يَسْتَكْفِرَ ٱلسَّيِّئُ أَنْ
 يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلِكَةُ ٱلْمَقْرُونُونَ وَمَنْ يَسْتَكْفِفْ
 عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْفِفْ سَيِّئَاتِهِمْ ٱلْيَهُ حَبِيبًا ۖ إِنَّ
 ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَاتِ فَوْقَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ
 يُؤْتِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ اسْتَكْفَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا
 فَيَعِدُّهُمْ عِدَابًا أَلِيمًا ۚ وَلَا يُجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ
 وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۖ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ
 مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ
 آمَنُوا بِٱللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِى رَحْمَتِهِ
 وَمِنَهُ وَفَضْلٍ ۖ وَيَهْدِيهِمْ يَوْمَ ٱلْأَوَّلِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

(১৭১) হে আহলে-কিতাব! তোমরা দুইনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সক্ত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলা না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসুল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ—তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তার রসুলগণকে মান্য কর। আর একথা বলা না যে, আল্লাহ তিনের এক, একথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সম্ভান-সম্ভতি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তার। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট (১৭২) মসীহ আল্লাহর বান্দা হবেন, তাতে তার কোন লজ্জাবোধ নেই এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদেরও না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর দাসত্বে লজ্জাবোধ করবে এবং অহংকার করবে, তিনি তাদের সবাইকে নিজের কাছে সমবেত করবেন। (১৭৩) অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সংকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ সওয়াব দান করবেন, বরং স্বীয় অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। পক্ষান্তরে যারা লজ্জাবোধ করেছে এবং অহংকার করেছে তিনি তাদেরকে দেবেন বেদনাদায়ক আযাব। আল্লাহকে ছাড়া তারা কোন সাহায্যকারী ও সমর্থক পাবে না। (১৭৪) হে মানবকুল! তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সনদ পৌছে গেছে। আর আখি তোমাদের প্রতি প্রকৃষ্ট আলো অবতীর্ণ করেছে। (১৭৫) অতএব, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাতে দৃঢ়তা অবলম্বন করেছে তিনি তাদেরকে স্বীয় রহমত ও অনুগ্রহের আওতায় স্থান দেবেন এবং নিজের দিকে আসার যত সরল পথে তুলে দেবেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَكَذَّبَتْ শব্দে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর কালেমা। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরকারগণ বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন।

(এক) হযরত ইমাম গাযালী (রাহঃ) বলেন : কোন শিশুর জন্ম লাভের জন্য দু'টি শক্তির যৌথ ভূমিকা থাকে। তন্মধ্যে একটি হলো নারী-পুরুষের বীর্যের সম্মেলন। দ্বিতীয় শক্তি আল্লাহ তাআলার **কন** (হও) নির্দেশ দান; যার ফলে উক্ত শিশুর অস্তিত্বের সঞ্চার হয়ে থাকে। হযরত ঈসা (আঃ)—এর জন্ম লাভের ক্ষেত্রে প্রথম শক্তি বর্তমান ছিল না। তাই দ্বিতীয় শক্তির সাধে সম্পর্কিত করে তাঁকে কালেমাতুল্লাহ বলা হয়েছে। যার তাৎপর্য এই যে, তিনি বস্তুগত কার্যকারণ ছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার **কন** (হয়ে যাও) নির্দেশের প্রভাবে জন্মলাভ করেছেন। এমতাবস্থায় **ٱلْقَهْلَى ٱلَى مَرْيَمَ** বাক্যের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহ তাআলা এ কালেমাটি হযরত জিব্বারঈল (আঃ)—এর মাধ্যমে হযরত মরিয়মের কাছে পৌছে দিলেন, আর হযরত ঈসা (আঃ)—এর জন্মগ্রহণের মাধ্যমে তা কার্যকর ও বাস্তবায়িত হলো।

(দুই) কারো মতে ‘কালেমাতুল্লাহ’ অর্থ আল্লাহর সুসংবাদ। এর দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)—এর ব্যক্তি-সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। ইতিপূর্বে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতার মাধ্যমে হযরত মরিয়ম (আঃ)—কে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যে সুসংবাদ দান করেছিলেন সেখানে ‘কালেমা’ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যথা : **إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ لَإِمرَأَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ بَرَكُوكِ** এবং ফেরেশতারা বললো—যে মরিয়ম! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে সু-সংবাদ দিচ্ছেন ‘কালেমা’ সম্পর্কে।

(তিন) কারো মতে এখানে ‘কালেমা’ অর্থ নিদর্শন। যেমন, অন্য এক আয়াতে শব্দটি নিদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَمَكَدَّتْ يَكْفِيتُ رَيْبًا

وَرُوْمُنَ — এ শব্দে দুটি বিষয় প্রশ্নবিধানযোগ্য। প্রথমতঃ হযরত ঈসা (আঃ)—কে ‘রূহ’ বলার তাৎপর্য কি? দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার কারণ কি?

এ সম্পর্কে তফসীরকারগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে—(এক) কারো মতে ‘রূহ’ অতিশয় পবিত্র বস্তু হওয়ার কারণে এরূপ বলা হয়েছে। কেননা, প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, কোন বস্তুর অধিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বোঝাবার জন্য তাকে সরাসরি ‘রূহ’ বলা হয়। হযরত ঈসা (আঃ)—এর জন্মলাভের মধ্যে যেহেতু বীর্যের কোন দখল ছিল না, বরং তিনি শুধু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা এবং **কন** নির্দেশের ভিত্তিতে জন্মলাভ করেছিলেন, কাজেই দৈহিক পবিত্রতার দিক দিয়ে তিনি শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। অতএব, প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁকে ‘রূহ’ বলা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করার উদ্দেশ্যে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা। যেমন, মসজিদের সম্মানার্থে সেটিকে ‘আল্লাহর মসজিদ’ বলা হয়, কাবা শরীফকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহর মসজিদ বলা হয়; অথবা কোন একান্ত আনুগত বান্দাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে আবদুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা বলা হয়। যেমন, সূরা বনী-ইসরাঈলের **أَسْرَى بِعَبْدٍ** আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে ‘আল্লাহর বান্দা’ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(দুই) কারো মতে আধ্যাত্মিক জীবন দান করে মানুষের মৃতপ্রায় কবরকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন। দৈহিক জীবনের মূল যেমন রূহ বা প্রাণ, তদ্রূপ হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাণ স্বরূপ। অতএব, তাঁকে ‘রূহ’ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। যেমন **وَكُنْزُكَ وَسَيِّدُكَ وَرَبُّكَ** আয়াতে পরিসর কোরআনকেও ‘রূহ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা, কোরআনপাক আধ্যাত্মিক জীবনের উৎসমূল।

(তিন) কেউ বলেন—‘রূহ’ শব্দটি রহস্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থেই অধিক সমীচীন। কারণ, হযরত ঈসা (আঃ)—এর নজীরহীন ও নিদুসর জন্ম আল্লাহ্ তাআলার অসীম কুদরতের নিদর্শন ও রহস্য। এজন্যই তাঁকে ‘রুহুল্লাহ’ বলা হয়।

(চার) আরেকটি অভিমত এই যে, **روح** (রূহ) শব্দ ফুঁক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ পাকের নির্দেশক্রমে হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযরত মরিয়ম (আঃ)—এর গলবন্দে ফুঁক দিয়েছিলেন। আর তার ফলেই তিনি কর্তব্যী হয়েছিলেন। যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ) শুধু ফুঁককারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাই তাঁকে রুহুল্লাহ্ খেতাব দেয়া হয়েছে। কোরআন পাকে একেই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে। **فَمَخَّرْنَا بِهَا إِمْرًا وَرُوحًا**

এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। তবে হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র সত্তার অংশে ছিলেন বা আল্লাহুই ঈসা (আঃ)—এর মননীয় দেহে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন—এমন অর্থ করা বা ধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল।

একটি ঘটনা : আল্লামা আলুসী (রাহঃ) লিখেছেন যে, একদিন খলিফা হাক্করুর রশীদের দরবারে জনৈক খৃস্টান চিকিৎসক হযরত আলী ইবনে হোসাইন ওয়াকেরদীর সাথে তর্কে প্রবৃত্ত হয়। সে বলল,—তোমাদের কোরআনে এমন একটি শব্দ রয়েছে যার দ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র অংশে ছিলেন। প্রমাণ স্বরূপ সে কোরআনের **وَرُوحُهُ** শব্দটি পেশ করল। তদুত্তরে আল্লামা ওয়াকেরদী কোরআন পাকের আয়াত **وَمَكَرُواكَ فِي السُّورَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ حَيَاتًا** পাঠ করলেন।

এখানে **حَيَاتًا** শব্দ দ্বারা সব কিছুকে আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যার অর্থ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্র গুণ হতে। অতএব, **وَرُوحُهُ** শব্দের অর্থ যদি করা হয় যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহ্র অংশে, তবে **حَيَاتًا** শব্দের অর্থ করতে হবে আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্র অংশে। (নামুবিলাহি মিন যালিক)। অতএব, হযরত ঈসা (আঃ)—এর বিশেষ কোন মর্যাদা সাব্যস্ত হয় না। এ উত্তর শুনে খৃস্টান চিকিৎসক নিরুত্তর হয়ে গেল এবং ইসলাম গ্রহণ করলো।

وَلَا تَتَّبِعُوا آيَاتَهُ কোরআন নাযিলের সমসাময়িক কালে খৃস্টানরা যেসব উপদল বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ত্রিব্রবাদ সম্পর্কে তাদের ধর্মবিশ্বাস তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদল মনে করতো—মসীহই খোদা। স্বয়ং খোদাই মসীহরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। দ্বিতীয় দল বলতো—মসীহ পুত্র। তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল, তিন সদস্য সমন্বয়ে খোদার একক পরিবার। এ দলটি আবার দু’টি উপদলে বিভক্ত ছিল। এক দলের মতে পিতা, পুত্র ও মরিয়ম এ তিনের সমন্বয়ে এক খোদা। অন্য এক দলের মতে হযরত মরিয়ম (আঃ)—এর পরিবর্তে রুহুল কুদুস পবিত্রাত্মা হযরত জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন তিন

খোদার একজন।

মোটকথা, খৃস্টানরা হযরত ঈসা মসীহ (আঃ)—কে তাদের এক খোদা মনে করতো। তাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য কোরআন করীমে প্রত্যেকটি উপদলকে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং সম্মিলিতভাবেও সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সামনে স্পষ্ট ও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, সত্য একটিই। আর তা হল হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) তাঁর মাতা হযরত মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী একজন মানুষ ও আল্লাহ্ তাআলার সত্য রসূল। এর অতিরিক্ত তাঁর সম্পর্কে যা কিছু বলা বা ধারণা করা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল। তাঁর প্রতি ইহুদীদের মত অবজ্ঞা বা ঈর্ষা পোষণ করা অথবা খৃস্টানদের মত অতি ভক্তি প্রদর্শন করা সমভাবে নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

কোরআন মজীদের অসংখ্য আয়াতে একদিকে ইহুদী-খৃস্টানদের পথভ্রষ্টতা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ্ তাআলার দরবারে হযরত ঈসা (আঃ)—এর উচ্চ মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের অধিকারী হওয়ার কথাও জোরালোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে অবজ্ঞা ও অতিভক্তি দু’টি পরস্পর বিরোধী ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যবর্তী সত্য ও ন্যায় সঠিক পথ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا

অর্থাৎ, আসমান ও যমীনে উপর হতে নীচে পর্যন্ত যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টি ও তাঁর বান্দা! অতএব, তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র-পরিজন হতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা একাই সর্বকার্য সম্পাদনকারী এবং সকলের কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি একাই যথেষ্ট; অন্য কারো সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন নেই। তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার বা পুত্র-পরিজন থাকতে পারে না।

সারকথা, কোন সৃষ্ট ব্যক্তিরই স্রষ্টার অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা নেই। আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সত্তার জন্য এর অবকাশও নেই, প্রয়োজনও নেই। অতএব, একমাত্র বিবেকবর্জিত, ঈমান হতে বঞ্চিত ব্যক্তি ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্ট কোন জীবকে তাঁর অংশীদার বা পুত্র বলা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা হারাম : **لَا تَتَّبِعُوا فِي دِينِكُمْ** আয়াতে ইহুদী-নাসারাগণকে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে। **غلو** শব্দের অর্থ সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। ইমাম জাঙ্গাস ‘আহ্‌কামুল-কোরআনে’ লিখেছেন :

الغلو في الدين هو مجاوزة حد الحق فيه
অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার অর্থ তার ন্যায়সঙ্গত সীমা রেখা অতিক্রম করা।

আহলে-কিতাব অর্থাৎ ইহুদী-খৃস্টান উভয় জাতিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ বাড়াবাড়ি করো না। কারণ, এ বাড়াবাড়ির রোগে উভয় জাতিই আক্রান্ত হয়েছে। খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)—কে ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। তাঁকে স্বয়ং খোদা, খোদার পুত্র অথবা তিনের এক খোদা বানিয়ে দিয়েছে। অপর দিকে ইহুদীরা তাঁকে অমান্য ও প্রত্যাখ্যান করার দিক দিয়ে বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছে। তারা হযরত ঈসা (আঃ)—কে আল্লাহ্র নবী হিসেবে স্বীকার করেনি। বরং তাঁর মাতা হযরত মরিয়ম (আঃ)—এর উপর মারাত্মক অপবাদ আরোপ করেছে এবং তাঁর নিন্দাবাদ করেছে।

ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও সীমা লঙ্ঘনের কারণে ইহুদী ও খৃষ্টানদের গোমরাহী ও ধ্বংস হওয়ার শোচনীয় পরিণতি বার বার প্রত্যক্ষ হয়েছে। তাই হযরত রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর প্রিয় উম্মতকে এব্যাপারে সংযত থাকার জন্য সতর্ক করেছেন। মুসনাদে আহমদে হযরত ফারকে আযম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন :

لا تظروني كما اظرت النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد
فقلوا عبد الله ورسوله

অর্থাৎ, ‘তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে এমন অতিরঞ্জিত করোনা, যেমন খৃষ্টানরা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)—এর ব্যাপারে করেছে। সুপ্রাণ রাখবে যে, আমি আল্লাহর বান্দা। অতএব, আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল বলবে।’ বোখারী এবং ইবনে-মাদয়িনী এ হাদীস উল্লেখ করে এর সনদকে সহীহ বলেছেন।

সারকথা, আল্লাহর বান্দা ও মানুষ হিসেবে আমিও অন্য লোকদের সমপর্যায়ের। তবে আমার সবচেয়ে বড় মর্যাদা এই যে, আমি আল্লাহর রসূল। এরচেয়ে অগ্রসর করে আমাকে আল্লাহ তাআলার কোন বিশেষণে বিশেষিত করা বাড়াবাড়ি বৈ নয়। তোমরা ইহুদী-নাসারাদের মত বাড়াবাড়ি করো না। বস্তুতঃ ইহুদী-খৃষ্টানরা শুধু নবিগণের ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি করে ক্রান্ত হয়নি, বরং এটা যখন তাদের স্বভাবে পরিণত হলো, তখন তারা নবিগণের সহচর ও অনুগামীদের ব্যাপারেও অতিরঞ্জিত সব গুণ আরোপ করেছিল। পাশ্চী-পুরোহিতগণকেও তারা নিষাপ মনে করতো। অতঃপর এতটুকু যাচাই করারও প্রয়োজন মনে করতো না যে, তারা সত্যিকারভাবে নবিগণের অনুগত এবং তাঁদের শিক্ষার অনুসারী না শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে পণ্ডিত-পুরোহিত রূপে পরিগণিত হন? ফলে পরবর্তীকালে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব এমন পাশ্চী-পুরোহিতদের কৃষ্ণিগত হয়েছে যারা নিজেরা স্বার্থপর ও পঞ্চাঙ্গ ছিল এবং অনুসারীদেরকে চরম বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। ধর্ম-কর্মের নামে তারা অধর্ম-অনাচারে লিপ্ত হয়েছে। কোরআন পাক ঘোষণা করছে :

اِئْتِذُواْ اٰمِنًا رُّهُمُ وَرُفْعًا هُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ

‘তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ ও সন্যাসিগণকে মাবুদের আসনে বসিয়েছিল।’ রসূলকে তো খোদা বানিয়েছিলই, রসূলের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার নামে পূর্ববর্তী নবিগণকেও পূজা করা শুরু করেছিল।

এতদূরা বোঝা গেল যে, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা এমন এক মারাত্মক ব্যাধি যা ধর্মের নামেই পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের সত্যিকার রূপরেখাকে বিলীন করেছে। তাই আমাদের প্রিয়নবী (সাঃ) স্বীয় উম্মতকে এহেন ভয়াবহ মহামারীর কবল হতে রক্ষা করার জন্য পূর্ণ সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হজ্বের সময় ‘রমীয়ে-জামারাহ’ অর্থাৎ, কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য রসূলুল্লাহ হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ)—কে কঙ্কর আনতে আদেশ করলেন। তিনি মাঝারী আকারের পাথরকুচি নিয়ে এলে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং বললেন—
بِشَلْهِن اর্থৎ, এ ধরনের মাঝারী আকারের কঙ্কর নিক্ষেপ করাই পছন্দনীয়। বাক্যটি তিনি দুবার বললেন। অতঃপর আরো বললেন :

اياكم والغلو في الدين فانما هلك من قبلكم بالغلو في دينهم

অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি থেকে দূরে থেকো। কেননা,

তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতসমূহ তাদের ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। এ হাদীস দ্বারা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল জানা গেল।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল : প্রথমতঃ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয় তা মাঝারী আকারের হওয়াই সূন্য। অতি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পাথর নিক্ষেপ করা সূন্যতের পরিপন্থী। বড় বড় প্রস্তর নিক্ষেপ করা ধর্মের কাজে বাড়াবাড়ির শামিল।

দ্বিতীয়তঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে যে কাজের যে সীমারেখা শিক্ষা দিয়েছেন, সেটিই শরীয়তের নির্ধারিত সীমা। অতিক্রম করাই বাড়াবাড়ি রূপে পরিগণিত হবে।

তৃতীয়তঃ - যে কোন কাজে সূনাহ সম্মত সীমারেখা অতিক্রম করাই বাড়াবাড়ি রূপে বিচেনা করতে হবে।

দুনিয়ার মহব্বতের রূপরেখা : পার্শ্বি ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত আকাংক্ষা ও লোভ-লালসা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। এটা পরিত্যাগ করার জন্য কোরআন পাকে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দুনিয়ার মহব্বত বা পার্শ্বি মোহ সম্পর্কে সতর্ক করার সাথে সাথে রসূলে করীম (সাঃ) স্বীয় কথা ও কার্য দ্বারা জর সীমারেখাও নির্ধারণ করেছেন। যেমন, বিবাহ করাকে তিনি নিজের সূন্য বলে ঘোষণা করেছেন, বিবাহ করার জন্য উৎসাহিত করেছে, সন্তান জন্মানের উপকারিতা বুঝিয়েছেন, পরিবার-পরিজনের সাথে সদ্যবয়স ও তাদের ন্যায্য অধিকার পূরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, নিজের ও পরিবারবর্গের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন করাকে ‘ফরিযাতুন বা’দ ফরিযা’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যবসায়, কৃষিকার্য, শিল্প-কর্ম, হস্তশিল্প ও মজদুরীর জন্য প্রেরণা যুগিয়েছেন। অতএব, এর কোনটাই দুনিয়ার মহব্বতের গম্ভীর মধ্যে পড়ে না। ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্ত এবং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাকে নবুওয়তের দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় প্রচেষ্টায় সমগ্র আরব উপ-দ্বীপে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তন করেন। অতঃপর খোলাফায়ে-রাশেদীনের সুবর্ণ যুগে সে রাষ্ট্রের এলাকা বহু দূর-দূরান্তে বিস্তৃত হয়েছিল, অথচ তাঁদের অগ্রর দুনিয়ার কোন মোহই ছিল না। এতদূরা সাব্যস্ত হয় যে, প্রয়োজন অনুসারে এসব করা নিন্দনীয় নয়।

ইহুদী ও খৃষ্টানরা এ তত্ত্বটি অনুবাহন করতে অপারক হওয়ায় সন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছে। তাদের এ ভ্রান্তি খণ্ডন করে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন :

وَرَبَّائِنَا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ اَعْمَانًا عَلَيْهِنَّ اَلِ الْاِثْمُ الرَّسُوْلَانِ اللّٰهُ

فَمَا تَعْمَلُوْنَ اَمَّا رِجَالُهُمْ

অর্থাৎ, তারা নিজেদের পক্ষ থেকে সন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছে। যা আলি তাদের প্রতি আরোপ করিনি। অতঃপর তারা তা যথাযথভাবে ব্যাখ্যা রাখেন।

সূন্য ও বেদাতের সীমারেখা : এবাদত, লেন-দেন, আচার-ব্যবস্থা তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রসূলে পাক (সাঃ) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে মধ্যপন্থা নির্দেশ করেছেন। তার চেয়ে পেছনে অবস্থান যেমন, অবাঞ্ছনীয় তেমনি অগ্রসর হওয়াও অমাজনীয়। এ জন্য রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বক্ষেত্রে বেদাতকে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

গোমরাহী আর প্রত্যেকটি গোমরাহীর পরিণামই জাহান্নাম। রসূলে মকবুল (সঃ)-এর কথা বা কার্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে বিষয়ের সম্বন্ধ পাওয়া যায় না, এরূপ কোন বিষয়কে সওয়াবের কাজ মনে করাই বেগাত।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাম্মদেস দেহলবী (রাঃ) লিখছেন : ইসলামের দৃষ্টিতে বেদাতকে চরম অপরাধ এ জন্য বলা হয়েছে যে, ঐহীন ও শরীয়তকে বিকৃত করার প্রধান হাতিয়ার ও চিহ্নায়িত পন্থা। পূর্ববর্তী উম্মতগণেরও প্রধান ব্যাধি ছিল যে, তারা নিজেদের নবী ও রসূলালয়ের মৌলিক শিক্ষার উপর নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্তন করত। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা কিংকি বর্ধিত করেছে আর আসল বিষয়টি কি ছিল, তা জানারও কোন উপায় ছিল না।

দীনকে বিকৃত করার কারণ ও পন্থাসমূহ কি কি, কোনও গুপ্তপথে যাতে এ মহামারী উম্মতে-মোহাম্মদীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, তজ্জন ইসলামী শরীয়তে কিভাবে প্রতিটি পথে সতর্ক ও শক্তিশালী প্রহরা মোতায়েন করা হয়েছে, সে সম্পর্কে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাম্মদেস দেহলবী (রাঃ) তদীয় ‘হুজ্বাতুল্লাহ হিলবালেগাহ’ কিভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মানের মধ্যপন্থা : উক্ত কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম কারণ হলো ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, নবী-করীম (সঃ)-এর কঠোর ইশিয়ারী এবং শরীয়তের কঠিন বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও বর্তমান মুসলিম সমাজ ধর্মীয় ব্যাপারে বাড়াবাড়ির শিকারে পরিণত হয়েছে। দ্বীনের প্রতিটি শাখায় এই লক্ষ্য সুস্পষ্ট ও উদ্দেগজনক। দ্বীন ও ইমানের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ও মারাত্মক হচ্ছে ধর্মীয় নেতাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার আতিশয্য অথবা জবহেলা ও অবজ্ঞার মনোবৃত্তি। একদল মনে করছে যে, ধর্মীয় আলেম-ওলামা, পীর-বুয়ুগাণের কোন প্রয়োজনই নেই; আল্লাহর কিতাবই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কারণ, তারাও মানুষ আমাদের মানুষ। এমনোভাবাপন্ন কোন কোন উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি আরবী ভাষায়ও অনভিজ্ঞ, কোরআনের হাকীকত ও নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ। রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও সাহাবায়ে-কেরামের বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তফসীর সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়া সত্ত্বেও, কয়েকখানি অনুবাদ পুস্তক পাঠ করেই নিজেই কোরআনের সমঝদার মনে করে বসেছে। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরেদ অর্থাৎ, সাহাবায়ে-কেরাম কর্তৃক বর্ণিত ব্যাখ্যা ও তফসীরের তোয়াক্কা না করে নিজেদের কল্পনা-প্রসূত মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছে। অথচ তারা চিন্তা করে না যে, ওস্তাদ ছাড়া শুধু কিতাবই যদি যথেষ্ট হতো, তবে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের লিখিত কপি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে সক্ষম ছিলেন—রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে ওস্তাদরূপে প্রেরণের আবশ্যক হতো না। একথা শুধু আল্লাহর কিতাবের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং দুনিয়ার যে কোন বিষয় বা শাস্ত্রের বই পুস্তক বা অনুবাদ পাঠ করেই কেউ উক্ত শাস্ত্র পারদর্শী হতে পারে না। শুধু ডাক্তারী বই পড়েই আজ পর্যন্ত কেউ বড় ডাক্তার হতে পারে নাই। প্রকৌশল বিদ্যার বই অধ্যয়ন করেই কোন পারদর্শী প্রকৌশলী হয়েছে বলে শুনা যায় না। এমনকি দর্জিবিদ্যা বা পাক প্রণালীর শুধু বই পড়ে কোন সুদক্ষ দর্জী বা বাবুটি হতেও দেখা যায় না। বরং এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। অথচ তারা কোরআন-হাদীসকে এত হাফ্ফা মনে করেছে যে, এগুলো বুঝার জন্য কোন ওস্তাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। এটা

সত্যই পরিতাপের বিষয়।

অনুরূপভাবে একদল শিক্ষিত লোক গচ্ছালিকা প্রবাহে যেতে উঠেছে যে, কোরআন পাক বুঝার জন্য তর্জমা অব্যয়নই যথেষ্ট। পূর্ববর্তী মনীষিগণের তফসীর ও ব্যাখ্যার প্রতি ক্রেশ্প করা বা তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ করার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। আদতে এটাও এক প্রকার বাড়াবাড়ি বা অনধিকার চর্চা।

অপরদিকে বহু মুসলমান অজ্ঞ ভক্তিজ্ঞানিত রোগে আক্রান্ত। যাকে তাদের পছন্দ হয়েছে, তাকেই নেতা সাব্যস্ত করে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে। তারা কখনো এতটুকু যাচাই করে দেখে না যে, আমরা যাকে নেতারূপে অনুসরণ করছি তিনি এলেম-আমল, এছলাহ ও পরহেযগারীর মাপকাঠিতে টিকেন কিনা? তারা যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক কিনা? প্রকৃতপক্ষে এহেন অন্ধভক্তি বা বাড়াবাড়িরই নামান্তর।

বাড়াবাড়ির উভয় পথ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইসলামী শরীয়তের পন্থ-নির্দেশ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর কিতাব আল্লাহ ওয়াল্লা লোকদের কাছে বুঝতে হবে এবং আল্লাহর কিতাব দ্বারা আল্লাহ ওয়াল্লা লোকদের চিনতে হবে। অর্থাৎ, প্রথমে কোরআন ও হাদীসের নির্ধারিত নিরিখের আলোকে ঝাঁটি আল্লাহ ওয়াল্লাগণকে চিনে নাও। অতঃপর দেখ তাঁরা কোরআন ও হাদীসের চর্চায় সদা নিমগ্ন এবং তাদের জীবনধারাও কোরআন-হাদীসের রয়েছে রক্ষিত কিনা। অতঃপর কোরআন ও হাদীসের সব জটিল প্রশ্নের সমাধানে তাঁদের অভিমত ও সিদ্ধান্তকে নিজেদের বুঝ-ব্যবস্থার উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁর অনুসরণ করতে হবে।

আল্লাহর বান্দা হওয়াই সর্বোচ্চ মর্যাদার বিষয় : لَنْ يَنْفَكَنَّ الْإِسْلَامُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ - অর্থাৎ, হযরত ইসা (আঃ) স্বয়ং এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতাগণ কখনো আল্লাহর বান্দারূপে পরিচিত হতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন না। কারণ, আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামি করা, তাঁর এবাদত-বন্দগী করা, আদেশ-নিষেধ পালন করা অতি মর্যাদা, গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়। হযরত ইসা মসীহ (আঃ) ও হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রমুখ বিশিষ্ট ফেরেশতাগণ এ সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত রয়েছেন। তাই এতে তাঁদের কোন লজ্জা নেই। আসলে আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব বা গোলামি করাই লজ্জা ও অমর্যাদার কাজ। যেমন, খৃষ্টনরা হযরত ইসা মসীহ (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র ও অন্যতম উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং মুশরেকরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা ও দেবী সাব্যস্ত করে তাদের মূর্তি তৈরী করে পূজা-অর্চনা শুরু করেছে। অতএব, তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি ও অপমান অবধারিত রয়েছে।—(ফাওয়ায়েদে-উসমানী)

‘বুরহান’ শব্দের আভিধানিক অর্থ فَدْلُهُ بَرَهَانٌ مِنْ رَبِّهِ - অকাট্য দলীল-প্রমাণ। এ আয়াতে এর দ্বারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র সত্তা ও মহান ব্যক্তিত্বকে বোঝানো হয়েছে।—(তফসীরে রুজ্ব-আ’আনী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মহান ব্যক্তিত্বের জন্য ‘বুরহান’ শব্দ প্রয়োগ করার তাৎপর্য এই যে, তাঁর বরকতময় সত্তা, অনুপম চরিত্র মাধুর্য, অপূর্ব যৌদ্ধেয়াসমূহ, তাঁর প্রতি বিস্ময়কর কিতাব আল-কোরআন অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি তাঁর রেশালতের অকাট্য দলীল ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যার পরে আর কোন সাক্ষ্য-প্রমাণের আবশ্যক হয় না। অতএব, তাঁর মহান ব্যক্তিত্বই তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

وَاللَّهُ وَالْفَضْلِ الْعَظِيمِ

যে কোন সাহাবীর কল্যাণার্থ যা যার প্রশ্নের উত্তরে কোন আয়াত ন্মিল হয়েছে, উক্ত আয়াত তাঁকে মহিমাবানিত ও গৌরবান্বিত করেছে। আর মতভেদ হলে যার বক্তব্য অনুসারে ওহী নাখিল হয়েছে, কেয়ামত পর্যন্ত চিরদিন তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি বজায় থাকবে। যাহোক, ‘কলালাহ’ সন্দর্ভে প্রশ্ন ও উত্তর উল্লেখ করে উপরোক্ত সমাধানসমূহের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।—(কাওয়ায়েদ-ওসমানী)

নামে নুযুল : এটি সূরা মায়দার প্রথম আয়াত। সূরা মায়দা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ। মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যেও এটি শেষ দিককার সূরা। এমনকি, কেউ কেউ একে কোরআন মজীদের সর্বশেষ সূরাও বলেছেন। মুসনাদে-আহমদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আসমা বিনতে এয়াযীদে (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত আছে, সূরা মায়দা যে সময় অবতীর্ণ হয়, সে সময় রসুলুল্লাহ (সঃ) সফরে ‘আযবা’ নদীর উত্তীরে শিঠে গুওয়ার ছিলেন। সাধারণতঃ ওহী অবতরণের সময় বেশকিছু অসাধারণ গুঞ্জন ও বোঝা অনুভূত হতো, তখনও যথারীতি তা অনুভূত হয়েছিল। এমনকি গুঞ্জনের চাপে উদ্বী অক্ষম হয়ে পড়লে রসুলুল্লাহ (সঃ) নীচে নেমে আসেন। কোন কোন রেওয়াজে দুটো বোঝা যায় যে, এটি ছিল বিদায় হজ্জের সফর। বিদায় হজ্জ নবম হিজরীর ঘটনা। এ হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর হুম্বুর (সঃ) প্রায় আশি দিন জীবিত ছিলেন। ইবনে হাব্বান ‘বাহরে-মুহীত’ গ্রন্থে বলেন : সূরা মায়দার কিয়দংশ হোদায়বিয়ার সফরে, কিয়দংশ মক্কা বিজয়ের সফরে এবং কিয়দংশ বিদায় হজ্জের সফরে অবতীর্ণ হয়। এতে বোঝা যায় যে, এ সূরাটি সর্বশেষ সূরা না হলেও শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

রুহুল-মা’আনী গ্রন্থে আবু ওবায়দাহ হযরত হামযা ইবনে হাবীব এবং আতিয়া ইবনে কায়স বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে :

الْمائدة من آخر القرآن تنزيلا فاحلوا حلالها وحرّموا حرامها

অর্থাৎ, ‘সূরা মায়দাহ কোরআন অবতরণের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে যা হালাল করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্যে হালাল এবং যা হারাম করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্যে হারাম মনে করো।’

ইবনে-কাসীরে এমনি ধরনের একটি রেওয়াজে হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি একবার হজ্জের পর হযরত আয়েশা সিন্দীকা (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন : জুবায়ের, তুমি কি সূরা মায়দাহ পাঠ কর? তিনি আরম্ভ করলেন, জী-হা, পাঠ করি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন : এটি কোরআন পাকের সর্বশেষ সূরা। এতে হালাল ও হারামের যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত আছে, তা ঠিক। এগুলো রহিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কাজেই এগুলোর প্রতি বিশেষ যত্নবান থেকে।

সূরা মায়দায়ও সূরা নেসার মত বিভিন্ন বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল, লেন-দেন, পারস্পরিক চুক্তি-অঙ্গীকার ইত্যাদির বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই রুহুল-মা’আনীর গ্রন্থকার বলেন : বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সূরা বাক্বারা ও সূরা আল-ইমরান অভিন্ন। কেননা, এ দু’টি সূরায় প্রধানতঃ মৌলিক বিধি-বিধান ও আকায়েদ, যথা, তওহীদ, রেসালত, কিয়ামত ইত্যাদির বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক ঋণিটিটি বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নিসা ও সূরা মায়দাহ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিন্ন। কেননা, এ দু’টি সূরায় প্রধানতঃ বিভিন্ন বিধি-বিধানের

বিস্তারিত আলোচনা স্থান লাভ করেছে এবং মৌলিক বিধি-বিধান প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নিসায় পারস্পরিক লেন-দেন ও বন্দার হকের উপর জোর দেয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর হক, এতীমের হক, পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। সূরা মায়দার প্রথম আয়াতেও এসব লেন-দেন ও চুক্তি-অঙ্গীকার মেনে চলা ও পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

—অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এ কারণেই সূরা মায়দার অপর নাম সূরা ওকুদ। অর্থাৎ, ওয়াদা-অঙ্গীকারের সূরা।—(বাহরে-মুহীত)

চুক্তি-অঙ্গীকার ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে এ সূরাটি বিশেষ করে এর প্রথম আয়াতটি সর্বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমার ইবনে হাম্ব (রাঃ)-কে ঐ আমলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং একটি ফরমান লিখে তাঁর হাতে অর্পণ করেন, তখন এ ফরমানের শিরোনামে উল্লেখিত আয়াতটিও লিপিবদ্ধ করে দেন।

এ সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম ব্যাকটি এত ব্যাপক অর্থবোধক যে, এর ব্যাখ্যা হাজারো পৃষ্ঠা লেখা যায় এবং লেখা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ অর্থাৎ, হে বিশৃঙ্গীগণ ! স্বীয় চুক্তি-অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এতে প্রথমে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে সম্বোধন করে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এতে যে নির্দেশ রয়েছে, তা সাক্ষ্যে ইমানের দাবী। এরপর বলা হয়েছে : أَوفُوا بِالْعُقُودِ عقد - عقد - শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ বাঁধা, আবদ্ধ করা। চুক্তিতে যেহেতু দুই ব্যক্তি অথবা দুই দল আবদ্ধ হয়, এজন্য এটাকেও عقد বলা হয়। এভাবে عقود এর অর্থ হয় عقود অর্থাৎ, চুক্তি ও অঙ্গীকার।

খ্যাতনামা তফসীরবিদ ইবনে-জরীর উপরোক্ত অর্থে তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবয়ীগণের ‘ইজমা’ (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন। ইমাম জাশাস বলেনঃ দুই পক্ষ যদি ভবিষ্যতে কোন কাজ করা অথবা না করার বাধ্য-বাধকতায় একমত হয়ে যায়, তবে তাকেই عهد, عقد, معاهد বলা হয়। আমাদের পরিভাষায় একেই চুক্তি বলা হয়। অতএব, উপরোক্ত বাক্যের সারমর্ম এই যে, পারস্পরিক চুক্তি পূর্ণ করাকে জরুরী ও অপরিহার্য মনে কর।

এখন দেখতে হবে আয়াতে চুক্তি বলে কোন ধরনের চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণের বাহ্যতঃ বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : আল্লাহ তাআলা বান্দাদের কাছ থেকে ইমান ও এবাদত সম্পর্কিত যে সব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা আল্লাহ তাআলা বান্দাদের কাছ থেকে স্বীয় নাখিলকৃত বিধি-বিধান হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। এ উক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।

তফসীরবিদ ইবনে সাআদ ও য়াদ ইবনে আসলাম বলেন : এখানে ঐসব চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ পরস্পরে একে অন্যের সাথে সম্পাদন করে। যেমন, বিবাহ-শাদী ও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ইত্যাদি।

কেউ কেউ বলেন : এখানে ঐসব শপথ ও অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যা জাহেলিয়াত যুগে একজন অন্যজনের কাছ থেকে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পাদন করতো। মুজাহিদ, রবী, কাতাদাহ

প্রমুখ তফসীরবিদগণও একথাই বলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সব উক্তির মধ্যে কোন পরস্পরবিরোধিতা নাই। অতএব, উপরোক্ত সব চুক্তি ও অঙ্গীকারই عقود শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং কোরআন সবগুলোই পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এ কারণেই ইমাম রাগেব বলেন : চুক্তির যত প্রকার রয়েছে, সবই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি বলেন : এর প্রাথমিক প্রকার তিনটি। (এক)-পালনকর্তার সাথে মানুষের অঙ্গীকার। উদাহরণতঃ ইমান ও এবাদতের অঙ্গীকার অথবা হারাম ও হালাল মেনে চলার অঙ্গীকার। (দুই)-নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যেমন, নিজ বিশ্বাস্য কোন বস্তুর মানুত মানা অথবা শপথ করে কোন কাজ নিজের উপর জরুরী করে নেওয়া। (তিন)-মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত চুক্তি। এছাড়া সে সব চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যা দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়।

বিভিন্ন সরকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা পারস্পরিক সমঝোতা, বিভিন্ন দলের পারস্পরিক অঙ্গীকার এবং দুই ব্যক্তির মধ্যকার সর্বপ্রকার লেন-দেন, বিবাহ, ব্যবসা, শেয়ার, ইজারা ইত্যাদিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে সব বৈধ শর্ত স্থির করা হয়, আলোচ্য আয়াতদুটো তা মেনে চলা প্রত্যেক পক্ষের অবশ্য কর্তব্য। “বৈধ” শব্দটি প্রয়োগ করার কারণ এই যে, শরীয়ত বিরোধী শর্ত আরোপ করা এবং তা গ্রহণ করা কারও জন্যে বৈধ নয়।

অতঃপর বলা হয়েছে : اٰخِذْ بِالْحُكْمِ الَّذِي هُوَ اَكْبَرُ যেসব জীব-জন্তুকে সাধারণভাবে নির্বোধ মনে করা হয়, সেগুলোকে بهيمة (অস্পষ্ট প্রাণী) বলা হয়। কেননা, মানুষ অভ্যাসগতভাবে তাদের ভাষা বুঝে না। ফলে তাদের বক্তব্য مبهم তথা অস্পষ্ট থেকে যায়। ইমাম শা’রানী বলেন : সাধারণ লোকের ধারণা অনুযায়ী এসব জন্তুকে بهيمة বলার কারণ এটা নয় যে, তাদের বুদ্ধি নাই এবং বুদ্ধির বিষয়বস্তু তাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়; বরং প্রকৃত সত্য হল এই যে, কোন প্রাণীই বুদ্ধি ও অনুভূতিহীন নয়, এমনকি কোন বৃক্ষ এবং প্রস্তরও নয়। তবে এদের ততটুকু বুদ্ধি নাই, যতটুকু মানুষের রয়েছে।

انعام — শব্দটি نعم এর বহুবচন। এর অর্থ পালিত পশু। যেমন, উট, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি। সূরা আনআমে এদের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এদের সবাইকে انعام বলা হয়। بهيمة শব্দের ব্যাপকতাকে انعام শব্দ এসে সংকুচিত করে দিয়েছে। এখন আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে, গৃহপালিত পশু আট প্রকার তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, عقود শব্দ বলে যাবতীয় চুক্তি-অঙ্গীকার বুকানো হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল ঐ অঙ্গীকার, যা আল্লাহ তাআলা হালাল ও হারাম মেনে চলার বাপারে বান্দার কাছ থেকে নিয়েছেন। আলোচ্য বাক্য এই বিশেষ অঙ্গীকারটিই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে উট, ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদিকে হালাল করে দিয়েছেন। শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তোমরা এগুলোকে যবেহ করে খেতে পার।

আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اشْكُوا مَا كَرِهَ اللَّهُ
شعيرة — শব্দটি شعائر আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। এখানে شعائر শব্দটি
শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন। যেসব অনুভূত ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্মকে
সাধারণের পরিভাষায় মুসলমান হওয়ার চিহ্নরূপে গণ্য করা হয়,

সেগুলোকে شعائر اسلام তথা ‘ইসলামের নির্দর্শনাবলী’ বলা হয়। যেমন, নামায, আযান, হজ্ব, সুন্নতী দাঁড়ি ইত্যাদি। আয়াতে উল্লেখিত ‘আল্লাহর নির্দর্শনাবলী’র ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। কিন্তু হযরত হাসান বহরী ও আতা (রাঃ) থেকে বর্ণিত বাহরে-মুহীত ও রুহুল-মাআনী গ্রন্থে উল্লেখিত ব্যাখ্যাটিই পরিষ্কার ও সহজবোধ্য। ইমাম জামসাম এ ব্যাখ্যাটিকে এ সম্পর্কিত সব উক্তির নির্ধারক বলে আখ্যায়িত করেছে। ব্যাখ্যাটি এই : আল্লাহর নির্দর্শনাবলীর অর্থ সব শরীয়ত এবং বর্ণিত নির্ধারিত ওয়াজেব, ফরয ও এদের সীমা।

আলোচ্য আয়াতে لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ বলার সারমর্ম এই যে, আল্লাহর নির্দর্শনাবলীর অবমাননা করা না। আল্লাহর নির্দর্শনাবলীর এক অবমাননা এই যে, মূলতঃই এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। প্রথমতঃ এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। দ্বিতীয়তঃ এসব বিধি-বিধানকে অসম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং তৃতীয়তঃ নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে সমুখের অগ্রসর হওয়া। আয়াতে এ তিন প্রকার অবমাননাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কোরআন পাক এ নির্দেশটিই শব্দান্তরে এভাবে বর্ণনা করেছে :

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ تَقْوَى الْقُلُوبِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি

আল্লাহর নির্দর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা অন্তরে খোদা-ভীতিরই লক্ষণ। আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে কিছু বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

বলা হয়েছে :

وَاللَّهُمَّ لِلَّهِ وَاللَّهُدَى وَلَا تَكْفُرُوا وَلَا تَلْبِسُوا

الْحُرْمَ يَنْتَوْنَ فَكُلُّوا وَلَا تَقْرَبُوا وَلَا تَمَسُّوا

অর্থাৎ, পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে এগুলোর অবমাননা করা না। পবিত্র মাস হচ্ছে শাওয়াল, জিলহজ্ব ও রজব। এসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা শরীয়তের আইনে অবৈধ ছিল। সাধারণ আলেমগণের মতে পরবর্তী কালে এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। এছাড়া হরমে কুরবানী করার দৃষ্ট বিশেষতঃ যেসব জন্তুকে গলায় কুরবানীর চিহ্নধারণ কন্ঠাভরণ পরানো হয়েছে, সেগুলোর অবমাননা করা না। এসব জন্তুর অবমাননার এক পন্থা হচ্ছে এদের হরম পর্যন্ত পৌঁছাতে না দেয়া অথবা ছিনিয়ে নেয়া। দ্বিতীয় এই যে, এগুলো কুরবানীর পরিবর্তে অন্য কোন কাজে নিয়োজিত করা। যেমন, আরোহন করা অথবা দুগু লাভ করা ইত্যাদি। আয়াত এসব পন্থাকেই অবৈধ করে দিয়েছে।

এছাড়া এসব লোকেরও অবমাননা করোনা, যারা হজ্বের জন্যে পবিত্র মসজিদের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছে। এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে বীর পালনকর্তার কৃপা ও সমৃদ্ধি অর্জন করা। অর্থাৎ, পবিত্রমাসে তাদের গতিরোধ করা না এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট দিয়ো না।

অতঃপর বলা হয়েছে : وَلَا تَلْبِسُوا الْحُرْمَ فَكُلُّوا অর্থাৎ, প্রথম আয়াতে এহরাম অবস্থায় শিকার করতে যে নিষেধ করা হয়েছিল, এখানে সে নিষেধাজ্ঞার সীমা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তোমরা এহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন শিকার করার নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। অতএব, তখন শিকারও করতে পারবে।

উল্লেখিত আয়াতে প্রত্যেক মানব ও পালনকর্তার মধ্যকার চুক্তি কয়েকটি অংশে এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে এতে প্রথমে আল্লাহর নির্দর্শনাবলীর

এটি সর্বাবস্থায় সম্মান প্রদর্শন করতে এবং এগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর বিশেষভাবে হজ্ব সম্পর্কিত আদ্বার নিদর্শনাবলীর কিছু বিবরণ রয়েছে। তন্মধ্যে হজ্জের উদ্দেশে আসন্নকারী যাত্রীসাধারণ ও তাদের সাথে আনিত কুরবানীর জন্তুদের গতিরোধ ও সেগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অতঃপর চুক্তির দ্বিতীয় অংশে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

وَلَا تَجْرُوا مَكْرَهُنَّ فَإِنَّهُنَّ كَأَنَّهِنَّ الْحِمَامُ
أَنْ تَضُرَّوْا

অর্থাৎ, যে সম্প্রদায় হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় তোমাদের মকায় প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে বাধা প্রদান করেছিল এবং তোমরা ঐয় কোভ ও দুখ নিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিল, এখন শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে তোমরা তাদের কাছ থেকে এভাবে প্রতিশোধ নিও না যে, তোমরা তাদের কাবাগৃহে ও পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং হজ্ব করতে বাধা দিতে শুরু করবে। এটাই হবে জুলুম। আর ইসলাম জুলুমের উত্তরে জুলুম করতে চায় না। বরং ইসলাম জুলুমের প্রতিদানে ইনসাফ এবং ইনসাফে কায়ম থাকার শিক্ষা দেয়। তারা শক্তি ও ক্ষমতা হাতে পেয়ে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে অন্যায়ভাবে বাধা দিয়েছিল। এখন এর প্রত্যুত্তরে রূপ হওয়া সমীচীন নয় যে, মুসলমানরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে তাদের হজ্জের ক্রিয়াকর্ম থেকে বাধা প্রদান করবে।

কোরআন পাকের শিক্ষা এই যে, ইনসাফ ও ন্যায়বিচারে শত্রু-মিত্র সব সমান। তোমাদের শত্রু যতই কঠোর হোক সে তোমাদের যতই কষ্ট দিয়ে থাকুক, তার ব্যাপারেও ন্যায়বিচার করা তোমাদের কর্তব্য।

এটা ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য যে, সে শত্রুদের অধিকারও সংরক্ষণ করে এবং তাদের অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে অন্যায় দ্বারা নয়; বরং ন্যায় বিচার দ্বারা দিতে শিক্ষা দেয়।

পারম্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কোরআনী মূলনীতি :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়দার দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্য। এতে কোরআন পাক এমন একটি মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞজ্ঞানোচিত স্বয়ংসালা দিয়েছে, যা সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রশ্নস্বরূপ। এর উপরই মানুষের সর্ব প্রকার মঙ্গল ও সাফল্য বরং তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এ প্রশ্নটি হচ্ছে পারম্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা। জ্ঞানী মাত্রই জানে যে, এ বিশ্বের গোটা রক্ষা ব্যবস্থা মানুষের পারম্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি একজন অন্যজনের সাহায্য না করে, তবে একাকী মানুষ হিসেবে সে যতই বুদ্ধিমান, শক্তিশ্বর অথবা বিত্তশালী হোক, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারবে না। একাকী মানুষ স্বীয় খাদ্যের জন্যে শস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে আহরোপযোগী করা পর্যন্ত সব স্তর অতিক্রম করতে পারে না। এমনভাবে পোশাক-পরিচ্ছদের জন্যে তুলা চাষ থেকে শুরু করে স্বীয় দেহের মানানসই পোশাক তৈরী করা পর্যন্ত অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে একাকী কোন মানুষ কিছুতেই সক্ষম নয়। মোটকথা, প্রত্যেকটি

মানুষই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অন্য হাজারো লাখে মানুষের মুখাপেক্ষী। তাদের পারম্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা দুরাই সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এ সাহায্য ও সহযোগিতা পার্থিব জীবনের জন্যেই জরুরী নয়—মৃত্যু থেকে নিয়ে কবরে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরে এ সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। বরং এর পরও মানুষ জীবিতদের দেয়ায়ে-মাগফেরাত ও ইহালে-ছওয়াবের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় অসীম জ্ঞান ও পরিপূর্ণ ক্ষমতায় বিশৃঙ্খলার জন্যে এমন অটুট ব্যবস্থা রচনা করেছেন, যাতে একজন অন্যজনের মুখাপেক্ষী। দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার জন্যে যেমন ধনীর মুখাপেক্ষী, তেমনি শ্রেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তিও পরিশ্রম ও মেহনতের জন্যে দিনমজুরের মুখাপেক্ষী। ব্যবসায়ী গ্রাহকের মুখাপেক্ষী এবং গ্রাহক ব্যবসায়ীর মুখাপেক্ষী। গৃহ নির্মাতা রাজমিস্ত্রী, কর্মকার, ছুতারের মুখাপেক্ষী এবং এরা সবাই গৃহনির্মাতার মুখাপেক্ষী। যদি এহেন সর্বব্যাপী মুখাপেক্ষিতা না থাকতো এবং সাহায্য-সহযোগিতা কেবল নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপরই নির্ভরশীল হতো, তবে কে কার কাজ করতে এগিয়ে আসতো। এমতাবস্থায় সাহায্য-সহযোগিতার দশাও তাই হতো, যা এ জগতে সাধারণ নৈতিক মূল্যবোধের হচ্ছে। যদি এ কর্মবন্টন কোন সরকার অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আইন আকারে করে দেওয়া হতো, তবে এর পরিণামও তাই হতো, যা আজকাল সারা বিশ্বে জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে। অর্থাৎ, আইন খাতাপত্রে সেরক্ষিত আছে এবং বাজারে ও অফিস আদালতে ঘুষ, অন্যায় সুবিধান, কর্তব্যবিমূখতা ও কর্মহীনতার আইন চালু রয়েছে। একমাত্র সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার ব্যবস্থাপনাই বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন কারবারের স্পৃহা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে।

মোটকথা, সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনাও পারম্পরিক সম্পর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ চিত্রের একটা ভিন্ন পিঠও আছে। তা এই যে, যদি অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদির জন্যে পারম্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা হতে থাকে, চোর ও ডাকাতদের বড় বড় সুশৃঙ্খল দল গঠিত হয়ে যায়, তবে এ সাহায্য ও সহযোগিতাই বিশ্বব্যবস্থাকে তছনছ করে দিতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, পারম্পরিক সহযোগিতা একটি দুখারী তরবারি— যা নিজের উপরও চালিত হতে পারে এবং বিশ্বব্যবস্থাকেও বানচাল করতে পারে। এ বিশ্ব মঙ্গলামঙ্গল, ভালমন্দ এবং সং-অসংয়ের আবাসভূমি। এ কারণে এতে এরূপ হওয়া অসম্ভব ছিল না। এখানে অপরাধ, হত্যা, লুণ্ঠন ও কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যে পারম্পরিক সহযোগিতা ও শক্তি ব্যবহৃত হতে পারত। এটা শুধু সম্ভাবনাই নয়; বরং বাস্তব আকারে বিশ্ববাসীর সামনে ফুটে উঠেছে। তাই এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্বের জ্ঞানীগণীরা স্বীয় হেফাজতের জন্যে বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ দল অথবা জাতির ভিত্তি স্থাপন করেছে— যাতে একদল অথবা একজাতির বিরুদ্ধে অন্য দল অথবা অন্য জাতি আক্রমণোদ্ভূত হলে সবাই মিলে পারম্পরিক সহযোগিতার শক্তি ব্যবহার করে তা প্রতিহত করতে পারে।

জাতীয়তা বন্টন : আবদুল করিম শাহরেশ্তানী প্রণীত ‘মিলাল ওয়ানুনিহাল’ গ্রন্থে বলা হয়েছে : প্রথম দিকে যখন পৃথিবীর জনসংখ্যা বেশী ছিল না, তখন বিশ্বের চার দিকের ভিত্তিতে চারটি জাতীয়তা জন্মলাভ করে : প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, দক্ষিণ, উত্তর প্রত্যেক দিকে বসবাসকারীরা নিজেদেরকে এক জাতি এবং অন্যকে ভিন্ন জাতি মনে

করতে থাকে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি রচিত হতে থাকে। এরপর যখন জনসংখ্যা বেড়ে যায়, তখন প্রত্যেক দিকের লোকদের মধ্যে বংশ ও গোত্রের ভিত্তিতে জাতীয়তার ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে। আরবের সমগ্র ব্যবস্থা এ বংশ ও গোত্রগত ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর ভিত্তিতেই যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হতো। বনু হাশেম এক জাতি, বনু তামীম অন্য জাতি এবং বনু খোযায়াহ স্বতন্ত্র একটি জাতি বলে বিবেচিত হতো। হিন্দুদের মধ্যে আছ পর্যন্ত উচ্চজাত ও নীচ জাতের ব্যবধান অব্যাহত রয়েছে।

আধুনিক ইউরোপীয়রা নিজেদের বংশ তো বিসর্জন দিয়েছেই, অন্যান্যদের রক্ত-ধারাকেও তারা মূল্যহীন প্রতিপন্ন করেছে। দুনিয়ায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই তারা বংশগত ও গোত্রগত জাতীয়তা ও বিভাগকে নিচিহ্ন করে আবার আঞ্চলিক, প্রাদেশিক, দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে মানবজাতিকে ঝুড়-ঝুড় করে পৃথক পৃথক জাতি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আছ প্রায় সারা বিশ্বেই ভাষা এবং অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তার ধারণা চালু হয়ে গেছে। এমনকি, মুসলমানরাও এ জাদুর পরশ থেকে মুক্ত নয়। আরবী, তুর্কী, ইরাকী, সিন্ধীর বিভাগই নয়, বরং তাদের মধ্যেই ভাগফলকে ভাগ করে মিসরী, সিরীয়, হেজাজী, নজ্দী এবং পান্জাবী, বাঙ্গালী, সিন্ধী, হিন্দী ইত্যাদি পৃথক পৃথক জাতি জন্মলাভ করেছে। ইউরোপীয়রা এসবের ভিত্তিতেই সরকারী কাজ-কারবার পরিচালনা করেছে। ফলে আঞ্চলিকতা ভিত্তিক বিদ্রোহ জনাগণের শিরা-উপশিরায় ঢুকে পড়েছে এবং প্রত্যেক প্রদেশের জনগণ এর ভিত্তিতেই সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে।

জাতীয়তা ও কোরআনী শিক্ষা : কোরআন পাক মানুষকে আবার ভুলে যাওয়া সবক' স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সূরা নেসার প্রথম আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে : তোমরা সব মানুষ এক পিতা-মাতার সন্তান। রসুলুল্লাহ (সঃ) এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, কোন আরবের অনারবের উপর অথবা কোন শূন্যের কৃষকের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। খোদাতীতি ও খোদার আনুগত্যই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। কোরআনের এ শিক্ষা **إِنَّمَا النَّسَبُ لِلَّهِ وَرَحْمَتُهُ** (মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই) ঘোষণা করে আবিসিনিয়ার কৃষ্ণাঙ্গকে লাল তুর্কী ও রোমীর ভাই এবং অনারব নীচ জাতের মানুষকে কোরায়শী ও হাশেমী আরবের ভাই করে দিয়েছে। জাতীয়তা ও বাত্বের ভিত্তি এভাবে রচনা করেছে যে, যারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুলকে মেনে চলে, তারা এক জাতি এবং যারা মানে না, তারা ভিন্ন জাতি। জাতীয়তার এ ভিত্তিই আবু জেহেল ও আবু লাহাবের পারিবারিক সম্পর্ক রসুলুল্লাহ (সঃ) থেকে ছিন্ন করে দিয়েছে এবং বেলাল হাবশী ও ছুযয়েব রোমীর সম্পর্ককে তাঁর সাথে ছুড়ে দিয়েছে।

হাসান বসরা থেকে, বেলাল হাবাশা থেকে এবং ছুযাইব রোম থেকে এলেন অশ্ব মক্কার পবিত্র মাটি থেকে উঠলো আবু জেহেল, 'এটা কেমন আচর্যজনক ব্যাপার' এমনকি, কোরআন পাক ঘোষণা করেছে :

عَلَيْكُمْ دِينُ اللَّهِ وَآخِرُ دِينِكُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছ— কিছু কাকের হয়ে গেছ এবং কিছু মুমিন। বদর, ওহদ, আহযাব ও হেনায়েনের যুদ্ধে কোরআনের এ বিভক্তি কার্যক্রে বিকাশ লাভ করেছিল। বংশগত ভাই আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্যের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে মুসলমান ভাইয়ের বাত্ব সম্পর্ক তার সাথে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং সে তার তরবারির নীচে এসে গিয়েছিল। বদর ওহদ ও

বদকের ঘটনাবলী এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়।

এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যদি মুসলমান ভাইও ন্যায়ের বিরুদ্ধে এক অন্যায় ও উৎপীড়নের পথে চলে, তবে অন্যায় কার্যে তারও সাহায্য করো না। বরং অন্যায় ও অত্যাচার থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এটাই তাকে বিশ্বস্ত সাহায্য—যাতে অন্যায় ও অত্যাচারের পাশে তার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট না হয়।

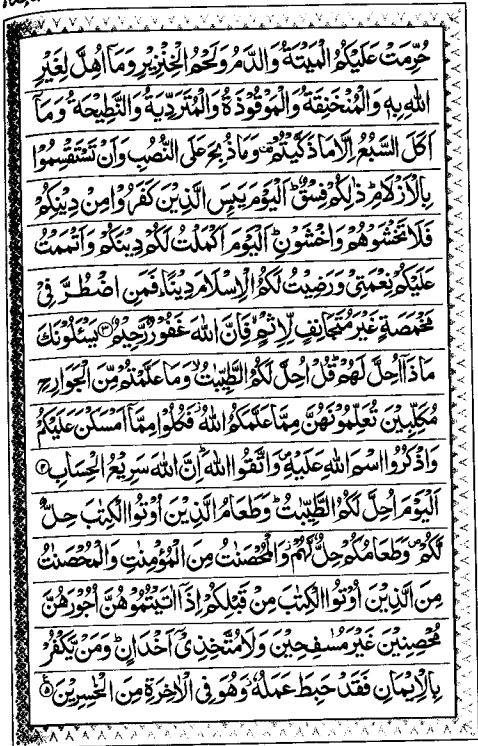
কোরআন পাকের এ শিক্ষা সংকর্ম ও খোদাতীতিকে আসল মাপকাঠি করেছে, তার উপরই মুসলিম জাতি জাতীয়তাবাদের প্রাচীর খাড়া করেছে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে। এর বিপরীতে পাপ ও অত্যাচার উৎপীড়নকে কঠোর অপরাধ গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। এক্ষেত্রে **بِرِ** ও **تَتَوَى** দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। **بِرِ** শব্দের অর্থ সাধারণ তফসীরকারগণের মতে সংকর্ম এবং **تَتَوَى** শব্দের অর্থ মন্দ কাজ বর্জন। **اِثْمِ** শব্দের অর্থ যে কোন পাপকর্ম-অধিকার সম্পর্কিত হোক অথবা এবাদত সম্পর্কিত। **عُدْوَانِ** শব্দের অর্থ সীমা লঙ্ঘন করা। এখানে অর্থ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা।

সংকর্ম ও খোদাতীতিতে সাহায্য করার জন্য রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন : **الدال على الخير كفاعله** - অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন সংকর্মের পথ বলে দেয়, সে ততটুকু ছওয়াব পাবে, যতটুকু নিজে সংকর্মটি করলে পেতে। - (ইবনে-কাসীর)

সহীহ বুখারীর হাদীসে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন : যে ব্যক্তি হেলায়েত ও সংকর্মের প্রতি আহ্বান জানায়, তার আহ্বানে যতলোক সংকর্ম করবে, সে তাদের সবার সমান ছওয়াব পাবে। এতে তাদের ছওয়াব হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসংকর্ম অথবা পাপের প্রতি আহ্বান করে, তার আহ্বানে যতলোক পাপকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সবার সমান গোনাই তারও হবে। এতে তাদের গোনাই হ্রাস করা হবে না।

ইবনে-কাসীর বর্ণিত তিবরানীর রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন : যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর সাথে তার সাহায্যার্থে বের হয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। এর ভিত্তিতেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ অত্যাচারী বাদশাহর চাকুরী ও পদ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে বিরত রয়েছেন। কার, এতে অত্যাচারে সহায়তা করা হয়। **كُلُّ أَوَّلَى كَلْبٍ الْمُبْرُورِ** আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এ হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন ডাক দেয়া হবে—অত্যাচারী ও তাদের সাহায্যকারীরা কোথায় আছ? অতঃপর যারা অত্যাচারীদের দোয়াত-কলমও ঠিক করে দিয়েছে, তাদেরকেও একটি লৌহ শব্দধারে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

কোরআন ও সুন্নাহ এ শিক্ষাই জগতে সত্যতা, ইনসাফ, সহানুভূতি ও সচ্চরিত্রতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে কমীনারূপে প্রস্তুত করেছে এবং অপরাধ ও উৎপীড়ন দমনের জন্যে প্রতিটি ব্যক্তিকে এমন সিপাহীরূপে গড়ে তুলেছিল, যারা খোদাতীতির কার্য প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে। এ বিজ্ঞজনেচিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুফল সাহাবী ও তাবয়ীগণের যুগে জগদ্বাসী প্রকাশ করেছে। আছকালও কোন দেশে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে নাগরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেককেই কিছু কিছু আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অপরাধবৃত্তি নিবারণের জবে জনগণকে সংকাজের প্রতি আহ্বান প্রচেষ্টা কোথায় পরিলক্ষিত হয় না।



(৩) তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কষ্টভাবে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ করছ। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। এসব গোনাহর কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে, কিন্তু কোন গোনাহর প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল। (৪) তারা আপনাকে জিজ্ঞাস করে যে, কি বস্ত্ত তাদের জন্যে হালাল? বলে দিঃ : তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্ত্তসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি ধ্রুৱণের জন্যে এবং ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ সত্যর হিসাব গ্রহণকারী। (৫) আজ তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্ত্তসমূহ হালাল করা হল। আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্যে হালাল সতী-সাক্ষী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী-সাক্ষী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী করার জন্যে, কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা শুণ্ডে প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্যে নয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফল যাবে এবং পরকালে সে কতিগ্রস্ত হবে।

এটা জানা কথা যে, সামরিক কূচকাওয়াজ ও নাগরিক প্রতিরক্ষার নিয়ম অনুযায়ী এ কাজের অনুশীলনী হয় না; বরং এ কাজ শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতই নয়। আজকালকার সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত গুলোতে **بر** ও **نقوى** তথা সংকর্ম ও খোদাভীতির প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং **اثم** ও **عنوان** তথা পাপ ও অত্যাচারের সকল পথ উন্মুক্ত। গোটা জাতিই যেখানে হালাল ও হারাম, ন্যায় ও অন্যায় ভুলে গিয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে যায়, সেখানে বেচারী পুলিশ কতদূর অপরাধ দমন করতে পারে? আজ সর্বত্র ও সবদেশে অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, অশ্লীলতা, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি রোগ রোজ রোজ বেড়েই চলেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তা দমন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। বলাবাহুল্য, এর কারণ দু'টি : এক, প্রচলিত সরকারগুলো কোরআনী ব্যবস্থা থেকে দূরে রয়েছে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তির স্বীয় জীবনে **بر** ও **نقوى** সংকর্ম ও খোদাভীতির মূলনীতি অনুসরণ করতে দ্বিধা বোধ করে - যদিও এর ফলশ্রুতিতে তাদের অসংখ্য দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। আক্ষেপ, তারা যদি একবার পরীক্ষার জন্যেই এ তিক্ত ঢোক গিলে ফেলতো এবং খোদায়ী কুদরতের তামাশা দেখতো যে, কিভাবে তাদের এবং জনগণের জীবনে সুখ, শান্তি আরাম ও আনন্দের স্রোতধারা নেমে আসে!

দুই, জনগণ মনে করে নিয়েছে যে, অপরাধ প্রবণতা দমন করা একমাত্র সরকারের দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, তারা পেশাদার অপরাধীদের অপরাধ গোপন করতেও সচেষ্ট থাকে। শুধু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও অপরাধ দমন করার উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার রীতিই দেশ থেকে উঠে গেছে। জনগণের বোঝা দরকার যে, অপরাধীর অপরাধ গোপন করা এবং সত্য সাক্ষ্যদানে বিরত থাকা অপরাধে সহায়তা করার নামান্তর। এটা কোরআনের আইনে হারাম ও কঠোর পাপ এবং আলোচ্য আয়াত **وَلَا تَتَّبِعُوا عَلَى الْأَرْوَاحِ وَالْعُدْوَانِ** - এ বর্ণিত নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়দাহর তৃতীয় আয়াত। এতে অনেক মূলনীতি এবং শাখাগত বিধি-বিধান ও মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে হালাল ও হারাম জন্তু সম্পর্কিত। যেসব জন্তুর মাংস মানুষের জন্যে শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন দেহে রোগসৃষ্টি হতে পারে; অথবা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন চরিত্র ও অন্তরগত অবস্থা বিনষ্ট হতে পারে, কোরআন পাক সেগুলোকে অশুচি আখ্যা দিয়ে হারাম করেছে। পক্ষান্তরে যেসব জন্তুর মাংসে কোন শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি নাই, সেগুলোকে পবিত্র ও হালাল ঘোষণা করেছে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে : তোমাদের জন্যে মৃত জন্তু হারাম করা হয়েছে। 'মৃত' বলে ঐ জন্তু বুঝানো হয়েছে, যা যবেহ ব্যতীত কোন রোগে অথবা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়। এধরনের মৃত জন্তুর মাংস চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মানুষের জন্যে ক্ষতিকর এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও।

তবে হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) দুই প্রকার মৃতকে বিধানের বাইরে রেখেছেন; একটি মৃত মাছ ও অপরাট মৃত টিড্ডী। (মুসনাদে আহমদ,

ইবনে মাজাহ, দারেকুতনী, বায়হাকী)

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় হারাম বস্তু হচ্ছে রক্ত। কোরআনের অন্য আয়াতে **أَوْ دَمًا مَسْفُورًا** বলায় বুঝা যায় যে, যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাই হারাম। সুতরাং কলিজা ও প্লীহা রক্ত হওয়া সত্ত্বেও হারাম নয়। পূর্বোক্ত যে হাদীসে মাছ ও টিড্ডীর কথা বলা হয়েছে, তাতেই কলিজা ও প্লীহা হালাল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

তৃতীয় বস্তু শূকরের মাংস। একেও হারাম করা হয়েছে। মাংস বলে তার সম্পূর্ণ দেহ বুঝানো হয়েছে। চর্বি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ ঐ জন্তু যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। যদি যবেহ করার সময়ও অন্যের নাম নেয়া হয়, তবে তা খোলাখুলি শিরক। এরূপ জন্তু সর্বসম্মতভাবে মৃতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আরবের মুরেরকরা মূর্তিদের নামে যবেহ করতো। অধুনা কোন কোন মূর্খ লোক পীর-ফকীরের নামে যবেহ করে। যদিও যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, কিন্তু জন্তুটি যেহেতু অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে কুরবানী করে, তাই সাধারণ ফেকাহবিদগণ একেও **وَمَا أَوْلَىٰ لِغَيْرِ اللَّهِ** আয়াত দৃষ্টে হারাম বলেছেন।

পঞ্চম **مَنْخَنَةً** অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে অথবা নিজেই কোন জাল ইত্যাদিতে আবদ্ধ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গেছে।

ষষ্ঠ **مَوْفُودَةً** অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা লাঠি অথবা পাথর ইত্যাদির প্রচণ্ড আঘাতে নিহত হয়। যদি নিক্ষিপ্ত তীরের ধারাল অংশ শিকারের গায়ে না লাগে এবং তীরের আঘাতে শিকার নিহত হয়, তবে সে শিকারও **مَوْفُودَةً** এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। **مَنْخَنَةً** এবং **مَيْتَةً** উভয়টি **مَوْفُودَةً** তথা মৃতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জাহেলিয়াত যুগে এগুলোকে জায়েয মনে করা হতো। এ কারণে আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আদী ইবনে হাতেম রাডিয়াল্লাহু আনহু একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন : আমি মাঝে মাঝে চণ্ডা তীর দ্বারা শিকার করি। যদি এতে শিকার মরে যায়, তবে খেতে পারি কি না ? তিনি উত্তরে বললেন : তীরের যে অংশ ধারাল নয়, যদি সে অংশের আঘাতে শিকার মরে যায়, তবে তা **مَوْفُودَةً** এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তুমি খেতে পারবে না। আর যদি ধারাল অংশ শিকারের গায়ে লাগে এবং শিকারকে আহত করে, তবে তা খেতে পার। ইমাম জাসসাস ‘আহ্কাযুল-কোরআন’ গ্রন্থে এ হাদীসটি নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। এরূপ শিকার হালাল হওয়ার জন্যে শর্ত এই যে, বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ করতে হবে।

যে শিকার বন্দুকের গুলিতে মরে যায়, ফেকাহবিদগণ সেটাকেও **مَوْفُودَةً** এর অন্তর্ভুক্ত করে হারাম বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলতেন : **الْمَقْتُولَةُ بِالْبَنْدُوقِ تَلْكَ الْمَوْفُودَةُ** - অর্থাৎ বন্দুক দ্বারা যে জন্তুকে হত্যা করা হয়, তাই অতএব হারাম। (জাসসাস)। ইমাম আযম আবু হানীফা (রাঃ) শাফেয়ী, মালেক প্রমুখ সবাই এ ব্যাপারে একমত। - (কুরতুবী)

সপ্তম **مُتْرَدِيَةً** অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোন পাহাড়, টিলা, উচু দালানের উপর থেকে অথবা কূপে পড়ে মরে যায়। এ কারণেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : যদি তুমি পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান কোন শিকারের প্রতি বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ কর এবং তীরের আঘাতে সে নীচে পড়ে মরে যায়, তবে তা খেয়ে না। কারণ, এতে

সম্ভাবনা আছে যে, শিকারটি তীরের আঘাতে না মরে নীচে পড়ে মাঝার কারণে মরে গেছে। এমতাবস্থায় তা **مُتْرَدِيَةً** -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে কোন পাখিকে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি পেটি পানিতে পড়ে যায়, তবে উহা খাওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ, এখানেও পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। - (জাসসাস)

অষ্টম **نَظِيحَةً** অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোন সৎঘর্ষে নিহত হয়। যেমন রেলগাড়ী, মোটর ইত্যাদির নীচে এসে মরে যায় অথবা কোন জন্তু শিং-এর আঘাতে মরে যায়।

নবম ঐ জন্তু হারাম, যেটি কোন হিংস্র জন্তুর কামড়ে মরে যায়। উপরোক্ত নয় প্রকার হারাম জন্তুর বর্ণনা করার পর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করে বলা হয়েছে : **إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ** - অর্থাৎ, এসব জন্তুর মধ্যে কোনটিকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর যবেহ করতে পারলে হালাল হয়ে যাবে।

এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চার প্রকার জন্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। কেননা, মৃত ও রক্তকে যবেহ করার সম্ভাবনা নাই এবং শূকর এক আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত জন্তু সত্ত্বেও দিক দিয়েই হারাম। এ দুটোকে যবেহ করা না করা উভয়ই সমান। এ কারণে হযরত আলী (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান বসরী, কাতাদাহ প্রমুখ পূর্বসূরী মনীষীগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চারটি পরবর্তী পাঁচটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অতএব আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ পাঁচ প্রকার জন্তুর মধ্যে যদি জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায় এক তদবস্থায়ই বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করে দেয়া হয়, তবে এগুলো খাওয়া হালাল হবে।

দশম, ঐ জন্তু হারাম, যাকে নুহুরের উপর যবেহ করা হয়। নুহুর ঐ প্রস্তরকে বলা হয়, যা কাবা গৃহের আশেপাশে স্থাপিত ছিল। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা এদের উপাসনা করত এবং এদের কাছে এদের উদ্দেশ্যে জন্তু কোরবানী করত। একে তারা এবাদত বলে গণ্য করত।

জাহেলিয়াত যুগের আরবরা উপরোক্ত সব প্রকার জন্তুর মাংস ভক্ষণ অভ্যস্ত ছিল। কোরআন পাক এগুলোকে হারাম করেছে।

একাদশ **الْأَوْثَامُ** হারাম। **الْأَوْثَامُ** শব্দটি **زَلَمَ** এর বহুবচন। এর অর্থ ঐ তীর, যা জাহেলিয়াত যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে নির্ধারিত ছিল। এ কাজের জন্যে সাতটি তীর ছিল। তন্মধ্যে একটিতে **نَم** (হাঁ), একটিতে **لَا** (না) এবং অন্যগুলোতে অন্য শব্দ লিখিত ছিল। এ তীরগুলো কাবাগৃহের খাদেমের কাছে থাকত। কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা কোন কাজ করার পূর্বে তা উপকারী হবে না অপকারী, তা জানতে চাইলে সে কা'বার খাদেমের কাছে পৌঁছে একশত মুদ্রা উপঢৌকন দিত। খাদেম তখন থেকে একটি একটি করে তীর বের করত। ‘হাঁ’ শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হয়ে আসলে মনে করা হত যে, কাজটি উপকারী। পক্ষান্তরে ‘না’ শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে নিত যে, কাজটি করা ঠিক হবে না। হারাম জন্তুসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা এ তীরগুলো জন্তুসমূহের মাংস বন্টনেও ব্যবহার করত। কয়েকজন শরীক হয়ে উট ইত্যাদি যবেহ করে তা মাংস প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী বন্টন না করে এসব জুয়ার তীরের সাহায্যে বন্টন করত। ফলে কেউ সম্পূর্ণ বঞ্চিত, কেউ প্রাপ্য অংশের চাইতে কম এবং কেউ অনেক বেশী মাংস পেয়ে যেত। এ কারণে হারাম জন্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হারাম বন্টন পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

আলেমগণ বলেন : ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং অদৃশ্য বিষয় জানার যেসব পন্থা প্রচলিত আছে ; যেমন ভবিষ্যৎ কখন বিদ্যা, হস্তরেখা বিদ্যা, শকুন দ্বারা ইত্যাদি সব **استقسام بالازلام** এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম।

استقسام بالازلام শব্দটি কখনও জুয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যাতে ঐক্য নিক্ষেপ অথবা লটারীর নিয়মে অধিকার নির্ধারণ করা হয়। কোরআন পাক একে **ميسر** নাম দিয়ে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। এ ক্ষেত্রেই হযরত ছায়েদ ইবনে জুবায়র, মুজাহিদ ও শা'বী (রাঃ) বলেনঃ যার যেমন ভাগ্য নির্ধারক তীরের সাহায্যে অংশ বের করা হত পারস্য ও রোমেও তেমনি আবার ছক, চওসর ইত্যাদির গুটি দ্বারা অংশ বের করা হত। সুতরাং তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে নির্ধারণের ন্যায় এগুলোও হারাম। - (মহত্বী)

ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা বন্টন হারাম করার সাথে সাথে বলা হয়েছে : **ذُرِّيَّةٌ** - অর্থাৎ, এ বন্টন পদ্ধতি পাপাচার ও পথভ্রষ্টতা। এরপর বলা হয়েছে :

الْيَوْمَ يَنْفَسُ الْاِذَا نَ كَفَرُوا مِنْ دِينِهِمْ وَلَا عَشْرُوهُمْ وَاعْتَمُوا

অর্থাৎ, অদ্য কাফেররা তোমাদের দ্বীনেকে পরাভূত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে আর ভয় করো না। তবে আল্লাহকে ভয় কর।

এ আয়াতটি হিজরতের দশম বৎসরে বিদায় হজ্জের আরাফার দিনে অবতীর্ণ হয়। তখন মক্কা এবং প্রায় সমগ্র আরব মুসলমানদের করতলগত ছিল। সমগ্র আরব উপত্যকায় ইসলামী আইন প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। তাই বলা হয়েছে : ইতিপূর্বে কাফেররা মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি অপেক্ষাকৃত কম দেখে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পরিকল্পনা করতো। কিন্তু এখন তাদের মধ্যে এরূপ দুঃসাহস ও বল-ভরসা নাই। এ কারণে মুসলমানরা তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত হয়ে স্বীয় প্রতিপালকের আনুগত্য ও এবাদতে মনোনিবেশ করুক।

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ

لَكُمْ الدِّينَ اَلْاِسْلَامَ وَبِئَا

এ আয়াতটি অবতরণের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। আরাফার দিন। এ দিনটি পূর্ণ বৎসরের মধ্যে সর্বোত্তম দিন। ঘটনাক্রমে এ দিনটি পড়েছিল শুক্রবারে। এর শ্রেষ্ঠত্বও সর্বজনবিদিত। স্থানটি হচ্ছে ময়দানে-আরাফাতের জ্বলে-রহমত, (রহমতের পাশাড়া) এর সন্নিহিত। এ স্থানটিই আরাফার দিনে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত অবতরণের বিশেষ স্থান। সময় আছরের পর-যা সাধারণ দিনগুলোতেও বরকতময় সময়। বিশেষতঃ শুক্রবার দিনে। অনেক রেওয়াজে দুই এ দিনের এ সময়েই দোয়া কবুলের মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসে। আরাফার দিনে আরও বেশী বেশি সহকারে দোয়া কবুলের সময়।

হজ্জের জন্যে মুসলমানদের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক সমাবেশ। প্রায় দেড় লক্ষ সাহাবায়ে-কেরাম উপস্থিত। রাহমাতুল্লিল-আলামীন সাহাবায়ে-কেরামের সাথে জ্বলে-রহমতের নীচে স্বীয় উষ্ট্রী আযবার পিঠে সওয়ার। সবাই হজ্জের প্রধান রোকন অর্থাৎ, আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত।

এসব শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও রহমতের ছত্রছায়ায় উল্লেখিত পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সাহাবায়ে-কেরাম বর্ণনা করেন : যখন হযরত রসুল করীম (সাঃ) - এর উপর ওহীর মাধ্যমে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়,

তখন নিয়মানুযায়ী ওহীর গুরুত্ব সহ্য করতে না পেয়ে উষ্ট্রী ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : এ আয়াত কোরআনের শেষ দিককার আয়াত। এরপর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোন আয়াত নাখিল হয়নি। বলা হয় যে, শুধু উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কয়েকখানি আয়াত-এর পর নাখিল হয়েছে। এ আয়াত নাখিল হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) মাত্র একাশি দিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। কেননা, দশম হিজরীর ৯ই মিলহজ্জু তারিখে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে হযরত রসুলে করীম (সাঃ) ওফাত পান।

এ আয়াত যেমন বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি এর বিষয়বস্তুও ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের জন্যে বিরাট সুসংবাদ, অনন্য পুরস্কার ও স্বাতন্ত্রের স্বাক্ষর বহন করে। এ বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, পৃথিবীতে মানব জাতিকে সত্য দ্বীন ও খোদায়ী নেয়ামতের চূড়ান্ত মাপকাঠি প্রদানের যে ওয়াদা ছিল, আজ তা হোলকলায় পূর্ণ করে দেয়া হলো। হযরত আদম (আঃ) - এর আমল থেকে যে সত্যধর্ম ও খোদায়ী নেয়ামতের অবতরণ ও প্রচলন আরম্ভ করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের অবস্থানুযায়ী এ নেয়ামত থেকে আদম সন্তানদের অংশ দেয়া হচ্ছিল, আজ যেন সেই ধর্ম ও নেয়ামত পরিপূর্ণ আকারে শেখনিবী মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতকে প্রদান করা হল।

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরে শিকারী কুকুর, বাজ ইত্যাদি দ্বারা শিকার করা জন্তু হালাল হওয়ার জন্যে চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম, কুকুর অথবা বাজ শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে। শিকার পদ্ধতি এই যে, আপনি যখন কুকুরকে শিকারের দিকে প্রেরণ করবেন, তখন সে শিকার ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসবে— নিজে খাওয়া শুরু করবে না। বাজপক্ষীর বেলায় পদ্ধতি এই যে, আপনি ফেরৎ আসার জন্যে ডাক দেয়া মাত্রই সে কাল বিলম্ব না করে ফিরে আসবে— যদিও তখন কোন শিকারের পিছনে খাওয়া করতে থাকে। শিকারী জন্তু এমনভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে গেলে বোঝা যাবে যে, সে আপনার জন্যে শিকার করে নিজের জন্যে নয়। এমতাবস্থায় এগুলোর ধরে আনা শিকার স্বয়ং আপনারই শিকার বলে গণ্য হবে। যদি শিকারী জন্তু কোন সময় এ শিকার বিরুদ্ধাচরণ করে যেমন, কুকুর নিজেই খাওয়া আরম্ভ করে কিংবা বাজপাখী আপনার ডাকে ফেরৎ না আসে, তবে এ শিকার আপনার শিকার নয়। কাজেই তা খাওয়াও বৈধ নয়।

দ্বিতীয়, আপনি নিজ ইচ্ছায় কুকুরকে অথবা বাজকে শিকারের পেছনে প্রেরণ করবেন। কুকুর অথবা বাজ যেন স্বেচ্ছায় শিকারের পেছনে দৌড়ে শিকার না করে। আলোচ্য আয়াতে এ শর্তটি **مَكْرَهًا** শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এটি **تَكْلِيْف** ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ কুকুরকে শিক্ষা দেয়া। এরপর সাধারণ শিকারী জন্তুকে শিক্ষা দেয়ার পর শিকারের দিকে প্রেরণ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। জালালাইন- এর গ্রন্থকার **مَكْرَهًا** শব্দের ব্যাখ্যায় **اِرسال** শব্দ উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ শিকারের দিকে প্রেরণ করা। তফসীরে কুরতুবীতেও এ উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় শর্ত এই যে, শিকারী জন্তু নিজে শিকারকে খাবে না; বরং আপনার কাছে নিয়ে আসবে। এ শর্তটি **وَمَا اسْتَكْبَرُوا عَلَيْهِ** বাক্যাংশে

বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ শর্ত এই যে, শিকারী কুকুর অথবা বাজকে শিকারের দিকে প্রেরণ করার সময় ‘বিসমিল্লাহ্’ বলতে হবে। বর্ণিত চারটি শর্ত পূর্ণ হলে শিকার আপনার হাতে পৌঁছার পূর্বেই যদি মরে যায়, তবুও তা হালাল হবে; যবেহ করার প্রয়োজন হবে না। আর যদি জীবিত অবস্থায় হাতে আসে, তবে যবেহ ব্যতীত হালাল হবে না।

ইমাম আযম আবু হানীফা (রাঃ)-এর মতে একটি পঞ্চম শর্তও আছে। তা এই যে, শিকারী জন্তু শিকারকে আহতও করতে হবে। جوارح শব্দে এ শর্তের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।

যেসব বন্য জন্তু কারও করতলগত নয়, উপরোক্ত মাছআলা তাদের বেলায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে কোন বন্য জন্তু কারও করতলগত হয়ে গেলে, তা নিয়মিত যবেহ করা ব্যতীত হালাল হবে না।

উপসংহারে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা’আলা শিকার করা জন্তু হালাল করেছেন ঠিক, কিন্তু শিকারের পেছনে লেগে নামায ও শরীয়তের অন্যান্য জরুরী নির্দেশের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়া কিছুতেই বৈধ নয়।

সূরা মায়দার প্রথম আয়াতে গৃহপালিত পশু ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদির হালাল হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তৃতীয় আয়াতে নয় প্রকার হারাম জন্তুর বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের বিবরণে প্রথম বাক্যেই গোটা অধ্যায়ের সারমর্ম এমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে, যাতে বিভিন্ন জন্তুর মধ্যে হালাল ও হারাম হওয়ার বৈশিষ্ট্যসহ এর একটি মাপকাঠি ও মূলনীতি সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়।

এরশাদ হচ্ছে اَلْيَوْمَ اَحْلَلْنَا لَكُمْ اَكْلَ الْكَلْبِ - অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্যে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল করা হল। ‘আজ’ বলে এ দিনকে বোঝানো হয়েছে, যেদিন এ আয়াত ও এর পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, দশম হিজরীর বিদায় হজ্জের আরাফার দিন। উদ্দেশ্য এই যে, আজ যেমন তোমাদের জন্যে তোমাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে, তেমনি আল্লাহ তা’আলার পবিত্র বস্তুসমূহ, যা পূর্বেও তোমাদের জন্যে হালাল ছিল, চিরস্থায়ীভাবে হালাল রাখা হল। এ নির্দেশ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। কেননা, অচিরেই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এ আয়াতে طيبات অর্থাৎ, পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَكْلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللّٰهُ طَيِّبٰتٍ - অর্থাৎ, আল্লাহ হালাল করেন তাদের জন্যে طيبات এবং হারাম করেন خبائث এখানে طيبات - এর বিপরীতে خبائث ব্যবহার করে উভয় শব্দের মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

অভিধানে طيبات পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাম্য বস্তুসমূহকে এবং এর বিপরীতে خبائث নোংরা ও ঘৃণ্য বস্তুসমূহকে বলা হয়। কাজেই আয়াতের এ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, যেসব বস্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও পবিত্র, সেগুলো মানুষের জন্যে হালাল করা হয়েছে এবং যেসব বস্তু নোংরা, ঘৃণ্য ও অপকারী, সেগুলো হারাম করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, জগতে মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের ন্যায় খাওয়া-পরা, নিদ্রা-জাগরণ ও জীবন-মরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্যেই মানুষকে সৃষ্টি সেরা করেছেন। সে লক্ষ্যটি উত্তম ও পবিত্র চরিত্র ব্যক্তি অর্জিত হতে পারে না। এ কারণেই অসচ্চরিত্র ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষ আখ্যা লাভের যোগ্য নয়।

কোরআন পাক এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলে : مِّنْ فَسَّاقٍ - অর্থাৎ, এরা চতুষ্পদ জন্তুর চাইতেও অধিকতর পথভ্রষ্ট। যখন চরিত্র সংশোধনের উপর মানবের মানবতা নির্ভরশীল, তখন যেসব বস্তু ফসাদ চরিত্রকে কলুষিত ও বিনষ্ট করে, সেগুলো থেকে মানুষকে পুরোপুরিভাবে বাঁচিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানব চরিত্রের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমাজের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অতএব, একটা সুস্পষ্ট যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা যখন মানব চরিত্র প্রভাবান্বিত হয়, তখন যে বস্তু মানুষের শরীরের অংশে পরিণত হয়, তার দ্বারা মানব চরিত্র অবশ্যই প্রভাবান্বিত হবে। এ কারণে পানাহারের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরী। চুরি, ডাকাতি, ঘৃণা, সূ, জুয়া ইত্যাদির আমদানী যে ব্যক্তির শরীরের অংশ হবে, সে নিশ্চয় রূপেই মানবতা থেকে দূরে সরে পড়বে এবং শয়তানের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।

এ কারণেই কোরআন পাক বলে : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ طَيِّبَاتِ الدِّيْنِ - এখানে সংকর্মের জন্যে হালাল ভক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, হালাল ভক্ষণ ব্যতীত সংকর্ম সম্পন্নাতীত।

বিশেষ করে মাংস মানব দেহের প্রধান অংশে পরিণত হয়। সুতরাং যে মাংস চরিত্র বিনষ্ট করে, তা যাতে মানুষের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা অধিকতর জরুরী। এমনভাবে সে মাংস থেকে বিরত থাকতে হবে, যা দৈহিক দিক দিয়ে মানুষের জন্যে ক্ষতিকর। কেননা, এতে রোগ-ব্যাধির জীবাণু থাকে। শরীয়তে যেসব বস্তুকে নোংরা ও ঘৃণ্য সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো নিশ্চিতরূপেই মানুষের দেহ কিংবা আত্মা অথবা উভয়কে বিনষ্ট করে এবং মানুষের প্রাণ অথবা চরিত্রকে ধ্বংস করে। এ কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বস্তু দ্বারা মানুষের দেহ ও আত্মা লালিত হয় এবং উৎকর্ষ চরিত্র গঠিত হয়। এ কারণে এগুলো হালাল করা হয়েছে। ষোটকথা اَحْلَلْنَا لَكُمْ اَكْلَ الْكَلْبِ - বাক্যটি হালাল ও হারাম হওয়ার দর্শন এক মূলনীতিও ব্যক্ত করেছে।

এখন কোন কোন বস্তু طيبات অর্থাৎ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় কাম্য এবং কোন কোন বস্তু خبائث অর্থাৎ, নোংরা ক্ষতিকর ও ঘৃণ্য ও সূহৃৎ চিত্তজ্ঞানের আগ্রহ ও অনীহার উপরই নির্ভরশীল। এ কারণেই কোন জন্তুকে ইসলাম হারাম সাব্যস্ত করেছে, প্রতিযোগের সূহৃৎ স্বভাব মনুষ্য সেগুলোকে নোংরা ও ঘৃণ্য মনে করে এসেছে। যেমন, মৃতজন্তু, রক্ত ইত্যাদি। তবে মাঝে মাঝে মূর্খতাসূলত রীতিনীতি সূহৃৎ স্বভাবের উপর প্রবল হয়ে যায়। ফলে ভাল ও মন্দে পার্থক্য লোপ পায় অথবা কোন কোন বস্তুর নোংরামিও অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এ ধরনের ব্যাপার পয়গম্বরদের সিদ্ধান্ত সবার জন্যে অকাট্য দলীলস্বরূপ। কেননা, মানুষ মধ্যে পয়গম্বরগণই সর্বাধিক সূহৃৎ স্বভাবসম্পন্ন। আল্লাহ তাবাল বিশেষভাবে তাঁদেরকে সূহৃৎ স্বভাব দ্বারা ভূষিত করেছেন। স্বয়ং তাঁর শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছেন। তাদের চার দিকে ফেরেশতাদের পক্ষ দিয়েছেন। ফলে তাদের মন-মস্তিষ্ক ও চরিত্র কোন ভ্রান্ত পরিবেশ দূষিত হতে পারে না। তাঁরা যেসব বস্তুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন

দিয়েছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

অতএব, নূহ (আঃ) - এর আমল থেকে শেষনবী (সাঃ) - এর আমল পর্যন্ত প্রত্যেক পয়গম্বর মৃত জন্তু ও শূকর ইত্যাদিকে নিজেদের সময়ে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রতি যুগের সুস্থ-স্বভাব মনীষীরা এদের নোংরা ও ক্ষতিকর বলেই মনে করেছেন।

হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী (রাঃ) ‘হজ্জাতুল্লাহিল বালগা’ গ্রন্থে বলেন, ইসলামী শরীয়তে হারামকৃত জন্তুদের সম্পর্কে চিন্তা করলে সেগুলো দুটি মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এক প্রকার জন্তু সৃষ্টিগত ও স্বভাবগতভাবে নোংরা ও অপবিত্র এবং দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর যবেহ পদ্ধতি দ্রাষ্ট, ফলে যবেহ-করা জন্তুর পরিবর্তে মৃত বলেই সাব্যস্ত করা হবে।

সূরা মায়দার তৃতীয় আয়াতে নয়টি বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে। তন্মধ্যে শূকর প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং অবিশিষ্ট আটটি দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

কোরআন পাক وَحَرَّمَ عَلَيْهِمُ اللَّحْمَ الْخَنِيتَ বলে সংক্ষেপে সব নোংরা ও অপবিত্র জন্তু হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। অতঃপর শূকরের মাসে, প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদি কয়েকটি বস্তুর নাম পরিষ্কার উল্লেখ করেছে। অবশিষ্ট নোংরা ও অপবিত্র বস্তুসমূহের বর্ণনা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) - এর দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি কোন জন্তুর خبيث তথা নোংরা হওয়ার আলামত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : কোন জাতিকে শাস্তি হিসেবে কোন জন্তুর আকৃতিতে বিকৃত ও রূপান্তরিত করা হলে বোঝা যায় যে, জন্তুটি স্বভাবগতভাবে নোংরা। ফলে যারা আল্লাহ্র গণ্যে পতিত, তাকে সেসব জীবের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়েছে। উদাহরণতঃ কোরআনে বলা হয়েছে :

وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ

অর্থাৎ, কোন কোন জাতিকে শাস্তি হিসেবে শূকর ও বানরের আকৃতিতে বিকৃত করা হয়েছে। অতএব, বোঝা যায় যে, এই দুই প্রকার জন্তু স্বভাবগতভাবেই নোংরা শ্রেণীভুক্ত। নিয়মিত যবেহ করলেও এগুলো হালাল হবে না। এছাড়া অনেক জন্তু এমনও আছে, ক্রিয়াকর্ম ও লক্ষণাদি দ্বারা সেগুলো নোংরা হওয়ার বিষয় প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারে। উদাহরণতঃ হিংস্র জন্তু। অন্যান্য জন্তুকে ক্ষত-বিক্ষত করা, ছিড়ে-খামচে ভক্ষণ করা এবং নির্মমতাই এদের কাছ।

এজন্যই রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি সাধারণ নীতি হিসেবে বর্ণনা করেন যে, দাঁত দ্বারা ছিড়ে খায় এমন যাবতীয় হিংস্র জন্তু যেমন, সিংহ, বাঘ ইত্যাদি এবং খাবা দ্বারা শিকার করে এমন প্রত্যেক পাখী যেমন বাজ, চিল প্রভৃতি সবই হারাম। এছাড়া ইদুর, মৃতভোজী জন্তু, গাধা ইত্যাদির স্বভাব হচ্ছে হীনতা, নিকৃষ্টতা ও অপবিত্রতার সাথে জড়িত হওয়া। এসব জন্তুর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষতিকর হওয়া প্রত্যেক সাধারণ সুস্থ-স্বভাব ব্যক্তিই অনুভব করতে সক্ষম।

মোটকথা এই যে, ইসলামী শরীয়ত যেসব জন্তুকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তন্মধ্যে এক প্রকার জন্তুর মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই নোংরামি পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর মাঝে প্রকৃতিগতভাবে কোন নোংরামি নাই; কিন্তু জন্তু যবেহ করার যে পদ্ধতি আল্লাহ্ তা’আলা নির্ধারণ করেছেন তাকে সে পদ্ধতিতে যবেহ করা হয়নি। এখন এর ধরন বিভিন্ন হতে পারে : (এক) মূলতঃ যবেহই করা হয়নি। যেমন, হৈচকা টান্না ঘের

ফেলা, আঘাত করে মারা ইত্যাদি। (দুই) যবেহ করা হয়েছে ; কিন্তু আল্লাহ্র নামের পরিবর্তে অন্যের নাম নিয়ে। (তিন) কারও নাম নেয়া হয়নি এবং যবেহ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়নি। এরূপ যবেহ শরীয়তে মর্তব্য নয়; বরং যবেহ ব্যতীত মেরে ফেলারই শামিল।

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَالٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَالٌ لَهُمْ

অর্থাৎ, আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য আহলে কিতাবদের জন্যে হালাল।

এক্ষেত্রে সাধারণ সাহাবী ও তাবয়ীগণের মতে ‘খাদ্য’ বলতে যবেহ করা জন্তুকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আব্দুলদারদা, ইবরাহীম, কাতাদাহ্, সুদী, যাহ্যাক, মুজাহিদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এক কথাই বর্ণিত আছে।— (রুন্সুল মা’আলী, জাসাসাস) কেননা, অন্য প্রকার খাদ্যবস্তুতে আহলে-কিতাব, পৌত্তলিক, মুশরেক সবাই সমান। রুটি, আটা, চাল, ডাল ইত্যাদিতে যবেহ করার প্রয়োজন নেই। এগুলো যে কোন লোকের কাছ থেকে যে কোন বৈধ পন্থায় অর্জিত হলে মুসলমানের জন্যে খাওয়া হালাল। অতএব, আলোচ্য বাক্যের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তু মুসলমানদের জন্যে এবং মুসলমানদের যবেহ করা জন্তু আহলে-কিতাবদের জন্যে হালাল।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, কোরআন ও সূন্যাহ্র পরিভাষায় আহলে কিতাব কারা? কিতাব বলে কোন কিতাবকে বোঝানো হয়েছে? আহলে-কিতাব হওয়ার জন্যে স্বীয় কিতাবের প্রতি বিশ্বস্ত ইমান থাকা এবং আমল করাও জরুরী কি না? এটা জানা কথা যে, এ স্থলে কিতাবের আভিধানিক অর্থে যে কোন লিখিতপাতাকে বোঝানো হয়নি, বরং যে কিতাব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগমন করেছে, তাই বোঝানো হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই যে, এখানে ঐ ঐশী কিতাবকেই বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্র কিতাব হওয়া কোরআনের সমর্থন দ্বারা নিশ্চিত। যেমন, তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর, মুসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর ছহীফা ইত্যাদি। সুতরাং যেসব জাতি এমন কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাকে খোদায়ী প্রত্যাদেশ বলে মনে করে তারাই আহলে কিতাব। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র কিতাব বলে কোরআন ও সূন্যাহ্র নিশ্চিত পন্থায় প্রমাণিত নয়, তারা আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন মক্কার মুশরেক, অগ্নিউপাসক, মূর্তিপূজারী হিন্দু, বৌদ্ধ, আর্য, শিখ ইত্যাদি। এতে বোঝা গেল যে, কোরআনের পরিভাষায় ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতিই আহলে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। তারা তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি বিশ্বাসী।

তৃতীয় একটি জাতি হচ্ছে ‘ছাবেয়ীন’। তাদের অবস্থা সন্দেহযুক্ত।

যেসব আলেমের মতে তারা দাউদ (আঃ)-এর কিতাব যবুরের প্রতি ইমান রাখে, তাঁরা তাদেরও আহলে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আর যারা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, যবুর কিতাবের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই, এরা তারকা উপাসক জাতি, তারা এদের মূর্তি ও অগ্নিউপাসকদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। মোটকথা, নিশ্চিতরূপে যাদের আহলে-কিতাব বলা যায় তারা হল ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতি। তাদের যবেহ করা জন্তু মুসলমানদের জন্যে এবং মুসলমানদের যবেহ করা জন্তু তাদের জন্যে হালাল।

ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে যারা নাস্তিক, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয় : আজকাল ইউরোপে বিরাট সংখ্যক ইহুদী ও খ্রীষ্টান রয়েছে, যারা শুধু আদম শুমারীর দিক দিয়েই ইহুদী ও খ্রীষ্টান বলে কথিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না, তওরাত ও ইঞ্জিলকে আল্লাহর গ্রন্থ মনে করে না এবং মুসা ও ইসা (আঃ)-কে আল্লাহর নবী ও পয়গম্বর বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এটা জানা কথা যে, এরূপ ব্যক্তি আদম শুমারীর নামের কারণে আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

‘আহলে কিতাবের খাদ্য’ বলে কি বোঝানো হয়েছে : طعام শব্দের আভিধানিক অর্থ, খাদ্য দ্রব্য। শাব্দিক অর্থে সর্বপ্রকার খাদ্যই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে এ স্থলে طعام বলে শুধু আহলে কিতাবদের যবেহ করা গোশত বোঝানো হয়েছে। কেননা, গোশত ছাড়া অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে আহলে কিতাব ও অপরাপর কাফেরদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কাফেরদের হাতের আহায্য বস্তু গম, যুট, চাউল, ফল ইত্যাদি খাওয়া হালাল। এতে কারও দ্বিমত নেই। তবে যেসব খাদ্য মানুষের হাতে প্রস্তুত হয়, সেগুলোর ব্যাপারে যেহেতু কাফেরদের বাসন-কোসন ও হাতের পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না, সেহেতু তা থেকে বেচে থাকাই উত্তম। কিন্তু এতে মুশরেক মূর্তিপূজারীর যে অবস্থা, আহলে কিতাবদেরও একই অবস্থা। কারণ, অপবিত্রতার সম্ভাবনা উভয় ক্ষেত্রেই সমান।

আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ : এটি আলোচ্য বিষয়বস্তুর তৃতীয় প্রশ্ন। এর উত্তর অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের পক্ষ থেকে এই দেয়া হয় যে, কাফেরদের মধ্য থেকে আহলে কিতাব ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের যবেহ করা জন্তু হালাল হওয়া এবং তাদের মহিলাকে বিবাহ করা হালাল হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ দুটি বিষয়ে তাদের ধর্মমতও ইসলামের হুবহু অনুরূপ। অর্থাৎ, আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে জন্তু যবেহ করাকে তারাও বিশ্বাসগতভাবে জরুরী মনে করে। এ ছাড়া মৃত জন্তুকেও তারা হারাম মনে করে।

এমনিভাবে ইসলামে যেসব মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, তাদের ধর্মেও তাদের বিবাহ করা হারাম। ইসলামে যেমন বিবাহ প্রচার করা ও সাক্ষীদের উপস্থিতিতে হওয়া জরুরী, তেমনি তাদের ধর্মেও এসব বিধি বিধান জরুরী।

আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ এই যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মে অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও যবেহ করার মাসআলাটি ইসলামী শরীয়তের অনুরূপ রয়েছে। আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা জন্তুকে তারাও হারাম মনে করে এবং যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা জরুরী মনে করে।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে যারা আহলে-কিতাবদের আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা জন্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, তাদের মতেও আহলে-কিতাবদের আসল মাযহাবে এরূপ জন্তু হারাম। কিন্তু তাঁরা বিব্রাৎ লোকদেরকেও আসল আহলে-কিতাবদের সাথে এক করে তাদের যবেহ করা জন্তুকেও হালাল বলেছেন। পক্ষান্তরে সাধারণ সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ দিকটি লক্ষ্য করেছেন যে, আহলে কিতাবদের মূখ্য জনগণ যে আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে অথবা আল্লাহর নাম ব্যতীতই যবেহ করে, তা যেমন ইসলামী বিধানের পরিপন্থী, তেমনি স্বয়ং খ্রীষ্টানদের বর্তমান ধর্মমতেরও বিরোধী। এ কারণে ধর্মীয় বিধানের উপর তাদের কর্মের কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়া উচিত।

তাঁরা ফায়সালা দিয়েছেন যে, তাদের যবেহ করা জন্তু আয়াতে বর্ণিত আহলে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তা হালাল হওয়ার কোন কারণ নাই। তাদের দ্রাব্ধ কর্মের কারণে কোরআনের আয়াতে নসখ তথা রহিতকরণের পথ বেছে নেয়া কিছুতেই সমীচীন নয়।

এ কারণেই ইবনে জরীর, ইবনে কাছীর, আবু হাইয়ান প্রমুখ তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, সূরা বাক্বারা ও সূরা আনআমের আয়াতসমূহে কোন নসখ হয়নি। এটাই সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়ীদের মত। ইবনে কাছীরের বরাতে দিয়ে পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ মতই বাহরে-মুহীত গ্রন্থে নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লেখিত হয়েছে :

ذهب الى ان الكتابي اذا لم يذكر الله على الذبيحة وذكر غير الله لم تؤكل فيه قال ابو البرداء وعبد الله بن الصامت وجماعة من الصحابة- وبه قال ابو حنيفة وابويوسف ومحمد وزفر ومالك وكره النخعي والثوري اكل ما ذبح واهل به لغير الله-

- “তাঁর মাযহাব এই যে, আহলে-কিতাব যদি যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে, অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করে, তবে তা খাওয়া জায়েয নয়। আবুদারদা, ওবান্না ইবনে ছামেত এবং একদল ছাহাবী এ কথাই বলেন এবং ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মোহাম্মদ, যুফার ও ইমাম মালেকের মতও তাই। নাখারী ও সওরী এরূপ জন্তুকে খাওয়া মকরহ মনে করেন।” - (বাহরে মুহীত, ৪৩১ পৃঃ, ৪র্থ খণ্ড)

বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত আজকালকার তওরাত ও ইঞ্জিল থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের নিম্নোক্ত উক্তিসমূহ দেখুন। বর্তমান যুগের ইহুদী ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে স্বীকৃত বাইবেলের প্রাচীন আশ্বাদনামায় যবেহ সম্পর্কে এসব বিধি-বিধান রয়েছে :

(১) যে জন্তু আপনা আপনি মরে যায় এবং যেসব জন্তুকে অন্য কোন হিসে প্রাণী ছিড়ে ফেলে, তার চর্বি অন্য কাজে লাগালে লাগাতে পারে; কিন্তু কোন অবস্থাতেই তা খেতে পারবে না। (আহবাবে - ২৪)

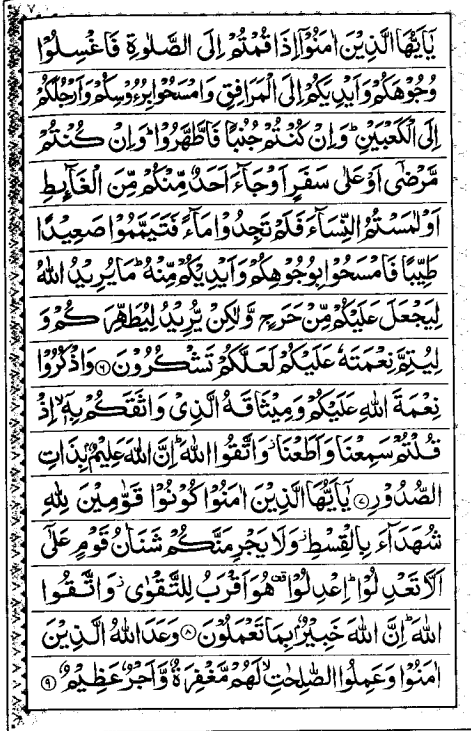
(২) যে কোন পশু-প্রক্রিয়ায় মনের আগ্রহে এবং খোদাওয়াদ প্রদত্ত বরকত অনুযায়ী যবেহ করে মাংস খেতে পারবে; কিন্তু তোমরা রক্ত কখনও খেয়ে না। (এন্তেস্কা, ১২-১৫)

(৩) তোমরা দেবদেবীর নামে কোরবানীর মাংস, রক্ত, কঠরোধে নিহত জন্তু এবং হারাম কর্ম থেকে বিরত থাক। - (আহদ নামা জাদীদ কিতাব আ’মাল ১-২৯)

(৪) খ্রীষ্টানদের প্রধান পোপ পলিস ক্রিস্টিউনের নামে প্রথম পরে লিখন : বিশ্বমীরা যেসব কোরবানী করে তা শয়তানের জন্যে কাজে খোদার জন্যে নয়। আমি চাই না যে, তুমি শয়তানের অশ্লীলারও হও। তুমি খোদাওয়াদের পিয়লা ও শয়তানের পেয়লা উভয়টি থেকে পান করতে পার না। (ক্রিস্টিউন ১০-২০-৩০)

(৫) ‘আ’মালে হাওয়ারিয়ীন’ গ্রন্থে আছে, আমি এ মীমাণা লিখেছিলাম যে, তারা শুধু দেবদেবীর কোরবানীর মাংস থেকে এক কঠরোধে নিহত জন্তু ও হারাম কর্ম থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখবে। (আ’মাল ২১-২৫)

এগুলো হচ্ছে আজকালকার বাইবেল সোসাইটিসমূহের মুদ্রিত



(৬) হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং পদমুগল গিটসহ। যদি তোমরা অবপবিত্র হও, তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও— অর্থাৎ, স্বীয় মুখ-মণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান—যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৭) তোমরা আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐ অঙ্গীকারকেও যা তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা বলেছিলে : আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন। (৮) হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষাদানের ব্যাপারে অবচল থাকবে এবং কোন সজ্ঞাদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর। এটাই খোদাতীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত। (৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সংকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তওরাত ও ইঞ্জিলের উদ্ধৃতি। এতে বিস্তার পরিবর্তন ও পরিবর্তনের পরও হুবহু কোরআনের বিধি-বিধানের অনুরূপ এ বিষয়বস্তুগুলো অবশিষ্ট রয়েছে।

কোরআনের বক্তব্যও এমন : “তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, যে জীব আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়, কঠরোধে নিহত জন্তু, আঘাতজনিত কারণে মৃত জন্তু, উচ্চস্থান থেকে পতনে মৃত জন্তু, শিং এর আঘাতে মৃত জন্তু, হিস্পে জন্তুর ভক্ষণ করা মৃত জন্তু—তবে যদি তোমরা যবেহ করে পাক করে নিতে পার এবং ঐ জন্তু, যা দেবদেবীর যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয়।”

দেখুন আহবার ৬-১৮-১৯ পর্যন্ত। এখানে হারাম মহিলাদের একটি দীর্ঘ তালিকা দেয়া হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ঐসব মহিলা, যাদের কোরআন হারাম করেছে। এমন কিসের جمع بين الاخيرين, দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করাও হারাম এবং হায়েয অবস্থায় সহবাস হারাম হওয়াও বর্ণিত রয়েছে। এছাড়া বাইবেলে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূর্তিপূজারী ও মূর্শরিকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা অবৈধ। প্রচলিত তওরাতের ভাষা এরূপ :

“তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করবে না। তাদের পুত্রদের স্বীয় কন্যা দান করবে না এবং স্বীয় পুত্রদের জন্যে তাদের কন্যা গ্রহণ করবে না। কারণ, তারা আমার অনুসরণ থেকে আমার পুত্রদের বিমুখ করে দিবে—যাতে তারা অন্য উপাস্যের উপাসনা করে। (এন্তেস্তা ৭-৩-৪)

তফসীর মাযহরীতে বলা হয়েছে যে, যবেহ করার ব্যাপারে ও বিবাহের ব্যাপারে পার্থক্য এই যে, যবেহ করা জন্তু উভয় পক্ষ থেকেই হালাল। আহলে কিতাবদের যবেহ করা জন্তু মুসলমানদের জন্যে হালাল এবং মুসলমানদের যবেহ করা জন্তু আহলে-কিতাবদের জন্যে হালাল কিন্তু মহিলাদের বিবাহের ব্যাপারটি এরূপ নয়। আহলে-কিতাবদের মহিলাকে বিবাহ করা মুসলমানদের জন্যে হালাল বটে, কিন্তু আহলে-কিতাবদের সাথে মুসলমান মহিলাদের বিবাহ হালাল নয়।

আরেকটি বিষয় এই যে, যদি কোন মুসলমান কখনও ধর্মত্যাগী হয়ে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যায়, তবে সে আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না; বরং সে হবে ধর্মত্যাগী। তার যবেহ করা জন্তু সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এমনিভাবে যে মুসলমান ইসলামের কোন একটি জরুরী ও অকাটা বিষয় অস্বীকার করার কারণে ধর্মত্যাগী বলে সাব্যস্ত হয়, সে কোরআন ও রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি বিশ্বাসের দাবী করলেও ধর্মত্যাগী এবং তার যবেহ করা জন্তু হালাল নয়। অবশ্য অন্য কোন ধর্মাবলম্বী যদি স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যায়, তবে সে আহলে-কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার যবেহ করা জন্তু হালাল বলে গণ্য হবে।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৮ নং আয়াতের বিষয়বস্তু প্রায় এসব শব্দেই সূরা নেসায়ও বর্ণিত হয়েছে।

পার্থক্য এতটুকু যে, সেখানে كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ

বলা হয়েছিল এবং এখানে كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

হয়েছে। এ দুটি আয়াতে শব্দ আগে পিছে করার একটি সুক্ষ্ম কারণ ‘বাহরে-মুহীত’ কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই :

স্বভাবতঃ দুটি কারণই মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারে বাধা-প্রদান এবং অন্যায় ও অবিচারে প্ররোচিত করে। (এক) নিজের অথবা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব; (দুই) কোন ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা ও মনোমালিন্য। সূরা নেসার আয়াতে প্রথমোক্ত কারণের উপর ভিত্তি করে সুবিচারের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং সূরা মায়েরদার আলাচ্য আয়াতে শেষোক্ত কারণ হিসেবে বক্তব্য রাখা হয়েছে।

এ কারণেই সুরা-নেসার পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে -
 وَلَوْ عَلِمْنَا فِيهِ لَإِذْنًا إِلَىٰ رَبِّنَا لَبَسْنَا مِنْهُ نَكَاتًا - অর্থাৎ, ন্যায়বিচারে
 অধিষ্ঠিত থাক, যদিও তা স্বয়ং তোমাদের অথবা তোমাদের পিতামাতা ও
 আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধে যায়। সুরা মায়ের আলেচ্য আয়াতে উল্লিখিত
 বাক্যের পর বলা হয়েছে -
 وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَائِكُمْ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ - অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেমন তোমাদেরকে ন্যায়বিচারে
 পঙ্গদপদ হতে উদ্ভুক্ত না করে।

অতএব, সূরা নসার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে নিজের এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদেরও পরওয়া কারো না। যদি ন্যায় বিচার তাদের বিরুদ্ধে যায়, তবে তাতেই কায়ম থাক। সূরা মায়দার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে কোন শত্রুর শত্রুতার কারণে পক্ষাঘাত হওয়া উচিত নয় যে, শত্রুর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার শুরু করবে।

এ কারণেই সূরা নেসার আয়াতে قَسَطٌ অর্থৎ, ‘ইনসাক্’কে অগ্রে উল্লেখ করে বলা হয়েছে - كُتُوبًا قَوِّمِينَ يَأْتِ قَسَطَ شَهَادَاتِهِ
এবং সূরা মায়দার আয়াতে - كُتُوبًا قَوِّمِينَ يَأْتِ قَسَطَ شَهَادَاتِهِ
অবশ্য উভয় আয়াত পরিণামের দিক দিয়ে একই উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুবিচারের জন্যে দণ্ডায়মান হবে, সে আল্লাহ্র জন্যেই দণ্ডায়মান হবে এবং সে সুবিচারই করবে। কিন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা হতে পারে যে, এসব সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখাও তো আল্লাহ্র জন্যই। তাই এখানে قَسَطٌ শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সুবিচারের বিপক্ষে কারও প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহ্র জন্যে হতে পারে না। সূরা মায়দায় শত্রুদের সাথে ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে قَسَطٌ শব্দটি অগ্রে এনে মানব স্বভাবকে ভাবাবেগের কবল থেকে দূরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্র জন্যে দণ্ডায়মান হয়েছ। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে শত্রুদের সাথেও ন্যায় বিচার কর।

মোটকথা এই যে, সূরা নেসা ও সূরা মায়েরদার উভয় আয়াতে দুটি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (এক) শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার ব্যাপারে ন্যায্য ও সুবিচারে অটল থাক। আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে অথবা কারও শত্রুতা পরবশ হয়ে এতে দুর্বলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। (দুই) সত্য সাক্ষ্য এবং সত্য কথা প্রকাশ করতে পিছুপা হবে না – যাতে বিচারকবর্গ সত্য ও বিশুদ্ধ রায় দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

সত্য সাক্ষ্য দিত ত্রুটি না করার প্রতি কোরআন পাক অনেক আয়াতে
বিভিন্ন ভঙ্গিতে জোর দিয়েছে। এক আয়াতে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে
নির্দেশ দেয়া হয়েছে :
وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَشْهَدْ فَإِنَّهُ يَمُرُّ قَلْبَهُ
অর্থাৎ, সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার অন্তর পাণী।

এতে প্রমাণিত হয় যে, সত্য সাক্ষ্য দেয়া অপরিহার্য কর্তব্য এবং সাক্ষ্য গোপন করা কঠোর গোনাহ।

কিন্তু যে বিষয়টি মানুষকে সত্য সাক্ষ্য দিতে বাধ্যদান করে, কোরআন পাক তার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে। বিষয়টি এই যে, সাক্ষীকে ব্যয় ব্যয় আদালতে হাজিরা দিতে হয় এবং অনর্থক নানা ধরনের হয়রানিরও সম্মুখীন হতে হয়। ফলে সাধারণ লোক সাক্ষীর তালিকাভুক্ত হওয়াকে সাক্ষাৎ বিপদ বলে মনে করে। নিজের কাজ কারবার তো নষ্ট হয়েই; তদুপরি অর্থহীন যাতনায় ভোগ করতে হয়।

এ কারনেই কোরআন পাক সত্য সাক্ষ্য দেয়াকে অপরিহার্য কর্তব্য
সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করেছে যে, **وَلَا يَمْلِكُ**
وَلَا سَعْيُهُنَّ অর্থাৎ, মোকদ্দমার বিবরণ লিপিবদ্ধকারী ও সাক্ষ্যদাতার কোন
ক্ষতি করা যাবে না।

আজ্ঞ-কালকার আদালত ও মোকদ্দমাসমূহের ষোড়শ নিলে দেখা যাবে যে, অকুস্থলের সত্য সাক্ষী খুব কমই পাওয়া যায়। সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হওয়ার ভয়ে জ্ঞানী ও ভদ্র ব্যক্তির কোথাও দৃষ্টিনার আঁচ পেলে দ্রুত সেখান থেকে পলায়ন করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বানোয়াট সাক্ষীর দ্বারা মামলা দাঁড় করানো হয়। এর ফল তাই দাঁড়াতে পারে, যা আজকাল আমরা দিবারাট প্রত্যক্ষ করে থাকি। শতকরা-দশ পাঁচটি মোকদ্দমারও ন্যায় ও সুবিচারভিত্তিক রায় হতে পারে না। এ ব্যাপারে আদালতকে দোষ দেয়া যায় না। কারণ, তারা প্রাপ্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই রায় দিতে বাধ্য।

সাধারণতঃ এ মারাত্মক ভুলটির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। যদি সাক্ষীদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করা হতো এবং তাদেরকে বার বার পেরেশান করা না হতো, তবে কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী কোন সভ্যদাী লোক সাক্ষাদান থেকে বিরত থাকতো না। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে এই যে, যে পুলিশ মোকদ্দমার প্রাথমিক তদন্ত করে, সে-ই বার বার ডেকে সাক্ষীকে এমনভাবে পেরেশান করে দেয় যে, সে-মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কোন মোকদ্দমার সাক্ষী না হওয়ার জন্যে ছেলেদেরকেও ওছিয়ত করে যেতে বাধ্য হয়। এরপর যদি মোকদ্দমা আদালতে পৌছে, তবে তারিখের পর তারিখ পড়তে থাকে। প্রতি তারিখেই নিরপরাধ সাক্ষীকে হাজিরা দেয়ার সাজা ভোগ করতে হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকাররূপে আইনের এ দীর্ঘসূত্রিতা আমাদের আদালতসমূহকে নোংরা করে রেখেছে। হেঙ্গামা ও অন্যান্য কতিপয় দেশে প্রচলিত প্রাচীন সাদা-সিঁধা বিচার পদ্ধতিতে একদিকে যেমন মোকদ্দমার প্রাচুর্য নাই, অন্যদিকে তেমনী সাক্ষীদের পক্ষে সাক্ষাদানও কষ্টকর নয়।

মোটকথা এই যে, সাক্ষাদান পদ্ধতি ও বিচার পদ্ধতিকে কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে তোলা হলে এর বরকত আঙ্গু দেখা যেতে পারে। কোরআন একদিকে ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত লোকদের উপর সত্য সাক্ষাদান অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে এবং অপরদিকে সাক্ষীদেরকে অকারণে উত্তম না করতে এবং যথাসম্ভব কম সময়ে বয়ান নিয়ে ছেড়ে দিতে নির্দেশ জারি করেছে।

পরীক্ষার নম্বর, সনদ-সার্টিফিকেট ও নির্বাচনের ভোট দান সবই সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত : পরিশেষে এখানে আরও একটি বিষয় জানা জরুরী। তা এই যে, আজকাল শাহাদত তথা সাক্ষ্যদানের যে অর্থ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা শুধু মামলা-মোকদ্দমায় কোন বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহ

পরিভাষায় ‘শাহাদত’ শব্দটি আরও ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণতঃ যদি ডাক্তার কোন রোগীকে সার্টিফিকেট দেয় যে, সে কর্তব্য পালনের যোগ্য নয় কিংবা চাকুরী করার যোগ্য নয়, তবে এটিও একটি শাহাদত। এতে বাস্তব অবস্থার খেলাফ যদি কিছু লেখা হয়, তবে তা মিথ্যা সাক্ষ্য হয়ে কবিরার গোনাহ হবে।

এমনভাবে পরীক্ষার্থীদের লিখিত খাতায় নম্বর দেয়াও একটি শাহাদত। যদি ইচ্ছাপূর্বক কিংবা শৈথিল্যভরে কম বা বেশী নম্বর দেয়া হয়, তবে তাও মিথ্যা সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হারাম ও কঠোর পাপ বলে গণ্য হবে।

উল্লিখিত ছাত্রদের মধ্যে সনদ ও সার্টিফিকেট বিতরণের অর্থ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া যে, তারা সংশ্লিষ্ট কাজের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। যদি সনদধারী ব্যক্তি বাস্তবে এরূপ না হয়, তবে সার্টিফিকেট ও সনদে স্বাক্ষরদাতা সবাই মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অপরাধে অপরাধী হয়ে যাবে।

এমনভাবে আইন সভা, কাউন্সিল ইত্যাদির নির্বাচনে ভোট দেয়াও এক প্রকার সাক্ষ্যদান। এতে ভোটদাতার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দেয়া হয় যে, আমার মতে এ ব্যক্তি ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সততা ও বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে জাতির প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য।

এখন চিন্তা করুন, আমাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়জন এমন আছেন, যাদের বেলায় এ সাক্ষ্য সত্য ও বিশুদ্ধ হতে পারে? দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের জনগণ নির্বাচনকে একটি হার-জিতের খেলা মনে করে রেখেছে। এ কারণে কখনও পয়সার বিনিময়ে ভোটাধিকার বিক্রয় করা হয়, আবার কখনও চাপের মুখে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়। আবার কখনও সাময়িক বন্ধুত্ব এবং সস্তা অঙ্গীকারের ভরসায় একে ব্যবহার করা হয়।

অন্যের কথা কি বলব, লেখাপড়া জানা ধার্মিক মুসলমানও আযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে গিয়ে কখনও চিন্তা করেন না যে, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে খোদায়ী অভিশাপ ও শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে ভোট দেয়ার দ্বিতীয় একটি দিক রয়েছে—যাকে শাফায়াত বা সুপারিশ বলা হয়। ভোটদাতা ব্যক্তি যেন সুপারিশ করে যে, অমুক প্রার্থীকে প্রতিনিধিত্ব দান করা হোক। কোরআনের ভাষায় এ সম্পর্কিত নির্দেশ পূর্বই বর্ণিত

হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছেঃ

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهَا فَوْضٌ بِمَا كَسَبَتْ وَأَمَّنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهَا كِذْبٌ وَمُنْهَا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি উত্তম ও সত্য সুপারিশ করবে, যার জন্যে সুপারিশ করে, তাকে তার পুণ্য থেকে অংশ দেয়া হবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ ও মিথ্যা সুপারিশ করবে, সে তার মন্দ কর্মের অংশ পাবে।

এর ফলশ্রুতি এই যে, এ প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে তার কর্মজীবনে যেসব ভ্রান্ত ও অবৈধ কাজ করবে, তার পাপ ভোটদাতাও বহন করবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে ভোটের তৃতীয় দিক হচ্ছে ওকালতির দিক। অর্থাৎ, ভোটদাতা প্রার্থীকে নিজ প্রতিনিধিত্বের জন্যে উকিল নিযুক্ত করে। কিন্তু এ ওকালতি যদি ভোট দাতার ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে হতো এবং এর লাভ-লোকসান কেবল মাত্র সে-ই পেত, তবে এর জন্যে সে নিজেই দায়ী হতো, কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তেমন নয়। কেননা, এ ওকালতি এমনসব অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত যাতে তার সাথে সমগ্র জাতিও শরীক। কাজেই কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে স্বীয় প্রতিনিধিত্বের জন্যে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে গোটা জাতির অধিকার খর্ব করার পাপও ভোটদাতার কাঁধে চেপে বসবে।

মোটকথা, আমাদের ভোটের তিনটি দিক রয়েছে। (এক) সাক্ষ্যদান, (দুই) সুপারিশ করা এবং (তিন) সম্মিলিত অধিকার সম্পর্কে ওকালতি করা। এ তিনটি ক্ষেত্রে সং, ধর্মভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দান করা যেমন বিরাট ছোয়াবের কাজ এবং এর সুফল যেমন ভোটদাতাও প্রাপ্ত হয়, তেমনি আযোগ্য ও অধর্মপরায়াণ ব্যক্তিকে ভোট দেয়া, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, মন্দ সুপারিশ এবং অবৈধ ওকালতির অন্তর্ভুক্ত এবং এর মারাত্মক ফলাফলও ভোটদাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে।

তাই ভোটদানের পূর্বে প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কাজের যোগ্যতা রাখে কিনা এবং সে সং ও ধর্মভীরু কিনা, তা যাচাই করে দেখা প্রত্যেকটি মুসলমান ভোটারের অবশ্য কর্তব্য। শৈথিল্য ও ঔদাসীন্যবশতঃ অকারণে বিরাট পাপের ভাগী হওয়া উচিত নয়।

المائدة

১১০

لا يحب الله

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 الْجَحِيمِ ۝ يَأْتِيهِمُ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْطَّغْيَانِ وَيُرِيدُونَ
 الْإِسْلَامَ وَيَقُولُونَ إِنَّا بِمَا يَصْعَدُونَ مِنَ الْأَرْضِ عَلَىٰ
 أُنُودٍ مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ إِلَّا فِي كِبَرٍ ۚ
 وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ
 وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ
 لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ
 بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا
 لَّأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ
 فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ فِيمَا نَقُضُهُم بِهَا فَهُمْ
 لَعْنُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ
 عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ
 تَطَّلِعُ عَلَى خَلْقٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ
 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

(১০) যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নির্দোষতাকে মিথ্যা বলে, তারা দোষী। (১১) যে মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি আলাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তখন তিনি তাদের হস্ত তোমাদের থেকে প্রতিহত করে দিলেন। আলাহকে ভয় কর এবং মুমিনদের আলাহর উপরই ভরসা করা উচিত। (১২) আলাহ বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অস্বীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আলাহ বলে দিলেন : আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাক, আমার পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাদের সাহায্য কর এবং আলাহকে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহ দূর করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবেশ করব, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নিমিরীসযুহ প্রবাহিত হয়। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাকের হয়, সে নিশ্চিতই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। (১৩) অতএব, তাদের অস্বীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অতিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের কোন না কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া। অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন। আলাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মায়েদার পূর্বোল্লিখিত সপ্তম আয়াতে আলাহ তা'আলা মুসলমানদের কাছ থেকে একটি অস্বীকার নেয়ার এবং তাদের তা মেনে নেয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন :

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّتِي وَافَقْتُمُوهَا
 إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَمَمُوا لِلَّهِ

এ অস্বীকারটি হচ্ছে আলাহ ও রসুলের আনুগত্য ও শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার অস্বীকার। এর পারিভাষিক শিরোনাম কলেশ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ” উচ্চারণকারী প্রতিটি মুসলমান এ অস্বীকারের অধীন। এর পরবর্তী আয়াতে অস্বীকারের কয়েকটি প্রধান দফা অর্থাৎ, শরীয়তের বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাতে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার জন্যে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এক ক্ষমতারোহণের পর শত্রুদের প্রতি প্রতিশোধের পরিবর্তে সুবিচার ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ অস্বীকারটিও আলাহ তা'আলার একটি বড় নেয়ামত। এ কারণেই **أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ** বলে তার বর্ণনা শুরু করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটিকেও আবার **أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ** বাক্য দ্বারা শুরু করে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা উপরোক্ত অস্বীকার পূর্ণ করার কারণে আলাহ তা'আলা তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে শক্তি, উন্নতি ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের কলা কৌশলকে সফল হতে দেননি।

এ আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শত্রুরা বার বার রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও মুসলমানদেরকে হত্যা, লুণ্ঠন ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার যেসব পরিকল্পনা করে, সেগুলো আলাহ ব্যর্থ করে দেন। বলা হয়েছে : একটি সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার চিন্তায় নিপু ছিল, কিন্তু আলাহ তা'আলা তাদের হস্তকে প্রতিহত করে দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে কাকেরদের পরিকল্পনা ব্যর্থতার পর্যবসিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। কিন্তু তফসীরবিদগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। উদাহরণতঃ মুসনাদে-আবদুর রাক্কাহকে হযরত জাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে :

কোন এক জেহাদে রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম এক জায়গায় অবস্থান করছিলেন। বিস্তৃত ময়দানের বিভিন্ন অংশে সাহাবীগণ বিশ্রাম গ্রহণ করতে লাগলেন। এদিকে রসুলুল্লাহ (সাঃ) একটি গাছের ডালে তরবারি ঝুলিয়ে তার নীচে শুয়ে পড়লেন। শত্রুদের মধ্য থেকে জনৈক বেদুঈন সুযোগ বুঝে তাঁর দিকে খাবিত হয়ে প্রথমেই তরবারিটি হস্তগত করে ফেলল। অতঃপর তাঁর দিকে তরবারী উঠিয়ে বলল : আমার কবল থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে ?

রসুলুল্লাহ (সাঃ) চকিতে উত্তর দিলেন : আলাহ তা'আলা। আগন্তুক আবার তার বাক্য পুনরাবৃত্তি করল। তিনিও নিশ্চিন্তে বললেন : আলাহ তা'আলা। কয়েকবার এরূপ কথাবার্তা হওয়ার পর অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে আগন্তুক তরবারী কোষবদ্ধ করতে বাধ্য হল। তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণকে ডেকে ঘটনা শুনালেন। আগন্তুক বেদুঈন তখনও তাঁর

পাশেই উপবিষ্ট ছিল। তিনি তাকে কিছুই বললেন না। - (ইবনে-কাসীর)

কোন কোন সাহাবী থেকে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, ইহুদী কা'ব ইবনে আশরাফ একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বগৃহে দাওয়াত করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রসূলের কথাসম্মুখে এ সংবাদ দিয়ে শত্রুর ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দেন। - (ইবনে কাসীর)

হযরত মুজাহিদ, ইকরিমা (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার এক মোকদ্দমার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বনী-নুযায়রের ইহুদীদের বস্তিতে গমন করেন। তারা তাঁকে একটি প্রাচীরের নীচে বসতে দিয়ে কথাবর্তায় ব্যাপৃত রাখে। অপর দিকে আমার ইবনে জাহ্শ নামক এক দুরাত্মকে নিয়োগ করা হয় প্রাচীরের পিছন দিক থেকে উপরে উঠে একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড তাঁর উপর গড়িয়ে দেয়ার জন্য। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরকে তাদের সংকল্পের কথা জানিয়ে দেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে প্রস্থান করেন। - (ইবনে-কাসীর)

এসব ঘটনায় কোন বৈপরীত্য নাই - সবগুলোই আলোচ্য আয়াতের সাক্ষী হতে পারে। আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুসলমানদের অদৃশ্য হেফাযতের কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে :

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ هَٰذَا ۚ لَا مَسْجِدَ لَهَا وَلَا مَكْرَهٍ ۚ وَالدِّينُ الْقَائِمُ ۚ

হয়েছে যে, আল্লাহর নেয়ামত লাভ করা একমাত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর নৈশিষ্ট্য নয়, বরং এ সাহায্য ও অদৃশ্য হেফাযতের আসল কারণ হচ্ছে তাকওয়া তথা আল্লাহর উপর নির্ভর করা। যে কোন জাতি অথবা ব্যক্তি যে কোন সময় যে কোন স্থানে এ দু'টি গুণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তারই এভাবে হেফাযত ও সংরক্ষণ করা হবে।

আলোচ্য বাক্যটিতে পূর্ববর্তী আয়াত সমষ্টির সাথেও সংযুক্ত করা যায়, যাতে চরম শত্রুদের সাথেও সদ্ব্যবহার ও সুবিচার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তখন এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, এতেন ঘোর শত্রুদের সাথে সদ্ব্যবহার ও উদারতার শিক্ষা বাহ্যতঃ একটি রাজনৈতিক ব্রাহ্মি এবং শত্রুদেরকে দুঃসাহসী করে তোলার নামান্তর। তাই এ বাক্যে মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা যদি খোদাতীকর ও আল্লাহর উপর ভরসাকারী হও, তবে এ উদারতা ও সদ্ব্যবহার তোমাদের জন্যে মোটেই ক্ষতিকর হবে না, বরং তা শত্রুদেরকে বিরুদ্ধাচরণে দুঃসাহসী করার পরিবর্তে তোমাদের প্রভাবাধীন ও ইসলামের নিকটবর্তী করার কারণ হবে। এছাড়া খোদাতীতিই মানুষকে অস্বীকার মনে চলতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক থেকে বাধ্য করতে পারে। যেখানে খোদাতীতি নাই, সেখানে অস্বীকারের দশা তাই হয়, যা আজকাল সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এ কারণে পূর্ববর্তী যে আয়াতে অস্বীকারের কথা বলা হয়েছিল, সেখানে আয়াতের শেষাংশে وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ (আল্লাহকে ভয় কর) বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এ বাক্যটি আবার উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সম্পূর্ণ আয়াতে এদিকেও ইশারা করা হয়েছে যে, মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য শুধু বাহ্যিক সমরোপকরণের উপর মোটেও নির্ভরশীল নয়, বরং তাদের আসল শক্তি তাকওয়া ও আল্লাহর মধ্যেই নিহিত।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনী-ইসরাঈল দুর্ভাগ্যবশতঃ এসব সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করেনি এবং অস্বীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিভিন্ন আঘাবে নিক্ষেপ করেন।

বনী-ইসরাঈলের প্রতি কুর্কম ও অব্যাহতার ফলে দুই প্রকার আঘাব

নেমে আসে। (এক) বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আঘাব। যেমন রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদির বৃষ্টি বর্ষণ, প্রস্তর বর্ষণ, ভূমি উলটিয়ে দেয়া ইত্যাদি। এগুলো কোরআন পাকের অনেক আয়াতে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

(দুই) আত্মিক আঘাব। অর্থাৎ, অব্যাহতার ফলে তাদের অন্তর ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। তাতে চিন্তা-ভাবনা ও বুঝার ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ফলে তারা পাপের পরিণামে আরও পাপে লিপ্ত হতে থাকে।

এরশাদ হচ্ছে “আমি বিশ্বাসঘাতকতা ও অস্বীকার ভঙ্গ করার সাজা হিসেবে তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিলাম।” ফলে এখন এতে কোন কিছুই সংকলান রইল না। রহমত থেকে দূরে পড়া এবং অন্তরের কঠোরতাকেই সূরা মুতাফিকীনে ‘মরিচা’ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে — “কোরআনী আয়াত ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার কারণ এই যে, তাদের অন্তরে পাপের কারণে ‘মরিচা’ পড়ে গেছে।”

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীসে বলেন :

মানুষ প্রথমে যখন কোন পাপ কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। এর অনিষ্ট সর্বদাই সে অনুভব করে, যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়ে কাল দাগ লেগে গেলে তা দৃষ্টিকে সব সময়ই কষ্ট দেয়। এরপর যদি সে সতর্ক হয়ে তওবা করে এবং ভবিষ্যতে পাপ না করে, তবে এ দাগ মিটিয়ে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যদি সে সতর্ক না হয় এবং উপর্যুপরি পাপ কাজ করেই চলে, তবে প্রত্যেক গোনাহর কারণে একটি করে কাল দাগ বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার অন্তর কাল দাগে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন তার অন্তরের অবস্থা ঐ পাত্রের মত হয়ে যায়, যা উপড় করে রাখা হয় এবং কোন জিনিস রাখলে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে আসে। - পরে পাত্রে কিছু থাকে না। ফলে কোন সং ও পুণ্যের বিষয় তার অন্তরে স্থান পায় না। তখন তার অন্তর لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكراً কোন পুণ্য কাজকে পুণ্য এবং মন্দ কাজকে মন্দ মনে করে না। বরং ব্যাপার উল্টো হয়ে যায়। অর্থাৎ, দোষকে গুণ, পুণ্যকে পাপ এবং পাপকে ছোয়াব মনে করতে থাকে এবং অব্যাহতায় বেড়েই চলে। এটা হচ্ছে তার পাপের নগদ সাজা- যা সে ইহকালেই লাভ করে।

বনী-ইসরাঈলরা অস্বীকার ভঙ্গের নগদ সাজা এই লাভ করে যে, মুক্তির সর্ববৃহৎ উপায় আল্লাহর রহমত থেকে তারা দূরে পড়ে যায় এবং অন্তর এমন পাষাণ হয়ে যায় যে, আল্লাহর কলামকে তারা স্বস্থান থেকে ঘুরিয়ে দেয় অর্থাৎ, আল্লাহর কলামে পরিবর্তন করে। কখনও শব্দে, কখনও অর্থে এবং কখনও তেলাওয়াতে পরিবর্তন করে। পরিবর্তনের এ প্রকারগুলো কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টানও একথা কিছু কিছু স্বীকার করে। - (তফসীরে ওসমানী)

খ্রীষ্টান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে পারম্পরিক শত্রুতা : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা খ্রীষ্টানদের অস্বীকার ভঙ্গের সাজা বর্ণনা করে বলেছেন যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সঞ্চারিত করে দেয়া হয়েছে — যা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আজকালকার খ্রীষ্টানদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ দেখে আয়াতের সত্যতায় সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। উত্তর এই যে, আয়াতে প্রকৃত খ্রীষ্টানদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যারা ধর্মকর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে গেছে, তারা প্রকৃত পক্ষে খ্রীষ্টানদের তালিকাভুক্ত নয় - যদিও জাতিগতভাবে তারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান নামেই অভিহিত করে। এমন

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ
فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَسَوْفَ
يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٥٠﴾ يَأْهَلُ
الْكُتُبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا
مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ
كَثِيرٍ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ
مُبِينٌ ﴿٥١﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ لَقَدْ
كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ
الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَآتَمَهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يُخْلُقُ
مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٣﴾

- (১৪) যারা বলে : আমরা নাছারা, আমি তাদের কাছ থেকেও তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। অতঃপর তারাও যে উপদেশ গ্রাপ্ত হয়েছিল, তা থেকে উপকার লাভ করা ভুলে গেল। অতঃপর আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।
- (১৫) হে আল্লাহ-কিতাবগণ। তোমাদের কাছে আমার রাসুল আগমন করেছেন। কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ।
- (১৬) এর দ্বারা আল্লাহ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অঙ্কুর থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন।
- (১৭) নিশ্চয় তারা কাকের, যারা বলে, মসীহ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ। আপনি জিজ্ঞেস করুন, যদি তাই হয়, তবে বল - যদি আল্লাহ মসীহ ইবনে মরিয়ম, তাঁর জননী এবং ভূমণ্ডলে যারা আছে, তাদের সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কারও সাধ্য আছে কি যে আল্লাহর কাছ থেকে তাদেরকে বিদ্যুতের ঝাঁপাতে পারে? নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, সবকিছুর উপর আল্লাহ তা' অলারই আধিপত্য। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিময়।

খ্রীষ্টানদের মধ্যে যদি ধর্মীয় বিদ্বেষ ও পারস্পরিক শত্রুতা না থাকে, তবে তা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, ধর্মের ভিত্তিতেই বিভেদ ও বিদ্বেষ হতে পারত। যখন তাদের ধর্মই নাই, তখন বিভেদ কিসের। যারা ধর্মগত দিক দিয়ে খ্রীষ্টান, আয়াতে তাদের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ খ্রীষ্টানদের মতভেদ সর্বজনবিদিত।

বায়যাতীর টীকায় তাইসীর গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে আসলে তিনটি সম্প্রদায় রয়েছে। (এক) নিস্তরিয়। এরা ইসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে। (দুই) ইয়াকুবিয়া। এরা ইসাকে খোদার সাথে এক মনে করে। (তিন) মালকাইয়া। এরা ইসা (আঃ)-কে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে।

যেখানে মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এত বড় মতানৈক্য, সেখানে পারস্পরিক শত্রুতা অপরিসার্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে খ্রীষ্টানদের একটি উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে— যা তাদের একদলের ধর্ম বিশ্বাসও ছিল। অর্থাৎ, হযরত মসীহ (আঃ) (মা'আয়াল্লাহ) হুবহু আল্লাহ তাআলা। কিন্তু যে যুক্তি দ্বারা বিষয়টির খণ্ডন করা হয়েছে, তাতে খ্রীষ্টানদের সব দলের একত্ববাদ বিরোধী বাস্তব বিশ্বাসেরই খণ্ডন হয়ে যায়, তা মসীহ (আঃ)—এর খোদার সন্তান হওয়া সংক্রান্ত বিশ্বাসই হোক অথবা তিন খোদার অন্যতম খোদা হওয়ার বিশ্বাসই হোক।

এস্থলে হযরত মসীহ ও তাঁর জননীকে উল্লেখ করার মধ্যে দু'টি রহস্য থাকতে পারে। (এক) আল্লাহ তাআলার সামনে মসীহ (আঃ)—এর এ অক্ষমতা যে, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না এবং যে জননীর খেদমত ও হেফাযত তাঁর কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়, সে জননীকেও রক্ষা করতে পারেন না। (দুই) এতে ঐ সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসও খণ্ডন করা হয়েছে, যারা মরিয়মকে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে।

এস্থলে হযরত মসীহ ও মরিয়মের মৃত্যুকে ধরে নেয়ার পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কোরআন অবতরণের সময় হযরত মরিয়মের মৃত্যু ধরে নেয়ার পর্যায়ে ছিল না; বরং বাস্তবই মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। এর এক কারণ তল্লীক অর্থাৎ, আসলে হযরত মসীহ (আঃ)—এর মৃত্যুকে ধরে নেয়ার পর্যায়ে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর জননীর মৃত্যুকেও একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে—যদিও তাঁর মৃত্যু আগেই হয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একথাও বলা যায় যে, আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আমি মরিয়মকে যেমন মৃত্যুদান করেছি, তেমনি হযরত মসীহ ও অন্যান্য সৃষ্টজীবের মৃত্যুও আমারই হাতে। **يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ** বাক্যে খ্রীষ্টানদের এ বাস্তব বিশ্বাসের কারণকেও খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা, হযরত মসীহকে খোদা মনে করার আসল কারণ তাদের মতে এই ছিল যে, তিনি জগতের সাধারণ নিয়মের বিপরীতে পিতা ছাড়া শুধুমাত্র গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি মানুষ হলে নিয়মানুযায়ী পিতা-মাতা উভয়ের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করতেন।

আলোচ্য বাক্যে এর উত্তর দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। যেমন, **مَنْ عِشَى** **عِنْدَ اللَّهِ كَيْفَ أَدَمُ** আয়াতে এ সন্দেহই নিরসন করা হয়েছে। অর্থাৎ খোদার সাধারণ নিয়মের বাইরে মসীহ (আঃ)—কে সৃষ্টি করা তার খোদা হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না।

অন্তর্বর্তীকালের বিধান : আলোচ্য আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, যদি কোন সম্প্রদায়ের কাছে কোন রসূল, পয়গম্বর অথবা তাদের কোন প্রতিনিধি আগমন না করে এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তও তাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকে, তবে তারা শেরক ছাড়া অন্য কোন

কুর্ম ও গোমরাহীতে লিপ্ত হলে তা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তারা আযাবের যোগ্য হবে না। এ কারণেই অর্ন্তবর্তীকালের লোকদের সম্পর্কে ফেকাহুদিগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে কি না।

সাধারণ ফেকাহুদিগণ বলেনঃ তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে বলেই আশা করা যায়, যদি তারা নিজেদের ঐ ধর্ম অনুসরণ করে, যা ভুলভ্রান্ত অবস্থায় হযরত ইসা অথবা মুসা (আঃ)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে তাদের কাছে এসেছিল। তারা একত্ববাদের বিরুদ্ধাচরণ ও শেরকে লিপ্ত হলে একথা প্রযোজ্য হবে না। কেননা, একত্ববাদ কোন পয়গম্বরের পথ প্রদর্শনের অপেক্ষা রাখে না। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করে নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ তা জেনে নিতে পারে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তরঃ এখানে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে যেসব ইহুদী ও খ্রীষ্টানকে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্ন্তবর্তীকালে তাদের কাছে কোন রসূল আগমন না করলেও তৌরাত ও ইঞ্জিল তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাদের আলেম সম্প্রদায়ও ছিল। এমতাবস্থায় “আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক পৌছে নি” বলে তাদের ওজর পেশ করার কোন যুক্তি ছিল কি? উত্তর এই যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর আমল পর্যন্ত তৌরাত ও ইঞ্জিল অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে তাতে মিথ্যা ও বানোয়াট কিছ-কাহিনী অনুপ্রবেশ করেছিল। কাজেই তা থাকা না থাকা সমান ছিল। ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ আলেমের বর্ণনা অনুযায়ী তৌরাতের আসল লিপি কারও কাছে কোন অজ্ঞাত স্থানে বিদ্যমান থাকলেও তা এর পরিপন্থী নয়।

শেষ নবীর বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিতঃ “আমার রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) দীর্ঘ বিরতির পর আগমন করেছেন”- আলোচ্য আয়াতে আহলে-কিতাবদের সম্বোধন করে একথা বলার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের উচিত তাঁর আগমনকে খোদাপ্রদত্ত বিরাট দান ও বড় নেয়ামত মনে করা। কেননা, পয়গম্বরের আগমন সুদীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। এখন তোমাদের জন্যে তা আবার খোলা হয়েছে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এদিকেও রয়েছে যে, তাঁর আগমন এমন এক যুগে ও এমন স্থানে হয়েছে, যেখানে জ্ঞান ও ধর্মের কোন আলো ছিল না। খোদার সৃষ্ট মানব খোদার সাথে পরিচয় হারিয়ে মূর্তিপূজায় মনোনিবেশ করেছিল। এমন জাহেলিয়াতের যুগে এহেন পথভ্রান্ত জাতির সংশোধন করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তাঁর সংসর্গের কল্যাণ ও নবুওয়তের জ্যোতির পরশে অল্প দিনের মধ্যেই এ জাতি সমগ্র বিশ্বের জন্যে জ্ঞান-গরিমা, কর্মপ্রেরণা, সচ্চরিত্রতা, লেন-দেন, সামাজিকতা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য হয়ে পড়ে। এতে করে রসূলুল্লাহ এর নবুওয়ত ও তাঁর পয়গম্বুরসূলভ শিক্ষা যে পূর্ববর্তী পয়গম্বুরগণের চাইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। যে ডাক্তার কোন চিকিৎসা থেকে নিরাশ রোগীর চিকিৎসা এমন জায়গায় করে, যেখানে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্রও দুলভ, অতঃপর তাঁর সফল চিকিৎসায় মরণোন্মুখ রোগী শুধু আরোগ্যই লাভ করে না; বরং একজন বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকও হয়ে যায়, এমন ডাক্তারের উৎকৃষ্টতায় কারও মনে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

সুদীর্ঘ বিরতির পর যখন চারদিকে অন্ধকারই অন্ধকার বিরাজ করছিল, তখন তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চতুর্দিককে এমন আলোকোজ্জ্বলিত

করে তুলে যে, অতীত যুগে এর দৃষ্টান্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব, সব মো'জেহা একদিকে রেখে একা এ মো'জেহাটিই মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করতে পারে।

পূর্ববর্তী এক আয়াতে সে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে যা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের ব্যাপারে বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে নেয়া হয়েছিল। এর সাথে সাথে তাদের সাধারণ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকরণ, অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ এবং তার শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহ তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে।

ঘটনাটি এই যে, ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী যখন সমুদ্রে নিষিক্ত হলে এবং মুসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায় বনী-ইসরাঈল ফেরাউনের দানব থেকে মুক্তিলাভ করে মিসরের আধিপত্য লাভ করল, তখন আল্লাহ তাআলা সেই সঙ্গে তাদেরকে আরো কিছু নেয়ামত এবং তাদের শৈশব দেশ সিরিয়াকেও তাদের অধিকারে প্রত্যাৰ্পণ করতে চাইলেন। সেমতে মুসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাদেরকে জেহাদের উদ্দেশে পবিত্র ভূমি সিরিয়ায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দেয়া হল। সাথে সাথে তাদেরকে আগাম সুসংবাদও দেয়া হল যে, এ জেহাদে তারাই বিজয়ী হবে। কাজল, আল্লাহ তাআলা এ পবিত্র ভূমির আধিপত্য তাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন যা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু বনী-ইসরাঈল প্রকৃতিগত হীনতার কারণে আল্লাহর বহু নেয়ামত তথা ফেরাউনের সাগরডুবি ও তাদের মিসর অধিকার ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখেও এক্ষেত্রে অঙ্গীকার পালনের পরাক্রম প্রদর্শন করতে সক্ষম হল না। তারা সিরিয়ার জেহাদ সম্পর্কিত আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় জেদ ধরে বসে রইল। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর কঠোর শাস্তি নাযিল করলেন। পরিণতিতে তারা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় অবরুদ্ধ ও বন্দী হয়ে রইল। বাহ্যতঃ তাদের চারপাশে কোন বাধার প্রাচীর ছিল না এবং তাদের হাত, পা ও শেকল বাঁধা ছিল না; বরং তারা ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে। তারা বদশে অর্থাৎ, মিসর ফিরে যাবার জন্যে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথও চলত; কিন্তু তারা নিজেদেরকে সেখানেই দেখতে পেত, যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিল। ইত্যবসরে হযরত মুসা ও হারুন (আঃ)-এর ওকাত হয়ে যায় এবং বনী-ইসরাঈল তীহ প্রান্তরেই উদ্বাস্তের মত ঘুরাফেরা করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের হেদায়েতের জন্য অন্য একজন পয়গম্বুর প্রেরণ করলেন।

এমনিভাবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বনী-ইসরাঈলের অবশিষ্ট বংশধর তৎকালীন পয়গম্বুরের নেতৃত্বে সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের জন্যে জেহাদের সংকল্প গ্রহণ করে এবং আল্লাহ তাআলার ওয়াদা ও পূর্ণতা লাভ করে। এ হচ্ছে আয়াতে বর্ণিত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এবার কোরআনের ভাষায় বিস্তারিত ঘটনা শুনুনঃ

হযরত মুসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বায়তুল মুকাদ্দাস ও সিরিয়া অভিযানের খোদায়ী নির্দেশ শোনাবার পূর্বে পয়গম্বুরসূলভ বিচক্ষণতা ও উপদেশের মাধ্যমে বনী-ইসরাঈলকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বললেনঃ

اَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءًا وَجَعَلَ لَكُمْ

وَاَنْتُمْ سَامِعُونَ اَحَادِثَ الْعَالَمِيْنَ

“তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতকে স্মরণ কর। তিনি তোমাদের

মধ্য অনেক পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, তোমাদেরকে রাজ্যের অধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন নেয়ামত দিয়েছেন, যা বিশৃঙ্খলতার কেউ পায়নি।

এতে তিনটি নেয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি আধ্যাত্মিক নেয়ামত; অর্থাৎ, তাঁর সম্প্রদায়ে অব্যাহতভাবে বহু পয়গম্বর প্রেরণ। এর দ্বিতীয় বড় পারলৌকিক সন্মান আর কিছু হতে পারে না। তফসীরে মাযহরীতে বর্ণিত আছে যে, বনী-ইসরাঈলের মত এত অধিক সংখ্যক পয়গম্বর অপর কোন উম্মতে হয়নি।

হাদীসবিদ ইবনে আবী হাতেম আ'মাশের রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণনা করেন যে, বনী-ইসরাঈলের শেষ পর্বে যা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়, তাতেই এ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক হাজার পয়গম্বর প্রেরিত হন। আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় নেয়ামতটি হচ্ছে পার্থিব ও বাহ্যিক। অর্থাৎ, তাদেরকে রাজ্য দান। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনী-ইসরাঈল সুদীর্ঘ কাল ফেরাউন ও ফেরাউন বংশীয়দের ক্রীতদাসরূপে দিনরাত অসহনীয় নির্বাসনের শিকার ছিল। আজ আল্লাহ তাআলা ফেরাউন ও তার বাহিনীকে নিকট করে কী-ইসরাঈলকে তার রাজ্যের অধিপতি করে দিয়েছেন। এখানে প্রশ্নানযোগ্য যে, পয়গম্বরগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে **جَعَلْنَاكَ فِئَكَةٍ** অর্থাৎ, তোমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককে পয়গম্বর করেছেন। এর অর্থ এই যে, সমগ্র জাতি পয়গম্বর ছিল না। বাস্তব সত্যও তাই। পয়গম্বর কয়েকজনই হন। অবশিষ্ট গোটা জাতি তাদের উম্মত ও অনুসারী হয়। কিন্তু এখানে জাগতিক রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে **وَجَعَلْنَاكَ مَلِكًا** অর্থাৎ, তোমাদেরকে রাজ্যধিপতি করে দিয়েছেন। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমাদের সবাইকে রাজা করে দিয়েছেন। **ملك** শব্দটি **ملك** এর বহুবচন। সাধারণ পরিভাষায় এর অর্থ অধিপতি, বাদশাহ, রাজা। একথা সবাই জানে যে, গোটা জাতি যেমন নবী ও পয়গম্বর হয় না, তেমনি কোনদেশে গোটা জাতি বাদশাহ বা রাজাও হয় না। বরং জাতির এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তি শাসন কার্য পরিচালনা করে। অবশিষ্ট জাতি তাদের অধীনস্থ হয়ে থাকে। কিন্তু কোরআনের ভাষায় তাদের সবাইকে বাদশাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর একটি কারণ বয়ানুল—কোরআনে এক বুয়ূর্গের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, কোন জাতির মধ্য থেকে কেউ বাদশাহ হলে সাধারণ পরিভাষায় তার রাজত্ব ও সাম্রাজ্যকে গোটা জাতির দিকে সর্বস্বক করা হয়। উদাহরণতঃ ইসলামের মধ্য যুগের বাদশাহদের রাজত্বকে কী-উমাইয়া ও বনী আব্বাসের রাজত্ব বলা হয়। এমনভাবে ভারতবর্ষে গনবী বংশের রাজত্ব, যৌবী বংশের রাজত্ব, মোঘল বংশের রাজত্ব অতঃপর ইংরেজদের রাজত্বকে সমগ্র জাতির দিকে সনুক্মুক্ত করা হয়েছে। তাই যে জাতির একজন বাদশাহ হয়, সে জাতির সবাইকে বাদশাহ বলে দেখা হয়।

এই বিশেষ বাচনভঙ্গি অনুযায়ী কোরআন পাক সমগ্র বনী-ইসরাঈলকে রাজ্যধিপতি বলে দিয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে জনগণের রাষ্ট্র। জনগণই স্বীয় রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করার অধিকারী এবং জনগণই সম্মিলিত মত দ্বারা তাঁকে অপসারণও করতে পারে। তাই দেখার ক্ষেত্রে যদিও একজন রাষ্ট্রপ্রধান হন, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক জনগণই।

তৃতীয় নেয়ামত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার নেয়ামতের সমষ্টি। বলা হয়েছে : **وَأَنشَأْنَا لَكُم مِّنَ الْغَلِيلِ** অর্থাৎ, তোমাদেরকে এমনসব নেয়ামত দিয়েছেন, যা বিশৃঙ্খলতার আর কাউকে দেননি। আভ্যন্তরীণ সশ্রদ্ধা, নবুওয়ত এবং রেসালতও এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া বাহ্যিক রাজত্ব এবং অর্থ-সম্পদও এরই মধ্যে পরিগণিত। প্রশ্ন হতে পারে, কোরআনের উক্তি অনুযায়ী মুসলিম সম্প্রদায় অন্য সব উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কোরআনের উক্তি **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ** প্রভৃতি বাক্য এবং **وَلَدَلَاكُ جَنَّاتُ لَّهُمْ وَطَنًا** অসংখ্য হাদীসও এ বক্তব্য সমর্থন করে। উত্তর এই যে, আয়াতে বিশৃঙ্খলতার এসব লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা মুসা (আঃ)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তখন সমগ্র বিশ্বের কেউ এসব নেয়ামত পায়নি, যা বনী-ইসরাঈল পেয়েছিল। পরবর্তী যুগের কোন উম্মত যদি আরও বেশী নেয়ামত লাভ করে, তবে তা আয়াতের পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বর্ণিত মুসার উক্তিটি ছিল ঐ নির্দেশ বর্ণনার ভূমিকা, যা পরবর্তী আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ** অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা সে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছেন।

পবিত্র ভূমি বলে কোন ভূমি বোঝানো হয়েছে : এ প্রশ্নে তফসীরবিদগণের মত বাহ্যতঃ ভিন্ন ভিন্ন। কারও মতে বায়তুল-মুকাদ্দাস, কারও মতে কুদস শহর ও ইলিয়া এবং কেউ কেউ বলেন : আরিহা শহর—যা জর্দান নদী ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যস্থলে বিশুর একটি প্রাচীনতম শহর যা পূর্বেও ছিল এবং এখনও আছে। হযরত মুসা (আঃ)-এর আমলে এ শহরের অত্যন্ত চর্চাজী-জমক ও বিজুতি ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, এ শহরের এক হাজার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছিল। প্রতি অংশে এক হাজার করে বাগান ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, পবিত্র ভূমি বলে দামেস্ক ও ফিলিস্তিনকে এবং কারও মতে জর্দানকে বোঝানো হয়েছে। হযরত কাতাদাহ বলেন : সমগ্র সিরিয়াই পবিত্র ভূমি। কা'ব আহবার বলেন : আমি আল্লাহর কিতাবে (সম্ভবতঃ তৌরাত) দেখেছি যে, সমগ্র সিরিয়ায় আল্লাহ তাআলার বিশেষ ধন-ভাণ্ডার রয়েছে এবং এতে আল্লাহর অনেক প্রিয় বাদা রয়েছে। পয়গম্বরগণের জন্মস্থান ও বাসস্থান হওয়ার কারণে একে পবিত্র ভূমি বলা হয়।

এক রেওয়ায়েতে আছে, একদিন হযরত ইবরাহীম (আঃ) লেবাননের পাহাড়ে আরোহণ করলে আল্লাহ তাআলা বললেন : ইবরাহীম, এখান থেকে দৃষ্টিপাত কর। যে পর্যন্ত তোমার দৃষ্টি পৌঁছাবে, আমি তার সবটুকুকে পবিত্র ভূমি করে দিলাম। ইবনে-কাহীর ও মাযহরী তফসীর গ্রন্থ থেকে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সর্বশেষ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সমগ্র সিরিয়াই পবিত্র ভূমি। তবে বর্ণনায় কেউ সিরিয়ার অংশবিশেষকে এবং কেউ সমগ্র সিরিয়াকে বর্ণনা করেছেন।

قَالُوا لِيُؤْتِيَنَا এর আগে আল্লাহ তাআলা মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে বনী-ইসরাঈলকে আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করে সিরিয়া

দখল করতে বলেছিলেন। সাথে সাথে এ সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, সিরিয়ার ভূখণ্ড তাদের ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে। কাজেই তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।

উল্লেখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সত্ত্বও বনী-ইসরাঈল চিরাচরিত ঐক্যত্ব ও বক্র স্বভাবের কারণে এ নির্দেশ পালনে স্বীকৃত হল না; বরং মুসা (আঃ)-কে বলল : হে মুসা, এ দেশে প্রবল পরাক্রান্ত জাতি বাস করে। যতদিন এ দেশ তাদের দখলে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। যদি তারা অন্য কোথাও চলে যায়, তবে আমরা সেখানে যেতে পারি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইকরিমা, আলী ইবনে আবী তালহা প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তখন সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাস আমালেকা সম্প্রদায়ের দখলে ছিল। তারা ছিল আদ সম্প্রদায়ের একটি শাখা। দৈহিক দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত সুঠাম, বলিষ্ঠ ও ভয়াবহ আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। তাদেরই সাথে জেহাদ করে বায়তুল-মুকাদ্দাস অধিকার করার নির্দেশ মুসা আলাইহিসসালাম ও তাঁর সম্প্রদায়কে দেয়া হয়েছিল।

মুসা আলাইহিসসালাম আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্যে বনী-ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া অভিযুখে রওয়ানা হলেন। উদ্দেশ্য ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌছা। জর্দান নদী পার হয়ে বিশ্বের প্রাচীনতম শহর আরিহায় পৌছে শিবির স্থাপন করলেন। বনী-ইসরাঈলের দেখা-শোনার জন্যে বার জন সর্দার নির্বাচন করার কথা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মুসা (আঃ) এই বার জন সর্দারকে শত্রুদের অবস্থা ও রণাঙ্গণের হাল-হকিকত জেনে আসার জন্যে পাঠান। বায়তুল মুকাদ্দাসের অদূরে শহরের বাইরে আমালেকা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির সাথে তাদের দেখা হয়। সে একাই বার জনকে গ্রেফতার করে বান্দশার সামনে উপস্থিত করে বলল : এরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এসেছে। শাহী দরবারে নানাহ পরামর্শের পর তাদেরকে মুক্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল—যাতে তারা স্বজাতির কাছে পৌছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমালেকা জাতির শৌর্য-বীর্যের কাহিনী বর্ণনা করে। ফলে আক্রমণ তো দূরের কথা, ভীত হয়ে এদিকে মুখ করার সাহসও তারা হারিয়ে ফেলে।

এস্থলে অধিকাংশ তফসীর গ্রন্থে উল্লেখিত ইসরাঈলী রেওয়াজে তফসীরে নাস্তিদীর্ঘ কিছা-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং আমালেকা সম্প্রদায়ের উল্লেখিত ব্যক্তির নাম বলা হয়েছে আউজ ইবনে ওনুক। এসব রেওয়াজেতে তার অদ্ভুত আকার-আকৃতি ও শক্তি-সাহসকে এমন অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে উদ্ধৃত করাও কঠিন।

ইবনে-কাহীর বলেন : আউজ ইবনে ওনুকের যেসব কিছা এমন ইসরাঈলী রেওয়াজেতে স্থান পেয়েছে, সেগুলো কোন বুদ্ধিমানের কাছে গ্রহণীয় নয় এবং শরীয়তেও এগুলোর কোন বৈধতা নেই—এ সবই মিথ্যা ও বানোয়াট। আসল ব্যাপার এতটুকু যে, আমালেকা সম্প্রদায় ছিল আদ সম্প্রদায়ের উত্তর পুরুষদের একটি অংশ। আদ সম্প্রদায়ের ভয়াবহ আকার-আকৃতির কথা স্বয়ং কোরআন পাক বর্ণনা করেছে। তাদের বিশালাকৃতি ও শক্তি-সাহস প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের এক ব্যক্তি বনী-ইসরাঈলের বার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

মোটকথা, বনী-ইসরাঈলের বার জন সর্দার আমালেকাদের কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়ে আরিহায় স্বজাতির কাছে ফিরে এল। তারা মুসা (আঃ)-এর কাছে এ বিস্ময়কর জাতি ও তাদের অবিশ্বাস্য শৌর্যবীর্যের কাহিনী বর্ণনা করল। হযরত মুসা (আঃ) এসব কাহিনী শুনে এতটুকুও ভীত হলেন না। কারণ, আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বিজয় ও সাফল্যের বাণী শুনিয়ে রেখেছিলেন।

হযরত মুসা তো তাদের শৌর্যবীর্যের অবস্থা শুনে স্বস্থানে পাহাড়ের মত দৃঢ়তা সহকারে জেহাদের প্রস্তুতিতে লেগে রইলেন। কিন্তু বনী-ইসরাঈলকে নিয়েই সমস্যা। তারা যদি প্রতিপক্ষের অসাধারণ শক্তি-সাহসের কথা জেনে ফেলে, তবে নিশ্চিতই ভরাডুবি। তাই তিনি বার জন সর্দারকে আমালেকা সম্প্রদায়ের অবস্থা বনী-ইসরাঈলের কাছে ব্যক্ত করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু তা হল না। তারা প্রত্যেকেই গোপনে গোপনে বন্ধু-বান্ধবের কাছে তা ব্যক্ত করে দিল। শুধু ইউশা ইবনে নুন ও কালেব ইবনে ইউকেন্না নামক দু'ব্যক্তি মুসা (আঃ)-এর নির্দেশ পালন করে তা কারও কাছে প্রকাশ করল না।

قَالُوا يَوْمَئِذٍ إِنْ لَمْ تُدِخْهُمْ أَكْبَارُ مَا دَامُوا فِيهَا قَالَتْ هَبْ
 أَنْتَ وَرَبُّكَ فَتَايِلًا إِنَّا هُمَا فَعْدُونَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي
 لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
 الْفَاسِقِينَ ۝ قَالَ فَإِنَّا خَرْمَةٌ عَلَيْهِمَا أَرْبَعِينَ سَنَةً
 يَتَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝
 وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ مَائِدَتِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَأَ بِأُورِثْنَا فَنُقِلَ
 مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ
 إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ لَكِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ
 لِتُقَتِّلَنِي مَا أَنَا بِسَاطِئِي يَدَيْكَ لَاقِتُكَ إِنِّي أَخَافُ
 اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ سَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّي
 إِشْرَكَ قَتَلْتُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝
 فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْمَكْرُهِينَ ۝
 فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحِثُ فِي الْأَرْضِ لِيُورِيَهِ كَيْفَ بُورِئِ
 سَوْءَةِ أَخِيهِ قَالَ يُوزِلْنِي أَعْيَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا
 الْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ الْمَدْمُونِينَ ۝

(২৪) তারা বলল : হে মুসা, আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম। (২৫) মুসা বলল : হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অব্যাহা সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। (২৬) বললেন : এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হল। তারা ভূপৃষ্ঠে উদ্ভাস্ত হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অব্যাহা সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না। (২৭) আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তু অবস্থা পাঠ করে শুনান। যখন তারা উভয়েই কিছু উৎসর্গ নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয়নি। সে বলল : আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। সে বলল : আল্লাহ্ ধর্মবিরুদ্ধদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন। (২৮) যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর, তবে আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি। (২৯) আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাধ্যমে চাপিয়ে নাও। অতঃপর তুমি দোষবিশীল অশুভ্রষ্ট হয়ে যাও। এটাই অত্যাচারীদের শাস্তি। (৩০) অতঃপর তার অন্তর তাকে প্রাতঃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। অন্তর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অশুভ্রষ্ট হয়ে গেল। (৩১) আল্লাহ্ এক কাক প্রেরণ করলেন। সে মাটি খনন করছিল—যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভাতার মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে। সে বললঃ আফসোস, আমি কি এ কাকের সমতুল্যও হতে পারলাম না যে, আপন ভাতার মৃতদেহ আবৃত করি। অতঃপর সে অনুতাপ করতে লাগল।

কিন্তু বনী-ইসরাঈল যেখানে পয়গম্বরের কথার প্রতিই কর্পাত করল না, সেখানে তাদের উপদেশের আর মূল্য কি? তারা পূর্বের জওয়াবই আরও বিশী ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করলঃ فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَتَايِلًا অর্থাৎ, আপনি ও আপনার আল্লাহ্ উভয়ে গিয়েই যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব। বনী-ইসরাঈল বিদ্রোহের ভঙ্গিতে একথা বললে, তা পরিষ্কার কুফর হতো এবং অতঃপর তাদের সাথে মুসা (আঃ)—এর অবস্থান করা, তাই প্রান্তরে দোয়া করা ইত্যাদি সম্ভবপর হতো না যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এ কারণে তফসীরবিদগণ উপরোক্ত বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন—আপনি যান এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। আপনার আল্লাহ্ই আপনার সাহায্য করবেন, আমরা সাহায্য করতে অক্ষম। এ অর্থের দিক দিয়ে বনী-ইসরাঈলের জওয়াবটি কুফরের পরিধি অতিক্রম করে যায়—যদিও কথাটি অত্যন্ত বিশী ও পীড়াদায়ক। এ কারণেই তাদের এ বাক্যটি প্রবাদ বাক্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বদরযুদ্ধে নিরস্ত্র ও ক্ষুধার্ত মুসলমানদের মোকাবেলায় এক হাজার সশস্ত্র জওয়ানের বাহিনী প্রস্তুত হয়ে ছিল। রসুলুল্লাহ (সঃ) এ দৃশ্য দেখে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে লাগলেন। এতে ছাহাবী হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) আরম্ভ করলেন : ইয়া রসুলুল্লাহ! খোদার কসম, আমরা কসিন কালেও একথা বলব না, যা মুসা (আঃ)—কে তাঁর স্বজাতি বলেছিল فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَتَايِلًا إِنَّا هُمَا فَعْدُونَ বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করব। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

হাবিল ও কাবিলের কাহিনী : আলোচ্য আয়াতে রসুলুল্লাহ (সঃ)—কে আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন—আপনি আহলে-কিতাবদেরকে অথবা সমগ্র উম্মতকে আদম আলাইহিস সালামের পুত্রদ্বয়ের কাহিনী সত্য সত্য বর্ণনা করে শুনিয়ে দিন।

কোরআন মজীদে অভিনিবেশকারী মাত্রই জানে যে, কোরআন পাক কোন কিছ—কাহিনী অথবা ইতিহাস গ্রন্থ নয় যে, তাতে কোন ঘটনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করা হবে। এতদসঙ্গেও অতীত ঘটনাবলী এবং বিগত জাতিসমূহের ইতিবৃত্তের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে। এগুলোই ইতিহাসের আসল প্রাণ। তন্মধ্যে অনেক অবস্থা ও ঘটনা এমনও রয়েছে, যেগুলোর ওপর শরীয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান ভিত্তিশীল। এসব উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন পাকের সামগ্রিক রীতি এই যে, স্থানে স্থানে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে অধিকাংশ স্থানে পূর্ণ ঘটনা এক জায়গায় বর্ণনা করে না; বরং ঘটনার যে অংশের সাথে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সম্পর্ক থাকে সে অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়।

হযরত আদম আলাইহিস সালামের পুত্রদ্বয়ের কাহিনীটিও এই বিজ্ঞ রীতির ভিত্তিতে বর্ণনা করা হচ্ছে। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে শরীয়তের অনেক বিধি-বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এখন প্রথমে আয়াতের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা এবং তৎপ্রসঙ্গে আসল কাহিনী শুনুন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বর্ণনা করা হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে বনী-ইসরাঈলের প্রতি জেহাদের নির্দেশ এবং তাতে

তাদের কাপুরুষতা ও ভীকুতা বর্ণনা করা হয়েছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য কাহিনীতে অন্যায় হত্যার অনিষ্ট ও ধ্বংসকারিতা বর্ণনা করে জাতিকে মিতাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সত্যের সমর্থনে এবং মিতাচার থেকে পেছনে হটা যেমন ভুল, তেমনি অন্যায় হত্যাকাণ্ডে এগিয়ে যাওয়া ইহকাল ও পরকালকে বরবাদ করার শামিল।

প্রথম আয়াতে **إِنِّي أَدْرَأُكُمْ** শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। সেমতে প্রত্যেককেই **إِنِّي أَدْرَأُكُمْ** বা আদম সন্তান বলা যায়। কিন্তু সাধারণ তফসীরবিদগণের মতে এখানে **إِنِّي أَدْرَأُكُمْ** বলে হযরত আদমের ঔরসজাত পুত্রদ্বয় হাবিল ও কাবিলকে বোঝানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক রেওয়াজে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সততা অপরিহার্য : তাদের কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে : **وَأَتْلُوهُنَّ لِقَاءِ آدَمَ بِالْحَقِّ** অর্থাৎ, তাদেরকে পুত্রদ্বয়ের কাহিনী বিশুদ্ধ ও বাস্তব ঘটনা অনুযায়ী শুনিতে দিন। এতে **بِالْحَقِّ** শব্দ দ্বারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনায় খুবই সাবধানতা প্রয়োজন এবং এতে কোনরূপ মিথ্যা জালিয়াতি ও প্রভাবগার মিশ্রণ না থাকা চাই এবং প্রকৃত ঘটনা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত না হওয়া চাই।—(ইবনে কাসীর) কোরআন পাক শুধু এখানেই নয়, বরং অন্যান্য জায়গায়ও এ মূলনীতি অনুসরণ-অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এছাড়া এ শব্দ দ্বারা কোরআন পাকের সম্ভাব্যিত ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বাহ্যতঃ নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও হাজারো বছর পূর্বকাল ঘটনাবলী যেভাবে বিশুদ্ধ ও সত্য সত্য বর্ণনা করেছেন, তার কারণ খোদায়ী ওহী ও নবুওয়ত ছাড়া আর কি হতে পারে ?

এ ভূমিকার পর কোরআন পাক পুত্রদ্বয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেঃ

إِذْ قَرَّبْنَا نَارًا فَتَقَرَّبَ إِلَيْهَا آلُ آدَمَ كُلُّهُمْ وَلَوْ يَفْقَهُنَّ مِنَ الْخَبَرِ

আভিধানিক দিক দিয়ে যে বস্তু কারও নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে ‘কোরবান’ বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় কোরবান ঐ জন্তকে বলে যাকে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়।

হযরত আদম আলাইহিস সালামের পুত্রদ্বয়ের কোরবানীর ঘটনাটি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর একে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সর্বস্তরের আলেমদের সর্বসম্মত উক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন। ঘটনাটি এইঃ যখন আদম ও হাওয়া (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন প্রতি গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা—এরূপ যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করত। তখন ভ্রাতা-ভগিনী

ছাড়া হযরত আদমের আর কোন সন্তান ছিল না। অথচ ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তাআলা উপস্থিত প্রয়োজনের খতিরে আদম (আঃ)—এর শরীয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা-ভগিনী গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্যে প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারিনী কন্যা সহোদরা ভগিনী গণ্য হবে না। তাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে কাবিলের সহজাত সহোদরা ভগিনীটি ছিল পরমাসুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত কন্যাটি ছিল কুশ্রী ও কদাকার। বিবাহের সময় হলে নিয়মানুযায়ী হাবিলের সহজাত কুশ্রী কন্যা কাবিলের ভাগে পড়ল। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবিলের শত্রু হয়ে গেল। সে জেদ ধরল যে, আমার সহজাত ভগিনীকেই আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। হযরত আদম (আঃ) তাঁর শরীয়তের আইনের পরিশ্রেক্ষিতে কাবিলের আদার প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন : তোমরা উভয়েই আল্লাহর জন্যে নিজ নিজ কোরবানী পেশ কর। যার কোরবানী পরিগৃহীত হবে, সেই কন্যার পানিগ্রহণ করবে। হযরত আদম আলাইহিস সালামের নিকিত বিশ্রাস যে, যে সত্য পথে আছে, তার কোরবানীই গৃহীত হবে।

তৎকালে কোরবানী গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে কোরবানীকে ভস্মীভূত করে আবার অস্তিত্বিত হয়ে যেত। যে কোরবানী অগ্নি ভস্মীভূত করত না, তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হত।

হাবিল ভেড়া, দুগ্ধা ইত্যাদি পশু পালন করত। সে একটি উৎকৃষ্ট দুগ্ধা কোরবানী করল। কাবিল কৃষিকাজ করত। সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কোরবানীর জন্যে পেশ করল। অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কোরবানীটি ভস্মীভূত করে দিল এবং কাবিলের কোরবানী যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আত্মসম্বল করতে পারল না এবং প্রকাশ্যে ভাইকে বলে দিল : **إِنِّي أَدْرَأُكُمْ** অর্থাৎ, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব।

হাবিল তখন ক্রোধের জওয়াবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করল। এতে কাবিলের প্রতি তার সহনভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। সে বলল : **إِنِّي أَدْرَأُكُمْ إِلَهُكَ مِنَ الْمَقْتُلِينَ**

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার নিয়ম এই যে, তিনি খোদাতীক্ পরহেজগারের কর্মই গ্রহণ করেন। তুমি খোদাতীতি অবলম্বন করলে তোমার কোরবানীও গৃহীত হত। তুমি তা করনি, তাই কোরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমার দোষ কি ?

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ تَكْتَبُنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنَّهُ مَنْ
 قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
 النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثُرُوا مِنْهُمْ بِعَدَا
 ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَنُسْرِفُنَّ إِنَّهَا جَزَاءُ الَّذِينَ يَحَارِبُونَ
 اللَّهَ وَرُسُلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
 يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأرجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ
 يُنْفَخُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
 وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا
 مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ وَلَئِنْ لَمْ يَرْجِعُوا
 إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَنَكُمُ
 اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَتَاعَ
 الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتِنُنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ
 يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُفْقِلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَادَابُ إِلَيْهِ

কোরআনী আইনের অভিনব ও বৈপ্লবিক পদ্ধতি : পূর্ববর্তী
 আয়াতসমূহে হত্যাকাণ্ড এবং তার গুরুতর অপরাধের কথা বর্ণিত
 হয়েছিল। আলাচ্য আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে হত্যা, লুণ্ঠন,
 ডাকাতি ও চুরির শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। ডাকাতি ও চুরির শাস্তির মাধ্যমে
 খোদাভীতি ও এবাদতের মাধ্যমে খোদার নৈকট্য লাভের শিক্ষা দেয়া
 হয়েছে। কোরআন পাকের এ পদ্ধতি অত্যন্ত সুস্বভাবের মানসিক বিপ্লব
 সৃষ্টি করে। মানব রচিত দণ্ডবিধির মত কোরআন পাক শুধু অপরাধ ও
 শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে
 খোদাভীতি ও পরকাল কল্পনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে
 এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয়
 অপরাধ ও গোনাহ থেকে পবিত্র করে দেয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত
 রয়েছে যে, জনমনে আল্লাহ তাআলা ও আখেরাতের ভয় সৃষ্টি করা ছাড়া
 জগতের কোন আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা
 দিতে পারে না। কোরআন পাকের এই বিজ্ঞজ্ঞোচিত পদ্ধতিই জগতে
 দিত পূর্ব বিপ্লব এনেছে এবং এমন লোকদের একটি সমাজ গঠন করেছে,
 যারা পবিত্রতায় ফেরেশতাদের চাইতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

শরীয়তের শাস্তি তিন প্রকার : চুরি ও ডাকাতির শাস্তি এবং সংশ্লিষ্ট
 আয়াতের তফসীর বর্ণনা করার পূর্বে এসব শাস্তি সম্পর্কে শরীয়তের
 পরিভাষার কিছুটা ব্যাখ্যা আবশ্যিক। কেননা, এসব পরিভাষা সম্পর্কে
 অজ্ঞতার কারণে অনেক শিক্ষিত লোকের মনেও নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দেয়।
 জগতের সাধারণ আইনে অপরাধ সম্পর্কিত সব শাস্তিকেই ‘দণ্ডবিধি’
 নামে অভিহিত করা হয়। ‘ভারতীয় দণ্ডবিধি’, ‘বাংলাদেশ দণ্ডবিধি’
 ইত্যাদি নামে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সর্বপ্রকার অপরাধ ও সব
 ধরনের শাস্তিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত এরূপ নয়। ইসলামী
 শরীয়তে অপরাধের শাস্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে : হৃদুদ,
 কেছাছ ও তা’যীরাত। অর্থাৎ, দণ্ডবিধি। এগুলোর সংজ্ঞা ও অর্থ জানার
 পূর্বে প্রথমতঃ একথা জেনে নেয়া জরুরী যে, যেসব অপরাধের দরুন অন্য
 মানুষের কষ্ট অথবা ক্ষতি হয়, তাতে সৃষ্টজীবের প্রতিও অন্যায্য করা হয়
 এবং হৃদুদ ও নাফরমানী করা হয়। তাই এ জাতীয় অপরাধে ‘হক্কুল্লাহ’
 (আল্লাহর হক) এবং ‘হক্কুল আদ’ (বান্দার হক) উভয়টিই বিদ্যমান
 থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের কাছেই অপরাধী বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু কোন কোন অপরাধে বান্দার হক এবং কোন কোন অপরাধে
 আল্লাহর হক প্রবল থাকে এবং এ প্রাবল্যের উপর ভিত্তি করেই
 বিধি-বিধান রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ একথা জানা জরুরী যে, ইসলামী শরীয়ত বিশেষ বিশেষ
 অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ
 করেনি; বরং বিচারকের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান,
 কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্যে যেরূপ ও যতটুকু
 শাস্তির প্রয়োজন মনে করবেন, ততটুকুই দেবেন। প্রত্যেক স্থান ও কালের
 ইসলামী সরকার যদি শরীয়তের রীতিনীতি বিবেচনা করে বিচারকদের
 ক্ষমতার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং অপরাধসমূহের শাস্তির
 কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করে,
 তবে তাও জায়েয। বর্তমান শতাব্দীতে তাই হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় সব
 ইসলামী দেশে এ ব্যবস্থাই প্রচলিত রয়েছে।

(৩২) এ কারণেই আমি বনী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ
 গ্রাণের বিনিময়ে গ্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা
 করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে,
 সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য
 নির্দেশাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক
 পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে। (৩৩) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে
 সন্তোষ করে এবং দেশে হাস্যাম সৃষ্টি করতে চেষ্টা হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে
 এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলীতে চড়ানো হবে অথবা
 তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ
 থেকে বহিস্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্যে পার্থিব লাঞ্ছনা আর
 পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। (৩৪) কিন্তু যারা তোমাদের
 গুণভারের পূর্বে তওবা করে, জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।
 (৩৫) হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং
 তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। (৩৬) যারা কাফের,
 যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আরও তদনুরূপ
 সম্পদ থাকে আর এগুলো বিনিময়ে দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিব্রাণ
 পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না। তাদের জন্যে
 যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, যেসব অপরাধের কোন শাস্তি কোরআন ও সুন্নাহ নির্ধারণ করেনি, বরং বিচারকদের অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছে, সেসব শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় ‘ডায়রাহ’ তথা দণ্ড বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি কোরআন ও সুন্নাহ নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেগুলো দু’রকম : (এক) যেসব অপরাধে আল্লাহর হকের পরিমাণ প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে ‘হদ’ বলা হয়। আর ‘হদ’-এরই বহুবচন ‘হুদুদ’। (দুই) যেসব অপরাধে বান্দার হককে শরীয়তের বিচারে প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে বলা হয় ‘কেছাছ’। কোরআন পাক হুদুদ ও কেছাছ পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছে। আর দণ্ডনীয় অপরাধের বিবরণকে রসুলের বর্ণনা ও সমকালীন বিচারকদের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে।

সারকথা, কোরআন পাক যেসব অপরাধের শাস্তিকে আল্লাহর হক হিসেবে নির্ধারণ করে জারি করেছে, সেসব শাস্তিকে ‘হুদুদ’ বলা হয় এবং যেসব শাস্তিকে বান্দার হক হিসেবে জারি করেছে, সেগুলোকে ‘কেছাছ’ বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেনি, সে জাতীয় শাস্তিকে বলা হয় ‘তা’হীর’ তথা ‘দণ্ড’। শাস্তির এ প্রকার তিনটির বিধান অনেক বিষয়েই বিভিন্ন। যারা নিজেদের পরিভাষার ভিত্তিতে প্রত্যেক অপরাধের শাস্তিকে দণ্ড বলে এবং শরীয়তের পরিভাষাগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা শরীয়তের বিধি-বিধানে অনেক বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়।

দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘু থেকে লঘুতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। এব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু হুদুদের বেলায় কোন সরকার, শাসনকর্তা অথবা বিচারকই সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধিকারী নয়। স্থান ও কাল ভেদেও এতে কোন পার্থক্য হয় না এবং কোন শাসক ও বিচারক তা ক্ষমাও করতে পারে না। শরীয়তে হুদুদ মাত্র পাঁচটি : ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ-এ চারটির শাস্তি কোরআনে বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চমটি মদ্যপানের হদ। এটি সাহাবায়ে-কেরামের এজমা তথা একমত্য দ্বারা প্রমাণিত। এভাবে মোট পাঁচটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ও হুদুদরূপে চিহ্নিত হয়েছে। এসব শাস্তি যেমন কোন শাসক ও বিচারক ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না। তবে খাটি তওবা দ্বারা আখেরাতের গোনাহ মাফ হয়ে সেখানকার হিসাব-কিতাব থেকে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। তন্মধ্যে শুধু ডাকাতির শাস্তির বেলায় একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তওবা করে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারাও তওবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে সে হদ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পরবর্তী তওবা ধর্তব্য নয়। অন্যান্য হুদুদ তওবা দ্বারাও মাফ হয় না। এ তওবা গ্রেফতারীর পূর্বে হোক অথবা পরে। সব দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ শ্রবণ করা যায়; কিন্তু হুদুদের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা শ্রবণ করা দুই-ই নাজায়েয। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হুদুদের শাস্তি সাধারণতঃ কঠোর। এগুলো প্রয়োগ করার আইনও নির্মম। অর্থাৎ, কোন অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না এবং কেউ ক্ষমা করারও অধিকারী নয়। কিন্তু সাথে সাথে সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলীও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তাবলীর মধ্য থেকে যদি কোন একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ, অপরাধ প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ প্রয়োগ করা

যায় না। এ ব্যাপারে শরীয়তের স্বীকৃত আইন হচ্ছে **الحدود تنزل بالشبهات** অর্থাৎ, হুদুদ সামান্যতম সন্দেহের কারণেই অকোঁষা হয়ে পড়ে।

এ ক্ষেত্রে বুঝে নেয়া উচিত যে, কোন সন্দেহ অথবা কোন শর্তের অনুপস্থিতির কারণে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছাড়পত্র পেয়ে যাবে যার ফলে তার অপরাধ প্রবণতা আরও বেড়ে যাবে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে দণ্ডগত শাস্তি দেবেন। শরীয়তের দণ্ডগত শাস্তিসমূহ সাধারণতঃ দৈহিক ও আর্থিক। এগুলো দৃষ্টান্তমূলক হওয়ার কারণে অপরাধ দমনে খুবই কার্যকর। ধর্ম, ব্যভিচার প্রমাণে মাত্র তিন জন সাক্ষী পাওয়া গেলে এবং তারা সবাই নির্ভরযোগ্য ও মিথ্যার সন্দেহ থেকে মুক্ত। কিন্তু আইনানুযায়ী চতুর্থ সাক্ষী না থাকার কারণে হদ জারি করা যাবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি অথবা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, বরং বিচারক তাকে অন্য কোন উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করবেন, যা বেত্রাঘাতের আকারে হতে পারে।

তেমনিভাবে চুরি প্রমাণের জন্যে নির্ধারিত শর্তসমূহে কোন ত্রুটি অথবা সন্দেহ দেখা দেয়ার কারণে চোরের হাত কেটে দেয়া যাবে না বটে, কিন্তু এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণ মুক্তও হয়ে যাবে না; বরং তাকে অবস্থানুযায়ী অন্য দণ্ড দেয়া হবে।

কেছাছের শাস্তিও হুদুদের মত কোরআন পাকে নির্ধারিত। অর্থাৎ, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ সংহার করা হবে এবং জখমের বিনিময়ে সমান জখম করা হবে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, হুদুদকে আল্লাহর হক হিসেবে গ্রেহণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা হবে না এবং হদ অব্যবহার্য হবে না। উদাহরণতঃ যার অর্থ চুরি যায়, সে ক্ষমা করলেও চোরের নির্ধারিত শাস্তি অপ্রযোজ্য হবে না। কিন্তু কেছাছ এর বিপরীত। কেছাছে বান্দার হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে কেছাছ হিসেবে তাকে মৃত্যুদণ্ডও করতে পারে। জখমের কেছাছও তদ্রূপ। পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, হুদুদ ও কেছাছ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি পেয়ে যাবে; বরং বিচারক দণ্ডমূলক শাস্তি যতটুকু উপযুক্ত মনে করবেন, দিতে পারবেন। কাজেই নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলে হত্যাকারীদের সাহস বেড়ে যাবে কিংবা ব্যাপক হারে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে—এরূপ আশঙ্কা করা ঠিক নয়। কেননা, হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করা ছিল নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য। সে তা ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু অপরাধের লোকদের প্রাণরক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার এ দায়িত্ব পালনের জন্য হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অন্য কোন শাস্তি দিয়ে এ বিপদাশঙ্কা রোধ করতে পারে।

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ অর্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্য অনুেষণ করা। **وسيلة** শব্দটি **وسل** ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। এ শব্দটি **وسل** উভয় বর্ণে প্রায় একই অর্থে আসে। পার্থক্য এতটুকু যে, **وسل** এর অর্থ যে কোনরূপে সাক্ষাৎ করা ও সংযোগ করা এবং **وسل** এর অর্থ আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সাক্ষাৎ করা।—(হেহাছ, জওহরী, মুফরাদাতুল-কোরআন) তাই **وسيلة** ও **وسيلة** ঐ বস্তুকে বলে, যা দুই বস্তুর মধ্যে মিলন ও সংযোগ স্থাপন করে—তা আগ্রহ ও সম্প্রীতির মাধ্যমেই হোক অথবা অন্য কোন উপায়ে। পক্ষান্তরে **وسيلة** ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা

একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সংযুক্ত করে দেয়।—(লিসানুল আরব, মুফরাদাতুল-কোরআন) وسيله শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হলে এ বস্তুকে বলা হবে, যা বান্দাকে আগ্রহ ও মহব্বত সহকারে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষী, ছাহাবী ও তাবয়ীগণ এবাদত, নৈকট্য, ঈমান ও সংকর্ম দ্বারা আয়াতে উল্লিখিত وسيله শব্দের তফসীর করেছেন। হাকেমের বর্ণনা মতে হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বলেন, ‘ওসীলা’ শব্দ দ্বারা নৈকট্য ও আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। ইবনে জরীর হযরত আ’তা (রাঃ), মুজাহিদ (রাঃ) ও হাসান বসরী (রাঃ) থেকে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন : تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بطاعته والعمل بما يرضيه অর্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করে। অতএব, আয়াতের সারব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, ঈমান ও সংকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অনুেষণ কর।

মুসনাদে-আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত এক ছহীহ হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : জান্নাতের একটি উচ্চ স্তরের নাম ‘ওসীলা’। এর উর্ধ্বে কোন স্তর নেই। তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া কর যেন তিনি এ স্তরটি আমাকে দান করেন।

মুসলিমের এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যখন মুয়াযযিন আযান দেয়, তখন মুয়াযযিন যা বলে, তোমরাও তাই বল। এরপর দরদর পাঠ কর এবং আমার জন্যে ওসীলার দোয়া কর।

এসব হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, ওসীলা জান্নাতের একটি স্তর, যা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট। আলোচ্য আয়াতে প্রত্যেক ঈমানদারকে ওসীলা অনুেষণের নির্দেশ বাহ্যতঃ এর পরিপন্থী। উত্তর এই যে, হেদায়াতের সর্বোচ্চ স্থান যেমন রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরগুলো সব মুমিনই প্রাপ্ত হবে, তেমনি ওসীলার সর্বোচ্চ স্তর রসুলুল্লাহ (সাঃ) লাভ করবেন এবং এর নিম্নের

স্তরগুলো মুমিনরা প্রাপ্ত হবে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী তাঁর ‘মকতুবাত’ গ্রন্থে এবং কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী তফসীরে মাযহারীতে বর্ণনা করেন যে, ওসীলা শব্দটিতে শ্রেম ও আগ্রহের অর্থ সংযুক্ত থাকায় বোঝা যায় যে, ওসীলার স্তরসমূহের উন্নতি আল্লাহ ও রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহব্বতের উপর নির্ভরশীল। মহব্বত সৃষ্টি হয় সুন্নতের অনুসরণের দ্বারা।

কেননা, কোরআন বলে : فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন।) তাই এবাদত, লেন-দেন, চরিত্র, সামাজিকতা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে সুন্নতের যত বেশী অনুসরণ করবে, আল্লাহর মহব্বত সে ততবেশী অর্জন করতে পারবে এবং আল্লাহর প্রিয়জনে পরিণত হবে। মহব্বত যতবেশী বৃদ্ধি পাবে, নৈকট্যও ততবেশী অর্জিত হবে।

ওসীলা শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা এবং ছাহাবী ও তাবয়ীগণের তফসীর থেকে জানা গেল যে, যে বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, তাই মানুষের জন্যে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার ওসীলা। ঈমান ও সংকর্ম যেমন এর অন্তর্ভুক্ত তেমনি পয়গম্বর ও সংকর্মীদের সংসর্গ এবং মহব্বতও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এগুলোও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেরই উপায়। এ কারণেই তাঁদেরকে ওসীলা করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করা জায়েয। দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাসকে ওসীলা করে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করেছিলেন এবং আল্লাহ তা’আলা সে দোয়া কবুল করেছিলেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং জনৈক অন্ধ ছাহাবীকে এভাবে দোয়া করতে বলেছিলেন : (আল্লাহ্, আমি রহমতের নবী মুহাম্মদের ওসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি)।—(যানার)

المائدة

১১৫

لا يصب الله

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يُرِيدُونَ أَن يُخْرِجُوا مِنَ الدِّينِ وَمَا لَهُمْ بِخُرْجَتِهِ
مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً لِّمَا كَسَبَا تَكْلًا مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ۝ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ
يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ
مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ يَأْتِيهَا الرُّسُلُ لَا
يُحِزُّكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا
أُمَّا يَأْتِيهِمْ وَلَهُمْ آيَاتُ بَيِّنَاتٍ وَلَهُمْ مُّؤْمِنُونَ قُلُوبُهُمْ ۖ وَمِنَ الَّذِينَ
هَادُوا فَاسْتَعْمُوا لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ
يَأْتُواكَ بِبَيِّنَاتٍ ۖ فَتَوَقَّ ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
يَأْتِيهَا الرُّسُلُ لَا يُحِزُّكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا
أُمَّا يَأْتِيهِمْ وَلَهُمْ آيَاتُ بَيِّنَاتٍ وَلَهُمْ مُّؤْمِنُونَ قُلُوبُهُمْ ۖ وَمِنَ الَّذِينَ
هَادُوا فَاسْتَعْمُوا لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ
يَأْتُواكَ بِبَيِّنَاتٍ ۖ فَتَوَقَّ ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(৩৭) তারা দোম্বের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না। তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। (৩৮) যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। (৩৯) অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৪০) তুমি কি জান না যে, আল্লাহর নিমিত্তেই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আশ্রিত। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৪১) হে রসূল, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়; যারা মুখে বলে : আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা ইহুদী; মিথ্যা বলার জন্যে তারা গুপ্তচর বৃত্তি করে। তারা অন্যদের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলে : যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে কবুল করে নিও এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকে। আল্লাহ যাকে পছন্দ করলে চান, তার জন্যে আল্লাহর কাছে আপনি কিছু করতে পারবেন না। এরা এমনই যে, আল্লাহ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি।

এ সম্পর্কে প্রথমে দেখা দরকার যে, কোরআন পাক মাত্র চারটি অপরাধের শাস্তি স্বয়ং নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করেছে। শরীয়তের পরিভাষায় এগুলোকে ‘হদ’ বলা হয়। ডাকাতির শাস্তি ডান হাত বা বাম পা কটন করা, চুরির শাস্তি ডান হাত গিঠ থেকে কটন করা, ব্যভিচারের শাস্তি কোন কোন অবস্থায় একশ’ বেত্রাঘাত এবং কোন কোন অবস্থায় প্রহার নিক্ষেপে হত্যা করা এবং ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত। পঞ্চম ‘হদ’ মদ্যপানের শাস্তি ছাহাবীদের ঐকমত্যে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত হয়েছে। এ পাঁচটি ছাড়া সব অপরাধের সাজা বিচারকের বিবেচনাধীন; তিনি অপরাধ, অপরাধী এবং পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে যেরূপ ও যতটুকু শাস্তি উপযুক্ত মনে করবেন, দেবেন। এ ব্যাপারে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শক্রমে শাস্তির সীমা নির্ধারণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করাও জায়েয। যেমন, আজকাল এসেমুলীর মাধ্যমে দণ্ডবিধি নির্ধারণ করা হয় এবং বিচারক ও জজগণ নির্ধারিত দণ্ডবিধির অধীনে মামল-মোকদ্দমায় রায় দেন। তবে কোরআন ও ইজমা দ্বারা নির্ধারিত উপরোক্ত পাঁচটি অপরাধের শাস্তি পরিবর্তন করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা এসেমুলীর নেই। কিন্তু এ পাঁচটির ক্ষেত্রেও যদি শরীয়তের নির্ধারিত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা অপরাধ প্রমাণিত না হয় কিংবা অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর যেসব শর্তের অধীনে ‘হদ’ জারি করা হয়, সেগুলো পূরণ না হয়, তবে হদ জারি করা হবে না, বরং অন্য কোন দণ্ড দেয়া হবে। এতদসঙ্গে এ নীতিটিও স্বীকৃত যে, সন্দেহের সুযোগ অপরাধীরা ভোগ করতে পারবে। অপরাধ প্রমাণে কিংবা অপরাধের শর্তাবলীর মধ্য থেকে কোন একটিতে সন্দেহ দেখা দিলে হদ অব্যবহার্য হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শুধু অপরাধ প্রমাণিত হলেই সাধারণ দণ্ড দেয়া হবে।

এতে বোঝা গেল যে, উপরোক্ত পাঁচটি অপরাধের মধ্যে অনেক অবস্থায় হদ প্রয়োগ করা যাবে না, বরং বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী সাধারণ দণ্ডই দেয়া হবে। সাধারণ দণ্ড শরীয়ত নির্ধারণ করেনি। কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সাধারণ আইনের অনুরূপ এগুলো পরিবর্তন ও কমবেশী করা যায়। কাজেই এগুলোর ব্যাপারে কারও আপত্তি করার অবকাশ নেই। এখন আলোচ্য বিষয় থেকে যাবে শুধু এ পাঁচটি অপরাধের শাস্তি এবং এগুলোর বিশেষ বিশেষ অবস্থা। উদাহরণতঃ চুরিই ধরুন এবং দেখুন যে, ইসলামে হস্ত কতনের শাস্তি সব চুরির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং যে চুরির কারণে চোরের হাত কাটা হয়, তার একটা বিশেষ সংজ্ঞা আছে। এর ব্যাখ্যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, অন্যের মাল হেফাজতের জায়গা থেকে বিনানুমতিতে গোপনে নিয়ে যাওয়াকেই সংজ্ঞাটো সাধারণ পরিভাষায় চুরি বলা হয়—এরূপ।

আলোচ্য তিনখানি আয়াত এবং তৎপরবর্তী কতিপয় আয়াত যেসব কারণ ও ঘটনার পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয় তার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই ইহুদীরা কখনও স্বজন-প্রীতির বশবর্তী হয়ে এবং কখনও নাম-যশ ও অর্থের লোভে ফতোয়া প্রার্থীদের মনমত ফতোয়া তৈরী করে দিত। বিশেষতঃ অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে এটিই ছিল তাদের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি। কোন বড়লোক অপরাধ করলে তারা তওরাতের গুরুতর শাস্তিকে লঘু শাস্তিতে পরিবর্তন করে দিত। তাদের এ অবস্থাটিই আয়াতের এ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে—

يُحِزُّونَ الْكَلِمَةَ مِن بَعْدِ مَا وَضِعَ رَسُولُ اللَّهِ (সঃ) যখন মদীনায় হিজরত

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلشُّعْبِ فَإِنْ جَاءَ وَلَدٌ فَاعْلَمُوا
بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضُوا عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ
شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ٥٠ وَكَيْفَ يُحْكُمُ لَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا
حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ
بِالْمُؤْمِنِينَ ٥١ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ
يُحْكُمُ بِهَا الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَذَا وَآؤُ
الرَّبِيبِينَ وَالْأَحْبَارَ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ
اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاشْشَوُا
وَلَا تَشْتَرُوا بِالْبَيِّنَاتِ كَيْفَ بَالُ الَّذِينَ لَمْ يُحْكَمْ بِهَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ٥٢ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ
فِيهَا أَنْ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَرْفُ
يَلْأَرْفُ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجُرْمُ
قَصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ
لَمْ يُحْكَمْ بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٥٣

(৪২) এরা মিথ্যা বলার জন্যে গুণ্ডচরবৃত্তি করে, হারাম ভক্ষণ করে।
অতএব, তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা
করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে লিপিপু থাকুন। যদি তাদের থেকে
লিপিপু থাকেন, তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি
করতে পারে। যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন।
নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। (৪৩) তারা আপনাকে
কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে অথচ তাদের কাছে তওরাত রয়েছে।
তাতে আল্লাহর নির্দেশ আছে। অতঃপর এরা পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে
নেয়। তারা কখনও বিশাসী নয়। (৪৪) আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি।
এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহর আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও
আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে
এ খোদায়ী গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর
রক্ষাব্যবস্থাকে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং
আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ
করো না। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা
কর না, তারাই কাফের। (৪৫) আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি
যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক,
কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যথম সময়ের বিনিময়
সমান যথম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ থেকে পাক হয়ে যায়।
যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না,
তারাই জালেম।

করলেন এবং ইসলামের অভূতপূর্ব জীবন ব্যবস্থা ইহুদীদের সামনে এল,
তখন তারা একে একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইল। ইসলামী
জীবন ব্যবস্থায় একদিকে যেমন অনেক নমনীয়তা ছিল, অন্যদিকে তেমনি
অপরাধ-দমনের জন্যে একটি যুক্তিযুক্ত বিধি-ব্যবস্থাও ছিল। যেসব ইহুদী
তওরাতের কঠোর শাস্তিসমূহকে পরিবর্তন করে সহজ করে নিত, তারা এ
জাতীয় মোকদ্দমায় রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিচারক নিযুক্ত করতে প্রয়াস
পেত—যাতে একদিকে ইসলামের সহজ ও নরম বিধি-বিধান দ্বারা উপকৃত
হওয়া যায় এবং অন্যদিকে তওরাত পরিবর্তন করার অপরাধ থেকেও
অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেও তারা একটি দৃষ্টির আশ্রয়
নিত। তা এই যে, নিয়মিত বিচারক নিযুক্ত করার পূর্বে কোন না কোন
পন্থায় মোকদ্দমার রায় ফতোয়া হিসাবে জেনে নিতে। চাইত উদ্দেশ্য, এ
রায় তাদের আকাঙ্ক্ষিত রায়ের অনুরূপ হলে বিচারক নিযুক্ত করবে,
অন্যথায় নয়। এ সম্পর্কে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাতে রসুলুল্লাহ
(সাঃ) যথেষ্ট মর্যাদা অনুভব করেছিলেন। তাই আয়াতের প্রারম্ভেই
তাঁকে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে যে, এতে আপনি দূষিত হবেন না। এর
পরিণাম আপনার জন্যে শুভই হবে।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

অতঃপর আয়াতে অবহিত করে দেয়া হয়েছে যে, তারা আশঙ্কিতর
সাথে আপনাকে বিচারক নিযুক্ত করছে না। তাদের নিয়তে গোলমাল
রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে ক্ষমতা দিয়ে বলা হয়েছে
যে, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের মোকদ্দমায় ফয়সালা করুন, নতুবা
লিপিপু থাকুন। আরও বলা হয়েছে যে, আপনি যদি লিপিপু থাকতে চান,
তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

তাঁকে বলা হয়েছে
আয়াতের বিষয়বস্তু তাই। পরের আয়াতে বলা হয়েছে
যদি আপনি ফয়সালাই করতে চান, তবে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে
ফয়সালা করুন। অর্থাৎ, নিজ শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করুন। কেননা
রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত রহিত হয়ে
গেছে। কোরআনে যেসব আইন বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলো অবশ্য
রহিত হয়নি। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে অন্য কোন
আইন, প্রথা ও প্রচলনের অধীনে মোকাদ্দমার রায় প্রদান করাকে অন্যায়,
পাপাচার ও কুফর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদের মোকদ্দমা বিধি : এখানে স্মর্তব্য
যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) - এর আদালতে মোকদ্দমা দায়েরকারী ইহুদীরা,
ইসলামে বিশাসী ছিল না এবং মুসলমানদের অধীনস্থ যিম্মীও ছিল না।
তবে তারা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে
তাদের ব্যাপারে লিপিপু থাকুন এবং ইচ্ছা করলে তাদের মোকদ্দমার
শরীয়তানুযায়ী ফয়সালা করুন। কেননা, তাদের ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের
কোন দায়িত্ব ছিল না। তারা যিম্মী হলে এবং ইসলামী আদালতে মোকদ্দমা
দায়ের করলে তার ফয়সালা করা মুসলিম বিচারকের দায়িত্বে ফরয হত;
লিপিপু থাকা জায়েয হত না। কেননা, তাদের অধিকারের দেখাশোনা করা
এবং অত্যাচার থেকে রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে
মুসলমান ও যিম্মীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই; তাই পরবর্তী আয়াতে বলা
হয়েছে :

অর্থাৎ, তারা

আপনার কাছে মোকদ্দমা নিয়ে আসলে আপনি তার ফয়সালা শরীয়ত

অনুযায়ী করে দিন।

এ আয়াতে ক্ষমতা দেয়ার পরিবর্তে নির্দিষ্ট করে ফয়সালা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু বকর জাসাসাস আহকামুল কোরআন গ্রহে উভয় আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন যে, যে আয়াতে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তা ঐসব অমুসলিমের সম্পর্কে, যারা আমাদের রাষ্ট্রের বাসিন্দা অথবা যিম্মী নয়, বরং নিজ দেশে বাস করে আমাদের সাথে কোন চুক্তি করেছে মাত্র। যেমন, বনী-কুরায়যা ও বনী-নুযায়ের। আর দ্বিতীয় আয়াত ঐসব অমুসলিমদের সম্পর্কে, যারা যিম্মী এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক।

এখন প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, উভয় আয়াতে অমুসলিমদের মোকদ্দমায় নিজ শরীয়তানুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের মনোবাঞ্ছার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, এ নির্দেশ ঐসব মোকদ্দমা সম্পর্কেই দেয়া হয়েছে, যা আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে-নুযুলে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হত্যার শাস্তি ও রক্ত-বিনিময়ের মোকদ্দমা ও অপরটি হচ্ছে ব্যভিচার সংক্রান্ত মোকদ্দমা। এ জাতীয় মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে একই নিয়ম। অর্থাৎ, সমগ্র দেশে একই আইন বলবৎ থাকে। একে সাধারণ আইন বলা হয়। সাধারণ আইনে শ্রেণী অথবা ধর্মের কারণে কোনরূপ পার্থক্য হয় না। উদাহরণতঃ চুরির শাস্তি হস্ত কর্তন শুধু মুসলমানদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, বরং দেশের যে কোন বাসিন্দার বেলায় এ শাস্তিই প্রযোজ্য। এমনভাবে হত্যা ও ব্যভিচারের শাস্তিও সবার বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু অমুসলমানদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় ব্যাপারাদির ফয়সালাও যে ইসলামী আইন অনুযায়ী করতে হবে এমনটি জরুরী নয়।

স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ) মদ্যপান ও শূকরের মাংস মুসলমানদের জন্যে হারাম করে তার শাস্তিও নির্ধারিত করেছিলেন, কিন্তু অমুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি অমুসলমানদের বিবাহ-শাদী ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করেননি। তাদের ধর্ম অনুযায়ী যে বিবাহ শুদ্ধ ছিল, তিনি তাই বহাল রেখেছিলেন।

হিজরের অগ্নি পূজারী এবং নাজরান ও ওয়াদিয়ে কুরার ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী ছিল। মহানবী (সাঃ) জনভেদে যে, অগ্নি-উপাসকদের ধর্ম মা ও ভগিনীকেও বিয়ে করা হালাল। এমনভাবে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মমতে ইদত অভিবাহিত না করে এবং সাক্ষী ব্যতিরেকেও বিবাহ শুদ্ধ। কিন্তু তিনি কখনও তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করেননি, বরং তাদের বিবাহ-শাদীর বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছে।

মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিষয়াদির স্বীকৃতি তাদেরই ধর্মমতের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। যদি এ সব ব্যাপারে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তবে তাদের ধর্মাবলম্বী বিচারক নিযুক্ত করে ফয়সালা করাতে হবে।

তবে যদি তারা মুসলমান বিচারকের নিকট উপস্থিত হয়ে উভয় পক্ষ তাঁর রায় মেনে নিতে সম্মত হয়, তবে মুসলমান বিচারক ইসলামী আইন অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। কেননা, তখন তিনিই উভয় পক্ষে নিযুক্ত বিচারকরূপে গণ্য হবেন। **وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ** আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-কে ইসলামী আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে দেয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার এক কারণ হয় এই যে, মোকদ্দমাটিই সাধারণ আইনের—যাতে কোন সম্প্রদায়ই আগত বাহির্ভূত নয়, অথবা এর কারণ

এই যে, উভয় পক্ষ স্বয়ং রসুলুল্লাহকে বিচারক স্বীকার করে ফয়সালার জন্যে আসে, এমতাবস্থায় তাঁর ফয়সালা তাই হবে, যার প্রতি তাঁর ইমান রয়েছে এবং যা তাঁর শরীয়তের নির্দেশ। মোটকথা, আলোচ্য প্রথম আয়াতে প্রথমে রসুলুল্লাহ (সাঃ) কে সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে অতঃপর ইহুদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়েছে। **يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ** বাবা থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে।

এতে এ রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) - এর কাছে যে প্রতিনিধি দলটি আগমন করেছিল, তারা সবাই ছিল মুনাফেক। ইহুদীদের সাথে এদের গোপন যোগ-সাজশ রয়েছে এবং এরা তাদেরই প্রেরিত। এরপর প্রতিনিধিদলের কতিপয় বদভ্যাস বর্ণনা করে মুসলমানদের হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এগুলো কাকফরসুলভ অভ্যাস। এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত।

ইহুদীদের একটি বদভ্যাস : **سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ** অর্থাৎ, তারা মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনাতে অভ্যস্ত। তারা আলেম বলে কথিত বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদেরই অঙ্ক অনুসারী। তওরাতের নির্দেশাবলীর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ দেখা সত্ত্বেও তারা তাদেরই অনুসরণ করে এবং তাদের বর্ণিত মিথ্যা ও অমূলক কেচ্ছা-কাহিনীই শুনতে থাকে।

আলেমদের অনুসরণ করার বিধি : যারা তওরাত পরিবর্তন করে এবং আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশাবলীতে মিথ্যা বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করে, আয়াতে তাদেরকে লক্ষ্য করে যেমন শাস্তিবাদী উচ্চারণ করা হয়েছে, তেমনি ঐসব লোককেও অপরাধী বলা হয়েছে যারা তাদেরকে অনুসরণযোগ্য সাব্যস্ত করে মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এতে মুসলমানদের জন্যেও একটি মৌলিক নির্দেশ রয়েছে যে, আলেমদের কাছ থেকে ফাতোয়া নেয়ার পূর্বে তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া দরকার। অজ্ঞ জনগণের ধর্ম-কর্ম করার একমাত্র পথ হচ্ছে আলেমদের ফতোয়া ও শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করা। রুগ্ন ব্যক্তি কোন ডাক্তার অথবা হাকীমের কাছে যাওয়ার পূর্বে পরিচিতির কাছে খোঁজ নেয় যে, এ রোগের জন্যে কোন্ ডাক্তার পারদর্শী, কোন্ হাকীম বেশী ভাল, তার কি কি ডিগ্রী আছে, তার চিকিৎসাধীন রোগীদের পরিণাম কি, যথাসম্ভব খোঁজ-খবর নেয়ার পরও যদি সে কোন ভ্রান্ত ডাক্তার অথবা হাকীমের ফাঁদে পড়ে যায়, তবে বিজ্ঞজনের দৃষ্টিতে সে নিদার পাণ্ড নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনরূপ খোঁজ-খবর না নিয়েই কোন হাতুড়ে ডাক্তারের ফাঁদে পড়ে এবং পরিণামে অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট করে, বিজ্ঞজনের মতে তার আত্মহত্যার জন্যে সে নিজেই দায়ী হয়।

জনগণের ধর্মকর্মের অবস্থাও তাই। যদি তারা এলাকার বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে কোন আলেমের অনুসরণ করে এবং তার ফতোয়া অনুযায়ী আমল করে, তবে তারা মানুষের কাছেও ক্ষমযোগ্য হবে এবং আল্লাহর কাছেও। এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কেই রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, **فَانْأَمِ عَلَى مَنْ أَنْتَى** অর্থাৎ, এমতাবস্থায় আলেম ও মুফতী ভুল করলে এবং কোন মুসলমান তার ভুল ফতোয়া অনুযায়ী কাজ করলে, তার গোনাহ তার উপর নয়—বরং আলেম ও মুফতীর উপরই বর্তাবে, যদি সে জেনেগুনেন ভুল করে কিংবা সম্ভাব্য চিন্তা-ভাবনায় ত্রুটি করে অথবা প্রকৃতপক্ষে সে আলেম না হলেও যদি জনগণকে ধোঁকা দিয়ে আলেমের পদ দখল করে বসে থাকে।

কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর না নিয়ে শুধু নিম্ন মতে কোন আলেমের অনুসরণ করে এবং তার উক্তি অনুযায়ী কাজ করে

অথচ সংশ্লিষ্ট আলেম অনুসরণের যোগ্য না হয়, তবে এর গোনাহ্ একা ত্বাক্বিত আলেম ব্যক্তিই বহন করবে না, বরং অনুসরণকারীও সমান দ্বন্দ্বপ্রাপ্ত হবে। এমন লোকদের সম্পর্কেই কোরআন বলেছে **سُعُونَ لِكَيْبٍ** - অর্থাৎ, তারা মিথ্যা কথা শোনায় অত্যন্ত অভ্যস্ত এবং স্বীয় অনুসৃতদের এলম, আমল ও ধার্মিকতার খোজ-খবর না নিয়েই তাদের অনুসরণে লিপ্ত।

কোরআন পাক ইহুদীদের এ অবস্থা বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে স্মরণিয়েছেন যেন তারা এ দোষ থেকে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মুসলমানরা এ ব্যাপারে উদাসীন। এ উদাসীনতাই আজকাল মুসলমানদের চরম দূরবস্থার অন্যতম কারণ। অথচ তারা বৈষয়িক ব্যাপারাদিতে খুবই হুশিয়ার, কর্মচঞ্চল ও সুচতুর। অসুস্থ হলে অধিকতর মেগা ডাক্তার-বেদা খোজ করে, মোকদ্দমা হলে নামীদামী টকিল-ব্যারিস্টার নিয়োগ করে এবং গৃহ নির্মাণ করতে হলে উৎকৃষ্টতর স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ারের শরণাপন্ন হয়, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে এতই উদার যে, কারও দাড়ি-কোর্তা দেখে এবং কিছু কথাবার্তা শুনেই তাকে অনুসরণযোগ্য আলেম, মুফতী ও পথপ্রদর্শক বলে নির্বাচন করে নেয়। সে নিয়মিত কোন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছে কি না, বিশেষজ্ঞদের সংসর্গে থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে কি না, শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে কি না, সাক্ষা বুয়ুর্গ ও আল্লাহ্ ভক্তদের সংসর্গে থেকে কিছু আত্মিক পরিব্রতা অর্জন করেছে কি না ইত্যাদি বিষয়ের খবর নেয়ারও প্রয়োজন মনে করে না।

এর ফলশ্রুতি এই যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্ম-কর্মে মনোযোগী, তাদের একটি বিরাট অংশ মুর্থ ওয়ায়েজ ও ব্যবসায়ী পীরের ফাঁদে পড়ে বিশুদ্ধ ধর্মপথ থেকে দূরে পড়ে যায়। তাদের ধর্মীয় জ্ঞান এমন কতিপয় কেছ-কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা রৈপিক কামনা-বাসনার পরিপন্থী নয়। তারা ধর্মপথে চলছে এবং বিরাট এবাদত করছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, কিন্তু কোরআনের ভাষায় তাদের স্বরূপ হচ্ছে এই :

الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِنُونَ كَقَمَرٍ مُّضِيٍّ

مُضِيٍّ

অর্থাৎ, তারা এমন, যাদের চেষ্টা-চরিত্র ও কাজ-কর্ম পার্থিব জীবনেই লুপ্ত প্রায়, অথচ তারা মনে করছে যে, চমৎকার ধর্ম-কর্ম করে যাচ্ছে।

মোটকথা এই যে, কোরআন পাক **سُعُونَ لِكَيْبٍ** বাক্যে মুনাক্ফক ইহুদীদের অবস্থা বর্ণনা করে একটি বিরাট মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ, মুর্থ জনগণের পক্ষে আলেমদের অনুসরণ করা অপরিহার্য বটে, কিন্তু যথার্থ খোজ-খবর না নিয়ে কোন আলেমের অনুসরণ করা ঠিক নয় এবং অজ্ঞ লোকদের মুখে মিছামিছি কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হওয়া উচিত নয়।

ইহুদীদের দ্বিতীয় বদভ্যাস : উপরোক্ত মুনাক্ফকদের দ্বিতীয় বদভ্যাস হচ্ছে **سُعُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَأْتُونَ** - অর্থাৎ, এরা বাহ্যতঃ আপনার কাছে একটি ধর্মীয় বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং ধর্মীয় বিষয় জ্ঞানার জন্যও আসেনি। বরং তারা এমন একটি ইহুদী সম্প্রদায়ের গুপ্তচর, যারা অহংকারবশতঃ নিজে আপনার কাছে আসেনি। তাদের বাসনা অনুযায়ী এরা শুধু ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে আপনার মতবাদ জেনে তাদেরকে বলে দিতে চায়। এরপর মানা না মানা সম্পর্কে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে। এতে

মুসলমানদের জন্যে হুশিয়ারী রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও রাসুলের আদেশ জানা ও তা অনুসরণ করার নিয়তেই আলেমদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা কর্তব্য। নিজ প্রবৃত্তির অনুকূলে নির্দেশ অনুসন্ধান করার নিয়তে মুফতীদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা রিপু ও শয়তানের অনুসরণ বৈ কিছু নয়। এ থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

ইহুদীদের তৃতীয় বদভ্যাস ঐশী গ্রন্থের বিকৃতিসাধন : ইহুদীরা আল্লাহর কলামকে যথার্থ পরিবেশ থেকে সরিয়ে তার ভুল অর্থ করত এবং খোদায়ী নির্দেশকে বিকৃত করত। এ বিকৃতি ছিল দ্বিবিধ : তওরাতের ভাষায় কিছু হেরফের করা এবং ভাষা ঠিক রেখে তদস্থলে অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করা। ইহুদীরা উভয় প্রকার বিকৃতিতেই অভ্যস্ত ছিল।

এতে মুসলমানদের জন্যেও একটি হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। কোরআন পাকের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং হাতে রেখেছেন। এতে শাসনিক পরিবর্তনের দুঃসাহস কেউ করতে পারবে না। কেননা, লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও লাখে মানুষের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত কলামে কেউ যের-যবরের পরিবর্তন করতেই ধরা পড়ে যায়। অর্থগত পরিবর্তন বাহ্যতঃ করা যায় এবং কেউ করেছেও। কিন্তু এর হেফাযতের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার গৃহীত ব্যবস্থা এই যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের কিয়ামত পর্যন্ত একটি সত্যপন্থী দল থাকবে, যারা হবে কোরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ অর্থের বাহক। তারা পরিবর্তনকারীদের রহস্য ফাঁস করে দেবে।

চতুর্থ বদভ্যাস উৎকোচ গ্রহণ : দ্বিতীয় আয়াতে তাদের আরও একটি বদভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে : **اَلْكُفُّونَ لِلْمُحْتَبِ** - অর্থাৎ, তারা (সুহূত) খাওয়ায় অভ্যস্ত। সুহূতের শাসনিক অর্থ কোন বস্তুকে মূলোৎপাটিত করে ধ্বংস করে দেয়া। এ অর্থই কোরআনে বলা হয়েছে :

فَسُحَّتْ مِيزَانُ

অর্থাৎ, তোমরা কুর্কম থেকে বিরত না হলে আল্লাহ্ তাআলা আযাব দ্বারা তোমাদের মূলোৎপাটন করে দিবেন। অর্থাৎ, তোমাদের মূল শিকড় ধ্বংস করে দেয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে ‘সুহূত’ বলে উৎকোচকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ), ইবরাহীম নখরী (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ), মুজাহিদ (রাঃ), কাতাদাহ (রাঃ) ও যাহ্যাক (রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

উৎকোচ বা ঘুষকে সুহূত বলার কারণ এই যে, এটি শুধু গ্রহিতাকেই ধ্বংস করে না, সমগ্র দেশ ও জাতিরও মূলোৎপাটন করে এবং জননিরাপত্তা ধ্বংস করে। যে দেশে অথবা যে বিভাগে ঘুষ চালু হয়ে পড়ে, সেখানে আইনও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অথচ আইনের উপরই দেশ ও জাতির শান্তি নির্ভরশীল। আইন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে কারও জ্ঞান-মাল ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত থাকে না। তাই ইসলামে একে ‘সুহূত’ আখ্যা দিয়ে কঠোরতর হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঘুষের উৎসমুখ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদেরকে প্রদত্ত উপাটোকনকেও হুদীহ হাদীসে ঘুষ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ্ তাআলা ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রতিও, যে উভয়ের মধ্যে দালালী বা মধ্যস্থতা করে। - (জাসাস)

শরীয়তের পরিভাষায় ঘুষের সংজ্ঞা এই যে, যে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা আইনতঃ জায়েয নয় সে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা। উদাহরণতঃ যে কাজ করা কোন ব্যক্তির কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত, সে

কাজের জন্যে কোন পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করাই ঘৃণ। সরকারী অফিসার ও ক্লাব চাকরীর অধীনে স্বীয় কর্তব্য-কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য ; সে যদি সংশ্লিষ্ট কোন লোকের কাছ থেকে সে কাজের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করে, তবে তা ঘৃষের অন্তর্ভুক্ত। কন্যাকে পাত্রস্থ করা পিতা-মাতার দায়িত্ব। তারা কারও কাছ থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করতে পারে না। এখন কোন পাত্রকে কন্যাদান করে তারা যদি কিছু গ্রহণ করে, তবে তাও ঘৃষ। রোযা, নামায, হজ্জ, তেলাওয়াতে-কোরআন ইত্যাদি এবাদতও মুসলমানদের দায়িত্ব। এ জন্যে কারও কাছ থেকে বিনিময় নিলে তা ঘৃষ হবে। অবশ্য পরবর্তী ফেকাহবিদদের ফতোয়া অনুযায়ী কোরআন শিক্ষা দান করা ও নামাযে ইমামতি করা এ থেকে আলাদা।

কেউ যদি ঘৃষের বিনিময়ে ন্যায়সংগত কাজও করে দেয়, তবে সে গোনাহ্গার হবে এবং ঘৃষের অর্থও তার পক্ষে হারাম হবে। পক্ষান্তরে যদি ঘৃষ গ্রহণ করে কারও অন্যায় কাজ করে দেয়, সে উপরোক্ত গোনাহ্ ছাড়াও অধিকার হরণ এবং খোদায়ী নির্দেশে বিকৃতি সাধনের কঠোর অপরাধে অপরাধী হয়ে যায়। আল্লাহ মুসলমানদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে :

إِذَا زُرْنَا لِلْزَّوْجَةِ وَفِي هَذِهِ زُورُ

অবতারণ করেছি, যাতে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন এবং একটি বিশেষ জ্যোতি ছিল। এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আজ যে তওরাতের শরীয়তকে রহিত করা হচ্ছে, এতে করে তওরাতের কোনরূপ মর্যাদাহানি করা হচ্ছে না, বরং সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধি-বিধান পরিবর্তন করার তাগিদেই তা করা হচ্ছে। নতুবা তওরাতও আমারই প্রেরিত গ্রন্থ। এতে বনী-ইসরাঈলের জন্যে পথপ্রদর্শনের মূলনীতি রয়েছে এবং একটি বিশেষ জ্যোতিও রয়েছে, যা আধ্যাত্মিক পন্থায় তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

এরপর বলা হয়েছে :

يَعْلَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا إِلَى اللَّهِ هَذَا وَرَأَيْتُهُمْ
وَالْكَتَابُ

অর্থাৎ, তওরাত অবতারণের কারণ ছিল এই যে, যত দিন তার শরীয়তকে রহিত করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত ভবিষ্যতে আগমনকারী পয়গম্বর, তাঁদের প্রতিনিধি আল্লাহ ওয়াল্লা ও আলেমগণ সবাই এ তওরাত অনুযায়ী ফয়সালা করবেন এবং এ আইনকেই জগতে প্রবর্তন করবেন। এ বাক্যে পয়গম্বরদের প্রতিনিধিগণকে দুই ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমভাগ رِئَانِيُون এবং দ্বিতীয়ভাগ اَحْبَار - রীনি শব্দটি এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ ওয়াল্লা (আল্লাহভক্ত)। অহবার শব্দটি এর বহুবচন। ইহুদীদের বাকপদ্ধতিতে আলেমকে حبر বলা হত। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহভক্ত ব্যক্তিমাত্রই আল্লাহর জরুরী বিধি-বিধান সম্পর্কে অবশ্যই আলেমও হবে। নতুবা এলম ব্যতীত আমল হতে পারে না এবং আমল ব্যতীত কোন ব্যক্তি আল্লাহভক্ত হতে পারে না। এমনভাবে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই আলেম, যে এলম অনুযায়ী আমলও করে। পক্ষান্তরে যে আলেম খোদায়ী বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও জরুরী ফরয ও ওয়াজেবের আমল করে না, তার প্রতি কেউ চোখ তুলেও তাকায় না। সে আল্লাহ ও রসুলের দৃষ্টিতে মুখের চাইতেও অধম। অতএব,

প্রত্যেক আল্লাহভক্তই আলেম এবং প্রত্যেক আলেমই আল্লাহভক্ত। কিন্তু আলোচ্য বাক্যে আল্লাহভক্ত ও আলেমকে পৃথকভাবে উল্লেখ করে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একটির জন্যে অপরটি জরুরী হলেও যার মধ্যে যে দিক প্রবল, সে অনুযায়ীই তার নাম রাখা হয়। যে ব্যক্তির মনোবল বেশীর ভাগ এবাদত, আমল ও যিকিরে নিবদ্ধ থাকে এবং যতটুকু দরকার ততটুকু এলম হাসিল করে ক্ষান্ত হয় তাকে 'রাব্বানী' অর্থাৎ, আল্লাহভক্ত বলা হয়। আধুনিক পরিভাষায় তাকে শায়খ, মুরশেদ, গীর ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করে জনগণকে শরীয়তের নির্দেশাবলী বর্ণনা করা ও শিক্ষা দেয়ার কাজে বেশীর ভাগ নিয়োজিত থাকে এবং ফরয, ওয়াজেব ও সুন্নে-মুহাক্কামাহ ছাড়া অন্যান্য নফল এবাদতে বেশী সময় ব্যয় করে না তাকে حبر বলা হয়।

মোটকথা, এ বাক্যে শরীয়ত ও তরীকত এবং আলেম ও মাশায়েখের আসল একত্বও ব্যক্ত হয়েছে এবং কর্মপন্থা ও প্রধান বস্তির দিক দিয়ে তাদের পার্থক্যও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, আলেম ও হুফী দু'টি সম্প্রদায় বা দু'টি দল নয়, বরং উভয়ের জীবনের লক্ষ্যই আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য। তবে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মপন্থা বাহ্যতঃ পৃথক বলে মনে হয়।

এরপর এরশাদ হয়েছে :

بِمَا اسْتَفْظَرْنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِمْ شُهُدَاءُ

পয়গম্বর ও তাঁদের উভয় শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ আলেম ও মাশায়েখ তওরাতের নির্দেশাবলী প্রয়োগ করতে এ কারণে বাধ্য ছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা তওরাতের হেফযত তাঁদের দায়িত্বেই ন্যস্ত করেছিলেন এবং ওয়া এ দায়িত্ব পালনের ওয়াদা-অঙ্গীকারও করেছিলেন।

এ পর্যন্ত বর্ণিত হল যে, তওরাত একটি ঐশী গ্রন্থ, পথ প্রদর্শক, জ্যোতি আর আয়িয়া আল-ইহিমুসসালাম ও তাদের সাক্ষা প্রতিনিধিগণ হচ্ছেন মাশায়েখ ও ওলামা এর হেফযত করেছেন। অতঃপর বর্তমান যুগের ইহুদীদেরকে তাদের বক্তৃতা ও বক্তৃতার আসল কারণ সম্পর্কে অবহিত করে বলা হয়েছে : তোমরা পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তওরাতের হেফযত করার পরিবর্তে এর বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিয়েছ। তওরাতে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে শেষ নবী (সাঃ) - এর আগমনের সংবাদ এবং ইহুদীদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছিল, কিন্তু তারা এ নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) - এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে দেয়। আয়াতে তাদের এ মারাত্মক ভ্রান্তির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : পার্শ্ব নাম-যশ ও অর্থ লিপ্সাই তোমাদের এ বিরোধিতার কারণ। তোমরা রসুলে করীম (সাঃ)-কে সত্য নবী জেনেও তাঁর অনুসরণ করতে বিব্রত বোধ করছ। কারণ, এখন তোমরা স্বীয় সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় বলে গণ্য হও এবং ইহুদী জনগণ তোমাদের পিছনেই চলে। এমনভাবেই ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলে তোমাদের সর্দারী নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়া বড়লোকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ঘৃষ নিয়ে তওরাতের নির্দেশ সঙ্ঘ করে দেয়াকে তারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে হুশিয়ার করার জন্যে বর্তমান যুগের ইহুদীদেরকে বলা হয়েছে :

فَلَا تَعْتَصُوا
الْأَنَاسَ وَآخِثُونَ وَلَا تَتَّبِعُوا بَالِيْنَ كَمَا كُنْتُمْ لَا

লোকদেরকে ভয় করো না যে, তারা তোমাদের অনুসরণ ত্যাগ করবে

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۚ
 مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ
 لِّلْمُتَّقِينَ ۖ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْأَرْجَالِ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ ۖ وَمَنْ
 لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۖ وَأَنْزَلْنَا
 إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
 وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
 أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
 وَمِنْهَا جَاءَ أَوْسَاءُ ۚ اللَّهُ جَعَلَكَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُبَدِّلُكُمْ
 فِي مَا أَلْتُمْ ۚ فَاسْتَقِمْ كَمَا نَزَّلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ وَجَمْعُهُمْ جَمِيعًا ۖ فَتَبَيَّنَ
 بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَفُونَ ۖ وَإِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحِدٌ رِّفْمَانٌ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلِمَ أَلَمَّا يُزَيَّدُ اللَّهُ أَنْ يَصِيدَهُمْ
 بِبَعْضِ دُورِهِمْ وَإِنْ كَثُرَ أَمْسَ النَّاسُ لَافِقُونَ ۖ أَفَكُم
 الْيَاهِلِيَّةُ يَبْغُونَ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوفُونَ ۖ

অথবা শত্রু হয়ে যাবে। তাছাড়া দুনিয়ার নিকট অর্থকড়ি গ্রহণ করে তাদের জন্যে আল্লাহর নির্দেশও পরিবর্তন করো না। এতে করে তোমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়টিই বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, **وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا** অর্থাৎ, যারা আল্লাহ প্রেরিত বিধানকে জরুরী মনে করে না এবং তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, বরং এর বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা কাকের ও অবিশ্বাসী। এর শাস্তি জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব।

এরপর দ্বিতীয় আয়াতে তওরাতের বরাত দিয়ে কেছাছের বিধান বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ

وَكُنْتُمْ عَلَيْهُمْ فِيهَا أَكْأَنَ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفِ

بِالْأَنفِ وَالْأُذُنِ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُورَ قَصَاصٌ

অর্থাৎ, আমি ইহুদীদের জন্যে তওরাতে এ বিধান অবতারণ করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং বিশেষ জখমেরও বিনিময় আছে।

বনী-কোরাযযা ও বনী-নুযায়রের একটি মোকদ্দমা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর এজলাসে উপস্থাপিত হয়েছিল। বনী-নুযায়র গায়ের জোরে বনী - কোরাযযাকে বাধ্য করে রেখেছিল যে, বনী-নুযায়রের কোন ব্যক্তি যদি তাদের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নেয়া হবে এবং রক্ত-বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বনী-নুযায়রের কোন ব্যক্তি বনী-কোরাযযার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে শুধু কেছাছ নয়, রক্ত-বিনিময় দেয়া হবে তাও বনী-নুযায়রের রক্ত-বিনিময়ের অর্ধেক।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের এ জাহেলিয়াতের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন যে, স্বয়ং তওরাতের কেছাছ ও রক্ত-বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতার বিধান রয়েছে। তারা জেনে শুনে তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং শুধু বাহানাবাজির জন্যে নিজেদের মোকদ্দমা রসূলুল্লাহ (সঃ) - এর এজলাসে উপস্থিত করে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

আল্লাহ প্রেরিত বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালেম, খোদায়ী বিধানে অবিশ্বাসী এবং বিদ্রোহী। তৃতীয় আয়াতে প্রথমে হযরত ইসা (সঃ)-এর নবুওয়তপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। এরপর ইঞ্জিল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটিও তওরাতের মতই হেদায়েত ও জ্যোতি।

আনুষঙ্গিক স্ফাতব্য বিষয় :

৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইঞ্জিলের অধিকারীদের ইঞ্জিলে অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা উচিত। যারা এ আইনের বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা অবাধ্য ও উদ্ধত।

কোরআন তওরাত ও ইঞ্জিলের সংরক্ষক : পক্ষম ও বস্তু আয়াতে নবী করীম (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ “আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতারণ করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জিলের সত্যায়ন

(৪৬) আমি তাদের পেছনে মরিয়ম তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাঁকে ইঞ্জিল প্রদান করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের, সত্যায়ন করে, পঞ্চ প্রদর্শন করে এবং এটি খোদাতীকরদের জন্যে হেদায়েত ও উপদেশবাণী। (৪৭) ইঞ্জিলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করা। যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা ই পাগাচারী। (৪৮) আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, আপনি তাদের পালন করুন এবং আপনার কাছে যে সংপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ করেননি— যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, দোঁড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করত। (৪৯) আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন— যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ তাদেরকে তাদের গোনাহর কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই ন্যাকরমান। (৫০) তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ অপেক্ষা বিশাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে ?

করে এবং এদের সরেক্কও বটে”। কারণ, যখন তওরাতের অধিকারীরা তওরাতে এবং ইঞ্জীলের অধিকারীরা ইঞ্জীলে পরিবর্তন সাধন করে, তখন কোরআনই তাদের পবিত্রনের মুখোশ উন্মোচন করে সরেক্ককের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রকৃত শিক্ষা আজও কোরআনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এসব গ্রন্থের উত্তরাধিকারী এবং অনুসরণের দাবীদাররা এদের রূপ এমনভাবে বিগড়িয়ে দিয়েছে যে, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শেষাংশে মহানবী (সাঃ)-কে তওরাত ও ইঞ্জীলধারীদের অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে : আপনার যাবতীয় নির্দেশ ও ফয়সালা আল্লাহ্ প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে। যারা আপনার দ্বারা স্বীয় বৈয়াকি কামনা-বাসনা অনুযায়ী ফয়সালা করতে চায়, তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হুশিয়ার থাকবেন। এরূপ বলার একটি বিশেষ কারণ ছিল এই যে, ইহুদীদের কতিপয় আলেম মহানবী (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, আপনি জানতেন, আমরা ইহুদীদের আলেম ও ধর্মীয় নেতা। আমরা মুসলমান হয়ে গেলে তারাও সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। তবে আমাদের একটি শর্ত আছে। তা হল এই যে, আপনার কওমের সাথে আমাদের একটি মোকদ্দমা রয়েছে আমরা মোকদ্দমাটি আপনার কাছে উত্থাপন করব। আপনি এর ফয়সালা আমাদের পক্ষে করে দিলে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। আল্লাহ্ তাআলা হযুর (সাঃ)-কে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলছেন : আপনি এদের মুসলমান হওয়ার প্রেক্ষিতে ন্যায়, সুবিচার ও আল্লাহ্ প্রেরিত আইনের বিপক্ষে কোন ফয়সালা দিবেন না এবং এরা মুসলমান হবে কি হবে না এ বিষয়ের প্রতি জ্রেক্ষণও করবেন না।

পয়গম্বরদের বিভিন্ন শরীয়তের আর্থিক প্রভেদ ও তার তাৎপর্য : আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, সব আয়িয়াহ আলাইহিসসালাম যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই প্রেরিত এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ, হুদীফা ও শরীয়তসমূহও যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আগত, তখন এসব গ্রন্থ ও শরীয়তের মধ্যে প্রভেদ কেন এবং পরবর্তী গ্রন্থ ও শরীয়ত পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়তকে রহিত করে দেয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ও তাৎপর্য এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :

لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا مَا أُفِيضَ إِلَيْكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ جَدِيدًا يُغْفِرُ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

وَإِلَّا لَكُنْ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ كَثِيرَةٌ لِّمَا تَكْفُرُونَ ۚ

অর্থাৎ, আমি তোমাদের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে একটি বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ কর্পশা নির্ধারণ করেছি। এতে মূলনীতি অভিন্ন ও সর্বসম্মত হওয়া সত্ত্বেও শাখাগত নির্দেশসমূহে কিছু প্রভেদ আছে। যদি আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে একই উম্মত, একই জাতি এবং সবার জন্যে একই গ্রন্থ ও একই শরীয়ত নির্ধারণ করতে চাইতেন, তবে এরূপ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা পছন্দ করেননি। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পরীক্ষা করা। তিনি যাচাই করতে চান যে, কারা এবাদতের স্বরূপ অবগত হয়ে নির্দেশ এলেই তা পালন করার জন্যে সর্বদা কান পেতে রাখে, নতুন গ্রন্থ ও নতুন শরীয়ত এলে তার অনুসরণে লেগে যায়, পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়ত প্রিয় হলেও এবং পৈতৃক ধর্ম হয়ে যাওয়ার কারণে তা বর্জন করা কঠিন হলেও কারা সর্বদা উন্মুখভাবে আনুগত্যের জন্যে প্রস্তুত থাকে। পক্ষান্তরে কারা এ সত্য বিস্মৃত হয়ে বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ গ্রন্থকেই সম্বল করে নেয় এবং পৈতৃক ধর্ম হিসেবে আঁকড়ে থাকে—এর বিপক্ষে খোদারী নির্দেশের প্রতিও কর্পপাত করে না।

শরীয়তসমূহের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট রহস্য। এর

মাধ্যমে প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক স্তরের মানুষকে এবাদত ও দাসত্বের এ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করা হয় যে, প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব, আনুগত্য ও অনুসরণকেই এবাদত বলা হয়। এ দাসত্ব ও আনুগত্য নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, যিকর ও তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে এগুলো উদ্দেশ্যও নয়, বরং এগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে খোদারী নির্দেশের আনুগত্য। একারণেই যে সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে সে সময়ে নামায পড়লে ছোয়াব তো দূরের কথা, উল্টো পাপের বোঝাই জরী হয়। দুই ঈদসহ বছরে পাঁচদিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ। এসময়ে রোযা রাখা নিষিদ্ধ গোনাহ্। ৯ই মিলহজ্জ ছাড়া অন্য কোনদিন কোন মাসে আরাকাতের ময়দানে একত্রিত হয়ে দোয়া ও এবাদত করা বিশেষভাবে কোন ছোয়াবের কাজ নয়। অথচ ৯ই মিলহজ্জ তারিখে এটি সর্ববৃহৎ এবাদত। অন্যান্য এবাদতের অবস্থায় তাই। যতক্ষণ তা করার নির্দেশ, ততক্ষণই তা এবাদত এবং যখন যেখানে নিষেধ করা হয়, তখন সেখানে তা হারাম ও না জায়েয হয়ে যায়। অজ্ঞ জনসাধারণ এ সত্য সম্পর্কে অবহিত নয়। যেসব এবাদত তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়, বরং যেসব জাতীয় প্রথাকে তারা এবাদত মনে করে পালন করতে থাকে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ও রসুলের প্রকাশ্য নির্দেশের প্রতিও তারা কর্পপাত করে না। এ ছিন্নপ্রথেই বেদআত ও মনগড়া আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়তে পরিবর্তন হওয়ার কারণও ছিল তাই। আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন পয়গম্বরদের প্রতি বিভিন্ন গ্রন্থ ও শরীয়ত অবতারণ করে মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন একটি কাজ অথবা এক প্রকার এবাদতকে উদ্দেশ্য করে নেয়া ঠিক নয়, বরং বিস্তৃত অর্থে আল্লাহ্র অনুগত বান্দা হওয়া উচিত। আল্লাহ্ যখনই আগের কাজ বর্জন করার আদেশ দেন, তখনই তা বর্জন করা দরকার এবং যে কাজের নির্দেশ দেন, বিনা দ্বিধায় তা পালন করা কর্তব্য।

এ ছাড়া শরীয়তসমূহের বিভিন্নতার আর একটি বড় রহস্য এই যে, জগতের প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক স্তরের মানুষের মনমোজাজ ও স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন। কালের পরিবর্তন মানবস্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি সবার জন্যে শাখাগত বিধান এক করে দেয়া হয়, তবে মানুষ গুরুতর পরিস্থিতির সন্মুখীন হবে। তাই খোদারী রহস্যের তাগিদে প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক মানুষের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাখাগত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। এখানে ‘নাসিখ’ (রদকারী আদেশ) ও ‘মনসুখ’ (রদকৃত আদেশ)—এর অর্থ এরূপ নয় যে, আদেশদাতা পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না বলে একটি আদেশ জারি করার ফলে যখন নতুন পরিস্থিতি সামনে এল, তখন অপর একটি আদেশ জারি করে একে রহিত করে দিলেন, অথবা পূর্বে অসাবধানতা ও ভ্রান্তিবশত কোন নির্দেশ জারি করেছিলেন, পরে হুশিয়ার হয়ে তা পরিবর্তন করে দিলেন। বরং শরীয়তসমূহে নাসিখ ও মনসুখের অবস্থা একজন বিজ্ঞ হাকীম ও ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মত। ডাক্তার ব্যবস্থাপত্রে পর্যায়ক্রমে ঔষধ পরিবর্তন করে। তিনি পূর্ব থেকেই জানেন যে, তিন দিন এ ওষুধ প্রয়োগ করার পর রোগীর মধ্যে এরূপ অবস্থা দেখা দেবে, তখন অমুক ওষুধ সেবন করানো হবে। সুতরাং ডাক্তার যখন পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপত্র রহিত করে নতুন ব্যবস্থাপত্র দেন তখন এরূপ বলা ঠিক নয় যে, পূর্বের ব্যবস্থাপত্রটি ভুল ছিল বলেই রহিত করা হয়েছে। বরং আসল সত্য হচ্ছে এই যে, বিগত দিনগুলোতে সে ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরী ছিল এবং পরবর্তী পরিবর্তিত অবস্থায় পরবর্তী পরিবর্তিত এ ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا آيَةٌ ۚ قُلْ إِنَّ آيَةَ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالْقَوْمِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ ۖ فَيُصِيبُوا عَلَىٰ مَا سَارُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ذُرِّيَةً ۚ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنْ هُمُ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ الْأَعْنَاءُ لَهُمْ وَأُصْبِحُوا تُرْبَةً ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ وَدَيْهَ فَقَدْ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُخَيِّرُهُمْ وَيُخَيِّرُونَ ۚ إِذْ عَلَى الْيَهُودِ عِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَئِنْ أُنْفِقُوا لَأَنْفِقُوا أَكْثَرَ ۚ فَذَلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾ أَمَّا وَلَكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٣﴾

(৫১) হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৫২) বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে : আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন— ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে। (৫৩) মুসলমানরা বলবে : এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। (৫৪) হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নয় হবে এবং কারফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ— তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। (৫৫) তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মুমিনবৃন্দ— যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনয়। (৫৬) আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত স্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহের সারসংক্ষেপ : (১) প্রাথমিক আয়াতসমূহের দ্বারা জানা যায় যে, ইহুদীদের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় মহানবী (সাঃ) যে ফয়সালা দিয়েছিলেন, তা তওরাতের শরীয়তানুযায়ী ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিগত শরীয়তসমূহের বিধি-বিধানকে যদি কোরআন অথবা ওহী রহিত না করে, তবে তা যথারীতি বহাল থাকে। যেমন ইহুদীদের মোকদ্দমায় কেছাদের সমতা এবং ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তর বর্ষণে হত্যার নির্দেশ তওরাতে ছিল এবং অতঃপর কোরআনও তা হুবহু বহাল রেখেছে।

(২) দ্বিতীয় আয়াতে জখমের কেছাহ সম্পর্কিত বিধান তওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামেও এ বিধান রসূলুল্লাহ (সাঃ) জারি করেছেন। এ কারণেই আলোচ্যের মতে বিগত শরীয়তসমূহের যেসব বিধান কোরআন রহিত করেনি, সেগুলো আমাদের শরীয়তেও প্রযোজ্য এবং অনুসরণীয়। এর ভিত্তিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহে তওরাতের অনুসারীদেরকে তওরাত অনুযায়ী এবং ইঞ্জিলের অনুসারীদেরকে ইঞ্জিল অনুযায়ী ফয়সালা দেয়ার ও আমল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অথচ এ গ্রন্থদ্বয় ও তার শরীয়ত মহানবী (সাঃ)—এর আগমনের সাথে সাথেই রহিত হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য এই যে, তওরাত ও ইঞ্জিলের যেসব বিধান কোরআন রহিত করেনি, সেগুলোর আজও অনুসরণ করা জরুরী।

(৩) আল্লাহ শ্রেণিত বিধি-বিধান সত্য নয়—এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এসব বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা করা কুফর, কিন্তু সত্য বিশ্বাস করার পর যদি কার্যতঃ বিপরীত করা হয়, তবে তা অন্যায় ও পাপ।

(৪) ঘুষ গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় হারাম— বিশেষতঃ আইন বিভাগে ঘুষ গ্রহণ করা অধিকতর হারাম।

(৫) আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সব পয়গম্বর ও তাঁদের শরীয়ত মূলনীতির ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন, কিন্তু তাদের আংশিক ও শাখাগত বিধি-বিধান বিভিন্ন এবং এ বিভিন্নতা বিরাট রহস্যের উপর নির্ভরশীল।

আনুষঙ্গিক স্ফাভাব বিষয়

প্রথম আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে সামঞ্জস্য ও গভীর বন্ধুত্ব না করে। সাধারণ অমুসলিম এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের রীতিও তাই। তারা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শুধু স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে; মুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে না।

এরপর যদি কোন মুসলমান এ নির্দেশ অমান্য করে কোন ইহুদী অথবা খ্রীষ্টানের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে সে ইসলামের দৃষ্টিতে সে সম্প্রদায়েরই লোক বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

তফসীরবিদ ইবনে জরীর ইকরিমা (রাঃ)—এর বাচনিক বর্ণনা করেন : এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায়া আগমনের পর পার্শ্ববর্তী ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধ করবে না, বরং মুসলমানদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। এমনভাবে মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং কোন বহিরাগ্রমণকারীর সাহায্য করবে না, বরং আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। কিছুদিন পর্যন্ত এ চুক্তি উভয় পক্ষেই বলবৎ থাকে, কিন্তু ইহুদীরা স্বভাবগত কটিলতা ও ইসলাম

বিদ্রোহের কারণে বেশীদিন এ চুক্তি মেনে চলতে পারল না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরেকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে স্বীয় দুর্গে আহবান জানিয়ে পত্র লিখল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। বনী-কুরায়যার এসব ইহুদী একদিকে মুশরেকদের সাথে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং অপরদিকে মুসলমানদের দলে অনুপ্রবেশ করে অনেক মুসলমানের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিল। এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরেকদের জন্যে গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। এ কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদেরকে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করে দেয়া হয়, যাতে শত্রু মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারে। তখন ওবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ ও অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন। অপর পক্ষে কিছুসংখ্যক লোক, যারা কপট বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিংবা যারা তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তারা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার মধ্যে সমূহ বিপদাশঙ্কা অনুভব করত। তারা চিন্তা করত, যদি মুশরেক ও ইহুদীদের চক্রান্ত সফল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়, তবে আমাদের প্রাণ রক্ষার একটা উপায় থাকা দরকার। কাজেই এদের সাথেও সম্পর্ক রাখা উচিত, যাতে তখন আমরা বিপদে না পড়ি। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল একারণেই বলল : এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা আমার মতে বিপজ্জনক। তাই আমি তা করতে পারি না। এর পরিত্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ হল :

قَوَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسُوءُونَ لِمَنْ دُونَهُمْ
تَخَشَى أَنْ يُبَيِّنَنَّ آيَاتَهُ

অর্থাৎ, অসহযোগের নির্দেশ শুনে যাদের অন্তরে কপটতাজনিত রোগ ছিল, তারা কাফের বন্ধুদের পানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল এবং বলতে লাগল : এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মধ্যে আমাদের জন্য বিপদাশঙ্কা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা এর উত্তরে বলেন :

قَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنَّ الْقَوْمَ مِنْ دُونِهِمْ فَيَضْرِبُوا
كَأْسَرَاءٍ أَنْفُسَهُمْ يَوْمَئِذٍ

অর্থাৎ, এরা তো এ কল্পনাবিলাসে মগ্ন যে, মুশরেক ও ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্ত এই যে, এক্রপ হবে না, বরং মক্কা বিজয় অতি সন্নিকটে অথবা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আল্লাহ তাআলা মুনাফেকদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদেরকে লালিত করবেন। তখন তারা মনের লুকায়িত চিন্তাধারার জন্যে অনুতপ্ত হবে।

তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে, যখন মুনাফেকদের মুখোশ উন্মোচিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বের দাবী ও শপথের স্বরূপ ফুটে উঠবে, তখন মুসলমানরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলবে : এরাই কি আমাদের সাথে আল্লাহ্র নামে কঠোর শপথ করে বন্ধুত্বের দাবী করত ? আজ এদের সব লোক দেখানো ধর্মীয় কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা মক্কা বিজয় ও মুনাফেকদের লালনার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার বাস্তব চিত্র কিছুদিন পর

সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিমদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। নতুবা সত্যধর্ম ইসলামের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন। কোন ব্যক্তি কিংবা দলের বক্রতা ও অবাধ্যতা দুইয়ের কথা, বন্ধ মুসলমানদের কোন ব্যক্তি কিংবা দল যদি সত্যি সত্যি ইসলাম ত্যাগ করে বসে এবং সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগী হয়ে অমুসলিমদের সাথে হাত মিলায়, তবে এতেও ইসলামের কোনই ক্ষতি হবে না— হতে পারে না। কারণ, এর হেফাযতের দায়িত্ব সর্বশক্তিমানের। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য কোন জাতিকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন, যারা ইসলামের হেফাযত ও প্রচারের কর্তব্য সম্পাদন করবে। আল্লাহ তাআলার কাজ কোন ব্যক্তি, বিরাট দল অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি যখন চান ষড়-কূটকেও কড়িকাঠের কাজে লাগাতে পারেন। অন্যথায় কড়িকাঠও পচে-গলে মাটি হত থাকে।

এ আয়াতে যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা কোন জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবেন, সেখানে সেই পুণ্যাত্মা জাতির কিছু গুণাবলীও বর্ণনা করেছেন। যারা ধর্মের কাজ করে, এ গুণগুলোর প্রতি তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, এসব গুণের অধিকারীরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে প্রিয় ও মকবুল।

তাদের প্রথম গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ভালবাসবেন এবং তারা নিজেরাও আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসবে। এ গুণটি দুই অংশে বিভক্ত : (এক) আল্লাহ্র সাথে তাদের ভালবাসা। একে কোন না কোন স্তরে মানুষের ইচ্ছাধীন মনে করা যায়। কারণ সাথে সাথে স্বভাবজাত ভালবাসা না হলেও কমপক্ষে যৌক্তিক ভালবাসাকে স্বীয় ইচ্ছাধীন রাখতে পারে। এছাড়া স্বভাবজাত ভালবাসা যদিও ইচ্ছাধীন নয়, কিন্তু এর উপায়-উপকরণগুলো ইচ্ছাধীন। উদাহরণতঃ আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য, প্রতাপ, শক্তি-সামর্থ্য এবং মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অগণিত নেয়ামতরাজির ধ্যান ও কল্পনা অবশ্যস্বাভাবিকভাবে মানুষের মনে আল্লাহ্র প্রতি স্বভাবজাত ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়।

কিন্তু দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, তাদের সাথে আল্লাহ তাআলার ভালবাসার ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোন ভূমিকা নেই। যে বিয়টি মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের বাইরে, তা মানুষকে শুনানোরও কোন বাহ্যিক সার্থকতা নেই।

কিন্তু কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াতের পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, এ ভালবাসার উপায়-উপকরণগুলো মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ যদি এসব উপায়কে কাজে লাগায়, তবে তাদের সাথে আল্লাহ তাআলার ভালবাসা অবশ্যস্বাভাবী। এসব উপায় নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

অর্থাৎ, হে রসূল, আপনি বলে দিন : যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ভালবাসতে থাকবেন।

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ভালবাসা লাভ করতে চায়, তার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এক প্রতিটি পদক্ষেপে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুনীত অনুসরণে অবিচল থাকা।

এমন করলে আল্লাহ তাআলা তাকে ভালবাসবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, যে দল সুন্নতের অনুসরণ করে, পীরীয়েতের নির্দেশ পালনে ক্রটি করে না এবং নিজেরা সুন্নত বিরোধী কল-কর্ম ও বেদআত প্রচার করে না, একমাত্র তারাই কুফর ও বেত্যাগের মুকাবিলা করতে সক্ষম।

‘তারা মুসলমানদের সামনে নম্র হবে এবং কোন ব্যাপারে মতবিরোধ হলে সত্যপন্থী হওয়া সত্ত্বেও সহজে বশ হয়ে তারা ঝগড়া ত্যাগ করবে। এ লক্ষ্যই রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

انا زعيم بيت في رضى الجنة لمن ترك المراء وهو معني
অর্থঃ আমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যস্থলে বাসস্থান দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করছি, যে সত্যপন্থী হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করে।

যেটুকু, তারা মুসলমানদের সাথে স্বীয় অধিকার ও কল-কারবারের ব্যাপারে কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদ রাখবে না। বাক্যের দ্বিতীয় অংশে اعزة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি عزيز এর বহুবচন। এর অর্থ প্রবল, শক্তিশালী ও কঠোর। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর ধর্মের শত্রুর মোকাবিলায় কঠোর ও পরাক্রান্ত। শত্রু তাদেরকে সহজে কব্জ করতে পারে না।

উভয় বাক্য একত্রিত করলে সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, তারা হবে এমন একটি জাতি, যাদের ভালবাসা ও শত্রুতা নিজ সত্ত্বা ও সত্ত্বাগত অধিকারের পরিবর্তে শুধু আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ধর্মের খাতিরে নিবেদিত প্রাণ হবে। এ কারণেই তাদের বন্দুকের নল আল্লাহ ও রসূলের অনুগতদের দিকে নয়; বরং তাঁর শত্রু ও অব্যাহদের দিকে নিবদ্ধ থাকবে। সূরা ফাতহে উল্লিখিত **لَا يَأْمُرُكَ أَنْ تَتَّبِعَ أَهْلَ عِلْمٍ وَلَا تَتَّبِعَهُمْ** আয়াতের বিষয়বস্তুও তাই।

প্রথম শৃঙ্গের সারমর্ম ছিল অধিকারসমূহে পূর্ণতা এবং দ্বিতীয় শৃঙ্গের সারমর্ম ছিল বান্দার অধিকার ও কল-কারবারের সমতা। তাদের তৃতীয় শৃঙ্গ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : **يُحْكِمُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** - অর্থঃ তারা সত্যধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জেহাদে প্রবৃত্ত হবে। এর সারমর্ম এই যে, কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করার জন্যে শুধু কতিপয় প্রচলিত এবাদত এবং নম্র ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেও থাকতে হবে। এ উদ্দেশ্যনাকে পূর্ণতা দানের জন্যে চতুর্থ শৃঙ্গ **وَلَا يَأْمُرُكَ أَنْ تَتَّبِعَ أَهْلَ عِلْمٍ وَلَا تَتَّبِعَهُمْ** বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থঃ, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তারা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনারই পরওয়া করবে না।

চিন্তা করলে বুঝা যাবে, যে কোন আন্দোলন পরিচালনার পথে দু’টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। প্রথমতঃ বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং দ্বিতীয়তঃ আপন লোকদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা আন্দোলন পরিচালনায় দৃঢ়সংকল্প হয়ে অগ্রসর হয়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না-জেল-জুলুম, জখম, হত্যা ইত্যাদি সবকিছুই অমানবদনে সহ্য করে নেয়। কিন্তু আপন লোকদের ভর্ৎসনা-বিদ্রোহ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় কর্মীদেরও পদস্খলন ঘটে। সম্ভবতঃ একারণেই আল্লাহ তাআলা এখানে এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তারা কারও ভর্ৎসনার পরওয়ানা করে স্বীয় জেহাদ অব্যাহত রাখবে।

আয়াতের শেষাংশে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এসব গুণ ও উত্তম

অভ্যাসসমূহ আল্লাহ তাআলারই দান। তিনিই যাকে ইচ্ছা এসব গুণ দুরাভূষিত করেন। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া মানুষ শুধু চেষ্টাচরিত্রের মাধ্যমে এগুলো অর্জন করতে পারে না।

আয়াতের শব্দসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু লোক ধর্মত্যাগী হয়ে গেলেও ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না, বরং ইসলামের হেফাযত ও সমর্থনের জন্যে আল্লাহ তাআলা একটি উচ্চস্তরের চরিত্র ও আমলের অধিকারী দলকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন।

তফসীরবিদগণ বলেছেন : এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে অনাগত গোলযোগকে প্রতিহতকারী দলের জন্যে একটি সুসংবাদ। অনাগত গোলযোগ হচ্ছে ধর্মত্যাগের সে হিড়িক, যার কিছু কিছু জীবানু নবুওয়তের সর্বশেষ দিনগুলোতে পাখা বিস্তার করতে শুরু করেছিল এবং অতঃপর রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ওফাতের পর তা ঘূর্ণির আকারে সমগ্র আরব উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে সুসংবাদ লাভের অধিকারী হচ্ছে ছাহাবায়ে কেরামের সে দল, যারা প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ) - এর ডাকে বজ্রকঠোর দৃঢ়তার সাথে ধর্মত্যাগের এ হিড়িককে স্তব্ধ করে দেন।

ঘটনাগুলো ছিল এই : সর্বপ্রথম মুসায়লামা কাযযাব মহানবী (সাঃ) - এর সাথে নবুওয়তে অংশদারিত্বের দাবী করে। তার ধৃষ্টতা এত চরমে পৌঁছে যে, সে মহানবী (সাঃ) - এর দূতকে অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। সে দূতদেরকে হুমকি দিয়ে বলে : যদি দূতদেরকে হত্যা করা আশঙ্কাজনক আইনের পরিপন্থী না হত, তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। মুসায়লামা স্বীয় দাবীতে মিথ্যাবাদী ছিল। হযুর (সাঃ) তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার পূর্বেই ইস্তিকাল করেন।

এমনিভাবে এয়ামনে মুযাজ্জ গোত্রের সর্দার আসওয়াদ আ’নাসী নবুওয়তের দাবী করে বসে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাকে দমন করার জন্যে এয়ামনে নিযুক্ত গভর্নরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু যে রাতে তাকে হত্যা করা হয়, তার আগের দিন রসুলুল্লাহ (সাঃ) ওফাত পান। রবিউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে ছাহাবায়ে কেরামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে। বনী-আসাদ গোত্রেও এমনি ধরনের আরেক ঘটনা ঘটে। তাদের সর্দার তোলায়হা ইবনে খুওয়াইলেদ নবুওয়ত দাবী করে বসে।

উপরোক্ত তিনটি গোত্র হযুরে আকরম (সাঃ) - এর রোগ শয্যা থাকা অবস্থায়ই ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সর্বত্র ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। আরবের সাতটি গোত্র বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে। তারা প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দীককে ইসলামী আইন অনুযায়ী যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে।

হযুর (সাঃ)-এর ওফাতের পর দেশ ও জাতির দায়িত্ব প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ) এর কাঁধে অর্পিত হয়। একদিকে তাঁরা ছিলেন রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বিয়োগ ব্যথায় মুহাম্মদ; অপরদিকে ছিল গোলযোগ ও বিদ্রোহের হিড়িক। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন : রসুলুল্লাহর ওফাতের পর আমার পিতা হযরত আবুবকরের উপর যে বিপদের বোঝা পতিত হয়, তা কোন পাহাড়ের উপর পতিত হলে পাহাড়ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন দুর্জয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দান করেন যে, তিনি অমিত বিক্রমে সমস্ত আপদ-বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যান এবং সর্বশেষে সফলকাম হন।

এটা জানা কথা যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও বিদ্রোহের মোকাবিলা করা যায়, কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি এতই নাজুক ছিল যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) ছাড়াবায়-কেরামের কাছে পরামর্শ চাইলে কেউ সে পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মত দিলেন না। ছাড়াবায়-কেরাম অন্তর্দৃষ্টি লিপ্ত হয়ে পড়লে বহিঃশক্তি এ নবীন ইসলামী দেশটির উপর চড়াও হয়ে পড়তে পারে এমন আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বীয় সিদ্ধিকের অন্তরকে এ জেহাদের জন্যে পাখরের মত মজবুত করে দিলেন। তিনি ছাড়াবায়-কেরামের সামনে এমন এক মর্মভেদী ভাষণ দিলেন, যার ফলে এ জেহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কারও মনে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট রইল না। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় স্বীয় দৃঢ়তা ও অসম সাহসিকতা সবার সামনে তুলে ধরেন :

“যারা মুসলমান হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামী আইনকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সব জিন-মানব ও বিশুর যাবতীয় বৃক্ষ-প্রস্তর একত্রিত করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ না থাকে, তবুও আমি একা এ জেহাদ চালিয়ে যাব।”

একথা বলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন ছাড়াবায়-কেরাম সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে এক জায়গায় বসিয়ে অশ্লক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণের জন্য মানচিত্র তৈরী করে ফেললেন।

একারণেই হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ), যাহ্যাক (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি হযরত আবুবকর সিদ্ধিক (রাঃ) ও তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে যে জাতিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে আনার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাঁরাই হলেন সর্বপ্রথম সে জাতি।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্য কোন দল আয়াতে কথিত জাতি হবে না; বরং অন্যদের বেলায়ও এ আয়াতটি প্রযোজ্য হতে পারে। যারা হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) ও অন্যান্য ছাড়াবায়-কেরামকে আয়াতের প্রতীক বলে আখ্যা দিয়েছেন, তাঁরাও এর বিরোধী নন। বরং নির্ভুল বক্তব্য এই যে, তাঁরা সবাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী যেসব মুসলমান কোরআনী নির্দেশ অনুযায়ী কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করবে, তাঁরাও এ আয়াতের লক্ষণভুক্ত। মোটকথা, ছাড়াবায়-কেরামের একটি দল খলিফার নির্দেশে এ গোলযোগ দমনে তৈরী হয়ে গেলেন। হযরত খালেদ ইবনে ওলাদ (রাঃ) - কে একটি বিরাট বাহিনীসহ মুসায়লামাকে দমন করার উদ্দেশ্যে এয়ামামার দিকে প্রেরণ করা হল। সেখানে মুসায়লামার দল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছিল। তুমুল যুদ্ধের পর মুসায়লামা হযরত ওয়াহশী (রাঃ) - এর হাতে নিহত হল এবং তার দল তওবা করে পুনরায় মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এমনভাবে তোলায়হা ইবনে খুওয়াইলদের মুকাবিলায়ও হযরত খালেদই (রাঃ) গমন করলেন। তোলায়হা পলায়ন করে দেশের বাইরে চলে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন এবং সে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে।

সিদ্ধিকী খেলাফতের প্রথম মাসে রবিউল আউয়ালের শেষ দিকে আসওয়াদ আনাছীর হত্যা ও তার গোত্রের বশ্যতা স্বীকারের সংবাদ মদীনায় পৌঁছে। এটিই ছিল সর্বপ্রথম বিজয়বার্তা, যা চরম সঙ্কট মুহূর্তে খলিফা লাভ করেছিলেন। এমনভাবে অন্যান্য যাকাত অস্বীকারকারীদের মুকাবিলায় আল্লাহ তাআলা প্রতিটি রণাঙ্গনে ছাড়াবায়-কেরামকে প্রকাশ্য

বিজয় দান করেন।

এভাবে তৃতীয় আয়াতের শেষভাগে উল্লিখিত **الَّذِينَ** (নিচয় আল্লাহতওক্ষদের দলই বিজয়ী)। আল্লাহ তাআলার এ উক্তির বাস্তব ব্যাখ্যা পৃথিবীবাসী স্বচক্ষে দেখতে পায়। ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে যখন একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, যখনই (সাঃ) - এর ওফাতের পর আরবে ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় এবং এর মুকাবিলার জন্যে আল্লাহ তাআলা যে জাতিকে কর্মক্ষেত্রে আনয়ন করেন, তাঁরা হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) ও তাঁর সহকর্মী সাহাবায়ে কেরাম, তখন এ আয়াত থেকেই একথাও প্রমাণিত হয় যে, এ দলের যেসব জন কোরআন পাক বর্ণনা করেছে, তা সবই হযরত আবুবকর (রাঃ) ও তাঁর সহকর্মী ছাড়াবায়-কেরামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ, -

প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ভালবাসেন।

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসেন।

তৃতীয়তঃ তাঁরা সবাই মুসলমানদের ব্যাপারে নম্র এবং কাকেরদের বেলায় কঠোর।

চতুর্থতঃ তাঁদের জেহাদ নিক্তি রূপেই আল্লাহর পথে ছিল এবং এতে তাঁরা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করেননি।

আয়াতের শেষভাগে এ পরম সত্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এসব গুণ, এগুলোর যথাসময়ে প্রয়োগ, এগুলোর মাধ্যমে ইসলামী জেহাদে সাফল্য অর্জন প্রভৃতি বিষয় শুধুমাত্র চেষ্টা-তদবীর, শক্তি অথবা দলের জোরে অর্জিত হয় না, বরং এ সবই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তিনিই যাকে ইচ্ছা এ অনুগ্রহ দান করেন।

উপরোক্ত চার আয়াতে মুসলমানদেরকে কাকেরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। পক্ষম আয়াতে ধনাত্মকভাবে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্ব ও বিশেষ বন্ধুত্ব যাদের সাথে স্থাপিত হতে পারে, তারা কারা? এ প্রশ্নে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা ও অতঃপর তাঁর রসুলের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বন্ধু ও সাথী সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাই আছেন এবং তিনিই হতে পারেন। তাঁর সম্পর্ক ছাড়া যত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আছে, সবই ধ্বংসশীল। রসুলুল্লাহ (সাঃ) - এর সম্পর্কও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলারই সম্পর্ক; পৃথক নয়। তৃতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সাথী ও আন্তরিক বন্ধু এসব মুসলমানকে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা শুধু নামে নয়- সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

الَّذِينَ يُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكَّعُونَ - প্রথমতঃ

তাঁরা পূর্ণ আদব ও শর্তাদিসহ নিয়মিত নামায পড়ে। দ্বিতীয়তঃ স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করে। তৃতীয়তঃ তারা বিনম্র ও বিনয়ী; স্বীয় সংকল্পের জন্যে গর্বিত নয়।

তৃতীয় বাক্য **رُكَّعُونَ** এ **رُكْع** শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এখানে রুক্কর অর্থ পারিভাষিক রুক্ক, যা নামাযের একটি রোকন। **الَّذِينَ يُؤْتُونَ الصَّلَاةَ** - এর পর **وَهُمْ رُكَّعُونَ** বাক্যটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য মুসলমানদের নামাযকে অপরাপর সম্প্রদায়ের নামায থেকে ভিন্নরূপে প্রকাশ করা। কারণ, ইহুদী

১৩ টানরাও নামায পড়ে, কিন্তু তাদের নামাযে রুকু নেই। রুকু একমাত্র ইসলামী নামাযেরই স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য। - (মায়হারী)

কিন্তু অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন : এখানে রুকু শব্দ দ্বারা আভিধানিক ক্বাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, নত হওয়া, বিনয়, নম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা। বাহরেমুহীত গ্রন্থে আবু হাইয়ান এবং কাশাফ গ্রন্থে মকশরী এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তফসীরে মায়হারী এবং রাসুল-কোরআনেও এ অর্থই নেওয়া হয়েছে। অতএব, বাক্যটির অর্থ হবে এই যে, তারা স্বীয় সংকল্পের জন্যে গর্ব করে না, বরং বিনয় ও নম্রতা তাদের স্বভাব।

কোন কোন রেওয়াজেতে বলা হয়েছে, এবাক্যটি হযরত আলী (রাঃ)-এর বিশেষ একটি ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন হযরত আলী (রাঃ) নামায পড়ছিলেন। যখন তিনি রুকুতে গেলেন, তখন জনৈক ভিক্ষুক কিছু ভিক্ষা চাইল। তিনি রুকু অবস্থায়ই অঙ্গুলি থেকে আংটি বের করে ভিক্ষুকের দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। নামায শেষে ভিক্ষুকের প্রয়োজন মিটাবেন, এতটুকু দেবী করাও তিনি পছন্দ করেননি। তিনি সংকাজে যে দ্রুততা প্রদর্শন করলেন, তা আল্লাহ তাআলার খুব পছন্দ হয় এবং আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে তার মূল্য দেওয়া হয়।

এ রেওয়াজেতের সনদ আলেম ও হাদীছবিদদের মতে সর্বসম্মত নয়। তবে রেওয়াজেতেটি বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে এর সারমর্ম হবে এই যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্বের যোগ্য তারা ই হবে, যারা নামায ও যাকাতের গাফিলি করে। বস্তুতঃ তাদের মধ্যে বিশেষভাবে হযরত আলী (রাঃ) এ বন্ধুত্বের অধিক যোগ্য।

হযরত আলী (রাঃ)-কে এ বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) - এর অন্তর্দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ গোলযোগের ঘটনাবলী ফুটে উঠেছিল যে, কিছু লোক হযরত আলী (রাঃ) - এর শক্রতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করবে। খারিজী সম্প্রদায়ের গোলযোগের দরুন পরবর্তী কালে তাই প্রকাশ পেয়েছে।

মোটকথা, আয়াতটি এ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক; ছাড়াবায়ে কেলাম ও সব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত। বক্তব্যের দিক দিয়ে কোন এক ব্যক্তির সাথে আয়াতের বিশেষত্ব নেই। এ কারণেই হযরত ইমাম বাকের (রাঃ)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করল : **الَّذِينَ آمَنُوا** আয়াতে কি হযরত আলী (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন : মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে তিনি আয়াতের লক্ষণভুক্ত।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে যারা কোরআনের নির্দেশ পালন করে বিজাতির সাথে গভীর বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকে এবং শুধু আল্লাহ, রসুল ও মুসলমানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে বিজয় ও বিশুদ্ধ জয়ী হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে :

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

এতে বলা হয়েছে যে, যেসব মুসলমান আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালন করে, তারা আল্লাহর দল। এরপর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে আল্লাহর দলই সবার উপর জয়ী হবে।

পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে সবাই প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে যে, ছাড়াবায়ে -কেলাম (রাঃ) সবার উপর জয়ী হয়েছেন। যে শক্তিই এ পাহাড়ে মাথা ঠুকেছে, সে-ই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম খলিফার বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সবার বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। হযরত ফারাকে আযম (রাঃ) - এর মোকাবিলায় বিশ্বের বৃহৎ শক্তিদ্বয় কায়সার ও কেসরা অবতীর্ণ হলে আল্লাহ তাআলা তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দেন। তাঁদের পর খলিফা ও মুসলমানদের মধ্যে যতদিন আল্লাহর এসব নির্দেশ পালন অব্যাহত রয়েছে এবং মুসলমানরা বিজাতির সাথে মোলায়েমতা ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বিরত রয়েছে, ততদিন তাদেরকে বিজয়ী বেশেই দেখা গেছে।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

৫৭ আয়াতে তাকীদের জন্যে রুকু'র শুরুভাগে বর্ণিত নির্দেশ পূনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ, হে বিশ্বাসী, তোমরা তাদেরকে সাক্ষী অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে। এরা দুই দলে বিভক্ত : (এক) আহলে-কিতাব সম্প্রদায়, (দুই) সাধারণ কাকের ও মুশরিক সম্প্রদায়।

আবু হাইয়ান বাহরে-মুহীত গ্রন্থে বলেন : কফার শব্দে আহলে-কিতাব সম্প্রদায়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবুও এখানে স্বতন্ত্রভাবে আহলে-কিতাবদের উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, আহলে-কিতাবরা অন্যান্য কাকেরদের তুলনায় যদিও বাহ্যতঃ ইসলামের নিকটবর্তী, কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, তাদের কমসংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর আমল ও তৎপরবর্তী আমলে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের সংখ্যা পর্যালোচনা করলে সাধারণ কাকেরদের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। আহলে-কিতাবদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছে, তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

এর কারণ এই যে, আহলে-কিতাবদের গর্ব ছিল যে, তারা খোদার ধর্ম ও ঐশীগ্রন্থের অনুসারী। এ গর্ব ও অহঙ্কারই তাদেরকে সত্যধর্ম গ্রহণ বিরত রেখেছে। মুসলমানদের সাথে তারাই বেশীর ভাগ ঠাট্টা-বিক্রণ করেছে। এ দুটামির একটি ঘটনা সপ্তম আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

وإذا نادىكم إلى الصلوة اتخذوها هزوا ولعبا

মুসলমানরা যখন নামাযের আযান দেয়, তখন তারা হাসি-তামাশা করে। তফসীরে-মায়হরীতে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে : মদীনায় জনৈক খ্রীষ্টান বসবাস করত। সে আযানে যখন মিন্থাবাদীকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করত।

পরিণামে তার এ বাক্যটিই তার গোটা পরিবার পুড়ে ভস্মীভূত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। এক রাতে সে যখন ঘুমিয়েছিল, তার চাকর প্রয়োজন বশতঃ আশুন নিতে ঘরে প্রবেশ করল। আশুনের স্কুলিক উড়ে সবার অজ্ঞাতে কোন একটি কাপড়ে গিয়ে পড়ল। এরপর সবাই যখন নিদ্রায় বিভোর, তখন আশুন দাঁড় দাঁড় করে জ্বলে উঠল এবং সবাই পুড়ে কাবাব হয়ে গেল।

এ আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে :

ذلك يأثمهم وتمر لا يعقلون

অর্থাৎ, সত্যধর্মের সাথে ঠাট্টা-মস্কারা করার কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা নির্বোধ।

তফসীরে-মায়হরীতে কাযী হানউল্লাহ (রঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নির্বোধ বলেছেন, অথচ সাংসারিক ব্যাপারে তাদের বুদ্ধিমত্তার জুড়ি নেই। এতে বোঝা যায় যে, একজন লোক এক ধরনের কাজে চতুর ও বুদ্ধিমান এবং অন্য ধরনের কাজে নির্বোধ ও বোকা হতে পারে। এ বোকা হওয়ার কারণ দ্বিবিধ - হয় সে বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, না হয় তার বুদ্ধি এ ব্যাপারে অচল। কোরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি অন্য এক আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছে :

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ

(৫৭) হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাকেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। (৫৮) আর যখন তোমরা নামাযের জন্যে আহ্বান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ। (৫৯) বলুন : হে আহলে-কিতাবগণ, আমাদের সাথে তোমাদের এছাড়া কি শক্ততা যে, আমরা বিশ্রাস স্থাপন করেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি। আর তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান। (৬০) বলুন : আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহর কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকটতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে। (৬১) যখন তারা তোমাদের কাছে আসে, তখন বলে দাও : আমরা বিশ্রাস স্থাপন করেছি। অথচ তারা কুফর নিয়ে এসেছিল এবং কুফর নিয়েই প্রস্থান করেছে। তারা যা গোপন করত, আল্লাহ তা খুব জানেন। (৬২) আর আপনি তাদের অনেককে দেখবেন যে, দৌড়ে দৌড়ে পাপে, সীমালঙ্ঘনে এবং হারাম ভক্ষণে পতিত হয়। তারা অত্যন্ত মন্দ কাজ করছে। (৬৩) দরবেশ ও আলমেরা কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? তারা খুবই মন্দ কাজ করছে।

অর্থাৎ, তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক বিষয়গুলো খুব বোঝা, কিন্তু
স্বাভাবিক ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীন।

﴿اِنَّكَ لَمِنَ الْمُنْظَرِيْنَ﴾ - বাক্যে আল্লাহ তাআলা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে
দৃষ্টিমান করে সবার পরিবর্তে অধিকাংশকে ঈমান থেকে বিচ্যুত বলে
বর্ণনা করেছেন। এর কারণ এই যে, তাদের কিছুসংখ্যক লোক এমনও
ছিল, যারা সর্বাবস্থায় ঈমানদার ছিল। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত
এবং এর পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল তওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দেশাবলীর অনুসারী
এবং এতদুভয়ে বিশ্বাসী। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তি ও কোরআন
নাজিলের পর তারা তাঁর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কোরআন
দ্বারা কাজকর্ম সম্পাদন করতে থাকে।

প্রচারকার্যে সম্মুখিত ব্যক্তির রেয়াত করা : ﴿فَلْيَعْلَمِ الَّذِي يُدْعٰى اِلَيْهِ﴾
যদিও উদাহরণের ভঙ্গিতে আল্লাহর অভিযাপ ও ক্রোধপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যে
দণ্ড বর্ণিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে সম্মুখিত ব্যক্তিদেরই অবস্থা ছিল।
কাজেই এ দোষ সরাসরি তাদের উপর আরোপ করে 'তোমরা এরূপ'
কালেও চলত। কিন্তু কোরআন এ বর্ণনাবঙ্গি পরিবর্তন করে বিষয়টিকে
একটি উদাহরণের রূপ দিয়েছে। এতে পয়গম্বরসুলত একটি প্রচারকার্যের
বিশেষ পদ্ধতি ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, বর্ণনাবঙ্গি এরূপ হওয়া চাই,
যদিও সম্মুখিত ব্যক্তির মনে উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়।

ইহুদীদের চারিত্রিক বিপর্যয় : প্রথম আয়াতে অধিকাংশ ইহুদীর
চারিত্রিক বিপর্যয় ও কর্মগত ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে - যাতে
প্রত্যেক উপদেশ গ্রহণ করে এবং এসব কার্যকলাপ ও তার কারণ থেকে
আত্মরক্ষা করে।

যদিও সাধারণভাবে ইহুদীদের অবস্থা তাই ছিল, তথাপি তাদের মধ্যে
কিছু ভাল লোকও ছিল। কোরআন পাক তাদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করার
জন্য ﴿كثيرا﴾ (অনেকে) শব্দটি ব্যবহার করেছে। সীমালঙ্ঘন এবং হারাম
তদ্রূপ (পাপ) শব্দের অর্থেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উভয় প্রকার পাপের
ধ্বংসকারিতা এবং সে কারণে শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার বিষয়কে
ঘটিয়ে তোলার জন্যে বিশেষভাবে এগুলোকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করা
হয়েছে।—(বাহরে-মুহীত)

তফসীরে রুহুল মা'আনী প্রভৃতিতে বলা হয়েছে যে, তাদের সম্পর্কে
'দৌড়ে দৌড়ে পাপে পতিত হওয়ার' শিরোনাম ব্যবহার করে কোরআন
পাক ইঙ্গিত করেছে যে, তারা এসব কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত অপরাধী এবং
এসব কুসংস্কারে হয়ে তাদের শির-উপশিরায় জড়িত হয়ে গেছে।
এখন তারা ইচ্ছা না করলেও সেদিকেই চলে।

এতে বোঝা যায় যে, মানুষ সং কিংবা অসং যে কোন কাজ উপযুক্ত
করতে থাকলে আস্তে আস্তে তা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।
এরপর তা করতে তার কোনরূপ কষ্ট ও দুঃখ হয় না। ইহুদীরা কু-অভ্যাসে
এ সীমায়ই পৌঁছে গিয়েছিল। এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্যে বলা হয়েছেঃ

﴿يَسْرِعُونَ فِي الْاِثْمِ﴾ (তারা দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে পাপে পতিত হয়।)

সংকর্মে পয়গম্বর ও ওলীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁদের সম্পর্কেও
কোরআন বলেছে : ﴿يُسْرِعُونَ فِي الْاِثْمِ﴾ অর্থাৎ, তারা দৌড়ে দৌড়ে

পুণ্য কাজে আত্মনিয়োগ করে।

কর্ম সংশোধনের পদ্ধতি : সুফী-বুয়ূর ও ওলী-আল্লাহগণ কর্ম
সংশোধনে সবচাইতে অধিক যত্নবান। তাঁরা কোরআন পাকের এসব বাণী

থেকেই এ মূলনীতি বেছে নিয়েছেন যে, মানুষ যেসব ভাল কিংবা মন্দ
কাজ করে, আসলে সেগুলোর মূল উৎস হচ্ছে এসব গোপন কর্মক্ষমতা ও
চরিত্র, যা মানুষের মজ্জায় পরিণত হয়। এ কারণেই মন্দ কর্ম ও অপরাধ
দমন করার জন্যে তাঁদের দৃষ্টি এসব সূক্ষ্ম গোপন বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ
থাকে এবং তাঁরা এগুলো সংশোধন করে দেন। ফলে সব কাজ-কর্ম
আপনা থেকেই সংশোধিত হয়ে যায়। উদাহরণতঃ কারও অন্তরে জাগতিক
অর্থলিপ্সা প্রবল হলে সে এর ফলে ঘৃণ গ্রহণ করে, সুদ খায় এবং সুযোগ
পেলে চুরি, ডাকাতি পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়। সুফী বুয়ূররা এসব
অপরাধের পৃথক পৃথক প্রতিকার না করে এমন ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করেন,
যদ্বারা এসব অপরাধের ভিত্তিই উৎপাটিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, তাঁরা
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কল্পনায় একথা বহুমূল করে দেন যে, এ জগৎ ক্ষণস্থায়ী
এবং এর আরাম-আয়েশ বিযাক্ত।

এমনিভাবে মনে করুন, কেউ অহঙ্কারী কিংবা ক্রোধের হাতে
পরভূত। সে অন্যকে ঘৃণা ও অপমান করে এবং বন্ধু-বান্ধব ও
প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে। সুফী বুয়ূররা এমন লোকের
ক্ষেত্রে পরকালের চিন্তা এবং আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ব্যবস্থাপত্র
প্রয়োগ করেন। ফলে উপরোক্ত মন্দ অভ্যাস আপনা থেকেই খতম হয়ে
যায়।

মোটকথা, এ কোরআনী ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে
এমন কিছু কর্মক্ষমতা রয়েছে, যা মজ্জায় পরিণত হয়ে যায়। এগুলো সং
কর্মক্ষমতা হলে সংকাজ আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে এগুলো
মন্দ কর্মক্ষমতা হলে মন্দ কাজের দিকে মানুষ আপনা-আপনি ধাবিত হয়।
কর্ম সংশোধনের নিমিত্ত এসব কর্মক্ষমতার সংশোধন অত্যাৱশ্যক।

আলেমদের কাঁখে সর্বসাধারণের কাজ-কর্মের দায়িত্ব : দ্বিতীয়
আয়াতে ইহুদী পীর-মাশায়েখ ও আলেমদেরকে কঠোরভাবে হুশিয়ার করা
হয়েছে যে, তারা সাধারণ মানুষকে মন্দকাজ থেকে কেন বিরত রাখে না?
কোরআন পাকে এক্ষেত্রে দু'টি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি رايون
- এর অর্থ আল্লাহভক্ত; অর্থাৎ, আমাদের পরিভাষায় যাকে দরবেশ, পীর
কিংবা মাশায়েখ বলা হয়। দ্বিতীয় শব্দ احبار ব্যবহার করা হয়েছে।

ইহুদীদের আলেমদেরকে 'আহবার' বলা হয়। এতে বোঝা যায় যে,
'সংকাজে আদেশ ও অসংকাজে নিষেধ' -এর মূল দায়িত্ব এ দু'শ্রেণীর
কাঁধেই অপতি - (এক) পীর ও মাশায়েখ এবং (দুই) আলেমবর্গ। কোন
কোন তফসীরবিদ বলেন رايون বলে এসব আলেমকে বুঝানো
হয়েছে, যারা সরকারের পক্ষ থেকে আদিত্ত ও ক্ষমতাসীন এবং احبار বলে
সাধারণ আলেমবর্গকে বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় অপরাধ থেকে
বিরত রাখার দায়িত্ব শাসককূল ও আলেমকূল উভয়ের কাঁখে ন্যস্ত হয়ে
যায়। অন্যান্য কতিপয় আয়াতে এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে বর্ণিতও হয়েছে।

আলেম ও পীর-মাশায়েখের প্রতি হুশিয়ারী : আয়াতের শেষভাগে
বলা হয়েছে ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ - অর্থাৎ, 'সংকাজে আদেশ ও
অসং কাজে নিষেধ' করার কর্তব্যটি ত্যাগ করে এসব মাশায়েখ ও আলেম
অত্যন্ত বদভ্যাসে লিপ্ত হয়েছে; জাতিকে ধ্বংসের দিকে যেতে দেখেও
তারা বাধা দিচ্ছে না।

তফসীরবিদ আলেমগণ বলেন, প্রথম আয়াতে সর্বসাধারণের দুষ্কর্ম
বর্ণিত হয়েছিল। এর শেষে ﴿لَيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ বলা হয়েছে এবং

দ্বিতীয় আয়াতে মাশায়েখ ও আলেমদের ব্রাহ্মি প্রকাশ করা হয়েছে। এর শেষে **كَيْسَ مَاكَانُوا يُصْنَعُونَ** বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আরবী

অভিধানের দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত সব কাজকেই **فعل** বলা হয়। **عمل** শব্দটি ঐ কাজকে বোঝাবার জন্যে ব্যবহার করা হয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং **صنع** ও **صنعت** শব্দ ঐ কাজের বেলায় প্রয়োগ করা হয়, যা ইচ্ছার সাথে সাথে বারবার অভ্যাস ও লক্ষ্য হিসেবে ঠিক করে করা হয়। তাই সর্বসাধারণের কুকর্মের পরিণতির ক্ষেত্রে শুধু **عمل** শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে **كَيْسَ مَاكَانُوا يُصْنَعُونَ** আর বিশিষ্ট

মাশায়েখ ও আলেমদের ব্রাহ্মি কাজের জন্য **صنع** শব্দ প্রয়োগে **كَيْسَ مَاكَانُوا يُصْنَعُونَ** বলা হয়েছে। এতে এদিকে ইঙ্গিত হতে

পারে যে, ইহুদীদের মাশায়েখ ও আলেমরা জানত যে, তারা নিষেধ করলে সর্বসাধারণ শুনবে এবং বিরত থাকবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও উপটোকনের লোভে কিংবা মানুষের বদধারণার ভয়ে তাদের মাশায়েখ ও আলেমদের মনে সত্য সমর্থন করার কোন আবেদন জাগ্রত হত না। এ নিষ্পৃহতা সেসব দুষ্কর্মীর দুষ্কর্মের চাইতেও গুরুতর অপরাধ।

এর সারমর্ম এই যে, কোন জাতি অপরাধ ও পাপে লিপ্ত হলে তাদের মাশায়েখ ও আলেমরা যদি অবস্থাদৃষ্টে বুঝতে পারে যে, তারা নিষেধ করলে জাতি অপরাধ থেকে বিরত হবে, তবে এমতাবস্থায় কোন লোভ কিংবা ভয়ের কারণে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত না রাখলে মাশায়েখ ও আলেমদের অপরাধ প্রকৃত অপরাধীদের অপরাধের চাইতেও গুরুতর হবে। তাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : মাশায়েখ ও আলেমদের জন্যে সমগ্র কোরআনে এ আয়াতের চাইতে কঠোর হুশিয়ারী আর কোথাও নাই। তফসীরবিদ যাহ্যাক বলেন : আমার মতে মাশায়েখ ও আলেমদের জন্যে এ আয়াত সর্বাধিক ভয়াবহ। - (ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর)

কারণ এই যে, এ আয়াতদৃষ্টে তাদের অপরাধ সব চোর, ডাকাত ও দুষ্কর্মীদের অপরাধের চাইতেও কঠোর হয়ে যায় - (নাউয়ুবিলাহ)। কিন্তু সুরা রাখা দরকার যে, অপরাধের এ তীব্রতা তখনই হবে, যখন মাশায়েখ ও আলেমরা অবস্থাদৃষ্টে অনুমানও করতে পারবেন যে, তাদের নিষেধাজ্ঞা শোনা ও মান্য করা হবে। পক্ষান্তরে যদি অবস্থাদৃষ্টে কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁদের নিষেধাজ্ঞা শুনবে না; বরং উল্টো তাদেরকে নির্যাতন করা হবে, তবে তাঁরা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তরীকা তখনও এই যে, কেউ মানুষ বা না মানুষ, তারা স্বীয় কর্তব্য পালন করে যাবেন এবং এ ব্যাপারে কারও নির্যাতন বা তিরস্কারের প্রতি ক্রক্ষেপ করবেন না। যেমন, কয়েক আয়াত পূর্বে আল্লাহ তাআলার প্রিয় মুজাহিদদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** অর্থাৎ, তারা আল্লাহর পথে এবং সত্য প্রকাশে

কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরওয়া করে না।

মোটকথা, যে ক্ষেত্রে কথা শোনা ও মান্য করার সম্ভাবনা বেশী, সেখানে মাশায়েখ ও আলেম বরং প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সাধ্যানুযায়ী পাপ কাজে বাধা দান করবে; হাতে হোক কিংবা মুখে অথবা

কমপক্ষে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে নিবে। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, নিষেধাজ্ঞা শোনা হবে না অথবা নিষেধাজ্ঞা বিরুদ্ধে শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, সেখানে নিষেধ করা ও বাধা দান করা ফরয নয়, তবে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ অবশ্যই। 'সংকাজে আদেশ ও অসংকাজে নিষেধ' সম্পর্কিত এ বিবরণ হাদীস থেকে সংগৃহীত হয়েছে। নিজে সংকর্ম করা ও অসংকর্ম থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে অপরকেও সংকর্মের প্রতি পথ প্রদর্শন করা এবং অসংকর্ম থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব সাধারণ মুসলমান এবং বিশেষ করে মাশায়েখ ও আলেমদের উপর ন্যস্ত করে ইসলাম জগতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার বর্ধকর লেখার যোগ্য একটি মূলনীতি স্থাপন করেছে। এটি যথাযথ বাস্তবায়িত হলে সমগ্র জাতি অনায়াসেই যাবতীয় দুর্নীতি থেকে পবিত্র হতে পারে।

উম্মতের সংশোধনের পন্থা : ইসলামের প্রথম ও পরবর্তী সমস্ত শতাব্দীগুলোতে যতদিন এ মূলনীতি বাস্তবায়িত হয়েছে, ততদিন মুসলিম জাতি জ্ঞান-গরিমা, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে সারা বিশ্বে সমুন্নত ও স্বতন্ত্র রয়েছে। পক্ষান্তরে যেদিন থেকে মুসলমানরা এ কর্তব্য পালনে বিমূখ হয়ে পড়েছে এবং অপরায় দমনকে শুধু সরকার ও পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব মনে করে নিজেরা হাত গুটিয়ে বসেছে, সেদিন থেকেই মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। আজ পিতা-মাতা ও গোটা পরিবার ধার্মিক ও শরীয়তের অনুসারী; কিন্তু সম্ভান-সমৃদ্ধি ও আত্মীয়-স্বজনের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মতিগতি, চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা ভিন্ন থাকে প্রবাহিত। একারণেই জাতির সামগ্রিক সংশোধনের নিমিত্ত কোরআন ও হাদীসে 'সংকাজে আদেশ ও অসংকাজে নিষেধ'-এর প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। কোরআন এ কর্তব্যটিকে উম্মতে-মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য আখ্যা দিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধাচারণ করাকে কঠোর পাপ ও শাস্তির কারণ বলে সাব্যস্ত করেছে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কোন জাতির মধ্যে যখন পাপ কাজ করা হয় অথচ কোন লোক তা নিষেধ করে না, তখন তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব প্রেরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়। - (বাহরে মুহীত)

পাপ কাজে ঘৃণা প্রকাশ না করার কারণে সতর্কবাণী : মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা এক জাহায়ায় ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক বস্তি ধ্বংস করে দাও। ফেরেশতারা আরম্ভ করলেন : এ বস্তিতে আপনার অমুক এলাদতকারী বান্দাও রয়েছে। নির্দেশ এল : তাকেও আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাও - আমার অব্যাহতা ও পাপাচার দেখেও তার চেহারা কখনও ক্রোধে বিবর্ত হয়নি।

হযরত ইউশা ইবনে নুন (আঃ) -এর প্রতি ওহী আসে যে, আপনার জাতির এক লক্ষ লোককে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে। এদের মধ্যে চল্লিশ হাজার সং লোক এবং যাঁটা হাজার অসং লোক। ইউশা (আঃ) নিবেদন করলেন, হে রাক্বুল আলামীন, অসং লোকদেরকে ধ্বংস করার কারণ তো জানাই, কিন্তু সং লোকদেরকে কেন ধ্বংস করা হচ্ছে? উত্তর এল : এ সংলোকগুলোও অসংলোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখত। তাদের সাথে পানাহার ও হাসি-তামাশায় যোগদান করত। আমার অব্যাহতা ও পাপাচার দেখে কখনও তাদের চেহারা বিতৃষ্ণার চিহ্নও ফুটে উঠেনি। - (বাহরে মুহীত)

ইহুদীদের একটি ধষ্টতার জওয়াব : وَقَالَتِ الْيَهُودُ : آيَا آتَاكُمْ هَذَا أَوْ أَنزَلَهُ إِلَهُكُمْ : আয়াতে ইহুদীদের একটি গুরুতর অপরাধ ও জঘন্য উক্তি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, হতভাগারা বলতে শুরু করেছে যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলা দরিদ্র হয়ে গেছেন।

ঘটনাটি ছিল এই যে, আল্লাহ তাআলা মদীনার ইহুদীদেরকে বিত্তশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছিলেন, কিন্তু যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমন করেন এবং তাদের কাছে ইসলামের আহবান পৌঁছে, তখন পাষণ্ডরা সামাজিক মোড়লি ও কুপথার মাধ্যমে প্রাপ্ত নযর-নিয়াযের খাতিরে এ আহবান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ তাআলা শাস্তি হিসেবে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হ্রাস করে দেন। ফলে তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে। তখন মুখদের মুখ থেকে এ জাতীয় কথাবার্তা বের হয়ে থাকে যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর ধনভাণ্ডার ফুরিয়ে গেছে অথবা আল্লাহ তাআলা কৃপণ হয়ে গেছেন। এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাত তো তাদেরই বাঁধা হবে এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত হবে, যার ফলে পরকালে আযাব এবং ইহকালে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তাআলার হাত সব সময়ই উন্মুক্ত রয়েছে। তাঁর দান চিরকাল অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। কিন্তু তিনি যেমন ধনবান ও বিত্তশালী, তেমনি সুবিজ্ঞও বটে। তিনি বিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্যয় করেন; যাকে উপযুক্ত মনে করেন, বিত্তশালী করে দেন এবং যার ঘাড়ে উপযুক্ত মনে করেন, অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেন।

অতঃপর বলেছেন : এরা উদ্ধত জাতি। আপনার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনী নির্দেশাবলীর দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তাদের কুফর ও অশিশাস আরও কঠোর হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ঘোর মতানৈক্য সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সাহসী হয় না এবং তাদের কোন চক্রান্তও সফল হয় না। كَلِمًا أَوْ كَذِبًا أَوْ أَنَا رَبُّكَ فَأَرْبَابُكُمْ إِلَهُكُمْ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : বাক্যে প্রকাশ্য যুদ্ধে বার্থতা এবং وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا : বাক্যে গোপন চক্রান্তে বার্থতার কথাই বর্ণিত হয়েছে।

খোদায়ী নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালনে ইহকালীন কল্যাণ : ৬৪তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা তওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দেশাবলী এবং পয়গম্বরগণের বাণী দ্বারা কোন উপকার লাভ করেনি এবং জাগতিক লোভ-লালসায় লিপ্ত হয়ে সবকিছু বিস্মৃত হয়ে বসেছে। ফলে দুনিয়াতেও এরা কপর্দকহীন হয়ে পড়েছে। যদি এখনও তারা বিশাস ও খোদাভীতি অবলম্বন করে, তবে আমি তাদের বিগত সব গোনাহ মাফ করে দেব এবং নেয়ামতপূর্ণ উদ্যান দান করব।

খোদায়ী নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালন করার উপায় : وَأَقِمِ الصَّلَاةَ : আয়াতে ঐ বিশাস ও খোদা ভীতির কিছু বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে, যদ্বারা জাগতিক কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দানের ওয়াদা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছিল। বিবরণ এই যে, ইহুদীরা তওরাত, ইঞ্জিল এবং পরবর্তী সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআনকে প্রতিষ্ঠিত করুক। এখানে عمل তথা পালন করার পরিবর্তে أَقَامَتْ তথা প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে।

(৬৪) আর ইহুদীরা বলে : আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক। একথা বলার জন্যে তাদের প্রতি অভিসম্পাত। বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। আপনার প্রতি পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে কলাম অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবস্থাটা ও কুফর পরিবর্তিত হবে। আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আশুপন প্রত্যাশিত করে, আল্লাহ তা নির্বাণিত করে দেন। তারা দেশে অশান্তি উপাদান করে বেড়ায়। আল্লাহ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৬৫) আর যদি আহলে-কিতাবরা বিশাস স্থম্পন করত এবং খোদাভীতি অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নেয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবেশিত করতাম। (৬৬) যদি তারা তওরাত, ইঞ্জিল এবং যা প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, পুরোপুরি পালন করত, তবে তারা উপর থেকে এবং গায়ের নিচ থেকে ভক্ষণ করত। তাদের কিছুসংখ্যক লোক সংপথের অনুযায়ী এবং অনেকেই মন্দ কাজ করে যাচ্ছে। (৬৭) হে রসুল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছানেন না। আল্লাহ আপনারকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৬৮) বলে দিন : হে আহলে-কিতাবগণ, তোমরা কোন পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তওরাত, ইঞ্জিল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাও পুরোপুরি পালন না কর। আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবস্থাটা ও কুফর বন্ধি পাবে। অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।

উদ্দেশ্য এই যে, এসব গ্রন্থের আমল পুরোপুরি ও বিশুদ্ধ তখনই হবে, যখন তাতে কোন রকম ক্রটি ও বাড়াবাড়ি না থাকবে। যেমন, কোন শব্দকে তখনই প্রতিষ্ঠিত বলা যায়, যখন তা কোনদিকে ঝুঁকে থাকবে না বরং সোজা দাঁড়ানো থাকবে।

এর সারমর্ম এই যে, যদি ইহুদীরা আজও তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআন পাকের নির্দেশাবলীর প্রতি বিশ্वास স্থাপন করে এবং সেগুলো পুরোপুরি পালন করে—ক্রটি এবং মনগড়া বিষয়াদিকে ধর্ম বলে আখ্যা দিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, তবে তারা পরকালের প্রতিশ্রুত নেয়ামতরাজির যোগ্য হবে এবং ইহকালেও তাদের সামনে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। ফলে উপর-নীচ সবদিক থেকে তাদের উপর রিযিক বর্ষিত হবে। ‘উপর-নীচে’র বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে তারা অনায়াসে ও অব্যাহতভাবে রিযিক প্রাপ্ত হবে।—(তফসীরে-কবীর)

পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু পরকালের নেয়ামতের ওয়াদা ছিল। আলোচ্য আয়াতে পার্শ্ববিশেষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওয়াদাও বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ইহুদীদের কুকর্ম এবং তওরাত ও ইঞ্জিলের নির্দেশাবলী পরিবর্তনের বড় কারণ ছিল তাদের সংসার-প্রীতি ও অর্থলিপ্সা। এ মোহই তাদেরকে কোরআন ও রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রকাশ্য নির্দেশাবলী দেখা সত্ত্বেও সেগুলো মেনে নিতে বাধা প্রদান করছিল। তাদের আশঙ্কা ছিল এই যে, তারা মুসলমান হয়ে গেলে তাদের মোড়লি শেষ হয়ে যাবে এবং ধর্মীয় নেতা হওয়ার কারণে যেসব হাদিয়া ও উপঢৌকন পাওয়া যায়, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তাদের এ আশঙ্কা দূর করার জন্যে ওয়াদাও করেছেন যে, তারা সাক্ষাৎ ঈমানদার ও সৎকর্মী হয়ে গেলে তাদের জাগতিক অর্থ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশ হাস পাবে না, বরং আরও বেড়ে যাবে।

একটি সন্দেহ নিরসন : এ বিবরণ থেকে একথা জানা গেল যে, এই বিশেষ ওয়াদাটি এসব ইহুদীর জন্য করা হয়েছে, যারা মহানবী (সাঃ)—এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তারা এসব নির্দেশ মেনে নিলে ইহকালেও তাদেরকে সব রকম নেয়ামত ও শান্তি প্রদান করা হত। সেমতে তখন যারা ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করেছে, তারা এসব নেয়ামত পুরোপুরিভাবেই লাভও করেছে। যেমন, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী ও আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ। এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ বিশ্वास ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, সে-ই ইহকালে অবশ্যজ্ঞাবীরূপে অগাধ ধন-দৌলতের অধিকারী হবে এবং যে এরূপ না করবে, সে অবশ্যই অভাব-অনটনে পতিত হবে। কারণ, এ স্থলে কোন সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং একটি বিশেষ দলের সাথে বিশেষ অবস্থায় ওয়াদা করা হয়েছে।

তবে সাধারণ নীতি হিসেবে ঈমান ও সৎকর্মের ফলস্বরূপ পবিত্র-জীবন প্রাপ্ত হওয়ার ওয়াদা রয়েছে। এটি অগাধ ধন-দৌলতের আকারেও হতে পারে কিংবা বাহ্যিক অভাব-অনটনের আকারেও। পয়গম্বর ও ঙ্গলীদের অবস্থাই এর প্রমাণ। তাঁরা সবাই অগাধ-ধন-দৌলত প্রাপ্ত হননি, তবে পবিত্র-জীবন অবশ্যই প্রাপ্ত হয়েছেন।

আয়াতের শেষাংশে ইনসাফ প্রদর্শনার্থ একথাও বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের যেসব বক্তৃতা ও কুকর্ম বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব ইহুদীর অবস্থায় নয় বরং **وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ** অর্থাৎ, তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দল সংপথের অনুসারীও রয়েছে। তবে তাদের অধিকাংশই কুকর্মী। সংপথের অনুসারী বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা পূর্বে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান ছিল, এরপর কোরআন ও রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি বিশ্वास স্থাপন

করেছে।

প্রচারকার্যের তাকিদ ও রসূল (সাঃ)—এর প্রতি সাধুনা : এ আয়াতদ্বয়ে এবং এর পূর্ববর্তী উপস্থাপিত দুই রুকুতে ইহুদী ও খ্রীষ্টানের বক্তৃতা, বিপথগামিতা, হঠকারিতা এবং ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র বর্ণিত হয়েছে। মানুষ হিসেবে এর একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এরূপ হওয়াও সম্ভবপর ছিল যে, এর ফলে মহানবী (সাঃ) নিরাশ হয়ে পড়তেন কিংবা বাধ্য হয়ে প্রচারকার্যে ভাটা দিতে পারতেন। আর এর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া এরূপও হতে পারত যে, তিনি বিরোধিতা, শত্রুতা ও নির্মাতনের পরওয়া না করে প্রচারকার্যে ব্যাপৃত থাকতেন, ফলে তাঁকে শত্রুর পক্ষ থেকে নানা রকম কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হত। তাই তৃতীয় আয়াতে এর দিকে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে জোরালো ভাষায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকিছু অবতরণ করা হয়, তার সম্পূর্ণটিই বিনা দ্বিধায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিন; কেউ মন্দ বলুক অথবা ভাল, বিরোধিতা করুক কিংবা গ্রহণ করুক। অপরদিকে তাঁকে এ সর্বোদ দিয়ে আশুস্ত করা হয়েছে যে, প্রচারকার্যে কাকেররা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আপনার দেখাশোনা করবেন।

আয়াতের **وَلَا تَمْتَلِكْ فَمَا يَكْنُزُكَ** বাক্যটি প্রশিধানযোগ্য—এর উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আল্লাহ তাআলার একটি নির্দেশও পৌঁছাতে বাধী রাখেন, তবে আপনি পয়গম্বুরীর দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। এ কারণেই রসুলুল্লাহ (সাঃ) আজীবন এ কর্তব্য পালনে পূর্ণ সাহসিকতা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

বিদায় হজ্জের সময় মহানবী (সাঃ)—এর একটি উপদেশ : বিদায় হজ্জের প্রসিদ্ধ ভাষণটি একদিক দিয়ে ছিল ইসলামের আইন এবং অপর দিক দিয়ে দয়ার সাগর, পিতা-মাতার চেয়েও অধিক স্নেহশীল পয়গম্বরের অস্তিম উপদেশ। এ ভাষণে তিনি সাহাবায়ে-কেরামের অভূতপূর্ব সমাবেশকে লক্ষ্য করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করার পর প্রশ্ন করলেন : **أَلَا هَلْ بَلَفَتْ** শোন, আমি কি তোমাদের কাছে ঈদীন পৌঁছে দিয়েছি? সাহাবীগণ স্বীকার করলেন, জি হা, অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর বললেন : তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থেকে। তিনি আরও বললেন, **فَلْيَبْلُغْ** অর্থাৎ, এ সমাবেশে যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার কথাটি অনুপস্থিতদের কাছেও পৌঁছে দিবে। অনুপস্থিত বলে দুই শ্রেণীর লোককে বোঝানো হয়েছে। (এক) যারা তখন দুনিয়াতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সমাবেশে উপস্থিত ছিল না এবং (দুই) যারা তখনো পর্যন্ত জন্মগ্রহণই করেনি। তাদের কাছে পয়গাম পৌঁছানোর পন্থা, ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার। সাহাবী ও তাবয়ীগণ এ কর্তব্য যথাযথ পালন করেছেন।

এর প্রভাবেই সাধারণ অবস্থায় সাহাবায়ে-কেরাম রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর বাণী ও হাদীসকে আল্লাহ তাআলার একটি বিরাট আমানতের ন্যায় অনুভব করেছেন। তাঁরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত প্রত্যেকটি কথাই উশ্মতের কাছে পৌঁছে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। যদি কোন বিশেষ কারণ অথবা অক্ষমতার দরুন কেউ বিশেষ হাদীস অন্যের কাছে বর্ণনা না করতেন, তবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তা দু’চার জনকে অবশ্যই শুনিয়ে দিয়েছেন যাতে এ আমানতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন। সহীহ বোখারীতে হযরত মুয়ায (রাঃ)—এর একটি হাদীস সম্পর্কে এমন ধরনের এক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। বলা হয়েছে **خبر به معاذ عند موته** অর্থাৎ, এ আমানত না পৌঁছানোর কারণে গোনাহগার হওয়ার ভয়ে হযরত মুয়ায হাদীসটি মৃত্যুর সময় বর্ণনা করেছেন।

وَاللَّهُ يَوْمَكَ مِنَ الْعَالَمِينَ আয়াতের এ দ্বিতীয় বাক্য সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে যত বিরোধিতাই করুক, শত্রুও আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

হাদীসে বলা হয়েছে : এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কয়েকজন যহুদী দেহরক্ষী হিসেবে সাধারণভাবে মহানবী (সাঃ)-এর সাথে থাকতেন এবং গৃহে ও প্রবাসে তাঁকে প্রহরা দিতেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি সবাইকে বিদায় করে দেন। কারণ, এ দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

হযরত হাসান (রাঃ)-বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেন : প্রচারকার্যের নির্দেশ প্রাপ্তির পর আমার মনে বেশ ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। কারণ, চারদিক থেকে হযরত সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং বিরোধিতা করবে। অতঃপর যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন ভয়-ভীতি দূর হয়ে অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়।—(তফসীরে-কবীর)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রচারকার্যে কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কিছুমাত্র ও ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য যুদ্ধ ও জেহাদে সাময়িকভাবে কোনরূপ কষ্ট পাওয়া এর পরিপন্থী নয়।

আহলে-কিতাবদের প্রতি শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ : প্রথম আয়াতে আহলে-কিতাব ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যদি তোমরা শরীয়তের নির্দেশাবলী পালন না কর, তবে তোমরা কিছুই নও। উদ্দেশ্য এই যে, ইসলামী শরীয়ত অনুসরণ না করলে তোমাদের যাবতীয় সাধুতা ও ক্রিয়াকর্ম পণ্ডশূন্য মাত্র। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে একটি সৃষ্টিগত মর্যাদা দান করেছেন ; অর্থাৎ তোমরা পয়গম্বরদের বংশধর। দ্বিতীয়তঃ তওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষাগত মর্যাদাও তোমাদের আয়ত্ত্বাধীন; তোমাদের মধ্যে অনেক সাধু ব্যক্তিও রয়েছে। তারা আধ্যাত্মিক পথে পরিশ্রম ও সাধনা করে। কিন্তু এসব বিষয়ের মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে তখনই হবে, যখন তোমরা ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করবে। এছাড়া কোন সম্পর্কই কাজে আসবে না এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিশ্রম ও সাধ্য-সাধনার কোনটিতেই তোমাদের মুক্তি আসবে না।

এ আয়াত থেকে মুসলমানরাও নির্দেশ লাভ করেছে যে, শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ব্যতীত সাধুতা, আধ্যাত্মিকতা, চেষ্টা-সাধনা, অস্তিত্বলাভ, এল্‌হাম ইত্যাদি দ্বারা মুক্তিলাভ করা যাবে না।

এ আয়াতে শরীয়ত অনুসরণের জন্যে তিনটি বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে : প্রথম—তওরাত। দ্বিতীয়—ইঞ্জিল, যা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের কাছে পূর্বই অবতীর্ণ হয়েছে এবং তৃতীয় وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ۖ অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা প্রেরিত হয়েছে।

সাহাবা ও তাবয়ী তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, এর মর্ম কোরআন পাক, যা খ্রীষ্টান ও ইহুদী সম্প্রদায়সহ সব উম্মতের জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে পর্যন্ত তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনের আনীত বিধি-বিধানগুলো বিস্তৃদ্ধভাবে ও পূর্ণরূপে পালন না করবে, সে পর্যন্ত তোমাদের বংশগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং মর্যাদা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে না।

এখানে প্রাধান্যযোগ্য যে, আয়াতে তওরাত ও ইঞ্জিলের মত কোরআনেরও সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার না করে একটি দীর্ঘ বাক্য وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ۖ ব্যবহার করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, এতে কতিপয় হাদীসের বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এসব হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আমাকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার কোরআন দেয়া হয়েছে, তেমনি অন্যান্য তত্ত্বকথা সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। এগুলোকে এক দিক দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যাও বলা যেতে পারে। হাদীসের ভাষ্য এরূপ : ‘শোন, আমাকে কোরআন দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এমন হবে যে, কোন তত্ত্ব ও আরামপ্রিয় ব্যক্তি বলাবলি করবে যে, তোমাদের জন্যে কোরআনই যথেষ্ট। এতে যা হালাল করা হয়েছে তাকেই হালাল মনে কর এবং এতে যা হারাম করা হয়েছে তাকেই হারাম মনে কর। অথচ বাস্তব সত্য এই যে, আল্লাহর রসূল যা হারাম করেছেন, তাও আল্লাহর হারাম করা বস্তুর মতই হারাম।’ --(আবু-দাউদ, ইবনে-মাজা দারেমী)।

শরীয়তের বিধান তিন প্রকার : স্বয়ং কোরআনও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় : وَيُنَظِّقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّ هُوَ الْكَذَّابُ الْيَوْنِي অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না। তিনি যাকিছু বলেন, সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে বলেন। যেসব ক্ষেত্রে তিনি কোন কথা স্বীয় ইজতেহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে বলেন এবং অতঃপর ওহীর মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে নির্দেশ অবতীর্ণ না হয়, পরিণামে সে ইজতেহাদও ওহীর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেসব বিধান উম্মতকে দিয়েছেন, সেগুলো তিন প্রকার : (এক) যেসব বিধান কোরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে, (দুই) যেসব বিধান সুস্পষ্টভাবে কোরআনে উল্লেখিত নাই; বরং পৃথক ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং (তিন) যেসব বিধান তিনি স্বয়ং ইজতেহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে দিয়েছেন এবং এর বিরুদ্ধে ওহীর মাধ্যমে কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি।

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রাধান্যযোগ্য বিষয় এই যে, এতে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআন তিনটি গ্রন্থের নির্দেশাবলী পালন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ এগুলোর একটি অপরটিকে রহিত করে দিয়েছে। ইঞ্জিল তওরাতের কতক বিধানকে এবং কোরআন তওরাত ও ইঞ্জিলের অনেক বিধানকে রহিত করেছে। এমতাবস্থায় তিনটির সমষ্টিকে পালন করা কিরূপে সম্ভবপর হবে ?

এর জওয়াব সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, পরবর্তীকালে আগমনকারী গ্রন্থ পূর্ববর্তী গ্রন্থের যেসব বিধানকে পরিবর্তন করেছে, সেসব পরিবর্তিত বিধান পালন করাই উভয় গ্রন্থ পালন করার নামাস্তর। রহিত বিধান পালন করা উভয় গ্রন্থের উদ্দেশ্যেরই পরিপন্থী।

মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি একটি সান্দ্বনা : উপসংহারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সান্দ্বনার জন্যে বলা হয়েছে : আহলে-কিতাবদের অনেকেই আমার দেয়া সুযোগ-সুবিধা ও অনুগ্রহের দ্বারা উপকৃত হবে না, বরং তাদের কুফর ও ঔদ্ধত্য আরও বেড়ে যাবে। অতএব, আপনি এতে দুঃখিত হবেন না এবং তাদের প্রতি অনুকম্পাশীলও হবেন না।

চারটি সম্প্রদায়ের প্রতি পরকালে মুক্তির ওয়াদা : দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলা চারটি সম্প্রদায়কে ঈমান ও সংকর্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সেজন্য পরকালে মুক্তির ওয়াদা করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম সম্প্রদায় হচ্ছে **الَّذِينَ آمَنُوا** অর্থাৎ, মুসলমান। দ্বিতীয়তঃ **مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** ৷ **لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ** ৷ **وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ** ৷ **رُسُلًا لِّكَيْلَاجَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ** ৷ **فَرِيقًا كَذَّبُوا** ৷ **وَفَرِيقًا تَقَبَّلُوهُ** ৷ **وَسُحِبُوا إِلَىٰ أَرَاكُنٍ مِّنْهُ فَعَمُوا وَصَمَوْا وَكَانَتْ** ৷ **تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمَوْا كَذَّبُوا بِآيَاتِهِمْ وَاللَّهُ يَبْصِرُ مَا** ৷ **يَعْمَلُونَ** ৷ **لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ** ৷ **وَقَالَ الْمَسِيحُ بَنِي إِسْرَءِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ** ৷ **مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَزَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ لُجَّةً وَمَأْوَاهُ النَّارُ** ৷ **وَلِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ آدَمَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ** ৷ **ثَلَاثَةٍ وَمِمَّنْ إِلَٰهٌ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّان كَيْدَهُمْ إِنَّمَا يَنْقُلُونَ** ৷ **لَيْمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَ الْآلِئِمْ فَلَا يَتَوَّبُونَ إِلَى** ৷ **اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ** ৷ **وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** ৷ **مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا** ৷ **رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأَنَّ اللَّهَ صَدِيقُكَ كَذَّابٌ أَكْبَرُ** ৷ **الظَّالِمَ أَنْظَرْتُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظَرْتُمْ أَنْ يَكُونُوا** ৷

(৬৯) নিচয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, ছাবেয়ী বা খ্রীষ্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্वास স্থাপন করে আল্লাহর প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সংকর্ষ সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুহিত হবে না। (৭০) আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে অনেক পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। যখনই তাদের কাছে কোন পয়গম্বর এমন নির্দেশ নিয়ে আসত যা তাদের মনে চাইত না, তখন তাদের অনেকের প্রতি তারা মিথ্যারোপ করত এবং অনেককে হত্যা করে ফেলত। (৭১) তারা ধারণা করেছে যে, কোন অনিষ্ট হবে না। ফলে তারা আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন। এরপরও তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও বধির হয়ে রইল। আল্লাহ দেখেন, তারা যা কিছু করে। (৭২) তারা কান্দির, যারা বলে যে, মরিয়ম-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ অথচ মসীহ বলেন, হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমার পালন কর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিচয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার হির করে, আল্লাহ তার জন্যে জ্ঞানাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৭৩) নিচয় তারা কান্দির, যারা বলে : আল্লাহ তিনের এক ; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। (৭৪) তারা আল্লাহর কাছে তওবা করে না কেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে না কেন? আল্লাহ যে ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৭৫) মরিয়ম-তনয় মসীহ রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রাসূল অতিক্রান্ত হয়েছেন আর তাঁর জননী একজন ওলী। তাঁরা উভয়েই স্বাদ্ভক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্যে কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখুন, তারা উদ্ভট কোন দিকে যাচ্ছে।

তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর হযরত কাতাদার বরাতে দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সাবিয়ুন হল তারাই যারা ফেরেশতাদের এবাদত করে, কেবলার উষ্টেদিকে নামায পড়ে এবং দাউদ (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ যবুর পাঠ করে।

কোরআন পাকের এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে বাহ্যতঃ এর সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা কোরআন মজীদে চারটি ঐশী গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে : কোরআন, ইঞ্জীল, যবুর ও তওরাত। আয়াতে এ গ্রন্থ চতুর্থের অনুসারীদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার কাছে সাফল্য সংকর্ষের উপর নির্ভরশীল : উভয় আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, আমার দরবারে কারও বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কোন মূল্য নেই। যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্য, বিশ্वास ও সংকর্ষ অবলম্বন করবে, সে পূর্বে যাই থাক, আমার কাছে প্রিয় বলে গণ্য হবে এবং তার কাজকর্ম গৃহীত হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, কোরআন অবতরণের পর পূর্ণ আনুগত্য মুসলমান হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কারণ, পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত এবং ইঞ্জীলেও এরই নির্দেশ রয়েছে। কোরআন পাক শুধুমাত্র এ উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণেই কোরআন অবতরণ ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্वास স্থাপন করা ছাড়া তওরাত, ইঞ্জীল ও যবুরের অনুসরণ বিস্তৃত হতে পারে না। অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা মুসলমান হবে, তারাই পরকালে মুক্তি ও ছোয়াবের অধিকারী হবে। এতে এ ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যে, এরা কুফর ও পাপের পথে থেকে এযাবৎ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব হীন চক্রান্ত করেছে, মুসলমান হওয়ার পর এদের পরিণাম কি হবে? আয়াতদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে যে, অতীত সব গোনাহ ও ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা হবে এবং পরকালে তারা শক্তি ও দুঃখিত হবে না।

বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এখানে মুসলমানদের উল্লেখ নিম্নয়োজন। কেননা, আয়াতে যে স্তরের ঈমান ও আনুগত্য কামনা করা হয়েছে, তারা পূর্ব থেকেই সে স্তরে বিরাজমান। এ স্তরের প্রতি যাদেরকে ডাকা উদ্দেশ্য, আয়াতে শুধু তাদের উল্লেখ করাই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের সাথে মুসলমানদের যুক্ত করার ফলে একটি বিশেষ ভাষালঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বোঝা যাবে। কোন শাসনকর্তা অথবা বাদশাহ্ এরূপ স্থলে বলে থাকেন : আমাদের আইন সবার বেলায় প্রযোজ্য, অনুগত হোক কিংবা বিরোধী যে-ই আনুগত্য করবে, সেই অনুগ্রহ ও পুরস্কারের যোগ্য হবে। এখন সবারই

মানা যে, অনুগতরা তো আনুগত্য করছেই— যে বিরোধী আসলে তাকে শাসনোই উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে অনুগতকে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, অনুগতদের প্রতি আমাদের যে কৃপাদৃষ্টি, তা কোন বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়, বরং তাদের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যদি বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিও আনুগত্য অবলম্বন করে, তবে সেও এ কৃপা ও অনুগ্রহের অধিকারী হবে।

উপরোক্ত চার সম্প্রদায়কে সম্প্রদান করে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা তিনটি অংশে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস এবং স্ফর্ক।

রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই : এ আয়াতে ঈমান ও বিশ্বাস সম্বন্ধীয় সব বিষয়ের বিবরণ পেশ করা লক্ষ্য নয়। ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস উল্লেখ করে সব বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং প্রকৃতি আহবান জানানোই এখানে উদ্দেশ্য। নতুবা যে আয়াতেই ঈমানের উল্লেখ করা হবে, সেখানেই ঈমানের আদ্যোপাঙ্গত বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। অথচ এমনটি অপরিহার্য হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রেও রসূল অথবা রেসালতের প্রতি বিশ্বাসের কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত না হওয়ায় কোন সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও কোনরূপ সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না। বিশেষ করে যখন সমগ্র কোরআন ও তার শত শত আয়াত রেসালতের প্রতি বিশ্বাসের স্পষ্টোক্তিভে পরিপূর্ণ রয়েছে। এসব আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রসূল ও রসূলের বাণীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই এবং এ বিশ্বাস ছাড়া কোন ঈমান ও স্ফর্কই গ্রহণীয় নয়। কিন্তু একটি ধর্মদ্রোহী দল কোন না কোন উপায়ে নিজদের প্রান্ত মতবাদ কোরআনের অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কারভাবে রেসালত উল্লেখিত না হওয়ায় তারা একটি নতুন মতবাদ খাড়া করেছে, যা কোরাআন ও হাদীসের অসংখ্য স্পষ্টোক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। তা এই যে, প্রত্যেক বিস্ত্র লোক তা ইহুদী, খ্রীষ্টান এমন কি মূর্তিপূজারী পৌত্তলিক থাকে অবস্থায়ও যদি শুধু আল্লাহ ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং স্ফর্ক সম্পাদন করে, তবে পরকালে মুক্তির অধিকারী হতে পারে— পারলৌকিক মুক্তির জন্যে ইসলাম গ্রহণ করা কোন জরুরী বিষয় নয়।—(নাউঘুবিল্লাহ)

আল্লাহ তাআলা যাদেরকে কোরআন পাঠের শক্তি এবং কোরআনের প্রতি বিস্ত্র ঈমান দান করেছেন, তাদের পক্ষে কোরআনী স্পষ্টোক্তি দ্বারা এ বিশ্বাসি দূর করা খুব বেশী বিদ্যা-বুদ্ধির মুখাপেক্ষী নয়। যারা কোরআনের অনুবাদ জানে তারাও এ কাল্পনিক প্রান্তি অন্যায়সে বুঝতে পারে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : “আজ যদি মুসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গতি ছিল না।”

অতএব, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালন করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই এবং মুসলমান না হয়েই পরকালে মুক্তি পাবে—এরূপ বলা কোরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ নয় কি ?

বনী-ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভঙ্গ : **كَلَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا كُفُورَىٰ**

অর্থঃ, বনী-ইসরাঈলের কাছে তাদের রসূল যখন কোন নির্দেশ নিয়ে আসতেন যা তাদের রুচিবিরুদ্ধ হত, তখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করত এবং পয়গম্বরদের মধ্যে

কারো প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং কাউকে হত্যা করত। এটি ছিল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা। এখন পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অবস্থা এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, এতসব নির্মম অত্যাচার ও বিদ্রোহীসুলভ অপরাধে লিপ্ত হয়েও তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে বসে থাকত। ভাবনা এই যে, এসব কুক্রমের কোন সাজাই ভোগ করতে হবে না এবং নির্যাতন ও বিদ্রোহের অশুভ পরিণতি কখনও সামনে আসবে না। এহেন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা খোদায়ী নির্দর্শন ও হুশিয়ারী থেকে সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে যায় এবং যা গর্হিত তাই করতে থাকে। এমনকি, কতক পয়গম্বরকে তারা হত্যা করে এবং কতককে বন্দী করে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা বাদশাহ বখতে-নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। অতঃপর দীর্ঘদিন অতীত হলে জনৈক পারস্য সন্ন্যাসী তাদেরকে বখতে-নসরের লাল্পনা ও অবমাননার কবল থেকে উদ্ধার করে বাবেল থেকে বায়তুল-মোকাদ্দাসে আনেন। তখন তারা তওবা করে এবং অবস্থা সংশোধনে মনোনিবেশ করে। আল্লাহ তাদের সে তওবা কবুল করেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা আবার দুষ্কৃতিতে মেতে উঠে এবং অন্ধ ও বধির হয়ে হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে হত্যা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। তারা হযরত ইসা (আঃ)-কেও হত্যা করতে উদ্যত হয়।—(ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

..... لَقَدْ كَفَرَ الْيَهُودُ ۖ أَرْثَا، হযরত মসীহ, রুহুল কুদুস ও আল্লাহ কিংবা মসীহ, মরিয়ম ও আল্লাহ সবাই আল্লাহ—(নাউঘুবিল্লাহ)। তাদের মধ্যে একজন অশ্লীলার হলেন আল্লাহ। এরপর তারা তিন জনই এক এবং একজনই তিন। এ হচ্ছে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্মবিশ্বাস। এ যুক্তিবিরোধী ধর্মবিশ্বাসকে তারা জটিল ও দুর্য্যবোধক ভাষায় ব্যক্ত করে। অতঃপর বিষয়টি যখন কারও বোধগম্য হয় না, তখন একে ‘বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য’ বলে আখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হয়।—(ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

মসীহ (আঃ)-এর উপাস্যতা খণ্ডন : **فَرَحَلْتُ مِنْ قِبَلِ الرَّسُولِ** অর্থঃ, অন্যান্য পয়গম্বর যেমন পৃথিবীতে আগমন করার পর কিছুদিন অবস্থান করে এখানে থেকে লোকান্তরিত হয়ে গেছেন এবং স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেননি যা উপাস্য হওয়ার লক্ষণ, এমনভাবে হযরত মসীহ (আঃ) যিনি তাঁদের মতই একজন মানুষ—স্থায়িত্ব ও অমরত্ব লাভ করতে পারেননি। কাজেই তিনি উপাস্য হতে পারেন না।

চিন্তা করলে বোঝা যাবে, যে ব্যক্তি পানাহারের মুখাপেক্ষী, সে পৃথিবীর সব কিছুই মুখাপেক্ষী। মাটি বাতাস, পানি, সূর্য এবং জীবজন্তু থেকে সে পরামুখ হতে পারে না। খাদ্যশস্য উদরে পৌছা এবং হজম হওয়া পর্যন্ত চিন্তা করুন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কতকিছু প্রয়োজন। এরপর খাওয়ার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা কতদূর পর্যন্ত পৌছবে। পরমুখাপেক্ষিতার এ দীর্ঘ পরশরার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা মসীহ ও মরিয়মের উপাস্যতা খণ্ডনকল্পে যুক্তির আকারে এরূপ বলতে পারি : মসীহ ও মরিয়ম পানাহারের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র থেকে মুক্ত ছিলেন না। এ বিষয়টি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও লোকপরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি পানাহার থেকে মুক্ত নয়, সে পৃথিবীর কোন বস্তু থেকেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না। এখন আপনিই বলুন, যে সত্তা মানব-মণ্ডলীর মত স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থ বস্তুজগত থেকে পরামুখ নয়, সে কিভাবে আল্লাহ হতে পারে? এ শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট যুক্তিটি জ্ঞানী ও মুখ সবাই সমভাবে বুঝতে পারে। অর্থঃ, পানাহার করা উপাস্য হওয়ার পরিপন্থী—যদিও পানাহার না করাও উপাস্য হওয়ার প্রমাণ নয়। নতুবা সব ফেরেশতা আল্লাহ হয়ে যাবে।—(ফাওয়ায়েদে ওসমানী)।

المائدة

১২২

الحج

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ أَتَعْبُدُونَ
وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْتَوُوا
دِينَكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن
قَبْلُ وَأَصْلُوا كَثِيرًا مِّن سَوَاءِ السَّبِيلِ ۚ لَقَدْ
إِذْنًا لِّكُفْرٍ وَأَمِنَ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ ذُلٌّ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَهَبِ
إِبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا لَا
يَتَنَبَّهُونَ عَنْ مَكْرٍ قَعُولَهُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝
تَرَىٰ كَيْفَ إِذَا فُتِنُوا بِأَمْتِهِمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْسَ لَهُمْ
لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ
خُلْدٌ ۚ وَكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا نَزَّلَ
إِلَيْهِمَ إِلَّا الْخُذُوهُمْ وَأُولَئِكَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
فُتِنُوا ۚ لَتَلَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا
الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً
لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَٰلِكَ يَٰ
مَنْهُمْ قَسِيصٌ وَرُفْقَانًا ۚ أَهْمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝

(৭৬) বলে দিন : তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর এবাদত কর, যে তোমাদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না? অথচ আল্লাহ সব শুনেন, জানেন।

(৭৭) বলুন : হে আহলে-কিতাবগণ, তোমরা ধর্ম অনুযায় বাড়াবাড়ি করো না এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। (৭৮) বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাকের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অতিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লঙ্ঘন করত। (৭৯) তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল। (৮০) আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাকেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্যে যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। (৮১) যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাকেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার। (৮২) আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান বলে। এর কারণ এই যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহংকার করে না।

হযরত মরিয়ম পয়গম্বুর ছিলেন কি ওলী : হযরত মরিয়মের পয়গম্বুর ও ওলী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে প্রশংসার স্থলে صديقة শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, তিনি ওলী ছিলেন— নবী নয়। কারণ, প্রশংসার স্থলে সাধারণতঃ উচ্চপদই উল্লেখ করা হয়। নবুওয়ত প্রাপ্ত হয়ে থাকলে এখানে نبیة বলা হত। অথচ বলা হয়েছে صديقة এটি ওলীত্বের একটি স্তর। — (রুহুল মাআনী, সংক্ষেপিত)

আলেমদের সূচিস্তিত অভিমত এই যে, মহিলারা কখনও নবুওয়ত লাভ করেনি। এ পদ সর্বদা পুরুষদের জন্যেই সংরক্ষিত রয়েছে।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বনী-ইসরাঈলের কুটিলতার আরেকটি দিক : قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْتَوُوا دِينَكُمْ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বনী-ইসরাঈলের ঔদ্ধত্য ও তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন বর্ণনা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ প্রেরিত রসূল-যারা তাদের অক্ষয় জীবনের বার্তা ও তাদের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের কার্যবিধি নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে (وَلَيَكُنَّ لَكُم مَّوَدَّةَ بَيْنٍ) অর্থাৎ, কতক পয়গম্বুরকে তারা মিথ্যারোপ করে এবং কতককে হত্যা করে ফেলে

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব বনী-ইসরাঈলেরই কুটিলতার আরেকটি দিক ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মূর্খরা যেমন ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার এক প্রান্তে থেকে আল্লাহর পয়গম্বুরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং কতককে হত্যা করেছে, তেমনি এরাই বক্রতার অপর প্রান্তে পৌঁছে পয়গম্বুরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহতে পরিণত করে দিয়েছে, (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ) অর্থাৎ, যে সব বনী-ইসরাঈল বলে যে, আল্লাহ তো ঈসা ইবনে মরিয়মেরই নাম, তারা কাকের হয়ে গেছে।

এখানে এ উক্তিটি শুধু খ্রীষ্টানদের বলে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র একই ধরনের বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা ইহুদীদের ব্যাপারেও বর্ণনা করা হয়েছে (وَقَالَتِ الْيَهُودُ غُرَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ الْنَصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ)

অর্থাৎ, ইহুদীরা বলে যে, হযরত ওয়ালর আল্লাহর পুত্র এবং খ্রীষ্টানরা বলে যে, মসীহ আল্লাহর পুত্র।

غلو শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রম করা। ধর্মের সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ধর্ম যে সীমা নির্ধারণ করেছে, তা লঙ্ঘন করা।

উদাহরণতঃ পয়গম্বুরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সীমা এই যে, আল্লাহর সৃষ্টজীবের মধ্যে তাঁদেরকে সর্বোত্তম মনে করতে হবে। এ সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে আল্লাহ কিংবা আল্লাহর পুত্র বলে দেয়া হচ্ছে বিশ্বাসগত সীমা লঙ্ঘন।

বনী-ইসরাঈলের বাড়াবাড়ি : পয়গম্বুরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং হত্যা করতঃও কুটিলতা হওয়া, অথবা তাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ কিংবা আল্লাহর পুত্র বলে দেয়া, বনী-ইসরাঈলের এ পরস্পর বিরোধী দু'টি

করই হচ্ছে মূর্ততপ্রসূত বাড়াবাড়ি। আরবের প্রসিদ্ধ প্রবচন হচ্ছে : **الجاهل اما مفراط او مفرط** অর্থাৎ, মূর্খ ব্যক্তি কখনও মিতাচার ও ক্ষুণ্ণ অবলম্বন করতে পারে না। সে হয় বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, না হয় ক্ষীণলব্ধনে। এ বাড়াবাড়ি ও সীমালব্ধন বনী-ইসরাঈলের দু'টি ভিন্ন দল পক্ষ থেকে হয়ে থাকতে পারে এবং এমনও হতে পারে যে, একদল লোকই দু'টি ভিন্নমুখী কর্ম বিভিন্ন পয়গম্বরের সাথে করেছে। অর্থাৎ, তারা কারো প্রতি মিথ্যারোপ করে হত্যা করেছে এবং কাউকে আল্লাহর সমতুল্য করে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদেরকে সম্মোদন করে যে সব নির্দেশ তাদেরকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরকে দেয়া হয়েছে, তা ধর্ম অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি মূল স্তম্ভ বিশেষ। এ মূলনীতি থেকে সামান্য এ দিক-সেদিক হলেই মানুষ পঞ্চব্রততার আবর্তে পতিত হয়ে যায়। এ কারণে এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আল্লাহ পর্ষস্ত সৌহার পথ : এটা বাস্তব সত্য যে, সমগ্র দুনিয়া-জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। সমগ্র বিশ্বে তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই নির্দেশ চালু। তাঁরই আনুগত্য করা প্রতিটি মনবের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু বেচারী মাটির মানুষ মৃত্যিকাজনিত তমসা ও অধোগতির দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। সে আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তা এবং তাঁর বিধান ও নির্দেশাবলী শত চেষ্টা করেও জানতে পারে না। আল্লাহ তাআলা স্বীয় কৃপায় তার জন্যে দু'টি মাধ্যম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ মাধ্যমদ্বয়ের দ্বারা সে আল্লাহ তাআলার পছন্দ-অপছন্দ এবং আদর্শ ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করতে পারে। তন্মধ্যে একটি মাধ্যম হচ্ছে ঐশীগ্রন্থ, যা মানুষের জন্যে আইন ও নির্দেশনামা বিশেষ। দ্বিতীয় মাধ্যম হচ্ছে মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে স্বীয় পছন্দ ও অপছন্দের বাস্তব নমুনা এবং স্বীয় গ্রন্থের বাস্তব ব্যাখ্যা রূপে পাঠিয়েছেন। ধর্মীয় পরিভাষায় তাঁদেরকে রসূল কিংবা নবী বলা হয়। কেননা, অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, কোন গ্রন্থ-তা যতই সর্ব বিষয় সমন্বিত ও বিস্তারিত হোক না কেন, মানুষের সংশোধন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে যথেষ্ট হয় না। বরং স্বভাবগতভাবেই মানুষের প্রশিক্ষক ও সংস্কারক একমাত্র মানুষই হতে পারে। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষের সংশোধন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে দু'টি উপায় রেখেছেন : আল্লাহর গ্রন্থ এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দার জামাত। পয়গম্বুরগণ, তাঁদের উত্তরসূরি আলোম ও মাশায়েখ-এরা সবাই এ মানব মন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর প্রিয় এসব মানুষের সম্মানের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই নিবাসী বাড়াবাড়ির ভুলে লিপ্ত রয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে যেসব দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে, সে সবই এ ভুলের ফসল। কোথাও তাদেরকে সীমা ডিসিয়ে ব্যক্তিপূজার স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে এবং কোথাও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে **الله حسبنا كتاب** - বাক্যটিকে ভুল অর্থ পরিয়ে দেয়া হয়েছে। একদিকে রসূলকে বরং পীরদেরকেও 'আলেকুল গায়ব' এবং খোদারী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করে নেয়া হয়েছে এবং পীর পূজা বরং কবরপূজা আরম্ভ হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহর রসূলকে শুধু একজন পত্রবাহকের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পয়গম্বুরদের অবমাননাকারীদেরকে যেমন কাকের বলা হয়েছে, তেমনি তাঁদেরকে সীমা ছাড়িয়ে আল্লাহর সমতুল্য আখ্যাদানকারীদেরকেও কাকের সাব্যস্ত করা হয়েছে। **لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُدْعَى إِلَهُ مِثْلَ اللَّهِ عَدْوَانًا** - আয়াতখানি এ বিষয়বস্তুরই ভূমিকা। এতে ফুটে উঠেছে যে, ধর্ম

প্রকৃতপক্ষে কতগুলো সীমা ও প্রতিবন্ধককেই বলা হয়। এ সীমার ভিতরে ক্রটি করা যেমন অপরাধ, তেমনি এ সীমাকে ডিসিয়ে যাওয়াও অন্যায়। রসূল ও তাঁদের উত্তরসূরিদের কথা অমান্য করা এবং তাঁদের অবমাননা করা যেমন মহাপাপ, তেমনি তাদেরকে আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী মনে করা আরও গুরুতর অপরাধ।

শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ বাড়াবাড়ি নয় : **عَوَّلُوا** - বলায় সাথে সাথে **لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُدْعَى إِلَهُ مِثْلَ اللَّهِ عَدْوَانًا** বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। সুস্বদর্শী তফসীরবিদদের মতে এ শব্দটি তাকীদ অর্থাৎ, বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, ধর্ম বাড়াবাড়ি সর্বাবস্থায়ই অন্যায়। এটা ন্যায় হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। আল্লামা যমখশরী প্রমুখ তফসীরবিদগণ, এ স্থলে বাড়াবাড়িকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি অন্যায় ও অসত্য, যা আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অপরটি ন্যায় ও বৈধ। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরা শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণকে উপস্থিত করেছেন। ধর্মীয় বিশ্লেষণে মাসআলায় মুসলিম দার্শনিকগণ এবং ফেকাহ সংক্রান্ত মাসআলায় ফেকাহবিদগণ এরূপ তথ্যানুসন্ধান করেছেন। উপরোক্ত তফসীরবিদগণের মতে এগুলোও বাড়াবাড়ি; তবে ন্যায় ও বৈধ। সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেন : এগুলো আদৌ বাড়াবাড়ি নয়। কোরআন ও সুন্নাহর মাসআলায় যতটুকু তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ রসূল-করীম (সাঃ), সাহাবী ও তাবয়ীগণ থেকে প্রমাণিত রয়েছে, ততটুকু বাড়াবাড়ি নয় এবং যা বাড়াবাড়ির সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তা এ ক্ষেত্রেও নিন্দনীয়।

বনী-ইসরাঈলকে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বনের নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতের শেষভাগে বর্তমান কালের বনী-ইসরাঈলদেরকে সম্মোদন করে বলা হয়েছে-

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ دَرَأَوْا بَيْنَهُمُ الْبَيْنَ وَهُمْ يَبْغُونَ - অর্থাৎ,

ঐ সম্প্রদায়ের অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরা পঞ্চব্রত হয়েছিল এবং অপরকেও পঞ্চব্রত করেছিল। অতঃপর তাদের পঞ্চব্রততার স্বরূপ ও কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে: **وَصَلُّوا عَلَى سَرَّاءِ النَّبِيِّ** - অর্থাৎ, তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, যা ছিল বাড়াবাড়ি ও ক্রটির মাঝখানে মধ্যবর্তী পথ। এভাবে এ আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ক্রটি যে, একটি মারাত্মক ভ্রান্তি, তা এবং সরল পথে কায়ম থাকার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

বনী-ইসরাঈলের কু-পরিণাম : দ্বিতীয় আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ক্রটিজনিত পঞ্চব্রতায় লিপ্ত বনী-ইসরাঈলের কুপরিণাম বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে- প্রথমতঃ হযরত দাউদ (আঃ)-এর মুখে, যার ফলে তাদের আকার-আকৃতি বিকৃতি হয়ে শূকরে পরিণত হয়। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর বাচনিক এ অভিসম্পাত তাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়। এর জাগতিক প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, তারা বিকৃত হয়ে বানরে পরিণত হয়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, এস্থলে স্থানোপযোগিতার কারণে মাত্র দু'জন পয়গম্বরের বাচনিক তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাদের উপর অভিসম্পাতের সূচনা হযরত মুসা (আঃ) থেকে হয়েছিল এবং তা সমাপ্ত হয়েছে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাচনিক। এভাবে উপর্যুপরি চারজন পয়গম্বরের বাচনিক তাদের উপর অভিসম্পাত

বর্ষিত হয়েছে, যারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল কিংবা তাঁদেরকে সীমা ভিঙ্গিয়ে আত্মা ত্যাগ করার গুণাবলীতে অংশীদার করেছিল।

সর্বশেষ দু'আয়াতে কাফেরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এর মারাত্মক পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, বনী-ইসরাঈলের সব বক্তৃতা ও পথদ্রষ্টা তাদের দ্রাব্য পরিবেশ ও কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্বেরই ফলশ্রুতি ছিল, যা তাদেরকে ধ্বংসের গহবরে নিক্ষেপ করেছিল।

কতিপয় আহলে-কিতাবের সত্যানুরাগ : আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ও বন্ধুত্বের মাপকাঠিতে এসব আহলে-কিতাবের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যারা সত্যানুরাগ ও খোদাভক্তির কারণে মুসলমানদের প্রতি হিন্দু ও শত্রুতা পোষণ করত না। কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে এ জাতীয় লোকের সংখ্যা ছিল নেহায়েতই নগণ্য। উদাহরণতঃ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম প্রমুখ। খ্রীষ্টানদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল বেশী। বিশেষতঃ মহানবী (সঃ)-এর আমলে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এ কারণেই মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমানরা কোরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গেলে রসুলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দেন এবং বলেন : আমি শুনেছি আবিসিনিয়ার সম্রাট কারও প্রতি জুলুম করেন না এবং কাউকে জুলুম করতে দেন না। তাই মুসলমানরা কিছুদিনের জন্যে সেখানে চলে যেতে পারে।

পরামর্শ অনুযায়ী প্রথমবার এগার জনের একটি দল আবিসিনিয়ায় চলে যায়। তাদের মধ্যে হযরত ওসমান গনী (রাঃ) এবং তাঁর স্ত্রী নবী-দুহিতা হযরত রোকাইয়া (রাঃ)-ও ছিলেন। এরপর হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেবের নেতৃত্বে একটি বিরাট কাক্ফা আবিসিনিয়ায় গিয়ে পৌঁছে। এ কাক্ফেলায় পুরুষ ছিলেন বিরাশি জন। আবিসিনিয়ার অধিবাসিরা তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানায় এবং তারা তথ্য সুখে-শান্তিতে বাস করতে থাকেন।

কিন্তু মুসলমানরা অন্য কোন দেশে গিয়ে শান্তিতে জীবন যাপন করবে, মক্কার ক্রোধান্বিত কাফেরকুলের তাও সহ্য হল না। তারা প্রচুর উপটোকনসহ একটি প্রতিনিধিদল আবিসিনিয়ার সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দিল এবং মুসলমানদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করল। কিন্তু সম্রাট প্রকৃত অবস্থা তদন্ত করলেন এবং হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে ইসলাম ও রসুলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অবগত হলেন। এসব তথ্য ও ইসলামী শিক্ষাকে তিনি হযরত ঈসা (আঃ) ও ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পূর্ণ অনুরূপ পেলেন। বলাবাহুল্য, ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী (সঃ)-এর আবির্ভাব, তাঁর শিক্ষার সৎকণ্ঠ চিত্র, তাঁর ও তাঁর সহচরবর্গের দৈহিক আকার-আকৃতি ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছিল। এতে প্রভাবান্বিত হয়ে সম্রাট কোরাইশী প্রতিনিধি দলের সব উপটোকন ফেরৎ দিলেন এবং তাদেরকে পরিষ্কার বলে দিলেন যে, আমি এমন লোকদেরকে কখনও দেশ থেকে বহিস্কারের আদেশ দিতে পারি না।

জা'ফর ইবনে আবু তালেবের বক্তৃতার প্রভাব : হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব নাজ্জাশীর দরবারে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার একটি সৎকণ্ঠ ও সর্বাত্মক সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এছাড়া সেখানে তাঁদের বসবাসের ফলেও সম্রাট, রাজকর্মচারী ও জনগণের অন্তরে ইসলামের

প্রতি অগাধ ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। রসুল্লাহ (সঃ) মদীনায হিজরত করার পর যখন সাহাবীদের নিয়ে নিরাপদে কালতিপাত করতে থাকেন, তখন আবিসিনিয়ার মুহাজিরগণ মদীনা যাওয়ার সঙ্কল্প করেন। এ সময় ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ সম্রাট নাজ্জাশী তাঁদের সাথে প্রধান প্রধান খ্রীষ্টান আলেম ও মাশায়েখের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সঃ)-এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। সত্তর জনের এ প্রতিনিধিদলে বায়ট জন আবিসিনিয় ও আট জন সিরীয় আলেম ও মাশায়েখ ছিলেন।

নবীর দরবারে শাহী প্রতিনিধিদলের উপস্থিতি : প্রতিনিধিদলটি সম্ভারত্যাগী দরবেশসুলত পোশাক পরিহিত হয়ে দরবারে উপস্থিত হলে মহানবী (সঃ) তাদেরকে সূরা-ইয়াসীন পাঠ করে শুনালেন। কোরআন পাঠ শুনে তাদের চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু বরছিল। তারা শ্রদ্ধাসূত কষ্ট বললেন : এ কলাম হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কলামের সাথে কতই না গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতঃপর প্রতিনিধিদলের সবাই মুসলমান হয়ে গেলেন।

তাদের প্রত্যাবর্তনের পর সম্রাট নাজ্জাশীও ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন এবং একখানা চিঠি লিখে স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে অপর একটি প্রতিনিধিদল মদীনায পাঠালেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে জাহাজ ভূমির ফলে তারা সবাই প্রাণত্যাগ করল। মোটকথা, আবিসিনিয়ার সম্রাট, রাজ কর্মচারী ও জনগণ ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শুধু ভয় ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং পরিশেষে তারা নিজেরাও মুসলমান হয়ে যান।

তফসীরবিদগণের মতে উল্লেখিত আয়াতসমূহ তাঁদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে :

وَلَقَدْ دَخَلْنَا مَدْيَنَ وَرَأَيْنَاهُمُ مُّزَوَّجًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَتِيمَ وَالْوَائِلَةَ فَصَلَّى

পরবর্তী আয়াতে আত্মার ভয়ে তাদের ত্রন্দন করা এবং সত্যকে গ্রহণ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তফসীরবিদগণ এ বিষয়েও একমত যে, যদিও আলোচ্য আয়াতসমূহ সম্রাট নাজ্জাশী ও তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধিদল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্ত্বেও ভাষার ব্যাপকতার দরুন অন্যান্য ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ খ্রীষ্টানদের বেলায়ও এ আয়াত প্রযোজ্য। অর্থাৎ, যারা ইসলাম পূর্বকালে ইঞ্জিলের অনুসারী ছিল এবং ইসলামোত্তর কালে ইসলামের অনুসারী হয়ে গেছে।

ইহুদীদের মধ্যেও এ ধরনের কয়েকজন ছিলেন যারা পূর্বে তওরাতের অনুসরণ করতেন এবং ইসলাম আসার পর ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা জাতিসমূহের আলোচনায় অনুল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম ছিল। অবশিষ্ট ইহুদীদের অবস্থা সবারই জ্ঞাত ছিল যে, তারা মুসলমানদের শত্রুতা ও মূলোৎপাটনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। তাই আয়াতের শুরুভাগে ইহুদীদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : لَقَدْ دَخَلْنَا مَدْيَنَ وَرَأَيْنَاهُمُ مُّزَوَّجًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَتِيمَ وَالْوَائِلَةَ فَصَلَّى—অর্থাৎ, মুসলমানদের প্রতি শত্রুতায় ইহুদীরাই সর্বাধিক কঠোর।

মোটকথা, এ আয়াতে খ্রীষ্টানদের একটি বিশেষ দলের গুণকীর্তন করা হয়েছে, যারা ছিল খোদাতীক ও সত্য প্রিয়। নাজ্জাশী ও তাঁর পারিষদবর্গও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য যেসব খ্রীষ্টান এসব গুণের বাহক ছিল কিংবা ভবিষ্যতে হবে, তারাও এ দলেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়াতের অর্থ এই নয় এবং হতেও পারে না যে, খ্রীষ্টান জাতি যতই পথদ্রষ্ট হোক না কেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যতই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ

وَأَذْأَسْمَعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ
تَفْقَهُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا
فَإَكْتَنَاهُمُ الشَّاهِدِينَ ۖ وَمَا لَنَا لَوْ كُنَّا بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ
الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ۝
فَأَنذَرَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَذِي عَجْرٍ مِنْ نَحْتِهِ إِلَى الْأَنْهَارِ
فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْفَاسِقِينَ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۖ وَكُلُوا وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ
أَتَقُولُ اللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۖ لِيَأْخُذَكُمْ اللَّهُ
بِالْعَوْفِ ۖ إِنَّمَا كَانَ لَكُمْ لِكُفَّارَتِكُمْ بِلَاغٌ مِنَ الْإِيمَانِ
فَكَفَّارَةٌ ۚ وَأَطْعَمُ عَشْرَةَ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا نَطْعَمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْفَتَهُمْ أَوْ خَيْرٌ مِمَّا يَشْتَرُونَ لَمْ يَجِدْ فِصَامَ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ لِكُفَّارَتِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يَمَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْيُسْرَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَكَلِمَةٍ شَكُورٍ ۝

(৬৩) আর তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শুনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন; এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে : হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরকেও মন্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন। (৬৪) আমাদের কি শব্দ ধাক্কা দেবে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং এ আশা করবো না যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সং লোকদের সাথে প্রতিষ্ঠা করবেন? (৬৫) অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ্‌ এ উক্তির প্রতিদান স্বরূপ এমন উদ্যান দিবেন যার ভলদেশে নিব্বিরীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তন্মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই সংকমশীলদের প্রতিদান। (৬৬) যারা কাকের হয়েছে এবং আমার নিন্দনাবলীকে মিথ্যা বলেছে, তাইই দোষবী। (৬৭) হে মুমিনগণ, তোমরা ঐসব সুবাদু বস্ত্র হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৬৮) আল্লাহ্‌ তা'আলা যেসব বস্ত্র তোমাদেরকে দিয়েছেন, তন্মধ্যে থেকে হালাল ও পবিত্র বস্ত্র ঋণ এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশুদী। (৬৯) আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে বাধ। অতএব, এর কাফফারা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা, তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা, একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটা কাফফারা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর এমনভাবে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

করুক না কেন সর্বাবস্থায়ই তাদেরকে মুসলমানদের বন্ধু ও হিতৈষী বলে মনে করতে হবে এবং মুসলমানরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে। কেননা, এমন অর্থ করাও নিষিদ্ধ। ভুল এবং ঘটনাবলীর পরিপন্থী। তাই ইমাম আবু বকর জাসসাস আহকামুল কোরআনে বলেন : কিছু সংখ্যক অশ্রু লোকের ধারণা এই যে, এসব আয়াতে সর্বাবস্থায় খ্রীষ্টানদের প্রশংসা কীর্তন করা হয়েছে এবং তারা সর্বতোভাবে ইহুদীদের চাইতে উত্তম। এটি নিরোঁ মুর্থতা। কারণ, সম্ভারণভাবে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস যাচাই করলে দেখা যায়, খ্রীষ্টানদের মুশরিক হওয়াই অধিক সুস্পষ্ট। মুসলমানদের সাথে কাজ-কারবার পরীক্ষা করলে দেখা যায়, কতদূর কালের সামারণ খ্রীষ্টানরাও ইসলাম বিদূষে ইহুদীদের চাইতে পিছিয়ে নেই। তবে এ কথা সত্য যে, এক সময় খ্রীষ্টানদের মধ্যে খোদাতীক ও সত্যপ্রিয় লোকদের প্রাচুর্য ছিল। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণে সম্মত হয়েছে। আলোচ্য আয়াত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা পার্থক্য কুটিয়ে তোলার জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। স্বয়ং এ আয়াতের শেষভাগে কোরআন এ সত্য বর্ণনা করে বলেছে : **ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَتَلُوا** অর্থাৎ, এসব আয়াতে খ্রীষ্টানদের প্রশংসা করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে আলেম, সংসারত্যাগী ও খোদাতীক ব্যক্তিবর্গ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অহঙ্কার নাই যে, অন্যের কথা শুনে সন্মত হবে না। এতে বোঝা গেল যে, ইহুদীদের অবস্থা এমন ছিল না। তারা খোদাতীক ও সত্যপ্রিয় ছিল না। তাদের আলেমরাও সংসারত্যাগের পরিবর্তে স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধিকে শুণ্ডীকৃত-উপার্জনে নিয়োজিত করেছিল এবং সংসারের প্রতি এমন মোহবিষ্ট ছিল যে, সত্যাসত্য ও হালাল-হারামের প্রতিও লক্ষ্যপাত করত না।

সত্যানুরাগী আলেম ও মাশায়েখই জাতির প্রাণকেন্দ্র : আলোচ্য আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল যে, সত্যানুরাগী খোদাতীক আলেম ও মাশায়েখই জাতির আসল প্রাণকেন্দ্র। তাদের অস্তিত্বের মধ্যেই সমগ্র জাতির জীবন নিহিত। যতদিন কোন জাতির মধ্যে এমন আলেম ও মাশায়েখ বিদ্যমান থাকেন, যারা পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী নয় এবং যারা খোদাতীক, ততদিন সে জাতি অব্যাহতভাবে কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে থাকে।

আনুমানিক স্ত্রীত্ব বিষয়

সংসার ত্যাগ খোদাতীক সীমার ভিতরে হলে বৈধ, নতুবা হারাম : উল্লেখিত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, সংসার ত্যাগ ও ভোগ-বিলাস ত্যাগ করা যদিও এক পর্যায়ে প্রশংসনীয়, কিন্তু এতেও আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা নিন্দনীয় ও হারাম। এর বিবরণ নিম্নরূপ :

হালাল বস্ত্রকে হারাম সাব্যস্ত করার তিনটি স্তর : কোন হালাল বস্ত্রকে হারাম করে নেয়ার তিনটি স্তর রয়েছে। (এক) বিশাসগতভাবে হারাম মনে করে নেয়া, (দুই) উক্তির মাধ্যমে কোন বস্ত্রকে নিজের জন্যে হারাম করে নেয়া। উদাহরণতঃ এরূপ প্রতিজ্ঞা করা যে, ঠান্ডা পানি পান করবে না কিংবা অমুক হালাল খাদ্য খাবে না অথবা অমুক জায়েয কাজ করবে না এবং (তিন) বিশ্বাস ও উক্তি কিছুই নয় কিন্তু কার্যতঃ কোন হালাল বস্ত্রকে চিরতরে বর্জন করার সংকল্প করে নেয়া।

প্রথমাবস্থায় যদি ঐ বস্ত্র অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে হালাল হয়ে থাকে, তবে তাকে হারাম বলে যে লোক বিশ্বাস করবে সে আল্লাহর আইনের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণের কারণে কাকের হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়াবস্থায় যদি কসমের শব্দ যোগে হালাল বস্তুটিকে নিজের উপর হারাম করে থাকে, তবে কসম শুদ্ধ হবে। কসমের শব্দ অনেক, যা ফেকাহ গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখিত রয়েছে। উদাহরণতঃ কেউ এরূপ বলে যে, আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, অমুক বস্তু খাব না কিংবা অমুক কাজ করব না অথবা এরূপ বলে যে, আমি অমুক বস্তু কিংবা অমুক কাজকে নিজের উপর হারাম করছি। বিনা প্রয়োজনে এরূপ কসম খাওয়া গোনাহ। কিন্তু এরূপ কসম ভঙ্গ করলে তার কাফকারা দেয়া জরুরী। কাফকারার বিবরণ পরে বর্ণিত হবে।

তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ, বিশৃঙ্খল ও উক্তি দ্বারা কোন হালালকে হারাম না করে কার্যতঃ হারামের মত ব্যবহার করলে যদি এরূপ বর্জনকে ছোয়াবের কাজ মনে করে, তবে তা বেদআত এবং বৈরাগ্য বা সৎসারত্যাগ। এরূপ বৈরাগ্য যে মহাপাপ তা কোরআনের স্পষ্ট আয়াতে বর্ণিত আছে। এর বিরুদ্ধাচরণ করা গুনাহ এবং এরূপ বিধিনিষেধে অটল থাকা গোনাহ। তবে এরূপ বিধিনিষেধ ছোয়াবের নিয়তে না হয়ে অন্য কোন কারণে যথা, কোন দৈহিক কিংবা আত্মিক অসুস্থতার কারণে কোন বিশেষ বস্তুকে স্থায়ীভাবে বর্জন করলে তাতে গোনাহ নেই। কোন কোন সুকী-বুয়ুর্গ হালাল বস্তু স্থায়ীভাবে বর্জন করেছেন বলে যেসব ঘটনা বর্ণিত আছে, তা এমনি ধরনের বর্জনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা এসব বস্তুকে স্বীয় নফসের জন্যে ক্ষতিকর মনে করেছেন কিংবা কোন বুয়ুর্গ ক্ষতিকর বলেছেন। তাই প্রতিকারার্থ তা বর্জন করেছেন। এতে কোন দোষ নেই।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে :

وَلَا تَقْسُوا زَيْنَ اللَّهِ لَا يَحِبُّ الْمُقْسُونَ - অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা

কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা না। কেননা, আল্লাহ তাআলা সীমাতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, কোন হালাল বস্তুকে বিনা গুণের ছোয়াব মনে করে বর্জন করা। অজ্ঞ ব্যক্তি একে তাকওয়া তথা খোদাভীরুতা মনে করে। অথচ আল্লাহর কাছে এটা সীমাতিক্রম ও অবৈধ। তাই দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ - অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যে পবিত্র ও হালাল বস্তু তোমাদেরকে দিয়েছেন, তা খাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমাদের বিশৃঙ্খল রয়েছে।

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হালাল ও পবিত্র বস্তুকে ছোয়াব মনে করে বর্জন করা তাকওয়া নয়, বরং আল্লাহর নেয়ামত মনে করে ব্যবহার করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মধ্যেই তাকওয়া নিহিত। হুঁ, কোন দৈহিক ও আত্মিক রোগের প্রতিকারার্থে কোন বস্তু বর্জন করলে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

শপথের কয়েকটি প্রকার ও তার বিধান : আলোচ্য আয়াতে শপথের কয়েকটি প্রকার বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সূরা-বাকারায়ও বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোর সারকথা এই যে, যদি অজীত ঘটনা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা হয়, তবে ফেকাহবিদদের পরিভাষায় এরূপ শপথকে 'এয়ামীনে গুমুস' বলা হয়। উদাহরণতঃ কেউ একটি কাজ করে ফেলল এবং সে জানে যে, এ কাজটি সে করেছে। এরপর সে জেনেগুনে শপথ করে যে, সে কাজটি করেনি। মিথ্যা শপথ কবীরা গোনাহ এবং ইহকাল ও পরকালে শাস্তির কারণ। কিন্তু এর জন্যে কোনরূপ কাফকারা গুনাহেব হয় না- তওবা ও এন্তেগফার করা জরুরী।

এ কারণেই একে পরিভাষায় 'এয়ামীনে গুমুস' বলা হয়। কেননা, তুমুল অর্থ, যে ভুবিয়ে দেয়। এ শপথ শপথকারীকে গোনাহ ও শাস্তিতে ডুবিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, নিজ ধারণায় সত্য মনে করে কোন অজীত ঘটনা সম্পর্কে শপথ করা; কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হয়। উদাহরণতঃ কোন সূত্রে জানা গেল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এর উপর নির্ভর করে কেউ শপথ করল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এরপর দেখ গেল যে, এটা বাস্তবের বিপরীত। এরূপ শপথকে 'এয়ামীনে লগুত' বলা হয়। এরূপ শপথে গোনাহ নেই এবং কাফকারাও দিতে হয় না।

তৃতীয় প্রকার এই যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার শপথ করা। এরূপ শপথকে 'এয়ামীনে মুনআকদা' বলা হয়। এ শপথ ভঙ্গ করলে কাফকারা গুনাহেব হয়। তবে কোন কোন অবস্থায় গোনাহ হয়, কিন্তু কোন কোন অবস্থায় গোনাহ হয় না।

এস্থলে কোরআন পাকের উল্লেখিত আয়াতে লগুত বলে বাহ্যতঃ এমন শপথকেই বোঝানো হয়েছে, যাতে কাফকারা নেই; গোনাহ হোক বা না হোক। কেননা, এর বিপরীতে عَمْدًا الْاِثْمَان - উল্লেখিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানে পাকড়াও করার অর্থ জাগতিকভাবে পাকড়াও, যা কাফকারার আকারে হয়।

সূরা বাকারার আয়াতে বলা হয়েছে :

لَا يَزِيدُكُمْ إِلَّا عِثْرَةً لِلْعُقُوبَةِ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِطَغْوَةٍ
يَا كَيْفَ تُلَوِّكُمُ

এখানে لغو বলে ঐ শপথকে বোঝানো হয়েছে, যা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে কিংবা কেউ নিজ ধারণায় সত্য মনে করে শপথ করে, কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হয়। এর বিপরীতে ঐ শপথ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলা হয়। একে 'এয়ামীনে গুমুস' বলা হয়। অতএব, এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, এয়ামীনে লগুতে গোনাহ নেই- 'এয়ামীনে গুমুসে' গোনাহ আছে, যাতে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা হয়। সূরা-বাকারায় পারলৌকিক গোনাহ বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা-মায়দার আলোচ্য আয়াতে জাগতিক নির্দেশ অর্থাৎ, কাফকারা বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, এয়ামীনে লগুতের জন্যে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না- অর্থাৎ, কাফকারা গুনাহেব করেন না, বরং কাফকারা শুধু ঐ শপথের জন্যেই গুনাহেব করেন যা ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করা সম্পর্কে করা হয় এবং অতঃপর তা ভঙ্গ করা হয়। এরপর কাফকারার বিস্তারিত বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

فَكَفَّارَتُهُ أَطْعَامُ سِتْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْطَوْنَ
أُولَئِكَ أَوْسَطُكُمْ أَوْسَطُكُمْ رَقِيَّةً

অর্থাৎ, তিনটি কাজের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় যে কোন একটি কাজ করতে হবে : (এক) দশ জন দরিদ্রকে মধ্যমশ্রেণীর খাদ্য সকাল-বিকাল দু'বেলা খাওয়াতে হবে কিংবা (দুই) দশ জন দরিদ্রকে 'সতর ঢাকা' পরিমাণ পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে। উদাহরণতঃ একটি পাছামা অথবা একটি লুঙ্গি অথবা একটি লম্বা কোর্তা কিংবা (৩) কোন গোলাম মুক্ত করতে হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلَمَّا الْخَمْرُ وَالْبَيْسُ وَالْإِنْسَابُ ۖ وَالَّذِينَ
رَجَسَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا عَنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ إِنَّمَا
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْبَيْسِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاعْبُدُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُ الْكَا
فِرِينَ ۚ رُسُلُنَا الْبَالِغُ الْأُمِّيُّنَ ۝ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
تَتَرَكُوا ۚ وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا ۚ وَأَحْسَنُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَأْكُلْ آلُكُمْ آلَتُهُمْ شَيْءٌ مِمَّنْ الصَّيْدِ تَتَّالِي أَيْدِيكُمْ
وَمَا حُلِمَ لَكُمْ ۚ يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ عِثَابِهِ بِالْعَذِيبِ ۚ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِمَّا قَتَلَ مِنْ النَّعِيمِ
يَكْفُرُ بِهِ ذَوْعًا لِيٍّ مِنْهُ هَذِيءٌ أَلِيَّةٌ لَعْنَةُ الْكُفَّةِ ۚ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعْمُ
مَسْكِينٍ ۚ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكُمْ صِيَامًا ۚ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَقَابِ اللَّهِ
عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ يَكْتَسِبْ لَكَ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

‘আযলাম’-এর ব্যাখ্যা : এ চার বস্তুর মধ্যে اِزْلَام অন্যতম। এটি زِلْم-এর বহুবচন। আযলাম এমন শরকে বলা হয়, যদ্বারা আরবে ভাগ্যনির্ণায়ী জুয়া খেলার প্রথা প্রচলিত ছিল। দশ ব্যক্তি শরীক হয়ে

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَافَةِ وَحُرْمٌ
 عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مِمَّا دَمَّتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
 تُحْشَرُونَ ۝ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَتِيمَ الْيَتِيمَ الْحَرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ
 وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لْتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ ۝ إِنْ عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ ۝ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
 وَمَا تَكْتُمُونَ ۝ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ
 أَغْبَيْتُ كَثْرَةَ نُفُوسِكُمُ الْخَبِيثُ قَاتِلُوا اللَّهَ يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
 تَتْلِحُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ
 بُدِّدَ لَكُمْ سُؤْلُكُمْ وَإِنْ سَأَلُوا عَنْهَا جَبْنَ بَرُّ الْقُرْآنِ بُدِّدَ
 لَكُمْ عَمَّا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ
 مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ۝ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ
 بَيِّنَةٍ وَلَا سَلِيمَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
 يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَذَلِكَ هُمْ كَافِرُونَ ۝

(৯৬) তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে এবং তোমাদের এহরাম অবস্থায় থাকে। আল্লাহকে ভয় কর, যার কাছে তোমরা একত্রিত হবে। (৯৭) আল্লাহ সন্মানিত গৃহ কাঁ বাকে মানুষের স্বীতিশীলতার কারণ করেছেন এবং সন্মানিত মাসসমূহকে, হারাম কোরবানীর জন্তকে ও যাদের গলায় আবরণ রয়েছে। এর কারণ এই যে, যাতে তোমরা জেনে নাও যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু জানেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (৯৮) জেনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা ও নিশ্চয় আল্লাহ কমাশীল-দয়ালু। (৯৯) রসুলের দায়িত্ব শুণু পৌছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ্যে কর এবং যা কিছু গোপনে কর। (১০০) বলে দিন : অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিম্বিত করে। অতএব, হে মুক্তিমানগণ, আল্লাহকে ভয় কর-যাতে তোমরা মুক্তি পাও। (১০১) হে মুমিনগণ, এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। যদি কোরআন অবতরণকালে তোমরা এসব বিষয় জিজ্ঞেস কর, তবে তা তোমাদের জন্যে প্রকাশ করা হবে। অতীত বিষয় আল্লাহ কমা করেছেন আল্লাহ কমাশীল, সহনশীল। (১০২) এরূপ কথাবার্তা তোমাদের পূর্বে এক সম্ভ্রমায় জিজ্ঞেস করেছিল। এরপর তারা এসব বিষয়ে অবিশ্বাসী হয়ে পেল। (১০৩) আল্লাহ 'বহিরা', 'সায়েরা', 'ওসীলা' এবং 'হামী' কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। কিন্তু যারা কাকের, তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তাদের অধিকাংশেরই বিবেক বুদ্ধি নেই।

একটি উট যবাই করত। অতঃপর এর মাংস সমান দশ ভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তা দ্বারা জুয়া খেলা হত। দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন অংশে চিহ্ন অবিকৃত থাকত। কোনটিতে এক এবং কোনটিতে দুই বা তিন অংশে অঙ্কিত থাকত। অবশিষ্ট তিনটি শর অংশবিহীন সাদা থাকত। এ শরগুলোকে ত্বনের মধ্যে রেখে খুব নাড়াচাড়া করে নিয়ে একে অংশীদারের জন্যে একটি শর বের করা হত। যত অংশবিশিষ্ট শর যার নামে বের হত, সে তত অংশের অধিকারী হত এবং যার নামে অংশবিহীন শর হত, সে বঞ্চিত হত। আজকাল এ ধরনের অনেক নটরী বাজার প্রচলিত আছে। এগুলোও জুয়া এবং হারাম।

নটরীর জরায়ব প্রকার : এক প্রকার নটরী জরায়ব এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে। তা এই যে, অধিকার সবার সমান এক অংশও সমান বন্টন করা হয়েছে। এখন কার অংশ কোনটি, তা নটরীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায়। উদাহরণতঃ একটি গৃহ চার জন অংশীদারের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এখন মূল্যের দিক দিয়ে গৃহটিকে সমান চার ভাগে ভাগ করতে হবে। অতঃপর কে কোন ভাগ নিবে, তা যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট করা সম্ভব না হয়, তবে নটরীর মাধ্যমে যার নামে যে অংশ আসে, তা তাকে দেয়াও জায়েয। অথবা মনে করুন, কোন একটি বস্তুর প্রার্থী এক হাজার জন এবং সবার অধিকারও সমান। কিন্তু যে বস্তুটি ভাগ করতে হবে, তা সর্বমোট একশটি। এ ক্ষেত্রেও নটরীযোগে মীমাংসা করা যায়।

মাসআলা : হরমের সীমার ভেতরে এহরাম অবস্থায় যেসব শিকার হারাম, তা বাধ্য জাতীয় অর্থাৎ, হালাল জন্ত হোক কিংবা অবাধ্য অর্থাৎ হারাম জন্ত হোক সবাই হারাম।

* বন্য জন্তকে শিকার বলা হয়, যেগুলো প্রকৃতিগতভাবে মানুষের কাছে থাকে না। সুতরাং যেসব জন্ত সৃষ্টিগতভাবে গৃহশালিত, যেমন ভেড়া, ছাগল, গরু, উট এগুলো যবাই করা এবং খাওয়া জায়েয।

আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয়

* তবে যেসব জন্ত দলীলের ভিত্তিতে ব্যতিক্রমধর্মী, সেগুলোকে ধরা এবং বদ করা হালাল। যেমন, সামুদ্রিক জন্ত শিকার। দলীল এই :

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ (তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে।) কিছুসংখ্যক স্থলভাগের জন্ত, যেমন-কাক, চিল, বাঘ, সাপ, বিছু, পাগলা কুকুর-প্রভৃতি বধ করা হালাল। এমনভাবে যে হিংস্র জন্ত নিজে আক্রমণ করে, সেটিকে বধ করাও হালাল। হাদীসে এগুলোর ব্যতিক্রম উল্লেখিত হয়েছে।

* যে হালাল জন্ত এহরাম হাড়া অবস্থায় এবং হরমের বাইরে শিকার করা হয়, এহরামওয়ালা ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়া জায়েয। যদি সে জন্তকে শিকার করা ও বধ করার কাছে সে নিজে সহায়ক কিংবা পরামর্শদাতা কিংবা জন্তের প্রতি ইঙ্গিতকারী না হয়। হাদীসে তাই বলা হয়েছে এক আয়াতের (لَقَدْ كُنْتُمْ أَشْهُارًا لَا تَعْلَمُونَ) শব্দেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, আয়াতে (لَقَدْ كُنْتُمْ أَشْهُارًا لَا تَعْلَمُونَ) (বধ করো না) বলা হয়েছে- (لَقَدْ كُنْتُمْ أَشْهُارًا لَا تَعْلَمُونَ) (খবো না) বলা হয়নি।

* হরমের এলাকায় প্রাপ্ত শিকারকে জেনে শুনে বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজেব হয়, তেমনিভাবে ভুলক্রমে বা অজান্তে বধ করলেও বিনিময় ওয়াজেব (রুকুল-মা'আনী)

• প্রথম বার বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজেব, এমনিভাবে দ্বিতীয়-তৃতীয় বার বধ করলেও বিনিময় ওয়াজেব।

• বিনিময়ের সারমর্ম এই যে, যে সময়ে এবং যে স্থানে জন্তকে বধ করা হয়, উত্তম এই যে, দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা (একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারাও জায়েয) জন্তর মূল্য অনুমান করাতে হবে। যদি ক্ষিত জন্ত খাবার আযোগ্য (অর্থাৎ, হারাম) হয়, তবে এর মূল্য একটি মূল্যের মূল্যের চাইতে বেশী ওয়াজেব হবে না। আর যদি জন্তটি ধারযোগ্য (অর্থাৎ, হালাল) হয়, তবে যে পরিমাণ মূল্য অনুমান করা হবে, তাই ওয়াজেব হবে। উভয় অবস্থায় পরবর্তীতে তিনটি কাজের মধ্য থেকে সে যেকোন একটি করতে পারে। হয় এ মূল্যের দ্বারা কোরবানীর শর্তনুযায়ী কোন জন্ত ক্রয় করে হেরেমের সীমানার ভিতরে তা জবাই করে মাৎস ফকিরদের মধ্যে বন্টন করে দিবে, না হয় এ মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্যশস্য ক্ষেতরার শর্তনুযায়ী প্রতি মিসকীনকে অর্ধ ছা' হিসেবে দান করে দিবে এবং না হয় সে খাদ্যশস্য অর্ধ ছা' হিসেবে যতজনকে দেয়া যেত ততসংখ্যক রোযা রাখবে। খাদ্যশস্য বন্টন এবং রোযা রাখা হেরেমের ভিতরে হওয়া শর্ত নয়। যদি অনুমানকৃত মূল্য অর্ধ ছা' থেকেও কম হয়, তবে ইচ্ছা করলে তা একজন ফকিরকে দিয়ে দিতে পারবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি রোযা রাখতে পারবে। এমনিভাবে প্রতি মিসকীনকে অর্ধ ছা' হিসেবে দেয়ার পর যদি অর্ধ ছা' থেকে কম অবশিষ্ট থাকে, তবুও ইচ্ছা করলে তা এক মিসকীনকে দিয়ে দিবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি রোযা রাখবে। আমাদের দেশে প্রচলিত ওজন অনুযায়ী অর্ধ ছা' পোশে দুই সেরের সমান।

• উল্লিখিত অনুমানে যতজন মিসকিনের অংশ সাব্যস্ত হয়, যদি তাদেরকে দু'বেলা পেটভরে আহার করিয়ে দেয়, তবে তাও জায়েয।

• যদি এ মূল্য দিয়ে যবেহ করার জন্যে জন্ত ক্রয় করার পর কিছু টাকা উদ্ধৃত হয়, তবে উদ্ধৃত টাকা দিয়ে ইচ্ছা করলে অন্য জন্ত ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্য ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্যের হিসেবে রোযা রাখতে পারবে। জন্ত বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজেব হয়, তেমনিভাবে জন্তকে আহত করলেও অনুমান করাতে হবে যে, এ আঘাতের ফলে জন্তটির কতটুকু মূল্য হ্রাস পেয়েছে। অতঃপর হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য দিয়ে পূর্বোক্ত তিনটি কাজের যে কোন একটি কাজ করা জায়েয হবে।

• এহরাম বাধা ব্যক্তির পক্ষে যে জন্ত শিকার করা হারাম সেই জন্তকে যবেহ করাও হারাম। তার যবেহকৃত জীবটি মৃত বলে গণ্য হবে। (كَفَرُوا) বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এহরাম বাধা ব্যক্তির পক্ষে যবেহ করা বধ করারই অনুরূপ।

• যদি কোন অনাবাদী জায়গায় জন্ত বধ করা হয়, তবে নিকটতম জনবসতির বাজার দর হিসাবে মূল্য অনুমান করতে হবে।

• শিকার কাজের জন্য ইঙ্গিত-ইশারা করা, বলে দেয়া এবং সাহায্য করাও শিকার করার মতই হারাম।

শান্তির চারটি উপায় : প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা চারটি বস্তুকে মানুষের প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও শান্তির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ কা' বা। আরবী ভাষায় কা' বা চতুষ্কোণবিশিষ্ট গৃহকে বলা হয়। আরবে খাছুআম গোত্রের নির্মিত অপর একটি গৃহও এ নামে খ্যাত ছিল। সে গৃহকে 'কা' বা এমানিয়াহ' বলা হত। তাই বায়তুল্লাহকে সে কা' বা থেকে স্বতন্ত্র করে বোঝাবার জন্যে কা' বা শব্দের সাথে

الْبَيْتِ الْحَرَامِ শব্দ যোগ করা হয়েছে।

اسم مصدر قوام ও قیام এর অর্থ এই সব বস্তু, যার উপর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। তাই قِيَامُ الْكَائِنَاتِ - এর অর্থ হবে এই যে, কা' বা ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহ মানুষের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের কারণ এবং উপায়।

ناس শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এক্ষেত্রে স্থানের ইঙ্গিতে বিশেষভাবে মক্কার লোকজন কিংবা আরববাসী কিংবা সমগ্র বিশ্বের মানুষকেও বোঝা যেতে পারে। বাহ্যতঃ সমগ্র বিশ্বের মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে মক্কা ও আরববাসীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাজেই আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা কা' বা তথা বায়তুল্লাহকে এবং পরবর্তীতে উল্লিখিত আরও কতিপয় বস্তুকে সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপায় করে দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত জগতের প্রতিটি দেশ ও অঞ্চলের মানুষ বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে থাকবে এবং হজ্জ্বত পালন করতে থাকবে, অর্থাৎ, যাদের উপর হজ্জ ফরয, তারা হজ্জ করতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত থাকবে। পক্ষান্তরে যদি এক বছরকালও কেউ হজ্জ্বত পালন না করে কিংবা বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে কেউ নামায আদায় না করে, তবে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপক আযাব নেমে আসবে।

কা' বা সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ : এ বিষয়বস্তুটি তফসীরবিদ হযরত আতা (রহঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন :
খানায়-কা' বা সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ। যতদিন এর দিকে মুখ করা হবে এবং হজ্জ পালিত হতে থাকবে, ততদিনই জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি কোন সময় বায়তুল্লাহর এ সম্মান বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে বিশ্বকেও বিলীন করে দেয়া হবে। বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও বায়তুল্লাহর মাঝে যে যোগসূত্র রয়েছে, তার স্বরূপ জানা জরুরী নয়। যেমন, চুম্বক লোহা এবং বিশেষ প্রকারের আঠা ও ষড়-কুটোর পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ কেউ জানে না। কিন্তু এটি এমন একটি বাস্তব সত্য, যা চোখেই দেখা যায়; কেউ একে অস্বীকার করতে পারে না। বায়তুল্লাহর ও বিশ্ব-ব্যবস্থাপনার পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের সাধ্যাতীত। বিশ্ব-স্রষ্টার বর্ণনার মাধ্যমেই তা জানা যায়। বায়তুল্লাহর সমগ্র বিশ্বের স্থায়িত্বের কারণ হওয়া এটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বহিঃক দৃষ্টি তা অনুভব করতে পারে না, কিন্তু আরব ও মক্কাবাসীদের জন্য এটি যে শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ, তা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষ জ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত।

বায়তুল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্ব-শান্তির কারণ : সাধারণতঃ বিশ্বে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব কারণে ডাকাত চোর, হত্যা ও লুণ্ঠনকারীরা দুঃসাহস করতে পারে না। কিন্তু জাহেলিয়াত যুগের আরবে কোন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিংবা জন-নিরাপত্তার জন্যে কোন নিয়মিত আইনও প্রচলিত ছিল না। গোত্রীয় কাঠামোতেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক গোত্র অন্য গোত্রের জ্ঞান-মাল ও মান-সম্ভ্রমের উপর যখন ইচ্ছা আক্রমণ করতে পারত। কাজেই কোন গোত্রের পক্ষে কখনও শান্তি ও নিরাপত্তার সুযোগ ছিল না। আল্লাহ তাআলার স্বীয় পরিপূর্ণ কুদরতের বলে মক্কার বায়তুল্লাহকে রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করে শান্তির উপায় করে দেন। রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার মত ধৃষ্টতা যেমন, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি করতে পারে না, বায়তুল্লাহ শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার সাহসও তেমনিভাবে কেউ করতে পারত না। আল্লাহ তাআলা জাহেলিয়াত যুগে বায়তুল্লাহ শরীফের সম্মান ও মাহাত্ম্য

সাধারণ মানুষের অন্তরে এমনভাবে সংস্থাপিত করে দেন যে, তারা এর প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্যে যাবতীয় তাবাবেগ ও প্রবৃত্তিকে বর্জন করতেও কৃষ্টিত হত না।

সে যুগের আরবদের রগোনাদনা ও গোত্রগত বিদ্বেষ সারা বিশ্বের প্রবাদবাক্যের মত খ্যাত ছিল। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে বায়তুল্লাহ্ ও তার আনুষঙ্গিক বস্ত্রসামগ্রীর সম্মান ও মাহাত্ম্য এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে, প্রাণের খোরতর শত্রু কিংবা কঠোরতম অপরাধীও যদি একবার হারাম শরীফের সীমানায় আশ্রয় নিতে পারত, তবে তার সাত খুন মাফ হয়ে যেত। তারা তীব্র দুঃখ ও ক্রোধ সত্ত্বেও তাকে কিছুই বলত না। হেরেমের অভ্যন্তরে পিতৃহত্যাকে চোখের সামনে দেখেও তারা চক্ষু নত করে চলে যেত।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি হজ্জ ও ওমরার নিয়তে বাড়ী থেকে বের হত কিংবা যে জন্তু হারাম শরীফে কোরবানীর জন্যে আনা হত, তার প্রতিও আরবরা সম্মান প্রদর্শন করত এবং কোন অতি মন্দ ব্যক্তিও এর ক্রটি করত না। হজ্জ ও ওমরার কোন লক্ষণ কিংবা কঠাভরণ বাধা অবস্থায় কোন প্রাণের শত্রুকেও তারা কিছুই বলত না।

ষষ্ঠ হিজরীতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) একদল সাহাবায়ে কেরামকে সাথে করে ওমরার এহরাম বেখে বায়তুল্লাহর উদ্দেশে রওয়ানা হন। হেরেম শরীফের সীমানার সন্নিকটে হোদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যাত্রাবিরতি করেন এবং হযরত ওছমান (রাঃ)-কে কয়েকজন সঙ্গীসহ মক্কায় পাঠিয়ে দেন, যাতে তাঁরা মক্কার সর্দারদেরকে বলে দেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধের নিয়তে নয়-ওমরা আদায় করার জন্যে এসেছেন। কাজেই তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত হবে না।

মোটকথা, জাহেলিয়াত যুগেও আল্লাহ্ তাআলা আরবদের মনে হারাম শরীফের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত ছিল; এ সম্মানের ফলশ্রুতিতে শুধু হারাম শরীফের ভেতরে যাতায়াতকারী লোকজন এবং বিশেষ চিহ্ন পরিহিত অবস্থায় হজ্জ ও ওমরার জন্যে আগমনকারীরা নিরাপদ হয়ে যেত বটে, কিন্তু বহির্বিশ্বের লোকজন এদ্বারা কোন উপকার, শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারত না। কিন্তু আরবে যেভাবে বায়তুল্লাহ্ ও হারাম শরীফের সম্মান ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হতো, তেমনিভাবে হজ্জের মাসগুলোর প্রতিও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হত। আরবরা এ মাসগুলোকে ‘আশহুরে হুক্রম’ বা সম্মানিত মাস বলত। কেউ কেউ এগুলোর সাথে রজব মাসকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। এসব মাসে হেরেমের বাইরে যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকেও আরবরা হারাম মনে করত এবং এ থেকে সযত্নে বেঁচে থাকত।

এ কারণে কোরআন পাক মানুষের স্থায়িত্বের উপায় হিসেবে কা’বার সাথে আরও তিনটি বস্তুর উল্লেখ করেছে : প্রথমতঃ **الشَّهْرَ الْحَرَامَ** অর্থাৎ, সম্মান ও মহত্বের মাস। এখানে **شهر** শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেছেন যে, এখানে **حرام** বলে জিলহজ্জ মাসকে বোঝানো হয়েছে। এমাসেই হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, শব্দটি একবচন হলেও অর্থের দিক দিয়ে হওয়ার কারণে অন্যান্য সম্মানিত মাসও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় বস্তু হচ্ছে **هَدًى** হারাম শরীফে যে জন্তুকে কোরবানী করা হয়, তাকে **هَدًى** বলা হয়। যে ব্যক্তির সাথে এরূপ জন্তু থাকত, সে নির্বিবাদে পথ চলতে পারত; তাকে কেউ কিছু বলত না। এভাবে কোরবানীর জন্তুও

ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম উপায়।

তৃতীয় বস্তু **قِلَادَة** এটি **قِلَادَة** শব্দের বহুবচন। এর অর্থ, গলার হার। জাহেলিয়াত যুগের আরবে প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কেউ হজ্জের উদ্দেশে বের হলে চিহ্নস্বরূপ গলায় একটি হার পরে নিত - যাতে একে দেখে সবাই বুঝতে পারে যে, লোকটি হজ্জ করতে যাচ্ছে, ফলে কেউ যেন তাকে কোন কষ্ট না দেয়। কোরবানীর জন্তুর গলায়ও এধরনের হার পরিয়ে দেয়া হত। এসব হারকেও **قِلَادَة** বলা হয়। এ কারণে **قِلَادَة** ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হয়ে যায়।

চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, সম্মানিত মাসসমূহ, কোরবানীর জন্তু এবং গলার হার এ তিনটি বস্তুই-বায়তুল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এদের সম্মানও বায়তুল্লাহর সম্মানেরই একেকটি অংশ। সারকথা এই যে, বায়তুল্লাহ্ ও তৎসম্পর্কিত বস্ত্রসমূহকে আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র বিশ্বমানবের জন্যে সাধারণভাবে এবং আরব ও মক্কাবাসীদের জন্যে বিশেষভাবে স্থায়িত্বের উপায় করে দিয়েছেন।

قِيَامُ اللَّيْلِ এর ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন, এর অর্থ এই যে, বায়তুল্লাহ্ ও হারামকে সবার জন্যে শান্তির আবাসস্থল করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে মক্কাবাসীদের জন্যে রুমি-রোযাগারের সুবিধা দান। কেননা, এখানে কোন কিছু উৎপন্ন হয় না, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা সারা বিশ্বের জিনিসপত্র এখানে পৌঁছিয়ে দেন।

কেউ বলেন, মক্কাবাসীরা যেহেতু কা’বা গৃহের খাদেম ও সন্ত্রস্তক বলৈ পরিচিত ছিল, তাই তাদেরকে আল্লাহ্ তত্ত্ব মনে করে সর্বদা মানুষ তাদের সম্মান করত। **قِيَامُ اللَّيْلِ** বাক্যে তাদের এ বিশেষ সম্মানকেই বোঝানো হয়েছে।

ইমাম আবদুল্লাহ্ রাযী (রাঃ) বলেন, এসব উক্তির মধ্যে কোনরূপ বৈপরীত্য নেই। এসবগুলোই উপরোক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা বায়তুল্লাহ্কে সব মানুষের স্থায়িত্ব, ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সাফল্যের উপায় করেছেন এবং আরব ও মক্কাবাসীদেরকে বিশেষভাবে এর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ মঙ্গল ও বরকত দ্বারা ভূষিত করেছেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে :

ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَأْمِنُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَنَافِيَ السُّبُوتِ وَمَنَافِيَ الْأَرْضِ
وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থাৎ, আমি বায়তুল্লাহ্ ও তৎসম্পর্কিত বস্ত্রসমূহকে মানুষের জন্যে স্থায়িত্ব, শান্তি ও নিরাপত্তার উপায় করেছি। আরববাসীরা বিশেষভাবে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে। এটা এজন্যে বলা হয়েছে যাতে সবাই জেনে নেয় যে, আল্লাহ্ তাআলা ভূমণ্ডল ও নেভামণ্ডলের যাবতীয় বিষয় যথাযথভাবে জানেন এবং তিনিই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে পারেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে :

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থাৎ, জেনো, আল্লাহ্ তাআলা কঠোর শাস্তিদাতা এবং আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। এতে বলা হয়েছে যে, হালাল ও হারামের যেসব বিধান দেয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত উপযোগী। এগুলো পালন করার মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত। পক্ষান্তরে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণ

করা কঠোর শাস্তির কারণ। সাথে সাথে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, দ্বিতীয় জুল্লাহী ও উদাসীনের কারণে কোন গোনাহ হয়ে গেলে আল্লাহ জালাল তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না, বরং তওবাকারী-অনুতপ্ত লোকদের জন্যে ক্রমার দ্বারও উন্মুক্ত রাখেন।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে :

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَمَا تَشَاءُونَ

- অর্থাৎ, আমার রসুলের দায়িত্ব এতটুকই যে, তিনি আমার নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌঁছে দিবেন। এরপর তা মানা না মানার লাভ ও ক্ষতি তারাই ভোগ করবে; তারা না মানলে আমার রসুলের কোনই ক্ষতি নেই। একথাও জেনো যে, আল্লাহ তাআলাকে ধোকা দেয়া যাবে না। তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে :

قُلْ لَا يَسْمَعُونِي الْخَبِيثَاتُ وَالْخَبِيثَاتُ شَرُّ الْبَرِّ

আরবী ভাষায় খাবিথ ও খাবিথ দু'টি বিপরীত শব্দ। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বস্তুকে খাবিথ এবং প্রত্যেক নিকৃষ্ট বস্তুকে খাবিথ বলা হয়। আয়াতে অধিকাংশ জফরীরবিদের মতে খাবিথ শব্দ দ্বারা হারাম ও অপবিত্র এবং খাবিথ শব্দ দ্বারা হালাল ও পবিত্র বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে বরং প্রত্যেক সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের দৃষ্টিতেও পবিত্র ও অপবিত্র এবং হালাল ও হারাম সমান হতে পারে না।

এক্ষেত্রে খাবিথ ও খাবিথ শব্দ দু'টি স্বীয় ব্যাপকতার দিক দিয়ে হালাল ও হারাম অর্থ-সম্পদ, উত্তম ও অধম মানুষ এবং ভাল ও মন্দ কাজ-কর্ম ও চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কোন সুস্থ বিবেকবানের দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ এবং ভাল ও মন্দ সমান নয়। এ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার কাছে হালাল ও হারাম কিংবা পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। এমনভাবে ভাল ও মন্দ কাজ-কর্ম ও চরিত্র এবং সৎ ও অসৎ লোকও সমান নয়।

অতঃপর বলা হয়েছে : وَلَوْ أَنِ جِبْرَائِيلُ ذُكِّرَهُ بِالْحَقِّ لَعَسَا يَهْتَكِرَ فِيهِ

যায়ে যায়ে মন্দ ও অনুৎকৃষ্ট বস্তুর প্রাদুর্ভূত দর্শকদেরকে বিস্মিত করে দেয় এবং আশ-পাশে মন্দ ও অপবিত্র বস্তুর ব্যাপক প্রসারের কারণে সেগুলোকেই ভাল বলে মনে করতে থাকে, কিন্তু আসলে এটি মানুষের অবচেতন মনের একটি রোগ এবং অনুভূতির ত্রুটি বিশেষ।

অনাবশ্যক প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ : আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক খোদায়ী বিধি-বিধানের অনাবশ্যক চুলচেরা খঁটাখঁটি করতে আগ্রহী হয়ে থাকে এবং যেসব বিধান দেয়া হয়নি, সেগুলো নিয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলতে থাকে। আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন এরূপ প্রশ্ন না করে, যার ফলশ্রুতিতে তারা কষ্টে পতিত হবে কিংবা গোপন রহস্য ফাঁস হওয়ার কারণে অপমানিত ও লাঞ্চিত হবে।

শানে মুঘল : মুসলিমের রেওয়াজে অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে-মুঘল এই যে, যখন হজ্জ ফরয হওয়া সম্পর্কিত আদেশ অবতীর্ণ হয়, তখন আ'করা ইবনে হাবেস (রাঃ) প্রশ্ন করলেন : ইয়া রসুলুল্লাহ আমাদের জন্যে কি প্রতি বছরই হজ্জ করা ফরয? রসুলুল্লাহ (সাঃ) এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। প্রশ্নকারী পুনর্বার প্রশ্ন করলেন। তিনি তবুও চুপ। প্রশ্নকারী তৃতীয় বার প্রশ্ন করলে তিনি শাসনের সূত্র বললেন : যদি আমি তোমার উত্তরে বলে দিতাম যে, হ্যাঁ, প্রতি বছরই হজ্জ ফরয, তবে তাই হয়ে যেত। কিন্তু তুমি এ আদেশ পালন করতে

পারতে না। অতঃপর তিনি বললেন : যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দেই না, সেগুলোকে সেভাবেই থাকতে দিও-খাঁটাখাঁটি করে প্রশ্ন করো না। তোমাদের পূর্বে কোন কোন উম্মত বেশী প্রশ্ন করেছে ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ ও রসুল যেসব বিষয় ফরয করেননি, তারা প্রশ্ন করে সেগুলোকে ফরয করিয়ে নিয়েছিল এবং পরে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছিল। আমি যে কাজের আদেশ দেই, সাধ্যানুযায়ী তা পালন করা এবং যে কাজে নিষেধ করি, তা পরিত্যাগ করাই তোমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত। (অর্থাৎ, যেসব বিষয়ে আমি নীবর থাকি, সেগুলো নিয়ে খাঁটাখাঁটি করবে না)।

মহানবী (সাঃ)-এর পর নবুওয়ত ও ওহী আগমনের সমাপ্তি : এ আয়াতে একটি প্রাসঙ্গিক বাক্যে বলা হয়েছে : وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ خَيْرَ الْيَوْمِ بِمَا آتَاهُمُ الرَّسُولُ لَيَقُولُنَّ يَوْمَ أُفِرَ الْفَرْقَانِ

অর্থাৎ, কোরআন অবতরণকালে যদি তোমরা এরূপ প্রশ্ন কর, তবে ওহীর মাধ্যমে উত্তর এসে যাবে। এতে 'কোরআন অবতরণকালে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন অবতরণ সমাপ্ত হলে নবুওয়ত ও ওহীর আগমনও বন্ধ করে দেয়া হবে।

নবুওয়তের আগমন ষতম হয়ে যাওয়া ও ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ ধরনের প্রশ্নের ফলে যদিও নতুন কোন বিধান আসবে না এবং যা ফরয নয়, তা ফরয হবে না কিংবা ওহীর মাধ্যমে কারও গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে না, তথাপি অনাবশ্যক প্রশ্ন তৈরী করে সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপ্ত হওয়া কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা নবুওয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধই থাকবে। কেননা, এতে করে নিজের ও অপরের সময় নষ্ট করা হয়। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ حَسَنِ إِسْلَامٍ أَلْغَاهُ مِنْ حَسَنِ إِسْلَامٍ

অর্থাৎ, মুসলমান হওয়ার একটি সৌন্দর্য এই যে, মুসলমান ব্যক্তি অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করে। আজকাল অনেক মুসলমান অনর্থক বিষয়াদির তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপ্ত থাকে। আজকাল মুসা (আঃ)-এর মায়ের নাম কি ছিল, নূহ (আঃ) এর নৌকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কি ছিল, ইত্যাকার প্রশ্নের কোন সম্পর্ক মানুষের কর্মের সাথে নাই। উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, এ জাতীয় প্রশ্ন করা নিন্দনীয়, বিশেষ করে যখন এ কথাও জানা যায় যে, এরূপ প্রশ্নকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় মাসআলা সম্পর্কেই অজ্ঞ থাকে। অনর্থক কাজে ব্যাপ্ত হওয়ার ফলে মানুষ জরুরী কাজ থেকে বঞ্চিত থাকে। অতীতে ফেকাহবিদ আলেমগণ মাসআলা-মাসায়েলের অনেক কাল্পনিক দিক বের করে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরী করে শরীয়তের বিধান বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে এগুলো জরুরী ছিল। তাই এসব প্রশ্ন অনর্থক ও অনাবশ্যক ছিল না। ইসলামের অন্যতম শিক্ষা এই যে, কোন দ্বীনী কিংবা জাগতিক উপকার লক্ষ্য না হলে যে কোন জ্ঞানানুশীলন, কর্ম অথবা কথায় ব্যাপ্ত হওয়া উচিত নয়।

বহিরা, সায়েবা ইত্যাদির সংজ্ঞা : 'বহিরা' 'সায়েবা' 'ওহীলা' 'হামী' প্রভৃতি সবই জাহেলিয়াত যুগের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। এগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরবিদদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। তবে আলোচ্য শব্দগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভবপর। আমরা সহীহ বুখারী থেকে সাযীদ ইবনে মুসাইয়্যেবের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি।

'বহিরা' এমন জন্তুকে বলা হয় যার দুধ প্রতিবার নামে উৎসর্গ করা হত এবং কেউ নিজের কাজে ব্যবহার করত না।

المائدة هـ

124

واذا سمعوا ،

[illegible]

এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজ্জায় বর্ণিত রয়েছে। আবু দাউদের

ভাষায় হাদীসটি এরূপ : যারা কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও (সাধ্যানুযায়ী) বাধা দেয় না, আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে একযোগে আযাবে নিক্ষেপ করবেন।

মাসআলা : মরণোন্মুখ ব্যক্তি যার হাতে মাল সোপর্দ করে অন্য কাউকে দিতে বলে যায়, তাকে ওসী বলা হয়। ওসী একজন বা একাধিক ব্যক্তিও হতে পারে।

০ সফরে হোক কিংবা স্বগৃহে অবস্থানকালে মুসলমান ও ধর্মপরায়ণ ওসি নিয়োগ করা উত্তম; জরুরী নয়।

০ মোকদ্দমার যে পক্ষ অতিরিক্ত বিষয় প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়, সে বাদী এবং অপর পক্ষ বিবাদী।

০ প্রথমে বাদীর কাছ থেকে সাক্ষী তলব করা হয়। যদি সে শরীয়তের বিধি মোতাবেক সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে, তবে তার পক্ষেই মোকদ্দমার রায় দেয়া হয়। পক্ষান্তরে সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে বিবাদীর কাছ থেকে কসম নেয়া হয় এবং তার পক্ষে মোকদ্দমার রায় দেয়া হয়। যদি বিবাদী কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে বাদীর পক্ষেই মোকদ্দমার রায় দেয়া হয়।

০ আলোচ্য আয়াতে অনুরূপ কাল কিংবা স্থান দ্বারা কসমকে কঠোর করা বিচারকের অভিমতের উপর নির্ভরশীল— জরুরী নয়। এ আয়াত দ্বারাও জরুরী হওয়া প্রমাণিত হয় না। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস থেকেও জরুরী না হওয়া প্রমাণিত হয়।

০ বিবাদী নিজের কোন কাজ সম্পর্কে কসম খেলে ভাষা এরূপ হয়— ‘আমি এ কাজ সম্পর্কে জানি না।’

০ যদি উত্তরাধিকারের মোকদ্দমার ওয়ারিস বিবাদী হয়, তবে শরীয়তের আইনানুযায়ী যারা উত্তরাধিকারী, তাদেরকেই কসম খেতে হবে তা একজন হোক কিংবা একাধিক। যারা উত্তরাধিকারী নয়, তারা কসম খাবে না।— (বয়ানুল-কোরআন)

কাফেরের ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

أُولَٰئِكَ مِنْكُمْ أَمْثَلُ شَهَادَةِ بَيْنَكُمْ وَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ এ আয়াতে

মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কারও যত্ন উপস্থিত হলে দু’ ব্যক্তিকে ওসি নিযুক্ত কর। তারা তোমাদের মধ্য থেকেই হবে এবং ধর্মপরায়ণ হবে। যদি স্বজাতীয় লোক না থাকে, তবে বিজাতি অর্থাৎ, কাফেরদের মধ্য থেকে নিযুক্ত কর।

এ আয়াত থেকে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্য বৈধ। কেননা, আয়াতে কাফেরদের সাক্ষ্য মুসলমানদের ব্যাপারে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। وَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ থেকে তা সুস্পষ্ট। অতএব, কাফেরের ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য আরও উত্তম রূপে বৈধ হবে। কিন্তু পরে

— آيَةُ الْآيَةِ الْمَوْثِقَةِ أَنَّكَ لَا تَتَزَوَّدُ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ فَكَيْفَ يُؤَدُّ

মুসলমানদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্যের বৈধতা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্যের বৈধতা পূর্ববাহ্যই বহল রয়েছে।— (কুরতুবী, আহকামুল-কোরআন)

ইমাম সাহেবের মতের সমর্থন এ হাদীস দ্বারাও হয়। জনৈক ইহুদী ব্যাভিচারে লিপ্ত হলে জনগণ তার মুখে চুনকালি মাখিয়ে মহানবী (সাঃ)—এর দরবারে উপস্থিত করে। তিনি তার দূরবাহ্য কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল : সে ব্যাভিচার করেছে। তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে অপরাধীকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।— (জাসাস)

প্রাপক খাতককে কয়েদ করতে পারে : خَسِرْتُمْ أَهْلًا مِّمَّنْ هُمْ أَكْثَرُ عِلْمًا আয়াত থেকে একটি মূলনীতি জানা যায় যে, যার যিশ্মায় অপরের কোন প্রাপ্য ওয়াজেব রয়েছে, তাকে পাওনাদার ব্যক্তি পাওনার দায়ে প্রয়োজন বোধে কয়েদ করতে পারে।— (কুরতুবী)

— مِنْ بَيْنِ السَّلَوةِ - এখানে সলো বলে আছরের নামায বুঝানো হয়েছে। এ সময়টি নির্ধারণ করার কারণ এই যে, আহলে-কিতাব এ সময়ের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করত। এ সময়ে মিথ্যা বলা তাদের মতে নিষিদ্ধ ছিল। এতে বুঝা যায় যে, কোন বিশেষ সময় কিংবা স্থানের শর্ত যোগ করে কসমকে কঠোর করা জায়েয।— (কুরতুবী)

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ قَالَوا أَلَعَلَّ الْإِنَّمَارَ
لَنَا أَتَكَ أَنْتَ عَلَّمَ الْغُيُوبَ ۖ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيُوسَىٰ إِنَّكَ أَنْتَ
أَذِ كَرِمْ مَقِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَيْكَ إِذْ أَبَدْتَ ثَلَاثَ يَوْمٍ
الْقُدْسِ مَقَامَكَ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَلَّمَكَ الْكَلْبُ
وَالْحِكْمَةُ وَالْثَوْرَةُ وَالْإِنجِيلُ وَإِذْ خَلَقَ مِنَ الطِّينِ
كَهَيْتَةَ الطَّيْرِ يَأْذِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَ
ثُورِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ يَأْذِي وَإِذْ نَحْنُ بِالسَّوْدِي يَأْذِي
وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جَعَلَهُمُ بِالْمِصْرَ
فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّا هَذَا الْأَسْحَرُ مُمِيزٌ ۖ وَ
إِذْ أُوحِيَ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ أَمُونِي وَبِرَسُولِي قَالُوا
أَمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۖ إِذْ قَالَ الْخَوَارِجُونَ
يُوسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ هَلْ سَيُطِيعُ رَبُّكَ أَنَّ يَنْزِلَ
عَلَيْكَ نَامُوسٌ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ أَتَقْوَى اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ۖ قَالُوا نَزِّلْ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا وَتَقْطَعُ فَرْقُوتُنَا
وَتَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ۖ

(১০৯) যেদিন আল্লাহ সব পয়গম্বরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর বলবেন : তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে ? তারা বলবেন : আমরা অবগত নই! আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (১১০) যখন আল্লাহ বলবেন : হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্বয়ং কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ প্রদান করি, তবুও ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদমাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে, ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্বিত ও কুঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে বের করে দাঁড় করিয়ে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাকের ছিল, তারা বলল : এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়।

(১১১) আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা অনুগতগণ। (১১২) যখন হাওয়ারীরা বলল : হে মরিয়ম-তনয় ঈসা, আপনার পালনকর্তা কি একত্রিত করে পাবেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাচ্কা! অবতরণ করে পাবেন ? তিনি বললেন : যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর। (১১৩) তারা বলল : আমরা তা থেকে খেতে চাই! আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে, আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব।

কিয়ামতে পয়গম্বরগণকে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে : **يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ** কিয়ামতে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একটি উন্মুক্ত মাঠে উপস্থিত হবে। যে কোন অঞ্চলের, যে কোন দেশের এবং যে কোন সময়ের মানুষই হোক না কেন, সবাই সে সুবিশাল ময়দানে উপস্থিত হবে এবং সবার কাছ থেকে তাদের সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে। কিন্তু আয়াতে বিশেষভাবে নবী-রসুলগণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, **يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ** অর্থাৎ, ঐ দিনটি বাস্তবিকই স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ তাআলা সব পয়গম্বরকে হিসাবের জন্যে একত্রিত করবেন। উদ্দেশ্য এই যে, একত্রিত সবাইকে করা হবে, কিন্তু সর্ব প্রথম প্রশ্ন নবী-রসুলগণকেই করা হবে যাতে সমগ্র সৃষ্টজগত দেখতে পায় যে, আজ হিসাব ও প্রশ্ন থেকে কেউ বাদ পড়বে না। পয়গম্বরগণকে যে প্রশ্ন করা হবে, তা এই : **مَاذَا أَجَبْتُمْ** অর্থাৎ, তোমরা যখন নিজ নিজ উন্মত্তকে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান করেছিলে, তখন তারা তোমাদেরকে কি উত্তর দিয়েছিল ? তারা তোমাদের বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করেছিল, না অস্বীকার ও বিরোধিতা করেছিল ?

এ প্রশ্নটি যদিও আশ্চর্য (আঃ)-কে করা হবে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে তাঁদের উন্মত্তকে শুনানো। অর্থাৎ, উন্মত্তরা যেসব সংকর্ম ও কুকর্ম করেছে, তার সাক্ষ্য সর্ব প্রথম তাদের পয়গম্বরদের কাছ থেকে নেয়া হবে। উন্মত্তের জন্যেও মুহূর্তটি হবে অত্যন্ত নাজুক। কারণ, তারা এ হৃদয়বিদারক পরিস্থিতিতে যখন নিজেদের নবী-রসুলগণের সুপারিশ আশা করবে, তখনই স্বয়ং নবী-রসুলগণের কাছে তাদের সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, আশ্চর্যগণ কোন দ্রাব্য ও বাস্তব বিরোধী কথা বলতে পারবেন না। তাই গোনাহগার ও অপরাধীরা আশঙ্কা করবে যে, যখন স্বয়ং নবীগণই আমাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্যদাতা তখন আর কে আমাদের সুপারিশ ও সাহায্য করবে ?

এ প্রশ্নের উত্তরে তারা বলবেন : **قَالُوا أَلَعَلَّ الْإِنَّمَارَ لَنَا أَتَكَ أَنْتَ عَلَّمَ الْغُيُوبَ** অর্থাৎ, তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আপনিই স্বয়ং যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

একটি সন্দেহের নিরসন : এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের ওফাতের পর তাঁর যে উন্মত্ত জন্মগ্রহণ করে, তাদের সম্পর্কে পয়গম্বরগণের এ উত্তর নির্ভুল ও সুস্পষ্ট। কেননা, অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ ছাড়া কারও জানা নেই। কিন্তু বিরাট সংখ্যক উন্মত্ত এমনও তো রয়েছে, যারা স্বয়ং পয়গম্বরগণের অক্লান্ত চেষ্টায় এ তাঁদের হাতেই মুসলমান হয় এবং তাঁদের সামনেই বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করে। এমনভাবে যেসব কাকের পয়গম্বরগণের আদেশের বিরোধিতা ও তাঁদের সাথে শত্রুতা করে, তাদের সম্পর্কে একথা বলা কিভাবে নির্ভুল হতে পারে যে, তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই ? তফসীর বাহরে-মুহীতে ইমাম আবু আবদুল্লাহ রাযী এর উত্তরে বলেন : এখানে পৃথক পৃথক দু'টি বিষয় রয়েছে : (এক) এলম, যার অর্থ পূর্ণ বিশ্বাস, (দুই) প্রবল ধারণা। একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সামনে থাকা সত্ত্বেও তার ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দিতে পারে, পূর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। কেননা, অন্তরের ভেদ ও সত্যিকার ঈমান সম্পর্কে কেউ ওহী ব্যতীত নিশ্চিতভাবে জানতে পারে না। কারণ, ঈমানের সম্পর্ক হল অন্তরের সাথে। প্রত্যেক উন্মত্তেই কপট বিশ্বাসী মুনাক্ফদেরও একটি দল ছিল। তারা বাহাতঃ ঈমানও আনত এবং নির্দেশাবলীও পালন করত,

কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না এবং নির্দেশাবলী অনুসরণের আন্তরিক কোন প্রেরণাও ছিল না। তাদের মধ্যে যা কিছু ছিল, সবই ছিল লোক দেখানো। তবে বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের উপরই জাগতিক বিচার নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, খোদায়ী নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এবং ইসলাম ও ঈমান বিরোধী কোন কথা ও কর্মে জড়িত হয় না, নবী-রসূলগণ তাকে ‘ঈমানদার ও সংকামী’ বলতে বাধ্য ছিলেন; সে অন্তরে খাঁটি ঈমানদার কিংবা মুনাফেক যাই হোক। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

অর্থাৎ, আমরা তো বাহ্যিক কাজকর্ম দেখে বিচার করি। অন্তর্নিহিত গোপনভেদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা।

এ বিধান অনুযায়ী দুনিয়াতে আশ্বিয়া (আঃ) ও তাঁদের উত্তরাধিকারী আলেমসমাজ বাহ্যিক কাজকর্মের ভিত্তিতে কারও ঈমানদার সংকামী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারতেন। কিন্তু আজ সে দুনিয়া ও দুনিয়ার রীতি-নীতি শেষ হয়ে গেছে। আজ হাশরের ময়দান। এখানে চুলচেরা তথ্য উদঘাটিত হবে এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন হবে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রথমে অন্যদের সাক্ষ্য নেয়া হবে। যদি অপরাধী এতে নিশ্চিত না হয় এবং স্বীয় অপরাধ স্বীকার না করে, তবে বিশেষ ধরনের সরকারী সাক্ষী উপস্থিত করা হবে। অপরাধীদের মুখে ও জিহবায় সীল মেরে দেয়া হবে এবং তাদের হস্ত, পদ ও চামড়ার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এরা প্রত্যেক কাজের পূর্ণ স্বরূপ তুলে ধরবে।-

الْيَوْمَ نَخْتَارُ عَلَىٰ قُورَاهُمْ وَتَكْفُلَنَّا يُبْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ لَهُمْ

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ, অদ্য আমি তাদের মুখে সীল মেরে দিব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তখন মানুষ জ্ঞানতে পারবে যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছিল রাক্বুল-আলামীনের গুণ্ড পুলিশ। এদের বর্ণনার পর অস্বীকার করার কোন উপায়ই থাকবে না।

মোটকথা, পরজগতে শুধু ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কোন কিছুই বিচার করা হবে না বরং অকাট্য জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সবকিছুর বিচার হবে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কারও ঈমান ও কর্মের সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া কারও নেই। তাই হাশরের ময়দানে যখন নবী-রসূলগণকে প্রশ্ন করা হবে مَاذَا أُجِبْتُمْ তখন তাঁরা এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলবেন যে, এ প্রশ্ন ইহজগতে হচ্ছে না যে, ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে জওয়াব দিলেই চলবে, বরং এ প্রশ্ন হচ্ছে হাশরের ময়দানে, যেখানে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কোন কিছু বলা যাবে না। তাই তাঁদের এ উত্তর যথার্থ ও সঙ্গত যে, এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর-পয়গম্বরগণের চূড়ান্ত দয়্যার্তা প্রকাশ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, উম্মতের গ্রহণ করা ও গ্রহণ না করা এবং আনুগত্য ও অব্যাহতার যেসব ঘটনা তাঁদের সামনে সংঘটিত হয়েছে, এগুলো সম্পর্কে প্রবল ধারণাপ্রসূত যে জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছিলেন, উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে অন্ততঃ তা বর্ণনা করা উচিত ছিল। এ জ্ঞানটি নিশ্চিত কি না, শুধু এ বিষয়টিই আল্লাহর জ্ঞানে সমর্পন করলে চলত। কিন্তু এখানে নবী-রসূলগণ নিজস্ব জ্ঞান ও সংঘটিত ঘটনাবলী একেবারেই উল্লেখ করেননি। সবকিছু আল্লাহর জ্ঞানের উপর সমর্পন করে তাঁরা চুপ হয়ে গেলেন।

এর তাৎপর্য এই যে, নবী-রসূলগণ নিজ নিজ উম্মত ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়ালী। তাঁদের সম্পর্কে এমন কোন কথাই উচ্চারণ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক, যার ফলে তাঁরা বিপদের সম্মুখীন হয়। তবে নিরুপায় হলে অবশ্যই বলতে হত। এখানে অকাট্য জ্ঞান না থাকার অজুহাত ছিল। এ অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে মুখে উম্মতের বিরুদ্ধে কিছু বলা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতেন এবং সেমতে তাঁরা তাই করে আত্মরক্ষা করেছেন।

হাশরের পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন : সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের একটি বলক সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। হিসাব-নিকাসের কাঠগড়ায় আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় রসূলগণ কম্পিত বদনে উপস্থিত হবেন। সুতরাং অন্যদের যে কি অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়। তাই এখন থেকেই সে ভয়াবহ দিনের চিন্তা করা উচিত এবং জীবনকে এ হিসাব-নিকাস প্রস্তুতিতে নিয়োজিত করা কর্তব্য।

তিরমিযীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

“হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তির পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর নেয়া হয়। প্রথম এই যে, সে জীবনের সুদীর্ঘ ও প্রচুর সংখ্যক দিব্যরাত্রে কি কাজে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় এই যে, বিশেষভাবে কর্মক্ষম যৌবনকালকে সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তৃতীয় এই যে, সে অর্থকড়ি কোন (হালাল কিংবা হারাম) পথে উপার্জন করেছে? চতুর্থ এই যে, অর্থকড়িতে সে কোন (জায়েয কিংবা নাজায়েয) কাজে ব্যয় করেছে? পঞ্চম এই যে, নিজ এলম অনুযায়ী সে কি আমল করেছে?

আল্লাহ তাআলা চূড়ান্ত অনুগ্রহ ও দয়া বশতঃ এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পূর্বেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাধ্যমে উম্মতের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এখন এসব প্রশ্নের সমাধান শিক্ষা করাই উম্মতের কাজ। পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র প্রকাশ করে দেয়ার পরও যদি কেউ ফেল করে, তবে এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে বিশেষ প্রশ্নোত্তর : প্রথম আয়াতে সমগ্র পয়গম্বরগণের অবস্থা ও তাঁদের সাথে প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এবং এর পরবর্তী নয় আয়াতে (সূরার শেষ পর্যন্ত) বিশেষভাবে বনী-ইসরাঈলের শেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে আলোচনা ও তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের কিছু বিবরণ দেয়া হয়েছে। হাশরে তাঁকে একটি বিশেষ প্রশ্ন ও তার উত্তর পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত হয়েছে।

এ প্রশ্নোত্তরের সারমর্ম ও বনী-ইসরাঈল তথা সমগ্র মানব জাতির সামনে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরা। এ ময়দানে রাক্বুল্লাহ ও কালেমাতুল্লাহ অর্থাৎ, ঈসা (আঃ)-কেও প্রশ্ন করা হবে যে, তোমার উম্মত তোমাকে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। হযরত ঈসা স্বীয় সম্মান, মাহাত্ম্য, নিশাপাতা ও নবুওয়ত সত্ত্বেও অস্থির হয়ে আল্লাহর দরবারে সাফাই পেশ করবেন। একবার নয়, বার বার বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশ করবেন যে, তিনি উম্মতকে এ শিক্ষা দেননি। প্রথমে বলবেন :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا مَا كُنْزِيْ

অর্থাৎ, আপনি পবিত্র, আমার কি সাধ্য ছিল যে, আমি এমন কথা বল, যা বলার অধিকার আমার নেই?

স্বীয় সাফাইয়ের দ্বিতীয় ভঙ্গি এই যে, তিনি স্বয়ং আল্লাহ তাআলাকে

সাক্ষী করে বলবেন : যদি আমি এরূপ বলতাম, তবে অবশ্যই আপনার তা জানা থাকত। কেননা, আপনি তো আমার অন্তরের গোপন রহস্য সম্পর্কেও অবগত। কথা ও কর্মেরই কেন, আপনি তো ‘আল্লামুল-গুযুব’, দ্বিতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

এ দীর্ঘ ভূমিকার পর হযরত ঈসা (আঃ) প্রশ্নের উত্তর দেন।

হযরত ঈসার উত্তর : আমি তাদেরকে ঐ শিক্ষাই দিয়েছি, যার নির্দেশ আপনি দিয়েছিলেন, **أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ** অর্থাৎ, আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন কর, যিনি আমার ও তোমাদের সকলের পালনকর্তা। এ শিক্ষার পর আমি যত দিন তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মের সাক্ষী ছিলাম, তখন পর্যন্ত তাদের কেউ এরূপ কথা বলত না -) এরপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নেন, তখন তারা আপনার দেখাশোনার মধ্যেই ছিল। আপনিই তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি কতিপয় বিশেষ অনুগ্রহের বর্ণনা : আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে যে প্রশ্নোত্তরের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার পূর্বে ঈসব অনুগ্রহের বিষয়ও উল্লেখিত হয়েছে, যা বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-কে মো’জ্জযার আকারে দেয়া হয়। এতে একদিকে বিশেষ অনুগ্রহ ও অপরদিকে জবাবদিহির দৃশ্যের অবতারণা করে বনী-ইসরাঈলের ঐ জাতিদ্বয়কে হুশিয়ার করা হয়েছে, যাদের এক জাতি তাঁকে অপমানিত করে এবং নানা অপবাদ আরোপ করে কষ্ট দেয় এবং অন্য জাতি ‘খোদা’ কিংবা ‘খোদার পুত্র’ আখ্যা দেয়। অনুগ্রহ উল্লেখ করে প্রথম জাতিকে এবং প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করে শেষোক্ত জাতিকে হুশিয়ার করা হয়েছে। এখানে যেসব অনুগ্রহ কয়েকটি আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি বাক্য খুবই প্রশিধানযোগ্য। এতে

বলা হয়েছে : **نُفِخَ فِي السَّاعَةِ فِي الْيَوْمِ وَالْآخِرِ** অর্থাৎ, হযরত ঈসা (আঃ)-কে দেয়া একটি বিশেষ মো’জ্জযা এই যে, তিনি মানুষের সাথে শিশু অবস্থায়ও কথা বলেন এবং পরিণত বয়সেও কথা বলেন।

এখানে প্রথমোক্ত বিষয়টি যে, মো’জ্জযা ও বিশেষ অনুগ্রহ, তা বলাই বাহুল্য। জন্মগ্রহণের প্রথম দিকে শিশু কথা বলতে পারে না। কোন শিশু মায়ের কোলে কিংবা দোলনায় কথাবার্তা বললে, তা তার বিশেষ স্বাভাব্যরূপে গণ্য হবে। পরিণত বয়সে কথা বলা, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। প্রত্যেক মানুষই এ বয়সে কথা বলে থাকে। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এটিও একটি মো’জ্জযা। কেননা, পরিণত বয়সে পৌছার পূর্বেই ঈসা (আঃ)-কে ইহজগত থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এখন এ জগতের মানুষের সাথে পরিণত বয়সে কথা বলা তখনই হতে পারে, যখন দ্বিতীয় বার তিনি এ জগতে পদার্পণ করবেন। মুসলমানদের সর্বসম্মত বিশ্বাস তাই এবং কোরআন ও সুন্নাহর বর্ণনা থেকেও একথাই প্রমাণিত। অতএব, যোঝা গেল যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর শিশু অবস্থায় কথা বলা যেমন মো’জ্জযা, তেমনি পরিণত বয়সে কথা বলাও একটি মো’জ্জযা। কারণ, তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে পদার্পণ করবেন।

ثَالِثُ أَتَمُّوْا لِلّٰهِ إِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যখন হাওয়ায়ীরা ঈসা (আঃ)-এর কাছে আকাশ থেকে খাদ্যাধার অবতারণ দাবী করল, তখন তিনি উত্তরে বললেন : যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর। এতে বুঝা যায় যে, ঈমানদার বান্দার পক্ষে এ ধরনের ফরমায়েশ করে আল্লাহকে পরীক্ষা করা কিংবা তাঁর কাছে অলৌকিক বিষয় দাবী করা একান্ত অনুচিত। বরং ঈমানদার বান্দার পক্ষে আল্লাহর নির্ধারিত পথে রুখী ইত্যাদি অন্ত্রেষণ করাই কর্তব্য।

দয়্যার কঠোরতা করতে পারেন না। তাই তাদেরকে শাস্তি দিলে তা দায়বিত্য ও বিজ্ঞতা-ভিত্তিকই হবে। অগত্যা যদি ক্ষমা করে দেন, তবে এ ক্ষম্য অক্ষমতাসূত হব না। কেননা, আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রবল।
 ঐই কোন অপরাধী আপনার শক্তির নাগালের বাইরে যেতে পারবে না। যেহেতু আপনি সুবিজ্ঞ, তাই এটাও সম্ভব নয় যে, অপরাধীকে বিনা ক্ষিরেই ছেড়ে দেবেন। মোটকথা, অপরাধীদের ব্যাপারে আপনি যে রায়ই দেন, তাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞানোচিত ও সক্ষমতাসূলভ হবে। হযরত ইসা (আঃ) হাম্বরের ময়দানে এসব কথা বলবেন। সেখানে কাকেরদের পক্ষে কোনরূপ সুপারিশ, দয়া ভিক্ষা ইত্যাদি চলবে না। তাই তিনি عَزَّوَجَلَّ এর পরিবর্তে تَجَوُّوْا ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ অবলম্বন করেনি। এর বিপরীতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) দুনিয়াতে পরওয়ারদেগারের দরবারে আরঘ করেছিলেন :
 رَبِّ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَخُذَّيْكَ الْخَاسِءَ كَيْفَ تَتَعَفَى قَوْلَهُ وَبِئْسَ الْخَصَالُ فَإِنَّكَ عُفُوٌّ رَحِيمٌ

হে পরওয়ারদেগার, এ মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে পঞ্চদষ্ট করেছে। তাদের মধ্যে যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার লোক এবং যে আমার ক্রম্যতা করে, তুমি অত্যন্ত ক্ষমালী ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ, এখনও সময় আছে। তুমি স্বীয় রহমতে ভবিষ্যতে তাদেরকে তওবা ও সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনের শক্তি দান করে অতীত গোনাহ ক্ষমা করতে পার।—
 (ফাওয়ায়েদে-গুসমানী)

ইবনে-কাসীর হযরত আবু যয়ের (রাঃ) বাচনিক বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সঃ) একবার সারা রাতি أَنْ تَعْلَمَهُمْ وَتَهْتَبِلَهُمْ আয়াতখানিই পাঠ করতে থাকেন। ভোর হলে আমি আরঘ করলাম : ইয়া রসূলুল্লাহ, আপনি এ আয়াতটিই পাঠ করতে করতে ভোর করেছেন। এ আয়াত দুইই কবু করেছেন এবং এ আয়াত দুইই সেজদা করেছেন। তিনি বলেন : আমি পরওয়ারদেগারের কাছে নিজের জন্যে শাফায়াতের আবেদন করেছি। আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। অতি সম্ভবই আমি তা লাভ করব। আমি এমন ব্যক্তির জন্যে শাফায়াত করতে পারব, যে আল্লাহ্ জহালার সাথে কোন অংশীদার করেনি।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে : মহানবী (সঃ) উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে আকাশের দিকে হস্ত প্রসারিত করেন এবং বলেন : اللهم امتي

অর্থাৎ, হে পাক পরওয়ারদেগার, আমার উম্মতের প্রতি করুণার দৃষ্টি দাও। অতঃপর তিনি কাদতে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলের মাধ্যমে এভাবে কাদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জিবরাঈলকে উপরোক্ত উক্তি শুনিতে দেন। আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলকে বলেন : তা হলে যাও এবং (হযরত) মুহম্মদ (সঃ)—কে বলে দাও যে, আমি অতিসম্ভব আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব— অসন্তুষ্ট করব না।

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صُدُقُهُمْ — সাধারণভাবে বাস্তবসম্মত উক্তিকে ‘সিদক’ তথা সত্য এবং বাস্তব বিরুদ্ধ উক্তিকে ‘কিয্ব’ তথা মিথ্যা মনে করা হয়। কিন্তু কোরআন-সুনাহ্ থেকে জানা যায় যে, সত্য ও মিথ্যা শুধু উক্তিই নয়, কর্মও হতে পারে। নিম্নোক্ত হাদীসে বাস্তব বিরোধী কর্মকে মিথ্যা বলা হয়েছে :

‘অর্থাৎ, কেউ من تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوب زور — যদি এমন অলঙ্কারে সজ্জিত হয়, যা তাকে দেয়া হয়নি, অর্থাৎ, এমন কোন গুণ বা কর্ম দাবী করে, যা তার মধ্যে নেই, তবে সে যেন মিথ্যার বস্ত্র পরিধান করে।’

অন্য এক হাদীসে প্রকাশ্যে ও গোপনে উত্তমরূপে নামায আদায়কারীকে সত্য বান্দা বলা হয়েছে :

যে ব্যক্তি জনসমন্কে উত্তমরূপে নামায পড়ে এবং নির্জনতায়ও এমনিভাবে নামায পড়ে, তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন : সে আমার সত্যিকার বান্দা।— (মেশকাত)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি। এক হাদীসে বলা হয়েছে : জান্নাত পাওয়ার পর আল্লাহ্ তাআলা বলবেন : বড় নেয়ামত এই যে, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট, এখন থেকে কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।

ذَلِكَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ — অর্থাৎ, এটিই মহান সফলতা। সৃষ্টা ও পরম প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে গেলে এর চাইতে বৃহত্তর সফলতা আর কি হতে পারে ?

সূরা আল-আন-আম

আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : সূরা আন'আমের একটি বেশিষ্ট্য এই যে, কয়েকখানি আয়াত বাদে গোটা সূরাটিই একযোগে মক্কা অবতীর্ণ হয়েছে। সত্তর হাজার ফেরেশতা তসবীহ পাঠ করতে এ সূরার সাথে অবতরণ করেছিলেন। তফসীরবিদগণের মধ্যে মুজাহিদ, কলবী, কাতাদাহ প্রমুখও প্রায় একথাই বলেন।

আবু ইসহাক ইসকেরায়িনী বলেন : এ সূরাটিতে তওহীদের সমস্ত মূলনীতি ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এ সূরাটিকে **أَحْسَنُ دِيْنٍ** বাক্য দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। এতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, সববিধ প্রশংসা আল্লাহর জন্যে। এ খবরের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রশংসা শিক্ষা দেওয়া এবং এ বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষাদানের মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি কারও হামদ বা প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন। কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক, তিনি স্বীয় ওজুদ বা সত্তার পরাকাষ্ঠার দিক দিয়ে নিজেই প্রশংসনীয়। এ বাক্যের পর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসনীয় হওয়ার প্রমাণও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে সত্তা এ হেন মহান শক্তি-সামর্থ্য ও বিজ্ঞবান বাহক, তিনিই হামদ ও প্রশংসার যোগ্য হতে পারেন।

এ আয়াতে **سَمَوات** শব্দটিকে বহুবচনে এবং **ارض** শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও অন্য এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নভোমণ্ডলের ন্যায় ভূমণ্ডলও সাতটি। সম্ভবতঃ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সপ্ত আকাশ আকার-আকৃতি ও অন্যান্য অবস্থার দিক দিয়ে একটি অপরিষ্কার থেকে অনেক স্বতন্ত্র, কিন্তু সপ্ত পৃথিবী পরস্পর সমআকৃতি বিশিষ্ট, তাই এগুলোকে এক গণ্য করা হয়েছে।—(মাহহারী)

এমনিভাবে **ظلمات** শব্দটিকে বহুবচনে এবং **نور** শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, **نور** বলে বিশুদ্ধ সরল পথ ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তা মাত্র একটিই। আর **ظلمات** বলে প্রান্ত পথ ব্যক্ত করা হয়েছে, যা অসংখ্য।—(মাহহারী ও বাহুরে-মুহীত)

এখানে এ বিষয়টিও প্রাধান্যযোগ্য যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল নির্মাণ করাকে **خلق** শব্দ দ্বারা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করাকে **جعل** শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অন্ধকার ও আলো নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মত স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর বস্তু নয়, বরং পরনির্ভর আনুসঙ্গিক ও গুণবাচক বিষয়। অন্ধকারকে আলোর পূর্বে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এ জগতে অন্ধকার হল আসল এবং আলো বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাথে জড়িত। সেসব বস্তু সামনে থাকলে আলোর উদ্ভব হয়, না থাকলে সবকিছু অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একত্ববাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা করে জগতের ঐসব জাতিকে হুশিয়ার করা, যারা মূলতঃ একত্ববাদের বিশ্বাসী নয় কিংবা বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও একত্ববাদের তাৎপর্যকে পরিত্যাগ করে বসেছে।

অগ্নি উপাসকদের মতে জগতের স্রষ্টা দু'জন-ইয়াযদান ও আহরামান। তারা ইয়াযদানকে মঙ্গলের স্রষ্টা এবং আহরামানকে অমঙ্গলের স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে। এ দুটিকেই তারা অন্ধকার ও আলো বলে ব্যক্ত করে।

ভারতের পৌত্তলিকদের মতে তেত্রিশ কোটি দেবতা খোদার অঙ্গীদার। আর্য সমাজ একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আত্মা ও মূল

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَحْسَنُ دِيْنٍ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
وَالنُّوْرَ ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ۝ هُوَ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلَكُمْ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ
مَمْنُونُونَ ۝ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ
وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنَ الْبَيْنَاتِ ۝ وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ
لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ
رَبٌّ الْأَوَّلَ الْأَوَّلَ الْأَوَّلَ الْأَوَّلَ الْأَوَّلَ الْأَوَّلَ الْأَوَّلَ الْأَوَّلَ الْأَوَّلَ
وَأَنْشَأْنَا مِنْكُمْ آلِهَةً ثُمَّ كَذَّبْتُمْ بِهِنَّ تَقِيْمُهُمْ فَهَلْ تَعْلَمُونَ ۚ وَتَقِيْمُهُمْ
فَهَلْ تَعْلَمُونَ ۚ وَتَقِيْمُهُمْ فَهَلْ تَعْلَمُونَ ۚ وَتَقِيْمُهُمْ فَهَلْ تَعْلَمُونَ ۚ
وَلَوْ تَرَىٰ أَنَّ عَلَيْكَ لَنُفُوسًا كَثِيْرًا قَدْ قُلِبُوا كَيْدَ بَيْنِهِمْ لَقُلْ
الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَهُهُمْ يُدْعِيْنَ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ
عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ فَكُلُّ الْقَوْمِ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنْظُرُونَ ۝

সূরা আল-আন-আম

(মক্কা অবতীর্ণ : আয়াত ১৬৫)

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।

- (১) সববিধ প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন। তথাপি কাকেররা স্বীয় পালনকর্তার সাথে অন্যান্যকে সমতুল্য স্থির করে। (২) তিনিই তোমাদেরকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর নির্দিষ্টকাল নির্ধারণ করেছেন। আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহর কাছে আছে। তথাপি তোমরা সন্দেহ কর। (৩) তিনিই আল্লাহ নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলে। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং তোমরা যা কর তাও অবগত (৪) তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের নির্দশনাবলী থেকে কোন নিদর্শন আসেনি, যার প্রতি তারা বিমুগ্ধ হয় না। (৫) অতএব, অবশ্য তারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে যখন তা তাদের কাছে এসেছে। বস্তুতঃ অচিরেই তাদের কাছে ঐ বিষয়ের স্বেবাদ আসবে, যার সাথে তারা উপহাস করত। (৬) তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দেইনি। আমি আকাশকে তাদের উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতে দিয়েছি এবং তাদের তলদেশে নদী সৃষ্টি করে দিয়েছি, অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের পানের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। (৭) যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাখিল করতাম, অতঃপর তারা তা সহস্বে স্পর্শ করত, তবুও অবিশ্বাসীরা একথাই বলত যে, এটা প্রকাশ্য জাদু বৈ কিছু নয়। (৮) তারা আরও বলে যে, তাঁর কাছে কোন ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হল না? যদি আমি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, তবে গোটা ব্যাপারটিই শেষ হয়ে যেত। অতঃপর তাদেরকে সাহায্যও অবকাশ দেওয়া হত না।

পূর্বক অনাদি এবং খোদার শক্তি-সামর্থ্য ও সৃষ্টি থেকে মুক্ত সাবাস্তুর একত্ববাদের মূল স্বরূপ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। এমনভাবে খ্রীষ্টানরা একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথে হযরত ইসা (আঃ) ও তাঁর মাতাকে আল্লাহ তাআলার অশ্লীলার সাব্যস্ত করেছে। এরপর একত্ববাদের বিস্মকে টিকিয়ে রাখার জন্যে তারা ‘একে তিন’ এবং ‘তিনে এক’ এর জ্যোতিষিক মতবাদের আশ্রয় নিয়েছে। আরবের মুশরেকরা তো খোদায়ী কনীন চূড়ান্ত বদান্যতার পরিচয় দিয়েছে। প্রতিটি পাহাড়ের প্রতিটি বড় পাথরও তাদের মতে মানবজাতির উপাস্য হতে পারত। মোটকথা, যে মনবকে আল্লাহ তাআলা ‘আশরাফুল-মখলুকাৎ’ তথা সৃষ্টির সেরা করেছিলেন, তারা যখন পশ্চষ্ট হল, তখন চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, জ্বালাল, পানি, বৃক্ষলতা, এমনকি, পোকা-মাকড়কেও সেজদার যোগ্য উপাস্য ক্বীদাতা ও বিপদ বিদূরকারী সাব্যস্ত করে নিল।

কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলাকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভাবক বলে উপরোক্ত সব ব্রহ্ম বিস্বাসের মূলেপাটন করেছে। কেননা, অন্ধকার ও আলো, নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল এবং এতে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তু আল্লাহ তাআলা সৃষ্ট। অতএব, এগুলোকে কেমন করে আল্লাহ তাআলার অশ্লীলার করা যায়?

প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তম বস্তুগুলোকে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও মুখাপেক্ষী বলে মানুষকে নির্ভুল একত্ববাদ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমার অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ বিশেষ। যদি এরই সূচনা, পরিণতি ও কালস্থানের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তবে একত্ববাদ একটা বাস্তব সত্য হয়ে সামনে ফুটে উঠবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ إِلَيْكُمْ - অর্থাৎ, আল্লাহ-

জাআলাই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন। আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-কে একটি বিশেষ পরিমাণ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণেই আদম-সন্তানরা বর্ণ, আকার এবং চরিত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন। কেউ কৃষ্ণবর্ণ, কেউ শ্বেতবর্ণ, কেউ লালবর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নরম, কেউ পবিত্র-স্বভাব বিশিষ্ট এবং কেউ অপবিত্র-স্বভাবের হয়ে থাকে। - (যাহহারা)

এই হচ্ছে মানব সৃষ্টির সূচনা। এরপর পরিণতির দু’টি মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। একটি মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি, যাকে মৃত্যু বলা হয়। অপরটি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ও তার উপকারে নিয়োজিত সৃষ্টজগৎ-সবার সমষ্টির পরিণতি, যাকে কেয়ামত বলা হয়। মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি বুঝাবার জন্যে বলা হয়েছে : قَضَىٰ إِلَيْكُمْ - অর্থাৎ, মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ তাআলা তার স্বায়ত্ত্ব ও আয়ুষ্কালের জন্যে একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌঁছার নাম মৃত্যু। এ মেয়াদ মানবের জানা না থাকলেও আল্লাহর ফেরেশতারা জানেন, বরং এ দিক দিয়ে মানুষও মৃত্যু সম্পর্কে অবগত। কেননা, সে সর্বদা, সর্বত্র আশ-পাশে আদম-সন্তানদেরকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে।

এরপর সমগ্র বিশ্বের পরিণতি অর্থাৎ, কেয়ামতের উল্লেখ করা বলা হয়েছে : وَاجِلُ سَعْيِكُمْ عِنْدَ - অর্থাৎ, আরও একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। এ মেয়াদের পূর্ণ জ্ঞান

ফেরেশতাদের নেই এবং মানুষেরও নেই। সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ, গোটা বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ তাআলা কর্তৃক সৃষ্টি ও নির্মিত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনভাবে ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ, মানুষ যে আল্লাহর সৃষ্টজীব, তা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানুষকে শৈখিল্য থেকে জাগ্রত করার জন্যে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষকে একটি বিশেষ আয়ুষ্কাল রয়েছে, যার পর তার মৃত্যু অবশ্যিত। প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি সর্বক্ষণ নিজের আশ-পাশে প্রত্যক্ষ করে। وَاجِلُ سَعْيِكُمْ عِنْدَ - অর্থাৎ, বাবো এ নির্দেশ রয়েছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত। মৃত্যুকে মুক্তি ও প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক মৃত্যু অর্থাৎ, কেয়ামতকে সপ্রমাণ করা একটা মনস্তাত্ত্বিক ও স্বাভাবিক বিষয়। তাই কেয়ামতের আগমনে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণে আয়াতের শেষভাবে উপযুক্ততা প্রকাশার্থে বলা হয়েছে قَضَىٰ إِلَيْكُمْ - অর্থাৎ, এহেন সুস্পষ্ট মুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও তোমরা কেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর। এটা অনুচিত।

তৃতীয় আয়াতে প্রথম দু’আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ফলাফল বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তাআলাই এমন এক সত্তা যিনি নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলে এবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য এবং তিনিই তোমাদের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা এবং প্রতিটি উক্তি ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি পরিজ্ঞাত।

চতুর্থ আয়াতে অমনোযোগী মানুষের হঠকারিতা ও সত্য বিরোধী জেদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

وَمَا تَنْتَظِرُونَ مِنَ اللَّهِ أَنْ يُؤْتِيَهُمُ الْآيَاتِ إِلَّا كَذِبًا وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট মুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করে রেখেছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের হোদায়েতের জন্যে যে-কোন নিদর্শন প্রেরণ করা হয়, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়—এ সম্পর্কে মোটেই চিন্তা-ভাবনা করে না।

পঞ্চম আয়াতে কতক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে এ অমনোযোগিতার আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে فَتَذَكَّرُ لِلْآيَاتِ - অর্থাৎ, সত্য যখন তাদের সামনে প্রতিভাত হল, তখন তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। এখানে ‘সত্যের’ অর্থ কোরআন হতে পারে এবং নবী করীম (সাঃ)—এর পবিত্র ব্যক্তিত্বও হতে পারে।

কেননা, মহানবী (সাঃ) আজীবন আরব গোত্রসমূহের মধ্যেই অবস্থান করেন। তাঁর শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্য তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা একথাও পুরোপুরিই জ্ঞানত যে, মহানবী (সাঃ) কোন মানুষের কাছে এক অক্ষরও শিক্ষালাভ করেননি। এমন কি তিনি নিজ হাতে নিজের নামও লিখতে পারতেন না। সারা আরবে তিনি উম্মি (নিরক্ষর) উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে যেতেই অকস্মাৎ তাঁর মুখ দিয়ে নিশ্চলত্ব, আধ্যাত্মবিদ্যা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন স্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল, যা জগতের পারদর্শী দার্শনিকদেরকেও বিস্ময়াভূত করে দেয়। তিনি নিজের অনীতকালামের মোকাবেলা করার জন্যে আরবের স্বনামখ্যাত প্রাঞ্জলভাষী কবি-সাহিত্যিক ও অলঙ্কারবিদদেরকে চ্যালেঞ্জ দিলেন। তারা মহানবী (সাঃ)-কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে স্বীয় জ্ঞান-মাল, মান-সম্পদ, সম্ভান-সম্পত্তি ও পরিবার-পরিজন বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকত, কিন্তু এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কোরআনের একটি আয়াতের অনুরূপ বাক্য রচনা করার সাহস

তাদের কারও হল না।

এভাবে নবীকরীম (সঃ) এবং কোরআনের অস্তিত্ব ছিল সত্যের এক বিরাট নিদর্শন। এছাড়া মহানবী(সঃ) - এর মাধ্যমে হাজারো মো'জেযা ও খোলাখুলি নিদর্শন প্রকাশ পায়, যে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ যা অবশীকার করতে পারত না। কিন্তু কাকেররা এসব নিদর্শনকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে :

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ

আয়াতের শেষে তাদের অবশীকৃতি ও মিথ্যারোপের অন্তত পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে : **فَوَيْلٌ لِلْيَهُودِ أَتَشْكُرُونَ** - অর্থাৎ, আচ্ছ তো এসব অপরিণামদর্শী লোকেরা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মো'জেযা, তাঁর আনীত হেদায়াত, কেয়ামত ও পরকাল সবকিছু নিয়েই হাস্যোপহাস করছে, কিন্তু সে সময় দূরে নয়, যখন এগুলোর স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবে। কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। ইমান ও আমলের হিসাব দিতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পাবে। তখন এগুলোকে বিশ্বাস ও স্বীকার করলেও কোন উপকার হবে না। কেননা, সেটা কর্ম জগৎ নয়— প্রতিদান দিবস। আল্লাহ তাআলা এখনও চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দিয়েছেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ষোদায়ী নির্দানবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করলেই ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যারা ষোদায়ী বিধান ও পয়গম্বরগণের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত কিংবা বিরোধিতা করত, তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিবাহী উচ্চারিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব অবিশ্বাসীর দৃষ্টি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাচীনকালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট করে তাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নিম্নসন্দেহে বিশৃ-ইতিহাস একটি শিক্ষাগ্রন্থ। জ্ঞানচক্ষু মেলে নিরীক্ষণ করলে এটি হাজারো উপদেশের চাইতে অধিক কার্যকরী উপদেশ। “জগৎ একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং কাল উৎকৃষ্ট শিক্ষক” - জনৈক দার্শনিকের এ উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ কারণেই কোরআন পাকের একটি বিরাট বিষয়বস্তু হচ্ছে কাহিনী ও ইতিহাস। কিন্তু সাধারণভাবে অমনোযোগী মানুষেরা জগতের ইতিহাসকেও একটি চিত্তবিনোদনের সামগ্রীর চাইতে অধিক গুরুত্ব দেয়নি, বরং উপদেশ ও জ্ঞানের এ উৎকৃষ্ট বিষয়টিকেও তারা অমনোযোগিতা ও সোনাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। পূর্ববর্তী কিছু-কাহিনীকে হয় শুধু ঘূমের পূর্বে ঘূমের গুণ্ধের স্থলে ব্যবহার করা হয়; না হয় অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

সম্ভবতঃ এ কারণেই কোরআন পাক শিক্ষা ও উপদেশের জন্যে বিশৃ-ইতিহাসকে বেছে নিয়েছে। তবে কোরআনের বর্ণনাতন্ত্রী বিশ্বের সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থের মত নয়, যাতে কাহিনী ও ইতিহাস রচনাই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাই কোরআন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ধারাবাহিক কাহিনীর আকারে বর্ণনা করেনি, বরং কাহিনীর যতটুকু অংশ যে ব্যাপারে ও যে অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত, সে ব্যাপারে ততটুকু অংশই উল্লেখ করেছে। অতঃপর অন্যত্র এ কাহিনীর অন্য অংশ বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বর্ণনা করেছে। এতে এ সত্যের দিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, কোন কাহিনী কখনও স্বয়ং উদ্দেশ্য হয় না, বরং প্রত্যেক ঘটনা বর্ণনা করার লক্ষ্য হচ্ছে তা থেকে কোন কার্যকর ফল বের করা। এ কারণে এ ঘটনার যতটুকু অংশ এ লক্ষ্যের জন্যে জরুরী, ততটুকু পাঠ কর এবং

সামনে এগিয়ে যাও। স্বীয় অবস্থা পর্যালোচনা কর এবং অতীত ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা অর্জন করে আত্মসংশোধনে ব্রতী হও।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রত্যক্ষ সত্যোক্তি মক্কাবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা দেখেনি? দেখলে তা থেকে তারা শিক্ষা ও উপদেশ অর্জন করতে পারত। এখানে ‘দেখা’র অর্থ তাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা, সে জাতিগুলো তখন তাদের সামনে ছিল না। এরপর পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংস ও বিপর্যয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে। **وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قُرُونٍ** - অর্থাৎ, তাদের পূর্বে অনেক ‘কারণ’কে (অর্থাৎ, সম্প্রদায়কে) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি।

এ শব্দের অর্থ সমসাময়িক লোকসমাজ এবং সুদীর্ঘ কাল। দশ বছর থেকে একশ বছর পর্যন্ত সময়কাল অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু **قُرُون** শব্দের অর্থ যে এক শতাব্দী, কোন কোন ঘটনা ও হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এক হাদীসে আছে : মহানবী (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে বিশর মায়ানীকে বলেছিলেন : তুমি এক ‘কারণ’ পর্যন্ত জীবিত থাকবে। পরে দেখা গেল যে, তিনি পূর্ণ একশ বছর জীবিত ছিলেন। মহানবী (সঃ) জনৈক বালককে দোয়া দেন যে, তুমি এক ‘কারণ’ জীবিত থেকে। বালকটি পূর্ণ একশ বছর জীবিত ছিল। **خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ** এ হাদীসের অর্থ করতে গিয়ে অধিকাংশ আলেম এক ‘কারণ’ বলতে এক শতাব্দী স্থির করেছেন।

এ আয়াতে অতীত জাতিসমূহ সম্পর্কে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পৃথিবীতে এমন বিস্তৃতি, শক্তি ও জীবন ধারণের সাজ-সরঞ্জাম দান করেছিলেন, যা পরবর্তী লোকদের ভাগ্যে জুটেনি। কিন্তু তারাই যখন পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল এক ষোদায়ী নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করল, তখন প্রভূত জাঁকজমক, প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও অর্থ-সম্পদ তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারল না। তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিষ্কৃত হয়ে গেছে। আচ্ছ মক্কাবাসীদেরকে সম্মোহন করা হচ্ছে। আদ ও সামুদ গোত্রের মত শক্তিবল তাদের নেই এবং সিরিয়া ও এয়ামেনবাসীদের অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্যশীলও তারা নয়। এসব অতীত জাতিসমূহের ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এক নিজেদের ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা করে দেখা তাদের উচিত। বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের পরিণতি কি হবে, তাও ভেবে দেখা দরকার।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে : **وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ**

—অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার শক্তি-সামর্থ্য শুধু প্রবল প্রতাপান্বিত, অসাধারণ জাঁকজমক ও সায়াজ্যের অধিপতি এবং জনবহুল ও মহাপরাক্রান্ত জাতিসমূহকে চোখের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করে সেখানে বসিয়ে দিয়েছে। ফলে কেউ বুঝতেই পারল না যে, এখান থেকে লোকজন হ্রাস পেয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন আবদুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে একটি হঠকারিতাপূর্ণ দাবী পেশ করে বসল। সে বললো : আমি আপনার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না, যে পর্যন্ত না আপনাকে আকাশে আরোহণ করে সেখান থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসতে দেখব। গ্রন্থে আমার নাম উল্লেখ করে এ আদেশ লিপিবদ্ধ থাকতে হবে : হে আবদুল্লাহ, রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। সে আরও বলল : আপনি

এগুলো করে দেখালেও আমার মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতসব কথার পরও লোকটি মুসলমান হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইসলামের গাঙ্গী হয়ে তায়েফ যুদ্ধে শাহাদতও রক্ষা করেছিল।

জাতির এহেন অন্যান্য, হঠকারিতাপূর্ণ দাবী-দাওয়া এবং উপহাসের চকিত কথাবার্তা পিতা-মাতার চাইতে অধিক স্নেহশীল রসূল করীম (সাঃ)-এর অন্তরকে কতটুকু ব্যথিত করেছিল, তার সঠিক অনুমান আমরা করতে পারি না। শুধু ঐ ব্যক্তি হয়ত তা অনুভব করতে পারে, যে জাতির মঙ্গল ও কল্যাণ চিন্তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মত জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছে।

জড়ীয় আয়াত অবতরণেরও একটি ঘটনা রয়েছে। পূর্বোল্লিখিত আবদুল্লাহ ইবনে আবী উমাইয়া, নযর ইবনে হারেস এবং নওফেল ইবনে খালেদ একবার একত্রিত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে : আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যদি আপনি আকাশ থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসেন। গ্রন্থের সাথে চারজন ফেরেশতা এসে সাক্ষ্য দিবে যে, এ গ্রন্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই এসেছে এবং আপনি আল্লাহ্র রসূল।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এর এক উত্তর এই যে, গাফেলরা এসব দাবী-দাওয়া করে মৃত্যু ও ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। কেননা, আল্লাহ্র আইন এই যে, কোন জাতি কোন পয়গম্বরের কাছে যখন বিশেষ কোন মো'জ্জেযা দাবী করে এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের দাবী পূরণ করে দেওয়া হয়, তখন ইসলাম গ্রহণে সামান্য দেরীও সহ্য করা হয় না। ব্যাপক আযাবের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। মক্কাবাসীরাও এ দাবী সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করছিল না যে, তা যেনে নেয়ার আশা করা যেত। তাই বলা হয়েছে :

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِلَىٰ مَا كُنَّا لَنُفْخِرُ بِالْأَمْرِ

نُؤَيِّدُكَ

অর্থাৎ, আমি যদি তাদের চাহিদা মত মো'জ্জেযা

দেখানোর জন্যে ফেরেশতা পাঠিয়ে দেই তবে মো'জ্জেযা দেখার পরও বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ পক্ষ থেকে ধ্বংসের নির্দেশ জারি হয়ে যাবে। এরপর তাদেরকে বিন্দুমাত্রও অবকাশ দেওয়া হবে না। কাজেই তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, তাদের চাওয়া মো'জ্জেযা প্রকাশ না করলে তাদেরই মঙ্গল।

এরই দ্বিতীয় উত্তর চতুর্থ আয়াতে অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে এরা ফেরেশতা অবতরণের দাবী করে অদ্ভুত বোকামির পরিচয় দিচ্ছে। কেননা, ফেরেশতা যদি আসল আকার-আকৃতিতে সামনে আসে, তবে ভয়ে মানুষের অন্তরাত্মা কাঠ হয়ে যাবে। এমনকি, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার আশঙ্কাও রয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি মানবাকৃতি ধারণ করে ফেরেশতা সামনে আসে, যেমন জিবরাঈল বহবার মহানবী (সাঃ)-এর কাছে এসেছেন, তবে তারা তাঁকে একজন মানুষই মনে করবে এবং তাদের আপত্তি পূর্বাবস্থায়ই বহাল থাকবে।

এসব হঠকারিতাপূর্ণ কথাবার্তার উত্তর দেওয়ার পর পঞ্চম আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-এর সাস্থনার জন্যে বলা হয়েছে : স্বজাতির পক্ষ থেকে আপনি যে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যাতনা ভোগ করছেন, তা শুধু আপনারই বৈশিষ্ট্য নয়, আপনার পূর্বেও সব পয়গম্বরকে এমনি হৃদয়বিদারক ও প্রাণঘাতী ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তারা সাহস হারায়নি। পরিশামে বিদ্রূপকারী জাতিকে সে আযাবই পাকড়াও করেছে, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

মোটকথা এই যে, আল্লাহ্র বিধানাবলী প্রচার করাই আপনার কাজ। এ দায়িত্ব পালন করে আপনি দায়মুক্ত হয়ে যান। কেউ তা গ্রহণ করল কি না তা দেখাশোনা করা আপনার দায়িত্বে নয়। তাই এতে মশগুল হয়ে আপনি অন্তরকে ব্যথিত করবেন।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ لِّمَن مَّآئِ السَّنَوَاتِ আয়াতে কাকেরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে : নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে যা আছে, তার মালিক কে? অতঃপর আল্লাহ নিজেই রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বাচনিক উত্তর দিয়েছেন : সবার মালিক আল্লাহ। কাকেরদের উত্তরের অপেক্ষা করার পরিবর্তে নিজেই উত্তর দেয়ার কারণ এই যে, এ উত্তর কাকেরদের কাছেও স্বীকৃত। তারা যদিও শিরক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল, তথাপি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সবকিছুর মালিক আল্লাহ তাআলাকেই মানত।

لِيَجْمَعَنَّهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ বাক্যে الى শব্দটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাতে মর্ম দাঁড়িয়েছে এই যে, আল্লাহ তাআলা আদি-অন্ত সম মানুষকে কেয়ামতের দিন সমবেত করবেন কিংবা এখানে কবরে একত্রিত করা বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামত পর্যন্ত সব মানুষকে কবরে একত্রিত করতে থাকবেন এবং কেয়ামতের দিন সবাইকে জীবিত করবেন। (কুরত্বী)

كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ হযীফ মুসলীমে হযরত আবু হোয়ায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : যখন আল্লাহ তাআলা যাবতীয় বস্তুনিচয় সৃষ্টি করেন, তখন একটি ওয়াদাপত্র লিপিবদ্ধ করেন। এটি আল্লাহ তাআলার কাছেই রয়েছে। এতে লিখিত আছে : আমার অনুগ্রহ আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। (কুরত্বী)

الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ এতে ইঙ্গিত আছে যে, আয়াতের শুরুতে

বর্ণিত আল্লাহ তাআলার ব্যাপক অনুগ্রহ থেকে যদি কাকের ও মুরেক্বা বঞ্চিত হয়, তবে স্বীয় কৃতকর্মের কারণেই হবে। কারণ, তারা অনুগ্রহ লাভের উপায় অর্থাৎ, ইমান অবলম্বন করেনি। (কুরত্বী)

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْتِ وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ এখানে استقرار অবস্থান করা ; অর্থাৎ, পৃথিবীর দিবারাত্রিতে যা কিছু অবস্থিত আছে, তা সবই আল্লাহর অথবা এর অর্থ وحركت এর সমষ্টি। অর্থাৎ, ما سكن وما تحرك (স্থাবর ও অস্থাবর)। আয়াতে শুধু سكن উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত حركت আপনা-আপনিই বোঝা যায়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার অপার শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে তৎপ্রতি বিশ্বা স্থাপন করার এবং শিরক থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত সমূহের প্রথম আয়াতে এ নির্দেশ অমান্য করার শাস্তি এক বিশেষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আপনি বলেদিন : মনে কর, যদি আমিও স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করি, তবে আমারও কেয়ামতের শাস্তির ভয় রয়েছে। এটা জানা কষ্ট যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) নিশাপ। তাঁর দ্বারা অব্যাহতা হতেই পারে না। কিন্তু তাঁর দিকে সবুজ করে উন্মতকে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, এ নির্দেশের বিরোধিতা করলে বশ নবীগণের সর্দারকেও ক্ষমা করা যায় না, তখন অন্যরা কেন ছার।

এরপর বলা হয়েছে : مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ অর্থাৎ, হাজার দিবসের শাস্তি অত্যন্ত লোমহর্ষক ও কঠোর হবে। কারণ ও উপর থেকে এ শাস্তি সরে গেলে মনে করতে হবে যে, তার প্রতি আল্লাহর অশেষ করুণা হয়েছে। وَذَلِكَ الْقَوْلُ الْمَوْعُودُ অর্থাৎ, এটিই বৃহৎ ও প্রকাশ্য সফলতা। এখানে সফলতার অর্থ জ্ঞানতে প্রবেশ। এতে বোঝা গেল যে, শাস্তি থেকে মুক্তি ও জ্ঞানতে প্রবেশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

(৯) যদি আমি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে পাঠ্যতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হত। এতেও ঐ সন্দেহই করত, যা এখন করছে। (১০) নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাঁদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে ঐ শাস্তি বেঁধন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত। (১১) বলে দিন : তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে? (১২) জিজ্ঞেস করুন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তার মালিক কে? বলে দিন : মালিক আল্লাহ। তিনি অনুকম্পা প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন। এর আগমনে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে না। (১৩) যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে, তাঁরই। তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (১৪) আপনি বলে দিন : আমি কি আল্লাহ ব্যতীত—যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং যিনি সবাইকে আহার্য দান করেন ও তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না—অপরকে সাহায্যকারী স্থির করব? আপনি বলে দিন : আমি আদিত হয়েছি যে, সর্বত্র আমিই আচ্ছাবহ হব। আপনি কদাচ অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত করেন না। (১৫) আপনি বলুন, আমি আমার প্রতিপালকের অবস্থা হতে ভয় পাই কেননা, আমি একটি মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় করি। (১৬) যার কাছ থেকে ঐদিন এ শাস্তি সরিয়ে নেওয়া হবে, তার প্রতি আল্লাহর অনুকম্পা হবে। এটাই বিরাট সাফল্য। (১৭) আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান (১৮) তিনিই পরাক্রান্ত স্বীয় বান্দাদের উপর। তিনিই জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ।

قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ وَيَنْذِرُكُمْ
وَأَوْحِي إِلَىٰ هَٰذَا الْقُرْآنِ لِأَنَّ لَكَ بِهِ وَمَنْ بَلَمَّ أَتَيْتَهُمْ
لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا
هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا
الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
فَهُمْ لَئِيْمُونَ ۚ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كِبَاءً
كَذِبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَطْلُبُوا الظُّلُمَاتِ ۚ وَتَوْمَ عَصْرِهِمْ جَمِيعًا
ثُمَّ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَكُنَّا شُرَكَاءُ الَّذِينَ آمَنُوا كُنْتُمْ
تَرْغَبُونَ ۚ قُلْ تَكُنْ فَنَتَّبِعُكُمُ الْإِنَّا قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا
شُرَكَائِيْنَ ۚ أَنْظَرِكُمْ كَذَّبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَلَا يَرْوُكُلُ
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَكُمُ الْيَحْيَادُ لَوْ أَنَّكَ يَقُولُ الَّذِينَ
كُفَرُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ وَمِنْهُمْ يَهْتَفُونَ عَنْهُ
وَيَذَرُونَهُ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَكُنْ لَكُمْ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۚ

(১১) আপনি জিজ্ঞেস করুন : সর্ববৃহৎ সাক্ষ্যদাতা কে? বলে দিন :
আল্লাহ্! আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী। আমার প্রতি এ কোরআন
অবতীর্ণ হয়েছে— যাতে আমি তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এ
কোরআন পৌঁছে-সবাইকে ভীতি-প্রদর্শন করি। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে,
আল্লাহ্‌র সাথে অন্যান্য উপাস্যও রয়েছে? আপনি বলে দিন : আমি এরূপ
সাক্ষ্য দেব না। বলে দিন : তিনিই একমাত্র উপাস্য; আমি অবশ্যই
তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। (২০) যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি,
তারা তাকে চিনে, যেমন তাদের সন্তানদেরকে চিনে। যারা নিজেদেরকে
ক্ষতির মধ্যে ফেলেছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (২১) আর যে
আল্লাহ্‌র প্রতি অগ্নিবাদ আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা
বলে, তার চাইতে বড় জালেম কে? নিচয় জালেমরা সফলকাম হবে না।
(২২) আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা
শিরক করেছিল, তাদেরকে বলব : যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা
করতে, তারা কোথায়? (২৩) অতঃপর তাদের কোন অপরিশুদ্ধতা থাকবে
না; তবে এটুকুই যে তারা বলবে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র কসম,
আমরা মুশরিক ছিলাম না। (২৪) দেখতে, কিতাবে মিথ্যা বলছে নিজেদের
বিপক্ষে? এবং যেসব বিষয় তারা আপনার প্রতি মিছামিছি রচনা করত, তা
সবই উঘাও হয়ে গেছে। (২৫) তাদের কেউ কেউ আপনার দিকে কান
লাগিয়ে থাকে। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি যাতে
একে না বুঝে এবং তাদের কানে বোমা ভরে দিয়েছি। যদি তারা সব নিদর্শন
অবলোকন করে তবুও সেগুলো বিশ্বাস করবে না। এমনকি, তারা যখন
আপনার কাছে বগড়া করতে আসে, তখন কাফেররা বলে : এটি
পূর্বকালের কিছ্রকাহিনী বৈ তো নয়। (২৬) তারা এ থেকে বাধা প্রদান
করে এবং এ থেকে পলায়ন করে। তারা নিজেদেরকেই ধ্বংস করছে, কিন্তু
বুঝে না।

দ্বিতীয় আয়াতে ইসলামের একটি মৌলিক বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে।
অর্থাৎ, প্রতিটি লাভ-ক্ষতির মালিক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলা।
সত্যিকারভাবে কোন ব্যক্তি কারও সামান্য উপকারও করতে পারে না
ক্ষতিও করতে পারে না। আমার বাহ্যতঃ একজনকে অপরজন দ্বারা
উপকৃত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখি। এটি নিছক একটি বাহ্যিক আকার।
সত্যের সামনে একটি পর্দার চাইতে বেশী এর কোন গুরুত্ব নেই।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম বগতী হযরত আবদুল্লাহ্
ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : একবার রসুলুল্লাহ (সাঃ) উটে
সওয়ার হয়ে আমাকে পিছনে বসিয়ে নিলেন। কিছু দূর চলার পর আমার
দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : হে বৎস! আমি আরয় করলাম : আদেশ
করুন, আমি হাযির আছি। তিনি বললেন : “তুমি আল্লাহ্‌কে সুরণ রাখবে,
আল্লাহ্ তোমাকে সুরণ রাখবেন।” তুমি আল্লাহ্‌কে সুরণ রাখলে সর্ববৃহৎ
তাকে সামনে দেখতে পাবে। তুমি শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময়
আল্লাহ্‌কে সুরণ রাখলে, বিপদের সময় তিনি তোমাকে সুরণ রাখবেন।
কোন কিছু যাক্ষ্য করতে হলে তুমি আল্লাহ্‌র কাছেই যাক্ষ্য কর এবং
সাহায্য চাইতে হলে আল্লাহ্‌র কাছেই সাহায্য চাও। জগতে যা কিছু হবে,
ভাগ্যের লেখনী তা লিখে ফেলেছে। তোমার অংশে নেই—তোমার এমন
কোন উপকার করতে সমগ্র সৃষ্টজীব সন্নিহিতভাবে চেষ্টা করলে, তারা
কখনও তা করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি তারা সবাই মিলে তোমার
এমন কোন ক্ষতি করতে চায়, যা তোমার ভাগ্যে নেই, তবে কখনই তারা
তা করতে সক্ষম হবে না। যদি তুমি বিশ্বাস সহকারে ধৈর্যধারণ করতে পার
তবে অবশ্যই তা করো। সক্ষম না হলে ধৈর্য ধর। কেননা, স্বভাব-বিরুদ্ধ
কাজে ধৈর্য ধরার মধ্যে অনেক মঙ্গল রয়েছে। মনে রাখবে, আল্লাহ্‌র
সাহায্য ধৈর্যের সাথে জড়িত—কষ্টের সাথে সুখ এবং অভাবের সাথে
স্বাচ্ছন্দ্য জড়িত। (তিরমিযী, মুসনাদে-আহমদ)

পরিতাপের বিষয়, কোরআন পাকের এ সুস্পষ্ট ঘোষণা এবং রসুলুল্লাহ
(সাঃ)-এর আজীবনের শিক্ষা সত্ত্বেও মুসলমানরা এ ব্যাপারে পথভ্রান্ত।
তারা আল্লাহ্ তাআলার সব ক্ষমতা সৃষ্টজীবের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছে।
আজ এমন মুসলমানের সংখ্যা বর্গণ নয়, যারা বিপদের সময় আল্লাহ্
তাআলাকে সুরণ করে না বরং তারা তাঁর কাছে দোয়া করার পরিবর্তে
বিভিন্ন নামের দোহাই দেয় এবং তাদেরই সাহায্য কামনা করে। তারা
আল্লাহ্ তাআলার প্রতি লক্ষ্য করে না। পয়গম্বর ও ওলীদের ওসলায়
দোয়া করা ভিন্ন কথা। এটা জায়েয। স্বয়ং নবী করীম (সাঃ)-এর শিক্ষায়
এর প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সরাসরি কোন সৃষ্টজীবকে অভাব পূরণের জন্যে
ডাকা এ কোরআনী নির্দেশের পরিপন্থী ও প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার
নামান্তর। আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে সরল পথে কায়ম রাখুন।

আয়াতের শেষে বলেছেন : وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْمُؤْتِزُّ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলাই সবার উপর পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং
সবাই তাঁর ক্ষমতাবীন ও মুখাপেক্ষী। এ কারণেই দুনিয়ার জীবনে অনেক
যোগ্যতাসম্পন্ন মহত্তম ব্যক্তিগণও সব কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারে
না এবং তার সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না; তিনি নৈকট্যশীল রসুলই হোন
কিংবা রাজাধিরাজ।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুশরেকদের ব্যর্থতার অবস্থা : পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখ করা
হয়েছিল যে, অত্যাচারী ও কাফেররা সফলতা পাবে না। আলোচ্য আ-
য়াতসমূহে এর বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে
একটি সর্ববৃহৎ পরীক্ষার কথা বর্ণিত হয়েছে যা হাশরের ময়দানে রাক্বুল
আলামীনের সামনে অনুষ্ঠিত হবে। বলা হয়েছে : وَتَوْمَ نَخْرُجُكُمْ جَمِيعًا

অর্থাৎ, এই দিনটিও স্মরণযোগ্য, যেদিন আমি সবাইকে অর্থাৎ, মুশরক ও তাদের তৈরী করা উপাস্যসমূহকে একত্রিত করব। **ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا** অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাদেরকে প্রশ্ন করব যে, তোমরা যেসব উপাস্যকে আমার অংশীদার, স্বীয় অভাব পূরণকারী ও বিপদ বিদূরণকারী মনে করতে, আজ তারা কোথায়? তারা তোমাদের সাহায্য করে না কেন?

এখানে **ثُمَّ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিলম্ব ও দেরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে বুঝা যায় যে, হাশরের মাঠে একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে প্রশ্নাত্তর অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে না, বরং সবাই দীর্ঘকাল পর্যন্ত হতবাক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। অনেক কাল পর হিসাব-কিতাব ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হবে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন আল্লাহ তাআলা হাশরের ময়দানে তোমাদেরকে এমনভাবে একত্রিত করবেন, যেমন তীরসমূহকে তুণীরে একত্রিত করা হয়। পক্ষাঙ্গ হাজার বছর তোমরা এমনভাবে থাকবে। অন্য এক হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন এক হাজার বছর পর্যন্ত সবাই অন্ধকারে থাকবে। পরস্পর কথাবার্তাও বলতে পারবে না। — (মুত্তাদরাক, বায়হাকী)।

উপরোক্ত দুই হাদীসে পক্ষাঙ্গ হাজার ও এক হাজারের যে পার্থক্য, তা কোরআন পাকের দুই আয়াতেও উল্লেখিত আছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে : **كَانَ وَقْدًا ارْتَعَسَ اَلْفَ سَنَةٍ** অর্থাৎ, এই দিনের পরিমাণ পক্ষাঙ্গ হাজার বছর হবে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : **اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ** অর্থাৎ, একদিন তোমার প্রতিপালকের কাছে এক হাজার বছরের মত হবে। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, এ দিনটি তীর কষ্ট ও কঠোর শ্রমের দিক দিয়ে দীর্ঘ হবে। কষ্ট ও শ্রমের স্তর বিভিন্ন রূপ হবে। তাই কারও কাছে এ দিন পক্ষাঙ্গ হাজার বছরের এবং কারও কাছে এক হাজার বছরের সমান বলে মনে হবে।

সারকথা, এ মহাপরীক্ষা কেন্দ্রে প্রথমতঃ দীর্ঘকাল পর্যন্ত পরীক্ষা শুরুই হবে না। এমনকি সবাই বাসনা করতে থাকবে যে, কোনরূপে পরীক্ষা ও হিসাব-কিতাব হয়ে যাক- পরিণতি যাই হোক, এ অনিশ্চয়তার কষ্ট তো দূর হবে। এ দীর্ঘ অবস্থানের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যে **ثُمَّ** শব্দ প্রয়োগ করে **ثُمَّ نَقُولُ** বলা হয়েছে। এমনভাবে পরবর্তী আয়াতে মুশরকদের পক্ষ থেকে যে উত্তর বর্ণিত হয়েছে, তাতেও **ثُمَّ** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, তারাও দীর্ঘ বিরতির পর যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে উত্তর দেবে : **وَاللّٰهُ رَبُّنَا كُنَّا شُرَكَاءَ —** অর্থাৎ, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কসম, আমরা মুশরেক ছিলাম না। এ আয়াতে তাদের উত্তরকে **فَنَّة** শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি পরীক্ষার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং কারও প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থই সম্ভবপর। প্রথম অর্থে তাদের পরীক্ষার উত্তরকেই পরীক্ষা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, এরা পৃথিবীতে এসব মূর্তি ও স্বহস্ত নির্মিত উপাস্যদের প্রতি আসক্ত ছিল, স্বীয় অর্থ-সম্পদ এদের জন্যেই উৎসর্গ করত। কিন্তু আজ সব ভালবাসা ও আসক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং এ ছাড়া তাদের মুখে কোন উত্তর যোগাচ্ছে না। কাজেই তাদের থেকে নির্লিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়ারই দাবী করে বসল।

তাদের উত্তরে একটি বিস্ময়কর বিষয় এই যে, কিয়ামতের ভয়াবহ ও লোমহর্ষক দৃশ্যাবলী এবং রাব্বুল আলামীনের শক্তি-সামর্থ্যের অভাবনী ঘটনাবলী দেখার পর তারা কোন সাহসে রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিজলা মিথ্যা বলতে পারল। তাও এমন বলিষ্ঠ চিহ্নে যে, আল্লাহর মহান সত্তার কসম খেয়ে বলছে যে, আমরা মুশরেক ছিলাম না।

অধিকাংশ তফসীরবিদ এর উত্তরে বলেন : তাদের এ উত্তর বিবেক-বুদ্ধি ও পরিণামদর্শিতার উপর ভিত্তিশীল নয়, বরং ভয়ের আভিপ্রায়ে হতবুদ্ধিতার আবেশে মুখে যা এসেছে, তাই বলেছে। কিন্তু হাশরের সাধারণ ঘটনাবলী ও অবস্থা চিন্তা করলে এ কথাও বলা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তাদের পূর্ণ অবস্থা দৃষ্টির সামনে আনার জন্যে তাদেরকে এ শক্তিও দিয়েছেন যেন, তারা পৃথিবীর মত অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে যা ইচ্ছা বলুক- যাতে কুফর ও শিরকের সাথে সাথে তাদের এ দোষটিও হাশরবাসীদের জানা হয়ে যায় যে, তারা মিথ্যা ভাষণে অদ্বিতীয় পট্টু এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও তারা মিথ্যা বলতে দ্বিধা করে না। কোরআন পাকের অপর এক আয়াতে **فَيَقُولُونَ لَهُ كَذِبًا فَيَقُولُونَ لَهُ** বলে এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাক্যটির অর্থ এই যে, এরা মুসলমানদের সামনে যেমন মিথ্যা কসম খায়, তেমনি স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের সামনেও মিথ্যা কসম খেতে দ্বিধা করবে না।

হাশরের ময়দানে যখন তারা কসম খেয়ে নিজ নিজ শেরেকী ও কুফরী অস্বীকার করবে, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা তাদের মুখে মোহর এঁটে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হস্তপদের নির্দেশ দিবেন যে, তোমরা সাক্ষ্য দাও, তারা কি করতো। তখন প্রমাণিত হবে যে, আমাদের হস্ত-পদ, চক্ষু-কর্ণ - এরা সবাই ছিল আল্লাহ তাআলার গুপ্ত পুলিশ। তারা সব কাজকর্ম একটি একটি করে সামনে তুলে ধরবে। এ সম্পর্কেই সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে :

অদ্য আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

এহেন ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করার পর আর কেউ কোন তথ্য গোপন ও মিথ্যা ভাষণে দুঃসাহসী হবে না।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : **وَلَا يَكْفُرُونَ اِلَّا بِاللّٰهِ حَيَاتًا** অর্থাৎ, এদিন তারা আল্লাহর কাছ থেকে কোন কথা গোপন করতে পারবে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে এর অর্থ এই যে, প্রথম প্রথম তারা খুব মিথ্যা বলবে এবং মিথ্যা কসম খাবে, কিন্তু স্বয়ং তাদের হস্তপদ যখন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, তখন কেউ ভুল কথা বলতে সাহসী হবে না।

মহাবিচারপতির আদালতে সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে। পৃথিবীতে যেভাবে সে মিথ্যা বলত, তখনও তার মিথ্যা বলার এ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হবে না। কেননা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার মিথ্যার আবরণ স্বয়ং তার হস্তপদের সাক্ষ্য দ্বারা উন্মোচিত করে দিবেন।

মৃত্যুর পর কবরে মুনকীর-নকীর ফেরেশতাদ্বয়ের সামনে প্রথম পরীক্ষা হবে। একে ভর্তি পরীক্ষা বলা যেতে পারে। এ পরীক্ষা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে : মুনকির-নাকীর যখন কাফেরকে জিজ্ঞেস করবে, **اَنْتَ مِنْ رِبِّكَ وَمَا دِينُكَ** অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক কে এবং তোমার ধর্ম

কি? কাফের বলবে **هَاهُ هَاهُ لَا اَدْرِ** অর্থাৎ হায়, হায়! আমি কিছুই জানি না। এর বিপরীতে মুমিন বলবে, **وَبِنَى الْاِسْلَامِ** আমার প্রতিপালক, আল্লাহ্ এবং আমার দ্বীন, ইসলাম। এতে বুঝা যায় যে, এ পরীক্ষায় কেউ মিথ্যা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে না। নতুবা কাফের ও মুমিনের ন্যায় উত্তর দিতে পারতো। কারণ এই যে, এখানে পরীক্ষক হচ্ছেন ফেরেশতা। তারা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত নয় এবং তারা হস্তপদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করতে অক্ষম। এখানে মিথ্যা বলার ক্ষমতা মানুষকে দেওয়া হলে ফেরেশতা তার উত্তর অনুযায়ীই কাজ করতো, ফলে পরীক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। হাশরের পরীক্ষা এরূপ নয়। সেখানে প্রশ্ন ও উত্তর সরাসরি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত ও সর্বশক্তিমানের সাথে হবে। সেখানে কেউ মিথ্যা বললেও তা কার্যকরী হবে না।

তফসীর ‘বাহরে-মুহীত’ ও ‘মায়হারী’তে কোন কোন তফসীরবিদের এ উক্তিও বর্ণিত আছে যে, যারা মিথ্যা কসম খেয়ে স্বীয় শিরককে জব্বীকার করবে, তারা হলো সেসব লোক, যারা কোন সৃষ্টজীবকে খোলাখুলি আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহর প্রতিনিধি না বলেও আল্লাহর সব ক্ষমতা সৃষ্টজীবের বস্তু করে দিয়েছিল। সৃষ্টজীবের কাছেই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাক্ক করত, তাদের নামে নৈবেদ্য প্রদান করত এবং তাদের কাছেই স্বাস্থ্য, রুখী-রোযগার, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য যাবতীয় মনোবাঞ্ছা প্রার্থনা করতো। তারা নিজেদেরকে মুশরেক মনে করত না। তাই হাশরের ময়দানেও কসম খেয়ে বলবে যে, তারা মুশরেক ছিল না। কিন্তু কসম খাওয়া স্বস্তেও আল্লাহ্ তাআলা তাদের লাল্হিত করবেন।

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কোরআনের কোন কোন আয়াতের দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা কাফের ও গোনাহগারদের সাথে কথা বলবেন না। অথচ আলোচ্য আয়াত থেকে পরীক্ষার বুঝা যাচ্ছে যে, তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি কথা বলবেন।

উত্তর এই যে, এ সম্বোধন ও কথাবার্তা সন্মান প্রদান ও প্রার্থনা শ্রবণ হিসেবে হবে না। হুমকি প্রদর্শন ও শাসনীর জন্যেও সম্বোধন হবে না, উক্ত আয়াতের অর্থ তা নয়। এ কথাও বলা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে যে সম্বোধন রয়েছে, তা হবে ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায়। পক্ষান্তরে যে আয়াতে সম্বোধন ও কথাবার্তা হবে না বলে বলা হয়েছে, সেখানে প্রত্যক্ষ কথাবার্তা বুঝানো হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে :

اَنْطَرِكُمْ كَذَّابًا اَوْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

—এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে যে, দেখুন, তারা নিজেদের বিপক্ষে কেমন মিথ্যা বলেছে; আল্লাহর বিরুদ্ধে যাদেরকে তারা মিছামিছি শরীক তৈরী করেছিল, আজ তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে। নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলার অর্থ এই যে, এ মিথ্যার শাস্তি তাদের উপরই পতিত হবে। মনগড়া তৈরী করার অর্থ এই যে, দুনিয়াতে তাদেরকে আল্লাহর অংশীদার করার ব্যাপারটি ছিল মিছামিছি (শরীক) ও মনগড়া। আজ বাস্তব সত্য সামনে এসে যাওয়ায় এ মিথ্যা অকেজো হয়ে গেছে। মনগড়া তৈরীর অর্থ মিথ্যা কসমও হতে পারে, যা হাশরের ময়দানে উচ্চারণ করবে। অতঃপর হস্তপদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দ্বারা সে মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন : মনগড়া তৈরী করা বলে মুশরেকদের

এসব অপব্যখ্যা বুঝানো হয়েছে, যা তারা দুনিয়াতে মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে বর্ণনা করত। উদাহরণতঃ তারা বলতঃ **مَنْعَدُّهُمْ اِلَهِاتًا مِثْلَ رَبِّهِمْ** অর্থাৎ, আমরা উপাস্য মনে করে মূর্তির উপাসনা করি না, বরং উপাসনা করার কারণ এই যে, তারা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে আমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দেবে। হাশরে তাদের এ মনগড়া ব্যাখ্যা এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত হবে যে, তাদের মহাবিপদের সময় কেউ তাদের সুপারিশ করবে না।

উভয় আয়াতে এ বিষয়টি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, হাশরের ভয়াবহ ময়দানে মুশরিকদেরকে যা ইচ্ছা, বলার স্বাধীনতাদানের মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মিথ্যা বলার অভ্যাস একটি দুষ্ট অভ্যাস যা পরিত্যাগ করা অতি কঠিন। সুতরাং যারা দুনিয়াতে মিথ্যা কসম খেত, তারা এখানেও তা থেকে বিরত থাকতে পারেনি। ফলে সমগ্র সৃষ্টজগতের সামনে তারা লাল্হিত হয়েছে। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে মিথ্যা বলার নিন্দা জোরালো ভাষায় করা হয়েছে। কোরআনের স্থানে স্থানে মিথ্যাবাদীর প্রতি অভিসম্পাত বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যা পাপাচারের দোসর। মিথ্যা ও পাপাচার উভয়ই জাহান্নামে যাবে। — (ইবনে-হায্বান)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় : যে কাজের দরুন মানুষ দোষখে যাবে, তা কি? তিনি বললেন : সে কাজ হচ্ছে মিথ্যা। — (মুসনাদে-আহমদ)

যে রাজ রজনীতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তির চোয়াল চিরে দেওয়া হচ্ছে। সে আবার পূর্ববস্থায় ফিরে আসছে। অতঃপর আবার চিরে দেওয়া হচ্ছে। তার সাথে এ কার্যধারা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তিনি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন : এ ব্যক্তি কে? জিবরাঈল বললেন : এ হল মিথ্যাবাদী।

মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : মিথ্যা সম্পূর্ণরূপে বর্জন না করা পর্যন্ত কেউ পূর্ণ মুমিন হতে পারে না। এমনকি, হাসি-ঠাট্টা ছলেও মিথ্যা না বলা উচিত।

বায়হাকীতেও ছহীহ সনদ সহকারে বর্ণিত আছে, মুসলমানের মধ্যে অন্য কু-অভ্যাস থাকতে পারে, কিন্তু আত্মসাত ও মিথ্যা থাকতে পারে না। অন্য এক হাদীসে আছে, মিথ্যা মানুষের রিয়িক কমিয়ে দেয়।

وَهُوَ يَنْهَوْنَهُ যাহ্যাক, কাতাদাহ্, মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া

(রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণের মতে এ আয়াত মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা কোরআন শুনতে ও অনুসরণ করতে লোকদের বারণ করত এবং নিজেরাও তা থেকে দূরে সরে থাকত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, ঈরা তাঁকে সমর্থন করতেন এবং কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে তাঁকে রক্ষা করতেন, কিন্তু কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করতেন না। এমতাবস্থায় **عَنْ** শব্দের সর্বনামটির অর্থ কোরআনের পরিবর্তে নবী করীম (সাঃ) হবেন। — (মায়হারী)

الانعام

১২২

وإذا سمعوا

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইসলামের তিনটি মূলনীতি রয়েছে - (১) একত্ববাদ, (২) রেসালত ও (৩) আখেরাতে বিশ্বাস। অবশিষ্ট সব বিশ্বাস এ তিনটিরই অধীন। এ তিন মূলনীতি মানুষকে স্বীয় স্বরূপ ও জীবনের লক্ষ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করে তাকে এক সরল ও স্বচ্ছ পথে দাঁড় করিয়ে দেয়। এগুলোর মধ্যে পরকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির বিশ্বাস কার্যকর; এমন একটি বৈশ্ববিক বিশ্বাস, যা মানুষের প্রত্যেক কাজের গতি বিশেষ একটি দিকে ঘুরিয়ে দেয়। এ কারণেই কোরআন পাকের সব বিষয়বস্তু এ তিনটির মধ্যেই চক্রাকারে আবর্তিত হয়। আলাচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে পরকালের প্রশ্ন ও উত্তর, কঠোর শাস্তি, অশেষ হুওয়াব এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে অবিশ্বাসী, অপরাধীদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে : পরকালে যখন তাদেরকে দোষখের কিনারায় দাঁড় করানো হবে এক তারা কম্পনাভীত ভয়াবহ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে বলবে, আফসোস, আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ করা হলে আমরা পালনকর্তা প্রেরিত নির্দোষাবলী ও নির্দেশাবলীকে মিথ্যারোপ করতাম না, বরং এগুলো বিশ্বাস করে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম।

দ্বিতীয় আয়াতে সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত, মহাবিচারপতি তাদের বিহবল আকাঙ্ক্ষার রহস্য উন্মোচন করে বলেছেন : এরা চিরকালই মিথ্যায় অভ্যস্ত ছিল। এ আকাঙ্ক্ষায়ও এরা মিথ্যাবাদী। আসল ব্যাপার এই যে, পয়গম্বরদের মাধ্যমে যেসব বাস্তব সত্য তাদের সামনে জুলে ধরা হয়েছিল এবং তারা তা জানা ও চেনা সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতা কিংবা লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে এসব সত্যকে পর্দায় আবৃত রাখার চেষ্টা করত। আজ সেগুলো একটি একটি করে তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে গেছে, আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র অধিকার ও শক্তি-সামর্থ্য চোখে দেখেছে, পয়গম্বরদের সত্যতা অবলোকন করেছে, পরকালে পুনর্জীবিত হওয়া যা সব সময়ই তারা অস্বীকার করত, নির্মম সত্য হয়ে সামনে এসেছে, প্রতিদান ও শাস্তি প্রকাশ হতে দেখেছে এবং দোষখও দেখেছে। কাজেই বিরোধিতা করার কোন ছুতা তাদের হাতে অবশিষ্ট রইল না। তাই এমনভিত্তিই বলতে শুরু করেছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনর্বীর প্রেরিত হলে ঈমানদার হয়ে ফিরতাম।

তাদের এ উক্তিকে মিথ্যা বলা পরিণতির দিক দিয়েও হতে পারে। অর্থাৎ, তারা যে ওয়াদা করছে যে, আমরা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মিথ্যারোপ করব না, এর পরিণতি কিন্তু এরূপ হবে না; তারা দুনিয়াতে পৌছে আবারও মিথ্যারোপ করবে। এ মিথ্যা বলায় এ অর্থও হতে পারে যে, তারা এখনও যা কিছু বলছে, তা সদিচ্ছায় বলছে না, বরং সাময়িক বিপদ টলানোর উদ্দেশ্যে, শাস্তির কবল থেকে বাঁচার জন্যে বলছে - অস্তুরে এখনও তাদের সদিচ্ছা নেই।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : **إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا** এর **عطف** হয়েছে **عادوا** এর উপর। অর্থ এই যে, যদি তারা দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হয়, তবে সেখানে পৌছে একথাই বলবে যে, আমরা এ পার্শ্ববর্তী জীবন ছাড়া অন্য কোন জীবন মানি না; এ জীবনই একমাত্র জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে না।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠে যে, যখন কিয়ামতে পুনরুজ্জীবিত হওয়াবে এবং হিসাব-নিকাশ, প্রতিদান ও শাস্তিকে একবার স্বচক্ষে দেখেছে, তখন

(২৭) আর আপনি যদি দেখেন, যখন তাদেরকে দোষখের উপর দাঁড় করানো হবে। তারা বলবে : কতই না ভাল হত, যদি আমরা পুনঃ প্রেরিত হতাম; তা হলে আমরা স্বীয় পালনকর্তার নির্দেশসমূহে মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম। (২৮) এবং তারা ইতিপূর্বে যা গোপন করত, তা তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। যদি তারা পুনঃ প্রেরিত হয়, তবুও তাই করবে, যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। (২৯) তারা বলে : আমাদের এ পার্শ্ববর্তী জীবনই জীবন। আমাদেরকে পুনরায় জীবিত হতে হবে না। (৩০) আর যদি আপনি দেখেন, যখন তাদেরকে প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। তিনি বলবেন : এটা কি বাস্তব সত্য নয়? তারা বলবে : হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের কসম। তিনি বলবেন : অতএব, স্বীয় কুফরের কারণে শাস্তি আবাদন কর। (৩১) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে মিথ্যা মনে করেছে। এমনকি, যখন কিয়ামত তাদের কাছে অকস্মাৎ এসে যাবে, তারা বলবে : হায় আফসোস, এর ব্যাপারে আমরা কতই না ক্রটি করেছি। তারা স্বীয় বোঝা স্বীয় পৃষ্ঠে বহন করবে। শুনে রাখ, তারা যে বোঝা বহন করবে, তা নিকৃষ্টতর বোঝা। (৩২) পার্শ্ববর্তী জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহেযগারদের জন্যে শ্রেষ্ঠতর। তোমরা কি বুঝ না? (৩৩) আমার জন্য আছে যে, তাদের উক্তি আপনাকে দৃষ্টান্ত করে। অতএব, তারা আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং জালেমরা আল্লাহর নির্দেশাবলীকে অস্বীকার করে। (৩৪) আপনার পূর্ববর্তী অনেক পয়গম্বরকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা এতে হবর করেছেন। তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌছা পর্যন্ত তারা নিষাধিত হয়েছেন। আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। আপনার কাছে পয়গম্বরদের কিছু কাহিনী পৌছেছে।

দুনিয়াতে এসে পুনরায় তা অস্বীকার করা কিরাণে সম্ভবপর?

উত্তর এই যে, অস্বীকার করার জন্যে বাস্তবে ঘটনাবলীর বিশ্वास না থাকা জরুরী নয়। বরং আজকাল যেমন অনেক কাকের ইসলামী সত্যসমূহে পূর্ণ বিশ্वासী হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতা বশতঃ ইসলামকে অস্বীকার করে চলেছে, এমনভাবে তারা দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পর কিয়ামত, পুনরুজ্জীবন ও পরকাল সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্वासী হওয়া সত্ত্বেও শুধু হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে এগুলো অস্বীকারে প্রবৃত্ত হবে। কোরআন পাক বর্তমান জীবনে কোন কোন কাকের সম্পর্কে বলে :

وَحَدِّثْهُمْ تَسْمَعُونَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ يُحْذَرُونَ ۚ ۝ ৩৭ ৷ অর্থাৎ, তারা

আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করছে কিন্তু তাদের অন্তরে এগুলোর সত্যতা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্वास রয়েছে। যেমন, ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা শেষ নবী (সাঃ)-কে এমনভাবে চেনে, যেমন স্বীয় সন্তানদেরকে চেনে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে আছে।

যেট কথা, জগৎপ্রস্টা স্বীয় আদি জ্ঞানের মাধ্যমে জানেন যে, তাদের এ বক্তব্য যে, দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলে মুমিন হয়ে যাব, - সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণামূলক। তাদের কথা অনুযায়ী পুনরায় জগৎ সৃষ্টি করে তাদেরকে সেখানে ছেড়ে দিলেও তারা আবার তাই করবে, যা প্রথম জীবনে করত।

তফসীর মাহহারীতে তিবরানীর বরাতে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, হিসাব-কিতাবের সময় আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-কে বিচার দণ্ডের কাছে দাঁড় করিয়ে বলবেন : সন্তানদের কাজকর্ম স্বচক্ষে পরিদর্শন কর। যার সংকর্ম পাপকর্মের চাইতে এক রতি বেশী হয়, তাকে তুমি জন্নাতে পৌছাতে পার। আল্লাহ তাআলা আরও বলবেন : আমি জাহান্নামের আযাবে ঐ ব্যক্তিকে প্রবেষ্ট করাব, যার সম্পর্কে জানি যে, দুনিয়াতে পুনঃ প্রেরিত হলেও পূর্বের মতই কাজ করবে।

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ ۝ ৩৮ ৷ হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন সং লোকদের

কাজকর্ম তাদের বাহন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে অসং লোকদের কাজকর্ম ভারী বোঝার আকারে তাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কাকের ও পাগীর হাশরের ময়দানে প্রাণরক্ষার্থে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নানা ধরনের কথা-বার্তা বলবে। কখনও মিথ্যা কসম খাবে, কখনও দুনিয়ায় পুনঃ প্রেরিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। কিন্তু একথা কেউ বলবে না যে, আমরা এখন বিশ্वास স্থাপন করেছি এবং এখন সংকাজ করব। কেননা, এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে যে, এ জগৎ কর্মজগৎ নয় এবং বিশ্वास স্থাপন ততক্ষণ পর্যন্তই শুদ্ধ, যতক্ষণ তা অদৃশ্যে বিশ্वास স্থাপন হয়। দেখার পর সত্য জানা, তা দেখারই প্রতিক্রিয়া - আল্লাহ ও রসুলকে সত্য জানা নয়। এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি, এর ফলাফল - অর্থাৎ, চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ, দুনিয়াতে শান্তিময় পবিত্র জীবন এবং পরকালে জান্নাত লাভ শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। এর পূর্বে আত্মজগতে এগুলো অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এর পরে পরকালেও এগুলো উপার্জন করা সম্ভবপর নয়।

এতে ফুটে উঠল যে, পার্থিব জীবন অনেক বড় নেয়ামত এবং অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়। উপরোক্ত সুমহান সওদা এ জীবনেই ক্রয় করা যায়। তাই ইসলামে আত্মহত্যা হারাম এবং মৃত্যুর জন্য দোয়া ও মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ। কারণ এতে আল্লাহ তাআলার একটি বিরাট নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

সারকথা এই যে, দুনিয়াতে যে বস্তুটি প্রত্যেকেই প্রাপ্ত হয়েছে এবং যা সর্বাধিক মূল্যবান ও প্রিয়, তা হচ্ছে মানুষের জীবন। একথাও সবার জানা যে, মানুষের জীবনের একটা সীমাবদ্ধ গণ্ডি রয়েছে কিন্তু জীবনের সঠিক সীমা কারও জানা নেই যে, তা সন্তর বছর হবে, না সন্তর ঘণ্টা, না একটি শ্বাস ছাড়ারও সময় পাওয়া যাবে না।

وَأَنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ ۝

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে :

অর্থাৎ, কাকেররা প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে না, বরং আল্লাহর নির্দেশাবলীর প্রতিই মিথ্যারোপ করে। সুদীর্ঘ বাচনিক তফসীরে মাযহরীতে এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার দু'জন কাকের সর্দার আখনাস ইবনে শরীক ও আবু জাহলের মধ্যে সাক্ষাৎ হলে আখনাস আবু জাহলকে জিজ্ঞেস করল : হে আবুল হিকাম! (আরবে আবু জাহল 'আবুল হিকাম' (জ্ঞানধর) নামে খ্যাত ছিল। ইসলামযুগে কুফরী ও হঠকারিতার কারণে তাকে 'আবু জাহল' (মুর্থতাধর) উপাধি দেয়া হয়।) আমরা এখন একান্তে আছি। আমাদের কথাবার্তা কেউ শুনবে না; মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সম্পর্কে তোমার সঠিক ধারণা কি? আমাকে সত্য সত্য বল? তাকে সত্যবাদী মনে কর, না মিথ্যাবাদী?

আবু জাহল আল্লাহর কসম খেয়ে বলল : নিঃসন্দেহে মুহম্মদ সত্যবাদী। তিনি সারা জীবন মিথ্যা বলেননি। কিন্তু ব্যাপার এই যে, কোরাইশ গোত্রের একটি শাখা 'বনী-কুসাই' এসব গৌরব ও মহত্বের সমাবেশ ঘটবে, অবশিষ্ট কোরাইশরা রিক্ত হস্ত থেকে যাবে— আমরা তা কিরূপে সহ্য করতে পারি? পতাকা বনী-কুসাই-এর হাতে রয়েছে। হরম শরীকে হাজ্জীদেরকে পানি পান করানোর গৌরবজনক কাজটিও তাদের দখলে। খানায়-কা' বার প্রহরা ও চাবি তাদের করায়ত্ত। এখন যদি আমরা নবুওয়ত ও তাদের ছেড়ে দেই, তবে অবশিষ্ট কোরাইশদের হাতে কি থাকবে?

নাজিয়া ইবনে কা'ব থেকে বর্ণিত অপর এক রেওয়াজেতে বলা হয়েছে যে, একবার আবু জাহল স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলল : আপনি মিথ্যাবাদী—এরূপ কোন ধারণা আমরা পোষণ করি না। তবে আমরা ঐ ধর্ম ও গ্রন্থকে অসত্য মনে করি, যা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন।—(মাযহরী)

এসব রেওয়াজেতের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতটিকে তার প্রকৃত অর্থও নেয়া যেতে পারে, কোন রূপক অর্থ করার প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ, কাকেররা আপনাকে নয়—আল্লাহর নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে। আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, কাকেররা বাহ্যতঃ যদিও আপনাকে মিথ্যা বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনাকে মিথ্যা বলার পরিণাম স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ও তাঁর নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলা। যেমন, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দেয়, সে যেন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই কষ্ট দেয়।

যষ্ঠ আয়াতে وَمَا مِن دَابَّةٍ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কেয়ামতের দিন মানুষের সাথে সর্বপ্রকার জানোয়ারকেও জীবিত করা হবে। ইবনে-জরীর, ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)—এর রেওয়াজেতক্রমে বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন সব প্রাণী, চতুষ্পদ জন্তু এবং পক্ষীকুলকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং আল্লাহ তাআলা এমন সুবিচার করবেন যে, কোন শিং বিশিষ্ট জন্তু কোন শিথিবীই জন্তুকে দুনিয়াতে আঘাত করে থাকলে এর দিনে তার প্রতিশোধ তার কাঁধ থেকে নেয়া হবে। (এমনিভাবে অন্যান্য জন্তুর পারস্পরিক নির্ঘাতনের প্রতিশোধ নেয়া হবে।) যখন তাদের পারস্পরিক অধিকার ও নির্ঘাতনের প্রতিশোধ নেয়া সমাপ্ত হবে, তখন আদেশ হবে : 'তোমরা সব মাটি হয়ে যাও।' সব জন্তু তৎক্ষণাৎ মাটির স্থূপে পরিণত হবে। এ সময়েই কাকেররা আক্ষেপ করে বলবে : يَلَيْتُنَا كُنْتُ شُرَبًا অর্থাৎ, আফসোস আমিও

وَلَن كَانَ كَذِبًا عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي
نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلُقًا فِي السَّمَاءِ فَأَتَيْتَهُمْ بِآيَةٍ وَكَوْنُوا اللَّهُ
لَجِبَهُمْ عَلَى الْهَدَىٰ فَلَا تُكُونُ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ إِنَّمَا يُجِيبُ
الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝ وَ
قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ
يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَكَاظِمُونَ ۝ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي
الْأَرْضِ وَلَا ظَلِيمٍ يَخْلُفُ بِجَنَابِهِ إِلَّا أَمَرَ امثالَهُمْ مَا تَكُونُوا
فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْجَرُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا
بِالْكِتَابِ وَالْأَنبِيَاءِ وَالْطُّغَمَاءِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَاءُ
يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ قُلْ إِنْ يَكُنْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَابُ
اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغْرَبَ اللَّهُ بَأْسَكُمْ إِنَّكُمْ لَخُمُلَاتُونَ ۝
بَلْ إِنَّمَا لَكُمْ دِينُ اللَّهِ فَكَيْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَهُ الْإِنْسَانِ شَاءَ وَتَسْئَلُونَ
مَآثِرَكُمْ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
وَالْأَنبِيَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ
وَلَكِنْ فَسَتْ فُلُوقُهُمْ وَرَبِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝

(৩৫) আর যদি তাদের বিমুখতা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়, তবে আপনি যদি ভূতলে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে সমর্থ হন, অতঃপর তাদের কাছে কোন একটি মোজ্জিয়া আনতে পারেন, তবে নিয়ে আসুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সবাইকে সরল পথে সমবেত করতে পারতেন। অতঃপর, আপনি নির্বোধদের অন্তর্ভুক্ত করেন না। (৩৬) তারা ই মানে, যারা শ্রবণ করে। আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করে উত্তিত করবেন। অতঃপর তারা তাঁরই দিকে প্রত্যাগতি হবে। (৩৭) তারা বলে : তার প্রতি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নির্দেশন অবতীর্ণ হয়নি কেন? বলে দিন : আল্লাহ নির্দেশন অবতারণ করতে পূর্ণ সক্ষম; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৩৮) আর যত প্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে এবং যত প্রকার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই একেবারেই শ্রেণী। আমি কোন কিছু লিখতে ছাড়িনি। অতঃপর সবাই স্বীয় প্রতিপালকের কাছে সমবেত হবে। (৩৯) যারা আমার নির্দেশনসমূহকে মিথ্যা বলে, তারা অন্ধকারের মধ্যে মুক ও বহির। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন। (৪০) বলা, বলতো দেখি, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি পতিত হয় কিংবা তোমাদের কাছে কিয়ামত এসে যায়, তবে তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকবে যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৪১) বরং তোমরা তো তাঁকেই ডাকবে। অতঃপর যে বিপদের জন্যে তাঁকে ডাকবে, তিনি ইচ্ছা করলে তা দূরও করে দেন। যাদেরকে অশীদার করছ, তখন তাদেরকে ভুলে যাবে। (৪২) আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাদি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে। (৪৩) অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আযাব আসল, তখন কোন কাকুতি-মিনতি করল না? বস্তুতঃ তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল।

দ্বি-মাটি হয়ে যেতাম এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে যেতাম।

হুমাম বগতী হযরত আবু হোরাযরার বাচনিক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন সব পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করা হবে, এমনকি, শিথিল হাঙ্গলের প্রতিশোধ শিথিল হাঙ্গলের কাছ থেকে নেয়া হবে।

সৃষ্টজীবের পাওনার গুরুত্ব : সবাই জানে যে, জীব-জানোয়ারকে কোন শরীয়ত ও বিধি-বিধান পালন করতে আদেশ দেয়া হয়নি, এ আদেশ শুধু মানুষ ও জিনদের প্রতি। একথাও জানা যে, যারা আদিষ্ট নয়, তাদের সাথে প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবহার হতে পারে না। তাই আলেমগণ বলেন : যশের জীব-জানোয়ারের প্রতিশোধ তাদের আদিষ্ট হওয়ার কারণে নয়, বরং রাব্বুল-আলামীনের চূড়ান্ত ইনসাফ ও সুবিচারের কারণে এক জন্তুর নির্ধারনের প্রতিশোধ অন্য জন্তুর কাছ থেকে নেয়া হবে। তাদের অন্য কোন কাজের হিসাব-নিকাশ হবে না। এতে বোঝা যায় যে, সৃষ্টজীবের পারস্পরিক পাওনা বা নির্ধারনের ব্যাপারটি এতই গুরুতর যে, আদিষ্ট নয়—এমন জন্তুদেরকেও তা থেকে মুক্ত রাখা হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ধার্মিক ও এবাদতকারী ব্যক্তিও এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে কুফর ও শিরক বাতিল করে একদ্বাদ সম্প্রদায় করা হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতে মকার মুশরেকদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে : যদি আজ তোমাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে—উদাহরণতঃ আল্লাহর আযাব যদি দুনিয়াতেই তোমাদেরকে পাকড়াও করে, কিংবা মৃত্যু অথবা কেয়ামতের ভয়াবহ হাঙ্গামা শুরু হয়ে যায়, তবে চিন্তা করে বল, তোমরা এ বিপদ দূর করার জন্যে কাকে ডাকবে? কার কাছে বিপদমুক্তির আশা করবে? নাকি পাথরের এসব হস্তনির্মিত মূর্তি কিংবা অন্য কোন সৃষ্টজীব, যাদেরকে তোমরা খোদার মর্যাদায় আসীন করে রেখেছ, তারা তখন তোমাদের কাছে আসবে কি? তোমরা তাদের কাছে ফরিয়াদ করবে? না শুধু আল্লাহ তাআলাকেই আহ্বান করবে?

এর উত্তর যে কোন সচেতন মানুষের পক্ষ থেকে এছাড়া কিছুই হতে পারে না, যা আল্লাহ তাআলা তাদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, এ ব্যাপক বিপদমুহূর্তে কটর মুশরেকই সব মূর্তি ও হস্তনির্মিত উপাস্যদেরকে ভুলে যাবে এবং একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই আহ্বান করবে। এখন ফলাফল সুস্পষ্ট যে, তোমাদের মূর্তি এবং ঐ উপাস্য, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর আসনে আসীন করে রেখেছ এবং বিপদ বিদূরকারী ও অভাব মোচনকারী মনে করছ, তারা যখন এ বিপদ মুহূর্তে তোমাদের কাছে আসবে না এবং তোমরা সাহায্যের জন্যে তাদেরকে আহ্বান করতেও সাহসী হবে না, তখন তাদের এবাদত কোন উপকারে আসবে।

এ বিষয়টি পূর্ববর্তী আয়াতের সারমর্ম। এসব আয়াতে কুফর, শিরক ও অবাধ্যতার শাস্তিস্বরূপ পার্থিব জীবনেও আযাব আসার সম্ভাব্যতা বর্ণিত হয়েছে। ধরে নেয়া যাক, যদি এ জীবনে আযাব নাও আসে, তবে কেয়ামতের আগমন তো অবশ্যস্বাভী। সেখানে মানুষের সব কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে এবং প্রতিদান ও শাস্তির বিধান জারি হবে।

এখানে ساعة শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ কেয়ামতও হতে পারে এবং 'কেয়ামতে ছুগরা' (ছোট কেয়ামত)—ও হতে পারে। প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুতেই এ কেয়ামত কায়ম হয়ে যায়। প্রবাদবাক্য আছে : من مات

فقد قامت قيامته অর্থাৎ, যার মৃত্যু হয়, তার কেয়ামত সেদিনই হয়ে যায়। কেননা, কেয়ামতের হিসাব-কিতাবের প্রাথমিক নমুনাও কবর ও বরযখে দেখা যাবে এবং প্রতিদান ও শাস্তির নমুনাও এখান থেকেই শুরু হয়ে যাবে।

সারকথা এই যে, অবাধ্যদেরকে এসব আয়াতে সতর্ক করা হয়েছে, তারা যেন নিশ্চিন্ত হয়ে না যায়। পার্থিব জীবনেও তারা আযাবে পতিত হতে পারে—যেমন, পূর্ববর্তী উম্মতরা হয়েছে। যদি তা না হয়, তবে মৃত্যু কিংবা কেয়ামত পরবর্তী হিসাব তো অবশ্যস্বাভী।

কিন্তু যে মানব সীমাবদ্ধ জীবনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার আলোতে সমগ্র বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করে, তারা এ জাতীয় বিষয়বস্তুতে বাহ্যাবাজির আশ্রয় নেয়। তারা পয়গম্বরদের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কবাণীকে কুসংস্কারপূর্ণ ধারণা আখ্যা দিয়ে গা ঝাঁটিয়ে যায়। বিশেষ করে যখন প্রায় সব যুগেই এমন অবস্থাও সামনে আসে যে, অনেক মানুষ আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্যতা সত্ত্বেও ধনেজনে সমৃদ্ধ হচ্ছে। অর্থ-সম্পদ, জাঁকজমক ও সম্মান-মর্যাদা সব কিছুই তাদের কন্ঠায়ত্ত রয়েছে। একদিকে এ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা এবং অপরদিকে পয়গম্বরদের ভীতি-প্রদর্শন যখন তারা উভয়টিকে মিলিয়ে দেখে, তখন বাহ্যাবাজি মন ও শয়তান তাদেরকে এ শিক্ষাই দেয় যে, পয়গম্বরদের উক্তি একটি প্রতারণা ও কুসংস্কার প্রসূত ধারণা বৈ নয়।

এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী উম্মতদের ঘটনাবলী এবং তাদের উপর প্রয়োগকৃত আইন বর্ণনা করেছেন। বলেছেন :

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ آيَاتٍ مُّجِيبَاتٍ لِّمَا تُدْرِكُ الْأَعْيُنُ وَيَدْرِي السَّمْعُ

وَالْقَلْبُ لَا يُؤْمِنُ بِهِمْ قَلِيلٌ

অর্থাৎ, আমি আপনার পূর্বেও অন্যান্য উম্মতের কাছে স্বীয় রসূল প্রেরণ করেছি। দু'ভাবে তাদের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। প্রথমে কিছু অভাব-অনটন ও কষ্টে ফেলে দেখা হয়েছে যে, কষ্টে ও বিপদে অস্থির হয়েও তারা আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে কি না। তারা যখন এ পরীক্ষায় ফেল করল এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসা ও অবাধ্যতা ত্যাগ করার পরিবর্তে তাতে আরও বেশী লিপ্ত হয়ে পড়ল, তখন তাদের দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া হল। অর্থাৎ, তাদের জন্যে পার্থিব ভোগ-বিলাসের সব দার খুলে দেয়া হল এবং পার্থিব জীবন সম্পর্কিত সবকিছুই তাদেরকে দান করা হল। আশা ছিল যে, তারা এ সব নেয়ামত দেখে নেয়ামতদাতাকে চিনবে এবং এভাবে তারা খোদাকে স্মরণ করবে। কিন্তু এ পরীক্ষায়ও তারা অকৃতকার্য হল। নেয়ামতদাতাকে চেনা ও তাঁর কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা ভোগ-বিলাসের মোহে এমন মত্ত হয়ে পড়ল যে, আল্লাহ ও রসূলের বাণী ও শিক্ষা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে গেল। উভয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর যখন তাদের ওয়র-আপত্তির আর কোন ছিদ্র অবশিষ্ট রইল না, তখন আল্লাহ তাআলা অকস্মাৎ তাদেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলেন এবং এমন ভাবে নাস্তানাবুদ করে দিলেন যে, বংশে বাতি জ্বালাবারও কেউ অবশিষ্ট রইল না। পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর এ আযাব জলে-স্থলে—অস্তরীক্ষে বিভিন্ন পন্থায় এসেছে এবং গোটা জাতিকে মিসমার করে দিয়েছে। নূহ (আঃ)—এর গোটা জাতিতে এমন প্লাবন ঘিরে ধরে, যা থেকে তারা পর্বতের শৃঙ্গেও নিরাপদ থাকতে পারেনি। আদ জাতির উপর দিয়ে উপরপরি আট দিন প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। ফলে তাদের একটি

প্রাণীও বেঁচে থাকতে পারেনি। সামুদ্র জাতিকে একটি হৃদয়বিদারী আওয়াজের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হয়। লূত (আঃ)-এর কওমের সম্পূর্ণ বন্ডি উল্টে দেয়া হয়, যা আজ পর্যন্ত জর্দান এলাকায় একটি অভূতপূর্ব জলাশয়ের আকারে বিদ্যমান। এ জলাশয়ে ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি জীব-জন্তুও জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে ‘বাহরে মাইয়েৎ’ তথা ‘মৃত সাগর’ নামেও অভিহিত করা হয় এবং ‘বাহরে লূত’ নামেও।

মোটকথা, পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাস্য্যতার শাস্তি প্রায়ই বিভিন্ন প্রকার আযাবের আকারে অবতীর্ণ হয়েছে যাতে সমগ্র জাতি বরবাদ হয়ে গেছে। কোন সময় তারা বাহ্যতঃ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং পরবর্তীতে তাদের নাম উচ্চারণকারীও কেউ অবশিষ্ট থাকেনি।

আলোচ্য আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোন জাতির প্রতি অকস্মাৎ আযাব নাহিল করেন না, বরং প্রথমে হুশিয়ারীর জন্যে অল্প শাস্তির অবতারণা করেন। এতে ভাগ্যবান লোক অসাবধানতা পরিহার করে বিশুদ্ধ পথ অবলম্বন করার সুযোগ পায়। আরও জানা গেল যে, ইহকালে সাজা হিসেবে যে কষ্ট ও বিপদ আসে, তা সাজার আকারে হলেও প্রকৃত সাজা তা নয়, বরং অসাবধানতা থেকে সজাগ করাই তার উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য, এটি সাক্ষাৎ করুণা।

এসব আয়াত দু'রাই এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় যে, ইহকাল প্রতিদান জগৎ নয়, বরং কর্মজগৎ। এখানে সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ একই পাল্লায়

ওজন করা হয় বরং অসৎ লোক সৎলোকদের চাইতে অধিক সুখে থাকে। অতএব, এ জগতে শাস্তি কার্যকর করার অর্থ কি? এ সন্দেহের উত্তর সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, আসল প্রতিদান ও শাস্তি কেয়ামতেই হবে। তাই কিয়মতের অপর নাম ‘ইয়াওমুদ্দীন’; প্রতিদান দিবস। কিন্তু আযাবের নমুনা কিছু কষ্ট এবং ছোয়াবের নমুনা হিসেবে কিছু সুখ করুণাবশতঃ ইহজগতে প্রেরণ করা হয়। কোন কোন সাধক বলেছেন যে, এ জগতের সব সুখ ও আরাম জান্নাতের সুখেরই নমুনা, যাতে মানুষ জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হয়। পক্ষান্তরে দুনিয়াতে যত কষ্ট, বিপদ ও দুঃখ রয়েছে, সব পরকালের শাস্তিরই নমুনা, যাতে মানুষ জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়। বলাবাহুল্য, নমুনা ব্যতীত কোন কিছুর প্রতি আগ্রহও সৃষ্টি করা যায় না এবং কোন কিছু থেকে ভীতি প্রদর্শনও করা যায় না।

আলোচ্য আয়াতের শেষ ভাগেও لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ বাক্যে এ তাৎপর্যটিরই উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে যে কষ্ট ও বিপদে জড়িত করেছি, এর উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে শাস্তিদান নয়, বরং এ পরীক্ষায় ফেলে আমার দিকে আকৃষ্ট করাই ছিল উদ্দেশ্য। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই বিপদে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। এতে বুঝা গেল যে, দুনিয়াতে আযাব হিসেবেও যে কষ্ট ও বিপদ কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়, তাতেও একদিক দিয়ে আল্লাহর রহমতই কার্যরত থাকে।

এরপর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : **فَتَمَنَّا عَلَيْهِمُ ابْنَابَ كُلِّ شَيْءٍ**

অর্থাৎ, তাদের অবাধ্যতা যখন সীমাতিক্রম করতে থাকে, তখন তাদেরকে একটি বিপজ্জনক পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। অর্থাৎ, তাদের জন্যে দুনিয়ার নেয়ামত, সুখ ও সাফল্যের দূর খুলে দেয়া হয়।

এতে সাধারণ মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখে ধোঁকা খেয়ো না যে, তারাই বুঝি বিশুদ্ধ পথে আছে এবং সফল জীবন যাপন করছে। অনেক সময় আযাবে পতিত অবাধ্য জাতিসমূহেরও এরূপ অবস্থা হয়ে থাকে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত এই যে, তাদেরকে অকস্মাৎ কঠোর আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করা হবে।

তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা দেখ যে, কোন ব্যক্তির উপর নেয়ামত ও ধন-দৌলতের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে, অথচ সে গোনাহ ও অবাধ্যতায় অটল, তখন বুঝে নেবে, তাকে ঢিল দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, তার এ ভোগ-বিলাস কঠোর আযাবে গ্রেফতার হওয়ারই পূর্বাভাস।— (ইবনে কাছীর)

তফসীরবিদ ইবনে জরীর ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : “আল্লাহ তাআলা যখন কোন জাতিতে টিকিয়ে রাখতে ও উন্নত করতে চান, তখন তাদের মধ্যে দুটি গুণ সৃষ্টি করে দেন— (এক) প্রত্যেক কাজে সমতা ও মধ্যবর্তিতা, (দুই) সাধুতা ও পবিত্রতা। অর্থাৎ, অসত্য বিষয় ব্যবহারে বিরত থাকা। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা যখন কোন জাতিতে ধ্বংস ও বরদাদ করতে চান, তাদের জন্যে বিশ্বাসভঙ্গ ও আত্মসাতের দূর খুলে দেন। অর্থাৎ, বিশ্বাস ভঙ্গ ও কুকর্ম সত্ত্বেও তারা দুনিয়াতে সফল বলে মনে হয়।”

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে : আল্লাহর ব্যাপক আযাব আসার ফলে অত্যাচারীদের বংশ নির্মূল হয়ে গেল। এরই পর বলা হয়েছে : **وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অপরাধী ও অত্যাচারীদের উপর আযাব নাযিল হওয়াও সারা বিশ্বের জন্যে একটি নেয়ামত। এ জন্যে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কোরাইশ কাফেরদেরকে তাদের বাসনা অনুযায়ী অন্য রকম মো'জ্জ্যাসমূহের মধ্যে কোন কোনটি আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্যভাবে কার্যক্ষেত্রে দেখিয়ে দিয়েছেন। তারা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করার দাবী করেছিল। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মো'জ্জ্য্যাটি শুধু কোরাইশরাই নয়, তৎকালীন বিশ্বের বহু লোক স্বচক্ষে দেখেছিল।

তাদের দাবী অনুযায়ী এমন বিরাট মো'জ্জ্য্যা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও তারা কুফর ও পঞ্চদ্বন্দ্বিতায় এবং জেদ ও ইঠকারিতায় পূর্ববৎ অটল থেকে যায় এবং আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশকে **إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ** বলে উপেক্ষা করে। এসব বিষয় দেখা ও বোঝা সত্ত্বেও তারা প্রতিদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে নতুন নতুন মো'জ্জ্য্যা দাবী করত।

আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের প্রশ্ন ও দাবীর উত্তর একটি বিশেষ ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে।

কাফেররা বিভিন্ন সময়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে তিনটি দাবী করেছিল। (এক) যদি আপনি বাস্তবিকই আল্লাহর রসূল হয়ে থাকেন,

فَلْيَأْتِنَا سَوَاءُ مَا دُرُّوْا بِهِ فَنَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ
حَتَّىٰ إِذَا فِرِحُوا بِهَا وَأُوتُوا أَخَذْنَا مِنْهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ
مُبْلِسُونَ ۖ فَفُطِمَ دَاوُدُ الْقَوْمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ
أَبْصَارَكُمْ وَخَمَلَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيَكُم بِهِ أَنْظَرُ
كَيْفَ تَصْرَفُ الْأَيْدِي ثُمَّ هُمْ يَصْطَرُونَ ۖ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
أَشْكُو عَادًا لِلَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرًا هَلْ يَهْكُلُ إِلَّا الْقَوْمُ
الظَّالِمُونَ ۖ وَمَا رُسُلُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الْمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ
فَمَنْ أَمِنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ
وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَسْتَهْزِئُهُمُ الْعَادَابُ بِمَا كَانُوا
يَفْسُقُونَ ۖ قُلْ إِنْ أَقُولُ لَكُمْ غَدِي خَزَايِنَ اللَّهِ وَالْأَعْلَمُ
الْغَيْبِ ۖ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ أَرِيتُمْ مَلَكًا إِنْ أَرِيتُمْ إِلَّا نَذِيرًا ۖ قُلْ مَنْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۚ
وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِمَةِ إِذِ الْقُلُوبُ نَدِي ۚ يَنْصَرُّوْنَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَكِنَّ
لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعَ لِعَالَمٍ يَتَقُونَ ۝

(৪৪) অতঃপর তারা যখন ঐ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব কিছুর দূর উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি, যখন তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির জন্যে তারা খুব গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। (৪৫) অতঃপর জ্বলেদগ্ধের মূল শিকড় কটিত হল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে, যিনি বিশুদ্ধজাতির পালনকর্তা। (৪৬) আপনি বলুন : বল তো দেখি, যদি আল্লাহ তোমাদের কান ও চোখ নিয়ে যান এবং তোমাদের এবং তোমাদের অন্তরে মোহর এটে দেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে এগুলো এনে দেবে? দেখ, আমি কিভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিদর্শনাবলী বর্ণনা করি। তথাপি তারা বিমূখ হচ্ছে। (৪৭) বলে দিন : দেখতো, যদি আল্লাহর শাস্তি, আকস্মিক কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আসে, তবে জ্বালেম, সম্প্রদায় ব্যতীত কে ধ্বংস হবে? (৪৮) আমি পয়গম্বরদেরকে প্রেরণ করি না, কিন্তু সংবাদদাতা ও উত্তী-প্রদর্শকরূপে— অতঃপর যে বিশাস স্থাপন করে এবং সংশোধিত হয়, তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (৪৯) যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তাদেরকে তাদের নায়ফরমানীর কারণে আযাব স্পর্শ করবে। (৫০) আপনি বলুন : আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাগুর রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিন : অন্ধ ও চক্ষুস্থান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না? (৫১) আপনি এ কোরআন দ্বারা তাদেরকে ভয়-প্রদর্শন করুন, যারা আশঙ্কা করে স্বীয় পালনকর্তার কাছে এমনতাবস্থায় একত্রিত হওয়ার যে, তাদের কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী হবে না— যাতে তারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে।

তবে মো'জ্জযার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর ধনভাণ্ডার আমাদের জন্যে একত্রিত করে দিন। (দুই) যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য রসূল হয়ে থাকেন, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ উপকারী ও ক্ষতিকর অবস্থা ও ঘটনাবলী ব্যক্ত করুন যাতে আমরা উপকারী বিষয়গুলো অর্জন করার এবং ক্ষতিকর বিষয়গুলো বর্জন করার ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে নিতে পারি। (তিন) আমরা বুঝতে অক্ষম যে, আমাদেরই স্বগোত্রের একজন লোক, যিনি আমাদের মতই পিতা-মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং পানাহার ও বাজারে ঘুরাফেরা ইত্যাদি মানবিক গুণে আমাদের সম অংশীদার, তিনি কিরূপে আল্লাহর রসূল হতে পারেন! সৃষ্টি ও গুণাবলীতে আমাদের থেকে স্বতন্ত্র কোন ফেরেশতা হলে আমরা তাঁকে আল্লাহর রসূল ও মানব জাতির নেতাক্রমে মেনে নিতাম।

উপরোক্ত তিনটি দাবীর উত্তরে বলা হয়েছে : 'রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের বাজে প্রশুদির উত্তরে আপনি বলে দিন : তোমরা আমার কাছে পৃথিবীর ধনভাণ্ডারও দাবী করছ, কিন্তু আমি কবে এ দাবী করলাম যে, আল্লাহ তাআলার সব ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত? তোমরা দাবী করছ যে, আমি ভবিষ্যতের সব উপকারী ও ক্ষতিকর ঘটনা তোমাদেরকে বলে দেই, আমি এ কথাও কবে বললাম যে, আমি সব অদৃশ্য বিষয় জানি? তোমরা আমার মধ্যে ফেরেশতা সুলত গুণাবলী দেখতে চাও, আমি কবে এ দাবী করলাম যে, আমি ফেরেশতা?

মোটকথা, আমি যে বিষয় দাবী করি, তার প্রমাণই আমার কাছে চাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ, আমি আল্লাহর রসূল। তাঁর প্রেরিত নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌঁছাই এবং নিজেও তা অনুসরণ করি, অপরকেও অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করি। এর জন্যে একটি দু'টি নয়— অসংখ্য সুস্পষ্ট প্রমাণও উপস্থিত করা হয়েছে।

রেসালত দাবী করার জন্যে আল্লাহ তাআলার সব ধনভাণ্ডারের মালিক হওয়া, আল্লাহ তাআলারই মত প্রত্যেক ছোটবড় অদৃশ্য বিষয়ে অবগত হওয়া এবং মানবিক গুণের উর্ধ্বে কোন ফেরেশতা হওয়া মোটেই জরুরী নয়। রসূলের কর্তব্য এতটুকুই যে, তিনি আল্লাহ প্রেরিত এশীবাণী অনুসরণ করবেন; নিজেও তদনুযায়ী কাজ করবেন এবং অপরকেও কাজ করতে আহ্বান করবেন।

এ নির্দেশনামা দ্বারা এক দিকে রেসালতের প্রকৃত দায়িত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং অপরদিকে রসূল সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছিল, তাও দূর করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুসলমানদেরকেও পথ নির্দেশ করা হয়েছে যে, তারা যেন খ্রীষ্টানদের মত রসূলকে খোদা না মনে করে বসে। রসূলের মাহাত্ম্য ও ভালবাসার দাবীও তাই। এ ব্যাপারে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মত বাড়াবাড়ি করা যাবে না। ইহুদীরা রসূলদের সম্মান হানিতে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে এবং খ্রীষ্টানরা সম্মানদানে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে : আল্লাহর ধনভাণ্ডার আমার করায়ত্ত নয়। এ ধনভাণ্ডার দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে : সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ অনেক জিনিসের নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোরআন স্বয়ং ধনভাণ্ডার প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছে :

وَأَنْذِرْهُمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَخْلُقُونَ أَنْفُسَهُمْ وَأَلَاءِ رَبِّهِمْ

অর্থাৎ, দুনিয়াতে এমন কোন বস্তু নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই। এতে বুঝা যায়, ভাণ্ডার বলে দুনিয়ার সব বস্তুকেই বুঝানো হয়েছে; এতে কোন বিশেষ বস্তুকে নির্দিষ্ট করা যায় না। অবশ্য তফসীরবিদগণ যেসব নির্দিষ্ট বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, তাও দৃষ্টান্ত স্বরূপই উল্লেখ করছেন। কাজেই এতে কোন মতবিরোধ নেই। এ আয়াতে যখন বলা হয়েছে যে, খোদায়ী ভাণ্ডার পয়গম্বরকূল-শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুত্তকা (সাঃ)-এর হাতেও নেই, তখন উম্মতের কোন গুলী অথবা বৃহৎ সম্পদে এরূপ ধারণা পোষণ করা যে, তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন, যাকে যা ইচ্ছা দিতে পারেন—সুস্পষ্ট মূর্ততা বৈ কিছু নয়।

শেষ বাক্যে বলা হয়েছে : وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَكِّي অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমি ফেরেশতা, যে কারণে তোমরা আমার মানবিক গুণ দেখে রেসালতে অস্বীকার করবে।

মধ্যবর্তী কথায় বাক্যে ভঙ্গি পরিবর্তন করে لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ الْغَيْبِ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, 'আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমি অদৃশ্য বিষয় জানি। একথা না বলে 'আমি অদৃশ্য বিষয় জানি না' বলা হয়েছে।

তফসীর বাহরে—মুহীতে আবু হাইয়ান এরূপ বলায় একটি সুস্পষ্ট কারণ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, খোদায়ী ভাণ্ডারের মালিক হওয়া না হওয়া এবং কোন ব্যক্তির ফেরেশতা হওয়া না হওয়া এগুলো প্রত্যক্ষ বিষয়। কাফেররাও জানত যে, আল্লাহ তাআলার সব ভাণ্ডার রসূলের হাতে নেই এবং তিনি ফেরেশতাও নন। তারা শুধু হঠকারিতাবশতঃ এসব দাবী করত। কাজেই কাফেরদের এসব কথার উত্তরে একথা বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল যে, আমি আল্লাহর ভাণ্ডারের মালিক হওয়া এবং ফেরেশতা হওয়ার দাবী কখনও করিনি।

দ্বিতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এ সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি তারা জেদ পরিহার না করে, তবে তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক বন্ধ করে আসল কাজে অর্থাৎ রেসালত প্রচারে আত্মনিয়োগ করুন। যারা কেয়ামতে আল্লাহর দরবারে উপস্থিতি ও হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন। যেমন, মুসলমান কিংবা যারা কমপক্ষে এসব বিষয় অস্বীকার করে না, আর কিছু না হোক, কমপক্ষে তারা হিসাবের আশঙ্কা করে।

মোটকথা এই যে, কেয়ামত সম্পর্কে তিন প্রকার লোক রয়েছে (এক) কেয়ামতে নিক্তি বিশ্বাসী, (দুই) অনিশ্চিত বিশ্বাসী এবং (তিন) সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী। এ তিন প্রকার লোককেই ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ নবী-রসূলগণকে দেয়া হয়েছে। কোরআনের অনেক আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই প্রকার লোক ভীতি প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হবে বল বৈশী আশা করা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের দিকে মনোযোগ দানের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে :

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর কাছে একত্রিত হওয়ার আশঙ্কা করে, তাদেরকে কোরআন দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করুন।

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَصِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَ مَا عَنَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ
مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ مَقْرُورَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ
الظَّالِمِينَ ۝ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ
مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ۝
وَلِأَجْلِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا وَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ كَذَّبُوا
رَبَّهُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُمْ مِنْ عَمَلٍ مُتَمَرِّدِينَ لِبِجَاهِكَ
فَكُنْ تَابٌ مِنْ بَعْدِ ۝ وَأَصْلَحْ فَأَنَّهُ غَوَوْا رَحِيمَهُ ۝ وَكَذَلِكَ
نَقُصُّكَ الْأَيَّاتِ وَلِتَسْتَتِينَ سَبِيلَ الْمُتَعَمِّدِينَ ۝ قُلْ لِي
هُدًى أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَّا
أَسْمِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝
قُلْ لِي عَلَىٰ بَيْتِهِ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۝ إِنِ الْكُلْمُ إِلَّا اللَّهُ يُقَضُّ الْحَقُّ وَهُوَ
خَيْرُ الْفَصِّلِينَ ۝ قُلْ لَّوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ
لَقَضَىٰ الرِّمْيَ الَّذِي رَبِّي وَأَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ۝

(৫২) আর তাদেরকে বিভাঙিত করবেন না, যারা সকাল-বিকাল স্বীয় পলনকর্তার এবাদত করে, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তাদের হিসাব কিছুকালও আপনার দায়িত্বে নয় এবং আপনার হিসাব কিছুকালও তাদের দায়িত্বে নয় যে, আপনি তাদেরকে বিভাঙিত করেন। নতুবা আপনি ঈশ্বরের কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। (৫৩) আর এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি— যাতে তারা বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্য থেকে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ দান করছেন? আল্লাহ কি কুজ্ঞানের সম্পর্কে সুপ্রসিদ্ধাত নন? (৫৪) আর যখন তারা আপনার কাছে আসবে যারা আমার নির্দর্শনসমূহে বিশ্বাস করে, তখন আপনি বলে দিন : তোমাদের উপর শাস্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের পলনকর্তা রহমত করা নিজ দায়িত্বে নিখে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাগত কোন মন্দ কাজ করে, অনন্তর এরপরে তওবা করে নয় এক সং হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৫৫) আর এখনভাবে আমি নির্দর্শনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি— যাতে অপরাধীদের পক্ষ সুস্থিট হয়ে উঠে। (৫৬) আপনি বলে দিন : আমাকে অন্যের এবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের এবাদত কর। আপনি বলে দিন : আমি তোমাদের খুশীতে চলবো না। কেননা, তাহলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং সুপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হব না। (৫৭) আপনি বলে দিন : আমার কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি স্বপ্ন আছে এক তেমনা তার প্রতি মিথ্যারোপ করছে। তোমরা যে বস্ত শীঘ্র দাবী করছ, তা আমার কাছে নেই। আল্লাহ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই প্রকৃতম যীমৎসাকারী। (৫৮) আপনি বলে দিন : যদি আমার কাছে তা থাকত, যা তোমরা শীঘ্র দাবী করছ, তবে আমার ও তোমাদের পারস্পরিক বিবাদ কবেই চূকে যেত। আল্লাহ জ্ঞানের সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত।

মান-অপমানের ইসলামী মাপকাঠি : ইসলামে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য নেই : যারা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মনুষ্যত্ব কাকে বলে তা জানে না, বরং মানুষকে জগতের বিভিন্ন জ্ঞানোন্মাদের মধ্যে এমন একটি সম্ভাব্য জ্ঞানোন্মাদের মনে করে, যে অন্য জ্ঞানোন্মাদেরকে অধীনস্ত ও প্রভাবাধীন করে স্বীয় সেবাদাসে পরিণত করেছে, তাদের মতে জীবনের লক্ষ্য পানাহার, নিশ্রা-জাগরণ ও অন্যান্য জৈবিক অনুভূতিতে ব্যবহার করা ছাড়া আর কিইবা হতে পারে? জীবনের লক্ষ্য যখন শুধু তাই হয়, তখন জগতে ভাল-মন্দ, ছোট-বড়, সম্মানিত ও অপমানিত, ভদ্র ও ইতর পরিচয়ের মাপকাঠি এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, যার কাছে পানাহার ও ভোগ্য বস্তুর প্রাচুর্য রয়েছে, সেই কৃতকর্মী, সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র এবং যার কাছে এসব বস্তু স্বল্পমাত্রায় আছে সে অপমানিত, লাঞ্চিত ও অকৃতকর্মী।

সত্য বলতে কি, এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত হওয়ার জন্যে সচরিত্র ও সংকর্মের কোন প্রয়োজনই নেই, বরং যে কর্ম ও চরিত্র এ জৈবিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক, তাই সংকর্ম ও সচরিত্রতা।

এ কারণেই নবী-রসুলগণের এবং তাদের আনীত ধর্মের সর্ব প্রথম ও সর্বশেষ শিক্ষা ছিল এই যে, এ জীবনের পর আরেকটি চিরস্থায়ী ও অনন্ত জীবন রয়েছে, সে জীবনের সুখশান্তি যেমন পূর্ণ ও চিরস্থায়ী, তেমনি কষ্ট, শাস্তি ও চিরস্থায়ী। পার্থিব জীবন স্বয়ং লক্ষ্য নয়, বরং পর জীবনে যে যে বিষয় উপকারী, তা সত্ত্বেই ব্যস্ত থাকাই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আসল লক্ষ্য।

মানুষ ও জন্তু জ্ঞানোন্মাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জন্তু-জ্ঞানোন্মাদেরকে পর জীবনের চিন্তা করতে হয় না, কিন্তু জ্ঞানী ও সচেতন ব্যক্তিদের মতে পরজীবনের সংশোধনই মানুষের সর্ববৃহৎ চিন্তা। এ বিশ্বাস ও মতবাদ অনুযায়ী ভদ্রতা ও নীচতা এবং সম্মান ও অপমানের মাপকাঠি অধিক পানাহার কিংবা অধিক ধন-সম্পদ আহরণ হবে না, বরং সচরিত্রতা ও সংকর্মই হবে আভিজাত্যের এক মাত্র মাপকাঠি। পরকালের সম্মান এগুলোর উপরই নির্ভরশীল।

জগদ্রাসী যখনই নবী-রসুলগণের নির্দেশাবলী, শিক্ষা এবং পরকাল-বিশ্বাসের প্রতি অমনোযোগী হয়েছে, তখনই তার স্বাভাবিক ফলশ্রুতিও সামনে এসে গেছে— অর্থহীন, শুধু অন্ত ও উদরই মান-অপমান, ভদ্রতা ও নীচতার মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হয়েছে। যারা এতে সফলকাম তারা ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত হয়েছে এবং যারা এতে ব্যর্থ কিংবা অসম্পূর্ণ, তারা দরিদ্র, সম্মানহীন, নীচ ও লাঞ্চিত বলে পরিগণিত হয়েছে।

তাই সর্বকালে শুধু পার্থিব জীবনের গোলক ধাঁধায় আবদ্ধ মানুষ বিস্তবাসদেরকে সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র এবং দীন-দরিদ্র বিস্তহীনদেরকে সম্মানহীন ও নীচ বলে গণ্য করেছে। এ মাপকাঠির ভিত্তিতেই হযরত নূহ (আঃ)—এর কণ্ঠে বিশ্বাস স্থাপনকারী দরিদ্রদেরকে নীচ বলে আখ্যা দিয়ে বলেছিল : আমরা এ নীচদের সাথে একত্রে বসতে পারি না। আপনি যদি আমাদেরকে কোন পয়গাম শুনাতে চান, তবে দরিদ্র ও নিঃস্বদেরকে আগে দরবার থেকে বহিস্কার করুন।

মহানবী (সাঃ)—এর আমলে আবারও এ প্রশ্নই দেখা দেয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এরই উত্তর বিশেষ নির্দেশসহ উল্লেখিত হয়েছে।

ইবনে কাছীর ইমাম ইবনে জরীরের বাচনিক বর্ণনা করেন যে, ওতবা, শায়বা, ইবনে-রবিয়া, মুতএম ইবনে আদী, হারেছ ইবনে নওফেল প্রমুখ

কতিপয় কোরাইশ সর্দার মহানবী (সাঃ)-এর চাচা আবু তালেবের নিকট এসে বলল : আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ (সাঃ)-এর কথা যেনে নিতে আমাদের সামনে একটি বাধা এই যে, তার চার পাশে সর্বদা এমন সব লোকের ভিড় লেগে থাকে, যারা হয় আমাদের ক্রীতদাস ছিল, এরপর আমরা মুক্ত করে দিয়েছি, না হয় আমাদেরই দান-দক্ষিণায় যারা লালিত-পালিত হতো। এমন নিকট লোকদের উপস্থিতিতে আমরা তার মজলিসে যোগদান করতে পারি না। আপনি তাকে বলে দিন, যদি সে আমাদের আসার সময় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেয়, তবে আমরা তার কথা নিয়ে বিবেচনা করতে সম্মত রয়েছি।

আবু তালেব মহানবী (সাঃ)-কে তাদের বক্তব্য জ্ঞানিয়ে দিলে হযরত ওমর (রাঃ) মত প্রকাশ করে বললেন : এতে অসুবিধা কি? আপনি কিছুদিন তাই করে দেখুন। এরা তো অকপট বন্ধুবর্গই। কোরাইশ সর্দাদের আগমনের সময় এরা না হয় সরেই যাবে।

এরই পরিশ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে উল্লিখিত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। আয়াত অবতরণের পর হযরত ফারুককে আজম (রাঃ)-কে ‘আমার মত ভ্রান্ত ছিল’—এই বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

যে দরিদ্রদের সম্পর্কে আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে, তারা ছিলেন হযরত বেলাল হাবশী (রাঃ), ছোহায়েব কুমী (রাঃ), আশ্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ), আবু হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালাম (রাঃ), উসায়দের মুক্ত ক্রীতদাস ছবীহ (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ), মেকদাদ ইবনে আমর (রাঃ), মসউদ ইবনুল হারী (রাঃ), যুশ-শিমালাইন (রাঃ) প্রমুখ সাহায্যে করাম। তাদের সম্মান ও ভক্ততার সনদ আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

কতিপয় নির্দেশ : উল্লিখিত আয়াত থেকে কতিপয় নির্দেশ বোঝা যায়—প্রথমতঃ কারও ছিন্বেস্ত কিংবা বাহ্যিক দূরবস্থা দেখে তাকে নিকট ও হীন মনে করার অধিকার কারও নেই। প্রায়ই এ ধরনের পোশাকে এমন লোকও থাকেন, যারা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রিয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : অনেক দুর্দশাগ্রস্ত, ধূলি-ধূসরিত লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রিয় তারা যদি কোন কাজের আবদার করে বলে বসেন, ‘এরূপ হবে’ তবে আল্লাহ তাআলা তাদের সে আবদার অবশ্যই পূর্ণ করেন।’

দ্বিতীয়তঃ শুধু পার্থিব ধন-দৌলতকে ভ্রমতা ও নীচতার মাপকাঠি মনে করা মানবতার অবমাননা। এর প্রকৃত মাপকাঠি হচ্ছে সচ্চরিত্র ও সংকর্ম।

তৃতীয়তঃ কোন জাতির সম্প্রদায়িক ও প্রচারকের জন্যে ব্যাপক প্রচারকার্যও জরুরী। অর্থাৎ, পক্ষ-বিপক্ষ, মান্যকারী ও অমান্যকারী সবার কাছেই স্বীয় বক্তব্য প্রচার করতে হবে। কিন্তু যারা তার শিক্ষার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তা পালন করে চলবে, তাদের অধিকার অগ্রগণ্য। অন্যের কারণে তাদেরকে পেছনে ফেলা কিংবা উপেক্ষা করা জায়েয নয়। উদাহরণতঃ অমুসলমানদের মধ্যে প্রচার কার্যের জন্যে অজ্ঞ মুসলমানদের শিক্ষাদান ও সংশোধনকে পিছনে ফেলে দেয়া উচিত নয়।

চতুর্থতঃ, আল্লাহর নেয়ামত কৃতজ্ঞতার অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি খোদায়ী নেয়ামতের আধিক্য কামনা করে, কথায় ও কাজে কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করা তার পক্ষে অপরিহার্য।

এবার আয়াতসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা দেখুন। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে :

وَلَا جَبْدَ لَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا قُلْ سَلَوُكُمْ وَلَكُمْ

رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ

অর্থাৎ, আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে, এমন লোক বন্ধ আপনার কাছে আসে (এখানে آيات—এর অর্থ কোরআনের আয়াত হতে পারে এবং আল্লাহ তাআলার শক্তি ও কুদরতের সামান্য নিদর্শনাবলীও হতে পারে।) তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে سَلَوُكُمْ বলে সম্বোধন করুন। এখানে سَلَوُكُمْ—এর দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে : (এক) তাদেরকে আল্লাহ তাআলার সালাম পৌছিয়ে দিন, যাতে তাদের প্রতি চূড়ান্ত সম্মান বোঝা যায়। প্রকৃত করে ঐসব দরিদ্র মুসলমানের মনোবেদনার চমৎকার প্রতিকার হয়ে গেছে, যাদেরকে মজলিস থেকে হটিয়ে দেয়ার প্রস্তাব কোরাইশ সর্দারা করেছিল। (দুই) আপনি তাদেরকে নিরাপত্তার সুসংবাদ শুনিতে দিন যে, তাদের ভুলত্রুটি হয়ে থাকলেও তা ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তারা সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

كَلَّمَ رَبُّكُمُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ —বাক্যে এ অনুগ্রহের উপর আরও

অনুগ্রহ ও নেয়ামত দানের গুয়াদা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মুসলমানদেরকে বলে দিন : তোমাদের প্রতিপালক দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। কাজেই খুব ভীত ও অস্থির হওয়া না। এ বাক্যে প্রথমতঃ رَبُّ (প্রতিপালক) শব্দ ব্যবহার করে আয়াতের বিষয়বস্তুকে যুক্তিযুক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতিপালক। এখন জানা কথা যে, কোন প্রতিপালক স্বীয় পালিতদেরকে বিনষ্ট হতে দেন না। অতঃপর رَبُّ শব্দটি যে দয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছিল, তা পরিকারভাবেও উল্লেখ করা হয়েছে। তাও এমন ভঙ্গিতে যে, তোমাদের প্রতিপালক দয়া প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্বে লিখে নিয়েছেন। কাজেই কোন ভাল ও সং লোকের দুরাই যখন গুয়াদা খেলাকী হতে পারে না, তখন রাক্বুল আলামীনের দ্বারা তা কেমন করে হতে পারে? বিশেষ করে যখন গুয়াদাটি চুক্তির আকারে লিপিবদ্ধ করে নেয়া হয়।

সহীহ বুখারী, মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যখন আল্লাহ তাআলা সব কিছু সৃষ্টি করলেন এবং প্রত্যেকের ভাগ্যের ফয়সালা করলেন, তখন একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করে নিজের কাছে আরশে রেখে দিলেন। তাতে লেখা আছে : اِنْ رَحْمَتِي غَلَبَتْ عَلَى غَضَبِي —অর্থাৎ, আমার দয়া আমার ক্রোধের উপর প্রবল হয়ে গেছে।

হযরত সালামান (রাঃ) বলেন : আমি তওরাতে লিখিত দেখেছি, যখন আল্লাহ তাআলা আসমান, যমিন ও এতদুভয়ের সবকিছু সৃষ্টি করলেন, তখন ‘রহমত’ (দয়া) গুণটিকে একশ’ ভাগ করে একভাগ সমস্ত সৃষ্টজীবকে দান করলেন। মানুষ, জীবজন্তু ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে দয়ার যেসব লক্ষণ দেখা যায়, তা ঐ এক ভাগেরই ক্রিয়া। পিতা-মাতা ও সন্তানদের মধ্যে, ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে এবং প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যে পারস্পরিক সহানুভূতি, ভালবাসা ও দয়া পরিলক্ষিত হয়, তা ঐ একভাগ দয়ারই ফলশ্রুতি। অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ দয়া আল্লাহ তাআলা নিজের জন্যে রেখেছেন। কোন কোন রেওয়াজেতে একে নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসরূপেও বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই অনুমান করা যায় যে, সৃষ্টজীবের প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়া কিরূপ ও কতটুকু।

আর তিনি অত্যন্ত দয়ালু। অর্থাৎ, ক্ষমা করেই ক্ষান্ত হবেন না, বরং নেয়ামতও দান করবেন।

আয়াতের ‘অজ্জতা’ শব্দ দ্বারা বাহ্যতঃ কেউ ধারণা করতে পারে যে, গোনাহ্ ক্ষমা করার ওয়াদা একমাত্র তখনই প্রযোজ্য হবে যখন অজ্জতাবশতঃ কোন গোনাহ্ হয়ে যায়, জেনেশুনে গোনাহ্ করলে হয়তো এ ওয়াদা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। কেননা, এখানে ‘অজ্জতা’ বল অজ্ঞতার কাজ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, এমন কাজ করে বসে, যা পরিশ্রম সম্পর্কে অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তিই করে। এর জন্যে বাস্তবে অজ্ঞ হওয়া জরুরী নয়। স্বয়ং - **جهالت** (অজ্জতা) শব্দই এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে **جهل** শব্দের পরিবর্তে **جهالت** - এর ব্যবহার সম্ভবতঃ এদিকে বৃদ্ধি করার জন্যেই করা হয়েছে। কেননা, **جهل** শব্দটি **علم** (জ্ঞান) এর বিপরীত এবং **جهالت** শব্দটি **حلم** (সহনশীলতা ও গাভীর) -এর বিপরীত। অর্থাৎ, **جهالت** শব্দটি বাকপদ্ধতিতে ‘কার্যগত অজ্ঞতার’ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যখনই কোন গোনাহ্ হয়ে যায়, তা কার্যগত অজ্ঞতার কারণেই হয়। তাই কোন কোন ব্যুর্গ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রসুলের কোন নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, সে অজ্ঞ। এখানে কার্যগত অজ্ঞতাই বোঝানো হয়েছে। এর জন্যে অজ্ঞান হওয়া জরুরী নয়। কেননা, কোরআন পাক ও অসংখ্য সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, তওবা দ্বারা প্রত্যেক গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়- অমনোযোগিতা ও অজ্জতাবশতঃ হোক কিংবা জেনেশুনে মানসিক দুর্মতি ও প্রবৃত্তির তাড়না লভ্য হোক।

এখানে বিশেষভাবে প্রশ্নাধনযোগ্য যে, আয়াতে দু’টি শর্তাধীনে গোনাহ্কারদের সম্পর্কে ক্ষমা ও রহমতের ওয়াদা করা হয়েছে (এক) তওবা অর্থাৎ, গোনাহ্র জন্য অনুতপ্ত হওয়া। হাদীসে বলা হয়েছে **انما التوبة النماء** - অর্থাৎ, অনুশোচনার নামই হল তওবা।

(দুই) ভবিষ্যতের জন্য আমল সংশোধন করা। কয়েকটি বিষয় এ আমল সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত। ভবিষ্যতে এ পাপ কাজের নিকটবর্তী না

হওয়ার সংকল্প করা ও সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া এবং কৃত গোনাহ্র কারণে কারও অধিকার নষ্ট হয়ে থাকলে যথাসম্ভব তা পরিশোধ করা, তা আল্লাহ্র অধিকার হোক কিংবা বান্দার অধিকার। আল্লাহ্র অধিকার যেমন, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব ইত্যাদি ফরয কর্মে ত্রুটি করা। আর বান্দার অধিকার— যেমন, কারও অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে করায়ত্ত করা ও ভোগ করা, কারও ইজ্জত-আবরু নষ্ট করা, কাউকে গালি-গালাজের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন প্রকারে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি।

তাই তওবার পূর্ণতার জন্যে যেমন অতীত গোনাহ্র জন্যে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, ভবিষ্যতের জন্যে কর্ম-সংশোধন করা এবং গোনাহ্র নিকটবর্তী না হওয়া জরুরী, তেমনিভাবে যেসব নামায ও রোযা অমনোযোগিতাবশতঃ তরক করা হয়েছে, সেগুলোর কাযা করা, যে যাকাত দেয়া হয়নি, তা এখন দিয়ে দেয়া, হজ্ব ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্ব না করে থাকলে এখন তা আদায় করে নেয়া, নিজে করতে সক্ষম না হলে বদলী হজ্ব করানো প্রভৃতি বিষয়ও অপরিহার্য। যদি জীবদ্দশায় বদলী হজ্ব ও অন্যান্য কাযার পুরোপুরি সুযোগ না মিলে তবে ওছিয়ত করা, যাতে ওয়ারিশ ব্যক্তির তার ফরযসমূহের ফিদিয়া (বিনিময়) ও বদলী হজ্বের ব্যবস্থা করে। মোটকথা, কর্ম-সংশোধনের জন্যে শুধু ভবিষ্যৎ কর্ম-সংশোধন করাই যথেষ্ট নয়, বিগত ফরয ও ওয়াজেবসমূহ আদায় করাও জরুরী।

এমনিভাবে যদি কারও অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে হস্তগত করে থাকে, তবে তা ফেরৎ দিতে হবে কিংবা তার কাছ থেকে ক্ষমা নিতে হবে। কাউকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে তারও ক্ষমা নিতে হবে। যদি ক্ষমা নেয়া সম্ভবপর না হয়— উদাহরণতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি মারা যায়, কিংবা তার ঠিকানা অজ্ঞাত হয়, তবে তার জন্যে নিয়মিতভাবে আল্লাহ্ তাআলার কাছে মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকবে। এতে আশা করা যায়, সে সন্তুষ্ট হবে এং ঈশ্বরী ব্যক্তি ঈশ্বর থেকে অব্যাহতি পাবে।

স্বপ্নেও সূত জীবের জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে উহ্য রয়েছে।

وَعِنْدَ مَا نُرَاقِبُ - এর অর্থ এই দাঁড়াল যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডার আল্লাহরই কাছে রয়েছে। কাছে থাকার অর্থ মালিকানায ও ক্রয়ও থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, অদৃশ্য বিষয়ের ভাণ্ডারসমূহের জ্ঞান তাঁর ক্রয়ত্ব এবং সেগুলোকে অস্তিত্ব দান করা অর্থাৎ, কখন কতটুকু অস্তিত্ব লাভ করবে—তাও তাঁর সামর্থ্যের অন্তর্গত। কোরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

وَلَا يَسْئُرُ الْاَعْيُنُ مَا خُزِّنَتْ وَهِيَ تَنْزِيلُ الْاَيَاتِ وَمَقْلُومٌ

অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার আমার কাছে রয়েছে। কিন্তু আমি প্রত্যেক বস্তু একটি বিশেষ পরিমাণে অবতীর্ণ করি।

মোটকথা এই যে, এ বাক্য দ্বারা আল্লাহ তাআলার নজিরবিহীন জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠাও প্রমাণিত হয়েছে এবং সামর্থ্যগত পরাকাষ্ঠাও। আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, এ জ্ঞান ও সামর্থ্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য। এ গুণ অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী عَلَيْهِ শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী বাক্যে এ ইঙ্গিতকে সুস্পষ্ট উক্তিতে রূপান্তরিত করে পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্যে বলা হয়েছে : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ - অর্থাৎ, অদৃশ্য বিষয়ের এসব ভাণ্ডার সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ অবহিত নয়।

তাই এ বাক্য দ্বারা দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়েছে : (এক) আল্লাহ তাআলার পরিব্যাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের মাধ্যমে সব অদৃশ্য বিষয়ের উপর সামর্থ্যবান হওয়া এবং (দুই) তাঁকে ছাড়া অন্য কোন সূত বস্তুর এরূপ জ্ঞান ও সামর্থ্য অর্জিত না হওয়া।

কোরআনের পরিভাষায় غيب শব্দের অর্থ পূর্বে তফসীরে মাযহারীর বরাতে দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, যেসব বিষয় এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি কিংবা অস্তিত্ব লাভ করলেও কোন সূতজীব সে সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারেনি। এ অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখলে অদৃশ্য বিষয়ের প্রশ্নে জনসাধারণের মনে বাহ্যদৃষ্টিতে যেসব প্রশ্ন দেখা দেয়, তা আপনা-আপনিই দূর হয়ে যাবে।

কিন্তু غيب শব্দ দ্বারা মানুষ সাধারণতঃ আভিধানিক অর্থ বুঝে। ফলে যে বস্তু আমাদের জ্ঞান ও দৃষ্টির অন্তরালে, তাকেও সাধারণ মানুষ غيب বলে দেয়, যদিও অন্যদের কাছে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উপকরণাদি বিদ্যমান থাকে। এর ফলে নানাবিধ প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। উদাহরণতঃ জ্যোতি বিদ্যা, ভবিষ্যৎকথন বিদ্যা, গণনবিদ্যা কিংবা হস্ত-রেখা বিদ্যা দ্বারা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর জ্ঞান অর্জন করা হয় অথবা ‘কাশফ ও এলহাম’ (আল্লাহ প্রকাশিত সত্য স্বর্গীয় প্রেরণা) দ্বারা কেউ কেউ ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী জেনে ফেলে অথবা মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি দেখে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা ঝড়-বৃষ্টি সম্পর্কে ভবিষ্যৎদৃষ্টি করে এবং তা অনেকাংশে সত্যও পরিণত হয়—এসব বিষয় জনসাধারণের দৃষ্টিতে ‘এলমে গায়ব’ তথা অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞান। তাই আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কোরআন পাক ‘এলমে-গায়ব’-কে আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্ট্য বলেছে, অথচ চাক্ষুষ দেখা যায় যে, অন্যরাও তা অর্জন করতে পারে।

উত্তর এই যে, আল্লাহ তাআলা ‘কাশফ ও এলহামের’ মাধ্যমে যদি

কোন বান্দাকে কোন ভবিষ্যৎ ঘটনা বলে দেন, তবে কোরআনের পরিভাষায় তাকে ‘এলমে গায়ব’ বলা যায় না। এমনভাবে উপকরণ ও যন্ত্রাদির মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, তাও কোরআনী পরিভাষা অনুযায়ী ‘এলমে-গায়ব’ নয়, যেমন আবহাওয়া বিভাগের খবর কিংবা নাড়ি দেখে রোগীর শারীরিক অবস্থা বলে দেয়া। কারণ, আবহাওয়া বিভাগ কিংবা কোন হাকীম-ডাক্তার এসব খবর দেয়ার সুযোগ তখনই পায়, যখন এসব ঘটনার উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়। তবে ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায় না। যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় কিন্তু জনসাধারণ অজ্ঞ থাকে। এরপর উপকরণ যখন শক্তিশালী হয়ে যায়, তখন সবার দৃষ্টিতেই ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। এ কারণেই আবহাওয়া বিভাগ একমাস দু'মাস পর যে বৃষ্টি হবে, তার খবর আজ দিতে পারে না। কেননা, এখনও পর্যন্ত এ বৃষ্টির উপকরণ সৃষ্টি হয়ে প্রকাশ পায়নি। এমনভাবে কোন হাকীম-ডাক্তার আজ নাড়ি দেখে বৎসর-দুই বছর পূর্বে কিংবা পরে সেবনকৃত ওষুধ কিংবা পথ্যের সন্ধান দিতে পারে না। কারণ, স্বভাবতঃ এর কোন ক্রিয়া নাড়ীতে থাকে না।

মোটকথা, চিহ্ন ও লক্ষণাদি দেখেই এসব বিষয়ের অস্তিত্বের খবর দেয়া হয়। লক্ষণাদি ও উপকরণ প্রকাশ পাওয়ার পর আর সেগুলো অদৃশ্য বিষয় থাকে না, বরং প্রত্যক্ষ বিষয়ে পরিণত হয়। তবে সুক্ষ্ম হওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না; শক্তিশালী হয়ে উঠার পরই সবার চোখে ফুটে উঠে।

এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত উপায়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, তা সবকিছু স্বপ্নেও অনুমানের অতিরিক্ত কিছু নয়। এলম বলা হয় নিশ্চিত জ্ঞানকে, তা এগুলোর কোনটির মাধ্যমেই অর্জিত হয় না। তাই এসব খবর ভ্রান্ত হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেসব বিষয় হিসাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত তা জানা এলম বটে, কিন্তু ‘গায়ব’ নয়। যেমন হিসাব করে কেউ বলে দেয় যে, আজ পাঁচটা একচল্লিশ মিনিটে সূর্যোদয় হবে কিংবা অমুক মাসের অমুক তারিখে চন্দ্রগ্রহণ অথবা সূর্যগ্রহণ হবে। বলাবাহুল্য, একটি ইন্ডিয়গ্রাফ বস্তুর গতি হিসাব করে সময় নির্দিষ্ট করা এমনই যেমন আমরা কোন রেলগাড়ী কিংবা উডোজাহাজের স্টেশনে কিংবা বিমান বন্দরে পৌছার খবর দিয়ে দেই। এছাড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাধ্যমে খবর জানানার যে দাবী করা হয়, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। একশটি মিথ্যার ভিতর থেকে একটি সত্য বেরিয়ে আসা আদৌ পাণ্ডিত্য নয়।

গর্ভস্থ জ্ঞান পুত্র না কন্যা, এ সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করতে ছাড়ে না। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এটিও নিছক অনুমান ছাড়া কিছু নয়। শতকরা দু'চার ক্ষেত্রে নির্ভুল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। কোন জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

এক্সরে মেশিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনেকেই মনে করেছিল, এবার এর মাধ্যমে গর্ভস্থ সন্তান পুত্র কি কন্যা জানা যাবে। কিন্তু প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এক্ষেত্রে এক্সরে যন্ত্রপাতিও ব্যর্থ।

মোটকথা, কোরআনের পরিভাষায় যাকে ‘গায়ব’ বা অদৃশ্য বলা হয়, তা আল্লাহ ছাড়া কারও জানা নেই। পক্ষান্তরে উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মানুষ স্বভাবতঃ যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তা প্রকৃত পক্ষে ‘গায়ব’ নয়; যদিও ব্যাপকভাবে প্রকাশ না পাওয়ার দরুন তাকে ‘গায়ব’ বলেই অভিহিত করা হয়।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

খোদায়া জ্ঞান ও অপার শক্তির কয়েকটি নমুনা : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও শক্তির পরাক্রান্তি এবং নজিরবিহীন বিস্তৃতি বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এতদুভয়ের কয়েকটি চিহ্ন ও নমুনা বর্ণিত হচ্ছে।

প্রথম আয়াতে ظلمات শব্দটি এর ব্যবহৃত। অর্থ অন্ধকার। ظلماتُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ - এর অর্থ স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহ। অন্ধকারের অনেক প্রকার রয়েছে : রাত্রির অন্ধকার, মেঘমালায় অন্ধকার, ভূবালির অন্ধকার, সমুদ্রের চেউ এর অন্ধকার ইত্যাদি সব প্রকার বোঝাবার জন্যে ظلمات শব্দটি ব্যবহৃত ব্যবহার করা হয়েছে।

নিম্না ও বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে অন্ধকারও মানুষের জন্যে একটি নেয়ামত। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় মানুষের কাজকর্ম আলো দ্বারাই সম্পন্ন হয় এবং অন্ধকার সব কাজকর্ম থেকে অকেজো করা ছাড়াও মানুষের অগণিত দুঃখ ও বিপদাদেশের কারণ হয়ে যায়। তাই আরবদের বাক-পদ্ধতিতে ظلمة শব্দটি দুঃখ ও বিপদাদেশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতেও সাধারণ তফসীরবিদগণ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা মুশরেকদেরকে ইশিয়ার ও তাদের আশ্রয় কর্ম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্যে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন : আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, স্থল ও সামুদ্রিক ভ্রমণে যখনই তোমরা বিপদের সম্মুখীন হও এবং সব আরাধ্য দেব-দেবীকে ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহকে আহবান কর, কখনও প্রকাশ্যে বিনীতভাবে এবং কখনও মনে মনে স্বীকার কর যে, এ বিপদ থেকে আল্লাহ ছাড়া কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, এর সাথে সাথে তোমরা এরূপ গুণাদাও কর যে, আল্লাহ তাআলা যদি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তবে আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা অবলম্বন করব, তাঁকেই কার্যনির্বাহী মনে করব, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করব না। কেননা, বিপদেই যখন কাজে আসে না, তখন তাদের পূজাপাতি আমরা কেন করব? তাই আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, এমতাবস্থায় কে তোমাদেরকে বিপদ ও ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করে? উত্তর নির্দিষ্ট ও জানা। কেননা, তারা এ স্বতঃসিদ্ধতা অস্বীকার করতে পারে না যে, আল্লাহ ছাড়া কোন দেব-দেবী এ অবস্থায় তাদের কাজে আসেনি। তাই দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে আদেশ দিয়েছেন যে, আপনিই বলে দিন : একমাত্র আল্লাহ তাআলাই তোমাদেরকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দিবেন, বরং অন্যান্য সব কষ্ট-বিপদ থেকে তিনি উদ্ধার করবেন। কিন্তু এসব সুস্পষ্ট নির্দেশন সত্ত্বেও যখন তোমরা বিপদ মুক্ত হয়ে যাও, তখন আবার শেরকে লিপ্ত হয়ে পড় এবং দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ শুরু করে দাও। এটা কেমন বিশ্বাসঘাতকতা ও মারাত্মক মূর্খতা।

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে : (এক) আল্লাহ তাআলা অপার শক্তি-সামর্থ্য; অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দিতে তিনি পুরোপুরি সামর্থ্য। (দুই) সর্বপ্রকার বিপদাপদ, কষ্ট ও অস্থিরতা দূর করা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই করায়ত্ত এবং (তিন) একথা বাস্তব সত্য ও স্বতঃসিদ্ধ যে, আজীবন দেব-দেবীর পূজাকারীরাও যখন বিপদে পতিত হয়, তখন একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই আহবান করে এবং তাঁর প্রতিই মনোনিবেশ করে।

শিক্ষণীয় : মুশরেকদের এ কর্মপন্থা বিশ্বাসঘাতকতার দিক দিয়ে যতবড় অপরাধই হোক, কিন্তু বিপদে পড়ে একমাত্র আল্লাহর প্রতি

মনোনিবেশ করা ও সত্যকে স্বীকার করা মুসলমানদের জন্যে একটি শিক্ষার চাবুক বিশেষ। আমরা মুসলমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বিপদের সময়ও তাঁকে স্মরণ করি না, বরং আমাদের সব জ্ঞান বস্তুরিষ্ট সাক্ষ-সরঞ্জামের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আমরা যদিও মুক্তি ও দেব-দেবীকে স্বীয় কার্যনির্বাহী মনে করি না, কিন্তু বস্তুরিষ্ট সাক্ষ-সরঞ্জাম উপকরণ ও যন্ত্রপাতিও আমাদের কাছে দেব-দেবীর চাইতে কম নয়। এদের চিন্তায় আমরা এমনভাবে ডুবে আছি যে, আল্লাহ ও আল্লাহর অঙ্গ মহিমার প্রতি মনোযোগ দেয়ার অবসর আমাদের নেই।

বিপদাদেশের আসল প্রতিকার : আমরা প্রত্যেক সময়ে জ্ঞানভার ও গুরুত্বকে এবং প্রত্যেক কষ্ট-তৃকন-কন্যায় গুরু বস্তুরিষ্ট সাক্ষ-সরঞ্জামকে কার্যনির্বাহী মনে করে এমন মত্ত হয়ে পড়ি যে, যখন কথা চিন্তাই করি না। অথচ কোরআন পাক বার বার সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত করেছে যে, পার্শ্বি বিপদাদেশ সাধারণতঃ মানুষের কুর্কর্মের ফল এক পারলৌকিক শাস্তির একটা অতি সাধারণ নমুনা। এসব বিপদাদেশ মুসলমানদের জন্যে এক প্রকার রহমত। কারণ, বিপদাদেশ নিজেই অমনোযোগী মানুষকে সতর্ক করা হয়, যাতে তারা এখনও স্বীয় কুর্কর্ম থেকে বিরত থাকতে যত্নবান হয় এবং পরকালের কঠোর বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে। এ বিষয়বস্তুটি বোঝানোর জন্যেই কোরআন পাক বলে :

وَلَقَدْ يَمَنُّونَ مِنَ الْعَذَابِ الْكَذَّبِيِّ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে সামান্য শাস্তি আশ্বাসন করছি পরকালের বড় শাস্তির পূর্বে—যাতে তারা অমনোযোগিতা ও ফকস থেকে ফিরে আসে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :

وَأَصْلَاهُمْ مِنْ تُبُوعِهِمْ وَأَكْبَرُ الْيَدِ يُكْرَهُ وَيَتَّقُوا عَنِ كَثِيرٍ

অর্থাৎ, তোমাদেরকে যে বিপদাদেশ স্পর্শ করে, তা তোমাদের কুর্কর্মের প্রতিকূল। আল্লাহ তাআলা অনেক কুর্কর্ম ক্ষমা করে দেন।—(শূরা)

এ আয়াতের বর্ণনায় রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : ঐ সত্তার কসব, স্বীয় হাতে আমার প্রাণ— কারণ গায়ে কোন কাষ্ঠখণ্ডের সামান্য আঁড় নাড়ন কিংবা কারণ কোথাও পদস্থলন ঘটলে কিংবা কারণ গ্রোম-ব্যাধি দেখে দিলে তা সবই কোন না কোন গোনাহের প্রতিকূল মনে করতে হবে। আল্লাহ তাআলা অনেক গোনাহ ক্ষমাও করে দেন।

বায়যাতী (রহঃ) বলেন : এর অর্থ এই যে, অপরাধী ও গোনাহকার যেসব রোগ-ব্যাধি ও বিপদাদেশের সম্মুখীন হয়, তা সবই গোনাহের ফল। কিন্তু নিশাপ ও পাপমুক্তদেরকে রোগ-ব্যাধি ও বিপদাদেশের সম্মুখীন করার উদ্দেশ্য তাদের স্বার্থ ও দৃঢ়তার পরীক্ষা নেয়া এবং জল্লাতে তাদেরকে উচ্চস্তর মর্যাদা দান করা হয়ে থাকে।

এ থেকে আরও জানা যায় যে, সব বিপদাদেশ, অস্থিরতা, দুর্ভিক্ষ ও সঙ্কটের আসল ও সত্যিকার প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ তাআলার দিগ প্রত্যাবর্তন করা, অতীত গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতে জ থেকে বিরত থাকতে কৃতসংকল্প হওয়া এবং বিপদ মুক্তির জন্যে আল্লাহর কাছেই দোয়া করা।

এর অর্থ এই নয় যে, বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম, ওষুধ-পত্র, চিকিৎসা এবং বিপদমুক্তির জন্য বস্তুগত কলা-কৌশল অনর্থক, বরং উদ্দেশ্য এই যে, প্রকৃত কার্যনির্বাহী আল্লাহ তাআলাকেই মনে করতে হবে এবং বস্তুগত সাজ-সরঞ্জামকেও তাঁরই নেয়ামত মনে করে ব্যবহার করতে হবে। কেননা, সব সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি তাঁরই সৃষ্টিত এবং তাঁরই প্রদত্ত নেয়ামত। এগুলো তাঁরই নির্দেশ ও ইচ্ছার অনুগামী হয়ে মানুষের সেবা করে।

মোটকথা এই যে, বিপদ মুহূর্তে মশরেকেরা আল্লাহকেই স্মরণ করে—এ ঘটনা থেকে মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সব বিপদাপদ ও ঝুঁকি দূর করার জন্যে বস্তুনিষ্ঠ সাজ-সরঞ্জাম ও কলা-কৌশলের চাইতে আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করাই মুমিনের কাজ। নতুবা এর পরিণতি যা হচ্ছে তাই হবে। অর্থাৎ, সব কলা-কৌশল সামগ্রিক হিসেবে ঝুঁকি দিকে যাচ্ছে। বন্যা প্রতিরোধ ও তার ক্ষয়ক্ষতির কবল থেকে আত্মরক্ষার সব কৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছে, কিন্তু বন্যা আসে এবং বার বার আসে। রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার নতুন নতুন ফন্দি-ফিকির করা হচ্ছে, কিন্তু রোগ-ব্যাধি রোজ রোজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করার জন্যে সর্ব প্রকার চেষ্টা চলছে এবং বাহ্যতঃ তা কার্যকরীও মনে হচ্ছে। কিন্তু সামগ্রিক দিক দিয়ে এ পাগলা ঘোরা ছুটেই চলছে। চুরি, ডাকাতি, অপহরণ, ঘৃণা, চোরার কারবার প্রভৃতি দমন করার জন্যে সব সরকারই বস্তুনিষ্ঠ কলা-কৌশল ব্যবহার করছে, কিন্তু হিসাব করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যহ এসব অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলেছে। আফসোস! আজ ব্যক্তিগত ও বাহ্যতঃ লাভ-লোকসানের উর্ধ্ব উঠে অবস্থা পর্যালোচনা করলে প্রমাণিত হবে যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে আমাদের বস্তুগত কলা-কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, বরং এগুলো আমাদের বিপদকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এর পর কোরআন বর্ণিত প্রতিকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার যে, বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে সৃষ্টির দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং বস্তুগত কলা-কৌশলকেও তাঁর প্রদত্ত নেয়ামত হিসেবে ব্যবহার করা। এছাড়া নিরাপত্তার আর কোন বিকল্প পথ নেই।

আনুষঙ্গিক স্ফাভাব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার সুবিস্তৃত জ্ঞান ও নজিরবিহীন শক্তি-সামর্থ্য উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, প্রত্যেক মানুষের বিপদাপদ তিনিই দূর করতে পারেন এবং বিপদ মুহূর্তে যে তাঁকে আহ্বান করে, সে তাঁর সাহায্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। কেননা, সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর তাঁর শক্তি-সামর্থ্য কামেল ও পরিপূর্ণ এবং সৃষ্টজীবের প্রতি তাঁর দয়াও অসাধারণ। তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এরূপ শক্তি-সামর্থ্য নেই এবং সমগ্র সৃষ্টজীবের প্রতিও দয়া-মমতা নেই।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের অপর পিঠ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যে কোন আযাব ও যে কোন বিপদ দূর করতে যেমন সক্ষম, তেমনিভাবে তিনি যখন কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়কে অবাধ্যতার শাস্তি দিতে চান, তখন যে কোন শাস্তি দেয়া তাঁর পক্ষে সহজ। কোন অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্যে দুনিয়ার শাসনকর্তাদের ন্যায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দরকার হয় না এবং কোন সাহায্যকারীও প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

مُؤَلَّفًا دُرُوعًا وَلَا نَبِيًّا ۚ إِنَّ يَبْقَىٰ عَذَابُ الْآثِمِينَ أَلَّا يَتَذَكَّرُوا

أَوْ مِنْ عَذَابِ آتِيكَ أَدْرَأَيْكَ يَكْمُلُ سِوَايَا

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এ বিষয়েও শক্তিমান যে, তোমাদের প্রতি উপর দিক থেকে কিংবা পদতল থেকে কোন শাস্তি পাঠিয়ে দেবেন কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত করে পরস্পরের মুখোমুখি করে দেবেন এবং এককে অপরের হাতে শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেবেন।

খোদায়ী শাস্তির তিনটি প্রকার : এখানে তিন প্রকার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে : (এক) - যা উপর দিক থেকে আসে, (দুই) যা নীচের দিক থেকে আসে এবং (তিন) যা নিজেদের মধ্যে মতানৈক্যের আকারে সৃষ্টি হয়। عَذَابًا শব্দটিকে تَنْزِيلًا সহ নকর উল্লেখ করে ব্যাকরণের দিক দিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ তিন প্রকারের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

তফসীরবিদগণ বলেন : উপর দিক থেকে আযাব আসার দৃষ্টান্ত বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে অনেক রয়েছে। যেমন নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনাকারে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল, আ'দ জাতির উপর ঝড়ঝঞ্ঝা চড়াও হয়েছিল, লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষিত হয়েছিল এবং বনী-ইসরাঈলের উপর রক্ত, ব্যাধি ইত্যাদি বর্ষণ করা হয়েছিল। আবরারহার হস্তীবাহিনী যখন মক্কার উপর চড়াও হয়, তখন পক্ষীকুল দ্বারা তাদের উপর কঙ্কর বর্ষণ করা হয়। ফলে সবাই চর্বিত ভূমির ন্যায় হয়ে যায়।

এমনিভাবে বিগত উম্মতসমূহের মধ্যে নীচের দিক থেকে আযাব আসারও বিভিন্ন প্রকার অতিবাহিত হয়েছে। নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি উপরের আযাব বৃষ্টির আকার এবং নীচের আযাব ভূতল থেকে পানি স্ফীত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তারা একই সময়ে উভয় প্রকার আযাবে পতিত হয়েছিল। ফেরাউনের সম্প্রদায়কে পদতলের আযাবে গ্রেফতার করা হয়েছিল। কারশ, স্বীয় ধন-ভাণ্ডারসহ এ আযাবে পতিত হয়ে মৃত্যুকার অভ্যন্তরে প্রোথিত হয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদগণ বলেন : উপরের আযাবের অর্থ অত্যাচারী বাদশাহ ও নির্দয় শাসকবর্গ এবং নীচের আযাবের অর্থ নিজ চাকর, নাকর ও অধীন কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতক, কর্তব্যে অবহেলাকারী ও আত্মসৎকারী হওয়া।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কতিপয় উক্তি থেকেও উপরোক্ত তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়। মেশকাত শরীফে এ উক্তি বর্ণিত রয়েছে : كَمَا تَكُونُونَ يَوْمَ عَلِيكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের কাজকর্ম যেমন ভাল কিংবা মন্দ হবে, তেমনি শাসক বর্গ তোমাদের উপর চালিয়ে দেয়া হবে। তোমরা সং ও আল্লাহ্র বাধ্য হলে তোমাদের শাসকবর্গও দয়ালু ও সুবিচারক হবে। পক্ষান্তরে তোমরা কুকর্মী হলে তোমাদের শাসকবর্গও নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হবে। প্রসিদ্ধ উক্তি عَمَّا لَكُمْ এর অর্থ তাই।

মেশকাতে উল্লেখিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

—আল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহ। আমাকে ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি সব বাদশাহ্রও প্রভু। সব অন্তর আমার করায়ত্ত। আমার বান্দারা যখন আমার আনুগত্য করে, তখন আমি বাদশাহ ও শাসকদের অন্তরে তাদের প্রতি সুহ-মমতা সৃষ্টি করেই দেই। পক্ষান্তরে আমার বান্দারা যখন আমার অবাধ্যতা করে, তখন আমি শাসকদের অন্তরকে তাদের প্রতি কঠোর করে দেই। তারা তাদেরকে সব রকম নির্ধাতন করে। তাই শাসকবর্গকে মন্দ বলে নিজের সময় নষ্ট করা না, বরং আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন ও স্বীয় কাজ কর্মসংশোধন কর—যাতে আমি তোমাদের

সবকাজ ঠিক করে দেই।

এমনিভাবে আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েয (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

যখন আল্লাহ তাআলা কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার মঙ্গল চান, তখন তাকে উত্তম সহকারী দান করেন, যাতে প্রশাসক কোন ভুল করে ফেললে সে সুরাণ করিয়ে দেয় এবং সঠিক কাজ করলে সে তার সাহায্য করে। পক্ষান্তরে যখন কোন প্রশাসক বা শাসনকর্তার জন্যে অমঙ্গল অবধারিত হয়, তখন মন্দ লোকদেরকে তার পরামর্শদাতা ও অধীন করে দেয়া হয়।

এসব হাদীস ও আলোচ্য আয়াতের উল্লেখিত তফসীরের সারমর্ম এই যে, জনগণ শাসকবর্গের হাতে যেসব কষ্ট ও বিপদাপদ ভোগ করে, তা উপর দিককার আযাব এবং এসব কষ্ট অধীন কর্মচারীদের দ্বারা ভোগ করতে হয়, সেগুলো নীচের দিককার আযাব। এগুলো কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, বরং খোদায়ী আইন অনুসারে মানুষের কৃতকর্মের শাস্তি। হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন : যখন আমি কোন গোনাহ করে ফেলি, তখন এর ক্রিয়া স্বীয় চাকর, আরোহণের ঘোড়া ও বোঝা বহনের গাধার মেজাজেও অনুভব করি। এরা সবাই আমার অব্যাহতা করতে থাকে।

আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় প্রকার আযাব হচ্ছে : **أَوْ يَكْسُكُوْهُمْ**

—অর্থাৎ, তোমরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে যাবে এবং একদল অন্য দলের জন্যে আযাব হয়ে যাবে। এতে **يَكْسُكُوْهُمْ** শব্দটি **لَيْسَ** ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ গোপন করা, আবৃত করা। এ অর্থেই **لَيْسَ** ঐ কাপড়কে বলে, যা মানুষের দেহকে আবৃত করে এবং এ কারণেই **النِّسَاسِ** সন্দেহ ও অস্পষ্টতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, যেখানে কোন বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ আবৃত ও অস্পষ্ট হয়।

سَيِّع শব্দটি **سَيِّعَة** এর বহুবচন। এর অর্থ অনুসারী ও অনুগামী।

কোরআনে বলা হয়েছে : **وَأَنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لِرِئْهِيْمٍ** — অর্থাৎ, নূহ (আঃ)—এর অনুসারী হলেন ইবরাহীম (আঃ)। সাধারণে প্রচলিত ভাষা ও বাক-পদ্ধতিতে **سَيِّعَة** শব্দটি এমন দলকে বলা হয়, যারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় এবং এ উদ্দেশ্যে একে অন্যের সহায়ক হয়। অধুনা প্রচলিত ভাষায় এর স্বতঃস্ফূর্ত অনুবাদ হচ্ছে দল বা পার্টি।

তাই আয়াতের অনুবাদ এরূপ হবে : এক প্রকার আযাব এই যে, জাতি বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরে মুখোমুখি হয়ে যাবে। এ কারণেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলমানদেরকে সম্মোহন করে বললেন :

أَلَا لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كَفَرًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

—অর্থাৎ, তোমরা আমার পরে পুনরায় কাকের হয়ে যেয়ো না যে, একে অন্যের গর্দান মারতে শুরু করবে।— (মায়হারী)।

হযরত সাদী ইবনে আবী ওয়াহ্বাস বলেন : একবার আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সাথে চলতে চলতে মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকাত নামায পড়লাম। অনেকক্ষণ দোয়া করার পর তিনি বললেন : আমি পালনকর্তার কাছে তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি : (এক) আমার উম্মতকে যেন নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা না হয়। আল্লাহ তাআলা এ দোয়া কবুল করেছেন। (দুই) আমার উম্মতকে যেন দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা দ্বারা ধ্বংস করা না হয় আল্লাহ তাআলা এ দোয়াও কবুল করেছেন। (তিন) আমার উম্মত যেন পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে ধ্বংস না হয়। আমাকে শেষ পর্যন্ত এরূপ দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।— (মায়হারী)

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে। এতে তিনটি দোয়ার মধ্যে একটি এই যে, আমার উম্মতের উপর এমন শত্রুকে চাপিয়ে দিবেন না, যে সবাইকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেয়। এ দোয়া কবুল হয়েছে। অপর দোয়া এই যে, তারা যেন পরস্পরে মারমুখী না হয়ে পড়ে। এরূপ দোয়া করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এসব হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উম্মতে মোহাম্মদীর উপর বিগত উম্মতদের ন্যায় আকাশ কিংবা ভূতল থেকে কোন ব্যাপক আযাব আগমন করবে না; কিন্তু একটি আযাব দুনিয়াতে তাদের উপরও আসতে থাকবে। এ আযাব হচ্ছে পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং দলীয় সংঘর্ষ। এ জন্যেই হযরত (সাঃ) অত্যন্ত জোর সহকারে উম্মতকে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন। তিনি প্রতি ক্ষেত্রে ইশিয়ার করেছেন যে, দুনিয়াতে যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে, তবে তা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেই আসবে।

সূরা হুদের এক আয়াতে এ বিষয় বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে : **وَلَا يَزَالُونَ عُتِفِينَ الْأَمَنَ تَحْرِيْكَ** — অর্থাৎ, তারা সর্বদা পরস্পরে মতবিরোধই করতে থাকবে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহর রহমত রয়েছে, তারা এর ব্যতিক্রম।

এতে বোঝা গেল যে, যারা পরস্পরে (শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া) মতবিরোধ করে, তারা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত কিংবা দূরবর্তী।

এক আয়াতে বলা হয়েছে : **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا**

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রজ্জকে দলবদ্ধভাবে শক্ত করে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ে পড়া না। অন্য এক আয়াতে আছে : **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ** **قَتَلُوْا وَاسْتَلَفُوْا** অর্থাৎ, যারা বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধ করেছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না।

وَأَذِارَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي الْآيَاتِ فَأَخْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَأَمَّا يُنَبِّئُكَ الشَّيْطَانُ فَكَارْتَعَدُ
بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَمُنُونَ
مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ وَذَرِ
الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لُغْوًا وَهَوًا أُغْرِقْتَهُمْ فِي سَعْيِهِمُ الدُّنْيَا
وَدَرَجَاتِهِمْ أَنَسَلُوا نَفْسًا بِمَا كَسَبَتْ كَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا دُونَ اللَّهِ
وَلَوْ لَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ بِهِ وَلِلَّهِ
الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا كُتِبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ
أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ قُلْ إِنَّ خَوَافَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّكُمْ وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ أَفَلَا يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ
كَأَنَّهُ سَمْعُهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ لَا أَصْحَبُ
يَدَّ عُونَةٍ إِلَى الْهُدَىٰ إِنِّي أَمَّا قُلٌّ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ
وَأَمْرٌ أَلِيمٌ ۝ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَأَنْ أَوْفُوا الصَّلَاةَ وَ
أَتَقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

(৬৮) যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াতসমূহে ছিদ্রানুেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়। যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে সুরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না। (৬৯) এদের যখন বিচার করা হবে তখন পরহেযগারদের উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না; কিন্তু তাদের দায়িত্ব উপদেশ দান করা— যাতে ওরা ভীত হয়। (৭০) তাদেরকে পরিচ্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্শ্ববর্তী জীবন যাদেরকে ধোঁকায ফেলে রেখেছে। কোরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ স্বীয় কর্মে এমনভাবে প্রেক্ষতার না হয়ে যায় যে, আল্লাহ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী ও সুশাসিকারী নেই এবং যদি তারা জগতের বিনিময়ও প্রদান করে, তবু তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। একাই স্বীয় কর্মে জড়িত হয়ে পড়েছে। তাদের জন্যে উত্তম পানি এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে— কুফরের কারণে। (৭১) আপনি বলে দিন : আমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুকে আহ্বান করব, যে আমাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না এবং আমরা কি পচাৎপদে ফিরে যাব, এরপর যে, আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন? ঐ ব্যক্তির মত, যাকে শয়তানরা বনভূমিতে বিপথগামী করে দিয়েছে— সে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘোরাক্ষেপ করছে। তার সহচররা তাকে পথের দিকে ডেকে বলছে : আস, আমাদের কাছে। আপনি বলে দিন : নিচয় আল্লাহর পথই সুপথ। আমরা আদিত হয়েছি যাতে স্বীয় পালনকর্তা আত্মবহ হয়ে যায়। (৭২) এবং তা এই যে, নামায কায়েম কর এবং তাঁকে ভয় কর। তাঁর সামনেই তোমরা একত্রিত হবে। (৭৩) তিনিই সঠিকভাবে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেনঃ হয়ে যা, অতঃপর হয়ে যাবে।

আনুযঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

বাতেল পন্থীদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ : উল্লিখিত আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যে কাজ নিজে করা গোনাহ, সেই কাজ যারা করে, তাদের মজলিসে যোগদান করাও গোনাহ। এ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। এর বিবরণ এরূপ :

প্রথম আয়াতে يخوضون শব্দটি خوض থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ পানিতে অবতরণ করা ও পানিতে চলা। বাজে ও অনর্থক কাজে প্রবেশ করাকেও خوض বলা হয়। কোরআন পাকে এ শব্দটি সাধারণতঃ এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। وَكُنَّا خَاوِضِينَ مَعَ الْخَاطِئِينَ এবং خَوْفَهُمْ يَكُونُونَ ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তাই আয়াত فی الايات এর অনুবাদ এ স্থলে 'ছিদ্রানুেষণ' (অর্থাৎ, দোষ খোঁজাখুঁজি করা) কিংবা 'কলহ করা'— করা হয়েছে। অর্থাৎ, আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, যারা আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলীতে শুধু ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টা-বিক্রপের জন্যে প্রবেশ করে এবং ছিদ্রানুেষণ করে, তখন আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

এ আয়াতে প্রত্যেক সম্মোদনযোগ্য ব্যক্তিকে সম্মোদন করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) ও এর অন্তর্ভুক্ত আছেন এবং উম্মতের ব্যক্তিবর্গও। প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে সম্মোদন করাও সাধারণ মুসলমানদেরকে শুনানোর জন্যে। নতুবা তিনি এর আগেও কখনও এরূপ মজলিসে যোগদান করেননি। কাজেই কোন নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন ছিল না।

অতঃপর মিথ্যাপন্থীদের মজলিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কয়েক প্রকারে হতে পারে : (এক) - মজলিস ত্যাগ করা, (দুই) - সেখানে থেকেও অন্য কাজে প্রবৃত্ত হওয়া— তাদের দিকে জ্রেক্ষণ না করা। কিন্তু আয়াতের শেষে যা বলা হয়েছে তাতে, প্রথম প্রকারই বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ, মজলিসে বসা যাবে না, সেখান থেকে উঠে যেতে হবে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : যদি শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয় অর্থাৎ, ভুলক্রমে তাদের মজলিসে যোগদান করে ফেল— নিষেধাজ্ঞা সুরণ না থাকার কারণে হোক কিংবা তারা যে স্বীয় মজলিসে আল্লাহর আয়াত ও রসূলের বিপক্ষে আলোচনা করে, তা তোমার সুরণ ছিল না, তাই যোগদান করেছ। উভয় অবস্থাতে যখনই সুরণ হয় তখনই মজলিস ত্যাগ করা উচিত। সুরণ হওয়ার পর সেখানে বসে থাকা গোনাহ। অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ ভাগে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি সেখানে বসে থাক, তবে তুমিও তাদের মধ্যে গণ্য হবে।

ইমাম রাযী তফসীর-কবীরে বলেন : এ আয়াতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গোনাহের মজলিস ও মজলিসের লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এর উত্তম পন্থা হচ্ছে মজলিস ত্যাগ করে চলে যাওয়া। কিন্তু মজলিস ত্যাগ করার মধ্যে যদি জ্ঞান, মাল কিংবা ইজ্জতের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে সর্বসাধারণের পক্ষে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অন্য পন্থা অবলম্বন করাও জায়েয। উদাহরণতঃ অন্য কাজে ব্যাপ্ত হওয়া এবং তাদের প্রতি জ্রেক্ষণ না করা। কিন্তু বিশিষ্ট লোক ধর্মীয় ক্ষেত্রে যাদের অনুকরণ করা হয়— তাদের পক্ষে সর্বাবস্থায় সেখান থেকে উঠে যাওয়াই সমীচীন।

এরপর বলা হয়েছে :

وَأَمَّا يُنَبِّئُكَ الشَّيْطَانُ — অর্থাৎ, যদি

শয়তান তোমাকে বিস্মৃত করিয়ে দেয়। এখানে সাধারণ মুসলমানের প্রতি সম্মোহন হয়ে থাকলে তাতে কোন আপত্তির বিষয় নেই। কেননা, ভুল করা ও বিস্মৃত হওয়া প্রত্যেক মানুষের অনিচ্ছাকৃতদোষ। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি যদি সম্মোহন হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহর রসূলও যদি ভুল করেন এবং বিস্মৃত হন, তবে তাঁর শিক্ষার প্রতি আস্থা কিরূপে থাকতে পারে?

উত্তর এই যে, বিশেষ কোন রহস্য ও উপযোগিতার অধীনে নবীগণও (আঃ) ভুল করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে ওহীর মাধ্যমে তাঁদের ভুল সংশোধন করে দেয়া হতো। ফলে তারা ভুলের উপর কায়ম থাকতেন না; তাই পরিণামে তাঁদের শিক্ষা ভুলপ্রাপ্তি ও বিস্মৃতির সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

মোটকথা, আয়াতের এ বাক্য থেকে জানা গেল যে, কেউ ভুলক্রমে কোন শাস্ত্র কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তা মাফ করা হবে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : **رفع عن امتي الخطأ وما استكروها عليه** অর্থাৎ, আমার উম্মতকে ভুলপ্রাপ্তি ও বিস্মৃতির গোনাহ এবং যে কাজে অপারে জোরজবরদস্তির সাথে করায়, সেই কাজের গোনাহ থেকে অব্যাহতি দান করা হয়েছে।

ইমাম জাসসাস আহ্কামুল-কোরআনে বলেন : “আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, যে মজলিসে আল্লাহ্, আল্লাহর রসূল কিংবা শরীয়তের বিপক্ষে কথাবার্তা হয় এবং তা বন্ধ করা, করানো কিংবা কমপক্ষে সত্য কথা প্রকাশ করার সাধ্য না থাকে, তবে এরূপ প্রত্যেকটি মজলিস বর্জন করা মুসলমানদের উচিত। হাঁ, সংশোধনের নিয়তে এরূপ মজলিসে যোগদান করলে এবং হক কথা প্রকাশ করলে তাতে কোন দোষ নাই।” আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : সূর্য হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে উপবেশন করো না। এ থেকে ইমাম জাসসাস মাসআলা চয়ন করেছেন যে, এরূপ অত্যাচারী, অধার্মিক ও উদ্ধৃত লোকদের মজলিসে যোগদান করা সর্বাবস্থায় গোনাহ ; তারা তখন কোন অবৈধ আলোচনায় লিপ্ত হোক বা না হোক। কারণ, বাজে আলোচনা শুরু করতে তাদের দেয়ী লাগে না। কেননা, আয়াতে সর্বাবস্থায় জালেমদের সাথে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। তারা তখনও জুলুমে ব্যাপ্ত থাকবে এরূপ কোন শর্ত আয়াতে নেই।

কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও এ বিষয়বস্তুটি পরিস্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে : **وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقْسِمُوا بِكُمُ الْإِيمَانُ** — অর্থাৎ, অত্যাচারীদের সাথে মেলামেশা ও উঠাবসা করো না। নতুবা তোমাদেরকেও জাহান্নামের অগ্নি স্পর্শ করবে।

আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরম্ভ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ্, যদি সর্বাবস্থায় তাদের মজলিসে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে, তবে আমরা মসজিদে-হারামে নামায ও তওয়াফ থেকেও বঞ্চিত হয়ে যাব। কেননা, তারা সর্বদাই সেখানে বসে থাকে (এটি মক্কাবিজয়ের পূর্ববর্তী ঘটনা) এবং ছিদ্রানুেষণ ও কুভাষণ ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। এই পরিস্থিতিতে পরবর্তী দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয় :

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِنْ جُنَاحِهِمْ شَيْءٌ وَلَكِنْ ذِكْرٌ

لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

অর্থাৎ, যারা সংযমী, তারা নিজের কাজে মসজিদে-হারামে গেলে দুই

লোকদের কুকর্মের কোন দায়-দায়িত্ব তাদের উপর বর্তাবে না। তবে তাদের কর্তব্য শুধু হক কথা বলে দেয়া। সম্ভবতঃ দুইটো এতে উপদেশ গ্রহণ করে বিশুদ্ধ পথ অনুসরণ করবে।

তৃতীয় আয়াতেও প্রায় একই বিষয়বস্তুর উপর আরও জোর দিয়ে বলা হয়েছে : **وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَاطِلٍ يُغْوِيهِمْ وَآلَهُمْ** — এখানে **ذَر** শব্দটি

থেকে উদ্ধৃত। এর অর্থ অসম্ভব হয়ে কোন কিছু পরিত্যাগ করা। আয়াতের অর্থ এই : আপনি তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা স্বীয় ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুক করে রেখেছে। এর দু'টি অর্থ হতে পারে : (এক) তাদের জন্যে সত্য ধর্ম ইসলাম প্রেরিত হয়েছে; কিন্তু একে তারা ক্রীড়া ও কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছে এবং একে নিয়ে চাট্টা-বিদ্রুপ করে। (দুই) তারা আসল ধর্ম পরিত্যাগ করে ক্রীড়া ও কৌতুকেই ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে। উভয় অর্থেরই সারমর্ম প্রায় এক।

এরপর বলা হয়েছে : **وَعَزَّزُوا حَبِطَ الدُّنْيَا** — অর্থাৎ, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। এটিই তাদের ব্যাধির আসল কারণ। অর্থাৎ, তাদের যাবতীয় লক্ষ্যবস্তু ও ঔজ্জ্বল্যের আসল কারণই হচ্ছে এই যে, তারা ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবন দ্বারা প্রলোভিত এবং পরকাল বিস্মৃত। পরকাল ও কেয়ামতের বিশ্বাস থাকলে তারা কখনও এসব কাণ্ড করত না।

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাধারণ মুসলমানদেরকে দু'টি নির্দেশ দেয়া হয়েছে : এক, উল্লিখিত বাক্যে বর্ণিত লোকদের কাছ থেকে দূরে থাকা এবং মুখ কিরিয়ে নেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধনাত্মকভাবে তাদেরকে কোরআন দ্বারা উপদেশ দান করা এবং আল্লাহ্ তাআলার আযাবের ভয় প্রদর্শন করাও জরুরী।

আয়াতের শেষে আযাবের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে তারা স্বয়ং কুকর্মের জালে আবদ্ধ হয়ে যাবে। আয়াতে **أَنْ تُبْسِلَ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ আবদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং জড়িত হয়ে পড়া।

কোন ভুল কিংবা কারও প্রতি অত্যাচার করে বসলে তার সম্ভাব্য শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মানুষ দুনিয়াতে তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করতে অভ্যস্ত। স্বীয় দলবল ব্যবহার করে অত্যাচারের প্রতিশোধ থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। এতে বর্ষ হলে প্রভাবশালীদের সুপারিশ কাজে লাগায়। এতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার চেষ্টা করে।

আল্লাহ্ তাআলা আলোচ্য আয়াতে বলেছেন যে, আল্লাহ্ অপরাধীকে যখন শাস্তি দেবেন, তখন সে শাস্তির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যে কোন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এগিয়ে আসবে না, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারও সুপারিশ কার্যকর হবে না এবং কোন অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করা হবে না। যদি কেউ সারা বিশ্বের অর্থ-সম্পদের অধিকারী হয় এবং শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তা বিনিময় স্বরূপ দিতে চায়, তবুও এ বিনিময় গ্রহণ করা হবে না।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ كَيْسَ لِبُغَاةٍ أُعْداَتٍ

أَلَيْسَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ভঙ্গিতে এ আহ্বানকেই সমর্থন দান করা হয়েছে। এ ভঙ্গি স্বভাবগতভাবেই আরবদের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। হয়রত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন সমগ্র আরবের পিতামহ। তাই গোটা আরব তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে সর্বদা একমত ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের একটি তর্কমুক্ত উল্লেখ করা হয়েছে, যা তিনি প্রতিমাপূজা ও তারকা-পূজার বিপক্ষে স্বীয়

সম্প্রদায়ের সাথে করেছিলেন এবং সবাইকে একত্ববাদের শিক্ষা দান করেছিলেন।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তদীয় পিতা আযরকে বললেন : তুমি স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমাকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছ। আমি তোমাকে এবং তোমার গোটা সম্প্রদায়কে পথ ঠেঁটায় পতিত দেখতে পাচ্ছি।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম 'আযর'- বলেই প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ ইতিহাসবিদ তার নাম 'তারেখ' উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে 'আযর' তার উপাধি। ইমাম রাযী এবং কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী আলেম বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার নাম 'তারেখ' এবং চাচার নাম 'আযর' ছিল। তাঁর চাচা আযর নমরদের মতীভ গ্রহণ করার পর মুশরেক হয়ে যায়। চাচাকে পিতা বলা আরবী বাকপদ্ধতিতে সাধারণভাবে প্রচলিত রীতি। এ রীতি অনুযায়ী আয়াতে আযরকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা বলা হয়েছে। যরকানী 'মাওয়াহেব' গ্রন্থের চীকায় এর পক্ষে কয়েকটি সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করেছেন।

বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধনের আহ্বান : আযর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা হোক কিংবা চাচা— সর্বাবস্থায় বংশগত দিক দিয়ে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে সত্য প্রচারের কাজ শুরু করেন। রসুলুল্লাহ (সঃ)-কেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল : **وَأَنذِرْ نَفْسَكَ الْآفِرِينَ** — অর্থাৎ, নিকট আত্মীয়দেরকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। সেমতে তিনি সর্বপ্রথম সাফা পর্বতে আরোহণপূর্বক সত্য প্রচারের জন্যে পরিবারের সদস্যদেরকে একত্রিত করেন।

তফসীরে বাহরে-মুহীতে বলা হয়েছে : এতে বুঝা যায় যে, পরিবারের কোন সম্মানিত ব্যক্তি যদি ভ্রান্ত পথে থাকে তবে তাকে বিশুদ্ধ পথে আহ্বান করা সম্মানের পরিপন্থী নয়, বরং সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার দাবী তাই। আরও জানা গেল যে, সত্যপ্রচার ও সংশোধনের কাজ নিকট আত্মীয়দের থেকে শুরু করা পয়গম্বরগণের সুনত।

দ্বিজাতি তত্ত্ব : এ ছাড়া আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পরিবার ও সম্প্রদায়কে নিজের দিকে সম্বন্ধ করার পরিবর্তে পিতাকে বললেন : তোমার সম্প্রদায় পথভ্রষ্টায় পতিত হয়েছে। মুশরেক স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর পথে যে মহান ত্যাগ স্বীকার করেন, এ উক্তিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি স্বীয় কর্মের মাধ্যমে বলে দিলেন যে, ইসলামের সম্পর্ক দুারাই মুসলিম জাতিয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। বংশগত ও দেশগত জাতিয়তা যদি মুসলিম জাতিয়তার পরিপন্থী হয়, তবে মুসলিম জাতিয়তার বিপরীতে সব জাতিয়তাই বজ্রনয়।

কোরাআন পাক হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ ঘটনা উল্লেখ করে ভবিষ্যৎ উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন তারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। বলা হয়েছে :

فَذَكَاتُ لَكُمْ آسُوةً حَسَنَةً لِّقُلُوبِهِمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَذَقُوا

لَهُمْ هَمُومًا يُرِيدُونَ مَعَهُ دُونَ اللَّهِ

অর্থাৎ, ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা যা করেছিলেন, তা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্যে উত্তম আদর্শ ও অনুকরণযোগ্য। তাঁরা স্বীয় বংশগত ও

দেশগত স্বজনদেরকে পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে, আমরা তোমাদের ও তোমাদের ভ্রান্ত উপাস্যদের থেকে মুক্ত। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিহিংসা ও শত্রুতার প্রাচীর ততদিন অবহিত থাকবে, যতদিন তোমরা এক আল্লাহর আরামনায় সমবেত না হও।

বলাবাহুল্য এ দ্বিজাতি তত্ত্বই এ যুগের একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম এ মতবাদ ঘোষণা করেন। উম্মতে মুহাম্মাদী ও অন্যান্য সব উম্মত নির্দেশানুযায়ী এ পন্থাই অবলম্বন করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ জাতিয়তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিদায় হজ্বের সফরে রসুলুল্লাহ (সঃ) একটি কাকলার সাক্ষাৎ পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কোন্ জাতীয় লোক ? উত্তর হল : **نحن قوم مسلمون** — অর্থাৎ, আমরা মুসলমান জাতি।— (বুখারী)

এতে ঐ সত্যিকার ও কালজয়ী জাতিয়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা দুনিয়া থেকে শুরু করে পরকাল পর্যন্ত চালু থাকবে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এখানে পিতাকে সম্বোধন করার সময় স্বজনদেরকে পিতার যুক্ত করে স্বীয় অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু সেখানে জাতিকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করে বলেছেন : **يَقُولُ لِي يَا رَبِّ إِنَّي مُشْرِكٌ** — অর্থাৎ, হে আমার গুণম, আমি তোমাদের শিরক থেকে মুক্ত। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও বংশ ও দেশ হিসেবে তোমরা আমার জাতি, কিন্তু তোমাদের মুশরেকসুলভ ক্রিয়াকর্ম আমাকে তোমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য করেছে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর স্বজন ও তদীয় পিতা দ্বিবিধ শিরকে লিপ্ত ছিল। তারা প্রতিমা পূজাও করত এবং নক্ষত্র পূজাও। এ কারণেই ইবরাহীম (আঃ) এ দু'টি প্রশ্নই পিতা ও স্বজাতির সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

প্রথম আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রতিমা পূজা পথভ্রষ্টতা পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, তারকাপূজা আরামনার যোগ্য নয়। মাঝখানে এক আয়াতে ভূমিকাস্বরূপ আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীমের বিশেষ মর্যাদা ও সুউচ্চ জ্ঞান-গরিমা উল্লেখ করে বলেছেন :

وَكَذَلِكَ يَرْوِي رَبُّكَ لَكَ كُنُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمَّا كُنُوتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ, আমি ইবরাহীমকে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্টবন্তসমূহ প্রদর্শন করেছি, যাতে সেসব বিষয়ের স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে জেনে নেয় এবং তার বিশ্বাস পূর্ণতা লাভ করে। এর ফলশ্রুতিই পরবর্তী আয়াতসমূহে একটি অভিনব বিতর্কের আকারে বর্ণিত হয়েছে।

প্রচারকার্যে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা প্রয়োগ করা পয়গম্বরগণের সুনত :

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا تَقَالَ هَذَا نَارِي

রাত্রিতে যখন অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হল এবং একটি নক্ষত্রের উপর দৃষ্টি পড়ল, তখন স্বজাতিতে শুনিতে বললেন : এ নক্ষত্র আমার প্রতিপালক। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী এটিই আমার ও তোমাদের প্রতিপালক। এখন অলক্ষণের মধ্যেই এর স্বরূপ দেখে নেবে। কিছুক্ষণ পর নক্ষত্রটি অস্তমিত হয়ে গেলে ইবরাহীম (আঃ) জাতিকে জ্ঞদ করার চমৎকার সুযোগ পেলেন। তিনি বললেন— **أَلَيْسَ - لَا رَجْعَ لِلْإِنْسَانِ** — শব্দটি থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অস্ত যাওয়া।

উদ্দেশ্য এই যে, আমি অন্তগামী বস্ত্রসমূহকে ভালবাসি না। যে বস্ত্র খোলা কিংবা উপাস্য হবে, তার সর্বধিক ভালবাসার পাত্র হওয়া উচিত।

এরপর অন্য কোন রাত্রিতে চাঁদকে বলমল করতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে পূর্বোক্ত পন্থা অবলম্বন করলেন এবং বললেন : (তোমাদের বিশ্রাস অনুযায়ী) এটি আমার পালনকর্তা। কিন্তু এর স্বরূপও কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুটে উঠবে। সেমতে চন্দ্র যখন অস্তাচলে ডুবে গেল, তখন বললেন : যদি আমার পালনকর্তা আমাকে পথপ্রদর্শন না করতে থাকতেন, তবে আমিও তোমাদের মত পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম এবং চাঁদকেই স্বীয় পালনকর্তা ও উপাস্য মনে করে বসতাম। কিন্তু এর উল্লাসের পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাকে সতর্ক করেছে যে, এ নক্ষত্রটিও আরামনার যোগ্য নয়।

এ আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আমার পালনকর্তা অন্য কোন শক্তি, যার পক্ষ থেকে আমাকে সর্বক্ষণ পথপ্রদর্শন করা হয়।

এরপর একদিন সূর্য উদিত হতে দেখে পুনরায় জাতিকে শুনিয়ে ঐভাবেই বললেন : (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) এটি আমার প্রতিপালক এবং বৃহত্তম। কিন্তু এ বৃহত্তমের স্বরূপও অতি সত্ত্বর দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। সেমতে যথাসময়ে সূর্যও অন্ধকারে মুখ লুকালে জাতির সামনে সর্বশেষ প্রমাণ সম্পন্ন করার পর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরলেন এবং বললেন :

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كِبَاؤُكَ وَلَوْ رَأَيْتَ أَنَّ شَوْسُورًا — অর্থাৎ, হে আমার জাতি, আমি

তোমাদের এসব মুশরেকসুলভ ধারণা থেকে মুক্ত। তোমরা আল্লাহ্‌ তআলার সৃষ্ট বস্ত্রকেই আল্লাহ্র অংশীদার স্থির করেছে।

অন্তঃপর এ স্বরূপ উদ্ঘাটন করলেন যে, আমার ও তোমাদের পালনকর্তা এসব সৃষ্টবস্ত্রের মধ্যে কোনটিই হতে পারে না। এরা স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থে অন্যের মুখাপেক্ষী এবং প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন, উদয়-অস্ত ইত্যাদি পরিবর্তনের আবর্তে নিপতিত। বরং সেই সত্তা আমাদের সবার পালনকর্তা, যিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে সৃষ্ট সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমি স্বীয় আনন তোমাদের স্বনির্মিত প্রতিমা এবং পরিবর্তন ও প্রভাবের আবর্তে নিপতিত নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে হটিয়ে 'খোদায়ে ওয়াহদাহ্ লা-শরীকে'র দিকে করে নিয়েছি এবং আমি তোমাদের ন্যায় অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

এ বিতর্কে হযরত ইবরাহীম (আঃ) পয়গম্বরসুলভ প্রজ্ঞা ও উপদেশ প্রয়োগ করে প্রথমবারেই তাদের নক্ষত্র পূজাকে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টতা বলে আখ্যা দেননি, বরং এমন এক পন্থা অবলম্বন করলেন, যাতে প্রত্যেক সচেতন মানুষের মন ও মস্তিষ্ক প্রভাবান্বিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সত্যকে উপলব্ধি করে ফেলে। তবে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে প্রথমবারেই কঠোর হয়ে যান এবং স্বীয় পিতা ও জাতির পথভ্রষ্ট হওয়ার বিষয়টি দৃষ্টদৃষ্টি ভাষায় প্রকাশ করে দেন। কেননা, মূর্তিপূজা যে একটি অধৌক্তিক পথভ্রষ্টতা, তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও সুবিদিত। এর বিপরীতে নক্ষত্র পূজার ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা এতটা স্পষ্ট ছিল না।

নক্ষত্র পূজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বর্ণিত যুক্তি প্রমাণের সারমর্ম এই যে, যে বস্ত্র পরিবর্তনশীল, যার অবস্থা নিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকে এবং স্বীয় গতিশীলতায় অন্য শক্তির অধীন, সে কিছুতেই পালনকর্তা হওয়ার যোগ্য নয়। এ যুক্তি-প্রমাণে নক্ষত্রের উদয়, অস্ত এবং মধ্যবর্তী সব অবস্থাও উল্লেখ করে বলা যেত যে, নক্ষত্র স্বীয় গতি-প্রকৃতিতে স্বাধীন নয়— অন্য কারও নির্দেশ অনুসরণ করে একটি বিশেষ পথে বিচরণ করে। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) এসব অবস্থার মধ্য থেকে শুধু নক্ষত্র-পুঞ্জের অন্তর্গত হওয়ায় প্রমাণে উল্লেখ করেছেন। কেননা; এগুলোর অন্তর্গত হওয়ার বিষয়টি জনসাধারণের দৃষ্টিতে সেগুলির এক প্রকার পতনরূপে গণ্য হয়। যে যুক্তি-প্রমাণ জনগণের মনে সাড়া জাগাতে পারে, পয়গম্বরগণ সাধারণতঃ সে যুক্তি-প্রমাণই অবলম্বন করেন। তাঁরা দার্শনিকসুলভ সত্যাসত্যের পেছনে বেশী পড়েন না; বরং সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির মাপকাঠিতেই সম্মোহন করেন। তাই নক্ষত্রপুঞ্জের অসহায়ত্ব ও শক্তিহীনতা প্রমাণ করার জন্যে অন্তর্গত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। নতুবা এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে উদয় এবং তৎপরবর্তী অন্তর্মিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব পরিবর্তনকেও প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেত।

প্রচারকদের জন্যে কয়েকটি নির্দেশ : হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বিতর্ক-পদ্ধতি থেকে ওলামা ও ইসলাম প্রচারকদের জন্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ অঙ্কিত হয়। প্রথম এই যে, প্রচার ও সংশোধনের কাজে সবক্ষেত্রে কঠোরতা সমীচীন নয় এবং সবক্ষেত্রে নম্রতাও সমীচীন নয়। বরং প্রত্যেকটির একটা বিশেষ ক্ষেত্র ও সীমা রয়েছে। প্রতিমা-পূজার ব্যাপারে ইবরাহীম (আঃ) কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন। কেননা, এর ভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ বিষয়। কিন্তু নক্ষত্র পূজার ক্ষেত্রে এরূপ কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেননি, বরং বিশেষ দূরদর্শিতার সাথে আসল স্বরূপ জাতির সামনে তুলে ধরেছেন। কেননা, নক্ষত্র-পুঞ্জের ক্ষমতাহীনতা স্বহস্ত-নির্মিত প্রতিমাদের ক্ষমতাহীনতার মত সুস্পষ্ট নয়। এতে বোঝা গেল যে, জনসাধারণ যদি এমন কোন ভ্রান্ত কাজে লিপ্ত হয়, যার ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা সাধারণ দৃষ্টিতে স্পষ্ট নয়, তবে আলোম ও প্রচারকের উচিত, কঠোরতার পরিবর্তে তাদের সন্দেহ ভঞ্নের পন্থা অবলম্বন করা।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই যে, সত্য প্রকাশের বেলায় এখানে ইবরাহীম (আঃ) জাতিকে একথা বলেননি যে, তোমরা এরূপ কর; বরং নিজের অবস্থা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি এসব উদয় ও অস্তের আবর্তে নিপতিত বস্ত্রকে উপাস্য স্থির করতে পারি না। তাই আমি স্বীয় আনন এমন সত্তার দিকে করে নিয়েছি, যিনি এসব বস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। উদ্দেশ্য তাই ছিল যে, তোমাদেরও এরূপ করা দরকার। কিন্তু বিজ্ঞজ্ঞানোচিত ভঙ্গিতে তিনি স্পষ্ট সম্মোহনে বিরত থাকেন— যাতে তারা জেদের বশবর্তী না হয়ে পড়ে। এতে বোঝা গেল যে, যেভাবে ইচ্ছা সত্যকথা বলে দেয়াই সম্প্রসারক ও প্রচারকের দায়িত্ব নয়, বরং কার্যকরী ভঙ্গিতে বলা জরুরী।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : শক্তির কবল থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিত তারাই হতে পারে, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর বিশ্বাসের সাথে কোনরূপ জুলুমকে মিশ্রিত না করে। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাখিল হলে সাহাবায়ে কেয়াম চমকে উঠেন এবং আরম্ভ করেন : ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পাশের মাধ্যমে নিজের উপর কোন জুলুম করেনি? এ আয়াতে শক্তির কবল থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্যে বিশ্বাসের সাথে জুলুমকে মিশ্রিত না করার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের মুক্তির উপায় কি? মহানবী (সাঃ) উত্তরে বললেন : তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে 'জুলুম' বলে শেরককে বোঝানো হয়েছে। দেখ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন : **إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** - (নিশ্চিত শিরক বিরাট জুলুম) কাজেই আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীতে কাউকে অংশীদার স্থির না করে, সে শক্তির কবল থেকে নিরাপদ ও সুখ প্রাপ্ত।

মোটকথা এই যে, যারা প্রতিমা, প্রস্তর, বৃক্ষ, নক্ষত্র, সমুদ্র ইত্যাদির পূজা করে তারা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ এগুলোকে ক্ষমতাসালী মনে করে এবং ধারণা করে, এরা হয়তো কোন ক্ষতি করে ফেলবে— এ কারণে এদের আরাধনা ত্যাগ করতে ভয় পায়। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদের নিষ্পেক্ষ কথা বলে দিলেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ভালমন্দ সবকিছু করার ব্যাপারে সর্বশক্তিমান। তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে বিপদ হবে— অথচ এ ভয় তো তোমরা কর না। পক্ষান্তরে যাদের জ্ঞানও নেই, শক্তিও নেই— তাদের পক্ষ থেকে বিপদের ভয় কর— এটা নির্বুদ্ধিতা নয় তো কি? একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা উচিত। যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তার কোন বিপদাশঙ্কা নেই।

এ আয়াতে **وَلَا يُلْسُوا أَيْدِيَهُمْ فِى ظُلْمٍ** - বলা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ

(সাঃ)—এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী জুলুমের অর্থ শেরক— সাধারণ গোনাহ নয়। কিন্তু **ظلم** শব্দটি **نكره** ব্যবহার করায় আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এর অর্থ ব্যাপক হয়ে গেছে। অর্থাৎ, যাবতীয় শেরকই এর অন্তর্ভুক্ত। **يَلْسُوا** শব্দটি **لِيس** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরিধান করা কিংবা মিশ্রিত করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি স্বীয় বিশ্বাসের সাথে কোন প্রকার শেরক মিশ্রিত করে; অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলাকে তাঁর যাবতীয় গুণসহ স্বীকার করা সত্ত্বে অন্যকেও কোন কোন ঐশী গুণের বাহক মনে করে, সে ঈমান থেকে খারিজ।

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, খোলাখুলিভাবে মুশরেক ও মূর্তিপূজারী হয়ে যাওয়াই শুধু শেরক নয়, বরং সে ব্যক্তিও মুশরেক, যে কোন প্রতিমার পূজা করে না এবং ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করে; কিন্তু কোন ফেরেশতা কিংবা রসূল কিংবা ওলীকে খোদার কোন কোন বিশেষ গুণে অংশীদার মনে করে। সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে যারা ওলীদেরকে এবং তাদের মাযারকে 'মনোবাহু পূরণকারী' বলে বিশ্বাস করে এবং কার্যভঃ মনে করে যে, খোদায়ী ক্ষমতা যেন তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে, আয়াতে তাদের প্রতি কঠোর ইশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।

আয়াতে উল্লিখিত সতের জন পয়গম্বরের তালিকায় একজন অর্থাৎ,

(৮২) যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শেরকীর সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শাউ এবং তারাই সুপথগামী। (৮৩) এটি ছিল আমার মুক্তি, যা আমি ইবরাহীমকে তাঁর সন্তানদের বিপক্ষে প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা মরণায় সমুন্নত করি। আপনার পালনকর্তা প্রজাময়, মহাজ্ঞানী। (৮৪) আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং এয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ-প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নূহকে পথ-প্রদর্শন করেছি— তাঁর সন্তানদের মধ্যে ডাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকে। এমনভাবে আমি সংকল্পীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (৮৫) আরও যাকারিয়া, ইয়াহুয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৮৬) এবং ইসরাঈল, ইয়াসা, ইউনুস, নূতকে— প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি। (৮৭) আরও তাদের কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে, আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। (৮৮) এটি আল্লাহর হেদায়েত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, এপথে চালান। যদি তারা শেরকী করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্যে ব্যর্থ হয়ে যেত। (৮৯) তাদেরকেই আমি গ্রন্থ, শরীয়াত ও নবুওয়ত দান করেছি। অতএব, যদি এরা আপনার নবুওয়ত অস্বীকার করে, তবে এর জন্যে এমন সন্ত্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না। (৯০) এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ পথ-প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন : আমি তোমাদের কাছে এর জন্যে কোন পারিশ্রমিক চাই না। এটি সারা বিশ্বের জন্যে একটি উপদেশমাত্র।

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ
مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى مُوسَى
هُدًى لِلنَّاسِ يُخَوِّفُهُمْ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ وَتُفْهِمُونَ كِتَابَهُ
وَعَلَيْكُمْ مَا تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ تَعَالَى ذَرَهُمْ فِي
خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۝ وَهَذَا كِتَابُنَا أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ وَمَنْ
أَخْلَصَ مَعْنَى إِيْمَانِهِ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ آيَاتِ الْإِيمَانِ إِلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلْ
إِلَى الْيَوْمِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِنْ مِثْلِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ
الظُّلُمُوتِ فِي عَمَزَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَمْحُوا
أَنْفُسَكُمْ أَيُّكُمْ يُؤْمِنُونَ ۝ عَذَابَ الْهَوْنِ بِمَا أَنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
غَيْرَ آخِنٍ ۝ وَمَنْ عَنِ الْيَتِيمِ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ وَلَقَدْ جَاءُكُمْ رَسُولٌ
مِنْ أَنْفُسِكُمْ يَتْلُو آيَاتِ اللَّهِ وَلَمْ تُؤْمِنُوا بِهِ ۝ وَلَوْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۝ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُ شِفْعَةً لِمَنْ أَنْزَلْنَا رُوحَهُمْ فِيكُمْ سِرًّا
لَقَدْ نَقَطَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَرْجُونَ ۝

(১১) তারা আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি, যখন তারা বলল : আল্লাহ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি। আপনি জিজ্ঞেস করুন : ঐ গ্রন্থ কে নাযিল করেছে, যা মুসা নিয়ে এসেছিল? যা জ্যোতিষিষ্য এবং মানবমন্ডলীর জন্যে হেদায়েতস্বরূপ, যা তোমরা বিকিণ্ডপথে রেখে লোকদের জন্যে প্রকাশ করছ এবং বহলাশে গোপন করছ। তোমাদেরকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা জানতো না। আপনি বলে দিন : আল্লাহ নাযিল করেছেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের কীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন। (১২) এ কোরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পার্শ্ববর্তীদেরকে ভয়প্রদর্শন করেন। যারা পরকালে বিশ্वास স্থাপন করে তারা এর প্রতি বিশ্वास স্থাপন করে এবং তারা স্বীয় নামায সতর্কতার সাথে এবং তাঁর আয়াতসমূহ থেকে অহংকার করত। (১৩) তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ, আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম, তা পশ্চাতেই রেখে এসেছ। আমি তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিল যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে অঙ্গীদার। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবী উথাও হয়ে গেছে।

হযরত নূহ (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর পূর্বপুরুষ। অবশিষ্ট সবাই তাঁর সন্তান-সন্ততি। বলা হয়েছে

আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করার কারণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর কন্যা পক্ষের সন্তান; অর্থাৎ, পৌত্র নয়— দৌহিত্র। অতএব, তাঁকে বংশধর কিরূপে বলা যায়? অধিকাংশ আলোম ও ফেকাহবিদ এর উত্তরে বলেছেন যে, ذريت শব্দটি পৌত্র ও দৌহিত্র সবাইকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এ প্রমাণের ভিত্তিতেই তারা বলেন যে, হযরত হুসাইন (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বংশধর।

দ্বিতীয় আপত্তি হযরত লূত (আঃ) সম্পর্কে দেখা দেয় যে, তিনি ইব্রাহীম (আঃ) এর সন্তানভুক্ত নন, বরং তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র। এর উত্তরও সুস্পষ্ট যে, সাধারণ পরিভাষায় পিতব্যকে পিতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্র বলা সুবিদিত।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রতি খোদায়ী অবদানসমূহ বর্ণনা করে এ আইন ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে প্রিয় বস্তু বিসর্জন দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতেও তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করেন। অপরদিকে মক্কার মুশরেকদেরকে এসব অবস্থা শুনিয়া বলা হয়েছে যে, দেখ, তোমাদের মান্যবর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর সমগ্র পরিবার এ কথাই বলে এসেছেন যে, আরাধনার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার সত্তা। তাঁর সাথে অন্যকে আরাধনায় শরীক করা কিংবা তাঁর বিশেষ গুণে তাঁর সমতুল্য মনে করা কুফর ও পথভ্রষ্টতা। অতএব তোমরা যদি মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদেশ অমান্য কর, তবে তোমরা আপন স্বীকৃত বিষয় অনুযায়ীও অভিযুক্ত।

অষ্টম আয়াতে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে। পরিশেষে মহানবী

فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءُ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا

فَوَمَا لَكُمْ إِذَا يَكْفُرُ بِهَا

ব্যক্তি যদি আপনার কথা অমান্য করে এবং পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের নির্দেশ বর্ণনা করা সত্ত্বেও অস্বীকারই করতে থাকে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, আপনার নবুওয়ত স্বীকার করার জন্যে আমি একটি বিরাট জাতি স্থির করে রেখেছি। তারা অবিশ্বাস করবে না। মহানবী (সাঃ) এর আমলে বিদ্যমান মুহাজির ও আনসার এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সব মুসলমান এ 'বিরাট জাতির' অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত তাঁদের সবার জন্যে গর্বের সামগ্রী। কেননা, এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রশংসার স্থলে তাদের উল্লেখ করেছেন

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর জন্যে স্বজাতি ও স্বগোত্র পরিত্যাগ করার বিনিময়ে আমিয়া (আঃ) - এর একটি বিরাট দল লাভ করেন, যাদের অধিকাংশই ছিলেন তাঁর সন্তান-সন্ততি। তিনি ইরাক ও সিরিয়া পরিত্যাগ করার বিনিময়ে আল্লাহর ঘর, নিরাপদ শহর, উম্মুল কুরা অর্থাৎ, মক্কা লাভ করেন। তাঁর জাতি তাঁকে লালিত করতে চাইলে এর বিনিময়ে তিনি সমগ্র বিশু এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানব জাতির ইমাম ও নেতা রূপে বরিত হন। বিশুর বিভিন্ন জাতি ও ধর্মাবলম্বী পারস্পরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও তাঁর প্রতি সন্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে একমত।

এ ক্ষেত্রে সতের জন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। তাঁদের

অধিকাংশই ইবরাহীম (আঃ) এর সন্তান-সন্ততি ও বংশধর। তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ধর্মের খেদমতের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং সংপথ প্রদর্শন করেছেন।

আলাচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে মক্কাবাসীদেরকে শুনানো হয়েছে যে, কোন জাতির পূর্ব-পুরুষরা শুধু পিতৃপুরুষ হওয়ার কারণেই অনুসরণীয় হতে পারে না যে, তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজকে অনুসরণযোগ্য মনে করতে হবে। আরবদের সাধারণ ধারণা তাই ছিল। অনুসরণের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে যে, যার অনুসরণ করা হবে, সে নিজেও বিশুদ্ধ পথে আছে কি না। তাই আশ্বিয়া (আঃ) —এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করে বলা হয়েছে : **وَأُولَئِكَ هَدَى اللَّهُ سَبِيلَهُمْ** —অর্থাৎ, এরাই এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সংপথ প্রদর্শন করেছেন। এরপর বলেছেন : **فَمُتَّبِعُهُمْ تَافَهُوا** —অর্থাৎ, আপনিও তাদের হেদায়াত ও কর্মপন্থা অনুসরণ করুন।

এতে দু'টি নির্দেশ রয়েছে : (এক) আরববাসী ও সমগ্র উম্মতকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পৈতৃক অনুসরণের কুসংস্কার পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সুপথপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর।

(দুই) রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনিও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের পন্থা অবলম্বন করুন।

এখানে প্রশিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আশ্বিয়া (আঃ)-এর শরীয়তসমূহে শাখাগত ও আংশিক বিভিন্নতা পূর্বেও ছিল এবং ইসলামেও তাঁদের থেকে ভিন্ন অনেক বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে। এমতাবস্থায় মহানবী (সাঃ)-কে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের পন্থা অনুসরণের নির্দেশ দানের অর্থ কি? দ্বিতীয় আয়াত এবং বিভিন্ন হাদীসের পরিশ্রেক্ষিতে এর উত্তর এই যে, এখানে সব শাখাগত ও আংশিক বিধি-বিধান পূর্ববর্তী পয়গম্বুদের পন্থা অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি, বরং ধর্মের মূলনীতি একত্ববাদ, রেসালত ও পরকালে তাদের পন্থা অনুসরণ করা উদ্দেশ্য। এগুলো কোন পয়গম্বরের শরীয়তেই পরিবর্তিত হয়নি। আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সাঃ) পর্যন্ত একই বিশ্বাস এবং একই পন্থা অব্যাহত রয়েছে। যেসব শাখাগত বিধানে পরিবর্তন করা হয়নি, সেগুলোতেও অভিন্ন কর্মপন্থা রয়েছে এবং যেসব বিধানের ক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তনের কারণে ভিন্ন নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা পালিত হয়েছে।

এ কারণেই রসুলুল্লাহ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে বিশেষ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত শাখাগত ব্যাপারেও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কর্মপন্থা অনুসরণ করতেন।—(মাযহারী ইত্যাদি)

এরপর মহানবী (সাঃ)-কে বিশেষভাবে একটি ঘোষণা করতে বলা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও করেছেন। ঘোষণাটি এই

فَلَا تَسْتَكْبِرُوا عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ هُمَا ذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

—অর্থাৎ, আমি তোমাদের জীবনকে পরিপাটি করার জন্যে যেসব নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, তজ্জন্য তোমাদের কাছে কোন ফিস বা পারিশ্রমিক চাই না। তোমরা এসব নির্দেশ মেনে নিলে আমার কোন লাভ নেই এবং না মানলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই। এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে উপদেশ ও শুভেচ্ছার বার্তা।” শিক্ষা ও প্রচার কার্যের জন্যে কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ না করা সব যুগে সব পয়গম্বরের অভিন্ন রীতি ছিল। প্রচারকার্য কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

দ্বিতীয় আয়াতে ঐসব লোকের জওয়াব দেয়া হয়েছে, যারা বলেছিল, আল্লাহ তাআলা কোন মানুষের প্রতি কখনও কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ করেননি, গ্রন্থ ও রসুলদের ব্যাপারেটি মূলতঃ ভিত্তিহীন।

ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এটি মূর্তিপূজারীদের উক্তি বলে ব্যাপার সুস্পষ্ট। কেননা, তারা কোন গ্রন্থ ও নবীর প্রবক্তা কোন কালেই ছিল না। অন্যান্য তফসীরকারের মতে এটি ইহুদীদের উক্তি। আয়াতের বর্ণনা-পরশরা বাহ্যতঃ এরই সমর্থন করে। এমতাবস্থায় তাদের এ উক্তি ছিল ক্রোধ ও বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ, যা স্বয়ং তাদেরও ধর্মের পরিশীলী ছিল। ইমাম বগতী (রহঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এ উক্তি করেছিল, ইহুদীরা তার বিরুদ্ধে ক্ষেপে গিয়ে তাকে ধর্মীয় পদ থেকে অপসারিত করেছিল।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলেছেন : যারা এমন বাজে কথা বলেছে, তারা যথোপযুক্তভাবে আল্লাহ তাআলাকে টিনে নি। নতুবা এরূপ ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি তাদের মুখ থেকে বেরই হত না। যারা সর্ববস্থায় ঐশীগ্রন্থকে অস্বীকার করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন : —আল্লাহ তাআলা কোন মানুষের কাছে যদি গ্রন্থ প্রেরণ না-ই করে থাকেন, তবে যে তওরাত তোমরা স্বীকার কর এবং যার কারণে তোমরা জাতির ‘চৌধুরী’ হয়ে বসে আছ, সে তওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? আরও বলে দিন : তোমরা এমন বক্রগামী যে, তোমরা যে তওরাতকে ঐশীগ্রন্থ বলে স্বীকার কর, তার সাথেও তোমাদের ব্যবহার সহজ-সরল নয়। তোমরা একে বাঁধাই করা গ্রন্থের আকারে না রেখে বিচ্ছিন্ন পাত্রে লিপিবদ্ধ করে রেখেছ, যাতে যখনই মন চায়, তখনই মাঝখান থেকে কোন পাতা উখাও করে দিয়ে তার বিষয়বস্তু অস্বীকার করতে পার। তওরাতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরিচয় ও গুণাবলী সম্পর্কিত কিছু আয়াত ছিল। ইহুদীরা সেগুলো তওরাত থেকে উখাও করে দিয়েছিল। আয়াতের শেষে **فَعَلَوْا قَرْطَاسًا** বাক্যের উদ্দেশ্য তাই। **قَرْطَاسٌ** শব্দটি এর বহুবচন। এর অর্থ কাগজের পাতা।

এরপর তাদেরকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে : **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ** —অর্থাৎ, কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে তওরাত ও ইঞ্জিলের চাইতেও অধিক জ্ঞান দান করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে তোমরাও জানতে না এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও জানা ছিল না।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **فُلِلَّ اللَّهُ ذِكْرَهُمْ فِي خُفْيَةٍ** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ না করে থাকলে তওরাত কে অবতীর্ণ করেছে? এ প্রশ্নের উত্তর তারা কি দেবে, আপনিই বলেদিন : আল্লাহ তাআলাই অবতীর্ণ করেছেন। যখন তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন আপনার কাজও শেষ হয়ে গেছে। এখন তারা যে ক্রীড়া-কৌতুকে ডুব আছে তাতেই তাদেরকে থাকতে দিন।

তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পূর্ণ করার পর তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে :

وَهَذَا كِتَابُنَا أَنْزَلْنَاهُ مُصَدِّقًا لِّدِينِكَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُتَنَزِّدًا

أَنْزَلْنَاهُ وَمَنْ حَوْلَهَا

إِنَّ اللَّهَ فِئْتِ الْعَيْتِ وَاللَّوِي يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ
 الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَ اللَّهُ فَاُتَى فُؤَادُكَ ۝ قَالِي الرِّبَابِ وَ
 جَعَلَ الْبَيْتَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
 الْعَلِيمِ ۝ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجْمَ لِيَهْتَدُوا بِهَا فِي
 ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَ
 هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ
 قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
 نَخْرُجُ مِنْهُ خَبَأًا ثُمَّ أَتَاكِذَا وَمِنَ الْخَضِرِ مِنْ طَلْعِهَا قُوتًا لِلَّذِينَ
 ذَلَّلُوا ۝ وَجَعَلَ مِنَ السَّمَاءِ سَاقِيًا وَالزُّيُونَ وَالْمَآئِنَ مُسْتَبَآ ۝ وَعَبَدُ
 مُتَشَابِهٍ ۝ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ
 وَخَرَقُوا آلَ الْيَنَانِ وَبَدَّ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مَخَافَتَهُ وَعَلَى الْعَالَمِينَ ۝
 بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَى بِكُونِهِ لَوْلَا ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
 صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(১৫) নিচয় আল্লাহই স্বীকৃত ও আঁটি থেকে আত্মার সৃষ্টিকারী, তিনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন ও মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। তিনি আল্লাহ, অতঃপর তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হছ? (১৬) তিনি প্রভাত রশ্মির উদ্ভাবক। তিনি রাত্রিকের আরামদায়ক করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসেবের জন্য রেখেছেন। এটি পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ। (১৭) তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন—যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও। নিচয় যারা জ্ঞানী তাদের জন্য আমি নির্দোষালী বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছি। (১৮) তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অনন্তর একটি হচ্ছে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা ও একটি হচ্ছে গচ্ছিত স্থল। নিচয় আমি প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্যে, যারা চিন্তা করে। (১৯) তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন অতঃপর আমি এর দ্বারা সর্বপ্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি, অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে ফুটি স্বীকৃত উৎপন্ন করি। শেজুরের কান্ড থেকে গুচ্ছ বের করি, যা নুয়ে থাকে এবং আত্মার বাগান, যয়তুন, আনার পরম্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের ফলের প্রতি লক্ষ্য কর—যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্বতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিচয় এগুলোতে নিদর্শন রয়েছে ইমানদারদের জন্যে। (২০) তারা জিনদেরকে আল্লাহর অংশীদার হির করে; অথচ তাদেরকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তারা অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহর জন্যে পুত্র ও কন্যা সাব্যস্ত করে নিয়েছে। তিনি পবিত্র ও সমুন্নত, তাদের বর্ণনা থেকে। (২১) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি স্রষ্টা। কিরূপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে, অথচ তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ।

অর্থাৎ, তওরাত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ—একথা যেমন তারাও স্বীকার করে, তেমনিভাবে এ কোরআনও আমি অবতীর্ণ করেছি। কোরআনের সত্যতার জন্যে তাদের পক্ষে এ সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, কোরআন, তওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ সব বিষয়বস্তুর সত্যায়ন করে। তওরাত ও ইঞ্জীলের পর এ গ্রন্থ অবতীর্ণ করার প্রয়োজন এ জন্যে দেখা দেয় যে, এ গ্রন্থদ্বয় বনী-ইসরাঈলের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদের অপর শাখা বনী-ইসমাঈল যারা আরব নামে খ্যাত এবং উম্মুল কুরা অর্থাৎ, মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাসবাস করে, তাদের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত কোন বিশেষ পয়গম্বর ও গ্রন্থ এ যাবত অবতীর্ণ হয়নি। তাই এ কোরআন বিশেষভাবে তাদের জন্যে এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের জন্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে। মক্কা মোযাজ্জমকে কোরআন পাক ‘উম্মুল কুরা’ বলেছে। অর্থাৎ, বস্তিসমূহের মূল। এর কারণ এই যে, ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এখান থেকেই পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল। এছাড়া এ স্থানটিই সারা বিশ্বের কেবলা এবং মুখ ফেরানোর কেন্দ্রবিন্দু—(মাহযারী)

উম্মুল কুরার পর **وَمِنْ حَوْلِهَا** বলা হয়েছে। অর্থাৎ, মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকা। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের সমগ্র বিশ্ব এর অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতের শেষাংশ বলা হয়েছে :

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
 يُحَافِظُونَ

অর্থাৎ, যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা কোরআনের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায সংরক্ষণ করে। এতে ইহুদী ও মুশরিকদের একটি অভিন্ন রোগ সম্পর্কে হুশিয়ার করা হয়েছে। অর্থাৎ, যা ইচ্ছা মেনে নেয়া এবং যা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করা এর বিরুদ্ধে রণক্ষেত্র তৈরী করা—এটি পরকালে বিশ্বাসহীনতা রোগেরই প্রতিক্রিয়া। যে ব্যক্তি পরকালে বিশ্বাস করে, খোদাতীতি অবশ্যই তাকে মুক্তি—প্রমাণে চিন্তা-ভাবনা করতে এবং পৈতৃক প্রথার পরওয়া না করে সত্যকে গ্রহণ করে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে।

চিন্তা করলে দেখা যায়, পরকালের চিন্তা না থাকাই সর্বরোগের মূল কারণ। কুফর ও শিরকসহ যাবতীয় পাপও এরই ফলশ্রুতি। পরকালে বিশ্वासী ব্যক্তির দ্বারা যদি কোন সময় ভুল ও পাপ হয়েও যায়, তাতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে এবং অবশেষে তওবা করে পাপ থেকে বেঁচে থাকতে কৃতসংকল্প হয়। প্রকৃতপক্ষে খোদাতীতি এবং পরকালতীতিই মানুষকে মানুষ করে এবং অপরাধ থেকে বিরত রাখে। এ কারণেই কোরআন পাকের কোন সূরা বরং কোন রুকু এমন নেই, যাতে পরকাল চিন্তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৫ থেকে ৮৯ এই চার আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষের এ রোগের প্রতিকারার্থ স্বীয় বিস্তৃত জ্ঞান ও মহান শক্তির কয়েকটি নমুনা এবং মানুষের প্রতি নেয়ামত ও অনুগ্রহরাজি উল্লেখ করেছেন। এতে সামান্য চিন্তা করলেই প্রত্যেক সন্তুষ্ট স্বভাব ব্যক্তি স্রষ্টার মাহাত্ম্য ও তাঁর অপরিমিত শক্তি-সামর্থ্য স্বীকার না করে থাকতে পারবে না। তখন সে মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, এ বিরাট কীর্তি আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারও হতে পারে না। বলা হয়েছে : **إِنَّ اللَّهَ فِئْتِ الْحَيِّ وَاللَّوِي** অর্থাৎ, আল্লাহ

তাআলা বীজ ও আঁটি অঙ্কুরণকারী। এতে খোদায়ী শক্তি-সামর্থ্যের এক বিস্ময়কর ঘটনা বিবৃত হয়েছে। শুষ্ক বীজ ও শুষ্ক আঁটি ফাঁক করে তার ভেতর থেকে শ্যামল ও সতেজ বৃক্ষ বের করে দেয়া একমাত্র জগত স্রষ্টারই কাজ— এতে কোন মানুষের চেষ্টা ও কর্মের কোন প্রভাব নেই। খোদায়ী শক্তির বলে বীজ ও আঁটির ভেতর থেকে যে নাজুক অঙ্কুর গজিয়ে উঠে, তার পথ থেকে সকল প্রতিবন্ধকতা ও ক্ষতিকর বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেয়াই কৃষকের সকল চেষ্টার মূল বিষয়। লাস্কল চষে মাটি নরম করা, সার দেয়া, পানি দেয়া ইত্যাদি কর্মের ফল এর চাইতে বেশী কিছু নয় যে, অঙ্কুরের পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকে। এ ব্যাপারে আসল কাজ হচ্ছে বীজ ও আঁটি ফেটে বৃক্ষের অঙ্কুরোদগম হওয়া, অতঃপর তাতে রং-বেরঙের রকমারি পাতা গজানো এবং এমন ফল-ফুলে সুশোভিত হওয়া যে, মানুষের বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক তার একটি পাতা ও পাপড়ি তৈরী করতেও অক্ষম হয়ে যায়। এটা জানা কথা যে, এতে মানব কর্মের কোন প্রভাব নেই। তাই কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে :

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا أَنَّهُمْ تَزْوُجُوا أَمْهَنَ الزُّرُوعِ

অর্থাৎ, তোমরা কি ঐ বীজগুলোকে দেখ না যা তোমরা মাটিতে ফেলে দাও? এগুলো তোমরা বপন ও তৈরী কর না আমি করি?

দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে : يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলাই মৃত বস্তু থেকে জীবিত বস্তু সৃষ্টি করেন। মৃত বস্তু যেমন, বীর্ষ ও ডিম— এগুলো থেকে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের সৃষ্টি হয়, এমনিভাবে তিনি জীবিত বস্তু থেকে মৃত বস্তু বের করে দেন— যেমন, বীর্ষ ও ডিম জীবিত বস্তু থেকে বের হয়।

এরপর বলেছেন : ذَلِكَ اللَّهُ الَّذِي تَوْفَّقُون - অর্থাৎ, এগুলো সব এক আল্লাহর কাজ। অতঃপর একথা জেনে-শুনো তোমরা কোন দিকে বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরাক্ষেপা করছ? তোমরা স্বহস্ত নির্মিত প্রতিমাকে বিপদ-বিদূরকারী ও অভাব পূরণকারী উপাস্য বলতে শুরু করেছ।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : فَإِنَّ إِلَىٰ الرَّسْمِ - অর্থাৎ, শব্দের অর্থ ফাঁককারী এবং اصباح শব্দের অর্থ এখানে প্রভাতকাল। -এর অর্থ প্রভাতের ফাঁককারী; অর্থাৎ, গভীর অন্ধকারের চাদর ফাঁক করে প্রভাতের উন্মেষকারী। এটিও এমন একটি কাজ, যাতে জিন, মানব ও সমগ্র সৃষ্ট জীবের শক্তিই ব্যর্থ। প্রতিটি চক্ষুস্থান ব্যক্তি একথা বুঝতে বাধ্য যে, রাত্রির অন্ধকারের পর প্রভাতরশ্মির উদ্ভাবক জিন, মানব, ফেরেশতা অথবা অন্য কোন সৃষ্টজীব হতে পারে না, বরং এটি বিশুদ্ধ আল্লাহ তাআলারই কাজ।

সৌর ও চন্দ্র হিসাব : বলা হয়েছে : وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُسَبِّحَاتُ

حسان একটি গাছ। এর অর্থ হিসাব করা, গণনা করা। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সূর্য ও চন্দ্রের উদয়, অস্ত এবং এদের গতিকে একটি বিশেষ হিসাবের অধীনে রেখেছেন। এর ফলে মানুষ বৎসর, মাস, দিন, ঘণ্টা এমনকি, মিনিট ও সেকেন্ডের হিসাবও অতি সহজে করতে পারে।

আল্লাহ তাআলার অপার শক্তিই এসব উজ্জ্বল মহাগোলক ও এদের গতি-বিধিকে অটল ও অনড় নিয়মের অধীন করে দিয়েছে। হাজার হাজার বছরেও এদের গতি-বিধিতে এক মিনিট বা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয় না। এদের কলকল্লা মেরামতের জন্যে কোন ওয়াকশপের প্রয়োজন হয়

না এবং যন্ত্রাংশের ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরিবর্তনের আবশ্যকতাও দেখা দেয় না। এ উজ্জ্বল গোলকদ্বয় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে বিচরণ করছে :

لَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ ۚ تَتَذَكَّرُ الْغَمْرُ ۚ لَا أَيْلَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ

পরিভ্রমণের বিষয়, প্রকৃতির এ অটল ও অপরিবর্তনীয় ব্যবস্থা থেকেই মানুষ প্রভাবিত হয়েছে। তারা এগুলোকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বরং উপাস্য ও উদ্ভিষ্ট মনে করে বসেছে। যদি এ ব্যবস্থা মাঝে মাঝে অচল হয়ে যেত এক কলকল্লা মেরামতের জন্যে কয়েক দিন বা কয়েক ঘণ্টার বিরতি দেখা দিত, তবে মানুষ বুঝতে পারত যে, এসব মেশিন আপনা আপনি চলে না, বরং এগুলোর পরিচালক ও নির্মাতা আছে। ঐশীগ্রহ, পয়গম্বর ও রসূলগণ এ সত্য উদ্ঘাটন করার জন্যেই স্রোতিত হন।

কোরআন পাকের এ বাক্য আরও ইঙ্গিত করেছে যে, বছর ও মাসের সৌর ও চন্দ্র উভয় প্রকার হিসাবই হতে পারে এবং উভয়টি আল্লাহ তাআলার নেয়ামত। এটা ভিন্ন কথা যে, সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের সুবিধার্থ এবং তাদেরকে হিসাব-কিতাবের জটিলতা থেকে দূরে রাখার জন্যে ইসলামী বিধি-বিধান চন্দ্র বৎসর ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু ইসলামী তালিখ এবং ইসলামী বিধান পুরোপুরিভাবে চন্দ্র হিসাবের উপর নির্ভরশীল, তাই এ হিসাবকে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত রাখা সকল মুসলমানের অবশ্যই কর্তব্য। প্রয়োজনবশতঃ সৌর ও অন্যান্য হিসাবও ব্যবহার করা যেতে পারে, তাতে কোন পাপ হবে না। কিন্তু চন্দ্র হিসাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা এবং বিলোপ করে দেয়া পাপের কারণ। এতে রমযান কিফা যিলহজ্জ ও মহররম কাবে হবে তা অজ্ঞাত হয়ে যাবে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে : ذَلِكَ تَعَذُّرُ الْفُلُجِ - অর্থাৎ, এ বিস্ময়কর অটল ব্যবস্থা— যাতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেন্ড এদিক-ওদিক হয় না— একমাত্র আল্লাহ তাআলারই অপরিমিত শক্তির কারসাজি, যিনি পরাক্রান্ত ও শক্তিমান এবং সব ব্যাপারে জ্ঞানী।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْغَيْمَ رِجَامًا وَرَأٰبًا فِي ظُلُمَاتٍ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য নক্ষত্রও আল্লাহ তাআলার অপরিমিত শক্তির বহিঃপ্রকাশ। এগুলো সৃষ্টি করার পেছনে যে হাজারো রহস্য রয়েছে তন্মধ্যে একটি এই যে, জল ও স্থলপথে ভ্রমণ করার সময় রাত্রির অন্ধকারে যখন দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন মানুষ এসব নক্ষত্রের সাহায্যে পথ ঠিক করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, আদ্য বৈজ্ঞানিক কলকল্লার যুগেও মানুষ নক্ষত্রপঞ্জের পথ প্রদর্শনের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়।

এ আয়াতেও মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এসব নক্ষত্রও কেন একজন নির্মাতা ও নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন বিচরণ করছে। এরা স্থায়ী অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও কর্মে স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। যারা শুধু এদের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে এবং নির্মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা এবং আত্মপ্রবঞ্চিত।

এরপর বলেছেন : فَذَكِّرْ لَكُمُ الْآيَاتِ الْبَاطِنَاتِ ۚ - অর্থাৎ, আমি শক্তির প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি বিজ্ঞজ্ঞানের জন্যে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা এসব সুস্পষ্ট নির্দলন দেখেও আল্লাহকে

দিন না, তারা বেখবর ও অচেতন।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে : **وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُم مِّنْ فَسِقَةٍ وَأَجَدَ لَكُم مِّنْ فَسِقَةٍ وَأَمْسَدَ** **مُسْتَقَر** - শব্দটি **قَرَار** থেকে উদ্ভূত। কোন বস্তুর অবস্থান স্থলকে **مُسْتَقَر** বলা হয়। **وَدِيعَت** শব্দটি **مُسْتَوْدَع** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কারও কাছে কোন বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রেখে দেয়া। অতএব, **مُسْتَوْدَع** ঐ জায়গাকে বলা হবে, যেখানে কোন বস্তু অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন রাখা হয়।

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলাই সে পবিত্র সত্তা যিনি মানুষকে এক সত্তা থেকে অর্থাৎ, আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তার জন্যে একটি দীর্ঘকালীন এবং একটি সুল্পকালীন অবস্থান-স্থল নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কোরআন পাকের ভাষা এরূপ হলেও এর ব্যাখ্যা বহুবিধ সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে তফসীরকারদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ বলেছেন : **مُسْتَقَر** ও **مُسْتَوْدَع** যথাক্রমে মাতৃগর্ভ ও দুনিয়া। আবার কেউ বলেছেন : কবর ও পরলোক। এছাড়া আরও বিভিন্ন উক্তি আছে এবং কোরআনের ভাষায় সবগুলোরই অবকাশ রয়েছে। কাযী সানাউল্লাহ পানিশী (রঃ) তফসীরে মাহহারীতে বলেছেন : **مُسْتَقَر** হচ্ছে পরলোকের রোহশত ও দোহাখ। আর মানুষের জন্ম থেকে শুরু করে পরকাল অবধি সবগুলো স্তর। তা মাতৃগর্ভই হোক কিংবা পৃথিবীতে বসবাসের জায়গাই হোক কিংবা কবর ও বরযখই হোক— সবগুলোই হচ্ছে **مُسْتَوْدَع** অর্থাৎ, সাময়িক অবস্থানস্থল। কোরআন পাকের এক আয়াত দ্বারাও এ উক্তির অঙ্গগত্যা বুঝা যায়। আয়াতে বলা হয়েছে : **لَنَرْجِعَنَّ كَبَائِدَ كَبَائِدَ**

- অর্থাৎ, তোমরা সর্বদা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। এর সারমর্ম এই যে, পরকালের পূর্বে মানুষ সমগ্র জীবনে একজন মুসাকিরসদৃশ। বাহ্যিক স্থিতি ও অবস্থিতির সময়ও প্রকৃতপক্ষে সে জীবন-সফরের বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করতে থাকে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্ত্তে অতিনব শ্রেণীবিন্যাস নির্দেশিত হয়েছে। এখানে তিন প্রকার সৃষ্ট জগতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে : (এক) উর্বরজগত (দুই) অধঃজগত এবং (তিন) শূন্যজগত। অর্থাৎ, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের মধ্যবর্তী শূন্যজগতে সৃষ্ট বস্তুসমূহ। প্রথমে অধঃজগতের বস্তু সমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ এগুলো আমাদের অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর এগুলোর বর্ণনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে : (এক) মাটি থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগানের বর্ণনা এবং (দুই) মানব ও জীবজন্তুর বর্ণনা। প্রথমোক্তটি প্রথমে বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এটি অপরটির তুলনায় অধিক স্পষ্ট এবং অপরটি যেহেতু আত্মার উপর নির্ভরশীল, তাই কিছুটা সূক্ষ্ম। সেমতে বার্বের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা চিকিৎসকদের অনুভূতির সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কশীল। এর বিপরীতে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলে-ফলে সমৃদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ। এরপর শূন্যজগতের উল্লেখ করা হয়েছে ; অর্থাৎ, সকাল ও বিকাল। এরপর উর্বরজগতের সৃষ্ট বস্তু বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি। অতঃপর অধঃজগতের বস্তুসমূহ অধিক প্রত্যক্ষ হওয়ার কারণে এগুলোর পূর্ণ বর্ণনা দ্বারা আলোচনা সমাপ্ত করা হয়েছে। তবে পূর্বে এগুলো সন্ধিপ্তাকারে উল্লেখিত হয়েছিল, এবার বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিস্তারিত বর্ণনার শ্রেণীবিন্যাসে সন্ধিপ্ত বর্ণনার শ্রেণীবিন্যাসের বিপরীত করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রাণীদের বর্ণনা অগ্রে এবং উদ্ভিদের বর্ণনা পরে। সম্ভবতঃ এর কারণ এই যে, এ বিস্তারিত বর্ণনায় নেয়ামত প্রকাশের ভঙ্গি অকলম্বন করা হয়েছে। তাই **مِنَّم عَلَيْهِ** যাদেরকে নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে, তারা উদ্ভিদ হওয়ার কারণে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। উদ্ভিদের মধ্যে পূর্বোক্ত শ্রেণীবিন্যাস বহল রয়েছে। অর্থাৎ, শস্যের অবস্থা, বীজ ও আঁটির বর্ণনার আসে এনে এবং একে উদ্ভিদের অনুগামী করে মাঝখানে বৃষ্টির প্রসঙ্গ টানা হয়েছে। এতে আরও একটি সূক্ষ্ম কারণ থাকতে পারে। তা এই যে, সূচনার দিক থেকে বৃষ্টি উর্বরজগতের, পরিণতির দিক দিয়ে অধঃজগতের এবং দূরত্ব অতিক্রমের দিক দিয়ে শূন্যজগতের বস্তু।

الانصار

১২২

واخاسعوا

আনুভূতিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম আয়াতে ابصار শব্দটি بصر-এর বহুবচন। এর অর্থ দুটি এবং দৃষ্টিশক্তি। ادراك শব্দের অর্থ পাওয়া, ধরা, বেটন করা। হয়ত ইবনে আক্বাস (রাঃ) এখানে ادراك শব্দের অর্থ বেটন করা কর্তব্য করেছেন।—(বাহরে-মুহীত)

এতে আয়াতের অর্থ হয় এই যে, জিন, মানব, ফেরেশতা ও যাবতী জীব-জন্তুর দৃষ্টি একত্রিত হয়েও আল্লাহর সত্তাকে বেটন করে দেখতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টজীবের দৃষ্টিকে পূর্ণরূপে দেখেন এবং সবাইকে বেটন করে দেখেন। এ সৎকিণ্ড আয়াতে আল্লাহ তাআলার দু'টি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে। (এক) সমগ্র সৃষ্ট জগতে কারও দৃষ্টি বরং সবার দৃষ্টি একত্রিত হয়েও তাঁর সত্তাকে বেটন করতে পারে না।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)—এর এক রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : এযাবত পৃথিবীতে যত মানুষ, জিন, ফেরেশতা ও শতজন জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে যত জন্মগ্রহণ করবে, তারা সবাই যদি এক কাতারে দাঁড়িয়ে যায়, তবে সবার সম্মিলিত দৃষ্টি দ্বারাও আল্লাহ তাআলার সত্তাকে পুরোপুরি বেটন করা সম্ভবপর নয়।—(মাযহরী)

এ বিশেষ গুণটি একমাত্র আল্লাহ তাআলারই হতে পারে। নত্বা আল্লাহ দৃষ্টিকে এত শক্তি দিয়েছেন যে, ক্ষুদ্রতম জীবের ক্ষুদ্রতম চক্ষু পৃথিবীর বৃহত্তম মণ্ডলকে দেখতে পারে এবং চতুর্দিক বেটন করে দেখতে পারে। সূর্য ও চন্দ্র কি বিরাট গ্রহ! এদের বিপরীতে পৃথিবীও কিছুই নয়। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ, বরং ক্ষুদ্রতম জন্তুর চক্ষু এসব গ্রহকে চতুর্দিক বেটন করে দেখতে পারে।

সত্যি বলতে কি, দৃষ্টি মানুষের একটি ইন্দ্রিয়বিশেষ। এর দ্বারা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহেরই জ্ঞান লাভ করা যায়। আল্লাহর পবিত্র সত্তা মুক্তি ও হারশার বেটনীরও উর্ধ্বে। দৃষ্টিশক্তি দ্বারা তাঁর জ্ঞান কিরূপে অর্জিত হতে পারে?

স্রষ্টার দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা : মানুষ আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পারে কিনা, এ সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের বিশৃঙ্খল এই যে, এ জগতে এটা সম্ভবপর নয়। এ কারণেই হযরত মুসা (খঃ) যখন رَبِّ ارْنِي (হে পরওয়ারদগোশ্বর, আমাকে দেখা দাও) বলে আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন উত্তরে বলা হয়েছিল : لَنْ تَرَانِي (তুমি কসিনকালেও আমাকে দেখতে পারবে না।) হযরত মুসাই যখন এ উত্তর পেয়েছিলেন, তখন অন্য কোন জিন ও মানুষের সাধ্য কি! তবে পরকালে মুমিনরা আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ লাভ করবে। একথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। স্বয়ং কোরআন পাকে বলা হয়েছে : وَنُفِثَ فِي قُلُوبِهِمْ نُسْرَتَهُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ فَنَسُوا (কেয়ামতের দিন অনেক মুখমণ্ডল সজীব ও প্রকল্প হবে। তারা স্বীয় পালনকর্তাকে দেখতে থাকবে।

তবে কাকের ও অবিশ্বাসীরা সেদিনও সাজা হিসেবে আল্লাহকে দেখার গৌরব থেকে বঞ্চিত থাকবে। কোরআনের এক আয়াতে আছে : كَلَّا أَنتُمْ عَنْ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ مُّعْرِضُونَ —অর্থাৎ, কাকেররা সেদিন স্বীয় পালনকর্তার সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

পরকালে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ ঘটবে— গ্রন্থে

(১০২) তিনিই আল্লাহ জোমাদের পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই সব কিছু রচয়িতা। অতএব, জোমরা তাঁরই এবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী। (১০৩) দৃষ্টিসমূহ তাঁকে পেতে পারে না, অবশ্য তিনি দৃষ্টিসমূহকে পেতে পারেন। তিনি অত্যন্ত স্বল্পদর্শী, সুবিস্তার। (১০৪) জোমাদের কাছে জোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দর্শনকালী এসে গেছে। অতএব, যে প্রত্যক্ষ করবে, সে নিজেরই উপকার করবে এবং যে অন্ধ হবে, সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি জোমাদের পর্যবেক্ষক নই। (১০৫) এমনভাবে আমি নির্দর্শনকালী ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কর্তব্য করি—যাতে তারা না বলে যে, আপনি তো পাড়ে নিয়েছেন এক যাতে আমি একে সুস্বীকৃতির জন্যে খুব পরিবর্তন করে দেই। (১০৬) আপনি পক্ষ অনুসরণ করুন, যার আদেশ পালনকর্তার পক্ষ থেকে আসে। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এক মুশরিকদের তরফ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (১০৭) যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তারা শেরক করত না। আমি আপনাকে তাদের সন্তরুদ্ধ করিনি এক আপনি তাদের কার্যনির্বাহী নন। (১০৮) জোমরা তাদেরকে মন্দ বলবে না, যাদের তারা আরামনা করে আল্লাহকে ছেড়ে। অতএব তারা গুহুতা করে অজ্ঞাতবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে। এমনভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি। অতঃপর স্বীয় পালনকর্তার কাছে তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে বলে যেনো যাকিছু তারা করত। (১০৯) তারা জোর দিয়ে আল্লাহর কসম খায় যে, যদি তাদের কাছে কোন নির্দর্শন আসে, তবে অবশ্যই তারা বিশৃঙ্খল স্থাপন করবে। আপনি বলে দিন : নির্দর্শনকালী তো আল্লাহর কাছেই আছে। হে মুসলমানসন, জোমাদেরকে কে বলবে যে, যখন তাদের কাছে নির্দর্শনকালী আসবে, তখন তারা বিশৃঙ্খল স্থাপন করবে? (১১০) আমি ঘুরিয়ে দিব তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে, যেমন—তারা এর প্রতি প্রথমবার বিশৃঙ্খল স্থাপন করেনি এক আমি তাদেরকে তাদের অবশ্যতায় উদ্বাস্ত ছেড়ে দিব।

অবস্থানকালেও এবং জ্ঞানতে পৌছার পরও। জ্ঞানীদের জন্যে আল্লাহর সাক্ষ্যই হবে সর্ববৃহৎ নেয়ামত।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : জ্ঞানাতীরা জ্ঞানতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ্ ক্লাবেন, তোমরা যেসব নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছ, এগুলোর চাইতে বৃহৎ আরও কোন নেয়ামতের প্রয়োজন হলে বল, আমি তাও দেব। জ্ঞানাতীরা নিবেদন করবে : ইয়া আল্লাহ্, আপনি আমাদেরকে দোষ থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং জ্ঞানতে স্থান দিয়েছেন। এর বেশী আমরা আর কি চাইব। তখন মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে নেয়া হবে এবং সবার সাথে আল্লাহর সাক্ষাৎ হবে। এটিই হবে জ্ঞানাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমের হযরত সোহাবব থেকে বর্ণিত আছে।

বোখারীর এক হাদীসে আছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) এক চন্দ্রালোকিত রাতে সাহাবীদের সমভিষ্যাহারে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন : (পরকালে) তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে এ চাঁদের ন্যায় চক্ষুষ দেখতে পাবে।

তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে জ্ঞানতে বিশেষ মর্যাদা দান করবেন, তাঁদেরকে প্রতিদিন সকাল-বিকাল সাক্ষাৎ দান করবেন।

মোটকথা, এ জগতে কেউ আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে না এবং পরকালে সব জ্ঞানাতী এ নেয়ামত লাভ করবে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) যে'রাজের রাতে যে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তাও প্রকৃতপক্ষে পরকালেরই সাক্ষাৎ। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী বলেন : আকাশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্থানকেই জগত বা দুনিয়া বলা হয়। আকাশের উপরে পরকালের স্থান। সেখানে পৌঁছে যে সাক্ষাৎ হয়েছে, তাকে পার্শ্বব সাক্ষাৎ বলা যায় না।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, : لَكُنْزُكَ الْاِصْحَارُ — আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, মানুষ আল্লাহ তাআলাকে দেখতেই পারে না। এমতাবস্থায় কেয়ামতে কিরূপে দেখবে? এর উত্তর এই যে, 'আল্লাহ্কে দেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।' আয়াতের অর্থ এটা নয়; বরং অর্থ এই যে, মানুষের দৃষ্টি তাঁর সত্তাকে চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে না। কারণ, তাঁর সত্তা অসীম এবং মানুষের দৃষ্টি সসীম।

কেয়ামতের দেখাও চতুর্দিক বেষ্টন করে হবে না। দুনিয়াতে এরূপ দর্শন হয় করার মত শক্তি মানুষের চোখে নেই। তাই দুনিয়াতে কোন অবস্থাতেই দেখা যেতে পারে না। পরকালে এ শক্তি সৃষ্টি হবে এবং দেখা ও সাক্ষাৎ হতে পারবে। কিন্তু দৃষ্টিতে আল্লাহর সত্তাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে দেখা তখনও হতে পারবে না।

আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর দ্বিতীয় গুণ এই যে, তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্টজগতকে পরিবেষ্টনকারী। জগতের অণু-কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নয়। সর্বাবস্থায় এ জ্ঞান এবং জ্ঞানগত পরিবেষ্টনও আল্লাহ তাআলারই বৈশিষ্ট্য। তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্টবস্তুর পক্ষে সমগ্র সৃষ্টজগত ও -তার অণু-পরমাণুর এরূপ জ্ঞান লাভ কখনও হয়নি এবং হতে পারেও না। কেননা, এটা আল্লাহ তাআলারই বিশেষ গুণ।

এরপর এরশাদ হয়েছে : وَقَوْلَ الْلطِيفِ الْخَفِيرِ — আরবী অভিধানে لَطِيف শব্দটি 'দু' অর্থে ব্যবহৃত হয় : (এক) দয়ালু, (দুই) সূক্ষ্ম বস্তু যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা কিংবা জানা যায় না।

خَبِير শব্দের অর্থ যে খবর রাখে। বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহ সূক্ষ্ম

তাই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁকে অনুভব করা যায় না এবং তিনি খবর রাখেন। তাই সমগ্র সৃষ্টজগতের কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর জ্ঞান ও খবরের বাইরে নয়। এখানে لَطِيف শব্দের অর্থ দয়ালু নেয়া হলে আলোচ্য বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, তিনি যদিও আমাদের প্রত্যেক কণা ও কাজের খবর রাখেন এবং এজন্যে আমাদের গোনাহর কারণে আমাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু তিনি দয়ালুও, তাই সব গোনাহর কারণেই পাকড়াও করেন না।

দ্বিতীয় আয়াতের بِصِيرٍ শব্দটি بصيرت —এর বহুবচন। এর অর্থ বুদ্ধি ও জ্ঞান। অর্থাৎ, যে শক্তি দ্বারা মানুষ অতিস্বীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। আয়াতে بِصِيرٍ বলে ঐসব যুক্তি-প্রমাণ ও উপায়াদিকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো দ্বারা মানুষ সত্য ও বাস্তব রূপকে জানতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য দর্শনের উপায়-উপকরণ পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ, কোরআন, রসুল (সাঃ) ও বিভিন্ন মো'জ্জেযা আগমন করেছে এবং তোমরা রসুলের চরিত্র, কাজ-কর্ম ও শিক্ষা প্রত্যক্ষ করেছ। এগুলোই হচ্ছে সত্য দর্শনের উপায়।

অতএব, যে ব্যক্তি এসব উপায় ব্যবহার করে চক্ষুষ্মান হয়ে যায়, সে নিজেরই উপকার সাধন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব উপায় পরিত্যাগ করে সত্য সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকে, সে নিজেরই ক্ষতিসাধন করে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : আমি তোমাদের সরঞ্জাম নই। অর্থাৎ, মানুষকে জ্বরদস্তিমূলকভাবে অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত রাখা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর দায়িত্ব নয়, যেমন সরঞ্জামের দায়িত্ব হয়ে থাকে। রসুলের একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশাবলী পৌঁছে দেয়া ও বুঝিয়ে দেয়া। এরপর স্বেচ্ছায় সেগুলো অনুসরণ করা না করা মানুষের দায়িত্ব।

এরপর বলা হয়েছে : وَلَقَوْلُودَ اَدْرَسَتْ وَلَقِيْنَةُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ —এর মর্ম এই যে, হেদায়েতের সব সাজ-সরঞ্জাম, মো'জ্জেযা, অনুপম প্রমাণাদি— যেমন, কোরআন— একজন নিরক্ষরের মুখ দিয়ে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সত্য প্রকাশ করা, যা ব্যক্ত করতে জগতের সব দার্শনিক পর্যন্ত অক্ষম এবং এমন অলঙ্কারপূর্ণ কালাম উচ্চারিত হওয়া, যার সমতুল্য কালাম রচনা করার জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত জিন ও মানবকে চ্যালেঞ্জ করার পরও সারা বিশু অক্ষমতা প্রকাশ করেছে—সত্য দর্শনের এসব সরঞ্জাম দেখে যে কোন হটকারী অবিশ্বাসীও রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদতলে লুটিয়ে পড়া উচিত ছিল, কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা বিদ্যমান ছিল, তারা বলতে থাকে اَدْرَسَتْ অর্থাৎ, এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান আপনি কারও কাছ থেকে অধ্যয়ন করে নিয়েছেন।

সাথে সাথেই বলা হয়েছে : وَلَقِيْنَةُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ —এর সারমর্ম এই যে, সঠিক বুদ্ধিমান ও সুস্থ জ্ঞানীদের জন্যে এ বর্ণনা উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। মোটকথা এই যে, হেদায়েতের সরঞ্জাম সবার সামনেই রাখা হয়েছে। কিন্তু কুটিল ব্যক্তির এ দ্বারা উপকৃত হয়নি। পক্ষান্তরে সুস্থ জ্ঞানী মনীষীরা এর মাধ্যমে বিশ্বের পথপ্রদর্শক হয়ে গেছেন।

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে : কে মানে আর কে মানে না— আপনি তা দেখবেন না। আপনি স্বয়ং ঐ পথ অনুসরণ করুন, যা অনুসরণ করার জন্যে পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ আগমন করেছে। এর প্রধান বিষয় হচ্ছে এ বিশ্বাস যে, আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই। এ প্রত্যাদেশ প্রচারের নির্দেশও রয়েছে। এর উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে মুশরিকদের জন্যে পরিতাপ করবেন না যে, তারা কেন

গ্রহণ করল না।

এর কারণ এই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ যদি সৃষ্টিগতভাবে ইচ্ছা করতেন যে, সবাই মুসলমান হয়ে যাক, তবে কেউ শেরক করতে পারত না। কিন্তু তাদের দুষ্কৃতির কারণে তিনি ইচ্ছা করেননি, বরং তাদেরকে শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। তাই শাস্তির সরঞ্জামও সরবরাহ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনি তাদেরকে কিরূপে মুসলমান করতে পারেন? আপনি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন, আমি আপনাকে তাদের সরেক্কক নিযুক্ত করিনি এবং আপনি এসব কাজকর্মের জন্যে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যে আমার পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্তও নন। কাজেই তাদের কাজ-কর্মের ব্যাপারে আপনার উদ্বিগ্ন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মাসআলা নির্দেশিত হয়েছে যে, যে কাজ করা বৈধ নয়, সে কাজের কারণ ও উপায় হওয়াও বৈধ নয়।

ইবনে জরীরের বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের শানে-নুযল এই : রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পিতৃব্য আবু তালেব যখন অস্তিম রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর শক্রতায়, নির্ধাতনে এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মুশরেক সর্দাররা মহাকাঁপেরে পড়ে যায়। তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে : আবু তালেবের মৃত্যু আমাদের জন্যে কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তার মৃত্যুর পর আমরা যদি মুহাম্মদকে হত্যা করি, তবে এটা আমাদের আত্মসম্মান ও গৌরবের পরিপন্থী হবে। লোকে বলবে : আবু তালেব জীবিত থাকতে তো তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারেনি, এখন একা পেয়ে তাকে হত্যা করেছে। কাজেই এখনও সময় আছে, চল আমরা সকলে মিলে স্বয়ং আবু তালেবের সাথেই চূড়ান্ত কথাবার্তা বলে নেই।

প্রায় প্রতিটি শিক্ষিত মুসলমান জানে যে, আবু তালেব মুসলমান না হলেও ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি তাঁর অগাধ মহব্বত ছিল। তিনি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর শক্রদের মোকাবেলায় সব সময় ঢাল হয়ে থাকতেন।

কতিপয় কোরাইশ সর্দারের পরামর্শক্রমে আবু তালেবের কাছে যাওয়ার জন্যে একটি প্রতিনিধিদল গঠন করা হল। আবু সুফিয়ান, আবু জাহল, আমর ইবনে আছ প্রমুখ সর্দার এ প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের জন্যে মুতালিব নামক এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করা হল। সে আবু তালেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রতিনিধি দলকে সেখানে পৌঁছিয়ে দিল।

তারা আবু তালেবকে বলল : আপনি আমাদের মান্যবর এবং সর্দার। আপনি জানেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ আমাদেরকে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে ভীষণ কষ্টে ফেলে রেখেছেন। আমাদের অনুরোধ এই যে, তিনি যদি আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ না বলেন, তবে আমরা তাঁর সাথে সন্ধি স্থাপন করব। তিনি যেভাবে ইচ্ছা নিজ ধর্ম পালন করবেন, যাকে ইচ্ছা, উপাস্য করবেন। আমরা কিছুই বলব না।

আবু তালেব রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে কাছে ডেকে বললেন : এরা সমাজের সর্দার, আপনার কাছে এসেছেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রতিনিধিদলকে সম্বোধন করে বললেন : আপনারা কি চান? তারা বলল : আমাদের বাসনা, আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকুন। আমরাও আপনাকে এবং আপনার উপাস্যকে মন্দ বলব না। এভাবে পারস্পরিক বিরোধের অবসান হবে।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : আচ্ছা, যদি আমি আপনাদের কথা যেনে নেই, তবে আপনারা কি এমন একটি বাক্য উচ্চারণ করতে সম্মত হবেন, যা উচ্চারণ করলে আপনারা সমগ্র আরবের প্রভু হয়ে যাবেন এবং অনারবরাও আপনাদের অনুগত ও করদাতায় পরিণত হয়ে যাবে?

আবু জাহল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল : এরূপ বাক্য একটি নয়, আমরা দশটি উচ্চারণ করতে সম্মত। বলুন বাক্যটি কি? রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। একথা শুনেতই তারা উত্তোষিত হয়ে উঠল। আবু তালেবও রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন : ভ্রাতুষ্পুত্র, এ কলমে ছাড়া অন্য কোন কথা বলুন। কেননা, আপনার সম্প্রদায় এ কলমে শুনে ধাবড়ে পড়ে।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : চাচাজান, আমি এ কলমে ছাড়া অন্য কোন কলমে বলতে পারি না। যদি তারা আকাশ থেকে সূর্যকে নিয়ে আসে এবং আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি এ কলমে ছাড়া অন্য কিছু বলব না। এভাবে তিনি কোরাইশ সর্দারদেরকে নিরাশ করে দিলেন।

এতে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলতে লাগল : হয় আপনি আমাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত হবেন, না হয় আমরা আপনাকেও গালি দিব এবং ঐ সন্তাকেও, আপনি নিজেই যার রসূল বলে দাবী করেন। এরই পরিশ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থাৎ, আপনি ঐ প্রতিমাদেরকে মন্দ বলবেন না, যাদেরকে তারা উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। তাহলে তারা আল্লাহকে মন্দ বলা শুরু করবে পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতার কারণে।

এখানে (لَا تَسُبُّوا) শব্দটি সب্ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ গালি দেওয়া। রসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বভাবগত চরিত্রের কারণে শৈশবকালেও কোন মানুষকে বরং কোন জন্তুকেও কখনও গালি দেননি। সম্ভবতঃ কোন সাহাবীর মুখ থেকে এমন কোন কঠোর বাক্য বের হয়ে থাকতে পারে, যাকে মুশরিকরা গালি মনে করে নিয়েছে। কোরাইশ সর্দাররা এ ঘটনাকে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে রেখে ঘোষণা করেছে যে, আপনি আমাদের প্রতিমাদেরকে গালি-গালাজ করা থেকে বিরত না হলে আমরা আপনার আল্লাহকেও গালি-গালাজ করব।

এতে কোরআনের এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের সম্পর্কে কোন কঠোর বাক্য বলতে মুসলমানদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে প্রশিধানযোগ্য যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হচ্ছিল; যেমন বলা হয়েছে :

إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِهِمْ ۚ تَتَّبِعُ الْهَوَىَٰ بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ وَأَعْرَضَ عَنِ الذِّكْرِ ۚ

وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

এবং -এসব বাক্যে রসুলুল্লাহ

(সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছিল যে, আপনি এমন করুন কিংবা এমন করবেন না। অতঃপর এ আয়াতে সম্বোধনকে রসুলুল্লাহ থেকে ঘুরিয়ে সাধারণ মুসলমানদের দিকে করে দিয়ে (لَا تَسُبُّوا) বলা হয়েছে। এতে এ দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) তো কখনও কাউকে গালি দেননি। কাজেই সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। ফলে সব সাহাবায়ে কেরামও এ ব্যাপারে সাবধান হয়ে যান —(বাহর-মুহীত)

এখন প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কঠোর ভাষা প্রতিমাদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। এসব আয়াত রহিত নয়। অদাব্যধি এগুলো তেলাওয়াত করা হয়।

উত্তর এই যে, কোরআনের আয়াতে যেখানে কঠোর ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে বিতর্ক হিসেবে কোন সত্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে জ

করা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে কারও মনে কষ্ট দেয়া উদ্দেশ্য নয় এবং কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না যে, এতে প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা কিংবা মুরিকদের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ করা হয়েছে। এ সুস্পষ্ট পরিস্থিতি প্রত্যেক ভাষার বিশেষ বাক-পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সহজেই বুঝতে পারে যে, কখনও কোন বিষয়ের তথ্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির দোষ-ক্রটি আলোচনা করা হয়; যেমন সাধারণতঃ আদালতসমূহে এরূপ হয়ে থাকে। আদালতের সামনে প্রদত্ত ও ধরনের রীতিকে জগতের কেউ এরূপ বলে না যে, অমুক অমুককে গালি দিয়েছে। এমনভাবে ডাক্তার ও হাকীমদের সামনে মানুষের অনেক দোষ বর্ণিত হয়। এগুলোই অন্যত্র ও অন্যভাবে বর্ণিত হলে গালি মনে করা হয়। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এগুলো বর্ণনা করাকে কেউ গালি মনে করে না।

এমনিভাবে কোরআন পাক স্থানে স্থানে প্রতিমাদের অচেতন, অজ্ঞান, নিক্তিহীন ও অসহায় হওয়ার কথা এমনিভাবে ব্যক্ত করেছে, যাতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই তাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে নিতে পারে এবং যারা বুঝতে পারে না, তাদের ভ্রান্তি ও অদূরদর্শিতা ফুটে উঠে। বলা হয়েছে : **صَعَفَ الْكَلْبُ** অর্থাৎ, প্রতিমা ও প্রতিমার উপাসক উভয়ই দুর্বল। অন্যত্র বলা হয়েছে : **وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهْلٌ** অর্থাৎ, তোমরা এবং তোমাদের উপাস্য প্রতিমারা— সবাই জাহান্নামের ইন্ধন। এখানেও কাউকে মন্দ বলা উদ্দেশ্য নয়— পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির কুপরিণাম ব্যক্ত করাই লক্ষ্য। ফেকাহবিদগণ বর্ণনা করেছেন যে, কেউ এ আয়াতটি মুরিকদের সাথে ব্যঙ্গ করার উদ্দেশ্যে পাঠ করলে এ পাঠও নিষিদ্ধ গালির অন্তর্ভুক্ত এবং না-জায়েয হবে। যেমন, মকরুহ হানসমূহে কোরআন তেলাওয়াত যে না-জায়েয, তা সবাই জানে। – (রূহুল-মা'আনী)

মোটকথা, রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর মুখে এবং কোরআন পাকে পূর্বে এরূপ কোন বাক্য উচ্চারিত হয়নি যাকে গালি বলা যায় এবং ভবিষ্যতেও উচ্চারিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। তবে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে তা নিষেধ করা হয়েছে।

এ ঘটনা ও এ সম্পর্কিত কোরআনী নির্দেশ একটি বিরাট জ্ঞানের দূর উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং কতিপয় মৌলিক বিধান এ থেকে বের হয়ে এসেছে।

কোন পাপের কারণ হওয়াও পাপ : উদাহরণতঃ একটি মূলনীতি এই বের হয়েছে যে, যে কাজ নিজ সত্তার দিক দিয়ে বৈধ; বরং কোন না কোন স্তরে প্রশংসনীয়ও, সে কাজ করলে যদি কোন ফ্যাসাদ অবশ্যস্বাবী হয়ে পড়ে কিংবা তার ফলশ্রুতিতে মানুষ গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে সে কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা, মিথ্যা উপাস্য অর্থাৎ, প্রতিমাদেরকে মন্দ বলা কমপক্ষে বৈধ অবশ্যই এবং ঈমানী মর্যাদাবোধের দিক দিয়ে দেখলে সম্ভবতঃ নিজ সত্তায় ছওয়াব ও প্রশংসনীয়ও বটে, কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে আশঙ্কা দেখা দেয় যে, প্রতিমাপূজারীরা আল্লাহ তাআলাকে মন্দ বলবে। অতএব, যে ব্যক্তি প্রতিমাদেরকে মন্দ বলবে, সে এ মন্দের কারণ হয়ে যাবে। তাই এ বৈধ কাজটিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

হাদীসে এর আরও একটি দৃষ্টান্ত বর্ণিত রয়েছে। একবার রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)—কে বললেন : জাহেলিয়াত যুগে এক দুর্গিন্দায়া কাবাগৃহে বিশ্বস্ত হয়ে গেলে কোরাইশরা তার পুনর্নির্মাণ করে। এ পুনর্নির্মাণে কয়েকটি বিষয় প্রাচীন ইবরাহীম ভিত্তির খেলাফ হয়ে গেছে।

প্রথমতঃ কা'বার যে অংশকে 'হাতীম' বলা হয়, তাও কা'বাগৃহের অংশবিশেষ ছিল। কিন্তু পুনর্নির্মাণে অর্থাভাবের কারণে সে অংশ বাদ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কা'বা গৃহের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দু'টি দরজা ছিল। একটি প্রবেশের এবং অপরটি প্রস্থানের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। জাহেলিয়াত যুগের নির্মাতারা পশ্চিম দরজা বন্ধ করে একটি মাত্র দরজা রেখেছে। এটিও ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চে স্থাপন করেছে যাতে কেউ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কা'বা গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) আরও বললেন : আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, কা'বা গৃহের বর্তমান নির্মাণ ভেঙ্গে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ইবরাহীম (আঃ)—এর নির্মাণের অনুরূপ করে দেই। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, তোমার সম্প্রদায় অর্থাৎ, আরব জাতি নতুন নতুন মুসলমান হয়েছে। কা'বা গৃহ বিশ্বস্ত করলে তাদের মনে বিরূপ সন্দেহ দেখা দিতে পারে। তাই আমি আমার বাসনা মূলতবী রেখেছি।

এটা জানা কথা যে, কা'বা গৃহকে ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ নির্মাণ করা একটি এবাদত ও সওয়াবের কাজ ছিল। কিন্তু জনগণের অজ্ঞতার কারণে এতে আশঙ্কা আঁচ করে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এ পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এ ঘটনা থেকেও এ মূলনীতিই জানা গেল যে, কোন বৈধ বরং সওয়াবের কাজেও যদি কোন অনিষ্ট অবশ্যস্বাবী হয়ে পড়ে, তবে সে বৈধ কাজও নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এতে রূহুল মা'আনী গ্রন্থে আবু মনসুর কর্তৃক একটি আপত্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর জেহাদ ও কাফের নিধন ফরয করেছেন। অথচ কাফের নিধনের অবশ্যস্বাবী পরিণতি হল এই যে, কোন মুসলমান কোন কাফেরকে হত্যা করলে কাফেররাও মুসলমানদেরকে হত্যা করবে। অথচ মুসলমানকে হত্যা করা হারাম। এখানে জেহাদ মুসলমান হত্যার কারণ হয়েছে। অতএব, উপরোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী জেহাদও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এমনিভাবে আমাদের প্রচারকার্য, কোরআন তেলাওয়াত, আযান ও নামাযের প্রতি অনেক কাফের ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ করে। অতএব, আমরা কি তাদের এ ভ্রান্ত কর্মের দরুন নিজ এবাদত থেকেও হাত গুটিয়ে নেব ?

এর জওয়াবও স্বয়ং আবু মনসুর থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি জরুরী শর্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে এ প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। শর্তটি এই যে, ফ্যাসাদ অবশ্যস্বাবী হওয়ার কারণে যে বৈধ কাজটি নিষিদ্ধ করা হয়, তা ইসলামের উদ্দিষ্ট ও জরুরী কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া চাই। যেমন, মিথ্যা উপাস্যদেরকে মন্দ বলা। এর সাথে ইসলামের কোন উদ্দেশ্য সম্পর্কযুক্ত নয়। এমনিভাবে কা'বা গৃহের নির্মাণকে ইবরাহীমী ভিত্তির অনুরূপ করার উপরও ইসলামের কোন উদ্দেশ্য নির্ভরশীল নয়। তাই এগুলোর কারণে যখন কোন ধর্মীয় অনিষ্টের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তখন এগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কাজ স্বয়ং ইসলামের উদ্দেশ্য কিংবা কোন ইসলামী উদ্দেশ্য যার উপর নির্ভরশীল, যদি বিশ্বাসীদের ভ্রান্ত আচরণের কারণে তাতে কোন অনিষ্টও দেখা দেয়, তবুও এ জাতীয় উদ্দেশ্যকে কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করা হবে না। বরং এরূপ কাজ স্বস্থানে অব্যাহত রেখে যতদূর সম্ভব অনিষ্টের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

এ কারণেই একবার হযরত হাসান বসরী ও মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহঃ) উভয়েই এক জানাযার নামাযে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। নিকটে পৌঁছে দেখলেন, সেখানে পুরুষদের সাথে সাথে মহিলাদেরও সমাবেশ হয়েছে। এ অবস্থা দেখে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন সেখান থেকেই ফিরে গেলেন। কিন্তু হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বললেন : জনসাধারণের

ব্রাহ্ম কৰ্ম-পন্থায় কাৰণে আমৰা জৱৰী কাজ কিল্পে ত্যাগ কৰতে পাৰি ? জনাযাৰ নামায ফৰয। উপস্থিত অনিষ্টৰ কাৰণে তা ত্যাগ কৰা যায় না। তবে অনিষ্ট দূৰীকৰণৰে জনো যথাসম্ভব চেষ্টা কৰা হ'বে।

এ ঘটনাটিও ক্লান্ত মা'অনীতে বৰ্ণিত রয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াত থেকে উদ্ধৃত মূলনীতিৰ সারমৰ্য এই যে, যে কাজ নিজ সন্তায় বৈধ বৰং এবাদত, কিন্তু শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলীৰ অন্তৰ্ভুক্ত নয়, যদি তা কৰলে ফ্যাসাদ বা অনিষ্ট অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে পড়ে, তবে তা বৰ্জন কৰা ওয়াযেব। পক্ষান্তরে কাজটি শরীয়তের উদ্দেশ্যাবলীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হলে অনিষ্ট অবশ্যজ্ঞাবী হওয়ার কাৰণেও তা বৰ্জন কৰা যাবে না।

এ মূলনীতি অনুসরণ করে ফেকাহবিদগণ হাজ্জোৰো বিধান ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেছেন : পিতা যদি অব্যাহত পুত্র সম্পর্কে একথা জানেন যে, তাকে কোন কাজ করতে বললে অস্বীকার কৰবে এবং বিরুদ্ধাচরণ কৰবে যদ্বন্ধন তার কঠোর গোনাহগার হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে পড়বে, তবে পিতার উচিত আদেশের ভঙ্গিতে কাজটি কৰতে বা না কৰতে বলার পৰিবৰ্তে উপদেশের ভঙ্গিতে এভাবে বলবেন : অমুক কাজটি কৰলে খুবই ভাল হ'ত। এভাবে অস্বীকার অথবা বিরুদ্ধাচরণ কৰলেও একটি নতুন অব্যাহতৰ গোনাহ পুত্ৰের উপর বৰ্তাবে না। —(খোলাছাতুল ফাতাওয়া)

এমনিভাবে কাউকে উপদেশ দানের ক্ষেত্রেও যদি লক্ষণাদি দৃষ্টে জানা যায় যে, সে উপদেশ গ্রহণ কৰার পৰিবৰ্তে কোন কুশণ্ড কৰে বসবে, যদ্বন্ধন আরও অধিকতর গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তবে তাকে উপদেশ প্রদান না কৰাই উত্তম। ইমাম বোখারী শীঘ্র হাদীস গ্ৰহণে এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রেখেছেন :

باب من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في اشد منه

অর্থাৎ, মাঝে মাঝে বৈধ বৰং উত্তম কাজও এজন্যে পরিত্যাগ করা হয় যে, তাতে স্বল্পবুদ্ধি জনগণের কোন ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে শর্ত এই যে, কাজটি ইসলামী উদ্দেশ্যসমূহের অন্তৰ্ভুক্ত না হওয়া চাই।

কিন্তু যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যসমূহের অন্তৰ্ভুক্ত ফরয, ওয়াযেব, সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ অথবা অন্য কোন প্রকার ইসলামী বৈশিষ্ট্য হ'বে তা কৰলে যদিও কিছু স্বল্পজ্ঞানী লোক ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়, তবু এ কাজ কখনও ত্যাগ কৰা যাবে না। বরং অন্য পন্থায় তাদের ভুল বোঝাবুঝির ও ভাঙি দূর কৰা চেষ্টা কৰা হ'বে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, নামায, কোরাআন তেলাওয়াত ও ইসলাম প্রচারের কাৰণে কাফেররা উত্তেজিত হয়ে উঠত, কিন্তু এ কাৰণে এসব ইসলামী বৈশিষ্ট্য কখনও ত্যাগ কৰা হয়নি। স্বয়ং আলোচ্য আয়াতের শানে-নুযুলে বর্ণিত আবু জাহল প্রমুখের ঘটনার সারমৰ্য তাই ছিল যে, কোরাইশ সর্দাররা তওহীদ প্রচার ত্যাগ কৰার শর্তে সজ্জি স্থাপন কৰতে চেয়েছিল। কিন্তু উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন যে, তারা যদি চন্দ্র ও সূর্য এনে আমার হাতে রেখে দেয়, তবুও আমি তওহীদ প্রচার ত্যাগ কৰতে পাৰি না।

তাই এ মাসআলাটি এভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যাবলীৰ অন্তৰ্ভুক্ত, যদি তা কৰলে কিছু লোক ভুল বোঝাবুঝির শিকার হয়, তবুও তা কখনও ত্যাগ কৰা যাবে না। অবশ্য যে কাজ ইসলামী উদ্দেশ্যাবলীৰ অন্তৰ্ভুক্ত নয়; বরং যা ত্যাগ কৰলে কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় না, এ ধরনের কাজ অপরের ভুল বোঝাবুঝি অথবা ভাঙির আশঙ্কার কাৰণে পরিত্যাগ কৰা উচিত।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখ কৰা হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) —এর

সুস্পষ্ট মো'জ্জো ও আল্লাহ তাআলার উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ দেখা সফল হঠকালী লোকেরা সেগুলো দূরা উপকৃত হয়নি এবং শীঘ্র অস্বীকার ও জেদে অটল রয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, তারা শীঘ্র জেদ ও নতুন সংস্কার রচনা করে রসূলুল্লাহ (সাঃ) —এর কাছে বিশেষ বিশেষ ধরনের মো'জ্জো দাবী করেছে। যেমন, ইবনে জরীরের কবুল অনুযায়ী কোরাইশ সর্দাররা দাবী উত্থাপন করেছে যে, আপনি যদি সাক্ষ্য পাহাড়টি স্বর্ণে পরিণত হওয়ার মো'জ্জো আমাদেরকে দেখাতে পারেন, তবে আমরা আপনার নবুওয়ত মেনে নেব এবং মুসলমান হয়ে যাব।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : আচ্ছা, শপথ কর, যদি এ মো'জ্জো প্রকাশ পায়, তবে তোমরা মুসলমান হয়ে যাবে। তারা শপথ কৰল। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া কৰার জন্যে দাঁড়ালেন যে, এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দিন। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল প্রত্যাদেশ নিয়ে এলেন যে, আপনি চাইলে আমি এক্ষুণি এ পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেখ। কিন্তু আল্লাহর আইনানুযায়ী এর পরিণাম হ'বে এই যে, এরপরও বিশ্বাস স্থাপন না কৰলে ব্যাপক আযাব নাযিল করে সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া হ'বে। বিগত সম্প্রদায়সমূহের বেলায়ও তাই হয়েছে। তারা বিশেষ কোন মো'জ্জো দাবী কৰার পর তা দেখানো হয়েছে। এরপরও যখন তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন তাদের উপর আল্লাহর গযব ও আযাব নাযিল হয়েছে। দয়ার সাগর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাফেরদের অভ্যাস ও হঠকালি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই দয়াপরবশ হয়ে বললেন : এখন আমি এ মো'জ্জোর দোয়া কৰি না। এ ঘটনার পরিস্থিতিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় :

وَاقْسُرُوا يَاسُوَءَ بْنَ إِدْرِيسَ أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ وَاقْسُرُوا يَاسُوَءَ بْنَ إِدْرِيسَ أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ

এতে কাফেরদের উক্তি বর্ণনা কৰা হয়েছে যে, তারা প্রার্থিত মো'জ্জো প্রকাশিত হলে মুসলমান হওয়ার জন্যে শপথ কৰল। এর পরবর্তী آيَةُ الْيَوْمِ عَنْكَ اللَّهُ আয়াতে তাদের উক্তির জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, মো'জ্জো ও নিদর্শন সবই আল্লাহর ইচ্ছাধীন। যেসব মো'জ্জো ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোও তাঁর পক্ষ থেকেই ছিল এবং যেসব মো'জ্জো দাবী করা হচ্ছে, এগুলো প্রকাশ কৰতেও তিনি পূর্ণরূপে সক্ষম। কিন্তু বিবেক ও ইনসাফের দিক দিয়ে তাদের এরূপ দাবী কৰার কোন অধিকার নেই। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) রেসালতের দাবীদার এবং এ দাবীর পক্ষে অনেক যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য মো'জ্জো আকারে উপস্থিত করেছেন। এখন এসব যুক্তি-প্রমাণ ও সাক্ষ্য খণ্ডন কৰার এর ব্রাহ্ম প্রমাণিত কৰার অধিকার প্রতিপক্ষের আছে। কিন্তু এসব সাক্ষ্য খণ্ডন না করে অন্য সাক্ষ্য দাবী করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যেমন, আদালতে কোন বিবাদী বাদীর উপস্থিত করা সাক্ষীদের অযোগ্যতা প্রমাণ না করেই দাবী করে বসে যে, আমি এসব সাক্ষীর সাক্ষ্য মানি না। অমুক নির্দিষ্ট ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলে তা মেনে নেব। বাদীর এ উদ্ভট দাবীর প্রতি কোন আদালতই কর্ণপাত কৰবে না।

এমনিভাবে নবুওয়ত ও রেসালতের পক্ষে অসংখ্য নিদর্শন ও মো'জ্জো প্রকাশিত হওয়ার পর এগুলো খণ্ডন না কৰা পর্যন্ত তাদের এরূপ বলা অধিকার নেই যে, আমরা তো অমুক ধরনের মো'জ্জো দেখেই বিশ্বাস স্থাপন কৰব।

এরপর শেষ অবধি আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে সম্প্রদায়ের আদেশ কৰা হয়েছে যে, নিজে সত্য ধর্মে কায়ম থাকা এবং অপরের কাছে তা শুদ্ধরূপে পৌছে দেয়াই হচ্ছে তোমাদের দায়িত্ব। এরপরও যদি তারা হঠকালি করে, তবে তাদের চিন্তায় মাথা ধামানো উচিত নয়। কেননা, জোহর-জবরদস্তি করে কাউকে মুসলমান করা উদ্দেশ্য নয়। যদি তা উদ্দেশ্য হ'ত, তবে তা কৰিতে আল্লাহর চাইতে শক্তিশালী কে ? তিনি নিজেই সবাইকে মুসলমান করে দিতেন। এসব আয়াতে মুসলমানদেরকে সাদুনা দান কৰার জন্যে আরও বলা হয়েছে যে, আমি যদি তাদের প্রার্থিত

মো'জ্যেয়াসমূহ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দেই, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা, তাদের অস্বীকৃতি কোন ভুল বোঝাবুঝি ও অজ্ঞতার কারণে নয়, বরং জেদ ও হঠকারিতার কারণে। কোন মো'জ্যেয়া দ্বারা এর প্রতিকার হবার নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَوِ اتَّخَذْتُمُ اللَّهُمَّ الْمَلِكَةَ আয়াতে এ বিষয়বস্তুই বর্ণিত হয়েছে

যে, যদি আমি তাদের প্রার্থিত মো'জ্যেয়াসমূহ দেখিয়ে দেই ; বরং এর চাইতেও বেশী- ফেরেশতাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ এবং মৃতদের সাথে বাক্যালাপ করিয়ে দেই, তবুও তারা মানবে না। পরবর্তী দু'আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, এরা যদি আপনার সাথে শত্রুতা করে, তবে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরদেরও অব্যাহতভাবে শত্রু ছিল। অতএব, আপনি এতে মনঃকল্প হবেন না।

أَفَتَعْتَبِرُوا اللَّهَ لَمَّا أَتَىٰ حَكْمًا — অর্থাৎ, তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ

তাআলার এ ফয়সালায় পর আমি অন্য কোন ফয়সালাকারী অনুসন্ধান করি? না, তা হতে পারে না। এরপর কোরআন পাকের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো স্বয়ং কোরআনের সত্যতা এবং আল্লাহর কালাম হওয়ারই প্রমাণ। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا এ আয়াতে কোরআন

পাকের চারটি বিশেষ পূর্ণতার কথা বর্ণিত হয়েছে : (এক) কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (দুই) এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অলৌকিক গ্রন্থ-এর মোকাবেলা করতে সারা বিশ্ব অক্ষম। (তিন) যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়বস্তু এতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। (চার) পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ইহুদী ও খ্রীষ্টানরাও নিশ্চিতভাবে জানে যে, কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সত্য কালাম। এরপর তাদের মধ্যে যারা সত্যভাষী ছিল, তারা একথা প্রকাশও করেছে। পক্ষান্তরে যারা হঠকারী, তারা বিশ্বাস সত্ত্বেও তা প্রকাশ করেনি।

কোরআন পাকের এ চারটি পূর্ণতা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বেদন করা হয়েছে : فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ অর্থাৎ

“এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের পর আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।” এটা জানা কথা যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন সময়ই সংশয়কারী ছিলেন না, থাকতে পারেন না; যেমন স্বয়ং তিনি বলেন : আমি কোন সময় সন্দেহ করিনি এবং প্রশ্ন করিনি — (ইবনে-কাসীর)। এতে বোঝা গেল যে, এখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বেদন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য লোকদের শোনানোই এর উদ্দেশ্য। এছাড়া বিষয়টিকে জোরদার করার উদ্দেশে সরাসরি তাঁকে সম্বেদন করা হয়েছে। অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেই যখন এরূপ বলা হয়েছে, এখন অন্য আর কে সন্দেহ করতে পারে?

দ্বিতীয় আয়াতে কোরআন পাকের আরও দু'টি বৈশিষ্ট্যমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এগুলোও কোরআন পাক যে আল্লাহর কালাম, এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলা হয়েছে :

وَتَنبَذَ كَذِبَ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ

অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তার কালাম সত্যতা, ইনসাফ ও সমতার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ। তাঁর কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই।

(১১১) আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে অবতারণ করতাম এবং তাদের সাথে মৃতরা কথাবার্তা বলত এবং আমি সব বস্তুকে তাদের সামনে জীবিত করে দিতাম, তথাপি তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী নয় ; কিন্তু যদি আল্লাহ চান। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মুর্থ। (১১২) এমনভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে শত্রু করেছি শয়তান, মানব ও জিনকে। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্যে একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। (১১৩) অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যাপবাদকে মুক্ত ছেড়ে দিন যাতে কারুকার্যখচিত বাক্যের প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয় যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং তারা একেও পছন্দ করে নেয় এবং যাতে এসব কাজ করে, যা তারা করছে। (১১৪) তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বিচারক অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন? আমি যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করেছি, তারা নিশ্চিত জানে যে, এটি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, আপনি সংশয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। (১১৫) আপনার প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ সত্য ও সুস্ব। তাঁর বাক্যের কোন পরিবর্তনকারী নেই। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (১১৬) আর যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মেনে নেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দেবে। তারা শুধু অলীক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমানভিত্তিক কথাবার্তা বলে থাকে। (১১৭) আপনার প্রতিপালক তাদের সম্পর্কে খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যারা তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয় এবং তিনি তাদেরকেও খুব ভাল করে জানেন, যারা তাঁর পথে অনুগমন করে। (১১৮) অতঃপর যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়, তা থেকে ভক্ষণ কর যদি তোমরা তাঁর বিধানসমূহে বিশ্বাসী হও।

وَكُنْتُ শব্দে সম্পূর্ণ হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং كُنْتُ بِرَبِّكَ বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। —(বাহরে-মুহীত)। কোরআনের গোটা বিষয়বস্তু দু'প্রকার, (এক) যাতে বিশ্ব ইতিহাসের শিক্ষণীয় ঘটনাবলী, অবস্থা, সংকাজের জন্যে পুরস্কারের ওয়াদা এবং অসৎ কাজের জন্যে শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন বর্ণিত হয়েছে এবং (দুই) যাতে মানব জাতির কল্যাণ ও সাফল্যের বিধান বর্ণিত হয়েছে। কোরআন পাকের এ দুই প্রকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে صَلَاتُكَ وَعِلْمُكَ দুই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

—এর সম্পর্ক প্রথম প্রকারের সাথে; অর্থাৎ, কোরআনে যেসব ঘটনা, অবস্থা, ওয়াদা ও ভীতি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই সত্য ও নির্ভুল। এগুলোতে কোনরূপ ভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই। عِلْمُ এর সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, বিধানের সাথে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলার সব বিধান عِلْمُ তথা ন্যায়বিচার ভিত্তিক। عِلْمُ শব্দের দুটি অর্থঃ (এক) ইনসাফ, যাতে কারও প্রতি অবিচার ও অধিকার হরণ করা হয় না। (দুই) সমতা ও সুষমতা। অর্থাৎ, আল্লাহর বিধান সম্পূর্ণরূপে মানবিক প্রবৃত্তির অনুসারীও নয় এবং এমনও নয় যে, মানবিক প্রেরণা ও স্বভাবগত ধারণা ক্ষমতা তা সহ্য করতে পারে না। অতএব আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, খোদায়ী বিধান সুবিচার ও সমতার উপর ভিত্তিহীন। এতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং এমন কোন কঠোরতাও নেই যা মানুষ সহ্য করতে পারে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে:

وَلَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسَ الزَّالِمِ وَنَسَمًا অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বাইরে কারো প্রতি কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেননি। আলোচ্য আয়াতে نَسَمٌ শব্দ ব্যবহার করে আরও বলা হয়েছে যে, কোরআনে শুধু عِلْمُ ও عِلْمُ বিদ্যমানই নয়, বরং কোরআন এসব গুণে সব দিক দিয়ে পূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কোরআন পাকের যাবতীয় বিধান বিশেষ সকল জাতি, ক্রিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধর এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার জন্যে সুবিচার ও সমতাভিত্তিক। একথাটি একমাত্র আল্লাহ রচিত বিধানের মধ্যেই থাকা সম্ভবপর হতে পারে। জগতের কোন আইনসভা বর্তমান ও ভবিষ্যত সকল অবস্থা পুরোপুরি অনুমান করে তদনুযায়ী কোন আইন রচনা করতে পারে না। প্রত্যেক দেশ ও জাতি নিজ দেশ ও জাতির শুধু বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আইন রচনা করে। এসব আইনের মধ্যেও অনেক বিষয় অভিজ্ঞতার পর সুবিচার ও সমতার পরিপন্থী দেখা গেলে সেগুলো পরিবর্তন করতে হয়। ভবিষ্যৎ অবস্থার প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক অবস্থার জন্যে সুবিচার ও সমতাভিত্তিক আইন রচনা করার বিষয়টি মানুষের চিন্তা-কল্পনারও অনেক উর্ধ্বে। এটা একমাত্র আল্লাহ তাআলার কালামেই সম্ভবপর। তাই কোরআন পাকের এ পঞ্চম অবস্থাটি (অর্থাৎ, কোরআনে বর্ণিত অতীত ও ভবিষ্যতের ঘটনাবলী, পুরস্কারের ওয়াদা ও শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন সবই সত্য; এসব ব্যাপারকে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কোরআন বর্ণিত যাবতীয় বিধান সমগ্র বিশ্ব ও ক্রিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরদের জন্যে সুবিচার ও সমতাভিত্তিক, এগুলোতে কারও প্রতি অবিচার নেই এবং সমতা ও মধ্যবর্তিতার চূল পরিমাণ লক্ষ্যন নেই।) কোরআন যে আল্লাহর কালাম—তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কোরআনের ষষ্ঠ অবস্থা এই যে, كُنْتُ بِرَبِّكَ অর্থাৎ, আল্লাহর কালামের কোন পরিবর্তনকারী নেই। পরিবর্তনের এক প্রকার হচ্ছে যে, এতে কোন ভুল প্রমাণিত করার কারণে পরিবর্তন করা এবং দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে জবরদস্তিমূলকভাবে পরিবর্তন করা। আল্লাহর কালাম এ সকল প্রকার পরিবর্তনেরই উর্ধ্বে। আল্লাহ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন:

وَلَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسَ الزَّالِمِ وَنَسَمًا অর্থাৎ, আমিই কোরআন অবতীর্ণ করেছি

এবং আমিই এর সংরক্ষক। এমতাবস্থায় কার সাধ্য আছে যে, এ রক্ষণাবেক্ষণ ভেদ করে এতে পরিবর্তন করে? কোরআনের উপর দিয়ে চৌদ্দশত বছর অভিযাহিত হয়ে গেছে। প্রতি শতাব্দী ও প্রতি যুগে এর শত্রুদের সংখ্যাও এর অনুসারীদের তুলনায় বেশী ছিল; কিন্তু এর একটি বের ও বদল পরিবর্তন করার সাধ্যই কারো হয়নি। অবশ্য একটি তৃতীয় প্রকার পরিবর্তন সম্ভবপর ছিল। তা এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কোরআনকে রহিত করে পরিবর্তন করতে পারতেন। একারণেই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বশেষ পয়গম্বর এবং কোরআন সর্বশেষ গ্রন্থ। একে রহিতকরণের আর কোন সম্ভাবনা নেই। কোরআনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি আরও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ অর্থাৎ, তুমি যেসব কথাবার্তা বলছে, আল্লাহ সব শোনেন এবং সবার অবস্থা জানেন। তিনি প্রত্যেকের কার্যের প্রতিফল দেন।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অবহিত করেছেন যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট। আপনি এতে ভীত হবেন না এবং তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। কোরআন একাধিক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে:

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمُ الْكَثَرُ الْأَوَّلِينَ

অন্যত্র বলা হয়েছেঃ

وَمَا أَكْثَرُ الْأَنَاسِ وَلَوْ حَصَصْتُ بِمُؤْمِنِينَ উদ্দেশ্য এই যে, সংখ্যাধিক্য

কোর ভীতি স্বভাবতই মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ফলে মানুষ তাদের আনুগত্য করতে থাকে। কাজেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলা হয়েছেঃ

পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক এমন রয়েছে যে, আপনি যদি তাদের নির্দেশ মান্য করেন, তবে তারা আপনাকে বিপথগামী করে দেবে। কেননা, তারা বিশ্বাস ও মতবাদে শুধুমাত্র কল্পনা ও কুসংস্কারের পেছনে চলে এবং বিধি-বিধানে একমাত্র ভিত্তিহীন অনুমান দ্বারা চালিত হয়।

মোটকথা, আপনি তাদের সংখ্যাধিক্যে ভীত হয়ে তাদের সাথে একাত্মতার কথা চিন্তাও করবেন না। কারণ, এরা সবাই নীতিহীন ও বিপথগামী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ যারা আল্লাহর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়ে যায় এবং যারা আল্লাহর পথে চলে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা তাদের সবাইকে জানেন। অতএব, তিনি বিপথগামীদেরকে যেমন শাস্তি দেন, তেমনি সরল পথের অনুসারীদেরকেও পুরস্কৃত করবেন।

وَمَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ এ বাক্যে ইচ্ছাধীন যবেহ ও নিরুপায় অবস্থার যবেহ— উভয় প্রকার যবেহকেই বোঝানো হয়েছে। নিরুপায় অবস্থার যবেহ হচ্ছে তীর, বাজপক্ষী ও কুকুরের শিকার করা জন্তু। এগুলো ছাড়ার সময় বিছিন্নল্লাহ পাঠ করলে এদের শিকার করা জন্তু জীবিত না পাওয়া গেলেও তাতে যবেহ করা জন্তু বলেই মনে করতে হবে। অবশ্য জীবিত পাওয়া গেলে ইচ্ছাধীনভাবে যবেহ করতে হবে। যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণও দুই প্রকারে হতে পারে— (এক) সত্যিকার উচ্চারণ এবং (দুই)— অসত্যিকার ও নির্দেশগত উচ্চারণ। যেমন, মুসলমান ব্যক্তি কর্তৃক ভুলক্রমে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে যবেহ করা। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)—এর মতে ভুলক্রমে আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করলেও তা উপরোক্ত বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং হালাল হবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে উচ্চারণ না করলে হারাম হবে।

(১১১) কোন্ কারণে তোমরা এমন জন্তু থেকে ভক্ষণ করবে না, যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়, অথচ আল্লাহ্ এই সব জন্তুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলোকে তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন; কিন্তু সেগুলোও তোমাদের জন্যে হালাল, যখন তোমরা নিরূপায় হয়ে যাও। অনেক লোক স্বীয় ভ্রাতৃ, প্রবৃত্তি দ্বারা না জেনে বিপথগামী করতে থাকে। আপনার প্রতিপালক সীমাতিক্রমকারীদেরকে যথাধর্ম জানেন। (১২০) তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গোনাহ্ পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় যারা গোনাহ্ করছে, তারা অভিসমভূত তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে। (১২১) যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গোনাহ্। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাশে করে— যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মূসুরে হয়ে যাবে। (১২২) আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি এই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে— সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এমনভাবে কান্ধেদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেয়া হয়েছে। (১২৩) আর এমনভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্গার নিয়োগ করেছি— যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজদের বিরুদ্ধেই; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। (১২৪) যখন তাদের কারো আমরা আয়াত পৌছে, তখন বলে : আমরা কখনই মানব না যে পর্যন্ত না কোমর ও তা প্রদস্ত হই, যা আল্লাহর রসূলগণ প্রদস্ত হয়েছেন। আল্লাহ্ এবিষয়ে সুপারিস্কার্ত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। যারা অপরাধ করছে, তারা অভিসমভূত আল্লাহর কাছে পৌছে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি পাবে, তাদের চক্রান্তের কারণে।

এখন দেখতে হবে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? উল্লেখিত নীতি অনুযায়ী একথা সুনির্দিষ্ট যে, সে যদি জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য পালন করে যায়, তবে সে জীবিত, নতুবা মৃত বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। যেসব জ্ঞানপাপী পণ্ডিত মানুষকে জগতের একটি স্বউদগত ঘাস কিংবা একটি চালাক ধরনের জন্তু বলে সাব্যস্ত করেছে, যাদের মতে মানুষ ও গাধার মধ্যে কোন স্বাতন্ত্র্য নেই এবং যারা মানবিক প্রবৃত্তি চিরিতার্থ করা, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ এবং অবশেষে মরে যাওয়াকেই মানব জীবনের

লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছে, তারা প্রকৃত জ্ঞানীদের কাছে সম্মুখনের যোগ্যও নয়। বিশ্বের প্রত্যেক ধর্ম ও চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কশীল মনীষীবৃন্দ সৃষ্টির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি এ বিষয়ে একমত যে, মানুষ সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মাখলুকাত। এটা জানা কথা যে, যার জীবনের লক্ষ্য সেরা ও উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী, তাকেই সেরা ও উত্তম বলা যেতে পারে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথাও জানে যে, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ, বসবাস ও পরিধানের ব্যাপারে অন্যান্য জীব-জন্তুর চাইতে মানুষের বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। বরং অনেক জীবজন্তু মানুষের চাইতে উত্তম ও বেশী পানাহার করে, মানুষের চাইতে ভাল প্রাকৃতিক পোশাকে পরিবৃত্ত এবং মানুষের চাইতে উৎকৃষ্ট আলো-বাতাসে বসবাস করে। নিজের লাভ-লোকসান চেনার ব্যাপারেও প্রত্যেক জন্তু বরং প্রত্যেক উদ্ভিদ বেশ সচেতন। উপকারী বস্তু অর্জন এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে আত্মরক্ষার যথেষ্ট যোগ্যতা তারা রাখে। এমনভাবে অপর উপকার সাধনের ব্যাপারে তো সকল জীবজন্তু ও উদ্ভিদ বাহ্যতঃ মানুষের চাইতেও অগ্রে। তাদের মাংস, চামড়া, অস্থি, রগ এবং বৃক্ষের শিকড় থেকে নিয়ে শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু সৃষ্টজীবের জন্যে উপকারী। পক্ষান্তরে মানুষের মাংস, চামড়া, লোম, অস্থি, রগ ইত্যাদি কোন কাজেই আসে না।

এখন দেখতে হবে, এমতাবস্থায় মানুষ কিসের ভিত্তিতে ‘সৃষ্টির সেরা’ পদে অভিষিক্ত হয়েছে? সত্যোপলব্ধির মনযিল এবার কাছেই এসে গেছে। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, উপরোক্ত বস্তুসমূহের বুদ্ধি ও চেতনার দৌড় উপস্থিত জীবনের সাময়িক লাভ-লোকসান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এ জীবনেই এগুলো অপরের জন্যে উপকারী বলে দেখা যায়। পার্শ্ব জীবনের পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি হবে—এ ক্ষেত্রে জড়পদার্থ ও উদ্ভিদের তো কথাই নেই, কোন বৃহত্তম হুশিয়ার জন্তুর জ্ঞান-চেতনাও কাজ করে না এবং এক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে কোন বস্তুই কারও উপকারে আসে না। ব্যস, এক্ষেত্রেই সৃষ্টির সেরা মানুষকে কাজ করতে হবে এবং এর দ্বারাই অন্যান্য সৃষ্টজীব থেকে তার স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হতে পারে।

জানা গেল যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের আদি-অন্তকে সামনে রেখে সবার পরিণাম চিন্তা করে এটা নির্ধারণ করা যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে কোন বস্তু উপকারী এবং কোন বস্তু ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক। অতঃপর এ জ্ঞানের আলোতে নিজের জন্যে উপকারী বস্তুসমূহ অর্জন করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা। অপরকেও এসব উপকারী বস্তুসমূহের প্রতি আহ্বান করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হওয়া, যাতে চিরস্থায়ী সুখ, আরাম ও শান্তির জীবন অর্জিত হয়। যখন মানব জীবনের লক্ষ্য এবং মানবিক পূর্ণতার এ আদর্শগত উপকার নিজেকে অর্জন করতে হবে এবং অপরকে পৌছাতে হবে, তখন কোরআনের এ দৃষ্টান্ত বাস্তব রূপ ধারণ করে ফুটে উঠবে যে, ঐ ব্যক্তিই জীবিত যে, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বের আদি-অন্ত ও এর সামগ্রিক লাভ-লোকসানকে খোদায়ী প্রত্যাদেশের আলোকে যাচাই করে। কেননা, নিছক মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধি কখনও একাজ করেনি এবং করতে পারেও না। বিশ্বের বড় বড় পণ্ডিত ও দার্শনিক অবশেষে একথা স্বীকার করেছেন।

ঈমান আলো এবং কুফর অন্ধকার : ঈমানকে আলো এবং কুফরকে অন্ধকার বলা হয়েছে। চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ দৃষ্টান্তটি মোটেই কাল্পনিক নয়—বাস্তব সত্যেরই বর্ণনা। আলো ও অন্ধকারের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে দৃষ্টান্তের স্বরূপ ফুটে উঠবে। আলোর

উদ্দেশ্য হচ্ছে নিকট ও দূরের বস্তুসমূহ দেখা, যার ফলে ক্ষতিকর বস্তুসমূহ বেঁচে থাকা এবং উপকারী বস্তুসমূহকে অবলম্বন করার সুযোগ পাওয়া যায়।

এখন ঈমানকে দেখুন। সেটি একটি নূর, যার আলো সমগ্র আলম, ভূপৃষ্ঠ এবং এগুলোর বাইরের সব বস্তুতে প্রতিফলিত। একমাত্র এ আলোই গোটা বিশ্বের পরিণাম এবং সবকিছুর বিশুদ্ধ ফলাফল দেখাতে পারে। যার কাছে এ নূর থাকে, সে নিজেও সব ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচতে পারে এবং অপরকেও বাঁচাতে পারে। পক্ষান্তরে যার কাছে এ আলো নেই, সে নিজে অন্ধকারে নিমজ্জিত। সামগ্রিক বিশ্ব এবং গোটা জীবনের দিক দিয়ে কোন বস্তু উপকারী এবং কোন বস্তু অপকারী, সে জ বাছাই করতে পারে না। শুধু হাতের কাছেই বস্তুসমূহকে অনুমান করে কিছু চিনতে পারে। ইহকালীন জীবনই হচ্ছে হাতের কাছেই পরিকল্পনা। কাকের ব্যক্তি পার্শ্ব ও ক্ষণস্থায়ী এ জীবন এবং এর লাভ-লোকসান চিনে নেয়। কিন্তু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের কোন খবরই সে রাখে না। এ জীবনের লাভ-লোকসানের কোন অনুভূতিও তার নেই? কোরআন পাক এ বিষয়টি বোঝাবার জন্যেই বলেছে :

يَلْمِزُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ

অর্থাৎ, তারা বাহ্যিক পার্শ্ব জীবন এবং এর লাভ-লোকসান যৎসামান্য বোঝে, কিন্তু পরকাল সম্পর্কে এরা একেবারেই গাফেল।

অন্য এক আয়াতে পূর্ববর্তী কাকের সম্প্রদায়সমূহের কথা উল্লেখ করার পর কোরআন বলে : وَكَانُوا مُسْتَبِيرِينَ অর্থাৎ, পরকালের ব্যাপারে এমন তীব্র গাফেল ব্যক্তিরা এ জগতে বোকা ও নির্বোধ ছিল না; বরং তারা ছিল উর্বর মস্তিষ্ক প্রগতিবাদী। কিন্তু এ বাহ্যিক চিন্তার উচ্ছ্বাস শুধু জগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরিপাটিতেই কাজে লাগতে পারত। পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে এর কোন প্রভাব ছিল না।

এ বিবরণ শোনার পর আলোচ্য আয়াতটি পুনরায় পাঠ করুন :

أَوَمَن كَانَ مِثْلًا فَأَكْبَحِيْنَهُ وَوَعَدْنَا لَهُ نُورًا يَّكْشِفُ بِهٖ فِي النَّاسِ كَمَنْ مِّثْلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি পূর্বে মৃত অর্থাৎ, কাকের ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি অর্থাৎ, মুসলমান করেছি এবং তাকে এমন একটি নূর অর্থাৎ, ঈমান দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে এমন অন্ধকারে নিমজ্জিত, যা থেকে বের হতে পারে না। অর্থাৎ, কুফর অন্ধকারসমূহে পতিত। সে নিজেই নিজের লাভ-লোকসান চিনে না, অপরকে কি উপকার করবে।

ঈমানের আলোর উপকার অন্যেরাও পায় : এ আয়াতে وَكَانُوا مُسْتَبِيرِينَ বলে এ কথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ঈমানের আলো শুধু মসজিদ, খানকা, নির্জন প্রকাণ্ড কিংবা হুজুরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ নূর প্রাপ্ত হয়, সে একে নিয়ে জনসমাবেশে চলাফেরা করে এবং সর্বত্র এর দ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং অপরকেও উপকার পৌছায়। আলো কোন অন্ধকারে কাছে পরাভূত হয় না। একটি মিটিমিটি প্রদীপ ও অন্ধকারে নতিস্বীকার করে না, তবে প্রদীপের আলো দূর পর্যন্ত পৌছে না। কিরণ প্রথর হলে দূর

পক্ষ পৌছে এবং নিস্তেজ হলে অল্প স্থান আলোকিত করে। কিন্তু সর্বিহায়ই সে অন্ধকার ভেদ করে। অন্ধকার তাকে ভেদ করতে পারে না। অন্ধকার যে আলোকে ভেদ করে, সে আলোই নয়। এমনভাবে যে ইমান কুফরের কাছে পরাভূত হয়ে যায়, তা ঈমানই নয়। ঈমানের নূর হান্নানীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বিহায় ও সর্বযুগে মানুষের সাথে থাকে।

এমনভাবে এ দৃষ্টান্তে আরও একটি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলোর উপকারিতা প্রত্যেক মানুষ ও জীব-জন্তু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সর্বিহায় রিহু না কিছু ভোগ করে। মনে করুন, আলোর মালিক চায় না যে, অন্য কেউ এ আলোর দ্বারা উপকৃত হোক এবং অপর ব্যক্তিও উপকার লাভের ইচ্ছা করেনি; কিন্তু কারো সাথে আলো থাকলে অনিচ্ছায় ও স্বাভাবিকভাবে সবাই তদ্বারা উপকৃত হবে। এমনভাবে মুমিনের ঈমান দ্বারা অন্যরাও কিছু না কিছু উপকার লাভ করে, সে অনুভব করুক বা না করুক। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে: **كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ**

অর্থাৎ, এসব স্পষ্ট ও খোলাখুলি প্রমাণ সত্ত্বেও ক্যফেরদের কুফরে জ্বল থাকার কারণ এই যে, প্রত্যেকেই নিজ ধারণায় একটা না একটা ব্যতিক্রম পোষণ করে। শয়তান ও মানসিক প্রবৃত্তি তাদের মন্দ কাজকেই তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে রেখেছে। এটা মারাত্মক বিভ্রান্তি - (নউব্বিল্লাহ মিনব)

পূর্ববর্তী আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছিল যে, এ জগত একটি পরীক্ষাকেন্দ্র। এখানে সংকর্মের সাথে যেমন কিছু পরিশ্রম, কষ্ট ও বাধ-বিপত্তি রয়েছে, তেমনই মন্দ কর্মের সাথে ক্ষণস্থায়ী আনন্দ এবং কামনা-বাসনার ধোঁকা সংযুক্ত রয়েছে। এ ধোঁকা অপরিণামদর্শী মানুষের দৃষ্টিতে তাদের মন্দ কাজকেই সুশোভিত করে রাখে। জগতের অনেক চতুর ব্যক্তিও এ ধোঁকায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথমটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, এটাও এ পরীক্ষারই এক পিঠ যে, পৃথিবীর আদিদাল থেকে প্রত্যেক জনপদের সর্দার ও ধনী ব্যক্তিরাই বাস্তব সত্য ও পরিণাম ফল থেকে উদাসীন হয়ে ক্ষণস্থায়ী আনন্দে বিভোর হয়ে অপরাধ করে থাকে এবং জনসাধারণ বড় লোকদের পিছনে চলা এবং তাদের অনুকরণ করাকেই সৌভাগ্য ও সাফল্য গণ্য করে। আম্বিয়া (আঃ) ও তাঁদের নায়ের আলেম ও মাশায়েখগণ তাদের মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে এবং পরিণামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইলে বড় লোকেরা তাঁদের বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্ত করে। এসব চক্রান্ত বাহ্যতঃ পয়গম্বর, আলেম ও মাশায়েখদের বিরুদ্ধে হলেও পরিণামের দিক দিয়ে এগুলোর শাস্তি স্বয়ং তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে এবং প্রায়শঃ দুনিয়াতেও তা প্রকাশ পায়।

এতে মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যাতে তারা বড় লোক ও ধনীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, যেন তাদের পিছনে চলার অভ্যাস না করে, যেন পরিণামদর্শিতা অবলম্বন করে এবং ভাল-মন্দ যেন নিজেই চিনে নেয়।

এছাড়া আয়াতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাবুনা দেয়া হয়েছে যে, কোরাইশ সর্দারদের বিরুদ্ধাচরণে আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। এটা নতুন ঘটনা নয়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদেরকেও এধরনের লোকের সাথে পালা পড়েছে। পরিণামে এরা অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়েছে।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন যে, কোরাইশ প্রধান আবু জাহল একবার কল যে, আবদে মনাফ গোত্রের (অর্থাৎ, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর গোত্রের)

সাথে আমরা প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা করেছি এবং কখনও পিছনে পড়িনি। কিন্তু এখন তারা বলে: তোমরা ভদ্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের সমতুল্য হতে পারবে না। আমাদের পরিবারে একজন নবী আগমন করেছেন। তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসে। আবু জাহল বললঃ আল্লাহর কসম, আমরা কোনদিনই তাদের অনুসরণ করব না, যে পর্যন্ত না আমাদের কাছে তাদের অনুরূপ ওহী আসে। আয়াতের **وَإِذَا جَاءَهُمْ يُنذِرُ** বাক্যের অর্থ তাই।

নবুওয়ত সাধনালব্ব বিষয় নয়, বরং আল্লাহ প্রদত্ত একটি মহান পদঃ কোরআন পাক এ উক্তি বর্ণনা করার পর জওয়াবে বলেছেঃ

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَخْتَارُ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলাই জানেন,

রেসালত কাকে দান করতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ নির্বাধ মনে করে রেখেছে যে, নবুওয়ত বংশগত সম্প্রদায় কিংবা গোত্রীয় সর্দারী ও ধনাত্মতার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। অথচ নবুওয়ত হচ্ছে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের একটি পদ। এটা অর্জন করা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। হাজারো গুণ অর্জন করার পরও কেউ স্বেচ্ছায় অথবা গুণের জোরে রেসালত অর্জন করতে পারে না। এটা খাটি আল্লাহর দান। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, রেসালত ও নবুওয়ত উপার্জন করার বস্তু নয় যে, জ্ঞানগত ও কর্মগত গুণাবলী অথবা সাধনা ইত্যাদি দ্বারা অর্জন করা যাবে। আল্লাহর বক্তৃত্বের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেও কেউ নবুওয়ত লাভ করতে পারে না। বরং আল্লাহর এ খাটি অনুগ্রহ আল্লাহর জ্ঞান ও রহস্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বন্দাকে দান করা হয়। তবে এটা জরুরী যে, আল্লাহ যাকে এ পদমর্যাদা দিতে ইচ্ছা করেন তাকে প্রথম থেকেই এর জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়, তাঁর চরিত্র ও কাজকর্ম বিশেষভাবে গঠন করা হয়।

আয়াতে বলা হয়েছেঃ

سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا كَانُوا يَكْرُمُونَ

এখানে **صَغَارٌ** শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ, অপমান ও লাঞ্ছনা। এ বাক্যের অর্থ এই যে, সত্যের যেসব শত্রু আজ স্বগোষ্ঠে সর্দার ও বড় লোক খেতাবে ভূষিত, অতিসম্মানের তাদের বড়ত্ব ও সম্মান খুলায় লুপ্তিত হবে। আল্লাহর কাছে তারা তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে এবং কঠোর শাস্তিতে পতিত হবে।

‘আল্লাহর কাছে’ -এর এক অর্থ এই যে, কেয়ামতের দিন যখন তারা আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, তখন অপমানিত ও লাঞ্চিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। অতঃপর তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, বর্তমানে বাহ্যতঃ তারা সর্দার ও সম্মানিত হলেও আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা স্পর্শ করবে। এমনটি দুনিয়াতেও হতে পারে এবং পরকালেও। যেমন, পয়গম্বরদের শত্রুদের ব্যাপারে জগতের ইতিহাসে এরূপ হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ, তাঁদের শত্রুরা পরিণামে দুনিয়াতেও লাঞ্চিত হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বড় বড় শত্রু, যারা নিজেরা সম্মানী বলে খুব আশ্চর্যান্বিত করত, তারা একে একে হয় ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, না হয়

الانعام

১৩৫

ولولنا

فَنَنْزِلُ إِلَهُكَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَسَّرَ صَدْرَكَ لِلْإِسْلَامِ
وَمَنْ يَزِدْ أَنْ يُضَلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَكَ مِيقًا حَرَجًا كَانُوا
يَصْعَدُونَ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَضَّلْنَا
الْأَيْتَ لِقَوْمِهِمْ يَذْكُرُونَ ۝ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
جَبِينًا يَمُشِّرُ الْبَيْنَ قَدْ اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ
أَوْلَئِكَ مِنْ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَنْبَحْ بِضَائِعٍ وَيُلْغَا
أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ الْمَاءُ مِثْلُكُمْ خَلِدِينَ
فِيهَا أَلَمْ آتِ شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ وَكَذَلِكَ
تُؤْتَى بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝
يَمْشُرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ
يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْبَيِّنَاتِ وَيُبَيِّنُ رُؤُوسَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ
الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۝

(১২৫) অতঃপর আল্লাহ্ যাকে পথ-প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ—অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন—যেন সে সবোচ্চ আকাশে আরোহণ করছে। এমনভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব বর্ষণ করেন। (১২৬) আর এটাই আপনার পালনকর্তার সরল পথ। আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে আয়াতসমূহ পুচ্ছানুপুচ্ছ বর্ণনা করেছি। (১২৭) তাদের জন্যেই তাদের প্রতিপালকের কাছে নিরাপত্তার গৃহ রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু তাদের কর্মের কারণে। (১২৮) যেদিন আল্লাহ্ সবাইকে একত্রিত করবেন, হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষদের মধ্যে অনেককে অনুগামী করে নিয়েছ। তাদের মানব বন্ধুরা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা পরস্পরে পরস্পরের মাধ্যমে ফল লাভ করেছি। আপনি আমাদের জন্যে যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। আল্লাহ্ বলবেন : আগুন হল তোমাদের বাসস্থান। তথ্য তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে; কিন্তু যখন চাইবেন আল্লাহ্। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজাময়, মহাজ্ঞানী। (১২৯) এমনভাবে আমি পাগীদেরকে একে অপরের সাথে যুক্ত করে দেব তাদের কাজকর্মের কারণে। (১৩০) হে জিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বরের আগমন করেনি, যাঁরা তোমাদেরকে আমার বিধানাবলী বর্ণনা করতেন এবং তোমাদেরকে আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা বলবে : আমরা স্বীয় গোনাহ স্বীকার করে নিলাম। পার্থিব জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কান্ধের ছিল।

অপমানিত ও লাঞ্চিত অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আবু জাহল, আবু লাহাব প্রমুখ কোরাইশ সর্দারদের শোচনীয় অবস্থা বিশুবাসীর চোখের সামনে ফুট উঠেছে। মক্কা বিজয়ের ঘটনা তাদের সবার কোমর ভেঙ্গে দেয়।

আনুষঙ্গিক স্মৃত্যব্য বিষয় :

ধর্ম সম্পর্কে বক্ষ উন্মুক্তকরণ এবং এর লক্ষণাদি : বলা হয়েছে :

فَنَنْزِلُ إِلَهُكَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَسَّرَ صَدْرَكَ لِلْإِسْلَامِ

অর্থাৎ, যাকে আল্লাহ্ তাআলা হেদায়েত দিতে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন।

হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থ এবং বায়হাকী শায়াবুল ইমান গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বাচনিক বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে **شرح صدر** বক্ষ উন্মুক্তকরণের তফসীর জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন : আল্লাহ্ তাআলা মুমিনের অন্তরে একটি আলো সৃষ্টি করে দেন। ফলে তার অন্তর সত্যকে নিরীক্ষণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা এবং গ্রহণ করার জন্যে উন্মুক্ত হয়ে যায়। (সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে শুরু করে এবং অসত্যকে ঘৃণা করতে থাকে।) সাহাবায়ে-কেরাম আরব করলেন : এরূপ ব্যক্তিকে চেনার মত কোন লক্ষণ আছে কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ, লক্ষণ এই যে, এরূপ ব্যক্তি সমগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা পরকাল ও পরকালের নেয়ামতের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। সে পার্থিব অন্যায় কামনা-বাসনা এবং ধ্বংসশীল আনন্দ-উল্লাস থেকে বিরত থাকে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হতে থাকে। অতঃপর বলা হয়েছে :

وَمَنْ يَزِدْ أَنْ يُضَلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَكَ مِيقًا حَرَجًا كَانُوا يَصْعَدُونَ فِي السَّمَاءِ

অর্থাৎ, যাকে আল্লাহ্ তাআলা পথভ্রষ্টতায় রাখতে চান, তার অন্তর সংকীর্ণ এবং অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন। সত্যকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা তার কাছে এমন কঠিন মনে হয়, যেমন কারও আকাশে আরোহণ করা।

তফসীরবিদ কলবী বলেন : তার অন্তর সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই যে, তাতে সত্য ও সংকর্মের জন্যে কোন পথ থাকে না। হযরত ফারুক আযম (রাঃ) থেকেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : আল্লাহ্ র যিকির থেকে তার মন বিমুখ থাকে এবং কুফর ও শেরকের কথাবার্তা নিবিস্ত হয়।

সাহাবায়ে কেরাম ধর্মের ব্যাপারে উন্মুক্তবক্ষ ছিলেন : আল্লাহ্ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে স্বীয় রসুলের সংসর্গ এবং প্রত্যক্ষ শিষ্যত্বে জন্যে মনোনীত করেছিলেন। ইসলামী বিধি-বিধানে তাঁরা খুব কমই সন্দেহ ও সংশয়ের সম্মুখীন হতেন। তাঁরা সারা জীবনে যেসব প্রশ্ন রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উত্থাপন করেন, সেগুলো গুণাগুণিত কয়েকটি মাত্র। কারণ এই যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংসর্গের কল্যাণে আল্লাহ্ র মায়ায় ও ভালবাসা তাঁদের অন্তরে সুগভীর রেখাপাত করেছিল। ফলে তাঁরা **شرح صدر** তথা বক্ষ উন্মুক্তকরণের স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁদের অন্তর আপনা থেকেই সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। তাঁরা সত্যকে অতি সহজে কালবিলয় না করে গ্রহণ করে নিতেন এবং অসত্য তাঁদের

জ্বরের পথ খুঁজে পেতে না। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগ থেকে যতই দূর বাড়তে থাকে, সন্দেহ ও সংশয় ততই অন্তরে রাস্তা পেতে থাকে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে।

সন্দেহ দূর করার প্রকৃত পন্থা : আজ সমগ্র বিশ্বে এসব সন্দেহ ও সন্দেহের আবেশে নিপতিত। তারা তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে এর মীমাংসা করতে চেষ্টা। অথচ এটা এর নির্ভুল পথ নয়।

সাধ্যায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ যে পথ ধরেছিলেন, সেটাই হল যথার্থ পথ। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তি ও নেয়ামত কলনায় উপস্থিত করে অন্তরে তাঁর মহাত্ম্য ও ভালবাসা সৃষ্টি করলে সন্দেহ-সংশয় আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। এ কারণেই কোরআন পাক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ দোয়া করার আদেশ দিয়েছে : رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দাও।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ لِرَبِّهِكَ كَيْدًا ۖ إِنَّكَ لَتَكُونُ مِنَ الْمُنْظَرِينَ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এমনভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের প্রতি দ্বিধা করেন। তাদের অন্তরে সত্য আসন পায় না এবং তারা প্রত্যেক মন্দ ও অপকর্মে সোলাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে— وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمٌ অর্থাৎ, এটা আপনার পালনকর্তার সরল পথ। এখানে هَذَا (এটা) শব্দ দ্বারা ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মতে কোরআনের দিকে এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে ইসলামের দিকে ইশারা করা হয়েছে—(রুহুল মা'আনী)। উদ্দেশ্য এই যে, আপনাকে প্রস্তুত কোরআন কিংবা ইসলাম আপনার পালনকর্তার পথ। অর্থাৎ, এমন পথ, যা আপনার পালনকর্তা স্বীয় প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্থির করেছেন এবং মাননীয় করেছেন। এখানে পথকে পালনকর্তার দিকে সম্পৃক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন ও ইসলামের যে কর্মব্যবস্থা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেয়া হয়েছে, তা পালন করা আল্লাহ তাআলার উপকারের জন্যে নয়, বরং পালনকারীদের উপকারের জন্যে পালনকর্তার দাবীর ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষকে এমন শিক্ষাই দান করা উদ্দেশ্য যা তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে।

এখানে رَبِّ শব্দকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধ করে তাঁর প্রতি এমন এক বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপা প্রকাশ করা হয়েছে, যার রসাস্বাদন বিশেষ ব্যক্তিরাই করতে পারেন। কেননা, পালনকর্তা ও উপাস্যের সাথে কোন বন্দার সামান্যতম সম্বন্ধ জড়িত হয়ে যাওয়াও তার জন্যে পরম গৌরবের বিষয়। তদুপরি যদি পরম পালনকর্তা নিজেকে বান্দার দিকে সম্বন্ধ করে বলেন যে, আমি তোমার, তখন তার সৌভাগ্যের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

এরপর مُسْتَقِيمٌ শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআনের এ পথই হলো সরল পথ। এখানেও مُسْتَقِيمٌ -কে صِرَاط -এর বিশেষণ হিসেবে উল্লেখ না করে অবস্থা হিসেবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশ্বে পালকের স্থিতিত পথ মুস্তাকীম ও সরল হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনাই নাই।—(রুহুল মা'আনী, বাহরে মুহীত)

এরপর فَذَلِكُنَا الَّذِي لُمْتُمْ نَذْرًا -অর্থাৎ, আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে আয়াতসমূহকে পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছি। বলা

হয়েছে : এখানে فَذَلِكُنَا শব্দটি تفصيل থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে এক এক অধ্যায়কে পৃথক পৃথক করে বিশদভাবে বর্ণনা করা। এভাবে গোটা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। অতএব, تفصيل -এর সারমর্ম হচ্ছে বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণনা করা। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মৌলিক বিষয়গুলোকে পরিষ্কার ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছি; এতে কোন সন্ধিগত বা অস্পষ্টতা রাখিনি। এতে لُمْتُمْ বলা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কোরআনের বক্তব্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হলেও, তদ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কোরআনের উপর চিন্তা-ভাবনা করে; জেদ, হঠকারিতা এবং পৈতৃক প্রথার নিষ্ঠুর অনুসরণের প্রাচীর যাদের সামনে অন্তরায় সৃষ্টি করে না।

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ وَعِنْدَ اللَّهِ -অর্থাৎ, উপরোক্ত ব্যক্তি, যারা মুক্ত মনে উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কোরআনের পয়গাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এর অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতিস্বরূপ কোরআনী নির্দেশ মেনে চলে, তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে 'দারুস-সালাম'-এর পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে 'দার' শব্দের অর্থ গৃহ এবং 'সালাম' শব্দের অর্থ যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা। কাজেই 'দারুস-সালাম' এমন গৃহকে বলা যায়, যেখানে কষ্ট-শ্রম, দুঃখ, বিষাদ, বিপদাপদ ইত্যাদির সমাগম নেই। নিঃসন্দেহে এটা জ্ঞানাতাই হতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : সালাম আল্লাহ তাআলার একটি নাম। দারুস-সালামের অর্থ আল্লাহর গৃহ। আল্লাহর গৃহ বলতে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান বোঝায়। অতএব, সার অর্থ আবারও তাই হয় যে, এমন গৃহ যাতে শান্তি, সুখ, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি বিদ্যমান। জ্ঞানাতকে দারুস-সালাম বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একমাত্র জ্ঞানাতই এমন জায়গা, যেখানে মানুষ সর্বপ্রকার কষ্ট, উৎকর্ষ, উপদ্রব ও স্বভাব বিরুদ্ধ বস্তু থেকে পূর্ণরূপে ও স্থায়ীভাবে নিরাপদ থাকে। এরূপ নিরাপত্তা জগতে কোন রাজাধিরাজ এবং নবী-রসূলও কখনও লাভ করেন না। কেননা, ধ্বংসশীল জগত এরূপ পরিপূর্ণ ও স্থায়ী শান্তির জায়গাই নয়।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব সৌভাগ্যশালীর জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে দারুস-সালাম রয়েছে। 'প্রতিপালকের কাছে' -এর এক অর্থ এই যে, এ দারুস-সালাম ইহজগতে নগদ পাওয়া যায় না; কেয়ামতের দিন যখন তারা স্বীয় প্রতিপালকের কাছে যাবে, তখনই তা পাবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দারুস-সালামের ওয়াদা ভ্রান্ত হতে পারে না। প্রতিপালক নিজেই এর জামিন। তাঁর কাছে তা সংরক্ষিত রয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দারুস-সালামের নেয়ামত ও আরাম আজ কেউ কল্পনাও করতে পারে না। যে প্রতিপালকের কাছে এ ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে, তিনিই তা জানেন।

দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে দারুস-সালাম লাভ করা কেয়ামত ও পরকালের উপর নির্ভরশীল মনে হয় না। বরং পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা, এ জগতেও সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা দিয়ে দারুস-সালাম (শান্তির আবাস) দান করতে পারে। দুনিয়ার কোন বিপদাদই তাকে স্পর্শ করে না। যেমন, পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও ওলীগণের মধ্যে এর নজীর দেখতে পাওয়া যায়। আবার পরকালের নেয়ামত তার সামনে উপস্থিত করে তার দৃষ্টিকে এমন সত্যদর্শী করে দেয়া হয় যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বিপদাপদ তার দৃষ্টিতে নিতান্ত নগণ্য বলে প্রতিভাত হতে থাকে। বিপদের পাহাড়ও তাকে

কিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না।

এ আয়াতে সংলোকের জন্যে যে দারুস-সালামের কথা বলা হয়েছে, তা পরকালে তো নিশ্চিত ও অবধারিত; পরন্তু দুনিয়াতেও তাদেরকে দারুস সালামের সুখ ও আনন্দ দেয়া যেতে পারে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **وَهُوَ إِلَهُكُمْ بِمَا كَانُوا يَمُونُونَ**

অর্থাৎ, তাদের সংকর্মের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হয়ে যান। তাদের সব মুশকিল আসান হয়ে যায়।

তৃতীয় আয়াতে হাশরের ময়দানে সব জিন ও মানবকে একত্রিত করার পর উভয় দলের সাথে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা শয়তান জিনদেরকে সম্মোহন করে তাদের অপরাধ ব্যক্ত করবেন এবং বলবেন : তোমরা মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করার কাজে বিরাট অংশ নিয়েছ। এর উত্তরে জিনরা কি বলবে, কোরআন তা উল্লেখ করেনি। তবে এটা বোঝা যায় যে, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর সামনে স্বীকারোক্তি করা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তাদের স্বীকারোক্তি উল্লেখ না করার মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ প্রশ্ন শোনে তারা এমন হতবাক হয়ে যাবে যে, উত্তর দেয়ার জন্যে মুখই খুলতে পারবে না।—(রুজুল-মা'আনী)

এরপর শয়তান মানব অর্থাৎ, দুনিয়াতে যারা শয়তানদের অনুগামী ছিল, নিজেদেরও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর দরবারে একটি উত্তর বর্ণনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রশ্ন যদিও তাদেরকে করা হয়নি; কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে তাদেরকেও যেন সম্মোহন করা হয়েছিল। কেননা, তারাও শয়তান জিনদের কাজ অর্থাৎ, পথভ্রষ্টতাই প্রচার করেছিল। এ প্রাসঙ্গিক সম্মোহনের কারণে তারা উত্তর দিয়েছে। কিন্তু বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, মানবরপী শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হয়ে থাকবে। তা স্পষ্টতঃ এখানে উল্লেখ করা না হলেও সূরা ইয়াসীনের এক আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে : **أَلَمْ أَهْذَلِكُمْ يَذِّكِّرْكُمْ**

অর্থাৎ, হে আদম সন্তানরা, আমি কি তোমাদেরকে পয়গম্বরের মাধ্যমে বলিনি যে, শয়তানদের অনুসরণ করো না?

এতে বোঝা যায়, এ সময়ে মানুষ শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হবে। তারা উত্তরে স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা শয়তানদের কথা মান্য করার অপরাধ করেছি। তারা আরও বলবে : হ্যাঁ, জিন শয়তানরা আমাদের সাথে এবং আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ফল লাভ করেছি। মানুষ শয়তানরা তাদের কাছ থেকে এ ফল লাভ করেছে যে, দুনিয়ার ভোগবিলাস আহরণের উপায়াদি শিক্ষা করেছে এবং কোথাও কোথাও জিন শয়তানদের দোহাই দিয়ে কিংবা অন্য পন্থায় তাদের কাছ থেকে সাহায্যও লাভ করেছে, যেমন মূর্তিপূজারীর মধ্যে বরং ক্ষেত্রবিশেষে অনেক মূর্খ মুসলমানের মধ্যেও এ পন্থা প্রচলিত আছে, যদ্বারা শয়তান ও জিনদের কাছ থেকে কোন কোন কাজে সাহায্য নেয়া যায়। জিন শয়তানরা মানুষদের কাছ থেকে যে ফল লাভ করেছে, তা এই যে, তাদের কথা অনুসরণ করা হয়েছে এবং তারা মানুষকে অনুগামী করতে সক্ষম হয়েছে। এমন কি, তারা মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তারা স্বীকার করবে যে, শয়তানের বিপথগামী করার কারণে আমরা যে মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে গিয়েছিলাম, এখন তা সামনে এসে গেছে। এ স্বীকারোক্তির পর আল্লাহ তাআলা বলবেন :

الْأَمْثَلُ عَلَيْكُمْ خُلِدْنَ فِيهَا الْأَلَمَ أَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

অর্থাৎ, তোমরা উভয় দলের অপরাধের শাস্তি এই যে, তোমাদের বাসস্থান হবে অগ্নি, যাতে সদা-সর্বদা থাকবে। তবে আল্লাহ কড়িৎ জা থেকে বের করতে চাইলে তা ভিন্ন কথা। কোরআনের অন্যান্য আয়াতে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তাআলাও তা চাইবেন না। তাই অনন্তকাল সেখানে থাকতে হবে।

আয়াতে **وَهُوَ** শব্দটির আভিধানিক দিক দিয়ে দু'টি অর্থ হতে পারে। (এক) পরস্পরকে যুক্ত করে দেয়া ও নিকটবর্তী করে দেয়া এবং (দুই) শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেয়া। তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবয়ীসদের কল্প থেকে উভয় প্রকার অর্থই বর্ণিত আছে।

হাশরের কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে দল বিভক্ত হবে— জাতিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে নয় : হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়র, কাতাদা (রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে মানুষের দল বিভক্তি বংশ, দেশ কিংবা বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে হবে না; বরং কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে হবে। আল্লাহর আনুগত্যশীল মুসলমান যেকোনো থাকবে, সে মুসলমানদের সাথী হবে এবং অব্যাহা কাদের যেকোনো থাকবে, সে কাদেরদের সাথী হবে, তাদের বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে যতই দূরত্ব ও পার্থক্যই থেকে থাকুক না কেন।

এরপর মুসলমানদের মধ্যেও সং ও ধার্মিকেরা ধার্মিকদের সাথে থাকবে এবং পাপী ও কুকর্মীদেরকে কুকর্মীদের সাথে যুক্ত করে দেয়া হবে। সূরা তাক্বীরে বলা হয়েছে : **وَالَّذِينَ هُمْ يُرْجُونَ** — অর্থাৎ, মানবকুলে যুগল ও দল তৈরী করে দেয়া হবে। এর উদ্দেশ্যও তাই যে, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে হাশরবাসীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেন : সং কিংবা অসং-এক ধরনের আমলকারীদেরকে একত্রিত করে দেয়া হবে। সংলোকেরা সংলোকদের সাথে জন্মাত এবং অসংলোকেরা অসংদের সাথে জাহান্নামে পৌঁছাবে।

আলাচ্য আয়াতের সার বিষয়বস্তু এই যে, আল্লাহ তাআলা কত জালেমকে অন্য জালেমদের সাথে যুক্ত করে একদলে পরিণত করে দেবেন— বংশগত ও দেশগতভাবে তাদের মধ্যে যতই দূরত্ব থাক না কেন।

অন্য এক আয়াতে একথাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আশ মানুষের মধ্যে বংশ, দেশ, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে যে পার্থক্য ও আনুষ্ঠানিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, হাশরের মাঠে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বলা হয়েছে : **وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِدُ بَنِي إِسْرَءِيلَ** — অর্থাৎ, যেদিন কেয়ামত কায়ম হবে, সেদিন পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ ও ঐক্যমত পোষণকারী ব্যক্তিরা পৃথক হয়ে যাবে।

দুনিয়ার সম্বন্ধে কাজ-কারবারে কর্ম ও চরিত্রের প্রভাবঃ পার্থক্য আত্মীয়তা, সম্পর্ক ও আনুষ্ঠানিক সংগঠনসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কেয়ামতের দিন তো স্পষ্টভাবে সবারই দৃষ্টিগোচর হবে, দুনিয়াতেও এর সামান্য নমুনা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এখানে সংলোকের সম্পর্ক স লোকদের সাথেই স্থাপিত হয় এবং তাদেরই দল ও সমাজের সাথে জড়িত থাকে। ফলে তার সামনে সংকর্মের বিভিন্ন পথ খুলতে থাকে এবং তার

রসূল দূত হতে থাকে। এমনভাবে অসং ব্যক্তির সম্পর্ক তার মত অসং ব্যক্তির সাথেই স্থাপিত হয়। সে তাদের মধ্যে উঠাবসা করে। তাদের সম্পর্ক তার অসংকর্ম ও অসচ্চারিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার সামনে সংকর্মের দূর রুদ্ধ হতে থাকে। এটা তার মন্দ-কর্মের নগদ ফল, যা এ দুনিয়াতেই সে পায়।

রসূলুল্লাহ বলেন : আল্লাহ তাআলা কোন বাদশাহ্ ও শাসনকর্তার প্রতি ক্ষমতা হলে তাকে সং মন্ত্রী ও সং কর্মচারী দান করেন, ফলে তার ক্ষমতার সব কাজকর্ম ঠিকঠাক ও উন্নত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা কারও প্রতি অগ্রসন্ন হলে সে অসং সহকর্মী ও অসং কর্মচারী পায়। সে কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করলেও ফুলিয়ে উঠতে পারে না।

এক জালামে অপর জালামের হাতে শাস্তি ভোগ করে : আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা تَوَّابُ শব্দের প্রথমোক্ত অর্থের দিক বর্ণিত হল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়র, ইবনে যায়েদ (রাঃ), মালেক ইবনে দীনার (রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের তফসীর এরূপ বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা একজন জালামকে অন্য জালামের উপর শাসক হিসেবে চাপিয়ে দেন এবং এভাবে এককে অন্যর হাতে শাস্তি দেন।

এ বিষয়বস্তুর যথাস্থানে সঠিক ও নির্ভুল এবং কোরআন-হাদীসের জ্ঞান্য বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিশীল। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : **كَمَا تَكُونُونَ كَذَلِكَ يُؤْمَرُ عَلَيْكُمْ** অর্থাৎ, তোমরা যেমন হবে তোমাদের উপর তেমনি শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে। তোমরা জালাম ও গাণাচারী হলে তোমাদের শাসকবর্গ ও জালাম ও গাণাচারীই হবে। পক্ষান্তরে তোমরা সাধু ও সংকর্মী হলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের শাসনকর্তারূপে সাধু, দয়ালু ও সুবিচারক লোকদের মনোনীত করবেন।

ইবনে-কাসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বাচনিক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন : **من اعان ظالما سلط الله** -এর অর্থ, যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর অত্যাচারে তাকে সাহায্য করে, আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে এ জালামকেই তার উপর চাপিয়ে দেন। তার হাতেই তাকে শাস্তি দেন।

দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। এ প্রশ্নটি হাশরের ময়দানে জিন ও মানবকে করা হবে। প্রশ্নটি এই : তোমরা কি কারণে কুফর ও আল্লাহর অবাব্যতায় লিপ্ত হলে? তোমাদের কাছে কি আমার পয়গম্বর পৌঁছেনি। সে তো তোমাদের মধ্য থেকেই ছিল এবং আমার আয়াতসমূহ তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাতে, আজকের দিনের উপস্থিতি এবং হিসাব-কিতাবের ভয় প্রদর্শন করত। এর উত্তরে তাদের সবার পক্ষ থেকে পয়গম্বরদের আগমন, আল্লাহর বাণী পৌঁছানো এবং এতদসঙ্গেও কুফরে লিপ্ত হওয়ার স্বীকারোক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ভ্রান্ত কর্মের কোন কারণ ও হেতু তাদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয়নি; বরং আল্লাহ নিজেই এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, **وَعَزَّوْتَهُمُ الْيَوْمَ لِلْإِنْيَا**

অর্থাৎ, তাদেরকে পার্থিব জীবন ও ভোগ-বিলাস ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। ফলে তারা একেই মুখ মনে করে বসেছে, অথচ এটা প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমতঃ প্রশ্নাধীনযোগ্য বিষয় এই যে, অন্য কতিপয় আয়াতে বলা হয়েছে, হাশরের ময়দানে মুশরিকদেরকে কুফর ও শিরক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা মুখ মুছে অস্বীকার করবে এবং

পালনকর্তার দরবারে কসম খেয়ে মিথ্যা বলবে : **وَاللَّهِ رَبِّكَ أَكْبَرُ** - অর্থাৎ, আমাদের পালনকর্তার কসম, আমরা কখনও

মুশরিক ছিলাম না। অথচ এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, তারা অনুতাপ সহকারে স্বীয় কুফর ও শিরক স্বীকার করে নিবে। অতএব, আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধিতা দেখা দেয়। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রথমে যখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তখন তারা অস্বীকার করবে। সেমতে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরত-বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দেবেন। হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নেবেন। আল্লাহর কুদরতে সেগুলো বাকশক্তি প্রাপ্ত হবে। সেগুলো পরিষ্কারভাবে তাদের কুকর্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে দেবে। তখন জিন ও মানব জানতে পারবে যে, তাদের হাত, পা, কান, জিহ্বা সবই ছিল আল্লাহর গুণ্ড প্রহরী, যারা সব কাজ-কারবার ও অবস্থার অবশ্য রিপোর্ট প্রদান করেছে। এমতাবস্থায় তাদের আর অস্বীকার করার জো থাকবে না। তখন তারা সবাই পরিষ্কার ভাষায় অপরাধ স্বীকার করে নেবে।

জিনদের মধ্যেও কি পয়গম্বর প্রেরিত হন? দ্বিতীয় প্রশ্নাধীনযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা জিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়কে সম্মোহন করে বলেছেন : তোমাদের মধ্য থেকে আমার পয়গম্বর কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? এতে বোঝা যায় যে, মানব জাতির পয়গম্বররূপে যেমন মানব প্রেরিত হয়েছে, তেমনি জিন জাতির পয়গম্বররূপে জিন প্রেরিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে হাদীস ও তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্মরূপ। কেউ কেউ বলেন : রসূল ও নবী একমাত্র মানবই হয়েছে। জিন জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে রসূল হয়নি; বরং মানব রসূলের বাণী স্বজাতির কাছে পৌঁছানোর জন্যে জিনদের মধ্য থেকে কিছু লোক নিযুক্ত হয়েছে। তারা প্রকৃতপক্ষে মানব-রসূলগণের দূত ও বার্তাবহ ছিল। অপ্রকৃতভাবে তাদেরকেও রসূল বলে দেখা হয়। যেসব তফসীরবিদ একথা বলেন, তাদের প্রমাণ ঐসব আয়াত, যেগুলোতে জিনদের এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তারা নবীর বাণী অথবা কোরআন শ্রবণ করে স্বজাতির কাছে পৌঁছিয়েছে। **وَأَوَّلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ** - এবং সূরা জিনের

আয়াত **نَّارًا مِّنْ أَعْيُنِنَا غَيَّبْنَاهُ لِقَوْمٍ قَادِرِينَ عَلَى الْبَصَرِ** ইত্যাদি।

কিন্তু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে একদল আলেম এ বিষয়েরও প্রবক্তা যে, শেষ নবী (সাঃ)-এর পূর্বে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রসূল সে সম্প্রদায় থেকেই প্রেরিত হতেন। মানব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরে মানব রসূল এবং জিন জাতির বিভিন্ন স্তরে জিন রসূলই আগমন করতেন। শেষনবী (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সমগ্র বিশুর মানব ও জিনদের একমাত্র রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন; তাও কোন এক বিশেষ কালের জন্যে নয়, বরং কেয়ামত অবধি সমস্ত জিন ও মানব তাঁর উম্মত এবং তিনিই সবার রসূল।

হিন্দুদের অবতারণা সাধারণতঃ জিন, তাদের মধ্যে কোন রসূল ও নবী হওয়ার সম্ভাবনা : কলবী, মুজাহিদ (রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ এ উক্তিই গ্রহণ করেছেন। কবী ছানউল্লাহ পানিপথী তফসীরে-মাযহারীতে এ উক্তি গ্রহণ করে বলেছেন : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আদম (আঃ)-এর পূর্বে জিনদের রসূল জিনদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হত। যখন একথা প্রমাণিত যে, পৃথিবীতে মানব আগমনের হাজার হাজার বছর

الانعام

১৭৭

ولواتناه

ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا
 غَفُلُونَ ﴿١٧٧﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ وَمِمَّا عَمِلُوا وَمَا رُبُّكَ
 بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٨﴾ وَرَبُّكَ الْعَزِيزُ ذُو الرِّضَىٰ
 إِنْ يَشَاءْ يُبْعَثْهُمُ وَيَسْتَعْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا
 أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٧٩﴾ إِنْ مَا تُوعَدُونَ
 لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٨٠﴾ قُلْ يَوْمَ نَأْمُرُ عَلَى
 مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ
 عَلَيْهِ الدَّارُ إِنَّهُ لَا يُسْلِمُهُ الظَّالِمُونَ ﴿١٨١﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ
 مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا
 هَذَا لِلَّهِ بِرْغِمِهِمْ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا فَمَا كَانَ
 لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ وَهُوَ
 يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَكَذَلِكَ
 زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ
 شُرَكَاءَهُمْ لِيَزْدُودَهُمْ وَليُكْسِبُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٨٣﴾

(১৩১) এটা এ জন্যে যে, আপনার প্রতিপালক কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে জুলুমের কারণে ধ্বংস করেন না এমন অবস্থায় যে, তৎকালকার অধিবাসীরা অজ্ঞ থাকে। (১৩২) প্রত্যেকের জন্যে তাদের কর্মের আনুপাতিক মর্যাদা আছে এবং আপনার প্রতিপালক তাদের কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন। (১৩৩) আপনার প্রতিপালক অমুখাপেক্ষী, করুণাময়। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে উচ্ছেদ করে দিবেন এবং তোমাদের পর যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলে অভিষিক্ত করবেন; যেমন তোমাদেরকে অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে সৃষ্টি করেছেন। (১৩৪) যে বিষয়ের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা অক্ষম করতে পারবে না। (১৩৫) আপনি বলে দিন : হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা স্বস্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করি। অচিরেই জানতে পারবে যে, পরিণাম গৃহ কে লাভ করে। নিশ্চয় জালেমরা সুফলপ্রাপ্ত হবে না। (১৩৬) আল্লাহ যেসব শাস্যক্রেত্র ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশে আল্লাহর জন্যে নির্ধারণ করে অতঃপর নিজ ধারণা অনুসারে বলে, এটা আল্লাহর এবং এটা আমাদের অংশীদারদের। অতঃপর যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো আল্লাহর দিকে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহর তা তাদের উপাস্যদের দিকে পৌঁছে যায়। তাদের বিচার কতই না মন্দ। (১৩৭) এমনভাবে অনেক মুশরেকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা সজ্ঞান হত্যাকে সুশোভিত করে দিয়েছে যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্মমতকে তাদের কাছে বিভ্রান্ত করে দেয়। যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব, আপনি তাদেরকে এবং তাদের মনগড়া বুলিকে পরিত্যাগ করুন।

পূর্বে জিন জাতি বসবাস করত এবং তারাও মানবজাতির মত বিধি-বিধান পালন করত আদিত ছিল, তখন শরীয়ত ও যুক্তির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান পৌঁছানোর জন্যে পয়গম্বর হওয়া অপরিহার্য।

কাযী ছানউল্লাহ (রঃ) আরও বলেন : ভারতবর্ষের হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থ বেদের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরানো বলে বর্ণনা করে এবং তাদের অনুসৃত অবতারদেরকে সে যুগেরই লোক বলে উল্লেখ করে। এটা অসম্ভব নয় যে, তারা এ জিন জাতিরই পয়গম্বর ছিলেন এক তাদেরই আনীত নির্দেশাবলী কালে পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অবতারদের যেসব চিত্র ও মূর্তি মন্দিরসমূহে রাখা হয়, সেগুলোর দেহাকৃতিও অনেকটা এমন ধরনের। কারণ অনেকগুলো মুখমণ্ডল, কারণ অনেক হাত-পা, কারণ হাতীর মত ঠুঁড়। এগুলো সাধারণ মানবাকৃতি থেকে ভিন্ন। জিনদের পক্ষে এহেন আকৃতি ধারণ করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই এটা সম্ভব যে, তাদের অবতার জিন জাতির রসূল কিংবা তাদের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাদের ধর্মগ্রন্থও তাদের নির্দেশাবলীর সমষ্টি ছিল। এরপর আস্তে আস্তে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় একেও পরিবর্তিত করে তাতে শেরক ও মূর্তিপূজা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

যদি আসল ধর্মগ্রন্থ এবং জিন জাতির বিশুদ্ধ নির্দেশাবলীও বিদ্যমান থাকত, তবুও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাব ও রেসালতের পর আরহিত হয়ে যেত, বিকৃত ও পরিবর্তিত ধর্মগ্রন্থের তো কথাই নেই।

আনুযঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানব ও জিনদের মধ্য রসূল প্রেরণ করা আল্লাহ তাআলার ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের প্রতীক। তিনি কোন জাতির প্রতি এমনভাবেই শাস্তি প্রেরণ করেন না, যে পর্যন্ত না তাদেরকে পূর্বাঙ্কে পয়গম্বরদের মাধ্যমে জাগ্রত করা হয় এবং হেদায়েতের আলো প্রেরণ করা হয়।

১৩২ নং আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তাআলার কাছে মানব ও জিন জাতির প্রত্যেক স্তরের লোকদের পদমর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে। এস পদমর্যাদা তাদের কাজকর্মের ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের প্রতিদান ও শাস্তি এসব কর্মের মাপ অনুযায়ী হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, জিন ও মানব জাতির প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিকট রসূল ও হেদায়েত প্রেরণ করা আল্লাহ তাআলার চিরকাল রীতি। পয়গম্বরদের মাধ্যমে তাদেরকে পূর্ণভাবে সত্যক না করা পর্যন্ত কুফর, শেরক ও অবাদ্যতার কারণে কখনও শাস্তি দেয়া হয়নি।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বর ও ঐশীগ্রন্থসমূহের অব্যাহত ধারা এ জন্যে ছিল না যে, বিশু পালনকর্তা আমাদের এবাদত ও আনুগত্যের মুখাপেক্ষী কিংবা তাঁর কোন কাজ আমাদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল নয়, তিনি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তবে পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষী হওয়ার সাথে সাথে তিনি দয়া গুণেও গুণান্বিত। সমগ্র বিশ্বকে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দান করা এবং বিশ্ববাসীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব প্রয়োজন অযাচিতভাবে মিটানোর কারণে তাঁর দয়াগুণ। নতুবা মানুষ তথা গোটা সৃষ্টি নিজের প্রয়োজনাদি নিজে সমাধার করার যোগ্য হওয়া তো দূরের কথা, সে স্বীয় প্রয়োজনাদি চাওয়া রীতি-নীতিও জানে না। বিশেষতঃ অস্তিত্বের যে নেয়ামত দান করা হয়েছে, তা যে চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে, তা দিবালোকের মত স্পষ্ট। কোন মানুষ কোথাও নিজের সৃষ্টির জন্যে দোয়া করেনি এবং অগ্নি

জ্ঞাত পূর্বে দোয়া করা কম্পনাও করা যায় না। এমনভাবে অস্তর এবং কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি হাত, পা, মন-মস্তিষ্ক প্রভৃতি একলা কোন মানব চেয়েছিল কি?

আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন- জগত-সৃষ্টি শুধু তাঁর অনুগ্রহের ফল : মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে **وَرَبَّكَ الْعَاقِبُونَ** শব্দ দ্বারা বিশ্বপালকের জ্ঞাপেক্ষিতা বর্ণনা করার সাথেই **دَوَاءَ الرَّحْمَةِ** যোগ করে বলা হয়েছে যে, তিনি করুণাময়ও বটে।

আল্লাহ্ যে কোন মানুষকে অমুখাপেক্ষী করেননি তার তাৎপর্য : জ্ঞাপেক্ষিতা আল্লাহ্ পাকেরই বিশেষ গুণ। নতুবা মানুষ অপরের প্রতি জ্ঞাপেক্ষী হয়ে গেলে সে অপরের লাভ-লোকসান ও সুখ-দুঃখের প্রতি কেটেই ক্রোশ করত না বরং অপরের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে উদ্যত হত। কোরআন পাকের এক আয়াতে বলা হয়েছে :

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ অর্থাৎ, মানুষ যখন নিজেকে জ্ঞাপেক্ষী দেখতে পায়, তখন অবাব্যতা ও গুহ্মত্বে মেতে উঠে। তাই আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে এমন প্রয়োজনাদির শিকলে আটপুঠে বেঁধে দিয়েছেন, যেগুলো অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ণ হতে পারে না। প্রবল প্রজাপনিত রাজা-বাদশাহ ও চাকর-চাকরানীর মুখাপেক্ষী। বিস্তালাল ও মিল মলিক শ্রমিকদের মুখাপেক্ষী। প্রত্যুৎপাদন শ্রমিক ও রিস্তাচালক কিছু পক্ষা উপার্জন করে অভাব-অনটন দূর করার জন্যে যেমন রোষগারের জলাশে বের হয়, ঠিক তেমনিভাবে বিস্তালাল ব্যক্তিও শ্রমিক, রিস্তা ও দান বাহনের ঝোঁড়ে বের হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সবাইকে জ্ঞাব-অনটনের এক শিকলে বেঁধে রেখেছেন। প্রত্যেকেই মুখাপেক্ষী। কারও প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। এরূপ না হলে কোন ধনী ব্যক্তি কাউকে এক পরমাণু দিত না এবং কোন শ্রমিক কারও সামান্য বোঝাও বহন করত না। এটা একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই বিশেষ গুণ যে, পুরোপুরি অমুখাপেক্ষিতা সত্ত্বেও তিনি দয়ালু, করুণাময়।

এরপর আরও বলা হয়েছে যে, তাঁর রহমত যেমন ব্যাপক ও পূর্ণ, তেমনি তাঁর শক্তি-সামর্থ্য প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। সমগ্র সৃষ্টজগত নিশ্চিহ্ন করে দিলেও তাঁর কুদরতের কারখানায় বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা দেবে না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বর্তমান সৃষ্টজগতকে ধ্বংস করে অস্থল অন্য সৃষ্টজগত এমনভাবে এ মুহূর্তে উদ্ভব করে স্থাপন করতে পারেন। এর একটি নজীর প্রতি যুগের মানুষের সামনেই রয়েছে। আজ কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাস করছে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ-কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। যদি আজ থেকে একশ বছর পূর্বকার অবস্থার দিকে তাকানো যায়, তবে দেখা যাবে, তখনও এ পৃথিবী এমনভাবে জমজমাট ছিল এবং সব কাজ-কারবার এভাবেই চলত। কিন্তু তখন বর্তমান অধিবাসী ও কার্য পরিচালনাকারীদের কেউই ছিল না। অন্য এক জাতি ছিল, যারা আজ ভূগর্ভে চলে গেছে এবং যাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বর্তমান দুনিয়া সে জাতির কণ্ঠ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। বলা হয়েছে :

“আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে, তোমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারেন। ‘নিয়ে যাওয়া’ অর্থ এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়া যেন নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট না থাকে। তাই এখানে ধ্বংস করা বা মেরে ফেলার কথা বলা হয়নি ; বরং নিয়ে যাওয়া বলা হয়েছে। এতে পুরোপুরি ধ্বংস ও

নাম-নিশানাহীন করে দেয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।”

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার অমুখাপেক্ষী হওয়া, করুণাময় হওয়া এবং সর্বশক্তির অধিকারী হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর অবাব্য ও নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে,

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ لَدُنِّي وَإِنَّكُمْ لَيُفْعِلُونَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা সব একত্রিত হয়েও আল্লাহ্ সে আযাব প্রতিরোধ করতে পারবে না।

তৃতীয় আয়াতে পুনরায় তাদেরকে হুশিয়ার করার জন্যে অন্য এক পন্থা অবলম্বন করে বলা হয়েছে :

“হে রসূল, আপনি মক্কাবাসীদেরকে বলে দিন : হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমরা আমার কথা না মান, তবে না মানা তোমাদের ইচ্ছা এবং স্বস্থানে বীথ্য বিশ্বাস ও হঠকরিতা অনুযায়ী কাজ করতে থাক। আমিও বীথ্য বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে থাকব। এতে আমার কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কে পরকালের মুক্তি ও সফলতা অর্জন করে। মনে রেখো, জালাম অর্থাৎ, অধিকার আত্মসাৎকারী কখনও সফল হয় না।”

পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের একটি বিশেষ পঞ্চব্রততা ব্যক্ত করা হয়েছে। আরবদের অভ্যাস ছিল যে, শস্যক্ষেত্র, বাগান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যাকিছু আয়দানী হত, তার এক অংশ আল্লাহ্‌র জন্যে এবং এক অংশ উপাস্য দেব-দেবীর নামে পৃথক করে রাখত। আল্লাহ্‌র নামের অংশ থেকে গরীব-মিসকীনকে দান করা হত এবং দেব-দেবীর অংশ মন্দিরের পূজারী, সেবায়ত ও রক্ষকদের জন্যে ব্যয় করত।

প্রথমতঃ এটাই কম অবিচার ছিল না যে, যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ এবং সমুদয় উৎপন্ন ফসলও তিনিই দান করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত বস্তুসমূহের মধ্যে প্রতিমাদেরকে অংশীদার করা হত। তদুপরি তারা আরও অবিচার করত এই যে, কখনও উৎপাদন কম হলে তারা কন্মের ভাগটি আল্লাহ্‌র অংশ থেকে কেটে নিত, অথচ মুখে বলত : আল্লাহ্ তো সম্পদশালী, অভাবমুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। এরপর প্রতিমাদের অংশ এবং নিজেদের ব্যবহারের অংশ পুরোপুরি নিয়ে নিত। আবার কোন সময় এমনও হত যে, প্রতিমাদের কিংবা নিজেদের অংশ থেকে কোন বস্তু আল্লাহ্‌র অংশে পড়ে গেলে তা হিসাব ঠিক করার জন্যে সেখান থেকে তুলে নিত। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্‌র অংশ থেকে কোন বস্তু নিজেদের কিংবা প্রতিমাদের অংশে পড়ে যেত, তবে তা সেখানেই থাকত। দিত এবং বলত : আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, তাঁর অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই। কোরআন পাক তাদের এ পঞ্চব্রততার উল্লেখ করে বলেছে :

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ অর্থাৎ, তাদের এ বিচারপদ্ধতি অত্যন্ত বিপ্লী ও একদেহদর্শী। যে আল্লাহ্ তাদেরকে এবং তাদের সমুদয় বস্তু-সামগ্রীকে সৃষ্টি করেছেন, প্রথমতঃ তারা তাঁর সাথে অপরকে অংশীদার করেছে। তদুপরি তাঁর অংশও নানা ছলছুতায় অন্যদিকে পাচার করে দিয়েছে।

কাফেরদের প্রতি হুশিয়ারীতে মুসলমানদের জন্যে শিক্ষাঃ এ হচ্ছে মুশরিকদের একটি পঞ্চব্রততা ও ভ্রান্তির জন্যে হুশিয়ারী। এতে ঐসব মুসলমানের জন্যেও শিক্ষার চাবুক রয়েছে, যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণ কার্যক্রমতাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে বয়স ও

الانعام

১৭৫

ولوانتاه

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَّيَطْعَمُنَّ إِلَّا مَنْ
 تَشَاءُ مِنْهُمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ
 لَا يَذُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِمْ سُبُحٌ
 بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ
 خَالِصَةٌ لِّذُنُوبِنَا وَمَعْزٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ
 مِمَّنَّاهُ فَمَنْ فِيهِ شِرْكٌ ۚ سُبُحٌ عَلَيْهِمْ وَصَفُهُمْ لَمَّا حَكِمُوا
 عَلَيْهِمْ ۝ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا
 بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ
 قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ
 جَدَّتْ مَعْرُوشَتٍ وَقَعْرَ مَعْرُوشَتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
 مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانِ مِثْلَ لَبَنٍ
 مُتَغَيَّرٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ وَ
 مِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ لِّأَهْلِ الْبَلَدِ وَالْأَنْعَامِ
 لَا تَعْمُرُ خَطَايَا السَّيِّئِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَذَابٌ مُّبِينٌ ۝

(১৩৮) তারা বলে : এসব চতুষ্পদ জন্তু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাকে ইচ্ছা করি, সে ছাড়া এগুলো কেউ খেতে পারবে না, তাদের খারগা অনুসারে। আর কিছুসংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে আরোহণ হারাম করা হয়েছে এবং কিছুসংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা বাস্ত খারগাবশতঃ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, তাদের মনগড়া বুলির কারণে; অচিরেই তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন। (১৩৯) তারা বলে : এসব চতুষ্পদ জন্তুর পেটে যা আছে, তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্যে এবং আমাদের মহিলাদের জন্যে তা হারাম। যদি তা মৃত হয়, তবে তার প্রাপক হিসাবে সবাই সমান। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের বর্ণনার শাস্তি দিবেন। তিনি প্রজাময়, মহাজ্ঞানী। (১৪০) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজ সন্তানদেরকে নিষিদ্ধাবশতঃ কোন প্রমাণ ছাড়াই হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যেসব দিয়েছিলেন, সেগুলোকে আল্লাহর প্রতি বাস্ত খারগা পোষণ করে হারাম করে নিয়েছে। নিশ্চিতই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সুপঞ্চাশী হয়নি। (১৪১) তিনিই উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছে—তাও, যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয় এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না, এবং স্বর্ভূর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র—যেসবের বাদবিশিষ্ট এবং যত্নবুনা ও আনার সৃষ্টি করেছেন—একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলস্ত হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। (১৪২) তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বোকা বহনকারীকে এবং স্বর্বাঙ্গীকে। আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন, তা থেকে খাও এবং শয়তানের পাদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

সময়ের এক অংশ তারা আল্লাহর এবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করে, জীবনের সমস্ত সময় ও মুহূর্তকে তাঁরই এবাদত ও অনুগত্যের জন্যে ওয়াকফ করে মানবিক প্রয়োজনাদি ঘটানোর জন্যে তা থেকে কিছু সময় নিজের জন্যে বের করে নেয়াই সম্ভব ছিল। সত্য বলতে কি, এরপরও আল্লাহর যথার্থ কৃতজ্ঞতা আদায় হত না। কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, দিবা-রাত্রির চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি কিছু সময় আমরা আল্লাহর এবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করি, তবে কোন প্রয়োজন দেখা নিল কাজ-কারবার ও আরাম-আয়েশের সময় পুরোপুরি ঠিক রেখে তার সমস্ত জের নাশায, তেলাওয়াত ও এবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের উপর কোন দেই। কোন অতিরিক্ত কাজের সম্মুখীন হলে কিংবা অসুখ-বিসুখ হলে সর্বপ্রথম এর প্রভাব এবাদতের নির্দিষ্ট সময়ের উপর পড়ে। এই নিঃসন্দেহে অবিচার, অকৃতজ্ঞতা এবং অধিকা রহস্য। আল্লাহ আমাদেরকে এবং সব মুসলমানকে এহেন গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

আনুযিকি স্তাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের এ পথভ্রষ্টতা বর্ণিত হয়েছিল যে, জালেমরা আল্লাহ সৃষ্টিত জন্তু-জানোয়ার এবং আল্লাহ দ্বারা নেয়াতসমূহে স্বহস্তনির্মিত নিশ্চাপ অচেতন প্রতিমাদেরকে আল্লাহ অংশীদার স্থির করেছিল এবং যেসব বস্তু তারা সদকা-খয়রাতের জন্যে পৃথক করত, যেগুলোতে এক অংশ আল্লাহর এবং এক অংশ প্রতিমাদের জন্যে রাখত। অতঃপর আল্লাহর অংশকেও বিভিন্ন ছলছুয় প্রতিমাদের অংশের মধ্যে পাচার করে দিত। এমন ধরনের আরও অনেক মূর্খতাসূচক কুপ্রথাকে তারা ধর্মীয় আইনের মর্দাদা দান করেছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা উদ্ভিদ ও বৃক্ষের বিভিন্ন প্রকার এবং তাদের উপকারিতা ও ফল স্বজন বীর শক্তি-সামর্থ্যের বিস্ময়কর পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের বিভিন্ন প্রকার স্বজনের বর্ণনা উল্লেখ করে মুশরিকদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে হুশিয়ার করেছেন যে, এ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেরা কেমন সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ সাথে কেমন অজ্ঞ, অচেতন, নিশ্চাপ ও অসহায় বস্তুসমূহকে শরীক অংশীদার করে ফেলেছে।

অতঃপর তাদেরকে সরল পথ ও বিশুদ্ধ কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন যে, যখন এসব বস্তু সৃষ্টি করা ও তোমাদেরকে দান করার কাজে কোন অংশীদার নেই, তখন এবাদতে তাদেরকে অংশীদার করা একান্ত অকৃতজ্ঞতা ও জুলুম। যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করে তোমাদেরকে দান করেছেন এবং এমন অনুগত করে দিয়েছেন যে, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করতে পার, এরপর সবগুলোকে তোমাদের দান হালাল করে দিয়েছেন, তোমাদের কর্তব্য এসব নেয়াত দ্বারা উপভোগ হওয়ার সময় তাঁর কৃতজ্ঞতা স্মরণে রাখা এবং প্রকাশ করা—শরীক ধ্যান-ধারণা এবং মূর্খতাসূচক প্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

প্রথম আয়াতে أَنْشَأَ শব্দের অর্থ সৃষ্টি করেছেন এবং وَقَعْرَ مَعْرُوشَتٍ শব্দটিকে উল্লেখ করে উদ্ভূত। এর অর্থ উঠানো এবং উচ্চ করা। وَقَعْرَ মَعْرُوشَتِ উদ্ভিদ এসব লতা বোঝানো হয়েছে, যেগুলোকে মাচার উপর চড়ানো হয়। যেমন, আঙ্গুর ও কোন কোন শাকসব্জি। এর বিপরীতে وَقَعْرَ مَعْرُوشَتِ শব্দটিকে বলাই সমস্ত বৃক্ষ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর লতা উপরে চড়ানো হয় না; কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ হোক, যাদের লতাই হয় না, কিংবা লতাবিশিষ্ট বৃক্ষ

শিশু সেগুলো মাটিতেই বিস্তৃত হয় এবং উপরে চড়ানো হয় না; যেমন জন্ম, খরবুয়া ইত্যাদি।

শব্দে 'নخل' শব্দের অর্থ খজুর বৃক্ষ, زرع সর্বপ্রকার শস্য, زيتون যয়তুন বৃক্ষ বলা হয় এবং এর ফলকেও এবং رمان ডালিমকে বলা হয়।

এসব আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রথমে বাগানে উৎপন্ন বৃক্ষসমূহের দুই প্রকার বর্ণনা করেছেন। এক, যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো নয় এবং দুই, যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো হয় না। এতে আল্লাহর চূড়ান্ত রহস্য ও কৃপার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, একই মাটি, একই পানি এবং একই পরিবেশে কেমন বিভিন্ন প্রকার চারাগাছ সৃষ্টি করেছেন। এরপর এদের ফল স্ত্রী, সজীবতা এবং এদের মধ্যে নিহিত হাজারো বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোন বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, যতদিন লতা উপরে না চড়ানো হয়, ততদিন প্রথমতঃ ফলই ধরে না-যদি ধরেও, তবে জা বাড়ে না এবং বাকী থাকে না; যেমন আম্র ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কোন বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, লতা উপরে চড়াতে চাইলেও চড়ে না-চড়ালেও ফল দুর্বল হয়ে যায়; যেমন খরবুয়া, তরমুজ ইত্যাদি। কোন কোন বৃক্ষকে মজবুত কাণ্ডের উপর দাঁড় করিয়ে এত উচ্চে নিয়ে গেছেন যে, মানুষের চেষ্টায় এত উচ্চে নিয়ে যাওয়া স্বভাবতঃ সম্ভবপর ছিল না। রিযাত রহস্যের অধীনে ফলের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে বৃক্ষসমূহ বিভিন্নরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন কোন ফলে মাটিতেই বাড়ে এবং পরিপক্ব হয় এবং কোন কোন ফল মাটির সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। কতক ফলের জন্যে উচ্চ শাখায় খুলে অবিরাম তাজা বাতাস, সূর্যকিরণ এবং তারকার রশ্মি থেকে রং গ্রহণ করা জরুরী। সর্বশক্তিমান প্রত্যেকের জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

قَرَأَ اللَّهُ الْخُسْفَانَ

এরপর বিশেষভাবে খজুর বৃক্ষ এবং শস্যের কথা উল্লেখ করেছেন। খজুর ফল সাধারণভাবে চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে খাওয়া হয়। প্রয়োজন হলে এ দুরা পূর্ণ খাদ্যের কাজও নেয়া যায়। শস্যক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য থেকে সাধারণতঃ মানুষের খোরাক এবং জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য সংগ্রহ করা হয়। এ দু'টি বস্তু উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে : مَخْلُوقَاتِهِ এখানে অর্থাৎ

এর সর্বনাম زرع এবং نخل উভয়ের দিকে যেতে পারে। অর্থ এই যে, ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ আছে। শস্যের তো শত শত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ ও উপকারিতা আছে। একই পানি, বাতাস এবং একই মাটি থেকে উৎপন্ন ফলের মধ্যে এত রিযাত ব্যবধান এবং প্রত্যেক প্রকারের উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্যের এমন বিশৃঙ্খলার বিভিন্নতা স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকেও একথা স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, এদের সৃষ্টিকর্তা এমন এক অচিন্তনীয় সত্তা, যার জ্ঞান ও রহস্য মানুষ অনুমান করতেও সক্ষম নয়।

এরপর আরও দু'টি বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে : যয়তুন ও ডালিম। যয়তুন একাধারে ফল ও তরকারি হয়ে থাকে। এর তৈল সর্বাধিক পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং অসংখ্য গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। এটি হাজারো রোগের উত্তম প্রতিষেধক। এমনভাবে ডালিমেরও অনেক গুণাগুণ সবার জানা আছে। এ দুই প্রকার ফল উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে : مَسْكَاةً وَمَسْكَاةً অর্থাৎ, এদের প্রত্যেকটির কিছু ফল রং ও স্বাদের দিক দিয়ে সাদৃশ্যশীল হয় এবং কিছু ফলের রং, স্বাদ ও পরিমাণ একই রূপ হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন হয়। যয়তুনের অবস্থাও তদ্রূপ।

এসব বৃক্ষ ও ফল সম্পর্কে উল্লেখ করার পর মানুষের প্রতি দু'টি

নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ মানুষের বাসনা ও প্রবৃত্তির দাবীর পরিপূরক। বলা হয়েছে : اِذَا أَشْمَرَ অর্থাৎ, এসব বৃক্ষের ও শস্যক্ষেত্রের ফল ভক্ষণ কর, যখন এগুলো ফলন্ত হয়। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এসব বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করে সৃষ্টিকর্তা নিজের কোন প্রয়োজন মেটাতে চান না; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্যে এগুলো সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তোমরা খাও এবং উপকৃত হও اِذَا أَشْمَرَ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, বৃক্ষের ডাল থেকে ফল বের করা তোমাদের সাধ্যাতীত কাজ। কাজেই আল্লাহর নির্দেশে যখন ফল বের হয়ে আসে, তখনই তোমরা তা খেতে পার-পরিপক্ব হোক বা না হোক।

ক্ষেতের ওশর : দ্বিতীয় নির্দেশ এই দেয়া হয়েছে : وَاتَّوَحَّاهُ وَاتَّوَحَّاهُ শব্দের অর্থ আন অথবা আদায় কর। ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময়কে حصاد বলা হয়। শব্দের সর্বনাম পূর্বোল্লিখিত প্রত্যেকটি খাদ্য বস্তুর দিকে যেতে পারে। বাক্যের অর্থ এই যে, এমন বস্তু খাও, পান কর এবং ব্যবহার কর; কিন্তু মনে রাখবে যে, ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময় এদের হকও আদায় করতে হবে। 'হক' বলে ফকীর-মিসকীনকে দান করা বুঝানো হয়েছে : وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ অর্থাৎ, সং লোকদের ধন-সম্পদে নিদিষ্ট হক রয়েছে ফকীর-মিসকীনদের।

এখানে সাধারণ সদকা-খরযাত বোঝানো হয়েছে না ক্ষেতের যাকাত ও ওশর বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবয়য়ীগণের দু'রকম উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ প্রথমোক্ত মত প্রকাশ করে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং যাকাত মদীনায় হিজরত করার দুই বছর পর ফরয হয়েছে। তাই এখানে 'হক' -এর অর্থ ক্ষেতের যাকাত হতে পারে না। পক্ষান্তরে কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন এবং حَقٌّ -এর অর্থ যাকাত ও ওশর নিয়েছেন।

তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আরাবী উদ্দুলুসী 'আহকামুল-কারআনে'-এর সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেছেন যে, আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হোক অথবা মদীনায়, উভয় অবস্থাতেই এ আয়াত থেকে শস্যক্ষেত্রের যাকাত অর্থাৎ, ওশর অর্থ নেয়া যেতে পারে। কেননা, তাঁদের মতে যাকাতের নির্দেশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা মুযাযাম্মলের আয়াতে যাকাতের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। তবে যাকাতের পরিমাণ ও নেসার নির্ধারণের নির্দেশ হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের উপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি হক আরোপ করা হয়েছে। এর পরিমাণ আয়াতে উল্লিখিত হয়নি। কাজেই পরিমাণের ব্যাপারে আয়াতটি সংক্ষিপ্ত। মক্কায় পরিমাণ নির্ধারণের প্রয়োজনও ছিল না। কেননা, ক্ষেত ও বাগানের ফসল অনায়াসে লাভ করার ব্যাপারে তখন মুসলমানরা নিশ্চিত ছিলেন না। তাই পূর্ব থেকে সংলোকদের মধ্যে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাই অনুসৃত হত। অর্থাৎ, ফসল কাটা ও ফল নামানোর সময় যেসব গরীব-মিসকীন সেখানে উপস্থিত থাকত, তাদেরকে কিছু দান করা হত। কোন বিশেষ পরিমাণ নির্ধারিত ছিল না। ইসলামপূর্ব কালে অন্যান্য উম্মতের মধ্যেও ফল ও

ফসল এভাবে দান করার প্রথা **إِنْ يَكُونُ فَرَسًا مَّا يَكُونُ أَكْثَرُ النَّاسِ**

কোরআন পাকের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হিজরতের দু'বছর পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) যেমন অন্যান্য ধন-সম্পদের যাকাত ও নেসাবের পরিমাণ ওহীর নির্দেশক্রমে বর্ণনা করেন, তেমনিভাবে ফসলের যাকাতও বর্ণনা করেন। মুয়ায ইবনে জাবাল, ইবনে ওমর ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ(রাঃ) প্রমুখের রেওয়াজেতক্রমে বিয়তি সব হাদীসগ্রন্থে এভাবে বর্ণিত রয়েছে: **مَا سَقَتِ السَّاءُ فِيهِ الْعَشْرُ وَمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ نِصْفَ الْعَشْرِ** অর্থাৎ, যেসব ক্ষেতে জল সেচনের ব্যবস্থা নেই শুধু বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করতে হয়, সেসব ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজেব এবং যেসব ক্ষেত কূপের পানি দ্বারা সেচ করা হয়, সেগুলোর উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজেব।

ইসলামী শরীয়ত যাকাত আইনে সর্বত্র এ বিষয়টিকে মূলনীতি হিসাবে ব্যবহার করেছে। যে ফসলে পরিশ্রম ও ব্যয় কম, তার যাকাতের পরিমাণ বেশী এবং পরিশ্রম ও ব্যয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, যাকাতের পরিমাণও সে পরিমাণে হ্রাস পায়। উদাহরণতঃ যদি কেউ কোন লুকায়িত ধনভাণ্ডার পেয়ে বসে কিংবা সোনা-রূপা ইত্যাদির বনি আবিষ্কৃত হয়, তবে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজেব। কেননা, এখানে পরিশ্রম ও ব্যয় কম এবং উৎপাদন বেশী। এরপর বৃষ্টি বিধৌত ক্ষেতের নমুনা আসে। এতে পরিশ্রম ও ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। তাই এর যাকাত পাঁচ ভাগের একের অর্ধেক—অর্থাৎ, দশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর রয়েছে ঐ ক্ষেত, যা কূপ থেকে সেচের মাধ্যমে কিংবা খালের পানি ক্রয় করে সিক্ত করা হয়। এতে পরিশ্রম ও খরচ বেড়ে যায়। ফলে এর যাকাত তারও অর্ধেক। অর্থাৎ, বিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর আসে সাধারণ সোনা-রূপা ও পণ্যসামগ্রীর পালা। এগুলো অর্জন করতে পরিশ্রম ও ব্যয় অত্যধিক। এ জন্যে এগুলোর যাকাত তারও অর্ধেক অর্থাৎ, চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসে ক্ষেতের ফসলের জন্যে কোন নেসাব নির্ধারিত হয়নি। তাই ইমাম আবু হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল

(রহঃ)—এর মাহাব এই যে, ক্ষেতের ফসল কম হোক কিংবা বেশী সর্ববিধায় তার যাকাত বের করা জরুরী। সূরা বাকারার যে আয়াতে ক্ষেতের যাকাত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও এর কোন নেসাব বর্ণিত হয়নি। বলা হয়েছে : **أَفْئُتُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ** - অর্থাৎ, স্বীয় হালাল উপার্জন থেকে ব্যয় কর এবং ঐ ফসল থেকে, যা আমি তোমাদের জন্যে ক্ষেত-খামার থেকে উৎপন্ন করেছি।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) পণ্য-সামগ্রী ও চতুশদ জন্মের নেসাব বর্ণনা প্রদান বলেছেন যে, রূপা সাড়ে বায়ান্ন তোলার কম হলে যাকাত নেই। স্বর্ণ ১০০ এবং উট ৫—এর কম হলে যাকাত নেই। কিন্তু ক্ষেতের ফসল সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত হাদীসে কোন নেসাব ব্যক্ত করা হয়নি। তাই প্রত্যেক ক্ষেতের ফসলের উপরই উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে দশ ভাগের এক ভাগ কিংবা বিশ ভাগের এক যাকাত দেয়া ওয়াজেব।

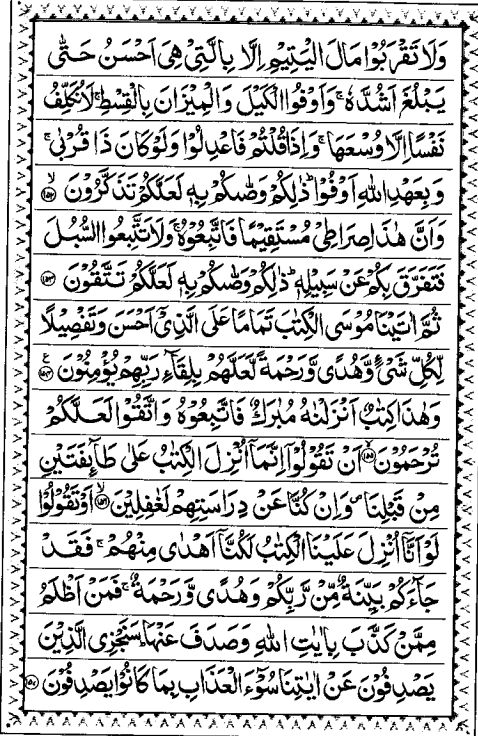
আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ** অর্থাৎ, সীমিতবদ্ধ ব্যয় করো না। কেননা, আল্লাহ তায়াল অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহর পথে যদি কেউ সমস্ত ধন-সম্পদ বরং জীবনও ব্যয় করে দেয়, তবে একে অপব্যয় বলা যায় না; বরং যথার্থ প্রাপ্য পরিশোধ হয়েছে একরূপ বলাও কঠিন। এমতাবস্থায় এখানে অপব্যয় করতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য কি? উত্তর ঐ যে, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে অপব্যয়ের ফল স্বভাবতঃ অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রটরূপে দেখা দেয় যে ব্যক্তি স্বীয় কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে মুক্তহস্তে সীমিতবদ্ধ ব্যয় করে, সে সাধারণতঃ অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করতে ক্রটি করে। এখানে একরূপ ক্রটি করতেই বাধা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, যদি কেউ একই ক্ষেত্রে স্বীয় যথাসর্বস্ব লুটিয়ে দিয়ে রিক্তহস্ত হয়ে বসে, তবে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন বরং নিজের প্রাপ্য কিরণ পরিশোধ করবে? তাই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর পথে ব্যয় সুমম হওয়া চাই, যাতে সবার প্রাপ্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়।

ثَنِينَ آذَانٍ مِّنَ النَّصَانِ اثْنَيْنِ ۚ وَمِنَ الْمَعْرِائَيْنِ
 ثَلَاثُ كُرْبَيْنِ ۚ وَهُوَ أَمَرُ الْأَنْثَيْنِ ۚ أَمَّا اسْتَمْتَكْتُ عَلَيْهِ
 أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ ۚ يُعْتَوِي بِعِلْمِهِ لَنْ تُنْفِقُوا مِمَّنْ
 وَمِنَ الْأَيْلِ اثْنَيْنِ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۚ قُلْ أَلَمْ يَكُنْ
 حَزْمٌ أَمَرُ الْأَنْثَيْنِ ۚ أَمَّا اسْتَمْتَكْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ
 أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَضَعَكُمُ اللَّهُ فِي بَرْحِهِ ۚ قُلْ أَعْمَى
 أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِفَعْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ
 مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَتْعَبُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
 دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا
 أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
 رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ وَكُلِ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا كُلًّا
 ذِي ظُنْفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْعِزَّةِ حَرَّمًا عَلَيْهِمْ شَوْحُومُهَا
 إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ
 بِعَظْمٍ ۚ ذَلِكَ جَزَاءُ لَهُمْ بِغَيْرِهِمْ ۚ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ۝

ثَنِينَ آذَانٍ مِّنَ النَّصَانِ اثْنَيْنِ ۚ وَمِنَ الْمَعْرِائَيْنِ
 ثَلَاثُ كُرْبَيْنِ ۚ وَهُوَ أَمَرُ الْأَنْثَيْنِ ۚ أَمَّا اسْتَمْتَكْتُ عَلَيْهِ
 أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ ۚ يُعْتَوِي بِعِلْمِهِ لَنْ تُنْفِقُوا مِمَّنْ
 وَمِنَ الْأَيْلِ اثْنَيْنِ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۚ قُلْ أَلَمْ يَكُنْ
 حَزْمٌ أَمَرُ الْأَنْثَيْنِ ۚ أَمَّا اسْتَمْتَكْتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْنِ
 أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَضَعَكُمُ اللَّهُ فِي بَرْحِهِ ۚ قُلْ أَعْمَى
 أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِفَعْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ
 مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَتْعَبُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ
 دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا
 أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
 رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ وَكُلِ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا كُلًّا
 ذِي ظُنْفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْعِزَّةِ حَرَّمًا عَلَيْهِمْ شَوْحُومُهَا
 إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ
 بِعَظْمٍ ۚ ذَلِكَ جَزَاءُ لَهُمْ بِغَيْرِهِمْ ۚ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ۝

(১৪৭) যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে বলে দিন : তোমার প্রতিপালক সূক্ষ্মশ্রুত করণার মালিক। তাঁর শাস্তি অপরাধীদের উপর থেকে চলেবে না। (১৪৮) এখন মূশরেকরা বলবে : যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন, তবে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-মাদার এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম। এমনভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, এমন কি তারা আমার শাস্তি আশ্বাসন করেছে। আপনি বলুন : তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে, যা আমাদেরকে দেখাতে পার? তোমরা শুধুমাত্র আন্দাজের অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বল। (১৪৯) আপনি বলে দিন : অতএব, পরিপূর্ণ যুক্তি আল্লাহ্রই। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে পথ প্রদর্শন করতেন। (১৫০) আপনি বলুন : তোমাদের সাক্ষীদেরকে আন, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তাআলা এগুলো হারাম করেছেন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে আপনি এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না এবং তাদের কুপ্তবস্তির অনুসরণ করবেন না, যারা আমার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যারা স্বীয় প্রতিপালকের সমতুল্য অংশীদার করে। (১৫১) আপনি বলুন : এস, আমি তোমাদেরকে ঐসব বিষয় পাঠ করে শুনাই, যেগুলো তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা করো না-আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহ্বার দেই-নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা মুক্ত।

(১৪৩) সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার। জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে? না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৪৪) সৃষ্টি করেছেন উটের মধ্যে দুই প্রকার এবং গরুর মধ্যে দুই প্রকার। আপনি জিজ্ঞেস করুন : তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে, না যা উভয় মাদীর পেটে আছে? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন আল্লাহ্ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন? অতএবক সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা পোষণ করে যাতে করে মানুষকে বিনা প্রমাণে পঞ্চদ্রষ্ট করতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পঞ্চদ্রষ্ট করেন না। (১৪৫) আপনি বলে দিন : যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্যে, যা সে ভক্ষণ করে; কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস-এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ; যবেহ করা জন্তু, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতঃপর যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে এমনভাবে হয় যে অবশ্যতা করে না এবং সীমালঙ্ঘন করে না, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ক্ষমালীল দয়ালু। (১৪৬) ইহুদীদের জন্যে আমি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্যে হারাম করেছিলাম, কিন্তু ঐ চর্বি, যা পৃষ্ঠে কিংবা অস্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবশ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী।



আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে প্রায় দু'তিন রুকুতে অব্যাহতভাবে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, গাফেল ও মুর্থ মানুষ ভ্রমশূল ও নভোমজ্জার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ-প্রেরিত আইন পরিত্যাগ করে পেতৃক ও মনস্ক কুপ্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তাআলা যেসব বস্তু হালাল করেছিলেন, সেগুলোকে তারা বৈধ মনে করে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ কর্তৃক হালালকৃত অনেক বস্তুকে তারা নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়েছে এবং কোন কোন বস্তুকে শু পুরুষদের জন্যে হালাল, স্ত্রীদের জন্যে হারাম করেছে। আবার কোন কোন বস্তুকে স্ত্রীদের জন্যে হালাল, পুরুষদের জন্যে হারাম করেছে।

আলোচ্য তিন আয়াতে সেসব বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। বিশদ বর্ণনায় নয়টি বস্তুর উল্লেখ হয়েছে। এরপর দশম নির্দেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, **مَذَاقِطُ** অর্থাৎ, এ ধর্মই হচ্ছে আমার সরল পথ। এ পথে

অনুসরণ কর। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর আনীত ও বর্ণিত ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে সমস্ত হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, মকরহ ও মোস্তহক্ক বিষয়কে এ ধর্মে ন্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্মই বিষয়কে হালাল বলেছে, তাকে হালাল এবং যে বিষয়কে হারাম বলেছে, তাকে হারাম মনে করবে— নিজের পক্ষ থেকে হালাল-হারামের ক্ষমতা জারি করবে না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে যে দশটি বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর আসল লক্ষ্য হচ্ছে হারাম বিষয়সমূহ বর্ণনা করা। কাজেই সবগুলোকে নিষেধাজ্ঞার ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হইল সঙ্গত, কিন্তু কোরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞজ্ঞানোচিত পদ্ধতি অনুসারে তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয়কে ধনাত্মকভাবে আদেশের ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। তার উদ্দেশ্য এই যে, এর বিপরীত করা হারাম। (কাশশাফ) এর তাৎপর্য পরে জানা যাবে। আয়াতে বর্ণিত দশটি হারাম বিষয় হচ্ছে এই :

(১) আল্লাহ তাআলার সাথে এবাদত ও আনুগত্যে কাউকে অবশ্যই স্থির করা, (২) পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যহার না করা, (৩) দারিদ্র্যের ভয়ে সম্ভ্রম হত্যা করা, (৪) অশ্লীল কাজ করা, (৫) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, (৬) এতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা, (৭) ওজন ও মাপে কম দেয়া, (৮) সাক্ষা, ফয়সালা অথবা অন্যান্য কথাবার্তায় অবিচার করা (৯) আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ না করা এবং (১০) আল্লাহ তাআলার সোজা-সরল পথ ছেড়ে অন্য পথ অবলম্বন করা।

আলোচ্য আয়াতসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : তওরাত বিপ্লবের কা'বে আবহার পূর্বে ইহুদী ছিলেন, অতঃপর মুসলমান হয়ে যান। তিনি বলেন : আল্লাহর কিতাব তওরাত বিস্মিল্লাহর পর কোরআন পাকের এসব আয়াত দ্বারা ইত্তর হয়, যেগুলোতে দশটি হারাম বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আরও বর্ণিত আছে যে, এ দশটি বাক্যই হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রতিও অবতীর্ণ হয়েছিল।

তফসীরবিদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : সূরা আলে এমরানে মুহকাম আয়াতের বর্ণনায় এ আয়াতগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সাঃ) পর্যন্ত স পয়গম্বরের শরীয়তই এসব আয়াত সম্পর্কে একমত। কোন ধর্ম ও শরীয়তে এগুলোর কোনটিই মনসূখ বা রহিত হয়নি।— (তফসীর

(১৫২) এতীমদের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায়-যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাথের অতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর। (১৫৩) তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও। (১৫৪) অতঃপর আমি মুসাকে গ্রহণ দিয়েছি, সংকর্ষীদের প্রতি নেয়ামতপূর্ণ করার জন্যে, প্রত্যেক বস্তুর বিশদ বিবরণের জন্যে, হেদায়াতের জন্যে এবং করুণার জন্যে— যাতে তারা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী হয়। (১৫৫) এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়, অতএব, এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর— যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও। (১৫৬) এ জন্যে যে, কখনও তোমরা বলতে শুরু কর : গ্রন্থ তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দু'সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমরা সেগুলোর পাঠ ও পঠন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। (১৫৭) কিংবা বলতে শুরু কর : যদি আমাদের প্রতি কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হত, আমরা এদের চাইতে অধিক পক্ষপ্রাপ্ত হতাম। অতএব, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়েত ও রহমত এসে গেছে। অতঃপর সে ব্যক্তির চাইতে অধিক অনাচারী কে হবে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে এবং গা বাঁচিয়ে চলে। অতি সঙ্কর আমি তাদেরকে শাস্তি দেব, যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে গা বাঁচিয়ে চলে— জঘন্য শাস্তি তাদের গা বাঁচানোর কারণে।

কবীরে-মুহীত)

এসব আয়াত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওছীয়াতনামা : তফসীর হলে কাছীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মোহরাক্ষিত ওছীয়াতনামা দেখতে চায়, সে তাকে এসব আয়াতগুলো পাঠ করে। এসব আয়াতে ঐ ওছীয়াত বিদ্যমান, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশে উপমতকে দিয়েছেন।

হাকেম হযরত ওবাদা ইবনে ছামেতের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কে আছে যে আমার হাতে তিনটি আয়াতের আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ করবে? অতঃপর তিনি আলোচ্য তিনটি আয়াত তেলওয়াত করে বললেন : যে ব্যক্তি এ শপথ পূর্ণ করবে, তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহর দায়িত্ব।

এবার দশটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এবং আয়াতত্রয়ের তফসীর লক্ষ্য করুন। আয়াতগুলোর সূচনা এভাবে করা হয়েছে : **فَلْيَمْلِكُوا** শব্দের অর্থ 'এস'। আসলে উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নিম্নের লোকদেরকে নিজের কাছে ডাকা অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দাওয়াত কবুল করার মধ্যেই তাদের জন্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রাধান্য বিদ্যমান। এখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে করা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে বলুন : এস, যাতে আমি তোমাদেরকে এসব বিষয় পাঠ করে শুনাতে পারি যেগুলো আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন। এটা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত গাঠী। এতে কারও কম্পনা, আন্দাজ ও অনুমানের কোন প্রভাব নেই, যাতে তোমরা এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করতে যত্নবান হও এবং অনর্থক নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর হালালকৃত বিষয়সমূহকে হারাম না কর।

এ আয়াতে যদিও সরাসরি মক্কার মুশরেকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি ব্যাপক হওয়ার কারণে সমগ্র মানবজাতিই এর আওতাধীন—মুমিন হোক কিংবা কাফের, আরব হোক কিংবা অনারব, উপস্থিত লোকজন হোক কিংবা অনাগত বংশধর।—(বাহুরে-মুহীত)

সর্বপ্রথম মহাপাপ শিরক, যা হারাম করা হয়েছে : এরূপ সযত্ন সম্বোধনের পর হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের তালিকায় সর্বপ্রথম বলা হয়েছে : অর্থাৎ, **أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا** সর্বপ্রথম কাজ এই যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক ও অংশীদার করো না। আরবের মুশরেকদের মত দেব-দেবীদেরকে বা মূর্তিকে খোদা মনে করো না। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মত পয়গম্বরগণকে খোদা কিংবা খোদার পুত্র বলা না। অন্যদের মত কেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যা দিয়ো না। মূর্খ জনগণের মত পয়গম্বর ও ওলীগণকে জ্ঞান ও শক্তি সামর্থ্যে আল্লাহর সমতুল্য সাব্যস্ত করো না।

শিরকের সংজ্ঞা ও প্রকার ভেদ : তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে : এখানে **شَيْئًا** এর অর্থ এরূপ হতে পারে যে, 'জলী' অর্থাৎ, প্রকাশ্য শিরক ও প্রচ্ছন্ন শিরক—এ প্রকারদ্বয়ের মধ্য থেকে কোনটিতেই লিপ্ত হয়ো না। প্রকাশ্য শিরকের অর্থ সবাই জানে যে, এবাদত আনুগত্য অথবা অন্য কোন বিশেষ গুণে অন্যকে আল্লাহ তাআলার সমতুল্য অথবা তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা। প্রচ্ছন্ন শিরক এই যে, নিজ কাজ-কর্মে ধর্মীয় ও পার্শ্ব উদ্দেশ্যসমূহে এবং লাভ-লোকসানে আল্লাহ তাআলাকে কার্যনির্বাহী বলে বিশ্বাস করেও কার্যতঃ অন্যান্যকে কার্যনির্বাহী মনে করা

এবং যাবতীয় প্রচেষ্টা অন্যদের সাথেই জড়িত রাখা। এছাড়া লোক দেখানো এবাদত করা, অন্যদেরকে দেখানোর জন্যে নামায ইত্যাদি ঠিকমত পড়া, নাম-যশ লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা অথবা কার্যতঃ লাভ-লোকসানের মালিক আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সাব্যস্ত করা ইত্যাদিও প্রচ্ছন্ন শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, প্রকাশ্য প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকার শিরক থেকেই বেঁচে থাকা দরকার। প্রতিমা ইত্যাদির পূজাপাট যেমন শিরকের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি পয়গম্বর ও ওলীদেরকে জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি গুণে আল্লাহ তাআলার সমতুল্য মনে করাও অন্যতম শিরক। আল্লাহ না করুন, যদি কারও বিশ্বাস এরূপ হয়, তবে তা প্রকাশ্য শিরক। আর বিশ্বাস এরূপ না হয়ে কাজ এরূপ করলে তা হবে প্রচ্ছন্ন শিরক। এ স্থলে সর্বপ্রথম শিরক থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, শিরকের অপরাধ সম্পর্কে কোরআন পাকের সিদ্ধান্ত এই যে, এর ক্ষমা নাই।

দ্বিতীয় গোনাহ পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার : বর্ণনা করা হয়েছে : **وَالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا** অর্থাৎ, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য এই যে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করো না। তাদেরকে কষ্ট দিও না; কিন্তু বিজ্ঞজনোচিত ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। এতে এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা না করা এবং কষ্ট না দেয়াই যথেষ্ট নয়; বরং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা ফরয। কোরআন পাকের অন্যত্র এ কথাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে : **وَخُفْضًا لِّمَا جَاءَكَ مِنَ الْوَالِدَيْنِ**

এ আয়াতে পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া শিরকের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে তাদের আনুগত্য ও সুখবিশদানে আল্লাহ তাআলার এবাদতের সাথে সংযুক্ত করে বলা হয়েছে :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا অর্থাৎ, তোমার

পালনকর্তা ফয়সালা করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে : **أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَلِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا** অর্থাৎ, আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং পিতা-মাতার। অতঃপর আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ, বিপরীত করলে শাস্তি পাবে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি উত্তরে বললেন : নামায মুত্তাহাব সময়ে পড়া। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন : এরপর কোনটি উত্তম? উত্তর হল : পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার। আবার প্রশ্ন হল : এরপর কোনটি? উত্তর হল : আল্লাহর পথে জেহাদ।

ছহীহ মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণিত আছে : একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিনবার বললেন : **رَغِمَ أَنْفُهُ ۖ رَغِمَ أَنْفُهُ ۖ رَغِمَ أَنْفُهُ** অর্থাৎ, লালিত্বিত হয়েছে। সাহাবায়ে কেয়াম আরয করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ! কে লালিত্বিত হয়েছে? তিনি বললেন : যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে বার্ষ্যক অবস্থায় পেয়েও জ্ঞান্যে প্রবেশ করতে পারে না।

তৃতীয় হারাম : সন্তান হত্যা : আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় হারাম বিষয় হচ্ছে সন্তান হত্যা। এখানে পূর্বপর সম্পর্ক এই যে, ইতিপূর্বে

পিতা-মাতার হক বর্ণিত হয়েছে, যা সন্তানের কর্তব্য। এখন সন্তানের হক বর্ণিত হচ্ছে, যা পিতা-মাতার কর্তব্য। জাহেলিয়াত যুগে সন্তানকে জীবন্ত পুতে ফেলা কিংবা হত্যা করার ব্যাপারটি ছিল সন্তানের সাথে অসদ্ব্যবহারের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

অর্থাৎ, দারিদ্র্যের কারণে স্বীয় সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তোমাদেরকে এবং তাদেরকে — উভয়কেই জীবিকা দান করব।

জাহেলিয়াত যুগে এ নিষ্কণ্টক নির্দয়-পাশও প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে কাউকে জামাতা করার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে জীবন্ত পুতে ফেলা হতো। মাঝে মাঝে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হবে মনে করে পাশওয়া নিজ হাতে সন্তানদেরকে হত্যা করত। কোরআন পাক এ কু-প্রথা রহিত করে দিয়েছে। উল্লেখিত আয়াতে তাদের সেই মানসিক ব্যাধিরও প্রতিকার বর্ণিত হয়েছে, যে কারণে তারা এ ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হত। সন্তানের পানাহারের সংস্থান কোথা থেকে হবে, এ ভাবনাই ছিল তাদের মানসিক রোগ। আল্লাহ তাআলা আয়াতে ব্যক্ত করেছেন যে, পানাহার করানো এবং জীবিকা প্রদানের আসল দায়িত্ব তোমাদের নয়, এ কাজ সরাসরি আল্লাহ তাআলার। তোমরা স্বয়ং জীবিকা ও পানাহারে তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি দিলে তোমরা সন্তানদেরকেও দিয়ে থাক। তিনি না দিলে তোমাদের কি সাধ্য যে, একটি গম অথবা চালের দানা নিজে সৃষ্টি করবে। শক্ত মাটির বুক চিরে বীজকে অঙ্কুরিত করা, অতঃপর তাকে বৃক্ষের আকার দান করা, অতঃপর ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ করা কার কাজ? পিতা-মাতা এ কাজ করতে পারে কি? এগুলো সব সর্বশক্তিমানের কুদরতের কারসাজি। একাজে মানুষের কোন হাত নেই। সে শুধু মাটিকে নরম করতে এবং চারা গজালে পানি দিতে পারে। কিন্তু ফুল-ফল সৃষ্টিতে তার বিন্দুমাত্রও হাত নেই। অতএব, পিতা-মাতার এ ধারণা অমূলক যে, তারা সন্তানদেরকে রিযিক দান করে। বরং আল্লাহ তাআলার অদৃশ্য বাণীর থেকে পিতা-মাতাও পায় এবং সন্তানরাও। তাই এখানে প্রথমে পিতা-মাতার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি তোমাদেরকেও রিযিক দেব এবং তাদেরকেও। এতে আরও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তোমাদেরকে রিযিক এজন্যে দেয়া হয়, যাতে তোমরা সন্তানদেরকে পৌছে দাও। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন **اِنَّمَا تَنْصَرُونَ وَتَرْزُقُونَ بَضْعَانِكُمْ** অর্থাৎ, তোমাদের দুর্বল ও অক্ষম লোকদের কারণে আল্লাহ তাআলা তোমাদের সাহায্য করেন ও রিযিক দান করেন।

সূরা ইসরাযও এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে রিযিকের ব্যাপারে প্রথম সন্তানের উল্লেখ করে বলা হয়েছে : **عَنْ رَبِّكُمْ وَإِيَّاهُمْ** অর্থাৎ, আমি তাদেরকেও রিযিক দেব এবং তোমাদেরকেও। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমার কাছে রিযিকের প্রথম হকদার দুর্বল ও অক্ষম সন্তানরা। তাদের খাতিরেই তোমাদেরকেও দেয়া হয়।

সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্রগঠন না করা এবং ধর্মবিমুখতার জন্যে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া ও এক প্রকার সন্তান হত্যা : আয়াতে বর্ণিত সন্তান হত্যা যে অপরাধ ও কঠোর গোনাহ তা বাহ্যিক হত্যা ও মেরে ফেলার অর্থে তো সুস্পষ্টই। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা না দেয়া এবং তার চরিত্র গঠন না করা, যদ্বন্দ্বন সে আল্লাহ-রসূল ও পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে এবং চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে, এটাও সন্তান হত্যার চাইতে কম মারাত্মক নয়।

কোরআন পাকের ভাষায় সে ব্যক্তি মৃত, যে আল্লাহকে চিনে না এবং তাঁর আনুগত্য করে না। **أَوْ مَن كَانَ مِيتًا فَآخِيبَةً** আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। যারা সন্তানদের কাজ-কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় কিংবা এমন ভ্রান্ত শিক্ষা দেয়, যার ফলে ইসলামী চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়, তারাও একদিক দিয়ে সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী। বাহ্যিক হত্যার প্রভাবে তো শুধু কক্ষমাত্র জাগতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু এ হত্যা মানুষের পারলৌকিক ও চিরস্থায়ী জীবনের মূলেও কুঠারাঘাত করে।

চতুর্থ হারাম নির্লজ্জ কাজ : আয়াতে বর্ণিত চতুর্থ হারাম বিষয় হচ্ছে নির্লজ্জ কাজ। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে : **وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَكَّنْ** অর্থাৎ, প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন, যে কোন রকম অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না।

فاحشة ও **فحشاء**, **فحش** এর বহুবচন। **فاحشة** শব্দটি **فاحش** শব্দটি থেকে এসেছে। **فاحش** এর অর্থ সাধারণতঃ অশ্লীলতা ও নির্লজ্জ হয়। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এসব শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সব কাজ, যার অনিশ্চয়তা ও খারাবী সুদূর প্রসারী। ইমাম রাগেব 'মুফরাদাতুল'-কোরআন গ্রন্থে এবং ইবনে আসীর নেহায়্যা গ্রন্থে এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। কোরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এসব কাজের নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে : **وَمِنَ الْفَحْشَاءِ** অর্থাৎ, অন্যত্র বলা হয়েছে : **حَرَّمَ زَيْنَ الْفَوَاحِشِ** অর্থাৎ, অন্যত্র বলা হয়েছে : **وَالْمُنْكَرِ**

যাবতীয় বড় গোনাহ **فاحش** ও **فحشاء** এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত, তা উক্তি সম্পর্কিত হোক কিংবা কর্ম সম্পর্কিত, বাহ্যিক হোক কিংবা আভ্যন্তরীণ। এছাড়া আভ্যিক ব্যতিচার ও নির্লজ্জতার যাবতীয় কাজও এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই সাধারণ ভাষায় এ শব্দটি ব্যতিচারের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোরআনের আলোচ্য আয়াতে নির্লজ্জ কাজসমূহের কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। ব্যাপক অর্থ নেয়া হলে যাবতীয় বদঅভ্যাস, মুখ, হাত, পা ও অন্তরের যাবতীয় গোনাহই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থ ব্যতিচার নেয়া হলে আয়াতে ব্যতিচার ও তার ভূমিকা এবং কারণসমূহ বুঝানো হয়েছে।

এ আয়াতেই **فواحش** এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে : **وَالْمُنْكَرِ** প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক **فواحش** এর অর্থ হবে হাত, পা ইত্যাদি দ্বারা সম্পন্ন গোনাহ এবং আভ্যন্তরীণ **فواحش** এর অর্থ হবে অন্তর সম্পর্কিত গোনাহ। যেমন - হিংসা, পরহীকাতরতা, অকৃতজ্ঞতা, অধৈর্য ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক **فواحش** এর অর্থ এমন ব্যতিচার যা প্রকাশ্যে করা হয়। আর আভ্যন্তরীণের অর্থ যে ব্যতিচার গোপনে করা হয়। ব্যতিচারের ভূমিকাও প্রকাশ্য ব্যতিচারের অন্তর্ভুক্ত। কু-নিয়তে পর নারীকে দেখা, হাতে স্পর্শ করা এবং তার সাথে প্রেমালাপ করা এই অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ব্যতিচার সম্পর্কিত যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, সংকল্প এবং গোপন কৌশল অবলম্বন আভ্যন্তরীণ ব্যতিচারের অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : বাহ্যিক নির্লজ্জতার অর্থ সাধারণভাবে প্রচলিত অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজকর্ম এবং আভ্যন্তরীণ নির্লজ্জতার অর্থ আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে নির্লজ্জ কাজ-কর্ম, যদিও

সাধারণভাবে মানুষ সেগুলোকে খারাপ মনে করে না কিংবা সেগুলো যে হারাম, তা সাধারণ মানুষ জানে না। উদাহরণতঃ স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়ার পরও তাকে স্ত্রী হিসেবে রেখে দেয়া কিংবা হালাল নয় এরূপ মিলিকে বিয়ে করা।

মোটকথা, এ আয়াত নির্লজ্জতার প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে বাহ্যিক ও প্রাচুর্যবান সমস্ত গোনাহকে এবং সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়ে ব্যভিচারের প্রকাশ্য ও গোপন সকল পন্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এ সম্পর্কে নির্দেশ এই যে, এগুলোর কাছেও যেয়ো না। কাছে না যাওয়ার ক্ষেত্রে এরূপ মজলিস ও স্থান থেকে বেঁচে থাকা যেখানে গেলে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং এরূপ কাজ থেকেও বেঁচে থাক, যদ্বারা এসব গোনাহর পথ খুলে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : **حَامٌ حَوْلَ الْحَمَى** অর্থাৎ, যে লোক নিষিদ্ধ জায়গার আশপাশে ঘুরাকো করে, সে তাতে প্রবেশ করার কাছাকাছি হয়ে যায়।

পঞ্চম হারাম বিষয় অনায়াস হত্যা : এ সম্পর্কে বলা হয়েছে : **وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা

ধাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না, তবে ন্যায্যভাবে। এ 'ন্যায্যভাবে' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : তিনটি কারণ ছাড়া কোন মুসলমানের খুন হালাল নয়। (এক) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, (দুই) অনায়াসভাবে কাউকে হত্যা করলে তার কেছা হিসেবে তাকে হত্যা যাবে এবং (তিন) সত্যধর্ম ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেলে।

খলিফা হযরত ওসমান গনী (রাঃ) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন এবং বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখনও তিনি তাদেরকে এ হাদীস শুনিয়ে বলেছিলেন : আল্লাহর রহমতে আমি এ তিনটি কারণ থেকেই মুক্ত। মুসলমান হয়ে তো দূরের কথা, জাহেলিয়াত যুগেও আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি, আমি কোন খুন করিনি, স্বীয় ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করব—এরূপ কল্পনাও আমার মনে কখনও জাগেনি। এমতাবস্থায় তোমরা আমাকে কি কারণে হত্যা করতে চাও ?

বিনা কারণে মুসলমানকে হত্যা করা যেমন হারাম, তেমনিভাবে এমন কোন অমুসলমানকে হত্যা করাও হারাম, যে কোন ইসলামী দেশের প্রচলিত আইন মান্য করে বসবাস করে কিংবা যার সাথে মুসলমানের চুক্তি থাকে।

তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ গ্রন্থে হযরত আবু হোরায়রা রাঃ বর্ণিত এক রেওয়াযেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি কোন মিস্যী অমুসলিমকে হত্যা করে, সে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যে আল্লাহ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অখচ জান্নাতের সুগন্ধি সপ্তর বছরের দূরত্ব পর্যন্ত পৌছে। এই একটি আয়াতে দশটি মধ্য পাঁচটি হারাম বিষয়ের বর্ণনা দেয়ার পর বলা হয়েছে : **ذِكْرُكُمْ وَلَكُمْ** অর্থাৎ, এসব বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ।

ষষ্ঠ হারাম এতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা : দ্বিতীয় আয়াতে এতীমদের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা যে হারাম, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে : **وَلَا تَمْشُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ آسَنُ** অর্থাৎ, এতীমের মালের কাছেও যেয়ো না ; কিন্তু উত্তম

পন্থায়, যে পর্যন্ত না সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে যায়। এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক এতীম শিশুদের অভিভাবককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তারা যেন এতীমদের মালকে আশুন মনে করে এবং অবৈধভাবে তা খাওয়া ও নেয়ার কাছেও না যায়। অন্য এক আয়াতে অনুরূপ ভাষায়ই বলা হয়েছে যে, যারা এতীমদের মাল অন্যায় ও অবৈধভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে আশুন ভর্তি করে।

তবে এতীমের মাল সংরক্ষণ করা এবং স্বভাবতঃ লোকসানের আশঙ্কা নেই—এরূপ কারবারে নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করা উত্তম ও জরুরী পন্থা। এতীমদের অভিভাবককে এ পন্থা অবলম্বন করাই উচিত।

এরপর এতীমের মাল সংরক্ষণের সীমা বর্ণনা করা হয়েছে, **حَتَّىٰ يَسْكُنُوا لِبْنَهُمْ** অর্থাৎ, সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে গেলে অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তার মাল তার কাছে সমর্পন করতে হবে।

اشد শব্দের প্রকৃত অর্থ শক্তি। আলেমগশের মতে বয়োঃপ্রাপ্ত হলেই এর সূচনা হয়। বালক-বালিকার মধ্যে বয়োঃপ্রাপ্তির লক্ষণ দেখা দিলে কিংবা বয়স পনের-ষোল বছর পূর্ণ হয়ে গেলে শরীয়ত মতে তাদেরকে বয়োঃপ্রাপ্ত বলা হবে।

তবে বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর দেখতে হবে, তার মধ্যে নিজের মালের রক্ষণ-বেক্ষণ এবং শুদ্ধ খাতে ব্যয় করার যোগ্যতা হয়েছে কিনা। যোগ্যতা দেখলে বয়োঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে তার ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করা হবে। অন্যথায় পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ধন-সম্পদ হেফায়ত করার দায়িত্ব অভিভাবকদের। ইতিমধ্যে যখনই ধন-সম্পদ সংরক্ষণ এবং কারবারের যোগ্যতা তার মধ্যে দেখা যাবে, তখনই তার ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করতে হবে। যদি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্তও তার মধ্যে এ যোগ্যতা সৃষ্টি না হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)—এর মতে তার মাল তাকেই সমর্পণ করতে হবে যদি সে উম্মাদ না হয়। কোন কোন ইমামের মতে তখনও তার মাল তাকে দেয়া যাবে না, বরং শরীয়তের কাযী (বিচারক) তার মাল সংরক্ষণের জন্যে কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করবেন।

সপ্তম হারাম ওজন ও মাপে ত্রুটি করা : এ আয়াতে সপ্তম নির্দেশ ওজন ও মাপ ন্যায্যভাবে পূর্ণ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। 'ন্যায্যভাবে' বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে ওজন করে দেবে, সে প্রতিপক্ষকে কম দেবে না এবং প্রতিপক্ষ নিজ প্রাপ্যের চাইতে বেশী নেবে না।—(রুহুল-মা'আনী)

দ্রব্য আদান-প্রদানে ওজন ও মাপে কম-বেশী করাকে কোরআন কঠোর হারাম সাব্যস্ত করেছে। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্যে সূরা মুতাফফিফীনে কঠোর শাস্তিবাদী বর্ণিত হয়েছে।

তফসীরবিদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে ওজন ও মাপের কাজ করে, তাদেরকে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ওজন ও মাপ এমন একটি কাজ যে, এতে অনায়াস আচরণ করে তোমাদের পূর্বে অনেক উম্মত আল্লাহর আযাবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। তোমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন কর।—(ইবনে-কাছীর)

কর্মচারী ও শ্রমিকদের নির্ধারিত কর্তব্য কর্মে ত্রুটি করাও ওজন ও মাপে ত্রুটি করার অনুরূপ : ওজন ও মাপে ত্রুটি করাকে কোরআন পাকে **تَطْيِف** বলা হয়েছে। এটা শুধু ওজন করার সময় কমবেশী করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্যের প্রাপ্যে ত্রুটি করাও **تَطْيِف** এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালেক (রহঃ) স্বীয় মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত ওমর (রাঃ)

থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তিকে নামাযের আরকানে ক্রটি করতে দেখে তিনি বলেছিলেন : **تَطْفِيفٌ** করছে, অর্থাৎ, যথার্থ প্রাপ্য শোধ করনি। এ ঘটনা বর্ণনা করে ইমাম মালেক বলেন : **لَكَ شَىْءٌ وَفَاءٌ** অর্থাৎ, প্রাপ্য পুরোপুরি দেয়া ও ক্রটি করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হয় - শুধু ওজন ও মাপের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ নয়।

এতে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি কর্তব্য কর্ম পূর্ণ করে না, সময় চুরি করে কিংবা কাজে ক্রটি করে, সে-ও উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, সে কোন মন্ত্রী হোক প্রশাসক হোক কিংবা সাধারণ কর্মচারী হোক অথবা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিয়োজিত হোক না কেন।

এরপর বলা হয়েছে : **لَا تُكْفِرُوا نَفْسًا أَرَادَتْ أَنْ يُسَلِّمَ** অর্থাৎ, আমি কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতিরিক্ত কাজের নির্দেশ দেই না। কোন কোন হাদীসে এর অর্থ এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সাধ্যমত পুরোপুরি ওজন করে, এতদসত্ত্বেও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে ওজনে কমবেশী হয়ে যায়, তবে তা মাকুল। কেননা, এটা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে।

তফসীরে মাযহরীতে বলা হয়েছে : এ বাক্য যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রাপ্য পরিশোধের সময় কিছু বেশী দেয়াই সতর্কতা- যাতে কর্মের সন্দেহ না থাকে, যেমন এরূপ স্থলেই রসুলুল্লাহ (সাঃ) ওজনকারীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন : **زِنْ وَارْجِعْ** অর্থাৎ, ওজন কর এবং কিছু ঝুঁকিয়ে ওজন কর। - (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাধারণ অভ্যাস তাই ছিল। তিনি কারও প্রাপ্য পরিশোধ করার সময় প্রাপ্যের চাইতে বেশী দেয়া পছন্দ করতেন।

অষ্টম নির্দেশ ন্যায্য ও সুবিচারের বিপরীত করা হারাম : বলা হয়েছে : **وَأَذِّنْ لَهُمْ أَهْلُهُمْ وَأَوْكَانَ دَاثِرِي** অর্থাৎ, তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ন্যায্যসঙ্গত কথা বলবে, যদি সে আত্মীয়ও হয়।' এখানে বিশেষ কোন কথার উল্লেখ নাই। তাই সাধারণ তফসীরবিদগণের মতে সব রকম কথাই এর অন্তর্ভুক্ত। কোন ব্যাপারের সাক্ষ্য হোক কিংবা বিচারকের ফয়সালা হোক অথবা পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকার কথাব্যবহাতি হোক- সব ক্ষেত্রে সর্ববিস্তার ন্যায্য ও সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মোকদ্দমার সাক্ষ্য কিংবা ফয়সালায় ক্ষেত্রে ন্যায্য ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ এই যে, ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে যা জানা আছে, নিজের পক্ষ থেকে কমবেশী না করে তা পরিষ্কার বলে দেয়া- অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন কথা না বলা এবং এতে কারও উপকার কিংবা কারও অপকারের ক্রক্ষেপ না করা। মোকদ্দমার ফয়সালায় সাক্ষীদেরকে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী যাচাই করার পর তাদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য সূত্র দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তাই ফয়সালা করা। সাক্ষ্য ও ফয়সালায় কারও বন্ধুত্ব ও ভালবাসা এবং কারও শত্রুতা ও বিরোধিতা সত্য বলার পথে অন্তরায় না হওয়া উচিত। এ কারণেই আয়াতে **وَأَوْكَانَ دَاثِرِي** বাক্যটি যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, যার মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিবে কিংবা ফয়সালা করবে, সে তোমার নিকটাত্মীয়ের হলেও ন্যায্য ও সত্যকে কোন অবস্থাতেই হাতছাড়া করবে না।

মিথ্যা সাক্ষ্য ও অসত্য ফয়সালা প্রতিরোধ করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত রয়েছে : - মিথ্যা সাক্ষ্য শেরেকীর সমতুল্য।'

নবম নির্দেশ : আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা : বলা

হয়েছে : **وَيَعْمَلُونَ لَكَ آثَرًا** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এর অর্থ ঐ অঙ্গীকারও হতে পারে, যা রূহের জগতে অবস্থান করার সময় প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে। তখন সব মানুষকে বলা হয়েছিল **أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ** (আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?) তখন সবাই সমস্তের উত্তর দিয়েছিল : **بَلَىٰ** (অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের পালনকর্তা)। এ অঙ্গীকারের দাবী হল এই যে, পালনকর্তার কোন নির্দেশ অমান্য করা যাবে না। তিনি যে কাজের আদেশ দেন, তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি যে কাজে নিষেধ করেন, তার কাছেও যাওয়া যাবে না এবং সন্দেহযুক্ত কাজ থেকেও বাচতে হবে। অঙ্গীকারের সারকথা এই যে, আল্লাহ তাআলার পুরোপুরি আনুগত্য করতে হবে।

এছাড়া এর অর্থ কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ অঙ্গীকারও হতে পারে। বর্ণিত তিনটি আয়াত এদের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর তফসীর করা হচ্ছে এবং যেগুলোতে দশটি নির্দেশ তাকীদ সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলেমগণ বলেন : নযর, মান্নত ইত্যাদি পূর্ণ করাও এ অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত। এতে অমুক কাজ করব কিংবা করব না বলে মানুষ আল্লাহ তাআলার সাথে অঙ্গীকার করে। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একথা পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে **يُؤْتُونَ بِالْإِثْمِ** অর্থাৎ, আল্লাহ সৎ বান্দার স্বীয় মান্নত পূর্ণ করে।

মোটকথা, এ নবম নির্দেশটি গণনার দিক দিয়ে নবম হলেও স্বরূপের দিক দিয়ে শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের মধ্যে পরিব্যপ্ত।

এ আয়াতের শেষভাগে বলা রয়েছে : **ذِكْرًا وَمَنْ يَنْسِيهِ لَعَنَّا** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এসব কাজের জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।

দশম নির্দেশ :

وَأَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَأَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

تَفْتَرُونَ بِهَا سُبُلًا

অর্থাৎ, এ শরীয়তে মুহাম্মদী হল আমার সরল পথ। অতএব, তোমরা এ পথে চল এবং অন্য কোন পথে চলা না। কেননা, সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

এখানে **هَذَا** শব্দ দ্বারা দ্বীন ইসলাম অথবা কোরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সূরা আনআমের প্রতিও ইশারা হতে পারে। কেননা, তাতেও ইসলামের যাবতীয় মূলনীতি, তৌহীদ, রেসালত এবং মূল বিশ্ব-বিশ্বদ ব্যক্ত হয়েছে। **صِرَاطٌ** শব্দটি **مُسْتَقِيمٌ** এর বিশেষণ। কিন্তু ব্যাকরণিক দিক দিয়ে একে বর্তমান কাল বাচক উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সরল হওয়া ইসলামের একটি অপরিহার্য বিশেষণ। এরপর বলা হয়েছে : **فَأَتَّبِعُوا** অর্থাৎ, ইসলামই যখন আমার পথ এবং এটাই যখন সরল পথ, তখন মনযিলে-মকছুদের (অভিষ্ট লক্ষ্যের) সোজা পথ হাতে এসে গেছে। তাই এ পথেই চল।

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ
بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا
إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسِبَتْ فِي أِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ
انْظُرُوا إِلَى مَا تُدْعَوْنَ لِلدِّينِ فَأَنْتُمْ أَكْثَرُ نَافِعٍ
لَكُمْ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ ۝ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ
بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تَجْزِيهِ إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ قُلِ إِنِّي
هَدَيْتُ رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَهُوَ يُدْخِلُكُمْ فِيهِ الْيُسْرَى
حَنِيفًا ۝ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ قُلِ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَا
كُنْتُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ لَا تَبْرَأُ إِلَهُ وَبِذَلِكَ أُفْوتُ
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ قُلِ اعْبُدُوا اللَّهَ أَتَعْبُدُونَ كُلَّ شَيْءٍ
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا ذِكْرًا وَذُرِّيَّةً أُخْرَى ثُمَّ إِلَى
رَبِّكَ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ وَمَا لِيَ أُنذِرُ
بِجَعَلِكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ وَرَبُّكُمْ يَوْمَ يَكُونُ لَكُمْ
فِي أَنْتُمْ أَنْ رَبُّكُمْ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۝ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(১৫৮) তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নির্দেশ আসবে। যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন নির্দেশ আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্যে ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সংকল্প করেনি। আপনি বলে দিন : তোমরা পথের দিকে চেয়ে থাক, আমরাও পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। (১৫৯) নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহ তা আবার নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা কিছু তারা করে থাকে। (১৬০) যে একটি সংকল্প করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুতঃ তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (১৬১) আপনি বলে দিন : আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন— একাত্তি ইব্রাহীমের বিসৃদ্ধ ধর্ম। সে অংশীদারীদের অস্তিত্ব ছিল না। (১৬২) আপনি বলুন : আমার নামায, আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশু-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। (১৬৩) তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আশ্রিত হয়েছি এবং আমি প্রথম অনুগত্যশীল। (১৬৪) আপনি বলুন : আমি কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য প্রতিপালক খোঁজব, অথচ তিনিই সবকিছুর প্রতিপালক? যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে, তা তারই দায়িত্বে থাকে। কেউ অপরের বােমা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদেরকে সবাইকে প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অনন্তর তিনি তোমাদেরকে বলে দিবেন, যেসব বিষয়ে তোমরা বিরোধ করতে। (১৬৫) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন এবং একে অন্যের উপর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন, যাতে তোমাদেরকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করে, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আপনার প্রতিপালক কৃত শাস্তিদাতা এবং তিনি অত্যন্ত ক্রমাশীল, দয়ালু।

এরপর বলা হয়েছে - وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا النَّبِيلَ أَكْثَرُ مِنْكُمْ سَبِيلًا - আল্লাহ শব্দটি সبিল পর্যন্ত পৌছো এবং তাঁর সন্ততি অর্জনের আসল পথ তো একটিই, জগতে যদিও মানুষ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনেক পথ করে রেখেছে। তোমরা সেসব পথে চলা না। কেননা, সেগুলো বাস্তবে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছো না। কাজেই যে এসব পথে চলবে সে আল্লাহ থেকে দূরেই সরে পড়বে।

তফসীর-মাযহারীতে বলা হয়েছে : কোরআন পাক ও রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রেরণ করার আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা, ইচ্ছা ও পছন্দকে কোরআন ও সূন্যাহর হাঁচে টেলে নিক এবং স্বীয় জীবনকে এরই অনুসারী করে নিক। কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, মানুষ কোরআন ও সূন্যাহকে নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও পছন্দের হাঁচে টেলে নিতে চাচ্ছে। কোন আয়াত কিংবা হাদীসকে নিজের মতলব বা ধারণার বিপরীতে দেখলে তারা তার মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় প্রবৃত্তির পক্ষে নিয়ে যায়। এখান থেকেই অন্যান্য বেদান্ত ও পথভ্রষ্টতার জন্ম। আয়াতে এসব পথ থেকে বেঁচে থাকতেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গাফেল থাকার কারণ এটা নয় যে, তওরাত ও ইঞ্জিল আরবী ভাষায় ছিল না, অনুবাদের মাধ্যমে বিষয়বস্তু জানা সম্ভবপর ও বাস্তবসম্মত। বরং কারণ এই যে, আহলে-কিতাবরা আরবদের শিক্ষা ও একত্ববাদের ব্যাপারে কখনও যত্নবান হয়নি। ঘটনাচক্রে কোন বিষয়বস্তু পাঠ করাই ইশিয়ার হওয়ার ব্যাপারে ততটুকু কার্যকর নয়। তবে এতটুকু ইশিয়ারীর কারণে একত্ববাদের জ্ঞান অনুসন্ধান ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ওয়াজেব হয়ে যায় এবং এ কারণেই একত্ববাদ বর্জন করার জন্য আরবদেরকে শাস্তি দেয়া সম্ভবপর ছিল। এতে একথা জরুরী হয় না যে, তাহলে হযরত মুসা ও ইসা (আঃ)-এর নবুওয়ত ব্যাপক ও সবার জন্য ছিল। এরূপ নয়, বরং এ ধরনের ব্যাপকতা আমাদের পয়গমুর মুহম্মদ (সাঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য এবং তা মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা উভয়ের সমষ্টির দিক দিয়ে। নতুবা মূলনীতিতে সকল পয়গমুরের অনুসরণই সব মানুষের জন্যে জরুরী। সুতরাং এ দিক দিয়ে আরবদেরকে শাস্তি দেয়া অশুদ্ধ হত না; কিন্তু আয়াতে বর্ণিত অজুহাতটি বাহ্যদৃষ্টিতে পেশ করা সম্ভবপর ছিল। এখন তারও অবকাশ রইল না এবং আল্লাহ্র মুক্তি পূর্ণ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় উক্তি وَأَوَّلُ مَا آتَانَا لَكَ الْإِسْلَامَ الْوَحْدَانِيَّةُ - সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও উত্তর নবুওয়তের বিরতিকালে অবস্থান করার কারণে যারা মুক্তি পাবে, তাদের সম্পর্কে সূরা মায়েরদার তৃতীয় রুকূর শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে।

আনুশঙ্গিক স্ফাতব্য বিষয়

সূরা আনআমের অধিকাংশই মক্কাবাসী ও আরব-মুশরেকদের বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সম্প্রদায় এবং তাদের সন্দেহ ও প্রশ্নের জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে।

গোটা সূরায় এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মক্কা ও আরবের অধিবাসীদের সামনে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তোমরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মো'জেযা ও প্রমাণাদি দেখে নিচ্ছে, তাঁর সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও পয়গমুরগণের ভবিষ্যদ্বাণীও শুনে নিচ্ছে এবং একজন নিরক্ষরের মুখ থেকে কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত শোনার মো'জেযাটিও লক্ষ্য করছে। এখন ন্যায় ও সত্যের সমুদয় পথ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

অতএব, বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে আর কিসের অপেক্ষা?

এ বিষয়টি আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বলা হয়েছে :

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ
بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ

অর্থাৎ, তারা কি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে এ জন্যে অপেক্ষা করছে যে, মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের কাছে পৌঁছবে। না কি হাশরের ময়দানের জন্যে অপেক্ষা করছে, যেখানে প্রতিদান ও শাস্তির ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আগমন করবেন অথবা কিয়ামতের কোন একটি সর্বশেষ নিদর্শন দেখে নেয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে? ফয়সালায় জন্যে কিয়ামতের ময়দানে পালনকর্তার উপস্থিতি কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা কিভাবে এবং কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন, তা মানবজ্ঞান পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। তাই এ ধরনের আয়াত সম্পর্কে সাহায্যে কেলাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের অভিমত এই যে, কোরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তাই বিশ্বাস করতে হবে। উদাহরণতঃ এ আয়াতে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে প্রতিদান ও শাস্তির যীমান্সে করার জন্যে উপস্থিত হবেন। তবে কি অবস্থায় উপস্থিত হবেন এবং কোন দিকে অবস্থান করবেন এ আলোচনা অর্থহীন।

অতঃপর “যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন কোন নিদর্শন এসে যাবে.....?”

এতে হৃদয়গ্রাহী করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার কোন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেনি, তখন বিশ্বাস স্থাপন করলে তা কবুল করা হবে না এবং যে ব্যক্তি পূর্বেই বিশ্বাস স্থাপন করেছে; কিন্তু কোন সৎকর্ম করেনি, সে তখন তওবা করে ভবিষ্যতে সৎকর্ম করার ইচ্ছা করলে তার তওবাও কবুল করা হবে না। মোটকথা, কাফের স্বীয় কুফর থেকে এবং পাপাচারী স্বীয় পাপাচার থেকে যদি তখন তওবা করতে চায়, তবে তা কবুল হবে না।

কারণ, বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা যতক্ষণ মানুষের ইচ্ছাধীন থাকে, ততক্ষণই তা কবুল হতে পারে। আল্লাহর শাস্তি ও পরকালের স্বরূপ ফুটে উঠার পর প্রত্যেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপন ও তওবা করতে আপনা থেকেই বাধ্য হবে। বলাবাহুল্য, এরূপ ঈমান ও তওবা গ্রহণযোগ্য নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যখন কেয়ামতের সর্বশেষ নিদর্শনটি প্রকাশিত হবে অর্থাৎ, সূর্য পূর্বদিকের পরিবর্তে পশ্চিমদিক থেকে উদিত হবে, তখন এ নিদর্শনটি দেখা মাত্রই সারা বিশ্বের মানুষ ঈমানের কালেমা পাঠ করতে শুরু করবে এবং সব অবাধ্য লোকও অনুগত হয়ে যাবে। কিন্তু তখনকার ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় হবে না। — (বগভী)

এ আয়াত থেকে একথা জানা গেল যে, কেয়ামতের কোন কোন নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন আর কোন কাফের কিংবা ফাসেকের তওবা কবুল হবে না। কিন্তু এ নিদর্শন কোনটি, কোরআন পাক তা পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেনি।

ছহীহ মুসলিমে এর বিস্তারিত বিবরণে হযায়ফা ইবনে ওসায়দ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার সাহাবায়ে কেলাম

পরস্পর কেয়ামতের লক্ষণাদি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন : দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত কেয়ামত হবে না। (এক) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়। (দুই) বিশেষ এক প্রকার ধোয়া, (তিন) দাব্বাতুল-আরদ, (চার) ইয়াজ্জু-মাজ্জুয়ের আবির্ভাব (পাঁচ) ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, (ছয়) দাঙ্গালের অভ্যুদয়, (সাত, আট, নয়) প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও আরব উপদ্বীপ-এ তিন জায়গায় মাটি ধসে যাওয়া এবং (দশ) আদন থেকে একটি আশুন বেরিয়ে মানুষকে সামনের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া। মসনদ-আহমদে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : এসব নিদর্শনের মধ্যে সর্বপ্রথম নিদর্শনটি হল পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ও দাব্বাতুল-আরদের আবির্ভাব।

ইমাম কুরতুবী তাকেরা গ্রন্থে এবং হাফেয ইবনে হাজার বুখারীর টীকায় হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : এ ঘটনার অর্থাৎ, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পর একশ বিশ বছর পর্যন্ত পৃথিবী বিদ্যমান থাকবে। — (ফুতুল-মা’আনী)

এ বিবরণ দৃষ্টে প্রশ্ন হয় যে, ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের পর ছহীহ রেওয়ায়েতে অনুযায়ী তিনি মানব জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দেবেন এক মানুষ ঈমান কবুল করবে। ফলে সমগ্র বিশ্বে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি তখনকার ঈমান গ্রহণীয় না হয়, তবে এ দাওয়াত এক মানুষের ইসলাম গ্রহণ অর্থহীন হয়ে যায় না কি?

তফসীর রুহুল-মা’আনীতে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের ঘটনাটি ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের অনেক পরে হবে। তওবার দরজা তখন থেকেই বন্ধ হবে; ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে নয়।

সূরা আল-আনআমের অধিকাংশই মক্কার মুশরেকদেরকে সম্মোহন এবং তাদের প্রশ্ন ও উত্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এখন আল্লাহ তাআলার সোজাপথ একমাত্র কোআন ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের যুগে যেমন তাঁদের ও তাঁদের গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসরণের উপর মুক্তি নির্ভরশীল ছিল, তেমনি আজ শুধু রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর শরীয়তের নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই মুক্তি সীমাবদ্ধ। কাজেই তোমরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দাও এবং সোজা-সরল পথ ছেড়ে এদিক-ওদিক ভ্রান্তপথ অবলম্বন করো না। এসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে মুশরেক, ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলমান সবাইকে ব্যাপকভাবে সম্মোহন করা হয়েছে এবং তাদেরকে আল্লাহর সরল পথ পরিহার করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে যে, এসব ভ্রান্ত পথের মধ্যে কিছু সরল পথের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখীও রয়েছে ; যেমন, মুরেক ও আহলে-কিতাবদের অনুসৃত পথ এবং কিছু বিপরীতমুখী নয়, কিন্তু সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে ডানে-বামে নিয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে সন্দেহমূলক ও বেদআতের পথ। এগুলোও মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেয়।

“যারা ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের কাজ আল্লাহ তাআলার নিকট সম্পর্কিত। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে তাদের কৃতকর্মসমূহ বিবৃত করবেন।

আয়াতে উল্লেখিত ‘ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করা’ এবং ‘বিভিন্ন দলে বিভক্ত হওয়ার’ অর্থ ধর্মের মূলনীতিসমূহের অনুসরণ ছেড়ে স্বীয় ধ্যান-ধারণাও প্রবৃত্তি অনুযায়ী কিংবা শয়তানের ধোকা ও সন্দেহে লিপ্ত হয়ে ধর্মে কিছু নতুন বিষয় ঢুকিয়ে দেয়া অথবা কিছু বিষয় তা থেকে বাদ দেয়া।

ধর্মে বেদআত আবিষ্কার করার কারণে কঠোর শাস্তিবাণী : তফসীর মাহহারীতে বলা হয়েছে— কিছু লোক ধর্মের মূলনীতি বর্জন করে সে জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে কিছু বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। এ উদ্দেশ্যের বেদআতীরাও নতুন ও ভিত্তিহীন বিষয়কে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। তারা সবাই আলোচ্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন : বনী-ইসরাঈলরা যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, আমার উদ্দেশ্যও সেগুলোর সম্মুখীন হবে। তারা যেমন কর্মে লিপ্ত হয়েছিল, আমার উদ্দেশ্যও তেমনি হবে। বনী-ইসরাঈলরা ৭২টি দলে বিভক্ত হয়েছিল, আমার উদ্দেশ্যে ৭৩টি দল সৃষ্টি হবে। তন্মধ্যে একদল ছাড়া সবাই লোথাক বাবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয় করলেন : মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি? উত্তর হল : যে দল আমার ও আমার সাহাবীদের পথ অনুসরণ করবে, তারা ই মুক্তি পাবে।— (তিরমিযী, আবু দাউদ)

তিরানী নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হযরত ফারাকে আযম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)—কে বলেছিলেন : এ আয়াতে বেদআতী, প্রবৃত্তির অনুসারী এবং নতুন পথের উদ্ভাবকদের কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত আছে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) ধর্মে নিজের পক্ষ থেকে নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন।

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী প্রমুখ ইরবায় ইবনে সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : “তোমাদের মধ্যে যারা আমার পর জীবিত থাকবে, তারা বিস্তারিত মতামত দেখতে পাবে। তাই (আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি যে), তোমরা আমার ও খোলাফায়-রাশেদীনের সুন্যতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো এবং তদনুযায়ী কাজ করে যেও। নতুন নতুন পথ থেকে সযত্নে গা বাঁচিয়ে চলা। কেননা, ধর্মে নতুন সৃষ্টি প্রত্যেক বিষয়ই বেদআত এবং প্রত্যেক বেদআতই পথভ্রষ্টতা।”

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : ছয় ব্যক্তির প্রতি আমি অভিসম্পাত করি, এবং আল্লাহ তাআলাও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করুন। (এক) যে ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহর গ্রন্থ কোন কিছু যোগ করে (তা শব্দই যোগ করুক কিংবা এমন কোন অর্থ যোগ করুক যা সাহাবায়ে কেরামের তফসীরের বিপরীত)। (দুই) যে ব্যক্তি তফসীরকে অস্বীকার করে। (তিন) যে ব্যক্তি জবরদস্তীমূলকভাবে মুসলমানদের নেতা হয়ে যায়— যাতে ঐ ব্যক্তিকে সম্মানিত করে, যাকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করেছেন এবং ঐ ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করে, যাকে আল্লাহ সম্মান দান করেছেন। (চার) যে ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বস্তুকে হালাল মনে করে; অর্থাৎ, মক্কার হেরেমে খুন-খারাবি করে কিংবা শিকার করে। (পাঁচ) যে ব্যক্তি আমার বংশধর ও সম্ভান-সন্ততির সম্মান হানি করে। (ছয়) যে ব্যক্তি আমার সুন্যত ত্যাগ করে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে :

مَنْ جَاءَ بِالنَّاصَةِ فَلَهُ شِئْرُ ذِمَّةٍ أَوْ مَن جَاءَ بِالسَّيْئَةِ فَلَا شِئْرَ لَهُ
مَنْ جَاءَ بِالنَّاصَةِ فَلَهُ شِئْرُ ذِمَّةٍ أَوْ مَن جَاءَ بِالسَّيْئَةِ فَلَا شِئْرَ لَهُ

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, সরল পথ থেকে বিমুখ ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ তাআলাই কেয়ামতের দিন শাস্তি দিবেন।

এ আয়াতে পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির একটি সহদয় বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি একটি সংকাজ করবে, তাকে দশগুণ প্রতিদান দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গোনাহ করবে, তাকে শুধু এক গোনাহর সমান বদলা দেয়া হবে।

বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী ও মুসনাদে-আহমদে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। যে ব্যক্তি কোন সংকাজের শুধু ইচ্ছা করে, তার জন্যে একটি নেকী লেখা হয়— ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করুক বা না করুক। অতঃপর যখন সে সংকাজটি সম্পাদন করে, তখন তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর তা কার্যে পরিণত না করে, তার আমলনামায়ও একটি নেকী লেখা হয়। অতঃপর যদি সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করে, তবে একটি গোনাহ লেখা হয়। কিংবা একেও মিটিয়ে দেয়া হয়। এহেন দয়া ও অনুকম্পা সত্ত্বেও আল্লাহর দরবারে ঐ ব্যক্তিই ধ্বংস হতে পারে, যে ধ্বংস হতেই দৃঢ়সংকল্প।— (ইবনে-কাছীর)

এক হাদীসে কুদসীতে হযরত আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে— যে ব্যক্তি একটি সংকাজ করে, সে দশটি সংকাজের ছওয়াব পায় বরং আরও বেশী পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একটি গোনাহ করে সে তার শাস্তি এক গোনাহর সম-পরিমাণ পায় কিংবা তাও আমি মাফ করে দিব। যে ব্যক্তি পৃথিবী ভর্তি গোনাহ করার পর আমার কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তার সাথে ততটুকুই ক্ষমার ব্যবহার করব। “যে ব্যক্তি আমার দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে একহাত অগ্রসর হই এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে একহাত অগ্রসর হয় আমি তার দিকে বা’ (অর্থাৎ, দুই বাহু প্রসারিত) পরিমাণ অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার দিকে লাফিয়ে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।”

এসব হাদীস থেকে জানা যায়, আয়াতে যে সংকাজের প্রতিদান দশগুণ দেয়ার কথা বলা হয়েছে, তা সর্বনিম্ন পরিমাণ। আল্লাহ তাআলা স্বীয় কৃপায় আরও বেশী দিতে পারেন এবং দিবেন। অন্যান্য হাদীস দ্বারা সন্তর গুণ বা সাতশ’ গুণ পর্যন্ত প্রমাণিত রয়েছে।

আলোচ্য আয়াতগুলো হচ্ছে সূরা আনআমের সর্বশেষ ছয় আয়াত। যারা সত্যধর্মে বাড়াবাড়ি ও কম-বেশী করে একে ভিন্ন ধর্মে রূপান্তরিত করেছিল এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তাদের মোকাবেলায় প্রথম তিন আয়াতে সত্যধর্মের বিশুদ্ধ চিত্র, মৌলিক নীতি এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শাখাগত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম দু’আয়াতে মূলনীতি এবং তৃতীয় আয়াতে শাখাগত বিধান উল্লেখিত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে সম্মোদন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে একথা বলে দিন যে, আমাকে আমার পালনকর্তা একটি সরল পথ বাতলে দিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমি তোমাদের মত নিজ ধ্যান-ধারণা বা পৈতৃক কুপ্রথা অনুসারী হয়ে এ পথ অবলম্বন করিনি, বরং আমার পালনকর্তাই আমাকে এ পথ বাতলে দিয়েছেন। (পালনকর্তা) শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ পথ বলে দেয়া তাঁর পালনকর্তার একটি দাবী। তোমরাও ইচ্ছা কর তবে হেদায়েতের আয়োজন তোমাদের জন্যেও বিদ্যমান রয়েছে।

সূরার বিষয়-সংক্ষেপ

সমগ্র সূরা আ'রাফের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায় যে, এ সূরার অধিকাংশ বিষয়বস্তুই পরকাল ও রেসালতের সাথে সম্পৃক্ত। প্রথম আয়াত **فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** নবুওয়তের এবং যষ্ঠ আয়াতে **فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** পরকালের সত্যতা সম্পর্কিত। চতুর্থ রুকুর অর্ধেক থেকে যষ্ঠ রুকুর শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরকালের আলোচনা রয়েছে। অতঃপর অষ্টম রুকু থেকে ২১ তম রুকু পর্যন্ত আযিয়া (আঃ) ও তাঁদের উম্মতের ব্যাপারাদি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সবই রেসালতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এসব কাহিনীতে রেসালতে অবিশ্বাসীদের শাস্তির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে— যাতে বর্তমান অবিশ্বাসীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। ২২ তম রুকুর অর্ধেক থেকে ২৩ রুকুর শেষ পর্যন্ত পরকাল সম্পর্কিত বিষয়ের পুনরাবলোচনা করা হয়েছে। শুধু সপ্তম ও ২২ তম রুকুর শুরুতে এবং সর্ব শেষ ২৪ তম রুকুর বেশীর ভাগ অংশে তওহীদ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা। এ সূরার খুব কম অংশই এমন আছে যাতে স্থানোপযোগী শাখাগত বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। - (বয়ানুল-কোরআন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ - প্রথম আয়াতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে

সম্মোদন করে বলা হয়েছে : এ কোরআন আল্লাহর গ্রন্থ, যা আপনার কাছে প্রেরিত হয়েছে। এর কারণে আপনার অন্তরে কোন সংকোচ থাকা উচিত নয়। অন্তরের সংকোচান অর্থ হল কোরআন পাক ও এর নির্দেশাবলী প্রচারের ক্ষেত্রে কারও ভয়ভীতি অন্তরায় না হওয়া উচিত যে, মানুষ এর প্রতি মিথ্যারোপ করবে এবং আপনাকে কষ্ট দেবে। - (মায়হারী)

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যিনি আপনার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন, তিনি আপনার সাহায্য এবং হেফাজতেরও ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই আপনি মনকে সংকোচিত করবেন কেন? কারো কারো মতে এখানে অন্তরের সংকোচানের অর্থ এই যে, কোরআন ও ইসলামী বিধি-বিধান শুনেও যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে রসুলুল্লাহ (সাঃ) দয়ার কারণে মর্মান্বিত হতেন। একেই মানসিক সংকোচ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে : আপনার কর্তব্য শুধু দ্বীনের প্রচার করা। এটা করার পর কে মুসলমান হলো আর কে হলো না- এ দায়িত্ব আপনার নয়।

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ - অর্থাৎ,

কিয়ামতের দিন সর্বসাধারণকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি তোমাদের কাছে রসুল ও গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলে? পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞেস করা হবে : যেসব বার্তা ও বিধান দিয়ে আমি আপনাদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, সেগুলো আপনারা নিজ নিজ উম্মতের কাছে পৌঁছিয়েছেন কি না? - (মায়হারী)

হুহীহ মুসলিমে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্বের ভাষণে উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলেন : কিয়ামতের দিন আমার সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আমি আল্লাহর পয়গাম পৌঁছিয়েছি কি না। তখন তোমরা উত্তরে কি বলবে? সাহাবায়ে কেরাম আরয় করলেন : আমরা বলব, আপনি আল্লাহর

সূরা আল আ'রাফ

মকায় অবতীর্ণ : আয়াত ২০৬

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।।

(১) আলিক, লাম, মীম, ছোয়াদ। (২) এটি একটি গ্রন্থ, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে করে আপনি এর মাধ্যমে তীতি-প্রদর্শন করেন। অতঃপর, এটি পৌঁছে দিতে আপনার মনে কোনরূপ সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। আর এটি বিশ্বাসীদের জন্যে উপদেশ। (৩) তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথীদের অনুসরণ করো না। (৪) আর তোমরা অশ্লীল উপদেশ গ্রহণ কর। অনেক জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের কাছে আমার আযাব রাত্রি বেলায় পৌঁছেছে অথবা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের অবস্থায়। (৫) অন্তরের স্বপ্ন তাদের কাছে আমার আযাব উপস্থিত হয়, তখন তাদের কথা এই ছিল যে, তারা বলল : নিশ্চয় আমরা অত্যাচারী ছিলাম। (৬) অতঃপর, আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব যাদের কাছে রসুল প্রেরিত হয়েছিল এবং আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করব রসুলগণকে। (৭) অতঃপর আমি স্বজ্ঞানে তাদের কাছে অবস্থা বর্ণনা করব বস্তুতঃ আমি অনুপস্থিত তো ছিলাম না। (৮) আর সেদিন যথার্থই ওজন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। (৯) এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, অতঃপর এমন হবে, যারা নিজদের ক্ষতি করেছে। কেননা, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করতো। (১০) আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠাই দিয়েছি এবং তোমাদের জীবিকা নিদিষ্ট করে দিয়েছি। তোমরা অশ্লীল কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (১১) আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরপর আকার-অবয়ব, ভৈর্য করেছি। অতঃপর আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছি - আদমকে সেজদা কর তখন সবাই সেজদা করেছে; কিন্তু ইবলীস সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

পয়গাম আমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং খোদা প্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, **اللهم اشهد** অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন।

মুসনাদ আহমদে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি তাঁর পয়গাম বান্দাদের কাছে পৌছিয়েছি কি না। আমি উত্তরে বলব, পৌছিয়েছি। কাজেই এখানে তোমরা এ বিষয়ে সচেতন হও যে, যারা এখন উপস্থিত রয়েছে, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার পয়গাম পৌছিয়ে দেয়।— (মায়হারী)

অনুপস্থিতদের অর্থ যারা সেযুগে বর্তমান ছিল; কিন্তু মজলিসে উপস্থিত ছিল না এবং সেসব বংশের যারা পরবর্তী কালে জন্মগ্রহণ করবে। তাদের কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পৌছানোর অর্থ এই যে, প্রতি যুগের মানুষ তাদের পরবর্তী বংশধরদের কাছে পৌছানোর ধারা অব্যাহত রাখবে— যাতে কিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষের কাছে এ পয়গাম পৌছে যায়।

এ আয়াতে বলা হয়েছে : **وَالْزُّنُّونَ يَمِيزُ الْغَيْثُ** (সেদিন যে

ভাল-মন্দ কাজকর্মের ওজন হবে তা সত্য-সঠিকভাবেই হবে)। এতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে মানুষ ঠোকায পড়তে পারে যে, যেসব বস্তু ভারী, সেগুলোর ওজন ও পরিমাপ হতে পারে। মানুষের ভাল-মন্দ কাজকর্ম কোন জড় পদার্থ নয় যে, এগুলোকে ওজন করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় কাজকর্মের ওজন কিরূপে করা হবে? উত্তর এই যে, প্রথমতঃ পরমপ্রভু আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তিনি সব কিছুই করতে পারেন। অতএব, আমরা যা ওজন করতে পারি না আল্লাহ তাআলাও তা ওজন করতে পারবেন না, এটা জরুরী নয়। দ্বিতীয়তঃ আজকাল জগতে ওজন করার নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে যাতে দাঁড়িপাল্লা, স্কেলকাঁটা ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই। এসব নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল এমন বস্তু ও ওজন করা যায়, যা ইতিপূর্বে ওজন করার কল্পনাও করা যেত না। আজকাল বাতাসের চাপ এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহও ওজন করা যায়, এমনকি শীত-গ্রীষ্ম পর্যন্ত ওজন করা হয়। এগুলোর মিটারই এদের দাঁড়িপাল্লা। যদি আল্লাহ তাআলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে মানুষের কাজকর্ম ওজন করে নেন, তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

আমলের ওজন সম্পর্কে একটি সন্দেহ ও তার উত্তর : আমলের ওজন সম্পর্কে হাদীসসমূহের বিশদ বর্ণনায় একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, একাধিক হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হাশরের দাঁড়িপাল্লায় কলেমা লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর ওজন হবে সবচাইতে বেশী। এ কলেমা যে পাল্লায় থাকবে, তা সর্বাধিক ভারী হবে।

তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে-হাব্বান, বায়হাকী ও হাকেম প্রমুখ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : হাশরের ময়দানে আমার উশ্মতের এক ব্যক্তিকে তার নিরানব্বইটি আমলনামাসহ সকলের সামনে উপস্থিত করা হবে। প্রত্যেকটি আমলনামা তার দুটিসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। আর সবগুলো আমলনামাই অসৎকাজ এবং গোনাহে পরিপূর্ণ হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে : এসব আমলনামায় যা কিছু লেখা রয়েছে, তার সবই ঠিক, না কি আমলনামা লেখক ফরেশতা তোমার প্রতি কোন অবিচার করেছে এবং অবাস্তব কোন কথাও লিখে দিয়েছে? সে স্বীকার করে বলবে : আয়

পরওয়ারদেগার, এতে যা কিছু লেখা আছে, সবই ঠিক। সে মনে মনে অস্থির হবে যে, এখন মুক্তির উপায় কি? তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন : আজ কারও প্রতি অবিচার হবে না। এসব পাপের মোকাবিলায় তোমার একটি নেকীর পাতাও আমার কাছে আছে। তাতে তোমার কলেমা ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আনা মুহাম্মাদান আবদুল ওয়া রাসূলুল্লাহ’ লেখা রয়েছে। লোকটি বলবে : ইয়া রব, এত বিরাট পাপপূর্ণ আমলনামার মোকাবেলায় এ ছোট পাতাটির কি মূল্য? তখন আল্লাহ বলবেন : তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না। অতঃপর এক পাল্লায় পাপে পরিপূর্ণ আমলনামাগুলো রাখা হবে এবং অপর পাল্লায় ইমানের কলেমা সমূলিত পাতাটি রাখা হবে এতে কলেমার পাল্লা ভারী হবে এবং পাপের পাল্লা হালকা হবে। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহর নামের তুলনায় কোন বস্তুই ভারী হতে পারে না।— (মায়হারী)

মুসনাদ, বাযযার ও মুস্তাদরাব হাকেম উদ্ধৃত হয়রত ইবনে ওমরের এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : নুহ (আঃ) – এর ওষাট নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর পুত্রদেরকে সমবেত করে বললেন : আমি তোমাদেরকে কলেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ওছিয়ত করছি। কেননা, যদি সাত আসমান ও যমিন এক পাল্লায় এবং কলেমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে কলেমার পাল্লাই ভারী হবে। এ সম্পর্কিত অনেক হাদীস হয়রত আবু সাঈদ খুদরী, ইবনে আব্বাস ও আবুদারদা (রাঃ) থেকে নির্বরণ্য সনদসহ হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে।— (মায়হারী)

এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, মুমিনের পাল্লা সব সময়ই ভারী হবে, সে যত পাপই করুক। কিন্তু কোরআনের অন্যান্য আয়াত এক অনেক হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মুসলমানের নেকী ও পাপকর্মসমূহেরও ওজন করা হবে। কারও নেকীর পাল্লা ভারী হবে এক কারও পাপের পাল্লা ভারী হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে মুক্তি পাবে এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে শাস্তি ভোগ করবে।

উদাহরণতঃ কোরআন পাকের এক আয়াতে আছে :

**وَنَضْمُ الْمَوَازِينِ الْقَاسِطِ يُؤْتِيهِمُ الْوَيْمَةَ ذَلَّكَ نَطْلَمُ كُنْزٌ شَيْئًا وَرَانَ
كَانَ وَمُقَالَ حَبِيبَةً حَرْدَلٍ أَتَيْنَاهَا وَلَكِنْ يَنَاقُصُونَ**

অর্থাৎ, আমি কিয়ামতের দিন ইনছাফের পাল্লা স্থাপন করব। কাজেই কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার হবে না। যদি একটি রাঙ্গিনা পরিমাণও ভালমন্দ কাজ কেউ করে, তবে সবই সে পাল্লায় রাখা হবে। আমিই হিসাবের জন্যে যথেষ্ট। সূরা কারেয়ায বলা হয়েছে :

**فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا
مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ**

অর্থাৎ, যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে সুখ-স্বচ্ছন্দে থাকবে এক যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তার স্থান হবে দোযখে।

এসব আয়াতের তফসীরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : যে মুমিনের নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে স্বীয় আমলসহ জন্মতে এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে, সে স্বীয় পাপকর্মসহ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (মায়হারী)

আবু দাউদে আবু হোরায়রা (রাঃ) – এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত

রয়েছে যে, যদি কোন বান্দার ফরয কাজসমূহে কোন ত্রুটি পাওয়া যায়, তবে রাসুলুল আলামীন বলবেন : দেখ, তার নফল কাজও আছে কি না। নফল কাজ থাকলে ফরযের ত্রুটি নফল দ্বারা পূরণ করা হবে।

আমলের ওজন কিভাবে হবে : আবু হোরায়রার (রাঃ) প্রণোয়িতক্রমে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কিয়ামতের দিন কিছু মোটা লোক আসবে। তাদের মূল্য আল্লাহর কাছে শাশর পাখার সমানও হবে না। এ কথার সমর্থনে তিনি কোরআন পাকের এ আয়াত পাঠ করলেন :

لَا تُؤْتِيهِمْ لِحْمَهُمْ الْقِيَمَةُ — অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমি

তাদের কোন ওজন স্থির করবো না ! - (মায়হার)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) - এর প্রশংসায় বর্ণিত এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : তাঁর পা দু'টি বাহ্যতঃ যতই সরু হোক, কিন্তু যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, কিয়ামতের দাঁড়ি-পাল্লায় তাঁর ওজন ওহুদ পর্বতের চাইতেও বেশী হবে।

হযরত আবু হোরায়রার যে হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী স্বীয় গ্রন্থের সমাপ্তি টেনেছেন, তাতে বলা হয়েছে : দু'টি বাক্য উচ্চারণের দিক দিয়ে খুবই হালকা; কিন্তু দাঁড়ি পাল্লায় অত্যন্ত ভারী এবং আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়। বাক্য দু'টি এই :

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলতেন : 'সোবহাল্লাহ' ! বললে আমলের দাঁড়ি-পাল্লার অর্ধেক ভরে যায় আর আলহামদু লিল্লাহ বললে বাকী অর্ধেক পূর্ণ হয়ে যায়।

আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান বিশুদ্ধ সনদে আবুদারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমলের ওজনের কোনো কোন আমলই সচ্চরিত্রতার সমান ভারী হবে না।

হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ)-কে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন : তোমাকে দু'টি কাজের কথা বলছি- এগুলো করা মানুষের জন্যে মোটেই কঠিন নয়; কিন্তু ওজনের দিক দিয়ে এগুলো খুবই ভারী হবে। (এক) সচ্চরিত্রতা এবং (দুই) অধিক মৌনতা, অর্থাৎ বিনা প্রয়োজনে কথা না কলা।

ইমাম আহমদ কিতাবুয যুহুদে হযরত হাযেম (রাঃ)-এর প্রণোয়িতক্রমে বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে

হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন। তখন একব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদছিলেন। জিবরাঈল বললেন : মানুষের সব আমলেরই ওজন হবে; কিন্তু আল্লাহ ও পরকালের ভয়ে কাঁদা এমন একটি আমল, যার কোন ওজন হবে না। বরং এর এক ফোঁটা অশ্রুও জাহান্নামের বৃহত্তম আগুন নির্বাপিত করে দিবে। - (মায়হারী)

এক হাদীসে আছে, হাশরের ময়দানে একটি লোক উপস্থিত হয়ে যখন আমল-নামায় সংকর্য কম দেখবে, তখন খুবই অস্থির হয়ে পড়বে। তখন হঠাৎ একটি বস্তু মেঘের মত উঠে আসবে এবং তার আমলনামার পাল্লায় এসে পড়বে। তাকে বলা হবে : দুনিয়াতে তুমি মানুষকে মাসআলা বলতে এবং শিক্ষা দিতে। এ হচ্ছে তোমার সেই আমলের ফল। তোমার এ শিক্ষা এগিয়ে এসেছে এবং যারা এ শিক্ষা অনুযায়ী আমল করেছে, তাদের সবার আমলেও তোমার অংশ রাখা হয়েছে। - (মায়হারী)

তিবরানী ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি জানাযার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যায়, তার আমলের ওজনে দু'টি কিরাত রেখে দেয়া হবে। অন্য এক রেওয়াজেতে বলা হয়েছে, এই কিরাতের ওজন হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান।

তিবরানী জাবের (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : মানুষের আমলের দাঁড়ি-পাল্লায় সর্বপ্রথম যে আমল রাখা হবে, তা হবে তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যয়রূপী সংকর্য।

ইমাম যাহাবী (রহঃ) হযরত এমরান ইবনে হাছীন (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন, যে কালি দ্বারা দুীনা এলেম ও বিধান সংক্রান্ত বিষয় লেখা হয় তা এবং শহীদদের রক্ত কিয়ামতের দিন ওজন করা হবে। তখন ওজনের ক্ষেত্রে আলেমদের কালি শহীদদের রক্তের চাইতেও ভারী হবে।

কিয়ামতে আমলের ওজন সম্পর্কে এ ধরনের বহু হাদীস রয়েছে। এখানে কয়েকটি এজন্যে উল্লেখ করা হলো যে, এগুলো দ্বারা বিশেষ আমলের শ্রেষ্ঠত্ব ও মূল্য অনুমান করা যায়।

মোটকথা, মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আল্লাহ তাআলা ভূ-পৃষ্ঠে সক্ষিত রেখেছেন। কাজেই সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করাই মানুষের কর্তব্য। কিন্তু মানুষ গাফেল হয়ে স্রষ্টার অনুগ্রহরাজি বিস্মৃত হয়ে যায় এবং পার্থিব দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যেই নিজে হারিয়ে ফেলে। তাই আয়াতের শেষে অভিযোগের সূত্র বলা হয়েছে :
فَلْيَرْكَبْ أَكْثَرُكُمْ — অর্থাৎ, তোমরা খুব কম লোকই কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

الاعتراف

১৫৩

ولواتنا

قَالَ مَا مَنَّكَ يَا سَيِّدُ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَتَاخَذُ بِمُغْنِي خَلْقَتِي
 مِنْ تَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَأَهْبِطْ وَمِنْهَا لِمَا يَكُونُ لَكَ
 أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ قَالَ أَنْظِرْنِي
 إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ النَّظِيرِينَ قَالَ فَمَا الْغَوَائِبُ
 لَا أَقْدُونَ لَهُمْ عِصْرَ لَكَ السُّبُحِ ثُمَّ رَأَيْنَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ
 وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ
 شَاكِرِينَ قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا مَنْ دَخَلَ مِنْهَا مَذْخَرًا لَمْ يَنْتَعِبْ مِنْهُ
 لَمَّا كُنَ فِيهَا مِنْهُمْ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَإِلَادًا اسْتَبْرَأَتْ وَزَوْجًا
 الْحَبَّةَ فَمَلَأَ مِنْ حَيْثُ رَشْتُمْ وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونُوا
 مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيَدِي لَهُمَا وَدَرَى
 عَمَّهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي
 لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَلَمَّا دَفَعَا الشَّجَرَةَ يَدَيْتَ لَهَا
 سَوَاتِمًا وَطَقَقَا خَصِيفَيْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ رَقِّ الْحَبَّةِ وَدَاخِلًا لَهَا
 أَهْلُكُمَا عَنْ يَمِينِ الشَّجَرَةِ وَأَقْلَ لَهَا الشَّيْطَانُ لَهَا مَعْدُومِينَ

(১২) আল্লাহ বললেন : আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদা করতে বাধ্য করল? সে বলল : আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আশুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। (১৩) বললেন তুমি এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোরা নাই। অতএব তুমি বের হয়ে যা। তুমি হীনতমদের অন্তর্ভুক্ত। (১৪) সে বলল : আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (১৫) আল্লাহ বললেন : তোকে সময় দেয়া হল। (১৬) সে বলল : আপনি আমাকে যেমন উদ্ভাস্ত করেছেন, আমিও বশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। (১৭) এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পশ্চিম দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বামদিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (১৮) আল্লাহ বললেন : বের হয়ে যা এখান থেকে লাক্ষিত ও অপমানিত হয়ে। তাদের যে কেউ তোরা পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তাদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। (১৯) হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জন্মাতে বসবাস কর। অতঃপর সেখান থেকে যা ইচ্ছা থাক, তবে এ বৃক্ষের কাছে যেয়ো না। তাহলে তোমরা গোনাহ্গার হয়ে যাবে। (২০) অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করল, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বলল তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিবেধ করেননি, তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও- কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী। (২১) সে তাদের কাছে কসম খেয়ে বলল : আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। (২২) অতঃপর প্রতারণাপূর্বক তাদেরকে সম্মত করে ফেলল। অনন্তর যখন তারা বৃক্ষ আশ্রয় করল, তখন তাদের লক্ষ্যস্থান তাদের সামনে ঝুলে গেল এবং তারা নিজের উপর বেহেশতের পাতা জড়াতে লাগল। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন : আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিবেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে উল্লিখিত হয়ত আদম (আঃ) ও শয়তানের এ ঘটনা সূরা বাকারার চতুর্থ রুকুতেও বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা সেখানে করা হয়েছে। এখানে আরও কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকা সম্পর্কে ইবলীসের দোয়া কবুল হয়েছে কি না? কবুল হয়ে থাকলে দু'টি পরস্পর বিরোধী আয়াতের ভাষায় সামঞ্জস্য বিধান : ইবলীস ঠিক ক্রোধ ও গযবের মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার কাছে একটি অভিনব প্রার্থনা করে বলেছিল : আমাকে হাশরের দিন পর্যন্ত জীবন দান করুন। আলোচ্য আয়াতে এর উত্তরে শুধু এতদুই বলা হয়েছে : إِنَّكَ مِنَ النَّظِيرِينَ - অর্থাৎ, তোকে অবকাশ দেয়া হল।

দোয়া ও প্রশ্নের ইঙ্গিতে এ থেকে বুঝে নেয়া যায় যে, এ অবকাশ হাশর পর্যন্ত সময়ের জন্যই দেয়া হয়েছে। কারণ, সে এ প্রার্থনাই করেছিল। কিন্তু এ আয়াতে স্পষ্টভাবে একথা বলা হয়নি যে, এখানে উল্লিখিত অবকাশ ইবলীসের আবদার অনুযায়ী হাশর পর্যন্ত দেয়া হয়েছে, না কি অন্য কোন মেয়াদ পর্যন্ত। কিন্তু অন্য আয়াতে এ স্থলে إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ শব্দাবলীও ব্যবহৃত হয়েছে। এ থেকে ব্যাঘাতঃ বোঝা যায় যে, ইবলীসের প্রার্থিত অবকাশ কিয়ামত পর্যন্ত দেয়া হয়নি, বরং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে, যা আল্লাহর জ্ঞানে সুরক্ষিত। অতঃপর সারকথা এই যে, ইবলীসের এ দোয়া কবুল হলেও আংশিক কবুল হয়ে থাকবে। অর্থাৎ, কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দানের পরিবর্তে একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়েছে।

মোটকথা, শয়তান ঐ সময় পর্যন্ত অবকাশ প্রার্থনা করেছিল যখন দ্বিতীয়বার শিক্ষা ফুক দেয়া পর্যন্ত সব মৃতকে জীবিত করা হবে। একই পুনরুত্থান দিবস বলা হয়। এ দোয়া স্বতঃ কবুল হলে যে সময় একবার আল্লাহকে ছাড়া অন্য কেউ জীবিত থাকবে না এবং لَمْ يَكُنْ لَكُمْ قَاتِلٌ এর বহিঃপ্রকাশ ঘটবে, এ দোয়ার কারণে ইবলীস তখনও জীবিত থাকতো। এ কারণেই তার পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দানের একই দোয়াকে পরিবর্তন করে প্রথমবার শিক্ষা ফুক দেয়া পর্যন্ত কবুল করা হয়েছে। এর ফলে যেসময় সমগ্র বিশ্ব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, তখন ইবলীসও মৃত্যুমুখে পতিত হবে। অতঃপর সবাই যখন পুনরায় জীবিত হবে, তখন সে-ও জীবিত হবে।

কাফেরের দোয়াও কবুল হতে পারে কি وَكَادُوعُوا الْكُفْرَانَ : এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, কাফেরের দোয়া কবুল হয় না; কিন্তু ইবলীসের এ ঘটনাও আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে উপরোক্ত প্রশ্ন দেখা দেয়। উত্তর এই যে, দুনিয়াতে কাফেরের দোয়াও কবুল হতে পারে। ফলে ইবলীসের মত মহা কাফেরের দোয়াও কবুল হয়ে গেছে। কিন্তু পরকালে কাফেরের দোয়া কবুল হবে না। উল্লিখিত আয়াত وَكَادُوعُوا الْكُفْرَانَ : পরকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দুনিয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই।

আল্লাহর সামনে এমন নির্ভীকভাবে কথা বলার দুঃসাহস ইবলীসের কিরপে হল : রাক্বুল ইযযত আল্লাহর মহান দরবারে তাঁর মাহাত্ম্য ও প্রতাপের কারণে রসূল কিংবা ফেরেশতাদেরও নিঃশ্রাস ফেলার

قَالَتْ يَا ظَنَمَنَّا أَنْفُسًا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ۝ قَالِ اهْبُطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي
الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ قَالِ فِيهَا تُحْيَوْنَ وَمِيتَاف
تَمُوتُونَ وَفِيهَا تُخْرَجُونَ ۝ يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا
يُؤَدِّي سَوَآتَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكِ
لِأَيِّ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَذْكُرُونَ ۝ يٰبَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطَانُ
كَمَا أَخْرَجَ آدَمَ مِنْ الْجَنَّةِ يَتَزَوَّجُ مِنَ الْمَرْءِ الْمَرْءِ
أَنَّهُ يَزَكِّيهِمْ هُوَ وَوَقِيلَهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ
أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذَا قَعَلُوا فَاجِسَةً قَالُوا جِدَدًا
عَلَيْهَا أَبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنْ لِلَّهِ لَأَمْثَلُ الْخَشَاءِ
أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ
وَاقْبَلُوا وَجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ ۝ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۝ فَرِيقًا هَدَىٰ وَ
فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنََّّهُمْ مُهْتَدُونَ ۝

(২৩) তারা উভয়ে বলল : হে আমাদের পালনকর্তা আমরা নিজেদের প্রতি
জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদের
প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাব। (২৪)
আল্লাহ্ বললেন : তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু।
তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে বাসস্থান আছে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত
ফল ভোগ আছে। (২৫) বললেন : তোমরা সেখানেই জীবিত থাকবে,
সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরুত্থিত হবে। (২৬) হে
বনী-আদম। আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা
তোমাদের লজ্জাহীন আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র
এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কৃদরতের
অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (২৭) হে বনী-আদম।
শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে; যেমন সে তোমাদের
পিতামাতাকে জ্ঞানাত থেকে বের করে দিয়েছে এমনভাবেই যেন, তাদের
পোশাক তাদের থেকে খুলিয়ে দিয়েছে— যাতে তাদেরকে লজ্জাহীন দেখিয়ে
দেয়। সে এবং তার দলবল তোমাদেরকে দেখে, যেখান থেকে তোমরা
তারেরকে দেখ না। আমি শয়তানদেরকে তাদের বন্ধু করে দিয়েছি, যারা
বিশ্বাস স্থাপন করে না। (২৮) তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন বলে
: আমরা বাপ-দাদাকে এমন করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এ
নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ মন্দকাজের আদেশ দেন না। এমন কথা
আল্লাহর প্রতি কেন আরোপ কর, যা তোমরা জান না। (২৯) আপনি বলে
দিন : আমার প্রতিপালক সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক
সেজদার সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখ এবং তাঁকে ষাটি আনুগতশীল
হয়ে ডাক। তোমাদেরকে প্রথমে যেমন সৃষ্টি করেছেন, পুনর্বাসিতও সজ্জিত
হবে। (৩০) একদলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্যে
পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু
হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করে যে, তারা সংপথে রয়েছে।

সাধ্য ছিল না। ইবলীসের এরূপ দুঃসাহস কিরূপে হল? আলোমগণ বলেন
: এটাও আল্লাহ্ তাআলার চূড়ান্ত গণ্যবের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহর রহমত
থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণে ইবলীসের সামনে একটি পর্দা অন্তরায়
হয়ে যায়। এ পর্দা তার সামনে আল্লাহর মাহাত্ম্য ও প্রত্যাপকে ঢেকে দেয়
এবং তার মধ্যে নির্লক্ষ্যতা প্রবল করে দেয়। - (বয়ানুল-কোরআন :
সংক্ষেপিত)

মানুষের উপর শয়তানের হামলা চতুর্দিকে সীমাবদ্ধ নয়- আরও
ব্যাপক : আলোচ্য আয়াতে ইবলীস আদম সন্তানদের উপর আক্রমণ
করার জন্যে চারটি দিক বর্ণনা করেছে- অগ্র, পশ্চাৎ, ডান ও বাম। এখানে
প্রকৃতপক্ষে কোন সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হল প্রত্যেক দিক
ও প্রত্যেক কোণ থেকে। তাই উপর কিংবা নিচের দিক থেকে পথভ্রষ্ট
করার সম্ভাবনা এর পরিপন্থী নয়। এভাবে হাদীসের এ বর্ণনাও এর পরিপন্থী
নয় যে, শয়তান মানবদেহে প্রবেশ করে রক্তবাহী রগের মাধ্যমে সমগ্র
দেহে হস্তক্ষেপ করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আদম (আঃ) ও ইবলীসের যে ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত
হয়েছে, হুবহু এ ঘটনাই সূরা বাকরার চতুর্থ রুকুতে বিশদ বর্ণনাসহ
উল্লেখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে সম্ভাব্য সব প্রশ্ন ও সন্দেহের বিস্তারিত উত্তর
পূর্ণ ব্যাখ্যা ও জ্ঞাতব্য বিষয়াদিসহ সূরা বাকরার তফসীরে লিপিবদ্ধ করা
হয়েছে। প্রয়োজন হলে সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

ইতিপূর্বে পূর্ণ এক রুকুতে আদম (আঃ) ও অভিশপ্ত শয়তানের ঘটনা
বর্ণনা করা হয়েছিল। এতে শয়তানী প্ররোচনার প্রথম পরিণতিতে আদম ও
হাওয়া (আঃ)-এর জ্ঞানাতী পোশাক খুলে গিয়েছিল এবং তাঁরা উলঙ্গ হয়ে
পড়েছিলেন। ফলে তাঁরা বৃক্ষপত্র দ্বারা গুপ্তাঙ্গ ঢাকতে শুরু করেছিলেন।

আলোচ্য ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত আদম সন্তানকে
সম্বোধন করে বলেছেন : তোমাদের পোশাক আল্লাহ্ তাআলার একটি
মহান নেয়ামত। একে যথার্থ মূল্য দাও। এখানে মুসলমানদেরকে সম্বোধন
করা হয়নি-সমগ্র বনী-আদমকে করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে,
গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদন ও পোশাক মানব জাতির একটি সহজাত প্রবৃত্তি ও
প্রয়োজন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই এ নিয়ম পালন করে। অতঃপর এর
বিশদ বিবরণে তিন প্রকার পোশাকের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম, **لِبَاسًا يُؤَدِّي سَوَآتَكُمْ** - এখানে **يُؤَدِّي** শব্দটি **مَوَارَاة** থেকে
উদ্ভূত। এর অর্থ আবৃত করা **سَوَات** শব্দটি **سَوَمَة** এর বহুবচন। এর অর্থ
মানুষের ঐসব অঙ্গ, যেগুলো খোলা রাখাকে মানুষ স্বভাবতই খারাপ ও
লজ্জাকর মনে করে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থ এমন
একটি পোশাক সৃষ্টি করেছি, যদ্বারা তোমরা গুপ্তাঙ্গ আবৃত করতে পার।

এরপর বলা হয়েছে : **وَرِيشًا** সাজ-সজ্জার জন্যে মানুষ যে পোশাক
পরিধান করে, তাকে **رِيش** বলা হয়। অর্থ এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করার
জন্যে তো সংক্ষিপ্ত পোশাকই যথেষ্ট হয়; কিন্তু আমি তোমাদেরকে আরও
পোশাক দিয়েছি, যাতে তোমরা তদ্বারা সাজ-সজ্জা করে বাহ্যিক
দেহাবয়বকে সুশোভিত করতে পার।

পোশাকের দ্বিবিধ উপকারিতা : আয়াতে পোশাকের দু'টি
উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। (এক) - গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদিত করা এবং (দুই)

শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা এবং অঙ্গ-সজ্জা। প্রথম উপকারিতাটি অগ্রে বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা পোশাকের আসল লক্ষ্য। এটাই সাধারণ জঙ্ঘ-জানোয়ার থেকে মানুষের স্বাতন্ত্র্য। জঙ্ঘ-জানোয়ারের পোশাক সৃষ্টিগতভাবে তাদের দেহের অঙ্গ। এ পোশাকের কাজ শুধু শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা নয় অঙ্গ-সজ্জাও বটে। গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনেও এর তেমন কোন ভূমিকা নেই। তবে তাদের দেহে গুপ্তাঙ্গ এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে যাতে সম্পূর্ণ খোলা না থাকে। কোথাও লেজ দ্বারা আবৃত করা হয়েছে এবং কোথাও অন্যভাবে।

আদম, হাওয়া এবং তাঁদের সাথে শয়তানী প্ররোচনার ঘটনা বর্ণনা করার পর পোশাকের কথা উল্লেখ করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উলঙ্গ হওয়া এবং গুপ্তাঙ্গ অপরের সামনে খোলা চূড়ান্ত হীনতা ও নিলজ্জতার লক্ষণ এবং নানা প্রকার অনিষ্টের ভূমিকা বিশেষ।

মানুষের উপর শয়তানের প্রথম হামলা : মানুষের বিরুদ্ধে শয়তানের সর্বপ্রথম আক্রমণের ফলে তার পোশাক খসে পড়েছিল। আজও শয়তান তার শিষ্যবর্গের মাধ্যমে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছায় সভ্যতার নামে সর্বপ্রথম তাকে উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ করে পথে নামিয়ে দেয়। শয়তানের তথাকথিত প্রগতি নারীকে লজ্জা-শরম থেকে বঞ্চিত করে সাধারণ্যে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে আসা ছাড়া অর্জিতই হয় না।

ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা : শয়তান মানুষের এ দুর্বলতা আঁচ করে সর্বপ্রথম হামলা গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের উপর করেছে। তাই মানুষের সর্বপ্রকার মঙ্গল বিধানকারী শরীয়ত গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনের প্রতি এতটুকু গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাকেই স্থির করেছে। নামায, রোযা ইত্যাদি সবই এরপর।

হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : নতুন পোশাক পরিধান করার সময় এ দোয়া পাঠ করা উচিত : “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে পোশাক দিয়েছেন। এ পোশাক দ্বারা আমি গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করি এবং সাজ-সজ্জা করি।”

নতুন পোশাক তৈরীর সময় পুরাতন পোশাক দান করে দেয়ার ছওয়াব : তিনি আরও বলেন : যে ব্যক্তি নতুন পোশাক পরার পর পুরাতন পোশাক ফকীর-মিসকীনকে দান করে দেয়, সে জীবনে ও মরণে সর্বাবস্থায় আল্লাহর আশ্রয়ে চলে আসে। - (ইবনে-কাসীর)

এ হাদীসেও মানুষকে পোশাক পরিধানের সময় ঐ দু'টি উপকারিতাই স্মরণ করানো হয়েছে, যার জন্যে আল্লাহ তাআলা পোশাক সৃষ্টি করেছেন।

পোশাকের তৃতীয় প্রকার : গুপ্ত-অঙ্গ আবৃতকরণ এবং আরাম ও সাজ-সজ্জার জন্যে দু'প্রকার পোশাক বর্ণনা করার পর কোরআন পাক তৃতীয় এক প্রকার পোশাকের কথা উল্লেখ করে বলেছে : **وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ** **وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ** পড়া হয়েছে। **وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ** কোন কোন কেরাআতে যবর দিয়ে **وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ** পড়া হয়েছে। এমতাবস্থায় **انزلنا** এর **مفعول** হয়ে অর্থ হবে এই যে, আমি একটি তৃতীয় পোশাক অর্থাৎ, তাকওয়ায় পোশাক অবতীর্ণ করেছি। প্রসিদ্ধ কেরাআত অনুযায়ী অর্থ এই যে, এ দু'প্রকার পোশাক তো সবাই জানে। তৃতীয় একটি পোশাক হচ্ছে তাকওয়ায় পোশাক। এটি সর্বোত্তম পোশাক। হযরত ইবনে আব্বাস ও ওরওয়া ইবনে যুবার (রাঃ)-এর তফসীর অনুযায়ী তাকওয়ায় পোশাক বল সংকর্ম ও খোদাভীতিকে বোঝানো হয়েছে। -

(রুসুল-মা'আনী)

উদ্দেশ্য এই যে, বাহ্যিক পোশাক যেমন মানুষের গুপ্ত অঙ্গের জন্যে আবরণ এবং শীত-গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা ও সাজ-সজ্জার উপায় হয়, তেমনি সংকর্ম ও খোদাভীতিও একটি আধ্যাত্মিক পোশাক। এটি মানুষের চারিত্রিক দোষ ও দুর্বলতার আবরণ এবং স্থায়ী কষ্ট ও বিপদাদন থেকে মুক্তির উপায়। এ কারণেই এটি সর্বোত্তম পোশাক।

বাহ্যিক পোশাকের আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন করা : **لِبَاسُ التَّقْوَىٰ** শব্দ থেকে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, বাহ্যিক

পোশাক দ্বারা গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করা ও সাজ-সজ্জা করার আসল উদ্দেশ্য তাকওয়া ও খোদাভীতি। এ খোদাভীতি পোশাকের মধ্যেও এভাবে প্রকাশ পাওয়া উচিত যেন গুপ্তাঙ্গসমূহ পুরোপুরি আবৃত হয়। পোশাক শরীরে এমন আঁটসাঁটও না হওয়া চাই, যাতে এসব অঙ্গ উলঙ্গের মত দৃষ্টিগোচর হয়। পোশাকে অহঙ্কার ও গর্বের ভঙ্গিও না থাকা চাই, বরং নম্রতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হওয়া চাই। প্রয়োজনানুসারে অপব্যয় না হওয়া চাই, মহিলাদের জন্যে পুরুষদের এবং পুরুষদের জন্যে মহিলাদের পোশাক না হওয়া চাই, যা আল্লাহ তাআলার অপছন্দনীয়। অধিকন্তু পোশাকে বিভ্রান্তি অনুকরণও না হওয়া চাই, যা স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক।

এতদসঙ্গে পোশাকের আসল উদ্দেশ্য চরিত্র ও কর্মের সংশোধনও হওয়া চাই। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **ذَٰلِكُمْ لِيَذْكُرُوا** **ذَٰلِكُمْ لِيَذْكُرُوا** অর্থাৎ, মানুষকে এ তিন প্রকার পোশাক দান করা আল্লাহ তাআলার শক্তির নির্দানসমূহের অন্যতম— যাতে মানুষ এ থেকে নিজ গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় আয়াতে পুনরায় সব মানব সন্তানকে সম্বোধন করে ইশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রত্যেক কাজে শয়তান থেকে বেঁচে থাক। সে যে আবার তোমাদেরকে ফাসাদে ফেলে না দেয়; যেমন তোমাদের পিতা-মাতা আদম ও হাওয়াকে জন্মাত থেকে বের করিয়েছে এবং তাদের পোশাক খুলে উলঙ্গ করার কারণ হয়েছে। সে তোমাদের পুরাতন শত্রু। সর্বদা তার শত্রুতার প্রতি লক্ষ্য রাখ।

ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াত যুগে শয়তান মানুষকে যেমন লজ্জাজনক ও অর্থহীন কুপ্রথায লিপ্ত করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, কোরাইশদের ছাড়া কোন ব্যক্তি নিজ বস্ত্র পরিত্যক্ত অবস্থায় কাঁবা গৃহের তওয়াফ করতে পারত না। তাকে হয় কোন কোরাইশীর কাছ থেকে বস্ত্র ধার করতে হতো, না হয় উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করতে হতো।

এটা জানা কথা যে, আরবের সব মানুষকে বস্ত্র দেয়া কোরাইশের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাই পুরুষ মহিলা অধিকাংশ লোক উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করত। মহিলারা সাধারণতঃ রাতের অন্ধকারে তওয়াফ করত। তারা এ শয়তানী কাজের কারণ এই বর্ণনা করতে যে, যেমন পোশাক পরে আমরা পাপকাজ করি, সেগুলো পরিধান করে আল্লাহর ক্ষম প্রদক্ষিণ করা বেআদবী। এ জ্ঞানপাশীরা এ বিষয়টি বুঝত না যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা আরও বেশী বেআদবীর কাজ। হরমের সেবক হওয়ার সুবাদে শুধু কোরাইশ গোত্র এ উলঙ্গতা আইনের ব্যতিক্রম ছিল।

আলোচ্য প্রথম আয়াত এ নির্লজ্জ প্রথা ও তার অনিষ্ট বর্ণনা করার জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে : তারা যখন কোন অন্ত্রীল কাঁচ করত, তখন কেউ নিষেধ করলে তারা উত্তরে বলত : আমাদের বাপ-দাদা

ও মুকব্বিরা তাই করে এসেছেন। তাদের তরিকা ত্যাগ করা লজ্জার কথা। তারা আরও কলত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন।

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে অশ্লীল কাজ বলে উলঙ্গ জুহুয তওয়াফকেই বোঝানো হয়েছে। فحشا، فحشا এমন প্রত্যেক মন্দ কাজকে বলা হয়, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের মন্দ এবং যুক্তি, বুদ্ধি ও সুস্থ বিবেকের কাছে পূর্ণমাত্রায় সুস্পষ্ট। - (মায়হারী)

এস্তরে ভাল ও মন্দের যুক্তিগত ব্যাপার হওয়া সবার কাছে স্বীকৃত। - (রুহুল-মা'আনী)

তারা এ বাজে প্রথার বৈধতা প্রতিপন্ন করার জন্যে দু'টি প্রমাণ উপস্থিত করেছে। (এক) বাপ-দাদার অনুসরণ; অর্থাৎ, বাপ-দাদার তরিকা কায়ম রাখার মতোই মঙ্গল নিহিত। এর উত্তর দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। মুখ বাপ-দাদার অনুসরণ করার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই। সামান্য জ্ঞান ও চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিও একথা বুঝতে পারে যে, কোন তরিকার বৈধতার পক্ষে এটা কোন প্রমাণ হতে পারে না যে, বাপ-দাদা এরূপ করত। কেননা, বাপ-দাদার তরিকা হওয়া যদি কোন তরিকার বিশ্বস্ততার জন্যে যথেষ্ট হয়, তবে দুনিয়াতে বিভিন্ন লোকের বাপ-দাদার বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী তরিকা ছিল। এ যুক্তির ফলে জগতের সব ভ্রান্ত তরিকাও বৈধ ও বিশ্বস্ত প্রমাণিত হয়ে যায়। মোটকথা, মুখদের এ প্রমাণ কল্পযোগ্য ছিল না বলেই কোরআন পাক এখানে এর উত্তর দেয়া জরুরী মনে করেনি। তবে অন্যান্য আয়াতে এরও উত্তর দিয়ে বলা হয়েছে যে, বাপ-দাদারা কোন মুখতাসুলভ কাজ করলেও কি তা অনুসরণযোগ্য হত পারে?

উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করার বৈধতার প্রশ্নে তাদের দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা সর্বৈব মিথ্যা এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি ভ্রান্তি আরোপ। এর উত্তরে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে :

أَرْثَا، آپনি বলে দিন : আল্লাহ তাআলা কখনও অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। কেননা, এরূপ নির্দেশ দেয়া খোদায়ী প্রজ্ঞা ও শানের পরিপন্থী। অতঃপর তাদের এ মিথ্যা অপবাদ ও ভ্রান্ত ধারণা পূর্ণরূপে প্রকাশ করার

জন্যে তাদেরকে হুশিয়ার করে বলা হয়েছে :

أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ أَرْثَا، তোমরা কি আল্লাহ্র প্রতি এমন বিষয় আরোপ কর, যার জ্ঞান তোমাদের কাছে নেই? জানা কথা যে, না জেনে না শুনে কোন ব্যক্তির প্রতি কারো সম্বন্ধ করে দেয়া চরম ধৃষ্টতা ও অন্যায়। অতএব, আল্লাহ্র প্রতি এমন ভ্রান্ত সম্বন্ধ করা কত বড় অপরাধ ও অন্যায় হবে! মুজতাহিদগণ কোরআনের আয়াত থেকে ইজ্তিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান উদ্ভাবন করেন, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, তাঁরা প্রমাণের ভিত্তিতে এসব বিধান উদ্ভাবন করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে :

أَرْثَا، যেসব মুখ উলঙ্গ তওয়াফ বৈধ করার ভ্রান্ত সম্বন্ধ আল্লাহ্র দিকে করে, আপনি তাদের বলে দিন : আল্লাহ তাআলা সর্বদা قسط এর নির্দেশ দেন। قسط এর আসল অর্থ ন্যায্যবিচার ও সমতা। এখানে ঐ কাজকে বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ ক্রটিও নেই এবং নির্দিষ্ট সীমার লঙ্ঘনও নেই। অর্থাৎ, স্বল্পতা ও বাহুল্য থেকে মুক্ত। শরীয়তের সব বিধি-বিধানের অবস্থা তাই। এজন্যে قسط শব্দের অর্থ যাবতীয় এবাদত, আনুগত্য ও শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। - (রুহুল-মা'আনী)

এ আয়াতে ন্যায্যবিচার ও সমতার নির্দেশ বর্ণনা করার পর তাদের পঞ্চদষ্টতার উপযোগী দু'টি বিধান বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

وَادْعُوهُمْ حُرُوبًا وَعَدْوًا এবং দুই, وَادْعُوهُمْ حُرُوبًا وَعَدْوًا প্রথম বিধানটি মানুষের বাহ্যিক কাজকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে প্রথম বিধানে শব্দটি সেজদা ও এবাদতের অর্থে বর্ণিত হয়েছে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক এবাদত ও নামাযের সময় স্বীয় মুখমণ্ডল সোজা রাখা। এর এক উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, নামাযের সময় মুখমণ্ডল সোজা কেবলার দিকে রাখতে যত্নবান হও এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এ-ও হতে পারে যে, প্রত্যেক কথায়, কাজে এবং কর্মে স্বীয় আননকে প্রতিপালকের নির্দেশের অনুসারী রাখ এবং সতর্ক থাক যে, এদিক-সেদিক যেন না হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে এ বিধানটি বিশেষভাবে নামাযের জন্যে হবে না; বরং যাবতীয় এবাদত ও লেন-দেনকেও পরিব্যাপ্ত করবে।

দ্বিতীয় বিধানের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলাকে এমনভাবে ডাক, যেন এবাদত খাঁটিভাবে তাঁরই হয়; এতে যেন অন্য কারও অংশীদারিত্ব না থাকে; এমন কি, গোপন শিরক অর্থাৎ, লোক-দেখানো ও নাম-যশের উদ্দেশ্য থেকেও পবিত্র হওয়া চাই।

এ বিধান দু'টি পাশাপাশি উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় অবস্থাকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সংশোধন করা অবশ্য কর্তব্য। আন্তরিকতা ব্যতীত শুধু বাহ্যিক আনুগত্য যথেষ্ট নয়। এমনভাবে শুধু আন্তরিকতা বাহ্যিক শরীয়তের অনুসরণ ব্যতীত যথেষ্ট হতে পারে না। বরং বাহ্যিক অবস্থাকেও শরীয়ত অনুযায়ী সংশোধন করা এবং অন্তরকেও আল্লাহ্র জন্যে খাঁটি রাখা একান্ত জরুরী। এতে তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে, যারা শরীয়ত ও তরীকতকে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা মনে করে। তাদের ধারণা এই যে, তরীকত অনুযায়ী অন্তর সংশোধন করে দেয়াই যথেষ্ট, তাতে শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ হলেও কোন দোষ নেই। বলাবাহুল্য এটা সুস্পষ্ট পঞ্চদষ্টতা।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে :

كَابِدْكُمْ تَوَدُّونَ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনিভাবে কেয়ামতের দিন পুনর্বার তোমাদেরকে সৃষ্টি করে দশায়মান করবেন। তাঁর অসীম শক্তির পক্ষে এটা কোন কঠিন কাজ নয়; বরং খুব সহজ। সম্ভবতঃ এ সহজ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে يعبئكم এর পরিবর্তে تَوَدُّونَ বলেছেন। অর্থাৎ, পুনর্বার সৃষ্টি করার জন্যে বিশেষ কোন কর্মতৎপরতা ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। - (রুহুল-মা'আনী)

এ বাক্যটি এখানে আনার আরও একটি উপকারিতা এই যে, এর ফলে শরীয়তের বিধানাবলীতে পূর্ণরূপে কায়ম থাকা মানুষের জন্যে সহজ হয়ে যাবে। কেননা, পরকাল ও কেয়ামত এবং তথায় ভালমন্দ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির কল্পনাই মানুষের জন্যে প্রত্যেক কঠিনকে সহজ এবং কষ্টকে সুখে রূপান্তরিত করতে পারে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষের মধ্যে এ ভীতি জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত কোন ওয়াজ ও উপদেশ তাকে সোজা করতে পারে না এবং কোন আইনই তাকে অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : একদল লোককে তো আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করেছেন এবং একদলের জন্যে পঞ্চদষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। কেননা, তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে সহচর করেছে।

অথচ তাদের ধারণা এই যে, তারা সঠিক পথে রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর হেদায়েত যদিও সবার জন্যে ছিল কিন্তু তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে শয়তানদের অনুসরণ করেছে এবং জুলুমের উপর জুলুম এই হয়েছে যে, তারা স্বীয় অসুস্থাবস্থাকেই সুস্থতা এবং পথভ্রষ্টতাকেই হেদায়েত মনে করে নিয়েছে।

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে মূর্খতা ও অজ্ঞতা কোন গুণের নয়। যদি কেউ ভ্রান্ত পথকে বিশুদ্ধ মনে করে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা অবলম্বন করে, তবে সে আল্লাহর কাছে ক্ষমাযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে চেতনা, ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান ও বুদ্ধি এ জনেই দিয়েছেন, যাতে সে তদ্বারা আসল ও মেকী এবং অশুদ্ধ ও শুদ্ধকে চিনে নেয়। অতঃপর তাকে এ জ্ঞানবুদ্ধির উপরই ছেড়ে দেননি, পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন এবং গ্রন্থ নাযিল করেছেন। এসবের মাধ্যমে শুদ্ধ ও ভ্রান্ত এবং সত্য ও মিথ্যাকে পুরোপুরিভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

যদি কারও মনে সন্দেহ জাগে যে, যে ব্যক্তি বাস্তবে নিজেকে সত্য মনে করে যদিও সে ভ্রান্ত হয়, তাতে তার দোষ কি? সে ক্ষমার হওয়া উচিত। কারণ, সে নিজের ভ্রান্তি সম্পর্কে জ্ঞাতই ছিল না। উত্তর এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে জ্ঞান, বিবেচনা অতঃপর পয়গম্বরদের শিক্ষা দান করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে কমপক্ষে তার অবলম্বিত পথের বিপরীতটির সম্ভাবনা ও সন্দেহ অবশ্যই হওয়া উচিত। এখন তার দোষ এই যে, সে এসব সম্ভাবনা ও সন্দেহের প্রতি জাক্ফপই করেনি এবং যে ভ্রান্ত পথ অবলম্বন করেছে তাতেই অটল রয়েছে।

অবশ্য যে ব্যক্তি সত্যানুেষণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ পথ ও সত্যের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়, আল্লাহ তাআলার কাছে তার ক্ষমার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইমাম গাযালী (রহঃ) 'আত্মাক্রমেকাতু বাহিনাল ইসলামে ওয়াযযিনদিকাহ্' গ্রন্থে একথা বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে : হে আদাম সন্তানেরা ! তোমরা মসজিদে প্রত্যেক উপস্থিতির সময় স্বীয় পোশাক পরিধান করে নাও এবং তপ্তির সাথে খাও ও পান কর-সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সীমা লংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা উলঙ্গ অবস্থায় কা' বা গৃহের তওয়াফকে যেমন বিশুদ্ধ এবাদত এবং কা' বা গৃহের প্রতি সন্মান প্রদর্শন মনে করত, তেমনি তারা হজ্বের দিনগুলোতে পানাহার ত্যাগ করত। এতটুকু পানাহার করত, যাতে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু থাকতে পারে। বিশেষতঃ ঘি, দুধ ও অন্যান্য সুবাসু খাদ্য সম্পূর্ণরূপে বর্জন করত - (ইবনে-জরীর)

তাদের এ অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ আয়াত অবতীর্ণ

হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা নির্লজ্জতা ও বে-আদাবী বিষয় বর্জনীয়। এমনভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সুবাসু খাদ্য অহেতুক বর্জন করাও কোন ধর্মকাজ নয়; বরং তাঁর হালালকৃত বস্ত্রসমূহকে হারাম করে নেয়া গৃহীতা এবং এভাবে সীমালংঘন। আল্লাহ তাআলা একে পছন্দ করেন না। তাই হজ্বের দিনগুলোতে তপ্তির সাথে খাও, পান কর, তবে অপব্যয় করো না। হালাল খাদ্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, হজ্বের আসল লক্ষ্য এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে পানাহার মশগুল থাকাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াতটি যদিও জাহেলিয়াত যুগের আরবদের একটি বিশেষ কুপ্রথা উলঙ্গতাকে মিটানোর জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে, যা তারা তওয়াফের সময় আল্লাহর গৃহের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের নামে করত, কিন্তু তফসীরবিদ ও ফেকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন বিশেষ ঘটনায় কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ এরূপ নয় যে, নির্দেশটি এ ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। বরং ভাষার ব্যাপকতা দেখতে হবে। যে যে বিষয় ভাষার ব্যাপকতার আওতায় পড়ে, সবগুলোর ক্ষেত্রে সে নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

নামাযে গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ফরয : তাই ছাহাবী, তাব্বী ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ আয়াত থেকে বেশ কয়েকটি বিধান উদ্ভাবন করেছেন। প্রথম— উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করা যেমন নিষিদ্ধ হয়েছে, তেমনি উলঙ্গ অবস্থায় নামায পড়াও হারাম ও বাতিল। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : الطواف بالبيت صلوٰة (বায়তুল্লাহর তওয়াফও এক প্রকার নামায) এছাড়া স্বয়ং এ আয়াতেই তফসীর বিদগণের মতে যখন مسجد বলে সেজদা বোঝানো হয়েছে, তখন সেজদা অবস্থায় উলঙ্গতার নিষেধাজ্ঞা আয়াতে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হয়ে যায়। সেজদায় যখন নিষিদ্ধ হল, তখন নামাযের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মেও অপরিহার্যরূপে নিষিদ্ধ হবে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বিষয়টিকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে। এক হাদীসে তিনি বলেন : চাদর পরিধান ব্যতীত কোন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার নামায জায়েয নয়। - (তিরমিযী)

নামায ছাড়া অন্যান্য অবস্থায়ও গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা যে ফরয, তা অন্যান্য আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে। তন্মধ্যে এ সূরারই একটি আয়াত পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا زَكٰتَكُمْ لِيَّاسَّٰئِلُوْا رِزْقًا مِّنْهُ

মোটকথা, এই যে, গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা মানুষের জন্যে প্রথম মানবিক ও ইসলামী ফরয। এটা সর্বাবস্থায় অপরিহার্য। নামায ও তওয়াফে আরও উত্তমরূপে ফরয।

নামাযের জন্যে উত্তম পোশাক : আয়াতের দ্বিতীয় মাসআলা, পোশাককে زينت (সাজ-সজ্জা) শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাযে শুধু গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করা ছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী সাজ-সজ্জার পোশাক পরিধান করা শ্রেয়ঃ। হযরত হাসান (রাঃ) নামাযের সময় উত্তম পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি বলতেন : আল্লাহ তাআলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন, তাই আমি প্রতিপালকের সামনে সুন্দর পোশাক পরে হাজির হই। তিনি বলেছেন :

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

বোঝা গেল, এ আয়াত দ্বারা যেমন নামাযে গুপ্ত অঙ্গ আবৃত করা ফরয বলে প্রমাণিত হয়, তেমনি সামর্থ্য অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করার ফযীলতও প্রমাণিত হয়।

নামাযে পোশাক সম্পর্কে কয়েকটি মাসআলা : আয়াতের তৃতীয় মাসআলা, যে গুপ্ত-অঙ্গ সর্বাবস্থায় বিশেষতঃ নামায ও তওয়াফে আবৃত করা ফরয, তার সীমা কি? কোরআন পাক সংক্ষেপে গুপ্ত-অঙ্গ আবৃত করার নির্দেশ দিয়ে এর বিবরণ দানের দায়িত্ব রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর ন্যস্ত করেছে। তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পুরুষের গুপ্তাঙ্গ নাজী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের গুপ্তাঙ্গ মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল বাদে সমস্ত দেহ।

হাদীসসমূহে এসব বিবরণ বর্ণিত রয়েছে। নাজীর নীচের অংশ অথবা হাঁটু খোলা থাকলে পুরুষের জন্যে এরূপ পোশাক এমনিতেও গর্হিত এবং এতে নামাযও আদায় হয় না। এমনিভাবে নারীর মস্তক, ঘাড় অথবা বাহু অথবা পায়ের গোছা খোলা থাকলে এরূপ পোশাক এমনিতে নাজায়েয এবং এতে নামাযও আদায় হয় না। এক হাদীসে বলা হয়েছে : যে গৃহে নারী খোলা মাথায় থাকে, সে গৃহে নেকীর ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

নারীর মুখমণ্ডল, হাতের তালু এবং পদযুগল গুপ্তাঙ্গের বাহিরে রাখা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, নামাযে এসব অঙ্গ খোলা থাকলে নামাযে কোন ত্রুটি হবে না। এর অর্থ এরূপ কখনও নয় যে, মাহরাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সে শরীয়ত সম্মত ওয়র ব্যতীত মুখমণ্ডল খুলে ঘুরাফেরা করবে।

এ হচ্ছে গুপ্তাঙ্গের ফরয সম্পর্কিত বিধান। এটি ছাড়া নামাযই হয় না। নামাযে শুধু গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাই কাম্য নয়; বরং সাজ-সজ্জার পোশাক পরিধান করতেও বলা হয়েছে। তাই পুরুষের উলঙ্গ মাথায় নামায পড়া কিংবা কনুই খুলে নামায পড়া মাকরুহ। হাফশাট পরিহিত অবস্থায় হেঁক কিংবা আস্তিন গুটানো হোক— সর্বাবস্থায় মাকরুহ। এমনিভাবে এমন পোশাক পরে নামায পড়া মাকরুহ, যা পরিধান করে বন্ধু-বান্ধব কিংবা সাধারণ লোকের সামনে যাওয়া লজ্জাজনক মনে করা হয়; যেমন কোর্তা ছাড়া শুধু গেঞ্জি গায়ে নামায পড়া যদিও আস্তিন পূর্ণ হয় কিংবা টুপির পরিবর্তে মাথায় কোন কাপড় অথবা ছোট হাত-রুমাল বেঁধে নামায পড়া। কারণ, রুচি সম্মত ব্যক্তি মাত্রই এ অবস্থায় বন্ধু-বান্ধব অথবা অপরের সামনে যাওয়া পছন্দ করে না। এমতাবস্থায় বিশু পালনকর্তা আল্লাহর দরবারে যাওয়া কিরূপে পছন্দনীয় হতে পারে? মাথা, কাঁধ, কনুই ইত্যাদি খুলে নামায পড়া যে মাকরুহ তা আয়াতে ব্যবহৃত زينت (সাজ-সজ্জা) শব্দ থেকে এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বক্তব্য থেকেও বোঝা যায়।

আয়াতের প্রথম বাক্য যেমন মূর্ততা যুগের আরবদের উলঙ্গতা মিটানোর জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু ভাষার ব্যাপকতা দৃষ্টে তা থেকে

(৩১) হে বনী-আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও— খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না। (৩২) আপনি বলুনঃ আল্লাহর সাজ-সজ্জাকে— যা তিনি বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন : এসব নেয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্যে এবং কিয়ামতের দিন ঋণীতাদের তাদেরই জন্যে। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্যে, যারা বুঝে। (৩৩) আপনি বলে দিন : আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছে— যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছে গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন, সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথার আরোপ করা, যা তোমরা জান না। (৩৪) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি মেয়াদ রয়েছে। যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে। (৩৫) হে বনী-আদম, যদি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে পরগমুর আগমন করে— তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শুনায়, তবে যে ব্যক্তি সযত হয় এবং সংকাজ অবলম্বন করে, তাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (৩৬) যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে এবং তা থেকে অহংকার করবে, তারাও দোষী এবং তথায় চিরকাল থাকবে। (৩৭) অতঃপর ঐ ব্যক্তির চাইতে অধিক জ্বালাম কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে? তারা তাদের গ্রন্থে লিখিত অংশ পেয়ে যাবে। এমন কি, যখন তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফেরেশতার প্রাণ নেওয়ার জন্যে পৌঁছে, তখন তারা বলে : তারা কোথায় গেল, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আহ্বান করতে? তারা উত্তর দেবে : আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে, তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার করবে যে, তারা অবশ্যই কাফের ছিল।

অনেক বিধান ও মাসআলাও জানা গেছে। এমনিভাবে দ্বিতীয় **وَلَا تُشْرِكُوا** বাক্যটিও আরবদের হজ্জের দিনগুলোতে উৎকৃষ্ট পানাহারকে গোনাহ মনে করার কল্পনা মিটানোর জন্যে অবতীর্ণ হলেও ভাষার ব্যাপকতা দৃষ্টে এখানেও অনেক বিধান ও মাসআলা প্রমাণিত হয়।

যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার ফরয : প্রথম, শরীয়তের দিক দিয়েও পানাহার করা মানুষের জন্যে ফরয ও জরুরী। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ পানাহার বর্জন করে, ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয় কিংবা এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে, ফরয কর্মও সম্পাদন করতে অক্ষম হয়, তবে সে আত্মাহুত কাছে অপরাধী ও পাপী হবে।

নিষিদ্ধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছু অবৈধ হয় না : আহকামুল কোরআন জাসাসাসের বর্ণনামতে এ আয়াত থেকে একটি মাসআলা এরূপ বোঝা যায় যে, জগতে পানাহারের যত বস্তু রয়েছে আসলের দিক দিয়ে সেগুলো সব হালাল ও বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিশেষ বস্তুর অবৈধতা ও নিষিদ্ধতা শরীয়তের কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ প্রত্যেক বস্তুকে হালাল ও বৈধ মনে করা হবে। **وَلَا تُشْرِكُوا**

বাক্যে **مَفْعُول** অর্থাৎ, কি বস্তু পানাহার করবে, তা উল্লেখ না করায় এ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবী ভাষায় বিশেষজ্ঞগণ বলেন : এরূপ স্থলে **مَفْعُول** উল্লেখ না করে **مَفْعُول** এর ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তু পানাহার করতে পার - ঐ সব দ্রব্য-সামগ্রী বাদে, যেগুলো স্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে।

পানাহারে সীমালঙ্ঘন বৈধ নয় : আয়াতের শেষ বাক্য **وَلَا تُشْرِكُوا** দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পানাহারের অনুমতি বরং নির্দেশ থাকার সাথে সাথে অপব্যয় করার নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। আয়াতে ব্যবহৃত **اسراف** শব্দের অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। সীমালঙ্ঘন কয়েক প্রকারের হতে পারে। এক, হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পৌছা এবং হারাম বস্তু পানাহার করতে থাকা। এ সীমালঙ্ঘন যে হারাম তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

দুই, আত্মাহুত হালালকৃত বস্তুসমূহকে শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়াই হারাম মনে করে বর্জন করা। হারাম বস্তু ব্যবহার করা যেমন অপরাধ ও গোনাহ তেমনি হালালকে হারাম মনে করাও খোদায়ী আইনের বিরোধিতা ও কঠোর গোনাহ- (ইবনে-কাসীর, মাযহারী, রুহুল-মাআনী)

ক্ষুধা ও প্রয়োজনের চাইতে অধিক পানাহার করাও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। তাই ফেকাহবিদগণ উদর পূর্তির অধিক ভক্ষণ করাকে না-জায়েয লিখেছেন। (আহকামুল-কোরআন) এমনিভাবে শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কম খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়া, ফলে ফরয কর্ম সম্পাদনের শক্তি না থাকা- এটাও সীমালঙ্ঘনের মধ্যে গণ্য। উল্লেখিত উভয় প্রকার অপব্যয় নিষিদ্ধ করার জন্যে কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে :

إِنَّ الْمُدْرِئِينَ الْكَافِرِينَ لَيَكُونُنَّ أَهْلًا لِّعَذَابٍ أَلِيمٍ

অর্থাৎ, অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَالَّذِينَ لَا يَرْفَعُوا أَعْيُنَهُمْ تَحِيَّةً وَلَا يَسْبُحُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

তাবা

অর্থাৎ, আত্মাহুত তাদেরকে পছন্দ করেন, যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করে- প্রয়োজনের চাইতে বেশী ব্যয় করে না এবং কমও করে না।

পানাহারে মধ্য পছাই দ্বীন ও দুনিয়ার জন্যে উপকারী : হযরত ওমর (রাঃ) বলেন : বেশী পানাহার থেকে বেঁচে থাক। কারণ, অধিক পানাহার দেহকে নষ্ট করে, রোগের জন্ম দেয় এবং কর্মে অলসতা সৃষ্টি করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্য পছাই অবলম্বন কর। এটা দৈহিক সুস্থতার পক্ষে উপকারী এবং অপব্যয় থেকে দূরবর্তী। তিনি আরও বলেন : আত্মাহুত তাআলা স্থলদেহী আলেমকে পছন্দ করেন না। (অর্থাৎ, যে বেশী পানাহার করে সে নিজের প্রচেষ্টায়ই স্থলদেহী হয়।) আরও বলেন : মানুষ ততক্ষণ ধ্বংস হয় না, যতক্ষণ না সে মানসিক প্রবৃত্তিকে ধর্মের উপর অগ্রাধিকার দান করে। - (রুহুল-মা'আনী)

বায়হাকী বর্ণনা করেন, একবার রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আয়েশাকে দিনে দু'বার খেতে দেখে বললেন : হে আয়েশা, তুমি কি পছন্দ কর যে, আহার করাই তোমার একমাত্র কাজ হোক ?

এ আয়াতে পানাহার সম্পর্কে যে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে, তা শুধু পানাহারের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং পরিধান ও বসবাসের প্রত্যেক কাজেই মধ্য পছাই পছন্দনীয় ও কাম্য। হযরত ইবনে আক্বাস (রাঃ) বলেন : যা ইচ্ছা পানাহার কর এবং যা ইচ্ছা পরিধান কর, তবে শুধু দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাক। (এক) তাতে অপব্যয় অর্থাৎ, প্রয়োজনের চাইতে বেশী না হওয়া চাই এবং (দুই) গর্ব ও অহঙ্কার না থাকা চাই।

এক আয়াত থেকে আটটি মাসআলা : মোট কথা এই যে, **وَلَا تُشْرِكُوا** বাক্য থেকে আটটি মাসআলার উদ্ভব হয়। (এক)

যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু পানাহার করা ফরয। (দুই) শরীয়তের কোন প্রমাণ দ্বারা কোন বস্তুর অবৈধতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সব বস্তুই হালাল। (তিন) আত্মাহুত তাআলা ও রসুলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ ব্যবহার করা অপব্যয় ও অবৈধ। (চার) যেসব বস্তু আত্মাহুত তাআলা হালাল করেছেন, সেগুলোকে হারাম মনে করাও অপব্যয় এবং মহাপাপ। (পাঁচ) পেট ভরে খাওয়ার পরও আহার করা নাজায়েয। (ছয়) এতটুকু কম খাওয়াও অবৈধ, যদ্বরূপ দুর্বল হয়ে ফরয কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। (সাত) সর্বদা পানাহারের চিন্তায় মগ্ন থাকাও অপব্যয়। (আট) মনে কিছু চাইলেই তা অবশ্যই খাওয়া অপব্যয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে সেসব লোককে হুশিয়ার করা হয়েছে, যারা এবাদতে বাড়াবাড়ি করে এবং স্বকল্পিত সৎকীর্তা সৃষ্টি করে আত্মাহুত তাআলা কর্তৃক হালালকৃত বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা এবং হারাম মনে করাকে এবাদত জ্ঞান করে। যেমন, মক্কার মুশরেকরা হজ্জের দিনগুলোতে তওয়াফ করার সময় পোশাক পরিধানকেই বৈধ মনে করত না এবং আত্মাহুত তাআলা কর্তৃক হালালকৃত ও উপাদেয় খাদ্যসমূহ বর্জন করাকে এবাদত মনে করত।

এহেন লোকদেরকে শাসনোর ভঙ্গিতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, বান্দাদের জন্যে সজ্জিত আত্মাহুত **زِينَت** অর্থাৎ, উত্তম পোশাক এবং আত্মাহুত প্রদত্ত সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্যকে হারাম করেছে ?

উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য বর্জন করা ইসলামের শিক্ষা নয় : উদ্দেশ্য এই যে, কোন বস্তু হালাল অথবা হারাম করা একমাত্র সে সত্তারই কাজ যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। কাজেই সেসব লোক দণ্ডনীয়, যারা আত্মাহুত হালালকৃত উৎকৃষ্ট পোশাক অথবা পবিত্র ও সুস্বাদু খাদ্যকে হারাম মনে করে। সংগতি থাকা সত্ত্বেও জীর্ণবিস্তার থাকা ইসলামের শিক্ষা নয় এবং ইসলামের দৃষ্টিতে পছন্দনীয়ও

নহ্ন যেমন অনেক অঙ্ক লোক মনে করে।

পূর্ববর্তী মনীষীদের অনেককেই আল্লাহ তাআলা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন। তারা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করতেন। দু'জাহানের সর্দার রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও যখন সঙ্গতিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন উৎকৃষ্টতর পোশাকও অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, একবার যখন তিনি বাড়ীর বাইরে আসেন, তখন তাঁর গায়ে এমন চাদর শোভা পাচ্ছিল, যার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম। বর্ণিত আছে, ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) চারশ 'গিনি মূল্যের চাদর ব্যবহার করেছেন। এমনিভাবে হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) সব সময় উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর জন্যে জনৈক বিংশশাণী ব্যক্তি সারা বছরের জন্যে ৩৬০ জোড়া পোশাক নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছিল। যে বশ্রজোড়া তিনি একবার পরিধান করতেন, দ্বিতীয়বার ব্যবহার করতেন না। মাত্র একদিন ব্যবহার করেই কোন দরিদ্র ছাত্রকে দিয়ে দিতেন।

কারণ এই যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা যখন কোন বন্দাকে নেয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখন আল্লাহ তাআলা এ নেয়ামতের চিহ্ন তার পোশাক-পরিচ্ছদে ফুটে উঠাকে পছন্দ করেন। কেননা, নেয়ামতকে ফুটিয়ে তোলাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা। এর বিপরীতে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিন্দবশ্র অথবা মলিন পোশাক পরিধান করা অকৃতজ্ঞতা।

অবশ্য, দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী : (এক) রিয়া ও নাম-যশ এবং (দুই) গর্ব ও অহঙ্কার। অর্থাৎ, শুধু লোক দেখানো এবং নিজের বড় মানুসী প্রকাশ করার জন্যে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করা যাবে না। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ দু'টি বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে হযরত ওমর (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন ছাহাবী থেকে মামুলী পোশাক কিংবা তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করার কথা বর্ণিত আছে। এর কারণ ছিল দ্বিবিধ। প্রথম এই যে, তাঁদের হাতে যে ধনসম্পদ আসত, তা প্রায়ই ফকীর-মিসকীন ও ধর্মীয় কাজে ব্যয় করে ফেলতেন। নিজের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট থাকত না, ফদ্বরা উৎকৃষ্ট পোশাক নিতে পারতেন। দ্বিতীয় এই যে, তিনি ছিলেন সবার অনুসৃত। সাদাসিধা ও সস্তা পোশাক পরে অন্যান্য শাসনকর্তাকে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য ছিল – যাতে সাধারণ দরিদ্র ও ফকীরদের উপর তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভাব না পড়ে।

এমনিভাবে সূফী বুয়ুগগণ শিষ্যদেরকে প্রথম পর্যায়ে সাজ-সজ্জার পোশাক পরিধান করতে এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করতে নিষেধ করেন। এর উদ্দেশ্য এরূপ নয় যে, এসব বস্তু স্থায়ীভাবে বর্জন করা হওয়াবের কাজ, বরং প্রবৃত্তিকে বশে আনার জন্যে প্রথম পর্যায়ে চিকিৎসা ও ঐতিকারার্থে ঐধরনের সাধনার ব্যবস্থা করা হয়। যখন সে প্রবৃত্তিকে বশীভূত করে ফেলে এবং এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, প্রবৃত্তি তাকে হারাম ও নাজায়েযের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে না, তখন সব সূফী বুয়ুগই পূর্ববর্তী সাধক মনীষীদের ন্যায় উত্তম পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য ব্যবহার করেন। তখন এসব উৎকৃষ্ট খাদ্য ও পোশাক তাঁদের জন্যে আধ্যাত্ম পথে বিঘ্ন সৃষ্টির পরিবর্তে অমিক নৈকট্য লাভের উপায় হয়ে যায়।

খোরাক ও পোশাকে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নত : খোরাক ও পোশাক সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সাঃ) ছাহাবী ও তাবয়ীগণের সুন্নতের সারকথা এই যে, এসব ব্যাপারে লৌকিকতা পরিহার করতে হবে। যেরূপ পোশাক ও খোরাক সহজলভ্য তাই কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে

হবে। মোটা ভাত ও মোটা কাপড় জুটলে যে কোন উপায়ে এমনকি, কজ করে হলেও উৎকৃষ্টটি অর্জনের জন্যে চেষ্টাতি হবে না।

এমনিভাবে উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য জুটলে তাকে জেনে শুনে খারাপ মনে করবে না অথবা তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে না। উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্যের পিছনে লাগা যেমন লৌকিকতা, তেমনি উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট করা কিংবা তা বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করাও নিন্দনীয় লৌকিকতা।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এর একটি বিশেষ তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব নেয়ামত; উৎকৃষ্ট পোশাক ও সুস্বাদু খাদ্য প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যাশীল মুমিনদের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাদের কল্যাণেই অন্যেরা ভোগ করতে পারছে। কেননা, এ দুনিয়া হচ্ছে কর্মক্ষেত্র – প্রতীদান ক্ষেত্র নয়। এখানে পার্থিব নেয়ামতের মধ্যে আসল-নকল ও ভালমন্দের পার্থক্য করা যায় না। করশামায় আল্লাহ তাআলার দস্তুরখান সবার জন্যে সমভাবে বিছানো রয়েছে বরং এখানে আল্লাহর রীতি এই যে, মুমিন ও অনুগত বান্দাদের আনুগত্যে কিছু ঐর্ষি হয়ে গেলে অন্যেরা তাদের উপর প্রবল হয়ে পার্থিব নেয়ামতের ভাগুর অধিকার করে বসে এবং তারা দারিদ্র্য ও উপবাসের করাল গ্রাসে পতিত হয়।

কিন্তু এ আইন শুধু এ দুনিয়ারূপী কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পরকালে সমস্ত নেয়ামত ও সুখ কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগত বান্দাদের

জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে। আয়াতের এ বাক্যে তাই বলা হয়েছে : **لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِّنْ لِّمَن لَّمْ يَأْمَنِ** — অর্থাৎ, আপনি বলে দিন : সব পার্থিব নেয়ামত প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনেও মুমিনদেরই প্রাপ্য এবং কিয়ামতের দিন তো এককভাবে তাদের জন্যেই নির্দিষ্ট হবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) মতে এ বাক্যটির অর্থ এই যে, পার্থিব সব নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরকালে শান্তির কারণ হবে না – এ বিশেষ অবস্থাসহ তা একমাত্র অনুগত মুমিন বান্দাদেরই প্রাপ্য। কাফের ও পাপাচারীর অবস্থা এরূপ নয়। পার্থিব নেয়ামত তারাও পায় বরং আরও বেশী পায়; কিন্তু এসব নেয়ামত পরকালে তাদের জন্যে শাস্তি ও স্থায়ী আযাবের কারণ হবে। কাজেই পরিণামের দিক দিয়ে এসব নেয়ামত তাদের জন্যে সম্প্রদান ও সুখের বস্তু নয়।

কোন কোন তফসীরবিদের মতে এর অর্থ এই যে, পার্থিব সব নেয়ামতের সাথে পরিশ্রম, কষ্ট, হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা ও নানারকম দুঃখ-কষ্ট লেগে থাকে, নির্ভেজাল নেয়ামত ও অনাবিল সুখের অস্তিত্ব এখানে নেই। তবে কিয়ামতে যারা এসব নেয়ামত লাভ করবে, তারা নির্ভেজাল অবস্থায় লাভ করবে। এগুলোর সাথে কোনরূপ পরিশ্রম, কষ্ট হস্তচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা এবং কোন চিন্তা-ভাবনা থাকবে না। উপরোক্ত তিন প্রকার অর্থই আয়াতের এ বাক্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাই ছাহাবী ও তাবয়ী তফসীরবিদগণ এসব অর্থই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে: **كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ لِقَاءَ الْوَعْدِ الَّذِي لَمْ يَأْمَنُوا** — অর্থাৎ, “আমি স্বীয় অসীম শক্তির নিদর্শনাবলী জ্ঞানবানদের জন্যে এমনিভাবে খুলে খুলে বর্ণনা করি, যাতে পণ্ডিত-মুর্খ নির্বিশেষে সবাই বুঝে নেয়।” ভাল পোশাক ও ভাল খাদ্য বর্জন করলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন – এ আয়াতে মানুষের এ বাড়াবাড়ি ও মূর্থতাসূলভ ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে।

الإعراف،

১৫৭

ولواتنا

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْبَنِي وَالْأَنْبِيَاءِ
 فِي النَّارِ كَمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ آخِثًا إِذَا دَخَلُوا فِيهَا
 جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَجْتُمْ رَبَّنَا هَذَا أَصَلُوكُمْ فَلَا تَزِمُوا
 عَذَابَ أَصْفَاءٍ مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ①
 وَقَالَتْ أُولَاهُمْ أَخْرَجْتُمْ رَبَّنَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ بَأْسٌ فَضَلُّ
 قَدُورُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ② إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْعَلُ لَهُمْ آيَاتُ السَّمَاءِ وَلَا
 يَخْذُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلْبِغَ الْجَحِيمُ فِي سَمِ الْخِلَابِ وَكَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ③ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ وَهَادٍ وَمِنْ قُوْرِهِمْ عَوَاشٍ
 وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ④ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا أَلًّا وَسَعْمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ⑤ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ فَخَيَّرُوا
 حَتَّى إِذَا نَفَخُوا فِي الْأَنْفُسِ إِلَهُ الَّذِي هَدَانَا لَهُنَا وَأَمَّا كُنَّا
 لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّي بِالْحَقِّ
 وَنُودُوا أَنْ تُلْكُوا الْجَنَّةَ أَوْ رَتُّوا هَهَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ⑥

(৩৮) আল্লাহ বলবেন : তোমাদের পূর্বে জিন ও মানবের যেসব সম্প্রদায় চলে গেছে, তাদের সাথে তোমরাও দোযখে যাও। যখন এক সম্প্রদায় প্রবেশ করবে; তখন অন্য সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করবে। এমনকি, যখন তাতে সবাই পতিত হবে, তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক। এরাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছিল। অতএব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন। আল্লাহ বলবেন : প্রত্যেকেরই দ্বিগুণ; তোমরা জান না। (৩৯) পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদেরকে বলবে : তাহলে আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব, শাস্তি আস্থাদান কর স্বীয় কর্মের কারণে। (৪০) নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্যে আকাশের দূর উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জন্মতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনভাবে পানীদেরকে শাস্তি প্রদান করি (৪১) তাদের জন্যে নরকান্নির শয্যা রয়েছে এবং উপর থেকে চাদর। আমি এমনভাবে জ্বালেনদেরকে শাস্তি প্রদান করি। (৪২) যারা বিশ্রাস স্থাপন করেছে এবং সংকর করেছে আমি কাউকে তার সামর্থ্যের চাইতে বেশী বোঝা দেই না, তারা ই জন্মাতের অধিবাসী। তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। (৪৩) তাদের অন্তরে যা কিছু দুঃখ ছিল, আমি তা বের করে দেব। তাদের উলদেশ দিয়ে নির্বরণী প্রবাহিত হবে। তারা বলবেঃ আল্লাহ শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের রসূল আমাদের কাছে সত্যকথা নিয়ে এসেছিলেন। আওয়াজ আসবে : এটি জন্মাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদান।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে কতিপয় এমন বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। সত্য এই যে, এগুলো বর্জন করলেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা দ্বিবিধ মুখ্যতায় লিপ্ত। একদিকে আল্লাহ তাআলার হালালকৃত উত্তম ও মনোরম বস্ত্রসমূহকে নিজেদের জন্যে অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করে এসব নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং অপরদিকে যেসব বস্ত্র প্রকৃতপক্ষে হারাম ছিল এবং যেগুলো ব্যবহারের পরিণতিতে আল্লাহর গণ্য ও পরকালের শাস্তি অবশ্যস্বাবী ছিল, সেগুলোর ব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পরকালের শাস্তি ক্রয় করেছে। এভাবে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে দু'কূলই হারিয়েছে। বলা হয়েছে :

“যেসব বস্ত্রকে তোমরা অহেতুক হারাম সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো তো হারাম নয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সব নির্লজ্জ কাজ হারাম করেছেন, তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক। আরও হারাম করেছেন প্রত্যেক পাপকাজ, অন্যায়-উৎপীড়ন, বিনা প্রমাণে আল্লাহর সাথে কাজকে অংশীদার করা এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা, যার কোন সনদ তোমাদের কাছে নেই।”

এখানে **ائم** (পাপকাজ) শব্দের আওতায় সেসব গোনাহ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেগুলো মানুষের নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং **يمنى** (উৎপীড়ন) শব্দের আওতায় অপরের সাথে লেনদেন ও অপরের অধিকার সম্পত্তি গোনাহ এসে গেছে। অতঃপর শিরক ও আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ এগুলো সুস্পষ্টভাবেই বিশ্রাসগত মহাপাপ।

প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় আয়াতে মূশরেকদের দুটি ব্রাহ্ম কাজ বর্ণিত হয়েছিল। (এক) হালালকে হারাম করা এবং (দুই) হারামকে হালাল করা। তৃতীয় আয়াতে তাদের ভয়াবহ পরিণাম এবং পরকালীন শাস্তি ও আযাব বর্ণনা করা হয়েছে :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَعْتِرِفُونَ

অর্থঃ, যেসব অপরাধী সর্ব প্রকার অবাব্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের মধ্যে লালিত-পালিত হচ্ছে এবং বাহ্যতঃ তাদের উপর কোন আযাব আসতে দেখা যায় না, তারা যেন আল্লাহ তাআলার এ চিরাচরিত রীতি সম্পর্কে উদাসীন না থাকে যে, তিনি অপরাধীদেরকে ক্ৰপাশতঃ ঢিল দিতে থাকেন, যাতে কোনরকমে তারা স্বীয় কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়; কিন্তু আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে এ ঢিল ও অবকাশের একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট থাকে। যখন এ মেয়াদ এসে যায়, তখন এক মুহূর্তও আগেপিছে হয় না এবং তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করা হয়। কখনও দুনিয়াতেই আযাব এসে যায়, এবং যদি দুনিয়াতে না আসে, তবে মৃত্যুর সাথে সাথেই আযাবে প্রবৃষ্ট হয়ে যায়।

এ আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেপিছে না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটি এমন একটি বাকপদ্ধতি, যেমন আমাদের পরিভাষায় ক্রেতা দোকানদারকে বলে : মূল্য কিছু কম-বেশী হতে পারবে কি না? এখানে জানা কথা যে, বেশী মূল্য তার কাম্য নয়- কম হবে কিনা, তাই জিজ্ঞেস করে। কিন্তু ক্রমের অনুগামী করে বেশীও উল্লেখ করা হয়। এমনভাবে এখানে আসল উদ্দেশ্য এই যে, নির্দিষ্ট মেয়াদের পর বিলম্ব হবে না। কিন্তু সাধারণের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী বিলম্বের সাথে আগে হওয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বে কতিপয় আয়াতে একটি অসীকার বর্ণিত হয়েছে। এটি প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে তার দুনিয়াতে আগমনের পূর্বে আত্মা জগতে নেয়া হয়েছিল। অসীকারটি ছিল এই : যখন আমার পয়গম্বর তোমাদের কাছে

আমার নির্দেশাবলী নিয়ে আসবেন, তখন মনে-প্রাণে সেগুলো মেনে নেবে এবং তদনুযায়ী কাজ করবে। এ কথাও বলে দেয়া হয়েছিল যে, দুনিয়াতে আগমনের পর যে ব্যক্তি এ অঙ্গীকারে অটল থেকে তা পূর্ণ করবে, সে যাবতীয় দুঃখ ও চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যে পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলবে এবং তাদের নির্দেশাবলী অমান্য করবে, তাদের জন্যে জাহান্নামের চিরস্থায়ী শাস্তি অপেক্ষমান রয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সে পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে, যা দুনিয়াতে আগমনের পর বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সৃষ্টি করেছে। কেউ অঙ্গীকার ভুলে গিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে আবার কেউ তাতে অটল রয়েছে এবং তদনুযায়ী সংকর্ম সম্পাদন করেছে। এ উভয় দলের পরিণতি এবং আযাব ও ছণ্ডাব আলোচ্য চার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে অঙ্গীকার ভঙ্গকারী অবিশ্বাসীদের কথা এবং শেষ দু'আয়াতে অঙ্গীকার পূর্ণকারী মুমিনদের কথা আলোচিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : যারা পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলেছে এবং আমার নির্দেশাবলীর প্রতি ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে, তাদের জন্যে আকাশের দরজা খোলা হবে না।

তফসীর বাহুরে মুহীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের বর্ণিত এক তফসীরে উল্লেখ রয়েছে যে, তাদের আমল ও তাদের দোয়ার জন্যে আকাশের দরজা খোলা হবে না। অর্থাৎ, তাদের দোয়া কবুল করা হবে না এবং তাদের আমলকে ঐ স্থানে যেতে দেয়া হবে না, যেখানে আল্লাহর নেক বান্দাদের আমলসমূহ সংরক্ষিত রাখা হয়। কোরআনের সূরা মুতাকফিফীনে এ স্থানটির নাম ইল্লিয়ীন বলা হয়েছে। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও উল্লিখিত বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বলা হয়েছে : **الْيَوْمَ نَصِفُكَ الْكَاذِبَ وَالْمُنْكَرَ الْكَافِرَ**

অর্থাৎ, মানুষের পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ তাআলার দিকে উর্ধ্বগামী হয় এবং সংকর্ম সেগুলোকে উখিত করে। অর্থাৎ, মানুষের সংকর্মসমূহ পবিত্র ও বাক্যাবলী আল্লাহর বিশেষ দরবারে পৌঁছানোর কারণ হয়।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে অপর এক রেওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবী থেকে এমনও বর্ণিত আছে যে, কাফেরদের আত্মার জন্যে আকাশের দরজা খোলা হবে না। এসব আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। এ বিষয়বস্তুর সমর্থন হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ)-এর ঐ হাদীস থেকে পাওয়া যায়, যা আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে-মাজা ও ইমাম আহম্মদ বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সংক্ষেপে এই :

‘রসূলুল্লাহ (সাঃ) জনৈক আনসারী সাহাবীর জানাযায় গমন করেন। কবর প্রস্তুতে কিছু বিলম্ব দেখে তিনি এক জায়গায় বসে যান। সাহাবায়ে কোরামও তাঁর চারদিকে চূচাপ বসে যান। তিনি মাথা উচু করে বললেন : মুমিন বান্দার মৃত্যুর সময় হলে আকাশ থেকে সাদা ধবধবে চেহারাশিষ্ট ফেরেশতারা আগমন করে। তাদের সাথে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধি থাকে। তারা মরণোন্মুখ ব্যক্তির সামনে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত আযরাঈল আসেন এবং তার আত্মাকে সম্বোধন করে বলেন : হে নিশ্চিস্ত আত্মা, পালনকর্তা মাগফেরাত ও সন্তুষ্টির জন্যে বের হয়ে আস। তখন তার আত্মা এমন অনায়াসে বের হয়ে আসে, যেমন মশকের মুখ খুলে দিলে তার পানি বের হয়ে আসে। মৃত্যুদূত তার আত্মাকে হাতে নিয়ে উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে সমর্পন করেন। ফেরেশতারা তা নিয়ে রওয়ানা হলে পশ্চিমধ্যে একদল ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা

জিজ্ঞেস করে : এ পাক আত্মা কার? ফেরেশতারা তার ঐ নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যা দুনিয়াতে তার সম্মানার্থ ব্যবহার হত এবং বলে : ইনি হচ্ছেন অমুকের পুত্র অমুক। ফেরেশতারা তার আত্মাকে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খোলতে বলে। দরজা খোলা হয়। এখান থেকে আরও ফেরেশতা তাদের সঙ্গী হয়। এভাবে তারা সপ্তম আকাশে পৌঁছে। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন : আমার এ বান্দার আমলনামা ইল্লিয়ীনে লিখ এবং তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। এ আত্মা আবার কবরে ফিরে আসে। কবরে হিসাব গ্রহণকারী ফেরেশতা এসে তাকে উপবেশন করায় এবং প্রশ্ন করে : তোমার পালনকর্তা কে? তোমার ধর্ম কি? সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ তাআলা এবং ধর্ম ইসলাম। এর পর প্রশ্ন হয় : এই যে ব্যক্তি, যিনি তোমাদের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে বলে : ইনি আল্লাহর রসূল। তখন একটি গায়েবী আওয়াজ হয় যে, আমার বান্দা সত্যবাদী। তার জন্যে জান্নাতের শয্যা পেতে দাও, জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও এবং জান্নাতের দিকে তার দরজা খুলে দাও। এ দরজা দিয়ে জান্নাতের সুগন্ধি ও বাতাস আসতে থাকে। তার সংকর্ম একটি সুশ্রী আকৃতি ধারণ করে তাকে সঙ্গ দোয়ার জন্যে তার কাছে এসে যায়।

‘এর বিপরীতে কাফেরের মৃত্যু সময় উপস্থিত হলে আকাশ থেকে কাল রঙের ভয়ঙ্কর মূর্তি ফেরেশতা নিকট চট নিয়ে আগমন করে এবং তার বিপরীত দিকে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত তার আত্মা এমনভাবে বের করে, যেমন কোন কাঁটা-বিশিষ্ট শাখা ভিজা পশমে জড়িয়ে থাকলে তাকে সেখান থেকে টেনে বের করা হয়। আত্মা বের হলে তার দুর্গন্ধ মৃত জন্তুর দুর্গন্ধের চাইতেও প্রকট হয়। ফেরেশতারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হলে পশ্চিমধ্যে একদল ফেশেতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তারা জিজ্ঞেস করে : এ দুরাত্মাটি কার? ফেরেশতারা তখন তার ঐ হীনতম নাম ও উপাধি উল্লেখ করে, যদ্বারা সে দুনিয়াতে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ, সে অমুকের পুত্র অমুক। অতঃপর প্রথম আকাশে পৌঁছে দরজা খুলতে বললে তার জন্যে দরজা খোলা হয় না বরং নির্দেশ আসে যে, এ বান্দার আমলনামা সিঙ্জীনে রেখে দাও। সেখানে অব্যাহত বান্দাদের আমলনামা রাখা হয়। এ আত্মাকে নীচে নিক্ষেপ করা হয় এবং তা পুনরায় দেহে প্রবেশ করে। ফেরেশতারা তাকে কবরে বসিয়ে মুমিন বান্দার অনুরূপ প্রশ্ন করে। সে প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে কেবল **هَـا هَـا اَدْرٰى** (হায় হায় আমি জানি না) বলে। তাকে জাহান্নামের শয্যা ও জাহান্নামের পোষাক দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দিকে দরজা খুলে দেয়া হয়। ফলে তার কবরে জাহান্নামের উত্তাপ পৌঁছতে থাকে এবং কবরকে তার জন্যে সংকীর্ণ করে দেয়া হয়।

আয়াতের শেষে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَلَا يَذْكُرُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَهَنَّمُ فِي سَمِّ النَّارِ

‘**يلج**’ শব্দটি **لَوَج** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংকীর্ণ জায়গায় প্রবেশ করা। **جل** এর অর্থ উট এবং **سم** এর অর্থ সূচের ছিদ্র। অর্থ এই যে, তারা ভতর্কণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতর্কণ না উঠের মত বিরাট বপু জন্তু সূচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা যেমন স্বভাবতঃ অসম্ভব, তেমনি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাও অসম্ভব। এতে তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতঃপর তাদের আযাবের অধিকতর তীব্রতা বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

وَهُـا ۚ لَهُـمْ فِي جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَفِيهَا زُجُجٌ ۚ وَهُمْ لَا يُخْرَجُونَ

শব্দের অর্থ বিছানা এবং **زُجُجٌ** শব্দটি **عَاشِيَةٌ** এর বহুবচন। এর অর্থ আবৃতকারী বস্ত্র। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের চাদর ও শয্যা সবই জাহান্নামের

হবে। প্রথম আয়াতে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তার শেষে **وَذَلِكَ جَزَاءُ الْيَغْيُومِينَ** বলা হয়েছিল। দ্বিতীয় আয়াতে জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করার পর **وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ** বলা হয়েছে। কেননা, এটি আগেরটির চাইতে গুরুতর।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহর নির্দেশাবলী যারা পালন করে, তাদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতের অধিবাসী এবং জান্নাতেই অনন্তকাল বসবাস করবে।

শরীয়তের নির্দেশাবলী সহজ করা হয়েছে : কিন্তু তাদের জন্যে সেখানে বিশ্রাস স্থাপন করা ও সংকর্ম সম্পাদন করার শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, কৃপাবশত : এ কথাও বলা হয়েছে : **لَا يَكُونُ فَنَسًا إِلَّا أَرْوَسًا** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা কোন বান্দার উপর এমন বোঝা চাপান না, যা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে। উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্যে যেসব সংকর্ম শর্ত করা হয়েছে, সেগুলো মানুষের সাধ্যাতীত কঠিন কাজ নয়। বরং আল্লাহ তাআলা প্রতি ক্ষেত্রেই শরীয়তের নির্দেশাবলী নরম ও সহজ করেছেন। প্রত্যেক নির্দেশে অসুস্থতা, দুর্বলতা, সফর ও অন্যান্য মানবিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

তফসীর বাহরে মুহীতে বলা হয়েছে : মানুষকে সংকর্মের আদেশ দেয়ার সময় এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, সব সংকর্ম সর্বত্র ও সর্ববিস্তার পালন করা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়ার কারণে আদেশটি তাদের জন্যে কঠিন হতে পারে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণার্থে বলা হয়েছে : আমি মানব জীবনের সকল কাল ও অবস্থা যাচাই করে সর্ববিস্তার সব সময় ও সব জায়গার জন্যে উপযুক্ত নির্দেশাবলী প্রদান করি। এগুলোর বাস্তবায়ন মোটেই কঠিন কাজ নয়।

জান্নাতীদের মন থেকে পারম্পরিক মালিন্য অপসারণ করা হবে : চতুর্থ আয়াতে জান্নাতীদের দু'টি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। (এক) : **وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ فَخَيَّرْنَا لَهُمْ** অর্থাৎ, জান্নাতীদের অন্তরে পরস্পরের পক্ষ থেকে যদি কোন মালিন্য থাকে, তবে আমি তা তাদের অন্তর থেকে অপসারণ করে দেব। তারা একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট ও ভাই ভাই হয়ে জান্নাতে যাবে এবং বসবাস করবে।

ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, মুমিনরা যখন পুলসিরাত অতিক্রম করে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ করবে, তখন জান্নাত ও দোষের মধ্যবর্তী এক পুলের উপর তাদেরকে থামিয়ে দেয়া হবে। তাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কারও প্রতি কারও কোন কষ্ট থাকে কিংবা কারও কাছে কারও পাওনা থাকে, তবে এখানে পৌঁছে পরস্পরে প্রতিদান নিয়ে পারম্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার করে নেবে। এভাবে হিংসা দ্বেষ, শত্রুতা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পূতপবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তফসীর মাযহারীতে আছে, এ পুল বাহ্যতঃ পুলসিরাতের শেষ প্রান্ত এবং জান্নাত সলংগ। আল্লামা সুযুতী প্রমুখ এ মতই গ্রহণ করেছেন।

এ স্থলে যেসব পাওনা দাবী করা হবে সেগুলো টাকা পয়সা দ্বারা পরিশোধ করা যাবে না। কারণ, সেখানে কারও কাছে টাকা-পয়সা থাকবে না। মুসলিমের এক হাদীস অনুযায়ী সংকর্ম দ্বারা এ সব পাওনা পরিশোধ করা হবে। যদি কারও সংকর্ম এভাবে নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং তার পরেও পাওনা বাকী থাকে, তবে প্রাপকের গোনাহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ ব্যক্তিকে সর্বাধিক নিঃশব্দ বলে আখ্যা দিয়েছেন, যে দুনিয়াতে সংকর্ম সম্পাদন করে, কিন্তু অপরের পাওনার প্রতি আক্ষেপ করে না, ফলে পরকালে সে যাবতীয় সংকর্ম থেকে রিস্তহস্ত হয়ে পড়ে।

এ হাদীসে পাওনা পরিশোধের সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে এরূপ করা জরুরী নয়। ইবনে কাহীর ও তফসীরে মাযহারীর বর্ণনা অনুযায়ী সেখানে প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতিরেকে পারম্পরিক হিংসা ও মালিন্য দূর হয়ে যাওয়াও সম্ভব।

যেমন, কোন কোন হাদীসে আছে, তারা পুলসিরাত অতিক্রম করে একটি ঝর্ণার কাছে পৌঁছবে এবং পানি পান করবে। এ পানির বৈশিষ্ট্য এই যে, সবার মন থেকে পারম্পরিক হিংসা ও মালিন্য ধোয়ে-মুছে যাবে। ইমাম কুরতবী (রহঃ) কোরআন পাকের **وَسَقُومُهُمْ ذُكْرًا وَأَبْطَهَوْرًا** আয়াতের তফসীরও তাই বর্ণনা করেছেন যে, এ পানি দ্বারা সবার মনের কলহ ও মালিন্য ধোয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

হযরত আলী মুর্তাযা (রাঃ) একবার এ আয়াতে পাঠ করে বললেন : আমি আশা করি আমি, ওসমান, তালহা ও যুযায়ের ঐ সব লোকের অন্তর্ভুক্ত হব, যাদের বন্ধ জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে মনোমালিন্য থেকে পরিষ্কার করে দেয়া হবে। (ইবনে কাসীর) বলাবাহুল্য, দুনিয়াতে তাঁদের পারম্পরিক মতবিরোধ দেখা দেয়ার ফলে যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত জান্নাতীদের দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, জান্নাতে পৌঁছে তারা আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, তিনি তাদেরকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং জান্নাতের পথ সহজ করে দিয়েছেন। তারা বলবে : যদি আল্লাহ তাআলা কৃপা না করতেন, তবে এখানে পৌঁছার সাধ্য আমাদের ছিল না।

এতে বোঝা যায় যে, কোন মানুষ কেবল স্বীয় প্রচেষ্টায় জান্নাতে যেতে পারে না, যে পর্যন্ত না তার প্রতি আল্লাহ তাআলার কৃপা হয়। কেননা, স্বয়ং প্রচেষ্টা তার ইচ্ছাধীন নয়। এটাও শুধু আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহই অর্জিত হয়ে থাকে।

হেদায়তের বিভিন্ন স্তর : ইমাম রাগেব ইম্পাহানী 'হেদায়ত' শব্দের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত চমৎকার ও গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তা এই যে, 'হেদায়ত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। এর বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সত্য এই যে, আল্লাহর দিকে যাওয়ার পথ প্রাপ্তির নামই হেদায়ত। তাই আল্লাহর নৈকট্যের স্তর যেমন বিভিন্ন ও অনন্ত, তেমনি হেদায়তের স্তরও অত্যধিক বিভিন্ন। কুফর ও শিরক থেকে মুক্তি ও ঈমান এর সর্বনিম্ন স্তর। এরই মাধ্যমে মানুষের গতিধারা বাস্তব পথ থেকে সরে আল্লাহ মুখী হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ও বান্দার মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা অতিক্রম করার প্রত্যেক স্তরই হেদায়ত। তাই হেদায়ত অনুেষণ থেকে কখনও কোন মানব এমনকি, নবী-রসূল পর্যন্ত নিলিপ্ত হতে পারেন না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) জীবনের শেষ পর্যন্ত **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** দোআটি যেমন উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনি নিজেও যত্নসহকারে অব্যাহত রেখেছেন। কেননা, আল্লাহর নৈকট্যের স্তরের কোন শেষ নেই। এমন কি, আলোচ্য আয়াতে জান্নাতে প্রবেশকেও হেদায়ত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, এটি হচ্ছে হেদায়তের সর্বশেষ স্তর।

[illegible]

(৪৩) জ্ঞানাতীরা দোষখীদেরকে ডেকে বলবে : আমাদের সাথে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি। অতএব, তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য পেয়েছ? তারা বলবে : হাঁ। অতঃপর একজন ঘোষক উভয়ের মাঝখানে ঘোষণা করবে : আল্লাহর অভিসম্পাত জ্বলেমদের উপর, (৪৪) যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অনুশ্রম করত। তারা পরকালের বিষয়েও অবিশ্বাসী ছিল। (৪৫) উভয়ের মাঝখানে একটি প্রাচীর থাকবে এবং আরাকের উপরে অনেক লোক থাকবে। তারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দ্বারা চিনে নেবে। তারা জ্ঞানাতীদেরকে ডেকে বলবে : তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা তখনও জ্ঞান্নাতে প্রবেশ করবে না, কিন্তু প্রবেশ করার ব্যাপারে আগ্রহী হবে। (৪৬) যখন তাদের দৃষ্টি দোষখীদের উপর পড়বে, তখন বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এ জ্বলেমদের সাথী করো না। (৪৮) আশাবাসীরা যাদেরকে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে, তাদেরকে ডেকে বলবে তোমাদের দলবল ও ঔদ্ধত্য তোমাদের কোন কাজে আসেনি। (৪৯) এরা কি তারাি; যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, আল্লাহ এদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন না। প্রবেশ কর জ্ঞান্নাতে। তোমাদের কোন আশঙ্কা নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না। (৫০) দোষখীরা জ্ঞান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে : আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ তোমাদেরকে যে বুখী দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা বলবে : আল্লাহ এই উভয় বস্তু কাকেরদের জন্যে নিষিদ্ধ করেছেন, (৫১) তারা স্বীয় ধর্মকে তামাশা ও খেলা বানিয়ে নিয়েছিল এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল। অতএব, আমি আজকে তাদেরকে ভুলে যাব; যেমন তারা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করত।

জ্ঞানাত্মীরা জ্ঞানতে এবং দোষখীরা দোষথে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌছে গেলে বাহ্যতঃই উভয় স্থানের মধ্যে সব দিক দিয়ে বিরাট ব্যবধান হবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, উভয় স্থানের মাঝখানে এমন কিছু রাস্তা থাকবে, যার ফলে একে অপরকে দেখতে পারবে এবং পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর হবে।

সূরা ছাফফাতে দু'ব্যক্তির কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা দুনিয়াতে একে অপরের সঙ্গী ছিল; কিন্তু একজন ছিল মুমিন আর অপর জন ছিল কাফের। পরকালে যখন মুমিন জান্নাতে এবং কাফের দোযখে চলে যাবে, তখন তারা এখে অপরকে দেখবে এবং কথাবার্তা বলবে। বলা হয়েছে : “জান্নাতী সাথী উকি দিয়ে দোযখী সাথীকে দেখবে এবং তাকে দোযখের মধ্যস্থলে পতিত পাবে। সে বলবে : হতভাগা, তোর ইচ্ছা ছিল আমিও তোর মত বরবাদ হয়ে যাই। যদি আল্লাহর কৃপা না হত, তবে আজ আমিও তোর সাথে জাহান্নামে পড়ে থাকতাম। তুই আমাকে বলতে যে, এ দুনিয়ার মৃত্যুর পর কোন জীবন, কোন হিসাব-কিতাব বা সওয়াব-আযাব হবে না।” এখন দেখলি এসব কি হচ্ছে?

আলোচ্য আয়াতসমূহ ও পরবর্তী প্রায় এক ককু পর্যন্ত এধরনেরই কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে, যা জ্ঞান্নাতী ও দোষাধীদের মধ্যে হবে।

জ্ঞানাত ও দোষখের মাফখানে একে অপরকে দেখা ও কথাবার্তা বলার পথও প্রকৃতপক্ষে দোষখীদের জন্যে এক প্রকার আযাব হবে। চারদিক থেকে তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষিত হবে। জ্ঞানাতীদের নেয়ামত ও সুখ দেখে দোষখের আশুনের সাথে সাথে অনুতাপের আশুনেও তারা দগ্ধ হবে। অপরপক্ষে জ্ঞানাতীদের নেয়ামত ও সুখে এক নতুন সংযোজন হবে। কেননা, প্রতিপক্ষের বিপদ দেখে নিজ সুখ ও নেয়ামতের মূল্য বেড়ে যাবে। যারা দুনিয়াতে ধার্মিকদের প্রতি বিদ্রোহ-বাণ বর্ষণ করত এবং তারা কোনরূপ প্রতিশোধ নিত না, আজ তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় আযাবে পতিত দেখে তারা হাসবে যে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল তারা পেয়ে গেছে। কোরআন পাকে এ বিষয়টি সূরা ‘মুতাফফেফীনে’ এভাবে বিধৃত হয়েছে :

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَذْلَٰكِ
يُنْظُرُونَ - هَلْ ثُبُوبٌ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

দোষীদেরকে তাদের পঞ্চভ্রষ্টতার জন্যে হুশিয়ারী এবং বোকাশূলভ
কথাবার্তার জন্যে ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও তিরস্কার করা হবে। তারা
তাদেরকে সম্মোহন করে বলবে : - هَذِهِ الْأَنْبِيَاءُ كُذِّبُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

এ হচ্ছে ঐ আগুন, যাকে তোমরা মিথ্যা
 বলাতে। এখন দেখ এটা কি জ্বাদু, না তোমরা চোখে দেখ না।

এমনিভাবে আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, জ্ঞানুভীরা দোষখীদেরকে প্রশ্ন করবে : আমাদের পালনকর্তা আমাদের সাথে যেসব নেয়ামত ও সুখের ওয়াদা করেছিলেন, আমরা সেগুলো সম্পূর্ণ সঠিক পেয়েছি। তোমরা বল, তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, তা তোমাদের সামনে এসেছে কিনা? তারা স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি।

তাদের এ প্রশ্নোত্তরের সমর্থনে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ফেরেশতা ঘোষণা করবে যে, জালেমদের উপর আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত হোক। তারা মানুষকে আল্লাহর পথে আসতে বাধা দিত এবং পরকালে অবিশ্বাস করত।

আ'রাফবাসী কারা : জান্নাতী ও দোষীদের পারস্পরিক কথাবার্তা প্রসঙ্গে তৃতীয় আয়াতে আরও একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু লোক এমনও থাকবে, যারা দোষ থেকে তো মুক্তি পাবে, কিন্তু তখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করার আশা পোষণ করবে। তাদেরকেই আ'রাফবাসী বলা হয়।

আ'রাফ কি? সূরা হাদীদের আয়াত থেকে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এতে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে তিনটি দল হবে। (এক) সুস্পষ্ট কাফের ও মুশরিক। এদের পুলসেরাতে চলার প্রশ্নই উঠবে না। এর আগেই জাহান্নামের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া হবে। (দুই) মুমিনের দল। তাদের সাথে ঈমানের আলো থাকবে। (তিন) মুনাফেকের দল। এরা দুনিয়াতে মুসলমানদের সাথে লাগা থাকত। সেখানেও প্রথম দিকে সাথে লাগা থাকবে এবং পুলসেরাতে চলতে শুরু করবে। তখন একটি ভীষণ অন্ধকার সবাইকে ঘিরে ফেলবে। মুমিনরা ঈমানের আলোর সাহায্যে সামনে এগিয়ে যাবে। মুনাফেকরা ডেকে ডেকে তাদেরকে বলবে : একটু আস। আমরাও তোমাদের আলো দ্বারা উপকৃত হই। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ফেরেশতা বলবে : পেছনে ফিরে যাও এবং সেখানেই আলো তালাশ কর। উদ্দেশ্য এই যে, এ আলো হচ্ছে ঈমান ও সংকর্মের। এ আলো হাশিল করার স্থান পেছনে চলে গেছে। যারা সেখানে ঈমান ও সংকর্মের মাধ্যমে এ আলো অর্জন করেনি, তারা আজ আলো দ্বারা উপকৃত হবে না। এমতাবস্থায় মুমিন ও মুনাফেকদের মধ্যে একটি প্রাচীর বেটনী দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। এতে একটি দরজা থাকবে। দরজার বাইরে কেবলই আযাব দৃষ্টিগোচর হবে এবং ভেতরে মুমিনরা থাকবে। তাদের সামনে আল্লাহর রহমত এবং জান্নাতের মনোরম পরিবেশ বিরাজ করবে।

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِوَجْهِهِمْ

ইবনে জরীর ও অন্যান্য তফসীরের মতে এ আয়াতে ۞ قَالَ ۞ বলে এ প্রাচীর বেটনীকেই বোঝানো হয়েছে। এ প্রাচীর বেটনীর উপরিভাগের নামই আ'রাফ। কেননা, আ'রাফ'ওরকে'র বহুবচন। এর অর্থ প্রত্যেক বস্তুর উপরিভাগ। কারণ, দূর থেকে এ ভাগই 'মারফ' তথা খ্যাত হয়ে থাকে। এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, জান্নাত ও দোষীদের মধ্যবর্তী প্রাচীর-বেটনীর উপরিভাগকে আ'রাফ বলা হয়। আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাশরে এ স্থানে কিছুসংখ্যক লোক থাকবে। তারা জান্নাত ও দোষ উভয় দিকের অবস্থা নিরীক্ষণ করবে এবং উভয়পক্ষের লোকদের সাথে প্রশ্নোত্তর ও কথাবার্তা বলবে।

সালামের মসনুন শব্দ : আ'রাফবাসীদের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা জ্ঞাত হওয়ার পর এখন আয়াতের বিষয়বস্তু দেখুন। বলা হয়েছে : আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদের ডেকে বলবে : সালামুন আলাইকুম। এ বাক্যটি দুনিয়াতেও পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় সম্মান প্রদর্শনার বলা হয় এবং বলা সুলত। মৃত্যুর পর কবর বিয়ারতের সময় এবং হাশর ও কয়ামতেও বলা হবে। কিন্তু আয়াত ও হাদীসদুটে জানা যায় যে, দুনিয়াতে আসসালামু আলাইকুম বলা সুলত। কবর বিয়ারতের জন্যে কোরআন পাকে

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ الْوَالِدَاتِ

হয়েছে। ফেরেশতাগণ যখন জান্নাতীদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে, তখনও বলা হবে - سَلَامٌ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ الْوَالِدَاتِ আলোচ্য আয়াতেও আ'রাফবাসীরা জান্নাতীদেরকে এ বাক্য দ্বারা সালাম করবে।

অতঃপর আ'রাফবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা এখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু এ ব্যাপারে আগ্রহী। অতঃপর বলা হয়েছে “আরাফবাসীদের দৃষ্টি যখন দোষীদের উপর পড়বে এবং তাদের শাস্তি ও বিপদ প্রত্যক্ষ করবে, তখন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে যে, আমাদেরকে এসব জালেমের সাথী করবেন না।”

وَلَقَدْ جِئْتَهُم بِكِتَابٍ فَخَّلْنَاهُ عَلَىٰ عَلَيْهِمْ هُدًى وَرَحْمَةً
 لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي
 تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ سُوءُوا مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ
 رَبِّنَا بِالْحَقِّ قَوْلَ لَتَأْمُنَ شُعَاعًا قَدْ شَفَعُوا لَنَا أَوْرَدُ مُغْتَمِلٍ
 غَيْرَ الَّذِي لَتَأْمُنَ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا
 كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ إِنَّ رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى الْكِلَ
 الْتَهَارَ يُطَلِّبُهُ حَيْثُ أَتَى الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجُودُ مُسْتَرْجَبٌ
 بِأَمْرِ الْآلَةِ الْخَلْقِ وَالْمَرْءِ تَوَكَّلْ اللَّهُ رَبَّ الْمَلَكِينَ ۝ إِذْ جَاءُوا
 رَبَّهُمْ فَقَرَّبَهُمْ وَأَخْبَتَهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ لِيَوْمِهِمْ أَهْلٌ لِّقَبُولِهِ
 فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
 اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلَ الرِّيحَ
 بُشْرًا لِّبَنِي إِدْرِكَ رَحْمَةً حَتَّىٰ إِذَا أَفْلَحَ صَاحِبُهَا بِهَبَ الْهَبَ
 سُقْنَهُ لِيَكُنِيَ مَيْتٌ فَأَنْزَلْنَاهُ يَدُ الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
 كُلَّ الثَّمَرِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

(৫২) আমি তাদের কাছে গ্রন্থ পৌছিয়েছি, যা আমি স্বীয় জ্ঞানে বিস্তারিত করি। যা পঞ্চদশের এক মুমিনদের জন্যে রহস্য। (৫৩) তারা কি এমন এ অপেক্ষাই আছে যে, এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হোক? যেদিন এর বিষয়বস্তু প্রকাশিত হবে, সেদিন পূর্বে যারা একে ভুলে গিয়েছিল, তারা কবে : বাস্তবিকই আমাদের প্রতিপালকের পয়গম্বরগণ সত্যসহ আগমন করেছিলেন। অতএব, আমাদের জন্যে কোন সুশাসিকারী আছে কি যে, সুশাসিত করবে অথবা আমাদেরকে পুণ্ড্র প্রেরণ করা হলে আমরা পূর্বে যা করতাম তার বিপরীত কাজ করে আসতাম। নিশ্চয় তারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা মনগড়া যা বলত, তা উঠাও হয়ে যাবে। (৫৪) নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি পরিয়ে দেন রাতের উপর দিনকে এমনভাবে যে, দিন দৌড়ে দৌড়ে রাতের পিছনে আসে। তিনি সৃষ্টি করেছেন সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র স্বীয় আদেশের অনুযায়ী। তখন রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা। আল্লাহ্, বরকতময় যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। (৫৫) তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকূতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৫৬) পৃথিবীকে কৃষ্ণকারমুক্ত ও ঠিক করার পর তাতে অর্ধ সৃষ্টি করে না। তাঁকে আহ্বান কর ভয় ও আশা সহকারে। নিশ্চয় আল্লাহ্ রক্ষণা সাক্ষরীদের নিকটবর্তী। (৫৭) তিনি বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ণ মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে একটি সূত শব্দের দিকে ঠিকিয়ে দেই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনভাবে যে মৃতদেরকে পেরে করব—যাতে তোমরা চিন্তা কর।

আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করা এবং একটি বিশেষ অটল ব্যবস্থার অনুগামী হয়ে তাদের নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম শক্তির কথা বর্ণনা করে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষকে চিন্তার আহ্বান জানানো হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা এ বিশাল বিশ্ব সৃষ্টি করতে এবং বিজ্ঞানোচিত ব্যবস্থাব্যবস্থানে পরিচালনা করতে সক্ষম, তাঁর জন্য এসব বস্তুকে ধ্বংস করে কেয়ামতের দিন পুনরায় সৃষ্টি করা কি কঠিন কাজ? তাই কেয়ামতকে অস্বীকার না করে একমাত্র তাঁকেই স্বীয় পালনকর্তা মনে কর, তার কাছেই প্রয়োজনাদি প্রার্থনা কর, তাঁরই এবাদত কর এবং সৃষ্ট বস্তুকে পূজা করার পদ্ধতি থেকে বের হয়ে সত্যকে চিন। এ আয়াতে বলা হয়েছে : আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের পালনকর্তা। তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার কারণ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করতে সক্ষম। স্বয়ং কোরআন পাকেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে একথা বার বার বলা হয়েছে। কোথাও বলা হয়েছে : “এক নিমেষের মধ্যে আমার আদেশ কার্যকরী হয়ে যায়।” কোথাও বলা হয়েছে :

“আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন বলে দেন : হয়ে যাও। আর সঙ্গে সঙ্গে তা সৃষ্টি হয়ে যায়।” এমনভাবে বিশ্ব সৃষ্টিতে ছয় দিন লাগার কারণ কি?

তফসীরবিদ হযরত সায়ীদ ইবনে জোবায়র (রঃ) এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন : আল্লাহ্ তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমেষে সব কিছু সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু মানুষকে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই এতে ছয় দিন ব্যয় করা হয়েছে।

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টির পূর্বে দিবা-রাত্রির পরিচয় কি ছিল?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, সূর্যের পরিক্রমণের ফলে দিন ও রাত্রির সৃষ্টি। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বে যখন চন্দ্র-সূর্যই ছিল না, তখন ছয় দিনের সংখ্যা কি হিসাবে নিরূপিত হল?

কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন : ছয় দিন বলে এতটুকু সময় বোঝানো হয়েছে, যা এ জগতের হিসাবে ছয় দিন হয়। কিন্তু পরিষ্কার ও নির্ভল উত্তর এই যে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে দিন এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যে রাত এটা এ জগতের পরিভাষা। বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দিবা-রাত্রির পরিচয়ের অন্য কোন লক্ষণ নির্দিষ্ট থাকতে পারে; যেমন জন্মান্তের দিবা-রাত্রি সূর্যের পরিক্রমণের অনুগামী হবেন।

সহীহ রেওয়াজে অনুযায়ী যে ছয় দিনে জগত সৃষ্টি হয়েছে তা রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবার শেষ হয়। শনিবারে জগত সৃষ্টির কাজ হয়নি। কোন কোন আলেম বলেন السبت —এর অর্থ কর্তন করা। এদিনে কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে এদিনকে يوم السبت (শনিবার) বলা হয়। —(ইবনে কাসীর)

আলোচ্য আয়াতে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি ছয় দিনে সমাপ্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সূরা হা-মী-য সেজদার নবম ও দশম আয়াতে এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, দু'দিনে ভূমণ্ডল, দু'দিনে ভূমণ্ডলের

পাহাড়, সমুদ্র, খনি, বৃক্ষ, উদ্ভিদ এবং মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের পানাহারের বস্তু - সামগ্রী সৃষ্টি করা হয়েছে। মোট চার দিন হল। বলা হয়েছে : **خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ**

আবার বলা হয়েছে : **وَوَضَعْنَا أَوْدَانَهَا فِي يَوْمَيْنِ آيَاتٍ**

যে দু'দিনে ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, তা ছিল রবিবার ও সোমবার। দ্বিতীয় দু'দিন ছিল মঙ্গল ও বুধ, যাতে ভূমণ্ডলের সাজ-সরঞ্জাম পাহাড়, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এরপর বলা হয়েছে : **فَقَضَّاهُمْ سِتْمَةَ سَعْدَاتٍ** অর্থাৎ, অতঃপর সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দুদিনে। বাহ্যতঃ এ দুদিন হবে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। এভাবে শুক্রবার পর্যন্ত ছয় দিন হল।

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজনের কথা বর্ণনার পর বলা হয়েছে : **ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ** অর্থাৎ, অতঃপর আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। **اسْتَوَى** - এর শাব্দিক অর্থ অধিষ্ঠিত হওয়া। 'আরশ' রাজসিংহাসনকে বলা হয়। এখন আল্লাহর 'আরশ' কিরূপ এবং কি- এর উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থই বা কি? এ সম্পর্কে নির্মল, পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ মাহাবাব সাহাবী ও তাবয়ীদের কাছ থেকে এবং পরবর্তীকালে সুফী বুয়ুগদের কাছ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, মানব জ্ঞান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম। এর অনুসন্ধান ব্যাপ্ত হওয়া অর্থহীন; বরং ক্ষতিকরও বটে। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে এরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত যে, এসব বাক্যের যে অর্থ আল্লাহ তা'আলার উদ্দিষ্ট, তাই শুদ্ধ ও সত্য। এরপর নিজে কোন অর্থ উদ্ভাবন করার চিন্তা করাও অনুচিত।

হযরত ইমাম মালেক (রহঃ)-কে কেউ **اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ** - এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন : **استوا** শব্দের অর্থ তো জানাই আছে; কিন্তু এর স্বরূপ ও অবস্থা মানব বুদ্ধি সম্যক বুঝতে অক্ষম। এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজেব। এর অবস্থা ও স্বরূপ জিজ্ঞেস করা বেদআত। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ ধরনের প্রশ্ন করেননি। সুফিয়ান সওরী, ইমাম আওযায়ী, লায়স ইবনে সা'দ, সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা, আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ) প্রমুখ বলেছেন : যেসব আয়াত আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর প্রতি যেভাবে আছে সেভাবে রেখেই কোনরূপ ব্যাখ্যা ও সদর্থ ছাড়াই বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। - (মাযহরী)

এরপর বলা হয়েছে : **يُغِيثُ الْبَلَّ وَيَكْرِهُهُ الْحَبْلُ حَبْلًا** অর্থাৎ,

আল্লাহ তা'আলা রাত্রি দ্বারা দিনকে সমাচ্ছন্ন করেন এভাবে যে, রাত্রি দ্রুত দিনকে ধরে ফেলে। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র বিশুকে আলো থেকে অন্ধকারে অথবা অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন। দিবা-রাত্রির এ বিরাট পরিবর্তন আল্লাহর কুদরতে অতি দ্রুত ও সহজে সম্পন্ন হয়ে যায়-মোটাই দেবী হয় না।

এরপর বলা হয়েছে : **وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ سَجُودٌ لِأَمْرِ**

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এমতাবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে, সবাই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুগামী।

এতে প্রত্যেক বুদ্ধিমানের জন্যে চিন্তার খোরাক রয়েছে। বড় বড়

বিশেষজ্ঞদের তৈরী মেশিনসমূহে প্রথমতঃ কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটি থাকে। যদি দোষ-ত্রুটি নাও থাকে, তবুও যত কঠিন ইম্পাতের মেশিন ও কল-কক্সাই হোক না কেন, চলতে চলতে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এক এক সময় ঢিল হয়ে পড়ে। ফলে মেরামত প্রেসিং দরকার হয়। এক্ষেত্রে কয়েকদিন বরং অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ ও কয়েক মাস তা অকাজে পড়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নির্মিত মেশিনের প্রতি লক্ষ্য করুন, প্রথম দিন যেভাবে এগুলো চালু করা হয়েছিল, আজো তেমনি চালু রয়েছে। এগুলোর গতিতে কখনও এক মিনিট কিংবা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয় না। কখনও এগুলোর কোন কলকক্সা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এক কখনও ওয়্যার্কর্শপে পাঠাতে হয় না। কারণ, এগুলো শুধুমাত্র আল্লাহর আদেশে চলছে। অর্থাৎ, এগুলো চালানোর জন্য না বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয়, না কোন ইঞ্জিনের সাহায্য নিতে হয়, বরং শুধু আল্লাহর আদেশের শক্তিবলেই চলছে। এ চলার গতিতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য আসাও অসম্ভব। তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ নিজেই যখন নির্দিষ্ট সময়ে এগুলোকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করবেন, তখন গোটা ব্যবস্থাই তখনই হয়ে যাবে। আর এরই নাম হল কয়ামত।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা একটি সামগ্রিক বিধির আকারে বর্ণনা করে বলা হয়েছে : **الْأَلَهُ الْقَائِلُ وَالْأَكْمَرُ** - **خَلَقَ** শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা এবং **أَمْر** শব্দের অর্থ আদেশ করা। বাক্যের অর্থ এই যে, সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট। অন্য কেউ না সামান্যতম বস্তু সৃষ্টি করতে পারে, আর না কাউকে আদেশ করার অধিকার রাখে। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কাউকে কোন বিশেষ বিভাগ বা কার্যভার সমর্পণ করা হলে তাও বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলারই আদেশ। তাই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব বস্তু সৃষ্টি করাও তাঁরই কাজ এবং সৃষ্টির পর এগুলোকে কর্মে নিয়োগ করাও অন্য কারও সাধ্যের বিষয় নয়; বরং আল্লাহ তা'আলারই অসীম শক্তির কারসাজি।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, একমাত্র বিশৃপালকই যখন অসীম শক্তির অধিকারী এবং যাবতীয় অনুকম্পা ও নিয়ামত প্রদানকারী, তখন বিপদাপদ ও অভাব-অনটনে তাঁকেই ডাকা এবং তাঁর কাছেই দোয়া-প্রার্থনা করা উচিত। তাঁকে ছেড়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করা মূর্থতা এবং বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর।

এতদসহ আলোচ্য আয়াতসমূহে দোয়ার কতিপয় আদবও ব্যক্ত করা হয়েছে। এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখলে দোয়া কবুল হওয়ার আশা বেড়ে যায়।

আরবী ভাষায় **دُعَاء** (দোয়া) শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ - (এক) বিপদাপদ দূরীকরণ ও অভাব পূরণের জন্যে কাউকে ডাকা এবং (দুই) যে কোন অবস্থায় কাউকে স্মরণ করা। এ আয়াতে উভয় অর্থই হতে পারে। বলা হয়েছে : **ادْعُوا رَبَّكُمْ** অর্থাৎ, অভাব পূরণের জন্যে স্বীয় পালনকর্তাকে ডাক অথবা স্মরণ কর এবং পালনকর্তার এবাদত কর।

প্রথমাবস্থায় অর্থ হবে, স্বীয় অভাব-অনটনের সমাধান একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা কর। আর দ্বিতীয়াবস্থায় অর্থ হবে, স্মরণ ও এবাদত একমাত্র তাঁরই কর। উভয় তফসীরই পূর্ববর্তী মনীষী ও তফসীরবিদগণের কাছ থেকে বর্ণিত রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে: **فَقَرَأْهُ ذَاتِ خِفَاةٍ** - শব্দের অর্থ অক্ষমতা, নিরুণ ও নম্রতা প্রকাশ করা এবং **خَفِيَّةٍ** শব্দের অর্থ গোপন।

এ শব্দদ্বয়ে দোয়া ও সুরার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ আদব বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ অপারকতা ও অক্ষমতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে দোয়া করা, তা কবুল হওয়ার জন্য জরুরী শর্ত। দোয়ার তাবাও অক্ষমতার সাথে সম্বন্ধসম্পন্ন হতে হবে। বলার ভঙ্গি এবং দোয়ার আকার-আকৃতিও বিনয় এবং নম্রতাসূচক হওয়া চাই। এতে বোঝা যায় যে, আজকাল জনসাধারণ যে ভঙ্গিতে দোয়া প্রার্থনা করে প্রথমতঃ একে দোয়া-প্রার্থনা বলাই যায় না; বরং দোয়া পড়া বলা উচিত। কেননা, প্রায়ই জানা থাকে না যে, মুখে যেসব শব্দ উচ্চারণ করা হচ্ছে, তার অর্থ কি? আজকাল সাধারণ মুসলিমসমূহে এটি ইমামদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাদের কতিপয় জরুরী ব্যক্তি মুখস্থ থাকে এবং নামায শেষে সেগুলোই আবৃত্তি করা হয়। অবিকাল ক্ষেত্রে স্বয়ং ইমামদেরও এসব শব্দের অর্থ জানা থাকে না। তাদের জানা থাকলেও মুক্তাদীরা সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। তারা জব্ব না বুঝেই ইমামের আবৃত্তি করা বাক্যাবলীর সাথে সাথে 'আমীন' 'আমীন' বলতে থাকে। এই আগাগোড়া প্রহসনের সারমর্ম কতিপয় বাক্যের আবৃত্তি ছাড়া কিছুই নয়। দোয়া প্রার্থনার যে স্বরূপ, তা এ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এটা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় এসব নিদ্রাশ বাক্যগুলোও কবুল করে নিতে পারেন। কিন্তু একথা বোঝা দরকার যে, দোয়া প্রার্থনা পাঠ করার বিষয় নয়। কাজেই চাওয়ার যথাযথ রীতি অনুযায়ী চাইতে হবে।

এছাড়া যদি কারও নিজ বাক্যাবলীর অর্থও জানা থাকে এবং তা বুকসূর বলে, তবে বলার ভঙ্গি এবং বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে বিনয় ও নম্রতা ফুটে না উঠলে এ দোয়াও দাবীতে পরিণত হয়, যা করার অধিকার কোন বান্দারই নেই।

ষোড়শ, প্রথম শব্দ দোয়ার প্রাণ ব্যক্ত হয়েছে যে, স্বীয় অক্ষমতা, দীনতা, হীনতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে অভাব-অনটন ব্যক্ত করা। দ্বিতীয় শব্দ আরও একটি নির্দেশ রয়েছে যে, চুপচাপ ও সংগোপনে দোয়া করা উত্তম এবং কবুলের নিকটবর্তী। কারণ, উচ্চৈশ্বরে দোয়া চাওয়ার মধ্যে প্রথমতঃ বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান থাকা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ এতে রিয়া এবং সুখ্যাতিরও আশঙ্কা রয়েছে। তৃতীয়তঃ এতে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানে না যে, আল্লাহ তা'আলা শ্রোতা ও মহাজ্ঞানী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই তিনি জানেন এবং সরব ও নীরব সব কথাই তিনি শোনেন। এ কারণেই শয়বর যুদ্ধের সময় দোয়া করতে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তোমরা কোন বখিরকে অথবা অনুপস্থিতকে ডাকাডাকি করছ না যে, এত জোরে বলতে হবে; বরং একজন শ্রোতা ও নিকটবর্তীকে সম্পোষন করছ— অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলাকে, তাই সজোরে বলা অবধীন। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা জনৈক সংকর্মীর দোয়া উল্লেখ করে বলেন : **أَتَأْتِيَ رَبِّي وَهَذَا بَالِغٌ**

অর্থাৎ, যখন সে তার পালনকর্তাকে অনুচ্চৈশ্বরে ডাকল। এতে বোঝা যায় যে, অনুচ্চৈশ্বরে দোয়া করা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয়।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : প্রকাশ্যে ও সজোরে দোয়া করা এবং নীরবে ও অনুচ্চৈশ্বরে দোয়া করা এতদুভয়ের ফযীলত ৭০ ডিগ্রী তফাৎ রয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ অধিকাংশ সময় আল্লাহর স্মরণে ও দোয়ায়

মশগুল থাকতেন, কিন্তু কেউ তাদের আওয়াজ শুনতে পেত না। বরং তাদের দোয়া তাদের ও আল্লাহর মধ্যে সীমিত থাকত। তাদের অনেকেই সমগ্র কোরআন মুখস্থ তেলাওয়াত করতেন, কিন্তু অন্য কেউ টেরও পেত না। অনেকেই প্রভূত ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতেন; কিন্তু মানুষের কাছে তা প্রকাশ করে বেড়াতে না। অনেকেই রাতের বেলায় স্বগৃহে দীর্ঘ সময় নামায পড়তেন; কিন্তু আগন্তুকরা তা বুঝতেই পারত না। হযরত হাসান বসরী আরও বলেন : আমি এমন অনেকেকে দেখেছি, যারা গোপনে সম্পাদন করার মত কোন এবাদত কখনও প্রকাশ্যে করেননি। দোয়ায় তাঁদের আওয়াজ অত্যন্ত অনুচ্চ হত।— (ইবনে কাসীর, মাযহারী)

ইবনে জুরাইজ বলেন : দোয়ায় আওয়াজকে উচ্চ করা এবং শোরগোল করা মকরহ। আবু বকর জাসাসাস হানাকী আহ্কামুল কোরআন গ্রন্থে বলেন : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, নীরবে দোয়া করা জোরে দোয়া করার চাইতে উত্তম। হাসান বসরী ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও একথাই বর্ণিত রয়েছে। এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, নামাযে সূরা ফাতেহার শেষে 'আমীন'ও আন্তে বলা উত্তম। কারণ, এটিও একটি দোয়া।

অভাব-অনটনের ব্যাপারে দোয়া করা সম্পর্কে এ পর্যন্ত বর্ণনা করা হল। আয়াতে যদি দোয়ার অর্থ যিকর ও এবাদত নেয়া হয়, তবে এ সম্পর্কেও পূর্ববর্তী মনীষীদের সুনিশ্চিত অভিমত এই যে, নীরবে যিকর সরব যিকর অপেক্ষা উত্তম। সুফীগণের মধ্যে চিশতিয়া তরীকার যুগ্মগণ মুরীদকে প্রথম পর্যায়ে সরব যিকর শিক্ষা দেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থার প্রতিকার হিসেবে এরূপ করেন, যাতে শব্দের মাধ্যমে অলসতা দূর হয়ে যায় এবং যিকরের সাথে আত্মার সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে। নতুবা সরব যিকর জায়েয হলেও তা তাঁদের কাম্য নয়। অবশ্য এর বৈধতাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, এ বৈধতার জন্যে রিয়া ও সুখ্যাতি অর্জন উদ্দেশ্য না হওয়া শর্ত।

ইমাম আহমদ, ইবনে হাকবান ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত সা'দ ইবনে আরী-ওক্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : **خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْنِي** অর্থাৎ, নীরব যিকর উত্তম এবং ঐ রিযিক উত্তম, যা যথেষ্ট হয়ে যায়।

তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ সময়ে সরব যিকরই কাম্য ও উত্তম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় উক্তি ও কর্ম দ্বারা এসব অবস্থা ও সময় বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। উদাহরণতঃ আযান ও একামত উচ্চৈশ্বরে বলা, সরব নামাযসমূহে উচ্চৈশ্বরে কোরআন তেলাওয়াত করা, নামাজের তকবীর, তশরীকের তকবীর এবং হজ্জে লাক্বাইকা উচ্চৈশ্বরে বলা ইত্যাদি। এ কারণেই এ সম্পর্কে ফেকাহবিদগণের সিদ্ধান্ত এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেসব বিশেষ অবস্থা ও স্থানে কথা ও কর্মের মাধ্যমে সরব যিকর করার শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে সজোরেই করা উচিত। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও স্থানে নীরব যিকরই উত্তম ও অধিক উপকারী।

মعتدين - **إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ** -

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ** - শব্দটি اعتداء থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমাতিক্রম করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। তা দোয়ায় সীমা অতিক্রম করাই হোক কিংবা অন্য কোন কাজে—কোনটিই আল্লাহর পছন্দনীয় নয়। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সীমা ও শর্তাবলী পালন ও আনুগত্যের নামই ইসলাম। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য লেনদেনে শরীয়তের সীমা অতিক্রম করলে সেগুলো এবাদতের

পরিবর্তে পোনাহে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

দোয়ায় সীমা অতিক্রম করা কয়েক প্রকারে হতে পারে। (এক) দোয়ায় শাব্বিক লৌকিকতা, ছন্দ ইত্যাদি অবলম্বন করা। এতে বিনয় ও নম্রতা ব্যাহত হয়। (দুই) দোয়ায় অনাবশ্যক শর্ত সংযুক্ত করা। যেমন, বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) স্বীয় পুত্রকে এভাবে দোয়া করতে দেখলেন : হে আল্লাহ্, আমি আপনার কাছে জন্মতে শুভ রঙ্গের ডান দিকস্থ প্রাসাদ প্রার্থনা করি। তিনি পুত্রকে বারণ করে বললেন : দোয়ায় এ ধরনের শর্তযুক্ত করা সীমা অতিক্রম। কোরআন ও হাদীসে তা নিষিদ্ধ। — (মাযহরী)

(তিন) সাধারণ মুসলমানদের জন্যে বদ দোয়া করা কিংবা এমন কোন বিষয় কামনা করা যা সাধারণ লোকের জন্যে ক্ষতিকর এবং এমনভাবে এখানে উল্লেখিত দোয়ায় বিনা প্রয়োজনে আগুয়ায় উচ্চ করাও এক প্রকার সীমা অতিক্রম। — (তফসীরে মাযহরী, আহকামুল কোরআন)

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে : **وَلَا تُؤْنَسُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ صَلَاتِهِمْ** এখানে **صلاح** দুটি পরস্পর বিরোধী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। **صلاح** শব্দের অর্থ সংস্কার এবং **فساد** শব্দের অর্থ অনর্থ ও গোলযোগ। ইমাম রাগেব ‘মুফরাদাতুল কোরআন’ গ্রন্থে বলেন : সমতা থেকে বের হয়ে যাওয়াকেই **فساد** বলা হয়, তা সামান্য হোক কিংবা বেশী। কম বের হলে কম ফাসাদ এবং বেশী বের হলে বেশী ফাসাদ হবে। **افساد** শব্দের অর্থ অনর্থ সৃষ্টি করা এবং **صلاح** শব্দের অর্থ সংস্কার করা। কাজেই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না, আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক সংস্কার করার পর।

ইমাম রাগেব বলেন : আল্লাহ্ তা’আলার সংস্কার কয়েক প্রকার হতে পারে। (এক) প্রথমেই জিনিসটি সঠিকভাবে সৃষ্টি করা। যেমন, বলা হয়েছে : **وَأَنزَلْنَا الْهَاجِلَ** (দুই) অনর্থ আসার পর তা দূর করা। যেমন, **فِيهِ لَكُمُ الْغَنَاءُ** (তিন) সংস্কারের নির্দেশ দান করা। আয়াতে বলা

হয়েছে, যখন আল্লাহ্ তা’আলা পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন, তখন তোমরা তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এখানে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করার দু’টি অর্থ হতে পারে। (এক) বাহ্যিক সংস্কার; অর্থাৎ, পৃথিবীকে চাষাবাদ ও বৃক্ষ রোপণের উপযোগী করেছেন, তাতে মেঘের সাহায্যে পানি বর্ষণ করে মাটি থেকে ফল-ফুল উৎপন্ন করেছেন এবং মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর জন্যে মাটির থেকে জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন।

(দুই) পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ ও অর্থগত সংস্কার করেছেন। পয়গম্বর, গ্রন্থ, ও হেদায়েত প্রেরণ করে পৃথিবীকে কুফর, শেরক ও পাপাচার থেকে পবিত্র করেছেন। আয়াতে উভয় অর্থ, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কারও উদ্ভিষ্ট হতে পারে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা’আলা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পৃথিবীর সংস্কার সাধন করেছেন। এখন তোমরা এতে পোনাহ্ ও অব্যাহততার মাধ্যমে গোলযোগ ও অনর্থ সৃষ্টি করো না।

ভূপৃষ্ঠের সংস্কার ও অনর্থের মর্ম : সংস্কার যেমন দু’রকম : বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ, তেমনি অনর্থও দু’রকম। ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এই যে, আল্লাহ্ তা’আলা একে এমন এক পদার্থরূপে সৃষ্টি করেছেন, যা পানির মত নরমও নয় যে, তাতে কোন কিছু স্থিতিবস্থা লাভ করতে পারে না এবং পাথরের মত শক্তও নয় যে, খনন করা যাবে না।

বরং এক মধ্যবর্তী অবস্থায় রেখেছেন যাতে মানুষ একে চাষাবাদের ক্ষমতা নরম করে নিয়ে বৃক্ষ ও ফল-ফুল উৎপন্ন করতে পারে এবং খনন করে কূপ, পরিখা ও নদীনালা তৈরী করতে পারে ও গৃহের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। এরপর মাটির ভেতরে ও বাইরে আবাদ করার উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, যাতে তরিতরকারী, উদ্ভিদ ও ফলমূল উৎপন্ন হয়। কষ্টের বাতাস, আলো, ঠাণ্ডা ও উত্তাপ সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর স্বেচ্ছায় মাধ্যমে তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন, যার ফলে বৃক্ষ উৎপন্ন হতে পারে। বিভিন্ন নক্ষত্র ও গ্রহপুঞ্জের শীতল ও উত্তপ্ত কিরণ নিক্ষেপ করে ফল ও ফলে রঙ ও রস ভরে দেয়া হয়েছে। মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করা হয়েছে, যদ্বারা সে যান্ত্রিকাজ্যত কাঁচামাল কাঠ, লোহা, তামা, পিত্তা, এলোমেনিয়াম ইত্যাদিকে ছোঁড়া দিয়ে শিল্পদ্রব্যের এক নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছে। এগুলো ভূপৃষ্ঠের বাহ্যিক সংস্কার এবং আল্লাহ্ তা’আলা স্বীয় অসীম শক্তির বলে তা সাধন করেছেন।

আভ্যন্তরীণ ও আত্মিক সংস্কার হল আল্লাহর স্বপ্ন, আল্লাহর স্বপ্ন সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। এর জন্যে আল্লাহ্ তা’আলা প্রথমে প্রতিটি মানুষের অন্তরে আনুগত্য ও স্মরণের একটি প্রেরণা নিহিত রেখেছেন : **وَاللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مَنًّا وَتَقْوَاهَا** (আল্লাহ্ মানুষকে পাপাচার ও খোদাভীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত করেছেন।) মানুষের চর পাশের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অসীম শক্তি ও বিস্ময়কর কারিগরির এমন বহিঃপ্রকাশ রেখেছেন, যেগুলো দেখে সামান্য বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি বলে উঠে : **مَرْكَبُ اللَّهِ لَأَكْبَرُ الْخَلْقِ** (সমুচ্চ হেন সুন্দরতম দ্বয়।)

এছাড়া রসূল প্রেরণ করেছেন এবং ধর্মগ্রন্থ নাখিল করেছেন। এভাবে যন্ত্র সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপনের পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এভাবে যেন ভূপৃষ্ঠের পরিপূর্ণ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কার হয়ে গেছে। এখন নির্দেশ দেয়া হচ্ছে : আমি এ ভূপৃষ্ঠকে ঠিকঠাক করে দিয়েছি। তোমরা একে নষ্ট করো না।

সংস্কারের যেমন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দু’টি রূপ বর্ণিত হয়েছে, তেমনি এর বিপরীতে ফাসাদ ও অনর্থ সৃষ্টিরও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দু’টি প্রকার রয়েছে। আলোচ্য আয়াত দ্বারা ফাসাদের উভয় প্রকারই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আসল ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধন এবং আভ্যন্তরীণ অনর্থ সৃষ্টিকে প্রতিরোধ করা। কিন্তু এ জগতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সংস্কার ও ফাসাদের মধ্যে এমন নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে যে, একটির ফাসাদ অন্যটির ফাসাদের কারণ হয়ে যায়। তাই শরীয়ত আভ্যন্তরীণ ফাসাদের দূর যেমন রুদ্ধ করেছে, তেমনি বাহ্যিক ফাসাদকেও প্রতিরোধ করেছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা এবং যাবতীয় অশ্লীল কার্যকলাপও জগতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ফাসাদ সৃষ্টি করে। তাই এসব বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর শাস্তি আরোপ করা হয়েছে এবং সাধারণ অপরাধকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেননা, প্রত্যেকটি অপরাধ ও পাপ কাজই কোথাও বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং কোথাও আভ্যন্তরীণ অনর্থের কারণ হয়। চিন্তা করলে বেশ যায়, প্রতিটি বাহ্যিক ফাসাদ আভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় এবং প্রতিটি আভ্যন্তরীণ ফাসাদ বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে।

বাহ্যিক ফাসাদ যে আভ্যন্তরীণ ফাসাদের কারণ হয় তা বলাই বাব্ধ্য। কারণ, বাহ্যিক ফাসাদ হচ্ছে আল্লাহ্ তা’আলার নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ।

বস্তুত আল্লাহর নাফরমানীরই অপর নাম আভ্যন্তরীণ ফাসাদ। তবে আভ্যন্তরীণ ফাসাদ যে বাহ্যিক ফাসাদ ডেকে আনে, তা বোঝা কিছুটা চিন্তাসাপেক্ষ ব্যাপার। কারণ এ বিশৃঙ্খলার ও এর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ বস্তু আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি এবং তাঁর আজ্ঞাধীন। মানুষ যতদিন আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন থাকে, ততদিন এসব বস্তুও মানুষের খাদেম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করতে শুরু করে, তখন জগতের প্রত্যেকটি বস্তু অজান্তে ও পরোক্ষভাবে মানুষের অবাধ্য হয়ে উঠে, যা মানুষ বাহ্যতঃ চর্যচক্ষে দেখে না; কিন্তু এসব বস্তুর প্রভাব, বেশিষ্টা, পরিণাম ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এর ছাঙ্কল্যমাণ প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাহ্যতঃ জগতের সব বস্তুই মানুষের ব্যবহারে এসে থাকে। পানি কঠিনালীতে পৌছে পিপাসা নিবৃত্ত করতে অস্বীকার করে না। খাদ্য ক্ষুধা দূর করতে বিরত হয় না। পোশাক-পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ শীত-গ্রীষ্মে সুখ সরবরাহ করতে অস্বীকৃত হয় না।

কিন্তু পরিণাম চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এসবের কোন একটি বস্তুও স্বীয় কর্তব্য পুরোপুরি পালন করছে না। কেননা, এসব বস্তু ও এসবের ব্যবহারের আসল উদ্দেশ্য আরাম ও সুখ লাভ করা, অস্থিরতা ও কষ্ট দূর হওয়া এবং অসুখে-বিসুখে রোগমুক্তি অর্জিত হওয়া। অথচ তা হচ্ছে না।

এখন জগতের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন যে, আজকাল আরাম-আয়েশ ও রোগমুক্তি, সাজ-সরঞ্জামের ধারণাভীত প্রার্থ্য সত্ত্বেও মানবগোষ্ঠী অস্থিরতা ও রোগ-ব্যাধির শিকার হচ্ছে। নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ ভিড় জমাচ্ছে। কোন ধনকুবেরই স্বস্থানে নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত নয়। বরং এসব সাজ-সরঞ্জাম যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে হারেই বিপদাপদ, রোগ-ব্যাধি এবং অস্থিরতাও বেড়ে চলছে।

আজ বিদ্যুৎ, বাষ্প ও অন্যান্য বস্তুনিষ্ঠ চাকচিক্যে বিমোহিত মানুষ যদি এসব বস্তুর উদ্দেশ্য উঠে চিন্তা করে, তবে বোঝা যাবে যে, আমাদের সব প্রচেষ্টা, সব শিল্প ও আবিষ্কারই আমাদের আসল লক্ষ্য অর্থাৎ, সুখ-শান্তি দানে ব্যর্থ হয়েছে। এই আভ্যন্তরীণ কারণ ছাড়া এর অন্য কোন কারণ নেই যে, আমরা স্বীয় প্রতিপালক ও প্রভুর অবাধ্যতার পথ বেছে নিয়েছি। ফলে তাঁর সৃষ্ট বস্তুসমূহও অর্ধগতভাবে আমাদের অবাধ্যতা শুরু করেছে।

অর্থাৎ, জগতের এসব বস্তুকে বাহ্যতঃ প্রাণহীন ও চেতনহীন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রভুর আজ্ঞাধীন হয়ে কাজ করার উপলব্ধি তাদেরও রয়েছে।

সারকথা, চিন্তা করলে বোঝা যায়, প্রতিটি গোনাহ ও আল্লাহর প্রত্যেকটি অবাধ্যতা দুনিয়াতে শুধু আভ্যন্তরীণ অনর্থই সৃষ্টি করে না, বরং বাহ্যিক অনর্থও এর অবশ্যস্বার্থী পরিণতি হয়ে থাকে।

এটা কোন কবির কল্পনা নয়, বরং এমন একটি বাস্তব সত্য, কোরআন ও হাদীস যার সাক্ষ্য। শাস্তির হালকা নমুনা এ জগতে রোগ-ব্যাধি, মহামারী, ঝড় ও বন্যার আকারে দেখা দেয়।

তাই وَلَقَدْ سَبَّحُوا فِي الْأَرْضِ بِعَدَا صَاحِبِهَا বাক্যের অর্থে যেমন জগতে বাহ্যিক ফাসাদ সৃষ্টিকারী গোনাহ ও অপরাধসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তেমনি আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় অবাধ্যতাই এর অন্তর্ভুক্ত।

তাই আলোচ্য আয়াতে অতঃপর বলা হয়েছে : وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا

অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় ও আশা সহকারে ডাক। অর্থাৎ, একদিকে দোয়া অগ্রাহ্য হওয়ার ভয় থাকবে এবং অপরদিকে তাঁর করুণা লাভের পূর্ণ আশাও থাকবে। এ আশা ও ভয়ই দৃঢ়তার পথে মানবাত্মার দু'টি বাহ। এ বাহুদয়ের সাহায্যে সে উর্ধ্বলোকে আরোহণ করে এবং সুউচ্চ পদ মর্যাদা অর্জন করে।

এ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ প্রতীয়মান হয় যে, আশা ও ভয় সমান সমান হওয়া উচিত। কোন কোন আলেম বলেন, জীবিতাবস্থায় ও সুস্থতার সময় ভয়কে প্রবল রাখা প্রয়োজন, যাতে আনুগত্যে ক্রটি না হয়, আর যখন মৃত্যু নিকটবর্তী হয়, তখন আশাকে প্রবল রাখবে। কেননা, এখন কাজ করার শক্তি বিদায় নিয়েছে। করুণা লাভের আশা করাই এখন তার একমাত্র কাজ। - (বাহুর-মুহীত)

কোন কোন সুফদর্শী আলেম বলেন : ধর্মের বিশুদ্ধ পথে অটল থাকা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহর আনুগত্য করাই প্রকৃত লক্ষ্য। মানুষের মেজাজ ও স্বভাব বিভিন্নরূপ। কেউ ভয়ের প্রবলতার দ্বারা এ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, আবার কেউ মহব্বত ও আশার প্রবলতার দ্বারা। যার জন্যে যে অবস্থা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয়, সে তাই হাসিল করতে চেষ্টািত হবে।

মেটিকথা, পরবর্তী আয়াতে দোয়ার দু'টি আদব বর্ণিত হয়েছে। (এক) বিনয় ও নম্রতা সহকারে দোয়া করা এবং (দুই) আস্তে ও সংগোপনে দোয়া করা। এ দু'টি গুণই মানুষের বাহ্যিক দেহের সাথে সম্পৃক্ত। কেননা, বিনয়ের অর্থ হল দোয়ার সময় দৈহিক আকার-আকৃতিকে অপারক ও ফকীরের মত করে নেয়া, অহংকারী ও বেশপওয়ার মত না হওয়া। দোয়া সংগোপনে করার সম্পর্কও মুখ ও জিহবার সাথে যুক্ত।

এ আয়াতে দোয়ার আরও দু'টি আভ্যন্তরীণ আদব বর্ণিত হয়েছে। এ গুলোর সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে। আর তা হল এই যে, দোয়াকারীর মনে এ আশঙ্কা থাকা উচিত যে, সম্ভবতঃ দোয়াটি গ্রাহ্য হবে না এবং এ আশাও থাকা উচিত যে, দোয়া কবুল হতে পারে। কেননা, পাপ ও গোনাহ থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়াও ঈমানের পরিপন্থী। অপরদিকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়াও কুফর। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকলেই দোয়া কবুল হবে বলে আশা করা যায়।

অতঃপর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার করুণা সংকরীদের নিকটবর্তী।

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও দোয়ার সময় ভয় ও আশা উভয় অবস্থাই থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আশার দিকটিই থাকবে প্রবল। কেননা, বিশু প্রতিপালক পরম দয়ালু আল্লাহর দান ও অনুগ্রহে কোন ক্রটি ও কুপণতা নেই। তিনি মন্দের চেয়ে মন্দ লোক, এমনকি শয়তানের দোয়াও কবুল করতে পারেন। কবুল না হওয়ার আশঙ্কা একমাত্র স্বীয় কুর্কর্ম ও গোনাহর অকল্যাণেই থাকতে পারে। কারণ, আল্লাহর রহমতের নিকটবর্তী হওয়ার জন্যে সংকরী হওয়া প্রয়োজন।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে, স্বীয় বেশভূষা ফকীরের মত করে এবং আল্লাহর সামনে দোয়ার হস্ত প্রসারিত করে; কিন্তু তাদের খাদ্য, পানীয় ও পোশাক সবই হারাম-এরূপ লোকের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে? - (মুসলিম, তিরমিযী)

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : বান্দা যতক্ষণ কোন গোনাহ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না করে এবং তড়িৎভি না করে, ততক্ষণ তার দোয়া কবুল হতে থাকে। সাহায্যে কোরাম আরয করলেন :

الاعراف

১৫৭

ولواتنا

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَحْزَنُ نَبَاتُهُ بِأَذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَأَ
لَا تَحْزَنُ إِلَّا نَكْدًا كَذَلِكَ تُصَوِّرُ الْأَيْتِ يَقَوْمُ تَكُونُونَ ⑤
لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
لَكُمْ مِنَ الْعِزَّةِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑥
قَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرْكَبُ فِي صَلْبِ مُبِينٍ ⑦ قَالَ
يَقَوْمُ لَيْسَ بِي صَلَافٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑧
أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأُنصِرُكُمْ وَالْعَالَمِينَ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَتَعْلَمُونَ ⑨
أَوْحَيْنَا أَنْ جَاءَ لَكُمْ مِنْ تُرْمِيزٍ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ
لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ⑩ فَكَلَّمَهُ فَأَعْيَنَهُ
وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَصِيَيْنَ ⑪ وَاللَّيْلَ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ
يَقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ الْعِزَّةِ أَفَلَا تَتَّقُونَ ⑫
قَالَ الْمَلَأَمِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرْكَبُ فِي
سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَنْظُرُكَ مِنَ الْكَافِرِينَ ⑬ قَالَ يَقَوْمُ
لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ⑭

(৫৮) যে শহর উৎকৃষ্ট, তার ফসল তার প্রতিপালকের নির্দেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকট তাতে অল্পই ফসল উৎপন্ন হয়। এমনভাবে আমি আয়াতসমূহ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করি কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্যে। (৫৯) নিশ্চয় আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল : হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্যে একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করি। (৬০) তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল : আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পঞ্চব্রতের মাঝে দেখতে পাচ্ছি। (৬১) সে বলল : হে আমার সম্প্রদায়, আমি কখনও লাস্ত নই, কিন্তু আমি বিশ্বপ্রতিপালকের রসূল। (৬২) তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌছাই এবং তোমাদেরকে সদুপদেশ দেই। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমনসব বিষয় জানি, যেগুলো তোমরা জান না। (৬৩) তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে—যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যেন তোমরা সংবত হও এবং যেন তোমরা অনুগৃহীত হও। (৬৪) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আমি তাকে এবং নোকাহিত লোকদেরকে উদ্ধার করলাম এবং যারা মিথ্যারোপ করত, তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ। (৬৫) আদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই হুদকে। সে বলল : হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। (৬৬) তার সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল : আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (৬৭) সে বলল : হে আমার সম্প্রদায়, আমি মোটেই নির্বোধ নই, বরং আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত পয়গম্বর।

তড়িঘড়ি দোয়া করার অর্থ কি? তিনি বললেন : এর অর্থ হল এরশ ঘাঘর করে বসা যে, আমি এত দীর্ঘ দিন থেকে দোয়া করছি, অশ্রু এখনো পর্বা কবুল হল না। অতঃপর নিরাশ হয়ে দোয়া ত্যাগ করা। - (মুশবিহ, তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : যখনই আল্লাহর কবুল দোয়া করবে, তখনই কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে দোয়া করবে।

অর্থাৎ, আল্লাহর রহমতের বিস্তৃতিকে সামনে রেখে দোয়া করলে অবশ্যই দোয়া কবুল হবে বলে মনে মনে মজবুত কর। এমন মনে কবুল গোনাহর কারণে দোয়া কবুল না হওয়ার আশঙ্কা অনুভব করা এর পরিণতি নয়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ ও বড় নেয়ামতসমূহ উল্লেখ করেছিলেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, দিবারাত্র, চন্দ্র-সূর্য সন্ধ্যা নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টি ও মানুষের প্রয়োজনাদি সরবরাহে এক সেবার এগুলোর নিয়োজিত থাকার কথা উল্লেখ করে এ ব্যাপারে হুশিয়ার করেছিলেন যে, যখন এক পবিত্র সত্তাই যাবতীয় প্রয়োজন ও সুখ-শান্তির উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, তখন যে কোন অভাব-অনটন ও প্রয়োজনে উন্নীত কাছেই দোয়া প্রার্থনা করা উচিত এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকে সাফল্যের চাবিকাঠি বলে মনে করা কর্তব্য।

আলোচ্য প্রথম আয়াতেও এমনই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় নেয়ামত উল্লেখিত হয়েছে। এসব নেয়ামতের উপরই মানুষ ও পৃথিবীর সমস্ত জীবের জীবন ও স্বাস্থ্য নির্ভরশীল। উদাহরণতঃ বৃষ্টি এবং তৃষ্ণা উৎপন্ন বৃক্ষ, ফসলাদি তরিতরকারী ইত্যাদি। পার্শ্বক্য এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উর্ধ্বজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত নেয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছিল এবং আলোচ্য আয়াতে নিম্নজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত নেয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। - (বাহর-মুহীত)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

৫৮ নং আয়াতে বিশেষভাবে একথা বলা হয়েছে যে, আমার এসব বিরাট নেয়ামত যদিও তৃষ্ণের সর্বত্র ব্যাপক, বৃষ্টি বর্ষিত হলে যদিও পাহাড়, সমুদ্র, উর্বর, অনূর্বর এবং উত্তম ও অনুত্তম সব রকম ভূখণ্ডই সমভাবে বর্ষিত হয়, কিন্তু ফসল, বৃক্ষ ও তরিতরকারী একমাত্র এমন ভূখণ্ডেই উৎপন্ন হয়, যাতে উর্বরতা রয়েছে—কঙ্কর ও বালুকাময় ভূখণ্ড এ বৃষ্টির দ্বারা উপকৃত হয় না।

প্রথম আয়াতের ফলাফল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা সৃষ্ট ভূখণ্ডে ফসল উৎপাদনের মত জীবনীশক্তি দান করেন, তাঁর পক্ষে যে মানুষ পূর্বে জীবিত ছিল অতঃপর মারা যায়, তার মধ্যে পুনরায় জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করে দেয়া মোটেই কঠিন নয়। এ ফলাফলটি আয়াতে স্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াত থেকে এরূপ ফলাফল বের করা হয়েছে যে, আল্লাহর হেদায়েত, ঐশী গ্রন্থসমূহ, আশ্বিয়া (অঃ), তাঁদের প্রতিনিধি আলেম ও শাসায়েশের শিক্ষা ও বৃষ্টির মত সবার জন্যেই ব্যাপক, কিন্তু বৃষ্টি দ্বারা যেমন সব ভূখণ্ডই উপকৃত হয় না তেমনি এ আশ্বাফি বৃষ্টির উপকারও তারাই লাভ করে, যাদের মধ্যে যোগ্যতা রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তর কঙ্করময় কিংবা বালুকাময় ভূখণ্ডের মত উৎপাদনের যোগ্যতা বিবর্জিত, তারা যাবতীয় সুশৃষ্টি নির্দান সংকেত স্বীকৃতি পঞ্চব্রতায় অটল থাকে। এ ফলাফলের দিকেই দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

كَذَلِكَ تُصَوِّرُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ تَكُونُونَ

আমি এমনভাবে স্বীয় প্রমাণাদি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করি তাদের জন্যে যারা এর মূল্য দেয়। উদ্দেশ্য এই যে, বাস্তবে যদিও এ বর্ণনা সবার জন্যেই ব্যাপক; কিন্তু পরিণতির দিক দিয়ে তাদের জন্যেই উপকারী প্রমাণিত হয়েছে যারা যোগ্যতাসম্পন্ন এবং যারা এর মূল্য ও মর্যাদা বোঝে। এভাবে উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে ইহকাল ও পরকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এবার উভয় আয়াতের বিস্তারিত বর্ণনা শুনুন। প্রথম আয়াতে কা হয়েছে : **وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاتِ بُشْرًا لِّبَنِي إِدْرَىٰ حَمِيمٍ** - এতে **ريح** শব্দটি **سحاب** - এর বহুবচন। এর অর্থ বায়ু, **بُشْرًا** শব্দের অর্থ সুসবাদ। এবং রহমত বলে বৃষ্টির রহমত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলাই বৃষ্টির পূর্বে সুসবাদ দেয়ার জন্যে বায়ু প্রেরণ করেন।

উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির পূর্বে ঠাণ্ডা বায়ু প্রেরণ করা আল্লাহর চিরন্তন রীতি। এ বাতাস দ্বারা স্বয়ং মানুষ আরাম ও প্রফুল্লতা অর্জন করে এবং তা যেন ভাবী বৃষ্টির সংবাদও পূর্বাঙ্কে প্রদান করে। অতএব, এ বায়ু দু'টি নেয়ামতের সমষ্টি। (এক) স্বয়ং মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টজীবের জন্যে উপকারী এবং (দুই) বৃষ্টির পূর্বে বৃষ্টির আগমনবার্তা বহনকারী। কেননা, মানুষ একটি নরম ও নাজুক সৃষ্টি; তার অনেক প্রয়োজনীয় কাজ বৃষ্টির কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টির সংবাদ পূর্বে পেয়ে সে নিজের ব্যবস্থা সম্পন্ন করে নেয়। এছাড়া স্বয়ং তার অস্তিত্ব এবং তার আসবাবপত্র ও নিজের রক্ষাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে নেয়।

এরপর বলা হয়েছে : **حَتَّىٰ إِذَا أَفْلَحَ سَحَابًا مِّثْرًا** - এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী। অর্থাৎ, বায়ু যখন ভারী মেঘমালাকে উপরে উঠিয়ে নেয়। ভারী মেঘমালার অর্থ পানিতে ভরপুর মেঘমালা — যা বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে উপরে উঠে যায়। এভাবে হাজারো মণ ভারী পানি বাতাসে ভর করে উপরে পৌঁছে যায়। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এতে কোন মেশিন কাজ করে না এবং কোন মানুষও শ্রম নিয়োগ করে না। আল্লাহ তা'আলার হুকুম হওয়া মাত্র আপন-আপনি সমুদ্র থেকে বাষ্প (মৌসুমী বায়ু) উখিত হতে থাকে এবং উপরে উঠে মেঘমালার আকার ধারণ করে। অতঃপর হাজারো বরং লাখে গ্যালন পানিভর্তি এ জাহাজ বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে আকাশ পানে গণিত হয়।

এরপর বলা হয়েছে : **سَوْفَ يُعْطِيكَ يَكْمَاتٍ** - এর অর্থ কোন জন্তকে হাঁকানো ও চালানো, **بلد** এর অর্থ শহর, বসতি ও জনপদ। আর **ميت** - এর অর্থ মৃত।

অর্থাৎ, বাতাস যখন ভারী মেঘমালাকে তুলে নেয়, তখন আমি মেঘমালাকে কোন মৃত শহরের দিকে পরিচালিত করি। মৃত শহর বলে এমন জনপদকে বোঝানো হয়েছে, যা পানির অভাবে উজাড়প্রায়। এখানে সাধারণ ভূখণ্ডের পরিবর্তে বিশেষভাবে শহর উল্লেখ করা এ জন্যে সমীচীন হয়েছে যে, বৃষ্টি-বাদল প্রেরণ ও মাটিকে সিক্ত করার প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন মেটানো। মানুষের বাসস্থান হচ্ছে শহর। নতুবা বন-জঙ্গলের সজীবতা স্বয়ং কোন লক্ষ্য নয়।

এ পর্যন্ত আলোচ্য আয়াতের বিষয়-বস্তুর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রমাণিত হল। প্রথমতঃ বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়। এতে বোঝা গেল যে, যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও 'সামা' (আকাশ) শব্দ দ্বারা মেঘমালাকেই বোঝানো হয়েছে। কোন সময় সামুদ্রিক মৌসুমী বায়ুর পরিবর্তে সরাসরি আকাশ থেকে

মেঘমালা সৃষ্টি হয়ে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ কোন বিশেষ দিক কিংবা বিশেষ ভূখণ্ডের দিকে মেঘমালা গণিত হওয়া সরাসরি আল্লাহর নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি যখন যেখানে ইচ্ছা এবং যে পরিমাণ ইচ্ছা বৃষ্টি বর্ষণের নির্দেশ দান করেন। মেঘমালা আল্লাহর সে নির্দেশই পালন করে মাত্র।

এ বিষয়টি সর্বত্রই এভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় যে, মাঝে মাঝে কোন শহর অথবা জনপদের উপর মেঘমালা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে এবং সেখানে বৃষ্টির প্রয়োজনও থাকে, কিন্তু মেঘমালা সেখানে এক ফোঁটা পানিও দেয় না; বরং আল্লাহর নির্দেশে যে শহর বা জনপদের প্রাপ্য নির্ধারিত থাকে, সেখানে পৌঁছেই বর্ষিত হয়। নির্দিষ্ট শহর ছাড়া অন্যত্র মেঘের পানি লাভ করার সাধ্য কারো নেই।

প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকগণ মৌসুমী বায়ুর গতিপথ নির্ণয়ের জন্যে কিছু কিছু বিশিষ্ট ও মূলনীতি আবিষ্কার করে রেখেছেন। এসবের মাধ্যমে তারা বলে দেন যে, অমুক সাগর থেকে যে মৌসুমী বায়ু উখিত হয়েছে, তা কোন দিকে প্রবাহিত হবে, কোথায় বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং কতটুকু বৃষ্টিপাত হবে। বিভিন্ন দেশে এ ধরনের তথ্য পরিবেশন করার জন্যে আবহাওয়া বিভাগ কায়ম করা হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, আবহাওয়া বিভাগ প্রদত্ত খবরাদি প্রচুর পরিমাণে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। খোদায়ী নির্দেশ তাদের বিপরীতে বলে তাদের সব নিয়ম-কানুনই একেজো হয়ে যায় এবং মৌসুমী বায়ু তাদের প্রদত্ত খবরের বিপরীতে অন্য কোন দিকে গতি পরিবর্তন করে চলে যায়। ফলে আবহাওয়া বিভাগের নিষ্ফল তাকিয়ে থাকাই সার হয়।

এছাড়া বায়ুর গতিপ্রবাহ নির্ণয়ের জন্যে বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবিত নীতিমালাও মেঘমালা যে আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন—এ বিষয়ের পরিপন্থী নয়। কেননা, বিশৃঙ্খলার সব কাজ-কারবারে আল্লাহর চিরন্তন রীতি এই যে, আল্লাহর নির্দেশ স্বাভাবিক কারণসমূহের আবরণ ভেদ করে প্রকাশ পায়। এসব স্বাভাবিক কারণদষ্টেই মানুষ নীতিমালা গ্রহণন করে।

অতঃপর বলা হয়েছে : অর্থাৎ, আমি মৃত শহরে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর পানি দ্বারা সব রকম ফল-মূল উৎপন্ন করি।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **كَذَٰلِكَ يُخْرِجُ الْوَنُورُ لِّلْكَوْكُوتِ**

অর্থাৎ, এভাবেই আমি মৃতদেরকে কেয়ামতের দিন উখিত করব যাতে তোমরা বোঝ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেভাবে মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করি এবং তা থেকে বৃক্ষ ও ফল-মূল নির্গত করি, তেমনিভাবে কেয়ামতের দিন মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করে তুলব। আমি এসব দৃষ্টান্ত এজন্যে বর্ণনা করি, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ পাব।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কেয়ামতে দু'বার শিক্ষা ফুঁকা হবে। প্রথম ফুৎকারের পর সারা বিশ্ব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে, কোনকিছুই জীবিত থাকবে না। দ্বিতীয় ফুৎকারের পর নতুনভাবে সারা বিশ্ব সৃষ্টিত হবে এবং সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, উভয়বার শিক্ষা ফুৎকারের মাঝখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে। এ চল্লিশ বছর পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টিপাত হতে থাকবে। এ সময়ের মধ্যেই প্রতিটি মৃত মানুষ ও জন্তুর দেহের অংশ একত্রিত করে পূর্ণ কাঠামো তৈরি করা হবে। অতঃপর শিক্ষা ফুৎকার সাথে সাথে এসব মৃতদেহে আত্মা এসে যাবে এবং জীবিত হয়ে দণ্ডায়মান হবে। এ রেওয়াজাতের বেশীর ভাগ বোখারী ও মুসলিম থেকে

কোন স্বার্থ আছে। এখানে رَبِّ الْعَالَمِينَ 'বিশ্ব পালনকর্তা' শব্দটি শেরকের মূল কুঠারখাতস্বরূপ।

এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কোন দেব-দেবী-ইয়াযদা ও আহরেমানই টিকতে পারে না। এরপর বলেছেনঃ কেয়ামতের শান্তি সম্পর্কে তোমাদের যে সন্দেহ—এর কারণ তোমাদের অজ্ঞতা। আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান দান করা হয়েছে।

এরপর তাদের দ্বিতীয় সন্দেহের উত্তর দেয়া হয়েছে, যা সূরা মুমিনুনে পটভাবে উল্লেখিত রয়েছেঃ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَحْيِي الْحَيَاتِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

অর্থাৎ, নূহ (আঃ)—এর দাওয়াত শোনে তাঁর কণ্ঠ এমনও সন্দেহ করল যে, সে তো আমাদেরই মত একজন মানুষ, আমাদেরই মত পানাহার করে এবং নিদ্রিত ও জাগ্রত হয়, তাঁকে আমরা কিরূপে অনুসৃত মেনে নিতে পারি? আল্লাহ্ তাআলা যদি আমাদের কাছে কোন পয়গাম পাঠাতে চাইতেন, তবে ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করতেন। তাদের স্বাতন্ত্র্য ও মহাত্ম্য আমাদের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট হত। এবং এছাড়া আর কোন কিছু নয় যে, আমাদের গোত্রেরই এক ব্যক্তি আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

এর উত্তরে তিনি বললেনঃ

أَوَلَمْ يَجْعَلْنَا جَنَّاتٍ وَرَوْسَ رِجَالٍ وَنَجْعَلُ لَكُمْ فِيهَا رِجَالًا

অর্থাৎ, তোমরা কি এ ব্যাপারে বিস্মিত যে, তোমাদের পালনকর্তার পয়গাম তোমাদেরই মধ্যে থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে, যাতে তোমরা ভীত হও এবং যাতে তোমরা অনুগৃহীত হও। অর্থাৎ, তাঁর ভয় প্রদর্শনের ফলে তোমরা হুশিয়ার হয়ে বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ কর, যার ফলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ নাযিল হয়।

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষকে রসূল করা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা রেসালত দান করবেন। এতে কারও টু শব্দটি করার অধিকার নেই। এছাড়া আসল ব্যাপারে চিন্তা করলেও বোঝা যায় যে, সাধারণ মানুষের প্রতি রেসালতের উদ্দেশ্য মানুষের মাধ্যমেই পূর্ণ হতে পারে। ফেরেশতাদের দ্বারা এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না।

কারণ, রেসালতের আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব জাতিকে আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদতে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাঁর নির্দেশাবলীর বিরোধিতা থেকে রক্ষা করা। এটা তখনই সম্ভব, যখন মানুষের মধ্য থেকেই এক ব্যক্তি আদর্শ হয়ে তাদেরকে দেখিয়ে দেয় যে, মানবিক কামনা-বাসনার সাথেও আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদত একত্রিত হতে পারে। ফেরেশতা এ দাওয়াত নিয়ে আসলে এবং নিজের দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে তুলে ধরলে মানুষের প্রকাশ্য আপত্তি থেকে যেত যে, ফেরেশতারা মানবিক প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত—তাদের ক্ষুধা - তৃষ্ণা এবং নিদ্রা ও শ্রান্তি কিছুই নেই—আমরা তাদের মত হব কেমন করে? কিন্তু নিজেদেরই এক ব্যক্তি যখন সব মানবিক প্রবৃত্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও খোদারী নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করবে, তখন তাদের কোন অজুহাত থাকতে পারবে না।

এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যেই বলা হয়েছেঃ لَيُنْذِرَكُمْ وَلَسْتُ مَكِينًا অর্থাৎ,

মানুষ ও মানবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির ভয় প্রদর্শনে প্রভাবান্বিত হয়েই মানুষ ভীত হতে পারে— কারো ভয় প্রদর্শনে নয়। অধিকাংশ উম্মতের কাফেররা এ সন্দেহ উত্থাপন করেছে যে, কোন মানুষের নবী ও রসূল হওয়া উচিত নয়। কোরআন পাক সবাইকে এ উত্তরই দিয়েছে। পরিতাপের বিষয় যে, কোরআনের এতসব বর্ণনা সত্ত্বেও আজও কিছু লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর মানবত্ব অস্বীকার করার দুঃসাহস করে। কিন্তু মুখরী এ সত্যটি বোঝে না। তারা কোন স্বজাতীয় ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয়। এ কারণেই মুখরী সব সময়ই সমসাময়িক গুলী ও আলেমদের প্রতি সমসাময়িকতার কারণে ঘৃণা ও বিমুখতা পোষণ করে এসেছে।

স্বজাতির মর্মসুদ কথাবার্তার জওয়াবে নূহ (আঃ)—এর দয়ার্ধ এবং শুভেচ্ছামূলক আচরণও চেতনাহীন জাতির মধ্যে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। তারা অন্ধভাবে মিথ্যারোপেই ব্যাপৃত রইল। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি প্লাবনের শাস্তি প্রেরণ করলেন। বলা হয়েছেঃ

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذْنَاهُ فِي الْغُلَّتِ وَأَعْرَضْنَا الْدِّينَ كَذِبًا

— অর্থাৎ, নূহ (আঃ)—এর জালাম

সম্প্রদায় তাঁর উপদেশ ও শুভেচ্ছার পরোয়া করল না এবং যথারীতি মিথ্যারোপে অটল রইল। এর পরিণতিতে আমি নূহ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে একটি নৌকায় উঠিয়ে মুক্তি দিয়েছি এবং যারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছিল, তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিয়েছি। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ।

হযরত নূহ (আঃ)—এর কাহিনী, তাঁর সম্প্রদায়ের সলিল সমাধি লাভ এবং নৌকারোহীদের মুক্তির পূর্ণ বিবরণ সূরা নূহ ও সূরা হুদে বর্ণিত হবে। এস্থলে আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোটামুটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। হযরত য়ায়েদ ইবনে আসলাম বলেনঃ যে সময় নূহ (আঃ)—এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনের আঘাব নেমে এসেছিল, তখন তারা জনসংখ্যা ও শক্তির দিক দিয়ে ভরপুর ছিল। সংখ্যাধিক্যের কারণে ইরাকের ভূখণ্ড এবং পাহাড়েও তাদের সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহ তাআলার চিরন্তন নীতি এই যে, তিনি অবাধ্য জাতিদেরকে টিল দেন। তারা যখন সংখ্যাধিক্য, শক্তি ও ধনাঢ্যতার চরম সীমায় উপনীত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তখনই তাদের উপর আল্লাহর আঘাব নেমে আসে।—(ইবনে কাসীর)

নূহ (আঃ)—এর সাথে নৌকায় কতজন লোক ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতক্রমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আশি জন লোক ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম ছিল জুরহাম। সে আরবী ভাষায় কথা বলত।—(ইবনে-কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, আশি জনের মধ্যে চল্লিশ জন পুরুষ ও চল্লিশ জন মহিলা ছিল। প্লাবনের পর তারা মোসেলের যে স্থানটিতে বসতি স্থাপন করেন, তা 'ছামানুন' (অর্থাৎ, আশি) নামে খ্যাত হয়ে যায়।

মোটকথা, এখানে নূহ (আঃ)—এর সৎক্ষিপ্ত কাহিনী বর্ণনা করে কয়েকটি বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে। (এক) পূর্বতন সব পয়গম্বরের দাওয়াত ও বিশ্বাসের মূলনীতি ছিল অভিন্ন। (দুই) আল্লাহ তাআলা স্বীয় পয়গম্বরের সাহায্য ও সমর্থন কিরূপ বিস্ময়কর পন্থায় করেন যে পাহাড়ের সুউচ্চ শৃঙ্গে পর্যন্ত প্লাবনের মধ্যেও তাঁদের নিরাপত্তা ব্যাহত

হয়নি। (তিনি) পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা আল্লাহর আযাব ডেকে আনারই নামাস্তর। পূর্ববর্তী উস্মতরা যেমন পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করার কারণে আযাবে শ্রেষ্টতার হয়েছে, একালের লোকদেরও এ থেকে ভয়মুক্ত হওয়া উচিত নয়।

আদ ও সামুদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : ‘আদ’ প্রকৃতপক্ষে নূহ (আঃ)-এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং তাঁর পুত্র সামের বংশধরেরই এক ব্যক্তির নাম। অতঃপর তার বংশধর ও গোটা সম্প্রদায় ‘আদ’ নামে খ্যাত হয়ে গেছে। কোরআন পাকে আদের সাথে কোথাও ‘আদে উলা’ (প্রথম আদ) এবং কোথাও **أَزْدَآبِ الْوَحْشِ** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, আদ সম্প্রদাকে ‘ইরাম’ ও বলা হয় এবং প্রথম আদের বিপরীতে কোন দ্বিতীয় আদও রয়েছে। এ সম্পর্কে তফসীরবিদ ও ইতিহাসবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। অধিক প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, আদের দাদার নাম ইরাম। তাঁর এক পুত্র আওসের বংশধররাই আদ। তাদেরকে প্রথম আদ বলা হয়। অপর পুত্র জাসুর পুত্র হচ্ছে সামুদ। তার বংশধরকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আদ ও সামুদ উভয়ই ইরামের দু’শাখা। এক শাখাকে প্রথম আদ এবং অপর শাখাকে সামুদ অথবা দ্বিতীয় আদ বলা হয়। ইরাম শব্দটি আদ ও সামুদ উভয়ের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য।

আদ সম্প্রদায়ের তেরটি পরিবার ছিল। আশ্মান থেকে শুরু করে হামরামাওত ও ইয়ামন পর্যন্ত তাদের বসতি ছিল। তাদের খেত-খামারগুলো অত্যন্ত সজীব ও শস্যশ্যামল ছিল। সব রকম বাগান ছিল। তারা ছিল সুঠামদেহী ও বিরাট বপুস্পন্ন। আয়াতে **وَزَادُوا فِي الْخَلْقِ بَقْلَةً** বাক্যের উদ্দেশ্য তাই। আল্লাহ তাআলা তাদের সামনে দুনিয়ার যাবতীয় নেয়ামতের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু বক্রবুদ্ধির কারণেই এসব নেয়ামতই তাদের জন্যে কাল হয়ে দাঁড়াল। তারা শক্তিমদমত্ত হয়ে **مَنْ أَشَدُّ وَتَرًا** (আমাদের চাইতে শক্তিশালী কে?)-এর ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে থাকে।

যে বিশু প্রতিপালকের নেয়ামতের বৃষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হচ্ছিল, তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজায় আত্মনিয়োগ করে।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : আদ সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব আসে, তখন তাদের একটি প্রতিনিধিদল মক্কা গমন করেছিল। ফলে তারা আযাব থেকে রক্ষা পেয়ে যায়—তাদেরকে দ্বিতীয় আদ বলা হয়। - (বয়ানুল কোরআন)

‘হুদ’ একজন পয়গম্বরের নাম। তিনি নূহ (আঃ)-এর পঞ্চম পুরুষের মধ্যে এবং সামের বংশধরের এক ব্যক্তি। আদ সম্প্রদায় এবং হুদ (আঃ)-এর বংশতালিকা চতুর্থ পুরুষে সাম পর্যন্ত পৌছে এক হয়ে যায়।—তাই হুদ (আঃ) আদের বংশগত ভাই। এ কারণেই আয়াতে **أَخَاهُمْ هُودًا** (তাদের ভাই হুদ) বলা হয়েছে।

হযরত হুদ (আঃ)-এর বংশতালিকা ও কিছু জীবন-চরিত্র : আল্লাহ তাআলাই তাদের হেদায়েতের জন্যে হুদ (আঃ)-কে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন তাদেরই পরিবারের একজন। আরব বংশ বিশেষজ্ঞ আবুল বারাকাত জওফী লিখেন : হুদ (আঃ)-এর পুত্র ইয়ারাব ইবনে কাহতান ইয়ামনে পৌছে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামনের সব সম্প্রদায় তাঁরই বংশধর। আরবী ভাষার সূচনা তাঁর থেকেই হয়েছে এবং তাঁর নামানুসারে ভাষার নাম আরবী এবং এ ভাষাভাষীদের নাম হয়েছে আরব।—(বাহরে-মুহীত)

কিন্তু বিশুদ্ধ তথ্য এই যে, আরবী ভাষা নূহ (আঃ)-এর আক্ষ থেকেই প্রচলিত ছিল। নূহ (আঃ)-এর নৌকার একজন আরোহী জুবহান আরবী ভাষায় কথা বলতেন।—(বাহরে-মুহীত)। জুরহাম থেকেই মক্কা শহর আবাদ হয়েছে। এটা সম্ভব যে, ইয়ামনে আরবী ভাষার সূচনা ইয়ারাব ইবনে কাহতান থেকে হয়েছিল। আবুল বারাকাতের বক্তব্যের উদ্দেশ্যও তাই।

হযরত হুদ (আঃ) আদ জাতিতে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে একত্ববাদে অনুসরণ করতে এবং অত্যাচার-উৎপীড়ন ত্যাগ করে ন্যায় ও সুবিচারের পথ ধরতে আদেশ করেন। কিন্তু তারা স্বীয় ধনেশুর্ষের মোহে মত্ত হয়ে তাঁর আদেশ অমান্য করে। এর পরিণতিতে তাদের উপর প্রথম আযাব নাফিল হয় এবং তিন বছর পর্যন্ত উপর্যুপরি বৃষ্টি বন্ধ থাকে। তাদের শস্যক্ষেত্র শুষ্ক বালুকায়ময় মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যায়। বাগান জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা শেরেক ও মূর্তি পূজা ত্যাগ করে না। অতঃপর আট দিন সাত রাত্রি পর্যন্ত তাদের উপর প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের আযাব সওয়ার হয়। ফলে তাদের অবশিষ্ট বাগবাগিচা ও দালান-কোঠা ভূমিসাৎ হয়ে যায়। মানুষ ও জীবজন্তু শূন্যে উড়তে থাকে। অতঃপর উপুড় হয়ে মাটিতে পড়তে থাকে। এভাবে আদ জাতিতে সমূল ধ্বংস করে দেয়া হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে : **وَكُنْزُكَ دَكَايَرٍ** অর্থাৎ, আমি মিথ্যারোপকারীদের বংশ কেটে দিয়েছি। এর মর্ম কোন কোন তফসীরকার এটাই স্থির করেছেন যে, তখন তাদের মধ্যে যারা জীবিত ছিল তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ এর অর্থ একরূপ বর্ণনা করেছেন যে, ভবিষ্যতের জন্যেও আদ জাতিতে নির্বংশ করে দেয়া হয়েছে।

হযরত হুদ (আঃ)-এর আদেশ অমান্য করা এবং কুফর ও শেরকে লিপ্ত থাকার কারণে যখন আদ জাতির উপর আযাব নাফিল হয়, তখন হুদ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা একটি কুঁড়ে ঘরে আশ্রয়গ্রহণ করেন। আশ্রয়ের বিষয় ছিল এই যে, ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে বিরাট বিরাট অট্টালিকা মাটিতে লুটিয়ে পড়লেও এ কুঁড়ে ঘরটিতে বাতাস খুব সুস্থ পরিমাণে প্রবেশ করত। হযরত হুদ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা ঠিক আযাবের মুহুর্তেও এখানে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন। তাঁদের কোন কষ্টই হয়নি। সবাই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তিনি মক্কায় চলে যান এবং সেখানেই ওফাত পান।—(বাহরে মুহীত)

আদ জাতির উপর ঘূর্ণিঝড়ের আকারে আযাব আসা কোরআন পাকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে। সূরা মুমিনুনে নূহ (আঃ)-এর কাহিনী উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে : **فَوَاسَّأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْآنًا خَرِيدٍ** অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাদের পরে আরও একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। বাহাড এরাই হচ্ছে ‘আদ’ জাতি। পরে এ সম্প্রদায়ের কাজ-কর্ম ও কথা বার্তা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে - **فَأَخَذْنَاهُمُ الْغِيْثَ بِالْحَقِّ** অর্থাৎ, একটি বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল। এ আয়াতের ভিত্তিতে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : আদ জাতির উপর বিকট ধরনের শব্দের আযাব সওয়ার হয়েছিল। কিন্তু উভয় মতের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এটা সম্ভব যে, বিকট শব্দ ও ঘূর্ণিঝড় উভয়টিই হয়েছিল।

এ হচ্ছে আদ জাতি ও হযরত হুদ (আঃ)-এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা। কোরআন পাকের ভাষায় এর বিবরণ একরূপ :

৬৫ নং আয়াত **وَلِلَّهِ عَادٌ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَتُوبُوا غَيْرَ وَاللَّهِ مَا كُنتُمْ إِلَّا كَذَّابُونَ** অর্থাৎ, আমি আদ জাতির প্রতি তাদের

ভাই হুদ (আঃ) - কে হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করছি। সে বলল : হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা শুধু আল্লাহ্ তাআলারই এবাদত কর। তিনি কৃত্রিম তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমরা কি ভয় কর না ?

আদ জাতির পূর্বে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত মহাশাস্তির স্মৃতি তখনও মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। তাই হুদ (আঃ) আমাদের কঠোরতা বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করেননি। বরং এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছেন যে, তোমরা কি ভয় কর না ?

৬৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে : **قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ** অর্থাৎ, সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলেন : আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি। আমাদের ধারণা, তুমি একজন মিথ্যাবাদী।

এটা প্রায় নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের প্রত্যুত্তরের মতই-শুধু কয়েকটি শব্দের পার্থক্য মাত্র। তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে এর উত্তর প্রায় তেমনি দেয়া হয়েছে, যেমন নূহ (আঃ) দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই। ব্যাপার শুধু এতটুকু যে, আমি বিশ্ব পালনকর্তার কাছ থেকে রাসূল হয়ে এসেছি। তাঁর বার্তা তোমাদের কাছে পৌছাই। আমি সুস্পষ্টভাবে তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই তোমাদের পৈতৃক মূর্ত্যায় তোমাদের সঙ্গী হওয়ার পরিবর্তে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সত্য কথা তোমাদের কাছে পৌছে দেই। কিন্তু তা তোমাদের মনঃপূত নয়।

পঞ্চম আয়াতে আদ জাতির সে আপত্তির কথাই উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের পূর্বে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় উত্থাপন করেছিল। অর্থাৎ, আমরা নিজেদেরই মত কোন মানুষকে নেতাক্রমে কিভাবে মেনে নিতে পারি? কোন ফেরেশতা হলে মেনে নেয়া সম্ভবপর ছিল। এর উত্তরেও কোরআন পাক তাই উল্লেখ করেছে, যা নূহ (আঃ) দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, কোন মানুষ আল্লাহ্র রসূল হয়ে মানুষকে ভয় প্রদর্শনের জন্যে আসবেন। কেননা, মানুষকে বোঝানোর জন্যে মানুষের পয়গম্বর হওয়াই কার্যকরী হতে পারে।

এরপর আদ জাতিতে আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে বলা হয়েছে :

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي
الْحَقِّ بِطَغْوَاهُ إِذْ ذُكِّرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ

অর্থাৎ, স্মরণ কর যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে কওমে নূহের পর ভূপৃষ্ঠের মালিক করে দিয়েছেন এবং দেহাবয়বে বিশালতা সম্পদ জনসংখ্যায় আধিক্য দিয়েছেন। আল্লাহ্র এসব নেয়ামত স্মরণ করলে তোমাদের মঙ্গল হবে।

কিন্তু এ অবধ্য জাতি এসব উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করল না। তারা পথভ্রষ্টদের চিরাচরিত প্রথায় উত্তর দিল : তুমি কি আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্ম আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাও? দেবতাদেরকে ছেড়ে আমরা এক আল্লাহ্র এবাদত করি-এটাই কি তোমার কাম্য? না, আমরা তা করতে পারব না। তুমি যে শাস্তির হুমকি দিচ্ছ, তা নিয়ে আস যদি সত্যবাদী হও।

৬৭নং আয়াতে হুদ (আঃ) উত্তর দিয়েছেন : তোমরা যখন এমনি অবধ্য ও অজ্ঞান, তখন তোমাদের উপর আল্লাহ্র গযব ও শাস্তি এল বলে, তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও এখন তারই প্রতীক্ষা করছি। জাতির এ উস্কানিমূলক উত্তর শুনে তিনি আযাব আসার সংবাদ দিয়েছিলেন বটে; কিন্তু পয়গম্বরসুলভ দয়া ও শুভেচ্ছা তাঁকে সাথে সাথে একথা বলতেও বাধ্য করল : পরিতাপের বিষয়, তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা জড় ও অচেতন পদার্থসমূহকে উপাস্য করে নিয়েছে। এদের উপাস্য হওয়ার না কোন যুক্তিগত প্রমাণ আছে, না ইতিহাসগত। এদের এবাদতে তোমরা এতই পাকা হয়ে গেছ যে, এদের সমর্থনে আমার সাথে বিতর্ক করে যাচ্ছ।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে, হুদ (আঃ)-এর সব প্রচেষ্টা এবং আদ জাতির অবধ্যতার সর্বশেষ পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, আমি হুদ ও তাঁর সাথী মুমিনদেরকে আযাব থেকে নিরাপদে রেখেছি এবং মিথ্যারোপকারীদের মূল কেটে দিয়েছি। তারা বিশ্বাস স্থাপনকারী ছিল না।

এ কাহিনীতে গাফেলদের জন্যে আল্লাহ্র স্মরণ ও আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করার নির্দেশ, বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্যে শিক্ষাসামগ্রী এবং প্রচারক সংস্কারকদের জন্যে পয়গম্বরসুলভ প্রচার ও সংস্কারপদ্ধতির শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

الاعراب

১৭০

لوانآء

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ছালেহ্ (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইতিপূর্বে কওমে নূহ ও কওমে হুদের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সূরা আ'রফের শেষ পর্যন্ত পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের অবস্থা এবং সত্যের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার কারণে তাদের কুফর ও অশুভ পরিণতির বিষয় বর্ণিত হবে।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে **وَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِهِمْ وَسَلِّمْ** ইতিপূর্বে আদ জাতির আলোচনায় বলা হয়েছে যে, আদ ও সামুদ একই দাদার বংশধরের দু' ব্যক্তির নাম। তাদের সন্তানরাও তাদের নামে অভিহিত হয়ে দু' সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। একটি আদ সম্প্রদায়, আর একটি সামুদ সম্প্রদায়। তারা আরবের উত্তর পশ্চিম এলাকায় বসবাস করত। তাদের প্রধান শহরের নাম ছিল 'হজর'। বর্তমানে একে সাধারণতঃ 'মাদায়েনে ছালেহ' বলা হয়। আদ জাতির মত সামুদ জাতিও সম্পন্ন, শক্তিশালী ও বীর জাতি ছিল। তারা প্রস্তর খোদাই ও স্থাপত্য বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল। সমতল ভূমিতে বিশালকায় অট্টালিকা নির্মাণ ছাড়াও পর্বত খোদাই করে নানা রকম প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। আরমুল কোরআন গ্রন্থে মাওলানা সাইয়্যেদ সোলায়মান নদভী লিখেছেন : তাদের স্থাপত্যের নিদর্শনাবলী আজও পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গায়ে ইরামী ও সামুদী বর্ণমালায় শিলালিপি রয়েছে।

পার্শ্ব বিস্ত ও ধনৈশ্বর্যের পরিণতি প্রায়ই অশুভ হয়ে থাকে। বিস্তশালীরা আল্লাহ ও পরকাল ভুলে গিয়ে ভ্রান্তপথে পা বাড়ায়। সামুদ জাতির বেলায়ও তাই হয়েছে।

অথচ পূর্ববর্তী কওমে নূহের শান্তির ঘটনাবলী তখনও লোকমুখে আলোচিত হত এবং আদ জাতির ধ্বংসের কাহিনী যেন সাম্প্রতিক কারের ঘটনা বলে বিবেচিত হত। কিন্তু ঐশ্বর্য ও শক্তির নেশা এমনি জিনিস যে, একজনের ধ্বংসস্তূপের উপর অন্যজন এসে স্বীয় প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং প্রথম জনের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ ভুলে যায়। আদ জাতির ধ্বংসের পর সামুদ জাতি তাদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় এবং যে সব জায়গায় নিজেদের বিলাস বহুল প্রাসাদ গড়ে তোলে, সেখানেই তাদের ভাইয়েরা নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। তারা আদ জাতির অনুরূপ কার্যকলাপও শুরু করে দেয়। আল্লাহ ও পরকাল বিস্মিত হয়ে শিরক ও মূর্তি পূজায় মনোনিবেশ করে। আল্লাহ তাআলা স্বীয় চিরন্তন রীতি অনুযায়ী তাদের হেদায়েতের জন্যে ছালেহ্ (আঃ) কে পয়গম্বররূপে প্রেরণ করেন। তিনি বংশ ও দেশের দিক দিয়ে সামুদ জাতিরই একজন এবং সামেরই বংশধর ছিলেন। একারণেই আয়াতে তাঁকে **آلَهُمْ صَلِّ** অর্থাৎ, সামুদ জাতির ভাই বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ছালেহ্ (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সে দাওয়াতই দেন, যা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে তখনও পর্যন্ত সমস্ত পয়গম্বর দিয়ে এসেছিলেন। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে : **وَلَقَدْ بَعَدْنَا كُلَّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّبِعُوا الْاَطَاْعَتِ**

অর্থাৎ, আমি প্রত্যেক উম্মতে একজন করে রসূল প্রেরণ করেছি, যাতে তারা মানুষকে আল্লাহর এবাদত করার ও মূর্তি পূজা পরিহার করার নির্দেশ দেয়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের ন্যায় ছালেহ্ (আঃ)ও তাঁর জাতিতে একথাই বললেন যে, আল্লাহ তাআলাকে প্রতিপালক ও স্রষ্টা মনে কর। তিনি ব্যতীত এবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তাঁর ভাষায় **يَقُومُوا عِبَادَةَ اللَّهِ**

مَا لَكُمْ مِنَ الْغَيْرَةِ

أَبَيْكُمْ رَسُولِي رَّبِّي وَإِنَّا لَكُمْ تَائِبُونَ آمِينَ ۝ وَكُنْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرُنَا رَحْمَةً عَلَىٰ رَحْمِي وَمِنْكُمْ لَيِّنُونَ رَكُمْ وَادُّرُوا أَدَّ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَخْطَةً ۝ فَادُّرُوا أَدَّ اللَّهُ لَكُمْ تَائِبُونَ ۝ قَالُوا أَجِئْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَلَيْتَنَاهُمَا تَائِبُونَ ۝ كُنْتُمْ مِنَ الضَّالِّينَ ۝ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ ۝ أَجِئَا لَوْنِي فِي أَسْمَاءٍ سَيَّيْتُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطٰنٍ فَانْتَبَهُوْا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِّنَ الْبُنْيَانِ ۝ فَاجْعِلْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ رَحْمَةً مِنَّا وَ قَطْعَنَادِ الْاَذِينَ كَذَّبُوا بِالْاِيْتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝ وَاللَّهُ سَمُودَ آخَاهُمْ صَلِّ عَلَيْهِ ۝ قَالُوا يَقُومُوا عِبَادَةَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنَ الْغَيْرَةِ ۝ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي اَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا سَمُودَ ۝ فَيَا خَلْقُكُمْ عَذَابُ الْيَمِّ ۝

(৬৮) তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম সৌহার্দ্য এবং আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বিশুদ্ধ। (৬৯) তোমরা কি আশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজনের বাচনিক উপদেশ এসেছে—যাতে সে তোমাদেরকে তীতি প্রদর্শন করে। তোমরা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে কওমে নূহের পর সর্দার করেছেন এবং তোমাদের দেহের বিশুদ্ধি বোধী করেছেন। তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর—যাতে তোমাদের মঙ্গল হয়। (৭০) তারা বললঃ তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছ যে আমরা এক আল্লাহর এবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূজা করত, তাদেরকে ছেড়ে দেই? অতএব নিয়ে আস আমাদের কাছে যদ্বারা আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৭১) সে বলল : অবধারিত হয়ে গেছে তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ। আমার সাথে ঐসব নাম সম্পর্কে কেন তর্ক করছ, যেগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছে। আল্লাহ এদের কোন মদ অবতীর্ণ করেননি। অতএব অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। (৭২) অনন্তর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং যারা আমার আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করত তাদের মূল কেটে দিলাম। তারা মান্যকারী ছিল না। (৭৩) সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি তাদের ভাই সালেহকে। সে বলল : হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি প্রমাণ এসে গেছে। এটি আল্লাহর উদ্দী—তোমাদের জন্যে প্রমাণ। অতএব একে ছেড়ে দাও, আল্লাহর ভূমিতে চড়ে বেড়াবে। একে অসংভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে।

এতদসঙ্গে আরও বললেন : **قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ** অর্থাৎ, এখন তো একটি সুস্পষ্ট নিদর্শনও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসে গেছে। এ নিদর্শনের অর্থ একটি আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী। এ আয়াতে এর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ রয়েছে। এবং কোরআনের বিভিন্ন সূরায় এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। এ উষ্ট্রীর ঘটনা এই যে, হযরত ছালেহ (আঃ) যৌবনকাল থেকেই স্বীয় সম্প্রদায়কে একত্ববাদের দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং এ কাজেই বার্ষিক্যের দ্বারে উপনীত হন। তাঁর বার বার গীড়াপীড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থির করল যে, তাঁর কাছে এমন একটি দাবী করতে হবে যা পূরণ করতে তিনি অক্ষম হয়ে পড়বেন এবং আমরা তাঁর বিরুদ্ধে জয়লাভ করব। সে মতে তারা দাবী করল যে, আপনি যদি বাস্তবিকই আল্লাহর পয়গম্বর হন, তবে আমাদেরকে ‘কাতেবা পাহাড়ের ভিতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী, সবল ও স্বাস্থ্যবতী উষ্ট্রী বের করে দেখান।

ছালেহ (আঃ) প্রথমে তাদের কাছ থেকে অস্বীকার নিলেন যে, যদি আমি তোমাদের দাবী পূরণ করে দেই, তবে তোমরা আমার প্রতি ও আমার দাওয়াতের প্রতি বিশ্রাস স্থাপন করবে কি না? সবাই যখন এই মর্মে অস্বীকার করল, তখন ছালেহ (আঃ) দু'রাকআত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, ‘ইয়া পরওয়ারদেগার, আপনার জন্যে কোন কাজই কঠিন নয়। তাদের দাবী পূরণ করে দিন।’ দোয়ার সাথে সাথে পাহাড়ের গায়ে স্পন্দন দেখা গেল এবং একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে তার ভেতর থেকে দাবীর অনুরূপ একটি উষ্ট্রী বের হয়ে এল।

ছালেহ (আঃ) এর এ বিস্ময়কর মো'জেযা দেখে কিছু লোক ভঙ্কণাৎ মুসলমান হয়ে গেল এবং অবশিষ্টাও মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা করল, কিন্তু দেবদেবীদের বিশেষ পূজারী ও মূর্তিপূজারী ঠাকুর ধরনের কিছু সর্দার তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিল। হযরত ছালেহ (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে অস্বীকার ভঙ্গ করতে দেখে শঙ্কিত হলেন যে, এদের উপর আযাব এসে যেতে পারে। তাই পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করে বললেন : এ উষ্ট্রীর দেখাশোনা কর। একে কোনরূপ কষ্ট দিও না। এভাবে হয়ত তোমরা আযাব থেকে বেঁচে যেতে পার। এর অন্যথা হলে তোমরা সাথে সাথে আযাবে পতিত হবে। নিষ্প্রাণ আয়াতে এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে :

هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ قَدْ رُؤِيَ مَا كُلُّ فِي أََرْضٍ لَكُمْ لَا تَسْتَوِيهَا

سُورَةُ قِيَامَتُهُمْ عَذَابُ الْآلِمَةِ অর্থাৎ, এটি আল্লাহর উষ্ট্রী—তোমাদের জন্যে নিদর্শন। অতএব একে আল্লাহর যমিনে চরে বেড়াতে দাও এবং একে অনিষ্টের অভিপ্রায়ে স্পর্শ করো না। নতুবা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। এ উষ্ট্রীকে ‘আল্লাহর উষ্ট্রী’ বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহর আসীম শক্তির নিদর্শন এবং ছালেহ (আঃ) এর মো'জেযা হিসেবে বিস্ময়কর পন্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন, হযরত ইসা (আঃ) এর জন্মও অলৌকিক পন্থায় হয়েছিল বলে তাঁকে রূতুল্লাহ (আল্লাহর আত্মা) বলা হয়েছে। **قَالَ نَزَلَ مِنْ رَبِّي أَرْضَ اللَّهِ** বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ উষ্ট্রীর পানাহারে তোমাদের মালিকানা ও তোমাদের ঘর থেকে কিছুই ব্যয় হয় না। যমিন আল্লাহর এবং এর উৎপন্ন ফসলও আল্লাহর সৃজিত। কাজেই তাঁর উষ্ট্রীকে তাঁর যমিনে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও, যাতে সাধারণভাবে চারণ ক্ষেত্রে বিচরণ করে বেড়াতে পারে।

সামুদ জাতি যে কূপ থেকে পানি পান করত এবং জন্তুদেরকে পান করাত, এ উষ্ট্রীও সে কূপ থেকেই পানি পান করত। কিন্তু এ আশ্চর্য ধরনের উষ্ট্রী যখন পানি পান করত, তখন পানি নিঃশেষে পান করে ফেলত। হযরত ছালেহ (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে ফয়সালা করে দিলেন যে, একদিন এ উষ্ট্রী পানি পান করবে এবং অন্য দিন সম্প্রদায়ের সবাই পানি নিবে। যেদিন উষ্ট্রী পানি পান করত সেদিন অনারা উষ্ট্রীর দুধ দ্বারা তাদের সব পাত্র ভর্তি করে নিত। কোরআনের অন্যত্র এভাবে পানি বন্টনের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

وَيَذَرُهُمْ أَتَانِ الْمَآءِ قَسَمَةً يَبْتَكِرُ كُلُّ نَرَبٍ مَنَصَرًّا অর্থাৎ, হে

ছালেহ তুমি স্বজাতিকে বলে দাও যে, কূপের পানি তাদের এবং উষ্ট্রীর মধ্যে বন্টন হবে—একদিন উষ্ট্রীর এবং পরবর্তী দিন তাদের। আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতারা এ বন্টন ব্যবস্থা দেখাশোনা করবে—যাতে কেউ এর খেলাফ করতে না পারে। অন্য এক আয়াতে আছে **هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ**

وَلَكُمْ فِيهَا دُرُّكُمْ يُرْوَى مِنْ سَوَاءِ الْمَاءِ অর্থাৎ, এটি আল্লাহর উষ্ট্রী। একদিন এর পানি এবং অন্য নির্দিষ্ট দিনের পানি তোমাদের।

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخِفُّونَ مِنْ سُورَيْهَا فَاصْبُرُوا وَاصْبُرُوا الْجِبَالِ يَبُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا الْآلَاءَ وَاللَّهُ لَا يَنْسِي ۚ

مُفْسِدِينَ ۝ قَالَ الْهَلَاكُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لَهُنَّ ۚ إِنَّهُمْ وَهُمْ أُتْعَمُونَ ۚ إِنَّ صَلَاحًا مِّنْ رَّبِّيَ قَالُوا لَا بُدَّ أَلَّا يَرْسِلَ إِلَيْهِ مَوْمِنُونَ ۝

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنَّا بِهِ كَافِرُونَ ۖ فَتَقَرُّوا وَالْثَّاقَةُ وَعَتَوْا ۚ إِنَّ أَمْرَ رَبِّهِمْ وَأَلَّا يُصْلِحَهُمُ احْتِذَا بِمَا تَوَدَّ أَنْ تَكُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَخَذَ لَهُمُ الرَّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيئِينَ ۝

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمُ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَفَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَوْ طَإِذْ قَالِ لَقَوْمُهُ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۖ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْنِسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝

(৭৪) তোমরা স্মরণ কর, যখন তোমাদেরকে আদ জাতির পরে সর্দার করেছেন; তোমাদেরকে পৃথিবীতে ঠিকানা দিয়েছেন। তোমরা নরম মাটিতে অটালিকা নির্মাণ কর এবং পর্বত গাত্র খনন করে প্রকাণ্ড নির্মাণ কর। অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। (৭৫) তার সম্প্রদায়ের দান্তিক সর্দাররা ঈমানদার দরিদ্রদেরকে জিজ্ঞেস করল : তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সালেহকে তার পালনকর্তা প্রেরণ করেছেন? তারা বলল : আমরা তো তার আনিত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসী। (৭৬) দান্তিকরা বলল : তোমরা যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ, আমরা তাতে অস্বীকৃত। (৭৭) অতঃপর তারা উষ্ট্রকে হত্যা করল এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তারা বলল : হে ছালেহ, নিয়ে এস যুদ্ধের আমাদেরকে ভয় দেখাতে, যদি তুমি রাসূল হয়ে থাক। (৭৮) অতঃপর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে সকাল বেলায় নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৭৯) ছালেহ তাদের কাছ থেকে প্রস্থান করলো এবং বলল : হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের পয়গাম পৌছিয়েছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি কিন্তু তোমরা মঙ্গলাকাশীদদেরকে ভালবাস না। (৮০) এবং আমি লুতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলল : তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি? (৮১) তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষদের কাছে গমণ কর নারীদেরকে ছেড়ে। বরং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ।

৭৪ নং আয়াতে এ অব্যাহ ও অঙ্গীকারভঙ্গকারী জাতির শুভেচ্ছা ও তাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর জন্যে পুনরায় তাদেরকে আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হয়েছে, যাতে তারা অব্যাহতা পরিহার করে। বলা হয়েছে :

وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ...

এতে خُلَفَاءَ শব্দটি এর বহুবচন। এর অর্থ স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি। قصر শব্দটি এর বহুবচন। এর অর্থ উচ্চ অটালিকা ও প্রাসাদ। نَحْت শব্দটি نَحْت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রস্তর খোদাই করা। جبال শব্দটি جبل এর বহুবচন। এর অর্থ পাহাড়। بَيوت শব্দটি بيت এর বহুবচন। এর অর্থ প্রকাণ্ড। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত স্মরণ কর যে, তিনি আদ জাতিকে ধ্বংস করে তাদের স্থলে তোমাদেরকে অভিষিক্ত করেছেন, তাদের ঘরবাড়ী ও সহায়-সম্পত্তি তোমাদেরকে দান করেছেন এবং তোমাদেরকে এ শিল্প কার্য শিক্ষা দিয়েছেন যে, উন্মুক্ত জয়গায় তোমরা প্রাসাদোপম অটালিকা নির্মাণ করে ফেল এবং পাহাড়ের গাত্র খোদাই করে তাতে প্রকাণ্ড তৈরী কর। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে অর্থাৎ, আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ কর, অনুগ্রহ স্বীকার কর, তাঁর আনুগত্য অবলম্বন কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না।

জ্ঞাতব্য বিষয় : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় মৌলিক ও শাখাগত মাসআলা জানা যায়।

(এক) ধর্মের মূল বিশ্বাসসমূহে সব পয়গামুরই একমত এবং তাঁদের সবার শরীয়তই অভিন্ন। সবারই দাওয়াত ছিল এক আল্লাহর এবাদত করা এবং এর বিরুদ্ধাচরণের কারণে ইহকাল ও পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা।

(দুই) পূর্ববর্তী সব উম্মতের মধ্যে এই হয়েছে যে, সম্প্রদায়ের বিস্তারশীল ও প্রধানরা পয়গামুরদের দাওয়াত কবুল করেনি। ফলে তারা ইহকালেও ধ্বংস হয়েছে এবং পরকালেও শাস্তির যোগ্য হয়েছে।

(তিন) তফসীর কুরত্বীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহর নেয়ামত সমূহ দুনিয়াতে কাফেরদেরকেও দান করায়; যেমন, আদ ও সামুদ জাতির সামনে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ ও শক্তির দ্বার খুলে দিয়েছেন।

(চার) তফসীর কুরত্বীতে আছে, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুউচ্চ প্রাসাদ ও বৃহদাকার অটালিকা নির্মাণ করাও আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ও বৈধ।

এটা তিন কথ্য যে, কোন নবী, রাসূল ও ওলীগণ অটালিকা পছন্দ করেননি। কারণ, এগুলো মানুষকে গাফেল করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ সম্পর্কে যেসব বক্তব্য বর্ণিত আছে, সেগুলো এধরনেরই।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সামুদ জাতির দু'দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংগ্রাম উল্লেখ করা হয়েছে। একদল ছালেহ (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় দল ছিল অবিশ্বাসী কাফেরদের। বলা হয়েছে :

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ

اسْتَكْبَرُوا ۖ اَرْثَاهُ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা অহঙ্কারী ছিল, তারা তাদেরকে বলল, যাদেরকে দুর্বল ও হীন মনে করা হত-অর্থাৎ, যারা বিস্বাস স্থাপন করেছিল।

ইমাম রাসী তফসীর কবীর বলেন : এখানে দু'দলের দুটি গুণ ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু কাফেরদের গুণটি معروف এ صيغة বলা হয়েছে এবং মুমিনদের গুণটি مجهول এ صيغة বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কাফেরদের অহঙ্কার গুণটি ছিল তাদের নিজস্ব কাজ যা, দশনীয়, তিরস্কৃত ও পরিণামে শাস্তির কারণ হয়েছে। পক্ষান্তরে মুমিনদের যে বিশেষণ তারা বর্ণনা করত যে, এরা নিকট, হীন ও দুর্বল, এটা কাফেরদেরই কথা, স্বয়ং মুমিনদের বাস্তব অবস্থা ও বিশেষণ নয়, যা তিরস্কারযোগ্য হতে পারে। বরং তিরস্কার তাদেরই প্রাপ্য, যারা বিনা কারণে তাদেরকে হীন ও দুর্বল বলত ও মনে করত। উভয় দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপ ছিল এই যে, কাফেররা মুমিনদেরকে বলল : তোমরা কি বাস্তবিকই জান যে, ছালেহ্ (আঃ) তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল?

উত্তরে মুমিনরা বলল : আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হেদায়েতসহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন আমরা সেগুলোর প্রতি বিশ্বাসী।

তফসীর কাশাফে বলা হয়েছে : সামুদ জাতির মুমিনরা কি চমৎকার অংকরপূর্ণ উত্তরই না দিয়েছে যে, তোমরা এ আলোচনায় ব্যস্ত রয়েছ যে, তিনি রসূল কি না। আসলে এটা আলোচনার বিষয়ই নয় ; বরং জিজ্ঞাস্য ও নিশ্চিত। সাথে সাথে এটাও নিশ্চিত যে, তিনি যা বলেন, তা আল্লাহ তাআলার কাছে থেকে আনিত পয়গাম। জিজ্ঞাস্য বিষয় কিছু থাকলে তা এই যে, কে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কে করে না? আল্লাহর ফযলে আমরা তাঁর আনিত সব নির্দেশের প্রতিই বিশ্বাসী।

কিন্তু তাদের অলংকারপূর্ণ উত্তর শুনেও সামুদ জাতি পূর্ববৎ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বললঃ যে বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করছ, আমরা তা মানি না। দুনিয়ার মহব্বত, ধন-সম্পদ ও শক্তির মত্ততা থেকে আল্লাহ তাআলা নিরাপদ রাখুন। এগুলো মানুষের চোখে পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা জিজ্ঞাস্যমান বিষয়কেও অস্বীকার করতে শুরু করে।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ছালেহ্ (আঃ)-এর দোয়ায় পাহাড়ের একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড বিস্ফোরিত হয়ে আশ্চর্য ধরনের এক উষ্ট্রি বের হয়ে এসেছিল। আল্লাহ তাআলা এ উষ্ট্রিকেই এ সম্প্রদায়ের জন্যে সর্বশেষ পরীক্ষার বিষয় করে দিয়েছিলেন। সেমত সে জনপদের সব মানুষ ও জীব-জন্তু যে কূপ থেকে পানি পান করত, উষ্ট্রি তার সব পানি পান করে ফেলত। তাই ছালেহ্ (আঃ) তাদের জন্যে পানির পালা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, একদিন উষ্ট্রি পানি পান করবে এবং অন্য দিন জনপদের অধিবাসীরা।

সূতরাং এ উষ্ট্রির কারণে সামুদ জাতির বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। ফলে তারা এর ধ্বংস কামনা করত। কিন্তু আযাবের ভয়ে নিজেরা একে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হত না।

যে সুবৃহৎ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনাকে বিলুপ্ত করে দেয়, তা হচ্ছে নারীর প্রলোভন। সূতরাং সম্প্রদায়ের দু'জন পরমাসুন্দরী নারী বাজী রাখল যে, যে ব্যক্তি এ উষ্ট্রিকে হত্যা করবে, সে

আমাদের এবং আমাদের কন্যাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারবে।

সম্প্রদায়ের দু'জন যুবক মিছদা' ও কাসার এ নেশায় মত্ত হয়ে উষ্ট্রিকে হত্যা করার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। তারা উষ্ট্রির পথে একটি বড় প্রস্তর খণ্ডের আড়ালে আত্মগোপন করে বসে রইল। উষ্ট্রি সামনে আসতেই মিছদা' তার প্রতি তাঁর নিক্ষেপ করল এবং কাসার তরবারির আঘাতে তার পা কেটে হত্যা করল।

কোরআন পাক তাকেই সামুদ জাতির সর্ববৃহৎ হতভাগ্য বলে আখ্যা দিয়ে বলেছে : اِذْ يَبْتَئِسُ النَّاسُ مِنْهَا ۚ কেননা, তার কারণেই গোটা সম্প্রদায় আযাবে পতিত হয়।

উষ্ট্রি হত্যার ঘটনা জানার পর ছালেহ্ (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে আল্লাহর নির্দেশ জানিয়ে দিলেন যে, এখন থেকে তোমাদের জীবন কাল মাত্র তিন দিন অবশিষ্ট রয়েছে। تَبْتَئِسُ النَّاسُ مِنْهَا ۚ اَيُّكُمْ يَذَّكَّرُ مِنْ ذَلِكَ ۚ وَمَنْ عَصَا

مَكَرُوبٍ ۖ অর্থাৎ, আরও তিন দিন আরাম করে নাও (এরপরই আযাব নেমে আসবে)। এ ওয়াদা সত্য, এর ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে জাতির দুঃসময় ঘনিযে আসে, তার জন্যে কোন উপদেশ ও হুশিয়ারী কার্যকর হয় না। সূতরাং ছালেহ্ (আঃ)-এর একথা শুনেও তারা ঠাট্টা-বিদ্রোহ করে বলল : এ শাস্তি কিভাবে এবং কোথা থেকে আসবে? এর লক্ষণ কি হবে?

ছালেহ্ (আঃ) বললেন : তাহলে আযাবের লক্ষণও শুনে নাও—আগামী কাল বৃহস্পতিবার তোমাদের নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবার মুখমণ্ডল হলদে ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। অতঃপর পরশু শুক্রবার সবার মুখমণ্ডল গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করবে। অতঃপর শনিবার দিন সবার মুখমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাবে। এটাই হবে তোমাদের জীবনের শেষ দিন। হতভাগ্য জাতি একথা শুনেও ক্ষমা প্রার্থনা করার পরিবর্তে স্বয়ং ছালেহ্ (আঃ)-কেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। তারা ভাবল, যদি সে সত্যবাদী হয় এবং আমাদের উপর আযাব আসেই, তবে আমরা নিজেদের পূর্বে তার ভবলীলাই সাঙ্গ করে দেই না কেন? পক্ষান্তরে যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে মিথ্যার সাজা ভোগ করুক। সামুদ জাতির এ সংকল্পের বিষয় কোরআন পাকের অন্যত্র বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু লোক রাতের বেলা ছালেহ্ (আঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহপানে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা পশ্চিমাধ্যেই প্রস্তর বর্ষণে তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন।

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَكَرَّمُوا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ অর্থাৎ, তারাও গোপন ষড়যন্ত্র করল এবং আমিও প্রত্যুত্তরে এমন কৌশল অবলম্বন করলাম যে, তারা তা জানতেই পারল না। বৃহস্পতিবার ভোরে ছালেহ্ (আঃ)-এর কথা অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল গভীর হলুদ রঙে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। প্রথম লক্ষণ সত্য হওয়ার পরও জালেমরা ইমানের প্রতি মনোনিবেশ করল না; বরং তারা ছালেহ্ (আঃ)-এর প্রতি আরও চটে গেল এবং সমগ্র জাতি তাকে হত্যা করার জন্যে যোরাফেরা করতে লাগল। আল্লাহ রক্ষা করুন, তাঁর গণ্যবেরও লক্ষণাদি থাকে। মানুষের মন ও মস্তিষ্ক যখন অধোমুখী হয়ে যায়, তখন লাভকে ক্ষতি ও ক্ষতিকে লাভ এবং ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল মনে করতে থাকে।

দ্বিতীয়দিন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সবার মুখমণ্ডল লাল এবং তৃতীয় দিন ঘোর কাল হয়ে গেল। তখন সবাই নিরাশ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল যে,

কোন দিক থেকে কিভাবে আযাব আসে।

এমতাবহায় ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হল এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ চিৎকার শুনা গেল। ফলে সবাই একযোগে বসা অবস্থায় অথোমুখী হয়ে ভূশায়ী হল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ভূমিকম্পের কথা উল্লেখিত রয়েছে। **وَأَخَذَ نَهُمُ الرِّجْفَةُ** এখানে **رِجْفَةُ** শব্দের অর্থ ভূমিকম্প।

অন্যান্য আয়াতে **وَأَخَذَ نَهُمُ السَّيْحَةُ** ও বলা হয়েছে। **سَيْحَةُ** শব্দের অর্থ ভীষণ চিৎকার ও বিকট শব্দ। উভয় আয়াতদ্বয়ে প্রতিয়মান হয় যে, তাদের উপর উভয় প্রকার আযাবই এসেছিল; নীচের দিক থেকে ভূমিকম্প আর উপর দিক থেকে বিকট চিৎকার। ফলে তাদের **وَأَخَذَ نَهُمُ الرِّجْفَةُ** এ পরিণতি হয়েছিল। **جَاهِمُ** শব্দটি **جَاهَمُوا** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চেতনাহীন হয়ে পড়ে যাওয়া কিংবা বসে থাকা। (কামুস) অর্থাৎ, যে যে অবস্থায় ছিল, সে সেভাবেই মৃত্যুমুখে পতিত হল। **نَوْمُ اللَّهِ مِنْ قَبْرِهِ وَعَذَابِهِ**

এ কাহিনীর প্রধান অংশগুলো স্বয়ং কোরআন পাকের বিভিন্ন সূরায় এবং কিছু অংশ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। কিছু অংশ এমনও রয়েছে যা তফসীরবিদগণ ইসরাইলী (অর্থাৎ, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের) বর্ণনা থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু এগুলোর উপর কোন ঘটনার প্রমাণ নির্ভরশীল নয়।

ছহীহ বুখারীর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তাবুক যুদ্ধের সফরে রসুলুল্লাহ (সাঃ) হিজর নামক সে স্থানটি অতিক্রম করেন, যেখানে সামুদ জাতির উপর আযাব এসেছিল। তিনি সাহাবায়ে কেয়ামকে নির্দেশ দেন, কেউ যেন এ আযাব-বিশ্বস্ত এলাকার ভিতরে প্রবেশ কিংবা এর কূপের পানি ব্যবহার না করে— (মায়হারী)

কোন কোন হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : সামুদ জাতির উপর আপতিত আযাব থেকে আবুরেগাল নামক এক ব্যক্তি ছাড়া কেউ প্রাণে বাঁচতে পারেনি। এ ব্যক্তি তখন মক্কায় এসেছিল। মক্কার হেরেমের সম্মানার্থে আল্লাহ তাআলা তাকে বাঁচিয়ে রাখেন। অবশেষে যখন সে হেরেম থেকে বাইরে যায়, তখন সামুদ জাতির আযাব তার উপরও পতিত হয় এবং সেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রসুলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেয়ামকে মক্কার বাইরে আবুরেগালের কবরের চিহ্ন দেখান এবং বলেন : তার সাথে স্বর্গের একটি ছড়িও দাফন হয়ে গিয়েছিল। সাহাবায়ে কেয়াম কবর খনন করলে ছড়িটি পাওয়া যায়। এ রেওয়াজে আরও বলা হয়েছে যে, তায়েফের অধিবাসী ছকীফ গোত্র আবু রেগালেরই বংশধর।— (মায়হারী)

এসব আযাব-বিশ্বস্ত সম্প্রদায়ের বস্তিগুলোকে আল্লাহ তাআলা ভবিষ্যৎ লোকদের জন্যে শিক্ষাশুল হিসাবে সংরক্ষিত রেখেছেন। কোরআন পাক আরবদেরকে বার বার হুশিয়ার করেছে যে, তোমাদের সিরিয়া গমনের পথে এসব স্থান আজও শিক্ষার কাহিনী হয়ে বিদ্যমান রয়েছে। **لَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ أَلْفَ تَافَةٍ**

আযাবের ঘটনা বিবৃত করার পর বলা হয়েছে : **تَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِهِمْ رَسُولٌ بِذُنُوبٍ كَثِيرَةٍ وَجَهُ لِقَوْمِهِمْ** অর্থাৎ, স্বজাতির উপর আযাব নাথিল হওয়ার পর ছালেহ (আঃ) ও ইমানদারগণ সে এলাকা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। কোন কোন রেওয়াজে আছে, তাঁর সাথে চার হাজার মুমিন ছিল। তিনি সবাইকে নিয়ে এয়ামনের 'হাযারা মাওতে' চলে গেলেন। সেখানেই তাঁর ওফাত হয়। কোন কোন রেওয়াজে থেকে তাঁর

মক্কায় প্রস্থান এবং সেখানে ওফাতের কথাও জানা যায়।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থে জানা যায় যে, ছালেহ (আঃ) প্রথমকালে জাতিকে সম্মোদন করে বললেন : হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছি; কিন্তু আফসোস, তোমরা কল্যাণকামীদেরকে পছন্দই কর না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবাই যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন তাদেরকে সম্মোদন করে লাভ কি? উত্তর এই যে, এক লাভ তো এই যে, এ থেকে অন্যরাও শিক্ষা লাভ করতে পারবে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও বদর যুদ্ধে নিহত কোরাইশ সর্দারদেরকে এমনিভাবে সম্মোদন করে কিছু কথা বলেছিলেন। এছাড়া ছালেহ (আঃ)—এর এ সম্মোদন আযাব অবতরণের পূর্বেও হতে পারে— যদিও বর্ণনায় তা পরে উল্লেখ করা হয়েছে।

পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের কাহিনী পর্বের চতুর্থ কাহিনী হচ্ছে হযরত লূত (আঃ)—এর কাহিনী।

লূত (আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর ভ্রাতৃশুত্রু। উভয়ের মাতৃভূমি ছিল পশ্চিম ইরাকে বসরার নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ বাবেল শহর। এখানে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। স্বয়ং হযরত ইবরাহীমের পরিবারও মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। তাদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম (আঃ)—কে পয়গম্বর করে পাঠান। কিন্তু সবাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ব্যাপারটি নমরাদের অগ্নি পর্যন্ত গড়ায়। স্বয়ং পিতা তাঁকে গৃহ থেকে বহিস্কার করার হুমকি দেন।

নিজ পরিবারের মধ্যে শুধু সহধর্মিনী হযরত সারা ও ভ্রাতৃশুত্রু লূত মুসলমান হন। **وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ** অবশেষে তাদেরকে সাথে নিয়ে হযরত ইবরাহীম দেশ ছেড়ে সিরিয়ায় হিজরত করেন। জর্দান নদীর তীরে পৌঁছার পর আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কেনানে গিয়ে অবস্থান করেন, যা বায়তুল মোকাদ্দাসের অদূরেই অবস্থিত।

লূত (আঃ)—কেও আল্লাহ তাআলা নবুওয়ত দান করে জর্দান ও বায়তুল মোকাদ্দাসের মধ্যবর্তী সাদুমের অধিবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্যে প্রেরণ করেন। এ এলাকায় সাদুম, আমুরা, উমা, ছাব্বিম, বালে, অথবা সুগর নামক পাঁচটি বড় বড় শহর ছিল। কোরআন পাক বিভিন্ন স্থানে এদের সমষ্টিকে 'মু'তাকেফা' ও মু'তাকেফাত শব্দে বর্ণনা করেছে। এসব শহরের মধ্যে সাদুমকেই রাজধানী মনে করা হত। হযরত লূত (আঃ) এখানেই অবস্থান করতেন। এ এলাকার ভূমি ছিল উর্বর ও শস্যশ্যামল। এখানে সর্বপ্রকার শস্য ও ফলের প্রাচুর্য ছিল। (এসব ঐতিহাসিক তথ্য বাহরে মুহীত, মায়হারী, ইবনে কাহীর, আল-মানার প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে)।

কোরআন পাকের ভাষায় মানুষের সাধারণ অভ্যাস হচ্ছে **كَانَ الْإِنْسَانُ لَكُمْفًا أَنْ رَأَى اسْتَعْتَى** অর্থাৎ, মানুষ যখন দেখে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন অবাধ্যতা শুরু করে। তাদের সামনেও আল্লাহ তাআলার স্বীয় নেয়ামতের দার খুলে দিয়েছিলেন। তারা মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী ধনশ্রবের নেশায় মত্ত হয়ে বিলাস-ব্যসন, কাম প্রবৃত্তি ও লোভ-লালসার জ্বলে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, লজ্জা-শরম ও ভাল-মন্দের স্বভাবজাত পার্থক্যও বিস্মৃত হয়ে যায়। তারা এমন প্রকৃতিবিরুদ্ধ নির্লজ্জতায় লিপ্ত হয়, যা হারাম ও গোনাহ তো বটেই, সুখ স্বভাবের কাছে ঘৃণা হওয়ার কারণে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারও এর

নিকটবর্তী হয় না।

আল্লাহ্ তাআলা হযরত লূত (আঃ)-কে তাদের হেদায়েতের জন্যে নিযুক্ত করেন। তিনি স্বজাতিকে সম্বোধন করে বলেন :

اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَاسِيَةً بِمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْغَالِبِينَ অর্থাৎ, হুশিয়ার করে বললেন : তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ কর, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি।

যিনা তথা ব্যাভিচার সম্পর্কে কোরআন পাক **اَلْزُّنَّانَ فَاحِشَةٌ** আলিফ ও লাম ব্যতিরেকেই **فَاحِشَةٌ** শব্দ ব্যবহার করেছে; কিন্তু এখানে আলিফ নামসহ **اَلْزُّنَّانَ فَاحِشَةٌ** বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাভিচার যেন একাই সমস্ত অশ্লীলতার সমাহার এবং যিনার চাইতেও কঠোর অপরাধ।

এরপর বলা হয়েছে : এ নির্লজ্জ কাজ তোমাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ করেনি। আমার ইবনে দীনার বলেন : এ জাতির পূর্বে পৃথিবীতে কখনও এহেন কুকর্ম দেখা যায়নি।— (মায়হারী) সাদুমবাসীদের পূর্বে কোন ধরনের মন্দ ব্যক্তির চিন্তাও এদিকে যায়নি। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক বলেন : কোরআনে লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ না হলে আমি কম্পনাও করতে পারতাম না যে, কোন মানুষ এরূপ কাজ করতে পারে।— (ইবনে কাছীর)

এতে তাদের নির্লজ্জতার কারণে দু'দিক দিয়ে হুশিয়ার করা হয়েছে। (এক) অনেক গোনাহে মানুষ পরিবেশ অথবা পূর্ববর্তীদের অনুকরণের কারণে লিপ্ত হয়ে যায়—যদিও তা কোন শরীয়ত সম্মত ওযর নয়; কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তাকে কোন না কোন স্তরে ক্ষমায়োগ্য মনে করা যায়। কিন্তু যে গোনাহ পূর্বে কেউ করেনি এবং তা করার বিশেষ কোন কারণও নেই; তা নিঃসন্দেহে অধিক শাস্তির যোগ্য। (দুই) যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ কিংবা কুপ্রথার উদ্ভাবন ও প্রথম প্রচলন করে, তার উপর তার নিজের কাজের গোনাহ ও শাস্তি তো চাপেই সাথে সাথে ঐসব লোকের শাস্তিও তার গর্দনে চপে বসে, যারা কেয়ামত পর্যন্ত তার সে কাজে প্রভাবিত হয়ে গোনাহে লিপ্ত হয়।

দ্বিতীয় আয়াতে তাদের এ নির্লজ্জতাকে আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলা হয়েছে : তোমরা নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদের সাথে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের স্বভাবজাত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা একটি হালাল ও জায়েজ পন্থা নির্ধারণ করেছেন এবং তা হচ্ছে নারীদেরকে বিয়ে করা। এ পন্থা ছেড়ে অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করা একান্ত হীনতা ও বিকৃত চিন্তারই পরিচায়ক।

এ কারণেই সাহাবী, তাবয়ী ও মুজতাহিদগণ এ অপরাধকে সাধারণ ব্যভিচারের চাইতেও অধিক গুরুতর অপরাধ ও গোনাহ বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন : যারা একাজ করে, তাদেরকে ঐ রকম শাস্তিই দেয়া উচিত, যেমন লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ র পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং মাটি উলটিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই এরূপ ব্যক্তিকে কোন উচু পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিয়ে উপর থেকে প্রস্তর বর্ষণ করা উচিত। মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে

মাজযা হযরত ইবনে আবাস (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ ব্যক্তিদের সম্পর্কে বলেছেন : অর্থাৎ, একাজে জড়িত উভয় ব্যক্তিকে হত্যা কর।— (ইবনে কাছীর)

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ** অর্থাৎ, তোমরা মনুষ্যত্বের সীমা অতিক্রমকারী সম্প্রদায়। প্রত্যেক কাজে সীমা অতিক্রম করাই তোমাদের আসল রোগ। যৌন কামনার ক্ষেত্রেও তোমরা আল্লাহ্ র নির্ধারিত সীমা ডিসিয়ে স্বভাববিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছ।

তৃতীয় আয়াতে, লূত (আঃ)-এর উপদেশের জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায়ের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে : তাদের দ্বারা যখন কোন যুক্তিসংগত জওয়াব দেয়া সম্ভবপর হ'ল না, তখন জেদের বশবর্তী হয়ে পারস্পরিক বলতে লাগল : এরা বড় পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বলে দাবী করে। এদের চিকিৎসা এই যে, এদেরকে বস্ত্র থেকে বের করে দাও।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতে সাদুম সম্প্রদায়ের বক্তৃতা ও বেহায়াপনার আসমানী শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিই আল্লাহ্ র আযাবে পতিত হল। শুধু লূত (আঃ) ও তাঁর কয়েকজন সঙ্গী আযাব থেকে বেঁচে রইলেন। কোরআনের ভাষায় **فَأَجْبَدُوا وَأَمْلَكُوا** বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি লূত ও তাঁর পরিবারকে আযাব থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। 'আহল' তথা পরিবারকে বলা হয়, এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : তাঁর পরিবারের মধ্যে দু'টি কন্যা মুসলমান হয়েছিল; কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী মুসলমান হয়নি। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : **فَمَا وَجَدْنَا لِأَيْمَانِهِمْ مِنَ الْمُلِيِّينَ** - অর্থাৎ, সমগ্র বস্তির মধ্যে একটি ঘর ছাড়া কোন মুসলমান ছিল না। এতে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, লূত (আঃ)-এর ঘরের লোকই শুধু মুসলমান ছিল। সুতরাং তারাই আযাব থেকে মুক্তি পেল। অবশ্য তাদের মধ্যে তাঁর বিবি অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : আহলের অর্থ ব্যাপক। এতে পরিবারের লোকজন এবং অন্যান্য মুসলমানকেও বোঝানো হয়েছে। সারকথা এই যে, গুণা-গুণতি কয়েকজন মুসলমান ছিল। তাদেরকে আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ্ তাআলা লূত (আঃ)-কে নির্দেশ দেন যে, বিবি ব্যতীত অন্যান্য পরিবার-পরিজন ও সম্পর্কশীল লোককে নিয়ে শেষ রাতে বস্ত্র থেকে বের হয়ে যান এবং পিছনে ফিরে দেখবেন না। কেননা, আপনি যখন বস্ত্র থেকে বের হয়ে যাবেন, তখনই কালবিলম্ব না করে আযাব এসে যাবে।

হযরত লূত (আঃ) এ নির্দেশ মত স্বীয় পরিবার পরিজন ও সম্পর্কশীলদেরকে নিয়ে শেষ রাতে সাদুম ত্যাগ করেন। তাঁর বিবি প্রসঙ্গে দু'রকম রেওয়ায়েতই বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সে সঙ্গে রওয়ানাই হয়নি। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে, কিছু দূর সঞ্চে চলার পর আল্লাহ্ র নির্দেশের বিপরীতে পিছনে ফিরে বস্তিবাসীদের অবস্থা দেখতে চেয়েছিল। ফলে সাথে সাথে আযাব এসে তাকেও পাকড়াও করল। কোরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এ ঘটনাটি সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তৃতীয় আয়াতে শুধু বলা হয়েছে যে, আমি লূত (আঃ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনকে আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছি। কিন্তু তাঁর সহধর্মিণী আযাবে লিপ্ত রয়ে গেছে। শেষ রাতে বস্ত্র ত্যাগ করা এবং পিছনে ফিরে না দেখার নির্দেশ কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াতেও উল্লেখিত রয়েছে।

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ
مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۖ فَأَخْرِجُوهُمْ
وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ۖ وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرَكِيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝
وَالِلَّيْلِ مَدِينٌ ۖ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ قَالَ يَوْمُ أَعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ
رَبِّكُمْ ۖ قَالُوا وَمَا الْكَافِرُ إِلَّا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ۚ
أَشْيَاءٌ هُمْ وَلَا تَنْفُسُ فِي الْأَرْضِ ۖ بَعْدَ صَلَاحِهِمْ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا تَقْعُدُوا
بِجُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبِعُوا عَاجِبًا ۖ وَأَذْكُرُوا الَّذِي كُنْتُمْ
قَالُوا لَا تَكْذِبُوا ۖ أَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ۖ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمِنُوا
بِالَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا
حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝

(৬২) তাঁর সম্প্রদায় এ ছাড়া কোন উত্তর দিল না যে, বের করে দাও এদেরকে শহর থেকে। এরা খুব সাধু থাকতে চায়। (৬৩) অতঃপর আমি তাকে ও তাঁর পরিবার পরিজনকে বাঁচিয়ে দিলাম, কিন্তু তার স্ত্রী। সে তাদের মধ্যেই রয়ে গেল, যারা রয়ে গিয়েছিল। আমি তাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। (৬৪) অতঃপর দেখ, গোনাহগারদের পরিণতি কেমন হয়েছে। (৬৫) আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল : হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য নাই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণ এসে গেছে। অতঃপর তোমরা মাপ ও ওজ্ঞন পূর্ণ কর এবং মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দিয়ে না এবং ভূপৃষ্ঠের সলসলার সাধন করার পর তাতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। এই হল তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৬৬) তোমরা পথে ঘাটে এ কারণে বসে থেকে না যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদেরকে হুমকি দিবে, আল্লাহ্ পথে বাধা সৃষ্টি করবে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে। সুরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং লক্ষ্য কর কিরূপ অশুভ পরিণতি হয়েছে অনর্থকারীদের। (৬৭) আর যদি তোমাদের একদল ঐ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং একদল বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে হুসন কর যে পর্বত আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা না করে দেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৮৪ নং আয়াতে আযাব সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকুই বলা হয়েছে যে, তাদের উপর এক অভিনব বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। সূরা হুদে এ আযাবের বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

فَلَمَّا جَاءَ امْرَأَتُنَا جَعَلْنَا عَلَىهَا سَاوِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارًا مَوْسُئِلًا فَتَنْصُرُوهُنَّ مَوْسُئِمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا مِنْ ظَالِمٍ يَبْعِدُ

অর্থাৎ, যখন আমার আযাব এসে গেল, তখন আমি বস্তিটিকে উলটে দিলাম এবং তাদের উপর স্তরে স্তরে প্রস্তর বর্ষণ করলাম যা আপনরা প্রতিপালকের নিকট চিহ্নযুক্ত ছিল। সে বস্তিটি এ কাকেরদের থেকে বেশী দূর নয়।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, উপর থেকে প্রস্তর বর্ষিত হয়েছে এবং নীচে থেকে জিবরাঈল (আঃ) গোটা ভূখণ্ডকে উপরে তুলে উল্টে দিয়েছেন। বর্ষিত প্রস্তরসমূহ স্তরে স্তরে একত্রিত ছিল। অর্থাৎ, এমন অবিরাম ধারায় বর্ষিত হয়েছিল যে, স্তরে স্তরে জমা হয়ে গিয়েছিল। এসব প্রস্তর চিহ্নযুক্ত ছিল। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : প্রত্যেক পাথরে ঐ ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে খতম করার জন্যে পাথরটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সূরা হিজরের আয়াতে এ আযাবের বর্ণনার পূর্বে বলা হয়েছে : فَتَذَكَّرُ لَهُنَّ الصَّيْحَةُ مُنْزِلِينَ অর্থাৎ, সূর্যোদয়ের সময় বিকট নাদ তাদেরকে পাকড়াও করল।

এতে জানা যায় যে, প্রথমে আকাশ থেকে একটি বিকট টাঁককার ধ্বনি এবং এরপর অন্যান্য আযাব এসেছে। বাহাতঃ বোঝা যায় যে, টাঁককার ধ্বনির পর প্রথমে ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর তাদেরকে অধিকতর লাঞ্চিত করার জন্যে উপর থেকে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয়। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, প্রথমে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করা হয় এবং পরে ভূখণ্ড উলটিয়ে দেয়া হয়। কারণ, কোরআনের বর্ণনা পদ্ধতিতে যে বিষয়টি আগে উল্লেখ করা হয়, তা বাস্তবেও আগেই সংঘটিত হবে, তা অপরিহার্য নয়।

লূত (আঃ)—এর সম্প্রদায়ের উপর পতিত ভয়াবহ আযাবসমূহের মধ্যে ভূখণ্ড উলটিয়ে দেয়ার আযাবটি তাদের অন্ত্রীল ও নির্লজ্জ কাকের সাথে বিশেষ সঙ্গতিও রাখে। কারণ, তারা সিদ্ধ পন্থার বিপরীত কাজ করেছিল।

সূরা হুদে বর্ণিত আয়াতসমূহের শেষে কোরআন পাকে আরবদেরকে হুশিয়ার করে এ কথাও বলেছে যে, وَمَا مِنْ ظَالِمٍ يَبْعِدُ অর্থাৎ, উলটে দেয়া বস্তিগুলো জালেমদের কাছ থেকে বেশী দূরে নয়। সিরিয়া গমনের পথে সব সময়ই সেগুলো তাদের চোখের সামনে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

এ দৃশ্য শুধু কোরআন অবতরণের সময়েই নয়, আজও বিদ্যমান রয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস ও জর্দান নদীর মাঝখানে আজও এ ভূখণ্ডটি ‘লূত সাগর’ অথবা ‘মৃত সাগর’ নামে পরিচিত। এর ভূভাগ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক নীচে অবস্থিত। এর একটি বিশেষ অংশে নদীর আকারে আশ্চর্য ধরনের পানি বিদ্যমান। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি জীবিত থাকতে পারে না। এ কারণেই একে মৃত সাগর বলা হয়। কথিত আছে, এটাই সাদুমের অবস্থান স্থল।

পয়গম্বরদের কাহিনী পরম্পরার পঞ্চম কাহিনী হচ্ছে হযরত শোয়ায়েব

(আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ কাহিনীটিই বিবৃত হয়েছে।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত শোয়ায়েব (আঃ) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পুত্র মাদইয়ানের বংশধর। হযরত নূত (আঃ)-এর সাথেও তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাঁর বংশধরও মাদইয়ান নামে খ্যাত হয়েছে। যে বসতিতে তারা বসবাস করত, তাও মাদইয়ান নামে অভিহিত হয়েছে। অতএব ‘মাদইয়ান’ একটি জাতির ও একটি শহরের নাম। এ শহর অদ্যাবধি পূর্ব জর্দানের সামুদ্রিক বন্দর ‘মাদ্যনের’ অদূরে বিদ্যমান রয়েছে। কোরআন পাকের অন্যত্র মুসা (আঃ)-এর কাহিনীতে বলা হয়েছে وَلَكَاوَدَمَاءَ مَدْيَنَ এতে এ বসতিটিকে বোঝানো হয়েছে। (ইবনে কাছীর) হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে চমৎকার বানিতার কারণে ‘খতিবুল আম্মিয়া’ বলা হয়।- (ইবনে কাছীর, বাহরে মুহীত)

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) যে সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন, কোরআন পাকে কোথাও তাদেরকে ‘আহলে মাদইয়ান’ ও ‘আছহাবে মাদইয়ান’ নামে উল্লেখ করা হয়েছে আবার কোথাও ‘আছহাবে আইকা’ নামে। ‘আইকা’ শব্দের অর্থ জঙ্গল ও বন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : ‘আছহাবে মাদইয়ান’ ও ‘আছহাবে আইকা’ পৃথক পৃথক জাতি। তাদের বাসস্থানও ছিল ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) প্রথমে এই জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তত্ত্বপূর্বক হয়ে যাওয়ার পর অপর জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। উভয় জাতির উপর যে আযাব আসে, তার ভাষাও বিভিন্ন রূপ। আছহাবে মাদইয়ানের উপর কোথাও صيحة এবং কোথাও رجفة এবং আছহাবে আইকার উপর কোথাও طلة এর আযাব উল্লেখ করা হয়েছে। صيحة শব্দের অর্থ বিকট চীৎকার এবং ভীষণ শব্দ। رجفة শব্দের অর্থ ভূমিকম্প এবং طلة শব্দের অর্থ ছায়াযুক্ত ছাদ, শামিয়ানা। আছহাবে আইকার উপর এভাবে আযাব নাখিল করা হয় যে, প্রথমে কয়েকদিন তাদের বসতিতে ভীষণ পরম পড়ে। ফলে গোটা জাতি ছটফট করতে থাকে। অতঃপর নিকটস্থ একটি গভীর জঙ্গলের উপর গাঢ় মেঘমালা দেখা দেয়। ফলে জঙ্গলে ছায়া পড়ে এবং নীচল বাতাস বইতে থাকে। এ দৃশ্য দেখে বস্তির সবাই জঙ্গলে জমায়েত হয়। এভাবে খোদায়াী অপরাধীরা কোনরূপ প্রেক্ষতরী পরোয়ানা ও সিপাই-সাত্তীর গ্রহণা ছাড়াই নিষ্ক পায় হেটে ব্যভূমিতে গিয়ে পৌছে। যখন সবাই সেখানে একত্রিত হয়, তখন মেঘমালা থেকে অগ্নি বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং নীচের দিকে গুরু হয় ভূমিকম্প। ফলে সবাই নিস্তানাবুদ হয়ে যায়।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : ‘আছহাবে মাদইয়ান’ ও ‘আছহাবে আইকা’ একই সম্প্রদায়ের দুই নাম। পূর্বাভূষিত তিন প্রকার আযাবই তাদের উপর নাখিল হয়েছিল। প্রথমে মেঘমালা থেকে অগ্নি বর্ষিত হয়, অতঃপর বিকট চীৎকার শোনা যায় এবং সবশেষে ভূমিকম্প হয়। ইবনে কাছীর এ তফসীরেরই প্রবক্তা।

মোটকথা, উভয় সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হোক কিংবা একই সম্প্রদায়ের দু'নাম হোক হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে যে পয়গাম দেন, তা শব্দ ও দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যার পূর্বে জেনে নিই যে, ইসলামই সব পয়গামের অস্তিত্ব দাওয়াত। এর সারমর্ম হচ্ছে হক আদায় করা। হক দু'প্রকার : (এক) সরাসরি আল্লাহর হক, যা করা না করার সাথে অন্য মানুষের কোন উল্লেখযোগ্য লাভ-ক্ষতি সম্পর্কযুক্ত নয়।

যেমন—এবাদত, নামায, রোযা ইত্যাদি। (দুই) বান্দার হক। এর সম্পর্ক অন্য মানুষের সাথে। শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় উভয় প্রকার হক সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে উভয়ের বিপক্ষে কাজ করছিল।

তারা আল্লাহ তাআলা ও রসুলের প্রতি বিশ্वास স্থাপন না করে আল্লাহর হকের বিরুদ্ধাচরণ করছিল। এর সাথে ক্রয়-বিক্রয়ে মাপ ও ওজনে কম দিয়ে বান্দাদের হক নষ্ট করছিল। তদুপরি তারা রাস্তা ও সড়কের মুখে বসে থাকত এবং পথিকদের ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাদের ধন-সম্পদ লুটে নিত এবং শোয়ায়েব (আঃ)-এর প্রতি বিশ্वास স্থাপন করতে বাধা দিত। তারা এভাবে ভূপৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করছিল। এসব অপরাধের পরিশ্রেক্ষিতে তাদের হেদায়েতের জন্যে শোয়ায়েব (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম দু'আয়াতে তাদের সংশোধনের জন্যে শোয়ায়েব (আঃ) তিনটি বিষয় বর্ণনা করেছেন। প্রথমত: يَقُومُوا غِبَدًا وَآلِهَةً اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত উপাস্য হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। একত্ববাদের এ দাওয়াতই সব পয়গামের দিয়ে এসেছেন। এটিই সব বিশ্वास ও কর্মের প্রাণ। এ সম্প্রদায়ও সৃষ্টবস্তুর পূজায় লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী ও হক সম্পর্কে গাফেল হয়ে পড়েছিল। তাই তাদেরকে সর্বপ্রথম এ পয়গাম দেয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে : قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের কাছে প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। এখানে ‘সুস্পষ্ট প্রমাণ’-এর অর্থ এসব মো'জ্জেযা, যা শোয়ায়েব (আঃ)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর মো'জ্জেযার বিভিন্ন প্রকার তফসীর বাহরে মুহীতে উল্লেখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْيَمَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

এতে প্রথমের অর্থ মাপ এবং میزان শব্দের অর্থ ওজন করা। بخس শব্দের অর্থ কারও পাওনা হ্রাস করে ক্ষতি করা। অর্থাৎ তোমরা মাপ ও ওজন পূর্ণ কর এবং মানুষের মর্যাদাদিতে কম দিয়ে তাদের ক্ষতি করো না।

এতে প্রথমে একটি বিশেষ অপরাধ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ওজনে কম দিয়ে করা হত। অতঃপর وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ বলে সর্ব প্রকার হকে ক্রটি করাকে ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা ধন-সম্পদ, ইয়যত-আবরু অথবা অন্য যে কোন বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত হোক না কেন।- (বাহরে মুহীত)

এ থেকে জানা গেল যে, মাপ ও ওজনে পাওনার চাইতে কম দেয়া যেমন - হারাম, তেমনি অন্যান্য হকে ক্রটি করাও হারাম। কারও ইয়যত-আবরু নষ্ট করা, কারও পদমর্যাদা অনুযায়ী তার সম্মান না করা, যাদের আনুগত্য জরুরী তাদের আনুগত্যে ক্রটি করা অথবা যার সম্মান করা ওয়াজেব, তার সম্মানে ক্রটি করা ইত্যাদি সবই এ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত, যা শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় করত। বিদায় হচ্ছের ভাষণে রসুলুল্লাহ (সঃ) মানুষের ইয়যত-আবরুকে তাদের রক্তের সমান সম্মানযোগ্য ও শ্রেয়শযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন।

কোরআন পাকে مَطْفِنٍ ও تَطْنِيفٍ এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত সব বিষয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি রুকু-সেজদা করতে দেখে বললেন : تَطْنِيفٌ تَطْنِيفٌ, তুমি মাপ ও ওজনে ক্রটি করছে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক) অর্থাৎ, তুমি নামাযের হক পূর্ণ করনি। এখানে নামাযের হক পূর্ণ না করাকে تَطْنِيف শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَلَا تَسِيءُوا إِلَى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

অর্থাৎ পৃথিবীর সৎস্কার সাধিত হওয়ার পর তাতে অনর্থ ছড়িও না। এ বাক্যটি সূরা আ'রাকে পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে এর বিস্তারিত অর্থ এই বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বাহ্যিক সৎস্কার হল, প্রত্যেকটি বস্তুকে যথার্থ স্থানে ব্যয় করা, এবং নির্ধারিত সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখা। বস্তুতঃ তা ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল। আর আভ্যন্তরীণ সৎস্কার হল আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তা তাঁর নির্দেশাবলী পালনের উপর ভিত্তিশীল। এমনিভাবে পৃথিবীর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অনর্থ এসব নীতি ত্যাগ করার কারণেই দেখা দেয়। শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায় এসব নীতির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করেছিল। ফলে পৃথিবীতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সব রকম অনর্থ বিরাজমান ছিল। তাই তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের এসব কর্মকাণ্ড সমগ্র ভূপৃষ্ঠে অনর্থ সৃষ্টি করবে। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাক।

অতঃপর বলা হয়েছে: **ذٰلِكَمَّ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ** অর্থাৎ যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর, তবে এ বিষয়টি তোমাদের জন্যে উত্তম। উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা অবৈধ কাজ-কর্ম থেকে বিরত হও, তবে এতেই তোমাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত রয়েছে। ধর্ম ও পরকালীন মঙ্গলের বর্ণনা নিশ্চয়োজ্ঞন। কারণ, এটি আল্লাহর আনুগত্যের সাথেই সর্বতোভাবে জড়িত। ইহকালের মঙ্গল এ জন্যে যে, যখন সবাই জ্ঞানতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তি মাপ ও ওজনে এবং অন্যান্য হকের ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ, তখন বাজারে তার প্রভাব বিস্তৃত হবে এবং ব্যবসায় উন্নতি সাধিত হবে।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা মানুষকে ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহর পথে বাধা দান করার জন্যে পথে-ঘাটে গুত পেতে বসে থেকে না। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে উভয় বাক্যের উদ্দেশ্যই এক। অর্থাৎ, তারা রাস্তাঘাটে বসে শোয়ায়েব (আঃ)-এর কাছে আমানতকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন করত। তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলেন যে, তাদের পৃথক পৃথক দু'টি অপরাধ ছিল। পথে বসে লুটপাট করতে এবং শোয়ায়েব (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেও বাধা দিত। প্রথম বাক্যে প্রথম অপরাধ এবং দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে। বাহরে মুহীত প্রভৃতি তফসীর গ্রন্থে এ অর্থই গৃহীত হয়েছে। তারা শরীয়ত বিরোধী অবৈধ ট্যাক্স আদায় করার জন্যে রাস্তার মোড়ে স্থাপিত চৌকিসমূহকেও পথে বসে লুটপাট করার

অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আল্লামা কুতুবী বলেন : যারা পথে বসে শরীয়ত বিরোধী অবৈধ ট্যাক্স আদায় করে, তারাও শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মত অপরাধী, বরং তাদের চাইতেও অধিক অত্যাচারী ও দুষ্কৃতিকারী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে: **وَتَبِعُواْ مَا عَٰوَجَزَ** অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর পথে বক্তার অনুবশে ব্যাপৃত থাক, যাতে কোথাও অসুবিধা রাখার আশঙ্কা পাওয়া গেলে আপত্তি ও সন্দেহের কাজ সৃষ্টি করে ক্ষতিকর সত্য ধর্ম থেকে বিমুখ করার চেষ্টা করা যায়।

এরপর বলা হয়েছে: **اِنَّكُمْ اِلٰهَكُمْ فَاَلَا تَكْفُرُوْا** এখানে তাদেরকে হিশ্যার করার জন্যে উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন উভয় পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার নেয়াবত সুরণ করানো হয়েছে যে, তোমরা পূর্বে সংখ্যা ও গণনার দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের বেশ বৃদ্ধি করে তোমাদেরকে একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করেছেন। অথবা তোমরা ধন-সম্পদের দিক দিয়ে কম ছিলে, আল্লাহ তাআলা ঐশ্বর্য্য দান করে তোমাদের স্বনির্ভর করে দিয়েছেন। অতঃপর ভীতি প্রদর্শনার বলা হয়েছে : পূর্ববর্তী অনর্থ সৃষ্টিকারী জাতিসমূহের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য কর—কণ্ঠে নুহ, আদাম, সামুদ ও কণ্ঠে নূতর উপর কি ভীষণ আযাব এসেছে। তোমরা ভেবে-চিন্তে কাজ করো।

পঞ্চম আয়াতে এ সম্প্রদায়ের একটি সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে। শোয়ায়েব (আঃ)-এর দাওয়াতের পর তাঁর সম্প্রদায় দু'ভাবে বিভক্ত হয় যায়। কিছু সংখ্যক মূলমান হয় এবং কিছু সংখ্যক কাকেরই থেকে যায়। কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে উভয় দল একই রূপ আরাহ-আয়েশ দিনাতিপাত করতে থাকে। এতে তারা সন্দেহ প্রকাশ করে যে, কাকের হওয়া অপরাধ হলে অপরাধীরা অবশ্যই শাস্তি পেত। এ সন্দেহের উত্তরে বলা হয়েছে: **اِنَّكُمْ اِلٰهَكُمْ فَاَلَا تَكْفُرُوْا** অর্থাৎ, তাড়াতাড়ি কিসের!

আল্লাহ তাআলা স্বীয় সহনশীলতা ও কৃপাশূণ্য অপরাধীদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তারা যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়, তখন সত্য ও শিখার সীমাংসা করে দেয়া হয়। তোমাদের অবস্থাও তদ্রূপ। তোমরা যদি কখন থেকে বিরত না হও, তবে অতি সত্ত্বর কাকেরদের উপর চূড়ান্ত আযাব নাযিল হয়ে যাবে।

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ
يُنْعِيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَوْمِكَ أَوْ لَنُعَوِّدَنَّ فِي بَيْتِكَ
قَالَ أَوْ لَنُؤْتِيَنَّكَ كُرْهِيْنَ ۖ قَدْ أَفْرَأْتِنَا عَلَى اللَّهِ كَيْدًا لَّئِنْ عَرَفْنَا
فِي مَلِكِكُمْ بَعْدَ إِذْ جُنِدْنَا لِلَّهِ مَتَاهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ بِهَا
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ
تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا إِنَّهُمْ يَبِينُونَ قَوْمَنَا يَا حَتَّى وَأَنْتَ خَيْرُ
الْفَاحِشِينَ ۝ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ لَمْ يَأْتِ
شُعَيْبًا بِآيَةٍ مُبِينَةٍ لَنَعْتَصِدَنَّكُمْ وَنَقُتِّلَنَّكُمْ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ
فِي دَارِهِمْ لَنَنَجِّنَّهُمْ ۖ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا كَوْمِيعًا
فِيهِمَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْغَاسِقِينَ ۝ مَتَوَلَّى
عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِهِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ
فَكَيْفَ آتَيْتُمْنِي عَلَى قَوْمِكُمْ ۖ وَمَا أَتَى لَنَا فِي قَوْمِكُمْ مِنْ نَبِيٍّ
إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهُ بِالْأَسَاسِ ۖ وَالْقَرَاءَ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ۝
ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ
آبَاءَنَا الْقَارِعُ ۖ وَالسَّارَةَ قَاخَذْنَا لَهُمْ يَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

(৮৮) তার সম্প্রদায়ের দাস্তিক সর্দাররা বলল : হে শোয়ায়েব, আমরা অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার সাথে বিশ্রাস স্থাপনকারীদেরকে শহর থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে। শোয়ায়েব বলল : আমরা অপছন্দ করলেও কি? (৮৯) আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করি, অথচ তিনি আমাদেরকে এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের কাজ নয় এ ধর্মে প্রত্যাবর্তন করা, কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যদি চান। আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেটন করে আছেন। আল্লাহর প্রতিই আমরা ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। (৯০) তার সম্প্রদায়ের কাফের সর্দাররা বলল : যদি তোমরা শোয়ায়েবের অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৯১) অনন্তর পাকড়াও করল তাদেরকে ভূমিকম্প। ফলে তারা সকাল বেলায় গৃহ মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। (৯২) শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপকারীরা যেন কোন দিন সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শোয়ায়েবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল। (৯৩) অনন্তর সে তাদের কাছ থেকে গৃহস্থান করল এবং বলল : হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের হিত কামনা করেছি। এখন আমি কাফেরদের জন্যে কোন দুঃখ করব? (৯৪) আর আমি কোন জনপদে কোন নবী পাঠাইনি, তবে (এমতাবস্থায় যে) পাকড়াও করেছে সে জনপদের অধিবাসীদেরকে কষ্ট ও কঠোরতার মধ্যে, যাতে তারা শিথিল হয়ে পড়ে। (৯৫) অতঃপর অকল্যাণের স্থলে তা কল্যাণে বদলে দিয়েছি। এমনকি তারা অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং বলতে শুরু করেছে, আমাদের বাপ-দাদাদের উপরও এমন আনন্দ-বেদনা এসেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি এমন আকস্মিকভাবে যে তারা টেরও পায়নি।

শোয়ায়েব (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল : আপনি যদি সত্যপন্থী হতেন, তবে আপনার অনুসারীরা সমৃদ্ধ হত এবং অমান্যকারীদের উপর আঘাত আসত। কিন্তু হচ্ছে এই যে, উভয় দল সমভাবে আরামে দিন যাপন করছে। এমতাবস্থায় আমরা আপনাকে সত্যপন্থী বলে কিরূপে মেনে নিতে পারি? উত্তরে শোয়ায়েব (আঃ) বললেন : তাড়াহুড়া কিসের? অতি সত্ত্বর আল্লাহ তাআলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। এরপর সম্প্রদায়ের অহঙ্কারী সর্দাররা অত্যাচারী ও উদ্ধত লোকদের চিরাচরিত পন্থায় বলে উঠল : হে শোয়ায়েব, হয় তুমি এবং তোমার অনুসারী মুমিনরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে, না হয় আমরা তোমাদেরকে বন্দি থেকে উচ্ছেদ করে দেব।

তাদের ধর্মে 'ফিরে আসা' কথাটা মুমিনদের ক্ষেত্রে যথার্থই প্রযোজ্য। কারণ, তারা পূর্বে তাদের ধর্মেই ছিল এবং পরে শোয়ায়েব (আঃ)-এর দাওয়াতে সাদা দিয়ে মুসলমান হয়েছিল। কিন্তু শোয়ায়েব (আঃ) একদিনও তাদের মিথ্যা ধর্মে ছিলেন না। আল্লাহর কোন পয়গম্বর কখনও কোন মুশরিকসুলভ মিথ্যা ধর্মের অনুসারী হতেই পারেন না। এমতাবস্থায় তাঁকে ফিরে আসার কথা বলা সম্ভবতঃ এ কারণে ছিল যে, নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদের বাতিল কথাবার্তা ও কাজকর্ম দেখে চূপ থাকতেন এবং তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতেন। ফলে তাঁর সম্পর্কেও সম্প্রদায়ের লোকদের ধারণা ছিল যে, তিনিও তাদেরই সমধর্মী। ঈমানের দাওয়াতে দেয়ার পর তারা জ্ঞানতে পারল যে, তাঁর ধর্ম তাদের থেকে ভিন্ন অথবা তিনি তাদের ধর্ম ত্যাগ করেছেন। শোয়ায়েব (আঃ) উত্তরে বললেনঃ

أَوْ لَنُؤْتِيَنَّكَ كُرْهِيْنَ ۖ অর্থাৎ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি এই যে, তোমাদের ধর্মে অপছন্দ করা সত্ত্বেও আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাব? অর্থাৎ, এটা হতে পারে না। এ পর্যন্ত প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হল।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, শোয়ায়েব (আঃ) জাতিকে বললেন : তোমাদের মিথ্যা ধর্ম থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন। এরপর আমরা যদি তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই, তবে এ হবে আমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলার প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করা।

কেননা, প্রথমতঃ কুফর ও শিরককে ধর্ম বলে স্বীকার করার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলাই যেন এ নির্দেশ দিয়েছেন। এটা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ। এছাড়া বিশ্রাস স্থাপন করা এবং জ্ঞান ও চক্ষুমানতা অর্জিত হওয়ার পর পুনরায় কুফরের দিকে ফিরে যাওয়া যেন একথা বলা যে, পূর্বের ধর্ম মিথ্যা ও ভ্রান্ত ছিল। এখন যে ধর্ম গ্রহণ করা হচ্ছে, তাই সত্য ও বিশুদ্ধ। এটা দ্বিমুখী মিথ্যা ও অপবাদ। কারণ, এতে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলা হয়।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর এ উক্তিতে এক প্রকার দাবী ছিল যে, তোমাদের ধর্মে আমরা কখনও ফিরে যেতে পারি না। এরূপ দাবী করা বাহ্যতঃ দাসত্বের পরিপন্থী এবং নৈকট্যপীল ও আধ্যাত্মবিদদের পক্ষে অসমীচীন; তাই পরে বলেছেন :
وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ بِهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا

يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

অর্থাৎ, আমরা তোমাদের ধর্মে কখনও ফিরে যেতে পারি না। অবশ্য যদি (খোদা না করুন) আমাদের প্রতিপালকই আমাদেরকে পন্থব্রষ্ট করার ইচ্ছা

করেন, তবে ভিন্ন কথা। আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞান প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী। আমরা তাঁর উপরই ভরসা করছি।

এতে স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করা হয়েছে এবং আল্লাহর উপর ভরসা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমরা কোন কাজ করা অথবা না করার কে? কোন সংকাজ করা অথবা মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহর মেহেরবানীতেই হয়ে থাকে। যেমন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন :
 قَوْلُ اللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَيْنَا
 অর্থাৎ, আল্লাহর কৃপা না হলে আমরা সংপথ পেতাম না হুদকা খয়রাত করতে পারতাম না এবং নামায পড়তে সক্ষম হতাম না।

জাতির অহঙ্কারী সর্দারদের সাথে এ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার পর যখন শোয়ায়েব (আঃ) বুঝতে পারলেন যে, তারা কোন কিছুতেই প্রভাবান্বিত হচ্ছে না, তখন তাদের সাথে কথা-বার্তা ছেড়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করলেন :
 رَبَّنَا انْفِرْ بِنَا وَأَوْبِقْ قَوْمَنَا يَرِجْ
 অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে ফয়সালা করে দিন, সত্যভাবে এবং আপনি শ্রেষ্ঠতম ফয়সালাকারী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন :
 قَاضِي فَاتِحٍ شَكَاكَ
 শব্দের অর্থ এখানে ফয়সালা করা। এ অর্থেই ফাতিক শব্দটি উৎপত্তি।
 অর্থাৎ, বিচারক অর্থে ব্যবহৃত হয়। — (বাহরে মুহীত)

প্রকৃতপক্ষে এর মাধ্যমে শোয়ায়েব (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের কাকেরদেরকে ধ্বংস করার দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা এ দোয়া কবুল করে ভূমিকম্পের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

তৃতীয় আয়াতে অহঙ্কারী সর্দারদের একটি দ্রাস্ত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তারা পরস্পর অথবা নিজ নিজ অনুসারীদেরকে বলতে লাগল : যদি তোমরা শোয়ায়েবের অনুসরণ কর, তবে অত্যন্ত বেওকুফ ও মুর্থ প্রতিপন্ন হবে। — (বাহরে মুহীত)

চতুর্থ আয়াতে তাদের আযাবের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে :
 فَاتَّخَذَ تَحْتَهُمُ الرَّحْمَةُ قَاصِبًا فِي ذُرَاهِمُ جُحُودٍ
 অর্থাৎ, তাদেরকে ভীষণ ভূমিকম্প পাকড়াও করল। ফলে তারা গৃহমধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের আযাবকে এ আয়াতে ভূমিকম্প বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে فَاتَّخَذَ تَحْتَهُمُ الرَّحْمَةُ قَاصِبًا বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তাদেরকে ছায়াদিবসের আযাব পাকড়াও করেছে। 'ছায়া দিবসের' অর্থ এই যে, প্রথমে তাদের উপর ঘন কাল মেঘের ছায়া পতিত হয়। তারা এর নীচে একত্রিত হয়ে গেলে এ মেঘ থেকেই তাদের উপর প্রস্তর অথবা অগ্নিবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) উভয় আয়াতের সামঞ্জস্য প্রসঙ্গে বলেন : শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রথমে এমন ভীষণ গরম চাপিয়ে দেয়া হয়, যেন জাহান্নামের দরজা তাদের দিকে খুলে দেয়া হয়েছিল। ফলে তাদের শ্বাস রুদ্ধ হতে থাকে। ছায়া এমন কি, পানিতেও তাদের জন্যে শাস্তি ছিল না। তারা অসহ্য গরমে অতিষ্ঠ হয়ে ভূগর্ভস্থ কক্ষ প্রবেশ করে দেখল, সেখানে আরও বেশী গরম। অতঃপর অস্ত্রির হয়ে জঙ্গলের দিকে ধাবিত হল। সেখানে আল্লাহ তাআলা একটি ঘন কাল মেঘ পাঠিয়ে দিলেন, যার নীচে শীতল বাতাস বইছিল। তারা সবাই গরমে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে মেঘের নীচে এসে ভিড় করল। তখন মেঘমালা আগুনে রূপান্তরিত হয়ে তাদের উপর বর্ষিত হল এবং ভূমিকম্পও এল। ফলে তারা সবাই ভস্মরূপে পরিণত হল। এভাবে তাদের উপর ভূমিকম্প ও ছায়ার আযাব উভয়টিই আসে। — (বাহরে

মুহীত)

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এটাও সম্ভব যে, তাদের বিভিন্ন অংশের উপর বিভিন্ন আযাব এসেছে। ফলে এক অংশ ভূমিকম্পে এক এক অংশ ছায়া আযাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে তাদের উল থেকে অন্যান্যকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা এ ঘটনা বর্ণনা করার আল্লাহ উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে,
 الَّذِينَ كَذَّبُوا شَيْئًا كَانُوا يَكْفُرُونَ فِيهَا
 শব্দের এক অর্থ কোন স্থানে আরাম আয়েশে জীবন-যাপন করা। এখানে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেসব ধর্ম আরাম-আয়েশে জীবন-যাপন করত, আযাবের পর এমন অবস্থা হল, যেন এখানে কোনদিন আরাম-আয়েশের নাম নিশানাও ছিল না। অতঃপর বলা হয়েছে :
 الَّذِينَ كَذَّبُوا شَيْئًا كَانُوا يَكْفُرُونَ
 অর্থাৎ, যারা শোয়ায়েব (আঃ)-কে মিথ্যা বলেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যারা শোয়ায়েব (আঃ) ও তাঁর মুমিন সঙ্গীদেরকে বস্তি থেকে বহিকার করার হুমকি দিত, পরিণামে ক্ষতির বোঝা তাদের ঘাড়ের উপর চাপেছে।

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে :
 مَوَّلَىٰ غَوْمٍ
 অর্থাৎ, স্বজাতির উপর আযাব আসতে দেখে শোয়ায়েব (আঃ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। তফসীরবিদগণ বলেন যে, তারা মক্কা মুয়াযযমায় চলে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত এখানেই অবস্থান করেন।

জাতির চরম অবাধ্যতায় নিরাশ হয়ে শোয়ায়েব (আঃ) বদদোষ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু যখন আযাব এসে গেল, তখন পয়গম্বরস্বলত দয়ার কারণে তাঁর অন্তর ব্যথিত হল। তাই নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে বললেন : আমি তোমাদের কাছে প্রতিপালকের নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষায় কোন ক্রটি করিনি; কিন্তু আমি কাকের সম্প্রদায়ের জন্য কতটুকু কি করতে পারি?

পূর্ববর্তী নবিগণ (আঃ), তাঁদের জাতিসমূহের ইতিহাস এবং তাঁদের দৃষ্টান্তমূলক অবস্থা ও সুরগীয় ঘটনাবলী যার বর্ণনাধারা কয়েক রকম পূর্ব থেকেই চলে আসছে, তাতে এ পর্যন্ত পাঁচ জন নবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ষষ্ঠ কাহিনীটি হযরত মুসা (আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায় বনী-ইসরাঈলের।

পূর্বেই বলা হয়েছে, কোরআনে করীম বিশু-ইতিহাস এবং বিশ্লেষণ বিভিন্ন জাতির অবস্থা বর্ণনা করে। কিন্তু তার বর্ণনারীতি হল এই যে, তাতে সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থ কিংবা গল্প-উপন্যাসের মত আলোচ্য বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনা না করে বরং স্থান ও কালের উপযোগিতা অনুসারে ইতিহাস ও গল্প-কাহিনীর অংশবিশেষ তুলে ধরা হয়। সে সঙ্গে আলোচ্য কাহিনীতে প্রাপ্ত নিদর্শনমূলক ফলাফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। এ নিয়ম অনুযায়ী সে পাঁচটি কাহিনী বর্ণনার পর এখানে কিছু সতর্কতামূলক প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় এবং 'আদ' ও 'সামূদ' জাতিকে যেসব ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা শুধুমাত্র তাদের সাথেই এককভাবে সম্পৃক্ত নয়, বরং আল্লাহ রাকবুল আলামীন স্বীয় রীতি অনুযায়ী দুনিয়ার বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট জাতি-সম্প্রদায়ের সংশোধন ও কল্যাণ সাধনকল্পে যেসব নবি-রসূল প্রেরণ করেন তাঁদের আদেশ-উপদেশের প্রতি যারা মনোনিবেশ করে না প্রথমে তাদেরকে পার্থিব বিপদাপদের সম্মুখীন করা হয়, যাতে এই বিপদাপদের চাপে তারা নিজের গতি আল্লাহ তাআলার প্রতি পরিবর্তিত করে নিতে পারে।

কারণ, প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের মনে বিপদাপদের মুখেই আল্লাহর কথা সূরণ হয় বেশী। আর এই বাহ্যিক দৃষ্টকণ্ঠ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রাহমানুর-রহীমেরই দান। উল্লেখিত আয়াতে بؤس و بأساء শব্দ দু'টির অর্থ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা। আর ضر و ضراء শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো রোগ ও ব্যাধি। কোরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত অর্থেই শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)-ও এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। কোন কোন অভিধানবিদ অবশ্য بؤس و بأساء শব্দ দু'টির অর্থ আর্থিক ক্ষতি এবং ضر و ضراء অর্থ শারীরিক বা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি বলে উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ উভয়বিদ অর্থেরই মর্ম এক।

আয়াতটির মর্ম হচ্ছে এই যে, যখনই আমি কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি রসূল প্রেরণ করি এবং সে জাতি তাঁদের কথা অমান্য করে, তখন আমার রীতি হলো, প্রথমে সে অব্যাহত লোকগুলোকে পৃথিবীতেই অর্থনৈতিক ও শারীরিক ক্ষতি আর রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে দেয়া যাতে পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। পরবর্তি আয়াতে تَزَكَّى لِمَا كَانَ السَّيِّئَةُ الْحَسَنَةُ حَتَّىٰ عَفَا এখানে سَيِّئَةً শব্দে পূর্বোল্লিখিত দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির দূরবস্থাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর حَسَنَةً শব্দে উদ্দেশ্য করা হয়েছে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির বিপরীত দিক; ধন-সম্পদের বিস্তৃতি ও স্বচ্ছলতা এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। عَفَا শব্দটি عَفُو থেকে উদ্ভূত। এর একটি অর্থ হয় প্রবৃদ্ধি

ও উন্নতি লাভ করা।

সারমর্ম এই যে, প্রথম পরীক্ষাটি নেয়া হয়েছে তাদিগকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে। তারা যখন তাতে অকৃতকার্য হয়েছে, আল্লাহ তাআলার প্রতি ফিরে আসেনি, তখন দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেয়া হয় দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির পরিবর্তে তাদের ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে। তাতে তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে এবং অনেক গুণে বেড়ে যায়। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা দুঃখ-কষ্টের পরে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং এভাবে যেন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ফিরে আসে। কিন্তু কর্মবিমুখ, শৈথিল্যপরায়াণের দল তাতেও সতর্ক হয়নি। বরং বলতে শুরু করে দেয় যে, 'এটা কোন নতুন বিষয় নয়, সং কিংবা অসং কর্মের পরিণতিও নয়; বরং প্রকৃতির নিয়মই তাই, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ, কখনও রোগ কখনও স্বাস্থ্য, কখনও দারিদ্র্য, কখনও স্বচ্ছলতা— এমনই হয়ে থাকে। আমাদের পিতা-পিতামহ প্রমুখ পূর্ব-পুরুষদেরকেও এমনি সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আর তখনই ধরা পড়লো আকস্মিক আঘাবের মাধ্যমে اِخْتَدَتْ لَهُمْ يَحْنَةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (বাগতাতান) ইঠাৎ, সহসা বা অকস্মাৎ। তার অর্থ, যখন তারা উভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়ে গেল এবং সতর্ক হলো না, তখন আমি তাদেরকে আকস্মিক আঘাবের মাধ্যমে ধরে ফেললাম এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন খবরই ছিল না।

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ الْأُمْنَىٰ وَاتَّقَوْا فَفَتَنَّا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থঃ, সে জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং নাকরমানী থেকে বিরত থাকত তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা যখন মিথ্যারোপ করেছে, তখন আমি তাদেরকে তাদেরই কৃতকর্মের দরুন পাকড়াও করেছি।

বরকতের শাসনিক অর্থ প্রবৃদ্ধি। ‘আসমান ও যমীনের সমস্ত বরকত খুলে দেয়া’ বলতে উদ্দেশ্য হল সব রকম কল্যাণ সবদিক থেকে খুলে দেয়া। অর্থঃ, তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হত আর যমীন থেকে যে কোন বস্তু তাদের মনোমত উপাদিত হত এবং অতঃপর সেসব বস্তু দ্বারা তাদের লাভবান হওয়ার এক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেয়া হত। তাতে তাদেরকে এমন কোন চিন্তা-ভাবনা কিংবা টানাপোড়নের সম্মুখীন হতে হত না যার দরুন বড় বড় নেয়ামতও পঙ্কিলতাপূর্ণ হয়ে পড়ে। ফলে তাদের প্রতিটি বিষয়ে বরকত বা প্রবৃদ্ধি ঘটত।

পৃথিবীতে বরকতের বিকাশ ঘটে দু’রকমে। কখনও মূল বস্তুটি প্রকৃতভাবেই বেড়ে যায়। যেমন, রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর মো’জ্জেবাসমুদ্রে মধ্যে রয়েছে, একটা সাধারণ পাত্রের পানি দ্বারা গোটা কাফেলার পরিপূর্ণ হওয়া। কিংবা সামান্য খাদ্য-দ্রব্যে বিরাট সমাবেশের পূর্ণোদর খাওয়া বা সঠিক ও বিশুদ্ধ রেওয়াজে বর্ণিত রয়েছে। আবার কোন কোন সময় দ্রব্য বস্তুতে বাহ্যতঃ কোন বরকত বা প্রবৃদ্ধি যদিও হয় না, পরিমাণ বা মূল্য তাই থেকে যায়, কিন্তু তার দ্বারা এতবেশী কাজ হয় যা এমন দ্বিগুণ, চতুগুণ বস্তুর দ্বারাও সাধারণতঃ সম্ভব হয় না। তাছাড়া সাধারণভাবে দেখা যায় যে, কোন একটা পাত্র, কাপড়-চোপড় কিংবা ঘরদোর অথবা ঘরের অন্য কোন আসবাবপত্র এমন বরকতময় হয় যে, মানুষ তাতে আজীবন উপকৃত হওয়ার পরেও তা তেমনি বিদ্যমান থেকে যায়। পক্ষান্তরে অনেক জিনিস তৈরী করার সময়ই ভেঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা অটুট থাকলেও তার দ্বারা উপকার লাভের কোন সুযোগ আসে না। অথবা উপকারে আসলেও তাতে পরিপূর্ণ উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না।

এই বরকত মানুষের ধন-সম্পাদেও হতে পারে, মন মস্তিষ্কেও হতে পারে, আবার কাজ-কর্মেও হতে পারে। কোন কোন সময় মাত্র একদম খাদ্যও মানুষের জন্য পূর্ণশক্তি-সামর্থ্যের কারণ হয়। আবার কোন কোন সময় অতি উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য বা গুণগুণ কোন কাজে আসে না। তেমনিভাবে কোন সময়ের মধ্যে বরকত হলে মাত্র এক ঘট্টা সময়ে এও অধিক কাজ করা যায়, যা অন্য সময় চার ঘট্টায়ও করা যায় না। বস্তুতঃ এসব ক্ষেত্রে পরিমাণের দিক দিয়ে সম্পদ বা সময় বাড়ে না সত্য, কিন্তু এমনি বরকত তাতে প্রকাশ পায় যাতে কাজ হয় বহুগুণ বেশী।

এ আয়াতের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, আসমান ও যমীনের সমস্ত সৃষ্টি ও বস্তু-রাজির বরকত ঈমান ও পরহেযগারীর উপরই নির্ভরশীল। ঈমান ও পরহেযগারীর পথ অবলম্বন করলে আখেরাতের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার কল্যাণ এবং বরকতও লাভ হয়। পক্ষান্তরে ঈমান ও পরহেযগারী পরিহার করলে সেগুলোর কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى الْأُمْنَى وَاتَّقَوْا فَفَتَنَّا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧٢﴾ أَقَامُوا أَهْلَ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٧٣﴾ وَأَمِنَ أَهْلَ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَعْفَىٰ وَهُمْ يُلْمُونَ ﴿١٧٤﴾ أَقَامُوا مَكَرَ اللَّهِ ﴿١٧٥﴾ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٧٦﴾ أَوَلَمْ يَجِدُوا لَكَ دِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّكُوشَاءُ صَبَرْتُمْ عَلَىٰ نُوْهُهُمْ وَظَبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ قَدْ لَكُمْ غُصَّةٌ مِّنْ ذَٰلِكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالنَّبِيِّتِ فَمَا كَانُوا إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَظْبِعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا لَأَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٧٨﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِ هُم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا لِيُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَطَّلُوا بِهَا فَاظْطَرُّوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٧٩﴾ قَالَ مُوسَىٰ لِيُفْرِعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾

(১৬) আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের দরুন। (১৭) এখনও কি এই জনপদের অধিবাসীরা এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত যে, আমার আযাব তাদের উপর রাতের বেলায় এসে পড়বে অথচ তখন তারা থাকবে ঘুমে অচেতন। (১৮) আর এই জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার আযাব দিনের বেলাতে এসে পড়বে অথচ তারা তখন থাকবে খেলা-খুলায় মত্ত। (১৯) তারা কি আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুতঃ আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারা নিশ্চিন্ত হতে পারে, যাদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসে। (২০০) তাদের নিকট কি একথা প্রকাশিত হয়নি, যারা উত্তরাধিকার লাভ করেছে। সেখানকার লোকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার পর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে তাদেরকে তাদের পাপের দরুন পাকড়াও করে ফেলতাম। বস্তুতঃ আমি মোহর এটে দিয়েছি তাদের অন্তরসমূহের উপর। কাজেই এরা শুনতে পায় না। (২০১) এগুলো হল সেসব জনপদ যার কিছু বিবরণ আমি আপনাকে অবহিত করছি। আর নিশ্চিন্তই ওদের কাছে পৌছেছিলেন রসূল নিদর্শন সহকারে। অতঃপর কশ্বিনকালেও এরা ঈমান আনবার ছিল না, তারপরে যা তারা ইতিপূর্বে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেছে। এভাবেই আল্লাহ কাফেরদের অন্তরে মোহর এটে দেন। (২০২) আর তাদের অধিকাংশ লোককেই আমি প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নকারীরূপে পাইনি; বরং তাদের অধিকাংশকে পেয়েছি বহুহু অমান্যকারী। (২০৩) অতঃপর আমি তাঁদের পরে মুসাকে পাঠিয়েছি নিদর্শনাবলী দিয়ে ফেরাউন ও তার সভাসদদের নিকট। বস্তুতঃ ওরা তাঁর মোকাবেলায় কুফরী করেছে। সুতরাং চেয়ে দেখ, কি পরিণতি হয়েছে অনাচারীদের। (২০৪) আর মুসা বললেন, হে ফেরাউন, আমি বিশ-পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত রসূল।

অতঃপর বলা হয়েছে **كَذَلِكَ يَطْمَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ** অর্থাৎ, যেভাবে তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে সাধারণ ক্রাফের ও নাস্তিকদের অন্তরেও আল্লাহ মোহর এঁটে দিয়ে থাকেন, যাতে সততা বা নেকী অবলম্বনের যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না।

তারপর বলা হয়েছে, **وَإِنْ وَجَدْنَاكُمْ لَافْقِينَ** অর্থাৎ, আমি

الاعوان

১৭৫

قَالَ الْمَلَأُ

حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى الْمَلَأِ إِلَّا سَحَى قَدْ جَعَلْتُمْ بَيْنَهُ
 مِنْ رَحْمَةٍ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ مَعِيَ بَيْنَ الْمَلَأِ وَالْمَلَأِ فَقَالَ إِنَّ كُنْتُمْ جَعَلْتُمْ
 بَيْنَهُ قَاتٍ بِهَذَا كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ قَالَ لَقِيَ عَصَاهُ
 فَأَذَاهُ ثَمْبَانٌ مُبِينٌ ۚ وَنَزَعَ يَدَهُ قَدْ أَهَى بَيْضَاءُ
 لِلْمُظْهِرِينَ ۖ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ تَوَمُّرٍ وَتَوَمُّرٌ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ
 عَلَيْهِمْ يُرِيدُ أَنْ يُجْرِبَكُمْ مِّنْ أَرْضِهِمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۖ
 قَالُوا الْحِجَةُ وَنَحْنَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ خَبِيرِينَ ۖ يَأْتُواكَ
 بِبَعْضِ سِحْرِ عَلِيمٍ ۖ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فَوَعُونَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَكْثَرَ
 إِنَّ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۖ قَالَ نَعَمْ وَإِنِّي أَخَافُ الْغَلِيظِينَ ۖ
 قَالُوا لِيُؤْمِسْ إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ غَنًى الْمُنَافِقِينَ ۖ
 قَالَ الْقَوْمُ قَلْبًا الْقَوْمَ سَحَرُوا وَعَيْنُ الْكَاسِ وَسَاحِرُهُمْ
 وَجَاءَهُمْ سِحْرٌ عَظِيمٌ ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاهُ
 فَأَذَاهُ تَلَقَّفَ مَا يَأْتُونَ ۖ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ فَغُلِبُوا هُنَاكَ وَانْقَلَبُوا صَبِيرِينَ ۖ وَ
 أَلْقَى السَّحَرَةُ سِهَابًا ۖ قَالُوا لِمَنْ لَّبِثُ الْعَالَمِينَ ۖ

(১০৫) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়। আমি তোমাদের পরওয়ারদেগারের নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং তুমি বনী ইসরাঈলদেরকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও। (১০৬) সে বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থিত কর যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। (১০৭) তখন তিনি নিক্ষেপ করলেন নিজের লাঠিখানা এবং তৎক্ষণাৎ তা জলজাভ্য এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। (১০৮) আর বের করলেন নিজের হাত এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। (১০৯) ফেরাউনের সাজ-পাজরা বলতে লাগল, নিশ্চয় লোকটি বিজ্ঞ-যাদুকর। (১১০) সে তোমাদিগকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এ ব্যাপারে তোমাদের কি মত? (১১১) তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দান করুন এবং শহরে বন্দরে লোক পাঠিয়ে দিন লোকদের সমবেত করার জন্য- (১১২) যাতে তারা পরাক্রান্তসম্পন্ন বিজ্ঞ যাদুকরদের এনে সমবেত করে। (১১৩) বস্তুতঃ যাদুকরা এসে ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হল। তারা বলল, আমাদের জন্য কি কোন পারিশ্রমিক নির্ধারিত আছে, যদি আমরা জয়লাভ করি? (১১৪) সে বলল, হাঁ। এবং অবশ্যই তোমরা আমার নিকটবর্তী লোক হয়ে যাবে। (১১৫) তারা বলল, হে মুসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা আমরা নিক্ষেপ করছি। (১১৬) তিনি বললেন, তোমরাই নিক্ষেপ কর। যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকদের চোখলোকে ধাঁধিয়ে দিল, ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহাযাদু প্রদর্শন করল। (১১৭) তারপর আমি ওহীযোগে মুসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপ কর তোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গিলতে লাগল, যা তারা বানিয়েছিল যাদু বলে। (১১৮) সুতরাং এভাবে প্রকাশ হয়ে গেল সত্য বিষয় এবং ভুল প্রতিপন্ন হয়ে গেল যা কিছু তারা করেছিল। (১১৯) সুতরাং তারা সেখানেই পরাজিত হয়ে গেল এবং অতীব লাল্হিত হল। (১২০) এবং যাদুকরা সেজদায় পড়ে গেল। (১২১) বলল, আমরা ঈমান আনছি মহা বিশ্বের পরওয়ারদেগারের প্রতি।

তাদের অধিকাংশকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য থেকে বিমুখ পেয়েছি।

এ পর্যন্ত বিগত নবী-রসূল (আঃ)-গণ এবং তাঁদের জাতি সম্প্রদায়ের পাঁচটি ঘটনা বিবৃত করার মাধ্যমে বর্তমান উষ্মতকে সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ দেয়া হয়েছে।

অতঃপর ষষ্ঠ ঘটনাটিতে হযরত মুসা (আঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এতে প্রসঙ্গক্রমে বহু হুকুম-আহকাম, মাসআলা-মাসায়েল এবং শিক্ষা ও উপদেশসংক্রান্ত বিচিত্র বিষয় রয়েছে। সেজন্যই কোরআন করীমে এ ঘটনার অংশবিশেষ বার বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে।

এ সূরা নবী-রসূলগণ এবং তাদের জাতি ও সম্প্রদায় সম্পর্কে নতু কাহিনী ও ঘটনাবলী আলোচনা করা হয়েছে, এ হল সেগুলোর মধ্যে নতু কাহিনী। এখানে এ কাহিনীটি বেশী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কারণ এই যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর মু'জ্জেয়াসমূহ বিগত অন্যান্য নবী-রসূলগণের তুলনায় যেমন সংখ্যায় বেশী, তেমনিভাবে প্রকাশের বলিষ্ঠতার দিক দিয়েও অধিক। এমনভাবে তাঁর সম্প্রদায় বনী-ইসরাঈলের মুখতা এবং হঠকরিতাও বিগত উষ্মত বা জাতিসমূহের তুলনায় বেশী কঠিন। অতুপি এই কাহিনীর আলোচনা প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ও হুকুম-আহকামের কথা এসেছে।

১০৩ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, তাঁদের পরে অর্থাৎ, হযরত নুহ্ হদ সালেহ, লূত ও শোয়াইব (আঃ)-এর বা তাঁদের জাতি ও সম্প্রদায়ের পরে আমি হযরত মুসা (আঃ)-কে আমার নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার জাতির প্রতি পাঠিয়েছি। নিদর্শন বা আয়াত' বলতে আসমানী কিতাব তাওরাতের আয়াতও হতে পারে, কিংবা হযরত মুসা (আঃ)-এর মু'জ্জেয়াসমূহও হতে পারে। আর সে যুগে 'ফেরাউন' হতো মিসরের সম্রাটের খেতাব। হযরত মুসা (আঃ)-এর সময়ে যে ফেরাউন ছিল তার নাম 'কাবুস' বলে উল্লেখ করা হয়।—(কুরতুবী)

فَقُلْ لِّمَوْلَاهَا - এর যে সর্বনাম তার লক্ষ্য হল নিদর্শন। অর্থাৎ, তার আয়াত বা নিদর্শনসমূহের প্রতি জুলুম করেছে। আর আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শনের প্রতি জুলুম করার অর্থ হল এই যে আল্লাহ্ তাআলার আয়াত বা নিদর্শনের কোন মর্যাদা বোঝেনি। সেগুলোর শুকরিয়া আদায় করার পরিবর্তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং ঈমানের পরিবর্তে কুফরী অবলম্বন করেছে। কারণ, জুলুম-এর প্রকৃত সংজ্ঞা হচ্ছে কোন বস্তু বা বিষয়কে তার সঠিক স্থান কিংবা সঠিক সময়ের বিপরীত ব্যবহার করা।

অতঃপর বলা হয়েছে, فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ অর্থ, চেয়ে দেখ না, সেই দাস্ত-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কি পরিণতি ঘটেছে। এ মর্মার্থ এই যে, ওদের দুষ্কর্মের অন্তত পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা কর এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১০৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত মুসা (আঃ) ফেরাউনকে বললেন, আমি বিশু পালক আল্লাহ্ তাআলার রসূল। আর আমার অবস্থা এই যে, আমার যে নবুওয়তী মর্যাদা তার দাবী হলো, যাতে আমি আল্লাহ্ প্রতি সত্য ছাড়া কোন বিষয় আরোপ না করি। কারণ, নবীগণকে (ঈদ) আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সত্যের যে পয়গাম দান করা হয়, তাই তাঁদের নিকট আল্লাহর আমানত। নিজের পক্ষ থেকে সেগুলোতে কোন

পরিবর্তন-পরিবর্তন করা সবই আমানতের খেয়ানত। পক্ষান্তরে নবী-রসূলগণ হলেন খেয়ানত ও যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত-নিষ্পাপ। সরুকা, আমার কথার উপর তোমাদের বিশাস এজন্য স্থাপন করা কর্তব্য যে, আমার সত্যতা তোমাদের সবার সামনে ভাস্বর; আমি কখনও মিথ্যা বলিওনি, বলতে পারিও না। তাছাড়া

فَدَيْتُكُمْ بِبَنَاتِيْنَ مِن زُرْعَةٍ فَارْتَبَواْ وَكَانُواْ بِرُسُلِيْ سَاهِيْنَ অর্থাৎ, শুধু তাই নয় যে, আমি কখনও মিথ্যা বলিনি; বরং আমার দাবীর স্বপক্ষে আমার মু'জ্জেয়াসমূহও প্রমাণ হিসাবে রয়েছে।

সূত্রঃ এসব বিষয়ের প্রেক্ষিতে তোমরা আমার কথা শুন, আমার কথা মন। বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়কে অন্যান্য দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে আমার সাথে দিয়ে দাও। কিন্তু ফেরাউন অন্য কোন কথাই লক্ষ করল না ;

মু'জ্জেয়া দেখাবার দাবী করতে লাগল এবং বলল, اِن كُنْتُمْ جُنْدَ رَبِّىْ فَارْتَدُّوْاْ اِلَیَّ اَوْ اَمْلَاوْاْ اَجَلًا اَوْ اَعِدُّوْاْ عَذَابًا اَلَدًّا অর্থাৎ, বাস্তবিকই যদি তুমি কোন মু'জ্জেয়া নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা উপস্থাপন কর যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক।

হযরত মুসা (আঃ) তার দাবী মেনে নিয়ে স্বীয় লাঠিখানা মাটিতে ফেলে দিলেন ; আর অমনি তা এক বিরাট অজগরে পরিণত হয়ে গেল فَاِذَا هِیَ ثَمَرٌ مُّضِيْءٌ ‘সু’বান’ বলা হয় বিরাটকায় অজগরকে। আর তার গুণবাচক مُّضِيْءٌ (মুবীন) শব্দ উল্লেখ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, সে লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা এমন কোন ঘটনা ছিল না যা অন্ধকারে কিংবা পর্দার আড়ালে ঘটে থাকবে, যা কেউ দেখে থাকবে, কেউ দেখবে না—সাধারণতঃ যা যাদুকর বা ঐন্দ্রজালিকদের বেলায় ঘটে থাকে। বরং এ ঘটনাটি—সংঘটিত হল প্রকাশ্য দরবারে, সবার সামনে।

কোন কোন ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সেই অজগর ফেরাউনের প্রতি যখন হা করে মুখ বাড়াল, তখন সে সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ে হযরত মুসা (আঃ)–এর শরণাপন্ন হল; আর দরবারের বহু লোক ভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল। – (তফসীরে – কবীর)

লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া অসম্ভব কোন ব্যাপার নয়, অবশ্য সাধারণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে এটা যে অত্যন্ত বিস্ময়কর, তাতে সন্দেহ নেই। আর মু'জ্জেয়া বা কারামতের উদ্দেশ্যও থাকে তাই। যে কাজ সাধারণ মানুষ করতে পারে না, তা নবী-রসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত করে দেয়া হয় যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, তাঁদের সঙ্গে কোন প্রশীশক্তি সক্রিয় রয়েছে। কাজেই হযরত মুসা (আঃ)–এর লাঠির সাপ হয়ে যাওয়াটা বিস্ময়কর কিংবা অস্বীকার করার মত কোন বিষয় হতে পারে না।

অতঃপর বলা হয়েছে — وَزَعَرٰٓیْہٗ فَاِذَا هِیَ بِیَضَآءٍ مُّطَّرَرٍ (নায়উন) অর্থ হচ্ছে কোন একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তুর ভেতর থেকে কিছুটা বল প্রয়োগের মাধ্যমে বের করা। অর্থাৎ, নিজের হাতটিকে টেনে বের করলেন। এখানে কিসের ভেতর থেকে বের করলেন, তা উল্লেখ করা হয়নি। অন্য আয়াতে দু'টি বস্তুর উল্লেখ রয়েছে। এক স্থানে এসেছে স্বীয় হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নীচে থেকে অর্থাৎ, কখনও গলাবন্ধের ভিতরে ঢুকিয়ে হাত বের করলে আবার কখনও বগল তলে দাবিয়ে সেখান থেকে বের করে আনলে এ মু'জ্জেয়া প্রকাশ পেত অর্থাৎ, সে হাতটি দর্শকদের সামনে প্রদীপ্ত হতে থাকতো।

তখন ফেরাউনের দাবীতে হযরত মুসা (আঃ) দু'টি মু'জ্জেয়া প্রদর্শন

করেছিলেন। একটি হল লাঠির সাপ হয়ে যাওয়া; আর অপরটি হল হাত গলাবন্ধ কিংবা বগলের নীচে দাবিয়ে বের করে আনলে তার প্রদীপ্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠা। প্রথম মু'জ্জেয়াটি ছিল বিরোধীদিককে ভীতি প্রদর্শন করার জন্য; আর দ্বিতীয়টি তাদেরকে আকৃষ্ট করে কাছে আনার উদ্দেশ্যে। এতে ইঙ্গিত ছিল যে, মুসা (আঃ)–এর শিক্ষায় একটি হেদায়েতের জ্যোতি রয়েছে; আর সেটির অনুসরণ ছিল কল্যাণের কারণ।

فَاِذَا الْمَوْءِیْدَةُ سُوْیَ ۙ শব্দটি ব্যবহৃত হয় কোন সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী নেতৃবর্গকে বোঝাবার জন্য। অর্থ হচ্ছে এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির এসব মু'জ্জেয়া দেখে তাদের সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলল, এ যে বড় পারদর্শী যাদুকর! তার কারণ, প্রত্যেকের চিন্তাই তার নিজ যোগ্যতা অনুসারেই হয়ে থাকে। সে হতভাগারা আল্লাহর পরিপূর্ণ কুদরত ও মহিমা সম্পর্কে কি বুঝবে, যারা জীবনভর ফেরাউনকে খোদা আর যাদুকরদিককে নিজেদের পথপ্রদর্শক মনে করেছে এবং যাদুকরদের ভোজবাজীই দেখে এসেছে। কাজেই তারা এহেন বিস্ময়কর ঘটনা দেখার পর এছাড়া আর কিইবা বলতে পারত যে, এটা একটা মহাযাদু। কিন্তু তারাও এখানে ساحر এর সাথে عَلِیْم শব্দটি যোগ করে একথা প্রকাশ করে দিয়েছে যে, হযরত মুসা (আঃ) – এর মু'জ্জেয়া সম্পর্কে তাদের মনেও এ অনুভূতি জন্মেছিল যে, এ কাজটি সাধারণ যাদুকরদের কাজ থেকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন প্রকৃতির। সেজন্যই স্বীকার করে নিয়েছে যে, তিনি বড়ই বিজ্ঞ যাদুকর।

মু'জ্জেয়া ও যাদুর পার্থক্য : বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা সর্বমুগেই নবী রসূলগণের মু'জ্জেয়াসমূহকে এমনি ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন যে, দর্শকবৃন্দ যদি সামান্যও চিন্তা করে আর হঠকারিতা অবলম্বন না করে, তাহলে মু'জ্জেয়া ও যাদুর মাঝে যে পার্থক্য তা নিজেরাই বুঝতে পারে। যাদুকররা সাধারণতঃ অপবিত্রতা ও পঙ্কিলতার মধ্যে ডুবে থাকে। পঙ্কিলতা ও অপবিত্রতা যত বেশী হবে, তাদের যাদুও তত বেশী কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা হল নবী রসূলগণের সহজাত অভ্যাস। আর এও একটা পরিষ্কার পার্থক্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকেই নবুওয়তের দাবীর পর কারও কোন যাদু কার্যকর হয় না।

তাছাড়া বিজ্ঞজনেরা জানান যে, যাদুর মাধ্যমে যে বিষয় প্রকাশ করা হয়, সেসব মানসিক বিষয়সমূহের আওতাভুক্তই হয়ে থাকে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সে বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের মাঝে প্রকাশ পায় না; বরং অন্তর্নিহিত থাকে। কাজেই সে মনে করে, একাজটি বাহ্যিক কোন কারণ ছাড়াই প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে মু'জ্জেয়াতে বাহ্যিক বা মানসিক কোন বিষয়ের সামান্যতম সংযোগও থাকে না। তা সরাসরি আল্লাহ তাআলার কুদরতের কাজ। তাই কোরআন মজীদে এ বিষয়টিকে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন, وَكَرَّوْاْۤیْہٖ اِلَیَّ ۙ – এবং আল্লাহ তাআলাই সে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মু'জ্জেয়া এবং যাদুর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী। যারা তদ্বজ্ঞ তাদের কাছে এতদুভয়ের মিলে যাওয়ার কোন কারণই নেই। তবে সাধারণ মানুষের কাছে তা মিলে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে এমনসব বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে দিয়েছেন যার ফলে মানুষ ধোকা থেকে বেঁচে যেতে পারে।

সারমর্ম এই যে, ফেরাউনের সম্প্রদায়ও হযরত মুসা (আঃ)–এর মু'জ্জেয়াকে নিজেদের যাদুকরদের কার্যকলাপ থেকে কিছুটা স্বতন্ত্রই মনে করেছিল। সেজন্যই একথা বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, এ যে বড় বিজ্ঞ

যাদুকর, সাধারণ যাদুকররা যে এমন কাজ দেখাতে পারে না।

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ثُمَّ أَتَانَهُمْ
যাদুকরের ইচ্ছা হলো তোমাদিগকে দেশ থেকে বের করে দেয়া। এবার
বল, তোমরা কি পরামর্শ দাও?

এ আয়াতগুলোতে মুসা (আঃ)-এর অবশিষ্ট কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে যে, ফেরাউন যখন হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রকৃষ্ট মু'জ্জেযা দেখল; লাঠি মাটিতে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা সাপে পরিণত হয়ে গেল এবং আবার যখন সেটাকে হাতে ধরলেন, তখন পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। আর হাতকে যখন গলাবন্ধের ভিতরে দাবিয়ে বের করলেন, তখন তা প্রদীপ্ত হয়ে চকমক করতে লাগল। এ প্রীতি নিদর্শনের যৌক্তিক দাবী ছিল মুসা (আঃ)-এর উপর ঈমান নিয়ে আসা, কিন্তু ভ্রাতৃবাদীরা যেমন সত্যকে গোপন করার জন্য এবং তা থেকে ফিরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে বাস্তব ও সঠিক বিষয়ের উপর মিথ্যার শিরোনাম লাগিয়ে থাকে, ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়ের নেতারাও তাই করল। বলল যে, তিনি বড় বিজ্ঞ যাদুকর এবং তাঁর উদ্দেশ্য হলো তোমাদের দেশ দখল করে নিয়ে তোমাদিগকে বের করে দেয়া। কাজেই তোমরাই বল এখন কি করা উচিত?

ফেরাউনের সম্প্রদায় একথা শুনে উত্তর দিল, اَوْحُوا وَانْحَاؤْا وَارْتَبِعُوا
অর্থাৎ এ বাক্যটিতে اَوْحُوا শব্দটি
في الْمَدَائِنِ خَيْرٌ مِنْ يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ سِجُونِهِمْ
খেকে উজ্জ্বল—যার অর্থ ঢিল দেয়া, শিথিল করা এবং আশা দান করা। আর مَدَائِنِ শব্দটি مدينة এর বহুবচন, যা যেকোন বড় শহরকে বলা হয়। حَاشِرِينَ শব্দটি حَاشِر এর বহুবচন যার অর্থ হলো আহবানকারী এবং সংগ্রহকারী। মর্মার্থ হল সৈন্যদল, যারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যাদুকরদিগকে তুলে এনে একত্রিত করবে।

আয়াতের অর্থ দাঁড়াল এই যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা পরামর্শ দিল যে, ইনি যদি যাদুকর হয়ে থাকেন এবং যাদুর দ্বারাই আমাদের দেশ দখল করতে চান, তবে তাঁর মোকাবেলা করা আমাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। আমাদের দেশেও বহু বড় বড় অভিজ্ঞ যাদুকর রয়েছে যারা তাকে যাদুর দ্বারা পরাভূত করে দেবে। কাজেই কিছু সৈন্য-সামন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিন। তারা সব শহর থেকে যাদুকরদিগকে ডেকে নিয়ে আসবে।

তার কারণ ছিল এই যে, তখন যাদু-মন্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল এবং সাধারণ লোকদের উপর যাদুকরদের প্রচুর প্রভাব ছিল। আর মুসা (আঃ)-কেও লাঠি এবং উজ্জ্বল হাতের মু'জ্জেযা এজন্যই দেয়া হয়েছিল যাতে যাদুকরদের সাথে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং মু'জ্জেযার মোকাবেলায় যাদুর পরাজয় সবাই দেখে নিতে পারে। আল্লাহ তাআলার সনাতন রীতিও ছিল তাই। প্রত্যেক যুগের নবী-রসূলকেই তিনি সে যুগের জনগণের সাধারণ প্রবণতা অনুপাতে মু'জ্জেযা দান করেছেন। হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগে গ্রীক বিজ্ঞান ও গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু উৎকর্ষের চরম শিখরে ছিল, সেহেতু তাঁকে মু'জ্জেযা দেয়া হয়েছিল জম্বাঙ্ককে দৃষ্টিসম্পন্ন করে দেয়া এবং কুষ্ঠরোগগ্রস্তকে সুস্থ করে তোলা। রসূলে করীম (সঃ)-এর যুগে আরবরা সর্বাধিক পরাকাস্তা অর্জন করেছিল অলংকার শাস্ত্র ও বাগিতায়। তাই হযুরে আকরাম (সঃ)-এর সবচেয়ে বড় মু'জ্জেযা হল কোরআন যার মোকাবেলায় গোটা আরব-আজম অসমর্থ হয়ে পড়ে।

মুসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে সারা দেশ থেকে যেসব

যাদুকর এসে সমবেত হয়েছিল তাদের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে। ৯০০ থেকে শুরু করে তিন লক্ষ পর্যন্ত রেওয়ায়েত আছে। তাদের সাথে লাঠি ও দড়ির এক বিরাট স্তূপও ছিল যা ৩০০ উটের পিঠে বোঝাই করে আনা হয়েছিল।—(কুরতুবী)

ফেরাউনের যাদুকররা প্রথমে এসেই দরকষাকষি করতে শুরু করল যে, আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে এবং তাতে জয়ী হলে, আমরা কি পাই? তার কারণ, যারা ভ্রাতৃবাদী, পার্শ্ব লাভই হল তাদের মুখ্য। কাজেই যেকোন কাজ করার পূর্বে তাদের সামনে থাকে বিনিময় কিংবা লাভের প্রশ্ন। অথচ নবী-রসূলগণ এবং তাঁদের যারা নায়েব বা প্রতিনিধি, তাঁরা প্রতি পদক্ষেপে ঘোষণা করেন — وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا وَاعِيُونَ
অর্থাৎ, আমরা যে সত্যের বাণী তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদেরকে পৌঁছে দেই তার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান কামনা করি না। বরং আমাদের প্রতিদানের দায়িত্ব শুধু আল্লাহর উপরই রয়েছে। ফেরাউন তাদেরকে বলল, তোমরা পারিশ্রমিক চাই! আমি পারিশ্রমিক তো দেবই; আর তার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদিগকে শাস্তি দরবারের ঘনিষ্ঠদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নেব।

ফেরাউনের সাথে এসব কথাবার্তা বলে নেয়ার পর যাদুকররা হযরত মুসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান ও সময় সাব্যস্ত করিয়ে নিল। সেমতে, এক বিস্তৃত ময়দানে এবং এক উৎসবের দিনে সূর্যোদয়ে কিছুক্ষণ পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় সাব্যস্ত হল। যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে—

قَالَ مَوْجُودٌ كَوْمَ الْيَوْمِ وَإِنِّي لَأَشِيرُ النَّاسَ مَعِيَ

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় যাদুকরদের সর্দারের সাথে হযরত মুসা (আঃ) আলোচনা করলেন যে, আমি যদি তোমাদের উপর জয় লাভ করি, তবে তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে তো? বলল, আমাদের কাছে এমন যাদু রয়েছে যে, তার উপর কেউ জয়ী হতে পারে না। কাজেই আমাদের পরাজয়ের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর অগত্যা যদি তুমি জয়ী হয়ে যাও, তাহলে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে ফেরাউনের চোখের সামনে তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নেব।—(মায়হারী, কুরতুবী)

قَالُوا يَوْمَئِذٍ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَقِيٌّ وَإِنَّا نَكُونُ مَعَهُ الْمُنَافِقِينَ

এখানে এলা এর অর্থ নিক্ষেপ করা। অর্থাৎ, প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বক মাঠে গিয়ে সবাই উপস্থিত, তখন যাদুকররা হযরত মুসা (আঃ)-এ বলল, হয় আপনি প্রথমে নিক্ষেপ করুন অথবা আমরা প্রথমে নিক্ষেপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই। যাদুকরদের এ উক্তিটি ছিল নিজেদের নিশ্চিন্ততা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে যে, এ ব্যাপারে আমাদের কোন পরোয়াই নেই যে, প্রথমে আমরা শুরু করি। কার, আমরা নিজের শাস্ত্রের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশুস্ত। তাদের বর্ণনাভঙ্গি একথা বোঝা যায় যে, তারা মনে মনে প্রথমে আক্রমণের প্রত্যাশী ছিল। কিন্তু শক্তিমত্তা প্রকাশের উদ্দেশ্যে হযরত মুসা (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করা নিল যে, প্রথমে আপনি আরম্ভ করবেন, না আমরা করব।

হযরত মুসা (আঃ) তাদের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে নিয়ে নিজ মু'জ্জেযা সম্পর্কে পরিপূর্ণ আশুস্ততার দরুন প্রথম তাদেরকেই মুক্ত দিলেন। বললেন, اَلْقُوا অর্থাৎ, তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর।

তফসীরে-ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে যে, যাদুকররা হযরত মুসা

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ قَالَ فِرْعَوْنُ الْمُنْتَوِيهِ قَبْلَ أَنْ
 أَذِنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا الْمَكِيدُ كَذِبُهُ فِي الْمَدِينَةِ لِيُفْرِجَ أَمْرَهَا
 أَهْلَهَا مُتَقَوِّمٌ يَعْلَمُونَ ۖ لَا قَطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ
 مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَصَلَبَكُمْ جَمِيعِينَ ۖ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا
 مُنْقَلِبُونَ ۖ وَمَا نَقُومُ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّا يَا بَيْتَ رَبِّنَا
 جَاءَنَا ثَمَّ تَبَّأْنَا فِرْعَوْنَ عَلَيْنَا صَابِرًا وَتَوَقُّفًا مُسْتَبِينَ ۖ وَقَالَ
 الْمَلِكُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْتَضُونَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَيْكَلُ قَالَ سَنَقْبَلُ آبَاءَهُمْ
 وَنَسْتَعْمِي نِسَاءَهُمْ وَنَأْتِي قَوْمَهُمْ فَهُمْ رُونَ ۖ قَالَ مُوسَىٰ
 لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۖ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ
 يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۖ
 قَالُوا أَوْ ذِيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَرْجِعِنَا
 قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوُّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي
 الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۖ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ
 فِرْعَوْنَ بِالْأَيْمَانِ وَنَقِضَ مِنَ الشَّعَرِ لَعْنَهُمْ يَذْكُرُونَ ۖ

(১৭৭) যিনি মুসা ও হারুনের পরওয়ারদেগার। (১২০) ফেরাউন বলল, তোমরা কি (তাহলে) আমার অনুমতি দেয়ার আগেই ঈমান নিয়ে আসলে— এটা যে প্রভাষণ, যা তোমরা এ নগরীতে প্রদর্শন করলে। যাতে করে এ শহরের অধিবাসীদিগকে শহর থেকে বের করে দিতে পার। সুতরাং তোমরা শীঘ্রই বুঝতে পারবে। (১২৪) অবশ্যই আমি কেটে দেব তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে। তারপর তোমাদের সবাইকে শুলীতে চড়িয়ে মারব। (১২৫) তারা বলল, আমাদেরকে তো মৃত্যুর পর নিজেদের পরওয়ারদেগারের নিকট ফিরে যেতেই হবে। (১২৬) বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শক্রতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের পরওয়ারদেগারের নির্দেশসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে। হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের জন্য ষের্ষের দ্বার খুলে দাও এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দান কর। (১২৭) ফেরাউনের সম্প্রদায়ের সর্দাররা বলল, তুমি কি এমনি ছেড়ে দেবে মুসা ও তার সম্প্রদায়কে। দেশময় হৈ-চৈ করার জন্য এবং তোমাকে ও তোমার দেব-দেবীকে বাতিল করে দেবার জন্য। সে বলল, আমি এখনি হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদিগকে; আর জীবিত রাখব মেয়েদেরকে। বস্তুতঃ আমরা তাদের উপর প্রবল। (১২৮) মুসা বললেন তাঁর কণ্ঠমকে, সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট এবং ষের্ষ ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহ্‌র। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে। (১২৯) তারা বলল, আমাদের কষ্ট ছিল তোমার আসার পূর্বে এবং তোমার আসার পরে। তিনি বললেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিষিদ্ধ দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর। (১৩০) তারপর আমি পাকড়াও করছি-ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(আঃ)-এর প্রতি আদব ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে গিয়েই প্রথম সুযোগ নেয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। তারই প্রতিক্রিয়ায় তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছিল।

فَلَمَّا الْقَاسِوُاسْعُرُوْا عَيْنِ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْا بِسُجُوْدٍ عَظِيْمٍ

অর্থাৎ, যাদুকররা যখন তাদের লাঠি ও দড়িগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল, তখন দর্শকদের নজরবন্দী করে দিয়ে তাদের উপর ভীতি সঞ্চারিত করে দিল এবং মহাযাদু দেখাল।

এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের যাদু ছিল এক প্রকার নজরবন্দী যাতে দর্শকদের মনে হতে লাগল যে, এই লাঠি আর দড়িগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ছিল তেমনি লাঠি ও দড়ি যা পূর্বে ছিল, সাপ হয়নি। এটা এক রকম সনোহানী, যার প্রভাব মানুষের কল্পনা ও দৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেয়।

কিন্তু তাই বলে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, যাদু এ প্রকারেই সীমাবদ্ধ এবং যাদুর মাধ্যমে বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটেতে পারে না। কারণ, শরীয়তের বা যুক্তির কোন প্রমাণ এর বিরুদ্ধে স্থাপিত হয়নি। বরং বিভিন্ন প্রকার যাদুর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কোথাও তা শুধু হাতের চালাকি, যাতে দর্শকরা একটা বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। কোথাও শুধু নজরবন্দীর কাজ করে। যেমন, কাজ করে সনোহানী। আর কোথাও যদি বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন ঘটেও যায়, যেমন মানুষের পাখর হয়ে যাওয়া, তাহলে সেটা শরীয়ত বা বেজ্ঞানিক যুক্তির বিরুদ্ধে নয়।

وَاجِبِيْنَ اِلَىٰ مُوسَىٰ اَنْ اِلٰهِيْ عَصَاكَ ۖ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ

অর্থাৎ, আমি মুসা (আঃ)-কে নির্দেশ দিলাম যে, তোমার লাঠিটি মাটিতে ফেলে দাও। তা মাটিতে পড়তেই সবচেয়ে বড় সাপ হয়ে সমস্ত সাপগুলোকে গিলে খেতে শুরু করল, যেগুলো যাদুকররা যাদুর দ্বারা প্রকাশ করেছিল।

ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে যে, হাজার হাজার যাদুকরের হাজার হাজার লাঠি আর দড়িগুলো যখন সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগল, তখন সমগ্র মাঠ সাপে ভরে গেল এবং সমবেত দর্শকদের মাঝে এক অদ্ভুত ভীতি ছেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হরত মুসা (আঃ)-এর লাঠি যখন এক বিরাট আয়দাহা বা অজগরের আকার ধরে এল তখন সে সবগুলোকে গিলে খেয়ে শেষ করে ফেলল।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে উল্লেখ ছিল যে, ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের সর্দারদের পরামর্শ অনুযায়ী মুসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যেসব যাদুকরকে সমগ্র দেশ থেকে এনে সমবেত করেছিল, তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে পরাজয় বরণ করল তো বটেই, তদুপরি হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমানও নিয়ে এল।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় রয়েছে যে, যাদুকরদের সর্দার মুসলমান হয়ে গেলে তার দেখাদেখি ফেরাউনের সম্প্রদায়ের ছয় লক্ষ লোক মুসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান নিয়ে এল এবং তা ঘোষণা করে দিল।

এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিতর্কের পূর্বে তো হযরত মুসা ও হারুন (আঃ) এ দু'জন ফেরাউনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এর পরে সবচেয়ে বড় যাদুকর যে স্বীয় সম্প্রদায়ের বিপুল প্রভাবের অধিকারী ছিল এবং তার সাথে ছিল

হয় লক্ষ জনসাধারণ; তারা সবাই মুসলমান হয়ে যাবার দরুন একটা বিরাট শক্তি ফেরাউনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল।

সে সময় ফেরাউনের ব্যাকুলতা ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়াটা একেবারে নিরর্থক ছিল না। কিন্তু সে তা গোপন করে একজন ধূর্ত ও বিজ্ঞ রাজনীতিকের ভঙ্গিতে প্রথমে যাদুকরদের উপর বিদ্রোহমূলক অপবাদ আরোপ করল যে, তোমরা মুসা (আঃ)-এর সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করে এ কাজটি নিজের দেশ ও জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে করেছ।

إِنَّ هَذَا الْمَكْرَ مُكَرَّمٌ وَهُوَ فِي الْيَدَيْنِ أَرْثَاৎ, এটা একটা ষড়যন্ত্র, যা তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঠে আসার পূর্বেই শহরের ভেতরে নিজেদের মধ্যে স্থির করে রেখেছিলে। তারপর যাদুকরদিককে লক্ষ্য করে বলল, مَسْتَوْرِبُهُ مِثْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ অর্থাৎ, তোমরা কি আমার অনুমতির পূর্বেই ঈমান গ্রহণ করে ফেললে। অস্বীকৃতিবাচক এই কৈফিয়তটি ছিল হুমকি ও তাম্বীহস্বরূপ। স্বীয় অনুমতির পূর্বে ঈমান আনার কথা বলে লোকদেরকে আশুস্ত করার চেষ্টা করল যে, আমারও কাম্য ছিল যে, মুসা (আঃ)-এর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটি যদি প্রতীয়মান হয়ে যায় তাহলে আমিও তাকে মেনে নেব এবং লোকদেরকেও মুসলমান হওয়ার জন্য অনুমতি দান করব। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করলে এবং প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝে-শুনেই একটা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গেলে।

এই চাতুর্ষের মাধ্যমে একদিকে লোকের সামনে মুসা (আঃ)-এর মু'জেযা আর যাদুকরদের স্বীকৃতিতে একটা ষড়যন্ত্র সাব্যস্ত করে তাদেরকে আদি বিভ্রান্তিতে ফেলে রাখার ব্যবস্থা করল। অপরদিকে রাজনৈতিক চালাকীটি করল এই যে, মুসা (আঃ)-এর কার্যকলাপ এবং যাদুকরদের ইসলাম গ্রহণ একান্তই ফেরাউনের পথভ্রষ্টতাকে পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং জাতি ও জনসাধারণের সাথে যার কোনই সম্পর্ক ছিল না—একটা রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বলল, لَيْسَ هَذَا شَيْءٌ مِنْكُمْ أَرْثَاৎ, তোমরা এই ষড়যন্ত্র এ জন্য করেছ যে, তোমরা মিসর দেশের উপর জয়লাভ করে এ দেশের অধিবাসীদিককে এখান থেকে বহিস্কার করতে চাও। এই চাতুর্ষ-চালাকীর পর সবার উপর নিজের আতঙ্ক এবং সরকারের প্রভাব ও ভীতি সঞ্চার করার জন্য যাদুকরদের হুমকি দিতে আরম্ভ করল। প্রথমে অস্পষ্ট ভঙ্গিতে বলল, سَوْفَ نَقْتُلُكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের যে কি

পরিণতি, তোমরা এখনই দেখতে পাবে। অতঃপর তা পরিষ্কারভাবে বলল لَقَطَعْنَا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفِكُمْ ثُمَّ وَاسَيْدَكُمُ أَجْمَعِينَ অর্থাৎ, আমি তোমাদের সবার বিপরীত দিকের হাত-পা কেটে তোমাদের সবাইকে শুলীতে চড়াব। বিপরীত দিকের কাটা অর্থ হল ডান হাত, বাম পা। যাতে উভয়পার্শ্বে জখমী হয়ে বেকার হয়ে পড়বে।

ফেরাউন এই দুরবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার জন্য এবং স্বীয় পারিষদবর্গ ও জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছিল। আর তার উৎপীড়নমূলক শাস্তি আগে থেকেই প্রসিদ্ধ এবং অস্ত্রাঘাতকে কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু ইসলাম ও ঈমান এমন এক প্রবল শক্তি যে, যখন তা কোন আত্মায় বদ্ধমূল হয়ে যায়, তখন মানুষ সমগ্র পৃথিবী ও তার যাবতীয় উপকরণের মোকাবেলা করতে তৈরী হয়ে যায়।

যে যাদুকররা কয়েক ঘণ্টা আগেও ফেরাউনকে নিজের খোদা বলে মানত এবং অন্যকেও এই পথভ্রষ্টতার দীক্ষা দিত, কয়েক মুহূর্তে ইসলামের কলোয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে সে কি জিনিস সৃষ্টি

হয়েছিল, যাতে তারা ফেরাউনের যাবতীয় হুমকির উত্তরে বলে উঠে : إِنْ أَرَادَى رَبِّي أَنْ يَبْعَثَ فِيهِ رَسُولًا أَوْ يَنْزِلَ بِهِ نَارًا أَوْ يَنْزِلَ بِهِ سُلْطَانًا أَوْ يَنْزِلَ بِهِ نَارًا أَوْ يَنْزِلَ بِهِ سُلْطَانًا অর্থাৎ, আমি যদি আমাদের পালনকর্তার কাছেই চলে যাব, যেখানে আমরা সব রকম শাস্তি পাব।

فَأَقْضَىٰ مَأْنَتُكَ قَائِلًا لِّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا অর্থাৎ, আমাদের ব্যাপারে তোমার যা ইচ্ছা হুকুম দিয়ে দাও। ব্যাস, এতদুই যে যে, তোমার হুকুম আমাদের পার্থিবজীবনে চলতে পারে এবং তোমার রোযানলে আমাদের এ জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ঈমান আনার পর আমাদের দৃষ্টিতে এই পার্থিব জীবনের সে গুরুত্বই অবশিষ্ট রহনীয় ঈমান আনার পূর্বে ছিল। কারণ, আমরা জেনেছি যে, এ জীবন দুঃখে ভেঁক সুখে হোক কেটে যাবেই। চিন্তা সে জীবনের ব্যাপারে করা কর্তব্য যার পরে আর মৃত্যু নেই এবং যার শাস্তিও স্থায়ী, অশাস্তিও স্থায়ী।

চিন্তা করার বিষয় যে, যারা কিছুক্ষণ আগেও নিকৃষ্টতম কুসৃত্তে আক্রান্ত ছিল, ফেরাউনের মত একজন বাজে লোককে খোদা হিসাবে মানত, আল্লাহর মহিমা-মহত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, তাদের মধ্যে সহসা এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন কেমন করে এল যে, এখন বিগত সমস্ত বিশ্বাস ও কার্যক্রম থেকে একেবারে তওবা করে নিয়ে সত্য দ্বীনের উপর এমন বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত দেখা যায় এবং দুনিয়া থেকে বিগত হয়ে যাওয়ায় একজন পছন্দ করে নেয় যে, এতে স্বীয় পালনকর্তার কাছে চলে যেতে পারবে।

শুধু ঈমানের শক্তি এবং আল্লাহর রাহে জেহাদের সংসাহসই যে, তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাই নয়; বরং মনে হয়, তাদের জন্য সত্য ও প্রকৃত মা'রেফত জ্ঞানের দারও যেন উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে কারণেই ফেরাউনের বিরুদ্ধে এহেন সাহসী বিবৃতি দেয়ার সাথে সাথে এ প্রার্থনাও করে যে, رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَكَّلْنَا مُسْلِمِينَ

অর্থাৎ, — হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য দান কর এবং মুসলমান অবস্থায় আমাদেরকে মৃত্যু দান কর।

এতে সেই মা'রেফতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ যদি না চান, তাহলে মানুষের সাহস ও দৃঢ়তা কিছু কাজেরই নয়। কাজেই এখানে দৃঢ়তা লাভ করার প্রার্থনা করা হয়েছে। আর এ প্রার্থনা যেমন সত্যকে চিনে নেয়ার ফল, তেমনিভাবে সেই বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যও সর্বোত্তম উপায়, যাতে তারা তখন পড়েছিল। কারণ, ঐশ্বর্য ও দৃঢ়তাই এমন বিষয় যা মানুষকে তার প্রতিপক্ষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয় লাভের নিশ্চয়তা দিতে পারে।

যাদুকরদের ঈমানী বিপ্লব হযরত মুসা (আঃ)-এর এক বিরাট মু'জেযা : পরিচালকের বিষয়, ইদানীং মুসলমানগণ এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করে চলেছে, কিন্তু সে রহস্যটি তারা ভুলে গেছে যা শক্তি ও স্বকীয়তার প্রাণকেন্দ্র। অথচ ফেরাউনের যাদুকরেরাও প্রথম পর্যায়েই তা বুঝ নিয়েছিল। আর তা সারা জীবন আল্লাহর পরিচয়বিপ্লব নাস্তিক-কাফেরদিককে মুহূর্তে শুধু যে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছিল তাই নয়; বরং একেকজনকে পরিপূর্ণ আরেফ এবং মুজাহিদে পরিণত করে দিয়েছিল। কাজেই হযরত মুসা (আঃ)-এর এই মু'জেযা লাটি এত জ্যোতির্ময় হাতের মু'জেযা অপেক্ষা কম ছিল না।

ফেরাউনের উপর হযরত মুসা ও হারুন (আঃ)-এর ভীতজনক

প্রতিক্রিয়া : ফেরাউনের ধূর্ততা এবং রাজনৈতিক চাল তার মুখজাতিকে জর সাথে পুরাতন পথ চলেতায় লিপ্ত থাকার ব্যাপারে কিছুটা সহায়ক হয়েছিল বটে, কিন্তু এই বিষয়কর ব্যাপারটি তাদের জন্য লক্ষ্য করার মত ছিল যে, ফেরাউনের সমস্ত রোহানল যাদুকরদের উপরেই শেষ হয়ে গেল। মুসা (আঃ) সম্পর্কে ফেরাউনের মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হল না, অথচ তিনিই ছিলেন আসল বিরোধী। কাজেই তাদেরকে বলতে হল :

أَنذَرُومُنَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذُرُكَ وَآلِهَتَكَ

অর্থঃ, জাহল কি তুমি মুসা (আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায়কে এমনি ছেড়ে দেবে, ক্ষত তোমাকে এবং তোমার উপাস্যদিগকে পরিহার করে দেশময় দাঙ্গা-কাদাঙ্গ করতে থাকবে ?

এতে বাধ্য হয়ে ফেরাউন বলল : سَتَجِدُنِي أَمَّا كَرُهٍ وَإِن مَّا يَكُنْ لَّيَوْمَ أَتَاكَ بِطِلَافَةٍ فَأَسْرِ بِهَا بِأَعْيُنٍ مُّصَوَّرَةٍ وَأَقَمِ الْأَمْرَ فِي الْبُلَدِ

অর্থঃ, তাঁর বিষয়টি আমাদের পক্ষে তেমন চিন্তার বিষয় নয়। আমরা তাদের জন্য এই ব্যবস্থা নেব যে, তাদের মধ্যে কোন পুরুষসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করব, শুধু কন্যা-সন্তানদের ক্ষত দেব। যার ফলে কিছুকালের মধ্যেই তাদের জাতি পুরুষশূন্য হয়ে পড়বে; থাকবে শুধু নারী আর নারী। আর তারা হবে আমাদের সেবাদাসী। তাছাড়া তাদের উপরে তো আমাদের পরিপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছেই; যা ইচ্ছা জই করব। এরা আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

তফসীরকার আলেমগণ বলেছেন যে, সম্প্রদায়ের এহেন জেরার মুখেও ফেরাউন একথাই বলল যে, আমরা বনী-ইসরাঈলের ছেল-সন্তানদিগকে হত্যা করে দেব, কিন্তু হযরত মুসা ও হারুন (আঃ) সম্পর্কে তখনও তার মুখে কোন কথাই এল না। তার কারণ হযরত মুসা (আঃ)-এর এই মু'জ্জিয়া এবং তার পরবর্তী ঘটনা ফেরাউনের মন-মস্তিষ্কে হযরত মুসা (আঃ)-এর ব্যাপারে কঠিন ভীতির সঞ্চার করে দিয়েছিল।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রহঃ) বলেন, ফেরাউনের এমন অবস্থা ঠিকিয়েছিল যে, যখনই সে হযরত মুসা (আঃ)-কে দেখত, তখন অবচেতন অবস্থায়ই তার পেশাব বেরিয়ে যেত।

ফেরাউন মুসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে বনী-ইসরাঈলদের প্রতি তার রাগ ঝাড়ল যে, তাদের ছেলদিগকে হত্যা করে মেয়েদিগকে জীবিত রাখার আইন তৈরী করে দিল। এতে বনী-ইসরাঈলরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল যে, মুসা (আঃ)-এর জন্মের পূর্বে ফেরাউন তাদের উপর যে আঘাচাপিয়ে দিয়েছিল তা আবার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর মুসা (আঃ)ও যখন তা উপলব্ধি করলেন, তখন একান্তই রসূল জনোচিত সোহাগ ও দর্শনানুযায়ী সে বিপদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য তাদেরকে দু'টি বিষয় শিক্ষাদান করলেন। (এক) শত্রুর মোকাবেলায় আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা এবং (দুই) কার্যসিদ্ধি পর্যন্ত সাহস ও ধৈর্য ধারণ। সেই সঙ্গে একথাও বাতলে দিলেন যে, এই ব্যবস্থা যদি অবলম্বন করতে পার, তাহলে এ দেশ তোমাদের, তোমরাই জয়ী হবে। এই হলো প্রথম আয়াতের বক্তব্য যাতে বলা হয়েছে:

اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

এবং ধৈর্য ধারণ কর। তারপর বলা হয়েছে - إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

অর্থঃ, সমগ্র ভূমি আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা এই ভূমির উত্তরাধিকারী ও মালিক করবেন। আর একথা নিশ্চিত যে, শেষ পর্যন্ত মুস্তাকী পরহেযগারগণই কৃতকার্যতা লাভ করে থাকে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যদি পরহেযগারী অবলম্বন কর যার পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হয়েছে। অর্থঃ, আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা ও ধৈর্য ধারণের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী হও, তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমরাই হবে মিসর দেশের মালিক ও অধিপতি।

জটিলতা ও বিপদমুক্তির অমোঘ ব্যবস্থা : হযরত মুসা (আঃ) শত্রুর উপর বিজয় লাভের জন্য বনী-ইসরাঈলদিগকে যে দার্শনিকসুলভ ব্যবস্থার শিক্ষা দান করেছিলেন, গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এই হচ্ছে সেই অমোঘ ব্যবস্থা, যা কখনও ভুল হয় না এবং যার অবলম্বনে বিজয় সুনিশ্চিত। এই ব্যবস্থার প্রথম অংশটি হলো আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা। এটাই হল এ ব্যবস্থার প্রকৃত প্রাণ। কারণ বিশৃঙ্খলা যার সাহায্য থাকেন, তার দিকে সমগ্র বিশুর সহায়তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সমগ্র সৃষ্টি হয় তাঁরই হুকুমের আওতাভুক্ত।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন আপনা থেকেই তার উপকরণাদি সংগৃহীত হতে থাকে। কাজেই শত্রুর মোকাবেলায় বৃহত্তর শক্তিও মানুষের ততটা কাজে আসতে পারে না, যতটা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কাজে লাগতে পারে। অবশ্য তার শর্ত হলো এই যে, এই সাহায্য প্রার্থনা হতে হবে একান্তই সত্যনিষ্ঠার সাথে, শুধু কিছু শব্দের আবৃত্তি নয়।

দ্বিতীয় অংশটি হলো, 'সবর' এর ব্যবস্থা। অভিধান অনুযায়ী সবর-এর প্রকৃত অর্থ হল ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়ে ধীর স্থির থাকা এবং রিপুকে আয়ত্তে রাখা। কোন বিপদে ধৈর্য ধারণকেও সেজন্যই 'সবর' বলা হয় যে, তাতে কান্নাকাটি এবং বিলাপের স্বাভাবিক চেতনাকে দাবিয়ে রাখা হয়।

যে কোন অভিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন যে, দুনিয়ার যে কোন বৃহদাঙ্গন্য সাধনের পথে বহু ইচ্ছাবিরুদ্ধ পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতা অপরিহার্য। যে লোক পরিশ্রমের অভ্যাস করে নিতে পারে এবং ইচ্ছাবিরুদ্ধ বিষয়সমূহকে সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করে নিতে পারে, সে তার অধিকাংশ উদ্দেশ্যে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। হাদীসে রসূলে করীম (সাঃ)-এর এরশাদ বর্ণিত আছে যে, সবর বা ধৈর্য এমন একটি নেয়ামত, যার চাইতে বিস্তৃত আর কোন নেয়ামত কেউ পায়নি। - (আবু দাউদ)

হযরত মুসা (আঃ)-এর বিজ্ঞজেনোচিত উপদেশ এবং তার প্রেক্ষিতে বিজয় ও কৃতকার্যতার সংক্ষিপ্ত ওয়াদা কুটিলমতি বনী-ইসরাঈল কি বুঝবে; এসব শুনে বরং বলে উঠল—

أَوُفٍّ يَأْمَنُ قَيْلًا أَنْ تَأْتِيَهُمْ وَرَأْسُكَ

অর্থঃ, আপনার আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে কষ্টই দেয়া হয়েছে, আর আপনার আগমনের পরেও তাই হচ্ছে।

উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আপনার আগমনের পূর্বে তো এ আশায় দিন কেটে যেত যে, আমাদের উদ্ধারের জন্য কোন একজন পয়গম্বর আসবেন। অথচ এখন আপনার আগমনের পরেও উৎপীড়নের সে ধারাই যদি বহাল থাকল, আমরা কি করব।

فَإِذَا جَاءَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَئِنْ هَذِهِ إِلَّا تَصْنِيعُ سَيِّئَةٍ
يَظُنُّوْنَ وَيُؤَسُّوْنَ وَمِنْ مَعَةٍ أَلَا تَأْتِيهِمْ جُنُودُ اللَّهِ
وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قَالُوا مَهْمَا تَأْتِيَنَا بِهِ
مِنْ آيَةٍ لِّنَسْحَرَكُنَّ بِهَا فَأَعْنُ لَكَ يَوْمَيْنِ ۝ فَأَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادَ وَالذَّمَارَ
مُقَصَّاتٍ فَأَسَدَكَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ۝ وَلَمَّا
وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ قَالُوا لِيُؤَسِّسْ أَدْعُنَا رَبَّنَا بِمَا عَاهَدَ
عِنْدَكَ لَكِنْ كَشَفْتَ عَنْنَا الرَّجْزَ لَنُؤْمِنَ لَكَ وَلَمْ تُرْسِلْ
مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرَّجْزَ إِلَى
أَحْلِ هُمْ بَلِغُوا إِذَا هُمْ يَنْتَكِبُونَ ۝ فَأَنْتَقَبْنَا مِنْهُمْ
فَاغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ يَا نَحْمُكَ كَذِبًا إِنَّنَا وَمَا كُنَّا
غَافِلِينَ ۝ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَفُونَ
مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَتَبَّتْ
رَيْكُ الْحَسَنِ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ هَ بِمَا صَبَرُوا وَوَدَّعْنَا
مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فَرَعُونُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا لِيُفْرِسُونَ ۝

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতগুলোতে ফেরাউনের সম্প্রদায় এবং হযরত মুসা (আঃ)-এর অবশিষ্ট কাহিনীর আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে ফেরাউনের জাদুকররা মুসা (আঃ)-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধেরে ধিরে ঈমান এনেছে, কিন্তু ফেরাউনের সম্প্রদায় তেমনি ঔদ্ধত ও কৃপার আঁকড়ে রয়েছে।

এ ঘটনার পর ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত মুসা (আঃ) নিব্বহর যাবৎ মিসরে অবস্থান করে সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহর বাণী শোনান এবং সত্য ও সরল পথের দিকে আহ্বান করতে থাকেন। এ সময়ে আল্লাহ তাআলা হযরত মুসা (আঃ)-কে নয়টি মূ'জেযা দান করেছিলেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়কে সত্যের সত্য পথে আনা। **وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ** আয়াতে এই নয়টি মূ'জেযা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

এই নয়টি মূ'জেযার মধ্যে প্রথম দু'টি মূ'জেযা অর্থাৎ **لَا تِلْكَ** সাপে পরিণত হওয়া এবং হাতের কিরণময় হওয়া ফেরাউনের দরবারে প্রকাশিত হয়। আর এগুলোর মাধ্যমেই জাদুকরদের বিরুদ্ধে হযরত মুসা (আঃ) জয়লাভ করেন। তারপরের একটি মূ'জেযা যার আলোচনা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছে, তা ছিল ফেরাউনের সম্প্রদায়ের হঠকান্ন ও দুরাচরণের ফলে দুর্ভিক্ষের আগমন। যাতে তাদের ক্ষেতের ফসল এবং বাগ-বাগিচার উৎপাদন চরমভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ফলে এরা অজ্ঞা ব্যাকুল হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত হযরত মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তিলাভের দোয়া করায়। কিন্তু দুর্ভিক্ষ রহিত হয়ে গেলে পুনরায় নিজেদের ঔদ্ধত্যে লিপ্ত হয় এবং বলাতে শুরু করে যে, এই দুর্ভিক্ষ মুসা (আঃ)-এর সঙ্গী-সাথীদের অলক্ষণের দরুনই আপতিত হয়েছিল। আর এখন যে দুর্ভিক্ষ রহিত হয়েছে তা হলে আমাদের সুকৃতির স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। এমনটিই তো আমাদের প্রাপ্য।

পরবর্তী ছয়টি মূ'জেযার বিষয় আলোচিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতগুলোতে। **فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادَ**

অর্থাৎ, অতঃপর আমি তাদের উপর পাঠিয়েছি তুফান, পঙ্গপাল, মূণ পোকা, ব্যাঙ এবং রক্ত। এতে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর আপতিত পাঁচ রকমের আযাবের কথা আলোচিত হয়েছে এবং এগুলোকে উক্ত আয়াতে **وَالذَّمَارَ** বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হল এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি আযাব নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থেকে রহিত হয়ে যায় এবং কিছু সময় বিরতির পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আযাব পৃথক পৃথকভাবে আসে।

ইবনে-মুনযির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়াতে উদ্ধৃত করেছেন যে, এর প্রতিটি আযাব ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর সাত দিন করে স্থায়ী হয়। শনিবার দিন শুরু হয়ে দ্বিতীয় শনিবারে রহিত হয় যেত এবং পরবর্তী আযাব আসা পর্যন্ত তিন সপ্তাহের অবকাশ দেয়া হয়।

ইমাম বগযী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি লিখে বলেছেন যে, প্রথমবার যখন ফেরাউনের সম্প্রদায়ের উপর দুর্ভিক্ষ আযাব চেপে বসে এবং হযরত মুসা (আঃ)-এর দোয়ায় তা রহিত হয় যায়, কিন্তু তারা নিজেদের ঔদ্ধত্য থেকে বিরত হয় না, তখন হযরত মুসা (আঃ) প্রার্থনা করেন, হে আমার পরওয়াদেগার, এরা এতই উদ্ধত ও দুর্ভিক্ষের আযাবেও প্রভাবিত হয়নি; নিজেদের কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো।

(১০১) অতঃপর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে যে, এটাই আমাদের জন্য উপযোগী। আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয় তবে তাতে মুসার এবং তাঁর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে। শুনে রাখ তাদের অলক্ষণ যে, আল্লাহরই এলমে রয়েছে, অথচ এরা জানে না। (১০২) তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের উপর জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা কিন্তু তোমার উপর ঈমান আনছি না। (১০৩) সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত প্রভৃতি বহুবিধ নিদর্শন একের পর এক। তারপরেও তারা গর্ব করতে থাকল। বস্তুতঃ তারা ছিল অপরাধপ্রবণ। (১০৪) আর তাদের উপর যখন কোন আযাব পড়ে তখন বলে, হে মুসা! আমাদের জন্য তোমার পরওয়াদেগারের নিকট সে বিষয়ে দোয়া কর যা তিনি তোমার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এ আযাব সরিয়ে দাও, তবে অবশ্যই আমরা ঈমান আনব তোমার উপর এবং তোমার সাথে বনী-ইসরাঈলদেরকে যেতে দেব। (১০৫) অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিতাম নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত-যেখান পর্যন্ত তাদেরকে পৌছানো উদ্দেশ্য ছিল, তখন তড়িঘড়ি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। (১০৬) সুতরাং আমি তাদের কাছ থেকে বদলা নিয়ে নিলাম-বস্তুতঃ তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি করেছিল আমার নিদর্শনসমূহকে এবং তৎপ্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল। (১০৭) আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকেও আমি উত্তরাধিকার দান করেছি এ ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের যাতে আমি বরকত সন্নিহিত রেখেছি এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত কল্যাণ বনী-ইসরাঈলদের জন্য তাদের ঐশ্বর্যধারের দরুন। আর ধ্বংস করে দিয়েছি সে সবকিছু যা তৈরী করেছিল ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নির্মাণ করেছিল।

কর তাদের উপর এমন কোন আযাব চাপিয়ে দাও, যা হবে তাদের জন্য কল্যাণকর এবং আমাদের জাতির জন্য উপদেশের কাজ করবে ও পুনর্জন্মের জন্য যা হবে ভরসামূলক শিক্ষা। তখন আল্লাহ প্রথমে তাদের চিন্তা নাশিল করেন তুফানজনিত আযাব। প্রখ্যাত মুফাসসেরগণের মতে তুফান অর্থ পানির তুফান। অর্থাৎ, জলোচ্ছাস। তাতে ফেরাউনের সমস্ত ঘর-বাড়ী ও জমি-জমা জলোচ্ছাসের আবের্ডে এসে পড়ল। না থাকে কোথাও শোয়া-বসার জায়গা, না থাকে জমিতে ঘর-বাসের কোন ব্যবস্থা। আরো আশ্চর্যের বিষয় ছিল এই যে, ফেরাউন সমস্তায়ের সঙ্গেই ছিল বনী-ইসরাঈলদেরও জমি-জমা ও ঘর-বাড়ী। কিন্তু বনী-ইসরাঈলদের ঘর-বাড়ী জমি-জমা সবই ছিল শুষ্ক। সেগুলোর কোথাও জলোচ্ছাসের পানি ছিল না, অথচ ফেরাউন সমস্তায়ের জমি ছিল পানির নীচে।

এই জলোচ্ছাসে ভীত হয়ে ফেরাউন সমস্তায়ের হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকট প্রার্থনা করল যে, আপনার পরওয়ানদেগারের দরবারে দোয়া করুন যাতে এ আযাব দূর হয়ে যায়, তাহলে আমরা ঈমান আনব এবং বনী-ইসরাঈলদিগকে মুক্ত করে দেব। মুসা (আঃ)-এর দোয়ায় জলোচ্ছাসের তুফান রহিত হয়ে গেল এবং তারপর তাদের শস্য-ফসল অধিকতর সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠল। তখন তারা বলতে আরম্ভ করল যে, আমরা এই তুফান তথা জলোচ্ছাস কোন আযাব ছিল না; বরং আমাদের দায়দার জন্মেই তা এসেছিল। যার ফলে আমাদের শস্যভূমির উৎপাদন ক্রমতা বেড়ে গেছে। সুতরাং মুসা (আঃ)-এর এতে কোন দখল নেই। এসব কথা বলেই তারা কৃত প্রতিজ্ঞার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে শুরু করে।

এভাবে এরা মাসাধিককাল সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। আল্লাহ তাদের চিন্তা-ভাবনার অবকাশ দান করলেন। কিন্তু তাদের চিন্তাভাবনা হল না। তখন দ্বিতীয় আযাব পঙ্গপালকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হল। এই পঙ্গপাল তাদের সমস্ত শস্য, ফসল ও বাগানের ফল-ফলারী খেয়ে নিঃশেষিত করে ফেলল। কোন কোন রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, কাঠের দরজা-জানালা, ছাদ প্রভৃতিসহ ঘরে ব্যবহার্য সমস্ত আসবাবপত্র পঙ্গপালেরা খেয়ে শেষ করে ফেলেছিল। আর এ আযাবের ক্ষেত্রেও মুসা (আঃ)-এর মু'জ্জেযা পরিলক্ষিত হয় যে, এই সমস্ত পঙ্গপালই শুধুমাত্র কিব্বী বা ফেরাউনের সমস্তায়ের শস্যক্ষেত্র ও ঘর-বাড়ীতে ছেয়ে গিয়েছিল। সলঙ্গ ইসরাঈলীদের ঘর-বাড়ী, শস্যভূমি ও বাস-বাগিচা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে।

এবারও ফেরাউনের সমস্তায় চীৎকার করতে লাগল এবং মুসা (আঃ)-এর নিকট আবেদন জানাল যে, এবার আপনি আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করে আযাব সরিয়ে দিলে আমরা পাকা গুয়াদা করছি যে, ঈমান আনব এবং বনী-ইসরাঈলদিগকে মুক্তি দিয়ে দেব। তখন মুসা (আঃ) আবার দোয়া করলেন এবং এ আযাবও সরে গেল। আযাব সরে যাওয়ার পর তারা দেখল যে, আমাদের কাছে এখনও এ পরিমাণ খাদ্যশস্য বৃদ্ধি রয়েছে, যা আমরা আরও বছরকাল খেতে পারব। তখন আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে এবং উদ্ধৃত প্রদর্শন প্রবৃত্ত হল। ঈমানও আনল না, বনী-ইসরাঈলদিগকেও মুক্তি দিল না।

আবার আল্লাহ তাআলা এক মাসের জন্য অবকাশ দান করলেন। এই অবকাশের পর তাদের উপর চাপালেন তৃতীয় আযাব قمل (কোম্বালা)। قمل সে উকুনকে বলা হয়, যা মানুষের চুল বা কাপড়ে জন্মে থাকে এবং সেসব পোকা বা কীটকেও বলা হয়, যা কোন কোন সময় খাদ্যশস্যে পড়ে এবং যাকে সাধারণতঃ ফুশ এবং কেরী পোকাও বলা হয়। কোম্বালের এ

আযাবে সম্ভবতঃ উভয় রকমের পোকাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের খাদ্যশস্যেও ফুশ ধরেছিল এবং শরীরে মাথাঘণ্ড উকুন পড়েছিল বিপুল পরিমাণে।

সে ঘুণের ফলে খাদ্যশস্যের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে, দশ সের গমে তিন সের আটাও হতো না। আর উকুন তাদের চুল-প্র পর্বস্ত খেয়ে ফেলেছিল।

শেষে আবার ফেরাউনের সমস্তায় কুঁশিয়ে কুঁশিয়ে কঁদতে লাগল এবং মুসা (আঃ)-এর নিকট এসে ফরিয়াদ করল, এবার আর আমরা গুয়াদা ভঙ্গ করব না, আপনি দোয়া করুন। হযরত মুসা (আঃ)-এর দোয়ায় এ আযাবও চলে গেল। কিন্তু যে হতভাগাদের জন্য ধ্বংসই ছিল অনিবার্য এরা প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে কেমন করে। অব্যাহতি লাভের সাথে সাথে সবই ভুলে গেল এবং অস্বীকার করে বসল।

তারপর আবার একমাসের সময় দেয়া হলো। যাতে প্রচুর আরাম-আয়েশে কাটল। কিন্তু যখন এই অবকাশেরও কোন সুযোগ নিল না, তখন চতুর্থ আযাব হিসাবে এসে হাযির হল ব্যাঙ। এত অধিক সংখ্যায় ব্যাঙ তাদের ঘরে জমাল যে, কোনখানে বসতে গেলে গলা পর্যন্ত উঠত ব্যাঙের শৃঙ্গ। শুতে গেলে ব্যাঙের শৃঙ্গের নীচে তলিয়ে যেতে হতো, পাশ ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ত। রান্নার হাড়ি, আটা-চালের মটকা বা টিন সব কিছুই ব্যাঙে ভরে যেত। এই আযাবে অসহ্য হয়ে সবাই বিলাপ করতে লাগল এবং আগের চাইতেও পাকাপাকি গুয়াদার পর হযরত মুসা (আঃ) এর দোয়ায় এ আযাবও সরলো।

কিন্তু যে জাতির উপর খোদায়ী গণব চপে থাকে তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা, জ্ঞান-চেষ্টা কোন কাজই করে না। কাজেই এ ঘটনার পরেও আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে এরা আবারও নিজেদের হঠকারিতায় আঁকড়ে বসল এবং বলতে আরম্ভ করল যে, এবার তো আমাদের বিশৃঙ্খল আরও দৃঢ় হয়ে গেছে যে, মুসা (আঃ) মহাজাদুকর, আর এসবই তাঁর জাদুর কীর্তি-কাণ্ড।

অতঃপর আরেক মাসের জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অব্যাহতি দান করলেন, কিন্তু তারা এরও কোন সুযোগ নিল না। তখন এল পঞ্চম আযাব 'রক্ত'। তাদের সমস্ত পানাহারের বস্তু রক্তে রূপান্তরিত হয়ে গেল। কূপ কিংবা হাড়ি থেকে পানি তুলে আনলে তা রক্ত হয়ে যায়, খাবার রান্না করার জন্য তৈরী করে নিলে, তাও রক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ সমস্ত আযাবের বেলায়ই হযরত মুসা (আঃ)-এর এ মু'জ্জেযা বরাবর প্রকাশ পেতে থাকে যে, যে কোন আযাব থেকে ইসরাঈলীরা থাকে মুক্ত ও সুরক্ষিত। রক্তের আযাবের সময় ফেরাউনের সমস্তায়ের লোকেরা বনী-ইসরাঈলদের বাড়ী থেকে পানি চাইত। কিন্তু তা তাদের হাতে যাওয়া মাত্র রক্তে পরিণত হয়ে যেত। একই দস্তুরশানে বসে কিব্বী ও বনী-ইসরাঈল খাবার খেতে গেলে যে লোকমাটি বনী-ইসরাঈলেরা তুলত তা যথাক্রম থাকত, কিন্তু যে লোকমা বা পানির খোঁট কোন কিব্বী মুখে তুলত তাই রক্ত হয়ে যেত। এ আযাবও পূর্ববর্তী অনুযায়ী সাত দিন পর্যন্ত স্থায়ী হল এবং আবার এই দুরাচার প্রতিজ্ঞাসকারী জাতি চীৎকার করতে লাগল। অতঃপর হযরত মুসা (আঃ)-এর নিকট ফরিয়াদ করল এবং অধিকতর দৃঢ়ভাবে গুয়াদা করল। দোয়া করা হলে এ আযাবও সরে গেল, কিন্তু এরা তেমনি গোমরাহীতে স্থির থাকল। এ বিষয়েই কোরআন বলেছে— فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ অর্থাৎ, এরা আত্মগর্ব প্রকাশ করতে থাকল। বস্তুতঃ এরা ছিল অপরাধে অভ্যস্ত জাতি।

অতঃপর ষষ্ঠ আযাবের আলোচনা প্রসঙ্গে আয়াতে جُر এর নাম বলা

হয়েছে। এই শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্লেগ রোগকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অবশ্য বসন্ত প্রভৃতি মহামারীকেও رَجَز (রিজয) বলা হয়। তফসীরসংক্রান্ত রেওয়াজেতে উল্লেখ রয়েছে যে, গুদের উপর প্লেগের মহামারী চাপিয়ে দেয়া হয়, যাতে তাদের সন্তর হাজার লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। তখন আবারও তারা নিবেদন করে এবং পুনরায় দোয়া করা হলে প্লেগের আঘাতও তাদের উপর থেকে সরে যায়। কিন্তু তারা যথারীতি ওয়াদা ভঙ্গ করে। ক্রমাগত এতবার পরীক্ষা ও অবকাশ দানের পরেও যখন তাদের মধ্যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়নি তখন চলে আসে সর্বশেষ আঘাত। তাহল এই যে, তারা নিজেদের ঘর-বাড়ী, জমি-জমা ও আসবাবপত্র ছেড়ে মুসা (আঃ)-এর পশ্চাদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত লোহিত সাগরের গ্রাসে পরিণতি হয়। তাই বলা হয়েছে—

فَأَعْرِضْهُمْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كُنَّا يُبَايِعُنَا وَكَاوَعُنَا غُلِيظِينَ
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ

অর্থ— যে জাতিকে দুর্বল ও হীন বলে মনে করা হতো, তাদেরকে আমি সে ভূমির উদয়চল ও অন্ত্যচলের অধিপতি বানিয়ে দিয়েছি, যাতে আমি রেখেছি বরকত বা আশীর্বাদ।

কোরআনের শব্দগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এতে ‘যে জাতিকে ফেরাউনের সম্প্রদায় দুর্বল ও হীন মনে করেছিল’ বলা হয়েছে। এ কথা বলা হয়নি যে, ‘যে জাতি দুর্বল ও হীন ছিল।’ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা যে জাতির সহায়তায় থাকেন প্রকৃতপক্ষে তারা কখনও দুর্বল হয় না। যদিও কোন সময় তাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখে অন্যান্য লোক ঠোকাষ পড়ে যায় এবং তাদেরকে দুর্বল বলে মনে করে বসে। কিন্তু শেষ পরিণতির ক্ষেত্রে সবাই দেখতে পায় যে, তারা মোটেই দুর্বল ও হীন ছিল না। কারণ, প্রকৃত শক্তি ও মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহরই হাতে।

আর যমিনের মালিক বানিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে وَأَوْرَثْنَا শব্দটি ব্যবহার করে বলেছেন যে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ‘ওয়্যারেস’ বা উত্তরাধিকারী যেমন করে নিজের পূর্ব পুরুষের সম্পদের অধিকারী হয় এবং পিতার জীবদ্দশায়ই সবাই একথা জেনে নিতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর ধন-সম্পদের মালিক তাঁর সন্তানরাই হবে, তেমনিভাবে আল্লাহর জানা মতে বনী-ইসরাঈলরা পূর্ব থেকেই কওমে-ফেরাউনের ধন-সম্পদের অধিকারী ছিল।

مَشَارِقُ শব্দটি مشرق এর বহুবচন। আর مغارب হচ্ছে مغرب এর বহুবচন। শীত ও গ্রীষ্মের বিভিন্ন ঋতুতে যেহেতু সূর্যের উদয়ান্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে, সেহেতু এখানে ‘মাশারিক’ (উদয়চলসমূহ) এবং ‘মাগারি’ (অস্ত্যচলসমূহ) বহুবচন জ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর ভূমি ও যমিন বলতে এক্ষেত্রে অধিকাংশ মুফাসসেরীনের মতে শাম বা সিরিয়া ও মিসর ভূমিকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে— যাতে আল্লাহ তাআলা কওমে-ফেরাউন ও কওমে-আ’মালেকাহকে ধ্বংস করার পর বনী-ইসরাঈলকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শাসনক্ষমতা দান করেছিলেন।

হযরত মুসা (আঃ) যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে সাহায্যের ওয়াদা করেছিলেন তখনও তিনি জাতিকে বলেছিলেন যে, আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা এবং একান্ত দৃঢ়তার সাথে বিপদাপদের মোকাবেলা করাই কৃতকার্যতার চাবিকাঠি। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ যদি এমন কোন লোক বা দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পৃক হয়, যাকে প্রতিহত করা তার ক্ষমতার বাইরে, তবে সে ক্ষেত্রে কৃতকার্যতা ও কল্যাণের সঠিক পথ হল তার মোকাবেলা না করে বরণ সবার করা। তিনি বলেন, যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির উৎপীড়নের মোকাবেলা উৎপীড়নের মাধ্যমে করে অর্থাৎ নিজের নিজের প্রতিশোধ নেবার চিন্তা করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে তার শক্তি-সামর্থ্যের উপর ছেড়ে দেন। তাতে সে কৃতকার্য হোক, নি অকৃতকার্য হোক সে ব্যাপারে তাঁর কোন দায়িত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে যখন কোন লোক মানুষের উৎপীড়নের মোকাবেলা যৈর বা সবার এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে করে, তখন আল্লাহ স্বয়ং তার জন্য পথ খুল দেন।

আর যেভাবে আল্লাহ বনী-ইসরাঈলের সাথে তাদের সবার ও দৃঢ়তার প্রেক্ষিতে এই ওয়াদা করেছিলেন যে, তাদিগকে শত্রুর উপর বিজয় এক যমিনের উপরে শাসনক্ষমতা দান করবেন, তেমনিভাবে মহানবী (সঃ)-এর উম্মতের প্রতিও ওয়াদা করেছেন।—

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ فِي الْأَرْضِ

আর যেভাবে বনী-ইসরাঈলরা আল্লাহর ওয়াদা প্রত্যক্ষ করেছিল, মহানবী (সঃ)-এর উম্মতরা তার চেয়েও প্রকৃষ্টভাবে আল্লাহর সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছে, সমগ্র বিশ্বে তাদের শাসন ও রাষ্ট্রকে ব্যাপক করে দেয়া হয়েছে।— (ব্রাহ্ম-বয়ান)



(১০৬) বস্ত্তঃ আমি সাগর পার করে দিয়েছি বনী-ইসরাঈলদিগকে। তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌছল, যারা স্বহস্তনির্মিত মূর্তিপূজায় নিয়োজিত ছিল। তারা বলতে লাগল, হে মুসা! আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি কালল, তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে। (১০৯) এরা যে কাছে নিয়োজিত রয়েছে তা ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তারা করেছে তা যে ভুল। (১১০) তিনি বললেন, তাহলে কি আল্লাহকে ছাড়া তোমাদের জন্যে অন্য কোন উপাস্য অনুসন্ধান করব, অথচ তিনিই তোমাদিগকে সারা বিশ্বে প্রভু দান করেছেন। (১১১) আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছি। তারা তোমাদেরকে দিত নিকৃষ্ট শাস্তি, তোমাদের পুত্র-সন্তানদের ঘেরে ফেলত এবং মেয়েদের ঝাঁচিয়ে রাখত। এতে তোমাদের প্রতি তোমাদের পরওয়ারদেগারের বিরাট পরীক্ষা রয়েছে। (১১২) আর আমি মুসাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ত্রিশ রাত্রির এবং সেগুলোকে পূর্ণ করেছে আরো দশ রাত্রি। বস্ত্তঃ এভাবে চল্লিশ রাতের মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেছে। আর মুসা তাঁর তাই হারানকে বললেন, আমার সম্প্রদায়ে তুমি আমার প্রতিনিমি হিসাবে থাক। তাদের সংশোধন করতে থাক এবং হাদ্দের সৃষ্টিকারীদের পক্ষে চলে না। (১১৩) তারপর মুসা যখন আমার প্রতিশ্রুত সময় অনুযায়ী এসে হাথির ফলন এবং তাঁর সাথে তাঁর পরওয়ারদেগার কবল বললেন, তখন তিনি কালল, হে আমার প্রভু, তোমার দীদার আমাকে দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কশিনকালেও দেখতে পাবে না, তবে তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, সেটি যদি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তাঁর পরওয়ারদেগার পাহাড়ের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে বিস্ময় করে দিলেন এবং মুসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল, বললেন, হে প্রভু! তোমার সত্তা পবিত্র, তোমার দরবারে আমি তওবা করছি এবং আমিই সর্বধর্মক বিশ্বাস স্থাপন করছি।

وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ ۚ وَابْرَءَامِ ۚ وَابْنِ إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ

অর্থাৎ, আমি বনী-ইসরাঈলদিগকে সাগর পার করে দিয়েছি। ফেরাউন সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় বনী-ইসরাঈলদের যে অলৌকিক কৃতকার্যতা ও প্রশান্তি লাভ হয়, তার সে প্রতিক্রিয়াই হয়েছে যা সাধারণতঃ প্রাদুর্ভাব আসার পর বস্ত্তবাদী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্থাৎ, ওরাও ভোগবিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করল।

ঘটনাটি হলো এই যে, এই জাতি মুসা (আঃ)-এর যু'জ্জিয়া বলে সদ্য লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে এসেছিল এবং গোটা ফেরাউন সম্প্রদায়ের সাগরে ডুবে মরার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে নিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু অগ্রসর হতেই তারা এমন এক মানব গোষ্ঠীর বাসভূমির উপর দিয়ে অতিক্রম করল, যারা বিভিন্ন মূর্তির পূজায় লিপ্ত ছিল। এই দেখে বনী-ইসরাঈলদেরও তাদের সে রীতি-নীতিই পছন্দ হতে লাগল। তাই মুসা (আঃ)-এর নিকট আবেদন জানাল, এসব লোকের যেমন বহু উপাস্য রয়েছে, আপনি আমাদের জন্যেও এমনি ধরনের কোন একটা উপাস্য নির্ধারণ করে দিন, যাতে আমরা একটা দৃষ্ট বস্ত্তকে সামনে রেখে এবাদত-উপাসনা করতে পারি, আল্লাহর সত্তা তো আর সামনে আসে না।

মুসা খালাইহিস্ সালাম বললেন, إِنَّكُمْ قَوْمٌ يَّجْهَلُونَ অর্থাৎ - তোমাদের মধ্যে বড়ই মূর্খতা রয়েছে। যাদের রীতি-নীতি তোমরা পছন্দ করছ, তাদের সমস্ত আমল যে বিনষ্ট ও বরবাদ হয়ে গেছে। এরা মিথ্যার অনুগামী। ওদের এসব বাস্তব রীতি-নীতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তোমাদের পক্ষে উচিত নয়। আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি কি তোমাদের জন্যে অন্য কোন উপাস্য বানিয়ে দেব? অথচ তিনিই তোমাদিগকে দুনিয়াবাসীর উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন। অর্থাৎ, তৎকালীন বিশ্ববাসীর উপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন। কারণ, তখন মুসা (আঃ)-এর উপর যারা ঈমান এনেছিল, তারাই ছিল অন্যান্য লোক অপেক্ষা বেশী মর্যাদাসম্পন্ন ও উত্তম।

অতঃপর বনী-ইসরাঈলদিগকে তাদের বিগত অবস্থা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ফেরাউনের কণ্ঠস্বর হাতে তারা এমনই অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত ছিল যে, তাদের ছেলেদিগকে হত্যা করে নারীদিগকে অব্যাহতি দেয়া হতো সেবাদাসী বানিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। আল্লাহ মুসা (আঃ)-এর বদৌলতে এবং তাঁর দোয়ার বরকতে তাদেরকে সে আশাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এই অনুগ্রহের প্রভাব কি এই হওয়া উচিত যে, তোমরা সেই রাব্বুল-আলামীনের সাথে দুনিয়ার নিকৃষ্টতর পাখরকে অশ্লীলার সাব্যস্ত করবে। এয়ে মহা জুলুম। এর থেকে তওবা কর।

এতে وَعَدْنَا শব্দটি وَعَدَ (ওয়াদা) থেকে উদ্ভূত। আর ওয়াদার তাৎপর্য হল এই যে, কাউকে লাভজনক কোন কিছু দেয়ার পূর্বে তা প্রকাশ করে দেয়া যে, তোমার জন্যে অমুক কাজ করব।

এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা মুসা (আঃ)-এর প্রতি স্বীয় কিতাব নাযিল করার ওয়াদা করেছেন এবং সেজন্য শর্ত আরোপ করেছেন যে, মুসা (আঃ) ত্রিশ রাত্রি তুর পর্বতে এ'তেকাফ ও আল্লাহর এবাদত-আরাধনায় অতিবাহিত করবেন। অতঃপর এই ত্রিশ রাত্রির উপর আরও দশ রাত্রি বাড়িয়ে চল্লিশ করে দিয়েছেন।

وَعَدْنَا শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো দু'পক্ষ থেকে প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতি দান করা। এখানেও আল্লাহ জাল্লা-শানুহর পক্ষ থেকে ছিল তওরাত দানের

প্রতিকৃতি; আর মুসা (আঃ)-এর পক্ষ থেকে চল্লিশ রাত এবং এ'তেকাফের প্রতিজ্ঞা। কাজেই وَعَدْتُ نَا বলে وَعَدْتُ বলা হয়েছে।

এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় ও নির্দেশ লক্ষণীয়।

প্রথমতঃ চল্লিশ রাত এ'তেকাফ করানোই যখন আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, তখন প্রথমে ত্রিশ এবং পরে দশ বৃদ্ধি করে চল্লিশ করার তাৎপর্য কি? একত্রেই চল্লিশ রাতের এ'তেকাফের হুকুম দিয়ে দিলে কি ক্ষতি ছিল? আল্লাহর হেকমতের সীমা-পরিসীমা কে জানবে! তবুও আলেম সমাজ এর কিছু কিছু হেকমত বা তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন।

তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে যে, এর একটি তাৎপর্য হল ক্রমধারা সৃষ্টি করা। যাতে কোন কাজ কারো দায়িত্বে অর্পণ করতে হলে, প্রথমেই তার উপর সম্পূর্ণ কাজের চাপ সৃষ্টি করা না হয়; বরং ক্রমান্বয়ে বা ধাপে ধাপে যেন বাড়ানো হয়, যাতে সে সহজে তা পালন করতে পারে। তারপর অতিরিক্ত কাজ অর্পণ করা।

তফসীরে কুরতুবীতে আরও বলা হয়েছে যে, এভাবে শাসক ও দায়িত্বশীল লোকদিগকে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য যে, কাউকে যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন কাজের বা বিষয়ের দায়িত্ব দেয়া হয় আর সে যদি উক্ত সময়ের মধ্যে তা সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাকে আরও সময় দেয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন, মুসা (আঃ)-এর সাথে হয়েছে - ত্রিশ রাত্রে যে অবস্থা লাভ উদ্দেশ্য ছিল তা যখন পূর্ণ হয়নি, তখন অতিরিক্ত দশ রাত্রি বাড়িয়ে দেয়া হয়। কারণ, এই দশ রাত্রি বৃদ্ধির ব্যাপারে তফসীরকারগণ যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা হলো এই যে, ত্রিশ রাত্রির এ'তেকাফের সময় হযরত মুসা (আঃ) নিয়মানুযায়ী ত্রিশটি রোযাও রেখেছেন, কিন্তু মাঝে কোন ইফতার করেন নাই। ত্রিশ রোযা শেষ করার পর ইফতার করে তুর পর্বতের নির্ধারিত স্থানে গিয়ে হাথির হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হলো যে, রোযাদারের মুখ থেকে যে বিশেষ এক রকম গন্ধ পেটের বাষ্পজনিত কারণে সৃষ্টি হয়, তা আল্লাহ তাআলার নিকট অতি পছন্দনীয়, কিন্তু আপনি মেসওয়াক করে সে গন্ধ দূর করে দিয়েছেন! কাজেই আরও দশটি রোযা রাখুন যাতে সে গন্ধ আবার সৃষ্টি হয়।

কোন কোন তফসীর-সংক্রান্ত রেওয়াজেতে উদ্ধৃত আছে যে, ত্রিশ রোযার পর হযরত মুসা (আঃ) মেসওয়াক করে ফেলেছিলেন, যার ফলে রোযাজনিত মুখের গন্ধ চলে গিয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় না যে, রোযাদারের জন্য মেসওয়াক করা অনুত্তম বা নিষিদ্ধ। কারণ, প্রথমতঃ এই রেওয়াজেতের কোন সনদ নেই। দ্বিতীয়তঃ এমনও হতে পারে যে, এ হুকুমটি ব্যক্তিগতভাবে শুধু মুসা (আঃ)-এরই জন্য; সাধারণ নির্দেশ নয়। অথবা মুসা (আঃ)-এর শরীয়তে এ ধরনের হুকুম হয়তো সবারই জন্য ছিল যে, রোযার সময় মেসওয়াক করা যাবে না। কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মদীয়া বা মহানবী (সাঃ)-এর শরীয়তে রোযার অবস্থায় মেসওয়াক করার প্রচলন হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, যা বায়হাকী হযরত আয়েশা (রাঃ) - এর রেওয়াজেতে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযুরে আকরাম (সাঃ) বলেছেন : خَيْرُ خُضَالِ الصَّيَامِ السَّوَالُ অর্থাৎ, রোযাদারের সর্বোত্তম কাজ হল মেসওয়াক করা। এই রেওয়াজেতেটি জামেউস-সগীরে উদ্ধৃত করে, একে 'হাসান' বলা হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : এ রেওয়াজেতের শ্রেণিতে একটা প্রশ্ন হয় যে, হযরত মুসা (আঃ) হযরত শিথিরের সন্ধানে যখন সফর করছিলেন, তখন যে ক্ষেত্রে অর্ধ দিনের ক্ষুধাতোও ঘেঁষেধারণ করতে পারেননি এবং নিজের প্রশমনস্বীকে বলেছেন যে,

إِنِّي لَأَكْفَرُ مِنَ الْفَقْرِ لَأَكْفَرُ مِنَ الْفَقْرِ لَأَكْفَرُ مِنَ الْفَقْرِ

অর্থাৎ,

- আমাদের নাশতা বের কর। কারণ, এ ভ্রমণ আমাদেরকে পরিত্যাগিত সম্প্রদায় করে দিয়েছে, সেক্ষেত্রে তুর পর্বতে ক্রমাগত এমনভাবে প্রশ্ন রাখা করা যাতে রাতের বেলায়ও কোন ইফতার করা যাবে না-বিস্তারিত ব্যাপার নয় কি?

তফসীরে রাসুল-বয়ানে বর্ণিত আছে যে, এই পার্থক্যটা ছিল একতরফ সফরের প্রকৃতির পার্থক্যের দরুন। প্রথমোক্ত সফরের সম্পর্ক ছিল সৃষ্টি সাথে সৃষ্টির। পক্ষান্তরে তুর পর্বতের এই সফর ছিল সৃষ্টি থেকে আলাদা হয়ে মহান পরওয়ারদেগারের অনুযায়। এমন একটি মহৎ ক্রিয়াক্রিয়াতেই তাঁর জৈবিক চাহিদা এমন স্তিমিত হয়ে গেছে যে পানাহারের প্রয়োজনীয়তা এত কমে গেছে যে, ত্রিশ রোযা পর্যন্ত কোন কষ্টই তিনি অনুভব করেন নাই।

এবাদতের বেলায় চান্দ হিসাব ও পার্থিব ব্যাপারে সৌর হিসাবের অবকাশ : আয়াতটিতে আরও একটি বিষয় সাব্যস্ত হয় যে, নবী-রসুলগণের শরীয়তে তারিখের হিসাব ধরা হতো রাত থেকে। কারণ, এ আয়াতেও ত্রিশ দিনের স্থলে ত্রিশ রাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো এই যে, নবী-রসুলগণের শরীয়তে চান্দমাস গ্রহণীয়। আর চান্দমাস শুরু হয় রাত এবং তার প্রতিটি তারিখের গণনা শুরু হয় সূর্যাস্তের পর। সাথে। আসমানী যত গ্রহ রয়েছে সে সবগুলোর হিসাবই এভাবে চান্দমাস থেকে এবং তারিখের গণনা সূর্যাস্ত থেকে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ইবনে-আরাবীর বরাতে কুরতুবী উদ্ধৃত করেছেন যে, حساب الشمس حسب القمر للمناسك - সৌর হিসাব হলো পার্থি লাভের জন্য; আর চান্দ হিসাব হলো এবাদত-উপাসনার জন্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তফসীর অনুসারে এই ত্রিশ রাত্রি ছিল যিলকদ মাসের রাত্রি; আর এরই উপর যিলহজ্জ মাসের দশ রাত বাড়িয়ে দেয়া হয়। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত মুসা (আঃ) তওরাতের উপটোকনটি লাভ করেছিলেন কোরবানীর দিনে। - (কুরতুবী)

আজ্ঞাশুদ্ধিতে ৪০ দিনের বিশেষ তাৎপর্য : এ আয়াতের ইঙ্গিত বুঝা যাচ্ছে যে, আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংশোধনে ৪০ দিনের একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক ৪০ দিন নিঃস্বার্থতার সাথে আল্লাহর এবাদত করবে, আল্লাহ তার জন্য থেকে জ্ঞান ও হেকমতের বর্ণাধারা প্রবাহিত করে দেন। - (রাসুল-বয়ান)

মানুষের প্রতি সকল কাজে ধীর-ধীরতা ও ক্রমান্বয়ের শিক্ষা : এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য একটা বিশেষ সময় নির্ধারিত করে নেয়া এবং তা ধীর-ধীরতার সাথে পর্যায়ক্রমিকভাবে সমাধা করা আল্লাহ তাআলার রীতি। কোন কাজে তাড়াহুড়া করা আল্লাহ পছন্দ নয়।

সর্বপ্রথম স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁর কাজের জন্য অর্থাৎ, বিশৃঙ্খল উপলক্ষে ছয় দিনের সময় নির্ধারণ করে এ নিয়মটিই বাতলে দিয়েছেন। অথচ আল্লাহর পক্ষে আসমান-যমীন তথা সমগ্র বিশৃঙ্খল সৃষ্টির জন্য এক মিনিট সময়েরও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তিনি যখনই কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। কিন্তু সময় নির্ধারণ এ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্টিকে এ হেদায়েত দানই ছিল উদ্দেশ্য। যে তোমরা প্রতিটি কাজ একান্ত বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে ধীর-ধীরভাবে সমাধা করবে। তেমনিভাবে মুসা (আঃ)-কে তওরাত দান করার জন্যে যে সময় নির্ধারণ করা হয় তাতেও সে ইঙ্গিতই রয়েছে।

আর এই হল সে রীতি, যাকে উপেক্ষা করার দরুন ঈসরাঈলদিগকে গোমরাহীর সম্মুখীন হতে হয়। কারণ, হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার সাবেক হুকুম অনুসারে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে দিয়েছিলেন যে, আমি ত্রিশ দিনের জন্য যাচ্ছি। কিন্তু এদিকে যখন দশ দিনের সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়, তখন এরা নিজেদের তাড়াহুড়ার দরুন ক্ষুব্ধ শুরু করে যে, মুসা (আঃ) তো কোথাও হারিয়েই গেছেন। কাজেই আমাদের অপর কোন নেতা নির্ধারণ করে নেয়াই উচিত। তার ফলে তারা হুসাই ‘সামেরী’-এর ফাঁদে আটকে গিয়ে ‘বাহুর’-এর পূজা করতে শুরু করে দেয়। তারা যদি চিন্তা-ভাবনা এবং নিজেদের কাজে ধীর-স্থিরতা ও পরায়মিত্তিকতা অবলম্বন করত, তাহলে এহেন পরিণতি হত না। - (কুরতুবী)

প্রয়োজনবশত : স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ : প্রথমতঃ হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা অনুসারে তুর পর্বতে গিয়ে যখন এতকাফ করার ইচ্ছা করেন, তখন স্বীয় সঙ্গী হযরত হারুন (আঃ) কে কলেন, **اٰخُذْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ** অর্থাৎ, আমার পেছনে বা অবর্তমানে আপনি আমার সম্প্রদায়ে আমার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে দায়িত্ব পালন করুন। এতে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত হন তবে প্রয়োজনবোধে কোথাও যেতে হলে সে কাজের ব্যবস্থাপনার জন্য কোন লোক নিয়োগ করে যাওয়া কর্তব্য।

আরও প্রমাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ যখন কোথাও যাবেন, তখন নিজের কোন লোককে স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যাবেন।

রসুল করীম (সঃ)-এর সাধারণ রীতি এই ছিল যে, কখনও যদি তাঁকে মদীনার বাইরে যেতে হত, তখন তিনি কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে যেতেন। একবার তিনি হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ)-কে খলীফা বা প্রতিনিধি নির্ধারণ করেন এবং একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উস্মে মাকতুম (রাঃ)-কে খলীফা নিযুক্ত করেন। এমনিভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহাবী (রাঃ)-কে মদীনায় খলীফা নিযুক্ত করে তিনি বাইরে যেতেন। - (কুরতুবী)

মুসা (আঃ) হারুন (আঃ)-কে খলীফা নিযুক্ত করার সময় তাঁকে কয়কটি উপদেশ দান করেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, কাজের সুবিধার জন্য প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ বা উপদেশ দিয়ে যেতে হয়। এই হোয়াতে বা নির্দেশাবলীর মধ্যে প্রথম নির্দেশ হল **اٰمُرُكُمْ** এখানে **اٰمُرُكُمْ** এর কোন ‘কম’ উল্লেখ করা হয়নি যে, কার এসলাহ বা সংশোধন করা হবে। এতে বুঝা যায় যে, নিজেরও এসলাহ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় সম্প্রদায়েরও এসলাহ করবেন। অর্থাৎ, তাদের মাঝে দাঙ্গা-হাঙ্গামা জ্বলিত কোন বিষয় আঁচ করতে পারলে তাদেরকে সরল পথে আনয়নের চেষ্টা করবেন। দ্বিতীয় হেদায়েত দেয়া হলো এই যে, **وَلَا تَتَّبِعُوْا سَبِيْلَ الْمُتَكِبِرِيْنَ** অর্থাৎ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবেন না। বলাবাহুল্য, হারুন (আঃ) হলেন আল্লাহ্র নবী, তাঁর নিজের পক্ষে ফাসাদে পতিত হওয়ার কোন আশঙ্কাই ছিল না। কাজেই এই হেদায়েতের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কোন সাহায্য-সহায়তা করবেন না।

সূরার হযরত হারুন (আঃ) যখন দেখলেন, তাঁর সম্প্রদায় ‘সামেরী’ এর অনুগমন করতে শুরু করেছে, এমনকি তার কথা মত ‘বাহুরের’ পূজা করতে শুরু করে দিয়েছে, তখন তাঁর সম্প্রদায়কে এহেন ভণ্ডামী থেকে

বাধা দান করলেন এবং সামেরীকে সে জন্য শাসালেন। অতঃপর ফিরে এসে হযরত মুসা (আঃ) যখন ধারণা করলেন যে, হারুন (আঃ) আমার অবর্তমানে কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছেন, তখন তাঁর প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করলেন।

হযরত মুসা (আঃ)-এর এ ঘটনা থেকে সেসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা অব্যবস্থা এবং নিষ্কিন্তুতাকেই সবচেয়ে বড় বুয়ুগী বলে মনে করে থাকেন।

لَنْ تَرْزُقُوْا (অর্থাৎ, আপনি আমাকে দেখতে পারবেন না।) এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দর্শন যদিও অসম্ভব নয়, কিন্তু যার প্রতি সম্মোহন করা হচ্ছে অর্থাৎ, মুসা (আঃ) বর্তমান অবস্থায় তা সহ্য করতে পারবেন না। পক্ষান্তরে দর্শন যদি আদৌ সম্ভব না হতো, তাহলে **لَنْ تَرْزُقُوْا** না বলে বলা হত, **لَنْ اَرَى** ‘আমার দর্শন হতে পারে না’ - (মাহহারী)

এতে প্রমাণিত হয় যে, যৌক্তিকতার বিচারে পৃথিবীতে আল্লাহ্র দর্শন লাভ যদিও সম্ভব, কিন্তু তবুও এতে তার সর্ব্বোত্তমের অসম্ভবতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আর এটাই হল, অধিকাংশ আহলে সুন্নাহ্র মত যে, এ পৃথিবীতে আল্লাহ্র দীদার বা দর্শন লাভ যুক্তিগতভাবে সম্ভব হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্ভব নয়। যেমন, সহী মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে— **لَنْ يَّرَىٰ اَحَدٌ مِنْكُمْ رَّبَّهُ حَتّٰى يَمُوتَ** অর্থাৎ, “তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুর পূর্বে তার পরওয়ারদেগারকে দেখতে পারবে না।”

وَلٰكِنْ اَنْظُرُوْا اِلَیَّ এতে প্রমাণ করা হচ্ছে যে, বর্তমান অবস্থায় শ্রোতা আল্লাহ্র দর্শন সহ্য করতে পারবে না বলেই পাহাড়ের উপর যৎসামান্য ছটা বিকিরণ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাও তোমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভবপর নয়; মানুষ তো একান্ত দুর্বলচিত্ত সৃষ্টি, সে তা কেমন করে সহ্য করবে?

فَلَمَّا تَخَلَّىٰ رَبُّهُ لَلْبَيْكِلِ আরবী অভিধানে **تَخَلَّىٰ** অর্থ, প্রকাশিত ও বিকশিত হওয়া। সূফী সম্প্রদায়ের পরিভাষায় ‘তাজাল্লী’ অর্থ হলো কোন বিষয়কে কোন কিছু মাধ্যমে দেখা। যেমন, কোন বস্তুকে আয়নার মাধ্যমে দেখা হয়। সেজন্যই তাজাল্লীকে দর্শন বলা যায় না। স্বয়ং এ আয়াতেই তার সাক্ষ্য বর্তমান যে, আল্লাহ্ তাআলা দর্শনকে বলেছেন অসম্ভব আর তাজাল্লী বা বিকশিত হওয়াকে তা বলেননি।

ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও হাকেম হযরত আনাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, নবী করীম (সঃ) এ আয়াতটি তেলাওয়াত করে হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলির মাধ্যমে বৃদ্ধাঙ্গুলি রেখে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ্ জাল্লা-শানুহু এতটুকু অংশই শুধু প্রকাশ করা হয়েছিল, যাতে পাহাড় পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। অবশ্য এতে গোটা পাহাড়ই যে ঋণ্ডবিধু হয়ে যেতে হবে তা অপরিস্রব নয়, বরং পাহাড়ের যে অংশে আল্লাহ্র তাজাল্লী বিকিরিত হয়েছিল সে অংশটিই হয়তো প্রভাবিত হয়ে থাকবে।

হযরত মুসা (আঃ)-এর সাথে আল্লাহ্র কালাম বা বাক্যবিনিময় : এ বিষয়টি তো কোরআনের প্রক্ট শব্দের দ্বারাই প্রমাণিত যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুসা (আঃ) -এর সাথে সরাসরিই বাক্য বিনিময় করেছেন। এ কালামের মধ্যে রয়েছে প্রথমতঃ সেসব কালাম যা নবুওয়ত দানকালে হয়েছিল। আর দ্বিতীয়তঃ সেসব কালাম, যা তওরাত দানকালে হয়েছে এবং যার আলোচনা এ আয়াতে করা হয়েছে। আয়াতের শব্দের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের কালাম বা বাক্যবিনিময়

الاحزاب

১৭৭

قَالَ الْمَلَأُ

قَالَ يُبَسِّئُ رَأْسِي أَصْطَفَيْتَكَ عَلَى النَّاسِ يَرْسُلُونِي وَ
 يَكَلِّمُونِي مَخَذًا مَا آتَيْتَكَ وَكَانَ مِنَ الشُّكْرَيْنِ ۝ وَكَتَبْنَا
 لَهُ فِي الْكِتَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُوعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ
 شَيْءٍ ۝ فَخَذَهَا يَهُودُوعَ وَأَمْرُ قَوْمِكَ بِأَخْذِهَا بِأَحْسَنِهَا
 سَأَوْرَكُمْ دَارَ الْفَقِيرِينَ ۝ سَأَوْرُكَ عَنْ النَّبِيِّ الَّذِينَ
 يَتَذَكَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا
 لَا تُؤْمِنُ بِهَا ۝ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذْهُ سَبِيلًا
 وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذْهُ سَبِيلًا ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا
 بِآيَاتِنَا وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ عَنْهُمْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ
 إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ
 حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ أَلْمَرُّ وَرَوَّالَةٌ لَا يَمْلِكُهُمْ
 وَلَا يَرْبُدُ بِهِمْ سَبِيلًا ۝ وَاتَّخَذُوا ظِلْمِينَ ۝ وَلَكِنَّا
 سَقَطْنَا فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوُا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ۝ قَالَ الْوَالِدِينَ
 لِمَ يَصْنَعُونَ بَنِينَ أَوِغْوُوكُنَّا لِلْغَوِيِّينَ ۝

(১৪৪) (পরওয়ারদেগার) বললেন, হে মুসা, আমি তোমাকে আমার বার্তা পানোদের এবং কথা বলার মাধ্যমে লোকদের উপর বিশিষ্টতা দান করেছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম, গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক। (১৪৫) আর আমি তোমাকে পটে লিখে দিয়েছি সর্বকার উপদেশ ও বিস্তারিত সব বিষয়। অতএব, এগুলোকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও। শত্রুই আমি তোমাদেরকে দেখাব কাফেরদের বাসস্থান। (১৪৬) আমি আমার নিদর্শনসমূহ হতে তাদেরকে ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে পর্ব করে। যদি তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ফেলে, তবুও তা বিশ্বাস করবে না। আর যদি হেদায়েতের পথ দেখে, তবে সে পথ গ্রহণ করে না। অথচ গোমরাহীর পথ দেখলে তাই গ্রহণ করে নেয়। এর কারণ, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে মনে করেছে এবং তা থেকে বে-শ্বর হয়ে গেছে। (১৪৭) বস্তস্ত যারা মিথ্যা জেনেছে আমার আয়াতসমূহকে এবং আশেবারাতের সাক্ষাতকে, তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমন বন্দাই সে পাবে যেমন আমল করত। (১৪৮) আর বানিয়ে নিল মুসার সন্তাদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকারীদের দ্বারা একটি বাছুর তা থেকে বেরুজিল ‘হাস্বা হাস্বা’ শব্দ। তারা কি একথাও লক্ষ্য করল না যে, সেটি তাদের সাথে কথাও বলছে না এবং তাদেরকে কোন পক্ষও বাতলে দিচ্ছে না। তারা সেটিকে উপাস্য বানিয়ে নিল। বস্তস্ত তারা ছিল জালেম। (১৪৯) অতঃপর যখন তারা অনুভূত হল এবং বুঝতে পারল যে, আমরা নিশ্চিতই গোমরাহ হয়ে পড়েছি, তখন বলতে লাগল, আমাদের প্রতি যদি আমাদের পরওয়ারদেগার করুণা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।

প্রথম পর্যায়ের কালামের তুলনায় ছিল কিছুটা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ কালামের তাৎপর্য এবং তা কেমন করে সংঘটিত হয়েছিল, তা একজন আল্লাহ ছাড়া কেউ জানতে পারে না। তবে এতে শরীয়তের পরিপন্থী কিছু এমন যত রকম যৌক্তিক সম্ভাব্যতা থাকতে পারে, সেগুলোর বেশী একটিকে বিনা প্রমাণে নির্দিষ্ট করা জায়েয হবে না। তাছাড়া এ কালাম পূর্ববর্তী সাহাবী-তাবেঈগণের মতামতই সব চাইতে উত্তম যে, এ বিকল্প আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়া এবং নানা ধরনের সম্ভাব্যতা বুঝে কেবলমাত্র পোহেন না পড়াই বাঞ্ছনীয়।—(বয়ানুল-কোরআন)

دَارَ الْفَقِيرِينَ এ সَأَوْرَكُمْ দার-ফকিরীন কবের অর্থ কি? এ দু’টি মত রয়েছে। একটি মিসর, অপরটি শাম বা সিরিয়া। কারণ, হযরত মুসা (আঃ)-এর বিজয়ের পূর্বে মিসরে ফেরাউন এবং তার সন্তাদায় ছিল শাসক ও প্রবল। এ হিসাবে মিসরকে ‘দারুল ফাসেকীন’ বা পাপচারিত্রের আবাসস্থল বলা যায়। আর সিরিয়ায় যেহেতু তখন আমালেকা সন্তাদায় অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যেহেতু ওয়াও ছিল ফাসেক বা পাপচারী সেহেতু তখন সিরিয়াও ছিল ফাসেকদেরই আবাসভূমি। এতদুত্তর অর্থে কোনটি যে এখানে উদ্দেশ্য’ সে ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর জাতিভিত্তি হল এই যে, ফেরাউনের সন্তাদায়ের জুবে মরার পুত্র বনী-ইসরাঈলরা মিসরে ফিরে গিয়েছিল কি না? যদি মিসরে ফিরে গিয়ে থাকে এবং মিসর সাম্রাজ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে থাকে; যেমন আল্লাহ ওয়াওরুতাল-ক্বোর’আন এর দ্বারা সমর্থন পাওয়া যায়, তবে মিসরে জন্ম আধিপত্য আলোচ্য তুর পর্বতে তাজদারী বা জ্যোতি বিকিরণের ক্ষমতা আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে এ আয়াতে دَارَ الْفَقِيرِينَ অর্থ শাম দেশ বা সিরিয়াই নির্ধারিত হয়ে যায়। কিন্তু যদি তখন তারা মিসরে ফিরে না গিয়ে থাকে, তাহলে তাতে উভয় দেশই উদ্দেশ্য হতে পারে।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

وَكُنَّا لَهُ فِي الْكِتَابِ এতে প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব থেকে লেখা তওরাতের পাতা বা তখতী হযরত মুসা (আঃ)-কে অর্পণ করা হয়েছিল। আর সে তখতীগুলোর নামই হলো ‘তওরাত’।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, “আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে সেরসব লোককে বিমুখ বা বঞ্চিত করব, যারা পৃথিবীতে অধিকার না থাকা সত্ত্বেও গর্বিত, অহংকারী হয়।”

এখানে “অধিকার না থাকা” শব্দটি প্রয়োগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গর্বিত অহংকারীদের মোকাবিলায় প্রতি-অহংকার করা অন্যায়। গোনাহ নয়। কারণ, এক্ষেত্রে তা শুধু বাহ্যিক রূপের দিক দিয়ে অহংকার, প্রকৃত প্রভাবে তা নয়। যেমন, প্রবাদ আছে অর্থাৎ, অহংকারীদের সাং প্রতি-অহংকারই হলো নম্রতা।—(মাসায়েল-সুলুক)

অহংকার মানুষকে সূর্যু জ্ঞান ও ঐশী এলম থেকে বঞ্চিত করে দেয় : গর্বিত-অহংকারীদেরকে স্বীয় নিদর্শনসমূহ থেকে বঞ্চিত করে দেয়ার প্রকৃত মর্ম হচ্ছে এই যে, তাদের থেকে আল্লাহর নিদর্শন বা আয়াতসমূহ বোঝা বা উপলব্ধি করার এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সামর্থ্য ও তওফীক তুলে নেয়া হয়। আর এখানে ‘আল্লাহর নিদর্শন

কথাটিও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যাতে তওরাত, যবুর ও কোরআনে বর্ণিত আয়াত বা নিদর্শনসমূহ যেমন অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহ যা আসমান, যমীন ও তাতে অবস্থিত সৃষ্টির মাঝে বিস্তৃত। কাজেই আলাচ্য আয়াতের মূল বক্তব্য দাঁড়ায় এই যে, 'তাকাবুর, অর্থাৎ, নিজেকে নিজে অন্যান্যদের চাইতে বড় ও উত্তম মনে করা এমনই দুষণীয় ও জঘন্য অভ্যাস যে, এতে যে পতিত হয়, তার মূল বুদ্ধি-জ্ঞান থাকে না। সেজন্যই সে আল্লাহ তাআলার আয়াতের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। না থাকে কোরআনের আয়াত বুঝবার ক্ষমতা ও তরফীক, না আল্লাহর সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে যথার্থ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহর মা' রেফাত বা পরিচয় লাভে মন চলে।

তরফীকে রূহুল-বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অহংকার ও গর্ব এমন এক মন্দ অভ্যাস, যা ঐশী জ্ঞান লাভের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, আল্লাহর জ্ঞান লাভ হতে পারে একমাত্র আল্লাহরই রহমতে। আর আল্লাহর রহমত হয় একমাত্র বিনম্রতার মাধ্যমে।

হযরত মুসা (আঃ) যখন তওরাত গ্রহণ করার জন্য তুর পাহাড়ে গিয়ে যান বসলেন এবং ইতিপূর্বে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত ধ্যানের যে নির্দেশ হয়েছিল; সে মতে স্বীয় সম্প্রদায়কে বলে গিয়েছিলেন যে, ত্রিশ দিন পরে আমি ফিরে আসব, সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা যখন আরও দশ দিন ধ্যানের মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন, তখন ইসরাঈলী সম্প্রদায় তাদের রীচরিত তড়াহুড়া ও ভট্টতার দরুন নানা রকম মস্তব্য করতে আরম্ভ করল। তাঁর সম্প্রদায়ে 'সামেরী' নামে একটি লোক ছিল। তাকে সম্প্রদায়ের লোকেরা 'বড় মোড়ল' বলে মানত। কিন্তু সে ছিল একান্তই দুর্বল বিশ্বাসের লোক। কাজেই সে সুযোগ বুঝে বনী-ইসরাঈলের

লোকদের বলল, তোমাদের কাছে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের যেসব অলংকারপত্র রয়েছে, সেগুলো তো তোমরা কিবতীদের কাছ থেকে ধার করে এনেছিলে, এখন তারা সবাই ডুবে মরেছে, আর অলংকারগুলো তোমাদের কাছেই রয়ে গেছে, কাজেই এগুলো তোমাদের জন্যে হালাল নয়। কারণ, তখন কাকফেরদের সাথে যুদ্ধে বিজিত সম্পদও হালাল ছিল না। বনী-ইসরাঈলরা তার কথামত সমস্ত অলংকারাদি তার কাছে (সামেরীর কাছে) এনে জমা দিল। সে এই সোনা-রূপা দিয়ে একটি বাছুরের প্রতিমূর্তি তৈরী করল এবং হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর ঘোড়ার খুরের তলার মাটি যা পূর্ব থেকেই তার কাছে রাখা ছিল এবং যাকে আল্লাহ তা'আলা জীবন ও জীবনী শক্তিতে সমৃদ্ধ করে দিয়েছিলেন, সোনা-রূপাগুলো আগুনে গলাবার সময় সে তাতে মাটি মিশিয়ে দিল। ফলে বাছুরের প্রতিমূর্তিটিতে জীবনী শক্তির নিদর্শন সৃষ্টি হলো এবং তার ভেতর থেকে গাভীর মত হাস্যা রব বেরোতে লাগল। এ ক্ষেত্রে جَسَدًا الْخَوَّارِ শব্দের ব্যাখ্যায় جَسَدًا الْخَوَّارِ বলে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সামেরীর এ বিস্ময়কর পৈশাটিক আবিষ্কার যখন সামনে উপস্থিত হলো, তখন সে বনী-ইসরাঈলদিগকে কুফরীর প্রতি আমন্ত্রণ জানাল যে, "এটাই হলো খোদা। মুসা (আঃ) তো আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্যে গেছেন তুর পাহাড়ে, আর এদিকে আল্লাহ (নাউযুবিলাহ) সশরীরে এখানে এসে হাজির হয়ে গেছেন। মুসা (আঃ)-এর সত্যি ভুলই হয়ে গেল।" বনী-ইসরাঈলদের সবাই পূর্ব থেকেই সামেরীর কথা শুনত। আর এখন তার এই আদ্ভুত ম্যাজিক দেখার পর তো আর কথাই নেই; সবাই একেবারে ভক্তে পরিণত হয়ে গেল এবং সে বাছুরকে খোদা মনে করে তারই উপাসনা-এবাদতে প্রবৃত্ত হল।

الاعراف

১৬০

قال الملاء

আনুযয়িক জাতব্য বিষয়

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعِمَّتُمْ مِزْرَةً وَأَلْقَى الْأَوْءَاءَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْحَدُ بِهِ قَالَ ابْنَ أَمْرِ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِسْحَاقَ وَأَوْفِنِي بِوَعْدِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ أَخَذُوا الْوَيْلَ سَيْنًا لَهُمْ غُصْبًا مِنَ تَبْوِهِمْ وَذُلٌّ فِيهِ الْيَسِيرُ وَالضَّرَّاءُ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْسِدِينَ ۝ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَأَمْسَأُوا أَن رَّبِّكَ مِن بَعْدِهَا فَاعْتَوَرْتَحِيمَ ۝ وَلَمَّا سَأَلْنَا عَنْ مُوسَىٰ الْغُصْبِ أَخَذَ الْأَوَّلُونَ نَسْتَحْيَا هَٰذَا وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ هُمْزُونَ ۝ وَخَذْنَا مَوْسَىٰ قَوْمَهُ سَبِحِينَ رَّبًّا لَّيْسَ بِأَنْتَ أَكْبَرُ أَغْنَيْنَاكَ اللَّهُمَّ الْغُصْبَ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَهْلِكُكَ إِنَّمَا تَعْلَمُ الْغُصْبَ وَمِنَّا إِنْ أَرَادْنَا بِكَ تَصْلٌ بِهَا مَن نَّشَاءُ وَنَهْدِي مَن نَّشَاءُ إِنَّا فَاعِلُونَ ۝ وَلَيْسَ أَفْعُولُ وَأَحْصَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝

(১৫০) তারপর যখন মুসা নিজ সম্প্রদায়ে ফিরে এলেন রাগান্বিত ও অনুতপ্ত অবস্থায়, তখন বললেন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কি নিকট প্রতিনিধিষ্ঠাটাই না করেছ! তোমরা নিজ পরওয়ারদেগারের হুকুম থেকে কি তাড়াহুড়া করে ফেললে এবং সে তখতীগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং নিজের ভাইয়ের মাথার চুল চপে ধরে নিজের দিকে টানতে লাগলেন। ভাই বললেন, হে আমার মায়ের পুত্র, লোকগুলো যে আমাকে দুর্বল মনে করল এবং আমাকে যে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য করেছিল। সুতরাং আমার উপর আর শত্রুদের হাসিও না। আর আমাকে জালিমদের সারিতে গণ্য করো না। (১৫১) মুসা বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, ক্ষমা কর আমাকে আর আমার ভাইকে এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যে সর্বাধিক করুণাময়। (১৫২) অবশ্য যারা গোবৎসকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, তাদের উপর তাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে পার্থিব এ জীবনেই গণ্য ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে। এমনি আমি অপবাদ আরোপকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (১৫৩) আর যারা মন্দ কাজ করে, তারপরে তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তবে নিশ্চয়ই তোমার পরওয়ারদেগার তওবার পর অবশ্য ক্ষমাকারী, করুণাময়। (১৫৪) তারপর যখন মুসার রাগ পড়ে গেল, তখন তিনি তখতীগুলো তুলে নিলেন। আর যা কিছু তাতে লেখা ছিল, তা ছিল সে সমস্ত লোকের জন্য হেদায়েত ও রহমত যারা নিজদের পরওয়ারদেগারকে ভয় করে। (১৫৫) আর মুসা বেছে নিলেন নিজের সম্প্রদায় থেকে সত্তর জন লোক আমার প্রতিশ্রুতি সময়ের জন্য। তারপর যখন তাদেরকে ভূমিরূপ পাকড়াও করল, তখন বললেন, হে আমার পরওয়ারদেগার, তুমি যদি ইচ্ছা করতে, তবে তাদেরকে আগেই ধ্বংস করে দিতে এবং আমাকেও। আমাদেরকে কি সে কর্মের কারণে ধ্বংস করছ, যা আমার সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা করেছে? এসবই তোমার পরীক্ষা; তুমি যাকে ইচ্ছা এতে পথভ্রষ্ট করবে এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথে রাখবে। তুমি যে আমাদের রক্ষক-সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের উপর করুণা কর। তাছাড়া তুমিই তো সর্বাধিক ক্ষমাকারী।

কোন কোন পাশের শাস্তি পার্থিব জীবনেই পাওয়া যায় : সত্যি ও তার সঙ্গীদের যেমন হয়েছিল যে, গোবৎস উপাসনা থেকে যখন তারা যথার্থভাবে তওবা করল না, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে এ পৃথিবীতে অপদস্থ-অপমানিত করে ছেড়েছেন। তাকে মুসা (আঃ) নির্দেশ দিয়ে দিলেন, সে যেন সকলের কাছ থেকে পৃথক থাকে; সেও যাতে কাউকে না ছোঁয়, তাকেও যেন কেউ না ছোঁয়। সুতরাং সারা জীবন এমনিকার জীব-জন্তুর সাথে বসবাস করতে থাকে; কোন মানুষ তার সঙ্গ আসতো না।

তফসীরে-কুরতুবীতে হয়রত কাতাদাহ (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তার উপর এমন আঘাত চাপিয়ে দিয়েছিলেন যে, যখনই সে কাউকে স্পর্শ করত কিংবা তাকে কেউ স্পর্শ করত, তখন সঙ্গে সঙ্গে উভয়েরই গায়ে জ্বর এসে যেত।—(কুরতুবী)

তফসীরে রুহুল-বয়ানে বলা হয়েছে যে, আজও তার বংশধররা মাঝে এমনি অবস্থা বিদ্যমান। আয়াতের শেষদিকে বলা হয়েছে, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْسِدِينَ অর্থাৎ, যারা আল্লাহর প্রতি অপবাদ আয়ো করে, তাদেরকে এমনি শাস্তি দিয়ে থাকি। হয়রত সুফিয়ান ইবন উইয়াইনাহ (রহঃ) বলেন, যারা ধর্মীয় ব্যাপারে বেদআত অবলম্বন করে (অর্থাৎ, ধর্মে কোন রকম কুসংস্কার সৃষ্টি অথবা গ্রহণ করে), তারা আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপের অপরাধে অপরাধী হয়ে সে শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়ে।—(মায়হারী)

ইমাম মালেক (রহঃ) এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, ধর্ম ব্যাপারে যারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোন বেদআত বা কুসংস্কার আবিষ্কার করে তাদের শাস্তি এই যে, তারা আখেরাতে আল্লাহর রোযনার পতিত হবে এবং পার্থিবজীবনে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে।—(কুরতুবী)

দ্বিতীয় আয়াতে সেসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, যার হয়রত মুসা (আঃ)-এর সত্যকিরণের পর নিজেদের এই অপরাধের দ্বা তওবা করে নিয়েছে এবং তওবার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছিল যে, তাদেরই একজন অপরাধজনক হজা করতে থাকলেই তওবা কবুল হবে—তারা সে শর্তও পালন করল, তখন হয়রত মুসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার নির্দেশক্রমে তাদেরকে জেরে বললেন, তোমাদের সবার তওবাই কবুল হয়েছে। এই ইত্যাম্যে যার মৃত্যুবরণ করেছে, তারা শহীদ হয়েছে, আর যারা বেঁচে রয়েছে তারা এক ক্ষমাপ্রাপ্ত। এ আয়াতে বলা হয়েছে, যেসব লোক মন্দ কাজে লিপ্ত হই পড়ে তা সে কাজ যত বড় পাপই হোক, কুফরীও যদি হয়, তখন পরবর্তীতে তওবা করে নিলে এবং ঈমান ঠিক করে ঈমানের দাবী অনুপ্রাণিত নিজের আমল বা কর্ম সংশোধন করে নিলে, আল্লাহ তাকে নিজ রহমত ক্ষমা করে দেবেন। কাজেই কারো দ্বারা কোন পাপ হয়ে গেলে, সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে তওবা করে নেয়া একান্ত কর্তব্য।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, হয়রত মুসা (আঃ)-এর রাগ ধর্ম প্রশমিত হয়, তখন তাড়াতাড়িতে ফেলে রাখা তওবাতের তখতীগুলো আবার তুলে নিলেন। আল্লাহ তাআলাকে যারা ভয় করে তাদের জন্য 'সংকলন' হেদায়েত ও রহমত ছিল।

‘সংকলন’ বলা হয় সে লেখাকে যা কোন গ্রন্থরাজি থেকে উদ্ধৃত করা হয়। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত মুসা (আঃ) রাগের মধ্যে যখন তওরাতের তথ্যগুণো তাদ্ভাতাভিতে নামিয়ে রাখেন, তখন সেগুলো ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফলে পরে আল্লাহ তাআলা অন্য কোন কিছুতে লেখা তওরাত দান করেছিলেন। তাকেই ‘নোসখা’ বা সংকলন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সন্তর জন বনী-ইসরাঈলের নির্বাচন এবং তাদের ধ্বংসের ঘটনা চতুর্থ আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, হযরত মুসা (আঃ) যখন আল্লাহর কিতাব তওরাত নিয়ে এসে বনী-ইসরাঈলদিগকে দিলেন, তখন নিজেদের বক্রতা ও ছলছুরার দরুন ক্ষোভে লাগল যে, আমরা একথা কেমন করে বিশ্বাস করব যে, এটা আল্লাহরই কলাম? এমনও তো হতে পারে যে, আপনি নিজেই এগুলো নিয়ে এসে থাকবেন। মুসা (আঃ) তখন এ বিষয়ে তাদের নিশ্চয়তা দিবার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করলেন। তারই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বলা হলো যে, আপনি এ সম্প্রদায়ের নির্বাচিত ব্যক্তিদিগকে তুরে নিয়ে আসুন। আমি তাদেরকেও নিজের কলাম শুনিতে দেব। তাহলেই বিষয়টি তাদের বিশ্বাস হয়ে যাবে। মুসা (আঃ) তাদের মধ্য থেকে সন্তর জনকে নির্বাচিত করে তুরে নিয়ে গেলেন। ওয়ালা অনুযায়ী তারা নিজ কানে আল্লাহর কলামও শুনল। এ প্রমাণও স্বার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তারা পুনরায় বলতে লাগল, কে জানে, এ শব্দ আল্লাহরই, না অন্য কারও। আমরা তো তখনই বিশ্বাস করব, আল্লাহকে যখন প্রকাশ্য আমাদের সামনে সরাসরি দেখতে পাব। তাদের এ দাবী যেহেতু একান্তই ইহঁকারিতা ও মূর্থতার ভিত্তিতে ছিল, তাই তাদের উপর ঐশী রোষানল বর্ষিত হল। ফলে তাদের নীচের দিক থেকে এল ভূকম্পন, আর উপর দিক থেকে শুরু হল বজ্র গর্জন। যার দরুন তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল এবং দৃশ্যতঃ মৃত্যে পরিণত হল। এ ঘটনার বর্ণনা ধ্রুসক সূরা বাক্বারায় এ ক্ষেত্রে صَاعِقَةٍ (সোয়ে’কাহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর এখানে বলা হয়েছে رَجْفَةٍ (রাজফাহ)। ‘সোয়েকা’ অর্থ বজ্র গর্জন। আর ‘রাজফাহ’ অর্থ ভূকম্পন। কাজেই ভূকম্পন ও বজ্র গর্জন একই সাথে আরম্ভ হয়ে যাওয়াও কিছুই অসম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু হোক আর নাই হোক, তারা মৃতের মত হয়ে মাটিতে

লুটিয়ে পড়ল, যাতে বাহ্যতঃ মৃত বলেই মনে হতে পারে। এ ঘটনায় হযরত মুসা (আঃ) অত্যন্ত বিচলিত হলেন। কারণ, একে তো এরা ছিল সম্প্রদায়ের বাছা বাছা (বুদ্ধিজীবী) লোক, দ্বিতীয়তঃ জাতির কাছে গিয়ে তিনি কি জবাব দেবেন। তারা অপবাদ আরোপ করবে যে, মুসা (আঃ) তাদেরকে কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করে ফেলেছে। তদুপরি এ অপবাদ আরোপের পর এরা আমাকেও রেহাই দেবে না; নির্ধাত হত্যা করবে। সেজন্যেই তিনি আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন; ইয়া পরওয়ারদেগার, আমি জানি, এ ঘটনায় তাদেরকে হত্যা করা আপনার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তাই যদি হতো, তবে ইতিপূর্বে বহু ঘটনা ঘটেছে যাতে এরা নিহত হয়ে যেতে পারত; ফেরাউনের সাথে তাদেরও সলিল সমাধি হতে পারত; কিংবা গোবৎস পূজার সময়ও সবার সামনে হত্যা করে দেয়া যেতে পারত। তাছাড়া আপনি ইচ্ছা করলে আমাকেও তাদের সাথেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু আপনি তা চাননি। তাতে বোধা যাচ্ছে, এক্ষেত্রেও তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো শাস্তি দেয়া এবং সতর্ক করা। তাছাড়া এটা হয়ইবা কেমন করে যে, আপনি আমাদের কয়েকজন নিরেট মূর্খের কার্যকলাপের দরুন আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন! এক্ষেত্রে ‘নিজকে নিজে ধ্বংস করা’ এজন্য বলা হয়েছে যে, এই সন্তর জনের এভাবে অদৃশ্য মৃত্যুর পরিণতি সম্প্রদায়ের হাতে মুসা (আঃ)-এর ধ্বংসেরই নামান্তর ছিল।

অতঃপর নিবেদন করলেন যে, আমি জানি, এটা একান্তই পরীক্ষা, যাতে আপনি কোন কোন লোককে পথভ্রষ্ট-গোমরাহ করে দেন, যার ফলে তারা আল্লাহ তা’আলার না-শোকর বা কৃতঘ্ন হয়ে উঠে। আবার অনেককে এর দ্বারা সুপথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। ফলে তারা আল্লাহ তা’আলার তত্ত্ব ও কল্যাণসমূহ উপলব্ধি করে প্রশান্তি অনুভব করতে থাকে। আমিও আপনার বিজ্ঞতা ও জ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত রয়েছি। সুতরাং আপনার এ পরীক্ষায় আমি সন্তুষ্ট। তাছাড়া আপনিই তো আমাদের প্রকৃত অভিভাবক—আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি করুণা ও রহমত দান করুন। আপনিই সমস্ত ক্ষমাকারীদের মধ্যে মহান ক্ষমাকারী। কাজেই তাদের ধৃষ্টতাকেও ক্ষমা করুন। বস্তুতঃ (এ প্রার্থনার পর) তারা যথাপূর্ব জীবিত হয়ে উঠে।

الاعراف

১৫১

قَالَ الْمَلَأَ

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَكْتُبُ لَكَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هَذَا نَكَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَلْتَهُمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ يَكْفُمُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَحْدِثُ لَهُ كُتُوبًا عِنْدَ هُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۖ وَالَّذِينَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ قَامُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْتِي بِلِلَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ۖ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَمَنْ قَوْمُ مُوسَىٰ إِذْ يَهْدُونَهُ بِأَلْحَقٍ بِهِ يَعْلَمُونَ ۝

(১৫৬) আর পৃথিবীতে এবং আখেরাতে আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দাও। আমরা তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমার আযায তারই উপর পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব যারা ভয় রাখে, যাকাত দান করে এবং যারা আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। (১৫৭) সেসমস্ত লোক, যারা আনুগত্য অবলম্বন করে এর সুলের, যিনি নিরক্ষর নবী, যার সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পায়, তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সংকর্ষের, বারণ করেন অসংকর্ষ থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দীত্ব অপসারণ করেন যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল। সুতরাং যেসব লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছে, তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং সে নুরের অনুসরণ করেছে যা তাঁর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধুমাত্র তারাই নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। (১৫৮) বলে দাও, হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ্ প্রেরিত রসুল, সমগ্র আসমান ও যমীনে তার রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা নয়। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর উপর, তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কলামের উপর। তাঁর অনুসরণ কর যাতে সরল পথপ্রাপ্ত হতে পার। (১৫৯) বস্ত্তত মুসার সপ্তদায়ে একটি দল রয়েছে যারা সত্যপথ নির্দেশ করে এবং সে যত্নে বিচার করে থাকে।

ধাতোমুদ্রাবিহীন মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ও তাঁর উম্মী গুণ-বৈশিষ্ট্য : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মুসা (আঃ)-এর পোষাক প্রতিউত্তরে বলা হয়েছিল যে, সাধারণতঃ আল্লাহর রহমত তো সমস্ত মানুষ ও বিষয়-সামগ্রীতে ব্যাপক; আপনার বর্তমান উম্মতও তা থেকে বঞ্চিত নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ নেয়ামত ও রহমতের অধিকারী হলো তারাই যারা ঈমান, তাকওয়া-পরহেযগারী ও যাকাত দান প্রভৃতি বিশেষ শর্তসমূহ পূরণ করেন।

এ আয়াতে তাদেরই সন্ধান দেয়া হয়েছে যে, উল্লেখিত শর্তসমূহ যথার্থ পূরণকারী কারা হতে পারে। বলা হয়েছে, এরা হচ্ছে সেসব লোক, যারা উম্মী-নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর যথার্থ অনুসরণ করবে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সাঃ)-এর কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রতি শুধু ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপন নয়; বরং সেই সাথে তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্যেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পরকালীন কল্যাণ লাভের জন্য ঈমানের সম সঙ্গে শরীয়ত ও সুন্নাহর আনুগত্য - অনুসরণও একান্ত আবশ্যিক।

الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ এখানে মহানবী (সাঃ)-এর দু'টি পদবী 'রসুল' ও 'নবী' - এর সাথে সাথে তৃতীয় একটি বৈশিষ্ট্য 'উম্মী' -এরও উল্লেখ করা হয়েছে। 'উম্মী' শব্দের অর্থ হল নিরক্ষর। যে লেখা-পড়া কোনটাই জানে না। সাধারণ আরবদিককে সে কারণেই কোরআন اميين (উম্মীয়ান) বা নিরক্ষর জাতি বলে অভিহিত করেছে যে, তাদের মনে লেখা-পড়ার প্রচলন খুবই কম ছিল। তবে উম্মী বা নিরক্ষর হওয়াটা কেবল মানুষের জন্য প্রসংশনীয় গুণ নয়, বরং ত্রুটি হিসেবেই গণ্য। কিন্তু রসুল করীম (সাঃ)-এর জ্ঞান-গরিমা, তত্ত্বও, তথ্য অবগতি এবং অন্য গুণবৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও উম্মী হওয়া তাঁর পক্ষে বিরাত গুণ ও পরিপূর্ণতায় পরিণত হয়েছে। কারণ, শিক্ষাগত, কার্যগত ও নৈতিক পরাকাষ্ঠা যদি কোন লেখাপড়া জানা মানুষের দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহলে তা হয়ে থাকে তার সে লেখাপড়ারই ফলশ্রুতি, কিন্তু কোন একান্ত নিরক্ষর ব্যক্তির দ্বারা এমন অসাধারণ, অভূতপূর্ব ও অনন্য তত্ত্ব-তথ্য ও সূত্র বিষয় প্রকাশ পেলে, তা তাঁর প্রকৃষ্ট মু'জ্জেযা ছাড়া আর কি হতে পারে—যা কোন প্রথম শ্রেণীর বিদ্যুৎ ও অস্বীকার করতে পারে না। বিপণ করে মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের প্রথম চল্লিশটি বছর মক্কা নগরীতে সার সামনে এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে, যাতে তিনি কারও কাছে এক অক্ষর পড়েনওনি লেখেনওনি। ঠিক চল্লিশ বছর বয়সকালে সহস্রাধি পবিত্র মুখ থেকে এমন বাণীর ঋণাধারা প্রবাহিত হলো, যার একটি ছুঁ থেকে ক্ষুদ্রতর অংশের মত একটি সূরা রচনায় সমগ্র বিশ্ব অপারক হতে পড়ল। কাজেই এমতাবস্থায় তাঁর উম্মী বা নিরক্ষর হওয়া, আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত রসুল হওয়ার এবং কোরআন মজীদ আল্লাহর কলাম হওয়ার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অতএব, উম্মী হওয়া যদিও অন্যদের জন্য কেবল প্রশংসনীয় গুণ নয়, কিন্তু মহানবী হওয়ার আকরাম (সাঃ)-এর জন্য একটি প্রশংসনীয় ও মহান গুণ ও পরাকাষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন মানুষের জন্য যেমন 'অহংকারী' শব্দটি কোন প্রশংসোবাচক গুণ নয়; বরং তাঁ বলে গণ্য হয়, কিন্তু মহান আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের জন্য এ বিশেষভাবেই প্রশংসোবাচক সিন্ধত।

আলোচ্য আয়াতে মহানবী (সাঃ)-এর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা (অর্থাৎ, ইহুদী-নাসারারা) আপনার সম্পর্কে তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখবে। এখানে লক্ষণীয় যে, কোরআন মজীদ একথা বর্ণনা

যে, আপনার গুণ-বৈশিষ্ট্য ও অবস্থাসমূহ তাতে লেখা পাবে।' এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তওরাত ও ইঞ্জীলে মহানবী (সাঃ)-এর অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্যসমূহ এমন স্পষ্ট ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, যার দ্বারা লক্ষ্য করা যায় হযুর আকরাম (সাঃ)-কে দেখারই শামিল। আর তখন তওরাত ও ইঞ্জীলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, নবী-ইসরাঈলরা এ দু'টি গ্রন্থকেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকত। তা না হলে মহানবী (সাঃ)-এর গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনা 'যবুর' গ্রন্থেও রয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছেন হযরত মুসা (আঃ)। এতে প্রকৃষ্ট বলা হয়েছে, দুনিয়া ও আখেরাতের পরিপূর্ণ কল্যাণ আপনার চেষ্টার মধ্যে তারাই পেতে পারবে, যারা উম্মী-নবী ও খাতামুল আম্মিয়া আল্লাইহিসসালাতু ওয়াস সালামের অনুসরণ করবে। এ বিষয়গুলো তারা তওরাত ও ইঞ্জীলে লেখা দেখতে পাবে।

তওরাত ও ইঞ্জীলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গুণবৈশিষ্ট্য ও নির্দেশ : বর্তমান কালের তওরাত ও ইঞ্জীল অসংখ্য রদবদল ও বিকৃতি সন্নিবেশের ফলে বিশ্বাসযোগ্য থাকেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত তাতে এমনসব বাক্য ও বর্ণনা রয়েছে, যাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ-মোস্তফা (সাঃ)-এর সন্ধান পাওয়া যায়। আর এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, কোরআন মজীদ যখন ঘোষণা করেছে যে, শেষ নবীর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নির্দেশসমূহ তওরাত ও ইঞ্জীলে রয়েছে, তখন একখাটি যদি বাস্তবতা রিয়ারী হত, তবে সে যুগের ইহুদী ও নাসারাদের হাতে ইসলামের বিরুদ্ধে এমন এক বিরাট হাতিয়ার উপস্থিত হতো যার মাধ্যমে (সহজেই) কোরআনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে পারত যে, না, তওরাত ও ইঞ্জীলের কোথাও নবীয়ে-উম্মী (সাঃ) সম্পর্কে আলোচনা নেই। কিন্তু তখনকার ইহুদী বা নাসারারা কোরআনের এ ঘোষণার বিরুদ্ধে কোন পাশ্টা ঘোষণা করেনি। এটাই একটা বিরাট প্রমাণ যে, তখনকার তওরাত ও ইঞ্জীলে রসূল করীম (সাঃ)-এর গুণবৈশিষ্ট্য ও নির্দেশাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা বিদ্যমান ছিল, ফলে তারাও ছিল সম্পূর্ণ নীরব-নিশ্চুপ।

খাতেমুন্নাবিয়ীন (সমস্ত নবীর শেষ নবী) (সাঃ)-এর যেসব গুণবৈশিষ্ট্য তওরাত ও ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ ছিল সেগুলোর কিছু আলোচনা তওরাত ও ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি সাপেক্ষে কোরআন মজীদেও করা হয়েছে। আর কিছু সে সমস্ত মনীষীবৃন্দের উচ্চৈশ্বর্যে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যারা তওরাত ও ইঞ্জীলের আসল সংকলন স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাতে হযুরে আকরাম (সাঃ)-এর আলোচনা নিজে পড়েই মুসলমান হয়েছেন।

হযরত বায়হাকী (রহঃ), দালায়েলুননুব্যা'ত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে, কোন এক ইহুদী বালক নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমত করত। হঠাৎ সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে হযুর (সাঃ) তার অবস্থা জ্ঞানার জন্য তশরীফ নিয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, তার পিতা তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তওরাত তেলাওয়াত করছে। হযুর (সাঃ) বললেন : হে ইহুদী, আমি তোমাকে কসম দিচ্ছি সে মহান সন্তার যিনি মুসা (আঃ)-এর উপর তওরাত নাযিল করেছেন, তুমি কি তওরাতে আমার অবস্থা ও গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং আবির্ভাব সম্পর্কে কোন বর্ণনা পেয়েছ? সে অস্বীকার করল। তখন তার ছেলে বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ, তিনি (অর্থাৎ, এই ছেলের পিতা) ভুল কাছেন। তওরাতে আমরা আপনার আলোচনা এবং আপনার গুণ-বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আপনি তাঁর প্রেরিত রসূল। অতঃপর হযুরে আকরাম (সাঃ) সাহাবায়ে কোরাম (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, এখন এ বালক মুসলমান। তার মৃত্যুর পর তার কাফন-দাফন মুসলমানরা করবে। তার

পিতার হাতে দেয়া হবে না।—(মায়হারী)

হযরত আলী মুর্তাযা (রাঃ) বলেন যে, হযুর আকরাম (সাঃ) -এর নিকট জনৈক ইহুদীর কিছু ঋণ প্রাপ্য ছিল। সে এসে তার ঋণ চাইল। হযুর (সাঃ) বললেন, এমুহূর্তে আমার কাছে কিছুই নেই; আমাকে কিছু সময় দাও। ইহুদী কঠোরভাবে তাগাদা করে বলল, আমি আপনাকে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়ব না। হযুর (সাঃ) বললেন, তোমার সে অধিকার রয়েছে—আমি তোমার কাছে বসে পড়ব। তারপর হযুর (সাঃ) সেখানেই বসে পড়লেন এবং যোহর, আসর, মগরেব ও এশার নামায সেখানেই আদায় করলেন। এমনকি পরের দিন ফজরের নামাযও সেখানেই পড়লেন। বিষয়টি দেখে সাহাবায়ে কোরাম (রাঃ) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং ক্রমাগত রাগান্বিত হচ্ছিলেন; আর ইহুদীকে আস্তে আস্তে ধমকাচ্ছিলেন যাতে সে হযুর (সাঃ)-কে ছেড়ে দেয়। হযুর (সাঃ) বিষয়টি বুঝতে পেরে সাহাবীগণকে বললেন, একি করছ? তখন তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, এটা আমরা কেমন করে সহ্য করব যে, একজন ইহুদী আপনাকে বন্দী করে রাখবে? হযুর (সাঃ) বললেন, 'আমার পরওয়ারদেগার কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির প্রতি জুলুম করতে আমাকে বারণ করেছেন।' এহুদী এসব ঘটনাই লক্ষ্য করছিল।

شهد ان لا اله الا الله - ভোর হওয়ার সাথে সাথে ইহুদী বলল -
 أشهد انك رسول الله (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহ্র রসূল।) এভাবে ইসলাম গ্রহণ করে নিয়ে সে বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি আমার অর্ধেক সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় দিয়ে দিলাম। আর আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, এতক্ষণ আমি যা কিছু করেছি তার উদ্দেশ্য ছিল শুধু পরীক্ষা করা যে, তওরাতে আপনার যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তা আপনার মধ্যে যথার্থই বিদ্যমান কি নয়। আমি আপনার সম্পর্কে তওরাতে এ কথাগুলো পড়েছি :

“মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, তাঁর জন্ম হবে মক্কায়, তিনি হিজরত করবেন 'তাইবা'র দিকে; আর তাঁর দেশ হবে সিরিয়া। তিনি কঠোর মেজাজের হবেন না, কঠোর ভাষায় তিনি কথাও বলবেন না, হাটে-বাজারে তিনি হট্টগোলও করবেন না। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে তিনি দূরে থাকবেন।”

পরীক্ষা করে আমি এখন এসব বিষয় সঠিক পেয়েছি। কাজেই সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্যই নেই; আর আপনি হলেন আল্লাহ্র রসূল। আর এই হল আমার অর্ধেক সম্পদ। আপনি যেভাবে খুশী খরচ করতে পারেন। সে ইহুদী বহু ধন-সম্পত্তির মালিক ছিল। তার অর্ধেক সম্পদও ছিল এক বিরাট সম্পদ।—(বায়হাকী কৃত 'দালায়েলুননুব্যা'ত' গ্রন্থের বরাতে দিয়ে 'তফসীরে-মায়হারীতে' ঘটনাটি উদ্ধৃত করা হয়েছে।)

ইমাম বগভী (রহঃ) নিজ সনদে কা'আবে আহবার (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, তওরাতে হযুর আকরাম (সাঃ) সম্পর্কে লেখা রয়েছে :

“মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল ও নির্বাচিত বান্দা। তিনি না কঠোর মেজাজের লোক, না বাজে বক্তা। নাইবা তিনি হাটে-বাজারে হট্টগোল করার লোক। তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং ক্ষমা করে দেন এবং ছেড়ে দেন। তাঁর জন্ম হবে মক্কায়, আর হিজরত হবে তাইবায়, তাঁর দেশ হবে শাম (সিরিয়া)। আর তাঁর উম্মত হবে 'হাম্মাদীন'। অর্থাৎ, আনন্দ-বেদনা উভয় অবস্থাতেই আল্লাহ্ তাআলার

প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। তারা যে কোন উম্মারোহণকালে তকবীর বলবে। তারা সূর্যের ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যাতে সময় নির্ণয় করে যথাসময় নামায পড়তে পারে। তিনি তাঁর শরীরের নিম্নাংশে ‘তহবন্দ’ (লুঙ্গি) পরবেন এবং হস্ত-পদাদি ওয়ূর মাধ্যমে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। তাঁদের আযানদাতা আকাশে সুউচ্চ স্বরে আহ্বান করবেন। জেহাদের ময়দানে তাদের সারিগুলো এমন হবে যেমন নামাযে হয়ে থাকে। রাতের বেলায় তাদের তেলাওয়াত ও যিকিরের শব্দ এমনভাবে উঠতে থাকবে, যেন মধুমক্ষিকার শব্দ।” —(মায়হারী)

ইবনে সা’আদ ও ইবনে আসাকির (রহঃ) হযরত সাহাল মওলা খাইসামা (রাঃ) থেকে সনদ সহকারে উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত সাহাল বলেন, আমি নিজে ইঞ্জীলে মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) - এর গুণ - বৈশিষ্ট্যসমূহ পেড়েছি যে, :

“তিনি খুব বেঁটেগে হবেন না আবার খুব লম্বাও হবেন না। উজ্জ্বল বর্ণ ও দু’টি কেশ-গুচ্ছধারী হবেন। তাঁর দু’কাঁধের মধ্যস্থলে নবুওয়তের মোহর থাকবে। তিনি সদকা গ্রহণ করবেন না। গাধা ও উটের উপর সওয়ারী করবেন। ছাগলের দুধ নিজে দুইয়ে নেবেন। তালি লাগানো জামা পরবেন। আর যারা এমন করে তারা অহঙ্কার মুক্ত হয়ে থাকেন। তিনি ইসমাঈল (আঃ) -এর বংশধর হবেন। তাঁর নাম হবে আহ্মদ।”

আর ইবনে সা’আদ, দারেমী ও বায়হাকী যথাক্রমে তাবকাত, মুসনাদ ও ‘দালায়েলেনবুওয়ত’ গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন ; যিনি ছিলেন ইহুদীদের সবচেয়ে বড় আলেম এবং তওরাতের সর্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেছেন যে, তওরাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে :

“হে নবী, আমি আপনাকে সমস্ত উম্মতের জন্য সাক্ষী, সংকামীশীদের জন্য সুসংবাদদাতা, অসংকামীদের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মিয়্যীন অর্থাৎ, আরবদের জন্য রক্ষণ-বেক্ষণকারী বানিয়ে পাঠিয়েছি। আপনি আমার বান্দা ও রসূল। আমি আপনার নাম ‘মুতাওয়াঞ্চিল’ রেখেছি। আপনি কঠোর মেজাজও নন, দাস্তাবাজও নন। হাটে-বাজারে হটগোলকারীও নন। মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন না; বরং ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে মৃত্যু দেবেন না; যতক্ষণ না তাঁর মাধ্যমে বাঁকা জাতিকের সোজা করে নেবেন। এমনকি যতক্ষণ না তারা لا اله الا الله (আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই) - এর মন্ত্রে স্বীকৃত হয়ে যাবেন, যতক্ষণ না অন্ধ চোখ খুলে দেবেন, বধির কান যতক্ষণ না শোনার যোগ্য বানাবেন এবং বন্ধ হৃদয় যতক্ষণ না খুলে দেবেন।”

এমনি ধরনের একটি রেওয়াজে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বোখারী শরীফেও উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আর প্রাচীন গ্রন্থ-বিশারদ আলেম হযরত ওহাব ইবনে মুনাবিহ (রাঃ) থেকে ইমাম বায়হাকী তাঁর দালায়েল-নবুওয়ত গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন যে,

“আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আঃ) -এর প্রতি ওহী নাযিল করেন যে, হে দাউদ, আপনার পরে একজন নবী আসবেন, যার নাম হবে ‘আহ্মদ’। আমি তাঁর প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট হবো না এবং তিনি কখনোও আমার নাসিরমানী করবেন না। আমি তাঁর গত-আগত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছি। তাঁর উম্মত হল দয়াকৃত উম্মত (উম্মতে মরহুমাহ)। আমি তাদেরকে সে সমস্ত নফল বিষয় দান করছি, যা পূর্ববর্তী নবীগণকে দিয়েছিলাম এবং তাদের উপর সেসব ফরয আরোপ করেছি, যা পূর্ববর্তী

নবীগণের প্রতি অপরিহার্য করেছিলাম। এমনকি তারা হাশরের দিন আমার সামনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তাদের নূর আযিয়া আলাইহিমু সালামের নূরের মত হবে। হে দাউদ, আমি মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতকে সমস্ত উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আমি তাদেরকে বিশেষভাবে ছয়টি বিষয় দিয়েছি, যা অন্য কোন উম্মতকে দেইনি। (১) কোন ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাদের কোন শাস্তি হবে না। (২) অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের দ্বারা কোন পাপ কাজ হয়ে গেলে যদি সে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। (৩) যে মাল সে পছন্দ মনে আল্লাহর রাহে খরচ করবে, আমি দুনিয়াতেই তাকে তা থেকে বঞ্চিত বশী দিয়ে দেব। (৪) তাদের উপর কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে বলি তারা اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُونَ পড়ে, তবে আমি তাদের জন্য এ বিপদকে করুণা ও রহমত এবং জ্ঞানাতের দিকে পথনির্দেশে পরিণত করে দেব। (৫-৬) তারা যে দোয়া করবে আমি তা কবুল করব, কখনও না চেয়েছে তাই দান করে, আর কখনও এই দোয়াকেই তাদের আবেগে পাথের করে দিয়ে।” —(রহুল মা’আনী)

শত শত আয়াতের মধ্যে এ ক’টি রেওয়াজে তওরাত, ইঞ্জীল ও যবুর-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হলো। সমগ্র রেওয়াজেও সর্বমুখ্য মোহাদ্দেসগণ বিভিন্ন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

তওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত শেষনবী (সাঃ) ও তাঁর উম্মতের গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং নিদর্শনসমূহের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে বহু স্বতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান যমানায় হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ কীরানভী মুহাজ্জের মক্কী (রহঃ) তাঁর গ্রন্থ ‘এযহারুল-হক’ এ বিষয়টিকে অত্যন্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও গবেষণাসহ লিখেছেন। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমান যুগের তওরাত ও ইঞ্জীল যাতে সীমাহীন বিকৃতি সাধিত হয়েছে, তাতেও মহানবী (সাঃ) -এর বহু গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে।

উপরে তওরাতের উদ্ধৃতিতে রসূলে করীম (সাঃ) - এর যে সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছিল, তাতে একথাও ছিল যে, আল্লাহ রক্ষু আলামীন তাঁর মাধ্যমে অন্ধ চোখে আলো এবং বধির কানে শ্রবণশক্তি দান করবেন; আর বন্ধ অন্তরাত্মাকে খুলে দেবেন। রসূলে করীম (সাঃ) -কে আল্লাহ তাআলা امر بالمعروف (সৎ কাজের নির্দেশ দান) ও النهي عن المنكر (অন্যায় কাজ থেকে বারণ করা) -এর জন্য যে অসীম স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলেন এসমস্ত গুণাবলীও হয়ত তারই ফলশ্রুতি।

দ্বিতীয় গুণটি এই বলা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) মানবজাতির জন্য পবিত্র ও পছন্দনীয় বস্তু-সামগ্রী হালাল করবেন; আর পলি বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করবেন। অর্থাৎ, অনেক সাধারণ পছন্দনীয় বস্তু সামগ্রী যা শাস্তিস্বরূপ বনী-ইসরাঈলদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছিল, রসূলে করীম (সাঃ) সেগুলোর উপর থেকে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করে নেবেন। উদাহরণতঃ পশুর চর্বি বা মেদ প্রভৃতি যা বনী-ইসরাঈলদের অসদাচরণের শাস্তি হিসাবে হারাম করে দেয়া হয়েছিল, মহানবী (সাঃ) সেগুলোকে হালাল বায্যস্ত করেছেন। আর নোহো ও পঙ্কিল বস্তু-সামগ্রী মধ্যে রক্ত, মৃত পশু, মদ ও সমস্ত হারাম জন্তু অন্তর্ভুক্ত এবং যাবতী হারাম উপায়ের আয় যথা, সুদ, ঘুষ, জুয়া প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত। (আসসিরাজুল -মুনীর) কোন কোন মনীষী মন্দ চরিত্র ও অভ্যাসপূর্ণ পঙ্কিলতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ

দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—
 وَالْأَنْفَالُ الْوَيْلُ لِلَّذِينَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ
 বোঝা ও প্রতিবন্ধকতাও সরিয়ে দেবেন, যা তাদের উপর চেপে ছিল।

‘হিসর’ শব্দের অর্থ এমন ভারী বোঝা যা নিয়ে মানুষ চলাফেরা করতে অক্ষম। আর اغْلِلْ (আগলাল) غل এর বহুবচন। ‘গাল্লন’ সে বোঝাকড়াকে বলা হয় যদ্বারা অপরাধীর হাত তার ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেয়া হয় এবং সে একেবারেই নিরুপায় হয়ে পড়ে।

‘হিসর’ (হিসর) ও اغْلِلْ (আগলাল) অর্থাৎ, অসহনীয় চাপ ও আবদ্ধতা নিয়ে এ আয়াতে সে সমস্ত কঠিন ও সাধ্যাতীত কর্তব্যের বিধি-বিধানকে হালকা করেছে যা প্রকৃতপক্ষে ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু বনী-ইসরাঈল সন্তানদের উপর একান্ত শাস্তি হিসাবে আরোপ করা হয়েছিল। যেমন, সপ্তদশ নাপাক হয়ে গেলে পানিতে ধুয়ে ফেলা বনী-ইসরাঈলদের জন্য যথেষ্ট ছিল না; বরং যে স্থানটিতে অপবিত্র বস্তু লেগেছে সেটুকু কেটে ফেলা ছিল তাদের জন্য অপরিহার্য। আর বিধর্মী কাফেরদের সাথে জেহাদ করে গণীমতের যে মাল পাওয়া যেত, তা বনী-ইসরাঈলদের জন্য হালাল ছিল না, বরং আকাশ থেকে একটি আগুন নেমে এসে সেগুলোকে ছালিয়ে দিত। শনিবার দিন শিকার করাও তাদের জন্য বৈধ ছিল না। কোন অস্ত্র দ্বারা কোন পাপ কাজ সৎঘটিত হয়ে গেলে, সেই অস্ত্রটি কেটে ফেলা ছিল অপরিহার্য, ওয়াজিব। কারো হত্যা, তা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, উভয় অবস্থাতেই হত্যাকারীকে হত্যা করা ছিল ওয়াজিব, যুনের ক্ষতিপূরণের কোন বিধানই ছিল না।

এ সমস্ত কঠিন ও জটিল বিধানসমূহ যা বনী-ইসরাঈলদের উপর আরোপিত ছিল, কোরআনে সেগুলোকে ‘ইসর’ ও ‘আগলাল’ বলা হয়েছে এবং সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, রসূল করীম (সাঃ) এসব কঠিন বিধি-বিধানের পরিবর্তন অর্থাৎ, এগুলোকে রহিত করে তদন্তুলে সহজ বিধি-বিধান প্রবর্তন করবেন।

এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) এ বিষয়টিই বলেছেন যে, আমি তোমাদিগকে একটি সহজ ও সাবলীল শরীয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। জাতে না আছে কোন পরিশ্রম, না পথভ্রষ্টতার কোন ভয়-ভীতি।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, الدين يسر অর্থাৎ, ধর্ম সহজ। কোরআন কারীমে বলা হয়েছে وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَ الْوَيْلَ مِنَ الْوَيْلِ مِنَ حَرْجٍ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা ধর্মের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা আরোপ করেননি।

উম্মী নবী (সাঃ) এর বিশেষ ও পরিপূর্ণ গুণ-বৈশিষ্ট্যের আলোচনার পর বলা হয়েছে : فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الْكَوْثَرَ الَّذِي تَزْلُكُ مَعَهُ الْوَيْلُ لِلَّذِينَ كَانَتْ عَلَيْهِمْ
 নবী (সাঃ) এর প্রকৃষ্ট গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি ব্যতলে দেয়ার পরিণতি এই যে, যারা আপনার প্রতি ঈমান আনবে এবং আপনার সহায়তা করবে আর সেই নুরের অনুসরণ করবে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে—অর্থাৎ, যারা কোরআনের অনুসরণ করবে, তারা ইহল কল্যাণপ্রাপ্ত।

এখানে কল্যাণ লাভের জন্য চারটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। প্রথমতঃ মহানবী (সাঃ) এর প্রতি বিশ্वास স্থাপন করে ঈমান আনা, দ্বিতীয়তঃ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করা, তৃতীয়তঃ তাঁর সাহায্য ও

সহায়তা করা এবং চতুর্থতঃ কোরআন অনুযায়ী চলা।

শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন বোঝাবার জন্য عَزَّرُوهُ (আযযারুহু) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা تعزيز থেকে উদ্ভূত। تعزيز (তা'যীর) অর্থ সমুদ্রে বারণ করা ও রক্ষা করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) عَزَّرُوهُ (আযযারুহু) - এর অর্থ করেছেন শ্রদ্ধা ও সম্মান করা। মুবাররাদ বলেছেন যে, উচ্চতর সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে বলা হয় تعزيز (তা'যীর)।

তার অর্থ, যারা মহানবী (সাঃ) এর প্রতি যথাযথ সম্মান ও মহত্ববোধ সহকারে তাঁর সাহায্য ও সমর্থন করবে এবং বিরোধীদের মোকাবেলায় তাঁর সহায়তা করবে, তারা ইহবে পরিপূর্ণ কৃতকার্য ও কল্যাণপ্রাপ্ত। নবী করীম (সাঃ) এর জীবৎকালে সাহায্য ও সমর্থনের সম্পর্ক ছিল স্বয়ং তাঁর সন্তার সাথে। কিন্তু হযুর (সাঃ) এর তিরোধানের পর তাঁর শরীয়ত এবং তাঁর প্রবর্তিত দ্বীনের সাহায্য-সমর্থনই হলো মহানবী সাহায্য-সমর্থনের শামিল।

এ আয়াতে কোরআনে কারীমকে ‘নূর’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার কারণ এই যে, ‘নূর’ বা জ্যোতির পক্ষে জ্যোতি হওয়ার জন্য যেমন কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই; বরং সে নিজেই নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ, তেমনিভাবে কোরআন কারীমও নিজেই আল্লাহর কালাম ও সত্যবাণী হওয়ার প্রমাণ—যে, একজন একান্ত উম্মী বা নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ দিয়ে এমন উচ্চতর সালস্কার বাগ্মিতাপূর্ণ কালাম বেরিয়েছে, যার কোন উপমা উপস্থাপনে সমগ্র বিশ্ব অপারক হয়ে পড়েছে। এটা স্বয়ং কোরআন-কারীমের আল্লাহর কালাম হওয়ারই প্রমাণ।

তদুপরি নূর যেমন নিজেই উজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং অন্ধকারকে আলোময় করে দেয়, তেমনিভাবে কোরআন কারীমও যোর অন্ধকারের আবেতে আবদ্ধ পৃথিবীকে আলোতে নিয়ে এসেছে।

কোরআনের সাথে সাথে সূন্যাহর অনুসরণও ফরয : এ আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে - يَكْفِيكَوْنُ السُّوْلُ الْيُسْرَى - এর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে - وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي تَزْلُكُ مَعَهُ - এর প্রথম বাক্যে ‘উম্মী নবীর’ অনুসরণ এবং পরবর্তী বাক্যে কোরআনের অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আখেরাতের মুক্তি কোরআন ও সূন্যাহ উভয়টি অনুসরণের উপরই নির্ভরশীল। কারণ, উম্মী নবীর অনুসরণ তাঁর সূন্যাহর অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।

গুণ রসূলের অনুসরণই নয়; বরং মুক্তির জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা এবং মহত্বত থাকাও ফরয : উল্লেখিত বাক্য দু'টির মাঝে وَعَزَّرُوهُ শীর্ষক দু'টি শব্দ সংযোজন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত বিধি-বিধানের এমন অনুসরণ উদ্দেশ্য নয়, যেমন সাধারণতঃ দুনিয়ার শাসকদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে করতে হয়। বরং অনুসরণ বলতে এমন অনুসরণই উদ্দেশ্য যা হবে মহত্ব, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসার ফলশ্রুতি। অর্থাৎ, অন্তরে হযুরে আকরাম (সাঃ) এর মহত্ব ও ভালবাসা এত অধিক পরিমাণে থাকতে হবে, যার ফলে তাঁর বিধি-বিধানের অনুসরণে বাধ্য হতে হয়। কারণ, উম্মতের সম্পর্ক থাকে নিজ রসূলের সাথে বিভিন্ন রকম। একে তো তিনি হলেন আজ্ঞাদানকারী মনিব, আর উম্মত হচ্ছে আজ্ঞাবহ প্রজা। দ্বিতীয়তঃ তিনি হলেন প্রেমাশ্রদ, আর উম্মত হচ্ছে প্রেমিক।

এদিকে রসূলে করীম (সাঃ) জ্ঞান, কর্ম ও নৈতিকতার ভিত্তি

স্থাপনকারী একক মহত্বের আধার; আর সে তুলনায় সমগ্র উম্মত হচ্ছে একান্তই হীন ও অক্ষম।

আমাদের পেয়ারা নবী (সাঃ)-এর মাঝে যাবতীয় মহত্ব পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, কাজেই তাঁর প্রতিটি মহত্বের দাবী পূরণ করা প্রত্যেক উম্মতের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রসূল হিসাবে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে হবে, মনিব ও হাকেম হিসাবে তাঁর প্রতিটি নির্দেশের অনুসরণ করতে হবে, প্রিয়জন হিসাবে তাঁর সাথে গভীরতম প্রেম ও ভালবাসা রাখতে হবে এবং নবুওয়তের ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি পরিপূর্ণ, তাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ তো উম্মতের উপর ফরয হওয়াই উচিত। কারণ, এছাড়া নবী-রসূলগণকে প্রেরণের উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের রসূলে মকবুল (সাঃ) সম্পর্কে শুধু আনুগত্য অনুসরণের উপর কান্ড করেননি; বরং উম্মতের উপর তাঁর প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দান করাকেও অবশ্য কর্তব্য সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। উপরন্তু কোরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে তাঁর রীতি-নীতির শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এ আয়াতে عَزُّوْهُ وَتَضَرُّوْهُ বাক্যে সেদিকেই হেদায়েত দান করা হয়েছে। অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে وَتَعَزُّوْهُ وَتَضَرُّوْهُ অর্থাৎ, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং তাঁকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দান কর। এ ছাড়া আরও কয়েকটি আয়াতে এই হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ)-এর উপস্থিতিতে এত উচ্চৈশ্বরে কথা বলা না, যা তাঁর স্বর থেকে বেড়ে যেতে পারে। বলা হয়েছে -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَوَايَاكُمْ

يَكْذِبُ اللَّهُ وَسُوءُهُ অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ, আল্লাহ ও তাঁর রসূল থেকে এগিয়ে যেয়ো না। অর্থাৎ, যদি মজলিসে হযূর আকরাম (সাঃ) উপস্থিত থাকেন এবং তাতে কোন বিষয় উপস্থিত হয়, তাহলে তোমরা তাঁর আগে কোন কথা বলা না।

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন যে, হযূর (সাঃ)-এর পূর্বে কেউ কথা বলবে না এবং তিনি যখন কোন কথা বলেন, তখন সবাই তা নিশ্চুপ বসে শুনবে।

কোরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ)-কে ডাকার সময় আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখবে; এমনভাবে ডাকবে না; নিজেদের মধ্যে একে অপরকে যেভাবে ডেকে থাক। বলা হয়েছে -

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ

الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَمَا يَتَّبِعُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا এ আয়াত শেষে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, এ নির্দেশের খেলাফ কোন অসম্মানজনক কাজ করা হলে সমস্ত সংকর্ম ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে।

একারণেই সাহাবায়ে কেরাম রেওয়ানুল্লাহি আলাইহিম যদিও সর্বক্ষণ সর্বাবস্থায় মহানবী (সাঃ)-এর কর্মসঙ্গী ছিলেন এবং এমতাবস্থায় সম্মান ও আদবের প্রতি পরিপূর্ণ লক্ষ্য রাখা বড়ই কঠিন হয়ে থাকে; তবুও তাঁদের অবস্থা এই ছিল যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) যখন মহানবী (সাঃ)-এর খেদমতে কোন বিষয় নিবেদন করতেন, তখন এমনভাবে বলতেন, যেন কোন গোপন বিষয় আস্তে আস্তে বলছেন। এমনি অবস্থা ছিল হযরত ফারুকে আযম (রাঃ)-এর ও।—

(শেফা)

হযরত আমর ইবনুল আ'স (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন আমর কোন প্রিয় ব্যক্তি সারা বিশ্বে ছিল না। আর আমার এ অবস্থা ছিল যে, আমি তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেও পারতাম না। আমার কাছে যদি হযূর আকরাম (সাঃ)-এর আকার-অবয়ব সম্পর্কে কেউ জানতে চায়, তাহলে তা বলতে আমি এ জন্যে অপারক যে, আমি কখনও তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়েও দেখিনি।

ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রেওয়াজেত করেছেন যে, মজলিসে যখন হযূর আকরাম (সাঃ) তশরীফ আনছেন তখনই সবাই নিম্নদৃষ্টি হয়ে বসে থাকতেন। শুধু সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আযম (রাঃ) তাঁর দিকে চোখ তুলে চাইতেন; আর তিনি তাঁদের দিকে চেয়ে মুচকি হাসতেন।

ওরওয়া ইবনে মাসউদকে মক্কাবাসীরা গুপ্তচর বানিয়ে মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য মদীনায় পাঠাল। সে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে হযূর (সাঃ)-এর প্রতি এমন নিবেদিত প্রাণ দেখতে পেল যে, ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিল; “আমি কিসরা ও কাযসারের দরবারও দেখেছি এবং সন্তানাজ্জাশীর সাথেও সাক্ষাত করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহাবীগণের যে অবস্থা আমি দেখেছি, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমার ধারণা তোমরা কম্বিনকালেও তাদের মোকাবেলায় জয়ী হতে পারবে না।”

হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, হযূর আকরাম (সাঃ) যখন ঘরের ভেতর অবস্থান করতেন, তখন তাঁকে বাইরে থেকে সশব্দে ডাকাকে সাহাবায়ে কেরাম যে-আদবী মর করতেন। দরজায় কড়া নাড়তে হলেও শুধু নখ দিয়ে টোকা দিতেন যাতে বেশী জোরে শব্দ না হয়।

মহানবী (সাঃ)-এর তিরোধানের পরও সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস ছিল যে, মসজিদে-নবতীতে কখনও জোরে কথা বলা তো দূরের কথা, কোন ওয়াজ কিংবা বয়ান বিবৃতিও উচ্চৈশ্বরে করা পছন্দ করতেন না। অধিকাংশ সাহাবী (রাঃ)-এর এমনি অবস্থা ছিল যে, যখনই কেউ হযূর আকরাম (সাঃ)-এর পবিত্র নাম উল্লেখ করতেন, তখনই কেঁদে উঠতেন এবং ভীত হয়ে পড়তেন।

এই শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের বরকতেই তাঁরা নবুওয়তী ফযয থেকে বিশেষ উত্তরাধিকার লাভ করতে পেরেছিলেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও এ কারণেই তাঁদেরকে আযিয়া (আঃ) - এর পর সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

এ আয়াতে ইসলামের মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে রেসালতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচিত হয়েছে যে, আমাদের রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালত সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত জিন ও মানবজাতি তথা কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাদের বংশধরদের জন্য ব্যাপক।

এ আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে সাধারণভাবে ঘোষণা করে দেয়া জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি মানুষকে বলে দিন যে, আমি তোমাদের সবার প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমার নবুওয়ত লাভের রেসালতপ্রাপ্তি বিগত নবীগণের মত কোন বিশেষ জাতি কিংবা বিশেষ ভূগুণ অথবা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়; বরং সমগ্র বিশৃঙ্খলিত জাতি, বিশ্বের প্রতিটি অংশ, প্রতিটি দেশ ও রাষ্ট্র এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য কিয়ামতকাল পর্যন্তের জন্য তা পরিব্যাপ্ত। আর মন জাতি ছাড়াও এতে জিন জাতিও অন্তর্ভুক্ত।

মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত কিয়ামতকাল পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তাই তাঁর উপরই-নবুওয়তের ধারাও সমাপ্ত : নবুওয়ত সমাপ্তির এটাই হল প্রকৃত রহস্য। কারণ, মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত বংশধরদের জন্য ব্যাপক, তখন আর অন্য কোন নবী বা রসূলের আবির্ভাবের না কোন প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে, না তার কোন অবকাশ আছে। আর এই হল মহানবীর (সাঃ)-এর উম্মতের বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত রহস্য যে, নবী করীম (সাঃ)-এর ভাষায় এতে সর্বদাই এমন একটি দল প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যারা ধর্মের মাঝে সৃষ্ট দ্বিতীয় ফেতনা-ফাসাদের মোকাবেলা করবেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে সৃষ্ট-সমস্ত প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ করতে থাকবেন। কোরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে যেসব বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে, এদল সেগুলোরও অপনোদন করবে এবং আল্লাহ তাআলার বিশেষ সাহায্য ও সহায়তাপ্রাপ্ত হবেন; যার ফলে তারা সবার উপরই বিজয়ী হবেন। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এ দলটি হবে মহানবী (সাঃ)-এর রেসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁরই স্থলাভিষিক্ত, নায়েব।

ইমাম রাযী (রহঃ) رَوَى الصِّدِّيقُ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতে এই ইঙ্গিত বিদ্যমান রয়েছে যে, এই উম্মতের মধ্যে 'সাদেকীন' অর্থাৎ, সত্যনিষ্ঠদের একটি দল অবশ্যই অবশিষ্ট থাকবে। তা নাহলে বিশ্বাসীর প্রতি সত্যনিষ্ঠদের সাথে থাকার নির্দেশই দেয়া হতো না। আর এরই ভিত্তিতে ইমাম রাযী (রহঃ) সর্বযুগে একমুখে-উম্মত বা মুসলমান জাতির একমত্যকে শরীয়তের দলীল বলে গ্রহণ করেছেন। তার কারণ, সত্যনিষ্ঠ দলের বর্তমানে কোন ভুল বিষয় কিংবা কোন পথভ্রষ্টতায় সবাই ঐকমত্য বা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না।

ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতে মহানবী (সাঃ)-এর খাতামুনাবিযীন বা শেষনবী হওয়ার বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, হযুর (সাঃ)-এর আবির্ভাব ও রেসালত যখন কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত বংশধরদের জন্য এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক, তখন আর অন্য কোন নতুন রসূলের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেই না। সেজন্যই শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আঃ) যখন আসবেন, তখন তিনিও যথাস্থানে নিজের নবুওয়তে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মহানবী (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত শরীয়তের উপরই আমল করবেন। (হযুরে আকরাম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর নিজস্ব যে শরীয়ত ছিল, তাকে তখন তিনিও রহিত বলেই গণ্য করবেন।) বিশুদ্ধ রেওয়াত দ্বারা তাই প্রতীয়মান হয়।

মহানবী (সাঃ)-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : ইবনে কাসীর মুনাদে আহমদ গ্রন্থের বরাতে দিয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদের সাথে উদ্ধৃত করেছেন যে, গয়ওয়ায়ে তাবুকের (তাবুক যুদ্ধের) সময় রসূল করীম (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের ভয় ছিল যে, শত্রুবা না এ অবস্থায় আক্রমণ করে বসে। তাই তাঁরা হযুর (সাঃ)-এর চারদিকে সমবেত হয়ে গেলেন। হযুর নামায শেষ করে এরশাদ করলেন, আজকের রাতে আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে আর কোন নবী-রসূলকে দেয়া হয়নি। তার একটি হল এই যে, আমার রেসালত ও নবুওয়তকে সমগ্র দুনিয়ার জাতিসমূহের জন্য ব্যাপক করা হয়েছে। আর আমার পূর্বে যত নবী-রসূলই এসেছেন, তাঁদের দাওয়াত ও আবির্ভাব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমাকে আমার শত্রুর মোকাবেলায় এমন প্রভাব দান করা হয়েছে যাতে তারা যদি আমার কাছ থেকে এক মাসের দূরত্বেও থাকে, তবুও তাদের উপর আমার প্রভাব ছেয়ে যাবে। তৃতীয়তঃ কাকেরদের সাথে যুদ্ধপ্রাপ্ত

মাল-গনীরত আমার জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। অথচ পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য তা হালাল ছিল না। বরং এসব মালের ব্যবহার মহাপাপ বলে মনে করা হত। তাদের গনীরতের মাল ব্যয়ের একমাত্র স্থান ছিল এই যে, আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সে সমস্তকে জ্বালিয়ে থাক করে দিয়ে যাবে। চতুর্থতঃ আমার জন্য সমগ্র ভূমণ্ডলকে মসজিদ করে দেয়া হয়েছে এবং পবিত্র করার উপকরণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, যাতে আমাদের নামায যে কোন যমি, যে কোন জায়গায় শুদ্ধ হয়, কোন বিশেষ মসজিদে সীমাবদ্ধ নয়। পঞ্চমতঃ পূর্ববর্তী উম্মতদের এবাদত শুধু তাদের উপসনালয়েই হতো, অন্য কোথাও নয়। নিজেদের ঘরে কিংবা মাঠে-ময়দানে তাদের নামায বা এবাদত হত না। তাছাড়া পানি ব্যবহারের যখন সামর্থ্যও না থাকে, তা পানি না পাওয়ার জন্য হোক কিংবা কোন রোগ-শোকের কারণে, তখন মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নেয়াই পবিত্রতা ও অযুর পরিবর্তে যথেষ্ট হয়ে যায়। পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য এ সুবিধা ছিল না। অতঃপর বললেন- আর পঞ্চমটির কথা তো বলতেই নেই, তা নিজেই নিজের উদাহরণ, একেবারে অনন্য। তা হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রত্যেক রসূলকে একটি দোয়া কবুল হওয়ার এমন নিশ্চয়তা দান করেছেন, যার কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না। আর প্রত্যেক নবী-রসূলই তাঁদের নিজ নিজ দোয়াকে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে নিয়েছেন এবং সে উদ্দেশ্যেও সিদ্ধ হয়েছে। আমাকে তাই বলা হলো যে, আপনি কোন একটা দোয়া করুন। আমি আমার দোয়াকে আখেরাতের জন্য সংরক্ষিত করিয়ে নিয়েছি। সে দোয়া তোমাদের জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত ٱلْكَافِرِينَ কালমার সাক্ষ্য দানকারী যেসব লোকের জন্য হবে, তাদের কাজে লাগবে।

হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, যে লোক আমার আবির্ভাব সম্পর্কে শুনবে, তা সে আমার উম্মতদের মধ্যে হোক কিংবা ইহুদী-খ্রীষ্টান হোক, যদি সে আমার উপর ঈমান না আনে, তাহলে জাহান্নামে যাবে।

আর সহীহ বোখারী শরীফে এ আয়াতের বর্ণনা প্রসঙ্গে আবুদ্বারদা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে কোন এক বিষয়ে মতবিরোধ হয়। তাতে হযরত ওমর (রাঃ) নারায় হয়ে চলে যান। তা দেখে হযরত আবু বকর (রাঃ)ও তাকে মানাবার জন্য এগিয়ে যান। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) কিছুতেই রাযী হলেন না। এমনকি নিজের ঘরে পৌঁছে দরজা বন্ধ করে দিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ফিরে যেতে বাধ্য হন এবং মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে গিয়ে হাযির হন। এদিকে কিছুক্ষণ পরেই হযরত ওমর (রাঃ) নিজের এহেন আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে গিয়ে উপস্থিত হয়ে নিজের ঘটনা বিবৃত করেন। হযরত আবুদ্বারদা (রাঃ) বলেন যে, এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন লক্ষ্য করলেন যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রতি ভর্বসনা করা হচ্ছে, তখন নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, দোষ আমারই বেশী। রসূল করীম (সাঃ) বললেন, আমার একজন সহচরকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকাটাও কি তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তোমরা কি জান না যে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে আমি যখন বললাম : “হে মানবমণ্ডলী, আমি তোমাদের সমস্ত লোকের আল্লাহ রসূল।”

তখন তোমরা সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলে। শুধু এই আবু বকর (রাঃ)-ই ছিলেন, যিনি সর্বপ্রথম আমাকে সত্য বলে স্বীকৃতি

দিয়েছেন।

সারমর্ম এই যে, এ আয়াতের দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য, প্রত্যেক দেশ ও ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য এবং প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য মহানবী (সাঃ)-এর ব্যাপকভাবে রসূল হওয়া প্রমাণিত হয়েছে। সাথে সাথে একথাও সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, হযুরে আকরাম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর যে লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না, সে লোক কোন সাবেক শরীয়ত ও কিতাবের কিংবা অন্য কোন ধর্ম ও মতের পরিপূর্ণ আনুগত্য একান্ত নিষ্ঠাপরায়ণভাবে করতে থাকা সত্ত্বেও কশ্মিনকালেও মুক্তি পাবে না।

হযরত মুসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের একটি সত্যনিষ্ঠ দল :
 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ
 وَهُمْ لَا يُصَلُّونَ
 অর্থাৎ, হযরত মুসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা নিজেরা সত্যের অনুসরণ করে এবং নিজেদের বিতর্কমূলক বিষয়সমূহের মীমাংসার বেলায় সত্য অনুযায়ী মীমাংসা করে থাকে।

বিগত আয়াতসমূহে মুসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের অসদাচরণ, কুটকট এবং গোমরাহীর বর্ণনা ছিল। কিন্তু এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, গোটা জাতিটিই এমন নয়; তাদের মধ্যে বরং কিছু লোক ভালও রয়েছে যারা সত্যানুসরণ করে এবং ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করে। এরা হলো সেসব লোক, যারা তওরাত ও ইঞ্জিলের যুগে সেগুলোর হেদায়েত অনুযায়ী আমল করত এবং যখন খাতামুন্নাবিয়ীন (সাঃ)-এর আবির্ভাব হয়, তখন তওরাত ও ইঞ্জিলের সুসংবাদ অনুসারে তাঁর উপর ঈমান আনে এবং তাঁর যথাযথ অনুসরণও করে। বনী-ইসরাঈলদের এই সত্যনিষ্ঠ দলটির উল্লেখও কোরআন মজীদে বারংবারই করা হয়েছে।

প্রখ্যাত তফসীরকার ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর (রহঃ) প্রমুখ এ প্রসঙ্গে এক কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন যে, এ জমাআত বা দল দ্বারা সে দলই উদ্দেশ্য, যারা বনী-ইসরাঈলদের গোমরাহী, অসৎকর্ম, নারী হত্যা প্রভৃতি কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে তাদের থেকে সরে পড়েছিল। বনী-ইসরাঈলদের বারটি গোত্রের মধ্যে একটি গোত্র ছিল, যারা নিজেদের জাতির কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে প্রার্থনা করেছিল যে, হে পরওয়ারদেগারে আলম! আমাদের থেকে সরিয়ে কোন দূর দেশে পুনর্বাসিত করে দিন, যাতে আমরা আমাদের দ্বীনের উপর দৃঢ়তার সাথে আমল করতে

পারি। আল্লাহ তাঁর পরিপূর্ণ কুদরতের দ্বারা তাদেরকে দূর প্রাচ্যের কোন ভূ-খণ্ডে পৌঁছে দেন। সেখানে তারা নির্ভেজাল এবাদতে আত্মনিয়োগ করে। রসূলে করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পরেও আল্লাহর মহিযর তাদের মুসলমান হওয়ার এই ব্যবস্থা হয় যে, মে'রাজের রাতে হযরত জিবরাঈল (আঃ) হযুর (সাঃ)-কে সেদিকে নিয়ে যান। তখন তারা ময়দানী (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনে। হযুর আলাইহিস সালাতু ওয়াসালাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমাদের কি মাপ-জোখের কোন ব্যবস্থা আছে? আর তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা কি? তারা উত্তর দিল যে, আমরা যমীতে শস্য বপন করি, যখন তা উপযোগী হয়, তখন সেগুলোকে কেটে সেখানেই স্থপীকৃত করে দেই। সেই স্থপ থেকে সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত নিয়ে আসে। কাজেই আমাদের মাপ-জোখের কোন প্রয়োজন পড়ে না। হযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ মিথ্যা কথা বলে? তারা নিবেদন করল, না। কারণ, কেউ যদি জ করে, তাহলে সাথে সাথে একটি আগুন এসে তাকে পুড়িয়ে দেয়। হযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সবার ঘর-বাড়ীগুলো একই রকম কেন? নিবেদন করল, যাতে কেউ কারও উপর প্রাধান্য প্রকাশ করতে না পারে। অতঃপর হযুর (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের বাড়ীগুলোর সামনে এসব কবর কেন বানিয়ে রেখেছ? নিবেদন করল, যাতে আমাদের সামনে সর্বক্ষণ মৃত্যু উপস্থিত থাকে। অতঃপর হযুর (সাঃ) যখন মে'রাজ থেকে মক্কায় ফিরে আসলেন, তখন আয়াতটি নাযিল হল
 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَكْفُرُونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُصَلُّونَ

এ রেওয়াজেটিকে মৌলিক সাব্যস্ত করে অন্যান্য সম্ভাব্যতার কথাও লিখেছেন। ইবনে কাসীর একে বিস্ময়কর কাহিনী বলেছেন, কিন্তু একে খণ্ডন করেননি। অবশ্য কুরতুবী এ রেওয়াজেটটি উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, সম্ভবতঃ এই রেওয়াজেটটি বিপুল নয়।

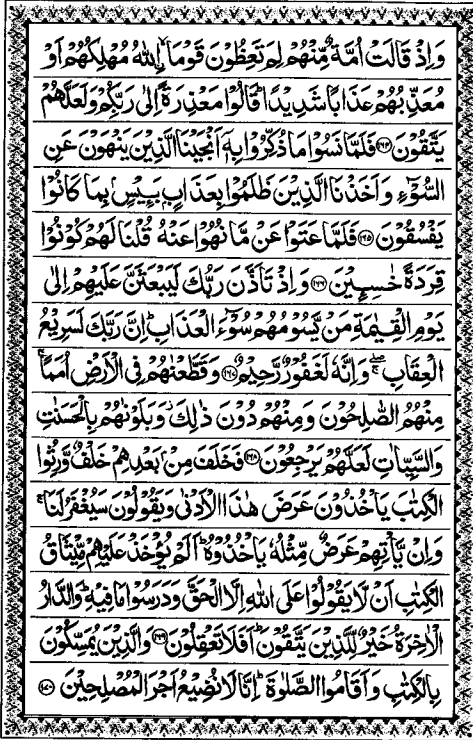
যাহোক, এ আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, হযরত মুসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দল রয়েছে যারা সব সময়েই সত্যে সুদৃঢ় রয়েছে। তা তারা হযুর (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সংবাদ শুনে যারা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল তারাই হোক অথবা বনী-ইসরাঈলদের দ্বাদশতম সে গোত্র হোক, যাকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর কোন বিশেষ স্থানে পুনর্বাসিত করে রেখেছেন যেখানে যাওয়া অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। (আল্লাহই সর্বদিক জ্ঞানী)।

وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِطًا ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ
 مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ
 فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَا عَشَرَ نَبِطًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ
 مَّشْرِبَهُمْ ۖ وَكَلَّمْنَا عَلَيْهِمُ الْغِيَامَ ۖ وَانزَلْنَا عَلَيْهِمُ
 الْمَنَّاءَ ۖ وَالسَّلَوى ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۖ وَ
 مَا ظَلَمُونَا ۖ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝
 لَهُمْ أَسْكُتُوا هَذِهِ الْقَرْيَةُ ۖ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ
 شِئْتُمْ ۖ وَقُولُوا حِطَّةٌ ۖ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّفُورًا
 لَّكُمْ خِيَلَتْ لَكُمْ سَرَايِدُ الْمُحْسِنِينَ ۝
 الَّذِينَ كَلَّمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ ۖ يَمَسُّ مَا كَانُوا
 يَظْلِمُونَ ۝
 وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ
 حَاضِرَةَ الْخِرَادِ يُعَذِّبُونَ فِي السَّبْتِ ۖ إِذِ اتَّيَبُوا
 حِينَ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَاعًا ۖ وَيَوْمَ لَا يَسْجُدُونَ ۖ لَا
 تَأْتِيهِمْ كُنْ لَكَ تَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মুসা (আঃ)-এর অবশিষ্ট কাহিনী বিবৃত করার পর তাঁর উম্মত (ইহুদী)-এর অসংকমশীল লোকদের প্রতি নিন্দাবাদ এবং তাদের নিকৃষ্ট পরিণতির বর্ণনা এসেছে। এ আয়াতগুলোতেও তাদের শাস্তি এবং অন্তত পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে সে দু'টি শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে যা পৃথিবীতে তাদের উপর আরোপিত হয়েছে। আর তা হল প্রথমতঃ কয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর এমন কোন ব্যক্তিকে অবশ্য চাপিয়ে রাখতে থাকবেন, যে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকবে এবং অপমান ও লাঞ্ছনায় জড়িয়ে রাখবে। সুতরাং তখন থেকে নিয়ে অদ্যাবধি ইহুদীরা সবসময়ই সর্বত্র ঘৃণিত, পরাজিত ও পরাধীন অবস্থায় রয়েছে। সাম্প্রতিককালের ইসরাঈলী রাষ্ট্রের কারণে এ বিষয়ে এজন্য সন্দেহ হতে পারে না যে, যারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তাদের জন্য আছে যে, প্রকৃতপক্ষে আজও ইসরাঈলীদের না আছে নিজস্ব কোন ক্ষমতা, না আছে রাষ্ট্র। প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলামের প্রতি রাশিয়া ও আমেরিকার একান্ত শত্রুতারই ফলশ্রুতি হিসাবে তাদেরই একটা ধাঁচি মাত্র। এরচেয়ে বেশী কোন গুরুত্বই এর নেই। তাছাড়া আজও ইহুদীরা তাদেরই অধীন ও আশ্রাবহ। যখনই এতদুভয় শক্তি তাদের সাহায্য করা বন্ধ করে দেবে, তখনই ইসরাঈলের অস্তিত্ব বিশ্বের পাতা থেকে মুছে যেতে পারে।

(১৬০) আর আমি পৃথক পৃথক করে দিয়েছি তাদের বার জন পিতামহের সন্তানদেরকে বিরাট বিরাট দলে, এবং নির্দেশ দিয়েছি মুসাকে, যখন তার কাছে তার সম্প্রদায় পানি চাইল যে, স্বীয় যষ্টির দ্বারা আঘাত কর এ পাথরের উপর। অতঃপর এর ভেতর থেকে ফুটে বের হল বারটি প্রস্রবণ। প্রতিটি গোত্র চিনে নিল নিজ নিজ ধাঁচি। আর আমি ছায়া দান করলাম তাদের উপর মেঘের এবং তাদের জন্য অবতীর্ণ করলাম মান্না ও সালওয়া। যে পরিচ্ছন্ন বস্ত্র জীবিকারূপে আমি তোমাদের দিয়েছি, তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর। বস্ত্রতঃ তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি, বরং ক্ষতি করেছে নিজেদেরই। (১৬১) আর যখন তাদের প্রতি নির্দেশ হল যে, তোমরা এ নগরীতে বসবাস কর এবং ঋণও তা থেকে যেখান থেকে ইচ্ছা এবং বল, আমাদের ক্ষমা করুন। আর দরজা দিয়ে প্রবেশ কর প্রণত অবস্থায়। তবে আমি ক্ষমা করে দেব তোমাদের পাপসমূহ। অবশ্য আমি স্ককমীদিগকে অতিরিক্ত দান করব। (১৬২) অনন্তর জালেমরা এতে অন্য শব্দ বদলে দিল তার পরিবর্তে, যা তাদেরকে বলা হয়েছিল। সুতরাং আমি তাদের উপর আযাব পাঠিয়েছি আসমান থেকে তাদের অপকর্মের কারণে। (১৬৩) আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যা ছিল নদীর তীরে অবস্থিত। যখন শনিবার দিনের নির্দেশ ব্যাপারে সীমাতিক্রম করতে লাগল, যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন পানির উপর, আর যেদিন শনিবার হত না, আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। কারণ, তারা ছিল নাফরমান।



(১৬৪) আর যখন তাদের মধ্য থেকে এক সম্প্রদায় বলল, কেন সে লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা আযাব দিতে চান-কঠিন আযাব? সে বলল, তোমাদের পালনকর্তার সামনে দোষ ফুরাবার জন্য এবং এজন্য যেন তারা ভীত হয়। (১৬৫) অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সেসব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম, গোনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের না-ফরমানীর দরুন। (১৬৬) তারপর যখন তারা এগিয়ে যেতে লাগল সে কর্মে যা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছিল, তখন আমি নির্দেশ দিলাম যে, তোমরা লাল্হিত বানর হয়ে যাও। (১৬৭) আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার পালনকর্তা সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই কেয়ামত দিবস পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দান করতে থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার পালনকর্তা শীঘ্র শাস্তিদানকারী এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৬৮) আর আমি তাদেরকে বিভক্ত করে দিয়েছি দেশময় বিভিন্ন শ্রেণীতে, তাদের মধ্যে কিছু রয়েছে ভাল, আর কিছু অন্য রকম। তাছাড়া আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছে ভাল ও মন্দের মাধ্যমে যাতে তারা ফিরে আসে। (১৬৯) তারপর তাদের পেছনে এসেছে কিছু অপদার্থ, যারা উত্তারিকারী হয়েছে কিভাবে; তারা নিকৃষ্ট পারিবার উপকরণ আহরণ করছে এবং বলছে, আমাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে। বস্তুতঃ এমন ধরনের উপকরণ যদি আবায়ো তাদের সামনে উপস্থিত হয়, তবে তাও ভুলে নেবে। তাদের কাছ থেকে কিভাবে কি অস্বীকার নেয়া হয়নি যে, আল্লাহর প্রতি সত্য ছাড়া কিছু বলবে না? অথচ তারা সে সবই পাঠ করেছে, যা তাতে লেখা রয়েছে। বস্তুতঃ আখেরাতের আলয় ভীতদের জন্য উত্তম—তোমারা কি তা বোঝ না? (১৭০) আর যেসব লোক সুদৃঢ়ভাবে কিভাবেকে আঁকড়ে থাকে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে নিশ্চয়ই আমি বিনষ্ট করব না সংকমীদের সওয়াব।

দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদীদের উপর আরোপিত অন্য আরেক শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যা এই পৃথিবীতেই তাদেরকে দেয়া হয়েছে। তা হল এই যে তাদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একান্ত বিক্ষিপ্ত করে দেয়া। কোথাও কেন এক দেশে তাদের সমবেতভাবে বসবাসের সুযোগ হয়নি। **وَقَطَّعْنَاهُمُ** এর মর্মও তাই। **وَقَطَّعْنَاهُمُ** শব্দটি থেকে নির্গত। অর্থ খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়া। আর **أُمَةٌ** হল **أُمَّة** এর বহুবচন। যার অর্থ ল বা শ্রেণী। মর্ম হল এই যে, আমি ইহুদী জাতিকে খণ্ড খণ্ড করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছি।

এতে বুঝা গেল যে, কোন জাতিবিশেষের কোন এক স্থানে সমবেত জীবন যাপন ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনও আল্লাহ তাআলার একটি নেয়ামত; পক্ষান্তরে তাদের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একরকম ঐশী আযাব। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহর এ নেয়ামত সব সময়ই রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ থাকবেও কেয়ামত পর্যন্ত। তারা যেখানেই অবস্থান করেছে সেখানেই তাদের প্রবল একটা সমবেত শক্তি গড়ে উঠেছে। ধর্ম থেকে এ ধারা শুরু হয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এভাবেই এক বিস্ময়কর প্রক্রিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। দূরপ্রাচ্যে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থায়ী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ এর ফলশ্রুতিতে গঠিত। পক্ষান্তরে ইহুদীরা সস সময়ই বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। যতই ধনী ও সম্পদশালী হোক না কেন কখনও শাসনক্ষমতা তাদের হাতে আসেনি।

কয়েক বছর থেকে ফিলিস্তিনের একটি অংশে তাদের সমবেত হওয়া এবং কৃত্রিম ক্ষমতার কারণে ধোঁকায পড়া উচিত হবে না। শেষ যমানায় এখানে তাদের সমবেত হওয়াটা ছিল অপরিহার্য। কারণ, সদাসত্য রসূল করীম (সাঃ)-এর হাদীসে বলা আছে যে, কিয়ামতের কাছাকাছি সময় তাই ঘটবে। শেষ যমানায় ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হবেন, সমস্ত খ্রীষ্ট মুসলমান হয়ে যাবে এবং তিনি ইহুদীদের সাথে জেহাদ করে তাদেরকে হত্যা করবেন। অবশ্য আল্লাহর অপরাধীকে সমন জারি করে এক পুলিশের মাধ্যমে ধরে হামির করা হবে না। বরং তিনি এমনই প্রাকৃতিক উপকরণ সৃষ্টি করবেন যাতে অপরাধী পায় হেঁটে বহু চেষ্টা করে নিজের বধ্যভূমিতে গিয়ে হামির হবে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ ঘটে সিরিয়ার দামেশকে। ইহুদীদের সাথে তাঁর যুদ্ধও সেখানে সংঘটিত হবে, যাতে ঈসা (আঃ)-এর পক্ষে তাদেরকে নিধন করা সহজ হয়। আল্লাহ তাআলা ইহুদীদিগকে সর্বদাই রাজক্ষমতা থেকে বঞ্চিত অবস্থায় বিভ্রি দেশে বিক্ষিপ্ত করে রেখে অমর্যাদাজনিত শাস্তির আশ্বাদ গ্রহণ করিয়েছেন। অতঃপর শেষ যমানায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্য সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে তাদেরকে তাদের বধ্যভূমিতে সমবেত করেছেন। কাজেই তাদের এই সমবেত হওয়া বর্ণিত আযাবের পরিপন্থী নয়।

রইল তাদের বর্তমান রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রশ্ন। বস্তুতঃ এটা এক একটা ধোঁকা, যার উপরে বর্তমান যুগের সত্য পৃথিবী যদিও অতি সুন্দর কারুকার্যময় আবরণ জড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু বিশৃঙ্খল রাজনীতি সম্পর্ক সজাগ কোন ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্যও এতে ধোঁকা খেতে পারে না কারণ, অধুনা যে এলাকাটিকে ইসরাঈল নামে অভিহিত করা হয়

প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের একটা যৌথ ছাউনির
জটিলিত কোন গুরুত্ব তার নেই। এটি শুধুমাত্র এসব দেশের সাহায্যেই
ঠিক আছে এবং এদের বশব্দে থাকার ভেতরেই নিহিত রয়েছে তার
জটিলতার রহস্য। বলাবাহুল্য, নির্ভেজাল দাসত্বকে ভেজাল রাষ্ট্র নামে
জটিলিত করে দেয়ায় এ জাতির কোন ক্ষমতালভ ঘটে না। কোরআনে
করীম তাদের সম্পর্কে কেয়ামতকাল পর্যন্ত অপমান ও লাঞ্ছনাজনিত যে
শত্রুর কথা বলেছে তা আজও তেমনিভাবে অব্যাহত। প্রথম আয়াতটিতে
জরী আলোচনা এভাবে করা হয়েছে

لَيَعْلَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْفَيْصَةِ مَنْ يُدْخِلُكُمْ فِيهَا بِنَافِلَةٍ ۚ أَرْثَاهُ ۚ
অর্থঃ, জাফার পালনকর্তা যখন সুদূর ইচ্ছা করে নিয়েছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত
জন্মের উপর এমন এক শত্রিকে চাপিয়ে দেবেন, যা তাদেরকে নিকট
জাহান্নামের স্বাদ আশ্বাদন করাবে। যেমন, প্রথমে হযরত সোলায়মান
(সঃ)-এর হাতে, পরে বুখ্তানাসারের দ্বারা এবং অতঃপর মহানবী
(সঃ)-এর মাধ্যমে, আর বাদবাকী হযরত ফারুককে আযমের মাধ্যমে সব
জাহায্য থেকে অপমান ও লাঞ্ছনার সাথে ইহুদীদের বহিস্কার করা একান্ত
প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা।

এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যটি হল এই وَمَنْهُمْ الظُّلُمُونَ
অর্থঃ, 'এদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সৎ এবং কিছু অন্য রকম।' 'অন্য
রকম'-এর মর্ম হল এই যে, কাকফের দুষ্কৃতকারী ও অসৎ লোক রয়েছে।
অর্থঃ, ইহুদীদের মধ্যে সবই এক রকম লোক নয়, কিছু সৎও আছে। এর
অর্থ, সেসব লোক, যারা তওরাতের যুগে তওরাতের নির্দেশাবলীর পূর্ণ
অনুগত্য ও অনুশীলন করেছে। না তার হুকুমের প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ
করেছে, আর না কোন রকম অপব্যখ্যা ও বিকৃতির আশ্রয় নিয়েছে।

এছাড়া এতে তারাও উদ্দেশ্য হতে পারেন, যারা কোরআন অবতীর্ণ
হওয়ার পর তার অনুগত্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং রসুলুল্লাহ
(সঃ)-এর উপর ঈমান এনেছেন। অপরদিকে রয়েছে সে সমস্ত লোক,
যারা তওরাতকে আসমানী গ্রন্থ বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধাচরণ
করেছে, কিংবা তার আত্মকাম বা বিধি বিধানের বিকৃতি ঘটিয়ে নিজেদের
পক্ষকালকে পৃথিবীতে নিকট বস্তু-সামগ্রীর বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে এরশাদ হয়েছে : وَيَكُونُ لَهُمْ رِجْزٌ وَآلَاءُ ۚ
অর্থঃ, আমি ভাল-মন্দ অবস্থার দ্বারা তাদের পরীক্ষা
করছি যেন তারা নিজেদের গর্হিত আচার-আচরণ থেকে ফিরে আসে।
'ভাল অবস্থার দ্বারা' এর অর্থ হলো এই যে, তাদেরকে ধন-সম্পদের
গুরুত্ব ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ দান। আর মন্দ অবস্থা অর্থ হয়
লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সে অবস্থা যা যুগে যুগে বিভিন্নভাবে তাদের উপর নেমে
এসেছে, অথবা কোন কোন সময়ে তাদের উপর আপতিত দুর্ভিক্ষ ও
দারিদ্র্য। যাহোক, সারমর্ম হল এই যে, মানব জাতির আনুগত্য ও ঔদ্ধত্যের
পরীক্ষা করার দু'টিই প্রক্রিয়া। তাদের ব্যাপারে উভয়টিই ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু ইহুদী সম্প্রদায় এতদুভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা যখন তাদের জন্য নেয়ামতের দুয়ার খুলে দিয়েছেন
ম-সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছেন, তখন তারা বলতে শুরু করেছে

قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ قَائِرُونَ وَعَنْ أُغْيَا ۚ (নাউযুল্লাহ) আল্লাহ্ হলেন ক্ষীর
আর আমরা ধনী। আর তাদেরকে যখন দারিদ্র্য ও দুর্দশার মাধ্যমে পরীক্ষা
করা হয়েছে, তখন বলতে শুরু করেছে : وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ
অর্থঃ, আল্লাহ্‌র হাত সংকুচিত হয়ে গেছে।

জ্ঞাতব্য বিষয় : এ আয়াতের দ্বারা একটা বিষয় তো এই জানা গেল
যে, কোন জাতির একত্র বাস আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত এবং তার
বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততা হল একটা শাস্তি। দ্বিতীয়তঃ পার্শ্ব
আরাম-আয়েশ, আনন্দ-বেদনা এগুলো প্রকৃতপক্ষে ঐশী পরীক্ষারই
বিভিন্ন উপকরণ, যার মাধ্যমে তাদের ঈমান ও আল্লাহ্‌র আনুগত্যের
পরীক্ষা নেয়া হয়। এখানকার যে দুঃখ-কষ্ট তা তেমন একটা হা-হুতাশ বা
কাঁদাকাটার বিষয় নয়। তেমনিভাবে এখানকার আনন্দ-উচ্ছলতাও
অহঙ্কারী হয়ে উঠার মত কোন উপকরণ নয়। দূরদর্শী বুদ্ধ্যমানের জন্য
এতদুভয়টিই লক্ষণীয় বিষয়।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে একটি প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে
আলোচনা করা হয়েছে যা বিশেষতঃ বনী-ইসরাঈলের আলেম সম্প্রদায়ের
নিকট থেকে তওরাত সম্পর্কে নেয়া হয়েছিল যে, এতে কোন রকম
পরিবর্তন কিংবা বিকৃতি সাধন করবে না এবং সত্য ও সঠিক বিষয় ছাড়া
মহান পরওয়ারদেগারের প্রতি অন্য কোন বিষয় আরোপ করবে না। আর
এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখিত হয়ে গিয়েছিল যে, বনী-ইসরাঈলের
আলেমগণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে স্বার্থান্বেষীদের কাছ থেকে উৎকোচ নিয়ে
তওরাতের বিধি-বিধানের পরিবর্তন করেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থের
সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে বাতলিয়েছে। এখন আলোচ্য এই আয়াতটিতে সে
বর্ণনারই উপসংহার হিসাবে বলা হয়েছে যে, বনী-ইসরাঈলের সব
আলেমই এমন নয়—কোন কোন আলেম এমনও রয়েছে যারা তওরাতের
বিধি-বিধানকে দৃঢ়তার সাথে ধরেছে এবং বিশৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে সংকাজেও
নিষ্ঠা অবলম্বন করেছে। আর যথারীতি নামাযও প্রতিষ্ঠা করেছে। এমন
লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করে দেন
না, যারা নিজেদের সংশোধন করে। কাজেই যারা ঈমান ও আমলের উভয়
ফরয আদায়ের মাধ্যমে নিজের সংশোধন করে নিয়েছে, তাদের প্রতিদান
বা প্রাপ্য বিনষ্ট হতে পারে না।

এ আয়াতে কয়েকটি লক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে। প্রথমতঃ এই
যে, কিতাব বলতে এতে সে কিতাবই উদ্দেশ্য যার আলোচনা ইতিপূর্বে
এসেছে। অর্থঃ, তওরাত। আর এও হতে পারে যে, এতে সমস্ত আসমানী
কিতাবই উদ্দেশ্য। যেমন, তওরাত, যবুর, ইঞ্জীল ও কোরআন।

দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতের দ্বারা বোঝা গেছে যে, আল্লাহ্‌র কিতাবকে
একান্ত আদব ও সম্মানের সাথে অতি যত্ন সহকারে নিজের কাছে শুধু
রেখে দিলেই তার উদ্দেশ্য সাধিত হয় না; বরং তার বিধি-বিধান ও
নির্দেশাবলীর অনুবর্তীও হতে হবে। আর এ কারণেই এখানে বলা
হয়েছে, وَيَكُونُ ۚ যার অর্থ হয় দৃঢ়তার সাথে পরিপূর্ণভাবে ধরা। অর্থঃ,
তার সমস্ত বিধি-বিধানের অনুশীলন করা।

কেন প্রশ্ন করার অধিকার।

কিন্তু তিনি নিজের একান্ত অনুগ্রহে বিশ্বব্যবস্থাকে এমনভাবে তৈরী করেছেন যে, প্রত্যেকটি বস্তুর জন্য একটা নিয়ম, একটা বিধিব্যবস্থা রয়েছে। নিয়ম ও বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী যারা চলবে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে স্থায়ী ও সুখ ও শান্তি। আর তার বিপরীতে যারা তার বিরুদ্ধাচারী তাদের জন্যে রয়েছে সব রকমের আযাব ও শাস্তি।

তাছাড়া বিরুদ্ধাচরণকারী অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার জন্য তার নিজস্ব সর্বব্যাপক জ্ঞানই যথেষ্ট ছিল, যা সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুকে পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং সে জ্ঞানের সামনে গোপন ও প্রকাশ্য সবতীয় কাজ-কর্ম; বরং মনের গোপন ইচ্ছা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিকশিত। কাজেই আমলনামা লিখে রাখার জন্য কোন পরিদর্শক নিয়োগ করা, আমলনামা তৈরী করা, আমলনামাসমূহের ওজন দেয়া এবং সেজন্য সাক্ষী-সাবুদ দাঁড় করানোর কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না।

কিন্তু তিনিই তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের দরুন এ ইচ্ছাও করলেন যে, কোন লোককে তত্ত্বক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দেবেন না, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে দ্বিষিত-পড়িত প্রমাণ এবং অনস্বীকার্য সাক্ষী-সাবুদের মাধ্যমে সে অপরাধ তার সামনে এমনভাবে এসে যায়, যেন সে নিজেও নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকার করে এবং নিজেকে যথার্থই শাস্তিযোগ্য মনে করে।

সে জন্যই প্রতিটি মানুষের সঙ্গে তার প্রতিটি আমল এবং প্রতিটি বাক্য লেখার জন্য ফেরশতা নিয়োগ করে দিয়েছেন। বলা হয়েছে : **مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ** অর্থাৎ, এমন কোন বাক্য মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত হয় না, যার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিদর্শক ফেরশতা নিয়োজিত রয়নি। আরো বলা হয়েছে : **وَكُلٌّ صَعِيرٌ مُخْتَبِرٌ** অর্থাৎ, মানুষের প্রতিটি ছোট-বড় কাজ লিখিত রয়েছে।

অন্তঃপর হাশর ময়দানে ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করে মানুষের সৎ ও অসৎ কর্মের ওজন দেয়া হবে। যদি সৎকর্মের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে সে মুক্তি পাবে। আর যদি পাপের পাল্লা ভারী হয়ে যায়, তাহলে আযাবে ধরা পড়বে।

এছাড়া মহা বিচারকের দরবার যখন হাশরের মাঠে স্থাপিত হবে, তখন প্রত্যেকের কাজ-কর্মের উপর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। কোন কোন অপরাধী সাক্ষীদেরকে মিথ্যা বলে দাবী করবে, তখন তারই হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এবং সে ভূমি ও স্থান থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যার দ্বারা এবং যেখানে সে এ অপরাধমূলক কাজ করেছিল। সেগুলো আল্লাহর নির্দেশক্রমে সত্য-সঠিক ঘটনা ব্যতলে দেবে। এমনকি তখন অপরাধীদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা অস্বীকার করার কোন সুযোগই থাকবে না। তারা স্বীকার করবে—

أَعْرَفُوا أَنَّهُمْ قُضِعَتِ الْأَصْطَبُ السَّعِيرُ

মহান করুণাময় প্রভু ন্যায়বিচার অনুষ্ঠানের এ ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হনি এবং পার্থিব রাষ্ট্রসমূহের মত নিছক একটা পদ্ধতি ও আইনই শুধু তাদেরকে দিয়ে দেননি; বরং আইনের সঙ্গে সঙ্গে একটা ধারাবাহিক বাস্তবায়ন ব্যবস্থাও স্থাপন করেছেন।

একজন অনন্য সাধারণ স্নেহপরায়ণ পিতা যেমন নিজের পারিবারিক ব্যবস্থার সুষ্ঠুতা বিধানের উদ্দেশে এবং পরিবার-পরিজনকে ভদ্রতা ও

শিষ্টাচার শেখাবার জন্য কিছু পারিবারিক নিয়ম-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি তৈরী করেন যে, যে-ই বিরুদ্ধাচরণ করবে সে-ই শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু তার (পিতার) স্নেহ ও অনুগ্রহ তাকে এমন ব্যবস্থা স্থাপনেও উদ্বুদ্ধ করে, যাতে কেউ শাস্তিযোগ্য না হয় ; বরং সবাই যেন সেই নিয়ম-পদ্ধতি মোতাবেক চলতে পারে। বাচ্চার জন্য যদি সকাল বেলা স্কুলে যাওয়ার নির্দেশ থাকে এবং তার বিরুদ্ধাচরণের জন্য যদি শাস্তি নির্ধারিত থাকে, তাহলে পিতা ভোর হতেই এ চিন্তাও করেন, যাতে বাচ্চা তার কাজটি করার জন্য সময়ের আগেই তৈরী হয়ে যেতে পারে।

সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের রহমত মাতা-পিতার দয়া ও করুণার চেয়ে বহুগুণ বেশী। কাজেই তিনি তার কিতাবকে শুধু আইন-কানুন ও শাস্তিবিধি হিসাবেই তৈরী করে দেননি; বরং একটি নির্দেশনামাও বানিয়েছেন এবং প্রতিটি আইনের সাথে সাথে এমন সব নিয়ম-পদ্ধতি লিখে দিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে আইনের উপর আমল করা সহজ হয়ে যায়।

ঐশী এ ব্যবস্থার তাগিদেই তিনি নিজে নবী-রসূল পাঠিয়েছেন, তাদের সাথে পাঠিয়েছেন আসমানী নির্দেশনামা। এক বিরাট সংখক ফেরেশতাকে সংকর্মের প্রতি পথ প্রদর্শনের জন্য এবং সংকর্মে সাহায্য করার জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন।

এই ঐশী ব্যবস্থারই একটা তাগিদ ছিল, প্রত্যেকটি জাতি ও সম্প্রদায়কে অবহেলা থেকে সজাগ করার এবং নিজের মহান পালনকর্তাকে সুরণ করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ তৈরী করে দেয়া, আসমান ও ঘম্বীরের সমস্ত সৃষ্টি, রাত ও দিনের পরিবর্তন এবং স্বয়ং মানুষের নিজস্ব পরিমন্ডলে তাকে সুরণ করিয়ে দেয়ার মত এমনসব নির্দেশ স্থাপন করে দেয়া যে, যদি সামান্য সচেতনতা অবলম্বন করা যায়, তাহলে কোন সময় স্বীয় মালিককে ভুলবে না। তাই বলা হয়েছে :

وَالْأَرْضُ يَتَّبِعُونَ أَفْعَالَهُمْ — অর্থাৎ, যারা দৃষ্টিমান তাদের জন্য পৃথিবীতে আমার নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সন্তার মাঝেও (নিদর্শন রয়েছে)। তারপরেও কি তোমরা দেখছ না ?

তাছাড়া যারা গাফেল, তাদেরকে সজাগ করার জন্য এবং সংকাজে নিয়োজিত করার জন্য রাক্বুল আলামীন একটি ব্যবস্থা এটাও করেছেন যে, ব্যক্তি, দল ও জাতিসমূহের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় নবী-রসূলগণের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি আদায় করে তাদেরকে আইনের অনুবর্তিতার জন্য প্রস্তুত করেছেন।

কোরআন মজীদে একাধিক আয়াতে বহু প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির কথা আলোচনা করা হয়েছে, যা বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায়ের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় আদায় করা হয়েছে। নবী-রসূলগণের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে, তারা যেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত; রেসালাতের বাণীসমূহ অবশ্যই উস্মতকে পৌঁছে দেন। এতে যেন কারো ভয়-ভীতি, মানুষের অপমান ও ভৎসনার কোন আশঙ্কাই তাদের জন্য অন্তরায় না হয়। আল্লাহর এই পবিত্র দল নিজেদের এই প্রতিশ্রুতির হক পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করেছেন। রেসালতের বাণী পৌঁছাতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের সবকিছু কোরবান করে দিয়েছেন।

এমনিভাবে প্রত্যেক রসূল ও নবীর উস্মতের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে যে, তারাও নিজ নিজ নবী-রসূলের যথাযথ অনুসরণ করবে।

তারপর প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এবং বিশেষভাবে সেগুলো সম্পাদন করতে গিয়ে নিজের পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যকে ব্যয় করার জন্য—যা কেউ পূরণ করেছে, কেউ করেনি।

এসব প্রতিশ্রুতির মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি হলো সে প্রতিশ্রুতিটি যা আমাদের রসূল মকবুল (সাঃ) সম্পর্কে সমস্ত নবী-রসূলগণের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে যে, তাঁরা ‘নবীয়ে-উ-নবী’ খাতামুল আম্মিয়া (সাঃ)-এর অনুসরণ করবেন। আর যখনই সুযোগ পাবেন, তাঁকে সাহায্য-সহায়তা করবেন। যার আলোচনা নিম্নের আয়াতে করা হয়েছে :

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ نَبِيِّيٍّ وَكِفَاةٍ

এ সমুদয় প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিই হল আল্লাহ্ রাকবুল আলামীনের পরিপূর্ণ রহমতের বিকাশ। এগুলোর উদ্দেশ্য হল এই যে, মানুষ যারা অত্যন্ত মনভোলা, প্রায়ই যারা নিজেরদের কর্তব্যকর্ম ভুলে যায়, তাদেরকে বার বার এসব প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সতর্ক করে দেয়া, যাতে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করে তারা ধ্বংসের সম্মুখীন না হয়।

বায়আত গ্রহণের তাৎপর্য : নবী-রসূল এবং তাঁদের প্রতিনিধি গুলোমা ও মশায়েখগণের মাঝে বায়আত গ্রহণের যে রীতি প্রচলিত রয়েছে, তাও এই ঐশী রীতিরই অনুসরণ। স্বয়ং রসূল করীম (সাঃ)-ও বিভিন্ন ব্যাপারে সাহাবীগণ (রাঃ)-এর নিকট থেকে বায়আত গ্রহণ করেছেন। সেসব বায়আতের মধ্যে ‘বায়আতে-রেদওয়ান-এর কথা কোরআন করীমে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

لَقَدْ رَفَعْنَا اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوكَ عَتَا الشُّرُوكَ

যারা বিশেষ গাছের নীচে আপনার হাতে বায়আত নিয়েছেন।

হিজরতের পূর্বে মদীনার আনসারগণের বায়আতে ‘আকাবা’ ও এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতির অন্তর্ভুক্ত।

বহু সাহাবীর নিকট থেকে ঈমান ও সংকর্মে নিষ্ঠার ব্যাপারে বায়আত নেয়া হয়েছে। মুসলমান সূফী সম্প্রদায়ে যে বায়আত প্রচলিত রয়েছে, তাও ঈমান ও সংকর্মে নিয়মানুবর্তিতা এবং পাশাচার থেকে বিরত থাকারই আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ্ ও নবী-রসূলগণের সে রীতিরই অনুসরণ। আর সে কারণেই এতে বিশেষ বরকত রয়েছে। এতে মানুষ পাশাচার থেকে বেঁচে থাকার এবং শরীয়তের নির্দেশাবলী যথাযথ পালনের সংসাহস ও সামর্থ্য লাভ করতে পারে। বায়আতের তাৎপর্য জানার সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বর্তমানে যে ধরনের বায়আত সাধারণভাবে অজ্ঞ ও মূর্খদের মাঝে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, কোন ব্যুর্গের হাতে হাত রেখে দেয়াকেই মুস্তির জন্য যথেষ্ট বলে ধারণা করা হয়—তা সম্পূর্ণই মূর্খতা। বায়আত হল একটি চুক্তি বা প্রতিশ্রুতির নাম। তখনই এর উপকারিতা লাভ হবে, যখন এ চুক্তি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অন্যথায় এতে মহাবিপদের আশঙ্কা।

সূরা আ’রাফের বিগত আয়াতগুলোতে সে প্রতিশ্রুতির বিষয় আলোচিত হয়েছে যা বনী-ইসরাঈলদের কাছ থেকে তওরাতের বিধি-বিধানের অনুবর্তিতার ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়েছিল। আলাচ্য আয়াতে সেই বিশুদ্ধনীন প্রতিশ্রুতির কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা সমস্ত আদমসন্তানের কাছ থেকে এই দুনিয়ায় আসারও পূর্বে সৃষ্টিলগ্নে নেয়া হয়েছিল। যা সাধারণ ভাষায় عهد الست (আহদে-আলাস্ত) বলে প্রসিদ্ধ।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَيِّ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ

أَنفُسِهِمْ এ আয়াতগুলোতে আদমসন্তানদের বুঝাবার জন্য শব্দ

ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম রাগেব ইসফাহানী বলেন যে, এ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে ذُرَى (যরউন) থেকে গঠিত। যার অর্থ সৃষ্টি করা। কোরআন করীমে কয়েক জায়গায় এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كُفْرًا

প্রভৃতি। কাজেই ‘যুরিয়ায়্যাহ’-এর শব্দটি তরজমা হল সৃষ্টি। এ শব্দটি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই প্রতিশ্রুতি সে সমস্ত মানুষেরই ব্যাপক ও প্রসারিত যারা আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছে ও করবে।

হাদীসের রেওয়াজেতে এই আদি প্রতিশ্রুতির আরও কিছু বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। যথা :

ইমাম মালেক, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইমাম আহমদ (রহঃ) মুসলিম ইবনে ইয়াসারের বরাতে উদ্ধৃত করেছেন যে, কিছু লোক হযরত কাব্বাহ আ’যম (রাঃ)-এর নিকট এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এ আয়াতটির মর্ম জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তাঁর কাছে যে উত্তর আমি শুনেছি তাহল এই—

‘আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। তখন নিজের কুদরতের হাত যখন তাঁর পিঠে বুলিয়ে দিলেন, তখন তাঁর ঔরস যত সংমানুষ জন্মাবার ছিল তারা সব বেরিয়ে এল। তখন তিনি কানেন, এদেরকে আমি জন্মাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা জন্মাতেরই কাছ করবে। পুনরায় দ্বিতীয়বার তাঁর পিঠে কুদরতের হাত বুলালেন। তখন রূপ পাপী-তাপী মানুষ তাঁর ঔরসে জন্মাবার ছিল, তাদেরকে বের করে আনলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি দোষখের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা দোষখে যাবার মতই কাছ করবে।’ সাহাবীগণের মধ্যে একজন নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, প্রথমই যখন জন্মাতী ও দোষখী সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, তখন আর আমল করানো হয় কি উদ্দেশ্যে? হুযু (সাঃ) বললেন, ‘যখন আল্লাহ্ তাআলা কাউকে জন্মাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন সে জন্মাত বাসের কাছই করতে শুরু করে। এমনকি জা মৃত্যুও এমন কাজের ভেতরেই হয়, যা জন্মাতবাসীদের কাজ। জা আল্লাহ্ যখন কাউকে দোষখের জন্য তৈরী করেন, তখন সে দোষখ কাছই করতে আরম্ভ করে। এমনকি তার মৃত্যুও এমন কোন কাজে মাধ্যমেই হয়, যা জাহান্নামের কাজ।’

অর্থাৎ, মানুষ যখন জানে না যে, সে কোন শ্রেণীভুক্ত, তখন জা পক্ষে নিজের সামর্থ্য, শক্তি ও ইচ্ছাকে এমন কাজেই ব্যয় করা উচিত যা জন্মাতবাসীদের কাজ, আর এমন আশাই পোষণ করা কর্তব্য যে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর রেওয়াজেতে এ বিষয়টি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমবারে যারা জন্ম (আঃ)-এর ঔরস থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারা ছিল শেতবর্ণ—যাদের বলা হয়েছে জন্মাতবাসী। আর দ্বিতীয়বার যারা বেরিয়েছিল তারা নি কৃষ্ণবর্ণ—যাদেরকে জাহান্নামবাসী বলা হয়েছে।

আর তিরমিযীতেও একই বিষয় হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এ রেওয়াজেতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। এতে এ কথাও রয়েছে যে, একে কেয়ামত পর্যন্ত জন্মানোর মত যত আদমসন্তান বেরিয়ে এল, তাদের সমস্ত ললাটে একটা বিশেষ ধরনের দাঁপটি ছিল।

এখন লক্ষণীয় এই যে, এসব হাদীসে তো 'যুরিয়াত'-এর আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে নেয়ার এবং বেরিয়ে আসার কথা উল্লেখ রয়েছে, অথচ কোরআনের শব্দে 'বনী-আদম' অর্থাৎ, আদমসন্তানের ঔরসে জন্মগ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এতদুভয়ের সামঞ্জস্য এই যে, আদম (আঃ)-এর পিঠ থেকে তাদেরকে বের করা হয়েছে, যারা সরাসরি আদম (আঃ)-এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করার ছিল। তারপর তাঁর বংশধরদের পৃষ্ঠদেশ থেকে অন্যান্যদেরকে। এভাবে যে ধারায় এ পৃথিবীতে আদমসন্তানেরা জন্মাবার ছিল, সে ধারায়ই তাদেরকে পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছে।

হাদীসের বর্ণনায় সবাইকে আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করার অর্থও এই যে, আদম থেকে তাঁর সন্তানদিগকে, অতঃপর এই সন্তানদের থেকে তাদের সন্তানদিগকে আনুক্রমিকভাবে সৃষ্টি করা হয়।

কোরআন মজীদে সমস্ত আদমসন্তানের কাছ থেকে যে স্বীকৃতি নেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে, এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, এই আদমসন্তান, যাদেরকে তখন পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, তারা শুধু আত্মাই ছিল না; বরং আত্মা ও শরীরের এমন একটা সমন্বয় ছিল যা শরীরের স্ফুটতর অণু-পরমাণুর দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল। কারণ, পালনকর্তা, বিদ্যমানতা এবং লালন-পালনের প্রয়োজন বেশীর ভাগ সে ক্ষেত্রেই দেখা দেয়, যেখানে দেহ ও আত্মার সমন্বয় ঘটে এবং যাকে এক পর্যায়ে থেকে আরেক পর্যায়ে উন্নীত হতে হয়। রূহ বা আত্মাসমূহের অবস্থা তা নয়। তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকে। তাছাড়া উল্লিখিত হাদীসসমূহে যে তাদের সাদা ও কাল বর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিংবা তাদের ললাটদেশে দাঁড়ির বর্ণনা রয়েছে তাতেও বুঝা যায় যে, সেগুলো শুধু অশরীরী আত্মাই ছিল না। রূহ বা আত্মার কোন রং বা রস নেই; শরীরের সাথেই এসব গুণ-বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক হয়ে থাকে।

এতেও বিস্ময়ের কোন কারণ নেই যে, কেয়ামত পর্যন্ত জন্মাবার যোগ্য সমস্ত মানুষ এক জায়গায় কেমন করে সমবেত হতে পারল? কারণ, হযরত আবুদুদারদা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে এ বিষয়েও বিশ্লেষণ রয় গেছে যে, তখন যে আদমসন্তানকে আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করা হয়েছিল, সেগুলো নিজেদের প্রকৃত অবয়বে ছিল না, যা নিয়ে তারা পৃথিবীতে আসবে। বরং তখন তারা ছিল ক্ষুদ্র পিপড়ার মত। তাছাড়া নিজস্ব বর্তমান উন্নতির যুগে তো কোন সমঝদার লোকের মনে এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নেরই উদয় হওয়া উচিত নয় যে, এত বড় আকার-অবয়বসম্পন্ন মানুষ একটা পিপড়ার আকৃতিতে কেমন করে বিকাশ লাভ করল। ইদানীং তো একটি অণুর ভেতরে গোটা সৌরমণ্ডলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ফিল্মের মাধ্যমে একটি বড় চ্যেয়ে বড় বস্তুকেও একটি বিন্দুর আয়তনে দেখানো যেতে পারে। কাজেই আল্লাহ তাআলা যদি এই অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির সময় সমস্ত আদমসন্তানকে নিতান্ত ক্ষুদ্র দেহে অস্তিত্ব দান করে থাকেন, তবে তেমন কঠিন হবে কেন?

আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এই আদি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আরও কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। প্রথমতঃ এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেয়া হয়েছিল?

দ্বিতীয়তঃ এ অঙ্গীকার যখন এমন অবস্থাতে নেয়া হয় যে, তখন একমাত্র আদম ছাড়া অন্য কোন মানুষের জন্যই হয়নি, তখন তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কেমন করে হল, যাতে তারা আল্লাহকে চিনতে পারবে এবং

তার পালনকর্তা হওয়ার কথা স্বীকার করবে? কারণ, পালনকর্তার কথা সে-ই স্বীকার করতে পারে, যে পালনকর্তা সম্পর্কে জানবে বা প্রত্যক্ষ করবে। পক্ষান্তরে এই প্রত্যক্ষ করাটা এ পৃথিবীতে জন্মানোর পরেই সম্ভব হতে পারে।

প্রথম প্রশ্ন যে, প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি কোথায় এবং কখন নেয়া হয়েছিল-এ সম্পর্কে মোফাস্সের কোরআন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও হাকেম (রহঃ) যে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন তাহল এই যে, এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি তখনই নেয়া হয়, যখন আদম (আঃ)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়। আর এ প্রতিশ্রুতির স্থানটি হল, 'ওয়াদিয়ে নু'মান'- যা পরবর্তীকালে আরাকফাতের ময়দান নামে প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি লাভ করেছে।—(তফসীরে-মায়হারী)

খাকল দ্বিতীয় প্রশ্ন যে, এই নতুন সৃষ্টি যাকে এখনও উপকরণগত অস্তিত্ব দান করা হয়নি, সে কেমন করে বুঝবে যে, আমাদের কোন সৃষ্টা ও পালনকর্তা রয়েছেন? এমন অবস্থাতে তাদেরকে প্রশ্ন করাই তাদের উপর অসহনীয় চাপ, তা তারা উত্তর কি দেবে। এর উত্তর হল এই যে, যে বিশৃঙ্খলিত তার পরিপূর্ণ ক্ষমতাবলে সমস্ত মানুষকে একটি অণুর আকারে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পক্ষে তখন প্রয়োজনানুপাতে তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা-অনুভূতি দেয়া কি তেমন কঠিন ব্যাপার ছিল। আর প্রকৃতপক্ষে হয়েছে ছিল তাই। আল্লাহ-জাল্লা শানুহু সেই ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মাঝে যাবতীয় মানবীয় ক্ষমতার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল জ্ঞানানুভূতি।

স্বয়ং মানুষের অস্তিত্বে আল্লাহ তাআলার মহত্ব ও কুদরতের এমনসব অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে যে লোক সামান্যও লক্ষ্য করবে, সে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে গাফেল থাকতে পারে না। কোরআনে রয়েছে—

وَالْأَرْضُ لِلَّهِ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ

অর্থাৎ, বিজ্ঞানদের জন্য এ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার বহু নিদর্শন রয়েছে। আর স্বয়ং তোমাদের সত্তার মাঝেও (নিদর্শন রয়েছে), তবুও কি তোমরা দেখছ না?

এখানে তৃতীয় আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে, এই আদি প্রতিশ্রুতি (আহদে আলাপ্ত) যতই নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ হোক না কেন, কিন্তু এ কথাটি তো অশ্রুতঃ সবাই জানে যে, এ পৃথিবীতে আসার পর এ প্রতিশ্রুতি কারোই সুরণ থাকেনি। তাহলে প্রতিশ্রুতিতে লাভটা কি হল?

এর উত্তর এই যে, একে তো এই আদমসন্তানদের মধ্যে অনেক এমন ব্যক্তিবর্গও রয়েছে যারা একথা স্বীকার করেছেন যে, আমাদের এই প্রতিশ্রুতির কথা যথার্থই মনে আছে। হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেছেন, এই প্রতিশ্রুতির কথা আমার এমনভাবে সুরণ আছে, যেন এখনও শুনছি। আর অনেকে তো এমনও বলেছেন যে, যখন এই স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হয়, তখন আমার আশেপাশে কারা কারা উপস্থিত ছিল সে কথাও আমার সুরণ আছে। তবে একথা বলাই বাহুল্য যে, এমন লোকের সংখ্যা একান্তই বিরল। কাজেই সাধারণ লোকের বুঝার বিষয় হল এই যে, বহু কাজ থাকে যেগুলোর বৈশিষ্ট্যগত কিছু প্রভাব থেকে যায়, তা কারো সুরণ থাক বা নাই থাক। এ বিষয়ে কারও ধারণা-কল্পনা না থাকলেও সে তার প্রভাব বিস্তার করবেই। এই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির অবস্থাও তেমনি। প্রকৃতপক্ষে এই স্বীকারোক্তি প্রত্যেকটি মানুষের মনে

খোদা-পরিচিতির একটা বীজ বপন করে দিয়েছে, যা ক্রমান্বয়ে লালিত হচ্ছে, সে ব্যাপারে কারও জ্ঞান থাক কিংবা না থাক। আর এই বীজেরই ফল-ফসল এই যে, প্রতিটি মানুষের মনেই ঐশী প্রেম ও মহত্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে—তার বিকাশ যেভাবেই হোক। চাই পৌত্তলিকতা এবং সৃষ্টি-পূজার কোন ভ্রান্ত পদ্ধতির মাধ্যমেই হোক বা অন্য কোনভাবে। সেই কতিপয় হতভাগ্য, যাদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গিয়ে তাদের জ্ঞান ও রুচিবোধ বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং তিক্ত-মিষ্টির পার্থক্য করাও যাদের দ্বারা সম্ভব নয়, তাদের ছাড়া সমগ্র দুনিয়ার শত শত কোটি মানুষ আল্লাহর ধ্যান, তাঁর কল্পনা ও মহিমামূর্তি অস্তিত্বের অনুভূতি থেকে শূন্য নয়। অবশ্য যদি কেউ জৈবিক কামনা-বাসনায় মোহিত হয়ে অথবা কোন গোমরাহ ও ভ্রষ্ট সমাজ-পরিবেশের কবলে পড়ে সেই সহজাত বৃত্তিকে ভুলে যায়, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। মহানবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন **كُلُّ عَلَىٰ هَذِهِ الْمَلَّةِ** কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে **مولود يولد على الفطرة** (বোখারী, মুসলিম) অর্থাৎ, প্রতিটি সন্তান স্বভাববর্ষ অর্থাৎ, ইসলামের উপরেই জন্মায়। পরে তার পিতা-মাতা তাকে অন্যান্য মত ও পথে প্রবৃত্ত করে দেয়। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আল্লাহ বলেন যে, আমি আমার বন্দাদিগকে ‘হানীফ’ অর্থাৎ, এক আল্লাহুতে বিশূসীরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের পেছনে লেগে গেছে এবং তাদেরকে সেই সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

এমনিভাবে বৈশিষ্ট্যগত প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন বহু আমল ও কথা রয়েছে, যা এ পৃথিবীতে ও নবী-রসূল (আঃ)—এর শিক্ষার মাধ্যমে প্রচলিত হয়েছে। সেগুলোর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মানুষ বুঝুক বা না বুঝুক, স্মরণ রাখুক বা না রাখুক। সেগুলো কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই নিজের কাজ করে যাচ্ছে এবং আপন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিকশিত করছে।

উদাহরণতঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে তার ডান কানে আযান আর বাম কানে একামত ও তবকীর বলার যে সুনুতটি সব মুসলমানই জানে এবং (আলহামদু লিল্লাহ) সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রচলিত রয়েছে—যদিও শিশুরা এসব বাক্যের অর্থ কিছুই বুঝে না এবং বড় হওয়ার পর স্মরণও থাকে না যে, তার কানে কি কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু তবুও এর একটা তাৎপর্য রয়েছে। আর তাহল এই যে, এতেকরে সেই আদি প্রতিশ্রুতিতে শক্তি সঞ্চার করে কানের পথে অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করে দেয়া হয়। পরবর্তীকালে এরই প্রতিক্রিয়ায় লক্ষ্য করা যায় যে, বড় হওয়ার পর যদি সে ইসলাম ও ইসলামিয়াত থেকে বহু দূরেও সরে পড়ে, কিন্তু নিজেকে নিজে মুসলমান বলে এবং মুসলমানের তালিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে একান্তই খারাপ মনে কর। এমনিভাবে যারা কোরআনের ভাষা জানে না তাদের প্রতিও কোরআন তেলাওয়াতের যে নির্দেশটি দেয়া হয়েছে, তারও তাৎপর্য হয় তো এই যে, এতেকরে অন্ততঃ এই গোপন উপকারিতা নিশ্চিতই লাভ হয় যে, মানুষের মনে ঈমানের জ্যোতি সজীব হয়।

সেজন্যই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে : **أَن تَقُولُوا أَوَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ قَبْلَ نَافِلَةٍ** অর্থাৎ, এ স্বীকারোক্তি আমি এ কারণে গ্রহণ করেছি যাতে তোমরা কেয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই আদি প্রশ্নোত্তরে তোমাদের অন্তরে ঈমানের মূল এমনিভাবে স্থাপিত হয়ে গেছে যে, সামান্য একটু চিন্তা করলেই তোমাদের পক্ষে আল্লাহ রাব্বুল

আলামীনকে পালনকর্তা স্বীকার না করে কোন অব্যাহতি থাকবে না।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে **وَأَوَّلُوا رَبَّكُمُ الْأَوَّلَ**

وَنَاقِلُوا

অর্থাৎ, এ অঙ্গীকার আমি এ জন্মেও গ্রহণ করেছি, আমার না তোমরা কেয়ামতের দিন এমন কোন ওয়র-আপত্তি করতে থাক যে, শিরক ও পৌত্তলিকতা তো আসলে আমাদের বড়রা অবলম্বন করেছিল, আর আমরা তো ছিলাম তাদের পরে তাদের বংশধর। আমরা তো খাটি-অখাটি, ভুল-শুদ্ধ কোনটাই জানতাম না। কাজেই বড়রা যা কিছু করেছে আমরাও তাই করেছি। অতএব, বড়দের শাস্তি আমাদেরকে দেয়া হবে কেন? আল্লাহ তাআলা বাতলে দিয়েছেন যে, অন্যের শাস্তি তোমাদেরকে দেয়া হয়নি; বরং স্বয়ং তোমাদেরই শৈথিল্য ও গাফলতির শাস্তি দেয়া হয়েছে। কারণ, আদি প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানবাত্মায় এমন এক জ্ঞান ও দর্শনের বীজ রোপণ করে দেয়া হয়েছিল যাতে সামান্য চিন্তা করলেই এটুকু বিষয় বুঝতে পারা কোন কঠিন ছিল না যে, এসব পাথরের মূর্তি যেগুলোকে আমরা নিজের হাতে গড়ে নিয়েছি কিংবা আশুন, পানি, বৃক্ষ অথবা কোন মানুষ প্রভৃতির কোন একটিও এমন নয়, যাকে কোন মানুষ নিজের স্রষ্টা ও পালনকর্তা বা মোক্ষদাতা কিংবা মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস করতে পারে।

তৃতীয় আয়াতেও একই বিষয়ে বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে **وَأَوَّلُوا رَبَّكُمُ الْأَوَّلَ**

অর্থাৎ, আমি এমনিভাবে আমার নিদর্শনগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি, যাতে মানুষ শৈথিল্য, গাফলতি ও অনাচার থেকে ফিরে আসে। অর্থাৎ, আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে যদি কেউ সামান্য লক্ষ্যও করে, তাহলে সে সেই আদি প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির দিকে ফিরে আসতে পারে, যা সৃষ্টিলগ্নে করেছি। অর্থাৎ, একটু লক্ষ্য করলেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পালনকর্তা হওয়ার স্বীকৃতি দিতে শুরু করবে এবং তার ফলে তাঁর আনুগত্যকে নিজের জন্য অবশ্যজ্ঞাবী মনে করবে।

উল্লিখিত আয়াতে বনী-ইসরাঈলের জন্মক বড় আলেম ও অনুসরণীয় ব্যক্তির জ্ঞান ও দর্শনের সুউচ্চ স্তরে পৌঁছার পর সহসা গোমরাহ ও অভিশপ্ত হয়ে যাওয়ার একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা এবং তার কারণসমূহ বিবৃত হয়েছে। আর তাতে বহু শিক্ষণীয় বিষয়ও রয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এ ঘটনার যোগসূত্র এই যে, পূর্বে আয়াতগুলোতে সেই প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতির আলোচনা ছিল যা আল্লাহ তাআলা আদিলগ্নে সমস্ত আদমসন্তান থেকে এবং পরবর্তীতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহুদী-নাসারা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতি-সম্প্রদায়ে কাছ থেকে নিয়েছেন। আর উল্লিখিত আয়াতগুলোতে এ আলোচনাও প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছিল যে, প্রতিশ্রুতিদাতাদের মধ্যে অনেককেই সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। যেমন, ইহুদীরা খাতেমুনাবিয়ীন (সাঃ)—এর এ পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে তাঁর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করত এবং তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও আকার-অবয়ব সম্পর্কে মানুষের কাছে বর্ণনা করত এবং তিনি যে সত্য নবী তাও প্রমাণ করত। কিন্তু যখন মহানবী (সাঃ)—এর আবির্ভাব হয়, তখন তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থের লোভে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে এবং তাঁর অনুসরণ করতে বিরত থাকে।

বনী-ইসরাঈলের জনৈক অনুসরণীয় আলেমের পঞ্চদশতম বর্ষমূলক ঘটনা : এ আয়াতগুলোতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি স্বীয় জাতিকে সে ঘটনা শুনিয়ে দিন, যাতে বনী-ইসরাঈলের একজন বিরাট আলেম ও আরোফের এমনি উত্থানের পর পশু ও হেদায়েতের পর গোমরাহীর কথা বর্ণিত রয়েছে। সে বিস্তারিত জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ মারফাত হাসিল করার পর যখন রৈপিক কামনা-বাসনা ও স্বার্থ তার উপর প্রবল হয়ে গেল, তখন তার সমস্ত জ্ঞান-গরিমা, নৈকট্য ও সমস্ত মর্যাদা বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং তাকে চরম লাজুনা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হল।

কোরআন মজীদে সে লোকের নাম বা কোন পরিচয় উল্লেখ করা হয়নি। তফসীরবিদ, সাহাবী ও তাবৈঈনের কাছ থেকে এ ব্যাপারে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ এবং ঐক্যবিশিষ্ট আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য রেওয়ায়েতটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে হযরত ইবনে মারদুত্য়াহ (রহঃ) উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে যে, সে লোকটির নাম ছিল বালআম ইবনে বাউ'রা। সে সিরিয়ায় বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকটবর্তী কেন্‌আনের ঐক্যবাসী ছিল। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, সে বনী-ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোক ছিল। আল্লাহর কোন কোন কিতাবের এলেম তার ছিল। তার গুণ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোরআন করীমে যে ﴿يُؤْتِي الْكَلِمَ الْأَثْوَرُ﴾ বলা হয়েছে, তাতে সে এলেমের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ফেরাউনের জল-মগ্নতা ও মিসর বিজয়ের পর যখন হযরত মুসা (আঃ) ও বনী-ইসরাঈলদিগকে 'জাব্বারীন' সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করার হুকুম হল এবং 'জাব্বারীন' সম্প্রদায় যখন দেখল যে, মুসা (আঃ) সফল বনী-ইসরাঈল সৈন্যসহ পৌঁছে গেছেন-পক্ষান্তরে তাদের মোকাবেলায় ফেরাউন সম্প্রদায়ের জল-মগ্ন হয়ে মরার কথা পূর্ব থেকেই তাদের জানা ছিল, তখন তাদের ভয় হল। তারা সবাই মিলে বালআম ইবনে বাউ'রার কাছে সমবেত হয়ে বলল, মুসা (আঃ) অতি কঠিন লোক, তদুপরি বিপুল সংখ্যক লোকজনও রয়েছে তাঁর সাথে; তারা এসেছে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্য। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি তাদেরকে আমাদের মোকাবেলা থেকে ফিরিয়ে দেন। বালআম ইবনে বাউ'রা ইসমে আ'যম জানত এবং সেই ইস্মের মাধ্যমে যে দোয়া করত তাই কবুল হত।

বালআ'ম বলল, অতি পরিতাপের বিষয়, তোমরা একি বলছ! তিনি হলেন আল্লাহর নবী। তাঁর সাথে রয়েছেন আল্লাহর ফেরেশতা। আমি তাঁর বিরুদ্ধে কেমন করে বদদোয়া করতে পারি? অথচ আল্লাহর দরবারে তাঁর যে মর্যাদা, তাও আমি জানি। আমি যদি এহেন কাজ করি, তাহলে আমার দুনিয়া-আখেরাত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

সমাজের প্রভাবশালী লোকেরা পীড়াপীড়ি করতে থাকলে বালআ'ম বলল, আচ্ছা, তাহলে আমি আমার পালনকর্তার নিকট জেনে নেই; এ ব্যাপারে দোয়া করার অনুমতি আছে কিনা? সে তার নিয়মানুযায়ী বিষয়টি জ্ঞানার জন্য এস্তেখারা কিংবা অন্য কোন আমল করল। তাতে স্বপ্নযোগে তাকে বলে দেয়া হল, সে যেন এমন কাজ কখনও না করে। সে সম্প্রদায়কে বলল যে, বদদোয়া করতে আমাকে বারণ করা হয়েছে। তখন সমাজপতিরা তাকে একটা লোডনীয় উপটৌকন দান করল। প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল উৎকোচবিশেষ। সে যখন সেই উপটৌকন গ্রহণ করে নিল,

তখন সম্প্রদায়ের লোকজন তার পেছনে লেগে গেল যে, আপনি একাজ্জিট করে দিন। তাদের অনুরোধ-উপরোধ আর পীড়াপীড়ির অন্ত ছিল না। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী তার স্ত্রী উৎকোচ গ্রহণ করে তাদের কাজটি করে দেয়ার পরামর্শ দেয়। তখন স্ত্রীর সন্তুষ্টি কামনা এবং সম্পদের মোহ তাকে অন্ধ করে দিল। ফলে সে মুসা (আঃ) এবং বনী-ইসরাঈলদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে আরম্ভ করল।

সে মুহুর্তে আল্লাহর মহা কুদরতের এক আশ্চর্য বিষয় দেখা দেয়-মুসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে গিয়ে সে যেসব বাক্য বলতে চাইছিল সেসবই নিজ সম্প্রদায়ের প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে উচ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল। তখন সবাই চীৎকার করে উঠল, তুমি যে আমাদের জন্যই বদদোয়া করছ। বালআ'ম বলল, এটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়-আমার জিহ্বা এর বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ নয়।

ফল দাঁড়াল এই যে, সে সম্প্রদায়ের উপর ধ্বংস নামিল হল। আর বালআ'মের শাস্তি হল এই যে, তার জিহ্বা বেরিয়ে এসে বুকের উপর লটকে গেল। এবার সে নিজ সম্প্রদায়কে বলল, আমার যে দুনিয়া-আখেরাত সবই শেষ হয়ে গেল। আমার দোয়া যে আর চলছে না। তবে আমি তোমাদিগকে একটা কৌশল বলে দিচ্ছি, যার দ্বারা তোমরা মুসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে।

তাহল এই যে, তোমরা তোমাদের সুন্দরী নারীদিগকে সাজিয়ে বনী-ইসরাঈল সৈন্যদের মাঝে পাঠিয়ে দাও। তাদেরকে একথা ভাল করে বুঝিয়ে দাও যে, বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাদের সাথে যা-ই কিছু করতে চায়, তারা যেন তা করতে দেয়; কোন রকম বাধা যেন না সাধে। এরা মুসাফির, দীর্ঘদিন ঘর ছাড়া, হয় তো বা এরা এ ব্যবস্থায় ব্যতিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহর নিকট ব্যতিচার অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ। যে জাতির মাঝে তা অনুপ্রবেশ করে, তাদের উপর গযব ও অভিসম্পাত নামিল হয়, সে জাতি কখনও বিজয় কিংবা কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারে না।

বালআ'মের এই পৈশাচিক চালটি তাদের বেশ পছন্দ হল এবং সেমতেই কাজ করা হল। বনী-ইসরাঈলদের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ চালের শিকার হয়ে গেল। হযরত মুসা (আঃ) তাকে এই দুষ্কর্ম থেকে বারণ করলেন। কিন্তু সে বিরত হল না; বরং পৈশাচিক ফাঁদে জড়িয়ে পড়ল।

ফলে বনী-ইসরাঈলের মাঝে কঠিন প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল। তাতে একই দিনে সত্তর হাজার ইসরাঈলী মৃত্যুমুখে পতিত হল। এমনকি যে লোক অসৎকর্মে লিপ্ত হয়েছিল, তাকে এবং যার সাথে লিপ্ত হয়েছিল তাকে বনী-ইসরাঈলরা হত্যা করে প্রকাশ্যে টাঙ্গিয়ে রাখল, যাতে অন্যান্যরা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তারা সবাই তওবাও করল। তখন সে প্লেগ দমিত হল।

কোরআন মজীদে উল্লেখিত ব্যাপারে বলা হয়েছে, فَاسْلَخَ مِنْهُمْ أَنسِلَاسَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ فَأَسْلَخَ مِنْهُمْ أَنسِلَاسَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿١٠١﴾ (ইনসেলাখুন) শব্দটি প্রকৃতপক্ষে পশুদের চামড়ার ভেতর থেকে কিংবা সাপের ছলমের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে বলা হয়। এখানেও আয়াতের জ্ঞানকে একটি পোশাক বা লেবাসের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, এ লোকটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে সরে

পড়েছে। فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ (শয়তান তার পেছনে লেগে গেছে।) অর্থাৎ,

যে পর্যন্ত আয়াতের জ্ঞান এবং আল্লাহর স্মরণ তার সাথে ছিল, সে পর্যন্ত তার উপর শয়তান কোন রকম প্রভাব বিস্তার করতে পারছিল না। কিন্তু যখন তা শেষ হয়ে গেল, তখন শয়তান তাকে কাবু করে ফেলল।

فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (অতঃপর সে হয়ে গেল গোমরাহদের অন্তর্ভুক্ত।)

অর্থাৎ, শয়তান কাবু করে ফেলার দরুন সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَئِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهُ

অর্থাৎ, আমি ইচ্ছা করলে এসব আয়াতের মাধ্যমে তাকে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন করে দিতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গিয়ে রৈপিক কামনা-বাসনার দাসত্ব করতে শুরু করেছে। এখানে أَخْلَدَ শব্দটি اخلاذ ধাতু থেকে গঠিত হয়েছে। যার অর্থ হল কোন কিছুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া কিংবা কোন স্থানকে আঁকড়ে ধরা। আর ارض—এর প্রকৃত অর্থ হল ভূমি। পৃথিবীতে যাবতীয় যাকিছু রয়েছে সেগুলো হয় সরাসরি ভূমি হবে, আর না হয় ভূমিসংক্রান্ত বিষয়সম্পত্তি, বাড়ী-ঘর, ক্ষেত-খামার প্রভৃতি হবে অথবা ভূমি থেকেই উৎপন্ন অন্যান্য লাঞ্ছা-কোটি বস্তু-সামগ্রী, যার উপর মানুষের জীবন এবং আরাম-আয়েস নির্ভরশীল। সুতরাং 'ارض' (আরদ) শব্দ বলে এখানে সমগ্র পৃথিবীকেই বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে যে, ঐ আয়াতসমূহ এবং সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হল প্রকৃত মর্যাদা ও উন্নতির কারণ। কিন্তু যে লোক এ সমস্ত আয়াতের যথার্থ সম্মান না দিয়ে পার্থিব কামনা-বাসনাকে আল্লাহর আয়াতসমূহ অপেক্ষা অগ্রাধিকার দেবে, তার জন্য ঐই জ্ঞানই মহাবিপদ হয়ে যাবে।

এই বিপদের কথাটিও আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে—فَتَنَّاكَ كَهَنَسٍ

الْكَلْبِ إِنَّ عَيْنَ عِيَالِهِمْ وَأَنَّكَ يَكْفُرُ لَهٗ - অর্থাৎ, শব্দের প্রকৃত অর্থ হল জিহ্বা বের করে জ্বোরে শ্বাস নেয়া।

প্রত্যেকটি প্রাণীই নিজের জীবন রক্ষার জন্য ভেতরের উষ্ণ বায়ু বাইরে বের করে দিতে এবং বাইরে থেকে নতুন তাজা বায়ু নাক ও গলার মাধ্যমে ভেতরে টেনে নিতে বাধ্য। এরই উপর নির্ভরশীল প্রতিটি প্রাণীর জীবন। আল্লাহ তাআলাও প্রত্যেক জীবের জন্য একাক্ষতি এতই সহজ ও সাবলীল করে দিয়েছেন যে, কোন ইচ্ছা বা পরিশ্রম ছাড়াই নাকের রক্ত দিয়ে ভেতরের হাওয়া বাইরে এবং বাইরের হাওয়া ভেতরে আসা-যাওয়া করছে। এতে না কোন শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, না ইচ্ছা করে করার প্রয়োজন পড়ে। স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিকভাবেই এ একাক্ষতি ক্রমাগত সম্পন্ন হতে থাকে।

জীব-জন্তুর মধ্যে শুধু কুকুরই এমন এক জীব, যাকে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের আসা-যাওয়ার ব্যাপারে জিহ্বা বের করে জ্বোরে দিতে হয় এবং পরিশ্রম করতে হয়। অন্যান্য জীবের বেলায় এমন অবস্থা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন তাদের প্রতি কেউ আক্রমণ করে কিংবা সে ক্রান্ত-পরিণাম হয়ে পড়ে অথবা আকস্মিক কোন বিপদের সম্মুখীন হয়।

কোরআন করীম সে ব্যক্তিকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছে। তার কারণ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার দরুনই তাকে এ শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তার জিহ্বা বেরিয়ে গিয়ে বুকের উপর ঝুলে পড়েছিল এবং তাতে সে অনবরত কুকুরের মত হাঁপাচ্ছিল। তাকে কেউ তাড়া করল আর না-ই করল, সে যে কোন অবস্থায় শুধু হাঁপাতেই থাকত।

উল্লেখিত আয়াতগুলোর সারমর্ম হচ্ছে—

প্রথমতঃ কারো পক্ষেই নিজের জ্ঞান-গরিমা এবং এবাদত-উপাসনার ব্যাপারে গর্ব করা উচিত নয়। কারণ, সময় বদলাতে এবং বিপরীতগামী হতে দেবী হয় না। যেমন হয়েছিল বালুআ'ম ইবনে বাউয়ার পরিণতি। এবাদত-উপাসনার সাথে সাথে আল্লাহর শোকরগোয়ারী ও তাতে দৃঢ়তার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা এবং তাঁর উপর ভরসা করা কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ এমনসব পরিবেশ ও কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা উচিত, যাতে স্বীয় ধর্মীয় ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। বিশেষ করে ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতির ভালবাসার ক্ষেত্রে সেই অশুভ পরিণতির কথা সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যিক।

তৃতীয়তঃ অসৎ ও পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের নিমন্ত্রণ বা উপহার-উপঢৌকন গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থাকাও কর্তব্য। কারণ, আস্ত লোকদের উপঢৌকন গ্রহণ করার কারণেই বালুআম ইবনে বাউরা ঐই মহাবিপদের সম্মুখীন হয়েছিল।

চতুর্থতঃ অশ্লীলতা ও হারামের অনুসরণ গোটা জাতির জন্য ধ্বংস ও বিলুপ্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে জাতি নিজেদেরকে বিপদাপদ থেকে বিমুক্ত রাখতে চায়, তার কর্তব্য হল নিজ জাতিতে যথাশক্তি অশ্লীলতার প্রাচীর হতে বিরত রাখা। অন্যথায় আল্লাহ তাআলার আযাবকেই আমন্ত্রণ জানানো হবে।

পঞ্চমতঃ আল্লাহর আয়াতসমূহের বিরুদ্ধাচরণ নিজেও একটি আযাব এবং এর কারণে শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে গিয়ে আরও হাজার রকমের মন্দ কাজে উদ্বুদ্ধ করে দেয়। কাজেই যে লোককে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন, সাধ্যমত সে জ্ঞানের সম্মান দান এবং নিজ আমল সংশোধনের চিন্তা থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও বিরত না থাকা তার একান্ত কর্তব্য।



(১৭৯) আর আমি সৃষ্টি করেছি দোষখের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তার দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তার দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুশ্চন্দ্র জন্তর মড; বরং তাদের চেয়েও নিকটতর। তারা ই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ। (১৮০) আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে ঝঁক পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে। (১৮১) আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে এমন এক দল রয়েছে যারা সত্য পথ দেখায় এবং সে অনুযায়ী ন্যায়বিচার করে। (১৮২) বস্ত্ততঃ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার আয়াতসমূহকে, আমি তাদেরকে ক্রমানুয়ে পাকড়াও করব এমন জায়গা থেকে, যার সম্পর্কে তাদের ধারণাও হবে না। (১৮৩) বস্ত্ততঃ আমি তাদেরকে ঢিল দিয়ে ধাকি। নিঃসন্দেহে আমার কৌশল সূনিপূর্ণ। (১৮৪) তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, তাদের সম্মুখী লোকটার মস্তিষ্কে কোন বিকৃতি নেই? তিনি তো ভীতি প্রদর্শনকারী প্রকৃষ্টভাবে। (১৮৫) তারা কি প্রত্যক্ষ করেনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজ্য সম্পর্কে এবং যাকিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তাআলা বস্ত্ত-সমগ্রী থেকে এবং এ ব্যাপারে যে, তাদের সাথে কৃত ওয়াদার সময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে? বস্ত্ততঃ এরপর কিসের উপর ঈমান আনবে? (১৮৬) আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন। তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। আর আল্লাহ তাদেরকে তাদের দুষ্কার্যমতে মত্ত অবস্থায় ছেড়ে দিয়ে রাখেন। (১৮৭) আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও যমীনের জন্য এসে অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই সেটি যাবে। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধান লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহর নিকটই রয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করে না।

কাকেরদের না বোঝা, না দেখা ও না শোনার তাৎপর্য : এ আয়াতে সেসব লোকের বোঝা, দেখা ও শুনাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এরা কিছুই বোঝে না, কোন কিছু দেখেও না এবং শোনেও না। অথচ বাস্তবে এরা পাগল বা উদ্মাদ নয় যে, কিছুই বুঝতে পারে না। অন্ধও নয় যে, কোন কিছু দেখবে না, কিংবা কালাও নয় যে, কোন কিছু শোনেবে না। বরং প্রকৃতপক্ষে এরা পার্শ্বিক বিষয়ে অধিকাংশ লোকের তুলনায় অধিক সতর্ক ও চতুর।

কিন্তু কথা হল এই যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় সৃষ্টিসমূহের মধ্যে প্রত্যেক সৃষ্টির প্রয়োজন অনুপাতে তার জীবনের লক্ষ্য অনুযায়ী বুদ্ধি ও উপলব্ধি ক্ষমতা দান করেছেন। যেসব জিনিসকে আমরা বুদ্ধি বিবজ্জিত ও অনুভূতিহীন বলে মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোও জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা-অনুভূতি বিবজ্জিত নয়। অবশ্য এসব বিষয় সেগুলোর মাঝে সে অনুপাতেই দেয়া হয়েছে যেটুকু তাদের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন। সবচেয়ে কম বুদ্ধি ও চেতনা-উপলব্ধি রয়েছে মাটি, পাথর প্রভৃতি জড় পদার্থের মাঝে। যাদের না আছে প্রবুদ্ধি, না স্বস্থান থেকে কোথাও যাওয়া কিংবা চলাফেরার প্রয়োজন। কাজেই এতে সে শক্তি-সামর্থ্য এতই ক্ষীণ যে, তাদের জীবনীশক্তির আদাজ করাও কঠিন। এগুলোর চাইতে সামান্য বেশী রয়েছে উদ্ভিদদের মধ্যে, যার অস্তিত্বের লক্ষ্যের মাঝে প্রবুদ্ধি এবং ফল দান প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এগুলোকে বুদ্ধি-উপলব্ধি সে অনুপাতেই দেয়া হয়েছে। তারপর আসে পশুর নম্বর; যাদের জীবনের উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রবর্ধন ও চলাফেরা করে খাবার আহরণ, ক্ষতিকর বিষয় থেকে আত্মরক্ষা আর বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়। এ কারণেই তাদেরকে যে বুদ্ধি, চেতনা ও অনুভূতি দেয়া হয়েছে তা অন্যান্য সৃষ্টির তুলনায় বেশী। কিন্তু ততটুকু বেশী যাতে তারা নিজেদের পানাহার, উদরপূর্তি ও নিদ্রা-জাগরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে পারে, শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এসবের পরে আসে মানুষের নম্বর; যার অস্তিত্বের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হল নিজের স্রষ্টা ও পালনকর্তাকে চেনা, তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চলা, তাঁর অসন্তুষ্টির বিষয় থেকে বেঁচে থাকা, সমগ্র সৃষ্টির তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য করা এবং তার দ্বারা উপকৃত হওয়া। সমগ্র বস্ত্তজগতের পরিণতি ও ফলাফলকে উপলব্ধি করা, আসল ও মেকী যাচাই করে যা ভাল, মঙ্গল ও কল্যাণকর সেগুলোকে গ্রহণ করা, আর যাকিছু মন্দ, অকল্যাণকর সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা। এ কারণেই মানব জাতি এমন বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত হয়েছে, জীবনের উন্নতি লাভের সুবিস্তৃত ক্ষেত্র লাভ করেছে যা অন্য কোন সৃষ্টি পায়নি। মানুষ উন্নতি লাভ করে ফেরেশতাদের কাতার থেকেও এগিয়ে যেতে পারে। একমাত্র মানুষের মাঝেই এমন গুণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে যে, তার কর্মের জন্য ভাল-মন্দ প্রতিদান রয়েছে। যে কারণে তাদেরকে বুদ্ধি, জ্ঞান এবং চেতনা-উপলব্ধিও দেয়া হয়েছে সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় অধিক, যাতেকরে সাধারণ জীবের স্তরের উর্ধ্বে উঠে নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য মোতাবেক কাজে আত্মনিয়োগ করে। আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ বুদ্ধি, চেতনা ও উপলব্ধিকে এবং দর্শন ও শ্রবণশক্তিকে যেন সেমত কাজে নিয়োগ করে।

এই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়টি সামনে এসে যাবার পর একজন মানুষের বোঝা, তার দর্শন ও শ্রবণ অন্যান্য জীব-জন্তুর বোঝা, শোনা ও দেখা থেকে ভিন্ন রকম হওয়াই উচিত। মানুষও যদি নিজেদের দর্শন, শ্রবণ ও বিবেচনাশক্তিকে তেমনি কাজে নিয়োগ করে, যেমন কাজে অন্যান্য

জীব-জন্তুরা নিয়োগ করে থাকে এবং মানুষের জন্য মন্দ পরিণতি ও ভবিষ্যৎ ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখা, অমঙ্গল থেকে বঁচা থাকা, কল্যাণ ও মঙ্গলকর বিষয়কে গ্রহণ করা প্রভৃতি যেসব কাজ নির্ধারিত ছিল, সেগুলোর প্রতি যদি লক্ষ্য না রাখে, তবে বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তাকে নির্বোধ বলা হবে, চোখ থাকার সত্ত্বেও তাকে অন্ধ এবং কান থাকার সত্ত্বেও তাকে বধির বলেই আখ্যায়িত করা হবে। সেজন্যই কোরআন করীম অন্যত্র এ ধরনের লোকদিগকে وَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ অর্থাৎ, কানা, বোবা ও অন্ধ বলে আখ্যায়িত করেছে।

এতে একথা বিবৃত করা হয়নি যে, তারা নিজেদের পানাহার, থাকা-পরা ও নিদ্রা-জাগরণ প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজন সম্পর্কেও বোঝে না কিংবা জৈবিক প্রয়োজন সম্পর্কিত বিষয়গুলোও দেখতে বা শোনতে পায় না; বরং স্বয়ং কোরআন-করীম তাদের সম্পর্কে এক জায়গায় বলেছে— يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ অর্থাৎ,

‘তারা পার্শ্বব জীবনের বাহ্যিক দিকগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, কিন্তু আখেরাত সম্পর্কে একান্ত গাফেল’। আর ফেরাউন, হামান এবং তাদের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছে— وَكَانُوا مُسْتَبْرِرِينَ ‘তারা একান্তভাবেই বাহ্যদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল’। কিন্তু তাদের বুদ্ধিমত্তা ও দর্শনক্ষমতার ব্যবহার যেহেতু শুধুমাত্র সে পর্যায়েই সীমিত ছিল, যে পর্যায়ে সাধারণ জীব-জন্তুর থাকে—অর্থাৎ, শুধু পেট ও দেহের সেবা করা, আত্মার সেবা কিংবা তার তৃপ্তি সম্পর্কে কোন কিছুই না ভাবা বা না দেখা—সেহেতু তারা এই বৈষয়িকতা ও সামাজিকতায় যত উন্নতি-অগ্রগতিই লাভ করুক না কেন, চন্দ্র ও মঙ্গলের অভিযানে যত বিজয়ই অর্জন করুক না কেন এবং কৃত্রিম উপগ্রহে সমগ্র নভোমণ্ডলকে ভরে দিক না কেন, কিন্তু এসবই পেট ও শরীরের সেবা, তার চেয়ে অধিক কিছু নয়। আত্মার স্থায়ী শান্তি ও তৃপ্তির জন্য এগুলোতে কিছুই নেই। কাজেই কোরআন তাদেরকে অন্ধ-বধির বলেছে। এ আয়াতে তাদের উপলব্ধি, দর্শন ও শ্রবণকে অস্বীকার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের যা বোঝা বা উপলব্ধি করা উচিত ছিল তারা তা করেনি, যা দেখা উচিত ছিল তা তারা দেখেনি, যাকিছু তাদের শোনা উচিত ছিল তা তারা শোনেনি। আর যাকিছু বুঝেছে, দেখেছে এবং শোনেছে, তা সবই ছিল সাধারণ জীব-জন্তুর পর্যায়ে বোঝা, দেখা ও শোনা, যাতে গাধা-ঘোড়া, গরু-ছাগল সবই সমান।

এ জন্যই উল্লেখিত আয়াতের শেষাংশে এসব লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে— اُولٰٓئِكَ لَا تَتَذَكَّرُ অর্থাৎ, এরা চতুশদ জীব-জানোয়ারেরই মত, শুধুমাত্র শরীরের বর্তমান কাঠামোর সেবায় নিয়োজিত। খাদ্য আর পেটই হলো তাদের চিন্তার সর্বোচ্চ স্তর। অতঃপর বলা হয়েছে— بَنَٰٓءُ مَوَٰصِلٍ অর্থাৎ, এরা চতুশদ জীব-জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট। তার কারণ চতুশদ জীব-জানোয়ার শরীয়তের বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত নয়—তাদের জন্য কোন সাজা-শাস্তি কিংবা দান-প্রতিদান নেই। তাদের লক্ষ্য যদি শুধুমাত্র জীবন ও শরীর কাঠামোতে সীমিত থাকে তবেই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষকে যে স্বীয় কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। সে জন্য তাদের সুফল কিংবা শাস্তি ভোগ করতে হবে। কাজেই এসব বিষয়কেই নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলে সাব্যস্ত করে বসা জীব-জন্তুর চেয়েও অধিক নিবুদ্ধিতা। তাছাড়া জীব-জানোয়ার নিজেদের প্রভু ও মালিকের সেবা যথার্থই সম্পাদন করে। পক্ষান্তরে অকৃতজ্ঞ না-ফরমান মানুষ স্বীয় মালিক, পরওয়ানদেগারের আনুগত্যে ক্রটি করতে থাকে। সে কারণে তারা চতুশদ জানোয়ার

আপেক্ষা বেশী নির্বোধ ও গাফেল প্রতিপন্ন হয়। কাজেই বলা হয়েছে اُولٰٓئِكَ الْغٰفِلُونَ অর্থাৎ, এরাই হলো প্রকৃত গাফেল।

وَاللّٰهُ الْغٰفِلُ عَنِ السَّاعَةِ اَلَمْ نَبَيِّنْ لَّكَ آٰيٰتِيْكَ فَكَادَ تَعُوْذُ بِهَا اَلَمْ نَجْعَلِ لَّكَ اٰیٰتٍ مُّبِيْنًا অর্থাৎ, সব উত্তম নাম আল্লাহরই জন্যে নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক।

‘আসমায়ে-হুসনা’ বা উত্তম নামের বিশ্লেষণ : উত্তম নাম বলতে সে সমস্ত নামকে বোঝানো হয়েছে, যা গুণ-বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরকে চিহ্নিত করে। বলাবাহুল্য, কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ স্তর যার উর্ধ্ব আর কোন স্তর থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র মহান পালনকর্তা আল্লাহ জাল্লা শানাহুর জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্টির পক্ষে এই স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, যে কোন পূর্ণ ব্যক্তি আপেক্ষা অপর ব্যক্তি পূর্ণতর এবং জ্ঞানী আপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হতে পারে। وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ ذِي الْعَرْشِ الْعَلِيِّ —এর মর্মও তাই। প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি আপেক্ষা অপর ব্যক্তি অধিকতর জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে।

সে কারণেই আয়াতে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে বোঝা যায় যে, এসব আসমায়ে-হুসনা বা উত্তম নামসমূহ একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য লাভ করা অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়; কাজেই فَادْعُوْهُ بِهَا অর্থাৎ, — এ বিষয়টি যখন জানা গেল যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কিছু আসমায়ে-হুসনা রয়েছে এবং সে সমস্ত আসমা বা নাম একমাত্র আল্লাহর সত্তার সাথেই নির্দিষ্ট, তখন আল্লাহকে যখনই ডাকবে এসব নামে ডাকাই কর্তব্য।

ডাকা কিংবা আহ্বান করা হলো ‘দোয়া’ শব্দের অর্থ। আর দোয়া শব্দটি কোরআনে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হল আল্লাহর যিকির, প্রশংসা ও তসবীহ-তাহলীলের সাথে যুক্ত। আর অপরটি হল নিজের অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা এবং বিপদাপদ থেকে মুক্তি আর সকল জটিলতার নিরসনকল্পে সাহায্যের আবেদন সম্পর্কিত। এ আয়াতে فَادْعُوْهُ শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যাপক। অতএব, আয়াতের মর্ম হল এই যে, হামদ, সানা, গুণ ও প্রশংসাকর্তন, তসবীহ-তাহলীলের যোগ্যও শুধু তিনিই এক বিপদাপদে মুক্তি দান আর প্রয়োজন মেটানোও শুধু তাঁরই ক্ষমতা। কাজেই যদি প্রশংসা বা গুণকর্তন করতে হয়, তবে তাঁরই করবে আর নিজের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা বিপদমুক্তির জন্য ডাকতে হলে, সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে শুধু তাঁকেই ডাকবে, তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে।

আর ডাকার সে পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব আসমায়ে-হুসনা বা উত্তম নামে ডাকবে যা, আল্লাহর নাম বলে প্রমাণিত।

দোয়া করার কিছু আদব-কায়দা : এ আয়াতের মাধ্যমে গোটা মুসলিম জাতি দোয়া প্রার্থনার বিষয়ে দু’টি হেদায়েত বা দিকনির্দেশ লাভ করেছে। প্রথমতঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্তাই প্রকৃত হামদ-সানা কিংবা বিপদমুক্তি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ডাকার যোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁকে ডাকার জন্য মানুষ এমন মুক্ত নয় যে, যেকোন শব্দে ইচ্ছা ডাকতে থাকবে, বরং আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহপরিবশ হয়ে আমাদিগকে সেসব শব্দসমষ্টিও শিখিয়ে দিয়েছেন যা তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদার উপযোগী। সেই সাথে এ সমস্ত শব্দেই তাঁকে ডাকার জন্য আমাদিগকে বাধ্য করে দিয়েছেন যাতে আমরা নিজের মতে শব্দের পরিবর্তন না করি। কারণ, আল্লাহর গুণ-বৈশিষ্ট্যের সব দিক লক্ষ্য রেখে তাঁর মহত্বের উপযোগী শব্দ

চলন করতে পারা মানুষের সাধ্যের উদ্দেশ্যে।

ইমাম বোখারী ও মুসলিম, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসুলে-করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে আয়ত্ত করে নেবে, সে জন্মাতে প্রবেশ করবে। এই নিরানব্বইটি নাম সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও হাকেম (রহঃ) সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর নিরানব্বই নাম পাঠান্তে যে উদ্দেশ্যের জন্যই প্রার্থনা করা হয়, তা কবুল হয়। আল্লাহ স্বয়ং ওয়াদা করেছেন - **أَعُوذُكَ أَنْتَجِبَ لَكَ** অর্থ, 'তোমরা যদি আমাকে ডাক, তাহলে আমি তোমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করব।' উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা জটিলতা বা বিপদমুক্তির জন্য দোয়া ছাড়া অন্য কোন পন্থা এমন নেই যাতে কোন না কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না এবং ফললাভ নিশ্চিত হবে। নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করতে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। তদুপরি একটা নগদ লাভ হল এই যে, দোয়া যে একটি এবাদত তার সওয়াব দোয়াকারীর আমলনামায় তখনই লেখা হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে - **الدعاء مخ العباد** অর্থ, দোয়া হল এবাদতের মগজ। যে উদ্দেশ্যে মানুষ দোয়া করে অধিকাংশ সময় হুবহু সে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কোন কোন সময় এমনও হয় যে, যে বিষয়টিকে প্রার্থনাকারী নিজের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছিল, তা তার পক্ষে কল্যাণকর নয় বলে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে সে দোয়াকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন, যা তার জন্য একান্ত উপকারী ও কল্যাণকর। আর আল্লাহর হামদ ও সানার মাধ্যমে যিকর করা হলো ইমানের খোরাক। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার প্রতি মানুষের মহব্বত ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তাতে সামান্য পার্থিব দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হলেও শীঘ্রই সহজ হয়ে যায়।

সেজন্যই বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে লোক চিন্তা-ভাবনা, পেরেশানী কিংবা কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তার পক্ষে নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়া উচিত। তাতে সমস্ত জটিলতা সহজ হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এরূপ -

لا اله الا الله العظيم الحليم - لا اله الا الله رب العرش العظيم - لا اله الا الله رب السموات والارض ورب العرش الكريم -

‘মুসতাদরাকে হাকমে’ হযরত আনাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলে-করীম (সাঃ) হযরত ফাতেমা যাহরা (রাঃ)-কে বলেন, আমার ওসীয়াতগুলো শুনে নিতে (এবং সেমতে আমল করতে) তোমার বাধা কিসে। সে ওসীয়াতটি হল এই যে, সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়াটি পড়ে নেবে -

يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني

كله ولا تكن لي نفسى طرفه عين

এ আয়াতটি সমস্ত মকসূদ ও জটিলতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য তুলনহীন। সারকথা হল এই যে, উল্লেখিত আয়াতের এ বাক্যে উম্মতকে দু'টি হেদায়েত দেয়া হয়েছে। একটি হল এই যে, যেকোন উদ্দেশ্য

হাসিলের জন্য, যে কোন বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য শুধুমাত্র আল্লাহকেই ডাকবে; কোন সৃষ্টিকে নয়। অপরটি হলো এই যে, তাকে সে নামেই ডাকবে যা আল্লাহ তাআলার নাম হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে; তার শব্দের কোন পরিবর্তন করবে না।

আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে - **وَرُوَاؤُ الْيَزِيدِ**

يُجِدُونَ فِي آسَائِهِ سُبُورُونَ مَا تَأْتُوا بِمِثْلِهِ অর্থ, সেসমস্ত লোকের

কথা ছাড়ুন, যারা আল্লাহ তাআলার আসমায়ে-হুসনার ব্যাপারে বাঁকা চাল অবলম্বন করে। তারা তাদের কৃত বাঁকায়ের প্রতিফল পেয়ে যাবে। অভিধান অনুযায়ী **الحاد** (এলহাদ) অর্থ খুঁকে পড়া এবং মধ্যমপন্থা থেকে সরে পড়া। এ কারণেই বগলী কবরকে **الحاد** বলা হয়। কারণ, তাতেও লাশ মাঝ থেকে সরিয়ে রাখা হয়। কোরআনের পরিভাষায় **الحاد** বলা হয় কোরআনের সঠিক অর্থ ছেড়ে তাতে এদিক সেদিকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জুড়ে দেয়াকে।

এ আয়াতে রসুলে-করীম (সাঃ)-কে হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, আপনি এমন সব লোকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলুন, যারা আল্লাহ তাআলার আসমায়ে-হুসনার ব্যাপারে বক্রতা অর্থাৎ, অপব্যাখ্যা ও অপবিশ্লেষণ করে।

আল্লাহর নামের বিকৃতি সাধনের নিষেধাজ্ঞা এবং তার কয়েকটি মিক : আল্লাহর নামের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির কয়েকটি পন্থাই হতে পারে। আর সে সমস্তই এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলার জন্য এমন কোন নাম ব্যবহার করা যা কোরআন-হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত নয়। সতর্কিত আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে কারোই এমন কোন অধিকার নেই যে, যে যা ইচ্ছা নাম রাখবে কিংবা যে গুণে ইচ্ছা তাঁর গুণকীর্তন করবে। শুধুমাত্র সে সমস্ত শব্দ প্রয়োগ করাই আবশ্যিক যা কোরআন ও সুন্নাহতে আল্লাহ তাআলার নাম কিংবা গুণবাচক হিসাবে উল্লেখিত রয়েছে। যেমন, আল্লাহকে ‘করীম’ বলা যাবে, কিন্তু ‘সখী’ বা ‘দাতা’ বলা যাবে না। ‘নূর’ বলা যাবে, কিন্তু জ্যোতি বলা যাবে না। ‘শাফী’ বলা যাবে, কিন্তু ‘তবীব’ বা ‘চিকিৎসক’ বলা যাবে না। কারণ, এই দ্বিতীয় শব্দগুলো প্রথম শব্দের সমার্থক হলেও কোরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি।

ইসলামে বিকৃতি সাধনের দ্বিতীয় পন্থাটি হলো আল্লাহর যে সমস্ত নাম কোরআন-হাদীসে উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোন নামকে অশোভন মনে করে বর্জন বা পরিহার করা। এতে সে নামের প্রতি বেআদবী বা অবজ্ঞা প্রদর্শন বুঝা যায়।

কোন লোককে আল্লাহ তাআলার জন্য নির্ধারিত নামে সম্বোধন করা জায়েয নয় : তৃতীয় পন্থা হলো আল্লাহর জন্য নির্ধারিত নাম অন্য কোন লোকের জন্য ব্যবহার করা। তবে এতে এই ব্যাখ্যা রয়েছে যে, আসমায়ে-হুসনাসমূহের মধ্যে কিছু নাম এমনও আছে যেগুলো স্বয়ং কোরআন ও হাদীসে অন্যান্য লোকের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। আর কিছু নাম রয়েছে যেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অপর কারোও জন্য ব্যবহার করার কোন প্রমাণ কোরআন-হাদীসে নেই। যেসব নাম আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সেসব নাম অন্যের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, রাহীম, রাব্বীদ, আলী, কারীম, আজীজ প্রভৃতি। পক্ষান্তরে আল্লাহ ছাড়া অপর কারো

জন্যে যেসব নামের ব্যবহার কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্যে এগুলোর ব্যবহার করাই উল্লেখিত ‘এলহাদ’ তথা বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত এবং না-জায়েয ও হারাম। যেমন, রাহমান, সুবহান, রায্যাক, খালেক, গাফফার, কুদ্দুস প্রভৃতি।

তদুপরি এই নির্দিষ্ট নামগুলো যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো ক্ষেত্রে কোন বাস্তব বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয় যে, যাকে এসব শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হচ্ছে তাকেই যদি খালেক কিংবা রায্যাক মনে করা হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণ কুফর। আর বিশ্বাস যদি বাস্তব না হয়, শুধুমাত্র অমনোযোগিতা কিংবা না বোঝার দরুন কাউকে খালেক, রায্যাক, রাহমান কিংবা সুবহান বলে ডেকে থাকে, তাহলে তা যদিও কুফর নয়, কিন্তু শেরেকী সুলভ শব্দ হওয়ার কারণে কঠিন পাপের কাজ বটে।

উল্লেখিত আয়াত সমূহের সারমর্ম এই যে, তাদের হঠকারিতা এবং সত্য গ্রহণে অনীহার দরুন তিনি যেন মনঃক্ষুণ্ণ না হন। কারণ, সত্য বিষয়টি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে পৌঁছে দেয়াই ছিল তাঁর নির্ধারিত দায়িত্ব। তা তিনি সম্পাদনও করেছেন। তাঁর উপর অর্পিত দায়-দায়িত্বও শেষ হয়ে গেছে। এখন কারও মানা না মানার ব্যাপারটি হল একান্ত ভাগ্যসংক্রান্ত। এতে তাঁর কোন হাত নেই। সুতরাং তিনি কেন দুঃখিত হবেন!

এ সূরার বিষয়বস্তুর মধ্য তিনটি বিষয় ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (এক) তওহীদ। (দুই) রেসালত। (তিন) আখেরাত। আর এই তিনটি বিষয়ই ঈমান ও ইসলামের মূলভিত্তি। এগুলোর মধ্যে তওহীদ ও রেসালতের বিষয় পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। উল্লেখিত আয়াতগুলোর মধ্যে শেষ দু’টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে আখেরাত ও কেয়ামত সংক্রান্ত বিষয়। এগুলো নাযিলের পেছনে বিশেষ একটি ঘটনা কার্যকর ছিল। তাই তফসীরে ইমাম ইবনে জরীর (রহঃ) এবং আবদ ইবনে হুমাইদ (রহঃ) হযরত কাতাদা (রাঃ)—এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কোরাইশরা হুযুরে আকরাম (সাঃ)—এর নিকট ঠাট্টা ও বিদ্রোহে জিজ্ঞেস করল যে, আপনি কেয়ামত আগমনের সংবাদ দিয়ে মানুষকে এ ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে থাকেন,—এ ব্যাপারে যদি আপনি সত্য হয়ে থাকেন, তবে নির্দিষ্ট করে বলুন, কেয়ামত কোন সালের কত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে আমরা তা আসার আগেই তৈরী হয়ে যেতে পারি। আপনার এবং আমাদের মাঝে আত্মীয়তার যে সম্পর্ক বিদ্যমান তার দাবীও তাই। আর যদি সাধারণ লোকদিগকে বিষয়টি আপনি বলতে না চান, তবে অন্ততঃ আমাদেরকে বলে দিন। এ ঘটনার ভিত্তিতেই নাযিল হয়

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ

এখানে উল্লেখিত سَاعَةٌ শব্দটি আরবী ভাষায় সামান্য সময় বা মুহূর্তকে বলা হয়। আভিধানিকভাবে যার কোন বিশেষ পরিসীমা নেই। আর গাণিতিক ও জ্যোতির্বিদদের পরিভাষায় রাত ও দিনের চব্বিশ অংশের এক অংশকে বলা হয় سَاعَةٌ (সোআত), যাকে বাংলায় ঘণ্টা নামে অভিহিত করা হয়। কোরআনের পরিভাষায় এ শব্দটি সে দিবসকে বোঝায় যা জন্য ব্যবহৃত হয়, যা হবে সমগ্র সৃষ্টির মৃত্যুদিবস এবং সেদিনকেও বলা হয় যাতে সমগ্র সৃষ্টি পুনরায় জীবিত হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে উপস্থিত হবে। (আইয়ানা) অর্থ কবে। আর

مُسْمَا (মুরসা) অর্থ অনুষ্ঠিত কিংবা স্থাপিত হওয়া।

تَجْلِيَةٌ শব্দটি تَجْلِيَةٌ থেকে গঠিত। এর অর্থ প্রকাশিত এবং খোলা। حَيُّ (হাফিয়ান) অর্থ অকস্মাৎ। حَيُّ (হাফিয়ান) অর্থ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, জ্ঞানী ও অবহিত ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে এমন লোককে ‘হাফী’ বলা হয়, যে প্রশ্ন করে বিষয়ের পরিপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করে নিতে পারে।

কাজেই আয়াতের মর্ম দাঁড়াল এই যে, এরা আপনার নিকট কেয়ামত সম্পর্ক প্রশ্ন করে যে, তা কবে আসবে? আপনি তাদেরকে বলে দিন, এর নির্দিষ্টতার জ্ঞান শুধুমাত্র আমার পালনকর্তারই রয়েছে। এ ব্যাপারে পূর্বেকারও জ্ঞান নেই এবং সঠিক সময়ও কেউ জানতে পারবে না। নির্ধারিত সময়টি যখন উপস্থিত হয়ে যাবে, ঠিক তখনই আল্লাহ তাআলা তা প্রকাশ করে দেবেন। এতে কোন মাধ্যম থাকবে না। কেয়ামতের ঘটনাটি আসমান ও যমীনের জন্যও একান্ত ভয়ানক ঘটনা হবে। সেগুলোও টুকরো টুকরো হয়ে উড়তে থাকবে। সুতরাং এহেন ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে পূর্বে থেকে প্রকাশ না করাই বিচক্ষণতার তাকাদা। তা না হলে যারা বিশৃঙ্খলিত তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠত এবং যারা অবিশ্বাসী মুনকের তল্লা অধিকতর ঠাট্টা-বিদ্রোহের সুযোগ পেয়ে যেত। সেজন্যই বলা হয়েছে

لَا تَأْتِي السَّاعَةَ إِلَّا بَعْدَ عَذَابٍ شَدِيدٍ

এখানিও মুসলিমের হাদীসে হযরত আবু হোরায়া (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) কেয়ামতের আকস্মিক আগমন সম্পর্কে বলেছেন, ‘মানুষ নিজ নিজ কাজে পরিব্যস্ত থাকবে। এক লোক খরিদদারকে দেখাবার উদ্দেশ্যে কাপড়ের ধান খুলে সামনে ধরে থাকবে, সে (সওদাগর) এ বিষয়টিও সব্যস্ত করতে পারবে না, এরই মধ্যে কেয়ামত এসে যাবে। এক লোক তার উটটার দুধ দুইয়ে নিয়ে যেতে থাকবে এবং তখনও তা ব্যবহার করতে পারবে না, এরই মধ্যে কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ নিজের হাউজ মেরামত করতে থাকবে—তা থেকে অবসর হওয়ার পূর্বেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। কেউ হয় তো খাবার লোকমা হাতে তুলে নেবে, তা মুখে দেবার পূর্বেই কেয়ামত হয়ে যাবে।—(রুহুল-মা’আনী)

যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুর তারিখ ও সময়-কাল অনির্দিষ্ট ও গোপন রাখার মাঝে বিরতি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে, তেমনিভাবে কেয়ামতকেও—যা সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক মৃত্যুরই নামান্তর, তাকে গোপন এবং অনির্দিষ্ট রাখার মধ্যেও বিপুল রহস্য ও তাৎপর্য বিদ্যমান। তা না হলে একে তো এতেই বিশৃঙ্খলিত জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে এবং পার্শ্বি যাবতীয় কাজকর্ম অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তদুপরি অবিশ্বাসীরা সূর্য সময়ের কথা শুনে ঠাট্টা-বিদ্রোহের সুযোগ পাবে এবং তাদের ওজ্ঞতা অধিকতর বৃদ্ধি পাবে।

সেজন্যই হেকমত ও বিচক্ষণতার তাগিদে তার তারিখ বা দিন-কালকে অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছে, যাতে করে মানুষ তার ভয়াবহতা সম্পর্কে সদা ভীত থাকে। আর এ ভয়ই মানুষকে অপরাধপ্রবণতা থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বাধিক কার্যকর পন্থা। সুতরাং উক্ত আয়াতগুলোতে এ জ্ঞানই দেয়া হয়েছে যে, কোন একদিন কেয়ামতের আগমন ঘটবে, আল্লাহর সমীপে সবাইই উপস্থিত হতে হবে এবং তাদের সারা জীবনের ছোট-বড়, ভাল-মন্দ সমস্ত কার্যকলাপের নিকাল নেয়া হবে। যার ফলে হয় জন্মাত্মক অকল্মনীয় ও অনন্ত নেয়ামতরাজি লাভ হবে অথবা জাহান্নামের সেই কঠিন ও দুর্বিসহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে, যার কল্পনা

করতেও পিতৃ পানি হয়ে যেতে থাকবে। যখন কারও বিশ্বাস ও প্রত্যয় থাকবে, তখন কোন বুদ্ধিমানের কাজ এমন হওয়া উচিত নয় যে, আমাদের অবকাশকে এমন বিতর্কের মাঝে নষ্ট করবে যে, এ ঘটনা কবে কখন সংঘটিত হবে। বরং বুদ্ধিমত্তার সঠিক দাবী হল বয়সের অবকাশকে গণীমত মনে করে সে দিবসের জন্য তৈরী হওয়ার কাজে ব্যাপৃত থাকা এবং আল্লাহ্ রাক্বুল 'আলামীনের নির্দেশ লব্ধন করতে গিয়ে এমনভাবে ভয় করা, যেমন আগুনকে ভয় করা হয়।

আয়াতের শেষাংশে পুনরায় তাদের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে : **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَيْثِ** প্রথম প্রশ্নটি ছিল এ প্রসঙ্গে যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন সংঘটিত হবেই তখন আমাদের কাছে তার যথার্থ ও সঠিক তারিখ, দিন-রাত্রি ও সময় সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন। জারই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, এ প্রশ্নটি একান্ত নিবুদ্ধিতা ও বোকাগ্রন্থত। পক্ষান্তরে বুদ্ধিমত্তার দাবী হল এর নির্দিষ্টতা সম্পর্কে কড়কে অবহিত না করা, যাতে প্রত্যেক আমলকারী প্রতি মুহূর্তে আখেরাতের আযাবের ভয় করে নেক আমল অবলম্বন করার এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার প্রতি পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়।

আর এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল তাদের একথা বোঝা যে, মহানবী (সাঃ) অবশ্যই কেয়ামতের তারিখ ও সময়-ক্ষণ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে এ বিষয়ে অবশ্যই তিনি জ্ঞান লাভ করে নিয়েছেন, কিন্তু তিনি কোন বিশেষ কারণে সেকথা বলছেন না। সেজন্যই নিজ আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তারা তাঁকে প্রশ্ন করল যে, আমাদের কাছে কেয়ামতের পরিপূর্ণ সন্ধান দিয়ে দিন। এ প্রশ্নের উত্তরে এরশাদ হয়েছে

قُلْ إِنَّمَا مَعِيَ عَلَمُ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ অর্থাৎ, আপনি

লোকদিগকে বলে দিন যে, প্রকৃতপক্ষে কেয়ামতের সঠিক তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তাঁর কোন ফেরেশতা কিংবা নবী-রসূলগণেরও জানা নেই। কিন্তু এ বিষয়টি অনেকেই জানে না যে, বহু জ্ঞান আল্লাহ শুধুমাত্র নিজের জন্যই সংরক্ষণ করেন যা কোন ফেরেশতা কিংবা নবী-রসূল পর্যন্ত জ্ঞানতে পারেন না। মানুষ নিজস্বের মুখ্যতাবশতঃ মনে করে যে, কেয়ামত অনুষ্ঠানের তারিখ সম্পর্কিত জ্ঞান নবী কিংবা

রসূল হওয়ার জন্য অপরিহার্য। এরই ভিত্তিতে তারা এই প্রেক্ষিতে আবিষ্কার করে যে, মহানবী (সাঃ)-এর যখন এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ এলুম নেই, কাজেই এটা তাঁর নবী না হওয়ারই লক্ষণ-(নাউমুবিলাহ)। কিন্তু উপরোক্ত আলোচনায় জানা গেছে যে, এ ধরনের ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

সারকথা হল এই যে, যারা এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে, তারা বড়ই বোকা, নির্বোধ ও অজ্ঞ। না এরা বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত, না জানে তার অন্তর্নিহিত রহস্য ও প্রশ্ন করার পদ্ধতি।

তবে হা, মহানবী (সাঃ)-কে কেয়ামতের কিছু নিদর্শন ও লক্ষণাদি সম্পর্কিত জ্ঞান দান করা হয়েছে। আর তাহল এই যে, এখন তা নিকটবর্তী। এ বিষয়টি মহানবী (সাঃ) বহু বিশুদ্ধ হাদীসে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে-“আমার আবির্ভাব এবং কেয়ামত এমনভাবে মিশে আছে, যেমন মিশে থাকে হাতের দু'টি আঙ্গুল।—(তিরমিযী)

কোন কোন ইসলামী কিতাবে পৃথিবীর বয়স সাত হাজার বছর হয়েছে বলে যে কথা বলা হয়েছে, তা হুমুর আকরাম (সাঃ)-এর কোন হাদীস নয়; বরং তা ইসরাঈলী মিথ্যা রেওয়ায়েত থেকে নেয়া বিষয়।

ভূমণ্ডল বিষয়ক পণ্ডিতগণ আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে পৃথিবীর বয়স লক্ষ লক্ষ বছর হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কোরআনের কোন আয়াত কিংবা কোন বিশুদ্ধ হাদীসের সাথে এ নতুন গবেষণার কোন বিরোধ ঘটে না। ইসলামী রেওয়ায়েতসমূহে এহেন অলীক রেওয়ায়েত ঢুকিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যই হয় তো ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষের মনে কু-ধারণা সৃষ্টি করা, যার খণ্ডন স্বয়ং বিশুদ্ধ হাদীসেও বিদ্যমান রয়েছে। বিশুদ্ধ এক হাদীসে রসুলে করীম (সাঃ) স্বয়ং উম্মতকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন যে, “পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় তোমাদের উদাহরণ এমন যেন এক কালো বলদের গায়ে একটা সাদা লোম।” এতে যে কেউ অনুমান করতে পারে যে, হুমুর (সাঃ)-এর দৃষ্টিতেও পৃথিবীর বয়স এত দীর্ঘ, যার অনুমান করাও কঠিন। সে কারণেই হাফেয ইবনে হাযেম উন্সুলুসী বলেছেন যে, আমাদের বিশ্বাস, দুনিয়ার বয়স সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা করা যায় না; তার সঠিক জ্ঞান শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তারই রয়েছে।—(মুরাগী)

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ
 كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ
 الشُّوْءُ إِنَّ أَنَا الْأَوْدِيُّ وَشِيتِي لَقَوْمٌ يُؤْمِنُونَ ۝ هُوَ الَّذِي
 خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا
 فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلٌ خَفِيضًا فَهَرَّتْ بِهِ فَلََمَّا أَتَتْكَ
 دَعَا اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَجَعَلْنَاكِ مِنْ الشَّاكِرِينَ ۝
 فَلَمَّا أَتَتْهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُمَا لُحْمًا فَهِيَ الَّتِي هِيَ اللَّهُ
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ أَيْبُرُونَ مَا لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ وَهُمْ يَحْلِفُونَ ۝
 وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرٌ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ
 تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَدْعَوْتُهُمْ
 أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ۝ إِنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا الْكُرْآنَ إِنَّ كُتُبَكُمْ
 صِدْقٌ ۝ أَلَمْ أَهْلِكُ أُولَئِكَ لِيَسْأَلُوا بِمَا أَلَمْ أَهْلِكُ أُولَئِكَ لِيَسْأَلُوا
 بِمَا أَلَمْ أَهْلِكُ أُولَئِكَ لِيَسْأَلُوا بِمَا أَلَمْ أَهْلِكُ أُولَئِكَ لِيَسْأَلُوا
 بِمَا أَهْلِكُ أُولَئِكَ لِيَسْأَلُوا بِمَا أَهْلِكُ أُولَئِكَ لِيَسْأَلُوا

(১৮৮) আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এক অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ্ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন তীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য। (১৮৯) তিনিই সে সন্তা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন একটি মাত্র সন্তা থেকে; আর তার থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে। অতঃপর পুরুষ যখন নারীকে সাবস্ত করল, তখন, সে গর্ভবতী হল। অতি হালকা গর্ভ। সে তাই নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল। তারপর যখন বোঝা হয়ে গেল, তখন উভয়েই আল্লাহকে ডাকল যিনি তাদের পালনকর্তা যে, তুমি যদি আমাদেরকে সুস্থ ও ভাল দান কর তবে আমরা তোমার শুকরিয়া আদায় করব। (১৯০) অতঃপর তাদেরকে যখন সুস্থ ও ভাল দান করা হল, তখন দানকৃত বিষয়ে তাঁর অংশীদার তৈরী করতে লাগল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের শরীক সাব্যস্ত করা থেকে বহু উর্ধ্বে। (১৯১) তারা কি এমন কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে যে একটি বস্তুতঃ সৃষ্টি করেনি, বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (১৯২) আর তারা না তাদের সাহায্য করতে পারে, না নিজের সাহায্য করতে পারে। (১৯৩) আর তোমরা যদি তাদেরকে আহবান কর সুপথের দিকে, তবে তারা তোমাদের আহবান অনুযায়ী চলবে না। তাদেরকে আহবান জানানো কিংবা নীরব থাকা উভয়টিই তোমাদের জন্য সমান। (১৯৪) আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, তারা সবাই তোমাদের মতই বান্দা। অতঃপর, তোমরা যখন তাদেরকে ডাক, তখন তাদের পক্ষেও তো তোমাদের সে ডাক কবুল করা উচিত-যদি তোমরা সভাবাদী হয়ে থাক। (১৯৫) তাদের কি পা আছে, যদ্বারা তারা চলাফেরা করে, কিংবা তাদের কি হাত আছে, যদ্বারা তারা ধরে। অথবা তাদের কি চোখ আছে যদ্বারা তারা দেখতে পায় কিংবা তাদের কি কান আছে যদ্বারা তারা শুনতে পায়? বলে দাও, তোমরা ডাক তোমাদের অংশীদারদিগকে, অতঃপর আমার অমঙ্গল কর এক আমাকে অবকাশ দিও না।

প্রথম আয়াতে মুশরিক ও সাধারণ মানুষের সেই ভ্রান্ত আকীদার খণ্ডন করা হয়েছে যে, তারা নবী-রসূলগণের ব্যাপারে গোষণ করত যে, তাঁরা গায়বী বিষয়েও অবগত রয়েছেন। তাঁদের জ্ঞানও আল্লাহর মতই সমস্ত বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যপ্ত এবং তাঁরা কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। যাকে ইচ্ছা কল্যাণ দান কিংবা যার জন্য ইচ্ছা অকল্যাণ করার ক্ষমতাও তাদেরই হাতে।

এ আয়াতে তাদের এই শেরেকী আকীদার খণ্ডন উপলক্ষে বলা হয়েছে যে, এলমে-গায়ব এবং সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুর ব্যাপক এলমে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলারই রয়েছে। এটা তাঁরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এতে কোন সৃষ্টিকে অংশীদার সাব্যস্ত করা, তা ফেরেশতাই হোক আর নবী ও রসূলগণই হোক, শেরেকী এবং মহাপাপ। তেমনভাবে প্রত্যেক লাভ-ক্ষতি কিংবা মঙ্গলামঙ্গলের মালিক হওয়াও এককভাবে আল্লাহ তাআলারই গুণ। এতে কাউকে অংশীদার দাঁড় করানোও শেরেকী। বস্তুতঃ এই শেরেকী বা আল্লাহ্ রাসূল আলামিনের সাথে কোন অংশীদারিত্বের আকীদাকে খণ্ডন করার জন্যই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং রসূলে মকবুল (সাঃ)—এর আবির্ভাব ঘটেছে।

কোরআনে করীম তার অসংখ্য আয়াতে এ বিষয়টি একান্ত প্রকৃষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছে। এরশাদ হয়েছে, এলমে-গায়ব এবং ব্যাপক জ্ঞান, যে জ্ঞানের বাইরে কোন কিছুই থাকতে পারে না, তা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলারই একক গুণ। তেমন সাধারণ ক্ষমতা, অর্থাতঃ—যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ, লাভ-লোকসান সবই যার অন্তর্ভুক্ত—তাও আল্লাহর একক গুণ। এতে আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা শেরেক।

এ আয়াতে মহানবী (সাঃ)—কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে; আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমি নিজের লাভ-ক্ষতিরও মালিক নই—অন্যের লাভ-ক্ষতি তো দূরের কথা।

এভাবে তিনি যেন একথাও ঘোষণা করে দেন যে, আমি আলেমে-গায়ব নই যে, যাবতীয় পূর্ণ জ্ঞান আমার থাকা অনিবার্য হবে। তাছাড়া আমার যদি গায়বী জ্ঞান থাকতই, তবে আমি প্রত্যেকটি লাভজনক বস্তুই হাসিল করে নিতাম, কোন একটি লাভও আমার হাতছাড়া হতে পারত না। আর প্রতিটি ক্ষতিকর বিষয় থেকে সর্বদা রক্ষিত থাকতাম। কখনও কোন ক্ষতি আমার শারে—কাছে পর্যন্ত পৌছাতে পারত না। অথচ এতদুভয় বিষয়ের কোনটিই বাস্তব নয়। বহু বিষয় রয়েছে যা রসূলে করীম (সাঃ) আয়ত্ত করতে চেয়েছেন, কিন্তু তা করতে পারেননি। তাছাড়া বহু দুঃখ-কষ্ট রয়েছে যা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে পতিত হতে হয়েছে। হুদায়রিয়্যার সন্ধির সময় হুম্মর (সাঃ) এহরাম বেঁধে সাহাবায়ে—কেরামের সাথে ওমরা করার উদ্দেশ্যে হেরেমের সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে যান, কিন্তু হেরেম শরীফে প্রবেশ কিংবা ওমরা করা তখনও সম্ভব হতে পারেনি; সবাইকে এহরাম খুলে ফিরে আসতে হয়েছে।

তেমনভাবে ওহুদ যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) আহত হন এবং মুসলমানদেরকে সাময়িক পরাজয় বরণ করতে হয়। এমনি আরও বহু অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যা মহানবী (সাঃ)—এর জীবনে সংঘটিত হয়েছে।

আর এমনসব ঘটনা প্রকাশের উদ্দেশ্যও হয় তো এই ছিল যাতে

الامراء

১৫৫

قَالَ الْمَلَأَ

إِنَّ رَحِيمَ اللَّهِ الَّتِي تَزُلُّ الْكَيْبَ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ ۝
 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَدْعَاكُمْ وَلَا
 أَنْفُسَهُمْ يَصُدُّونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَكُمْ مَعَهُ
 وَتَرْكُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ۝ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝ خُذِ الْعَقْبُ وَامْرُ
 بِالْعُوبَى وَأَعِزِّضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ وَلَمَّا زَعَمْتَ أَنَّكَ مِنَ
 الشَّيْطَانِ نَزَعْتَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ
 اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ
 مُبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ يَبْتَغُونَ فَرْجَ الْغِيظِ لَكُمْ لِيَقْصُرُوا
 وَرَأَى الْمُنَافِقِينَ قَالُوا لَوْلَا جَعَلْنَاهُمْ قُلُوبًا كَالْأَنْفُسِ
 مَا يُؤْتِي إِلَيْنَا مِنْ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ هَذَا بَصَائِرُ لَكُمْ وَهُدًى وَ
 رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا
 لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ بِنِهَايَةِ
 تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُؤَانَ الْجُبِّ مِنْ الْقَوْلِ بِالْعُدُوِّ
 وَالْأَصْلَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ
 لَكَيْفٌ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُمْ لَا يَخْلِفُونَ ۝ وَهُمْ لَا يَخْلِفُونَ ۝

(১১৬) আমার সহায় তো হলেন আল্লাহ্, যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। বক্তৃত্ত তিনিই সাহায্য করেন সংকমশীল বান্দাদের। (১১৭) আর তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে, না নিজদের আত্মরক্ষা করতে পারবে। (১১৮) আর তুমি যদি তাদেরকে সুপথে আহ্বান কর, তবে তারা তা কিছুই শুনবে না। আর তুমি তো তাদের দেখছই, তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। (১১৯) আর ক্ষমা করার অভাস গড়ে তোল, সংকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহেলদের থেকে থেকে দূরে সরে থাক। (২০০) আর যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (২০১) যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে। (২০২) পক্ষান্তরে যারা শয়তানের চাই, তাদেরকে সে ক্রমাগত পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর তাতে কোন কয়লা করে না। (২০৩) আর যখন আপনি তাদের নিকট কোন নির্দেশ নিয়ে না যান, তখন তারা বলে, আপনি নিজের পক্ষ থেকে কেন অমূল্যকি নিয়ে আসলেন না, তখন আপনি বলে দিন, আমি তো সে মতেই চলি যে হুকুম আমার নিকট আসে আমার পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে। এটা ভাববার বিষয় তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং হেদায়েত ও রহমত সেসব লোকের জন্য যারা ঈমান এনেছে। (২০৪) আর যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তাতে কান লাগিয়ে রাখ এবং নিচুপ থাক যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়। (২০৫) আর সুরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে আপনি মনে ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন স্বরে যা টীংকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকে না। (২০৬) নিশ্চয়ই যারা তোমার পরওয়ারদেগারের সান্নিধ্যে রয়েছেন, তারা তাঁর বন্দগীর ব্যাপারে অহঙ্কার করেন না এবং সুরণ করেন তাঁর পবিত্র সন্তাকে; আর তাঁকেই সেজদা করেন।

মানুষের সামনে কার্যতঃ একথা স্পষ্ট করে দেয়া যায় যে, নবী-রসূলগণ আল্লাহ্ তাআলার নিকট সবচেয়ে বেশী উত্তম ও শ্রিয় সৃষ্টি, কিন্তু তবুও তাঁরা খোদায়ী জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী নন। এভাবে সুস্পষ্ট করে দেয়ার উদ্দেশ্যে এই, যাতে মানুষ এমন কোন বিভ্রান্তিতে পতিত না হয় যে, নবী-রসূলগণ খোদায়ী গুণাবলী ও বেশিষ্ট্যাবলীর অধিকারী। যেমন, ইহুদী-খ্রীষ্টানরা এমনভাবে নিজদের রসূলগণ সম্পর্কে খোদায়ী গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার বিশ্বাস করে শেরক ও কুফরে পতিত হয়েছিল।

এ আয়াত একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নবী-রসূলগণ সর্বশক্তিমানও নন এবং এলমে-গায়বেরও মালিক নন, বরং তাঁরা জ্ঞান ও কুদরতের ততটুকুরই অধিকারী হয়েছিলেন, যতটা আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন তাঁদেরকে নিজের পক্ষ থেকে দান করেছিলেন।

অবশ্য এতে কোন রকম সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই যে, তাঁদেরকে জ্ঞানের যতটা অংশ দান করা হয়েছে, তা সমগ্র সৃষ্টির সমষ্টিগত জ্ঞানের চাইতেও বহু বেশী। বিশেষ করে আমাদের রসূলে করীম (সাঃ)-কে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র সৃষ্টির সমপরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে। অর্থাৎ, সমস্ত নবী-রসূলগণকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করা হয়েছে সে সময়দয় এবং তার চেয়েও বহুগুণ বেশী জ্ঞান দান করা হয়েছিল। আর এই দানকৃত জ্ঞান অনুযায়ী তিনি শত-সহস্র গোপন বা সাধারণভাবে অজানা বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, যার সত্যতা সম্পর্কে সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সবাই প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে বলা যেতে পারে যে, রসূলে করীম (সাঃ)-কে লক্ষ লক্ষ গায়বী বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। কিন্তু একে কোরআনের পরিভাষায় এলমে গায়ব বলা হয় না। কাজেই রসূল্লাহ (সাঃ)-এর জ্ঞানকে ‘এলমে-গায়ব’ বলা যেতে পারে না।

আনুযমিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ رَحِيمَ اللَّهِ الَّتِي تَزُلُّ الْكَيْبَ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ

এখানে ‘ওলী’ অর্থ রক্ষাকারী; সাহায্যকারী। আর ‘কিতাব’ অর্থ কোরআন। সালেহীন’ অর্থ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ভাষায় সে সমস্ত লোক, যারা আল্লাহর সাথে কড়িকে সমান করে না। এতে নবী-রসূল থেকে শুরু করে সাধারণ সংকমশীল মুসলমান পর্যন্ত সবাই অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুতঃ আয়াতের অর্থ হল এই যে, তোমাদের বিরোধিতার কোন ভয় আমার এ কারণেই নেই যে, আমার রক্ষাকারী ও সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ্, যিনি আমার উপর কোরআন অবতীর্ণ করেছেন।

এখানে আল্লাহ্ তাআলার সমস্ত গুণাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে কোরআন অবতীর্ণ করার গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, তোমরা যে আমার শত্রুতা ও বিরোধিতায় বদ্ধপরিকর হয়ে আছ তার কারণ হচ্ছে যে, আমি তোমাদেরকে কোরআনের শিক্ষা দেই এবং কোরআনের প্রতি আহ্বান করি। কাজেই যিনি আমার উপর কোরআন নাযিল করেছেন তিনিই আমার সাহায্যদাতা ও রক্ষাবাহকরক্ষাকারী। অতএব, আমার কি চিন্তা?

অতঃপর আয়াতের শেষ বাক্যটিতে একটি সাধারণ নিয়ম বাতলে দেয়া হয়েছে যে, নবী-রসূলগণের মর্যাদা তো বহু উর্ধ্বে, সাধারণ সং মুসলমানদের জন্যও আল্লাহ্ সহায় ও রক্ষাকারী। তিনি তাদের সাহায্য

করেন বলেই কোন শত্রু শত্রুতা তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। অধিকাংশ সময় এ পৃথিবীতেই তাদেরকে শত্রু উপর জয়ী করে দেয়া হয়। আর যদি কখনও কোন বিশেষ তাৎপর্যের কারণে তাৎক্ষণিক বিজয় দান করা নাও হয়, তাতে বিজয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তারা বাহ্যিক অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কৃতকার্য হয়ে থাকেন। কারণ, সংকমশীল মুমিনের প্রতিটি কাজ হয় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তাঁর আনুগত্যের জন্য। কাজেই তারা যদি কোন কারণে পার্থিবজীবনে অকৃতকার্যও হয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে তাদের উদ্দেশ্য লাভে কৃতকার্য হয়ে থাকে। বস্তুতঃ এটাই হল সত্যিকার কৃতকার্যতা।

কোরআনী চরিত্রের একটি ব্যাপক হেদায়েতনামাঃ আলোচ্য আয়াতগুলো কোরআনী চরিত্র দর্শনের এক অনন্য ও ব্যাপক হেদায়েতনামাস্বরূপ। এর মাধ্যমে রসূলে করীম (সাঃ)-কে প্রশিক্ষণ দান করে তাঁকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত সৃষ্টির মাঝে ‘মহান চরিত্রবান’ খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইসলামের শত্রুদের মন্দ চাল-চালন, হঠকারিতা ও অসচ্চরিত্রতার আলোচনার পর আলোচ্য এই আয়াতগুলোতে তার বিপরীতে মহানবী (সাঃ)-কে সর্বোত্তম চরিত্রের হেদায়েত দেয়া হয়েছে। তাতে তিনটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্য خُلِّقَ آدَمُ আরবী অভিধান মোতাবেক عَفُو (আফবুন)-এর অর্থ একাধিক হতে পারে এবং একত্রে সব ক’টি অর্থই প্রযোজ্য হতে পারে। সে কারণেই তফসীরবিদ আলেমগণের বিভিন্ন দল বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ তফসীরকার যে অর্থ নিয়েছেন তাহল এই যে, عَفُو বলা হয় এমন প্রত্যেকটি কাজকে, যা সহজে কোন রকম আয়াস ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে। তাহলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনি এমন বিষয় গ্রহণ করে নিন, যা মানুষ অনায়াসে করতে পারে। অর্থাৎ, শরীয়ত নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদনে আপনি সাধারণ মানুষের কাছে সুউচ্চমান দাবী করবেন না; বরং তারা সহজে যে পরিমাণ আমল করতে পারে আপনি তাই গ্রহণ করে নিন। যেমন, নামাযের প্রকৃত রূপ হচ্ছে এই যে, বান্দা সমগ্র দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ও একাগ্র হয়ে আপন পালনকর্তার সামনে হাত বেঁধে এমনভাবে দাঁড়াবে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনার মাধ্যমে নিজের আবেদনসমূহ কোন প্রকার মাধ্যম ব্যতীত তাঁর দরবায়ে সরাসরি পেশ করছে। তখন সে যেন সরাসরি আল্লাহ বাকুল আলামিনের সাথে কথোপকথন করছে। এজন্য যে বিনয়, নম্রতা, রীতি-পদ্ধতি ও সম্মানবোধের প্রয়োজন, তা যে লাখে নামাযীর মধ্যে বিরল বান্দাদের ভাগ্যেই জোটে, তা বলাই বাহুল্য। সাধারণ মানুষ এ স্তর লাভ করতে পারে না। অতএব, এ আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আপনি সেসব লোকদের কাছে এমন সুউচ্চ স্তরের প্রত্যাশাই করবেন না; বরং যে স্তর তারা সহজে ও অনায়াসে লাভ করতে পারে তাই গ্রহণ করে নিন। তেমনিভাবে অন্যান্য এবাদত-যাকাত, রোযা, হজ্জ এবং সাধারণ আচার-আচরণ ও সামাজিক ব্যাপারে শরীয়ত নির্ধারিত কর্তব্যসমূহ যারা পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারে না, তাদের কাছ থেকে সেটুকুই কবুল করে নেয়া বাঞ্ছনীয়, যা তারা অনায়াসে করতে পারে।

সহীহ বোখারী শরীফেও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়র (রাঃ)-এর উদ্ধৃতিতে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ) হতে উল্লেখিত আয়াতের এই অর্থই বর্ণনা

করা হয়েছে।

অপর এক রেওয়াজেতে আছে, এ আয়াতটি নাযিল হলে হযর (সাঃ) বললেন, আল্লাহ আমাকে মানুষের আমল-আখলাকের ব্যাপারে সাধারণ আনুগত্য কবুল করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছি যে, যে পর্যন্ত আমি তাদের মাঝে থাকব এমনি করব।—(ইবনে-কাসীর)

তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের এক বিরাট জামাত—হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়র, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং মুজাহিদ প্রমুখও এ বাক্যটির উল্লেখিত অর্থ সাব্যস্ত করেছেন।

عَفُو এর অপর অর্থ ক্ষমা করা এবং অব্যাহতি দেয়াও হয়ে থাকে। তফসীরকার আলেমগণের এক দল এ ক্ষেত্রে এ অর্থেই বাক্যটির মর্ম সাব্যস্ত করেছেন এই যে, আপনি পাপী-তাপীদের অপরাধ ক্ষমা করে দিন।

তফসীরশাস্ত্রের ইমাম ইবনে-জরীর (রহঃ) উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াতটি যখন নাযিল হয়, তখন মহানবী (সাঃ) হযরত জিবরাঈল-আমীনকে এর মর্ম জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল স্বয়ং আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে জেনে নিয়ে মহানবী (সাঃ)-কে জানান যে, কেউ যদি আপনার প্রতি অন্যায-অবিচার করে, তবে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন। যে আপনাকে কিছুই দেয় না, তাকে আপনি দান করুন এবং যে আপনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তার সাথেও মেলামেশা করুন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে মারদুযিয়া (রহঃ) সা’দ ইবনে ওবাদা (রাঃ)-এর রেওয়াজেতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, গণ্ডগোয়ে-ওহুদের সময় যখন হযর (সাঃ)-এর চাচা হযরত হামযা (রাঃ)-কে শহীদ করা হয় এবং অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁর শরীরের অংগ-প্রত্যঙ্গ কেটে লাশের প্রতি চরম অসম্মানজনক আচরণ করা হয়, তখন মহানবী (সাঃ) লাশটিকে সে অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, যারা হামযা (রাঃ)-এর সাথে এহেন আচরণ করেছে, আমি তাদের সত্তর জনের সাথে এমনি আচরণ করে ছাড়ব। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় এবং এতে হযর (সাঃ)-কে বাতলে দেয়া হয় যে, এটা আপনার মর্যাদাসম্পন্ন নয়; বরং আপনার মর্যাদার উপযোগী হলো ক্ষমা ও অব্যাহতি দান করা।

وَأَمْرٌ بِالْعَفْوِ - معروف অর্থে عَفُو বলা হয় যে কোন ভাল ও

প্রশংসনীয় কাজকে। অর্থাৎ, যেসব লোক আপনার সাথে মন্দ ও উৎপীড়নমূলক আচরণ করে, আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন না; বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। কিন্তু সেই সাথে তাদেরকে সংকাজেরও উপদেশ দিতে থাকুন। অর্থাৎ, অসদাচরণের বিনিময় সদাচরণ এবং অত্যাচারের বিনিময় শুধুমাত্র ন্যায্যনীতির মাধ্যমেই নয়; বরং অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করুন।

وَاعْوِزْ بِالْحَيْلِ - এর অর্থ হল এই যে, যারা জাহেল বা মূর্খ

তাদের কাছ থেকে আপনি দূরে সরে থাকুন। মর্মার্থ এই যে, আপনি অত্যাচারের প্রতিশোধ না নিয়ে তাদের সাথে কল্যাণকর ও সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহার করুন এবং একান্ত কোমলতার সাথে তাদেরকে সত্য ও ন্যায়ের বিষয় বাতলে দিন। কিন্তু বহু মূর্খ এমনও থাকে যারা এহেন ভদ্রাচিতি আচরণে প্রভাবিত হয় না; বরং এমতাবস্থায়ও তারা মূর্খজনাচিতি রূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। এমন ধরনের লোকদের সাথে আপনার আচরণ হবে

এই যে, তাদের হৃদয়বিদারক মূর্খ-জ্ঞানোচিত কথা-বার্তায় দূষিত হয়ে তাদেরই মত ব্যবহার আপনিও করবেন না; বরং তাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন।

উকসীরশাশ্বের ইমাম ইবনে-কাসীর (রহঃ) বলেন যে, দূরে সরে থাকার অর্থও মন্দের প্রত্যুত্তরে মন্দ ব্যবহার না করা। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের হেলায়েত করাও বর্জন করতে হবে। কারণ, এটা রেসালত ও নুগুযতের দায়িত্ব এবং মর্যাদার যোগ্য নয়।

সহীহ বোখারীতে এক্ষেত্রে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, হযরত ফারাকে আ'যম (রাঃ)-এর ফেলাকত আমলে উয়াইনাহ ইবনে হিসন একবার মদীনাতে আসে এবং স্বীয় ভাতৃশূর হু-ইবনে কায়সের মেহমান হয়। হু-ইবনে কায়স ছিলেন সে সমস্ত বিজ্ঞ আলেমদের একজন যারা হযরত ফারাকে আযম (রাঃ)-এর পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণ করতেন। উয়াইনাহ স্বীয় ভাতৃশূর হুকে বলল, তুমি তো আমীরুল-মু'মিনীনের একজন অতি ঘনিষ্ঠ লোক; আমার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাতের একটা সময় নিয়ে এসো। হু ইবনে-কায়স (রাঃ) ফারাকে আযম (রাঃ)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমার চাচা উয়াইনাহ আপনার সাথে সাক্ষাত করতে চান। তখন তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন।

কিন্তু উয়াইনাহ ফারাকে আযম (রাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়েই একান্ত অসম্মতি ও বাস্তব কথাবার্তা বলতে লাগল যে, “আপনি আমাদেরকে না দেন আমাদের ন্যায্য অধিকার, না করেন আমাদের সাথে ন্যায় ও ইনসাকের আচরণ।” হযরত ফারাকে আযম (রাঃ) তাঁর এসব কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন হু ইবনে-কায়স নিবেদন করলেন, ইয়া আমীরুল-মু'মিনীন, “আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন-
خُذِ الْعَقْلَ وَأْمُرْ بِالْعَقْلِ وَأْمُرْ بِالْعَقْلِ وَأْمُرْ بِالْعَقْلِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ

এই আয়াতটি শোনার সাথে সাথে হযরত ফারাকে আযম (রাঃ)-এর সমস্ত রাগ শেষ হয়ে গেল এবং তাকে কোন কিছুই বললেন না। হযরত ফারাকে আযম (রাঃ)-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিল যে, كان رفاقا عند كتاب الله
وَأَمَّا الْفِتْيَانُ فَمَا لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ
অর্থ, আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত হুকুমের সামনে তিনি ছিলেন উৎসর্গিত প্রাণ।

وَأَمَّا الْفِتْيَانُ فَمَا لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ

অর্থ, আপনার মনে যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন গুণ্ডগা আসতে আরম্ভ করে, তখন সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবেন। তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত।

প্রকৃতপক্ষে এ আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের উপসংহার। কারণ, এতে হেলায়েত দেখা হয়েছে যে, যারা অত্যাচার-উৎপীড়ন করে এবং মূর্খজ্ঞানোচিত ব্যবহার করে, তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন। তাদের মন্দের উত্তর মন্দের দ্বারা দেবেন না। এ বিষয়টি মানব প্রকৃতির পক্ষে একান্তই কঠিন। বিশেষতঃ এমন পরিস্থিতিতে সং এবং ভাল মানুষদেরকেও শয়তান রাসানিত করে লড়াই-ঝগড়ায় প্রবৃত্ত করেই ছাড়ে। সে জন্যই পরবর্তী আয়াতে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, যদি এহেন মুহূর্তে গ্রোহানল ছুলে উঠতে দেখা যায়, তবে বোঝাবেন শয়তানের পক্ষ থেকেই এমনটি হচ্ছে এবং তার প্রতিকার হল আল্লাহর নিকট পানা-চাওয়া, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, দু'জন লোক মহানবী (সাঃ)-এর সামনে ঝগড়া-বিবাদ করছিল। এদের একজন রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাবার উপক্রম হলে হযুর (সাঃ) বললেন, “আমি একটি বাক্য জানি, যদি এ লোকটি সে বাক্য উচ্চারণ করে, তাহলে তার এই উদ্বেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। তারপর বললেন, বাক্যটি হল এই اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - সে লোক হযুর (সাঃ)-এর নিকট শোনে সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটি উচ্চারণ করল। তাতে সাথে সাথে তার রোযানল প্রশমিত হয়ে গেল।

هَذَا بَصَرٌ مِنْ رَبِّكَ

দেগারের পক্ষ থেকে আগত বহুবিধ দলীল-প্রমাণ ও মু'জ্জযার এক সমাহার। এতে সামান্য লক্ষ্য করলেই একথা বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না যে, এটি যথার্থই আল্লাহর কলাম। এতে কোন সৃষ্টিরই কোন হাত নেই।

অতঃপর বলা হয়েছে - وَهَٰذَا رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

কোরআন সারা বিশ্বের জন্য সত্য দলীল তো বটেই, তদুপরি যারা ঈমানদার তাদেরকে আল্লাহর রহমত ও হেলায়েত পর্যন্ত পৌছে দেয়ার অবলম্বনও বটে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআন মু'মিনদের জন্যে রহমত। কিন্তু এই রহমতের দূরা লাভবান হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত ও প্রক্রিয়া রয়েছে, যা সাধারণ সম্মোহনের মাধ্যমে এভাবে বলা হয়েছে- وَإِذْ أُفِّيَتْ

الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا

অর্থ, যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা সবাই তার প্রতি কান লাগিয়ে চুপচাপ থাকবে।

এ আয়াতের শানে-নুফল সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এ হুকুমটি কি নামাযের কোরআন পাঠ সংক্রান্ত, না কোন বয়ান-বিবৃতিতে কোরআন পাঠের ব্যাপারে, নাকি সাধারণভাবে কোরআন পাঠের বেলায়; তা নামাযেই হোক অথবা অন্য যে কোন অবস্থায় হোক। অধিকাংশ মুফাসসেরীনের মতে এটাই যথার্থ যে, আয়াতের শব্দগুলো যেমন ব্যাপক, তেমনি এই হুকুমটিও ব্যাপক। কতিপয় নিষিদ্ধ স্থান বা কাল বতীত যেকোন অবস্থায় কোরআন পাঠের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ ব্যাপক।

সে কারণেই হানাফী মাযহাবের ওলামাগণ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ইমামের পেছনে নামায পড়ার সময় মুকতাদীগণের জন্য কেরাআত পড়া বিধেয় নয়। পক্ষান্তরে যেসব ফোকাহা মুকতাদীগণকে (ইমামের পেছনে নামায পড়ার ক্ষেত্রেও) সূরা ফাতেহা পাঠ করার কথা বলেছেন, তাঁদের মধ্যেও অনেকে বলেছেন যে, ফাতেহা পড়লেও তা ইমামের কেরাআতের ফাঁকে ফাঁকে পড়বে।

আলোচ্য আয়াতের প্রকৃত বিষয় হল এই যে, কোরআন-করীমকে যাদের জন্য রহমত সাব্যস্ত করা হয়েছে, সে জন্য শর্ত হচ্ছে যে, তাদেরকে কোরআনের আদব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হতে হবে এবং এর উপর আমল করতে হবে। আর কোরআনের বড় আদব হলো এই যে, যখন তা পাঠ করা হয়, তখন শ্রোতা সেদিকে কান লাগিয়ে নিশ্চুপ থাকবে।

কোরআন পাঠ শ্রবণ করা এবং তার হুকুম-আহকামের উপর আমল করার চেষ্টা করা উভয়টিই কান লাগিয়ে রাখার অন্তর্ভুক্ত।—(মাযহারী ও কুরতুবী) আয়াত শেষে لَكُمْ تَرْجَمُونَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআনের রহমত হওয়া উল্লেখিত আদবসমূহের অনুবর্তিতার উপর

নির্ভরশীল।

কোরআন তেলাওয়াতের সময় নীরব থেকে তা শ্রবণ করা সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী মাসায়েল : একথা একান্তই সুস্পষ্ট যে, কেউ যদি উল্লেখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে কোরআন-করীমের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে, তবে সে রহমতের পরিবর্তে আল্লাহর গম্ব ও রোযানলের অধিকারী হবে।

নামাযের মধ্যে কোরআনের দিকে কান লাগানো এবং নিশ্চুপ থাকার বিষয়টি মুসলমান মাত্রেরই জ্ঞানা রয়েছে। তবে অনেক সময় অমনোযোগিতার কারণে এমনও ঘটে যায় যে, অনেকে একথাও বলতে পারে না যে, ইমাম কোন সূরাটি পাঠ করেছেন। তাদের পক্ষে কোরআনের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া এবং শোনার জন্য মনোনিবেশ করা কঠব্য। জুম'আ কিংবা ঈদের খুতবার হুকুমও তাই। এই আয়াত ছাড়াও রসুলে করীম (সাঃ) বিশেষ করে খুতবার ব্যাপারে এরশাদ করেছেন : **اذا خرج الامام للخطبة فلا صلوة ولا كلام** অর্থাৎ, ইমাম যখন খুতবার জন্য এসে উপস্থিত হন, তখন না নামায পড়বে, না কোন কিছু বলবে।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, তখন কোন লোক অপর কাউকে উপদেশ দেয়ার উদ্দেশ্যে একথাও বলবে না যে, 'চুপ কর' (অগত্যা যদি বলতেই হয়, তবে হাতে ইশারা করে দেবে), যাহোক, খুতবা চলাকালে কোন রকম কথা-বার্তা, তসবীহ-তাহলীল, দোয়া-দরুদ কিংবা নামায প্রভৃতি জায়েয নয়।

ফেকাহবিদগণ বলেছেন যে, জুম'আর খুতবার যে হুকুম, ঈদ কিংবা বিয়ে প্রভৃতির খুতবার হুকুমও তাই। অর্থাৎ, তখন মনোনিবেশ সহকারে নীরব থাকা ওয়াজিব।

অবশ্য নামায এবং খুতবা বাতীত সাধারণ অবস্থায় কেউ যখন আপন মনে কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকে, তখন অন্যান্যদের কান লাগিয়ে রাখা এবং নীরব থাকা ওয়াজিব কিনা, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মতপার্থক্য রয়েছে। কোন কোন মনীষী এমতাবস্থায়ও কান লাগানো এবং নীরব থাকাকে ওয়াজিব বলেছেন; আর এর বিরুদ্ধাচরণকে পাপ বলে সাব্যস্ত করেছেন। সেজন্যই যেসব স্থানে মানুষ নিজ নিজ কাজ-কর্মে নিয়োজিত থাকে কিংবা বিশ্রাম করতে থাকে, সেসব জায়গায় কারও পক্ষে সরবে কোরআন পাঠ করাকে তাঁরা অবৈধ বলেছেন এবং যে লোক এমন জায়গায় উচ্চৈশ্বরে কোরআন পাঠ করবে, তাকে গোনাহগার বলেছেন। 'খোলাসাতুল-ফাতাওয়া' প্রভৃতি গ্রন্থেও তাই লেখা রয়েছে।

কিন্তু কোন কোন ফকীহ বিশ্লেষণ করেছেন যে, কান লাগানো এবং শোনা শুধুমাত্র সে সমস্ত জায়গায়ই ওয়াজিব, যেখানে শোনাবার উদ্দেশ্যেই কোরআন তেলাওয়াত করা হয়। যেমন, নামায ও খুতবা প্রভৃতিতে। আর যদি কোন লোক নিজের ভাবে তেলাওয়াত করতে থাকে, কিংবা কয়েকজন কোন এক স্থানে নিজ নিজ তেলাওয়াতে নিয়োজিত থাকে, তাহলে অন্যের আওয়াযের প্রতি কান লাগিয়ে রাখা এবং নীরব থাকা ওয়াজিব নয়। তার কারণ, সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, রসুলে করীম (সাঃ) রাত্রি বেলায় নামাযে সরবে কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং আখুওয়াজে-মুতাহহারাত তখন ঘুমোতে থাকতেন। অনেক সময় হুজরার বাইরেও হুযর (সাঃ)-এর আওয়ায শোনা যেত।

নীরব ও সরব যিকরের বিধি-বিধান : এ আয়াতে কোরআন করীম নিশ্চন্দ যিকরি কিংবা সশন্দ যিকর দু'রকম যিকরেরই স্বাধীনতা দিয়েছে।

নিশ্চন্দ যিকর সম্পর্কে বলা হয়েছে : **وَأَذْكُرُكَ فِي نَفْسِكَ** অর্থাৎ,

স্বীয় পরওয়ারদেগারকে স্মরণ কর নিজের মনে। এরও দু'টি উপায় রয়েছে। (এক) জিহ্বা না নেড়ে শুধু মনে মনে আল্লাহর 'যাত' (সভা) ও ভগ্নাকীর গ্যান করবে, যাকে 'যিকরে কুল্বী' (আত্মিক যিকর) বা 'তাকাকুল্বী' (নিবৃতি চিন্তা) বলা হয়। (দুই) তৎসঙ্গে মুখেও কীম শব্দে আল্লাহ তআলার নামের অক্ষরগুলো উচ্চারণ করবে। এটাই হল যিকরের সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্টতর উপায় যে, যে বিষয়ের যিকর করা হচ্ছে তার বিষয়বস্তু উপলব্ধি করে অন্তরেও তার প্রতিফলন ঘটিয়ে গ্যান করবে এক মুখেও তা উচ্চারণ করবে। কারণ, এভাবে অন্তরের সাথে মুখও যিকরে অংশগ্রহণ করে। পক্ষান্তরে যদি শুধু মনে মনেই গ্যান ও চিন্তায় মগ্ন থাকে, মুখে কোন অক্ষর উচ্চারিত না হয়, তবে তাতেও যথেষ্ট সওয়াব রয়েছে, কিন্তু সর্বনিম্ন স্তর হল শুধু মুখে মুখে যিকর করা, অন্তরাভ্যার তা থেকে বিমুখ থাকা।

যিকরের দ্বিতীয় পন্থা এ আয়াতেই বলা হয়েছে, **وَأَذْكُرُكَ فِي نَفْسِكَ** অর্থাৎ, সুউচ্চ স্বরে চাইতে কম স্বরে। অর্থাৎ, যে লোক আল্লাহ তআলার যিকর করবে তার সশন্দ যিকর করারও অধিকার রয়েছে, তবে তার আদব হল এই যে, অত্যন্ত জোরে চীৎকার করে যিকর করবে না। মাঝামাঝি আওয়াযে করবে যাতে আদব এবং মর্যাদাবোধের প্রতি লক্ষ্য থাকে। অতি উচ্চৈশ্বরে যিকর বা তেলাওয়াত করাতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, যার উদ্দেশ্যে যিকর করা হচ্ছে, তাঁর মর্যাদাবোধ অন্তরে নেই। সে সন্তার সম্মান ও মর্যাদা এবং ভয় মানব মনে বিদ্যমান থাকে, তাঁর সম্মান স্বভাবগতভাবেই মানুষ অতি উচ্চৈশ্বরে কথা বলতে পারে না। কাজেই আল্লাহর সাধারণ যিকরই হোক, কিংবা কোরআনের তেলাওয়াতই হোক, যখন আওয়াযের সাথে পড়া হবে, তখন সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য যাতে তা প্রয়োজনের চাইতে বেশী উচ্চৈশ্বরে না হতে পারে।

সারকথা এই যে, এ আয়াতের দ্বারা আল্লাহর যিকর বা কোরআন তেলাওয়াতের তিনটি পদ্ধতি বা নিয়ম জানা গেল। প্রথমতঃ আত্মিক যিকর। অর্থাৎ, কোরআনের মর্ম এবং যিকরের কল্পনা ও চিন্তার মাঝেই যা সীমিত থাকবে; যার সাথে জিহ্বার সামান্যতম স্পন্দনও হবে না। দ্বিতীয়তঃ যে যিকরে আত্মার চিন্তা-কল্পনার সাথে সাথে জিহ্বাও নড়বে। কিন্তু বেশী উচ্চ শব্দ হবে না, যা অন্যান্য লোকেও শোনবে। এ দু'টি পদ্ধতিই আল্লাহর বানী **وَأَذْكُرُكَ فِي نَفْسِكَ** -এর অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় পদ্ধতিটি হল অন্তরে উদ্ভিষ্ট সন্তার উপস্থিতি ও গ্যান করার সাথে সাথে জিহ্বার স্পন্দনও হবে এবং সেই সঙ্গে শব্দও বেরোবে। কিন্তু এই পদ্ধতির জন্য আদব বা রীতি হল আওয়াযকে অধিক উচ্চ না করা। সীমার বাইরে যাতে না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা। যিকরের এ পদ্ধতিই **وَأَذْكُرُكَ فِي نَفْسِكَ** আয়াতে শেখানো হয়েছে। কোরআনের আরও একটি আয়াতে বিষয়টিকে বিশেষ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে- **يُحْكِمُكَ فِي هَيْئِكَ** -এতে রসুলে করীম (সাঃ)-এর প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে, যাতে কোরআত পড়তে গিয়ে অতি উচ্চৈশ্বরেও পড়া না হয় এবং একেবারে মনে মনেও নয়। বরং কোরআতে যেন মাঝামাঝি আওয়াযে অবলম্বন করা হয়।

নামাযের মাঝে কোরআন তেলাওয়াত সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ও হযরত ফারুক আ'যম (রাঃ)-কে এ হেদায়েতই দিয়েছেন।

সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, একবার রসূলে করীম (সাঃ) শেষ রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর বাড়ী গিয়ে দেখলেন, তিনি নামায পড়ছেন। কিন্তু তাতে আস্তে আস্তে অর্থাৎ, শব্দহীনভাবে কোরআন তেলাওয়াত করছেন। তারপর তিনি (হুযূর সাঃ) সেখান থেকে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর বাড়ী গিয়ে দেখলেন, তিনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করছেন। অতঃপর ভোরে যখন উভয়ে হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর বেদমতে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি রাতের বেলায় আপনার নিকট গিয়ে দেখলাম, আপনি অতি ক্ষীণ আওয়াজে কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ, যে সন্তাকে শোনানো আমার উদ্দেশ্য ছিল তিনি শোনে নিচ্ছেন, তাই যথেষ্ট নয় কি? তেমনিভাবে হযরত ফারুককে আযম (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে হুযূর (সাঃ) বললেন, আপনি অতি উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করছিলেন। তিনি নিবেদন করলেন, উচ্চ শব্দে কেরাআত পড়তে গিয়ে আমার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে ঘুম আসতে না পারে এবং শয়তান যেন সে শব্দ শুনে পালিয়ে যায়। অতঃপর হুযূরে আকরাম (সাঃ) যীমাংসা করে দিলেন। তিনি হযরত সিদ্দীকে-আকবর (রাঃ)-কে কিছুটা জোরে এবং হযরত ফারুককে আযম (রাঃ)-কে কিছুটা আস্তে তেলাওয়াত করতে বললেন।—(আবু-দাউদ)

সেজদার কতিপয় ফযীলত ও আহকাম : এখানে নামাযসংক্রান্ত এবাদতের মধ্য থেকে শুধু সেজদার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামাযের সমগ্র আরকানের মধ্যে সেজদার একটি বিশেষ ফযীলত রয়েছে।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন এক লোক হযরত সওবান (রাঃ)-এর নিকট নিবেদন করলেন যে, আমাকে এমন একটা আমল বাতলে দিন যাতে আমি জ্ঞান্নাতে যেতে পারি। হযরত সওবান (রাঃ) নীরব রইলেন; কিছুই বললেন না। লোকটি আবার নিবেদন করলেন, তখনও তিনি চুপ করে রইলেন। এভাবে তৃতীয়বার যখন বললেন, তখন তিনি বললেন, আমি এ প্রশ্নটিই রসূলে করীম (সাঃ)-এর দরবারে করেছিলাম। তিনি আমাকে ওসীয়াত করেছিলেন যে, অধিক পরিমাণে সেজদা করতে

থাক। কারণ, তোমরা যখন একটি সেজদা কর তখন তার ফলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের মর্যাদা এক ডিগ্রী বাড়িয়ে দেন এবং একটি গোনাহ ক্ষমা করে দেন।

লোকটি বললেন, হযরত সওবান (রাঃ)-এর সাথে আলাপ করার পর আমি হযরত আবুদুদার (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছেও একই নিবেদন করলাম এবং তিনিও একই উত্তর দিলেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হোয়ায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, বান্দা স্বীয় পরওয়ারদেগারের সর্বাবধিক নিকটবর্তী তখনই হয়, যখন সে বান্দা সেজদায় অবনত থাকে। কাজেই তোমরা সেজদারত অবস্থায় খুব বেশী করে দোয়া-প্রার্থনা করবে। তাতে তা কবুল হওয়ার যথেষ্ট আশা রয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র সেজদা হিসাবে কোন এবাদত নেই। কাজেই ইমাম আ'যম হযরত আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে অধিক পরিমাণে সেজদা করার অর্থ অধিক পরিমাণে নফল নামায পড়া। নফল যতবেশী হবে সেজদাও ততই বেশী হবে।

কিন্তু কোন লোক যদি শুধু সেজদা করেই দোয়া করে নেয়, তাহলে তাতেও কোন ক্ষতি নেই। আর সেজদারত অবস্থায় দোয়া করার হেদায়েত শুধু নফল নামাযের সাথে সম্পৃক্ত, ফরয নামাযে নয়।

সূরা আ'রাফ শেষ হল। এর শেষ আয়াতটি হল আয়াতে সেজদা। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোয়ায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, কোন আদমসন্তান যখন কোন সেজদার আয়াত পাঠ করে অতঃপর সেজদায়ে তেলাওয়াত সম্পন্ন করে, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে যায় এবং বলে যে, আফসোস, মানুষের প্রতি সেজদার হুকুম হল আর সে তা আদায়ও করলো, ফলে তার ঠিকানা হল জ্ঞান্নাত, আর আমার প্রতিও সেজদার হুকুম হয়েছিল, কিন্তু আমি তার না-ফরমানী করেছি বল আমার ঠিকানা হল জাহান্নাম।

الأنفال

১৫৪

قال البلا



সূরা আল-আনফাল

মদীনার অবতীর্ণ : আয়াত, ৭৫

প্রথম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(১) আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীরমতের হুকুম। বলে দিন, গনীরমতের মাল হল আল্লাহর এবং রসুলের। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের হুকুম মান্য কর – যদি ঈমানদার হয়ে থাক। (২) যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কলাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা পোষণ করে। (৩) সে সমস্ত লোক যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রক্মী দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে- (৪) তাবাই হল সত্যিকার ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট মর্যাদা, ক্রমা এবং সম্মানজনক রক্মী। (৫) যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সংকাজের জন্য, অথচ ঈমানদারদের একটি দল (তাতে) সম্মত ছিল না। (৬) তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পর; তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে। (৭) আর যখন আল্লাহ দু'টি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়ালা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা কামনা করছিলেন যাতে কোন রকম কষ্টকট নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক, অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কলামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাকেরদের মূল কর্তন করে দিতে, (৮) যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন, যদিও পাণীরা অসন্তুষ্ট হয়।

সূরা আল-আনফাল

সূরার বিষয়বস্তু :

সূরা আনফাল এখন যা আরম্ভ হচ্ছে, এটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা। এর পূর্ববর্তী সূরা আ'রাফে মুশরেকীন (অশ্বীবাদী) এবং আহলে-কিফরে মুখ্ভতা, বিদ্রোহ, কুফরী ও ফেন্দা-ফাসাদ সংক্রান্ত আলোচনা এক তৎসম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা ছিল।

বর্তমান সূরাটিতে আলোচিত অধিকাংশ বিষয়ই বদরের যুদ্ধকাল সেই কাকের, মুশরিক ও আহলে-কিতাবের অন্তত পরিস্থিতি, তাদের পরাজয় ও অকৃতকার্যতা এবং তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের কৃতকার্যতা সম্পর্কিত, যা মুসলমানদের জন্য ছিল একান্ত কৃপা এক কাকেরদের জন্য ছিল আযাব ও প্রতিশোধস্বরূপ।

আর যেহেতু এই কৃপা ও দানের সবচাইতে বড় কারণ ছিল মুসলমানদের নিঃস্বার্থতা, পারস্পরিক ঐক্য, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পরিপূর্ণ আনুগত্যের ফল, সেহেতু সূরার প্রারম্ভেই তাকওয়া, পরহেজারী এবং আল্লাহর আনুগত্য, যিকির ও ভরসা প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। আয়াতের বিস্তারিত তফসীরের পূর্বে সে-ঘটনাটি জানা থাকলে এর তফসীর বুঝতে সহজ হবে বলে আশা করি।

ঘটনাটি হল এই যে, কুফর ও ইসলামের প্রথম সংঘর্ষ বদর যুদ্ধে যখন মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়ে গেল এবং কিছু গনীরমতের মাল-সামান হাতে এল, তখন সেগুলোর বিলি-বন্টন নিয়ে সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যে এমন এক ঘটনা ঘটে যা নিঃস্বার্থতা, এখলাস ও ঐক্যের সেই সুউচ্চমানে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, যার ভিত্তিতে সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ)-এর গোটা জীবন চলে সাজানো ছিল। সেজন্য সর্বাত্মক এ আয়াতে উন্নত সমাধান দেয়া হয়, যাতে করে এই পুণ্ড্রপবিত্র এবং নিশ্চল সপ্তদ্বারে অন্তরে বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থতা এবং ঐক্য ও আত্মত্যাগের প্রেরণা ছাড়া অন্য কোন বিষয় থাকতে না পারে।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হয়রত ওয়ালা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে-মাযা, মুসতাদারকে-হাকেম প্রভৃতি গ্রন্থে এভাবে উদ্ধৃত রয়েছে যে, হয়রত ওয়ালা ইবনে সায়েত (রাঃ)-এর নিকট কোন এক ব্যক্তি আয়াতে উল্লিখিত 'আনফাল' শব্দের মর্ম জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "এ আয়াতটি তো আমাদের অর্থাৎ, বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সে ঘটনাটি ছিল এই যে, গনীরমতের মালামাল বিলি-বন্টন ব্যাপারে আমাদের মাঝে সামান্য মতবিরোধ হয়ে গিয়েছিল যাতে আমাদের পবিত্র চরিত্রে একটা অন্তত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আল্লাহ এ আয়াতে মাধ্যমে গনীরমতের সমস্ত মালামাল আমাদের হাত থেকে নিয়ে রসুল করীম (সাঃ)-এর দায়িত্বে অর্পণ করেন। আর রসুল করীম (সাঃ) বদর অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে সমানভাবে সেগুলো বন্টন করে দেন।"

ব্যাপার ঘটছিল এই যে, বদরের যুদ্ধে আমরা সবাই রসুলে করীম (সাঃ)-এর সাথে বেরিয়ে যাই এবং উভয়দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধের পর আল্লাহ তাআলা যখন শত্রুদের পরাজিত করে দেন, তখন আমাদের সেনাবাহিনী তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু লোক শত্রুদের

পক্ষাবন করেন, যাতে তারা পুনরায় ফিরে আসতে না পারে। কিছু লোক কাকেরদের পরিত্যক্ত গনীরমতের মালামাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। আর কিছু লোক রসূলে করীম (সাঃ)-এর পাশে এসে সমবেত হন, যাতে গোপনে লুকিয়ে থাকা কোন শত্রু মহানবী (সাঃ)-এর উপর আক্রমণ করতে না পারে। যুদ্ধ শেষে সবাই যখন নিজেদের অবস্থানে এসে উপস্থিত হন, তখন যারা গনীরমতের মালামাল সংগ্রহ করেছিলেন, তাঁরা বলতে লাগলেন যে, এ সমস্ত মালামাল যেহেতু আমরা সংগ্রহ করেছি, কাজেই সবার আমদের ছাড়া অপর কারও ভাগ নেই। আর যারা শত্রুর পক্ষাবন করতে গিয়েছিলেন তাঁরা বললেন, এতে তোমরা আমাদের চাইতে বেশী অধিকারী নও। কারণ, আমরাই তো শত্রুকে হটিয়ে দিয়ে তোমাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছি যাতে তোমরা নিশ্চিন্তে গনীরমতের মালামালগুলো সংগ্রহ করে আনতে পার। পক্ষান্তরে যারা মহানবী (সাঃ)-এর অংশগ্রহণকল্পে তাঁর পাশে সমবেত ছিলেন, তাঁরা বললেন, আমরাই ইচ্ছা করলে গনীরমতের এই মাল সংগ্রহে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারতাম, কিন্তু আমরা জেহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হুম্মরে আকরাম (সাঃ)-এর হেফাযতে নিয়োজিত ছিলাম। অতএব আমরাও এর অধিকারী।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর এসব কথাবার্তা হুম্মর (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছলে পর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে পরিস্কার হয়ে যায় যে, এসব মালামাল আল্লাহ তাআলার; একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত এর অন্য কোন মালিক বা অধিকারী নেই। শুধু তাঁকে ছাড়া যাকে রসূলে করীম (সাঃ) দান করেন। সুতরাং মহানবী (সাঃ) আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের নির্দেশ অনুযায়ী এসব মালামাল জেহাদে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দেন।—(ইবনে-কাসীর) অতঃপর সবাই আল্লাহ ও রসূলের এই সিদ্ধান্তের উপর রাষ্ট্রী হয়ে যান এবং তাঁদের মহান মর্যাদার পরিপন্থী পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেজন্য সবাই লজ্জিত হন।

انفال শব্দটি نفل এর বহুবচন। এর অর্থ অনুগ্রহ, দান ও উপঢৌকন। নফল নামায, রোযা, সদকা প্রভৃতিকে এ কারণেই ‘নফল’ বলা হয় যে, এগুলো কারো উপর অপরিসর্য কর্তব্য ও গুয়াজিব নয়। যারা তা করে, নিজের খুশীতেই করে থাকে। কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় ‘নফল ও আনফাল’ গনীরমত বা যুদ্ধলব্ধ মালামালকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, যা যুদ্ধকালে কাকেরদের থেকে লাভ করা হয়। তবে কোরআন মজীদে এতদর্থ তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে—(১) আনফাল (২) গনীরমত এবং (৩) ফায়। انفال শব্দটি তো এ আয়াতেই রয়েছে। আর غنيمه (গনীরমত) শব্দ এবং তার বিশ্লেষণ এ সূরার একচল্লিশতম আয়াতে আসবে। আর فَي (ফায়) এবং তার ব্যাখ্যা সূরা হাশরের আয়াত .. فَيَوْمَئِذٍ প্রসঙ্গে করা হয়েছে। এ তিনটি শব্দের অর্থ যৎসামান্য পার্থক্যসহ বিভিন্ন রকম। সামান্য ও সাধারণ পার্থক্যের কারণে অনেক সময় একটি শব্দকে অন্যটির ক্ষয়গায় শুধু ‘গনীরমতের মাল’ অর্থেও ব্যবহার করা হয়। انفال (গনীরমত) সাধারণতঃ সে মালকে বলা হয়, যা যুদ্ধ-জেহাদের মাধ্যমে বিরোধী দলের কাছ থেকে হাসিল করা হয়। আর فَي (ফায়) বলা হয় সে মালকে যা কোন রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই কাকেরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তা সেগুলো কেলে কাকেররা পালিয়েই যাক, অথবা বেছায়া দিয়ে দিতে রাজী হোক। আর نفل ও انفال (নফল ও আনফাল) শব্দটি অধিকাংশ সময় এনআম বা পুরস্কার অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা জেহাদের নায়ক কোন বিশেষ মুজাহিদকে তার কৃতিত্বের বিনিময় হিসাবে গনীরমতের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তফসীরে ইবনে-জরীর গ্রন্থে হযরত

আবদুল্লাহ ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে।—(ইবনে-কাসীর) আবার কখনও ‘নফল’ ও ‘আনফাল’ শব্দ দ্বারা সাধারণ গনীরমতের মালকেও বোঝানো হয়। এ আয়াতের ক্ষেত্রেও অধিকাংশ তফসীরকার এই সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছেন। সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি সাধারণ-অসাধারণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে কোন মতবিরোধ নেই। বস্তুতঃ এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা হল সেটাই, যা ইমাম আবু ওবাইদ (রহঃ) করেছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ ‘কিতাবুল আশওয়াল’-এ উল্লেখ করেছেন যে, মূল অভিধান অনুযায়ী ‘নফল’ বলা হয় দান ও পুরস্কারকে। আর এই উদ্ভূতের প্রতি এটা এক বিশেষ দান যে, জেহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে যেসব মাল-সামান কাকেরদের কাছ থেকে লাভ করা হয়, সেগুলো মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। বিগত উদ্ভূতের মধ্যে এই প্রচলন ছিল না।

উল্লেখিত আয়াতে আনফাল-এর বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর এবং রসূলের। তার অর্থ এই যে, এগুলোর প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের এবং রসূলে করীম (সাঃ) হচ্ছেন সেগুলোর ব্যবস্থাপক। তিনি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক স্বীয় কল্যাণ বিবেচনায় সেগুলো বিলি-বন্টন করবেন।

সেজন্যই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-আব্বাস, ইকরিমাহ (রাঃ) এবং মুজাহিদ ও সুফী (রহঃ) প্রমুখসহ তফসীরবিদগণের এক বিরাট দল মত প্রকাশ করেছেন যে, এই ভুক্তিটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক আমলের, যখন গনীরমতের মাল-সামান বিলি-বন্টনের ব্যাপারে কোন আইন অবতীর্ণ হয়নি। আলোচ্য সূরার পঞ্চম ক্বুত্রে এ বিষয়টিই আলোচিত হবে। এ আয়াতে গনীরমতের যাবতীয় মালামালের বিষয়টি মহানবী (সাঃ)-এর কল্যাণ-বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তার ব্যবস্থা করতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীতে যে বিস্তারিত বিধি-বিধান এসেছে, তাতে বলে দেয়া হয়েছে যে, গনীরমতের সম্পূর্ণ মালামালকে পাঁচ ভাগ করে তার এক ভাগ বায়তুলমালে সাধারণ মুসলমানদের প্রয়োজনের লক্ষ্যে সুরক্ষণ করতে হবে এবং বাকী চার ভাগ বিশেষ নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে জেহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণের মাঝে বন্টন করে দেয়া হবে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সে সমস্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সূরা আনফালের আলোচ্য প্রথম আয়াতটিকে রহিত করে দিয়েছে। আবার কোন কোন মনীষী বলেছেন যে, এখানে কোন ‘নাসেখ-মনসুখ’ অর্থাৎ, রহিত কিংবা রহিতকারী নেই, বরং সংক্ষেপন ও বিশ্লেষণের পার্থক্য মাত্র। সূরা আনফালের প্রথম আয়াতে যা সংক্ষেপে বলা হয়েছে, একত্রিতম আয়াতে তারই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অবশ্য ‘ফায়’-এর মালামাল-যার বিধান সূরা হাশরে বিবৃত হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে রসূলে করীম (সাঃ)-এর অধিকারভুক্ত। তিনি নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনা অনুযায়ী যেভাবে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। সে কারণেই সেখানে তার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

“আমার রসূল যা কিছু তোমাদের দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে বারণ করেন, তা থেকে বিরত থাক।”

এই বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গনীরমতের মাল হলো সেসমস্ত মালামাল যা যুদ্ধ-জেহাদের মাধ্যমে হস্তগত করা হয়। আর ‘ফায়’ হল সে সমস্ত মালামাল যা কোন রকম লড়াই এবং জেহাদ ছাড়াই হাতে আসে। আর انفال (আনফাল) শব্দটি উভয় মালামালের জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এবং সেই বিশেষ পুরস্কার বা উপঢৌকনের

ঈমানকেই হাদীসে 'ঈমানের মাধুর্য' শব্দে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সূত্রাং আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, একজন পরিপূর্ণ মুমিনের গুণ-বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যে, তার সামনে যখনই আল্লাহর আয়াত প্রদর্শিত হয় এবং সৎকর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাবে। এতে বোঝা যাচ্ছে, মুসলমানেরা যেভাবে কোরআন পাঠ করে এবং শুনে, যাতে না মিলে কোরআনের আদব ও মর্যাদাবোধের কোন খোঁজ, না থাকে আল্লাহ শানুহর মহত্বের প্রতি লক্ষ্য, সে ধরনের ভেলাওয়াত উদ্দেশ্য ও নয় বরং এতে উচ্চতর ফলাফলও সৃষ্টি হয় না। অবশ্য সেটাও সম্পূর্ণভাবে পূর্ণা বিবর্তিত নয়।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আল্লাহর প্রতি ভরসা : মুমিনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ক্রমাগত গিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা রাখে। তাওয়াক্কুল অর্থ হল আস্থা ও ভরসা। অর্থাৎ, নিজের যাবতীয় কাজ-কর্ম ও অবস্থায় তার পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা থাকে শুধুমাত্র একক সত্তা আল্লাহ তাআলার উপর। সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, এর অর্থ এই নয় যে, স্বীয় প্রয়োজনের জন্য জড়-উপকরণ এবং চেষ্টা-চরিত্রকে পরিত্যাগ করে বসে থাকবে। বরং এর অর্থ হলো এই যে, যাহিক জড়-উপকরণকেই প্রকৃত কৃতকার্যতার জন্য যথেষ্ট বলে মনে না করে বরং নিজের সামর্থ্য ও সাহস অনুযায়ী জড়-উপকরণের আয়োজন ও চেষ্টা-চরিত্রের পর সাফল্য আল্লাহ তাআলার উপর ছেড়ে দেবে এবং মনে রাখবে যে, যাবতীয় উপকরণও তাঁরই সৃষ্টি এবং সে উপকরণসমূহের ফলাফলও তিনিই সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ হবও তাই, যা তিনি চাইবেন। এক হাদীসে বলা হয়েছে **اللَّهُ يَجْعَلُ الْيُسْرَىٰ أَيْسَرَ مِنَ الْهَيْبَةِ** অর্থাৎ, স্বীয় বিকির এবং অন্যান্য প্রয়োজনের জন্যে মাঝামাঝি পর্যায়ের অনুব্রণ এবং জড়-উপকরণের মাধ্যমে চেষ্টা করার পর তা আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও। নিজের মন-মস্তিস্ককে শুধুমাত্র স্থূল প্রচেষ্টা ও জড়উপকরণের মাঝেই জড়িয়ে রেখো না।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য নামায প্রতিষ্ঠা করা : মুমিনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে নামায প্রতিষ্ঠা করা। এখানে এ বিষয়টি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, এখানে 'নামায' পড়ার কথা নয়; বরং নামায প্রতিষ্ঠা করার কথা বলা হয়েছে **أَقَامَتِ** শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোন কিছুকে সোজা দাঁড় করানো। কাজেই **أَقَامَتِ صَلَاةَ** এর মর্মার্থ হচ্ছে নামাযের যাবতীয় আদব-কায়দা, রীতি-নীতি ও শর্তাশর্ত এমনভাবে সম্পাদন করা, যেমন করে রসুলে করীম (সাঃ) স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে ব্যতলে দিয়েছেন। আদব-কায়দা ও শর্তাশর্তের কোন রকম ত্রুটি হলে তাকে নামায পড়া বলা গেলেও নামায প্রতিষ্ঠা করা বলা যেতে পারে না। কোরআন মজীদে নামাযের যেসব উপকারিতা, প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং বরকতের কথা বলা হয়েছে—যেমন, **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْفَعُ فِي الْخُشْيَةِ وَالْمُتَّقِينَ** (অর্থাৎ, নামায লজ্জাহীনতা ও পাপ থেকে বিরত রাখে।) তা নামায প্রতিষ্ঠা করার উপরই নির্ভরশীল। নামাযের আদবসমূহে যখন কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তখন ফতোয়ার দিক দিয়ে তার সে নামাযকে জায়েয বলা হলেও ক্রটির পরিমাণ হিসাবে নামাযের বরকত ও কল্যাণে পার্থক্য দেখা দেবে। কোন কোন অবস্থায় তার বরকত বা কল্যাণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হতে হবে।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য আল্লাহর রাহে ব্যয় করা : মর্দে-মুমিনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাকে যে রিযিক দান করেছেন,

তা থেকে আল্লাহর রাহে খরচ করবে। আল্লাহর রাহে এই ব্যয় করার অর্থ ব্যাপক। এতে শরীয়ত নির্ধারিত যাকাত-ফেতরা প্রভৃতি, নফল দান-খয়রাতসহ মেহমানদারী, বড়দের কিংবা বন্ধুবান্ধবদের প্রতি কৃত আর্থিক সাহায্য-সহায়তা প্রভৃতি সব রকমের দান-খয়রাতই অন্তর্ভুক্ত।

মর্দে মুমিনের এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, **أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا** অর্থাৎ, এমনসব লোকই হল সত্যিকার মুমিন যাদের ভেতর ও বাহির এক রকম এবং মুখ ও অন্তর একাবদ্ধ। অন্যথায় যাদের মধ্যে এসমস্ত বৈশিষ্ট্য অবর্তমান, তারা মুখে **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** **وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ** বললেও তাদের অন্তরে না থাকে তওহীদের রং, আর না থাকে রসুলের আনুগত্য। তাদের কার্যধারা তাদের কথাতে প্রত্যাখ্যান করে। কাজেই এ আয়াতে এই ইঙ্গিতই দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক সত্যেরই একটা তাৎপর্য থাকে, তা যখন অর্জিত হয় না, তখন সত্যটিও লাভ হয় না।

কোন এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রহঃ)—এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিল যে, হে আবু সাঈদ! আপনি কি মুমিন? তখন তিনি বলেন, ভাই, ঈমান দু'প্রকার। তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয়ে থাকে যে, আমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ ও রসূলগণের উপর এবং বেহেশত, দোখখ, কেয়ামত ও হিসাব-কিতাবের উপর বিশ্বাস রাখি কি না? তাহলে তার উত্তর এই যে, নিশ্চয়ই আমি মুমিন। পক্ষান্তরে সূরা আনফালের আয়াতে যে মুমিনে কামেল বা পরিপূর্ণ মুমিনের কথা বলা হয়েছে তোমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, আমি তেমন মুমিন কি না? তাহলে আমি তা কিছুই জানি না যে, আমি তার অন্তর্ভুক্ত কি না। সূরা আনফালের আয়াত বলতে সে আয়াতগুলোই উদ্দেশ্য যা আপনারা এইমাত্র শুনলেন।

আয়াতগুলোতে সত্যিকার মুমিনের গুণ-বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণাদি বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে—**لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ كَثِيرَةٌ** অর্থাৎ মুমিনদের জন্য তিনটি বিষয়ের ওয়াদা করা হয়েছে। (১) সুউচ্চ মর্যাদা, (২) মাগফেরাত বা ক্ষমা এবং (৩) সম্মানজনক রিযিক।

তফসীরে বাহরে-মুহীতে উল্লেখ রয়েছে যে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে মুমিনদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে সেগুলো তিন রকম। (১) সেসব বৈশিষ্ট্য যার সম্পর্ক অন্তর ও অভ্যন্তরের সাথে। যেমন, ঈমান, খোদাভীতি, আল্লাহর উপর ভরসা বা নির্ভরশীলতা, (২) যার সম্পর্ক দৈহিক কার্যকলাপের সাথে। যেমন, নামায, রোযা প্রভৃতি (৩) যার সম্পর্ক ধন-সম্পদের সাথে। যেমন, আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে তিনটি পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। আত্মিক গুণাবলীর জন্য 'সুউচ্চ মর্যাদা'। সে সমস্ত আমল বা কাজ-কর্মের জন্য 'মাগফেরাত' বা ক্ষমা যেগুলোর সম্পর্ক মানুষের দেহের সাথে। যেমন নামায, রোযা প্রভৃতি। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, নামাযে পাপসমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। আর 'সম্মান জনক রিযিক'—এর ওয়াদা দেয়া হয়েছে আল্লাহর রাহে ব্যয় করার জন্য। মুমিন এ পথে যা ব্যয় করবে, আখেরাতে সে তদপেক্ষা বহু উত্তম ও বেশী প্রাপ্ত হবে।

সূরার শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সূরা আনফালের অধিকাংশ বিষয়ই হলো কাফের-মুশরিকদের আযাব ও প্রতিশোধ এবং মুসলমানদের

প্রতি অনুগ্রহ ও পুরস্কার সম্পর্কিত। এতে উভয়পক্ষের জন্যই শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয় এবং বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। আর এসব বিষয়ের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল বদর যুদ্ধ। এতে বিপুল আয়োজন, সংখ্যাধিক্য ও প্রচুর শক্তি সত্ত্বেও মুশরেকীনরা জান-মালের বিপুল ক্ষতিসহ পরাজয় বরণ করেছে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা সর্বপ্রকার স্বল্পতা সত্ত্বেও বিজয়ের গৌরব অর্জন করেছে।

বদর যুদ্ধের সময় কোন কোন মুসলমান জেহাদের অভিযান পছন্দ করছিলেন না, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ ফরমানের সাহায্যে রসূল করীম (সাঃ)-কে জেহাদাভিযানের নির্দেশ দিলে তারাও তাতে অংশগ্রহণ করেন, যারা ইতিপূর্বে বিষয়টিকে পছন্দ করছিলেন। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে কোরআন করীম এমনসব শব্দ প্রয়োগ করেছে, যেগুলো বিভিন্নভাবে প্রাধান্যযোগ্য।

আয়াতটি আরম্ভ করা হয়েছে **كَيْفَ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ** বাক্য দিয়ে। এতে **كَيْفَ** এমন একটি বাক্যাংশ যা তুলনা বা উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রয়োগ করা হয়। অতএব, লক্ষ্য করার বিষয় যে, এখানে কিসের সাথে কিসের তুলনা করা হচ্ছে। তফসীরকার মনীষীবৃন্দ এর বিভিন্ন বিশ্লেষণ করেছেন। তাতে বহুবিধ সম্ভাব্যতা রয়েছে।

এক : এই তুলনার উদ্দেশ্য এই যে, যেভাবে বদর যুদ্ধে হস্তগত গনীমতের মালামাল বন্টন করার সময় সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর মাঝে পারস্পরিক কিছুটা মতবিরোধ হয়েছিল এবং পরে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক সবাই মহানবী (সাঃ)-এর হুকুমের প্রতি আনুগত্য করেন এবং তাঁর বরকত ও শুভ পরিণতিসমূহ দেখতে পান, তেমনিভাবে এ জেহাদের প্রারম্ভে কারো পক্ষ থেকে তা অপছন্দ করা হলেও পরে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী সবাই আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তার শুভফল ও উত্তম পরিণতি দেখতে পায়। এ বিশ্লেষণকে ফারুগ ও মুবাররাদ এর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া বয়ানুল-কোরআনেও এ বিশ্লেষণকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

দুই : এমন সম্ভাবনাও হতে পারে যে, বিগত আয়াতসমূহে সত্যিকার মুমিনগণের জন্য আখেরাতে সুউচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রুহী দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। অতঃপর এ আয়াতগুলোতে সে সমস্ত প্রতিশ্রুতির অবশ্যস্বাবিতা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আখেরাতের প্রতিশ্রুতি যদিও এখনই চোখে পড়ে না, কিন্তু বদর যুদ্ধে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি প্রত্যক্ষ করা গেছে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস কর যে, এ পৃথিবীতেই যেভাবে ওয়াদা বাস্তবায়িত হয়েছে তেমনিভাবে আখেরাতের ওয়াদাও অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। - (কুরত্বী)

তিন : এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যা আবু-হাইয়ান (রহঃ) মুফাসসেরীনদের উক্তি উদ্ধৃত করার পর লিখেছেন যে, এ সমস্ত উক্তির কোনটির উপরেই আমার পরিপূর্ণ আস্থা ছিল না। একদিন আমি এ আয়াতটির বিষয় চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্নে দেখলাম, আমি কোথাও যাচ্ছি এবং আমার সাথে অন্য একটি লোক রয়েছে। আমি সে লোকটির সাথে এ আয়াতের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করতে গিয়ে বললাম, আমি কখনও এমন জটিলতার সম্মুখীন হইনি, যেমনটি এ আয়াতের ব্যাপারে হয়েছি। আমার মনে হচ্ছে, যেন এখানে কোন একটি শব্দ উহ্য রয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ স্বপ্নের মাঝেই আমার মনে পড়ে গেল যে,

এখানে **نَصْرَكَ** (নাছরাকা) শব্দটি উহ্য রয়েছে। বিষয়টি আমারও বেশ মনঃপূত ও পছন্দ হল এবং যার সাথে তর্ক করছিলাম সেও পছন্দ করল। ঘুম থেকে জাগার পর পুনরায় বিষয়টি নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম। তাতে আমার মনের সন্দেহ বা প্রশ্ন দূর হয়ে গেল। কারণ, এ ক্ষেত্রে **نَصْرَكَ** শব্দটির ব্যবহার উদাহরণ ব্যক্ত করার জন্য থাকে না, বরং কাল বিশ্লেষণাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। আর তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বদর যুদ্ধের সময় মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেই যে বিশেষ সাহায্য-সহায়তা নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি হয়েছিল, তার কাল ছিল এই যে, এই জেহাদে তিনি যা কিছু করেছিলেন তার কোন কিছু নিজের মতে করেননি, বরং সেসবই করেছিলেন প্রভুর নির্দেশে এক খোদায়ী হুকুমের প্রেক্ষিতে। তাঁরই হুকুমে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। আল্লাহ্ র আনুগত্যের ফলও তাই হওয়া উচিত এবং তাতেই আল্লাহ্ সাহায্য-সহায়তা পাওয়া যায়।

যাহোক, আয়াতে বর্ণিত এই বাক্যটিতে উল্লেখিত তিনটি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে এবং তিনটিই যথার্থ বটে।

বস্তুতঃ **نَصْرَكَ** বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জেহাদে উদ্দেশ্যে মহানবী (সাঃ)-এর যাত্রা প্রকৃত প্রস্তাবে যেন আল্লাহ্ তাআলার যাত্রা ছিল যা হুমুরের মাধ্যমে বাস্তবতা লাভ করেছে বা প্রকাশ পেয়েছে।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এখানে **نَصْرَكَ** বলা হয়েছে যাতে আল্লাহ্ র উল্লেখ এসেছে ‘রব’ ‘গণবাচক’ নামে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর এ জেহাদ যাত্রা ছিল পালনকর্তা ও লালনসুলভ গুণের দাবী। কারণ, এতে অত্যাচারিত, উৎপীড়িত মুসলমানদের জন্য বিদ্রোহ এবং অত্যাচারী, দাস্তিক কাফেরদের জন্যে আযাবের বিকাশই হল উদ্দেশ্য।

وَمِنْ بَيْنِكُمْ এর অর্থ হল আপনার ঘর থেকে। অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা আপনাকে আপনার ঘর থেকে বের করেছেন। অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই ‘ঘর’ বলতে মদীনা তাইয়েবার ঘর কিংবা মদীনাকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে হিজরতের পর তিনি অবস্থ করছিলেন। কারণ, বদরের ঘটনাটি হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে সংঘটিত হয়েছিল। এরই সঙ্গে **بَيْنِكُمْ** শব্দ ব্যবহার করে বাতল দেয়া হয়েছে যে, এই সমূহ বিষয়টিই সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসত্যকে প্রতিহত করা উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্র বা সরকারের মত রাজ্য বিজয়ের লোভ কিংবা রাজ্যবর্গের রাগ-রোষের প্রেক্ষিতে ছিল না। আয়াত শেষাংশে বলা হয়েছে - **وَأَنَّ رُسُلًا مِّنْكُمْ لَيُخَوِّنُنَّ كُفْرًا**

মুসলমানদের কোন একটি দল এ জেহাদ কঠিন মনে করছিল এবং পালন করছিল না। সাহাবায়ে কেরামের মনে এই কঠিনতাবোধ কেমন করে গেল, সে কথা উপলব্ধি করার জন্য এবং পরবর্তী অন্যান্য আয়াতগুলোর যথাযথভাবে বোঝার জন্য প্রথম গণ্ডিয়ায় বদরের প্রাথমিক অবস্থা কারণগুলো জেনে নেয়া প্রয়োজন।

ইবনে-আকাবাহ ও ইবনে আমরের বর্ণনা অনুসারে ঘটনাটি ছিল এই যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট মদীনায় এ সংবাদ এসে পৌঁছে যে আবু সুফিয়ান একটি বাণিজ্যিক কাকফেলাসহ বাণিজ্যিক পণ্য-সামগ্রী সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর এই বাণিজ্যে মক্কার মক্কা কোরায়েশ অংশীদার। ইবনে-আকাবাহ বর্ণনা অনুযায়ী মক্কার এমন লোক

কোরায়েশ নারী বা পুরুষ ছিল না যার অংশ এ বাণিজ্যে ছিল না। কারো কাছে এক মিস্কাল (সাড়ে চার মাশা) পরিমাণ সোনা থাকলে, সেও তা এতে নিজের অংশ হিসাবে লাগিয়েছিল। এই কাফেলার মোট পুঁজি সম্পর্কে ইবনে আকাবার বর্ণনা হচ্ছে এই যে, তা পঞ্চাশ হাজার দীনার ছিল। দীনার হল একটি স্বর্ণমুদ্রা যার ওজন সাড়ে চার মাশা। স্বর্ণের দর অনুযায়ী এর মূল্য হয়, বাহান্ন টাকা এবং গোটা পুঁজির মূল্য হয় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। আর তাও আজকের নয়, বরং চৌদ্দ শ' বছর পূর্বকার ছাব্বিশ লক্ষ যা বর্তমান ছাব্বিশ কোটি অপেক্ষাও অনেক গুণ বেশী হতে পারে। এই বাণিজ্যিক কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবসায়ের জন্য সত্তর জন কোরায়েশ যুবক ও সর্দার এর সাথে ছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এই বাণিজ্য কাফেলাটি ছিল কোরায়েশদের একটি বাণিজ্য কোম্পানী।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখের রেওয়াজে মতে বগতী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, এই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কোরায়েশদের চতুর্দশ জন বোড়সওয়ার সর্দার যাদের মধ্যে আমার ইবনুল আস, মাখরামাহ ইবনে নাওফল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া একথাও সবাই জানত যে, কোরায়েশদের এই বাণিজ্য এবং বাণিজ্যিক এই পুঁজিই ছিল সবচেয়ে বড় শক্তি। এরই ভরসায় তারা রসূলে করীম (সাঃ) ও তাঁর সঙ্গীসাব্বীদিগকে টপ্পাডন করে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। সে কারণেই হযুর (সাঃ) যখন সিরিয়া থেকে এই কাফেলা ফিরে আসার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি দ্রুত করলেন যে, এখনই কাফেলার মোকাবেলা করে কোরায়েশদের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দেয়ার উপযুক্ত সময়। তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তখন ছিল রমযানের মাস। যুদ্ধেরও কোন পুঞ্জীভূতি ছিল না। কাজেই কেউ কেউ সাহস ও শৌর্য প্রদর্শন করলেও অনেকে কিছুটা দোদুল্যমানতা প্রকাশ করলেন। স্বয়ং হযুর (সাঃ)-ও সবার উপর এ জেহাদে অংশগ্রহণ করাকে অপরিহার্য বা বাধ্যতামূলক হিসেবে সাব্যস্ত করলেন না; বরং তিনি হুকুম করলেন, যাদের কাছে সওয়ারীর ব্যবস্থা রয়েছে, তারা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাতে অনেকে যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থেকে যান। আর যারা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাদের সওয়ারী ছিল গ্রাম এলাকায়, তাঁরা গ্রাম থেকে সওয়ারী আনিয়ে পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অমুখতি চাইলেন, কিন্তু এতটা অপেক্ষা করার মত সময় তখন ছিল না। তাই নির্দেশ হল, যাদের নিকট এ মুহুর্তে সওয়ারী উপস্থিত রয়েছে এবং জেহাদে যেতে চান, শুধু তাঁরাই যাবেন। বাইরে থেকে সওয়ারী আনিয়ে নেবার মত সময় এখন নেই। কাজেই হযুর (সাঃ)-এর সাথে যেতে আগ্রহীদের মধ্যেও অল্পই তৈরী হতে পারলেন। বস্তুতঃ যারা এই জেহাদে অংশগ্রহণের আদৌ ইচ্ছাই করেনি, তার কারণও ছিল, তা এই যে, মহানবী (সাঃ) এতে অংশগ্রহণ করা সবার জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য সাব্যস্ত করেননি। তাছাড়া তাদের মনে এ বিশ্বাসও ছিল যে, এটা একটা বাণিজ্যিক কাফেলা মাত্র, কোন যুদ্ধবাহিনী নয় যার মোকাবেলা করার জন্য রসূলে করীম (সাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদিগকে খুব বেশী পরিমাণ সৈন্য কিংবা মুজাহেদীদের প্রয়োজন পড়তে পারে। কাজেই সাহাবায়ে-কেরামের এক বিরাট অংশ এতে অংশগ্রহণ করেননি।

মহানবী (সাঃ) 'বি'র সুক্কাইয়া' নামক স্থানে পৌঁছে যখন কায়েস ইবনে সা'দ'আ (রাঃ)-কে সৈন্য গণনা করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি তা গুণ নিয়ে জানান তিন'শ তের জন রয়েছে। মহানবী (সাঃ) এ কথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন, তালুতের সৈন্য সংখ্যাও তাই ছিল। কাজেই লক্ষণ শুভ। বিজয় ও কৃতকার্যতারই লক্ষণ বটে। সাহাবায়ে কেরামের সাথে

মোট উট ছিল সত্তরটি। প্রতি তিন জনের জন্য একটি, যাতে তারা পালাক্রমে সওয়ারী করেছিলেন। স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে অপর দু'জন একটি উটের অশীদার ছিলেন। তাঁরা ছিলেন হযরত আবু লুবাযাহ্ ও হযরত আলী (রাঃ)। যখন হযুর (সাঃ)-এর পায়ে হেঁটে চলার পালা আসতো, তখন তারা বলতেন, ইয়া রসূলান্নাহ্, আপনি উটের উপরেই থাকুন, আপনার পরিবর্তে আমরা হেঁটে চলব। তাতে রাহমাতুল্লিল আলামীনের পক্ষ থেকে উত্তর আসতঃ না, তোমরা আমার চাইতে বেশী বলিষ্ঠ, আর না আখেরাতের সওয়াবে আমার প্রয়োজন নেই যে, আমার সওয়ারীর সুযোগটি তোমাদিগকে দিয়ে দেব। সুতরাং নিজের পালা এলে মহানবী (সাঃ)-ও পায়ে হেঁটে চলতেন।

অপরদিকে সিরিয়ার বিখ্যাত স্থান 'আইনে-যোরকায়' পৌঁছে এক ব্যক্তি কোরায়েশ কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ানকে এ সংবাদ দিল যে, রসূলে করীম (সাঃ) তাদের এ কাফেলার অপেক্ষা করেছেন; তিনি এর পশ্চাদ্ধাবন করবেন। আবু সুফিয়ান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করল। যখন কাফেলাটি হেজাজের সীমানায় পৌঁছাল, তখন বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম জৈনক দমদম ইবনে ওমরকে কুড়ি মেসকাল সোনা অর্থাৎ, প্রায় দু'হাজার টাকা মজুরী দিয়ে এ ব্যাপারে রাযী করাল যে, সে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রীতে চড়ে যথাসীধ্য মক্কা মুকাররমায় গিয়ে এ সংবাদটি পৌঁছে দেবে যে, তাদের কাফেলা সাহাবায়ে-কেরামের আক্রমণ আশঙ্কার সম্মুখীন হয়েছে।

দম্ দম ইবনে ওমর সেকালের বিশেষ রীতি অনুযায়ী আশঙ্কার ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার উষ্ট্রীর নাক-কান কেটে এবং নিজের পরিধেয় পোশাকের সামনা পেছনে ছিড়ে ফেলল এবং হাওদাটি উল্টোভাবে উষ্ট্রীর পিঠে বসিয়ে দিল। এটি ছিল সেকালে ঘোর বিপদের চিহ্ন। যখন সে এভাবে মক্কা এসে ঢুকল, তখন গোটা মক্কা নগরীতে এক হৈ-ঠে পড়ে গেল, সাজ সাজ রব উঠল। সমস্ত কোরাইশ প্রতিরোধের জন্য তৈরী হয়ে গেল। যারা এ যুদ্ধে যেতে পারল, নিজেই অংশগ্রহণ করল। আর যারা কোন কারণে অপারক ছিল, তারা অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল। এভাবে মাত্র তিন দিনের মধ্যে সমগ্র কোরাইশ বাহিনী পরিপূর্ণ সাজ-সজ্জায় নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

তাদের মধ্যে যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে গড়িমসি করত, তাদেরকে তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং মুসলমানদের সমর্থক বলে মনে করত। কাজেই এ ধরণের লোককে তারা বিশেষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল। যারা প্রকাশ্যভাবে মুসলমান ছিলেন এবং কোন অসুবিধার দরুন তখনও হিজরত করতে না পেরে মক্কাতে অবস্থান করছিলেন, তাদেরকে এবং বনু-হাশেম গোত্রের যেসব লোকের প্রতি সন্দেহ হতো যে, এরা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে, তাদেরকেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। এ সমস্ত অসহায় লোকদের মধ্যে মহানবী (সাঃ)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং আবু তালেবের দুই পুত্র তালেব ও আকীলও ছিলেন।

যাহোক, এভাবে সব মিলিয়ে এই বাহিনীতে এক হাজার জওয়ান, দু'শ' ঘোড়া ছ'শ' বর্মধারী এবং সারী গায়িকা ঐদীদল তাদের বাদ্যযন্ত্রাদিসহ বদর অভিযুগ্মে রওনা হল। প্রত্যেক মঞ্জিলে তাদের খাবার জন্য দশটি করে উট জবাই করা হত।

অপরদিকে রসূলে করীম (সাঃ) শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক কাফেলার মোকাবেলা করার অনুপাতে প্রস্তুতি নিয়ে ১২ই রমযান শনিবার মদীনা তাইয়্যেবা থেকে রওনা হন এবং কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর

বদরের নিকট এসে পৌছে দু'জন সাহাবীকে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন।—(মাযহারী)

সংবাদবাহকরা ফিরে এসে জানানেন যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা মহানবীর পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ জানতে পেরে নদীর তীর ধরে অতিক্রম করে চলে গেছে। আর কোরাইশরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে।—(ইবনে-কাসীর)

বলাবাহুল্য, এ সংবাদে অবস্থার মোড় পালে গেল। তখন রসূলে করীম (সাঃ) সঙ্গী সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কি না। হযরত আবু আইয়্যুব আনসারী ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, তাদের মোকাবেলা করার মত শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা এমন কোন উদ্দেশ্য নিয়েও আসিনি। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং রসূলের নির্দেশ পালনের জন্য নিজেকে নিবেদন করলেন। তারপর হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং তেমনভাবে নির্দেশ পালন ও জেহাদের জন্য প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করলেন। অতঃপর মেকদাদ (রাঃ) উঠে নিবেদন করলেনঃ

“ইয়া রসূলুল্লাহ্, আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি যে ফরমান পেয়েছেন, তা জারি করে দিন, আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহর কসম, আমরা আপনাকে এমন উত্তর দেব না, যা বনী-ইসরাঈলরা দিয়েছিল হযরত মুসা (আঃ)-কে। তারা বলেছিল : **قُلْ هَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ تَقَارُرًا** অর্থাৎ, যান, আপনি ও আপনার রব (পালনকর্তা) গিয়ে লড়াই করুন, আমরা তো এখানেই বসে থাকলাম। সে সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের আবিসিনিয়ার ‘বার্কুলগিমাদ’ নামক স্থানে নিয়ে যান, তবুও আমরা জেহাদ করার জন্য আপনার সাথে যাব”।

মহানবী (সাঃ) হযরত মেকদাদের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং দোয়া করেন। কিন্তু তখনও আনসারগণের পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। আর এমন একটা সম্ভাবনাও ছিল যে, হুম্মের আকরাম (সাঃ)-এর সাথে আনসারগণের যে সহযোগিতা-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যেহেতু তা ছিল মদীনার অভ্যন্তরের জন্য, সেহেতু তারা মদীনার বাইরে সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে বাধ্যও ছিলেন না। সুতরাং মহানবী (সাঃ) সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেন-বন্ধুগণ, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও যে, আমরা এই জেহাদে মদীনার বাইরে এগিয়ে যাব কি না? এই সম্বেধানের মূল লক্ষ্য ছিলেন আনসারগণ। হযরত সা'দ ইবনে মো'আয আনসারী (রাঃ) হুম্ম (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিবেদন করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্, আপনি কি আমাদিগকে জিজ্ঞেস করছেন?

তিনি বললেন, হাঁ। তখন সা'দ ইবনে মো'আয (রাঃ) বললেনঃ

“ইয়া রসূলুল্লাহ্ আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দান করেছি যে, আপনি যা কিছু বলেন তা সত্য। আমরা এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, যে কোন অবস্থায় আপনার আনুগত্য করব। অতঃপর, আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফরমান লাভ করেছেন, তা জারি করে দিন। সে সত্তার কসম, যিনি আপনাকে দ্বীনে-হক দিয়ে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদিগকে সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমরা আপনার সাথে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্য থেকে কোন একটি লোকও আপনার কাছ থেকে সরে যাবে না। আপনি যদি কালই আমাদিগকে শত্রুর সশুধীন করে দেন, তবুও আমাদের মনে এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না। আমরা আশা করি, আল্লাহ তাআলা আমাদের কর্মের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রত্যক্ষ করাবেন, যা দেখে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহর নামে আমাদিগকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান।”

এ বক্তব্য শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অত্যন্ত খুশী হলেন এবং স্বীয় কাফেলাকে হুকুম করলেন, আল্লাহর নামে এগিয়ে যাও। সাথে সাথে এ সুসংবাদও শোনালেন যে, আমাদের আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীন ওয়াদা করেছেন যে, এ দু'টি দলের মধ্যে একটির উপর আমাদের বিজয় হবে। দু'টি দল বলতে, একটি হল আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা, আর অপরটি হল মক্কা থেকে আগত সৈন্যদল। অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহর কসম, আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি স্বচক্ষে দেখছি।

(—এ সমুদয় ঘটনা তফসীরে ইবনে-কাসীর এবং মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ الْمُنَافِقِينَ لَكُمُ

এই জেহাদকে কঠিন মনে করছিল বলে যে উক্তি করা হয়েছে, তাতে পরামর্শকালে সাহাবায়ে-কেরামের পক্ষ থেকে জেহাদের ব্যাপারে যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল, সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আর এ ঘটনারই বিশ্লেষণ ব্যক্ত হয়েছে পরবর্তী **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** আয়াতে।

অর্থাৎ, এরা আপনার সাথে সত্যের ব্যাপারে বিতর্ক ও বিরোধ করেছে যে তাদেরকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে।

সাহাবায়ে-কেরাম যদিও কোন রকম নির্দেশ লব্ধন করেননি; বর পরামর্শের উত্তরে নিজদের দুর্বলতা ও ভীকৃত্য প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু রসূলের সহচরদের কাছ থেকে এহেন মত প্রকাশও তাদের সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে আল্লাহর পছন্দ ছিল না, কাজেই অসন্তোষের ভাষায়ই তা বিবৃত করা হয়েছে।



(৯) তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। (১০) আর আল্লাহ্ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাপ্রতির অধিকারী, হেকমত ওয়ালা। (১১) যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাক্ষত্রতা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন, যাতে তোমাদিগকে পবিত্র করে দেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতেন পোরেন তোমাদের অস্ত্রসমূহকে এবং তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতেন পোরেন তোমাদের পা গুলো। (১২) যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়। (১৩) যেহেতু তারা অবাক হয়েছিল আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের, সেজন্য এই নির্দেশ। বস্ততঃ যে লোক আল্লাহ্ ও রসুলের অবাক হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (১৪) আগাতত্ত বর্তমান এ শাস্তি তোমরা আত্মদান করেন নাও এবং জেনে রাখ যে, কাফেরদের জন্য রয়েছে দোষের আঘাত। (১৫) হে ইমানদারগণ, তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। (১৬) আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত—অন্যরা আল্লাহ্র গণ্য সাধে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্ততঃ সেটা হল নিকট অবস্থান।

সূরা আনফালের শুরু থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার সে সমস্ত নেয়ামতের আলোচনা চলছে যা তাঁর অনুগত বাদাদের প্রতি প্রদত্ত হয়েছে। গযওয়ায়ে-বদরের ঘটনাগুলোও সে ধারারই কয়েকটি বিষয়। গযওয়ায়ে-বদরে যেসব নেয়ামত আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে দান করা হয়েছে তার প্রথমটি ছিল এ যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের যাত্রা করা যা আয়াতে বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় নেয়ামত হল ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করার ওয়াদা, যা **وَإِذْ يَخْتَصِمُ النَّعَاسُ** আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। আর তৃতীয় নেয়ামত দোয়ার মঞ্জুরী ও সাহায্যের ওয়াদা **إِذْ سَخَّرَ لَكُمْ** আয়াতে। উল্লেখিত আয়াতসমূহের প্রথমটিতে রয়েছে চতুর্থ দানের আলোচনা। তাতে মুসলমানদের জন্য দু'টি নেয়ামতের কথা বলা হয়েছে। একটি হল সবার উপর তন্দ্রা নেমে আসার ফলে তন্দ্রা-শান্তি বিদূরিত হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হল বাষ্টির মাধ্যমে তাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দেয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রটিকে তাদের জন্য সমতল আর শত্রুদের জন্য কাদাপূর্ণ করে দেয়া।

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, কুফর ও ইসলামের সর্ব প্রথম এই সময় যখন অবশ্যস্বার্থী হয়ে পড়ে, তখন মক্কার কাফের বাহিনী প্রথমে সেখানে পৌঁছে গিয়ে এমন জায়গায় অবস্থান নিয়ে নেয় যা উপরের দিকে ছিল। পানি ছিল তাদের নিকটে। পক্ষান্তরে মহানবী (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম সেখানে পৌঁছলে তাদেরকে অবস্থান গ্রহণ করতে হয় নিম্নাঞ্চলে। কোরআনে করীম এই যুদ্ধক্ষেত্রের নকশা এ সূরার বিয়াল্লিশতম আয়াতে এভাবে বিবৃত করেছে — **إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى** সনিস্তার বিশ্লেষণ পরবর্তীতে করা হবে।

যেখানে পৌছার পর রসুলে করীম (সাঃ) প্রথম অবস্থান গ্রহণ করেন, সে স্থানের সাথে পরিচিত হযরত হোবাব ইবনে মুনির (রাঃ) স্থানটিকে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রায়োগী বিবেচনা করে নিবেদন করলেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! যে জায়গাটি আপনি গ্রহণ করেছেন, তা কি আপনি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে গ্রহণ করেছেন, যাতে আমাদের কিছু বলার কোন অধিকার নেই, না কি শুধুমাত্র নিজের মত ও অন্যান্য কল্যাণ বিবেচনায় বেছে নিয়েছেন? হযুর আকরাম (সাঃ) বললেন, না, এটা আল্লাহ্র নির্দেশ নয়; এতে পরিবর্তনও করা যেতে পারে। তখন হোবাব ইবনে-মুনির (রাঃ) নিবেদন করলেন, তাহলে এখান থেকে এগিয়ে গিয়ে মকী সর্দারদের বাহিনীর নিকটবর্তী একটি পানিপূর্ণ স্থান রয়েছে, সেটি অধিকার করাই হবে উত্তম। মহানবী (সাঃ) তাঁর এ পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং সেখানে পৌঁছে পানির উপর কক্ষা করে নেন। একটি হাউজ বানিয়ে তাতে পানির সঞ্চয় গড়ে তোলেন।

এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর হযরত সা'দ ইবনে আ'আয (রাঃ) নিবেদন করেন, ইয়া রসুলাল্লাহ্! আমরা আপনার জন্য কোন একটি সুরক্ষিত স্থানে একটি সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে দিতে চাই। সেখানে আপনি অবস্থান করবেন এবং আপনার সওয়ারীগুলিও আপনার কাছেই থাকবে।

এর উদ্দেশ্য এই যে, আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ করব। আল্লাহ্ যদি আমাদের বিজয় দান করেন, তবে তো এটাই উদ্দেশ্য। আর যদি

খোদানাখাত্তা অন্য কোন অবস্থার উদ্ভব হয়ে যায়, তাহলে আপনি আপনার সওয়াবীতে সওয়াব হয়ে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের সাথে গিয়ে মিশবেন, হারা মদীনা-তাইয়েবায় রয়ে গেছেন। কারণ, আমার ধারণা, তাঁরাও একান্ত জীবন উৎসর্গকারী এবং আপনার সাথে মহব্বতের ক্ষেত্রে তাঁরাও আমাদের চাইতে কোন অংশে কম নয়। আপনার মদীনা থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাঁরা যদি একথা জানতেন যে, আপনাকে এহেন সুসজ্জিত বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে, তাহলে তাদের একজনও পেছনে থাকতেন না। আপনি মদীনায় গিয়ে পৌঁছলে তাঁরা হবেন আপনার সহকর্মী। মহানবী (সাঃ) তার এই বীরাচিহ্ন প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে দোয়া করলেন এবং তাঁর জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সামিয়ানার ব্যবস্থা করে দেয়া হল। তাতে মহানবী (সাঃ) এবং সিন্দীকে আকবর (রাঃ) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। হযরত মো'আয (রাঃ) তাঁদের হেফাযতের জন্য তরবারি হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে— ছিলেন।

যুদ্ধের প্রথম রাত। তিনশ' তের জন নিরস্ত্র লোকের মোকাবেলা নিজেদের চাইতে তিন গুণ অর্থাৎ, প্রায় এক হাজার লোকের এক বাহিনীর সাথে। যুদ্ধক্ষেত্রের উপযুক্ত স্থানটিও ওদের দখলে। পক্ষান্তরে নিম্নাঞ্চল, তাও বালুময় এলাকা, যাতে চলাফেরাও কষ্টকর, সেটি পড়ল মুসলমানদের ভাগে। স্বাভাবিকভাবেই পেরেশানী ও চিন্তা-দুর্ভাবনা সবারই মধ্যে ছিল; কারো কারো মনে শয়তান এমন ধারণাও সঞ্চার করেছিল যে, তোমরা নিজেদেরকে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী কর এবং এখনও আরাম করার পরিবর্তে তাহাজ্জুদের নামায়ে ব্যাপৃত রয়েছে। অথচ সবদিক দিয়েই শত্রুরা তোমাদের উপর বিজয়ী এবং ভাল অবস্থায় রয়েছে। এমনি অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের উপর এক বিশেষ ধরনের তন্দ্রা চাপিয়ে দিলেন। তাতে ঘুমানোর কোন প্রবৃত্তি থাক বা নাই থাক জবরদস্তি সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

হাফেযে হাদীস আবু ইয়া'লা উক্ত করেছেন যে, হযরত আলী মুর্তবা (রাঃ) বলেছেন, বরর যুদ্ধের এই রাতে কেউ ছিল না, যে ঘুমায়েনি। শুধু রসুলে করীম (সাঃ) সারা রাত জেগে থেকে ভোর পর্যন্ত তাহাজ্জুদের নামায়ে নিয়োজিত থাকেন।

ইবনে-কাসীর বিশুদ্ধ সনদসহ উক্ত করেছেন যে, রসুলে করীম (সাঃ) এ রাতে যখন স্বীয় 'আরীশ' অর্থাৎ, সামিয়ানার নীচে তাহাজ্জুদ নামায়ে নিয়োজিত ছিলেন তখন তাঁর চোখেও সামান্য তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসতে হাসতে জেগে ওঠে বলেন, হে আবু বকর। সুসংবাদ শুন; এই যে জিবরাঈল (আঃ) টিলার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। একথা বলতে বলতে তিনি—

আয়াতটি পড়তে পড়তে সামিয়ানার বাইরে বেরিয়ে এলেন। আয়াতের অর্থ এই যে, শীঘ্রই শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়ে যাবে এবং পক্ষাদপসরণ করে পালিয়ে যাবে। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে যে, তিনি সামিয়ানার বাইরে এসে বিভিন্ন জায়গার প্রতি ইশারা করে বললেন, এটা আবু জাহ্লর হত্যা স্থান, এটা অমুকের; সেটা অমুকের। অতঃপর ঘটনা তেমনিভাবে ঘটতে থাকে।— (তফসীরে মাহহারী) আর বদর যুদ্ধে যেমন ক্লাস্তি-পরিশ্রান্তি দূর করে দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের উপর এক বিশেষ ধরনের তন্দ্রালুতা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তেমনি ঘটনা ঘটেছিল ওহদ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও।

সুফিয়ান সগরী (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)—এর রেওয়াজেতক্রমে উক্ত করেছেন যে, যুদ্ধাবস্থায় ঘুম আসাটা আল্লাহর পক্ষ

থেকে শান্তি ও স্বস্তির লক্ষণ, আর নামাযের সময় ঘুম আসাটা শয়তানের পক্ষ থেকে।— (ইবনে-কাসীর)

এ রাতে মুসলমানগণ দ্বিতীয় যে নেয়ামতটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা ছিল বৃষ্টি। এর ফলে গোটা সমরাস্থানের চেহারাই পাল্টে যায়। কোরাইশ সৈন্যরা যে জায়গাটি দখল করেছিল তাতে বৃষ্টি হয় খুবই তীব্র এবং সারা মাঠ জুড়ে কাদা হয়ে গিয়ে চলাচলই দুষ্কর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যেখানে মহানবী (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম অবস্থান করছিলেন, সেখানে বালুর কারণে চলাচল করা ছিল দুষ্কর। বৃষ্টি এখানে অশ্প হয়। যাতে সমস্ত বালুকে বসিয়ে দিয়ে মাঠকে অতি সমতল ও আরামদায়ক করে দেয়া হয়।

উল্লেখিত আয়াতে এ দু'টি নেয়ামতের কথাই বলা হয়েছে। (১) নিদ্রা ও (২) বৃষ্টি, যাতে গোটা মাঠের রূপই বদলে যায় এবং দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের মন থেকে সে সমস্ত শয়তানী ওসওসা ধুয়ে— মুছে যায় যে, আমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও পরাজিত ও পতিত বলে মনে হচ্ছে, অথচ শত্রুরা অন্যায়ের উপর থেকেও শক্তি-সামর্থ্য ও শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা চাপিয়ে দিচ্ছিলেন তোমাদিগকে প্রশান্তি দান করার জন্য; আর তোমাদের উপর পানি বর্ষণ করছিলেন, যেন তোমাদের পবিত্র করে দেন এবং যেন তোমাদের মন থেকে শয়তানী ওসওসা দূর করে দেন। আর যেন তোমাদের মনকে সুদৃঢ় করেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে পঞ্চম নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যা বদরের সমরাস্থানে মুসলমানদের দেয়া হয়েছে। তাহল এই যে, আল্লাহ তাআলা যেসব ফেরেশতাকে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছিলেন তাঁদের সম্ভাষণ করে বলা হয়েছে, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, তোমরা ঈমানদারদিগকে সাহস দান করতে থাক। আমি এখনই কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিচ্ছি। বস্তুতঃ তোমরা কাফেরদের গর্দানের উপর অস্ত্রের আঘাত হান; তাদের হত্যা কর দলে দলে।

এভাবে ফেরেশতাদিগকে দু'টি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। প্রথমতঃ মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি করবে। একাজটি ফেরেশতাগণ কর্তৃক মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে দলবদ্ধ করে কিংবা তাঁদের সাথে মিলে যুদ্ধ করার মাধ্যমেও হতে পারে এবং নিজেদের দৈবক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরসমূহকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করেও হতে পারে। যাহোক তাঁদের উপর দ্বিতীয় দায়িত্ব অর্পণ করা হয় যে, ফেরেশতাগণ নিজেরাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন এবং কাফেরদের উপর আক্রমণও করবেন। সুতরাং এ আয়াতের দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, ফেরেশতাগণ উভয় দায়িত্বই যথাযথ সম্পাদন করেছেন। মুসলমানদের মনে দৈবক্ষমতা প্রয়োগক্রমে তাদের সাহস ও বল বৃদ্ধি করেছেন এবং যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। তদুপরি বিষয়টির সমর্থন কর্তৃপক্ষ হাদীসের বর্ণনার দ্বারাও হয়, যা তফসীরে দুরেরে-মনসুর ও মাহহারীতে সবিস্তারে বিধৃত হয়েছে। তাতে ফেরেশতাদের যুদ্ধ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামে চাক্ষুস সাক্ষ্য-প্রমাণও বর্ণনা করা হয়েছে।

আলোচ্য তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফর ও ইসলামের এ সম্মুখ সমরে যা কিছু ঘটছে তার কারণ ছিল কুফর কর্তৃক আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার উপর আরোপিত হয় আল্লাহ তাআলার সুকৃতি

আঘাব। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, বদর যুদ্ধে একদিকে মুসলমানদের উপর নাযিল হয়েছে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতরাজি, অপরদিকে কাফেরদের উপর মুসলমানদের মাধ্যমে আঘাব নাযিল করে তাদেরই অসদাচরণের ফসামান্য শাস্তি দেয়া হয়েছে। অবশ্য তার চেয়ে কঠিন শাস্তি হবে আধারাতে। আর তাই বলা হয়েছে চতুর্থ আয়াতে — **ذَلِكَ نَذِيرٌ لِلْكَافِرِينَ عَذَابُ اللَّهِ** অর্থাৎ, এটা হল আমার ফসামান্য আঘাব; এর আশ্বাদ গ্রহণ কর এবং জেনে রাখ যে, এরপরেও কাফেরদের জন্য আরো আঘাব আসবে, যা হবে অত্যন্ত কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী ও কম্পনাতীত।

উল্লেখিত ১৫ ও ১৬ আয়াত দু'টিতে ইসলামের একটি সমরনীতি হাভলে দেয়া হয়েছে। ১৫ নং আয়াতে **زحف** শব্দের মর্মার্থ হল, উভয় বাহিনীর মোকাবেলা ও মুখোমুখি সংঘর্ষ। অর্থাৎ, এমনভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাবার পর পশ্চাদপসরণ এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের জন্যে জায়েয নয়।

১৬ নং আয়াতে এই হুকুমের আওতা থেকে একটি অব্যাহতি এবং না-জায়েয পন্থায় পলায়নকারীদের সুকঠিন আঘাবের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

الْمُتَحَرِّقَاتِ الْيَتَامَىٰ أَوْ مَحْضَرًا দু'টি অবস্থার ক্ষেত্রে অব্যাহতি রয়েছে— অর্থাৎ, যুদ্ধাবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা দুই অবস্থায় জায়েয। প্রথমতঃ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এ পশ্চাদপসরণ হবে শুধুমাত্র যুদ্ধের কৌশলস্বরূপ, শত্রুকে দেখাবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এতে যুদ্ধ ছেড়ে পলায়নের কোন উদ্দেশ্য থাকবে না; বরং প্রতিপক্ষকে অসতর্কবস্থায় ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করাই থাকবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটাই হল **الْمُتَحَرِّقَاتِ الْيَتَامَىٰ** এর অর্থ। কারণ, **تحرق** অর্থ হয় কোন একদিকে ঝুঁকে পড়া — (রাসুল-মা'আনী)

দ্বিতীয়তঃ বিশেষ কোন অবস্থা— যাতে সমরক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণের অনুমতি রয়েছে, তাহল এই যে, নিজেদের উপস্থিত সৈন্যদের দুর্বলতা বোধ করে সেজন্যে পেছনের দিকে সরে আসা যাতে মুজাহিদগণ অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করতে সক্ষম হয়। **أَوْ مَحْضَرًا** এর অর্থ তাই। কারণ, **محيز** এর আভিধানিক অর্থ হল মিলিত হওয়া এবং **مُحِيزٌ** অর্থ দল। কাজেই এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, নিজেদের দলের সাথে মিলিত হয়ে শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুনরায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সমরাসন থেকে পেছনের দিকে সরে আসলে তা জায়েয।

এই স্বতন্ত্রতার বর্ণনার পর সেসব লোকের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যারা এই স্বতন্ত্রতাবস্থা ছাড়াই অবৈধভাবে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেছে কিংবা পশ্চাদপসরণ করেছে। এরশাদ হয়েছে —

فَقَدْ بَاءَ بِمَا عَصَىٰ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمُ وَيُسَّ الْمُبْصِرِ

অর্থাৎ, যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যারা পালিয়ে যায় তারা আল্লাহ্ তাআলার গম্ব নিয়ে ফিরে যায় এবং তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর সেটি হল নিকট অবস্থান।

এ আয়াত দু'টির দ্বারা এই নির্দেশ বোঝা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ সংখ্যা, শক্তি ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে যতবেশী হোক না কেন, মুসলমানদের

জন্য তাদের মোকাবেলা থেকে পশ্চাদপসরণ করা হারাম, দু'টি স্বতন্ত্র অবস্থা ব্যতীত। তা হল এই যে, এই পশ্চাদপসরণ পলায়নের উদ্দেশ্য হবে না; বরং তা হবে পায়তারা, পরিবর্তন কিংবা শক্তি অর্জনের মাধ্যমে পুরাক্রমণের উদ্দেশ্যে।

বদর যুদ্ধকালে যখন এ আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন এটাই ছিল সাধারণ হুকুম যে, নিজেদের সৈন্য সংখ্যার সাথে প্রতিপক্ষের কোন তুলনা করা না গেলেও পশ্চাদপসরণ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাওয়া জায়েয নয়। বদর যুদ্ধের অবস্থাও ছিল তাই। মাত্র তিনশ' তের জনকে মোকাবেলা করতে হচ্ছিল তিন শৃগ অর্থাৎ, এক হাজারের অধিক সৈন্যের সাথে। তারপরে অবশ্য এই হুকুমটি শিথিল করার জন্য সূরা আনফালের ৬৫ ও ৬৬ তম আয়াত নাযিল করা হয়। ৬৫তম আয়াতে বিশ জন মুসলমানকে দু'শ' কাফেরের সাথে এবং একশ' মুসলমানকে এক হাজার কাফেরের সাথে যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়। তারপর ৬৬ তম আয়াতে তা আরো শিথিল করার জন্য এ বিধান অবতীর্ণ হয়— **أَلَمْ يَخَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صُفْعًا** অর্থাৎ,

এখন আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং তোমাদের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে এই বিধান জারি করেছেন যে, দৃঢ়চিত্ত মুসলমান যদি একশ' হয় তবে তারা দু'শ' কাফেরের উপর জয়ী হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করে দেয়া হয়েছে যে, নিজেদের দিশৃগ সংখ্যক প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় মুসলমানদেরই জয়ী হওয়ার আশা করা যায়। কাজেই এমন ক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করা জায়েয নয়। তবে প্রতিপক্ষের সংখ্যা যদি দিশৃগের চেয়ে বেশী হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা জায়েয রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি একা তিন ব্যক্তির মোকাবেলা থেকে পালিয়ে যায়, তা পলায়ন নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি দু'জনের মোকাবেলা থেকে পালায় সেই পলাতক বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ, সে কবীরা গোনাহে লিপ্ত হবে। — (রাসুল-মা'আনী) এখন এই হুকুমই কেয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

অধিকাংশ উম্মত এবং চার ইমামের মতেও এটাই শরীয়তের নির্দেশ যে, প্রতিপক্ষের সংখ্যা যতক্ষণ না দিশৃগের বেশী হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া হারাম ও গোনাহে-কবীরা।

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সাতটি বিষয়কে মানুষের জন্য মারাত্মক বলেছেন। সেগুলোর মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত। কাজেই গণ্যওয়ায়ে হুনাইনের ঘটনায় সাহাবায়ে কেরামের প্রাথমিক পশ্চাদপসরণকে কোরআনে করীম একটি শয়তানী পদস্থলন বলে সাব্যস্ত করেছে, যা মহাপাপেরই দলীল। এরশাদ হয়েছে—

إِنَّمَا اسْرَءْلُهُمُ الشَّيْطَانُ

তাছাড়া তিরমিযী ও আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর এক কাহিনী বর্ণিত রয়েছে যে, একবার তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে মদীনা এসে আশ্রয় নেন এবং মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই বলে অপরাধ স্বীকার করেন যে, আমার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক অপরাধীতে পরিণত হয়ে পড়েছি। মহানবী (সাঃ) অসন্তোষ প্রকাশের পরিবর্তে তাঁকে সামান্য দান করলেন। বলেন **بل انتم العكارون وانا و فتكم** অর্থাৎ, “তোমারা পলাতক নও; বরং অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে

الافعال

1A.

قال الملا

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُمْ إِذْ رَمَيْتُمْ وَ
لَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلَٰكِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسْبًا إِنَّ اللَّهَ
سَبِيْعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٠﴾ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهُنٌ كَيْدُ الْكَافِرِينَ ﴿٤١﴾ إِنْ
كَتَفْتُمْ مَوْفِقَتَنَا جَاءَكُمُ الْقِتْمَةُ وَإِنْ تَتَّقُوا فَهَوَّيْنَا كَأَمْ
إِنْ تَعُودُوا لَعْنَا وَلَنْ نَعْفِيَ عَنْكُمْ فَمَنْكُمْ شَيْءٌ أَوْ كُفِّرَتْ
وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٢﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عُنُوًّا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَا
تَوَلَّوْا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤٤﴾ إِنْ
شَرَّ النَّاسُ بِعَيْنِ اللَّهِ الضُّمُّ إِلَيْكُمْ الْكَافِرِينَ لَا
يَعْقِلُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْبَغَهُمْ وَلَوْ
أَسْبَغَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٦﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ
تَخَشَّرُونَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُغْنِيَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

হয় যে, কেউ নিজের চেষ্টা-চরিত্রের জন্য গর্ব করো না; যা কিছু হোক তা শুধুমাত্র তোমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টারই ফসল নয়; বরং এটা আল্লাহ তাআলার একান্ত সাহায্য ও সহায়তারই ফল। তোমাদের হাতে শত্রু শত্রু নিহত হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে তোমরা হত্যা করনি; আল্লাহ তাআলাই হত্যা করেছেন।

এমনিভাবে রসূলে করীম (সাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে এরশাদ হয়েছে وَمَا رَزَيْتُمْ إِلَّا رِزْقَ اللَّهِ وَأَرْثَاۥ, আপনি যে কাকরের মুঠা নিক্ষেপ করেছেন প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং স্বয়ং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন। সারমর্ম হচ্ছে, যে, কাকর নিক্ষেপের এই ফলাফল যে, তা প্রতিটি শত্রু সৈন্যের চোখে পৌঁছে গিয়ে সবাইকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেয়, এটা আপনার নিক্ষেপের প্রভাবে হয়নি; বরং স্বয়ং আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরতের দ্বারা এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন।

পতীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, মুসলমানদের জন্য জেহাদে বিজয় লাভের চাইতেও অধিক মূল্যবান ছিল এই হেদায়েতটি যা তাদের সম্মানসঙ্গে উপকরণ থেকে কিরিয়ে উপকরণের স্ট্রার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং তাতে করে এমন অহংকার ও আত্মগর্বের অভিশাপ থেকে তাদেরকে মুক্তি দান করে, যার নেশায় সাধারণতঃ বিজয়ী সম্প্রদায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারপর বলে দেয়া হয়েছে যে, জয়-পরাজয় আমারই হুকুমের অধীন। আর আমার সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করে যারা অনুগত।

وَاللَّيْلِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ دُونِهِمْ حَسَنًا অর্থাৎ, আমি মুমিনগণকে এই ফাযিলাত দিয়েছি তাদের পরিশ্রমের পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়ার উদ্দেশ্যে। এর শব্দগত অর্থ হল পরীক্ষা। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলার পরীক্ষা কখনো হয় বিপদাপদের সম্মুখীন করে, আবার কখনো হয় ধন-দৌলত ও সাহায্য-বিজয় দানের মাধ্যমে। حسن بلاء বলা হয় এমন পরীক্ষাকে যা আরাম-আরাম, ধন-সম্পদ ও সাহায্য দানের মাধ্যমে নেয়া হয়। এতে দেখা হয় যে, এরা একে আমার অনুগ্রহের দান মনে করে শুকরিয়া আদায় করে, নাকি একে নিজেদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার ফল ধারণা করে গর্ব ও অহংকারে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং কৃত আমলকে বরবাদ করে দেয়। কারণ, আল্লাহ তাআলার দরবারে কারও গর্বাহংকারের কোন অবকাশ নেই।

পরবর্তী আয়াতে এর পাশাপাশি এই বিজয়ের আরও একটি উপকারিতার কথা বাতলে দেয়া হয়েছে যে, ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُؤْمِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ অর্থাৎ, মুসলমানদিগকে এ বিজয় এ কারণেই দেয়া হয়েছে যে, এরা সাহায্যে কাকরেরদের পরিকল্পনা ও কলা-কৌশলসমূহকে নস্যাত করে দেয়া যায় এবং যাতে কাকরেরা একথা উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ তাআলার সহায়তা আমাদের প্রতি নেই এবং কোন কলা-কৌশল তথা পরিকল্পনাই আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া কৃতকার্য হতে পারে না।

পক্ষম আয়াতে পরাজিত কোরায়শী কাকেরদের সম্বোধন করে একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যা মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে কোরায়শ বাহিনীর মক্কা থেকে বেরোবার সময় ঘটেছিল।

ঘটনাটি এই যে, কোরায়শ কাকেরদের বাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নেয়ার পর মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার থাকালে বাহিনী প্রধান আবু জাহল প্রমুখ বায়তুল্লাহর পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিল। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এই দোয়া করতে গিয়ে তারা

নিজেদের বিজয়ের দোয়ার পরিবর্তে সাধারণ বাক্য এভাবে দোয়া করেছিলঃ

ইয়া আল্লাহ! উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি উত্তম ও উচ্চতর, উভয় বাহিনীর মধ্যে যেটি বেশী হেদায়েতের উপর রয়েছে এবং উভয় দলের যেটি বেশী ভদ্র ও শালীন এবং উভয়ের মধ্যে যে ধর্ম উত্তম তাকেই বিজয় দান করো।'—(মায়হারী)

এই নির্বোধেরা এ কথাই ভাবছিল যে, মুসলমানদের তুলনায় আমরাই উত্তম ও উচ্চতর এবং অধিক হেদায়েতের উপর রয়েছে, কাজেই এ দোয়াটি আমাদেরই অনুকূলে হচ্ছে। আর এই দোয়ার মাধ্যমে তারা কামনা করছিল, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যেন হক ও বাতেল তথা সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিল, যখন আমরা বিজয় অর্জন করব, তখন এটাই হবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের সত্যতার ফয়সালা।

কিন্তু তারা একথা জানত না যে, এই দোয়ার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের জন্য বদদোয়া ও মুসলমানদের জন্য নেক-দোয়া করে যাচ্ছে। যুদ্ধের ফলাফল সামনে আসার পর কোরআনে করীম তাদের বাতলে দিল اِنْ تَسْتَفِهُوا فَتَسْتَفِهُوا فَلَكُمْ اُفْكُমُ অর্থাৎ, তোমরা যদি এশী মীমাংসা কামনা কর, তবে তা সামনে এসে গেছে। সত্যের জয় এবং মিথ্যার পরাজয় সূচিত হয়েছে। اِنْ تَسْتَفِهُوا فَتَسْتَفِهُوا فَلَكُمْ اُفْكُমُ আর যদি

তোমরা এখনও কুফরীজনিত শত্রুতা পরিহার কর, তাহলে তা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। اِنْ تَوُودُوا فَاُولٰٓئِكَ اَرْثُكُمْ আর তোমরা আবাবো যদি নিজেদের দুষ্টামী ও যুদ্ধের দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও মুসলমানদের সাহায্যের দিকে ফিরে যাব। وَلَنْ تُفْنِي عَنْكُمْ دِينَكُمْ سَيِّئًا وَلَوْ كَرِهَتْ

তোমাদের দল ও জেট যতই অধিক হোক না কেন, আল্লাহর সাহায্যের মোকাবেলায় তা কোন কাজেই লাগবে না। وَاللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ, আল্লাহ যখন মুসলমানদের সাথে রয়েছেন, তখন কোন দল তোমাদের কিই বা কাজে লাগতে পারে?

ذٰلِكُمْ اَرْثُكُمْ سَبَقَكُمْ سَبَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ অর্থাৎ, সর্বপ্রকার উপকরণ ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও মক্কার মুশরিকদের পরাজয়ের প্রকৃত কারণ ছিল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা। এতে সে সমস্ত লোকের জন্য এক চরম শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে, যারা আসমান-যমীনের স্ট্রা ও একচ্ছত্র মালিকের পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও গায়েবী শক্তিকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র স্থূল ও জড়-উপকরণ এবং শক্তির উপর নির্ভর করে থাকে, কিংবা আল্লাহর না-ফরমানী করা সত্ত্বেও তাঁর সাহায্য লাভের লাস্ত আশার মাধ্যমে নিজের সাথে প্রতারণা করে।

উল্লেখিত আয়াতে এরই দ্বিতীয় আরেকটি দিক মুসলমানদের সম্মুখীন করে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা হল এই যে, মুসলমানগণ তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও নিঃসম্বলতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সাহায্যের মাধ্যমেই এহেন বিপুল বিজয় অর্জন করতে সমর্থ হয়েছেন। আর এই যে সাহায্য, এটা হল আল্লাহর প্রতি তাঁদের আনুগত্যের ফল। এই আনুগত্যের উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকার জন্য মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য অবলম্বন কর এবং তাতে স্থির থাক। অতঃপর

এ বিষয়টির প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে বলা হয়েছে, وَلَا تَوَلَّوْا أَعْنَئَةً وَأَنْتُمْ سَمْعُونَ অর্থাৎ, কোরআন ও সত্যের বাণী শুনে নেবার পরেও তোমরা আনুগত্য-বিমুখ হয়ো না।

অর্থাৎ, তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা মুখে একথা বলে সত্য যে, আমরা শুনে নিয়েছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই শুনেনি। ‘সে সমস্ত লোক’ বলতে উদ্দেশ্য হল সাধারণ কাকেরকূল, যারা শোনার দাবী করে বটে, কিন্তু বিশ্বাস করে বলে দাবী করে না এবং এতে মুনাক্কফও উদ্দেশ্য যারা শোনার সাথে সাথে বিশ্বাসেরও দাবীদার, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা এবং সঠিক উপলব্ধি থেকে এতদুভয় সম্প্রদায়ই বঞ্চিত। কাজেই তাদের এই শ্রবণ না শোনারই শামিল। মুসলমানদিগকে এদের অনুরূপ হতে বারণ করা হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে সে সমস্ত লোকের কঠিন নিন্দা করা হয়েছে, যারা সত্য ও ন্যায়ের বিষয় গভীর মনোযোগ ও নিবিষ্টতার সাথে শ্রবণ করে না এবং তা কবুলও করে না। এহেন লোককে কোরআনে করীম চতুশদ জীব-জন্তু অপেক্ষাও নিকট প্রতিপন্ন করেছে। এরশাদ করেছেঃ

إِنْ شَرَّ النَّاسِ شَرًّا عِنْدَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

اللَّوَاتِ শব্দটি এরা বহুবচন। অভিধান অনুযায়ী যমীনের উপর বিচরণকারী প্রতিটি জীবকেই دابة বলা হয়। কিন্তু সাধারণ প্রচলন ও পরিভাষায় دابة বলা হয় শুধুমাত্র চতুশদ জন্তুকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আল্লাহর নিকট সে সমস্ত লোকই সর্বাপেক্ষা নিকট ও চতুশদ জীবতুল্য যারা সত্য ও ন্যায়ের শ্রবণের ব্যাপারে বধির এবং তা গ্রহণ করার ব্যাপারে মুক। বস্তুতঃ মুক ও বধিরদের মধ্যে, সামান্য বুদ্ধি থাকলেও তারা ইঙ্গিত-ইশারায় নিজেদের মনের কথা ব্যক্ত করে এবং অন্যের কথা উপলব্ধি করে নেয়। অথচ এরা মুক ও বধির হওয়ার সাথে সাথে নির্বোধও বটে। বলাবাহুল্য, যে মুক-বধির বুদ্ধি বিবিজিতও হবে, তাকে বুঝবার এবং বুঝাবার কোনই পথ থাকে না।

এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মানুষকে يَتَّقِ اللَّهَ (সুগঠিত অঙ্গ সৌন্দর্য) দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সৃষ্টির সেরা ও বিশেষ বরণ্য করা হয়েছে এই যাবতীয় এনআম ও কৃপা শুধু সত্যের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যখন মানুষ সত্য ও ন্যায়কে শুনে, উপলব্ধি করতে এবং তা মেনে নিতে অস্বীকার করে, তখন এই সমৃদ্ধ পুরস্কার ও কৃপা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তার ফলে সে জানোয়ার অপেক্ষাও নিকট হয়ে পড়ে।

তফসীরে রুল-বয়ান গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, মানুষ প্রকৃত সৃষ্টির দিক দিয়ে সমস্ত জীব-জানোয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ফেরেশতা অপেক্ষা নিম্ন মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু যখন সে তার অধ্যাবসায়, আমল ও সত্যানুগত্যের সাধনায় ব্রতী হয়, তখন ফেরেশতা অপেক্ষাও উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সে যদি সত্যানুগত্যে বিমুখ হয়, তখন নিকটতার সর্বনিম্ন পর্যায়ে উপনীত হয় এবং জানোয়ার অপেক্ষাও অধম হয়ে যায়।

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فَوْضَ حَيْرِ الْأَسْمَاءِ وَكَوْا سَمْعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مَرْضُونَ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যদি তাদের মধ্যে সামান্যতম কল্যাণকর দিক

তথা সংচিন্তা দেখতেন, তবে তাদেরকে বিশ্বাস সহকারে শোনার সাক্ষ্য দান করতেন কিন্তু বর্তমান সত্যানুরাগ না থাকা অবস্থায় যদি আল্লাহ তাআলা সত্য ও ন্যায় কথা তাদেরকে শুনিতে দেন, তাহলে জ্ঞান অনীহাভরে তা থেকে বিমুখতা অবলম্বন করবে।

এখানে কল্যাণকর দিক বা সংচিন্তা বলতে সত্যানুরাগ বুঝানো হয়েছে। কারণ, অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমেই চিন্তা-ভাবনা ও উপলব্ধির দ্বারা উদঘাটিত হয় এবং এতেই বিশ্বাস ও আমলের সামর্থ্য লাভ হয়। পক্ষান্তরে যার মাঝে সত্যানুরাগ বা অনুসন্ধিৎসা নেই, তাতে কে কোন রকম কল্যাণ নেই। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যদি কোন রকম জ্ঞান থাকত, তবে তা আল্লাহ তাআলার অবশ্যই জানা থাকত। যখন আল্লাহ তাআলার জানা মতে তাদের মধ্যে কোন জ্ঞানই তথা সংচিন্তা নেই, তখন একথাই প্রতীয়মান হল যে, প্রকৃতপক্ষেই তারা যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। আর এই প্রবঞ্চিত অবস্থায় তাদেরকে যদি চিন্তা-ভাবনা ও সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়, তবে তারা কপিনিকালেও জ গ্রহণ করবে না, বরং তা থেকে মুখ ফিরিয়েই নেবে। অর্থাৎ, তাদের এই বিমুখতা এ কারণে হবে না যে, তারা দুইনের মধ্যে কোন আপত্তিকর বিষয় দেখতে পেয়েছে, সে জন্যই তা গ্রহণ করেনি; বরং প্রকৃতপক্ষে তারা সত্যের বিষয় কোন লক্ষ্যই করেনি।

وَأَمْلَأُوا أَنْ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَقَلْبِهِ অর্থাৎ, জেনে রাখ, আল্লাহ

তাআলা মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে থাকেন। এ বাক্যটির দু’টি অর্থ হতে পারে এবং উভয়টির মধ্যেই বিরাট তাৎপর্য ও শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায়, যা প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বক্ষণ স্মরণ রাখা কর্তব্য।

একটি অর্থ এই হতে পারে যে, যখনই কোন সংকাজ করার ক্ষিপ্র পাপ থেকে বিরত থাকার সুযোগ আসে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তা করে ফেলে, এতটুকু বিলম্ব করা না এবং অবকাশকে গণীমত জ্ঞান কর। কারণ, কেন কোন সময় মানুষের ইচ্ছার মাঝে আল্লাহ নির্ধারিত কায বা নিয়তি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং সে তখন আর নিজের ইচ্ছায় সফল হতে পারে না। কোন রোগ-শোক, মৃত্যু কিংবা এমন কোন কাজ উপস্থিত হয়ে যেতে পারে, যাতে সে কাজ করার আর অবকাশ থাকে না। সুতরাং মানুষ কর্তব্য হল আয়ু এবং সময়ের অবকাশকে গণীমত মনে করা। আল্লাহে কাজ কালকের জন্য ফেলে না রাখা। কারণ, একথা কারোই জানা নেই, কাল কি হবে।

তাছাড়া এ বাক্যের দ্বিতীয় মর্ম এও হতে পারে যে, এতে আল্লাহ তাআলা যে বন্দার অতি সন্নিহিতে তাই বলে দেখা হয়েছে। যেমন, **وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** এতে আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবন শিরার চেয়েও নিকটবর্তী সেকথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, মানবাত্মা সর্বক্ষণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যখন তিনি কোন বন্দাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করতে চান, তখন তিনি জ্ঞ অন্তর ও পাপের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেন। আবার যখন কার ভাগ্যে অমঙ্গল থাকে, তখন তার অন্তর ও সংকর্মের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়া হয়। সে কারণেই রসূল করীম (সাঃ) অধিকাংশ সময় এই দোয়া করতেন— **يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ** অর্থাৎ, হে অন্তরসমূহের বিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে তোমার দুইনের উপ প্রতিষ্ঠিত রাখ।

وَأَذْكُرُوا أَنَّمْ قَلِيلٌ مِّمَّا تَصْنَعُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ
 أَن يَتَخَفَتَكُمْ النَّاسُ قَالُوا لَهُمْ إِنَّا كُنتُمْ بِمَنَاصِرٍ وَرَزَقَكُمْ
 مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
 تَتَّخِذُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَوَحُّوْا أَمْتًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
 وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ
 عِنْدَكَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّخِذُوا اللَّهَ
 يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَ
 اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ وَأَذْكُرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا
 لِيُذَمِّتَكُمْ أَوْ يَقْتُلُوكُمْ أَوْ يُخْرِجُوكُمْ وَيَكُونُوا وَبِمَكْرَمَةِ
 وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُنْكَرِينَ ۝ وَإِذْ أَتَى عَلَى اللَّهِ الْوَيْلُ قَالَ
 قَدْ سَمِعْنَا لَوْ لَفُتْنًا أَمِثِلْ هَذَا إِنَّ هَذَا أَوَّلُ
 أَسَاطِيرِ الْأُولَى ۝ وَإِذْ قَالَ الْفُلُكُنُ إِنَّ كَانَ هَذَا
 هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمِطْ عَنْكُمُ إِيَّاهُ مِنَ السَّمَاءِ
 أَوْ فَتِنَا بَعْدَ آبِ إِلَيْهِ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ
 فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝

(২৬) আর সূরশ কর, যখন তোমরা ছিলে অস্প, পরাজিত অবস্থায় পড়েছিলে দেশে, ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলে যে, তোমাদের না অন্যেরা ধোঁ মেরে নিয়ে যায়। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন, স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তোমাদিগকে শক্তি দান করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছে যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। (২৭) হে ঈমানদারগণ, যেহেতু তোমরা আল্লাহর সাথে ও রসুলের সাথে এবং যেহেতু তোমরা না নিজদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনো। (২৮) আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অকল্যাণের সন্মুখীনকারী। বস্তুতঃ আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা সওয়াব। (২৯) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করতে থাক, তবে তোমাদের মধ্যে কনসাল্লা করে দেবেন এবং তোমাদের থেকে তোমাদের পাপকে সরিয়ে দেবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত মহান। (৩০) আর কাকেরেরা যখন প্রতারণা করত আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য, তখন তারা যেমন হলনা করত তেমনি, আল্লাহও হলনা করতেন। বস্তুতঃ আল্লাহর হলনা সবচেয়ে উত্তম। (৩১) আর কেউ যখন তাদের নিকট আযার আয়াতসমূহ পাঠ করে তবে বলে, আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এমন করতে পারি; এ তো পূর্ববর্তী ইতিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। (৩২) তাছাড়া তারা যখন বলতে আরম্ভ করে যে, ইয়া আল্লাহ, এই যদি তোমার পক্ষ থেকে (আগত) সত্য দ্বীন হয়ে থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তুত বর্শ কর কিংবা আমাদের উপর বেদনাদায়ক আযাব নাফিল কর। (৩৩) অথচ আল্লাহ কখনই তাদের উপর আযাব নাফিল করবেন না যতক্ষণ আপনি তাদের মাঝে অবস্থান করবেন। তাছাড়া তারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আল্লাহ কখনও তাদের উপর আযাব দেবেন না।

কোরআনে কব্রীম গবওয়ায়ে বদরের কিছু বিস্তারিত বিবরণ এবং তাতে মুসলমানদের প্রতি নাফিলকৃত এনআমসমূহের উল্লেখের পর তা থেকে অর্জিত ফলাফল এবং অতঃপর সে প্রসঙ্গে মুসলমানদের প্রতি কিছু উপদেশ দান করেছে। **يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ** আয়াত থেকে তা আরম্ভ হয়। আলোচ্য এ আয়াতগুলো তারই কয়েকটি আয়াত।

এর মধ্যে প্রথম আয়াতটিতে এমন সব পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে হেদায়েত করা হয়েছে, যার জন্য নির্ধারিত সুকঠিন আযাব শুধু পাপীদের পর্বতই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পাপ করেনি এমন লোকও তাতে জড়িয়ে পড়ে।

সে পাপ যে কি, সে সম্পর্কে তফসীরবিদ গুলোমধ্যে-কোরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেন কোন মনীষী বলেন, ‘আম্র বিল মা’রুফ’ তথা সংকাজের নির্দেশ দান এবং ‘নাহী আনিল মুনকার’ অর্থাৎ, অসংকাজ থেকে মানুষকে বিরত করার চেষ্টা পরিহার করাই হল এই পাপ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা নিজের এলাকায় কোন অপরাধ ও পাপানুষ্ঠান হতে না দেয়। কারণ, যদি তারা এমন না করে, অর্থাৎ, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অপরাধ ও পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেবে তা থেকে বারণ না করে, তবে আল্লাহ স্বীয় আযাব সবার উপরই ব্যাপক করে দেন। তখন তা থেকে না বাঁচতে পারে কোন পোনাংহার, আর না বাঁচতে পারে নিরপরাধ।

এখানে ‘নিরপরাধ’ বলতে সেসব লোককেই বুঝানো হচ্ছে যারা মূল পাশে পাপীদের সাথে অংশগ্রহণ করেনি, কিন্তু তারাও ‘আম্র বিল মা’রুফ’ বর্জন করার পাশে পাপী। কাজেই এ ক্ষেত্রে এমন কোন সন্দেহ করার কারণ নেই যে, একজনের পাপের জন্য অন্যের উপর আযাব করাটা অবিচার এবং কোরআনী সিদ্ধান্ত **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** এর পরিপন্থী। কারণ, এখানে পাপী তার মূল পাপের পরিণতিতে এক নিরপরাধরা তাদের ‘আম্র বিল মা’রুফ’ থেকে বিরত থাকার পাপের দরুন ধরা পড়েছে, কারো পাপ অন্যের কাঁধে চাপানো হয়নি।

ইমাম বখরী (রহঃ) ‘শরহ্-সুন্নাহ’ ও ‘মা’আলিন’ নামক গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-মসউদ (রাঃ) ও হযরত আরোশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর রেওয়াজেতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসুলে কব্রীম (সঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা কোন নির্দিষ্ট দলের পাপের আযাব সাধারণ মানুষের উপর আরোপ করেন না, যতক্ষণ না এমন কোন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, সে নিজের এলাকায় পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেবে তা বাধাদানের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাতে বাধা দেয়না, তবেই আল্লাহর আযাব সবাইকে ঘিরে ফেলে।

তিরমিযী ও আবু-দাউদ প্রভৃতি গ্রন্থে বিতুল্ল সনদসহ উদ্ধৃত রয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর এক ভাষণে বলেছেন যে, আমি রসুলে কব্রীম (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, মানুষ যখন কোন অত্যাচারীকে দেখেও অত্যাচার থেকে তার হাতকে প্রতিরোধ করবে না, শীঘ্রই আল্লাহ তাদের সবার উপর ব্যাপক আযাব নাফিল করবেন।

সহীহ বোখারীতে হযরত নু’মান ইবনে কশীর (রাঃ)-এর রেওয়াজেতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসুলে কব্রীম (সঃ) বলেছেন, যারা আল্লাহর কানুনের শীলানলনকারী পোনাংহার এবং যারা তাদের দেখেও

যৌনতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে সেই পাপানুষ্ঠান থেকে বাধা দান করে না, এতদূত্থ শ্রেণীর উদাহরণ এমন একটি সামুদ্রিক জাহাজের মত যাতে দু'টি শ্রেণী রয়েছে এক নীচের শ্রেণীর লোকেরা উপরে উঠে এসে নিজেদের প্রয়োজনে পানি নিয়ে যায়, যাতে উপরের লোকেরা কষ্ট অনুভব করে। নীচের লোকেরা এমন অবস্থা দেখে জাহাজের ডানায় ছিদ্র করে নিজেদের কাজের জন্য পানি সঞ্গ্রহ করতে শুরু করে। কিন্তু উপরের লোকেরা এহেন কাণ্ড দেখেও ব্যরণ করে না। এতে বলাইবাধ্য যে, পোটা জাহাজেই পানি ঢুক পড়বে। আর তাতে নীচের লোকেরা যখন ডুবে মরবে, তখন উপরের লোকেরাও ঝাঁচতে পারবে না।

এসব রেওয়াজের ভিত্তিতে অনেক তফসীরবিদ মনীষী সাব্যস্ত করেছেন যে, এ আয়াতে **فَنَنْتَ** (কিন্হাঃ) বলতে 'এই পাপ' অর্থাৎ, 'সৎকাজে নির্দেশ দান ও অসৎ কাজে বাধা দান' বর্জনকেই বুঝানো হয়েছে।

তফসীরে-মাযহরীতে উল্লেখ রয়েছে যে, 'এই' বলতে উদ্দেশ হল জেহাদ বর্জন করা। বিশেষ করে এমন সময়ে জেহাদ থেকে বিরত থাকা, যখন আমিরুল-মু'মেনীন তথা মুসলমানদের নেতার পক্ষ থেকে জেহাদের জন্য সাধারণ মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবং ইসলামী 'শয়ার'সমূহের হেফাযতও তার উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, তখন জেহাদ বর্জনের পরিণতি শুধু জেহাদ বর্জনকারীদের উপরই নম্র; বরং সমগ্র মুসলিম জাতির উপর এসে পড়ে। কাকেরদের বিজয়ের ফলে নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং অন্যান্য বহু নিরপরাধ মুসলমান হত্যার শিকারে পরিণত হয়। তাদের জ্ঞান-মাল বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় 'আযাব' অর্থ হবে পার্শ্ব বিপদাপদ।

আর যেহেতু আল্লাহ ও বান্দার হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে গাফেলতী ও শৈথিল্যের কারণ সাধারণতঃ মানুষের ধন-দৌলত ও সম্ভান-সম্ভত্তিই হয়ে থাকে, কাজেই সে সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে **وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُمُ الْمَوْلَىٰ وَآلُكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ** অর্থাৎ, জেনে রেখো যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভত্তি তোমাদের জন্য ফেনা।

'ফেনা', শব্দের অর্থ পরীক্ষাও হয়; আবার আযাবও হয়। তাছাড়া এমনসব বিষয়কেও ফেনা বলা হয় যা আযাবের কারণ হয়ে থাকে। কোরআন করীমের বিভিন্ন আয়াতে এই তিন অর্থেই ফেনা শব্দের ব্যবহার হয়েছে। বক্তব্য এখানে তিনটি অর্থেই সুযোগ রয়েছে। কোন কোন সময় সম্পদ ও সম্ভান মানুষের জন্য পৃথিবীতেই প্রাপ্ত শত্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং সেগুলোর জন্য শৈথিল্য ও পাশে লিপ্ত হয়ে আযাবের কারণ হয়ে পড়তি একান্তই স্বাভাবিক। প্রথমতঃ ধন-দৌলত ও সম্ভান-সম্ভত্তির মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করাই আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য যে, আমার এসব দান গ্রহণ করার পর তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, না অকৃতজ্ঞ হও। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভত্তির মায়ায় জড়িয়ে গিয়ে যদি আল্লাহকে অসম্ভত্ত করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভত্তিই তোমাদের জন্য আযাব হয়ে দাঁড়াবে। কোন সময় তো পার্শ্ব জীবনেই এসব বস্তু মানুষকে কঠিন বিপদের সম্মুখীন করে দেয় এবং দুনিয়াতে সে ধন-দৌলত ও সম্ভান-সম্ভত্তিকে আযাব বলে মনে করতে শুরু করে। অন্যথায় একথাটি অপরিহার্য যে, যে ধন-সম্পদ দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকামের বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে অর্জন

করা হয়েছে কিংবা ব্যয় করা হয়েছে, সে সম্পদই আযাবের কারণ হতে পারে। সাপ, বিজু ও আগুন পোড়ার কারণ হবে। যেমন, কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে তার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। আর তৃতীয় অর্থ এই যে, এসব বস্তু-সামগ্রী আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এবিষয়টি তো একান্তই স্পষ্ট যে, এসব বস্তু আল্লাহর প্রতি মানুষকে গাফেল করে তোলে এবং তাঁর হুকুম-আহকামের প্রতি অমনোযোগী করে দেয়, তখন সেগুলোই আযাবের কারণ হয়। আয়াত শেষে বলা হয়েছে **وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ** অর্থাৎ, এ কথাটিও জেনে রেখো যে, যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করতে গিয়ে ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভত্তির ভালবাসার সামনে পরাজয় বরণ না করবে তার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে মহান প্রতিদান।

পূর্ববর্তী আয়াতে এ বিষয়ের আলোচনা হচ্ছিল যে, মানুষের জন্য ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভত্তি একটি ফেনাবিশেষ। অর্থাৎ, এগুলো সবই পরীক্ষার বিষয়। কারণ, এসব বস্তুর মায়ায় হেরে গিয়েই মানুষ সাধারণতঃ আল্লাহ এবং আযাবের প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে। অথচ এই মহানোয়ামতের যৌক্তিক দাবী ছিল, আল্লাহর এহেন মহা অনুগ্রহের জন্য তাঁর প্রতি অধিকতর বিনত হওয়া।

আলাল্য এ আয়াতসমূহের প্রথমটি সে বিষয়েরই উপসংহার। এতে বলা হয়েছে, যে লোক বিবেককে স্বভাবের উপর প্রবল রেখে এই পরীক্ষায় দৃঢ়তা অবলম্বন করবে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও মহব্বতকে সবকিছু উর্ধ্বে স্থাপন করবে—যাকে কোরআন ও শরীয়তের ভাষায় 'তাকওয়া' বলা হয়—তাহলে সে এর বিনিময়ে তিনটি প্রতিদান লাভ করে। (১) ফোরকান, (২) পাপের প্রায়শ্চিত্ত (৩) মাগফেরাত বা পরিত্রাণ।

فُرْقَانٌ দু'টি ধাতুর সমার্থক। পরিভাষাগতভাবে **فُرْقَانٌ** (ফোরকান) এমন সব বস্তু বা বিষয়কে বলা হয় যা দু'টি বস্তুর মাঝে প্রকৃষ্ট পার্থক্য ও দূরত্ব সূচিত করে দেয়। সেজন্যই কোন বিষয়ের মীমাংসাকে ফোরকান বলা হয়। কারণ, উহা হক ও না-হকের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার সাহায্যকেও ফোরকান বলা হয়। কারণ, এর দ্বারাও সত্যপন্থীদের বিজয় এবং তাদের প্রতিপক্ষের পরাজয় সূচিত হওয়ার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। সে জন্যই কোরআনে কবীমে গণ্যওয়ায়ে-বদরকে 'ইয়াওমুল-ফোরকান' তথা পার্থক্যসূচক দিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ আয়াতে বর্ণিত 'তাকওয়া' অবলম্বনকারীদের প্রতি 'ফোরকান' দান করা হবে—কথাটির মর্ম অধিকাংশ মুকাসসেরার মতে এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার সাহায্য-সহায়তা থাকে এবং তিনি তাদের হেফাযত করেন। কোন শত্রু তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। যাবতীয় উদ্দেশ্য তারা সাফল্য লাভে সমর্থ হন।

তফসীরে-মুহায়েমী গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, পূর্ববর্তী ঘটনায় হযরত আবু লুবা'ব (রাঃ) কর্তৃক স্বীয় পরিবার-পরিজনের রক্ষাবেক্ষণের দিকে যে পক্ষপাতিত্ব ঘটে গিয়েছিল, তা এ কারণেও একটি ত্রুটি ছিল যে, পরিবার-পরিজনের হেফাযত ও রক্ষাবেক্ষণের জন্যও আল্লাহ ও রসুলের প্রতি যথাযথ আনুগত্য অবলম্বন করাই ছিল সঠিক পন্থা। তা হলে ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভত্তি সবই আল্লাহ তাআলার হেফাযতে চলে আসত। কোন কোন মুকাসসেরা বলেছেন যে, এ আয়াতে কোরকান বলতে সেসব জ্ঞান-বুদ্ধিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্য ও ঠাট্টা-মেকীর মাঝে পার্থক্য করা সহজ হয়ে যায়। অতএব, মর্ম দাঁড়ায়

কোরাইশী সর্দারদের পরামর্শে মহানবী (সাঃ)-এর সম্পর্কে যে তিনটি মত উপস্থাপিত হয়েছিল সে সবকটিই কোরআনের এ আয়াতে উল্লেখ করে বলা হয়েছে — **وَأَذِنتُ لَكَ الْبَيْتَ كَعَمَلٍ إِذْ يَنْتَظِرُكَ أَوْفِقْتُونَ** অর্থঃ, সে সময়টি সুপ্রযোজ্য, যখন কাকেররা আপনার

বিরুদ্ধে নানা রকম ব্যবস্থা নেয়ার বিষয় চিন্তা-ভাবনা করছিল যে, আপনাকে বন্দী করে রাখবে না হত্যা করবে, নাকি দেশ থেকে বের করে দেবে।

কিন্তু আল্লাহ তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছেন। সুতরাং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, **وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمُنْذِرِينَ** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থাপক, যা যাবতীয় ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাকে ছাপিয়ে যায়। যেমনটি এ ঘটনার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

আরবী অভিধানে **مكر** শব্দের অর্থ হল কোন ছল-কৌশলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের লোককে তার উদ্দেশ্য সাধনে বিরত রাখা। বস্তুতঃ একাজ যদি কোন সদুদ্দেশ্যে করা হয় তবে তা উত্তম ও প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু অসৎ মতলবে করা হলে দুষণীয় এবং মন্দকাজ। কাজেই এ শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে এবং আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবশ্য আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র এমনসব পরিবেশ ও পরিস্থিতিতেই এ শব্দের ব্যবহার হতে পারে যেখানে বাক্যের ধারাবাহিকতা কিংবা তুলনার মাধ্যমে দুষণীয় ছলনার কোন অবকাশ থাকতে না পারে। যেমনটি এখানে হয়েছে।—(মায়হরী)

এখানে এ কথাটিও প্রশ্নবিধানযোগ্য যে, আয়াতের শেষাংশে যেসব শব্দ বলা হয়েছে তা বর্তমান—ভবিষ্যৎকাল জ্ঞাপক ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, **وَيَسْخَرُونَ مِنْكُمْ** অর্থাৎ, তারা ঈমানদারদেরকে কষ্টদানের জন্য কলা-কৌশল করতে থাকবে এবং আল্লাহ তাদের সে কলা-কৌশলকে ব্যর্থ করে দেয়ার ব্যবস্থা নিতে থাকবেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা তদবীর করাটা কাক্ষেরদের চিরাচরিত বৃত্তি থাকবে। আর তেমনভাবে আল্লাহ তাআলার সাহায্য-সহায়তাও সর্বকালেই সত্যিকার মুসলমানদের উপর থেকে তাদের সেসব ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে দিতে থাকবে।

একত্রিশ ও বত্রিশতম আয়াতে সেই ‘দারুন-নদওয়্যার’ জঁকেন সদস্য নযর ইবনে হারেসের এক অহেতুক সলোপ এবং ত্রিশতম আয়াতে তার জওয়াব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নযর ইবনে হারেস ব্যবসায়ী লোক ছিল এবং বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের ফলে ইহুদী-নাসারাদের গ্রন্থ ও তাদের এবাদত-উপাসনা বার বার দেখার সুযোগ পেয়েছিল। কাজেই সে যখন কোরআনে করীমে বিগত উম্মতসমূহের অবস্থা সংক্রান্ত বিবরণ শুনল তখন বলল—**فَدَسِمْنَا أَوْلَئِكَ لَمَّا شِئْنَا هَذَا إِنَّ هَذَا أَلَّاكَ اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ** অর্থাৎ, “এসব তো আমাদের শোনা কথাই। আমরা ইচ্ছা করলে এমন কথা বলতে পারি। এগুলো তো বিগত লোকদেরই ইতিকথা”। তারপর কোন কোন সাহাবী যখন তাকে লা-জওয়াব করে দিলেন যে, যদি বলতেই পার, তবে বলছ না কেন? কোরআন যে সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য বিধান করে দিয়েছে এবং সমস্ত বিশুকে চ্যালেঞ্জ করে দিয়েছে যে, এর বিরোধীরা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে কোরআনের ছোট একটি সূরার অনুরূপই একটি সূরা উপস্থাপন করে দেখাক। অথচ বিরোধিতায় যারা জ্ঞানের বাজি লাগিয়েছিল, যারা ধন-দৌলত আর সন্তান-সন্ততিকে পর্যন্ত কোরবান করেছিল তাদের সবাই মিলে কোরআনের মোকাবেলায় ছোট একটি সূরাও পেশ করতে পারেনি। তাহলে একথা বলা যে, আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে আমরাও এমন কালাম বলতে পারি,—এমন একটি

কথা যা লাজ-লজ্জার অধিকারী কোন লোকই বলতে পারে না। তারপর নযর ইবনে হারেসের সামনে সাহায্যে কেরাম এই কালামের সজ্ঞ সম্পর্কে বর্ণনা করলেন, তখন সে স্বীয় বাস্তব মতবাদের উপর তার দৃষ্টি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বলতে লাগল : **إِنَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ وَمَنْ عِنْدَكَ قَاتِلٌ عَلَيْكَ جَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ وَاسْتَفْتَا بَعْدَ آيِ الْيَوْمِ** অর্থাৎ, হে আল্লাহ, এই কোরআনই যদি আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয় থাকে, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন কিংবা কোন কঠিন আঘাব নাযিল করে দিন।

স্বয়ং কোরআন করীম এর উত্তর দিয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ** অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ (সঃ), আপনার মক্কা থাকে। অবস্থায় আল্লাহ তাদের উপর আঘাব করবেন না। কাল, সমস্ত নবী-রসূলগণের ব্যাপারেই আল্লাহর নীতি এই যে, তাঁরা যে জনগন থাকেন তাতে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন আঘাব নাযিল করেন না, যতক্ষণ না স্বীয় পয়গম্বরগণকে সেখান থেকে সরিয়ে নেন।

এ উত্তরের সারমর্ম এই যে, তোমরা তো কোরআন ও ইসলামের বিরোধিতার কারণে পাথর বর্ষণেরই যোগ্য, কিন্তু মহানবী (সঃ) এর মক্কা অবস্থান এর অন্তরায়। ইমাম ইবনে জরীর (রহঃ) বলেন, আয়াতের এ অংশটি সে সময় নাযিল হয়েছিল যখন হযুর (সঃ) মক্কা অবস্থান করছিলেন। তারপর মদীনায হিজরত করার পর আয়াতের দ্বিতীয় অংশ অবতীর্ণ হয়। **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাদের উপর আঘাব নাযিল করবেন না, তখন তারা এতদ্বারা তথা ক্ষমপ্রার্থনা করে। এর মর্ম এই যে, মহানবী (সঃ)—এর মদীনা চলে যাবার পর যদিও ব্যাপক আঘাবের পথে যে অন্তরায় ছিল তা দূর হয়ে গেছে, অর্থাৎ, তাঁর সেখানে বর্তমান থাকা, কিন্তু তারপরেও আঘাব আসার পথে আরেকটি বাধা রয়ে গেছে তাহলে এই যে, অনেক দুর্বল মুসলমান যারা হিজরত করতে পারছিলেন না, সেখানে রয়ে গিয়েছিলেন এক আল্লাহর দরবারে এস্তগফার ও ক্ষমপ্রার্থনা করে যাচ্ছিলেন। তাঁদের খাতিরে মক্কাবাসীদের উপর আঘাব নাযিল করা হয়নি।

অতঃপর এ সমস্ত মুসলমানও হিজরত করে যখন মদীনায গৌহ যান, তারপরে আয়াতের এই ব্যাক্যটি নাযিল হয় : **وَالَهُمْ أَزِيدُهُمْ** অর্থাৎ, আল্লাহ তাদেরকে আঘাব দেবেন না তা কেমন করে হয়, অর্থাৎ, তারা রসূলকে মসজিদে-হারামে গিয়ে এবাদত করতে বাধা দান করে।

অর্থাৎ, আঘাব আসার পথের দু’টি অন্তরায়ই এখন দূর হয়ে গেছে। এখন মক্কাতে না আছেন মহানবী (সঃ), না আছেন ক্ষম প্রার্থনাকারী মুসলমানগণ। অতএব, আঘাব আসতে এখন আর কোন বাধাই অবশিষ্ট নেই। বিশেষতঃ তাদের শাস্তিযোগ্য অপরাধের মধ্যে ইসলাম বিরোধিতা ছাড়াও আরেকটি অপরাধ সংযোজিত হয়েছে যে, তারা নিজেরা যে এবাদত-উপাসনার যোগ্য ছিলই না, তদুপরি যেসব মুসলমান এবাদত, ওমরা ও তওয়াফের উদ্দেশ্যে মসজিদে-হারামে আসতে চায় তাদেরকে বাধাদান করতে শুরু করেছে। অতএব, এখন তাদের শাস্তিপ্রাপ্তির দিবাগ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, সুতরাং মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে তাদের উপর এ আঘাবই নাযিল করা হয়।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছিল যে, মক্কার মুশরিকরা নিজেদের কুফরী ও অস্বীকৃতির দরুন যদিও আসমানী আযাব প্রাপ্তিরই যোগ্য, কিন্তু মক্কায় রসূলে করীম (সাঃ) – এর উপস্থিতি ব্যাপক আযাবের পথে অন্তরায় হয়ে আছে। আর তাঁর হিজরতের পর সে সমস্ত অসহায়-দুর্বল মুসলমানদের কারণে এমন আযাব আসছে না যারা মক্কায় থেকে আল্লাহ্ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতগুলোতে বলা হচ্ছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) কিংবা অসহায় ও দুর্বল মুসলমানদের কারণে যদি দুনিয়াতে তাদের আযাব রহিত হয়েও গিয়ে থাকে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, এরা আযাবের যোগ্যই নয়। বরং তাদের আযাবের যোগ্য হওয়াটা পরিষ্কার। তাছাড়া কুফরী ও অস্বীকৃতি ছাড়াও তাদের এমনসব অপরাধ রয়েছে যার ফলে তাদের উপর আযাব নেমে আসা উচিত। আলোচ্য আয়াত দু'টিতে তাদের তিনটি অপরাধ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমতঃ এরা নিজেরা তো মসজিদে-হারাম অর্থাৎ, খানায়-কা'বায় এবাদত করার যোগ্য নয়, তদুপরি যেসব মুসলমান সেখানে এবাদত-বন্দেগী ও নামায, তওয়াফ প্রভৃতি আদায় করতে চায়, তাদেরকে বাধাদান করে। এতে হোদায়বিয়ার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে যখন রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামসহ ওমরা পালনের উদ্দেশে মক্কায় আগমন করেন, তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁকে বাধাদান করেছিল এবং ফিরে যেতে বাধ্য করেছিল।

দ্বিতীয় অপরাধ হল এই যে, এই নির্বোধের দল মনে করত এবং বলত যে, আমরা মসজিদে-হারামের মোতাওয়াল্লী, যাকে ইচ্ছা এখানে আসতে অনুমতি দেব, যাকে ইচ্ছা দেব না।

তাদের এই ধারণা ছিল দু'টি ভুল বুঝাবুঝির ফলশ্রুতি। প্রথমতঃ এই যে, তারা নিজেদেরকে মসজিদে-হারামের মোতাওয়াল্লী বলে মনে করেছিল, অথচ কোন কাফের কোন মসজিদের মোতাওয়াল্লী হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তাদের এই ধারণা যে, যাকে ইচ্ছা তারা মসজিদে আসতে বাধাদান করতে পারে। অথচ মসজিদ যেহেতু আল্লাহর ঘর, সূতরাং এতে আসতে বাধা দেবার অধিকার কারো নেই। তবে এমন বিশেষ অবস্থার কথা স্বতন্ত্র, যাতে মসজিদের অবমাননা কিংবা অন্যান্য নামাযীদের কষ্টের আশঙ্কা থাকে। যেমন, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন— “নিজেদের মসজিদসমূহকে রক্ষা কর ছোট শিশুদের থেকে, পাগলদের থেকে এবং নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ থেকে।” ছোট শিশু বলতে সেসব শিশুকে উদ্দেশ করা হয়েছে যাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আর পাগলদের দ্বারা অপবিত্রতারও আশঙ্কা থাকে এবং নামাযীদের কষ্টেরও সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া নিজেদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদের দরুন মসজিদের অসম্মানও হয় এবং নামাযীদের কষ্টও হয়।

এ হাদীসের ভিত্তিতে মসজিদের একজন মোতাওয়াল্লীর এমন শিশু ও পাগলদেরকে মসজিদে আসতে না দেয়ার এবং মসজিদে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ হতে না দেয়ার অধিকার থাকলেও এমন অবস্থা বা পরিস্থিতি ব্যতীত কোন মুসলমানকে মসজিদে আসতে বাধা দেয়ার কোন অধিকার নেই।

কোরআন করীমে আলোচ্য আয়াতটিতে শুধু প্রথম বিষয়টিরই

وَمَا لَهُمْ آلَافٌ يَدْعُونَ اللَّهَ وَهُمْ يُصَدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُ لَهُ إِلَّا الْمُشْكُونَ
وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا كَانَ صَلَاةُهُمْ
عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيَةٌ فَتَذَرُوهَا الْعَذَابُ
بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ إِنْ الْكَافِرِينَ كُفْرًا يُؤْتُونَ
أَمْوَالَهُمْ لِيُضَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ
تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ۖ ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
إِلَى جَهَنَّمَ يُجْشَرُونَ ۖ يَبْتَغِزُ اللَّهُ النَّفِثَاتِ مِنَ الطَّلِبِ وَ
يَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكَبُ جَمِيعًا
فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۖ ثُمَّ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا وَإِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَآ قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا
فَتَقَدَّمُ مَضَىٰ ذُنُوبِهِمْ الْأُولَىٰ ۖ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا
تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا
فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ يُغْنِمُ الْمَوْتَىٰ وَيُغْنِمُ الْبَصِيرُ ۖ

(৩৪) আর তাদের মধ্যে এমন কি বিষয় রয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাদের উপর আযাব দান করবেন না। অথচ তারা মসজিদে-হারামে যেতে বাধাদান করে, অথচ তাদের সে অধিকার নেই। এর অধিকার তো তাদেরই রয়েছে যারা পরহেযগার। কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে বিষয়ে অবহিত নয়। (৩৫) আর কা'বার নিকট তাদের নামায বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোন কিছুই ছিল না। অতএব, এবার নিজেদের কৃত কুফরীর আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর। (৩৬) নিঃসন্দেহে যেসব লোক কাফের, তারা ব্যয় করে নিজেদের ধন-সম্পদ, যাতে করে বাধাদান করতে পারে আল্লাহর পথে। বস্তুতঃ এখন তারা আরো ব্যয় করবে। তারপর তাই তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে এবং শেষপর্যন্ত তারা হেরে যাবে। আর যারা কাফের, তাদেরকে দোষখের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (৩৭) যাতে পৃথক করে দেন আল্লাহ্ অপবিত্র ও না-পাককে পবিত্র ও পাক থেকে। আর যাতে একটির পর একটিকে স্থাপন করে সমবেত স্বপ্নে পরিণত করেন এবং পরে দোষকে নিষ্ক্ষেপ করেন। এরাই হল ক্ষতিগ্রস্ত। (৩৮) তুমি বলে দাও, কাফেরদেরকে যে, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে যা কিছু ঘটে গেছে ক্ষমা হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আবারও যদি তাই করে, তবে পূর্ববর্তীদের পথ নির্ধারিত হয়ে গেছে। (৩৯) আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না আন্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (৪০) আর তারা যদি না মানেন, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের সমর্থক; এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী।

আলোচনা করা হয়েছে যে, মসজিদে-হারামের মোতাওয়াল্লী যখন শুধুমাত্র মুত্তাকী-পরহেগার ব্যক্তিই হতে পারেন, তখন তাদেরকে কেমন করে এর মোতাওয়াল্লী হিসাবে স্বীকার করা যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদে মোতাওয়াল্লী কোন মুসলমান দ্বীনদার ও পরহেগার ব্যক্তিরই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন কোন মুফাসসেরীন **أَنَّ أَوْلَىٰ ذِيكَ** এর সর্বনামটি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত বলে সাব্যস্ত করে এই অর্থ করেছেন যে, আল্লাহর ওলী শুধুমাত্র মুত্তাকী-পরহেগার ব্যক্তিরই হতে পারেন।

এই তফসীর বা ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের মর্ম এই দাঁড়ায় যে, যারা শরীয়ত ও সুন্নতের বরখেলাফ আমল করা সত্ত্বেও আল্লাহর ওলী হওয়ার দাবী করে, তারা সর্বোপরি মিথ্যাবাদী এবং যারা এহেন লোকদের ওলীআল্লাহ বলে মনে করে, তারা (একান্তভাবেই) ঠোকায পতিত।

তাদের তৃতীয় অপরাধ এই যে, তাদের মধ্যে কুফর ও শেরকের পঙ্কিলতা তো ছিলই, তাদের কার্যকলাপও সাধারণ মানবিকতার স্তর থেকেও বহু নিম্নে রয়েছে। কারণ, এরা নিজেদের যে কাজকে ‘নামায’ নামে অভিহিত করে, তা মুখে কিছু শিস দেয়া এবং হাতে কিছু তালি বাজানো ছাড়া আর কিছু নয়। বলাবাহুল্য, যার সামান্যতম বুদ্ধিও থাকবে সেও এধরনের কার্যকলাপকে এবাদত কিংবা নামায তো দূরের কথা, সঠিক কোন মানবীয় আচরণও বলতে পারে না। কাজেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, **فَذَوُو الْعَذَابِ أَلَم يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُكْفَرُوا** অর্থাৎ, তোমাদের কুফরী ও অপরাধের পরিণতি এই যে, এবার আল্লাহর আযাবের আশ্বাদ গ্রহণ কর। আযাব বলতে এখানে আখেরাতের আযাব হতে পারে এবং পার্শ্বি আযাবও হতে পারে যা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের মাধ্যমে তাদের উপর নাফিল হয়।

এ ঘটনার বিবরণ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রাঃ)-এর বর্ণনা মতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত রয়েছে যে, গযওয়ায়ে-বদরের পরাজয়ের পর অবশিষ্ট আহত মক্কাবাসী কাফেররা যখন মক্কায় গিয়ে পৌছল, তখন যাদের পিতা-পুত্র এযুদ্ধে নিহত হয়েছিল, তারা বাণিজ্যিক কাফেলার আশ্রয় আশ্রয় সূফিয়ানের কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে যে, আপনি তো জানেন, এ যুদ্ধটি বাণিজ্যিক কাফেলার হেফাযতকল্পে করা হয়েছে, যার ফলে জান-মালের এহেন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই আমরা চাই, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে আমাদের কিছু সাহায্য করা হোক, যাতে আমরা ভবিষ্যতে মুসলমানদের থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি। তারা এ দাবী মেনে নিয়ে তাদেরকে এক বিরাট অঙ্কের অর্থ দিয়ে দেয় যা তারা বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওহুদ যুদ্ধে ব্যয় করে এবং তাতেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ফলে পরাজয়ের গ্লানির সাথে সাথে অর্থ অপচয়ের অতিরিক্ত অনুতাপ যোগ হয়ে যায়।

কোরআন করীম এ আয়াতে এই ঘটনার পূর্বের রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে এর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে দেয়। বলা হয়, যারা কাফের, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর দ্বীন থেকে মানুষকে বাধাদান করার কাজে ব্যয় করতে চাইছে। অতএব, তার পরিণতি হবে এই যে, নিজেদের ধন-সম্পদও ব্যয় করে বসবে এবং পরে এ ব্যয়ের জন্য তাদের অনুতাপ হবে। অখচ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পরাজয়ই বরণ করতে হবে। বস্তুতঃ গযওয়ায়ে-ওহুদে ঠিক তাই ঘটেছে; সক্ষিত ধন-সম্পদও ব্যয় করে ফেলেছে এবং পরে যখন পরাজিত হয়েছে, তখন পরাজয়ের গ্লানির সাথে সাথে ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার জন্য অতিরিক্ত অনুতাপ ও দুঃখ পোহাতে হয়েছে।

বগভী প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতের বিষয়বস্তুকে বদর যুদ্ধের ব্যয়সংক্রান্ত বলেই অভিহিত করেছেন। বদর যুদ্ধে এক হাজার জোওয়ানের বাহিনী মুসলমানদের মোকাবেলা করতে গিয়েছিল। তাদের খাবার-দাবার এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়ভার মক্কার বার জন সর্দার নিজেদের দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল আবু-জাহল, ওবায়দ, শায়বা প্রমুখ। বলাবাহুল্য, এক হাজার লোকের যাতায়াত ও খাদ্য-পান প্রভৃতিতে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় হয়েছিল। কাজেই নিজেদের পরাজয়ের সাথে সাথে অর্থ ব্যয়ের জন্যও বিপুল অনুতাপ ও আফসোস হয়েছিল—(মায়হারী)

আয়াত শেষে আখেরাতের দিক দিয়ে তাদের মন্দ পরিণতির কথা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে **وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا** অর্থ, যারা কাফের, জাহান্নামের দিকেই হবে তাদের হাশর।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে সত্য দ্বীন থেকে বাধা দানকল্পে অর্থ ব্যয়ে যে অন্তত পরিণতির কথা বলা হয়েছে, তাতে বর্তমান কালের সেসব কাফেরও অন্তর্ভুক্ত যারা মানুষকে ইসলাম থেকে বিরত রাখতে এক নিজেদের মিথ্যা ও বাতিল মতবাদের প্রতি আহ্বান করতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাসপাতালে, শিক্ষাঙ্গনে এবং দান-খয়রাতের নামে ব্যয় করে থাকে। তেমনভাবে সেসব পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাও এর অন্তর্ভুক্ত, যারা ইসলামে সর্ববাদীসম্মত আকীদা ও বিশ্বাসসমূহে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি ও সেগুলো বিরুদ্ধে মানুষকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁর দ্বীনের হেফাযত করেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এরা বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ব্যয় করা সত্ত্বেও নিজেদের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য থেকে যায়।

৩৭তম আয়াতে উল্লেখিত ঘটনাবলীর কিছু ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে যার সার-সংক্ষেপ এই যে, কাফেররা যেসব সম্পদ ইসলামে বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে এবং পরে যার জন্য দুঃখ ও অনুতাপ করেছে তার অপমানিত-অপদস্থ হয়েছে, তাতে ফায়দা হয়েছে এই **يُؤْتِيكَ اللَّهُ الْخَبِيرَ** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যাতে অপবিত্র পঙ্কিল এবং পরিপূতঃ বস্তুতে পার্থক্য প্রকাশ করে দেন। **طِيبٌ** ও **خَبِيثٌ** দু’টি বিপরীতগত শব্দ। **خَبِيثٌ** শব্দটি অপবিত্র, পঙ্কিল ও হারাম বস্তুকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর **طِيبٌ** তার বিপরীতে পবিত্র, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তুকে বোঝাতে বলা হয়। এখানে এ দু’টি শব্দের দ্বারা যথাক্রমে কাফেরদের অপবিত্র ধন-সম্পদ এবং মুসলমানদের পবিত্র সম্পদ ও ঐ বোঝা যেতে পারে। এমতাবস্থায় এর অর্থ হবে এই যে, কাফেররা এ বিপুল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে তা ছিল অপবিত্র ও হারাম সম্পদ। ফলে তার অন্তত পরিণতি দাঁড়িয়েছে এই যে, তাতে মালও গেছে এবং জনও গেছে। পক্ষান্তরে তার বিপরীতে মুসলমানরা অতি অল্প পরিমাণ সম্পদ ব্যয় করেছে, কিন্তু সে সম্পদ ছিল পবিত্র ও হালাল। ফলে তা ব্যয়কারী বিজয় অর্জন করেছেন এবং সাথে সাথে গন্যমতের মালামাল অর্জনে সমর্থ হয়েছেন। তারপর এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এক ‘খবীস’ তথা অপবিত্রকে অপর অপবিত্রের সাথে মিলিয়ে দেন এবং তারপর সে সমস্তকে সমবেত করে

দেবন জাহান্নামে। বস্তুতঃ এরাই হল ক্ষতির সম্মুখীন।

অর্থাৎ, পৃথিবীতে যেমন চুস্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, এবং আধুনিক বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাই পারস্পরিক আকর্ষণের উপর স্থাপিত, তেমনিভাবে কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ ও স্বভাব-চরিত্রের মধ্যেও একটা আকর্ষণ রয়েছে। একটি মন্দ কাজ অন্যান্য মন্দ কাজকে এবং একটি ভাল কাজ অন্যান্য ভাল কাজকে আকর্ষণ করে। একটি খারাপ সম্পদ আরেকটি খারাপ সম্পদকে টেনে আনে এবং তারপর এসব খারাপ সম্পদ মিলে অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর এরই পরিণতি হিসাবে আল্লাহ তাআলা সমস্ত অপবিত্র সম্পদরাজিকে জাহান্নামে সমবেত করবেন এবং এসব সম্পদের অধিকারীরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

এছাড়া এখানে অনেক তফসীরবিদ মনীষী **خبيث و طيب** এর সাধারণ অর্থ যথাক্রমে অপবিত্র ও পবিত্র বলেই সাব্যস্ত করেছেন এবং ‘পাক’ বলতে মুমিন আর অপবিত্র বলতে কাফের বুঝিয়েছেন। এমতাবস্থায় মর্ম হুব এই যে, উল্লেখিত অবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পবিত্র ও অপবিত্র অর্থাৎ মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য করতে চান; সমস্ত মুমিন জাহান্নামে আর সমস্ত কাফের জাহান্নামে সমবেত হোক, এটাই তাঁর ইচ্ছা।

৩৮তম আয়াতে কাফেরদের প্রতি আবারো এক মুকুব্বীসুলভ আহবান জানানো হয়েছে। এতে উৎসাহও রয়েছে এবং ভীতিও রয়েছে। উৎসাহ এ ব্যাপারে যে, যদি তারা এ সমুদয় কুকর্মের পরে এখনও তওবা করে নেয় এবং ঈমান নিয়ে আসে, তাহলে পূর্বকৃত সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর ভীতি হলো এই যে, তারা যদি এখনো অপকর্ম থেকে বিরত না হয়, তবে তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলাকে নতুন কোন আইন প্রণয়ন কিংবা নতুন করে কোন চিন্তাভাবনা করতে হবে না। বিগত কালের কাফেরদের জন্য যে আইন প্রবর্তিত হয়ে গেছে তাই তাদের উপরও প্রবর্তন করা হবে। অর্থাৎ, পৃথিবীতে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে এবং আখেরাতে হয়েছে কঠিন আযাবের যোগ্য।

এটি হলো সূরা আনফালের উনচল্লিশতম আয়াত। এতে দু’টি শব্দ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

(১) ফেৎনা (২) দ্বীন। আরবী অভিধান অনুযায়ী শব্দ দু’টি একাধিক অর্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণ সাহাবায়ে-কেরাম ও তাবঈনদের নিকট থেকে এখানে দু’টি অর্থ উদ্ধৃত করেছেন। (১) ফেৎনা অর্থ কুফর ও শিরক আর (২) দ্বীন অর্থ ইসলাম। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এই বিশ্লেষণই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মুসলমানদিগকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে যতক্ষণ না কুফর নিঃশেষিত হয়ে ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে এই নির্দেশ শুধুমাত্র মক্কাবাসী এবং আরববাসীদের জন্যে নির্দিষ্ট হবে। কারণ, আরব হচ্ছে ইসলামের উৎসস্থল। এতে ইসলাম ছাড়া যদি অন্য কোন ধর্ম বিদ্যমান থাকে তাহলে দ্বীনে-ইসলামের জন্য তা হবে আশঙ্কাজনক। তবে পৃথিবীর অন্যত্র অন্যান্য ধর্মমত ও আদর্শকে আশ্রয় দেয়া যেতে পারে। যেমন, কোরআন করীমের অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে।

আর দ্বিতীয় তফসীর যা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছে তাহল এই যে, এতে

‘ফেৎনা’ অর্থ হচ্ছে সেসব দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদের ধারা, যা মক্কার কাফেররা সদাসর্বদা মুসলমানদের উপর অব্যাহত রেখেছিল যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মক্কায় অবস্থান করছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তাদের অবরোধে আবদ্ধ থেকে নানা রকম কষ্ট সহ্য করে গেছেন। তারপর যখন তারা মদীনায় হিজরত করেন, তখন তারা মুসলমানের পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁদের হত্যা ও লুণ্ঠন করতে থাকে। এমনকি মদীনায় পৌঁছার পরও গোটা মদীনা আক্রমণের মাধ্যমে তাদের হিসে-রোষই প্রকাশ পেতে থাকে।

পক্ষান্তরে ‘দ্বীন’ শব্দের অর্থ হল প্রভাব ও বিজয়। এ ক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই যে, মুসলমানগণকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকা কর্তব্য, যতক্ষণ না তাঁরা অন্যের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর এক ঘটনার দ্বারাও এ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। তাহল এই যে, মক্কার প্রশাসক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুযায়ের (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সৈন্য সমাবেশ করে এবং উভয়পক্ষে মুসলমানদের উপরই যখন মুসলমানদের তলোয়ার চলতে থাকে, তখন দু’জন লোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) - এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, এইক্ষেণে মুসলমানগণ যে মহাবিপদের সম্মুখীন, তা আপনি নিজেই দেখছেন। অথচ আপনি সেই ওমর ইবনে খাত্তাবের পুত্র, যিনি কোনক্রমেই এহেন ফেৎনা-ফাসাদকে বরদাশত করতেন না। কাজেই আপনি আজকের ফেৎনার সমাধান করার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন না? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, তার কারণ এই যে, আল্লাহ তাআলা কোন মুসলমানের রক্তপাত করাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আগত দু’জন আরম্ভ করলেন, আপনি কি কোরআনের এ আয়াতটি পাঠ করেন না **وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَإِثْمِهِمْ وَفَسْنُهُ** অর্থাৎ, যুদ্ধ

করতে থাক, যতক্ষণ না ফেৎনা-ফাসাদ তথা দাঙ্গা-হাঙ্গামা থাকে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আমি এ আয়াত পাঠ করি এবং এর উপর আমলও করি। আমরা এ আয়াতের ভিত্তিতে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছি যতক্ষণ না ফেৎনা শেষ হয়ে দ্বীন-ইসলামের বিজয় সূচিত হবে। অথচ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত সত্যধর্মের বিরুদ্ধে অন্য কারো বিজয় সূচিত হোক, তা চাও না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জেহাদ ও যুদ্ধের হুকুম ছিল কুফরীর ফেৎনা এবং কাফেরদের অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। তা আমরা করেছি এবং বরাবরই করে যাচ্ছি। আর তাতে করে সে ফেৎনা প্রদমিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধকে তার সাথে তুলনা করা যথার্থ নয়। বরং মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই-বিবাদের ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ)-এর হেদায়েত হচ্ছে এই যে, তাতে বসে থাকা লোকটি দাঁড়ানো ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম।

এ বিশ্লেষণের সারমর্ম এই যে, মুসলমানদের উপর ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ-জেহাদ অব্যাহত রাখা ওয়াজিব, যতক্ষণ না মুসলমানদের উপর তাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের ফেৎনার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং যতক্ষণ না তথাকথিত সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। আর এমন অবস্থায় কেয়ামতের নিকটবর্তী কালেই বাস্তবায়িত হবে এবং সে কারণে কেয়ামত পর্যন্তই জেহাদের হুকুম অব্যাহত ও বলবৎ থাকবে।

ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জেহাদের পরিণতিতে দু’টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমতঃ এই যে, তারা মুসলমানদের উপর

الانفال

১৮৩

واعلموا

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُصَّةً وَ
 لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيَّ عَبْدًا يَأْتِي
 الْقُرْآنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
 إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَ
 الرُّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخَفَلْتُمْ فِي
 الْيَمِينِ وَلَكِنْ لَيْقَضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ
 مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ
 اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ إِذْ يَرِيكُمْ اللَّهُ فِي مَتَابِكُمْ وَلَيْلًا
 وَلَوْ أَرَادَ لَكُمْ كَثِيرٌ مِمَّا تَسْتَأْذِنُونَ فِي الْأَمْرِ
 وَلَكِنَّ اللَّهَ سَمِعَ أَنَّهُ عَالِمٌ يُدَارِيتُ الصُّدُورَ ۝
 إِذْ يَرِيكُمْ اللَّهُ فِي الْقَيْتَمِ فِي أَعْيُنِكُمْ قِيلَ لَهُ وَقَسَّيْكُمْ
 فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ
 تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لِقِيتُمْ قَوْمًا
 فَأُتْبِئُوا وَأُذْكُرُوا وَاللَّهُ كَثِيرٌ أَعْلَمُ تَقْدِيرًا ۝

(৪১) আর এ কথাও জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গণীমত হিসাবে পাবেও, তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রসুলের জন্য, তাঁর নিকটাতীর্থ-স্বজনদের জন্য এবং এতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফয়সালার দিনে, যেদিন সমুদ্রবর্তী হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সব কিছুর উপরই ক্ষমতালীল। (৪২) আর যখন তোমরা ছিলে সমরাসক্তের এ প্রান্তে আর তারা ছিল সে প্রান্তে অথচ কাফেলা তোমাদের থেকে নীচে নেমে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় যদি তোমরা পারস্পরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে, তবে তোমরা এক সঙ্গে সে ওয়াদা পালন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এমন এক কাজ করতে চেয়েছিলেন, যা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল — যাতে সে সব লোক নিহত হওয়ার ছিল, প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর এবং যাদের বিচার ছিল, তারা বেঁচে থাকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর। আর নিশ্চিতই আল্লাহ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ। (৪৩) আল্লাহ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন; বেশী করে দেখালে তোমরা কাপুরুষতা অবলম্বন করতে এবং কাফের বেলায় বিপদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ ঠাট্টায়ে দিয়েছেন। তিনি অতি উত্তমভাবেই জানেন; যা কিছু অন্তরে রয়েছে। (৪৪) আর যখন তোমাদেরকে দেখালেন সে সৈন্য দল মোকাবেলার সময় তোমাদের চোখে অল্প এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে অল্প, যাতে আল্লাহ সে কাজ করে নিতে পারেন যা ছিল নির্ধারিত। আর সব কাজই আল্লাহর নিকট গিয়ে পৌঁছায়। (৪৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার।

অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে বিরত হয়ে যাবে, তা ইসলামী শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমেও হতে পারে, কিংবা নিজ নিজ ধর্মমতে থেকেই অনাগত্যের চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমেও হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ এতদুভয় অবস্থার কোনটি গ্রহণ না করে অব্যবস্থ মোকাবেলায় স্থির থাকবে। আয়াতে এই উভয় অবস্থার হুকুমই বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

فَإِنْ أَتَوْهُمُ فَقَاتِلْهُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ بَيِّنَاتٍ

অর্থাৎ, তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ যথাভাবেই অবলোকন করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে গণীমতের বিধান ও তার বন্টনীতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অভিধানে ‘গণীমত’ বলা হয় সে সমস্ত মাল-সামানকে যা শত্রু নিকট থেকে লাভ হয়। শরীয়তের পরিভাষা অনুযায়ী অমুসলমানদের নিকট থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহে বিজয়জার্জনের মাধ্যমে যে মালামাল অর্জিত হয়, তাকেই বলা হয় ‘গণীমত’। আর যা কিছু আপোষ, সন্ধি-সম্মতি মাধ্যমে অর্জিত হয়, যেমন, জিমিয়া কর, খাজনা-টেক্স প্রভৃতি — তার বলা হয় ‘ফাই’। কোরআন করীমে এতদুভয় শব্দের মাধ্যমে (অর্থাৎ, ‘গণীমত’ ও ‘ফাই’) এতদুভয় প্রকার মালামালের হুকুম-আহুকাম জ্ঞা-বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা-আনফালে সে গণীমতের মালামালের কথাই আলোচিত হয়েছে যা যুদ্ধকালে অমুসলমানদের কাছ থেকে লাভ হয়েছে।

এখানে সর্বপ্রথমে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইসলামী ও কোরআনী মতাদর্শ অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব-জাহানের মালিকানা শুধুমাত্র সে সত্তার জন্য নির্ধারিত যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের পক্ষে কোন কিছু মালিকানা লাভ করার একটি মাত্র পন্থা রয়েছে। তা হল এই যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আইনের মাধ্যমে কোন বস্তুতে কোন ব্যক্তি মালিকানা সাব্যস্ত করে দেন। যেমন, সূরা ইয়াসীনে চতুশদ জীয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — ‘এরা কি দেখতে পায় না যে, চতুশদ-জন্তুসমূহকে আমি নিজে সৃষ্টি করেছি (এবং) তারপর জ্ঞ সেগুলোর মালিক হয়েছে।’ অর্থাৎ, এদের মালিকানা নিজস্ব নয়, বরং আমিই নিজ অগ্রগৃহে তাদেরকে এগুলোর মালিক বানিয়েছি।

কোন জাতি যখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, অর্থাৎ, কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন প্রথম আল্লাহ তা'আলা তাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে স্বীয় রসুল ও কিতাব পাঠিয়ে থাকেন। এ হতভাগা এ খোদায়ী দানের মাধ্যমেও প্রভাবিত না হয়, তার বিরুদ্ধে জেহাদ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যে নির্দেশ দিয়েছেন তার মর্ম দীর্ঘ এই যে, এই বিদ্রোহীদের জান-মাল সবই হালাল করে দেয়া হয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত মালামালের দ্বারা লাভবান হওয়ার কোন অধিকারই আর তাদেরই নেই। বরং তাদের ধন-সম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত করা নেয়া হয়েছে। এই বাজেয়াপ্ত করা মালামালেরই অপর নাম, গণীমত মাল যা কাফেরদের মালিকানা থেকে বেরিয়ে একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার মালিকানায় রয়ে গেছে।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَازَعُوا فَعَشَلُوا وَتَنَاصَرُوا
 رِيحَكُمْ وَأَصِيدُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ وَلَا تَكُونُوا
 كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَ
 يُصْطَلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَمَّا يَعْمَلُونَ ۝ حُطِّبُ
 وَادَّزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لِعَالِبِ لَهُ
 الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَ آدَمَ الْفَيْثِينَ
 تَكْصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّنْكَ إِنِّي أرى مَا لَا تَرَوْنَ
 إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ إِذْ يَقُولُ
 الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَوُا لَهُ دِينَهُمْ
 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ وَ
 لَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمَلَكُ يُصْرِفُونَ
 دُونَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُقُوا عَبَابَ الْحَرِّ ۝ ذَلِكِ
 يَمَّا أَتَتْكُمْ آلُ يُونُسَ ۝ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝
 كَذَّابِ إِلَى رُوعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
 فَاتَّخَذَهُمُ اللَّهُ يَدُوتَهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

(৪৬) আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রসুলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা বৈধ ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা আলা রয়েছেন দৈয়শীলদের সাথে (৪৭) আর তাদের মত হয়ে যেয়ো না, যারা বেরিয়েছে নিজদের অবস্থান থেকে নির্দিষ্টভাবে এবং লোকদেরকে দেখাবার উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহর পথে তারা যথা দান করত। বস্তুতঃ আল্লাহর আয়ত্রে রয়েছে সে সমস্ত বিষয় যা তারা করে। (৪৮) আর যখন সূরশ করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বলল যে, আজকের দিনে কোন মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি হলম তোমাদের সমর্থক, অতঃপর যখন সামনাসামনী হল উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুত পায়ে পেছন দিকে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সাথে নাই—আমি দেখছি, যা তোমরা দেখছ না; আমি ভয় করি আল্লাহকে। আর আল্লাহর আযাব অত্যন্ত কঠিন। (৪৯) যখন মোনাফেকরা বলতে লাগল এবং যাদের অন্তর ব্যাহিগ্রস্ত, এরা নিজদের ধর্মের উপর গর্বিত। বস্তুতঃ যারা ভরসা করে আল্লাহর উপর, সে নিশ্চিত, কেননা আল্লাহ অতি পরাক্রমশীল, সুবিজ্ঞ। (৫০) আর যদি তুমি দেখ, যখন ফেরেশতারা কাফেরদের জ্ঞান কবল করে; প্রহার করে, তাদের মুখে এবং তাদের পশ্চাদদেশে আর বলে, দ্রুত আযাবের স্বাদ গ্রহণ করা। (৫১) এই হলো সে সবার বিনিময় যা তোমরা তোমাদের পূর্বে পাঠিয়েছ নিজের হাতে। বস্তুতঃ এটি এ জন্য যে, আল্লাহ কব্দার উপর যুদ্ধ করেন না। (৫২) যেমন, রীতি রয়েছে কোউনের অনুসারীদের এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের ব্যাপারে যে, এরা আল্লাহর নির্দেশের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং সেজন্য আল্লাহ তাআলা তাদের পাকড়াও করেছেন তাদেরই পাগের দরুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহা শক্তিশালী, কঠিন শাস্তিদাতা।

যুদ্ধ-জেহাদে কৃতকার্যতা লাভের জন্য কোরআনের হেদায়েত : প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানগণকে যুদ্ধক্ষেত্র এবং শত্রুর মোকাবেলার জন্য একটি বিশেষ হেদায়েতনামা দান করেছেন, যা তাদের জন্য পার্শ্ব জীবনে কৃতকার্যতা এবং পরকালীন নাজাতের অমোঘ ব্যবস্থা। প্রাথমিক যুগের যুদ্ধসমূহে মুসলমানদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের রহস্যও এতেই নিহিত ছিল।

প্রথমত দৃঢ়তা : অর্থাৎ, দৃঢ়তা অবলম্বন করা ও স্থির-অটল থাকা। মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের অটলতা উভয়টি এর অন্তর্ভুক্ত। মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই জানে, উপলব্ধি করে এবং পৃথিবীর প্রতিটি জাতি নিজদের যুদ্ধে এরই উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। কারণ, অভিজ্ঞ লোকদের কাছে এ বিষয়টি গোপন নেই যে, সমরক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং সব চাইতে কার্যকর অস্ত্রই হচ্ছে মন ও পদক্ষেপের দৃঢ়তা। এর অবর্তমানে অন্যান্য সমস্ত উপায়-উপকরণই অকাজে, বেকার।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর যিকর : এটি সেই বিশেষ ধরনের আধ্যাত্মিক হাতিয়ার যার ব্যাপারে ঈমানদারগণ ব্যতীত সাধারণ পৃথিবী গাফেল। সমগ্র পৃথিবী যুদ্ধের জন্য সর্বোত্তম অস্ত্রশস্ত্র, আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ সগ্রহ করার জন্য এবং সেনাবাহিনীকে সুদৃঢ় রাখার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা নেয়। কিন্তু মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও পার্শ্ব এ হাতিয়ার সম্পর্কে তারা অপরিতচিত ও অজ্ঞ। সে কারণেই এই হেদায়েত, এই নির্দেশনামা। এই নির্দেশনামা মোতাবেক যে কোন অঙ্গনে যে কোন জাতির সাথে মোকাবেলা হয়েছে, প্রতিপক্ষের সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা-তদবীর পুরোপুরি নিক্ষেপ হয়ে পড়েছে। আল্লাহর যিকরে নিজস্বভাবে যে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে তা তো যথাস্থানে আছেই, তদুপরি এটাও একটি বাস্তব সত্য যে, দৃঢ়তার জন্যও এর চেয়ে পরীক্ষিত কোন ব্যবস্থা নেই। আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাতে বিশ্রাস রাখা এমন এক বিদ্যুৎ শক্তি যা একজন দুর্বলতর মানুষকেও পাহাড়ের সাথে মোকাবেলা করতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। বিপদ যত কঠিনই হোক না কেন, আল্লাহর স্মরণ সে সমস্ত হওয়ায় উড়িয়ে দেয় এবং মানুষের মন-মানসকে বলিষ্ঠ ও পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করে রাখে।

কোরআনে করীম এহেন শঙ্কাপূর্ণ পরিবেশে মুসলমানদেরকে আল্লাহকে স্মরণ করার শিক্ষা দিয়েছে; তাও আবার অধিক পরিমাণে স্মরণ করার তাকীদসহ।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, সমগ্র কোরআনে আল্লাহর যিকর ব্যতীত অন্য কোন এবাদতই এত অধিক পরিমাণে করার হুকুম কোথাও উল্লেখ নেই। তার কারণ এই যে, আল্লাহর যিকর তথা স্মরণ এমন সহজ একটি এবাদত যে, তাতে না তেমন কোন বিরাট সময় ব্যয় হয়, না পরিশ্রম এবং নাইবা অন্য কোন কাজের কোন রকম ব্যাঘাত ঘটে। তদুপরি আল্লাহ রাক্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে আল্লাহর যিকরের জন্য কোন শর্তাশর্ত, কোন বাধ্যবাধকতা, গুয়ু কিংবা পবিত্রতা পোশাকশাক এবং কেবলামুখী হওয়া প্রভৃতি কোন নিয়মই আরোপ করেননি। যে কোন মানুষ যে কোন অবস্থায় গুয়ুর সাথে, বিনা গুয়ুতে, দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে। এর পরেও যদি ইয়াম জামারীর গবেষণার বিষয়টি তুলে ধরা যায়, যা তিনি হিসনে হাসীন গ্রহে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর যিকর শুধু মুখে কিংবা মনে মনে যিকর

করাকেই বলা হয় না বরং প্রতিটি জায়েয বা বৈধ কাজ আল্লাহ-রাসুলের আনুগত্যের আওতায় থেকে করা হলে সে সবই যিকরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত, তবে এই পর্যালোচনা অনুযায়ী যিকরুল্লাহর মর্ম এত ব্যাপক ও সহজ হয়ে যায় যে, নিখ্রিত মানুষকেও যাকের বলা যেতে পারে। যেমন কোন কোন রেওয়াজেতে উল্লেখ রয়েছে—“আলেম ব্যক্তির মুমু ও এবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত”। কারণ, যে আলেম তার এলেমের চাহিদা অনুযায়ী আমল করেন তার জন্য তাঁর নিদ্রা, তাঁর জাগরণ সবাই আল্লাহর আনুগত্যের আওতাভুক্ত হওয়া অপরিহার্য।

যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করার নির্দেশটিতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুজাহেদীদের জন্য একটি কাজ বাড়িয়ে দেয়া হল বলে মনে হয় যা স্বভাবতঃই কষ্ট ও পরিশ্রমসাধ্য হবে, কিন্তু আল্লাহর যিকরের এটা এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য যে, তাতে কখনও কোন পরিশ্রম তো হয়ই না, বরং এতে একটা সুখের অনুভূতি, একটা শক্তি এবং একটা পৃথক স্বাদ অনুভূত হতে থাকে যা মানুষের কাজ-কর্ম অধিকতর সহায়ক হয়। তাছাড়া এমনিতোও কষ্ট-পরিশ্রমের কাজ যারা করে থাকে তাদের অভ্যাস থাকে কোন একটা বাক্য কিংবা কোন গানের কলি কাজের ফাঁকেও গুনগুনিয়ে পড়তে বা গাইতে থাকার। সুতরাং কোরআন করীম মুসলমানগণকে তার একটি উত্তম বিকল্প দিয়েছে যা হাজারো উপকারিতা ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সে কারণেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** অর্থাৎ, তোমরা যদি দৃঢ়তা এবং আল্লাহর যিকরের দু’টি গোপন রহস্য স্মরণ রাখ এবং কর্মক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ কর, তবে বিজয় ও কৃতকার্যতা তোমাদেরই হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রের একটি যিকর তো হলো তাই, যা সাধারণতঃ ‘না’ রায়ে তকবীর শ্লোগানের মাধ্যমে করা হয়। এছাড়া আল্লাহ তাআলার উপর ভরসার খেয়াল রাখা, তাঁরই উপর নির্ভর করতে থাকা, তাঁর কথা মনে রাখা প্রভৃতি সবই যিকরুল্লাহ’ – এর অন্তর্ভুক্ত।

৪৬ তম আয়াতে তৃতীয় আরেকটি বিষয়ের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে **وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ** অর্থাৎ, “আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্যকে অপরিহার্যভাবে পালন কর”। কারণ, আল্লাহর সাহায্য-সমর্থন শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে পাপকর্ম ও আনুগত্যহীনতা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি ও বঞ্চিতির কারণ হয়ে থাকে। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য কোরআনী হেদায়েতনামার তিনটি ধারা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তা হল দৃঢ়চিত্ততা, আল্লাহর যিকর ও আনুগত্য। অতঃপর

وَلَا تَتَزَكُّوا فَمَقْشُورُوا وَتَذَهَّبَ وَخُكْرُكُمْ وَاصْبِرُوا আয়াতে ক্ষতিকর দিক-গুলোর উপর আলোকপাত করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই বলা হয়েছে **وَلَا تَتَزَكُّوا** অর্থাৎ, তোমরা পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হওয়া না। তা হলে তোমাদের মাঝে সাহসহীনতা বিস্তার লাভ করবে এবং তোমাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে, তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে।

তারপর **وَاصْبِرُوا** (অবশ্য অবশ্যই ধৈর্যধারণ কর)। বাক্যের বিন্যাসধারায় প্রতীয়মান হয় যে, এতে বিবাদ-বিসংবাদ থেকে রক্ষা পাবার একান্ত কার্যকর ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হয়েছে। এর বিশ্লেষণ এই যে, কোন দলের মত ও উদ্দেশ্যে যত একাই থাক না কেন, কিন্তু ব্যক্তি মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাছাড়া কোন

উদ্দেশ্য লাভের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞ, বুদ্ধিজীবীদের মতপার্থক্য থাকা অপরিহার্য। কাজেই অন্যের সাথে চলতে গিয়ে এবং অন্যকে সঙ্গে রাখতে গিয়ে মানুষকে স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়েও দৈর্ঘধারণ ও সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং নিজের মতের উপর এত অধিক দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা রাখা উচিত যা গৃহীত না হলে খেপে যায়। এই গুণের অপর নামই হ’ল ‘ছবর’। ইদানীং এ কথাটি সবাই জানে এবং বলেও থাকে যে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করা অত্যন্ত মন্দ কাজ। কিন্তু জা থেকে বেঁচে থাকার মূল কথা ‘ছবর’ অবলম্বনে অভ্যস্ত হওয়া এবং নিজের মত মানবার ফিকিরে খেপে না যাওয়ার গুণটি অতি অল্প লোকের মাঝে পাওয়া যায়। সে কারণেই ঐক্য ও একতার যাবতীয় গুণায়ন-শীলই নিষ্ফল হয়ে যায়।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে কোরআন করীম **وَأَصْبِرُوا** বলেছে। অর্থাৎ, পারস্পরিক বিবাদ-দুন্দ্ব থেকে বিরত করেছ, যজ্ঞ পার্থক্য কিংবা তা প্রকাশ করতে বাধা দেয়নি। যে ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সাথে সাথে নিজের মত অন্যকে মানবার প্রেরণা কার্যকর থাকে তাকে বলা হয় বিবাদ ও বিসংবাদ। আর এটিই হল সে প্রেরণা যাকে কোরআন করীম — **وَاصْبِرُوا** শব্দে ব্যক্ত করেছে এবং সবশেষে ‘ছবর’ অবলম্বনে এক বিরাট উপকারিতার কথা বলে এর তিষ্ঠতা দূর করে দিয়েছে যে,

إِنَّا اللَّهُمَّ الظُّمِرِينَ (যারা ছবর তথা ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন।) এটি এমন এক মহাসম্পদ যে, ইহ পর-কালের যাবতীয় সম্পদ এর মোকাবেলায় নগণ্য।

ইমাম ইবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এ রেওয়াজেতে ক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, মক্কার কোরায়েশ বাহিনী যখন মুসলমানদের সাথে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, তখন তাদের মনে এমন এক আশঙ্কা চেপে ছিল যে, আমাদের প্রতিবেশী বনু-বকর গোত্র আমাদের শত্রু, আমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে চলে গেলে সেই সুযোগে এই শত্রু গোত্র না আবার আমাদের বাড়ী-ঘর এবং নারী-শিশুদের উপর হামলা করে বসে। সুতরাং কাকফলার নেতা আবু সুফিয়ানের ভয়ানক আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে তারা বেরিয়ে গেল ঠোঁট, কিন্তু মনের এ আশঙ্কা তাদের পায়ের বেড়ী হয়ে রইল। এমন সময় শয়তান সোরাকা ইবনে মালেকের রূপে এমনভাবে সামনে এসে উপস্থিত হল যে, তাঁর হাতে রয়েছে একটি পতাকা আর তাঁর সাথে রয়েছে ষাঁড় সৈনিকদের একটি খণ্ড দল। সোরাকা ইবনে মালেক ছিল সে এলাকার এবং গোত্রের বড় সর্দার। কোরায়েশদের মনে তারই আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে কোরায়েশ জোওয়ানদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে এক ভাষণ দিয়ে বসল এবং দু’ভাবে তাদেরকে প্রভাবিত করল। প্রথমতঃ **لَا تَتَزَكُّوا فَمَقْشُورُوا وَتَذَهَّبَ وَخُكْرُكُمْ** অর্থাৎ, আজকের দিনে এমন কেউ নেই যারা তোমাদের উপর জয়লাভ করতে পারে। এর উদ্দেশ্য ছিল একটা বুঝিয়ে দেয়া যে, আমি তোমাদের প্রতিপক্ষ সম্পর্কেও অবগত রয়েছি এবং তোমাদের শক্তি সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্য তো চোখেই দেখছি, কাজেই তোমাদের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, তোমরা নিশ্চিন্তে এগিয়ে যাও, তোমরাই প্রবল থাকবে, তোমাদের মোকাবেলায় বিজয় অর্জন করবে, এমন কেউ নেই।

দ্বিতীয়তঃ **وَإِنِّي جَارِلٌ** অর্থাৎ, বনু-বকর প্রভৃতি গোত্রের ব্যাপ্ত্য তোমাদের মনে যে আশঙ্কা চেপে আছে যে, তোমাদের অবর্তমানে তারা মক্কা আক্রমণ করে বসবে, তার দায়-দায়িত্ব আমি নিয়ে নিচ্ছি যে, এদম

আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। মক্কার কোরায়েশরা সোরা কালেক এবং তার বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে পূর্ব হই অবগত ছিল। কাজেই তার বক্তব্য শোনামাত্র তা তাদের মনে বসে এবং কনু-বকর গোত্রের আমক্রমশাশঙ্কা মুক্ত হয়ে মুসলমানদের বদলায় উদ্বুদ্ধ হল।

ইদ্রিবিধ প্রতারণার মাধ্যমে শয়তান তাদেরকে নিজেদের বধ্যভূমির দাবড়ে দিল। কিন্তু—

فَلَمَّا تَرَأَوْتُ الْمُؤْمِنِينَ يَكْفُونَ عَلَىٰ عِزِّهِمْ
যখন মক্কার মুশরেক ও মুসলমানদের উভয় দল (বদর প্রাঙ্গণে) সমাবেশ লিপ্ত হল, তখন শয়তান পেছন ফিরে পালিয়ে গেল।

বদর যুদ্ধে যেহেতু মক্কার মুশরেকদের সহায়তায় একটি শয়তানী সীও এসে উপস্থিত হয়েছিল, কাজেই আল্লাহ তাআলা তাদের কাবুলায় হযরত জিবরাঈল ও মীকাঈল (আঃ)-এর নেতৃত্বে কোরায়েশদের বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন। ইমাম ইবনে জরীর হযরত ইবনে কাসের (রাঃ) রেওয়াজেতে উদ্ধৃত দিয়ে লিখেছেন যে, শয়তান যখন সোরাকাহ ইবনে মালেকের রূপে স্বীয় বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তখন সে সোরাঈল-আমীন এবং তাঁর সাথী ফেরেশতা বাহিনী দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে সময় তার হাত এক কোরায়েশী যুবক হারেছ ইবনে হাশামের হাতে ধরা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে চাইল। হারেছ তিরস্কার করে বলল, এ কি করছ! তখন সে যুবকের উপর এক প্রহর ঘা মেরে হারেছকে ফেলে দিল এবং নিজের বাহিনী নিয়ে পালিয়ে গেল। হারেছ তাকে সোরাকাহ মনে করে বলল, হে আরব সর্দার সোরাকাহ, তুমি তো বলেছিলে, আমি তোমাদের সমর্থনে রয়েছি। অথচ তুমি যুদ্ধের ময়দানে এমন আচরণ করছ! তখন শয়তান সোরাকাহর পক্ষেই উত্তর দিল, إِنَّنِي مَوْلَاكُمْ إِنِّي أَلِيُّ الْيَاسْتَكْبَرِ

অর্থাৎ, আমি তোমাদের সাথে কৃত চুক্তি থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি। কারণ, আমি এমন জিনিস দেখছি যা তোমাদের চোখ দেখতে পায় না। অর্থাৎ, ফেরেশতা বাহিনী। তাছাড়া আমি আল্লাহকে ভয় করি। কাজেই তোমাদের সহ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি।

শয়তান যখন ফেরেশতা বাহিনী দেখতে পেল এবং সে যেহেতু তাদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিল, তখন বুঝল যে, এবার আর পরিত্রাণ নেই। অব তার বাক্য 'আমি আল্লাহকে ভয় করি'। সম্পর্কে তফসীর শাস্ত্রের ইমাম কাতাদাহ বলেন যে, কথাটি সে মিথ্যা বলেছিল। সত্যি সত্যি যদি সে আল্লাহকে ভয় করত, তাহলে নাকরমানী করবে কেন? কিন্তু অধিকাংশ মনীষী বলেছেন যে, ভয় করাও যথাস্থানে ঠিক। কারণ, সে যেহেতু আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ কুদরত তথা মহা ক্ষমতা এবং কঠিন আযাব সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত, কাজেই ভয় না করায় কোন কারণ থাকতে পারে না। তবে ঈমান ও আনুগত্য ছাড়া শুধু ভয় করা কোন লাভ নেই।

শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচার উপায় : আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘটনা থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যাচ্ছে :

(১) শয়তান মানুষের জ্ঞাতশত্রু, তাদের ক্ষতি সাধনের জন্য সে নানা রকম কলা-কৌশল ও চাল-ছলনার আশ্রয় নেয় এবং বিভিন্ন রূপ বদলাতে থাকে। কোন কোন সময় শুধু মনে গুসগুয়াসা সৃষ্টি করে পেরেশান করে তোলে, আবার কখনো সামান্যামনি এসে ধোঁকা দেয়।

(২) শয়তানকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা দান করেছেন যে, সে বিভিন্ন

রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। জনৈক প্রখ্যাত হানাফী ফেকাহীদের গ্রন্থ 'আকামুল-মার্জান ফী আহকামিল জানান'—এ বিষয়টি সবিস্তারে প্রমাণ করা হয়েছে। সে কারণেই গবেষক সুফী মনীষীবৃন্দ যারা আধ্যাত্মিক কাশ্ফ ও দর্শনের ক্ষমতা রাখেন তারা মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কোন লোককে দেখেই কিংবা তার কথাবার্তা শুনেই কোন রকম অনুসন্ধান না করে তার পেছনে চলতে আরম্ভ করা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে থাকে—এমন কি কাশ্ফ ও এলহামেও শয়তানের পক্ষ থেকে সংমিশ্রণ হয়ে যেতে পারে।

কৃতকার্যতার জন্য নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, পথের সরলতাও অপরিহার্য :

(৩) যেসব লোক কুফর ও শিরক কিংবা অন্য কোন অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়, তার কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই হয়ে থাকে যে, শয়তান তাদের দুষ্কর্মকে সুন্দর, প্রশংসনীয় এবং কল্যাণকর হিসাবে প্রকাশ করে তাদের মন-মস্তিষ্ককে ন্যায্য ও সত্য এবং প্রকৃত পরিণতি থেকে ফিরিয়ে দেয়। তারা নিজেদের অন্যায়েকেই ন্যায্য এবং মন্দকেই ভাল মনে করতে শুরু করে। ন্যায়পন্থীদের মত তারাও নিজেদের অন্যায্য-অসত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে তৈরী হয়ে যায়। সেজন্য কোরায়েশ বাহিনী এবং তার সর্দার যখন বায়তুল্লাহ থেকে বিদায় নিচ্ছিল তখন বায়তুল্লাহের সামনে এসব শব্দে প্রার্থনা করে বলেছিল—اللهم انصر الهدى الطائفتين—অর্থাৎ, আয় আল্লাহ, উভয় দলের যেটি অধিকতর সংপন্থী তারই সাহায্য করো তাকেই বিজয় দান করো। এই অজ্ঞ লোকেরা শয়তানের প্রতারণায় পড়ে নিজেরা নিজেদেরকেই অধিক হেদায়েত-প্রাপ্ত এবং ন্যায়পন্থী বলে মনে করত। আর পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে নিজেদের মিথ্যা ও অন্যায়ের সাহায্য ও সমর্থনে জান-মাল কোরবান করে দিত।

এতেই প্রতীয়মান হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমল তথা কার্যকলাপের গতি-প্রকৃতি সঠিক না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়।

অন্তঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে মদীনার মুনাফেক ও মক্কার মুশরেকদের একটি যৌথ সলোাপ উদ্ভূত করা হয়েছে যা তাদের জন্য দুঃখ করেছে যেন বলা হয়েছিল। তা হচ্ছে এই

عَزَّوَجَلَّ

অর্থাৎ, বদরের ময়দানে মুষ্টিমেয় এই মুসলমানরা যে এহেন বিরাট শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে, তা এই বেচারাদেরকে তাদের দুর্দীন প্রতারণায় ফেলে মৃত্যুর মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের উত্তরে বলেছেন

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ

অর্থাৎ, যে লোক আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করে, জেনে রাখা, সে কখনও আপমানিত ও অপদস্ত হয় না। কারণ, আল্লাহ তাআলা সব কিছু উপর পরাক্রমশীল। তাঁর কৌশলের সামনে সবার জ্ঞান-বুদ্ধি বিকল হয়ে যায়। মর্মার্থ এই যে, তোমরা শুধু বস্ত ও বস্তুজগত সম্পর্কেই অবগত এবং তারই উপর নির্ভর কর। কিন্তু সেই গোপন শক্তি সম্পর্কে তোমাদের কোন খবরই নেই, যা বস্তু ও বস্তুজগতের স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার ভান্ডারে রয়েছে এবং যা তাঁর উপর ঈমান ও বিশৃঙ্খল স্থাপনকারী লোকদের সঙ্গে থাকে।

ইদানিকালেও সরল সোজা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেখে তথাকথিত অনেক বিজ্ঞ-বুদ্ধিমান বলে থাকে—এরা সেকলে, এদের কিছু বুলো নাক। কিন্তু এদের মধ্যে যদি আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ঈমান ও ভরসা থাকে, তবে

এতে তাদের কিছুই অনিষ্ট হতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্ববর্তী দু'আয়াতে কাফেরদের মৃত্যুকালীন আযাব এবং ফেরেশতাদের সতর্কীকরণের আলোচনা করা হয়েছে। এতে নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যখন আল্লাহর ফেরেশতাগণ কাফেরদের রূহ কবজ করছিলেন, তাদের মুখে ও পিঠে আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন যে, আগুনে জ্বলার আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর; আপনি যদি সে সময়ে তাদের অবস্থা দেখতেন, তখন আপনি এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেতেন।

তফসীরশাশ্বেদর ইমামগণের কেউ কেউ এ বিবরণকে সে সমস্ত কোরায়শ কাফেরের অবস্থা বলে সাব্যস্ত করেছেন, যারা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতা বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে এই যে, বদর যুদ্ধে যে সব কাফের সর্দার নিহত হয় তাদের মৃত্যুতে ফেরেশতাদের হাত ছিল। তাঁরা তাদেরকে সামনের দিক দিয়ে তাদের মুখে এবং পেছন দিক থেকে তাদের পিঠে আঘাত করে তাদের হত্যা করছিলেন আর সেই সঙ্গে আখেরাতে জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে তাদের স্বেদা দিয়ে দিচ্ছিলেন।

আর যারা আয়াতের শব্দের ব্যাপকতারভিত্তিতে এর বিষয়বস্তুকেও ব্যাপক হিসাবেই গ্রহণ করেছেন তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যখন কোন কাফের মৃত্যুবরণ করে, তখন মওতের ফেরেশতা রূহ কবজ করার সময় তার মুখে ও পিঠে আঘাত করেন। কোন কোন রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, তাঁদের হাতে আগুনের চাবুক এবং লোহার গদা থাকে যার দ্বারা মরণোন্মুখ কাফেরকে আঘাত করা হয়। কিন্তু যেহেতু এই আযাবের সম্পর্ক জড়জগতের সাথে নয়, বরং কবর জগতের সাথে যাকে বরযখ বলা হয়, কাজেই এই আযাব সাধারণতঃ চোখে দেখা যায় না।

সেইজন্যই রসুলে করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, যদি আপনি দেখতেন, তবে বড়ই করুণ দৃশ্য দেখতে পেতেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যুর পর আলমে বরযখেও অর্থাৎ, মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামতের বিচারের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের কাফেরদের উপর আযাব হয়ে থাকে। তাই তা সাধারণভাবে দেখা যায় না। কোরআন মজীদে অন্যন্য আয়াতে এবং হাদীসের বর্ণনাতেও কবর আযাবের ব্যাপারে বিপুল আলোচনা রয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, দুনিয়া ও আখেরাতে এ আযাব তোমাদের নিজের হাতেই অর্জিত। সমস্ত কাজকর্ম যেহেতু হাতের দ্বারা সম্পাদিত হয়, সেহেতু এখানেও হাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। মর্মান্বহ এই যে, এসব আযাব তোমাদের নিজের আমলেরই ফলাফল। আর একথা সত্য যে, আল্লাহ তাঁর বন্দার উপর যুলুমকারী নন যে, অকারণেই কাউকে আযাবে নিপতিত করে দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব অপরাধীর উপর আল্লাহ তাআলার এই আযাব নতুন কিছু নয়, বরং এটাই আল্লাহ তাআলার সাধারণ রীতি যে, তিনি তাঁর বন্দাদের হেলায়েতের জন্য তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেন, আশে-পাশে তাদের জন্য এমন অসংখ্য বিকল্প বিদ্যমান থাকে যেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেই তারা আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরত ও মহত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারে এবং অসম্মত সৃষ্টিকে আর তাঁর সাথে শরীক করে না। তদুপরি অতিরিক্ত সতর্কীকরণে জন্য নবী-রসূল পাঠান। আল্লাহর রসূল তাদের বুঝতে ও বোঝাতে সামান্যতম ক্রটিও রাখেন না। তাঁরা তাদেরকে মুজ্জিয়া আকারে আল্লাহ তাআলার ভয়ানক ক্ষমতার দৃশ্যাবলীও দেখান। তারপরেও যখন কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় এ সমস্ত বিষয়ে চোখ বন্ধ করে নেয় এবং খোদার সতর্কতার কোনটিতেই কান দেয় না, তখন এহেন লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার রীতি হল এই যে, পৃথিবীতেও তাদের উপর আযাব নেমে আসে এবং আখেরাতেও অন্তহীন আযাবে বন্দী হয়ে যায়। এরশাদ হয়েছে - **وَأَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ الْبُرْجِ** - অর্থাৎ, রীতি, অভ্যাস। অর্থাৎ, ফেরাউনের অনুসারী এবং তাদের পূর্ববর্তী কাফের ও উদ্ধত লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার রীতি সম্পর্কে গোটা কিছু জানতে পেরেছে যে, তিনি ফেরাউনকে তার সমস্ত আড়ম্বর ও প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন এবং তার পূর্ববর্তী আদম সামুদ জাতিসমূহকে বিভিন্ন প্রকৃতির আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরশাদ হচ্ছেঃ

كَمْ أَوَّلَآئِكَ لَدُنَّ اللَّهِ فَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ يَوْمَ يُصْعَقُونَ

তাআলার আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে স্বীয় আযাবে নিপতিত করেছেন। **إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ**

شَدِيدُ الْعِقَابِ আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী, কোন ক্ষমতাবানই নিজের শক্তির বলে তাঁর আযাব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। আর আল্লাহ তাআলার শাস্তিও অত্যন্ত কঠিন।

৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামী তাঁর নেয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। এরশাদ হয়েছে—

ذَٰلِكَ يَٰۤاَنۡلَٰهُ لَمۡ يَكۡ مُغَيِّرَ اٰتِۢمَآءَ اَنۡعَمَآءَ لِقَوْمِهِۦ حَتّٰى يَغَيِّرُوۡا مَآ
بِاَنۡفُسِهِمۡ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কোন জাতিকো যে নেয়ামত দান করেন তিনি তা ততক্ষণ পর্যন্ত বদলান না, যে পর্যন্ত না সে জাতি নিজেই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপ বদলে দেয়।

এখানে প্রথম লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ নেয়ামত দান করার অন্য কোন মূলনীতি বর্ণনা করেননি। না সে জন্য কোন রকম বাধ্যবাধকতা ও শর্তাশর্ত আরোপ করেছেন, না কারো কোন সংকল্পের উপর তা নির্ভরশীল রেখেছেন। তার কারণ যদি এমনই হতো, তবে সর্বপ্রথম নেয়ামত আমাদের অস্তিত্ব যাতে আল্লাহ্র আশ্চর্যজনক শিল্পকর্মের হাজারো বিস্ময়কর নেয়ামতের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে—বলাইবাখ্যাত, এসব নেয়ামত সে সময় দান করা হয়, যখন না ছিলাম আমরা, না ছিল আমাদের কোন আমল বা কাজকর্ম।

কাজেই যদি আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত ও অনুগ্রহসমূহ বাদ্যর সংকল্পের অপেক্ষা থাকত, তবে আমাদের অস্তিত্বই স্থাপিত হতো না।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত ও রহমত তথা তাঁর দান ও করুণা তাঁর রাক্বুল আলামীন ও রাহমানুররাহীম গুণেই প্রকৃতিগত ফসল। অবশ্য এ সমস্ত নেয়ামতের স্থায়িত্বের জন্য একটা নিয়ম বা মূলনীতি রয়েছে। যা এ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে যে, যে জাতিকো আল্লাহ্ তাআলা কোন নেয়ামত দান করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তা তাদের কাছে থেকে ফিরিয়ে নেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদেরই নিজেদের অবস্থা ও কার্যকলাপকে পরিবর্তিত করে আল্লাহ্ তাআলার আযাবকে আমন্ত্রণ জানায়।

অবস্থা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে ভাল ও সং অবস্থা ও কর্মের পরিবর্তে মন্দ অবস্থা ও কার্যকলাপ অবলম্বন করে নেয়া কিংবা আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত আগমনের সময় যে সমস্ত মন্দ ও পাপ কাজে লিপ্ত ছিল নেয়ামত প্রাপ্তির পর তার চেয়ে অধিক মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়া।

এই বিশ্লেষণের দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, বিগত আয়াতগুলোতে যে সমস্ত জাতি-সম্প্রদায়ের আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ, কোরায়েশ গোত্রের কাকেররা এবং ফেরাউনের সম্প্রদায়; এ আয়াতের সাথে তাদের সম্পর্ক এ কারণে যে, এরা যদিও আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতপ্রাপ্তির সময়ও তেমন কোন ভাল অবস্থায় ছিল না; সবাই ছিল মুশিরক ও কাকের, কিন্তু নেয়ামতপ্রাপ্তির পর এরা নিজেদের মন্দাচার ও অসৎ কর্ম পূর্বের চাইতে বহুগুণে বেশী তৎপর হয়ে উঠে।

ফেরাউনের বংশধররা বনী-ইসরাঈলদের উপর নানা করম অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করে এবং হয়রত মুসা (আঃ)—এর মোকাবেলা ও বিরুদ্ধাকারে প্রবৃত্ত হয়। যা ছিল তাদের পূর্ববর্তী অপরাধে আরেকটি সংযোজন। এতেকরে তারা নিজেদের অবস্থাকে অধিকতর কল্যাণের

(৫৩) তার কারণ এই যে, আল্লাহ্ কখনও পরিবর্তন করেন না সে সব নেয়ামত, যা তিনি কোন জাতিকো দান করেছিলেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ শ্রবকারী, মহাজ্ঞানী। (৫৪) যেমন ছিল রীতি ফেরাউনের বংশধর এবং যারা তাদের পূর্বে ছিল, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল স্বীয় কারনকর্তার নিরূপণসমূহকে। অতঃপর আবি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি তাদের শাপের দরুন এবং ডুবিয়ে মেরেছি ফেরাউনের বংশধরদেরকে। বস্তুতঃ এরা সবাই ছিল ষালেম। (৫৫) সমস্ত জীবের মাঝে আল্লাহ্র নিকট তারাই সবচেয়ে নিকট, যারা অস্বীকারকারী হয়েছে, অতঃপর আর ইমান আনেনি। (৫৬) যাদের সাথে তুমি চুক্তি করছে তাদের মধ্য থেকে অতঃপর প্রতিবার তারা নিজেদের কৃত চুক্তি লংঘন করে এবং ভয় করে না। (৫৭) সুতরাং যদি কখনো তুমি তাদেরকে যুদ্ধ পেয়ে যাও, তবে তাদের এমন শাস্তি দাও, যেন তাদের উত্তরসূরীরা তাই দেখে পালিয়ে যায়; তাদেরও যেন শিক্ষা হয়। (৫৮) তবে কোন সম্প্রদায়ের ঝোঁক দেয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের ভয় থাকে, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকেই ছুঁড়ে ফেলে দাও এমনভাবে যেন হয়ে যাও তোমরা ও তারা সমান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ঝোঁকবাহক, প্রত্যেককে পছন্দ করেন না। (৫৯) আর কাকেররা যেন একথা মনে না করে যে, তারা বেঁচে গেছে; কখনও এরা আমাকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না। (৬০) আর গল্পত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহ্র শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহ্র রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না। (৬১) আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তুমিও সে দিকেই আগ্রহী হও এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা কর। নিশ্চিন্দেহে তিনি শ্রবকারী, পরিজ্ঞাত।

দিকে প্রত্যাবর্তিত করে দেয়। তখন আল্লাহ তাআলাও তাঁর নেয়ামতকে বিপদাপদ ও শাস্তি-সাজায় বদলে দেন। তেমনিভাবে মক্কার কোরায়েশরা যদিও মুশরিক ও বদকার ছিল, কিন্তু তার সাথে সাথে তাদের মাঝে কিছু সৎকর্ম, সেলাহ-রেহমী, তথা স্বজনবাৎসল্য, মেহমান-নাওয়াযী তথা অতিথিপরায়ণতা, হাজীদের সেবা, বায়তুল্লাহর প্রতি সম্মানবোধ প্রভৃতি কিছু সদগুণও বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য দুই-দুনিয়ার নেয়ামতরাজির দরজা খুলে দিয়েছেন, দুনিয়াতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি দান করেছেন। যেসব দেশে কারো বাণিজ্যিক কাফেলা নিরাপদে অতিক্রম করতে পারত না সেসব দেশে—যেমন, সিরিয়া ও ইয়ামেনে তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা যেত এবং একান্ত নিরাপদে লাভবান হয়ে ফিরে আসত।

আর দুইনের দিক দিয়ে সে মহা-নেয়ামত তাদের দান করা হয়েছে যা বিগত কোন জাতি-সম্প্রদায়ই পায়নি। তাদেরই মাঝে আবিস্তৃত হন নবীকুল শিরোমণি সর্বশেষ নবী (সাঃ) এবং তাদেরই মাঝে অবতীর্ণ হয় আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ কোরআন করীম।

কিন্তু এরা আল্লাহ তাআলার এসমস্ত দান ও অনুগ্রহের জন্য শুকরিয়া আদায় করা, এর যথার্থ মর্যাদা দান এবং এগুলোর মাধ্যমে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করার পরিবর্তে আগের চেয়েও বেশী পঙ্কিলতায় মজে যায়। সেলাহ-রেহমী পরিহার করে মুসলমান হয়ে যাওয়ার অপরাধে নিজ বাতুল্পত্রের উপর চরম বর্বরতাসূলভ উৎপীড়ন চালাতে আরম্ভ করে, অতিথিপরায়ণতার পরিবর্তে সেই মুসলমানদের জন্য দানা-পানি বন্ধ করার প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করে, হাজীদের সেবা করার পরিবর্তে মুসলমানদের হরমে প্রবেশে পর্যন্ত বাধা দান করতে থাকে। এগুলো ছিল সেসব অবস্থা যাকে কোরায়েশ কাফেররা পরিবর্তিত করে ফেলেছিল। এরই পরিণতিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নেয়ামতসমূহকে বিপদাপদ ও আঘাতে রূপান্তরিত করে দেন। ফলে এরা দুনিয়াতেও অপদস্থ হয় এবং যে সত্তা দুনিয়া ও আশেরাতের জন্য রাহমাতুল লিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন তাঁরই মাধ্যমে এরা নিজেদের মৃত্যু ও ধ্বংসকে আমন্ত্রণ জানায়।

তফসীরে-মাযহারীতে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ক্বিলাব ইবনে মুরা যিনি রসুলে করীম (সাঃ)-এর বংশ পরম্পরায় তৃতীয় পুরুষে পরদাদা হিসাবে গণ্য। তিনি প্রথম থেকেই দুইনে-ইবরাহীমী ও ইসমাজিলীর অনুগামী ছিলেন এবং বংশানুক্রমিকভাবে এ দুইনের নেতৃত্ব ও পৌরাহিত্য তাদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল। কোসাই ইবনে ক্বিলাবের সময়ে তাদের মধ্যে মূর্তি উপাসনার সূচনা হয়। তাঁর পূর্বে তাদের ধর্মীয় নেতা ছিলেন কা'আব ইবনে লুওয়াই। তিনি জুমার দিন যাকে তাদের ভাষায় 'আরোয়িয়া' বলা হয় (সমাজের) সবাইকে সমবেত করে ভাষণ দিতেন এবং বলতেন যে, তার সম্মানবর্গের মাঝে শেষনবী (সাঃ)-এর জন্ম হবে। তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করা সবার জন্য অপরিহার্য হবে। যে লোক তাঁর উপর ঈমান আনবে না, তার কোন আমলই কবুল হবে না। মহানবী (সাঃ) সম্পর্কে তার আরবী কবিতা জাহেলিয়াত আমলের কবিদের মধ্যে খুবই প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এই কোসাই ইবনে ক্বিলাব সমস্ত হাজীর জন্য খানাপিনার ব্যবস্থা করতেন। এমনকি এ দায়িত্বটি মহানবী (সাঃ)-এর বংশে তাঁর আমলেও বলবৎ ছিল। এই ইতিহাসের দ্বারা একথাও বলা যেতে পারে যে, কোরায়েশদের পরিবর্তনের

মর্ম হল দুইনে-ইবরাহীমী পরিহার করে মূর্তি উপাসনা আরম্ভ করা।

যাহোক, আয়াতের প্রতিপাদ্যে এ কথা বোঝা যাচ্ছে যে, কোন কোন সময় আল্লাহ তাআলা তাঁর নেয়ামত এমন কোন কোন লোককেও দান করেন, যে তার আমল বা কর্মের দ্বারা তার যোগ্য নয়, কিন্তু প্রদত্ত হওয়া পর যদি সে নিজের আমল বা কর্মধারা সংশোধন করে কল্যাণের নিক ফিরানোর পরিবর্তে মন্দ কাজের দিকেই আরো বেশী উৎসাহী হয়ে পড়ে, তখন প্রদত্ত নেয়ামত তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং সে ক্ষেত্রে আল্লাহর আঘাতের যোগ্য হয়ে পড়ে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে— **وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতিটি কথাবার্তা শুনে এবং তাদের সমস্ত আমল ও কার্যকলাপ জানেন। এতে কোন রকম ভুল-বিস্মৃতির কোনই অবকাশ নেই।

উল্লেখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তু বঙ্গ শব্দাবলীও প্রায় তেমনি, যা এক আয়াত আগেই আলোচিত হয়েছে।

এ-**دَابَّةٌ مِّن دُوَابِ** এতে **دَابَّةٌ** শব্দটি **دَابَّةٌ** এর বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী। মানুষসহ যত **دَابَّةٌ** ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করে সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে সাধারণ প্রচলনে এ শব্দটি বিশেষ করে চতুষ্পদ জীবের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। যেহেতু নির্ভীকতা ও অনুভূতিহীনতার দিক দিয়ে তাদের অবস্থা চতুষ্পদ জীব-জানোয়ার অপেক্ষাও নীচে নেমে গিয়েছিল, কাজেই তাদেরকে বোঝাতে গিয়ে এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ সুস্পষ্ট যে, সমস্ত জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে এরাই সবচেয়ে নিকটতর। আয়াতের শেষাংশে রয়েছে— **فَهُمْ لَكِيْفُونَ** অর্থাৎ, এরা ঈমান আনবে না। মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যেসব যোগ্যতা দান করেছিলেন, তারা সে সবই হারিয়ে ফেলেছে এবং চতুষ্পদ জীব-জানোয়ারেরই মত পানাহার ও নিদ্রা-জাগরণকেই জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছে। কাজেই ঈমান পর্যন্ত তাদের পৌছা হবে না।

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতটি ইহুদী সম্প্রদায়ের ছ'জন লোক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা পূর্বাচ্ছেই সংবাদ দিয়ে দিয়েছেন যে, এরা শেষ পর্যন্ত ঈমান আনবে না।

الَّذِينَ عٰهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْفُتُونَ عَنْهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ - এ আয়াতটি মদীনার ইহুদী এবং বনু-কোরায়যা ও বনু-নাঈর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলো মক্কার মুশরিকদের উপর বদর ময়দানে মুসলমানদের মাধ্যমে আল্লাহর আঘাত অবতীর্ণ হওয়ার বিষয় আলোচনা এবং পূর্ববর্তী উম্মতের কাফেরদের সাথে তাদের সামঞ্জস্যের বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সে যালেম দলের আলোচনা করা হয়েছে যারা মদীনায় হিজরতের পর মুসলমানদের জন্য আত্মত্যাগের সগুণ পরিণত হয় এবং যারা একদিকে মুসলমানদের বন্ধুত্ব ও সখ্যতার দাবীদার ছিল এবং অপরদিকে মক্কার কাফেরদের সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত। ধর্মমতের দিক দিয়ে এরা ছিল ইহুদী। মক্কার মুশরেকদের মাঝে আবু-জাহল যেমন ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অগ্রবর্তী ছিল, তেমনি মদীনার ইহুদীদের মধ্যে এ কাজের নেতা ছিল কা'আব ইবনে

আশরাফ।

রসূলে করীম (সাঃ) হিজরত করে মদীনায়ে চলে আসার পর মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ্য করে এরা ভীত হলেও তাদের মনে ইসলামের প্রতি শত্রুতার এক দাবিদাহ জ্বলেই যাচ্ছিল।

ইসলামী জাতীয়তা : রসূলে করীম (সাঃ) মদীনায়ে আগমনের পর ইসলামী রাজনীতির সর্বপ্রথম বুনিন্দা প্রতিষ্ঠিত করেন। মুহাজেরীন ও অনসারদের স্বদেশী ও স্বজাতীয় সাম্প্রদায়িকতাকে মিটিয়ে দিয়ে ইসলামের নামে এক নতুন জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাজেরীন ও অনসারদের বিভিন্ন গোত্রকে ভাই-ভাইয়ে পরিণত করে দেন। আর হযুর (সাঃ)-এর মাধ্যমে আব্দুল্লাহ তাআলা অনসারদের সে সমস্ত বিরোধও দূর করে দেন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে চলে আসছিল। এবং মুহাজেরীনদের সাথেও তিনি পারস্পরিকভাবে ভাই ভাই সম্পর্ক স্থাপন করেন।

ইহুদীদের সাথে মৈত্রী চুক্তি : হিজরতের পর দেখা যায়, মুসলমানদের প্রতিপক্ষ ছিল দু'টি। (১) মক্কার মুশরেকীন, যাদের জত্যাচার-উৎপীড়ন মক্কা তাগ করতে বাধ্য করছিল এবং (২) মদীনার ইহুদীবর্গ, যারা এখন মুসলমানদের প্রতিবেশী হয়েছিল। এদের মধ্য থেকে ইহুদীদের সাথে এক চুক্তি সম্পাদন করা হয়, এবং একটা বিস্তারিত প্রতিজ্ঞা পত্রও লেখা হয়। এই চুক্তির প্রতি আনুগত্য মদীনা এলাকার সমস্ত ইহুদী এবং মুসলমান, অনসার ও মুহাজেরদের উপর আরোপ করা হয়। চুক্তির পূর্ণ ভাষ্য ইবনে-কাসীর 'আলবেদায়াহ ওয়ান্নুহায়াহ' গ্রন্থে এবং গীরাতে ইবনে-হেশাম প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বস্তুতঃ এর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে, মদীনার ইহুদিগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন দ্রব্ধ প্রকাশ্য কি গোপন সাহায্য করবে না। কিন্তু এরা বদর যুদ্ধের সময় সম্পাদিত চুক্তি লঙ্ঘন করে মক্কার মুশরেকদেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করে, তবে বদর যুদ্ধের ফলাফল যখন মুসলমানদের সুস্পষ্ট বিজয় এবং কাফেরদের অপমানজনক পরাজয়ের আকারে সামনে এসে যায়, তখন পুনরায় তাদের উপর মুসলমানদের প্রভাব ও তীতি প্রবল হয়ে উঠে এবং তারা মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হয়ে ওয়র পেশ করে যে, এবারে আমাদের ভুল হয়ে গেছে, এবার বিষয়টি ক্ষমা করে দিন, ভবিষ্যতে আর এমনভাবে আমরা চুক্তি লঙ্ঘন করব না।

মহানবী (সাঃ) ইসলামী গাণ্ডী, দয়া ও সহনশীলতার প্রেক্ষিতে যা তাঁর অভ্যাস ছিল আবারও তাদের সাথে চুক্তি নবায়ন করে নিলেন। কিন্তু এরা নিজেদের অসৎ স্বভাব থেকে বিরত ছিল না। ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয় ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা জানতে পেরে তাদের সাহস বেড়ে যায় এবং তাদের সর্দার কা'আব ইবনে আশরাফ নকায় গিয়ে মক্কার মুশরেকদের পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং আশ্বাস দেয় যে, মদীনার ইহুদীরা তোমাদের সাথে থাকবে।

এটা ছিল তাদের দ্বিতীয়বারে চুক্তি লঙ্ঘন যা তারা ইসলামের বিরুদ্ধে করেছে। আলোচ্য আয়াতে এভাবে বার বার চুক্তি লঙ্ঘনের কথা উল্লেখ করে তাদের দুষ্কৃতির বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক, যাদের সাথে আপনি চুক্তি সম্পাদন করে নিয়েছেন, কিন্তু এরা

প্রতিবারই সে চুক্তি লঙ্ঘন করে চলছে। আয়াতের শেষাংশে এরশাদ হয়েছে : **وَهُمْ كَاذِبُونَ** অর্থাৎ, এরা ভয় করে না। এর মর্মার্থ এও হতে পারে যে, এ হতভাগ্যরা যেহেতু দুনিয়ার লোভে উন্মাদ ও অজ্ঞান হয়ে আছে, তাদের মনে আখেরাতের কোন চিন্তাই নেই। কাজেই এরা আখেরাতের আযাবকে ভয় করে না। এছাড়া এও হতে পারে যে, এহেন দুরাচার ও চুক্তি লঙ্ঘনকারী লোকদের যে অন্তত পরিণতি পৃথিবীতেই হয়ে থাকে এরা নিজেদের গাফলতী ও অজ্ঞানতার দরুন সে ব্যাপারেও ভয় করে না।

অতঃপর সমগ্র বিশুই স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে যে, এসব লোক নিজেদের দুষ্কর্মের শাস্তি পৃথিবীতেও ভোগ করেছে। আবু জাহ্লের মত কা'আব ইবনে আশরাফ নিহত হয়েছে এবং মদীনার ইহুদীদেরকে দেশছাড়া করা হয়েছে।

وَأَمَّا تَبَسُّطُهمُ فِي السُّبُطِ فَسُوءٌ مِّنْ خَلْقِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

এতে **تَبَسُّطُهمُ** শব্দটির অর্থ, তাদের উপর ক্ষমতা লাভ করা। আর **سُوءٌ**

মূল ধাতু আর **تَشَرُّدٌ** থেকে গঠিত হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ বিতাড়িত এবং বিক্ষিপ্ত করে দেয়া। অতএব, আয়াতের অর্থ হবে যে, "আপনি যদি কোন যুদ্ধে তাদের উপর ক্ষমতা লাভে সমর্থ হয়ে যান, তবে তাদেরকে এমন কঠোর শাস্তি দিন যা অন্যান্যের জন্যও দৃষ্টান্ত হয়ে যায়।" তাদের পশ্চাতে যারা তাদের সহায়তা ও ইসলামের শত্রুতায় লেগে আছে তারাও যেন একথা উপলব্ধি করে নেয় যে, এখন থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই কল্যাণ। এর মর্ম হল এই যে, এদেরকে এমন শাস্তিই যেন দেয়া হয়, যা দেখে মক্কার মুশরেকীন ও অন্যান্য শত্রু সম্প্রদায়গুলোও প্রভাবিত হবে এবং ভবিষ্যতে মুসলমানদের মোকাবেলা করার সাহস করবে না।

আয়াতের শেষাংশে **لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** বলে রাক্বুল আলামীনের ব্যাপক রহমতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই সুকঠিন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা নয় বরং এতে তাদেরই কল্যাণ যে, হয়তো বা এহেন অবস্থা দেখে এরা কিছুটা চেতনা ফিরে পাবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের সংশোধন করে নেবে।

সন্ধি চুক্তি বাতিল করার উপায় : পরবর্তী আয়াতে রসূলে মকবুল (সাঃ)-ক যুদ্ধ ও সন্ধির আইনসংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বলে দেয়া হয়েছে। এতে যদি চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষের দিক থেকে বিশৃঙ্খলতা অর্থাৎ, চুক্তি লঙ্ঘনের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে চুক্তির বাধ্যবাধকতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা অপরিহার্য নয়। কিন্তু চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়ার পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জায়েয নয়। বরং এর বিশুদ্ধ পন্থা হল এই যে, প্রতিপক্ষকে শাস্ত পরিহিতিতে এবং অবকাশের অবস্থায় এ ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে যে, তোমাদের কুটিলতা ও বিরুদ্ধাচারণের বিষয়টি আমাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে কিংবা তোমাদের আচার-আচরণ আমাদের সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে, তাই আমরা আগামীতে এই চুক্তি পালনে বাধ্য থাকব না; তোমাদেরও সব রকম অধিকার থাকবে যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করতে পার। আয়াতের কথাগুলো হল এই :

وَأَمَّا غَدَاةُ مِنَ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَابْتَذِلْهُمُ عَلَى سَوَاءٍ إِنْ اللَّهُ لَكَاظِمٌ

الْحَقِيقَةُ

অর্থাৎ, আপনার যদি কোন চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা হয়, তবে তাদের চুক্তি তাদের দিকে এমনভাবে ফিরিয়ে দেবেন যেন আপনারা এবং তারা সমান সমান হয়ে যান। কারণ, আল্লাহ্ খেয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

অর্থাৎ, যে জাতির সাথে কোন সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তার মোকাবেলায় কোন রকম সামরিক পদক্ষেপ খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ্ খেয়ানতকারীদেরকে পছন্দ করেন না। যদি এ খেয়ানত কাকের শত্রুর সাথেও করা হয়, তবুও তা জায়েয নয়। অবশ্য যদি অপরপক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়, তবে এমনটি করা যেতে পারে যে, তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণার মাধ্যমে অবহিত করে দেবেন যে, আগামীতে আমরা এ চুক্তির বাধ্য থাকব না। কিন্তু ঘোষণাটি এমনভাবে হতে হবে যেন মুসলমান ও অপরপক্ষ এতে সমান সমান হয়। অর্থাৎ, এমন অবস্থা যেন সৃষ্টি করা না হয় যে, এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পূর্ব থেকেই তাদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিয়ে নেবে এবং তারা চিন্তামুক্ত হয়ে থাকার দরুন প্রস্তুতি নিতে পারবে না। বরং যদি কোন প্রস্তুতি নিতে হয়, তা এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পরেই নেবেন।

চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা : আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) প্রমুখ সুলায়ম ইবনে 'আমের এর রেওয়াজেতক্রমে উদ্ধৃত করেছেন যে, নির্দিষ্ট এক সময়ের জন্য হযরত মো'আবিয়া (রাঃ) এবং কোন এক সম্প্রদায়ের সাথে এক যুদ্ধবিরতি চুক্তি ছিল। হযরত মো'আবিয়া (রাঃ) ইচ্ছা করলেন যে, এই চুক্তির দিনগুলোতে নিজেদের সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সে সম্প্রদায়ের কাছাকাছি নিয়ে রাখবেন, যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। কিন্তু ঠিক যখন হযরত মো'আবিয়ার সৈন্য দল সৈদিকে রওয়ানা হচ্ছিল, দেখা গেল, একজন বুড়ো লোক ঘোড়ায় চড়ে খুব উচ্চৈঃস্বরে না'রা, লাগিয়ে আসছেন যে, **الله اكبر الله اكبر و فاء لا غدر** অর্থাৎ, না'রায়ে তকবীরের সাথে

তিনি বললেন, সম্পাদিত চুক্তি পূরণ করা কর্তব্য। এর বিরুদ্ধাচারণ করা উচিত নয়। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, কোন জাতি-সম্প্রদায়ের সাথে কোন সন্ধি বা যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেলে, তার বিরুদ্ধে কোন গিট খোলা অথবা ঝাঁপও উচিত নয়। যাহোক, হযরত মো'আবিয়াকে বিষয়টি জানানো হলো। দেখা গেল কথাগুলো যিনি বলেছেন, তিনি হলেন সাহাবী হযরত আমর ইবনে আবুসাহ্ (রাঃ)। হযরত মো'আবিয়া ততক্ষণে স্বীয় বাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যাতে যুদ্ধবিরতির মেয়াদে সৈন্য স্থাপনার পদক্ষেপের দরুন খেয়ানতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না পড়েন।—(ইবনে কাসীর)

উল্লিখিত আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথম আয়াতে সে সমস্ত কাফেরের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বলে বেঁচে গেছে কিংবা অংশ নিয়েও পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা যেন এমন ধারণা না করে যে, বাস্তবিক পক্ষেই আমরা বেঁচে গেছি। কারণ, বদরের যুদ্ধটি কাফেরদের জন্য এক ষোড়ায়ী আযাব। এই পাকড়াও থেকে বেঁচে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং বলা হয়েছে—**لَهُمْ لَكِبَةٌ** অর্থাৎ, এরা নিজেদের চতুরতার দ্বারা আল্লাহকে অপারক করতে পারবে না, তিনি যখনই ওদেরকে ধরতে চাইবেন, তখন এরা এক পা'ও সরতে পারবে না। হয়তো বা পৃথিবীতেই এরা ধরা পড়ে যেতে পারে, না হয় আখেরাতে তো তাদের

আটকে পড়া অবধারিত।

এ আয়াত ইঙ্গিত করে দিচ্ছে যে, কোন অপরাধী পাপী যদি কোন বিপদ ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তারপরেও যদি তওবা না করে বরং স্বীয় অপরাধে অটল-অবিচল থাকে, তবে তাকে এর লক্ষ্য মন করা না যে, সে কৃতকার্য হয়ে গেছে এবং চিরকালের জন্যই মুক্তি পেয়ে গেছে, বরং সে সর্বক্ষণই আল্লাহর হাতের মুঠোয় রয়েছে এবং এই অব্যাহতি তার বিপদকে আরো বাড়াচ্ছে যদিও সে তা অনুভব করতে পারছে না।

জেহাদের জন্য যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা করা : পরবর্তী আয়াতে ইসলামের শত্রুকে প্রতিরোধ ও কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করার জন্যে প্রস্তুতির বিধান বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে—**وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ** অর্থাৎ, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করে নাও যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব। এক্ষেত্রে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করার সাথে **مَا اسْتَطَعْتُمْ**—এর শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমাদের সফলতা লাভের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, তোমাদের প্রতিপক্ষের নিকট যে ধরনের এবং যে পরিমাণ উপকরণ রয়েছে তোমাদেরকেও ততটাই অর্জন করতে হবে বরং সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু উপকরণ জোগাড় করতে পার তাই সঞ্চার করে নাও, তবে সৌকর্য্য যথেষ্ট—আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা তোমাদের সঙ্গে থাকবে।

অতঃপর সে উপকরণের কিছুটা বিশ্লেষণ এভাবে করা হয়েছে **وَأَعِدُّوا لَهُمْ** অর্থাৎ, মোকাবেলা করার শক্তি সঞ্চয় কর। এতে সন্ধি যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত এবং শরীরচর্চা ও সমর বিদ্যা শিক্ষা করারও অন্তর্ভুক্ত। কোরআন করীম এখানে তৎকাল প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের কোন উল্লেখ করেনি, বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'শক্তি' ব্যবহার করে ইঙ্গিত দিয়েছে, 'শক্তি' প্রত্যেক যুগ, দেশ ও যুগ অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৎকালীন সময়ের অস্ত্র ছিল তীর-তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি। তারপরে বন্দুক-তোপের যুগ এসেছে। তারপর এখন চলছে বোমা, রকেটের যুগ। 'শক্তি' শব্দটি এ সবকিছুই ব্যাপক। সুতরাং যে কোন বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হয় সেসবই যদি এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুকে প্রতিহত করা এবং কাফেরদের মোকাবেলা করা হবে, তাহলে তা জেহাদেরই শামিল।

বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে রসুলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা এর সেগুলো ব্যবহার করার কায়দা-কৌশল অনুশীলন করাকে বিরাট এবাদত ও মহাপুণ্য লাভের উপায় বলে সবাস্ত্য করেছেন।

আর জেহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষার বিষয়টি সর্বমুখে ও সব জাতিতে আলাদা রকম, সেহেতু রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন—“মুশরেকীদের বিরুদ্ধে জ্ঞান-মাল ও মুখে জেহাদ কর।”—(আবু দাউদ, নাসায়ী)

এ হাদীসের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, জেহাদ ও প্রতিরোধ বেদ অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তেমনি কোন কোন সময় মুখও হয় থাকে। তাছাড়া কলমও মুখেরই পর্যায়ভুক্ত। ইসলাম ও কোরআনে বিরুদ্ধে কাফের ও মুলহেদদের আক্রমণ এবং তার বিকৃতি সাধনে প্রতিরোধ মুখে কিংবা কলমের দ্বারা করাও এই সুস্পষ্ট নির্দেশিত জেহাদের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লিখিত আয়াতে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করার নির্দেশ দানের পর সেসব সশস্ত্রসামান্য সংগ্রহ করার ফায়দা এবং আসল উদ্দেশ্যও এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে— **وَيُؤَيِّدُ بَيْنَهُمْ وَاعْدُوَّهُمْ وَعَدُوَّهُمْ** অর্থাৎ, যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বিশ্রহ করা নয়, বরং কুফর ও শিরককে পরাস্ত ও প্রভাবিত করে দেয়া। তা কখনো মুখ ও কলমের মাধ্যমেও হত পারে। আবার অনেক সময় যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয়। কাজেই পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিরোধ করা করম।

অন্তঃপর বলা হয়েছে, যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে যাদেরকে প্রভাবিত করা উদ্দেশ্য তাদের অনেককে মুসলমানরা জানে। আর তারা হল সেসব লোক যাদের সাথে মুসলমানদের মোকাবেলা চলছে। এ ছাড়াও কিছু লোক রয়েছে যাদেরকে এখনও মুসলমানরা জানে না। এর মর্ম হল সারা দুনিয়ার কুফর ও শুরিক, যারা এখনও মুসলমানদের মুকাবেলায় আসেনি কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের সাথেও সংঘর্ষ বাধতে পারে। কোরআন করীমের এ অঙ্গীকারিতা বলে দেখা হয়েছে যে, মুসলমানগণ যদি নিজেদের উপস্থিত দুর মোকাবেলার প্রস্তুতি নেয়, তবে এর প্রভাব শুধু সে শত্রুর উপরই পড়বে না, বরং দূরদূরান্তের কাকের শক্তির উপরেও পড়বে। বস্তুতঃ হয়েছে তাই। খোলাফায়ে-রাশেদীনের আমলে এরা সবাই পরাজিত ও প্রভাবিত হয়ে যায়।

যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থেরও প্রয়োজন হয়; বরং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম অর্থ-সম্পদের দ্বারাই তৈরী করা যেতে পারে। সেজন্যই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহর রাহে মাল বা জর্-সম্পদ ব্যয় করার ফযীলত এবং তার মহা-প্রতিদানের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে যে, এ পথে তোমরা যাই কিছু ব্যয় করবে তার বন্দা পুরোপুরিভাবে তোমাদেরকে দেয়া হবে। কোন কোন সময় দুনিয়াতেই পন্থতের মালের আকারে এ বন্দা মিলে যায়, না হয় আখেরাতের বন্দা যে নির্ধারিত রয়েছে। বলাবাহুল্য, সেটিই অধিকতর মূল্যবান।

তৃতীয় আয়াতে সন্ধির বিধি-বিধান এবং সে সম্পর্কিত বর্ণনা। বলা হয়েছে **(-) وَلَئِنْ جَاءَكَ لِلْإِسْلَامِ فَاجْتَنِبْهَا** (সীম সীন বর্ণের উপর যবর (-)) এক সীম সীন বর্ণের নীচে যে (-) উভয় উচ্চারণেই শব্দটি সন্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যদি কাকেরা কোন সময় সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে আপনারও তাই করা উচিত। এখানে নির্দেশবাচক পদ উত্তমতা বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মর্মার্থ এই

যে, কাকেরা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে সেক্ষেত্রে আপনার এ অধিকার রয়েছে যে সন্ধি করায় যদি মুসলমানদের কল্যাণ মনে করেন, তাহলে সন্ধিও করতে পারেন।

আর **وَلَنْ جَعَلُكُمْ**—এর শর্ত আরোপ করতে বোঝা যাচ্ছে, সন্ধি তখনই করা যেতে পারে, যখন কাকেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ পাবে। কারণ, তাদের আগ্রহ ব্যতীত যদি স্বয়ং মুসলমানগণ সন্ধির উদ্যোগ করে, তবে এতে তাদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। তবে যদি এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, মুসলমানগণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য একমাত্র সন্ধি ছাড়া অন্য কোন পন্থা দেখা না যায়, তবে সেক্ষেত্রে ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের মতে সন্ধির উদ্যোগ করাও জায়েয।

আর যদি শত্রুদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশে এমন কোন সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে যে, তারা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে, শৈথিল্যে ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে, সেজন্য আয়াতের শেষাংশে রসুলে করীম (সাঃ)—কে হেদায়েত দান করা হয়েছে যে, **وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ** অর্থাৎ, আপনি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করুন। কারণ, তিনিই যথার্থ শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। তিনি তাদের কথাবার্তাও শোনেন এবং তাদের মনের গোপন ইচ্ছাও জানেন। তিনি আপনার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। কাজেই আপনি এহেন প্রমাণহীন আশঙ্কা-সম্ভাবনার উপর নিজ কাজের ভিত রাখবেন না। এসব আশঙ্কার বিষয়গুলো আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন।

পরবর্তী আয়াতে বিষয়টিকে আরো কিছুটা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, “এ সম্ভাবনাই যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায়, সন্ধি করতে গিয়ে তাদের নিয়ত যদি ঝারাপ থাকে এবং আপনাকে যদি এভাবে ধোঁকা দিতে চায়, তবুও আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আল্লাহ তাআলাই আপনার জন্য যথেষ্ট। পূর্বেও আল্লাহর সাহায্য-সমর্থনেই আপনার ও মুমিনদের কার্যসিদ্ধি হয়েছে।” তিনি তাঁর বিশেষ সাহায্যে আপনার সহায়তা করেছেন, যা আপনার বিজয় ও কৃতকার্যতার ভিত্তি ও বাস্তব সত্য। আবার বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের ক্ষামতকে আপনার সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যা ছিল বাহ্যিক উপকরণ। সুতরাং যিনি প্রকৃত মালিক ও মহাশক্তিমান, যিনি বিজয় ও কৃতকার্যতার যাবতীয় উপকরণকে বাস্তবতায় রূপায়িত করেছেন, তিনি আজও শত্রুদের ধোঁকা-প্রতারণার ব্যাপারে আপনার সাহায্য করবেন।

وَأَنْ تُرِيدُوا أَنْ تُخِذُوا عَوْدَكُمْ وَإِنْ حَسِبَكَ اللَّهُ هُمُ الَّذِي
 أَيْدَكَ بِمَعْرُوفِهِ وَإِلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ فُلُوحُهُمْ لَوْ أَقْبَمَتْ
 مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَقْبَمَتْ بَيْنَ فُلُوحِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ
 أَكْفَىٰ بِهِمْ رِثَّةً غَيْرَ رِثَّةٍ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَسِبَكَ اللَّهُ
 مِنْ أَتْبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ
 عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَبَرُونَ يَغْلِبُوا
 وَمَاتَيْنِ ۖ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا الْكَافِرِينَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا يَا أَيُّهَا قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ
 وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ صَعْقًا ۖ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا
 وَمَاتَيْنِ ۖ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا الْقَبِيلَ بِأَذْنِ اللَّهِ وَ
 اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۖ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْرِي حَتَّى
 يَشُحْنَ فِي الْأَرْضِ ۖ يُرِيدُ أَنْ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ
 الْآخِرَةَ ۖ وَاللَّهُ غَنِيٌّ رَحِيمٌ ۖ لَوْلَا كُنْتُ مِنَ الْإِسْوَاقِ
 لَسْتُكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ كُلُّوْا مِنْ غَنَمِكُمْ
 حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(৬২) পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রতারণা করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে। (৬৩) আর ক্বীতি সফার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি তুমি সেন্সব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু যযীনের বুক রয়েছে, তাদের মনে ক্বীতি সফার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাদের মনে ক্বীতি সফার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। (৬৪) হে নবী, আপনার জন্য এক যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ্‌ যথেষ্ট। (৬৫) হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন জেহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে এক শ' লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর থেকে তার কারণ, ওরা জ্ঞানহীন। (৬৬) এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ্‌ তাআলা তোমাদের উপর এক তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিহ্ন একশ' লোক বিদ্যমান থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু' হাজারের উপর। আর আল্লাহ্‌ রয়েছে দৃঢ়চিহ্ন লোকদের সাথে। (৬৭) নবীর পক্ষে উচিত নয় কবীলগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটবে। তোমরা পার্শ্বি সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ্‌ চান আশ্চর্য। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়াল। (৬৮) যদি একটি বিষয় না হত যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ্‌ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ সে জন্য বিরট আধাব এসে পৌছাত। (৬৯) সুতরাং তোমরা খাও গমীমত হিসাবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালকা বস্ত্র অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। নিচরই আল্লাহ্‌ কামাল, মেহেরবান।

মুসলমানদের পারস্পরিক হাযী একা ও সন্তীতির প্রকৃত দৃষ্টি : এতে বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষের অন্তরে পারস্পরিক সন্তীতি সৃষ্টি করে আল্লাহ্‌ তাআলার দান। তাছাড়া এতে একথাও প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌ তাআলার না-করমানীয় মাধ্যমে তাঁর দান অর্জন করা সম্ভব এবং তাঁর দান লাভের জন্য তার আনুগত্য ও সন্তীতি অর্জনের চেষ্টা করা শর্ত।

দল বা ব্যক্তিবর্গের মাঝে একতা ও একমত্য এমন একটি বিষয় যা উপকারিতা ও প্রশংসনীয় হওয়ার ব্যাপারে কোন মতবাদের ও দাবী, কোন কোন মতবাদেই কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। সেজন্যই এমন একটি লোক, যে মানুষের সংশোধন ও সম্প্রদায় কামনা করে সে আল্লাহ্‌ পরস্পরের মাঝে একা সৃষ্টির উপর জোর দিয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্‌ পৃথিবী এ বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত নয় যে, দীর্ঘস্থায়ী ও আন্তরিক এক বাহ্যিক প্রচেষ্টার দ্বারা অর্জিত হয় না। একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তীতি ও আনুগত্যের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে। কোরআন হাদীস এই বাস্তবতার প্রতিই কয়েকটি আয়াতে ইঙ্গিত করেছে। এক আয়াত বলা হয়েছে

وَأَعِظُوا عِبِلَ اللَّهِ جَمِيعًا وَارْتَقُوا
 মতবিরোধ ও অনৈক্য থেকে বাঁচার পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে যে, সব মিলে আল্লাহর রক্ষণকে অর্থাক, কোরআন তথা ইসলামী শরীয়াতে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তাহলে সবাই আপনা থেকেই একাবদ্ধ হয়ে যাবে এবং পারস্পরিক যেসব বিরোধ রয়েছে, তা মিটে যাবে। অবশ্য অসম্পূর্ণ পার্থক্য থাকা পৃথক জিনিস, যতক্ষণ পর্যন্ত এ পার্থক্য তার সীমায় থাকে, ততক্ষণ তা বিবাদ-বিসংবাদ ও বিবেদের কারণ হতে পারে না। অগত্যা-বিবাদ তখনই হয়, যখন শরীয়ত নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘিত হয়।

আয়াতের শেষভাগে সাধারণ নীতি আকারে বলা হয়েছে :
 وَارْتَقُوا
 অর্থাক, আল্লাহ্‌ তাআলা দৃঢ়চিহ্ন লোকদের সাথে রয়েছে। এর যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বনকারীও অন্তর্ভুক্ত এবং শরীয়তের সাক্ষা হুকুম-আহকামের অনুবর্তিতায় দৃঢ়তা অবলম্বনকারীরাও শামল। তার সবার জন্যই আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তদানের ও প্রতিশ্রুতি। আর এই কোরী সন্তই প্রকৃতপক্ষে তাদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের মূল রহস্য। কারণ, এ ব্যক্তি একক ক্ষমতার অধিকারী পরওয়ারদেগারের সকলান্তে সন্ত হতে তাকে সারা বিশ্বের সমবেত শক্তিও নিজের জায়গা থেকে এক নি নাড়াতে পারে না।

..... مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ
 ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বিষয় এগুলোর তকসীর করার পূর্বে বিতর্ক। প্রামাণ্য রেওয়াজে ও হাদীসের মাধ্যমে ঘটনাটি বিবৃত করা বাঞ্ছনীয়।

ঘটনাটি হল এই যে, বদর যুদ্ধটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম জেহাদ একান্তই দৈবাৎ সংঘটিত হয়। তখনও জেহাদ সংক্রান্ত হুকুম-আহকাম কোন বিস্তারিত বিবরণ কোরআনে অবতীর্ণ হয়নি। যেমন, জেহাদ করা গিয়ে গমীমতের মাল হস্তগত হলে তা কি করতে হবে, শত্রু-সৈ নিজেদের আয়ত্তে এসে গেলে, তাকে কবী করা জায়েয হবে কিনা এ কবী করে ফেললে তাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে প্রভৃতি।

সহীহ বোখারী ও মুসলিমের রেওয়াজে বর্ণিত রয়েছে যে, হুকুম

করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। সেগুলোর মাঝে একটি যে, কাকেরদের থেকে প্রাপ্ত গনীমতের মালামাল কারো জন্য হালাল ছিল না, কিন্তু আমার উম্মতের জন্য তা হালাল করে দেয়া হয়েছে। অন্যতর মাল বিশেষভাবে এ উম্মতের জন্য হালাল হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা ছিল, কিন্তু গণ্ডগোয়ায় বদরের পূর্ব পর্যন্ত এর হালাল হওয়ার ব্যাপারে মহানবী (সাঃ)-এর উপর কোন ওহী নাযিল হয়নি। অথচ গণ্ডগোয়ায় বদরে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে ধারণা-কম্পনার বাইরে অসাধারণ বিজয় দান করেন। রক্তাক্ত বহু মালামালও ফেলে যায়, যা গনীমত হিসাবে মুসলমানদের জন্য হয় এবং তাদের বড় বড় সন্তর জন সর্দারও মুসলমানদের হাতে পড়ি হয়ে আসে। কিন্তু এতমুখ্য বিষয়ের বৈধতা সম্পর্কে কোন ওহী তখনও আসেনি।

সে কারণেই সাহাবায়ে কেরামের প্রতি এহেন ডিঙি পদক্ষেপের দরুন চর্চনা অবতীর্ণ হয়। এই ভর্ৎসনা ও অসন্তুষ্টি এই ওহীর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে মুক্কাবন্দীদের সম্পর্কে বাহ্যতঃ দুটি অধিকার মুসলমানগণকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এরই মাঝে এই ইঙ্গিতও করা হয়েছে যে, বিষয়টির দুটি দিকের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট একটি পছন্দনীয় এবং অপরটি অপছন্দনীয়। তিরমিযী, সুন্নে নাসায়ী, সহীহ ইবনে হাব্বান প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ)-এর প্রেরণাভিত্তিক উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ সময় হযরত জিব্রাইল-আমীন রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট আগমন করে তাঁকে আল্লাহর এ নির্দেশ প্রদান যে, আপনি সাহাবায়ে কেরামকে দুটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার দান করুন। তার একটি হলো এই যে, এই মুক্কাবন্দীগণকে হত্যা করে শত্রুর মনোবলকে চিরতরে ভেঙ্গে দেবে। আর দ্বিতীয়টি হলো এই যে, তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেবে। তবে দ্বিতীয় অবস্থায়, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে একথা অবধারিত হয়ে রয়েছে যে এর বদলা হিসাবে আগামী বছর মুসলমানদের এমনি সংখ্যক লোক শহীদ হবেন, যে সংখ্যক বন্দী আজ মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হবে। এভাবে যদিও ক্ষমতা দেয়া হয় এবং সাহাবায়ে কেরামকে এ দুটি থেকে একটি বেছে নেয়ার অধিকার দেয়া হয় কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় সন্তর জন সাহাবার শাহাদাতের ফয়সালার বিষয় উল্লেখ করার মাঝে অবশ্যই এই ইঙ্গিত বিদ্যমান ছিল যে, এ দিকটি আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়। কারণ, এটি যদি পছন্দই হত, তবে এর ফলে সন্তর জন মুসলমানের নু'অবধারিত হতো না।

সাহাবায়ে কেরামের সামনে এ দুটি বিষয় যখন ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পেশ করা হল যে, এদেরকে যদি মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে যতো এরা সবাই অথবা এদের কেউ কেউ কোন সময় মুসলমান হয়ে যাবে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হল জেহাদের উদ্দেশ্য ও মূল উপকারণ। দ্বিতীয়তঃ এমনও ধারণা করা হয়েছিল যে, এ সময় মুসলমানগণ যখন নিরাক্ষর দৈন্যাবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন সন্তর জনের আর্থিক মুক্তিপণ অর্জিত হলে এ কষ্টও কিছুটা লাঘব হতে পারে এবং তা ভবিষ্যতে জেহাদের প্রস্তুতির জন্যও সহায়ক হতে পারে। রহিল সন্তর জন মুসলমানের শাহাদতের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এটাও একটা বিপুল গৌরবের বিষয়। এতে ঘাবড়ানো উচিত নয়। এসব ধারণার প্রেক্ষিতে সিদ্ধীকে আকবর (রাঃ) ও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এ মতই প্রদান করলেন যে, বন্দীগণকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হোক। শুধুমাত্র

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) ও হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাঃ) প্রমুখ কয়েকজন এ মতের বিরোধিতা করলেন এবং বন্দীদের সবাইকে হত্যা করার পক্ষে মত দান করলেন। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, একান্ত সৌভাগ্যক্রমে ইসলামের মোকাবেলায় শক্তি ও সামর্থ্যের বলে যোগদানকারী সমস্ত কোরায়েশ সর্দার এখন মুসলমানদের হস্তগত হলেও পরে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি একান্তই কম্পনানির্ভর। কিন্তু ফিরে গিয়ে এরা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করবে সে ধারণাই প্রবল।

রসুল করীম (সাঃ) যিনি রাহযাতুললিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন এবং আপাদমস্তক করুণার আধার ছিলেন, তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দুটি মত লক্ষ্য করে সে মতটিই গ্রহণ করে নিলেন, যাতে বন্দীদের ব্যাপারে রহমত ও করুণা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং বন্দীদের জন্যও ছিল সহজ। অর্থাৎ, মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া। তিনি ছিদ্দীকে আকবর ও ফারুক আযম (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বললেন لَئِنْ لَمْ يَخْلَفْنَا مَا خَالَفْنَاكُمْ অর্থাৎ, তোমরা উভয়ে যদি কোন বিষয়ে একমত হয়ে যেতে, তবে আমি তোমাদের বিরোধিতা করতাম না। (মাহহারী) তাঁদের মত-বিরোধের ক্ষেত্রে বন্দীদের প্রতি সহজতা প্রদর্শন করাই ছিল সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও করুণার তাকাদ। অতএব, তাই হল। আর তারই পরিণতিতে পরবর্তী বছর খোদায়ী বাণী মোতাবেক সন্তর জন মুসলমানের শাহাদতের ঘটনা সংঘটিত হল।

رُبُّيْذُونَ عَوْصُ الدُّنْيَا আয়াতে সে সমস্ত সাহাবাকে সম্মোহন করা হয়েছে, যারা মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার রসুলকে অসংগত পরামর্শ দান করছো। কারণ, শত্রুদেরকে বশে পাওয়ার পরেও তাদের শক্তি ও দস্তকে চূর্ণ করে না দিয়ে অনিষ্টকর শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের জন্য স্থায়ী বিপদ দাঁড় করিয়ে দেয়া কোন নবীর পক্ষেই শোভন নয়।

এ আয়াতে حَتَّى يَسْتَوْفُوا فِي الْاَرْضِ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে إِثْنَانِ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কারও শক্তি ও দস্তকে ভেঙ্গে দিতে গিয়ে কঠোরতর ব্যবস্থা নেয়া। এ অর্থের তাকীদ বোঝাবার জন্য فِي الْاَرْضِ বাক্যের প্রয়োগ। এর সারার্থ হল এই যে, শত্রুর দস্তকে ধূলিস্মাৎ করে দেন।

যেসব সাহাবী মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন, তাঁদের সে মত যদিও নির্ভেজাল একটি দ্বীনী প্রেরণাও বিদ্যমান ছিল—অর্থাৎ, মুক্তি পাবার পর তাদের মুসলমান হয়ে যাবার আশা, কিন্তু সেই সাথে আত্মস্বার্থজনিত অপর একটি দিকও ছিল যে, এতে করে তাদের হাতে কিছু অর্থ-সম্পদ এসে যাবে। অথচ তখনও পর্যন্ত কোন সরাসরি 'মছ' বা খোদায়ী বাণীর মাধ্যমে সে সমস্ত মালামালের বৈধতা প্রমাণিত ছিল না। কাজেই মানুষের যে সমাজটিকে রসুল করীম (সাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে এমন মানদন্ডের গঠন করা হচ্ছিল, যাতে তাদের মর্যাদা ফেরেশতাদের চেয়েও বেশী হবে, তাদের পক্ষে গনীমতের সে মাল-সামান বা দ্রব্য সামগ্রীর আগ্রহকেও এক রকম পাশ বলে গণ্য করা হয়। তাছাড়া যে কাজে বৈধবৈধের সমন্বয় থাকে, তার সমষ্টিকে অবৈধ বলেই বিবেচনা করা হয়। সে জন্যই সাহাবায়ে কেরামের সে কাজটিকে ভর্ৎসনাযোগ্য সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে : رُبُّيْذُونَ عَوْصُ الدُّنْيَا

الانفال

১৪৬

واعلموا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ لِمَنْ فِي آيَاتِكُمْ مِنَ الرِّسَالَةِ إِنِّي كَعَلِمِ اللَّهِ فِي
 قُلُوبِهِ خَيْرًا أَتُؤَيِّدُكُمْ خَيْرًا مِنْ أَمْنٍ وَمِنْكُمْ وَتُغَيِّرُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ
 رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ يَرِيدُ أَلْبَاسًا فَتَكُنْ أَفْئِدَتُكَ أَفْئِدَةً مِنْ مَقْبُورٍ
 فَتَكُنْ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَابُوا
 وَجْهَهُمْ لِلَّهِ وَاتَّقَوْهُمْ فَسَيَبْطِلُ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 وَتَصَرَّوْا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 وَلَمْ يُهَاجِرُوا أَمَّا الَّذِينَ لَا يَتْلُوهُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا
 وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ
 بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ وَاللَّهُ مُبْصِرٌ ۝ وَالَّذِينَ
 كَفَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ الرَّافِقُونَ قُلْ عَلَى الْأَرْضِ
 وَقَسَاكُمُ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ وَإِنِ
 سَيَّلِ اللَّهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَصَرَّوْا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ
 حَقًّا لَهُمْ عَقَبَةُ وَزَرْقَةُ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ
 وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ وَأَمْعَهُمْ فَاُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
 بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(৭০) হে নবী, তাদেরকে বলে দাও, যারা তোমার হাতে বন্দী হয়ে আছে যে, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম মঙ্গলচিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (৭১) আর যদি তারা তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায়—বস্তুতঃ তারা আল্লাহর সাথেও ইতিপূর্বে প্রতারণা করেছে, অতঃপর তিনি তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ সববিষয়ে পরিজ্ঞাত, সুকৌশলী। (৭২) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ইমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্ত্রী জন ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ইমান এনেছে কিন্তু দিশত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে তাদের সহযোগী-চুস্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের যোকবেলায় নয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সেসবই দেখেন। (৭৩) আর যারা কাকের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাস-হাক্কায়া বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে। (৭৪) আর যারা ইমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরাই হলো সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রুখী। (৭৫) আর যারা ইমান এনেছে পরবর্তী পথ দিয়ে এবং ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জেহাদ করেছে, তারাও তোমাদেরই অঙ্গভূক্ত। বস্তুতঃ যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ হাবতীয় বিষয়ে সক্ষম ও অবগত।

وَأَرْثَا ۝ وَاللَّهُ يُبْدِ الْخُرُوجَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذِكْرُهُ

অর্থঃ তোমরা দুনিয়া কামনা কর। অর্থঃ তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ চান, তোমরা যেন আখেরাত কামনা কর। এখানে ভরসনা হিসাবে শুধুমাত্র তাদের সে কাজের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে যা ছিল অসম্ভবতার কারণ। বন্দীদের মুসলমান হওয়ার জন্য সংক্রান্ত দ্বিতীয় কারণটির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সাহায্যে কেরামের মত নিঃস্বার্থ, পবিত্রাত্মা দলের পক্ষে এমন দ্ব্যর্থবোধক নিয়ত করা, যাতে কিছু পার্থিব স্বার্থও নিহিত থাকে গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে ভরসনা ও সত্যকীরণের লক্ষ্যস্থল হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। যদিও রকু' করীম (সাঃ) নিজেও তাঁদের মতামত সমর্থন করে তাদের সাথে আর্থিকভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে কাজটি ছিল একান্তভাবে তাঁর রাহমাতুললিল আলামীন বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ। সে কারণেই তিনি মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সে দিকটিই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, যা বন্দীদের পক্ষে সহজ ও দয়ামিতিক।

আয়াতের শেষাংশে وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذِكْرُهُ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে

আল্লাহ তাআলা মহাপরাক্রমশীল, হেকমতওয়ালা; আপনারা যদি তাড়াহুড়া না করতেন, তবে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে পরবর্তী বিষয় আপনাদের জন্য ধন-সম্পদের ব্যবস্থাও করে দিতেন।

মাসআলা : উল্লেখিত আয়াতে মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তিদান ও গনীমতে মালামাল সংগ্রহের কারণে ভরসনা নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহর আযাবের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং পরে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এতে ভবিষ্যতে এসমস্ত ব্যাপার মুসলমানদিগকে কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে, তা পরিস্কারভাবে বোঝা যায় না। সে কারণেই পরবর্তী আয়াতে গনীমতের মালামাল সংক্রান্ত মাসআলাটি পরিস্কার করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে — قُلْ أَمْرًا ۝ অর্থাৎ, গনীমতের যে সব মালামাল তোমাদের হস্তগত হবে, এক থেকে সেগুলো তোমরা খেতে পারবে এবং ভবিষ্যতের জন্যও তা হালকা করে দেয়া হল। কিন্তু তার পরেও এতে একটি সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, গনীমতের মাল হালাল হওয়ার নির্দেশটি তো এখন হলে; কি ইতিপূর্বে যেসব মালামাল সংগ্রহ করে নেয়া হয়েছিল হয়তো সেগুলোতে কোন রকম কারাহাত বা দোষ থাকতে পারে। সেইজন্যই এর পরে هَلَالًا ۝ বলে সে সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে যে, যদি বৈধতার হুকুম নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে গনীমতের মাল সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া জায়েয ছিল না, কিন্তু এখন যখন গনীমতের মালের বৈধতা সংক্রান্ত হুকুম এসে গেছে, তখন সংগৃহীত মালামালও নির্দোষভাবেই হালাল।

মাসআলা : এখানে উসুলে ফেকাহর একটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রণিধানযোগ্য। তা হল এই যে, যখন কোন অবৈধ পদক্ষেপের পর বন্ধ কোন আয়াতের মাধ্যমে সে বিষয়টিকে হালাল করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, তখন তাতে পূর্ববর্তী পদক্ষেপের কোনই প্রভাব থাকে না; সে মালকে যথার্থভাবেই পবিত্র ও হালাল হয়ে যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গণওয়ায়ে বদরের বন্দীদিগকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। ইসলাম ও মুসলমানদের সে শত্রু যারা তাদেরকে কষ্ট দিতে, মারতে এবং হত্যা করতে কখনই কোন ত্রুটি করেনি; যখনই কোন রকম সুযোগ পেয়ে একান্ত নির্দয়ভাবে অত্যাচার-উৎপীড়ন করেছে, মুসলমানদের হাতে কী হয়ে আসার পর এহেন শত্রুদেরকে প্রাণে বাঁচিয়ে দেয়াটা সাধারণ ব্যাপার

হিল না: এটা ছিল তাদের জন্য বিরাট প্রাপ্তি এবং অসাধারণ দয়া ও কল্যাণ। পক্ষান্তরে মুক্তিপণ হিসাবে তাদের কাছ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছিল, তাও ছিল অতি সাধারণ।

এটা আল্লাহ তাআলার একান্ত মেহেরবাণী ও দয়া যে, এই সাধারণ কর পরিশোধ করতে গিয়ে যে কষ্ট তাদের করতে হয়, তাও তিনি কি সম্ভবভাবে দূর করে দিয়েছেন। উল্লেখিত আয়াতে এরশাদ হয়েছে, **وَاللَّهُ تَعَالَىٰ** তাআলা যদি তোমাদের মন-মানসিকতায় কোন রকম কল্যাণ দেখতে পান, তবে তোমাদের কাছ থেকে যা কিছু নেয়া হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম বস্তু তোমাদের দিয়ে দেবেন। তদুপর তোমাদের অতীত পাপও তিনি ক্ষমা করে দেবেন। এখানে **رُحْمًا** অর্থ ঈমান ও নিষ্ঠা। অর্থাৎ, মুক্তি লাভের পর সেসব বন্দীদের মধ্যে যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা যে মুক্তিপণ দিয়েছে, তার চাইতে অধিক ও উত্তম বস্তু দেয়া যাবে। বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেয়ার সাথে সাথে তাদেরকেও এমনভাবে অমত্ৰণ জানানো হয়েছে যে, তারা যেন মুক্তি লাভের পর নিজদের লাভ-ক্ষতির প্রতি মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করে। সুতরাং যত্নের ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তাদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছিলেন, আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ক্ষমা এবং জান্নাতে সুউচ্চ স্থান দান হৃদয় পাখির জীবনে এত অধিক পরিমাণ ধন-সম্পদ দান করেছিলেন, যা তাদের দেয়া মুক্তিপণ অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ও অধিক ছিল।

অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন যে, এ আয়াতটি মহানবী (সাঃ)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ, তিনিও কবীর যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেও মুক্তিপণ নেয়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, মক্কা থেকে তিনি যখন ফর যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন কাকের সৈন্যদের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে প্রায় সাতশ' স্বর্ণমুদ্রা সাথে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো ব্যয় করার পূর্বেই তিনি গ্রেফতার হয়ে যান।

যখন মুক্তিপণ দেয়ার সময় আসে, তখন তিনি হুযর আকরাম (সাঃ)-এর নিকট নিবেদন করলেন, আমার কাছে যে স্বর্ণ ছিল সেগুলোকেই আমার মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করা হোক। হুযর (সাঃ) কালেন, যে সম্পদ আপনি কুফরীর সাহায্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছিলেন, তা তো মুসলমানদের গণীমতের মালে পরিণত হয়ে গেছে, কিংদুইয়া বা মুক্তিপণ হতে হবে সেগুলো বাদে। সাথে সাথে তিনি একথাও বললেন যে, আপনার দুই ভাতিজা 'আকীল ইবনে-আবী তালেব এবং নওফল ইবনে হারেসের মুক্তিপণও আপনাকেই পরিশোধ করতে হবে। আব্বাস (রাঃ) নিবেদন করলেন, আমার উপর যদি এত অধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়, তবে আমাকে কোরাইশদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে হবে; আমি সম্পূর্ণভাবে ফকীর হয়ে যাব। মহানবী (সাঃ) বললেন, কেন, আপনার নিকট কি সে সম্পদগুলো নেই, যা আপনি মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আপনার স্ত্রী উম্মুল ফযলের নিকট রেখে এসেছেন? হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, আপনি সে কথা কেমন করে জানলেন? আমি যে রাত্রের অন্ধকারে একান্ত গোপনে সেগুলো আমার স্ত্রীর নিকট অর্পণ করেছিলাম এবং এ ব্যাপারে তৃতীয় কোন লোকই অবগত নয়। হুযর (সাঃ) বললেন, সে ব্যাপারে আমার পরওয়ারদেগার আমাকে বিজ্ঞিত অবহিত করেছেন। একথা শুনেই হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর মনে হুযর (সাঃ)-এর নবুওয়তের সত্যতা সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায়। তাছাড়া এর আগেও তিনি মনে মনে হুযর (সাঃ)-এর ভক্ত ছিলেন, কিন্তু কিছু সন্দেহও ছিল যা এ সময় আল্লাহ তাআলা দূর করে

দেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি তখনই মুসলমান হয়ে যান। কিন্তু তিনি বহু টাকা-কড়ি মক্কার কোরাইশদের নিকট ঋণ হিসাবে প্রাপ্য ছিল। তিনি যদি তখনই তাঁর মুসলমান হয়ে যাওয়ার ব্যাপারেই প্রকাশ্যে ঘোষণা করতেন, তবে সে টাকাগুলো মারা যেত। কাজেই তিনি তখনই তা ঘোষণা করলেন না। সুয়ং রসুল্লাহ (সাঃ)ও এ ব্যাপারে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করলেন না। মক্কা বিজয়ের পূর্বে তিনি মহানবী (সাঃ)-এর নিকট মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনাতে চলে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে মহানবী (সাঃ) তাঁকে এ পরামর্শই দিলেন, যাতে তিনি এ মুহূর্তে হিজরত না করেন।

হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর এ সমস্ত কথাপকথনের প্রেক্ষিতে রসুলে করীম (সাঃ) উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত খোদায়ী ওয়াদার বিষয়টিও তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, আপনি যদি মুসলমান হয়ে গিয়ে থাকেন এবং একান্ত নিষ্ঠাসহকারে ঈমান এনে থাকেন, তবে যেসব মালামাল আপনি মুক্তিপণ বাবদ খরচ করেছেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবেন। সুতরাং হযরত আব্বাস (রাঃ) ইসলাম প্রকাশের পর প্রায়ই বলে থাকতেন, আমি তো সে ওয়াদার বিকাশ বাস্তবতা সূচকেই প্রত্যক্ষ করছি। কারণ, আমার নিকট থেকে মুক্তিপণ বাবদ বিশ ডকিয়া সোনা নেয়া হয়েছিল। অথচ এখন আমার বিশটি গোলাম (ক্রীতদাস) বিভিন্ন স্থানে আমার ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে এবং তাদের কারো ব্যবসায়ই বিশ হাজার দেরহাম থেকে কম নয়। তদুপরি হজ্জের সময় হাজীদের পানি ষাওয়ানার খেদমতটিও আমাকেই অর্পণ করা হয়েছে যা আমার নিকট এমন এক অমূল্য বিষয় যে, সমগ্র মক্কাবাসীর যাবতীয় ধন-সম্পদও এ তুলনায় ভুছ বলে মনে হয়।

গণ্ডগায়ে বদরের বন্দীদের মধ্যে কিছু লোক মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের সম্পর্কে লোকদের মনে একটা ঝটকা ছিল যে, হয়তো এরা মক্কায় ফিরে গিয়ে আবার ইসলাম থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং পরে আমাদের কোন না কোন ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত হবে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ ঝটকাটি এভাবে দূর করে দিয়েছেন:

وَلَا يُرِيدُ الْإِسْلَامَ فَكَذَّبُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمَّا اللَّهُ فَمَا كَانَ مِنْهُمْ

عَلِيمٌ خَبِيرٌ

অর্থাৎ, যদি আপনার সাথে ষেখানত করার সংকল্পই তারা করে, তবে তাতে আপনার কোন ক্ষতিই সাধিত হবে না। এরা তো সেসব লোকই, যারা ইতিপূর্বে আল্লাহর সাথেও ষেখানত করেছে। অর্থাৎ, সৃষ্টিলিপ্সে আল্লাহ তাআলার রাব্বুল আলামীন তথা বিশৃপালক হওয়ার ব্যাপারে যে অস্বীকার তারা করেছিল, পরবর্তীকালে তার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তাদের এই ষেখানত তাদের নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা অপদস্ত, পদদলিত, লাল্হিত ও বন্দী হয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ তাআলা মনের গোপনতম রহস্য সম্পর্কেও অবহিত রয়েছেন। তিনি বড়ই সুকৌশলী, হেকমতগুয়াল। এখনও যদি তারা আপনার বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়, তবে আল্লাহর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে যাঁবোটা কোথায়? তিনি এমনভাবে তাদেরকে পুনরায় গ্রেফতার করে ফেলবেন। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদেরকে একান্ত উৎসাহবাঞ্ছক ভঙ্গিতে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল। আর আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের পার্শ্ব ও পারত্রিক কল্যাণ শুধুমাত্র ইসলাম ও ঈমানের উপরই নির্ভরশীল।

এ পর্যন্ত কাকেরদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ, তাদের কবীদশা ও মুক্তিদান এবং তাদের সাথে সন্ধি-সমঝোতার বিধান সংক্রান্ত আলোচনা চলছিল। পরবর্তী আয়াতসমূহে অর্থাৎ, সূরার শেষ পর্যন্ত এ প্রসঙ্গেই এক বিশেষ অধ্যায়ের আলোচনা ও তার বিধি-বিধান সংক্রান্ত কিছু বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে। আর সেগুলো হচ্ছে হিজরত সংক্রান্ত হুকুম-আহকাম। কারণ, কাকেরদের সাথে মোকাবেলা করতে গিয়ে এমন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হতে পারে যে, মুসলমানদের হয়তো তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না এবং তারাও সন্ধি করতে রাজী হবে না। এহেন নান্যুৎ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পরিগ্রহ লাভের একমাত্র পথ হল হিজরত। অর্থাৎ, এ নগরী বা দেশ অন্য কোন নগরী বা জনপদে গিয়ে বসতি স্থাপন করা, যেখানে স্বাধীনভাবে ইসলামী হুকুম-আহকামের উপর আমল করা যাবে।

সূরা আনফালের শেষ চারিটি আয়াতে সে সমস্ত আহকাম বর্ণনাই প্রকৃত ও মূল উদ্দেশ্য যা মুসলমান মুহাজ্জেরদের উত্তরাধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে অমুহাজ্জের মুসলমানও অমুসমানদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আলোচনাও এসে গেছে।

এসব বিধি-বিধান বা হুকুম-আহকামের সারমর্ম এই যে, যে সমস্ত লোকের উপর শরীয়তের বিধি-বিধান বতায় তারা প্রথমতঃ দু'ভাগে বিভক্ত; মুসলমান ও কাকের। আবার মুসলমান তখনকার দৃষ্টিতে দু'রকম; (১) মুহাজ্জের; যারা হিয়রত করয় হওয়ার প্রেক্ষিতে মক্কা থেকে মদীনায় এসে অবস্থান করতে থাকেন। (২) যারা কোন বৈধ অসুবিধার দরুন কিংবা অন্য কোন কারণে মক্কাতেই থেকে যান।

পারম্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক এ সবরকম লোকদের মাঝেই বিদ্যমান ছিল। কারণ, ইসলামের প্রাথমিক পূর্বে এমন হয়েছিল যে, পুত্র হয়তো মুসলমান হয়ে গেলেন কিন্তু পিতা কাকেরই রয়ে গেল, কিংবা পিতা মুসলমান হয়ে গেলেন কিন্তু পুত্র রয়ে গেল কাকের। তেমনিভাবে ভাই ভতিজা ভাছতে, নানা-মামা প্রভৃতির অবস্থাও ছিল তাই। তদুপরি মুহাজ্জের-অমুহাজ্জের মুসলমানদের মধ্যে আত্মীয়তা থাকা তো বলাইবাহুল্য।

আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম রহমত ও পরম কুশলতার দরুন মৃত ব্যক্তিদের পরিত্যক্ত মাল-আসবাব তথা ধন-সম্পদের অধিকারী তারই নিকটবর্তী ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনকে সাব্যস্ত করেছেন। অথচ যে যা কিছু এ পৃথিবীতে অর্জন করেছেন, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত কিছুই মালিকানাই আল্লাহ তাআলার। তাঁর পক্ষ থেকে এগুলো সারা জীবন ব্যবহার করার জন্য, এগুলোর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য মানুষকে অস্থায়ী মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং মানুষের মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সব কিছু আল্লাহ তাআলার অধিকারে চলিয়া যাওয়াটাই ছিল ন্যায় বিচার ও যুক্তিসম্মত। যার কার্যকররূপ ছিল ইসলামী বায়তুল মাল তথা সরকারী কোষাগারে জমা হয়ে যাওয়ার পর তদ্বারা সমগ্র সৃষ্টির লালন-পালন ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু এমনটি করতে গেলে একদিকে মানুষের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক অনুভূতি আহত হত। তাছাড়া মানুষ যখন একথা জানত যে, মৃত্যুর পর আমার ধন-সম্পদ না পাবে আমার সন্তান-সন্ততি, না পাবে আমার পিতা-মাতা, আর নাহিবা পাবে আমার স্ত্রী, তখন তার ফল দাঁড়াই এই যে, স্বভাবসিদ্ধভাবে কোন মানুষই স্বীয় মালামাল ও ধন-সম্পদ বৃদ্ধি কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা করত না। শুধুমাত্র নিজের জীবন পর্যন্তই প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করত। তার বেশী কিছু করার জন্য কেউ এতটুকু যত্নবান হত না। বলাবাহুল্য,

এতে সমগ্র মানবজাতি ও সমস্ত শহর-নগরীর উপর ধ্বংস ও বরবাদী নেমে আসত।

সে কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার আত্মীয় স্বজনের অধিকার বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। বিশেষ করে এমন আত্মীয়-স্বজনের উপকারিতার লক্ষ্যে সে তার জীবনে ধন-সম্পদ অর্জন ও সঞ্চয় করত এবং নানা রকম কষ্ট পরিশ্রমে ব্রতী হত।

এরই সাথে সাথে ইসলাম যে অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যটির প্রতি মীরাসের বন্টন ব্যাপার লক্ষ্য রেখেছে, যার জন্য গোটা মানব জাতির সৃষ্টি অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও এবাদত। এদিক দিয়ে সমগ্র মানবিশুকে দু'টি পৃথক পৃথক জাতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে; মুমিন ও কাকের। কোরআনে উল্লেখিত এ আয়াত **فَإِنَّكُمْ كَوْمًا فَرَقْتُمُوهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَتَرَفَعُونَ صُنُوفَهُمْ** এর মর্মও তাই।

এই দ্বি-বিধ জাতীয়তার দর্শনই বংশ ও গোত্রগত সম্পর্কে মীরাসে পর্যায় পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। সুতরাং কোন মুসলমান কোন কাকের আত্মীয়ের মীরাসের কোন অংশ পাবে না এবং কোন কাকেরেরও জ্ঞান কোন মুসলমান আত্মীয়ের মীরাসে কোন অধিকার থাকবে না। প্রত্যেক দু'টি আয়াতে এ বিষয়েরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ এ নির্দেশ চিরস্থায়ী ও অরহিত। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে কোরআন পর্যন্ত ইসলামের এ উত্তরাধিকার নীতিই বলবৎ থাকবে।

এর সাথে মুসলমান মুহাজ্জের ও আনসারদের মীরাস সংক্রান্ত জ্ঞান একটি হুকুম রয়েছে, যার সম্পর্কে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, মুসলমানগণ যতক্ষণ মক্কা থেকে হিজরত না করবে, হিজরতকারী মুসলমানদের সাথে তাদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন থাকবে। না কোন মুহাজ্জের মুসলমান তার অমুহাজ্জের মুসলমান আত্মীয় উত্তরাধিকারী হবে, না অমুহাজ্জের কোন মুসলমান মুহাজ্জের মুসলমান মীরাসের কোন অংশ পাবে। বলাবাহুল্য, এ নির্দেশটি তখন পর্যন্ত কার্যকর ছিল যতক্ষণ না মক্কা বিজয় হয়ে যায়। কারণ, মক্কা বিজয়ের পর স্বয়ং রসূল করীম (সাঃ) ঘোষণা করে দেন, **لَا مِيرَاةَ بَعْدَ الْفَتْحِ** অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের হুকুমটিই শেষ হয়ে গেছে। আর হিজরত হুকুমই যখন শেষ হয়ে গেল, তখন যারা হিজরত করবে না, তাদের সার্ব সম্পর্কচ্ছেদের প্রশ্নটিও শেষ হয়ে যায়।

এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন, এ হুকুমটি মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে অনুসন্ধানবিদদের মতে এ হুকুমটি চিরস্থায়ী ও গায়েব মনসুখ, কিন্তু এটি অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে। যে পরিস্থিতিতে কোরআনের অবতরণকালে এ হুকুমটি নালি হয়েছিল, যদি কোন কালে কোন দেশে এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হত তাহলে সেখানেও এ হুকুমই প্রবর্তিত হবে।

বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে গেলে এই দাঁড়াই যে, মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর হিজরত করা 'ফরযে আইন' অর্থাৎ অপরিহার্য কর্তব্য হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। এ নির্দেশ পালন করে গিয়ে হাতে গণ্য কতিপয় মুসলমান ছাড়া বাকী সব মুসলমানই হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছিলেন। তখন মক্কা থেকে হিজরত না করা এক লক্ষ্য হয়ে গিয়েছিল যে, সে মুসলমান নয়। কাজেই অমুহাজ্জের মুসলমানও তখন সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিল। সেজন্যই মুহাজ্জের-অমুহাজ্জের উত্তরাধিকার স্বত্ব ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল।

এখন যদি কোন দেশে আবারও এমনি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেখানে কবলন করে যদি ইসলামী ফরায়েয সম্পাদন করা আদৌ সম্ভব না হয়, তবে সে দেশ থেকে হিজরত করা পুনরায় ফরয হয়ে যাবে। আর এমন পরিস্থিতিতে অতি জটিল কোন ওযর ব্যতীত হিজরত না করা নিষিদ্ধভাবে যদি কুফরীর লক্ষণ বলে গণ্য হয়, তবে আবারও এ হুকুমই প্রেরণিত হবে। মুহাজ্জের ও অমুহাজ্জেরের মাঝে পারস্পরিক উত্তরাধিকার স্বত্ব বজায় থাকবে না। এ বর্ণনাতে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুহাজ্জের ও অমুহাজ্জেরদের মাঝে মীরাসী স্বত্ব রহিতকরণের হুকুমটি প্রকৃতপক্ষে পৃথক কোন হুকুম নয়, বরং এটিও সে প্রাথমিক নির্দেশ, যা মুসলমান ও অমুসলমানের মাঝে উত্তরাধিকার স্বত্বকে ছিন্ন করে দেয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এই কুফরীর লক্ষণের প্রেক্ষিতে তাকে কাকের বলে সাব্যস্ত করা হয়নি, যতক্ষণ না তার মধ্যে প্রকৃষ্ট ও স্পষ্টভাবে কুফরীর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

আর হয়তো এ যুক্তিতেই এখানে আরেকটি নির্দেশ অমুহাজ্জের মুসলমানদের কথা উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তারা মুহাজ্জের মুসলমানদের নিকট কোন রকম সাহায্য-সহায়তা কামনা করে, তবে মুহাজ্জের মুসলমানদের জন্য তাদের সাহায্য করা কর্তব্য; যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, অমুহাজ্জের মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণভাবে কাকেরদের কাতারে গণ্য করা হয়নি, বরং তাদের এই ইসলামী অধিকার এখনও বলবৎ রয়ে গেছে যে, সাহায্য কামনা করলে তারা সাহায্য পেতে পারে।

আর যেহেতু এ আয়াতের শানে-নুযূল মক্কা থেকে মদীনায বিশেষ হিজরতের সাথে যুক্ত এবং তারাই অমুহাজ্জের মুসলমান ছিলেন, যারা মক্কায অবস্থান করেছিলেন এবং কাকেরদের উৎপীড়নের সম্পৃক ছিলেন, কাজেই তাঁদের সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টি যে একান্তই মক্কার কাকেরদের বিরুদ্ধে ছিল, তা বলাইবাখ্য। আর কোরআন করীম যখন মুহাজ্জের মুসলমানদের প্রতি তাদের (অমুহাজ্জের) মক্কাবাসী মুসলমানদের সাহায্যের নির্দেশ দান করেছে, তাতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে একথাই বোঝা যায় যে, যে কোন অবস্থায়, যে কোন জাতির মোকাবেলায় তাঁদের সাহায্য করা মুসলমানদের উপর অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। এমনকি যে জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করা হবে তাদের সাথে যদি মুসলমানদের কোন যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়েও থাকে তবুও তাই করতে হবে, অথচ ইসলামী নীতিতে ন্যায়নীতি ও চুক্তির অনুবর্তিতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। সে কারণেই এ আয়াতে একটি ব্যতিক্রমী নির্দেশও উল্লেখ করা হয়েছে যে, অমুহাজ্জের মুসলমান যদি মুহাজ্জের মুসলমানের নিকট এমন কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে মুসলমানরা যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছে, তবে চুক্তিবদ্ধ কাকেরদের মোকাবেলায় নিজেদের মুসলমান ভাইদের সাহায্য করাও জায়েয নয়।

এই ছিল প্রথম দু'টি আয়াতের সৎক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু। এবার বাক্যের সাথে জুলনা করে দেখা যাক। এরশাদ হচ্ছে—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ بِرِئَاسَۃٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ بِرِئَاسَۃٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ بِرِئَاسَۃٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ

অর্থ— যে সমস্ত লোক যারা ইমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের প্রিয় জনাভূমি ও আত্মীয়-আপনজনদের পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান-মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, সম্পদ ব্যয় করে যুদ্ধের জন্য ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছে এবং যুদ্ধের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে; অর্থাৎ, প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজ্জেরবৃন্দ এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে; অর্থাৎ, মদীনার আনসার মুসলমানগণ—এতদুভয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পরস্পরের ওলী বা সহায়ক। অতঃপর বলা হয়েছে, সেসব লোক যারা ইমান এনেছে বটে কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করবে।

এখানে কোরআন করীম **وَالْيَتِ** ও **وَالْيَتِ** শব্দ ব্যবহার করেছে, যার প্রকৃত অর্থ হল বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত হাসান কাতাদাহ ও মুজাহিদ (রাঃ) প্রমুখ তফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের মতে এখানে **وَالْيَتِ** অর্থ উত্তরাধিকার এবং অর্থ **وَالْيَتِ** উত্তরাধিকারী। আর কেউ কেউ এখানে এর আভিধানিক অর্থ বন্ধুত্ব ও সাহায্য সহায়তাও নিয়েছেন।

প্রথম তফসীর অনুসারে আয়াতের মর্ম এই যে, মুসলমান মুহাজ্জের ও আনসার পারস্পরিকভাবে একে অপরের ওয়ারিস হবেন। তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক না থাকবে অমুসলমানদের সাথে আর নাইবা থাকবে সে সমস্ত মুসলমানের সাথে যারা হিজরত করেননি। প্রথম নির্দেশ অর্থাৎ দ্বিতীয় পার্থক্য তথা ধর্মীয় বৈপরিত্যের ভিত্তিতে উত্তরাধিকারের ছিন্নতার বিষয়টি তো চিরস্থায়ী আছেই, বাকী থাকল দ্বিতীয় হুকুমটি। মক্কা বিজয়ের পর যখন হিজরতেরই প্রয়োজন থাকেনি। তখন মুহাজ্জের ও অমুহাজ্জেরের উত্তরাধিকারের বিচ্ছিন্নতার হুকুমটিও আর বলবৎ থাকেনি। এর দ্বারা কোন কোন ফেকাহবিদ প্রমাণ করেছেন যে, দ্বীনের পার্থক্য যেমন উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ তেমনিভাবে দেশের পার্থক্যও উত্তরাধিকার ছিন্ন হওয়ার কারণ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা ফেকাহর কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

অতঃপর এরশাদ হয়েছে—

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ بِرِئَاسَۃٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآلَهُمْ بِرِئَاسَۃٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ

অর্থাৎ, এসব লোক হিজরত করেনি যদিও তাদের উত্তরাধিকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু যে কোন অবস্থায় তারাও মুসলমান। যদি তারা নিজেদের দ্বীনের হেফাযতের জন্য মুসলমানদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে তাঁদের সাহায্য করা তাঁদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলে ন্যায় ও ইনসাফের অনুবর্তিতার নীতিকে বিসর্জন দেয়া যাবে না। তারা যদি এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ নয় চুক্তি সম্পাদিত হয়ে গেছে, তবে সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে সেসব মুসলমানের সাহায্য করা জায়েয নয়।

হুদাযবিয়ার সন্ধিকালে এমন ঘটনা ঘটেছিল। রসূল করীম (সাঃ) যখন মক্কার কাকেরদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন এবং চুক্তির শর্তে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে যে, এখন মক্কা থেকে যে ব্যক্তি মদীনায় চলে

যাবে হযর (সাঃ) তাকে ফিরিয়ে দেবেন। ঠিক এই সজ্জা চুক্তিকালেই আবু-জান্দাল (রাঃ) যাকে কাফেররা মক্কায় বন্দী করে রেখেছিল এবং নানাভাবে নির্যাতন করছিল কোন রকমে মহানবীর খেদমতে গিয়ে হাজির হলেন এবং নিজের উৎপীড়নের কাহিনী প্রকাশ করে রসুলুল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলেন। যে নবী সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হয়ে আগমন করেছিলেন, একজন নিপীড়িত মুসলমানের ফরিয়াদ শুনে তিনি কি পরিমাণ মর্মাহত হয়েছিলেন, তার অনুমান করাও যার তার জন্য সম্ভব নয়, কিন্তু এহেন মর্মপিড়া সত্ত্বেও উল্লেখিত আয়াতে হুকুম অনুসারে তিনি তাঁর সাহায্যের ব্যাপারে অপারকতা জানিয়ে ফিরিয়ে দেন।

তাঁর এভাবে ফিরে যাওয়ার বিষয়টি সমস্ত মুসলমানের জন্যই একান্ত গীড়াদায়ক ছিল, কিন্তু সরওয়ারে কায়েনাত (সাঃ) খোদায়ী নির্দেশের আলোকে যেন প্রত্যক্ষ করছিলেন যে, এখন আর এ নির্যাতন-নিপীড়নের আয়ু বেশী দিন নেই। তাছাড়া আর ক'টি দিন বৈরখারশের সওয়াবও আবু-জান্দানের প্রাপ্য রয়েছে। এর পরেই মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এসব কাহিনীর সমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে। যাহোক, তখন মহানবী (সাঃ) কোরআনী নির্দেশ মোতাবেক চুক্তির অনুবর্তিতাকেই তাঁর ব্যক্তিগত বিপদাপদের উপর গুরুত্বদান করেছিলেন। এটাই হল ইসলামী শরীয়তের সেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, যার ফলে তাঁরা পার্থিব জীবনে বিজয় ও সম্মান এবং আখেরাতের কল্যাণ ও মুক্তির অধিকারী হতে পেরেছেন। অন্যথায় সাধারণভাবে দেখা যায়, পৃথিবীর সরকারসমূহ চুক্তির নামে এক ধরনের প্রহসনের অবতারণা করে থাকে, যাতে দুর্বলকে দাবিয়ে রাখা এবং সবলকে ফাঁকি দেয়াই থাকে উদ্দেশ্য। যখন নিজেদের সামান্যতম স্বার্থ দেখতে পায়, তখনই নানা রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে দেয়া হয় এবং দোষ অন্যের উপর চাপানোর—ফন্দি-ফিকির করতে থাকে।

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে— **وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ فَيَمْكُرُونَ لَوَ كَانُوا يَفْقَهُونَ**

অর্থাৎ, কাফেররা পরস্পর একে অপরের বন্ধু। **وَالَّذِينَ كَفَرُوا** শব্দটি যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, একটি সাধারণ ও ব্যাপকার্থক শব্দ। এতে যেমন ওরাসাত বা উত্তরাধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত, তেমনিভাবে অন্তর্ভুক্ত বৈয়য়িক সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতার বিষয়ও। কাজেই এ আয়াতের দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেরদিগকে পারস্পরিক উত্তরাধিকারী মনে করতে হবে এবং উত্তরাধিকার বন্টনের যে আইন তাদের নিজেদের ধর্মে প্রচলিত রয়েছে, তাদের উত্তরাধিকারের বেলায় সে আইনই প্রয়োগ করা হবে। তদুপরি তাদের এতীম-অনাথ শিশুদের ওলী এবং বিবাহ-শাদীর অভিভাবক তাদেরই মধ্য থেকে নির্ধারিত হবে। সারকথা, সামাজিক বিষয়াদিতে অমুসলমানদের নিজস্ব আইন-কানুন ইসলামী রাষ্ট্রের সংরক্ষিত রাখা হবে।

আয়াতের শেষভাবে এরশাদ হয়েছে **أَلَمْ تَرَ أَنَّكَ إِذَا فَرَّسْتَهُ لَمْ يَخْرُجْ سِتْرًا**

অর্থাৎ, তোমরা যদি এমনটি না কর, তাহলে গোটা পৃথিবীতে ফেৎনা-ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে।

এ বাক্যটি সে সমস্ত হুকুম-আহকামের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, মুহাজেরীন ও আনসারগণকে একে অপরের অভিভাবক হতে হবে—যাতে পারস্পরিক সাহায্য-সহায়তা এবং ওরাসাত তথা উত্তরাধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়তঃ এখানকার মুহাজেরীন ও অমুহাজেরীন মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক

উত্তরাধিকারের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু সাহায্য-সহায়তার সম্পর্ক তার শর্ত মোতাবেক বলবৎ থাকা উচিত। তৃতীয়তঃ কাফেরগণ একে অন্যের ওলী বিধায় পারস্পরিক অভিভাবক ও তাদের উত্তরাধিকার আইনের ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা মুসলমানদের জন্য সমীচীন নয়। বস্তুতঃ এ সমস্ত নির্দেশের উপর কী আমল করা না হয়, তাহলে পৃথিবীতে গোলাযোগ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়বে। সম্ভবতঃ এ ধরনের সতর্কতা এ কারণে উচ্চারিত হয়েছে যে, এখানে যেসব হুকুম-আহকাম বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো ন্যায়, সুবিচার ও সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলার মূলনীতি স্বরূপ। কারণ, এসব আয়াতের মূল সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে গেছে যে, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পর্ক যেমন আত্মীয়তার উপর নির্ভরশীল, তেমনিভাবে এক্ষেত্রে ধর্মীয় ও মতাদর্শগত সম্পর্কও বংশগত সম্পর্কে চেয়ে অগ্রবর্তী। সেজন্যই বংশগত সম্পর্কের দিক দিয়ে পিতা-পুত্র কিংবা ভাই-ভাই হওয়া সত্ত্বেও কোন কাফের কোন মুসলমানের এবং কোন মুসলমান কোন কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। এরই সঙ্গে সার্ব ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মূর্থতা জনোচিত বিদ্বেষের প্রতিরোধকল্পে এই হেদায়েতও দেয়া হয়েছে যে, ধর্মীয় সম্পর্ক এহেন সুদৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও চুক্তির অনুবর্তিতা তার চেয়েও বেশী অগ্রাধিকারযোগ্য। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উত্তেজনাবশে সম্পাদিত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েয নয়। এমনিভাবে এই হেদায়েতও দেয়া হয়েছে যে, কাফের একে অপরের উত্তরাধিকারী ও অভিভাবক। তাদের ব্যক্তিগত অধিকার ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যেন কোন রকম হস্তক্ষেপ করা না হয়। দৃষ্টান্ত এগুলোকে কতিপয় আনুযয়িক ও শাখাগত বিধান বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশৃঙ্খলার জন্য এগুলোই ন্যায় ও সুবিচারের সর্বোত্তম ও ব্যাপক মূলনীতি। আর সে কারণেই এখানে এসব আহকাম ও বিধি-বিধান বর্ণনার পর এমন কাঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যা সাধারণতঃ অন্যান্য আহকামের ক্ষেত্রে করা হয়নি। তা হল এই যে, তোমরা যদি এসব আহকামের উপর আমল না কর, তবে বিশ্ববিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিশ্বার লাভ করবে। বাক্যটিতে এ ইঙ্গিত বিদ্যমান যে, দাঙ্গা-বিশৃঙ্খলা রোধে এসব বিধি-বিধানের বিশেষ প্রভাব অবদান রয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবায়ে কোরাম এর তাদের সাহায্যকারী মদীনাবাসী আনসারদের প্রশংসা, তাঁদের সত্যিকার মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য ও তাঁদের মাগফেরাত ও সম্মানজনক উপার্জন দানের ওয়াদার কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে **لَا يَرْجِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْكَاذِبُ** অর্থাৎ, তারাই হচ্ছেন সত্যিকারভাবে মুসলমান। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা হিজরত করতে পারেননি যদিও তাঁরা মুসলমান, কিন্তু তাদের ইসলাম পরিপূর্ণ নয় এবং নিশ্চিতও নয়। কারণ, তাতে এমন সন্দেশ রয়েছে যে, হয়তোবা তারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফেক হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামে দাবী করছে। তারপরেই বলা হয়েছে **لَا يَرْجِيَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْكَاذِبُ** অর্থাৎ, তাঁদের জন্য মাগফেরাত নির্ধারিত। যেমন, বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে **يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ مَكَانُ الْكَاذِبِ مَكَانَ الْبَاطِلِ** অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ যেমন তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনিভাবে হিজরত তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়।

চতুর্থ আয়াতে মুহাজেরীনদের বিভিন্ন শ্রেণীর নির্দেশাবলী বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, যদিও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছেন প্রার্থিত

করিমের মুহাজের, যারা হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির পূর্বে হিজরত করেছেন কেউ কেউ রয়েছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের মুহাজের, যারা হুদায়বিয়ার হিজরত করেছেন। এর ফলে তাঁদের পরকালীন মর্যাদায় পার্থক্য হলেও পার্শ্ব বিধান মতে তাঁদের অবস্থা প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজেরীদেরই অনুরূপ। তাঁরা সবাই পরস্পরের ওয়ারিস তথা উত্তরাধিকারী হবেন। সুতরাং মুহাজেরীনগণকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে - **وَأُولُو الْأَرْحَامِ** অর্থাৎ, দ্বিতীয় পর্যায়ের এই মুহাজেরীনরাও তোমাদেরই অনুরূপ। সে কারণেই উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিতেও তাদের হুকুম মুহাজেরীদেরই মত।

এটি সূরা আনফালের সর্বশেষ আয়াত। এর শেষাংশে উত্তরাধিকার আইনের একটি ব্যাপক মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এরই মাধ্যমে সেই সাময়িক বিধানটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে, যেটি হিজরতের প্রথম পর্বের মুহাজের ও আনসারদের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃ বন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে একে অপরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে নাথিল হয়েছিল। বলা হয়েছে—

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

আরবী অভিধানে **أولوا** শব্দটি “সাধী” অর্থে ব্যবহৃত হয়। যার বাংলা হল ‘সম্পন্ন’। যেমন **أولوا العقل** বুদ্ধিসম্পন্ন। **أولوا الامر** দায়িত্ব-সম্পন্ন। কাজেই **وَأُولُو الْأَرْحَامِ** অর্থ হয় গর্ভ-সাধী, একই গর্ভসম্পন্ন। **رحم** শব্দের বহুবচন। এর প্রকৃত অর্থ হল সে অঙ্গ যাতে সন্তানের জন্মক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আর যেহেতু আত্মীয়তার সম্পর্ক গর্ভের অঙ্গীদায়িত্বের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়, কাজেই **وَأُولُو الْأَرْحَامِ** আত্মীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বস্তুতঃ আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যদিও পারস্পরিকভাবে একে অপরের উপর প্রত্যেক মুসলমানই একটি সাধারণ অধিকার সংরক্ষণ করে এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একের প্রতি অন্যের সাহায্য করা ওয়াজেব হয়ে দাঁড়ায় এবং একে অন্যের উত্তরাধিকারীও হয় কিন্তু যেসব মুসলমানের মাঝে পারস্পরিক আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক বিদ্যমান, তারা অন্যান্য মুসলমানের তুলনায় অগ্রবর্তী। এখানে **وَأُولُو الْأَرْحَامِ** অর্থ **أولوا** অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা এক বিশেষ নির্দেশ বলে এ বিধান জারি করেছেন।

এ আয়াত এই মূলনীতি বাতলে দিয়েছে যে, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি আত্মীয়তার মান অনুসারে বন্টন করা কর্তব্য। আর **وَأُولُو الْأَرْحَامِ** সাধারণভাবে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন অর্থেই বলা হয়। তাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের অংশ স্বয়ং কোরআন করীম সূরা নিসায় নির্ধারিত করে দিয়েছে। মীরাস শাস্ত্রের পরিভাষায় এদেরকে বলা হয় ‘আহলে কারায়েয’ বা ‘যাবিল ফুরূয’। এদেরকে দেয়ার পর যে সম্পদ উদ্বৃত্ত হবে তা আয়াত দৃষ্টে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করা কর্তব্য।

তাছাড়া এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট যে, সমস্ত আত্মীয়ের মধ্যে কোন সম্পত্তি বন্টন করে দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ, দূরবর্তী আত্মীয়তা যে সমগ্র বিশৃঙ্খলার মাঝেই বর্তমান, তাতে কোন রকম সন্দেহ-সংশয়েরই অবকাশ নেই। সারা পৃথিবীর মানুষ একই পিতা-মাতা, আদম ও হাওয়ার বংশধর। কাজেই নিকটবর্তী আত্মীয়দিগকে দূরবর্তীর উপর অগ্রাধিকার দেয়া এবং নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করাই আত্মীয়দের মধ্যে মীরাস বন্টনের কার্যকর ও বাস্তবরূপ হতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ রসূলে করীম (সাঃ)—এর হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ‘যাবিল ফুরূয’র অংশ দিয়ে দেয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা মৃত ব্যক্তির ‘আসাবাগণ’ অর্থাৎ, পিতামহ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে দেয়া হবে। অর্থাৎ, নিকটবর্তী আসাবাকে দূরবর্তী আসাবা অপেক্ষা অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিকটবর্তী আসাবার বর্তমানে দূরবর্তীকে বঞ্চিত করা হবে। আর ‘আসাবা’ এর মধ্যে আর কেউ জীবিত না থাকলে অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বন্টন করা হবে।

আসাবা ছাড়াও অন্যান্য যেসব লোক আত্মীয় হতে পারে, ফরায়য শাস্ত্রের পরিভাষায় তাদের বোঝাবার জন্য ‘যাবিল আরহাম’ শব্দ নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই পরিভাষাটি পরবর্তীকালে নির্ধারিত হয়েছে। কোরআনে করীমে বর্ণিত **وَأُولُو الْأَرْحَامِ** শব্দটি কিন্তু আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী সমস্ত আত্মীয়-স্বজনের ক্ষেত্রেই ব্যাপক। এতে যাবিল ফুরূয, আসাবা এবং যাবিল আরহাম সবাই মোটামুটিভাবে অন্তর্ভুক্ত।

তদুপরি এর কিছু বিস্তারিত বিশ্লেষণ সূরা নিসার বিভিন্ন আয়াতে দেয়া হয়েছে। তাতে বিশেষ বিশেষ আত্মীয়ের প্রাপ্য অংশ আল্লাহ্ তাআলা নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাদেরকে মীরাস শাস্ত্রের পরিভাষায় ‘যাবিল ফুরূয’ বলা হয়। এছাড়া অন্যান্যদের সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন—

أَحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

অর্থাৎ, যাদের অংশ স্বয়ং কোরআন নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা তাদেরকেই দিতে হবে যারা মৃতের ঘনিষ্ঠতম পুরুষ।

এদেরকে মীরাসের পরিভাষায় ‘আছাবা’ (عصبا) বলা হয়। যদি কোন মৃত ব্যক্তির আসাবাদের কেউ বর্তমান না থাকে, রসূলে করীম (সাঃ)—এর কথা অনুযায়ী তবেই মৃতের সম্পত্তির অংশ তাদেরকে দিতে হবে। এদেরকে বলা হয় ‘যাবিল আরহাম’ যেমন, মামা, খালা প্রভৃতি।

সূরা আনফালের শেষ আয়াতের সর্বশেষ বাক্যটির দ্বারা ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের সে ধারাটি বাতিল করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে বর্ণিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যার ভিত্তিতে মুহাজেরীন ও আনসারগণ আত্মীয়তার কোন বন্ধন না থাকলেও পরস্পরের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ হুকুমটি ছিল একটি সাময়িক হুকুম যা হিজরতের প্রাথমিক পর্যায়ে দেয়া ছিল।

সূরা আল-আনফাল সমাপ্ত

وَرَدَةُ الْيَتِيمِ إِتْمَانًا وَنُفُوسًا
سِتِينَ مِائَةً وَتِسْعَ عَشْرَةَ يَتِيمًا كَرِيمًا

١
بِرَأْيِهِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ

وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى

التَّاسِ يَوْمَ الْحِجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ

رسوله فان تبدم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم

عَلَىٰ جُزْءٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۚ ذَٰلِكُمْ كَيْفَ تَقْدِرُونَ ۚ

نُظَاهِرُ وَعَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَتْهُمُ اللَّهُمَّ عَهْدُهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ^ط

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾ فَاذْأَسْلَخُوا الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ وَاقْتُلُوا

الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُهُمْ وَخَذُوهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ

وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ

اتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٠ وَإِنْ

أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجَرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ

اللَّهُ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا أَمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

সূরা আত্-তাওবাহ

মদীনায়া অবতীর্ণ : আয়াত ১২৯

(১) সম্পর্কচ্ছেদ করা হল আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে সেই মুশরিকদের সাথে, যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। (২) অতঃপর তোমরা পরিব্রজন কর এ দেশে চার মাসকাল। আর জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহকে পরাভূত করতে পারবে না, আর নিষ্কিয় আল্লাহ কাফেরদিগকে লালিত করে থাকেন। (৩) আর মহান হস্তের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের পক্ষ থেকে লোকদের প্রতি ঘোষণা করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ মুশরেকদের থেকে দারিত্ব মুক্ত এবং তাঁর রসুলও। অবশ্য যদি তোমরা তওবা কর, তবে তা, তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, আর যদি মুখ ফেরাও, তবে জেনে রেখো, আল্লাহকে তোমরা পরাভূত করতে পারবে না। আর কাফেরদেরকে মর্যাদিক শাস্তির সুসংবাদ দাও। (৪) তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, অতঃপর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোন কটটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্যও করেনি, তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের দেয়া মেয়াদ পর্যন্ত পূরণ কর। অবশ্যই আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন। (৫) অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ধাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়ম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) আর মুশরিকদের কেউ যদি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর কলাম শুনেতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাস্রদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এজন্যে যে এরা জ্ঞান রাখে না।

সূরা আত্-তাওবাহ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখান থেকে সূরা বরাআতের শুরু। একে সূরা 'তওবাও' বলা হয়। বরাআত বলা হয় এ জন্য যে, এতে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্তির উল্লেখ রয়েছে। আর 'তওবা' বলা হয় এজন্য যে, এতে মুসলমানদের তওবা কবুল হওয়ার বর্ণনা রয়েছে— (মাহহারী)। সূরাটির একটি বৈশিষ্ট্য হল, কোরআন মজীদে এর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' লেখা হয় না, অথচ অন্যান্য সকল সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লেখা হয়। এই সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখিত না হওয়ার কাল অনুসন্ধানের আগে মনে রাখা আবশ্যিক যে, কোরআন মজীদ হেঁচক বছরের দীর্ঘ পরিসরে অল্প অল্প করে নাথিল হয়। এমনকি একই সূরার বিভিন্ন আয়াত বিভিন্ন সময়ে অবতীর্ণ হয়। হয়রত জিব্রীলে আমীন ওঈ নিয়ে আসলে আল্লাহর আদেশ মতে কোন সূরার কোন আয়াতের পর আর আয়াতকে স্থান দিতে হবে তাও বলে যেতেন। সেমতে রসূলুল্লাহ (সদ) ওঈ লেখকদের দ্বারা তা' লিখিয়ে নিতেন।

একটি সূরা সমাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় সূরা শুরু করার আগে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ নাখিল হত। এর থেকে বোঝা যেত যে, একটি সূরা শেষ হল, অতঃপর অপর সূরা শুরু হল। কোরআন মজীদে সকল সূরার বেলায় এ নীতি বলবৎ থাকে। সূরা তওবা সর্বশেষে নাখিলকৃত সূরাগুলোর অন্যতম। কিন্তু সাধারণ নিয়ম মতে এর শুরুতে না বিসমিল্লাহ নাখিল হয় আর না রসুলুল্লাহ (সাঃ) তা লিখে নেয়ার জন্য ওহী লেখকদের নির্দেশ দেন। এমতাবস্থায় হযরত (সাঃ)—এর ইস্তিকাল হয়।

কোরআন সংগ্রাহক হযরত ওসমান গনী (রাঃ) স্বীয় শাসনামলে যখন কোরআনকে গ্রন্থের রূপ দেন, তখন দেখা যায়, অপরাপর সূরার বরখোলাফ সূরা তওয়ার শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ নেই। তাই সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে, হয়তো এটি স্বতন্ত্র কোন সূরা নয় বরং অন্য কোন সূরার অংশ। এতে এ প্রশ্নের উদ্ভবও হয় যে, এমতাবস্থায় তা কোন সূরার অংশ হয়ে পারে? বিষয়-বস্তুর দিক দিয়ে একে সূরা আনফালের অংশ বলাই সঙ্গত।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর এক রেওয়াজেতে একথাও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে সূরা আনফাল ও তওবাকে করীনাভাইন বা মিলিত সূরা বলা হত (মায়হযরী)। সেজন্য একে সূরা আনফালের পর খুদ হয। এতে এ সতর্কতাও অবলম্বিত হয়েছে যে, বাস্তবে যদি এটি সূরা আনফালের অংশ হয়, তবে তারই সাথে যুক্ত থাকাই দরকার। পক্ষান্তরে সূরা তওবার স্বতন্ত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়। তাই কোরআন লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় সূরা আনফালের শেষে এবং সূরা তওবা শুরু করার আগে কিছু ফাঁক রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়। যেমন, অপরাপর সূরার শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’-এর স্থান হয়।

সূরা বরাআত বা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ লিখিত না হওয়ার তত্ত্বটি হাদীসের কিতাব আবু দাউদ, নাসায়ী ও মুসনাদে ইয়াম আহমদে স্বয়ং হযরত ওসমান গনী (রাঃ) থেকে এবং তিরমিযী শরীফে মুফাসসসে কোরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। বিষয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন যে, যে নিয়মে কোরআনের সূরাগুলোর বিন্যাস করা হয় অর্থাৎ, প্রথম দিকে শতাধিক আয়াতসমূলিত বৃহৎ সূরাগুলো রাখা হয়—পরিভাষায় যাদের বলা হয় ‘মি-ঈন’, অতঃপর রাখা হয় শতের ক

সমুলিত সূরাগুলো—যাদের বলা হয় ‘মাসানী’। এর পর স্থান দেয়া ছোট সূরাগুলোকে—যাদের বলা হয় ‘মুফাজ্জলাত’। কোরআন সূরার এ নিয়মানুসারে সূরা তওবাকে সূরা আনফালের আগে স্থান দিও উচিত ছিল না? কারণ, সূরা তওবার আয়াতসংখ্যা শতের কম। আর আনফালের শতের কম। প্রথম দিকের দীর্ঘ সাতটি সূরাকে সূরার সংখ্যানুসারে যে নিয়মে রাখা হয়েছে যাদের *سبع طوال* বলা হয়; সূরার আনফালের স্থলে সূরা তওবা থাকাই তো অধিক সঙ্গত। অথচ এখানে এ নিয়মের বরখলাফ করা হয়। এর রহস্য কি?

হযরত উসমান গনী (রাঃ) বলেন, কথাগুলো সত্য, কিন্তু কোরআনের সূরা যা করা হল, তা সাবধানতার খাতিরে। কারণ, বাস্তবে সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে আনফালের অংশ হয়, আর একথা প্রকাশ্য যে, আনফালের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় তওবার আয়াতগুলোর আগে, তাই এর হুকুম ব্যতীত আনফালের আগে সূরা তওবাকে স্থান দেয়া আমাদের মনে বৈধ হবে না। আর একথাও সত্য যে, ওহীর মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোন হেদায়েত আসেনি। তাই আনফালকে আগে এবং তওবাকে পরে রাখা হয়েছে।

এ তত্ত্ব থেকে বোঝা গেল যে, সূরা তওবা স্বতন্ত্র সূরা না হয়ে সূরা আনফালের অংশ হওয়ার সম্ভাবনাটি এর শুরুতে বিসমিল্লাহ না লেখার কারণ, এ সম্ভাবনা থাকার ফলে এখানে বিসমিল্লাহ লেখা বৈধ নয়, যেমন যে নয় কোন সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহ লেখা। এ কারণেই আমাদের মনে ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ বলেন, যে ব্যক্তি সূরা আনফালের তেলাওয়াত সমাপ্ত করে সূরা তওবা শুরু করে, সে বিসমিল্লাহ পাঠ করবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথমেই সূরা তওবা থেকে তেলাওয়াত শুরু করে, কিংবা এর মাঝখানে থেকে আরম্ভ করে, সে বিসমিল্লাহ পড়বে। অনেকে মনে করে যে, সূরা তওবার তেলাওয়াত কালে কোন অবস্থায়ই বিসমিল্লাহ পাঠ দ্বায়ের নয়। তাদের এ ধারণা ভুল। অধিকন্তু, এ ভুলও তারা করে বসে যে, এখানে বিসমিল্লাহ এর স্থলে *اعوذ بالله من النار* তারা পাঠ করে। এর কোন প্রমাণ ছয় (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক হযরত আলী (রাঃ) থেকে অপর একটি রেওয়াজেও বর্ণিত আছে। এতে সূরা তওবার শুরুতে বিসমিল্লাহ না লেখার কারণ দর্শানো হয় যে, বিসমিল্লাহতে আছে শান্তি ও নিরাপত্তার গণ্যাম, কিন্তু সূরা তওবার কাকেরদের জন্যে শান্তি ও নিরাপত্তা চুক্তিগুলো নাকচ করে দেয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটিও এক সুস্পষ্ট তত্ত্ব যা মূল কারণের পরিপন্থী নয়। মূল কারণ হল, তওবা ও আনফাল একটি মাত্র সূরা হওয়ার সম্ভাবনা। হাঁ, উপরোক্ত কারণও যুক্ত হতে পারে এ সূরায় কাকেরদের নিরাপত্তাকে নাকচ করে দেয়া হয় বিধায় ‘বিসমিল্লাহ’ সঙ্গত নয়।

সূরা তওবার উপরোক্ত আয়াতগুলোর যথাযথ মর্যাপলব্ধির জন্যে যে ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে, প্রথমে তা জেনে নেয়া আবশ্যিক। এখানে সংক্ষেপে ঘটনাগুলোর বিবরণ দেয়া হল।

(১) সূরা তওবার সর্বত্র কতিপয় যুদ্ধ, যুদ্ধ সংক্রান্ত ঘটনাবলী এবং এ ধরনের অনেকগুলো ছকুম-আহকাম ও মাসায়েলের বর্ণনা রয়েছে। যেমন, আরবের সকল গোত্রের সাথে কৃত সকল চুক্তি বাতিলকরণ, মক্কা বিজয়, মোদাইন ও তাবুক যুদ্ধ প্রভৃতি। এ সকল ঘটনার মধ্যে প্রথম হল অষ্টম হিজরী সালের মক্কা বিজয় অতঃপর এ বছরেই সংগঠিত হয় হোনাইন

যুদ্ধ। এরপর তাবুক যুদ্ধ বাধে নবম হিজরীর রজব মাসে। তারপর এ সালের জিলহজ্জ মাসে আরবের সকল গোত্রের সাথে সকল চুক্তি বাতিল করার ঘোষণা দেয়া হয়।

(২) চুক্তি বাতিলের যে কথাগুলোর আয়াতে উল্লেখিত আছে, তার সারমর্ম হল, ষষ্ঠ হিজরী সালে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওমরা পালনের নিয়ত করেন। কিন্তু মক্কার কোরাইশ বংশীয় লোকেরা হযরত (সাঃ)কে মক্কা প্রবেশে বাধা দেয়। পরে তাদের সাথে হোদায়বিয়ায় সন্ধি হয়। এর মেয়াদকাল ছিল তফসীরে ‘রুহুল-মা’আনী’র বর্ণনা মতে, দশ বছর। মক্কার কোরাইশদের সাথে অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও বসবাস করত। হোদায়বিয়ায় যে সন্ধি হয়, তার একটি ধারা এও ছিল যে, কোরাইশ বংশীয় লোক ছাড়া অন্যান্য বংশের লোকেরা ইচ্ছা করলে কোরাইশদের মিত্র অথবা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মিত্র হয়ে তাঁর সঙ্গী হতে পারে। এ ধারা মতে ‘খোযাআ’ গোত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এবং বনু-বকর গোত্র কোরাইশদের মিত্রে পরিণত হয়। এ সন্ধির অপর উল্লেখযোগ্য ধারা হল, এ দশ বছরে না পরস্পরের মধ্যে কোন যুদ্ধ বাধবে, আর না কেউ যুদ্ধকারীদের সাহায্য করবে। যে গোত্র যার সাথে রয়েছে তার বেলায়ও এ নীতি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, এদের কারো প্রতি আক্রমণ বা আক্রমণে সাহায্যদান হবে চুক্তিভঙ্গের নামান্তর।

এ সন্ধি স্থাপিত হয় ষষ্ঠ হিজরীতে। সপ্তম হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) গত বছরের ওমরা কাবা করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে গমন করেন এবং তিন দিন তথায় অবস্থান করে সন্ধি মোতাবেক মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময়ের মধ্যে কোন পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের কিছু পাওয়া যায়নি।

এরপর পাঁচ-ছয় মাস অতিবাহিত হলে এক রাতে বনু-বকর গোত্র বনু খোযা আর উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। কোরাইশগণ মনে করে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অবস্থান বহুদূরে, তদুপরী এ’হল নৈশ অভিযান। ফলে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে সহজে পৌঁছাবে না। তাই তারা এ আক্রমণে লোক ও অস্ত্র দিয়ে বনু-বকরের সাহায্য করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে যা কোরাইশেরাও স্বীকার করে নিয়েছিল। অর্থাৎ, হোদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হয়ে যায়, যাতে ছিল দশ বছরকাল যুদ্ধ স্থগিত রাখার চুক্তি।

ওদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মিত্র বনু-খোযাআ গোত্র ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়। তিনি কোরাইশদের চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ পেয়ে তাদের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

বদর, ওহাদ ও আহযাব যুদ্ধে মুসলমানদের গায়েবী সাহায্য লাভের বিষয়টি কোরাইশরা আঁচ করে হীনবল হয়ে পড়েছিল। তার উপর চুক্তি ভঙ্গের বর্তমান ঘটনায় মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতির আশঙ্কা বেড়ে গেল। চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ হযরতের কাছে পৌঁছার পর পুনরীকৃত লক্ষ্য করে এ আশঙ্কা আরো ঘনীভূত হল। তাই তারা বাধ্য হয়ে আবু সুফিয়ানকে অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে মদীনায় প্রেরণ করে। যাতে তিনি মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতি আঁচ করতে পারলে পূর্ববর্তী ঘটনার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে সেই চুক্তিকে নবায়ন করতে পারেন।

আবু সুফিয়ান মদীনায় উপস্থিত হয়ে হযরত (সাঃ) যুদ্ধ প্রস্তুতি অবলাকন করেন, এতে তিনি শঙ্কিত হয়ে গণ্যমান্য সাহাবীদের কাছে যান, যাতে তাঁরা হযরত (সাঃ) এর কাছে চুক্তি বলবৎ রাখার সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁরা সবাই তাদের পূর্ববর্তী ও উপস্থিত ঘটনাবলীর তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন কথটি নাকচ করে দেন। ফলে আবু সুফিয়ান বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন, আর এতে মক্কার সর্বত্র যুদ্ধের ভয়-ভীতি

ছড়িয়ে পড়ে।

‘বিদায়া’ ও ‘ইবনে-কাসীর’ এর বর্ণনা মতে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) অষ্টম হিজরীর দশই রমযান সাহাবায়ে কেরামের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কা জয়ের উদ্দেশে মদীনা ত্যাগ করেন, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়।

সূরার তৃতীয় আয়াত **يَوْمَ الْمَوْجِ الْكَبِيرِ** বাক্যের অর্থ নিয়ে মুফাসসেরগণের মধ্যে মতবৈধ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), হযরত ওমর ফারাক (রাঃ), আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ বিন যুযায়ের প্রমুখ সাহাবা বলেন : **يَوْمَ الْمَوْجِ الْكَبِيرِ** এর অর্থ—আরাফাতের দিন। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীস শরীফে এরশাদ করেছেন **الحج عرفة** “হজ্জ হল আরাফাতের দিন”—(আবু দাউদ)। আর কেউ বলেন, এর অর্থ কোরবানীর দিন বা দশই যিলহজ্জ।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) এবং অপরাপর ইমামগণ এ সকল উক্তির সমন্বয় সাধন উদ্দেশে বলেন, হজ্জের পাঁচ দিন হল হজ্জু আকবরের দিন। এতে আরাফাত ও কোরবানীর দিনগুলোও রয়েছে। তবে এখানে **يَوْمَ** (দিন) শব্দের একবচন আরবী বাকরীতির বিরুদ্ধ নয়। কোরআনের অপর আয়াতে বদর যুদ্ধের দিনগুলোকে **يَوْمَ الْبُرْءِ** রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এখানেও শব্দটি একবচন রূপে ব্যবহৃত হয়। তেমনি আরবের অপরাপর যুদ্ধ যথা **يوم أحد يوم بعاث** প্রভৃতিতে একবচন রয়েছে। রয়েছে অনেক দিনব্যাপী এ সকল যুদ্ধ চলতে থাকে।

তা’ছাড়া ওমরার অপর নাম হল হজ্জু-আসগর বা ছোট হজ্জু। এর থেকে হজ্জুকে পৃথক করার জন্যে বলা হয় হজ্জু-আকবর অর্থাৎ, বড় হজ্জু। তাই কোরআনের পরিভাষা মতে, প্রতি বছরের হজ্জুকে হজ্জু-আকবর বলা যাবে। সাধারণ লোকেরা যে মনে করে, যে বছর আরাফাতের দিন হবে শুক্রবার, সে বছরের হজ্জু হল হজ্জু-আকবর-তাদের এই ধারণা ভুল। তবে এতটুকু কথ্য বলা আছে যে, হযরত (সাঃ)-এর বিদায় হজ্জু আরাফাতের দিনটি ঘটনাচক্রে শুক্রবার পড়েছিল। সম্ভবতঃ এর থেকে উক্ত ধারণার উৎপত্তি। অবশ্য শুক্রবারের বিশেষ ফযীলতের বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। তবে আয়াতের মর্মের সাথে উক্ত ধারণার কোন সম্পর্ক নেই।

ইমাম জাসাসাস (রহঃ) ‘আহকামুল-কোরআন’ গ্রন্থে বলেন, হজ্জের দিনগুলোকে ‘হজ্জু-আকবর’ নামে অভিহিত করা থেকে এ মাসআলাটি বের হয় যে, হজ্জের দিনগুলোতে ওমরা পালন করা যাবে না। কেননা, কোরআন মজীদ এ দিনগুলোকে হজ্জু-আকবরের জন্যে নির্দিষ্ট রেখেছে।

সূরা তওবার প্রথম পাঁচ আয়াতে মক্কাবিজয়ের পর মক্কা ও তার আশ-পাশের সকল কাকের-মুশরিকের জান-মালের সার্বিক নিরাপত্তা দানের বিষয়টি উল্লিখিত হয়। তবে তাদের চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার

তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে তাদের সাথে আর কোন চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সত্ত্বেও ইতিপূর্বে যাদের সাথে চুক্তি করা হয় এবং যারা চুক্তিভঙ্গ করেনি, তাদের যেমদ পূর্ণ হওয়া অবধি চুক্তি রক্ষা জন্যে এ আয়াতসমূহে মুসলমানদের আদেশ দেয়া হয়। আর যাদের সাথে কোন চুক্তি হয়নি, কিংবা যাদের সাথে কোন যেমাদী চুক্তি হয়নি, তাদের প্রতি এই অনুকম্পা করা হয় যে, তাড়িৎ মক্কা ত্যাগের আদেশের স্থলে চার মাসের সময় দেয়া হয়। যাতে এ অবসরে যেদিকে সুবিধা চলে যেতে পারে অথবা, এ সময়ে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করে মুসলমান হতে পারে। আল্লাহর এ সকল আদেশের উদ্দেশ্য হল, আগামী সাল নাগাদ যেন মক্কা শরীফ এ সকল বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের থেকে পবিত্র হয়ে যায়। তবে এ ব্যবস্থা যেহেতু প্রতিশোধমূলক নয়; বরং তাদের একটানা বিশ্বাসঘাতকতার প্রেক্ষিতে নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে নেয়া হয়, সেহেতু তাদের সংশোধন ও মঙ্গল লাভের দরজা খোলা রাখা হয়।

ইসলামের সত্যতার দলীল-প্রমাণ পেশ করা আলমগণের কর্তব্য :

প্রথমত : আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন বিশ্বাসী যদি ইসলামের সত্যতার দলীল জানতে চায়, তবে প্রমাণপঞ্জী সহকারে তার সামনে ইসলামকে পেশ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

দ্বিতীয়ত : কোন বিশ্বাসী ইসলামের সম্যক তথ্য ও তত্ত্বাবলী হাঙ্গিলের জন্যে যদি আমাদের কাছে আসে, তবে এর অনুমতি দান ও তার নিরাপত্তা বিধান আমাদের পক্ষে ওয়াজিব। তাকে বিরত করা বা তার ক্ষতিসাধন অবৈধ। তফসীরে-কুরতুবীতে আছে : এ হুকুম প্রযোজ্য হয় তখন, যখন আল্লাহর কলাম শোনা ও ইসলামের গবেষণাই তার উদ্দেশ্য হয়। জিনু কোন উদ্দেশ্য ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির জন্যে যদি আসতে চায়, তবে তা মুসলিম স্বার্থ ও মুসলিম শাসকগণের বিচেনার উপর নির্ভরশীল। সঙ্গত মনে হলে অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের অধিক সময়ের অনুমতি দেয়া যায় না :

তৃতীয়ত : বিদেশী অমুসলমান যাদের সাথে আমাদের কোন চুক্তি নেই, আবশ্যকভাবে অধিক সময় অবস্থানের অনুমতি তাদের দেয়া যাবে না। কারণ, এ আয়াতে তাদের আশ্রয় দান অবস্থানের সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, **حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ** অর্থাৎ, এদের অবস্থানের এতটুকু সময় দাও, যাতে এরা আল্লাহর কলাম শুনতে পায়।

চতুর্থত : মুসলিম শাসক ও রাষ্ট্রনায়কের কর্তব্য হবে কোন অমুসলমান প্রয়োজনে আমাদের অনুমতি (ভিসা) নিয়ে আমাদের দেশে আগমন করলে তার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং প্রয়োজন শেষে নিরাপদে তাকে প্রত্যর্পণ করা।

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ
إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا عِنْدَ السَّيِّدِ الْأَرَامِ قَبْلَ اسْتِغَاثَتِهِمْ
لَكُمْ وَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ وَإِنْ
يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْفِقُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ يُرْضَوْنَ كُفْرَهُمْ
بِأَقْوَاهِهِمْ وَتَأْتِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَيَسْقُونَ ۝
اِشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ قَبْلًا قَلِيلًا قَصْدًا وَأَعْنَ سَبِيلَهُ
إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَرْفِقُونَ فِي مُؤْمِنِينَ إِلَّا
وَلَا ذِمَّةَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَعَدُونَ ۝ فَإِنْ تَأَلَّوْا وَاقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَاوُا الزَّكَاةَ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ فِي الدِّينِ وَنَقَضُوا
الْأَيْمَانَ لِقَوْمٍ لَيْسَ لَهُمْ بِيَعْلَمُونَ ۝ وَإِنْ تَكْثُرُوا أَهْلَانَهُمْ
مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا
أَيُّهَا الْكَافِرُ ۝ إِنَّهُمْ لَا آيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَنْتَهُونَ ۝ أَلَا تَعْلَمُونَ قَوْمًا تَكْثُرُوا أَهْلَانَهُمْ
وَهُمْ يُؤَاخِزُكَ الرُّسُلُ وَهُمْ يَدُّوْكُمْ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ
أَخْشَوْهُمْ كَأَنَّهُمْ كَالَّذِينَ تَخْشَوْنَ أَنْ تُخْشَوْهُمْ أَنْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝

(৭) মুশরিকদের চুক্তি আল্লাহর নিকট ও তাঁর রসূলের নিকট কিরূপে বলবৎ থাকবে। তবে যাদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ মসজিদুল-হারামের নিকট। অতএব, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের জন্য সরল থাকে, তোমরাও তাদের জন্য সরল থাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সাবধানীদের গৃহস্থ করেন। (৮) কিরূপে? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। (৯) তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে, অতঃপর লোকদের নিবৃত্ত রাখে তাঁর পথ থেকে, তারা যা করে চলেছে, তা অতি নিকট। (১০) তারা মর্যাদা দেয় না কোন মুসলমানের ক্ষেত্রে আত্মীয়তার, আর না অঙ্গীকারের। আর তারা ইমামালখেনকারী। (১১) অবশ্য তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। আর আমি কিমানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্যে সর্বস্তরের বর্ণনা করে থাকি। (১২) আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কোন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে। (১৩) তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সঙ্কল্প নিয়েছে রসূলকে বহিস্কারের? আর এরাই প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ—যদি তোমরা মুমিন হও।

ন্যায়ের উপর অবিচল এবং বাড়াবাড়ি হতে বিরত থাকার শিক্ষা : কোরআন মজীদ মুসলমানদের তাকিদ করে যে, শত্রুদের বেলায়ও ইনসাফ থেকে কোন অবস্থায় যেন বিচ্যুত না হয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। যেমন, নগণ্যসংখ্য মুশরিক ছাড়া বাকী সবাই চুক্তিভংগ করেছে। সাধারণতঃ এমনাবস্থায় বাহ-বিচার তেমন থাকে না। নির্দোশ ক্ষুদ্র দলকেও সংখ্যাগুরু অপরাধী দলের একই ভাগ্য বরণ করতে হয়। কিন্তু কোরআন **عَهْدٌ عِنْدَ السَّيِّدِ الْأَرَامِ** “তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল-হারামের পাশে চুক্তি সম্পাদন করেছ” বলে ওদের পৃথক করে দেয়, যারা চুক্তিভংগ করেনি, এবং আদেশ দেয়া হয় যে, সংখ্যাগুরু চুক্তিভংগকারী মুশরিকদের প্রতি রাগ করে এদের সাথে তোমরা চুক্তিভংগ করো না; বরং এরা যতদিন তোমাদের প্রতি সরল ও চুক্তির উপর অবিচল থাকে, তোমরাও তাদের প্রতি সরল থাক। ওদের প্রতি আক্রোশ বশতঃ এদের কষ্ট দেবে না। অষ্টম আয়াতের শেষ বাক্য থেকেও বিষয়টি আঁচ করা যায়। যেখানে বলা হয় : **وَكَثَرُوا فِي قُلُوبِهِمْ** “এদের অধিকাংশই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।” অর্থাৎ এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ভদ্রচিহ্ন লোক চুক্তির উপর অবিচল থাকতে চায়। কিন্তু সংখ্যাগুরুর ভয়ে তারাও জড়সড়। কোরআন মজীদ বিষয়টি অপর এক আয়াতে পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে। বলা হয়েছে : **لَا يَرْفِقُونَ فِي مُؤْمِنِينَ** “কোন জাতির শত্রুতা যেন বে-ইনসাফ হতে তাহাদের উদ্ভুদ্ধ না করে” (মায়দাহ)

এরপর নবম আয়াতে বিশ্বাসঘাতক মুশরিকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাদের মর্মশীড়ার কারণ উল্লেখ করে তাদের উপদেশ দেয়া হয় যে, তারা যেন বিচার-বিবেচনা করে নিজেদের বিশুদ্ধ করে নেয়। তৎসঙ্গে মুসলমানদেরও হুশিয়ার করা হয় যে, ওরা যে কারণে বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত হয়েছে, সাবধান। তোমরা তার থেকে পূর্ণ সতর্ক থাকবে। সে কারণটি হল দুনিয়াপ্রীতি। মূলতঃ দুনিয়াবী অর্থ-সম্পদের লালসা এদের অন্ধ করে রেখেছে। তাই এরা আল্লাহর আদেশাবলী ও ঈমানকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে দেয়। তাদের এ স্বভাব বড়ই গুণিগন্ধময়।

দশম আয়াতে এদের চরম হঠকারিতার বর্ণনা দেয়া হয়। **لَا يَرْفِقُونَ** এরা চুক্তিবদ্ধ মুসলমানদের সাথেই যে বিশ্বাসঘাতকতা ও আত্মীয়তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, তা নয়; বরং তারা যে কোন অমুসলমানের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, আত্মীয়তাকেও জলাঞ্জলি দেবে।

মুশরিকদের উপরোক্ত ঘৃণ্য চরিত্রের প্রেক্ষিতে মুসলমানদের জন্যে তাদের সাথে চিরতরে সম্পর্কচ্ছেদ করে নেয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু না। কোরআন যে আদর্শ ও ন্যায়-নীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তার আলোকে মুসলমানদের হেদায়েত দেয় : **فَإِنْ تَأَلَّوْا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَاوُا الزَّكَاةَ** “তবে, তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই।” এখানে বলা হয় যে, কাফেররা যত শত্রুতা করুক, যত নিপীড়ন চালাক, যখন সে মুসলমান হয়, তখন আল্লাহ যেমন তাদের কৃত অপরাধগুলো ক্ষমা করেন, তেমনি সকল তিক্ততা ভুলে তাদের ভ্রাতৃ-বন্ধনে আবদ্ধ করা এবং ভ্রাতৃত্বের সকল দাবী পূরণ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব লাভের তিনটি শর্ত : এ আয়াত প্রমাণ করে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথম, কুফর ও

শিরক থেকে তওবা। দ্বিতীয় নামায, তৃতীয় যাকাত। কারণ, ঈমান ও তওবা হল গোপন বিষয়। এর যথার্থতা সাধারণ মুসলমানের জানার কথা নয়। তাই ঈমান ও তওবার দুই প্রকাশ্য আলামতের উল্লেখ করা হয়; নামায ও যাকাত।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মসউদ (রাঃ) বলেন, এ আয়াত সকল কেবলানুসারী মুসলমানের রক্তকে হারাম করে দিয়েছে। অর্থাৎ, যারা নিয়মিত নামায ও যাকাত আদায় করে এবং ইসলামের বরখেলাফ কথা ও কর্মের প্রমাণ পাওয়া যায় না, সর্বক্ষেত্রে তারা মুসলমানরূপে গণ্য; তাদের অন্তরে সঠিক ঈমান বা মুনাফেকী যাই থাক না কেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে এ আয়াত থেকে অশ্রদ্ধাধারণের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে সাহাবায়ে কেরামের সন্দেহ নিরসন করেছিলেন। - (ইবনে কাসীর)

একাদশ আয়াতের শেষ চুক্তিকারী ও তওবাকারী লোকদের উদ্দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ আদেশাবলী পালনের তাগিদ দিয়ে বলা হয় : وَتَقْبِلَ عَلَيْهِمْ تَابَهُمْ ۚ وَتُفْسِدُ سَائِرَ الْمَالِ الْمُنْتَفَعِ ۚ “আর আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্যে বিধানসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে থাকি।”

ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ায় মক্কার যে কোরাইশদের সাথে যুদ্ধ হুসিত রাখার সন্ধি হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে সূরা তওবার শুরু আয়াতগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, তারা সন্ধিচুক্তির উপর অবিচল থাকবে না। অতঃপর অষ্টম, নবম ও দশম আয়াতে তাদের চুক্তিভঙ্গের কারণসমূহ বর্ণিত হয়। একাদশ আয়াতে বলা হয় যে, চুক্তিভঙ্গের ভীষণ অপরাধে অপরাধী হলেও তারা যদি মুসলমান হয় এবং ইসলামকে নামায ও যাকাতের মাধ্যমে প্রকাশ করে, তবে অতীতের সকল তিক্ততা ভুল যাওয়া ও তাদের বাত্বন্ধনে আবদ্ধ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

আলোচ্য দ্বাদশ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক এরা যখন চুক্তিটি ভঙ্গ করে দিল; তখন এদের সাথে মুসলমানদের কি ব্যবহার করা উচিত। এরশাদ হয় : وَانْكَرُوا إِلَيْنَا أَن يُبَيِّنُوا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ وَتَقْبِلَ عَلَيْهِمْ تَابَهُمْ ۚ وَتُفْسِدُ سَائِرَ الْمَالِ الْمُنْتَفَعِ ۚ অর্থাৎ, “এরা যদি চুক্তি সম্পাদনের পর শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ইসলামও গ্রহণ না করে, অধিকন্তু ইসলামকে নিয়ে বিদ্রোহ করে, তবে সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।”

لَمَّا كَانَتْ يَوْمَئِذٍ تُنَادِي بِالسَّلَامِ ۚ وَتَقْبِلُ عَلَيْهِمْ تَابَهُمْ ۚ وَتُفْسِدُ سَائِرَ الْمَالِ الْمُنْتَفَعِ ۚ “সেই কুফর-প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।” তার কল্যাণ, এরা চুক্তিভঙ্গের দ্বারা কুফরের ইমাম বা প্রধানের পরিণত হয়ে যুদ্ধে উপযুক্ত হয়। এ বাকরীতিতে যুদ্ধাদেশের কারণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

কতিপয় মুফাসসির বলেন, এখানে কুফর-প্রধান বলতে বোঝায় যুদ্ধে ঐ সকল কোরাইশ-প্রধান যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লোকদের উৎসাহ দান ও রণ-প্রস্তুতিতে নিয়োজিত ছিল। বিশেষতঃ এদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ এজন্যে দেয়া হয় যে, মক্কাবাসীদের শক্তির উৎস হল এরা। তা’ছাড়া, এদের সাথে ছিল অনেক মুসলমানের আত্মীয়তা। যার কল্যাণ এরা হয়ত প্রশ্রয় পেয়ে বসতো।—(মাযহারী)

وَلَقَدْ نَادَيْنَاكَ ۚ وَتَقْبِلُ عَلَيْهِمْ تَابَهُمْ ۚ وَتُفْسِدُ سَائِرَ الْمَالِ الْمُنْتَفَعِ ۚ “এবং বিদ্রোহ করে তোমাদের দীন সম্পদকে” বাক্য থেকে কতিপয় আলেম প্রমাণ করেন যে, মুসলমানদের ধর্মের প্রতি বিদ্রোহ করা চুক্তিভঙ্গের নামান্তর। যে ব্যক্তি ইসলাম ও ইসলামী শরীয়তকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রোহ করে, তাকে চুক্তি রক্ষাকারী বলা যাবে না। তবে মাননীয় ফকীহ বৃন্দের ঐকমত্যে আলোচ্য বিদ্রোহ হল তা, যা ইসলাম ও মুসলমানদের হেয় করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যরূপে করা হয়, ইসলামী আইন-কানূনের গবেষণার উদ্দেশ্যে কৃত সমালোচনা বিদ্রোহের শামিল নয় এবং আভিধানিক অর্থেও তাকে বিদ্রোহ বলা যায় না। মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থানকারী অমুসলিম বিশ্মীদের তত্ত্বগত সমালোচনার অনুমতি দেয়া যায়, কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রোহের অনুমতি দেয়া যায় না।

আয়াতের অপর বাক্য হল لَمَّا كَانَتْ يَوْمَئِذٍ تُنَادِي بِالسَّلَامِ ۚ অর্থাৎ ‘এদের কোন শপথ নেই; কারণ, এরা শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে অভ্যস্ত। তাই এদের শপথের কোন মূল্য-মান নেই।

আয়াতের শেষ বাক্য হল لَمَّا كَانَتْ يَوْمَئِذٍ تُنَادِي بِالسَّلَامِ ۚ “যাতে তারা ফিরে আসে” এতে বলা হয় যে, মুসলমানদের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্যে অপরাধের জাতি মত শত্রু নির্যাতন ও প্রতিশোধ-সম্পূর্ণ নিবারণ, কিংবা সাধারণ রাষ্ট্রনায়কগণের মত নিছক দেশ দখল না হওয়া চাই। বরং তাদের যুদ্ধে উদ্দেশ্য হওয়া চাই শত্রুদের মঙ্গল কামনা ও সহনুভূতি এবং বিপথ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা।



(৪৪) যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাল্হিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন (১৫) এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞায়। (১৬) তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমন, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সর্বশেষ অবহিত। (১৭) মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার, যখন তারা নিজেরাই নিজদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে। এদের আমল বরবাদ হবে এবং এরা আগুনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে। (১৮) নিঃসন্দেহে তারা ই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়ম করেছে নামায ও আদায় করে যাকাত; আর আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়েতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (১৯) তোমরা কি হাঙ্গীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল-হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ইমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করেছে আল্লাহর রাহে, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না। (২০) যারা ইমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে, নিজদের মাল ও জ্ঞান দিয়ে জেহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর জরাইসফলকাম।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের হঠকারিতা, বিশৃঙ্খলিততা ও নিজদের বাতিল ধর্মকে টিকিয়ে রাখার সকল প্রচেষ্টা এবং তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের জেহাদে অনুপ্রাণিত করার বর্ণনা রয়েছে। আর উপরোক্ত আয়াতসমূহে জেহাদের তাগিদে সাথে রয়েছে এর তাৎপর্য। অর্থাৎ, জেহাদের দ্বারা মুসলমানদের পরীক্ষা করা হয়। এ পরীক্ষায় নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং মুনাফিক ও দুর্বল ইমানসম্পন্নদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়। অতএব, এ পরীক্ষা জরুরী।

ষষ্ঠদশ আয়াতে বলা হয়েছে, তোমরা কি মনে কর যে, শুধু কলেমার মৌখিক উচ্চারণ ও ইসলামের দাবী শোনে তোমাদের এমনিতে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহ প্রকাশ্য দেখতে চান কারা আল্লাহর রাহে জেহাদকারী এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বপে গ্রহণ করেছে না। এ আয়াতে সম্বোধন রয়েছে মুসলমানদের প্রতি। এদের মধ্যে কিছু মুনাফিক প্রকৃতির, আর কিছু দুর্বল ইমানসম্পন্ন ইতস্ততসকারী, যারা মুসলমানদের গোপন বিষয়গুলো নিজদের অ-মুসলিম বন্ধুদের বলে দিত। সেজন্য অত্র আয়াতে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দু'টি আলামতের উল্লেখ করা হয়।

নিষ্ঠাবান মুসলমানদের দুই আলামত : প্রথম, শুধু আল্লাহর জন্যে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে। দ্বিতীয়, কোন অমুসলমানকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করে না। এ আয়াতের শেষে বলা হয়—
وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
“আর আল্লাহ তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে সর্বশেষ অবহিত”। তাই তাঁর কাছে কোন ইলা-বাহানা চলবে না।

অমুসলিমদের অন্তরঙ্গ বন্ধু করা জায়েয নয় : ষষ্ঠদশ আয়াতে উল্লেখিত শব্দ وَلِجَبَةِ - এর অর্থ, অন্তরঙ্গ বন্ধু, যে গোপন কথা জানে। অন্য এক আয়াতে এ অর্থে لِيُطَاعَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ কাপড়ের ঐ স্তর যা অন্যান্য কাপড়ের ভিতরে পেট বা শরীরের স্পর্শে থাকে। আয়াতটি হল—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا بِلِبَاسِكُمْ لَكُمْ ذِكْرًا لِيَأْتِ بِكُمْ خَيْرٌ

অর্থাৎ, “হে ইমানদারগণ, মুমিনদের ব্যতীত আর কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু সাব্যস্ত করো না, তারা তোমাদের ধর্মসাধনে কোন ক্রটি বাকী রাখবে না।”

এ সকল বিষয় আলোচনার পর সপ্তদশ ও অষ্টাদশ আয়াতে মসজিদুল-হারাম ও অন্যান্য মসজিদগুলোকে বাতিল উপাসনা থেকে পবিত্রকরণ এবং সঠিক ও কবুলযোগ্য তরীকায় এবাদত করার পথনির্দেশ রয়েছে।

কতিপয় মাসায়েল : আয়াতে বলা হয় যে, মসজিদ আবাদ করার উপযুক্ততা কাফেরদের নেই। অর্থ হল, কাফেররা মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক হতে পারবে না। আরও ব্যাপক অর্থে বলা যায়, কোন কাফেরকে কোন ইসলামী ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগ করা জায়েয নয়। তবে নির্মাণকাজে অমুসলিমের সাহায্য নিতে দোষ নেই। - (তফসীরে-মুরাব্বী)

কোন অ-মুসলিম যদি সওয়াব মনে করে মসজিদ নির্মাণ করে দেয় অথবা মসজিদ নির্মাণের জন্য মুসলমানদের চাঁদা দেয়, তবে কোন প্রকার দ্বীন বা দুনিয়াবী ক্ষতি সেটার উপর আরোপ করা অথবা খোঁটা দেয়ার আশংকা না থাকলে তা গ্রহণ করা জায়েয রয়েছে। - (শামী)

দ্বিতীয় আয়াতে যা বলা হয়, আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার যোগ্যতা রয়েছে উপরোক্ত গুণাবলীসম্পন্ন নেককার মুসলমানদের। এর থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি মসজিদের হেফাজত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য ব্যবস্থায় নিয়োজিত থাকে কিংবা যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকর বা দু'নি এলমের শিক্ষা দানে, কিংবা শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাতায়াত করে, তা'তার কামেল মুমিন হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। তিরমিযী ও ইবনে-মাজা শরীফে বর্ণিত আছেঃ রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিকে তোমরা মসজিদে উপস্থিত হতে দেখ, তোমরা তার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দেবে। কারণ, আল্লাহ নিজেই বলেছেন, **إِنَّمَا بُنِيَ لِلَّهِ مِنَ الْمَسْجِدِ** “আল্লাহর মসজিদগুলো আবাদ করে তারা, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি.....।”

বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, নবীয়ে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ

“যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে উপস্থিত হয়, আল্লাহ তার জন্যে জন্মাতে একটি মাকাম প্রস্তুত করেন।” হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, “মসজিদে আগমনকারী ব্যক্তি আল্লাহর যম্বারতকারী মেহমান, আর মেজবানের কর্তব্য হল মেহমানের সম্মান করা।” —(মায়হারী, তাবরানী, ইবনে-জরীর ও বায়হাকী শরীফ প্রভৃতি)

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) বলেন, মসজিদের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত কার্যকলাপ থেকে মসজিদকে পবিত্র রাখাও মসজিদ আবাদ করার শামিল। যেমন, মসজিদে ক্রয়-বিক্রয়, দুনিয়াবী কথাবার্তা, হারানো বস্তুর সন্ধান, ভিক্ষাবৃত্তি, বাজু কবিতা পাঠ, ঝগড়া-বিবাদ ও হৈ-হুল্লাড় প্রভৃতি মসজিদের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত কাজ। —(মায়হারী)

১৯ থেকে ২২ পর্যন্ত বর্ণিত চারটি আয়াতে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। তা হল- মক্কার অনেক মুসরিক মুসলমানদের মোকাবেলায় গর্ব সহকারে বলত, মসজিদুল-হারামের আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আমরাই করে থাকি। এর উপর আর কারো কোন আমল শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার হতে পারে না। ইসলাম গ্রহণের আগে হযরত আব্বাস (রাঃ) যখন বদর যুদ্ধে বন্দী হন এবং তাঁর মুসলিম আত্মীয়গণ তাঁকে বাতিল ধর্মের উপর বহাল থাকায় বিদ্বেষের সাথে বলেন, আপনি এখনো ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। উত্তরে তিনি বলেন, তোমরা ঈমান ও হিজরত (দেশত্যাগ)-কে বড় শ্রেষ্ঠ কাজ মনে করে আছ, কিন্তু আমরাও তো মসজিদুল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে থাকি। তাই আমাদের সমান আর কারো আমল হতে পারে না। তফসীরে ইবনে-কাসীরে আছে, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়।

মুন্দানো আবদুর রাযযাকের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর তালহা বিন শায়বা, হযরত আব্বাস ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মধ্যে আলোচনা চলছিল। হযরত তালহা বলেন, আমার যে ফযীলত তা তোমাদের নেই। বায়তুল্লাহ শরীফের চাবি আমার দখলে। ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরেও রাত্রিযাপন করতে পারি। হযরত আব্বাস বললেন, হাজীদের পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা আমার হাতে। মসজিদুল-হারামের শাসনক্ষমতা, আমার নিয়ন্ত্রণে। হযরত আলী (রাঃ) অতঃপর বললেন, বুঝতে পারি না এগুলোর উপর তোমাদের এত গর্ব কেন? আমার কৃতিত্ব হল, আমি সবার থেকে ছয় মাস আগে বায়তুল্লাহর দিকে করে নামায আদায় করছি এবং রসূলুল্লাহর সাথে যুদ্ধেও

অংশ নিয়েছি। তাঁদের এ আলোচনার প্রেক্ষিতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। যাতে স্পষ্ট করে দেয়া হয় যে, ঈমানশূন্য কোন আমল-জা'ফরী বড় হোক—আল্লাহর কাছে কোন মূল্য রাখবে না। আর না শিরক অবহেলা অনুকূপ আমলকারী আল্লাহর মকবুল বন্দায় পরিণত হতে পারবে।

মুসলিম শরীফে নোমান বিন ক্বীর থেকে বর্ণিত হাদীসে **كَانَ** ভিন্ন-রূপে উদ্ধৃত হয়। এক জুমআর দিন তিনি কতিপয় সাহাবার সাথে মসজিদে নববী (সাঃ)-তে মিম্বরের পাশে বসা ছিলেন। উপস্থিত একজন বললেন, ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি সরবরাহের মত মর্যাদাসম্পন্ন আর কোন আমল নেই এবং এর মোকাবেলায় আর কোন আমলের ধার আমি ধারি না। তাঁর উক্তি শুন করে অপরজন বললেন, আল্লাহর রাহে জেহাদ করার মত উত্তম আমল আর নেই। এভাবে দু'জনের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। হযরত ওয়াক্কাক (রাঃ) তাদের ধমক দিয়ে বললেন, রসূলুল্লাহর মিম্বরের কাছে শোরগোল বন্ধ কর। জুমআর নামাযের পর স্বয়ং হযরতের কাছে বিবরণী পেশ কর। কথামত প্রশুটি তাঁর কাছে রাখা হয়। এর প্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং এতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের উপর জেহাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

ঘটনা যাই হোক না কেন, আয়াতগুলো অবতরণ হয়েছিল মূলত মুশরিকদের অহঙ্কার নিবারণ উদ্দেশ্যে। অতঃপর মুসলমানদের পরস্পর মধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটে, তার সম্পর্কে প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় ও সকল আয়াত থেকে। যার ফলে শ্রোতার ধরে নিয়েছে যে, এ ঘটনা প্রেক্ষিতে আয়াতগুলো নাযিল হয়।

সে যাহোক, উপরোক্ত আয়াতে যে সত্যটি তুলে ধরা হয় তা হল, শিরক মিশ্রিত আমল তা যত বড় আমলই হোক কবুলযোগ্য নয় এবং এর কোন মূল্যমানও নেই। সে কারণে কোন মুশরিক মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহ দ্বারা মুসলমানদের মোকাবেলায় ফযীলত ও মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। অন্যদিকে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও জেহাদের মর্যাদা মসজিদুল-হারামের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশী। তাই যে মুসলমান ঈমান ও জেহাদ অগ্রগামী, সে জেহাদে অনুপস্থিত মুসলমানের চেয়ে অধিক মর্যাদা অধিকারী।

আয়াতের শেষ বাক্য হল- **وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** “আর আল্লাহ যালেম লোকদের হেদায়েত করেন না।” অর্থাৎ, ঈমান যে সকল আমলের মূল ও সকল এবাদত থেকে আফবল এবং জেহাদ যে মসজিদ আবাদ ও হাজীদের পানি সরবরাহ থেকে উত্তম, তা'কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা দুর্বোধ্য বিষয় নয়; বরং একান্ত পরিষ্কার কথা। কিন্তু আল্লাহ যালেম লোকদের হেদায়েত ও উপলব্ধি শক্তি দান করেন না বিধায় তারা একটি সোজা কথায়ও কু-তর্কে অবতীর্ণ হয়।

বিশেষতম আয়াতে তার উপরের আয়াতে উল্লেখিত শব্দ **لَيْسَتْ** ‘সমান নয়’ এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এরশাদ হয় **أَلَيْسَ مَسْجِدُكُمْ وَهَاجِرُكُمْ** “যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করে এবং আল্লাহর রাহে মাল ও জ্ঞান দিয়ে যুদ্ধ করেছে, আল্লাহর কাছে রয়েছে তাদের বড় মর্যাদা এবং তা'রাই সফলকাম।” পক্ষান্তরে তাদের প্রতিপক্ষ মুশরিকদের কোন সফলতা আল্লাহ দান করেন না। তবে সাধারণ মুসলমানগণ এ সফলতার অঙ্গীদার, কিন্তু দেশত্যাগী মুজাহিদগণ সফলতা সবার উর্ধ্বে। তাই পূর্ণ সফলতার অধিকারী হল তারা।

يُخَيِّرُكُمْ رُكُومَ بَرَحْمَتِهِ مِنْهُ وَرَضَوَانِ وَجَدْتُمْ لَهُمْ حَقًّا
 نَحْمُومُكُمْ ۝ خُلِيدِينَ فَمَا آتَاكَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرُ
 عَظِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا آيَاتِكُمْ وَ
 إِخْوَانَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ اسْتَحْوُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ
 يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ قُلْ إِنْ كَانَ
 آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
 أَسْأَلُكُمْ بِمَا تَدْعُونَهُمْ إِلَى تَعْبَادَةٍ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
 مَسْكِينَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ
 جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَضَوْنَ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي
 مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۝ وَتُؤْمَرُ حَتَّى إِذَا عَجَبْتُمْ أَنْ تَقْرُوا
 فَتَقْرَأَ عَنْهُمْ شَيْئًا فَذَاقُوا عَذَابَ اللَّهِ الَّذِي هُمْ
 رَحِمْتُ لَكُمْ وَلَكُمْ مُذَبِّرِينَ ۝ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
 عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُودًا أَلَمْ تَرَوْهَا
 وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝

(১১) তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেরার স্বীয় দয়া ও
 সন্তোষের এক জল্পাতে, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। (১২)
 তথ্য তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহা
 পুরস্কার। (১৩) হে ইমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের
 অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ইমান অপেক্ষা কুফরকে
 ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা
 সীমান্বয়নকারী। (১৪) বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা,
 তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের পোষ,
 তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়
 কর এক তোমাদের বাসস্থান—যাকে তোমরা পছন্দ কর—আল্লাহ, তাঁর
 রসূল ও তাঁর রাস্থে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর,
 আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেয়রত
 করেন না। (১৫) আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এক
 ঘেনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ তোমাদের প্রবল করেছিল,
 কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এক পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও
 তোমাদের জন্যে সঙ্কটচিত হয়েছিল। অতঃপর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন
 করেছিল। (১৬) তারপর আল্লাহ নাফিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সাহায্য
 তাঁর রসূল ও মুমিনদের প্রতি এক অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের
 তোমরা দেখতে পাওনি। আর শান্তি প্রদান করেন কাকরদের এক এটি হল
 কাকরদের কর্তব্যকল।

২১তম ও ২২তম আয়াতে সেই সকল লোকদের পুরস্কার ও
 পরকালীন মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে। এরশাদ হয় : **يُخَيِّرُكُمْ رُكُومَ بَرَحْمَتِهِ مِنْهُ وَرَضَوَانِ وَجَدْتُمْ لَهُمْ حَقًّا** “তাদের প্রতিপালক তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন
 স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এক জল্পাতে, যেখানে তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী
 শান্তি, তারা থাকবে সেখানে চিরদিন, আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহান
 পুরস্কার।”

উপরোক্ত আয়াতে হিজরত ও জেহাদের ফযীলত বর্ণিত হয়।
 সেক্ষেত্রে দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অর্থ-সম্পদকে বিদায়
 জনাতে হয়। আর এটি হল মনুষ্য স্বভাবের পক্ষে বড় কঠিন কাজ। তাই
 সামনের আয়াতে এগুলোর সাথে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসার নিন্দা করে
 হিজরত ও জেহাদের জন্যে মুসলমানদের উৎসাহিত করা হয়। এরশাদ
 হয় : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا آيَاتِكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ** “হে
 ইমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ
 করো না, যদি তারা ইমানের বদলে কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের
 যারা অভিভাবকরূপে তাদের গ্রহণ করে, তারা ই হবে সীমান্বয়নকারী।”

মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং অপরাধের আত্মীয়-স্বজনের সাথে
 সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদ কোরআনে বহু আয়াত রয়েছে। কিন্তু
 আলোচ্য আয়াতে বলা হয় যে, প্রত্যেক সম্পর্কের একেকটি সীমা আছে
 এক এ সকল সম্পর্ক তা মাতা-পিতা, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন যার
 বেলাতেই হোক, আল্লাহ ও রসূলের সম্পর্কের প্রশ্নে বাদ দেয়ার উপযুক্ত।
 যেখানে এ দুসম্পর্কের সংঘাত দেখা দেবে, সেখানে আল্লাহ ও রসূলের
 সম্পর্কেই বহল রাখা আবশ্যিক।

আরও কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় : উল্লেখিত পাঁচটি আয়াত থেকে
 আরও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ইমান হল আমলের প্রাণ।
 ইমানবিহীন আমল প্রাণশূন্য দেহের মত যা কবুলিয়তের অযোগ্য।
 আখেরাতের নাজাত ক্ষেত্রে এর কোন দাম নেই। তবে আল্লাহ যেহেতু
 বে-ইনসাক নন, সেহেতু কাকরদের নিশাশ ভাল আমলগুলোকো
 সম্পূর্ণ নষ্ট করেন না; বরং দুনিয়ায় এর বিনিময়স্বরূপ আরাম-আয়েশ ও
 অর্থ-সম্পদ দান করে হিসাব পরিকার করে নেন। কোরআনের বিভিন্ন
 আয়াতে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয় : মোনাহ ও পাশাচারের ফলে মানুষের বিবেক ও বিচারশক্তি
 নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারে না।
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ “আল্লাহ যালম লোকদের সত্য পথ প্রদর্শন করেন না” থেকে কথাটির
 ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন, এর বিপরীতে অপর এক আয়াতে বলা হয়ঃ
إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا “তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর,
 তবে তিনি ভাল-মন্দ পার্থক্যের শক্তি দান করবেন।” অর্থাৎ,
 এবাদত-বন্দেগী ও তাকওয়া-পরহেযাগীর ফলে বিবেক প্রবর্ত হয়, সুস্থ
 বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি আসে। তাই সে ভাল-মন্দের পার্থক্যে ভুল করে
 না।

তৃতীয় : নেক আমলগুলোর মর্যাদায় তারতম্য রয়েছে। সেমতে
 আমলকারীর মর্যাদায়ও তারতম্য হবে। অর্থাৎ, সকল আমলকারীকে
 একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যাবে না। আর একটি কথা হল, আমলের
 আধিক্যের উপর ফযীলত নির্ভরশীল নয়, বরং আমলের সৌন্দর্যের উপর

তা নির্ভরশীল। সূরা মূলকের শুরুতে আছে : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** “যাতে আল্লাহ্ পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের কার আমল কত সৌন্দর্যমণ্ডিত।”

চতুর্থ : আরাম-আয়েশের স্থায়িত্বের জন্যে দু’টি বিষয় আবশ্যক। প্রথম, নেয়ামতের স্থায়িত্ব। দ্বিতীয়, নেয়ামত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়া। তাই আল্লাহ্ র মকবুল বন্দাদের জন্যে আয়াতে এ দু’টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দেয়া হয়। **نَوْمُهُمْ** (হায়ী শান্তি) এতে আছে প্রথম বিষয়, আর **خَلِيلِينَ فِيهَا أَيْدٍ** (তথায় চিরদিন বসবাস করবে) বাক্যে আছে দ্বিতীয় বিষয়।

পঞ্চম : এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাহল, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সকল সম্পর্কের উপর আল্লাহ্ ও রসুলের সম্পর্ক অপ্রকৃত্য। এ দুই সম্পর্কের সাথে সৎভাবে দেখা দিলে আত্মীয়তার সম্পর্কে জলাঞ্জলি দিতে হবে। উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামাতরূপে সাহাবায়ে কেরাম যে অভিহিত, তার মূলে রয়েছে তাঁদের এ ত্যাগ ও কোরবানী। তাঁরা সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ও রসুলের সম্পর্কেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাই আফ্রিকার হযরত বেলাল (রাঃ), রোমের হযরত সোহাইব (রাঃ), পারস্যের হযরত সালমান (রাঃ), মকর কোরাইশ ও মদীনার আনসারগণ গভীর স্নাত্ত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এক ওহদ ও বদর যুদ্ধে পিতা ও পুত্র এবং ভাই ও ভাইয়ের মধ্যে অস্ত্রের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার এই প্রমাণ বহন করে।

সূরা তওবার ২৪তম আয়াতটি নাখিল হয় মূলতঃ ওদের ব্যাপারে যারা হিজরত করয় হওয়াকালে মক্কা থেকে হিজরত করেনি। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, সম্বন্ধ-সম্বন্ধি, স্ত্রী-পরিবার ও অর্ধ-সম্পদের মায়া হিজরতের করয় আদায়ে এদের বিরত রাখে। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা রসুলে করীম (সঃ)—কে নির্দেশ দেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন : “যদি তোমাদের নিকট তোমাদের পিতা, তোমাদের সম্বন্ধ, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের পোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের বাবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ্, তাঁর রসুল ও তাঁর রায়ে জেহাদ করা থেকে তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়, তবে আপেক্ষা কর আল্লাহ্ র বিধান আসা পর্যন্ত, আল্লাহ্ নাকরমানদিসকে কৃতকার্য করেন না।”

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার বিধান আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার যে কথা আছে, তৎসম্পর্কে তফসীরশাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এখানে ‘বিধান’ অর্থে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মক্কা জয়ের আদেশ। বাক্যের মর্ম হল, যারা দুনিয়াবী সম্পর্কের জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের সম্পর্কে জলাঞ্জলি দিচ্ছে, তাদের করুণ পরিশোধি দিন সমাপ্ত। মক্কা যখন বিজিত হবে আর এ সকল নাকরমানেরা লাক্ষিত ও অপদস্থ হবে, তখন দুনিয়াবী সম্পর্ক তাদের কোন কাজে আসবে না।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এখানে বিধান অর্থে আল্লাহ্ র আযাবের বিধান। অর্থাৎ, আখেরাতের সম্পর্কের উপর যারা দুনিয়াবী সম্পর্কে প্রাধান্য দিয়ে হিজরত থেকে বিরত রয়েছে, আল্লাহ্ র আযাব অতি শীঘ্র তাদের গ্রাস করবে। দুনিয়ার মধ্যেই এ আযাব আসতে পারে। অন্যথায় আখেরাতের আযাব তো আছেই। এখানে ইশিয়ালী উচ্চারণটি মূলতঃ হিজরত-না করার প্রেক্ষিতে। কিন্তু তদন্থলে উল্লেখ করা হয় জেহাদের—যা হল হিজরতের পরবর্তী পদক্ষেপ। এই বর্ণনাতন্ত্রির দ্বারা

ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, সবেমাত্র হিজরতের আদেশ দেয়া হল। এতই অনেকের হাঁপ ছেড়ে বসার অবস্থা। কিন্তু অচিরেই আসবে জেহাদের আদেশ, যে আদেশ পালনে আল্লাহ্ ও রসুলের জন্যে সকল বস্তুর ক্ষয় এমন কি প্রাণের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করতে হবে।

এও হতে পারে যে, এখানে ‘জেহাদ’ বলে হিজরতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কারণ, হিজরত মূলতঃ জেহাদেরই অন্যতম অংশ।

আয়াতের শেষ বাক্য হল : **وَاللَّهُ يَكْفِي الْقَوْمَ الْقَوِيمِينَ** “আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করবেন না।” “এতে কী হয় যে, যারা হিজরতের আদেশ আসা সত্ত্বেও দুনিয়াবী সম্পর্কে প্রাধান্য নিয়ে আত্মীয়-বন্ধন এবং অর্ধ-সম্পদকে বুকে জড়িয়ে বসে আছে, তাদের এ আচরণ দুনিয়াতেও কোন কাজ দেবে না এবং তারা আত্মীয়-বন্ধন পরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বপ্নেই আরাম-আয়েশ ও ভোগের যে আশা পোষণ করে আছে, তা পূরণ হওয়ার নয়; বরং জেহাদের দামামা বেজে উঠার পর সকল সহায়-সম্পত্তি তাদের জন্যে অভিলাষ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, আল্লাহ্ র ইরাদা হল, তিনি নাকরমান লোকদের উদ্দেশ্য পূরণ করেন না।

হিজরতের মাসায়েল : প্রথম, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের ক্ষয় হকুম যখন আসে, তখন এ হকুম পালন শুধু কর্তব্য আদায় করাই ছিল না; বরং তা ছিল মুসলমান হওয়ার আলামতও। তাই যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত থেকে বিরত ছিল তাদের মুসলমান বলা যেতো না। মক্কা বিজয়ের পর এ আদেশ রহিত হয়। তবে আদেশের মূল বক্তব্য এখনো বলবৎ আছে যে, যে দেশে আল্লাহ্ র আদেশ তথা নাযাম-রোযা প্রভৃতি পালন সম্ভব না হয়, সামর্থ্য থাকলে সে দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে সব সময়ের জন্যে করণ্য।

দ্বিতীয় : সেনাহ ও পাগাচার যে দেশে প্রবল, সে দেশ ত্যাগ করা মুসলমানদের পক্ষে সব সময়ের জন্যে মুস্তাহাব। - (বিস্তারিত অবগতির জন্যে ‘ফাতহুল বারী দ্বিতীয়)

উল্লেখিত আয়াতে সরাসরি সম্বোধন রয়েছে তাদের প্রতি, যারা হিজরত করয় হওয়াকালে পার্শ্ব সম্পর্কের মোহে হিজরত করেনি। তবে আয়াতটির সঙ্গতি শব্দের ব্যাপক অর্থে সকল মুসলমানের প্রতি এ আদেশ রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ভালবাসাকে এমন উন্নত স্তরে রাখা ওয়াজিব, যে স্তর অন্য কারো ভালবাসা অতিক্রম করবে না। ফলে যার ভালবাসা এ স্তরে নয়, সে আযাবের যোগ্য।

পূর্ণতর ইমানের পরিচয় : এজন্যে বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে : ‘রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এরশাদ করেছেন, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ মুহিম হতে পারে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, সম্বন্ধ-সম্বন্ধি ও অন্যান্য সকল লোক থেকে অধিক প্রিয় হই।’ আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে : ‘রসুলে করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কারো সাথে বন্ধুত্ব রেখেছে শুধু আল্লাহ্ র জন্যে, শত্রুতা রেখেছে শুধু আল্লাহ্ র জন্যে, অর্ধ ব্যয় করে। আল্লাহ্ র জন্যে, অর্ধ ব্যয় থেকে বিরত রয়েছে আল্লাহ্ র জন্যে, সে নিজের ইমানকে পরিপূর্ণ করেছে।’

হাদীসের এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, রসুলুল্লাহ্ (সঃ) এর ভালবাসাকে অপরাপর ভালবাসার উর্ধ্বে স্থান দেয়া এক শত্রুতা ও মিত্রতায় আল্লাহ্-রসুলের হকুমের অনুগত থাকা পূর্ণতর ইমান লাভের পূর্বশর্ত।

ইমামে তফসীর কাযী বায়যাবী (রহঃ) বলেন, সম্প্রসংখ্যক লোকই

শ্রীমতে উল্লেখিত শান্তি থেকে রেহাই পাবে। কারণ, অনেক বড় বড় জ্ঞানমণ্ডল ও পরহেযগার লোককেও শ্রী-পরিজন এবং অর্থ-সম্পদের মোহে লুপ্ত দেখা যায়, তবে আল্লাহ্ যাদের হেফাযত করেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। নিষ্ঠাকামী বায়যাহী প্রসঙ্গতঃ একথাও বলেছেন যে, এখানে ভালবাসা অর্থ-সম্পদকৃত ভালবাসা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আল্লাহ্ কোন মানুষকে তার সমর্থের বাইরে কষ্ট দেন না। তাই কারো অন্তরে যদি পার্শ্বব সম্পর্কের স্বাভাবিক আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু এ আকর্ষণ আল্লাহ্-রসুলের ভালবাসাকে প্রভাবিত এবং বিরুদ্ধাচরণে প্ররোচিত না করে, তবে তার এ পার্শ্বব আকর্ষণ উপরোক্ত দশবিধির আওতায় আসে না। যেমন, কোন কনুই লোক ঔষধের তিক্ততা বা অস্ত্রাণচারণকে ভয় করে, কিন্তু তার স্নেহকে একে শান্তি এ আরোগ্যের মাধ্যম মনে করে। এখানে যেমন তার ক্রোধের-ভীতি স্বাভাবিক এবং এর জন্যে কেউ তাকে তিরস্কারও করে না, তেমনি শ্রী-পরিজন ও অর্থ-সম্পদের মোহে কারো অন্তর যদি শরীয়তের কোন কোন বকুম পালনে অস্বীকার্যভাবে চাপ বোধ করে এবং এসবকেও সে শরীয়তের বকুম পালন করে, তবে তার পক্ষে দুনিয়ার এ আকর্ষণ দুঃখীয় নয়; বরং সে প্রশংসার পাত্র এবং তার আল্লাহ্-রসুলের এ ভালবাসাকে এ আয়াত অনুসারে সবার উর্ধ্বে স্থান দাতাগণের কাতারে শামিল রাখা হবে।

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) তফসীরে-মাহহারীতে বলেন, আল্লাহ্ ও রসুলের ভালবাসার এ স্তরে উপনীত হওয়া এক বিরাট নেয়ামত। কিন্তু এ নেয়ামত লাভ করা যায় আল্লাহ্র জ্বালালের সংসর্গে থেকে। এজন্যে সুফিয়ায়ে কেরাম তা' হাসিলের জন্যে মাশায়েখগণের পদসবাকে আবশ্যকীয় মনে করেন। তফসীরে 'রুহুল-বয়ান' প্রণেতা বলেন, 'বন্ধুত্বের এই মাকাম হাসিল হয় তাদের, যারা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্ (আঃ)-এর মত নিজের জান-মাল ও সন্তানের কোরবানী দিয়েছে আল্লাহ্র পক্ষে, তাঁরই প্রেমে উদ্ভূত হয়ে।'

কাযী বায়যাহী (রহঃ) স্বীয় তফসীরে বলেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্নান ও শরীয়তের হেফাযত এবং এতে হিদ্র সৃষ্টিকারী লোকদের প্রতিরোধও আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের ভালবাসার স্পষ্ট প্রমাণ।

২৫ তম আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্র সেই দয়া ও দানের উল্লেখ রয়েছে যা প্রতি ক্ষেত্রে মুসলমানেরা লাভ করে। বলা হয়: لَقَدْ فَضَّلْنَاكَ عَلَى الْكَافِرِينَ 'আল্লাহ্ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে। এরপর বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় হোনাইন যুদ্ধের কথা। কারণ, সে যুদ্ধ এমনসব ধারণাতীত অদ্ভুত ঘটনার প্রকাশ ঘটছে, যেগুলো নিয়ে চিন্তা করলে মানুষের ঈমানী শক্তি প্রবল ও কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পায়। সেজন্যে আয়াতের শাসনিক তফসীরের আগে হাদীস ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখিত এ যুদ্ধের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দেয়া সমীচীন মনে করি। এতে আয়াতের তফসীর অনুধাবন সহজ হবে এবং যে সকল হিতকর বিষয়ের উদ্দেশে ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়, তা সামনে এসে যাবে। এ বিবরণের অধিকাংশ তথ্য তফসীরে-মাহহারী থেকে নেয়া হয়েছে, যাতে হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থের উদ্ধৃতি রয়েছে।

'হোনাইন' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। যা মক্কা শরীফ থেকে প্রায় দশ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে যখন মক্কা বিজিত হয় আর মক্কার কোরাইশগণ অস্ত্র সমর্পণ করে, তখন আরবের বিখ্যাত ধনী ও যুদ্ধবাজ হাওয়াজেন গোত্র —যার একটি শাখা তায়েফের বনু-সকীফ নামে পরিচিত, তাদের মাঝে ব্যাপক ধতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ফলে তারা একত্রিত হয়ে আশংকা প্রকাশ করতে

থাকে যে, মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানদের বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়েছে, তখন পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্য হবে তায়েফ। তাই তাদের আগে আমাদের আক্রমণ পরিচালনা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। পরামর্শ মতে এ উদ্দেশে হাওয়াজেন গোত্র মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত শাখা-গোত্রগুলোকে একত্রিত করে। আর বিশাল সে গোত্রের প্রায় সবাই যুদ্ধের জন্যে সমবেত হয়।

এ অভিযানের নেতা ছিলেন মালেক বিন আউফ। অবশ্য পরে তিনি মুসলমান হয়ে ইসলামের অন্যতম ঝাণ্ডাবাহী হন। তবে প্রথম মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তীব্র প্রেরণা ছিল তাঁর মনে। তাই স্বগোত্রের সংখ্যাগুরু অংশ তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ গোত্রের অপর দু'টি ছোট শাখা—বনুকাব ও বনু-কেলাব মতানৈক্য প্রকাশ করে। আল্লাহ্ তাদের কিছু দিব্যদৃষ্টি দান করেছিলেন। তারা বলতে থাকে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়াও যদি মুহাম্মদের (সাঃ) বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, তথাপি তিনি সকলের উপর জয়ী হবেন, আমরা খোদায়ী শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে পারব না।

যাহোক, এই দুই গোত্র ছাড়া বাকী সবাই যুদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। সেনানায়ক মালেক বিন আউফ পূর্ণ শক্তির সাথে রণাঙ্গনে তাদের সুদৃঢ় রাখার জন্যে এ কৌশল অবলম্বন করেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের পরিবার-পরিজনও উপস্থিত থাকবে এবং প্রত্যেকের জীবিকার প্রধান সহায় পশুপালও সাথে রাখতে হবে। উদ্দেশ্য, কেউ যেন পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের টানে রণক্ষেত্র ত্যাগ না করে। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। হাফেযুল-হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার (রঃ) চবিশ বা আটশ হাজারের সংখ্যাকে সঠিক মনে করেন। আর কেউ কেউ বলেন, এদের সংখ্যা চার হাজার ছিল। তবে এও হতে পারে যে, পরিবার-পরিজনসহ ছিল তারা চবিশ বা আটশ হাজার, আর যোদ্ধা ছিল চার হাজার।

মোটকথা, এদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা শরীফেই অবহিত হন এবং তিনিও এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প নেন। মক্কায় হযরত আবুবা ইবনে আসাদ (রাঃ)-কে আমীর নিয়োগ করেন এবং মাআয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে লোকদের ইসলামী তলীম দানের জন্য তাঁর সাথে রাখেন। অতঃপর মক্কার কোরাইশদের থেকে অস্ত্র-শস্ত্র ধারস্বরূপ সংগ্রহ করেন। কোরাইশ সরদার সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া এতে ক্ষেপে উঠে বলে, আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র কি আপনি জোর করে নিয়ে যেতে চান? হযরত (সাঃ) বলেন, না, না, বরং ধারস্বরূপ নিচ্ছি। যুদ্ধ শেষে ফিরিয়ে দেব। একথা শোনে সে একশত লৌহবর্ম এবং নওফেল ইবনে হারেস তিন হাজার বর্শা তাঁর হাতে তুলে দেয়। ইমাম যুহরীর (রহঃ) বর্ণনামতে চৌদ্দ হাজার মুসলিম সেনা নিয়ে হযরত (সাঃ) এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এতে ছিলেন মদীনার বার হাজার আনসার যারা মক্কা বিজয়ের জন্য তাঁর সাথে এসেছিলেন। বাকী দু'হাজার ছিলেন আশ পাশের অধিবাসী, যারা মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলেন এবং যাদের বলা হত 'তোলাকা'। অর্থাৎ, সাধারণ ক্ষমায় মুক্তিপ্রাপ্ত। ৮ম হিজরীর ৬ই শাওয়াল শুক্রবার হযরতের নেতৃত্বে মুসলমান সেনাদলের যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়। হযরত (সাঃ) বলেন, ইশাআল্লাহ্, আগামীকাল আমাদের অবস্থান হবে খায়ফে বনীকেনানা'র সে স্থানে, যেখানে মক্কার কোরাইশগণ ইতিপূর্বে মুসলমানদের সাথে সামাজিক বয়কটের চুক্তিপত্র সই করেছিল।

চৌদ্দ হাজারের এই বিরাট সেনাদল জেহাদ-উদ্দেশে বের হয়ে পড়ে,

তাদের সাথে মক্কার অসংখ্য নারী-পুরুষও যুদ্ধের দৃশ্য উপভোগের জন্যে বের হয়ে আসে। তাদের সাধারণ মনোভাব ছিল, এ যুদ্ধে মুসলিম সেনারা হেরে গেলে আমাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেয়ার একটা ভাল সুযোগ হবে। আর তারা জয়ী হলেও আমাদের অবশ্য ক্ষতি নেই।

এ মনোভাবসম্পন্ন লোকদের মধ্যে শায়বা ইবনে ওসমানও ছিলেন। যিনি পরে মুসলমান হয়ে নিজের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে আমার পিতা হযরত হামযা (রাঃ)-এর হাতে এবং আমার চাচা হযরত আলী (রাঃ)-এর হাতে নিহত হন। ফলে অন্তরে প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলছিল, তা' বর্ণনার বাইরে। আমি এটাকে অপূর্ব সুযোগ মনে করে মুসলমানদের সহযাত্রী হলাম। যেন মওকা পেলেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আক্রমণ করতে পারি। তাই আমি তাঁদের সাথে থেকে সদা সুযোগের সন্ধানে রইলাম। এক সময় যখন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুদ্ধের সূচনায় দেখা যায়, মুসলমানরা হত্যোদ্দ্যম হয়ে পালাতে শুরু করেছে; আমি এ সুযোগে ত্বরিতবেগে হযরতের (সাঃ) কাছে পৌছি। কিন্তু দেখি যে, ডান দিকে হযরত আব্বাস, বাম দিকে আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস হযরতের (সাঃ) দেহরক্ষীরূপে আছেন। এজন্যে পেছন দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর কাছে পৌছি এবং সংকল্প নেই যে, তরবারির অতর্কিত আঘাত হেনে তাঁকে হত্যা করব। ঠিক এ সময় আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং আমাকে ডাক দিয়ে বলেন, শায়বা, এদিকে এস। আমি তাঁর পাশে গেলে তাঁর পবিত্র হাত আমার বুকের উপর রাখেন আর দোয়া করেন, 'হে আল্লাহ্ !' এর থেকে শয়তানকে দূর করে দাও।' অতঃপর আমি যখন দৃষ্টি উঠাই, আমার চোখ, কান ও প্রাণ থেকেও হযরত (সাঃ)-কে অধিক প্রিয় মনে হচ্ছিল। তারপর তিনি আদেশ দেন, যাও, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। আমার তখন এ অবস্থা যে, হযরতের (সাঃ) জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। তাই কাফেরদের সাথে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করি। যুদ্ধ শেষে হযরত (সাঃ) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর খেদমতে হাযির হই। তিনি আমার মনের গোপন দুরভিসন্ধি প্রকাশ করে বলেন, মক্কা থেকে মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছিলে। আর আমাকে হত্যার জন্যে আশে পাশে ঘুরছিলে। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল তোমার দ্বারা সং কাজ করানো। পরিশেষে তাই হ'ল।

এ ধরনের ঘটনা ঘটে নযর ইবনে হারেসের সাথে, তিনিও এ উদ্দেশ্যে হোনাইন গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে আল্লাহ্ তাঁর অন্তরে হযরতের (সাঃ) ভালবাসা প্রবর্ত্ত করান। ফলে একজন মুসলিম যোদ্ধারূপে কাফেরদের মোকাবেলা করেন।

তেমনি ঘটনা ঘটে আবু বুরদা ইবনে নাযার (রাঃ)-এর সাথে। তিনি 'আওতাস' নামক স্থানে পৌছে দেখেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক বুকের নীচে উপবিষ্ট। তাঁর পাশে অন্য একজন লোক। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে হযরত (সাঃ) বলেন, এক সময় আমার তন্দ্রা এসে যায়। এ সুযোগে লোকটি আমার তরবারিটি হাতে নিয়ে আমার শির পাশে এসে বলে, হে মুহাম্মদ ! এবার বল, আমার হাত থেকে তোমায় কে রক্ষা করবে? বললাম, আল্লাহ্ আমার হেফাযতকারী। একথা শুনে তরবারিটি তার হাত থেকে খসে পড়ে। আবু বুরদা (রাঃ) বলেন, ইয়া-রসূলুল্লাহ্ ! অনুমতি দিন, আল্লাহ্র এই শত্রুর গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দিই। একে শত্রুদলের গোয়েন্দা মনে হচ্ছে। হযরত (সাঃ) বলেন, তুমি ধাম, আল্লাহ্র দীন অপরাপের দীনকে পরাজিত না করা অবধি আল্লাহ্ আমার হেফাযত করে যাবেন। এ বলে লোকটিকে বিনা তিরস্কারে মুক্তি দিলেন। সে যাহোক, মুসলিম সেনাদল হোনাইন নামক স্থানে পৌছে শিবির স্থাপন করে। এ সময় হযরত সুহাইল ইবনে

হান্‌যালা (রাঃ) রসূলুল্লাহ্‌কে এসে বলেন, জনৈক অনুসারী এসে শত্রুদলের সংবাদ দিয়েছে যে, তারা পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পাদসহ রণাঙ্গনে জমায়েত হয়েছে। শ্মিতহাস্যে হযরত (সাঃ) বলেন, চিন্তা করো না ! ওদের সবকিছু গণীমতের মালামাল হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হবে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হোনাইনে অবস্থান নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হাদাদ (রাঃ)-কে শত্রুদলের অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্যে গোয়েন্দারূপে পাঠান। তিনি দু'দিন তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের সকল যুদ্ধ প্রস্তুতি অবলোকন করেন। এক সময় শত্রু সেনানায়ক মালেক ইবনে আউককে স্বীয় লোকদের একথা বলতে শোনেন, 'মুহাম্মদ এখনো কেন সাহসী যোদ্ধাবাদ্দের পাল্লায় পড়েনি। মক্কার নিরীহ কোরাইশদের দমন করে তিনি বেশ দক্ষিণ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারবেন কার সাথে তাঁর মোকাবেলা। আমরা তাঁর সকল দস্ত চূর্ণ করে দেব। তোমরা কল ভোরেই রণাঙ্গনে এরূপ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে যে, প্রত্যেকের পেছনে তার স্ত্রী-পরিজন ও মালামাল উপস্থিত থাকবে। তরবারির কোষ ভেঙে ফেলবে এবং সকলে এক সাথে আক্রমণ করবে।' বস্তৃতঃ এদের ছিল প্রচুর যুদ্ধ অভিজ্ঞতা। তাই তারা বিভিন্ন ঘাঁটিতে কয়েকটি সেনাদল লুক্কায়িত রেখে দেয়।

এ হল শত্রুদের রণপ্রস্তুতির একটি চিত্র। কিন্তু অন্যদিকে এক হিসাবে এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ, যাতে অংশ নিয়েছে চৌদ্দ হাজারের এক বিরাট বাহিনী। এছাড়া অশ্রু-শস্ত্রও ছিল আগের তুলনায় প্রচুর। ইতিপূর্বের ওমদ ও বদর যুদ্ধে মুসলমানদের এ অভিজ্ঞতা হয় যে, মর তিনশ' তের জন প্রায় নিরস্ত্র লোকের হাতে পরাজয় বরণ করেছে এক হাজার কাফের সৈন্য। তাই হোনাইনের বিরাট যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রেক্ষিতে হাদীসতত্ত্ববিদ 'হাকেম' ও 'বাজ্জার'-এর বর্ণনামতে কতিপয় মুসলিম সেনা উৎসাহের আতিশয্যে এ দাবী করে বসে যে, আজকের জয় অনিবার্য, পরাজয় অসম্ভব। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাই শত্রুদল পলাতে বাধ্য হবে।

কিন্তু মুসলমানরা আল্লাহ্র উপর ভরসা না করে জনবলের উপর ভর্য থাকবে এটা আল্লাহ্র পছন্দ ছিল না। এটাই হোনাইনের যুদ্ধে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে।

হাওয়ায়েন গোত্র পূর্ব পরিকল্পনা মতে মুসলমানদের প্রতি সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালনা করে। একই সাথে বিভিন্ন ঘাঁটিতে লুক্কায়িত কাফের সেনারা চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের ঘিরে ফেলে। এ সময় আর ধূলি-ঝড় উঠে সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে, এতে সাহাবীগণের পক্ষে স্ব স্ব অবস্থানে টিকে থাকা সম্ভব হল না। ফলে তারা পিছু হটতে শুরু করেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অশ্রু চালিয়ে সামনের দিকে বাড়তে থাকেন। আর তাঁর সাথে ছিলেন অঙ্গসংখ্যক সাহাবী, যাদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন শ'। অন্য রেওয়াজে মতে এক শ' কিংবা তারও কম, যারা হযরত (সাঃ)-এর সাথে অটল রইলেন। কিন্তু এদেরও মনোবাহু ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেন আর অগ্রসর না হন।

এ অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন, উচ্চৈঃস্বরে ডাক দাও, বুকের নীচে জেহাদের বায়আত গ্রন্থকারী সাহাবীগণ কোথায়? সূরা বাব্বারাবুয়ালা কোথায়? জান কোরবানে প্রতিশ্রুতিদানকারী আনসারগণই বা কোথায়? সবাই ফিরে এস, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এখানে আছেন।

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَتِمُّوا الشُّرُكُوْنَ
 بِحَسْرٍ وَلَا تَقْرَبُوا السَّبِيْحَةَ اَحْرَامَ بَعْدَ عَلْوِهِمْ هٰذَا ۚ
 اِنْ خِفْتُمْ عِيْلَةً فَمَوْتُ يَغْنِبْكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اِنْ شِئْتُمْ
 اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ
 وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُعْتَزُّوْنَ بِمَا حَسَرَهُمُ اللَّهُ وَ
 رَسُوْلُهُ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنََ الْحَقِّ مِنَ الْاَكْثَرِيْنَ
 اَوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يَضُطُّوا الْحَرْبَ عَنْ يَدَيْهِمْ وَهُمْ
 طٰغِرُوْنَ ۝ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ لِّبْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ
 النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ يَاقَوْلِهِمْ
 يَضَاهُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ
 قَاتَلَهُمُ اللَّهُ اَتْلٰى يُوَفُّوْنَ ۝ اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ
 وَرُهَبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَالْمَسِيْحَ
 ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَا اُمُّرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا
 لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

(২৭) এরপর আল্লাহ যাদের প্রতি ইচ্ছা তওবার তওফীক দেবেন, আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৮) ‘হে ঈমানদারগণ মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল-হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (২৯) ‘তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ্ হাশেরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিমিয়া প্রদান করে। (৩০) ইহুদীরা বলে ‘ভগাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে ‘মসীহ আল্লাহর পুত্র। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাকেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন্ উল্টা পথে চলে যাচ্ছে। (৩১) তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র যাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন যাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র।

হযরত আব্বাসের (রাঃ) এ আওয়ায রশাদনকে প্রকাশিত করে তোলে। পলায়নরত সাহাবীগণ ফিরে দাঁড়ান এবং প্রবল সাহসিকতার সাথে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে চলেন। ঠিক এ সময় আল্লাহ এঁদের সাহায্যে ফেরেশতাদল পাঠিয়ে দেন। এরপর যুদ্ধের ঘোড় ঘুরে যায়, কাকের সেনানায়ক মালেক ইবনে আউফ পরিবার-পরিজন ও মালামালের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং তায়ফ দুর্গে আত্মগোপন করে। এরপর গোটা শতাব্দী পালাতে শুরু করে। এ যুদ্ধে সত্তর জন কাকের নেতা নিহত হয়। কতিপয় মুসলমানদের হাতে কিছু শিশু আহত হয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) এটাকে শক্ত ভাষায় নিষেধ করেন। যুদ্ধ শেষে মুসলমানদের হাতে আসে তাদের সকল মালামাল, ছয় হাজার যুদ্ধবন্দী, চব্বিশ হাজার উষ্ট্র, চব্বিশ হাজার বকরী এবং চার হাজার উকিয়া রোপ্য।

আলোচ্য ২৫ ও ২৬ নং আয়াতে যুদ্ধের এদিকটি তুলে ধরে বলা হয় যে, তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলে। কিন্তু সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কাছে আসল না। প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্যে সঙ্কুচিত হয়ে গেল, তারপর তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছিলে। অতঃপর আল্লাহ সান্দ্বনা নাখিল করলেন আপন রসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর এবং ফেরেশতাদের এমন সৈন্যদল প্রেরণ করলেন, যাদের তোমরা দেখনি। তারপর তোমাদের হাতে কাকেরদের শাস্তি দিলেন। ‘অতঃপর আল্লাহ সান্দ্বনা নাখিল করলেন আপন রসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর’। এ বাক্যের অর্থ হল হেনাইন যুদ্ধের প্রথম আক্রমণে যে সকল সাহাবী আপন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোবল ফিরে পাবার পর স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে আসেন; আর রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আপন অবস্থানে সুদৃঢ় হন। সাহাবীদের প্রতি সান্দ্বনা প্রেরণের অর্থ হল, তাঁরা বিজয় সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহর সান্দ্বনা ছিল দুই প্রকার। এক প্রকার পলায়নরত সাহাবীদের জন্যে অন্য প্রকার হযরতের (সাঃ) সাথে যারা সুদৃঢ় ছিলেন তাঁদের জন্যে। এ কথার ইঙ্গিত দানের জন্যে ‘উপর’ শব্দটি দু’বার ব্যবহার করা হয়। যেমন, ‘অতঃপর আল্লাহ সান্দ্বনা নাখিল করলেন তাঁর রসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর’।

অতঃপর বলা হয় : وَأَنْزَلَ جُودًا لَّهُمْ وَهَمًا এবং প্রেরণ করলেন এমন সৈন্যদল যাদের তোমরা দেখনি। এটি হল সাধারণ লোকের ব্যাপারে। তাই কেউ কেউ দেখেছেন বলে কতিপয় রেওয়ায়েতে যে বর্ণিত আছে, তা উপরোক্ত উক্তির বিরোধী নয়। এ আয়াতের শেষ বাক্য হল : وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَاُ الْكَافِرِيْنَ “আর শাস্তি দিলেন কাকেরদের”। এ শাস্তি বলতে বোঝায় মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়া, যা স্পষ্ট প্রতিভাত হল। আর এটি ছিল পার্থিব শাস্তি, যা দ্রুত কার্যকর হল। পরবর্তী আয়াতে আখেরাতের

আনুযমিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“অতঃপর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা তওবা নসীব করবেন। আল্লাহ অতীব মার্জনাকারী, পরম দয়ালু” এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, যারা মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়ার শাস্তি পেয়েছে এবং এখনো কুফরী আদর্শের উপর অটল রয়েছে, তাদের কিছুসংখ্যক লোককে আল্লাহ ঈমানের তওফীক দেবেন। নিম্নে এ ধরনের ঘটনার বিবরণ দেয়া

হল।

হোনাইন যুদ্ধে হাওয়ায়েন ও সকীফ গোত্রের কতিপয় সরদার নিহত হয়; কিছু পালিয়ে যায়। তাদের পরিবার-পরিজন বন্দীরাপে এবং মালামাল গণীমতরূপে মুসলমানদের আয়ত্তে আসে।

অতঃপর পরাজিত হাওয়ায়েন ও সকীফ গোত্রদ্বয় বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক স্থানে তারা পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত তারা তায়েফের এক মজবুত দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করে। রসূলে করীম (সাঃ) পনের-বিশ দিন পর্যন্ত এই দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। ওরা দুর্গ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস তাদের কারো ছিল না। সাহাবায়ে কেবাম বলেন, ইয়া রসূলান্নাহ্! এদের বদদোয়া দিন। কিন্তু তিনি এদের জন্যে হেদায়েতের দোয়া করেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেবামের সাথে পরামর্শ করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জি'রানা নামক স্থানে পৌঁছে প্রথমে মক্কা গিয়ে ওমরা আদায় ও পরে মদীনা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অপর দিকে মক্কাবাসীদের যারা মুসলমানদের শেষ পরিণতি দেখার উদ্দেশ্যে দর্শকরূপে যুদ্ধে এসেছিল, তাদের অনেকে ইসলামের সত্যতা প্রত্যক্ষ করে উক্ত জি'রানা নামক স্থানে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

আত্মপ্রসাদ পরিত্যাজ্য : উল্লেখিত আয়াতগুলোর প্রথম হেদায়েত হল, মুসলমানদের কোন অবস্থায় শক্তি-সামর্থ্য ও সংখ্যাধিক্যের উপর আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত নয়, সম্পূর্ণ নিঃশ্রবস্থায় যেমন তাদের দৃষ্টি আল্লাহর সাহায্যের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে, তেমন সকল শক্তি-সামর্থ্য থাকবস্থায়ও আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে।

হোনাইন যুদ্ধের পর্যাণ্ত পরিমাণ সাজ-সরঞ্জাম ও সংখ্যাধিক্য দেখে কতিপয় সাহাবী যে আত্মগর্বের সাথে বলেছিলেন, আজকের যুদ্ধে কেউ আমাদের পরাস্ত করতে পারবে না, আল্লাহর নিকট তাঁর প্রিয় বন্দাদের মুখ থেকে এ ধরনের কথা পছন্দ হচ্ছিল না। যার ফলে রণাঙ্গনে কাফেরদের প্রথম ধাক্কা সামলাতে না পেরে তাঁরা পলায়নপর হয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহর গাভী সাহায্য পেয়ে তাঁরা এ যুদ্ধে জয়ী হন।

বিজিত শত্রুর মালামাল গ্রহণে ন্যায়নীতি বিসর্জন না দেয়া : দ্বিতীয় হেদায়েত যা এই ঘটনা থেকে হাসিল হয়, তাহল এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হোনাইন যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে মক্কার বিজিত কাফেরদের থেকে যে যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিয়েছিলেন তা ধারস্বরূপ ছিল এবং প্রত্যর্পণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়েছিলেন এবং পরে এ প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করেছিলেন। অথচ, এরা ছিল বিজিত ও ভীত-সন্তুষ্ট। তাই জোর করেও সমর্পন আদায় করা যেত। কিন্তু হযরত (সাঃ) তা করেননি। এতে রয়েছে শত্রুর সাথে পূর্ণ সদািবহারের হেদায়েত।

তৃতীয় : রসূলুল্লাহ (সাঃ) হোনাইন গমনকালে 'খাইফে বনী কেনানা' নামক স্থান সম্পর্কে বলেছিলেন, আগামীকালের অবস্থান হবে আমাদের সেখানে, যেখানে মক্কার কোরাইশগণ মুসলমানদের একঘরে করে রাখার প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছিল। এতে মুসলমানদের প্রতি যে হেদায়েত আছে, তাহল, আল্লাহ তাদের শক্তি-সামর্থ্য ও বিজয় দান করলে বিগত বিপদের কথা যেন ভুলে না যায় এবং যাতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। দুর্গে আশ্রয় নেয়া হাওয়ায়েন গোত্রের বাণ নিক্ষেপের জবাবে বদ-দোয়ার পরিবর্তে হেদায়েত লাভের যে দোয়া হযরত (সাঃ) করেছেন—তাতে রয়েছে এই শিক্ষা যে, মুসলমানের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য শত্রুকে নিছক

পরাস্ত করা নয়; বরং উদ্দেশ্য হল হেদায়েতের পথে তাদের নিয়ে আসা। তাই এ চেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

চতুর্থ : পরাজিত শত্রুদের থেকেও নিরাশ হওয়া উচিত নয়; আল্লাহ ইসলাম ও ঈমানের হেদায়েত তাদেরও দিতে পারেন। যেমন হাওয়ায়েন গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের তওফীক দিয়েছিলেন।

হাওয়ায়েন গোত্রের যুদ্ধবন্দী মুস্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণের মতামত জানতে চেয়েছিলেন এবং তাঁরা আনন্দের সাথে রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও সকলের ব্যক্তিগত মতামত যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, হকদারের পূর্ণ সন্তুষ্টি ছাড়া কেউ তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। লজ্জা বা জনগণের চাপে কেউ নীরব থাকলে তা সন্তুষ্টি বলে ধর্তব্য হবে না। আমাদের মাননীয় ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ এ থেকে মাসআলা বের করেন যে, ব্যক্তিগত প্রভাব দেখিয়ে কারো থেকে ধর্মীয় প্রয়োজনে চান্দা আদায় করাও জায়েয নয়। কারণ, অবস্থার চাপে পড়ে বা লজ্জা রক্ষার খাতিরে অনেক ভুললোকই অনেক সময় কিছু না কিছু দিয়ে থাকে, অথচ অজ্ঞ এতে পূর্ণ সায দেয় না। এ ধরনের অর্থ-কড়িতে বরকতও পাওয়া যায় না।

.... فَلَا يَفْرَأُوا السَّيِّئَاتِ الْحَوَامِلَ - সুতরাং তারা এ বছরের পর যেন মসজিদুল-হারামের নিকটবর্তী না হয়।

'মসজিদুল-হারাম' বলতে সাধারণতঃ বোঝায় বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকের আঙ্গিনাকে যা দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। তবে কোরআন ও হাদীসে কোন কোন স্থানে তা মক্কার পূর্ণ হরম শরীফ অর্থেও ব্যবহৃত হয় যা কয়েক বর্গমাইল এলাকাব্যাপী। যার সীমানা চিহ্নিত করেছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। যেমন, মে'রাজের ঘটনায় মসজিদুল-হারাম উল্লেখ রয়েছে। ইমামগণের ঐকমত্যে এখানে মসজিদুল-হারাম অর্থ বায়তুল্লাহর আঙ্গিনা নয়। কারণ, মে'রাজের শুরু হয় হযরত উম্মে হানী (রাঃ)-এর গৃহ থেকে, যা ছিল বায়তুল্লাহর আঙ্গিনার বাইরে অবস্থিত। অনুরূপ সূরা তওবার শুরুতে যে মসজিদুল হারাম - এর উল্লেখ রয়েছে **الَّذِينَ هُمْ عَنْهُ وَعَدَّ اللَّهُ** তার অর্থও পূর্ণ হরম শরীফ। কারণ, এখানে উল্লেখিত সজির স্থান হল 'হোদায়বিয়া' যা হরম শরীফের সীমানার বাইরে তার সন্নিকটে অবস্থিত।— (জাসাস)। এ বছরের পর মুশরিকদের জন্যে পূর্ণ হারাম-শরীফে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হল।

তবে এ বছর বলতে কোনটি বোঝায় তা নিয়ে মুফাসসিরগণের কিছু মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, দশম হিজরী। তবে অধিকাংশ মুফাসসের মতে তাহল নবম হিজরী। কারণ, নবী করীম (সাঃ) নবম হিজরীর হজ্জের মৌসুমে হযরত আলী ও আবু বকর সিন্দীক (রাঃ)-এর দ্বারা কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করান, তাই নবম হিজরী থেকে দশম হিজরী পর্যন্ত ছিল অবকাশের বছর। দশম হিজরীর পর থেকেই এ নিষেধাজ্ঞা জারী হয়।

কতিপয় প্রশ্ন : উল্লেখিত আয়াত দ্বারা দশম হিজরীর পর মসজিদুল-হারামে মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এতে তিনটি প্রশ্ন আসে। প্রথম, এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মসজিদুল-হারামের জন্যে, না অন্যান্য মসজিদের জন্যেও? দ্বিতীয়, মসজিদুল-হারামের জন্যে হতে থাকলে তা কি সর্বাবস্থার জন্যে, না শুধু হজ্জ ও ওমরার জন্যে? তৃতীয়, এ নিষেধাজ্ঞা কি শুধু মুশরিকদের জন্যে, না আহলে-কিতাব কাফেরদের জন্যেও?

এ সকল প্রশ্নের উত্তরে কোরআন নীরব। তাই ইজতিহাদকারী ইমামগণ কোরআনের ইশারা-ইঙ্গিত ও হযরত (সাঃ)-এর হাদীস সামনে রেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে প্রথমে আলোচনা করতে হয়, কোরআন মজিদ মুশরিকদের যে অপবিত্র ঘোষণা করেছে, তা কোন দৃষ্টিতে? যদি প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য জানাবত ইত্যাদি অপবিত্রহেতু বলা হয়ে থাকে, তবে তর্কের কিছুই নেই। কারণ, দৃশ্যমান অপবিত্র বস্তু সাথে রেখে কিংবা গোসল ফরয হয়েছে এরূপ নারী-পুরুষের মসজিদে প্রবেশ জায়েয নয়। পক্ষান্তরে কথ্যটি যদি কুফর-শেরকের গোপন অপবিত্রতার দৃষ্টিকোণে বলা হয়ে থাকে, তবে সম্ভবতঃ এর হুকুম হবে ভিন্ন।

‘তহসীরে-কুরতুবীতে বলা হয়েছে : মদীনার ফেকাহশাস্ত্রবিদগণ জ্ঞা ইমাম মালেক (রহঃ) ও অন্যান্য ইমামগণের মতে মুশরিকরা যে কোন দৃষ্টিকোণে অপবিত্র। কারণ, তারা প্রকাশ্য অপবিত্রতা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করে না। তেমনি ফরয গোসলেরও ধার ধারে না। তদুপরি কুফর শিরকের বাতেনী অপবিত্রতা তো তাদের আছেই। সুতরাং সকল মুশরিক এবং সকল মসজিদের জন্যেই হুকুমটি সাধারণভাবে প্রযোজ্য।

এ মতের সমর্থনে তাঁরা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের (রহঃ) একটি ফরমানকে দলীলরূপে পেশ করেন, যা তিনি বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসকগণকে লিখেছিলেন। এতে লেখা ছিল, “মসজিদসমূহে কাফেরদের প্রবেশ করতে দেবে না।” এ ফরমানে তিনি উপরোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করেছিলেন। তাঁদের দ্বিতীয় দলীল হল নবী করীম (সাঃ)-এর এই হাদীস : ‘কোন ঋতুবতী মহিলা বা গোসল ফরয হয়েছে এরূপ ব্যক্তির পক্ষে মসজিদে প্রবেশ করাকে আমি জায়েয মনে করি না।’ আর এ কথা সত্য যে, কাফের-মুশরিকগণ ফরয গোসল সাধারণতঃ করে না। তাই তাদের জন্যে মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, হুকুমটি কাফের মুশরিক এবং আহলে-কিতাব সকলের জন্যে প্রযোজ্য, কিন্তু তা শুধু মসজিদুল-হারামের জন্যে নির্দিষ্ট; অপরাপর মসজিদে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়।—(কুরতুবী) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর দলীল হল ছুমায়া ইবনে উছালের ঘটনাটি। তিনি ইসলাম গ্রহণের আগে একস্থানে মুসলমানদের হাতে বন্দী হলে নবী করীম (সাঃ) তাকে মসজিদে নববীর এক খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে উপরোক্ত আয়াতে মসজিদুল-হারামের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্যে মুশরিকদের প্রতি যে আদেশ রয়েছে, তার অর্থ হল, আগামী বছর থেকে মুশরিকদের স্থায়ী রীতি অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরা আদায়ের অনুমতি দেয়া যাবে না। তাঁর দলীল হল, হজ্জর যে মৌসুমে হযরত আলী (রাঃ)-এর দ্বারা কাফেরদের সাথে সপর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়, তাতে একথা ছিল لا يحجن بعد العام مشرك অর্থাৎ, ‘এ বছর পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না।’ তাই এ ঘোষণার আলোকে আয়াত ...فَلَا يَزِيدُ الْوَيْسَجُ الْحُكْمَ অর্থাৎ, ‘মুশরিকগণ মসজিদুল-হারামের নিকটবর্তী হবে না’—এর অর্থ হবে আগামী বছর থেকে মুশরিকদের জন্যে হজ্জ ও ওমরা নিষিদ্ধ করা হল। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অতঃপর বলেন, হজ্জ ও ওমরা ছাড়া মুশরিকগণ অন্য কোন প্রয়োজনে আমীরুল-মু’মিনীনের অনুমতিক্রমে মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করতে পারবে।

এ মতের সমর্থনে তাঁর দলীল হলো, মক্কা বিজয়ের পর সকীফ গোত্রের

প্রতিনিধিবৃন্দ নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে মসজিদে তাদের অবস্থান করানো হয়। অথচ, এরা তখনও অমুসলমান ছিল এবং সাহাবায়ে করামও আপত্তি তুলেছিলেন, ইয়া রসূলান্নাহু, এরা তো অপবিত্র। হযরত (সাঃ) তখন বলেছিলেন, ‘মসজিদের মাটি এদের অপবিত্রতায় প্রভাবিত হবে না।’—(জাসসাস)

এ হাদীস দ্বারা একথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কোরআন-মজীদে মুশরিকদের যে অপবিত্র বলা হয়েছে, তা তাদের কুফর ও শিরকজনিত বাতেনী অপবিত্রতার কারণে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এ মতেরই অনুসারী। অনুরূপ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, কোন মুশরিক মসজিদের নিকটবর্তী হবে না। তবে সে কোন মুসলমানের দাস বা দাসী হলে প্রয়োজন-বোধে প্রবেশ করতে পারে।—(কুরতুবী)

এ হাদীস থেকেও বোঝা যায় যে, প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণে মসজিদুল-হারাম থেকে মুশরিকদের বারণ করা হয়নি। নতুবা দাস-দাসীকে পৃথক করা যেত না, বরং আসল কারণ হল কুফর ও শিরক এবং এ দুয়ের প্রভাব-প্রতিপত্তির আশংকা। এ আশংকা দাস-দাসীর মধ্যে না থাকায় তাদের অনুমতি দেয়া হল। এছাড়া প্রকাশ্য অপবিত্রতার দৃষ্টিকোণে কাফের-মুশরিক-মুসলমান সমান। অপবিত্র বা গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় তো মুসলমানগণও মসজিদুল-হারামে প্রবেশ করতে পারবে না।

তদুপরি, অধিকাংশ মুফাসসেরগণের মতে এখানে মসজিদুল-হারাম বলতে যখন পূর্ণ হরম শরীফ উদ্দেশ্য, তখন এ নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ্য অপবিত্রতার কারণে না হয়ে কুফর-শিরকজনিত অপবিত্রতার কারণে হওয়া অধিকতর সম্ভব। এজন্যে শুধু মসজিদুল-হারামের নয়, বরং পূর্ণ হরম শরীফে মুশরিকদের প্রবেশও নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ, এটি হল ইসলামের দুর্গ।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর উপরোক্ত তত্ত্বের সার কথা হল, কোরআন ও হাদীসমতে মসজিদসমূহকে অপবিত্রতা থেকে বিশুদ্ধ রাখা আবশ্যিক এবং এটি জরুরী বিষয়, কিন্তু আমাদের আলোচ্য আয়াতটি এ বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং তা ইসলামের সেই বুনিয়াদী হুকুমের সাথে সংশ্লিষ্ট, যার ঘোষণা রয়েছে সূরা বরাআতের শুরুতে। অর্থাৎ, অচিরেই হরম শরীফকে সকল মুশরিক থেকে পবিত্র করে নিতে হবে। কিন্তু আদর্শ ও ন্যায়নীতি এবং দয়া ও অনুকম্পার প্রেক্ষিতে মক্কা বিজয়ের সাথে সাথেই তাদের হরম শরীফ ত্যাগের আদেশ দেয়া হয়নি; বরং যাদের সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তের চুক্তি ছিল এবং যারা চুক্তির শর্তসমূহ পালন করে যাচ্ছিল, তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার এবং অন্যান্যদের কিছু দিনের সুযোগ দিয়ে চলতি সালের মধ্যেই এই আদেশ কার্যকরী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়, ‘এবছরের পর-পূর্ণ হরম-শরীফে মুশরিকদের প্রবেশাধিকার থাকবে না।’ তারা শেরেকী প্রথা মতে হজ্জ ও ওমরা আদায় করতে পারবে না। সূরা তওবার আয়াতে যেমন পরিস্কার ঘোষণা দেয়া হয় যে, নবম হিজরীর পর কোন মুশরিক হরমের সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে না। রসূলে করীম (সাঃ) এ আদেশকে আরও ব্যাপক করে হুকুম দেন যে, গোটা আরব উপদ্বীপে কোন কাফের-মুশরিক থাকতে পারবে না। কিন্তু হযরত (সাঃ) নিজে এ আদেশ কার্যকর করতে পারেননি। অতঃপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর পক্ষেও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সমস্যায় জড়িত থাকার ফলে তা সম্ভব হয়নি। তবে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর শাসনামলে আদেশটি যথাযথভাবে প্রয়োগ

করেন।

ইতিপূর্বে মক্কার মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ ছিল। আর এ আয়াতদ্বয়ে আহলে-কিতাবের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ রয়েছে। তাবুকে আহলে কিতাবের সাথে মুসলমানদের যে যুদ্ধ-অভিযান সংঘটিত হয়েছিল, আয়াত দু'টি তারই পটভূমি। 'তফসীরে-দুররে মনসুরে' মুফাসসেরে-কোরআন হযরত মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, উক্ত আয়াত দু'টি তাবুক যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিল।

আভিধানিক অর্থে 'আহলে-কিতাব' বলতে যদিও সেই কাফের দলসমূহকে বোঝায়, যারা কোন না কোন আসমानी কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী; কিন্তু কোরআনের পরিভাষায় আহলে-কিতাব বলতে বোঝায় শুধু ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের। কারণ, আরবের আশেপাশে এই দু-সম্প্রদায়ই আহলে-কিতাব নামে সমধিক পরিচিত ছিল। এজন্যে কোরআনে আরবের মুশরিকদের সম্বোধন করে বলা হয় : **أَنْتُمْ وَالْأَسْمَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا** অর্থাৎ,

তোমরা হয়তো বলতে পার যে, কিতাব তো শুধু আমাদের পূর্বে দু'সম্প্রদায়ের প্রতিই নাযিল হয়েছিল, আর আমরা তো এর পঠন ও পাঠন থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলাম—(আনআমঃ-১৫৬)।

আহলে-কিতাবের উল্লেখ করে অত্র আয়াতদ্বয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করার যে নির্দেশ রয়েছে, তা শুধু আহলে কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ আদেশ রয়েছে সকল কাফের সম্প্রদায়ের জন্যেই। কারণ, যুদ্ধ করার যে সকল হেতু সামনে বর্ণিত হয়েছে, তা' সকল কাফেরদের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং এ আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। তবে বিশেষভাবে আহলে-কিতাবের উল্লেখ করা হয় মুসলমানদের এ দ্বিধা নিবারণ-উদ্দেশ্যে যে, ইহুদী-খ্রীষ্টানেরা অস্তিত্বঃ তাওরাত-ইঞ্জিল এবং হযরত মুসা ও ঈসা (আঃ)-এর প্রতি তো ঈমান রাখে। অতএব, পূর্বের আশ্বিয়া (আঃ) ও কিতাবের সাথে তাদের সম্পর্ক থেকে মুসলমানের জেহাদী মনোভাবের জন্য বাধা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাই বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ বিশেষভাবে আহলে-কিতাবের উল্লেখ করার মাঝে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, তারা এই দৃষ্টিকোণে অধিক শাস্তির যোগ্য। কারণ, এরা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী। এদের কাছে তওরাত ইঞ্জিলের জ্ঞান, যে তাওরাত ও ইঞ্জিলের রয়েছে রসুলে করীম (সাঃ) সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী, এমনকি তাঁর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা। এ সত্ত্বেও তাদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়।

প্রথম আয়াতে যুদ্ধের চারটি হেতুর বর্ণনা রয়েছে। প্রথমতঃ **لَا يُؤْمِنُونَ** তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে না। দ্বিতীয়তঃ **وَلَا يَأْتِيهِمُ الْآخِزُ** রোজ হাশরের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই। তৃতীয়তঃ

وَلَا يَحِزُّونَ مَا حَزَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ সত্য ধর্ম গ্রহণে তারা অনিচ্ছুক। আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে তারা হারাম মনে করে না। চতুর্থতঃ

এখানে প্রশ্ন জাগে, ইহুদী-খ্রীষ্টানেরা তো বাহ্যতঃ আল্লাহ, পরকাল ও রোজ কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী নয়। যে ঈমান বিশ্বাস আল্লাহর অভিপ্রেত, তা না হলে তার কোন মূল্য নেই। ইহুদী-খ্রীষ্টানেরা যদিও প্রকাশ্যে আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার করে না, কিন্তু পরবর্তী আয়াতের বর্ণনা মতে ইহুদীদের কর্তৃক হযরত ওয়াইর ও খ্রীষ্টানদের কর্তৃক হযরত

ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করা প্রকারান্তরে শিরক তথা অশ্বীবাদকে স্বীকার করে নেয়া। তাই তাদের তাওহীদ ও ঈমানের দাবী অর্থহীন।

অনুরূপ, আখেরাতের প্রতি যে ঈমান-বিশ্বাস রাখা আবশ্যিক জ্ঞ আহলে-কিতাবের অধিকাংশের মধ্যে নেই। তাদের অনেকের ধারণা হল, রোজ কেয়ামতে মানুষ জড়দেহ নিয়ে উঠবে না; বরং তা হবে মানুষের এক ধরনের রূহানী জিন্দেগী। তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, জন্মাত জাহান্নাম বিশেষ কোন স্থানের নাম নয়; বরং আত্মার শাস্তি হল জন্মাত আর অশাস্তি হল জাহান্নাম। তাদের এ বিশ্বাস কোরআনের পেশকৃত ধ্যান-ধারণার বরখেলাফ। সুতরাং আখেরাতের প্রতি ঈমানও তাদের যথাযোগ্য নয়।

তৃতীয় হেতুর উল্লেখ করে বলা হয় যে, ইহুদী-খ্রীষ্টানেরা আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হারাম মনে করে না। এ কথা অর্থ হল-তওরাত ও ইঞ্জিলে যে সকল বস্তুকে হারাম করে দেয়া হয়েছে, তা তারা হারাম বলে গণ্য করে না। যেমন, সুদ ও কতিপয় খাদ্যদ্রব্য-যা তওরাত ও ইঞ্জিলে হারাম ছিল, তারা সেগুলোকে হারাম মনে করত না।

এ থেকে একটি মাসআলা পরিষ্কার হয় যে, আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল মনে করা যে শুধু পাপ তা' নয়, বরং কুফরীও বটে। অনুরূপ কোন হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করাও কুফরী। তবে হারামকে হারাম মনে করে কেউ যদি ভুলে অসতর্ক পদক্ষেপ নেয়, তবে তা কুফরী নয়, বরং জা গোনাহ ও ফাসেকী।

আয়াতে উল্লেখিত **حَتَّى يَخُوتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ مُلْتَمِعُونَ** "যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে" বাক্য দ্বারা যুদ্ধবিগ্রহে একটি সীমা ঠিক করে দেয়া হয়। অর্থাৎ, তাবেদার প্রজ্ঞারূপে জিযিয়া প্রদান না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

'জিযিয়া'র শাস্তিক অর্থ, বিনিময়' পুরস্কার। শরীয়তের পরিভাষায় জিযিয়া বলা হয় কাফেরদের প্রাণের বিনিময়ে গৃহীত অর্থকে।

জিযিয়ার তাৎপর্যঃ কুফর ও শিরক হল আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু আল্লাহ নিজের অসীম রহমতগুণে শাস্তির এই কঠোরতা হ্রাস করে ঘোষণা করেন যে, তারা যদি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজ্ঞারূপে ইসলামী আইন-কানুনকে মেনে নিয় থাকতে চায় তবে তাদের থেকে সামান্য জিযিয়াকর নিয়ে মৃত্যুদণ্ড থেকে তাদের অব্যাহতি দেয়া হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা বিধান থাকবে। কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। শরীয়তের পরিভাষায় এ হল জিযিয়া কর।

দু'পক্ষের সম্মতিক্রমে জিযিয়ার যে হার ধার্য হবে তাতে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ধার্যকৃত হারে জিযিয়া নেয়া হবে। যেমন, নাজ্জান গোত্রের সাথে হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর চুক্তি হয় যে, তারা সকলের পক্ষ থেকে বার্ষিক দু'হাজার জোড়া বস্ত্র প্রদান করবে। প্রতি জোড়ায় থাকবে একটা লুঙ্গি ও একটা চাদর। প্রতি জোড়ার মূল্যও ধার্য হয়। অর্থাৎ, এক উকিয়া রূপার সমমূল্য। চল্লিশ দিরহামে হয় এক উকিয়া। যা আমাদের দেশের প্রায় সাড়ে এগার তোলা রূপার সমপরিমাণ।

অনুরূপ তাগলিব গোত্রীয় খ্রীষ্টানদের সাথে হযরত ওমর (রাঃ)-এর চুক্তি হয় যে, তারা যাকাতের নেসাবের দ্বিগুণ পরিমাণে জিযিয়াকর প্রদান করবে।

মুসলমানগণ যদি কোন দেশ যুদ্ধ করে জয় করে নেয় এবং সে দেশের অধিবাসিগণকে তাদের সহায়-সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের উপর বহাল রাখা এবং তারাও ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত নাগরিক হিসাবে থাকতে চায়, তবে তাদের জিমিয়ার হার তা হবে যা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আপন শাসনকালে ধার্য করেছিলেন। তাহল, উচ্চবিস্তের জন্যে মাসিক চার দিরহাম, মধ্যবিস্তের জন্যে দু'দিরহাম এবং স্বাস্থ্যবান শ্রমিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি নিম্নবিস্তের জন্য মাত্র এক দিরহাম। অর্থাৎ, সাড়ে তিন মাশা রূপা অথবা তার সমমূল্যের অর্থ। গরীব-দুঃখী, বিকলাঙ্গ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ এবং সংসারত্যাগী ধর্মযাজকদের এই জিমিয়া কর থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

কিন্তু এই স্বল্প পরিমাণ জিনিষ আদায়ের বেলায় রসুলে করীম (সাঃ)-এর তাগিদ ছিল যে, কারো সাথের বাইরে কোনরূপ জোর-জবরদস্তি করা না হয়। হযরত (সাঃ) ইশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, “যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর যুলুম চালাবে, রোজ্ হাশরে আমি যালেমের বিরুদ্ধে ঐ অমুসলিমের পক্ষ অবলম্বন করব।” - (মায়হরী)

উপরোক্ত রেওয়াজেতসমুহের প্রেক্ষিতে কতিপয় ইমাম এক মত
 পোষণ করেন যে, শরীয়ত জিহিয়ার বিশেষ কোন হার নির্দিষ্ট করে দেয়নি,
 বরং তা ইসলামী শাসকের সুবিবেচনার উপর নির্ভরশীল। তিনি
 অমসলিমদের অবস্থা পর্যালোচনা করে যা সঙ্গত মনে হয়, ধার্য করবেন।

আমাদের এর পর্যন্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হল যে, জিহিয়া প্রথা 'ইসলামের বিনিময় নয়' বরং তা আদায় করা হয় কাফেরদের মৃত্যুদণ্ড মওকফের বিনিময়ে। সুতরাং এ সম্ভেই যেন না হয় যে, অল্প মূল্যের বিনিময়ে ওদের কুফরী অবস্থায় বহাল থাকার অনুমতি কেমন করে দেয়া হল? কারণ, এমন অনেক লোক আছে, যাদের স্বধর্ম অবিচল থেকে বিনা জিহিয়ায় ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি দেয়া হয়। যেমন, মসিলা, শিশু, বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ এবং যাজক সম্প্রদায়। ইসলামের বিনিময়ে জিহিয়া নেয়া হলে এরা কিছুতেই অব্যাহতি পেত না।

আলোচ্য আয়াতে عَنْ دُ'টি ব্যবহৃত হয়েছে। عَنْ অর্থ এখানে কারণ, ۛ অর্থ শক্তি ও বিজয়। তাই জিযিয়া যেন খয়রাতি চাঁদা প্রদানের মত না হয়; বরং তা হবে ইসলামের বিজয়কে মেনে নিয়ে একান্ত অনুগত নাগরিক হিসেবে। — রুহুল মা'আনী।) এরপরের বাক্য হল— وَهُوَ طِغْرُ' ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)—এর তফসীর অনুযায়ী এর অর্থ হল— তারা যেন ইসলামের সাধারণ আইন-কানূনের আনুগত্যকে নিজেদের কর্তব্যরূপে গ্রহণ করে নেয়। — (রুহুল-মা'আনী, তফসীরে মাযহরী)।

জিযিয়া প্রদানে স্বীকৃত হলে ওদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার যে আদেশ আয়াতে হয়েছে তা অধিকাংশ ইমামের মতে সকল অমুসলিমের বোলায়ই প্রযোজ্য। তারা আহলে-কিতাব হোক বা অন্য কেউ। তবে আরবের মুসলিমগণ এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের থেকে জিযিয়া গৃহীত হয়নি।

দ্বিতীয় আয়াত হল প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা। প্রথম আয়াতে মোটাটুটিভাবে বলা হয় যে, আহলে-কিতাবগণ আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না। দ্বিতীয় আয়াতে তার ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, ইহুদীরা হযরত ওয়াইর (আঃ) ও খ্রীষ্টানরা হযরত ইসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে।

তাই তাদের ঈমান ও তওহীদের দাবী নিরর্থক। এরপর বলা হয়—
 ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ يٰٓاُوْهُهُمُ ‘এটি তাদের মুখের কথা।’ এ বাক্যের দু’টি অর্থ
 হতে পারে। (এক) তারা নিজেদের ভ্রান্ত আকীদার কথা নিজ মুখেও
 স্বীকার করে। এতে গোপনীয়তা কিছুই নেই। (দুই) তারা মুখে যে কুফরী
 উক্তি করে যাচ্ছে তার পেছনে না কোন দলীল আছে, না কোন যুক্তি।
 অতঃপর বলা হয় ۞ يٰٓاٰمَنُوْنَ قَوْلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْلِ قَاتِلِهِمُ ۝

﴿أَنْ يُّؤْمِنُوا﴾ “এরা পূর্ববর্তী কাকেরদের মত কথা বলে, আল্লাহ এদের কব্বে করুন। ওরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে।” এতে অর্থ হল ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা নবীগণকে আল্লাহর পুত্র বলে পূর্ববর্তী কাকের ও মূশরিকদের মতই হয়ে গেল, তারা ফেরেশতা ও লাভ-মানাত মূর্তিদ্বয়কে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করেছিল।

উপরোক্ত আয়াত চতুর্থে ইহুদী-খ্রীষ্টান পণ্ডিত ও পীর-পুরোহিতগণের কুফরী উক্তি ও আমলের বিবরণ রয়েছে। احبار - عیبر - এর এবং رهبان - راهب - এর বহুবচন। عیبر ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের আলেমকে এবং راهب তাদের সংসারবিরাগীদেরকে বলা হয়।

প্রথম আয়াতে বলা হয় যে, ইহুদী-খ্রীষ্টানরা তাদের আলেম ও যাজক শ্রেণীকে আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিপালক ও মাবুদ সাব্যস্ত করে রেখেছে। অনুরূপ হয়রত ইসা (আঃ)-কেও মাবুদ মনে করে। তাঁকে আল্লাহর পুত্র মনে করায় তাঁকে মাবুদ বানানোর বিষয়টি তো পরিষ্কার, তবে আলেম ও যাজক শ্রেণীকে মাবুদ সাব্যস্ত করার দোষে যে দোষী করা হয়, তার কারণ হল, তারা পরিষ্কার ভাষায় ওদের মাবুদ না বললেও পূর্ণ আনুগত্যের যে হক বন্দার প্রতি আল্লাহর রয়েছে, তাকে তারা যাজক শ্রেণীর জন্যে উৎসর্গ রাখে। অর্থাৎ, তারা সর্ববিশ্বাস্য যাজক শ্রেণীর আনুগত্য করে চলে; তা আল্লাহ-রসুলের যতই বরখেলাফ হোক না কেন? বলাবাহুল্য, পুরোহিতগণের আল্লাহ-রসুল বিরোধী উক্তি ও আমলের আনুগত্য করা তাদেরকে মাবুদ সাব্যস্ত করার নামান্তর। আর এটি হল প্রকাশ্য কুফরী।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শরী'াতের মাসায়েল সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণের পক্ষে ওলামায়ে-কেরামের ফতোয়ার অনুসরণ বা ইজ্তিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজ্তাহিদ ইমামগণের মতামতের অনুসরণ-এর সাথে অত্র আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, এদের অনুসরণ হল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্-রসুলেরই আনুগত্য। এর তাৎপর্য হল, ইমাম ও আলেমগণ আল্লাহ্-রসুলের আদেশ-নির্দেশকে সরাসরি বিশ্লেষণ করে তার উপর আমল করেন। আর জনসাধারণ আলেমদের জিজ্ঞেস করে— তারপর সেমতে আমল করেন। যে ওলামায়ে-কেরামের ইজ্তিহাদী ক্ষমতা নেই তারাও ইজ্তিহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুজ্তাহিদ ইমামগণের পায়রবী করেন। এই পায়রবী হল কোরআনের নির্দেশক্রমে, কাছেই তা মূলতঃ আল্লাহুরই পায়রবী। কোরআনে এরশাদ হয় : **فَتَقَالُوا هَٰذَا هِيَ سُنَنُهُمُ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَنَنظُرُهُمْ كَقَبْلُ** অর্থাৎ, তোমরা যদি আল্লাহ ও রসুলের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হও, তবে বিজ্ঞ আলেমদের কাছে জিজ্ঞেস কর।

পক্ষান্তরে ইহুদী-খ্রীষ্টানরা আন্নাহর কিতাব এবং আন্নাহর রসুলের আদেশ-নিষেধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্বার্থপর আলেম এবং অজ্ঞ পুরোহিতদের কথা ও কর্মকে যে নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে, তারই নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় অত্র আয়াতে। অতঃপর বলা হয়, “এই গোমরাহী অবলম্বন করেছে বাটে, কিন্তু আন্নাহর আদেশ হল একমাত্র তাঁর এবাদত করার এবং তিনি তাদের শেরেকী কার্য কলাপ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।”

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَقْوَاهِمَ ۖ وَيَأْتِي
 اللَّهُ بِالذِّكْرِ لَئِلَّا يُطْفِئُوا نُورَهُ ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ مُو
 عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالْوُحُوشِ لَيْسَ كَمِثْلِ
 آمَالِ النَّاسِ ۚ يَا بَاطِلُ ۖ وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ
 وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْهَمُونَ
 سَبِيلَ اللَّهِ فَيَتَشَبَّهُمُ بِدَابِّ الدِّمِ ۖ يَوْمَ يُخْرِجُنَا عَنْهَا
 فِي أَرْجَحِهِمْ فَتَكُونُ بِهِمْ أَجْيَابًا هُمْ وَجَنَابُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
 هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۖ فَذَوُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝
 إِنَّ عَذَابَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ۖ
 كِتَابَ اللَّهِ يَوْمَ تَحُلُّ السَّيِّدَاتُ وَالْأَرْضُ مِنْهَا
 أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَلَا تَطْلُمُونَ
 فِيهِمْ أَنفُسُكُمْ ۖ وَقَاتِلُوا الشُّرِكِينَ ۚ كَافَّةً ۚ كَمَا
 يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝

(৩২) তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিবাপিত করতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন—যদিও কাফেররা তা অস্বীকার মনে করে। (৩৩) তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রসুলকে হেদায়েত ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অস্বীকার মনে করে। (৩৪) হে ঈমানদারগণ! গণিত ও সংসারবিরাগীদের অনেকে লোকদের মালামল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত্ত রাখছে। আর যারা সূর্ণ ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিতে দিন। (৩৫) সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা রেখেছিলে, সূতরাং এক্ষণে আশ্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখার। (৩৬) নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সূত্রাঙ্কিত বিধান, সূতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইহুদী-খ্রীষ্টানদের এহেন বাতিল পথের অনুসরণ এবং গায়রুল্লাহর অবৈধ আনুগত্যের বিবরণ দিয়ে এ আয়াতটি শেষ করা হয়। পরবর্তী আয়াতে বলা হয় যে, তারা গোমরাহী করেছে ক্ষান্ত হচ্ছে না বরং আল্লাহর সত্য দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করারও ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছে। আয়াতে উপমা দিয়ে বলা হচ্ছে যে, এরা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ এটি তাদের জন্যে অসম্ভব। বরং আল্লাহর অমোঘ কয়লা যে, তিনি নিজের নূর তথা দ্বীন ইসলামকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, জা কাফের ও মুশরিকদের যতই মশপীড়ার কারণ হোক না কেন?

এরপর ৩৩ নং আয়াতের সারকথাও এটাই যে, আল্লাহ আপন রসুলকে হেদায়েতের উপকরণ কোরআন এবং সত্য দ্বীন-ইসলাম সহকারে এজন্যে প্রেরণ করেছেন, যাতে অপরাপর ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় সূচিত হয়। এ মর্মে আরও কতিপয় আয়াত কোরআনে রয়েছে, যাতে সকল ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মের বিজয় লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

তফসীরে মাযহারীতে উল্লেখ আছে যে, অন্যান্য দ্বীনের উপর দ্বীনে-ইসলামের বিজয় লাভের সুসংবাদগুলো অধিকাংশ অবস্থা ও কালানুপাতিক যেমন, হযরত মিকদাদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন : “এমন কোন কাঁচা ও পাকা স্বা দুনিয়ার মুকে থাকবে না, যেখানে ইসলামের প্রবেশ ঘটবে না। সম্মানীয়ে সম্মানের সাথে এবং লালিতদের লাল্হনার সাথে, আল্লাহ যাদের সম্মানিত করবেন তারা ইসলাম কবুল করবে এবং যাদের লাল্হিত করবেন তারা ইসলাম গ্রহণে বিমুখ থাকবে, কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত প্রজা পরিণত হবে।” আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি অচিরেই পূর্ণ হয়। যার ফলে গোটা দুনিয়ার উপর প্রায় এক হাজার বছর যাবত ইসলামের প্রভুত্ব বিস্তৃত থাকে।

চতুর্থ আয়াতে মুসলমানদের সম্মোদন করে ইহুদী-খ্রীষ্টান পীর-পুরোহিতদের এমন কুকাঁড়ির বর্ণনা দেয়া হয়, যা লোকসমাজে গোমরাহী প্রসারের অন্যতম কারণ। ইহুদী-খ্রীষ্টানদের আলোচনায় মুসলমানদের হয়তো এ উদ্দেশ্যে সম্মোদন করা হয় যে, তাদের অবস্থা যেন ওদের মত না হয়। আয়াতে ইহুদী খ্রীষ্টান পীর-পুরোহিতগণের অধিকাংশ সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা গর্হিত পন্থায় লোকদের মালামল গলাধঃকরণ করে চলছে এবং আল্লাহর সরল পথ থেকে মানুষকে নিবৃত্ত রাখছে।

অধিকাংশ পীর-পুরোহিতগণের যেখানে এ অবস্থা, সেখানে সাধারণত সমকালীন সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু কোরআন মজীদ তা না করে كثيرا (অধিকাংশ) শব্দ প্রয়োগ করেছে। এর দ্বারা মুসলমানদেরকে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য যে, তারা যেন শত্রুর বেলায়ও কোনরূপ ব্যাড়াঙ্কি আশ্রয় না নেয়।

গর্হিত পন্থায় মানুষের সম্পদ ভোগের অর্থ হল, অনেক সময় তারা পয়সা নিয়ে তওরাতের শিক্ষাবিরোধী ফতোয়া দান করত। আবার কখনো তওরাতের বিধি-নিষেধকে গোপন রেখে কিংবা তাতে নানা হীলা-বাহানা সৃষ্টি করে জ্ঞানপাপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। তাদের বড় অপরাধ হল যে, তারা নিজেরাই শুধু পণ্ডিত নয়, বরং সত্যপথ অনুেষণকারীদের বিভ্রান্ত হওয়ারও কারণ হয়ে দাঁড়াতে। কেননা, যেখানে নেতাদের এ অবস্থা, সেখানে অনুসারীদের সত্য সন্ধানে স্পৃহাও আর বাকী থাকে না।

হাফা, পীর-পুরোহিতগণের বাতিল ফতোয়ার দরুন সরল জনগণ
থাকুক ও সত্যরূপে বিশ্বাস করে নেয়।

হাদীস-ব্রীটান আলেম সম্প্রদায়ের মিথ্যা ফতোয়া দানের ব্যাধি সৃষ্টি হয়
লোভ-লালসা থেকে। এজন্যে আয়াতে বর্ণিত অর্থলিপ্সার করণ
প্রতি ও কঠোর সাজা এবং এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায়
সংগৃহীত হয়। এরশাদ হয়েছে : وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْوُضْعَةَ
وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
“অর্থ৷, যারা স্বর্ণ
রৌপ্য জমা করে রাখে, তা খরচ করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর
আবাদের সুসংবাদ দিন।”

“আর তা খরচ করে না আল্লাহর পথে” বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া
যে, যারা বিধানমতে আল্লাহর ওয়াস্তে খরচ করে, তাদের পক্ষে
অবশিষ্ট অর্থ সম্পদ ক্ষতিকর নয়। হাদীস শরীফে রসুলে করীম
(সঃ) এরশাদ করেছেন : “যে মালামালের যাকাত দেয়া হয়, তা জমা
করা ক্ষতিকর ধন-রত্নের শামিল নয়।” —(আবু দাউদ, আহমদ)। এ থেকে
প্রমাণ যায় যে, যাকাত আদায়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা জমা রাখা
আশাহ নয়। অধিকাংশ ফকীহ ও ঈমামগণ এমতের অনুসারী।

وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ “আর তা খরচ করে না” বাক্যের ‘তা’ সর্বনামের উদ্দিষ্ট
বস্তু হল রৌপ্য। অথচ, আয়াতে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়েরই উল্লেখ রয়েছে।
কিন্তু সূরার মাফহরীর মতে এ বর্ণনাব্যক্তি এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, যার অল্প
সম্মান স্বর্ণ ও রৌপ্য রয়েছে, সে যাকাত প্রদানের বেলায় স্বর্ণকে রূপার
মূল্যের সাথে যোগ করে রূপার হিসাবমতে যাকাত প্রদান করবে।

শেষের আয়াতে জমাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত
করে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগু করার যে কঠোর সাজার উল্লেখ রয়েছে,
তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ংক্রিয় আমলই সে আমলের সাজা।

অর্থাৎ, যে অর্থ সম্পদ অবৈধ পন্থায় জমা করা হয়, কিংবা বৈধ পন্থায়
জমা করলেও তার যাকাত আদায় করা না হয়, সে সম্পদই তার জন্য
আবাদের রূপধারণ করে।

এ আয়াতে যে ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ দগু করার উল্লেখ রয়েছে,
তার অর্থ সমগ্র শরীরও হতে পারে। কিংবা এই তিন অঙ্গের উল্লেখ এজন্যে
করা হয়েছে যে, যে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর রাহে খরচ করতে চায় না, তার
কাছে যখন কোন ভিক্ষুক কিছু চায়, কিংবা যাকাত তলব করে, তখন সে
প্রথমে জ্বকুঞ্জন করে, তারপর পাশ কাটিয়ে তাকে এড়িয়ে যেতে চায়।
এতেও সে ক্ষান্ত না হলে তাকে পৃষ্ঠ দেখিয়ে চলে যায়। এজন্যে বিশেষ
করে এ তিন অঙ্গে আযাব দানের উল্লেখ করা হয়।

إِنْ عَادَ الشُّهُورُ عَنِ الذُّلَّةِ نَاعَشْرَ شَهْرًا “নিশ্চয় আল্লাহর নিকট
মাস-গণনায় মাস হল বারটি।” এখানে উল্লেখিত عادت অর্থ গণনা شهر
হল شهر-এর বহুবচন। অর্থাৎ, মাস। বাক্যের সারমর্ম হল, আল্লাহর কাছে

মাসের সংখ্যা বারটি নির্ধারিত; এতে কম বেশী করার কারো ক্ষমতা নেই।

অতঃপর الْمَوَدَّةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ বলে স্পষ্ট করা হয় যে, বিষয়টি রোজে আযল
অর্থাৎ, সৃষ্টির প্রথম দিনেই লওহে-মাহফুযে লিখিত রয়েছে। এরপর
يَوْمَ تَحْكُمُ السُّنُوتُ وَالْأَرْضُ বলে ইঙ্গিত করা হয় যে, রোজে
আযলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও মাসগুলোরও ধারাবাহিকতা
নির্ধারিত হয়। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি পরবর্তী মুহূর্তে।

তারপর বলা হয়-سَنَاءُ أَرْبَعَةِ شُحُورٍ অর্থাৎ, তন্মধ্যে চার মাস হল
নিষিদ্ধ। সেহেতু এ চার মাস যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত হারাম। অর্থ হল, এই
চারটি মাস সম্মানী, যেহেতু মাসগুলো অতীব বরকতময়। এতে এবাদতের
সওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। প্রথম অর্থ মতে যে হুকুম, তা ইসলামী
শরীয়তে রহিত। তবে দ্বিতীয় অর্থ মতে আদব ও সম্মান প্রদর্শন এবং
এবাদতে যত্নবান হওয়ার হুকুমটি ইসলামেও বাকী রয়েছে।

বিদায় হজ্বের সময় মিনা প্রান্তরে প্রদত্ত খোতবায় নবী করীম (সঃ)
সম্মানিত মাসগুলোকে চিহ্নিত করে বলেন, “তিনটি মাস হল
ধারাবাহিক— যিলকদ, যিলহজ্ব ও মহররম, অপরটি হল রজব। তবে
রজব সম্পর্কে আরববাসীদের দ্বিমত রয়েছে। কতিপয় গোত্রের মতে রজব
হল রমযান। আর মুবার গোত্রের ধারণামতে রজব হল জমাদিউস-সানী ও
শা’বানের মধ্যবর্তী মাসটি। তাই নবী করীম (সঃ) খোতবায় মুবার গোত্রের
রজব বলে বিষয়টি পরিষ্কার করে দেন।

ذَلِكَ الْوَيْنُ الْقَدِيمُ “এটিই হল সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।” অর্থাৎ, মাস-
গুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ ও সম্মানিত মাসগুলোর সাথে সম্পৃক্ত
হুকুম-আহকামকে সৃষ্টির প্রথম পর্বের এলাহী নিয়মের সাথে সঙ্গতিশীল
রাখাই হল দ্বীনে-মুসতাকীম। এতে কোন মানুষের কম-বেশী কিংবা
পরিবর্তন-পরিবর্ধন করার প্রয়াস অসুস্থ বিবেক ও মন্দ স্বভাবের
আলামত।

فَلَا تَطْلُبُوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ “সুতরাং তোমরা এ মাসগুলোতে
নিজেদের প্রতি অবিচার করো না” অর্থাৎ, এ পবিত্র মাসগুলোর যথাযথ
আদব রক্ষা না করে এবং এবাদত বন্দেগীতে অলস থেকে নিজেদের ক্ষতি
করো না।

ইমাম জাস্সাস (রহঃ) ‘আহকামুল - কোরআন’ গ্রন্থে বলেন,
কোরআনের এ বাক্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ মাসগুলোর এমন
বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার ফলে এতে এবাদত করা হলে বাকী মাসগুলোতেও
এবাদতের তওফীক ও সাহস লাভ করা যায়। অনুরূপ কেউ এ
মাসগুলোতে পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারলে বছরের বাকী
মাসগুলোতেও পাপাচার থেকে দূরে থাকা সহজ হয়। তাই এ সুযোগের
সদ্ব্যবহার থেকে বিরত থাকা হবে অপূরণীয় ক্ষতি।

আহকাম ও মাসারেল

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাসের যে ধারাবাহিকতা এবং মাসগুলোর যে নাম ইসলামী শরীয়তে প্রচলিত, তা মানবরচিত পরিভাষা নয়; বরং রাক্বুল আলামীন যেদিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই মাসের তরতীব, নাম ও বিশেষ মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহকাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর দৃষ্টিতে শরীয়তের আহকামের ক্ষেত্রে চন্দ্রমাসই নির্ভরযোগ্য। চন্দ্রমাসের হিসাবমতেই রোযা, হজ্ব ও যাকাত প্রভৃতি আদায় করতে হয়। তবে কোরআন মজীদ চন্দ্রকে যেমন, তেমনি সূর্যকেও সন-তারিখ ঠিক করার মানদণ্ডরূপে অভিহিত করেছেন—**فَلْيُتَوَكَّلْ عَلَى السَّيِّدِ وَالْحَسَبِ** (যাতে তোমরা বৎসর গণনা ও কাল নির্ণয়ের জ্ঞান লাভ কর)। অতএব, চন্দ্র ও সূর্য উভয়টির মাধ্যমেই সন-তারিখ নির্দিষ্ট করা জায়েয। তবে চন্দ্রের হিসাব আল্লাহর অধিকতর পছন্দ। তাই শরীয়তের আহকামকে চন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। এজন্যে চন্দ্র বছরের হিসাব সংরক্ষণ করা ফরযে-কেফায়া; সকল উম্মত এ হিসাব ভুলে গেলে সনাই গোনাহ্‌গার হবে। চাঁদের হিসাব ঠিক রেখে অন্যান্য সূত্রের হিসাব ব্যবহার করা জায়েয আছে। তবে তা আল্লাহর রাসূল ও পরবর্তীগণের তরীকায় বরখোলাফ। সুতরাং অনাবশ্যকভাবে অন্য হিসাব নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়।

মাসের হিসাব পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে মূল মাস বাড়ানোর যে প্রথা আছে, এই আয়াতের প্রেক্ষিতে কেউ কেউ তাকেও না-জায়েয মনে করেন। কিন্তু এই মত ঠিক নয়। কেননা, এতে শরীয়তের বিধানের কোন সম্পর্ক নেই। জাহেলী যুগে চন্দ্রমাস পরিবর্তনের ফলে শরীয়তের হুকুম পরিবর্তিত হতো বিধায় তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা যেহেতু পরিবর্তন হয় না, তাই তা উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

দুনিয়ার মোহ ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা সকল অপরাধের মূল : অলসতার যে কারণ ও প্রতিকারের উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, দুনিয়ার ব্যাপারে সকল আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা ও সকল অপরাধ এবং গোনাহের মূলে রয়েছে দুনিয়া প্রীতি ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। হাদীস শরীফে আছে—**حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ** অর্থাৎ, দুনিয়ার মোহ সকল গোনাহের মূল। সেজন্য আয়াতে বলা হয় :

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর (চলাফেরা করতে চাও না)। আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি পরিতুষ্ট হয়ে গেলে।”

রোগ নির্ণয়ের পর পরবর্তী আয়াতে তার প্রতিকার উল্লেখ করা হয়েছে যে, “পার্শ্বিক জ্বিদেরী ভোগের উপকরণ আখেরাতের তুলনায় অতি নগণ্য।”

সারকথা হল, আখেরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তা-ভাবনাই মানুষের ক্বা উচিত। বস্তুতঃ আখেরাতের চিন্তা-ফিকিরই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের সার্বক উপায়।

ইসলামী আকাদীর মৌলিক বিষয় তিনটি : তওহীদ, রেসালত ও পরকালের বিশ্বাস। তন্মধ্যে পরকালের বিশ্বাস হল বিশুদ্ধ আমলের রূ

إِنَّمَا النَّسِيْءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُجَاهِدُونَ عَالِمًا وَيَجْرِمُونَهُ عَالَمًا لِّيُؤْطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَجِدُوهَا حَرَامًا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قُلْنَا إِلَى الْأَرْضِ أَنْزَلْنَاهُمْ فَأَحْيَوْنَا السِّيَامِنَ الْأَخْرَجْنَا قِمَاتًا غَيْرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْأَخْرَجَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ لَا تَتَفَسَّوْا وَيُؤْتُوا عِدَّةَ آبَائِ الْبَيْتَةِ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَتَفَسَّوْا سُبْحًا ۝ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ لَا تَتَفَسَّوْا فَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَلَاثِينَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْرُجْ إِنَّ اللَّهَ مَتَّعُنَا وَنَزَّلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُيُوشٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السَّعْلَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَالْحِمَارُ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(৩৭) এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার ফলে কাফেরগণ গোমরাহীতে পতিত হয়। এরা হালাল করে নেয় একে এক বছর এবং হারাম করে নেয় অন্য বছর, যাতে তারা গণনা পূর্ণ করে নেয় আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোর। অতঃপর হালাল করে নেয় আল্লাহর হারামকৃত মাসগুলোকে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্যে শোভনীয় করে দেয়া হল। আর আল্লাহ কাফের সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না। (৩৮) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। (৩৯) যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্যদণ্ড আঘাত দেবেন এবং অপর জাতিতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (৪০) যদি তোমরা তাকে (রসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিস্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিধু হওয়া না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সাহায্য নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সম্মুখ এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪১) তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জ্ঞান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।

এবং গোনাহ্ ও অপরাধের ক্ষেত্রে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। চিন্তা করলে পরিকার বোঝা যায় যে, দুনিয়ার শান্তি-শৃংখলা আখেরাতের আকীদা ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বস্তুবাদী উন্নতির এখন যৌবনকাল। অপরূপ দমনে সকল জাতি ও দেশের চেষ্টা-তদবীরের অন্ত নেই। আইন-আদালত ও অপরাধ দমনকারী সংস্থা সমূহের উন্নত ব্যবস্থাপনা সমূহ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দৈনন্দিন বেড়েই চলেছে। আমাদের দৃষ্টিতে সঠিক রোগ নির্ণয় ও তার সঠিক প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না বলেই আজকের এ অস্থিরতা। বস্তুতঃ এ সকল রোগের মূলে রয়েছে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা, পাশ্চি ব্যস্ততা এবং আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। আমাদের বিশৃঙ্খল, এর একমাত্র প্রতিকার হল, আল্লাহর যিকর ও স্মরণ এবং আখেরাতের চিন্তা-ভাবনা। যে দেশে যখন এই অমোঘ প্রতিকার প্রয়োগ করা হয়, সে দেশ ও সমাজ মানবতার মূর্ত প্রতীক হয়ে ফেরেশতাগণেরও ইরশার পাত্র হয়েছিল। নবী ও সাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণ-যুগ তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আজকের বিশৃঙ্খল অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ চায়, কিন্তু আল্লাহ্ ও আখেরাত থেকে উদাসীন হয়ে পদে পদে এমন ব্যবস্থাও করে রাখছে, যার ফলে আল্লাহর ও আখেরাতের প্রতি মনোযোগ আসে না। তাই এর অবশ্যসম্মত পরিণতি আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, অপরাধ দমনের সকল উন্নত ব্যবস্থাপনাই ব্যর্থ হয়ে পড়ছে। অপরাধ দমন তো দূরের কথা, ঝড়ের বেগে যেন তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। হায়! আজকের চিন্তাশীল মহল যদি উপরোক্ত কোরআনী প্রতিকার প্রয়োগ করে দেখত, তবে বুঝতে পারত, কত সহজে অপরাধপ্রবণতার উচ্ছেদ সাধন করা যায়।

৩৯ নং আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকারের উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেয়া হয় যে, “তোমরা জেহাদে বের না হলে আল্লাহ্ তোমাদের মর্যাদাশক্তি দেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন। আর দুইনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিন্দুমাত্র স্মৃতি করতে পারবে না। কেননা, আল্লাহ্ সববিষয়ে শক্তিমান।

৪০ নং আয়াতে রসুল করীম (সাঃ)-এর হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দেয়া হয় যে, আল্লাহর রসুল কোন মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মোহতাজ নন। আল্লাহ্ প্রত্যক্ষভাবে গায়ব থেকে তাঁর সাহায্য করতে সক্ষম। যেমন, হিজরতের সময় করা হয়, যখন তাঁর আপন গোত্র ও দেশবাসী তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সফরসঙ্গী হিসেবে একমাত্র সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ছাড়া আর কেউ ছিল না। পদব্রজী ও অশারোহী শত্রুরা সর্বত্র তাঁর খোঁজ করে ফিরছে। অথচ আশ্রয়স্থল কোন মজবুত দুর্গ ছিল না; বরং তা ছিল এক গিরিশৃংখা, যার দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছিল তাঁর শত্রুরা। তখন শুধু-সঙ্গী আবু বকর (রাঃ)-এর চিন্তা নিজের জন্য ছিল না, বরং তিনি এই ভেবে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, হয়তো শত্রুরা তাঁর বন্ধুর জীবন নাশ করে দেবে, কিন্তু এ সময়েও রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ছিলেন পাহাড়ের মত অনড়, অটল ও নিশ্চিন্ত। শুধু যে নিজে, তা নয়, বরং সফরসঙ্গীকেও অভয় দিয়ে বলছিলেন, চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।” দু’শব্দের এ বাক্যটি বলা মুশকিল কিছু নয়। কিন্তু শ্রোতাবৃন্দ এ নাজুক দৃশ্য সামনে রেখে চিন্তা করলে বুঝতে দেয়ী হবে না যে, নিছক দুনিয়াবী উপায়-উপকরণের প্রতি ভরসা রেখে মনের এই নিশ্চিন্তাভাব সম্ভব নয়। তবুও যে সম্ভব হল, আয়াতের পরবর্তী বাক্যে তার রহস্য বলে দেয়া হল। এরশাদ হয়ে ঃ “আল্লাহ্ তাঁর কলব মোবারকে সান্দ্রনা নাযিল করেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তাঁর সাহায্য করেন, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।” অদৃশ্য বাহিনী বলতে ফেরেশতাগণও হতে পারেন এবং জগতের গোপন শক্তিসমূহও হতে পারে। কারণ, এগুলোও আল্লাহর সৈন্যদল। সার কথা, এর ফলে কুফরীর পতাকা অবনমিত হয় এবং আল্লাহর ঝাণ্ডা মাথা তুলে দাঁড়ায়।

৪১ নং আয়াতে তাগিদদানের উদ্দেশ্যে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যে, জেহাদে বের হবার জন্যে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন তোমাদের আদেশ করেন, তখন সর্বাবস্থায় তা তোমাদের জন্যে ফরয হয়ে গেল। আর এ আদেশ পালনের মাঝেই নিহিত রয়েছে তোমাদের সমুদয় কল্যাণ।

আনুষ্ঠানিক জাতব্য বিষয়

التوبة ৭

১৭৫

وَأَعْلَمُوا ১

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَآتَيْنُكُمْ
وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَنْكُمُ الشُّعْثَةُ وَسَيَحِلُّونَ بِأَلْفِهِ
لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ
أَذْنَبْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَقَلَّ
الْكَاذِبِينَ ۝ لَا تَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَالنَّفْسِ
وَاللَّهُ عَالِمُ الْمُتَّقِينَ ۝ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاتَّبَعُوا قُلُوبُهُمْ
فَهُمْ فِي رَيْبٍ مِنْهُمْ لَيُرِيدُونَ ۝ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ
لَعَدَّ اللَّهُ عَذَابَهُمْ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ
فَكَبَّطَهُمْ وَرَقِيَ اعْقَدُوا مَعَ الْفَوَاحِشِ ۝
لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا
وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ
وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ الْظَالِمِينَ ۝

(৪২) যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং যাত্রাপথও সংক্ষিপ্ত হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। আর তারা এমনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম, এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে, আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী। (৪৩) আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিস্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের। (৪৪) আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জ্ঞান দ্বারা জেহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ সাবধানীদের ভাল জানেন। (৪৫) নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। (৪৬) আর যদি তারা বের হবার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়, তাই তাদের নিবৃত রাখলেন এবং আদেশ হল বস। লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক। (৪৭) যদি তোমাদের সাথে তারা বের হত, তবে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো না, আর অবশু ছুটতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুণ্ডার। বস্ত্রতঃ আল্লাহ যালিমদের ভালভাবেই জানেন।

৪২ নং আয়াতে অলসতার দরুন জেহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন লোকদের একটি গুণকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয় যে, এ গুণের গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ যে শক্তি-সামর্থ্য তাদের দান করেছেন, তা, আল্লাহর রাহে সাধ্যমত ব্যয় করেনি। তাই তাদের অসমর্থ থাকার গুণের গ্রহণযোগ্য নয়।

গ্রহণযোগ্য গুণ ও বাহানার পার্থক্য : এ আয়াত থেকে একটি মূলনীতির সন্ধান পাওয়া যায়, যার দ্বারা প্রকৃত গুণ ও বাহানার মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। তাহল, সেই লোকদের গুণের প্রকৃত গ্রহণযোগ্য, যারা আদেশ পালনে প্রস্তুত, কিন্তু কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে পরে অসমর্থ হয়ে পড়ে। মাযবুগণের সকল বিষয় এ নিরিখে যাচাই করা যাবে, কিন্তু আদেশ পালনে যার কোন কোন ইচ্ছা ও প্রস্তুতি নেই, পরে তার যদি কোন গুণও উপস্থিত হয়, তবে গোনাহের এ গুণের হবে গোনাহের চাইতে নিকট। সুতরাং এ গুণের গ্রহণযোগ্য নয়। কেউ জুমআ'র নামায়ে শরীফ হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছে। কিন্তু যেইমাত্র চলার ইচ্ছা করল, হঠাৎ এক ঘটনায় তার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। এ ধরনের গুণের গ্রহণযোগ্য এবং এতে আল্লাহ মা'যুর লোকের পূর্ণ সাওয়াব দান করেন। কিন্তু যে জুমআ'র কোন প্রস্তুতিই নেয়নি, তার কোন গুণের উপস্থিত হলে তা'হবে বাহানার নামাস্তর।

উদাহরণতঃ দেখা যায়, ভোরে ফজরের জামাআতে শরীফ হওয়ার প্রস্তুতিস্বরূপ ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে রাখে, কিংবা সময়মত জাগাবার জন্য কাউকে নিয়োজিত রাখে, কিন্তু পরে দেখা যায়, ঘটনাচক্রে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ। ফলে নামায কাযা হয়ে যায়। যেমন, রসুলে করীম (সঃ)-এর লায়লাতুত তা'রীসের ঘটনা। সময়মত জেগে উঠার জন্যে তিনি হযরত বেলাল (রাঃ)-কে নিয়োজিত রাখেন যেন প্রত্যুষে সবাইকে জাগিয়ে দেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁকেও তন্দ্রায় পেয়ে বসে। ফলে সূর্যোদয়ের পর সকলের চোখ খোলে। এ গুণের প্রকৃত ও গ্রহণযোগ্য। যে কারণে রসুলুল্লাহ (সঃ) সাহাবা কেয়ামকে সান্না দিয়ে বলেন, لا تفرط في النوم انما التفريط في اليقظة অর্থঃ, “সুমের মধ্যে মানুষ মা'যুর। তাই এটি হল যা মানুষ জাগ্রত অবস্থায় করে।” সান্নানার কারণ হল, সময়মত জেগে উঠার সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। সারকথা এই যে, আদেশ পালনের প্রস্তুতি ও অপ্রস্তুতির মাধ্যমে কোন গুণের গ্রহণযোগ্য কিনা তা জানা যাবে। নিকট যৌথিক জমা-খরচ দিয়ে কিছু লাভ হবে না।

৪২ নং আয়াতে মিথ্যা গুণের দেখিয়ে অব্যাহতি লাভকারী মুনাফিকদের প্রসঙ্গে বলা হয় যে, জেহাদ থেকে নিবৃত থাকাই উত্তম। কারণ, গুণান গেলে নানা ষড়যন্ত্র ও গুজবের মাধ্যমে সর্বত্র ক্যাসাদ সৃষ্টি করত। অতঃপর বলা হয় وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ অর্থঃ, তোমাদের মাঝে আছে এমন এক সরল প্রাণ মুসলমান যারা তাদের মিথ্যা গুণে বিভ্রান্ত হত।

لَقَدْ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبْتَكَ الْأُمُورَ
 حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرُهُونَ ۝
 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَقْبِضْ عَلَى يَدَيَّ
 الْفِتْنَةَ سَقَطُوا وَإِنْ جَهَنَّمَ لَكُنْجِيَةً يَا كَافِرِينَ ۝
 إِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ كَسُوءُ هُمْ وَلَنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ
 يَقُولُوا أَفَدَّ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ
 فَرِحُونَ ۝ قُلْ لَنْ يُصِيبَكُمْ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ هُوَ
 مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ كُلُّ الْيُودِيِّ ۝ قُلْ
 هَلْ تَرَى ضُفُوفَ بَنِي الْأَرَاكِ حَتَّى تُصِيبَهُمْ
 نَارُ يَدِي أَنْ يُصِيبَهُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِي
 أَوْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسٌ فَتَرْتَضَوْنَ أَلَا مَعَكُمْ مُتَرَضُّونَ ۝ قُلْ
 أَفْقُوقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يَقْبَلَ مِنْكُمْ إِلَهُكُمْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
 فَاسِقُونَ ۝ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا
 أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ
 إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرُهُونَ ۝

(৬৮) তারা পূর্বে থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যসমূহ উলট-পালট করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিষ্ঠিত। সে মেল এবং জয়ী হল আল্লাহর হুকুম, যে অবস্থায় তারা মন্দবোধ করল।

(৬৯) আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পঞ্চভট করবেন না। পোনে রাখ, তারা তো পূর্বে থেকেই পঞ্চভট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাকেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে। (৭০) আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা মন্দবোধ করে এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, আমরা পূর্বে থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং ফিরে যায় উল্লসিত মনে।

(৭১) আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছেবে না, কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন; তিনি আমাদের কার্যনির্বাহক। আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত। (৭২) আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্যে দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর; আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ তোমাদের আযাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষামান। (৭৩) 'আপনি বলুন, তোমরা ইচ্ছায় অর্থ ব্যয় কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা' কখনো কবুল হবে না, তোমরা নাফরমানের দল। (৭৪) তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সঙ্কুচিত মনে।

অর্থঃ, “ইতিপূর্বেও তারা ফাসাদ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল।” যেমন, ওহুদ যুদ্ধ প্রভৃতিতে। **وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ** “আল্লাহর বিজয় হল, যাতে মুনাফিকরা মমপীড়া বোধ করছিল।” এর দ্বারা ইঙ্গিত দেয়া হয় যে, জয়-বিজয় সবই আল্লাহর আয়ত্তে। যেমন ইতিপূর্বের যুদ্ধসমূহে আপনাকে জয়ী করা হয়েছে, তেমনি এ যুদ্ধও জয়ী হবেন এবং মুনাফিকদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে পড়বে।

ষষ্ঠ আয়াতে জদ বিন কায়স নামক জনৈক বিশিষ্ট মুনাফিকের এক বিশেষ বাহানার উল্লেখ করে তার গোমরাহীর বর্ণনা দেয়া হয়। সে জেহাদ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে ওয়র পেশ করে বলেছিল, আমি এক পৌরুষদীপ্ত যুবক। রোমানদের সাথে যুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাদের সুন্দরী যুবতীদের মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। কোরআন মজীদ তার কথার উত্তরে বলে **الْأَرَى الْفِتْنَةَ سَقَطُوا** “ভাল করে শোন” এই নির্বোধ এক সম্ভাব্য আশংকার বাহানা করে এক নিশ্চিত আশংকা অর্থাৎ, রসুলের অব্যাহতি ও জেহাদ পরিত্যাগের অপরাধের এখনই দণ্ডযোগ্য হয়ে গেল।

“আর নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাকেরদের পরিবেষ্টন করে আছে”। তা থেকে নিস্তার লাভের উপায় নেই। এর এক অর্থ এই হতে পারে যে, আখেরাতে জাহান্নাম এদের ঘিরে রাখবে। দ্বিতীয় অর্থ এই হতে পারে যে, জাহান্নামে পৌঁছার যে সকল কারণ এদেরকে বর্তমানে ঘিরে রেখেছে, সেগুলোই এখানে জাহান্নাম নামে অভিহিত। এ অর্থ হতে বলা যায়, এরা বর্তমানেও জাহান্নামের গণ্ডির মধ্যে রয়েছে।

সপ্তম আয়াতে এদের এক হীন স্বভাবের বর্ণনা দিয়ে বলা হয় যে, এরা যদিও বাহ্যতঃ মুসলমানদের সাথে উঠাবসা রাখে, কিন্তু **إِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ كَسُوءُ هُمْ** “আপনার কোন মঙ্গল দেখলে তাদের মুখ কাল হয়ে যায়” এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে উল্লাস করে বলে যে, আমরা আগেভাগেই তা জ্ঞানতাম যে, মুসলমানরা বিপদগ্রস্ত হবেই, তাই আমাদের জন্যে যা কল্যাণকর, তাই অবলম্বন করেছি।

অষ্টম আয়াতে আল্লাহ পাক মহানবী (সাঃ) ও মুসলমানদেরকে মুনাফিকদের কথায় বিভ্রান্ত না হয়ে আসল সত্যকে সদা সামনে রাখার হেদায়েত দান করেছেন। এরশাদ হয়েছে : **ثَلْثُ يُصِيبُكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ هُوَ مَوْلَانَا** “আপনি ঐ বস্তু পূজারীদের বলে দিন যে, তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছ। এসব পার্শ্ব উপকরণ হল এক যবনিকাবিশেষ। এই যবনিকার অন্তরালে যে শক্তি সক্রিয় রয়েছে, তা আল্লাহরই। আমরা যে সকল অবস্থার সম্প্রদায় হই তা’ আগেই আল্লাহ আমাদের জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন। তিনিই আমাদের কার্যনির্বাহক ও সাহায্যকারী। তাই মুসলমানদের আবশ্যক তাঁর প্রতি ভালবাসা রাখা এবং পার্শ্ব উপায়-উপকরণকে নিছক মাধ্যম মনে করা, আর মনে করা যে, এগুলোর উপর ভাল-মন্দ নির্ভরশীল নয়।

তদবীর সহকারে তকদীরে বিশ্বাস করা কর্তব্য : বিনা তদবীরে তাওয়াক্কুল করা ভুল; আলাচ্য আয়াতটি তকদীর ও তাওয়াক্কুলের

التوبة ৭

১৭৫

وَأَعْلَوْا ১০

فَلَا تُفْسِدْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَولَادَهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَةَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَكُمْ فِي مَالِ الْوَالِدِينَ حَقٌّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَةَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَكُمْ فِي مَالِ الْوَالِدِينَ حَقٌّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَةَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَلَكُمْ فِي مَالِ الْوَالِدِينَ حَقٌّ

(৫৫) সূতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হল এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিশ্চিত রাখা এবং প্রাণবিয়োগ হওয়া কুফরী অবস্থায়। (৫৬) তারা আল্লাহর নামে হুকুম করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে। (৫৭) তারা কোন আশ্রয়হল, কোন গুহা বা মাথা গোঁজার ঠাই পেলে সেদিকে পলায়ন করবে দ্রুতগতিতে। (৫৮) তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সদকা বটনে আপনাকে দোষারপ করে। এর থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়। (৫৯) কতই না ভাল হত, যদি তারা সন্তুষ্ট হত আল্লাহ ও তাঁর রসুলের উপর এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট, আল্লাহ আমাদের দেবেন নিজ করুণায় এবং তাঁর রসুলও, আমরা শুধু আল্লাহকেই কামনা করি। (৬০) “যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিহ্ন আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে, ঋণগ্রস্তদের জন্যে, আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে- এই হল আল্লাহর নিধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৬১) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ নবীকে ক্রেশ দেয়, এবং বলে, এ লোকটি তো কানসর্বশ্র। আপনি বলে দিন, কান হলেও তোমাদেরই মঙ্গলের জন্যে, আল্লাহর উপর বিশাস রাখা এবং বিশ্রাস রাখা মুসলমানদের কথার উপর। বস্তুতঃ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের জন্যে তিনি রহমতবিশেষ। আর যারা আল্লাহর রসুলের প্রতি কুৎসা রটনা করে, তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

মূল-তত্ত্বকে স্পষ্ট করে দিয়েছে। তকদীর ও তাওয়াক্কুল (আল্লাহর প্রতি ভরসা) এর প্রতি বিশ্রাসের অর্থ এই নয় যে, মানুষ হাত-পা শুটিয়ে বসে থাকবে এবং বলবে যে, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। বরং তার অর্থ হল, সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বনের পর সাধ্যমত চেষ্টা ও সাহস করে যাবে। এরপর বিষয়টিকে তকদীর ও তাওয়াক্কুলের উপর অর্পণ করবে, আর দুটি আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখবে। কারণ, চেষ্টা ও তদবীরের ফলাফল মানে মালিক হলেন তিনি।

তকদীর ও তাওয়াক্কুলের বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি বিদ্যমান। বরং বিরোধী কিছু লোক আদতেই তকদীর ও তাওয়াক্কুলে বিশ্বাসী নয়। তারা পার্শ্ব উপায়-উপকরণকেই আল্লাহর স্থলাভিষিক্ত করে রেখেছে। অল্প দিকে কিছু মুর্থ লোক আছে, যারা নিজেদের দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা চাপ দেয়ার জন্য তকদীর ও তাওয়াক্কুলের আশ্রয় নেয়। জেহাদের জন্য নবী করীম (সাঃ)-এর প্রস্তুতি, অতঃপর অত্র আয়াতের অবতরণ ও সকল বাড়াবাড়ির নিরসন করে সত্য পথ কি, তা’ দেখিয়ে দিয়েছে। ফার্সী প্রবাদ আছে, তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে উটের পা বেঁধে নাও।’ অর্থাৎ, দুনিয়ার উপায়-উপকরণও আল্লাহর নেয়ামত, এ নেয়ামতের সদুবহার না করা হল না-শোকরী ও মুর্থতা। তবে উপায়-উপকরণকে ঠিক তাই মনে কর, ফলাফল তার অধীন নয়, বরং আল্লাহর হুকুমের অধীন, সে বিশ্বাস রাখবে।

শেষের আয়াতে মু’মিনদের এক বিরল শানের উল্লেখ করে তাদের বিপদে আনন্দ উপভোগকারী কাফেরদের বলা হয় যে, আমাদের যে বিপদ দেখে তোমরা এত উৎফুল্ল, তাকে আমরা বিপদই মনে করি না; বরং জা আমাদের জন্যে শাস্তি ও সফলতার অন্যতম মাধ্যম। কারণ, মু’মিন আপন চেষ্টায় বিফল হলেও স্থায়ী সওয়াব ও প্রতিদান লাভের যোগ্য হয়, আর এটিই সকল সফলতার মূলকথা। তাই তারা অকৃতকার্য হলেও কৃতকার্য। তার ভাঙ্গনে রয়েছে গড়ার প্রতিশ্রুতি। এই হল **فَلَا تُفْسِدُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْوَالِدِينَ** ‘তোমরা কি আমাদের দু’টি মঙ্গলের একটির প্রতীক্ষায় আছ?’

অপরদিকে কাফেরদের অবস্থায় হল তার বিপরীত। আযাব থেকে কেন অবস্থায়ই তাদের অব্যাহতি নেই। এ জীবনেই তারা মুসলমানগণের মাধ্যমে আল্লাহর আযাব ভোগ করবে এবং এভাবে তারা দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনা পোহাবে। আর যদি এ দুনিয়ায় কোন প্রকারে নিকৃষ্টি পেয়েও যায়, তবে আখেরাতের আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই তা অবশ্যই ভোগ করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَةَ (আল্লাহর ইচ্ছা হল, এগুলোর দ্বারা তাদের আযাবে রাখা) বাক্যে মুনাফিকদের জন্যে তাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্পত্তিকে যে আযাব বলে অভিহিত করা হয়েছে, তার কারণ হল, দুনিয়ার মোহে উন্মত্ত থাকা মানুষের জন্যে পার্শ্ব জীবনেও এক ক আযাব। প্রথমে অর্থ উপার্জনের সুতীক্ষ্ণ কামনা, অতঃপর তা হাসিলের জন্যে নানা চেষ্টা-তদবীর, নিরন্তর দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম, না দিলে আরাম, না রাতের ঘুম, না স্বাস্থ্যের হেফায়ত আর না পরিবার-পরিজনকে সাথে আমোদ-আহলাদের অবকাশ। অতঃপর হাড়ভাঙা পরিশ্রম দ্বারা কিছু অর্জিত হয়, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও তাকে দ্বিগুণ-চতুগুণ বৃদ্ধি করার অবিশ্রান্ত চিন্তা-ভাবনা প্রভৃতি হল একেকটি স্বতন্ত্র আযাব। এরপর যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে বা রোগ-ব্যাদির কবলে পতিত হয়, তখন যেন আপন

পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সবই যদি ঠিক থাকে এবং মনের চাহিদামত কড়ি আসতে থাকে, তখন তার নিরাপত্তার প্রয়োজনও উত্তরোত্তর হ্রাস পায় এবং তখন সে চিন্তা-ফিকির তাকে মুহূর্তের জন্যও আরামে বসতে দেয় না।

১১. পরিশেষে এ সকল অর্থ-সম্পদ যখন মৃত্যুকালে বা তার আগে হঠাৎ হতে দেখে, তখন দুঃখ ও অনুশোচনার অন্ত থাকে না। বস্তুতঃ এমনিই হল আযাব। অস্ত্র মানুষ একে শান্তি ও আরামের সমূল মনে করে। কিন্তু মনের প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি কিসে, তার সন্ধান নেয় না। তাই শান্তির উপকরণকেই প্রকৃত শান্তি মনে করে তা' নিয়েই দিবা-নিশি ব্যস্ত থাকে। অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে তা দুনিয়ার জীবনে তার আরামের শত্রু এবং পরহেজের আযাবের পটভূমি।

১২. কাকেরদের সদকা দেয়া যায় কি? শেষের আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুনাফিকরাও সদকার অংশ পেত। কিন্তু তাদের মনমত না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে নানা আপত্তি উত্থাপন করত। এখানে যদি সদকার সম্পূর্ণ অর্থ নেয়া যায়, যে অর্থ অনুযায়ী সকল গুয়াজিব ও নফল সদকা দেয়া হবে, তবে কোন প্রশ্ন থাকে না। কারণ, অমুসলিমদের নফল সদকা ইমামগণের ঐকমত্যে জায়েয এবং তা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। আর মুসলিম সদকা বলতে ফরয সদকা যথা, যাকাত ও গুশর প্রভৃতি বোঝানো হয়, তবে তা থেকে মুনাফিকদেরকেও এজন্যে দেয়া হত যে, তারা মুসলমানদের মুসলমানরাপেই প্রকাশ করত এবং কুফরীর কোন প্রকাশ্য প্রমাণ তাদের থেকে পাওয়া যায়নি। আল্লাহ্ বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে আল্প দান করেন যে, তাদের সাথে মুসলমানদের অনুরূপ আচরণ করা দ্বন্দ্ব।—(বয়ানুল কোরআন)

১৩. لَا يَأْتِيَنَّكَ الصَّلَاةُ إِلَّا وَهُوَ مُسَوِّدٌ “তারা নামাযে আসে না, কিন্তু আলস্যবস্ত্রে”— আয়াতে মুনাফিকদের দু'টি আলামত বর্ণিত হয়েছে। নামাযে আলস্য ও দান-খয়রাতে কৃতাবোধ। এতে মুসলমানদের প্রতি ঈশারী প্রদান করা হয়েছে, যেন তারা মুনাফিকদের এই দু'প্রকার ভ্রান্ত্য থেকে দূরে থাকে।

১৪. সদকার ব্যয় খাতঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে সদকা সম্পর্কে মহানবী (সঃ)-এর উপর মুনাফিকদের আপত্তির বর্ণনা ও তার জবাব দেয়া হয়েছে। মুনাফিকরা অপবাদ রটাত যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) (নাউযু-বিল্লাহ) সদকা কটনে স্বজনস্বার্থিতার আশ্রয় নিয়েছেন এবং যাকে যা ইচ্ছা দিয়ে চলছেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক সদকার ব্যয়-খাত ঠিক করে দিয়ে তাদের সন্দেহ নিরসন করেছেন এবং কারা সদকা পাওয়ার উপযুক্ত তা বক্তল দিয়েছেন। আর দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আল্লাহর হুকুমতেই সদকার বিলি-কটন করছেন; নিজের খেয়াল-খুশীমত নয়।

হাদীস গ্রন্থ আবু দাউদ ও দারে কুতনী গ্রন্থে বর্ণিত এবং হযরত যেহাদ নি হারেস ছদরী কর্তৃক রেওয়ায়েতকৃত এক হাদীস দ্বারাও এ সত্যটি প্রমাণিত হয়। রেওয়ায়েতকারী বলেন, আমি একদা রসূল করীম (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে জানতে পারলাম যে, তিনি তাঁর গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে সৈন্যের একটি দল অচিরে প্রেরণ করবেন। আমি আরম্ভ করলাম ইয়া রসূলান্নাহ্! আপনি বিরত হোন, আমি দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তারা সবাই আপনার ব্যয়তা স্বীকার করে এখানে হাযির হবে। অতঃপর আমি স্বগোত্রের কাছে পত্র প্রেরণ করি। পত্র পেয়ে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে। এর প্রেক্ষিতে হযরত (সঃ) আমাকে বলেন,

وَالْأَخْصَاءُ الْمَطَاعُ فِي قَوْمٍ ‘তুমি তোমার গোত্রের একান্ত প্রিয় নেতা।’ আমি আরম্ভ করলাম, এতে আমার কৃতিত্বের কিছুই নেই। আল্লাহর অনুগ্রহে তারা হেলায়েত লাভ করে মুসলমান হয়েছে। রেওয়ায়েতকারী বলেন, আমি এই বৈঠকে খাকাবস্থায়ই এক ব্যক্তি এসে হযরত (সঃ)-এর কাছে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করল। হযরত (সঃ) তাকে জবাব দিলেন : ‘সদকার ভাগ-বাটোয়ারার দায়িত্ব আল্লাহ্ নবী বা অন্য কাউকে দেননি। বরং তিনি নিজেই সদকার আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই আট শ্রেণীর কোন একটিতে তুমি শামিল থাকলে দিতে পারি।—(কুন্তুবী-পৃষ্ঠা ১৬৮, ১৭১-১)

وَالْأَمْوَالُ الَّتِي لِلشَّيْءِ وَالْمَكْرُورِ অর্থাৎ, ধনীদের সম্পদে রয়েছে

ফকীর-বঞ্চিতদের অধিকার (সূরা যারিয়াত) এতে বলা হয়েছে যে, ধনীদের সম্পদে গরীবদের একটি নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে; আর এ হল তাদের হক।

এ থেকে বোঝা যায় যে, ধনীরা যে দান-খয়রাত করে, তা তাদের এহসান নয়, বরং এটি গরীবদের হক, যা আদায় করা তাদের কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ এ হক আল্লাহ্ নিজেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেউ নিজের খেয়াল-খুশীমত তাতে কয়-বেশী করতে পারবে না। আল্লাহ্ নির্দিষ্ট হকের পরিমাণ এবং তা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব রসূলের উপর সোপর্দ করেছেন। তিনিও এ কাজটিকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তা সাহায্যে কোরামকে যৌথিক বলেই যথেষ্ট মনে করেননি এবং এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বলিত ফরমান লিখে হযরত ওমর ফারাক ও আমর ইবনে হাশম, (রাঃ)-কে সোপর্দ করেছেন। এতে পরিস্কার প্রমাণিত হয় যে, যাকাতের নেসাব এবং প্রত্যেক নেসায়ে যাকাতের যে হার তা চিরদিনের জন্যে আল্লাহ্ তাঁর রসূলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতে কোন যুগে বা কোন দেশে কয়-বেশী বা রদবদল করার অধিকার কারো নেই।

নির্ভরযোগ্য তথ্যমতে মকায় ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় যাকাত ফরয হওয়ার আদেশ নাথিল হয়। তফসীরে ইবনে কাসীরে সূরা মুখাশশিমলের আয়াত فَاتِيئُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (‘সূতরাং নামায কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর’) — দ্বারা তাই প্রমাণ করা হয়। কারণ, সূরাটি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় নাথিল হয়েছে। তবে বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের শুরুতে যাকাতের বিশেষ নেসাব বা বিশেষ হার নির্ধারণ করা হয়নি, বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকত, তা’ মুসলমানগণ মুক্তহস্তে আল্লাহর রাহে দান করে দিতেন। হিজরতের পরে মদীনা শরীফে যাকাতের নেসাব ও হার নির্ধারণ করা হয় এবং মক্কা বিজয়ের পর সদকা ও যাকাত আদায়ের সুষ্ঠু নিয়ম-নীতি প্রবর্তন করা হয়।

সাহাবা ও তাবয়ীগণের ঐকমত্যে অত্র আয়াতে সেই গুয়াজিব সদকার খাতগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা মুসলমানদের জন্যে নামাযের মতই ফরয। কারণ, এ আয়াতে নির্ধারিত খাতগুলো ফরয সদকারই খাত। হাদীসমতে নফল সদকা আট খাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর পরিসর আরও প্রশস্ত।

যদিও পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সাধারণ অর্থেই সদকা শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যার মধ্যে গুয়াজিব ও নফল উভয় সদকাই শামিল রয়েছে, তবে অত্র আয়াতে ইমামগণের ঐকমত্যে কেবল ফরয সদকার খাতসমূহের উল্লেখ রয়েছে। তফসীরে কুন্তুবীতে উল্লেখ আছে যে, কোরআনে যেসব স্থানে ‘সদকা’ শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে নফল

সদকার কোন নির্দশন না থাকলে ফরয সদকাই উদ্দেশ্য হবে।

আলোচ্য আয়াতের শুরুতে **أَتَمَّ** (কেবল) শব্দ আনা হয়। তাই শুরু থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, সদকার যে সকল খাতের বর্ণনা সামনে দেয়া হচ্ছে কেবল সে খাতগুলোতেই সকল ওয়াজিব সদকা ব্যয় করা হবে। এছাড়া অন্য কোন ভাল খাতেও ওয়াজিব সদকা ব্যয় করা যাবে না। যেমন, জেহাদের প্রস্তুতি, মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ কিংবা জনকল্যাণমূলক সংস্থা প্রভৃতি। এগুলোও যে ভাল ও আবশ্যকীয় এবং তাতে ব্যয় করা যে বড় সওয়াবের কাজ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু যে সকল সদকার হার নির্দিষ্ট, তা' এ সকল কাজে ব্যয় করা যাবে না।

আয়াতের দ্বিতীয় শব্দ 'সাদাকাত' হল সদকার বহুবচন। আরবী অভিধানে আল্লাহর ওয়াস্তে সম্পদের সে অংশ ব্যয় করা হয়, তাকে সদকা বলা হয়।—(কামুস) ইমাম রাগেব (রাঃ) 'মুফরাদাতুল কোরআন' গ্রন্থে বলেন, দানকে সদকা বলা হয় এজন্যে যে, দানকারী প্রকারান্তরে দাবী করে যে, কথা ও কাজে সে সত্যবাদী এবং কোন পার্শ্বি স্বার্থে নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই তার এই দান-খয়রাত। বস্তুতঃ যে দানের সাথে দুনিয়ার স্বার্থ বা রিয়াকারী যুক্ত থাকে, কোরআন সে দানকে বার্ষ বলে গণ্য করেছে।

সদকা শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। নফল ও ফরয উভয় দানই এতে शामिल রয়েছে। নফলের জন্যে শব্দটির প্রচুর ব্যবহার, তেমনি ফরয সদকার ক্ষেত্রেও কোরআনের বহুস্থানে শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, **حُتِّبَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ** এবং আলোচ্য **أَتَمَّ الصَّدَقَتُ** আয়াত প্রভৃতি। বরং আল্লাহ কুরতুবী (রহঃ)—এর তত্ত্ব মতে কোরআনে যেখানে শুধু সদকা শব্দের ব্যবহার রয়েছে, সেখানে ফরয সদকা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আবার কতিপয় হাদীসে সদকা বলতে প্রত্যেক সৎকর্মকেও বোঝানো হয়েছে। যেমন, হাদীস শরীফে আছে, 'কোন মুসলমানের সাথে ছটটিতে সাক্ষাৎ করাও সদকা, কোন বোঝা বহনকারীর কাঁধে ভার তুলে দেয়াও সদকা। কূপ থেকে নিজের জন্যে উত্তোলিত পানির কিছু অংশ অন্যকে দান করাও সদকা।' এ হাদীসে সদকা শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের তৃতীয় শব্দ হল **الْمَشْكُورَ**—এর শুরুতে **ل** ('নাম') বর্ণটি উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বাক্যের অর্থ হবে, সকল সদকা সেই লোকদেরই হক, যাদের উল্লেখ পরে রয়েছে।

আটটি খাতের বিবরণ : প্রথম ও দ্বিতীয় খাত হল যথাক্রমে ফকীর ও মিসকীনের। আসল অর্থে যদিও পার্থক্য রয়েছে। যথা, ফকীর হল যার কিছুই নেই এবং মিসকীন হল যে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়। তবে যাকাতের হুকুমে সমান। মোটকথা, যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ অর্থ নেই, তাকে যাকাত দেয়া যাবে এবং সে-ও নিতে পারবে। প্রয়োজনীয় মালামালের মধ্যে থাকার ঘর, ব্যবহৃত বাসন-পেয়লা, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আসবাবপত্র প্রভৃতি शामिल রয়েছে।

সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা বা তার মূল্য যার কাছে রয়েছে এবং সে ঋণগ্রস্ত নয়, সে-ই নেসাবের মালিক। তাকে যাকাত দেয়া ও তার পক্ষে যাকাত নেয়া জায়েয নয়। অনুরূপ, যার কাছে কিছু রূপা বা নাদ কিছু টাকা এবং কিছু স্বর্ণ আছে— সব মিলে যদি সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপার সমমূল্য হয়, তবে সেও নেসাবের মালিক ; তাকেও যাকাত দেয়া নেয়া জায়েয নয়। তবে এ হিসাবে যে নেসাবের মালিক নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবান উপাধীনকম এবং একদিনের খাবার সংস্থানও যার রয়েছে, তাকে যাকাত দেয়া অবশ্য জায়েয, কিন্তু তিক্তবৃষ্টি তার জন্যে জায়েয

নয়। এ ধরনের লোকের পক্ষে মানুষের কাছে হাত পাটা হারান। এব্যাপার অনেকের অসাবধানতা রয়েছে। এ ধরনের লোকেরা হাত পেতে যা করে, তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) জাহান্নামের অঙ্গার বলে অভিহিত করেছেন।—(আবু দাউদ (রাঃ) হতে কুরতুবী)

অবশ্য সাধারণ সদকা অমুসলিমদেরকেও দেয়া যায়। রসূলে করীম (সাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)—কে ইয়ামেন প্রদেশে কালে যাকাত সম্পর্কে হেদায়েত দিয়েছিলেন যে, যাকাতের অর্থ শুধু মুসলিম ধর্মীদের থেকে নেয়া হবে এবং মুসলিম গরীবদেরকে দেয়া হবে। তাই যাকাতের অর্থ শুধু মুসলমান ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে কটন করা হবে। যাকাত ব্যতীত অন্যান্য সদকা-খয়রাত এমনিক সদকায়ে বিভিন্ন অমুসলিমদের দেয়া জায়েয।—(হেদায়া)

দ্বিতীয় শর্ত নেসাবের মালিক না হওয়া। আর তা ফকীর বা মিসকীন শব্দের অর্থেই প্রকাশ পায়। কেননা, তার নিকট হয় কিছুই থাকবে না অথবা নেসাবের পরিমাণ থেকে কম থাকবে। সুতরাং ফকীর ও মিসকীন মধ্য নেসাব পরিমাণ মালের মালিক না হওয়ার ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। যাহোক, এই খাতের পর আরো ছয়টি খাতের বর্ণনা রয়েছে যা প্রথমটি হল "আমেলীনে সদকা" অর্থাৎ, সদকা আদায়কারী। এরা ইসলাম সরকারের পক্ষ থেকে লোকদের কাছ থেকে যাকাত ও গণ্য প্রভৃতি আদায় করে বায়তুলমালে জমা দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকে। এ যেহেতু এ কাজে নিজেদের সময় ব্যয় করে, সেহেতু তাদের জীবন নির্বাহের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের উপর বর্তায়। কোরআন মাজীদে উপরোক্ত আয়াত যাকাতের একাংশ তাদের জন্য রেখে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, তাদের পারিশ্রমিক যাকাতের খাত থেকেই আদায় করা হবে।

এর মূল রহস্য হল এই যে, আল্লাহ পাক মুসলমানদের থেকে যাকাত ও অপরাপর সদকা আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছেন রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে। আর সূরার শেষের দিকে এক আয়াতে বলা হয়েছে : **حُتِّبَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ** "হে রসূল, আপনি তাদের মালামাল থেকে সদকা আদায় করুন।" উক্ত আয়াত মতে রসূলের অবর্তমানে তাঁর উত্তরাধিকারী খলীফা বা আমীর মু'মেনীনের উপর যাকাত ও সদকা আদায়ের দায়িত্ব বর্তায়। বলাবাহুল্য, সহকারী ব্যতীত আমীরের পক্ষে এ দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব না। আলোচ্য আয়াতে "আমেলীন" বলতে যাকাত আদায়কারী তথা সেস সহকারীদের কথাই বলা হয়েছে।

এ আয়াত মতে নবী করীম (সাঃ) অনেক সাহাবাকে বিভিন্ন স্থান যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং আদায়কৃত যাকাত থেকে তাদের পারিশ্রমিক দিতেন। এ সকল সাহাবীর অনেকে ধনীও ছিলেন। হাদীস শরীফে আছে : ধর্মীদের জন্য সদকার অর্থ হালাল নয়, তবে ঋণ ব্যক্তির জন্য হালাল। প্রথমতঃ যে জেহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, কিংবা সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থ তার নেই, যদিও সে স্বদেশে ধনী। দ্বিতীয়তঃ সদকা আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি। তৃতীয়তঃ সেই অর্থপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যার মজুদ অর্থের তুলনায় ঋণ অধিক। চতুর্থতঃ যে ব্যক্তি মূল আদায় করে গরীব-মিসকীন থেকে সদকার মালামাল ক্রয় করে। প্রথমতঃ যাকে গরীব লোকেরা সদকার প্রাপ্ত মাল হাদিয়াস্বরূপ প্রদান করে।

সদকা আদায়কারীদের কি পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়া হবে সে প্রশ্ন স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে হুকুম হল, তাদের কাজ ও পরিশ্রম অনুসারে পারিশ্রমিক দেয়া হবে। —(আহ্‌কামুল-কোরআনঃ জাসাস, কুরতুবী) তবে তাদের পারিশ্রমিক আদায়কৃত যাকাতের অর্ধাংশের বেশী দেয়া যাবে না। যাকাতের আদায়কৃত অর্থ যদি এত অল্প হয় যে, আদায়কারীদের কোন দিগে তার অর্ধেক বা কী থাকে না, তবে বেতনের হার হ্রাস করতে হবে। অর্ধেকের বেশী বেতন খাতে ব্যয় করা যাবে না। —(তফসীরে কুহুযরী, যহীরিয়া)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, যাকাত তহবীল থেকে আদায়কারীদের যে বেতন দেয়া হয়, তা সদকা হিসেবে নয়, বরং পরিশ্রমের বিনিময় হিসেবেই দেয়া হয়। তাই তারা ধনী হলেও এ অর্থের উপযুক্ত এবং যাকাত থেকে তাদেরকে দেয়া জায়েয। আট প্রকারের স্বরূপাতের মধ্যে এই একটি খাতই এমন যে, সেখানে স্বয়ং যাকাতের অর্থ পারিশ্রমিকরূপে দেয়া যায়। অথচ, যাকাত সে দানকেই বলা হয়, যা কোন বিনিময় ছাড়াই গরীবদের প্রদান করা হয়। সুতরাং কোন গরীবকে কাজের বিনিময়ে যাকাতের অর্থ দিলে যাকাত আদায় হবে না।

এখানে দুটি প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমতঃ যাকাত আদায়কারীদেরকে কাজের বিনিময়ে কিরূপে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে? দ্বিতীয়তঃ ধর্মীর জন্যে যাকাতের অর্থ কিভাবে হালাল হবে? উভয় প্রশ্নের উত্তর একটিই। জাহুল এই যে, সদকা আদায়কারীদের আসল পরিচয় জেনে নিতে হবে। জরা আসলে গরীবদেরই উকীলস্বরূপ। বলাবাহুল্য, উকীল কিছু গ্রহণ করলে তা মক্কেলের গ্রহণ বলেই গণ্য হয়। কেউ যদি অন্য লোককে কারো কাছ থেকে কর্ত্ত্ব আদায়ের জন্যে উকীল নিযুক্ত করে, তবে কর্ত্ত্বের টাকা উকীলের হাতে অর্পণ করলেও যেমন ঋণী ব্যক্তি দায়িত্ব মুক্ত হয়, তেমনি গরীবদের উকীল হিসেবে আদায়কারীর মাধ্যমে সদকা আদায় করলেও ধর্মীদের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর উকীল হিসেবে সদকার যে কর্ত্ত্ব তারা সগ্রহ করবে, গরীবরাই তার মালিক হবে। এর পর যাকাতের কর্ত্ত্ব থেকে আদায়কারীর যে বেতন দেয়া হয়, তা আসলে গরীবদের পক্ষ থেকেই, ধর্মীদের পক্ষ থেকে নয়। গরীবরা যাকাতের অর্থ যে কোন ধোয়াধনে ব্যয় করতে পারে। সুতরাং যাকাতের অর্থ দ্বারা তাদের উকীলের পারিশ্রমিক দেয়ার অধিকারও তাদের থাকবে।

অতঃপর প্রশ্ন আসে যে, যাকাত আদায়কারীদেরকে তো গরীবরা উকীল নিযুক্ত করেনি, তারা কেনম করে উকীল সেজে বসল? জবাব হল যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সে দেশের সকল গরীব-মিসকিনের উকীল। কারণ, এদের ভরণ-পোষণের সমুদয় দায়িত্ব তাঁর। তিনি যাকাত আদায়ের জন্যে যাদের নিযুক্ত করেন, তারা তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে গরীবদেরও উকীল সাব্যস্ত হয়।

এ থেকে বোঝা যায় যে, সদকা আদায়কারীদের বেতন হিসেবে যা দেয়া হয় তা মূলতঃ যাকাতের টাকা নয়; বরং যাকাত যে গরীবদের হক, সে গরীবদের পক্ষ থেকেই তা কাজের বিনিময় মাত্র।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান যুগে ইসলামী মাদ্রাসা এবং সে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালক বা তাদের প্রতিনিধিগণ সদকা ও যাকাত যে ধর্মীদের থেকে আদায় করেন, তারা উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নন। তাই যাকাত-সদকা থেকে তাদের কোন-ভাতা আদায় করা যাবে না; বরং ভিন্ন খাত থেকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, তারা ধর্মীদের উকীল, গরীবদের নয়। ধর্মীদের পক্ষ

থেকেই যাকাতের টাকা উপযুক্ত ঋতে ব্যয় করার অধিকার তাদের দেয়া হয়। সুতরাং যাকাতের টাকা তাদের হস্তগত হওয়ার পর সঠিক স্থানে ব্যয় না করা পর্যন্ত দাতাদের যাকাতও আদায় হবে না।

তারা যে গরীবদের উকীল নয়, তা সুস্পষ্ট। কারণ, কোন গরীব তাদের উকীল নিযুক্ত করেননি এবং আমীরুল মুমেনীনের প্রতিনিধিত্বও তারা করেন না। তাই তাদের পক্ষে ধর্মীদের উকীল হওয়া ব্যতীত আর কোন পথ খোলা নেই। সুতরাং যাকাত ঋতে ব্যয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যাকাতের টাকা তাদের হাতে থাকা ও মালিকের হাতে থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

এ ব্যাপারে সাধারণতঃ সাবধানতা অবলম্বন করা হয় না। বহু প্রতিষ্ঠান যাকাতের বিস্তার টাকা সগ্রহ করে বছরের পর বছর সিদ্ধুক তলাবদ্ধ করে রাখে। আর যাকাতদাতারা মনে করে যে, যাকাত আদায় হয়ে গেল। অথচ তাদের যাকাত আদায় হবে তখনই, যখন তা যাকাতের নির্ধারিত যে কোন একটি খাতে ব্যয়িত হবে।

অনুরূপ অনেকে বর্তমান যুগের যাকাত আদায়কারীদেরকে আমীরুল মুমেনীনের প্রতিনিধিবর্গের সাথে তুলনা করে যাকাতের অর্থ থেকে তাদের বেতন পরিশোধ করে। একান্তভাবেই এটি অজ্ঞতাপ্রসূত। দাতা ও গ্রহীতা কারো পক্ষেই তা জায়েয নয়।

এবাদতের পারিশ্রমিক গ্রহণ : এখানে আরও একটি প্রশ্ন আসে। কোরআনের ইশারা-ইঙ্গিত এবং হাদীসের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোন এবাদতের বিনিময় ও মজুরী নেয়া হারাম। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে : **قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَلَا تَكُلُوبُهُ** অর্থাৎ, “কোরআন পাঠ কর, কিন্তু কোরআনকে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে পরিণত করো না।” অপর হাদীসে কোরআন দ্বারা উপার্জিত বস্তুকে জাহান্নামের অংশ বলা হয়েছে। এসব হাদীসের প্রেক্ষিতে কেবাহ শাস্ত্রবিদগণ একমত যে, এবাদত-বন্দেগীর পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয নয়। সুতরাং নিঃসন্দেহে সদকা-স্বরূপ আদায় করাও এবাদত ও দ্বীনের একটি সেবা। রসূলে করীম (সাঃ) একে এক প্রকারের জেহাদ বলে অভিহিত করেছেন। তাই এ এবাদতের মজুরী গ্রহণ করাও হারাম হওয়া সঙ্গত। অথচ কোরআনের আলোচ্য আয়াতটি তা স্পষ্টরূপে জায়েয করে দিয়েছে এবং যাকাতের আট খাতের মধ্যে একেও শামিল করেছে।

ইমাম কুরতুবী (রাঃ) তাঁর তফসীরে বলেন, যে এবাদত করযে আইন বা ওয়াজেবে আইন, তার পারিশ্রমিক নেয়া সর্বাবস্থায় হারাম। কিন্তু যে এবাদত করযে কেফায়াহ, তার বিনিময় নেয়া এ আয়াত মতে জায়েয। করযে কেফায়াহ হল, যা সকল উম্মত বা শহরের সকল বাসিন্দার জন্যে করয, কিন্তু সকলের আদায় করা জরুরী নয়, কিছু লোক আদায় করলেই সবাই দায়িত্ব মুক্তি হয়। কিন্তু কেউ আদায় না করলে সবাই শুনাহার হয়।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, “এ আয়াত মতে ইমামতি ও ওয়ায-নসীহতের পারিশ্রমিক নেয়াও জায়েয রয়েছে। কারণ, এগুলো ওয়াজেবে-আইন নয়; বরং ওয়াজেবে-কেফায়াহ।” অনুরূপ কোরআন-হাদীস ও অপরাপর দ্বীনী এলমের তালীম ও প্রচার সকল উম্মতের জন্যেই করযে-কেফায়াহ। কতিপয় লোক দায়িত্ব পালন করলে সকলেই দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যায়। তাই এ সকল এবাদতের বিনিময় নেয়া জায়েয।

যাকাতের চতুর্থ ব্যয়খাত হল ‘মুআল্লাফাতুল কুলুব’। সাধারণতঃ তারা

তিন-চার শ্রেণীর বলে উল্লেখ করা হয়। এদের কিছু মুসলমান, কিছু অমুসলমান। মুসলমানদের মধ্যে কেউ ছিল চরম অভাবগ্রস্ত এবং নওমুসলিম, এদের চিত্তাকর্ষণের ব্যবস্থা এজন্যে নেয়া হয়, যেন তাদের ইসলামী বিশ্বাস পরিপক্ব হয়। আর কেউ ছিল ধনী, কিন্তু তাদের অন্তর তখনো ইসলামে রঞ্জিত হয়নি। আর কেউ কেউ ছিল পরিপক্ব মুসলমান, কিন্তু তার গোত্রকে এর দ্বারা হেদায়েতের পথে আনা উদ্দেশ্য ছিল। অমুসলমানদের মধ্যেও এমন অনেকে রয়েছে, যাদের শত্রুতা থেকে বাঁচার জন্যে তাদের পরিতুষ্ট রাখার প্রয়োজন ছিল। আর কেউ ছিল, যারা ওয়ায নসীহত কিংবা যুদ্ধ ও শক্তি প্রয়োগ দ্বারাও ইসলামে প্রভাবিত হচ্ছে না; বরং অতিজ্ঞতার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা দয়া, দান ও সদুবহারে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। রসুলে করীম (সাঃ)—এর সমগ্র জীবনের ব্রত ছিল কুফরীর অন্ধকার থেকে আল্লাহর বন্দাদের ঈমানের আলোয় নিয়ে আসা। তাই এ ধরনের লোকদের প্রভাবিত করার জন্য যে কোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করতেন। এরা সবাই মুআল্লাফাতুন কুলুবের অন্তর্ভুক্ত এবং আলোচ্য আয়াতে এদেরকে সদকার চতুর্থ ব্যয়খাত রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, এদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদকার অংশ দেয়া হত। সাধারণ ধারণা মতে মুসলিম-অমুসলিম উভয় শ্রেণীই এতে রয়েছে। অমুসলিমদের চিত্তাকর্ষণ করা হয় ইসলামের প্রতি উৎসাহিত করার জন্যে, আর নওমুসলিমদের পরিতুষ্ট করা হয় ইসলামের উপর অবিচল থাকার জন্য। জনশ্রুতি রয়েছে যে, নবী-যুগে উল্লেখিত বিশেষ কারণে এদের সদকা দান করা হত। কিন্তু হযরত (সাঃ)—এর ওফাতের পর যখন ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কাফেরদের শত্রুতা থেকে বাঁচা ও নওমুসলিমদের আকীদা পোক্ত করার জন্য এ সকল পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন তিরোহিত হয়ে যায়, তখন সেই কারণ ও উদ্দেশ্য আর বাকী থাকেনি। তাই তাদের সদকা দানও বন্ধ করে দেয়া হয়। কতিপয় ফেকাহবিদ এ অবস্থার প্রেক্ষিতে হুকুমটি রহিত বলে মন্তব্য করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছে হযরত ওমর ফারাক (রাঃ), হযরত হাসান বসরী, শা'বী, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহঃ)।

তবে অপরাপর ইমাম ও ফেকাহবিদগণের মতে হুকুমটি রহিত নয়; বরং হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারাক (রাঃ)—এর যুগে প্রয়োজন ছিল না বলে তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে পুনরায় প্রয়োজন দেখা দিলে এই শ্রেণীর লোকদিগকে যাকাতের অংশ দেয়া যাবে। এ মতের অনুসারী হলেন ইমাম যুহরী, কাযী আবদুল ওহাব ইবনে আরবী, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)।

প্রকৃত সত্য কথা হল এই যে, কোন যুগেই সদকা প্রভৃতি থেকে অমুসলিমদের অংশ দেয়া হয়নি এবং তারা যাকাতের চতুর্থ ব্যয়খাত—‘মুআল্লাফাতুলকুলুবে’ শামিল ছিল না।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) স্বীয় তফসীর গ্রন্থে রসুলে করীম (সাঃ) যাদের চিত্তাকর্ষণের জন্য সদকার খাত থেকে দান করেছিলেন, সবিস্তারে তাদের নামধামসহ উল্লেখ করে বলেছেন, *وَالْجَمَلَةُ لَكُمْ مِمَّنْ وَلَمْ يَكُنْ* নামধামসহ উল্লেখ করে বলেছেন, *وَالْجَمَلَةُ لَكُمْ مِمَّنْ وَلَمْ يَكُنْ* অর্থাৎ, তারা ছিল মুসলমান, তাদের মধ্যে অমুসলমান বলতে কেউ ছিল না।

অনুরূপ তফসীরে মাযহরীতে আছে :

لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطَى أَحَدًا مِنَ الْكُفَّارِ لِلْإِبْلَافِ شَيْئًا مِنَ الزَّكَاةِ

অর্থাৎ, কোন রেওয়াজেও থেকে

একথা প্রমাণিত নেই যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) কাফেরদের চিত্তাকর্ষণের জন্য যাকাতের অংশ দিয়েছিলেন। এ কথার সমর্থনে তফসীরে কাশশাফে একটি উক্তি পেশ করা যায়। তাতে উল্লেখ আছে যে, “কোরআনে এ যাকাতের ব্যয়খাতের বর্ণনার উদ্দেশ্য হল কাফের-মুনাফেকদের অপমান খণ্ডন করা যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) সদকার অংশ থেকে তাদের বঞ্চিত করেছেন। আয়াতে এই ব্যয়-খাতসমূহের বিবরণ দিয়ে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, সদকায় কাফেরদের কোন অধিকার নেই। মুআল্লাফাতুল কুলুবে কাফেরগণ শামিল থাকলে একথা বলার প্রয়োজন ছিল না।”

তফসীরে মাযহরীতে সে ভ্রমটিকেও অত্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে যা কোন কোন হাদীসের রেওয়াজেতের দরুন মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে। সেসব রেওয়াজেতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) কোন কোন অমুসলিমদেরকেও কিছু উপঢৌকন দিয়েছেন। সুতরাং স্বীয় মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়াজেতে সে কথা উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) সফওয়ান ইবনে উমাইয়্যাহকে তার কাফের থাকাকালে কিছু উপঢৌকন দান করেছেন, সে সম্পর্কে ইমাম নবতী (রহঃ)—এ উদ্ধৃতিক্রমে লেখা হয়েছে যে, এসব দান যাকাতের মালের মধ্য থেকে ছিল না; বরং হুতাইন যুদ্ধের গনীমতের মালের যে পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তার মধ্য থেকেই দেয়া হয়েছিল। আর একথা কলাই বাহুল্য যে, বায়তুলমালের এই খাত থেকে মুসলিম-অমুসলিম উভয়েই দান করা সমস্ত ফেকাহবিদগণের একমত্যােই জায়েয। অতঃপর কলাই বাহুল্য যে, ইমাম বায়হাকী (রহঃ), ইবনে সাহিয়েদুনাস, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ সবাই বলেছেন যে, এ দান যাকাতের মাল থেকে ছিল না, বরং গনীমতের পঞ্চমাংশ থেকে ছিল।

এ পর্যন্ত সদকার আটটি ব্যয়ক্ষেত্রের চারটির বিবরণ দান করা হল। এ চারটির অধিকার ‘লাম’ বর্ণের আওতায় বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে *لِلْمُقَرَّبِينَ وَالسَّكِينِ* পরবর্তীতে যে চারটি ব্যয়খাতের আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে শিরোনাম পরিবর্তন করে ‘লাম’—এর পরিবর্তে *لِ* (কী) ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে *وَفِي الرِّقَابِ وَالْفُرُوجِ* ইমাম যামাখশারী তাঁর কাশশাফ গ্রন্থে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এরা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, শেষের এ চারটি ব্যয়খাত প্রথম চারটি ব্যয়খাতের তুলনায় বেশী হকদার। কারণ, *فِي* হরফটি পাতকে বোঝাবার জন্য বলা হয়। ফলে তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, সদকাসমূহ এ সমস্ত লোকের মাঝে বেঁধে দেয়া উচিত। তাদের অধিকতর হকদার হওয়ার কারণ এই যে, প্রয়োজনীয়তা তাদেরই অধিক। কেননা, যে লোক কারো মালিকানাধীন দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ, সে সাধারণ ফকীর-মিসকীনদের তুলনায় অধিক কষ্টে রয়েছে। তেমনিভাবে যে লোক কারো কাছে গণী এবং পাণ্ডাদাররা তার উপর তাকাদা করছে, সে সাধারণ গণী-মিসকীন অপেক্ষা অধিক অভাবে থাকে। কারণ, নিজের দৈনন্দিন ব্যয়ভারে চাইতেও বেশী চিন্তা থাকে তার পাণ্ডাদারদের প্রতি।

আরেকটি ব্যয়খাত হল *لِالْفُرُوجِ* যা *غَارِمٍ* এর বহুবচন। এর অর্থ দেনাদার, ঋণী। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ব্যয়খাত *فِي*—এর সহযোগে বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রাপ্যতার অধিকারে প্রথম চারটি ব্যয়খাত অপেক্ষা অগ্রগণ্য। সেজন্য গোলামকে তার মুক্তির জন্য কিংবা ঋণগ্রস্তকে তার ঋণমুক্তির জন্য দান করা সাধারণ ফকীর-মিসকীনকে দান করার চাইতে উত্তম। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, ঋণগ্রস্তের কাছে এ পরিমাণ সম্পদ থাকবে না, যাতে সে ঋণ পরিশোধ করতে পারে। কারণ, অভিধানে এমন ঋণী ব্যক্তিকেই *غَارِمٍ* (গারেম) ক

আবার কোন কোন ইমাম এ শর্তও আরোপ করেছেন যে, সে ঋণ কোন কোন অবৈধ কাজের জন্য না করে থাকে। কোন পাপ কাজের জন্য ঋণ করে থাকে—যেমন, মদ কিংবা বিয়ে-শাদীর নাজায়েয ঋণ-অনুষ্ঠান প্রভৃতি, তবে এমন ঋণগ্রস্তকে যাকাতের অর্থ থেকে দান করা যাবে না; যাতে তার পাপ কাজও অপব্যয়ে অনর্থক উৎসাহ দান করা হয়।

في سبيل الله এখানে আবারো في হরফের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তফসীরে-কাশাশাফে বর্ণিত রয়েছে যে, এই পুনরাবৃত্তিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ খাতটি পূর্বোল্লিখিত সব খাত অপেক্ষা উত্তম। তার কারণ এই যে, এতে দু'টি ফায়দা রয়েছে। (১) গরীব-নিঃশেষের সাহায্য এবং (২) একটি ধর্মীয় সেবায় সহায়তা করা। কারণ في سبيل الله—এর মর্ম সেসব ধর্মী ও মুজাহিদ, যাদের অস্ত্র ও জেহাদের উপকরণ ক্রয় করার ক্ষমতা নেই অথবা ঐ ব্যক্তি যার উপর হজ্ব ফরয হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আর তার কাছে এমন অর্থ নেই যাতে সে ফরয হজ্ব আদায় করতে পারে। এ দু'টি কাজই নির্ভেজাল ধর্মীয় খেদমত ও এবাদত। কাজেই যাকাতের মাল দ্বারা ব্যয় করায় একজন নিঃশেষ লোকের সাহায্য হয় এবং একটি এবাদত আদায়ের সহযোগিতাও হয়। এমনিভাবে ফেকাহবিদগণ ছাত্রদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ, তারাও একটি এবাদত আদায় করার জন্যই এ রত গ্রহণ করে থাকে।—(যাহেরিয়ার হাওয়ালায় রুহুল-মা'আনী)

বাদায়ে, প্রণেতা বলেছেন যে, এমন প্রত্যেক লোকই 'ফী-সাবিলিল্লাহ' খাতের আওতাভুক্ত যে কোন সংকাজ কিংবা এবাদত করতে চায় যাতে জ্বরের প্রয়োজন। অবশ্য এতে শর্ত এই যে, তার কাছে এমন অর্থ-সম্পদ থাকবে না যদ্বারা সরিষ্ট সে কাজটি সম্পাদন করতে পারে। যেমন, ধর্মীয় শিক্ষা ও তবলীগ এবং সে জন্য প্রচার প্রকাশনা প্রভৃতি। কোন যাকাতের হকদার লোক যদি এ কাজ করতে চায়, তবে তাকে যাকাতের মাল দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে, কিন্তু কোন মালদার লোককে তা দেয়া যায় না।

উল্লিখিত বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, এ সমস্ত অবস্থাতেই যা سبيل الله—এর তফসীরে বর্ণনা করা হলো দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ততার শর্তটির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কোন ধনী সাহেবে-নেসাবের কোন অংশ এতে নেই। অবশ্য যদি তার বর্তমান মালামাল তার সে প্রয়োজন মেটাতে না পারে, যা জেহাদ কিংবা হজ্বের জন্য প্রয়োজন, তবে যদিও নেসাব পরিমাণ মালামাল বর্তমান থাকার কারণে তাকে ধনী বলা যেতে পারে—যেমন এক হাদীসেও তাকে غنى (ধনী) বলা হয়েছে, কিন্তু সেও এ হিসাবে ফকীর ও অভাবগ্রস্ত বলে গণ্য হবে। যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ জেহাদ অথবা হজ্বের জন্য প্রয়োজন তা তার কাছে বর্তমান নয়। 'ফতহুল-কাদীর' গ্রন্থে শাইখ ইবনে-হুযায় (রহঃ) বলেছেন, সদকা সক্রোস্ত আয়াতসমূহে যেসব ব্যয়খাতের কথা বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটির শব্দ স্বয়ং এর প্রমাণ দেন করে যে, সে তার দৈন্য ও অভাবের ভিত্তিতেই হকদার। ফকীর ও মিসকীন শব্দে তো তা সুস্পষ্ট রয়েছেই; রেকাব, গাবেরীন, ফী-সাবিলিল্লাহ, ইবনুস-সাবীল প্রভৃতি শব্দও এরই ইঙ্গিতবহ যে, তাদের অভাব দূর করার ভিত্তিতেই তাদেরকে দান করা হয়। অবশ্য যারা عاملين (খোদাশ্রিত) যাকাত উসুলকারী— তাদেরকে দেয়া হয় তাদের সেবার বিনিময়ে। সুতরাং এতে আযীর-ফকীর সমান। যেমন, غارمين এর খাত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে লোকের উপর দশ হাজার টাকার ঋণ রয়েছে এবং পাঁচ হাজার টাকা তার কাছে রয়েছে, তাকে পাঁচ হাজার টাকার যাকাত দেয়া যেতে পারে। কারণ, যে মাল তার কাছে মওজুদ রয়েছে, তা তার ঋণের দরুন না থাকারই শামিল।

জ্ঞাতব্য : الله في سبيل الله শব্দের অর্থ অতি ব্যাপক। যেসব কাজ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়, সে সবই এই ব্যাপক মর্মানুযায়ী الله في سبيل الله—এর অন্তর্ভুক্ত। যেসব লোক রসুলে করীম (সাঃ)—এর ব্যাখ্যা ও বর্ণনা এবং তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের বক্তব্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র শাস্ত্রিক অর্থের মাধ্যমে কোরআনকে বুঝতে চায়, এখানে তাদের এ বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, তারা الله في سبيل الله শব্দটি দেখেই সে সমস্ত কাজকেও যাকাতের ব্যয়-খাতের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, যা কোন কোন দিক দিয়ে সংকাজ কিংবা এবাদত বলে গণ্য। মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, সরাইখানা প্রভৃতি নির্মাণ, কূপ খনন, পুল ও সড়ক তৈরী করা এবং সেসব জনকল্যাণমূলক সংস্থার কর্মচারীদের বেতন ও যাবতীয় ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাকে তারা الله في سبيل الله—এর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে যাকাতের ব্যয়খাত সাব্যস্ত করে দিয়েছেন, যা একান্তই ভুল এবং সমগ্র উম্মতের ইজমার পরিপন্থী। সাহাবায়ে-কেরাম, যারা কোরআনকে সরাসরি রসুলে করীম (সাঃ)—এর নিকট অধ্যয়ন করেছেন ও বুঝেছেন, তাঁদের এবং তাবয়ীন ইমামগণের যত রকম তফসীর এ শব্দটির ব্যাপারে উদ্ধৃত রয়েছে তাতে এ শব্দটিকে হজ্বব্রতী ও মুজাহেদীদের জন্য নির্দিষ্ট বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি তাঁর একটি উট الله في سبيل الله (ফী-সাবিলিল্লাহ) গুয়াকফ করে দিয়েছিল। তখন মহানবী (সাঃ) সে লোকটিকে বলে দেন যে, একে হাজীদের সফরের কাজে ব্যবহার করো।—(মবসূত ৩, পৃঃ-১০)

ইমাম ইবনে জরীর, ইবনে-কাসীর প্রমুখ হাদীসের রেওয়ায়েতের দ্বারা কোরআনের তফসীর করেন। তাঁদের সবাই الله في سبিল الله শব্দকে এমন মুজাহেদীন ও হজ্বব্রতীদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, যাদের কাছে জেহাদ কিংবা হজ্ব করার উপকরণ নেই। আর যেসব ফেকাহবিদ মনীযীবন্দ তালেবে-এলম কিংবা অন্যান্য সংকামীদিগকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁরাও এ শর্তেই তা করেছেন যে, তাদেরকে ফকীর ও অভাবগ্রস্ত হতে হবে। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, ফকীর ও অভাবগ্রস্তরা নিজেই যাকাতের সর্বপ্রথম ব্যয়খাত। এদেরকে ফী-সাবিলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত করা না হলেও এরা যাকাতের হকদার ছিল। কিন্তু চার ইমাম ও উম্মতের ফেকাহবিদগণের কেউই একথা বলেননি যে, জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণে এবং সে সমস্তের যাবতীয় প্রয়োজন যাকাতের ব্যয়খাতের অন্তর্ভুক্ত। বরং তাঁরা এ বিষয়ে ভিন্নমত ব্যক্ত করে বলেছেন যে, যাকাতের মালামাল এসব বিষয়ে ব্যয় করা না জায়েয। হানাফী ফেকাহবিদ ইমামগণের মধ্যে শামসুল আয়েম্মা সারাখসী মবসূত দ্বিতীয় খণ্ড, ২০২ পৃষ্ঠায় এবং শরহে-সিয়াস চতুর্থ খণ্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠায়, শাফেয়ী ফেকাহবিদগণের মধ্যে আবু ওবায়দ 'কিতাবুল-আমওয়াল' গ্রন্থে, মালেকী ফেকাহবিদগণের 'দার্দেজ শরহে মুখতাসারুল খলীল' প্রথম খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠায় এবং হাম্বলী ফেকাহবিদগণের মধ্যে মুত্তাফিক মুগনী গ্রন্থে এ বিষয়টি সবিস্তারে লিখেছেন।

السبيل (ইবনুস-সাবীল) অর্থ পথ। আর ابن অর্থ মূলতঃ পুত্র হলেও আরবী পরিভাষায় اب و ابن প্রভৃতি সে সমস্ত বিষয়ের জন্যও বলা হয়, যার গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক কারো সাথে থাকে। এই পরিভাষা অনুযায়ী السبيل ابن বলা হয় পথিক ও মুসাফিরকে। কারণ, পথ অতিক্রম করা এবং গন্তব্য-স্থানের সন্ধান করার সাথে তাদের সম্পর্কও অতি নিবিড়। আর যাকাতের ব্যয়খাতের ক্ষেত্রে এমন মুসাফির বা পথিককে বুঝানোই উদ্দেশ্য; যার কাছে সফরকালে প্রয়োজনীয়

يَحْفِقُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُذْهِبَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا
أَنَّهُ مَنْ يَحْدِدِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنْ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ
خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخُزْيُ الْعَظِيمُ ۝ يَحْذَرُ الْمُتَّقُونَ
أَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ
قُلِ اسْتَخْرِعُوا إِنِ اللَّهُ مُخْرِجُ مَا تَخْذَرُونَ ۝ وَلَئِنْ
سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ يَا آلِهَ
وَالِنَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ
كُفِّرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ تُعَفُّ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ
تُعَذِّبُ طَائِفَةٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَانُوا لَمُجْرِمِينَ ۝ الْمُتَّقُونَ
وَالْمُتَّقِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَمُرُّونَ بِالْمَشْكَرِ
وَيَذَرُونَهُ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا
اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ
الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُفَارِّ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ۝

(৬২) তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায় যাতে তোমাদের রাযী করতে পারে। অবশ্য তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহকে এবং তাঁর রসুলকে রাযী করা অত্যন্ত জরুরী। (৬৩) তারা কি একথা জেনে নেয়নি যে, আল্লাহর সাথে এবং তাঁর রসুলের সাথে যে মোকাবেলা করে তাঁর জন্য নির্ধারিত রয়েছে দোখখ; তাতে সব সময় থাকবে। এটিই হল মত-অপমান। (৬৪) মুনাফেকরা এ ব্যাপারে ভয় করে যে, মুসলমানদের উপর না এমন কোন সুরা নাযিল হয়, যাতে তাদের অন্তরের গোপন বিষয় অবহিত করা হবে। সুতরাং আপনি বলে দিন, ঠাট্টা-বিদ্রোপ করতে থাক; আল্লাহ তা অবশ্যই প্রকাশ করবেন যার ব্যাপারে তোমরা ভয় করছ। (৬৫) আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর রসুল-আহকামের সাথে এবং তাঁর রসুলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? (৬৬) ছলনা করো না, তোমরা যে কাকের হৃদয় গেছ ঈম্মা প্রকাশ করার পর। তোমাদের মধ্যে কোন কোন লোককে যদি আমি ক্ষমা করে দেইও, তবে অবশ্য কিছু লোককে আযাবও দেব। কারণ, তারা ছিল গোনাহ্গার। (৬৭) মুনাফেক নর-নারী সবাইই গতিবিধি এক রকম; শিক্ষায় মন্দ কথা, ভাল কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বদ্ধ রাখে। আল্লাহকে ভুল গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিউসন্দেহে মুনাফেকরাই নাকরমান। (৬৮) ওয়াদা করেছেন আল্লাহ মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারীদের এবং কাফেরদের জন্যে দোখখের আশুনের- তাতে পড়ে থাকবে সর্বদা। সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসপাত করেছে এবং তাদের জন্য রয়েছে স্বায়ী আজাব।

অর্থ-সম্পদ নেই, স্বদেশে তার যত অর্থ-সম্পদই থাক না কেন। এমন মুসাক্ষিরকে যাকাতের মাল দেয়া যেতে পারে, যাতে করে সে তার সফরের প্রয়োজনাঙ্গাদি সমাধা করতে পারবে এবং স্বদেশে ফিরে যেতে সক্ষম হবে।

এ পর্যন্ত যাকাতের সে আটটি খাতের বিবরণ সমাপ্ত হল, যা উল্লিখিত আয়াতে সদকা ও যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে। এবার এখন কিছু মাসআলা বর্ণনা করা যাচ্ছে যেগুলো একইভাবে সে সমস্ত খাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মালিকানা : অধিকাংশ ফেকাহবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাতের নির্ধারিত আটটি খাতে ব্যয় করার ব্যাপারেও যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত রয়েছে যে, এসব খাতে কোন হকদারকে যাকাতের মালের উপর মালিকানা স্বত্ত্ব বা অধিকার দিয়ে দিতে হবে। মালিকানা অধিকার দেয়া ছাড়া যদি কোন মাল তাদেরই উপকার কাম্পে ব্যয় করা হয়, তবুও যাকাত আদায় হবে না। সে কারণেই চার ইমামসহ উশ্বাহু অধিকাংশ ফেকাহবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাতের অর্থ মসজিদ-মাদ্রাসা কিংবা হাসপাতাল-এভীমখানা প্রভৃতি নির্মাণ অথবা তাদের অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করা জায়েয নয়। যদিও এসব বিষয়ের উপকারিতা সেই ফকীর-মিসকীন ও প্রাপ্ত হয়, যারা যাকাতের খাত হিসাবে গণ্য, কিন্তু তাদের মালিকানা স্বত্ত্ব এসব বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এতে যাকাত আদায় হবে না।

অবশ্য এতীমখানাগুলোতে যদি মালিকানা স্বত্ব হিসাবে এতীমদের খাওয়া-পরা দেয়া হয়, তবে সে ব্যয়ের অনুপাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। তেমনিভাবে হাসপাতালসমূহে সেযব ওষুধ অতীম গরীবদিগকে মালিকানা অধিকার মোতাবেক দিয়ে দেয়া হয়, তার মূল্যও যাকাতের অর্থে পরিশোধ করা যেতে পারে। এমনভাবে উ-খাদ্য ফেকাহবিদগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী লা-ওয়্যারিস মৃতের কাফন যাকাতের অর্থ থেকে দেয়া যেতে পারে না। কারণ, মৃতের মালিক হওয়ার যোগ্য থাকে না। তবে যাকাতের অর্থ যদি কোন গরীব হকদার লোককে দিয়া দেয়া হয় এবং সে স্বেচ্ছায় সে অর্থ লা-ওয়্যারিস মৃতের কাফনে ব্যয় করে, তাহলে তা জায়েয। তেমনিভাবে যদি সে মৃতর উপর ঋণ থাকে, তবে সে ঋণ সরাসরি যাকাতের অর্থের দ্বারা আদায় করা যায় না। তবে তার বেশ ওয়্যারিস যদি গরীব ও যাকাতের হকদার হয়, তবে তাকে মালিকানা ভিত্তিতে তা দেয়া যেতে পারে। তখন সে অর্থের মালিক হয়ে নিজের ইচ্ছায় তদ্বারা মৃতের ঋণ পরিশোধ করতে পারে। এমনভাবে জনকল্যাণমূলক যাবতীয় কাজকর্ম—যেমন, কুপ খনন, পুল নির্মাণ কিংবা সড়ক তৈরী প্রভৃতি। যদিও এসবের মাধ্যমে যাকাত পাবার যোগ্য লোকেরাও উপকৃত হয়, কিন্তু এতে তাদের মালিকানা, অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এতে যাকাত আদায় হবে না।

মালিকুল-ওলামা তাঁর ‘বেদায়্যাহ’ গ্রন্থে যাকাত আদায় হওয়ার জন্য মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার শর্তের পক্ষে দলীল দিয়েছেন যে, কোরআন সাধারণতঃ যাকাত ও ওয়াজিব সদকার ক্ষেত্রে ايتاء শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—

وَأَيُّمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ — آتَاؤُا الصَّلَاةَ — وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ — وَآتُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَكَانُوا
 أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِهَا فَلَمَّا جَاءَهُمْ
 بَعْدُ مَا كَانُوا يَسْتَمْتَعُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِمَا كَانُوا
 يَكْفُرُونَ كَانُوا فِي غَاوٍ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ أَلَمْ يَأْتِهِمْ
 نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تَوَفَّوْا وَعَادُوا وَتَوَفَّوْا وَتَوَفَّوْا
 إِنْهُمْ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ۝ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
 بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ مُذَكِّرٌ ۝
 وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ ظَنِينٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ
 وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

প্রভৃতি আর 'إِنَاء' শব্দটি অভিধানে দান করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইমাম রাগেব ইসপাহানী (রহঃ) 'মুফরাদাত-কোরআন' গ্রন্থে বলেছেন—
 ৯. অর্থ 'إِنَاء' والاعطاء. رخص وضع الصدقة في القرآن بالإناء.
 'ইতা' অর্থ দান করা। আর কোরআনে ওয়াজিব সদকা আদায় করাকে
 'ইতা' শব্দের সাথে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। 'আর একথা বলাই বাহুল্য
 যে, কাউকে কোন কিছু দান করার মর্ম এটাই যে, তাকে সে বস্তুর মালিক
 বানিয়ে দেয়া হবে।

তাহাড়া যাকাত ছাড়াও 'إِنَاء' শব্দটি কোরআন করীমে মালিক বানিয়ে
 দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ ৯. অর্থ ৯.
 স্ত্রীদিগকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও। আর একথা সুস্পষ্ট যে, মোহরানা
 পরিশোধ করা হয়েছে বলে তখনই স্বীকৃত হবে যখন, মোহরের উপর
 স্ত্রীর মালিকানা স্বত্ত্ব দিয়ে দেয়া হবে।

দ্বিতীয়তঃ কোরআন করীমে যাকাতকে 'সদকা' শব্দে উল্লেখ করা
 হয়েছে। বলা হয়েছে— إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفَقَرَاءِ ৯. আর صدقة (সদকাহ)—এর
 প্রকৃত অর্থ তাই যে, কোন ফকীর-অভাবগ্রস্তকে তার মালিক বানিয়ে
 দেয়া হবে।

কাউকে খাবার খাইয়ে দেয়া কিংবা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে
 দেয়াকে প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে 'সদকা' বলা হয় না। শায়খ-ইবনে হুমায়
 'ফাতহুল-কাদীর' গ্রন্থে বলেছেন, সদকার তাৎপর্যও তাই যে, কোন
 কাকেরকে সে মালের মালিক বানিয়ে দেয়া হবে। এমনভাবে ইমাম
 জাসসাস 'আহকামুল-কোরআনে' বলেছেন, 'সদকা' শব্দটি হল মালিক
 করে দেয়ার নাম।—(জাসসাস ২য় খঃ ১৫২ পৃঃ)

আনুষঙ্গিক স্মার্তব্য বিষয়

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ আয়াতে কাকের ও
 মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের সাথে জেহাদ করতে এবং তাদের ব্যাপারে
 কঠোর হতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে যারা
 কাকের তাদের সাথে জেহাদ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট, কিন্তু
 মুনাফিকদের সাথে জেহাদ করার অর্থ স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর
 কর্মধারায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের সাথে জেহাদ করার মর্ম হল
 মৌখিক জেহাদ। অর্থাৎ, তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার
 জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে যাতে করে তারা ইসলামের দাবীতে নিষ্ঠাবান
 হয়ে যেতে পারে।—(কুরতুবী, মায়হারী)

وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ — এতে غلظ এর প্রকৃত অর্থ হল এই যে, উদ্ভিষ্ট
 ব্যক্তি যে আচরণের খোঁজ হবে তাতে কোন রকম রেয়ায়েত বা কোমলতা
 মেন না করা হয়। এ শব্দটি وأُفْتُ এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হল
 কোমলতা ও করুণা।

ইমাম কুরতুবী বলেছেন যে, এক্ষেত্রে غلظ শব্দ ব্যবহারে বাস্তব ও
 কার্যকর কঠোরতাই বোঝানো হয়েছে যে, তাদের উপর শরীয়তের হুকুম
 জারী করতে গিয়ে কোন রকম দয়া বা কোমলতা করবেন না। মুখে বা
 কথায় কঠোরতা প্রদর্শন করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তা
 নবী-রসুলগণের রীতি বিরুদ্ধ। তাঁরা কারো প্রতি কটুবাক্য কিংবা গালাগালি
 করতেন না। এক হাদীসে রসুলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—
 “যদি তোমাদের কোন ক্রীতদাসী যিনায় লিপ্ত হয়, তবে শরীয়ত অনুযায়ী তার

(৬৯) যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তোমাদের চেয়ে বেশী ছিল
 দক্ষিণে এবং ধন-সম্পদের ও সম্ভান-সমৃদ্ধির অধিকারীও ছিল বেশী ;
 জঙ্গলের উপকৃত হয়েছে নিজেদের ভাগের দ্বারা। আবার তোমরা ফায়দা
 টুটিয়েছ তোমাদের ভাগের দ্বারা— যেমন করে তোমাদের পূর্ববর্তীরা ফায়দা
 টুটিয়েছিল নিজেদের ভাগের দ্বারা। আর তোমরাও চলছ তাদেরই চলন
 অনুযায়ী। তারা ছিল সে লোক, যাদের আমলসমূহ নিঃশেষিত হয়ে গেছে
 মুনিয়া ও আখেরাতে। আর তারাও হয়েছে ক্ষতির সম্মুখীন। (৭০) তাদের
 সংবাদ কি এদের কানে এসে পৌঁছায়নি, যারা ছিল তাদের পূর্বে, নূহের
 আঁদের ও সামুদের সম্প্রদায় এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এবং
 মাদইয়ানবাসীদের? এবং সেসব জনপদের যেগুলোকে উষ্টে দেয়া
 হয়েছিল? তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের নবী পরিষ্কার নির্দেশ নিয়ে।
 বস্ততঃ আলাহু তো এমন ছিলেন না যে, তাদের উপর জুলুম করতেন, কিন্তু
 তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করতো। (৭১) আর ইমানদার পুরুষ
 ও ইমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং
 মদ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আলাহু ও
 তাঁর রসুলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আলাহু
 জালালা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আলাহু পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। (৭২)
 আলাহু ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন
 কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে
 থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জ থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্ততঃ এ
 সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হল আলাহুর সন্তুষ্টি। এটিই হল যখন
 কৃতকার্যতা।

التوبة

২০০

واعلموا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَاهِدُوا الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعِظْ عَظِيمَهُمْ
 مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا
 وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ
 يَسَاءُ لِمَا يَنبَأُونَ وَمَا تَقْبَلُوا إِلَّا أَنْ غَدَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
 مِنْ نَصْلِهِ ۚ قُلْ أَنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِكَلِمَاتٍ خَيْرًا لَكُمْ ۖ وَإِنْ يَسْكُوتُوا
 يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ
 فِي الْأَرْضِ مِنْ ذِي الْأَنْصَارِ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ عَمِلَ اللَّهُ لَهِّنَ
 اثْنَانِ فَتَضْلِلُهُ لَتَضَدَّقْنَ وَتَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝
 فَلَمَّا أَثْمَرُوا تَضْلِلُهُ بِخَوَائِهِمْ وَتَوَكُّوهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۝
 فَأَعْتَبَهُمْ نُونًا فَإِنْ نَلَوْا يَوْمَهُمُ إِلَى يَوْمِ الْبَاقِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ
 لَمَّا كَانُوا يُكْذِبُونَ ۝ أَلَمْ يَكُونُوا
 أَنْ اللَّهُ يَكْتُمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
 الْغُيُوبِ ۝ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ
 فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

(৭৩) হে নবী, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফকদের সাথে ; তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোষ এবং তাহল নিকট ঠিকানা।

(৭৪) তারা কসম খায় যে, আমরা বলিনি, অথচ নিঃসন্দেহে তারা বলেছে কুফরী বাক্য এবং মুসলমান হবার পর অস্বীকৃতিজ্ঞাপনকারী হয়েছে। আর তারা কামনা করেছিল এমন বস্তুর যা তারা প্রাপ্ত হয়নি। আর এসব তারই পরিণতি ছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে। বস্তৃতঃ এরা যদি তওবা করে নেয়, তবে তাদের জন্য যক্ষণ। আর যদি তা না মানে, তবে তাদেরকে আযাব দেবেন আল্লাহ তাআলা, বেদনাদায়ক আযাব দুনিয়া ও আখেরাতে। অতএব, বিশৃঙ্খলার তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী-সমর্থক নেই। (৭৫) তাদের মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যারা আল্লাহ তাআলার সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তিনি যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ দান করেন, তবে অবশ্যই আমরা ব্যয় করব এবং সংকরীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকব। (৭৬) অতঃপর যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহের মাধ্যমে দান করা হয়, তখন তাতে কার্পণ্য করেছে এবং কৃত ওয়াদা থেকে ফিরে গেছে তা ভেঙ্গে দিয়ে। (৭৭) তারপর এরই পরিণতিতে তাদের অন্তরে কপটতা স্থান করে নিয়েছে সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে গিয়ে মিলবে। তা এজন্য যে, তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা লঙ্ঘন করেছিল এবং এজন্য যে, তারা মিথ্যা কথা বলতো। (৭৮) তারা কি জেনে নেয়নি যে, আল্লাহ তাদের রহস্য ও সলা-পরামর্শ সম্পর্কে অবগত এবং আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন সমস্ত গোপন বিষয়? (৭৯) সে সমস্ত লোক যারা ভৎসনা-বিদ্রোহ করে সেসব মুসলমানদের প্রতি যারা মন খুলে দান-খয়রাত করে এবং তাদের প্রতি যাদের কিছুই নেই শুধুমাত্র নিজের পরিশ্রমবৃত্ত বস্ত্র ছাড়া। অতঃপর তাদের প্রতি ঠাট্টা করে। আল্লাহ তাদের প্রতি ঠাট্টা করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

উপর শান্তি প্রয়োগ কর, কিন্তু মুখে তাকে ভৎসনা বা গালাগালি করো না।' - (কুরত্বী)

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেছেন-
 وَلَوْ كُنْتَ فَطْرًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَقُصُّوْا مِنْ حَوْلِكَ

“আপনি যদি কটুবাক্য ও কঠোরমনা হতেন, তবে আপনার কাছ থেকে মানুষ পালিয়ে যেত।” তাছাড়া স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর রীতি-নীতিতেও কোথাও একধার প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, কখনো তিনি কাফের ও মুনাফিকদের সাথে কথা বলতে বা তাদের সম্বোধন করত গিয়ে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তে মুনাফিকদের আলোচনা করা হয়েছে যে, তারা নিজদের বৈঠক-সমাবেশে কুফরী কথা বার্তা বলতে থাকে এবং তা যখন মুসলমানরা জেনে ফেলে, তখন মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে নিজদের সৃষ্টি প্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়। ইমাম বগভী (রহঃ) এ আয়াতের শানে-মূল্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রসুল করীম (সাঃ) গযওয়ায় তাবুক প্রসঙ্গে এক ভাষণ দান করেন যাতে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত পরিণতি ও দুরবস্থার কথা বলা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে জুল্লাস নামক এক মুনাফিকও ছিল। সে নিজ বৈঠকে গিয়ে বলল, মুহাম্মদ (সাঃ) যা কিছু বলেন তা যদি সত্যি হয়, তবে আমরা (মুনাফিকরা) গাধার চাইতেও নিকট। তার এ বাক্যটি আমার ইবনে কায়স (রাঃ) নামক এক সাহাবী শুনে বলেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ) যা কিছু বলেন নিঃসন্দেহে তা সত্য এবং তোমরা গাধা অপেক্ষাও নিকট।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাবুকের সফর থেকে মদীনা মুনাওয়াযার দিকে আসেন, তখন আমার ইবনে কায়স (রাঃ) এ ঘটনা মহানবী (সাঃ)-কে বলেন। জুল্লাস নিজের কথা ঘুরিয়ে বলতে শুরু করে যে, আমার ইবনে কায়স (রাঃ) আমার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করছে (আমি এক কথা বলিনি)। এতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) উভয়কে ‘মিস্বরে-নববী’র পাশে দাঁড়িয়ে কসম খাবার নির্দেশ দেন। জুল্লাস অবলীলাক্রমে কসম খেয়ে নে যে, আমি এমন কথা বলিনি, আমার মিথ্যা কথা বলছে। ইয়রত আমের (রাঃ)-এর পালা এলে তিনিও (নিজের বক্তব্য সম্পর্কে) কসম খান এবং পরে হাত উঠিয়ে দোয়া করেন যে, আয় আল্লাহ, আপনি ওহীর মাধ্যমে স্বীয় রসুলের উপর এ ঘটনার তাৎপর্য প্রকাশ করে দিন। তাঁর প্রার্থনার স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ) এবং সমস্ত মুসলমান ‘আমীন’ বললেন। অতঃপর সেখান থেকে তাঁদের সরে আসার পূর্বেই জিবরীলে-আমীন ওহী দির হামির হন যাতে উল্লেখিত আয়াতখানি নাযিল হয়।

জুল্লাস আয়াতের পাঠ শুনে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করে, ইয়া রসুলুল্লাহ, এখন আমি স্বীকার করছি যে, এ ভুলটি আমার গুহ হয়ে গিয়েছিল।

আমের ইবনে কায়স (রাঃ) যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য। তবে আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাকে তওবা করার অবকাশ দান করেছেন। কাজেই এখনই আমি আল্লাহ তাআলার নিকট মাগফেরাত তথা ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং সাথে সাথে তওবা করছি। রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর তওবা কবুল করে নেন এবং অতঃপর তিনি নিজ তওবায় অটল থাকেন। তাতে তার অবস্থাও শুধরে যায়।—(মায়হারী)

কোন কোন তফসীরবিদ মনীষী এ আয়াতের শানে-নুফল প্রসঙ্গে এমনি ধরনের অন্যান্য ঘটনার বর্ণনা করেছেন। বিশেষতঃ এজন্য যে, আয়াতে এ বাক্যটিও রয়েছে যে, وَمَوْلَا يَسَاءَلُكُمْ عَنْهُ ۖ অর্থাৎ, তারা এমন এক কাজের চিন্তা করল, যাতে তারা কৃতকার্য হতে পারেনি। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতটি এমন কোন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত যাতে মুনাফিকরা মহানবী (সাঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে কৃতকার্য হতে পারেনি। যেমন, উক্ত গণ্ডিয়ায় তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের বিখ্যাত ঘটনা যে, মুনাফিকদের বার জন লোক পাহাড়ী এক ঘাঁটিতে এমন উদ্দেশ্যে লুকিয়ে রহছিল যে, মহানবী (সাঃ) যখন এখানে এসে পৌঁছবেন, তখন আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে ফেলবে। এব্যাপারে হযরত জিব্রীল-আমীন তাঁকে খবর দিয়ে দিলে তিনি এ পথ থেকে সরে যান এবং এতে করে তাদের হীনচক্রান্ত ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

এছাড়া মুনাফিকদের দ্বারা এ ধরনের অন্যান্য ঘটনাও সংঘটিত হয়। তবে এসবের মধ্যে কোন বৈপরীত্য কিংবা বিরোধ নেই। এ সমুদয় ঘটনাই উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَكَ ۖ এ আয়াতটিও এক বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। ইবনে জরীর, ইবনে-আবী হাতেম, ইবনে মারদুবিয়া, তাবারানী ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাঃ)-এর রেওয়াজেতক্রমে ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত করেছেন যে, জৈনৈক সা'লাবাহ ইবনে হাতেম আনসারী রসুলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হামির হয়ে নিবেদন করল যে, হযুর দোয়া করে দিন যাতে আমি মালদার ধনী হয়ে যাই। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমার কাছে আমার তরীকা পছন্দ নয়? সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে মদীনার পাহাড় সেনা হয়ে গিয়ে আমার সাথে সাথে ঘুরত। কিন্তু এমন ধনী হওয়া পছন্দ নয়। তখন লোকটি ফিরে গেল। কিন্তু আবার ফিরে এল এবং আবারো একই নিবেদন করল এ চুক্তির ভিত্তিতে যে, যদি আমি সম্পদপ্রাপ্ত হয়ে যাই, তবে আমি প্রত্যেক হকদারকে তার হক বা প্রাপ্য পৌঁছে দেব। এতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করে দিলেন। যার ফল এই পাড়ায় যে, তার ছাগল-ভেড়ায় অসাধারণ প্রবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এমনকি মদীনায বসবাসের জায়গাটি যখন তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, তখন সে বাইরে চলে যায়। তবে যোহর ও আসরের নামায মদীনায এসে মহানবী (সাঃ)-এর সঙ্গেই আদায় করতো এবং অন্যান্য নামায সেখানেই পড়ে নিত যেখানে তার মালামাল ছিল।

অতঃপর এ সমস্ত ছাগল-ভেড়ার আরো প্রবৃদ্ধি ঘটে, যার ফলে সে জায়গাটিতেও তার সংকুলান হয় না। সুতরাং মদীনা শহর থেকে আরো দূরে গিয়ে কোন একট জায়গা নিয়ে নেয়। সেখান থেকে শুধু জুম'আর নামাযের জন্য সে মদীনায আসত এবং অন্যান্য পাঞ্জেরগানা নামাযগুলো সেখানেই পড়ে নিত। তারপর এসব মালামাল আরো বেড়ে গেল সে জায়গাও তাকে ছাড়তে হয় এবং মদীনা থেকে বহু দূরে চলে যায়। সেখানে জুম'আ ও জামাআত সব কিছু থেকেই তাকে বঞ্চিত হতে হয়।

কিছুদিন পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) লোকদের কাছে সে লোকটির অবস্থা জানতে চাইলে লোকেরা বলল যে, তার মালামাল এত বেশী বেড়ে গেছে যে, শহরের কাছাকাছি কোথাও তার সংকুলান হয় না। ফলে বহু দূরে কোথাও গিয়ে সে বসবাস করছে। এখন আর তাকে এখানে দেখা যায় না। রসুলে করীম (সাঃ) একথা শুনে তিন বার বললেন-يَا وَيْحَ ثَعْلَبِ ۖ অর্থাৎ, সা'লাবাহর প্রতি আফসোস! সা'লাবাহর প্রতি আফসোস! সা'লাবাহর প্রতি আফসোস।

ঘটনাক্রমে সে সময়েই সদকার আয়াত নাখিল হয়, যাতে রসুলে করীম (সাঃ)-কে মুসলমানদের কাছ থেকে সদকা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়। حُنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ তিনি পালিত পশুর সদকার যথাযথ আইন প্রণয়ন করিয়ে দুজন লোককে সদকা উসুলকারী বানিয়ে মুসলমানদের পালিত পশুর সদকা আদায় করার জন্য পাঠালেন এবং তাদের প্রতি নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যেন তারা সা'লাবাহর কাছে যান। এছাড়া বনী সুলাইমের আরো এক লোকের কাছে যাবার হুকুমও করলেন।

এরা উভয়ে যখন সা'লাবাহর কাছে গিয়ে পৌঁছল এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর লিখিত ফরমান দেখাল, তখন সা'লাবাহ বলতে লাগল, এ তো 'জিয়া' কর হয়ে গেল, যা অ-মুসলমানদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। তারপর বলল, এখন আপনারা যান, ফেরার পথে এখানে হয়ে যাবেন। এঁরা চলে গেলেন।

আর সুলাইম গোত্রের অপর লোকটি যখন মহানবী (সাঃ)-এর ফরমান শুনল, তখন নিজের পালিত পশু উট-বকরীসমূহের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল তা থেকে সদকার নেসাব অনুযায়ী সে পশু নিয়ে স্বয়ং রসুল (সাঃ)-এর সে দুই কর্মকর্তার কাছে হামির হলেন। তাঁরা বললেন, আমাদের প্রতি যে নির্দেশ রয়েছে, পশুসমূহের মধ্যে যেটি উৎকৃষ্ট সেটি যেন না নেই। কাজেই আমরা তো এগুলো নিতে পারি না। সুলাইমী লোকটি বার বার বিনয় করে বললেন, আমি নিজের খুশীতে এগুলো দিতে চাই; আপনারা দয়া করে কবুল করে নিন।

অতঃপর এ দুই কর্মকর্তা অন্যান্য মুসলমানদের সদকা আদায় করে সা'লাবাহর কাছে এলে সে বলল, দাও দেখি সদকার আইনগুলো আমাকে দেখাও। তারপর তা দেখে সে কথাই বলতে লাগল যে, এ তো এক রকম জিয়া করা হয়ে গেল যা মুসলমানদের কাছ থেকে নেয়া উচিত নয়। যাহোক, এখন আপনারা যান, আমি পরে চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত নেব।

যখন এরা মদীনায ফিরে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হামির হলেন, তখন তিনি তাদের কুশল জিজ্ঞেস করার পূর্বে আবার সে বাক্যটিই পুনরাবৃত্তি করলেন, যা পূর্বে বলেছিলেন। يَا وَيْحَ ثَعْلَبِ ۖ সা'লাবাহর উপর আফসোস! কথ্যাটি তিন তিন বার বললেন। তারপর সুলাইমীর ব্যাপারে খুশী হয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। এ ঘটনারই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাখিল হয় যারা আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল যে, আল্লাহ যদি তাদের ধন-সম্পদ দান করেন, তবে তারা দান-খয়রাত করবে এবং উম্মাতের সংকশীলদের মত সমস্ত হকদার, আত্মীয়-স্বজন ও গরিব-মিসকীনের প্রাপ্য আদায় করবে। অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে সম্পদ দান করলেন, তখন কার্পণ্য করতে আরম্ভ করেছে এবং আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্যে বিমুখ হয়ে গেছে।

وَأَعْتَدُ لَهُمْ نَارًا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ ۖ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাদের অপকর্ম ও অস্বীকার লংঘনের ফলে তাদের অন্তরসমূহে মুনাফেকী বা কুটিলতাকে আরো পাকপোক্ত করে বসিয়ে দেন, যাতে তাদের তওবা করার ভাগ্যও হবে না।

হযরত আবু উমামাহ (রাঃ)-এর বিস্তারিত রেওয়াজেতের পর— যা এইমাত্র উল্লেখ করা হল, ইবনে জরীর লিখেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন সা'লাবাহর জন্য তিন তিন বার আফসোস করেন তখন সে মজলিসে সা'লাবাহর কতিপয় আত্মীয়-আপনজনও উপস্থিত ছিল। হযুর (সাঃ)-এর

হয় বসে রইল। আর শুধু নিজেরাই বসে রইল না; বরং অন্যান্য লোকদেরকেও এ কথাই বোঝাল যে, لَا تَتُوبُوا إِلَىٰ خَطْبِكُمْ (অর্থ, এমন) পরমের সময়ে জেহাদে বেরিয়ে না।

একথা পূর্বেই জানা গেছে যে, তাবুক যুদ্ধের অভিযান এমন এক সময়ে সংঘটিত হয়েছিল, যখন প্রচণ্ড গরম পড়ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের এ কথার উত্তর দান প্রসঙ্গে বলেছেন قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَكْبَرُ (অর্থ, এই হতভাগারা এ সময়ের উত্তাপ তো দেখছে এবং তা থেকে ঈচার চিন্তা করছে। বস্তুতঃ এর ফলে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নাক্ষরমণীর দরশন যে জাহান্নামের আগুনের সম্মুখীন হতে হবে সে কথা জ্বলছেই না। তাহলে কি মওসুমের এ উত্তাপ জাহান্নামের উত্তাপ অপেক্ষা বেশী? অতঃপর বলেন—

... فَلْيَضْحَكُوا زَكَاةً (অর্থ, হাসো কম, কাঁদো বেশী)। শব্দটি যদিও নির্দেশবাচক পদ আকারে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তফসীরবিদ মনীযীবুদ একে সংবাদবাচক সাব্যস্ত করেছেন এবং নির্দেশবাচক পদ ব্যবহারের এই তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন যে, এমন ঘটা জব্বারিত ও নিশ্চিত। অর্থাৎ, নিশ্চিতই এমনটি ঘটবে যে, তাদের এ আনন্দ ও হাসি হবে অতি সাময়িক। এরপর আখেরাতে তাদেরকে চিরকাল কাঁদতে হবে। এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আবী হাতেম (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاؤا. فإذا انقطع الدنيا وصاروا إلى الله فليستأنفوا البكاء. لا ينقطع أبدا—“দুনিয়া সামান্য কয়েক-দিনের অবস্থানস্থল, এতে যত ইচ্ছা হেসে নাও। অতঃপর দুনিয়া যখন শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হবে, তখনই কান্নার পালা শুরু হবে যা আর নিবৃত্ত হবে না।” — (মায়হারী)

পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে كُنْ غُرُورًا এর মর্মার্থ এই যে, এরা যদি ভবিষ্যতে কোন জেহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে যেহেতু তাদের অন্তরে ঈমান নেই, সেহেতু এদের সে ইচ্ছাও নিষ্ঠাপূর্ণ হবে না; যখন রওয়ানা হবার সময় হবে, পূর্বকার মতই নানা রকম ছলছুতার আশ্রয় নেবে। সুতরাং মহানবী (সাঃ)—এর প্রতি নির্দেশ হল যে, তারা নিজেরাও যখন কোন জেহাদে অংশগ্রহণের কথা বলবে, তখন আপনি প্রকৃত বিষয়টি তাদেরকে বাতল দিন যে, তোমাদের কোন কথা বা কাজে বিশ্বাস নেই। তোমরা না যাবে জেহাদে, না আমার পক্ষ হয়ে ইসলামের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেছেন যে, এ হুকুমটি তাদের জন্য পার্শ্বি শক্তি হিসাবে প্রবর্তন করা হয় যে, সত্যিকারভাবে তারা কোন জেহাদে অংশগ্রহণ করতে চাইলেও যেন তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া না হয়।

গোটা উম্মতের ঐকমত্যে আলোচ্য সহীহ হাদীসসমূহের মাধ্যমে প্রমাণিত রয়েছে যে, আলোচ্য ৮৪ তম এ আয়াতটি মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যু ও তার জানাযা সম্পর্কে নাখিল হয়েছে। সহীহাইন (আর্থ, বোখারী ও মুসলিম)—এর রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, তার জানাযায় রসুলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়েন। নামায পড়ার পরই এ আয়াত নাখিল হয় এবং এরপর আর কখনো তিনি কোন মুনাফিকের জানাযার নামায পড়েননি।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)—এর বর্ণনায় এ আয়াত নাখিলের ঘটনাটি সবিস্তারে উল্লেখ রয়েছে। তা’হল এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল যখন মারা যায়, তখন তার পুত্র

আবদুল্লাহ যিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ও সাহাবী ছিলেন হযুর (সাঃ)—এর নিকট এসে নিবেদন করলেন যে, হযুর, আপনি আপনার জামাটি দান করুন যাতে আমি তা আমার পিতার কাফনে পরাতে পারি। রসুলে করীম (সাঃ) নিজের জামা মোবারক দিয়ে দিলেন। তারপর আবদুল্লাহ নিবেদন করেন যে, আপনি তার জানাযার নামাযও পড়াবেন। হযুর (সাঃ) তাও কবুল করেন। জানাযার নামাযে দাঁড়ালে হযরত ওমর ইবনে খাতাব (রাঃ) হযুর (সাঃ)—এর কাপড় আকর্ষণ করে নিবেদন করলেন, আপনি এ মুনাফিকের জানাযা পড়ছেন, অথচ আল্লাহ আপনাকে মুসাফিকের নামায পড়তে বারণ করেছেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আল্লাহ আমাকে এ ব্যাপারে এখতিয়ার দিয়েছেন—মাগফেরাতের দোয়া করব অথবা করব না। আর সে আয়াতে যাতে সন্তর বার মাগফেরাতের দোয়া করলেও ক্ষমা হবে না বলে উল্লেখ রয়েছে, তা আমি সন্তর বারের বেশীও ইস্তেগফার করতে পারি। সে আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল সূরা তওবার ঐ আয়াত যা এইমাত্র বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, اَسْتَغْفِرُكُمْ

اَوَّلَاسْتِغْفَارِهِمْ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

অতঃপর রসুলুল্লাহ (সাঃ) তার জানাযার নামায পড়েন এবং নামাযের পরেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয় وَالْفَضْلُ عَلَىٰ الْاَحْيِ (সুতরাং এরপর কখনও তিনি কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েননি।)

উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে প্রথমতঃ প্রশ্ন উঠে এই যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এমন এক মুনাফিক ছিল যার মুনাফিকী বিভিন্ন সময়ে প্রকাশও পেয়েছিল এবং সে ছিল সব মুনাফিকের সর্দার। কাজেই এর সাথে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এমন বেশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যবহার করলেন কেমন করে যে, তার কাফনের জন্য নিজের পবিত্র জামা মোবারক পর্যন্ত দিয়ে দিলেন।

উত্তর এই যে, এর দু’টি কারণ থাকতে পারে : (এক) তার পুত্র যিনি একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী ছিলেন তাঁর আবেদন। অর্থাৎ, শুধুমাত্র তাঁর মনস্তত্ত্বের জন্যই তিনি এমনটি করেছিলেন। (দুই) অপর একটি কারণ এও হতে পারে, যা বুখারীর হাদীসে হযরত জাবের (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত রয়েছে যে, গয়ওয়ায়ে বদরের সময় যখন কিছু কোরাইশ সর্দার বন্দী হয়ে আসে, তাদের মধ্যে মহানবী (সাঃ)—এর চাচা আব্বাসও ছিলেন। হযুর (সাঃ) দেখলেন, তাঁর গায়ে কোর্তা নেই। তখন সাহাবীদিগকে বললেন, তাকে একটি কোর্তা পরিয়ে দেয়া হোক। হযরত আব্বাস ছিলেন দীর্ঘদেহী লোক। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছাড়া অন্য কারো কোর্তা তাঁর গায়ে ঠিক মত লাগছিল না। ফলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর কোর্তা বা কামীস নিয়েই রসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজের চাচা আব্বাসকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তার সে এহসানের বদলা হিসাবেই মহানবী (সাঃ) নিজের জামা মোবারকখানা তাকে দিয়ে দেন। (কুরতুবী)

দ্বিতীয় প্রশ্ন : এখানে আরো একটি প্রশ্ন এই যে, ফারুকে আযম (রাঃ) যে মহানবী (সাঃ)—কে বললেন যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে মুনাফিকদের নামায পড়তে বারণ করেছেন, তা কিসের ভিত্তিতে বলেছিলেন? কারণ, ইতিপূর্বে কোন আয়াতে পরিস্কারভাবে তাঁকে মুনাফিকের জানাযা পড়তে বারণ করা হয়নি। এতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ওমর বারগের বিষয়টি উক্ত সূরা তওবার সাবেক আয়াত اَسْتَغْفِرُكُمْ থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে আব্বাস প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ আয়াতটি যদি জানাযার নামাযের বারগের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে, তবে মহানবী (সাঃ) এতে বারণ হওয়া সাব্যস্ত করলেন না

কেন? বরং তিনি বললেন যে, এ আয়াতে আমাকে অধিকার দেয়া হয়েছে।

উত্তর : প্রকৃতপক্ষে আয়াতের শব্দাবলীর বাহ্যিক মর্ম হচ্ছে এখতিয়ার দান। তাছাড়া একথাও সুস্পষ্ট যে, সন্তর বারের উল্লেখ নির্দিষ্টতা বোঝাবার জন্য নয়, বরং আধিক্য বোঝাবার জন্য। সুতরাং উক্ত আয়াতের সারমর্ম এর বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী এই হবে যে, মুনাফিকদের মাগফেরাত হবে না, যতবারই তাদের জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন না কেন। কিন্তু এখানে পরিস্কারভাবে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হযরকে বারণ করা হয়নি। কোরআন করীমের অপর এক আয়াতে যা সূরা ইয়ানীনে উক্ত হয়েছে তাতে এর উদাহরণও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে—

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَمَرْتَهُمْ أَوْ نَهَيْتَهُمْ أَنْ يَأْتُواكُم بِثَمَنٍ ۚ كَذِبٌ مِّنْهُمْ

এ আয়াতে মহানবী (সাঃ)-কে দ্বীনের তবলীগ ও ভীতি প্রদর্শনে বারণ করা হয়নি, বরং অন্যান্য আয়াতের দ্বারা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ তাদের জন্যও অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয়—
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّا لَنَافِلُكُمْ ۚ
অথবা
إِنَّمَا أَتَيْنَاكُم بِذِكْرٍ ۖ وَإِنَّا لَنَافِلُكُمْ ۚ

সারকথা এই যে, **أَمَرْتَهُمْ أَوْ نَهَيْتَهُمْ** আয়াতের দ্বারা তো মহানবী (সাঃ)-কে ভীতি প্রদর্শন ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছেই, তদুপরি বর্তমান আলোচ্য আয়াতে নির্দিষ্ট দলীলের মাধ্যমে ভীতি-প্রদর্শনের ধারাকে অব্যাহত রাখা প্রমাণিত হয়ে গেল। মহানবী (সাঃ) উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে একথা বুঝে নিতে পেরেছিলেন যে, তাদের মাগফেরাত হবে না! কিন্তু অপর কোন আয়াতের মাধ্যমে এ পর্যন্ত তাকে ভীতি-প্রদর্শনেও বাধা দেয়া হয়নি।

আর মহানবী (সাঃ) জানতেন যে, তার জামার কারণে কিংবা জানাযা পড়ার দরুন তার মাগফেরাত হবে না, কিন্তু এতে অন্যান্য দ্বীনী কল্যাণ সাধিত হওয়ার আশা করা যায়। এতে হয়তো তার পরিবারের লোক ও অন্যান্য কাফেররা যখন হযর (সাঃ)-এর এহেন সৌজন্যমূলক আচরণ লক্ষ্য করবে, তখন তারাও ইসলামের নিকটবর্তী হবে এবং মুসলমান হয়ে যাবে। তাছাড়া তখনো পর্যন্ত যেহেতু (মুনাফেকের) জানাযা পড়ার সরাসরি নিষেধাজ্ঞা ছিল না, সেহেতু তিনি তার জানাযা পড়েছেন।

এ উত্তরের সমর্থন হয়তো সহীহ বুখারীর বাক্যও পাওয়া যাবে, যা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি যদি জানতে পারতাম, সন্তর বারের বেশী দেয়া ও মাগফেরাত কামনায় তার মাগফেরাত হয়ে যাবে, তাহলে আমি তাও করতাম।—(কুরতুবী)

দ্বিতীয় প্রমাণ হল, সে হাদীস যাতে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, আমার জামা তাকে আল্লাহর আযাব থেকে ঝাটতে পারবে না। তবে আমি এ কাজটি এ জন্য করেছি যে, আমার আশা, এ কাজের ফলে তার সম্প্রদায়ের হাজারো লোক মুসলমান হয়ে যাবে। সুতরাং মাগাযী এবং কোন কোন তফসীর গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে যে, এ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে খারাজ গোত্রের এক হাজার লোক মুসলমান হয়ে যায়।

যেটুকু, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মাধ্যমে স্বয়ং হযর (সাঃ)-এরও এ বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, তার এ কাজের দরুন এই মুনাফেকের মাগফেরাত তখা পাপ মুক্তি হবে না, কিন্তু যেহেতু আয়াতের শব্দাবলীতে বাহ্যতঃ এই অধিকার দেয়া হয়েছিল; অন্য কোন আয়াতের মাধ্যমে

নিষেধও করা হয়নি এবং যেহেতু অপর দিকে একজন কাফেরের প্রতি ইহসান করার মধ্যে পৃথিবীর কল্যাণের আশাও বিদ্যমান ছিল এবং এ ব্যবহারের দ্বারাও অন্যান্য কাফেরদের মুসলমান হওয়ার আশা ছিল, কাজেই তিনি নামায পড়াতেই অগ্রাধিকার দান করেছিলেন। আর ফারাকে আ'যম (রাঃ) বুঝেছিলেন যে, এ আয়াতের দ্বারা যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, মাগফেরাত হবে না, তখন তার জন্য নামাযে জানাযা পড়ে মাগফেরাত প্রার্থনা করাটা একটা অহেতুক কাজ, যা নবুওয়তের শানের খেলাফ। আর একেই তিনি নিষেধাজ্ঞা হিসাবে প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে রসুলে মক্ক (সাঃ) যদিও এ কাজটিকে মূলতঃ কল্যাণকর মনে করতেন না, কিন্তু অন্যান্যদের ইসলাম গ্রহণের পক্ষে সহায়ক হওয়ার প্রেক্ষিতে তা অহেতুক ছিল না। এভাবে না রসুলে করীম (সাঃ)-এর কাজের উপর কোন আশঙ্কা থাকে, না ফারাকে আ'যম (রাঃ)-এর কথায় কোন প্রশ্ন উঠতে পারে।—(বয়ানুল—কোরআন)

মাসআলা : এ আয়াতের দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন কাফেরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে তার সমাধিতে দায়ানো কিংবা তা যেয়ারত করতে যাওয়া জায়েয নয়। অবশ্য শিক্ষা গ্রহণের জন্য অথবা কোন বাধ্যবাধকতার কারণে হলে তা এর পরিপন্থী নয়। যেমন হেদায়া গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি কোন মুসলমানের কোন কাফের আত্মীয় মারা যায় এবং তার কোন ওলী-ওয়ারিস না থাকে, তবে মুসলমান আত্মীয় সুন্নত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য না করে তাকে সাধারণভাবে মাটিতে পুঁতে পারে।—(বয়ানুল—কোরআন)

উল্লেখিত আয়াতগুলোতেও সেসব মুনাফেকের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে যারা তামুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে নানা রকম ছলনার আশ্রয়ে রিক্ত থেকে ছিল। সেসব মুনাফেকের মাঝে কেউ কেউ সম্প্রদায়ালী লোকও ছিল। তাদের অবস্থা থেকে মুসলমানদের ধারণা হতে পারত যে, এরা যখন আল্লাহর নিকট বিকৃত, তখন দুনিয়াতে এরা কেন এসব নেয়ামত পাবে!

এর উত্তরে ৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি লক্ষ্য করে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে, তাদের এ ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সমৃদ্ধি কেন রহমত ও নেয়ামত নয়; বরং পার্থিবজীবনেও এগুলো তাদের জন্য আযাববিশেষ। আখেরাতের আযাব তো এর বাইরে আছেই। দুনিয়াতে আযাব হওয়ার ব্যাপারটি এভাবে যে, ধন-সম্পদের মহব্বত, তার রক্ষাব্যবস্থাপন ও বৃদ্ধির চিন্তা-ভাবনা তাদেরকে এমন কঠিনভাবে পেয়ে বসে যে, কোন সময় কোন অবস্থাতেই স্বস্তি পেতে দেয় না। আরাম-আয়েশের যত উপকরণই তাদের কাছে থাক না কেন, তাদের ভাগ্যে সে আরাম জুটে না যা মনের শান্তি ও স্বস্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে। এছাড়া দুনিয়ার এসব ধন-সম্পদ যেহেতু তাদেরকে আখেরাত সম্পর্কে গাফেল করে দিয়ে কুফর ও পাপে নিমজ্জিত করে রাখার কারণ হয়ে থাকে, সেহেতু আযাবের কারণ হিসাবেও এগুলোকে আযাব বলা যেতে পারে। এ কারণেই কোরআনের ভাষায় **يَذُوقُونَ** বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত ধন-সম্পদের মাধ্যমেই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান।

أُولَٰئِكَ শব্দটি সম্পন্ন লোকদের নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং এর দ্বারা যারা সম্পন্ন নয় অর্থাৎ, যারা অসম্পন্ন এতে তাদের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেল যে, তাদের কাছে একটা বাহ্যিক গুণও ছিল (যার ভিত্তিতে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে অব্যাহতি কামনা করতে পারত)।

বিশ্লেষণের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এসব বেদুইন যাবাবরদের মধ্যে দু'রকম লোক ছিল। (এক) যারা ছল-ছুতা পেশ করার জন্য মহানবী (সাঃ) এর খেদমতে হাযির হয় যাতে তাদেরকে জেহাদে যাওয়ার ব্যাপারে অব্যাহতি দান করা হয়। আর কিছু লোক ছিল এমন উদ্ধত যারা অব্যাহতি লাভের তোয়াক্কা না করেই নিজ নিজ অবস্থানে নিজের মতেই বসে থাকে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন জাদ ইবনে কায়েসকে জেহাদে না যাবার অনুমতি দিয়ে দেন, তখন কতিপয় মুনাফেকও খেদমতে উপস্থিত হয়ে কিছু কিছু ছল-ছুতা পেশ করে জেহাদ বর্জনের অনুমতি প্রার্থনা করে। এতে তিনি অনুমতি অবশ্য দিয়ে দেন, কিন্তু একথাও বুঝতে পারেন যে, এরা মিথ্যা ওয়র পেশ করছে। কাজেই তাদের ব্যাপারে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়। এতে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের ওয়র গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে তাদেরকে বেদনাদায়ক আযাবের দুঃসংবাদ শুনিতে দেয়া হয়। অবশ্য এরই সঙ্গে **كَفَرُوا مِنْهُمْ** বলে ইঙ্গিত করে দিয়েছেন যে, এদের মধ্যে কারো কারো ওয়র কুফরী ও মুনাফেকীর কারণে ছিল না; বরং স্বভাবগত আলস্যের কারণে ছিল। এরা এই কাফেরদের আযাবের আওতাভুক্ত নয়।

বিগত আয়াতসমূহে এমনসব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল যারা প্রকৃতপক্ষে জেহাদে অংশগ্রহণে অপারগ ছিল না, কিন্তু শৈথিল্যবশতঃ অজুহাত দর্শিয়ে তা থেকে বিরত রয়েছে কিংবা এমন সব মুনাফেকরা বিরত থেকেছে, যারা নিজেদের কুফরী ও কটিলতা হেতু নানা রকম ছলছুতার আশ্রয়ে রসূলে করীম (সাঃ) এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিয়েছিল। তাছাড়া এতে এমন কিছু উদ্ধত লোকও ছিল যারা অজুহাত দর্শিয়েও অনুমতি গ্রহণের কোন প্রয়োজনবোধ করেনি, এমনিতেই বিরত থেকে গেছে। এদের অপারগ না হওয়া এবং তাদের মধ্যে যারা কুফরীতে লিপ্ত ছিল, তাদের বেদনাদায়ক আযাব হওয়ার ব্যাপারটি বিগত আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছে।

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে যে সমস্ত নিষ্ঠাবান মুসলমানদের কথা আলোচনা করা হচ্ছে, যারা প্রকৃতই অপারাগতার দরুন জেহাদে অংশ গ্রহণে অসমর্থ ছিল। এদের মধ্যে কিছু লোক ছিল অন্ধ বা অসুস্থতার কারণে অপারগ এবং যাদের অপারাগতা ছিল একান্ত সুস্পষ্ট। আর কিছু লোক ছিল যারা জেহাদে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল, বরং জেহাদে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, কিন্তু তাদের কাছে সফর করার জন্য সওয়ারীর কোন জীব ছিল না। বস্তুতঃ সফর ছিল সুদীর্ঘ এবং মওসুমটি ছিল গরমের। তারা নিজেদের জেহাদী উদ্দীপনা এবং সওয়ারীর অভাবে তাতে অংশগ্রহণে অপারাগতার কথা জানিয়ে রসূলে করীম (সাঃ) – এর নিকট আবেদন করে যে, আমাদের জন্য সওয়ারীর কোন ব্যবস্থা করা হোক।

তফসীরের গ্রন্থসমূহে এ ধরনের একাধিক ঘটনার কথা লেখা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন হয়েছে যে, প্রথমে রসূলে করীম (সাঃ) তাদের কাছে নিজের অপারাগতা জানিয়ে দেন যে, আমাদের কাছে সওয়ারী বা যানবাহনের কোন ব্যবস্থা নেই। তাতে তারা অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ফিরে যায় এবং কেঁদেই সময় কাটাতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য এ ব্যবস্থা করেন যে, তখনই হযুর (সাঃ) – এর নিকট ছয়টি উট এসে যায় এবং তিনি সেগুলো তাদের দিয়ে দেন।—(মায়হারী) তাদের মধ্যে তিন

رَضَوُا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ
فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۚ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَذَبَ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ وَ
جَاءَ الْمُعَذِّبُونَ مِنَ الْأَشْرَابِ لِيُذَنِّبُوا لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ
كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا
عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ
رَسُولَهُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ
وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ
مِمَّا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ كَوَلًا وَإِئْتِيَهُمْ فَيَقُضُوا مِنَ الدَّعْوِ
حَرَجًا الْكَافِرُونَ ۚ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْيَاءُ رَضَوُا بِأَنْ يَكُونُوا
مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ

(৮৭) তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তরসমূহের উপর। বস্তুতঃ তারা বায়ে না। (৮৮) কিন্তু রসূল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে, তাঁর সাথে তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জন ও মালের দ্বারা। তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারা ই মুক্তির লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে।

(৮৯) আল্লাহ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবণ। তারা তাতে বাস করবে অনন্তকাল। এটাই হল বিরাট কৃতকার্যতা। (৯০) আর ছলনাকারী বেদুঈন লোকেরা এলো, যাতে তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে পারে তাদেরই যারা আল্লাহ ও রসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল। এবার তাদের উপর শীগ্রই আসবে বেদনাদায়ক আযাব যারা কাফের। (৯১) দুর্বল, রুগ্ন, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রসূলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (৯২) আর না আছে তাদের উপর যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান কর এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করা বহন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইতেছিল এ দুঃখে যে, তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে। (৯৩) অভিযোগের পথ তো তাদের ব্যাপারে রয়েছে, যারা তোমার নিকট অব্যাহতি কামনা করে অথচ তারা সম্পদশালী। যারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। আর আল্লাহ মোহর এটে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহে। বস্তুতঃ তারা জানতেও পারেনি।

التوبة ৭

২০৩

يَتَذَكَّرُونَ ১১

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لَكُمْ بِهِ إِنَّا بِمَا نَفَعْنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ بِعُرْوَاتِهِمْ فَأَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ رَجَسٌ وَمَا ذُنُوبُهُمْ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝ الْأَعْرَابُ آسَدُ أَقْرَأُوا نِفَاقًا وَأَحَدُكُمْ لَا يَلْعَبُكُمْ أَحَدٌ وَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۝ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ لِلذَّوَابِرِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَىٰ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَىٰ لَهُمْ سِيدُ خَلْقِهِمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(১৪) তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে, তখন তারা তোমাদের নিকট হুল-ছুতা নিয়ে উপস্থিত হবে; তুমি বলে, হুল কারো না, আমি কখনো তোমাদের কথা শুনব না; আমাকে আল্লাহ তা আলা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। আর এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহই দেখবেন এবং তাঁর রসূল। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই গোপন ও অগোপন বিষয়ে অবগত সত্তার নিকট। তিনি-ই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে। (১৫) এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহর কসম খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর- নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসাবে তাদের ঠিকানা হলো দোষ। (১৬) তারা তোমার সামনে কসম খাবে যাতে তুমি তাদের প্রতি রাগী হয়ে যাও। অতএব, তুমি যদি রাগী হয়ে যাও তাদের প্রতি তবু আল্লাহ তা আলা রাগী হবেন না, এ নাফরমান লোকদের প্রতি। (১৭) বেদুইনরা কুফর ও মুনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা সেসব নীতি-কানুন না শেখারই যোগ্য যা আল্লাহ তা আলা তাঁর রসূলের উপর নাযিল করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সব কিছুই জানেন এবং তিনি অত্যন্ত কুশলী। (১৮) আবার কোন কোন বেদুইন এমনও রয়েছে যারা নিজদের ব্যয় করাকে জরিমানা বলে গণ্য করে এবং তোমার উপর কোন দুর্দিন আসে কিনা সে অপেক্ষায় থাকে। তাদেরই উপর দুর্দিন আসুক। আর আল্লাহ হচ্ছেন প্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। (১৯) আর কোন কোন বেদুইন হল তারা, যারা ঈমান আনে আল্লাহর উপর, কেয়ামত দিনের উপর এবং নিজদের ব্যয়কে আল্লাহর নৈকট্য এবং রসূলের দোয়া লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনো। তাই হল তাদের ক্ষেত্রে নৈকট্য। আল্লাহ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

জনের সওয়াযীর ব্যবস্থা করেন হযরত ওসমান গনী (রাঃ)। অথচ ইতিপূর্বে তিনি বিপুল পরিমাণ ব্যবস্থা নিজ খরচে করেছিলেন।

আবার অনেক এমন লোকও থেকে যায়, যাদের জন্য শেষ পর্যন্ত কোন সওয়াযীর ব্যবস্থা হয়নি এবং বাধ্য হয়ে তারা জেহাদে বিরত থাকে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে তাদের কথাই বলা হয়েছে যাদের অপরাধ আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। আয়াতের শেষাংশে এ ব্যাপারে সত্যকথা উচ্চারণ করা হয়েছে যে, বিপদ শুধু তাদের ক্ষেত্রে যারা সামর্থ্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও জেহাদে অনুপস্থিত থাকাকে নারীদের মত পছন্দ করে নিয়েছে। - إِنَّمَا السَّيِّئُ عَلَى الْكَافِرِينَ يَسْتَأْذِنُكَ وَهُمْ غَائِبُونَ - এর মর্মও তাই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব মুনাফেকের আলোচনা ছিল যারা গণ্ডগালে তাবুক রওয়ানা হওয়ার প্রাকালে মিথ্যা অভূহাত দর্শিত জেহাদে যাওয়া থেকে অপারগতা প্রকাশ করেছিল। উপরোল্লিখিত আয়াতগুলোতে আলোচনা করা হচ্ছে সেসব লোকদের, যারা জেহাদ থেকে ফিরে আসার পর রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয় নিজদের জেহাদে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে মিথ্যা ওয়র-আপত্তি পেশ করছিল। এ আয়াতগুলো মদীনায় তাইয়েবায় ফিরে আসার পূর্বে অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে পরবর্তী সময়ে সংঘটিত ঘটনার সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, আপনি যখন মদীনায় ফিরে যাবেন, তখন মুনাফেকরা ওয়র-আপত্তি নিয়ে আপনার নিকট আসবে। বস্তুতঃ ঘটনা তাই ঘটে।

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে তাদের সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তিনটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে—(এক) যখন এরা আপনার কাছে ওয়র-আপত্তি পেশ করার জন্য আসে, আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, খামাখা মিথ্যা ওয়র পেশ করো না। আমরা তোমাদের কথাকে সত্য বলে স্বীকার কর না। কারণ, আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে তোমাদের দুটাই এবং তোমাদের মনের গোপন ইচ্ছা প্রভৃতি সবই বাতলে দিয়েছেন। ফলে তোমাদের মিথ্যাবাদিতা আমাদের কাছে প্রকৃষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই কেন রকম ওয়র-আপত্তি বর্ণনা করা অর্থহীন। তারপর বলা হয়েছে— وَ سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ এতে তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে, এখনও যে তারা মুনাফেকী পরিহার করে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যায়। কারণ, এত বলা হয়েছে যে, পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন যে, তা কি এবং কোন ধরনের হয়। যদি তোমরা তওবা করে নিয়ে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যাও, তবে সে অনুযায়ীই ব্যবস্থা করা হবে; তোমাদের পাপ মাফ হয়ে যাবে। অন্যথায় ত তোমাদের কোন উপকরই সাধন করবে না।

(দুই) ১৫ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, এসব লোক আপনার ক্ষির আসার পর মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে আশুস্ত করতে চাইবে এবং তাতে তাদের উদ্দেশ্য হবে, ائْتُوا عَنْهُمْ অর্থাৎ, আপনি যেন তাদের জেহাদের অনুপস্থিতির বিষয়টি উপেক্ষা করেন এবং সেজন্য যেন কেউ ভৎসনা না করেন। এরই প্রেক্ষিতে এরশাদ হয়েছে যে, আপনি তাদের ঈ বাসনা পূরণ করে দিন। اَرْسَلُوا عَنْهُمْ অর্থাৎ, আপনি তাদের বিষয় উপেক্ষা করুন। তাদের প্রতি ভৎসনাও করবেন না কিংবা তাদের দায় উৎফুল্ল সম্পর্কও রাখবেন না। কারণ, ভৎসনা করে কোন ফায়দা নেই। তাদের মনে যখন ঈমান নেই এবং তার বাসনাও নেই, তখন ভৎসনা করে

কি হবে। খামাখা কেন নিজের সময় নষ্ট করা।

(তিন) ১৬ নং আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, এরা কসম খেয়ে যেয়ে আপনাকে এবং মুসলমানদেরকে রাহী করাতে চাইবে। এ বাপারের আল্লাহ্ তাআলা হেদায়েত দান করেছেন যে, তাদের প্রতি রাহী হবেন না। আল্লাহ সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, আপনি রাহী হয়ে গেলেন বলে শ্রদ্ধা করেও নেয়া যায়, তবুও তাতে তাদের কোন লাভ হবে না এ কারণেই আল্লাহ তাদের প্রতি রাহী নন। তাছাড়াও তারা যখন নিজদের কুফরী মুনাফেকীর উপরই অটল থাকল, তখন আল্লাহ তাআলা কেমন করে রাহী হবেন।

عَرَاب শব্দটি عرب শব্দের বহুবচন নয়; বরং এটি একটি পদ বিশেষ শহরের বাইরের অধিবাসীদের বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর বহুবচন করত হলে اعرابي বলা হয়। যেমন, انصار - এর এক বচন, انصار হয়ে থাকে।

তাদের অবস্থা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, এরা কুফরী ও মুনাফেকীর ব্যাপারে শহরবাসী অপেক্ষাও বেশী কঠোর। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এরা এলম ও আলেম তথা জ্ঞান ও জ্ঞানী লোকদের থেকে দূরে থাকার কারণে মূর্খতা, কঠোরতায় ভুগতে থাকার দমন মনের দিক দিয়েও কঠোর হয়ে পড়ে। وَاجْبَدُ الرِّكَائِكَؤَادُ وَوَمَّا أَتَى اللَّهُ الْأَعْنَافِ الْعَظِيمِ অর্থাৎ, এসব লোকের পরিবেশই অনেকটা এমন যে, এরা আল্লাহ কর্তৃক নাখিলকৃত সীমা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। কারণ, না কোরআন তাদের সামনে আসে, না তার জর্জ-মর্জ ও বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

১৮ নং আয়াতেও এ সমস্ত বেদুইনেরই একটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা যাকাত প্রভৃতিতে যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে এক প্রকার জরিমানা বলে মনে করে। তার কারণ, তাদের অন্তরে তো ইমান নেই, শুধু নিজদের কুফরীকে লুকাবার জন্য নামাযও পড়ে নেয় এবং ফরয যাকাতও দিয়ে দেয়। কিন্তু মনে এ কালিমা থেকেই যায় যে, এ

অর্থ অনর্থক খরচ হয়ে গেল। আর সেজন্য অপেক্ষায় থাকে যে, কোন রকমে মুসলমানদের উপর কোন বিপদ নেমে আসুক এবং তারা পরাজিত হয়ে যাক; তাহলেই আমাদের এহেন অর্থদণ্ড থেকে মুক্তিলাভ হবে। دائِرَةُ الدَّائِرَةِ এর বহুবচন। আরবী অভিধান অনুযায়ী دائِرَةُ (দায়েরাহ) এমন পরিবর্তনশীল অবস্থাকে বলা হয়, যাতে প্রথম ভাল অবস্থার পর মন্দে পরিশত হয়ে যায়। সেজন্যই কোরআন করীম তাদের উত্তরে বলেছে عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ অর্থাৎ, তাদেরই উপর মন্দ অবস্থা আসবে। আর এরা নিজদের সেসব কাজ-কর্ম ও কথাবার্তার কারণে অধিকতর অপমানিত।

বেদুইন মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণনার কোরআনী বর্ণনারীতি অনুযায়ী তৃতীয় আয়াতে সেসব বেদুইনের আলোচনা সংগত মনে করা হয়েছে যারা সত্যিকার ও পাকা মুসলমান। আর তা এজন্য যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, সব বেদুইনই এক রকম নয়। তাদের মধ্যেও নিঃস্বার্থ, নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী লোক আছে। তাদের অবস্থা হল এই যে, তারা যে সদকা-যাকাত দেয়, তাকে তারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায় এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দোয়াপ্রাপ্তির আশায় দিয়ে থাকে।

সদকা যে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায় তা সুস্পষ্ট। তবে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দোয়া লাভের আশা এভাবে যে, কোরআন-করীমে যেখানে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মুসলমানদের কাছ থেকে যাকাতের মালামাল আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, যাকাত দানকারীদের জন্য আপনি দোয়াও করতে থাকুন। যেমন, পরবর্তী এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে - حُذِّرْنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

এ আয়াতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সদকা উসূল করার সাথে সাথে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাদের জন্য দোয়াও করুন। এ নির্দেশটি এসেছে صَلَوة শব্দের মাধ্যমে। বলা হয়েছে, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ কারণেই উল্লেখিত আয়াতে রসূলে করীম (সঃ)-এর দোয়াকে صَلَوة শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

التوبة

২৮

يَسْتَدْرُونَ ۝

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالشَّيْطُونُ الَّاُولُونَ مِنَ الْمُهْجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ حَوَّلَكُمْ مِنَ الْكُفْرَانِ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَدْ كُفِرَ عَنْكُمْ وَإِلَى الْأَعْيُنِ أَنْ يَخْبِتَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ حِكْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ مَنْ أَمَّا إِلَهُهُ صَدَقَ نَظَرُهُمْ وَتُرِكَ لَهُمْ بِمَا وَصَّلَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَواتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْتَوَّابُ الرَّحِيمُ ۚ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَيَرْجُونَ إِلَى اللَّهِ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ ۚ وَالشَّهَادَةُ ۚ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ وَالْغُرُوحُ مَرْجُونَ ۚ لَأَمْلَأَنَّ اللَّهُ بَأْسَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

(১০০) আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুল, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রব্রণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা। (১০১) আর কিছু কিছু তোমার আশ-পাশের মুনাফেক এবং কিছু লোক মদীনাবাসী কঠোর মুনাফেকীতে অনড়। তুমি তাদের জান না; আমি তাদের জানি। আমি তাদেরকে আখাব দান করব দু'বার, তারপর তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে মহান আখাবের দিকে। (১০২) আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করেছে, তারা মিশ্রিত করেছে একটি নেককাজ ও অন্য একটি বদকাজ। শীঘ্রই আল্লাহ্ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। ন্টিসন্দেহে আল্লাহ্ ক্রমাশীল, কক্ষামায়। (১০৩) তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বরকতময় করতে পার এর মাধ্যমে। আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, ন্টিসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সাহায্যরূপ। বস্ততঃ আল্লাহ্ সবকিছুই শোনে, জানেন। (১০৪) তারা কি একথা জানতে পারেনি যে, আল্লাহ্ নিজেই স্বীয় বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং যাকাত গ্রহণ করেন? বস্ততঃ আল্লাহ্ই তওবা কবুলকারী, কক্ষামায়। (১০৫) আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ্ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রসূল ও মুসলমানগণ। তাছাড়া তোমরা শীঘ্রই প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর সান্নিধ্যে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। তারপর তিনি জানিয়ে দেবেন তোমাদেরকে যা করতে। (১০৬) আবার অনেক লোক রয়েছে যাদের কাজকর্ম আল্লাহ্ নির্দেশের উপর স্থগিত রয়েছে, তিনি হয় তাদের আখাব দেবেন না হয় তাদের ক্ষমা করে দেবেন। বস্ততঃ আল্লাহ্ সব কিছুই জ্ঞাত, বিজ্ঞতাসম্পন্ন।

وَالشَّيْطُونُ الَّاُولُونَ مِنَ الْمُهْجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ ۝

অব্যাক্যে অধিকাংশ তফসীরবিদগণ تميم - এর জন্য সাব্যস্ত করে মুহাজিরীন ও আনসারদের দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। (১) ইকন গ্রন্থে ও হিজরতে যারা অগ্রবর্তী এবং (২) অন্যান্য সাহাবায়ে কোরাম।

এমন করার ক্ষেত্রেও মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন মনীষী সাহাবায়ে কোরামদের মধ্যে سابقین اولین তাদেরকেই সাব্যস্ত করেছেন, যারা উভয় কেবলা (অর্থাৎ, বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ) এর দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। অর্থাৎ, যারা কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে মুসলমান হয়েছেন তাদেরকে سابقین اولین গণ্য করেছেন। এমনটি হল সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব ও কাতাদাহ (রাঃ)-এর। যহরত আ'তা ইবনে আবী রাব্ব বলেছেন যে, 'সাবেকীনে আওয়ালীন' হলেন সে সমস্ত সাহাবায়ে কোরাম যারা গযওয়ায়ে বদরে অংশগ্রহণ করেছেন। আর ইমাম শা'বী (রাঃ)-এর মতে যেসব সাহাবী হোদায়বিয়ার বাইআতে-রেদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাই 'সাবেকীনে আওয়ালীন'। বস্ততঃ প্রতিটি মতনুযারী অন্যান্য সাহাবাগণ মুহাজির হোক বা আনসার-সাবেকীনে আওয়ালীনে পর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। (কুরতুবী, মাযহারী)

তফসীরে-মাযহারীতে আরো একটি মত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ আয়াতে من অব্যয়টি আংশিককৈ বোঝাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি, বরং বিবরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর মর্ম হবে এই যে, সমস্ত সাহাবায়ে কোরাম অন্যান্য সমস্ত উম্মতের তুলনায় সাবেকীনে আওয়ালীন। আর سابقین اولین হল তার বিবরণ। — 'বয়ানুল-কোরাআন' থেকে তফসীরের যে সার-সংক্ষেপ উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতেও এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম তফসীর অনুযায়ী সাহাবায়ে কোরামের দু'টি শ্রেণী সাব্যস্ত হয়েছে। একটি হল সাবেকীনে আওয়ালীনের, আর দ্বিতীয়টি কেবলা পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর অথবা বাইআতে রেদওয়ানের পর যারা মুসলমান হয়েছেন তাদের; আর দ্বিতীয় তফসীরের মর্ম হল এই যে, সাহাবায়ে কোরামই হলেন মুসলমানদের মধ্যে সাবেকীনে আওয়ালীন। কারণ, ইমান আনার ক্ষেত্রে তাঁরাই সমগ্র উম্মতের অগ্রবর্তী ও প্রথম।

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانٍ ۝

অর্থাৎ, যারা আমল ও চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুসলমানদের অনুসরণ করেছে পরিপূর্ণভাবে। প্রথম বাক্যের প্রথম তফসীর অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে সে সমস্ত সাহাবায়ে কোরাম, যারা কেবলা পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর অথবা বাইআতে হোদায়বিয়ার পর মুসলমান হয়ে সাহাবায়ে কোরামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় শ্রেণী হল তাঁদের পরবর্তী সে সমস্ত মুসলমানদের, যারা কেয়ামত অবধি ইমান গ্রহণ, সংকর্ষ ও স্ফটিকিততার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কোরামের আদর্শের উপর চলবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁদের অনুসরণ করবে।

আর দ্বিতীয় তফসীর অনুযায়ী اتَّبَعُوهُمْ বাক্যে সাহাবায়ে কোরামের পরবর্তী মুসলমানগণ অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে পরিভাষাগতভাবে تميم (তাবেমী) বলা হয়। এরপর পরিভাষাগত এই তাবেমীগণের পর কেয়ামত অবধি আগত সে সমস্ত মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা ইমান ও সংকর্ষের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে সাহাবায়ে কোরামের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَتُفَرُّوا وَيُقَرِّبُ الْبَيْنَ
 الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَصَادُّ الْبَيْنَ حَارَبَ اللَّهُ وَسَوَاءٌ مِنْ قَبْلٍ
 وَلِكَيْلُكُمْ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ وَاللَّهُ يَتَّبِعُهُمُ الْإِنْفِ
 لَكِنْ يُونُ ۝ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدًا أُيَسِّسَ عَلَى الْتَقْوَى
 مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فَمِنْ رِجَالٍ يَجْعَلُونَ أَنْ
 يَتَّبِعُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ۝ أَفَمَنْ أَتَسَسَ بَنِيَانَهُ
 عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرًا مِمَّنْ أَتَسَسَ بَنِيَانَهُ
 عَلَى شَفَاخِمْ فِي هَارٍ فَأَهَارِهِ فِي تَارٍ حَسَبَهُمُ وَاللَّهُ لَا
 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ لَا تَزَالُ بَنِيَانُهُمُ الَّذِينَ يَبُوءُ
 رَبِّيَنَ فُلُوكُمْ يَوْمَهُمُ الْآنَ نَقُطُّهُ فَلَوْ يَوْمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَاكِيَهُ
 إِنْ اللَّهُ أَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
 بِأَنْ لَّهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ
 يُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
 وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَشِيرُوا
 بَيْنَكُمْ وَالَّذِي يَبْعَثُ فِيهِ ذِكْرًا هُوَ الْقُورُ الْعَظِيمُ ۝

(১০৭) আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এ লোকের জন্য ধাঁচিবরণ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে, আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। পক্ষান্তরে আল্লাহ সাক্ষী যে, তারা সবাই মিথ্যুক। (১০৮) তুমি কখনো সেখানে দাঁড়াবে না, তবে যে মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে, সেটিই তোমার দাঁড়াবার যোগ্য স্থান। সেখানে রয়েছে এমন লোক, যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। (১০৯) যে ব্যক্তি স্বীয় গৃহের ভিত্তি রেখেছে কোন গর্তের কিনারায় যা খসে পড়ার নিকটবর্তী এবং অতঃপর তা ওকে নিয়ে দোষের আশুনে পতিত হয়। আর আল্লাহ জালেমদের পথ দেখান না। (১১০) তাদের নির্মিত গৃহটি তাদের অন্তরে সদা সন্দেহের উদ্রেক করে যাবে যে পবিত্র না তাদের অন্তরগুলো চৌচির হয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্বস্ত-প্রজাময় (১১১) আল্লাহ ক্রম করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জন্মাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে; অতঃপর যাবে ও মরে। ওগরত, ইহীল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিষ্ঠিত অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাক্ষ্য

সাহাবায়ে কেরাম জ্ঞাতী ও আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত :

মুহাম্মদ ইবনে কা'আব কুরবী (রাঃ)-কে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের সবাই জ্ঞাতাবাসী হবেন— যদি দুনিয়াতে তাঁদের কারো দ্বারা কোন ক্রটি বিচ্যুতি হয়েও থাকে তবুও। সে লোকটি জিজ্ঞেস করল, একথা আপনি কোথেকে বলছেন (এর প্রমাণ কি)? তিনি বললেন, কোরআন করীমের আয়াত পড়ে দেখ। وَالشُّعُونَ الْأَوَّلُونَ - এতে শতহীনভাবে সমস্ত সাহাবা সম্পর্কেই বলা হয়েছে وَفِي اللَّهِ عَنْهُمْ وَرِضْوَانُهُ - অবশ্য তাবেয়ীনদের ব্যাপারে। - اتباع باحسان এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের সবাই কোন রকম শর্তাশর্ত ছাড়াই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিধনা হবেন।

তফসীরে-মাহহারীতে এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, আমার মতে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জ্ঞাতাবাসী হওয়ার ব্যাপারে এর لَا يَسْتَوُونَ مِنْهُمْ مَنْ قَبْلُ الْقَوْمِ -

وَأُولَئِكَ أَطْعَمَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَعُوا مَنِ الْعَالَمِينَ وَأُولَئِكَ

আয়াতটি। এতে বিস্তারিতভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম প্রাথমিক পর্যায়ের হন কি পরবর্তী পর্যায়ের, আল্লাহ তাআলা তাঁদের সবার জন্যই জ্ঞাতাবাসী করেছেন।

তাছাড়া রসুলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীসে এরশাদ করেছেন যে, জাহান্নামের আগুন সে মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারে না, যে আমাকে দেখেছে কিংবা আমাকে যারা দেখেছে তাদেরকে দেখেছে।—(তিরমিযী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالْغُرُورُ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ যে দশ জন মুমিন বিনা ওজরে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত ছিলেন তাঁদের সাত জন মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদের বেঁধে নিয়ে মনের অনুতাপ-অনুশোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এদের উল্লেখ রয়েছে وَالْغُرُورُ أَعْرَضُوا আয়াতে। বাকী তিন জনের হুকুম রয়েছে وَالْغُرُورُ مَرْجُونَ আয়াতে, যারা প্রকাশ্যে এভাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেননি। রসুল করীম (সাঃ) তাঁদের সমাজচ্যুত করার, এমনকি তাঁদের সাথে সালাম-দোয়ার আদান-প্রদান পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা নেয়ার পর তাদের অবস্থা শোথের যায় এবং এখলাসের সাথে অপরাধ স্বীকার করে তওবা করে নেন। ফলে তাদের জন্য ক্ষমার আদেশ দেয়া হয়।—(বোখারী, মুসলিম)।

মসজিদে যোয়ার : মদীনায় আবু আ'মের নামের এক ব্যক্তি জাহেলী যুগে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে আবু আ'মের পাশী নামে খ্যাত হলো। তার পুত্র ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত হানযালা (রাঃ) যার মরদেহকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা নিজের গোমরাহী ও খ্রীষ্টবাদের উপর অবিচল ছিল।

হযরত নবী করীম (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হলে আবু আ'মের তাঁর সমীপে উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে। মহানবী (সাঃ) তার অভিযোগের জবাব দান করেন। কিন্তু

তাতে সেই হতভাগার সাধুনা আসলো না। অধিকন্তু সে বলল, “আমরা দু’জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে। সে একথাও বলল যে, আপনার যে কোন প্রতিপক্ষের সাহায্য আমি করে যাবো। সে মতে হোনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনে সে মুসলমানদের বিপরীতে অংশ নেয়। হাওয়াযেনের মত সুবৃহৎ শক্তিশালী গোত্রও যখন মুসলমানদের কাছে পরাজিত হলো, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়ায় চলে গেল। কারণ, তখন এটি ছিল খ্রীষ্টানদের কেন্দ্রস্থল। আর সেখানে সে আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। সে যে দোয়া করেছিল, তা সে ভোগ করলো। আসলে লাঞ্ছনা ভোগ কারো অদৃষ্টে থাকলে সে এমনই করে এবং নিজের দোয়ায় নিজেই লাঞ্ছিত হয়।

তবে আজীবন সে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। সে রোম সম্রাটকে মদীনায় অভিযান চালিয়ে মুসলমানদের উৎখাত করার প্ররোচনাও দিয়েছিল।

এ ষড়যন্ত্রের শুরুতে সে মদীনার পরিচিত মুনাফেকদের কাছে চিঠি লিখে যে, “রোম সম্রাট কর্তৃক মদীনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি। কিন্তু যথা সময় সম্রাটের সাহায্য হয় এমন কোন সম্মিলিত শক্তি তোমাদের থাকা চাই। এর পন্থা হলো এই যে, তোমরা মদীনায় মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যেন মুসলমানদের অন্তরে কোন সন্দেহ না আসে। অতঃপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ এবং পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কর্মপন্থা গ্রহণ কর।”

তার এ পত্রের ভিত্তিতে বার জন মুনাফেক মদীনায় কোবা মহল্লায়, যেখানে হুযের আকরাম (সাঃ) হিজরত করে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন— আরেকটি মসজিদের ভিত্তি রাখল। ইবনে ইসহাক (রহঃ) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এ বার জনের নাম উল্লেখ করেছেন। সে যাহোক অতঃপর তারা মুসলমানদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নিল যে, স্বয়ং রসুলে করীম (সাঃ)—এর দ্বারা এক ওয়াস্ত নামায সেখানে পড়াবে। এতে মুসলমানগণ নিশ্চিত হবে যে, পূর্বনির্মিত মসজিদের মত এটিও একটি মসজিদ।

এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধিদল মহানবী (সাঃ)—এর খেদমতে হাযির হয়ে আরম্ভ করে যে, কোবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে রয়েছে। দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুষ্কর। এছাড়া মসজিদটি এত প্রশস্তও নয় যে, এলাকার সকল লোকের সংকুলান হতে পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াস্ত নামায আদায় করেন, তবে আমরা বরকত লাভে ধন্য হব।

রসুলে করীম (সাঃ) তখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এখন সফরের প্রস্তুতিতে আছি। ফিরে এসে নামায আদায় করব। কিন্তু তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন তিনি মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন মসজিদে যেরার সম্পর্কিত এই আয়াতগুলো নাযিল হয়। এতে মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেয়া হল। আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর রসুলে করীম (সাঃ) কতিপয় সাহাবীকে— যাদের মধ্যে আমার বিন সকস্ এবং হযরত হামযা (রাঃ)—এর হস্তা ‘ওয়াহশী’ ও উপস্থিত ছিলেন—এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এক্ষুণি গিয়ে কথিত মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো।

আদেশমতে তারা গিয়ে মসজিদটি সমূলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন। এসব ঘটনা তফসীরে কুরুতুরী ও মাযহুরী থেকে উদ্ধৃত।

তফসীরে-মাযহুরীতে ইউসুফ বিন সালেহীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) মদীনা পৌঁছে দেখেন যে, সে মসজিদে জায়গাটি ফাঁকা পড়ে আছে। তিনি আসেম বিন আ’দীকে সেখানে কু নির্মাণের অনুমতি দান করেন। তিনি বলেন, ইয়া রসুলান্নাহ, যে জায়গা সম্পর্কে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, সেই অভিশপ্ত যান কু নির্মাণ আমার পছন্দ নয়। তবে সাবিত বিন আকরামের জোদনকর জায়গাটি দিয়ে দিন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, সে ঘরে তারও কোন সম্ভান-সম্ভতি হয়নি কিংবা জীবিত থাকেনি।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সে জায়গায় মানুষ তো দূরের কথা, পাখীকুল পর্যন্ত ডিম ও বাচ্চা দেয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাই সেই থেকে আজ পর্যন্ত মসজিদে কোবা থেকে কিছু দূরত্বে অবস্থিত সে জায়গাটি বিরান পড়ে আছে।

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا যারা মুসলমানদের কতি সাধনের উদ্দেশ্যে মসজিদের নামে গৃহ নির্মাণ করেছে ওরাও মুনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াতে উক্ত মসজিদ নির্মাণের তিনটি উদ্দেশ্য উল্লেখিত হয়েছে। প্রথমতঃ وَفَرَا অর্থাৎ, মুসলমানদের কতিসাধন। وَضَرُ অর্থ কতিসাধন। তবে ভাষাবিদগণ এ শব্দ দু’টির মধ্যে কিছু পার্থক্য করেছেন। তারা বলেন, وَضَرُ সেই কতিকে বলা হয়, যা কতি সাধনকারীর পক্ষে হয় লাভজনক, আর তার প্রতিপক্ষের জন্য হয় কতিকারক, যা وَضَر হলো যা কতি সাধনকারীর পক্ষেও মঙ্গলজনক হয় না। যেহেতু উক্ত মসজিদ নির্মাতাদের মঙ্গলের পরিবর্তে মারাত্মক وَفَرَا পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে, তাই আয়াতে وَضَر শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, وَتَرْفِيقَ الْيَتَامَى অর্থাৎ, অপর মসজিদ নির্মাণ দ্বারা মুসলমানদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করা। একটি দল সে মসজিদে নামায আদায়ের জন্য পৃথক হয়ে যাবে, যার ফলে কোবার পুরাতন মসজিদের মুসন্নী হ্রাস পাবে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য, وَلِإِصْطَادِ الْبَيْنِ حَارِبِ اللَّهِ অর্থাৎ, সেখানে আল্লাহ ও রসুলের শত্রুদের আশ্রয় মিলবে এবং তারা বসে বসে ষড়যন্ত্র পাকায় পারবে।

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যে মসজিদকে কোরআন মজীদ ‘মসজিদে যিরার’ নামে অভিহিত করেছে এবং যাকে মহানবী (সাঃ)—এর আদেশে ধ্বংস ও ভস্ম করা হয়েছে তা মূলতঃ মসজিদই ছিল না, তা নামায আদায়ের জন্য নির্মিত হয়নি। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল ভি, যা কোরআন চিহ্নিত করে দিয়েছে। এ থেকে বোঝা গেল যে, বর্তমান যুগে কোন মসজিদের মোকাবেলায় তার কাছাকাছি অন্য মসজিদ নির্মাণ করা হলে এবং এর পেছনে যদি মুসলমানদের বিভক্তিকরণ ও পূর্বদ মসজিদের মুসন্নী হ্রাস প্রভৃতি অসংখ্য নিয়ত থাকে, তবে এতে মসজিদ নির্মাণের সওয়াব তো হবেই না, বরং বিভেদ সৃষ্টির অপরাধে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও শরীয়ত মতে সে জায়গাটিকে মসজিদই বলা হয় এবং মসজিদের আদব ও হুকুমগুলো এখানেও প্রযোজ্য হবে। একে ধ্বংস করা কিংবা আগুন লাগিয়ে ভস্ম করা জায়েয হবে না। এ ধরনের মসজিদ নির্মাণ মূলতঃ গুনাহের কাজ হলেও যারা এতে নামায আদায় করবে, তাদের নামাযকে অশুদ্ধ বলা যাবে না। এ থেকে অপর একটি বিষয় পরিস্কার হয়ে যায় যে, কেউ যদি জিদের বশে বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে

মসজিদ নির্মাণ করে, তবে যদিও মসজিদ নির্মাণের সওয়াব সে বরাং গুনাহগার হবে, কিন্তু একে আয়াতে উল্লেখিত 'মসজিদে' বলা যাবে না। অনেকে এ ধরনের মসজিদকে 'মসজিদে যিয়ার' অভিহিত করে থাকে। কিন্তু তা ঠিক নয়। তবে একে 'মসজিদে' এর মত বলা যায়। তাই এর নির্মাতাকে এ প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত রাখা যায়। যেমন, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এক আদেশ জারী করেছিলেন যে, এক মসজিদের পার্শ্বে অন্য মসজিদ নির্মাণ করবে না, পূর্বতন মসজিদের জামাআত ও সৌন্দর্য হ্রাস পায়। - (কাশাফ)

১০. উপরোক্ত 'মসজিদে যিয়ার' সম্পর্কে ১০৮ নং আয়াতে মহানবী (সঃ)-কে হুকুম করা হয় যে, لَا تَقْرَبُوا الْمَسَاجِدَ بِكُلِّ بَنَانٍ بَخِلَ فِيهِ الْمَالُ الْأَوَّلَىٰ (১০৮) অর্থাৎ দাঁড়ানো অর্থ প্রথমতঃ উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো। অর্থাৎ, আপনি এই তথাকথিত মসজিদে প্রথমে নামায আদায় করবেন না।

১১. এ আয়াতে মহানবী (সঃ)-কে হেদায়েত দেয়া হয়েছে যে, আপনার ক্ষমতা মসজিদেই দুরন্ত হবে, যার ভিত্তি রাখা হয় প্রথমদিন থেকে পাকওয়া বা খোদাতীতির উপর। আর সেখানে এমন লোকেরা নামায আদায় করে, যারা পাকপবিত্রতায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনে উদগ্রীব। আল্লাহ্ নিজেও এমনিতর পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন।

আয়াতের বর্ণনাধারা থেকে বোঝা যায় যে, প্রশংসিত সে মসজিদটি হলো মসজিদে কোবা, যেখানে মহানবী (সঃ) তখন নামায আদায় করতেন। হাদীসের কতিপয় রেওয়াজেও থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। (মহসীনে মাযহারী)

ۖ وَيُحِبُّ آلَ يُسُفَٰرٍ ۚ ۝۱۰۸ এ আয়াতে সেই মসজিদকে মহানবী (সঃ)-এর নামাযের অধিকতর হকদার বলে অভিহিত করা হয়, যার ভিত্তি শুধু থেকেই তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছে। সে হিসেবে মসজিদে কোবা ও মসজিদে নববী উভয়টিই এ মর্যাদায় অভিষিক্ত। সে মসজিদেরই কবীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তথাকার মুসল্লীগণ পাক-পবিত্রতা সর্বদা সর্বশেষ যত্ববান। পাক-পবিত্রতা বলতে এখানে সাধারণ না-পাকী ও ময়লা থেকে পাক-পরিচ্ছন্ন হওয়া এবং তৎসঙ্গে গুনাহ ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র থাকা বোঝায়। আর মসজিদে নববীর মুসল্লীগণ সাধারণতঃ এসব গুণেই গুণান্বিত ছিলেন।

১১তম আয়াতের শানে নুযুল : অধিকাংশ মুফাসসেরের ভাষ্যমতে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে 'বায়'আতে আকাবায়' অংশ গ্রহণকারী লোকদের ব্যাপারে। এ 'বায়'আত নেয়া হয়েছিল মক্কায় মদীনার আনসারদের থেকে। তাই সূরাটি মদনী হওয়া সত্ত্বেও এ আয়াতগুলোকে মক্কী বলা হয়েছে।

'আকাবা' বলা হয় পর্বতাংশকে। এখানে আকাবা বলতে বোঝায় মিনার জমরায় আকাবার সাথে মিলিত পর্বতাংশকে। বর্তমানে হাজীদের সখ্যাধিক্যের দরুন পর্বতের এ অংশটিকে শুধু জমরা বাদ দিয়ে মাঠের সমান করে দেয়া হয়েছে। এখানে মদীনা থেকে আগত আনসারগণের তিন দফা বায়'আত নেয়া হয়। প্রথম দফা নেয়া হয় নবুওয়তের একাদশ বর্ষে। তখন মোট ছয় জন লোক ইসলাম গ্রহণ করে বায়'আত নিয়ে মদীনা ফিরে যান। এতে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলাম ও নবী করীম (সঃ)-এর চর্চা শুরু হয়। পরবর্তী বছর হজ্জের মৌসুমে বার জন লোক সেখানে একত্রিত হন। এদের পাঁচ জন ছিলেন পূর্বের এবং সাত জন ছিলেন নতুন। তাঁরা সবাই মহানবী (সঃ)-এর হাতে বায়'আত নেন। এর ফলে মদীনায় মুসলমানদের সখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, চল্লিশ জনেরও বেশী। তারা

নবী করীম (সঃ)-এর কাছে আবেদন জানান যে, তাঁদেরকে কোরআনের তালীম দানের উদ্দেশ্যে সেখানে কাউকে প্রেরণ করা হোক। তিনি হযরত মোসআব বিন ওমাইর (রাঃ)-কে প্রেরণ করেন, যিনি তথাকার মুসলমানদের কোরআন পড়ান ও ইসলামের তাবলীগ করেন। ফলে মদীনার বিরাট অংশ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়।

অতঃপর নবুওয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে সত্তর জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সেখানে একত্রিত হন। এ হলো তৃতীয় ও সর্বশেষ বায়'আতে আকাবা। সাধারণতঃ বায়'আতে আকাবা বলতে একেই বোঝানো হয়। এ বায়'আতটি ইসলামের মৌল আকীদা ও আমল, বিশেষতঃ কাকেরদের সাথে জেহাদ এবং মহানবী (সঃ) হিজরত করে মদীনা গেলে তাঁর হেফাযত ও সাহায্য-সহযোগিতার জন্য নেয়া হয়। বায়'আত গ্রহণকালে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা (রাঃ) বলেছিলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! এখন অঙ্গীকার নেয়া হচ্ছে; আপনার রব কিংবা আপনার সম্পর্কে কোন শর্তারোপ করার থাকলে তা পরিষ্কার বলে দেয়া হোক। হযর (সঃ) বলেন, আল্লাহর ব্যাপারে শর্তারোপ করেছে যে, তোমরা সবাই তাঁরই এবাদত করবে; তাঁকে ছাড়া কারো এবাদত করবে না। আর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হলো যে, তোমরা আমার হেফাযত করবে যেমন নিজের জান-মাল ও সন্তানদের হেফাযত কর। তাঁরা আরম্ভ করলেন, এ শর্ত দু'টি পূরণ করলে এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? তিনি বললেন, জ্ঞান্নাত। তাঁরা পুলকিত হয়ে বললেন, আমরা এর জন্য রাযী, এমন রাযী যে, নিজেদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি রহিত করার আবেদন কোন দিনই পেশ করব না এবং রহিতকরণকে পছন্দও করব না।

জেহাদের সর্বপ্রথম আয়াত : মহানবী (সঃ)-এর মক্কা শরীকে অবস্থানকালে এ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিত কোন হুকুম নাযিল হয়নি। এটিই সর্বপ্রথম জেহাদ সংক্রান্ত আয়াত, যা মক্কা শরীকে অবতীর্ণ হয়। তবে এর উপর আমল শুরু হয় হিজরতের পরে। এরপর দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয় : اُو۟۟۟۟۟۟۟۟۟۟۟۟ (সূরা হুদ ৩৯) মক্কায় কোরাইশ বংশীয় কাকেরদের অগোচরে যখন বায়'আতে আকাবা সম্পাদিত হয় তখনই মহানবী (সঃ) মক্কার মুসলমানদের মদীনায় হিজরতের আদেশ দিয়ে দেন। অতঃপর ক্রমশঃ সাহাবায়ে কোরামের হিজরতের গারা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু নবী করীম (সঃ) নিজে আল্লাহর অনুমতির অপেক্ষায় থাকেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হিজরতের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তাঁকে নিজের সহযাত্রী করার মানসে তখনকার মত নিবৃত্ত রাখেন। - (মাযহারী)

فِي النَّو۟۟۟۟۟۟۟۟۟۟۟۟ থেকে ۚ ۝۱۰৯ থেকে ۚ ۝১১০ পর্যন্ত আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, জেহাদের হুকুম পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্যও সকল কিতাবে নাযিল হয়েছিল। ইঞ্জিল (বাইবেলে) জেহাদের হুকুম নেই বলে যে কথা প্রচলিত রয়েছে, তা সম্ভবতঃ এজন্য যে, পরবর্তী খ্রীষ্টানরা ইঞ্জিলের যে বিকৃতি ঘটিয়েছে তার ফলে জেহাদের হুকুম সমূলিত আয়াতগুলো খারিজ হয়ে যায় - 'আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ' ۚ ۝۱১০ বায়'আতে আকাবায় রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়, তা দৃশ্যতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মত। তাই আয়াতের শুরুতে ক্রয় শব্দের ব্যবহার করা হয়। উপরোক্ত বাক্যে মুসলমানদের বলা হচ্ছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের এই সওদা তোমাদের জন্য লাভজনক ও বরকতময়। কেননা, এর দ্বারা অস্থায়ী জান-মালের বিনিময়ে স্থায়ী জ্ঞান্নাত পাওয়া গেল। চিন্তা করার ব্যাপার যে, এখানে ব্যয় হলো শুধু মাল। কিন্তু আত্মা মৃত্যুর পরও বাকী থাকবে। চিন্তা করলে আরো দেখা যায় যে, মালামাল

الْكَافِرُونَ الْعِيدُونَ الْحَيْدُونَ الشَّيْخُونَ الزُّكُوعُونَ
الشُّجُونُ الْأُمُورُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَيَشِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ
لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ
لَوْ كَانُوا أُولَى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ
أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
إِلَّا عَنِ مَوْعِدَةٍ وَعَدَ مَا يَأْتِيهِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ
لِللَّهِ تَوَلَّى أَمْنَةً إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَكَاذِبٌ عَالِيَةٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا
يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ
السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى
النَّبِيِّ وَالْمُخَلَّيْنِ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ فُرْقَانَهُمْ
وَمَنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

(১১২) তারা তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরসোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সংকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্তকারী এবং আল্লাহর দেওয়া সীমাসমূহের হেফাজতকারী। বস্ত্তঃ সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে। (১১৩) নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরেকদের মাগফেরাত কামনা করে, যদিও তারা আত্মীয় হোক—একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোষী। (১১৪) আর ইব্রাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফেরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে একথা প্রকাশ পেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম ছিলেন বড় কোমলহৃদয়, সহনশীল। (১১৫) আর আল্লাহ কোন জাতিকে হেদায়েত করার পর পশ্চত করেন না—যতক্ষণ না তাদের জন্য পরিস্কারভাবে বলে দেন সেসব বিষয় যা থেকে তাদের বেঁচে থাকা দরকার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব বিষয়ে ওয়াক্কফহাল। (১১৬) নিক্ত আল্লাহরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের সাম্রাজ্য। তিনিই জিন্দা করেন ও মৃত্যু ঘটান, আর আল্লাহ বাতীল তোমাদের জন্য কোন সহায়ও নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই। (১১৭) আল্লাহ দয়ালীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়ালীল ও করুণাময়।

হলো আল্লাহরই দান। মানুষ শূন্য হাতেই জন্ম নেয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে অর্থ-সম্পদের মালিক করেন এবং নিজের দেয়া সে অর্থ বিনিময়েই বান্দাকে জন্মাত দান করবেন। তাই হযরত ওমর কারক (রাঃ) বলেন, 'এ এক অভিনব বেচা-কেনা, মাল ও মূল্য উভয়ই তোমাদিগকে দিয়ে দিলেন আল্লাহ।' হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, 'লক্ষ্য কর, এ কেমন লাভজনক সওদা, যা আল্লাহ সকল মুমিনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন।' তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে কিছু ব্যয় করে জন্মাত ক্রয় করে নাও।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

الْكَافِرُونَ الْعِيدُونَ এ গুণাবলী হলো সেসব মুমিনের যাদের সম্পদে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে - 'আল্লাহ জন্মাতের বিনিময়ে তোমার জ্ঞান-মাল খরচ করে নিয়েছেন।' আয়াতটি নাখিল হয়েছিল বায়'আতে আকাবায় অংশ গ্রহণকারী একটি বিশেষ জামাত সম্পর্কে। তবে আল্লাহ রাহে জেহাদকারী সবাই এ আয়াতের মর্মভুক্ত। আর الْكَافِرُونَ থেকে দশ পর্যন্ত যে গুণাবলীর উল্লেখ হয়েছে, তা শর্তরূপে নয়। কারণ, আল্লাহ রাহে কেবল জেহাদের বিনিময়েই জন্মাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। তবে এ গুণাবলী উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, যারা জন্মাতের উপযুক্ত, তারা এ সকল গুণের অধিকারী হয়। বিশেষতঃ বায়'আতে আকাবায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবাদের এ সকল গুণ ছিল।

অধিকাংশ মুফাসসের মতে الشَّيْخُونَ এর অর্থ صانعون (দেশ ত্রমণ) থেকে উদ্ভূত। ইসলাম-পূর্ব রোযাপালনকারী। শব্দটি سياحة (দেশ ত্রমণ) থেকে উদ্ভূত। ইসলাম-পূর্ব যুগে ব্রীট ধর্মে দেশ ত্রমণকে এবাদত মনে করা হতো। অর্থাৎ, যম্ম পরিবার-পরিজন ও ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াত। ইসলাম ধর্মে একে বৈরাগ্যবাদ বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তে রোয পালনের এবাদতকে এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ দেশ ত্রমণে উদ্দেশ্য সংসার ত্যাগ। অথচ রোযা এমন এক এবাদত, যা পালন করতে গিয়ে যাবতীয় পার্থিব বাসনা ত্যাগ করতে হয় এবং এরই ভিত্তিতে কতিপয় রেওয়াজে জেহাদকেও দেশ ত্রমণের অনুরূপ বলা হয়। এ হাদীসটি ইবনে মাছা, হাকেম ও বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ সই সূরে বর্ণনা করেছেন। হযুরে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, অর্থাৎ, 'আমর উম্মতের দেশত্রমণ سبيل الله الجهاد فی سبيل الله হলো জেহাদ কীসাবীল্লাহ।'

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, কোরআন মজীদে সাহচীন سائحون শব্দের অর্থ রোযাদার। হযরত ইকরিমা (রাঃ) سائحون শব্দের ব্যাখ্যা বলেন যে, এরা হলো এলমে দুইনের শিক্ষার্থী, যারা এলম হাসিলের জন্য ঘর-বাড়ী ছেড়ে বের হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতে মুমিন-মুজাহিদের সাতটি গুণ যথা :

الْعِيدُونَ الْحَيْدُونَ الشَّيْخُونَ الزُّكُوعُونَ الشُّجُونُ الْأُمُورُ

উল্লেখ করে ঐষ্টম গুণ হিসেবে الْكَافِرُونَ উল্লেখ করে ঐষ্টম গুণ হিসেবে الْكَافِرُونَ এতে রয়েছে উপরোক্ত সাতটি গুণে সমাবেশ। অর্থাৎ, সাতটি গুণের মধ্যে যে তফসীল রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার হলো এই যে, এরা নিজেদের প্রতিটি কর্ম ও কথায় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা তথা শরীয়তের স্ফুমের অনুগত ও তার হেফাজতকারী।

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاعَتْ عَلَيْهِمْ
الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاعَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ
لَا مُجَاءَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَهُ يَوْمَهُمْ عَلَيْهِمْ يَتَوَلَّوْنَ
اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۖ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ
حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يَكْتُمِبُ لَأَنصِبُهُمْ
ظُلْمًا وَلَا تَقْصَبْ وَلَا تَخْصَصْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغَوْا
مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَتَالَوْنَ مِنْ عَذَابٍ نِيعًا ۚ
لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۖ
وَلَا يَغْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ
وَادِيًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ بَيْعًا يَوْمَهُمْ اللَّهُ أَحْسَنُ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۖ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَذُكِّرُوا
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ
لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۖ

(১১৮) এবং অপর তিন জনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কটিত হয়ে গেল এবং তাদের সীমানা দুর্বিসহ হয়ে উঠলো; আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন আশ্রয়স্থল নেই—অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে জরা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল। (১১৯) হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। (১২০) সীমানাবাসী ও পাশুবর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রসূলুল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করে পেছনে থেকে যাওয়া এবং রসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাকেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যাকিছু প্রাপ্ত হয়—তার প্রত্যেকটি পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সংকমণীল লোকদের হক নষ্ট করেন না। (১২১) আর তারা কল-নিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যত প্রান্তর তারা অতিক্রম করে, তা সবই তাদের নামে লেখা হয়, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের উত্তম বিনিময় প্রদান করেন। (১২২) আর সমস্ত মুমিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে সীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে?

‘সঙ্কটকময় মুহূর্ত’ বলে অভিহিত করেছে। কারণ, সে সময় মুসলমানগণ বড় অভাব-অনটনে ছিলেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) সে অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, সে সময় দশ জনের জন্য ছিল একটি মাত্র বাহন, যার উপর পালা করে তারা আরোহণ করতেন। তদুপরি সফরের সমূলও ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। অন্যদিকে ছিল গ্রীষ্মকাল, পানিও ছিল পথের মাত্র কয়েকটি স্থানে এবং তাও অতি অল্প পরিমাণে।

আয়াতের এ বাক্যে যে,

কিছু লোকের অন্তরের বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ ধর্মাস্তর নয়, বরং এর অর্থ হলো, কড়া গ্রীষ্ম ও সমূলের স্বপ্নতা হেতু সাহস হারিয়ে ফেলা এবং জেহাদ থেকে গা বাঁচিয়ে চলা। হাদীসের রেওয়াজেতগুলোও এ অর্থেরই সমর্থক। এই ছিল তাঁদের অপরাধ। যেজন্য তারা তওবা করেন এবং তা কবুল হয়।

আনুষঙ্গিক সঙ্গতব্য বিষয়

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا এখানে অর্থ যাদের পেছনে রাখা

হয়েছে। তবে মর্মার্থ হলো, যাদের সম্পর্কে শিক্ষান্ত স্থগিত রাখা হল। এরা তিন জন হলেন হযরত কা’আব ইবনে মালেক, শা—এর মুরারী ইবনে রবি এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ) তারা তিন জনই ছিলেন আনসারের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। যারা ইতিপূর্বে বায়’আতে আ’কাবা ও মহানবী (সাঃ)—এর সাথে বিভিন্ন জেহাদে শরীক হয়েছিলেন। কিন্তু এ সময় ঘটনাচক্রে তাঁদের বিচ্যুতি ঘটে যায়। অন্যদিকে যে মুনাফেকরা রূপটাতার দরুন এ যুদ্ধে শরীক হয়নি, তারা তাঁদের কুপরামর্শ দিয়ে দুর্বল করে তুললো। অতঃপর যখন হযুরে আকরাম (সাঃ) জেহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন মুনাফেকরা নানা অভ্যুহাত দেখিয়ে ও মিথ্যা শপথ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইল আর মহানবী (সাঃ)—ও তাদের গোপন অবস্থাকে আল্লাহর সোপর্দ করে তাদের মিথ্যা শপথই আশ্রিত হলেন, ফলে তারা দিবি আরামে সময় অতিবাহিত করে চলে আর ঐ তিন বুয়ুগ সাহাবীকে পরামর্শ দিতে লাগল যে, আপনারাও মিথ্যা অভ্যুহাত দেখিয়ে হযুর (সাঃ)—কে আশ্রিত করুন। কিন্তু তাঁদের বিবেক সায় দিল না। কারণ, প্রথম অপরাধ ছিল জেহাদ থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয় অপরাধ আল্লাহর নবীর সামনে মিথ্যা বলা, যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তারা পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন যে, অপরাধের সাজাস্বরূপ তাদের সমাজচ্যুতির আদেশ দেয়া হয়। আর এদিকে কোরআন মজীদ সকল গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটন এবং মিথ্যা শপথ করে অভ্যুহাত সৃষ্টিকারীদের প্রকৃত অবস্থাও ফাঁস করে দেয়। অত্র সূরার ৯৪ থেকে ৯৮ আয়াত

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ - عَلَيْهِمْ ذِكْرُ الشَّوْءِ

পর্যন্ত রয়েছে এদের অবস্থা ও নির্মম পরিণতির বর্ণনা। কিন্তু যে তিন জন সাহাবী মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে অপরাধ স্বীকার করেছেন, অত্র আয়াতটি নাখিল হয় তাঁদের তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এহেন দুর্বিসহ অবস্থা ভোগের পর তারা আবার আনন্দিত মনে রসুলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলিত হন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ পূর্ববর্তী

আয়াতসমূহে জেহাদ থেকে বিরত থাকার যে ক্রটি কতিপয় নিষ্ঠাবান সাহাবীর দ্বারাও সংঘটিত হয়ে গেল এবং পরে তাঁদের তওবা কবুল হলো,

এ ছিল তাঁদের তাকওয়া ও খোদাভীতিরই ফলশ্রুতি। তাই এ' আয়াতের মাধ্যমে সমস্ত মুসলমানকে তাকওয়ার হেদায়েত দান করা হয়েছে। আর

وَكُؤُومَةُ الضُّعَفَاءِ (তোমরা সবাই সত্যবাদীদের সাথে থাক।) বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যবাদীদের সাহচর্য এবং তাদের অনুরূপ আমলের মাধ্যমেই তাকওয়া লাভ হয়। এখানে এমনও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ঐ সকল সাহাবীর পদস্থলনের মধ্যে মুনাফেকদের সাথে উঠাবসা ও তাদের পরামর্শেরও একটা দখল ছিল। তাই নাফরমানদের সাহচর্য ত্যাগ করে সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করা প্রয়োজন। কোরআনের এ আয়াতে আলেম ও সালেহগণের পরিবর্তে 'সাদেকীন' শব্দ ব্যবহার করে আলেম ও সালেহ-এর প্রকৃত পরিচয় দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ, সে ব্যক্তিই যথার্থ সালেহ বা নেককার যে ভেতরে ও বাহিরে সমান এবং নিয়ত ও ইচ্ছায় এবং কথা ও কর্মে সমান সত্য হয়।

দ্বীনের এলম হাসিল ও সংশ্লিষ্ট নীতি-নিয়ম :

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতটি দ্বীনের এলম হাসিলের মৌলিক দলীল। চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, এতে দ্বীনী এলমের এক সংশ্লিষ্ট পাঠ্যসূচী এবং এলম হাসিলের পর আলেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হবে তাও বলে দেয়া হয়েছে। এখানে বিষয়টির কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

দ্বীনী এলমের ফযীলত : দ্বীনী এলমের অগণিত ফযীলত ও সওয়াব সম্পর্কে গুলামায়ে কোরাম ছোট বড় অনেক কিতাব লিখেছেন। এখানে কয়েকটি সংশ্লিষ্ট হাদীস পেশ করা হলো। তিরমিযী শরীফে আবুদারদা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি এলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোন পথ দিয়ে চলে, আল্লাহ এই চলার সওয়াব হিসাবে তার রাস্তাকে জন্মাতমুখী করে দেবেন। আল্লাহর ফেরেশতাগণ দ্বীনী জ্ঞান আহরণকারীর জন্য নিজেদের পালক বিছিয়ে রাখেন। আলেমের জন্য আসমান-যমীনের সমস্ত সৃষ্টি এবং পানির মৎস্যকুল দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করে। অধিকহারে নফল এবাদতকারী লোকের উপর আলেমের ফযীলত অপরাপর তারকারাজির উপর পূর্ণিমা চাঁদেরই অনুরূপ। আলেমসমাজ নবীগণের ওয়ারিস। নবীগণ স্বর্ণ, রূপার মীরাস রেখে যান না। তবে এলমের মীরাস রেখে যান। তাই যে ব্যক্তি এলমের মীরাস পায়, সে যেন মহা-সম্পদ লাভ করলো।— (কুরতুবী)

ইমাম দারেমী (রহঃ) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন যে, জনৈক সাহাবী নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন। বনী-ইসরাঈলের দু'জন লোক ছিলেন, যাদের একজন ছিলেন আলেম। তিনি শুধু নামায ও লোকের দ্বীনী তা'লীম দানে ব্যস্ত থাকতেন। অপরজন সারাদিন রোযা রাখতেন এবং সারা রাত এবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। এ দু'জনের মধ্যে কার ফযীলত বেশী? হুযর (সাঃ) বলেন, সেই আলেমের ফযীলত আবেদের উপর এমন, যেমন আমার ফযীলত তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর।— (কুরতুবী)

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন, শয়তানের মোকাবেলায় একজন ফেকাহবিদ এক হাজার আবেদের চাইতেও শক্তিশালী ও ভারী।— (তিরমিযী, মাযহারী) তিনি আরো বলেন, মানুষের মৃত্যু হলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের সওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। (এক) সদকায়ে জরিয়া—(যেমন, মসজিদ, মাদ্রাসা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান)। (দুই) এলম-যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত

হয়। (যেমন, শাগরিদ রেখে গিয়ে এলমে দ্বীনের চর্চা জারী রাখা বা কোন কিতাব লিখে যাওয়া)। (তিন) নেককার সন্তান—যে তার পিতার জন্য দোয়া করে এবং সওয়াব পাঠাতে থাকে।— (কুরতুবী)

দ্বীনী এলম ফরযে-আইন অথবা ফরযে-কেফায়া হওয়ার বিবরণ :

ইবনে আ'দী ও বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদে হযরত আনাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন—**طلب العلم فريضة على كل مسلم** 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর এলম শিক্ষা করা ফরয।' বলাবাহুল্য, এ হাদীসও উপরোক্ত অপরাপর হাদীসে উল্লেখিত 'এলম' শব্দের অর্থ দ্বীনের এলম। তবে অন্যান্য বিষয়ের মত দ্বিনিয়াবী জ্ঞান-বিজ্ঞানও মানুষের জন্য জরুরী। কিন্তু হাদীসসমূহে সে সর্বের ফযীলত বর্ণিত হয়নি। অতঃপর দ্বীনী এলম বলতে একটি মাত্র বিষয়ই বোঝায় না; বরং তা বহু বিষয়েরই উপর পরিব্যাপ্ত এক বিরাট ব্যবস্থা। সুতরাং সমস্ত বিষয়ই একা আয়ত্ত করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই উল্লেখিত হাদীস প্রত্যেক মুসলমানদের উপর যে এলম তলব ফরয করা হয়েছে, তার অর্থ হবে এই যে, সমস্ত মুসলমানদের জন্য দ্বীনী এলমের শুধু সে অংশ আয়ত্ত করাই ফরয করা হয়েছে, যা ঈমান ও ইসলামের জন্য জরুরী এবং যার অবর্তমানে মানুষ না পারে ফরযসমূহ আদায় করতে, আর না পারে হারাম বিষয় থেকে বাঁচতে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়; কোরআন-হাদীসে মাসআলা-মাসায়েল, কোরআন-হাদীস থেকে আহরিত শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও তার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা আয়ত্তে আনা মুসলমানের পক্ষে সম্ভবও নয় এবং ফরযে-আইনও নয়। তবে দ্বীনী মুসলিম বিশ্বের জন্য তা ফরযে কেফায়াহ। তাই প্রত্যেকটি শহরেই দ্বীনী শরীয়তের উপরোক্ত এলম ও আইন-কানূনের একজন সুদক্ষ আলেম থাকেন, তবে অন্যান্য মুসলমান এ ফরযের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। কিন্তু যদি শহর বা পল্লীতে একজনও অভিজ্ঞ আলেম না থাকেন, তবে তাদের কাউকেই আলেম বানানো বা অন্যথান থেকে কোরআলমকে ডেকে এনে এখানে রাখার ব্যবস্থা করা স্থানীয় লোকের পক্ষে ফরয। যাতে করে যে কোন প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে তার কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে সেমত আমল করা যায়। দ্বীনী এলম সম্পর্কে ফরযে-আইন ও ফরযে-কেফায়ায় তফসীল নিম্নরূপ :

ফরযে-আইন : ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাসমূহের জ্ঞান হাসিল করা, পাকী-নাপাকীর হুকুম-আহকাম জানা, নামায-রোযা ও অন্যান্য এবাদত বা শরীয়ত যেসব বিষয় ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর জ্ঞান রাখা এবং যেসব বিষয় হারাম বা মকরুহ করে দিয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে ওয়াকফহাল হওয়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর করা। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নেসাবের মালিক, তার জন্য যাকাত মাসআলা-মাসায়েল জানা, যে হজ্জ আদায় করতে সমর্থ তার পক্ষে জরুরী আহকাম ও মাসায়েল জেনে নেয়া, যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনা-বোঝা শিক্ষা-কারখানায় নিয়োজিত, তার পক্ষে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহকাম জেনে রাখা এবং যে বিয়ের উদ্যোগ নিচ্ছে, তার পক্ষে বিয়ে ও তালাকের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবগত হওয়া ফরয। এক কথায় শরীয়ত মানুষের উপর যেসব কাজ ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম-আহকাম ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয।

এলমে-তাসাউফ ও ফরযে-আইনের অন্তর্ভুক্ত : শরীয়তের যাহেরী হুকুম তথা নামায-রোযা প্রভৃতি যে ফরযে-আইন

সর্বজনবিদিত। তাই সেগুলোর এলম রাখাও ফরযে-আইন। হয়রত কাযী সানউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) তফসীরে মাযহারীতে এ আয়াতের টীকায় লিখেছেন যে, যেহেতু বাতেনী আমলও সকলের জন্য ফরযে-আইন, তাই হুদুদী আমল ও বাতেনী হারাম বস্তুর এলম-যাকে পরিভাষায় 'এলমে-তাসাউফ' বলা হয়, তা হাসিল করাও ফরযে-আইন।

অধুনা বিভিন্ন এলম, তত্ত্বজ্ঞান, কাশফ ও আত্মোপলব্ধির সম্মিলিত রূপকে এলমে তাসাউফ বলা হয়। তবে এখানে ফরযে-আইন বলতে হুদুদী আমলের শুধু সে অংশকেই বোঝায়, যা ফরয-ওয়াজিবের তফসীল। যেমন, বিশুদ্ধ আকীদা, যার সম্পর্ক বাতেন তথা অন্তরের সাথে অথবা সবার, শোকর ও তাওয়াক্কুল প্রভৃতি এর বিশেষ স্তর পর্যন্ত দৃঢ়, কিংবা গর্ভ-অহংকার, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কপণতা ও দুনিয়ার বোহ প্রভৃতি কোরআন ও হাদীস মতে হারাম। এগুলোর গতি-প্রকৃতি, জ্ঞা বা সেগুলো হাসিল করার কিংবা হারাম থেকে বেঁচে থাকার নিয়ম-নীতি জেনে রাখাও সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয। এ সকল বিষয়ের উপরই হল এলমে তাসাউফের আসল ভিত্তি, যা ফরযে আইন।

ফরযে কেফায়া : পূর্ণ কোরআন মজীদে অর্থ ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবহিত হওয়া, সমুদয় হাদীসের মর্ম বোঝা, বিশুদ্ধ ও দূর্বল হাদীস সম্পর্কে ওয়াকফহাল থাকা, কোরআন ও হাদীস থেকে নির্গত আহকাম ও মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন এবং এ সমস্ত ব্যাপারে সাহায্য, তাবয়ীনি ও মুজতাহেদ ইমামগণের ভাষ্য ও আমল থেকেও এ সম্পর্কিত পূর্ণ জ্ঞান হাসিল করা দুঃসাধ্য। তাই শরীয়ত একে ফরযে-কেফায়া রূপে সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ কিছু লোক যদি প্রয়োজনমত এগুলোর জ্ঞান হাসিল করে নেয়, তবে অন্যান্যরাও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

দ্বীনী এলমের সিলেবাস : কোরআন মজীদ আলোচ্য আয়াতের একটি যাত্র শব্দে দ্বীনী এলমের প্রকৃতি ও তার পাঠ্যক্রম কি হবে তা ব্যক্ত করে দিয়েছে। বলা হয়েছে : **يَتَعَلَّمُونَ فِي الدِّينِ** অথচ **الدين** (যেন দ্বীনের জ্ঞান হাসিল করে) ও বলা যেত। কিন্তু কোরআন এখানে **فهم** এর স্থলে **فقه** শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করেছে যে, নিছক দ্বীনের এলম 'পাঠ' করাই যথেষ্ট নয়। কারণ, ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরাও তা পাঠ করে, আর শয়তান তো এক্ষেত্রে তাদের সকলের আগে; বরং এলমে দ্বীনের উদ্দেশ্য হলো দ্বীনকে অনুধাবন করা কিংবা তাতে বিজ্ঞতা অর্জন করা। **فقه** শব্দের অর্থও তাই। এটি **فقه** থেকে উদ্ভূত। **فقه** অর্থ বোঝা, অনুধাবন করা। উল্লেখ্য যে, কোরআন মজীদ এ আয়াতে **مجرد** **صيفه** ব্যবহার করে **يَتَعَلَّمُونَ فِي الدِّينِ** (যেন তারা দ্বীনকে বোঝে নেয়) বলেনি; বরং একে **تفعل** বা **باب تفعل** এ নিয়ে **يَتَعَلَّمُونَ فِي الدِّينِ** বলেছে।

ফলে এতে পরিশ্রম ও সাধনাও शामिल হয়ে গেছে। সেমতে ব্যাক্যের মর্ম হবে "তারা যেন দ্বীন অনুধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাতে দক্ষতা হাসিল করে।" বলাবাহুল্য, পাকী-নাপাকী, নামায-রোযা ও ইহু-মাকাতের মাসআলা-মাসায়েল জানাচ্ছেই দ্বীনকে অনুধাবন করা বলা যাবে না। বরং দ্বীনের সত্যিকার অনুধাবন হলো, তাকে বোঝে তার প্রতিটি

কথা ও কর্ম এবং যাবতীয় গতিবিধির হিসাব দিতে হবে রোজ হাশরে। দুনিয়ার এ জীবন তাকে কিরূপে অভিযাহিত করতে হবে—মূলতঃ এ চিন্তাই হলো দ্বীন অনুধাবন। এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) 'ফেকাহ'-এর যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা হলো এই যে, "ফেকাহ সে শাস্ত্রকে বলা হয়, যাতে মানুষ নিজের করণীয় কাজকে বোঝে নেয় এবং সে সকল কাজকেও বোঝে নেয় যা' থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য জরুরী।" অধুনা মাসআলা-মাসায়েলের বিস্তারিত জ্ঞানকেই যে, 'এলমে-ফেকাহ' বলা হয় তা' পরবর্তী যুগের পরিভাষা। কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফেকাহর তাৎপর্য তাই যা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের সমস্ত কিতাব পাঠ করে নিল, কিন্তু দ্বীনকে পুরোপুরি বুঝতে পারল না, সে কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় আদৌ আলেম নয়।

এ তত্ত্ব থেকে বোঝা গেল যে, কোরআনের পরিভাষায় দ্বীনের এলম হাসিল করার অর্থ হলো, দ্বীন সম্পর্কে প্রজ্ঞা অর্জন করা। তা কিতাবের মাধ্যমে বা আলেমগণের সাহায্যে যে কোন উপায়েই হোক—সবই একই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত।

ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব : দ্বীনের জ্ঞান হাসিলের পর ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব কি হবে তার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে **وَالْيُنْذِرُونَ أَقْوَمَهُمْ** (যেন তারা জাতিকে আল্লাহর নাক্ষত্রমণী থেকে ভয়প্রদর্শন করে) বাক্যটিতে। উল্লেখ্য যে, এখানে আলেমগণের দায়িত্ব বলা হয়েছে **انذار** বা ভয়প্রদর্শন। এটি **انذار**—এর শাব্দিক তরজমা, যথাযথ মর্মার্থ নয়। বস্তুতঃ ভয়প্রদর্শন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের ভীতিপ্রদর্শন হলো, চোর-ডাকাতে, শত্রু, হিংস্রজন্তু ও বিষাক্ত প্রাণী থেকে ভয়প্রদর্শন করা। অন্য ধরনের হলো, পিতা স্নেহবশে আপন ছেলেকে আশুনি, বিষাক্ত প্রাণী ও অন্যান্য কষ্টদায়ক বস্তু থেকে যে ভয়প্রদর্শন করে। এর মূলে থাকে প্রগাঢ় মমতা, স্নেহবোধ। এ ভয়প্রদর্শনের কলাকৌশলও ভিন্ন। আরবীতে একেই বলা হয় **انذار**—এজন্য নবী-রসূলগণ **نذير** উপাধিতে ভূষিত। আলেমগণের উপর জাতিকে ভয়প্রদর্শনের যে দায়িত্ব রয়েছে, তা মূলতঃ নবীগণের আর্থিক মীরাস-যা হাদীসমতে ওলামায়ে কেরাম লাভ করেছেন।

তবে এখানে উল্লেখ্য যে, নবীগণ **بشير** ও **نذير** উভয় উপাধিতেই ভূষিত। **نذير** এর অর্থ উপরে জানা গেল। আর **بشير** অর্থ সুসংবাদ দানকারী। সুতরাং নবীগণের উপর দায়িত্ব হলো সংকমশীলদের সুসংবাদ দান করা। আলোচ্য আয়াতে যদিও শুধু ভয়প্রদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অন্য দলীলের দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, আলেমগণের অন্যতম দায়িত্ব হলো নেককার বান্দাদিগকে সুসংবাদ দেয়া। তবে এখানে শুধু ভয়প্রদর্শনের উল্লেখ থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষের আসল কাজ দু'টি। (এক) দুনিয়া ও আখেরাতে যা কল্যাণকর, তা অবলম্বন করা এবং (দুই) অকল্যাণ ও অনিষ্টকর কাজ থেকে বেঁচে থাকা। আলেমও দার্শনিকদের ঐকমত্যে শেযোক্ত কাজটিই গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ
 الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
 الْمُتَّقِينَ ۝ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ
 إِنَّا سَمِعْنَا هَذِهِ آيَاتًا قَالًا ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 قَرَأَتْهُمْ آيَاتًا ۚ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَإِنَّمَا
 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَمٌ قَرَأَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى
 رِجْسِهِمْ وَمَتَابُ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝ أَوَلَا يَرَوْنَ
 أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَمَلٍ مُّكْرًا أَوْ مَرَاتِينَ مُّكْرًا
 يَتَوَلَّوْنَ وَلَا هُمْ يَدْرِكُونَ ۝ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ
 نَّظَرُوا بِهَا إِلَىٰ بَعْضِ آلِيَاءِ لَكُمْ مِنْ أَحَدِكُمْ
 انْصَرَفُوا ۚ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ بَلْ كُفُّوا أَعْيُنَهُمْ
 يَفْقَهُونَ ۚ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ
 عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ
 رَّحِيمٌ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

(১২৩) হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (১২৪) আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করলো? অতএব যারা ঈমানদার, এ সূরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়েছে। (১২৫) বস্তুতঃ যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষ বৃদ্ধি করেছে এবং তারা কাফের অবস্থায়ই যত্নবরণ করলো। (১২৬) তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতিবছর তারা দু' একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ, তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না। (১২৭) আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকায় যে, কোন মুসলমান তোমাদের দেখছে কি-না- অতঃপর সরে পড়ে। আল্লাহ ওদের অন্তরকে সত্য বিমুখ করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তারা নির্বোধ সম্প্রদায়। (১২৮) তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়। (১২৯) এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ছিল জেহাদের প্রেরণা। আলোচ্য ১২৩ জা আয়াত থেকে ১২৭ তম আয়াতের প্রথম আয়াতে **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** - এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হচ্ছে যে, কাফেররা দুনিয়ার সর্বত্র রয়েছে। তবে কোন নিয়মে তাদের সাথে জেহাদ করা হবে? এ আয়াত বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, প্রথমে তাদের সাথে জেহাদ করবে। নিকটবর্তী দু'রকমের হতে পারে। (এক) অবস্থানের দিক দিয়ে অর্থাৎ, যারা তোমাদের নিকটে অবস্থানকারী, প্রথমে তাদের সাথে জেহাদ কর। (দুই) গোত্র, আত্মীয়তা ও সম্পর্কের দিক দিয়ে যারা নিকটবর্তী অন্যান্যদের আগে তাদের সাথে জেহাদ চালিয়ে যাও। কার্য ওদের কল্যাণ সাধনই ইসলামী জেহাদের উদ্দেশ্য। আর কল্যাণ সাধনে বেলায় আত্মীয়-স্বজন অগ্রগণ্য। যেমন, কোরআনে রসূলে করীম (সঃ)-কে আদেশ দেয়া হয়েছে - **وَأَيُّدِعْ شِرَكَكَ الْأَقْرَبِينَ** অর্থাৎ, “হে রসূল, নিজের নিকটাত্মীয়গণকে আল্লাহর আযাবের ভয়প্রদর্শন করুন।” তাই তিনি এ আদেশ পালনে সর্বাপেক্ষে স্বগোত্রীয়দের সমবেত করে আল্লাহর বাকী শুনিয়ে দেন। অনুরূপ, তিনি স্থান হিসাবে প্রথমে মদীনার আশ-পাশের কাফের তথা বনু-কোরাইযা, বনু-নযীর ও খায়বরবাসীদের সাথে যোদ্ধা পড়া করেন। তারপর দূরবর্তী লোকদের সাথে জেহাদ করেন এক সবশেষে রোমানদের সাথে জেহাদের আদেশ আসে, যার ফলে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً - অর্থ কঠোরতা, শক্তিমত্তা। বাকের মর্ম হলো, কাফেরদের সাথে এমন ব্যবহার কর, যাতে তোমাদের কোন দুর্বলতা তাদের চোখে ধরা না পড়ে। **قَرَأَتْهُمْ آيَاتًا** বাক্য থেকে বোঝা যায়, কোরআনের আয়াতের তেলাওয়াত, চিন্তা-ভাবনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ফলে ঈমানের উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ, ঈমানের নূর ও আশ্বাদ বৃদ্ধি পায়। ফলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফরমাবারদারী সহজ হর উঠে। এবাদতে স্বাদ পায়, শুন্যহের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা জন্মে ও কটবেশ হয়।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঈমান যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন একটি নূরের শ্বেতবিন্দুর মত দেখায়। অতঃপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, সেই শ্বেতবিন্দু সম্প্রসারিত হয়ে উঠে। এমনকি শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে যায়। তেমনি শুন্যহ ও মুনাফেকীর ফলে প্রথমে অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। অতঃপর পাপাচার ও কুফরীর তীব্রতার সাথে সাথে সে কাল দাগটিও বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর কাল হয়ে যায়। - (মাহহারী) এজন্য সাহাবায়ে কেরাম একে অন্যকে বলতেন: আস, কিছুক্ষণ একত্রে বসি এবং দ্বীন ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করি, যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَمَلٍ مُّكْرًا أَوْ مَرَاتِينَ বাক্যে মুনাফেকদের সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের কপটিতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রভৃতি অপরাধের পরিণতিতে প্রতিবছরই তারা কখনো একবার, কখনো দু'বার নানা ধরনের বিপদে পতিত হয়। যেমন, কখনো তাদের কাফের মিত্ররা পরাজিত হয়, কখনো তাদের গোপন অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে তারা দিবানিশি-মর্মপীড়া ভোগ করে। এখানে এক বা দু'বার বলতে কোন বিশেষ সংখ্যা



সূরা ইউনুস

মক্কা অবতীর্ণ : আয়াত ১০৯

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(১) এগুলো হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত। (২) মানুষের কাছে কি আশ্চর্য লাগছে যে, আমি ওহী পাঠিয়েছি তাদেরই মধ্য থেকে একজনের কাছে যেন তিনি মানুষকে সতর্ক করেন এবং সুসংবাদ শুনিতে দেন ইমানদারগণকে যে, তাঁদের জন্য সত্য মর্যাদা রয়েছে তাঁদের পালনকর্তার কাছে। কাফেররা বলতে লাগল, নিঃসন্দেহে এ লোক প্রকাশ্য যাদুকর। (৩) নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ যিনি তৈরী করেছেন আসমান ও যমীনে ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তিনি কার্য পরিচালনা করেন। কেউ সুপারিশ করতে পারবে না তবে তাঁর অনুমতি ছাড়া ইনিই আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা। অতঃপর, তোমরা তাঁরই এবাদত কর। তোমরা কি কিছুই চিন্তা কর না? (৪) তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্টি করেন প্রথমবার আবার পুনর্বার তৈরী করবেন তাদেরকে বদলা দেয়ার জন্য, যারা ইমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনসাফের সাথে। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রাদায়ক আযাব এ জন্য যে, তারা কুফরী করছিল। (৫) তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জ্বল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মন্বিলসমূহ, যাতে করে তোমরা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টি করেননি, কিন্তু যথার্থতার সাথে। তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে। (৬) নিশ্চয়ই রাত-দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীনে, সবই হল নিদর্শন সেসব লোকের জন্য যারা অজ্ঞ।

উদ্দেশ্য নয়, বরং বলা হচ্ছে যে, তাদেরই এই দুর্ভাগের পালা শেষ হওয়ার নয়। এ সম্বন্ধে কি তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

এ দু'টি আয়াত সূরা তওবার সর্বশেষ আয়াত, তাতে বলা হয়েছে যে, রসুল করীম (সাঃ) সকল সৃষ্টির উপর, বিশেষতঃ মুসলমানদের উপর বড় দয়াবান ও স্নেহশীল। সর্বশেষ আয়াতে তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনার যাবতীয় চেষ্টা-তদবীরের পরও যদি কিছু লোক ইমান গ্রহণে বিরত থাকে, তবে ধৈর্য ধরুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন।

সূরা তওবার শেষে একথা বলার সঙ্গত কারণ হলো এই যে, এর সর্বত্র রয়েছে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও যুদ্ধ-জেহাদের বর্ণনা, যা' আল্লাহর প্রতি আহ্বানের সর্বশেষ পন্থা রূপে বিবেচিত। আর এ পন্থা তখনই অবলম্বন করা হয়, যখন মৌখিক দাওয়াত ও ওয়াজ তবলীগে হেদায়েতের সকল আশা তিরোহিত হয়। তবে নবীগণের সমস্ত কাজ হলো স্নেহ-মমতা ও হামদাদির সাথে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকা, তাদের পক্ষ থেকে অবজ্ঞা ও যাতনার সম্মুখীন হলে, তা আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করা এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখা। এখানে 'আরশে আযীমের অধিপতি' বলার উদ্দেশ্য একথা বোঝানো যে, তাঁর অনন্ত কুদরত সমগ্র জগতের উপর পরিব্যাপ্ত। হযরত উবাই বিন কা'আব (রাঃ)-এর মতে এ দু'টি আয়াত হলো কোরআন মজীদে সর্বশেষ আয়াত। এরপর আর কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এ অবস্থায় নবী করীম (সাঃ)-এর ইশ্তেকাল হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-ও এ মতই পোষণ করেন।—(কুরতুবী)

সূরা তওবা সমাপ্ত

সূরা ইউনুস

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ইউনুস মক্কা অবতীর্ণ কেউ কেউ সূরার মাত্র তিনটি আয়াতকে মদনী বলে উল্লেখ করেছেন, যা মদীনায হিজরত করার পর নাখিল হয়েছে। এই সূরার মধ্যেও কোরআন পাক এবং ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলী-তওহীদ, রেসালত, আখেরাত ইত্যাদি বিষয়ের যথার্থতা বিশুচরার এবং তার মধ্যকার পরিবর্তন-পরিবর্তনশীল ঘটনাবলীর মাধ্যমে প্রমাণ দেখিয়ে ভালো করে বোদগম্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে সাথে কিছু উপদেশমূলক, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং কাহিনীর অবতারণা করে সে সমস্ত লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যারা আল্লাহ তাআলার এ সব প্রকাশ্য নিদর্শনসমূহের উপর একটুও চিন্তা করে না। এতদসঙ্গে অশৌবাদের খণ্ডন এবং তদসম্পর্কিত কিছু সন্দেহেরও উত্তর দেয়া হয়েছে। এ সূরার বিষয়বস্তুর প্রতি নিবিড়ভাবে চিন্তা করলে পূর্ববর্তী সূরা তওবা আর এ সূরার মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে তাও সহজেই বোঝা যায়। সূরা তওবায় এসব উদ্দেশ্যাবলী (তওহীদ, রেসালত, আখেরাত ইত্যাদি) হাসিল করার জন্যই অবিশ্বাসী কাফেরদের সাথে জেহাদ করা এবং কুফর ও শেরকের শক্তিকে সাধারণ উপকরণের মাধ্যমে পরাস্ত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সূরা যেহেতু জেহাদের হুকুম নাখিল হওয়ার পূর্বে মক্কা অবতীর্ণ হয়েছে, তাই উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলীকে মজী মিন্দেলী রীতি অনুযায়ী শুধু দলীল দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে।

الْأُولَئِكَ هُمُ الْمُكَذِّبُونَ ۝ এগুলোকে হরফে 'মোকাতাতআহ' বলা হয়, যা কোরআন মজীদে অনেক সূরার প্রথমে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, عَسَىٰ، قُلُوبُهُمْ، قُلُوبُهُمْ ইত্যাদি। এ সমস্ত শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তফসীরকারকগণ অনেক কিছু লিখেছেন। এ ধরনের সমস্ত হরফে

মোকাততআহ্ সম্পর্কে সাহাবায়ে কোরাম, তাবয়ীন এবং অধিকাংশ বুয়ুর্গানে কোরামের অভিমত হলো এই যে, এগুলো বিশেষ কিছু গুণ্ড কথ্য, যার অর্থ হয়তো বা হুয়ুর (শাঃ)- কে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সাধারণ উশ্মতকে শুধু সে সমস্ত জ্ঞান জ্ঞাতব্য সমূহকেই অবহিত করেছেন, যা তারা বহন করতে পারবে এবং যা না হলে তাদের কাজকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারত। আর হক্কে মোকাততআহ্ গুণ্ড তত্ত্ব এমন কোন জ্ঞাতব্য বিষয় নয় যে, তা না জানলে উশ্মতের ঈমান ও আমলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, কিংবা এমনও নয় যে, এগুলোর তত্ত্বকথা না জানলে উশ্মতের কোন ক্ষতি হতে পারে। এ জন্যই হুয়ুর (শাঃ)ও এগুলোর অর্থ উশ্মতের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে বর্ণনা করেননি। অতএব আমাদের পক্ষেও এগুলোর অর্থ বের করার পেছনে সময় ব্যয় করা উচিত হবে না। কারণ, এটাতো সত্য কথা যে, এসব শব্দের অর্থ জানার মধ্যে যদি আমাদের কোন রকম মঙ্গল নিহিত থাকত, তাহলে রহমতে-আলাম (শাঃ) অন্ততঃ এগুলোর অর্থ বিশ্লেষণে কোন রকম কার্পণ্য করতেন না।

দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে মুশরেকদের একটি সন্দেহ ও প্রশ্নের উত্তর। সন্দেহটি ছিলো এই যে, কাকেররা তাদের মূর্খতার দরুন সাব্যস্ত করে রেখেছিল যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে নবী বা রসুল আসবেন তিনি মানুষ হবেন না বরং তিনি মানুষ না হয়ে ফেরেশতা হওয়াটাই উচিত। কোরআন পাক বিভিন্ন জায়গায় তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার উত্তর বিভিন্ন প্রকারে দিয়েছে। এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে : “যমীনের উপর যদি ফেরেশতারা বাস করতো, তাহলে আমি তাদের জন্য কোন ফেরেশতাকেই রসুল বানিয়ে পাঠাতাম।” যার মূল কথা হলো এই যে, রেসালতের উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রসুল এবং যাদের মধ্যে রসুল পাঠানো হচ্ছে এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। বস্তুতঃ ফেলেশতার সম্পর্ক থাকে ফেরেশতাদের সাথে আর মানুষের সম্পর্ক থাকে মানুষের সাথে। যখন মানুষের জন্য রসুল পাঠানোটা উদ্দেশ্য, তখন কোন মানুষকেই রসুল বানানো উচিত।

এই আয়াতে এ বিষয়টিই অন্যভাবে বলা হয়েছে যে, এ কারণে এসব লোকের বিস্মিত হওয়া যে, মানুষকে কেন রসুল বানানো হলো এবং সে মানুষকেই বা কেন নাফরমান ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্র আযাবের ভীতি প্রদর্শন করার জন্য এবং যারা আল্লাহ্র ফরমাবরদার তাদেরকে সওয়াবের সুসংবাদ শুনিয়ে দেয়ার জন্য দায়িত্ব দেয়া হলো? এই বিস্ময় প্রকাশই একটা বিস্ময়ের বিষয়। কারণ, মানুষের কাছে মানুষকে রসুল করে পাঠানোই তো বুদ্ধিমত্তার কাজ। আশ্চর্য হওয়ার কারণ তখনই হতো যদি মানুষের কাছে মানুষ না পাঠিয়ে ফেরেশতা বা অন্য কাউকে পাঠানো হতো।

أَنَّهُمْ ذَمُّوْهُ وَعَدُّوْهُ كَذِبًا ۝

এখানে ফম অর্থ পা। যেহেতু পা-ই মানুষের চেষ্টা-তদবীর এবং উন্নতির চাবিকাঠি হয়ে থাকে, সেহেতু ভাবার্থ হিসেবে উচ্চমর্যাদাকে আরবীতে ‘কদম’ (পদমর্যাদা) বলে দেয়া হয়। আর ‘সত্যের পা’ বলে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, এই উচ্চমর্যাদা যা তাঁরা পাবে তা সত্য ও সুনিশ্চিত এবং তা চিরকাল থাকার মতো প্রতিষ্ঠিতও বটে। পৃথিবীর পদমর্যাদার মতো নয়। মোটকথা, . শব্দ ব্যবহার করে এ কথাই বোঝানো হয়েছে যে, আবেশারতের পদমর্যাদা যেমন সত্য-সঠিক, তেমনি পরিপূর্ণ এবং চিরস্থায়ীও বটে। অতএব, বাক্যের অর্থ দাঁড়ালো এই যে, ঈমানদারদেরকে

এ সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাঁদের জন্যে তাঁদের পালনকর্তার কাছে অনেক বড় সম্মানিত মর্যাদা রয়েছে যা তাঁরা নিশ্চিতই পাবে এবং পাওয়ার পথ কখনো তা শেষ হয়ে যাবে না। চিরকালই তারা সেই সম্মানিত মর্যাদা অধিষ্ঠিত থাকবে। কোন কোন মুফাসসের বলেছেন, এক্ষেত্রে مَعْلُوْم প্রয়োগের মাঝে এমন ইশারাও করা উদ্দেশ্য যে, বেহেশতের কোন উচ্চমর্যাদা একমাত্র সত্য নিষ্ঠা ও এখলাসের কারণেই পাওয়া যাবে। মুম্বৈকভাবে ঈমানের বাক্য উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মুখ এবং অন্তর উভয়টির মাধ্যমে নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনবে। যা অনিবার্য ফলাফল হলো নেক কাজের উপর পাবন্দী করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা।

তৃতীয় আয়াতে তওহীদকে এমন অনস্বীকার্য বাস্তবতার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করার মধ্যে অতপর সমস্ত কাজ-কর্ম পরিচালনার মধ্যে যখন আল্লাহ তাআলার কোন শরীক-অংশীদার নেই, তখন এবাদত-বন্দেগী এবং হকুম পালনের ক্ষেত্রে অন্য কেউ কি করে শরীক হতে পারে? বরং এতে (এবাদতে) অন্য কাউকে শরীক করা একান্তই অবিচার এবং সীমানাঘ্রনের শামিল। এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, আসমান ও যমীনকে (আল্লাহ পাক) মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আমাদের পরিভাষায় সময়ের সে পরিমাপকেই দিন বলা হয়, যা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সীমিত। আর এটা প্রকাশ্য যে, আসমান-যমীন ও তারকা-নক্ষত্রের সৃষ্টির পূর্বে সূর্যের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তাহলে সূর্য উঠা এবং সূর্য ডুবার হিসাব কি করে হবে? কাজেই (দিন বলতে) এখানে ঐ পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য যা এই পৃথিবীতে সূর্য উঠা এবং ডুবার মাঝখানে হয়ে থাকে।

এই ছয় দিনের সামান্য সময়ে এতো বড় বিশু যা আসমান, যমীন, তারকারাজি এবং এই বিশ্বে যত কিছু আছে সমস্তকে তৈরী করে দেয়া একমাত্র সে পবিত্র ‘যাতে-খোদা-ওয়াদী’র পক্ষেই সম্ভব ছিল যিনি সমস্ত কিছুর উপরে কুদরত রাখেন। তাঁর সৃষ্টিকার্যের জন্য না আগে থেকে কোন উপকরণের প্রয়োজন, না কোন কারিগর বা খাদেমের প্রয়োজন। বরং আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ কুদরতের এমনই শান যে, যখনই তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন কোন বস্তু বা কারো সাহায্য ছাড়াই এক মুহূর্তে তৈরী করে ফেলেন। এই ছয় দিনের অবকাশও হয়ত কোন বিশেষ হেকমত এবং মঙ্গলের জন্যই গ্রহণ করা হয়েছিল। না হয় তিনি এই অসামান, যমীন এবং বিশ্বের সমস্ত কিছু এক মুহূর্তে তৈরী করে দিতে পারতেন। তারপর বলেছেন, ثُمَّ اسْوَوْهُ عَلَى الْغَشِيِّ ۝

অর্থ, আরপের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কোরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ পাকের আরশ এমন এক সৃষ্টি যা সমস্ত আসমান, যমীন এবং সমগ্র বিশ্ব-জাহানকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। গোটা সৃষ্টিজগত তারই বেঠিনীর মধ্যে আবর্তিত।

এ তিনটি আয়াতে সমগ্র সৃষ্টিজগতের বহু নিদর্শন উল্লেখিত হয়েছে, যা আল্লাহ জ্ঞানশাস্ত্রের পূর্ণ কুদরত ও পরিপূর্ণ হেকমতের স্বাক্ষর বহন করে এবং এ দাবীর প্রমাণ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, আল্লাহ পাক বিশুকে ধ্বংস করে শুড়িয়ে দিতে সক্ষম এবং পরে পুনরায় সেই কণাসমূহকে একত্রিত করে একেবারে নতুন অবস্থায় জীবিত করে হিসাব-নিকাশের পর পুনরুদ্ধার কিংবা শাস্তির আইন-জারী করবেন (আর এটাই বিবেক ও জ্ঞানের চাহিদা)।

وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ۝

এখানে سَمْعٌ এবং

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ تَارَوْا ضُرُوبًا مِّنَ النَّارِ
وَأَطَاعُوا أَمْرًا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ النَّارِ غَافِلُونَ ۖ أُولَٰئِكَ
مَأْوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الطَّالِحَاتِ يَهْدِي اللَّهُ رُفْقَهُمْ إِلَىٰ مَأْوَاهُمْ فَخَرَجُوا مِنْ تَحْتِهَا
إِلَىٰ الْأَرْضِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۖ وَدَعَا لَهُمْ فِيهَا رَبُّكَ اللَّهُ ۖ وَ
خَرَجَتْهُمْ فِيهَا سُلَٰمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ۖ وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشُّرَاطِعَ عَاجِلًا وَآخِرًا
لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ فَذَرِ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ تَارَوْا
طُغْيَانَهُمْ يَبْغُمُونَ ۝ وَإِذْ آمَسَ الْإِنسَانُ الضُّرُوعَانَ
لِحَبَّتِهِ أَوْ قَاعًا أَوْ قَافِلًا فَلَمَّا نَسَقْنَاهُ غَنَةً ضُرَّه مَوْ
كَانَ كَأَنَّهُ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضَرْمَتِهِ كَذَلِكَ نُزِّنُ لِلْمُتَّبِعِينَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونِ مِن قَبْلِكَ
لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا
لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ
خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۖ

(৭) অবশ্যই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখেন না এবং পৃথিবী জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নির্দর্শনসমূহ সম্পর্কে বেখবর (৮) এমন লোকদের ঠিকানা হল আশ্রম সেসবের বদলা হিসাবে যা তারা অর্জন করছিল। (৯) অবশ্য যেসব লোক ইমান এনেছে এবং সং কাজ করেছে, তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন তাদের পালনকর্তা, তাদের ইমানের মাধ্যমে। এমন সুসময় কননকুস্তের প্রতি যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রসবসমূহ (১০) সেখানে তাদের প্রার্থনা হল ‘পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ’। আর শুভেচ্ছা হল সলাম আর তাদের প্রার্থনার সমাপ্তি হয়, ‘সমস্ত প্রশংসা বিনুপালক আল্লাহর জন্য’ বলে।

(১১) আর যদি আল্লাহ তাআলা মানুষকে যথাশীল অকল্যাণ পৌছে দেন
হস্তশীল তার কামনা করে, তাহলে তাদের আশাই শেষ করে দিতে হত।
সুতরাং বাদের মনে আমার সাক্ষাতের আশা নেই, আমি তাদেরকে তাদের
দুঃখীতে ব্যতিব্যস্ত ছেড়ে নিয়ে রাখি। (১২) আর যখন মানুষ কষ্টের
সম্মুখীন হয়, শুয়ে বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি
যখন তা থেকে মুক্ত করে দেই, সে কষ্ট যখন চলে যায়, তখন মনে হয়,
কখনো কোন কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনভাবে
দলপুত হয়েছো নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে। (১৩) অবশ্য তোমাদের
পূর্বে বহু দলকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন তারা জ্বলেম হয়ে গেছে। অথচ
রক্ষু তাদের কাছেও এসব বিষয়ের প্রকৃষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু
তাইতেই তারা ঈমান আনল না। এমনভাবে আমি শাস্তি দিয়ে থাকি পাশী
সমুদায়কে। (১৪) অন্তরপর আমি তোমাদেরকে যখনো তাদের পর
প্রতিনিধি বানিয়েছি যাতে দেখতে পারি তোমরা কি কর।

মনোনীশ করেনি। না চিনেছে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা মালিককে, না এ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করেছে যে, আমরা দুনিয়ার সাধারণ জীব-জন্তুর মতই কোন জীব নই, আল্লাহ তাআলা যখন আমাদেরকে পৃথিবীর সমস্ত জীব-জন্তু অপেক্ষা বহুগুণ বেশী চেতনানুভূতি ও জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকে যখন আমাদেরই সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন, তখন হয়তোবা আমাদের প্রতিও কিছু দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে থাকবেন এবং সে সবার জন্য হিসাব-নিকাশ দিতে হবে আর সেজন্য একটা হিসাবের দিন বা প্রতিদান দিবসেরও প্রয়োজন। কোরআনের পরিভাষায় যাকে কেয়ামত ও হাশর-নশর বলে অভিহিত করা হয়েছে। বরং তারা নিজেদের জীবনকে সাধারণ জীব-জানোয়ারের পর্যায়েই রেখে দিয়েছে। প্রথম দুই আয়াতে এ শ্রেণীর লোকদের বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের পরকালীন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে—‘আমার নিকট আসার ব্যাপারে যেসব লোকের মনে কোন ধারণা-কল্পনাও নেই, তাদের অবস্থা হল এই যে, তারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন ও তার অনন্ত অসীম সুখ-দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে।’

দ্বিতীয়তঃ ‘পৃথিবীতে তারা এমন নিশ্চিত হয়ে বসেছে যেন এখান থেকে আর কোথাও যেতেই হবে না; চিরকালই যেন এখানে থাকবে। কখনোও তাদের একথা মনে হয় না যে, এ পৃথিবী থেকে প্রত্যেকটি লোকের বিদায় নেয়া এমন বাস্তব বিষয় যে, এতে কখনো কোন সন্দেহ হতে পারে না। তাছাড়া এখান থেকে নিশ্চিতই যখন যেতে হবে, তখন যেখানে যেতে হবে, সেখানকার জন্যও তো খানিকটা প্রস্তুতি নেয়া কর্তব্য ছিল।’

তৃতীয়তঃ “এসব লোক আমার নিদর্শনাবলী ও আয়াতসমূহের প্রতি ক্রমাগত গাফেলতী করে চলেছে। এরা যদি আসমান-যমীন কিংবা এ দুয়ের মধ্যবর্তী সাধারণ সৃষ্টি অথবা, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটুও চিন্তা-ভাবনা করত, তাহলে বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া কঠিন হত না এবং তাতে করে তারা এহেন মূর্খজনাচিত গাফেলতীর গতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারত।”

এ সমস্ত লোক যাদের এসব লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে আখেরাতে তাদের শাস্তি হল এই যে, এদের ঠিকানা হবে জাহান্নামের আগুন। আর এ শাস্তি স্বয়ং তাদের কৃতকর্মেরই পরিণতি।

পরবর্তী আয়াতে সে সমস্ত ভাগ্যবান লোকদেরও আলোচনা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার কদরত তথা মহাশক্তির নির্দেশাবলী সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং সেগুলোকে চিনেছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ঈমানের চাহিদা মোতাবেক সংকর্ম সম্পাদনে নিয়ত নিয়োজিত রয়েছে,

কোরআন করীম সেসব মহান ব্যক্তিদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যে কল্যাণকর প্রতিদান নির্ধারণ করেছে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছে **اولئك**

الذين آمنوا অর্থাৎ, তাঁদের পরওয়ারদেগার তাঁদেরকে তাঁদের ঈমানের কারণে মনযিলে-মকসুদ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য জ্ঞানাতের পথ দেখিয়েছেন যেখানে সুখ ও শাস্তিময় কাননকূঞ্জে প্রবণসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে।

এতে ‘হেদায়েত’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত অর্থ হল পথপ্রদর্শন এবং রাস্তা দেখানো। আবার কখনো উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য। আর

মনযিলে-মকসুদ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বলতে জ্ঞানাতকে বোঝানো হয়েছে যার বিশ্লেষণ করা হয়েছে পরবর্তী শব্দে। প্রথম শ্রেণীর লোকদের শাস্তি বেন তাদের কৃতকর্মের জন্য ছিল, তেমনিভাবে দ্বিতীয় এই মুমিন প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই উত্তম প্রতিদান তাঁরা তাঁদের ঈমানের জন্য পাবেন। আর যেহেতু ঈমানের সাথে সাথে সংকর্মের কথাও আলোচিত হয়েছে কাজেই এখানে ঈমান বলতে সে ঈমানকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার সাথে সংকর্মও বিদ্যমান থাকবে। ঈমান ও সংকর্মের প্রতিদানই ছিল সুখ-শান্তির আলায় জ্ঞানাত।

دَعَوُهُمْ رَبُّكَ اَلَيْسَ لَكَ اَلدُّعٰى এখানে **دَعَوٰى** শব্দটি তার নির্ধারিত দাবী

অর্থে ব্যবহৃত হয়নি যা কোন বাদী তার প্রতি পক্ষের বিরুদ্ধে করে থাকে, বরং এখানে **دَعَوٰى** অর্থ হল দোয়া। সুতরাং এর মর্মার্থ হল এই যে, জ্ঞানাতে পৌঁছার পর জ্ঞানাতবাসীদের দোয়া বা প্রার্থনা হবে এই যে, তারা ‘সুবহানাকাল্লাহুমা’ অর্থাৎ, তাঁরা আল্লাহ জ্ঞানাতানুহর পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকবেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সাধারণ পরিভাষায় তো ‘দোয়া’ বলা হয় কোন বিষয়ের আবেদন এবং কোন উদ্দেশ্য যাত্রা করাকে, কিন্তু **سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ** সুবহানাকাল্লাহুমা-তে কোন আবেদন কিংবা কোন কিছুর প্রার্থনা, নেই একে দোয়া বলা যায় কেনম করে?

এর উত্তর এই যে, এ বাক্যের দ্বারা এ কথাই বোঝানো উদ্দেশ্য যে, জ্ঞানাতবাসীরা জ্ঞানাতে যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও যাবতীয় চাহিদা সন্তুষ্কৃতভাবে পেতে থাকবেন; কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করতে কিংবা চাইতে হবে না। কাজেই বাসনা-প্রার্থনা ও প্রচলিত দোয়ার অনুরূপ বাক্য তাদের মুখে আবৃত হতে থাকবে। অবশ্য তাও পার্থিব জীবনের মত অবশ্যকরণীয় কোন এবাদত হিসাবে নয়, বরং তারা এ বাক্যের জপ করে স্বাদানুভব করবেন এবং সানন্দ চিত্তে সুবহানাকাল্লাহুমা বলতে থাকবেন। এছাড়া এক হাদীসে কুদ্দসীতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যে বান্দা আমার প্রশংসাকীর্তনে সত্যত নিয়োজিত থাকে একে এমনকি নিজের প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করার সময় পর্যন্ত তার থাকে না, আমি তাকে সমস্ত প্রার্থনাকারী অপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করব, বিনা প্রার্থনায় তার যাবতীয় কাজ পূর্ণ করে দেব।’ এ হিসাবেও সুবহানাকাল্লাহুমা বাক্যটিকে দোয়া বলা যেতে পারে।

এ অর্থেই বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রসুল করীম (সাঃ)—এর সামনে যখনই কোন কষ্ট কিংবা পেরেশানী উপস্থিত হত, তখন তিনি এ দোয়া পড়তেন।

لا اله الا الله العظيم الحليم - لا اله الا الله رب السموات والارض ورب العرش الكريم

আর ইমাম তারাবী বলেছেন যে, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ একে ‘দোয়ায়ে কারব’ তথা বিপদের দোয়া বলে অভিহিত করতেন এবং যে কোন বিপদাপদ ও মানসিক পেরেশানীর সময় এ বাক্যগুলো পাড়ে দোয়া-প্রার্থনা করতেন।—(তফসীরে কুতুবী)

ইমাম ইবনে জরীর ও ইবনে মানযার প্রমুখ এমন এক রেওয়াজেও উদ্ধৃত করেছেন যে, জ্ঞানাতবাসীদের যখন কোন জিনিসের প্রয়োজন কিংবা বাসনা হবে, তখন তারা ‘সুবহানাকাল্লাহুমা’ বলবেন এবং এ

শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাগণ তাদের আরাধ্য বস্তু এনে উপস্থিত করেন। ‘বস্তৃতঃ সুবহানাকাল্লাহুমা বাক্যটি যেন জন্মাতবাসীদের পরিভাষা হবে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের বাসনা প্রকাশ করে যেন আর ফেরেশতাগণ প্রতিবারই তা পূরণ করে দেবেন — (রুহুল মনী, কুরত্বী) সুতরাং এ হিসাবেও ‘সুবহানাকাল্লাহুমা’ বাক্যটিকে বলা যেতে পারে।

জন্মাতবাসীদের দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে وَنَسْتَعِيزُكَ بِكَ প্রচলিত অর্থে ‘তাহা’ বলা হয় এমন শব্দ বা বাক্যকে যার নামে কোন আগন্তুক কিংবা অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। যেমন, সালাম স্বাগতম, খোশ আমদেদ, কিংবা আহলান ওয়া সলমান প্রভৃতি। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ জালা অথবা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে জন্মাতবাসীদেরকে سلام —এর নামে অভ্যর্থনা জানানো হবে। অর্থাৎ, এ সুসংবাদ দেয়া হবে যে, আমরা যে কোন রকম কষ্ট ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে হেফাজতে রাখবে। এ সালাম স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকেও হতে পারে।

সূরা ইয়াসীনে রয়েছে— سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ আবার ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন, অন্যত্র এরশাদ হয়েছে

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ প্রতিটি দরজা দিয়ে ‘সালামুন আলাইকুম’ বলতে বলতে জন্মাতবাসীদের কাছে আসতে থাকবেন। আর এ দু’টি বিষয়ে ব্রিগাম-বৈপরিভ নেই যে, কখনো সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এবং কখনো ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাম আসবে। সালাম দুটি যদিও পৃথিবীতে দোয়া হিসাবেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু জন্মাতে পৌছে পক্ষ যাবতীয় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাবে, তখন এ বাক্যটি দোয়ার পরিবর্তে সুসংবাদের বাক্য হিসেবে ব্যবহার হবে। — (রুহুল মা’আনী)

জন্মাতবাসীদের তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে وَإِذْ دَعَوْهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ, জন্মাতবাসীদের সর্বশেষ দোয়া হবে الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ, জন্মাতবাসীরা জন্মাতে পৌঁছার পর আল্লাহ্ তাআলার শ্রদ্ধা বা পরিচয়ের ক্ষেত্রে (বিপুল) উন্নতি লাভ করবে। যেমন, মরত শিহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) তাঁর এক পুস্তিকায় বলেছেন যে, জন্মাতে পৌঁছে সাধারণ জন্মাতবাসীদের জ্ঞান ও মা’রেফাতের এমন স্তর লাভ হবে, যেমন পার্থিব জীবনে ওলামাদের হয়ে থাকে। আর জ্ঞানাগণ সে স্তরে উন্নীত হবেন, যা এখানে নবী রসূলগণের হত। আর নবী-রসূলগণ সে স্তর প্রাপ্ত হবেন, যা পৃথিবীতে সাইয়েদুল আশ্বিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) পেয়েছিলেন। হয়তো বা এই স্তরের নামই হবে ‘মাকামে মাহমুদ’ যার জন্য আযানের পর তিনি দোয়া করতে বলেছেন।

সারকথা হল এই যে, জন্মাতবাসীদের প্রাথমিক দোয়া হবে سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ আর সর্বশেষ দোয়া হবে الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ এতে আল্লাহ্ রসূল আলামীর গুণ-বৈশিষ্ট্যের দু’টি প্রকারভেদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটি ‘সিফাতে জালালী’ তথা পরাক্রম ও মহত্ত্ব গুণ যাতে দ্বিতীয় দোষত্রুটি হতে আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

এবং দ্বিতীয়টি হল ‘সিফাতে করম’ যাতে তাঁর মহানুভবতা, পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। কোরআন করীমের تَبَارَكَ اسْمُكَ رَبِّكَ الْأَعْلَى আল্লাহ্ তাআলার আয়াতে এতদুভয় প্রকার বৈশিষ্ট্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, সুবহানহু’ আল্লাহ্ তাআলার জালালী গুণের অন্তর্ভুক্ত। আর তা’রীফ প্রশংসার অধিকারী হওয়া মহানুভবতা সক্রোস্ত গুণের অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিক বিন্যাস অনুযায়ী জালালী বৈশিষ্ট্য করুণা ও মহানুভবতা গুণের অগ্রবর্তী। সে কারণেই জন্মাতবাসীরা প্রথমে তাঁর জালালী গুণ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ বাক্যে বর্ণনা করবেন এবং সর্বশেষে মহানুভবতা গুণ প্রকাশ করবেন الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলে। আর এই হবে তাঁদের রাত-দিনের কর্ম।

এ তিনটি আয়াতের স্বাভাবিক ক্রমবিন্যাস হচ্ছে এই যে, জন্মাতবাসীরা যখন سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ বলবেন, তখন এর উত্তরে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম দেয়া হবে এবং এর ফলে তারা الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলবেন। — (রুহুল-মা’আনী)

দোয়া প্রার্থনাকারীর পক্ষে দোয়া শেষে وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ বলা মুস্তাহব। এতদসঙ্গে সূরা সাফাতের শেষ আয়াতগুলোে سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ - وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পাড়ে নেয়া অধিকতর উত্তম।

উল্লেখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথমটির সমৃদ্ধ সেসব লোকের সাথে যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী। সে জন্যই যখন তাদেরকে আখেরাতের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়, তখন বিদ্রোহিত বলতে থাকে যে, যদি তুমি সত্যবাদীই হয়ে থাক, তবে এখনই এ আযাব ডেকে আন। অথবা বলে, যদি তুমি সত্যবাদীই হয়ে থাক, অথবা বলে, এ আযাব শীঘ্র কেন আসে না? যেমন, নযর ইবনে হারেস বলেছিলঃ ‘আয় আল্লাহ্, একথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন কিংবা এর চেয়েও কোন কঠিন আযাব পাঠিয়ে দিন।’

১১ নং আয়াতে এরই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তো সববিষয়েই ক্ষমতাশীল, প্রতিশ্রুত সে আযাব এক্ষণেই নাযিল করতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর মহান হেকমত ও দয়া-করুণার দরুন এ মুর্খরা নিজের জন্য যে বদদোয়া করে এবং বিপদ ও অকল্যাণ কামনা করে তা নাযিল করেন না। যদি আল্লাহ্ তাআলা তাদের বদদোয়াগুলোও তেমনিভাবে যথাশীঘ্র কবুল করে নিতেন, যেভাবে তাদের ভাল দোয়াগুলো কবুল করেন, তাহলে এরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভ দোয়া-প্রার্থনার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা’আলার রীতি হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় তিনি সেগুলো শীঘ্র কবুল করে নেন। অবশ্য কখনো কোন হেকমত ও কল্যাণের কারণে কবুল না হওয়া এর পরিপন্থী নয়। কিন্তু মানুষ যে কখনো নিজেদের অজ্ঞান এবং কখনো দুঃখ-কষ্ট ও রাগের বশে নিজের কিংবা নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য বদদোয়া করে বসে, অথবা আখেরাতের প্রতি অস্বীকৃতির দরুন আযাবকে গ্রহণ মনে করে নিজের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে সেগুলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন না; বরং অবকাশ দেন, যাতে অস্বীকারকারীরা বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদের অস্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার সুযোগ পায় এবং কোন সাময়িক দুঃখ-কষ্ট, রাগ-রোষ কিংবা যদি মনোবেদনার কারণে বদদোয়া করে বসে, তাহলে সে

যেন নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ লক্ষ্য করে, তার পরিণতি বিবেচনা করে তা থেকে বিরত হবার অবকাশ পেতে পারে।

ইমাম জরীর তাবারী (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ)-এর রেওয়াতেক্রমে এবং বোখারী ও মুসলিম মুজাহিদ (রহঃ)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করছেন যে, এক্ষেত্রে বদদোয়ার মর্ম এই যে, কোন কোন সময় কেউ কেউ রাগতঃ নিজের সম্মান-সম্মতি কিংবা অর্থ-সম্পদ ধ্বংসের বদদোয়া করে বসে কিংবা বস্ত্র-সামগ্রীর প্রতি অভিসম্পাত করতে আরম্ভ করে-আল্লাহ তাআলা স্বীয় করুণা ও মহানুভবতাবশতঃ সহসাই এসব দোয়া কবুল করেন না। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী একটি রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন : 'আমি আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা জানিয়েছি, যেন তিনি কোন বন্ধু-স্বজনের বদদোয়া তার বন্ধু-স্বজনের ব্যাপারে কবুল না করেন।' আর শাহুর ইবনে হাওয়াব (রহঃ) বলেছেন, আমি কোন কোন কিতাবে পড়েছি, যেসব ফেরেশতা মানুষের প্রয়োজন সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণায় তাদেরকে এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে, আমার বন্দা দূষ-কষ্টের দরুন কিংবা রাগবশতঃ কোন কথা বলে ফেললে তা লিখবে না।—(কুরতুবী)

তারপরেও কোন কোন সময় এমন কবুলিয়ত বা মঞ্জুরীর সময় আসে, যখন মানুষের মুখ থেকে যে কোন কথা বের হয়, তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে যায়। সেইজন্য রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন, নিজের সম্মান-সম্মতি ও অর্থ-সম্পদের জন্য কখনো বদদোয়া করো না। এমন যেন না হয় যে, সে সময়টি হয় মঞ্জুরীর সময় এবং দোয়া সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়। আর পরে তোমাদেরকে অনুতাপ করতে হয়। সইহ মুসলিমে এ হাদীসটি হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়াতেক্রমে গণ্যওয়ায়ে 'বাওয়াত'-এর ঘটনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে একত্ববাদ ও আবেরাত অস্বীকারকারী লোকদেরকে আরেক অপরাধ সালঙ্কার ভঙ্গিতে স্বীকার করানো হয়েছে। তাহল এই যে, সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় এরা আল্লাহ ও আবেরাতের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়, অন্যান্যদেরকে আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করে এবং তাদেরই কাছে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা করে, কিন্তু যখন কোন বিপদে পড়ে তখন এরা নিজেরাও আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত লক্ষ্যস্থলের প্রতি নিরাশ হয়ে গিয়ে শুধু আল্লাহকেই ডাকতে আরম্ভ করে। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় একমাত্র তাঁকেই ডাকতে বাধ্য হয়। অথচ তাঁরই সাথে তাদের অনুগ্রহ বিমুখতার অবস্থা হল এই যে, যখনই আল্লাহ তাআলা

তাদের বিপদাপদ দূর করে দেন, তখনই আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে এমন মুক্ত-নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, যেন কখনো তাঁকে ডাকেইনি, তার কাছে নে কোন বাসনাই প্রার্থনা করেনি। এতে বোঝা যাচ্ছে, মানুষের বাসনা পূরণ আল্লাহ তাআলার সাথে যারা অপর কাউকে শরীক করে তারা নিজেরা তাদের সে বিশ্রাসের অসারতা, উপলব্ধি করে কিন্তু একান্ত বিবেক ও জেদের বশেই সে বাতিল বিশ্রাসে অটল থাকে।

তৃতীয় আয়াতে ও দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুরই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কেউ যেন আল্লাহ তাআলার অবকাশ দানের কারণে এমন ধারণা করে না বসে যে, পৃথিবীতে আযাব আসতেই পারে না। বিস্তৃত জাতি-সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং তাদের উদ্ধৃত ও কৃত্তবৃত্তার সাক্ষিবাক্স বিভিন্ন রকম আযাব ও পৃথিবীতেই এসে গেছে। আল্লাহ তাআলা নবীকুল শিরমণি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দৌলতে এ ওয়াদা করে নিয়েছেন যে, কোন সাধারণ ব্যাপক আযাব এ উম্মতের উপর আসবে না। ফলে আল্লাহ তাআলার এহেন করুণা, অনুগ্রহ এসব লোককে এমন নির্ভর করে নিয়েছে যে, তারা একান্ত দুঃসাহসের সাথে আল্লাহর আযাবকে আমন্ত্রণ জানাতে এবং তার দাবী করতে তৈরী হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ তাআলার আযাব সম্পর্কে এ নিশ্চিন্ততা কোন অবস্থাতেই তাদের জন্য সমীচীন ও কল্যাণকর নয়। কারণ, গোটা উম্মত এবং সমগ্র বিশ্বের উপর ব্যাপক আযাব না পাঠাবার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর আযাব নেমে আসা অসম্ভব নয়।

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

অর্থাৎ, অতঃপর পূর্ববর্তী জাতি-সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছি এবং পৃথিবীর খেলাফত তথা প্রতিনিষিদ্ধ তোমাদের হাতে অর্পণ করে দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করো না যে, পৃথিবীর খেলাফত (শুধু) তোমাদের ভোগ-বিলাসের জন্যই তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। বরং এই মর্যাদা ও সম্মান দানের পেছনে আসল উদ্দেশ্য হল তোমাদের পরীক্ষা নেয়া যে, তোমরা কেমন কার্যকলাপ অবলম্বন কর-বিগত উম্মতদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজদের অবস্থার সংশোধন কর, নাকি রাষ্ট্র ও ধন-দৌলতের নেশায় উন্মত্ত হয়ে পড়।

এতে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, পৃথিবীর সাম্রাজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন গর্ব-অহংকারের বিষয় নয়; বরং একটি ভারী বোঝা, যাতে রয়েছে বহু দায়-দায়িত্ব।

وَاذْكُرْ عَلَيْهِمْ اِيَّاكُنَّا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَمْ يَرْجُوْا
 لِقَاءَنَا اَنْ يَّعْرِضَ اَنْ يَّعْرِضَ هٰذَا اَوْ يَّعْرِضَ لَهٗ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْ
 اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تَلْفَافٍ اَوْ يَّعْرِضَ اَنْ اَكْبِرَ اَمَّا يَوْمُ يَخْرُجُ اِلَيْنَا
 اِلَى الْاَخْفَانِ اِنْ عَصَيْتَ رِيقَ عَذَابٍ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۝ قُلْ
 لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَكُوْنُ عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرِكُكُمْ بِهِ ۚ فَقَدْ لَبِثْتُ
 فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ۚ اَفَلَا تَتَعْلَمُوْنَ ۝ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ
 اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهٖ اِنَّهٗ لَكٰفِرٌ مُّبِينٌ
 الْمَجْرُمُوْنَ ۝ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ
 وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ
 اَسْتَشِيْتُ اللّٰهَ بِمَا لَا يَكُوْنُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ
 سُبْحٰنَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ
 اِلَّا اَمَةٌ وَّاحِدَةٌ ۚ فَاْتَاكَمُ الْوَلُوْا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ
 رَبِّكَ لَقَضٰى بَيْنَهُمْ فِىْ مَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ
 لَوْ لَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا اٰيَةً مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا
 الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِلٰى يَوْمِ الْمُنْتَظَرِ ۚ

(১৫) আর যখন তাদের কাছে আমার প্রকট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে সমস্ত লোক বলে, যাদের আশা নেই আমার সাক্ষাতের, নিয়ে এসো কোন কোরআন এটি ছাড়া, অথবা একে পরিবর্তিত করে দাও। জহাল বলে দাও, একে নিজের পক্ষ থেকে পরিবর্তিত করা আমার কাজ নয়। আমি সে নির্দেশেরই অনুগত করি, যা আমার কাছে আসে। আমি যদি ধীর পরওয়ারদেগারের নাক্ষরমানী করি, তবে কঠিন দিবসের আশাবের জয় করি। (১৬) বলে দাও, যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমি এটি তোমাদের সামনে পড়তাম না, আর নাইবা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করতেন এ সম্পর্কে। কারণ, আমি তোমাদের মাঝে ইতিপূর্বেও একটা বয়স অভিযাহিত করেছি। তারপরেও কি তোমরা চিন্তা করবে না? (১৭) জন্মের তার চেয়ে বড় জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছে? কসিনকালেও পানীদের কোন কল্যাণ হয় না। (১৮) আর উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপ্রিয়কারী। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ে অবহিত কচ্ছ, যে সম্পর্কে তিনি অবহিত নন আসমান ও যমীনের মাঝে? তিনি গুপ্ত-পরিচর ও মহান সে সমস্ত, থেকে যাকে তোমরা শরীক করছ। (১৯) আর সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল, পরে পৃথক হয়ে গেছে। আর একটি কথা যদি তোমার পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত না হয় বেত; তবে তারা যে বিষয়ে বিরোধ করছে তার মীমাংসা হয়ে বেত। (২০) বস্ত্তঃ তারা বলে, তাঁর কাছে তাঁর পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ এল না কেন? বলে দাও, গায়বের কথা আল্লাহই জানেন। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা রইলাম।

১৫ থেকে ১৮ এ চার আয়াতে আখেরাতের প্রতি অস্বীকারকারীদের একটি ব্রাস্ত ধারণা এবং অন্যান্য আবদারের খন্ডন করা হয়েছে। এসব লোক না জানত আল্লাহ তাআলার মা'রেকাত, না গুহী ও রেসালত সম্পর্কিত কোন পরিচয়। নবী-রসূলগণকেও সাধারণ মানুষের মত মনে করত। যে কোরআন করীম রসূল (সাঃ)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে পৌছেছে তার সম্পর্কে এদের ধারণা ছিল এই যে, এটি স্বয়ং তাঁরই কলাম, তাঁরই রচনা। এ ধারণার প্রেক্ষিতেই তারা মহানবী (সাঃ)-এর কাছে দাবী জানায় যে, কোরআন এটি তো আমাদের বিশ্বাস ও মতবাদের বিরোধী; যে মূর্তি-বিগ্রহকে আমাদের পিতা-পিতামহ সততঃ স্মরণ করে এসেছে এবং এগুলোকে সিদ্ধিদাতা হিসাবে মান্য করে এসেছে, কোরআন সে সমুদয়কে বাতিল ও পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করে। তদুপরি কোরআন আমাদের বলে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে এবং সেখানে হিসাব-নিকাশ হবে। এসব বিষয় আমাদের বুঝে আসে না। আমরা এসব মানতে রাযী নই। সুতরাং হয় আপনি এ কোরআনের পরিবর্তে অন্য কোরআন তৈরী করে দিন যাতে এসব বিষয় থাকবে না, আর না হয় অন্ততঃ এতেই সংশোধন করে সে বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দিন।

কোরআন করীম প্রথমে তাদের ব্রাস্ত বিশ্বাস দূর করার লক্ষ্যে মহানবী (সাঃ)-কে হেদায়েত দান করেছে যে, আপনি তাদের বলে দিন : এটি আমার কলামও নয় এবং নিজের ইচ্ছামত আমি এতে কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধনও করতে পারি না। আমি তো শুধুমাত্র খোদায়ী গুহীর তাবেদার। আমি আমার ইচ্ছামত এতে যদি সামান্যতম পরিবর্তনও করি, তাহলে অতি কঠিন গোনাহগার হয়ে পড়ব এবং নাক্ষরমানদের জন্যে যে আযাব নির্ধারিত রয়েছে, আমি তার ভয় করি। কাজেই আমার পক্ষে এমনটি অসম্ভব।

কাকের ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি-দেশভিত্তিক জাতীয়তা অর্থহীন : وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ اِلَّا اَمَةٌ وَّاحِدَةٌ অর্থাৎ, সমস্ত আদম সন্তান প্রথমে একত্ববাদে বিশৃঙ্খল একই উম্মত ও একই জাতি ছিল। শিরক ও কুফরের নামও ছিল না। পরে একত্ববাদে মতবিরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়।

একই উম্মত এবং সবার মুসলমান থাকার সময়কাল কত দিন এবং কবে ছিল? হাদীস ও সীরাতে বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগ পর্যন্ত এমনি অবস্থা ছিল। নূহ (আঃ)-এর যুগে এসেই কুফর ও শিরক আরম্ভ হয়, যার ফলে হযরত নূহ (আঃ)-কে এর মোকাবেলা করতে হয়।—(তফসীরে মাযহারী)

একথাও সুবিদিত যে, হযরত আদম থেকে হযরত নূহ (আঃ)-এর যুগ পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ সময়ে পৃথিবীতে মানব বংশ ও জনপদ যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ সমুদয় মানুষের মাঝে বর্ণ ও আকার-অবয়ব এবং জীবন ধারণ পদ্ধতিতে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়ার পর রাষ্ট্রগত পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও নিশ্চিত। আর হয়তো কথাবার্তা ভাষাগতও কিছু পার্থক্য হয়ে

وَلَا أَذُنًا لِّلنَّاسِ رَحِمَةً مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ إِنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَكُونُوا
فِي آيَاتِنَا لَقَالُوا أَسْمِعْ أَصْرَارَكُم ۖ إِنَّا لَنَسْمَعُ أَكْثَرُ مِنكُمْ ۖ فَامْكُثُوا ۚ
مَوَالِدِي بِمِثْرِ لَّهِ فِي الْغَيْبِ وَخُفِّي الْأَبْصَارَ ۚ إِنَّكُم مِّنَ الْمَلَكِ وَ
جَرِيئِينَ بِهِمْ بِرِجْ طَبْعَةٍ ۚ وَفَرَّقُوا بَيْنَ أَهْلَيْهَا ثُمَّ أَهْلَحُوا عَالَمَهُ
وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ۚ وَكَانُوا أَهْلُ الْخِطَابِ ۖ ثُمَّ دَعَا
اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الدِّينِ ۚ فَلَمَّا أَتَيْنَهُمْ فِي هَٰذِهِ لَنُكُونَنَّ
مِنَ الشَّاكِرِينَ ۖ فَلَمَّا أَتَاهُمْ ذَٰلِكُمْ أَهْلُ يَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ يَأْكُلُوا النَّاسَ إِنَّمَا بَعَثَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ثُمَّ الْيَتَامَىٰ مِنْهُمْ فَبِأَنفُسِهِمْ يَهْتُمُونَ ۖ إِنَّمَا مَثَلُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ
الْأَرْضِ وَمِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ
زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَنهَآ
أَمْرًا نَّيْلًا وَنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حُيُوتًا ۖ كَانَ لَمَنْ تَعَنَّى
بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۖ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۖ

(২১) আর যখন আমি আবাদন করাই স্বীয় রহমত সে কষ্টের পর, যা তাদের ভোগ করতে হয়েছিল, তখনই তারা আমার শক্তিমত্তার মাঝে নানা রকম ছলনা তৈরী করতে আরম্ভ করবে। আপনি বলে দিন, আল্লাহ সবচেয়ে দ্রুত কলা-কৌশল তৈরী করতে পারেন। নিশ্চয়ই আমাদের ফেরেশতারা লিখে রাখে তোমাদের ছল-চাতুরী। (২২) তিনিই তোমাদের ভ্রমণ করার স্থলে ও সাগরে। এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ করলে আর তা লোকজনকে অনুকূল হওগায় বয়ে নিয়ে চলল এবং তাতে তারা আনন্দিত হল, নৌকাগুলোর উপর এল তীব্র বাতাস, আর সর্বাঙ্গ থেকে সেগুলোর উপর ডেউ আসতে লাগল এবং তারা জানতে পারল যে, তারা অপরাক্ষ হয়ে পড়েছে, তখন ডাকতে লাগল আল্লাহকে তাঁর এবাদতে নিঃস্বার্থ হয়ে 'যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তাদের, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। (২৩) তারপর যখন তাদেরকে আল্লাহ বাচিয়ে দিলেন, তখনই তারা পৃথিবীতে অনাচার করতে লাগল অন্যায়ভাবে। হে মানুষ শোন, তোমাদের অনাচার তোমাদেরই উপর পড়বে। পার্থিব জীবনের সুফল ভোগ করে নাও—অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি বাতলে দেব, যা কিছু তোমরা করত। (২৪) পার্থিব জীবনের উদাহরণ তেমনি, যেমন আমি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করলাম, পরে তা মিলিত-সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে যমীনের শ্যামল উদ্ভিদ বেরিয়ে এল যা যমূল ও জীব-জন্তুরা খেয়ে থাকে। এমনকি যমীন যখন সৌন্দর্য-সুসমায় ভরে উঠল আর যমীনের অধিকাংশ ভাগতে লাগল, এগুলো আমাদের হাতে আসবে, ইঠাৎ করে তার উপর আমার নির্দেশ এল রাতে কিংবা দিনে, তখন সেগুলোকে কেটে ভুগ্ণাকার করে দিল যেন কালও এখানে কোন আবাদ ছিল না। এমনভাবে আমি খেলাখুলি কর্না করে থাকি নিদর্শনসমূহ সে সমস্ত লোকদের জন্য যারা লক্ষ্য করে। (২৫) আর আল্লাহ শান্তি-নিরাপত্তার অলয়ের প্রতি আহ্বান জানান এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথ প্রদর্শন করেন।

গিয়েছিল। কিন্তু কোরআন করীম এই বংশগত, অফলগত, বর্ণগত ও রাষ্ট্রগত পার্থক্যকে যা একান্তই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক—উষ্মতের প্রকোষ অন্তরায় বলে সাব্যস্ত করেনি এবং এই পার্থক্যের কারণে আদম সম্ভারক বিভিন্ন জাতি কিংবা বিভিন্ন উষ্মতও বলেনি, বরং ‘উষ্মতে ওয়াহিদা’ ভাষ্য একই জাতি বলে অভিহিত করেছে।

অবশ্য যখন ইমানের বিরুদ্ধে কুফরী ও শেরেকী বিস্তার লাভ করে, তখন কাদের ও মুশরিককে পৃথক জাতি, পৃথক সম্প্রদায় সাব্যস্ত করে বলেছে **فَاَحْزَنُوا** কোরআন করীমের **فَيُنَادِ الْمُؤْمِنُونَ هُمْ** আয়াত এ বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ তআলার সৃষ্ট আদম সন্তানদিককে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করার বিষয় শুধু ইমান ও ইনলায় বিমুখতা। বংশগত ও রাস্তায় বন্ধনের দ্বারা জাতিসমূহ পৃথক হয় না। ভাষা, দেশ কিংবা গোত্র-বর্ণের ভিত্তিতে মানুষকে বিভিন্ন সম্প্রদায় সাব্যস্ত করা মুর্থতার একটা নয়া দৃষ্টান্ত বা আধুনিক প্রগতির সৃষ্টি। আজকের বহু লেখা-পড়া জানা লোক এই ন্যাশনালিজম তথা জাতীয়তাবাদের পেছনে লেগে আছে। অথচ এরা হাজার রকমের দাঙ্গা বিশৃংখলায় জড়িয়ে রয়েছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

﴿قُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا﴾ আরবী অভিধান অনুসারে **رُزِقَ** বলা হয় গোশন
 পরিকল্পনাকে, যা ভালও হতে পারে এবং মন্দও হতে পারে। উর্দু (কিছা
 বাংলা) পরিভাষার দরুন থোকা খাওয়া উচিত নয় যে, উর্দু (কিছা
 বাংলায়) **رُزِقَ** বলা হয় থোকা, প্রভারণা, ফেরেববাছী প্রভৃতি অর্থে, যা
 থেকে আলাহ তাআলা পবিত্র।

- অর্থাৎ, তোমাদের অন্যায়-অনাচারের
 বিপদ তোমাদেরই উপর পড়ছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, জুলুমের কারণে বিপদ
 অবশ্যস্বাবী এবং দুনিয়াতেও তা ভোগ করতে হয়।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রসুলে করীম (সাঃ) বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা আত্মীয়-বাংসলা ও অনুগ্রহের বদলাও শীঘ্রই দান করেন। (আখেরাতের পূর্বে পৃথিবীতেই এর বরকত পরিলক্ষিত হতে আরম্ভ করে। তেমনিভাবে) অন্যায় অত্যাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বদলাও শীঘ্রই দান করেন। (দুনিয়াতেই তা ভোগ করতে হয়। এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজা নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।) অন্য এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তিন প্রকার পাপ এমন রয়েছে, যার অশুভ পরিণতি তার কাজের উপরই পতিত হয়। তা হল জুলুম, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও ধোকা-প্রতারণা।—(আবুশামায়া ইবনে মারদুযিয়াহ কর্তৃক তাঁর তফসীরে বর্ণিত ও মাযহরী থেকে উদ্ধৃত।)

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى دَارِ السَّلَامِ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে শান্তির আলয়ের দিকে আহ্বান করেন। অর্থাৎ, এমন গৃহের প্রতি আমন্ত্রণ জানান যাতে রয়েছে সর্ববিধ নিরাপত্তা ও শান্তি। না আছে তাতে কোন রকম দূষণ-কষ্ট, না আছে ব্যথা-বেদনা, না আছে রোগ-তাপের ভয় আর নাইবা আছে ধ্বংস।

‘দারুসসালাম’-এর মর্মার্থ হল জ্ঞানাত। একে ‘দারুসসালাম’ বলার এক কারণ হল এই যে, প্রত্যেকেই এখানে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও প্রশান্তি

لِّدِينٍ أَحْسَنُ لِّلْحَيٰتِ وَزِيَادَةً ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ ۚ وَكَانَ
 ذٰلِكَ اَوَّلَ لَيْلٍ اَضْحَبَ الْجُنُودَ فَمِمْهَا غَلِيظُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا
 السَّيِّئَاتِ جَزَاً اَسَدِيْدًا يَّبْدُلُهَا ۚ وَتَرَاهُمْ ذٰلِكَ مَا كَانُوْا مِنْ اَلٰهِ
 مِنْ عٰصِمٍ ۚ كَاكِبًا اَغْشَيْتُ وَجُوْهُهُمْ وَطَعَامٍ اَيْلٍ مُّظِلٍّ
 اَوَّلَ لَيْلٍ اَضْحَبَ النَّارَ فَمِمْهَا غَلِيظُوْنَ ۚ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ
 جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَمَّا اَنْتُمْ وَشُرَكَآءُكُمْ
 فَمَنْ اَنْتُمْ اَبْدِيْهُمْ وَقَالَ شُرَكَآءُكُمْ مَا كُنْتُمْ اِيَّاَنَا تَعْبُدُوْنَ ۚ
 فَكُنِيَ اِلٰهَهُمْ شَهِيدًا بَيْنَهُمْ ۚ اَلَيْسَ لَكُمۡ عِبَادٌ مِّمَّ
 لَّغُلٰٓيِلٍ ۚ هٰذَا لِكَيْ تَبْلُوْا اَمۡلَ نَفْسٍ مَّا سَأَلْتُمْ رُزُقًا ۚ وَٰلِلّٰهِ
 مَوْلٰهُمُ الْحَقُّ وَضَلُّ عَنْهُمْ وَاَكَاوُفٌ فَرُوْنَ ۚ ۝٢٧
 رَزَقْنٰهُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمۡنَ لِيَّبِكَ السَّمْعُ وَالْاَبْصَارُ
 مِّنۡ سِجِّينٍ ۚ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُحْيِي الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۚ وَمِنۡ يَّبْدُرُ
 اَلَمْ يَسْخَرُوْا لِّلّٰهِ فَاَلَا تَسْتَكْبِرُوْنَ ۚ ۝٢٨
 فَذٰلِكُمۡ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَذٰلِكُمۡ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ
 فَذٰلِكَ اَبَدُ الْحَقِّ اِلَّا الصَّلٰةَ ۚ فَاَنۡىٰ تَصُرُّوْنَ ۚ ۝٢٩
 حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْا اَلَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۚ

(২৬) যারা সংকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশী। আর তাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান।
 (২৭) আর যারা সফল করেছে অকল্যাণ-অসং কর্মের বদলায় সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাতে আবৃত করে ফেলেবে। কেউ নেই তাদেরকে বাঁচাতে পারে আল্লাহর হাত থেকে। তাদের মুখমণ্ডল যেন ঢেকে দেয়া হয়েছে আঁখার রাতের টুকরো দিয়ে। এরা হল দোষখবাসী। এরা এতই থাকবে অনন্তকাল। (২৮) আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে সমবেত করব; আর যারা শেরক করত তাদেরকে বলব : তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে যাও-অতঃপর তাদেরকে পরস্পরিক বিচ্ছিন্ন করে দেব, তখন তাদের শরীকরা বলবে, তোমরা তো আমাদের উপাসনা-বন্দগী করনি। (২৯) বস্তুতঃ আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। আমরা তোমাদের বন্দগী সম্পর্কে দীনতাম না। (৩০) সেখানে প্রত্যেকে যাচাই করে নিতে পারবে যাকিছু সে ইতিপূর্বে করেছিল এবং আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে যিনি তাদের প্রকৃত মালিক, আর তাদের কাছ থেকে দূরে যেতে থাকবে যারা মিথ্যা বলত। (৩১) তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুখী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? অম্বাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃত্যুকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ। তখন তুমি বলো, তারপরেও ভয় করব না? (৩২) অতএব, এ আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত পালনকর্তা। আর সত্য প্রকাশের পরে (উদ্ভাষ্য বুরার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী ছদ্ম-সূতরাং কোথায় ঘুরছে? (৩৩) এমনভাবে সপ্রমাণিত হয়ে গেছে তোমার পরওয়ারদগোঁদের বাদী সেসব নাক্ষরমানের ব্যাপারে যে, এরা ঈমান আনবেনা।

লাভ করবে। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন রেওয়াজে বর্ণিত রয়েছে যে, জন্মাতের নাম দারুসসালাম এজন্য রাখা হয়েছে যে, এতে বসবাসকারীদের প্রতি সার্বজনিকভাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও সালাম পৌছতে থাকবে। বরং সালাম শব্দই হবে জন্মাতবাসীদের পরিভাষা, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের মনোবাসনা ব্যক্ত করবেন এবং ফেরেশতাগণ তা সরবরাহ করে দেবেন। যেমন, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মা'আয (রহঃ) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে নসীহত হিসেবে জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন : হে আদম সম্ভানগণ, তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দারুসসালামের দিকে আহবান করেছেন, তোমরা এ খোদায়ী আহবানে কবে এবং কোথা থেকে সাড়া দেবে? ভাল করে জেনে রাখ, এ আহবান গ্রহণ করার জন্য যদি তোমরা পৃথিবী থেকেই চেষ্টা করতে আরম্ভ কর, তাহলে সফলকাম হবে এবং তোমরা দারুসসালামে পৌছে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা পার্শ্বি এ বয়স নষ্ট করার পর মনে কর যে, কবরে পৌছে এই আহবানের প্রতি চলতে আরম্ভ করব, তাহলে তোমাদের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হবে। তখন সেখান থেকে আর এক ধাপও আগাতে পারবে না। কারণ, তা কর্মস্থল নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'দারুসসালাম' হল জন্মাতের সাতটি নামের একটি। - (তফসীরে-কুরতুবী)

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দুনিয়াতে কোন ঘরের নাম 'দারুসসালাম' রাখা সমীচীন নয়। যেমন, জন্মাত কিংবা ফেরদৌস প্রভৃতি নাম রাখা জায়েয নয়।

وَيَوْمَئِذٍ مِّنۡ يَّبْرَأٰلِ ۚ
 অতঃপর উল্লেখিত আয়াতে এরশাদ হয়েছে-
 وَكَانَ مَعَهُ ۚ অর্থঃ, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল পথে পৌছে দেন।

এর মর্মার্থ হল যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দারুসসালামের দাওয়াত সমগ্র মানবজাতির জন্যই ব্যাপক। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে হেদায়েতও ব্যাপক। কিন্তু হেদায়েতের বিশেষ প্রকার-সরল-সোজা পথে তুলে দেয়া এবং তাতে চলার তওফীক বিশেষ বিশেষ লোকদের ভাগ্যেই জোটে।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَذٰلِكُمۡ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَذٰلِكُمۡ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ ۚ فَذٰلِكَ اَبَدُ الْحَقِّ ۚ

অর্থঃ, ইনিই

হলেন সে মহান সত্তা যার গুণ-পরাকান্তার বিবরণ এইমাত্র বর্ণিত হল, তারপরে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? অর্থঃ, যখন আল্লাহ তাআলার নিশ্চিত উপাস্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন সে নিশ্চিত সত্যকে পরিহার করে অন্যান্যদের প্রতি মনোনিবেশ করা কঠিন নিবুদ্ধিতার কাজ।

এ আয়াতের জ্ঞাতব্য বিষয় ও মাসায়েলসমূহের মধ্যে স্মরণ রাখার যোগ্য যে, আয়াতে فَذٰلِكَ اَبَدُ الْحَقِّ ۚ বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সত্য ও মিথ্যার মাঝে কোন সংযোগ নেই। যা সত্য ও ন্যায় হবে না, তাই মিথ্যা ও পথভ্রষ্টতার অন্তর্ভুক্ত হবে। এমন কোন কাজ থাকতে পারে না, যা না হবে সত্য, না হবে পথভ্রষ্টতা। আবার এমনও হতে পারে না যে, দু'টি বিপরীতধর্মী বস্তুই সত্য হবে। আকায়াদের সমস্ত

قُلْ هَلْ مِنْكُمْ مَنْ يَبْدُءُ الْحَقُّ ثُمَّ يُبَدِّلُهُ قُلْ اللَّهُ
يَبْدُءُ الْحَقُّ ثُمَّ يُبَدِّلُهُ قُلْ أَنَا تَوَكَّلُونَ قُلْ هَلْ مِنْكُمْ
مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي
إِلَى الْحَقِّ أَخَيْرٌ أَمْ مَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ يَهْدِي إِلَى الْفُتْرَانِ
كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَشْعُرُ أَكْثَرُهُمْ أَكْثَرُ الْأَعْيُنِ
وَمِنَ الْحَقِّ سَيِّئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ
هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَرَبِّ فِيهِ مِنْ رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ دُونَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا
بِمَاءِمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَكِنَّا إِنَّمَا يُنْمِطُوهَا بِكَلِمَاتٍ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَانَطَرُوا كَانُوا عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَ
مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ
بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوا فَقُلْ لِي عَمَلٌ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ
أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بِرَبِّي وَمِمَّا تَعْمَلُونَ ۝

(৩৪) বল, আছে কি কেউ তোমাদের শরীকদের মাঝে যে সৃষ্টিকে পয়দা করতে পারে এবং আবার জীবিত করতে পারে? বল, আল্লাহ্ই প্রথমবার সৃষ্টি করেন এবং অতঃপর তার পুনরুত্থব করবেন। অতএব, কোথায় ঘুরপাক খাচ্ছে? (৩৫) জিজ্ঞেস কর, আছে কি কেউ তোমাদের শরীকদের মধ্যে যে সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করবে? বল, আল্লাহ্ই সত্য-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, সুতরাং এমন যে লোক সঠিক পথ দেখাবে তার কথা মান্য করা কিংবা যে লোক নিজে নিজে পথ ঝুঁজে পায় না, তাকে পথ দেখানো কর্তব্য। অতএব, তোমাদের কি হল, কেমন তোমাদের বিচার? (৩৬) বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশই শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর চলে, অথচ আন্দাজ-অনুমান সত্যের বেলায় কোন কাজেই আসে না। আল্লাহ্ ভাল করেই জানেন, তারা যা কিছু করে। (৩৭) আর কোরআন সে জিনিস নয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ তা বানিয়ে নেবে। অবশ্য এটি পূর্ববর্তী কালামের সত্যায়ন করে এবং সে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ দান করে যা তোমার প্রতি দেয়া হয়েছে, যাতে কোন সন্দেহ নেই- তোমার বিশৃঙ্খলনকর্তার পক্ষ থেকে। (৩৮) মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছে? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটাই সূরা, আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ্ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (৩৯) কিন্তু কথা হল এই যে, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে আরম্ভ করেছে যাকে বুঝতে তারা অক্ষম। অথচ এখনো এর বিশ্লেষণ আসেনি। এমনভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা। অতএব, লক্ষ্য করে দেখ, কেমন হয়েছে পরিশিতি। (৪০) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোরআনকে বিশ্বাস করবে এবং কেউ কেউ বিশ্বাস করবে না। বস্তুতঃ তোমার পরওয়ারদেগার যথার্থই জানেন দুরাচারদিগকে। (৪১) আর যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে বল, আমার জন্য আমার কর্ম, আর তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদের দায়-দায়িত্ব নেই আমার কর্মের উপর এবং আমারও দায়-দায়িত্ব নেই তোমরা যা কর সেজন্য।

নীতিশাস্ত্রে একথা সর্বজন স্বীকৃত। অবশ্য আনুষ্ঠানিক মাসআলা-মাসায়েল ও ফেকাহ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে ওলামার কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন মনীষীর মতে ইজতেহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকেই সত্য ও সঠিক বলা হবে। আর অধিকাংশ ওলামা এ ব্যাপারে একমত যে, ইজতেহাদী মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে প্রতিপক্ষকে পঞ্চত্রিংশ-গোমরাহ্ বলা যাবে না।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَكِنَّا إِنَّمَا يُنْمِطُوهَا بِكَلِمَاتٍ

এখানে তাওল এর মর্মার্থ হল প্রতিফল ও শেষ পরিণতি। অর্থাৎ, এরা নিজেদের গাফলতী ও নিলিপ্ততার দরুন কোরআন সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করেনি। ফলে এর প্রতি মিথ্যারোপে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পরই সত্য ও বাস্তবতা প্রকাশ হয়ে পড়বে এর নিজেদের কৃতকর্মের অন্ত পূর্ণ পরিণতি চিরকালের জন্য গলার ফাঁস হয়ে যাবে।

يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ, কেয়ামতে যখন মৃতদেহকে কবর থেকে উঠানো হবে, তখন একে অপরকে চিনতে পারবে এবং মনে হবে দেখা-সাক্ষাত হয়নি তা যেন খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়।

ইমাম বগতী (রহঃ) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, এ পরিচয় হবে প্রথমদিকে। পরে কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী সামনে চলে আসলে পর এসব পরিচয় হিন্ন হয়ে যাবে। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে যে, তখনো পরিচয় থাকবে, কিন্তু ভয়-সন্ত্রাসের দরুন কথা বলতে পারবে না। - (মাযহারী)

أَتُورَا أَنَا وَقَوْمُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ অর্থাৎ, তোমরা কি তখন ঈমান আনবে, যখন তোমাদের উপর আযাব পতিত হয়ে যাবে? চাই তা মৃত্যুর সময়েই হোক কিংবা তার পূর্বে। কিন্তু তখন তোমাদের ঈমানের উত্তরে কি বলা হবে- **الْشَّنْ** এতক্ষণে ঈমান আনলে, যখন ঈমানের সময় চলে গেছে?

يَوْمَئِذٍ أَتَىٰ لُغْمُ الْعِلَىٰ ۖ অর্থাৎ, আমি ঈমান আনছি, নিশ্চয়ই কোন উপাস্য নেই তাকে ছাড়া যার উপর ঈমান এনেছে বনী ইসরাইলরা।)

উত্তরে বলা হয়েছিল- **الْشَّنْ** (অর্থাৎ, এতক্ষণে ঈমান আনলে?) বস্তুতঃ তার ঈমান কবুল করা হয়নি। এক হাদীসে রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বন্দার তওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার মৃত্যুকালীন উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়। অর্থাৎ, মৃত্যুকালীন গরগরা বা উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যাবার পর ঈমান ও তওবা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে দুনিয়াতে আযাব সংঘটিত হওয়ার পূর্বাঙ্কে তওবা কবুল হতে পারে। কিন্তু আযাব এসে যাবার পর আর তওবা কবুল হয় না। সূরার শেষাংশে ইউনুস (আঃ)-এর কণ্ঠের যে ঘটনা আসছে যে, তাদের তওবা কবুল করে নেয়া হয়েছিল, তা এই মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়েছিল। কারণ, তারা দূর থেকে আযাব আসতে দেখেই বিস্ময়-সত্য মনে কেঁদে-কেটে তওবা করে নিয়েছিল। তাই আযাব সরে যায়। যদি আযাব তাদের উপর পতিত হয়ে যেত, তবে আর তওবা কবুল হত না।

(৪২) তাদের কেউ কেউ কান রাখে তোমাদের প্রতি; তুমি বখিরদেরকে কি ক্ষমাবে যদি তাদের বিবেক-বুদ্ধি না থাকে। (৪৩) আবার তাদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখে; তুমি অন্ধদেরকে কি পথ দেখাবে যদি তারা মোটেও দেখতে না পারে। (৪৪) আল্লাহ জুলুম করেন না কসুরের উপর, বরং মানুষ নিজের উপর জুলুম করে। (৪৫) আর যিনি তাদেরকে সমবেত করা হবে, যেন তারা অবস্থান করেনি, তবে দিনের একদণ্ড। একজন অপরজনকে চিনবে। নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে এবং সরলপথে আসেনি। (৪৬) আর যদি আমি দেখাই তোমাকে সে ওয়াদাসমূহের মধ্য থেকে কোন কিছু যা আমি তাদের সাথে করেছি, অথবা তোমাকে মৃত্যুদান করি, বাহোক, আমার কাছেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সে সমস্ত কর্মের সাক্ষী যা তারা করে। (৪৭) আর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একেকজন রসূল রয়েছে। যখন তাদের কাছে তাদের রসূল নাস্তগুহ উপস্থিত হল, তখন আর তাদের উপর জুলুম হয় না। (৪৮) জরা আরো বলে, এ ওয়াদা কবে আসবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক? (৪৯) তুমি বল, আমি আমার নিজের ক্ষতি কিংবা লাভেরও মালিক নই, কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই একেকটি ওয়াদা রয়েছে, যখন তাদের সে ওয়াদা এসে পৌঁছে যাবে, তখন না একদণ্ড গেলে সরতে পারবে, না সামনে ফসকাতে পারবে। (৫০) তুমি বল, আমি দেশ তো দেখি, যদি তোমাদের উপর তাঁর আযাব রাতারাতি অথবা দিনের বেলায় এসে পৌঁছে যায়, তবে এর আগে পাণীরা কি করবে? (৫১) অথল কি আযাব সংঘটিত হয়ে যাবার পর এর প্রতি বিশ্বাস করবে? এখন ঈমান করলে? অথচ তোমরা এরই তাকাদা করত? (৫২) অতঃপর বলা হবে, মোনাহগারদিগকে, ভোগ করতে থাক অনন্ত আযাব- তোমরা যা কিছু করতে তার তাই প্রতিফল।

এখানে কোরআন করীমের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে—
(এক) وعظ و موعظة এর প্রকৃত অর্থ হল একন

বিষয় বর্ণনা করা, যা শুনে মানুষের অন্তর কোমল হয় এবং আল্লাহর প্রতি
প্রণত হয়ে পড়ে। পার্শ্বিক গাফলতীর পর্দা ছিন্ন হয়ে মনে আবেগের
ভাবনা উদয় হয়। কোরআন করীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই
'মাওয়াযেয়ে হাসনাহ'-এর অত্যন্ত সালস্বার প্রচারক। এর প্রতিটি
জায়গায় ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির সাথে সাথে ভীতি-প্রদর্শন, সওয়াবের সন্ধান
সাথে আযাব, পার্শ্বিক জীবনের কল্যাণ ও কৃতকার্যতার সাথে সাথে ব্যর্থতা
ও পথভ্রষ্টতা প্রভৃতির এমন সংমিশ্রিত আলোচনা করা হয়েছে, যা শোনার
পর পাখরও পানি হয়ে যেতে পারে। তদুপরি কোরআন করীমের অন্যান্য
বর্ণনা-বিশ্লেষণও এমন যা মনের পটপরিবর্তন করে দিতে অদ্বিতীয়।

مَوْعِظَةً এর সাথে مِنْ رَبِّكَ বলে কোরআনী-ওয়াদের মর্যাদার
অধিকতর উচ্চ করে দিয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এ ওয়াদা নিজেদেরই
মত কোন দুর্বল মানুষের পক্ষ থেকে নয় যার হাতে কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি
কিংবা পাপ-পুণ্য কিছু নেই; বরং এ হলো মহান পরওয়ারদেগারের পক্ষ
থেকে, যার কোথাও ভুল-ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই এবং যা
প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শনে কোন দুর্বলতা কিংবা আপত্তি ওয়ারে
আশংকা নেই।

وَعِظَ لِمَا لِي الصُّدُورُ বাক্যে বর্ণিত

হয়েছে। اَرْحَمَ অর্থ রোগ নিরাময় হওয়া আর صلور হল একন
বহুবচন, যার অর্থ বৃক। আর এর মর্যাদা অন্তর।

সারার্থ হচ্ছে যে, কোরআন করীম অন্তরের ব্যাধিসমূহের জন্য একম
সফল চিকিৎসা ও সুস্থতা এবং রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। হয়রত
হাসান বসরী (রহঃ) বলেন যে, কোরআনের এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা যের
যায় যে, এটি বিশেষতঃ অন্তরের রোগের শেফ; দৈহিক রোগের চিকিৎসা
নয়।—(রহুল-মা'আনী)

কিন্তু অন্যান্য মনীষীবৃন্দ বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে কোরআন স
রোগের নিরাময়, তা অন্তরের রোগই হোক কিংবা দেহেরই হোক। জ
আত্মিক রোগের ধ্বংসকারিতা মানুষের দৈহিক রোগ অপেক্ষা নৈ
মারাত্মক এবং এর চিকিৎসাও যে কারো সাধ্যের ব্যাপার নয়। সে কারণেই
এখানে শুধু আন্তরিক ও আত্মাত্মিক রোগের উল্লেখ করা হয়েছে। এত
একথা প্রতীয়মান হয় না যে, দৈহিক রোগের জন্য এটি চিকিৎসা নয়।

হাদীসের বর্ণনা ও উ-ম্মতের আলেম সম্প্রদায়ের অসংখ্য অভিজ্ঞ
এর প্রমাণ যে, কোরআন করীম যেমন আন্তরিক ব্যাধির জন্য অর্থা
মহৌষধ, তেমনি দৈহিক রোগ-ব্যাধির জন্যও উত্তম চিকিৎসা।

হয়রত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি
রসুলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে এসে নিবেদন করল যে, আমার বুকে
কষ্ট পাচ্ছি। মহানবী (সাঃ) বললেন, কোরআন পাঠ কর। কারণ আল্লাহ
তাআলা এরশাদ করেছেন—

وَعِظَ لِمَا لِي الصُّدُورُ

কোরআন সে সমস্ত রোগের জন্য আরোগ্য বা বৃকের মাঝে হয়ে থাকে।
(রহুল মা'আনী-ইবনে মাদুবিয়াহ থেকে)

وَيَسْتَدْرُونَكَ أَحَقُّ هَوَافُّ لِي وَرَبِّي إِنَّهُ يَنْقُصُ وَأَنْتُمْ مُعْجِزِينَ ①
وَأَنْ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْأَرْضِ أَفْقَدَتْ بِهِ وَأَسْرَأَ لِلْعَذَابِ
لَنَا وَكَأُ الْوَعْدِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ②
إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْكَرَّانُ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ③ فَوَيْلٌ لِمَنْ كَفَرَ بَعْدَ عَهْدِهِ وَتَوَلَّى وَرُجِعَ
النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَشِيرَةٌ لِمَنِ الْصَّدُورُ ④
وَهَذِهِ رُوحُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ ⑤ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ
فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لَكُمْ أَهْوَىٰ مِنْكُمْ يُبْعَثُونَ ⑥ قُلْ أَرَأَيْكُمْ أَنْزَلَ
اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَزْوَ
لَكُمْ أَعْمَلُ مِنَ اللَّهِ يَنْفَعُونَ ⑦ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⑧ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا شَاءَ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا
قَوْلَانِ وَلَا أَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ الْإِنْسَانِ عَلَيْهِمْ سُوءُ الْإِذْنِ يَنْفُسُونَ
فِيهِ وَمَا يُعِزُّ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا
فِى السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِى كِتَابٍ مُّبِينٍ ⑨

(৫৩) আর তোমার কাছে সংবাদ জিজ্ঞেস করে, এটা কি সত্য? বলে দাও,
অবশ্যই আমার পরওয়ারদেগারের কসম এটা সত্য। আর তোমরা পরিশ্রান্ত
করে দিতে পারবে না। (৫৪) বস্তুতঃ যদি প্রত্যেক গোনাহগারের কাছে এত
পরিমাণ থাকে যা আছে সমগ্র যমীনের মাঝে, আর অবশ্যই যদি সেগুলো
নিজের মুক্তির বিনিময়ে দিতে চাইবে আর গোপনে গোপনে অনুতাপ
করবে, যখন আযাব দেখবে। বস্তুতঃ তাদের জন্য সিদ্ধান্ত হবে ন্যায়সঙ্গত
এবং তাদের উপর জুম্ম হবে না। (৫৫) শুনে রাখ, যা কিছু রয়েছে
আসমানসমূহ ও যমীনে সবই আল্লাহর। শুনে রাখ, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি
সত্য। তবে অনেকেই জানে না। (৫৬) তিনিই জীবন ও মরণ দান করেন
এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৫৭) হে মানবকুল, তোমাদের
কাছে উপদেশবাণী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং
অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য। (৫৮)
বল, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবাণীতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা
উচিত। এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে যা সক্ষম করছ। (৫৯) বল, আচ্ছা
নিজেই লক্ষ্য করে দেখ, যা কিছু আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে
অবতীর্ণ করেছেন, তোমরা সেগুলোর যথ্য থেকে কোনটাকে হারাম আর
কোনটাকে হালাল সাব্যস্ত করছ? বল, তোমাদের কি আল্লাহ নির্দেশ
দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর উপর অপবাদ আরোপ করছ? (৬০) আর
আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের কি ধারণা কেয়ামত
সম্পর্কে? আল্লাহ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহই করেন, কিন্তু অনেকেই
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। (৬১) বস্তুতঃ যে কোন অবস্থাতেই ভূমি থাক
এবং কোরআনের যে কোন অংশ থেকেই পাঠ কর কিংবা যে কোন কাজই
তোমরা কর অথচ আমি তোমাদের নিকটে উপস্থিত থাকি যখন তোমরা
তাতে আত্মনিয়োগ কর। আর তোমার পরওয়ারদেগার থেকে গোপন থাকে
না একটি কথাও যমীনের এবং না আসমানের। না এর চেয়ে ক্ষুদ্র কোন কিছু
আছে, না বড় যা এই প্রকৃতি কিতাবে নেই।

اَلْاِيَّامِ اَوَّلِيَّاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
 الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا اَيُّهَا النَّفْسُ فِي الْغَيْبِ
 الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ
 الْقُوْرُ الْعَظِيْمُ ۝ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ
 جَمِيْعًا ۝ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
 وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ
 دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءُ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا
 يَخْرُصُوْنَ ۝ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَيْلَ لِتَسْكُنُوْا
 فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۝ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَتْلُوْهُ
 يَسْمَعُوْنَ ۝ قَالُوْا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَذٰلِكَ اَسْمَعُنَا هُوَ الْغَفُوْرُ
 لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ
 سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اَتَّقُوْا عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝
 قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكِذْبَ لَا
 يُفْلِحُوْنَ ۝ مَتَاعُ الدُّنْيَا كَمَا لَيَّمَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ
 نُنْزِلُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَفْكُرُوْنَ ۝

(৬২) মনে রেখো, যারা আল্লাহর বন্ধু, তাদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। (৬৩) যারা ঈমান এনেছে এক ভয় করতে রয়েছে—(৬৪) তাদের জন্য সুসংবাদ পার্শ্ববর্তী জীবনে ও পরকালীন জীবনে। আল্লাহর কথার কখনো হের-ফের হয় না। এটাই হল মহা সফলতা। (৬৫) আর তাদের কথায় দৃষ্ট নিয়ো না। আসলে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহর। তিনিই শ্রবকারী, সর্বজ্ঞ। (৬৬) শুনছ, আসমানসমূহে ও যমীনে যাকিছু রয়েছে সবই আল্লাহর। আর এরা যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে শরীকদের উপাসনার পেছনে পড়ে আছে—তা আসলে কিছুই নয়। এরা বুদ্ধি খাটাচ্ছে। (৬৭) তিনি জোমাদের জন্য তৈরী করেছেন রাত, যাতে করে তোমরা তাতে প্রাণ্ডি লাভ করতে পার, আর দিন দিয়েছেন দর্শন করার জন্য। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে সেসব লোকের জন্য যারা শ্রব করে। (৬৮) তারা বলে, আল্লাহ পুত্র সাব্যস্ত করে নিয়েছেন—তিনি পবিত্র, তিনি অমুখাপেক্ষী। যাকিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে সবই তাঁর। জোমাদের কাছে তার কোন সন্দ নেই। কেন তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ কর—যার কোন সন্দই জোমাদের কাছে নেই? (৬৯) বলে দাও, যারা এরূপ করে তারা অব্যাহতি পায় না। (৭০) পার্শ্ববর্তীজীবনে সামান্যই লাভ, অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তাদেরকে আশ্বাদন করাব কঠিন আশ্বাব—তাদেরই কৃত কুফরীর বদলাতে।

এমনিভাবে হযরত ওয়াসেলাহ ইবনে আশকা' (রাঃ)—এর রেওয়াজেতে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর খেদমতে এসে জানালো যে, আমার গলায় কষ্ট হচ্ছে। তিনি তাকেও একথাই বললেন যে, কোরআন পড়তে থাক।

قُلْ يٰٓعٰلَمِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِمْ ۝ اِنَّكَ لَذِيْكَرٌ ۝ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ

অর্থঃ, মানুষের কর্তব্য হল আল্লাহ তাআলার রহমত ও অনুগ্রহকেই প্রকৃত আনন্দের বিষয় মনে করা এবং একমাত্র তাতেই আনন্দিত হওয়া। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ ও মান-সম্মান কোনটাই প্রকৃতপক্ষে আনন্দের বিষয় নয়। কারণ, একে তো কেউ যত অধিক পরিমাণেই তা অর্জন করুক না কেন, (সবই) অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে; পরিপূর্ণ হয় না। দ্বিতীয়তঃ সততই তার পতনশঙ্কা লেগে থাকে। তাই আয়াতের শেষাংশে

বলা হয়েছে— ۝ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ অর্থঃ, আল্লাহর করুণা-অনুগ্রহ সে সমস্ত ধন-সম্পদ ও সম্মান-সাম্রাজ্য অপেক্ষা উত্তম, যেগুলোকে মানুষ নিজেদের সমগ্র জীবনের ভরসা বিবেচনা করে সংগ্রহ করে।

এ আয়াতে দু'টি বিষয়কে আনন্দ-হরষের উপকরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি হল 'ফজল', অপরটি 'رحمة' 'রহমত'। এতদুভয়ের মর্ম কি? এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহর 'ফজল'—এর মর্ম হল কোরআন, আর রহমত—এর মর্ম হল এই যে, তোমাদেরকে তিনি কোরআন অধ্যয়ন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তওফীক দান করেছেন।—(বুখারি-মু'আনী, ইবনে মারদুযিয়াহ থেকে)

এ বিষয়টি হযরত বারী' ইবনে আযেব (রাঃ) এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া অনেক তফসীরকার মনীষী বলেছেন যে, 'ফযল' অর্থ কোরআন; আর রহমত হল ইসলাম। বস্তুতঃ এর মর্মার্থও তাই যা উল্লেখিত হাদীসের দ্বারা বোঝা যায় যে, রহমতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআনের শিক্ষা দান করেছেন এবং এর উপর আমল করার সামর্থ্য দিয়েছেন। কারণ, ইসলামও এ তথ্যেরই শিরোনাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর ওলীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাদের প্রশংসা ও পরিচয় বর্ণনার সাথে সাথে তাদের প্রতি আখেরাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে—যারা আল্লাহর ওলী তাদের না থাকবে কোন অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোন উদ্দেশ্যে ব্যর্থতার গ্লানি। আর আল্লাহর ওলী হলেন সে সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া-পরহেযগারী অবলম্বন করেছে। এদের জন্য পার্শ্ববর্তীজীবনেও সুসংবাদ রয়েছে এবং আখেরাতেও।

এতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। (এক) আল্লাহর ওলীগণের উপর ভয় ও শঙ্কা না থাকার অর্থ কি? (দুই) ওলীআল্লাহর সংজ্ঞা ও লক্ষণ কি? (তিন) দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁদের জন্য সুসংবাদের মর্ম কি?

প্রথম বিষয় 'আল্লাহর ওলীদের কোন ভয়-শঙ্কা থাকে না' অর্থ এও হতে পারে যে, আখেরাতের হিসাব-নিকাশের পর যখন তাঁদেরকে তাঁদের মর্যাদায় জন্মতে প্রবেশ করানো হবে, তখন ভয় ও আশঙ্কা থেকে চিরতরে তাঁদের মুক্ত করে দেয়া হবে। না থাকবে কোন রকম কষ্ট ও অস্থিরতার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোন প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত বস্তুর হাতছাড়া হয়ে যাবার দৃষ্ট। বরং তাদের প্রতি জন্মাতের নেয়ামতরাজি হবে চিরস্থায়ী,

অনন্ত। এ অর্থে আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা আপত্তির কারণই নেই। কিন্তু এ প্রশ্ন অবশ্যই সৃষ্টি হয় যে, এতে শুধু ওলীগণের কোন বিশেষত্ব নেই, সমস্ত জ্ঞানাতবাসী যারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, তাদের সবাই এ অবস্থায়ই থাকবে। তবে একথা বলা যায় যে, যারা শেষ পর্যন্ত জাহান্নাতে পৌঁছবে তাদের সবাইকে ওলিআল্লাহ্ বলা হবে। পৃথিবীতে তাদের কার্যকলাপ যেমনই থাকুক না কেন, জাহান্নাতে প্রবেশ করার পর সবাই ওলীআল্লাহ্‌র তালিকা গণ্য হবে।

কিন্তু অনেক তফসীরকার বলেছেন, ওলীআল্লাদের জন্য দুঃখ-ভয় না থাকা দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক। আর ওলিআল্লাহ্‌দের বৈশিষ্ট্যও তাই যে, পৃথিবীতেও তারা দুঃখ ভয় থেকে মুক্ত। এছাড়া আখেরাতে তাদের মনে কোন চিন্তা-ভাবনা না থাকা তো সবারই জানা। এতে সমস্ত জ্ঞানাতবাসীই অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এতে অবস্থা ও বাস্তবতার দিক দিয়ে প্রশ্ন হল এই যে, পৃথিবীতে তো এ বিষয়টি বাস্তবতার পরিপন্থী দেখা যায়। কারণ, ওলীআল্লাহ্‌র তো কথাই নাই স্বয়ং নবী-রসূলগণও এ পৃথিবীতে ভয় ও আশঙ্কা থেকে মুক্ত নন বা ছিলেন না বরং তাঁদের ভয়-ভীতি অন্যান্যদের তুলনায় বেশীই ছিল। যেমন, কোরআন করীমে এরশাদ হয়েছে **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ** অর্থাৎ, ওলামাগণই পরিপূর্ণভাবে আল্লাহকে ভয় করেন। অন্যত্র **وَلَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ** অর্থাৎ, ওলামাগণই পরিপূর্ণভাবে আল্লাহকে ভয় করেন। অন্যত্র **مُتَّقِينَ** অর্থাৎ, এরা সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় করে। কারণ, তাদের পালনকর্তার আযাব এমন বিষয় যার সম্পর্কে কেউ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না।

আর ঘটনাপ্রবাহও তাই। যেমন, শামায়েলে-তিরমিযী গ্রন্থে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রসুল করীম (সাঃ)-কে অধিকাংশ সময় বিষণ্ণ-চিন্তান্বিত দেখা যেত। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি আল্লাহকে তোমাদের সবার চেয়ে বেশী ভয় করি।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারুক (রাঃ) সহ অন্যান্য সমস্ত সাহাবী, তাবয়ীন ও ওলীআল্লাহ্‌গণের কাদা-কাটার ঘটনাবলী ও আখেরাতের ভয়-ভীতি-সম্পন্ন থাকার অসংখ্য ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে।

তাই রহুল মা'আনীতে আল্লামা আলুসী (রহঃ) বলেছেন, পার্শ্ববর্তী জীবনে ওলীআল্লাহ্‌গণের ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ থাকা হল এ হিসেবে যে, পৃথিবীবাসী সাধারণতঃ যেসব ভয় ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন পার্শ্ববর্তী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, আরাম-আয়েশ, মান-সম্প্রদ ও ধন-সম্পদের সামান্য ক্ষতিতেই যে তারা মুচড়ে পড়ে এবং সামান্য কষ্ট ও অস্থিরতার ভয়ে তা থেকে ঝাঁচর তদবীরে রাত-দিন মজে থাকে। আল্লাহ্‌র ওলীগণের স্থান হয়ে থাকে এ সবার বহু উর্ধ্বে। তাঁদের দৃষ্টিতে না পার্শ্ববর্তী ক্ষণস্থায়ী মান-সম্প্রদ ও আরাম-আয়েশের কোন গুরুত্ব আছে যা অর্জন করার জন্য সদা পরিব্যস্ত থাকতে হবে, আর না এখানকার দুঃখ-কষ্ট-পরিশ্রম কোন লক্ষ্য করার মত বিষয় যা প্রতিরোধ করতে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি আল্লাহ্‌র ওলীগণের সংজ্ঞা ও তাঁদের লক্ষণ সন্ধান। 'আওলিয়া' শব্দটি ওলী শব্দের বহুবচন। আরবী ভাষায় 'ওলী' অর্থ নিকটবর্তীও হয় এবং দোস্ত-বন্ধুও হয়। আল্লাহ্‌ তাআলার প্রেম ও নৈকট্যের একটি সাধারণ স্তর এমন রয়েছে যে, তার আওতা থেকে পৃথিবীর কোন মানুষ, কোন জীবজন্তু এমনকি কোন বস্তু-সামগ্রীই বাদ

পড়ে না। যদি এ নৈকট্য না থাকে, তবে সমগ্র বিশ্বের কোন একটি বস্তু অস্তিত্ব লাভ করতে পারত না। সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্বের প্রকৃত উপকরণ হল সেই সংযোগ যা আল্লাহ্‌ তাআলার সাথে রয়েছে। যদিও এই সংযোগের তাৎপর্য কেউ বুঝেনি বা বুঝতে পারেও না, তথাপি এই অশরীরী সংযোগ অপরিহার্য ও নিশ্চিত। কিন্তু 'আওলিয়া' শব্দের নৈকট্যের এ স্তরের কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। বরং নৈকট্য, প্রেম ও ওলিআহ্‌ দ্বিতীয় আরেকটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে যা আল্লাহ্‌ তাআলার বিশেষ বিশেষ বন্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। সে নৈকট্যকে মুহাব্বত বা প্রেম বলা হয়। যারা নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হন, তাদেরকেই বলা হয় ওলীআল্লাহ্‌, তথা, আল্লাহ্‌র ওলী। যেমন এক হাদীসে-কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন : "আমার বন্দা নফল এবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি আমি নিজেও তাকে ভালবাসতে আরম্ভ করি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই তার কন্যা হয়ে যাই, সে যা কিছু শোনে, আমার মাধ্যমেই শোনে। আমিই তার জন্ম হয়ে যাই, যা কিছু সে দেখে, আমার মাধ্যমেই দেখে। আমিই তার হৃৎ-হৃৎ হয়ে যাই, যা কিছু সে করে আমার দ্বারাই করে।" এর মর্ম হল এই যে তার কোন গতি-স্থিতি ও অন্য যে কোন কাজ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ হয় না।

বস্তুতঃ এই বিশেষ ওলীত্ব বা নৈকট্যের স্তর অগণিত ও অশেষ। এ সর্বোচ্চ স্তর নবী-রসূলগণের প্রাপ্য। কারণ, প্রত্যেক নবীরই ওলীত্ব অপরিহার্য। আর এর সর্বোচ্চ-স্তর হল সায়েদুল আযিয়া নবী করীম (সাঃ)-এর এবং এ বেলায়েতের সর্বনিম্ন স্তর হল সুফী সাধকগণের পরিভাষায় 'দরজায়ে ফানা' তথা আত্মা বিলুপ্তির স্তর বলা হয়। এর মর্ম হল এই যে, মানুষের অন্তরাত্মা আল্লাহ্‌র সুরশে এমনভাবে ডুবে যায় যে পৃথিবীতে কারো মায়া-ভালবাসাই এর উপর প্রবল হতে পারে না। সে যাকে ভালবাসে, আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তাও আল্লাহ্‌র জন্য করে। এক কথায় তার প্রেম ও ঘৃণা, ভালবাসা ও শত্রুতা কোনটাই নিজের ব্যক্তিগত কোন কারণে হয় না। এরই অবশ্যকরি পরিণতি হল যে তাঁর দেহ মন, ভেতর বাহির সবই আল্লাহ্‌র সন্তোষ অনুবাহ্য নিয়োজিত থাকে। তখন সে প্রত্যেক এমন কাজ থেকে স্তব্ধ থাকে যা আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে পছন্দ নয়। এ অবস্থার লক্ষণই অমিত যিকরের আধিক্য ও আনুগত্যের সার্বক্ষণিকতা। অর্থাৎ, আল্লাহকে অমিত সুরণ করা এবং সর্বক্ষণ, সর্বাবস্থায় তাঁর হুকুম আহকামের অনুগত থাকা। এ দু'টি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাকেই, ওলী বলা হয়। যার মধ্যে দু'টির কোন একটিও না থাকে সে এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এ দু'টিই উপস্থিত থাকে তার স্তরের নিম্নতা উচ্চতার ক্ষেত্র সীমা-পরিসীমা নেই। এ সব স্তরের দিক দিয়েই ওলিআল্লাহ্‌গণের-মর্যাদা বেশ কম হয়ে থাকে।

এক হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুসাইন (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হয় যে, এ আয়াতে 'আওলিয়া' (আল্লাহ্‌র ওলীগণ) বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, সে সবার লোককে যারা একান্তভাবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা পোষণ করে, কোন পার্শ্ববর্তী উদ্দেশ্য এর মাঝে থাকে না। (ইবন মারদুযিয়াহ থেকে-মামহারী) আর একথা সুস্পষ্ট যে, এ অবস্থা সে সবার লোকেরই হতে পারে যাদের কথা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, বেলায়েতের এ স্তর লাভের উপায় কি?

[illegible]

(৬) আর তাদেরকে ওনিয়ে দাও নুহের অবস্থা—যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বল, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি এবং জ্ঞানবোধ আয়ত্তসমূহের মাধ্যমে নবীহত করা ভাবী বলে মনে হয়ে থাকে, তবু আমি আল্লাহর উপর তরসা করছি। এখন তোমরা স্বাধীন মনে নিজদের কর্তব্য সাধন কর এবং এতে তোমাদের শরীকদের সমাবেশ করে নও, যাতে তোমাদের মাঝে নিজদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যাকিছু করার করে ফেল এবং আমাকে জ্বাহিতি দিও না। (৭২) তারপরও যদি বিমুখতা অবলম্বন কর, তবে আমি তোমাদের কাছে কোন রকম বিনিময় মান্যমান করি না। আমার বিনিময় হল জ্বলন্তুর দায়িত্বে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে যেন আমি অনুগত্য কলমুম করি। (৭৩) তারপরও এরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। সুতরাং তাকে এক তার সাথে নৌকায়ারা ছিল তাদেরকে বাচিয়ে নিয়েছি এবং যথাস্থানে অধীন করেছি। আর তাদেরকে ভূমিয়ে দিয়েছি যারা আমার কর্তব্যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং লম্বা কর, কোন পরিশ্রিত বস্তুতে তাদের মাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। (৭৪) অনন্তর আমি নুহের পরে বহু নবী—স্বল্প পাঠিয়েছি তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি। তারপর তাদের কাছে তারা প্রকাশ্য নবী—প্রথম উপস্থাপন করেছে, কিন্তু তাদের দ্বারা এমনটি হয়নি যে, ইমান আনবে সে ব্যাপারে, যাকে তারা ইতিপূর্বে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। এভাবেই আমি মোহর এটা দেখি সীমালঙ্ঘনকারীদের দলভরসমূহের উপর। (৭৫) অতঃপর তাদের পেছনে পাঠিয়েছি আমি মুসা ও হারুনকে ফোয়উ ও তার সর্দারের প্রতি স্বীয় নির্দেশাবলী সহকারে। অথচ তারা অহংকার করতে আরম্ভ করেছে। (৭৬) বস্তুতঃ তারা ছিল গোনাহগার। আরার আমার কর্তৃক থেকে যখন তাদের কাছে সা তা বিল উপস্থিত হল, তখন কায়তে নাগালে, এগুলো তো প্রকাশ্য যাদু। (৭৭) মুসা বলল, সত্যের ব্যাপারে একথা বলছ, তা তোমাদের কাছে পৌছার পর? এ কি যাদু? অথচ যাদু যাদুস্বর, তারা সফল হতে পারে না। (৭৮) তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে দিতে এনেছ যাতে আমরা পেয়েছি আমাদের বাপ-মাদাদেরকে? আর যাতে তোমার দুইজন এদেশের সর্দারী পেয়ে বেতে পার? আমার তোমাদেরকে কিছুতেই মানব না।

হয়রত কাশী সানাদুলাহ পানিপথী (রহঃ) তফসীরে মাফহারীতে বলেছেন, উম্মতের লোকদের এই স্তর রসুলে করীম (সাঃ)—এরই সংসর্গের মাধ্যমে লাভ হতে পারে। এভাবেই আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কের সেরূপ যা মহানবী (সাঃ) পেয়েছিলেন, স্বীয় যোগ্যতা অনুপাতে তার অংশবিশেষ উম্মতের ওলীগণ পেয়ে থাকেন। বস্তুতঃ মহানবী (সাঃ)—এর সংসর্গের ফযীলত সাহাবায়ে—কেরাম পেয়েছিলেন সরাসরি। আর সে কারণেই তাদের বেলায়েতের দরজা উম্মতের সমস্ত ওলী—কুতুব অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে। পরবর্তী লোকেরা এ ফযীলতই এক বা একাধিক মাধ্যমে অর্জন করেন। মাধ্যম যত বাড়তে থাকে ব্যবধানও সে পরিমাণেই বাড়তে থাকে। এই মাধ্যম শুধুমাত্র সে সমস্ত লোকই হতে পারেন, যারা রসুলে করীম (সাঃ)—এর রহঃ রঞ্জিত হতে পেরেছেন, তাঁর সুন্নতের হুবহু অনুসরণ করেছেন। এ ধরনের লোকদের সান্নিধ্য ও সংসর্গের সাথে সাথে যখন তাদের নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহর যিকরেও আধিক্য ঘটে তখনই তা লাভ হয়। বেলায়েতের স্তর প্রাপ্তির এটিই পন্থা যা তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। (১) কোন ওলীর সংসর্গ, (২) তাঁর আনুগত্য ও (৩) আল্লাহর অধিক যিকর। কিন্তু শর্ত হল এই যে, এ যিকর সুন্নত তরীকা অনুযায়ী হতে হবে। কারণ, অধিক যিকরের দ্বারা যখন অজ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, তখন সে নূর বেলায়েতের প্রতিফলনের যোগ্য হয়ে উঠে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতিটি বস্তুর জন্য শিরিশ বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পন্থা রয়েছে, অন্তরের শিরিশ হল আল্লাহর যিকর। এ কথাই ইবনে-ওমর (রাঃ)—এর রেওয়াজেতক্রমে বায়হাকীও উদ্ধৃত করেছেন।

আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, (একবার) এক ব্যক্তি রসুলে করীম (সাঃ)—এর কাছে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলনে, যে কোন বৃষ্ণ ব্যক্তির সাথে মুহা঳ত রাখে কিন্তু আমলের দিক দিয়ে তাঁর স্তরে পৌছাতে পারে না। হুম্বর বললেন **مع من أحب** অর্থাৎ, প্রতিটি লোক তার সাথেই হবে যাকে সে ভালবাসে।' এতে প্রতীয়মান হয় যে, ওলিআল্লাহগণের সৎসর্গ ও তাদের প্রতি মহব্বত রাখা মানুষের জন্য বেলায়েত বা আল্লাহুর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। ইমাম বায়হাকী 'শো'আবুল ইমান' গ্রন্থে হযরত রায়ান (রাঃ)—এর এক রেওয়াজে উদ্ধৃত করেছেন যে, রসুলে করীম (সাঃ) হযরত রায়ান (রাঃ)—কে বললেন যে, তোমাকে দুইনের এমন নীতিমালা বলে দিচ্ছি যাতে করে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও কৃতকার্যতা লাভ করতে পারবে—তা হল এই যে, যারা আল্লাহুর স্মরণ করে তাদের মজলিস ও সৎসর্গকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেবে এবং যখন একা থাকবে, তখন যত বেশী সম্ভব আল্লাহুর যিকরে নিজের জিহবা নাড়তে থাকবে। যার সাথে মহব্বত রাখবে—আল্লাহুর জন্য রাখবে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে, আল্লাহুর জন্য করবে।—(মাহহারী)

তফসীরে মায়হরীতে বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষ যে কাশ্ফ-কারামত ও গায়বী বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়াকে ওলীর লক্ষণ ধরে নিয়েছে, তা একান্ত ভুল ও ধোকা। হাজার হাজার ওলীআল্লাহ এমন ছিলেন এবং রয়েছেন যাদের দ্বারা এ ধরনের কোন বিষয় সঘটিত হয়নি। পক্ষান্তরে এমন লোকের দ্বারাও কাশ্ফ ও গায়বী সংবাদ কথিত হয়েছে যার ঈমান পর্যন্ত ঠিক নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে হয়রত মুসা ও হারুন (আঃ) এবং বনী-ইসরাঈল ও ফেরাউন সম্প্রদায়ের কিছু অবস্থা এবং সে প্রসঙ্গে কিছু বিধি-বিধান আলোচনা করা

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اٰتُونِي بِحُجْرِ سَجْرِ عَلَيَّ ۖ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ
 قَالَ لَهُمْ مُوسٰى الْقَوٰمَ اَنْتُمْ مُّقْتَحُونَ ۖ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسٰى
 مَلِكُكُمْ يٰۤاَيُّهَا السَّحَرَةُ اِنَّ اللّٰهَ سَيَبْطِلُ اَنْ اَنْتُمْ لَكُمْ اٰلِهَةٌ ۚ
 الْمُسْتَفْسِدِيْنَ ۚ وَيَحْيٰى اَللّٰهُ الْحَقُّ يَكْفِيْهِمْ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝
 فَمَّا اَمْسَلَ لِمُوسٰى الْاَزْوَاجَ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ
 وَمَلَائِكَتِهِ اَنْ يَفْتِنَهُمْ فَلَمَّا فِرْعَوْنَ لَعَلَّ فِي الْاَرْضِ وَارَاَهُ
 لَوْنُ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ وَقَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ اٰمَنْتُمْ بِاٰلِهَةٍ
 فَلَعَلَّكُمْ تَكْفُرُوْنَ ۚ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۚ فَقَالُ الْاَوَّلُ اَللّٰهُ تَوَكَّلْنَا
 رَبَّنَا اَلْحَمْدُ لِفِتْنَةِ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۚ وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ وَمِنْ
 الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ۚ وَاحْيٰى اِلٰى مُوسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّآ
 لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ ۙ رَبُّكَ وَآجِزَا لِقَوْمِكُمَا بِمِثْلِهِ ۚ وَآقِصِمَا
 الصَّلٰوةَ وَابْشِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَقَالَ مُوسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ
 اَتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَكَ زَيْنَةَ اَمْوَالِى الْخَيْرِ الْاٰتِيَا
 رَبَّنَا لِيُخْلَصُوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ
 عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرُوْا الْعَذَابَ الرَّكِيْمَ ۝

(৭৯) আর ফেরাউন বলল, আমার কাছে নিয়ে এস সুদক্ষ যাদুকরদিককে।
 (৮০) তারপর যখন যাদুকুররা এল, মুসা তাদেরকে বলল, নিক্ষেপ কর,
 তোমরা যা কিছু নিক্ষেপ করে থাক। (৮১) অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ
 করল, মুসা বলল, যাকিছু তোমরা এনেছ তা সবই যাদু—এবার আল্লাহ
 এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুসারদের কর্মকে সুখুতা
 দান করেন না। (৮২) আল্লাহ সত্যকে সত্যে পরিণত করেন স্বীয় নির্দেশে
 যদিও পাপীদের তা মনঃপুত নয়। (৮৩) আর কেউ ঈমান আনল না মুসার
 প্রতি তাঁর কণ্ঠের কতিপয় বালক ছাড়া—ফেরাউন ও তার সর্দারদের ভয়ে
 যে, এরা না আবার কোন বিপদে ফেলে দেয়। ফেরাউন দেশময় কর্তৃত্বের
 শিকরে আরোহণ করেছিল। আর সে তার হাত ছেড়ে রেখেছিল। (৮৪) আর
 মুসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে
 থাক, তবে তারই উপর ভরসা কর যদি তোমরা ফরমাবরদার হয়ে থাক।
 (৮৫) তখন তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। হে
 আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উপর এ জ্ঞানকে কণ্ঠের শক্তি পরীক্ষা
 করিও না। (৮৬) আর আমাদেরকে অনুগ্রহ করে ছাড়িয়ে দাও এই
 কারেফরদের কবল থেকে। (৮৭) আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মুসা এবং
 তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে
 বাসস্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কেবলামুখী করে
 এবং নামায কয়েম কর আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর।
 (৮৮) মুসা বলল, হে আমার পরওয়ারদেগার, তুমি ফেরাউনকে এবং তার
 সর্দারদেরকে পাখির জীবনের আড়ম্বর দান করবে, এবং সম্পদ দান
 করবে— হে আমার পরওয়ারদেগার, এ জন্যই যে তারা তোমার পথ থেকে
 বিপথগামী করবে। হে আমার পরওয়ারদেগার, তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস
 করে দাও এবং তাদের অন্তরগুলোকে কঠোর করে দাও যাতে করে তারা
 ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে যতক্ষণ না বেদনাদায়ক আঘাত প্রত্যক্ষ করে
 নেয়।

হয়েছে। প্রথম আয়াতে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কিত হুকুম রয়েছে।
 তা'হল এই যে, বনী-ইসরাঈল যারা মুসা (আঃ)—এর দ্বীনের উপর আমল
 করত তাদের সবাই নিয়মিত নিজেদের নির্ধারিত উপসনালয়েই নামায
 আদায় করত। তাছাড়া পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য নির্দেশও ছিল তাই।
 তাদের নামায ঘরে পড়ল আদায় হতো না। তবে এই বিশেষ সুন্নি
 মহানবী (সাঃ)—এর উম্মতকেই দান করা হয়েছে যে, তারা যে কোনখানে
 ইচ্ছা নামায আদায় করে নিতে পারে। সহীহ মুসলিমের এক হাদীস
 রসূল করীম (সাঃ) তাঁর ছয়টি বেশিষ্টের মধ্যে এটিও উল্লেখ করেছেন
 যে, আমার জন্য গোটা যমীনকে মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে; স
 জায়গাতেই নামায আদায় হয়ে যায়। তবে এটা আলাদা কথা যে, স
 নামাযসমূহ মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা সুন্নতে মু'আব্বাস
 সাব্যস্ত করা হয়েছে। নফল নামায ঘরে আদায় করা উত্তম। স্বয়ং রসূল
 করীম (সাঃ)—এরই উপর আমল করতেন। তিনি শুধু করব নাফল
 মসজিদে পড়তেন। সুন্নত ও নফলসমূহ ঘরে গিয়ে আদায় করতেন।
 যাহোক, বনী-ইসরাঈলরা তাদের মায়হাব বা ধর্মমত অনুসারে নিজেদের
 উপাসনালয়ে গিয়ে নামায আদায়ে বাধ্য ছিল। এদিকে ফেরাউন যে
 তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারে কষ্ট দিত এবং তাদের উপর অত্যাচার করত, সে
 বিষয়টি লক্ষ্য করে তাদের সমস্ত উপসনালয় ভেঙ্গে চুরমার করে দিল;
 যাতে এরা নিজেদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নামায পড়তে না পারে। একই
 কারণে আল্লাহ তাআলা বনী-ইসরাঈলের উভয় পয়গম্বর হযরত মুসা ও
 হারুন (আঃ)—কে নির্দেশ দান করলেন যা আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে
 মিসরে বনী-ইসরাঈলদের জন্য নতুন গৃহ নির্মাণ করা হোক যা কেবলামুখী
 হবে, যাতে করে তারা এসব আবাসিক ঘরেই নামায আদায় করতে পারে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এতে বোঝা যাচ্ছে, উম্মতের জন্য যদিও এ নির্দেশ ছিল যে
 তাদেরকে শুধুমাত্র নির্ধারিত উপসনালয়েই নামায পড়তে হবে, কিন্তু এই
 বিশেষ বাধার পরিকল্পিত বনী-ইসরাঈলদের জন্য নিজেদের ঘরে নামায
 আদায় করে নেয়ার সাময়িক অনুমতি দেয়া হয় এবং তাদের ঘরের দিক
 কেবলার দিকে সোজা করে নিতে বলা হয়। তাছাড়া এমনও বলা হয়ে
 পারে, এই বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তাদেরকে নির্ধারিত যে ঘর
 নামায পড়ার কথা বলা হয়েছিল, যা কেবলামুখী করে নির্মাণ করা
 হয়েছিল। সাধারণ ঘরে কিংবা সাধারণ জায়গায় নামায পড়ার অনুমতি
 তখনও ছিল না, যেমনটি মহানবী (সাঃ)—এর উম্মতের জন্য রয়েছে যে
 যে কোন শহরে কিংবা মাঠে যে কোন স্থানে নামায আদায় করার সুফল
 দেয়া হয়েছে।—(রুহুল-মা'আনী)

এখানে এ প্রশ্নটি লক্ষ্য করার মত যে, এ আয়াতে বনী-
 ইসরাঈলদেরকে যে কেবলার প্রতি মুখ করার হুকুম দেয়া হয়েছে তা কেবল
 কেবলা ছিল—কা'বা ছিল না বায়তুল মুকাদাস? হযরত আবদুল্লাহ ইবন
 আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এতে কা'বাই উদ্দেশ্য এবং কা'বাই ছিল হযরত
 মুসা (আঃ) ও তাঁর আত্মহাবের কেবলা।—(কুরতুবা, রুহুল-মা'আনী)
 বরং কোন কোন ওলামা এমনও বলেছেন যে, পূর্ববর্তী সমস্ত নবী রসূল
 কেবলাই ছিল কা'বা শরীফ।

আর যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা নিজেদের নামাযে 'সাধারণ
 বায়তুল মুকাদাস'ের দিকে মুখ করত, তাকে সে সময়ের সাথে সম্পর্ক
 করা হয়েছে, যখন হযরত মুসা (আঃ) মিসর ছেড়ে বায়তুল মুকাদাসে
 দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। এটা মিসরে অবস্থানকালে তাঁর কেবল
 বায়তুল্লাহ হওয়ার পরিপন্থী নয়।

قَالَ قَدْ أُجِيبْتُ دَعْوَتُكُمْ فَاسْتَقِيمُوا وَلَا تَبِغُوا سَبِيلَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَجُودًا بَيْنِي وَسَاءِلَ الْعَرْشِ وَبَيْنَهُ
فَرُغُونَ وَجُودُهُ بَيْنَهُمَا وَعَدُوٌّ أَسْحَىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْنُ قَالَ
أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آذَنَ بِهِ بِؤُسُ الْمَرْءِ وَلَوْ
أَتَانَا الْمُسْلِمِينَ ۝ أَلَمْ نَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَلَدْتَ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ۝ قَالَ يَوْمَ نُفَعِّجُكَ بِمَدَنِكَ لَتَكُونَنَّ لِي خَلْقًا
أَيُّهُوَ وَإِنْ كَذَّبَ الْإِنْسَانُ عَنِ الْإِنْسَانِ الْعَالَمُونَ ۝ وَلَقَدْ
بَوَّأْنَا بَيْنِي وَالْمَرْءِ مِمَّا وَاصِدَقْ وَرَفَقْتُهُمْ مِنَ الْكَلْبِ
فَمَا أَتَيْنَاهُمْ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَفُونَ ۝ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ
شِدَّةِ الْكَلْبِ لَآتِيكَ فَنَسِلَ الَّذِينَ يَفْرَوْنَ مِنَ الْكَلْبِ مِنْ
فَيْكِ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْزِلِينَ
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَذِبَتُكَ رَبِّكَ لَا
يُؤْمِنُونَ ۝ وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ ৮৯নং আয়াতের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, নামায পড়ার জন্য কেবলামুখী হওয়ার শর্তটি পূর্ববর্তী নবীগণের সময়েও বিদ্যমান ছিল। তেমনিভাবে পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রসুলের শরীয়তই নামাজের জন্য পবিত্রতা ও আবরু ঢাকা যে শর্ত ছিল, তাও নির্ভরযোগ্য রেওয়াজেতের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

এ আয়াতে দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদটি উভয় পয়গম্বরকেই দিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাদেরকে সামান্য পরীক্ষা করা হয়েছে যে, দোয়া কবুল হওয়ার লক্ষণ আল্লাহা বগতীর মতে চল্লিশ বছর পর প্রকাশিত হয়। সে কারণেই এ আয়াতে দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করার সাথে সাথে উভয় নবীকে এ হেদায়েতও দেয়া হয়েছে যে, فَاسْتَقِيمُوا وَلَا تَبِغُوا سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ অর্থাৎ, নিজেদের উপর অপিত দায়িত্ব দাওয়াত ও তবলীগের কাজে নিয়োজিত থাকুন, দোয়া কবুল হওয়ার প্রতিক্রিয়া যদি দেরীতেও প্রকাশ পায়, তবুও জাহেলদের মত তাড়াহুড়া করবেন না।

৯০ নং আয়াতে হযরত মুসা (আঃ)-এর বিখ্যাত মু'জেযা সাগর পাড়ি দোয়া এবং ফেরাউনের ডুব মরার বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে- حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْنُ قَالَ أَمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آذَنَ بِهِ بِؤُسُ الْمَرْءِ وَلَوْ أَنَّا لَمُسْلِمِينَ অর্থাৎ, যখন তাকে জলডুবিতে পেয়ে বসল তখন বলে উঠল, আমি ঈমান এনেছি যে, যে আল্লাহর উপর বনী-ইসরাঈলরা ঈমান এনেছে তাঁকে ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর আমি তাঁরই আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে তার উত্তর দেয়া হয়েছে أَلَمْ نَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَلَدْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ অর্থাৎ, কি এতক্ষণে ঈমান এনেছ? অথচ ঈমান আনার এবং ইসলাম গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ঠিক মৃত্যুকালে ঈমান আনা শরীয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টির আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ সে হাদীসের দ্বারাও হয়, যাতে মহানবী (সাঃ) বলেছেন— আল্লাহ তাআলা বন্দার তওবা ততক্ষণ পর্যন্তই কবুল করতে থাকেন যতক্ষণ না মৃত্যুর উর্ধ্বশূন্য আরম্ভ হয়ে যায়। — (তিরমিযী)

মৃত্যুকালীন উর্ধ্বশূন্য বলতে সে সময়কে বোঝানো হয়েছে, যখন জ্ঞান কবজ করার সময় ফেরেশতা সামনে এসে উপস্থিত হন। তখন কর্মজগত পৃথিবীর জীবন সমাপ্ত হয়ে আখেরাতের হুকুম-আহকাম আরম্ভ হয়ে যায়। কাজেই সে সময়কার কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়। ঈমানও নয় এবং কুফরও নয়। এমন সময়ে যে লোক ঈমান গ্রহণ করে, তাকেও মুমিন বলা যাবে না এবং কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুন্নপ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন, ফেরাউনের এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বিশৃঙ্খলিত মুসলিমের একমতো ফেরাউনের মৃত্যু কুফরী অবস্থায় হয়েছে। তাছাড়া কোরআনের প্রকৃষ্ট নির্দেশে এটাই সুস্পষ্ট। তাই যারা ফেরাউনের এই ঈমানকে গ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন, হয় তার কোন ব্যাখ্যা করতে হবে, না হয় তাকে ভুল বলতে হবে। — (রাহুল-মা'আনী)

৯১) বললেন, তোমাদের দোয়া মঞ্জুর হয়েছে। অতএব, তোমরা দু'জন লোক একে-একভাবে পথে চলে না যারা অজ্ঞ। (৯০) আর বনী-ইসরাঈলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। তারপর তাদের পশ্চাদ্ভাবন করে ফেরাউন ও তার সেনাবাহিনী, দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে। নদী যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল, তখন বলল, এবার বিশ্রাস করে যে, কোন যা বুদ নেই তাঁকে ছাড়া যার উপর ঈমান এনেছে বনী-ইসরাঈলরা। বস্ত্রও আমিও তাঁরই অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। (৯১) এখন বলল, অথচ তুমি ইতিপূর্বে না-ফরমানী করছিলে। এবং আমারই অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (৯২) অতএব আজকের দিনে বাচিয়ে দিচ্ছি যে তোমার দেহকে যাতে তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নির্দশ হতে পারে। আর হিসাবদেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না। (৯৩) আর আমি বনী-ইসরাঈলদিগকে দান করেছি উত্তম স্থান এবং আমার আহ্বান দিয়েছি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বস্ত্র-সামগ্রী। বস্ত্রও তাদের মধ্যে যতবিশেষ হয়নি যতক্ষণ না তাদের কাছে এসে পৌঁছেছে সংবাদ। হিসাবদেহে তোমার পরওয়ারদেরগার তাদের মাঝে যীমাসা করে দেবেন তোমাদের দিন; যে ব্যাপারে তাদের মাঝে যতবিশেষ হয়েছিল। (৯৪) তুমি যদি সে বস্ত্র সম্পর্কে কোন সন্দেহের সন্মুখীন হয়ে থাক যা তোমার প্রতি আমি নামিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার পরওয়ারদেরগারের নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি কশিনকালেও সন্দেহকারী হয়ো না। (৯৫) এবং তাদের অন্তর্ভুক্তও হয় না যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর বাণীকে। তাহলে তুমিও যখন পণ্ডিত হয়ে যাবে (৯৬) যাদের ব্যাপারে তোমার পরওয়ারদেরগারের সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হয়ে গেছে তারা ঈমান আনবে না। (৯৭) যদি তাদের সামনে সমস্ত নির্দশাবলী এসে উপস্থিত হয় তবুও যতক্ষণ না তারা দেখতে পায় বেদনাদায়ক আজাব।

এমনিভাবে খোদানাক্ষাত্তা এমন মুমূর্ষু অবস্থায় যদি কারো মুখ দিয়ে কুফরী বাক্য বেরিয়ে যায়, তবে তাকে কাকের ও বলা যাবে না। বরং তার জানাযার নামায পড়ে তাকে মুসলমানদের মত দাফন করতে হবে এবং তার সে কুফরী বাক্যের রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন, কোন কোন ওলী আল্লাহর অবস্থার দ্বারাও তার সমর্থন পাওয়া যায় যে, এমন বাক্য তাঁদের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল মানুষ যাকে কুফরী বাক্য মনে করে ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরে যখন তাঁর কিছুটা সংজ্ঞা ফিরে আসে এবং সে বাক্যে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলে দেন, তখন সবাই নিশ্চিন্ত হয় যে, তা সাক্ষাৎ ঈমানী বাক্যই ছিল।

সারকথা এই যে, যখন রূহ বেরোতে থাকে এবং অস্তিম অবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন সে সময়টি পার্শ্ববর্তীভাবে গণ্য হয় না। তখনকার কোন আমল বা কার্যকলাপ শরীয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুতঃ এর পূর্বকার যাবতীয় আমলই ধ্বংস হয়ে থাকে। কিন্তু উপস্থিত দর্শকদের এ ব্যাপারে প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কারণ, এ বিষয়টির সঠিক অনুমান করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি হতে পারে যে, বাস্তবিকই এ সময়টি রূহ বেরোবার কিংবা উর্ধ্বশ্বাসের সময় কি তার পূর্ব যুগুত।

এখানে ফেরাউনকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, জলমগ্নতার পর আমি তোমার লাশ পানি থেকে বের করে দেব যাতে তোমার এই মৃতদেহটি তোমার পরবর্তী জনগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ তাআলার মহাশক্তির নিদর্শন ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।

ঘটনাটি এই যে, সাগর পাড়ি দেবার পর হযরত মুসা (আঃ) যখন বনী-ইসরাঈলদেরকে ফেরাউনের নিহত হবার সংবাদ দেন, তখন তারা ফেরাউনের ব্যাপারে এতই ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল যে, তা অস্বীকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, ফেরাউন ধ্বংস হয়নি। আল্লাহ তাআলা তাদের সঠিক ব্যাপার প্রদর্শন এবং অন্যান্যদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে একটি ডেউয়ের মাধ্যমে ফেরাউনের মৃতদেহটি তীরে এনে ফেলে রাখলেন, যা সবাই প্রত্যক্ষ করল। তাতে তার ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এল এবং তার এ লাশ সবার জন্য নিদর্শন হয়ে রইল। তারপর এ লাশের কি পরিণতি হয়েছিল তা জানা যায় না। যেখানে ফেরাউনের লাশটি পাওয়া গিয়েছিল আজও সে স্থানটি ‘জাবালে ফেরাউন’ নামে পরিচিত।

কিছুকাল পূর্বে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল যে, ফেরাউনের লাশ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে, সাধারণ লোকেরাও তা প্রত্যক্ষ করেছে এবং আজ পর্যন্ত তা কায়রোর যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, এ ফেরাউনই সে ফেরাউন, যার সাথে হযরত মুসা (আঃ)-এর মোকাবেলা হয়েছিল, নাকি অন্য কোনও ফেরাউন। কারণ, ফেরাউন শব্দটি কোন একক ব্যক্তির নাম নয়; সে যুগে মিসরের সব বাদশাহকেই ফেরাউন পদবী দেয়া হত।

কিন্তু এটাও কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, আল্লাহ তাআলা যেভাবে

জলমগ্ন লাশকে শিক্ষামূলক নিদর্শন হিসাবে সাগর তীরে এনে ফেলেছিলেন, তেমনিভাবে সেটিকে আগত বংশধরদের শিক্ষার জন্য পচাগলা থেকেও রক্ষা করে থাকবেন এবং এখনো তা বিদ্যমান থাকবে।

পরবর্তী আয়াতে ফেরাউনের করুণ পরিণতির মোকাবেলায় সে জাতির ভবিষ্যৎ দেখানো হয়েছে, যাদেরকে ফেরাউন হীন ও পদবিক্ষিত করে রেখেছিল। বলা হয়েছে, আমি বনী-ইসরাঈলকে উত্তম আবাস দান করেছি। একদিকে তারা মিসর রাষ্ট্রের আধিপত্য লাভ করেছে এক অপরদিকে জর্দান ও ফিলিস্তানের পবিত্র ভূমিও তারা পেয়ে গেছে যার আল্লাহ তাআলা স্বীয় খলীল ইবরাহীম ও তাঁর সন্তানবর্গের জন্য সীমান বানিয়ে দিয়েছিলেন। উত্তম আবাসকে কোরআন করীমে **مُبَارَكًا** শব্দ ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে **مُبَارَكًا** অর্থ কল্যাণজনক ও উপযোগী। অর্থাৎ,

এমন আবাসভূমি তাদেরকে দান করা হয়েছে যা তাদের জন্য সবকিছু দিয়েই কল্যাণকর ও উপযোগী ছিল। অতঃপর বলা হয়েছে— আমি তাদেরকে হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রীর মাধ্যমে আহাৰ্য দান করেছি। অর্থাৎ, দুনিয়ার যাবতীয় সুখাদু বস্তু-সামগ্রী ও আরাম-আয়েশ তাদের দিয়ে দিয়েছি।

আয়াতের শেষাংশে আবার তাদের কুটিলতা ও ব্রাহ্ম আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যেও বহু লোক ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর আল্লাহ তাআলার নেয়ামতসমূহের মর্যাদা দেয়নি এবং তাঁর আনুগত্যে বিমূগ্ধ অবলম্বন করেছে। এরা রসুলে করীম (সাঃ) সম্পর্কে তওরাতের যে নিদর্শন পাঠ করত, তাতে তাঁর আগমনের সর্বাপ্রাে তাদেরই ঈমান আন উচিত ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, মহানবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবে পূর্বে তো এরা শেষ নবীর উপর বিশ্বাস পোষণ করত, তার নিদর্শনসমূহে তাঁর আগমনের সময় নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ লোকদেরকে বলত, নিজেরাও দোয়া করতে গিয়ে শেষ যমানার নবীর ওসীলা দিয়ে পোষ করত, কিন্তু যখন শেষ যমানার নবী (সাঃ) তাঁর যাবতীয় প্রমাণাদি এত তওরাতের বাতলানো নিদর্শনসহ আগমন করলেন, তখন এরা পারস্পরিক মতবিরোধ করতে লাগল এবং কিছু লোক ঈমান আনলেও অন্যান্য সবার অস্বীকার করল। এ আয়াতে রসুলে করীম (সাঃ)-এর আগমনকে **مُبَارَكًا** শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে **مُبَارَكًا** বলতে ‘নিশ্চিত বিশ্বাস’ ও উদ্দেশ্য হতে পারে। তাহলে অর্থ হবে এই যে, যখন প্রত্যক্ষ করার সাথ সাথে বিশ্বাসের উপকরণসমূহও সংযোজিত হয়ে গেল, তখন জ্ঞান মতবিরোধ করতে লাগল।

কোন কোন তফসীরবিদ একথাও বলেছেন যে, এখানে **مُبَارَكًا** অর্থ, যখন সে সত্তা সামনে এসে উপস্থিত হল, যা তওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে পূর্বাঙ্কেই জানা ছিল, তখন তারা মতবিরোধ করতে আরম্ভ করল।

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَهُ يَوْمَئِذٍ لَأَنَّ
أَمْوَاجَهُمْ كَغَمَاقٍ غَرَجَ عَذَابَ الْخُزْيِ فِي السَّيْرِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ
أَقَامَتْ تَحْرِيكَ النَّاسِ حَتَّى يَكُونُوا أَمْوُومِينَ ۝ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ
أَنْ تُوْثِقَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّبُّ عَلَى الَّذِينَ لَا
يَعْقِلُونَ ۝ قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي
الْأَيَّامُ وَاللَّيَالَى قَوْمٌ لَا يَتَذَكَّرُونَ ۝ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا
مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ هَلَكَ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلِ فَانْظُرُوا إِلَى مَعْمَرٍ
مِّنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ ثُمَّ دُخِّي يَسْلَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ
حَقَّ عَلَيْنَا لَنُحِشِرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ قُلِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي خَشِيتُ
سَاءَ مَرْنٍ دُخِّي فَلَا أُعْبِدُ الَّذِينَ يَنْعُبُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَكَّلُكُمْ ۝ وَأَمُرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنْ أَوْفَوْا وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فَرَأَوْكَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ۝ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ
وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللَّهُ يَدَهُ فَلَا تَكْشِفُ لَكَ اَلْاَهْوَالَ اَيُّوْمِكَ
يَعْرِ فَلَا رَاحَةَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ وَهُوَ
الْعَفُوُّ الرَّحِيمُ ۝ قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَنبَغِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا
يُضِلُّ عَلَيْهِمَا وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝ وَاَتَيْنَهُ مَا يَوْصَىٰ
اِلَيْكَ وَاَصْبَحَ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّ
الرَّسُوْلَ اَحْكَمَ اِلٰهَ تَعَالٰى ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْكَ حِكْمَةٌ خَيْرٌ اَلَّا
تَعْبُدُوْا اِلَّا اللَّهَ اَلَا اِنَّيْٓ اِلٰهَكُمْ مِّنْ دُوْنِ وَّيْحٰىۤا وَيَسْۤا ۝ اَلَا اَسْتَغْفِرُوْا
رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْنَ اِلَيْهِ فَيُعْطِيْكُمْ مِّمَّا عَسَلْتُمْ اِلٰىٰ حِيلَ سَمٰىۤا وَ
يُوْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ۝ اِنَّ كُوْلُوْا فَاِذَا اِنْحَافَ عَلٰىكُمْ
عَذَابُ يَوْمٍ يُدْعٰى اِلَى اللَّهِ رُجْعَتُهُمْ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْۤءٍ قَدِيْرٌ ۝
اَلَا اَلْاَهْمَبِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُمْ لَيْسَتْ اَسْفُوْا مِمَّا اَلْحٰبِسُ يَسْتَعْمِلُوْنَ
شِيْءًا مَّعْلُوْمًا لَا يَمِيْرُوْنَ وَمَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ عَلَيْهِمْ لَكٰتُ الْفُتُوْرِ ۝

১১৭) আর আল্লাহ যদি তোমার উপর কোন কষ্ট আরোপ করেন তাহলে কেউ নেই তা ষণ্ডাবার মত তাঁকে ছাড়া। পক্ষান্তরে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন, তবে তার যেহেতুবানীকে রহিত করার মতও কেউ নেই। তিনি প্রতি অনুগ্রহ দান করতে চান স্বীয় বাপ্পাদের মধ্যে তাকেই দান করেন; বস্ত্ত: তিনিই ক্রমাশীল দয়ালু। (১০৮) বলে দাও, হে মানবকুল, সত্য তোমাদের কাছে পৌছে গেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে। এমন যে কেউ পথে আসে সে পথ গ্রাপ্ত হয় স্বীয় মঙ্গলের জন্য। আর যে বিব্রাভ ঘুরতে থাকে, সে স্বীয় অমঙ্গলের জন্য বিভ্রাভ অবস্থায় ঘুরতে থাকবে। অনন্তর আমি তোমাদের উপর অধিকারী নই। (১০৯) আর তুমি চল সে অনুযায়ী যেমন নির্দেশ আসে তোমার প্রতি এবং সবার কর, যতক্ষণ না ফয়সালা করেন আল্লাহ। বস্ত্তত: তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

সূরা হুদ

মকায় অবতীর্ণ: আয়াত: ১২০

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(১) আলিফ, লা-ম, র: এটি এমন এক কিতাব, যার আয়াতসমূহ সুসংগঠিত অতঃপর সবিত্ত্বের বর্ণিত এক মহাঙ্গানী; সবঙ্গ সত্তার পক্ষ হতে। (২) যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো বন্দগী না কর। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাঁরই পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। (৩) আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তা সমীপে ক্রমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং অধিক আমলকারীকে বেশী করে দেন। আর যদি তোমরা বিমুখ হতে থাক, তবে আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি। (৪) আল্লাহর সান্নিধ্যেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৫) জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বন্ধুদের ঘুরিয়ে দেয় যেন আল্লাহর নিকট হতে লুণ্ঠাতে পারে। শুন, তারা তখন কাপড় নিজেদেরকে আচ্ছাদিত করে, তিনি তখনও জানেন যা কিছু তারা দুপিসারে বলে আর ধকাস্যভাবে বলে। নিশ্চয় তিনি জানেন যা কিছু অন্তরসমূহে নিহিত রয়েছে।

—“ইউনুস (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এজন্য চলে যাচ্ছিলেন যে, তিনি সম্প্রদায়ের কঠিন বিরোধিতা এবং কুফরীর উপর হঠকারিতা সত্ত্বেও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত রেসালতের আহবান জানাতে থাকার ফলাফল প্রত্যক্ষ করে নিয়েছিলেন।”

বস্ত্তত: তাঁর এ সফর ছিল হিজরত হিসাবেই। অথচ তখনও তিনি হিজরতের অনুমতি লাভ করেননি।

এতে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর প্রতি ভৎসনা আসার কারণ রেসালত ও দাওয়াতের দায়িত্বে শৈথিল্য প্রদর্শন ছিল না; বরং অনুমতির পূর্বে হিজরত করাই ছিল ভৎসনার কারণ। উল্লেখিত সমকালীন তফসীরকারকে কোন কোন গলামা তাঁর এই ভুলের ব্যাপারে অবহিত করলে তিনি সূরা-সাফাফাতের তফসীরে স্বীয় মতবাদের সমর্থন অনেক তফসীরবিদের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে ওহাব ইবনে মুনাবিহ প্রমুখের ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহ ছাড়া অন্য কোনটির দূরারই তাঁর এ মতবাদের সমর্থন প্রমাণিত হয় না যে, হযরত ইউনুস (আঃ)—এর দ্বারা (মা’ আযাল্লাহ) রেসালতের দায়িত্ব সম্পাদনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছিল।

তাছাড়া জ্ঞানবান বিজ্ঞ লোকদের একথা অজ্ঞানা নেই যে, তফসীরবিদগণ নিজেদের তফসীরে এমনসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহও উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, যেগুলোর ব্যাপারে তাদের সবাই একমত যে, এসব রেওয়ায়েত প্রামাণ্য কিংবা গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তের কোন হুকুমকে এগুলোর উপর নির্ভরশীল করা যায় না। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত মুসলিম তফসীরবিদদের গ্রন্থেই থাক বা ইউনুস (আঃ)—এর সহীফাতেই থাক, শুধু এসবের উপর নির্ভর করেই হযরত ইউনুস (আঃ)—এর উপর এহেন মহা অপবাদ আরোপ করা যেতে পারে না যে, তাঁর দ্বারা রেসালতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়েছে। ইসলামের কোন তফসীরকার এহেন কোন মত গ্রহণও করেননি।

সূরা হুদ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হুদ ঐসব সূরার অন্যতম যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আপত্তিত খোদায়ী গজব ও বিভিন্ন প্রকার কঠিন আযাবের এবং পরে কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা বিশেষ বর্ণনারীতির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) একদিন হযরত রসুলে করীম (সাঃ)—এর কিছু দাড়ি-মোবারক পাকা দেখে বিচলিত হয়ে যখন জিজ্ঞেস করলেন—“ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ); আপনি বার্ষিক্যে উপনীত হয়েছেন।” তখন রসুলে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছিলেন, “হী, সূরা হুদ আমাকে বন্ধ করে দিয়েছে।” তখন কোন কোন রেওয়ায়েতে সূরা হুদের সাথে সূরা ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আশ্মা ইয়াতাসা’আলুন এবং সূরা তাকবীরের নামও উল্লেখ করা হয়েছে।—(আল-হাকেম ও তিরমিযী শরীফ) উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত সূরাগুলিতে বর্ণিত বিষয়বস্ত্ত অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ হওয়ার কারণে এসব সূরা নাযিল হওয়ার পর রসুলে পাক (সাঃ)—এর পবিত্র চেহরায় বার্ষিক্যের লক্ষণ দেখা দেয়।

অত্র সূরার প্রথম আয়াত “আলিফ লা’ম রা” বলে শুরু করা হয়েছে। এগুলো সে সমস্ত বর্ণের অন্তর্ভুক্ত যার সঠিক মর্ম একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর

রসুল (সাঃ)—এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য। অন্য কাউকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি; বরং এ ব্যাপারে চিন্তা করতেও বাধা করা হয়েছে।

অতঃপর কোরআন মজীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি এমন এক কিতাব যার আয়াতসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। **مَحْكَم** শব্দ **أَحْكَم** হতে গৃহীত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে কোন ব্যাক্যকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করা যার মধ্যে শব্দগত বা ভাবগত কোন বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। সেমতে আয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার মর্যাদা এই যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহকে এমনভাবে তৈরী করেছেন যাতে শাস্তিক অথবা ভাবগত দিক দিয়ে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি, অস্পষ্টতা বা অসারতার সম্ভাবনা নেই।—(তফসীরে-কুরতুবী)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন এখানে **مَحْكَم** শব্দ **مَنْسُوح**—এর বিরূপীত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেমতে আয়াতের মর্ম হবে—আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকের আয়াতসমূহকে সামগ্রিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, অপরিবর্তিতরূপে তৈরী করেছেন। তওরাত, ইঞ্জীল, ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাসমূহ পবিত্র কোরআন নাখিলের ফলে যেভাবে ‘মনসুখ’ বা রহিত হয়েছে কোরআন পাক নাখিল হওয়ার পর যেহেতু নবীর আগমন এবং গুহীর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব আর রহিত হবে না।—(কুরতুবী) তবে কোরআনের এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াত রহিত হওয়া এর পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য ১ম আয়াতেই **تَفْصِيلًا** অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে বলে কোরআন পাকের আরেকটি মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। **تَفْصِيلًا** শব্দের আভিধানিক অর্থ দু'টি বস্তুর মাঝে পার্থক্য ও ব্যবধান করা। সে জন্যেই সাধারণ গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন বিষয়বস্তু **فصل**, **فصل** শিরোনামে আলোচনা করা হয়। সে হিসাবে অত্র আয়াতের মর্ম হবে, আকায়েদ, এবাদত, লেন-দেন আচার-ব্যবহার ও নীতি-নৈতিকতার বিষয়বস্তুগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর আরেক অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তো পূর্ণ কোরআন মজীদ একসাথে লওহে মাহফয্য়ে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারপর স্থান-কাল-পাত্র, পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর সুরণ রাখা, মর্ম অনুধাবন করা এবং ক্রমানুয়ে তদনুযায়ী আমল করা সহজ হয়।

অতঃপর বলা হয়েছে **وَنُزِّلْنَاهُ مَكِّيًّا** অর্থাৎ, এসব আয়াত এমন এক মহান সন্তার পক্ষ হতে আগত হয়েছে, যিনি মহা প্রজ্ঞা ও সর্বজ্ঞ, যার প্রতিটি কাজে বহু তাৎপর্য ও হেকমত বিদ্যমান—যা অল্প উপলব্ধি করতে অক্ষম। তিনি সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু ভূত-ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি যাবতীয় বিধি-নিষেধ নাখিল করেন। মানুষ যতবড় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান ও দূরদর্শী হোক না কেন, তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা এক নির্দিষ্ট সীমারেখার গন্ডিতে আবদ্ধ। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ভিত্তিতে জ্ঞান অভিজ্ঞতা গড়ে উঠে। ভবিষ্যৎকালে অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক সমস্যা জন্ম ব্যর্থ ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার এলম ও হেকমত কখনো ভুল হবার নয়।

দ্বিতীয় আয়াতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ, তওরাতের উপরোক্তোক্ত আয়াতসমূহের বর্ণনা আরম্ভ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে **أَكْرَمَ مَكِّيًّا** অর্থাৎ, “একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো বন্দগী করবে না।” আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও এবাদত-উপাসনা করবে না।

অতঃপর এরশাদ করেছেন **إِنِّي لَكُم مِّنْ ذُرِّيَّتِي** “নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। অত্র আয়াতে বিশুবদী (সাঃ)—কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তিনি সারা বিশুবদীকে যেন জানিয়ে দেন যে, আমি আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী। অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য ও বিরুদ্ধাচরণকারী এবং নিজেদের অবৈধ কামনা-বাসনার অনুসরণ করে তাদেরকে আল্লাহর ভীতি প্রদর্শন করছি। অপরিদর্শিতা অনুগত, বাধ্য লোকদের দে-জাহানের শাস্তি ও নিরাপত্তা এবং আখেরাতে অক্ষয় নেয়ামতের সুসংবাদ দিচ্ছি।

ذُرِّيَّةٌ শব্দের অর্থ করা হয়, “ভীতি প্রদর্শনকারী।” কিন্তু এ শব্দটি ভীতি প্রদর্শনকারী শত্রু কিংবা হিংস্রজন্তু বা অন্য কোন অনিষ্টকারীর জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং এমন ব্যক্তিকে “নাযীর” বলা হয় যিনি পীর প্রিয়পাত্রগণকে সসুহে এমনসব বস্তু বা কার্য হতে বিরত রাখেন ও জা দেখান, যা তাদের জন্য দুনিয়া, আখেরাত অথবা উভয় লোকের ক্ষতিকারক।

زرق

৯

७

তদ্ব্যতীত একটি জবাব হচ্ছে, এখানে রিথিকের দায়িত্ব গ্রহণের অর্থ হবে আয়ুষ্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত আত্মা তাআলা রিথিকের দায়িত্ব নিয়েছেন। আয়ুষ্কাল শেষ হওয়া মাত্র তাকে মৃত্যুবরণ করে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিদায় নিতে হবে। সাধারণত বিভিন্ন রোগ-ব্যধির কারণে মৃত্যু হলেও কখনো কখনো অগ্নিদগ্ধ হওয়া, সলিল সমাধি লাভ করা, আঘাত বা দুর্গতিনায় পতিত হওয়াও এর কারণ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে রিথিক বন্ধ করে দেয়ার কারণে অনাহারও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। কাজেই, আমরা যাদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে দেবি, আসলে তাদের রিথিক ও আয়ু শেষ হয়ে গেছে, অভ্যুপ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رُخْسَتُهَا
يَعْلَمُ مَسَاقِفَهَا وَمَسَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝
هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ
عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ
إِنَّكُمْ تَبْعُونَ مَنْ بَعْدَ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ
هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۝ وَلَئِنْ أَخْرَجْنَا عَنْكُمْ الْعَذَابَ إِلَى آتَمِّ
مَعْدَدٍ لَيَقُولَنَّ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ إِلَّا يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَافُورُ
عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَا
الْإِنْسَانَ مَتَاعَ حَيَاةٍ ثُمَّ رَدَّغْنَاهُ إِنَّهُ لَكَايُوسٌ كَفُورٌ ۝
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مِمَّا نَسْتَأْذِنُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ
السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورًا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا نُوحِيَ إِلَيْكَ وَصَاحِبٌ بِرِ
صَدْرٍ ۚ إِنَّ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ وَجَاءَ مَعَهُ
مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

৫) আর পৃথিবীতে কোন বিচরণশীল নেই, তবে সবার জীবিকার
পরিচয় আল্লাহ নিয়ন্ত্রণে, তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং
কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত ক্রিাভাবে রয়েছে। (৭)
তিনি আসমান ও বর্ষীয় ছয় দিনে সৈরী করেছেন, তাঁর আরশ ছিল
পানির উপরে, তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, তোমাদের
কিছু কে সবচেয়ে ভাল কাজ করে। আর যদি আপনি তাদেরকে
বলেন যে, “নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত উঠানো হবে,
তখন কারেকরা অবশ্যই বলে এটা তো স্পষ্ট পড়ে। (৮) আর যদি আমি
কিছু নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তাদের আযাব স্থগিত রাখি, তাহলে তারা
নিশ্চয়ই বলবে কোন জিনিসে আযাব ঠেকিয়ে রাখছে? শুনে রাখ,
বলিন তাদের উপর আযাব এসে পড়বে, সেদিন কিন্তু তা ফিরে
স্বপ্নার নম্ব; তারা যে ব্যাপারে উপহাস করত তাই তাদেরকে ঘিরে
কেন্দ্রে। (৯) আর অবশ্যই যদি আমি মানুষকে আমার বহমতের
আযাব গ্রহণ করতে দেই, অতঃপর তা তার থেকে ছিনিয়ে নেই,
অত্বে সে হতশ্রী ও কৃতব্র হয়। (১০) আর যদি তার উপর আপতিত
কিছু-কিছুর পরে তাকে সুখভোগ করতে দেই, তবে সে বলতে থাকে
যে, আমার অমরক্স দূর হয়ে গেছে, আর সে আনন্দে আত্মহারা হয়,
অত্বে তার উদ্ধৃত হয়ে পড়ে। (১১) তবে যারা ঐর্ষধারণ করেছ এবং
স্বকর্ষ করেছ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে। (১২)
আর সম্ভবতঃ ঐসব আহকাম যা ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট পাঠানো
হয়, তার কিছু অংশ বর্জন করবে? এবং এতে মন ছোট করে বসবে?
আমের এ কথায যে, তাঁর উপর কোন ধন-ডান্ডার কেন অবতীর্ণ
হয়নি? অথবা তাঁর সাথে কোন ফেরেশতা আসেনি কেন? তুমিতো
শুধু সমকর্কারী যাত্র; তবে সব কিছুই দায়িত্বভার তো আল্লাহই
নিয়ন্ত্রণে।

রোগ-ব্যাধি বা দুর্ ঘটনায় তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি না ঘটিয়ে বরং রিযিক সরবরাহ বন্ধ হওয়ার কারণে অনাহার ও ক্ষুধা-পিপাসায় তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।

ইমাম কুরতুবী (রাঃ) অত্র আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবু মুসা (রাঃ) ও হযরত আবু মালেক (রাঃ) প্রমুখ আশআরী গোত্রের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন যে, তারা ইয়ামন হতে হিজরত করে মদীনা শরীফ পৌঁছলেন। তাঁদের সাথে পাথের স্বরূপ আহাৰ্য পানীয় যা ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে গেলে তাঁরা নিজেদের পক্ষ হতে একজন মুখপাত্র হযরত (সাঃ)-এর সমীপে প্রেরণ করলেন যেন রসূলে করীম (সাঃ) তাদের জন্য কোন আহাৰ্যের সুব্যবস্থা করেন। উক্ত প্রতিনিধি যখন রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর গৃহদ্বারে হাযির হলেন, তখন গৃহাভ্যন্তর হতে রসূলে পাক (সাঃ)-এর কোরআন তোলাওয়াতের সুমধুর শব্দ ভেসে এল وَمَا مِنْ

دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا لِيَرْزُقَهَا পৃথিবীতে চিরচরকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেননি। সাহাবী অত্র আয়াত শ্রবণ করে মনে করলেন যে, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং যখন খাবতীয় প্রাণীকূলের রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আমরা আশআরী গোত্রের লোকেরা আল্লাহ তাআলার নিকট নিশ্চয় অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে নিকৃষ্ট নই, অতএব তিনি অবশ্যই আমাদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। এ ধারণা করে তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিজেদের অসুবিধার কথা না বলেই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং ফিরে গিয়ে স্বীয় সাথীদের বললেন—“শুভ-সংবাদ, তোমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য আসছে।” তাঁরা এ কথার অর্থ বুঝলেন যে, তাঁদের মুখপাত্র নিজেদের দুরবস্থার কথা রসূলে পাক (সাঃ)-কে অবহিত করার পর তিনি তাঁদের আহাৰ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করার আশাস দান করেছেন। তাই তাঁরা নিশ্চয় মনে বসে রইলেন। তাঁরা উপবিষ্টই ছিলেন, এমন সময় দুই ব্যক্তি গোশত-রুটিপূর্ণ একটি قِصْعَةً অর্থাৎ, বড় খাঙ্কা বহন করে উপস্থিত হয়ে আশআরীদের দান করল। অতঃপর দেখা গেল আশআরী গোত্রের লোকদের আহাৰ্য করার পরও প্রচুর রুটি-গোশত রয়ে গেল। তখন তাঁরা পরামর্শ করে অবশিষ্ট খানা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সমীপে প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন, যেন তিনি প্রয়োজন অনুসারে ব্যয় করতে পারেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের দুই ব্যক্তির মাধ্যমে তা রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন।

তাঁরা খাঙ্কা নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন—“ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ), আপনার প্রেরিত রুটি-গোশত অত্যন্ত সুখাদ্য ও উপাদেয় এবং প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয়েছে।” তদুত্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “আমি তো কোন খাদ্য প্রেরণ করিনি।”

তখন তাঁরা পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন যে, আমাদের অসুবিধার কথা আপনার কাছে ব্যক্ত করার জন্য অমুক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি ফিরে গিয়ে একথা বলেছিলেন। ফলে আমরা মনে করেছি যে, আপনিই খানা প্রেরণ করেছেন। এতদশ্রবণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন—“আমি নই বরং ঐ পবিত্র সত্তা প্রেরণ করেছেন যিনি সকল প্রাণীর রিযিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।”

আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলে করীম (সাঃ)-এর রেসালতের সত্যতা এবং এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদের জবাব দেয়া হয়েছে। ৯ম থেকে তিন আয়াতে মানুষের একটি স্বভাবজাত বদভ্যাসের বর্ণনা এবং উহা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৯ম ও ১০ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ জন্মগতভাবে ঢল প্রকৃতির ও ক্ষিপ্তাবাদী। এতদসঙ্গে মানুষের বর্তমান নিয়ে বিভোর হওয়া অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। একজন করেছেন, আমি মানুষকে আমার কোন নেয়ামতের স্বাদ-আবাদন করার পর যদি তা হিনিয়ে নেই, তবে তারা একেবারে হিম্মত-হারা, হতাশ ও না-শোকর হয়ে যায়। আর তার উপর দুঃখ-দুর্দশা আপতিত হওয়ার পর, যদি তা দূরীভূত করে সুখ-শান্তি দান করি, তাহলে তারা আনন্দ আত্মহারা হয়ে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল চিরতরে দূরীভূত হয়ে গেছে।

সারকথা এই যে, মানুষ স্বভাবতঃ ক্ষিপ্তাবাদী বর্তমান অবস্থাকে তারা সর্বশ্রম মনে করে থাকে। অতীত ও ভবিষ্যতের অবস্থা এবং ইতিহাস স্মরণ রেখে এবং চিন্তা করে শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা অত্যাশ্রয় না। কাজেই, সুখ-সমৃদ্ধির পর দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়া মাত্র অতীত নেয়ামতরাজির প্রতি নিমকহারামী করে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশাবাদ হয়ে পড়ে। যে মহান সত্তা প্রথমে সুখ-সচ্ছলতা দান করেছিলেন, তিনি যে আবারও তা দিতে পারেন সে কথা তারা খেয়ালই করে না। অনুরপভাবে দুখ-দৈন্যের পরে যদি সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে, তখন পূর্বাবস্থা স্মরণ করে আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করার পরিবর্তে হঠকারিতা ও অহম্ব্য করতে থাকে। অতীতকে বিস্মৃত হয়ে তারা মনে করতে থাকে যে, এসে সুখ-সম্পদ আমারই যোগ্যতার পুরস্কার এবং অব্যাহতাবী প্রাপ্য। এক কখনো আমার হাতছাড়া হবে না। আত্মভোলা মানুষ এ কথা চিন্তা করেন যে, পূর্ববর্তী দুঃখ-দুর্দশা যেমন স্থায়ী হয়নি, তদ্রূপ বর্তমান সুখ-স্বচ্ছল চিরস্থায়ী নাও হতে পারে।

১১ তম আয়াতে এমনি ইনসানে-কামেল বা সত্যিকার মানুষকে সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা হতে পৃথক করার জন্য এরশাদ করেছেন

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ অর্থাৎ, সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা উর্ধ্ব এসব ব্যক্তি যাদের মধ্যে দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে। একটি হচ্ছে ধৈর্য ও সহনশীলতা, দ্বিতীয়টি সংকমশীলতা।

সবর শব্দটি বাংলা ও উর্দুর চেয়ে আরবী ভাষায় অনেক ব্যাপকতর অর্থ ব্যবহৃত হয়। সবরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাধা মো, বন্ধন করা। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় অন্যান্য কার্য হতে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করাকে ‘সবর’ বলে। সুতরাং শরীয়তের পরিপন্থী যাবতীয় পাপকার্য হতে প্রবৃত্তিকে দমন করা যেমন সবরের অন্তর্ভুক্ত, তদ্রূপ ক্ষয়, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব ইত্যাদি নেক কাজের জন্য প্রবৃত্তিকে ব্যা করাও সবরের শামিল। সারকথা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এ প্রতি পূর্ণ ঈমান ও রোজ কেয়ামতের জবাবদিহির ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ ও রসূলের অপসন্দনীয় কার্যকলাপ হতে দূরে থাকে এবং সন্তোষজনক কার্য মশগুল থাকে, তারাই পূর্ণ ঈমানদার ও সত্যিকার মানুষ নামের যোগ্য। অত্র আয়াতেরই শেষ বাক্যে ধৈর্য ধারণকারী, সংকমশীল, পূর্ণ ঈমানদারগণের প্রতিদান ও পুরস্কারের কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে وَلِلَّهِ يُرْزَقُ لَهُمْ مَقْصُورٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ অর্থাৎ, তাদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে তাঁদের গোনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে এবং তাদের সংকামসমূহে বিরাট প্রতিদান দেয়া হবে।

এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, পার্শ্বি সুখ-দুঃখ উভয়কে আল্লাহ তাআলা يُرْزَقُ “স্বাদ আবাদন করাই” বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ সুখ-দুঃখ পরকালে হবে। পৃথিবীতে পুরোপুরি সুখ বা দুঃখ নেই। বর

(৬) পার্শ্বি কোষ তিনি পানি যথ্য বলেন তখন এক নিচ্চ বেদি যাপ্ত ফেল আশ্র জাহ দুঃখ যে, অহং স্বক আর হয়, তাহে হয়নি শুষ্ক নিয়ে

পক্ষে স্বাদ গ্রহণের জন্য নমুনাধরূপে যৎকিঞ্চিৎ সুখ-দুঃখ দেয়া হইবে, আখেরাতের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে সুভার পান্থি সুখ-শান্তিতে আনন্দে আত্মহারা হওয়া যেমন তদ্রূপ পান্থি দুঃখ-দুর্দশাও অত্যধিক বিমর্ষ হওয়ার বিষয় নয়। দুনিয়াকে আধুনিক পরিভাষা অনুসারে আখেরাতের একটা ধরূপ বলা যেতে পারে। যেখানে আখেরাতের সুখ-দুঃখের নমুনা দ্রব্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ইহম আয়াত এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তা মকার মুশরিকরা মহানবী (সাঃ) সমীপে কতিপয় আবদার পেশ করিল। প্রথমতঃ তারা বলল, এতে আমাদের দেব-দেবীকে নিন্দা করা হইছে তাই আমরা এর প্রতি ঈমান আনতে পারছি না। অতএব, আপনি আমাদের কোরআন নিয়ে আসুন অথবা এর মধ্যে পরিবর্তন ও সংশোধন করুন। **أَتَىٰ يَسُوءُ ٱلْأَنفُسَ هَٰذَا ٱلْأَنفُسَ** আপনি অন্য কোরআন নিয়ে আসুন অথবা এগুলো পরিবর্তন করুন।—(তফসীরেবগবী ও তফসীরে মুনীর)।

দ্বিতীয়তঃ তারা আরো বলেছিল যে, “আমরা আপনার নবুওয়তের প্রতি তখন বিশ্বাস স্থাপন করব, যখন দেখব যে, দুনিয়ার বাদশাহদের মত আপনার আয়ত্তে কোন ধন-ভান্ডার রয়েছে এবং আপনি থেকে আপনি সবাইকে দান করেছেন। অথবা, আসমান হতে কোন বস্তু পড়তে অবতরণ করে আপনার সাথে সাথে থাকবেন এবং আপনার আশীর্বাদ করবে বলে যে, ইনি সত্যিই আল্লাহর রসূল।”

তাদের এহেন অবাস্তব ও অযৌক্তিক আবদার শুনে রসূলে করীম (সাঃ) মনঃক্ষুব্ধ হলেন। কারণ, তাদের অযৌক্তিক আবদার পূরণ করা এমন তাঁর এখতিয়ার বহির্ভূত ছিল, তদ্রূপ তাদেরকে কুফরী ও শেরকের দ্বারা ছেড়ে দেয়াও অসহনীয় ছিল, তাদের হেদায়েতের চিন্তা-ফিকির দূর হতে দূর করাও সম্ভবপর ছিল না। কেননা, রাহমাতুল-লিল-লামীন বা সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমতস্বরূপ তিনি অবতরণ করছিলেন।

বস্তুতঃ তাদের আবদার ছিল নিরৈক্য মূর্ততা ও চরম অজ্ঞতা-প্রসূত। কেননা, সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অসার মূর্তিপূজা ও অন্যান্য নিন্দনীয় কার্য-কলাপের সমালোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়তঃ নবুওয়তকে তারা বাদশাহীর সাথে তুলনা করেছিল। আসলে ঈ-ভান্ডারের সাথে নবুওয়তের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। অপরদিকে আল্লাহ তাআলারও এমন কোন রীতি নেই যে, তিনি বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে মানুষকে দিয়ে ঠেকিয়ে ঈমান আনতে বাধ্য করবেন। তাই যদি হতো, তবে নিখিল সৃষ্টিজগত তাঁর অপার কুদরতের আওতায়ই রয়েছে। কিন্তু সত্য ছিল যে, তাঁর অপছন্দনীয় কোন কাজ করবে বা চিন্তাধারা পালন করবে? কিন্তু তাঁর অফুরন্ত হেকমতের তাগিদে ইহ-জগতকে সঠিকাক্ষেপে সাব্যস্ত করেছেন। এখানে সংকার্য সম্পাদন অথবা, সত্য-অসত্য থেকে বিরত রাখার জন্য বৈষয়িক দিক থেকে কাউকে

বাধ্য করা হয় না।

তবে যুগে যুগে পয়গম্বর প্রেরণ ও আসমানী কিতাব নাযিল করে ভাল-মন্দের পার্থক্য এবং তার প্রতিকূল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। সংকার্য করা ও অসংকার্য থেকে দূরে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুজ্জাব্বারূপ সাথে সাথে যদি কোন ফেরেশতা থাকতেন, তবে যখনই কেউ তাঁকে অমান্য করত, তৎক্ষণাৎ গণবে পতিত হয়ে ধ্বংস হত। ফলে তা দায়ে ঠেকে ঈমান আনার পর্যায়ভূক্ত হত। তাছাড়া ফেরেশতার সাক্ষ্যদানের পর ঈমান আনা হলে তা ঈমান বিল-গায়ব বা গায়বের প্রতি ঈমান হত না। অথচ ঈমান বিল-গায়বই হচ্ছে ঈমানের মূল প্রাণশক্তি। আর ঈমান না আনার এখতিয়ারও থাকত না। অথচ এই এখতিয়ারের উপরই যাবতীয় আমলের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমীপে তাদের এহেন অসহনীয় আবদার প্রমাণ করে, তারা নবী ও রসূলের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ ও জাহেল ছিল। তারা আল্লাহ তাআলা ও রসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখে না; বরং আল্লাহর ন্যায় রসূলেরও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। তাই রসূলের কাছে তারা এমন আবদার করেছে যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ পূরণ করতে পারে না।

যাহোক, রসূলে করীম (সাঃ) তাদের এহেন অবাস্তব আবদারে অত্যন্ত দুঃখিত ও মনঃক্ষুব্ধ হলেন। তখন তাঁকে সাবুনা দান ও মুশরেকদের শাস্ত ধারণা নিরসনের জন্য অত্র আয়াত অবতীর্ণ হল।

যাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি কি তাদের কথায় হতোদ্যম হয়ে আল্লাহর প্রেরিত কোরআন পাকের কোন কোন আয়াত প্রচার করা ছেড়ে দেবেন, যার মধ্যে মূর্তির অসারতা ও অক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে বলে মুশরেকরা ঐ সব আয়াত অপছন্দ করছে? এখানে **لَمَّا** শব্দ এজন্য প্রয়োগ করা হয়নি যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন কোন আয়াত বাদ দেবেন বলে ধারণা করার অবকাশ ছিল। বরং এখানে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, মুশরেকদের মনোরঞ্জনের খাতিরে রসূলে পাক (সাঃ) কোরআন করীমের কোন আয়াত গোপন রাখতে পারেন না। কারণ, তিনি তো আল্লাহর পক্ষ হতে **نَزِير** ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরিত হয়েছেন। সর্ব কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই গ্রহণ করেছেন। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখনই নবীর মাধ্যমে মুজ্জাব্বার প্রদর্শন করেন। অতএব, তাদের অন্যান্য আবদারে আপনার মনঃক্ষুব্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

কাফের ও মুশরেকরা শুধু ভীতি প্রদর্শনের যোগ্য হওয়ার কারণে এখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে **نَذِير** নায়ীর বলা হয়েছে। নতুবা তিনি একদিকে যেমন **نَذِير** (ভীতি প্রদর্শক) ছিলেন, অপরদিকে সংকম্পীলদের জন্য তদ্রূপ **مُبَشِّر** সুসংবাদদাতাও ছিলেন। অধিকন্তু ‘নায়ীর’ এমন ব্যক্তিকে বলে যিনি স্নেহ-মমতার ভিত্তিতে স্বীয় প্রিয়জনকে অনিশ্চয় ও ক্ষতিকর বস্তু হতে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করেন এবং রক্ষা করার চেষ্টা করেন। অতএব, নায়ীর শব্দের মধ্যে ‘বায়ীর’-এর মর্মও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হুদ

২২২

وَمِنْ دَانِيَةِ ۱৩

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِينَ ۝
 ادْعُوا مَنِ اسْتَعْتَضْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝
 قَالُوا يَتَّبِعُونَ آلَهُمْ قَاعَمُوا آلَهُمَا إِنزِيلَ عَلِيمٍ ۝
 الْأَهُ قُفْلُ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ مَن كَانَ رِيْدَ الْيَتَامَىٰ
 رَبِّهَا نَوْفَ الْيَوْمِ أَحَبَّهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْسُوتُونَ ۝
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كُنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا
 صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ
 يَدَيْهِ ذُنُوبٌ وَبِتَوَاتُوهَ شَهِيدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ يَكْفُرُونَ ۝
 إِمَّا مَّا رُحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ
 الْأَحْزَابِ قَالَتُمْ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ
 مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ
 يَقُولُ الرَّسُولُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا
 لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ
 اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে মুশরেকদের পক্ষ হতে বিশেষ ধরনের মু'জ্জেবা কবী করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, হযরত (সাঃ)-এর মু'জ্জেবা পাক-কোরআন তোমাদের সম্পূর্ণ রয়েছে, যার আলৌকিকত্ব তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমরা বলি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ মু'জ্জেবার দাবী করে থাক, তাহলে কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের দাবী পূরণ করা হয়েছে। সূতরাং নতুন কোন মু'জ্জেবা দাবী করার কোন অধিকার তোমাদের নেই। আর বলি ষষ্ঠতার কারণে তোমরা মু'জ্জেবার দাবী করে থাক, তাহলে তোমাদের হুঁ হঠকারী লোকেরা মু'জ্জেবা দেখার পর ঈমান আনয়ন করবে এমন আশা করা যায় না। সারকথা, কোরআন করীম যে এক স্পষ্ট ও স্থায়ী মু'জ্জেবা তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ব্যাপারে কাকের ও মুশরেকেরা কোন অমূলক সন্দেহ-সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল পরবর্তী দুই আয়াতে তার জন্য এভাবে দেখা হয়েছে যে, তারা কি বলতে চায় যে, কোরআন মজীদ আল্লাহর কালাম নয়; বরং হযরত (সাঃ) স্বয়ং তা রচনা করেছেন? বলি তোমরা তাই মনে করে থাক যে, এরূপ বিস্ময়কর কালাম নবীয়ে-উস্বী (সাঃ) নিজে রচনা করেছেন, তাহলে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে দেখাও। আর একই ব্যক্তি দশটি সূরা তৈরী করতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। বরং সারা দুনিয়ার পন্ডিত, সাহিত্যিক, মানুষ ও জিন, তথা দেব-দেবী সবাই মিলেই তা রচনা করে আন। কিন্তু তারা কখন দশটি সূরাও তৈরী করতে পারছে না, তাই আপনি বলুন যে, ঐ কোরআন যদি কোন মানুষের রচিত কালাম হতো, তাহলে কখন মানুষেরাও অনুরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম হত। সকলের অপরাধ হওয়াই এর প্রকট প্রমাণ যে, এই কোরআন আল্লাহ পাকের এলম ও কুদরতে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত। এর মাঝে বিন্দুবিগল হ্রাস-বৃদ্ধি করারও অবকাশ নেই।

অত্র আয়াতে দশটি সূরা তৈরী করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। কিন্তু তা করতে যখন তারা অপারগ হল, তখন তাদের অক্ষমতা আর প্রকটভাবে প্রমাণ করার জন্য কোরআন করীমের সূরা বাক্তার আয়াতে মাত্র একটি সূরা তৈরী করার চ্যালেঞ্জ করা অর্থাৎ, তোমরা পরি কোরআনকে যদি মানুষের তৈরী কালাম বলে মনে করে থাক, তাহলে তোমরা বেশী নয় অনুরূপ একটি সূরা তৈরী করে আন। কিন্তু তাদের জন্য এতটা সহজ করে দেয়া সত্ত্বেও কোরআন পাকের এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম হল না। অতএব, কোরআন মজীদ আল্লাহ কালাম ও স্থায়ী মু'জ্জেবা হওয়া সন্দেহহীন প্রমাণিত হল। তাই পরিশেষে বলা হয়েছে— **فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ** অর্থাৎ, এখনও কি তোমরা মুসলমান ও আনুগত্যপরায়াণ হবে, নাকি সে গাফলতিতেই মজে থাকবে?

ইসলাম বিরোধীদের যখন আযাবের ভয় দেখানো হতো, তখন তারা নিজেদের দান-খয়রাত, জনসেবা ও জনহিতকর কার্যাবলীকে সাফাইরূপে তুলে ধরত। তারা বলত যে, এতসব সংকার্য করা সত্ত্বেও আমাদের গাফি হবে কেন? আজকাল পাণ্ডিত্যের দাবীদার অনেক অজ্ঞ মুসলমানকে এখানে সন্দেহে পতিত দেখা যায়। বাহ্যিকদৃষ্টিতে যেসব অমুসলমান সৎচারিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ হয় এবং কোন রাস্তা, পুল, হাসপাতাল, গদি সরবরাহ ইত্যাদি কোন জনকল্যাণকর কাজ করে, তাদেরকে মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। ১৫তম এ আয়াতে সে মনোভাবেরই জবাব দেয়া হয়েছে।

(১৩) তারা কি বলে? কোরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ হাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে। (১৪) অতঃপর তারা যদি তোমাদের কথা পূর্ণ করতে অপারগ হয়; তবে জেনে রাখ, এটি আল্লাহর এলম দ্বারা অবতীর্ণ হয়েছে; আরো একটী করে নাও যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই। অতএব, এখন কি তোমরা আত্মসমর্পণ করবে? (১৫) যে ব্যক্তি পার্শ্ববর্তী ও তার চাকচিক্যই কাফনা করে, হয় আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। (১৬) এরাই হল সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্য আগুন হাড়া নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরদাশ করেছে; আর যা কিছু উপার্জন করেছিল, সবই বিনষ্ট হল। (১৭) আচ্ছা বল তো, যে ব্যক্তি তার প্রভুর সুস্পষ্ট পথে রয়েছে, আর সাথে সাথে আল্লাহর তরফ থেকে একটি সাক্ষীও বর্তমান রয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী মুসা (আঃ)-এর কিতাবও সাক্ষী যা ছিল পথনির্দেশক ও রহযত স্বরূপ, (তিনি কি অন্যান্যের সমান)? অতএব তারা কোরআনের প্রতি ঈমান আনেন। আর ঐসব দলগুলির যে কেউ তা অস্বীকার করে, দোষণই হবে তার ঠিকানা। অতএব, আপনি তাতে কোন সন্দেহ থাকবেন না। নিঃসন্দেহে তা আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে ঋণ সত্য; তথাপি অনেকেই তা বিশ্বাস করে না। (১৮) আর তাদের চেয়ে বড় যালম কে হতে পারে, যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। এসব লোককে তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত সম্পূর্ণ করা হবে আর সাক্ষাৎ বলতে থাকবে, এরাই ঐসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। শুনে রাখ, যালমদের উপর আল্লাহর অভিস্পৃশ্যতা রয়েছে। (১৯) যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয়, আর তাতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায়, এরাই আখেরাতকে অস্বীকার করে।

আখেরার সারকথা এই যে, প্রতিটি সংকার্য গ্রহণযোগ্য ও পারলৌকিক কল্যাণ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, সেটা একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাভেদে জন্ম করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য তা আকরাম (সাঃ)—এর তরীকা মোতাবেক হতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি ঈমানই রাখে না, তার যাবতীয় কার্যকলাপ প্রত্যাখ্যাত, নীতি-নৈতিকতা প্রাণহীন দেহের ন্যায়। যার বাহ্যিক আকৃতি সুন্দর হলেও আখেরাতে তার কানাকড়িরও মূল্য নেই। তবে দৃশ্যতঃ যেহেতু পুণ্যকার্য ছিল এবং তা দ্বারা বহু লোক উপকৃত হয়েছে, তাই আল্লাহ জল্লাশানুহ এহেন তথাকথিত সংকার্যকে সম্পূর্ণ বিফল ও বিনষ্ট করে না বরং এসব লোকের যা মুখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য ছিল যেমন তার সম্মান বৃদ্ধি হবে, লোকে তাকে দানশীল, মহান ব্যক্তিরূপে সুরণ করে, নেতাক্রমে তাকে বরণ করবে ইত্যাদি আল্লাহ তাআলা স্বীয় সন্তোষ ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে ইহজীবনেই দান করেন। অপরদিকে আখেরাতে মুক্তিলাভ করা যেহেতু তাদের কাম্য ছিল না এবং তাদের ইচ্ছা ছিল সংকার্য আখেরাতের অপূর্ব ও অনন্ত নেয়ামতসমূহের মূল্য অর্জন করার যোগ্য ছিল না, কাজেই আখেরাতে তার কোন প্রতিদানও লাভ হবে না। বরং নিজেদের কুফরী, শেরেকী ও গোনাহের কারণে কল্যাণের আশুনে চিরকাল তাদের জ্বলতে হবে। এই হল ১৫ তম সূরার সৎক্ষিপ্ত সার। এবার অত্র আয়াতের শব্দবিন্যাস লক্ষ্য করুন।

১৫ আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে যে, “আখেরাতে তাদের জন্য ক্ষমতা ছাড়া আর কিছু নেই।” এতকরে বোঝা যায় যে, অত্র আয়াত কল্যাণের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কেননা, একজন মুসলমান যত বড় পাপীই হোক না কেন, তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে দোহা থেকে মুক্তিলাভ করে বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং আল্লাহ-আশ্রয়ে ও নেয়ামত লাভ করবে। এজন্য যাহ্যাক প্রমুখ মুফসসিরগণের মতে অত্র আয়াত শুধু কাকেরদের উপর প্রযোজ্য।

কোন কোন মুফাসসিরের মতে অত্র আয়াতে ঐসব মুসলমানদের কথা বর্ণিত হয়েছে—যারা সংকার্যের বিনিময়ে শুধু পার্শ্ববর্তীভাবে কুশান্তি, যশ-খ্যাতি প্রত্যাশা করে। লোক দেখানো মনোভাব নিয়ে কাজ করে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের মর্ম হবে এই যে, তারা নিজেদের কল্যাণের শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত দোষখের আশুনে ছাড়া অন্য কিছু পাবে না। পরিশেষে পাপের শাস্তি ভোগান্তে অবশ্য তারাও সংকার্যের প্রতিদান লাভ করবে।

১৬ আয়াতের সবচেয়ে স্পষ্ট তফসীর হচ্ছে এই যে, অত্র আয়াতে ঐসব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা তাদের যাবতীয় সংকার্য শুধু পার্শ্ববর্তী কল্যাণ হাসিলের জন্য করে থাকে, চাই সে আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী কাকের হোক, অথবা নামধারী মুসলমান হোক, যে পরকালকে মৌখিক স্বীকার করেও কার্যতঃ সেদিকে কোন লক্ষ্য রাখে না, বরং পার্শ্ববর্তী লাভের নিকটই সম্পূর্ণ মগ্ন ও বিভোর থাকে। তফসীরকার ইমামগণের মধ্যে হযরত মোয়বিয়া (রাঃ) মায়মুন ইবনে মেহরান ও মুজাহিদ (রহঃ) অত্র আয়াত অবলম্বন করেছেন।

১৭ সূরার কয়ীম (সাঃ)—এর প্রসিদ্ধ হাদীস **اِنَّا لَعَمَلُ الْاَعْمَالِ** দ্বারাও দ্বিতীয় অভিমতটির সমর্থন পাওয়া যায় যে, নিজের কাজের মধ্যে যে ক্ষতি যেমন নিয়ত রাখবে, তার কাজটি তদ্রূপ ধর্তব্য হবে এবং তদনুযায়ী প্রতিফল লাভ করবে। যে ব্যক্তি শুধু পার্শ্ববর্তী লাভ পেতে চায়, সে নগদ লাভই পায়, যে ব্যক্তি আখেরাতে পরিত্রাণ লাভ করতে চায়, সে

আখেরাতের নেয়ামতই পাবে। আর যে ব্যক্তি উভয় জীবনের কল্যাণ কামনা করে, সে দো-জাহানে কল্যাণ ও কামিয়াবী হাসিল করবে। নিয়তের উপর সংকার্যের ভিত্তি একথা সর্ব ধর্মে স্বীকৃত এক সনাতন মূলনীতি।—(তফসীরে-কুরতবী)।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) অত্র হাদীস বর্ণনা করে জন্দনরত অবস্থায় বললেন, কোরআনের আয়াত **مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا** দ্বারা পূর্বোক্ত হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা কারো প্রতি জুলুম করেন না। সংকমশীল মুমিন ব্যক্তির দুনিয়াতে আংশিক প্রতিদান লাভ করে থাকে এবং পূর্ণ প্রতিদান আখেরাতে লাভ করবে। আর কাকেররা যেহেতু আখেরাতের কোন ধ্যান-ধারণাই রাখে না, তাই তাদের প্রাপ্য হিস্যা ইহজীবনেই তাদেরকে পুরোপুরি ভোগ করতে দেয়া হয়। তাদের সংকার্যবলীর প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে ধন-সম্পদ, আরাম-আশ্রয়, বস্তুগত উন্নতি ও ভোগ-বিনাসের সামগ্রী দান করা হয়। অবশেষে যখন আখেরাতে উপস্থিত হবে, তখন সেখানে পাওয়ার মত তাদের প্রাপ্ত্য কিছুই থাকবে না।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْمَالِجَةَ فَلَا إِلَهَ فِيهَا مَا تَشَاءُ لِمَنْ شَاءَ

অর্থাৎ, যারা শুধু দুনিয়াতেই নগদ পেতে চায়, আমি তাদেরকে নগদই দান করি। তবে সেজন্য দুটি শর্ত রয়েছে। একটি শর্ত হচ্ছে—আমি যতটুকু ইচ্ছা করি, ততটুকুই দান করি, তাদের চেষ্টা বা চাহিদা মোতাবেক দান করা আবশ্যিক নয়। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে—আমার হেকমত অনুসারে যাকে সমীচীন মনে করি, শুধু তাকেই নগদ দান করি। সবাইকে দিতে হবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

১৭তম আয়াতে নবী করীম (সাঃ) এবং সত্যিকার মুমিনদের অবস্থা ঐসব লোকের মোকাবেলায় তুলে ধরা হয়েছে—যাদের চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছে শুধু দুনিয়া হাসিল করা। যেন দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারে যে, এই দুটি শ্রেণী কখনো সমকক্ষ হতে পারে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর বিশ্বমানবের জন্য রসূল হওয়া এবং যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান না আনে, সে যত ভাল কাজই করুক না কেন, তার গোমরাহ ও জাহান্নামী হওয়া ব্যক্ত করা হয়েছে।

অত্র আয়াতে **سَلَامٌ** বলে কোরআন পাককে বোঝানো হয়েছে। শব্দের ব্যাখ্যায় তফসীরকার ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। বয়ানুল-কোরআনে হযরত খানবী (রহঃ) লিখেছেন যে, এখানে ‘শাহেদ’ অর্থ পবিত্র কোরআনের **عَجَاز** এ’জায বা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া যা কোরআনের প্রতিটি আয়াতের সাথে বর্তমান রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কোরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে, যে কোরআনের উপর কাকের রয়েছে? আর কোরআনের সত্যতার একটি সাক্ষী তো খোদ কোরআনের সাথেই বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ, এর বিস্ময়করতা এবং মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া এবং দ্বিতীয় সাক্ষী ইতিপূর্বে তওরারূপে এসেছে, যা হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার রহমতস্বরূপ দুনিয়াবাসীর অনুসরণের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। কেননা, কোরআন যে আল্লাহ তাআলার সত্য কিতাব এই সাক্ষ্য তওরাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত ছিল।

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُصْعَقُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا
 يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ لَأَجْرِمَ
 أَتَاهُمُ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْخَسِرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَحْمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ ۝ مِثْلَ الْفَرْقَيْنِ مِثْلَ الْغُلَامِ وَالْأَمَةِ وَالْبَصِيرِ
 وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مِثْلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
 نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ إِنَّ لَكُمْ عَذَابًا وَلَا تَقْبَلُوا إِلَّآ
 اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ الْمَلَائِكَةُ
 كُفُّوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَزَكُّونَ ۝ أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادْنَا بِأَدَىٰ الزَّأْنِ وَمَا نَرَىٰ
 لَكُمْ عَلَيْهَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَنْقَضُهُمْ كَذِبِينَ ۝ قَالَ قَوْمُ أَرَأَيْتُمْ
 إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَإِنِّي رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِي
 فَصَبِّتْ عَلَيْكُمْ أَتَأْمُرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَأْمُرُونَ ۝

(২০) তারা পৃথিবীতেও আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই, তাদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে, তারা শুনেও পারত না এবং দেখতেও পেত না। (২১) এরা সে লোক, যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আর এরা যা কিছু মিথ্যা মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল, তা সবই তাদের থেকে হারিয়ে গেছে। (২২) আশেরাতে এরাই হবে সর্বমুখী ক্ষতিগ্রস্ত, কোন সন্দেহ নেই। (২৩) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং স্বীয় পালনকর্তার সমীপে বিনতি প্রকাশ করেছে তারাই বেহেশতবাসী, সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। (২৪) উত্তরপক্ষের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন অন্ধ ও বধির এবং যে দেখতে পায় ও শুনেও পায় উভয়ের অবস্থা কি এক সমান? তবুও তোমরা কি ভেবে দেখ না? (২৫) আর অবশ্যই আমি নূহ (আঃ)-কে তাঁর জাতির প্রতি প্রেরণ করেছি, তিনি কলনে- নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। (২৬) তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো এবাদত করবে না। নিশ্চয় আমি তোমাদের বাপের এক যন্ত্রণাদায়ক দিনের আখ্যাবের ভয় করছি। (২৭) তখন তাঁর কণ্ঠের কাকের প্রধানরা বলল-আমরা তো আপনাকে আমাদের মত একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছু মনে করি না, আর আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও ঝুল-বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার অনুসৃত্য করতে দেখি না এবং আমাদের উপর আপনাদের কোন প্রাধান্য দেখি না, বরং আপনারা সবাই মিথ্যাবাদী বলে আমরা মনে করি। (২৮) নূহ (আঃ) কলনে-হে আমার জাতি। দেখ তো আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে স্পষ্ট দলীলের উপর থাকি, আর তিনি যদি তাঁর পক্ষ হতে আমাকে রহমত দান করে থাকেন, তারপরেও তা তোমাদের চোখে না পড়ে, তাহলে আমি কি উহা তোমাদের উপর তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চাপিয়ে দিতে পারি?

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত নূহ (আঃ) যখন তাঁর জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন, তখন জাতি তাঁর নবুওয়ত ও রেসালতের উপর কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করেছিল। হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহর হুকুমে তাদের প্রতিটি উক্তি উপযুক্ত জবাব দান করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের একটি কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবনের ক্রমবিকাশ ও মাসায়েলের তা'লীম দেয়া হয়েছে।

২৭ নং আয়াতে মুশরেকদের কতিপয় আপত্তি ও সন্দেহমূলক বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

হযরত নূহ (আঃ)-এর নবুওয়ত ও রেসালতের উপর তাদের প্রথম আপত্তি ছিল مَا تَزَكُّونَ ۝ আমরা তো দেখি যে আপনি আমাদের মতই মানুষ মাত্র। আমাদের মত পানাহার করেন, হাট-বাড়ার যাতায়াত করেন, নিদ্রা যান জাগ্রত হন, সবকিছু স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও আপনি নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রসূল ও বার্তাবাহক বলে যে অস্বাভাবিক দাবী তুলছেন, তা আমরা কিরূপে মানতে পারি? তারা মনে করত যে, আল্লাহর পক্ষ হতে রসূলরূপে কোন মানুষের প্রেরিত হওয়া সমীচীন নয়, বরং ফেরেশতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন তাঁর বিশেষত্ব সফট ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় মানতে বাধ্য হয়।

২৮ নং আয়াতে ইহার জবাবে এরশাদ হয়েছে—

قَالَ قَوْمُ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَإِنِّي رَحْمَةٌ مِنْ
 عِنْدِي فَصَبِّتْ عَلَيْكُمْ أَتَأْمُرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَأْمُرُونَ ۝

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ হওয়া নবুওয়ত ও রেসালতের পরিপন্থী নয়। বরং চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, মানুষের নবী মানুষ হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। যেন মানুষ অনায়াসে তাঁর কাছে দ্বীন শিক করতে পারে, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। মানুষ ও ফেরেশতের স্বভাব-প্রকৃতির মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। যদি ফেরেশতকে নবী করে পাঠানো হত, তবে তাঁর কাছে ধর্মীয় আদর্শ শিক্ষা করা এবং তা পালন করা মানুষের জন্য দুষ্কর ও অসম্ভব হত। কেননা, ফেরেশতাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নেই, নিদ্রা-তন্দ্রার প্রয়োজন হয় না, রিপূর তাড়না নেই, মানবীয় প্রয়োজনের সস্মুখীন হন না। অতএব, তাঁরা মানুষের দুর্বলতা উপলব্ধি করে যথাবিহিত তা'লীম দিতে পারতেন না এবং তাদের পূর্ণ তাবেদারী করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হত না। এ প্রসঙ্গটি গম্বির কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টভাবে বা ইশারা-ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি করার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধি-বিশেষ প্রয়োগ করলে তোমরাও অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবে যে, মানুষ আল্লাহর নবী হতে পারবে না—এমন কোন কথা নেই। তবে আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর কাছে এমন কোন অকাট্য প্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে— যা দেখে মানুষ সহজেই বোঝতে পারে যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত পয়গম্বর বা বার্তাবাহক। সাধারণ লোকের জন্য নবীর মু'জ্জযাই তাঁর নবুওয়তের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। এজন্যই হযরত নূহ (আঃ) বলেছেন যে, আমি আল্লাহর তরফ হতে স্পষ্ট দলীল, অকাট্য প্রমাণ ও অনুগ্রহ নিয়ে এসেছি। সুকুভাবে চিন্তা-বিবেচনা করলে তোমরাও এটা অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু তোমাদের ঈর্ষা-বিদ্বেষ তোমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও অন্ধ করেছে। তাই তোমরা অস্বীকার করে বসেছ এবং নিজেদের ইষ্টকামিতার

(৯) তারা কি বলে? আপনি কোরআন রচনা করে এনেছেন? আপনি রচনা নিশি আঘি যদি রচনা করে এনে থাকি, তবে সে অপরাধ আমার, আর জেযরা যেসব অপরাধ কর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (৩৬) আর নূহ (আঃ)-এর প্রতি ওহী শ্রোণ করা হলো যে, যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছে তাদের ছাড়া আপনার জাতির অন্য কেউ ঈমান আনবেন না। অতঃপর, তাদের কার্যকলাপে বিমর্ষ হবেন না। (৩৭) আর আপনি আমার সন্তান আমারই নির্দেশ মোতাবেক একটি নৌকা তৈরী করুন এবং সন্তানদের ব্যাণায়ে আমাকে কোন কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা ডুবে মরবে।

দুর্বল শ্রেণীকে ইতর ও ছোটলোক সাব্যস্ত করেছিল—যাদের কাছে পার্শ্বি ধন-সম্পদ ও বিষয়-বেভব ছিল না। মূলতঃ তা ছিল তাদের জাহেলী চিন্তাধারার ফল। বস্তুতঃপক্ষে ইচ্ছত ও জিন্মতি, ধন-দৌলত বিদ্যা-বুদ্ধির অধীন নয়। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সম্পদ এবং সম্পানের মোহ একটি নেতার মত, যা অনেক সময় সত্য-ন্যায়কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, সত্য ও ন্যায় হতে বিচ্যুত করে। দরিদ্র ও দুর্বলদের সম্মুখে যেহেতু এরূপ কোন অন্তরায় থাকে না। কাজেই তারাই সর্বাত্মে সত্য-ন্যায়কে বরণ করতে এগিয়ে আসে। প্রাচীনকাল হতে যুগে যুগে দরিদ্র-দুর্বলরাই সমসাময়িক নবীগণের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিল, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন ঈমানের আহ্বান সম্বলিত রসূলে পাক (সাঃ)—এর পবিত্র চিঠি লাভ করল, তখন গুরুত্ব সহকারে নিজেই ইহার তদন্ত-তাহকীক করতে মনস্থ করল। কেননা, সে তওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব পাঠ করে করে সত্য নবীগণের আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে পুংখানুপুংখরূপে পারদর্শী ছিল। কাজেই তৎকালে আরব দেশের যেসব বাবসায়ী সিরিয়ায় উপস্থিত ছিল, তাদের একত্রিত করে উক্ত আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করে। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল যে, তাঁর অর্থাৎ, রসূলল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণী। তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করল, ইহা তো সত্য রসূল হওয়ার লক্ষণ। কেননা, যুগে যুগে দরিদ্র-দুর্বল শ্রেণীই প্রথমে নবীগণের আনুগত্য স্বীকার করেছে।

মোদ্দাকথা, দরিদ্র ও দুর্বল লোকদেরকে ইতর এবং হয়ে মনে করা চরম মূর্খতা ও অন্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইতর ও ঘৃণিত তারাই-যারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা মালিককে চিনে না, তার নির্দেশ মেনে চলে না। হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ)—কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইতর ও কমীনা কে? তিনি উত্তর দিলেন—যারা বাদশাহ ও রাজকর্মচারীদের খোশামোদ-তোষামোদে লিপ্ত হয়, তারাই কমীনা ও ইতর। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রাঃ) বলেন, যারা দ্বীন-ধর্ম বিক্রি করে দুনিয়া হাসিল করে তারাই কমীনা। পুনরায় প্রশ্ন করা হল—সবচেয়ে কমীনা কে? তিনি জবাব দিলেন—যে ব্যক্তি অন্যের পার্শ্বি স্বাস্থিসিদ্ধির জন্য নিজের দ্বীন ও ঈমানকে বরবাদ করে। হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কোরাম (রাঃ)-গণের নিন্দা-সমালোচনা করে, সে-ই ইতর ও অব্যচীন। কারণ, তাঁরাই সমগ্র উম্মতের সর্বাপেক্ষা হিত সাধনকারী। তাঁদের মাধ্যমেই ঈমানের অমূল্য দৌলত ও শরীয়তের আহকাম সকলের কাছে পৌছেছে।

যাহোক, ২৯ নং আয়াতে কওমের লোকদের মূর্খতা প্রসূত ধ্যান-ধারণা খন্ডন করার জন্য প্রথমতঃ বলা হয়েছে যে, কারো ধন-সম্পদের প্রতি নবী-রসূলগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তাঁরা নিজেদের খেদমত ও তা'লীম-তবলীগের বিনিময়ে কারো থেকে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। তাঁদের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তাআলারই দায়িত্বে। কাজেই, তাঁদের দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র এক সমান। তোমরা এমন অহেতুক আশঙ্কা পোষণ করো না যে, আমরা ধন-সম্পদশালীরা যদি ঈমান আনয়ন করি তবে হয়ত আমাদের বিস্ত-সম্পদে ভাগ বসানো হবে।

দ্বিতীয়তঃ তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা ঈমান আনার পূর্বশর্ত হিসাবে চাপ সৃষ্টি করছ যেন আমি দীন-দরিদ্র ঈমানদারগণকে তাড়িয়ে দেই। কিন্তু আমার দ্বারা তা কখনো সম্ভবপর নয়। কারণ, আর্থিক দিক দিয়ে তারা দরিদ্র হলেও আল্লাহ রাব্বুল ইচ্ছতের দরবারে তাদের

প্রবেশাধিকার ও উচ্চমর্যাদা রয়েছে। এমন লোকদেরকে তাড়িয়ে দেয়া অন্যায়-অসঙ্গত।

وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ “আর আমি গায়বও জানি না।” কেননা, উক্ত জাহেলদের আরো বিশ্বাস ছিল যে, যারা সত্যিকার পয়গম্বর, তাঁরা নিশ্চয়ই গায়বের খবর জানবেন। হযরত নূহ (আঃ)—এর উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবুওয়ত ও রেসালতের জন্য গায়বের এলুম অপরিহার্য নয়। আর তা হবেই বা কি করে? গায়বের এলুম তো একমাত্র আল্লাহ তাআলার বিশেষ ছেফত বা বৈশিষ্ট্য। কোন নবী, ওলী বা ফেরেশতা ইহার অসীম হতে পারে না। তাঁদের অত্র গুণে গুণানুিত মনে করা স্পষ্ট শেরেকী। অর হা, আল্লাহ তাআলা তদীয় পয়গম্বরগণের মধ্যে যাকে যতটুকু ইচ্ছা করুক জগতের এলুম দান করেন। ইহা নবী-ওলীগণের এখতিয়ারভূক্ত নয় যে, তাঁরা যখন-তখন যে কোন বিষয় সম্পর্কে জানতে বা বলতে পারেন। আল্লাহ তাআলা যখন অবহিত করেন, তখন তাঁদের জন্য তা আর গায় থাকে না। অতএব, একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে আলেমুল-গায়ব বলা হারাম ও শেরেকী।

তাঁর তৃতীয় উক্তি হয়েছে—وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَلَذُّوْنَ “আর আমি একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা।” এখানে তাদের এ প্রায় চিন্তাধারা বাতিল করা হয়েছে যে, নবী-রসূলরূপে উক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ফেরেশতা প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় ছিল।

তাঁর চতুর্থ কথা হচ্ছে—তোমাদের দৃষ্টি দ্বারা দরিদ্র ঈমানদারগণকে যেরূপ লাঞ্চিত, ক্ষত্রাদপিচ্ছ দেখছ, আমি কিন্তু তোমাদের মত একা বলতে পারি না যে, আল্লাহ তাদের কোন কল্যাণ ও কামিয়াবী দান করেন না। কারণ, প্রকৃত কল্যাণ ও কামিয়াবী ধন-সম্পদ এবং ক্ষমতার জোর হাসিল করা যায় না। বরং মানুষের অন্তরের অবস্থা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তা দান করা হয়। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সম্যক অবহিত আছেন যে, কল্যাণ ও কামিয়াবী হাসিল করার জন্য কার অন্তর যোগ্য, আর কার অন্তর অযোগ্য। অতএব, তিনিই তার ফয়সালা করবেন।

পরিশেষে হযরত নূহ (আঃ) বলেন, তোমাদের মত আমিও যদি দরিদ্র ঈমানদারগণকে লাঞ্চিত-অবাক্ষিত মনে করি, তাহলে আমিও জ্বালেয়রূপে পরিগণিত হবো।

আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)—কে প্রায় এক হাজার বছরের পূর্ব জীবন দান করেছিলেন। সাথে সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া ও দেশবাসীকে সুপথে পরিচালিত করার চিন্তা-ভাবনা এবং পয়গম্বররূপে উৎসাহ-উদ্দীপনা এতদূর দান করেছিলেন যে, সারাজীবন তিনি অক্লান্তভাবে নিজ জাতিকে তওহীদ ও সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। কওমের পক্ষ হতে তিনি কঠিন নির্যাতন-নিপীড়নের সম্মুখীন হন, তাঁর উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়; এমনকি তিনি অনেক সমর রক্তাক্ত হয়ে বেহুশ হয়ে পড়তেন। অতঃপর হুশ হলে পরে দোয় করতেন—আয় আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা অজ্ঞ-মূর্খ তারা জানে না, বোঝে না। তিনি এক পুরুষের পরে দ্বিতীয় পুরুষকে অতঃপর তৃতীয় পুরুষকে শুধু এ আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, হযরত তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত প্রাপ্ত চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা যখন ঈমান আনল না, তখন তিনি আল্লাহ রাব্বুল ইচ্ছতের দরবারে তাদের সম্পর্কে ফরিয়াদ করলেন—

إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْسَ لَكَ رَأْفَةٌ عَلَيْهِمْ إِلَّا فِرَارًا

আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)-কে নৌকা নির্মাণপদ্ধতি ও কলা-কৌশল শিক্ষা দানের সাথে সাথে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনার কওমের উপর এক মহাপ্লাবন আসবে, তারা সবাই ডুবে মরবে, তখন আপনি সেইপরবশ হয়ে তাদের জন্য কোন সুপারিশ যেন না করেন।

رَّبِّ لَاتَذْرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ

وَيَصْنَعُ الْفُلَ وَلَمَّا مَرَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ مِنْ قَوْمِهِ سِيْرِ اَمْنَةً
 قَالَ اِنْ تَعْبُرُوْا بَرًا وَّ اِنَّا لَنَعْبُرُ مَرْجًا وَّ كَمَا تَنْتَعِبُوْنَ ۚ فَاْتَوْهُ
 نَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ
 مُّقِيْرٌ ۚ حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَمْرًا وَّ قَالَ النَّفْثُ فُلًا اَجِبْ فَيَهَامُنْ
 كُلُّ رُوْحٍ اِثْنَيْنِ وَاَهْلِكَ الْاِمْنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
 وَمَنْ اَمِنَ وَمَا اَمِنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيْلٌ ۚ وَقَالَ الْكُفْرَانُ لَيْسَ
 بِاللّٰهِ جَبْرٌ ۙهَا وَاَمْرُهَا اَنْ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۚ وَهِيَ تَعْرِى
 بِهِيَ فَرَىٰ مَوْجٌ كَاِجْبَالٍ ۚ وَكَانَى مُوْجًا يَّابِئَةً وَكَانَ فِى
 مَعْرَ لٍ يُّبْئِى اَكْبَ مَعْنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكُفْرَانِ ۚ قَالَ سَلَوْنِى
 اِلَىٰ جَبَلٍ يَّصْحَبْنِى مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَهَا صِرَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ
 اللّٰهِ الْاِمْنُ رَحْمَةً وَّحَالٌ بَيْنَهُمَا الْيَوْمَ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرِبِ ۚ
 وَقِيلَ يَا رَاضٍ اَبْلَغِى مَاءَكَ وَيَسَاءَ اَفْعٰبِى وَغِيْضُ الْمَاءِ
 وَقِيْضُ الْاَمْرِ وَاَسْتَوَتْ عَلَى الْيَوْمِ وَقِيلَ بَعْدَ الْاَلْقَوْمِ
 الظَّالِمِيْنَ ۚ وَكَانَى مُوْجٌ رَّيْبَةً فَقَالَ رَبِّ اِنِّ اِنِّى مِنْ
 اَهْلِى وَاَنْتَ وَعَدَاكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

(৩৮) তিনি নৌকা তৈরী করতে লাগলেন, আর তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পার্শ্ব দিয়ে যেত, তখন তাঁকে বিজ্ঞপ্তি করত। তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাক, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রূপ তোমাদের উপহাস করছি। (৩৯) অতঃপর অচিরেই জানতে পারবে—লাঞ্ছনাজনক আযাব কার উপর আসে এবং চিরস্থায়ী আযাব কার উপর অবতরণ করে। (৪০) অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌছল এবং ভূ-পৃষ্ঠ উচ্ছসিত হয়ে উঠল, আমি বললামঃ সর্বপ্রকার জোড়ার দুটি করে এবং যাদের উপরে পূর্বাঙ্কেই হুকুম হয়ে গেছে তাদের বাদ দিয়ে, আপনার পরিজনবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিল। বলাবাহুল্য, অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল। (৪১) আর তিনি বললেন, তোমরা এতে আরোহণ কর। আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ণ, মেহেরবান। (৪২) আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে, আর নূহ (আঃ) তাঁর পুত্রকে ডাক দিলেন আর সে সরে রয়েছিল, তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সাথে থেকে না। (৪৩) সে বলল, আমি অচিরেই কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে। নূহ (আঃ) বললেন, আজকের দিনে আল্লাহর হুকুম থেকে কোন রক্ষাকারী নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে নিমজ্জিত হল। (৪৪) আর নির্দেশ দেয়া হল — হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ, ক্ষান্ত হও। আর পানি হাস করা হল এবং কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদী পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হল, দূরাত্মা কাফেররা নিপাত যাক। (৪৫) আর নূহ (আঃ) তাঁর পালনকর্তাকে ডেকে বললেন— হে পরওয়ারদেগার, আমার পুত্র তো আমার পরিজনদের অন্তর্ভুক্ত, আর আপনার ওয়াদাও নিঃসন্দেহে সত্য আর আপনিই সর্বসম্প্রদায় বিজ্ঞ ফয়সালাকারী।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৩৮ নং আয়াতে নৌকা তৈরীকালীন সময়ে নূহ (আঃ)—এর কওমের উদাসীনতা, গাফলতি, অবজ্ঞা ও দুঃসাহস এবং এর শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশক্রমে হযরত নূহ (আঃ) যখন নৌকা নির্মাণকার্যে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকারে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করত, আপনি কি করছেন! তিনি উত্তর দিতেন, অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লাবন হবে, তাই নৌকা তৈরী করছি। তখন তারা বলত —“এখানে তো পানি করার মত পানিও দুলত, আর আপনি ডাঙ্গা দিয়ে জাহাজ চালাবার ফিকিরে আছেন।” তদুত্তরে হযরত নূহ (আঃ) বলতেন, যদিও আজ তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস করছ, কিন্তু মনে রেখো, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করব। অর্থাৎ, তোমরা উপহাসের পাত্র হবে। বস্তুতঃ নবীল কখনো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন না। কাউকে উপহাস করা তাঁদের শান ও মর্যাদার পরিপন্থী, বরং হারাম। কোরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে—

لَا تَسْتَفْزِجُ قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

অর্থাৎ, “এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে উপহাস করবে না। হতে পারে যে, উপহাসকারীদের চেয়ে যাদের উপহাস করা হচ্ছে (আল্লাহর কাছে) তারাও শ্রেষ্ঠতর।” (পারা ২৬ঃ সূরা হুদ্রাত, ১১ আয়াত) সুতরাং পূর্বাঙ্কে আয়াতে উপহাস করার অর্থ কালের মাধ্যমে জবাব দেয়া। সেমতে ‘আমরা তোমাদেরকে উপহাস করব’ বাক্যের অর্থ হচ্ছে— তোমরা যখন আযাবে পতিত হবে, তখন আমরা তোমাদেরকে বলব যে, ‘এটা তোমাদের উপহাসের মর্যাদাসিক পরিণতি।’ যেমন ৩৯ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, “অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কাদের উপর লাঞ্ছনাজনক আযাব আসছে এবং চিরস্থায়ী আযাব কাদের উপর হয়।” প্রথম عَذَابٌ শব্দের দ্বারা দুনিয়ার আযাব এবং ثَوَابٌ দ্বারা আখেরাতের চিরস্থায়ী আযাব উদ্দেশ্য।

৪০ আয়াতে প্লাবন আরম্ভকালীন করণীয় ও আনুষঙ্গিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে—

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَمْرًا وَّ قَالَ النَّفْثُ

অর্থাৎ, ‘অবশেষে যখন আমার ফয়সালা কার্যকরী করার সময় হল এবং উনুন হতে পানি উথলে উঠতে লাগল।’

النَّفْثُ তান্নুর শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। ভূপৃষ্ঠকেও তান্নুর বলা হয়, ক্রটি পাকানের তন্দুরকেও তান্নুর বলে, যমীনের উঁচু অংশকেও তান্নুর বলে। তাই তফসীরকার ইমামগণের কারো কারো মতে আলাচ্য আয়াতে তান্নুর অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি হয়ে পানি উথলে উঠছিল। কেউ কেউ বলেন— এখানে তান্নুর বলে হযরত আদম (আঃ)—এর স্ত্রী পাকানো তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে, যা সিরিয়ান عَيْنُ وَرْدٍ ‘আইন আরদাহ’ নামক স্থানে অবস্থিত। উক্ত তন্দুরের ভেতর থেকেই সর্বপ্রথম পানি উঠতে শুরু করেছিল। কেউ বলেন— এখানে হযরত নূহ (আঃ)—এ তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে—যা কুফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল। হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, শা’বী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ অধিকাংশ মুফাসসেয়ীন এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শা’বী (রহঃ) কসম করে বলেছেন যে, উক্ত তন্দুর কুফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কুফার বর্তমান মসজিদের মধ্যবর্তী

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর নৌকা তৈরী করেছিলেন। আর তন্দুর ছিল ঐ তন্দুর প্রবেশ দ্বার।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা নূহ (আঃ)-কে মহাপ্রাণের পূর্বাভাসস্বরূপ আগেই জানিয়ে দেন যে, যখন আপনার ঘরের উনুন ফেটে পানি উঠতে দেখবেন, তখন বুঝবেন যে, মহাপ্রাণ শুরু হয়েছে।— (তফসীরে-কুরতুবী ও হারুনী)

আল্লাহ কুরতুবী (রহঃ) বলেন, তান্নুর শব্দের ব্যাখ্যা যতভেদ প্রচলিত হলেও আসলে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কেননা, প্রাণ যখন শুরু হয়, তখন রুটি পাকানো তন্দুর হতেও পানি উঠেছে, সমতলভূমি হতেও উঠেছে আর উচু যমীন হতেও পানি উঠেছে। সিরিয়ার আইনুল ফারাহ তন্দুর হতেও উঠেছে এবং কুফার তন্দুর হতেও উঠেছে। অল্প কয়েকই সব একাকার হয়েছে। যেমন কোরআন পাকের আয়াতে স্পষ্ট প্রমাণ করা হয়েছে—

فَقَضَّاهُ الْوَابِ السَّمَاءَ وَنُفِثَ مِنْهُ هَبْ وَجُوزَ الْأَرْضِ عَيُونًا

অর্থঃ, ‘অতঃপর আমি মুষলধারায় বর্ষণের সাথে সাথে আসমানের কক্ষমুখ খুলে দিলাম এবং যমীনে প্রস্রবণরূপে প্রবাহমান করলাম। — (২৭ সূরা আল-কামার, আয়াত-১১)

হুমায় শা’বী (রঃ) আরো বলেছেন যে, কুফার এই জা’মে মসজিদটি মসজিদে হারাম, মসজিদে-নব্বী ও মসজিদে-আকসার পর বিশেষ মসজিদসম্পন্ন বিশুর চতুর্থ মসজিদ।

তুফান শুরু হওয়া মাত্র হযরত নূহ (আঃ)-কে হুকুম দেয়া হল—

اِجْلِدْ فِي لَمَمْنٍ مِّنْ طَلْحٍ وَزُجْجِنِ الشَّيْئِ

অর্থঃ, ‘জোড়বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণী এক-এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিন।’ এতদ্বারা বোঝা যায় যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাহাজে সারা দুনিয়ার সব ধরনের প্রাণীর সমাবেশ করা হয়নি। বরং যেসব প্রাণী শব্দ-পুরুষের মিলনে জন্ম হয় এবং পানির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না, শুধু সেসব পশু-পাখীই উঠানো হয়েছিল জলজ প্রাণী উঠানো হয়নি। জলার প্রাণীকুলের মধ্যে যেসব পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, পুরুষ-স্ত্রীর মিলন ছাড়াই জন্ম হয় তাও বাদ পড়েছে। শুধু গরু, ছাগল, ঘোড়া-গাধা ইত্যাদি গৃহপালিত ও অতীত প্রয়োজনীয় পশু-পাখী কিশতিতে উঠানো হয়েছিল। এতদ্বারা এ সন্দেহ দূরীভূত হল যে, সারা দুনিয়ার সর্বপ্রকার প্রাণীকুলের স্থান সম্বলান এতদুচ্চ কিশতিতে কিভাবে হলো?

অতঃপর হযরত নূহ (আঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বেঈমান কাকেরদের বাদ দিয়ে আপনার পরিজনবর্গকে এবং সমস্ত ঈমানদারগণকে কিশতিতে তুলে নিন। তবে তৎকালে ঈমানদারদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল।

জাহাজে আরোহণকারীদের সঠিক সংখ্যা কোরআনে ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৮০ জন। যাদের মধ্যে হযরত নূহ (আঃ)-এর তিন পুত্র হাম, সাম, ইয়াকেস এবং তাদের ৩ জন স্ত্রীও ছিল। নূহ (আঃ)-এর চতুর্থ পুত্র কেন’আন কাকেরদের সাথে থাকায় সে ডুবে মরেছিল।

যানবাহনে আরোহণের আদব : ৪১ আয়াতে নৌকা-জাহাজ ইত্যাদি

জল-যানে আরোহণ করার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, بِسْمِ اللَّهِ جَرِّهَا وَمُسْهَلًا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ বলে আরোহণ করবে।

মজরী মাজরে’ অর্থ চলা, গতিশীল হওয়া।

‘মুরসা’ অর্থ স্থিতি বা থামা। অর্থঃ, অত্র কিশতির গতি ও স্থিতি আল্লাহর নামে, এর চলা ও থামা আল্লাহ তাআলার মজি ও কুদরতের অধীন।

প্রতিটি যানবাহনের গতি-স্থিতি আল্লাহর কুদরতের অধীন : সামান্য চিন্তা করলেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারত যে, জলযান, স্থলযান, ও শূন্যযান অথবা কোন জানদার সওয়ারী হোক, তা সৃষ্টি বা নির্মাণ করা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। স্থূলদৃষ্টিতে মানুষ হয়ত এই বলে আশ্চর্যান্বিত করতে পারে যে, আমরা তা তৈরী করেছি, আমরা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে তার লোহা-লকড়, তামা-পিতল, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি মূল উপাদান ও কাঁচামাল তারা সৃষ্টি করে না। এক তোলা লোহা বা এক ইঞ্চি কাঠ তৈরী করার ক্ষমতাও তাদের নেই। অধিকন্তু উক্ত কাঁচামাল দ্বারা রকমারী যন্ত্রাংশ তৈরী করার কলাকৌশল তাদের মস্তিষ্কে কে দান করেছেন? মানুষ শুধু নিজ বুদ্ধির জোরে যদি তা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করতে পারত, তাহলে দুনিয়ায় কোন নির্বোধ লোক থাকত না। সবাই এরিস্টটল, প্লুটো, এডিসন বনে যেত। কোথাকার কাঠ, কোন খনির লোহা, আর কোন দেশের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যানবাহনের কাঠামো তৈরী হয়। অতঃপর শত-শত টন, হাজার হাজার মণ মালামাল বহন করে যমীনের উপর দৌড়ানো বা হাওয়ার উপর উড়ার জন্য যে শক্তি অপরিহার্য তা পানি ও বায়ুর ঘর্ষণে বিদ্যুতরূপে হোক বা জ্বালানী তেল ইত্যাদি হোক সর্ববিস্ময় চিন্তা করে দেখুন, তন্মধ্যে কোনটি মানুষ সৃষ্টি করেছে? বায়ু বা পানি কি সে সৃষ্টি করেছে? তেল বা পেট্রোল কি সে সৃষ্টি করেছে? তার অভিজ্ঞেন ও হাইড্রোজেন শক্তি কি মানুষ সৃষ্টি করেছে?

মানুষ যদি বিবেককে সামান্য কাজে লাগায়, তাহলে অনায়াসে অনুধাবন করতে পারে যে, বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কারের যুগেও মানুষ একেবারে অক্ষম ও অসহায়। আর এটি অনবীকার্য সত্য যে, প্রত্যেকটি যানবাহনের গতি ও স্থিতি, নিয়ন্ত্রণ ও হেফাজত একমাত্র আল্লাহ তাআলার কুদরতের অধীন।

আত্মভোলা মানুষ তাদের বাহ্যিক জোড়া-তালির কার্যকলাপ যাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নাম দিয়েছে তার উপর গৌরব ও অহংকারের নেশায় এমন মাতাল হয়েছে যে, মৌলিক সত্যটি তাদের চোখে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এহেন বিভ্রান্তির বেড়া জাল হতে মানুষকে মুক্ত করার জন্যই আল্লাহ পাক যুগে যুগে স্বীয় পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন।

بِسْمِ اللَّهِ جَرِّهَا وَمُسْهَلًا একমাত্র আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি বলে মৌল সত্যকে চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটি মাত্র দুই শব্দবিশিষ্ট একটি বাক্য হলেও বস্তুরূপে এটা এমন একটা ধারণার প্রতি পথনির্দেশ করে, যদ্বারা মানুষ বস্তুজগতে বসবাস করেও ভাবজগতের অধিবাসীতে পরিণত হয় এবং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে সৃষ্টিকর্তার বাস্তব উপস্থিতি অবলোকন করতে সক্ষম হয়।

মুমিনের দুনিয়াদারী ও কাকেরের দুনিয়াদারীর মধ্যে এখানেই স্পষ্ট ব্যবধান। যানবাহনে উভয়েই আরোহণ করে, কিন্তু মুমিন যখন কোন

যানবাহনে আরোহণ করে, তখন সে শুধু যমীনের দূরত্বই অতিক্রম করে না, বরং আধ্যাত্মিক জগতেও পরিভ্রমণ করে থাকে।

৪২ ও ৪৩ আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ্ (আঃ)—এর পরিজনবর্গ কিশতিতে আরোহণ করল, কিন্তু ‘কেনআন’ নামক একটি ছেলে বাইরে রয়ে গেল। তখন শিত্‌সুলত স্নেহবশতঃ হযরত নূহ্ (আঃ) তাকে ডেকে বললেন, প্রিয় বৎস, আমাদের সাথে নৌকায় আরোহণ কর, কাফেরদের সাথে খেঁক না, তাহলে পানিতে ডুবে মরবে। কাফের ও দুশমনদের সাথে উক্ত ছেলেটির যোগ-সাজস ছিল এবং সে নিজেও কাফের ছিল। কিন্তু হযরত নূহ্ (আঃ) তার কাফের হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবহিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে যদি তিনি তার কুফরী সম্পর্কে অবহিত থেকে থাকেন, তাহলে তাঁর আহবানের মর্ম হবে—নৌকায় আরোহণের পূর্বশর্ত হিসাবে কুফরী হতে তওবা করে ঈমান আনার দাওয়াত এবং কাফেরদের সংসর্গ পরিত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হতভাগা ‘কেনআন’ তখনও প্লাবনকে অগ্রাহ্য করে বলছিল—আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে প্লাবন হতে আত্মরক্ষা করব। হযরত নূহ্ (আঃ) পুনরায় তাকে সতর্ক করে বললেন যে,—আজকে কোন উচু পর্বত বা প্রাসাদ কাউকে আল্লাহর আযাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহর খাস রহমত ছাড়া বিচার অন্য কোন উপায় নেই। দূর থেকে পিতা-পুত্রের কথোপকথন চলছিল। এমন সময় সহসা এক উত্তাল তরঙ্গ এসে উভয়ের মাঝে অন্তরালের সৃষ্টি করল এবং কেনআনকে নিমজ্জিত করল। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, হযরত নূহ্ (আঃ)—এর তুফানের সময় এক একটি টেড বড় বড় পাহাড়ের চূড়া হতে ১৫ গজ এবং কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় ৪০ গজ উচ্চতা বিশিষ্ট ছিল।

আলোচ্য ৪৪ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, যমীন ও আসমান

হুকুম পালন করল, প্লাবন সমাপ্ত হল, জুদী পাহাড়ে নৌকা ভিড়ল আর বলে দেয়া হল যে, দূরাত্মা কাফেররা চিরকালের জন্য আল্লাহর রহমত হতে দূরীভূত হয়েছে।

জুদী পাহাড় বর্তমানেও ঐ নামেই পরিচিত। সেটি হযরত নূহ্ (আঃ)—এর মূল আবাসভূমি, ইরাকের মোসোল শহরের উত্তরে ইবনে ওমর দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত।

বস্তুতঃ এটি একটি পর্বতমালার অংশবিশেষের নাম। এর অপর এক অংশের নাম আরারাত পর্বত। বর্তমান তওরাতে দেখা যায় যে, হযরত নূহ্ (আঃ) এর কিশতি আরারাত পর্বতে ভিড়েছিল। উভয় বর্ণনার মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নাই। প্রাচীন ইতিহাসে প্রচলিত বর্ণনায়ও দেখা যায় যে, জুদী পাহাড়েই কিশতি ভিড়েছিল। প্রাচীন ইতিহাসে আরো উল্লেখ আছে যে, ইরাকের বিভিন্নস্থানে উক্ত কিশতির ভগ্ন টুকরা এখনো অনেকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে, যা বরকতের জন্য সংরক্ষিত হয় এক রোগ ব্যাধিতে ব্যবহার করা হয়।

তফসীরে তাবারী ও বগভীতে আছে যে, হযরত নূহ্ (আঃ) ১০ই রজব কিশতিতে আরোহণ করেছিলেন। দীর্ঘ ৬ মাস পর্যন্ত উক্ত কিশতি তুফানের মধ্যেই চলছিল। যখন কা’ বা শরীফের পার্শ্বে পৌঁছল, তখন সাত বার কা’ বা শরীফের তওয়াফ করল। আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহ শরীফকে পানির উপরে তুলে রক্ষা করেছিলেন। পরিশেষে ১০ই মুহাররম অর্থাৎ, আশুরার দিন জুদী পাহাড়ে কিশতি ভিড়ল। হযরত নূহ্ (আঃ) স্বয়ং সেদিন শোকরানার রোযা রাখলেন এবং সহযাত্রী সবাইকে রোযা পালনের নির্দেশ দিলেন। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে যে, কিশতিতে অবস্থানরত যাবতীয় প্রাণীও সেদিন রোযা পালন করেছিল।—(তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী)

قَالَ يَبْرُؤُا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٍ ۖ نَاكَ
 سَتَكُنْ مِنَ الْمَكِينِ ۚ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ
 الْجَاهِلِينَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي
 بِهِ عِلْمٌ ۖ وَالْأَنْتَ تَعْلَمُ ۚ وَتَرْحَمْنِي ۚ إِنَّكَ مِنَ الْخُشِيِّينَ ۝
 قِيلَ يَا يَبْرُؤُا اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ
 مِمَّنْ مَعَكَ ۚ وَأْمُرْ سَبْعَتَهُمْ فَلْيَخُشِعْنَ لَكَ ۚ وَمِنَّا عِذَابُ الْإِيلَةِ ۝
 نَاكَ مِنْ أَتْبَاعِ الْعَذِيبِ ۚ نُوْحِيهِمَا إِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا ۚ أَنْتَ
 وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝
 وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ ۚ قَالَ يَقَوْمُ عِبَادَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ
 إِلَهِ غَيْرِي ۚ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْأَقْمَرُونَ ۚ يَقَوْمُ لَأَسْأَلَنَّكُمْ عَلَيْهِ
 أَجْرًا ۚ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عِلٌّ الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
 وَيَقَوْمُ اسْتَغْفِرْ ۚ وَارْجِعْ ۚ ثُمَّ نُوْحِيهِمَا إِلَيْكَ ۚ يُرْسِلُ السَّمَاءَ
 عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۚ وَارْجِعْ ۚ ثُمَّ نُوْحِيهِمَا إِلَيْكَ ۚ وَمَنْ خُشِعَ
 مُجْرِمِينَ ۚ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ ۚ وَمَا نَحْنُ
 بِتَارِكِي آلِهَتِنَا ۚ عِنْ قَوْلِكَ ۚ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝

(৪৬) আল্লাহ বলেন— হে নূহ! নিশ্চয় সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়।
 নিশ্চয় সে দুরাচার। সূতরাং আমার কাছে এমন দরখাস্ত করবেন না, যার
 ধর আপনি জানেন না। আমি আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, আপনি
 অজ্ঞদের দলভুক্ত হবেন না। (৪৭) নূহ (আঃ) বলেন— হে আমার
 পালনকর্তা! আমার যা জানা নেই এমন কোন দরখাস্ত করা হতে আমি
 আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না
 করেন, দয়া না করেন, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। (৪৮) হুকুম হল—হে
 নূহ (আঃ)। আমার পক্ষ হতে নিরাপত্তা এবং আপনার নিজের ও সঙ্গীয়
 সম্প্রদায়গুলির উপর বরকত সহকারে অবতরণ করুন। আর অন্যান্য
 যেসব সম্প্রদায় রয়েছে আমি তাদেরকেও উপকৃত হতে দেব। অতঃপর
 তাদের উপর আমার দারুন আঘাত আপতিত হবে। (৪৯) এটি গায়বের
 ধর, আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করছি। ইতিপূর্বে এটা আপনার এবং
 আপনার জাতির জন্য ছিল না। আপনি যৈর্থ ধারণ করুন। যারা ভয় করে
 চলে, তাদের পরিণাম ভাল, সন্দেহ নেই। (৫০) আর আদ জাতির প্রতি
 আমি তাদের ভাই হুদকে প্রেরণ করেছি; তিনি বলেন— হে আমার জাতি,
 আল্লাহর বন্দগী কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন মাবুদ নেই, তোমরা
 সবাই মিথ্যা আরোপ করছ। (৫১) হে আমার জাতি! আমি এজন্য
 তোমাদের কাছে কোন মজুরী চাই না; আমার মজুরী তাঁরই কাছে যিনি
 আমাকে পয়দা করেছেন; তবু তোমরা কেন বোঝ না? (৫২) আর হে
 আমার কণ্ড! তোমাদের পালন কর্তার কাছে তোমরা কাছ প্রার্থনা কর,
 অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর; তিনি আসমান থেকে তোমাদের
 উপর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি
 করবেন, তোমরা কিন্তু অপরার্থীদের মত বিমূষ হয়ে না (৫৩) তারা
 বলল— হে হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নিয়ে আস নাই, আমরা
 তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না আর আমরা
 তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নেই।

৪৬ আয়াতে আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত নূহ (আঃ) এর প্রতি
 সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, মন-মানসিকতার দিক দিয়ে এ
 ছেলটি আপনার পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নেই। সে একজন দুরাত্ম
 কাফের। সূতরাং প্রকৃত অবস্থা না জেনে আমার কাছে কোন আবেদন করা
 আপনার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যতে অজ্ঞতা-সুলভ কাজ না করার
 জন্য আমি আপনাকে নসীহত করছি।

আল্লাহ তাআলার অত্র ফরমানের মধ্যে দু'টি বিষয় জানা গেল। প্রথম
 এই যে, হযরত নূহ (আঃ) উক্ত পুত্রটির চূড়ান্ত কাফের হওয়া সম্পর্কে
 অবহিত ছিলেন না, বরং তার মুনাক্কীর কারণে তিনি তাকে ঈমানদার
 মনে করেছিলেন। তাই তিনি তার জন্য দোয়া করেছিলেন। জানা থাকলে
 তিনি কিছুতেই এমন দোয়া করতেন না। কেননা আল্লাহ তাআলা নূহ
 (আঃ) কে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, لَا تَخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ۖ
 وَلَا تَخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ۖ অতঃপর মহাপ্লাবন যখন শুরু হবে, আপনি তখন

কোন অব্যক্তি কাফেরের জন্য আমার কাছে সুপারিশ করবেন না।—
 এহেন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা লক্ষ্যনের দূরসাহস করা কোন নবীর পক্ষে সম্ভব
 নয়। বস্তুতঃপক্ষে এটি কুফরী অবস্থায় কেনআনকে রক্ষা করার আবদার
 ছিল না। বরং তাকে ঈমান দান করার জন্য খোদার দরবারে আকুল
 আবেদন ছিল। কিন্তু হযরত নূহ (আঃ) এর মত একজন বিশিষ্ট নবী
 কর্তৃক ভালমত না জেনে-শুনে একরূপ দোয়া করা কেও আল্লাহ তাআলা
 পছন্দ করেন নি, বরং একরূপ দোয়া তাঁর জন্য অসমীচীন হয়েছে বলে
 সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে
 দিয়েছেন। পয়গম্বরের উক্ত মর্যাদার পক্ষে এটি এমন একটি ত্রুটি যা
 পরবর্তীকালে তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। তাই হাশরের ময়দানে সমগ্র
 মানবজাতি যখন তাঁর কাছে সুপারিশের অনুরোধ জানাবে, তখনও তিনি
 উক্ত ত্রুটিকে ওজর হিসাবে ভুলে ধরে বলবেন যে, আমি এমন একটি ভুল
 করেছি, যার ফলে আজ সুপারিশ করার হিম্মত হয় না।

কাফের ও যালেমের জন্য দোয়া করা জায়েয নয় : উপরোক্ত
 বয়ান দ্বারা একটি মাসআলা জানা গেল যে, দোয়াকারীর কর্তব্য হচ্ছে যার
 জন্য ও যে কাজের জন্য দোয়া করা হবে— তা জায়েয, হালাল ও
 ন্যায়সঙ্গত কি না তা জেনে নেয়া। সন্দেহজনক কোন বিষয়ের জন্য দোয়া
 করাও নিষিদ্ধ হয়েছে। তফসীরে বয়যাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে রুহুল-মা'আনীতে
 বর্ণিত হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে যেহেতু সন্দেহজনক ক্ষেত্রে দোয়া
 করা নিষিদ্ধ হয়েছে, কাজেই জেনে-শুনে অন্যায় ও অবৈধ কাজের পক্ষে
 দোয়া করা অধিকতর হারাম।

এতদ্বারা আরো জানা গেল যে, বর্তমানে অনেক পীর-বুয়ূগানের নীতি
 হচ্ছে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন দোয়ার জন্য তাঁদের কাছে আসে,
 পীর-বুয়ূগান তাদের জন্যই হাত তোলেন, মকসুদ হাসিলের দোয়া করেন।
 অথচ অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জানা থাকে যে, এ ব্যক্তি যালেম ও
 অন্যায়কারী, অথবা যে মকসুদের জন্য দোয়া করাচ্ছে তা তার জন্য
 হালাল নয়। এমন কোন চাকরী বা পদ লাভের জন্য দোয়া চায়, যার ফলে
 সে হারামে লিপ্ত হবে। অথবা কারো হক নষ্ট করে নিজে লাভবান হবে।
 জেনে শুনে এসব দোয়া করা তো হারাম বটেই, এমনকি সন্দেহজনক
 ব্যাপারেও প্রকৃত অবস্থা না জেনে দোয়ার জন্য হাত তোলাও সমীচীন নয়।

মুমিন ও কাফেরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব হতে পারে না : এখানে আরো জানা গেল যে, মুমিন ও কাফেরের মধ্যে যতই নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক থাক না কেন, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উক্ত আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করা যাবে না। কোন ব্যক্তি যতই সম্প্রসৃত বংশীয় হোক না কেন, যতই বড় বৃহৎপূর্ণের সন্তান হোক না কেন, এমনকি সৈয়দ বংশীয় হওয়ার গৌরব অর্জন করুক না কেন, কিন্তু যদি সে ঈমানদার না হয়, তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে তার অভিজাত্য ও নবীর নিকটাত্মীয় হওয়ার কোন মূল্য নেই। ঈমান, তাকওয়া ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে। যার মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ হয়েছে সে পর হলেও আপনজন। অন্যথায় আপন আত্মীয় হলেও সে পর।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও যদি আত্মীয়তার লক্ষ্য রাখা হতো, তাহলে ভাইয়ের উপর ভাই কখনো তলোয়ার চালাতো না। বদর, ওহুদ ও আহযাবের লড়াই তো একই বংশের লোকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। যাতে করে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয়তা বংশ, বর্ণ, ভাষা বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে না, বরং ঈমান, তাকওয়া ও সংকমশীলতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে। তারা যে কোন বংশের, যে কোন গোত্রের, যে কোন বর্ণের, যে কোন দেশের, যে কোন ভাষাভাষী হোক না কেন, সবাই মিলে এক জাতি, একই ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ‘সকল মুসলমান ভাই-ভাই’ আয়াতের এটাই মর্মকথা। অপরদিকে যারা ঈমান ও সংকমশীলতা হতে বঞ্চিত, তারা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের সদস্য নয়।

সূরা হুদের ৫০ হতে ৬০ পর্যন্ত ১১ আয়াতে বিশিষ্ট পয়গম্বর হযরত হুদ (আঃ)-এর আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর নামেই অত্র সূরার নামকরণ হয়েছে। অত্র সূরার মধ্যে হযরত নূহ (আঃ) হতে হযরত মুসা (আঃ) পর্যন্ত সাত জন আমিয়ায়ে কোরাম (আঃ) ও তদীয় উম্মতগণের কাহিনী কোরআন পাকের বিশেষ বাচনভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যার মধ্যে উপদেশ ও শিক্ষামূলক এমন তথ্যাদি তুলে ধরা হয়েছে, যা যে কোন অনুভূতিশীল মানুষের অন্তরে ভাবান্তর সৃষ্টি না করে পারে না। তাছাড়া ঈমান ও সংকর্মের বহু মূলনীতি এবং উত্তম পথনির্দেশ রয়েছে।

যদিও অত্র সূরার মধ্যে সাত জন পয়গম্বরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সূরার নামকরণ করা হয়েছে হযরত হুদ (আঃ)-এর নামে। যাতে বোঝা যায় যে, এখানে হযরত হুদ-এর ঘটনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক হযরত হুদ (আঃ)-কে আদ জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। দৈহিক আকার-আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে ‘আদ জাতি’কে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। হযরত হুদ (আঃ) - ও উক্ত জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন—
أَخَاهُمْ هُودٌ
‘তাদের ভাই হুদ’—শব্দে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু পরিতোষের বিষয় যে, এত বড় বীর ও শক্তিশালী জাতি তাদের বিবেক ও চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। নিজেদের হাতে তৈরী প্রস্তরমূর্তিকে তারা তাঁদের

মা’বুদ সাব্যস্ত করেছিল।

হযরত হুদ (আঃ) তাঁর কণ্ঠের নিকট যে দ্বীনী দাওয়াত পেশ করেন, তার তিনটি মূলকথা ৫০, ৫১, ও ৫২ এই তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমতঃ— তওহীদ বা একত্ববাদের আহবান এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্তা বা শক্তিকে এবাদত উপাসনার যোগ্য মনে করা বাতুলতা মার। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি যে তওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছি, এজন্য জীবন উৎসর্গ করছি। তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি এহেন কষ্ট-ক্লেশের পথ কোন স্বার্থে অবলম্বন করছি? আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার বস্ত্রগত কোন ফায়দা বা স্বার্থ হাসিল হচ্ছে না। এটা যদি আল্লাহর নির্দেশ এবং আমার দায়িত্ব না হতো, তাহলে তোমাদেরকে দাওয়াত দিতে ও সংশোধন করতে গিয়ে এত কষ্ট-ক্লেশ বরণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

ওয়াজ্ব নছিহত ও দ্বীনী দাওয়াতের পারিশ্রমিকঃ কোরআন করীমে প্রায় নবী (আঃ)-গণের যবানীতে এ উক্তি ব্যক্ত হয়েছে যে, “আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌছানোর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না।” এতে বোঝা যায় যে, দ্বীনী-দাওয়াত ও তবলীগের কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হলে তা ফলপ্রসূ হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয় যে, যারা ওয়াজ্ব-নসিহত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, তাদের কথা শ্রোতাদের অন্তরে কোন তাসীর করতে পারে না।

তৃতীয়তঃ কথা হচ্ছে, নিজেদের অতীত জীবনে কুফরী, শেরকী ইত্যাদি যত গোনাহ করেছ, সেসব থেকে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য এসব গোনাহ হতে তওবা কর। অর্থাৎ, দৃষ্ট সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা কর যে, আগামীতে আর কখনো এসবের ধারে-কাছেও যাবো না। যদি তোমরা এরূপ সত্যিকার তওবা ও এস্তেগফার করতে পার, (তবে তার বদৌলতে পরকালের চিরস্থায়ী সাক্ষ্য ও সুখময় জীবন তো লাভ করবেই), অধিকন্তু দুনিয়াতেও ইহার বহু উপকারিতা দেখতে পাবে। দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটবে, যথাসময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যার ফলে তোমাদের আহার্য-পানীয়ের প্রাচুর্য হবে, তোমাদের শক্তি-সামর্থ্য বর্ধিত হবে।

এখানে ‘শক্তি’ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মধ্যে দৈহিক শক্তি এবং ধন-বল ও জনবল সবই অন্তর্ভুক্ত। এতদ্বারা জানা গেল যে, তওবা ও এস্তেগফারের বদৌলতে ইহজীবনেও ধন-সম্পদ এক সন্তানাদির মধ্যে বরকত হয়ে থাকে।

হযরত হুদ (আঃ)-এর আহবানের জবাবে তাঁর দেশবাসী মূর্খতাসূলত উত্তর দিল যে, আপনি তো আমাদেরকে কোন মু’জেযা দেখালেন না। শুধু মুখের কথায় আমরা নিজেদের বাপ-দাদার আমলের উপাশ্রয় দেব-দেবীগুলোকে বর্জন করবো না। এবং আপনার প্রতি ঈমানও আনব না। বরং আমরা সন্দেহ করছি যে, আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে আপনার মস্তক বিকৃত হয়ে গেছে। তাই আপনি এমন অসল্লম কথা বলছেন।



(৫৪) বরং আমরা তো বলি যে, আমাদের কোন দেবতা তোমার উপরে পৌনীয় ভূত চাপিয়ে দিয়েছে। হুদ বললেন—আমি আল্লাহকে সাক্ষী করেছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আমার কোন সম্পর্ক নাই তাঁদের সাথে যাদেরকে তোমরা শরিক করছ (৫৫) তাকে ছাড়া, তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অতঃপর আমাকে কোন অবকাশ দিও না। (৫৬) আমি আল্লাহর উপর নিশ্চিত ভরসা করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদেগার। পৃথিবীর যুক বিবরণকারী এমন কোন প্রাণী নাই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার পালনকর্তার সরল পথে সন্দেহ নেই। (৫৭) তথাপি যদি তোমরা মুখ ফেরাও, তবে আমি তোমাদেরকে তা পৌছিয়েছি যা আমার কাছে তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছে আর আমার পালনকর্তা অন্য কোন জাতিকে তোমাদের ক্লান্তিভিত্তিক করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুই বিগড়তে পারবে না; নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগারই প্রতিটি বস্তুর হেফাজতকারী। (৫৮) আর আমার আদেশ যখন উপস্থিত হল, তখন আমি নিজ রহমতে হুদ এবং তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে পরিব্রাজ করি এবং তাদেরকে এক কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করি। (৫৯) এ ছিল ‘আদ জাতি, যারা তাদের পালনকর্তার আয়াতকে অমান্য করেছে, আর তদীয় রসূলগণের অবাধ্যতা করেছে এবং প্রত্যেক উচ্চত বিরাধীদের আদেশ পালন করেছে। (৬০) এ দুনিয়ায় তাদের পিছনে পিছনে লা নত রয়েছে এবং কেয়ামতের দিনেও, জেনে রাখ, ‘আদ জাতি তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে, হুদের জাতি ‘আদ জাতির প্রতি অভিসম্পাত রয়েছে জেনে রাখ। (৬১) আর সামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করি; তিনি বললেন—হে আমার জাতি! আল্লাহর বন্দগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নাই। তিনিই যমীন হতে তোমাদেরকে পয়দা করেছেন, তন্মধ্যে তোমাদেরকে বসতি দান করেছেন। অতঃপর, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর তাঁরই দিকে ফিরে চল। আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন, কবুল করে থাকেন; সন্দেহ নেই। (৬২) তারা বলল—হে সালেহ, ইতিপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যা পূজা করত তুমি কি আমাদেরকে তার পূজা করতে নিষেধ কর? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদের আহবান জানাচ্ছ আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তদুত্তরে হযরত হুদ (আঃ) পয়গম্বরসুলভ নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, তোমরা যদি আমার কথা না মান, তবে শোন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব অলীক উপাসাদের প্রতি আমি রুষ্ট ও বিমুখ। এখন তোমরা ও তোমাদের দেবতারা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের, আমার উপর আক্রমণের চেষ্টা করে দেখ, আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিও না। এত বড় কথা আমি এজন্য বলছি যে, আমি আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখি; যিনি আমার এবং তোমাদের একমাত্র পালনকর্তা। ধরাধামে বিচরণশীল সকল প্রাণীই তাঁর মুঠোর মধ্যে। তাঁর ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া কেউ কারো কোন ক্ষতি করতে পারে না। নিশ্চয় আমার পরওয়ারদেগার সরল পথে রয়েছেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সরল পথে চলবে, সে আল্লাহকে পাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করবেন।

সমগ্র জাতির মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে এমন নির্ভীক ঘোষণা ও তাদের দীর্ঘ দিনের লালিত ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় আঘাত হানা সত্ত্বেও এত বড় সাহসী ও শক্তিশালী জাতির মধ্যে কেউ তাঁর একটি কেশও স্পর্শ করতে পারল না। বস্তুতঃ এটাও হযরত হুদ (আঃ)—এর একটি মু’জ্জেবা। এর দ্বারা একে তো তাদের এ কথার জবাব দেয়া হয়েছে যে, আপনি কোন মু’জ্জেবা প্রদর্শন করেননি। দ্বিতীয়তঃ তারা যে বলত আমাদের কোন কোন দেবতা আপনার মস্তিষ্ক বিবৃত করে দিয়েছে তাও বাতিল করা হল। কারণ দেব-দেবীর যদি কোন ক্ষমতা থাকত, তবে এত বড় কথা বলার পর ওরা তাঁকে জীবিত রাখত না।

অতঃপর তিনি বলেন,—তোমরা যদি এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে থাক, তবে জেনে রাখ, যে পয়গাম পৌছাবার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের নিকট পৌছিয়েছি। অতএব তোমাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব ও গম্বব আপতিত হবে, তোমরা সমূলে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর আমার পরওয়ারদেগার তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে এ পৃথিবীতে আবাদ করাবেন। তোমরা যা করছ তাতে তোমাদেরই সর্বনাশ করছ, আল্লাহ তাআলার কোন ক্ষতি করছ না। আমার পালনকর্তা সবকিছু লক্ষ্য রাখেন, রক্ষাবেক্ষণ করেন। তোমাদের সব ধ্যান-ধারণা ও কার্য-কলাপের তিনি খবর রাখেন।

কিন্তু হতভাগার দল হযরত হুদ (আঃ)—এর কোন কথায় কর্পণাত করল না। তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর অবিচল রইল। অবশেষে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান রূপে আল্লাহর আযাব নেমে এল। সাত দিন আট রাত যাবত অনবরত ঝড় তুফান বইতে লাগল। বাড়ী-ঘর ধ্বংস গেল, গাছ-পালা উপড়ে পড়ল, গৃহ-ছাদ উড়ে গেল, মানুষ ও সকল জীবজন্তু শূন্য উখিত হয়ে সজ্ঞার যমীনে নিকপ্ত হল, এভাবেই সূর্যম দেহের অধিকারী শক্তিশালী একটি জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল।

‘আদ জাতির উপর যখন প্রতিশ্রুত আযাব নামিল হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুযায়ী হযরত হুদ (আঃ) ও সঙ্গী ঈমানদারগণকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আযাব হতে রক্ষা করেন।

‘আদ জাতির কাহিনী ও আযাবের ঘটনা বর্ণনা করার পর অপরাপর লোকদের শিক্ষা ও সতর্কীকরণের জন্য এরশাদ করেছেন যে, কওমে আদ আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর

قَالَ يَقَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَيْنِي مِّنْهُ
 رَحْمَةً مِّنْ يُّصْرُنِي مِنَ اللّٰهِ اَنْ اَحْسِنَ تَةً قَبَارِئِي وَبَنِي عَيْرِ
 تَحْسِبُ ۝ وَيَقَوْمِ هٰذَا نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةٌ فَذَرُوهَا تَاكُلْ فِي
 اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْهُا سُوًى فَاِنَّكُمْ عَدَاۤءٌ لِّقَرِيْبٍ ۝
 فَعَقَرُوْهَا فَتَالَ تَمْنَعُوْا نِي دَارَكُمْ لَكُمۡ لَكُمۡ اٰيَةٌ وَذٰلِكَ وَعَدُ غَيْرِ
 مَّكَذُوْبٍ ۝ فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ
 بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمٍ مَّيۡدَانِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۝
 وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْحَةَ فَاصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ خٰثِرِيْنَ ۝
 كَانَ لَكُمْ يَتُوعًا فِيْهَا اَلَّا تَكُنۡ شُرُوْدًا تَفَرُّوْنَ اَلَّا تَعْبُدُوْا
 اِلٰهًا سِوَايَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوا سَلٰمًا
 قَالَ سَلٰمٌ قَمٰلِكُمْ اَنْ جَاءَكُمْ بِبَيِّنٰتٍ حٰقِقَةٍ فَلَمَّا رَاَ اٰيٰتِيْهِمْ
 لَا نَقُوْلُ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَكَرِهُوْهُمۡ وَاَوْحٰسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَفْعَلُوْا اِنَّا
 اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمٍ مُّوْطِنٍ ۝ وَاَمْرًا۟ لَّهٗ اَكْبَمُ فَصَبَّوْا عَنْهَا فَاَنصَرَفُوْا
 يٰسٰعِيْثُ وَوَيْلٌ لِّرٰسِخِيْنَ يَتُوعُوْا ۝ كَاٰتٍ يُّوْلٰتِيْ اِلٰدٍ
 وَاَنۡا عٰجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلٌ شَيْخٌ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝

(৬৩) সালেহ বললেন—হে আমার জাতি! তোমরা কি মনে কর, আমি যদি আমার পালনকর্তার পক্ষ হতে বুদ্ধি-বিবেচনা লাভ করে থাকি আর তিনি যদি আমাকে নিজের তরফ হতে রহমত দান করে থাকেন, অতঃপর আমি যদি তাঁর অবস্থা ইহা তবে তার থেকে কে আমায় রক্ষা করবে? তোমরা তো আমার ক্ষতি ছাড়া কিছুই বুদ্ধি করতে পারবে না। (৬৪) আর হে আমার জাতি! আল্লাহর এ উদ্দীপ্তি তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতঃপর তাকে আল্লাহর যমীনে বিচরণ করে যেতে দাও, এবং তাকে মন্দভাবে স্পর্শও করবে না। নতুবা অতি সঙ্ঘর তোমাদেরকে আযাব পাকড়াও করবে। (৬৫) তবু তারা উহার পা কেটে দিল। তখন সালেহ বললেন—তোমরা নিজদের গৃহে তিনটি দিন উপভোগ করে নাও। ইহা এমন ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না। (৬৬) অতঃপর আমার আযাব যখন উপস্থিত হল, তখন আমি সালেহকে ও তদীয় সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে উদ্ধার করি, এবং সেদিনকার অপমান হতে রক্ষা করি। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা তিনিই সর্বশক্তিমান পরাক্রমশালী। (৬৭) আর ভয়ঙ্কর গর্জন পাণ্ডিত্যের পাকড়াও করল, ফলে ভোর হতে না হতেই তারা নিজ নিজ গৃহসমূহে উদ্ধৃত হয়ে পড়ে রইল। (৬৮) মনে তাঁরা কোনদিনই সেখানে ছিল না। যেমন রাখ, নিশ্চয় সামুদ জাতি তাদের পালনকর্তার প্রতি অস্বীকার করেছিল। আরো শুনে রাখ, সামুদ জাতির জন্য অভিশাপ রয়েছে। (৬৯) আর অবশ্যই আমার প্রেরিত ফেরেশতারা ইরানীয়ের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল তারা বলল—সালাম, তিনিও বললেন—সালাম। অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটি ভূনা করা বাহুর নিয়ে এলেন। (৭০) কিন্তু যখন দেখলেন যে, আহাযের দিকে তাদের হস্ত প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তিনি সঙ্কল্প হইলেন এবং মনে মনে তাঁদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করতে লাগলেন। তারা বলল—ভয় পাবেন না। আমরা লুতের কণ্ঠের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৭১) তাঁর স্ত্রীও নিকটেই দাঁড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল। অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সুখের দীলিম এবং ইসহাকের পরের ইয়াকুবেরও। (৭২) সে বলল—কি দুর্ভাগ্য আমার। আমি সম্ভান প্রসব করব? অথচ আমি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছি আর আমার স্বামীও বৃদ্ধ, এতো ভারী আশ্চর্য কথা।

রসূলগণকে আমান্য করেছে, হঠকারী পাণ্ডিত্যের কথামত কাজ করেছে। যার ফলে দুনিয়াতে তাদের প্রতি গণ্য নাহিল হয়েছে এবং আখেরাতেও অভিশপ্ত আযাবে নিশ্চিত হবে।

এখানে বোঝা যায় যে, ‘আদ জাতি বড়-ভুফানের কবলে পড়িত হয়েছিল। কিন্তু ‘সূরা মুমিনুন’-এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ভয়ঙ্কর গর্জন তারা ধ্বংস হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, হযরত উভয় প্রকার আযাব নাহিল হয়েছিল। প্রথমে বড় ভুফান শুরু হয়েছিল, চরম পর্যায়ে ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছিল।

৬১ থেকে ৬৮ পর্যন্ত ৮ আয়াতে হযরত সালেহ (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যিনি ‘আদ জাতির দ্বিতীয় শাখা ‘কওমে সামুদ’-এর প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনিও তাঁর কণ্ঠকে সর্বপ্রথম তওহীদের দাওয়াত দিলেন। দেশবাসী তা প্রত্যাহ্বান করে বলল—“এ পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ড থেকে আমাদের সম্মুখে আপনি যদি একটি উদ্ভী বের করে দেখাতে পারেন, তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মানতে রাজী আছি।”

হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, তোমাদের চাহিদা মোতাবেক মু’জেযা প্রদর্শনের পরেও তোমরা যদি ইমান আনতে দ্বিধা প্রকাশ কর, তাহলে কিন্তু আল্লাহ তাআলার বিধান অনুসারে তোমাদের উপর আযাব নেমে আসবে, তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও তারা নিজদের হঠকারিতা থেকে বিরত হল না। আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম কুদরতে তাদের চাহিদা মোতাবেক মু’জেযা জাহির করলেন। বিশাল প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ হয়ে তাদের কবিত গুণাবলী সম্পূর্ণ উদ্ভী আত্ম-প্রকাশ করল। আল্লাহ তাআলা হুকুম দিলেন যে, এ উদ্ভীকে কেউ যেন কোনরূপ কষ্ট-ক্লেশ না দেয়। যদি এরূপ করা হয় তবে তোমাদের প্রতি আযাব নাহিল হয়ে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিষেধ মোতামান্য করল, উদ্ভীকে হত্যা করল। তখন আল্লাহ তাআলা কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। হযরত সালেহ (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণ নিরাপদে রক্ষা পেলেন। অন্য সবাই এক ভয়াবহ গর্জনে ধ্বংস হল। অর ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত সালেহ (আঃ)-এর জাতি তাঁকে বলল
 فَذٰلِكَ فَيۡنَا مَرۡجُوۡا قَبۡلَ هٰذَا

পূজা থেকে আমাদের বারণ করার আগ পর্যন্ত আপনার সম্পর্কে আমরা উচ্চাশা পোষণ করতাম যে, আপনি আগামীতে আমাদের নেতৃত্ব দান করবেন।” এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা বাল্যকাল হতেই নবীপদকে যোগ্যতা ও উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী করে থাকেন। যার ফলে সবাই তাঁদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হতো। যেমন হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুওয়ত ঘোষণা করার পূর্বে সমস্ত আরববাসী তাঁকে সত্যবাদী ও বিশুদী মনে করত, এবং ‘আল-আমীন’ উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কিন্তু নবুওয়তের দাবী ও মূর্তি পূজা থেকে বারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেসব লোক তাঁর বিরোধিতা ও শত্রুতা শুরু করেছিল।

আনুযঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অর্থ, তারা যখন আল্লাহর নিষেধ মোতামান্য করে অলৌকিক উদ্ভীকে হত্যা করল, তখন তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হল যে, মাত্র তিন দিন তোমাদিগকে অবকাশ দেয়া হল, এ তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ অবকাশের তিন দিন ছিল

وَأَعَدَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا لَكُمُ الصَّخْرَ ۖ وَآرْثَآءَ، এই পাণ্ডিত্যদেবকে এক ভয়ঙ্কর
গর্জন এসে পাকড়াও করল। এ ছিল হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর গর্জন,
যা হাজার হাজার বজ্রধ্বনির সম্মিলিত শক্তির চেয়েও ভয়াবহ। যা সত্য
করার ক্ষমতা মানুষ বা কোন জীববস্তুর হতে পারে না। এরূপ প্রাণ
ঈশানো গর্জনেই সকলে মৃত্যুবরণ করেছিল।

এখানে হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ)–এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সম্ভান লাভের সু-সংবাদ দেয়ার জন্য তাঁর কাছে কতিপয় ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছিলেন। কেননা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)–এর স্ত্রী বিবি সারা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি সম্ভানের জন্য একান্ত উদ্বেগী ছিলেন; কিন্তু উভয়ের বার্ষিকের চরম সীমায় উপনীত হওয়ার কারণে দৃশ্যতঃ সম্ভান লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাজালা ফেরেশতার মাধ্যমে সুসংবাদ দান করলেন যে, তাঁরা অচিরেই একটি পুত্রসন্তান লাভ করবেন। তাঁর নামকরণ করা হল ইসহাক। আরো অবহিত করা হল যে, হযরত ইসহাক (আঃ) দীর্ঘ জীবী হবেন, সম্ভান লাভ করবেন, তাঁর সম্ভানের নাম হবে ‘ইয়াকুব’ (আঃ)। উভয়ে নবুওয়তের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট কোন সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। এই সুসংবাদের বিবরণ সামনের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে: **فَبَشِّرْهُ بِالصَّالِحِينَ**

তরুণীকে ক্রুরত্ববীতে ইয়াসিনী সূত্র উদ্ধৃত করে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) একদিন তাঁর সাথে খানা খাওয়ার জন্য মেহমান তাল্লাশ করছিলেন। এমন সময় জনৈক অচেনা লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হল। তিনি তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। যখন খানা খেতে শুরু করবেন, তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আগন্তুক মুসাফিরকে বললেন—“বিসমিল্লাহ্—আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি বল।” সে বলল—“আল্লাহ্ কাকে বলে আমি জানি না।” হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রাগান্বিত হয়ে তাকে দস্তুরখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। যখন সে বের হয়ে গেল, তৎক্ষণাত হযরত জিবরাঈল (আঃ) উপস্থিত হলেন এবং জানানেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—আমি তার কুফরী সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সারা জীবন তাকে আহাব্য-পানীয় দিয়ে আসছি। আর আপনি একে এক বেলা খাবার দিতে পারলেন না। একথা শোনা মাত্র হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ঐ লোকটির তাল্লাশে ছুটলেন। অবশেষে তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি বৈকে বসল এবং বলল, “আপনি প্রথমে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, পরে আবার সাধাসাধি করে আনতে গেলেন কেন? এ কারণ না জানা পর্যন্ত আমি খাদ্য স্পর্শ করব না।”

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ঘটনা বর্ণনা করলেন। কাকের লোকটির মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হল। সে বলল— যে মহান পালনকর্তা ক্ষেপেণ্ডা প্রেরণ করে আপনাকে একথা জানিয়েছেন, তিনি সত্যই পরম দয়ালু। আমি তার প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর সে বিসমিল্লাহ বলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে খানা খেতে আরম্ভ করল।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর অতিথ্যেযার অভ্যাস অনুযায়ী আগন্তুক ফেশেতাগণকে মানুষ মনে করে অনতিবিলম্বে একটি বাছুর গরু জবেহ করলেন এবং উহা ভুনা করে মেহমান ফেশেতাগণের আহ্বরের জন্য তাদের সামনে রাখলেন।

৭০ তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, আগন্তুক ফেরেশতাগণ যদিও মানবাকৃতিতে আগমন করেছিলেন এবং মানবসুলভ পানাহারের বৈশিষ্ট্য তাদেরকে দান করা যদিও সম্ভব ছিল। কিন্তু পানাহার না করার মতোই হেকমত নিহিত ছিল, যেন তাঁদের ফেরেশতা হওয়া প্রকাশ পায়। কাজেই মানবাকৃতি সত্ত্বেও তাঁদের পানাহার না করায় ‘ফেরেশতা স্বভাব’ বজায় রাখা হয়েছিল। যার ফলে তাঁরা আহার্যের দিকে হাত বাড়ান নাই।

কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, ফেরেশতাদের হাতে কিছু তীর

قَالُوا اتَّعَصَيْنَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَمَتْ اللَّهُ وَرَبُّهُ عَلَيْهِمْ أَلْهَلْ
الْبَيْتَ إِنَّهُ حَسِيدٌ بَحِيدٌ قَالُوا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ
وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
لَحَكِيمٌ ۖ وَأَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۖ يٰإِبْرَاهِيمُ اٱعْزِزْ عَنْ هٰذَا إِنَّكَ قَدْ
جَاءَكَ أَمْرٌ رَبِّكَ ۖ وَٱلَّذِينَ هُمْ عِدَابٌ عَلَيْهِمْ أُوذُوا ۖ وَلٰكِنَّا
جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا فِى يَوْمِهِمْ فَذَرَأُوا قَالُوا هٰذَا
يَوْمُ عُصْبَتِكَ ۖ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ
كَانُوا يَعْبُدُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يٰقَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتُى هُنَّ أَكْثَرُ
لَكُمْ فَٱتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِى صَحْبِى ۚ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ
يَشْهَدُ ۚ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِى بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ
وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ ۖ قَالَ لَوِ ٱنَّ فِى يَدِى قُوَّةٌ أَوْ
أُوْتِىَ إِلَىَّ رِزْقٌ سَرِيدٌ ۖ قَالُوا لِيُوطِئَ ٱرْسُلَ رَبِّكَ
لَنْ يُصِلَا إِلَيْكَ فَٱسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا
يَلْقُوكَ مِنْهُمْ أَحَدٌ ۚ أَلَا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهُمَا مَا أَصَابَهُمْ
إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الضُّبْحُ ۖ أَلَيْسَ الضُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۖ

(৭৩) তারা বলল—তুমি আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে বিস্ময়বোধ করছ? হে গৃহবাসীরা, তোমাদের উপর আল্লাহর রহমত ও প্রভূত বরকত রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রণবসিত মহিমায। (৭৪) অতঃপর যখন ইব্রাহীম (আঃ) এর আতঙ্ক দূর হল এবং তিনি সুসংবাদ প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি আমার সাথে তর্ক শুরু করলেন কণ্ঠে লূত সম্পর্কে। (৭৫) ইব্রাহীম (আঃ) বড়ই বৈশিষ্ট্য, কোমল অন্তর, আল্লাহমুখী সন্দেহ নেই। (৭৬) ইব্রাহীম, এহেন ধারণা পরিহার কর; তোমার পালনকর্তার হুকুম এসে গেছে, এবং তাদের উপর সে আযাব অবশ্যই আপতিত হবে, যা কখনো প্রতিহত হবার নয়। (৭৭) আর যখন তোমাদের প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূত (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হল। তখন তাঁদের আগমনে তিনি দৃষ্টিগোচর হলেন এবং তিনি বলতে লাগলেন—আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। (৭৮) আর তাঁর কণ্ঠের লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর (গৃহ) পানে ছুটে আসতে লাগল। পূর্ব থেকেই তারা কু-কর্মে তৎপর ছিল। লূত (আঃ) বললেন—‘হে আমার কণ্ঠ, এ আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্রতমা। সুতরাং তোমার আল্লাহকে ভয় কর, এবং অতিথিদের ব্যাপারে আমাকে লজ্জিত করো না, তোমাদের মধ্যে কি কোন লজ্জা মানুষ নেই। (৭৯) তারা বলল—তুমি তো জানই, তোমার কন্যাদের নিয়ে আমাদের কোন গরজ নেই। আর আমরা কি চাই, তাও তুমি অবশ্যই জান। (৮০) লূত (আঃ) বললেন—হায়, তোমাদের বিরুদ্ধে যদি আমার শক্তি থাকত অথবা আমি কোন সুদৃঢ় আশ্রয় গ্রহণ করতে সক্ষম হতাম। (৮১) যেহেতু ফেরেশতাগণ বলল—হে লূত (আঃ) আমরা তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে প্রেরিত পেরেশতা। এরা কখনো তোমার দিকে পৌছতে পারবে না। ব্যস তুমি কিছুটা রাত থাকতে থাকতে নিজের লোকজন নিয়ে বাইরে চলে যাও। আর তোমাদের কেউ খেন পিছনে ফিরে না তাকায়। কিন্তু তোমার স্ত্রী নিশ্চয় তার উপরও তা আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে। ভোর বেলাই তাদের প্রতিশ্রুতির সময়, ভোর কি খুব নিকটে নয়?

ছিল। তাঁরা উহার ফলক দ্বারা ভূনা গোশত স্পর্শ করছিলেন। তাঁদের এহেন আচরণে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সন্ধিগ্ন ও শঙ্কিত হলেন। কারণ, সে দেশে নিয়ম ছিল যে, অসদুদ্দেশে কেউ কারো বাড়ীতে মেহমান হলে সেখানে পানাহার করত না। (তফসীরে কুরতুবী) অবশেষে ফেরেশতাগণ প্রকাশ করে দিলেন যে, আপনি ভীত হবেন না। আমরা মানুষই নই, বরং আল্লাহর ফেরেশতা।

আহকাম ও মাসায়েল

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামী আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত দেয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তদীয় তফসীরে যার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

সালামের সুনত : **قَالُوا سَلَامٌ ۚ** “তাঁরা সালাম বললেন, তিনিও বললেন সালাম।” এতদ্বারা বোঝা যায় যে, মূলসম্মানের পারস্পরিক সাফাৎ-মোলাকাতের সময় পরস্পরকে সালাম করা কর্তব্য। আরো জানা গেল যে, আগন্তুক ব্যক্তি প্রথমে সালাম করবে, অন্যরা তার জবাব দেবে—এটাই বাঞ্ছনীয়।

পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎকালে বিশেষ কোন বাক্য উচ্চারণ করে একে অপরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার রীতি পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। তবে এ ব্যাপারেও ইসলামের শিক্ষা অনন্য ও সর্বোত্তম। কেননা সালামের সুনত সমস্ত বাক্য **عليكم السلام**—এর মধ্যে সর্বপ্রথম ‘আস-সালামু’ আল্লাহর একটি গুণ বাচক নাম হওয়ার কারণে আল্লাহর যিকর করা হল, সযোষিত ব্যক্তির জন্য সালামতি ও নিরাপত্তার দোয়া করা হল, নিজের পক্ষ হতে তার জান-মাল ইচ্ছাতের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হল।

এখানে কোরআন পাকে ফেরেশতাদের পক্ষ হতে **سَلَامٌ** ‘সালামাদ’ এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর তরফ হতে শুধু **سَلَامٌ** ‘সালামুন’ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে সালাম ও জবাবের পূর্ণ বাক্য উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। কার্যতঃ অবশ্য এখানে উভয়ক্রে সুনত মোতাবেক সালাম জবাবের পূর্ণ বাক্যই বোঝানো হয়েছে। হযরত রসুলে করীম (সাঃও) নিজের আচরণের মাধ্যমে সালামের পূর্ণ বাক্য শিক্ষা দান করেছেন। অর্থাৎ, প্রথম পক্ষ আস-সালামু আলাইকুম বলবে, তদুত্তরে দ্বিতীয় পক্ষ ‘ওয়া-আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমতুল্লাহ’ বলবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হুদে পূর্ববর্তী অধিকাংশ আয়িয়াহে কেরাম (আঃ) ও তাঁদের উম্মতগণের কাহিনী ও নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আসমানী আযাব অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত লূত (আঃ) ও তাঁর দেশবাসীর অবস্থা ও দেশবাসীর উপর কঠিন আযাবের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

হযরত লূত (আঃ) এর কণ্ঠ একে তো কাকের ছিল, অধিকন্তু তারা এমন এক জঘন্য অপকর্ম ও লজ্জাকর অনাচারে লিপ্ত ছিল, যা পূর্ববর্তী কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায় নাই, বন্য পশুরাও যা ঘৃণা করে থাকে। অর্থাৎ, পুরুষ কর্তৃক অন্য পুরুষের সাথে মৈথুন করা। ব্যাভিচারে চেয়েও ইহা জঘন্য অপরাধ। এ জন্যই তাদের উপর এমন কঠিন আযাব অবতীর্ণ হয়েছে, যা অন্য কোন অপকর্মকারীদের উপর কখনো অবতীর্ণ হয় নাই।

হযরত লূত (আঃ)—এর ঘটনা যা অত্র আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত জিব্রীল (আঃ) সহ কতিপয় ফেরেশতাকে কওমে লূতের উপর আযাব নাযিল করার জন্য প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে তারা ফিলিস্তীনে প্রথমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)—এর নবীপে উপস্থিত হন।

আল্লাহ তাআলা যখন কোন জাতিকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করেন, তখন তাদের কার্যকলাপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আযাবই নাযিল করে থাকে। এ ক্ষেত্রেও ফেরেশতাগণকে নওজোয়ানরূপে প্রেরণ করেন। হযরত লূত (আঃ) ও তাঁদেরকে মানুষ মনে করে তাদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ মেহমানের আতিথেয়তা নবীর নৈতিক দায়িত্ব। পক্ষান্তরে দেশবাসীর কু-স্বভাব তাঁর অজানা ছিল না। উভয় সংকেটে পড়ে তিনি স্বগতোক্তি করলেন—“আজকের দিনটি বড় সংকটময় দিন।”

আল্লাহ জালা শানুহ এ দুনিয়াকে আজব শিক্ষাক্ষেত্র বানিয়েছেন। যার মধ্যে তাঁর অসীম কুদরত ও অফুরন্ত হেকমতের ভূরি ভূরি নিদর্শন রয়েছে। মূর্তিপূজারী আযবের গৃহে আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ)—কে পয়সা করেছেন। হযরত লূত (আঃ)—এর মত একজন বিশিষ্ট পয়গম্বরের স্ত্রী নবীর বিরুদ্ধাচরণ করে কাফেরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত। সম্মানিত ফেরেশতাগণ সুন্দর নওজোয়ান আকৃতিতে যখন হযরত লূত (আঃ)—এর গৃহে উপনীত হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী সমাজের দুই লোকদেরকে স্ববর দিল যে, আজ আমাদের গৃহে এরূপ মেহমান আগমন করেছেন।—(কুরত্বী ও মাযহারী)

হযরত লূত (আঃ)—এর আশঙ্কা যথার্থ প্রমাণিত হল। যার বর্ণনা ৭৮ নং আয়াতে দেয়া হয়েছে وَجَاءَهُمْ قَوْمٌ بِهَيْئَةٍ الْيَاسْرِ “আর তাঁর কওমের লোকেরা আত্যাচার হয়ে তাঁর গৃহপানে ছুটে এল। আর আগে থেকেই তারা কু-কর্মে অভ্যস্ত ছিল।”

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জঘন্য কু-কর্মের প্রভাবে তারা এতদূর চরম নির্ভঙ্ক হয়েছিল যে, হযরত লূত (আঃ)—এর মত একজন সম্মানিত পয়গম্বরের গৃহ প্রকাশ্যভাবে অবরোধ করেছিল।

হযরত লূত (আঃ) যখন দেখলেন যে, তাদেরকে প্রতিরোধ করা দুষ্কর, তখন তাদেরকে দুষ্কৃতি হতে বিরত রাখার জন্য তাদের সর্দারদের নিকট স্বীয় কন্যাদের বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব দিলেন। তৎকালে কাফের গাত্রের সাথে মুসলিম পাত্রীর বিবাহ-বন্ধন বৈধ ছিল। হুযূরে আকরাম (সঃ)—এর প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত এ হুকুম বহাল ছিল। এ জন্যই হযরত (সঃ) স্বীয় দুই কন্যাকে প্রথমে উভবা ইবনে আবু লাহাব ও আবুল আস ইবনে রবী’র কাছে বিবাহ দিয়েছিলেন। অথচ তখন তারা উভয়ে কুফরী ফলতে ছিল। পরবর্তীকালে ওহীর মাধ্যমে কাফেরের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ হারাম ঘোষণা হয়।—(কুরত্বী)

কোন কোন তফসীরকারের মতে—এখানে হযরত লূত (আঃ) নিজের কন্যা দ্বারা সমগ্র জাতির বধু কন্যাদের বন্ধিয়েছেন। কেননা, প্রত্যেক নবী নিজ উম্মতের জন্য পিতৃত্ব্য এবং উম্মতগণ তাঁর রূহানী সন্তানস্বরূপ।

যেমন কোরআনের ২১ পারা সূরা আহযাবের ৬ষ্ঠ আয়াত اَللّٰهُ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ اَتَهُمْ

ইবনে মাসউদ (রাঃ)—এর ক্বোরে لهم و هو اب বাক্যও বর্ণিত আছে। যার মধ্যে হযরত রসূলে করীম (সঃ)—কে সমগ্র “উম্মতের পিতা” বলে অভিহিত করা হয়েছে। অত্র তফসীর অনুসারে হযরত লূত (আঃ)—এর

কথার অর্থ হল, তোমরা নিজের কদাচার হতে বিরত হও এবং ভদ্রভাবে কওমের কন্যাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে বৈধভাবে স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর।

অতঃপর হযরত লূত (আঃ) তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভীতি প্রদর্শন করে বললেন فَاتَّقُوا اللَّهَ “আল্লাহকে ভয় কর” এবং কাকুতি-মিনতি করে বললেন—وَلَا تَخْزَوْنِيْ فِىْ ضَيْفِيْ “আমার মেহমানদের ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করো না।” তিনি আরো বললেন—اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ زَوَّجْتُكُمْ بِهٖ “তোমাদের মাঝে কি কোন ন্যায়নিষ্ঠ ভাল মানুষ নেই? আমার আকুল আবেদনে যার অন্তরে এতটুকু করুণার সৃষ্টি হবে।

কিন্তু তাদের মধ্যে শালীনতা ও মনুষ্যত্বের লেশমাত্র ছিল না। তারা একযোগে বলে উঠল—“আপনি তো জানেনই যে, আপনার বধু-কন্যাদের প্রতি আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আর আমরা কি চাই, তাও আপনি অবশ্যই জানেন।”

লূত (আঃ) এক সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন—হায়, আমি যদি তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হতাম, অথবা আমার আত্মীয়-স্বজন যদি এখানে থাকত, যারা এই জ্বালেমদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করতো, তাহলে কত ভালো হতো।

ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আঃ)—এর অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে প্রকৃত রহস্য ব্যক্ত করলেন এবং বললেন—আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনার দলই সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। আমরা মানুষ নই, বরং আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা। তারা আমাদেরকে কাবু করতে পারবে না বরং আযাব নাযিল করে দুরাত্মা-দুরাচারদের নিপাত সাধনের জন্যই আমরা আগমন করেছি।

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, “আল্লাহ তাআলা হযরত লূত (আঃ)—এর উপর রহম করন, তিনি নিরুপায় হয়ে সুদৃঢ় জামাতের আশ্রয় কামনা করেছিলেন।” তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত লূত (আঃ)—এর পরবর্তী প্রত্যেক নবী সম্প্রদায় ও শক্তিশালী বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।—(কুরত্বী) স্বয়ং রসূলে করীম (সঃ)—এর বিরুদ্ধে কোরাইশ-কাফেরগণ হাজার রকম অপচেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাঁর হাশেমী গোত্রের লোকেরা সম্মিলিতভাবে তাঁকে আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে, যদিও ধর্ম-মতের দিক দিয়ে তাদের অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করত। এ জন্যই সম্পূর্ণ বনী-হাশেম গোত্র রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর সাথে शामिल ছিল। যখন কোরাইশ কাফেররা তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের দানা-পানি বন্ধ করে দিয়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, দুর্বৃত্তরা যখন হযরত লূত (আঃ)—এর গৃহদ্বারে সমবেত হল, তখন তিনি গৃহদ্বার রুদ্ধ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ গৃহে অবস্থান করছিলেন। আড়াল হতে দুইদেদর কথাবার্তা চলছিল। তারা দেয়াল উপকে ভিতরে প্রবেশ এবং কপাট ভাঙতে উদ্যোগী হল। এমন সংগীন মুহুর্তে হযরত লূত (আঃ) পূর্বোক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে অভয় দান করলেন এবং গৃহদ্বার খুলে দিতে বললেন। তিনি দুয়ার খুলে দিলেন। হযরত জিব্রীল (আঃ) ওদের প্রতি তাঁর পাখার ঝাপটা দিলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল এবং ভাগতে লাগল।

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ
حِجَابًا مِّنْ سَبِيلٍ ۖ وَمُضَوِّدٌ ۖ مِّمَّا مَوْمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَ
مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۖ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا
قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ الْوَعْدَةِ وَلَا
تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْوِزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ مُّخِلًّا وَأَنَّىٰ
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ۖ وَيَقَوْمِ أَوْشُوا
الْمِكْيَالَ وَالْوِزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَتَّبِعُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتَوُوا الْأَرْضَ مَعْيِدِينَ ۖ بَقِيَّتُكَ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكَ إِن
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۖ قَالُوا الْيَهُودُ
أَصْلُوكُ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرَكَ مَا يُعْبَدُ آبَاؤُنَا وَإِنْ تَفْعَلْ
فِي أَمْوَالِنَا نَشْأُوهُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ ۖ قَالَ
يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ سَبِيلٍ مِّنْ رَبِّي وَرَفَعْتُ مَنَّهُ
رِسًا فَاسْحَنُوا لِئِنْ أَرِيدُ أَنْ أَخْلِفُكُمُ إِلَىٰ مَا أَنهَكُمُ
عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا
تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَهُودُ يَتَكَبَّرُونَ ۖ

(৮২) অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাকর-পাখর বর্ষণ করলাম। (৮৩) যার প্রতিটি তোমার পালনকর্তার নিকট চিহ্নিত ছিল। আর সেই পাপিষ্ঠদের থেকে খুব দূরেও নয়। (৮৪) আর মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোয়ায়েব (আঃ)-কে প্রেরণ করেছি। তিনি বললেন— হে আমার কণ্ঠ! আল্লাহর বদনগী কর, তিনি ছাড়া আমাদের কোন মাবুদ নাই। আর পরিমাপে ও ওজনকে কম দিও না, আজ আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থায়ই দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের উপর এমন একদিনের আযাবের আশঙ্কা করছি যেদিনটি পরিবেষ্টনকারী। (৮৫) আর হে আমার জাতি, ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনরূপ ক্ষতি করো না, আর পৃথিবীতে ফাসাদ করে বেড়াবে না। (৮৬) আল্লাহ প্রদত্ত উদ্ধৃত তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা ঈমানদার হও, আর আমি তো তোমাদের উপর সদা পর্যবেক্ষণকারী নই। (৮৭) তারা বলল— হে শোয়ায়েব (আঃ), আপনার নামায় কি আপনাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা এসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খাস মহৎ ব্যক্তি ও সংপথের পথিক। (৮৮) শোয়ায়েব (আঃ) বললেন— হে দেশবাসী, তোমরা কি মনে কর। আমি যদি আমার পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীলের উপর কয়েম থাকি আর তিনি যদি নিজের তরফ হতে আমাকে উত্তম রিখিক দান করে থাকেন, (তবে কি আমি তাঁর হুকুম অমান্য করতে পারি?) আর আমি চাই না যে— তোমাদেরকে যা ছাড়াতে চাই পরে নিজেই সে কাছ লাগে হব, আমি তো যথাসাধ্য শোখরাতে চাই। আল্লাহর মদদ দুরাই কিন্তু কাছ হয়ে থাকে, আমি তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং তাঁরই প্রতি ফিরে যাই।

তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার নির্দেশক্রমে হযরত নূত (আঃ)-কে বললেন— আপনি কিছুটা রাত থাকতে আপনার লোকজনসহ এখান থেকে অন্যত্র সরে যান এবং সবাইকে সতর্ক করে দিন যে, তাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়, তবে আপনার স্ত্রী ব্যতীত। কারণ, অন্যদের উপর যে আযাব আপতিত হবে, তাকেও সে আযাব জোম করতে হবে।

ইহার এক অর্থ হতে পারে যে, আপনার স্ত্রীকে সাথে নেন না। (দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে যে, তাকে পিছনে ফিরে চাইতে নিষেধ করবেন না।—(অনুবাদক)। আরেক অর্থ হতে পারে যে, সে আপনার হৃদয়ই মেনে চলবে না।

কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, তাঁর স্ত্রীও সাথে যাচ্ছিল। কিন্তু পাপিষ্ঠদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনাটা শুনে পশ্চাতে ফিরে তাকাল এবং কণ্ঠের শোচনীয় পরিণতি দেখে দৃষ্ট প্রকাশ করতে লাগল। তৎক্ষণাৎ একটি প্রস্তরের আঘাতে সেও অন্ধা পেল।—(কুরত্বী ও মাযহারী)

ইন মুওহহুমু الضُّبَيْرُ ফেরেশতারা আরো জানিয়ে দিলেন যে, প্রত্যুষকালেই তাদের উপর আযাব আপতিত হবে। হযরত নূত (আঃ) বললেন— “আমি চাই, আরো জলদি আযাব আসুক।” ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন “الْبَيْسُ الضُّبَيْرُ بِقَرْبٍ” প্রত্যুষকাল দূরে নয়, বরং সমাগত প্রায়।”

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অতঃপর উক্ত আযাবের ধরন সম্পর্কে কোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে—যখন আযাবের হুকুম কার্যকরী করার সময় হল, তখন আমি তাদের বসতির উপরিভাগকে নীচে করে দিলাম এবং তাদের উপর অবিশ্রান্তভাবে এমন পাখর বর্ষণ করলাম, যার প্রত্যেকটি পাখর একজনের নামে চিহ্নিত ছিল।

বর্ণিত আছে যে, চারটি বড় বড় শহরে তাদের বসতি ছিল। এসব জনপদকেই কোরআন পাকের অন্য আয়াতে **وَالْمُؤْتَفِكَةِ** ‘মুতাফেকাত’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত জিব্রীল (আঃ) তাঁর পাখা উক্ত শহর চতুষ্টির যমীনের তলদেশে ধরি করতঃ এমনভাবে মহাশূন্যে উত্তোলন করলেন যে, সবকিছু নিঃস্থান স্থির ছিল। এমনকি পানি ভর্তি পাত্র হতে এক বিন্দু পানিও পড়ল না বা নড়ল না। মহাশূন্য হতে কুসুর আনোয়ার ও মানুষের চিৎকার ভেসে আসছিল। এসব জনপদকে সোজাভাবে আকাশের দিকে তুলে উলটিয়ে যথাস্থানে নিক্ষেপ করা হল। তারা আল্লাহর আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে উলটিয়েছিল, তাই এটা ছিল তাদের উপযুক্ত শাস্তি।

হযরত নূত (আঃ)-এর নাফরমান জাতির শোচনীয় পরিণতি বর্ণন করার পর দুনিয়ার অপরাধের জাতিতে সতর্ক করার জন্য এরশাদ হয়েছে — **وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ** প্রস্তর বর্ষণের আযাব বর্তমানকালের জালেমদের থেকেও দূরে নয়। বরং কোরাইশ কাকেরদে জন্য ঘটনাস্থল ও ঘটনাকাল খুবই কাছে এবং অন্যান্য পাপিষ্ঠরাও যে নিজেদেরকে এহেন আযাব হতে দূরে মনে না করে। রসুলে করীম (শাঃ) এরশাদ করেছেন, “আমার উম্মতের কিছু লোক কণ্ঠের লুতের অপকর্ষ

লিপ্ত হবে। যখন এরূপ হতে দেখবে, তখন তাদের উপরও অনুরূপ আযাব আসার অপেক্ষা কর।”

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) ও তাঁর কণ্ডমের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। তারা কুফরী ও শেরকী ছাড়া ওজনে-পরিমাণেও লোকদের ঠকাতো। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন এবং ওজনে কম-বেশী করতে নিষেধ করলেন। আল্লাহর আযাবের ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও না-ফরমানীর উপর অটল রইল। ফলে এক কঠিন আযাবে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে গেল।

وَإِلَّا مَذَرِينَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا مُنَافِقِينَ ۖ ‘আর আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের তাই শোয়াইব (আঃ)-কে প্রেরণ করছি।’ ‘মাদইয়ান’ আসলে একটি শহরের নাম। মাদইয়ান ইবনে ইব্রাহীম ইহার পুত্রন করেছিলেন। সিরিয়ার বর্তমান معان ‘মোয়ান’ নামক স্থানে উহা অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। উক্ত শহরের অধিবাসীগণকে মাদইয়ানবাসী বলার পরিবর্তে শুধু “মাদইয়ান” বলা হত। আল্লাহ তাআলার বিশিষ্ট পয়গম্বর হযরত শোয়ায়েব (আঃ) উক্ত মাদইয়ান কণ্ডমের লোক ছিলেন তাই তাঁকে “তাদের ভাই” বলা হয়েছে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ করে তাদের স্বজাতির এক ব্যক্তিকে তাদের কাছে পয়গম্বর হিসেবে প্রেরণ করলেন, যেন তাঁর সাথে জানাশোনা থাকার কারণে সহজেই তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে।

قَالَ يٰٓأَيُّهَا الْعِبَادُ وَاللّٰهُ مَا لَكُمْ مِنَ الْوَعْدَةِ وَلَا تَنْفَعُكُمْ ۚ الْيٰٓكِلَ وَالْيٰٓكِلَ ۚ ‘তিনি বললেন— হে আমার জাতি! তোমরা একমাত্র আল্লাহর এবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের মাবুদ হওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। আর তোমরা ওজনে ও পরিমাণে কম দিও না।’ এখানে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) নিজ জাতিকে প্রথমে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানালেন। কেননা, তারা ছিল মুশরেক, গাছপালার পূজা করত। এজন্যই মাদইয়ানবাসীকে ‘আসহাবুল-আইকা’ বা ‘জঙ্গলওয়ালা’ উপাধি দেয়া হয়েছে। এহেন কুফরী ও শেরকীর সাথে সাথে আরেকটি মারাত্মক দোষ ও জঘন্য অপরাধ ছিল যে, আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয় কালে ওজনে-পরিমাণে হের-ফের করে লোকের হক আত্মসাৎ করত। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন।

এখানে বিশেষ প্রাধান্যযোগ্য যে, কুফরী ও শেরকীই সকল পাপের মূল। যে জাতি ইহাতে লিপ্ত, তাদেরকে প্রথমই তওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়। ঈমান আনয়নের পূর্বে আমল ও কায়-কারবারের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় না। দুনিয়াতে তাদের সফলতা অথবা ব্যর্থতাও শুধু ঈমান বা কুফরীর ভিত্তিতে হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে আমলের কোন দখল থাকে না। কোরআন পাকে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীগণের ও তাঁদের জাতিসমূহের ঘটনাবলী ইহার প্রমাণ। তবে শুধু দুইটি জাতি এমন ছিল, যাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কুফরীর সাথে সাথে তাদের বদ-আমলেরও দখল ছিল। প্রথম, হযরত লূত (আঃ)-এর জাতি যাদের কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের কুফরী ও গর্হিত অপকর্মের কারণে তাদের বসতিকে উলটিয়ে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কণ্ডম। যাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার জন্য কুফরী ও মাণে কম দেয়ায় কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

এতে করে বোঝা যায় যে, পুণ্ডিমখন ও মাণে কম দেয়া আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ। কারণ ইহা এমন

দু’টি কার্য যার ফলে সমগ্র মানব জাতির চরম সর্বনাশ সাধিত এবং সারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

ওজন-পরিমাণে হের-ফের করার ইহন মানসিকতা দূর করার জন্য হযরত শোয়ায়েব (আঃ) প্রথমে স্বীয় দেশবাসীকে পয়গম্বরসুলভ স্নেহ ও দরদের সাথে বললেন

إِنِّي أَرْسَلْتُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحْضٍ ۖ ‘বর্তমানে আমি তোমাদের অবস্থা খুব ভাল ও সচ্ছ দেখছি। তৎক্ষণাতর আশ্রয় গ্রহণ করার মত কোন কারণ দেখি না। তাই আল্লাহ তাআলার এ অনুগ্রহে শোকর আদায় করার জন্য হলেও তোমাদের পক্ষে তাঁর কোন সৃষ্ট জীবকে ঠকানো উচিত নয়। তোমরা যদি আমার কথা না শোন, আমার নিষেধ অমান্য কর, তাহলে আমার ভয় হয় যে, আল্লাহর আযাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এখানে আশ্বেতের আযাব বোঝানো হয়েছে, দুনিয়ার আযাবও হতে পারে, আবার দুনিয়ার আযাব বিভিন্ন প্রকারও হতে পারে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন আযাব হচ্ছে, তোমাদের স্বচ্ছলতা খতম হয়ে যাবে, তোমরা অভাবগ্রস্ত দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে। যেমন রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন—“যখন কোন জাতি মাণে কম দিতে শুরু করে তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধিজনিত শাস্তিতে পতিত করেন।”

ওজন-পরিমাণে কম দিতে নিষেধ করার মধ্যমই পরোক্ষভাবে যদিও সঠিক ওজন করার আদেশ হয়ে গেছে, তথাপি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হযরত শোয়ায়েব (আঃ) উদাত্ত আহ্বান জানালেন

وَيَقُومُوا أَفْئِدَةً وَآلِ الْيٰٓكِلَ ۚ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ ۚ

وَالْيٰٓكِلَ ۚ ‘হে আমার জাতি। ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে ঠিক ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কম দিও না আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।’ অতঃপর তিনি মমতার সাথে আরো বললেন :

يَقِيْنُكَ اللّٰهُ خَيْرٌ لِّمَنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَا عَلَيْكُمْ حَقِيْقٌ

“মানুষের পাওনা ঠিকমত ওজন করে পুরোপুরি দিয়ে দেয়ার পর যে লভ্যাংশে উদ্ধৃত থাকে, তোমাদের জন্য তা-ই উত্তম। পরিমাণে স্বল্প হলেও আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে বরকত দান করবেন, যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর। আর যদি অমান্য কর, তবে মনে রেখ-তোমাদের উপর কোন আযাব অবতীর্ণ হলে, তা থেকে তোমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমার নয়।”

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) সমুদ্রে রসূলে করীম (সাঃ) মন্তব্য করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন ‘খতীমুল-আম্মিয়া’ বা নবীগণের মধ্যে প্রধান বক্তা। তিনি তাঁর সুললিত বয়ান ও অপূর্ব বাগ্মীতার মাধ্যমে স্বীয় জাতিকে বোঝানো এবং সংপথে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু এত কিছু শোনার পরেও তাঁর কণ্ডমের লোকেরা পূর্ববর্তী বর্ষর পাশিষ্ঠদের ন্যায় একই জবাব দিল। তারা নবীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতঃ আল্লাহর নবীকে ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ করে বলল :

أَصَلَوْتُكَ تَمْزُكُ أَنْ تَنْزُكَ مَا يَمَعُ ۚ

أَبَاؤُنَا وَأَنْ تَقْعَلُ فِيْ أَمْرِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْكَاذِبُ الرَّشِيْدُ

আপনার নামায কি আপনাকে শিখায় যে, আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দেই, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যার পূজা করে আসছে। আর আমাদের ধন-সম্পদকে নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করার

অধিকারী না থাকি? কোনটা হালাল কোনটা হারাম তা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে করে সব কাজ করতে হবে?

হযরত শোয়েব (আঃ) সম্পর্কে সারাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি অধিকাংশ সময় নামায ও নফল এবাদতে মগ্ন থাকেন। তাই তারা তাঁর মূল্যবান নীতি বাক্যসমূহকে বিদ্রূপ করে বলতো— আপনার নামায কি আপনাকে এসব আবোল-তাবোল কথাবার্তা শিক্ষা দিচ্ছে?

ওদের এসব মন্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, এরা ধর্মকে শুধু কতিপয় আচার-আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করতো। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মকে কোন দখল দিত না। তারা মনে করত, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধন-সম্পদ যেমন খুশী ভোগ দখল করতে পারে, এ ক্ষেত্রে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা ধর্মের কাজ নয়। যেমন, বর্তমান যুগেও কোন কোন অবুঝ লোকের মধ্যে এহেন চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়।

অকৃত্রিম দরদ, নিঃস্বার্থ কল্যাণকামিতা ও সদুপদেশের জ্বাবে কণ্ঠের লোকেরা কতবড় রূঢ় মন্তব্য করল। কিন্তু হযরত শোয়ায়েব (আঃ)—এর চরিত্রে ছিল নবীসুলত সহনশীলতা। তাই উপহাস-পরিহাসের পরেও তিনি দরদের সাথে তাদেরকে সম্মুখীন করে বোঝাতে লাগলেন :

قَالَ يٰٓقَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا

হে আমার জাতি! তোমরা বলতো, যদি আমার প্রভুর পক্ষ হতে আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য আমার কাছে থাকে এবং আল্লাহ তাআলা যদি আমাকে সর্বাধিক উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, অর্থাৎ, দেহের

জ্ঞান প্রয়োজনীয় বাহ্যিক রিযিকও দান করেছেন অধিকন্তু বুদ্ধি-বিলেহ তথা নবুওয়তের দূর্বল মর্যাদাও দান করেছেন, এতদসত্ত্বেও কি আমি তোমাদের মত অন্যায় ও গোমরাহীর পথ অবলম্বন করব এবং সত্যের কণী তোমাদেরকে পৌছাব না?

অতঃপর তিনি আরো বললেন—

وَمَا يُؤْمِنُ اِلَّا خَالِفُكَ اِلٰى مَا تُهْمُكَ عَنْهُ

তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি যে কাজ হতে তোমাদেরকে বাধা দেই, নিজেও তার কাছে কখনো যাই না। আমি যদি তোমাদেরকে নিজে করে নিজে সে কাজ করতাম তাহলে তোমাদের কথা বলার অবকাশ ছিল।

এতদ্বারা বোঝা গেল যে, ওয়াজ নসিহত ও তকলীগকারীর কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা অপরিহার্য। অন্যথায় তার কথায় শ্রোতাদের কোন ফায়দা হয় না।

অতঃপর বলেন— اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ

“আমার আশ্রয় চেষ্টা এবং বার বার বোঝাবার একমাত্র উদ্দেশ্য তোমাদেরকে যথাসাধ্য সংশোধন করা। অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আর চেষ্টা-সাধনাও নিজ বাহু বলে নয় বরং—

وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيبُ

“আমি যা কিছু করছি তা আল্লাহর মদদেই করছি। অন্যথায় আমার চেষ্টা করারও সাধ্য ছিল না। তাঁর উপরই আমি ভরসা রাখি এবং সর্বকাজে সর্বাবস্থায় তাঁরই প্রতি রুজু হই।”

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নসীহত ও উপদেশ দানের পরে তিনি পুনরায় তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে সতর্ক করে বললেন—

وَيَقُولُ لَا يَحْزِمُهُمُ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ نُؤْمُرُ أَقْوَمُ هُودٌ أَقْوَمُ صَالِحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ

হে আমার কণ্ঠ, সাবধান! আমার সাথে বিদ্বেষ ও জিদ করে তোমরা নিজেদের উপর কণ্ঠে নূহ অথবা কণ্ঠে হুদ কিংবা সালেহ (আঃ)—এর কণ্ঠের মত বিপদ ডেকে আনবে না। আর লূত (আঃ)—এর জাতি ও তাদের শোচনীয় পরিণত তো তোমাদের থেকে খুব দূরেও নয়। অর্থাৎ, কণ্ঠে লূতের উষ্টিয়ে দেয়া জনপদগুলি মাদইয়ান শহরের অদূরেই অবস্থিত। তাদের উপর আযাব নামিল হওয়ার ঘটনা তোমাদের সময় থেকে খুব আগের কোন ব্যাপার নয়। অতএব, উহা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং হঠকারিতা পরিত্যাগ কর।

কণ্ঠের লোকেরা একথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগল—
“আপনার গোষ্ঠী-জাতির কারণে আমরা এতদিন আপনাকে কিছু বলিনি। নতুবা অনেক আগেই প্রস্তর আঘাতে আপনাকে হত্যা করে ফেলতাম।”

এরপরে হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে নসীহত করে বললেন—
“তোমরা আমার আত্মীয়-স্বজনকে ভয় কর, সম্মান কর, অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর না।”

শেষ পর্যন্ত কণ্ঠের লোকেরা যখন হযরত শোয়ায়েব (আঃ)—এর কোন কথা মানল না, তখন তিনি বললেন— ‘ঠিক আছে, তোমরা এখন আযাবের অপেক্ষা করতে থাক।’ অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুসারে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)—কে এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী ঈমানদারগণকে উক্ত জনপদ হতে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন এবং হযরত জিব্রীল (আঃ)—এর এক ভয়ঙ্কর হাকে অবশিষ্ট সবাই এক নিমেষে ধ্বংস হল।

আহকাম ও মাসায়েল

মাপে কম দেয়া : আলোচ্য আয়াতসমূহে মাদইয়ানবাসী ধ্বংস হওয়ার অন্যতম কারণ নির্দেশ করা হয়েছে মাপে কম দেয়াকে, আরবীতে যাকে ‘ততক্ষীফ’ বলা হয়। কোরআন করীমের—
وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ
‘আয়াতে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ওলামায়ে উম্মতের ‘এজমা’ বা সর্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহা সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম মালেক (রহঃ) তদীয় ‘মোয়াত্তা’ কিতাবে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)—এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, ওজন-পরিমাপে কম দেয়ার কথা বলে, আসলে বোঝান হয়েছে— কারো কোন ন্যায্য পাওনা পুরোপুরি না দিয়ে কম দেয়া; তা ওজন ও পরিমাপ করার বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু হোক। কোন বেতনভোগী কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট কর্তব্য পালনে গড়িমসি করে, কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী যদি নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কম সময় কাজ করে, কোন শিক্ষক যদি যত্ন সহকারে শিক্ষাদান না করে অথবা কোন নামাযী ব্যক্তি যদি নামাযের সুনতুলি পালনে অবহেলা করে তবে তারাও উক্ত তাতক্ষীফের অপরাধীদের তালিকাত্ত্ব হবেন।—(নোউজুবিল্লাহি মিনহু)

وَيَقُولُ لَا يَحْزِمُهُمُ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ نُؤْمُرُ أَقْوَمُ هُودٌ أَقْوَمُ صَالِحٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۝ وَاسْتَغْفِرُكُمْ وَأُفَوِّدُكُمْ إِلَيْنَا إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝ قَالُوا لَشُعَيْبٌ مَاتَفَقَهُ كَذِبًا إِنَّمَا نَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَآنْتَ عَالِيْنَا بِعَزَائِرِ ۝ قَالَ يَقَوْمِ أَهْطِ اعْرِضْ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخِذْ نِسْوَةً وَّارَةً طَهْرًا إِنِّي رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ وَيَقَوْمِ اعْمَلُوا لَكُمْ مَكَانِكُمْ لِيَآمِلَ سُوفَ تَعْمَلُونَ ۝ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَاسْتَقْبِرْ إِلَى رَبِّكَ رَقِيبٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَاتَّخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثُمِينَ ۝ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِهَا الْآلَاءَ بُعْدَ الْبَيْنِ كَمَا بَعْدَتْ نُجُودٌ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ۝ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَعْصَمُوا وَفِرْعَوْنَ وَمَأْمُورٌ خَوَّنَ بِرِشَابٍ ۝

(৬৬) আর হে আমার জাতি! আমার সাথে জিদ করে তোমরা নূহ বা হুদ অথবা সালেহ (আঃ)—এর কণ্ঠের মত নিজেদের উপর আযাব ডেকে আনবে না। আর লূতের জাতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়। (৬৭) আর তোমাদের পালনকর্তার কাছে মাজনা চাও এবং তাঁরই পানে ফিরে এসো। নিশ্চয়ই আমার পরওয়ারদেগার খুবই মেহেরবান অতিস্নেহময়। (৬৮) তারা বলল— হে শোয়ায়েব (আঃ), আপনি যা বলেছেন তাঁর অনেক কথাই আমরা বুঝি নাই, আমরা তো আপনাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তিরূপে মনে করি। আপনার ভাই-বন্ধুরা না থাকলে আমরা আপনাকে প্রস্তরআঘাতে হত্যা করতাম। আমাদের দৃষ্টিতে আপনি কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি নন। (৬৯) শোয়ায়েব (আঃ) বলেন— হে আমার জাতি, আমার ভাই-বন্ধুরা কি তোমাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে প্রভাবশালী? আর তোমরা তাকে বিস্মৃত হয়ে পেছনে ফেলে রেখেছ, নিশ্চয় তোমাদের কার্যকলাপ আমার পালনকর্তার আয়ত্তে রয়েছে। (৭০) আর হে আমার জাতি, তোমরা নিজ স্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি, অচিরেই জানতে পারবে কার উপর অপমানকার আযাব আসে আর কে মিথ্যাবাদী? আর তোমরাও অপেক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম। (৭১) আর আমার হুকুম যখন এল, আমি শোয়ায়েব (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী ঈমানদারগণকে নিজ রহমতে রক্ষা করে আর পাপিস্তদের উপর বিকট গর্জন পতিত হলো। ফলে তোর না হতেই তারা নিজেদের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৭২) যেন তারা সেখানে কখনো বসবাসই করে নাই। জেনে রাখ, সামুদের প্রতি অতিসম্পাতের মত মাদইয়ানবাসীর উপরেও অতিসম্পাত। (৭৩) আর আমি মুসা (আঃ)—কে প্রেরণ করি আমার নির্দেশাদি ও সুস্পষ্ট নসদসহ (৭৪) ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে; তবুও তারা ফেরাউনের হুকুমে চলতে থাকে, অথচ ফেরাউনের কোন কথা ন্যায়-সঙ্গত ছিলনা।

হুদা

২২২

وَمِنْ آيَاتِهِ ١٣

يَقْدِرُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْدَحَهُمُ الشَّارِدَ وَيُنَزِّلُ
 الْغُيُوثَ ۖ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعَنَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ الْفِتَنَ
 وَرُفْدَ الْغَرَقِيِّ ۚ ذَلِكَ مِنَ النَّبَأِ الْغُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا
 قُلُوبًا وَحَصِيدًا ۖ وَمَا ظَنَنَّهُمْ وَلَكِنْ ظَنَّمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا
 أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 شَيْءٍ لِنَجَاتِ آمُرِّكَ وَتَارُوتَ وَمُوسَى ۚ وَكَذَلِكَ
 أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ فَجَدُّوا
 شِدِيدًا ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ
 ذَلِكَ يَوْمُ تَنفَخُ فِيهِ السُّنُوفُ ۚ وَذَلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٍ ۚ وَمَا
 تُؤَخِّرُهُ إِلَّا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ۚ يَوْمَ يَأْتِي لَكُمْ نَصْرُكَ
 بِرَاذِلَةٍ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ وَسُودُوا ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ شَعْنُوا فُتًى
 النَّارَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۖ خَلِيلَيْنِ فِيهَا مَا دَامَتِ
 السُّنُوفُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَقَالَ لِمَا
 يُرِيدُ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ سُودُوا فُتًى الْجَمْعُ خَلِيلَيْنِ فِيهَا مَا دَامَتِ
 السُّنُوفُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَا رَبُّكَ عَطَاً غَيْرَ مَقْدُودٍ ۖ

(৬৮) কয়ামতের দিন সে তার জাতির লোকদের আগে আগে থাকবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে পৌঁছে দিবে, আর সোটা অতীব নিকট স্থান, যেখানে তারা পৌঁছেছে। (৬৯) আর এ জগতেও তাদের পেছনে লানত রয়েছে এবং কয়ামতের দিনেও; অত্যন্ত ভয়ানক প্রতিফল, যা তারা পেয়েছে। (৭০) এ হচ্ছে কয়েকটি জনপদের সামান্য ইতিবৃত্ত, যা আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। তন্মধ্যে কোন কোনটি এখনও বর্তমান আছে আর কোন কোনটির শিকড় কেটে দেয়া হয়েছে। (৭১) আমি কিন্তু তাদের প্রতি জুলুম করি নাই বরং তারা নিজেরাই নিজের উপর অবিচার করেছে। ফলে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব মানুষকে ডাকতো আপনার পালনকর্তার হুকুম যখন এসে পড়ল, তখন কেউ কোন কাজে আসল না। তারা শুধু বিপর্যয়ই বৃদ্ধি করল। (৭২) আর তোমার পরওয়ারদেগার যখন কোন পাপপূর্ণ জনপদকে ধরেন, তখন এমনভাবেই ধরে থাকেন। নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই যারাজুক, বড়ই কঠোর। (৭৩) নিশ্চয় ইহার মধ্যে নিদর্শন রয়েছে এমন প্রতিটি মানুষের জন্য যে আখেরাতের আযাবকে ভয় করে। উহা এমন একদিন, যেদিন সব মানুষই সমবেত হবে, সেদিনটি যে হাযিরের দিন। (৭৪) আর আমি যে উহা বিলম্বিত করি, তা শুধু একটি ওয়াদার কারণে যা নিশ্চিত রয়েছে। (৭৫) যেদিন তা আসবে সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। অতঃপর কিছু লোক হবে হতভাগ্য, আর কিছু লোক সৌভাগ্যবান। (৭৬) অতএব যারা হতভাগ্য তারা দেখবে যাবে, সেখানে তারা আত্মদান ও চিৎকার করতে থাকবে। (৭৭) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। (৭৮) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রভু অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ভিন্ন হওয়ার নয়।

মাসআলা : তফসীরে কুরত্বীতে আছে যে, মাদইয়ানবাসীর আরেকটি দুষ্কর্ম ছিল যে, তারা প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার পাশ্বে স্বর্ণ-রৌপ্য কেটে রেখে সেগুলো বাজারে চালিয়ে দিত। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করেছিলেন।

হাদীস শরীফে আছে যে, রসুলে করীম (সঃ) মুসলিম রাষ্ট্রের মুদ্রা তৈরি করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কোরআন পাকের ১৯ পারা, সূরাহ নফল ৪৮ নং আয়াত رَبَّنَا هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ هَدَيْنَا لَكَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَفْقَهُونَ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামুল মোফাসসরীন হযরত জায়েদ ইবনে আসলাম বলেন—মাদইয়ানবাসীরা দীনার ও দিরহাম কেটে তা থেকে স্বর্ণ-রৌপ্য আত্মসাৎ করতো। যাকে কোরআন করীমের ভাষায় মারাত্মক দুষ্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযিযের (রহঃ) খেলাফত কালে এক ব্যক্তিকে দিরহাম কর্তনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। খলিফা তাকে দোঁরা মারা ও মস্তক মুন্ডন করে শহরে প্রদক্ষিণ করাবার নির্দেশ দিলেন।—(তফসীরেকুরত্বী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হুদে হযরত নূহ (আঃ) থেকে হযরত মুসা (আঃ) পর্যন্ত বিশিষ্ট নবীগণ ও তাঁদের জাতিসমূহের ঘটনাবলী এক বিশেষ বর্ণনামূলক মাধ্যমে বিবৃত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বহু উপদেশ, হেকমত, আহকাম ও হেদায়েত বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উক্ত ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য রসুলে করীম (সঃ)—কে সত্যোদন করে সমগ্র উম্মতে-মুহাম্মদীকে আহ্বান জানান হয়েছে। এরশাদ হয়েছে—

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْهَا قُلُوبًا وَحَصِيدًا

অর্থাৎ, এটা পূর্ববর্তী যুগে কতিপয় শহর ও জনপদের কাহিনী, আমি আপনার সামনে তুলে ধরছি, যার উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয়েছে। তন্মধ্যে কোন কোন শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। আর কোন কোন জনপদকে এমনভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেমন ক্ষেতের ফসল কর্তন করে তাকে সমান করার পর পূর্ববর্তী ফসলের কোন চিহ্ন থাকে না।

অতঃপর বলেন যে, আমি তাদের উপর কোন জুলুম করি নাই, বরং তারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে। কেননা, তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা প্রভুকে পরিত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া, হাতে তৈরী মূর্তিকে বা অন্য কিছুকে মা'বুদ সাব্যস্ত করেছে। যার ফলে আল্লাহর আযাব যখন নেমে এল, তখন ঐসব কাশানিক মা'বুদরা তাদের কোন সাহায্য করতে পারল না। আর আল্লাহ তাআলা যখন কোন জনপদবাসীকে আযাবের সাথে পাকড়াও করেন, তখন অত্যন্ত শক্ত ও নির্মমভাবে পাকড়াও করেন। তখন আত্মরক্ষার জন্য কারো কোন গত্যন্তর থাকে না।

অতঃপর সবাইকে আখেরাতের চিন্তায় মগ্ন করার জন্য এরশাদ করেন যে, এসব ঘটনাবলীর মধ্যে ঐসব লোকের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনাবলী রয়েছে, যারা পরকালের আযাবকে ভয় করে। যেদিন সমগ্র মানবজাতি একই ময়দানে সমবেত হবে, সেদিনটি এতই ভয়াবহ যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারবেন না।

অতঃপর রসূলে করীম (সাঃ)-কে সন্মোদন করে পুনরায় এরশাদ করেছেন—

فَاسْتَقْرَأْ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

অর্থঃ, আপনি দ্বীনের পথে দৃঢ়ভাবে সোজা চলতে থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর যারা কুফরী হতে তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে, তারাও সোজা পথে চলুক এবং আল্লাহ্ তাআলার নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করবে না। কেননা, তিনি তোমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছেন।

ইস্তেকামতের তাৎপর্য, উপকারিতা ও মাসায়েল : ‘ইস্তেকামত’র আসল অর্থ হচ্ছে, কোনদিক একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা। বস্তুর এ কোন সহজ কাজ নয়। কোন লৌহদণ্ড বা পাথরের ধাম একজন সুদক্ষ প্রকৌশলী হইত এমনভাবে দাঁড় করাতে পারে, কিন্তু কোন প্রাণীর পক্ষে সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকা কত দুশ্কার তা কোন সাধারণ বোধসম্পন্ন ব্যক্তির অজানা নয়।

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ও সকল মুসলমানকে তাদের সর্বকার্যে সর্বাবস্থায় ইস্তেকামত অবলম্বন করার জন্য অত্র আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

‘ইস্তেকামত’ শব্দটি ছোট হলেও এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা, সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে— আকায়েদ, এবাদত, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থ উপার্জন ও ব্যয় তথা নীতি-নৈতিকতার যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থেকে তাঁরই নির্দেশিত সোজা পথে চলা। তন্মধ্যে কোন ক্ষেত্রে, কোন কার্যে এবং পরিস্থিতিতে গড়িমসি করা, বাড়াবাড়ি করা অথবা ডানে বামে ঝুঁকে পড়া ইস্তেকামতের পরিপন্থী।

দুনিয়ার যত গোমরাহী ও পাপাচার দেখা যায়, তা সবই ইস্তেকামত হতে সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। আকায়েদে অর্থাৎ, ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইস্তেকামত না থাকলে, মানুষ বেদ’আত হতে শুরু করে কুফরী ও শেরেকী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ্ তাআলার তওহীদ, তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) যে সুস্পষ্ট ও সঠিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্ধন পরিবর্তনকারী পথভ্রষ্টরূপে আখ্যায়িত হবে, তা তার নিয়ত যতই ভাল হোক না কেন। অনুরূপভাবে নবী ও রসূল (আঃ)-গণের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধার যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে, সে ব্যাপারে ত্রুটি করা সম্পূর্ণ ধৃষ্টতা ও পথভ্রষ্টতা।

তেমনি কোন রসূলকে খোদায়ী গুণাবলী ও ক্ষমতার মালিক বানিয়ে দেয়াও চরম পথভ্রষ্টতা। ইহুদী ও খ্রীষ্টানেরা এহেন বাড়াবাড়ির কারণেই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে। এবাদত ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করার জন্য কোরআনে আযীম ও রসূলে করীম (সাঃ) যে পথনির্দেশ করেছেন, তার মধ্যে কোনরূপ কমতি বা গাফলতি মানুষকে যেমন ইস্তেকামতের আদর্শ হতে বিচ্যুত করে, অনুরূপভাবে তার মধ্যে নিজের পক্ষ হতে কোন বাড়াবাড়ি বা পরিবর্ধনও মানুষকে বেদ’আতে লিপ্ত করে। সে কল্পনাবিলাসে বিভোর থাকে যে, আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাসিল করছি, অথচ সে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ্ তাআলার বিরাগভাজন হতে থাকে। এজন্যই হযরত রসূলে আকরাম (সাঃ) স্বীয় উশ্মতকে বেদ’আত ও নিত্য নতুন

فَلَا تَكُ فِي مَرْبِیَةٍ مِّمَّا يَعْجُدُ لَهُ أَكْوَاعٌ مَّا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا
يَعْبُدُ آبَاؤَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَنُوقُوهُمْ فِيصِيبُهُمْ عَذَابٌ
مَنْقُوصٌ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وُ
لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَكُنُوا
لِشَيْءٍ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝ وَإِنَّا لَكُنَّا لَنُوقِيَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ
إِنَّهُمْ يَمَاعِلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَاسْتَقْرَأْ كَمَا أُمِرْتُ وَمَنْ تَابَ
مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَلَا تَرْكَبُوا
الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ
أُولَئِكَ لَمْ أَكْتُبْ لَهُمْ الصَّلَاةَ وَطَرَفِ النَّهَارِ وَرَمُوا كَمَا
مِنَ الْكِبَرِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّرَّيَاتِ ذَلِكَ ذِكْرُ
لِّلَّذِينَ كَرِهُوا ۝ وَأَصِيرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ أَجْرَ الْمُتَسِينِ ۝ فَالْوَلَا
كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَحْشَرُونَ عَن
الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْ أَعْيُنَانَا مِنْهُمْ وَأَتَّبِعَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا بِغَيْرِ وَكَانُوا كَافِرِينَ ۝ وَمَا
كَانَ رَبُّكَ لِيُهِدِكَ الْقُرَىٰ يُظْلِمُ وَأَهْلُهَا مُصِلُونَ ۝

(১০৯) অতএব, তারা যেসবের উপাসনা করে তুমি সে ব্যাপারে কোনরূপ ধোঁকা পড়বে না। তাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারা যেমন পূজা উপাসনা করত, এরাও তেমন করছে। আর নিশ্চয় আমি তাদেরকে আযাবের ভাগ কিছু মাত্র কম না করেই পুরোপুরি দান করবো। (১১০) আর আমি মুসা (আঃ)-কে অবশ্যই কিতাব দিয়েছিলাম অতঃপর তাতে বিরোধ সৃষ্টি হল; কলাবাক্য তোমার পালনকর্তার পক্ষ হতে, একটি কথা যদি আগেই বলা না হত, তাহলে তাদের মধ্যে হুড়ুড় ফয়সালা হয়ে যেত। তারা এ ব্যাপারে এমনই সন্দেহপ্রবণ যে, কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছে না। (১১১) আর যত লোকই হোক না কেন, যখন সময় হবে, তোমার প্রভু তাদের সকলেরই আমলের প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন। নিশ্চয় তিনি তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের খবর রাখেন। (১১২) অতএব, তুমি এবং তোমার সাথে যারা তওবা করেছে সবাই সোজা পথে চলে যাও— যেমন তোমায় হুকুম দেয়া হয়েছে এবং সীমা লঙ্ঘন করবে না, তোমরা যা কিছু করছ, নিশ্চয় তিনি তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। (১১৩) আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুন ধরবে। আর আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না। (১১৪) আর দিনের দুই প্রাজ্জই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতেরও প্রান্তভাগে, পূণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা সুরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক। (১১৫) আর ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শূণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। (১১৬) কাজেই, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলির মধ্যে এমন সংকমশীল কেন হইল না, যারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে বাধা দিত, তবে মুঠিময় লোক ছিল যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছি। আর পাপিষ্ঠরা তো ভোগবিলাসে মগ্ন ছিল—যার সামগ্রী তাদেরকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছিল। আসলে তারা ছিল মহা অপরাধী। (১১৭) আর তোমার পালনকর্তা এমন নন যে জনবসতিগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, সেখানকার লোকেরা সংকমশীল হওয়া সত্ত্বেও।

সৃষ্টি প্রথা হতে অভ্যস্ত জ্ঞারালোভাবে নিষেধ করেছেন এবং বেদ' আতকে চরম গোমরাহী বলে অভিহিত করেছেন। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে, যখন কোন কার্য সে আল্লাহ ও রসূল (সাঃ)-এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবাদত হিসাবে করতে চায়, তখন কাজ করার আগে পূর্ণ তাহকীক করে জানতে হবে যে, রসূলল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেয়াম (রাঃ) উক্ত কার্য ঐভাবে করেছেন কি না? যদি না করে থাকেন, তবে উক্ত কাজে নিজের শক্তি ও সময়ের অপচয় করবে না।

অনুরূপভাবে আদান-প্রদান, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআন করীমে নির্দেশিত মূলনীতিগুলিকে রসূলে করীম (সাঃ) বাস্তবে রূপায়িত করে একটা সুস্থ সঠিক মধ্যপন্থার পত্তন করেছেন। যার মধ্যে বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ক্রোধ, ঘেঁষা, মিতব্যয় ও দানশীলতা, জীবিকা উপার্জন, বৈরাগ্য সাধনা, আল্লাহর উপর নির্ভরতা, সম্ভাব্য চেষ্টা-তদ্বির করা, আবশ্যকীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের প্রতি তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এক নজীরবিহীন মধ্যপন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন। তা পুরোপুরি অবলম্বন করেই মানুষ সত্যিকার মানুষ হতে পারে। তা থেকে বিচ্যুত হলেই সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সারকথা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে দুনিয়ার অনুশাসন মেনে চলাই ইস্তেকামতের তফসীর।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সাকাফী (রাঃ) রসূলল্লাহ (সাঃ) সমীপে আরজ করলেন, “ইয়া রসূলল্লাহ (সাঃ)। ইসলাম সম্পর্কে আপনি আমাকে এমন একটি ব্যাপক শিক্ষা দান করুন যেন আপনার পরে আমার কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়।” তিনি বললেন—**قُلْ أَمِنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ** অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি ঈমান আন, অতঃপর ইস্তেকামত অবলম্বন কর।—(মুসলিম শরীফ ও তফসীরে কুরতুবী)

ওসমান ইবনে হাযের আদী বলেন— একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম যে, “আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন। তদুত্তরে তিনি বললেন **عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبدع** অর্থাৎ— তাকওয়া বা খোদাভীতি ও ইস্তেকামত অবলম্বন কর, যার পন্থা হচ্ছে ধর্মীয় ব্যাপারে শরিয়তের অনুশাসন দ্বব্ব মেনে চল, নিজের পক্ষ হতে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে যেনো না।—(দারেমী ও কুরতুবী)

এ দুনিয়ায় ইস্তেকামতই সবচেয়ে দুষ্কর কার্য। এজন্যই বুয়ুর্গানেদ্বীন বলেন যে, কারামতের চেয়ে ইস্তেকামতের মর্যাদা উর্ধ্বে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সর্বকার্যে ইস্তেকামত অবলম্বন করে, যদি জীবনভর তাঁর দ্বারা কোন অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত না হয়, তথাপি ওলীগণের মধ্যে তাঁর মর্যাদা সবার উর্ধ্বে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন— “পূর্ণ কোরআন পাকের মধ্যে অত্র আয়াতের চেয়ে কঠিন ও কষ্টকর কোন হুকুম রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর উপর নাযিল হয় নাই।” তিনি আরো বলেন— একবার সাহাবায়ে-কেয়াম (রাঃ) রসূলল্লাহ (সাঃ)-এর দাড়ি যোবারকের কয়েক গাছি পেকে গেছে দেখতে পেলেন, তখন আফসোস করে বললেন, আপনার দিকে দ্রুত গতিতে বার্বক্য এগিয়ে আসছে। তদুত্তরে রসূলল্লাহ (সাঃ) বললেন— “সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে।” সূরা হুদে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির উপর কঠোর আযাবের ঘটনাবলী ও এর কারণ হতে

পারে। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন— “ইস্তেকামতের নির্দেশ ছিল বার্বক্যের কারণ।

তফসীরে কুরতুবীতে হযরত আবু আলী সিরী হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি স্বপ্নে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জেয়ারত লাভ করে জিজ্ঞেস করলেন—ইয়া রসূলল্লাহ (সাঃ), আপনি কি একথা বলেছেন যে, “সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে?” তিনি বললেন “হুঁ।” পুনরায় প্রশ্ন করলেন—উক্ত সূরায় বর্ণিত নবী (আঃ)-গণের কাহিনী ও তাঁদের কণ্ঠসমূহের উপর আযাবের ঘটনাবলী কি আপনাকে বৃদ্ধ করেছে? তিনি জবাব দিলেন—“না।” বরং **فَأَسْتَوَيْنَا كَمَا أَوْرَثَ** “ইস্তেকামত অবলম্বন কর যেমন তোমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।” এ আয়াতই আমাকে বৃদ্ধ করেছে।

একথা স্পষ্ট যে, রসূলে করীম (সাঃ) পরিপূর্ণ মানুষের বাস্তব নমুন্যরূপে এ জগতে সুভাগমন করেছিলেন। ইস্তেকামতের উপর সুদৃঢ় থাকা ছিল তাঁর জন্মগত স্বভাব। তথাপি অত্র নির্দেশকে এতদূর গুরুত্ব মনে করার কারণ এই যে, অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে শুধু সোজা পথে দৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং **فَأَسْتَوَيْنَا كَمَا أَوْرَثَ** “যেভাবে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে” বলে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা হয়েছে। নবী ও রসূল (আঃ)-গণের অন্তরে অপরিসীম খোদাভীতি প্রবল প্রভাবের কথা কারো অজানা নয়। তাই পূর্ণ ইস্তেকামতের উপর কায়ম থাকা সত্ত্বেও রসূলে পাক (সাঃ) সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা যেরূপ ইস্তেকামতের নির্দেশ দিয়েছেন, তা পুরোপুরি আদায় করা হচ্ছে কি না?

আরেকটি কারণ হতে পারে যে, রসূলল্লাহ (সাঃ) নিজের ইস্তেকামতের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। কেননা, আল্লাহর হুকুম তা পূর্ণ মাত্রায় হাসিল ছিল। কিন্তু উক্ত আয়াতে সমগ্র উম্মতকে সোজা পথে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ উম্মতের জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টকর। তাই রসূলল্লাহ (সাঃ) অতীব চিন্তিত ও শঙ্কিত ছিলেন।

ইস্তেকামতের আদেশ দানের পর বলেন **وَلَا تَطْغَوْا** “সীমালঙ্ঘন করে না। এটা **طغيان** শব্দ হতে গৃহীত। যার অর্থ সীমা অতিক্রম করা। এখানে সোজা পথে দৃঢ় থাকার আদেশ দান করেই শুধু ক্ষান্ত করা হয় নাই। বরং তার নেতিবাচক দিকটিও স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, আকায়েদ, এবাদত, লেন-দেন ও নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করো না। কেননা, এটা পার্থিব ও ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় ও ফাসাদের মূল কারণ।

১১৩ নং আয়াতে মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংস হতে থেকে রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেয়া হয়েছে — **وَلَا تَرْكَبُوا أَسْوَاقَ الَّذِينَ ظَلَمُوا**

অর্থাৎ, “ঐসব পাপিষ্ঠদের দিকে একটুও ঝুঁকবে না, তাহলে কিন্তু তাদের সাথে সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে।” “লা-তারকানু” শব্দের মূল হচ্ছে **ركن** যার অর্থ “কোন দিকে সামান্যতম ঝোঁকা বা আকৃষ্ট হওয়া এবং তার প্রতি আস্থা বা সম্মতি জ্ঞাপন করা।” সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, পাপ-পাশ্চাত্য লিপ্ত হওয়াকে তো সবাই ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর বলে বিধূষ করেই; অধিকন্তু পাপিষ্ঠদের প্রতি সামান্যতম ঝুঁকি পড়া, আকৃষ্ট হওয়া, আস্থা বা যৌন সম্মতি জ্ঞাপন করাও সমান ক্ষতিকর।

এই বোকা ও আকর্ষণের অর্থ সম্পর্কে সাহায্যে কোরাম ও জব্বারীপণের কয়েকটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে পারস্পরিক কোন বিরোধ নেই। বরং প্রত্যেকটি উক্তিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও সঠিক।

“পাপিষ্ঠদের প্রতি মোটেই ঝুঁকবে না” এ কথা বর্ণিত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত কাতাডা (রঃ) বলেন—“পাপিষ্ঠদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না, তাদের কথায় চলবে না।” হযরত ইবনে জোরাইজ বলেন—“পাপিষ্ঠদের প্রতি কোনো আকৃষ্ট হবে না। হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন—“তাদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তা পছন্দ করো না।”—(কুরতুবী) ‘সুন্নী’ (রঃ) বলেন—“তাদের অন্যায় কার্যে সম্মতি প্রকাশ বা নীরবতা অবলম্বন করবে না।” ইকরিমা (রঃ) বলেন—তাদের সংসর্গে থাকবে না। কাবী ‘বায়জাবী’ (রঃ) বলেন—“বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে, লেবাস-পোশাকে, চাল-চলনে তাদের অনুকরণও অত্র নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।”

কাবী বায়জাবী (রঃ) আরো বলেন—পাপাচার অন্যায়ের নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করার জন্য এখানে এমন কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যার চেয়ে অধিকতর জোরালো ভাষা কল্পনা করা যায় না। কেননা, পাপিষ্ঠদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্কেই শুধু নিষেধ করা হয়নি বরং তাদের প্রতি সামান্যতম আকৃষ্ট হওয়া, তাদের কাছে উপবেশন করা, তাদের কার্যকলাপের প্রতি মৌনতা অবলম্বনও নিষেধ করা হয়েছে।

ইমাম আওযারী (রঃ) বলেন—সমগ্র জগতে এ আলেমই আল্লাহ্ তাআলার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়—যে নিজের পার্শ্বি স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়।—(তফসীরে মাযহারী)

তফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াত দ্বারা বোঝা যায়—কাফের মুশরিক, বেদআতী ও পাপিষ্ঠদের সংসর্গ হতে দূরে থাকা একান্ত কর্তব্য। বস্তুতঃ মানুষের ভাল-মন্দ হওয়ার মধ্যে সংসর্গ ও পরিবেশের প্রভাবই সর্বাধিক। তবে একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজনবশতঃ অনন্যোপায় হয়ে তাদের কাছে যাওয়া জায়েয।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের দু’টি শব্দ সম্পর্কে বলেন—আল্লাহ্ তাআলা সম্পূর্ণ দীনকে দুটি ۞ হরফের মাঝে জমা করে দিয়েছেন। এক ۞ সীমালঙ্ঘন করবে না, দ্বিতীয় ۞ পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। প্রথম আয়াতে শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে খারাপ লোকদের সংস্পর্শে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এটাই সমস্ত দীনদারীর সার সংক্ষেপ।

আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রসুলে পাক (সাঃ)—এর মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত : সূরা হুদে পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাদের জাতিসমূহের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর নবীয়ে-করীম (সাঃ) ও উম্মতে মুহাম্মদীকে কতিপয় হেদায়েত দেয়া হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত ۞ আয়াত হতে যার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে।

কোরআন পাকের অপূর্ব বাচনভঙ্গি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। এখানে যেসব আদেশ প্রদান করা হয়েছে, তাতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে এবং উম্মতকে পরোক্ষভাবে উক্ত হুকুমের আওতায় আনা হয়েছে। যেমন—

فَاسْتَوُوا كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ

“আপনি সোজা পথে দৃঢ় থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং যারা তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে তারাও সোজাপথে চলতে থাকবে।” (১১২ নং আয়াত) ۞ আয়াতে ۞ “আপনি নামায কয়েম রাখুন।” ১১৫ তম আয়াতে ۞ “আপনি ধৈর্যধারণ করুন” ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যেসব কাজে নিষেধ করা হয়েছে এবং তা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে সরাসরি উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন ১১২তম আয়াতে ۞ “আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে না” ১১৩ নং আয়াতে ۞ “এবং তোমরা পাপীদের প্রতি ঝুঁকবে না” বলা হয়েছে।

অনুসন্ধান করলে সমগ্র কোরআন মজীদে সাধারণতঃ একই বাচনভঙ্গি পরিলক্ষিত হবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদেশ করা হয়েছে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে উদ্দেশ্য করে এবং নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে উম্মতের প্রতি সম্বোধন করে। যার মাধ্যমে রসুলে করীম (সাঃ)—এর মাহাত্ম্য ও উচ্চমর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে যে, নিন্দনীয় যত কাজ আছে, রসুলে পাক (সাঃ) নিজেই তা বর্জন করে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলাই তাঁকে এমন স্বভাব-প্রকৃতি দান করেছেন যে, কোন নিন্দনীয় প্রকৃতি বা পাপকার্যের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ হয় না। এমনকি ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেসব জিনিস জায়েয ও হালাল ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়া আল্লাহ্ তাআলার জানা ছিল; রসুলে পাক (সাঃ) জীবনে কখনো সেগুলোর কাছেও যান নি। যেমন মদ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি।

১১৪তম আয়াতে রসুলে করীম (সাঃ)—কে লক্ষ্য করে তাঁকে ও তাঁর সমস্ত উম্মতকে নামায কয়েম রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ওলামায়ে-তফসীর, সাহাবী ও তাবয়ীগণ একমত যে, আলোচ্য আয়াতে সালাত অর্থ ফরয নামায, (বাহরে মুহীত ও তফসীরে কুরতুবী) এবং একামতে সালাত অর্থ পূর্ণ পাবন্দীর সাথে নিয়মিতভাবে নামায আদায় করা। কোন কোন আলেমের মতে নামায কয়েম করার অর্থ সমুদয় সুনুত ও মুস্তাহাবসহ নামায আদায় করা। কারো মতে এর অর্থ মুস্তাহাব ওয়াস্তে নামায পড়া ۞ এর তফসীর প্রসঙ্গে উপরোক্ত তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। মূলতঃ এটা কোন মতানৈক্য নয়। বস্তুতঃ আলোচ্য সবগুলোই একামতে সালাতের সঠিক মর্যাদা।

নামায কয়েম করার নির্দেশ দানের পর সংকীর্ণভাবে নামাযের ওয়াস্ত বর্ণনা করেছেন যে, “দিনের দু’প্রান্তে অর্থাৎ, শুরুতে ও শেষভাগে এবং রাতেরও কিছু অংশে নামায কয়েম করবে।” দিনের দু’প্রান্তের নামাযের মধ্যে প্রথমভাগের নামায সম্পর্কে সবাই একমত যে, সেটি ফজরের নামায। কিন্তু শেষ প্রান্তের নামায সম্পর্কে কেউ বলেন—তা মাগরিবের নামায। কেননা, দিন সম্পূর্ণ শেষ হওয়া মাত্র মাগরিবের নামায পড়া হয়। কেউ কেউ আসরের নামাযকেই দিনের শেষ নামায সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এটিই দিনের সর্বশেষ নামায। মাগরিবের ওয়াস্ত দিনের অংশ নয়, বরং দিন সমাপ্ত হওয়ার পর রাতের প্রথম প্রান্তে মাগরিবের নামায পড়া হয়। ۞ শব্দ বহুবচন, তার একবচন ۞ যার অর্থ হচ্ছে অংশ বা টুকরা। ۞ অর্থাৎ, রাতের কিছু অংশের নামায সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা’ব, কাতাডা, যাহ্যাক প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরকারের অভিমত হচ্ছে যে, সেটি মাগরিব ও এশার নামায। হাদীসেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়, যাতে এরশাদ হয়েছে

যে, **وَرَلَّكَ الْبَلَدَ الْأَيْمَنَ** মাগরিব ও এশার নামায। তফসীরে ইবনে কাসীর অনুসারে **وَرَلَّكَ الْبَلَدَ الْأَيْمَنَ** অর্থ, ফজর ও আছরের নামায এবং **وَرَلَّكَ الْبَلَدَ الْأَيْمَنَ** অর্থ মাগরিব ও এশার নামায। অতএব অত্র আয়াতে চার ওয়াক্ত নামাযের বর্ণনা পাওয়া গেল। অবশিষ্ট রইল জেহরের নামায। তার ওয়াক্ত সম্পর্কে কোরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে **أَمَّا الْقَلْدُ** **إِلَّا لِلَّهِ** “নামায কায়ম কর, যখন সূর্য ঢলে পড়ে।”

আলোচ্য আয়াতে নামায কায়ম করার নির্দেশ দানের সাথে সাথে তার উপকারিতাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে— **إِنَّ الْفَضْلَ** **يُؤْتِيهِ السَّيِّئَاتِ** অর্থাৎ, পুণ্যকার্য অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়।^(১) শ্রদ্ধেয় তফসীরকারগণের মতে এখানে পুণ্যকার্য বলতে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, সদকাহ, সদ্ব্যবহার, উত্তম লেন-দেন প্রভৃতি যাবতীয় পুণ্যকার্য বোঝান হয়েছে। তবে তন্মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাগ্রগণ্য। অনুকূলভাবে পাপকার্যের মধ্যে সগীরা ও কবীরা যাবতীয় গোনাহ শামিল রয়েছে। কিন্তু কোরআন মজীদে অন্য এক আয়াত এবং রসুলে করীম (সঃ)-এর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, এখানে পাপকার্য দ্বারা সগীরা গোনাহ বোঝান হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হচ্ছে, যাবতীয় নেক কাজ, বিশেষ করে নামায সগীরা গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়।

কোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছে : **إِنْ جَاءَكَ مِنْ عِبَادٍ مُسْتَكِينِينَ** অর্থাৎ, তোমরা যদি বড় (কবীরা) গোনাহসমূহ হতে বিরত থাক যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট (সগীরা) গোনাহগুলি মিটিয়ে দেব।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন যে, পাঞ্জগানা নামায দ্বারা এক জুম'আ পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত এবং এক রমযান দ্বারা পরবর্তী রমযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী যাবতীয় (সগীরা) গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়া হয়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকে। অর্থাৎ, কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না, কিন্তু সগীরা গোনাহ নামায, রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি পুণ্যকর্ম করার ফলে আপনা-অপনিও মাফ হয়ে যায়। তবে “বাহরে মুহীত” নামক তফসীরে উমূল শামশের মোহাক্কে আলমগণের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুণ্যকার্যের ফলে সগীরা গোনাহ মাফ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ ও লজ্জিত হতে হবে, ভবিষ্যতে গোনাহ না করার সংকল্প থাকতে হবে এবং একই গোনাহে বার বার লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। অন্যথায় সগীরা গোনাহও মাফ হবে না। হাদীস শরীফের যেসব রেওয়ায়েতে গোনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, সেখানে সর্বত্র একই পাপকার্যে বার বার লিপ্ত না হওয়া, স্বীয় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা হতে দূরে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার শর্ত রয়েছে।

হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতসমূহে নিম্নবর্ণিত কাজগুলোকে কবীরা গোনাহ বলা হয়েছে : (১) আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তা অথবা গুণাবলীর মধ্যে অন্য কাউকে অঙ্গীকার বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। (২) শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ফরয নামায ছেড়ে দেয়া। (৩) কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। (৪) ব্যভিচার করা। (৫) চুরি করা। (৬) মদ্য পান করা। (৭) মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। (৮) মিথ্যা কসম করা। (৯) মিথ্যা সাক্ষী দান করা। (১০) যাদু করা। (১১) সুদ খাওয়া। (১২) অবৈধভাবে এতীমের মাল আত্মসাৎ করা। (১৩) জেহাদের ময়দান

হতে পলায়ন করা। (১৪) সতী নারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। (১৫) অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া। (১৬) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। (১৭) আমানতের মাল খেয়ানত করা। (১৮) অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে গালি দেয়া। (১৯) কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ইত্যাদি। কবীরা ও সগীরা গোনাহসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে উলমায়েরে কোরাম অনেক কিতাব প্রণয়ন করেছেন।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে, নেক কাজ করার ফলেও অনেক গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই রসুলে করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন যে, “তোমাদের থেকে কোন মন্দ কাজ হলে পরে সাথে সাথে নেক কাজ কর, তাহলে উহার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।” তিনি আরো বলেছেন যে, মানুষের সাথে হাসি-খুশী ব্যবহার কর।—(মুসনায়ে আহমদ ও তফসীরে ইবনে-কাসীর)

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ) সমীপে আরব করলাম যে, “ইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ) ! আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন।” তদুত্তরে তিনি বললেন—যদি তোমার থেকে কোন গোনাহর কাজ হয়ে যায়, তবে পরক্ষণেই কোন নেক কাজ কর, তাহলে গোনাহ মিটে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে এসব হাদীসে গোনাহ হতে তওবা করার সূনত তরীকা ও প্রশংসনীয় পন্থা বাতলে দেয়া হয়েছে। যেমন— মুসনায়ে আহমদে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) এরশাদ করেছেন, “যদি কোন মুসলমান কোন পাপকার্য করে বসে, তবে জু করে তার দু'রাকাত নামায পড়া উচিত। তাহলে উক্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।” অত্র নামাযকে তওবার নামায বলে।—(ইবনে-কাসীর)

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ অর্থাৎ, “এটি শব্দ দ্বারা কোরআন মজীদে প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে অথবা ইতিপূর্বে বর্ণিত বিধি-নিষেধের প্রতিও ইশারা হতে পারে। সে মতে আয়াতের মর্ম হচ্ছে— এই কোরআন পাক অথবা এতে বর্ণিত হুকুম-আহকামসমূহ এসব লোকের জন্য সুরণীয় হেদায়েত ও নসীহত, যারা উপদেশ শুনতে ও মানতে প্রস্তুত। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জেদী হঠকারী লোক যার নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কোন কথা চিন্তা-বিবেচনা করতে সম্মত নয়, তারা সুপথ হতে বঞ্চিত থাকে।

وَأَمْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُدْعَى إِلَى الْفِتْنَةِ অর্থাৎ, “আপনি সবার অবলম্বন করুন, বৈধধারণ করুন, অবচল থাকুন। কেননা, আল্লাহ তাআলা সংকমশীলদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করেন না।”

‘সবর’ শব্দের আভিধানিক অর্থ ধৈর্য, বন্ধন করা। স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখাকেও সবর বলে। সংকার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ এবং পাপকার্য হতে দমন রাখাও সবরের অন্তর্ভুক্ত। এখানে রসুল আকরাম (সঃ)-কে ‘সবর’ অবলম্বন ও বৈধধারণ করার নির্দেশ দানের এক উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে আপনাকে ইন্তেকামত ও নামায কায়ম করা ইত্যাদি যেসব হুকুম দেয়া হয়েছে, আপনি তার উপর দৃঢ়ভাবে কায়ম থাকুন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধাচার ও জুলুম-নির্যাতনে ধৈর্যবলম্বন করুন। অতঃপর এরশাদ হয়েছে, “নিশ্চয়, আল্লাহ তাআলা সংকমশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।” এখানে স্পষ্টতঃ ‘মুহসিনীন’ বা সংকমশীল শব্দ এসব লোকের উপর প্রযোজ্য হবে যারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধি-নিষেধের পূর্ণ অনুসারী, অর্থাৎ, ধর্মীয় ব্যাপারে ইন্তেকামতের উপর কায়ম এবং শরীয়তের সীমারেখা পরিষ্কার

কায় রেখে চলেন। পাপিষ্ঠ জালেমদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব বা অহেতুক সম্পর্ক রাখেন না, নামাযকে সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে আদায় করেন এবং শরীয়তের যাবতীয় অনুশাসন দৃঢ়তার সাথে মেনে চলেন।

মোটকথা, মুহাসিনীনের দলভুক্ত হতে হলে এমনভাবে সংকার্য করতে হবে যা স্বয়ং রসুল্লাহ (সাঃ) ‘ইহসান’ শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও এবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ অথবা অন্ততঃ এতটুকু ধারণা করবে যে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। আল্লাহ তাআলার পবিত্র সন্ত ও মহান গুণাবলী সম্পর্কে যখন কোন ব্যক্তির এ পর্যায়ের প্রত্যয় ছিল হবে, তখনকার যাবতীয় কার্যকলাপই সুষ্ঠু ও সুন্দর হওয়া জরুরী। পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মধ্যে তিনটি বাক্য বিশেষ কলিত ছিল, যা তাঁরা প্রায়শঃই একে অপরকে লিখে পাঠাতেন। বাক্য তিনটি সুরণ রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি আশেরাতের কাজে শগ্ন হয়, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তার পার্শ্বি কাজগুলি কন্যাসলবু এবং সুসম্পন্ন করে দেন। দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে—যে ব্যক্তি তার অন্তরকে ঠিক রাখবে অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুকেই অন্তর হতে বের করে দিয়ে অন্তরকে একমাত্র আল্লাহ তাআলার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তার বাহ্যিক অবস্থা ভাল করে দেবেন। তৃতীয় বাক্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক ঠিক রাখবে, তার সাথে অন্যান্য সকলের সম্পর্ক আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ঠিক করে দেবেন। (রুহুল বায়ান, ২য় জিলদ ১০৩ পৃঃ)

১১৬ ও ১১৭তম আয়াতে পূর্ববর্তী জাতিগুলির উপর আযাব নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করে তা থেকে আত্মরক্ষার পথ নির্দেশ করা হয়েছে। এরশাদ করেছেন : ‘আফসোস, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে দাবিদ্বন্দ্বী বিবেকবান কিছু লোক কেন ছিল না, যারা জাতিকে ফাসাদ সৃষ্টি করা হতে বিরত রাখত? তাহলে তো তারা সমূলে ধ্বংস হত না। তবে মুঠিমেয় কিছু লোক ছিল, যারা নবী (আঃ)-গণের যথার্থভাবে অনুসরণ করেছে এবং তারাই আযাব হতে নিরাপদ ছিল। অবশিষ্ট লোকেরা পার্শ্বি ভোগবিলাসে মগ্ন হয়ে অপকর্মে যেতে উঠেছিল।

অত্র আয়াতে সমঝদার বিবেকসম্পন্ন লোকদেরকে اُولَٰئِكَ বলা

হয়েছে। اُولَٰئِكَ অবশিষ্ট বস্তুকে বলে। মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তুকে নিজের জন্য সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করতে অভ্যস্ত। প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্য সব জিনিস হাতছাড়া করেও সেটি ধরে রাখার চেষ্টা করে। এ জন্যই বিবেক-বিবেচনা ও দূরদর্শিতাকে اُولَٰئِكَ বলা হয়। কেননা, এটি সর্বাধিক প্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ।

১১৭তম আয়াতে এরশাদ করেছেন যে, “আপনার পালনকর্তা জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে নিপাত করেন নাই এমতাবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা সংকমশীল ও আত্ম-সংশোধনরত ছিল।” এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অন্যায় অবিচারের কোন সম্ভাবনা নাই। যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়, তারা প্রকৃতপক্ষেই নিশাতযোগ্য, অপরাধী।

কোন কোন তফসীরকারের মতে অত্র আয়াতে ظلم জুলুম অর্থ শেরেকী এবং مَصْرُوفٌ অর্থ ঐসব লোক যারা কাকের-মুশরেক হওয়া সত্ত্বেও তাদের লেন-দেন, আচার-ব্যবহার, নীতি-নৈতিকতা ভাল। যারা মিথ্যা কথা বলে না, শোকাবাজী করে না, কারো কোন ক্ষতি করে না। সেমতে অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে, শুধু কাকের বা মুশরেক হওয়ায় দুনিয়ায় কোন জাতির উপর খোদায়ী আযাব অবতীর্ণ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের কার্য-কলাপ ও চাল-চলন দ্বারা পৃথিবীতে ফেৎনা-ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি না করে। পূর্ববর্তী যতগুলি জাতি ধ্বংস হয়েছে তাদের বিশেষ বিশেষ অপকর্মই তজ্জন্য দায়ী। হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি তাঁকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট-ক্লেশ দিয়েছিল, হযরত শোয়াইব (আঃ)-এর দেশবাসী ওজনে-পরিমাপে হের-ফের করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, হযরত লূত (আঃ)-এর কণ্ডম জঘন্য যৌন অপকর্মে অভ্যস্ত হয়েছিল, হযরত মুসা ও হারুন (সাঃ)-এর কণ্ডমের লোকেরা নিজেদের নবীগণের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেছিল। তাদের এ সব কার্য-কলাপই দুনিয়ায় তাদের উপর আযাব নাযিল হওয়ার মূল কারণ। শুধু কুফরী বা শেরেকীর কারণে দুনিয়ায় আযাব আপতিত হয় না। কেননা, তার শাস্তিতে তো দোষের আশুনে চিরকাল ভোগ করবেই। এজন্যই কোন কোন আলোমের অভিমত হচ্ছে যে, কুফরী ও শেরেকীতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে রাজত্ব-বাদশাহী করা যেতে পারে, কিন্তু অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত হওয়ার পর তা বজায় থাকতে পারে না।

যে, জগতের ইতিহাস ও অতীত ঘটনাবলী পরিবেশন করা পবিত্র কোরআনের লক্ষ্য নয়; বরং প্রত্যেক কাহিনী থেকেই কোন না কোন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা আসল লক্ষ্য।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, ইতিহাস রচনাও একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। এতে ইতিহাস রচয়িতাদের জন্যে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যে, বর্ণনা এমন সূক্ষ্ম না হয় যাতে পূর্ণ বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পঞ্চাশের বর্ণনা এত দীর্ঘ হওয়াও সমীচীন নয়, যাতে তা পড়া ও স্মরণ রাখা কঠিন হয়।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ এই যে, কোন কোন রেওয়াজেতে বলা হয়েছে, ইহুদীরা পরীক্ষার্থ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলছিল : যদি আপনি সত্যিই আল্লাহর নবী হন, তবে বলুন ইয়াকুব-পরিবার সিরিয়া থেকে মিসরে কেন ফ্রান্সেরিত হয়েছিল এবং ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা কি ছিল? প্রত্যুত্তরে ওহীর মাধ্যমে পূর্ণ কাহিনী অবতারণ করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মু'জ্জযা ও তাঁর নবুওতের একটি বড় প্রমাণ। কেননা, তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং জীবনের প্রথম থেকেই মক্কায় বসবাসকারী। তিনি কখনও কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি এবং কোন গ্রন্থও পাঠ করেননি। এতদসত্ত্বেও তওরাতে বর্ণিত আদ্যোপাঙ্গ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেন। **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمْ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لَعْنَةً وَمَنْ لَمْ يَلْمِزْهُ فَإِنَّهُ بَشَرٌ ذَلِيلٌ مُّسْتَضَرٌّ** অর্থাৎ, এগুলো সে গ্রন্থের আয়াত, যা ফলাল ও হারামের বিধি-বিধান এবং প্রত্যেক কাজের সীমা ও শর্ত বর্ণনা করে। মানুষকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের জন্য একটি সুমম ও সরল জীবনব্যবস্থা দান করে। এগুলো অবতীর্ণ করার অসীকার তওরাতে পাওয়া যায় এবং ইহুদীরা এ সম্পর্কে অবহিতও বটে।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ অর্থাৎ, আমি একে আরবী কোরআন হিসাবে নাযিল করেছি, হয়তো এতে তোমরা বুঝতে পারবে।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী সম্পর্কে যারা

প্রশ্ন তুলেছিল, তারা ছিল আরবের ইহুদী। আল্লাহ তাআলা তাদেরই ভাষায় এ কাহিনী নাযিল করেছেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সত্যতা ও সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাহিনীতে বর্ণিত বিধান ও নির্দেশাবলীকে চলার পথের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ **نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ** আমি এ কোরআনকে ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করে আপনার কাছে সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি। নিঃসন্দেহে আপনি ইতিপূর্বে এসব ঘটনা সম্পর্কে অনবগত ছিলেন।

এতে ইহুদীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আমার পয়গম্বরের যেভাবে পরীক্ষা নিতে চেয়েছ, তাতেও তাঁর গুণগত উৎকর্ষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা, তিনি পূর্ব থেকে নিরক্ষর এবং বিশু-ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞও ছিলেন। সুতরাং তিনি এখন যে বিজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন, তার মাধ্যমে আল্লাহর শিক্ষা ও ওহী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতাকে বললেন : পিতঃ আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আরও দেখেছি যে, তারা আমাকে সেজদা করছে।

এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্ন। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : এগারোটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ (আঃ)-এর এগার ভাই, সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ পিতা ও মাতা।

তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে : হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মাতা এ ঘটনার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন এবং তাঁর খালা তখন তার পিতার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। খালা এমনভাবেও মায়ের সমতুল্য গণ্য হয়। বিশেষতঃ যদি পিতার ভার্য্যা হয়ে যায়, তবে সাধারণতঃ পরিভাষায় তাকে মা-ই বলা হবে।

قَالَ يَبْنَئِي لَأَتَقَبُّصَ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ رِجْلَيْكَ فَمِنْكَ وَإِلَّا
 كَيْدُ الرَّانِ الشَّيْطَانِ لِلْإِنْسَانِ عَذَابٌ مُبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ
 يَجْتَنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نَجْمَتَكَ
 عَلَيْهِ ۝ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَتْهُمْ عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ
 وَإِسْحَاقَ الْبَيِّنَاتِ لِلْعَالَمِينَ ۝ إِذْ قَالَ الْيُوسُفُ لِأَخِيهِ هَبْ
 إِلَيَّ يَبْنَئِي وَأَخَذَ عُصْبَةً مِنْ أَبَاكَ لِيُضِلِّي بِهَا ۝ يَبْنَئِي
 لَأَقْتُلَنَّكَ إِذْ قَالَ الْيُوسُفُ لِأَخِيهِ هَبْ إِلَيَّ يَبْنَئِي ۝ وَ
 تَكَوَّنُوا مِنْ بَعْدِهِ ۝ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَوْ كُنَّا
 يُوسُفَ وَالْقُوَّةَ فِي عِبَادَتِ الْبَيْتِ يَلْقَظُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ
 إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۝ قَالَ يَا أَبَا نَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ
 وَإِنَّا لَهُ لَنَصْحُونَ ۝ أَرْسَلَهُ مَعْنَادَ إِتْرَعٍ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا
 لَهُ لَنَفِظُونَ ۝ قَالَ إِنِّي يَحْزَنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ
 أَنْ يَأْكُلَهُ الدَّيْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ۝ قَالَ الْوَالِدَيْنِ
 أَكْهَلُ الدَّيْبِ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذْ لَظُرُونُ ۝

(৫) তিনি বললেন : বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিচয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৬) এমনভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনিবেশ করবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুব পরিবার-পরিজনদের প্রতি; যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছেন। নিচয় তোমার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৭) অবশ্য ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৮) যখন তারা বলল : অবশ্যই ইউসুফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক স্নিহা অথচ আমরা একটা সংহত শক্তিবিশেষ। নিচয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভাষিতে রয়েছেন। (৯) হত্যা কর ইউসুফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে। (১০) তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং ফেলে দাও তাকে অন্ধকূপে যাতে কোন পশিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়। (১১) তারা বলল : পিতা, ব্যাপার কি, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? আমরা তো তার হিতাকাংক্ষী। (১২) আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে ধারণ করুন— তুপিসহ খাবে এবং খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তার রক্ষাব্যবস্থা করব। (১৩) তিনি বললেন : আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি যে, ব্যাঘ্র তাঁকে খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা তার দিক থেকে গাফেল থাকবে। (১৪) তারা বলল : আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি ব্যাঘ্র তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমরা সবই হারানাম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالَ يَبْنَئِي لَأَتَقَبُّصَ رُؤْيَاكَ ۝ অর্থাৎ, বৎস! তুমি এ স্বপ্ন ভাইদের

কাছে বর্ণনা করো না। আল্লাহ না করুন, তারা এ স্বপ্ন শুনে তোমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তোমাকে বিপর্যস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। কেননা, শয়তান হল মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে পার্শ্ব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ির লোভ দেখিয়ে মানুষকে এহেন অপকর্মে লিপ্ত করে দেয়,

স্বপ্নের তাৎপর্য স্তর ও প্রকারভেদ : সর্বপ্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে— স্বপ্নের স্বরূপ এবং তা থেকে যেসব ঘটনা ও বিষয় জানা যায়, সেগুলোর গুরুত্ব ও পর্যায়। তফসীরে মাহহারীতে কাযী সানাউল্লাহ (রহত) বলেন : স্বপ্নের তাৎপর্য এই যে, নিদ্রা কিংবা সংজ্ঞাহীনতার কারণে মানুষের মন যখন দেহের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে কম্পনাশক্তির পথে কিছু কিছু আকার-আকৃতি দেখতে পায়। এরই নাম স্বপ্ন। স্বপ্ন তিন প্রকার। তন্মধ্যে দু'প্রকার সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। এগুলোর কোন বাস্তবতা নেই। অবশিষ্ট একটির মৌলিকত্ব দিক দিয়ে নির্ভুল ও বাস্তব। কিন্তু এতে মাঝে মাঝে নানা উপসর্গ যুক্ত হয়ে এগুলোকেও অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য করে দেয়।

এ উক্তির ব্যাখ্যা এই যে, কোন কোন সময় মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যেসব বিষয় ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, সেগুলোই স্বপ্নে নানা আকার-আকৃতি নিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কোন কোন সময় শয়তান আনন্দদায়ক ও ভয়াবহ উভয় প্রকার দৃশ্য ও ঘটনাবলী মানুষের স্মৃতিতে জাগিয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, এ উভয় প্রকার স্বপ্নই ভিত্তিহীন ও অবাস্তব। এগুলোর কোন বাস্তব ব্যাখ্যা হতে পারে না। এতদুভয়ের প্রথম প্রকারকে حديث النفس তথা মনের স্বেলাপ এবং দ্বিতীয় প্রকারকে تسويل شيطان অর্থাৎ শয়তানের বিবাস্তি বলা হয়।

তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও বিশুদ্ধ। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক প্রকার ইলহাম (খোদায়ী ইশারা), যা বান্দাকে আনন্দ অথবা সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্যে করা হয়। আল্লাহ তাআলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে কোন কোন বিষয় বান্দার মন ও মস্তিষ্কে জাগিয়ে দেন।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন একটি সংযোগ বিশেষ। এর মাধ্যমে সে তার পালনকর্তার সাথে বাক্যালাপ করার গৌরব অর্জন করে। তিবরানী বিশুদ্ধ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন— (মাহহারী)

সূফী বুয়ুর্গগণের বর্ণনা অনুযায়ী এর স্বরূপ এই যে, জগতে অস্তিত্ব লাভের পূর্বে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ আকৃতি 'আলমে-মিসাল' অর্থাৎ, উপমা-জগতে বিদ্যমান থাকে, তেমনি 'মা'আলী' তথা অবস্তবাক্যক বিবয়াদিরও বিশেষ আকার-আকৃতি বিদ্যমান থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের মন যখন বাহ্যিক দেহের ক্রিয়া-কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে, তখন মাঝে মাঝে উপমা জগতের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় এবং সেখানকার আকার-অবয়ব সে দেখতে পায়। এছাড়া এসব আকার-অবয়ব অদৃশ্য জগৎ থেকে দেখানো হয়। মাঝে মাঝে এগুলোতেও এমনসব উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আসল সত্ত্বের সাথে কিছু কিছু অবাস্তব কম্পনাও মিশ্রিত হয়ে পড়ে। এ কারণে ব্যাখ্যানাতাদের পক্ষেও এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে

উপসর্গ আকার-অবয়ব যাবতীয় উপসর্গ থেকে পরিচ্ছন্ন থাকে। তখনই সেগুলো হয় আসল সত্য। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোন কোন স্বপ্ন থাকে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কারণ, তাতে বাস্তব ঘটনা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। এমনভাবে যদি ব্যাখ্যা ভ্রান্ত হয়, তবে ঘটনা ভিন্ন আকার ধারণ করে। তাই একমাত্র সে স্বপ্নই আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত ইলহাম ও বাস্তব সত্য বলে বিবেচিত হবে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে, তাতে কোন উপসর্গের সন্নিবেশ হবে না এবং ব্যাখ্যাও বিশুদ্ধ দেয়া হবে।

পয়গম্বরগণের সব স্বপ্ন ছিল এই পর্যায়ে। তাই তাদের স্বপ্নও ওহীর স্বপ্নস্বরূপে। সাধারণ মুসলমানদের স্বপ্নে নানাবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তাই তা কারও জন্যে প্রমাণ হয় না। তাদের স্বপ্নে কোন কোন সময় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিগত আকার-আকৃতির মিশ্রণ সংঘটিত হয়ে যায়, কোন সময় পাশের অন্ধকার ও মালিন্য স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করে দূর্বোধ্য করে দেয় এবং মাঝে মাঝে বিবিধ কারণে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যায়ও উপনীত হওয়া যায় না।

স্বপ্নের বর্ণিত তিনটি প্রকারই রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন :

স্বপ্ন তিন প্রকার। এক প্রকার শয়তানী। এতে শয়তানের পক্ষ থেকে কিছু কিছু বিষয় মনে জাগ্রত হয়। দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা কিছু দেখে, নিদ্রায়ও তাই সামনে আসে। তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও অসত্য। এটি নবুওয়তের ৪৬তম অংশ; অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম।

স্বপ্ন ও নবুওয়তের অংশ -এর অর্থ ও ব্যাখ্যা : স্বপ্নের এ সত্য ও বিশুদ্ধ প্রকার সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে। কোন হাদীসে নবুওয়তের ৪০তম অংশ, কোন হাদীসে ৪৬তম অংশ এবং কোন হাদীসে ৪৯তম, ৫০তম এবং ৭০তম অংশ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। এসব হাদীস তফসীরে-কুরতুবীতে একত্রে সন্নিবেশিত করে ইবনে আবদুল বারের বিশ্লেষণে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এগুলোর মধ্যে কোনরূপ পরস্পর বিরোধিতা নেই। বরং প্রত্যেকটি হাদীস স্ব-স্থানে বিশুদ্ধ ও সঠিক। যারা স্বপ্ন দেখে, তাদের অবস্থানভেদে বিভিন্নরূপে অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সত্যতা, বিশুদ্ধতা, ধর্মপরায়ণতা ও পরিপূর্ণ ঈমান দ্বারা বিভূষিত, তার স্বপ্ন নবুওয়তের ৪০ তম অংশ হবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এসব গুণ কম তার স্বপ্ন ৪৬তম অথবা ৫০ তম অংশ হবে এবং যার মধ্যে এসব গুণ আরও কম তার স্বপ্ন নবুওয়তের ৭০তম অংশ হবে।

এখানে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের অংশ-এর অর্থ কি? তফসীরে মায়হারীতে এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে তেইশ বৎসর পর্যন্ত ওহী আগমন করতে থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ছয়মাস স্বপ্নের আকারে এ ওহী আগমন করে। অবশিষ্ট পর্য্যায়গুলি যাম্মাসিকে জিবরাজিলের মধ্যস্থতায় ওহী আগমন করে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের ৪৬তম অংশ। যেসব হাদীসে কম-বেশি সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোতে হয় কাছাকাছি হিসাবে বলা হয়েছে, না হয় সনদের দিক দিয়ে সেসব হাদীস ধর্তব্য নয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন : স্বপ্ন নবুওয়তের অংশ হওয়ার তাৎপর্য এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে স্বপ্নে এমন বিষয় দেখে, যা তার সাধারণতঃ উদাহরণতঃ কেউ দেখে যে, সে আকাশে উড়ছে। অথবা অদৃশ্য জগতের এমন কোন বিষয় দেখে, যার জ্ঞান অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

অতএব এরূপ স্বপ্নের মাধ্যমে খোদারী সাহায্য ও প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, যা প্রকৃতপক্ষে নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য। তাই স্বপ্নকে নবুওয়তের অংশ স্থির করা হয়েছে।

কাদিয়ানী দাম্জালের একটি বিবৃতি খণ্ডন : এ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক লোক একটি অভিনব বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। তারা বলে : নবুওয়তের অংশ যখন দুনিয়াতে অবশিষ্ট ও প্রচলিত আছে, তখন নবুওয়তও অবশিষ্ট ও প্রচলিত রয়েছে। অর্থাৎ এটা কোরআনের অকাটা আয়াত ও অসংখ্য সহীহ হাদীসের পরিপন্থী এবং সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র নবুওয়ত সম্পর্কিত সর্বসম্মত নিশ্চয়স্বরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ সহজ সত্যটি বুঝতে পারল না যে, কোন বস্তুর একটি অংশ বিদ্যমান থাকলে বস্তুটি বিদ্যমান থাকা জরুরী হয়ে পড়ে না। যদি কোন ব্যক্তির একটি নব অথবা একটি চুল কোথাও বিদ্যমান থাকে, তবে কেউ একথা বলতে পারে না যে, এখানে ঐ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। যেহেতু অনেক কল-কল্লার মধ্য থেকে কোন একটি কল-কল্লা অথবা একটি শব্দ যদি কারও কাছে থাকে এক সে দাবী করে বসে যে, তার কাছে অমুক যেহেতু আছে, তবে নিশ্চয়ই তাকে হয় মিথ্যাবাদী, না হয় আস্তা আত্মশ্লক বলতে বাধ্য হবে।

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সত্য স্বপ্ন অবশ্যই নবুওয়তের অংশ, কিন্তু নবুওয়ত নয়। নবুওয়ত তো আবেদী নবী মোহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে।

সহীহ বুখারীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : لم يبق من النبوة الا البشائر অর্থাৎ, ভবিষ্যতে “মুবাশিরাত” ব্যতীত নবুওয়তের কোন অংশ বাকী থাকবে না। সাহাবায়ে কোরাম আরয করলেন : “মুবাশিরাত” বলতে কি বোঝায়? উত্তর হল : সত্য স্বপ্ন। এতে প্রমাণিত হয় যে, নবুওয়ত কোন প্রকারে অথবা কোন আকারেই অবশিষ্ট নেই। শুধুমাত্র এর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অবশিষ্ট আছে যাকে মুবাশিরাত অথবা সত্য স্বপ্ন বলা হয়।

কাকের ও কাসেক ব্যক্তির স্বপ্নও সত্য হতে পারে : মাঝে মাঝে পাগাচারী, এমন কি কাকের ব্যক্তিও সত্য স্বপ্ন দেখতে পারে। একথা কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং অভিজ্ঞতার জ্ঞান। সূরা ইউসূফে হযরত ইউসূফ (আঃ)-এর দু'জন কান্না-সঙ্গীর স্বপ্ন সত্য হওয়া এবং মিসর-সম্রাটের স্বপ্ন ও তা সত্য হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ তারা সবাই ছিল অমুসলমান। হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে পারস্য সম্রাটের স্বপ্নের কথা বর্ণিত আছে, যা সত্যে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ পারস্য সম্রাট মুসলমান ছিলেন না। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ক্ষুদ্র আতেকা কাকের থাকা অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে সত্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ ছাড়া কাকের বাদশাহ বখাতে নসরের স্বপ্ন সত্য ছিল, যার ব্যাখ্যা হযরত দানিয়াল (আঃ) দিয়েছেন।

এতে বোঝা যায় যে, সত্য স্বপ্ন দেখা এবং তদনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া এতটুকু বিষয়ই কারও সং, ধার্মিক এমনকি মুসলমান হওয়ারও প্রমাণ নয়। তবে এটা ঠিক যে, সং ও সাধু ব্যক্তিদের স্বপ্ন সাধারণতঃ সত্য হবে—এটাই আল্লাহর সাধারণ রীতি। কাসেক ও পাগাচারীদের সাধারণতঃ মনের স্ফলপ ও শয়তানী প্ররোচনা ধরনের মিথ্যা স্বপ্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এর বিপরীতও হওয়া সম্ভব।

মোটকথা, সত্য স্বপ্ন সাধারণ মুসলমানদের জন্যে হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সুসংবাদ কিংবা হুশিয়ারীর চাইতে অধিক মর্যাদা রাখে না। এটা

স্বয়ং তাদের জন্যে কোন ব্যাপারে প্রমাণরূপে গণ্য নয় এবং অন্যের জন্যেও নয়। কোন কোন অজ্ঞ লোক এ ধরণের স্বপ্ন দেখে নানা রকম কুমন্ত্রণায় লিপ্ত হয়। কেউ একে নিজের ওলীভের লক্ষণ মনে করতে থাকে এবং কেউ স্বপ্নলব্ধ বিষয়াদিকে শরীয়তের নির্দেশের মর্যাদা দিতে থাকে। এসব বিষয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; বিশেষতঃ যখন একথাও জানা হয়ে গেছে যে, সত্য স্বপ্নের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে প্রবৃতিগত অথবা শয়তানী অথবা উভয় প্রকার ধ্যান-ধারণার মিশ্রণ আসতে পারে।

স্বপ্ন প্রত্যেকের কাছে বর্ণনা করা ঠিক নয় : মাসআলা : **قَالَ بَيْنِي** আয়াতে ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-কে স্বীয় স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিশীল নয়—এরূপ লোকের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করা উচিত নয়। এছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী নয়—এমন ব্যক্তির কাছেও স্বপ্ন ব্যক্ত করা সঙ্গত নয়।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কষ্টদায়ক বিপজ্জনক স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করতে নেই। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র দয়া ও সহানুভূতির উপর ভিত্তিশীল—আইনগত হারাম নয়। সহীহ হাদীসসমূহে বলা হয়েছে , ওহদ যুদ্ধের সময় রসুলুল্লাহ (সঃ) বললেন : আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার তরবারি ‘যুলফাকার’ ভেঙ্গে গেছে এবং আরও কিছু গাভীকে জবাই হতে দেখেছি। এর ব্যাখ্যা ছিল হযরত হামযা (রাঃ)—সহ অনেক মুসলমানের শাহাদত বরণ। এটা একটা আশু মারাত্মক বিপর্যয় সম্পর্কিত ইঙ্গিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহাবীদের কাছে এ স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন। — (কুরতুবী)

মাসআলা : এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, মুসলমানকে অপরের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে অপরের কোন মন্দ অভ্যাস অথবা কুনিয়ত প্রকাশ করা জায়েয। এটা গীবত তথা অসাক্ষাতে পরনিদার অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণতঃ কেউ জানতে পারল যে, যাকে বকরের গৃহে চুরি করার অথবা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। এমতাবস্থায় বকরকে অবহিত করা তার কর্তব্য। এটা গীবতের মধ্যে গণ্য হবে না। আয়াতে ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-কে বলে দিয়েছেন যে, ভাইদের পক্ষ থেকে তার প্রাণ নাশের আশঙ্কা রয়েছে।

ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-কে কতিপয় নেয়ামত দানের ওয়াদা করেছেন। প্রথম- **وَكُنَّا بِكَ بِصِيْرًا** অর্থাৎ, আল্লাহ স্বীয় নেয়ামত ও অনুগ্রহরাজির জন্যে আপনাকে মনোনীত করবেন। মিসর দেশে রাজ্য, সম্মান ও ধন-সম্পদ লাভের মাধ্যমে এ ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করেছে। দ্বিতীয়, **وَنُفِثْنَاكَ مِنَ الْكَلْبِ** এখানে **أَحَادِيثُ** বলে মানুষের স্বপ্ন বোঝান হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। এতে আরও জানা গেল যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র, যা আল্লাহ তাআলা কোন কোন ব্যক্তিকে দান করেন। সবাই এর যোগ্য নয়।

মাসআলা : তফসীরে কুরতুবীতে শাদাদ ইবনুল-হাদের উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা চল্লিশ বৎসর পর প্রকাশ পায়। এতে বোঝা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্বপ্ন ফলে যাওয়া ভ্রষ্ট নয়।

তৃতীয় ওয়াদা **وَنُفِثْنَاكَ مِنَ الْكَلْبِ** - অর্থাৎ, আল্লাহ আপনার প্রতি স্বীয় নেয়ামতপূর্ণ করবেন। এতে নবুওয়ত দানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং

পরবর্তী বাক্যসমূহেও এর প্রতি ইঙ্গিত আছে। **وَنُفِثْنَاكَ مِنَ الْكَلْبِ** অর্থাৎ, যেভাবে আমি স্বীয় নবুওয়তের নেয়ামত আপনার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি ইতিপূর্বে পূর্ণ করেছি। এতে এদিকেও ইশারা হয়ে গেছে যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত শাস্ত্র যেমন ইউসুফ (আঃ)-কে দান করা হয়েছিল, তেমনিভাবে ইবরাহীম ও ইসহাক (আঃ)-কেও শেখানো হয়েছিল।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানবান, সুবিজ্ঞ। কাউকে কোন শাস্ত্র শেখানো উন্ন পক্ষে কঠিন নয় এবং তিনি প্রত্যেককেই তা শেখান না। বরং বিজ্ঞতা অনুযায়ী বেছে বেছে কোন কোন ব্যক্তিকে এ কৌশল শিখিয়ে দেন।

উল্লেখিত আয়াতসমূহের ৭নং আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এ সূরায় বর্ণিত ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীকে শুধুমাত্র একটি কাহিনী নিরিখে দেখা উচিত নয়; বরং এতে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের জন্যে আল্লাহ তাআলার অপর শক্তির বড় বড় নিদর্শন ও নির্দোষকী রয়েছে।

এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, যেসব ইহুদী পরীক্ষার উদ্দেশে নবী করীম (সঃ)-কে এ কাহিনী জিজ্ঞেস করেছিল, তাদের জন্যে এতে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) যে সময় মক্কা অবস্থানরত ছিলেন এবং তাঁর সংবাদ মদীনায় পৌঁছেছিল, তখন মদীনার ইহুদীরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যে একদল লোক মক্কায় প্রেরণ করেছিল। তারা অস্পষ্ট ভঙ্গিতে এরূপ প্রশ্ন করেছিল যে, আপনি সত্য নবী হলে বলুন, কোন পয়গম্বরের এক পুত্রকে সিরিয়া থেকে মিসরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তার বিরহ-ব্যাখ্যার ক্রন্দন করতে করতে পিতা অন্ধ হয়ে যায়?

জিজ্ঞাসার জন্যে এ ঘটনাটি মনোনীত করার পেছন কারণ ছিল এই যে, এ ঘটনা সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ ছিল না এবং মক্কার কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাতও ছিল না। তখন মক্কায় কিতাবী সম্প্রদায়ের কেউ বাস করত না যে, তওরাত ও ইনজীলের বরাতে তার কাছ থেকে এ ঘটনার কোন অংশবিশেষ জানা যেত। বলাবাহুল্য, তাদের এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ণ সূরা ইউসুফ অবতীর্ণ হয়। এতে হযরত ইয়াকুব ও ইউসুফ (আঃ)-এর সম্পূর্ণ কাহিনী এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তওরাত ও ইনজীলেও তেমনটি হয়নি। তাই এর বর্ণনা ছিল রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর একটি প্রকাশ্য মু'জ্জাযা।

আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইউসুফসহ হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বার জন পুত্র-সন্তান ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান-সন্ততি হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে। ইয়াকুব (আঃ)-এর উপাধি ছিল ‘ইসরাঈল’। তাই বারটি পরিবার সবাই ‘বনী-ইসরাঈল’ নামে খ্যাত হয়।

বারপুত্রের মধ্যে দশ জন জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী লাইয়া বিন্তে লাইয়ানের গর্ভে জন্মলাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পর ইয়াকুব (আঃ) লাইয়ার ভগিনী রাহীলকে বিবাহ করেন। রাহীলের গর্ভে দু'পুত্র ইউসুফ ও বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই ইউসুফ (আঃ)-এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বেনিয়ামিন এবং অবশিষ্ট দশ জন বৈমায়েয় ভাই। ইউসুফ জননী রাহীলও বেনিয়ামিনের জন্মের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। — (কুরতুবী)

৮নং আয়াত থেকে ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী শুরু হয়েছে। ইউসুফ

(আঃ)-এর ভ্রাতারা পিতা ইয়াকুব (আঃ)-কে দেখল যে, তিনি ইউসুফের প্রতি অসাধারণ মহব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এটাও সম্ভবপর যে, তারা কোনরূপে ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্নের বিষয়ও অবগত হয়েছিল, যদ্বারা তারা ইউসুফ (আঃ)-এর বিরাট ক্ষমতার কথা টের পেয়ে তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। তারা পরস্পর বলাবলি করল : আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের ভুলনায় ইউসুফ ও তার অনুজ বেনিয়ামিনকে অধিক ভালবাসেন। অথচ আমরা দশ জন এবং তাদের জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে গৃহের কাজকর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হল এ বিষয় অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে অধিক মহব্বত করা। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় ইউসুফকে হত্যা কর, না হয় এমন দূরদেশে নির্বাসিত কর, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে।

৯ নং আয়াতে ভাইদের পরামর্শ বর্ণিত হয়েছে। কেউ মত প্রকাশ করল যে, ইউসুফকে হত্যা করা হোক। কেউ বলল : তাকে কোন প্রকৃতির গভীরে নিক্ষেপ করা হোক—যাতে মাঝখান থেকে এ কন্টক দূর হয়ে যায় এবং পিতার সমগ্র মনোযোগ তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। হত্যা কিংবা কূপে নিক্ষেপ করার কারণে যে গোনাহ হবে, তার প্রতিকার এই যে, পরবর্তীকালে তওবা করে তোমরা সাধু হয়ে যেতে পারবে। আয়াতের **وَكُلُّوْهُمِنْ بَعْدِي قَوْمًا صَالِحِينَ** বাক্যের এক অর্থ তাই বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে হত্যা করার পর তোমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। কেননা, পিতার মনোযোগের কেন্দ্র শেষ হয়ে যাবে। অথবা অর্থ এই যে, হত্যার পর পিতা-ভ্রাতার কাছে দোষ স্বীকার করে তোমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।

ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা যে পয়গম্বর ছিল না, উপরোক্ত পরামর্শ তার প্রমাণ। কেননা, এ ঘটনায় তারা অনেকগুলো কবির গোনাহ করেছে। একজন নিরপরাধকে হত্যার সংকল্প, পিতার অবাধ্যতা ও তাঁকে কষ্ট প্রদান, চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ ও মিথ্যা চক্রান্ত ইত্যাদি। বিজ্ঞ আলেমগণের বিশূস অনুযায়ী পয়গম্বরগণ দ্বারা নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও এরূপ গোনাহ হতে পারে না।

১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে : ভ্রাতাদের মধ্যেই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে বলল : ইউসুফকে হত্যা করো না। যদি কিছু করতেই হয় তবে, কূপের গভীরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ কর, যেখানে সে জীবিত থাকে এবং পশিক যখন কূপে আসে, তখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অপরদিকে তাকে নিয়ে তোমাদেরকে কোন দূরদেশে যেতে হবে না। কোন কাফেলা আসবে, তারা স্বয়ং তাকে সাথে করে দূর-দূরান্তে পৌঁছে দেবে।

এ অভিমত প্রকাশকারী ছিল তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াকুব। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে যে, সবার মধ্যে রুবীল ছিল জ্যেষ্ঠ। সে-ই এ অভিমত দিয়েছিল। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন ইউসুফ (আঃ)-এর ছোট ভাই বেনিয়ামিনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিল : আমি ফিরে গিয়ে পিতাকে কিভাবে মুখ দেখাব? তাই আমি কেনানে ফিরে যাব না।

ইমাম কুরতুবী এ স্থলে **وَلَقَطَ** এর বিস্তারিত বিধানাবলী বর্ণনা করেছেন। এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই। তবে এ সম্পর্কে

একটি মৌলিক বিষয় বুঝে নেয়া দরকার যে, ইসলামী রাই-ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও মালের হেফাজত পঞ্চ-ঘাট ও সড়ক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ ইত্যাদি একমাত্র সরকারী বিভাগসমূহের দায়িত্ব নয়; প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষমতাকে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। পঞ্চ-ঘাটে ও সড়কে দাঁড়িয়ে অথবা নিজের কোন আসবাবপত্র ফেলে দিয়ে যারা পশিকদের চলার পথে অসুবিধা সৃষ্টি করে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি মুসলমানদের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তার জেহাদও গ্রহণীয় নয়। এমনভাবে রাস্তায় কোন বস্তু পড়ে থাকার কারণে যদি অপরের কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে, যেমন কাঁটা, কাঁচের টুকরো, পাথর ইত্যাদি, তবে এগুলোকে সরানো শুধু ভায়াপ্ত কৰ্তৃপক্ষেরই দায়িত্ব নয়; বরং প্রত্যেক মুসলমানকেই এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এবং যারা এ কাজ করে, তাদের জন্যে অশেষ প্রতিদান ও সওয়াবের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

এ মূলনীতি অনুযায়ীই কারও হারানো মাল পেলে তা আত্মসাত না করাই শুধু তার দায়িত্ব নয়; বরং এটাও তার দায়িত্ব যে, মালাটি উঠিয়ে সযত্নে রেখে দেবে এবং ঘোষণা করে মালিকের সন্ধান নেবে। সন্ধান পাওয়া গেলে এবং লক্ষণাদি বর্ণনার পর যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ মাল তারই; তবে তাকে প্রত্যর্পণ করবে। পক্ষান্তরে ঘোষণা ও খোজাখুঁজি সত্ত্বেও যদি মালিক না পাওয়া যায় এবং মালের গুরুত্ব অনুযায়ী অনুমিত হয় যে, মালিক আর তালাশ করবে না, তবে প্রাপক নিঃস্ব দরিদ্র হলে নিজেই তা ভোগ করতে পারবে। অন্যথায় ফকীর-মিসকীনকে দান করে দেবে। উভয় অবস্থায় সেটি প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে দানরূপে গণ্য করা হবে। দানের সওয়াব সে-ই পাবে; যেন পরকালের হিসাবে সেটি তার নামেই জমা করে দেয়া হবে।

এগুলো হচ্ছে জনসেবা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূলনীতি। এগুলোর দায়িত্ব মুসলিম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আফসোস! মুসলমানরা নিজেদের দীনকে বুঝলে এবং তা যথাযথ পালন করলে বিশ্ববাসীর চোখ খুলে যাবে। তারা দেখবে যে, সরকারের বড় বড় বিভাগ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যে কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, তা অনায়াসে কিভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়।

১১ ও ১২ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভাইয়েরা পিতার কাছে এরূপ ভাষায় আবেদন পেশ করল : আকাজ্ঞান। ব্যাপার কি যে, আপনি ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের প্রতি আস্থা রাখেন না, অথচ আমরা তার পুরোপুরি হিতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে-ও স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলা করতে পারে। আমরা সবাই তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব।

তাদের এই আবেদন থেকেই বোঝা যায় যে, তারা ইতিপূর্বেও এ ধরনের আবেদন কোন সময়ে করেছিল, যা পিতা অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাই এবার কিঞ্চিৎ জোর ও পীড়াপীড়ি সহকারে পিতাকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ আয়াতে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর কাছে প্রমোদ-ভ্রমণ এবং স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেননি। তিনি শুধু ইউসুফকে তাদের সাথে দিতে ইতস্ততঃ করেছেন, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এতে বোঝা গেল যে, প্রমোদ ভ্রমণ ও খেলাধুলা বিবিধ সীমার ভেতরে নিষিদ্ধ নয়, বরং সহীহ হাদীস থেকেও এর বৈধতা জানা

যায়। তবে শর্ত এই যে, খেলাধুলায় শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন বাঞ্ছনীয় নয় এবং তাতে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘিত হতে পারে এমন কোন কিছুর মিশ্রণও উচিত নয়।—(কুরত্বী)

ইউসুফ (আঃ)—এর ভ্রাতারা যখন আগামীকাল ইউসুফকে তাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে প্রেরণের আবেদন করল, তখন ইয়াকুব (আঃ) বললেন : তাকে প্রেরণ করা আমি দু'কারণে পছন্দ করি না। প্রথমতঃ এ নয়নের মণি আমার সামনে না থাকলে আমি শান্তি পাই না। দ্বিতীয়তঃ আশঙ্কা আছে যে, জঙ্গলে তোমাদের অসাবধানতার মুহুর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে।

বাঘের আশঙ্কা হওয়ার কারণ এই যে, কেনানে বাঘের বিস্তর প্রাদুর্ভাব ছিল। কিংবা ইয়াকুব (আঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি পাহাড়ের উপর আছেন। নীচে পাহাড়ের পাদদেশে ইউসুফ (আঃ)। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, কিন্তু একটি বাঘই এগিয়ে এসে তাঁকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর ইউসুফ (আঃ) মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেন।

এর ব্যাখ্যা এভাবে প্রকাশ পায় যে, দশটি বাঘ ছিল দশ জন ভাই এবং যে বাঘটি তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, সে ছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াকুব। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেয়ার অর্থ কূপের মধ্যে নিষ্কিপ্ত হওয়া।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইয়াকুব (আঃ) স্বয়ং এ ভাইদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করেছিলেন এবং তাদেরকেই বাঘ বলেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ওদের কাছে এই কথা প্রকাশ করেননি।—(কুরত্বী)

ভ্রাতারা ইয়াকুব (আঃ)—এর কথা শুনে বলল : আপনার এ ভয়ভীতি অমূলক। আমাদের দশ জনের শক্তিশালী দল তার হেফাজতের জন্যে বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের সবার বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘেই তাকে খেয়ে ফেলে, অস্তিত্বই নিষ্ফল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আমাদের দ্বারা কোন কাজের আশা করা যেতে পারে ?

হযরত ইয়াকুব (আঃ) পয়গম্বর সুলভ গাভীরোর কারণে পুত্রদের সামনে একথা প্রকাশ করলেন না যে, আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করি। কারণ, এতে প্রথমতঃ তাদের মনোকষ্ট হত, দ্বিতীয়তঃ পিতার এরূপ বলার পর ভ্রাতাদের শত্রুতা আরও বেড়ে যেতে পারত। ফলে এখন ছেড়ে দিলেও অন্য কোন সময় কোন হলছুতায় তাকে হত্যা করার ফিকিরে থাকত। তাই তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু ভাইদের কাছ থেকে অস্বীকারও নিয়ে নিলেন, যাতে ইউসুফের কোনরূপ কষ্ট না হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুবীল অথবা ইয়াকুব হাতে বিশেষ করে তাকে সোপর্দ করে বললেন : তুমি তার ক্ষুধা-ভ্রুক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনের ব্যাপারে দেখা-শোনা করবে এবং শীঘ্র ফিরিয়ে আনবে। ভ্রাতারা পিতার সামনে ইউসুফকে কাঁধে তুলে নিল এবং পালাক্রমে সবাই উঠাতে লাগল। কিছুদূর

পর্যন্ত হযরত ইয়াকুবও (আঃ) তাদেরকে বিদায় দেয়ার জন্যে গেলেন।

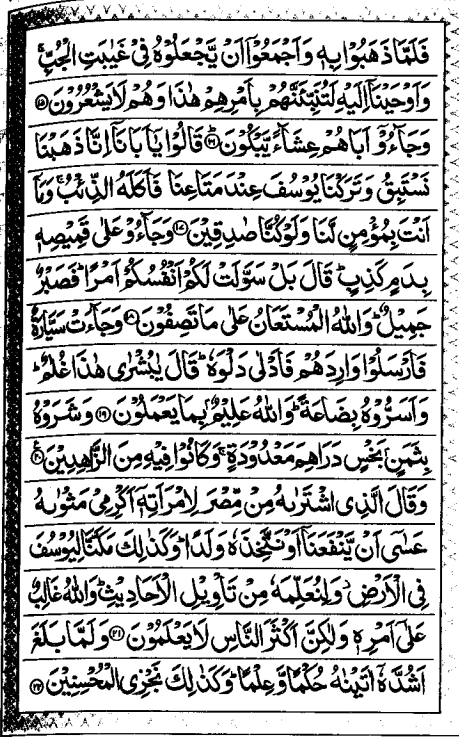
কুরত্বী ঐতিহাসিক রেওয়াজের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তারা যখন ইয়াকুব (আঃ)—এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন ইউসুফ (আঃ) যে ভাইয়ের কাঁধে ছিলেন, সে তাকে মাটিতে ফেলে নিল। তখন ইউসুফ (আঃ) পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন, কিন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের সাথে সাথে দৌড়াতে অক্ষম হয়ে অন্য একজন ভাইয়ের আশ্রয় নিলেন। সে কোন রূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করার তৃতীয়, চতুর্থ এমনভাবে প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সবাই উত্তর দিল যে, 'তুই যে এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র-সূর্যকে দেখা করতে দেখেছিস, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোকে সাহায্য করবে।'

কুরত্বী এর ভিত্তিতেই বলেন যে, এ থেকে জানা গেল, ভাইয়েরা কোন না কোন উপায়ে ইউসুফ (আঃ)—এর স্বপ্নের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। সে স্বপ্নই তাদের তীব্র ক্রোধ ও কঠোর ব্যবহারের কারণ হয়েছিল।

অবশেষে ইউসুফ (আঃ)—ইয়াকুবকে বললেন : আপনি জ্যেষ্ঠ। আপনিই আমার দুর্বলতা ও অল্পবয়স্কতা এবং পিতার মনোকষ্টের কথা চিন্তা করে দয়্যার হোন। আপনি ঐ অস্বীকার স্মরণ করুন, যা পিতার সাথে করেছিলেন। একথা শুনে ইয়াকুবের মনে দয়্যার সঞ্চার হল এবং তাকে বললঃ যতক্ষণ আমি জীবিত আছি এসব ভাই তোকে কোন কষ্ট দিতে পারবে না।

ইয়াকুবের অন্তরে আল্লাহ্ তাআলা দয়্যার ও ন্যায়ানুগ কাজ করার প্রেরণা জাগ্রত করে দিলেন। সে অন্যান্য ভাইকে সম্বোধন করে বলল : নিরপরাধকে হত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহকে ভয় কর এবং বালককে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চল। তবে তার কাছ থেকে অস্বীকার নিয়ে নাও যে, সে পিতার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করবে না।

ভাইয়েরা উত্তর দিল : আমরা জানি, তোমার উদ্দেশ্য কি। তুমি পিতার অন্তরে নিজের মর্যাদার আসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও। শুনে রাখ, যদি তুমি আমাদের ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হও, তবে আমরা তোমাকেও হত্যা করব। ইয়াকুব দেখল যে, নয় ভাইয়ের বিপরীতে সে একা কিছুই করতে পারবে না। তাই সে বলল : তোমরা যদি এ বালককে নিপাত করতে মনস্থ করে থাক, তবে আমার কথা শোন। নিকটেই একটি প্রাচীন কূপ রয়েছে। এতে অনেক ঝোপ-জঙ্গল গজিয়েছে। সর্প, বিছু ও হরেক রকমের ইতর প্রাণী এখানে বাস করে। তোমরা তাকে কূপে ফেলে দাও। যদি কোন সর্প ইত্যাদি দর্শন করে তাকে শেষ করে দেয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ এবং নিজ হাতে হত্যা করার দোষ থেকে তোমরা মুক্ত হলে। পক্ষান্তরে যদি সে জীবিত থাকে, তবে হয়তো কোন কাফেলা এখানে আসবে এবং পানির জন্য কূপে বালতি ফেলবে। ফলে সে বের হয়ে আসবে। তারা তাকে সাথে করে অন্য কোন দেশে পৌঁছিয়ে দেবে। এমতাবস্থায়ও তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।



(১৫) অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে চলল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল এবং আমি তাকে ইঙ্গিত করলাম যে, তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা বলবে এমতাবস্থায় যে, তারা তোমাকে চিনবে না। (১৬) তারা রাতের বেলায় কাদতে কাদতে পিতার কাছে এল। (১৭) তারা বলল : পিতঃ আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে অসাব্য-পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। অতঃপর তাকে বাঁধে খেঁয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী। (১৮) এবং তারা তার জামায় ক্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল। বললেন : এটা কখনই নয়, বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা শাঙ্কিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন ছবর করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা কর্না করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল। (১৯) এবং একটি কাকোলা এল। অতঃপর তাদের পানি সস্ত্রাহককে প্রেরণ করল। সে বলটি ফেলল। বলল : কি আনন্দের কথা। এ তো একটি কিশোর। তারা তাকে পঞ্চমব্য গণ্য করে গোপন করে ফেলল। আল্লাহ খুব জানেন যা কিছু তরা করেছিল। (২০) ওরা তাকে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল গুণাগুণটি স্বয়ং দেহহাম এবং তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল। (২১) মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল : একে সম্মানে রাখ। সম্ভবতঃ সে আমাদের কাছে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এখনভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এ জন্য যে তাকে বাক্যাদির পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই। আল্লাহ নিজ কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (২২) যখন সে পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে গেল, তখন তাকে প্রজ্ঞা ও যুগপতি দান করলাম। এমননিভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ প্রস্তাবে ভাইয়েরা সবাই একমত হল। এ বিষয়টি তৃতীয় আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهٖ وَاجْمَعُوا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيْبَتِ الْجُبِّ ۝ وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهٖ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

অর্থাৎ, ভাইয়েরা যখন ইউসুফ(আঃ)-কে জঙ্গলে নিয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে সবাই একমত হইল, তখন আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আঃ)-কে সংবাদ দিলেন যে, একদিন আসবে, যখন তুমি ভাইদের কাছে তাদের এ কু-কর্মের কথা ব্যক্ত করবে। তারা তখন কিছুই বুঝতে পারবে না।

ইমাম কুরতুবী বলেন : এ ওহী সম্পর্কে দু'প্রকার ধারণা সম্ভবপর। (এক) কূপে নিক্ষেপ হওয়ার পর তাঁর সাদ্ধাৎ ও মুক্তির সুসংবাদ দানের জন্যে এ ওহী আগমন করেছিল। (দুই) কূপে নিক্ষেপ হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আঃ)-কে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী বলে দিয়েছিলেন। এতে আরও বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে ধ্বংস হওয়ার কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমনি পরিস্থিতি দেখা দেবে যে, তুমি তাদের তিরস্কার করার সুযোগ পাবে; অথচ তারা তোমাকে চিনবেও না যে, তুমিই তাদের ভাই ইউসুফ।

ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি শৈশবে অবতীর্ণ এ ওহী সম্পর্কে তফসীর-মাযহরীতে বলা হয়েছে যে, এটা নবুওয়তের ওহী ছিল না। কেননা, নবুওয়তের ওহী চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমকালে অবতীর্ণ হয়। বরং এ ওহীটি ছিল এ ধরনের, যেমন মুসা (আঃ)-এর জননীকে ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত করানো হয়েছিল। ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি নবুওয়তের ওহীর আগমন মিসর পৌঁছাও যৌবনে পদার্পণের পর শুরু হয়েছিল। বলা হয়েছে : وَلَمَّا لَبِثَ اَشَدَّ اَلْفِیْنَةِ حُمْلًا ۝ ইবনে জরীর, ইবনে আবীহাতেম প্রমুখ একে ব্যতিক্রমধর্মী নবুওয়তের ওহীই আখ্যা দিয়েছেন; যেমন ইসা (আঃ)-কে শৈশবেই নবুওয়তের ওহী দান করা হয়েছিল। — (মাযহরী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : মিসর পৌঁছার পর আল্লাহ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-কে স্বীয় অবস্থা জানিয়ে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট খবর পাঠাতে ওহীর মাধ্যমে নিবেদন করে দিয়েছিলেন। — (কুরতুবী) এ কারণেই ইউসুফ (আঃ)-এর মত একজন পয়গম্বর জেল থেকে মুক্তি এবং মিসরের রাজত্ব লাভ করার পরও বৃদ্ধ পিতাকে স্বীয় নিরাপত্তার সংবাদ পৌঁছিয়ে নিশ্চিন্ত করার কোন ব্যবস্থা করেননি।

এ কর্মপন্থার মধ্যে আল্লাহ তাআলার কি কি রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা জানার সাধ্য কি? সম্ভবতঃ আল্লাহ হাড়া অন্য যে কোন কিছুই প্রতি অপরিণীম ভালবাসা রাখা যে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়, এ বিষয়ে ইয়াকুব (আঃ)-কে সতর্ক করাও এর লক্ষ্য ছিল। এ হাড়া শেষ পর্যন্ত যাদ্ধাকারীর বেশে ভাইদেরকেই ইউসুফ (আঃ)-এর সামনে উপস্থিত করে তাদেরকেও তাদের পূর্বকৃত দুষ্টকর্মের কিছু শাস্তি দেয়া উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদগণ এস্থলে ইউসুফ (আঃ)-কে কূপে

নিষ্কাশ করার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : যখন ওরা তাঁকে কূপে নিষ্কাশ করতে লাগল, তখন তিনি কূপের প্রাচীর ভাঙিয়ে ধরলেন। তাইয়েরা তার জামা খুলে তদ্বারা হাত বেঁধে দিল। তখন ইউসূফ (আঃ) পুনরায় তারের কাছে দয়া তিক্তা চাইলেন। কিন্তু তখনও সেই একই উত্তর পাওয়া গেল যে, যে এগারটি নক্ষত্র তোকে সেজন্য করে, তাদেরকে ভাক দে। তারাই তোর সাহায্য করবে। অতঃপর একটি বালতিতে রেখে তা কূপে ছাড়তে লাগল। যাকপাশে যেতেই উপর থেকে রশি কেটে নিল। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ইউসূফের হেফাজত করলেন। পানিতে পড়ার কারণে তিনি কেনরূপ আঘাত পাননি। নিকটেই এককণ্ড তাম্রময় প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হল। তিনি সুস্থ ও বহুল ভবিষ্যতে তার উপর বসে গেলেন। কেন কেন রেওয়ায়েতে রয়েছে, জিবরিল (আঃ) আল্লাহর আদেশ পেয়ে তাঁকে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়ে দেন।

ইউসূফ (আঃ) তিন দিন কূপে অবস্থান করলেন। ইয়াহুদা প্রত্যহ গোপনে তাঁর জন্যে কিছু খাদ্য আনত এক বালতির সাহায্যে তাঁর কাছে পৌছে দিত।

وَلَمَّا زَاكَّ أَهْلُهَا فَفُتِحَتْ قَالَ أَرْبَابُهَا مَاذَا جَاءَ بِكَ قَالَ بَدَّلُونِي إِلَىٰ بَيْتٍ آخَرَ وَتَوَلَّوْا وَابْتَاعُوا بَيْتَ آخَرَ وَتَوَلَّوْا وَبَدَّلُوا بِطَافٍ ۚ أَرْبَابُهَا مَاذَا جَاءَ بِكَ قَالَ بَدَّلُونِي إِلَىٰ بَيْتٍ آخَرَ وَتَوَلَّوْا وَابْتَاعُوا بَيْتَ آخَرَ وَتَوَلَّوْا وَبَدَّلُوا بِطَافٍ ۚ

وَلَمَّا زَاكَّ أَهْلُهَا فَفُتِحَتْ قَالَ أَرْبَابُهَا مَاذَا جَاءَ بِكَ قَالَ بَدَّلُونِي إِلَىٰ بَيْتٍ آخَرَ وَتَوَلَّوْا وَابْتَاعُوا بَيْتَ آخَرَ وَتَوَلَّوْا وَبَدَّلُوا بِطَافٍ ۚ

অর্থাৎ, পিতা, আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম এবং ইউসূফকে আসবাবপত্রের কাছে রেখে দিলাম। ইতিমধ্যে বাঘ এসে ইউসূফকে খেয়ে ফেলেছে। আমরা স্বত সত্যবাদীই হই; কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না।

ইবনে আরাবী ‘আহ্‌কামুল-কোরআনে’ বলেন : পারম্পরিক (দৌড়) প্রতিযোগিতা শরীয়তসিদ্ধ এবং একটি উত্তম খেলা। এটা জেহাদেও কাজে আসে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং এ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। অনু-প্রতিযোগিতা করানো (অর্থাৎ বৌদ্ধদৌড়)ও প্রমাণিত রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সালামা ইবনে আকওয়া’ জনৈক ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন।

উল্লেখিত আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা আসল বৌদ্ধদৌড়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়। এছাড়া বৌদ্ধদৌড় ছাড়া দৌড়, তীরে লক্ষ্যভেদ ইত্যাদিতেও প্রতিযোগিতা করা বৈধ। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পক্ষকে তৃতীয় পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করাও জায়েয। কিন্তু পরস্পর হার-জিতে কেন টাকার অংশ শর্ত করা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত, যা কোরআন পাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আধিকার বৌদ্ধদৌড়ের স্বত প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তার কোনটিই জুয়া থেকে মুক্ত নয়। তাই এগুলো হারাম ও নাজায়েয।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, ইউসূফ (আঃ)-এর বাতারা পারম্পরিক আলোচনার পর অবশেষে তাকে একটি অন্ধকূপে ফেলে দিল এবং পিতাকে এসে বলল যে, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে অতঃপর কাহিনী এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

وَجَاءَهُ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ أَرْبَابُهَا مَاذَا جَاءَ بِكَ قَالَ بَدَّلُونِي إِلَىٰ بَيْتٍ آخَرَ وَتَوَلَّوْا وَابْتَاعُوا بَيْتَ آخَرَ وَتَوَلَّوْا وَبَدَّلُوا بِطَافٍ ۚ

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের মিথ্যা কাঁস করে দেয়ার জন্যে তাদেরকে একটি জরুরী বিষয় থেকে গাফেল করে দিয়েছিলেন। তারা যদি রক্ত লাগানোর সাথে সাথে জামাটিও ছিন্-বিচ্ছিন্ন করে দিত, তবে ইউসূফকে বাঘে খাওয়ার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত। কিন্তু তারা অন্ধত ও অজ্ঞ জামায় ছানল ছানার রক্ত লাগিয়ে পিতাকে ধোকা দিতে চাইল। ইয়াকুব (আঃ) অন্ধত ও আন্ত জামা দেখে বললেন : বাঘরা, এ বাঘ কেমন রক্ত ও বুদ্ধিমান ছিল যে, ইউসূফকে তো খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু জামার কেন অংশ ছিন্ হতে দেখিনি।

এভাবে ইয়াকুব (আঃ)-এর কাছে তাদের জালিয়াতি কাঁস হয়ে গেল। তিনি বললেন :

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً قَصِدُواْ جَبِينِ وَاللّٰهُ الشَّكَّانُ ۚ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ

- অর্থাৎ, ইউসূফকে বাঘে খায়নি; বরং তোমাদেরই মন একটি বিষয় ঝাড়া করেছে। এখন আমার জন্যে উত্তম এই যে, মৈর্যধারণ করি এক তোমরা যা বল, তাতে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি।

মাসআলা : ইয়াকুব (আঃ) জামা অন্ধত হওয়া দ্বারা ইউসূফ বাতাদের মিথ্যা সপ্রমাণ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, বিচারকের উচিত, উভয় পক্ষের দাবী ও যুক্তি প্রমাণের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আলামতের প্রতিও লক্ষ্য রাখা।

মাওয়ারাদি বলেন : হযরত ইউসূফের জামাও কিছু আত্মবিশ্বাস বিষয়াদির স্মারক হয়ে রয়েছে। তিনটি বিরাট ঘটনা এ জামার সাথে জড়িত রয়েছে।

প্রথম ঘটনা হল, রক্ত রঞ্জিত করে পিতাকে ধোকা দেয়া এবং জামার সাক্ষ্য দ্বারাই তাদের মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া; দ্বিতীয়, যুলায়খার ঘটনা। এতেও ইউসূফ (আঃ)-এর জামাটিই সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। তৃতীয়, ইয়াকুব (আঃ)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার ঘটনা। এতেও তাঁর জামাটিই মুজ্জযার প্রতীক প্রমাণিত হয়েছে।

ঘটনাচক্রে একটি কাফেলা এ স্থানে এসে যায়। তফসীরে-কুরতুবীয়ে বলা হয়েছে : এ কাফেলা সিরিয়া থেকে মিসর যাচ্ছিল। পথ ভুলে এ জনমানবহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়। তারা পানি সঞ্চারকারীদের কূপ প্রেরণ করল।

মিসরীয় কাফেলার পথ ভুলে এখানে পৌছা এবং এই অন্ধ কূপে সম্পূর্ণ হওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। কিন্তু যারা সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞাত, তারা জানে যে, এসব ঘটনা একটি পরস্পর সংযুক্ত ও অটুট ব্যবস্থাপনার মিলিত অংশ। ইউসূফের দ্বারা ও রক্তকই কাফেলাকে পথ থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন এক কাফেলার লোকদেরকে এই অন্ধ কূপে প্রেরণ করেছেন। সাধারণ মানুষ যেসব ঘটনাকে আকস্মিক - ব্যাপারবাহীন মনে করে, সেগুলোর অবস্থার তদ্রূপ। দার্শনিকরা এগুলোকে দৈববাহীন ঘটনা আখ্যা দিয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এটা প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টজগতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অজ্ঞতার

কিনয়ক। নতুবা সৃষ্টিপরম্পরায় দৈবাৎ কোন কিছু হয় না। আল্লাহ্‌র আলার অবস্থা হচ্ছে **فَكَانَ لِجَارِيَّتَيْهِ** (তিনি যা ইচ্ছা, তাই করেন।) তিনি কোন রহস্যের অধীনে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যে, বাহ্যিক দৃষ্টান্তের সাথে তার কোন সম্পর্ক বোঝা যায় না। মানুষ একেই দৈব ক্রিয়ামানে করে বসে।

মোটকথা, কাফেলার মালেক ইবনে দো'বর নামে জনৈক ব্যক্তি কবিতা কবিতা করে, তিনি এই কূপে পৌছলেন এবং বালতি নিষ্কপ করলেন। ইউসুফ (আঃ) সর্বশক্তিমানের সাহায্য প্রত্যক্ষ করে বালতির দৃষ্টান্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি সমুজ্জ্বল মুক্ত দৃষ্টান্ত তেজে উঠল। এ মুখমণ্ডলের ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য থেকে দৃষ্টি বিস্ময়ে নিলেও উপস্থিত ক্ষেত্রেও অনুপম সৌন্দর্য ও গুণ-গত উৎকর্ষের সন্ধানবলী তার মহত্বের কম পরিচায়ক ছিল না। সম্পূর্ণ জ্ঞানোন্মিতভাবে কূপের তলদেশ থেকে ভেসে উঠা এই অসম্ভবরূপ, কল্প ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে মালেক সোলাসে চাঁৎকার করে উঠল : **يَسْرُورٌ هَذَا غَضَرٌ** - আরে, আনন্দের কথা- এ তো বড় চমৎকার

এক কিশোর বের হয়ে এসেছে। সহীহ মুসলিমের মি'রাজ রজুনীর হাদীসে মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেন : আমি ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের পর দীক্ষায় যে, আল্লাহ্‌ তাআলা সমগ্র বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেক তাঁকে দান করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সমগ্র বিশ্বে বন্টন করা হয়েছে।

وَأَسْرُورٌ بِضَاةٌ - অর্থাৎ, তারা তাঁকে একটি পণ্যদ্রব্য মনে করে গোপন করে ফেলল। উদ্দেশ্য এই যে, শুরুতে তো মালেক ইবনে দো'বর কিশোরকে দেখে অবাক বিস্ময়ে চাঁৎকার করে উঠল ; কিন্তু পরে চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করল যে, এটা জানাজানি না হওয়া উচিত এবং গোপন করে ফেলা দরকার, যাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ লাভ করা যায়। সমগ্র কাফেলার মধ্যে এ বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে সবাই এতে অঙ্গীদার হয়ে যাবে।

এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা বাস্তব ঘটনা গোপন করে তাকে পণ্যদ্রব্য করে নিল, যেমন কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, ইয়াহুদা প্রত্যহ ইউসুফ (আঃ)-কে কূপের মধ্যে খানা পৌছানোর জন্যে যেতো। তৃতীয় দিন তাকে কূপের মধ্যে না পেয়ে সে মিরে এসে ভাইদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করল : অতঃপর সব ভাই একত্রে সেখানে পৌছল এবং অনেক বোঝাখুজির পর কাফেলার লোকদের কাছ থেকে ইউসুফকে বের করল। তখন তারা বলল : এই ছেলেটি আমাদের গোলাম। পলায়ন করে এখানে এসেছে। তোমরা একে কন্ডায় নিয়ে খুব খরাপ কাজ করোহ। একথা শুনে মালেক ইবনে দো'বর ও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে গেল যে, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হবে। তাই ভাইদের সাথে তাকে ক্রয় করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগল।

এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ইউসুফ ভ্রাতারা নিজেরাই ইউসুফকে পণ্যদ্রব্য স্থির করে বিক্রি করে দিল।

وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ لَاجِبٌ - অর্থাৎ তাদের সব কর্মকাণ্ড আল্লাহ্‌র জ্ঞানার জ্ঞান ছিল।

উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা কি করবে এবং তাদের কাছ থেকে ক্রয় কাফেলা কি করবে- সব আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞান ছিল। তিনি তাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়ারও শক্তি রাখতেন। কিন্তু বিশেষ

কোন রহস্যের কারণেই আল্লাহ্‌ তাআলা এসব পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করেননি ; বরং নিজস্ব পথে চলতে দিয়েছেন।

وَبَشَّرُوهُ بِخَيْرٍ - আরবী ভাষায় **شراء** শব্দ ক্রয় করা ও বিক্রয় করা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলেও উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যদি সর্বনামকে ইউসুফ ভ্রাতাদের দিকে ফেরানো হয়, তবে বিক্রয় করার অর্থ হবে এবং কাফেলার লোকদের দিকে ফেরানো হলে ক্রয় করার অর্থ হবে। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা বিক্রয় করে দিল কিংবা কাফেলার লোকেরা ইউসুফকে খুব সস্তা মূল্যে অর্থাৎ নামে মাত্র কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল।

কুরতুবী বলেন : আরব বণিকদের অভ্যাস ছিল, তারা মোটা অঙ্কের লেন-দেন পরিমাপের মাধ্যমে করত এবং চল্লিশের উর্ধ্বে নয়, এমন লেন-দেন গণনার মাধ্যমে করত। তাই **دراهم** শব্দের সাথে **مَعْدُودَةٌ** (গুণাগুণতি) শব্দের প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় যে, দিরহামের পরিমাণ চল্লিশের কম ছিল। ইবনে কাসীর আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের রেওয়াজেতে লেখেন : বিশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছিল এবং দশ ভাই দুই দিরহাম করে নিজদের মধ্যে তা বন্টন করে নিয়েছিল।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রাথমিক জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, কাফেলার লোকেরা যখন তাঁকে কূপ থেকে উদ্ধার করল, তখন ভ্রাতারা তাঁকে নিজদের পলাতক ক্রীতদাস আখ্যা দিয়ে গুটিকতক দিরহামের বিনিময়ে তাঁকে বিক্রি করে দিল। প্রথমতঃ এ কারণে যে, তারা এ মহাপুরুষের সঠিক মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। দ্বিতীয়তঃ তাদের আসল লক্ষ্য তাঁর দূরা টাকা-পয়সা উপার্জন করা ছিল না; বরং পিতার কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। তাই শুধু বিক্রি করে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি ; বরং তারা আশঙ্কা করছিল যে, কাফেলার লোকেরা তাকে এখানেই ছেড়ে যাবে এবং অতঃপর সে কোন রকমে পিতার কাছে পৌছে আগাগোড়া চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে। তাই তফসীরবিদ মুজাহিদের বর্ণনা অনুযায়ী, তারা কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল। যখন কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল, তখন তারা কিছুদূর পর্যন্ত কাফেলার পেছনে পেছনে গেল এবং তাদেরকে বলল : দেখ, এর পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। একে মুক্ত ছেড়ে দিয়ো না; বরং বেঁধে রাখ। এ অমূল্য নিধির মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ কাফেলার লোকেরা তাঁকে এমনভাবে মিসরে নিয়ে গেল - (ইবনে-কাসীর)

এর পরবর্তী ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত রয়েছে। কোরআনের নিজস্ব সংক্ষিপ্তকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী কাহিনীর যতটুকু অংশ আপনা-আপনি বোঝা যায়, তার বেশী উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করা হয়নি; উদাহরণতঃ কাফেলার বিভিন্ন মনখিল অতিক্রম করে মিসর পর্যন্ত পৌছা, সেখানে পৌছে ইউসুফ (আঃ)-কে বিক্রি করে দেয়া ইত্যাদি। এগুলো ছেড়ে দিয়ে অতঃপর বলা হয়েছে :

وَقَالَ اِذْنِي لِسْتَرْفِعْ مِنْ مِّصْرَ لِمَا رَأَيْتُ مُتَوَلِّيًا - অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইউসুফ (আঃ)-কে মিসরে ক্রয় করল, সে তার স্বীকে বলল : ইউসুফের বসবাসের সুবন্দোবস্ত কর।

তফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে : কাফেলার লোকেরা তাঁকে মিসর নিয়ে যাওয়ার পর বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করতই ক্রেতার প্রতিযোগিতামূলকভাবে দাম বলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ইউসুফ (আঃ)-এর ওজনের সমান স্বর্ণ, সমপরিমাণ মৃগাভি এবং সমপরিমাণ রেশমী

বস্ত্র দাম বায্যস্ত হয়ে গেল।

আল্লাহ তাআলা এ রত্ন আখীয়ে মিসরের জন্যে অবধারিত করেছিলেন। তিনি বিনিময়ে উল্লিখিত দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ইউসুফ (আঃ)-কে ক্রয় করে নিলেন।

কোরআনের পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে জানা গেছে যে, এগুলো কোন দৈবাৎ ঘটনা নয়; বরং বিশু পালকের রচিত অটুট ব্যবস্থাপনার অংশমাত্র। তিনি মিসরে ইউসুফ (আঃ)-কে ক্রয় করার জন্যে এ দেশের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। ইবনে-কাসীর বলেন : যে ব্যক্তি ইউসুফ (আঃ)-কে ক্রয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন মিসরের অর্থমন্ত্রী। তাঁর নাম কিতফীর কিংবা ইতফীর বলা হয়ে থাকে। তখন মিসরের সম্রাট ছিলেন আমালেকা জাতির জনৈক ব্যক্তি রাইয়ান ইবনে ওসায়দ। তিনি পরবর্তীকালে ইউসুফ (আঃ)-এর হাতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁরই জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।—(মাঘহারী) ক্রেতা আখীয়ে মিসরের স্ত্রীর নাম ছিল রাইল কিংবা যুলায়খা। আখীয়ে-মিসর ‘কিতফীর’ ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন : তাকে বসবাসের উত্তম জায়গা দাও-ক্রীতদাসের মত রেখো না এবং তার প্রয়োজনাদির সুবন্দোবস্ত কর।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন : দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং চেহারা দেখে শুভাশুভ নিরূপণকারী প্রমাণিত হয়েছেন। প্রথম, আখীয়ে-মিসর। তিনি স্বীয় নিরূপণ শক্তি দ্বারা ইউসুফ (আঃ)-এর গুণাবলী অবহিত হয়ে স্ত্রীকে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়, হযরত শোআয়েব (আঃ)-এর ঐ কন্যা, যে মুসা (আঃ) সম্পর্কে পিতাকে বলেছিল :
يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
পিতাঃ, ‘তাকে চাকর রেখে দিন। কেননা, উত্তম চাকর ঐ ব্যক্তি, যে সবল, সঠাম ও বিশুদ্ধ হয়।’ তৃতীয় হযরত আবুবকর সিদ্দীক, যিনি ফারাকে আযম (রাঃ)-কে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেছিলেন।—(ইবনে কাসীর)

وَكَذَلِكَ نَكْتُبُ إِلَيْكَ فِي الْأَرْضِ — অর্থাৎ, এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম। এতে ভবিষ্যৎ ঘটনার সুসংবাদ রয়েছে যে, যে ইউসুফ এখন ক্রীতদাসের বেশে আখীয়ে মিসরের গৃহে প্রবেশ করেছে, অতি সম্ভব সে মিসরের সর্বপ্রধান ব্যক্তি হবে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবে।

وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ — এখানে শুরুতে এর

অর্থ নিলে এ অর্থেরই একটি বাক্য উহা মেনে নেয়া হবে। অর্থাৎ, আমি ইউসুফ (আঃ)-কে রাজত্ব দান করেছি, যাতে সে পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচারের মাধ্যমে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে, এ দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে এবং তাকে আমি বাক্যাদির পরিপূর্ণ অর্থ অনুশবানের পদ্ধতি শিক্ষা দেই। উপরোক্ত কথাটি ব্যাপক অর্থবহ। ঐ যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করা, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা, যাবতীয় জরুরী জ্ঞান অর্জিত হওয়া, স্বপ্নের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلِيبٌ — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা স্বীয় কর্মে প্রবল ও শক্তিমান। যাবতীয় বাহ্যিক কারণ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সঞ্চিত হয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যখন আল্লাহ তাআলা কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়ার সব উপকরণ তাঁর জন্যে প্রস্তুত করে দেন।

وَلَكِنَّ الْكَافِرِينَ لَآ يَكُونُونَ — কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য বুঝে না। তারা বাহ্যিক উপকরণাদিকেই সবকিছু মনে করে এগুলোর টিঙ্কর ব্যাপৃত থাকে এবং উপকরণ সৃষ্টিকারী ও সর্বশক্তিমানের কথা ভুলে যায়।

وَلِكَايَا أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَّا سُتِيقُوا إِلَى اللَّهِ عَذَابًا أَلِيمًا — অর্থাৎ, যখন ইউসুফ (আঃ) পূর্ণ শক্তি ও যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও কুশলি দান করলাম।

‘শক্তি ও যৌবন, কোন্ বয়সে অর্জিত হল, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ (রাঃ) বলেন : তখন বয়স ছিল তেরিশ বছর। যাইহোক বিশ বছর এবং হাসান বসরী চতুর্দশ বছর বর্ণনা করেছেন। তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করার অর্থ এস্থলে নবুওয়ত দান করা। এতে আরও জানা গেল যে, ইউসুফ (আঃ) মিসর পৌছারও অনেক পরে নবুওয়ত লাভ করেছিলেন। কুপের গভীরে যে গুহী তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, তা নবুওয়তের গুহী ছিল না; বরং আভিধানিক ‘গুহী’ ছিল, যা পয়গম্বর নয়-এমন ব্যক্তির কাছেও প্রেরণ করা যায়; যেমন মুসা (আঃ)-এর জননী এবং হযরত ইসা (আঃ)-এর মাতা মরিয়ম সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে।

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ — আমি সৎকর্মশীলদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ধর্মসেবকবল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজত্ব ও সম্মান পর্যন্ত পৌছানো ছিল ইউসুফ (আঃ)-এর সর্বাঙ্গ, আল্লাহ জীতি ও সৎকর্মের পরিণতি। এটা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য নয়, যে কেউ এমন সৎকর্ম করবে, সে এমনিভাবে আমার পুরস্কার লাভ করবে।

وَرَأَوْنَاهُ الْآخِرَىٰ هُوَ فِي بَيْنِنَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ الْأَوْبَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ

অর্থঃ, যে মহিলার গৃহে ইউসুফ (আঃ) থাকতেন, সে তাঁর প্রকৃতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং তাঁর সাথে কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে তাঁকে ফুসলাতে লাগল। সে গৃহের সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাঁকে বলল : শীঘ্র এসে যাও, তোমাকেই বলছি।

প্রথম আয়াতে জানা গিয়েছিল যে, এ মহিলা ছিল আশীয়ে মিসরের স্ত্রী। কিন্তু এ স্থলে কোরআন ‘আযীয-পত্নী’ এই সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে ‘যার গৃহে সে ছিল’ এ শব্দ ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ)–এর গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এ কারণে আরও অধিক কঠিন ছিল যে, তিনি তারই গৃহে–তারই আশ্রয়ে থাকতেন। তার আদেশ উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না।

গোনাহ থেকে বাঁচার প্রধান অবলম্বন স্বয়ং আত্মাহুত কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা : এর বাহ্যিক কারণ ঘটে এই যে, ইউসুফ (আঃ) যখন নিজেকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত দেখলেন, তখন পয়গম্বরসুলভ ভঙ্গিতে সর্বপ্রথম আত্মাহুত আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। **تَنِي قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ** তিনি শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পের উপর ভরসা করেননি। এটা জানা কথা যে, যে ব্যক্তি আত্মাহুত আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ বিশুদ্ধ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। অতঃপর তিনি পয়গম্বরসুলভ বিজ্ঞতা ও উপদেশ প্রয়োগ করে স্বয়ং যুলায়খাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, তারও উচিত আত্মাহুতকে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা থেকে বিরত থাকা। তিনি বললেন :

إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنُ مَوْلَىٰ إِنَّهُ لَكَرِيمٌ الظَّالِمُونَ তিনি আমার পালনকর্তা।

তিনি আমাকে সুখে রেখেছেন। মনে রেখো, অত্যাচারীরা কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না।

বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমার স্বামী আযীয়ে-মিসর আমাকে লালন-পালন করেছেন, আমাকে উত্তম জায়গা দিয়েছেন। অতএব তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী। আমি তাঁর ইহুযতে হস্তক্ষেপ করব? এটা জঘন্য অনাচার, অথচ অনাচারীরা কখনও কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না। এভাবে তিনি যেন স্বয়ং যুলায়খাকেও এ শিক্ষা দিলেন যে, আমি কয়েকদিন লালন-পালনের কৃতজ্ঞতা যখন এতটুকু স্বীকার করি, তখন তোমাকে আরও বেশী স্বীকার করা দরকার।

এখানে ইউসুফ (আঃ) আযীয়ে-মিসরকে স্বীয় ‘রব’ – পালন কর্তা বলেছেন। অথচ এ শব্দটি আত্মাহুত ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বেধ নয়। কারণ, এ ধরনের শব্দ শেরকের ধারণা সৃষ্টিকারী এবং মুশরেকদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই ইসলামী শরীয়াতে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে, কোন দাস স্বীয় প্রভুকে ‘রব’ বলতে পারবে না এবং কোন প্রভু স্বীয় দাসকে ‘বন্দা’ বলতে পারবে না। কিন্তু এ হচ্ছে ইসলামী শরীয়াতের বৈশিষ্ট্য। এতে শেরক নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে এমন বিষয়বস্তুকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা শেরকের উপায় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়াতে শেরককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলেও কারণ এবং উপায়াদির উপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। এ কারণে পূর্ববর্তী

(২৩) আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল, ঐ মহিলা তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বলল : ওন। তোমাকে বলছি, দ্রবিক আস। সে বলল : আত্মাহুত রক্ষা করুন, তোমার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমাকে সহজে থাকতে দিয়েছেন। নিচয় সীমা নির্ধারকারী সফল হয় না। (২৪) নিচয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত। যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত। এমনভাবে হয়েছে, যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিচয় সে আমার মনোনীত বন্দাদের একজন। (২৫) তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বলল : যে ব্যক্তি তোমার পরিচয়ের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তাকে কারাগারে পাঠানো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে? (২৬) ইউসুফ (আঃ) বললেন : হেঁ! আমার আত্মসংরক্ষণ না করতে হুসলিয়েছে। মহিলার পরিবারের জনকে সাক্ষী দিল যে, যদি তার জামা নামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদি। (২৭) এবং যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী (২৮) অতঃপর গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন, তখন সে বলল : নিচয় এটা আমাদের হলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের হলনা খুবই যারাত্মক। (২৯) ইউসুফ এ প্রসঙ্গ ছাড়। আর হে নারী। এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তুমি-ই পাপাচারিনী। (৩০) নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্যে বাস্তিতে দেখতে পাচ্ছি।

শরীয়তসমূহে চিত্র নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে বিধায় একে শেরক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত রাখার কারণে শিরকের উপায়াদি তথা চিত্র ও শেরকের ধারণা সৃষ্টিকারী শব্দাবলীও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোটকথা, ইউসুফ (আঃ) এর ﴿تُتِيهِ﴾ 'তিনি আমার পালনকর্তা' বলা স্বস্থানে ঠিকই ছিল।

পক্ষান্তরে ৯৮ শব্দের সর্বনামটি আল্লাহর দিকে ফেরানোও সম্ভবপর। অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) আল্লাহকেই 'রব' বলেছেন। বসবাসের উত্তম জায়গাও প্রকৃতপক্ষে তিনিই দিয়েছেন। সেমতে তাঁর অবাধ্যতা সর্ববৃহৎ জুলুম। এরূপ জুলুমকারী কখনও সফল হয় না।

সুন্দী ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, এ নির্জনতায় যুলায়খা ইউসুফ (আঃ)-কে আকৃষ্ট করার জন্যে তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল। সে বলল : তোমার মাথার চুল কত সুন্দর ! ইউসুফ (আঃ) বললেন : মৃত্যুর পর এই চুল সর্বপ্রথম আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর যুলায়খা বলল : তোমার নেত্রদ্বয় কতই না মনোরম ! ইউসুফ (আঃ) বললেন : মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে। যুলায়খা আরও বলল : তোমার মুখমণ্ডল কতই না কমনীয় ! ইউসুফ (আঃ) বললেন : এগুলো সব মৃত্তিকার খোরাক। আল্লাহ তাআলা তাঁর মনে পরকালের চিন্তা এতে বেশী প্রবল করে দেন যে, ভরা যৌবনেও জগতের যাবতীয় ভোগ-বিলাস তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। সত্য বলতে কি পরকালের চিন্তাই মানুষকে সর্বত্র সব অনিষ্ট থেকে নির্লিপ্ত রাখতে পারে।

পূর্ববর্তী আয়াতে ইউসুফ (আঃ)-এর বিরাট পরীক্ষা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, আযীযে-মিসরের স্ত্রী যুলায়খা গৃহের দরজা বন্ধ করে তাকে পাপকাজের দিকে আহ্বান করতে সচেষ্ট হল এবং নিজের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত করার সব উপকরণ উপস্থিত করে দিল, কিন্তু ইচ্ছান্তের মালিক আল্লাহ এ সং যুবককে এতেন অগ্নিপরীক্ষায় দৃঢ়পদ রাখলেন। এর আরও বিবরণ আয়াতো আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যুলায়খা তো পাপকাজের কল্পনায় বিভোরই ছিল, ইউসুফ (আঃ)-এর মনেও মানবিক স্বভাববশতঃ কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঠিক সেই মুহূর্তে স্বীয় যুষ্টি প্রমাণ ইউসুফ (আঃ)-এর সামনে তুলে ধরেন, যদ্বারা সেই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক ক্রমবর্ধিত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নিষ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং তিনি মহিলার নাগপাশ ছিন্ন করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে লাগলেন।

এ আয়াতে ৯৮ শব্দটি (কল্পনা অর্থে) যুলায়খা ও ইউসুফ (আঃ)-উভয়ের প্রতি সমৃদ্ধকৃত করা হয়েছে। বলা হয়েছে : ﴿وَقَدْ هَمَّتْ﴾ وَهَمَّتْ একথা সুনিশ্চিত যে, যুলায়খার কল্পনা ছিল পাপকাজের কল্পনা। এতে ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কেও এ ধরনের ধারণা হতে পারত। অথচ মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী এটা নবুওয়ত ও রেসালতের পরিপন্থী। কেননা, সকল মুসলিম মনীষীই এ বিষয়ে একমত যে, পয়গম্বরগণ সর্বপ্রকার সঙ্গীরা ও কবীরা গোনাহ থেকে পবিত্র থাকেন। তাঁদের দ্বারা কবীরা গোনাহ ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা ভুলবশতঃ কোনরূপেই হতে পারে না। তবে সঙ্গীরা গোনাহ অনিচ্ছা ও ভুলবশতঃ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাঁদেরকে এর উপরও সক্রিয় থাকতে দেয়া হয় না; বরং সতর্ক করে তা থেকে সরিয়ে আনা হয়।

পয়গম্বরগণের পবিত্রতার এ বিষয়টি কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত

হওয়া ছাড়াও তাঁদের যোগ্যতার প্রশ্নেও জরুরী। কেননা, পয়গম্বরগণের দ্বারা গোনাহ সৎবাতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাঁদের অনীত ধর্ম ও গুহীর প্রতি আহ্বার কোন উপায় থাকে না এবং তাঁদেরকে প্রেরণ ও তাঁদের প্রতি গ্রহণ অবতারগণের কোন উপকারিতাও অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক পয়গম্বরকেই গোনাহ থেকে পবিত্র রেখেছেন।

সহীহ বুখারীর হাদীসে আছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের এমন পাপচিন্তা ও কল্পনা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা সে কার্যে পরিণত করে না। (কুরতুবী)

বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলেন : আমার বন্দা যখন কোন সংকাজের ইচ্ছা করে, তখন শুধু ইচ্ছা কারণে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও। যদি সে সংকাজটি সম্পন্ন করে, তবে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি কোন পাপকাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, তখন পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও এবং যদি পাপকাজটি করেই ফেলে তবে একটি গোনাহই লিপিবদ্ধ করা—(ইবনে-কাসীর)

মোটকথা এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর অন্তরে যে কল্পনা অব্যবহৃত সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। ঐ গোনাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর এ ধারণার বিপক্ষে কাজ করার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর মর্যাদা আরও বেড়ে গেছে।

﴿لَوْلَا اَنْ رَّاٰ اَيُّهَا﴾ অংশটি পরে উল্লেখ করা হলেও তা আসল

অংশে রয়েছে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর মনে কল্পনা সৃষ্টি হত, যদি তিনি আল্লাহর প্রমাণ অবলোকন না করতেন। কিন্তু পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করার কারণে তিনি এ কল্পনা থেকে ঝেঁপে গেলেন। এ বিষয়বস্তুটি সঠিক, কিন্তু কোন কোন তফসীরবিদ এ অগ্র-পশ্চাৎকে ব্যাকরণিক ভুল আখ্যা দিয়েছেন। এদিক দিয়েও প্রমাণ তফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ, এতে ইউসুফ (আঃ)-এর আল্লাহ ভীতি ও পবিত্রতার মাহাত্ম্য আরও উদ্ভেদে চলে যায়। কেননা, তিনি স্বাভাবিক মানবিক ঝোঁক সত্ত্বেও গোনাহ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন।

﴿لَوْلَا اَنْ رَّاٰ اَيُّهَا﴾ এখানে এর ৯৮ উহা রয়েছে। অর্থ এই যে,

যদি তিনি পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন না করতেন, তবে এ কল্পনায় লিপ্ত থাকতেন। পালনকর্তার প্রমাণ দেখে নেয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও ধারণা অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল।

স্বীয় পালনকর্তার যে প্রমাণ ইউসুফ (আঃ)-এর দৃষ্টির সামনে এসেছিল, তা কি ছিল কোরআন পাক তা ব্যক্ত করেনি। এ কারণেই সম্পর্কে তফসীরবিদগণ নানা মত ব্যক্ত করেছেন। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, হুসাইন বসরী (রহঃ) প্রমুখ বলেছেন : আল্লাহ তাআলা যু'জ্জযা হিসেবে এ নির্দোষ কক্ষে হয়রত ইয়াকুব (আঃ)-এর চিত্র এভাবে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করে দেন যে, তিনি হাতের অঙ্গুলি দাঁতে চেপে তাঁকে হৃদয়াকরে করেছেন। কোন তফসীরবিদ বলেন : আযীযে-মিসরের মুখচ্ছবি তাঁর সম্মুখে হুঁতু তোলা হয়। কেউ বলেন : ইউসুফ (আঃ)-এর দৃষ্টি ছাদের দিকে উঠে সেখানে কোরআন পাকের এ আয়াত লিখিত দেখলেন :

وَلَا تُقْرَبُوا الرِّبَا زَيْدًا فَاحْشَاءُ وَسَامِيًّا — অর্থাৎ,

স্বাভিকারের নিকটবর্তী হয় না। কেননা, এটা খুবই নির্লজ্জতা, (খোদায়ী সন্তানের কারণ) এবং (সমাজের জন্যে) অত্যন্ত মন্দ পথ। কেউ কেউ বলেন : যুলায়খার গৃহে একটি মূর্তি ছিল। সে বিশেষ মুহূর্তটিতে যুলায়খা সেই মূর্তিটি কাপড় দ্বারা আবৃত করলে। ইউসুফ (আঃ)-এর কারণ নিষেধ করলেন। সে বলল : এটা আমার উপাস্য। এর সামনে গোনাহ্ দাঁড়ান মত সাহস আমার নেই। ইউসুফ (আঃ) বললেন : আমার উপাস্য ঈশ্বরও বেশী লজ্জা করার যোগ্যতাসম্পন্ন। তাঁর দৃষ্টিকে কোন পর্দা ঠেকায় পারে না। কারও কারও মতে ইউসুফ (আঃ)-এর নবুওয়্যত ও নিব্বাউনই ছিল স্বয়ং পালনকর্তা সম্পর্কে তাঁর এই দিব্যদৃষ্টির কারণ।

তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন : কোরআন-পাক যতটুকু বিষয় বর্ণনা করেছে, ততটুকু নিয়েই কান্ড থাকা দরকার। অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) এমন কিছু দেখেছেন, কল্পন তাঁর মন থেকে সীমালংঘন করার সামান্য ধারণাও বিদূরিত হয়ে গেছে। এ বস্তুটি কি ছিল — তফসীরবিদগণ যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর যে কোন একটি হতে পারে; তাই নিশ্চিতরূপে কোন একটিক নির্দিষ্ট করা যায় না।—(ইবনে কাসীর)

كَذَلِكَ لِنَصُوْرَتِ عَنْهُ السُّوْرَةُ وَالْفُحْشَاءُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِيْنَ

অর্থাৎ, আমি ইউসুফ (আঃ)-কে এ প্রমাণ এজন্মে দেখিয়েছি, যাতে তাঁর কাছ থেকে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে দূরে সরিয়ে দেই। ‘মন্দ কাজ’ বল সগীরা গোনাহ্ এবং ‘নির্লজ্জতা’ বলে কবীরা গোনাহ্ বোঝানো হয়েছে।—(মাহহারী)

এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে ইউসুফ (আঃ)-এর কাছ থেকে সরানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইউসুফ (আঃ)-কে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতা থেকে সরানোর কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) নবুওয়্যতের কারণে এ গোনাহ্ থেকে নিজেই দূরে ছিলেন, কিন্তু মন্দ কাজ নির্লজ্জতা তাঁকে জ্বায়েন করার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আমি এর জাল ছিন্ন করে দিয়েছি। কোরআন পাকের এ ভাষাও সাক্ষ্য দেয় যে, ইউসুফ (আঃ) কোন সামান্যতম গোনাহেও লিপ্ত হননি এবং তাঁর মনে যে কল্পনা জ্বায়েন হয়েছিল, তা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নতুবা এখানে এভাবে বক্তৃতা হত যে, আমি ইউসুফকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে দিলাম—এভাবে বলা হত না যে, গোনাহ্কে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম।

কেননা, ইউসুফ আমার মনোনীত বন্দাদের একজন। এখানে **مُخْلِصِيْنَ** শব্দটি লামের যবর-যোগ **مُخْلِص** এর বহুবচন। এর অর্থ মনোনীত। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার ঐ সব বন্দার অন্যতম, যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ রেসালতের দায়িত্ব পালন ও মানবজাতির স্বার্থের জন্যে মনোনীত করেছেন। এমন লোকের চারপাশে আল্লাহ্র শক্তি থেকে হেফাজতের পাহারা থাকে, যাতে তাঁরা কোন মন্দ কাজে লিপ্ত হতে না পারেন। স্বয়ং শয়তানও তার বিবৃতিতে একথা স্বীকার করেছে যে, আল্লাহ্র মনোনীত বন্দাদের উপর তার কলা-কৌশল অচল। শয়তানের উক্তি এই :

আপনার ইয়ুযত ও শক্তির কসম, আমি সব মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করব, তবে যেসব বন্দাকে আপনি মনোনীত করেছেন,

তাদেরকে ছাড়া।

কোন কোন কেরাআতে এ শব্দটি **مُخْلِصِيْنَ** লামের যের-যোগেও পাঠিত হয়েছে। **مُخْلِص** ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র এবাদত ও আনুগত্য আন্তরিকতার সাথে করে—এতে কোন পার্থিব ও প্রবৃত্তিগত উদ্দেশ্য, সুখ্যাতি ইত্যাদির প্রভাব থাকে না। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তিই স্বীয় কর্ম ও এবাদতে আন্তরিক হয়, পাপ থেকে বঁচে থাকার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা তাকে সাহায্য করেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা দু’টি শব্দ **نُحْشَاءُ** ও **سُوء** ব্যবহার করেছেন। প্রথমটির শাব্দিক অর্থ মন্দ কাজ এবং এর দ্বারা সগীরা গোনাহ্ বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-কে সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গোনাহ্ থেকেই মুক্ত রেখেছেন।

এ থেকে আরও বোঝা গেল যে, কোরআনে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি যে **مُخْلِص** অর্থাৎ, কল্পনা শব্দটিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল, যা কবীরা ও সগীরা কোন প্রকারের গোনাহেই অন্তর্ভুক্ত নয়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে যে, আযীযে-মিসরের পত্নী যখন ইউসুফ (আঃ)-কে পাশে লিপ্ত করার চেষ্টায় ব্যাপ্তা ছিল এবং ইউসুফ (আঃ) তা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মনে স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বিধা-দ্বন্দ্বও ছিল, তখন আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় মনোনীত পয়গম্বরের সাহায্যার্থে অলৌকিকভাবে কোন এমন বস্তু তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করে দেন, যার ফলে সে অনিচ্ছাকৃত কল্পনাও তাঁর মন থেকে উধাও হয়ে যায়। সে বস্তুটি পিতা ইয়াকুব (আঃ)-এর আকৃতিই হোক কিংবা ওহীর কোন আয়াত।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) এক নির্জন কক্ষে খোদায়ী প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই সেখান থেকে পলায়নোদ্যত হলেন এবং বাইরে চলে যাওয়ার জন্যে দরজার দিকে দৌড় দিলেন। আযীয-পত্নী তাঁকে ধরার জন্যে পেছনে দৌড় দিল এবং তাঁর জামা ধরে তাঁকে বহির্গমনে বাধা দিতে চাইল। তিনি পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়সংকল্প, তাই ধামলেন না। ফলে জামা পেছন দিক থেকে ছিড়ে গেল। ইত্যবসরে ইউসুফ (আঃ) দরজার বাইরে চলে গেলেন এবং তাঁর পশ্চাতে যুলায়খাও তথায় উপস্থিত হল। ঐতিহাসিকসমূহে বর্ণিত আছে যে, দরজা তালাবদ্ধ ছিল। ইউসুফ (আঃ) দৌড়ে দরজায় পৌঁছেতেই আপনা-আপনি তালা খুলে নীচে পড়ে গেল।

উভয়ে দরজার বাইরে এসে আযীযে-মিসরকে সামনেই দন্ডায়মান দেখতে পেল। তার পত্নী চমকে উঠল এবং কণ্ঠে বানিয়ে ইউসুফ (আঃ)-এর উপর দোষ ও অপবাদ চাপানোর জন্যে বলল : যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এ ছাড়া কি হতে পারে যে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে অথবা অন্য কোন কঠোর দৈহিক নির্যাতন।

ইউসুফ (আঃ) পয়গম্বরসুলভ ভদ্রতার খাতিরে সম্ভবতঃ সেই মহিলার গোপন অভিসন্ধির তথ্য প্রকাশ করতেন না, কিন্তু যখন সে নিজেই এগিয়ে এসে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের ইঙ্গিত করল, তখন বাধ্য হয়ে তিনিও সত্য প্রকাশ করে বললেন :

اِنَّ رَاَوْدِيْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ

অর্থাৎ, সে-ই আমার দ্বারা স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার জন্যে ফুসলাচ্ছিল।

ব্যাপার ছিল খুবই নাজুক এবং আযীযে-মিসরের পক্ষে কে সত্যবাদী, তার বীমাসো করা সুকঠিন ছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণের কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যেভাবে স্বীয় মনোনীত বন্দাদেরকে গোনাহ থেকে বাচিয়ে নিশ্চাপ ও পবিত্র রাখেন, এমনভাবে তাঁদেরকে গোনাহ থেকে বাচিয়ে রাখার অলৌকিকভাবে ব্যবস্থাও করে দেন। সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে কথা বলতে অক্ষম-এরূপ কচি শিশুদেরকে কাজে লাগানো হয়েছে। অলৌকিকভাবে তাদেরকে বাকশক্তি দান করে প্রিয় বন্দাদের পবিত্রতা সপ্রমাণ করা হয়েছে। যেমন হযরত মরিয়মের প্রতি যখন লোকেরা অপবাদ আরোপ করতে থাকে, তখন একদিনের কচি শিশু ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ তাআলা বাকশক্তি দান করে তাঁর মুখে জননীর পবিত্রতা প্রকাশ করে দেন এবং স্বীয় কুদরতের একটি বিশেষ দৃশ্য সবার সামনে প্রকাশ করেন। বনী-ইসরাঈলের একজন সাধু ব্যক্তি জুরাইজের প্রতি গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমন ধরনের এক অপবাদ আরোপ করা হলে নবজাত শিশু সেই ব্যক্তির পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করে। মুসা (আঃ)-এর প্রতি ফেরাউনের মনে সন্দেহ দেখা দিলে ফেরাউন-পত্নীর কেশ পরিচর্যাকারিণী মহিলার সদ্যজাত শিশু বাকশক্তি প্রাপ্ত হয়। সে মুসা (আঃ)-কে শৈশবে ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করে।

ঠিক এমনভাবে ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী একটি কচি শিশুকে আল্লাহ তাআলা বিজ্ঞ ও দার্শনিক সুলভ বাকশক্তি দান করলেন। এ কচি শিশু এ গৃহেই দোলনায় লালিত হচ্ছিল। তার সম্পর্কে ধারণা ছিলনা যে, সে এসব কর্মকাণ্ড দেখবে এবং বুঝবে, অতঃপর অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান স্বীয় আনুগত্যের পথে সাধনাকারীদের সঠিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলার জন্যে জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দেন যে, বিশুর প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু তাঁর গুপ্ত বাহিনী। এরা অপরাধীকে ভালভাবেই চেনে, তার অপরাধের রেকর্ড রাখে এবং প্রয়োজন মুহুর্তে তা প্রকাশও করে দেয়। হাশরের ময়দানে হিসাব-কিতাবের সময় মানুষ যখন স্বীয় অপরাধসমূহ স্বীকার করতে অস্বীকার করবে, তখন তারই হস্তপদ, চর্ম ও গৃহপ্রাচীরকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদাতারূপে দাঁড় করানো হবে। তারা তার প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড হাশরের লোকারণ্যের মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেবে। তখন মানুষ বুঝতে পারবে যে, হস্তপদ, গৃহপ্রাচীর ও রক্ষা ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কোনটিই তার আপন ছিল না; বরং এরা সবাই ছিল রাব্বুল আলামীনের গোপন বাহিনী।

মোটকথা এই যে, যে ছোট্ট শিশুটি বাহ্যতঃ জগতের সবকিছু থেকে উদাসীন ও নির্বিকার অবস্থায় দোলনায় পড়েছিল, সে ইউসুফ (আঃ)-এর মু'জ্জেবা হিসেবে ঠিক এ মুহুর্তে মুখ খুলল, যখন আযীযে-মিশর ছিল এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দিখাদ্দুদে জড়িত।

এ শিশুটি যদি এতটুকুই বলে দিত যে, ইউসুফ (আঃ) নির্দোষ এবং দোষ যুলায়খার, তবে তাও একটি মু'জ্জেবারূপে ইউসুফ (আঃ)-এর পক্ষে তাঁর পবিত্রতার বিরাট সাক্ষ্য হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ শিশুর মুখে একটি দার্শনিকসুলভ উক্তি উচ্চারণ করিয়েছেন যে, ইউসুফ (আঃ)-এর জামাটি দেখে—যদি তা সামনের দিকে ছিন্ন থাকে, যুলায়খার কথা সত্য ইউসুফ (আঃ) মিথ্যাবাদীরূপে সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে যদি জামাটি পেছন দিকে ছিন্ন থাকে, তবে এতে এ ছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই নেই যে, ইউসুফ (আঃ) পলায়রত ছিলেন এবং যুলায়খা তাঁকে পলায়নে বাধা দিতে চাচ্ছিল।

শিশুর বাকশক্তির অলৌকিকতা ছাড়াও এ বিষয়টি প্রত্যেকের

হৃদয়ঙ্গম হতে পারত। অতঃপর যখন বর্ণিত আলামত অনুযায়ী জামাটি পেছন দিকে ছিন্ন দেখা গেল, তখন বাহ্যিক আলামতদ্বয়ে ইউসুফ (আঃ)-এর পবিত্রতা সপ্রমাণ হয়ে গেল।

‘সাক্ষ্যদাতা’র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে, সে ছিল একটি কচি শিশু, যাকে আল্লাহ তাআলা অলৌকিকভাবে বাকশক্তি দান করেন। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে এ ব্যাখ্যা প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে, ইবনে হাব্বান স্বীয় গ্রন্থে এবং হাকিম তাঁর মুত্তাদরাকে এ উল্লেখ করে বর্ণনাটিকে সহীহ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

কতিপয় বিধান ও মাসআলা : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় বিধান ও মাসআলা বোঝা যায় :

মাসআলা : (১) **وَأَسْتَفْتَى الْبَابَ** আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, যে জায়গায় পাশে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সে জায়গাকেই পরিজ্ঞান করা উচিত; যেমন ইউসুফ (আঃ) সেখান থেকে পলায়ন করে এর প্রমাণ দিয়েছেন।

মাসআলা : (২) আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী পালনে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার ক্রটি না করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য; যদিও এর ফলাফল বাহ্যিক বের হতে দেখা না যায়। ফলাফল আল্লাহর হাতে। মানুষের কাজ হল স্বীয় শ্রম ও সাধ্যকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে দাসত্বের পরিচয় দেয়; যেমন ইউসুফ (আঃ) সব দরজা বন্ধ হওয়া এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তালাবন্ধ হওয়া সত্ত্বেও দরজার দিকে দৌড় প্রদানে নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছেন। এহেন অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের আগমন অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা হয়। বন্দা যখন নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে কেনে তখন আল্লাহর সাফল্যের উপকরণাদিও সরবরাহ করেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের শেষ দু'আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আযীযে-মিসর শিশুটির এভাবে কথা বলা দ্বারা ইবোয়ে নিয়েছিলেন যে, ইউসুফ (আঃ)—এর পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্যেই এ অস্বাভাবিক ঘটনা অবতারণা হয়েছে। অতঃপর তা বক্তব্য অনুযায়ী যখন দেখল যে, ইউসুফ (আঃ)-এর জামাটিও পেছন দিক থেকেই ছিন্ন, সে তখন নিশ্চিত হয়ে গেল যে, দোষ যুলায়খার এবং ইউসুফ (আঃ) পবিত্র। তখননারে যে যুলায়খাকে সম্মুখীন করে বলল : **أَتُكْذِبُنِي كَذِبًا** অর্থৎ এসব তোমার ছিলনা। তুমি নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাও। এরপর বলল : নারী জাতির ছিলনা খুবই মারাত্মক। একে বোঝা এবং এর জাল ছিন্ন করা সম্ভব নয়। কেননা, তারা বাহ্যতঃ কোমল, নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে। যার তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথায় দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। কিন্তু বুদ্ধি ও ধর্মভীরুতার অভাববশতঃ তা অধিকাংশ সময় ছিলনা হয় থাকে।—(মাহযারী)

তফসীর কুরতুবীতে আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এ উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, নারীদের ছিলনা ও চক্রান্ত শয়তানের ছিলনা ও চক্রান্তের চাইতে গুরুতর। কেননা, আল্লাহ তাআলা শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে বলেছেন **إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا** “শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল”। পক্ষান্তরে নারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে : **كَيْدُ الْمَرْءِ كَيْدُ عَظِيمٍ** অর্থৎ, তোমাদের চক্রান্ত খুবই জটিল। এটা জানা কথা যে, এখার সব নারী বোঝানো হয়নি, বরং এসব নারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা ধরনের হল-চাতুরীতে লিপ্ত থাকে। আযীযে-মিসর যুলায়খার ভুল কর্ম

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَرِّمًا
وَأُتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا
رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا
إِن هَذَا إِلَّا الْمَلَكُ كَرِيمٌ ۝ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَوْ
لَقَدْ رَأَوْنَهُ عَنِ نُفُوسِهِمْ فُلَسَفُوهَ ۖ فِئْتَنَ ۖ وَلَكِنَّ لَّيْسَ لَهُمْ شَأْنًا
لِّسَجَنَةٍ وَكَذِبًا مِّنَ الظَّالِمِينَ ۝ قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ
إِلَىَّ وَمَا كُنْتُ بِالْبَاسِ وَأَلَّا تَعْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصَبُ
أَلَيْسَ هُنَّ إِلهٌ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ
الَّذِينَ يُسَجِّنُهُ حَتَّىٰ جَاءَهُ ۖ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّنَ ۖ قَالَ
أَحَدُ مَا لِيَ أَرْبَعٌ أَصْحَابُ خُمْرٍ ۖ وَقَالَ الْآخَرُ لَئِنْ لَّمْ يَجْعَلْ فُوقَ
رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْمَنَةَ يَتَذَكَّرُ لِمَا بُوذِلَ ۖ إِنَّا أَنَا وَرَدُّكَ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِ إِلَّا تَبَاكُمَا
بِتَأْوِيلِهِ ۖ قَالَ أَنِ إِنَّا لَنَبُذُّكُمَا فِي الْيَمِّ وَلَكُمَا مَعَكُمْ رَقَبٌ ۖ ثُمَّ
مَلَكَ قَوْمٌ لَّا يُلَاقُونَكَ بِاللَّيْلِ وَهُمْ بِالْأُخْرَىٰ قَوْمٌ لَّا يَرْكَنُونَ ۝

(৩১) যখন সে তাদের চক্রান্ত শুনল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্যে একটি ভোজসভার আয়োজন করল। সে তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিয়ে বলল : ইউসুফ এদের সামনে লে এস। যখন তারা তাকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেলল। তারা বলল : কখনই নয়—এ ব্যক্তি মানব নয়। এ তো কোন মহান ফেরেশতা। (৩২) মহিলা বলল : এ ঐ ব্যক্তি, যার জন্যে তোমরা আমাকে ভৎসনা করছিলে। আমি ওরই মন জয় করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে। আর আমি যা আদেশ দেই, সে যদি তা না করে, তবে অবশ্যই সে কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাক্ষিত হবে। (৩৩) ইউসুফ বলল : হে পালনকর্তা, তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং ভজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৩৪) অতঃপর তার পালনকর্তা তার দোয়া কবুল করে নিলেন। অতঃপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (৩৫) অতঃপর এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাকে কিছুদিন কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করল। (৩৬) তাঁর সাথে কারাগারে দুজন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল : আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিভড়াছি। অপরজন বলল : আমি দেখলাম যে, নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। তা থেকে পাখী ঝুকিয়ে যাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলুন। আমরা আপনাকে সংকম্পশীল দেখতে পাচ্ছি। (৩৭) তিনি বললেন : তোমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য দেয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দেব। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি ঐসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী।

করার পর ইউসুফ (আঃ)-কে বলল : اَوْسَعْتَ اَعْرَضَ عَنْ هَذَا ۖ অর্থাৎ, ইউসুফ, এ ঘটনাকে উপেক্ষা কর এবং বলাবলি করো-না, যাতে বেইজ্ঞতি না হয়। অতঃপর যুলায়খাকে সম্মোহন করে বলল : وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ অর্থাৎ, ভুল তোমারই। তুমি নিজে ভুলের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এতে বাহ্যতঃ বোঝানো হয়েছে যে, স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে ক্ষমা চাও। কারণ, নিজে অন্যায় করেছ এবং দোষ তাঁর ঘাড় চাপিয়েছ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় :

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ অর্থাৎ, যখন যুলায়খা উক্ত মহিলাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারল, তখন তাদেরকে একটি ভোজসভায় ডেকে পাঠাল।

এখানে মহিলাদের কানায়ুসাকে যুলায়খা مَكْر অর্থাৎ, চক্রান্ত বলেছে। অথচ বাহ্যতঃ তারা কোন চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে গোপনে কুৎসা রটনা করত, তাই একে চক্রান্ত বলা হয়েছে।

وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَرِّمًا অর্থাৎ, তাদের জন্যে তাকিয়াযুক্ত আসন সজ্জিত করল।

وَأُتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا অর্থাৎ যখন মহিলারা ভোজসভায় উপস্থিত হল, তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করা হল। তন্মধ্যে কিছু খাদ্য চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার ছিল। তাই প্রত্যেককে এক একটি চাকুও দেয়া হল। এর বাহ্যিক উদ্দেশ্য তো ছিল ফল কাটা; কিন্তু মনে অন্য ইচ্ছা লুকায়িত ছিল, যা পরে বর্ণিত হবে। অর্থাৎ আগত মহিলারা ইউসুফ (আঃ)-কে দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে এবং চাকু দিয়ে ফলের পরিবর্তে নিজ নিজ হাত কেটে ফেলবে।

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ অর্থাৎ, এসব আয়োজন সমাপ্ত করার পর অন্য এক কক্ষে অবস্থানরত ইউসুফ (আঃ)-কে যুলায়খা বলল : একটু বের হয়ে এস। ইউসুফ (আঃ) তার কু-উদ্দেশ্য জানতেন না। তাই বাইরে এসে ভোজসভায় উপস্থিত হলেন।

فَكَرِهَتْهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا
إِن هَذَا إِلَّا الْمَلَكُ كَرِيمٌ

অর্থাৎ, সমাগত মহিলারা ইউসুফ (আঃ)-কে দেখল, তখন তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হয়ে গেল এবং নিজ নিজ হাত কেটে ফেলল। অর্থাৎ ফল কাটার সময় যখন এ বিস্ময়কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হল, তখন চাকু হাতেই লেগে গেল। অন্যমনস্কতার সময় প্রায়ই এরূপ হয়ে থাকে। তারা বলতে লাগল : হায় আল্লাহ, এ ব্যক্তি কখনই মানব নয়। সে তো মহানুভব ফেরেশতা। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতারাই এরূপ নূরানী চেহারাযুক্ত হতে পারে।

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَأَوْنَهُ عَنِ نُفُوسِهِ

فَاسْتَصْعَمُوا وَلَكِنْ كَرِهْتَ لِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَلَكِنْ كَرِهْتَ لِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

যুলায়খা বলল : দেখে নাও, এ ঐ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ভৎসনা করতে। বাস্তবিকই আমি তার কাছে নিজেই সমর্পন করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সে নিশাপ রয়ছে। ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন না করলে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাক্ষিত হবে।

যুলায়খা যখন দেখল যে, সমাগত মহিলাদের সামনে তার গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে গেছে, তখন সে তাদের সামনেই ইউসুফ (আঃ)-কে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। কোন কোন তফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, তখন আমন্ত্রিত মহিলারা ইউসুফ (আঃ)-কে বলতে লাগল : তুমি যুলায়খার কাছে ঋণী। কাজেই তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়।

পরবর্তী আয়াতের কোন কোন শব্দ দ্বারাও মহিলাদের উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়; যেমন يَدْعُوْنِيْ (এবং كَيْدُهُنَّ) এগুলোতে বহু বচনে কয়েক জনের কথা বলা হয়েছে।

ইউসুফ (আঃ) দেখলেন যে, সমবেত মহিলারাও যুলায়খার সুরে সুর মিলিয়েছে এবং তাকে সমর্পন করছে। কাজেই তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার বাহ্যিক কোন উপায় নেই। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে প্রত্যাভর্তন করলেন এবং তাঁর দরবারে আরখ করলেন :

رَبِّ السَّجِيْنِ اَحَبُّ اِلَيَّ وَمَيَّادِ عُوْنِيْ اِلَيْهِ وَاَلَا تَصْرُفُ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبَحْتُ اَلْيَوْمَ وَاَكُنُّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা! এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করছে, এর চাইতে জেলখানায়ই আমার অধিক পছন্দনীয়। যদি আপনি আমা থেকে ওদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তবে সম্ভবতঃ আমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেলব। ‘আমি জেলখানা পছন্দ করি’—ইউসুফ (আঃ)—এর এ উক্তি বন্দীজীবন প্রার্থনা বা কাম্য নয়; বরং পাপকাজের বিপরীতে এই পার্থিব বিপদকে সহজ মনে করার বহিঃপ্রকাশ। কোন কোন রেওয়াজেতে বলা হয়েছে : যখন ইউসুফ (আঃ) জেলে প্রেরিত হলেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসল, আপনি নিজেকে জেলে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ, আপনি বলেছিলেন السَّجِيْنُ اَحَبُّ (অর্থাৎ, এর চাইতে আমি জেলখানাকে অধিক পছন্দ করি।

আপনি নিরাপত্তা চাইলে আপনাকে পুরোপুরি নিরাপত্তা দান করা হতো। এ থেকে বোঝা গেল যে, কোন বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্যে দোয়ায় ‘এর চাইতে অমুক ছোট বিপদে পতিত করা আমি ভাল মনে করি, বলা সমীচীন নয়; বরং প্রত্যেক বিপদাপদের সময় আল্লাহর কাছে নিরাপত্তাই প্রার্থনা করা উচিত। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে সবরের দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, সবরের অর্থ হচ্ছে বিপদাপদে পতিত হওয়ার পর তা সহ্য করার ক্ষমতা। কাজেই আল্লাহর কাছে সবরের দোয়া করার পরিবর্তে নিরাপত্তার দোয়া করা উচিত।—(তিরমিযী)

‘যদি আপনি ওদের চক্রান্তকে প্রতিহত না করেন তবে সম্ভবতঃ আমি ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ব’—ইউসুফ (আঃ)—এর একথা বলা নবুওয়তের জন্যে যে পবিত্রতা জরুরী, তার পরিপন্থী নয়। কারণ, এ পবিত্রতার

সারমর্মই হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে গোনাই থেকে বাঁচিয়ে নেবেন। যদিও নবুওয়তের কারণে লক্ষ্য পূর্ব থেকেই অর্জিত ছিল, তথাপি শিষ্টাচার প্রসূত চূড়ান্ত ভীতির কারণে এরূপ দোয়া করতে বাধ্য হয়েছেন। এ থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলার সাহায্য ব্যতিরেকে কোনব্যক্তির গোনাই থেকে বাঁচতে পারে না। আরও জানা গেল যে, প্রত্যেক গোনাহর কাজ মুখ্যতাবশতঃ হয়ে থাকে। জ্ঞান মানুষকে গোনাহর কাজ থেকে বিরত রাখে।—(কুরতুবী)

وَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْوَلِيْمُ

অর্থাৎ তাঁর পালনকর্তা দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্তকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রোতা ও জ্ঞানী।

আল্লাহ তাআলা মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফ (আঃ)-কে বাঁচানোর জন্যে একটি ব্যবস্থা করলেন ইউসুফ (আঃ)-এর সফুরিত্ব, খোদাভীতি ও পবিত্রতার সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী দেখে আযীযে-মিসর ও তার বন্ধুদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ইউসুফ সৎ। কিন্তু শহরময় এ বিষয়ের কানা-ঘুসা হতে থাকে। এ কানা-ঘুসার অবসান করার জন্যে এটাই উত্তম পথ বিবেচিত হল যে, ইউসুফ (আঃ)-কে কিছুদিনের জন্যে জেলে আবদ্ধ রাখাই সমীচীন হবে। এ দ্বারা নিজের ঘরও রক্ষা পাবে এক জনগণের মধ্যেও এ বিষয়ের আলোচনা স্তিমিত হয়ে পড়বে।

ثُمَّ رَدَّاهُمُوْنَ بِوَدَّارٍ اَوْ اَلَيْسَ جِنَّةً حَقِّيْ

এর পর আযীয ও তাঁর পারিষদবর্গ কিছু দিনের জন্যে ইউসুফ (আঃ)-কে জেলে আবদ্ধ রাখাটাই মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করলেন এবং সেমতে ইউসুফ (আঃ) জেলে প্রেরিত হলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীর একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একথা বার বার বলা হয়েছে যে, কোরআন-পার কোন ঐতিহাসিক ও কিসসা-কাহিনীর গ্রন্থ নয়। এতে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা, উপদেশ ও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করা। সমগ্র কোরআন এবং অসংখ্য পয়গম্বরের ঘটনাবলীর মধ্যে একমাত্র ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীটিই কোরআন ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছে। নতুবা স্থানোপযোগী ঐতিহাসিক ঘটনার কোন অত্যাবশ্যকীয় অংশই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীটি আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করলে এতে শিক্ষা ও উপদেশের অনেক উপাদান এবং মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। প্রাসঙ্গিক এ ঘটনাটিতেও অনেক হেদায়েত নিহিত রয়েছে।

ঘটনা এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর নিশাপ চরিত্র ও পবিত্রতা দিবালোকের মত ফুটে উঠা সত্ত্বেও আযীযে-মিসর ও তার শত্রু লোক-নিন্দা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্যে ইউসুফ (আঃ)-কে কারাগারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা প্রকৃতপক্ষে ইউসুফ (আঃ)-এর দোয়া ও বাসনার বাস্তব রূপায়ন ছিল। কেননা, আযীযে-মিসরের গৃহে থাকে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইউসুফ (আঃ) কারাগারে পৌঁছেলে সাথে আরও দু’জন অভিজ্ঞ

ফররীও কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বাদশাহকে মদ্যপান করাও এবং অপরজন বাবুচি ছিল। ইবনে-কাসীর তফসীরবিদগণের বরাতে দিয়ে লিখেছেন : তারা উভয়েই বাদশাহর খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার নিয়োগে প্রেরিত হয়েছিল। মোকাদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল।

হুইস্ক (আঃ) কারাগারে প্রবেশ করে পয়গমুরুল্লাহ চরিত্র, দয়া ও অনুগ্রহের কারণে সব কয়েদীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং সাধ্যমত জামে দেখাশোনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন। কাউকে চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখলে তাকে সামান্য দিতেন। ঐশ্বর্য নিকা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। নিজে কষ্ট করে অন্যের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং সারারাত আল্লাহর এবাদতে মগ্ন থাকতেন। তাঁর এহেন অবস্থা দেখে কারাগারের সব কয়েদী তাঁর ডাক্ত হয়ে গেল। কারাধ্যক্ষও তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হল এবং বলল : আমার কক্ষা থাকলে আপনাকে ছেড়ে দিতাম। এখানে যাতে আপনার কোনরূপ কষ্ট না হয়, এখন শুধু সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে পারি।

ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে কারাগারে প্রবেশকারী দু'জন কয়েদী
একদিন বলল ও আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহানুভব ব্যক্তি।
তাই আপনার কাছে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে চাই। হয়রত
ইবনে-আব্বাস ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন : তারা বাস্তবিকই এ স্বপ্ন
দেখছিল। আবদুল্লাহ ইবনে-মাসউদ বলেন : প্রকৃত স্বপ্ন ছিল না। শুধু
ইউসুফ (আঃ)-এর মহানুভবতা ও সততা পরীক্ষা করার উদ্দেশে স্বপ্ন
রচনা করা হয়েছিল।

মোটকথা, তাদের একজন, অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাত, সে বলল : আমি স্বপ্নে দেখি যে, আঙ্গুল থেকে শরাব বের করছি। দ্বিতীয় জন অর্থাৎ বাবুড়ি বলল : আমি দেখি যে, আমার মাথায় রুটিভর্তি একটি খুঁটি রয়েছে। তা থেকে পাখীরা ঠুকরে ঠুকরে আহার করছে। তারা উভয় স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানাল।

ইউসুফ (আঃ)-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে; কিন্তু তিনি গদ্যময়রসূলত ভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তর দানের পূর্বে ঈমানের দাওয়াত ও বর্ধাচারের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। প্রচারের মূলনীতি অনুযায়ী প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিগতাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি মু'জ্জেযা উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্যে প্রত্যহ যে খাদ্য তোমাদের বাসা থেকে কিংবা অন্য কোন জায়গা থেকে আসে, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে খাদ্যের প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে বলে দেই। বাস্তবে আমার সরবরাহকৃত তথ্য সব সত্য হয়।

ذِكْرُكُمْ أَتَىٰ عَلَىٰ الْغَايَةِ ۚ أَرَأَيْتُمْ أَصْحَابَ الْأَنْبِيَاءِ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِوْا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ۚ

অর্থাৎ, এটা কোন ভবিষ্যৎ কখন, জ্যোতিষ বিদ্যা অথবা অতীন্দ্রিয়বাদের ভেলকি নয় ; বরং আমার পালনকর্তা ওহীর

মাধ্যমে আমাকে যা বলে দেন, আমি তাই তোমাদেরকে জানিয়ে দেই। নিঃসন্দেহে এ প্রকাশ্য মু'জ্জেযাতি নবুওয়তের প্রমাণ এবং আস্থার অনেক বড় কারণ। এরপর প্রথমে কুফরের নিন্দা এবং কাকফরদের ধর্মের প্রতি স্বীয় বিমুখতা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আরও বলেছেন যে, আমি নবী পরিবারেরই একজন এবং তাদেরই সত্য ধর্মের অনুসারী। আমার পিতৃপুরুষ হচ্ছেন ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব। এ বংশগত আভিজাত্যও স্বভাবতঃ মানুষের আস্থা অর্জনে সহায়ক হয়। এরপর বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে খোদারী গুণাবলীতে অশ্লীলার মনে করা আমাদের জন্যে মোটেই বৈধ নয়। এ সত্য ধর্মের তওফীক আমাদের প্রতি এবং সব লোকের প্রতি আল্লাহ তাআলারই অনুগ্রহ। তিনি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দান করে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। কিন্তু অনেক লোক এ নেয়ামতের কদর ও অনুগ্রহ স্বীকার করে না। অতঃপর তিনি কয়েন্দীদেরকেই প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা তোমরাই বল, অনেক পালনকর্তার উপাসক হওয়া উত্তম, না এক আল্লাহুর দাস হওয়া ভাল, যিনি সবার উপরে পরাক্রমশালী? অতঃপর অন্য এক পন্থায় মূর্তিপূজার অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করে বললেন : তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা কিছুসংখ্যক প্রতিমাকে পালনকর্তা মনে করে নিয়েছ। এরা শুধু নামসর্বস্বই, অথচ এদেরকেই তোমরা মা'বুদ সাব্যস্ত করে নিয়েছ। গুদের মধ্যে এমন কোন সত্যগত গুণ নেই যে, গুদেরকে সামান্যতম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করা যেতে পারে। কারণ, গুরা সবাই চেতনা ও অনুভূতিহীন। এটা চাক্ষুষ বিষয়। গুদের সত্য উপাস্য হওয়ার অপর একটি উপায় ছিল এই যে, আল্লাহ তাআলা গুদের আরাধনার জন্যে নির্দেশ নাযিল করতেন। এমতাবস্থায় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বিবেকবুদ্ধি যদিও গুদের খোদারী স্বীকার না করত, কিন্তু আল্লাহুর নির্দেশের কারণে আমরা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে ছেড়ে আল্লাহুর নির্দেশ পালন করতাম। কিন্তু এখানে এরূপ কোন নির্দেশও নেই। কেননা, আল্লাহ তাআলা এসব কৃত্রিম উপাস্যের এবাদতের জন্যে কোন প্রমাণ কিংবা সনদও নাযিল করেননি। বরং তিনি এ কথাই বলেছেন যে, নির্দেশ ও শাসনক্ষমতার অধিকার আল্লাহ ব্যতীত আর কারও নেই। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কারও এবাদত করো না। আমার পিতৃপুরুষেরা এ সত্য ধর্মই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন ; কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য জানে না।

প্রচার ও দাওয়াত সমাপ্ত করার পর ইউসুফ (আঃ) কয়েদীদের স্বপ্নের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং বললেন : তোমাদের একজন তো মুক্তি পাবে এবং চাকরীতে পুনর্বহাল হয়ে বাদশাহকে মদ্যপান করাবে। অপর জনের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে শূলে চড়ানো হবে। পাখীরা তার মাথার মগজ ঠুকরে খাবে।

وَاتَّبَعَتْ مَلَكَةَ الْبَاءِ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَاسْتَحْيَىٰ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ
لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا
وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ لِصَاحِبِ
السِّجْنِ ۝ أَرَأَيْتَ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَتَيَبُّوهُمَا أَنْتُمْ وَ
آبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ
أَمَّا الْأَعْمَىٰ وَالْأَكْرَايَةُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ لِصَاحِبِ السِّجْنِ ۝ أَمَا أَحَدُكُمْ
فَيَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ خَيْرًا ۝ أَمَا الْآخَرُ يُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ
مِنْ رَأْسِهِ فَفِي الْأَمْرِ الَّذِي فِيهِ سَتَقْتَبِلِينَ ۝ وَقَالَ
لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَّه
الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَمَّا فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۝
وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ
سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُودَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَسْبَغُ يَأْكُلُهُنَّ
الْمَلَائِكَةُ فِي رُؤْيَايَ إِنَّ كُنْهُنَّ لَمُرَوِّاتٌ ۝

(৩৮) আমি আপন পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের খবর অনুসরণ করছি। আমাদের জন্য শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহর অশৌদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না। (৩৯) হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? (৪০) তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের এবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা স্যাব্যস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য করণ এবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (৪১) হে কারাগারের সঙ্গীরা! তোমাদের একজন আপন প্রভুকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শুলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পানী আহার করবে। তোমরা যে বিষয়ে জানার আগ্রহী তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। (৪২) যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল : আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে। অতঃপর শয়তান তাকে প্রভুর কাছে আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হল। (৪৩) বাদশাহ বলল : আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী—এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক। হে পারিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা পারদর্শী হয়ে থাক।

পয়গম্বরসুলভ অনুকম্পার অভিনব দৃষ্টান্ত : ইবনে-কাসীর বলেন : উভয় কয়েদীর স্বপ্ন পৃথক পৃথক ছিল। প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট ছিল এবং এটাও নির্দিষ্ট ছিল যে, যে ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাত, সে মুক্ত হয়ে চাকুরীতে পুনর্বহাল হবে এবং বাবুর্চিকে শুলে চড়ানো হবে। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) পয়গম্বরসুলভ অনুকম্পার কারণে নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, তোমাদের অমুককে শুলে চড়ানো হবে—যাতে সে এখন থেকেই চিন্তামুক্ত না হয়ে পড়ে। বরং তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, একজন মুক্তি পাবে এক অপরজনকে শুলে চড়ানো হবে।

সবশেষে বলেছেন : আমি তোমাদের স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তা নিছক অনুমানভিত্তিক নয় : বরং এটাই আল্লাহর আটল ফয়সালা। যেসব তফসীরবিদ তাদের স্বপ্নকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলেছেন, তাঁরা একথাও বলেছেন যে, ইউসুফ (আঃ) যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন, তখন তারা উভয়েই বলে উঠল : আমরা কোন স্বপ্নই দেখিনি, বরং মিছামিছি বানিয়ে বলেছিলাম। তখন ইউসুফ (আঃ) বললেন : **فِي الْأَمْرِ الَّذِي فِيهِ سَتَقْتَبِلِينَ** তোমরা এ স্বপ্ন দেখে থাক বা না থাক, এখন বাস্তবে তাই হবে, যা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মিথ্যা স্বপ্ন তৈরী করার যে গোনাহ করেছ এখন তার শাস্তি তা'ই, যা ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে রেহাই পাবে, তাকে ইউসুফ (আঃ) বললেন : যখন ভূমি মুক্ত হয়ে কারাগারের বাইরে যাবে এবং শাহী দরবারে পৌঁছবে, তখন বাদশাহর কাছে আমার বিষয়েও আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে পড়ে রয়েছে। কিন্তু মুক্ত হয়ে লোকটি ইউসুফ (আঃ)—এর কথা ভুলে গেল। ফলে ইউসুফ (আঃ)—এর মুক্তি আরও বিলম্বিত হয়ে গেল এবং এ ঘটনার পর আরও কয়েক বছর তাঁকে কারাগারে কাটাতে হল। আয়াতে **بِضْعَ سِنِينَ** বলা হয়েছে। শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বোঝায়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এ ঘটনার পর আরও সাত বছর তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে।

قَالُوا أَضَلُّنَا أَهْلَكُمُ وَمَا نَكُنُ بِأَنْبِيَاءٍ إِلَيْكُمْ يُغْلِبُونَ
وَقَالَ الَّذِي نَجَّاهُمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَا أَنَبِيُّكُمْ وَمَا تَكُونُونَ
فَأَرْسَلُونَا يُوسُفَ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَانِي فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ
وَسِتِّينَ يَأْكُلْنَ سَبْعِ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضَرٍ وَأُخَرَ
يَبْسُطُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ رَزَقُونِي
سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُونِي فِي سَبِيلِهِ الْأَقْلِيلَ
مِمَّا نَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا
قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ الْأَوْفَى لِكُلِّ عِشْقُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
عَامٌ وَفِيهِ يَجْعَلُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِشُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ الْتَمَزْنَا
بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلِّمْ مَا بَالُ
الْيَسْوَءِ الَّذِي قَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ
قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَوْنِي يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ
رَبُّكَ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْفَزَّازِ الْتَمَّصْ
الْحَقُّ أَنَا رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصِّدِّيقِينَ ذَلِكَ لِيُعَلِّمَ
الْعَالِمَ أَنَّ أَخَاهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ لِلَّهِ الْيَمِينَ يَكِيدُ الْعَالَمِينَ

(৪৪) তারা বলল : এটা কল্পনামূলক স্বপ্ন। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জ্ঞান নেই। (৪৫) দু' জন কারাকন্ডের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর স্মরণ হলো, সে বলল, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলছি। তোমরা আমাকে শ্রবণ কর। (৪৬) সে তথ্যই পৌঁছে বলল : হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাজ্জা গাভী—তাদেরকে খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক, আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে পথনির্দেশ প্রদান করুন : যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অবগত করতে পারি। (৪৭) বলল : তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কাটবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ সমেত রেখে দেবে। (৪৮) এবং এরপরে আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর; তোমরা এ দিনের জন্য যা রেখেছিল, তা খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তুলে রাখবে। (৪৯) এরপরেই আসবে একবছর — এতে মানুষের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং এতে তারা রস নিশ্চিন্তাবে। (৫০) বাদশাহ বলল : ফিরে যাও তোমাদের প্রভুর কাছে এবং জিজ্ঞাস কর তাঁকে : এ মহিয়ার স্বরূপ কি, যারা স্বীয় হস্ত কর্তন করেছিল। আমার পালনকর্তা তো তাদের হলনা সবই জানেন। (৫১) বাদশাহ মহিলাদেরকে বললেন : তোমাদের হল-হাকিকত কি, যখন তোমরা ইউসুফকে আত্মসংবরণ থেকে ফুলিয়েছিলে? তারা বলল : আল্লাহ্ মহান, আমরা তার সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি না। আখীয-পত্নি বলল : এখন সত্য কথা প্রকাশ হয়ে গেছে। আমিই তাকে আত্মসংবরণ থেকে ফুলিয়েছিলাম এবং সে সত্যবাদী। (৫২) ইউসুফ বললেন : এটা এজন্ম, যাতে আখীয জেনে নেয় যে, আমি গোপনে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আরও এই যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে এগুতে দেন না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-এর মুক্তির জন্যে অদৃশ যবনিকার অন্তরাল থেকে একটি উপায় সৃষ্টি করলেন। বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখে উদ্বেগাকুল হলেন এবং রাজ্যের জ্ঞানী ব্যাখ্যা ও অতীন্দ্রিয়-বাদীদেরকে একত্রিত করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাস করলেন। স্বপ্নটি কারও বোধগম্য হল না। তাই সবাই উত্তর দিল :

أَضَلُّنَا أَهْلَكُمُ وَمَا نَكُنُ بِأَنْبِيَاءٍ إِلَيْكُمْ এখানে 'اضلنا' শব্দটি ضل্ট এর বহুবচন। এর অর্থ এমন গুঁলী, যাতে বিভিন্ন প্রকার আবর্জনা ও ঘাসখড় জমা থাকে। অর্থ এই যে, এ স্বপ্নটি মিশ্র ধরনের। এতে কল্পনা ইত্যাদি शामिल রয়েছে। আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না। সঠিক স্বপ্ন হলে ব্যাখ্যা দিতে পারতাম।

এ ঘটনা দেখে দীর্ঘকাল পর ইউসুফ (আঃ)-এর কথা মুক্তিপ্রাপ্ত সেই কয়েদীর মনে পড়ল। সে অগ্রসর হয়ে বলল : আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারব। তখন সে ইউসুফ (আঃ)-এর গুণাবলী, স্বপ্ন ব্যাখ্যা পারদর্শিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করে অনুরোধ করল যে, তাকে কারাগারে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হোক। বাদশাহ এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন এবং সে ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হল। কোরআন-পাক এসব ঘটনা একটিমাত্র শব্দ

فَأَرْسَلُونَا দ্বারা বর্ণনা করেছে। এর অর্থ আমাকে পাঠিয়ে দিন। ইউসুফ (আঃ)-এর নামোল্লেখ, সরকারী মঞ্জুরী অতঃপর কারাগারে পৌঁছা এসব ঘটনা আপনা আপনি বোঝা যায়। তাই এগুলো পরিষ্কার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করা হয়নি; বরং এ বর্ণনা শুরু করা হয়েছে :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ অর্থাৎ, লোকটি কারাগারে পৌঁছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে ইউসুফ (আঃ)-এর صديق অর্থাৎ কথা ও কাজে সাক্ষা হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। অতঃপর দরখাস্ত করেছে যে, আমাকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। স্বপ্ন এই যে, বাদশাহ সাতটি মোটাজ্জা গাভী দেখেছেন। এগুলোকেই অন্য সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও সাতটি গমের সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ দেখেছেন।

لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ অর্থাৎ, আপনি ব্যাখ্যা বলে দিলে অচিরে আমি ফিরে যাব এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা বর্ণনা করব। এতে সম্ভবতঃ তারা আপনার জ্ঞান-গরিমা সম্পর্কে অবগত হবে।

তফসীরে-মায়হারীতে বলা হয়েছে, 'আলমে-মিসালা' তথা প্রত্যাকৃতি-জগতে ঘটনাবলী যে আকারে থাকে, স্বপ্নে তাই দৃষ্টিগোচর হয়। এ জগতের প্রত্যাকৃতিসমূহের বিশেষ অর্থ আছে। স্বপ্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্র পুরোপুরিই এসব অর্থ জানার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-কে এ শাস্ত্র পুরোপুরি শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি স্বপ্নের বিবরণ শুনে বোঝে নিলেন যে, সাতটি মোটাজ্জা গাভী ও সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর ফলনসম্পন্ন সাত বছর। কেননা, মৃত্তিকা চাষায় ও ফসল ফলানোর কাজে গাভীর বিশেষ ভূমিকা থাকে। এমনভাবে সাতটি শীর্ণ গাভী ও সাতটি শুষ্ক শীষের অর্থ হচ্ছে, প্রথম সাতটি গাভীকে খেয়ে ফেলার অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী সাত বছরে খাদ্যশস্যের যে ভান্ডার সঞ্চিত থাকবে, তা সবই দুর্ভিক্ষের সাত বছর নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুষ্ক বীজের জন্যে কিছু খাদ্যশস্য বেঁচে যাবে।

বাদশাহর স্বপ্নে বাহ্যতঃ এতটুকুই ছিল যে, সাত বছর ভাল ফলন হবে, এরপর সাত বছর দুর্ভিক্ষ হবে। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) আরও কিছু বাড়িয়ে বললেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এক বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। এ বিষয়টি ইউসুফ (আঃ) এভাবে জানতে পারেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর যখন সর্বমোট সাতটি, তখন আল্লাহর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অষ্টম বছর বৃষ্টিপাত ও উৎপাদন হবে। হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আঃ) কে এ বিষয়ে জ্ঞাত করিয়েছিলেন, যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু সংবাদ তারা লাভ করে, তাঁর জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ পায় এবং তাঁর মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। তদুপরি ইউসুফ (আঃ) শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি ; বরং এর সাথে একটি বিজ্ঞজ্ঞানোচিত ও সহনুভূতিমূলক পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, প্রথম সাত বছরে সে অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবেন, তা গমের শীষের মধ্যেই সংরক্ষিত রাখতে হবে — যাতে পুরানো হওয়ার পর গমে পোকা না লাগে — অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, শস্য যতদিন শীষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোকা লাগে না।

ثُمَّ يَكُونُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ مِنْهُمُ الْهُنُ অর্থাৎ, প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ খরা ও দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে এবং পূর্ব-সঞ্চিত শস্য ভান্ডার খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, শীর্ণ ও দুর্বল গাভীগুলো মোটাতাজা ও শক্তিশালী গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলছে। তাই ব্যাখ্যায় এর সাথে মিল রেখে বলেছেন যে, দুর্ভিক্ষের বছরগুলো পূর্ববর্তী বছরগুলোর সঞ্চিত শস্য ভান্ডার খেয়ে ফেলবে ; যদিও বছর এমন কোন বস্তু নয়, যা কোনকিছুকে ভক্ষণ করতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও জীব-জন্তুতে দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে পূর্ব-সঞ্চিত শস্য ভান্ডার খেয়ে ফেলবে।

কাহিনীর গতিধারা দেখে বোঝা যায় যে, এ ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে এসেছে এবং বাদশাহকে তা অবহিত করেছে। বাদশাহ বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চিন্ত ও ইউসুফ (আঃ) এর গুণ গরিমায় মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কোরআন পাক এসব বিষয় উল্লেখ করা দরকার মনে করেনি। কারণ, এগুলো আপনা থেকেই বোঝা যায়। পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

وَالْمَلِكُ الْيُوزُفُ অর্থাৎ, বাদশাহ আদেশ দিলেন যে, ইউসুফ

(আঃ) কে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এস। অতঃপর বাদশাহর জনৈক দূত এ বার্তা নিয়ে কারাগারে পৌঁছল।

ইউসুফ (আঃ) দীর্ঘ বন্দীজীবনের দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশাহর প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরগণকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তা অন্যের পক্ষে অনুশ্রাবন করাও সম্ভব নয়।

তিনি দূতকে উত্তর দিলেন :

قَالَ اسْعَى إِلَى رَبِّكَ فَعَلَهُ مَا بَالَ الْإِسْوَةِ الْوَيْ قَطْعَنَ أَيُّدِيَهُنَّ
إِنَّ رَبِّي يَكِيدُ هُنَّ عَلِيمٌ

অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) দূতকে বললেন : তুমি বাদশাহর কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস কর যে, আপনার মতে এ মহিলাদের ব্যাপারটি কিরূপ, যারা হাত কেটে ফেলেছিল? বাদশাহ এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করেন কি না এবং আমাকে দোষী মনে করেন কি না?

এখানে এ বিষয়টিও প্রনিধানযোগ্য যে, ইউসুফ (আঃ) এখানে হস্তকর্তনকারিণী মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন, আযীয-পত্নীর নাম উল্লেখ করেননি ; অথচ সেই ছিল ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। বলাবাহুল্য, এতে ঐ নমিকের কদর করা হয়েছে, যা ইউসুফ (আঃ) আযীযের গৃহে লালিত পালিত হয়ে খেয়েছিলেন। প্রকৃত ভদ্র স্বভাবের লোকেরা স্বভাবতই এরূপ নিমকহালানী করার চেষ্টা করে থাকেন।—(ফুরতুবী)

আরেক কারণ এই যে, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। এ মহিলাদের মাধ্যমেও এ উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারত এবং এতে তাদেরও তেমন কোন অপমান ছিল না। তারা সত্য কথা স্বীকার করলে শুধু পরামর্শ দানের দোষ তাদের ঘাড়ের চাপত। আযীয-পত্নীর অবস্থা এরূপ ছিল না। সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে তাকে যিরেই তদন্তকার্য অনুষ্ঠিত হত। ফলে তার অপমান বেশী হত। ইউসুফ (আঃ) সাথে সাথে আরও বললেন : إِنَّ رَبِّي يَكِيدُ هُنَّ عَلِيمٌ অর্থাৎ, আমার পালনকর্তা তো তাদের মিথ্যা ও ছল-চাতুরী অবহিতই রয়েছেন। আমি চাই যে, বাদশাহও বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবগত হোন। এ বাক্যে সুস্থ ভঙ্গিতে নিজের পবিত্রতাও বর্ণিত হয়েছে।

وَمَا أَرَىٰ نَفْسِي إِلَّا النَّفْسَ لَمَّامَةً بِالسُّوءِ إِلَّا
 مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِي
 بِهِ اسْتِخْلَافًا لِّنَفْسِي قُلْنَا كَذَبُكَ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا
 مَكِينٌ ۝ أَمِينٌ ۝ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ
 عَلِيمٌ ۝ وَكَذَلِكَ سَكَنَّا لُؤْلُؤًا فِي الْأَرْضِ تَبَيَّنُوا مِنْهُ مَخْلُوعٌ
 يَشَاءُ نَصِيبُهُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ تَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝
 وَاجْعَلْ لِّلْآخِرَةِ خَيْرًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ وَجَاءَ
 إِخْوَةَ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُتْرِكُونَ ۝
 لَمَّا جَاءَهُمْ بِجَاهِهِمْ قَالَ أَتُؤْتِي بِآخِرٍ لَّكُمْ مِنْ أَمْرِ الْأَ
 تْرُونَ إِنِّي أَنَا الْكَلِيلُ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝ قَالُوا تَأْتِي
 بِهِ فَلَا كَيْلَ لَّكُمْ عِنْدِي وَلَا أَقْرَبُونَ ۝ قَالُوا سَوَاءٌ دُعَاؤُهُ
 أَبَاهُ وَإِنَّا لَنَعْلَمُونَ ۝ وَقَالَ لِفَتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَهُمْ فِي
 رِحَالِهِمْ لَعَلَّكُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْتَبَهَوْا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّكُمْ
 يَرْجِعُونَ ۝ فَلَمَّا جَعَلُوا إِلَىٰ أَيْمُونِهِم قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمْنَا
 الْكَيْلَ فَأَرْسَلْنَا مَعَنَا خَافَانًا يَكْتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَخَفِظُونَ ۝

(৩০) আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মধর্মবশ
 সে নয়—আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার
 পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৪৪) বাদশাহ বলল : তাকে আমার কাছে
 নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের বিশুভ সহচর করে রাখব। অতঃপর যখন
 তার সাথে মতবিনিময় করল, তখন বলল : নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে
 যত্ন থেকে বিশুভ হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন। (৪৫) ইউসুফ
 বলল : আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডার নিযুক্ত করুন। আমি বিশুভ রক্ষক ও
 অধিক জ্ঞানবান। (৪৬) এমনভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের মুক
 প্রতিষ্ঠা দান করেছি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত।
 আমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছা পৌঁছে দেই এবং আমি পৃথিব্যবাসীদের প্রতিদান
 নিই করি না। (৪৭) এবং ঐ লোকদের জন্য পরকালে প্রতিদান উত্তম যারা
 ইমান এনেছে ও সতর্কতা অবলম্বন করে। (৪৮) ইউসুফের আতারা
 আমন করল, অতঃপর তার কাছে উপস্থিত হল। সে তাদেরকে চিনল
 এবং তারা তাকে চিনল না। (৪৯) এবং সে যখন তাদেরকে তাদের রসদ
 বণ্টন করে দিল, তখন সে বলল : তোমাদের বোমায়ে ভাইকে আমার
 কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখ না যে, আমি পুরা মাপ দেই এবং
 যেমানদেরকে উত্তম সমাদার করি? (৫০) অতঃপর যদি তাকে আমার
 কাছে না আন, তবে আমার কাছে তোমাদের কোন বরাদ্দ নেই এবং তোমরা
 আমার কাছে আসতে পারবে না। (৫১) তারা বলল : আমরা তার সম্পর্কে
 অর পিতাকে সম্পত্তি করার চেষ্টা করব এবং আমাদেরকে একাজ করতেই
 হবে। (৫২) এবং সে ভ্রাতাদেরকে বলল : তাদের পণ্যমূল্য তাদের
 রসদ-পত্রের মধ্যে রেখে দাও — সম্ভবতঃ তারা গৃহে পৌঁছে তা বুঝতে
 পারবে, সম্ভবতঃ তারা পুনর্বির আসবে। (৫৩) তারা যখন তাদের পিতার
 কাছে ফিরে এল, তখন বললঃ হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্যে
 ষাণ্ডাশ্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আপনি আমাদের ভাইকে
 আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, যাতে আমরা ষাণ্ডাশ্যের বরাদ্দ আনতে
 পারি এবং আমরা অবশ্যই তার পুরোপুরি হেফাজত করব।

নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করা : পূর্ববর্তী আয়াতে ইউসুফ (আঃ)—এর
 এ উক্তি বর্ণিত হয়েছিল : আমার বিরুদ্ধে অনীত অভিযোগের পুরোপুরি
 তদন্তের পূর্বে আমি কারাগার থেকে মুক্তি পছন্দ করি না—যাতে আশীষ ও
 বাদশাহর মনে পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মে যে, আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতা
 করিনি এবং অভিযোগটি নিছক মিথ্যা ছিল। এ উক্তিতে একটি অনিবার্য
 প্রয়োজনে নিজের মুখেই নিজের পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছিল, যা বাহ্যতঃ
 নিজের শুচিতা নিজের বর্ণনা করার শামিল। এটা আল্লাহ তাআলার
 পছন্দনীয় নয় ; যেমন কোরআনে বলা হয়েছে।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ رَبُّهُمُ يُبْدِلُ مَا هُمْ بِأَعْيُنِنَا

অর্থাৎ, আপনি কি তাদেরকে দেখেন না যারা নিজেরাই নিজেদেরকে
 শুচিত্ব বলে? বরং আল্লাহ তাআলারই অধিকার আছে, তিনি যাকে
 ইচ্ছা, শুচিত্ব সাব্যস্ত করবেন। সূরা নজমেও এ বিষয়বস্তু সম্বলিত
 একটি আয়াত রয়েছে :

لَا تَدْرِي أَتَأْتِيكُمُ الْمَلَائِكَةُ بَاسْمِائِهِ

অর্থাৎ, তোমরা নিজের
 শুচিতা নিজে দাবী করেনা। আল্লাহ তাআলাই সম্যক জ্ঞাত আছেন, কে
 বাস্তবিক পরহেজগার ও আল্লাহভীর।

তাই আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ (আঃ) আপন পবিত্রতা প্রকাশ করার
 সাথে সাথেই এ সত্যও স্মৃতিয়ে তুলেছেন যে, আমার একথা বলা নিজের
 আল্লাহভীরতা ও পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য নয় ; বরং সত্য এই যে,
 প্রত্যেক মানুষের মন, যার মৌল উপাদান চার বস্তু যথা—অগ্নি, পানি,
 মৃত্তিকা ও বায়ু দ্বারা গঠিত হয়েছে, এ মন আপন স্বভাবে প্রত্যেককে মন্দ
 কাজের দিকেই আকৃষ্ট করে। তবে ঐ মন এর ব্যতিক্রম, যার প্রতি আমার
 পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন এবং মন্দ স্পৃহা থেকে পবিত্র রাখেন।
 পয়গম্বরগণের মন এরূপই হয়ে থাকে। কোরআন পাকে এরূপ মনকে
 ‘নফসে মুতমায়িনা’ আখ্যা দেয়া হয়েছে। যেটিকথা, এমন কঠোর পরীক্ষার
 সময় গোনাহ থেকে বেঁচে যাওয়াটা আমার কোন সম্ভাব্যত পরাকাষ্ঠা ছিল
 না; বরং আল্লাহ তাআলারই রহমত ও পথ প্রদর্শনের ফল ছিল। তিনি যদি
 আমার মন থেকে হীন প্রবৃত্তিকে বহিস্কার করে না দিতেন, তবে আমিও
 সাধারণ মানুষের মত কু-প্রবৃত্তির হাতে পরাভূত হয়ে যেতাম।

কোন কোন হাদীসে আছে, ইউসুফ (আঃ)—এর একথা বলার কারণ
 এই যে, তাঁর মনেও এক প্রকার কম্পনা সৃষ্টি হয়েই গিয়েছিল, যদিও তা
 অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। কিন্তু নবুওয়তের মাপকাঠিতে এটাও
 পদস্থলনই ছিল। তাই একথা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি নিজের মনকে
 সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র মনে করি না।

মানব-মন তিন প্রকার : আয়াতে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, এতে
 প্রত্যেক মানব-মনকেই **لَمَّا رَأَىٰ نَفْسَهُ** (মন্দ কাজের আদেশদাতা) বলা
 হয়েছে ; যেমন এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবায়ে-কেরামকে
 প্রশ্ন করলেন : এরূপ সাধী সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা, যাকে
 সম্মান-সমাদার করলে, অর্থাৎ অনু দিলে, বশ্র দিলে সে তোমাদেরকে
 বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে তার অবমাননা করা হলে অর্থাৎ তাকে
 ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ রাখা হলে সে তোমাদের সাথে সদুপহার করে? সাহাবায়ে
 কেরাম আরব করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ! এর চাইতে অধিক মন্দ

জীবনের জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সরকারী ধন-সম্পদ বিনষ্ট হতে না; বরং পূর্ণ হেফাজত সহকারে একত্রিত করা এবং অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় না করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে, যেখানে যে পরিমাণ ব্যয় প্রয়োজনীয়, সেখানে সেই পরিমাণ ব্যয় করা এবং এক্ষেত্রে কোন ক্ষতি হওয়া না করা। حفيظ শব্দটি প্রথম প্রয়োজনের এবং عليم শব্দটি দ্বিতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা।

আল্লাহ যদিও ইউসুফ (আঃ)-এর গুণাবলীতে মুগ্ধ ও তাঁর সন্তোষিত ও বুদ্ধিমত্তায় পুরোপুরি বিস্মীত হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি তাকে অর্থমন্ত্রীর পদ সোপর্দ করলেন না; বরং এক বছর পর্যন্ত পদে বসে রাখলেন অতিথি হিসেবে দরবারে রেখে দিলেন।

এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ই নয়; বরং সার্বভৌম সরকারী দায়িত্বও তাকে সোপর্দ করে দেয়া হলো। সম্ভবতঃ এই সময়ের কারণ ছিল এই যে, নিকট-সান্নিধ্যে রেখে চরিত্র ও অভ্যাস পরীক্ষা করে পুরোপুরি অভিজ্ঞতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে এত বড় পদে বসানো উপযুক্ত ছিল না।

কোন কোন তফসীরবিদ লিখেছেন : এ সময়েই যুলায়খার স্বামী তাকে বৃত্ত বরণ করে এবং বাদশাহর উদ্যোগে ইউসুফ (আঃ)-এর যুলায়খার বিবাহ হয়ে যায়। তখন ইউসুফ (আঃ) যুলায়খাকে পছন্দ করেন; তুমি যা চেয়েছিলে, এটা কি তার চাইতে উত্তম নয়? যুলায়খা তাঁর সৌন্দর্য স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আল্লাহ তাআলা সসম্মানে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন এবং খুব আনন্দ-আহলাদে তাঁদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁদের দু'জন পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের নাম ছিল ইফরায়িম ও মানশা।

কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, বিবাহের পর আল্লাহ তাআলা ইউসুফ (আঃ)-এর অন্তরে যুলায়খার প্রতি এত গভীর ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন, যে যুলায়খার অন্তরে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি ছিল না। এমনকি, একবার ইউসুফ (আঃ) যুলায়খাকে অভিযোগের স্বরে বললেন : এর কারণ কি যে, তুমি পূর্বে ন্যায় আমাকে ভালবাস না? যুলায়খা আরজ করলো : আপনার ওসিলায় আমি আল্লাহ তাআলার ভালবাসা অর্জন করেছি। এ ভালবাসার সামনে সব সম্পর্ক ও চিন্তা-ভাবনা ম্লান হয়ে গেছে। এ ঘটনাটি আরও কিছু বর্ণনাসহ তফসীর কুরতুবী ও মাযহারীতে বর্ণিত হয়েছে।

ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীতে সাধারণ মানুষের জন্যে কল্যাণকর অনেক পথনির্দেশ ও শিক্ষা নিহিত রয়েছে। পূর্বে এগুলোর আংশিক বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত আরও কিছু পথ-নির্দেশ নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে :

(১) وَمَا يَرْثِيكَ (ইউসুফ (আঃ) - এর উক্তি)তে সং, আল্লাহত্বকির পরবেশগারদের জন্যে পথনির্দেশ এই যে, কোন গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার তওফীক হলে তজ্জন্মে গর্ব করা কিংবা এর বিপরীতে যারা গোনাহ করে, তাদেরকে হয় মনে করা উচিত নয়; বরং ইউসুফ (আঃ)-এর ন্যায় অন্তরে একথা বহুমূল করতে হবে যে, এটা আমার কোন দোষ গুণ নয়; বরং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপা। তিনি 'নকসে-আম্মারা' কে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে দেননি। নতুবা আমার মন স্বভাবগতভাবে তাকে মন্দ কাজের দিকে আকৃষ্ট করে।

وَمَا يَرْثِيكَ عَلَىٰ خَيْرٍ مِنَ الْأَرْضِ (ইউসুফ (আঃ) - এর উক্তি) থেকে জানা যায় যে, কোন

বিশেষ সরকারী পদ নিজে উপাচ্যক হয়ে গ্রহণ করা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জায়েয; যেমন ইউসুফ (আঃ) দেশীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব চেয়ে নিয়েছিলেন।

কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এই যে, কোন বিশেষ পদ সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, অন্য কোন ব্যক্তি এর সুদৃষ্ট ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না এবং নিজে ভালরূপে তা সম্পাদন করতে পারবে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে এবং তা ছাড়া কোন গোনাহে লিপ্ত হওয়ারও আশঙ্কা না থাকে, তবে পদটি নিজে চেয়ে নেয়াও জায়েয। তবে শর্ত এই যে, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ-কড়ির মোহে নয়, বরং জনগণের বিশুদ্ধ সেবা ও ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য থাকতে হবে। যেমন ইউসুফ (আঃ)-এর সামনে এ লক্ষ্যই ছিল। আর যেখানে এরূপ অবস্থা না হয়, সেখানে রসুলুল্লাহ (সাঃ) কোন সরকারী পদ প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি নিজে কোন পদের জন্যে আবেদন করেছে, তিনি তাকে পদ দেননি।

মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) আবদুর রহমান ইবনে সামরা (রাঃ)-কে বললেন : কখনও প্রশাসকের পদ প্রার্থনা করো না। নিজে প্রার্থনা করে যদি প্রশাসকের পদ পেয়েও ফেল, তবে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন পাবে না। ফলে তুমি ভুল-ভ্রান্তি ও পদসম্মেলন থেকে বাচতে পারবে না। পক্ষান্তরে দরখাস্ত ব্যতিরেকে যদি তোমাকে কোন পদ দান করা হয়, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থন পাবে। ফলে তুমি পদের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

মুসলিমের অপর এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে একটি পদ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন : انا لن نستعمل على عملنا من اراده যে ব্যক্তি নিজে পদ প্রার্থনা করে, আমি তাকে সরকারী পদ দান করি না।

ইউসুফ (আঃ)-এর পদ প্রার্থনা বিশেষ রহস্যের উপর ভিত্তিহীন ছিল : ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারটি এই প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্ন। কারণ তিনি জানতেন যে, বাদশাহ্ কাফের। তার কর্মচারীরাও তেমনি। এ দিকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এমনতাবস্থায় স্বার্থবাদী মহল জনগণের প্রতি দয়্যার্য হবে না। ফলে লাঞ্ছনা মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, যে গরীবের প্রতি সুবিচার করতে পারে। তাই তিনি নিজেই এ পদের জন্যে আবেদন করলেন। তবে এর সাথে নিজের কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্যও তাঁকে প্রকাশ করতে হয়েছে, যাতে বাদশাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এ পদ দান করেন।

অমুসলিম রাষ্ট্রে সরকারী পদ গ্রহণ করা জায়েয কি না : হয়রত ইউসুফ (আঃ) মিসর-সম্রাটের চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। অথচ সম্রাট ছিল কাফের; এ থেকে বোঝা যায় যে, কাফের অথবা ফাসেক শাসনকর্তার অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা বিশেষ অবস্থায় জায়েয।

কিন্তু ইমাম জাসসাস كَانَ اَوَّلُ كُفَّارِ الْمَدِينَةِ (আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না) আয়াতের অধীনে লিখেছেন : এ আয়াতদ্বয়ে জায়েয ও কাফেরদের সাহায্য করা অবৈধ প্রমাণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, কাফেরদের অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা তাদের কার্যে অংশীদার হওয়া এবং সাহায্য করার নামান্তর। এ ধরনের সাহায্যকে কোরআন পাকের অনেক আয়াতে হারাম বলা হয়েছে।

হয়রত ইউসুফ (আঃ) এ চাকুরী শুধু গ্রহণই করেননি, বরং দরখাস্ত

করে লাভ করেছেন। তফসীরবিদ মুজাহিদের মতে এর বিশেষ কারণ এই যে, বাদশাহ্ তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোরআন-হাদীসে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর কারণ এই যে, ইউসুফ (আঃ) বাদশাহ্র আচরণদৃষ্টে অনুভব করেছিলেন যে, তিনি তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না এবং শরীয়ত বিরোধী কোন আইন জারী করতে তাঁকে বাধ্য করবেন না। তাঁকে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। ফলে তিনি স্বীয় অভিমত ও ন্যায়নানুগ আইন অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন। শরীয়ত বিরোধী কোন আইন মানতে বাধ্য করা হবে না—এরূপ পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে কোন কাকের অথবা জালেমের চাকুরী করার মধ্যে যদিও কাকেরের সাথে সহযোগিতা করার দোষ বিদ্যমান থাকে তথাপি যে পরিস্থিতিতে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার শক্তি না থাকে এবং পদ গ্রহণ না করলে জনগণের অধিকার খর্ব হওয়ার অথবা অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রবল আশঙ্কা থাকে, সেই পরিস্থিতিতে এতদুচ্চ সহযোগিতা করার অবকাশ ইউসুফ (আঃ)—এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, যতদূরকূতে স্বয়ং কোন শরীয়তবিরোধী কাজ সম্পাদন করতে না হয়। কেননা, এটা প্রকৃতপক্ষে তার গোমরাহীর কাজে সাহায্য করা হবে না; যদিও দূরবর্তী কারণ হিসেবে এতেও তার সাহায্য হয়ে যায়। উল্লেখিত পরিস্থিতিতে সাহায্যের দূরবর্তী কারণ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত অবকাশ আছে। ফেকাহবিদগণ এর পূর্ণ বিবরণ দান করেছেন। পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেরীয়গণের অনেকেই এহেন পরিস্থিতিতে অত্যাচারী শাসনকর্তাদের চাকুরী গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত আছে।—(কুরতুবী, মাযহারী)

আল্লামা মাওয়ারদি ‘শরীয়তসম্মত রাজনীতি’ সম্পর্কে স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, কেউ কেউ ইউসুফ (আঃ)—এর এ কর্মের ভিত্তিতে কাকের ও জালেম শাসকদের অধীনে চাকুরী কিংবা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করা এই শর্তে জায়েয বলেছেন যে, স্বয়ং তাকে শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করতে না হয়। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এ শর্ত সহকারেও এরূপ চাকুরী নাজায়েয বলেছেন। কারণ, এতেও জুলুমকারীদেরকে শক্তিশালী ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করা হয়। তাঁরা ইউসুফ (আঃ)—এর এ কাজের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করে থাকেন। এগুলোর সারমর্ম এই যে, এ কাজটি গ্রহণ করা ইউসুফ (আঃ)—এর সত্তা অথবা তাঁর শরীয়তের বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যায়ের জন্যে এখন তা জায়েয নয়। কিন্তু অধিকসংখ্যক আলেম ও ফেকাহবিদ প্রথমোক্ত মতামত গ্রহণ করে একে জায়েয বলেছেন।—(কুরতুবী)

তফসীর বাহরে-মুহীতে আছে : যে ক্ষেত্রে জানা যায় যে, আলেম পুণ্যবান ব্যক্তির এ পদ গ্রহণ না করলে সর্বসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে এবং সুবিচার পদে-পদে ব্যাহত হবে, সেখানে পদ গ্রহণ করা জায়েয এবং সওয়াবের কাজ; শর্ত এই যে, এ পদ গ্রহণ করে যদি স্বয়ং তাকে কোন শরীয়তবিরোধী কাজ করতে না হয়।

মাসআলা : ইউসুফ (আঃ)—এর **إِنَّ حَبِطَ عَلَيْهِ** উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজের কোন গুণগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা অবৈধ নয়। এটা কোরআনে নিষিদ্ধ ‘নিজের মুখে নিজের পবিত্রতা জাহির করা’র অন্তর্ভুক্ত নয়; অবশ্য যদি তা অহঙ্কার, গর্ব ও আশ্ফালনবশতঃ না হয়।

وَكَذَلِكَ مَثَلُ الْيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَذَكَّرُ لِمَا كَانَتْ يَشَاءُ
نُصِيبُ رَحْمَتًا مِّنْ رَبِّهِ وَكَذَلِكَ نَضِيفُ أَجْرَ الْمُتَّقِينَ

অর্থাৎ, আমি ইউসুফকে বাদশাহ্র দরবারে যেভাবে মান-সম্মান ও

উচ্চ পদমর্যাদা দান করেছি, এমনভাবে আমি তাকে সমগ্র বিশাল শাসনক্ষমতা দান করেছি। এখানে সে যেভাবে ইচ্ছা আদেশ জারী করতে পারে। আমি যাকে ইচ্ছা, স্বীয় রহমত ও নেয়ামত দ্বারা সোভাগ্যবান করি এবং আমি সংকমলীদের প্রতিদিন বিনষ্ট করি না।

ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয় যে, এক বছর অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বাদশাহ্র দরবারে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। রাজ্যের সমস্ত সভাস্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও কর্মকর্তাগণ এতে আমন্ত্রিত হন। ইউসুফ (আঃ)—কে রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দরবারে হাজির করা হয় এবং অর্ধ দফতরের দায়িত্ব নয়—যাবতীয় রাজকার্যই কার্যতঃ ইউসুফ (আঃ)—কে সোপর্দ করে বাদশাহ্ নির্জনবাসী হয়ে যান।—(কুরতুবী, মাযহারী)

ইউসুফ (আঃ) এমন সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ়ভাবে রাজকার্য পরিচালন করলেন যে, কারও কোন অভিযোগ রইল না। গোটা দেশ তাঁর প্রশাসনে মুখর হয়ে উঠল এবং সর্বত্র শান্তি-শৃংখলা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করতে লাগল। রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে স্বয়ং ইউসুফ (আঃ)—ও কোনরূপ বাধাবিপত্তি কিংবা কষ্টের সম্মুখীন হননি।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : এসব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজক্ষমতা দ্বারা ইউসুফ (আঃ)—এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্র বিশি-বিধান জারী করা এবং তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি কোন সময় এ কর্তব্য বিস্মৃত হননি এবং অব্যাহতভাবে বাদশাহকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর অবিরাম দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্ও মুসলমান হয়ে যান।

وَكَبِيرُ الْأَجْرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ অর্থাৎ, পরকালে

প্রতিদান ও সওয়াব তাদের জন্যে দুনিয়ার নেয়ামতের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, যারা ঈমানদার এবং যারা তাকওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করে।

জনগণের সুশাস্তি নিশ্চিত করার জন্যে ইউসুফ (আঃ) এমন কাজ করেন, যার নজির খুঁজে পাওয়া দুশ্কর। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুশ-শাস্তির সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইউসুফ (আঃ) পেটভরে খাওয়া ছেড়ে দেন। সবাই বলল : মিসর সাম্রাজ্যে যাবতীয় ধন-ভান্ডার আপনার কক্ষায়, অথচ আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন, এ কেমন কথা! তিনি বললেন : সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি যত আমার অন্তর থেকে উঠাও হয়ে না যায়, সেজন্যে এটা করি। তিনি শীঘ্র বাবুর্চিদেরকে নির্দেশ দিলেন : দিনে মাত্র একবার দুপুরের খাদ্য রান্না করা যাতে রাজপরিবারের সদস্যবর্গও জনসাধারণের ক্ষুধায় কিছু অশ্রদ্ধার করতে পারে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ কৃপায় মিসরের পূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভ করলেন। ৫৮তম আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েক আয়াতে ইউসুফ-ভ্রাতাদের খাদ্যাশস্যের জন্যে মিসর আগমন উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা হয়েছে যে, তাঁরাই মিসরে আগমন করেছিল; ইউসুফ (আঃ)—এর সহোদর ছোট ভাই তাঁদের সাথে ছিল না।

কাহিনীর মধ্যবর্তী অংশ কোরআন বর্ণনা করেনি। কারণ, তা আল্লাহ কেই বোঝা যায়।

ইবনে-কাসীর সুদী, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদগণ বরাতে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা ঐতিহাসিক ও ইসলামী রেওয়াজ

বাহ্যিক হলেও কিছুটা গ্রহযোগ্য। কারণ, কোরআনের বর্ণনারীতিতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তারা বলেছেন : ইউসুফ (আঃ)—এর হাতে মিসরের শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশের জন্যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ নিয়ে আসে। অটেল ফসল উৎপন্ন হয় এবং সাময়িকভাবে পরিমাণে অর্জন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করা হয়। এরপর স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ পেতে থাকে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তা দীর্ঘ সাত বছর অব্যাহত থাকে। ইউসুফ (আঃ) পূর্ব থেকেই জ্ঞাত ছিলেন যে, দুর্ভিক্ষ সাত বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তাই দুর্ভিক্ষের প্রথম বছরে দেশের মজুদ শস্য-ভান্ডার খুব সাবধানে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত রাখেন।

মিসরের অধিবাসীদের কাছে তাদের প্রয়োজন পরিমাণে খাদ্যশস্য পূর্ব থেকে সঞ্চিত করানো হলো। এখন দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল। চূড়ান্তক পর্যন্ত থেকে বুড়ুজ্ জনসাধারণ মিসরে আগমন করতে লাগল। ইউসুফ (আঃ) একটি বিশেষ পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে শুরু করলেন। অর্থাৎ, এক ব্যক্তিকে এক উট-বোঝাই খাদ্যশস্য দিতেন ; এর দ্বিতীয় দিতে না। কুরতুবী এর পরিমাণ এক ওসক অর্থাৎ, ষাট সা' দিচ্ছিলেন, যা আমাদের ওজন অনুযায়ী দু'শ দশ সের অর্থাৎ পাঁচ মনের কিছু বেশী হয়।

তিনি এ কাজটিকে এতটুকু গুরুত্ব দেন যে, বিক্রয় কার্যের তদারকি নিজেই করতেন। শুধু মিসরেই দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল না ; বরং দূর-দূরান্ত জায়গায় এর করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল। হযরত ইয়াকুব (আঃ)—এর পুত্রমি কেনান ছিল ফিলিস্তিনের একটি অংশ। অদ্যাবধি তা 'খলিল' নামে একটি সমৃদ্ধ শহরের আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে হযরত ইয়াকুব, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ (আঃ)—এর সমাধি অবস্থিত। এ কাজটিও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে ইয়াকুব (আঃ)—এর পরিবারও অনটন দেখা দেয়। সাথে সাথেই মিসরের এ সূচ্যটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে অল্প মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। হযরত ইয়াকুব (আঃ)—এর কানে এ সববাদ পৌঁছে যে, মিসরের বাদশাহ্ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি পুত্রদেরকে বললেন : তোমরাও সৎ এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে এসো।

এ কথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, একজনকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশী খাদ্যশস্য দেয়া হয় না। তাই তিনি সব পুত্রকেই পাঠাতে মনস্থ করলেন। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বেনিয়ামিন ছিলেন ইউসুফ (আঃ)—এর সহোদর। ইউসুফ নিষেধ হওয়ার পর ইয়াকুব (আঃ)—এর প্রহ ও ভালবাসা তার প্রতিই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সাঙ্ঘনা ও গোপালনার জন্য তাঁকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

দশ ভাই কেনান থেকে মিসর পৌঁছল। ইউসুফ (আঃ) শাহী পোশাকে স্বাধিপতির বেশে তাদের সামনে এলেন। শৈশবে সাত বছর বয়সে তামার তাঁকে কাকুলার লোকজনের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল, কিন্তু এখন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁর বয়স ছিল দ্বিগুণ বছর।—(কুরতুবী, মাহযারী)

বলাবাহুল্য, এত দীর্ঘ সময়ে মানুষের আকার-অবয়ব পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাদের ধারণায়ও একথা ছিল না যে, যে বালককে তারা গোলামরূপে বিক্রি করেছিল, সে কোন দেশের মন্ত্রী বা বাদশাহ্ হয়ে যেতে পারে। তাই

তারা ইউসুফ (আঃ)—কে চিনল না; কিন্তু ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে চিনে ফেললেন। تَعْرِفَهُمْ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ বাক্যের অর্থ তাই। আরবী ভাষায় انكار শব্দের আসল অর্থ অপরিচিত মনে করা, তাই تَعْرِفُونَ এর অর্থ অজ্ঞ ও অপরিচিত।

ইউসুফ (আঃ)—এর চিনে নেয়া সম্পর্কে সুদীর্ঘ বরাত দিয়ে ইবনে কাসীর আরও বর্ণনা করেন যে, দশ ভাই দরবারে পৌঁছলে ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, যেমন সন্দেহযুক্ত লোকদেরকে করা হয়— যাতে তারা সম্পূর্ণ সত্য উদ্ঘাটন করে। প্রথমতঃ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মিসরের অধিবাসী নও। তোমাদের ভাষাও হিব্রু। এমতাবস্থায় এখানে কিরাপে এলে? তারা বলল : আমাদের দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। আমরা আপনার প্রশংসা শুনে খাদ্যশস্যের জন্যে এখানে এসেছি। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন করলেন : তোমরা যে সত্য বলছ এবং তোমরা কোন শত্রুর চর নও, একথা কেমন করে বিশ্বাস করব? তারা বলল : আল্লাহ্‌র পানাহ্। আমাদের দ্বারা এরূপ কখনও হতে পারে না। আমরা আল্লাহ্‌র নবী ইয়াকুব (আঃ)—এর সন্তান। তিনি কোনোে বসবাস করেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ)—এর ও তাঁর পরিবারের বর্তমান অবস্থা জানা এবং গুণের মুখ থেকেই অতীতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হোক — তাদেরকে প্রশ্ন করার পেছনে এটাই ছিল ইউসুফ (আঃ)—এর লক্ষ্য। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের পিতার আরও কোন সন্তান আছে কি? তারা বলল : আমরা বারো ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে ছোট এক ভাই জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমাদের পিতা তাকেই সর্বাধিক আদর করতেন। এরপর তার ছোট সহোদর ভাইকে আদর করতে শুরু করেন। তাই তাকে আমাদের সাথে এ সকরে পাঠাননি।

এসব কথা শুনে ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখা এবং যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন।

বন্টনের ব্যাপারে ইউসুফ (আঃ)—এর রীতি ছিল এই যে, একবারে কোন এক ব্যক্তিকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশী খাদ্যশস্য দিতেন না। হিসাব অনুযায়ী যখন তা শেষ হয়ে যেত, তখন পুনর্ব্যবস্থার দিতেন।

ভাইদের কাছে সব বিবরণ জানানোর পর তাঁর মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, তারা পুনর্ব্যবস্থার আসুক। এজন্যে একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি স্বয়ং ভাইদেরকে বললেন :

اَتُونِي بِأَسْمَاءِ أَبْنَاءِكُمْ أَلَا تَرَوْنِي أَنِّي أَرْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ

অর্থাৎ, তোমরা যখন পুনর্ব্যবস্থার আসবে, তখন তোমাদের সে ভাইকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। তোমরা দেখতেই পাছ যে, আমি কিভাবে পুরোপুরি খাদ্যশস্য প্রদান করি এবং কিভাবে অতিথি আপ্যায়ন করি।

এরপর একটি সাবধানবাণীও শুনিতে দিলেন :

وَأَن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَعْرِفُونِ

যদি ভাইকে সাথে না আন, তবে আমি তোমাদের কাউকেই খাদ্যশস্য দেব না। (কেননা, আমি মনে করব যে, তোমরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছ।) এভাবে তোমরা আমার কাছে আসবে না।

অপর একটি গোপন ব্যবস্থা এই করলেন যে, তারা খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ যেসব নগদ অর্থকড়ি কিংবা অলংকার জমা দিয়েছিল, সেগুলো

গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেয়ার জন্যে কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন, যাতে বাড়ী পৌছে যখন তারা আসবাব খুলবে এবং নগদ অর্থ ও অলংকার পাবে, তখন যেন পুনর্বীর খাদ্যশস্য নেয়ার জন্যে আসতে পারে।

মোটকথা, ইউসুফ (আঃ) কর্তৃক এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কারণ ছিল এই যে, ভবিষ্যতেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট সহোদর ভাইয়ের সাথেও তাঁর সাক্ষাত ঘটান সুযোগ উপস্থিত হয়।

অনুশাবনযোগ্য মাসআলা : ইউসুফ (আঃ)-এর এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, যদি দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এমন চরমে পৌছে যে, সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অনেক লোক জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে, তবে সরকার এমন দ্রব্যসামগ্রীকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং খাদ্য শস্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। ফেকাহবিদগণ এ বিষয়টি পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইউসুফ (আঃ)-এর অবস্থা সম্পর্কে পিতাকে অবহিত না করার কারণ : ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনায় একটি চরম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, একদিকে তাঁর পিতা আল্লাহর নবী ইয়াকুব (আঃ) তাঁর বিরহব্যথায অশ্রু বিসর্জন করতে করতে অজ্ঞ হয়ে গেলেন এবং অন্যদিকে ইউসুফ (আঃ) স্বয়ং নবী ও রসুল পিতার প্রতি স্বভাবগত ভালবাসা ব্যতীত তাঁর অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে তিনি একবারও বিরহ-যাতনায় অস্থির ও মুহ্যমান পিতাকে কোন উপায়ে স্বীয় কুশল সংবাদ পৌছানোর কথা চিন্তাও করলেন না। সংবাদ পৌছানো তখনও অসম্ভব ছিল না, যখন তিনি গোলাম হয়ে মিসরে পৌছেছিলেন। আযীযে-মিসরের গৃহে তাঁর সবরকম স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধার সামগ্রী বিদ্যমান ছিল। তখন কারও মাধ্যমে পত্র অথবা খবর পৌছিয়ে দেয়া তাঁর পক্ষে তেমন কঠিন ছিল না। এমনিভাবে কারাগারের জীবনেও যে সংবাদ এদিক সেদিক পৌছতে পারে, তা কে না

জানে। বিশেষতঃ আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে সসম্মানে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং মিসরের শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে আসে, তখন নিজে নিজে পিতার কাছে উপস্থিত হওয়া তাঁর সর্বপ্রথম কাজ উচিত ছিল। এটা কোন কারণে অসমীচীন হলে কমপক্ষে দূত প্রেরণ করে পিতাকে নিরুদ্বেশ করে দেয়া তো ছিল তাঁর জন্যে নেহাত মামুলী ব্যাপার।

কিন্তু আল্লাহর পয়গম্বর ইউসুফ (আঃ) এরূপ ইচ্ছা করেছেন বোধ কোথাও বর্ণিত নেই। নিজে ইচ্ছা করা দূরের কথা, যখন খাদ্যশস্য নেয়ার জন্যে ভাতারা আগমন করল, তখনও আসল ঘটনা প্রকাশ না করে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দিলেন।

এ অবস্থা কোন সামান্যতম মানুষের কাছ থেকেও কল্পনা করা যায় না। আল্লাহর মনোনীত পয়গম্বর হয়ে তিনি তা কিরূপে বরদাশত করলেন।

এ বিস্ময়কর নীরবতার জওয়াবে সব সময় মনে একথা জাগ্রত হয় যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তাআলা বিশেষ রহস্যের অধীনে ইউসুফ (আঃ)-কে আত্মপ্রকাশে বিরত রেখেছিলেন। তফসীর কুরতুবীতে পরে সুস্পষ্ট করা পাওয়া গেল যে, আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আঃ)-কে নিজের সম্পর্কে কোন সংবাদ গৃহে প্রেরণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলার রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের পক্ষে জাযেবোহ অসম্ভব। তবে মাঝে মাঝে কোন বিষয় কারও বোধগম্য হয়ে যায়। এখানে বাহ্যতঃ ইয়াকুব (আঃ)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করা ছিল আসল রহস্য। এ কারণেই ঘটনার শুরুতে যখন ইয়াকুব (আঃ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউসুফকে বাঁধে খায়নি; বরং এটা তাঁর ভাইয়ের দুষ্কৃতি, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পৌছে সরেযমীনে তদন্ত করা তাঁর কর্তব্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর মনকে এদিকে যেতে দেননি। অতঃপর দীর্ঘদিন পর তিনি ছেলেদেরকে বললেন : তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালশ কর। আল্লাহ তাআলা যখন কোন কাজ করতে চান, তখন তার কারণাদি এমনভাবে সন্নিবেশিত করে দেন।

قَالَ هَلْ آمَنُوكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنَ تَكُونُ عَلَىٰ أَخِيهِمْ قَبْلُ
 قَالَ اللَّهُ خُذْ خُذْ وَهُوَ رَحِيمٌ الرَّحِيمِينَ ۝ وَلَمَّا أَتَوْا
 مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ زَيْدًا لَهُمْ قَالُوا يَا بَلَاءُ مَا
 نَجِئُ هَٰذَا بِضَاعَتُنَا وَزَيْدُهَا لَنَا وَنَحْفَظُهَا حَافِيًا
 وَكَذَّابُونَ ۝ قَالَ كَيْفَ يَكُن لَّيْلِي نَبِيًّا ۝ قَالَ كُنْ أَوْسَلَهُ
 مَعَهُ حَتَّىٰ تَوُتُوهُنَّ مَوْتُهُنَّ ۝ قَالَ اللَّهُ لَا تُفِي بِهٖ إِلَّا أَنْ
 يُخَاطِبَهُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْتَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝
 وَقَالَ لِيَبْنِيَ لَنَا مَدِينًا ۝ قَالَ بَابٌ وَأَجِدُوا مَدِينًا
 أَبْوَابَ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۝
 إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ قَلْبُكَ ۝
 الْتَوَكَّلُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ آتَوْهُم مَّا
 كَانُوا يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ
 يَعْقُوبَ قَطِيئًا وَرَأَاهُ الَّذِي عَلَّمَهَا عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَكْثَرُ
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ
 أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(৬৫) বললেন, আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে কি সরূপ বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলাম? অতঃপর আল্লাহ উত্তম হেফাজতকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু। (৬৫) এবং যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পণ্যমূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল : হে আমাদের পিতা, আমরা আর কি চাইতে পারি। এই আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। এখন আমরা আবার আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে রসদ আনব এবং আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করব এবং এক এক উটের বরাদ্দ খাদ্যশস্য আমরা অতিরিক্ত আনব। ঐ বরাদ্দ সহজ। (৬৬) বললেন, তাকে ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার না দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছে দেবে; কিন্তু যদি তোমরা সবাই একান্তই অসহায় না হয়ে যাও। অতঃপর যখন সবাই তাকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন : আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হলো সে ব্যাপারে আল্লাহই মধ্যস্থ রইলেন। (৬৭) ইয়াকুব লালনে : হে আমার বৎসগণ। সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আল্লাহর কোন বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আল্লাহরই চলে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের। (৬৮) তারা যখন পিতার কথামত প্রবেশ করল, তখন আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের বাঁচাতে পারল না। কিন্তু ইয়াকুবের সিদ্ধান্তে তাঁর মনের একটি বাসনা ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছেন। এবং তিনি তো আমার লোকানো বিষয় অবগত ছিলেন। কিন্তু অনেক মানুষ অবগত নয়। (৬৯) যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন সে আপন ভ্রাতাকে নিজের কাছে রাখল। বলল : নিশ্চই আমি তোমার সহোদর। অতঃপর তাদের কৃৎসর্মের জন্যে দুঃখ করো না।

৬৩ পরবর্তী আয়াতসমূহে ঘটনার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল, তখন পিতার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথাও বলল : আশীয়ে-মিসর ভবিষ্যতের জন্যে আমাদেরকে খাদ্যশস্য দেয়ার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোট ভাইকে সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, অন্যথায় নয়। তাই আপনি ভবিষ্যতে বেনিয়ামিনকেও আমাদের সাথে প্রেরণ করবেন — যাতে ভবিষ্যতে আমরা খাদ্যশস্য পাই। আমরা তার পুরোপুরি হেফাজত করব। তার কোনরূপ কষ্ট হবে না।

পিতা বললেন : আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? উদ্দেশ্য, এখন তোমাদের কথায় কি বিশ্বাস। একবার বিশ্বাস করে বিপদ ভোগ করেছি। তখনও হেফাজতের ব্যাপারে তোমরা এ ভাষাই প্রয়োগ করেছিলে।

এটা ছিল তাদের কথার উত্তর। কিন্তু পরে পরিবারের প্রয়োজনের পরিশ্রেক্ষিতে পয়গম্বরসুলভ তাওয়াক্কুল এবং এ বাস্তবতায় ফিরে গেলেন যে, লাভ-ক্ষতি কোনটাই বন্দার ক্ষমতাধীন নয় — যতক্ষণ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা না করেন। আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে গেলে তা কেউ টলাতে পারে না। তাই সৃষ্টজীবের উপর ভরসা করাও ঠিক নয় এবং তাদের কথার উপর নির্ভর করাও অসমীচীন।

তাই বললেন : **قَالَ اللَّهُ خُذْ خُذْ** অর্থাৎ, তোমাদের হেফাজতের ফল তো ইতিপূর্বে দেখে নিয়েছি। এখন আমি আল্লাহর হেফাজতের উপরই ভরসা করি। **وَهُوَ رَحِيمٌ الرَّحِيمِينَ** এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু। তাঁর কাছেই আশা করি, তিনি আমার বার্ষিক ও বর্তমান দুঃখ ও দুর্ভিক্ষের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে অধিক কষ্টে নিপতিত করবেন না।

মোটকথা, ইয়াকুব (আঃ) বাহ্যিক অবস্থা ও সম্ভাব্যতার ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর ভরসা করলেন না। তবে আল্লাহর ভরসায় কনিষ্ঠ ছেলেকেও সাথে প্রেরণ করতে সম্মত হলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত সফরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই তাদের কথাবার্তা হচ্ছিল। আসবাবপত্র তখনও খোলা হয়নি। অতঃপর যখন আসবাবপত্র খোলা হল এবং দেখা গেল যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ পরিশোধিত মূল্য আসবাবপত্রের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তখন তারা অনুভব করতে পারল যে, একাজ ভুলবশতঃ হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বক আমাদের পুঞ্জি আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তাই **رُدَّتْ إِلَيْهَا** বলা হয়েছে। অতঃপর তারা পিতাকে বলল : **مَا كُنَّا** অর্থাৎ, আমরা আর কি চাই? খাদ্যশস্যও এসে গেছে এবং এর মূল্যও ফেরত পাওয়া গেছে। এখন তো অবশ্যই ভাইকে নিয়ে পুনর্বাস নির্বিঘ্নে যাওয়া দরকার। কারণ, এ আচরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আশীয়ে-মিসর আমাদের প্রতি খুবই সদয়। কাজেই কোন আশঙ্কার কারণ নেই; আমরা পরিবারের জন্যে খাদ্যশস্য আনব, ভাইকেও হেফাজতে রাখব এবং ভাইয়ের অংশের বরাদ্দ অতিরিক্ত পাব। কারণ, আমরা যা এনেছি, তা প্রয়োজনের তুলনায় অগ্রতুল। অল্প দিনের মধ্যেই নিরশেষ হয়ে যাবে।

مَاتِبُ বাক্যের এক অর্থ বর্ণিত হল। এ বাক্যের ৬ শব্দটি নেতিবাচক

অর্থে নিলে বাক্যের আরেকটি অর্থ এরূপও হতে পারে যে, তারা পিতাকে বলল : এখন তো আমাদের কাছে খাদ্যশস্য আনার জন্য মূল্যও রয়েছে। আমরা আপনার কাছে কিছুই চাই না— শুধু ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন।

এসব কথা শুনে পিতা উত্তর দিলেন :

لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ

অর্থাৎ, আমি বেনিয়ামিনকে তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর কসমসহ এরূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার আমাকে দাও যে, তোমরা অবশ্যই তাকে সাথে নিয়ে আসবে। কিন্তু সত্যদর্শীদের দৃষ্টি থেকে এ বিষয় কোন সময় উঠাও হয় না যে, মানুষ বাহ্যতঃ যত শক্তি-সামর্থ্যই রাখুক, আল্লাহর শক্তির সামনে সে নিতান্তই অপারগ ও অক্ষম। সে কাউকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কতটুকু ওয়াদা-অঙ্গীকারই বা করতে পারে। কারণ, তা পালন করার পূর্ণ শক্তি তার নেই। তাই ইয়াকুব (আঃ) এ ওয়াদা-অঙ্গীকারের সাথে একটি তার নেই। তাই ইয়াকুব (আঃ) এ ওয়াদা-অঙ্গীকারের সাথে একটি ব্যতিক্রমও জুড়ে দিলেন : إِلَّا أَنْ يُحْكَمَ لَهُ অর্থাৎ, ঐ অবস্থা ব্যতীত, যখন তোমরা সবাই কোন বেঠানীতে পড়ে যাও। তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : এর অর্থ এই যে, তোমরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হও। কাতাদাহর মতে অর্থ এই যে, তোমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও পরাভূত হয়ে পড়।

فَلَمَّا أَوْفَوْهُمُ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا تَقُولُونَ وَاكْفُرُوا

অর্থাৎ, ছেলেরা যখন প্রার্থিত পাহায ওয়াদা-অঙ্গীকার করল অর্থাৎ, সবাই কসম খেল এবং পিতাকে আশ্বস্ত করার জন্যে কঠোর ভাষায় প্রতিজ্ঞা করল, তখন ইয়াকুব (আঃ) বললেন : বেনিয়ামিনের হেফাযতের জন্যে হালফ নেয়া হালফ করার যে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ তাআলার উপরই তার নির্ভর। তিনি শক্তি দিলেই কেউ কারও হেফাযত করতে পারে এবং দেয় অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারে। নতুবা মানুষ অসহায়; তার ব্যক্তিগত সামর্থ্যধীন কোন কিছু নয়।

মাসআলা : (১) ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে যে ভুল করেছিল, তাতে অনেক কবীরা ও জঘন্য গোনাহ সংঘটিত হয়েছিল। উদাহরণতঃ (এক) মিথ্যা কথা বলে ইউসুফকে তাদের সাথে খেলাধুলার জন্যে প্রেরণ করতে পিতাকে সম্মত করা। (দুই) পিতার সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। (তিন) কচি ও নিষাপ ভাইয়ের সাথে নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করা। (চার) বৃদ্ধ পিতাকে নিদারুণ মনোকাষ্ট দানে আক্কেপ না করা। (পাঁচ) একটি নিরপরাধ লোককে হত্যা করার পরিকল্পনা করা। (ছয়) একজন মুক্ত ও স্বাধীন লোককে জোরজবরদস্তি ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেয়া।

এগুলো ছিল চরম অপরাধ। ইয়াকুব (আঃ) যখন জানতে পারলেন যে, তারা মিথ্যা ভাষণ দিয়েছে এবং স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ইউসুফকে কোথাও রেখে এসেছে, তখন বাহ্যতঃ এটা ছেলদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার কিংবা ওদেরকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়ার মত বিষয় ছিল। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং তারা যথারীতি পিতার কাছেই থাকে। এমনকি মিসর থেকে খাদ্যশস্য আনার জন্য পিতা তাদেরকেই প্রেরণ করেন। তদুপরি দ্বিতীয়বার তার ছোট ভাই সম্পর্কে পিতার কাছে আবেদন-নিবেদন করার সুযোগ পায় এবং অবশেষে তাদের কথা মেনে নিয়ে ছোট ছেলেকেও তাদের হাতেই সমর্পণ করেন।

এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান কোন গোনাহ ও ক্রটি করে ফেলায় পিতার কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষা ও উপদেশ দানের মাধ্যমে তার সংশোধন করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ সম্পর্কচ্ছেদ না করা। হয়রত ইয়াকুব (আঃ) তাই করেছিলেন। অবশেষে ছেলেরা সবাই কৃত অপরাধের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছে। অবশ্য দ্বিতীয় সংশোধনের আদৌ আশা না থাকে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে অন্যদের ধর্মীয় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে সম্পর্কচ্ছেদ করা সমীচীন।

মাসআলা : (২) এখানে ইয়াকুব (আঃ) সদাচরণ ও সচরিত্রতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ছেলদের এহেন কঠিন অপরাধ সত্ত্বেও তিনি এমন আচরণ দেখিয়েছেন যে, তারা পুনর্বীর ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে সাহসী হয়েছে।

মাসআলা : (৩) এমতাবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে অন্যায়কারীকে একথা বলে দেয়াও সমীচীন যে, বিগত আচরণের কারণে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা ক্ষমা করে দিচ্ছি। এতে সে লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে পুরোপুরি তওবা করার সুযোগ পাবে; যেমন ইয়াকুব (আঃ) প্রথমে বলে নিয়েছিলেন যে, বেনিয়ামিনের ব্যাপারেও কি আমি তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? কিন্তু বলার পর অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের তওবার কথা জেনে তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন এবং ছোট ছেলেকে তাদের হাতে সৈন্দ দিয়েছেন।

মাসআলা : (৪) কোন মানুষের ওয়াদা ও হেফাযতের আশ্রয়ে উপর সত্যিকারভাবে ভরসা করা ভুল। প্রকৃত ভরসা শুধু আল্লাহর উপর হওয়া উচিত। তিনিই সত্যিকার কার্যনির্বাহী এবং কারণ উদ্ভাবক। কার সরবরাহ করা অতঃপর তাতে ক্রিয়াক্ষমতা দান করার ক্ষমতা তাঁরই। এ কারণেই ইয়াকুব (আঃ) বললেন :

فَاللَّهُ خَيْرٌ مِنْهُمَا

কা'বে আহ্বার বলেন : এবার ইয়াকুব (আঃ) শুধু ছেলদের উপর ভরসা করেননি, বরং ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করেছেন। তাঁর আল্লাহ বললেন : আমার ইয়াকুব ও প্রত্যাপের কসম, এখন আমি আপনার উভয় সন্তানকেই আপনার কাছে ফেরত পাঠাব।

মাসআলা : (৫) যদি অন্য ব্যক্তির মাল অথবা কোন ষা আসবাব-পত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এবং বলিষ্ঠ আলামত দূরা বোঝা যায় যে, সে তাকে দেয়ার জন্যে ইচ্ছাপূর্বক আসবাব-পত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছে, তবে তা গ্রহণ করা এবং তাকে নিজ কাজে ব্যয় করা জায়েয। ইউসুফ-ভ্রাতাদের আসবাবপত্রের মধ্যে যে পণ্যমূল্য পাওয়া গিয়েছিল সে সম্পর্কে বলিষ্ঠ আলামতের সাক্ষ্য ছিল এই যে, ভুল অথবা অনিচ্ছাপূর্বক তা হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বকই তা ফেরত দেয়া হয়েছে। তাই ইয়াকুব (আঃ) তা ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেননি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভুলবশতঃ এর যাওয়ার সন্দেহ থাকে, সেখানে মালিকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা বাস্তব তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

মাসআলা : (৬) কোন ব্যক্তিকে এরূপ কসম দেয়া উচিত নয়, যা পূর্ণ করা তার সাধ্যাতীত। যেমন, ইয়াকুব (আঃ) বেনিয়ামিনকে সুপ নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কসম দেয়ার সাথে সাথে একটি অক্ষম ব্যতিক্রম প্রকাশ করেছেন যে, যদি তারা সম্পূর্ণ অপারগ ও অক্ষম হত

কিংবা সবাই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তবে ভিন্ন কথা।

এ কারণেই রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন সাহাবায়ে-কেরামের কাছ থেকে আনুগত্যের অঙ্গীকার নেন, তখন নিজেই তাতে 'সাধ্যের শর্ত' যুক্ত করেন। অর্থাৎ, আমরা সাহাবানুযায়ী আপনার পুরোপুরি আনুগত্য করি।

রাসআলা : (৭) ইউসুফ-ব্রাতাদের কাছ থেকে একরূপ অঙ্গীকার নেয়া যে, তারা বেনিয়ামিনকে ফিরিয়ে আনবে — এ থেকে বোঝা যায় যে, (ব্যক্তির জামানত) বৈধ। অর্থাৎ, কোন মোকদ্দমার ক্ষমতাকে মোকদ্দমার তারিখে আদালতে হাযির করার জামানত নেয়া যায়।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে ইউসুফ-ব্রাতাদের মিসর শহরের সফরের কথা বর্ণিত হয়েছে। তখন ইয়াকুব (আঃ) মিসর শহরে প্রবেশ করার জন্যে একটি বিশেষ উপদেশ দেন। তেমনটা এগারো ভাই শহরের একই প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, নর-প্রাচীরের কাছে পৌঁছে ছড়ভক্ত হয়ে যেয়ো এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করো।

এরূপ উপদেশ দানের কারণ এই আশঙ্কা ছিল যে, স্বাস্থ্যবান, সূঠামুঠা, সুদর্শন এবং রূপ ও ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী এসব যুবক সম্পর্কে যখন লোকেরা জানবে যে, এরা একই পিতার সন্তান এবং ভাই ভাই, তখন ক্রোধ বদ নজর গেলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। অথবা সঙ্গবদ্ধভাবে প্রবেশ করার কারণে হয়তো কেউ হিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

ইয়াকুব (আঃ) তাদেরকে প্রথম সফরের সময় এরূপ উপদেশ দেননি; দ্বিতীয় সফরের প্রাক্কালেই দিয়েছেন। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, প্রথমবার তারা মুসাকিরের বেশে এবং দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় মিসরে প্রবেশ করতেন। কেউ তাদেরকে চিনত না এবং তাদের প্রতি কারও অতিরিক্ত মনোযোগ দানের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু প্রথম সফরেই মিসর-সম্রাট তাদের প্রতি অসামান্য সন্মান প্রদর্শন করেন। ফলে সাধারণ রাজকর্মচারী ও শহরবাসীদের কাছে তারা পরিচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং এখন কারও ক্ষতি লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠে, কিংবা সবাইকে একটি ঐকমত্যকর্মপূর্ণ দল মনে করে হয়ত কেউ হিংসায় মেতে উঠতে পারে। এছাড়া এবারকার সফরে ছোট পুত্র বেনিয়ামিন সঙ্গে থাকাও তাদের প্রতি পিতার অধিকতর মনোযোগ দানের কারণ হতে পারে।

কুদৃষ্টির প্রভাব সত্য : এতে বোঝা গেল যে, মানুষের চোখ (কুদৃষ্টি) লাগা এবং এর ফলে অন্য মানুষ অথবা জন্তু জানোয়ারের কষ্ট কিংবা ক্ষতি হওয়া সত্য। এটা মূর্তাসুলভ কুসংস্কার নয়। এ কারণেই ইয়াকুব (আঃ) এ থেকে পুত্রদের রক্ষার চিন্তা করেছেন।

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-ও একে সত্যায়িত করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন : কুদৃষ্টি মানুষকে কবরে এবং উটকে উনানে ঢুকিয়ে দেয়। এ কারণেই রসুলুল্লাহ (সাঃ) যেসব বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং উদ্দেশ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, তন্মধ্যে **لا عين لا ماله** ও রয়েছে। অর্থাৎ, আমি কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।—(কুরতুবী)

ইয়াকুব (আঃ) একদিকে কুদৃষ্টি অথবা হিংসার আশঙ্কাবশতঃ লোকদেরকে একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন এবং অন্যদিকে একটি বাস্তব সত্য প্রকাশ করাও জরুরী মনে করেছেন। এ সত্যের প্রতি ঔদাসীন্যের ফলে এ জাতীয় ব্যাপারাদিতে জনসাধারণ

মূর্তাসুলভ ধারণা ও কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়ে। সত্যটি এই যে, কোন মানুষের জ্ঞান ও মালের মধ্যে কুদৃষ্টির প্রভাব এক প্রকার মেসমেরিজম। ক্ষতিকর ঔষধ কিংবা খাদ্য যেমন মানুষকে অসুস্থ করে দেয় এবং শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতায় রোগব্যাধি জন্ম নেয়, তেমনি কুদৃষ্টি ও মেসমেরিজমের প্রভাবও এসব অভ্যস্ত কারণের অধীন। দৃষ্টি অথবা কল্পনার শক্তি বলে এদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। স্বয়ং এদের মধ্যে কোন সত্যিকার প্রভাবশক্তি নাই। বরং সব কারণ আল্লাহ তাআলার অপার শক্তি, ইচ্ছা ও এরাদায় অধীন। আল্লাহর তকদীরের বিপরীতে কোন উপকারী তদবীরে উপকার হতে পারে না এবং ক্ষতিকর তদবীরের ক্ষতির প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই ইয়াকুব (আঃ) বলেছেন :

وَمَا أُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أُمِرُوا إِلَّا لِيُحْذَرُوا

تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

অর্থাৎ, কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার যে তদবীর আমি বলেছি, আমি জানি যে, তা আল্লাহর ইচ্ছাকে এড়াতে পারবে না। আদেশ একমাত্র আল্লাহরই চলে। তবে মানুষের প্রতি বাহ্যিক তদবীর করার নির্দেশ আছে। তাই এ উপদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তদবীরের উপর ভরসা করি না; বরং আল্লাহর উপরই ভরসা করি। তাঁর উপরই ভরসা করা এবং বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীরের উপর ভরসা না করা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

ইয়াকুব (আঃ) যে সত্য প্রকাশ করেছেন, ঘটনাচক্রে হয়েছেও কিছুটা তেমনি। এ সফরেও বেনিয়ামিনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার যাবতীয় তদবীর চূড়ান্ত করা সত্ত্বেও সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং বেনিয়ামিনকে মিসরে আটকে রাখা হয়েছে। ফলে ইয়াকুব (আঃ) আরও একটি আঘাত পেলেন। তাঁর তদবীরের ব্যর্থতা পরবর্তী আয়াতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য তাই যে, আসল লক্ষ্যের দিক দিয়ে তদবীর ব্যর্থ হয়েছে, যদিও কুদৃষ্টি হিংসা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার তদবীর সফল হয়েছে। কারণ, সফরে অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে যে দুর্ঘটনা অনিবার্য ছিল, ইয়াকুব (আঃ)-এর দৃষ্টি সেদিকে যায়নি এবং এর জন্যে কোন তদবীর করতে পারেননি। এ বাহ্যিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আল্লাহর উপর ভরসার বরকতে এ দ্বিতীয় আঘাত প্রথম আঘাতেরও প্রতিকার প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিণামে পরম নিরাপত্তা ও ইয়তের সাথে ইউসুফ ও বেনিয়ামিন উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছে।

পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই বর্ণিত হয়েছে যে, ছেলেরা পিতার আদেশ পালন করে বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। ফলে পিতার নির্দেশ কার্যকর হয়ে গেল। অবশ্য এ তদবীর আল্লাহর কোন নির্দেশকে এড়াতে পারত না, কিন্তু পিতৃ-সুলভ স্নেহ-মমতার চাহিদা ছিল যা, তা তিনি পূর্ণ করেছেন।

এ আয়াতের শেষভাগে ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলা হয়েছে—

وَأَنذَرْتَهُمْ وَأَمَرَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ

— অর্থাৎ, ইয়াকুব (আঃ) বড় বিদ্বান ছিলেন, কারণ, আমি তাঁকে বিদ্যা দান করেছিলাম। উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ লোকদের ন্যায় তাঁর বিদ্যা পুঁথিগত ও অনুশীলনলব্ধ নয় বরং তা ছিল সরাসরি আল্লাহর দান। এ কারণেই তিনি শরীয়তসম্মত ও প্রশংসনীয় বাহ্যিক তদবীর অবলম্বন করলেও তার উপর ভরসা করেননি। কিন্তু অনেক লোক এ সত্য জানে না

এবং অজ্ঞাতবশতঃ ইয়াকুব (আঃ) সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে যে, একজন পয়গম্বরের পক্ষে এ জাতীয় তদবীর শোভনীয় ছিল না।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : প্রথম শব্দটি দ্বারা এলম অনুযায়ী আমল করা বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তাঁকে যে এলম দিয়েছিলাম তিনি তদনুযায়ী আমল করতেন। এ কারণেই বাহ্যিক তদবীরের উপর ভরসা করেননি ; বরং একমাত্র আত্মাহ্বার উপরই ভরসা করেছেন।

وَلَمَّا دَعَا إِلَىٰ يَوْسُفَ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَابِدُ اللَّهِ

অর্থাৎ, মিসরে পৌঁছার পর যখন সব ভাই ইউসুফ (আঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হল এবং তিনি দেখলেন যে, ওয়াদা অনুযায়ী তারা তাঁর সহোদর ছোট ভাইকেও নিয়ে এসেছে, তখন ইউসুফ (আঃ) ছোট ভাই বেনিয়ামিনকে বিশেষভাবে নিজের সাথে রাখলেন। তফসীরবিদ কাতাদাহ বলেন : সব ভাইয়ের বসবাসের ব্যবস্থা করে ইউসুফ (আঃ) প্রতি দু'জনকে একটি করে কক্ষ দিলেন। ফলে বেনিয়ামিন একা থেকে যায়। ইউসুফ তাকে নিজের সাথে অবস্থান করতে বললেন। যখন উভয়েই একান্তে গেলেন, তখন ইউসুফ (আঃ) সহোদর ভাইয়ের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন : আমিই তোমার সহোদর ভাই ইউসুফ এখন তোমার কোন চিন্তা নেই। অন্য ভাইগণ এ যাবত যেসব দুর্ব্যবহার করেছে, তজ্জন্যে মনোকষ্টে পতিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই।

নির্দেশ ও মাসআলা : আলোচ্য দু'আয়াত থেকে কতিপয় মাসআলা ও নির্দেশ জানা যায়।

(১) বদ নজর লাগা সত্য। সূতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ক্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করার ন্যায় এ থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করাও সমভাবে শরীয়তসিদ্ধ।

(২) প্রতিহিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিশেষ নেয়ামত ও গুণগত বৈশিষ্ট্যকে গোপন রাখা দুরন্ত।

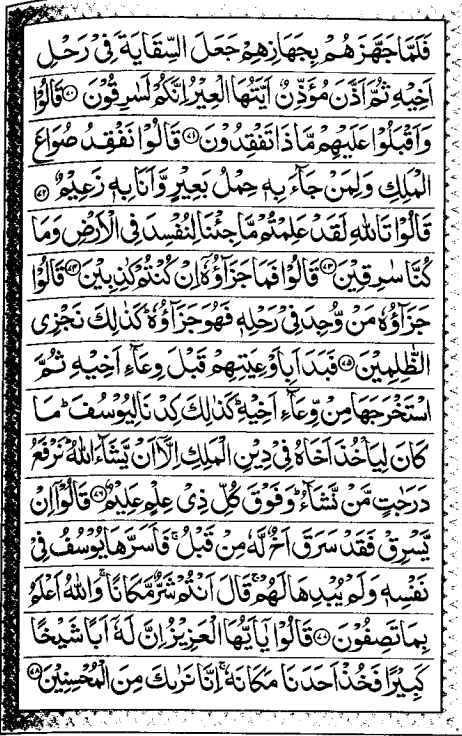
(৩) ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীর করা তাওয়াক্কুল ও পয়গম্বুরগণের পদমর্যাদার পরিপন্থী নয়।

(৪) যদি কেউ অন্য কারও সম্পর্কে আশঙ্কা পোষণ করে যে, সে দুঃখ-কষ্টে পতিত হবে, তবে তাকে অবহিত করা এবং দুঃখ কষ্টের হাত থেকে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য উপায় বলে দেয়া উত্তম, যেমন ইয়াকুব (আঃ) করেছিলেন।

(৫) যদি অন্য কারও কোন গুণ অথবা নেয়ামত দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ঠেকে এবং নজর লেগে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে তা দেখে **اللَّهُ** অথবা **مَا شَاءَ اللَّهُ** বলা দরকার, যাতে অন্যের কোন ক্ষতি না হয়।

(৬) নজর লাগা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে যে কোন সম্ভাব্য তদবীর করা জায়েয। তন্মধ্যে দোয়া-তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা প্রতিকার করাও অন্যতম; যেমন রসূলুল্লাহ (সঃ) জা'ফর ইবনে আবুতালেবের দু'হেলেখে দুর্বল দেখে তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

(৭) বিজ্ঞ মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক কাজে আসল ভরসা আত্মাহ্বার উপর রাখা। কিন্তু বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক উপায়াদিকেও উপক্ষে করবে না এবং সাধ্যানুযায়ী বৈধ উপায়াদি অবলম্বন করতে ক্রটি করবে না। ইয়াকুব (আঃ) তাই করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ ও (সঃ) তাই শিক্ষা দিয়েছেন।



- (১০) অতঃপর যখন ইউসুফ তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিল, তখন পানপাত্র আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিল। অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বলল : হে কাফেলার লোকজন, তোমরা অবশ্যই চোর। (১১) তারা গুদের দিকে মুখ করে বলল : তোমাদের কি হারিয়েছে? (১২) তারা বলল : আমরা বাদশাহ্র পানপাত্র হারিয়েছি এবং যে কেউ এটা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এর যামিন। (১৩) তারা বলল : আল্লাহ্র কসম, তোমরা তো জান, আমরা অনর্থকীতে এদেশে আসিনি এবং আমরা কখনও চোর ছিলাম না। (১৪) তারা বলল : যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে যে চুরি করেছে তার কি শাস্তি? (১৫) তারা বলল : এর শাস্তি এই যে, যার রসদপত্র থেকে তা পাওয়া যাবে, এর প্রতিদানে সে দাসত্ব যাবে। আমরা যালেমদেরকে এভাবেই শাস্তি দেই। (১৬) অতঃপর ইউসুফ আপন ভাইদের ধলের পূর্বে তাদের ধলে তল্লাশী শুরু করলেন। অবশেষে সেই পাত্র আপন ভাইয়ের ধলের মধ্যে থেকে বের করলেন। এমনভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। সে বাদশাহ্র আইনে আপন ভাইকে কখনও দাসত্ব দিতে পারত না, কিন্তু আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন। আমি যাকে ইচ্ছা, মর্যাদায় উন্নীত করি এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরে আছে অধিকতর এক জ্ঞানীজন। (১৭) তারা বলতে লাগল : যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে রাখলেন এবং তাদেরকে জানানলেন না। মনে মনে বললেন : তোমরা লোক হিসাবে নিতান্ত মন্দ এবং আল্লাহ্র খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যা তোমরা বর্ণনা করছ; (১৮) তারা বলতে লাগল : হে আযীয, তার পিতা আছেন, যিনি খুবই বৃদ্ধ-বয়স্ক। সুতরাং আপনি আমাদের একজনকে তার বদলে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অনুগ্রহশীল ব্যক্তিদের একজন দেখতে পাচ্ছি।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সহোদর ভাই বেনিয়ামিনকে রেখে দেয়ার জন্যে ইউসুফ (আঃ) একটি কৌশল ও তদবীর অবলম্বন করলেন। যখন সব ভাইকে নিয়ম মারফিক খাদ্যশস্য দেয়া হল, তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের পিঠে পৃথক পৃথক নামে চাপানো হল।

বেনিয়ামিনের যে খাদ্য শস্য উটের পিঠে চাপানো হল, তাতে একটি পাত্র গোপনে রেখে দেয়া হল। কোরআন পাক এ পাত্রটিকে এক জায়গায় 'السِّقَايَةَ' শব্দের দ্বারা এবং অন্যত্র 'السِّقَايَةَ' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। 'السِّقَايَةَ' শব্দের অর্থ পানি পান করার পাত্র এবং 'صَوَاعَ' শব্দটিও এমনি ধরনের পাত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়। একে 'ملك' তথা বাদশাহ্র দিকে নির্দেশিত করার ফলে আরও জানা গেল যে, এ পাত্রটি বিশেষ মূল্যবান ও মর্যাদাবান ছিল। কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে যে, পাত্রটি 'যবরজদ' পাথর দ্বারা নির্মিত ছিল। আবার কেউ স্বর্ণ নির্মিত এবং রৌপ্য নির্মিতও বলেছেন। মোটকথা, বেনিয়ামিনের রসদপত্র গোপনে রক্ষিত এ পাত্রটি যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া ছাড়াও বাদশাহ্র সাথে এর বিশেষ সম্পর্কও ছিল। বাদশাহ্র নিজে তা ব্যবহার করতেন, অথবা বাদশাহ্র আদেশে তা খাদ্যশস্য পরিমাপের পাত্ররূপে ব্যবহৃত হত।

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَتَتْهَا الْعِيرُ إِنَّهُمْ لَسَارِقُونَ — অর্থাৎ,

কিছুক্ষণ পর জ্ঞৈক ঘোষক ডেকে বলল : হে কাফেলার লোকজন, তোমরা চোর।

এখানে 'ثم' শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, এ ঘোষণা তৎক্ষণাৎ করা হয়নি; বরং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর করা হয়েছে—যাতে কেউ জালিয়াতির সন্দেহ না করতে পারে। মোটকথা, ঘোষক ইউসুফ—ভ্রাতাদের কাফেলাকে চোর আখ্যা দিল।

قَالُوا وَاقْبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ — অর্থাৎ ইউসুফ—ভ্রাতাগণ

ঘোষণাকারীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল : তোমরা আমাদেরকে চোর বলছ। প্রথমে একথা আমাদের বল যে, তোমাদের কি বস্তু চুরি হয়েছে?

قَالُوا تَفْقَدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

— ঘোষণাকারীগণ বলল, বাদশাহ্র পানপাত্র হারিয়ে গেছে। যে ব্যক্তি তা বের করে দেবে সে এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যশস্য পুরস্কার পাবে এবং আমি এর জামিন।

এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, ইউসুফ (আঃ) বেনিয়ামিনকে আটকানোর জন্যে এ কৌশল কেন করলেন, অথচ তিনি জানতেন যে, স্বয়ং তাঁর বিচ্ছেদের আঘাত পিতার জন্যে অসহনীয় ছিল? এমতাবস্থায় অপর ভাইকে আটকে তাঁকে আরও একটি আঘাত দেয়া তিনি কিরূপে পছন্দ করলেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ। তা এই যে, নিরপরাধ ভাইদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা, গোপনে তাদের আসবাব-পত্রের মধ্যে কোন বস্তু রেখে দেয়ার মত জালিয়াতি, কথা এবং প্রকাশ্যে তাদেরকে লালিত করা—এসব কাজ অবৈধ। আল্লাহ্র পয়গম্বর ইউসুফ (আঃ) এগুলো কিভাবে সহ্য করলেন?

কুর্তুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন : বেনিয়ামিন যখন ইউসুফ

(আঃ)-কে নিশ্চিতরূপে চিনে ফেলে, তখন সে নিজেই ভাইকে অনুরোধ করে যে, তাকে যেন ভাইদের কাছে ফেরত পাঠানো না হয়; বরং ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে রাখা হয়। ইউসুফ (আঃ) প্রথমে এ অজুহাতই পেশ করলেন যে, তাকে এখানে রাখা হলে পিতার মনোকষ্টের অন্ত থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ তাকে এখানে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করতঃ আটক রাখা। বেনিয়ামিন ভাইদের সাথে বসবাস করতে এতই নারাজ ছিল যে, সে এ জাতীয় প্রস্তাবেও সম্মত হয়ে যায়।

কিন্তু এ ঘটনা সত্য হলেও পিতার মনোকষ্ট, ভাইদের লাঞ্ছনা এবং তাদেরকে চোর বলা শুধু বেনিয়ামিনের সম্মতির কারণে বৈধ হতে পারে না। কেউ কেউ কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ঘোষক বোধ হয় ইউসুফ (আঃ)-এর অজ্ঞাতসারে এবং বিনা অনুমতিতে ভাইদের চোর বলেছিল। এ উক্তি যেমন প্রমাণহীন, তেমনি ঘটনার সাথে বে-খান্না। এমনভাবে কেউ কেউ বলেন : ভ্রাতাগণ ইউসুফ (আঃ)-কে পিতার কাছ থেকে চুরি করে বিক্রয় করেছিল। তাই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। এটাও একটা নিছক ব্যাখ্যা বৈ নয়। অতএব, এসব প্রশ্নের বিসৃদ্ধ উত্তর তা'ই - যা কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ গ্রন্থকার দিয়েছেন। তা এই যে, এ ঘটনায় যা করা হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে, তা বেনিয়ামিনের বাসনার ফলশ্রুতিও ছিল না এবং ইউসুফ (আঃ)-এর প্রস্তাবের ফলও ছিল না; বরং এসব কাজ ছিল আল্লাহর নির্দেশে তাঁরই অপার রহস্যের বহিঃপ্রকাশ। এসব কাজের মাধ্যমে ইয়াকুব (আঃ)-এর পরীক্ষার বিভিন্তর পূর্ণতা লাভ করছিল। এ উত্তরের প্রতি স্বয়ং কোরআনের এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে।
كَذَلِكَ يَكْنُزُكَ نَالِيُوسُفَ - অর্থাৎ, আমি ইউসুফের খাতিরে এমনভাবে তার ভাইকে আটকানোর কৌশল করেছি।

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে এ ফন্দি ও কৌশলকে আল্লাহ তাআলা নিজের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, এসব কাজ যখন আল্লাহর নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে, তখন এগুলোকে অবৈধ বলার কোন মানে নাই। এগুলো মুসা ও যিযিরের ঘটনায় নোকা ভাঙ্গা, বালককে হত্যা করা ইত্যাদির মতই। এগুলো বাহ্যতঃ গোনাহর কাজ ছিল বলেই মুসা (আঃ) তা মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু যিযির (আঃ) সব কাজ আল্লাহর নির্দেশে বিশেষ উপযোগিতার অধীনে করে যাচ্ছিলেন। তাই এগুলো গোনাহের কাজ ছিল না।

قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْتُمُوْا فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سِرْقِيْنَ

অর্থাৎ, শাহী ঘোষক যখন ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতাদেরকে চোর বলল, তখন তারা উত্তরে বলল : সভাসদবর্গও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন যে, আমরা এখানে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই।

قَالُوا اَجَزَاؤُكُمْنَ الْاَرْضَ كُنْتُمْ سِرْقِيْنَ - রাজকর্মচারীরা বললল : যদি তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি শাস্তি?

قَالُوا اَجَزَاؤُهُ مَن وَجِدَ فِيْ حَبْلِهِ فَهَؤُجَزَاؤُهُ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْظٰلِمِيْنَ

অর্থাৎ, ইউসুফের ভ্রাতাগণ বলল : যার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে নিজেই দাসত্ব বরণ করবে। আমরা চোরকে এমন ধরনের সাজা দেই।

উদ্দেশ্য, ইয়াকুব (আঃ)-এর শরীয়তে চোরের শাস্তি এই যে, যার মাল চুরি করে সে চোরকে গোলাম করে রাখবে। রাজকর্মচারীরা এভাবে স্বয়ং ভ্রাতাদের কাছ থেকে ইয়াকুবী শরীয়ত অনুযায়ী চোরের শাস্তি জেনে নিল, যাতে বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হলে তারা নিজেদেরই ফয়সালা অনুযায়ী তাকে ইউসুফ (আঃ)-এর হাতে সোপর্দ করতে বাধ্য হয়।

فَبَدَّلَ اَيُّوْبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَوَعَدَ اَخِيْهٖ

প্রকৃত ষড়যন্ত্র ঢেকে রাখার জন্যে প্রথমেই অন্য ভাইদের আসবাবপত্র তালিশ করল। প্রথমেই বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র খুলল না, যাতে তাদের সন্দেহ না হয়।

ثُمَّ اسْتَعْرِجْنَا مِنْ وَّعْدِ اَخِيْهٖ

অর্থাৎ, সব শেষে বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র খোলা হলে তা থেকে শাহীপত্রটি বের হয়ে এল।

তখন ভাইদের অবস্থা দেখে কে? লজ্জায় সবার মাথা হেঁট হয়ে গেল। তারা বেনিয়ামিনকে গাল-মন্দ দিয়ে বলল : তুমি আমাদের মুখে চুনকালি দিলে।

كَذٰلِكَ يَكْنُزُكَ نَالِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَاخُوْذَ لَخٰفَ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّا

اَنْ يَّسْأَلَ اللّٰهَ - অর্থাৎ, এমনভাবে আমি ইউসুফের খাতিরে

কৌশল করেছি। তিনি বাদশাহর আইনানুযায়ী ভাইকে গ্রেফতার করতে পারতেন না। কেননা, মিসরের আইনে চোরকে মারপিট করে এবং চোরাই মালের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে ছেড়ে দেয়ার বিধান ছিল। কিন্তু তারা এখানে ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছ থেকেই ইয়াকুবী শরীয়তানুযায়ী চোরের বিধান জেনে নিয়েছিল। এ বিধান দৃষ্টে বেনিয়ামিনকে আটকে রাখা বৈ হয়ে গেল। এমনভাবে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় ইউসুফ (আঃ)-এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

رَفَعْنَا رَدِّيْكَ مِنْ شَاْءٍ وَوَقَّوْا لِحٰثِ دِيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

আমি যাকে ইচ্ছা, উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে দেই, যেমন এ ঘটনায় ইউসুফের মর্যাদা তাঁর ভাইদের তুলনায় উচ্চ করে দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরই তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বিদ্যমান রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞানের দিক দিয়ে সৃষ্টজীবের মধ্যে একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। একজন যত বড় জ্ঞানীই হোক, তার মোকাবিলায় আরও অধিক জ্ঞানী থাকে। মানব জাতির মধ্যে যদি কেউ এমন হয় যে, তার চাইতে অধিক জ্ঞানী আর নেই, তবে এ অবস্থায়ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জ্ঞান সবারই উর্ধ্বে।

নির্দেশ ও মাসআলা :

(১) وَلَمِنْ جَآئِمٍ جَلِيْلٍ يَعْلَمُ - আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেল নির্দিষ্ট কাজের জন্যে মজুরী কিংবা পুরস্কার নির্ধারণ করে যদি এই মর্মে ঘোষণা দান করা হয় যে, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, সে এই পরিমাণ পুরস্কার কিংবা মজুরী পাবে, তবে তা জায়েয হবে; যেদ অপরাধীদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিংবা হারানো বস্তু ফেরত দেয়ার জন্যে এ ধরনের পুরস্কার-ঘোষণা সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। যদিও এ জাতীয় লেন-দেন ফিকাহ শাস্ত্রে বর্ণিত ইজারার সংজ্ঞানুরূপ নয়, তথাপি এ আয়াতদৃষ্টে তার বৈধতা প্রমাণিত হয়।—(কুরতুবী)

(২) وَكَانَ يَمُوعِيْمُ - দ্বারা বোঝা গেল যে, একজন অন্যজনের পক্ষ আর্থিক অধিকারের যামিন হতে পারে। সাধারণ ফিকাহবিদদের মতে এ

আমাদের বিধান এই যে, প্রাপক আসল দেনাদার কিংবা যামিন এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একজনের কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করে নিতে পারে। যদি যামিনের কাছ থেকে আদায় করা হয়, তবে সে দেনা পরিমাণ আসল দেনাদারের কাছ থেকে নিয়ে নেবে।— (কুরতুবী)

(৩) كَذٰلِكَ يُدۡرِکُكَ الْیُّسُفُ — থেকে জানা গেল যে, কোন শরীয়তসম্মত উপযোগিতার ভিত্তিতে যদি লেন-দেনের আকারে এমন পরিবর্তন করা হয়, যার ফলে বিধান পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে তা আইনতঃ জায়েয হবে। ফিকাহবিদদের পরিভাষায় একে حيلة (হীলা) বলা হয়। এর জন্য শর্ত এই যে, এর ফলে যেন শরীয়তের কোন বিধান বাতিল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শরীয়তের বিধান বাতিল হয়ে যায়—এরূপ হীলা সর্বসম্মতভাবে হারাম। যেমন যাকাত থেকে গা বাচানোর জন্যে কোন হীলা করা অথবা রমযানের পূর্বে কোন আবাব্যাক সফরে বের হয়ে পড়া—যাতে রোযা না রাখার অভ্যুহাত সৃষ্টি হয়। এরূপ করা সর্বসম্মতভাবে হারাম। এ জাতীয় হীলা করার কারণে কোন কোন জাতি আধাবে নিপতিত হয়েছে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ হীলা করতে নিষেধ করেছেন। এরূপ হীলার আশ্রয় নিলে কোন অবৈধ কাজ বৈধ হয়ে যায় না; বরং পাপের মাত্রা দ্বিগুণ হয়। এক পাপ আসল অবৈধ কাজের এবং দ্বিতীয় পাপ অবৈধ হীলার, যা একদিক দিয়ে আল্লাহ ও রসুলের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নামাশ্রয়। ইমাম বুখারী الحیل کتاب তথা হীলা অধ্যায়ে এ জাতীয় হীলার অবৈধতা প্রমাণ করেছেন।

اِنْ یُّسُوفُ فَقَدْ سَرَقَ اَرْبَعًا وَّعِشْرَ مِائَةً — অর্থাৎ, সে যদি চুরি করে থাকে তাতে আশ্চর্যের কি আছে। তার এক ভাই ছিল, সেও এমনভাবে হস্তিপূর্বে চুরি করেছিল। উদ্দেশ্য এই যে, সে আমাদের সহোদর ভাই নয়—বৈমাশ্রয় ভাই। তার এক সহোদর ভাই ছিল সে-ও চুরি করেছিল।

ইউসুফ—ব্রাতারা এখন স্বয়ং ইউসুফ (আঃ)—এর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। এতে ইউসুফ (আঃ)—এর শৈশবকালীন একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে বেনিয়ামিনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উত্থাপনের জন্যে যেভাবে চক্রান্ত করা হয়েছে, তখন হুবহু তেমনিভাবে ইউসুফ (আঃ)—এর বিরুদ্ধেও তার অজ্ঞাতে চক্রান্ত করা হয়েছিল। তখন এই ব্রাতারা ভালোভাবেই জানত যে, উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে ইউসুফ (আঃ) সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু এখন বেনিয়ামিনের প্রতি আক্রোশের আধিক্যবশতঃ সে ঘটনাটিকে চুরি আখ্যা দিয়ে ইউসুফ (আঃ)—কেও তাতে অভিযুক্ত করে দিয়েছে।

ঘটনাটি কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়াজে বর্ণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও মুজাহিদদের বরাতে দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ (আঃ)—এর জন্মের পর কিছুকালের মধ্যেই বেনিয়ামিন জনগ্রহণ করে। ফলে এ সম্ভ্রান্তসবই জননীর মৃত্যুর কারণ হয়। ইউসুফ ও বেনিয়ামিন উভয়েই মাতৃহীন হয়ে পড়লেন। তাদের লালন-পালন ফুফুর কোলে সম্পন্ন হতে লাগল। আল্লাহ তাআলা ইউসুফ (আঃ)—কে শিশুকাল থেকেই এমন রূপ-সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাকে যেই দেখত, সেই আদর করতে বাধ্য হত। ফুফুর অবস্থাও ছিল তাই। তিনি এক মুহুরের জন্যেও তাকে দৃষ্টি থেকে দূর হতে দিতেন না এবং দিতে পারতেন না। এদিকে পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ)—এর অবস্থাও এর চাইতে কম ছিল না। কিন্তু কচি শিশু হওয়ার কারণে কোন মহিলার রক্ষণাবেক্ষণ থাকা সম্ভব নয়। তাই ফুফুর হাতে সমর্পণ করে দেন। শিশু যখন চলাফেরার

যোগ্য হয়ে গেল, তখন ইয়াকুব (আঃ) তাকে নিজের সাথেই রাখতে চাইলেন। ফুফুর একথা বললে প্রথমে আপত্তি করলেন। অতঃপর অধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ইউসুফকে পিতার হাতে সমর্পণ করলেন। কিন্তু ফেরত নেয়ার জন্যে গোপনে একটি ফন্দি আঁটলেন। ফুফু হযরত ইসহাক (আঃ)—এর কাছ থেকে একটি হাঁসুলি পেয়েছিলেন। এটিকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করা হত। ফুফু এই হাঁসুলিটিই ইউসুফ (আঃ)—এর কাপড়ের নীচে কোমরে বেঁধে দিলেন।

ইউসুফ (আঃ)—এর চলে যাওয়ার পর ফুফু জোরেশোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার হাঁসুলি চুরি হয়ে গেছে। অতঃপর তল্লাশী নেয়ার পর ইউসুফ (আঃ)—এর কাছ থেকে তা বের হল। ইয়াকুবী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ফুফু ইউসুফকে গোলাম করে রাখার অধিকার পেলেন। ইয়াকুব (আঃ) যখন দেখলেন যে, আইনতঃ ফুফু ইউসুফের মালিক হয়ে গেছেন, তখন তিনি দ্বিধাক্কা না করে ইউসুফকে তার হাতে সমর্পণ করলেন। এরপর যতদিন ফুফু জীবিত ছিলেন, ইউসুফ (আঃ) তার কাছেই রইলেন।

এই ছিল ঘটনা, যাতে ইউসুফ (আঃ) চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর সবার কাছেই এ সত্য দিবালোকের মত ফুটে উঠেছিল যে, ইউসুফ (আঃ) চুরির এতটুকু সন্দেহ থেকেও মুক্ত ছিলেন। ফুফুর আদরই তাঁকে ঘিরে এ চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছিল। এ সত্য ভাইদেরও জানা ছিল। এদিক দিয়ে ইউসুফ (আঃ)—কে কোন চুরির ঘটনার সাথে জড়িত করা তাদের পক্ষে শোভনীয় ছিল না। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে তাদের যে বাড়াবাড়ি ও অবৈধাচারণ আজ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, এটা তারই সর্বশেষ অংশ ছিল।

فَاسَرَّهَا یُوسُفُ فِی نَفْسِهِ وَلَمْ یُبْدِهَا لَهُمْ — অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) ভাইদের কথা শুনে একথা মনে মনেই রাখলেন যে, এরা দেখি এখনও পর্যন্ত আমার পেছনে লেগে রয়েছে। এখনো তারা আমাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করছে। কিন্তু তিনি ভাইদের কাছে একথা প্রকাশ হতে দিলেন না যে, তিনি তাদের একথা শুনেছেন এবং তদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

قَالَ اَنْتُمْ سَرَقْتُمْ اَنَا وَاللّٰهِ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ — অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) মনে মনে বললেন : তোমাদের স্তর ও অবস্থাই মন্দ যে, জেনে শুনে ভাইদের প্রতি চুরির দোষারোপ করছ। আরও বললেন : তোমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন। প্রথম বাক্যটি মনে মনে বলেছেন এবং দ্বিতীয় বাক্যটি সম্ভবতঃ জোরেই বলছেন।

قَالُوا اَیُّهَا الْعَرَبُ اِنَّ لَکَ اِلٰهًا شَیْخًا کَرِیْمًا فَخُذْ حَذٰکَ مَکَانَ
اِنَّ اَعْرَکَ مِنَ الْمُنِیْنِ

ইউসুফ ব্রাতারা যখন দেখল যে, কোন চেষ্টাই ফলবতী হচ্ছে না এবং বেনিয়ামিনকে এখানে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই; তখন তারা প্রার্থনা জানাল যে, এর পিতা নিরতিশয় বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল। এর বিচ্ছেদের যাতনা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আপনি এর পরিবর্তে আমাদের কাউকে গ্রহণ করার করে নিন। আমরা দেখছি, আপনি খুবই অনুগ্রহশীল। এ ভরসায়ই আমরা এ প্রার্থনা জানাচ্ছি। অথবা অর্থ এই যে, আপনি পূর্বেও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

১২ يوسف

২২৭

১৩ وما يروى

আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنْ تَأْخُذَ الْاِمْنُ وَحْدًا مَتَاعًا غِنَاكَ
 اِنْ اِذَا اَظْلَمُوتُمْ ۝ قَالَا اَسْتَيسُوْا اِمْنًا خَلَصُوْا نَجِيًّا
 قَالَ كَيْفَ يُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا اَنْ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ
 مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا تَرْتَضِيْنَ فِيْ يُّوسُفَ قُلْنَ
 اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَأْذَنَ لِيْ اِنِّىْ اَوْحَيْتُكَ لِلَّهِ لِيْ وَهُوَ
 خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝ رَجِعُوْا اِلٰى اٰبِيْكُمْ فَقُولُوْا يَا اَبَانَا اِنَّ
 اِبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا
 لِلْغَيْبِ حٰظِيْنَ ۝ وَسَّالَ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا
 وَالْعَزِيْزَ الَّتِيْ اَقْبَلْنَا فِيْهَا وَكُلَّ الصّٰدِقُوْنَ ۝ قَالَ بَلْ
 سَوَّيْتُ لَكُمْ اَنْفُسَكُمْ اَمْرًا اَصْبَحْتُمْ بِهَا ۝ اَعْنٰى اللَّهُ اَنْ
 يَّاتِيَنِيْ بِهِمْ جَبِيْعًا اَلَمْ يَكُنْ لَّهِ الْوَلٰئِمُ الْحَكِيْمُ ۝ وَكُوْلُ
 عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ اَسْفٰى عَلَى يُّوسُفَ وَاَبْصَحْتَ عَلَيْهِ مِنْ
 الْحَزَنِ فَهُمْ يَكْظِمُوْنَ ۝ قَالُوْا اِنَّكَ لَفَتْنٰوْا نَذْرَ يُّوسُفَ حَتّٰى
 تَكُوْنَ حَرَصًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْمَلِكِيْنَ ۝ قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْ
 بَشَرًا وَّحُزْنِيْ اِلَى اللَّهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

(৭৯) তিনি বললেন : যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া আর কাউকে গ্রেফতার করা থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। তা হলে তো আমরা নিশ্চিতই অন্যায়কারী হয়ে যাব। (৮০) অতঃপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামর্শের জন্যে এখানে বসল। তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল : তোমরা কি জান না যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা অন্যায় করেছ? এতদ্ব্যতীত আমি তো কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না, যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে আদেশ দেন অথবা আল্লাহ আমার পক্ষে কোন ব্যবস্থা করে দেন। তিনিই সর্বোত্তম ব্যবস্থাপক। (৮১) তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল : পিতা, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা তাই বলে দিলাম, যা আমাদের জানা ছিল এবং অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য ছিল না। (৮২) জিজ্ঞেস করুন ঐ জনপদের লোকদেরকে যেখানে আমরা হিলাম এবং ঐ কাফেলাকে, যাদের সাথে আমরা এসেছি। নিশ্চিতই আমরা সত্য বলছি। (৮৩) তিনি বললেন : কিছুই না, তোমার মনগড়া একটি কথা নিয়েই এসেছ। এখন ষের্থধারণই উত্তম। সম্ভবতঃ আল্লাহ তাদের সবাইকে একসঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৮৪) এবং তাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : হায় আফসোস ইউসুফের জন্যে। এবং দুঃখে তাঁর চক্ষুদয় সাদা হয়ে গেল। এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট। (৮৫) তারা বলতে লাগল : আল্লাহর কসম আপনি তো ইউসুফের সুরণ থেকে নিবৃত্ত হবেন না, যে পর্যন্ত মরণাপন্ন না হয়ে যান কিংবা যতবরণ না করেন। (৮৬) তিনি বললেন : আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সঙ্গীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা জান না।

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنْ تَأْخُذَ الْاِمْنُ وَحْدًا مَتَاعًا غِنَاكَ ۝ اِنْ اِذَا اَظْلَمُوتُمْ

ইউসুফ (আঃ) ভাইদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেন : যাকে ইচ্ছা গ্রেফতার করার ক্ষমতা আমাদের নেই, বরং যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে, তাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে গ্রেফতার করি, তবে আমরা তোমাদেরই ফতোয়া ও ফয়সালা অনুযায়ী জালাম হয়ে যাব। কারণ, তোমরাই বলেছ যে, যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হবে, সেই তার শাস্তি পাবে।

অর্থাৎ, ইউসুফ ভ্রাতারা যখন বেনিয়ামিনের মুস্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরস্পর পরামর্শ করার জন্যে একটি পৃথক জায়গায় একত্রিত হল।

তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল : তোমাদের কি জান নেই যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে বেনিয়ামিনকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে কঠিন শপথ নিয়েছিলেন? তোমরা ইতিপূর্বেও ইউসুফের ব্যাপারে একটি মারাত্মক অন্যায় করেছ। তাই আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মিসর ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পিতা নিজেই আমাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ না দেবেন অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আমার এখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ না আসে। আল্লাহ তাআলাই সর্বোত্তম নির্দেশদাতা।

এখানে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উক্তি বর্ণিত হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন ইয়াহুদা। তিনি ছিলেন বয়সে সবার বড়। একদা ইউসুফ (আঃ)-কে হত্যা না করার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। কারণ মতে তিনি হচ্ছেন শামউন। তিনি প্রভাব প্রতিপত্তির ও মর্যাদার দিক দিয়ে সবার বড় গণ্য হতেন।

বড় ভাই বললেন আমি তো এখানে থাকব। তোমরা সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে বল যে, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা বলছি, তা আমাদের প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ ঘটনা। আমাদের সামনেই তার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল রে হয়েছে।

অর্থাৎ, আমরা আপনার কায় ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বেনিয়ামিনকে অবশ্যই ফিরিয়ে আন। আমাদের এ ওয়াদা ছিল বাহ্যিক অবস্থা বিচারে। অদৃশ্যের অবস্থা আমাদের জানা ছিল না যে, সে চুরি করে গ্রেফতার হবে এবং আর নিরুপায় হয়ে পড়বে। এ ব্যাক্যের এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা জৈ বেনিয়ামিনের যথাসাধ্য হেফাজত করেছি, যাতে সে কোন অনুচিত কাজ করে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেষ্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্ত সম্ভবপর ছিল। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ও অজ্ঞাতে সে এমন কাজ করবে, আমাদের জানা ছিল না।

ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে পিতাকে একবার ধোকা দিয়েছিল। ফলে তারা জানত যে, এ বর্ণনায় পিতা কিছুতেই আশুস্ত হবেন না এবং তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। তাই অধিক জোর দেয়ার জন্যে বলল : আমি যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, তবে যে শহরে আমরা ছিলাম (অর্থাৎ, মিসরে), তথাকার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং আমি

এ কাকেলার লোকজনকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন যারা আমাদের সম্বন্ধে মিসর থেকে কিনান এসেছে। আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

এ ক্ষেত্রে তফসীরে-মাযহরীতে এ প্রশ্নটি পূর্ণব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইউসুফ (আঃ) পিতার সাথে এমন নির্দয় ব্যবহার কেন করলেন? নিজের অবস্থা তো পিতাকে জানানেনই না, তদুপরি ছোট ভাইকেও রেখে দিলেন। ত্রাতারা বার বার মিসরে এসেছে; কিন্তু তিনি তাদের কাছে আত্মপরিচয় প্রকাশ করলেন না এবং পিতার কাছেও সংবাদ পাঠালেন না। এসব প্রশ্নের উত্তরে তফসীরে মাযহরীতে বলা হয়েছে :

ইউসুফ (আঃ) এসব কাজ আল্লাহর নির্দেশই করেছিলেন, ইয়াকুব (আঃ) এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল এ সবার উদ্দেশ্য।

মাসআলা : وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا ۖ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কারও সাথে কোন চুক্তির আবদ্ধ হয়, তখন তা বাহ্যিক অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়—অজানা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। ইউসুফ-ত্রাতারা পিতার সাথে বেনিয়ামিনের হেফাযত সম্পর্কে যে জরীফার করেছিল, তা ছিল তাদের আয়ত্তাধীন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বেনিয়ামিনের চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়াতে অঙ্গীকারে কোন ত্রুটি দেখা দেয়নি।

তফসীরে-কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে আরও একটি মাসআলা বের করে বলা হয়েছে : এ ব্যাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষ্যদান জানার উপর নির্ভরশীল। ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান যে কোনভাবে হোক, তদনুযায়ী সাক্ষ্য দেয়া যায়। তাই কোন ঘটনার সাক্ষ্য যেমন চাক্ষুষ দেখে দেয়া যায়, তেমনি কোন বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেও দেয়া যায়। তবে আসল সূর গোপন করা যাবে না—বর্ণনা করতে হবে যে, ঘটনাটি সে নিজে দেখেনি—অমুক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেছে। এ নীতির ভিত্তিতেই মালেকী মাযহরার ফিকাহবিদগণ অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্যকেও বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি সঃ ও সঠিক পথে থাকে; কিন্তু ক্ষেত্র এমন যে, অন্যেরা তাকে অসৎ কিংবা পাপকাজে লিপ্ত বলে সন্দেহ করতে পারে তবে তার পক্ষে এ সন্দেহের কারণ দূর করা উচিত, যাতে অন্যরা কু-ধারণার গোনাহে লিপ্ত না হয়। ইউসুফ (আঃ) এর সাথে কৃত পূর্ববর্তী আচরণের আলোকে বেনিয়ামিনের ঘটনায় ভাইদের সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, এবারও তারা মিথ্যা ও সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণের জন্যে জনপদ অর্থাৎ, মিসরবাসীদের এবং যুগপৎ কাকেলার লোকজনের সাক্ষ্য উপস্থিতি করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সঃ) ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একবার তিনি উম্মুল-মুমিনীন হযরত সফিয়া (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মসজিদ থেকে এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। গলির মাথায় দু'জন লোককে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেন : আমার সাথে সফিয়া বিনতে হুযাই রয়েছে। ব্যক্তিদ্বয় আরম্ভ করল : ইয়া রসূলুল্লাহ, আপনার সম্পর্কেও কেউ কু-ধারণা করতে পারে কি? তিনি বললেন : হা শরভান মানুষের শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই কারও মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়া বিচিত্র নয়।—(বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী)

ইয়াকুব (আঃ) এর ছোট ছেলে বেনিয়ামিন মিসরে গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর ত্রাতারা দেশে ফিরে এল এবং ইয়াকুব (আঃ)-কে যাবতীয় বৃত্তান্ত

শুনাল। তারা তাঁকে আশুস্ত করতে চাইল যে, এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ সত্যবাদী। বিশ্বাস না হলে মিসরবাসীদের কাছে কিংবা মিসর থেকে কেনানে আগত কাকেলার লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করা যায়। তারাও বলবে যে, বেনিয়ামিন চুরির কারণে গ্রেফতার হয়েছে। ইউসুফ (আঃ) এর ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল। তাই এবারও ইয়াকুব (আঃ) বিশ্বাস করতে পারলেন না; যদিও বাস্তবে এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলেনি। এ কারণে এ ক্ষেত্রেও তিনি এ ব্যাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা ইউসুফ (আঃ) এর নিষেধাজ্ঞা হওয়ার সময় উচ্চারণ করেছিলেন। —**وَأَرْثَاهُ** —**بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِنْهُ** —**وَأَرْثَاهُ** তোমরা যা বলছ, সত্য নয়। তোমরা মনগড়া কথা বলছ। কিন্তু আমি এবারও সবার করব। সবারই আমার জন্যে উত্তম।

এ থেকেই কুরতুবী বলেন : মুক্ততাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে কথা বলেন তা ভ্রান্তও হতে পারে। এমনকি, পয়গম্বরও যদি ইজতিহাদ করে কোন কথা বলেন, তবে প্রথম পর্যায়ে তা সঠিক না হওয়াও সম্ভবপর। যেমন, এ ব্যাপারে হয়েছে। ইয়াকুব (আঃ) ছেলেদের সত্যকেও মিথ্যা মনে করে নিয়েছেন। কিন্তু পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে ভ্রান্তি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। কাজেই পরিণামে তাঁরা সত্যে উপনীত হন।

এমনও হতে পারে, যে মনগড়া কথা বলে ইয়াকুব (আঃ) এ কথা বুঝিয়েছেন যা মিসরে গড়া হয়েছিল। অর্থাৎ, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কৃত্রিম চুরি দেখিয়ে বেনিয়ামিনকে গ্রেফতার করে নেয়া। অবশ্য ভবিষ্যতে এর পরিণাম চমৎকার আকারে প্রকাশ পেত। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এদিকে ইঙ্গিতও হতে পারে। বলা হয়েছে : **عَنِ اللَّهِ** —**أَن يَأْتِيَنَّكَ مِنْهُ خَبَرٌ** — অর্থাৎ, আশা করা যায় যে, সম্ভবত : শীঘ্রই আল্লাহ তাদের সবাইকে আমার কাছে পৌঁছে দেবেন।

মোটকথা, ইয়াকুব (আঃ) এবার ছেলেদের কথা মেনে নেননি। এই না মানার তাৎপর্য ছিল এই যে, প্রকৃতপক্ষে কোন চুরিও হয়নি এবং বেনিয়ামিনও গ্রেফতার হয়নি। এটা যথাস্থানে নির্ভুল ছিল। কিন্তু ছেলেরা নিজ জ্ঞানমতে যা বলেছিল, তাও ভ্রান্ত ছিল না।

وَكَوْلَىٰ عَنْهُمْ وَوَقَالَ يَاسْقَىٰ عَلَىٰ يَوْسُفَ وَابْنِصَّتْ عَيْنُهُ

وَكَوْلَىٰ عَنْهُمْ وَوَقَالَ يَاسْقَىٰ عَلَىٰ يَوْسُفَ وَابْنِصَّتْ عَيْنُهُ — অর্থাৎ, দ্বিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর ইয়াকুব (আঃ) এ ব্যাপারে ছেলেদের সাথে বাক্যলাপ ত্যাগ করে পালনকর্তার কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন এবং বললেন : ইউসুফের জন্যে বড়ই পরিতাপ। এ ব্যাখ্যা ত্রন্দন করতে তাঁর চোখ দু'টি শ্বেতবর্ণ ধারণ করল। অর্থাৎ, দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল। তফসীরবিদ মুকাতিল বলেন : ইয়াকুব (আঃ) এর এ অবস্থা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল। —**فَهُوَ كَظِيمٌ** — অর্থাৎ, অতঃপর তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কারও কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন না। **كَظِيمٌ** শব্দটি **كَطِمَ** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ভরে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুঃখ ও বিষাদে তাঁর মন ভরে গেল এবং মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কারও কাছে তিনি দুঃখের কথা বর্ণনা করতেন না।

এ কারণেই **كَطِمَ** শব্দটি ক্রোধ সংবরণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, মন ক্রোধে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মুখ অথবা হাত দ্বারা ক্রোধের কোন কিছু প্রকাশ না পাওয়া। হাদীসে আছে, **وَمَنْ يَكْظِمُ الْغَيْظَ** — অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে এবং শক্তি ধাকা সত্ত্বেও ক্রোধ প্রকাশ করে না, আল্লাহ তা আলা তাকে বড় প্রতিদান

দেবেন।

এক হাদীসে আছে, হাশরের দিন আল্লাহ তাআলা এরূপ লোকদেরকে প্রকাশ্য সমাবেশে এনে বলবেন : জন্মান্বিত নেয়ামতসমূহের মধ্যে যেটি ইচ্ছা, গ্রহণ কর।

ইমাম ইবনে জরীর এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বিপদমুহুর্তে **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** বলার শিক্ষা এ উম্মতেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়ার ব্যাপারে এ বাক্যটি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। উম্মতে মুহাম্মদীয় বৈশিষ্ট্য এভাবে জানা গেছে যে, তীব্র দুঃখ ও আঘাতের সময় ইয়াকুব (আঃ) এ বাক্যটির পরিবর্তে **يَا سَكْفَى عَلَى يُونُسَ** বলেছেন। 'বায়হাকী শোআবুল-ইমানে' ও হাদীসটি ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন।

ইউসুফের প্রতি ইয়াকুব (আঃ)-এর গভীর মহব্বতের কারণ : ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর অসাধারণ মহব্বত ছিল। ইউসুফ (আঃ) নির্ঝোঁজ হয়ে গেলে তিনি একেবারেই হতোদ্যম হয়ে পড়েন। কোন কোন রেওয়ায়েতে পিতা-ছেলের বিচ্ছেদের সময়কাল চল্লিশ বছর এবং কোন কোন রেওয়ায়েতে আশি বছর বলা হয়েছে। দীর্ঘ সময় তিনি ছেলের শোকে কান্দতে কান্দতে অতিবাহিত করেন। ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যায়। সন্তানের মহব্বতে এতটা বাড়াবাড়ি বাহ্যতঃ পয়গম্বরসুলত পদমর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নয়। কোরআন পাকে সন্তান-সন্ততিকে ফেনা আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে : **إِنَّمَا مَوْلَاكَ** **وَأَوْلَاكَ يَتِيمٌ** অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফেনা ও পরীক্ষা বৈ নয়। পক্ষান্তরে কোরআন পাকের ভাষায় পয়গম্বরগণের শান হচ্ছে এই **إِنَّا خَلَقْنَاهُم بِخَلْقِهِ وَذَكَرْنَاهُ الْكَلَامَ** — অর্থাৎ আমি পয়গম্বরগণকে একটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত করেছি। সে গুণ হচ্ছে পরকালের স্মরণ। মালেক ইবনে দীনারের মতে এর অর্থ এই যে, আমি তাঁদের অন্তর থেকে সাংসারিক মহব্বত বের করে দিয়েছি এবং শুধু আখেরাতের মহব্বত দ্বারা তাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। কোন বস্ত গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আখেরাত।

এ বর্ণনা থেকে এ সন্দেহ আরও কঠিনভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানের মহব্বতে এতটুকু ব্যাকুল হয়ে পড়া কেমন করে শুদ্ধ হতে পারে?

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) তফসীরে মাযহরীতে এ প্রশ্ন উল্লেখ করে হযরত মুজাদ্দিদে-আলফেসানীর এক বিশেষ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে সংসার ও সংসারের উপকরণাদির প্রতি মহব্বত নিন্দনীয়। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু সংসারের যেসব বস্তু আখেরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোর মহব্বত প্রকৃতপক্ষে আখেরাতেরই মহব্বত। ইউসুফ (আঃ)-এর গুণ-গরিমা শুধু দৈহিক রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং পয়গম্বরসুলত পবিত্রতা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যও এর

অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সমষ্টির কারণে তাঁর মহব্বত সংসারের মহব্বত ছিল না, বরং প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের মহব্বত ছিল।

এখানে এ বিষয়টিও প্রশ্নদানযোগ্য যে, এ মহব্বত যদিও প্রকৃতপক্ষে সংসারের মহব্বত ছিল না, কিন্তু সর্ববিস্তার এতে একটি সাংসারিক দিক ছিল। এ জন্যই এটা হযরত ইয়াকুব (আঃ) -এর পরীক্ষার কারণ হয়েছে এবং তাঁকে চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের অসহনীয় যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। এই ঘটনার অদ্যোপান্ত এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দীর্ঘতর হয়ে গেছে। নতুবা ঘটনার শুরুতে এক গভীর মহব্বত পোষণকারী পিতার পক্ষে পুত্রদের কথা শুনে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর হত না, বরং তিনি অবশ্যই অকুস্থলে পৌছে ঝোঁজ-খবর নিতেন। ফলে তখনই যাতনার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারত। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, তখন এদিকে দৃষ্টি যায়নি। এরপর ইউসুফ (আঃ)-কে পিতার সাথে যোগাযোগ করতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করা হল। ফলে মিসরের শাসনকন্মতা হাতে পেয়েও তিনি যোগাযোগের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এর চাইতে বেশী ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে দেয়ার মত ঘটনাবলী তখন ঘটেছে, যখন ইউসুফ-ভ্রাতারা বার বার মিসর গমন করতে থাকে। তিনি তখনও ভাইদের কাছে গোপন রহস্য খোলেননি এবং পিতাকে সংবাদ দেয়ার চেষ্টা করেননি, বরং একটি কৌশলের মাধ্যমে অপর ভাইকেও নিজের কাছে আটকে রেখে পিতার মর্মবেদনাকে দ্বিগুণ করে দেন। এসব কর্মকাণ্ড ইউসুফ (আঃ) -এর মত একজন মনোনিতি পয়গম্বর দ্বারা ততক্ষণ সম্ভবপর না, যতক্ষণ না তাঁকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেয়া হয়। এ কারণেই কুরআন প্রমুখ তফসীরবিদ ইউসুফ (আঃ)-এর এসব কর্মকাণ্ডকে খোদারী ওহীর ফলশ্রুতি সাব্যস্ত করেছেন। কোরআনের **كَذَلِكَ كُنَّا نَبَيُّونَ** বাক্যও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

قَالُوا أَتِلْكَ نَفْسًا تَكْفُرُ — অর্থাৎ, ছেলেরা পিতার

এহেন মনোবেদনা সত্ত্বেও এমন অভিযোগহীন সবার দর্শে বলতে লাগল : আল্লাহর কসম, আপনি তো সদাসর্বদা ইউসুফকেই স্মরণ করতে থাকেন। ফলে হয় আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, না হয় মরেই যাবেন। (প্রত্যেক আঘাত ও দুঃখের একটা সীমা আছে। সাধারণতঃ সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষ দুঃখ-বেদনা ভুলে যায়। কিন্তু আপনি এত দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রথম দিনের মতই রয়েছেন এবং আপনার দুঃখ তেমনি সতেজ রয়েছে।)

ইয়াকুব (আঃ) ছেলেরা কথায় শুনে বললেন : **إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي**

وَوُحْيِي إِلَى اللَّهِ — অর্থাৎ, আমি আমার ফরিয়াদ ও দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা তোমাদের অথবা অন্য কারও কাছে করি না; বরং আল্লাহর কাছে করি। কাজেই আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। সাথে সাথে এ কথাও প্রকাশ করলেন যে, আমার স্মরণ করা কথা যাবে না। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না। অর্থাৎ, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমাকে সবার সাথে মিলিত করবেন।

আনুভূমিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يُوسُفُ ۝ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا ۝ اِنْ يُوسُفُ وَآخِيهِ ۝

ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া না। কেননা, কাকের ছাড়া কেউ তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।

ইয়াকুব (আঃ) এতদিন পর ছেলেরকে আদেশ দিলেন যে, যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ কর এবং তাদেরকে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হওয়া না। ইতিপূর্বে কখনও তিনি এমন আদেশ দেননি। এটা তকদীরেরই ব্যাপার। ইতিপূর্বে তাদেরকে পাওয়া তকদীরে ছিল না। তাই এরূপ কোন কাজও করা হয়নি। এখন মিলনের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল। তাই আল্লাহ্‌ তাআলা এর উপযুক্ত তদবীরও মনে জাগিয়ে দিলেন।

উভয়কে খোঁজ করার স্থান মিসরই সাব্যস্ত করা হল। এটা বেনিয়ামিনের বেলায় নির্দিষ্টই ছিল ; কিন্তু ইউসুফ (আঃ)-কে মিসরে খোঁজ করার বাহ্যতঃ কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন এর উপযুক্ত কারণাদিও উপস্থিত করে দেন। তাই এবার ইয়াকুব (আঃ) সবাইকে খোঁজ করার জন্য ছেলেরকে আবার মিসর যেতে নির্দেশ দিলেন। কেউ কেউ বলেন : আযীযে-মিসর কর্তৃক ছেলের রসদপত্রের মধ্যে পণ্য ফেরত দেয়ার ঘটনা থেকে ইয়াকুব (আঃ) প্রথম বার আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, এই আযীযে মিসর খুবই ভদ্র ও দয়ালু ব্যক্তি। বিচিত্র নয় যে, সেই তাঁর হারানো ইউসুফ।

নির্দেশ ও মাসআলা : ইমাম কুরতুবী বলেন : ইয়াকুব (আঃ)-এর ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞান, মাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে কোন বিপদ ও কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সবর ও আল্লাহ্‌র কয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে এর প্রতিকার করা এবং ইয়াকুব (আঃ) ও অন্যান্য পয়গম্বরের অনুসরণ করা।

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : মানুষ যত চোক গিলে, তন্মধ্যে দু'টি চোকই আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয়। (এক) বিপদে সবর ও (দুই) জেদে সংবরণ।

হাদীসে আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, يَاسِرٌ مِنْ بَيْتِ لَمْ يَصِرْ ۝ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বীয় বিপদে সবর করে বর্ণনা করে, সে সবর করেনি।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন : আল্লাহ্‌ তাআলা ইয়াকুব (সাঃ)-কে সবরের কারণে শহীদদের সওয়াব দান করেছেন। এ উম্মতের মধ্যেও যে ব্যক্তি বিপদে সবর করবে, তাকে এমন প্রতিদান দেয়া হবে।

ইমাম কুরতুবী ইয়াকুব (আঃ)-এর এই অগ্নিপরীক্ষার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : একদিন ইয়াকুব (আঃ) তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। আর তাঁর সামনে ঘুমিয়ে ছিলেন ইউসুফ (আঃ)। হঠাৎ ইউসুফ (আঃ)-এর নাক ডাকার শব্দ শুনে তাঁর মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও এমনি হল। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা ফেরেশতাদেরকে বললেন : দেখ, আমার দোস্ত ও মকবুল বন্দা আমাকে সমুদ্রাশ্রয় করার মাঝখানে অন্যের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। আমার ইচ্ছাত ও প্রতাপের কসম, আমি তার চক্ষুদুয় উৎপাটিত করে দিব, যদ্বারা সে অন্যের দিকে তাকায় এবং যার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, তাকে দীর্ঘকালের জন্যে বিচ্ছিন্ন করে দিব। কোন কোন রেওয়ায়েতেও এ ঘটনাটি

(৮৭) কসম। যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালিশ কর এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হওয়া না। নিচয় আল্লাহ্‌র রহমত থেকে কাকের সম্ভার ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না। (৮৮) অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছল তখন বলল : হে আযীয, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কতর সমুদ্রাশ্রয় হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপরাধ পুঞ্জি নিয়ে এসেছি। অতঃপর আপনি আমাদের পুরোপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ্‌ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (৮৯) ইউসুফ বললেন : তোমাদের জন্য আছে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে করেছ, যখন তোমরা অপরিণামদর্শী ছিলে? (৯০) তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ। বললেন : আমিই ইউসুফ এবং এ হল আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিচয়, যে তাকওয়া বলমুন করে এক সবর করে, আল্লাহ্‌ এহেন সংকমশীলদের প্রতিদান ফিট করেন না। (৯১) তারা বলল : আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের চাইতে আল্লাহ্‌ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম। (৯২) বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবান চাইতে অধিক মেহেরবান। (৯৩) তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার পিতার যুগ্মতলের উপর রেখে দিও, এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস। (৯৪) যখন কাকেরা রওয়ানা হল, তখন তাদের পিতা বললেন : যদি তোমরা আমাকে অশক্তিহীন না বল, তবে বলি : আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। (৯৫) লোকেরা বলল : আল্লাহ্‌র কসম, আপনি তো সেই পুরানো বাস্তিতেই পড়ে আছেন।

বর্ণিত হয়েছে।

তাই বুখারীর হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন : নামাযে অন্য দিকে তাকানো কেমন? তিনি বললেন : এর মাধ্যমে শয়তান বন্দার নামায হেঁ মেরে নিয়ে যায়।

فَلَمَّا دَعَا إِلَىٰ كَفَالَتِهِ قَاتِلًا ۖ اَرْثَا ۚ ইউসুফ-ব্রাতারা যখন পিতার নির্দেশ মোতাবেক মিসরে পৌঁছল এবং আযীযে-মিসরের সাথে সাক্ষাত করল, তখন নিতান্ত কাতরভাবে কথাবার্তা শুরু করল। নিজেদের দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ করে বলতে লাগল : হে আযীয! দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা পরিবারবর্গ নিয়ে খুবই কষ্টে আছি। এমন কি, এখন খাদ্যশস্য কেনার জন্যে আমাদের কাছে উপযুক্ত মূল্যও নেই। আমরা অপারগ হয়ে কিছু একেজো বস্ত্র খাদ্যশস্য কেনার জন্যে নিয়ে এসেছি। আপনি নিজ চরিত্রগুণে এসব একেজো বস্ত্র কবুল করে নিয়ে এবং পরিবর্তে আমাদেরকে পুরোপুরি খাদ্যশস্য দিয়ে দিন, যা উত্তম মূল্যের বিনিময়ে দেয়া হয়। বলাবাহুল্য, আমাদের কোন অধিকার নেই। আপনি খয়রাত মনে করেই দিয়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা খয়রাতদাতাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন।

অকেজো বস্ত্রগুলো কি ছিল, কোরআন ও হাদীসে তার কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন : এগুলো ছিল কৃত্রিম রৌপ্য মুদ্রা, যা বাজারে অচল ছিল। কেউ বলেন : কিছু ঘরে ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্র ছিল। এ হচ্ছে مُرْتَجِزَةٌ শব্দের অনুবাদ। এর আসল অর্থ এমন বস্ত্র, যা নিজে সচল নয়; বরং জোরজবরদস্তি সচল করতে হয়।

ইউসুফ (আঃ) ভাইদের এহেন মিসকীনসুলভ কথাবার্তা শুনে এবং দুরবস্থা দেখে স্বভাবগতভাবে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, ইউসুফ (আঃ)-এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিশি-নিষেধ ছিল, এখন তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল। তফসীরে কুরতুবী ও মাযহরীতে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় হযরত ইয়াকুব (আঃ) আযীযে-মিসরের নামে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল এরূপ :-

ইয়াকুব সফিউল্লাহ ইবনে ইসহাক যবিনুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পক্ষ থেকে আযীযে-মিসর সমীপে।

বিনীতআরজ।

বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষার সস্মুখীন হওয়া আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যেরই অঙ্গবিশেষ। নমরূদের আগুনের দ্বারা আমার পিতামহ ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। অতঃপর আমার পিতা ইসহাকেরও কঠোর পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। এরপর আমার সর্বাধিক প্রিয় এক পুত্রের মাধ্যমে আমার পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। তার বিরহ-ব্যথায় আমার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেছে। তারপর তার ছোট ভাই ছিল ব্যাধিতের সন্তানর একমাত্র সমূল, যাকে আপনি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন। আমি বলি, আমরা পয়গম্বরদের সন্তান-সন্ততি। আমরা কখনও চুরি করিনি এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও কেউ চোর হয়ে জন্ম নেয়নি। গুয়াসসালাম।

পত্র পাঠ করে ইউসুফ (আঃ) কঁপে উঠলেন এবং কান্না রোধ করতে

পারলেন না। এরপর নিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন। পরিত্যক্ত ভূমিকা হিসেবে ভাইদেরকে প্রশ্ন করলেন : তোমাদের স্মরণ আছে কি? তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে, যখন তোমাদের মুখতার দিন ছিল এবং যখন তোমরা ভাল-মন্দের বিচার করতে পারতেন?

এ প্রশ্ন শুনে ইউসুফ-ব্রাতাদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফ কাহিনীর সাথে আযীযে-মিসরের কি সম্পর্ক! অতঃপর তারা একথাও চিন্তা করল যে, শৈশবে ইউসুফ একটি স্বপ্ন দেখেছিল, যার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, কালে ইউসুফ কোন উচ্চ মর্যবায় পৌঁছবে এবং তার সান্নাৎ আমাদের সবাইকে মাথা নত করতে হবে। অতঃপর এ আযীযে-মিসরী স্বয়ং ইউসুফ নয় তো। এরপর আরও চিন্তা-ভাবনার পর কিছু কিছু আলামত দ্বারা চিনে ফেলল এবং আরও তথ্য জানার জন্যে বলল :

إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۖ সত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ : ইউসুফ (আঃ) বললেন : হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই। ভাইয়ের প্রসঙ্গ জুড়ে দেয়ার কারণ, যাতে তাদের লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে দু'জনের বোঁজে তারা বের হয়েছিল, তারা উভয়েই এক জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। এরপর ইউসুফ (আঃ) বললেন :

فَدَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ إِنَّكَ لَمِنْ شَقِيْقٍ وَيَصِيرُ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَاٰبِيْعِيْمٌ اٰخَرُ ۖ اَلْمُسْتَضِيْع ۖ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। প্রথমে আমাদের উভয়কে সবার ও তাকওয়ার দু'টি গুণ দান করেছেন। এগুলো সাফল্যের চাবিকাঠি এবং প্রত্যেক বিপদাপদের রক্ষাকবচ। এরপর আমাদের কষ্টকে সুখে, বিচ্ছেদকে মিলনে এবং জ্ব সম্পদের স্বপ্নতাকে প্রাচুর্য রূপান্তরিত করেছেন। নিশ্চয় যারা পাপ কব থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদাপদে সবার করে, আল্লাহ এহেন সৎকর্মীকে প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও ইউসুফ (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব মনে নেয়া ছাড়া ইউসুফ-ব্রাতাদের উপায় ছিল না। সবাই একযোগে বলল : اَللّٰهُ لَكَ اَنْتَ اَرْكَوْا اللّٰهُ عَلَيْكَ اِنْ اَنْتَ اَرْكَوْا لَكَ اَلْطَّيْبِيْنَ ۖ আল্লাহর কসম, তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তুমি এরই যোগ্য ছিলে। আমরা নিজেদের কৃতকর্মে দোষী ছিলাম। আল্লাহ মাফ করুন। উত্তরে ইউসুফ (আঃ) পয়গম্বরসুলভ গাভীরের সাথে বললেন :

لَا تُؤْتِيْكُمْ اَرْثَا ۖ অর্থাৎ, তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়া তো দূরের কথা, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগও নেই। এ হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ। অতঃপর আল্লাহর কাছে দেয়া করলেন।

يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ اَلَمْ تَكُنْ اَوَّلَ مَا دَعَاكَ الرَّحْمٰنُ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্যায় ক্ষমা করুন। তিনি স মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান।

অতঃপর বললেন :

اٰذْكُرُوْا بَقِيْعِيْمِيْنَ هٰذَا اَلْقُوْةُ عَلٰى وَجْهِ اِيْنَ يٰٓاَتِ بِصِيْرًا وَّاَنْتُوْنِ ۖ اَرْثَا ۖ অর্থাৎ, আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার চেহারার উপর রেখে দাও। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। ফলে এখানে আসতেও সক্ষম হবেন। পরিবারের অন্যান্য সবাইকে

وَلَيْتَ أَفْصَلْتَ الْعِيْرُ — অর্থাৎ, কাফেলা শহর থেকে বের হতেই কেনানা ইয়াকুব (আঃ)–নিকটস্থ লোকদেরকে বললেন : তোমরা যদি আমাকে বোকা না ঠাণ্ডাও, তবে আমি বলছি যে, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। মিসর থেকে কেনানা পর্যন্ত হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী আট দিনের দূরত্ব ছিল। হযরত হাসান বসরীর বর্ণনা মতে আশি ফরসখ অর্থাৎ, প্রায় আড়াইশ* মাইলের ব্যবধান ছিল। আল্লাহ তাআলা এর দূর থেকে ইউসুফ (আঃ)–এর জামার মাধ্যমে তাঁর গন্ধ ইয়াকুব (আঃ)–এর মস্তিষ্কে পৌঁছে দেন। এটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বটে। অশ্চ ইউসুফ যখন কেনানারই এক কূপের ভেতরে তিন দিন পড়ে রইলেন, তখন ইয়াকুব (আঃ) এ গন্ধ অনুভব করেননি। এ থেকেই জানা যায় যে, মু'জ্জেযা পয়গম্বরগণের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় এবং প্রকৃতপক্ষে মু'জ্জেযা পয়গম্বরগণের নিজস্ব কর্মকাণ্ডও নয়–সরাসরি আল্লাহ তাআলার কর্ম। আল্লাহ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন, মু'জ্জেযা প্রকাশ করেন। ইচ্ছা না হলে

يوسف ١٣

২৮৮

وما يروى ١٣

فَلَمَّا آتَاكَ الْبَشِيرَ الْفُتُحُ عَلَى وَجْهِهِ فَاتَّكَ بِصِيرَةٍ
 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ⑤
 قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ⑥
 قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ⑦
 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى الْيَهُودَ أَبُوهُ وَقَالَ ادْخُلُوا
 مَعِيَ فِي الْبَيْتِ ⑧ وَرَفَعَ أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ
 وَخَزَّوَالَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ
 قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ لِي إِذْ أَخْرَجَنِي
 مِنَ السِّبْيِ ⑨ وَجَاءَ بِكَ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ
 الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ
 إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ⑩ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ
 عَمَلْتَ بَيْنِي وَتَأْوِيلَ الْأَحَادِيثِ فَاطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي
 بِالصَّالِحِينَ ⑪ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ
 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ⑫

(৯৬) অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌছল, সে জামাটি তাঁর মুখে রাখল। অমনি তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। বললেন : আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না? (৯৭) তারা বলল : পিতঃ, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করান। নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম। (৯৮) বললেন, সত্ত্বরই আমি পালনকর্তার কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৯৯) অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌছল, তখন ইউসুফ পিতা-মাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন এবং বললেন : আল্লাহ্ চাহেন তো শান্ত চিত্তে মিসরে প্রবেশ করুন। (১০০) এবং তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সামনে সেজদাবনত হল। তিনি বললেন : পিতঃ এ হচ্ছে আমার ইতিপূর্বকার স্বপ্নের বর্ণনা। আমার পালনকর্তা একে সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেয়ার পর। আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১০১) হে পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাষ্ট্রকর্মত্যাগ দান করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। হে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলের স্রষ্টা, আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে। আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে স্বজনদের সাথে মিলিত করুন। (১০২) এগুলো অদৃশ্যের স্বর, আমি আপনার কাছে প্রেরণ করি। আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা স্বীয় কাজ সাব্যস্ত করছিল এবং চক্রান্ত করছিল।

নিকটতম বস্তুও দূরবর্তী হয়ে যায়।

قَالُوا اللَّهُ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ — অর্থাৎ, উপস্থিত লোকেরা বলল : আল্লাহর কসম, আপনি তো সেই পুরানো ভ্রাতা ধারণায়ই পক্ষ রয়েছে যে, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَمَّا آتَاكَ الْبَشِيرَ — অর্থাৎ, যখন সুসংবাদদাতা কেনানে পৌছল এবং ইউসুফের জামা ইয়াকুব (আঃ)-এর চেহারায়ে রাখল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। সুসংবাদদাতা ছিল জামা বহনকারী ইয়াহুদা।

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ — অর্থাৎ, আমি কি বলিনি যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমি এমন বিষয় জানি, যা তোমরা জান না? অর্থাৎ, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলিত হবে।

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ — বাস্তব ঘটনা যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন ইউসুফের ভ্রাতারা স্বীয় অপরাধের জন্যে পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল : আপনি আমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে মাগফেরাতের দোয়া করুন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাদের মাগফেরাতের দোয়া করবে, সে নিজেও তাদের অপরাধ মাফ করে দেবে।

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي — ইয়াকুব (আঃ) বললেন : আমি সত্ত্বরই তোমাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।

ইয়াকুব (আঃ) এখানে তৎক্ষণাৎ দোয়া করার পরিবর্তে অতিসত্ত্বরই দোয়া করার ওয়াদা করেছেন। তফসীরবিদগণ এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শেষ রাত্রি দোয়া করবেন। কেননা, তখনকার দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবী থেকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা করেন : কেউ আছে কি, যে দোয়া করবে—আমি কবুল করব? কেউ আছে কি, যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে—আমি ক্ষমা করব?

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ — কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, ইউসুফ (আঃ) ভাইদের সাথে দু'শ' উট বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র, বস্ত্র ও নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দিলেন, যাতে গোটা পরিবার মিসরে আসার জন্যে ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। ইয়াকুব (আঃ) তাঁর আওলাদ ও সৎশ্রুতি ব্যক্তির প্রস্তুত হয়ে মিসরের উদ্দেশে রওয়ানা হলে—এক রেওয়াজেতে অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বাহাস্তর এবং অন্য রেওয়াজেতে অনুযায়ী তিরানব্বই জন পুরুষ ও মহিলা ছিল।

অপরদিকে মিসর পৌছার সময় নিকটবর্তী হলে ইউসুফ (আঃ) ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য বাইরে আগমন করলেন। তাদের সাথে চার হাজার সশস্ত্র সিপাহীও সামরিক কায়দার অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশে জমায়েত হল। সবাই যখন মিসরে ইউসুফ (আঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি পিতা মাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন।

এখানে—**أَبُوهُ** (পিতা-মাতা) উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ইউসুফ (আঃ)—এর মাতা তাঁর শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। কিন্তু তারপর ইয়াকুব (আঃ) মৃত্যুর ভগিনী লায়াকাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি ইউসুফ (আঃ)—এর খালা হওয়ার দিক দিয়েও মায়ের মতই ছিলেন এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতাই ছিলেন।

وَقَالَ ادْخُلُوا مِنۡ أُمۡمَةِ اللَّهِ آمِينَ — ইউসুফ (আঃ) পরিবারের সবাইকে বললেন : আপনারা সবাই আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ভয়ে, জবাবে মিসরে প্রবেশ করুন। উদ্দেশ্য এই যে, ভিনদেশীদের প্রবেশের দ্বারপারে স্বভাবতঃ যেসব বিধি-নিষেধ থাকে আপনারা সেগুলো থেকে মুক্ত।

وَرَزَمَ أَبُوهُ وَعَلَىٰ الْعُرۡشِ - অর্থাৎ, ইউসুফ (আঃ) পিতা-মাতাকে রাজ সিংহাসনে বসালেন।

وَعَزَّوَالَهُ سَجَدًا - অর্থাৎ, পিতা-মাতা ও ভ্রাতারা সবাই ইউসুফ (আঃ)—এর সামনে সেজদা করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : এ কৃতজ্ঞতাসূচক সেজদাটি ইউসুফ (আঃ)—এর জন্যে নয়— আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন : উপাসনামূলক সেজদা প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তে আল্লাহ্ হাড়া কারও জন্যে বৈধ ছিল না; কিন্তু সন্মানসূচক সেজদা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে বৈধ ছিল। শিল্পকের সিঁড়ি হওয়ার কারণে ইসলামী শরীয়তে তাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে : আল্লাহ্ হাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা বৈধ নয়।

وَقَالَ يٰٓأَيُّهَا هٰذَا وَنُورِيۡنِیۡ مِنْ قَبْلِ — ইউসুফ (আঃ)—এর সামনে যখন পিতা-মাতা ও এগার ভাই একযোগে সেজদা করল, তখন শৈশবের স্বপ্নের কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি বললেন : পিতঃ, এটা আমার শৈশবে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যাতে দেখেছিলাম যে, সূর্য, চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র আমাকে সেজদা করছে। আল্লাহর শোকর যে, তিনি এ স্বপ্নের সত্যতা চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন।

ইউসুফ (আঃ)—এর সবার ও শুকরিয়ার স্তর : এরপর ইউসুফ (আঃ) পিতা-মাতার সামনে কিছু অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন। এখানে এক দৃঢ় ধ্যেমে একটু চিন্তা করুন, আজ যদি কেউ এতটুকু দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, যতটুকু ইউসুফ (আঃ)—এর উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং এত দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ ও নৈরাশ্যের পর পিতা-মাতার সাথে মিলন ঘটে, তবে সে পিতা-মাতার সামনে নিজের কাহিনী কিভাবে বর্ণনা করবে? কতটুকু কাদাবে এবং কাদাবে? দুঃখ-কষ্টের কল্প কাহিনী বর্ণনা করতে কতদিন লাগবে? কিন্তু এখানে উভয়পক্ষই আল্লাহর রসূল ও পয়গম্বর। তাঁদের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন, ইয়াকুব (আঃ)—এর বিরহী প্রিয় ছেলে হাজারো দুঃখ-কষ্টের প্রান্তর অতিক্রম করে যখন পিতার সাথে মিলিত হন, তখন কি বলেন : **وَقَدْ أَحْسَنَ بِنَايَ**

أَخَّرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَارَ بَيْنِي مِنَ الْبُؤۡسِ وَبَعَدَ أَنْ تَزُرَّ الشَّيْطٰنُ بَيْنِي وَبَيْنَ أَخَوَتِي - অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন কারাগার থেকে আমাকে বের করেছেন এবং আপনাকে বহিরে থেকে এখানে এনেছেন; অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

ইউসুফ (আঃ)—এর দুঃখ-কষ্ট যথাক্রমে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। (এক) ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। (দুই) পিতা-মাতার কাছ থেকে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ। এবং (তিন) কারাগারের কষ্ট। আল্লাহর মনোনীত

পয়গম্বর স্বীয় বিবৃতিতে প্রথমে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করে কারাগার থেকে কথা শুরু করেছেন। কিন্তু এতে কারাগারে প্রবেশ করা এবং সেখানকার দুঃখ-কষ্টের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। বরং কারাগার থেকে অব্যাহতির কথা আল্লাহর কৃতজ্ঞতাসহ বর্ণনা করেছেন। কারাগার থেকে মুক্তি এবং তজ্জনা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে যেন একথাও বলে দিয়েছেন যে, তিনি কোন সময় কারাগারেও ছিলেন।

এখানে এ বিষয়টিও প্রাধান্যযোগ্য যে, ইউসুফ (আঃ) কারাগার থেকে বের হওয়ার কথা তো উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ভ্রাতারা যে তাঁকে—কুপে নিক্ষেপ করেছিল, তা এদিক দিয়েও উল্লেখ করেননি যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাকে ঐ কুপ থেকে বের করেছেন। কারণ এই যে, ভাইদের অপরাধ পূর্বই মাফ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন : **لَا تُؤۡتٰی عَلَیۡهِمُ الۡیَومَ** তাই যে কোনভাবে কুপের কথা উল্লেখ করে ভাইদেরকে লজ্জা দেয়া সমীচীন মনে করেননি—(কুরতুবী)

এরপর ছিল পিতা-মাতা থেকে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ও তার প্রতিক্রিয়ায় বর্ণনা করার পালা। তিনি সব বিষয় থেকে পাশ কাটিয়ে শুধু শেষ পরিণতি ও পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাতের কথা আল্লাহর কৃতজ্ঞতাসহ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে গ্রাম থেকে মিসর শহরে এনে দিয়েছেন। এখানে এই নেয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াকুব (আঃ)—এর বাসভূমি গ্রামে ছিল, সেখানে জীবন যাপনের সুযোগ-সুবিধা কম ছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে শহরে রাজকীয় সম্মানের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন।

এখন প্রথম অধ্যায়টি অবশিষ্ট রইল—অর্থাৎ, ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। একেও শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে এভাবে চুকিয়ে দিলেন যে, আমার ভ্রাতারা এরূপ ছিল না। শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে কলহ সৃষ্টি এ কাজটি করিয়েছে।

এ হচ্ছে নবুওয়তের শান। নবীগণ দুঃখ-কষ্টে শুধু সবারই করেন না, বরং সর্বত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকও আবিষ্কার করে ফেলেন। এ কারণেই তাঁদের এমন কোন অবস্থা নেই, যেখানে তারা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ নন। সাধারণ মানুষের অবস্থা এর বিপরীত। তারা আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত পেয়েও কোন নেয়ামতের কথা উল্লেখ করে না, কিন্তু কোন সময় সামান্য কষ্ট পেলে জীবনভর তা গেয়ে বেড়ায়। কোরআনে এ বিষয়েই অভিযোগ করে বলা হয়েছে : **إِنَّ الْإِنۡسَانَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ** অর্থাৎ, মানুষ পালনকর্তার প্রতি খবুই অকৃতজ্ঞ।

ইউসুফ (আঃ) দুঃখ-কষ্টের ইতিকথা সংক্ষেপে তিন শব্দে ব্যক্ত করার পর বললেন : **إِنۡ زَنِیۡ لَطِیۡفٌ لِّمَآیۡشَاۡئِنَا هُوَ الْعَزِیۡزُ الْحَكِیۡمُ** - অর্থাৎ, আমার পালনকর্তা যে কাজ করতে চান, তার তদবীর সূক্ষ্ম করে দেন। নিশ্চয় তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।

১০১তম আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইউসুফ (আঃ) পিতাকে সম্মোহন করেছিলেন। এরপর পিতা-মাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ফলে যখন জীবনে শান্তি এল, তখন সরাসরি আল্লাহর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও দোয়ায় মশগুল হয়ে গেলেন। বললেন :

“হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাষ্ট্রকর্মতা দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, আপনিই ইহকাল ও পরকালে আমার কার্যনির্বাহী। আমাকে পূর্ণ আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে পরিপূর্ণ সং বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত রাখুন।” “পরিপূর্ণ সং বন্দা” পয়গম্বরগণই হতে

পারেন। তাঁরা যাবতীয় গোনাহ থেকে পবিত্র।—(মাযহারী)

এ দোয়ায় ‘খাতেমা-বিলখায়র’ অর্থাৎ, অন্তিম সময়ে পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার প্রার্থনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তাআলার প্রিয়জনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইহকাল ও পরকালে যত উচ্চ মর্যবাই লাভ করুন এবং যত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদ-মর্যাদাই তাঁদের পদচুম্বন করুক, তাঁরা কখনও গর্বিত হন না; বরং সর্বদাই এসব অবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার অথবা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা করতে থাকেন। তাই তাঁরা দোয়া করতে থাকেন, যাতে আল্লাহ-প্রদত্ত বাহিক ও আভ্যন্তরীণ নেয়ামতসমূহ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, বরং সেগুলো আরও যেন বৃদ্ধি পায়।

ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী পুরোপুরি বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। ذٰلِكَ مِنْ

اٰیٰتِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ لَكَ — অর্থাৎ, এই কাহিনী এসব অদৃশ্য সংবাদের অন্যতম, যেগুলো আমি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে বলেছি। আপনি ইউসুফ-ব্রাতাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এজন্যে কলা-কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিল।

এ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনীটি পূর্ণ বিবরণসহ ঠিক ঠিক বলে দেয়া আপনার নবুওয়ত ও ওহীর সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা, কাহিনীটি হাজারো বছর পূর্বের। আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না যে, স্বচক্ষে দেখে বিবৃত করবেন এবং আপনি কারও কাছে শিক্ষাও গ্রহণ করেননি যে, ইতিহাস গ্রহণ পাঠ করে অথবা কারও কাছে শুনে বর্ণনা করবেন। অতএব, খোদায়ী ওহী ব্যতীত এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

কোরআন পাক শুধু এতটুকু বিষয় উল্লেখ করেছে যে, (আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না)। অন্য কোন ব্যক্তি অথবা গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জিত না হওয়ার কথা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি। কারণ, সমগ্র আরবের জানা ছিল যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) উম্মী বা নিরক্ষর। তিনি কারও কাছে লেখাপড়া করেননি। সবার আরও জানা ছিল যে, তাঁর সমগ্র জীবন মকায় অতিবাহিত হয়েছে। একবার চাচা আবুতালেবের সাথে সিরিয়া সফরে গমন করে মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছিলেন। দ্বিতীয় সফর, বাণিজ্য ব্যাপদেশে করেছিলেন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করেই ফিরে আসেন। এ সফরেও কোন পন্ডিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত অথবা কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। তাই এ ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি। তবে কোরআন পাকের অন্যত্র একথাও উল্লেখ করা হয়েছে: اَلَمْ يَكُنْ لَّكَ اٰیٰتٌ

وَلَا وَكَوْنُكَ مِنْ قَبْلُ هٰذَا — অর্থাৎ, কোরআন অবতরণের পূর্বে এসব ঘটনা আপনিও জানতেন এবং আপনার স্বজাতিও জানত না।

ইমাম বগভী বলেন : ইহদী ও কোরাইশরা সম্মিলিতভাবে পরীক্ষার রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল : আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে বলুন, ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাটি কি এবং কিভাবে ঘটেছিল? যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে সব বলে দিলেন এবং এরপরও তারা কুফরী ও অস্বীকারে অটল রইল, তখন তিনি অন্তরে দারুণ আঘাত পেলেন। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনার রেসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও অনেক মানুষ বিশৃঙ্খল স্থাপনকারী নয়— আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার কাজ হল প্রচার এবং সংশোধনের চেষ্টা করা। চেষ্টাকে সফল করা আপনার ক্ষমতাবান নয়। অধিকন্তু এটা আপনার দায়িত্বও নয়। কাজেই দুঃখ করাও উচিত নয়।

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ وَآتَيْنَاهُمُ عَلَيْهِمْ
 مِنَ الْجِبِ الْمُتَّكِئِينَ فِي الْوَدِيِّ مُنَازِلًا وَمَا كُنَّا بِأَعْيُنِنَا
 السَّجُودَ ۝ وَالْأَرْضَ يَمْرُؤُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝
 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝ أَفَأَمَّا إِنْ
 تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَتَىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً
 وَهُمْ لَا يُعْشِرُونَ ۝ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ
 بَصِيرَةٍ أَمَّا تَمَنِ الْعِبَادُ ۝ وَبُحْنُ اللَّهِ وَمَا كُنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
 أَقَلَّمْ سَبِيلُ رُؤُوفِي الْأَرْضَ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۝
 حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُنُوا إِجَابَةً
 تَصَرَّافًا مِّنْ شَيْءٍ نَّشَأَ وَلَٰيِدٌ بِّاسْمَاعِيلَ الْقَوْمِ الْغَافِرِينَ ۝
 لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ مَا كَانَ
 حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ
 تَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

(১০৩) আপনি যতই চান, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসকারী নয়। (১০৪) আপনি এর জন্যে তাদের কাছে কোন বিনিময় চান না। এটা তো সারা বিশ্বের জন্যে উপদেশ বৈ নয়। (১০৫) অনেক নিদর্শন রয়েছে নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম করে এবং তারা এসবের দিকে মনোনিবেশ করে না। (১০৬) অথচ মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শেরকও করে। (১০৭) তারা কি নির্ভীক হয়ে গেছে এ বিষয়ে যে, আল্লাহর আযাবের কোন বিপদ তাদেরকে আবৃত করে ফেলবে অথবা তাদের কাছে হঠাৎ কেয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা টেরও পাবে না? (১০৮) বলে দিন : এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই—আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অশ্লীলাবাদের অন্তর্ভুক্ত নই। (১০৯) আপনার পূর্বে আমি যতজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি, তারা সবাই পুরুষই ছিল জনপদবাসীদের মধ্য থেকে। আমি তাঁদের কাছে ওই প্রেরণ করতাম। তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে না, যাতে দেখে নিত কিরপ পরিণতি হয়েছে তাদের, যার পূর্বে ছিল? সংঘম কারীদের জন্যে পরকালের আবাসই উত্তম। তারা কি এখনও গোয়ে না? (১১০) এমনকি যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না। (১১১) তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্যে পূর্বকাল কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হেদায়েত।

وَأَتَيْنَاهُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْجِبِ الْمُتَّكِئِينَ فِي الْوَدِيِّ مُنَازِلًا — অর্থাৎ, আপনি

প্রচার ও বিশুদ্ধ পথ বলে দেয়ার যে চেষ্টা করছেন, সেজন্য তাদের কাছে তো কোন পারিশ্রমিক চান না যে, এটা মেনে নেয়া বা শোনা তাদের পক্ষে কঠিন হবে। আপনার কথাবার্তা তো নির্ভেজাল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও উপদেশ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আপনার এ চেষ্টার লক্ষ্য যখন পার্শ্ব উপকার লাভ নয়, বরং পরকালের সওয়াব ও জ্ঞতির হিতাকাঙ্ক্ষা, তখন এ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি কেন চিন্তিতহন?

وَكَايُنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّجُودِ وَالْأَرْضِ يَمْرُؤُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا

مُعْرِضُونَ অর্থাৎ, শুধু তাই নয় যে, এরা জেদ ও হঠকারিতাবশতঃ কোন শুভাকাঙ্ক্ষীর উপদেশ শ্রবণ করে না, বরং তাদের অবস্থা হল এই যে, নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে আল্লাহর যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর কাছ দিয়েও এরা উদাসীন হয়ে ও চোখ মুছে চলে যায়। একটুও লক্ষ্য করে না যে, এগুলো কার আপনার শক্তির নিদর্শন। নভোমন্ডলে ও ভূ-মন্ডলে আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও শক্তি অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। অতীতের আযাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তারা এগুলো থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে না।

যারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও শক্তিতেই বিশ্বাস করে না, উপরোক্ত বর্ণনা ছিল তাদের সম্পর্কে। অতঃপর এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর সাথে অন্য বস্তুকে অশ্লীলার সাব্যস্ত করে। বলা হয়েছেঃ

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ — অর্থাৎ, তাদের মধ্যে

যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তারাও শেরকের সাথে করে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি গুণের সাথে অন্যকে অশ্লীলার সাব্যস্ত করে, যা একান্ত অন্যায্য ও নিহক মূর্ততা।

ইবনে-কাসীর বলেন : যেসব মুসলমান ঈমান সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকার শেরকে লিপ্ত রয়েছে, তারাও এ আযাতের অন্তর্ভুক্ত। মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আমি তোমাদের জন্যে যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক হচ্ছে ছোট শেরক। সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন : রিয়া (লোক দেখানো এবাদত) হচ্ছে ছোট শেরক। এমনভাবে এক হাদীসে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়াকেও শেরক বলা হয়েছে। — (ইবনে কাসীর) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে মানুত করা এবং নিয়াজ দেয়াও ফেকাহবিদগণের মতে শেরকের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর তাদের অমনোযোগিতা ও মূর্খতার কারণে পরিতাপ ও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা অস্বীকার ও অব্যাহতা সত্ত্বেও কিরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর কোন আযাব এসে যাবে কিংবা অতর্কিতে কেয়ামত এসে যাবে তাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই।

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَمَّا تَمَنِ الْعِبَادُ

وَبُحْنُ اللَّهِ وَمَا كُنَّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

অর্থাৎ, আপনি তাদেরকে বলে দিন : তোমরা মান অথবা না

মান—আমার তরীকা এই যে, মানুষকে পূর্ণ বিশ্বাসসহকারে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে থাকব—আমি এবং আমার অনুসারীরাও।

উদ্দেশ্য এই যে, আমার দাওয়াত আমার কোন চিন্তাধারার উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি। এ দাওয়াত ও জ্ঞানে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর অনুসারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন : এতে সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর জ্ঞানের বাহক এবং আল্লাহর সিপাহী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : সাহাবায়ে কেরাম এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের অন্তর পবিত্র এবং জ্ঞান সুগভীর। তাঁদের মধ্যে লৌকিকতার নাম-গন্ধও নেই। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে স্বীয় রসূলের সংসর্গ ও সেবার জন্যে মনোনীত করেছেন। তোমরা তাঁদের চরিত্র অভ্যাস ও তরিকা আয়ত্ত কর। কেননা, তাঁরা সরল পথের পথিক।

وَمِنَ النَّبِيِّينَ - ব্যাপক অর্থেও হতে পারে। এতে ঐসব ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যারা কেয়ামত পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর দাওয়াতকে উম্মত পর্যন্ত পৌছানোর কাজে নিয়োজিত থাকবেন। কলবী ও ইবনে যায়েদ বলেন : এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর অনুসরণের দাবী করে, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁর দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌছানো এবং কোরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা।—(মাহযারী)

وَسُيِّنَ اللَّهُ وَكَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - অর্থাৎ, আল্লাহ শেরক থেকে পবিত্র এবং আমি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই। উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, অধিকাংশ লোক ঈমানের সাথে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শেরকেও যুক্ত করে দেয়। তাই শেরক থেকে নিজের সম্পূর্ণ পবিত্রতার প্রকাশ করেছেন। সারকথা এই যে, আমার দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করা নয়; বরং আমি নিজেও আল্লাহর দাস এবং মানুষকেও তাঁর দাসত্ব স্বীকার করার দাওয়াত দেই। তবে দাওয়াতদাতা হিসেবে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয।

মুশরেকরা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করতে যে, আল্লাহর রসূল ও দূত মানুষ নয়; বরং ফেরেশতা হওয়া দরকার। এর উত্তর পরবর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - অর্থাৎ, তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন ও নিরর্থক যে, আল্লাহর রসূল ফেরেশতা হওয়া দরকার—মানব হতে পারে না। বরং ব্যাপার উল্টা। মানব জাতির জন্যে আল্লাহর রসূল সবসময় মানবই হয়েছেন। তবে সাধারণ লোকদের থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এই যে, তাঁর প্রতি সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে ওহী আগমন করে। এটা কারও প্রচেষ্টা ও কর্মের ফল নয়। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বন্দাদের মধ্য থেকে যাকে উপযুক্ত মনে করেন, এ কাজের জন্যে মনোনীত করেন। এ মনোনয়ন এমন কতগুলো বিশেষ গুণের ভিত্তিতে হয়, যেগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না।

পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দাতার ও রসূলের নির্দেশাবলী অমান্য করে আল্লাহর আযাবকে ডেকে আনে। বলা হয়েছে :

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
وَكَذَٰلِكَ يُزَكَّىٰ لِكُلِّ ذَلِيلٍ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অর্থাৎ, তারা কি দেশ-ভ্রমণে বের হয় না, যাতে পূর্ববর্তী

জাতিসমূহের শোচনীয় পরিণতি স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে? কিন্তু তারা ইহকালের বাহ্যিক আরাম-আয়েশ ও সাজ-সজ্জায় মত্ত হয়ে পরকাল ভুল গেছে। অথচ পরহেযগারদের জন্যে পরকাল ইহকালের চাইতে অনেক উত্তম। তারা কি এতটুকুও বোঝে না যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ ভাল, না পরকালের চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ ও নেয়ামত ভাল?

অদৃশ্যের সংবাদ ও অদৃশ্যের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য :

ذَٰلِكَ مِنَ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ - এগুলো সব অদৃশ্যের সংবাদ, যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে বলি। এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এমনি ভাষায় সূরা আলে ইমরানের ৪৩তম আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। সূরা হুদের ৪৮তম আয়াতে নূহ (আঃ)—এর ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে : ذَٰلِكَ مِنَ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ - এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরদেরকে অদৃশ্যের সংবাদ বলে দেন। বিশেষ করে আমাদের শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)—কে এসব অদৃশ্য সংবাদের বিশেষ অংশ দান করা হয়েছে, যার পরিমাণ পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের তুলনায় বেশী। এ কারণেই তিনি উম্মতকে এমন অনেক ঘটনা বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কেয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। ‘কিতাবুল-ফিতান’ শিরোনামে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন বর্ণনা সমুলিত বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী হাদীসগ্রন্থসমূহে মজবুদ রয়েছে।

সাধারণ মানুষ ‘অদৃশ্যের জ্ঞান’ বলতে যে কোনরূপে অদৃশ্যের সংবাদ অবগত হওয়াকেই বোঝে। এ গুণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ জন্যেই তাদের মতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ‘আলেমুল-গায়ব’ (অদৃশ্যে জ্ঞানী) ছিলেন। কিন্তু কোরআন পাক পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, أَكْبَرُكُمْ فِي السَّلَاطَةِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ - এতে জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আলেমুল গায়ব হতে পারে না।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ الْغُفَى

এ আয়াতে পয়গম্বরগণের সম্পর্কে رَحْمَةً শব্দের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, পয়গম্বর সবসময় পুরুষই হন নারীদের মধ্যে কেউ নবী কিংবা রসূল হতে পারেন না।

ইবনে কাসীর ব্যাপকসংখ্যক আলেমের এ অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা কোন নারীকে নবী কিংবা রসূল নিযুক্ত করেননি। কোন কোন আলেম কয়েকজন মহিলা সম্পর্কে নবী হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন; উদাহরণতঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর বিবি সারা, হযরত মুসা (আঃ)—এর জননী এবং হযরত ইসা (আঃ)—এর জননী হযরত মরিয়ম। এ তিন জন মহিলা সম্পর্কে কোরআন পাকে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যদ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা তাঁদের সাথে বাক্যালাপ করেছে, সুসংবাদ দিয়েছেন কিংবা ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং তারা কোন বিষয় জানতে পেরেছেন। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক আলেমের মতে এসব আয়াত দ্বারা উপরোক্ত তিন জন মহিলার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহর কাছে তাঁদের উচ্চ মর্যাদাশালীনী হওয়া বোঝা যায় মাত্র। এই ভাষা নবুওয়াত ও রেসালত প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট নয়।

এ আয়াতেই أَكْبَرُكُمْ فِي السَّلَاطَةِ শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা সাধারণতঃ শহর ও নগরবাসীদের মধ্য থেকে রসূল প্রেরণ করেছেন অথ

প্রায় কিংবা বনাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য থেকে রসূল প্রেরিত হননি। কারণ, সাধারণতঃ গ্রাম বা বনাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বভাব-প্রকৃতি ও জ্ঞান বুদ্ধিতে নগরবাসীদের তুলনায় পশ্চাদপদ হয়ে থাকেন।— (ইবনে-কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পয়গম্বর প্রেরণ ও সত্যের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং পয়গম্বরদের সম্পর্কে কোন কোন সন্দেহের দূরীকরণ দেয়া হয়েছিল। উল্লেখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণের অন্তত পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে না। যদি তারা সামান্যও চিন্তা করত এবং পারিপার্শ্বিক শহর ও স্থানসমূহের ইতিহাস পাঠ করত, তবে নিশ্চয়ই জানতে পারত যে, পয়গম্বরগণের বিরুদ্ধাচরণকারীরা এ দুনিয়াতে কিরূপ ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। কওমে-লুতের জনপদসমূহ উল্টে দেয়া হয়েছে। কওমে-আ'দ ও কওমে-সামুকে নানাবিধ আযাব দ্বারা নাস্তানাবুদ করে দেয়া হয়েছে। পরকালের আযাব আরও কঠোরতর হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায়ই ফলস্বায়ী। আসল চিন্তা পরকালের হওয়া উচিত। সেখানকার অবস্থান চিরস্থায়ী এবং সুখ-দুঃখও চিরস্থায়ী। আরও বলা হয়েছে যে, পরকালের সুখাশুভি তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়ার অর্থ শরীয়তের যাবতীয় রিহ-বিধান পালন করা।

এ আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উদ্দেশ্যের অবস্থা দ্বারা বর্তমান লোকদেরকে সতর্ক করা। তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের একটি সন্দেহ দূর করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর মুখে খোদায়ী আযাব থেকে ভয় প্রদর্শনের কথা অনেক লোক দীর্ঘ দিন থেকে শুনে আসছিল, কিন্তু তারা কোন আযাব আসতে দেখত না। এতে তাদের দুঃসাহস আরও বেড়ে যায়। তারা বলতে থাকে যে, আযাব যদি আসবারই হত, তবে এতদিনে কবেই এসে যেত। তাই বলা হয়েছে আল্লাহ তাআলা স্বীয় করুণা ও রহস্যবশতঃ অনেক সময় অপরাধী সম্প্রদায়কে অবকাশ দান করেন। এ অবকাশ মাঝে মাঝে এত দীর্ঘতর হয় যে, অব্যাহতের দুঃসাহস আরও বেড়ে যায় এবং পয়গম্বরগণ এক প্রকার অস্থিরতার সম্মুখীন হন। এরশাদ হয়েছেঃ

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُنُوا فِي رَحْمَةٍ مِّنَّا نَبَزْنَا فِي سَنَآئِهِم مَّا يُصِيبُ الْمَوْتِ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ رَحْمَتَنَا مُبْتَلًّىٰ

অর্থাৎ, পূর্ববর্তী উদ্দেশ্যতাদের অব্যাহতের কারণে লম্বা লম্বা অবকাশ দেয়া হয়েছে। এমন কি দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের উপর আযাব না আসার কারণে পয়গম্বরগণ এরূপ ধারণা করে নিরাশ হয়ে পড়েছেন যে, আল্লাহ প্রদত্ত আযাবের সংক্ষিপ্ত ওয়াদার যে অবকাশ আমরা নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে স্থির করে রেখেছিলাম, সে সময়ে কাফেরদের উপর আযাব আসবে না এবং সত্যের বিজয় প্রকাশ পাবে না। পয়গম্বরগণ প্রবল ধারণা গোষণ করতে থাকেন, অনুমানের মাধ্যমে আল্লাহর ওয়াদার সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের বোধশক্তি ভুল করেছে। কারণ, আল্লাহ তাআলা তো কোন নির্দিষ্ট সময় বলেননি। আমরা বিশেষ বিশেষ ইঙ্গিতের মাধ্যমেই একটি সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম। এমনকি নৈরাস্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁদের কাছে আমার সাহায্য এসে যায়, অর্থাৎ, ওয়াদা অনুযায়ী কাফেরদের উপর আযাব এসে যায়। অতঃপর এ আযাব থেকে আমি

যাকে ইচ্ছা করছি, বাঁচিয়ে নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, পয়গম্বরগণের অনুসারী মুমিনদেরকে বাঁচানো হয়েছে এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। কেননা, আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে অপসৃত করা হয় না, বরং আযাব অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করে। কাজেই আযাবে বিলম্ব দেখে মক্কার কাফেরদের ঠোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নয়।

এ আয়াতে قُلُوبُ শব্দটি প্রসিদ্ধ কেরাআত অনুযায়ী পাঠ করা হয়েছে। আমরা এর যে তফসীর বর্ণনা করছি, এটাই অধিকতর স্বীকৃত ও স্বচ্ছ। অর্থাৎ, قُلُوبُ শব্দের সারমর্ম হচ্ছে অনুমান ও ধারণা ভ্রান্ত হওয়া। এটা এক প্রকার ইজ্তেহাদী ভ্রান্তি। পয়গম্বরগণের দ্বারা এরূপ ইজ্তেহাদী ভ্রান্তি সম্ভবপর। তবে পয়গম্বর ও অন্যান্য মুজতাহিদদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পয়গম্বরগণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এরূপ ভুল ধারণার উপর স্থির থাকার সুযোগ দেয়া হতো না, বরং তাদেরকে বাস্তব বিষয় জ্ঞাত করে প্রকৃত সত্য ফুটিয়ে তোলা হতো। অন্যান্য মুজতাহিদদের জন্যে এরূপ মর্যাদা নেই।

এমনিভাবে আয়াতে قُلُوبُ শব্দের মর্মও তাই যে, কাফেরদের উপর আযাব আসতে বিলম্ব হয়েছিল এবং পয়গম্বরগণ অনুমানের মাধ্যমে যে সময় মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন সে সময়ে আযাব আসেনি। ফলে তাঁরা ধারণা করেন যে, আমরা সময় নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে ভুল করেছি। এই তফসীরটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে আল্লামা তীবী বলেনঃ এই রেওয়ায়েত নির্ভুল। কারণ, সহীহ বুখারীতে তা বর্ণিত আছে।

কোন কোন কেরাআতে এ শব্দটি যাল—এর তশদীদসহ قُلُوبُ শব্দটি পাঠিত হয়েছে। قُلُوبُ ক্রিয়াপদটি تَكْذِيبُ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, পয়গম্বরদের অনুমিত সময়ে আযাব না আসার কারণে তাঁরা আশঙ্কা করতে থাকেন যে, এখন যারা মুসলমান, তারাও বুঝি তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপ করতে শুরু করে যে, তাঁরা যা কিছু বলেছিলেন তা পূর্ণ হল না। এহেন দুর্বিপাকের সময় আল্লাহ তাআলা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করে দেখালেন। অবিশ্বাসীদের উপর আযাব এসে গেল এবং মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হল। ফলে পয়গম্বরগণের বিজয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠলো। অর্থাৎ, পয়গম্বরগণের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্যে বিশেষ শিক্ষা রয়েছে।

এর অর্থ সব পয়গম্বরের কাহিনীতেও হতে পারে এবং বিশেষ করে ইউসুফ (আঃ)—এর কাহিনীতেও হতে পারে, যা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেননা, এ ঘটনায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার অনুগত বন্দাদের কি কি ভাবে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হয় এবং কূপ থেকে বের করে রাজসিংহাসনে এবং অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে উচ্চতম শিখরে কিভাবে পৌছে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীরা পরিণামে কিরূপ অপমান ও লান্দানা ভোগ করে।

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ অর্থাৎ, এ কাহিনী কোন মনগড়া কথা নয়, বরং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থনকারী। কেননা, তওরাত ও ইনজীলে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাঈহ বলেনঃ যতগুলো আসমানী গ্রন্থ ও সহীকা

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّيَ الْأَكْبَرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ ۝ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكُتُبِ الْوَحْيَ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوتَ بِغَيْرِ
عَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْنَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
كُلٌّ يَجْرِي لِأَجْلِ مُسَمًّى يَوْمَ يَكْفُلُ الْأَمْرُ غِطْسًا لِّعَلَّكُمْ
يَلْقَآءَ رُؤُوسَهُمْ ۝ وَالَّذِي يَكْنِ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا
رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الْجِبَالِ جَعَلَ فِيهَا زُجُجًا ثَلَاثِينَ
يَغْشَى الْبَلَّ السَّحَابُ ۝ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَ
فِي الْأَرْضِ قُطْعٌ مُّتَبَعَةٌ وَجَنُودٌ مُّغْتَابٌ وَرُءُوسٌ خَمِيلٌ
صُنُوفٌ وَعِصْمٌ ۝ وَالَّذِي يُسْقِي بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُقْطَلُ بَعْضُهَا
عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَرْضِ ۝ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَ
إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ۝ إِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنْ كُنَّا لَفِي حَلَكٍ
جَدِيدَةٍ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَكْفَلُ ۝ فِي
أَعْيُنِهِمْ ۝ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۝ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

সূরা রা'দ

মক্কা অবতীর্ণ : আয়াত ৪৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) আলিফ-লাম-মীম-রা; এগুলো কিতাবের আয়াত। যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না। (২) আল্লাহ, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমারা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নির্দশনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সমুদ্রে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (৩) তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু' দু' প্রকার সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে। (৪) এবং যমিনে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্র রয়েছে—একটি অপরটির সাথে সলগল এবং আঙ্গুরের বাগান আছে আর শস্য ও খজুর রয়েছে—একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়। আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে উৎকৃষ্টতর করে দেই। এগুলোর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে। (৫) যদি আপনি বিশ্বাসের বিষয় চান, তবে তাদের একথা বিশ্বাস কর যে, আমরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখনও কি নতুনভাবে সৃষ্টিত হবে? এরাই স্বীয় পালনকর্তার সন্তায় অবিশ্বাসী হয়ে গেছে, এদের গর্দানেই লৌহ-শৃংখল পড়বে এবং এরাই দেখা দিবে এরা তাতে চিরকাল থাকবে।

অবতীর্ণ হয়েছে, ইউসুফ (আঃ)—এর কাহিনী থেকে কোনটিই খালি নয়।—
(মাহহারী)

وَتَقْوِيلٌ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ — অর্থঃ ৭

কোরআন সব বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ। অর্থঃ, কোরআন পাকে এমন প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ রয়েছে, যা ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের জন্যে জরুরী। এবাদত, লেন-দেন, চরিত্র, সামাজিকতা, রাষ্ট্র পরিচালনা রাজনীতি ইত্যাদি মানব জীবনের প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধান ও নির্দেশ এতে রয়েছে। আরও বলা হয়েছে : এ কোরআন ঈমানদারদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। এতে বিশেষ করে ঈমানদারদের কথা বলার কারণ এই যে, উপকারিতা ঈমানদারগণই পেতে পারেন। যদিও কাকেরের জন্যেও কোরআন রহমত ও হেদায়েত, কিন্তু তাদের কুকর্ম ও অবাধ্যতার কারণে এ রহমত ও হেদায়েত তাদের পক্ষে শান্তির কারণ হয়ে যায়।

শায়খ আবু মনসুর বলেন : সমগ্র সূরা ইউসুফ এবং এতে সন্নিবেশিত কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে সান্ত্বনা প্রদান করা যে, স্বজাতির হাতে আপনি যেসব নির্যাতন ভোগ করেছেন, পূর্বজী পয়গম্বরগণও সেগুলো ভোগ করেছেন। কিন্তু পরিণামে আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরগণকেই বিজয়ী করেছেন। আপনার ব্যাপারটিও তদ্রূপই হবে।

সূরা ইউসুফ সমাপ্ত

সূরা রা'দ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরাভূর রা'দ মক্কা অবতীর্ণ। এতে সর্বমোট ৪৩টি আয়াত রয়েছে। এ সূরায়ও কোরআন পাকের সত্যতা, তওহীদ ও রেসালতের বর্ণনা এবং বিভিন্ন সন্দেহের উত্তর উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লাহ এগুলো খণ্ডবর্ণ। এসবের অর্থ আল্লাহ তাআলাই জানেন। উম্মতকে এর অর্থ বলা হয়নি। সর্বসাধারণের পক্ষে এর পেছনে পড়া সমীচীন নয়।

হাদীসও কোরআনের মত খোদারী ওহী : প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন পাক আল্লাহর কলাম এবং সত্য। কিতাব বলে কোরআনকেই বোঝানো হয়েছে এবং وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ۝ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ ۝ অক্ষরটি বাহ্যতঃ বোঝায় যে, কিতাব এবং الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ স্বতন্ত্র বিষয় এমতাবস্থায় কিতাবের অর্থ কোরআন এবং الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ এর অর্থ ওহী যা কোরআন ছাড়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে এসেছে। কেননা, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে ওহী আসত, তা শুধু কোরআনেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বয়ং কোরআনে বলা হয়েছে :

وَرَأَيْتُكَ عَنْ الْمَلَكِ ۝ إِنَّ مَوْلَاؤِي يُؤْتَوْنَ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের খোয়াল-খুশী অনুযায়ী কোন কিছু বলেন না; বর তাঁর উক্তি একটি ওহী, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রেরিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোরআন ছাড়া অন্য কোন বিশি-বিধান দিয়েছেন, সেগুলোও আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। পার্থক্য

এতদুচ্চ যে, কোরআনের তেলাওয়াত করা হয় এবং সেগুলোর তেলাওয়াত হয় না। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, কোরআনের অর্থ ও শব্দ উভয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোরআন ছাড়া হাদীসে যেসব বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলোর মর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু শব্দ অবতীর্ণ নয়। এ জন্যই নামাযে এগুলোর তেলাওয়াত হয় না।

সেমতে আয়াতের অর্থ এই যে, এই কোরআন এবং যেসব বিধি-বিধান আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত কিন্তু অধিকাংশ লোক চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে তা বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তার সৃষ্টি ও কারিগরির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বিশ্বাস করতে হবে যে, এগুলোর এমন একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি সর্বশক্তিমান এবং সমগ্র সৃষ্টজগত যার মুঠের মধ্যে।

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَهُ السَّمُوتَ بِنُوحٍ عَلَى تَرَاتُومٍ ۚ অর্থাৎ, আল্লাহ এমন এক সত্তা, যিনি আকাশসমূহকে সুবিস্তৃত ও বিশাল গম্বুজাকার খুঁটি ব্যতীত উচ্চে উন্নীত রেখেছেন যেমন তোমরা আকাশসমূহকে এ অবস্থায়ই দেখ।

আকাশের দেহ দৃষ্টিগোচর হয় কি? সাধারণতঃ বলা হয় যে, আমাদের মাথার উপরে যে নীল রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তা আকাশের রঙ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন : আলো ও অন্ধকারের সম্মিশ্রণে এই রঙ অনুভূত হয়। নীচে তারকারাশীর আলো এবং এর উপরে অন্ধকার। উভয়ের সম্মিশ্রণে বাইরে থেকে নীল রঙ অনুভূত হয়; যেমন গভীর পানিতে আলো বিচ্ছুরিত হলে তা নীল দেখা যায়। কোরআন পাকের কতিপয় আয়াতে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন এ আয়াতে **وَاللَّيْلِ السَّامِيَةِ** বলা হয়েছে এবং অন্য এক আয়াতে **وَاللَّيْلِ** বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য প্রথমতঃ এর পরিপন্থী নয়।

কেননা, এটা সম্ভব যে, আকাশের রঙও নীলাভ হবে অথবা অন্য কোন রঙ হবে; কিন্তু মধ্যস্থলে আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণের ফলে নীল দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। শূন্যের রঙের মধ্যে যে আকাশের রঙও शामिल রয়েছে, এ কথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا عَلَىٰ نُوحٍ عَلَيْنَا ۖ অর্থাৎ, অতঃপর আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিরাজমান হলেন, যা সিংহাসনের অনুরূপ। এ বিরাজমান হওয়ার স্বরূপ কারও বোধগম্য নয়। এতদুচ্চ বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, যেরূপ বিরাজমান হওয়া তাঁর পক্ষে উপযুক্ত, সেরূপেই বিরাজমান রয়েছেন।

وَنُوحٍ الْيَسْقِيهِمُ الْغُرُبَاتِ ۖ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সূর্য ও চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে।

আচ্ছাদিত করার অর্থ এই যে, উভয়কে যে যে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তারা অহর্নিশ তা করে যাচ্ছে। হাজারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; কিন্তু কোন সময় তাদের গতি চুল পরিমাণও কম-বেশী হয়নি। তারা ক্রান্ত হয় না এবং কোন সময় নিজের নির্দিষ্ট কাজ ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ধাবিত হওয়ার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা সমগ্র বিশ্বের জন্যে নিশ্চারিত সময় অর্থাৎ কেয়ামতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর মহাজগতের গোটা ব্যবস্থাপনা তখন ছ

হয়ে যাবে।

আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক গ্রহের জন্যে একটি বিশেষ গতি ও বিশেষ কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা সব সময় নিজ নিজ কক্ষপথে নিশ্চারিত গতিতে চলমান থাকে। চন্দ্র নিজ কক্ষপথ এক মাসে এবং সূর্য এক বছরে অতিক্রম করে।

এসব গ্রহের এক-একটির আয়তন পৃথিবীর চাইতে বহুগুণ বড়। এগুলো বিশেষ কক্ষপথে বিশেষ গতিতে হাজারো বছর যাবৎ একই ভঙ্গিতে চলমান রয়েছে। এদের কলকল্লা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, ভাঙ্গে না এবং মেরামতেরও প্রয়োজন দেখা দেয় না। বিজ্ঞানের বর্তমান চূড়ান্ত উন্নতির পরও মানব নির্মিত বস্তুসমূহের মধ্যে এদের পূর্ণ নকীর দূরের কথা, হাজার ভাগের এক ভাগ পাওয়াও অসম্ভব। প্রকৃতির এই ব্যবস্থাপনা উচ্চঃস্থরে ডেকে বলা হবে যে, এর পেছনে এমন একজন স্রষ্টা ও পরিচালক রয়েছেন, যিনি মানুষের অনুভূতি ও চেতনার বহু উর্ধ্বে।

يَذَرُ الْآثَرَ — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন। সাধারণতঃ মানুষ নিজের কলাকৌশলের জন্যে গর্ববোধ করে; কিন্তু একটু চোখ খুলে দেখলেই বোঝা যাবে যে, তার কলাকৌশল কোন বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা সৃজিত বস্তুসমূহের নির্ভুল ব্যবহার বোঝে নেয়াই তার কলাকৌশলের শেষ গম্ভ্য। পার্শ্বব বস্তুসামগ্রী ব্যবহার করার যে ব্যবস্থা, তাও মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। কেননা, মানুষ প্রত্যেক কাজে অন্য হাজারো মানুষ, জানোয়ার ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মুখাপেক্ষী, যেগুলোকে সে নিজ কলাকৌশলের মাধ্যমে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে না। আল্লাহর শক্তিই প্রত্যেক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে যে, আপনা থেকেই এসে জড়ো হয়। আপনার গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হলে স্থপতি থেকে শুরু করে রঙ পালিশকারী সাধারণ কর্মী পর্যন্ত শত শত মানুষ নিজের দৈহিক সামর্থ্য ও কারিগরি বিদ্যা নিয়ে আপনার সেবা করতে প্রস্তুত দেখা যাবে। বহু দোকানে বিকল্প নির্মাণ-সামগ্রী আপনি নিজ প্রয়োজনে প্রস্তুত পাবেন। কিন্তু নিজস্ব অর্থ অথবা কলাকৌশলের জোরে এসব বস্তুর মূল উপাদান সৃষ্টি করতে এবং সব মানুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও কারিগরী প্রতিভা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে আপনি সক্ষম হবেন কি? আপনি কেন, কোন বৃহত্তর সরকারও আইনের জোরে এ ব্যবস্থা কায়ম করতে পারে না। নিঃসন্দেহে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদান এবং তদ্বারা বিশ্বব্যবস্থার নিখুঁত পরিচালনা একমাত্র চিরজীব ও মহা ব্যবস্থাপক আল্লাহরই কাজ। মানুষ একে নিজের কলাকৌশল মনে করলে তা মূর্খতা বৈ আর কিছু হবে না।

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ ۖ অর্থাৎ, তিনি আয়াতসমূহকে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা করেন। এর অর্থ কোরআনের আয়াতসমূহ হতে পারে। আল্লাহ তাআলা এগুলো নাখিল করেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর মাধ্যমে তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন।

অথবা আলাচ্য আয়াতের অর্থ আল্লাহ তাআলা অপার শক্তির নিদর্শনাবলীও হতে পারে। অর্থাৎ, আসমান যমীন ও স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব, এগুলো বিস্তারিতভাবে সর্বদা ও সর্বত্র মানুষের দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান রয়েছে।

لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ অর্থাৎ, সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও তার বিস্ময়কর পরিচালন-ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা এজন্যে কায়ম করেছেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে পরকাল ও কেয়ামতে বিশুদী হও।

কেননা, এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করার পর পরকালে মানুষকে পুনর্বাসী সৃষ্টি করাকে আল্লাহর শক্তি বিহীন মনে করা সম্ভব হবে না। যখন শক্তির অন্তর্ভুক্ত ও সম্ভবপর বোঝা যাবে, তখন দেখতে হবে যে, এ সংবাদ এমন এক ব্যক্তি দিয়েছেন, যিনি জীবনে কোন দিন মিথ্যা বলেননি। কাজেই তা বাস্তবতাসম্পন্ন ও প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না।

وَمُؤَاذِيكَ مِنَ الْأَرْضِ وَفِيهَا رَوَايَا وَآخَرًا

তিনিই

ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারী পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন।

ভূমণ্ডলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্থী নয়। কেননা, গোলাকার বস্তু যদি অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের মতই দৃষ্টিগোচর হয়। কোরআন পাক সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণে সম্বোধন করে। বাহাদরী ব্যক্তি পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠরূপে দেখে। তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্যে এর উপর সুউচ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্টজীবকে পানি পৌছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পাহাড় শৃঙ্খল বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্যে কোন চৌবাচ্চা নেই। এবং তা তৈরী করারও প্রয়োজন নেই। অপবিত্র বা দূষিত সত্ত্বার ও কোন সম্ভাবনা নেই। অতঃপর এ ফলশুধারী থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে। অতঃপর কূপের মাধ্যমে এ ফলশুধারার সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়।

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَايَا ثَمَرًا

অর্থাৎ, এ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নানাবিধ ফল-ফসল উৎপন্ন করছেন এবং প্রত্যেক ফলের-ফসলের দু'দু'প্রকার সৃষ্টি করছেন : লাল, সাদা, টক-মিষ্টি। رَوَايَا এর অর্থ দুই না হয়ে একাধিক হতে পারে, যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দু'হবে। তাই বিষয়টি رَوَايَا শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। رَوَايَا এর অর্থ নর ও মাদী হওয়াও অসম্ভব নয়। যেমন, অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেক বৃক্ষ নর ও মাদী হয়। উদাহরণতঃ খেজুর, পেঁপে ইত্যাদি। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যেও এরূপ সম্ভাবনা আছে ; যদিও গবেষণা এখনো এতটা অগ্রসর হয়নি।

يُعْثِي الْبَلَّاءَ - অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলাই রাত্রি দ্বারা দিনকে

ঢেকে দেন। অর্থাৎ, দিনের আলোর পর রাত্রি নিয়ে আসেন ; যেমন কোন উজ্জ্বল বস্তুকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে দেয়া হয়।

إِنِّي ذَالِكُ الْأَلَمِ لَقَوْمٌ يَسْكُرُونَ - নিঃসন্দেহে সমগ্র সৃষ্টি ও তার

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্যে আল্লাহ তাআলার অপার শক্তির বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

وَفِي الْأَرْضِ قَطْعٌ مُتَبَعٌ وَجُنُودٌ مُّقْرَّبَةٌ أَعْيُنًا وَمَعِينًا

وَصُنُوفٌ وَأَعْيُنٌ مِّنْ دُونِهَا وَنَحْوُهَا كَثِيرٌ

بَعْضُ فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ, অনেক ভূমিখণ্ড পরস্পর সলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি ও

বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নরূপ। কোনটি উর্বর ও কোনটি অনুর্বর, কোনটি নরম ও কোনটি শক্ত এবং কোনটি শস্যের উপযোগী এবং কোনটি বাগানের উপযোগী। এসব ভূখণ্ডে রয়েছে আসুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র এক খেজুরবৃক্ষ। তন্মধ্যে কোন বৃক্ষ এমন যে, এক কাণ্ড উপরে পৌছে দু'কাণ্ড হয়ে যায় ; যেমন সাধারণ বৃক্ষ এবং কোনটিতে এক কাণ্ডই থাকে ; যেমন খেজুরবৃক্ষ ইত্যাদি।

এসব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয়, একই পানি দ্বারা সিক্ত হয় এক চন্দ্র সূর্যের কিরণ ও বাতাস সবই এক রকম পায় ; কিন্তু এ সত্ত্বেও এসবের রঙ ও স্বাদ বিভিন্ন এবং আকারে ছোট ও বড়। সলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নানা ধরনের বিভিন্নতা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, একই উৎস থেকে উৎপন্ন বিচিত্রধর্মী এসব ফল-ফসলের সৃষ্টি কোন একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সত্ত্বার আদেশের অধীনে চালু রয়েছে—শুধু বস্তুর রূপান্তরে নয়। যেমন এক শ্রেণীর অস্ত্র লোক তাই মনে করে। কেননা, নিছক বস্তুর রূপান্তর হলে সব বস্তু অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ বিভিন্নতা কিরূপে হত। একই জমি থেকে এক ফল এক ঋতুতে উৎপন্ন হয় এবং অন্য ফল অন্য ঋতুতে। একই বৃক্ষে একই ডালে বিভিন্ন প্রকার ছোট বড় এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল ধরে।

إِنِّي ذَالِكُ الْأَلَمِ لَقَوْمٌ يَسْكُرُونَ - নিঃসন্দেহে এতে আল্লাহর শক্তি,

মাহাত্ম্য ও একত্বের বহু নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্যে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা এসব বিষয়ে চিন্তা করে না, তারা বুদ্ধিমান নয়—যদিও দুনিয়াতে তারা বুদ্ধিমান ও সমবদার বলে কথিত হয়।

কাফেরদের সন্দেহ ছিল তিনটি। (এক) তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের হিসাব-কিতাবকে অসম্ভব ও মুক্তিবিরুদ্ধ মনে করত। এ কারণেই তারা পরাকালের সংবাদদাতা পয়গম্বরগণকে এবং তাঁদের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করত। কোরআন পাকের এক আয়াতে তাদের এ সন্দেহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে : مَنْ كَانَ لَكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يَدْعُهُمْ إِذَا اذًا مُّؤْتَمَرًا مِّنْ مَّوَدِّعِهِمْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فَرَبِّدُوا لَهُمْ مَنَافِعَهُمْ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِمْ وَلَهُمْ فِي يَوْمِئِذٍ عَذَابٌ أَلِيمٌ তারা এসব কথা দ্বারা পয়গম্বরগণের প্রতি উপহাস করার জন্যে বলত এস, আমরা তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলি, সে বলে যে, তোমরা যখন মৃত্যুর পর খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে এবং ধূলিকণা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, তখন তোমাদেরকে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণ : আলোচ্য ৫ নং আয়াতে তাদের এ সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে : وَإِن جَبَبْتُمْ فَحَقِّقْ تَوَهُُّؤَهُمْ وَإِذَا كُنَّا أَشْرَارًا عِزَّائِلَ الْفَنَىٰ حَقِّقْ جَدِيدِي বলা হয়েছে যে, আপনি আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, কাফেররা আপনার সুস্পষ্ট মো'জেযা এবং নবুওয়্যতের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও আপনার নবুওয়্যত স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিশ্চয় ও চেতনহীন পাথরকে উপাস্য মানে, যে পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়, অপারের উপকার ও ক্ষতি কিরূপে করবে ?

কিন্তু এর চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয় বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে ; এটা কি সম্ভবপর ? কোরআন পাক এ আশ্চর্যের কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহর অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনন্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে

وَيَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْهَيْبَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ
 قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى
 ظُلُمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ
 لِّقَوْمٍ قَوْمِهِ هَادٍ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغْضُ
 الْأَرْحَامُ وَمَا تَرْزَاوُ ۝ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ بَيْقُنَا ۝ عَلَيْهِ الْعُقُوبُ
 وَاللَّهُ مَادَّةُ الْكِتَابِ الْمَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِنْكُمْ أَسْرَ الْقَوْلِ ۝
 مَنْ يَهْرَبْهُ وَمَنْ هُوَ مُسْتَعْجِلٌ بِأَيْتِلٍ وَسَارِبٌ بِأَيْتِلٍ ۝
 لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ
 مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرَ ۝ وَمَا
 بِأَنْفُسِهِمْ ۝ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۝ وَمَا لَهُمْ
 مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ ۝ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ أَسْرَ الْخَوْفِ وَطَبْعَا
 وَيُشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَسَيَسِيرُ الْمَرْءُ بِحِمْدٍ ۝ وَالْمَلَائِكَةُ
 مِنْ خِيفَتِهِ ۝ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ
 يَشَاءُ ۝ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۝

(৬) এরা আপনার কাছে মঙ্গলের পরিবর্তে দ্রুত অমঙ্গল কামনা করে। তাদের পূর্বে অনুরূপ অনেক শাস্তিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী অতিগ্রস্ত হয়েছিল। আপনার পালনকর্তা মানুষকে তাদের অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমা করেন এবং আপনার পালনকর্তা কঠিন শাস্তিদাতাও বটে। (৭) কাফেররা বলে : তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হইল না কেন? আপনার কাজ তো ভয় প্রদর্শন করাই এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে পঞ্চদর্শক হয়েছে। (৮) আল্লাহ্ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে এবং গর্ভপর্শে যা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হয়। এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে। (৯) তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, মহাশক্তি, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (১০) তোমাদের মধ্যে কেউ গোপন কথা লুক বা তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে আত্মগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক, সবাই তাঁর নিকট সমান। (১১) তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহ্র নির্দেশে তারা গুদর হেফাযত করে। আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ্ যখন কোন জাতির উপর বিপদ চান, তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (১২) তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান ভয়ের জন্যে এবং আশার জন্যে এবং উচ্চিত করেন ঘন মেঘমালা। (১৩) তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বন্ধ এবং সব কেশপশা, সভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন, অতঃপর যাকে ইচ্ছা, তাকে তা ঘুরা আঘাত করেন; তথাপি তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী।

এনেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে এমন রহস্য নিহিত রেখেছেন, যা অনুভব করাও মানুষের সাধ্যাতীত। বলাবাহুল্য, যে সত্তা প্রথমবার কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারেন, তাঁর পক্ষে পুনর্বীর অস্তিত্বে আনা কিরূপে কঠিন হতে পারে? কোন নতুন বস্তু তৈরী করা মানুষের পক্ষেও প্রথমবার কঠিন মনে হয়, ; কিন্তু পুনর্বীর তৈরী করতে চাইলে সহজ হয়ে যায়।

আশ্চর্যের বিষয়, কাফেররা একথা বিশ্বাস করে যে, প্রথমবার সমগ্র বিশ্বেক অসংখ্য হেকমতসহ আল্লাহ্ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। এরপর পুনর্বীর সৃষ্টি করাকে তারা কিরূপে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করে?

সম্ভবতঃ অবিশ্বাসীদের কাছে বড় প্রশ্ন যে, মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধূলিকণার আকারে বিশুময় ছড়িয়ে পড়ে। বায়ু এসব ধূলিকণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়। অতঃপর কেয়ামতের দিন এসব ধূলিকণাকে কিরূপে একত্রিত করা হবে এবং একত্রিত করে কিরূপে জীবিত করা হবে?

কিন্তু তারা দেখে না যে, তাদের বর্তমান অস্তিত্বের মধ্যেও সারা বিশ্বের কণা একত্রিত রয়েছে। বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বস্ত্রসমূহ, পানি, বায়ু ও এদের আনীত কণা মানুষের খাদ্যের মধ্যে शामिल হয়ে তার দেহের অংশে পরিণত হয়। এ বেচারী অনেক সময় জানেও না যে, যে লোকমাটি সে মুখে পুরছে, তাতে কতগুলো কণা আফ্রিকার, কতগুলো আমেরিকার এবং কতগুলো প্রাচ্য দেশসমূহের রয়েছে? যে সত্তা অপার শক্তি ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করে, এমন মানুষ ও জন্তুর অস্তিত্ব খাড়া করেছেন, আগমীকাল এসব কণা একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কোন মুশকিল হবে? অথচ বিশ্বের সমস্ত শক্তি—পানি, বায়ু ইত্যাদি তাঁরই আচ্ছাবহ। তাঁর ইচ্ছিতে বায়ু পানি এবং শূন্য তার ভিতরকার সব কণা যদি একত্রিত করে দেয়, তবে তা অবিশ্বাস্য হবে কেন?

সত্যি বলতে কি, কাফেররা আল্লাহ্ তাআলার শক্তি ও মহিমাকে চিনতেই পারেনি। তারা নিজেদের শক্তির নিরিখে আল্লাহ্র শক্তিকে বোঝে। অথচ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব বস্তু আপন আপন মর্যাদা সম্পর্কে সন্ম্যক সচেতন এবং আল্লাহ্ তাআলার আজ্ঞাধীন।

মোটকথা, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও কাফেরদের পক্ষে নবুওয়্যত অস্বীকার করা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, তার চাইতেও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কেয়ামতের পুনর্জীবন ও হাশরের দিন যে অস্বীকার করা।

এরপর অবিশ্বাসীদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এরা শুধু আপনাকেই অস্বীকার করে না; বরং প্রকৃতপক্ষে পালনকর্তাকেও অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি এই যে, তাদের গর্দানে লৌহশৃঙ্খল পরানো হবে এবং তারা চিরকাল দোহাষে বাস করবে।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফেরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল এই : যদি বাস্তবিকই আপনি আল্লাহ্র রসূল হয়ে থাকেন, তবে রসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? ৬ নং আয়াতে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে :

“তারা বিপদমুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই আপনার কাছে বিপদ নাযিল হওয়ার তাগাদা করে (যে, আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক আযাব এনে দিন। এতে বোঝা যায় যে, তারা আযাব আসাকে খুবই অবাস্তব অথবা অসম্ভব মনে করে।) অথচ তাদের পূর্বে অন্য কাফেরদের উপর অনেক আযাব এসেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। এমতাবস্থায় ওদের উপর আযাব অবাস্তব হল কিরূপে? এখানে مَثَلَاتٍ শব্দটি مثلاً—এর বহুবচন। এর অর্থ অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

এরপর বলা হয়েছে : নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা মানুষের গোনাহ ও অব্যাহত্যা সত্ত্বেও অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যারা এ ক্ষমা ও দয়া দ্বারা উপকৃত হয় না এবং অব্যাহতায় ডুবে থাকে, তাদের জন্যে তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও বটে। কাজেই কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ যখন ক্ষমাশীল, দয়ালু, তখন আমাদের উপর কোন আযাব আসতেই পারে না।

কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই যে, আমরা রসুল (সাঃ)—এর অনেক মু'জ্জেযা দেখেছি; কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মু'জ্জেযা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এর উত্তর তৃতীয় আয়াতে দেয়া হয়েছে :

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا هُوَ
مُنذِرٌ وَّلَهُ الْيَوْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“কাফেররা আপনার নবুওয়তের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলে যে, আমরা যে বিশেষ মু'জ্জেযা দেখতে চাই; তা তাঁর উপর নাযিল করা হল না কেন? এর উত্তর এই যে, মু'জ্জেযা জাহির করা পয়গম্বরের ইচ্ছাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহর কাজ। তিনি যখন যে ধরনের মু'জ্জেযা প্রকাশ করতে চান, তাই করেন। তিনি কারও দাবী ও খায়েশ পূরণ করতে বাধ্য নন। এ জন্যেই বলা হয়েছে : إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ অর্থাৎ, আপনার কাজ শুধু কাফেরদেরকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা—মু'জ্জেযা জাহির করা নয়।

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ — অর্থাৎ, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে পথপ্রদর্শক ছিল। আপনি একক নবী নন। জাতিকে পথপ্রদর্শন করা সব পয়গম্বরেরই দায়িত্ব ছিল। মু'জ্জেযা প্রকাশ করার ক্ষমতা কাউকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ তাআলা যখন যে ধরনের মু'জ্জেযা প্রকাশ করতে চান, তাই করেন।

প্রত্যেক দেশে ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে পয়গম্বরের আসা কি জরুরী? আয়াতে বলা হয়েছে : প্রত্যেক কওমের জন্যে একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন সম্প্রদায় ও ভূখণ্ড পথপ্রদর্শক থেকে খালি থাকতে পারে না; যে কোন পয়গম্বরের হোক কিংবা পয়গম্বরের প্রতিনিধিরূপে তাঁর দাওয়াতের প্রচারক হোক। উদাহরণতঃ সূরা ইয়াসীনে পয়গম্বরের পক্ষ থেকে প্রথমে দু'ব্যক্তিকে কোন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণের কথা উল্লেখিত রয়েছে। তাঁরা স্বয়ং নবী ছিলেন না। এরপর তাঁদের সাহায্য ও সর্মথনের জন্যে তৃতীয় ব্যক্তিকে পাঠানোর কথা বর্ণিত রয়েছে।

তাই এ আয়াত থেকে একথা আবশ্যকভাবে প্রমাণিত হয় না যে, আমাদের উপহাদেশেও কোন নবী-রসুল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে

রসুলের দাওয়াত পৌছানোর জন্যে যুগে যুগেই এ দেশে প্রচুর সংখ্যক সাধক প্রচারকের আগমন প্রমাণিত রয়েছে। এ ছাড়া এ জাতীয় অসংখ্য পথপ্রদর্শক যে এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাও সবার জানা।

এ পর্যন্ত তিন আয়াতে নবুওয়ত অস্বীকারকারীদের সন্দেহের জগতায় বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ আয়াতে আবার তওহীদের আসল বিষয়বস্তু উল্লেখিত হয়েছে। সূরার শুরু থেকেই এ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে এসেছে। বলা হয়েছে :

أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْآيَاتُ مِنَّا مَعْلُومَاتٍ عِنْدَ مُبَيْتِنَا

অর্থাৎ, প্রত্যেক নারী যে গর্ভধারণ করে, তা ছেলে কি মেয়ে, সুদীর্ঘ কি কুশী, সং কি অসং—তা সবই আল্লাহ জানেন এবং নারীদের গর্ভাশয়ে যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোন সময় এক বা একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কোন সময় দ্রুত কোন সময় দেরীতে— তাও আল্লাহ জানেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ‘আলেমুল গায়ব’। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু ও সেসবের পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিটি চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে না উভয়ই; না কিছুই না—শুধু পানি অথবা বায়ু রয়েছে—এসব বিষয়ের নিশ্চিত ও নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র তিনিই রাখেন। লক্ষ্যাদিদৃষ্টে কোন হাকীম অথবা ডাক্তার এ ব্যাপারে যে মত ব্যক্ত করে, তার মর্যাদা, ধারণা ও অনুমানের চাইতে বেশী নয়। অনেক সময় বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত প্রকাশ পায়। আধুনিক ঐশ্বরে মেশিনও এ সত্য উদ্ঘাটন করতে অক্ষম। এর সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলাই রাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলাই জানেন যাকি

গর্ভাশয়ে রয়েছে।

আরবী ভাষায় وَيَضَعُ শব্দটি হ্রাস পাওয়া ও শুষ্ক হওয়ার অর্থ ব্যবহৃত হয়। আলাচ্য আয়াতে এর বিপরীতে تَزَادُ শব্দ এসে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে অর্থ হ্রাস পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, জননীর গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তার বিশুদ্ধ জ্ঞান আল্লাহ তাআলাই রাখেন। এ হ্রাস-বৃদ্ধির অর্থ গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভে এক সন্তান আছে কিংবা বেশী এবং জন্মের সময়ও হ্রাস-বৃদ্ধিও হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান কত মাস, কত দিন ও কত ঘণ্টায় জন্মগ্রহণ করে একজন বাহ্যিক মানুষের অস্তিত্ব লাভ করবে, তার নিশ্চিত জ্ঞানও আল্লাহ ছাড়া কেউ রাখতে পারে না।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : গর্ভাবস্থায় নারীদের যে রক্তপাত হয়, তা গর্ভস্থ সন্তানের দৈহিক আয়ন ও স্বাস্থ্য হ্রাসের কারণে হয়। وَيَضَعُ বলে এই হ্রাস বোঝানো হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, হ্রাসের ষড় প্রকার রয়েছে, আয়াতের ভাষা সবগুলোতেই পরিব্যপ্ত।

وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِنْدَ مُبَيْتِنَا অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ অনুমান ও মাপ রয়েছে। এর কমও হতে পারে না এবং বেশীও হতে পারে না। সন্তানের সব অবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত। তার প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ তাআলার কাছে নিখারিত আছে। কতদিন গর্ভে থাকবে, কতকাল দুনিয়াতে জীবিত থাকবে এবং কি পরিমাণ রিযিক

পাবে—এসব বিষয়ে আল্লাহর অনুপম জ্ঞান তাঁর তওহীদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالْكَرِيمُ الشَّعَال এখানে গیب শব্দ দ্বারা এসব বস্তু বোঝানো হয়েছে যা মানুষের পক্ষ হিন্দ্রিয়ের কাছে অনুপস্থিত; অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, নাকে ঘ্রাণ নেয়া যায় না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ বোঝা যায় না এবং হাতে স্পর্শ করা যায় না।

এর বিপরীত شهادة হচ্ছে এসব বস্তু, যেগুলো উল্লেখিত পক্ষ হিন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণ যে, তিনি প্রত্যেক অনুপস্থিতকে এমনভাবে জানেন, যেমন উপস্থিত ও বিদ্যমানকে জেনে থাকেন।

الْكَرِيم শব্দের অর্থ বড় এবং متعال এর অর্থ উচ্চ। উভয় শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তিনি সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলীর উর্ধ্বে এবং সবার চেয়ে বড়। কাকের ও মুশরেকেরা সংক্ষেপে আল্লাহ তাআলার মহত্ব ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করত, কিন্তু উপলব্ধি দোষে তারা আল্লাহকে সাধারণ মানুষের সমতুল্য জ্ঞান করে তাঁর জন্য এমন গুণাবলী সাব্যস্ত করত, যেগুলো তাঁর মর্যাদার পক্ষে খুবই অসম্ভব। উদাহরণতঃ ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা আল্লাহর জন্যে পুত্র সাব্যস্ত করেছে। কেউ কেউ তাঁর জন্যে মানুষের ন্যায় দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করেছে এবং কেউ কেউ বিশেষ দিক নির্ধারণ করেছে। অথচ তিনি এসব অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চে উর্ধ্বে ও পবিত্র। কোরআন পাক তাদের বর্ণিত গুণাবলী থেকে পবিত্রতা প্রকাশের জন্যে বার বার বলেছে : سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ - অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এসব গুণ থেকে পবিত্র, যেগুলো তারা বর্ণনা করে।

প্রথম اللَّهُ يَكْلُمُ مَا تَحْمِلُ এবং তৎপূর্ববর্তী اللَّهُ يَكْلُمُ مَا تَحْمِلُ বাক্যে আল্লাহ তাআলার জ্ঞানগত পরাক্রান্তি বর্ণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় الْكَرِيمُ الشَّعَال বাক্যে শক্তি ও মাহাত্ম্যের পরাক্রান্তি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের কম্পনার উর্ধ্বে। এর পরবর্তী আয়াতেও এ জ্ঞান ও শক্তির পরাক্রান্তি একটি বিশেষ আঙ্গিকে কণা করা হয়েছে :

سَوَاءٌ أُنذِرُكُمْ مِنْ أَمْرِ الْقَوْلِ وَمِنْ جَهَنَّمَ وَمِنْ قَوْمٍ مُتَنَبِّئِينَ

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَعْيُنَ وَالْأَلْبَابَ

جهر শব্দটি সরার থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আস্তে কথা বলার এবং جهر শব্দের অর্থ, জোরে কথা বলা। অপরকে শোনানোর জন্যে যে কথা বলা হয়, তাকে جهر বলে এবং যে কথা স্বয়ং নিজেকে শোনানোর জন্যে বলা হয়, তাকে سر বলে। مستخف শব্দের অর্থ যে গা ঢাকা দেয় এবং سارב এর অর্থ যে স্বাধীন নিশ্চিন্তভাবে পথ চলে।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলার জ্ঞান সর্বব্যাপী। কাজেই যে ব্যক্তি আস্তে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, তারা উভয়ই আল্লাহর কাছে সমান। তিনি উভয়ের কথা সমভাবে শোনেন এবং জানেন। এমনভাবে যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় এবং যে ব্যক্তি দিলালোকে প্রকাশ্যে রাস্তায় চলে, তারা উভয়ই আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে সমান। উভয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা তিনি সমভাবে জানেন এবং উভয়ের উপর তাঁর শক্তি সমভাবে পরিব্যাপ্ত। কেউ

তাঁর ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত নয়।

لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ أَمْرَ اللَّهِ

معقبات শব্দটি معقبه এর বহুবচন। যে দল অপর দলের পেছনে

কাছাকাছি হয়ে আসে, তাকে معقبه অথবা متعقبه বলা হয়। مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ -এর শাব্দিক অর্থ, উভয় হাতের মাঝখানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ দিক। مِنْ خَلْفِهِ - এর অর্থ পশ্চাদিক। مِنْ أَمْرِ اللَّهِ এখানে مِنْ কারণবোধক অর্থ দেয়; অর্থাৎ بامر الله কোন কেরাআতে এ শব্দটি الله বর্ণিতও আছে।—(রুহুল-মা'আনী)

আয়াতের অর্থ যে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ঢেকে রাখতে চায় অথবা প্রকাশ্যে সড়কে ঘোরাক্ষেপা করে—এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। তার সম্মুখে ও পশ্চাদিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। আল্লাহর নির্দেশে মানুষের হেফাযত করা তাদের দায়িত্ব।

সহীহ বুখারীর হাদীসে বলা হয়েছে : ফেরেশতাদের দু'টি দল হেফাযতের জন্যে নিযুক্ত রয়েছে। একদল রাত্রির জন্যে এবং একদল দিনের জন্যে। উভয় দল ফজরের ও আসরের নামাযের সময় একত্রিত হন। ফজরের নামাযের পর রাতের পাহারাদার দল বিদায় নেন এবং দিনের পাহারাদাররা কাজ বোঝে নেন। আসরের নামাযের পর তাঁরা বিদায় হয়ে যান রাতের ফেরেশতা দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন।

আবু দাউদের এক হাদীসে হযরত আলী মূর্তজা (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছুসংখ্যক হেফাযতকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যাতে কোন প্রাচীর ধ্বংস না পড়ে কিংবা সে কোন গর্তে পতিত না হয়, কিংবা কোন জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয়, ইত্যাদি বিষয়ে ফেরেশতাগণ তার হেফাযত করেন। তবে কোন মানুষকে বিপদাপদে জড়িত করার জন্যে যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ জারী হয়ে যায়, তখন হেফাযতকারী ফেরেশতারা সেখান থেকে সরে যায়।—(রুহুল-মা'আনী)

হযরত ওসমান গণী (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতে ইবনে-জরীর কতৃক বর্ণিত এক হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, হেফাযতকারী ফেরেশতাদের কাজ শুধু পার্থিব বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে হেফাযত করাই নয়; বরং তারা মানুষকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখারও চেষ্টা করেন। মানুষের মনে সাধুতা ও আল্লাহীভাবের প্রেরণা জাগ্রত করেন যাতে সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। এরপরও যদি সে ফেরেশতাদের প্রেরণার প্রতি উদাসীন হয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তারা দোয়া ও চেষ্টা করে যাতে সে শীঘ্র তওবা করে পাক হয়ে যায়। অগত্যা যদি সে কোনরূপেই হুশিয়ার না হয়, তখন তারা তার আমলনামায় গোনাহ লিখে দেয়। মোটকথা এই যে, হেফাযতকারী ফেরেশতা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের বিপদাপদ থেকে মানুষের নিদ্রায় ও জাগরণে হেফাযত করে। হযরত কা'ব আহবার বলেন : মানুষের উপর থেকে খোদায়ী হেফাযতের এই পাহারা সরিয়ে দিলে জিনদের অত্যাচারে মানবজীবন অতিষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এসব রক্ষামূলক পাহারা ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর থাকে, যতক্ষণ তকদীরে-ইলাহী মানুষের হেফাযতের অনুমতি দেয়। যদি আল্লাহ

১৩ রুদ

২৫২

১৩ মাআরী

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ
لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا كِبَاسٌ طَعْنُهُ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَهُ قَاهُ وَمَا هُوَ
بِإِلَهِهِ وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا أَرْقٌ ضَلِيلٌ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُمْ بِالْعُدُوِّ
وَالْأَصَالِ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ
أَفَاتُخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ نَفْعًا
وَالْضَرَّاءُ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۚ أَمْ هَلْ
تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۚ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا
كُلَّهُمْ فَنَسَّاهُ الْخَلْقَ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ
أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاقْتِصَلَ السَّنَبُ رِيبًا زَارِبًا وَمِمَّا
يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اقْتِصَاءُ حَلِيقَةٍ وَامْتِنَاعٍ رَبِّدُ
وَشَلُّهُ كُنْ لَكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ قَالُوا
الرَّبُّ قَدْ هَبَّ جُفَاءً ۚ وَمَا يَنْفَعُ النَّاسَ
فَيَمُوتُ فِي الْأَرْضِ كُنْ لَكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الرَّمْثَالَ ۝

(১৪) সত্যের আহ্বান একমাত্র তাঁরই এবং তাকে ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা তাদের কোন কাজে আসে না ; ওদের দৃষ্টান্ত সেরূপ, যেমন কেউ দু' হাত পানির দিকে প্রসারিত করে যাতে পানি তার মুখে পৌঁছে যায় ; অথচ পানি কোন সময় পৌঁছাবে না। কাকেরদের যত আহ্বান তার সবই পথভ্রষ্টতা। (১৫) আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিচ্ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায়। (১৬) জিজ্ঞেস করুন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা কে? বলে দিন : আল্লাহ। বলুন : তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির করেছ, যারা নিজেদের তাল-মন্দেরও মালিক নয়? বলুন : অঙ্ক চক্ষুস্থান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি অঙ্ককার ও আলোর সমান হয়। তবে কি তারা আল্লাহর জন্য এমন অংশীদার স্থির করেছে যে, তারা কিছু সৃষ্টি করেছে, যেমন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ? অতঃপর তাদের সৃষ্টি এরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বলুন : আল্লাহই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী। (১৭) তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর স্রোতারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। অতঃপর স্রোতারা স্থলীত ফেনারানি উপরে নিয়ে আসে। এবং অলঙ্কার অথবা তৈজসপত্রের জন্যে যে বস্তুকে আগুনে উত্তপ্ত করে, তাতেও তেমনি ফেনারানি থাকে। এমনভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা ক্ষমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ এমনভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।

তাআলাই কোন বান্দাকে বিপদে জড়িত করতে চান, তবে এক রক্ষামূলক পাহারা নিশ্চয় হয়ে যায়।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْذِرُ مَا يَقُولُ شَيْئًا يُخْشَى وَمَا يَأْتِيهِمْ وَلَا أَرَادَ اللَّهُ
بِقَوْلِهِمْ وَلَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ قَوْلٍ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং তারাই নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তিত করে না নেয়। (তারা যখন নিজেদের অবস্থা অব্যাহত ও নাকরমানীতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ তাআলাও স্বীয় কর্মক্ষম পরিবর্তন করে দেন। বলাবাহুল্য,) যখন আল্লাহ তাআলাই কাউকে আঘাত দিতে চান, তখন কেউ তা রদ করতে পারে না এবং আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে তার সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে না।

সারকথা এই যে, মানুষের হেফাযতের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত থাকে ; কিন্তু সম্প্রদায় যখন আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে কুর্কর্ম, কুচরিত ও অব্যাহতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ তাআলাও স্বীয় রক্ষামূলক পাহারা উঠিয়ে নেন। এরপর আল্লাহর গম্ব ও আঘাত তাদের উপর নেমে আসে। এ আঘাত থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের অবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন কোন সম্প্রদায় আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার পন্থা ত্যাগ করে স্বীয় অবস্থায় মন্দ পরিবর্তন সূচিত করে, তখন আল্লাহ তাআলাও স্বীয় অনুকম্পা ও হেফাযতের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন।

এ আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, কোন জাতির জীবনে কল্যাণকর বিপ্লব ততক্ষণ পর্যন্ত আসে না, যতক্ষণ তারা এ কল্যাণকর বিপ্লবের জন্যে নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নিজেদেরকে তার যোগ্য করে না নেয়।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْآيَاتِ حَقًّا وَطَعْنًا وَيُخَبِّرُ السَّحَابَ الثِّقَالَ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন। এটা মানুষের জন্যে ভয়েরও কারণ হতে পারে। কারণ, এটা যে জায়গায় পতিত হয় সবকিছু জ্বলিয়ে ছাইভস্ম করে দেয়। আবার এটা আশাও সঞ্চার করে যে, বিদ্যুৎ চমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবনের অবলম্বন। এবং আল্লাহ তাআলাই বড় বড় ভারী মেঘমালাকে মৌসুমী বায়ুতে রূপান্তরিত করে উথিত করেন এবং জলপূর্ণ মেঘমালাকে শূন্য কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যান। এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তকদীর অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, তা বর্ষণ করেন।

وَسِجِّيرَةُ الرَّعْدِ وَحَمْدُهُ وَالسَّيْكَةُ مِنْ حَيْفَتِهِ ۚ

অর্থাৎ, রা'দ আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার তসবীহ পাঠ করে এবং ফেরেশতারও তাঁর ভয়ে তসবীহ পাঠ করে। সাধারণের পরিভাষায় রা'দ বলা হয় মেঘের গর্জনকে, যা মেঘমালার পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়। এর তসবীহ পাঠ করার অর্থ ঐ তসবীহ যে সম্পর্কে কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে উল্লেখিত রয়েছে যে, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে এমন কোন বস্তু নেই যে আল্লাহর তসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই তসবীহ শুনতে সক্ষম হয় না। ==

কোন কোন হাদীসে আছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ও আলি

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْهُدَىٰ وَالَّذِينَ لَهُمْ الْأَمَانُ
لَهُمْ فِي الْأَرْضِ حِيبًا وَمِنْهُمْ لَقُتَادَةٌ وَلَهُمْ لَكُمْ
سُوءُ الْحِسَابِ وَأَوَّامٌ جَعَلَتْهُمْ فِيهَا عَمَلَ يُفْعَلُونَ
أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقَّ مَن هُوَ الْحَقُّ أَنَّا نَمُوتُ
وَالَّذِينَ يُؤْفِقُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَادَ وَجْهِهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَكَانُوا بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
بِالْحُسْنَىٰ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۚ جَنَّتٌ عَدْنٍ
يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ
يَدْخُلُونَ عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ۖ فَرِحَ
عُقْبَى الدَّارِ ۚ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَقْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ
أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَأَمَّهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۚ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُ اللَّهُ
وَيَرْحَلُهُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۚ

(১৮) যারা পালনকর্তার আদেশ পালন করে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে এবং যারা আদেশ পালন করে না, যদি তাদের কাছে জগতের সবকিছু থাকে এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে সবই নিজেদের মুক্তিপন স্বরূপ দিয়ে দেবে। তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর হিসাব। তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকট অবস্থান। (১৯) যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনায় প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা বোধভিত্তিসম্পন্ন। (২০) এরা এমন লোক, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অস্বীকার ভঙ্গ করে না। (২১) এবং যারা বজায় রাখবে ঐ সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কঠোর হিসাবের আশঙ্কা রাখে। (২২) এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্যে সবার করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গুহ। (২৩) তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সংকমণীল বাগ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে গভীর দরজা দিয়ে। (২৪) বলবে : তোমাদের সবারের কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিশ্রম-গুহ কতই না মনোরম। (২৫) এবং যারা আল্লাহর অস্বীকারকে দৃঢ় ও পাকা-পোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তা ভিন্ধি করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, ওরা ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্যে রয়েছে অভিসম্পাত এবং ওদের জন্যে রয়েছে কঠিন অবস্থা। (২৬) আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা রুমী প্রশস্ত করেন এবং সকলচিত্ত করেন। তারা পার্শ্ববর্তী জীবনের প্রতি মুগ্ধ। পার্শ্ববর্তী পরকালের সামনে প্রতি সামান্য সম্পদ বৈ নয়।

ফেরেশতার নাম রা'দ। এই অর্থে তসবীহ পাঠ করার মানে সুস্পষ্ট।

وَيُزِيلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ - এখানে বলা হচ্ছে শব্দটি সোয়াকি এর বহুবচন। এর অর্থ বজ্র, যা মাটিতে পতিত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলাই এসব বিদ্যুৎ মর্ডে প্রেরণ করেন, যেগুলো দূরা যাকে ইচ্ছা স্থানিয়ে দেন।

وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِجَالِ - এখানে محাল শব্দটি যীমের ঘেরযোগে কৌশল, শক্তি, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়, আয়াতের অর্থ এই যে, তারা আল্লাহ তাআলার তওহীদের ব্যাপারে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে; অথচ আল্লাহ তাআলা শক্তিশালী কৌশলকারী। তাঁর সামনে সবার চাতুরী অচল।

সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত : উভয় দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, এসব দৃষ্টান্ত ময়লা ও আবজনা যেমন কিছুক্ষণের জন্যে আসল বস্তুর উপরে দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু পরিণামে তা আন্তর্ভুক্তে নিক্ষিপ্ত হয় এবং আসল বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তেমনি মিথ্যাকে যদিও কিছুদিন সত্যের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যায়; কিন্তু অবশেষে মিথ্যা বিলুপ্ত ও পর্যুদন্ত হয় এবং সত্য অবশিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত থাকে। — (জালালাইন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ - অর্থাৎ বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট; কিন্তু এটি তারাই বোঝতে পারে, যারা বুদ্ধিমান। পক্ষান্তরে অমনোযোগিতা ও গোনাহ যাদের বিবেককে অকর্মণ্য করে রেখেছে, তারা অভাবদৃষ্টিতেই বোঝে না।

তৃতীয় আয়াতে উভয় দলের বিশেষ বিশেষ কাজকর্ম ও লক্ষণের বর্ণনা শুরু হয়েছে। প্রথমে আল্লাহর বিধানাবলী পালনকারীদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

الَّذِينَ يُؤْتُونَ بَعْدَ اللَّهِ - অর্থাৎ, তারা আল্লাহর সাথে কৃত অস্বীকার পূর্ণ করে। সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ তাআলা বান্দাদের কাছ থেকে যেসব অস্বীকার নিয়েছিলেন, এখানে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে। অল্পমধ্যে সর্বপ্রথম ছিল পালনকর্তা সম্পর্কিত অস্বীকার। এটি সৃষ্টির সূচনাকালে সকল আত্মাকে সমবেত করে অস্বীকার নেয়া হয়েছিল বলা হয়েছিল : كَسَبَتْ رَيْبُكُمْ - অর্থাৎ, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই? উত্তরে সবাই সম্মতের বলেছিল : بلى, অর্থাৎ, হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই আমাদের পালনকর্তা। এমনভাবে যাবতীয় বিধি-বিধানের আনুগত্য, সমস্ত করণ্য কর্মপালন এবং অবৈধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে উপদেশ এবং বান্দার পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ - অর্থাৎ, তারা কোন অস্বীকার ভঙ্গ করে না। ঐ অস্বীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তাআলা ও বান্দার মধ্যে রয়েছে এবং এইমাত্র يُؤْتُونَ بَعْدَ اللَّهِ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এসব অস্বীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো উম্মতের লোকেরা আপন পয়গম্বরের সাথে সম্পাদন করে এবং এসব অস্বীকারও বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে। আল্লাহ

তাআলার আনুগত্যশীল বান্দাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى اللَّهِ لَا يَصْلُونَ إِلَّا بِإِذْنِهِ — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা

যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা সেগুলো বজায় রাখে। এ ব্যক্তিটির প্রচলিত তফসীর এই যে, আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে আদেশ করেছেন, তারা সেসব সম্পর্ক বজায় রাখে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এর অর্থ এই যে, তারা ঈমানের সাথে সংকর্মকে অথবা রসুলুল্লাহ (সঃ)—এর প্রতি বিশ্বাসের সাথে পূর্ববর্তী পয়গম্বরের প্রতি এবং তাদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসকে যুক্ত করে।

চতুর্থ গুণ এই : وَخُشِعَتِ قُلُوبُهُمْ — অর্থাৎ, তারা তাদের পালনকর্তাকে

ভয় করে। এখানে خوف শব্দের পরিবর্তে خُشِعَ শব্দ ব্যবহার করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার প্রতি তাদের ভয় হিন্সে জন্তু অথবা ইতর মানুষের প্রতি স্বাভাবিক ভয়ের মত নয়। বরং তা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের এবং গুণ্ডাদের প্রতি শিষ্যের অভ্যাসগত ভয়ের মত। কষ্টদানের আশঙ্কা এ ভয়ের কারণ নয়।

وَيَخَافُونَ سَوْآتِ السَّيِّئَاتِ — অর্থাৎ, তারা মন্দ হিসাবকে ভয় করে।

‘মন্দ হিসাব’ বলে কঠোর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব বোঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা যদি কৃপাবশতঃ সংক্ষেপে ও মার্জনা সহকারে হিসাব গ্রহণ করেন, তবেই মানুষ মুক্তি পেতে পারে। নতুবা যার কাছ থেকেই পুরোপুরি ও কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব নেয়া হবে, তার পক্ষে আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হবে না। কেননা, এমন ব্যক্তি কে আছে, যে জীবনে কখনো কোন গোনাহ বা ত্রুটি করেননি ? এ হচ্ছে সৎ ও আনুগত্যশীল বান্দাদের পঞ্চম গুণ।

ষষ্ঠ গুণ এই : وَالَّذِينَ صَبَرُوا لِطَاعَتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ — অর্থাৎ যারা

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার আশায় অকৃত্রিমভাবে ধৈর্যধারণ করে। প্রচলিত কথায় কোন বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবরের অর্থ মনে করা হয়। কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ আরও অনেক ব্যাপক। কারণ, আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব-বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া ; বরং দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাছে ব্যাপ্ত থাকার। এ কারণেই এর দু’টি প্রকার বর্ণনা করা হয়। (এক) صَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান পালনে দৃঢ় থাকা এবং (দুই) صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ অর্থাৎ, গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।

সবরের সাথে الصَّبْرُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ কথটি যুক্ত হয়ে ব্যক্ত করেছে যে, সবর সর্বাঙ্গীয় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নয়। কেননা, কোন না কোন সময় যে-সবর ব্যক্তিরও দীর্ঘদিন পরে হলেও সবর এসেই যায়। কাজেই যে সবর ইচ্ছাধীন নয়, তার বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এরূপ অনিচ্ছাধীন কাজের আদেশ আল্লাহ তাআলা দেন না।

সপ্তম গুণ হচ্ছে : وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ — ‘নামায কায়েম করার’ অর্থ পূর্ণ আদব ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামায আদায় করা—গুণ নামায পড়া নয়। এ জন্যেই কোরআনে নামাযের নির্দেশ সাধারণতঃ أَقَامُوا صَلَاةَ শব্দ সহযোগে দেয়া হয়েছে।

অষ্টম গুণ হচ্ছে : وَآتَوْهُمَا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ — অর্থাৎ যারা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু আল্লাহর নামেও ব্যয় করে। এতে ইঙ্গিত

করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাছে চান না ; বরং নিজের দেয়া রিযিকের কিছু অংশ তাও মাত্র শতকরা আড়াই ভাগের মত সামান্যতম পরিমাণ তোমাদের কাছে চান। এটা দেয়ার ব্যাপারে স্বতন্ত্র তোমাদের ইত্তিকাদঃ করা উচিত নয়।

অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পাশে ব্যয় করার সাথে ذُرِّيَّاتِهِمْ শব্দ দু’টি যুক্ত হওয়ায় বোঝা যায় যে, সদকা-খয়রাত সর্বত্র গোপনে করাই সুত্ত নয় ; বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ। এ জন্যেই আলেমগণ বলেন যে, যাকাত ও গুয়াজিব সদকা প্রকাশ্যে দেয়াই উত্তম এবং গোপনে দেয়া সমীচীন নয়—যাতে অন্যেরাও শিক্ষা ও উৎসাহ পায়। তবে নফল সদকা-খয়রাত গোপনে দেয়াই উত্তম। যেসব হাদীসে গোপনে দেয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নফল সদকা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

নবম গুণ হচ্ছে : وَيَذْكُرُونَ بِالنِّسْبَةِ السَّيِّئَةِ — অর্থাৎ, তারা মন্দকে ভাল দূরা, শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দূরা এবং অন্যায় ও জুলুমকে ক্রমা ও মার্জনা দূরা প্রতিহত করে। মন্দের জগুয়াবে মন্দ ব্যবহার করে না। কেউ অর্থাৎ কোন সময় কোন গোনাহ হয়ে গেলে তারা অধিকতর যত্ন সহকারে অধিক পরিমাণে এবাদত করে। ফলে গোনাহ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত মু’আয (রাঃ)—কে বলেন : পাপের পর পুণ্য করে নাও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দিবে।

আল্লাহ তাআলার আনুগত্যশীলদের নয়টি গুণ বর্ণনা করার পর তাদের প্রতিদান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— لِيُكَفِّرَ عَنْكَ الذَّنْبَ অর্থাৎ, পরকাল। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তাদের জন্যেই রয়েছে পরকালের সাফল্য।

অন্তঃপর عَفَىٰ الذَّنْبَ অর্থাৎ, পরকালের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা হচ্ছে جَنَّتْ عَذَابُ তারা এগুলোতে প্রবেশ করবে। عِلْن শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান ও স্থায়িত্ব। উদ্দেশ্য এই যে, এসব জন্মাত থেকে কক্ষ তাদেরকে বহিস্কার করা হবে না; বরং এগুলোতে তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী হবে। কেউ কেউ বলেন : জন্মাতের মধ্যস্থলের নাম আদান। জন্মাতের স্থানসমূহের মধ্যে এটা উচ্চস্তরের।

এরপর তাদের জন্যে আরও একটি পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তাআলার এ নেয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পূর্ণ সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তানরাও এর অংশ পাবে। শর্ত এই যে, তাদের উপযুক্ত হতে হবে। এর ন্যূনতম স্তর হচ্ছে মুসলমান হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাপ-দাদা ও স্ত্রীদের নিম্ন আমল যদিও এ স্তরের পৌছার ঘোষণা নয়; কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ঋতিহে ও বরকতে তাদেরকেও এ উচ্চস্তরে পৌছিয়ে দেয়া হবে।

এরপর তাদের আরও একটি পরকালীন সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেরেশতারা তাদেরকে সালাম ক্রান্তে করতে প্রত্যেক দরজা দিরা প্রবেশ করবে এবং বলবে : সবরের কারণে তোমরা যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে। এটা পরকালের কুত্তাই না উত্তম পরিপাণ।

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ عَمَّا لَمْ يَنْفَعُوا — অর্থাৎ, তারা আল্লাহ

তাআলার অস্বীকারকে পাকাপোক্ত করার পর ভক্ত করে আল্লাহ তাআলার অস্বীকারের মধ্যে সেই অস্বীকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সূরা সূচনাকালে আল্লাহর পালনকর্তৃত্ব ও একত্ব সম্পর্কে সব আত্মার পক্ষে

উমাইয়্যাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে প্রেরণ করল। সে বলল : আপনি যদি চান যে, আমরা আপনাকে রসূল বলে স্বীকার করে নেই এবং আপনার অনুসরণ করি, তবে আমাদের কতকগুলো দাবী আছে এগুলো কোরআনের মাধ্যমে পূরণ করে দিলে আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব।

তাদের একটি দাবী ছিল এই যে, মক্কা শহরটি খুবই সংকীর্ণ। চতুর্দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা উচ্চভূমি, যাতে না চাষাবাদের সুযোগ আছে এবং না বাগ-বাগিচা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের অবকাশ আছে। আপনি মু'জ্জযার সাহায্যে পাহাড়গুলোকে দূরে সরিয়ে দিন—যাতে মক্কার যমীন প্রশস্ত হয়ে যায়। আপনিই তো বলেন যে, দাউদ (আঃ)—এর জন্যে পাহাড়ও সাথে সাথে তসবীহ পাঠ করত। আপনার কথা অনুযায়ী আপনি তো আল্লাহ্র কাছে দাউদের চাইতে খাটো নন।

দ্বিতীয় দাবী ছিল এই যে, আপনার কথা অনুযায়ী সূলায়মান (আঃ)—এর জন্যে যে রূপ বায়ুকে আজ্জাবহ করে পথের বিরাট বিরাট দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, আপনিও আমাদের জন্যে তদ্রূপ করে দিন—যাতে সিরিয়া ইয়ামনের সফর আমাদের জন্যে সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় দাবী ছিল এই যে, ঈসা (আঃ) মৃতদেরকে জীবিত করতেন। আপনি তাঁর চাইতে কোন অংশে কম নন। আপনিও আমাদের জন্যে আমাদের দাদা কুসাইকে জীবিত করে দিন—যাতে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনার ধর্ম সত্য কি না। (মাযহারী, বগতী, ইবনে আবী হাতেম ইবনে মরদুওয়াইহ)

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব হঠকারিতাপূর্ণ দাবীর উত্তরে বলা হয়েছে :

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ

أَوْ نُفِخَ بِهِ السُّنُورُ

এখানে তসীর জিাল বলে পাহাড়গুলোকে স্বস্থান থেকে হটানো,

قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ বলে সংক্ষিপ্ত সময়ে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করা এবং

نُفِخَ بِهِ السُّنُورُ বলে মৃতদেরকে জীবিত করে কথা বলা বোঝানো হয়েছে।

لَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ এর জওয়াব স্থানের ইঙ্গিতে উহা রয়েছে ; অর্থাৎ

لَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ যেমন কোরআনের অন্য এক জায়গায় এমনি বিষয়বস্তু এবং

তার এরূপ জওয়াবই উল্লেখ করা হয়েছে :

وَلَوْ أَنَّ تَارَةً تُرِيتُ لَأَخَذْتُمُوهَا زَيْجَرًا وَخَشَرْنَا عَلَيْهِمْ

كُلَّ شَيْءٍ مُّبِينٍ فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

অর্থ এই যে, যদি কোরআনের সাহায্যে তাদের এসব দাবী পূরণ করে দেয়া হয়, তবুও তারা বিশ্वास স্থাপন করবে না। কেননা, তারা এসব দাবীর পূর্বে এমনসব মু'জ্জযা প্রত্যক্ষ করেছে, যেগুলো তাদের প্রার্থিত মু'জ্জযার চাইতে অনেক উর্ধ্বে ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর ইশারায় চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া, পাহাড়ের স্বস্থান থেকে সরে যাওয়া এবং বায়ুকে আজ্জাবহ করার চাইতে অনেক বেশী বিস্ময়কর। এমনিভাবে তাঁর যাতে নিশ্চাপ কঙ্করের কথা বলা এবং তসবীহ পাঠ করা কোন মৃত ব্যক্তির জীবিত হয়ে কথা বলার চাইতে অধিকতর বিরাট মু'জ্জযা। শবে যে রাতে মসজিদে আকসা, অজুপার সেখান থেকে নভোমণ্ডলের সফর এক সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন, বায়ুকে বশ করা সূলায়মানী তথ্যের আলৌকিকতার চাইতে অনেক মহান। কিন্তু জালামরা এগুলো দেখার পরও বিশ্वास স্থাপন করেনি। অতএব এসব দাবীর পেছনেও তাদের নিয়ত যে টালবাহানা করা—কিছু মেনে নেয়া ও করা নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুশরেকদের এসব দাবীর লক্ষ্য এটাই ছিল যে, তাদের দাবী পূর্ণ না করা হলে তারা বলবে। (নাউয়বিলাহ) আল্লাহ তাআলাই এসব কাজ করার শক্তি রাখেন না, অথবা রসূলের কথা আল্লাহ্র কাছে শ্রবণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। এতে বোঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ্র রসূল নন। তাই অজুপার বলা হয়েছে :

بَلْ يَدْعُونَ الْمَرْثِيَّةَ

আল্লাহ তাআলারই। উদ্দেশ্য এই যে, উল্লেখিত দাবীগুলো পূরণ না করার কারণ এই নয় যে, এগুলো আল্লাহ্র শক্তি বহির্ভূত ; বরং বাস্তব সত্য এই যে, জগতের মজলুমজল একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি স্বীয় রহস্যের কারণে এসব দাবী পূর্ণ করা সমীচীন মনে করেননি। কারণ, দাবী উত্থাপনকারীদের হঠকারিতা ও বদনিয়ত তাঁর জানা আছে। তিনি জানেন যে, এসব দাবী পূরণ করা হলেও তারা বিশ্वास স্থাপন করবে না।

أَفَلَمْ يَكْفُرْ بِالْآيَاتِ الْمُبِينَةِ وَالْآيَاتِ الْمُبِينَةِ وَالْآيَاتِ الْمُبِينَةِ

— ইয়াম বগতী বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেয়াম মুশরেকদের এসব দাবী শুনে কামনা করতে থাকেন যে, মু'জ্জযা হিসেবে দাবীগুলো পূরণ করে দিলে ভালই হয়। মক্কার সবাই মুসলমান হয়ে যাবে এবং ইসলাম শক্তিশালী হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থ এই যে, মুসলমানরা মুশরেকদের ছলচাতুরী ও হঠকারিতা দেখা ও জানা সত্ত্বেও কি এখন পর্যন্ত তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়নি যে, এমন কামনা করতে শুরু করেছে? অথচ তারা জানে যে, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে সব মানুষকে এমন হেদায়েত দিতে পারেন যে, মুসলমান হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু সবাইকে ইসলাম ও ঈমানে বাধ্য করা খোদায়ী রহস্যের অনুকূল নয়; খোদায়ী রহস্য এটাই যে, প্রত্যেকের নিজস্ব

ক্ষমতা অটুট থাকুক এবং এ ক্ষমতাবলে ইসলাম গ্রহণ করুক অথবা কুফর অবলম্বন করুক।

وَالَّذِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا صَنَعُوا قَارِعَةً أَزْعَلَ قَوْمًا
مِّنْ ذُرِّيَّتِهِمْ

—হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : قَارِعَةً শব্দের অর্থ আপদ-বিপদ। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিকদের দাবী-দাওয়া পূরণ করার কারণ এই যে, তাদের বদন্যিত ও হঠকারিতা জানা ছিল যে, পূরণ করলেও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা আল্লাহর কাছে দুনিয়াতেও আপদ-বিপদে পতিত হওয়ার যোগ্য; যেমন মক্কাবাসীদের উপর কখনও দুর্ভিক্ষের, কখনও ইসলামী জেহাদ তথা বদর, ওহুদ ইত্যাদিতে হত্যা ও কলীফের বিপদ নাযিল হয়েছে। কারণ উপর বজ্র পতিত হয়েছে এবং কেউ অন্য কোন বাল-মুসীবিতে আক্রান্ত হয়েছে

أَوْعَلَ قَوْمًا مِّنْ ذُرِّيَّتِهِمْ
—অর্থাৎ মাঝে মাঝে এমনও হবে যে, সরাসরি তাদের উপর বিপদ আসবে না; বরং তাদের নিকটবর্তী জনপদের উপর বিপদ আসবে যাতে তারা শিক্ষালাভ করে এবং নিজেদের কুপরিণাম ও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ لَأَنَّ اللَّهَ لَئِيمٌ يُبْعَادُ
—অর্থাৎ, আপদ

ফিদের এ ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পূর্ণ না হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহর ওয়াদা কোন সময় টলতে পারে না। ওয়াদা বলে এখানে মক্কা বিজয় বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে। এমন কি, পরিশেষে মক্কা

বিজিত হবে এবং তারা সবাই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে যাবে।

আলোচ্য আয়াতে أَوْعَلَ قَوْمًا مِّنْ ذُرِّيَّتِهِمْ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কোন সম্প্রদায় ও জনপদের আশেপাশে আযাব অথবা আপদ-বিপদ নাযিল হলে তাতে আল্লাহ তাআলার এ রহস্যও নিহিত থাকে যে, পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোও হুশিয়ার হয়ে যায় এবং অন্যের দুরবস্থা দেখে তারাও নিজেদের ক্রিয়াকর্ম সংশোধন করে নেয়। ফলে অন্যের আযাব তাদের জন্যে রহমত হয়ে যায়, নতুবা একদিন অন্যদের ন্যায় তারাও আযাবে পতিত হবে।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ لَأَنَّ اللَّهَ لَئِيمٌ يُبْعَادُ
—অর্থাৎ, কাফের

ও মুশরিকদের উপর দুনিয়াতেও বিভিন্ন প্রকার আযাব ও আপদ-বিপদের ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পৌঁছে না যায়। কেননা, আল্লাহ কখনও ওয়াদার খেলাফ করেন না।

ওয়াদার অর্থ এখানে মক্কা বিজয়। আল্লাহ তাআলা এই ওয়াদা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়ে কাফের ও মুশরিকরা পর্যুদস্ত হবেই ; এর পূর্বেও অপরাধের কিছু কিছু সাজা তারা ভোগ করবে। ওয়াদার অর্থ এ স্থলে কেয়ামতও হতে পারে। এ ওয়াদা সব পয়গম্বরের সাথে সব সময়ই করা আছে। ওয়াদাকৃত সেই কেয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফেরও অপরাধী কৃতকর্মের পুরোপুরি শাস্তি ভোগ করবে।

বস্তুর মেয়াদ ও পরিমাণ আল্লাহ তাআলার কাছে লিখিত আছে। তিনি সৃষ্টির সূচনালগ্নে লিখে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে। কোথায় কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় মরবে, তাও লিখিত আছে।

এমনিভাবে একথাও লিখিত আছে যে, অমুক যুগে অমুক পয়গম্বরের প্রতি কি ওহী এবং কি কি বিধি-বিধান অবতীর্ণ হবে। কেননা, প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির উপযোগী বিধি-বিধান আসতে থাকাই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য। আরও লিখিত আছে যে, অমুক পয়গম্বুর দ্বারা অমুক সময়ে এই মু'জ্জিয়া প্রকাশ পাবে।

তাই রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে এরূপ দাবী করা যে, অমুক ধরনের বিধি-বিধান পরিবর্তন করান অথবা অমুক ধরনের মু'জ্জিয়া দেখান—এটি একটি হঠকারিতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত দাবী, যা রেসালত ও নবুওয়তের স্বরূপ-সম্পর্কে অজ্ঞতার উপর ভিত্তিশীল।

إِنَّمَا إِلَهُ الْكَوْكَبِ এখানে
এর শাব্দিক অর্থ মূলগ্রন্থ। এতে লওহে-মাহফুয বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্তন হতে পারে না।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় অপার শক্তি ও অসীম রহস্য জ্ঞান দ্বারা যে বিষয়কে ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যে বিষয়কে ইচ্ছা বহাল ও বিদ্যমান রাখেন। এরপর যা কিছু হয়, তা আল্লাহর কাছে সন্নিক্ত থাকে। এর উপর কারও কোন ক্ষমতা চলে না এবং তাতে হ্রাসবৃদ্ধিও হতে পারে না।

সূফীয়ান সওবী, ওয়াকী প্রমুখ তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ভিন্ন তফসীর বর্ণনা করেছেন। তাতে আয়াতের বিষয়বস্তুকে ভাগ্যালিপির সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্টজীবের ভাগ্য তথা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, সারা জীবনের রিযিক, সুখ কিংবা বিপদ এবং এসব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ তাআলা সূচনালগ্নে সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ফেরেশতাদেরকেও লিখিয়ে দেয়া হয় এবং প্রতি বছর শবে কদরে এ বছরের ব্যাপারাদির তালিকা ফেরেশতাদেরকে সোপর্দ করা হয়।

মোটকথা এই যে, প্রত্যেক সৃষ্টজীবের বয়স, রিযিক, গতিবিধি ইত্যাদি সব নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ ভাগ্যালিপি

وَعِنْدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ থেকে যতটুকু ইচ্ছা বাদ দেন এবং যতটুকু ইচ্ছা বহাল রাখেন। অর্থ—অর্থ—মিটানো ও বহাল রাখার পর যে মূলগ্রন্থ অবশেষে কার্যকর হয়, তা আল্লাহর কাছে রয়েছে। এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না।

এসব রেওয়াজেত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা কারও ভাগ্যালিপিতে যে বয়স, রিযিক ইত্যাদি লিখে দিয়েছেন, তা কোন কর্মের দরুন কম অথবা বেশী হতে পারে এবং দোয়ার কারণেও তা পরিবর্তিত হতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ভাগ্যালিপিতে বয়স, রিযিক, বিপদ অথবা সুখ ইত্যাদিতে কোন কর্ম অথবা দোয়ার কারণে যে পরিবর্তন হয়, তা ঐ ভাগ্যালিপিতে হয়, যা ফেরেশতাদের হাতে অথবা জ্ঞানে থাকে। এতে কোন সময় কোন নির্দেশ বিশেষ শর্তের সাথে সংযুক্ত থাকে। শর্তটি পাওয়া না গেলে নির্দেশটিও বাকী থাকে না। এ শর্তটি কোন সময় লিখিত আকারে ফেরেশতাদের জ্ঞানে থাকে এবং কোন সময় অলিখিত আকারে শুধু আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে থাকে। ফলে নির্দেশটি যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এ ভাগ্যকে ‘মুআল্লাক’ (বুলন্ত) বলা হয়। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এতে ‘মিটানো’ ও বাকী রাখা’র কাজ অব্যাহত থাকে। কিন্তু আয়াতের শেষ বাক্য وَعِنْدَهُ الْقِيَامَةِ

—ব্যক্ত করেছে যে, ‘মুআল্লাক ভাগ্য’ ছাড়া একটি ‘মুবরাম’ (চূড়ান্ত) ভাগ্য আছে, যা মূলগ্রন্থে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার কাছে রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জানার জন্যেই। এতে এসব বিধান লিখিত হয়, যেগুলো কর্মও দোয়ার শর্তের পর সর্বশেষ ফলাফল হয়ে থাকে। এ জন্যেই এটা মিটানো ও বহাল রাখা এবং হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। (ইবনে-কাসীর)

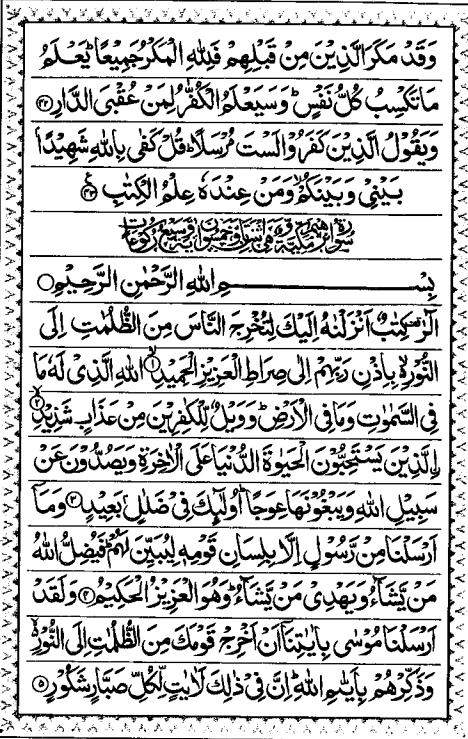
وَأَنَّ مَّا رِزْقُكَ بَعْضُ الَّذِي تَدْعُهُمْ إِنَّمَا تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

—এ আয়াতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে সাব্বান দেয়ার জন্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আপনাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, ইসলাম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে এবং কুফর ও কাফেররা অপমানিত ও লালিত হবে। আল্লাহর এ ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু আপনি এরূপ চিন্তা করবেন না যে, এ বিজয় কবে হবে। সম্ভবতঃ আপনার জীবদ্দশাতেই হবে এবং এটাও সম্ভব যে, আপনার ওফাতের পরে হবে। আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্যে তো এটাও যথেষ্ট যে, আপনি অহরহ দেখছেন, আমি কাফেরদের ভূখণ্ড

১৩ রবিউল

২৫৭

১৩ আক্বরী



(৪২) তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা চক্রান্ত করেছে। আর সকল চক্রান্ত তো আল্লাহর হাতেই আছে। তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে। কাকেররা জেনে নেবে যে, পর জীবনের আবাসস্থল কাদের জন্য রয়েছে। (৪৩) কাকেররা বলে : আপনি প্রেরিত ব্যক্তি নন। বলে দিন। আমার ও তোমাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট সাক্ষী হচ্ছেন আল্লাহ এবং ঐ ব্যক্তি, যার কাছে গ্রন্থের জ্ঞান আছে।

সূরা ইবরাহীম

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ২২ ॥

(১) আলিফ-লাম-রাঃ এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাখিল করেছি— যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন— পরাক্রান্ত, প্রশংসার বাগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে। (২) তিনি আল্লাহ ; যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সবকিছুর মালিক। কাকেরদের জন্যে বিপদ রয়েছে, কঠোর আশঙ্ক। (৩) যারা পরকালের চাইতে পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে; আল্লাহর পথে বাধা দান করে এবং তাতে বক্রতা অনুশ্রবণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে। (৪) আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, পছন্দ করেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্পূর্ণ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। (৫) আমি মুসাকে নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছিলাম যে, স্বজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনয়ন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনসমূহ স্মরণ করান। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক স্বৈরশীল কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

চতুর্দিক থেকে সম্বৃত্তি করে দিছি ; অর্থাৎ এসব দিক মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের অধিকৃত এলাকা হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে একদিন এ বিজয় চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। নির্দেশ আল্লাহর হাতেই। তাঁর নির্দেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

সূরা ইবরাহীম

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ও তার বিষয়বস্তু : এটা কোরআন পাকের চতুর্দশতম সূরা— ‘সূরা ইবরাহীম’। এটা মক্কায়, হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কতিপয় আয়াত সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, মক্কায়, হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ, না মদীনায় অবতীর্ণ।

এ সূরার শুরুতে রেসালাত, নবুওয়ত ও এসবের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর কাহিনী বর্ণনা হয়েছে এবং এর সাথে মিল রেখেই সূরার নাম ‘সূরা ইবরাহীম’ রাখা হয়েছে।

الرَّكَيبَ أَنْزَلْنَاهُ الْيَكْفُورَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ

كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ الْيَكْفُورَ

—ব্যাকরণের দিক দিয়ে একে এর গ্রন্থ

সাব্যস্ত করে এরূপ অর্থ নেয়াই অধিক স্পষ্ট যে, এটা ঐ গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। এতে অবতীর্ণ করার কাজটি আল্লাহর দিক সম্পৃক্ত করা এবং সম্মোহন রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর দিকে করার মধ্যে দু’টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (এক) এ গ্রন্থটি অত্যন্ত মহান। কারণ, একে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নাখিল করেছেন। (দুই) রসুলুল্লাহ (সাঃ) উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কারণ, তিনি এ গ্রন্থের প্রথম সম্মোহিত ব্যক্তি।

نَاسٍ إِخْرَجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ

শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল যুগের মানুষই বোঝানো হয়েছে। এতে ظلمات শব্দটি এর বহুবচন। এর অর্থ অন্ধকার। এখানে ظلمات বলে কুফর শিরক ও মন্দকর্মের অন্ধকারসমূহ এবং নর বলে ইমানের আলো বোঝানো হয়েছে। এজন্যেই ظلمات শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, কুফর ও শিরকের প্রকার অনেক। অমনিভাবে মন্দ কর্মের সংখ্যাও গণনার বাহিরে। পক্ষান্তরে নর শব্দটি একবচনে আনা হয়েছে। কেননা, ইমান ও সত্য এক। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি এ গ্রন্থ এজন্যে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি এর সাহায্যে বিশুর মানুষকে কুফর, শিরক ও মন্দ কর্মের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে ইমান ও সত্যের আলোর দিকে আনয়ন করেন। এখানে رب শব্দটি প্রয়োগ করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, গ্রন্থ ও পয়গম্বরের সাহায্যে সর্বস্তরের মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দেয়া—আল্লাহ তাআলার এ অনুগ্রহের একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐ কৃপা ও মেহরবানী, যা মানব জাতির স্রষ্টা ও প্রভু—প্রতিপালকত্বের কারণ

মানবজাতির প্রতি নিয়োজিত করে রেখেছেন।

إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

—এ আয়াতের শুরুতে যে অঙ্কার ও আলোর উল্লেখ করা হয়েছিল, বলাবাহুল্য, তা ঐ অঙ্কার ও আলো নয়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়। তাই তা ফুটিয়ে তোলার জন্যে এ বাক্য বলা হয়েছে যে, ঐ আলো হচ্ছে আল্লাহর পথ। এই পথে যারা চলে, তারা অঙ্কারে চলাচলকারীর অনুরূপ পথভ্রান্ত হয় না, হেঁচট খায় না এবং গম্ভ্যাবস্থলে পৌঁছতে বিফল মনোরথ হয় না। আল্লাহর পথ বলে ঐ পথ বোঝানো হয়েছে, যেপথে চলে মানুষ আল্লাহ পৰ্বশত পৌছতে পারে এবং তাঁর সন্তুষ্টির মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

এ স্থলে আল্লাহ শব্দটি পরে এবং তাঁর আগে তাঁর দু'টি গুণবাচক নাম **عزيز** ও **حميد** উল্লেখ করা হয়েছে **عزيز** শব্দের অর্থ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত এবং **حميد** শব্দের অর্থ ঐ সত্তা, যিনি প্রশংসার যোগ্য। এ দু'টি গুণবাচক শব্দকে আসল নামের পূর্বে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ পথ পথিককে যে সত্তার দিকে নিয়ে যায়, তিনি পরাক্রান্তও এবং প্রশংসার যোগ্য। ফলে এ পথের পথিক কোথাও হেঁচট খাবে না এবং তার প্রচেষ্টা বিফলে যাবে না; বরং তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছা সুনিশ্চিত। শর্ত এই যে, এপথ ছাড়তে পারবে না।

আল্লাহ তাআলার এ দু'টি গুণ আগে উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে : **اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** —অর্থাৎ তিনি

এ সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক। এতে কোন অংশীদার নেই। وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ هَـوَ أَلَدُّ الْغِیَاسِ - শব্দের অর্থ কঠোর শাস্তি ও বিপর্যয়। অর্থ এই যে, যারা কোরআনরূপী নেয়ামত অস্বীকার করে এবং অন্ধকারেই থাকতে পছন্দ করে, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষেপে ও বরবাদী, ঐ কঠোর আযাবের কারণে যা তাদের উপর আপতিত হবে।

সারকথা : অয়াতের সারমর্ম এই যে, সব মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আল্লাহ্র পথের আলোতে আনার জন্যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যে হতভাগা কোরআনকেই অস্বীকার করে, সে নিজেই নিজেকে আযাবে নিক্ষেপ করে। কোরআন যে আল্লাহ্র কালাম, যারা এ বিষয়টিই স্বীকার করে না, তারা তো নিশ্চিতরূপেই উপরোক্ত সাবধানবাণীর লক্ষ্য; কিন্তু যারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অস্বীকার করে না, তবে কার্যক্ষেত্রে কোরআনকে ত্যাগ করে বসেছে—তেলাওয়াতের সাথেও কোন সম্পর্ক রাখে না এবং বোঝা ও তা মেনে চলার প্রতিও জ্ঞক্ষেপ করে না, তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সাবধানবাণীর আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

الَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

এ আয়াতে কোরআনে অবিশ্বাসী কাফেরদের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। (এক) তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের তুলনায় অধিক পছন্দ করে এবং অগ্রাধিকার দেয়। এজন্যই পার্থিব লাভ বা আরামের খাতির

পরকালের ক্ষতি স্বীকার করে নেয়। এতে তাদের রোগ নির্ণয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কেন কোরআনের সুস্পষ্ট মু'জ্জেযা দেখা সত্ত্বেও একে অস্বীকার করে? কারণ এই যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনের ভালবাসা তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে অন্ধ করে রেখেছে। তাই তারা অন্ধকারকেই পছন্দ করে এবং আলোর দিকে আসার কোন আগ্রহ রাখে না।

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, তারা নিজেরা তো অন্ধকারে থাকা পছন্দ করেই ; তদুপর্য্য সর্বনাশের কথা এই যে, নিজের দ্রাস্তি ঢাকা দেয়ার জন্যে অন্যদেরকেও আলোর মহাসড়ক অর্থাৎ আল্লাহর পাথে চলতে বাধ্য দান করে।

কোরআন বোঝার ব্যাপারে কোন কোন শাস্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ : তৃতীয় অবস্থা وَيُؤْتُونَكَ وَالْبَاقِيَ বায্যে বর্শিত হয়েচে। এর অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে। (এক) তারা স্বীয় মন্দ বাসনা ও মন্দ কর্মের কারণে এ চিন্তায় মগ্ন থাকে যে, আল্লাহর উজ্জ্বল ও সরল পথে কোন যত্নতা ও ঘোষ দৃষ্টিগোচর হলেই তার আপত্তি ও ভর্ৎসনা করার সুযোগ পাবে। ইবনে কাসীর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

(দুই) তারা এরূপ খোঁজাখুঁজিতে লেগে থাকে যে, আল্লাহর পথে অর্থও কোরআন ও হাদীসের কোন বিষয়বস্তু তাদের চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তির অনুকূলে পাওয়া যায় কি না, যেন সেটাকে তারা নিজেদের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে পারবে, তফসীরে কুরতুবীতে এ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আজকাল অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তি এ ব্যাষিতে আক্রান্ত। তারা মনে মনে একটি চিন্তাধারা এখনও ভাব্তিবশতঃ এবং কখনও বিজ্ঞাতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গড়ে নেয়। এরপর কোরআন ও হাদীসে এর সমর্থন তালিশ করে। কোথাও কোন শব্দ এ চিন্তাধারার অনুকূলে দৃষ্টিগোচর হলেই একে নিজেদের পক্ষে কোরআনী প্রমাণ মনে করে। অথচ এ কর্মপন্থাটি নীতিগতভাবেই ভ্রান্ত। কেননা, মুমিনের কাজ হল নিজস্ব চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত মন নিয়ে কোরআন ও হাদীসকে দেখা। এরপর এগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে যা প্রমাণিত হয়, সেটাকে নিজের মতবাদ সাব্যস্ত করা।

—উপরে যেসব কাফেরের তিনটি অবস্থা

বর্ণিত হয়েছে, এ বাক্যে তাদেরই অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তারা পথভ্রষ্টতায় এতদূর পৌছে গেছে যে, সেখান থেকে সং পথে ফিরে আসা তাদের পক্ষে কঠিন।

আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আঃ) থেকে জগতে মানব-বসতি শুরু করেছেন এবং তাঁকেই মানব জাতির সর্বপ্রথম নবী ও পয়গম্বর মনোনীত করেন। এরপর পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পয়গম্বরের মাধ্যমে হেদায়েত ও পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা ততই সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগ ও জাতির অবস্থার উপযোগী বিধি-বিধান ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মানব জগতের ক্রমঃবিকাশ যখন পূর্ণাঙ্গের স্তরে উপনীত হয়েছে, তখন সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল-আখেরীন, ইমামুল -আম্মিয়া মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে সমগ্র বিশ্বের জন্য রসুলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁকে যে গ্রন্থ ও সরীয়ত দান করা হয়েছে, তাঁকে সেগ্রন্থ বিশ্ব এবং কৈয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে।

কোরআন আরবী ভাষায় কেন? এখন প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী

উম্মতদের প্রতি প্রেরিত রসূল তাদেরই ভাষাভাষী ছিলেন। ফলে তাদেরকে অনুবাদের শ্রম স্বীকার করতে হয়নি। শেষ পয়গম্বরের বেলায় এরূপ হল না কেন? রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে শুধু আরবেই কেন আরবী ভাষা দিয়ে প্রেরণ করা হল এবং তাঁর গ্রন্থ কোরআনও আরবী ভাষায়ই কেন নাযিল হল? একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই এর উত্তর পরিষ্কার হবে। বিশেষ জাতিসমূহের মধ্যে শত শত ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এমনভাবেই সবাইকে হেদায়েত করার দু'টি মাত্র উপায় সম্ভবপর ছিল। (এক) প্রত্যেক জাতির ভাষায় পৃথক পৃথক কোরআন অবতীর্ণ হওয়া এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর শিক্ষাও তদ্রূপ প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। আল্লাহর অপার শক্তির সামনে এরূপ ব্যবস্থাপনা মোটেই কঠিন ছিল না; কিন্তু সমগ্র বিশুবাসীর জন্যে এক রসূল, এক গ্রন্থ, এক শরীয়ত প্রেরণ করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে হাজারো মতবিরোধ সত্ত্বেও ধর্মীয়, চারিত্রিক ও সামাজিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের যে মহান লক্ষ্য অর্জন করা উদ্দেশ্য ছিল, এমনভাবেই তা অর্জিত হত না।

এছাড়া প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের কোরআন ও হাদীস ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় থাকলে কোরআন পরিবর্তনের অসংখ্য পথ খুলে যেত এবং কোরআন যে একটি সংরক্ষিত কলাম যা বিজ্ঞাতি এবং কোরআন-অবিশ্বাসীরাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে, এ আলৌকিক বৈশিষ্ট্য খতম হয়ে যেত। এছাড়া একই ধর্ম এবং একই গ্রন্থ সত্ত্বেও এর অনুসারীরা শতাব্দীভিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং তাদের মধ্যে ঐক্যের কোন কেন্দ্রবিন্দুই অবশিষ্ট থাকত না। এক আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যাখ্যা ও তফসীরে বৈধ সীমার মধ্যে কত মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। অবৈধ পন্থায় যেসব মত বিরোধ হয়েছে, সেগুলোর তো ইয়ত্তাই নেই। এ থেকেই উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা সত্যক অনুমান করা যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা কোন না কোন স্তরে কোরআনের বিধি-বিধান পালন করে, তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

মোটকথা এই যে, রসূলে করীম (সাঃ)—এর নবুওয়ত সমগ্র বিশেষ জন্যে ব্যাপক হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কোরআনের মাধ্যমে সমগ্র বিশুবাসীর শিক্ষা ও হেদায়েতের পন্থাকে কোন স্থূল বুজিসম্পন্ন ব্যক্তিও সঠিক ও নির্ভুল মনে করতে পারে না। তাই দ্বিতীয় পন্থাটিই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তা এই যে, কোরআন একই ভাষায় অবতীর্ণ হবে এবং রসূলের ভাষাও কোরআনেরই ভাষা হবে। এরপর অন্যান্য দেশীয় ও আঞ্চলিক ভাষায় এর অনুবাদ প্রচার করা হবে। নায়েবে রসূল আলেমগণ প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর নির্দেশাবলী তাঁদের ভাষায় বোঝাবেন এবং প্রচার করবেন। আল্লাহ তাআলা এর জন্যে বিশেষ ভাষাসমূহের মধ্য থেকে আরবী ভাষাকে নির্বাচন করেছেন। এর অনেক কারণ রয়েছে।

আরবী ভাষার কতিপয় বৈশিষ্ট্য : প্রথমতঃ আরবী ভাষা উর্ধ্ব জগতের সরকারী ভাষা। ফেরেশতাদের ভাষা আরবী, লওহে-মাহফুযের ভাষা আরবী, যেমন আয়াত : **بِلَ هُوَ وَرَاقٌ عِندَ رَبِّكَ مَحْظُوتٌ** থেকে জানা যায়। জ্ঞানাত মানুষের আসল দেশ সেখানে তাকে ফিরে যেতে হবে। সেখানকার ভাষাও আরবী।

তফসীরে কুরতুবী প্রমুখ গ্রন্থে আরও বর্ণিত আছে যে, জ্ঞানাত হযরত আদম (আঃ)—এর ভাষা ছিল আরবী। পৃথিবীতে অবতরণ ও তওবা কবুল হওয়ার পর আরবী ভাষাই কিছু পরিবর্তিত হয়ে সুরইয়ানী ভাষার রূপ পরিগ্রহ করে। এ থেকে ঐ রেওয়াজেতেরও সমর্থন পাওয়া যায়, যা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা পয়গম্বুরগণের প্রতি যত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলোর আসল ভাষা ছিল আরবী। জিবরাঈল (আঃ) সংশ্লিষ্ট পয়গম্বুরের ভাষায় অনুবাদ করে তা পয়গম্বুরগণের কাছে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এই রেওয়াজেটি আল্লামা সুহুতী ইতহান গহ্বে এবং অমিকাশে তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এর মূল বিষয়বস্তু এই যে, সব ঐশী গ্রন্থের আসল ভাষা আরবী। কিন্তু কোরআন ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দেশীয় ও জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করে দেয়া হয়েছে। তাই সেগুলোর অর্থসম্ভার তো আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু ভাষা ও শব্দ পরিবর্তিত। এটা একমাত্র কোরআনেরই বৈশিষ্ট্য যে, এর অর্থসম্ভারের মত শব্দাবলীও আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোরআন দাবী করেছে যে, সমগ্র বিশেষ জিন ও মানব একত্রিত হয়েছে কোরআনের একটি ছোট সূরা-বরং আয়াতের অনুরূপ তুল্য রচনা করতে পারবে না। কেননা, এটা অর্থগত ও শব্দগত দিক দিয়ে আল্লাহর কলাম এবং আল্লাহর গুণ। কেউ এর অনুকরণ করতে সক্ষম নয়। অর্থগত দিক দিয়ে তো অন্যান্য ঐশীগ্রন্থ আল্লাহর কলাম; কিন্তু সেগুলোতে সম্ভবতঃ আসল আরবী ভাষার পরিবর্তে অসুদিত ভাষায় হওয়ার কারণ এই দাবী অন্য কোন ঐশীগ্রন্থ করেনি। নতুবা কোরআনের মত আল্লাহর কলাম হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক গ্রন্থের অদ্বিতীয় ও অনুপম হওয়া নিশ্চিত ছিল।

আরবী ভাষার নিজস্ব গুণাবলী ও ভাষাকে বেছে নেয়ার অন্যতম কারণ এ ভাষায় একটি উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করার জন্যে অসংখ্য উপায় ও পথ বিদ্যমান রয়েছে।

আরও একটি কারণ এই যে, মুসলমানকে আল্লাহ তাআলা প্রকৃতিগতভাবেই আরবী ভাষার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি অনায়াসে আরবী ভাষা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু শিখে নিতে পারে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম যে দেশেই পৌঁছেছেন, অল্পদিনের মধ্যেই কোনরূপ জোর-জবরদস্তি ব্যতিরেকেই সে দেশের ভাষা আরবী হয়ে গেছে। আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সিরিয়া, সুদান, মৌরিতানিয়া, মিসর, ইরাক—এসব দেশের কোনটিই ভাষা আরবী ছিল না। কিন্তু আজ এগুলো অরবদেশ বলে কথিত হয়।

আরও একটি কারণ এই যে, আরবরা ইসলাম পূর্বকালে যদিও জফা সব মন্দ কর্মে লিপ্ত ছিল; কিন্তু এমনভাবেই ও জাতির কর্মকর্মজ, নৈপুণ্য ও ভাবাবেগ ছিল অনন্যসাধারণ। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ পয়গম্বুরকে তাদের মধ্য থেকে উদ্ভূত করেন, তাদের ভাষাকে কোরআনের জন্যে পছন্দ করেন এবং রসূল (সাঃ)—কে সর্বপ্রথম তাদের হেদায়েত ও শিক্ষার আদেশ দেন। **لَقَدْ رَاسِدْتِكَ الْكَافِرِينَ** আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম স্বীয় রসূলের চারপাশে তাদেরই এমন

ব্যক্তিবর্গকে জমায়েত করেন, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর জন্যে নিজেদের জ্ঞান-মাল, সম্ভান-সম্পত্তি সবকিছু উৎসর্গ করে দেন এবং তাঁর শিক্ষাকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করেন। এভাবে তাদের উপর তাঁর সৎসর্গ ও শিক্ষার গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং তাদের দ্বারা এমন একটি আদর্শ সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে; যার নজীর ইতিপূর্বে আসমান ও যমীন প্রত্যক্ষ করেনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই নজীরবিহীন দলটিকে কোরআনী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্যে নিযুক্ত করেন এবং বলেন : **بلغوا عني ولو آية** অর্থাৎ, তোমরা আমার কাছ থেকে শ্রুত প্রত্যেকটি কথা উন্মত্তের কাছ পৌছিয়ে দাও। সাহাবায় কেরাম এই নির্দেশটি অলঙ্ঘনীয় বলে গ্রহণ করে নেন এবং বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌছে কোরআনের শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর ওফাতের পর পঁচিশ বৎসরও অতিক্রান্ত হয়নি, কোরআনের আওয়ায প্রাচ্য-প্রাচীণ্য নির্বিশেষে তদানিস্তন পরিচিত পৃথিবীর সর্বত্র অনুরণিত হতে থাকে।

অপরদিকে আল্লাহ তাআলা তকদীরগত ও সৃষ্টিগতভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর দাওয়াত পর্যায়ে উন্মত্ত (দুনিয়ার সব মুশরিক এবং গ্রন্থধারী ইহুদী ও খ্রীষ্টান যাদের অন্তর্ভুক্ত)—এর মধ্যে একটি বিশেষ নৈপুণ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা, গ্রন্থ রচনা ও প্রচারকার্যের এমন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে দেন যে, এর নজীর জগতের অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর ফলশ্রুতিতে অনারব জাতিসমূহের মধ্যে শুধু কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনের অদম্য স্পৃহাই জাগ্রত হয়নি; বরং আরবী ভাষা শিক্ষা ও তার প্রসারের ক্ষেত্রে অনারবদের অবদান আরবদের চাইতেও কোন অংশে কম নয়।

বর্তমানে আরবী ভাষা, এর ব্যাকপদ্ধতি এবং ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের যতগুলো গ্রন্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, সেগুলোর অধিকাংশই অনারব লেখকদের রচিত। এটি এক বিস্ময়কর সত্য বটে। কোরআন ও হাদীসের সংকলন, তফসীর ও ব্যাখ্যা ক্ষেত্রেও অনারবদের ভূমিকা আরবদের চাইতে কম নয়।

এভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর ভাষা এবং তাঁর গ্রন্থ আরবী হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বকে তা বেটন করে নিয়েছে এবং দাওয়াত ও প্রচারের পর্যায়ে আরব ও অনারবের পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দেশ, জাতি এবং আরব-ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এমন আলেম সৃষ্টি হয়েছে, যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় অত্যন্ত সহজভাবে পৌছে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক জাতির ভাষায় পয়গম্বর প্রেরণের যে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হতে পারতো, তা অর্জিত হয়ে গেছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **آمِي** আমি মানুষের সুবিধার জন্যে পয়গম্বরগণকে তাদের ভাষায় প্রেরণ করেছি—যাতে পয়গম্বরগণ আমার বিধি-বিধান উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু হেদায়েত ও পথদষ্টতা এরপরও মানুষের সাধ্যাধীন নয়। আল্লাহ তাআলাই স্বীয় শক্তিবলে যাকে ইচ্ছা পথদষ্টতায় রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেন। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

৫ম আয়াতে বলা হয়েছে : **آمِي** আমি মুসা (আঃ)—কে আয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছি, যাতে সে স্বজাতিকে কুফর ও গোনাহের অন্ধকার থেকে ঈমান ও আনুগত্যের আলোতে নিয়ে আসে।

آمِي—আয়াত শব্দের অর্থ তওরাতের আয়াতও হতে পারে। কারণ, সেগুলো নাখিল করার উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের আলো ছড়ানো। আয়াতের

অন্য অর্থ মু'জ্জেযাও হয়। এখানে এ অর্থও উদ্দিষ্ট হতে পারে। মুসা (আঃ)—কে আল্লাহ তাআলা ন'টি মু'জ্জেযা বিশেষভাবে দান করেছিলেন।

একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব : এ আয়াতে 'কওম' শব্দ ব্যবহার করে নিজ কওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়বস্তুটিই যখন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সেখানে 'কওম' শব্দের পরিবর্তে **نَاسٍ** (মানবমণ্ডলী) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে : **النَّاسِ مِنَ الظَّالِمِينَ إِلَى التَّوْبَةِ** —এতে ইঙ্গিত আছে যে, মুসা (আঃ) শুধু বনী-ইসরাঈল ও মিসরীয় জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, অপরদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর নবুওয়ত সমগ্র বিশ্বমানবের জন্যে।

এরপর বলা হয়েছে : **وَذَرَّهُمْ أَتْلُوهَا** — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মুসা (আঃ)—কে নির্দেশ দেন যে, স্বজাতিকে 'আইয়্যামুল্লাহ' স্মরণ করান।

আইয়্যামুল্লাহ : **أيام** শব্দটি **يوم** —এর বহুবচন। এর অর্থ দিন, তা সুবিদিত। **أيام الله** শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) যুদ্ধ অথবা বিপ্লবের বিশেষ দিন, যেমন—বদর, ওহুদ, আহযাব, খন্দান ইত্যাদি যুদ্ধের ঘটনাবলী অথবা পূর্ববর্তী উন্মত্তের উপর আযাব নাখিল হওয়ার ঘটনাবলী। এসব ঘটনায় বিরাট জাতির ভাগ্য ওলট-পালট হয়ে গেছে এবং তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিষ্কিহ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় 'আইয়্যামুল্লাহ' স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য হবে, এসব জাতির কুফরের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা এবং হুশিয়ার করা।

আইয়্যামুল্লাহর অপর অর্থ আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ও অনুগ্রহও হয়। এগুলো স্মরণ করানোর লক্ষ্য হবে এই যে, ভাল মানুষকে যখন কোন অনুগ্রহদাতার অনুগ্রহ স্মরণ করানো হয়, তখন সে বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করতে লজ্জাবোধ করে।

কোরআন পাকের সংশোধন পদ্ধতি সাধারণতঃ এই যে, কোন কাজের নির্দেশ দিলে সাথে সাথে কাজটি করার কৌশলও বলে দেয়া হয়। এখানে প্রথম বাক্যে মুসা (আঃ)—কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর আয়াত শুনিয়া অথবা মু'জ্জেযা প্রদর্শন করে স্বজাতিকে কুফরের অন্ধকার থেকে বের করুন এবং ঈমানের আলোতে নিয়ে আসুন। এ বাক্যে এর কৌশল বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, অবাধ্যদেরকে দু'উপায়ে সংপথে আনা যায়। (এক) শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা এবং (দুই) নেয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে আনুগত্যের দিকে আহ্বান করা **وَذَرَّهُمْ أَتْلُوهَا** বাক্যে এ দু'টি উপায়ই উদ্দিষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী উন্মত্তের অবাধ্যদের অশুভ পরিণাম, তাদের আযাব, জেহাদে তাদের নিহত অথবা লালিত হওয়ার কথা স্মরণ করানো, যাতে তারা শিক্ষা অর্জন করে আত্মরক্ষা করে। এমনিভাবে এ জাতির উপর আল্লাহর যেসব নেয়ামত দিবারাত্র বর্ষিত হয় এবং যেসব বিশেষ নেয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে, সেগুলো স্মরণ করিয়ে আল্লাহর আনুগত্য ও তওহীদে দিকে আহ্বান করুন; উদাহরণতঃ তীহ্ উপত্যকায় তাদের মাথার উপর মেঘের ছায়া, আহ্বারের জন্যে মাদ্রা ও সালওয়ার অবতরণ, পানীয় জলের প্রয়োজনে পাথর থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি।

الْبَصِيرِ ۝

২৫৫

وَمَا يَرَىٰ ۝

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ —এর আয়াত—এর অর্থ

নিদর্শন ও প্রমাণাদি। صبار শব্দটি صبر থেকে মাল্গে এর পদ। এর অর্থ অত্যন্ত সবারকারী। شكور শব্দটি شكر থেকে মাল্গে এর পদ। এর অর্থ অধিক কৃতজ্ঞ। বাক্যের অর্থ এই যে, অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও আযাব সম্পর্কিত হোক অথবা আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত হোক, উভয় অবস্থাতে অতীত ঘটনাবলীতে আল্লাহর অপার শক্তি ও অসীম রহস্যের বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে অত্যন্ত সবারকারী এবং অধিক শোকরকারী।

সংক্ষেপে শোকর ও কৃতজ্ঞতার স্বরূপ এই যে, আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতা এবং হারাম ও অবৈধ কাজে ব্যয় না করা, মুখে ও আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং স্বীয় কাজকর্মকেও তাঁর ইচ্ছার অনুগামী করা।

সবরের সারমর্ম হচ্ছে স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপারাদিতে অস্থির না হওয়া, কথায় ও কাজে অকৃজ্ঞতার প্রকাশ থেকে বেঁচে থাকা এবং ইহকালেও আল্লাহর রহমত আশা করা ও পরকালে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তিতে বিশ্বাস রাখা।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৬ষ্ঠ আয়াতে পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, বনী-ইসরাঈলকে নিম্নলিখিত বিশেষ নেয়ামতটি স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে মুসা (আঃ)—কে আদেশ দেয়া হয়।

মুসা (আঃ)—এর পূর্বে ফেরাউন বনী-ইসরাঈলকে অবৈধভাবে গোলামে পরিণত করে রেখেছিল। এরপর এসব গোলামের সাথেও মানবাচিত ব্যবহার করা হত না। তাদের ছেলে—সন্তানকে জলাগ্ৰহণের পরই হত্যা করা হত এবং শুধু কন্যাদেরকে খেদমতের জন্যে লালন-পালন করা হত। মুসা (আঃ)—কে প্রেরণের পর তাঁর বরকতে আল্লাহ তাআলা বনী-ইসরাঈলকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দান করেন।

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي

لَشَدِيدٌ

تَأَذَّنَ —শব্দটির অর্থ সবেদা দেয়া ও ঘোষণা করা। আয়াতের উদ্দেশ্য

এই : একথা স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করে দেন, যদি তোমরা আমার নেয়ামত-সমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অর্থাৎ, সেগুলোকে আমার অবাধ্যতায় ও অবৈধ কাজে ব্যয় না কর এক নিজেদের ক্রিয়াকর্মকে আমার মর্জির অনুগামী করার চেষ্টা কর, তবে আমি এসব নেয়ামত আরও বাড়িয়ে দেব। এ বাড়ানো নেয়ামতের পরিমাণেও হতে পারে এবং স্থায়ীও হতে পারে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তওফীকপ্রাপ্ত হয়, যে কোন সময় নেয়ামতের বরকত ও বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় না।—(মায়হারী)

আল্লাহ আরও বলেন : যদি তোমরা আমার নেয়ামতসমূহের নাশোকরী কর, তবে আমার শাস্তিও ভয়ঙ্কর। নাশোকরীর সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতায় এবং অবৈধ কাজে ব্যয় করা অথবা তাঁর ফরয ও ওয়াজিব পালনে অবহেলা করা। অকৃজ্ঞতার কঠোর শাস্তিস্বরূপ

(৬) যখন মুসা স্বজাতিকে বললেন : তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর— যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দেন। তারা তোমাদেরকে অত্যন্ত নিকট ধরনের শাস্তি দিত, তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখত। এবং এতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা হয়েছিল। (৭) যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর। (৮) এবং মুসা বললেন : তোমরা এবং পৃথিবীই সবাই যদি কুফরী কর, তথাপি আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, যাবতীয় গুণের আধার (৯) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কওমে-নূহ, আদ ও সামুদের এবং তাদের পরবর্তীদের খবর পৌছেনি? তাদের বিষয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাদের কাছে তাদের পয়গম্বুর প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করে। অতঃপর তারা নিজেদের হাত নিজেদের মুখে রেখে দিয়েছে এবং বলেছে : যা কিছুসহ তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমরা তা মানি না এবং যে পথের দিকে তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দাও, সে সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ আছে, যা আমাদেরকে উৎকণ্ঠায় ফেলে রেখেছে। (১০) তাদের পয়গম্বুরগণ বলেছিলেন : আল্লাহ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে, যিনি নাভ্যমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন যাতে তোমাদের কিছু গোনাহ ক্ষমা করেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের সময় দেন। তারা বলত : তোমরা তো আমাদের যতই মানুষ। তোমরা আমাদেরকে ঐ উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও, যার এবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতঃপর তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর।

قَالَتْ لَهُمْ رَسُولُهُمْ إِنَّمَا أُوتِيتُمْ مَثَلًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ
 عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُلَاقُوا بِهِ
 إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَكُمْ
 أَنْ تَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلَنَا وَلَنْ يُفِثَ عَلَى مَا
 أَذْنَبْتُمْوْنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا وَلَنَعُودَنَّ فِي مَا كُنتُمْ
 فَاوْءَى الْيَوْمَ ثُمَّ لَكُمْ هَاهُنَا الطَّيْلِبِينَ وَلَنَسْتَبْسِكُنَّ الْأَرْضَ
 مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَذَ وَعْدِي وَإِنِّي لَأَسْتَعِزُّ
 وَخَالِبُ كُلَّ جَبَّارٍ عَدِيٍّ وَمِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ
 صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكْدِيهِ سِغَةً وَيَأْتِيهِ الْبُوتُ مِنْ كُلِّ
 مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِبَدِيدٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَالِيَةٍ
 لَأَقْبِرُونَهُمْ وَمَا كُنْهُوا عَنْ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْبَعِيدُ
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَيِّ إِنَّ شَيْئًا هَبْنَاهُمْ
 وَيَأْتِي بَحْنُ يَوْمٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

(১১) তাদের পয়গম্বুর তাদেরকে বলেন : আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপরে ইচ্ছা, অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়; ঈমানদারদের আল্লাহ্র উপর ভরসা করা চাই। (১২) আমাদের আল্লাহ্র উপর ভরসা না করার কি কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনি আমাদেরকে আমাদের পথ বলে দিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন করেছ, তজ্জন্যে আমরা সবর করব। ভরসাকারিগণের আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা উচিত। (১৩) কাফেররা পয়গম্বুরগণকে বলেছিল : আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জ্বালমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব। (১৪) তাদের পর তোমাদেরকে দেশে আবাদ করব। এটা ঐ ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ায় এবং আমার আযাবের ওয়াদাকে ভয় করে। (১৫) পয়গম্বুরগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অবস্থা, হঠকারী ব্যর্থ কাম হল। (১৬) তার পেছনে দোষ রয়েছে। তাতে পুঁজ মিশানে পানি পান করানো হবে। (১৭) ঢোক গিলে তা পান করবে এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে মরবে না। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর আযাব। (১৮) যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তায় অবিশ্বাসী, তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্মসমূহ ছাইভস্মের মত যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যায় খুলিবাড়ের দিন। তাদের উপার্জনের কোন অংশই তাদের করতলগত হবে না। এটা ই দূরবর্তী পঞ্চাশত। (১৯) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন? যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদেরকে বিলুপ্তিতে নিয়ে যাবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন। (২০) এটা আল্লাহ্র পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

দুনিয়াতেও নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া যেতে পারে অথবা এমন বিপদ আসতে পারে যেন, নেয়ামত ভোগ করা সম্ভবপর না হয় এবং পরকালেও আযাবে গ্রেফতার হতে পারে।

এখানে এ বিষয়টি সূরশীয় যে আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কৃতজ্ঞদের জন্যে প্রতিদান, সওয়াব ও নেয়ামত বৃদ্ধির ওয়াদা তাকিদ সহকারে করেছেন لَا تُزِيدُنَّكُمْ কিন্তু এর বিপরীতে অকৃতজ্ঞদের জন্যে তাকিদ সহকারে لَا عَذَابَكُمْ (আমি অবশ্যই তোমাদেরকে শাস্তি দেব)। বলেননি; বরং শুধু ‘আমার শাস্তিও কঠোর’ বলেছেন। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ আযাবে পতিত হবে—এটা জরুরী নয়; বরং ক্ষমারও সম্ভাবনা আছে।

وَقَالَ مُوسَى إِنَّ كُفْرًا وَآثَمًا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأَرْأَى اللَّهَ

অর্থাৎ, মুসা (আঃ) স্বজাতিকে বললেন : যদি তোমরা এবং

পৃথিবীতে যারা বসবাস করে, তারা সবাই আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতসমূহের নাশাকরী করে, তবে সুরণ রেখ, এতে আল্লাহ্ তাআলার কোন ক্ষতি নেই। তিনি সবার তারিফ, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার উদ্দেশ্যে। তিনি আপন সন্তায় প্রশংসনীয়। তোমরা তাঁর প্রশংসা না করলেও সব ফেরেশতা এবং সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁর প্রশংসায় মুখর।

কৃতজ্ঞতার উপকার সবটুকু তোমাদের জন্যেই। তাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার জন্যে তাকিদ করা হয়, তা নিষেধের জন্যে নয়; বরং দয়াবশতঃ তোমাদেরই উপকার করার জন্যে।

ইতিপূর্বে এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম হচ্ছে ছাইভস্মের মত, যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিটি কণা বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে নিকিহ হয়ে যায়। এরপর কেউ এগুলোকে একত্রিত করে কোন কাজে লাগাতে চাইলে তা অসম্ভব হয়ে যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَالِيَةٍ

— উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম বাহ্যতঃ সং

হলেও তা আল্লাহ্ তাআলার কাছে গ্রহণীয় নয়। তাই সব অর্থহীন ও অকেজো।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আবু বারী

২৫৭

১৩ মার্চ

وَرُدُّوْا إِلَیْهِ جَمِیْعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِیْنَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا
 كُنَّا لَكُمْ تَعَاوَنًا لَّنُمْ قُتْلَ عَدَاوِنَا عَذَابَ اللَّهِ مِنْ
 شَىْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَرَبْنَا أَمْ
 صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ حَیْثُ ۖ وَقَالَ الشَّیْطَانُ لَبَأَفْضَلُ أَلَمْ
 یَرِ الْإِلَاحَ وَعَدَا لَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ وَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ
 لِي عَلَیْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا
 تَلُمُوْنِیْ وَلَوْ مَوَّالَ انْفُسِكُمْ مَا أَنَا بِبَصِیْرٍ خَلِّیْكُمْ وَآتَمِّ بِبَصِیْرٍ
 إِنِّیْ لَفَرَّارٌ بِمَا أَشْرَكْتُمْ مِنْ قَبْلِ إِنْ الطَّیْلِیْنَ لَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِیْمٌ ۖ وَأُدْخِلَ الَّذِیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ
 جَنَّٰتٍ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خٰلِدِیْنَ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
 یُحِبُّهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۖ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِیْمَةً
 طَلِیْمَةً كَسَجْرَةٍ طَلِیْمَةٍ أَصْلٰهَا نَارٌ ۖ وَفَرَعُهَا النَّسَاءُ ۖ
 ذُوْقِ أَكْهٰكُلَ جَنِّیْنَ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ أَصْحَابُ الْأَمْثَالِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُوْنَ ۖ وَمَثَلُ كَلِیْمَةٍ خَبِیْثَةٍ كَسَجْرَةٍ
 خَبِیْثَةٍ لِّیُجْزِیَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝

(২১) সবাই আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং দুর্বলরা বড়দেরকে বলবে : আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম—অতএব, তোমরা আল্লাহর আয়াব থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করবে কি? তারা বলবে : যদি আল্লাহ আমাদেরকে সংপথ দেখাতেন, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সংপথ দেখাতাম। এখন তো আমরা ঘেঁষচ্যুত হই কিংবা সবার করি—সবই আমাদের জন্যে সমান—আমাদের রেহাই নেই। (২২) যখন সব কাজের ফয়সলা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে : নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতদুচ্চ যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। এতএব তোমরা আমাকে ভৎসনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালাম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (২৩) এবং যারা বিশৃঙ্খল স্থাপন করে এবং সংকর্ম সম্পাদন করে তাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নির্ঝরিতীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তাতে পালনকর্তার নির্দেশে অন্তকাল থাকবে। যেখানে তাদের সম্ভাব্য হবে সালাম। (২৪) তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ তাআলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন : পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উদ্ভিত। (২৫) সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন—যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (২৬) এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই।

এরপর উল্লেখিত আয়াতসমূহে প্রথমে মুমিন ও তার ক্রিয়াকর্মের একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। অতঃপর কাকের ও মুমিনদের ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। ২৪তম আয়াতে মুমিন ও তার ক্রিয়াকর্মের উদাহরণে এমন একটি বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার কাণ্ড মজবুত ও সুউচ্চ এবং শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত। ভূগর্ভস্থ ঝরণা থেকে সেগুলো সিক্ত হয়। গভীর শিকড়ের কারণে বৃক্ষটি এত শক্ত যে দমকা বাতাসে ভূমিশ্যাৎ হয়ে যায় না। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উর্ব্বৈর থাকার কারণে এর ফল ময়লা ও আবর্জনা থেকে মুক্ত। এ বৃক্ষের দ্বিতীয় গুণ এই যে, এর শাখা উচ্চতায় আকাশ-পানে ধাবমান। তৃতীয় গুণ এই যে, এর ফল সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়। এ বৃক্ষটি কি এবং কোথায়, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক তথ্য নির্ভর উক্তি এই যে, এটি হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। এর সমর্থন অভিজ্ঞতা এবং চাক্ষুষ দেখা দ্বারাও হয় এবং বিভিন্ন হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড যে উচ্চ ও মজবুত, তা প্রত্যক্ষ বিষয়—সবাই জানে।

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম হযরত আনাস (রাঃ)—এর রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : কোরআনে উল্লেখিত পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ এবং অপবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে হানফল তথা মাকাল বৃক্ষ।—(মাহহারী)

মুসনাদ আহমদে মুজাহিদের রেওয়াজেতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন : একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর খেমতে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে খেজুর বৃক্ষের শাঁস নিয়ে এল। তখন তিনি সাহাবায়ে কেয়ামকে একটি প্রশ্ন করলেন : বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ হচ্ছে মরদে—মুমিনের দৃষ্টান্ত। (বুখারীর রেওয়াজেতে মতে এখানে তিনি আরও বললেন যে, কোন ঋতুতেই এ বৃক্ষের পাতা ঝরে না।) বল, এ কোন বৃক্ষ? ইবনে ওমর বলেন : আমার মনে চাইল যে, বলে দেই—খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু মজলিসে আবু বকর, ওমর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে নিশ্চুপ দেখে আমি বলার সাহস পেলাম না। এরপর স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।

এ বৃক্ষ দ্বারা মুমিনের দৃষ্টান্ত দেয়ার কারণ এই যে, কালেমায় তাইয়েবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড় বিশিষ্ট, দুনিয়ার বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। কামেল মুমিন সাহাবী ও তাবয়ী; বর প্রতি যুগের খাটি মুসলমানদের এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যারা ঈমানের মোকাবেলায় জ্ঞান, মান ও কোন কিছু পরওয়া করেননি। দ্বিতীয় কারণ তাঁদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তারা দুনিয়ার নোংরামি থেকে সব সময় দূরে সরে থাকেন যেমন ভূ-পৃষ্ঠের ময়লা-আবর্জনা উচ্চ বৃক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। এ দুটি গুণ হচ্ছে أَصْلٰهَا نَارٌ—এর দৃষ্টান্ত। তৃতীয় কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের শাখা যেমন আকাশের দিকে উড়ে ধাবমান, মুমিনের ঈমানের ফলাফলও অর্থাৎ, সংকর্মও তেমনি আকাশের দিকে উদ্ভিত হয়। কোরআন বলে : اِلَیْهِ يَصْعَدُ الْكُلُّ الطَّیْلِ—অর্থাৎ, পবিত্র বাক্যাবলী আল্লাহ তাআলার যেসব যিকির, তসবীহ-তাহলীল, তেলাওয়াতে কোরআন ইত্যাদি করে, সেগুলো সকাল বিকাল আল্লাহর দরবারে পৌছতে থাকে।

চতুর্থ কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের ফল যেমন সব সময় সর্বাবস্থায়



(২৭) আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিবজীবনে এবং পরকালে। এক আল্লাহ জ্বালমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা, তা করেন। (২৮) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহর নেয়ামতকে কুফর পরিণত করেছে এবং স্বজাতিতে সম্মুখীন করেছে ধর্মের আলম—(২৯) দোষের? তারা তাতে প্রবেশ করবে সেটা কতই না মন্দ আবাস! (৩০) এবং তারা আল্লাহর জন্যে সমকক্ষ হির করেছে, যাতে তারা তার পক্ষ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। বলুন : মজা উপভোগ করে নাও। অতঃপর তোমাদেরকে অগ্নির দিকেই ফিরে যেতে হবে। (৩১) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা নামায কায়েম রাখুক এবং আমার দেয়া রিমিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক এদিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচা কেনা নেই এবং বন্ধুত্বও নাই। (৩২) তিনিই আল্লাহ, যিনি নজোমগুল ও ভূমণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃপর তা দ্বারা তোমাদের জন্যে ফলের রিমিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের আজীবন করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলা ফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। (৩৩) এবং তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাতি ও দিনকে তোমাদের কাছে লাগিয়েছেন। (৩৪) যে সকল বস্তু তোমরা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ। (৩৫) যখন ইবরাহীম কালেন : হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিতে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন।

এবং সব ঋতুতে দিবারাত্র ঋণ্ডা হয়, মুমিনের সৎকর্মও তেমনি সব সময়, সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে অব্যাহত রয়েছে এবং খেজুর বৃক্ষের প্রত্যেকটি অংশই যেমন উপকারী, তেমনি মুমিনের প্রত্যেক কথা ও কাজ, গঠাবসা এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্যে উপকারী ও ফলদায়ক। তবে শর্ত এই যে, কামেল মানুষ এবং আল্লাহ ও রসুলের শিকার অনুযায়ী হতে হবে।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, **تُؤْتِي الْأَمْثَالَ حَيَاتِي** বাক্যে **أَكِل** শব্দের অর্থ ফল ও খাদ্যোপযোগী বস্তু এবং **حَمِين** শব্দের অর্থ প্রতিমূর্ত্ত। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ ও কারণও অন্য উক্তিও রয়েছে।

কাফেরদের দৃষ্টান্ত : এর বিপরীতে কাফেরদের দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে খারাপ বৃক্ষ দ্বারা। কলেমায়ে তাইয়েযবার অর্থ যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ, ইমান, তেমনি কলেমায়ে খব্বাসার অর্থ কুফরী বাক্য ও কুফরী কাজকর্ম। পূর্বোল্লিখিত হাদীসে **يُخْرِجُ** অর্থাৎ, খারাপ বৃক্ষের উদ্ভিষ্ট অর্থ হান্ঘল বৃক্ষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ কেউ রসুন ইত্যাদি বলেছেন।

কোরআনে এই খারাপ বৃক্ষের অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এর শিকড় ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বেশী যায় না। ফলে যখন কেউ ইচ্ছা করে, এ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে। **جُذِبَتْ مِنْ قَوْي الْأَرْضِ** বাক্যের অর্থ তাই। কেননা, এর আসল অর্থ কোন বস্তুর অবয়বকে পুরোপুরি উৎপাটন করা।

কাফেরের কাজকর্মকে এ বৃক্ষের সাথে তুলনা করার কারণ তিনটি। (এক) কাফেরের ধর্ম বিশ্বাসের কোন শিকড় ও ভিত্তি নেই। অঙ্গাঙ্গের মধ্যেই নড়বড়ে হয়ে যায়। (দুই) দুনিয়ার আবজনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। (তিন) বৃক্ষের ফলফুল অর্থাৎ, কাফেরের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহর দরবারে ফলদায়ক নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইমানের বিশেষ প্রতিক্রিয়া : এরপর মুমিনের ইমান ও কলেমায়ে তাইয়েযবার একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে

يُحْيِي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِقَوْلِ الْكَافِرِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

—অর্থাৎ, মুমিনের কলেমায়ে-তাইয়েযবা মজবুত ও অনঢ় বৃক্ষের মত একটি প্রতিষ্ঠিত উক্তি। একে আল্লাহ তা'আলা চিরকাল কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন দুনিয়াতেও এবং পরকালেও। শর্ত এই যে, এ কলেমা আন্তরিকতার সাথে বলতে হবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর মর্ম পূর্ণরূপে বুঝতে হবে।

উদ্দেশ্য এই যে, এ কলেমায় বিশৃঙ্গী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শক্তি যোগানো হয়। ফলে সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ কলেমায় কায়েম থাকে, যদিও এর মোকাবেলায় অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। পরকালে এ কলেমাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে তাকে সাহায্য করা হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে, আয়াতে পরকাল বলে বরযখ অর্থাৎ, 'কবর জগৎ' বোঝানো হয়েছে।

কবরের শান্তি ও শান্তি কোরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত : রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : কবরে মুমিনকে প্রশ্ন করার ভয়ঙ্কর মুহূর্তও সে আল্লাহর সমর্থনের বলে এই কলেমার উপর কায়ম থাকবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্য দেবে। এরপর বলেন :

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ —এর উদ্দেশ্য তাই। এ হাদীসটি হয়রত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আরও প্রায় চল্লিশ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে-কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেছেন। শায়খ জালালুদ্দীন সুহুতী স্বীয় কাব্যপুস্তিকা التبيين عند التبيين এবং الصدر شرح এ সম্বন্ধে হাদীসের বরাত উল্লেখ করে সেগুলোকে মুতাওয়াতির বলেছেন। এসব সাহাবী সবাই আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের অর্থ কবর এবং আয়াতটিকে কবরের আযাব ও সওয়াব সম্পর্কিত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

মৃত্যু ও দাফনের পর কবরে পুনর্বাস জীবিত হয়ে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়া এবং এ পরীক্ষার সাফল্য ও অকৃতকার্যতার ভিত্তিতে সওয়াব অথবা আযাব হওয়ার বিষয়টি কোরআন পাকের প্রায় দশটি আয়াতে ইঙ্গিতে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্বন্ধে মুতাওয়াতির হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে। ফলে এ ব্যাপারে মুসলমানদের সন্দেহ করার অবকাশ নেই। তবে সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে সন্দেহ করা হয় যে, এই সওয়াব ও আযাব দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে এর বিস্তারিত উত্তর দানের অবকাশ নেই। সংক্ষেপে এতদুকু বোঝে নেয়া যথেষ্ট যে, কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়া সে বস্তুটির অনন্তিমূলীল হওয়ার প্রমাণ নয়। জ্বিন ও ফেরেশতারও দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তারা বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান যুগে রকেটের সাহায্যে যে মহাশূন্য জগৎ প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, ইতিপূর্বে তা কারও দৃষ্টিগোচর হত না; কিন্তু অস্তিত্ব ছিল। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বিপদে পতিত হয়ে ভিষণ কষ্টে অস্থির হতে থাকে; কিন্তু নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তি মোটেই তা টের পায় না।

যুক্তির কথা এই যে, এক জগতের অবস্থাকে অন্য জগতের অবস্থার সাথে তুলনা করা নিতান্তই ভুল। সৃষ্টিকর্তা যখন রসূলের মাধ্যমে পরজগতে পৌঁছার পর আযাব ও সওয়াবের সংবাদ দিয়েছেন, তখন এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকে তো প্রতিষ্ঠিত বাক্যের উপর কায়ম রাখেন, ফলে কবর থেকেই তাদের শান্তির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জায়েম অর্থাৎ, অস্বীকারকারী কাফের ও মুশরিকরা এ নেয়ামত পায় না। তারা মুনকার-নকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। ফলে এখান থেকেই তারা এক প্রকার আযাবে জড়িত হয়ে পড়ে।

وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ —অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা যা চান, তাই করেন। তাঁর ইচ্ছাকে রুখে দাঁড়ায়, এমন কোন শক্তি নেই। হয়রত উবাই ইবনে কাব আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হযায়ফা ইবনে এয়মান প্রমুখ সাহাবী বলেন : মুমিনের এরূপ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, তার যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা আল্লাহর ইচ্ছায়ই অর্জিত হয়েছে। এটা অর্জিত না হওয়া অসম্ভব ছিল। এমনভাবে যে বস্তু অর্জিত হয়নি, তা অর্জিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁরা আরও বলেন : যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস না রাখ, তবে তোমার আবাস হবে জাহান্নাম।

الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَا يَكُنْ لَهُمْ عِوَابٌ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ الْعَذَابُ
الْبَاطِلُ حَتَّىٰ يَصْلَوْهُمُ الرَّحْمَنُ

—অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে দেখেন না, যারা আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামতের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করেছে এবং তাদের অনুসারী জাতিকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে? তারা জাহান্নামে প্রচ্ছলিত হবে। জাহান্নাম অত্যন্ত মন্দ আবাস।

এখানে ‘আল্লাহর নেয়ামত’ বলে সাধারণভাবে অনুভূত, প্রত্যক্ষ ও মানুষের বাহ্যিক উপকার সম্পর্কিত নেয়ামত বোঝানো যেতে পারে; যেমন পানাহার ও পরিধানের দ্রব্য সামগ্রী, জমিজমা, বাসস্থান ইত্যাদি এবং মানুষের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিশেষ নেয়ামতসমূহও; যেমন, ঐশী গ্রন্থ এবং আল্লাহ তাআলার শক্তি ও রহস্যের নিদর্শনাবলী। এসব নিদর্শন স্বীয় অস্তিত্বের প্রতি গ্রহণিত, ভূমণ্ডল ও তার রহস্যমণ্ডিত জগতে মানবজাতির হেদায়েতের সামগ্রীকরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

এই উভয় প্রকার নেয়ামতের দাবী ছিল এই যে, মানুষ আল্লাহর মাহাত্ম্য ও শক্তিসামর্থ্য সত্যক উপলব্ধি করুক এবং তাঁর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করুক। কিন্তু কাফের ও মুশরিকরা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা ও নাক্ষরমানী করেছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা সমগ্র মানব সমাজকেই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং নিজেরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

আলোচ্য ৩০-৩৪ আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের নিন্দা এবং তাদের অন্তত পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে মুমিনদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের শোকর আদায় করার জন্যে কতিপয় বিধানের তাকিদ করা হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহর মহান নেয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সেগুলোকে আল্লাহর অবাধ্যতায় নিয়োজিত না করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা : نَدَّ শব্দটি —এর বহুবচন। এর অর্থ সমতুল্য, সমান। প্রতিমাসমূহকে اَنَادَ বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা স্বীয় কর্মে তাদেরকে আল্লাহর সমতুল্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল। نَمَسَ শব্দের অর্থ কোন বস্তু দ্বারা সাময়িকভাবে কয়েকদিন উপকৃত হওয়া। আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্ত মতবাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, তারা প্রতিমাসমূহকে আল্লাহর সমতুল্য ও তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আদেশ দেয়া হয়েছে : আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে থাক; তোমাদের শেষ পরিণতি জাহান্নামের আগ্নি।

দ্বিতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলা হয়েছে : “মক্কার কাফেররা তো আল্লাহর নেয়ামতকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করে নিয়েছে” আপনি আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে বলুন যে, তারা নামায কায়ম করুক এবং আমি যে রিযিক তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর পথে ব্যয় করুক। এ আয়াতে মুমিন বান্দাদের জন্যে বিরাট সুসংবাদ ও সন্মান রয়েছে। প্রথমে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজের বান্দা বলেছেন, এরপর ঈমান-গুণে গুণান্বিত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখ ও সন্মান দানের পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, তারা নামায কায়ম করুক। নামাযের সময়ে অলসতা এবং নামাযের সুই

নিয়মাবলীতে ক্রটি না করা চাই। এ ছাড়া আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু ঊর পথেও ব্যয় করুক। ব্যয় করার উভয় পদ্ধতিতেই বৈধ রাখা হয়েছে—গোপনে অথবা প্রকাশ্যে। কোন কোন আলেম বলেন : ফরয ফাকাত—কিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে হওয়া উচিত—যাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়, আর নফল সদকা—খয়রাত গোপনে দান করা উচিত—যাতে রিয়া ও নাম-হাশ অর্জনের মত মনোভঙ্গি সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে। ব্যাপারটি আসলে নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যদি প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে রিয়া ও নাম-হাশের নিয়ত থাকে, তবে দানের ফযীলত স্বতম হয়ে যায়—ফরয থেকে কিংবা নফল। পক্ষান্তরে যদি অপরকে উৎসাহিত করার নিয়ত থাকে, তবে ফরয ও নফল উভয়ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা বৈধ।

وَمَنْ قَبِلَ أَنْ يَأْتِيَ زَوْجَهُ مَعَهُ وَالْوَطَنَ خَلَّةً ۖ ۝ ১৬ ৷ এখানে خَلَّة শব্দটি خلة এর বহুবচন হতে পারে। এর অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য বন্ধুত্ব। একে مفاعله এর দ্বিত্ব বলা যায়; যেমন قاتل و دافع ইত্যাদি। এমতাবস্থায় এর অর্থ দু'ব্যক্তির পরস্পর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব করা। এ বাক্যটি উপরে বর্ণিত নামায ও সদকার নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

উদ্দেশ্য এই যে, আজ আল্লাহ তাআলা নামায পড়ার এবং গাফিলতিবশতঃ বিগত যমানার না পড়া নামাযের কাফা করার শক্তি ও অবসর দিয়ে রেখেছেন। এমনভাবে আজ টাকা-পয়সা ও অর্থ সম্পদ তোমার করায়ত্ত রয়েছে। একে আল্লাহর পথে ব্যয় করে চিরস্থায়ী জীবনের সমূল করে নিতে পার। কিন্তু এমন একদিন আসবে, যখন এ দু'টি শক্তি ও সামর্থ্য তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। তোমার দেহও নামায পড়ার যোগ্য থাকবে না এবং তোমার মালিকানাও কোন টাকা-পয়সা থাকবে না, যদ্বারা কারও পাওনা পরিশোধ করতে পার। সেদিন কোন কেনা-বেচাও হতে পারবে না যে, ভূমি স্বীয় ক্রটি ও গোনাহের কাফকারার জন্যে কোন কিছু কিনে নেবে। সেদিন পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং সম্পর্কও কোন কাজে আসবে না। কোন প্রিয়জন কারও পাপের বোঝা বহন করতে পারবে না এবং তার আযাব কোনরূপে হটাতে পারবে না।

‘ঐ দিন’ বলে বাহ্যতঃ হাশর ও কেয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। মৃত্যুর দিনও হতে পারে। কেননা, এসব প্রতিক্রিয়া মৃত্যুর সময় থেকেই প্রকাশ পায়। তখন কারও দেহে কাজ করার ক্ষমতা থাকে না এবং কারও মালিকানাও টাকা-পয়সাও থাকে না।

এ আয়াতে বলা হয়েছে : কিয়ামতের দিন কারও বন্ধুত্ব কারও কাজে আসবে না। এর উদ্দেশ্য এই যে, শুধু পার্থিব বন্ধুত্বই সেদিন কাজে আসবে না, কিন্তু যাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে এবং তাঁর দ্বীনের কাজের জন্যে হয়, তাদের বন্ধুত্ব তখনও উপকারে আসবে। সেদিন আল্লাহ তাআলার সং ও প্রিয় বান্দারা অপরের জন্যে সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন। বহু হাদীসে এ বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে।

কোরআন পাকে বলা হয়েছে : اَلَّذِينَ هُمْ يَرْجُونَ ۚ ۝ ১৭ ৷ —অর্থাৎ, দুনিয়াতে যারা পরস্পর বন্ধু ছিল, সেদিন পরস্পর শত্রু হয়ে যাবে; তারা বন্ধুর ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপিয়ে নিজেরা মুক্ত হয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু যারা আল্লাহ ভীরু, তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ ভীরুরা সেখানেও সুপারিশের মাধ্যমে একে অপরের সাহায্য করবেন।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ তাআলার অনেকগুলো নেয়ামত সূত্রণ করিয়ে মানুষকে এবাদত ও অনুগত্যের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : আল্লাহ তাআলার সন্তাই হল যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, যাদের ওপর মানুষের অস্তিত্বের সূচনা ও স্থায়িত্ব

নির্ভরশীল। এরপর তিনি আকাশ থেকে পানি অবতারণ করেছেন, যার সাহায্যে হরেক রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন। যাতে সেগুলো তোমাদের রিযিক হতে পারে। ثمرات শব্দটি ثمرة—এর বহুবচন। প্রত্যেক বস্তু থেকে অর্জিত ফলাফলকে ثمرة বলা হয়। তাই মানুষের খাদ্যজাতীয় বস্তু, পরিবেশ বস্তু এবং বসবাসের গৃহ—সবই ثمرات শব্দের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত رزق শব্দটিতে এসব প্রয়োজন শামিল রয়েছে।—(মাহহারী)

অতঃপর বলা হয়েছে : আল্লাহ তাআলাই নৌকা ও জাহাজসমূহকে তোমাদের কাছে নিয়োজিত করেছেন। এরা আল্লাহর নির্দেশে নদ-নদীতে চলাফেরা করে। আয়াতে ব্যবহৃত سفر শব্দের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা এসব জিনিসের ব্যবহার তোমাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। কাঠ, লোহা—লব্ধ, নৌকা তৈরীর হাতিয়ার এবং এগুলোর বিশুদ্ধ ব্যবহারের জ্ঞান—বুদ্ধি সবই আল্লাহ তাআলার দান। কাজেই এসব বস্তুর আবিষ্কারে গর্ব করা উচিত নয় যে, সে এগুলো আবিষ্কার অথবা নির্মাণ করেছে। কেননা, নৌকা ও জাহাজে যেসব বস্তু ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর কোনটিই সে সৃষ্টি করেনি এবং করতে পারে না। আল্লাহর সৃজিত কাঠ, লোহা, তামা ও পিতলের মধ্যে কৌশল প্রয়োগ করে এই আবিষ্কারের মুকুট সে নিজের মাথায় পরিধান করেছে। নতুবা বাস্তব সত্য এই যে, স্বয়ং তার অস্তিত্ব, হাত-পা, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিও তার নিজের তৈরী নয়।

এরপর বলা হয়েছে : আমি তোমাদের জন্যে সূর্য ও চন্দ্রকে অনুবর্তী করে দিয়েছি। এরা উভয়ে সর্বদা একই নিয়মে চলাচল করে। دَائِمِينَ শব্দটি داب থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অভ্যাস। অর্থ এই যে, সর্বদা ও সর্বাবস্থায় চলা এ দু'টি গ্রহের অভ্যাসে পরিণত করে দেয়া হয়েছে। এর খেলাফ হয় না। অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, তারা তোমাদের আদেশ ও ইঙ্গিতে চলবে। কেননা, সূর্য ও চন্দ্রকে মানুষের আভ্যাত্মিক চলা অর্থে ব্যক্তিগত নির্দেশের অনুবর্তী করে দিলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিত। কেউ বলত, আজ দু'ঘন্টা পর সূর্যোদয় হোক। কারণ, রাতের কাজ বেশী। কেউ বলত, দু'ঘন্টা আগে সূর্যোদয় হোক। কারণ, দিনের কাজ বেশী। তাই আল্লাহ তাআলা আসমান ও আকাশসমূহকে মানুষের অনুবর্তী করেছেন ঠিকই; কিন্তু এরূপ অর্থে করেছেন যে, এগুলো সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার অপার রহস্যের অধীনে মানুষের কাছে নিয়োজিত আছে। এরূপ অর্থে নয় যে, তাদের উদয়, অস্ত ও গতি মানুষের ইচ্ছা ও মজীর অধীন।

এমনিভাবে রাত দিনকে মানুষের অনুবর্তী করে দেয়ার অর্থও এরূপ যে, এগুলোকে মানুষের সেবা ও সুখ বিধানের কাছে নিয়োজিত করা হয়েছে।

وَاللَّهُ وَمَنْ عَلَى مَاسَاكِينِهِ ۚ ۝ ১৮ ৷ —অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ঐ সমুদয় বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ। আল্লাহর দান ও পুরস্কার কারও চাওয়ায় উপর নির্ভরশীল নয়। আমরা নিজের অস্তিত্বও তাঁর কাছে চাইনি। তিনি নিজ কৃপায় চাওয়া ব্যতীতই দিয়েছেন।

আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থনা কে করেছিল? এগুলো চাওয়া ছাড়াই আমাদের পালনকর্তা দান করেছেন। এ কারণেই কাফী বায়যাতী এ বাক্যের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে প্রত্যেক ঐ বস্তু দিয়েছেন, যা চাওয়ায় যোগ্য; যদিও তোমরা চাওনি। কিন্তু বাহ্যিক অর্থ নেয়া হলেও কোন অসুবিধা নেই।

কারণ, মানুষ সাধারণতঃ যা যা চায়, তার অধিকাংশ তাকে দিয়েই দেয়া হয়। যেখানে বাহ্যদৃষ্টিতে তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় না, সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জন্যে অথবা সারা বিশ্বের জন্যে কোন না কোন উপযোগিতা নিহিত থাকে যা সে জানে না। কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ জানেন যে, তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করা হলে স্বয়ং তার জন্যে অথবা তার পরিবারের জন্যে অথবা সমগ্র বিশ্বের জন্যে বিপদের কারণ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় প্রার্থনা পূর্ণ না করাই বড় নেয়ামত। কিন্তু জ্ঞানের ক্রটির কারণে মানুষ তা জানে না, তাই দূর্ভাগ্য হয়।

وَلَنْ تَجْعَلَ لِمَوْلَاكَ لُحْمًا — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার

নেয়ামত এত অধিক যে, সব মানুষ একত্রিত হয়ে সেগুলো গণনা করতে চাইলে গুণে শেষ করতে পারবে না। মানুষের নিজেই অস্তিত্বই স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, দেহের প্রতিটি গ্রহি এবং শিরা-উপশিরায় আল্লাহ তাআলার অন্তর্হীন নেয়ামত নিহিত রয়েছে। শত শত সূক্ষ্ম নাজুক ও অভিনব যন্ত্রপাতি সম্বিষ্ট এই ব্রাহ্ম্যমান কারখানাটি সর্বদা কাজে মশগুল রয়েছে। এরপর রয়েছে নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্ত, সমুদ্র ও পাহাড়ই অবস্থিত সৃষ্টবস্ত। আধুনিক গবেষণা ও তাতে আত্মজীবন নিয়োজিত হাজারো বিশেষজ্ঞও এগুলোর কূল-কিনারা করতে পারেনি। এছাড়া সাধারণভাবে ধনাত্মক আকারে যেগুলোকে নেয়ামত মনে করা হয়, নেয়ামত সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রত্যেক রোগ-শোক দুঃখ-কষ্ট আপদ-বিপদ থেকে নিরাপদ থাকার এক একটা স্বতন্ত্র নেয়ামত। একজন মানুষ কত প্রকার রোগে ও কত প্রকার মানসিক ও দৈহিক কষ্টে পতিত হতে পারে, তার গণনা কেউ করতে সক্ষম নয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ তাআলার সম্পূর্ণ দান ও নেয়ামতের গণনা করাও আমাদের দ্বারা সম্ভবপর নয়।

অসংখ্য নেয়ামতের বিনিময়ে অসংখ্য এবাদত ও অসংখ্য শোকের জরুরী হওয়াই ছিল ইনসাফের দাবী। কিন্তু আল্লাহ তাআলা দুর্বলমতি মানুষের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যখন সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নেয় যে, যথার্থ শোকের আদায় করার সাধ্য তার নেই, তখন আল্লাহ তাআলা এ স্বীকারোক্তিকেই শোকের আদায়ের স্থলাভিষিক্ত করে নেন। আল্লাহ তাআলা দাউদ (আঃ)-এর এ ধরনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই বলেছিলেন : **الان قد شكرت يا داود** অর্থাৎ, স্বীকারোক্তি করাই শোকের আদায়ের জন্যে যথেষ্ট।

আম্মাতের শেষে বলা হয়েছে : **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرُوا** অর্থাৎ, মানুষ খুবই জ্বালে এবং অত্যধিক অকৃতজ্ঞ। উদ্দেশ্য, কষ্ট ও বিপদে সবর করা, মুখ ও মনকে অভিযোগ থেকে পবিত্র রাখা, একজন রহস্যবিদের পক্ষ থেকে এসেছে বিশ্বাস বিপদকে নেয়ামতই মনে করা, পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তিতে সর্বাঙ্গিকরূপে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই ছিল ইনসাফের তাকিদ, কিন্তু সাধারণতঃ মানুষের অভ্যাস এ থেকে ভিন্ন। সামান্য কষ্ট ও বিপদ দেখা দিলেই তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং কাতরকণ্ঠে তা ব্যক্ত

করতে শুরু করে। পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তি লাভ করলে তাতে মত্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। একারণেই পূর্ববর্তী আয়াতে ষাটি মূমিনের গুণ **مَبْرُورِينَ** (অধিক সবরকারী, অধিক শোকরকারী) ব্যক্ত হয়েছে।

এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'টি দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দোয়া : **رَبِّ اجْعَلْ لِي الْبَكَاءَ دَائِمًا** — অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, এ (মক্কা) নগরীকে শান্তির আলয় করে দাও। সূরা বাক্বারায়ও এ দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ব্যতীত **لَا** বলা হয়েছে। এর অর্থ অনিদিষ্ট নগরী। কারণ এই যে, এ দোয়াটি যখন করা হয়েছিল, তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি। তাই ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় দোয়া করেছিলেন যে, এ জায়গাকে একটি শান্তির নগরীতে পরিণত করে দিন।

এরপর মক্কা যখন জনবসতি স্থাপিত হয়ে যায়, তখন এ আয়াতে বর্ণিত দোয়াটি করেন। এ ক্ষেত্রে মক্কাকে নির্দিষ্ট করে দোয়া করেন যে, একে শান্তির আবাসস্থল করে দিন। দ্বিতীয় দোয়া এই যে, আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

পয়গম্বরগণ নিশাপ। তাঁরা শিরক, মূর্তিপূজা এমনকি কোন গোনাহও করতে পারেন না। কিন্তু এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করতে গিয়ে নিজেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এর কারণ এই যে, স্বভাবজাত তীক্ষ্ণ প্রভাবে পয়গম্বরগণ সর্বদা শক্স অনুভব করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচানোর দোয়া করা। সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে নিজেও দোয়ায় शामिल করে নিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় বন্ধুর দোয়া কবুল করেছেন। ফলে তাঁর সন্তানরা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে নিরাপদ থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মক্কাবাসীরা তো সাধারণভাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এরই বংশধর। পরবর্তীতে তো তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা বিদ্যমান ছিল। বাহরে-মুহীত গ্রন্থে সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনান বরাত দিয়ে ইসমাইল (আঃ)-এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, ইসমাইল (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্যে কেউ প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজা করেননি, বরং যে সময় জুরহাম গোত্রের লোকেরা মক্কা অধিকার করে এর সন্তানদেরকে হরম থেকে বের করে দেয়, তখন তারা হরমে প্রতি অগাধ ভালবাসা ও সম্মানের কারণে এখানকার কিছু পাথর সাথ করে নিয়ে যায়। তারা এগুলোকে হরম ও বায়তুল্লাহর স্মারক হিসেবে সামনে রেখে এবাদত করত এবং এগুলোর প্রদক্ষিণ (তওযাফ) করত। এতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যের কোনরূপ ধারণা ছিল না, বরং বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায পড়া এবং বায়তুল্লাহর তওযাফ করা যেমন আল্লাহ তাআলারই এবাদত, তেমনি তারা এই পাথরের দিকে মুখ করা এবং এগুলো তওযাফ করাকে আল্লাহর এবাদতের পরিপন্থী মনে করত না। এরপর এ কর্মপন্থাই মূর্তিপূজার কারণ হয়ে যায়।

رَبِّ إِيْمَانٍ أَفْضَلُكَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَسَمِعْتَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَمُورٌ
 تَحِيْمٌ ۚ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ
 ذِي ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا
 الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ
 وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ رَبَّنَا
 إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ
 مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ اتَّخَذُوا إِلَهًا
 ذِي نُفُوسٍ غَيْرِ اللَّهِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ رَبَّنَا اسْكِنْنَا
 الْبَيْتَ الَّذِي بَنَيْنَا لَكَ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا
 غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝
 رَبَّنَا اجْعَلْ لِّي مَقِيلًا ۝ رَبَّنَا غْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
 وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝ وَلَا تَحْصِيَنَّ
 اللَّهُ عَاقِلَاتٍ يَخِفْنَ الْأَوَّلِيْنَ ۚ إِنَّهُ أَشَدُّ حَسْرَةً
 لِّيَوْمٍ يُنْفَخُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۚ مَهْطِعِينَ مَقَرِّ
 رُؤُوسِهِمْ لِكَيْلَ تَرَوُا إِلَهُكُمْ وَتَقُولُوا وَآفٍ بِهِمْ ۚ
 هُوَ اللَّهُ ۚ

(৩৬) হে পালনকর্তা, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৭) হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিহিত চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কায়েম রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুখী দান করুন, সম্ভবতঃ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (৩৮) হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি তো জানেন আমরা যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্য করি। আল্লাহর কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নয়। (৩৯) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে এই বার্ষিকো ইসমাইল ও ইসহাক দান করেছেন নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণ করেন। (৪০) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা, এবং কবুল করুন আমাদের দোয়া। (৪১) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে। (৪২) জালামেরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনও বেখবর মনে করা না তাদেরকে তো ঐ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হবে। (৪৩) তারা মন্তক উপরে তুলে ভীত-বিহবল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর উড়ে যাবে।

৩৬ আয়াতে এই দোয়ার কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মূর্তিপূজা থেকে আমাদের অব্যাহতি কামনার কারণ এই যে, এ মূর্তি অনেক মানুষকে পঞ্চব্রতীয় লিপ্ত করেছে। ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা ও জাতির অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলেছিলেন। মূর্তিপূজা তাদেরকে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে:

فَسَمِعْتَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَمُورٌ تَحِيْمٌ

—অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার অনুসারী হবে অর্থাৎ, ঈমান ও সংকর্ম সম্পাদনকারী হবে, সে তো আমারই। উদ্দেশ্য, তার প্রতি যে দয়া ও কৃপা করা হবে, তা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করে তার জন্যে আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এখানে অবাধ্যতার অর্থ যদি কর্মগত অবাধ্যতা অর্থাৎ, মন্দকর্ম নেয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ স্পষ্ট যে, আপনার কৃপায় তারও ক্ষমা আশা করা যায় এবং যদি অবাধ্যতার অর্থ কুফরী ও অস্বীকৃতি নেয়া হয়, তবে কাফের ও মুশরিকের ক্ষমা না হওয়া নিশ্চিত ছিল এবং ওদের জন্যে সুপারিশ না করার নির্দেশ ইবরাহীম (আঃ)—কে পূর্বেই দেয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাদের ক্ষমার আশা ব্যক্ত করা সঠিক হতে পারে না। তাই বাহুরে মুহীত গ্রহে বলা হয়েছে: এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) আদৌ দোয়া অথবা সুপারিশের ভাষা প্রয়োগ করেননি এবং একথা বলেননি যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তবে তিনি পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক পয়গম্বরের আন্তরিক বাসনা এটাই ছিল যে, কোন কাফেরও যেন আযাবে পতিত না হয়। “আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু”—একথা বলে তিনি এই স্বভাবসুলভ বাসনা প্রকাশ করে দিয়েছেন মাত্র। একথা বলেননি যে, এদের সাথে ক্ষমা ও দয়ার ব্যবহার করুন। হযরত ঈসা (আঃ)—ও স্বীয় উম্মতের কাফেরদের সম্পর্কে এরূপ বলেছিলেন:

وَلَنْ تَغْفِرَهُمْ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ — অর্থাৎ, আপনি যদি

ওদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান, সবই করতে পারেন। আপনার কাছে কেউ বাধাদানকারী নেই।

আল্লাহ তাআলার এ দু’জন মনোনীত পয়গম্বর কাফেরদের ব্যাপারে সুপারিশ করেননি। কারণ, এটা ছিল আদব ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী। কিন্তু একথাও বলেননি যে, কাফেরদের উপর আযাব নাযিল করুন। বরং আদবের সাথে বিশেষ ভঙ্গিতে তাদের হেদায়েত ও ক্ষমার স্বভাবজাত বাসনা প্রকাশ করেছেন মাত্র।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পান যে, দুগ্ধ-পোষ্য শিশু ও তার জননীকে শুষ্ক প্রান্তরে ছেড়ে আপনি শামে চলে যান, তখন তাঁর মনে এতটুকু বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আল্লাহ তাঁদেরকে বিনষ্ট করবেন না। তাঁদের জন্যে পানি অবশ্যই সরবরাহ করা হবে। তাই দোয়ায় غَيْرُ ذِي ذَرْعٍ (জলহীন প্রান্তরে) বলেননি: بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ

(চাষাবাদহীন) বলে আবেদন করেছেন যে, তাদেরকে ফলমূল দান করুন; যদিও তা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়। এ কারণেই মক্কা মুকাররমায় আজ পর্যন্ত চাষাবাদের তেমন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমূল এত অধিক পরিমাণে সেখানে পৌঁছে থাকে যে, অন্যান্য অনেক শহরেই

সেগুলো পাওয়া দুস্কর।—(বাহরে-মুহীত)

عَمَّا يَتَذَكَّرُكَ الْمُحَرَّمُ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, বায়তুল্লাহ শরীফের ভিত্তি হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী সূরা বাক্বারার তফসীরে বিভিন্ন রেওয়াজের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ) বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেন। তাঁকে যখন পৃথিবীতে নামানো হয়, তখন মু'জেযা হিসেবে সরস্বতী পাড়া থেকে এখানে পৌছানো হয় এবং জিবরাঈল বায়তুল্লাহর জায়গা চিহ্নিতও করে দেন। আদম (আঃ) স্বয়ং এবং তাঁর সন্তানরা এর চারদিক প্রদক্ষিণ করতেন। শেষ পর্যন্ত নূহের মহাপ্লাবনের সময় বায়তুল্লাহ উঠিয়ে নেয়া হয়; কিন্তু তার ভিত্তি সেখানেই থেকে যায়। হযরত ইবরাহীম (আঃ)—কে এই ভিত্তির উপরই বায়তুল্লাহ পুনর্নির্মাণের আদেশ দেয়া হয়। হযরত জিবরাঈল প্রাচীন ভিত্তি দেখিয়ে দেন। ইবরাহীম (আঃ) নির্মিত এই প্রাচীর মূর্ততা যুগে বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরাইশরা তা নতুনভাবে নির্মাণ করে। এ নির্মাণকাজে আবু তালেবের সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও নবুওয়তের পূর্বে অংশ গ্রহণ করেন।

এতে বায়তুল্লাহর বিশেষণ معمر উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সম্মানিতও হতে পারে এবং সুরক্ষিতও। বায়তুল্লাহ শরীফের মধ্যে উভয় বিশেষণই বিদ্যমান। এটি যেমন চিরকাল সম্মানিত, তেমনি চিরকাল শত্রুর কবল থেকে সুরক্ষিত।

لِقَائِيُمُ الصَّلَاةِ হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়ার প্রারম্ভে পূত্র ও তার জননীর অসহায়তা ও দুর্দশা উল্লেখ করার পর সর্বপ্রথম তাদেরকে নামায কয়েমকারী করার দোয়া করেন। কেননা, নামায দ্বারা ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় মঙ্গল সাধিত হয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, পিতা যদি সন্তানকে নামাযের অনুবর্তী করে দেয়, তবে এটিই সন্তানদের পক্ষে পিতার সর্ববৃহৎ সহনুভূতি ও হিতাকাঙ্ক্ষা হবে। ইবরাহীম (আঃ) যদিও সেখানে মাত্র একজন মহিলা ও ছেলেকে ছেড়েছিলেন; কিন্তু দোয়ায় বহুবচন ব্যবহার করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, ইবরাহীম (আঃ) জানতেন যে, এখানে শহর হবে এবং ছেলের বংশ বৃদ্ধি পাবে। তাই দোয়ায় সবাইকে শামিল রেখেছেন।

أَفْتَدَى مِنَ النَّاسِ শব্দটি افندة এর বহুবচন। এর অর্থ অন্তর। এখানে افندة শব্দটি نكرة এবং তার সাথে من অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে, যা تبعض ও تغليل এর অর্থে আসে। তাই অর্থ এই যে, কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন। অতফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : যদি এ দোয়ায় 'কিছু সংখ্যক' অর্থবোধক অব্যয় ব্যবহার করা না হত; افندة الناس বলা হত, তবে সারা বিশ্বের মুসলিম, অমুসলিম, ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মানুষ মক্কায় ভিড় করত, যা তাদের জন্যে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এ তথ্যের পরিলক্ষিত্তে ইবরাহীম (আঃ) দোয়ায় বলেছেন : কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন।

وَأَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ শব্দটি ثمرات এর বহুবচন। এর অর্থ ফল, যা স্বভাবতঃ খাওয়া হয়। এদিক দিয়ে দোয়ার সারমর্ম এই যে, তাদেরকে খাওয়ার জন্যে সর্বপ্রকার ফল দান করুন।

ثمرة শব্দটি কোন সময় ফলশ্রুতি ও উৎপাদনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা খাওয়ার ফলের চেয়ে অনেক ব্যাপক। প্রত্যেক উপকারী বস্তু

ফলাফলকে তার ثمره বলা যায়। মেশিন ও শিল্প কারখানার ثمره বলতে তার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীকে বোঝায়। চাকুরী ও মজুরীর ফলশ্রুতিতে যে পারিশ্রমিক ও বেতন পাওয়া যায়, তা চাকুরীর ثمره। কোরআন পাকের এক আয়াতে এ দোয়ায় ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ বলা হয়েছে। এতে شجر শব্দ ব্যবহার না করে شئ (বস্তু) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ইবরাহীম (আঃ) তাদের জন্যে শুধু খাওয়ার ফলের দোয়াই করেন নি; বরং প্রত্যেক বস্তুর অর্জিত ফলাফলেরও দোয়া করেছেন। সম্ভবতঃ এ দোয়ার প্রভাবেই মক্কা মুকাররমা কোন কৃষিপ্রধান, অথবা শিল্প প্রধান এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়, যা বোধ হয় জগতের অন্য কোন বৃহত্তম শহরেও পাওয়া যায় না।

لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, সন্তানদের জন্যে আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া এ কারণে করা হয়েছে, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়ে কৃতজ্ঞতার সওয়াবও অর্জন করে। এভাবে নামাযের অনুবর্তিতা দ্বারা দোয়া শুরু করে কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে শেষ করা হয়েছে। মাঝখানে আর্থিক সুখ-শান্তির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এতে শিক্ষা রয়েছে যে, মুসলমানের এরূপই হওয়া উচিত। তার ক্রিয়াকর্ম, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার উপর পরকালের কল্যাণ চিন্তা প্রবল থাকা দরকার এবং সংসারের কাছ ততটুকুই করা উচিত, যতটুকু নেহায়েত প্রয়োজন।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْتَنِي وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে দোয়া সমাপ্ত করা হয়েছে। কাকূতি-মিনতি ও বিলাপ প্রকাশার্থে رَبَّنَا শব্দটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আপনি আমার অন্তরগত অবস্থা ও বাহ্যিক আবেদন নিবেদন সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

‘অন্তরগত অবস্থা’ বলে ঐ দুঃখ, মনোবেদনা ও চিন্তা-ভাবনা বোঝানো হয়েছে, যা একজন দুঃপোষ্য শিশু ও তার জননীকে উদ্ভুক্ত প্রান্তরে নিঃসমূল, ফরিয়াদরত অবস্থায় ছেড়ে আসা এবং তাদের বিচ্ছেদের কারণে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিচ্ছিল। ‘বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন’ বলে ইবরাহীম (আঃ)—এর দোয়া এবং হাজেরার ঐসব বাক্য বোঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহর আদেশ শোনার পর তিনি বলেছিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ যখন নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তিনি আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনি আমাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। আয়াতের শেষে আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের বিস্তৃতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের বাহ্যিক ও অন্তরগত অবস্থাই কেন বলি, সমস্ত ভূমণ্ডল ও নেভাণ্ডলে কোন বস্তুই তাঁর অজ্ঞাত নয়।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي كُلَّ الْوَلَدِ وَأَسْتَغِيثُ بِهِ

—এ আয়াতের বিষয়বস্তুও পূর্ববর্তী দোয়ার

পরিশিষ্ট। কেননা, দোয়ার অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে দোয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা। ইবরাহীম (আঃ) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ তাআলার একটি নেয়ামতের শোকর আদায় করেছেন, নেয়ামতটি এই যে, যোর বার্ষিকের বয়সে আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করে তাঁকে সুসন্তান হযরত ইসমাইল ও ইসহাক (আঃ) দান করেছেন।

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَرَبْنَا آخِرًا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ يُحِبُّ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ الرَّسُولَ أَوْ لَمْ نَكُنْ مِنْ قَبْلُ مَالِكِينَ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْأَمْرَ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ وَكَوْنُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَخَافُونَ وُعْدَهُ ۚ رُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذُنُوبِهِمْ وَأَنْتُمْ مُبْذَلُونَ ۚ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۚ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۚ سَرَابِهُمُ مِّنْ طَيْرٍ ۚ وَتَعْنَىٰ وَجُوهَهُمُ النَّارُ ۚ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ هَذَا بَإِذْنِ اللَّهِ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ ۚ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرُوا الْأَوَّلَ الْأَوَّلَ ۚ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَنُ تِلْكَ الْكِتَابُ وَقُرْآنُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

এ প্রশংসা বর্ণনায় এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যক্ত শিশুটি আপনারই দান। আপনিই তার হেফযত করুন। অবশেষে — **إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ** — বলে প্রশংসা-বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী অর্থাৎ, কবুলকারী।

প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দোয়ায় মশগুল হয়ে যান : **رَبِّ اجْعَلْنِي وَمَنْ عَنِ الصَّلَاةِ وَرَبِّي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ** এতে নিজের জন্যে ও সন্তানদের জন্যে নামায কায়েম রাখার দোয়া করেন। অতঃপর কাকূতি-মিনতি সহকারে আবেদন করেন যে, হে আমার পালনকর্তা, আমার দোয়া কবুল করুন।

সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া করলেন : **رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ** অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা। আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন ঐদিন, যেদিন হাশরের ময়দানে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে।

এতে তিনি মাতা-পিতার জন্যেও মাগফেরাতের দোয়া করেছেন। অথচ পিতা অর্থাৎ আযর যে কাকের ছিল, তা কোরআন পাকেই উল্লিখিত রয়েছে। সম্ভবতঃ এ দোয়াটি তখন করেছেন, যখন ইবরাহীম (আঃ) —কে কাকেরদের জন্যে দোয়া করতে নিষেধ করা হয়নি। অন্য এক আয়াতেও অনুরূপ উল্লিখিত আছে :

وَأَغْوَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِذْ كَانَا مِنَ الصَّالِّينَ

وَلَا تَتَّبِعِ اللَّهُ عَافِيًا — অর্থাৎ, কোন অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহকে গাফেল মনে করো না। এখানে বাহ্যতঃ প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে সম্মোহন করা হয়েছে, যাকে তার গাফলতি এবং শয়তান এ ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। পক্ষান্তরে যদি রসুলুল্লাহ (সাঃ) —কে সম্মোহন করা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য উম্মতের গাফেলদেরকে শোনাণো এবং ছশিয়ার করা। কারণ, রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর পক্ষ থেকে এরূপ সম্ভাবনাই নেই যে, তিনি আল্লাহ তাআলাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর অথবা গাফেল মনে করতে পারেন।

لَيَوْمٍ تُنْخَضِرُ فِيهِ الْأَبْصَارُ — অর্থাৎ, সেদিন চক্ষুসমূহ বিক্ষারিত হয়ে থাকবে। **مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رُؤُوسِهِمْ** — অর্থাৎ ভয় ও বিস্ময়ের কারণে মস্তক উপরে তুলে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকবে। **لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ** অর্থাৎ, অপলক নেত্রে চেয়ে থাকবে **وَأَقْبَدَ لَهُمْ هَوَاءً** তাদের অন্তর শূন্য ও ব্যাকুল হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) —কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার জাতিতে ঐ দিনের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন জালাম ও অপরাধীরা অপারগ হয়ে বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে আরও কিছু সময় দিন। অর্থাৎ, দুনিয়াতে কয়েকদিনের জন্যে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারি এবং আপনার প্রেরিত পয়গম্বরগণের অনুসরণ করে এ আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জওয়াবে

(৪৪) মানুষকে ঐ দিনের ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের কাছে আযাব আসবে। তখন জালামরা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিন, যাতে আমরা আপনার আহবানে সাড়া দিতে এবং পয়গম্বরগণের অনুসরণ করতে পারি। তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেতে না যে, তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে যেতে হবে না? (৪৫) তোমরা তাদের বাসভূমিতেই বসবাস করতে, যারা নিজেরদের উপর জুলুম করেছে এবং তোমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল যে, আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছি এবং আমি তোমাদেরকে ওদের সব কাহিনীই বর্ণনা করেছি। (৪৬) তারা নিজেরদের মধ্যে ভীষণ চক্রান্ত করে নিয়েছে এবং আল্লাহর সামনে রক্ষিত আছে তাদের কু-চক্রান্ত। তাদের কুটকৌশল পাহাড় টলিয়ে দেয়ার মত হবে না (৪৭) অতএব আল্লাহর প্রতি ধারণা করো না যে, তিনি রসুলগণের সাথে কৃত গোয়ালা ভক্ত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৪৮) যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে পেশ হবে। (৪৯) তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। (৫০) তাদের জামা হবে দায আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলেবে। (৫১) যাতে আল্লাহ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান দেন। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৫২) এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই — একক, এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।

সূরা হিজর

মকায় অবতীর্ণ : আয়াত ৯৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আলিফ-লা-ম-রা ; এগুলো পরিপূর্ণ গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত।

বলা হবে এখন তোমরা একথা বলছ কেন? তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেয়ে বলনি যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের পতন হবে না এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনিভাবে বিলাস-ব্যসনে মগ্ন থাকবে? তোমরা পুনর্জীবন ও পরজগত অস্বীকার করেছিলে।

وَكُنْتُمْ فِي سَكْنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَبَيْنَ لَكُمْ كَيْفٌ

قُلْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكُنْتُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ كَاذِبِينَ

এতে বাহ্যতঃ আরবের মুশরিকদেরকে সম্মোহন করা হয়েছে, যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্যে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে আদেশ দেয়া হয়। এতে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের অবস্থা ও উত্থান-পতন তোমাদের জন্যে সর্বোত্তম উপদেশ। আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না। অথচ তোমরা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলেই বসবাস ও চলাফেরা কর। কিছু অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং কিছু সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে তোমরা একথাও জান যে, আল্লাহ তাআলা অব্যাহতার কারণে ওদেরকে কিরূপ কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। এছাড়া আমিও ওদেরকে সংগে আনার জন্যে অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু এর পরও তোমাদের চৈতন্যদায়ক হল না।

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ يُكْرَهُ

অর্থাৎ, তারা সত্যধর্মকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে এবং সত্যের দাওয়াত কবলকারী মুসলমানদের নিপীড়নের উদ্দেশ্যে সাধ্যমত কটুকৌশল করেছে। আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের সব গুপ্ত ও প্রকাশ্য কটুকৌশল বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এগুলোকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম। যদিও তাদের কটুকৌশল এমন মারাত্মক ও গুরুতর ছিল যে, এর মোকাবিলায় পাহাড়ও স্বস্থান থেকে অপসৃত হবে; কিন্তু আল্লাহর অপার শক্তির সামনে এসব কটুকৌশল তুচ্ছ ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আয়াতে বর্ণিত শত্রুতামূলক কটুকৌশলের অর্থ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কটুকৌশলও হতে পারে। উদাহরণতঃ নমরাদ, ফেরাউন, কওমে-আদ, কওমে-সামুদ ইত্যাদি। এটাও সম্ভব যে, এতে আরবের বর্তমান মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মোকাবেলায় অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত ও কটুকৌশল করেছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সব ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

অধিকাংশ তফসীরবিদ **وَلَنْ كَانَ مَكْرُهُمْ** বাক্যের **لَنْ** শব্দটি নেতিবাচক অব্যয় সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন যে, তারা যদিও অনেক কটুকৌশল ও চালবাজি করেছে, কিন্তু তাতে পাহাড়ের স্বস্থান থেকে হটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। 'পাহাড়' বলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সুদৃঢ় মনোবলকে বোঝানো হয়েছে। কাফেরদের কোন চালবাজি এ মনোবলকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেনি।

এরপর উম্মতকে শোনানোর জন্যে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে অথবা প্রত্যেক সম্মোহনযোগ্য ব্যক্তিকে হুশিয়ার করে বলা হয়েছে : **فَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ دَعْوَانَهُمْ وَمُؤَدَّاتِهِمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** অর্থাৎ, কেউ যেন এরূপ মনে না করে যে, আল্লাহ তাআলা রসুলগণের সাথে বিজয় ও সাফল্যের যে ওয়াদা করেছেন, তিনি তার খেলাফ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা

মহাপরাক্রান্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি পয়মগুরগণের শত্রুর কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং ওয়াদা পূর্ণ করবেন।

অতঃপর আবার কেয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

يَوْمَ تَكُنُ الْأَرْضُ عَيْرِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ سَوَاءً وَتَكُنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিনে বর্তমান পৃথিবী পাল্টে দেয়া হবে এবং আকাশও। সবাই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

পৃথিবী ও আকাশ পাল্টে দেয়ার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তাদের আকার ও আকৃতি পাল্টে দেয়া হবে; যেমন কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে আছে যে, সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেয়া হবে। এতে কোন গৃহের ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত গভীরতা কিছুই থাকবে না। এ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআনে বলা হয়েছে : **لَا تَرَى فِيهَا عِصْيَانًا** অর্থাৎ, গৃহ ও পাহাড়ের কারণে বর্তমানে রাস্তা ও সড়ক ঝাঁক ঘুরে ঘুরে চলেছে। কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও গভীরতা দেখা যায়। কেয়ামতের দিন এগুলো থাকবে না, বরং সব পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সম্পূর্ণতঃ এ পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পৃথিবী এবং এ আকাশের পরিবর্তে অন্য আকাশ সৃষ্টি করা হবে। এ সম্পর্কে বর্ণিত কিছু সংখ্যক হাদীস দ্বারা গুণগত পরিবর্তনের কথা এবং কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা সত্তাগত পরিবর্তনের কথাও জানা যায়।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, হাশরের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবী। তার রক্ত হবে রৌপ্যের মত সাদা। এর উপর কোন গোনাহুর বা অন্যায় খুনের দাগ থাকবে না। মুসনাদে-আহমদে ও তফসীর ইবনে জরীরে উল্লেখিত হাদীসে এই বিষয়বস্তুটিই হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে।—(মায়হারী)

বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত সহল ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন ময়দার রুটির মত পরিষ্কার ও সাদা পৃথিবীর বুকে মানবজাতিকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। এতে কোন বস্তুর চিহ্ন (গৃহ, উদ্যান, বৃক্ষ, পাহাড়, টিলা ইত্যাদি) থাকবে না। বায়হাকী এই আয়াতের তফসীরে এ তথ্যটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাকেম নির্ভরযোগ্য সনদসহ হযরত জাবরের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, চামড়ার কুঞ্জন দূর করার জন্য চামড়াকে যেভাবে টান দেয়া হয়, কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে সেভাবে টান দেয়া হবে। ফলে পৃথিবীর গর্ত, পাহাড় সব সমান হয়ে একটি সটান সমতল ভূমি হয়ে যাবে। তখন সব আদমসন্তান এই পৃথিবীতে জমায়েত হবে। ভীড় এত হবে যে, একজনের অংশে তার দাঁড়ানোর জায়গাটুকুই পড়বে। এরপর সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে। আমি পালনকর্তার সামনে সজ্জদায় নত হব। অতঃপর আমাকে সুপারিশের অনুমতি দান করা হবে। আমি সবার জন্য সুপারিশ করব যেন তাদের হিসাব কিতাব দ্রুত নিষ্পন্ন হয়।

শেষোক্ত রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, পৃথিবীর গুণ গুণগত পরিবর্তন হবে এবং গর্ত, পাহাড়, দালান-কোঠা, বৃক্ষ ইত্যাদি



(২) কোন সময় কাফেররা আকাশখা করবে যে, কি চমৎকার হত, যদি তারা মুসলমান হত। (৩) আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপ্ত থাকুক। অতি সত্তর তারা জেনে নেবে। (৪) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি; কিন্তু তার নির্দিষ্ট সময় লিখিত ছিল। (৫) কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্ট সময়ের আগে যায় না এবং পশ্চাতে থাকে না। (৬) তারা বলল : হে এই ব্যক্তি, যার প্রতি কোরআন নাখিল হয়েছে, আপনি তো একজন উন্মাদ। (৭) যদি আপনি সত্যবাদী হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন? (৮) আমি ফেরেশতাদেরকে একমাত্র ফয়সালায় জন্যেই নাখিল করি। তখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না। (৯) আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রহণ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। (১০) আমি আপনার পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি। (১১) ওদের কাছে এমন কোন রসূল আসেননি, যাদের সাথে ওরা ঠাট্টাবুদ্ধি করতে থাকেনি। (১২) এমনভাবে আমি এ ধরনের আচরণ পাপীদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেই। (১৩) ওরা এর প্রতি বিশ্বাস করবে না। পূর্ববর্তীদের এমন রীতি চলে আসছে। (১৪) যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনতর আরোহণও করতে থাকে (১৫) তবুও ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টির বিব্রাট ঘটনা হয়েছে না—বরং আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। (১৬) নিকট আমি আকাশে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্যে সুশোভিত করে দিয়েছি। (১৭) আমি আকাশকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি। (১৮) কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায়, তার পশ্চাদ্ধাবন করে উজ্জ্বল উজ্জ্বল।

থাকবে না, কিন্তু সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত রেওয়াজেও সমূহ থেকে জানা গিয়েছিল যে, হাশরের পৃথিবী বর্তমান স্থলে অন্য কোন পৃথিবী হবে। আয়াতে এই সত্তার পরিবর্তনই বোঝানো হয়েছে।

বয়ানুল-কোরআন গ্রন্থে মাওলানা আশরাফ আলী খান ডবী (রহঃ) বলেন : এতদুভয়ের মধ্যে কোনরূপ পরস্পরবিরোধিতা নাই। এটা সম্ভব যে, প্রথমে শিঙ্গা ফাঁকার পর পৃথিবীর শুষ্ক গুণগত পরিবর্তন হবে এবং হিসাব-কিতাবের জন্যে মানুষকে অন্য পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করা হবে।

তফসীর মাযহারীতে মুসনাদ আবদ ইবনে হুমায়দ থেকে হযরত ইকরিমার উক্তি বর্ণিত আছে, যদ্বারা উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থিত হয়। উক্তিটি এই : এ পৃথিবী কুঁচকে যাবে এবং এর পাশ্বে অন্য একটি পৃথিবীতে মানবমণ্ডলীকে হিসাব-কিতাবের জন্যে উপস্থিত করা হবে।

মুসলিম শরীফে হযরত সওবানের রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর নিকট এক ইহুদী এসে প্রশ্ন করল : যেদিন পৃথিবী পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন : পুলসিরাতের নিকটে একটি অঙ্ককারে থাকবে।

এ থেকেও জানা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী থেকে পুলসিরাতের মাধ্যমে মানুষকে অন্যদিকে স্থানান্তর করা হবে। ইবনে জারীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এ মর্মে একাধিক সাহাবী ও তাবয়ীর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তখন বর্তমান পৃথিবী ও তার নদ-নদী অগ্নিতে পরিণত হবে। বিশ্বের বর্তমান এলাকাটি যেন তখন জাহান্নামের এলাকা হয়ে যাবে। বাস্তব অবস্থা আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।

সূরা হিজর

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ذَرَهُمْ يَكُونُوا —থেকে জানা গেল যে, পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল

বৃত্তি সাব্যস্ত করে নেয়া এবং সাংসারিক বিলাস-ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহে মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফেরদের দুরাই হতে পারে, যারা পরকাল ও তার হিসাব-কিতাবে এবং পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করে না। মুমিনও পানাহার করে, জীবিকার প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ কাজ-কারবারের পরিকল্পনাও তৈরী করে; কিন্তু মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে এ কাজ করে না। তাই প্রত্যেক কাজে হালাল ও হারামের চিন্তা করে এবং অনর্থক পরিকল্পনা প্রণয়নকে বৃষ্টি হিসেবে গ্রহণ করে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : চারটি বিষয় দুর্ভাগ্যের লক্ষণ : চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত না হওয়া (অর্থাৎ গোনাহর কারণে অনুতাপ হয়ে তন্দ্রন না করা), কঠোর প্রাণ হওয়া দীর্ঘ আশা পোষণ করা এবং সংসারের প্রতি আসক্ত হওয়া।—(কুরতুবী)

দীর্ঘ আশা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত ও লাভে মগ্ন এবং মৃত্যু ও পরকাল থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনায় মগ্ন হওয়া।—(কুরতুবী) ধর্মীয় উদ্দেশ্যের জন্যে অথবা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্যে যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, এগুলোও পরকাল চিন্তারই একটি অংশ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : এ উম্মতের প্রথম স্তরের মুক্তি পূর্ণ ঈমান ও সংসার নির্লিপ্ততার কারণে হবে এবং সর্বশেষ স্তরের লোক কার্পণ্য ও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা পোষণের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

হযরত আব্দারদা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার দামেশকের জামে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন : হে দামেশকবাসীগণ! তোমরা কি একজন সহানুভূতিশীল, হিতাকাঙ্ক্ষী ভাইয়ের কথা শুনবে? শুনে নাও, তোমাদের পূর্বে অনেক বিশিষ্ট লোক অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা প্রচুর ধন-সম্পদ একত্রিত করেছিল, সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা তৈরী করেছিল, আজ তারা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের গৃহগুলোই তাদের কবর হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘ আশা ঠোকা ও প্রভাণায় পর্যবসিত হয়েছে। আদ জাতি তোমাদের নিকটেই ছিল। তারা ধন, জন, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বাদি দ্বারা দেশকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। আজ এমন কেউ আছে কি, যে তাদের উত্তরাধিকার আমার কাছ থেকে দু'দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্মত হবে?

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার জাল তৈরী করে, তার আমল অবশ্যই খারাপ হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

মামুনের দরবারের একটি ঘটনা : ইমাম কুরতুবী এ স্থলে মুত্তাসিল সনদ দ্বারা খলিফা মামুন রশীদের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মামুনের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিত ব্যক্তিগণের অংশ গ্রহণের অনুমতি ছিল। এমন এক আলোচনা সভায় জনৈক ইহুদী পণ্ডিত আগমন করল। আকার-আকৃতি, পোশাক ইত্যাদির দিকদিয়েও তাকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। তদুপরি তার আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অলংকারপূর্ণ এবং বিজ্ঞানসুলভ। সভা শেষে মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি ইহুদী? সে স্বীকার করল। মামুন পরীক্ষার্থ তাকে বললেন : তুমি যদি মুসলমান হয়ে যাও, তবে তোমার সাথে চমৎকার ব্যবহার করা হবে।

সে উত্তরে বলল : আমি পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। কথাবার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল। কিন্তু এক বছর পর সে মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করল এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফেকা সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা ও মুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থিত করল। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন : আপনি কি ঐ ব্যক্তি, যে বিগত বছর এসেছিল? সে বলল : হ্যাঁ, আমি ঐ ব্যক্তিই বটে। মামুন জিজ্ঞেস করলেন : তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃত ছিলেন। এরপর এখন মুসলমান হওয়ার কি কারণ ঘটল?

সে বলল : এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হস্তলেখাবিশারদ। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে উচ্চ দামে বিক্রয় করি। আমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করলাম। এগুলোতে অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে বেশকম করে লিখলাম। কপিগুলো নিয়ে আমি ইহুদীদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হলাম। ইহুদীরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কপিগুলো কিনে নিল। অতঃপর এমনভাবে ইঞ্জিলের তিন কপি কম-বেশ করে লিখে খ্রীষ্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানেও খ্রীষ্টানরা খুব খাতির যত্ন করে কপিগুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিল। এরপর কোরআনের বেলায়ও আমি তাই করলাম। এরও

তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে কম-বেশ করে দিলাম। এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থ বের হলাম, তখন যে-ই দেখল, সে-ই প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভুল কি না, যাচাই করে দেখল। অতঃপর বেশ-কম দেখে কপিগুলো ফেরত দিয়ে দিল।

এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, গ্রন্থটি স্বল্প সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ তাআলা নিজেই এর সংরক্ষণ করছেন। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। এ ঘটনার বর্ণনাকারী কাশী ইয়াহুয়া ইবনে আকতাম বলেন : ঘটনাক্রমে সে বছরই আমার হস্তে প্রাপ্ত পালন করার সৌভাগ্য হয়। সেখানে প্রখ্যাত আলেম সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার সাথে সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন : নিঃসন্দেহে এরূপ হওয়াই বিধেয়। কারণ, কোরআন পাকে এ সত্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। ইয়াহুয়া ইবনে আকতাম জিজ্ঞেস করলেন : কোরআনের কোন আয়াতে আছে? সুফিয়ান বললেন : কোরআন পাক যেখানে তওরাত ও ইঞ্জিলের আলোচনা করেছে, সেখানে বলেছে : **سُفِّهُوا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ**

ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে আল্লাহর গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জিলের হেফাযতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ কারণেই যখন ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা হেফাযতের কর্তব্য পালন করেনি, তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কোরআন পাক সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন : **وَإِلَّا لَكُلٌّ لِّلْخُفُوفُونَ**—অর্থাৎ, আমিই এর সংরক্ষক। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এর হেফাযত করার কারণে শত্রুরা হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও এর একটি নুজা এবং যের ও যবের পার্থক্য আনতে পারেনি। রেসালত আমলের পর আজ চৌদ্দশ' বছর অতীত হয়ে গেছে। ধর্মীয় ও ইসলামী ব্যাপারাদিতে মুসলমানদের ক্রটি ও অমনোযোগিতা সত্ত্বেও কোরআন পাক মুখস্থ করার ধারা বিশ্বের সর্বত্র পূর্ববৎ অব্যাহত রয়েছে। প্রতি যুগেই লাখে লাখে বরং কোটি কোটি মুসলমান যুবক বৃদ্ধ এবং বালক ও বালিকা এমন বিদ্যমান থাকে, যাদের বন্ধ-পাঞ্জরে আগাগোড়া কোরআন সংরক্ষিত রয়েছে। কোন বড় থেকে বড় আলেমের সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভুল পাঠ করে। তৎক্ষণাৎ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক লোক তার ভুল ধরে ফেলবে।

بروج শব্দটি **برج** এর বহুবচন। এটি বৃহৎ প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ, কাতাদাহ, আবু সালেহ প্রমুখ তফসীরবিদগণ এখানে **بروج** এর তফসীরে 'বৃহৎ নক্ষত্র' উল্লেখ করেছেন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশে বৃহৎ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি। এখানে 'আকাশ' বরং আকাশের শূন্য পরিমণ্ডলকে বোঝানো হয়েছে, যাকে সাম্প্রতিককালের পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়। আকাশগাত এবং আকাশের অনেক নীচে অবস্থিত শূন্য পরিমণ্ডল—এই উভয় অর্থে **سما** শব্দের প্রয়োগ সুবিধিত। কোরআন পাকে শেষোক্ত অর্থেও স্থানে স্থানে **سما** শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ যে আকাশের অভ্যন্তরে নহ; বরং শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত, এর চূড়ান্ত আলোচনা কোরআন পাকের আয়াতে আলোকে এবং প্রাচীন ও আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের আলোকে ইনশাআল্লাহ সূরা ফোরকানের আয়াত **تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا** এর তফসীরে করা হয়।

উলকাপিণ্ড : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমতঃ প্রমাণিত হয় যে, শয়তানরা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আদম সৃষ্টির সময় ইবলীসের আকাশে অবস্থান এবং আদম ও হাওয়ায়ে প্রলুব্ধ করা ইত্যাদি আদমের

পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বকার ঘটনা। তখন পর্যন্ত জ্বিন ও শয়তানদের আকাশে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল না। আদমের ও ইবলীসের বহিষ্কারের পর এই প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সূরা জ্বিনের আয়াতে বলা হয়েছে :

وَأَنَّا لَمُنْعِدُّوهُمْ مِمَّا مَقَاعِدُ لِلشَّيْطَانِ فَهُمْ يَنْسَوْنَ الَّذِينَ بَخَّسَهُمُ اللَّهُ

شَهَادَاتٍ

এ থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত শয়তানরা আকাশের সংবাদাদি ফেরেশতাদের পারস্পরিক কথাবার্তা থেকে শুনে নিত। এতদূরা এটা জরুরী হয় না যে, শয়তানরা আকাশে প্রবেশ করে সংবাদাদি শুনত।

এরা চোরের মত শূন্য পরিমণ্ডলে মেঘের আড়ালে বসে সংবাদ শুনে নিত। এ বাক্য থেকে আরও জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বেও জ্বিন ও শয়তানদের প্রবেশাধিকার আকাশে নিষিদ্ধই ছিল, কিন্তু শূন্য পর্যন্ত পৌছে তারা কিছু কিছু সংবাদ শুনে নিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর ওহীর হেফাযতের উদ্দেশে আরও অতিরিক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং উচ্চাপিণ্ডের মাধ্যমে শয়তানদেরকে এ চুরি থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আকাশের অভ্যন্তরে ফেরেশতাদের কথাবার্তা আকাশের বাইরে থেকে শয়তানরা কিভাবে শুনতে পারত? উত্তর এই যে, এটা অসম্ভব নয়। খুব সম্ভব আকাশগাত্র শব্দ শ্রবণের প্রতিবন্ধক নয়। এছাড়া এটাও হতে পারে যে, ফেরেশতাগণ কোন সময় আকাশ থেকে নীচে অবতরণ করে পরস্পর কথাবার্তা বলত এবং শয়তানরা তা শুনে পালাত। বুখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এক হাদীস থেকে এ কথারই সমর্থন পাওয়া যায় যে, মাঝে মাঝে ফেরেশতারা আকাশের নীচে মেঘমালার স্তর পর্যন্ত অবতরণ করত এবং আকাশের সাংবাদাদি পরস্পর আলোচনা করত। শয়তানরা শূন্যে আত্মগোপন করে এসব সংবাদ শুনত। পরে উচ্চাপাতের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। সূরা জ্বিনের ১৫-১৬-১৭ আয়াতের তফসীরে ইনশাআল্লাহ্-এর পূর্ণ বিবরণ আসবে।

কোরআন পাকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ওহীর হেফাযতের উদ্দেশে শয়তানদেরকে মারার জন্যে উচ্চাপিণ্ডের সৃষ্টি হয়। এর সাহায্যে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করে দেয়া হয়, যাতে তারা ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে না পারে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, শূন্য পরিমণ্ডলে উচ্চারণ অস্তিত্ব নতুন বিষয় নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বেও তারকা খসে পড়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যেত এবং পরেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় একথা

কেমন করে বলা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য হিসেবে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যেই উচ্চারণ সৃষ্টি? এতে যে প্রকান্তরে দার্শনিকদের ধারণাই সমর্থিত হয়। তারা বলেন : সূর্যের খরতাপে যেসব বাষ্প মাটি থেকে উথিত হয়, তন্মধ্যে কিছু আগ্নেয় পদার্থও বিদ্যমান থাকে। উপরে পৌছার পর এগুলোতে সূর্যের তাপ অথবা অন্য কোন কারণে অতিরিক্ত উত্তাপ পতিত হলে এগুলো প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে এবং দর্শকরা মনে করে যে, কোন তারকাই বুঝি খসে পড়েছে। এটা আসলে তারকা নয়—উচ্চা। সাধারণের পরিভাষায় একে ‘তারকা খসে যাওয়া’ বলেই ব্যক্ত করা হয়।

উত্তর এই যে, উভয় বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মাটি থেকে উথিত বাষ্প প্রজ্জ্বলিত হওয়া এবং কোন তারকা কিংবা গ্রহ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার পতিত হওয়া উভয়টিই সম্ভব। এমনটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ রীতি অনুযায়ী এরূপ ঘটনা পূর্ব থেকেই অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা বিশেষ কোন কাজ নেয়া হতো না। তাঁর আবির্ভাবের পর যেসব শয়তান চুরি-চামারি করে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে যায়, ওদেরকে বিতাড়িত করার কাজে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার ব্যবহার করা হয়।

আল্লামা আলুসী (রাঃ) তাঁর রাহুল মা’আনী গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, হাদীসবিদ যুহরীকে কেউ জিজ্ঞেস করল : রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বেও কি তারকা খসত? তিনি বললেন : হ্যাঁ। অতঃপর প্রশ্নকারী সূরা জ্বিনের উল্লেখিত আয়াতটি এ তথ্যের বিপক্ষে পেশ করলে তিনি বললেন : উচ্চা আগেও ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর যখন শয়তানদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হল, তখন থেকে উচ্চা ওদেরকে বিতাড়নের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আকাশে তারকা খসে পড়ল। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : জাহেলিয়াত যুগে অর্থাৎ, ইসলাম পূর্বকালে তোমরা তারকা খসে যাওয়াকে কি মনে করত? তাঁরা বললেন : আমরা মনে করতাম যে, বিশেষ কোন ধনের অখটন ঘটবে অথবা কোন মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কিংবা জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি বললেন : এটা অর্থহীন ধারণা। কারও জন্মমৃত্যুর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব জ্বলন্ত অঙ্গার শয়তানদেরকে বিতাড়নের জন্যে নিক্ষেপ করা হয়।

মোটকথা, উচ্চা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বক্তব্যও কোরআনের পরিপন্থী নয়। প্রকান্তরে এটাও অসম্ভব নয় যে, এসব জ্বলন্ত অঙ্গার সরাসরি কোন তারকা থেকে খসে নিক্ষেপ হয়। উভয় অবস্থাতে কোরআনের উদ্দেশ্য প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট।

الحجرات

২৭২

১৮

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا
 مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّزْرُوعٍ ۖ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَالِيشَ ۚ وَمَنْ
 لَّسْتُمْ لَهُ بِرُزُقِينَ ۚ وَكَانَ مِنْ شَيْءٍ الْإِنجِدَاخُ ۚ وَكَانَ
 نُزْلُ الْإِبْرَةِ رَمْلًا ۖ وَارْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَنُزِّلْنَا
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْتَبَقْتُمْ مَوَدَّةَ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَزَنِينَ ۚ وَ
 إِنَّا لَنَعْنُجِي وَنُحْيِي وَيُحْيِي وَيُخَيِّتُ ۚ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۚ وَلَقَدْ عَلِمْنَا
 الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۚ وَكَانَ
 رَبُّكَ هُوَ بِشَرِّهِمْ رَءِيفًا حَكِيمًا ۖ عَلِيمًا ۚ وَلَقَدْ خَلَقْنَا
 الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۚ وَالْحَمَاءُ
 خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّجُورِ ۚ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ
 لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۚ
 وَإِذْ أَسْوَيْتُهُ وَكَفَعْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعَا لَهُ سَيِّدِينَ ۚ
 فَسَبَّحُوا لِلَّهِ كَمَافُ أَجْمَعُونَ ۚ الْإِنشَاءُ إِلَى أَنْ يَكُونَ مَعَ
 السَّجْدِينَ ۚ قَالَ يَا لَيْلَيْسَ مَالِكُ الْأَكْثَرُونَ مَعَ السَّجْدِينَ ۚ قَالَ
 لَمْ أَكُنْ إِلَّا بَشَرًا خَلَقْتُهُ ۚ وَنَحْنُ صَلْصَالٌ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ۚ

(১৯) আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। (২০) আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করছি এবং তাদের জন্যও যাদের অন্তর্গত তোমরা নও। (২১) আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ভান্ডার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতারণ করি। (২২) আমি বৃষ্টিগত বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুতঃ তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই (২৩) আমিই জীবনদান করি, মৃত্যুদান করি এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (২৪) আমি জেনে রেখেছি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে এবং আমি জেনে রেখেছি পশ্চাদগামীদেরকে। (২৫) আপনার পালনকর্তাই তাদেরকে একত্রিত করে আনবেন। নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানময়। (২৬) আমি মানবকে পচা কর্ম থেকে তৈরী বিত্তক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (২৭) এবং জিনকে এর আগে ভূ-এর আগুনের দ্বারা সৃষ্টিত করেছি। (২৮) আর আপনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন : আমি পচা কর্ম থেকে তৈরী বিত্তক ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি একটি মানব জাতির পত্তন করব। (২৯) অতঃপর যখন তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রহ থেকে ফুঁক দেব, তখন তোমরা তার সামনে সেজদায় পড়ে যেয়ো। (৩০) তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সেজদা করল। (৩১) কিন্তু ইবলীস—সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হল না। (৩২) আল্লাহ বললেন : হে ইবলীস, তোমার কি হলো যে তুমি সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হলো না? (৩৩) বলল : আমি এমন নই যে, একজন মানবকে সেজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্ম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিত্তক মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّزْرُوعٍ —এর এক অর্থ অনুবাদে নেয়া হয়েছে, অর্থাৎ

রহস্যের তাকিদ অনুযায়ী প্রত্যেক উৎপন্ন বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করেছেন। এরকম নাহলে জীবন-ধারণ কঠিন হয়ে যেত এবং বেশী হলেও নানা অসুবিধা দেখা দিত। প্রয়োজনের তুলনায় গম, চাউল ইত্যাদি এবং উৎকৃষ্টতর ফল-মূল যদি এত বেশী উৎপন্ন হয়, যা মানুষ ও জন্তুদের খাওয়ার পরও অনেক উদ্ধৃত হয়, তবে পচা ছাড়া উপায় কি? এগুলো রাখাও কঠিন হবে এবং ফেলে দেয়ারও জায়গা থাকবে না।

এ থেকে জানা গেল যে, যেসব শস্য ও ফল-মূলের উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল সেগুলোকে এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করার শক্তিও আল্লাহ তাআলার ছিল যে, প্রত্যেকেই সর্বত্র সেগুলো বিনামূল্যে পেয়ে যেত এবং অবশ্যে ব্যবহার করার পরও বিরাট উদ্ভৃত ভাণ্ডার পড়ে থাকত। কিন্তু এটা মানুষের জন্যে একটা বিপদ হয়ে যেত। তাই একটি বিশেষ পরিমাণে এগুলো নাযিল করা হয়েছে, যাতে তার মান ও মূল্য বজায় থাকে এবং অনাবশ্যক উদ্ধৃত না হয়।

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّزْرُوعٍ —এর এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সব

উৎপন্ন বস্তুকে আল্লাহ তাআলা একটি বিশেষ সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মধ্যে উৎপন্ন করেছেন। ফলে তাতে সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল ও ফলকে বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন রঙ ও স্বাদ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার সমন্বয় ও সুন্দর দৃশ্য মানুষ উপভোগ করে বটে, কিন্তু এগুলোর বিস্তারিত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা তাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার।

وَمَا أَكْثَرُ لَهُ بَخْرَيْنِ ۚ وَارْسَلْنَا الرِّيحَ

এ বিভ্রান্তিভিত্তিক ব্যবহার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী ও হিংস্র জন্তুর জন্যে প্রয়োজনমাত্রিক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বত্র, সর্বাবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী পান, গোসল ধৌতকরণ এবং ক্ষেত ও উদ্যান সেচের জন্যে বিনামূল্যে পানি পেয়ে যায়। কূপ খনন ও পাইপ সংযোজনে কারও কিছু ব্যয় হলে তা সুবিধা অর্জনের মূল্য বৈ নয়। এক ফোঁটা পানির মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কারও নেই এবং কারও কাছে তা দাবীও করা হয় না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, খোদায়ী কুদরত কিতাবে সমুদ্রের পানিকে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পৌছানোর অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। তিনি সমুদ্রে বাষ্প সৃষ্টি করেছেন। বাষ্প বৃষ্টির উপকরণ (মৌসুমী বায়ু) সৃষ্টি হয়েছে এবং উপরে বায়ু প্রবাহিত করে একে পাহাড়সম মেঘমালায় পানিভর্তি জাহাজে পরণত করেছেন। অতঃপর এসব পানিভর্তি উড়ে জাহাজকে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে দরকার পৌছে দিয়েছেন। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সেখানে যতটুকু পানি দেয়ার আদেশ হয়েছে, এই স্বয়ংক্রিয় উড়ন্ত মেঘমালা সেখানে সে পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছে।

এভাবে সমুদ্রের পানি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাসকারী মানুষ ও জীব-জন্তু ঘরে বসেই পেয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় পানির স্বাদ ও আনন্দ্য গুণাগুণের মধ্যে অভিনব পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়। কেননা, সমুদ্রের পানিকে আল্লাহ তাআলা এমন লবণাক্ত করেছেন যে, তা থেকে হাজার

হাজার টন লবণ উৎপন্ন হয়। এর রহস্য এই যে, পৃথিবীর বিরাট জলভাগে কোটি কোটি প্রকার জীব-জন্তু বাস করে। এরা পানিতেই মরে এবং পানিতেই পচে, গলে। এছাড়া সমগ্র স্থলভাগের ময়লা ও আবর্জনাযুক্ত পানি অবশেষে সমুদ্রের পানিতেই গিয়ে মিশে। এমতাবস্থায় সমুদ্রের পানি মিঠা হলে তা একদিনেই পচে যেত এবং এর উৎকট দুর্গন্ধে স্থলভাগে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষাই দুষ্কর হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তাআলা এই পানিকে এমন এসিডযুক্ত লোনা করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের আবর্জনা এখানে পৌঁছে ভস্ম ও নিষ্চিহ্ন হয়ে যায়। মোটকথা, বর্ষিত রহস্যের ভিত্তিতে সমুদ্রের পানিকে লোনা বরং ক্ষারযুক্ত করা হয়েছে, যা পানও করা যায় না এবং পান করলেও পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। আল্লাহর ব্যবস্থাদীনে মেঘমালার আকারে পানির যেসব উড়ো জাহাজ তৈরী হয়, এগুলো শুধু সামুদ্রিক পানির ভান্ডারেই নয়, বরং মৌসুমী বায়ু উষ্মিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে বর্ষিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এগুলোতে বাহ্যিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই এমন বৈপ্রবিক পরিবর্তন আসে যে, লবণাক্ততা দূরীভূত হয়ে তা মিঠা পানিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সূরা মুরসালাতে এ দিকে ইঙ্গিত আছে। —وَأَسْقِئَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ— এখানে فرات শব্দের অর্থ এমন মিঠা পানি যন্ত্রাদি পিপাসা নিবৃত্ত হয়। অর্থ এই যে, আমি মেঘমালার প্রাকৃতিক যন্ত্রপাতি অতিক্রম করিয়ে সমুদ্রের লোনা ও ক্ষারযুক্ত পানিকে তোমাদের পান করার জন্যে মিঠা করে দিয়েছি।

وَلَقَدْ كَلَّمْنَا الْإِسْرَافِيَّ مِنْكُمْ وَكَلَّمْنَا عَالِيَةَ السَّابْغِيَّةِ — এখানে সাহাবী ও তাবয়ী তফসীরবিদদের পক্ষ থেকে مستفدين (অগ্রগামী দল) ও مستأخرين (পশ্চাদগামী দল)—এর তফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কাতাদাহ ও ইকরিমা বলেন : যারা এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি, তারা পশ্চাদগামী। হযরত ইবনে আব্বাস ও যাহ্যাক বলেন : যারা মরে গেছে, তারা অগ্রগামী এবং যারা জীবিত আছে, তারা পশ্চাদগামী। মুজাহিদ বলেন : পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা অগ্রগামী এবং উম্মতে মুহাম্মদী পশ্চাদগামী। হাসান কাতাদাহ বলেন : এবাদতকারী ও সংকমশীলরা অগ্রগামী গোনাহগররা পশ্চাদগামী। হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব, কুরতুবী, শা'বী প্রমুখ তফসীরবিদের মতে যারা নামাযের কাতারে অথবা জেহাদের সারিতে এবং অন্যান্য সংকাজে এগিয়ে থাকে, তারা অগ্রগামী এবং যারা এসব কাজে পেছনে থাকে এবং দেরী করে, তারা পশ্চাদগামী। বলাবাহুল্য, এসব উক্তির মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। সবগুলোর সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর। কেননা, আল্লাহ তাআলার সর্বব্যাপী জ্ঞান উল্লেখিত সর্বপ্রকার অগ্রগামী ও পশ্চাদগামীতে পরিব্যাপ্ত।

কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন : এ আয়াত থেকে নামাযের প্রথম কাতারে এবং আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যদি লোকেরা জানত যে, আযান দেয়া ও নামাযের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফযীলত কতটুকু, তবে সবাই প্রথম কাতারে দাঁড়াতে সচেষ্ট হত এবং প্রথম কাতারে সবার স্থান সংকুলান না হলে লটারীযোগে স্থান নির্ধারণ করতে হত।

কুরতুবী এতদসঙ্গে হযরত কা'বের উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, এ উম্মতের মধ্যে এমন মহাপুরুষও আছে, যারা সেজদায় গলে পেছনের সবার গোনাহ মাফ হয়ে যায়। এ জন্যেই হযরত কা'ব পেছনের কাতারে থাকা পছন্দ করতেন যে, সম্ভবতঃ প্রথম কাতারসমূহে আল্লাহর কোন এমন নেক বান্দা থাকতে পারে, যার বরকতে আমার মাগফেরাত হয়ে

যেতে পারে।

মানবদেহে আত্মা সঞ্চারিত করা এবং তাকে ক্ষেত্রশতাদের সেজদাযোগ্য করা সম্পর্কে সর্বক্ষিপ্ত আলোচনা : রূহ (আত্মা) কোন যৌগিক, না মৌলিক পদার্থ—এ সম্পর্কে পন্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মতভেদ চলে আসছে। শাযখ আবদুর রউফ মানাতী বলেন : এ সম্পর্কে দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তির সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে, কিন্তু এগুলোর সবই অনুমানভিত্তিক; কোনটিকেই নিশ্চিত বলা যায় না। ইমাম গাযালী, ইমাম রায়ী এবং অধিক সংখ্যক সুফী ও দার্শনিকদের উক্তি এই যে, রূহ কোন যৌগিক পদার্থ নয়, বরং একটি সূক্ষ্ম মৌলিক পদার্থ। রায়ী এ মতের পক্ষে বারটি প্রমাণ উপস্থিত করেছেন।

কিন্তু অধিকাংশ আলোমের মতে রূহ একটি সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট বস্তু۔ نَفْسُ শব্দের অর্থ ফুক দেয়া অথবা সঞ্চার করা। উপরোক্ত উক্তি অনুযায়ী রূহ যদি দেহবিশিষ্ট কোন বস্তু হয়ে থাকে, তবে সেটা ফুক দেয়ার অনুকূল। তাই যদি রূহকে সূক্ষ্ম পদার্থ মেনে নেয়া হয়, তবে ফুক আর অর্থ হবে দেহের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করা।—(বায়ুনল—কোরআন)

কাযী সানাউল্লা পানিপথী তফসীরে মাযহারীতে লিখেছেন : রূহ দুই প্রকার—স্বর্গজাত ও মর্ত্যজাত। স্বর্গজাত রূহ আল্লাহ তাআলার একটি একক সৃষ্টি। এর স্বরূপ দুর্জয়। অশুদ্ধটিসম্পন্ন মনীষীগণ এর আসল স্থান আরশের উপরে দেখতে পান। কেননা, এটা আরশের চাইতেও সূক্ষ্ম। স্বর্গজাত রূহ অশুদ্ধটিতে উপর-নীচে পাঁচটি স্তরে অনুভব করা হয়। পাঁচটি স্তর এই : কলব, রুহ, সির, বকী, আখফা—এগুলো আদেশ-জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এ আদেশ জগতের প্রতি কোরআনে قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মর্ত্যজাত রূহ হচ্ছে ঐ সূক্ষ্ম বাষ্প, যা মানবদেহের চার উপাদান অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু থেকে উৎপন্ন। এই মর্ত্যজাত রূহকেই নফস বলা হয়।

আল্লাহ তাআলা মর্ত্যজাত রূহকে যাকে নফস বলা হয় উপরোক্ত স্বর্গজাত রূহের আয়নায় পরিণত করে দিয়েছেন। আয়নাকে সূর্যের বিপরীতে রাখলে যেমন অনেক দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাতে সূর্যের ছবি প্রতিফলিত হয়, সূর্যকিরণে আয়নাও উজ্জ্বল হয় এবং তাতে সূর্যের উতাপও এসে যায়, যা কাপড়কে জ্বালিয়ে দিতে পারে, তেমনিভাবে স্বর্গজাত রূহের ছবি মর্ত্যজাত রূহের আয়নায় প্রতিফলিত হয়; যদিও তা মৌলিকত্বের কারণে অনেক উর্ধ্বে ও দূরত্বে অবস্থিত থাকে। প্রতিফলিত হয়ে স্বর্গজাত রূহের গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়া মর্ত্যজাত রূহের মধ্যে স্থানান্তরিত করে দেয়। নফসে সৃষ্ট এসব প্রতিক্রিয়াকেই আংশিক আত্মা বলা হয়।

মর্ত্যজাত রূহ তথা নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে প্রাপ্ত গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়াসহ সর্বপ্রথম মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এ সম্পর্কেরই নাম হায়াত ও জীবন। মর্ত্যজাত রূহের সম্পর্কের ফলে সর্বপ্রথম মানুষের হৃৎপিণ্ড জীবন ও ঐসব বোধশক্তি সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে লাভ করে। মর্ত্যজাত রূহ সমগ্র দেহে বিস্তৃত সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরায় সংক্রামিত হয়। এভাবে সে মানবদেহের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

মানবদেহের মর্ত্যজাত রূহের সংক্রামিত হওয়াটিকেই نَفْسُ رُوح তথা আত্মা ফুক বা আত্মা সঞ্চারিত করা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, এ সংক্রমণ কোন বস্তুতে ফুক ভরার সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল।

قَالَ فَأَخْرِجْهُمْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ إِلَيْكَ وَإِنَّ عَلَيْنَا
 الْفِتْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۖ قَالَ رَبِّ فَأُظْهِرْ لِي يَوْمَ
 يُبْعَثُونَ ۖ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۖ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ
 الْمَعْلُومِ ۖ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي
 الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عِبَادَكَ وَهُمْ
 الْمَخْلُوصِينَ ۖ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۖ إِنَّ
 عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ
 مِنَ الْغَوِينَ ۖ وَإِنْ جَهَنَّمُ لَمَوْعِدٌ لَهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ
 لَهُمْ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ۖ
 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ
 أَمِينٍ ۖ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى
 سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۖ لَا يُسْمِعُ فِيهَا النَّصَبُ ۖ وَمَا هُمْ بِمُتَحَرِّجِينَ
 بِمُحَرِّجِينَ ۖ يَتَّبِعُهُ عِبَادِي ۖ إِنَّ آتَانَ الْغُفُورَ الرَّحِيمَ ۖ وَإِنْ
 عَدَاؤُنَا لَهُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۖ وَيَذَرُهُمْ عَنْ صَيْغِرِ رُؤُوسِهِمْ
 إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهَا فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ

(৩৪) আল্লাহ বললেন : তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি
 বিতাড়িত। (৩৫) এবং তোমার প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পর্যন্ত
 অভিসম্পাত। (৩৬) সে বলল : হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে
 পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৩৭) আল্লাহ বললেন : তোমাকে
 অবকাশ দেয়া হল, (৩৮) সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন
 পর্যন্ত। (৩৯) সে বলল : হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে
 পথ ব্রত করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে
 আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথব্রত করে দেব। (৪০) আপনার
 মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। (৪১) আল্লাহ বললেন : এটা আমা পর্যন্ত
 সোজা পথ। (৪২) যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা
 নেই ; কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে। (৪৩)
 তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। (৪৪) এর সাতটি দরজা
 আছে। প্রত্যেক দরজার জন্যে এক-একটি পৃথক দল আছে। (৪৫) নিশ্চয়
 খোদাভীরুরা বাগান ও নিরীক্সীসমূহে থাকবে। (৪৬) বলা হবে :
 এগুলোতে নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে প্রবেশ কর। (৪৭) তাদের অন্তরে
 যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মত
 সামান্য-সামান্য আসনে বসবে। (৪৮) সেখানে তাদের মাটেই কষ্ট হবে না
 এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে না। (৪৯) আপনি আমার
 বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫০) এবং
 ইহাও যে, আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৫১) আপনি তাদেরকে
 ইবরাহীমের মেহমানদের অবস্থা শুনিয়ে দিন। (৫২) যখন তারা তাঁর গৃহে
 আগমন করল এবং বলল : সালাম। তিনি বললেন : আমরা তোমাদের
 ব্যাপারেভীত।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা রহকে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত
 করে **قَالَ رَبِّ فَأُظْهِرْ لِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ** বলেছেন, যাতে সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব
 ফুটে উঠে। কারণ মানবাত্মা উপকরণ ব্যতীত একমাত্র আল্লাহর আদেশেই
 সৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া তার মধ্যে আল্লাহর নূর গ্রহণ করার এমন যোগ্যতা
 রয়েছে, যা মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের আত্মার মধ্যে নেই।

মানব সৃষ্টির মধ্যে মৃত্তিকাই প্রধান উপকরণ। এ জন্যই কোরআন
 মানবসৃষ্টিকে মৃত্তিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে
 মানবসৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তন্মধ্যে পাঁচটি
 সৃষ্টিজগতের এবং পাঁচটি আদেশ জগতের। সৃষ্টিজগতের চার উপাদান
 আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং পঞ্চম হচ্ছে এ চার থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বায়ু
 যাকে মর্ত্যজাত রূহ বা নফস বলা হয়। আদেশজগতের পাঁচটি উপকরণ
 উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, কলব, রূহ, সির, খফী ও আখফা।

এ পরিব্যাপ্তির কারণে মানুষ খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত
 হয়েছে এবং মা'রফতের নূর, ইশক ও মহব্বতের জ্বালা বহনের যোগ্য
 পাত্র বিবেচিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার আকৃতিযুক্ত
 সঙ্গ লাভ। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : **الماء مع من أحب** অর্থাৎ, প্রত্যেক
 মানুষ তার সঙ্গলাভ করবে, যাকে সে মহব্বত করে।

খোদায়ী দ্যুতির গ্রহণ ক্ষমতা এবং খোদায়ী সঙ্গলাভের কারণেই
 খোদায়ী রহস্য দাবী করেছে যে, মানুষকে ফেরেশতাগণ সেজদা করুক।
 আল্লাহ বলেন : **فَقُولُوا لِمَنْ يُعْبُدُ** (তারা সবাই তার প্রতি সেজদা
 অবনত হলো)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ
 তাআলার মনোনীত বান্দাদের উপর শয়তানী কারসাস্কির প্রভাব পড়ে না।
 কিন্তু বর্ণিত আদমের কাহিনীতে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ও
 হাওয়্যার উপর শয়তানের চক্রান্ত সফল হয়েছে। এমনভাবে সাহাবায়ে
 কেরাম সম্পর্কে কোরআন বলে : **إِنَّمَا سَتَرْنَاهُمُ الشَّيْطَانُ يُفَوِّسُ**
مَا كُتِبَ (আলে-এমরান)। এ থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের
 উপরও শয়তানের ঝোঁক এ ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের উপর শয়তানের
 আধিপত্য বিস্তৃত না হওয়ার অর্থ এই যে, তাদের মন-মস্তিষ্ক ও
 জ্ঞান-বুদ্ধির উপর শয়তানের এমন আধিপত্য বিস্তৃত হয় না যে, তাঁরা নিজ
 শাস্তি কোন সময় বুঝতেই পারেন না। ফলে তওবা করার শক্তি হয় না
 কিংবা কোন ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ করে ফেলেন।

উল্লেখিত ঘটনাবলী এ তথ্যের পরিপন্থী নয়। কারণ, আদম ও হাওয়্য
 তওবা করেছিলেন এবং তা কবুলও হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামও তওবা
 করেছিলেন এবং শয়তানের চক্রান্তে যে গুনাহ করেছিলেন, তা মাফ করা
 হয়েছিল।

لَهُمْ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ — ইমাম আহমদ,

ইবনে জরীর তাবারী ও বায়হাকী হযরত আলীর রেওয়ায়েতে লিখেন যে,
 উপর নীচের স্তরের দিক দিয়ে জাহান্নামের দরজা সাতটি। কেউ কেউ

فَاَخَذَ اللَّهُ الصِّحَّةَ مُعْرِضِينَ ۝ وَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِهًا
 اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَارَّةً مِّنْ سِجِّيلٍ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
 لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ۝ وَآلِهَآلِ الْيَسِيْرِ يُعْبَدُوْنَ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
 لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَاِنْ كَانَ اَصْحَابُ الْاَيْكَةِ وَالْطَّالِبِيْنَ ۝ وَكُنْتُمْ
 مِّنْهُمْ ۝ وَآلِهَآلِ الْاِمَامَةِ مُبْدِيْنَ ۝ وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحَابُ الْحِجْرِ
 الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَاتَيْنَهُمُ الْاِيْتَانَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝
 وَكَانُوا يَرْجُوْنَ ۝ مِنَ الْجِبَالِ اِيْتَانًا مِّنْ دُونِهَا ۝
 فَلَمَّذَنَّهُمُ الصِّحَّةُ مُصِيبَةً ۝ فَمَا اخْلٰ عَنْهُمْ مَّا
 كَانُوْا يَسْتَبِقُوْنَ ۝ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا
 بَيْنَهُمَا اِلَّا رِبْعًا ۝ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۝ فَاصْبِرْ لِّلصَّغْرِ
 الْيُسْبُلِ ۝ اِنَّ رَّبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۝ وَلَقَدْ اَتَيْنَكَ
 سَبْعًا مِّنَ الْمَثَلِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ ۝ لَا تَمُدَّنَّ
 عَيْنِيْكَ اِلَى مَّا مَعْنَاهُ ۝ اَوْ جَاءَتْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ
 عَلَيْهِمْ ۝ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَقُلْ اِنِّيْ اَنَا
 النَّذِيْرُ الْبَيِّنُ ۝ كَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى الْمُقْسِيْنَ ۝

(৭৩) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচণ্ড একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল। (৭৪) অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর কঙ্করের প্রস্তর বর্ষণ করলাম। (৭৫) নিচয় এতে চিন্তাশীলদের জন্যে নির্দর্শনাবলী রয়েছে। (৭৬) জনপদটি সোজা পথে অবস্থিত রয়েছে। (৭৭) নিচয় এতে ইমানদারদের জন্যে নির্দর্শন আছে। (৭৮) নিচয় গহীন বনের অধিবাসীরা পাপী ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। উভয় বস্তি প্রকাশ্য রাস্তার উপর অবস্থিত। (৮০) নিচয় হিজরের বাসিন্দারা পরস্পরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। (৮১) আমি তাদেরকে নিজের নির্দর্শনাবলী দিয়েছি। অতঃপর তারা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৮২) তারা পাহাড়ে নিশ্চিন্তে ঘর খোদাই করত। (৮৩) অতঃপর এক প্রত্যুষে তাদের উপর একটা শব্দ এসে আঘাত করল। (৮৪) তখন কোন উপকারে আসল না যা তারা উপার্জন করেছিল। (৮৫) আমি নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা আছে তা তাৎপর্যহীন সৃষ্টি করিনি। কেয়ামত অবশ্যই আসবে। অতঃপর পরম ঐদারীনের সাথে ওদের ক্রিয়াকর্ম উপেক্ষা করুন। (৮৬) নিচয় আপনার পালনকর্তাই স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (৮৭) আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কোরআন দিয়েছি। (৮৮) আপনি চক্ষু তুলে ঐ বস্তুর প্রতি দেখবেন না, যা আমি তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্যে দিয়েছি, তাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না আর ইমানদারদের জন্যে স্বীয় বাহ নত করুন। (৮৯) আর বলুন : আমি প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শক। (৯০) যেমন আমি নাখিল করেছি যারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত তাদের উপর।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ وَآلِهَآلِ الْيَسِيْرِ يُعْبَدُوْنَ

সেসব জনপদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আরব থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এসব জনপদ অবস্থিত। এতদসঙ্গে আরও বলেছেন যে, এগুলোতে চক্ষুমান ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহ তাআলার অপার শক্তির বিরাট নির্দর্শনাবলী রয়েছে।

অন্য এক আয়াতে এসব জনপদ সম্পর্কে আরও বলেছেন যে, لَوْ شِئْنَا لَمِنْ بَعْدِهِمْ اَلْقَيْنَا — অর্থাৎ, এসব জনপদ আল্লাহর আখ্যে

ফলে জনশূন্য হওয়ার পর পুনর্বাস আবাদ হয়নি। তবে কয়েকটি জনপদ এর ব্যতিক্রম। এ বিবরণ সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা এসব জনপদ ও তাদের ঘর-বাড়ীকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে শিক্ষার উপকরণ করেছেন।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন এসব স্থান অতিক্রম করেছেন, তখন আল্লাহর ভয়ে তাঁর মস্তক নত হয়ে গেছে এবং তিনি সওয়ারীর উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে সেসব স্থান পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ কর্মের ফলে একটি সুন্নত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তা এই যে, যেসব স্থানে আল্লাহ তাআলার আযাব এসেছে, সেগুলোকে তামাশার ক্ষেত্রে পরিণত করা খুবই পামাণ হৃদয়ের কাজ। বরং এগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করার পন্থা এই যে, সেখানে পৌঁছে আল্লাহ তাআলার অপার শক্তির কথা গ্যান করতে হবে এবং অন্তরে তাঁর আযাবের তীতি সঞ্চার করতে হবে।

কোরআন পাকের বক্তব্য অনুযায়ী লূত (আঃ)—এর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ আজও আরব থেকে সিরিয়ামায়া রাস্তার পার্শ্বে জর্দানের এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যথেষ্ট নীচের দিকে একটি বিরাট মরুভূমির আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এর একটি বিরাট পরিধিতে বিশেষ এক প্রকার পানি নদীর আকার ধারণ করে আছে। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ, ইত্যাদি জন্তু জীবিত থাকতে পারে না। এ জন্যেই একে মৃত সাগর' ও 'লূত সাগর' নামে অভিহিত করা হয়। অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে, এতে পানির অংশ খুব কম এবং তেল জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তাই এতে কোন সামুদ্রিক জন্তু জীবিত থাকতে পারে না।

আজকাল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কিছুসংখ্যক আবাসিক দালান-কোঠা ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। পরকাল থেকে উদাসীন বস্তাবাদী মানুষ একে পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছে। তারা নিছক তামাশা হিসেবে এসব এলাকা দেখার জন্যে গমন করে। এহেন উদাসীনতার প্রতিকারার্থে কোরআন পাক অবশেষে বলেছে :

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মুমিনদের জন্যে শিক্ষাদায়ক। একমাত্র ইমানদাররাই এ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয় এবং অন্যরা এসব স্থানকে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে দেখে চলে যায়।

সূরা ফাতিহা সমগ্র কোরআনের মূল অংশ ও সারমর্ম : আলোচ্য আয়াতসমূহে সূরা ফাতেহাকে 'মহান কোরআন' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূরা ফাতিহা এক দিক দিয়ে সমগ্র কোরআন। কেননা, ইসলামের সব মূলনীতিই এতে ব্যক্ত হয়েছে।

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۖ قَوْمَ رَبِّكَ لَسْتَ لَهُمْ
 اٰجِبِينَ ۚ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ
 اَعْرَضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۚ اِنَّا كُنْزُكَ الْمُتَوَكِّلِينَ ۚ الَّذِيْنَ
 يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اٰخَرَتْمَوْفٍ يَعْلَمُوْنَ ۚ وَلَقَدْ عَلِمَ
 اَنَّكَ بِضَيْقِ صَدْرِكَ بِمَا يَقُولُوْنَ ۚ فَصَبِّرْ بِحَبْدِ رَبِّكَ وَكُنْ
 مِنَ السَّجِدِيْنَ ۚ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ ۝
 رَبُّكَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ
 بَيْنَهُمَا سَبْعًا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝
 اِنَّا اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا
 يُشْرِكُوْنَ ۝ يَزْلُكُ الْمَلٰٓئِكَةُ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ
 مِنْ عِبَادِهٖ اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ۚ اَلَا اِنَّكَ اَنْتَ الْوَحْدُ الْغَلِيْقُ
 السَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ يٰ اَحْمَدُ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ خَلَقَ
 الْاِنْسَانَ مِنْ تَطْفِئَةٍ ۚ وَاَذٰهُوَ حَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَالْاَنْعَامُ
 خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دَرَجٰتٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ۝
 وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ ۚ حِيْنَ تُرْجٰوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ۝

(১১) যারা কোরআনকে ঝড় ঝড় করেছে। (১২) অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিহাসাবাদ করব। (১৩) ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে। (১৪) অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিতে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না। (১৫) বিদ্রূপকারীদের জন্যে আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। (১৬) যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। অতএব অতিসত্ত্বর তারা জেনে নেবে। (১৭) আমি জানি যে আপনি তাদের কথাবার্তা হতোদ্যম হয়ে পড়েন। (১৮) অতএব আপনি পালনকর্তার সৌন্দর্য সূরশ করুন এবং সেক্সদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। (১৯) এবং পালনকর্তার এবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে।

সূরানাহল

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ১২৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

- (১) আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। অতএব এর জন্যে তাজাভূতা করো না। ওরা যেসব শরীক সাব্যস্ত করছে সেসব থেকে তিনি পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে।
- (২) তিনি স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা, নির্দেশসহ ফেরেশতাদেরকে এই মর্মে নাহিল করেন যে, হুশিয়ার করে দাও, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব আমাকে ভয় কর। (৩) যিনি যথাবিধি আকাশরাজি ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তারা যাকে শরীক করে তিনি তার বহু উর্ধ্বে। (৪) তিনি মানবকে এক ফোঁটা বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে গেছে। (৫) চতুষ্পদ জন্তুকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্যে নীত বস্ত্রের উপকরণ আছে, আর অনেক উপকার হয়েছে এবং কিছুসংখ্যকে তোমরা আহাৰ্য্যে পরিণত করে থাক। (৬) এদের দ্বারা তোমাদের সন্মান হয়, যখন বিকালে চারণভূমি থেকে নিয়ে আস এবং সকালে চারণভূমিতে নিয়ে যাব।

হাশ্বরে কি সম্পর্কে জিহাসাবাদ হবে : উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজের পবিত্র সত্তার কসম খেয়ে বলেছেন যে, সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোককে অবশ্যই জিহাসাবাদ করা হবে।

সাহাবায়ে কেরাম রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন যে, এই জিহাসাবাদ কি বিষয় সম্পর্কে হবে? তিনি বললেন : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর উক্তি সম্পর্কে। তক্ষসীর কুরতুবীতে এই রেওয়াজেত বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের মতে এর অর্থ অসীকারকে কার্যক্ষেত্রে পূর্ণ করা, যার শিরোনাম হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। শুধু মৌখিক উচ্চারণ উদ্দেশ্য নয়। কেননা, মৌখিক স্বীকারোক্তি তো মুনাফিকরাও করত। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : ঈমান কোন বিশেষ বেশভূষা ও আকার-আকৃতি ধারণ করা দ্বারা এবং ধর্ম শুধু কামনা দ্বারা গঠিত হয় না, বরং ঐ বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, যা অন্তরের অন্তঃস্থলে আসন লাভ করে এবং কর্ম তার সত্যায়ন করে : যেমন যায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণিত এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি আন্তরিকতা সহকারে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সাহাবায়ে-কেরাম জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রসুলুল্লাহ, এ বাক্যে আন্তরিকতার অর্থ কি? তিনি বললেন : যখন এ বাক্য মানুষকে আল্লাহর হারাম ও অবৈধ কর্ম থেকে বিরত রাখবে, তখন তা আন্তরিকতা সহকারে হবে।—(কুরতুবী)

এ— فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ : প্রচারকার্যে সাধ্যানুযায়ী ক্রমোন্নতি :

আয়াত নাহিল হওয়ার পূর্বে রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরাম গোপনে গোপনে এবাদত ও তেলাওয়াত করতেন এবং প্রচারকর্মও সংগোপনে একজন-দু'জনের মধ্যে চালু ছিল। কেননা, খোলাখুলি প্রচারকার্যে কাফেরদের পক্ষ থেকে উৎপীড়নের আশঙ্কা ছিল। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী ও উৎপীড়নকারী কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই তখন থেকে নিশ্চিন্তে প্রকাশ্যভাবে তেলাওয়াত, এবাদত ও প্রচারকার্য শুরু হয়।

اِنَّا كُنْزُكَ الْمُتَوَكِّلِينَ —বাক্যে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে,

তাদের নেতা ছিল পাঁচ ব্যক্তি : আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে এয়াগুস, ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং হারিস ইবনে তালাতিল। এই পাঁচ জনই অলৌকিকভাবে একই সময়ে হযরত জিব্রীলের হস্তক্ষেপে মৃত্যুবরণ করে। এই ঘটনা থেকে প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই নীতি জানা গেল যে, যে ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে সত্যকথা বললে কোন উপকার আশা করা যায় না, পরস্তু বক্তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেখানে গোপনে সত্য প্রচার করাও দূরন্ত ও বৈধ। তবে যখন প্রকাশ্যভাবে বলার শক্তি অর্জিত হয়, তখন প্রকাশ্যভাবেই বলা উচিত।

শত্রুর উৎপীড়নের কারণে মন ছোট হওয়ার প্রতিকার : اِنَّا كُنْزُكَ الْمُتَوَكِّلِينَ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি শত্রুর অন্যায় আচরণে মনে কষ্ট পায় এবং হতোদ্যম হয়ে পড়ে, তবে এর আত্মিক প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার তসবীহ ও এবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়া। আল্লাহ স্বয়ং তার কষ্ট দূর করে দেবেন।

সূরা নাহল

এ সূরা নাহলকে বিশেষ কোন ভূমিকা ছাড়াই কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী ও ভয়াবহ বিষয়বস্তু দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এর কারণ ছিল মুশরিকদের এই উক্তি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদেরকে কেয়ামত ও আযাবের ভয় দেখায় এবং বলে যে, আল্লাহ ত'আলা তাকে জয়ী করা এবং বিরোধীদেরকে শাস্তি দেয়ার ওয়াদা করেছেন। আমাদের তো এরূপ কিছু ঘটিবে বলে মনে হয় না। এর উত্তরে বলা হয়েছে : আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। তোমরা তাড়াছড়া করো না।

‘আল্লাহর নির্দেশ’ বলে এখানে এ ওয়াদা বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা রসূল (সাঃ)-এর সাথে করেছেন যে, তাঁর শত্রুদেরকে পরাভূত করা হবে এবং মুসলমানরা বিজয়, সাহায্য ও সম্মান-প্রতিপত্তি লাভ করবে। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ভীতিপ্রদ স্বরে বলেছেন যে, আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে; অর্থাৎ আসার পথেই রয়েছে, যা তোমরা অতি সম্ভব দেখে নেবে।

কেউ কেউ বলেন যে, এখানে ‘আল্লাহর নির্দেশ’ বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। এর এসে যাওয়ার অর্থও এই যে, আসা অতি নিকটবর্তী। সমগ্র জগতের বয়সের দিক দিয়ে দেখলে কেয়ামতের নিকটবর্তী হওয়া কিংবা এসে পৌছাও দূরবর্তী বিষয় নয়।— (বাহরে-মুহীত)

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে : আল্লাহ তাআলা শিরক থেকে পবিত্র। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যে আল্লাহর ওয়াদাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করছে, এটা কুফরী ও শিরক। আল্লাহ তাআলা এ থেকে পবিত্র। — (বাহরে-মুহীত)

একটি কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে তওহীদের দাওয়াত দেয়া এই আয়াতের সারমর্ম। দ্বিতীয় আয়াতে ইতিহাসগত দলীল দ্বারা তওহীদের প্রমাণিত হয়েছে যে, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে এবং বিভিন্ন সময়ে যে রসূলই আগমন করেছেন তিনি জনসমক্ষে তওহীদের বিশ্वासই পেশ করেছেন। অথচ বাহ্যিক উপায়াদির মাধ্যমে একজনের অবস্থা ও শিক্ষা অন্য জনের মোটেই জানা ছিল না। চিন্তা করুন, কমপক্ষে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মোটেই জানা ছিল না। চিন্তা করুন, কমপক্ষে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মহাপুরুষ, যারা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা সবাই যখন একই বিষয়ের প্রবক্তা, তখন স্বভাবতঃই করেছেন, তাঁরা সবাই যখন একই বিষয়টি ভ্রান্ত হতে পারে না। বিশ্वास মানুষ একথা বোঝতে বাধ্য হয় যে, বিষয়টি ভ্রান্ত হতে পারে না। বিশ্वास

স্থাপনের জন্যে এককভাবে এ যুক্তিটিই যথেষ্ট।

আয়াতে **وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ** শব্দ বলে হযরত ইবনে আব্বাসের মতে ওহী এবং অন্যান্য তফসীরবিদগণের মতে হেদায়েত বোঝান হয়েছে।—(বাহর) এ আয়াতে তওহীদের ইতিহাসগত প্রমাণ পেশ করার পর পরবর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের বিশ্वासকে যুক্তিগতভাবে আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন নেয়ামত বর্ণনা করে প্রমাণ করা হচ্ছে।

وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ — অর্থাৎ এই দুর্বল মানবকে যখন বল ও বাকশক্তি দান করা হল, তখন সে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কেই বিতর্ক উপস্থাপন করতে লাগল।

এরপর ঐসব বস্তু সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো মানুষের উপকারার্থেই বিশেষভাবে সৃষ্টিত হয়েছে। কোরআন সর্বপ্রথম আরববাসীকেই সম্বোধন করেছিল। আরবদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। তাই প্রথমে এসবের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে : **وَالْأَنْعَامَ خَلَقْنَا**

অতঃপর চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মানুষের যেসব উপকার হয়, তন্মধ্যে দু’টি উপকার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) **لِكُونِ لَّكُمْ فِيهَا مَرْءٌ وَنَاقَةٌ** — অর্থাৎ, এসব জন্তুর পশম দ্বারা মানুষ বস্ত্র এবং চামড়া দ্বারা পরিধেয় ও চুপী তৈরী করে শীতকালে উত্তাপ হাসিল করে।

(দুই) **وَمِنْ ثَمَرَاتِهَا حَبٌ وَنَخْلٌ وَنَخْلٌ** — অর্থাৎ, মানুষ এসব জন্তু যবেহ করে খোরাকও তৈরী করতে পারে। যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন দুধ দ্বারা উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে। অন্যান্য সাধারণ উপকার বোঝার জন্যে বলা হয়েছে : **وَمِنْ ثَمَرَاتِهَا حَبٌ وَنَخْلٌ وَنَخْلٌ**

— অর্থাৎ, জন্তুগুলোর মাংস, চামড়া অস্থি ও পশমের মধ্যে আরও অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। এ অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে ঐসব নবাবিস্কৃত বস্তুর প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে, যেগুলো জৈব উপাদান দ্বারা মানুষের খাদ্য, পোষাক, ঔষধ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত হবে।

পরিশেষে এসব জন্তুর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের ভারী জিনিসপত্রের দূর-দূরান্তের শহর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, যেখানে তোমাদের এবং তোমাদের জিনিসপত্রের পৌঁছা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভবপর নয়। উট ও গরু বিশেষভাবে মানুষের এ সেবা বিরাটাকারে সম্পন্ন করে থাকে। আজকাল রেলগাড়ী, ট্রাক ও উডোজাহাজের যুগেও মানুষের কাছে এরা উপেক্ষিত নয়। কারণ, এমনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে এসব নবাবিস্কৃত যানবাহন অকোজে হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে এসব জন্তুকে কাজে লাগায়।

(৭) এরা জোমাদের বোঝা এমন শহর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায়, যেখানে জোমরা প্রাপ্যভর্যের পরিশ্রম ব্যতীত পৌঁছতে পারতে না। নিচয় জোমাদের প্রচুর অভ্যস্ত দরদার পরম দয়ালু। (৮) জোমাদের আরোহণের জন্যে এক শোভার জন্যে তিনি ফোঁড়া, ঝড়র ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করেন, যা জোমরা জান না। (৯) সরল পথ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে এক পথজ্ঞানের স্বরূপ কিছু বক্র পথও রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে জোমাদের সবাইকে সংপথে পরিচালিত করতে পারতেন। (১০) তিনি জোমাদের জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে জোমরা পান কর এক এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে জোমরা পচাচর্য কর। (১১) এ পানি দ্বারা জোমাদের জন্যে উৎপাদন করেন কদল, বরতুন, বেঙ্গুর, আসুর ও সর্ষপকার ফল। নিচয় এতে চিত্তাঙ্গীনের জন্যে নির্দর্শ রয়েছে। (১২) তিনিই জোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এক চন্দ্রকে। তারকাসমূহ ঠারই কিরানের কর্ণে নিয়োজিত রয়েছে। নিচয়ই এতে বোধগতিসম্পন্নদের জন্যে নির্দর্শকালী রয়েছে। (১৩) জোমাদের জন্যে পৃথিবীতে বেসব রক্ত-বেরঙের বস্ত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন, যেগুলোতে নির্দর্শ রয়েছে তাদের জন্যে যারা চিত্তা-অন্ধরা কর। (১৪) তিনিই কাজে নাগিয়ে দিয়েছেন সূর্যকে, যাতে তা থেকে জোমরা ভাঙ্গা মাসে খেতে পার এক তা থেকে বের করতে পার পরিবেশ অলঙ্কার। তুমি তাতে জলবানসসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে এক যাতে জোমরা আল্লাহর কৃপা অনুবশ কর এবং যাতে তার অনুশ্রম স্বীকার কর।

ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছে এবং এদের উপকারিতাসমূহের মধ্যে মাংস ভক্ষণকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা সাব্যস্ত করেছে। এরপর পৃথকভাবে বলেছে : **وَالْحَيْلُ وَالْإِنْفَالُ وَالْحَيَرُ** এসব উপকারিতাসমূহের মধ্যে সওয়ার হওয়া এবং এসবের দ্বারা শোভা অর্জনের কথা তো উল্লেখ হয়েছে; কিন্তু গোশত ভক্ষণের কথা বলা হয়নি। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঘোড়া, খচর ও গাধার গোশত হালাল নয়। খচর ও গাধার গোশত যে হারাম, এ বিষয়ে জমহুর ফিকাহবিদগণ একমত। একটি স্বতন্ত্র হাদীসে এগুলোর অবৈধতা পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপারে দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণিত আছে। একটি দ্বারা হালাল ও অপরটি দ্বারা হারাম হওয়া বোঝা যায়। এ কারণেই এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগণের উক্তি বিভিন্মরূপ হয়ে গেছে। কারও মতে হালাল এবং কারও মতে হারাম। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এই পরস্পরবিরোধী প্রমাণের কারণে ঘোড়ার গোশতকে গাধা ও খচরের মাংসের অনুরূপ হারাম বলেননি; কিন্তু মাকরুহ বলেছেন।—(আহকামুল-কোরআন-জাসসাস)

মাসআলা : এ আয়াত থেকে সৌন্দর্য ও শোভার বৈধতা জানা যায় যদিও গর্ব ও অহঙ্কার করা হারাম। পার্থক্য এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যের সারমর্ম হচ্ছে মনের সুখী অথবা আল্লাহর নেয়ামত প্রকাশ করা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে নেয়ামতের যোগ্য হকদার মনে করে না এবং অপরকেও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে না; বরং তার দৃষ্টিতে এ কথাই থাকে যে, এটা আল্লাহর নেয়ামত। পক্ষান্তরে গর্ব ও অহঙ্কারের মধ্যে নিজেকে নেয়ামতের যোগ্য হকদার গণ্য করা হয় এবং অপরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা—এটা হারাম।—(বয়ানুল-কোরআন)

وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ نَارٌ শব্দটি প্রায়ই বৃক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোন কোন সময় এমন প্রত্যেক বস্তুকেও **شجر** বলা হয় যা ভূ-পৃষ্ঠে উৎপন্ন হয়। ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। আলোচ্য আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। কেননা, এর পরেই জন্তুদের চরার কথা বলা হয়েছে। ঘাসের সাথেই এর বেশীর ভাগ সম্পর্ক **شجر** শব্দটি **اسامة** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জন্তুকে চারণক্ষেত্রে চরার জন্যে ছেড়ে দেয়া।

إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ — এসব আয়াতে আল্লাহ তাআলার নেয়ামত এবং অভিনব রহস্য সহকারে জগত সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তারা এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পায়, যার ফলে আল্লাহ তাআলার তওহীদে যেন মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠে। এ কারণেই নেয়ামতগুলো উল্লেখ করে বার বার এ বিষয়ের প্রতি হুশিয়ার করা হয়েছে। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, এতে চিন্তাশীলদের জন্যে প্রমাণ রয়েছে। কেননা, ফসল ও বৃক্ষ এবং এ সবের ফল ও ফুলের যে সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার কারিগরি ও রহস্যের সাথে রয়েছে তা কিছুটা চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে বৈ কি। মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, শস্য কীভাবে আঁটি মাটির নিচে ফেলে রাখলে এবং পানি দিলে আপনা-আপনি বিরাট মইরাকে পরিণতি হতে পারে না এবং তা থেকে রঙ-বেগুনের ফুল উৎপন্ন হতে পারে না। যা হয়, তাতে কোন কৃষক ভূমায়ী কর্মের দখল নেই। বরং সবই সর্বশক্তিমানের কারিগরি ও রহস্য। এরপর বলা হয়েছে যে, দিব্যরাত্রি ও তারকারাজি আল্লাহ তাআলার

নির্দেশের অনুপাত হয়ে চলে। শেষে বলা হয়েছে :

إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ — অর্থাৎ, এগুলোর মধ্যে

বুদ্ধিমানদের জন্যে বহু প্রমাণ রয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন বস্তু যে আল্লাহ তাআলার নির্দেশের অনুবর্তী, তা বোঝাতে তেমন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। যার সামান্যতম বুদ্ধি আছে, সে বোঝে নিতে পারবে। কেননা, উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপাদনের মধ্যে তা কিছু না কিছু মানবীয় কর্মের দখল ছিল, এখানে তাও নেই।

এরপর মাটির অন্যান্য উৎপন্ন কসলের কথা উল্লেখ করে অবশেষে বলা হয়েছে :

إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذْكُرُونَ অর্থাৎ, এতে তাদের জন্যে প্রমাণ রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ক্ষেত্রেও গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। কেননা, এটা সম্পূর্ণ জাহাঙ্কল্যমান সত্য। কিন্তু মনোযোগ সহকারে এদিকে দেখা এবং উপদেশ গ্রহণ করা শর্ত। নতুবা কোন নির্বোধ ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তি যদি এদিকে লক্ষ্যই না করে, তবে তার কি উপকার হতে পারে ?

وَسُحُورُ لَيْلٍ وَالنَّهَارِ রাত্রি ও দিবসকে অনুবর্তী করার অর্থ এই যে, এগুলোকে মানুষের কাছে নিয়োজিত করার জন্যে স্বীয় কুদরতের অনুবর্তী করে দিয়েছেন। রাত্রি মানুষকে আরামের সুখোপ-সুবিধা সরবরাহ করে এবং দিবস তার কাজকর্মের পথ প্রশস্ত করে। এগুলোকে অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, রাত্রি ও দিবস মানুষের নির্দেশ মেনে চলেবে।

وَمُؤَاكِلِ ذِي سَعَرٍ الْبَحْرَيْنِ لَمَّا كَانَا নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং এগুলোতে মানুষের উপকার বর্ণনা করার পর এখন সমুদ্রপথে মানুষের উপকারের জন্য কি কি নিহিত রয়েছে, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে। সমুদ্রে মানুষের খাদ্যের চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে মানুষ টাটকা গোশত লাভ করে।

لَمَّا كَانَا — এ বাক্যে মাছকে টাটকা গোশত বলে আখ্যায়িত করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মাছকে যবেহ করা শর্ত নয়। এ যেন আপনা-আপনি তৈরী গোশত।

وَكَيْفَ تَصِفُ أَوْفَاءَ حُلِيِّهِ تَلْبَسُوهَا — এটা সমুদ্রের দ্বিতীয় উপকার। ভূবরীরা সমুদ্র থেকে মূল্যবান অলঙ্কার সামগ্রী বের করে আনে। **حلية** এর শাব্দিক অর্থ শোভা, সৌন্দর্য। এখানে এসব রত্নরাজি ও মণিমুক্ত বোঝানো হয়েছে, যা সমুদ্রগর্ভ থেকে নির্গত হয় এবং মহিলারা এর দ্বারা অলঙ্কার তৈরী করে বিভিন্ন পন্থায় ব্যবহার করে। এ অলঙ্কার মহিলারা পরিধান করে থাকে; কিন্তু কোরআন পুন্নিজ শব্দ ব্যবহার করে **تَلْبَسُوهَا** বলেছে।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মহিলাদের অলঙ্কার পরিধান করা প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের দেখার স্বার্থে। মহিলার সাজ-সজ্জা করটা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের অধিকার। সে শত্রীকে সাজ-সজ্জার পোশাক ও অলঙ্কার পরিধান করতে বাধ্যও করতে পারে। এছাড়া পুরুষরাও আঁটি ইত্যাদিতে মণিমুক্ত ব্যবহার করতে পারে।

وَتَرَى الْفُلَ مَآخِزَ فِهٖ وَلَبِئْسَ مَا تَرْضَاؤُنَ فَضْلًا এটা সমুদ্রের তৃতীয় উপকার। **مَآخِزَ** শব্দের অর্থ নৌকা। **مَآخِرَ** শব্দটি **مَآخِرَ** এর বহুবচন। **فلك**

وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رَوَايَ أَنْ تَحِيدَ يَوْمَ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَعَلَيْتُمْ وَالْغُلَامَ يَهْتَدُونَ ۝ أَكُنْ
يَخْلُقُ كُنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝ وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
لَا تَحْضُوا أَلْفَافَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُُونَ وَ
مَا تُعْلِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ أَمْ أَتَى غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ
أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝ إِنْ هُمْ إِلَّا وَاحِدٌ فَرَأَيْتُمْ أَفْعَالَهُمْ
يَا الْأَعْرَافَ فَلَوْ بِهِمْ مَبْذُورَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ لَكِرَمَ أَنْ
اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْرُُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَغَيْبُ السُّتُورِ ۝
وَلَا أُفِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا آسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ۝ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ أَوْرَاقَهُمْ كَامِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَمِنْ أَوْرَاقِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلِيسَ مَا
يُزَيَّرُونَ ۝ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَى
اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ
فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝

(১৫) এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও। (১৬) এবং তিনি পথনির্দেশক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, এবং তারকা দ্বারাও মানুষ পথের নির্দেশ পায়। (১৭) যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি সে লোকের সমতুল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি চিন্তা করবে না? (১৮) যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর, শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৯) আল্লাহ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। (২০) এবং যারা আল্লাহকে ছেড়ে অনদের ডাকে, ওরা তো কোন বস্তুই সৃষ্টি করে না, বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্টি। (২১) তারা মৃত-প্রাণহীন এবং কবে পুনরুজ্জীবিত হবে, জানে না। (২২) আমাদের ইলাহ একক ইলাহ। অনন্তর যারা পরজীবনে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকার প্রদর্শন করে। (২৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় বিষয়ে অবগত। নিশ্চিতই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না। (২৪) যখন তাদেরকে বলা হয় : তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেন? তারা বলে : পূর্ববর্তীদের কিসসা-কাহিনী। (২৫) ফলে কেয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতাতেই বিপণ্যগামী করে। ওনে নাও, খুবই নিকট বোঝা যা তারা বহন করে। (২৬) নিশ্চয় চক্রান্ত করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা, অতঃপর আল্লাহ তাদের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। এরপর উপর থেকে তাদের মাথায় ছাদ ধসে পড়ে গেছে এবং তাদের উপর আযাব এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণাও ছিল না।

এর অর্থ পানি ভেদ করা। অর্থাৎ, এসব নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ, যেগুলো পানির ডেউ ভেদ করে পথ অতিক্রম করে।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা সমুদ্রকে দূর-দূরান্তের দেশে সফর করার রাস্তা করেছেন এবং দূর-দূরান্তে সফর করা ও পণ্যপ্রবাহ আমদানী-রপতানী করা সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপার্জনের একটি উত্তম উপায় সাব্যস্ত করেছে। কেননা, সমুদ্রপথের ব্যবসা-বাণিজ্য করা সর্বাধিক লাভজনক।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

راسية رواسى - وَالَّذِي فِي الْأَرْضِ رَوَايَ أَنْ تَحِيدَ يَوْمَ

এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী পাহাড়। تَمِيد শব্দটি মিদ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আন্দোলিত হওয়া এবং অস্থিরভাবে টলমল করা।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা অনেক রহস্যের অধীনে ভূ-মণ্ডলকে নিবিড় ও ভারসাম্যবিহীন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেননি। তাই এটা কোন দিক দিয়ে ভারী এবং কোন দিক দিয়ে হালকা হয়েছে। অন্যথায় এর অবশ্যস্বাভাবী পরিণতি ছিল, ভূ-পৃষ্ঠের অস্থিরভাবে আন্দোলিত হওয়া। সাধারণ বিজ্ঞানীদের ন্যায় পৃথিবীকে স্থিতিশীল স্বীকার করা হোক কিংবা কিছুসংখ্যক প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীর মত একে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান মনে করা হোক—উভয় অবস্থাতেই এটা জরুরী ছিল। এই অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা এবং পৃথিবীর উৎপাদনকে ভারসাম্য পূর্ণ করার জন্যে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে পাহাড়ের ওজন স্থাপন করেন—যাতে পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। এখন পৃথিবী অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মত চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান কি না, এ সম্পর্কে কোরআন পাকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন কিছুই নেই। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে ফিসাগোর্সের অভিমত ছিল এই যে, পৃথিবী চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান। আধুনিক বিজ্ঞানীরা সবাই এ ব্যাপারে একমত। নতুন গবেষণা ও অভিজ্ঞতা এ মতবাদকে আরও ভাস্বর করে তুলছে। পাহাড়ের সাহায্যে যে অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা হয়েছে, তা পৃথিবীর জন্যে অন্যান্য গ্রহের ন্যায় যে গতি প্রমাণ করা হয়, তার জন্যে আরও অধিক সহায়ক হবে।

وَعَلَيْتُمْ وَالْغُلَامَ يَهْتَدُونَ উপরে বাণিজ্যিক সফরের কথা

বলা হয়েছে। তাই এসব সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করা এখানেও সমীচীন মনে হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তাআলা পথিকদের পথ অতিক্রম ও মনযিলে-মকসুদে পৌঁছার জন্যে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন। তাই বলা হয়েছে : وَعَلَيْتُمْ অর্থাৎ, আমি পৃথিবীতে রাস্তা চেনার জন্যে পাহাড়, নদী, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক চিহ্ন স্থাপন করেছি। বলাবাহুল্য, ভূ-পৃষ্ঠ যদি একটি চিহ্নবিহীন পরিমণ্ডল হত তবে মানুষ কোন গন্তব্যস্থানে পৌঁছার জন্যে পশ্চিমধ্যে কতই না ঘুরপাক খেত।

وَالْغُلَامَ يَهْتَدُونَ অর্থাৎ, পথিক যেমন ভূ-পৃষ্ঠের চিহ্নের দ্বারা

রাস্তা চেনে, তেমনি তারকারাজির সাহায্যেও দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে রাস্তা চিনে নেয়। এ বক্তব্য এদিকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, তারকারাজি সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য অন্যকিছু হলেও রাস্তার পরিচয় লাভ করা এগুলোর অন্যতম উপকারিতা।

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزَوْنَ بِهِمْ وَيَقُولُ السُّكَرَانُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ طَائِفَتٌ أَنفُسُهُمْ قَالُوا لِمَ تَعْلَمُونَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ قَادُخُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْسَ مَشْؤَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَكِنَّ الْأَخْيَرَ خَيْرٌ وَلَنَعْبُدَنَّ الْمُسْتَقِيمَ ۝ فَذُتْ عَيْنٌ يَدُ خُلُوعٍ ۝ فَتَعْرِى مِنْ حَيْثُ مَا أَلْهَضُوا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَمُوزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُم الْمَلَائِكَةُ طَائِفَتٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَظَلِمُوا ۝ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

০ কাফেরদের প্রথম সন্দেহ ছিল এই যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের কুফর, শিরক ও অবৈধ কাজকর্ম পছন্দ না করলে তিনি সজ্ঞারে আমাদেরকে বিরত রাখেন না কেন?

এ সন্দেহ যে অসার; তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই এর জগুয়ান দেয়ার পরিবর্তে শুধু রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, এহেন অনর্থক ও বাজে প্রশ্ন শুনে আপনি দুঃখিত হবেন না। সন্দেহটি যে অসার, তার কারণ এই যে, আল্লাহ তাআলা যে মূল ভিত্তির উপর এ দৃশ্যজগতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে মানুষকে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন রাখা হয়নি। তাকে এক প্রকার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ ক্ষমতাকে সে আল্লাহর আনুগত্যে প্রয়োগ করলে পুরস্কার এবং নাকরমানীতে প্রয়োগ করলে আযাবের অধিকারী হয়। কেয়ামত এবং হাশর ও নশরের যাবতীয় হাঙ্গামা এরই ফলশ্রুতি। যদি আল্লাহ তাআলা সবাইকে আনুগত্যে বাধ্য করতে চাইতেন, তবে আনুগত্যের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কার ছিল? কিন্তু রহস্যের তাগিদে এরূপ বাধ্য করা সঠিক ছিল না। ফলে মানুষকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সুতরাং এখন কাফেরদের একথা বলা যে, আমাদের ধর্মমত আল্লাহর কাছে পছন্দ না হলে আমাদের বাধ্য করেন না কেন, একটি বোকামী ও হঠকারিতা প্রসূত প্রশ্ন বৈ নয়।

(২৭) অতঃপর কেয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লালিত করবেন এবং বলবেন : আমার অবশীদাররা কোথায়, যাদের ব্যাপারে তোমরা খুব হঠকারিতা করতে? যারা আনন্ধ্যাপ্ত হয়েছিল, তারা বলবে : নিশ্চয়ই আজকের দিনে লাঞ্ছনা ও দুর্গতি কাফেরদের জন্যে, (২৮) ফেরেশতারা তাদের জান এমতাবস্থায় কবজ করে যে, তারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে। তখন তারা আনুগত্য প্রকাশ করবে যে, আমরা তো কোন মন্দ কাজ করতাম না। ই নিশ্চয় আল্লাহ সবিশেষ অবগত আছেন, যা তোমরা করতে। (২৯) অতএব জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, এতেই অনন্তকাল বাস কর। আর অহংকারীদের আবাসস্থল কতই নিকট! (৩০) পরহেযগারদেরকে বলা হয় : তোমাদের পালনকর্তা কি নাখিল করেছেন? তারা বলে : মহাকল্যাণ। যারা এ জগতে সংকাজ করে, তাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে এবং পরকালের গৃহ আরও উত্তম। পরহেযগারদের গৃহ কি চমৎকার? (৩১) সর্বদা বসবাসের উদ্যান, তারা যাতে প্রবেশ করবে। এর পাদদেশে দিয়ে স্রোতবিনী প্রবাহিত হয়। তাদের জন্যে তাতে তা-ই রয়েছে, যা তারা চায়। এমনভাবে প্রতিদিন দেখেন আল্লাহর পরহেযগারদেরকে, (৩২) ফেরেশতা যাদের জান কবজ করেন তাদের পবিত্র থাকা অবস্থায়। ফেরেশতারা বলে : তোমাদের প্রতি শাস্তি বর্ষিত হোক। তোমরা যা করতে, তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর। (৩৩) কাফেররা কি এখন অপেক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে কিংবা আপনার পালনকর্তার নির্দেশ পৌছবে? তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছিল। আল্লাহ তাদের প্রতি অবিচার করেননি, কিন্তু তারা স্বয়ং নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। (৩৪) সুতরাং তাদের মন্দ কাজের শাস্তি তাদেরই মাধ্যম আপতিত হয়েছে এবং তারা যে ঠাট্টা-বিদ্রোহ করত, তাই উল্টে তাদের উপর পড়েছে।

উপমহাদেশেও আল্লাহর কোন রসূল আগমন করেছেন কি?

وَإِنْ مِنْ أَرَبِ إِثْرِ فَأَنذِرْ ۚ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

أَمَّا الْإِخْلَافُ فَهَذَا يُرَى থেকে বাহ্যতঃ একথাই জানা যায় যে, উপমহাদেশীয়

এলাকাসমূহেও আল্লাহ্ তাআলার পয়গম্বর অবশ্যই আগমন করে থাকবেন। তিনি হয় এখানকারই অধিবাসী হবেন, না হয় অন্য কোন দেশের হবেন এবং তাঁর প্রতিনিধি ও প্রচারক এখানে এসে থাকবেন।

অপরপক্ষে **لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مُنْذِيرٌ** আয়াত থেকে বোঝা যায়,

রসুলুল্লাহ (সাঃ) যে উম্মতের কাছে জেরিত হয়েছেন, তাদের কাছে তাঁর পূর্বে কোন রসুল আগমন করেননি। এর উম্মত এরূপ হতে পারে যে, এখানে বাহ্যতঃ আরব সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে রসুলুল্লাহ (সাঃ) – এর নবুওয়ত দ্বারা সর্বপ্রথম সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে হযরত ইসমাইল (আঃ) –এর পর কোন পয়গম্বুরের আগমন হয়নি।

এজন্যই কোরআন পাকে তাদেরকে **الْمُؤْمِنِينَ** নামে অভিহিত করা হয়েছে।

এতে অপরিহার্য হয়ে পড়ে না যে, অবশিষ্ট বিশ্বেও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পূর্বে কোন পয়গম্বর আসেননি।

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা : وَالَّذِينَ هَاجَرُوا — এটি হজ্জা থেকে উদ্ধৃত। এর

আভিমানিক অর্থ দেশ ত্যাগ করা। আল্লাহর জন্যে দেশ ত্যাগ করা ইসলামে একটি বড় এবাদত। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন : **الهجرة تهمد ما كان عليها** অর্থঃ, হিজরতের পূর্বে মানুষ যেসব গোনাহ করে, হিজরত সেগুলোকে খতম করে দেয়।

হিজরত কোন কোন অবস্থায় ফরয, গুনাহিবি এবং কোন কোন অবস্থায় মোস্তাহাব ও উস্তুম হয়ে থাকে। এর বিস্তারিত বিধান সূরা নিসার ৯৭ নম্বর আয়াত **أَلَمْ تَكُنْ أَرْضًا مَّاءً لَّيْسَ لَهَا حَيَوةٌ** এর অধীনে বর্ণিত হয়েছে। এখানে শুধু মুহাজিরদের সাথে আল্লাহ তাআলার কৃত ওয়াদাসমূহ বর্ণিত হবে।

হিজরত দুনিয়াতেও সচ্ছন জীবিকার কারণ হয় কি?

আলোচ্য আয়াত কতিপয় শর্তধীন মুহাজিরদের সাথে দু'টি বিরাট ওয়াদা করা হয়েছে, প্রথমতঃ দুনিয়াতেই উত্তম ঠিকানা দেয়ার এবং দ্বিতীয়তঃ পরকালে বেহিসাব সওয়াবের। “দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা” এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। বসবাসের জন্যে গৃহ এবং সং প্রতিবেশী পাওয়া, উত্তম রিযিক পাওয়া, শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সাফল্য পাওয়া, সাধারণের মুখে মুহাজিরদের প্রশংসা ও সুখ্যাতি থাকা এবং পুরুষানুক্রমে পারিবারিক ইয়ত ও গৌরব পাওয়া—সবই এর অন্তর্ভুক্ত।—(করতবী)

আম্রাতের শানে নৃথল মূলতঃ ঐ প্রথম হিজরত, যা সাহাবায়ে কোরাম আবিসিনিয়া অভিযুখে করেন। এরপ সস্তাবনাও রয়েছে যে, আবিসিনিয়ার হিজরত এবং পরবর্তী কালের মদীনার হিজরত উভয়টি এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এ ওয়াদা বিশেষ করে ঐ সাহাবায়ে কোরামের জন্যে, যাঁরা আবিসিনিয়ায় কিংবা মদীনায় হিজরত করেছিলেন। আল্লাহর এ ওয়াদা দুনিয়াতে পূর্ণ হয়ে গেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে।

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ
 مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَزَمَتْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ
 كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا
 الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ٥ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ
 يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلِيَجْزِيَهُمُ الَّذِي خَلَقُوا مِنْهُمْ هَٰذَا اللَّهُ
 وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ فَبِئْسَ مَا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ٦ إِنْ تَحْرِضْ عَلَىٰ هَٰذَا مِمَّا
 فَلَانَ اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ لُصُوفٍ ٧ وَ
 أَفَسَوْا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ ٨
 بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٩
 لَيْسَ مِنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ١٠ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ
 لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ١١ هَٰذَا الَّذِي هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا
 ظَلَمُوا النَّبِيَّ تَتَّبِعُهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ
 كَانُوا يَعْلَمُونَ ١٢ الَّذِينَ صَدَقُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ١٣

(৫৮) মুশরিকরা বলল : যদি আল্লাহ্‌ চাইতেন, তবে আমরা তাঁকে ছাড়া কারও এবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরাও করত না এবং তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোন বস্তুই আমরা হারাম করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছে। রসুলের দায়িত্ব তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া। (৩৬) আমি এতোক উশ্মভের মধ্যেই রসুল প্রেরণ করেছে। এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ্‌ হেদায়েত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপৎগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেশ-বিখ্যারোপকারীদের কিরণ পরিশ্রুতি হয়েছে। (৩৭) আপনি তাদেরকে সুপাশে আনতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ্‌ যাকে বিপৎগামী করেন তিনি তাকে পথ দেখান না এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (৩৮) তারা আল্লাহ্‌র নামে কঠোর শপথ করে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ্‌ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই এর পার্কাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে। কিন্তু, অধিকাংশ লোক জানে না। (৩৯) তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল তা প্রকাশ করা যায় এবং যাতে কাফেররা জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। (৪০) আমি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করি; তখন তাকে কেবল এটুকুই বলি যে, হয়ে যাও। সুতরাং তা হয়ে যায়। (৪১) যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র জন্যে গৃহত্যাগ করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সুনিয়মে উত্তম আवास দেন এবং পরকালের পুরস্কার তো সর্বাধিক; হয়। যদি তারা জানত। (৪২) যারা দৃঢ়দল রয়েছে এবং তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করেছে।

আল্লাহ তাআলা মদীনাতে তাঁদের জন্যে কি চমৎকার ঠিকানা করেছিলেন। উৎপাদনকারী প্রতিবেশীদের স্থলে তাঁরা সহানুভূতিশীল, মহানুভব প্রতিবেশী পেয়েছিলেন। তাঁরা শত্রুদের বিপক্ষে বিজয় ও সাফল্য লাভ করেছিলেন। হিজরতের পর অশ্লীল কিছুদিন অতিবাহিত হতেই তাঁদের সামনে রিযিকের দূর উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। যারা ছিলেন ফকীর মিসকীন, তাঁরা হয়ে যান বিত্তশালী, ধনী। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বিজিত হয়। তাঁদের চরিত্র মাধুর্য ও সংকর্মের কীর্তি আবহমানকাল পর্যন্ত শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সবার মুখে উচ্চারিত হয়। তাঁদেরকে এবং তাঁদের বংশধরকে আল্লাহ তাআলা অসামান্য ইয়্যাত ও গৌরব দান করেন। এগুলো হচ্ছে পার্থিব বিষয়। পরকালের ওয়াদা পূর্ণ হওয়াও অবশ্যস্বাভাব্য। কিন্তু তফসীর বাহরে মুহীতে আবু হাইয়ান বলেন :

والذين هاجروا عام في المهاجرين كائنا ما كانوا فيشمل
اولهم واهلهم واهلهم واهلهم
মুহাজিরের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, যেকোন অঞ্চল ও যুগের মুহাজির হোক না কেন। তাই প্রথম যুগের হিজরতকারী মুহাজির এবং কেয়ামত পর্যন্ত আরও যত মুহাজির হবে, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ তফসীরবিদের তাগিদও তাই। আয়াতের শানে নুযূল বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ শ্রেণীর লোক হলেও শব্দের ব্যাপকতা গুরুত্ব হয়ে থাকে। তাই সারা বিশ্বের এবং সর্বকালের মুহাজির আলোচ্য ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। উভয় ওয়াদা সব মুহাজিরের ক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়া একটি নিশ্চিত ও অনিবার্য ব্যাপার।

এমন ধরণের এক ওয়াদা মুহাজিরদের জন্যে সূরা নেসার নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে :

وَمَنْ يُهَاجِرْ فَيُجِدْ سَبِيلَ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَبًا كَثِيرًا وَسَعَةً

এতে বিশেষ করে বাসস্থানের প্রশস্ততা এবং জীবিকার স্বচ্ছলতার ওয়াদা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাক এসব ওয়াদার সাথে মুহাজিরদের কিছু গুণাবলী এবং হিজরতের কিছু শর্তাবলীও বর্ণনা করেছে। তাই এসব ওয়াদার যোগ্য অধিকারী এসব মুহাজিরই হতে পারে, যারা এসব গুণের বাহক এবং যারা প্রার্থিত শর্তসমূহ পূর্ণ করে।

তন্মধ্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে فِي اللَّهِ অর্থাৎ, হিজরত করার লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন হতে হবে। এতে পার্থিব কাজ-কারবারের মুনাকা, চাকরী এবং প্রবৃত্তিগত উপকারিতা উদ্দেশ্য হতে পারবে না। দ্বিতীয় শর্ত মুহাজিরদের নির্ধারিত হওয়া; যেমন বলা হয়েছে :
وَمَنْ يُهَاجِرْ فَلْيُهَاجِرْ إِلَى اللَّهِ
তৃতীয় গুণ প্রাথমিক কষ্ট ও বিপদাপদে সবার করা ও দৃঢ়দান থাকে; যেমন বলা হয়েছে :
وَالَّذِينَ هُجِرُوا
চতুর্থ গুণ যাবতীয় বস্তুনিষ্ঠ কলাকৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভরসা শুধু আল্লাহর উপর রাখা; অর্থাৎ, কায়মনোবাক্যে এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, বিজয় ও সাফল্য একমাত্র তাঁরই হাতে; যেমন বলা হয়েছে :
وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ

এ থেকে জ্ঞান গেল যে, প্রাথমিক বিপদাপদ ও কষ্ট তো প্রত্যেক কাজে হয়েই থাকে। এগুলো অতিক্রম করার পরও যদি কোন মুহাজির উত্তম ঠিকানা ও উত্তম অবস্থা না পায়, তবে কোরআনের ওয়াদায় সন্দেহ

করার পরিবর্তে নিজের নিয়ত, আন্তরিকতা ও কর্মের উৎকর্ষতা যাচাই করা দরকার। এগুলোর ভিত্তিতেই এ ওয়াদা করা হয়েছে। যাচাই করার পর সে জানতে পারবে যে, দোষ তার নিজেরই। কোথাও হয়তো নিয়তে ত্রুটি রয়েছে, কোথাও হয়তো সবার, দৃঢ়তা ও ভরসার অভাব আছে।

দেশত্যাগ ও হিজরতের বিভিন্ন বিধি-বিধান : ইমাম কুতুবী এস্থলে হিজরত ও দেশ ত্যাগের প্রকার ও বিধি-বিধান সম্পর্কে একটি উপকারী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পাঠকবর্গের উপকারার্থে নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল।

কুরতুবী ইবনে-আরাবীর বরাতে দিয়ে লিখেন : দেশ ত্যাগ করা এবং দেশ ভ্রমণ করা কোন সময় কোন বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় এবং কোন সময় কোন বস্তুর অনুেষণের জন্যে হয়। প্রথম প্রকারকে হিজরত বলে। হিজরত ছয় প্রকার :

(প্রথম) দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে যাওয়া। এ প্রকার সফর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলেও ফরয ছিল এবং কেয়ামত পর্যন্ত শক্তিসামর্থ্যের শর্তসহ ফরয, যদি দারুল কুফরে জান, মাল ও আবরুর নিরাপত্তা না থাকে কিংবা ধর্মীয় কর্তব্য পালন সম্ভব না হয়। এরপরও যদি কেউ দারুল কুফরে অবস্থান করে, তবে সে গোনাহ্গার হবে।

দ্বিতীয়, বেদআতের স্থান থেকে চলে যাওয়া। ইবনে-কাসেম বলেন : আমি ইমাম মালেকের মুখে শুনেছি, এমন জায়গায় কোন মুসলমানের বসবাস করা হালাল নয়, যেখানে পূর্ববর্তী মনীষীদেরকে গালিগালাজ করা হয়। এই উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে-আরাবী লিখেন : এটা সম্পূর্ণ নির্ভুল। কেননা, যদি তুমি কোন গর্হিত কাজ বন্ধ করতে না পার, তবে নিজে সেখান থেকে দূরে সরে যাও। এটা তোমার জন্যে জরুরী; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأَذَارَ آيَاتِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ فِي الْيَتِيمَاتِ أَنْفُسُهُنَّ

তৃতীয়, যেখানে হারামের প্রাধান্য, সেখান থেকে চলে যাওয়া। কেননা, হালাল অনুেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

চতুর্থ, দৈহিক নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। এরূপ সফর জায়েয; বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রহমত। যেখানে শত্রুদের পক্ষ থেকে দৈহিক নির্যাতনের আশঙ্কা থাকে, সেস্থান ত্যাগ করা উচিত; যাতে আশঙ্কা মুক্ত হওয়া যায়। সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই প্রকার সফর করেন। তিনি কওমের নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে ইরাক থেকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং বলেন :
لَا تُهَاجِرْ إِلَى رَيْتِي
তারপর হযরত মুসা (আঃ) এমনি এক সফর মিসর থেকে মাদইয়ান অভিযুক্ত করেন। যেমন কোরআন বলে :
فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ

পঞ্চম, দুষিত আবহাওয়া ও রোগের আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। ইসলামী শরীয়ত এরও অনুমতি দেয়; যেমন রসূলুল্লাহ (সাঃ) কয়েকজন রাখালকে মদীনার বাইরে বনভূমিতে অবস্থান করার আদেশ দেন। কেননা, শহরের আবহাওয়া তাদের অনুকূলে ছিল না। এমনিভাবে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আবু ওবায়দাকে রাজধানী জর্দান থেকে স্থানান্তরিত করে কোন মালভূমিতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন, যেখানে আবহাওয়া দুষিত নয়।

যষ্ঠ, ধন-সম্পদ হেফাজতের জন্য সফর করা। কোন স্থানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব দেখলে সে স্থান ত্যাগ করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কেননা, মুসলমানের ধন-সম্পদও তার জানের ন্যায় সম্মান্য। এই ছয় প্রকার তো ছিল ঐ দেশ ত্যাগের যা কোন বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয়। আর শেষোক্ত প্রকার অর্থাৎ, কোন বস্তুর অনুেষণে যে সফর করা হয়, তা নয় ভাগে বিভক্ত।

(১) শিক্ষার জন্য সফর অর্থাৎ, আল্লাহর সৃষ্টজগত, অপার শক্তি ও বিগত জাতিসমূহের অবস্থা সরেযমীনে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিশু-পর্যটন করা। কোরআন পাক এরূপ সফরে উৎসাহিত করে বলেছে:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

হযরত যুলকারনাইনের সফরও কোন কোন আলেমের মতে এ ধরণের সফর ছিল। কেউ কেউ বলেন : তাঁর সফর পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে ছিল।

(২) হজ্জের সফর। কতিপয় শর্তসহ এ সফর যে ইসলামী ফরয, তা সুবিদিত।

(৩) জেহাদের সফর। এটাও যে ফরয, ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব, তা সব মুসলমানের জানা রয়েছে।

(৪) জীবিকার অনুেষণে সফর। স্বদেশে জীবিকার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সঞ্চিত না হলে অন্যত্র সফর করে জীবিকা অনুেষণ করা অপরিহার্য।

(৫) বাণিজ্যিক সফর অর্থাৎ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ অর্জন করার জন্যে সফর করা। শরীয়তে এটাও জায়েয। আল্লাহ বলেন :

إِبْتِغَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَبْتَغِيَ أَفْضَلَ مِنْ رِزْقِهِ

فَضْل (কৃপা অনুেষণ) বলে বাণিজ্য বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা হজ্জের সফরেও বাণিজ্যের অনুমতি দান করেছেন। অতএব বাণিজ্যের জন্যে সফর করা আরও উত্তমরূপে বৈধ হবে।

(৬) জ্ঞান অর্জনের জন্যে সফর। ধর্ম পালনের জন্যে যতটুকু জরুরী, ততটুকু জ্ঞান অর্জনের জন্যে সফর করা ফরযে আইন এবং এর বেশীর জন্যে ফরযে কেফায়া।

(৭) কোন স্থানকে পবিত্র মনে করে সেদিকে সফর করা। তিনটি মসজিদ ব্যতীত এরূপ সফর বৈধ নয় : মসজিদে হারাম (মক্কা), মসজিদে নববী (মদীনা) এবং মসজিদে আকসা (বায়তুল মোকাদ্দাস)। এ হচ্ছে কুরতুবী ও ইবনে-আরাবীর অভিমত। অন্যান্য আলেমের মতে সাধারণ পবিত্র স্থানসমূহের দিকে সফর করাও জায়েয।

(৮) ইসলামী সীমান্ত সুরক্ষণের জন্যে সফর। একে ‘রিবাত’ বলা হয়। বহু হাদীসে রিবাতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত রয়েছে।

(৯) স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে সফর। হাদীসে একেও পূণ্যকাজ আখ্যা দেয়া হয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আতীয-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে সফর করে, তার জন্যে ফেরেশতাদের দোয়া করার কথা উল্লেখিত রয়েছে। এটা তখন, যখন কোন বৈষয়িক স্বার্থের জন্যে নয়; বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সাক্ষাত করা হয়।

النحل ১৬

২৬২

ربما ১৩

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়



(৪৩) আপনার পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। অতএব জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে; (৪৪) প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে নির্দেশাবলী ও অবতীর্ণ গ্রন্থসহ এবং আপনার কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিষয় বিবৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাখিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (৪৫) যারা কুচক্র করে, তারা কি এ বিষয়ে ভয় করে না যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন কিংবা তাদের কাছে এমন জায়গা থেকে আঘাব আসবে, যা তাদের ধারণাতীত? (৪৬) কিংবা চলাফেরার মধ্যেই তাদেরকে পাকড়াও করবে, তারা তো তা ব্যর্থ করতে পারবে না। (৪৭) কিংবা তীতি প্রদর্শনের পর তাদেরকে পাকড়াও করবেন? তোমাদের পালনকর্তা তো অত্যন্ত নম্র, দয়ালু। (৪৮) তারা কি আল্লাহর সৃজিত বস্তু দেখে না, যার ছায়া আল্লাহর প্রতি বিনীতভাবে সেজদাবনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে। (৪৯) আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে এবং ফেরেশতাগণ; তারা অহংকার করে না। (৫০) তারা তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং তারা যা আদেশ পায়, তা করে। (৫১) আল্লাহ বললেন : তোমরা দুই উপাস্য গ্রহণ করো না—উপাস্য তো মাত্র একজনই। অতএব আমাকেই ভয় কর। (৫২) যা কিছু নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আছে তা তাঁরই এবাদত করা শাস্বত কর্তব্য। তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে? (৫৩) তোমাদের কাছে যে সমস্ত নেয়ামত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা যখন দুঃখ-কষ্ট পতিত হও তখন তাঁরই নিকট কল্যাণকামি কর। (৫৪) এরপর যখন আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দূরীভূত করে দেন, তখনই তোমাদের একদল স্বীয় পালনকর্তার সাথে অশ্বীদার সাব্যস্ত করতে থাকে।

মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করা : আলোচ্য আয়াতের **أَهْلَ الدِّينِ** কথার ব্যাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে

বলা হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এ জাতীয় সব ব্যাপারকে শামিল করে। তাই কোরআনী বর্ণনাতন্ত্রের দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগত ও ইতিহাসগত বিধি যে, যারা বিধি-বিধানের জ্ঞান রাখে না, তারা যারা জানে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নেবে এবং তাদের কথামত কাজ করা জ্ঞানহীনদের উপর করণ্য হবে। একেই তকলীদ (অনুসরণ) বলা হয়। এটা কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এবং যুক্তিগতভাবেও এ পথ ছাড়া আমল অর্থাৎ, কর্মকে ব্যাপক করার আর কোন উপায় নেই। সাহাবিগণের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনরূপ মতানৈক্য ছাড়াই এ বিধি পালিত হয়ে আসছে। যারা তকলীদ অস্বীকার করে, তারাও এ তকলীদ অস্বীকার করে না যে, যারা আলেম নয়, তারা আলেমদের কাছ থেকে কতোয়্য নিয়ে কাজ করবে। বলাবাহুল্য, আলেমরা যদি অস্ত্র জনসাধারণকে কোরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি বলেও দেন, তবে তারা এগুলোকে আলেমদের উপর আস্থার ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে। কারণ, তাদের মধ্যে প্রমাণাদিকে বোঝা ও পরখ করার যোগ্যতা কোথায়? জ্ঞানীদের উপর আস্থা রেখে কোন নির্দেশকে শরীয়তের নির্দেশ মনে করে পালন করার নামই তো তকলীদ। এ তকলীদ যে বৈধ বরণ জরুরী, তাতে কোনরূপ মতবিরোধের অবকাশ নেই। তবে যেসব আলেম কোরআন, হাদীস ও ইজমার ক্ষেত্রসমূহ বোঝার যোগ্যতা রাখে, তারা কারও তকলীদ না করে এমন বিধি-বিধানে সরাসরি কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী কাজ করতে পারে, যেগুলো কোরআন ও হাদীসে পরিস্কারভাবে উল্লেখিত রয়েছে এবং যেগুলোতে সাহাবী ও তাবয়ী আলেমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু যেসব বিধান পরিস্কারভাবে কোরআন ও হাদীসে উল্লেখিত নেই অথবা যেগুলোতে কোরআনী আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর হয় অথবা যেগুলোতে সাহাবী ও তাবয়ীগণের মধ্যে আয়াত কিংবা হাদীসের অর্থ নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে, সেসব বিধি-বিধান ইজতিহাদী বিষয়রূপে গণ্য হয় এবং পরিভাষায় এগুলোকে ‘মুজতাহিদ ফিহ্মাসআলা’ বলে। নিজে মুজতাহিদ নয়, এমন প্রত্যেক আলেমের পক্ষেও এ জাতীয় মাসআলায় কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা জরুরী। ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে এক আয়াত কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য মনে করে অবলম্বন করা এবং অন্য আয়াত কিংবা হাদীসকে অনগ্রগণ্য সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেয়া তার পক্ষে বৈধ নয়।

এমনিভাবে কোরআন ও সুন্নাহ যেসব বিধানের পরিস্কার উল্লেখ নেই সেগুলো কোরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত মূলনীতি অনুসরণ করে বের করা এবং সেগুলোর শরীয়তসম্মত নির্দেশ নির্ধারণ করাও এমন মুজতাহিদদের কাজ, যারা আরবী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখেন; কোরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কিত যাবতীয় শাস্ত্রে দক্ষতা রাখেন এবং আল্লাহ তীতি ও পরহেযগারীতে উচ্চ মর্যবায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যেমন ইমাম আহম আবু হানীফা, শাফে'রী মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আগুয়ায়ী, ফকীহ আবুল্লাহিস (রহঃ) প্রমুখ। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নবুওয়ত যুগের নৈকট্য এবং সাহাবী ও তাবয়ীগণের সংসর্গের বরকতে শরীয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বোঝার বিশেষ রুচি এবং বর্ণিত বিধানের উপর অবর্ণিত বিধানকে অনুমান করে শরীয়তসম্মত নির্দেশ বের করার অসাধারণ দক্ষতা

দান করেছিলেন। এ জাতীয় ইজ্তিহাদী মাসআলায় সাধারণ আলেমদের পক্ষেও কোন না কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা অপরিহার্য। মুজতাহিদ ইমামদের মতের বিরুদ্ধে কোন নতুন মত অবলম্বন করা ভুল।

এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের আলেম, মুহাদ্দিস ও ফেকাহবিদগণ, ইমাম গাফযালী, রায়ী, তিরমিযী, তাহাভী, মুযানী, ইবনে হুসাম, ইবনে কুদামা (রহঃ) এবং এই শ্রেণীর আরও লক্ষ লক্ষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেম আরবী ভাষা ও শরীয়ত সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজ্তিহাদী মাসআলাসমূহে সর্বদা মুজতাহিদ ইমামদের তকলীদ করে গেছেন। তাঁরা সব ইমামের বিপরীতে নিজমতে কোন ফতোয়া দেয়াকে বৈধ মনে করেননি।

তবে উল্লেখিত মনীযীবন্দ জ্ঞান ও আল্লাহ্ জীতিতে অনন্যসাধারণ মর্যবীর অধিকারী ছিলেন। ফলে তাঁরা মুজতাহিদ ইমামগণের উক্তি ও মতামতসমূহকে কোরআন ও সুন্নতের আলোকে যাচাই-বাছাই করতেন। অতঃপর তাঁরা যে ইমামের উক্তিকে কোরআন ও সুন্নতের অধিক নিকটবর্তী দেখতেন, সেই ইমামের উক্তি গ্রহণ করতেন। কিন্তু ইমামগণের মত ও পথের বাইরে, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে কোন মত আবিষ্কার করাকে তাঁরা কখনও বৈধ মনে করতেন না। তকলীদে আসল স্বরূপ এতদুকুই।

এরপর দিন দিন জ্ঞানের মাপকাঠি সচ্ছচিত হতে থাকে এবং তাকওয়া ও আল্লাহুজীতির পরিবর্তে মানবিক স্বার্থপরতা প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে যদি কোন মাসআলায় যে কোন ইমামের উক্তি গ্রহণ করার এবং অন্য মাসআলায় অন্য ইমামের উক্তি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়, তবে এর অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতিতে মানুষ শরীয়ত অনুসরণের নামে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যাবে। যে ইমামের উক্তিতে সে নিজ প্রবৃত্তির স্বার্থ পূর্ণ হতে দেখবে, সেই ইমামের উক্তিকেই গ্রহণ করবে। বলাবাহুল্য এরূপ করার মধ্যে ধর্ম ও শরীয়তের অনুসরণ হবে কম এবং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হবে বেশী। অথচ দুইন ও শরীয়তের অনুসরণ না করে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা উম্মতের ইজমা দ্বারা হারাম। আল্লামা শাতেবী ‘মুয়াফাকাত’ গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাধারণ তকলীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইবনে তাইমিয়া এ ধরনের অনুসরণকে স্বীয় ফতোয়া গ্রন্থে ইজমা দ্বারা হারাম বলেছেন। এ কারণে পরবর্তী ফেকাহবিদগণ এটা জরুরী মনে করেছেন যে, আমলকারীদের উপর কোন একজন ইমামেরই তকলীদ করা বাধ্যতামূলক করে দেয়া উচিত। এখান থেকেই ব্যক্তিভিত্তিক তকলীদের সূচনা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে একটি শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য দ্বীনী ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কায়ম রাখা এবং মানুষকে দ্বীনের আড়ালে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে ঝাটিয়ে রাখা। হযরত ওসমান গনী (রাঃ)—এর একটি কীর্তি হুবহু এর দৃষ্টান্ত। তিনি সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে কোরআনের সাতটি কেরআতের মধ্য থেকে মাত্র একটিকে বহাল রেখেছেন। অথচ কোরআন সাত কেরআতেই রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর বাসনা অনুযায়ী জিবরাঈলের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বহির্বিষু প্রচারিত হওয়ার পর সাত কেরআতে কোরআন পাঠ করার ফলে তাতে পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন সাহাবিগণের সর্বসম্মতিক্রমে একই কেরআতে কোরআন লেখা ও পড়া বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়। খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ) সেই এক কেরআতে কোরআনের অনেক কপি লিখিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন এবং আজ পর্যন্তও সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় তা অনুসরণ করে যাচ্ছেন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কেরআত সঠিক

ছিল না। বরং দ্বীনের শৃঙ্খলা বিধান এবং কোরআনের হেফাযতের কারণে একটি মাত্র কেরআত অবলম্বন করা হয়েছে। এমনভাবে সকল মুজতাহিদ ইমামই সত্য। তাদের মধ্যে কোন একজনকে তকলীদের জন্যে নির্দিষ্ট করার অর্থ কখনও এরূপ নয় যে, যে ব্যক্তি যে ইমামের তকলীদ করেছে তাকে ছাড়া অন্য ইমাম তার কাছে তকলীদের যোগ্য নয়। বরং যে ইমামের মধ্যে নিজেদের মতাদর্শ ও সুবিধা দেখতে পায় তারই তকলীদ করে এবং অন্য ইমামদেরকেও এমনভাবে সম্মানিত মনে করে।

উদাহরণতঃ রোয়ী ব্যক্তি হাকীম ও ডাক্তারদের মধ্য থেকে কোন একজনকেই চিকিৎসার জন্যে নির্দিষ্ট করাকে জরুরী মনে করে। কারণ, সে যদি নিজ মতে এক সময় এক ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান করে এবং অন্য সময় অন্য ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান করে, তবে এটা তার ধ্বংসের কারণ হয়। অতএব সে যখন একজন ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্যে মনোনীত করে, তখন এর অর্থ কখনও এরূপ হয় না যে, অন্য ডাক্তার পারদর্শী নয় কিংবা চিকিৎসা করার যোগ্যতা রাখেনা।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর যে বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার স্বরূপ এর চাইতে বেশী কিছু ছিল না। একে দলাদলির রঙ দেয়া এবং পারস্পরিক কলহ ও মতানৈক্য সৃষ্টিতে মেতে উঠা দ্বীনের কাজ নয় এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলেমগণ কোন সময় একে সুনজরে দেখেননি। কোন কোন আলেমের আলোচনা পারস্পরিক বিতর্কের রূপ ধারণ করে, যা পরে তিরস্কার ও ভৎসনার সীমা পর্যন্ত পৌছে যায়। এরপর মুখ্যতাসুলত লড়াই ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, যা আজকাল সাধারণতঃ ধর্মপরায়ণতা ও মাহাবব্বীতার চিহ্ন হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ তাআলার কাছেই আমাদের অভিযোগ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তকলীদ ও ইজ্তিহাদ সম্পর্কে এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা এ বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার। সাধারণ মুসলমানদের বোঝার জন্যে এতদুকুই যথেষ্ট। পশ্চিমসুলত বিস্তারিত আলোচনা উসুলে ফেকাহর কিতাবাদিতে বিশেষ করে আল্লামা শাতেবীকৃত ‘কিতাবুল মুয়াফাকাত’ ৪র্থ খণ্ড, ইজ্তিহাদ অধ্যায়ে, আল্লামা সাইফুদ্দীন আমেদীকৃত ‘আহকামুল আহকাম’ ৩য় খণ্ড, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীকৃত ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালোগা’ ও ‘ইকদুল জীদ’ এবং মাওলানা আশরাফ আলী খানভীকৃত ‘আল ইসতিহাদ ওয়াল ইজ্তিহাদ’ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

হাদীস অস্বীকার কোরআন অস্বীকারের নামান্তর : **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْكَرِيمَ** এ আয়াতে ذکر এর অর্থ সর্বসম্মতভাবে কোরআন পাক। আয়াতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদের কাছে কোরআনের আয়াত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে দিন। এতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন পাকের তত্ত্ব, তথ্য ও বিধানাবলী নির্ভুলভাবে বোঝা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানলাভ করেই কোরআনের বিধানাবলী আল্লাহর অভিপ্রেত পন্থায় বোঝাতে সক্ষম হত, তবে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পণ করার কোন অর্থ থাকত না।

আল্লামা শাতেবী ‘মুয়াফাকাত’ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন

যে, হাদীস আগাগোড়া কোরআনের ব্যাখ্যা। কেননা, কোরআন রসুলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে বলেছে : **وَأَنَّكَ لَمِنَ خُلَائِفَةِ عِزِّي** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) এই মহান চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন **كَانَ خَلْفَهُ الْقُرْآنُ** এর সারমর্ম এই যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে যে কোন উক্তি ও কার্য বর্ণিত রয়েছে, তা সব কোরআনেরই বস্তু। কোন কোনটি বাহ্যতঃ কোন আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যা, যা সাধারণ আলেমরা জানেন এবং কোন কোনটি বাহ্যতঃ কোরআনে নেই, কিন্তু রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর অন্তরে তা ওহী হিসেবে প্রসিক্ত করা হয়। এটাও একদিক দিয়ে কোরআনই। কেননা, কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন কথাই মনগড়া নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে প্রসিক্ত। **وَلَا يَخُفُّ عَنْ**

أَمْرِهِ এতে জানা গেল যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর এবাদত, লেন-দেন, চরিত্র ও অভ্যাস সবই আল্লাহ তাআলার ওহী ও কোরআনী নির্দেশের অনুসৃতি। তিনি যেখানেই নিজ ইজ্জতিহাদ দ্বারা কোন কাজ করেছেন, সেখানে ওহী কিংবা নিষেধ না করার মাধ্যমে সত্যায়ন ও সমর্থন করা হয়েছে। ফলে তাও ওহীরই অনুসৃতি। যেটুকু এই যে, আলোচ্য আয়াতে কোরআনের ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছে; যেমন সূরা জুমআ ও অন্যান্য সূরার কতিপয় আয়াতে গ্রন্থশিক্ষাদান বলে এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে।

অপরদিকে সাহাবী ও তাবয়ী থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের হাদীসবিদ পর্যন্ত প্রতিভার মনীষীবৃন্দ প্রাণের চাইতেও অধিক হেফাজত করে হাদীসের একটি বিশাল ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন। তাঁরা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সারা জীবন ব্যয় করে হাদীস বর্ণনার কিছু স্তর নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা যেসব হাদীসকে সনদের দিক দিয়ে শরীয়তের বিধানাবলীর ভিত্তি হওয়ায় যোগ্য পাননি, সেগুলোকে পৃথক করে এমন হাদীসসমূহ গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যেগুলো সারা জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর বিশুদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।

যদি আজ কেউ হাদীসের এই ভাণ্ডারকে কোন ছলছুতায় অনির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করে, তবে এর পরিস্কার অর্থ এই যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) কোরআনী নির্দেশ অমান্য করে কোরআনের বিষয়বস্তু বর্ণনা

করেননি; কিংবা তিনি বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তা অব্যাহত ও সংরক্ষিত থাকেনি। উভয় অবস্থাতেই অর্থাৎভাবে কোরআন সংরক্ষিত রইল না। অথচ এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তাআলা একথা বলে গ্রহণ করেছিলেন : **وَأَنَّكَ لَمِنَ الْخَافِظِينَ** অতএব উপরোক্ত দাবী কোরআনের এ আয়াতের পরিপন্থী হবে। এতে প্রমাণিত হল যে, যে ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষে কোরআনই অস্বীকার করে। **نَعُوذُ بِاللَّهِ**

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে **فُتُوْر** বলে কাফেরদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে ভয় প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহর আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারে। তোমরা যে মাটির উপর বসে আছ, তার অভ্যন্তরেই তোমাদেরকে বিলীন করে দেয়া যেতে পারে; কিংবা কোন ধারণাতীত জায়গা থেকে তোমরা আযাবে পতিত হতে পার; যেমন বদর যুদ্ধে এক হাজার অশ্রুসজ্জিত বীরযোদ্ধা কয়েকজন নিরস্ত্র মুসলমানের হাতে এমন মার খেয়েছে, যার কল্পনাও তারা করতে পারত না। কিংবা এটাও হতে পারে যে, চলাফেরার মধ্যেই তোমরা কোন আযাবে গ্রহণতার হয়ে যাও; যেমন কোন দুরারোগ্য প্রাণঘাতী ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে অথবা উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে অথবা শক্ত জিনিসের সাথে টক্কর লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পার, কিংবা এরূপ শাস্তিও হতে পারে যে, অকস্মাৎ আযাব না এসে টাকা-পয়সা, স্বাস্থ্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সামগ্রী আন্তে আন্তে হ্রাস পেতে থাকবে এবং এভাবে হ্রাস পেতে পেতে গোটা সম্প্রদায়ই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

দুনিয়ার আযাবও এক প্রকার রহমত : আলোচ্য আয়াতসমূহে দুনিয়ার বিভিন্ন আযাব বর্ণনার পর সর্বশেষে বলা হয়েছে **فَأَنَّ** দুনিয়ার বিভিন্ন আযাব বর্ণনার পর সর্বশেষে বলা হয়েছে যে, মানুষকে হুশিয়ার করার জন্যে দুনিয়ার আযাব হচ্ছে প্রতিপালকত্বের তাকিদ। এরপর তাকিদের **لَمْ** সহকারে আল্লাহর দয়ালু হওয়া ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার হুশিয়ারী প্রকৃতপক্ষে স্নেহ ও দয়ার কারণেই হয়ে থাকে, যাতে গাফেল মানুষ হুশিয়ার হয়ে স্বীয় কর্মকাণ্ড সংশোধন করে নেয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

০ আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের দু'টি বদ-অভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে। প্রথমতঃ, তারা নিজেদের ঘরে কন্যা-সন্তানের জন্মগ্রহণকে এত খারাপ মনে করে যে, লজ্জায় মানুষের সামনে দেখা পর্যন্ত দেয় না এবং চিন্তা করতে থাকে যে, কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণের কারণে তার যে বে-ইজ্জতি হয়েছে, তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না একে জীবিত কবরস্থ করে এ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। উপরন্তু মুর্থতা এই যে, যে সন্তানকে তারা নিজেদের জন্যে পছন্দ করে না, তাকেই আল্লাহর সাথে সম্পৃক্তযুক্ত করে বলে যে, ফেরেশতারা হল আল্লাহ তাআলার কন্যা।

الْكَافِرَاتُ الْيَاكُفُونَ

তফসীরে বাহরে-মুহীতে ইবনে আতিয়্যার বরাত

দিয়ে এ বাক্যের মর্ম উপরোক্ত দু'টি বদঅভ্যাসকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রথমতঃ তাদের এ ফয়সালাটিই মন্দ যে, কন্যা-সন্তান শাস্তি ও বে-ইজ্জতির কারণ। দ্বিতীয়তঃ যে বস্তুকে তারা নিজেদের জন্যে বে-ইজ্জতি মনে করে, তাকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্তযুক্ত করে।

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

বাক্যও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কন্যা-

সন্তান জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা এবং মুখ লুকিয়ে ফেরা খোদায়া রহস্যের যোকাবেলা করার নামাস্তর। কেননা, নর ও নারীর সৃষ্টি আল্লাহর একটি সাক্ষাত প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধি।—(ফুহুল-বয়ান)

النحل ١٦

২৬২

১৩৮

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمِتُوا فَسَوْفَ يَكْفُلُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ
لَهَا كَعْمَلُونَ بِنِصَابٍ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ لِكُنْهٍ ۝ عَمَّا كُنْتُمْ
تَقْرَأُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ بَهْنَةً ۝ وَهُمْ لَا يَشْتَهُونَ ۝
وَلَا يُبْشِرُ أَحَدَهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ۝ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَافٍ ۝
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۝ يُؤْمِنُكَ عَلَىٰ هُونٍ ۝ أَمْ
يَدُسُّ فِي الْأُتْرَابِ ۝ الْكَافِرَاتُ الْيَاكُفُونَ ۝ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا
بِالْآخِرَةِ مِثْلُ النُّعُوذِ ۝ وَلِلَّهِ الْاَكْثَرُ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
وَلَوْ كُنَّا إِذَا خُذَ اللَّهُ النَّاسُ بَظُلْمِهِمْ مَا تَرَكْنَاهُمْ إِلَّا دَارًا وَلَكِنَّ
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۝ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ
سَاعَةً ۝ وَلَا يَسْتَعِذُّونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُونُ وَنِصْفُ
الْيَسْتَعِذُّ الْكَذِبُ ۝ إِنَّ لَهُمْ عِشْيًا لَّجَرَمَ ۝ إِنَّ لَهُمُ النَّارَ ۝
أَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ۝ تَاللَّهِ لَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِمْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ
قُورَنَ ۝ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَمَّا لَهُمْ قُورَنَ ۝ وَلَهُمُ الْيَوْمَ عَذَابٌ
الِيمُ ۝ وَمَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا الْاَلْسِينَ ۝ لَهُمُ الَّذِي
اخْتَلَفُوا فِيهِ ۝ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ الْيُؤْمِنُونَ ۝

(৫৫) যাতে ঐ নেয়ামত অস্বীকার করে, যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব মজা ভোগ করে নাও—সত্তরই তোমরা জানতে পারবে। (৫৬) তারা আমার দেয়া জীবনোপকরণ থেকে তাদের জন্যে একটি অংশ নির্ধারিত করে, যাদের কোন খবরই তারা রাখে না। আল্লাহর কসম, তোমরা যে অপবাদ আরোপ করছ, সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (৫৭) তারা আল্লাহর জন্যে কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে—তিনি পবিত্র মহিমান্বিত এবং নিজেদের জন্যে ওরা তাই স্থির করে যা ওরা চায়। (৫৮) যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। (৫৯) তাকে শোনানো সুসংবাদের দুরূহে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নীচে পুতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিকট। (৬০) যারা পরকাল বিশ্রাস করে না, তাদের উদাহরণ নিকট এবং আল্লাহর উদাহরণই মহান, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৬১) যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের অন্যান্য কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুত সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের মৃত্যু এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা তরান্বিত করতে পারবে না। (৬২) যা নিজেদের মন চায় না তাই তারা আল্লাহর জন্যে সাব্যস্ত করে এবং তাদের জিহবা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ। স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, তাদের জন্যে রয়েছে আগুন এবং তাদেরকেই সর্বত্রো নিক্ষেপ করা হবে। (৬৩) আল্লাহর কসম, আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে রসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয়তান তাদেরকে কর্মসমূহ শোভনীয় করে দেখিয়েছে। আজ সে-ই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬৪) আমি আপনার প্রতি এ জন্যই গ্রন্থ নাখিল করেছি, যাতে আপনি সরল পথ প্রদর্শনের জন্যে তাদেরকে পরিক্ষার বর্ণনা করে দেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে এবং ঈমানদারকে ক্ষমা করার জন্যে।



(৬৫) আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তদ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন। নিশ্চয় এতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা শ্রবণ করে। (৬৬) তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করা ই তাদের উদরস্থিত বস্তুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিষ্কৃত দুগ্ধ যা পানকারীদের জন্যে উপাদেয়। (৬৭) এবং খেজুর বৃক্ষ ও আগুর ফল থেকে তোমরা মধ্য ও উত্তম খাদ্য তৈরী করে থাক, এতে অবশ্যই বোদ্ধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (৬৮) আপনার পালনকর্তা মধুমক্ষিকাকে আদেশ দিলেন : পর্বতগায়ে, বৃক্ষ এবং উঁচু চালে গৃহ তৈরী কর, (৬৯) এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন পালনকর্তার উম্মুক্ত পশুসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রক্তের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (৭০) আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের মৃত্যুদান করেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মণ্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা জানত সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান। (৭১) আল্লাহ তাআলা জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অতএব যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে স্বীয় জীবিকা থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করে? (৭২) আল্লাহ তোমাদের জন্যে তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া পয়লা করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। অতএব তারা কি মিথ্যা বিষয়ে বিশাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে?

গোবর ও রক্তের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কার দুধ বের করা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : জন্তুর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলীতে একত্রিত হলে পাকস্থলী তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলীর এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নীচে বসে যায় এবং দুধ উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যকৃত এই তিন প্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক করে রগের মধ্যে চালায় এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌঁছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়, যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য ব্যবহার করা দ্বীনদারীর পরিপন্থী নয়। তবে শর্ত এই যে, হালাল পশ্বে উপার্জন করতে হবে এবং অপব্যয় যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হযরত হাসান বসরী তাই বলেছেন।—(কুরতুবী)

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : তোমরা আহারের সময় এরূপ দোয়া দোয়া করবে —
 اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَاطْعَمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং ভবিষ্যতে আরও উত্তম খাদ্য দিন।

তিনি আরও বলেছেন : দুধ পান করার সময় এরূপ দোয়া করবে—
 اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ
 এতে বরকত দিন এবং আরও বেশী দান করুন। এর চাইতে উত্তম খাদ্য চাওয়া হয়নি। কারণ, মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চাইতে উত্তম কোন খাদ্য নেই। তাই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ, যা মায়ের স্তন থেকে সে লাভ করে।—(কুরতুবী)

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার সেসব নেয়ামতের উল্লেখ ছিল, যা মানুষের খাদ্য-দ্রব্যাদির প্রস্তুতিতে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর খোদায়ী নৈপুণ্য ও কুদরতের প্রকাশক। এ প্রসঙ্গে প্রথমে দুধের কথা উল্লেখিত হয়েছে, খোদায়ী কুদরত যা চতুষ্পদ জীব-জন্তুর উদরস্থিত রক্ত ও আবর্জনা জঞ্জালের মলিনতা থেকে পৃথক করে মানুষের জন্যে স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন খাদ্যের আকারে প্রদান করেছে, যার প্রস্তুতিতে মানুষের অতিরিক্ত নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না। এজন্যেই পূর্ববর্তী আয়াতে سُوِّدُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমরা দুধ পান করিয়েছি।

এরপরে এরশাদ করেছেন, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহের মধ্য থেকেও মানুষ তার খাদ্য ও লাভজনক সামগ্রী তৈরী করে। এই বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহ থেকে নিজেদের খাদ্যোপকরণ ও লাভজনক দ্রব্যসামগ্রীর প্রস্তুতিতে মানবীয় নৈপুণ্যেরও কিছুটা অবদান রয়েছে। আর এই নৈপুণ্যের ফলেই দু'ধরনের দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এর একটি হলো—মাদক দ্রব্য, যাকে মদ্য ও শরাব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো উত্তম জীবনোপকরণ অর্থাৎ, উত্তম রিমিক। যেমন, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা শুকিয়ে তাকে মজুতও করে নেয়া যায়। সুতরাং মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার শক্তিবলে খেজুর ও আঙ্গুর ফল মানুষকে দান করেছেন এবং তদ্বারা খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। এখন এটা তাদের নিজের অভিক্রটি যে, কি

প্রস্তুত করবে—মাদকদ্রব্য তৈরী করে বৃদ্ধি-বিবেক নষ্ট করবে, না খাদ্য তৈরী করে শক্তি অর্জন করবে?

এ তফসীর অনুযায়ী আলাচ্য আয়াত থেকে মাদকদ্রব্য অর্থাৎ, মদ হালাল হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমানের দান এবং সেগুলো ব্যবহার করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা। এগুলো সর্বব্যবস্থায় আল্লাহর নেয়ামত, যেমন যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী এবং উপাদেয় বস্তুসমূহ। অনেক মানুষ এগুলোকে অবৈধ পন্থায়ও ব্যবহার করে। কিন্তু ভ্রান্ত ব্যবহারের ফলে আসল নেয়ামতের পর্যায় থেকে তা বিয়োজিত হয়ে যায় না। তবে এখানে কোন ব্যবহারটি হালাল ও কোনটি হারাম, তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এতদসত্ত্বেও এখানে **سکر** এর বিপরীত **حسن رزق** আনার কারণে জানা গেছে যে, **سکر** ভাল রিয়িক নয়। অধিকাংশ তফসীরবিদগণের মতে **سکر** এর অর্থ মাদকদ্রব্য, যা নেশা সৃষ্টি করে।—(রুহুল মা'আনী, কুরতুবী, জাসাসাস)

(কোন কোন আলোমের মতে এর অর্থ সিকি ও এমন নবীয়, যা নেশা সৃষ্টি করে না। কিন্তু এখানে এ মতবিরোধ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।)

আলাচ্য আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। মদের নিষেধাজ্ঞা এর পরে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি নাহিল হওয়ার সময় মদ নিষিদ্ধ ছিল না। মুসলমানরা সাধারণভাবে তা পান করত। কিন্তু তখনও এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদ্যপান ভাল নয়। পরবর্তীকালে স্পষ্টতঃ শরাবকে কঠোরভাবে হারাম করার জন্যে কোরআনে বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়।—(জাসাসাস, কুরতুবী-সংক্ষিপ্ত)

وحي اوحى এখানে **وحي** শব্দটি পারিভাষিক অর্থে নয়; আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, কাউকে কোন বিশেষ কথা গোপনে এমনভাবে বৃষ্টিয়ে দেয়া যে অন্য ব্যক্তি তা বুঝতে না পারে।

النحل —জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুকৌশলের দিক দিয়ে মৌমাছি সমস্ত জন্তুর মধ্যে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে সম্বোধনও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে করেছেন। অন্য জন্তুদের ব্যাপারে সামগ্রিক নীতি হিসেবে **أَسْلَىٰ عَلَىٰ مِثْلِهِ خَلْقَهُ تَزَكَّىٰ** বলেছেন, কিন্তু এ ছোট প্রাণীটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে **وَأَوْفَىٰ ذِكْرًا** বলেছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটি অন্য জন্তুদের তুলনায় জ্ঞান-বুদ্ধি, চেতনা ও বোধশক্তিতে একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

মৌমাছির বোধশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাদের শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে সুন্দররূপে অনুমান করা যায়। এই দুর্বল প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা মানুষের রাজনীতি ও শাসননীতির সাথে চমৎকার খাপ খায়। সমগ্র আইন-শৃঙ্খলা একটি বড় মৌমাছির হাতে থাকে এবং সে-ই হয় মৌমাছিকুলের শাসক। তার চমৎকার সংগঠন ও কর্মবন্টনের ফলে গোটা ব্যবস্থা বিশুদ্ধ ও সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হয়ে থাকে। তার অভাবনীয় ব্যবস্থাও অলঙ্ঘনীয় আইন ও বিধিমালা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। স্বয়ং এই 'রাণী মৌমাছি' তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ছয় হাজার থেকে বার হাজার পর্যন্ত ডিম দেয়। দৈহিক গড়ন ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক দিয়ে সে অন্য মৌমাছির চেহারাতে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সে কর্মবন্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করে। তাদের কেউ দূর রক্ষকের কর্তব্য পালন করে এবং অজ্ঞাত ও বাইরের জনকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। কেউ কেউ ডিমের হেফাযত করে। কেউ কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের লালন-পালনে নিয়োজিত। কেউ স্থাপত্য ও

ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক কর্ম সমাধা করে। তাদের নির্মিত অধিকাংশ চাক্রে বিশ হাজার পর্যন্ত ঘর থাকে। কেউ কেউ মোম সঞ্চার করে স্থপতিদের কাছে পৌছাতে থাকে। তারা মোম দ্বারা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে। তারা বিভিন্ন উদ্ভিদের উপর জমে থাকা সাদা ধরনের গুড়া থেকে মোম সঞ্চার করে। আখের গায়ে এই সাদা গুড়া প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। কোন কোন মৌমাছি বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের উপর বসে রস চুষে। এই রস তাদের পেটে পৌঁছে মধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মধু মৌমাছি ও তাদের সন্তানদের খাদ্য এবং এটি আমাদের সবার জন্যে সুস্বাদু খাদ্যনির্বাচন এবং নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র। মৌমাছির এই বিভিন্ন দল অত্যন্ত তৎপরতা সহকারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং সম্রাজ্ঞীর প্রত্যেকটি আদেশ মনেপ্রাণে শিরোধার্য করে নেয়। যদি কোন মৌমাছি আবজ্ঞানার স্তূপে বসে যায়, তবে চাকের দারোয়ান তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দান করে এবং সম্রাজ্ঞীর আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। তাদের এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও কর্মকুশলতা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।—(আলজাওয়াহের)

এরপর ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত এই নির্দেশের যথাযথ ফলশ্রুতি বর্ণনা করা হয়েছে:

وَيَرْجُرُ مَنْ يَبْطُلُهُمْ شَرَابٌ عُثْمُكُمُ الْوَالِدَةُ فِيْهِ شَعْرٌ لِّلنَّاسِ
অর্থাৎ, তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্যে রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রঙ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন বিশেষ ফল-ফুলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার প্রভাব ও স্বাদ অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মধু সাধারণতঃ তরল আকারে থাকে তাই একে পানীয় বলা হয়েছে। এ বাক্যেও আল্লাহর একত্ব ও অপর শক্তির অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান। একটি ছোট প্রাণীর পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্বাদু পানীয় বের হয়। অথচ প্রাণীটি স্বয়ং বিষাক্ত। বিশ্বের মধ্যে এই বিষ-প্রতিষেধক বাস্তবিকই আল্লাহ তাআলার অপর শক্তির অভাবনীয় নিদর্শন। এরপর সর্বশক্তিমানের আশ্চর্যজনক কারিগরি দেখুন, অন্যান্য দুধের জন্তুর দুধ ঋতু ও খাদ্যের পরিবর্তনে লাল ও হলদে হয় না, কিন্তু মৌমাছির মধু বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে।

فِيْهِ شَعْرٌ لِّلنَّاسِ — মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্যে আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যধির জন্যেও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র। কেন হবে না, স্রষ্টার ভ্রাম্যমান যেমনি সর্বপ্রকার ফল-ফুল থেকে বলকারক রস ও পবিত্র নির্বাচন বের করে সুরক্ষিত গৃহে সঞ্চিত রাখে। যদি গাছ-গাছড়ার মধ্যে আরোগ্য লাভের উপাদান নিহিত থাকে, তবে এসব নির্বাচনের মধ্যে কেন থাকবে না? কক্ষজনিত রোগে সরাসরি এবং অন্যান্য রোগে অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসকরা সালাসা তরীক রকতে গিয়ে বিশেষভাবে একে অম্লভূক্ত করেন। এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজেও নষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয় না। এ কারণেই হাজারো বছর ধরে চিকিৎসকরা একে এলকোহল (Alcohol) — এর স্থলে ব্যবহার করে আসছেন। মধু বিরোচক এবং পেট থেকে দূষিত পদার্থ অপসারক। রসুলুল্লাহ (সাঃ) — এর কাছে কোন এক সাহাবী তাঁর ভাইয়ের অসুখের বিবরণ দিলে তিনি তাকে মধু পান করানোর মরামর্শ দেন। দ্বিতীয় দিনও এসে আবার সাহাবী বললেন : অসুখ পূর্ববৎ বহাল রয়েছে। তিনি আবারও একই পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ এল যে, অসুখে কোন পার্থক্য হয়নি, তখন তিনি বললেন : **صدق الله وكذب طعن أخيك**

অর্থাৎ, আল্লাহর উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। উদ্দেশ্য এই যে, ওষুধের দোষ নেই। রোগীর বিশেষ মেজাজের কারণে ওষুধ দ্রুত কাজ করেনি। এরপর রোগীকে আবার মধু পান করানো হয় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে شفاء শব্দটি نكرة تحت الانيات — এতে মধু যে প্রত্যেক রোগের ওষুধ, তা বোঝা যায় না। কিন্তু تنوين যা تعظيم এর অর্থ দিচ্ছে, তা থেকে অবশ্যই বোঝা যায় যে, মধুর নিরাময়শক্তি বিরাট ও স্বতন্ত্র ধরণের। কিছুসংখ্যক আল্লাহুওয়াল্লা বুয়ুর্গ এমনও রয়েছে, যারা মধু সর্বরোগের প্রতিষেধক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। তাঁরা মহান পালনকর্তার উক্তির বাহ্যিক অর্থেই এমন প্রবল ও অটল বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁরা ফোঁড়া ও চোখের চিকিৎসাও মধুর মাধ্যমে করেন এবং দেহের অন্যান্য রোগেরও। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁর শরীয়ে ফোঁড়া বের হলেও তিনি তাতে মধুর প্রলেপ দিয়ে চিকিৎসা করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন : আল্লাহ তাআলা কোরআনে কি মধু সম্পর্কে বলেননি যে, فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

—(কুরত্বী)

কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় : (১) আয়াত থেকে জানা গেল যে, বুদ্ধিবৈক্য ও চেতনা মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও আছে।

وَلَنَرَنَّاهُمْ يُعْطُونَ তবে বুদ্ধির স্তর বিভিন্নরূপ। মানুষের বুদ্ধি সবচাইতে পূর্ণাঙ্গ। এ কারণেই সে শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে। উদ্ভিদাদির কারণে যদি মানুষের বুদ্ধিবিভিন্ন ঘটে, তবে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও বিধি-বিধান পালনের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যৌমাছিকে মারতে নিষেধ করেছেন।—(আবু দাউদ)

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, মধু যৌমাছির বিষ্ঠা, না মুখের লাল। দার্শনিক এরিস্টটল কাঁচের একটি উৎকৃষ্ট পাত্রে চাক তৈরী করে তাতে যৌমাছিদেয়কে বদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি তাদের কর্মপদ্ধতি নিরীক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যৌমাছির সর্বপ্রথম পাত্রে আভ্যন্তরভাগে মোম ও কাদার একটি মোটা প্রলেপ বসিয়ে দেয় এবং আভ্যন্তরভাগ পূর্ণরূপে আবৃত না হওয়া পর্যন্ত কাজই শুরু করেনি।

(৪) فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আরও জানা গেল যে, ওষুধের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা বৈধ। কারণ, আল্লাহ তাআলা একে নেয়ামত হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

অন্যত্র বলা হয়েছে : وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَوَحَّيْنَا لِمُؤْمِنِي হাদীসে ওষুধ ব্যবহার ও চিকিৎসার প্রতি উৎসাহ দান করা

হয়েছে। কেউ কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করেন : আমরা কি ওষুধ ব্যবহার করব? তিনি বললেন : হ্যাঁ, রোগের চিকিৎসা করবে কারণ, আল্লাহ তাআলা যত রোগ সৃষ্টি করেছেন, তার ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। তবে একটি রোগের চিকিৎসা নেই। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন : সেটি কোন রোগ? তিনি বললেন : বার্বক্য।—(আবু দাউদ, কুরত্বী)

এক রেওয়াজেতে হযরত খুযায়মা (রাঃ) বলেন : একবার আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম : আমরা ঝাড়-ফুঁক করি কিংবা ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করি। এ ধরণের আত্মরক্ষা ও হেফযতের ব্যবস্থা আল্লাহর তকদীরকে পালটে দিতে পারে কি? তিনি বললেন : এগুলোও তো তকদীরেরই প্রকারভেদ।

মোটকথা, চিকিৎসা করা ও ওষুধ ব্যবহার করা যে বৈধ, এ বিষয়ে সকল আলেমই একমত এবং এ সম্পর্কে বহু হাদীস ও রেওয়াজেতে বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে ওমরের পরিবারে কাউকে বিচ্ছু দংশন করলে তাকে তিরহিয়াক (বিঘনাশক ওষুধ) পান করানো হত এবং ঝাড়-ফুঁক দ্বারা তার চিকিৎসা করা হত। তিনি একবার কাঁপুনির রোগীকে দাগ লাগিয়ে তার চিকিৎসা করেন।—(কুরত্বী)

কোন কোন সুফী, বুয়ুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা চিকিৎসা পছন্দ করতেন না। সাহাবিগণের মধ্যেও কারও কার্যক্রম থেকে তা প্রকাশ পায়। যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত ওসমান (রাঃ) তাকে দেখতে যান এবং জিজ্ঞেস করেন : আপনার অসুখটা কি? তিনি উত্তর দিলেন : আমি নিজ গোনাহের কারণে চিন্তিত। হযরত ওসমান বললেন : তাহলে কি চান? উত্তর হল : আমি পালনকর্তার রহমত প্রার্থনা করি। হযরত ওসমান বললেন : আপনি পছন্দ করলে চিকিৎসক ডেকে আনি। তিনি উত্তর দিলেন : চিকিৎসকই তো আমাকে শয্যাশায়ী করেছেন। (এখানে রূপক অর্থে চিকিৎসক বলে আল্লাহ তাআলাকে বোঝানো হয়েছে।)

কিন্তু এ ধরনের ঘটনা প্রমাণ নয় যে, তাঁরা চিকিৎসাকে মকরুহ মনে করতেন। সম্ভবতঃ এটা তখন তাদের রুচিবিরুদ্ধ ছিল। তাই তাঁরা একে পছন্দ করেননি। এটা প্রবল আল্লাহুতীতি ও আল্লাহুপ্রেম মস্ত থাকার ফলে বন্দার একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র। কাজেই একে চিকিৎসা অবৈধ অথবা মকরুহ হওয়ার প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যায় না। হযরত ওসমান (রাঃ) কর্তৃক চিকিৎসক ডেকে আনার অনুরোধ স্বয়ং চিকিৎসা বৈধ হওয়ার প্রমাণ; বরং কোন কোন অবস্থায় চিকিৎসা ওয়াজিবও হয়ে যায়।

وَيَمُوتُونَ مَرْتَدًّا — এখানে يَمُوتُونَ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বেও মানুষের উপর দিয়ে এক প্রকার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। সেটা ছিল তার প্রাথমিক শৈশবের যুগ। তখন সে কোনরূপ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ছিল না। তার হস্তপদ ছিল দুর্বল ও অক্ষম। সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করতে এবং উঠা-বসা করতে অপরের মুখাপেক্ষী ছিল। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে যৌবন দান করেছেন। এটা ছিল তার উন্নতির যুগ। এরপর ক্রমানুয়ে তাকে বার্বক্যের স্তরে পৌঁছে দেন। এ স্তরে তাকে দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষয়ের ঐ সীমায় প্রত্যাবর্তিত করা হয়, যা শৈশবে ছিল।

أَكْذَلُ الْعُمُرِ বলে বার্বক্যে সে বয়স বোঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের

দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এ বয়স থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন :

اللهم انى اعزبك من سوء العمر وفى رواية من ان ارد الى....

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি মন্দ বয়স থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। এক রেওয়াজেতে আছে, অকর্মণ্য বয়সে ফিরিয়ে দেয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

أَرْزُلُ الشَّيْءُ এর নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। তবে উল্লেখিত সংজ্ঞাটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কোরআনও এর প্রতি لِكُلِّ لَكُمْ رِزْقٌ وَعَدْلٌ عَلِيمٌ বলে ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ, যে বয়সে হুশ-জ্ঞান অবশিষ্ট না থাকে। ফলে সেসব জানা বিষয়ও ভুলে যায়।

أَرْزُلُ الشَّيْءُ —এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আরও অনেক উক্তি বর্ণিত রয়েছে।

কেউ ৮০ বছর বয়সকে এবং কেউ ৯০ বছর বয়সকে أَرْزُلُ الشَّيْءُ বলেছেন। হযরত আলী (রাঃ) থেকে ৭৫ বছর বয়সের কথা বর্ণিত আছে।—(মাযহারী)

لِكُلِّ لَكُمْ رِزْقٌ وَعَدْلٌ عَلِيمٌ বার্ষিকের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছার পর মানুষের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে এক বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার পর পুনরায় অজ্ঞ হয়ে যায়। সে আদ্যোপান্ত স্মৃতিভ্রমে পতিত হয়ে প্রায় সদ্য প্রসূত শিশুর মত হয়ে যায়, আর কোন কিছু খবর থাকে না। হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি নিয়মিত কোরআন তেলাওয়াত করে সে এরূপ অবস্থায় পতিত হবে না।

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ — নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী।

তিনি জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেকের বয়স জানেন এবং শক্তি দ্বারা যা চান, করেন। তিনি ইচ্ছা করলে শক্তিশালী যুবকের উপর অকর্মণ্য বয়সের লক্ষণাদি চাপিয়ে দেন এবং ইচ্ছা করলে একশ' বছরের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকেও শক্ত সমর্থ যুবক করে রাখেন। এসবই ল-শরীক সত্তার ক্ষমতাবানী।

জীবিকার শ্রেণী-বিভেদ মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ : আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে যে, দারিদ্র্য, ধনাত্যাগ এবং জীবিকার মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া যেমন, কারো দারিদ্র্য হওয়া কিংবা ধনী ও মধ্যবিত্ত হওয়া কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এটা আল্লাহর অপার রহস্য ও মানবিক উপকারিতার তাগিদ এবং মানব জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। যদি এরূপ না হয় এবং ধন-দৌলতে সব মানুষ সমান হয়ে যায়, তবে বিপুল-ব্যবস্থায় ক্রটি ও অনর্থ দেখা দেবে। তাই যেদিন থেকে পৃথিবীতে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে, সেদিন থেকে কোন যুগে ও কোন সময়ে সব মানুষ ধন-সম্পদের দিক দিয়ে সমান হয়নি এবং হতে পারে না। যদি কোথাও জোর-জবরদস্তিমূলকভাবে এরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে কিছু দিনের মধ্যে মানবিক কাজ-কারবারে ক্রটি ও অনর্থ দৃষ্টিগোচর হবে। আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবজাতিরকে বুদ্ধি, মেধা, বল, শক্তি ও কর্মদক্ষতায় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে উচ্চ, নীচ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্যমান রয়েছে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারে না। এরই অপরিহার্য পরিণতি হিসেবে ধন-সম্পদেও বিভিন্ন শ্রেণী থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতার যথোপযুক্ত প্রতিদান পেতে পারে। যদি প্রতিভাবান যোগ্য ব্যক্তিকে অযোগ্যের সমান করে দেয়া হয়, তবে যোগ্য ব্যক্তির

মনোবল ভেঙ্গে যাবে। যদি জীবিকায় তাকে অযোগ্যদের সমপর্যায়েই থাকতে হয়, তবে কিসে তাকে অধ্যবসায়, গবেষণা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে? এর অনিবার্য পরিণতিতে কর্মদক্ষতায় বন্ধ্যাত্ব নেমে আসবে।

সম্পদ পুঞ্জীভূত করার বিরুদ্ধে কোরআনের বিধান : তবে সুহিকর্তা যেখানে বুদ্ধিগত ও দেহগত শক্তিতে একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এর অধীনে রিযিক ও ধন-সম্পদে তারতম্য করেছেন, যেখানে এই অটল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, সম্পদের ভাগ্য এবং জীবিকা উপার্জনের কেন্দ্রসমূহ যেন কতিপয় ব্যক্তি অথবা বিশেষ শ্রেণীর অধিকারভুক্ত না হয়ে পড়ে, ফলে অন্যান্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির কাজ করার ক্ষেত্রেই অবশিষ্ট না থাকে। অথচ সুযোগ পেলে তারা দৈহিক শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করতে পারে। কোরআন পাক সূরা হাশের বলে : كُنْ لَا يَكُونُ دُولَةً

অর্থাৎ, আমি সম্পদ বন্টনের আইন এজন্যে তৈরী করেছি, যাতে ধন-সম্পদ পুঞ্জিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

إِنَّ اللَّهَ يَقَعْلُ مَا يَرِيدُ — আলোচ্য আয়াতের অধীনে এখানে এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য ছিল যে, ধন-সম্পদে তারতম্য হওয়া একটি স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক এবং মানবিক উপকারিতার সাথে সঙ্গতিশীল ব্যাপার।

جَعَلَ لِكُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ رِزْقًا — আয়াতে একটি প্রধান নেয়ামত বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের স্ত্রী নির্ধারণ করেছেন, যাতে পরস্পর ভালবাসাও পূর্ণরূপে হয় এবং মানব জাতির আভিজাত্য এবং মাযাত্ব্যও অব্যাহত থাকে।

وَجَعَلَ لِكُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ رِزْقًا وَحَدَّ — অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র পয়দা করেছেন।

এখানে প্রশ্নধান যোগ্য এই যে, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতা উভয়ের সহযোগে জন্মগ্রহণ করে। আলোচ্য আয়াতে তা শুধু জননী থেকে পয়দা করার কথা বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সন্তান প্রসব ও সন্তান প্রজননে পিতার তুলনায় মাতার দখল বেশী। পিতা থেকে শুধু একটি বীৰ্যবিন্দু নির্গত হয়। এ বিন্দুর উপর দিয়ে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে মানবকৃতিতে পরিণত হওয়া, তাতে প্রাণ সঞ্চার হওয়া, সর্বশক্তিমানের এসব সৃষ্টিজনিত ক্রিয়াকর্মের স্থান মাতার উদরেই। এজন্যেই হাদীসে মাতার হককে পিতার হক থেকে অগ্রা রাখা হয়েছে।

এ ব্যাকে পুত্রদের সাথে পৌত্রদের কথা উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ দম্পতি সৃষ্টির আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব বংশের স্থায়িত্ব, যাতে সন্তান ও সন্তানের সন্তান হয়ে মানব জাতির স্থায়িত্বের ব্যবস্থা হয়।

অতঃপর وَرَزَقْنَاهُم مِّنْ طِينٍ বলে মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জন্মের পর মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাও সরবরাহ করেছেন। আয়াতে ব্যবহৃত حَفْلَةٌ শব্দের আসল অর্থ সাহায্যকারী, সেবক। সন্তানদের জন্যে এ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতা-মাতার সেবক হওয়া সন্তানের কর্তব্য।—(কুরত্ববী)

فَلَا تَصْرُفُوهَا إِلَى الْيَمَنِ وَلَا إِلَى الْمَغْنَمِ - বাক্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য কুটিয়ে তোলা

হয়েছে। এ সত্যের প্রতি তাছিলা প্রদর্শনই কাকেরসুলভ সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়। সত্যটি এই যে, সাধারণভাবে মানুষ আল্লাহ তাআলাকে মানবজাতির অনুরূপ মনে করে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, যেমন রাজা-বাদশাহকে আল্লাহর দৃষ্টান্তরূপে পেশ করে। অতঃপর এই ভ্রান্ত দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে আল্লাহর কুদরতের ব্যবস্থাকেও রাজা-বাদশাহদের ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে বলতে থাকে যে, কোন রাষ্ট্রে একা বাদশাহ যেমন সমগ্র দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিচালনা করতে পারেন না, অধীনস্থ মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদেরকে ক্ষমতা অর্পণ করে তাদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলার অধীনে আরও কিছুসংখ্যক উপাস্য ও থাকা প্রয়োজন, যারা আল্লাহর কাজে সাহায্য করবে। মূর্তি পূজারী ও মূশরিকদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা তাই। আলোচ্য বাক্যটি তাদের সন্দেহের মূল উপড়ে দিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ তাআলার জন্যে সৃষ্টজীবনের দৃষ্টান্ত পেশ করা একান্তই নিবৃদ্ধিত। তিনি দৃষ্টান্ত, উদাহরণ এবং আমাদের ধারণা-কল্পনার অনেক উর্ধ্বে।

لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا - এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জ্ঞান লাভ মানুষের

ব্যক্তিগত নৈপুণ্য নয়। জন্মের সময় তার কোন জ্ঞান ও নৈপুণ্য থাকে না। অতঃপর মানবিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে কিছু কিছু জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি শিক্ষা দেয়া হয়। এসব জ্ঞান শিক্ষায় পিতামাতা ও গুণ্ডাদের কোন ভূমিকা নেই। সর্বপ্রথম তাকে কান্না শিক্ষা দেয়া হয়। তার এ গুণটিই তখন তার যাবতীয় অভাব মেটায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উত্তাপ কিংবা অন্য যে কোন কষ্ট অনুভব করলেই কান্না ছুড়ে দেয়। সর্বশক্তিমান তার অভাব মেটানোর জন্যে পিতামাতার অন্তরে বিশেষ স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে দেন। শিশুর আওয়াজ শুনেই তারা তার কষ্ট বুঝে ও তা দূর করতে সচেষ্ট হয়। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে শিশুকে এ কান্না শিক্ষা দেয়া না হত, তবে কে তাকে শিক্ষা দিত যে, কোন অসুবিধা দেখা দিলেই এভাবে শব্দ করতে হবে? এর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তাকে এলহামের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্যলাভ করার জন্যে মাড়ি ও ঠোঁটকে কাজে লাগাতে হবে। এ শিক্ষা প্রাকৃতিক ও সরাসরি না হলে কোন গুণ্ডাদের সাহা ছিল এ সদ্যজাত শিশুকে মুখ চালনা ও স্তন চোষা শিক্ষা দেয়া। এমনিভাবে তার প্রয়োজন যতই বাড়তে থাকে, সর্বশক্তিমান তাকে পিতামাতার মধ্যস্থতা ছাড়াই প্রাকৃতিকভাবে শিক্ষাদান করেন। কিছুদিন পর তার মধ্যে এমন নৈপুণ্য সৃষ্টি হতে থাকে যে, পিতামাতা ও নিকটস্থ অন্যান্য লোকের কথাবার্তা শুনে কিংবা কোন কোন বস্তু দেখে কিছু শিখতে থাকে। অতঃপর শ্রুত শব্দ ও দেখা বিষয় নিয়ে চিন্তা করার ও বোঝার নৈপুণ্য সৃষ্টি হয়।

وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ - অর্থাৎ, জন্মের শুরুতে যদিও কোন কিছু

জ্ঞান মানুষের মধ্যে ছিল না, কিন্তু সর্বশক্তিমান তার অস্তিত্বের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের অভিব্যক্তি উপকরণ স্থাপন করে দিয়েছেন। এসব উপকরণের মধ্যে সর্বপ্রথম سمع অর্থাৎ শ্রবণশক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একে অশ্রু আনার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, মানুষের সর্বপ্রথম জ্ঞান এবং সর্বাধিক জ্ঞান কানের পথেই আগমন করে। সূচনালগ্নে চক্ষু বন্ধ থাকে; কিন্তু কান শ্রবণ করে। এরপরও চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ সারা জীবনে যত জ্ঞান অর্জন

(৭৩) তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুর ইবাদত করে, যে তাদের জন্যে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল থেকে সামান্য রুখী দেওয়ারও অধিকার রাখে না এবং শক্তিও রাখে না। (৭৪) অতএব, আল্লাহর কোন সদৃশ সাব্যস্ত করা না, নিচয় আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। (৭৫) আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, অপরের মালিকানাধীন গোলামের, যে কোন কিছু উপর শক্তি রাখে না এবং এমন একজন যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে চমৎকার রুখী দিয়েছি। অতএব, সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে। উভয়ে কি সমান হয়? সব প্রশংসা আল্লাহর, কিন্তু অনেক মানুষ জানে না। (৭৬) আল্লাহ আরেকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, দু'ব্যক্তির, একজন বোবা কোন কাজ করতে পারে না। সে মালিকের উপর বোঝা। যেদিকে তাকে পাঠায়, কোন সঠিক কাজ করে আসে না। সে কি সমান হবে এ ব্যক্তির, যে ন্যায় বিচারের আদেশ করে এবং সরল পথে কায়ম রয়েছে? (৭৭) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য আল্লাহর কাছেই রয়েছে। কিয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন ঢোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী। নিচয় আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান। (৭৮) আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর। (৭৯) তারা কি উড়ন্ত পাখীকে দেখে না? এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আজীবন রয়েছে। আল্লাহ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে রাখে না। নিচয় এতে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَانِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتَانَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ خَلْقِ ظِلَالٍ مَا جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْبَأْسَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ رَحْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْمِعُونَ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝ يَتَّبِعُونَ ذِمَّتَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكُرُوهَا وَالَّذِي لَا يَكْفُرُونَ ۝ وَيَوْمَ تَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْمَعُونَ ۝ وَلِلَّذِينَ إِذَا رَأَوْا الْقُلُوبَ لَا يَخْفَافُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرُّوا لَهُمْ وَالَّذِينَ أُولُوا بِآَهْلَائِهِمْ شَرُّوا لَهُمُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَكْثَرُ شَرًّا وَآَلَاءُ اللَّهِ لَا يُؤْمَرُونَ الْقَوْلَ أَنْتُمْ لَكُمْ يَوْمَ ۝ وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ مِيزَانِ السَّكَمِ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

(৬০) আল্লাহ করে দিয়েছেন তোমাদের গৃহকে অবস্থানের জায়গা এক চতুর্দশ জন্তর চামড়া দ্বারা করেছে তোমার জন্যে তাঁবুর ব্যবস্থা। তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থান কালে পাও। তেড়ির পশম, উটের বাবরি চুল ও ছাগলের লোম দ্বারা কত আসবাবপত্র ও ব্যবহারের সামগ্রী তৈরী করেছে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। (৬১) আল্লাহ তোমাদের জন্যে সৃষ্টিত বস্ত্র দ্বারা ছায়া করে দিয়েছেন এক পাহাড়সমূহ তোমাদের জন্যে আব্রুসোপনের জায়গা করেছে এক তোমাদের জন্যে পোশাক তৈরী করে দিয়েছেন, যা তোমাদেরকে গ্রীষ্ম এক বিশদের সময় রক্ষা করে। এমনিভাবে তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের পূর্ণতা দান করেন, যাতে তোমরা আব্রুসবর্ণ কর। (৬২) অজ্ঞপ্তর যদি জরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবে আপনাদের কাছ হল সুশৃঙ্খলভাবে পৌছে দেয়া যাবে। (৬৩) তারা আল্লাহর অনুগ্রহ নিন, এরপর অস্বীকার করে এক তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ। (৬৪) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন কর্মরকারী দাঁড় করায়, তখন কক্ষেরদেয়কে অনুমতি দেয়া হবে না এক তাদের তওবাও গ্রহণ করা হবে না। (৬৫) যখন জালেমরা আযাব প্রত্যাক করবে, তখন তাদের থেকে তা লুপ্ত করা হবে না এক তাদেরকে কোন অবকাশ দেয়া হবে না। (৬৬) মুশরিকরা যখন ঐ সব বস্তুকে দেখবে, যেসবকে তারা আল্লাহর সাথে পরীক সম্ব্যস্ত করেছিল, তখন করবে : হে আমাদের পালনকর্তা, এরই ভরা আমরা তাদের শেরেকীর উপাদান, তোমাকে হেড় আশ্রয় যদিও দাকভায়। তখন ওরা তাদেরকে বলবে : তোমরা মিথ্যাবাদী। (৬৭) সেদিন তারা আল্লাহর সামনে আব্রুসবর্ণ করবে এক তারা যে মিথ্যা অপবাদ দিত তা বিস্মৃত হবে।

করে, তন্মধ্যে কানে শ্রুত জ্ঞানই সর্বাধিক। চোখে দেখা জ্ঞান তুলনামূলকভাবে কম।

এতদুভয়ের পর ঐসব জ্ঞানের পালা, যেগুলো মানুষ শোনা ও দেখা বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে অর্জন করে। কোরআনের উক্তি অনুযায়ী একাজ্জি মানুষের অন্তরের। তাই তৃতীয় পর্যায়ে অন্তে বলা হয়েছে। এটা ফুাদ এর বহুবচন। অর্থ অন্তর। দার্শনিকরা সাধারণভাবে মানুষের মস্তিষ্কে জ্ঞানবুদ্ধি ও বোধশক্তির কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কোরআনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কোন কিছু বোঝার ব্যাপারে যদিও মস্তিষ্কের প্রভাব রয়েছে, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধির আসল কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর।

এখানে আল্লাহ তাআলা শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির উল্লেখ করেছেন ; বাকশক্তি ও জিহ্বার কথা উল্লেখ করেননি। কেননা, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাকশক্তির প্রভাব নেই ; বাকশক্তি বরং জ্ঞান প্রকাশের উপায়। এছাড়া ইমাম কুরতুবী বলেন : ‘শ্রবণশক্তির সাথে বাকশক্তির উল্লেখও প্রসঙ্গতঃ হয়ে গেছে। কেননা, অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি কানে শোনে, সে মুখে কথাও বলে। বোবা কথা বলতে অক্ষম, সে কানের দিক থেকেও বধির। সম্ভবতঃ তার কথা না বলার কারণই হচ্ছে কানে কোন শব্দ না শোনা। শব্দ শুনলে হয়তো সে তা অনুসরণ করে বলাও শিখত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا — এখানে بَيْت শব্দটি سَكَنًا

—এর বহুবচন। রাত্রিযাপন করা যায় এমন গৃহকে বলা হয়। ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীরে বলেন : ‘যে বস্ত্র তোমার মাথার উপরে রয়েছে এবং তোমাকে ছায়া দান করে, তা ছাদ ও আকাশ বলে কথিত হয়। যে বস্ত্র তোমার অন্তিহ্নকে বহন করছে, তা যমিন এবং যে বস্ত্র চারদিক থেকে তোমাকে আবৃত করে রাখে, তা প্রাচীর। এগুলো সব কাছাকাছি একত্রিত হয়ে গেলে তাই বَيْت তথা গৃহে পরিণত হয়।’

وَمِنْ أَصْوَانِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا থেকে প্রমাণিত হল

যে, জীব-জন্তুর চামড়া, লোম ও পশম ব্যবহার করা মানুষের জন্য হালাল। এতে জন্তুটি যবেহকৃত হওয়া অথবা মৃত হওয়ারও কোন শর্ত নেই। এমনিভাবে যে জন্তুর পশম বা চামড়া আহরণ করা হবে, সেটির গোশত হালাল কি হারাম সেটা বিচার করারও কোন শর্ত নেই। সব রকম জন্তুর চামড়াই লবণ দিয়ে শুকানোর পর ব্যবহার করা হালাল। লোম ও পশমের উপর জন্তুর মৃত্যুর কোন প্রভাবই পড়ে না। তাই সেটি যথারীতি শুকিয়ে ব্যবহারযোগ্যযোগ্য করে নিলেই তা পাক হয়ে যায় এবং সেটি ব্যবহার করা হালাল ও জায়েয হয়ে যায়। ইমাম আমম আবু হানিফা (রহঃ)—এর মতমত্ব তাই। তবে শূকরের চামড়া ও যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও লোম-পশম অপবিত্র ও ব্যবহারের অযোগ্য।

سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ — এখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে রক্ষা করাকে

মানুষের পোশাকের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। অখচ পোশাক মানুষকে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুর প্রভাব থেকেই রক্ষা করে। ইমাম কুরতুবী ও অন্যান্য তফসীরবিদগণ এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন যে, কোরআনে পাক আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বপ্রথম এতে আরবদেরকে সম্মোদন করা হয়েছে। তাই এতে আরবদের অভ্যাস ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে

النحل

২৫৮

১৮



(৮৮) যারা কাকের হয়েছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদেরকে আযাবের পর আযাব বাড়িয়ে দেব। কারুণ, তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। (৮৯) সেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি একজন কর্নাকারী দাঁড় করাব তাদের বিশকে তাদের মধ্যে থেকেই এক তাদের বিষয়ে আপনাকে সাক্ষীরূপে উপস্থাপন করব। আমি আপনার প্রতি গ্রহ নাখিল করেছি যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট কর্না, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ। (৯০) আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণত, সদাচারণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এক তিনি অশ্লীলতা, অসম্মত কাজ এবং অব্যাহতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন — যাতে তোমরা সুরশ রাখ। (৯১) আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছে। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। (৯২) তোমরা ঐ মহিলার মত হযো না, যে পরিশ্রমের পর কাটা সূতা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলে, তোমরা নিজেদের কসমসমূহকে পারস্পরিক প্রবন্ধনার বাহানরূপে গ্রহণ কর এজন্যে যে, অন্য দল অপেক্ষা একদল অধিক কসমতাবান হয়ে যায়। এতদ্বারা তো আল্লাহ শুধু তোমাদের পরীক্ষা করেন। আল্লাহ অবশ্যই কিয়ামতের দিন প্রকাশ করে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা কলহ করত। (৯৩) আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই জিহাদিসিত হবে।

বক্তব্য রাখা হয়েছে। আরব হ'ল গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। সেখানে বরফ জমা ও শীতের কল্পনা করা কঠিন। তাই শুধু গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। হযরত খানকী (রহঃ) বয়ানুল কোরআনে বলেন : কোরআন পাক এ সূরার শুরুতে لَكُم فِيهَا رَحْمَةٌ বলে গোশাকের সাহায্যে শীত থেকে আত্মরক্ষা ও উত্তাপ হাসিল করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছিল। তাই এখানে শুধু উত্তাপ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে।

আনুযমিক জাতক বিষয়

وَرَزَّاتُكَ عَلَيْكَ الْكُتُبَ نَبِيًّا لِكُلِّ شَيْءٍ — এতে কোরআনকে

যাবতীয় বিষয়ের বিশ্লেষণকারী বলা হয়েছে। 'যাবতীয় বিষয়' বলে প্রধানতঃ দুইনের যাবতীয় বিষয় বোঝানো হয়েছে। কেননা, গুহী ও নুগুয়তের লক্ষ্য এগুলোর সাথেই সম্পৃক্ত। তাই মানুষের আয়সসাধ্য অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উদ্ধৃত দৈনন্দিন সমস্যাদির তৈরী সমাধান কোরআন পাকে অনুসন্ধান করা চুল। প্রসঙ্গতঃ এসব সমস্যাদির সমাধানের ব্যাপারে যে সব ইঙ্গিত রয়েছে, মানবীয় স্বেচ্ছার সংযোগে সেসব থেকেই সমাধান বুঝে বের করা সম্ভব। এমন প্রশ্ন থাকে যে, কোরআন পাকে অনেক দ্বীনী ইঙ্গিতটি বিষয়ও সমিভ্যারে বর্ণিত হয়নি। এমনতবস্থায় কোরআনকে نَبِيًّا لِكُلِّ شَيْءٍ — বলা যথার্থ হবে কিরূপে?

এর উত্তর এই যে, কোরআন পাকে সব বিষয়েরই ফুলনীতি বিদ্যমান রয়েছে। সেসব ফুলনীতির আলোকেই রসুল্লাহ (সঃ) এর হাদীস মাসআলা কর্না করে। কিছু কিছু বিবরণ ইচ্ছা ও ক্রিয়াসের আওতায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, হাদীস, ইচ্ছা ও ক্রিয়াস থেকে যেসব মাসআলা নির্গত হয়েছে, সেগুলোও পরোক্ষভাবে কোরআনেরই বর্ণিত মাসআলা।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ — আয়াত সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন : এটি হচ্ছে কোরআন পাকের ব্যাপকতর অর্থবোধক একটি আয়াত। — (ইবনে-কাসীর)

হযরত আকসাম ইবনে সায়কী (রাঃ) নামক একজন সাহাবী এ আয়াত শ্রবণ করেই মুসলমান হয়েছিলেন। ইমাম ইবনে-কাসীর হাক্ষে হাদীস আবু ইয়লাল গ্রহ মা'রেকাতুচ্ছহাবা থেকে সনদ-সহ এ ঘটনা কর্না করেন যে, আকসাম ইবনে সায়কী খীয় গোত্রের সর্দার ছিলেন। রসুল্লাহ (সঃ) এর নুগুয়ত দাবী ও ইসলাম প্রচারের সংবাদ পেয়ে তিনি রসুল্লাহ (সঃ) এর কাছে আপসন করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু গোত্রের লোকেরা বলল : আপনি সবার প্রধান। আপনার নিজের যাগুয়া সসীটীন নয়। আকসাম বললেন : তবে গোত্র থেকে দুজন লোক মনোনীত কর। তারা সেখানে যাবে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে জানাবে। মনোনীত দু'ব্যক্তি রসুল্লাহ (সঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরব করল : আমরা আকসাম ইবনে সায়কীর পক্ষ থেকে দু'টি বিষয় জানতে এসেছি। আকসামের প্রশ্ন দু'টি এই : من انت وما انت ؟ আপনি কে এবং কি ?

রসুল্লাহ (সঃ) বললেন : প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আবদুল্লাহর পূর্ব মুহাম্মদ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আল্লাহর দাস ও তাঁর রসুল। এরপর তিনি সূরা নহলর এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ — উত্তর দূত অনুগ্রহ করল

এ বাক্যগুলো আমাদেরকে আবার শোনানো হোক। রসূলুল্লাহ (সঃ) আয়াতটি একাধিকবার তেলাওয়াত করলেন। ফলে শেষ পর্যন্ত আয়াতটি তাদের মুখস্থ হয়ে গেল।

দুতুয় আকসাম ইবনে সাযফীর কাছে ফিরে এসে উল্লিখিত আয়াত শুনিতে দিল। আয়াতটি শুনেই আকসাম বলল : এতে বোঝা যায় যে, তিনি উত্তম চরিত্রের আদেশ দেন এবং মন্দ ও অপকৃত চরিত্র অবলম্বন করতে নিষেধ করেন। তোমরা সবাই তাঁর ধর্মের দীক্ষা নাও, যাতে তোমরা অন্যদের অগ্রে থাক এবং পেছনে অনুসারী হয়ে না থাক।—(ইবনে-কাসীর)।

এমনিভাবে হযরত ওসমান ইবনে মফউন (রাঃ) বলেন : গুরুতে আমি লোকমুখে শুনে বোঝার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আমার অন্তরে ইসলাম বহুমূল ছিল না। একদিন আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, হঠাৎ তাঁর উপর ওহী অবতরণের লক্ষণ প্রকাশ পেল। কতিপয় বিচিত্র অবস্থার পর তিনি বললেন : আল্লাহর দূত এসেছিল এবং এই আয়াত আমার প্রতি নাযিল হয়েছে। হযরত ওসমান ইবনে মফউন বলেন : এই ঘটনা দেখে এবং আয়াত শুনে আমার অন্তরে ঈমান বহুমূল ও অটল হয়ে গেল এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর মহব্বত আমার মনে আসন পেতে বসল। ইবনে কাসীর এ ঘটনা বর্ণনা করে এর সনদকে হাসান ও নির্ভুল বলেছেন।

রসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াত গুলীদ ইবনে মুগীরার সামনে তেলাওয়াত করলে সে-ও প্রভাবান্বিত হয় এবং কুরায়শদের সামনে ভাষণ দেয় যে :

وَاللّٰهُ اَنْ لَّهٗ خَلَاوَةٌ وَّ اَنْ عَلَيْهِ لَطَاوَةٌ وَّ اَنْ اَصْلَهُ لَمَوْقٌ وَّ اَعْلَاهُ لَشْمٌ
وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ بَشَرٍ -

আল্লাহর কসম, এতে একটি বিশেষ মাখুফ রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিশেষ রঙকম ও ঔজ্জ্বল্য রয়েছে। এর মূল থেকে শাখা ও পাতা গজাবে এবং শাখা ফলস্ব হবে। এটা কখনও কোন মানুষের বাক্য হতে পারে না।

তিনটি বিষয়ের আদেশ ও তিনটি বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন : সুবিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে নিষেধ করেছেন : অঙ্গীলতা, যাবতীয় মন্দ কাজ এবং জুলুম ও উৎপীড়ন। আয়াতে ব্যবহৃত ছয়টি শব্দের পারিভাষিক অর্থ ও সংজ্ঞার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

عدل — শব্দের আসল ও আভিধানিক অর্থ সমান করা। এর সাথে সম্বন্ধ রেখেই বিচারকদের জনগণের বিরোধ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় সুবিচারমূলক ফয়সালা করাকে عدل বলা হয়।
أَنْ تَكُونُوا يَدًا — আয়াতে এ অর্থই বিধৃত হয়েছে। এ অর্থের দিক দিয়েই স্বম্পত্তা ও বাহুল্যের মাঝামাঝি সমতাকেও عدل বলা হয়। কোন কোন তফসীরবিদ এ অর্থের সাথে সম্বন্ধ রেখেই আলোচ্য আয়াতে বাইরে ও ভিতরে সমান হওয়া দ্বারা عدل শব্দের তফসীর করেছেন। অর্থাৎ, عدل এমন উক্তি অথবা কর্ম, যা মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে প্রকাশ পায় এবং অন্তরেও তদ্রূপ বিশ্বাস থাকে। বাস্তব সত্য এই যে, এখানে عدل শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে উপরোক্ত সব অর্থই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত এসব অর্থের মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই।

ইবনে আরবী বলেন : ‘আদল’ শব্দের প্রকৃত অর্থ সমান করা। এরপর বিভিন্ন সম্পর্কের কারণে এর অর্থ বিভিন্ন হয়ে যায়। উদাহরণতঃ প্রথম আদল হচ্ছে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে আদল করা। এর অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলার হককে নিজের ভোগবিলাসের উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের কামনা-বাসনার উপর অগ্রাধিকার দেয়া, আল্লাহর বিধানাবলী পালন করা এবং নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা।

দ্বিতীয় আদল হচ্ছে মানুষের নিজের সাথে আদল করা। তা এই যে, দৈহিক ও আত্মিক ধ্বংসের কারণাদি থেকে নিজেকে বাঁচানো, নিজের এমন কামনা পূর্ণ না করা যা পরিণামে ক্ষতিকর হয় এবং সবার ও অস্পষ্টত্ব অবলম্বন করা, নিজের উপর অহেতুক বেশী বোঝা না চাপানো।

তৃতীয় আদল হচ্ছে নিঃস্বার্থ ও সত্য সত্য সত্যের সাথে সন্তোষ ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করা, ছোটবড় ব্যাপারে বিশৃঙ্খলতা না করা, সবার জন্যে নিজের মনের কাছে সুবিচার দাবী করা এবং কোন মানুষকে কষ্ট অথবা কার্য দ্বারা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কোনরূপ কষ্ট না দেয়া।

এমনিভাবে বিচারে রায় দেয়ার সময় পক্ষপাতিত্ব না করে সত্যের অনুকূলে রায় দেয়াও এক প্রকার আদল এবং প্রত্যেক কাজে স্বম্পত্তা ও বাহুল্যের পথ বর্জন করে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করাও আদল। আবু আবদুল্লাহ রাযী এ অর্থ গ্রহণ করেই বলেছেন যে, আদল শব্দের মধ্যে বিশ্বাসের সমতা, কার্যের সমতা, চরিত্রের সমতা—সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।—(বাহরেমুহীত)

ইমাম কুরতুবী আদলের অর্থ প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিবরণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ বিবরণ খুবই চমৎকার। এ থেকে আরও জানা গেল যে, আয়াতের আদল শব্দটিই যাবতীয় উত্তম কর্ম ও চরিত্র অনুসরণ এবং মন্দ কর্ম ও চরিত্র থেকে বেঁচে থাকার অর্থে পরিব্যাপ্ত।

الْإِحْسَانُ — এর আসল আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। তা দু’প্রকার। এক—কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসকে সুন্দর ও ভাল করা। দুই—কোন ব্যক্তির সাথে ভাল ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা। দ্বিতীয় অর্থের জন্যে আরবী ভাষায় احسان শব্দের সাথে فى ব্যব্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, এক আয়াতে وَاحْسِنْ كَمَا احْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ বলা হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী বলেন : আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উপরোক্ত উভয় প্রকার অর্থই এতে শামিল রয়েছে। প্রথম প্রকার এহসান অর্থাৎ, কোন কাজকে সুন্দর করা—এটাও ব্যাপক ; অর্থাৎ, এবাদত, কর্ম, চরিত্র, পারস্পরিক লেনদেন ইত্যাদিকে সুন্দর করা।

প্রসিদ্ধ ‘হাদীসে-জিবরাইলে’ স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) এহসানের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে এবাদতের এহসান। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহর এবাদত এভাবে করা দরকার, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাছ। যদি আল্লাহর উপস্থিতির এমন স্তর অর্জন করতে না পার, তবে এতদূর বিশ্বাস তো প্রত্যেক এবাদতকারীরই থাকা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা তার কাজ দেখছেন। কেননা, আল্লাহর জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে কোন কিছু থাকতে পারে না — এটা ইসলামী বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশ ইহসান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এতে এবাদতের এহসান এবং যাবতীয় কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসের এহসান অর্থাৎ এগুলোকে প্রার্থিত উপায়ে বিশুদ্ধ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করা বোঝানো হয়েছে। এছাড়া মুসলমান, কাফের মানুষ ও

জীব-জন্তু নির্বিশেষে সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করার বিষয়টিও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম কুরতুবী বলেন : যার ঘরে তার বিড়াল খাবার ও অন্যান্য দরকারী বস্তু না পায় এবং যার পিঁজরায় আবদ্ধ পাখীর পুরোপুরি দেখাশোনা করা না হয়, সে যত এবাদতই করুক, এহসানকারী বলে গণ্য হবেনা।

আয়াতে প্রথমে আদল ও পরে এহসানের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : আদল হচ্ছে অন্যের অধিকার পুরোপুরি দেয়া এবং নিজের অধিকার পুরোপুরি নেয়া — কমও নয়, বেশীও নয়। তোমাকে কেউ কষ্ট দিলে তুমি তাকে ততটুকুই কষ্ট দাও, যতটুকু সে দিয়েছে। পক্ষান্তরে এহসান হচ্ছে অপরকে তার প্রাপ্য অধিকারের চাইতে বেশী দেয়া এবং নিজের অধিকার নেয়ার ব্যাপারে কড়া কড়ি না করা এবং কিছু কম হলেও গ্রহণ করে নেয়া। এমনিভাবে কেউ তোমাকে হাতে কিংবা মুখে কষ্ট দিলে তুমি তার কাছ থেকে সমান প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দাও। বরং সংকাজের মাধ্যমে মন্দকাজের প্রতিদান দাও। এমনিভাবে আদলের আদেশ হল ফরয ও ওয়াজিবের স্তরে এবং এহসানের আদেশ হল কৰ্মের স্তরে।

وَلْيَأْتِيُوا الْقُرْبَىٰ — এ হচ্ছে তৃতীয় আদেশ। ايتاء শব্দের অর্থ কোন কিছু দেয়া এবং قُربى শব্দের অর্থ আত্মীয়তা। القُربى শব্দের অর্থ আত্মীয়-স্বজন। অতএব وَلْيَأْتِيُوا الْقُرْبَىٰ — এর অর্থ হল আত্মীয়-স্বজনকে কিছু দেয়া। কি বস্তু দেয়া, এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু অন্য এক আয়াতে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে : وَلِذَٰلِكَ الْقُرْبَىٰ حَقٌّ — অর্থাৎ, আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দান কর। বাহ্যতঃ আলোচ্য আয়াতেও তাই বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিতে হবে। অর্থ দিয়ে আর্থিক সেবা করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে দেখাশোনা করা, মৌখিক সাহায্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই উপরোক্ত প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত। এহসান শব্দের মধ্যে আত্মীয়ের প্রাপ্য দেয়ার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু অধিক গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ তিনটি ছিল ইতিবাচক নির্দেশ। অতঃপর তিনটি নিষেধাজ্ঞা তথা নীতিবাচক নির্দেশ বর্ণিত হচ্ছে।

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ — অর্থাৎ, আল্লাহ অশ্লীলতা, অসৎ কর্ম ও সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। প্রকাশ্য মন্দকর্ম অথবা কথাকে অশ্লীলতা বলা হয়, যাকে প্রত্যেকেই মন্দ মনে করে। ‘মুনকার’ তথা অসৎকর্ম এমন কথা অথবা কাজকে বলা হয় যা হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তবিদগণ একমত। তাই মতবিরোধের কারণে কোন পক্ষকে ‘মুনকার’ বলা যায় না। প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, কর্মগত ও চরিত্রগত যাবতীয় গোনাহই মুনকারের অন্তর্ভুক্ত। بَغْي — শব্দের আসল অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। এখানে জুলুম ও উৎপীড়ন বোঝানো হয়েছে। মুনকার শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তাতে فحشاء ও بغي ও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চূড়ান্ত মন্দ হওয়ার কারণে فحشاء কে পৃথক এবং অশ্রে উল্লেখ করা হয়েছে بغي —কে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এর প্রভাব অপরাপর লোক পর্যন্ত সংক্রমিত হয়। মাঝে মাঝে এই সীমালঙ্ঘন পারস্পরিক যুদ্ধ পর্যন্ত অথবা আরও অধিক সারা বিশ্বেও অশান্তি সৃষ্টির

পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : জুলুম ব্যতীত এমন কোন গোনাহ নেই, যার বিনিময় ও শাস্তি দ্রুত দেয়া হবে। এতে বোঝা যায় যে, জুলুমের কারণে পরকালীন কঠোর শাস্তি তো হবেই; এর পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা জালেমকে শাস্তি দেন; যদিও সে বুঝতে পারে না যে, এটা অমুক জুলুমের শাস্তি। আল্লাহ তাআলা মজলুমের সাহায্য করারও অঙ্গীকার করেছেন।

আলোচ্য আয়াত যে ছটি ইতিবাচক ও নীতিবাচক নির্দেশ দান করেছে, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাফল্যের অমোঘ প্রতিকার।

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম : যেসব লেনদেন ও চুক্তি কথার মাধ্যমে জরুরী করে নেয়া হয়; অর্থাৎ, দায়িত্ব নেয়া হয়, কসম খাওয়া হোক বা না হোক, কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক বা না করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক, সবগুলোই ۴৮ শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

এই আয়াতগুলো প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহেরই ব্যাখ্যা ও পূর্ণতা প্রদান। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ন্যায়বিচার ও ইহসানের আদেশ দেয়া হয়েছিল۔ عدل শব্দের মর্মার্থের মধ্যে প্রতিজ্ঞা পূরণও অন্তর্ভুক্ত।— (কুরতুবী)

কারও সাথে অঙ্গীকার করার পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অতি বড় গোনাহ। কিন্তু এ ভঙ্গ করার কারণে কোন নির্দিষ্ট কাফফারা দিতে হয় না; বরং পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পিঠে একটি পতাকা লাগিয়ে দেয়া হবে, যা হাশরের মাঠে তার অপমানের কারণ হবে।

এমনিভাবে যে কাজের কসম খাওয়া হয়, তার বিপরীত করাও কবীরা গোনাহ। তাতে তো পরকালে বিরাট শাস্তি হবেই দুনিয়াতেও কোন কোন অবস্থায় কাফফারা জরুরী হবে।— (কুরতুবী)

أَن تَكُونُوا مِمَّنْ أَمَرُوا — এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কোন দলের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়ে গেলে পার্শ্বি স্বার্থ ও উপকারের জন্যে সে চুক্তি ভংগ করো না। উদাহরণতঃ তোমরা অনুভব কর যে, যে দল অথবা পার্টির সাথে চুক্তি হয়েছে, তারা দুর্বল ও সংখ্যায় কম কিংবা আর্থিক দিক দিয়ে দৃষ্টি। তাদের বিপরীতে অপরদল সংখ্যাগরিষ্ঠ, শক্তিশালী অথবা ধনাঢ্য। এমতাবস্থায় শুধু এই লোভে যে, শক্তিশালী ও ধনাঢ্য দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে মুনাফা অধিক হবে, প্রথম পার্টির সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা জায়েয নয়; বরং তোমরা অঙ্গীকারের অটল থাকবে এবং লাভ ও ক্ষতি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করবে। তবে যে দল অথবা পার্টির সাথে অঙ্গীকার করা হয়, তারা যদি শরীয়ত বিরোধী কাজ-কর্ম করে বা করায় তবে তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েয। শর্ত এই যে, পরিস্কার ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, আমরা এখন থেকে আর এ চুক্তি পালন করব না। تَكُونُوا مِمَّنْ أَمَرُوا — আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে উপরোক্ত পরিস্থিতিকে মুসলমানদের পরীক্ষার উপায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে পরীক্ষা নেন যে, তারা রৈপিক স্বার্থ ও কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে অঙ্গীকার ভংগ করে, না আল্লাহর আদেশ পালনার্থে রিপূর প্রেরণাকে বিসর্জন দেয়?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا تَسْتَعِذُّوْا بِاٰیٰتِنَا نَحْنُ مُخَلَا — এ আয়াতে আরও একটি বিরাট শাস্তি ও গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, যদি কেউ কসম খাওয়ার সময়ই কসমের খেলাফ করার ইচ্ছা পোষণ করে এবং শুধু অন্যকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে কসম খায়, তবে এটা সাধারণ কসম ভঙ্গ করার চাইতেও অধিক বিপজ্জনক গোনাহ। এর পরিশ্রুতিতে ঈমান থেকেই বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। فَزَلَّ قَدَمُكَ عَنْ وَتَوَيْتَا বাক্যের উদ্দেশ্য তাই।

— অর্থাৎ, আল্লাহর অঙ্গীকার — وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

সামান্য মূল্যের বিনিময়ে ভঙ্গ করা না। এখানে ‘সামান্য মূল্য’ বলে দুনিয়ার মুনাফাকে বোঝানো হয়েছে। এগুলো পরিমাণে যত বেশীই হোক না কেন, পরকালের মুনাফার তুলনায় দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ সামান্যই বটে। যে ব্যক্তি পরকালের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত লোকসানের কারবার করে। কারণ, অনন্তকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট নেয়ামত ও ধন-সম্পদকে ক্ষণভঙ্গুর ও অপকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা কোন বজ্জিমান পছন্দ করতে পারে না।

ইবনে আতিয়া বলেন : যে কাজ সম্পন্ন করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব, সেটাই তার জন্যে আল্লাহর অঙ্গীকার। এরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্যে কারও কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা এবং বিনিময় না নিয়ে কাজ না করার অর্থই আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এমনভাবে যে কাজ না করা ওয়াজিব, কারও কাছ থেকে বিনিময় নিয়ে তা সম্পাদন করার অর্থও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

এতে বোঝা গেল, প্রচলিত সব রকম উৎকোচাই হারাম। উদাহরণশঃ সরকারী কর্মচারী কোন কাজের বেতন সরকার থেকে পায়, সে বেতনের বিনিময়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। যদি সে একাজ করার জন্যে কারও কাছে বিনিময় চায় এবং বিনিময় ছাড়া কাজ করতে গড়িমসি করে, তবে সে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে। এমনভাবে কর্তৃপক্ষ তাকে যে কাজ করার ক্ষমতা দেয়নি, উৎকোচের বিনিময়ে তা করাও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল — (বাহরে-মুহীত)

উৎকোচের সংজ্ঞা : ইবনে আতিয়্যার এ আলোচনায় উৎকোচের সংজ্ঞাও এসে গেছে। তফসীর বাহরে-মহীতের ভাষায় তা এই:

অর্থ—যে কাজ করা তার দায়িত্বে ওয়াজিব, তা করার জন্যে
বিনিময় গ্রহণ করা অথবা যে কাজ না করা তার জন্যে ওয়াজিব, তা করার
জন্যে বিনিময় গ্রহণ করাকে উৎকোচ বলে।—(বাহরে মুহীত, ৫৩৩ পৃঃ
৫ম খণ্ড)

—অর্থাৎ, যা কিছু তোমাদের

কাছে রয়েছে (এতে পার্থিব মুনাফা বোঝানো হয়েছে) তা সবই নিঃশেষ ও ধ্বংস হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে (এতে পরকালের সওয়াব ও আযাব বোঝানো হয়েছে) তা চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।

مَا عِنْدَكُمْ শব্দ বলতে সাধারণতঃ ধন-সম্পদের দিকে মন যায়।

শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা সৈয়দ আসগর হুসাইন সাহেব মরহুম বলেন : ৬

(৩৪) তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহদ্বন্দ্বের বাহানা করো না। তা হলে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা শান্তির স্বাদ আশ্বাদন করবে এ কারণে যে, তোমরা আমার পথে বাধাদান করবে এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। (১৫) তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উত্তম তোমাদের জন্যে, যদি তোমরা জানী হও। (১৬) তোমাদের কাছে যা আছে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, কখনও তা শেষ হবে না। যারা সবর করে, আমি তাদেরকে প্রাণ্য প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদানস্বরূপ যা তারা করত। (১৭) যে সংস্কার সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাণ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত। (১৮) অতএব, যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। (১৯) তার আশ্বিপত্য চলে না তাদের উপর, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপনি পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। (১০০) তার আশ্বিপত্য তো তাদের উপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে অশ্বীদার মানে। (১০১) এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলে: আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন; বরং তাদের অমিকাশ লোকই জানে না। (১০২) বলুন, একে পবিত্র ফেরেশত পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ নাখিল করেছেন, যাতে মুমিনদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এটা মুসলমানদের জন্যে পথনির্দেশ ও সংস্কারস্বরূপ।

শব্দটি আভিধানিকভাবে ব্যাপক অর্থবহ। এখানে ব্যাপক অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে কোন শরীয়তসম্মত বাধা নেই। তাই এতে পার্থিব ধন-সম্পদ তো অন্তর্ভুক্ত আছেই, এছাড়া দুনিয়াতে মানুষ আনন্দ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, লাভ-লোকসান, বন্ধুত্ব-শত্রুতা ইত্যাদি যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়, সেগুলোও এতে शामिल রয়েছে। এগুলো সবই ধ্বংসশীল। তবে এসব অবস্থা ও ব্যাপারের যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং কেয়ামতের দিন যেগুলোর কারণে সওয়াব ও আযাব হবে, সেগুলো সব অক্ষয় হয়ে থাকবে। অতএব, ধ্বংসশীল অবস্থা ও কাজ-কারবারে মগ্ন হয়ে থাকা এবং জীবন ও জীবনের কর্মক্ষমতা এতেই নিয়োজিত করে চিরস্থায়ী আযাব ও সওয়াবের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

‘হায়াতে তাইয়্যোবা’ কি? সংখ্যা গরিষ্ঠ তফসীরবিদগণের মতে এখানে ‘হায়াতে তাইয়্যোবা’ বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এর অর্থ পারলৌকিক জীবন। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ীও এরূপ অর্থ নয় যে, সে কখনও অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না। বরং অর্থ এই যে, মুমিন ব্যক্তি কোন সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত হলেও দু’টি বিষয় তাকে উদ্ভিগ্ন হতে দেয় না। এক, অল্পেভুটি এবং অন্যদ্বয়ের জীবন যাপনের অভ্যাস, যা দারিদ্র্যের মাঝেও কেটে যায়। দুই, তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে পরকালে সুমহান, চিরস্থায়ী নেয়ামত পাওয়া যাবে। কাকের ও পাপাচারীর অবস্থা এর বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও অসুস্থতার সম্মুখীন হলে তার জন্যে সান্ত্বনার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কানড়জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রায়শঃ আত্মহত্যা করে। পক্ষান্তরে সে যদি সচ্ছল জীবনের অধিকারী হয়, তবে লোভের আতিশয্য তাকে শাস্তিতে থাকতে দেয় না। সে কোটিপতি হয়ে গেলে অর্বপতি হওয়ার চিন্তায় জীবনকে বিভ্রম্নময় করে তোলে।

পূর্বাপর সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে অসীকার পূর্ণ করার প্রতি এবং সংকর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহিত করা হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায়ই মানুষ এসব বিধি-বিধানে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তাই ৯৮তম আয়াত থেকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ প্রার্থনা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। প্রতিটি সংকর্মের বেলায় এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে কোরআন পাঠের সাথে এর উল্লেখ রয়েছে। এ বিশেষত্বের কারণ এটাও হতে পারে যে, কোরআন তেলাওয়াত এমন একটি কাজ, যদ্বারা শয়তান পলায়ন করে।

যারা কোরআন পাঠ করে, তাদের কাছ থেকে দৈত্যদানব লেজ গুটিয়ে পালায়। এ ছাড়া কোন কোন বিশেষ আয়াত ও সূরা শয়তানী প্রভাব দূর করার জন্যে পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র। এগুলোর কার্যকারিতা ও উপকারিতা হাদীস ও কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত।—(বয়ানুল-কোরআন)

এ সত্ত্বেও যখন কোরআন তেলাওয়াতের সাথে শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য কাজের বেলায়ও এটা আরও জরুরী হয়ে যায়। এ ছাড়া স্বয়ং কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যে শয়তানী কুমন্ত্রণারও আশঙ্কা থাকে। ফলে তেলাওয়াতের আদব-কায়দা কম হয়ে যায় এবং চিন্তাভাবনা ও বিনয়-নয়তা থাকে না। এ জন্যেও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা জরুরী মনে করা হয়েছে।—(ইবনে-কাসীর, মাযহারী)

ইবনে-কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন : মানুষের শত্রু দু’রকম। এক, স্বয়ং মানবজাতির মধ্য থেকে ; যেমন সাধারণ কাকের।

দুই, জিনদের মধ্য থেকে অবাস্য শয়তানের দল। ইসলাম প্রথম প্রকার শত্রুকে জেহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শত্রুর জন্যে শুধু আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছে। কারণ, প্রথম প্রকার শত্রু স্বজাতীয়। তার আক্রমণ প্রকাশ্যভাবে হয়। তাই তার সাথে জেহাদ ও লড়াই করয় করে দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের শত্রুতা দৃষ্টিগোচর হয় না। তার আক্রমণও মানুষের উপর সামনা-সামনি হয় না। তাই তাকে প্রতিহত করার জন্যে এমন সন্তার আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য করা হয়েছে, যিনি মানুষ ও শয়তান কারও দৃষ্টিগোচর নয়। আর শয়তানকে প্রতিহত করার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পন করার যথার্থতা এই যে, যে ব্যক্তি শয়তানের কাছে পরাজিত হবে, সে আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত এবং আযাবের যোগ্য হবে। মানবশত্রুর বেলায় এমন নয়। কাকেরদের সাথে যুদ্ধে কেউ পরাজিত হলে কিংবা নিহত হলে সে শহীদ ও সওয়াবের অধিকারী হবে। তাই দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা মানবশত্রুর মোকাবিলা করা সর্বাবস্থায় লাভজনক—জয়ী হলে শত্রুর শক্তি নিকট হবে এবং পরাজিত হলে শহীদ হয়ে আল্লাহর কাছে সওয়াবের অধিকারী হবে।

মাসআলা : কোরআন তেলাওয়াতের সময় ‘আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম’ পাঠ করা আলোচ্য আয়াতের আদেশ পালনকল্পে রসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে তা পাঠ করেননি বলেও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। তাই অধিকাংশ আলেম এ আদেশকে ওয়াজিব নয়—সুনত বলেছেন। ইবনে জরীর তাবারী এ বিষয়ে সবার ইজমা বর্ণনা করেছেন।

নামাযে আউযুবিল্লাহ শুধু প্রথম রাকআতের শুরুতে, না প্রত্যেক রাকআতের শুরুতে পড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফেকাহবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) মতে শুধু প্রথম রাকআতে পড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক রাকআতের শুরুতে পড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফেকাহবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবু হানীফার মতে শুধু প্রথম রাকআতে পড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক রাকআতের শুরুতে পড়া মোস্তাহাব। উভয়পক্ষের প্রমাণাদি তফসীরে-মাযহারীতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআন তেলাওয়াত নামাযে হোক কিংবা নামাযের বাইরে—উভয় অবস্থাতে তেলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পাঠ করা সুনত। তবে একবার পড়ে নিলে পরে যতবারই তেলাওয়াত হবে প্রথম আউযুবিল্লাহই যথেষ্ট হবে। মাঝখানে তেলাওয়াত বাদ দিয়ে কোন সাংসারিক কাজে মশগুল হলে পুনর্বীর তেলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়া উচিত।

কোরআন তেলাওয়াত ছাড়া অন্য কোন কালাম অথবা কিতাব পাঠ করার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়া সুনত নয়। সেক্ষেত্রে শুধু বিসমিল্লাহ পড়া উচিত।—(দুরের-মুখতার)

তবে বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় আউযুবিল্লাহর শিক্ষা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। উদাহরণতঃ কারও অধিক ক্রোধের উদ্বেগ হলে হাদীসে আছে যে, আউযুবিল্লাহ পাঠ করলে ক্রোধ দমিত হয়ে যায়।—(ইবনে-কাসীর)

হাদীসে আরও বলা হয়েছে, পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্বে ‘আল্লাহুম্মা হিনী আউযুবিকা মিনাল খুবুসে ওয়াল খাবায়েসে’ পাঠ করা মোস্তাহাব।—(শামী)

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে

النحل ١٦

২৮০

رَبِّهَا ١٦

وَلَقَدْ تَعَلَّمْ أَهْمُمُ يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا يَعْلَمُهُ بِشَرِّ لِسَانِ الَّذِي
يُجِدُونَ وَالْيَدِ أَعْيُنِي وَهَذَا الْإِنْسَانُ عَرَبِيٌّ مُبْدِينٌ ﴿٥٠﴾
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيَهُمُ اللَّهُ وَلَا أَمَّهُمْ
عَذَابُ الْآلِمِ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَالْأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٥١﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ
بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنَ أَرَادَ أَنْ يُقْبَلَ هُمْ أَطْبِقُونَ إِلَّا أَيْمَانُ وَكَانَ
مَنْ شَرَّ يَأْتِيهِمْ صَدْرًا فَأَعْقَبَهُمْ نَضْبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْعِوَةَ الدُّنْيَا
عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٣﴾
أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْهُمْ لَبَنًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفٰطِرُونَ ﴿٥٤﴾ لَاحِزَةً أَهْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ
الْخٰسِرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ
مَا فَعَلُوا ثُمَّ جَعَلُوا وَصَرُّوا أَنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٦﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَبْجُلُ عَنْ
نَفْسِهَا وَتُوْثِقُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

(১০৩) আমি তো ভালভাবেই জানি যে, তারা বলে : তাকে জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা দেয়। যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আরবী নয় এবং এ কোরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়। (১০৪) যারা আল্লাহর কথায় বিশ্বাস করে না, তাদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১০৫) মিথ্যা কেবল তারা রচনা করে, যারা আল্লাহর নির্দেশে বিশ্বাস করে না এবং তারাই মিথ্যাবাদী। (১০৬) যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরী জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপত্তি হবে আল্লাহর গণ্য এবং তাদের জন্যে রয়েছে শাস্তি। (১০৭) এটা এ জন্যে যে, তারা পার্শ্বি জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (১০৮) এরাই তারা, আল্লাহ তা'আলা এদেরই অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই কান্ডজ্ঞানহীন। (১০৯) বলাবাহুল্য, পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (১১০) যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর দেশত্যাগী হয়েছে অতঃপর জেহাদ করেছে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা এসব বিষয়ের পরে অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১১) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্পণে সওয়াল-জওয়াব করতে করতে আসবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ ফল পাবে এবং তাদের উপর জুলুম করা হবে না।

মুক্তির পথ : এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে এমন শক্তি দেননি যাতে সে যে কোন মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অসাবধানতাবশতঃ কিংবা কোন স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তারই দোষ। তাই বলা হয়েছে : যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজ-কর্মে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে (কেমনা, তিনিই সংকাজের তওফীকদাতা এবং প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী) এ ধরনের লোকের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। অবশ্য যারা আত্মস্বার্থের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার কথাবার্তা পছন্দ করে এবং আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে কোন সংকাজের দিকে যেতে দেয় না এবং তারা সমস্ত মন্দ কাজের অগ্রভাগে থাকে।

আনুভঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মাসআলা : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, যদি প্রবল বিশ্বাস থাকে যে, হুমকিদাতা তা কার্যে পরিণত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তবে এমন জবরদস্তির ক্ষেত্রে সে যদি মুখে কুফরী কালাম উচ্চারণ করে, তবে তাতে কোন গোনাহ নেই এবং তার স্ত্রী তার জন্যে হারাম হবে না। তবে শর্ত এই যে, তার অন্তর ঈমানে অটল থাকতে হবে এবং কুফরী কালামকে মিথ্যা ও মন্দ বলে বিশ্বাস করতে হবে।—(কুরতুবী, মাযহারী)

আলোচ্য আয়াতটি কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যাদেরকে মুশরিকরা গ্রেফতার করেছিল এবং হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরী অবলম্বন করতে বলেছিল।

যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন হযরত আম্মার, তদীয় পিতা ইয়াসির, মাতা সুমাইয়া, সুহায়েব, বেলাল এবং খাবাব (রাঃ)। তাঁদের মধ্যে হযরত ইয়াসির ও তদীয় সহধর্মিণী সুমাইয়া কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। হযরত ইয়াসিরকে হত্যা করা হয় এবং হযরত সুমাইয়াকে দু'উটের মাঝখানে বেঁধে উট দু'টিকে দু'দিকে হাকিয়ে দেয়া হয়। ফলে তিনি দ্বিখন্ডিত হয়ে শহীদ হন। এ দু'জন মহাত্মাই ইসলামের জন্যে সর্বপ্রথম শাহাদত বরণ করেন। এমনিভাবে হযরত খাবাবও কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে অস্বীকার করে হাসিমুখে শাহাদত বরণ করে নেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আম্মার প্রাণের ভয়ে কুফরির মৌখিক স্বীকারোক্তি করলেও তাঁর অন্তর ঈমানে অটল ছিল। শত্রুর কবল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর খেদমতে উপস্থিত হন, তখন অত্যন্ত দুঃখের সাথে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি যখন কুফরী কালাম বলেছিলে, তখন তোমার অন্তরের অবস্থা কি ছিল? তিনি আরয় করলেন : আমার অন্তর ঈমানের উপর স্থির এবং অটল ছিল। তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তোমাকে এজন্যে কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর এ সিদ্ধান্তের সত্যায়নেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

জোর-জবরদস্তির সংজ্ঞা ও সীমা : اکراه—এর শাব্দিক অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তিকে এমন কথা বলতে অথবা এমন কাজ করতে বাধ্য করা, যা বলতে বা করতে সে সম্মত নয়। এরূপ জোর-জবরদস্তির দু'টি পর্যায় রয়েছে। এক, মনে-প্রাণে তাতে সম্মত নয়, কিন্তু এমন অক্ষম ও

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً
 يَأْتِيهَا رُفُهَا رَعْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَلَمَّ أَنْتَمُ
 اللَّهُ فَادَّاهَا اللَّهُ لِيَأْسَ الْبُجُوعِ وَالْحَوْتِ بِمَا كَانُوا
 يَصْنَعُونَ ۝ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ
 فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝ فَكُلُوا مِنْ
 رِزْقِ اللَّهِ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِعِمَّتِ اللَّهِ إِنَّ
 كُتْمَ الرِّيَاحِ لَعَمْدٌ لِلَّذِينَ وَاسَّخَرْتَهُمْ عَلَيْهِمُ الْمَيْتَةَ وَ
 الذَّمَّ وَالْحَمَّ الْخَيْرُ وَمَا هَلْ لَغَيْرِ اللَّهِ بِقَمِينَ
 اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
 وَلَا تَتَّبِعُوا الْبَاطِلَ أَنْتُمْ كُنْتُمْ الْكَذِبَ هَذَا
 حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لَتُفْتَنُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ
 الَّذِينَ يَفْتَنُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ۝
 مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَعَلَى الَّذِينَ
 هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا
 ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

(১১২) আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে স্বাদ আশ্বাদন করালেন, ক্ষুধা ও তীব্রতা। (১১৩) তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল আগমন করেছিলেন। অনন্তর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করল। তখন আযাব এসে ওদেরকে পাকড়াও করল এবং নিশ্চিন্তই ওরা ছিল পাশাপাশী। (১১৪) অতএব, আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তাঁরই এবাদতকারী হয়ে থাক। (১১৫) অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা জবাইকালে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। অতঃপর কেউ সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে নিরুপায় হয়ে পড়লে তবে, আল্লাহ ক্ষমশীল, পরম দয়ালু। (১১৬) তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে তেমননি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলা না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তাদের মঙ্গল হবে না। (১১৭) যৎসামান্য সুখ-সন্তোষ ভোগ করে নিক। তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (১১৮) ইহুদীদের জন্যে আমি তো কেবল তাই হারাম করেছিলাম যা ইতিপূর্বে আপনার নিকট উল্লেখ করেছি। আমি তাদের প্রতি কোন জুলুম করিনি, কিন্তু তারাই নিজদের উপর জুলুম করত।

১১২তম আয়াতে ক্ষুধা ও তীব্রতা স্বাদ আশ্বাদনের জন্যে 'লেবাস' শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে ক্ষুধা ও তীব্রতা পোশাক আশ্বাদন করানো হয়েছে। অথচ পোশাক আশ্বাদন করার বস্তু নয়। কিন্তু এখানে লেবাস শব্দটি পুরোপুরি পরিবেষ্টনকারী হওয়ার কারণে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, ক্ষুধা ও তীব্রতা তাদের সবাইকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে, যেমন পোশাক দেহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়, ক্ষুধা এবং তীব্রতা তাদের উপর তেমনভাবে চেপে বসে।

আয়াতে বর্ণিত দৃষ্টান্তটি কোন কোন তফসীরবিদের মতে একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। এর সম্পর্ক বিশেষ কোন জনপদের সাথে নয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ একে মক্কা মুকাররমার ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন। মক্কাবাসীরা সাত বছর পর্যন্ত নিদারুণ দুর্ভিক্ষে পতিত ছিল। এমনকি, মৃত জন্তু, কুকুর ও ময়লা-আবর্জনা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। এছাড়া মুসলমানদের ভয়ও তাদেরকে পেয়ে বসেছিল। অবশেষে মক্কার সরদাররা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে আরখ করল যে, কুফরী ও অব্যাহতার দোষে পুরুষরা দোষী হতে পারে, কিন্তু শিশু ও মহিলারা তো নির্দোষ। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের জন্যে মদীনা থেকে খাদ্যসম্ভার পাঠিয়ে দেন।—(মায়হারী)

আবু সুফিয়ান কাকের অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে অনুরোধ করেন যে, আপনি তো আত্মীয় বাৎসল্য, দয়া-দাক্ষিণ্য ও মার্জনা শিক্ষা দেন। আপনারই স্বজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ দূর করে দেয়ার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের জন্যে দোয়া করেন এবং দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়।—(করতুবী)

উল্লেখিত চারের মধ্যেই হারাম বস্তু সীমাবদ্ধ নয় : ১১৫ তম আয়াতে ব্যবহৃত **أَنْتُمْ** শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হারাম বস্তু আয়াতে উল্লেখিত চারটিই। এর চাইতে আরও অধিক স্পষ্টভাবে **فُلَانٌ لَا يَدْرِي مَا** আয়াত থেকে জানা যায় যে, এগুলো ছাড়া অন্য কোন বস্তু হারাম নয়। অথচ কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ইজমা দ্বারা আরও বহু বস্তু হারাম। এ সংশয়ের জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে চিন্তা করলেই বুজে পাওয়া যায়। এখানে সাধারণ হালাল ও হারাম বস্তুসমূহের তালিকা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং জাহেলিয়াত আমলের মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে অনেক বস্তু হারাম করে নিয়েছিল, অথচ আল্লাহ তদ্রূপ কোন নির্দেশ দেননি, সেগুলো বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, তাদের হারাম কৃত বস্তুসমূহের মধ্যে আল্লাহর কাছে শুধু এগুলোই হারাম। এ আয়াতের পুরোপুরি তফসীর এবং চারটি হারাম বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা যা আরেকফুল-কোরআন প্রথম খন্ডে সূরা বাক্বারার ১৭৩ আয়াতের তফসীরে দ্রষ্টব্য।

ثُمَّ لَكَ مِنَ الْإِنسَانِ عَوِلٌ الشُّرُوبِ جَهَالَةٌ ثُمَّ تَابُوا مِنْ
بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُوٌّ رَحِيمٌ ۝
إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَالَتْ تِلْكَ لِي وَهَيْفَا لِمَ كَرِهَ مِنْ
الْبَشَرِ ۝ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَتَّخِذُ لَكَ وَهْدَةً إِلَىٰ صِرَاطِ
مُسْتَقِيمٍ ۝ وَاتَّبَعْنَاهُ فِي الدِّينِ حَسَنَةً وَلَئِنَّ فِي الْآخِرَةِ لَكُنْ
الْصَّالِحِينَ ۝ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنَّ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّمَا جَعَلَ السَّبِطَ عَلَىٰ الَّذِينَ
أَخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالدُّعَاءِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۝ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْهَكِينَ ۝
وَإِنَّ عَادَةَ لَكُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ مَاعُودٌ ثُمَّ لَهُ وَلَيْنَ
صَبْرُهُ لَهْوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ۝
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

(১১৯) অনন্তর যারা অজ্ঞাতবশতঃ মদ্য কান্ড করে, অতঃপর তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আপনার পালনকর্তা এসবের পরে তাদের জন্যে অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১২০) নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক, সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহরই অনুগত এবং তিনি শেরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১২১) তিনি তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। (১২২) আমি তাঁকে দুনিয়াতে দান করেছি কল্যাণ এবং তিনি পরকালেও সংকমশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (১২৩) অতঃপর আপনার প্রতি প্রত্যাশে ধ্রুপদ করেছি যে, ইবরাহীমের দ্বীন অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং শেরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১২৪) শনিবার দিন পালন যে নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা তাদের জন্যেই যারা এতে যতবিরোধ করেছিল। আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা যতবিরোধ করত। (১২৫) আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিতে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দমুত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। (১২৬) আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবার কর, তবে তা সবারকারীদের জন্যে উত্তম। (১২৭) আপনি সবার করবেন। আপনার সবার আল্লাহর জন্যে ব্যতীত নয়, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না। (১২৮) নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেজগার এবং যারা সংকম্য করে।

যে গোনাহ বোঝে-সুঝে করা হয় এবং যে গোনাহ না বোঝে-সুঝে করা হয় সবই তওবা দ্বারা মাফ হতে পারে : আয়াতে **لَكَ مِنَ الْإِنسَانِ عَوِلٌ الشُّرُوبِ جَهَالَةٌ** এর **جهالة** শব্দ বরং **جهالة** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। **جهل** শব্দটি **علم** এর বিপরীতে অজ্ঞানতা ও বোধহীনতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে **جهالة** এর অর্থ হয় মুখসূলভ কান্ড, যদিও তা বোঝে-সুঝে করা হয়। এতে বোঝা গেল যে, তওবা দ্বারা শুধু না বোঝে অথবা অনিচ্ছায় করা গোনাহই মাফ হয় না; বরং যে গোনাহ সচেতনভাবে করা হয়, তাও মাফ হয়।

১২০ তম আয়াতে **أُمَّة** (উম্মত) শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রসিদ্ধ অর্থ দল ও সম্প্রদায়। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে এখানে এ অর্থই বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আঃ) একাই এক ব্যক্তি, এক সম্প্রদায় ও কওমের গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। 'উম্মত' শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে জাতির অনুসৃত নেতা ও গুণাবলীর আধার। কোন কোন তফসীরকার এখানে এ অর্থই নিয়েছেন। **فَانْت** শব্দের অর্থ আজ্ঞাবহ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) উদয়গুণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অনুসৃত এ কারণে যে, সমগ্র বিশ্বের প্রসিদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সবাই একবাক্যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দ্বীনের অনুসরণকে সন্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করে। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানরা তো তাঁর প্রতি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখেই, আরবের মুশরিকরা মূর্তিপূজা সত্ত্বেও এ মূর্তি সংহারকের প্রতি ভক্তিতে গদগদ এবং তাঁর ধর্মের অনুসরণকে গর্বের বিষয় গণ্য করে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে, আল্লাহর আজ্ঞাবহ ও অনুগত ছিলেন, এর বিশেষ স্বাতন্ত্র্য সেসমস্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ফুটে উঠে, যেগুলোতে আল্লাহর এ দোস্ত উষ্টরী হন। নম্রদের আশুন, পরিবার-পরিজনকে জনশূন্য প্রান্তরে ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার পর পাওয়া পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যত হওয়া- এসব স্বাতন্ত্র্যের কারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে উল্লেখিত উপাধিসমূহে সন্মানিত করেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দ্বীনে ইবরাহীমীর অনুসরণের নির্দেশ : আল্লাহ তাআলা যে শরীয়ত ও বিধানাবলী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দান করেছিলেন, শেষ নবী (সাঃ)-এর শরীয়তেও কতিপয় বিধান ছাড়া তদ্রূপ রাখা হয়েছে। যদিও রসূলুল্লাহ (সাঃ) পয়গম্বর ও রসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর ; কিন্তু এখানে শ্রেষ্ঠতরকে স্বর্ণপ্রেক্ষক ব্যক্তির অনুসরণ করার নির্দেশ দানের পেছনে দু'টি তাৎপর্য কার্যকর। এক, সেই শরীয়ত পূর্বে দুনিয়াতে এসে গেছে এবং সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ হয়েছে। সর্বশেষ শরীয়তেও যেহেতু তদ্রূপ হবার ছিল, তাই একে অনুসরণ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই, আল্লামায় যমখশরীর ভাষায় অনুসরণের এ নির্দেশও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্মানসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ সন্মান। এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি **ثُمَّ** (অতঃপর) শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব একদিকে এবং এগুলোর মধ্যে সর্বোপরি গুণ এই যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও হাবীবকে তাঁর দ্বীনের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি এবং পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম : আলোচ্য ১২৫তম আয়াতে দাওয়াত ও প্রচারের পূর্ণাঙ্গ কর্মপন্থা, মূলনীতি ও শিষ্টাচারের পূর্ণ বিবরণ অস্পষ্ট কথায় বিবৃত হয়েছে। তফসীর কুরআন

রয়েছে, হয়রত হরম ইবনে হাইয়ানের মৃত্যুর সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা অনুরোধ করল : আমাদেরকে কিছু ওসীয়াত করুন। তিনি বললেন : “মানুষ সাধারণতঃ অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে ওসীয়াত করে। অর্থ-সম্পদ আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার আয়াতসমূহ বিশেষতঃ সূরা নাহলের সর্বশেষ আয়াতসমূহের ব্যাপারে ওসীয়াত করছি। এগুলোকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে।” উল্লেখিত আয়াতসমূহই হচ্ছে সে আয়াত।

এর শাব্বিক অর্থ ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো, আহ্বান করা। পয়গম্বরগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। এরপর নবী ও রসুলের সমস্ত শিক্ষা হচ্ছে এ দাওয়াতেরই ব্যাখ্যা। কোরআন পাকে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর বিশেষ পদবী হচ্ছে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হওয়া। সূরা আহযাবের ৪৬তম আয়াতে বলা হয়েছে,

وَدَّاعِي إِلَى اللَّهِ بِآيَاتِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

আয়াতে বলা হয়েছে, يَوْمًا لِيُجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ

রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া উম্মতের উপরও ফরয করা হয়েছে। সূরা আলে—এমরানে আছে,

وَتَكُنْ مِّنْ أُمَّةٍ يُدْعَىٰ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন থাকা উচিত, যারা মানুষকে মঙ্গলের প্রতি দাওয়াত দেবে (অর্থঃ) সংকাজের আদেশ করবে এবং অসংকাজের নিষেধ করবে।

অন্য আয়াতে আছে,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ

— অর্থঃ, কথা-বার্তার দিক দিয়ে সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয় ?

বর্ণনায় বিষয়টিকে কোন সময় دعوت الى الله কোন সময় دعوت الى الخير এবং কোন কোন সময় دعوت الى الله শিরোনাম দেয়া হয়। সবগুলোর সারমর্ম এক। কেননা, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার দ্বারা তাঁর দ্বীন এবং সরল পথের দিকেই দাওয়াত দেয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

رب الى سبيل ربك —এতে আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণ

(পালনকর্তা) উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি এর সম্বন্ধ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দাওয়াতের কাজটি লালন ও পালনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। আল্লাহ তাআলা যেমন তাঁকে পালন করেছেন, তেমনি তাঁরও প্রতিপালনের ভঙ্গিতে দাওয়াত দেয়া উচিত। এতে প্রতিপক্ষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে, তার উপর চাপ সৃষ্টি না হয় এবং অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়। স্বয়ং দাওয়াত শব্দটিও এই কর্ম প্রকাশ করে। কেননা, পয়গম্বরের দায়িত্ব শুধু বিধি-বিধান পৌঁছে দেয়া ও শুনিয়ে দেয়াই নয়; বরং লোকদেরকে তা পালন করার দাওয়াত দেয়াও বটে। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি কাউকে দাওয়াত দেয়, সে তাকে এমন সম্বোধন করে না, যাতে তার মনে বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মে অথবা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রোপ ও তামাশা করে না।

يَا حَكِيمَةً “হিকমত” শব্দটি কোরআন পাকে অনেক অর্থে ব্যবহৃত

হয়েছে। এস্থলে কোন কোন তফসীরবিদ হিকমতের অর্থ কোরআন, কেউ কেউ কোরআন ও সুন্নাহ এবং কেউ কেউ অকাটা যুক্তি-প্রমাণ স্থির করেছেন। রুহুল-মা’আনী বাহরেমুহীতের বরাতে দিয়ে হিকমতের তফসীর নিম্নরূপ করেছেন مَرَقِعِ الْفَنَسِ الْوَقَاعِ مِنْ النَّفْسِ أَجْمَلُ —অর্থঃ, এমন বিস্তৃত্ত বাক্যকে হিকমত বলা হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। এ তফসীরের মধ্যে সব উক্তি সন্নিবেশিত হয়ে যায়। রুহুল-বয়ানের গ্রন্থকারও প্রায় এই অর্থটিই এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন : ‘হিকমত বলে সে অন্তর্দৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ যুজ্জে নেয় যে, প্রতিপক্ষের উপর বোঝা হয় না। নম্রতার স্থলে নম্রতা এবং কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। যেখানে মনে করে যে, স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে সেখানে ইঙ্গিতে কথা বলে কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন করে, যদ্বারা প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মুখীন হয় না এবং তার মনে একগুয়েমিভাবও সৃষ্টি হয় না।’

এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন

শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্যে নরম হয়ে যায়। উদাহরণতঃ তার কাছে কবুল করার সওয়াব ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা কর। — (কামুস, মুফরাদাত—রাগিব)

এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোন স্বার্থ নেই—শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন।

শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকরী ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ অপমানবোধ করে। — (রুহুল-মা’আনী)

এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্যে حسنة শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে।

وَجَادِلْهُمْ يَاتِيهِمْ أَحْسَنُ — শব্দটি مجادلة ধাতু থেকে উদ্ভূত। এখানে বলে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক বোঝানো হয়েছে। يَاتِيهِمْ أَحْسَنُ —এর অর্থ এই যে, যদি দাওয়াতের কাছে কোথাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্ক-বিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার। রুহুল-মা’আনীতে বলা হয়েছে, উত্তম পন্থার মানে এই যে, কথাবার্তায় নম্রতা ও কমনিয়তা অবলম্বন করতে হবে। এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। বহুল প্রচলিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বাক্যাবলীর মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং সে হঠকারিতার পথ পরিহার করে। কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, ‘উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক’ শুধু মুসলমানদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং আহলে কিতাব সম্পর্কে বিশেষভাবে কোরআন বলে যে,

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

নির্দেশ দিয়ে আরও হযরত মুসা ও হারুন (আঃ)—কে فَتَوَارَكُ قَرَارًا —কে বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের মত অবধ্য কাকেরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত।

দাওয়াতের মূলনীতি ও শিষ্টাচার : আলোচ্য আয়াতে দাওয়াতের জন্যে তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) হিকমত। (দুই) সদুপদেশ এবং (তিন) উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক। কোন কোন তফসীরকার বলেন : এ তিনটি বিষয় তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্যে বর্ণিত হয়েছে। হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত জ্ঞানী ও সুশীলজনের জন্যে, উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত জনসাধারণের জন্যে এবং বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াত তাদের জন্যে যাদের অন্তরে সন্দেহ ও দ্বিধা রয়েছে অথবা যারা ইত্বকারিতা ও একগুঁয়েমির কারণে কথা মেনে নিতে সম্মত হয় না।

হাকীমুল-উম্মত হযরত খানভী (রহঃ) বয়ানুল-কোরআনে বলেন : এ তিনটি বিষয় পৃথক পৃথক তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্যে হওয়া আয়াতের বর্ণনাপদ্ধতির দিক দিয়ে আযৌক্তিক মনে হয়।

বাহ্যিক অর্থ এই যে, দাওয়াতের এই সুস্ব পন্থাগুলো প্রত্যেকের জন্যেই ব্যবহার্য। কেননা, দাওয়াতে সর্বপ্রথম হিকমতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের অবস্থা যাচাই করে তদনুযায়ী শব্দ চয়ন করতে হবে। এরপর এসব বাক্য শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যদ্বারা প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হতে পারে। বর্ণনানুসঙ্গি ও কথাবার্তা সহানুভূতি পূর্ণ ও নরম রাখতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছু বলছে, আমারই উপকারার্থে এবং হিতাকাঙ্ক্ষাবশতঃ বলছে—আমাকে শরমিন্দা করা অথবা আমার মর্যাদাকে আহত করা তার লক্ষ্য নয়।

অবশ্য রুহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার এখানে একটি সুস্ব তত্ত্ব বর্ণনা করে বলেছেন যে, আয়াতের বর্ণনাপদ্ধতি থেকে জানা যায়, আসলে দু'টি বিষয়ই দাওয়াতের মূলনীতি-হিকমত ও উপদেশ। তৃতীয় বিষয় বিতর্ক, মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দাওয়াতের পথে কোন কোন সময় এরও প্রয়োজন দেখা দেয়।

মোটকথা, দাওয়াতের মূলনীতি দু'টি — হিকমত ও উপদেশ। এগুলো থেকে কোন দাওয়াত খালি থাকা উচিত নয়, আলেম ও বিশেষ শ্রেণীর লোকদেরকে দাওয়াত দেয়া হোক কিংবা সর্বসাধারণকে দাওয়াত দেয়া হোক। তবে দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন লোকদেরও সম্মুখীন হতে হয়, যারা সন্দেহ ও দ্বিধাদুন্দুে জড়িত থাকে এবং দাওয়াতদানকারীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে উদ্যত হয়। এমনাবস্থায় বিতর্কের শিক্ষা দান করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** —এর শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে যে, যে বিতর্ক এ শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, শরীয়তে তার কোন মর্যাদা নেই।

وَأَنَّ عَاقِبَتَهُ বাক্যে প্রথমতঃ আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারী দেরকে আইনগত অধিকার দেয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায়, তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার জন্যে বৈধ, কিন্তু এই শর্তে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না। যতটুকু জুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে; বেশী হতে পারবে না।

আয়াতের শেষে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রয়েছে, কিন্তু সবার করা উত্তম।

আয়াতের শানে মুঘল এবং রসুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবীদের পক্ষ থেকে নির্দেশ পালন : সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদগণের মতে এ আয়াতটি

মদীনায় অবতীর্ণ। ওহুদ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবীর শাহাদত বরণ এবং হযরত হামযা (রাঃ) —কে হত্যার পর তাঁর লাশের নাক-কান কর্তনে ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। সইহ্ বোখারীর রেওয়ায়েতে তদ্রূপই। দার-কুতুনী হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে :

ওহুদের যুদ্ধে-ময়দান থেকে মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সত্তর জন সাহাবীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। তাঁদের মধ্যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য হযরত হামযা (রাঃ) —এর মৃতদেহও ছিল। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে রসুলুল্লাহ (সাঃ) দারলুভাবে মর্মান্ত হইলেন। তিনি বললেন : আল্লাহর কসম, আমি হামযার পরিবর্তে মুশরিকদের সত্তর জনের মৃতদেহ বিকৃত করব। এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য **وَأَنَّ عَاقِبَتَهُ** শীর্ষক তিনটি আয়াত নাখিল হয়েছে। —(তফসীর কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, কাফেররা অন্যান্য সাহাবীদের মৃতদেহও বিকৃত করেছিল। —(তিরমিযি, আহমদ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে-হাব্বান)

এক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ (সাঃ) সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই দুঃখের আতিশয্যে বিকৃতদেহ সাহাবীদের পরিবর্তে সত্তর জন মুশরিকের মৃতদেহ বিকৃত করার সংকল্প করেছিলেন। এটা আল্লাহর কাছে সে সমতা ও সুবিচারের অনুকূল ছিল না, যা তাঁর মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার আপনার রয়েছে বটে, কিন্তু সে পরিমাণই, যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে। সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখে কয়েক জনের প্রতিশোধ সত্তর জনের উপর শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে ঠিক নয়। দ্বিতীয়তঃ রসুলুল্লাহ (সাঃ) —কে ন্যায়ানুগ আচরণের উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি যদিও রয়েছে, কিন্তু তাও ছেড়ে দিন এবং অপরাধীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। এটা অধিক শ্রেয়ঃ।

এ আয়াত নাখিল হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এখন আমরা সবারই করব। একজনের উপরও প্রতিশোধ নেব না। এরপর তিনি কসমের কাফকারা আদায় করে দেন। —(মায়হারী)

মক্কা বিজয়ের সময় এসব মুশরিক পরাজিত হয়ে যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের হস্তগত হয়, তখন ওহুদ যুদ্ধের সময় কৃত সংকল্প পূর্ণ করার একটা উত্তম সুযোগ ছিল। কিন্তু উল্লিখিত আয়াত নাখিল হওয়ার সময়ই রসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করে সবার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাই মক্কা বিজয়ের সময় তিনি আয়াত অনুযায়ী সবার অবলম্বন করেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মক্কা বিজয়ের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। এটাও সম্ভব যে, আয়াতগুলো বার বার নাখিল হয়েছে। প্রথমে ওহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাখিল হয়েছে এবং পরে মক্কা বিজয়ের সময় পুনর্বার অবতীর্ণ হয়েছে। —(মায়হারী)

মাসআলা : আলোচ্য আয়াতটি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতার আইন ব্যক্ত করেছে। এ কারণেই ফেকাহবিদগণ বলেছেন : যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে, তার বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আহত করলে আহতকারীকে জখমের পরিমাণে জখম করা হবে। কেউ কাউকে হাত পা কেটে হত্যা করলে নিহতের ওলীকে অধিকার দেয়া হবে, সেও প্রথমে হত্যাকারীর হাত-পা কর্তন করবে, অতঃপর হত্যা করবে।

بَنِي إِسْرَٰءِيلَ

২৮৮

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

سُورَةُ الْأَنْعَامِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۚ لَيْلًا مِّنَ السَّجْدِ
الْحَوَارِ إِلَى السَّجْدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ
الْأَيْمَنِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ
جَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَٰءِيلَ ۖ لَّا تَسْتَحِينَ وَلَا تُؤْمِنُونَ ۝ وَكَانَ
دُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۝
وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ فِي الْكِتَابِ نَقِصُدُنَّ فِي الْأَرْضِ
مَرْبُتِينَ وَنَلْعَلُّهُمْ عُلَاكِيدٌ ۝ فَآذَأْجَاءَ وَعَدَاؤُهُمَا بَعَثْنَا
عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّا أُولَىٰ بَيْنَ شِدْدِيهِمَا فَجَاسُوا خِلَالَ إِلَيْنَا ۚ
وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُمْ لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ
وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَكْثَرَ تَفْصِيلًا ۝
إِن أَحْسَنُمْ أَحْسَنُوا لِنَفْسِهِمْ ۚ وَإِن أَسَأَسُوا فَلَهُمَا
فَآذَأْجَاءَ وَعَدَاؤُهُ الْخَيْرَةَ لِيَسْأُوْا أَوْجُوهَهُمْ وَلِيَدَّخُلُوا
السَّجْدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَلِيُتَبَرَّوْا مَا عَاوَلْتُمُوهُنَّ ۝

সূরা বনী ইসরাঈল

মক্কা অবতীর্ণ : আয়াত ১১১

পরম মেহেরবান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু।

(১) পরম পবিত্র ও মহিমান্বয় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাতি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত— যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি—যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। (২) আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং সেটিকে বনী-ইসরাঈলের জন্যে হেদায়েতে পরিণত করেছি যে, তোমারা আমাকে ছাড়া কাউকে কার্যনির্বাহী হির করে না। (৩) তোমারা তাদের সন্তান, যাদেরকে আমি নুহর সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা। (৪) আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমারা পৃথিবীর বুকে দু'বার অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং অত্যন্ত বড় ধরনের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। (৫) অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সন্তান এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। (৬) অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। (৭) তোমারা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সমগ্রটি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকছিল এবং যেখানেই জয় হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

তবে কেউ যদি কাউকে পাথর মেরে কিংবা তীর দ্বারা আহত করে হত্যা করে, তাহলে এতে হত্যার প্রকারভেদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয় যে, কি পরিমাণ আঘাত দ্বারা হত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তি কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার সমতার কোন মাপকাঠি নেই। তাই হত্যাকারীকে তরবারি দ্বারা হত্যা করা হবে।— (জাসাস)

মাসআলা : আয়াতটি যদিও দৈহিক কষ্ট ও দৈহিক ক্ষতি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক এবং এতে আর্থিক ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একারণেই ফেকাহবিদগণ বলেছেন : যে ব্যক্তি কারও অর্থসম্পদ হিনতাই করে, প্রতিপক্ষেরও অধিকার রয়েছে তার কাছ থেকে হিনিয়ে নেয়ার কিংবা অপহরণ করার। তবে শর্ত এই যে, যে অর্থসম্পদ সে হিনিয়ে নেবে কিংবা অপহরণ করবে, তা হিনতাইকৃত অর্থসম্পদের অভিন্ন প্রকার হতে হবে। উদাহরণতঃ নগদ টাকা-পয়সা হিনতাই করলে বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে হিনতাই করলে বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে হিনতাই কিংবা অপহরণের মাধ্যমে নিতে হবে। খাদ্যশস্য বস্ত্র ইত্যাদি হিনতাই করলে, সেই রকম খাদ্য শস্য ও বস্ত্র নিতে পারে। কিন্তু এক প্রকার সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য কোন ব্যবহারিক বস্তু জোরপূর্বক নিতে পারবে না। কোন কোন ফেকাহবিদ সর্ববিস্থায় অনুমতি দিয়েছেন—এক প্রকার হোক কিংবা ভিন্ন প্রকার। এ মাসআলার কিছু বিবরণ কুরতুবী স্বীয় তফসীরে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা ফেকাহগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

وَأَن عَاقَبْتُمْ—আয়াতে সাধারণ আইন বর্ণিত হয়েছিল। এতে সব

মুসলমানের জন্যে সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু সবার করা শ্রেয়ঃ বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সবার করতে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা, তাঁর মহত্ত্ব ও উচ্চপদ হেতু অন্যের তুলনায় এটাই ছিল তাঁর পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তাই বলা হয়েছে : وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا الْيَاسِينَ—অর্থাৎ, আপনি তো প্রতিশোধের ইচ্ছাই করবেন না—সবরই করুন। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আপনার সবার আল্লাহর সাহায্যে হবে। অর্থাৎ, সবার করা আপনার জন্যে সহজ করে দেয়া হয়েছে যে, وَأَلَّهِ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا—এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলার সাহায্য তাদের সাথে থাকে, যারা দু'টি গুণে গুণান্বিত। এক তাকওয়া ও ইহসান। তাকওয়ার অর্থ সংকর্ম করা এবং ইহসানের অর্থ এখানে সৃষ্ট জীবের সাথে সদ্যবহার করা। অর্থাৎ, যারা শরীয়তের অনুসারী হয়ে নিয়মিত সংকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরের সাথে সদ্যবহার করে, আল্লাহ তাআলা তাদের সঙ্গে আছেন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য (সাহায্য) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অনিষ্ট সাধন করার সাধ্য কার ?

সূরা বনী-ইসরাঈল

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اسْرَٰى শব্দটি اسْرَٰءِ হাতু থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ রাতে নিয়ে যাওয়া। এরপর لَيْلًا শব্দটি স্পষ্টতঃ এ অর্থ ফুটিয়ে তুলেছে। لَيْلًا শব্দটি نَكْرَةً ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনায়

সম্পূর্ণ রাত্রি নয়; বরং রাত্রির একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। আয়াতে উল্লেখিত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' বলা হয় এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত যে সফর হয়েছে, তার নাম 'মে'রাজ্জ। ইসরা অকাটা আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর 'মে'রাজ্জ সুরা নাজমে উল্লেখিত রয়েছে এবং অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মান ও গৌরবের স্তরে ৬৬ শব্দটি একটি বিশেষ প্রেমময়তার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কাউকে 'আমার বান্দা' বললে এর চাইতে বড় সম্মান মানুষের জন্যে আর হতে পারে না।

কোরআন ও হাদীস থেকে দৈহিক 'মে'রাজ্জের প্রমাণাদি ও ইমজা : ইসরা ও 'মে'রাজ্জের সমগ্র সফর যে শুধু আত্মিক ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের সফরের মত দৈহিক ছিল, একথা কোরআন পাকের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আলোচ্য আয়াতের প্রথম سُبْحَانَ শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, এ শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্যে ব্যবহৃত হয়। 'মে'রাজ্জ যদি শুধু আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নজগতে সংঘটিত হত, তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক মুসলমান, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে।

عید শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, শুধু আত্মাকে দাস বলে না; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়। এছাড়া রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন 'মে'রাজ্জের ঘটনা হযরত উম্মে হানী (রাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারও কাছে একথা প্রকাশ করবেন না; প্রকাশ করলে কাকেররা আপনার প্রতি আরও বেশী মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হত, তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল?

অতঃপর রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাকেররা মিথ্যারোপ করল এবং ঠাট্টা বিদ্রূপ করল। এমনকি, কতক নও-মুসলিম এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব তুলকালাম কাণ্ড ঘটান সম্ভাবনা ছিল কি? তবে, এ ঘটনার আগে এবং স্বপ্নের আকারে কোন আত্মিক 'মে'রাজ্জ হয়ে থাকলে তা এর পরিপন্থী নয়

وَأَجَلْنَا السَّيْرَ إِلَىٰ رَبِّكَ رُؤْيَا (স্বপ্ন) বলে رُؤْيَا (দেখা) বোঝানো হয়েছে। কিন্তু একে رُؤْيَا শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই হতে পারে যে, এ ব্যাপারটিকে রূপক অর্থে رُؤْيَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে যদি رُؤْيَا শব্দের অর্থ স্বপ্নই নেয়া হয়, তবে এমনটিও অসম্ভব নয়। কারণ, 'মে'রাজ্জের ঘটনাটি দৈহিক হওয়া ছাড়া এবং আগে কিংবা পরে আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নযোগেও হয়ে থাকবে। এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে যে স্বপ্নযোগে 'মে'রাজ্জ হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে, তাও যথাস্থানে নির্ভুল। কিন্তু এতে শারীরিক 'মে'রাজ্জ না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

তফসীর কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির। নাকশ এ সম্পর্কে বিশ জন সাহাবীর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং কাশী আয়ায শেখা গ্রন্থে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত পূর্ণরূপে যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পঁচিশ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের কাছ থেকে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। নামগুলো এই : হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, আলী মর্তজা, ইবনে মাসউদ,

আবু যর গিফারী, মালেক ইবনে ছা'ছা, আবু হোরাযরা, আবু সায়ীদ, ইবনে আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুর রহমান ইবনে কু'র'ব, আবু হাইয়া, আবু লায়লা, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, বুয়াযদাহ, আবু আইউব আনসারী, আবু উমামা, সামুরা ইবনে জুনদুব, আবুল হামরা, সোহায়ব রুমী, উম্মে হানী, আয়েশা, আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)।

এরপর ইবনে কাসীর বলেন المسلمون اجمع عليه التفسير و اعراض عنه الزنادقة والملحدون সম্পর্কে সব মুসলমানের একমত্য রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী ফিল্ডীকরা একে মানেনি।

মে'রাজ্জের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ইবনে-কাসীরের রেওয়ায়েত থেকে : ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের তফসীর এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলেন : সত্য কথা এই যে, নবী করীম (সাঃ) ইসরা সফর জাগ্রত অবস্থায় করেন; স্বপ্নে নয়। মক্কা মোকাররমা থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফর বোরাকযোগে করেন। বায়তুল-মোকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে তিনি বোরাকটি অদূরে বেঁধে দেন এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কেবলার দিকে মুখ করে দু'রাকআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করেন। অতঃপর সিঁড়ি আনা হয়, যাতে নীচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্যে ধাপ বানানো ছিল। তিনি সিঁড়ির সাহায্যে প্রথমে প্রথম আকাশে, অতঃপর অবশিষ্ট আকাশসমূহে গমন করেন। এ সিঁড়িটি কি এবং কিরূপ ছিল, তার প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তাআলাই জানেন। ইদানিং-কালেও অনেক প্রকার সিঁড়ি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় লিফটের আকারে সিঁড়িও আছে। এই অলৌকিক সিঁড়ি সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধার কারণ নেই। প্রত্যেক আকাশে সেখানকার ফেরেশতারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং প্রত্যেক আকাশে সে সমস্ত পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাত হয়, যাদের অবস্থান কোন নির্দিষ্ট আকাশে রয়েছে। উদাহরণতঃ ষষ্ঠ আকাশে হযরত মুসা (আঃ) এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তিনি পয়গম্বরগণের স্থানসমূহও অতিক্রম করে যান এবং এক ময়দানে পৌছেন, যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তিনি 'সিদরাতুল-মুনতাহা' দেখেন, যেখানে আল্লাহ তাআলার নির্দেশে স্বর্গের প্রজ্ঞাপতি এবং বিভিন্ন রঙ-এর প্রজ্ঞাপতি ইতস্ততঃ ছোটোছোটো করছিল। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জিবরাঈলকে তাঁর স্বরূপে দেখেন। তাঁর ছয় শত পাখা ছিল। সেখানেই তিনি একটি দিগন্তবোঁধিত সবুজ রঙের 'রফরফ' দেখতে পান। সবুজ রঙের গদিবিশিষ্ট পাশকীকে রফরফ বলা হয়। তিনি বায়তুল-মা'মুরও দেখেন। বায়তুল-মামুরের নিকটেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থীর সাথে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এই বায়তুল মামুরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। কেয়ামত পর্যন্ত তাদের পুনর্বীর প্রবেশ করার পালা আসবে না। রসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বচক্ষে জন্মাত ও দোষ্য পরিদর্শন করেন। সে সময় তাঁর উম্মতের জন্য প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামায ফরয হওয়ার নির্দেশ হয়। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেয়া হয়। এ দ্বারা সব এবাদতের মধ্যে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

অতঃপর তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন আকাশে যেসব পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল তাঁরাও তাঁর সাথে বায়তুল-মোকাদ্দাসে অবতরণ করেন। তাঁরা (যেন) তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত আগমন করেন। তখন নামাযের

সময় হয়ে যায় এবং তিনি পয়গম্বরগণের সাথে নামায আদায় করেন। সেটা সেদিনকার কজ্বরের নামাযও হতে পারে। ইবনে-কাসীর বলেন : নামাযে পয়গম্বরগণের ইমাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারও কারও মতে আকাশে যাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যতঃ এ ঘটনাটি প্রত্যাবর্তনের পর ঘটে। কেননা, আকাশে পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত জিব্রাইল সব পয়গম্বরগণের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে এখানে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল উর্ধ্ব জগতে গমন করা। কাজেই একাজ্জি প্রথমে সেয়ে নেয়াই অবিকৃতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব পয়গম্বর বিদায় দানের জন্যে তাঁর সাথে বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত আসেন এবং জিব্রাইলের ইঙ্গিতে তাঁকে সবাই ইমাম বানিয়ে কার্যতঃ তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়া হয়।

এরপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাকে সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতেই মক্কা মোকাররমা পৌঁছে যান।

মেরাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য : তফসীর ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে : হাফেয আবু নায়ীম ইম্পাহানী দালায়েলুনবুওয়ত গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াকিদীর সনদে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুযীর বাচনিক নিয়োক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন :

‘রসূলুল্লাহ (সঃ) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখে হযরত দেহইয়া ইবনে স্বলীফাকে প্রেরণ করেন। এরপর দেহইয়ার পত্র পৌঁছানো, রোম সম্রাট পর্যন্ত পৌঁছা এবং তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন, এসব কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, যা সহীহ বোখারী এবং হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। এ বর্ণনার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠ করার পর রসূলুল্লাহ (সঃ)–এর অবস্থা জানার জন্যে আরবের কিছু সংখ্যক লোককে দরবারে সমবেত করতে চাইলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হরব ও তাঁর সঙ্গীরা সে সময় বাণিজ্যিক কাকফলা নিয়ে সে দেশে গমন করেছিল। নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে দরবারে উপস্থিত করা হল। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ বোখারী, মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। আবু সুফিয়ানের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে এই সুযোগে রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে, সম্রাটের সামনে তাঁর ভাবমূর্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আবু সুফিয়ান নিজেই বলে যে, আমার এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার পথে একটি মাত্র অন্তরায় ছিল। তা এই যে, আমার মুখ দিয়ে কোন সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্রাটের দৃষ্টিতে হয়ে প্রতিপন্ন হব এবং আমার সঙ্গীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ভৎসনা করবে। তখন আমার মনে মেরাজের ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। এটা যে মিথ্যা ঘটনা তা সম্রাট নিজেই বোঝে নবেন। আমি বললাম : আমি তাঁর ব্যাপারটি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি? আবু সুফিয়ান বলল : নবুওয়তের এই দাবীদারের উক্তি এই যে, সে এক রাত্রিতে মক্কা মোকাররমা থেকে বের হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং প্রত্যুষের পূর্বে মক্কায় আমাদের কাছে ফিরে গেছে।

ইলিয়ার (বায়তুল-মোকাদ্দাসের) সর্বপ্রধান যাজক ও পণ্ডিত তখন রোম সম্রাটের পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন : আমি সে রাত্রি সম্পর্কে জানি। রোম সম্রাট তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি

এ সম্পর্কে কিরূপে জানেন? সে বলল : আমার অভ্যাস ছিল যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের সব দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত আমি শয্যা গ্রহণ করতাম না। সে রাতে আমি অভ্যাস অনুযায়ী সব দরজা বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু একটি দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হল না। আমি আমার কর্মচারীদের ডেকে আনলাম। তারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালাল। কিন্তু দরজাটি তাদের পক্ষেও বন্ধ করা সম্ভব হল না। (দরজার কপাট স্বস্থান থেকে মোটেই নড়ছিল না।) মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগছি। আমি অপারগ হয়ে কর্মকার ও মিস্ত্রীদেরকে ডেকে আনলাম। তারা পরীক্ষা করে বলল : কপাটের উপর দরজার প্রাচীরের বাধা চাপে বসেছে। এখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করার কোন উপায় নেই। সকালে আমরা চেষ্টা করে দেখব, কি করা যায়। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম এবং দরজার কপাট খোলাই থেকে গেল। সকাল হওয়া মাত্র আমি সে দরজার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, মসজিদের দরজার কাছে ছিন্ন করা একটি প্রস্তর খণ্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল যে, ওখানে কোন ক্ষত বাধা হয়েছিল। তখন আমি সঙ্গীদেরকে বলেছিলাম : আল্লাহ তাআলা এ দরজাটি সম্ভবতঃ একারণে বন্ধ হতে দেননি যে, হযরতবা আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দা আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, ঐ রাতে তিনি আমাদের মসজিদে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি আরও বিশদ বর্ণনা দিলেন।—(ইবনে-কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৪ পৃঃ)

ইসরা ও মেরাজের তারিখ : ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন : মেরাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়াজে বর্ণিত রয়েছে। মুসা ইবনে ওকবার রেওয়াজেতে এই যে, ঘটনাটি হিজরতের ছয়মাস পূর্বে সংঘটিত হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন : হযরত খাদীজার ওফাত নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। ইমাম মুহরী বলেন : হযরত খাদীজার ওফাত নবুওয়ত প্রাপ্তির সাত বছর পরে হয়েছিল।

কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে, মেরাজের ঘটনা নবুওয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পরে ঘটেছে। ইবনে ইসহাক বলেন : মেরাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এসব রেওয়াজেতের সারমর্ম এই যে, মেরাজের ঘটনাটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

হরবী বলেন : ইসরা ও মেরাজের ঘটনা রবিউসানী মাসের ২৭ তম রাত্রিতে হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছে। ইবনে কাসেম সাহাবী বলেন : নবুওয়ত প্রাপ্তির আঠার মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে। মুহাম্মদসগণ বিভিন্ন রেওয়াজেতে উল্লেখ করার পরে কোন সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেননি। কিন্তু সাধারণভাবে খ্যাত এই যে, রজব মাসের ২৭ তম রাত্রি মেরাজের রাত্রি।

মসজিদে-হারাম ও মসজিদে-আকসা : হযরত আবু যর গফারী (রাঃ) বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)–কে জিজ্ঞেস করলাম : বিশেষ সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন : মসজিদে-হারাম। অতঃপর আমি আরও করলাম : এরপর কোনটি? তিনি বললেন : মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এতদুভয়ের নির্মাণের মধ্যে কতদিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন : চল্লিশ বছর। তিনি আরও বললেন : এ তো হচ্ছে মসজিদদুয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্যে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামায পড়ো নাও।—(মুসলিম)

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহর স্থানকে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তিস্তর

সপ্তম যমীনের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌছেছে। মসজিদে আকসা হযরত সোলায়মান (আঃ) নির্মাণ করেছেন।—(নাসায়ী, তফসীর কুরতুবী, ১২৭ পৃ. ৪র্থ খণ্ড)

বায়তুল্লাহর চারপাশে নির্মিত মসজিদকে মসজিদে-হারাম বলা হয়। মাঝে মাঝে সমগ্র হরমকেও মসজিদে হারাম বলে দেয়া হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে দু'টি রেওয়াজেই এর বৈপরিত্যও দূর হয়ে যায় যে, এক রেওয়াজে বলা হয়েছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত উম্মে হানীর গৃহ থেকে ইসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রেওয়াজে কা'বার হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্মেহানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা'বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়।

মসজিদে-আকসা ও শাম অঞ্চলের বরকত : আয়াতে **مَسْجِدَ اَلْاَقْصَا** বলা হয়েছে। এখানে **مسجد** বলে সমগ্র সিরিয়াকে বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তাআলা আরশ থেকে ফোঁড়াতে নদী পর্যন্ত বরকতময় ভূপৃষ্ঠকে বিশেষ পবিত্রতা দান করেছেন।—(রুহুল-মা'আনী)

এর বরকতসমূহ দুবিধ : ধর্মীয় ও পার্থিব। ধর্মীয় বরকত এই যে, এ ভূভাগটি পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের কেবলা, বাসস্থান এবং সমাধিস্থান। জাগতিক বরকত হচ্ছে যে, এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝরণা ও বহমান নদ-নদী এবং অফুরন্ত ফল-ফসলের বাগানাদি। বিভিন্ন ধরনের সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটির তুলনা সত্যি বিরল।

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন : রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রেওয়াজে তাআলা বলেছেন, হে শাম ভূমি! জনবসতিগুলোর মধ্যে তুমি আমার মনোনীত ভূ-ভাগ। আমি তোমার কাছেই স্থায়ী মনোনীত বান্দাদেরকে পৌছে দেব।—(কুরতুবী) মুসনাতে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, দাঙ্কাল সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিতরণ করবে, কিন্তু চারটি মসজিদ পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। (১) মদীনার মসজিদ, (২) মক্কার মসজিদ, (৩) মসজিদে আকসা এবং (৪) মসজিদে তুর।

ঘটনাপ্রবাহের আলোকে মসজিদুল-আকসা

প্রথম ঘটনা : বর্তমান মসজিদে-আকসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত সোলায়মান (আঃ) এর ওফাতের কিছুদিন পরে সংশ্লিষ্ট প্রথম ঘটনাটি সংঘটিত হয়। বায়তুল-মোকাদ্দাসের শাসনকর্তা ধর্মদ্রোহিতা ও কুকর্মের পথ অবলম্বন করলেন মিসরের জনৈক সম্রাট তার উপর চড়াও হয় এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আসবাব লুট করে নিয়ে যায়, কিন্তু নগরী ও মসজিদকে বিধ্বস্ত করেন।

দ্বিতীয় ঘটনা : এর প্রায় চারশ' বছর পর সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ঘটনাটি। বায়তুল-মোকাদ্দাসে বসবাসকারী কতিপয় ইহুদী মূর্তিপূজা শুরু করে দেয় এবং অবশিষ্টা অনৈক্যের শিকার হয়ে পারস্পরিক দুন্দ-কলহে লিপ্ত হয়। পরিণামে পুনরায় মিসরের জনৈক সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং নগরী ও মসজিদ প্রাচীরেরও কিছুটা ক্ষতিসাধন করে। এরপর তাদের অবস্থান যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি হয়।

তৃতীয় ঘটনা : এর কয়েক বছর পর তৃতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যখন বাবেল সম্রাট বুখতা নছর বায়তুল-মোকাদ্দাস আক্রমণ করে এবং

শহরটি পদানত করে প্রচুর ধন-সম্পদ লুট করে নেয়। সে অনেক লোককে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সাবকে সম্রাট পরিবারের জনৈক ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধিরূপে নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।

চতুর্থ ঘটনা : এর কারণ এই যে, উপরোক্ত নতুন সম্রাট ছিল মূর্তিপূজক ও অনাচারী সে বুখতা নছরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বুখতা নছর পুনরায় বায়তুল-মোকাদ্দাস আক্রমণ করে। এবার সে হত্যা ও লুটতরাজের চূড়ান্ত করে দেয়। আশুন লাগিয়ে সমগ্র শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। এ দুখটানাটি সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর সংঘটিত হয়। এরপর ইহুদীরা এখান থেকে নির্বাসিত হয়ে বাবেলে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে চরম অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্গতির মাঝে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়। অতঃপর ইরান সম্রাট বাবেলেও চড়াও হয়ে বাবেল অধিকার করে নেয়। ইরান সম্রাট নির্বাসিত ইহুদীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনরায় সিরিয়ায় পৌছে দেয় এবং তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীও তাদের হাতে প্রত্যাপণ করে। এ সময় ইহুদীরা নিজদের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নতুনভাবে বসতি স্থাপন করে ইরান সম্রাটের সহযোগিতায় পূর্বের নুমনা অনুযায়ী মসজিদে আকসা পুনর্নির্মাণ করে।

পঞ্চম ঘটনা : ইহুদীরা এখানে পুনরায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তারা আবার ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্মের ১৭০ বছর পূর্বে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আশুকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ইহুদীদের উপর চড়াও হয়। সে চল্লিশ হাজার ইহুদীকে হত্যা এবং চল্লিশ হাজারকে বন্দী ও গোলাম বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে মসজিদেও অবমাননা করে, কিন্তু মসজিদের মূল ভবনটি রক্ষা পেয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্রাটের উত্তরাধিকারীরা শহর ও মসজিদকে সম্পূর্ণ ময়দানে পরিণত করে দেয়। এর কিছুদিন পর বায়তুল মোকাদ্দাস রোম সম্রাটের দখলে চলে যায়। তারা মসজিদের সংস্কার সাধন করে এবং এর আট বছর পর হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়াতে আগমন করেন।

ষষ্ঠ ঘটনা : হযরত ঈসা (আঃ) এর সশরীরে আকাশে উখিত হওয়ার চল্লিশ বছর পর ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ইহুদীরা রোম সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রোমকরা শহর ও মসজিদ পুনরায় বিধ্বস্ত করে পূর্বের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। তখনকার সম্রাটের নাম ছিল তাইতিস। সে ইহুদীও ছিল না এবং খ্রীষ্টানও ছিল না। কেননা, তার অনেকদিন পর কনষ্টানটাইন প্রথম খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এরপর থেকে খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) এর আমল পর্যন্ত মসজিদটি বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। হযরত ওমর (রাঃ) এটি পুনঃ নির্মাণ করান। এ ছয়টি ঘটনা তফসীরে ইক্বানীর বরাতে দিয়ে তফসীরে বয়ানুল-কোরআনে লিখিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ছয়টি ঘটনার মধ্যে কোরআনে উল্লেখিত দু'টি ঘটনা কোন্গুলো? এর চূড়ান্ত ফয়সালা করা কঠিন। তবে বাহ্যতঃ এগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলো অধিক গুরুতর ও প্রধান এবং যেগুলোর মধ্যে ইহুদীদের নষ্টামিও অধিক হয়েছে এবং শাস্তিও কঠোরতর পেয়েছে, সেগুলোই বোঝা দরকার। বলাবাহুল্য, সেগুলো হচ্ছে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনা। তফসীরে কুরতুবীতে এ প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত হোযাফার বাচনিক একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতেও নির্ধারিত হয় যে, এখানে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। দীর্ঘ হাদীসটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল :

হযরত হোযায়ফা বলেন : আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করলাম, বায়তুল মোকাদ্দাস আল্লাহ তাআলার কাছে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। তিনি বললেন : দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি একটি বৈশিষ্টপূর্ণ মহান গৃহ। এটি আল্লাহ তাআলা সোলায়মান ইবনে দাউদের (আঃ) জন্যে স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা ইয়াকুত ও যমরদ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। সোলায়মান (আঃ) যখন এর নির্মাণকাজ আরম্ভ করেন, তখন আল্লাহ তাআলা জিনদেরকে তাঁর আজ্ঞাবহ করে দেন। জিনরা এসব মণিমুক্তা ও স্বর্ণরৌপ্য সঞ্গ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে। হযরত হোযায়ফা বলেন : আমি আরয করলাম, এরপর বায়তুল-মোকাদ্দাস থেকে মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য কোথায় এবং কিভাবে উঠাও হয়ে গেল? রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন— বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহর নাক্ষরমণী করে, গোনাহ ও কুকর্মে লিপ্ত হলে এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের ঘাড়ে বুখতা নছরকে চাপিয়ে দিলেন। বুখতা নছর ছিল অগ্নিউপাসক। সে সাতশ' বছর বায়তুল-মোকাদ্দাস শাসন করে। কোরআন পাকের

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشِرْكٍ أَلَا هُمْ صَادِقِينَ আয়াতে এ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। বুখতা ন'ছরের সৈন্যবাহিনী মসজিদে আকসায় ঢুকে পড়ে, পুরুষদের হত্যা, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়ীতে বহন করে নিয়ে যায় এবং স্বদেশ বাবেলে সংরক্ষিত রাখে। সে বনী-ইসরাঈলকে একশ' বছর পর্যন্ত লাঞ্ছনা সহকারে নানা রকম কষ্টকর কাজে নিযুক্ত করে রাখে।

এরপর আল্লাহ তাআলা ইরানের এক সম্রাটকে তার মোকাবেলার জন্যে তৈরী করে দেন। সে বাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট বনী-ইসরাঈলকে বুখতা নছরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। বোখতা নছর যেসব ধন-সম্পদ বায়তুল-মোকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়েছিল, ইরানী বাদশাহ সেগুলোও বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও নাক্ষরমণী কর এবং গোনাহর দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা ও বন্দীত্বের আযাব তোমাদের উপর চাপিয়ে দেব। আয়াত غَسَقَ رُؤُوسُهُمْ فِي يَوْمٍ ذُو عِلَّةٍ বলে একথাই বোঝানো হয়েছে।

বনী ইসরাঈলরা যখন বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফিরে এল এবং সমস্ত ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ তাআলা রোম সম্রাটকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشِرْكٍ أَلَا هُمْ صَادِقِينَ আয়াতে এ ঘটনাই

বোঝানো হয়েছে। রোম সম্রাট জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করে অগণিত লোককে হত্যা ও বন্দী করে এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের সমস্ত ধন-সম্পদ এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়ীতে বোঝাই করে নিয়ে যায়। এসব ধন-সম্পদ রোমের স্বর্ণমন্দিরে এখানে পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে। শেষ যমুনায় হযরত মাহ্দী আবির্ভূত হয়ে এগুলোকে আবার এক লক্ষ সত্তর হাজার নৌকা বোঝাই করে বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনবেন এবং এখানেই আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষকে একত্রিত করবেন। (এ দীর্ঘ হাদীসটি কুরতুবী স্বীয় তফসীরে উদ্ধৃত করেছেন)

বয়ানুল-কোরআনে বলা হয়েছে, কোরআনে উল্লেখিত ঘটনাদুয়ের অর্থ দুইটি শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। (এক) মুসা (আঃ)-এর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ এবং (দুই) ইসা (আঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পর তাঁর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। উপরোক্তোক্ত ঘটনাবলী প্রথম বিরুদ্ধাচরণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ঘটনাবলীর বিবরণের পর আলোচ্য আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

উল্লেখিত ঘটনাবলীর সারমর্ম এই যে, বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার কৃপাশা ছিল এই : তারা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্য করবে, ততদিন ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে কৃতকার্য ও সফলকাম থাকবে এবং যখনই ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়বে, তখনই লাল্চিত ও অশ্রমাসিত হবে এবং শত্রুদের হাতে পিটুনি খাবে। শত্রুরা তাদের উপর প্রবল হয়ে শুধু তাদের জান ও মালেরই ক্ষতি করবে না ; বরং তাদের পরম শ্রিয় কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসও শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ থাকবে না। তাদের কাকের শত্রু বায়তুল-মোকাদ্দাসের মসজিদে ঢুকে এর অবমাননা করবে এবং একে পর্যুদস্ত করে ফেলবে। এটাও হবে বনী-ইসরাঈলের শাস্তির একটি অংশবিশেষ। কোরআন পাক তাদের দুটি ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রথম ঘটনা মুসা (আঃ)-এর শরীয়ত চলাকালীন এবং দ্বিতীয় ঘটনা ইসা (আঃ)-এর আমলের। উভয় ক্ষেত্রেই বনী-ইসরাঈল সমকালীন শরীয়তের প্রতি পৃষ্ঠপোষক করে। ফলে প্রথম ঘটনায় জনৈক অগ্নিপুঙ্খক সম্রাটকে তাদের উপর এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। সে অবশেষে ধ্বংসলীলা চালায়। দ্বিতীয় ঘটনায় জনৈক রোম সম্রাটকে তাদের উপর চাপানো হয়। সে হত্যা ও লুণ্ঠরাজ্য করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত মৃত্যুর পুরীতে পরিণত করে দেয়। সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয় ক্ষেত্রেই বনী-ইসরাঈলরা যখন স্বীয় কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের দেশ, ধন-সম্পদ এবং জনবল ও সম্ভান-সম্ভতিকে পুনর্বহাল করে দেন।

عَلَىٰ رُكُودٍ أُنْصِفُكُمْ وَأَنْ عُدُّكُمْ عَدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ
لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هُوَ
يُخَوِّفُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَصْلَوْنَ الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَتَيْنَا لَهُمْ عَذَابًا
وَبِيدًا إِنَّ الْإِنْسَانَ بِالْشَّرِّ دُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولا
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَذَكَّرُوا عَذَابَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَضْلُهُ قَدْ صُفِّيَّا لَكُمُ الْإِنْسَانُ الْزَمِنُهُ
طَوِيلٌ فِي عَاقِبَةِ الْأَمْرِ وَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابٌ مَّشُورًا
إِذَا رَأَيْتَ أَنَّكَ تُفْطِنُ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي وَآلِي
يَهْدِي الْقِسْمَةَ وَمَنْ صَلَّ وَاتَّقَىٰ لِيَصِلَ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا رَأَوْا
أَنَّ تُهْلِكَ قَرِيبًا مَّرَمُوا مَرَمَهَا فَتَقَسَّفُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا
الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن
بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

(৮) হয়ত তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু যদি পুনরায় উদ্বোধন কর, আমিও পুনরায় তাই করব। আমি জাহান্নামকে কাকেরদের জন্যে কয়েদখানা করেছি। (৯) এই কোরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সংকল্প পরায়ণ মুমিনদেরকে সুস্বাদু দেয় যে, তাদের জন্যে মহা পুরস্কার রয়েছে। (১০) এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্যে যন্ত্রাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি। (১১) মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে, সেভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষ তো খুবই দ্রুততাপ্রিয়। (১২) আমি রাত্রি ও দিনকে দু'টি নির্দশন করেছি। অতঃপর নিশ্চয় করে দিয়েছি রাতের নির্দশন এবং দিনের নির্দশনকে দেখার উপযোগী করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অনুভব কর এবং যাতে তোমরা স্থির করতে পার বছরসমূহের গণনা ও হিসাব এক আমি সব বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। (১৩) আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবাঙ্গুল করে রেখেছি। কয়েদখানের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (১৪) পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্যে তুমিই যথেষ্ট। (১৫) যে কেউ সংগে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সং গঠন করে। আর যে পৃথক হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পৃথক হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না। (১৬) যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে উদ্ধৃত্ত করি অতঃপর তারা পাগাচারে যেতে উঠে। তখন সে জনসোপানীর উপর আদেশ অব্যাহত হয়ে যায়। অতঃপর আমি তাকে উদ্বিগ্নে আচ্ছাদিত দেই। (১৭) নূহের পর আমি অনেক উম্মতকে ধ্বংস করেছি। আপনাদের পালনকর্তাই বান্দাদের পাগাচারের সংবাদ জানা ও দেখার জন্যে যথেষ্ট।

এ ঘটনাদুয় উল্লেখ করার পর পরিশেষে আল্লাহ তাআলা এসব ব্যাপারে স্বীয় বিশিষ্ট বর্ণনা করে বলেছেন : **وَأَنْ عُدُّكُمْ عَدْنَا** — অর্থাৎ তোমরা পুনরায় নাফরমানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে আমিও পুনরায় এমনি ধরনের শাস্তি ও আযাব চাপিয়ে দেব। বর্ণিত এ বিশিষ্ট কয়েদখান পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এতে বনী-ইসরাঈলের সেসব লোককে সম্মোহন করা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ (সঃ) —এর আমলে বিদ্যমান ছিল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথমবার মুসার (আঃ) শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে এবং দ্বিতীয়বার ইসার (আঃ) শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে যেভাবে তোমরা শাস্তি ও আযাবে পতিত হয়েছিলে, এখন তৃতীয় যুগ হচ্ছে শরীয়তে মুহাম্মদীয় যুগ যা কয়েদখান পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর বিরুদ্ধাচরণ করলেও তোমাদেরকে পূর্বের পরিণতিতেই ভোগ করতে হবে। আসলে তাই হয়েছে। তারা শরীয়তে-মুহাম্মদী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হলে মুসলমানদের হাতে নির্বাসিত, লাঞ্চিত ও অপমানিত হো হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসও মুসলমানদের করতলগত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, পূর্ববর্তী সম্রাটরা তাদেরকেও অপমানিত ও লাঞ্চিত করেছিল এবং তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসেরও অবমাননা করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা বায়তুল-মোকাদ্দাস জয় করার পর শত শত বছর যাবত বিশ্বস্ত ও পরিতোষিত মসজিদটি নতুনভাবে পুনর্নির্মাণ করেন এবং পয়গম্বরগণের এ কেবলার যথাযথ সম্মান পুনর্বহাল করেন।

বনী-ইসরাঈলের ঘটনাবলী মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ। বায়তুল মোকাদ্দাসের বর্তমান ঘটনা এ ঘটনা পরস্পরের একটি অংশ : বনী-ইসরাঈলের এসব ঘটনা কোরআন পাকে বর্ণনা করা এবং মুসলমানদেরকে শোনাণোর উদ্দেশ্যে বাহ্যতঃ এই যে, মুসলমানগণ এ খোদায়ী বিশিষ্ট-ব্যবস্থা থেকে আলাদা নয়। তাদের ধর্মীয় ও পার্শ্বিক সম্মান, শান-শওকত, অর্থ-সম্পদও আল্লাহর আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন তারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তখন তাদের শত্রু ও কাকেরদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, যাদের হাতে তাদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহেরও অবমাননা হবে।

একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার : আল্লাহ তাআলা ভূপৃষ্ঠে এবাদতের জন্যে দু'টি স্থানকে এবাদতকারীদের কেবলা করেছেন। একটি বায়তুল-মোকাদ্দাস আর অপরটি বায়তুল্লাহ। কিন্তু আল্লাহর আইন উভয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাকেরদের হাত থেকে একে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এরই পরিণতি হতী বাহিনীর সে ঘটনা, যা কোরআন পাকের সূরা ফীলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়ামানের স্বীকৃত বাদশাহ বায়তুল্লাহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অভিযান করলে আল্লাহ তাআলা বিরাত হতী বাহিনীসহ তাকে বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই পাখীদের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বরবাদ করে দেন।

কিন্তু বায়তুল-মোকাদ্দাসের ক্ষেত্রে এ আইন নেই। বরং আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা যখন পৃথকীকৃত ও পোনাহে লিপ্ত হবে, তখন শাস্তি হিসেবে তাদের কাছ থেকে এ কেবলাও ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং কাকেররা এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।

কাকের আল্লাহর বান্দা, কিন্তু প্রিয় বান্দা নয় : উল্লেখিত প্রথম ঘটনায় কোরআন পাক বলেছে, আল্লাহর দ্বীনের অনুসারীরা যখন কেন্দ্র

ও ফাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দেবেন, যারা তাদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের উপর হত্যা ও লুটতরাজ চালাবে। এ স্থলে কোরআন পাক **عِبَادًا** শব্দ ব্যবহার করেছে **عِبَادًا** বলেনি। অথচ এটাই ছিল সর্বাঙ্গীণ। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর দিকে কোন বান্দার সম্বন্ধ হয়ে যাওয়া তার জন্যে পরম সম্মানের বিষয়। যেমন, এ সূরার প্রারম্ভে **أَسْرَىٰ** এর অধীনে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, শবে যে রাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সম্মান ও অসাধারণ নৈকট্য লাভ করেছিলেন। কোরআন পাক এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর নাম অথবা কোন বিশেষ বর্ণনা করার পরিবর্তে শুধু **عَلَيْهِ** (দাস) বলে ব্যক্ত করেছে যে, মানুষের সর্বশেষ উৎকর্ষ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক তাকে দাস বলে আখ্যায়িত করা। বনী-ইসরাঈলকে শান্তি দেয়ার জন্যে যেসব লোককে ব্যবহার করা হয়েছিল, তারা ছিল কাফের। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে **عِبَادًا** শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার পরিবর্তে **أَصْنَفًا** তথা সম্বন্ধ পদ পরিহার করে **عِبَادًا** বলেছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিগতভাবে তো সমগ্র মানবমণ্ডলীই আল্লাহর বান্দা; কিন্তু ঈমান ব্যতীত প্রিয় বান্দা হয় না যে, তাদের **أَصْنَفًا** তথা সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে হতে পারে।

‘আকওয়াম’ পথ : কোরআন পাক যে পথনির্দেশ করে, তাকে ‘আকওয়াম’ বলা হয়েছে। ‘আকওয়াম’ সে পথ, যা অতীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিকটবর্তী, সহজ এবং বিপদাপদমুক্তও।— (কুরতুবী) এ থেকে বোঝা গেল যে, কোরআন পাক মানব জীবনের জন্যে যেসব বিধি-বিধান দান করে, সেগুলোতে এ তিনটি গুণই বিদ্যমান রয়েছে। যদিও মানুষ স্বল্পবুদ্ধির কারণে মাঝে মাঝে এ পথকে দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল মনে করতে থাকে; কিন্তু রাক্বুল আলামীন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে সমান। একমাত্র তিনিই এ সত্য জ্ঞানতে পারেন যে, মানুষের উপকার কোন্‌ কাজে ও কিভাবে বেশী। স্বয়ং মানুষ যেহেতু সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাই সে নিজের ভালমন্দও পুরোপুরি জ্ঞানতে পারে না।

সম্ভবতঃ এদিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য আয়াতসমূহের সর্বশেষ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ তো মাঝে মাঝে তাড়াহুড়া করে নিজের জন্যে এমন দোয়া করে বসে, যা পরিণামে তার জন্যে ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে আনে। আল্লাহ্ তাআলা এমন দোয়া কবুল করে নিলে তা নিশ্চিতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা অধিকাংশ সময় এমন দোয়া তাত্ক্ষণিকভাবে কবুল করেন না। শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজেই বুঝতে পারে যে, তার এ দোয়া ভ্রান্ত এবং তার জন্যে তীব্র ক্ষতিকর ছিল। আয়াতের সর্বশেষ বাক্যে মানুষের একটি স্বভাবগত দুর্বলতা বিধির আকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ স্বভাবের তাড়নায়ই দ্রুততান্ত্রিয়। সে বাহ্যিক লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি রাখে, অথচ পরিণামদর্শিতায় ভুল করে; তাত্ক্ষণিক সুখ অম্প হলেও তাকে বড় ও স্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার দান করে। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আলোচ্য আয়াতে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা বর্ণিত হয়েছে।

কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতটিকে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনাটি এই যে, নযর ইবনে হারেস একবার ইসলামের বিরোধিতায় দোয়া করে বসে যে,

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَرًا مِّنَ السَّمَاءِ

السَّمَاءِ وَأُثْبِتْ بَعْدَ آيَاتِكَ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্, যদি আপনার কাছে ইসলামই সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করুন। এমতাবস্থায় ‘ইনসান’ শব্দ দ্বারা এই বিশেষ ব্যক্তি অথবা তার সমস্ত ভাবযুক্তদের বুঝতে হবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে প্রথমে দিবারাত্রির পরিবর্তনকে আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যদ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও আরামের জন্যে উপযুক্ত। আল্লাহ্ তাআলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, রাত্রির অন্ধকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর ঘুম আসে। সমগ্র জগত একই সময়ে ঘুমায়। যদি বিভিন্ন লোকের ঘুমের জন্যে বিভিন্ন সময় নির্ধারিত থাকত, তবে জাগ্রতদের হট্টগোলে ঘুমন্তদের ঘুমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হত।

এখানে দিনকে উজ্জ্বল্যময় করার দু’টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। (এক) দিনের আলোতে মানুষ ক্রমী অনুশ্রম করতে পারে। মেহনত, মজুরী, শিল্প ও কারিগরি সব কিছুর জন্যে আলো অত্যাবশ্যক। (দুই) দিবারাত্রির গমনাগমনের দ্বারা সন-বছরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। উদাহরণতঃ ৩৬০ দিন পূর্ণ হলে একটি সন পূর্ণতা লাভ করে।

এমনিভাবে অন্যান্য হিসাব-নিকাশও দিবারাত্রির গমনাগমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দিবারাত্রির এই পরিবর্তন না হলে মজুরের মজুরী, চাকুরের চাকুরি এবং লেন-দেনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা সুকঠিন হয়ে যাবে।

আমলনামা গলার হার হওয়ার মর্মার্থ : মানুষ যে কোন জায়গায় যে কোন অবস্থায় থাকুক, তার আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মৃত্যুর পর তা বন্ধ করে রেখে দেয়া হয়। কেয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে দেয়া হবে, যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে যে, সে পূরস্কারের যোগ্য, না আযাবের যোগ্য। হয়রত কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে, সেদিন লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিও আমলনামা পড়ে ফেলবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাম ইম্পাহানী হয়রত আবু উমামার একটি রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন কোন কোন লোকের আমলনামা যখন তাদের হাতে দেয়া হবে, তখন তারা নিজেদের কিছু কিছু সংকর্মে তাতে অনুপস্থিত দেখে আরয় করবে : পরওয়ারদেগার। এতে আমার অমুক অমুক সংকর্ম লেখা হয়নি। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে উত্তর হবে : আমি সেসব সংকর্ম নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। কারণ, তোমরা অন্যদের গীবত করতঃ — (মায়হারী)

পয়গম্বুর প্রেরণ ব্যতীত আযাব না হওয়ার ব্যাখ্যা : এ আয়াতদুট্টে কোন কোন ফেকাহবিদের মতে যাদের কাছে কোন নবী ও রসূলের দাওয়াত পৌঁছেনি কাফের হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন আযাব হবে না। কোন কোন ইমামের মতে ইসলামের যেসব আকীদা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায়। যেমন, আল্লাহর অস্তিত্ব, তওহীদ প্রভৃতি-সেগুলো যারা অবীকার করে, কুফরের কারণে তাদের আযাব হবে; যদিও তাদের কাছে নবী ও রসূলের দাওয়াত না পৌঁছে থাকে। তবে পয়গম্বুরগণের দাওয়াত ও তবলীগ ব্যতীত সাধারণ গোনাহর কারণে আযাব হবে না। কেউ কেউ এখানে রসূল শব্দের ব্যাপক অর্থ নিয়েছেন; রসূল ও নবী অথবা তাদের

বেদআত ও মনগড়া আমল যতই ভাল দেখা যাক— গ্রহণযোগ্য নয় : এ আয়াতে চেষ্টা ও কর্মের সাথে سَعَى শব্দযোগ করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্ম ও চেষ্টা কল্যাণকর ও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না; বরং সেটিই শর্তব্য হয়, যা (পরকালের) লক্ষ্যের উপযোগী। উপযোগী হওয়া না হওয়া শুধু আল্লাহ ও রসুলের বর্ণনা দুরাই জানা যেতে পারে। কাজেই যে সংকল্প মনগড়া পন্থায় করা হয়—সাধারণ বেদআতী পন্থাও এর অন্তর্ভুক্ত, তা দৃশ্যতঃ যতই সুন্দর ও উপকারী হোক না কেন—পরকালের জন্যে উপযোগী নয়। তাই সেটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং পরকালেও কল্যাণকর নয়।

তফসীর রুহুল মা'আনী سَعَى শব্দের ব্যাখ্যায় সুন্নত অনুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে একথাও অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, কর্মেও দৃঢ়তা থাকতে হবে। অর্থাৎ, কর্মটি সুন্নত অনুযায়ী এবং দৃঢ় অর্থাৎ, সার্বক্ষণিকও হতে হবে। বিশৃঙ্খলা ভাবে কোন সময় করল কোন সময় করল না—এতে পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না।

পিতা-মাতার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব : ইমাম কুরতুবী বলেন : এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে সদুবহার করাকে নিজের এবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরয করেছেন। যেমন, সূরা লোকমানে নিজের শোকরের সাথে পিতা-মাতার শোকরকে একত্রিত করে অপরিহার্য করেছেন। বলা হয়েছে:

أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۖ إِنَّ الشُّكْرَ لِلَّهِ ۖ أَمَّا الشُّكْرُ لِلَّهِ ۖ

এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলার এবাদতের পর পিতা-মাতার আনুগত্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজেব। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে রয়েছে, কোন এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে প্রশ্ন করল : আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেন : (মুস্তাহাব) সময় হলে নামায পড়া। সে আবার প্রশ্ন করল : এরপর কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন : পিতা-মাতার সাথে সদুবহার।—(কুরতুবী)

হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার আনুগত্য ও সেবাষত্বের ক্বশীলত : মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুস্তাদরাক হাকেমি বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত আবুদুদরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : পিতা জন্মান্তর মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফযত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। (মাযহারী) (১) তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : পিতা জন্মান্তর মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফযত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও (মাযহারী) (২) তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহর সন্তান পিতার সন্তানটির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তান পিতার অসন্তানটির মধ্যে নিহিত।

(৩) হযরত আবু উমামার বাচনিক ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে জিজ্ঞেস করল : সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক কি? তিনি বললেন : তাঁরা উভয়েই তোমার জন্মাত অথবা জাহান্নাম। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের আনুগত্য ও সেবায়ত্ব জন্মাতে নিয়ে যায় এবং তাঁদের সাথে বেআদবী ও তাঁদের অসন্তানি জাহান্নামে

পৌছে দেয়।

(৪) বায়হাকী শোয়াবুল-ইমান গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পিতা-মাতার আনুগত্য করে, তার জন্যে জন্মান্তর দু'টি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে, তার জন্যে জাহান্নামের দু'টি দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতা-মাতার মধ্য থেকে একজনই ছিল, তবে জন্মাত অথবা জাহান্নামের এক দরজা খোলা থাকবে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : জাহান্নামের এই শাস্তিবানী কি তখনও প্রযোজ্য যখন পিতা-মাতা এই ব্যক্তির প্রতি জুলুম করে? তিনি তিন বার বলেন : যদি পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি জুলুমও করে তবু পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে। এর সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সন্তানের নেই। তাঁরা জুলুম করলে সন্তান সেবায়ত্ব ও আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না।

(৫) বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে সেবায়ত্বকারী পুত্র পিতা-মাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব পায়। লোকেরা আরম্ভ করল : সে যদি দিনে একশ'বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, একশ'বার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সওয়াব পেতে থাকবে। সুবহানল্লাহ। তাঁর ভাণ্ডারে কোন অভাব নেই।

পিতা-মাতার হক নষ্ট করার শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া যায় :

(৬) বায়হাকী শোয়াবুল-ইমানে আবু বকরা (রাঃ) বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : সমস্ত গোনাহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা যেগুলো ইচ্ছা করেন কেয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু পিতা-মাতার হক নষ্ট করা এবং তাঁদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর ব্যতিক্রম। এর শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেও দেয়া হয়। (এ সবগুলো রেওয়ায়েতে তফসীরে-মাযহারী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।)

কোন কোন বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্য ওয়াজিব এবং কোন কোন বিষয়ে বিরুদ্ধচরণের অবকাশ আছে : এ ব্যাপারে আলেম ও ফেকাহবিদগণ একমত যে, পিতা-মাতার আনুগত্য শুধু বৈধ কাজে ওয়াজিব। অবৈধ ও গোনাহর কাজে আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই; বরং জায়েযও নয়। হাদীসে বলা হয়েছে : لَا طَاعَةَ لِلْمَلَائِكَةِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ۖ অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তার নাসফরমানীর কাজে কোন সৃষ্ট-জীবের আনুগত্য জায়েয নয়।

পিতা-মাতার সেবাষত্ব ও সদুবহারের জন্য তাঁদের মুসলমান হওয়া জরুরী নয় : ইমাম কুরতুবী এ বিষয়টির সমর্থনে বোখারী থেকে হযরত আসমার (রাঃ) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে জিজ্ঞেস করেন : আমার জননী মুশরিকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করা জায়েয হবে কি? তিনি বললেন : صَلَّى أُمُّكَ ۖ "তোমার জননীকে আদর-আপ্যায়ন কর।" কাকের পিতা-মাতা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন পাক বলে : وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ بِنَاصِرٍ ۚ ۝۱۲۷ অর্থাৎ, যার পিতা-মাতা কাকের এবং তাকেও কাকের হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েয নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সম্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বলাবাহুল্য, আয়াতে মারফ' বলে তাদের সাথে

আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বোঝানো হয়েছে।

মাসআলা : যে পর্যন্ত জেহাদ ফরযে আইন না হয়ে যায়, ফরযে কেফায়ার স্তরে থাকে, সে পর্যন্ত পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্যে জেহাদে যোগদান করা জায়েয নয়। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, জৈনক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে জেহাদের অনুমতি নেয়ার জন্যে উপস্থিত হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল : জী হাঁ, জীবিত আছেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন :

তাহলে তুমি পিতা-মাতার সেবায়ত্রে আত্মনিয়োগ করেই জেহাদ কর। অর্থাৎ, তাঁদের সেবায়ত্রে মাধ্যমেই তুমি জেহাদের সওয়াব পেয়ে যাবে। অন্য রেওয়াজেতে এর সাথে একথাও উল্লেখিত রয়েছে যে, লোকটি বলল : আমি পিতা-মাতাকে ত্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। একথা শুনে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : যাও, তাঁদের হাসাও, যেমন কাঁদিয়েছ। অর্থাৎ, তাঁদেরকে গিয়ে বল : এখন আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জেহাদে যাব না।—(কুরতুবী)

মাসআলা : এ রেওয়াজেতে থেকে জানা গেল যে, কোন কাজ ফরযে-আইন না হলে এবং ফরযে কেফায়ার স্তরে থাকলে সন্তানের জন্যে পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সে কাজ করা জায়েয নয়। দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করা এবং তবলীগের কাজে সফর করাও এর অন্তর্ভুক্ত। ফরয পরিমাণ দ্বীনী জ্ঞান যার অর্জিত আছে, সে যদি বড় আলেম হওয়ার জন্যে সফর করে কিংবা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজে সফর করে, তবে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত তা জায়েয নয়।

মাসআলা : পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করার যে নির্দেশ কোরআন ও হাদীসে উক্ত হয়েছে, পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্যবহার করাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : পিতার সাথে সদ্যবহার এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথেও সদ্যবহার করতে হবে। হযরত আবু উসায়দ বন্দরী (রাঃ) বর্ণনা করেন : আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে বসেছিলাম, ইতিমধ্যে এক আনসার এসে প্রশ্ন করল : ইয়া রসুলুল্লাহ! পিতা-মাতার এস্তেকালের পরও তাদের কোন হক আমার বিস্মায় আছে কি? তিনি বললেন : হাঁ তাদের জন্যে দোয়া ও এস্তেগফার করা, তাঁরা কারো সাথে কোন অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, তাঁদের বন্ধুবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা, যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাঁদেরই মাধ্যমে। পিতা-মাতার এসব হক তাঁদের পরও তোমার বিস্মায় অবশিষ্ট রয়েছে।

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর অভ্যাস ছিল যে, হযরত খাদীজার (রাঃ) ওফাতের পর তিনি তাঁর বান্ধবীদের কাছে উপটোকন প্রেরণ করতেন। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হযরত খাদীজার (রাঃ) হক আদায় করা।

পিতা-মাতার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, বিশেষত : বার্বক্যো : পিতা-মাতার সেবায়ত্রে ও আনুগত্য পিতা-মাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোন সময়ও বয়সের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু ওয়াজেব ও ফরয কর্তব্যসমূহ পালনের ক্ষেত্রে স্বভাবতঃ সেসব অবস্থা প্রতিবন্ধক হয়, কর্তব্য পালন সহজ করার উদ্দেশ্যে কোরআন পাক যেসব অবস্থায় বিভিন্ন

ভঙ্গিতে চিন্তাধারার লালন-পালনও করে এবং এর জন্যে অতিরিক্ত তাকিদও প্রদান করে। এটাই কোরআন পাকের সাধারণ নীতি।

বার্বক্যো উপনীত হয়ে পিতা-মাতা সন্তানের সেবায়ত্রে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যও বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে বার্বক্যোর উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। তৃতীয়তঃ বার্বক্যোর শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও একেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতা-মাতার বাসনা এবং দাবীদাওয়াও এমন ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। কোরআন পাক এসব অবস্থায় পিতা-মাতার মনোভূতি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল সুরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ পিতা-মাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদাপেক্ষা বেশী তাদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্যে কোরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহ-মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষীতার এই দৃশ্যময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাঁদের পূর্ব স্বর্ণ শোধ করা কর্তব্য। **كَانَ لَكُمْ صَفِيرًا** বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পিতা-মাতার বার্বক্যো উপনীত হওয়ার সময় সম্পর্কিত কতিপয় আদেশ দান করা হয়েছে।

(এক) তাঁদেরকে 'উহ'-ও বলবে না। এখানে 'উহ' শব্দটি বলে এমন শব্দ বোঝানো হয়েছে, যদ্বারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি, তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : গীড়া দানের ক্ষেত্রে 'উহ' বলার চাইতেও কম কোন স্তর থাকলে তাও অবশ্য উল্লেখ করা হত। (মোটকথা, যে কথায় পিতা-মাতার সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ।)

দ্বিতীয়, **وَلَا تَقْرَبُوا** - **نَهْر** শব্দের অর্থ ধমক দেয়া। এটা যে কষ্টের কারণ তা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় আদেশ, **وَلَا تُنَادُوا بِكُرْهِئِهِمْ** প্রথমোক্ত দু'টি আদেশ ছিল নেতিবাচক তাতে পিতা-মাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমনসব কাজেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতা-মাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নম্র স্বরে কথা বলতে হবে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন : যেমন কোন গোলাম তার রূঢ় স্বভাবসম্পন্ন প্রভুর সাথে কথা বলে।

চতুর্থ আদেশ : **وَأَخْضِرْ لِحْيَتَكَ الْكِبَرَ** এর সারমর্ম এই যে, তাদের সামনে নিজেকে অক্ষম ও হেয় করে পেশ করবে; যেমন গোলাম প্রভুর সামনে। **جَنَاح** শব্দের অর্থ পাখা। শাবিক অর্থ হচ্ছে পিতা-মাতার জন্যে নিজ নিজ পাখা নম্রতা সহকারে নত করে দেবে। শেষে

وَالْوَرَعُ বলে প্রথমতঃ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে এই ব্যবহার যেন নিছক লোক দেখানো না হয়, বরং আন্তরিক মমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে হওয়া কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ এ দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, পিতা-মাতার সামনে নম্র ও হেয় পেশ হওয়া সত্যিকার ইফ্যতের পটভূমি। কেননা, এরূপ করা বাস্তব অর্থে হেয় হওয়া নয়, বরং এর কারণ

মহব্বত ও অনুকম্পা।

পঞ্চম আদেশ, **وَقُلْ لِلَّهِ الْعِزَّةُ** এর সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার ঘোল আনা সুখ-শান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাঁদের জন্যে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করবে যে, তিনি যেন করুণাবশতঃ তাঁদের সব মুশকিল আসান করেন এবং কষ্ট দূর করেন। সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা পিতা-মাতার খেদমত করা যায়।

মাসআলা : পিতা-মাতা মুসলমান হলে তো তাঁদের জন্যে রহমতের দোয়া করা যাবেই, কিন্তু মুসলমান না হলে তাঁদের জীবদ্দশায় এ দোয়া জায়েয হবে এবং নিয়ত থাকবে এই যে, তাঁরা পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুন এবং ঈমানের তওফীক লাভ করুন। মৃত্যুর পর তাঁদের জন্যে রহমতের দোয়া করা জায়েয নয়।

পিতার আদব ও সম্মান সম্পর্কিত উল্লেখিত আদেশসমূহের কারণে সম্মানদের মনে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, পিতা-মাতার সাথে সদাসর্বদা থাকতে হবে তাঁদের এবং নিজেদের অবস্থাও সবসময় সমান যায় না। কোন সময় মুখ দিয়ে এমন কথাও বের হয়ে যেতে পারে, যা উপরোক্ত আদবের পরিপন্থী। এর জন্যে জাহান্নামের শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। কাজেই গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হবে। আলোচ্য সর্বশেষ **وَلَا تُقْرَبُوا** আয়াতে মনের এই সংকীর্ণতা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বেআদাবীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন সময় কোন পেরেশানী অথবা অসাবধানতার কারণে কোন কথা বের হয়ে গেলে এবং এজন্যে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা মনের অবস্থা সম্পর্কে সত্যক অবগত রয়েছেন যে, কথাটি বেআদাবী অথবা কষ্টদানের জন্যে বলা হয়নি। সুতরাং তিনি ক্ষমা করবেন। **تَوَابِينَ** শব্দের অর্থ **تَوَابِينَ** অর্থাৎ, তওবাকারী। হাদীসে বাদ মাগরিব ছয় রাকআত এবং ইশরাকের নফল নামাযকে **صلوة التوابين** বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই নামাযগুলো পড়ার তওফীক তাদেরই হয়, যারা **تَوَابِينَ** অর্থাৎ, **تَوَابِينَ** (তওবাকারী)।

সকল আত্মীয়ের হক দিতে হবে : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পিতা-মাতার হক এবং তাঁদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা ছিল। আলোচ্য আয়াতে সকল আত্মীয়দের হক বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ, কমপক্ষে তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন যাপন ও সদ্যবহার করতে হবে। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্যও এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেকের উপরই তার সাধারণ আত্মীয়দেরও হক রয়েছে। সে হক কি এবং কতটুকু তার বিশদ বর্ণনা আয়াতে নেই। তবে সাধারণভাবে আত্মীয়তা বজায় রাখা এবং সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা যে এর অন্তর্ভুক্ত, তা না বললেও চলে। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) বলেনঃ যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ—এমন আত্মীয় মহিলা কিংবা বালক-বালিকা হয়, নিঃস্ব হয় এবং উপার্জন করতেও সক্ষম না হয়; এমনিভাবে সে যদি বিকলাঙ্গ কিংবা অন্ধ হয়, জীবনধারণের মত ধন-সম্পদের অধিকারী না হয়, তবে তার ভরণ-পোষণ করা সক্ষম আত্মীয়দের উপর ফরয। যদি একই স্তরের কয়েকজন আত্মীয় সক্ষম হয়, তবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে কয়েকজনকেই বহন

করতে হবে। সূরা বাক্বারার আয়াত **وَعَلَى الْوَارِثِ مِنْ ذَلِكِ** দ্বারাও এ বিধানটি প্রমাণিত হয়।—(তফসীর-মায়হারী)

এ আয়াতে আত্মীয়, অভাবগ্রস্ত ও মুসফিরদের আর্থিক সাহায্যদানকে তাদের হক হিসাবে গণ্য করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি দাতার অনুগ্রহ প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। কেননা, তাদের হক তার যিস্মায় ফরয। দাতা সে ফরযই পালন করছে মাত্র; কারণ প্রতি অনুগ্রহ করছে না।

তীজির অর্থ্যাৎ, অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞা : কোরআন পাক অপব্যয়কে দু'টি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। একটি **تَبذِير** এবং অপরটি **اسراف** আলোচ্য আয়াতে **تَبذِير** নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং **وَلَا تُسْرِفُوا** আয়াতে **اسراف** নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : উভয় শব্দ সমার্থবোধক। গোনাহর কাজে কিংবা অস্থানে ব্যয় করাকে **تَبذِير** ও **اسراف** বলা হয়। কেউ কেউ বলেন : গোনাহর কাজে কিংবা সম্পূর্ণ অযথা ও অস্থানে ব্যয় করাকে **تَبذِير** বলা হয় আর বৈধ স্থানে প্রয়োজনের চাইতে অধিক ব্যয় করাকে **اسراف** বলা হয়। তাই **تَبذِير** এর চাইতে গুরুতর। **تَبذِير** কারীদেরকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ বলেন : কেউ নিজের সমস্ত মাল হক আদায় করার জন্যে ব্যয় করে দিলে তা অযথা ব্যয় হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্যায়-অহেতুক কাজে এক 'মুদ'ও (অর্থ সের) ব্যয় করে, তবে তা অযথা ব্যয় বলে গণ্য হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন : হক নয় এমন অস্থানে ব্যয় করাকে **تَبذِير** বলা হয় (মায়হারী)। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন : হক পাথে অর্থ উপার্জন করে নাহক পাথে ব্যয় করাকে **تَبذِير** বলা হয়। একে **اسراف** ও বলে। এটা হারাম।—(কুরতুবী)

ইমাম কুরতুবী বলেন : হারাম ও অবৈধ কাজে এক দিরহাম খরচ করাও **تَبذِير** এবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে সীমিতরিত্ত খরচ করা, যদ্বন্ধন ভবিষ্যতে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়—এটাও **تَبذِير** এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যদি কেউ আসল মূলধন ঠিক রেখে তার মুনাফাকে বৈধ কাজে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে, তবে তা **تَبذِير** এর অন্তর্ভুক্ত নয়।—(কুরতুবী)

২৮ নং আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে অভূতপূর্ব নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কোন সময় যদি অভাবগ্রস্ত লোকেরা সওয়াল করে এবং আপনার কাছে দেয়ার মত কিছু না থাকার দরুন আপনি তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হন, তবে এ মুখ ফিরানো আত্মস্তরিতাযুক্ত অথবা প্রতিপক্ষের জন্যে অপমানজনক না হওয়া উচিত; বরং তা অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ সহকারে হওয়া কর্তব্য।

এ আয়াতের শানে-নুহুল সম্পর্কে ইবনে জায়েদ রেওয়ায়েত করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অর্থ কড়ি চাইত। তিনি জানতেন যে, এদেরকে অর্থকড়ি দিলে তা দুষ্কর্মে ব্যয় করবে। তাই তিনি এদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করতেন এবং এটা ছিল তাদেরকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার একটি উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

মুসনাদে সাঈদ ইবনে মনসুর সাবা ইবনে হাকামের বাচনিক উল্লেখিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে কিছু বস্ত্র আসলে তিনি তা হকদারদের মধ্যে বন্টন করে দেন। বন্টন শেষ হওয়ার পর আরও কিছু

লোক আসলে তাদেরকে দেয়া সম্ভব হয়নি। তাদের সম্পর্কেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ : ২৯ নং আয়াতে সরাসরি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন মিতাচার শিক্ষা দেয়া, যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধকও না হয় এবং নিজের জন্যেও বিপদ ডেকে না আনে। এ আয়াতের শানে-নূযুলে ইবনে মারদওয়াইয়াহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের রেওয়াজেতে এবং বগভী হযরত জাবেরের রেওয়াজেতে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে একটি বালক উপস্থিত হয়ে আরয করল : আমার আত্মা আপনার কাছে একটি কোর্তা প্রদানের প্রার্থনা করেছেন। তখন গায়ের কোর্তাটি ছাড়া রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অন্য কোন কোর্তা ছিল না। তিনি বালকটিকে বললেন : অন্য সময় যখন তোমার আত্মার সওয়াব পূর্ণ করার সামর্থ্য আমার থাকে, তখন এসো। ছেলেটি ফিরে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল : আত্মা বলছেন যে, আপনার গায়ের কোর্তাটিই অনুগ্রহ করে দিয়ে দিন। একথা শুনে রসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজ শরীর থেকে কোর্তা খুলে ছেলেটিকে দিয়ে দিলেন। ফলে তিনি খালি গায়েই বসে রইলেন। নামাজের সময় হল। হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলেন। কিন্তু তিনি অন্য দিনের মত বাইরে এলেন না। সবার মুখমণ্ডলে চিন্তার রেখা দেখা দিল। কেউ কেউ ভিতরে গিয়ে দেখল যে, তিনি কোর্তা ছাড়া খালি গায়ে বসে আছেন। তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আল্লাহর পথে বেশী ব্যয় করে নিজে পেরেশান হওয়ার স্তর : এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ এ ধরনের ব্যয় করার নিষেধাজ্ঞা জানা যায়, যার পর নিজেই অভাবগ্রস্ত হয়ে পেরেশানী ভোগ করতে হয়। ইমাম কুরতুবী বলেন : সাধারণ অবস্থায় যেসব মুসলমান ব্যয় করার পর কষ্টে পতিত হয় এবং পেরেশান হয়ে বিগত ব্যয়ের জন্যে অনুতাপ ও আফসোস করে, আয়াতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোরআন

পাকের ﴿مُحَرِّمٌ﴾ শব্দের মধ্যে এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু যারা এতটুকু সংসাহসী যে, পরবর্তী কষ্টের জন্যে মোটেই ঘাবড়ায় না এবং হকদারদের হকও আদায় করতে পারে, তাদের জন্যে এ নিষেধাজ্ঞা নয়। এ কারণেই রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি আগামীকালের জন্যে কিছুই সঞ্চয় করতেন না। যেদিন যা আসত, সেদিনই তা নিঃশেষে ব্যয় করে দিতেন। প্রায়ই তাঁকে ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্টও ভোগ করতে হত এবং পেটে পাখর বাঁধার প্রয়োজনও দেখা দিত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এমন অনেক রয়েছে, যারা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে স্বীয় ধন-সম্পদ নিঃশেষে আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিয়েছেন; কিন্তু রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে নিষেধ বা তিরস্কার কোন কিছুই করেননি। এ থেকে বোঝা গেল যে, আয়াতের নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্যে, যারা ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্ট সহ্য করতে পারে না এবং খরচ করার পর 'খরচ না করলেই ভাল হত' বলে অনুতাপ করে। এরূপ অনুতাপ তাদের বিগত সংকাজকে নষ্ট করে দেয়। তাই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিশৃংখল খরচ নিষিদ্ধ : আসল কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতটি বিশৃংখলভাবে খরচ করতে নিষেধ করেছে। ভবিষ্যৎ অবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যা কিছু হাতে আছে, তৎক্ষণাৎ তা খরচ করে ফেলা এবং আগামীকাল কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এলে অথবা ধর্মীয় প্রয়োজন দেখা দিলে অক্ষম হয়ে পড়া এটাই বিশৃংখলা (কুরতুবী)। কিংবা খরচ করার পর পরিবার-পরিজনের গুয়াজিব হক আদায় করতে অপারাগ হয়ে পড়াও বিশৃংখলা। (মাহহারী) ﴿مُحَرِّمٌ﴾ শব্দদ্বয় সম্পর্কে তফসীরে মাহহারীতে বলা হয়েছে যে, ﴿مُحَرِّمٌ﴾ শব্দটি প্রথম অবস্থা অর্থাৎ, কৃপণতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, কৃপণতার কারণে হাত গুটিয়ে রাখলে মানুষের কাছে তিরস্কৃত হতে হবে। ﴿مُحَرِّمٌ﴾ শব্দটি দ্বিতীয় অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ বেশী ব্যয় করে নিজে ফকীর হয়ে গেলে সে ﴿مُحَرِّمٌ﴾ অর্থাৎ, শ্রান্ত, অক্ষম অথবা অনুতপ্ত হয়ে যাবে।

بَنِي إِسْرَآءِيلَ

২৮৭

سُبْحٰنَ الَّذِيۡ

আনুভঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۗ لَآ اِلَهَ اِلَّا هُوَ ۚ سُبْحٰنَ الَّذِيۡ يَرْفَعُ السَّجْدَ ۚ
 وَيُنَزِّلُ الْمَلَآئِكَةَ ۙ وَلاَ تَحْشَىۡ اُولَآءِ ۚ اَمَّا لِيۡفِىۡ هٰٓؤُلَآءِ اَنۡ يَّكُوۡنَ لَكَ اِلَٰهٌ اِلَّا هُوَ ۚ
 فَاحْشَىۡهُ وَسَآءَ سَبِيۡلُكَ ۚ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيۡ حَرَّمَ اللّٰهُ ۙ اِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنۡ قُتِلَ مَظْلُوۡمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلَآئِهِۦ سُلْطٰنًا ۙ فَلاَ تَكْفُرْ ۚ
 فِى الْقَتْلِ اِنَّهٗ كَانَ مَنۡصُوۡرًا ۚ وَلاَ تَقْرُبُوۡا اِمَالَ السَّبِيۡرِ ۙ اِلَّا بِاِذْنِ الْاٰبِآئِيۡ
 هِىۡ اَحْسَنُ ۙ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشَدُّهُ ۙ وَآُوۡفُوا بِالْعَهْدِ ۙ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
 مَسْئُوۡلًا ۙ وَآُوۡفُوا بِالْكَيْلِ ۙ اِذَا كُنْتُمْ اَوْفُوا بِالْقَطٰسِ الَّتِيۡ سَبَقْتُمُوۡهُ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ ۙ تَاُوۡبِۡلًا ۙ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۙ اِنَّ
 السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عِنۡدَہٗ مُسْمُوۡرًا ۙ وَلاَ
 تَمۡشِ فِى الْاَرْضِ مَحۡرًا ۙ اِنَّكَ لَن تَخۡرُقَ الْاَرْضَ وَلٰكِنۡ تَبۡتَغِىۡ الْحِجَالَ
 طُوۡلًا ۙ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيۡدَہٗ عِنۡدَ رَبِّكَ ۙ مَكۡرُوۡهَا ۙ ذٰلِكَ وَمَا
 اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۙ وَلاَ تَجْعَلۡ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ
 فَتُنۡفِىۡ فِىۡ جَہَنَّمَ مِمَّا وُۡدِّعَ خَوۡرًا ۙ اَفَاَصۡفَحۡمُ رَبُّكَ بِالۡيٰسِيۡنِ ۙ وَ
 اَتَّخَذَ مَنۡ الْمَلَآئِكَةِ اِنۡآَا ۙ اِنَّكُمۡ لَتَعۡتَوۡنَ ۙ قَوْلًا عَظِيۡمًا ۙ

(৩০) নিচয় তোমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা অধিক জীবনোপকরণ দান করেন এবং তিনিই তা সংকুচিতও করে দেন। তিনিই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত, —সব কিছু দেখছেন। (৩১) দারিত্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করে না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিচয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ। (৩২) আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিচয় এটা অশ্লীল কাজ এবং ফন্দ পথ। (৩৩) সে প্রাণকে হত্যা করে না, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন; কিন্তু ন্যায়ভাবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। অতএব, সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন না করে। নিচয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত। (৩৪) আর, এতীমের মালের কাছেও যেয়ো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাংক্ষা ছাড়া; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদাঙ্গণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিচয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (৩৫) যেপে দেয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম; এর পরিণাম শুভ। (৩৬) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড়ো না। নিচয় কান, চক্ষু ও অন্তর্করণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (৩৭) পৃথিবীতে দণ্ডভরে পদচারণা করে না। নিচয় তুমি তো ভূপৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বতপ্রমাণ হতে পারবে না। (৩৮) এ সবের মধ্যে যেগুলো মন্দ কাজ, সেগুলো তোমার পালনকর্তার কাছে অপছন্দনীয়। (৩৯) এটা এই হিকমতের অন্তর্ভুক্ত, যা আপনার পালনকর্তা আপনাকে ওহী যারফতে দান করেছেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করবেন না। তাহলে অভিমুক্ত ও আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন। (৪০) তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্যে পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং নিজের জন্যে ফেরেশতাদেরকে কন্যাক্রমে গ্রহণ করেছেন? নিচয় তোমরা গুরুতর গর্হিত কথাবার্তা বলছ।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একের পর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য ৩১ আয়াতে এই ষষ্ঠ নির্দেশটি জাহেলিয়াত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্ত উল্লেখিত হয়েছে। জাহেলিয়াত যুগ কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুস্থান করতে বলেছেন যে, রিয়িকদানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ তাআলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিয়িক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছে? বরং এ ক্ষেত্রে রিয়িক দেয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা অশ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আগে তারেরকে ও পরে তোমাদেরকে দেব। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা যে বান্দাকে নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ ও অন্য দরিদ্রদের সাহায্য করতে দেখেন, তাকে সে হিসাবেই দান করেন, যাতে সে নিজের প্রয়োজনও মেটাতে পারে এবং অন্যকেও সাহায্য করতে পারে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : **يَتَصَرَّوْنَ وَتَرِزُقُوْنَ** অর্থাৎ, তোমাদের দুর্বল শ্রেণীর জন্যেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে রিয়িক দেয়া হয়। এতে জানা গেল যে, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণকারী পিতা-মাতা যা কিছু পায়, তা দুর্বল চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের গুণিলাতেই পায়।

ব্যভিচারের অবৈধতা সম্পর্কে এটি সপ্তম নির্দেশ। এতে ব্যভিচার হারাম হওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায়। এ অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে **فَانفَعَلَ مَا شَتَّ** অর্থাৎ, তোমার লজ্জাই যখন লোপ পাবে, তখন যা খুশী তাই করতে পার। এজন্যই রসূলুল্লাহ (সঃ) লজ্জাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেন : **شُعْبَةٌ مِنَ الْاِيْمَانِ** (বুখারী)। দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাসৃষ্টি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অন্তর্ভুক্ত পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়। বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, চুরি-ডাকাতি ও হত্যার যে ছড়াছড়ি, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তার অধেকের চাইতে বেশী ঘটনার কারণ কোন পুরুষ ও নারী, যারা এ অপকর্মে লিপ্ত। এ অপরাধটি যদিও সরাসরি বান্দার হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় কিন্তু এখানে বান্দার হক সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সন্তবতঃ এই যে, অপরাধটি এমন অনেকগুলো অপরাধ সঙ্গে নিয়ে আসে, যার দ্বারা বান্দার হক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হত্যা ও লুটতরাজের হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। এ কারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি ও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত পৃথিবী বিবাহিত

যিনাকারদের প্রতি অভিসম্পাত করে। জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরাও তা থেকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। আশুনের আঘাবের সাথে সাথে জাহান্নামে তাদের লাঞ্ছনাও হতে থাকবে।—(মাযহার)

হযরত আবু হোরায়রা বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যিনাকার ব্যক্তি যিনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। মদ্যপানীয় মদ্য পান করার সময় মুমিন থাকে না। হাদীসটি বুখারী, ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। আবু দাউদের রেওয়ায়েতে এর ব্যাখ্যা এই যে, এসব অপরাধী যখন অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন ঈমান তাদের অন্তর থেকে বাহিরে চলে আসে। এরপর যখন অপরাধ থেকে ফিরে আসে, তখন ঈমানও ফিরে আসে।—(মাযহারী)

অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা অষ্টম নির্দেশ। অন্যায় হত্যা যে মহা অপরাধ, তা বিশেষ দলমত ও ধর্মধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে স্বীকৃত। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : একজন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আল্লাহর কাছে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেয়া লম্বু অপরাধ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এতদসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তাআলার সপ্ত আকাশ ও সপ্ত ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সম্মিলিতভাবে কোন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আল্লাহ তাআলা সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।—(ইবনে মাজা, মসনদ হাসান, বায়হাকী-মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে একটি কথা দূরা ও হত্যাকারীর সাহায্য করে, হাশরের মাঠে সে যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, তখন তার কপালে লেখা থাকবে অর্থাৎ, এই লোকটিকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে দেয়া হয়েছে।—(মাযহারী, ইবনে মাজা হইতে)

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত মুয়াবিয়ার রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : প্রত্যেক গোনাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে ব্যক্তি জেনে-পুনে ইচ্ছাপূর্বক কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে না।

অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে মুসলমান আল্লাহ এক এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয়; কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়। (এক) বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি যিনা করে, তবে প্রসূর বর্ষণে হত্যা করাই তার শরীয়তসম্মত শাস্তি। (দুই) সে যদি অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কেসাস হিসেবে হত্যা করতে পারে। (তিন) যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা।

কেসাস নেয়ার অধিকার কার? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই অধিকার নিহত ব্যক্তির ওলীর। যদি রক্ত সম্পর্কিত ওলী না থাকে, তবে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এ অধিকার পাবে। কারণ, সরকারও একদিক দিয়ে সব মুসলমানের ওলী।

فَلْيُرْفِئْ فِي الْقَتْلِ এটা ইসলামী আইনের একটা বিশেষ নির্দেশ।

এর সারমর্ম এই যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেয়া জায়েয

নয়। প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। যে পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির ওলী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কেসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত শরীয়তের আইন তার পক্ষে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তার সাহায্যকারী হবে পক্ষান্তরে সে যদি প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে কেসাসের সীমা লঙ্ঘন করে, তবে সে ময়লুমের পরিবর্তে জালামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং জালামে ময়লুম হয়ে যাবেন। আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে এবং তাকে জুলুম থেকে বাঁচাবে।

জাহেলিয়াত যুগের আরবে সাধারণতঃ এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীর পরিবার অথবা সঙ্গী-সাথীদের মধ্য থেকে যাকেই পাওয়া যেত, তাকেই হত্যা করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি গোত্রের সরদার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কেসাস হিসেবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হত না; বরং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন কিংবা আরও বেশী মানুষের প্রাণ সংহার করা হত। কেউ কেউ প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হত না; বরং তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে আঙ্গ বিকৃত করা হত। ইসলামী কেসাসের আইনে এগুলো সব অতিরিক্ত ও হারাম। তাই فُلْيُرْفِئْ

فُلْيُرْفِئْ আয়াতে এ ধরনের বাড়াবাড়িকে প্রতিরোধ করা হয়েছে।

একটি সুরগীয় গল্প : একজন মুজাহিদ ইমামের সামনে জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইসলামী ইতিহাসের সর্বাধিক জালাম এবং কুখ্যাত ব্যক্তি। সে হাজ্জারো সাহাবী ও তাবয়ীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তাই সাধারণভাবে তাকে মন্দ বলা যে মন্দ, সেদিকে কারও লক্ষ্য থাকে না। যে বুয়ুর্গ ব্যক্তির সামনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে দোষারোপ করা হয়, তিনি দোষারোপকারীকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাছে এই অভিযোগের পক্ষে কোন সনদ অথবা সাক্ষ্য রয়েছে কি? সে বলল : না। তিনি বললেন : যদি আল্লাহ তাআলা জালামে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাছ থেকে হাজ্জারো নিরপরাধ নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ নেন, তবে মনে রাখ, যে ব্যক্তি হাজ্জাজের উপর কোন জুলুম করে, তাকেও প্রতিশোধের কবল থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে না। আল্লাহ তাআলা তার কাছ থেকেও হাজ্জাজের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তাঁর আদালতে কোন অবিচার নেই যে, অসৎ ও পাণ্ডী বান্দাদেরকে যা ইচ্ছা, তা দোষারোপ ও অপবাদ আরোপের জন্যে অন্যদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হবে।

এতীমদের মাল সম্পর্কে সাবধানতা : প্রথম আয়াতে এতীমদের মালের রক্ষণ-বেক্ষণ এবং এ ব্যাপারে সাবধানতা সম্পর্কে নবম নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এতে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এতীমদের মালের কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ, এতে যেন শরীয়তবিরোধী অথবা এতীমদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না হয়। এতীমদের মালের হেফাযত ও ব্যবস্থাপনা যাদের দায়িত্বে অর্পিত হয় এ ব্যাপারে তাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তারা শুধু এতীমদের স্বার্থ দেখে ব্যয় করবে। এ কর্মধারা ততদিন অব্যাহত থাকবে, যতদিন এতীম শিশু যৌবনে পদার্পণ করে নিজের মালের হেফাযত নিজেই করতে সক্ষম না হয়। এর সর্বনিম্ন বয়স পনের বৎসর এবং সর্বোচ্চ বয়স আঠার বৎসর।

অবৈধ পন্থায় যে কোন ব্যক্তি মাল খরচ করা জায়েয নয়। এখানে বিশেষ করে এতীমের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সে নিজে কোন হিসাব নেয়ার যোগ্য নয়। অন্যেরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে

মানুষের পক্ষ থেকে হক দাবী করার কেউ না থাকে সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে দাবী কঠোরতর হয়ে যায়। এতে ক্রটি হলে সাধারণ মানুষের হকের তুলনায় গোনাহ অধিক হয়।

অঙ্গীকার পূর্ণ ও কার্যকরী করার নির্দেশ : অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাকীদ হচ্ছে দশম নির্দেশ। অঙ্গীকার দুই প্রকার। (এক) যা বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে রয়েছে; যেমন সৃষ্টির সূচনাকালে বান্দা অঙ্গীকার করেছিল যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমাদের পালনকর্তা। এ অঙ্গীকারের অবশ্যজ্ঞাবী প্রতিক্রিয়া এই যে, তাঁর নির্দেশাবলী মানতে হবে এবং সমস্তটি অর্জন করতে হবে। এ অঙ্গীকার তো সে সময় প্রত্যেকেই করেছে—দুনিয়াতে সে মুমিন হোক কিংবা কাফের। এছাড়া মুমিনের একটি অঙ্গীকার রয়েছে যা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এর সারমর্ম আল্লাহ বিধানাবলীর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য এবং তাঁর সমস্তটি অর্জন।

দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকার যা এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে করে। এতে ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে সম্পাদিত সমস্ত রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও লেন-দেন সম্পর্কিত চুক্তি অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করা মানুষের জন্য ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যেসব চুক্তি শরীয়তবিরোধী নয়, সেগুলো পূর্ণ করা ওয়াজিব। শরীয়তবিরোধী হলে প্রতিপক্ষকে জ্ঞাত করে তা খতম করে দেয়া ওয়াজিব। যে চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদি কোন এক পক্ষ তা পূর্ণ না করে, তবে আদালতে উপস্থাপন করে তাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করার অধিকার প্রতিপক্ষের রয়েছে। চুক্তির স্বরূপ হচ্ছে দুই পক্ষ সম্মত হয়ে কোন কাজ করা বা না করার অঙ্গীকার করা। যদি কোন লোক এক তরফাভাবে কারও সাথে ওয়াদা করে যে, অমুক বস্তু তাকে দেব অথবা অমুক কাজ করে দেব, তবে তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব। কেউ কেউ একেও উল্লেখিত অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন; কিন্তু পার্থক্য এই যে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে ব্যাপারটি আদালতে উপস্থাপিত করে তাকে চুক্তি পালনে বাধ্য করা যায়; কিন্তু এক তরফা চুক্তিকে আদালতে উপস্থাপন করে পূর্ণ করতে বাধ্য করা যায় না। হাঁ, শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে কারও সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করলে সে গোনাহগার হবে। হাদীসে একে কার্যতঃ নিফাক বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا** - অর্থাৎ

কেয়ামতে অন্যান্য ফরয, ওয়াজিব কর্ম এবং খোদায়ী বিধানাবলী পালন করা বা না করা সম্পর্কে যেমন জিজ্ঞাসাবাদ হবে, তেমনি পারস্পরিক চুক্তি সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে। এখানে শুধু 'প্রশ্ন করা হবে' বলে বক্তব্য শেষ করে দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন করার পর কি হবে, সেটাকে অব্যস্ত রাখার মধ্যে বিপদ যে গুরুতর হবে, সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

একাদশতম নির্দেশ হচ্ছে লেন-দেনের ক্ষেত্রে মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ এবং কম মাপার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা মুতাকফিরীনে উল্লেখিত আছে।

মাসআলা : ফেকাহবিদগণ বলেছেন : আয়াতে মাপ ও ওজন সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে, তার সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার চাইতে কম দেয়া হারাম। কাজেই কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট ও অর্পিত কাজের চাইতে কম কাজ করে অথবা নির্ধারিত সময়ের চাইতে কম সময় দেয় অথবা শ্রমিক যদি কাজ চুরি করে, তবে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

কম মাপ দেয়া ও কম ওজন করার নিষেধাজ্ঞা : মাসআলা **وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْإِيزَانِ** —তফসীর বাহরে মূহীতে আবু হাইয়ান বলেন : এ আয়াতে মাপ পূর্ণ করার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর অর্পিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, মাপ ও ওজন পূর্ণ করার জন্যে বিক্রেতা দায়ী।

আয়াতের শেষে মাপ ও ওজন পূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে : **ذَلِكَ** **خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا** —এতে মাপ ও ওজন করা সম্পর্কে দু'টি বিষয় বলা হয়েছে। (এক) এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ, এরূপ করা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম। শরীয়তের আইন ছাড়াও যুক্তি ও স্বভাবগতভাবেও কোন বিবেকবান ব্যক্তি কম মাপা ও কম ওজন করাকে ভাল মনে করতে পারে না। (দুই) এর পরিণতি শুভ। এতে পরকালের পরিণতি তথা সওয়াব ও জ্ঞান্নাত ছাড়াও দুনিয়ার নিকট পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। কোন ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা উপরোক্ত বাণিজ্যিক সততা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না।

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ —এ

আয়াতে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে : কানকে প্রশ্ন করা হবে : তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? চক্ষুকে প্রশ্ন করা হবে : তুমি সারা জীবন কি কি দেখেছ? অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে : সারা জীবনে মনে কি কি কল্পনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি কান দ্বারা শরীয়তবিরোধী কথাবার্তা শুনে থাকে; যেমন কারও গীতবৎ এবং হারাম গানবাদ কিংবা চক্ষু দ্বারা শরীয়তবিরোধী বস্তু দেখে থাকে; যেমন বেগানা স্ত্রীলোক বা স্ত্রী সুলী বালকের প্রতি কুদৃষ্টি করা কিংবা অন্তরে কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারও সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোন অভিযোগ মনে কায়ম করে থাকে, তবে এ প্রশ্নের ফলে আঘাব ভোগ করতে হবে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ প্রদত্ত সব নেয়ামত সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে। **لَسْتُمْ عَنْ يَوْمَئِذٍ عَنْ التَّوْبَةِ** অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে সব নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এসব নেয়ামতের মধ্যে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে বিশেষভাবে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে এরূপ অর্থও বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হয়েছিল **وَلَا تَقْبَلُوا النَّالَ عَنْ يَدِهِمْ** —অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, তা কার্যে পরিণত করো না। এর সাথে সাথে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি জানাশোনা ছাড়াই উদাহরণতঃ কাউকে দোষারোপ করল কিংবা কোন কাজ করল, যদি তা কানে শোনার বস্তু হয়ে থাকে, তবে কানকে প্রশ্ন করা হবে, যদি চোখে দেখার বস্তু হয়, তবে চোখকে প্রশ্ন করা হবে এবং অন্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করার বস্তু হলে অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ ও কল্পনাটি সত্য ছিল, না মিথ্যা? প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দেবে। এটা হাস্যরস ময়নানে ভিত্তিহীন অভিযোগকারী এবং না জেনে আমলকারীদের জন্যে অত্যন্ত লাল্ছনার কারণ হবে। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে :

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَنصِتُهُمْ أَسْمَاءُ

كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ, আজ (কেয়ামতের দিন) আমি এদের (অপরাধীদের) মুখ মোহর করে দেব। ফলে, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।

এখানে কান, চক্ষু ও অস্ত্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ স্বভাবতঃ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে এসব ইন্দ্রিয়চেতনা ও অনুভূতি এজ্ঞানই দান করেছেন, যাতে মনে যেসব কল্পনা ও বিশ্বাস আসে, সেগুলোকে এসব ইন্দ্রিয় ও চেতনা দ্বারা পরীক্ষা করে নেয়। বিস্কন্ধ হলে তা কার্যে পরিণত করবে এবং বাস্তব হলে তা থেকে বিরত থাকবে। যে ব্যক্তি এগুলোকে কাজে না লাগিয়ে অজ্ঞান বিষয়াদির পেছনে লেগে পড়ে, সে আল্লাহর এই নেয়ামতসমূহের নাশোকরী করে।

অতঃপর পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান লাভ করে— কণ্ঠ, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা এবং সমস্ত দেহে ছড়ানো ঐ অনুভূতি, যদ্বারা উদ্ভাপ ও শৈত্য উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু স্বভাবগতভাবে মানুষ অধিকতর জ্ঞান কণ্ঠ ও চক্ষু দ্বারা লাভ করে। নাকে ঘ্রাণ নিয়ে, জিহ্বা দ্বারা আশ্বাদন করে এবং হাতে স্পর্শ করে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা হয়, সেগুলো শোনা ও দেখার বিষয়াদির তুলনায় অনেক কম। এখানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ তাই। এতদূত্থের মধ্যেও কান অগ্রণে উল্লেখিত হয়েছে। কোরআন পাকের অন্যত্র যেখানেই এ দু'টি ইন্দ্রিয় একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কানকেই অগ্রণে রাখা হয়েছে। এর কারণও সম্ভবতঃ এই যে, মানুষের জ্ঞান বিষয়াদির মধ্যে কানে শোনার বিষয়াদির সংখ্যাই বেশী। এগুলোর তুলনায় চোখে দেখার বিষয়াদি অনেক কম।

৩৭ নং আয়াতে ত্রয়োদশতম নির্দেশ এই : ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে পদচারণ
করো না। অর্থাৎ, এমন ভঙ্গিতে চলো না, যম্ভদ্রা অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ
পায়। এটা নির্বোধসুলভ কাজ। সন্নিহিত ব্যক্তি যেন এভাবে চলে ভূপৃষ্ঠকে
বিদীর্ণ করে দিতে চায় এটা তার সাধ্যাতীত। বুক টান করে চলার উদ্দেশ্য
যেন অনেক উঁচু হওয়া। আল্লাহর সৃষ্টি পাহাড় তার চাইতে অনেক উঁচু।
অহংকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরের একটি কবীরা গোনাহ। মানুষের
ব্যবহার ও চলাচলের যেসব বিষয় থেকে অহংকার ফটে ওঠে, সেগুলোও

অবৈধ। অহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেয় ও ঘৃণ্য মনে করা। হাদীসে এর জন্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

ইমাম মুসলিম হযরত আযয ইবনে আশ্শামর (রাঃ) —এর রেওয়াজেত বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, নম্রতা ও হেয়তা অবলম্বন কর। কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহংকারের পথ অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন কারও উপর জুলুম না করে। —(মায়হাসরী)

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

—অর্থাৎ উল্লেখিত সব মন্দ

কাজ আল্লাহর কাছে মকরূহ ও অপছন্দনীয়।

উল্লেখিত নির্দেশাবলীর মধ্যে যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো যে মন্দ ও অপছন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু করণীয় আদেশও আছে; যেমন পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি। যেহেতু এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বেঁচে থাকা; অর্থাৎ, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা থেকে বেঁচে থাকা, তাই এসবগুলোও হারাম ও অপছন্দনীয়।

হাশিয়ায়ী : পূর্বোল্লিখিত পনেরটি আয়াতে বর্ণিত নির্দেশাবলী একদিক দিয়ে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় সাধনা ও কর্মেরই ব্যাখ্যা, যা আঠারো আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল : وَمَعْلُومًا

—এতে ব্যস্ত করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক চেষ্টা ও কর্মই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়, বরং যে চেষ্টা ও কর্ম রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর সুন্যত ও শিক্ষার সাথে সঙ্গতিশীল, শুধু সেগুলোই গ্রহণীয়। এসব নির্দেশে গ্রহণীয় চেষ্টা ও কর্মের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো বর্ণিত হয়ে গেছে। তন্মধ্যে প্রথমে আল্লাহর হুক ও পরে বান্দার হুক বর্ণিত হয়েছে।

এই পনেরটি আয়াত সমগ্র তওরাতের সার সংক্ষেপ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : সমগ্র তওরাতের বিধানাবলী সূরা বনী ইসরাঈলের পনের আয়াতে সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে।—
(মায়হুরী)

উদাহরণতঃ সূরা সাদে হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে :

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ — অর্থাৎ, আমি

পাহাড়সমূহকে আত্মবাহ করে দিয়েছি। তারা দাঁড়দের সাথে সকাল-বিকাল তসবীহ পাঠ করে। সূরা বাক্বারায় পাহাড়ের পাখর সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَإِنَّ مِنْهَا لَمَنْ يَفْهَمُونَ حُكْمَ اللَّهِ অর্থাৎ, কতক পাখর আল্লাহর ভয়ে নীচে পড়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাখরের মধ্যেও চেতনা, অনুভূতি ও আল্লাহর ভয় রয়েছে। সূরা মরিয়মে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে বলা হয়েছে :

وَقُلْ لِّجِبَالِ هَذَا أَنْ دَعَا لِيَوْمِ الْوَعْدِ وَلَكِنَّا

পুত্র সাব্যস্ত করে। তাদের এই কুফরী বাক্যের কারণে পাহাড় ভীত হয়ে পতিত হয়। বলাবাহুল্য, এই ভয়-ভীতি তাদের চেতনা ও অনুভূতির পরিচায়ক। চেতনা ও অনুভূতি থাকলে তসবীহ পাঠ করা অসম্ভব নয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে জিজ্ঞেস করে, আল্লাহকে স্মরণ করে-এমন কোন বান্দা তোমার উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে কি? যদি সে উত্তরে হ্যাঁ বলে, তবে প্রশংসারী পাহাড় তাতে আনন্দিত হয়। এর প্রমাণ হিসেবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ আয়াতটি পাঠ করেন :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ اذْهَبُوا ۚ اِنْ تَرَوْهُ فَقُلُّوا زَيْفٌ ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْاُفْهَامِ ۚ اذْهَبُوا ۚ اِنْ تَرَوْهُ فَقُلُّوا زَيْفٌ ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْاُفْهَامِ ۚ অতঃপর বলেন : এ আয়াত থেকে যখন প্রমাণিত হল যে, পাহাড় কুফরী বাক্য শুনে প্রভাবান্বিত হয় এবং ভীত হয়ে যায়, তখন ভূমি কি মনে কর যে, তারা বাতিল কথাবার্তা শোনে; কিন্তু সত্য কথা ও আল্লাহর যিকর শোনে না এবং তদ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না? (কুরত্বী) রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কোন জ্বিন, মানব, পাখর ও টিলা এমন নেই, যে মুয়াম্মিনের আওয়াজ শুনে কেয়ামতের দিন তার ইমানদার ও সং হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য না দিবে - (মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ইবনে মাজা)

পয়গম্বরের উপর যাদুর ক্রিয়া হতে পারে : পয়গম্বরগণ মানবিক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নন। তাঁরা যেমন রোগাক্রান্ত হতে পারেন, জ্বর বাথায ভুগতে পারেন, তেমনি তাঁদের উপর যাদুর ক্রিয়াও সম্ভবপর। কেননা, যাদুর ক্রিয়াও বিশেষ স্বভাবগত কারণে জ্বিন ইত্যাদির প্রভাবে হয়ে থাকে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একবার রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপরও যাদুর ক্রিয়া হয়েছিল। শেষ আয়াতে কাফেররা তাঁকে যাদুগ্রস্ত বলেছে এবং কোরআন তা খণ্ডন করেছে। এর সারমর্ম হচ্ছে যে, যাদুগ্রস্ত বলে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পাগল বলা। কোরআন তাই খণ্ডন করেছে। অতএব যাদুর হাদীসটি এই আয়াতের পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি বিশেষ শানে নুয়ল আছে। কুরত্বী সাইদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেনঃ কোরআনে যখন সূরা লাহাব নাখিল হয়, যাতে আবু লাহাবের শত্রীরও নিন্দা উল্লেখ করা হয়েছে, যখন তার শত্রী রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মজলিসে উপস্থিত হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) তখন মজলিসে বিদ্যমান ছিলেন। তাকে দূর থেকে আসতে দেখে তিনি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন : আপনি এখান থেকে সরে গেলে ভাল হয়। কারণ, সে অত্যন্ত কটুভাষিণী। সে এমন কটু কথা বলবে, যার ফলে আপনি কষ্ট পাবেন। তিনি বললেন : না, তার ও আমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা পর্দা ফেলে দেবেন। অতঃপর সে মজলিসে উপস্থিত হলে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখতে পেল না। সে হযরত

আবু বকরকে সম্মুখীন করে বলতে লাগল : আপনার সঙ্গী আমার “হিজু” (কবিতার মাধ্যমে নিন্দা) করেছেন। হযরত আবু বকর বললেন, আল্লাহর কসম, তিনি তো কবিতাই বলেন না। অতঃপর সে একথা বলতে বলতে প্রস্থান করল যে, আপনিও তো তাকে সত্য বলে বিশ্বাসকারীদের অন্যতম। তাঁর প্রস্থানের পর হযরত আবু বকর আরয় করলেন : সে কি আপনাকে দেখেনি? রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : যতক্ষণ সে এখানে ছিল, ততক্ষণ একজন ফেরেশতা আমাকে তার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিল।

শক্রর দৃষ্টি থেকে গোপন থাকার একটি আমল : হযরত কা’ব বলেন : রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন মুশরিকদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করতে চাইতেন, তখন কোরআনের তিনটি আয়াত পাঠ করতেন। এর প্রভাবে শক্ররা তাঁকে দেখতে পেত না। আয়াতত্রয় এই : এক আয়াত—সূরা কাহাফের

وَلَمَّا نَسُوا لَكُمْ وَاتَّخَذُوا آلِهَتَهُمْ آلِهَةً ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْاُفْهَامِ ۚ اذْهَبُوا ۚ اِنْ تَرَوْهُ فَقُلُّوا زَيْفٌ ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْاُفْহَامِ ۚ অতঃপর তৃতীয় আয়াত সূরা জাসিয়ার

اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْاُفْهَامِ ۚ اذْهَبُوا ۚ اِنْ تَرَوْهُ فَقُلُّوا زَيْفٌ ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْاُفْهَامِ ۚ হযরত কা’ব বলেন : রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই ব্যাপারটি আমি সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করি। তিনি কোন প্রয়োজনবশতঃ রোম দেশে গমন করেন। বেশ কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি রোমীয় কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়লে প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। শক্ররা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। এহেন সংকেত মুহূর্তে হঠাৎ হাদীসটি তাঁর মনে পড়ে। তিনি কালবিলম্ব না করে আয়াত তিনটি পাঠ করতেই শক্রদের দৃষ্টির সাধনে পর্দা পড়ে যায়। যে রাস্তায় তিনি চলছিলেন, শক্ররাও সেই রাস্তায় চলাফেরা করছিল; কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না।

ইমাম সা’লাবী বলেন : হযরত কা’ব থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি আমি ‘রায়’ অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করেছিলাম। ঘটনাক্রমে সায়লামের কাফেররা তাঁকে গ্রেফতার করে। তিনি কিছুদিন কয়েদ থাকার পর সুযোগ পেয়ে পলায়ন করেন। শক্ররা তাঁকে পেছনে ধাওয়া করে। তিনি উল্লিখিত আয়াতত্রয় পাঠ করলে আল্লাহ তাআলা তাদের চোখের উপর পর্দা ফেলে দেন। ফলে তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান; অথচ তারা পাশাপাশি চলছিল এবং তাদের কাপড় তাঁর কাপড় স্পর্শ করছিল।

ইমাম কুরত্বী বলেন : উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের সাথে সূরা ইয়াসীনের ঐ আয়াতগুলোও মেলানো উচিত, যেগুলো রসুলুল্লাহ (সাঃ) হিজরতের সময় পাঠ করেছিলেন। তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁর বাসগৃহ ঘেরাও করে রেখেছিল। তিনি আয়াতগুলো পাঠ করে তাদের মাঝখান দিয়ে চলে যান; বরং তাদের মাথায় ধূলা নিক্ষেপ করতে করতে যান; কিন্তু তাদের কেউ টেরও পায়নি। সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো এই :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا كُنَّا اَوَّلَ الْاَنْبِيَاءِ ۚ اِنَّا كُنَّا اَوَّلَ الْاَنْبِيَاءِ ۚ اِنَّا كُنَّا اَوَّلَ الْاَنْبِيَاءِ ۚ اِنَّا كُنَّا اَوَّلَ الْاَنْبِيَاءِ ۚ اِنَّا كُنَّا اَوَّلَ الْاَنْبِيَاءِ ۚ

بَنِي إِسْرَٰءِيلَ

২৮৮

سُورَةُ الْأَنْكَافِ

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْيُنِهِمْ أَغْلَٰظَ بَصَرٍ إِلَى الْآذَانِ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَعْيُنُهُمْ

فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ

ইমাম কুরতুবী বলেন : আমি স্বপ্নে আপদালুসে কর্ডোভার নিকটবর্তী মনসুর দুর্গে নিজেই এ ধরনের ঘটনার সন্মুখীন হয়েছিলাম। অবশেষে নিরুপায় অবস্থায় আমি শত্রুদের সন্মুখ দিয়ে দৌড়ে এক জায়গায় বসে গেলাম। শত্রুরা দু'জন অশুরোহীকে আমার পশ্চাদ্ভাবন করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। আমি সম্পূর্ণ খোলা মাঠেই ছিলাম। আড়াল করার মত কোন বস্তুই ছিল না। আমি তখন বসে বসে সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো পাঠ করছিলাম। অশুরোহী ব্যক্তিদ্বয় আমার সন্মুখ দিয়ে “লোকটি কোন শয়তান হবে” বলতে বলতে যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই ফিরে গেল। বলাবাহুল্য তারা, আমাকে অবশ্যই দেখেনি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আমার দিক থেকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন।— (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ يَنْفُخُ نُفُوزٍ يَوْمَ يُدْعَوْنَ - শব্দটি يدعو থেকে

উদ্ধৃত। এর অর্থ আওয়ায দিয়ে ডাকা। আয়াতের অর্থ এই যে, যেদিন আল্লাহ তাআলা তোমাদের সবাইকে হাশরের ময়দানের দিকে ডাকবেন। এই ডাকা ফেরেশতা ইসরাফীলের মাধ্যমে হবে। তিনি যখন দ্বিতীয়বার শিকায় হুঁক দেবেন, তখন সব মৃত জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এছাড়া জীবিত হওয়ার পর হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্যে আওয়ায দেয়াও সম্ভবপর।— (কুরতুবী)

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজের এবং পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। কাজেই ভাল নাম রাখবে। (অর্থহীন নাম রাখবে না।)

হাশরে কাকেররাও আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উষ্মিত হবে: فَتَسْتَوِيْنُ سَجَابَتٍ - শব্দের অর্থ ডাকার পর আদেশ পালন করা এবং উপস্থিত হওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, হাশরের ময়দানে যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে, তখন তোমরা সবাই ঐ আওয়ায অনুসরণ করে একত্রিত হয়ে যাবে। وَجْهٌ, অর্থাৎ, ময়দানে আসার সময় তোমরা সবাই আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উপস্থিত হবে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, তখন মুমিন ও কাকের সবারই এই অবস্থা হবে। কেননা, আয়াতে প্রকৃতপক্ষে কাকেরদেরকেই সম্মুখন করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কেই বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সবাই প্রশংসা করতে করতে উষ্মিত হবে। তফসীলবিদদের মধ্যে হযরত সাঈদ সিবহানকি ইবনে যুবায়ের বলেন : কাকেররাও কবর থেকে বের হওয়ার সময় سَبَاحًا বলতে বলতে বের হবে। কিন্তু তখনকার প্রশংসা ও গুণগীর্তন তাদের কোন উপকারে আসবে না।—(কুরতুবী) কেননা, তারা মৃত্যুর পর যখন জীবন দেখবে, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মুখ থেকে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও গুণবাচক বাক্য উচ্চারিত হবে। এটা প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য আমল হবে না।

(৫২) যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে। এবং তোমরা অনুমান করবে যে, সামান্য সময়ই অবস্থান করেছিল। (৫৩) আমার বান্দাদেরকে বল দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৫৪) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন। তিনি যদি চান, তোমাদের প্রতি রহমত করবেন কিংবা যদি চান, তোমাদেরকে আযাব দিবেন। আমি আপনাকে ওদের সবার তত্ত্বাবধায়ক রূপে প্রেরণ করিনি। (৫৫) আপনার পালনকর্তা তাদের সম্পর্কে ভালভাবে জ্ঞাত আছেন, যারা আকাশসমূহে ও ভূপৃষ্ঠে রয়েছে। আমি তো কতক পয়গম্বরকে কতক পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি এবং দাঁড়কে যবুর দান করেছি। (৫৬) বলুন : আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা উপাস্য মনে কর, তাদেরকে আহ্বান কর। অথচ ওরা তো তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে না এবং তা পরিবর্তনও করতে পারে না। (৫৭) যাদেরকে তারা আহ্বান করে, তারা নিজেরাই তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থতা জালশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যপালি। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ। (৫৮) এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কেয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর শাস্তি দেব না। এটা তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। (৫৯) পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নির্দর্শন অস্বীকার করার ফলেই আমাকে নির্দর্শনালী প্রেরণ থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। আমি তাদেরকে বোঝাবার জন্যে সাময়িক উদ্ভী দিচ্ছিলাম। অতঃপর তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আমি তীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই নির্দর্শনালী প্রেরণ করি। (৬০) এবং সূর্য্য করুন, আমি আপনাকে বলে দিয়েছিলাম যে, আপনার পালনকর্তা মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি তাও কোরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্যে। আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু এতে তাদের অবস্থাটাই আরও বৃদ্ধি পায়।

কোন কোন তফসীরবিদ একে বিশেষভাবে মুমিনদের অবস্থা আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, কাফেরদের সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে, যখন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তখন তারা একথা বলবে: **يَوْمَئِذٍ نَعْتَلَمُ بِعَذَابِ مَنْ مَرَّوَدٍ** হায় আফসোস! কে আমাদেরকে কবর থেকে জীবিত করে উদ্ভিত করেছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, তারা বলবে **يُسْتَرْوَى عَلَى مَا فَعَلْنَا فِي حَيْثُ اللَّهِ** হায় আফসোস! আমরা আল্লাহর ব্যাপারে বিরাট ক্রটি করেছি।

কিন্তু সত্য এই যে, উভয় তফসীরের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। শুরুতে সবাই প্রশংসা করতে করতে উঠবে। পরে কাফেরদেরকে মুমিনদের কাছ থেকে পৃথক করে দেয়া হবে, যেমন সূরা ইয়াসীনের আয়াতে রয়েছে **وَأَمَّا الزُّبُرُ الْيَوْمَ لَا يَمُرُّ بَيْنَهُمْ** অপরাধীরা, আজ তোমরা সবাই পৃথক হয়ে যাও। তখন কাফেরদের মুখ থেকে উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বাক্যাবলী উচ্চারিত হবে। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। ইমাম কুরতুবী বলেন : হাশরে পুনরুত্থানের শুরু হামদ দ্বারা হবে। সবাই হামদ করতে করতে উদ্ভিত হবে এবং সব ব্যাপারে সমাপ্তিও হামদের মাধ্যমে হবে। যেমন- বলা হয়েছে, **وَقُتِبَ عَلَيْهِمُ بِالنِّعَةِ وَقِيلَ الْمُسْلِمُونَ** অর্থাৎ, হাশরবাসীদের ফয়সালা হক অনুযায়ী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রশংসা বিশৃঙ্খলার পালনকর্তা আল্লাহর জন্যে।

কটুভাষা ও কড়া কথা কাফেরদের সাথেও জায়েয নয় : ৫৩ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে কড়া কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিনা প্রয়োজনে কঠোরতা করা যাবে না এবং প্রয়োজন হলে হত্যা পর্যন্ত করার অনুমতি রয়েছে।

হত্যা ও যুদ্ধের মাধ্যমে কুফরের শান-শওকত এবং ইসলামের বিরোধিতাকে নির্মূল করা যায়। তাই এর অনুমতি রয়েছে। গালি-গালাজ ও কটু কথা দ্বারা কোন দুর্গ জয় করা যায় না এবং কারও হেদায়েত হয় না। তাই এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন : আলোচ্য আয়াত হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘটনার পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি জনৈক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-কে গালি দিলে প্রত্যুত্তরে তিনিও তার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে হত্যা করতেও মনস্থ করেন, ফলে দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কুরতুবীর বক্তব্য এই যে, এই আয়াতে মুসলমানদেরকে পারস্পরিক কথাবার্তা বলা সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক মতানৈক্যের সময় কঠোর ভাষা প্রয়োগ করো না। এর মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-কলহ সৃষ্টি করে দেয়।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ — এখানে বিশেষভাবে যবুরের কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, যবুর গ্রন্থে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে

যে, তিনি পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে দেশ ও সাম্রাজ্যের অধিকারীও হবেন। কোরআনে বলা হয়েছে : **وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ** বর্তমান প্রচলিত যবুরেও কেউ কেউ এ কথার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন — (তফসীরে হক্কানী)

ইমাম বগভী স্বীয় তফসীরে এ স্থানে লেখেন : যবুর আল্লাহর গ্রন্থ, যা হযরত দাউদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। এতে একশ পঞ্চাশটি সূরা রয়েছে এবং প্রত্যেকটি সূরা দোয়া, হামদ ও গুণবীর্তনে পরিপূর্ণ। এগুলোতে হালাল, হারাম এবং ফরয কর্তব্যাদির বর্ণনা নেই।

يَتَّبِعُونَ إِلَى دَعْوَى أَوْسِيَاءِهِمْ — শব্দের অর্থ এমন বস্তু যাকে অন্য কারও কাছে পৌছার উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহর জন্যে ওসীলা হচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহর মজ্বির প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখা এবং শরীয়তের বিধি-বিধান অনুসরণ করা। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা সবাই সংকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণে মশগুল আছেন।

وَرَوَّحُونَ وَنَمَتُ وَخَفَّ عَذَابُهُ হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ বলেন : আল্লাহর রহমতের আশা করতে থাকা এবং ভয়ও করতে থাকা-মানুষের এ দু'টি ভিন্নমুখী অবস্থা যে পর্যন্ত সমান সমান পর্যায়ে থাকে, সেই পর্যন্ত মানুষ সঠিক পথে অনুগমন করে। পক্ষান্তরে যদি কোন একটি অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে সেই পরিমাণে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে — (কুরতুবী)

وَأَجَعَلْنَا الزُّبُرَ الْإِنشَاءَ لِلنَّاسِ অর্থাৎ, শব্দ-মে'রাজে যে দৃশ্যাবলী আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, তা মানুষের জন্যে একটি ক্ষেতনা ছিল। আরবী ভাষায় 'ক্ষেতনা' শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ গোমরাহী। আরিফ অর্থ পরীক্ষাও হয় এবং অন্য এক অর্থ হাস্য ও গোলযোগ। এখানে সব অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান। হযরত আয়েশা, সুফিয়ান, হাসান, মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে শেযোক্ত অর্থ নিয়েছেন। তাঁরা বলেন : এটা ছিল ধর্মত্যাগের ক্ষেতনা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন শবে-মে'রাজে বায়তুল-মুকাদ্দাস, সেখান থেকে আকাশে যাওয়ার এবং প্রত্যুষের পূর্বে ফিরে আসার কথা প্রকাশ করলেন, তখন কোন কোন অপক্ব নও মুসলিম এ কথা মিথ্যা মনে করে মুরতাদ হয়ে গেল। — (কুরতুবী)

এ ঘটনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, **زُيَّا** শব্দটি আরবী ভাষায় যদিও স্বপ্নের অর্থেও আসে, কিন্তু এখানে স্বপ্নের কিস্দা বোঝানো হয়নি। কারণ, এরূপ হলে কিছু লোকের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কোন কারণ ছিল না। স্বপ্ন তো প্রত্যেকেই দেখতে পারে; বরং এখানে **زُيَّا** শব্দ দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় অভিনব ঘটনা দেখানো বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে কোন কোন তফসীরবিদ মে'রাজের ঘটনা ছাড়া অন্যান্য ঘটনা বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু সেগুলো এখানে খাপ খায় না। একারণেই অধিক সংখ্যক তফসীরবিদ মে'রাজের ঘটনাকে আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন। — (কুরতুবী)

وَأَقْنَأَ الْمَلَكُوتَ أَسْجُدَ الْإِلَهِ فَجَعَلَ الْإِلَهِ لَيْسَ قَالَ
 أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ هَذَا الذِّئِي كَرِهَتْ
 عَلَى لَيْسَ آخَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَكُنْ تَعْبُكَ دُرِّيَّةَ الْإِلَهِ
 قِيلَ لَا قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَعْبُكَ وَمَنْ هُمْ قِيلَ جَهَنَّمَ بَرَاءُكُمْ
 جَزَاءُ مَقُورٍ وَأَسْفُورُ زَمِنَ اسْتَغْفَرُ مِنْهُمْ بِصُورِكَ
 وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ جَنَّتِكَ وَجَلَّكَ وَسَلَّ هُمْ عَلَى الْأَمْوَالِ
 وَالْأَوْلَادِ وَعِدَهُمْ وَأَيَّدَهُمُ الشَّيْطَانُ الْأَشْرُورُ لَعْنَةُ الْإِلَهِ
 لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكَفَى لَكَ الْإِلَهِ الْإِلَهِ
 يُرْجَى لَكُمْ الْعَالَمُ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَ عَوْنُ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا وَإِذَا اسْتَأْذَنُكَ فِي الْبَحْرِ صِلَ مَنْ تَدْعُونَ
 إِلَّا آيَةً فَلَمَّا جَاءَكَ إِلَى الرَّاغِبِ صِلَ مَنْ تَدْعُونَ
 لَكُمْ قِيلَ لَا فَإِنْ كُنْتُمْ أَنْ تَخِيفَ بَكُمْ جَلِيلُ الدَّرَجَاتِ
 عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا أَمْوَالَهُمْ
 يُعْبَدُكُمْ فَيُؤْتَانَهُ أَخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ
 الرِّيحِ فَيَغْرَقُكُمْ مِمَّا قَدْ تُمَتَّعْتُمْ بِالْكَافِرِينَ عَمَّا

(৬১) সূর্য কর, যখন আমি কেরেশতাদেরকে বললাম : আদমকে সেজদা কর, তখন ইলীস ব্যতীত সবাই সেজদায় পড়ে গেল। কিন্তু সে বলল : আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব, যাকে আপনি মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? (৬২) সে বলল : দেখুন তো, এ না সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চ মর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্য সৎব্যক ছাড়া তার কেশরদেরকে সম্মূল নষ্ট করে দেব। (৬৩) আল্লাহ বলেন : চলে যা, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে তোর অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে তাদের সবার শাস্তি - ভরপুর শাস্তি। (৬৪) তুই সত্যচ্যুত করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়ায দ্বারা, স্বীয় অশুরোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের অর্থ-সম্পদ ও সম্ভান-সম্বন্ধিত শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত দে। হলনা ছাড়া শরতান তাদেরকে কোন প্রতিষ্ঠিত দেয় না। (৬৫) আমার বান্দাদের উপর তোরা কোন ক্রমতা নেই আপনার পালনকর্তা হচ্ছে কার্যনির্বাহী। (৬৬) তোমাদের পালনকর্তা তিনিই, যিনি তোমাদের জন্যে সমুদ্রে জলযান চালায় করেন, যাতে তোমরা তার অসুস্থ অবস্থায় পড়তে পারো। নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৬৭) যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন শুধু আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাক তাদেরকে তোমরা বিস্মৃত হয়ে যাও। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করে দেন, তখন তোমরা মুগ্ধ কিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (৬৮) তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে কোথাও তুঙ্গরূপ করবেন না। অথবা তোমাদের উপর প্রভুর বর্ষকারী ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করবেন না, তখন তোমরা নিজদের জন্যে কোন কর্মবিধায়ক পাবে না। (৬৯) অথবা তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, তিনি তোমাদেরকে আরেকবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না, অতঃপর তোমাদের জন্যে মহা ব্যতিক্রম প্রেরণ করবেন না, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার শাস্তিগ্রস্ত তোমাদেরকে নিষিদ্ধিত করবেন না, তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে সাহায্যকারী কাউকে পাবে না।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়
 অসংকল্প - অসংকল্প শব্দের অর্থ কোন বস্তুর মূলোৎপাটন করা, ধ্বংস করা অথবা সম্পূর্ণরূপে বণীভূত করা। আস্তফুর - আস্তফুর শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন করা। এখানে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা বোঝানো হয়েছে। আস্তফুর - আস্তফুর শব্দের অর্থ আওয়ায। শয়তানের আওয়ায কি? এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : গান, বাদ্যযন্ত্র ও রং-তামাশার আওয়াযই শয়তানের আওয়ায। এর মাধ্যমে সে মানুষকে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ থেকে জানা গেল যে, বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনা হারাম।— (কুরত্বী)

ইবলীস হযরত আদমকে (আঃ) সেজদা না করার সময় দু'টি কথা বলেছিল। (এক) আদম মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে এবং আমি অগ্নির দ্বারা সৃজিত। আপনি মাটিকে অগ্নির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন? এ প্রশ্নটি আল্লাহর আদেশের বিপরীতে নির্দেশের রহস্য জানার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কোন আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই একথা বলাই বাহুল্য। কারণ, দুনিয়াতে স্বয়ং মানুষ তার চাকরকে এ অধিকার দেয় না যে, সে তার চাকরকে কোন কাজ করতে বলবে এবং চাকর সেই কাজটি করার পরিবর্তে প্রভুকে প্রশ্ন করবে যে, এর রহস্য কি? তাই ইবলীসের এই প্রশ্নটিকে উত্তরের অযোগ্য সাব্যস্ত করে আয়াতে তার উত্তর দেয়া হয়নি। এছাড়া বাহ্যিক উত্তর এটাই যে, এক বস্তুর অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাত্র সে সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি যখন যে বস্তুরকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, তখন তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।

ইবলীসের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা হয়, তবে আমি আদমের গোটা বংশধরকে অবশ্য তাদের কয়েকজন ছাড়া পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। আয়াতে আল্লাহ তাআলা এর উত্তরে বলেছেন : আমার ষাটি বান্দা যারা, তাদের উপর তোরা কোন ক্রমতা চলবে না; যদিও তোরা গোটা বাহিনী ও সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত হয়। অবশিষ্ট অশাটি বান্দারা তোরা বণীভূত হয়ে গেলে তাদেরও দুর্দশা তাই হবে, যা তোরা জন্যে নির্ধারিত, অর্থাৎ, জাহান্নামের আধাবে তাদের সবাই গ্রোহতার হবে। আয়াতের وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ جَنَّتِكَ وَجَلَّكَ বাস্তব শয়তানের অশুরোহী ও পদাতিক বাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্বারা বাস্তবও শয়তানের কিছু অশুরোহী ও কিছু পদাতিক বাহিনী জরুরী বিবেচিত হয় না; বরং এই বাকপদ্ধতিটি পূর্ণ বাহিনী তথা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তবে যদি এরূপ থেকেও থাকে, তবে তাও অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : যারা কুফরের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যায়, সেসব অশুরোহী ও পদাতিক বাহিনী শয়তানেরই অশুরোহী ও পদাতিক বাহিনী। এখন প্রশ্ন রইল, শয়তান কিরূপে জানতে পারল যে, সে আদমের বংশধরগণকে কুমত্রা দিয়ে পথভ্রান্ত করতে সক্ষম হবে? সম্ভবতঃ সে মানুষের গঠনপ্রকৃতি দেখে বুঝে নিয়েছে যে, এর মধ্যে কুপ্রবৃত্তির প্রাবল্য হবে। তাই কুমত্রার কীদে পড়ে যাওয়া কঠিন হবে না। এছাড়া এটা যে মিছামিছি দাবীই ছিল, তাও অবাস্তব নয়।

وَسَلَّ لَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ - মানুষের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْجَنَّةِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الْطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ يَوْمَ
نَدْعُوهُمْ أَتَانِسُ يَا أَيُّهَا مَعْهُمْ مَن أَوْتَى كِتَابَهُ يَفِيضُهُ نَأْتِيكَ
يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَظْلُمُونَ فِتْيَانًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ
أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝ كَانَ كَادُوا الْفِتْيَانُ أَنْ
عَنِ الَّذِينَ أَمَعَيْنَا لِيَكُن لِّمَنْ تَرَى عَلَيْنَا غَرَضًا ۝ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ
خَلْقِكَ أَلْوَانًا لَّئِنْ تَبَيَّنْتَ لِقَدِيدِكَ تَرَى الْيَوْمَ سُبْحَانَ الَّذِي
إِذَا لَدُنْكَ وَضَعْتَ الْحَيَاةَ وَضَعْتَ الْمَوْتَ ثُمَّ لَمْ يَلِدْكَ لَكَ
عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوا
مِنْهَا وَإِذَا أَلَيْسَ لَنَا خَلْقٌ إِلَّا قَلِيلًا ۝ سُبْحَانَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا
فَبِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَحْزَنْ لِمَنْ تَرَى الْفِتْيَانُ وَالصَّلَاةُ لِلْوَلَدِ
الشَّيْءِ إِلَى عَسَى الْيَوْمَ وَقُرْآنَ الْفَتْرِ ۝ إِنَّ قُرْآنَ الْفَتْرِ كَانَ
مَشْهُودًا ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ مَقْعَدُهَا وَإِنَّا لَكُنَّا عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ
رَبُّكَ مَقَامًا مَعْبُودًا ۝ وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَ
أَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ۝

(৭০) নিচয় আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে ফুল ও ফলে চলাচলের বাহন দান করেছি তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (৭১) সুরঙ্গ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের নেতাসহ আহবান করব, অতঃপর যাদেরকে ডানহাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে, তারা নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম হবে না। (৭২) যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ ছিল সে পরকালেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রান্ত। (৭৩) তারা তো আপনাকে হাট্টিয়ে দিতে চাচ্ছিল যে বিষয় আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা থেকে আপনার পদস্খলন ঘটানোর জন্যে তারা চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে, যাতে আপনি আমার প্রতি কিছু মিথ্যা সযুক্ত করেন। এতে সফল হলে তারা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিত। (৭৪) আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। (৭৫) তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দিগ্ধ শান্তির আশ্বাদন করাতাম। এ সময় আমি আমার মোকাবিলায় কোন সাহায্যকারী পেতেন না। (৭৬) তারা তো আপনাকে এ ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করে দিতে চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল যাতে আপনাকে এখন থেকে বহিস্কার করে দেয়া যায়। তখন তারাও আপনার পর সেখানে অশ্লকালই মাত্র টিকে থাকত। (৭৭) আপনার পূর্বে আমি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল। আপনি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না। (৭৮) সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায কয়েম করুন এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিচয় ফজরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয়। (৭৯) রাত্রির কিছু অংশ কোরআন পাঠসহ ভাঙত থাকুন। এটা আপনার জন্যে অতিরিক্ত। হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌছাবেন। (৮০) বলুন : হে পালনকর্তা! আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রাত্রীর সাহায্য।

সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানার অর্থ, হযরত ইবনে আক্বাস (রাঃ)-এর মতে এই যে, ধন-সম্পদ অবৈধ হারাম পন্থায় উপার্জন করা অথবা হারাম কাজে ব্যয় করাই হচ্ছে ধন-সম্পদে শয়তানের শরীকানা। সম্ভান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানা কয়েকভাবে হতে পারে : সম্ভান অবৈধ ও জারজ হলে, সম্ভানের মুশরিকসুলত নাম রাখা হলে, তাদের লালন-পালনে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করলে।—(কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব কেন? : ৭০ নং আয়াতে অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সন্তানদের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লেখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে দু'টি বিষয় প্রশ্নবিধানযোগ্য। (এক) এই শ্রেষ্ঠত্ব কি গুণাবলী ও কি কারণের উপর নির্ভরশীল? (দুই) অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কথা বলে কি বোঝানো হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহ তাআলা আদম-সন্তানকে বিভিন্ন দিক দিয়ে এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যেগুলো অন্যান্য সৃষ্টজীবের মধ্যে নেই। উদাহরণতঃ সুস্থী চেহারা, সুখম দেহ, সুখম প্রকৃতি এক অঙ্গসৌষ্ঠব। এগুলো মানুষকে দান করা হয়েছে যা অন্য কোন জীবের মধ্যে নেই। এছাড়া বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে। এর সাহায্যে সে সমগ্র উর্ধ্ব-জগত ও অধঃজগতকে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে। আল্লাহ তাআলা তাকে বিভিন্ন সৃষ্টবস্তুর সর্মিশ্রণে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার শক্তি দিয়েছেন, সেগুলো তার বসবাস, চলাফেরা, আহাৰ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্যাকশক্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে নৈশূন্য মানুষ লাভ করেছে, তা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের কথা অন্যকে বলে দেয়া, লেখা ও চিঠির মাধ্যমে গোপন ভেদে অন্যজন পর্যন্ত পৌছানো—এগুলো সব মানুষেরই স্বাতন্ত্র্য। কোন কোন আলেম বলেন : হাতের অঙ্গুলি দ্বারা আহাৰ্য করার ও মানুষেরই বিশেষ গুণ। মানুষ ব্যতীত সব জন্তু মুখে আহাৰ্য গ্রহণ করে। বিভিন্ন জিনিসের সর্মিশ্রণে খাদ্যবস্তুকে সুস্বাদু করাও মানুষেরই কাজ। অন্যান্য সব প্রাণী একক বস্তু আহাৰ্য করে। কেউ কাঁচা গোশত, কেউ মাছ এবং কেউ ফল আহাৰ্য করে। মানুষই কেবল সর্মিশ্রিত খাদ্য প্রস্তুত করে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা মানুষের সর্মপ্রধান শ্রেষ্ঠত্ব। এর মাধ্যমে সে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু পরিচয় এবং তাঁর পছন্দ ও অপছন্দ জেনে পছন্দের অনুগমন করে এবং অপছন্দ থেকে বিরত থাকে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনার দিক দিয়ে সৃষ্টজীবকে এভাবে তাস করা যায় যে, সাধারণ জীব-জন্তুর মধ্যে কামতাব ও কামনা-বাসনা আছে, কিন্তু বুদ্ধি ও চেতনা নেই। ফেরেশতাদের মধ্যে বুদ্ধি ও চেতনা আছে, কিন্তু কামতাব ও বাসনা নেই। একমাত্র মানুষের মধ্যেই বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা আছে এবং কামতাব ও কামনা-বাসনাও আছে। এ কারণেই সে বুদ্ধি ও চেতনার সাহায্যে কামতাব ও বাসনাকে পরাভূত করে দেয় এক আল্লাহ তাআলার অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিজেকে বাচিয়ে রাখে। ফলে তার স্থান ফেরেশতার চাইতেও উর্ধ্ব উন্নীত হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আদম-সন্তানকে অনেক সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠ করার অর্থ কি? এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই যে, সমগ্র উর্ধ্ব ও অধঃজগতের সৃষ্টজীব এবং সমস্ত জীব-জন্তুর চাইতেও আদম-সন্তান শ্রেষ্ঠ। এমনভাবে বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষের সমতুল্য জিন জাতির

চাইতেও আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব সবার কাছে স্বীকৃত। এখন শুধু ফেরেশতাদের ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, মানুষ ও ফেরেশতাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এ ব্যাপারে সূচিস্তিত কথা এই যে, মানুষের মধ্যে ঈসা সাধারণ ঈমানদার ও সংকর্মী; যেমন আলিয়া-দরবেশ, তাঁরা সাধারণতঃ ফেরেশতাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিশেষ ফেরেশতঃ; যেমন — জিবরাঈল, মীকাঈল প্রমুখ, তাঁরা সাধারণ সংকর্মী মুমিনের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বিশেষ শ্রেণীর মুমিন — যেমন পয়গম্বর শ্রেণী, তাঁরা বিশেষ শ্রেণীর ফেরেশতাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। এখন রহিল কাকের ও পাণিষ্ঠ মানুষের কথা। বলাবাহুল্য, এরা ফেরেশতাদের চাইতে উত্তম হওয়া তো দূরের কথা, আসল লক্ষ্য, সাফল্য ও মুক্তির দিক দিয়ে জন্ত-জানোয়ারের চাইতেও অধম। এদের সম্পর্কে কোরআনের কয়সালা এই : **أُولَئِكَ كَانُوا لَدُنَّ رَبِّكَ مُسْتَمْسِكِينَ** অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জন্তদের ন্যায়; বরং তাদের চাইতেও পথভ্রান্ত। — (মায়হারী)

يَوْمَ نَذْخُلُ الْأَرْضَ الْأَنْثَىٰ بِهَا مُسَبِّحِينَ অর্থাৎ এখানে **امام** শব্দের অর্থ গ্রন্থ; যেমন — সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, **وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ** অর্থাৎ সুস্পষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুলভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন— কোন অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেয়া হয়। — (কুরতুবী)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) —এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীর হাদীস থেকেও জানা যায় যে, আয়াতে ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ। হাদীসের ভাষা এরূপঃ **يَوْمَ نَذْخُلُ الْأَرْضَ الْأَنْثَىٰ بِهَا مُسَبِّحِينَ** অর্থাৎ এখানে **امام** শব্দের অর্থ গ্রন্থ; যেমন — সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, **وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ** অর্থাৎ সুস্পষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুলভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন— কোন অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেয়া হয়। — (কুরতুবী)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) —এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীর হাদীস থেকেও জানা যায় যে, আয়াতে ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ। হাদীসের ভাষা এরূপঃ **يَوْمَ نَذْخُلُ الْأَرْضَ الْأَنْثَىٰ بِهَا مُسَبِّحِينَ** অর্থাৎ এখানে **امام** শব্দের অর্থ গ্রন্থ; যেমন — সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, **وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ** অর্থাৎ সুস্পষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুলভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন— কোন অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেয়া হয়। — (কুরতুবী)

হযরত আলী (রাঃ) ও মুজাহিদ থেকে এখানে ইমাম শব্দের অর্থ নেতাও বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম নিয়ে ডাকা হবে—এই নেতা পয়গম্বর ও তাঁদের নায়ক, মাশায়েখ এবং ওলামা হোক কিংবা পথভ্রষ্টতার প্রতি আহবানকারী নেতা হোক। — (কুরতুবী)

এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম দ্বারা ডাকা হবে এবং সবাইকে এক জায়গায় জমায়েত করা হবে। উদাহরণতঃ ইবরাহীম (আঃ) —এর অনুসারী দল, মুসা (আঃ) —এর অনুসারী দল, ইসা (আঃ) —এর অনুসারী দল এবং মুহাম্মদ (সাঃ) —এর অনুসারী দল। এ প্রসঙ্গে এসব অনুসারীর প্রত্যেক নেতাদের নাম নেয়াও সম্ভবপর।

আমলনামাঃ কোরআন পাকের একাধিক আয়াত থেকে জানা যায় যে, শুধু কাকেরদেরকেই বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে; যেমন এক আয়াতে রয়েছে **يَوْمَ نَذْخُلُ الْأَرْضَ الْأَنْثَىٰ بِهَا مُسَبِّحِينَ** অর্থাৎ এখানে **امام** শব্দের অর্থ গ্রন্থ; যেমন — সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, **وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ** অর্থাৎ সুস্পষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুলভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন— কোন অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেয়া হয়। — (কুরতুবী)

আমলনামাঃ কোরআন পাকের একাধিক আয়াত থেকে জানা যায় যে, শুধু কাকেরদেরকেই বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে; যেমন এক আয়াতে রয়েছে **يَوْمَ نَذْخُلُ الْأَرْضَ الْأَنْثَىٰ بِهَا مُسَبِّحِينَ** অর্থাৎ এখানে **امام** শব্দের অর্থ গ্রন্থ; যেমন — সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, **وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ** অর্থাৎ সুস্পষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুলভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন— কোন অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেয়া হয়। — (কুরতুবী)

আমলনামাঃ কোরআন পাকের একাধিক আয়াত থেকে জানা যায় যে, শুধু কাকেরদেরকেই বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে; যেমন এক আয়াতে রয়েছে **يَوْمَ نَذْخُلُ الْأَرْضَ الْأَنْثَىٰ بِهَا مُسَبِّحِينَ** অর্থাৎ এখানে **امام** শব্দের অর্থ গ্রন্থ; যেমন — সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, **وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ** অর্থাৎ সুস্পষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুলভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন— কোন অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেয়া হয়। — (কুরতুবী)

আমলনামাঃ কোরআন পাকের একাধিক আয়াত থেকে জানা যায় যে, শুধু কাকেরদেরকেই বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে; যেমন এক আয়াতে রয়েছে **يَوْمَ نَذْخُلُ الْأَرْضَ الْأَنْثَىٰ بِهَا مُسَبِّحِينَ** অর্থাৎ এখানে **امام** শব্দের অর্থ গ্রন্থ; যেমন — সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, **وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ** অর্থাৎ সুস্পষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুলভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন— কোন অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেয়া হয়। — (কুরতুবী)

উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও কুফরই। এ থেকে জানা গেল যে, ডান হাতে আমলনামা ঈমানদারদেরকে দেয়া হবে, পরহেযগার হোক কিংবা গোনাহগার। তারা আনন্দচিত্তে আমলনামা পাঠ করবে, বরং অন্যদেরকেও পাঠ করতে দেবে। এ আনন্দ ঈমান ও চিরস্থায়ী আশাব থেকে মুক্তির হবে যদিও কোন কোন কৃতকর্মের জন্যে তাদেরকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

কোরআন পাকে আমলনামা ডান অথবা বাম হাতে অর্পণের অবস্থা বর্ণিত হয়নি, কিন্তু কোন কোন হাদীসে **تطايير الكتب** শব্দটি উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ আমলনামা উড়ে এসে হাতে পড়বে। কোন কোন হাদীসে আছে, সব আমলনামা আরশের নীচে একত্রিত হবে। অতঃপর বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সবগুলোকে উড়িয়ে মানুষের হাতে পৌঁছে দেবে কারও ডান হাতে এবং কারও বাম হাতে। — (বয়ানুল-কোরআন)

إِذَا زُلْزِلَتْ فَضَعَتِ الْحَيَوةُ وَضَعَتِ الْمَوْتُ অর্থাৎ, যদি অসম্ভবকে ধরে নেয়ার পর্যায়ে আপনি তাদের ব্রাহ্ম কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ার কাছাকাছি হয়ে যেতেন, তবে আপনার শাস্তি ইহকালেও দ্বি গুণ হত এবং মৃত্যুর পর কবর অথবা পরকালেও দ্বি গুণ হত। কেননা, নৈকট্যবিলম্বের মামুলী ভাষ্যকেও বিরাট মনে করা হয়। এ বিষয়বস্তুটি সে বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ, যা রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর পণ্ডীদের সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে —

يُنْسَأُ النَّبِيُّ مِنْ يَأْتِ مَثَلُهَا حَشَوْنَةً وَتُضَعَّفُ لَهَا

الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ

অর্থাৎ, হে নবী পত্নীরা, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কাজ করে, তবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে।

وَلَنْ كَادُوكَ لَيْسَ زُؤُنُكَ —এর শাস্তির অর্থ, কর্তন করা।

এখানে রসুলুল্লাহ (সাঃ) —কে স্বীয় বাসভূমি মক্কা অথবা মদীনা থেকে বের করে দেয়া বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কাকেররা আপনাকে নিজ দেশ থেকে বের করে দেয়ার উপক্রম করেছিল। তারা যদি এরূপ করত, তবে এর শাস্তি ছিল এই যে, তারাও আপনার পরে বেশী দিন এ শহরে বাস করতে পারত না। এটি অপর একটি ঘটনার বর্ণনা, যার নির্ণয়েও দু'রকম রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। একটি মদীনা তাইয়েবার ঘটনা এবং অপরটি মক্কা মোকাররমার। মদীনার ঘটনা এই যে, একদিন মদীনার ইহুদীরা রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করল : হে আবুল কাসেম (সাঃ), যদি আপনি নবুওয়তের দাবীতে সভাবাদী হয়ে থাকেন, তবে সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করাই আপনার পক্ষে সমীচীন। কেননা, সিরিয়ায় হবে হাশরের মাঠ এবং সেটাই পয়গম্বরের বাসভূমি। রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর মনে তাদের একথা কিছুটা রেখাপাত করে। তবুও যুদ্ধের সময় তিনি যখন সিরিয়া সফর করেন, তখন সিরিয়াকে অন্যতম বাসস্থান করার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু আলোচ্য

وَلَنْ كَادُوكَ لَيْسَ زُؤُنُكَ আয়াতটি নাখিল করে, তাঁকে এ ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে নিষেধ করে দেয়া হয়। ইবনে কাসীর রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে একে অসম্ভাবজনক আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি অপর একটি ঘটনার প্রতিও আয়াতের ইঙ্গিত বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি মক্কা সংঘটিত হয়। যা সূরাটির মক্কা অবতীর্ণ হওয়াএর পক্ষে শক্তিশালী ইঙ্গিত। ঘটনাটি এই যে, একবার কোরায়শরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)

—কে মক্কা থেকে বের করে দেয়ার ইচ্ছা করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে কাকেরদেরকে ইশিয়ার করা হয়েছে যে, যদি তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে মক্কা থেকে বহিস্কার করে দেয়, তবে নিজেরাও মক্কায় বেশীদিন সুখ-শান্তিতে টিকতে পারবে না। ইবনে কাসীর আয়াতের ইঙ্গিত হিসেবে এ ঘটনাটিকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন এবং বলেছেন, কোরআন পাকের এই হুশিয়ারীও মক্কার কাকেররা খোলা চোখে দেখে নিয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন, তখন মক্কাওয়ালারা একদিনও মক্কায় আরামে থাকতে পারেনি। মাত্র দেড় বছর পর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বদরের ময়দানে উপস্থিত করে নেন, যেখানে তাদের সত্তর জন সরদার নিহত হয় এবং গোটা শক্তি হিন্ন-বিহিন্ন হয়ে যায়। এরপর ওহুদ যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে তাদের উপর আরও ভয়-ভীতি চড়াও হয়ে যায় এবং খন্দক যুদ্ধের সর্বশেষ সংঘর্ষে তো তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে দেয়। হিজরী অষ্টম বর্ষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমগ্র মক্কা মোকাররমা জয় করে নেন।

سَمِعَ مَنْ كَذَّبَنَا — এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার

সাধারণ নিয়ম পূর্ব থেকেই এরূপই চালু রয়েছে যে, যখন কোন জাতি তাদের পয়গম্বরকে তাঁর মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়, তখন সেই জাতিকেও সেখানে বেশীদিন টিকিয়ে রাখা হয় না। তাদের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হয়।

শব্দদের দূরভিসন্ধি থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার নামায : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শব্দদের বিরোধিতা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে বিভিন্ন প্রকার কষ্টে পতিত করার অপচেষ্টা এবং এর জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে নামায কায়ম করার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শব্দদের দূরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার হচ্ছে নামায কায়ম করা। সূরা হিজরের আয়াতে আরও স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে :

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَتَبَرَّحْمَدُكَ

وَكُنْ مِنَ الشَّجِيرِينَ

অর্থাৎ, আমি জানি যে, কাকেরদের পীড়াদায়ক কথাবার্তা শুনে আপনার অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে যায়। অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সেজদা কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।—(কুরতুবী)

এ আয়াতে আল্লাহর যিকর, প্রশংসা, তসবীহ ও নামাযে মশগুল হয়ে যাওয়ায় শব্দদের উৎপীড়নের প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহর যিকর ও নামায বিশেষভাবে এ থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার। এ ব্যাখ্যাও অবাস্তব নয় যে, শব্দদের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করা আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহর সাহায্য লাভ করার উত্তম পন্থা হচ্ছে নামায। যেমন কোরআন পাক বলে : وَتَسْبِيحًا لِلَّهِ أَكْبَرُ وَالصَّلَاةِ

অর্থাৎ, সবর ও নামায দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর।

পাঞ্জগানানা নামাযের নির্দেশ : অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াস্ত নামাযের জন্যে একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ। কেননা, دُلُوك শব্দের অর্থ আসলে ঝুঁকে পড়া। সূর্যের ঝুঁকে পড়া তখন শুরু হয়, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, সূর্যাস্তকেও دُلُوك বলা যায়। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবয়ীগণ এহুলে শব্দের অর্থ সূর্যের ঢলে পড়াই

নিয়েছেন।—(কুরতুবী, মাযহারী, ইবনে কাসীর)

إِلَى غَنَى آلِهِ - শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে

যাওয়া। ইমাম মালেক হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ তফসীর বর্ণনা করেছেন।

এভাবে لَيْلُ الشَّيْءِ إِلَى غَنَى آلِهِ এর মধ্যে চারটি নামায

এসে গেছে : যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। এদের মধ্যে দু'নামাযের প্রথম ওয়াস্তও বলে দেয়া হয়েছে যে, যোহরের প্রথম ওয়াস্ত সূর্য ঢলার সময় থেকে শুরু হয় এবং এশার সময় غَسَقَ لَيْلٍ অর্থাৎ অন্ধকার পূর্ণ হয়ে গেলে হয়। একারণেই ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) সে সময়কে এশার ওয়াস্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন, যখন সূর্যাস্তের লাল আভার পর সাদা আভাও অন্তিমিত হয়। এটা সবারই জানা যে, সূর্যাস্তের পর পর পশ্চিম দিগন্তে লাল আভা দেখা দেয়। এরপর এক প্রকার সাদা আভা দিগন্তে ছড়িয়ে থাকে। এরপর এই সাদা আভাও অন্তিমিত হয়ে যায়। বলা-বাহুল্য, দিগন্তের শুভ্র আভা শেষ হয়ে গেলেই রাত্রির অন্ধকার পূর্ণতা লাভ করে। তাই আয়াতের এই শব্দের মধ্যে ইমাম আবু হানীফার মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অন্য ইমামগণ লাল আভা অন্তিমিত হওয়ায় এশার ওয়াস্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন এবং একেই غَسَقَ لَيْلٍ এর তফসীর স্থির করেছেন।

وَقُرْآنَ الْمُنْجَى এখানে قُرْآن শব্দ বলে নামায বোঝানো হয়েছে। কেননা,

কোরআন নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইবনে-কাসীর, কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই লিখেছেন। কাজেই আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, لَيْلُ الشَّيْءِ إِلَى غَنَى آلِهِ বাক্যে চার নামাযের বর্ণনা ছিল এবং এতে পঞ্চম নামাযের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। একে আলাদা করে বর্ণনা করার মধ্যে এই নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

كَانَ مَشْهُودًا - শাহাদাৎ থেকে এর উৎপত্তি। অর্থ উপস্থিত

হওয়া। সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় দিবা-রাত্রির উভয় দল ফেরেশতা নামাযে উপস্থিত হয়। তাই একে مشهود বলা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে পাঞ্জগানানা নামাযের নির্দেশ সৎক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ণ তফসীর ও ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) কথা ও কাজ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নামায আদায়ই করতে পারে না। জানি না, যারা কোরআনকে হাদীস ও রসূলের বর্ণনা ছাড়াই বোঝার দাবী করে, তারা নামায কিভাবে পড়ে? এমনভাবে এ আয়াতে নামাযে কোরআন পাঠের কথাও সৎক্ষেপে উল্লেখিত হয়েছে। এর বিবরণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কথা ও কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ, ফজরের নামাযে সামর্থ্যানুযায়ী দীর্ঘ কেরাআত করতে হবে। মাগরিবে দীর্ঘ কেরাআত এবং ফজরে সংক্ষিপ্ত কেরাআতের কথাও কোন কোন রেওয়াজে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু তা কার্যতঃ পরিত্যক্ত। সহীহ মুসলিমের যে রেওয়াজে মাগরিবের নামাযে সূরা আ'রাক, মুরসালাত ইত্যাদি দীর্ঘ সূরা পাঠ করা এবং ফজরের নামাযে শুধু 'কুল আউযু বিরাবিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাবিনাস' পাঠ করার কথা বর্ণিত আছে, ইমাম কুরতুবী সেই রেওয়াজে উদ্ধৃত করে বলেছেন :

মাগরিবে দীর্ঘ কেরাআত ও ফজরে সংক্ষিপ্ত কেরাআতের এসব কদাচিৎ ঘটনা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সার্বক্ষণিক আমল ও মৌখিক উক্তি দ্বারা পরিত্যক্ত।

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَحِينَ الظُّلُمِ
শব্দটি নিদ্রা

যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর বিরোধী দুই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির কিছু অংশে কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। কেননা, ৬ —এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে। (মাযহারী) কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকার অর্থ নামায পড়া। এ কারণেই শরীয়তের পরিভাষায় রাত্রিকালীন নামাযকে “নামাযে তাহাজ্জুদ” বলা হয়। সাধারণতঃ এর অর্থ, এরূপ নেয়া হয় যেকিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর যে নামায পড়া হয় তাই তাহাজ্জুদের নামায। কিন্তু তফসীর মাযহারীতে রয়েছে, আয়াতের অর্থ এতটুকুই যে, রাত্রির কিছু অংশে নামায পড়ার জন্য নিদ্রা ত্যাগ কর। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে নামায পড়লে যেমন এই অর্থ ঠিক থাকে, তেমনি প্রথমেই নামাযের জন্যে নিদ্রাকে পিছিয়ে নিলেও এ অর্থের ব্যতিক্রম হয় না। তাই তাহাজ্জুদের জন্যে প্রথমে নিদ্রা যাওয়ার শর্ত কোরআনের অভিপ্রেত অর্থ নয়। এরপর কোন কোন হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদের এই সাধারণ অর্থ প্রমাণ করা হয়েছে।

ইবনে কাসীর হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে তাহাজ্জুদের যে সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন, তাও এই ব্যাপক অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাসীর লেখেন :

قال الحسن البصري هو ما كان بعد العشاء ويحمل على ما كان
অর্থঃ, হযরত হাসান বসরী বলেন : এশার পরে পড়া হয় এমন প্রত্যেক নামাযকে তাহাজ্জুদ বলা যায়। তবে প্রচলিত পদ্ধতির কারণে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর পড়ার অর্থে বোঝা দরকার।

এর সারমর্ম এই যে, তাহাজ্জুদের আসল অর্থে নিদ্রার পরে হওয়ার শর্ত নেই এবং কোরআনের ভাষায়ও এরূপ শর্তের অস্তিত্ব নেই; কিন্তু সাধারণতঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তাই এভাবে পড়াই উত্তম হবে।

তাহাজ্জুদ ফরয না নফল? : تَكْوِيْنُ শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। এ কারণেই যেসব নামায, সদকা-খয়রাত ওয়াজিব ও জরুরী নয় — করলে সওয়াব পাওয়া যায় এবং না করলে গোনাহ নাই, সেগুলোকে নফল বলা হয়। আয়াতে নামাযে তাহাজ্জুদের সাথে تَكْوِيْنُ শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর জন্যে নফল। অথচ এটা সমগ্র উম্মতের জন্যেও নফল। এজন্যেই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে تَكْوِيْنُ শব্দটিকে فَرِيضَةٌ—এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ এরূপ স্থির করেছেন যে, সাধারণ উম্মতের ওপর তো শুধু পাঞ্জেরানা নামাযই ফরয; কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর উপর তাহাজ্জুদও একটি অতিরিক্ত ফরয। অতএব, এখানে تَكْوِيْنُ শব্দের অর্থ অতিরিক্ত ফরয — নফলের সাধারণ অর্থ নয়।

এ ব্যাপারে সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সূরা মুযাশ্শেল অবতীর্ণ হয়, তখন পাঞ্জেরানা নামায ফরয ছিল না, শুধু তাহাজ্জুদের নামায সবার উপর ফরয ছিল। সূরা মুযাশ্শেলে—এর উল্লেখ রয়েছে। এরপর শবে-মে'রাজে যখন পাঞ্জেরানা নামায ফরয করা হয়, তখন তাহাজ্জুদের ফরয নামায সাধারণ উম্মতের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে

রহিত হয়ে যায় এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর পক্ষেও রহিত হয় কিনা, সে ব্যাপারে মতভেদ থেকে যায়। আলোচ্য আয়াতের تَكْوِيْنُ শব্দের অর্থ তাই এই যে, তাহাজ্জুদের নামায রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর পক্ষে একটি অতিরিক্ত ফরয। কিন্তু তফসীরে কুরতুবীতে কয়েক কারণে এ বক্তব্যকে অশুদ্ধ বলা হয়েছে। (এক) ফরযকে নফল শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কোন কারণ নেই। যদি রূপক অর্থ বলা হয়, তবে এটি এমন একটি রূপক অর্থ হবে, যার কোন প্রকৃত অর্থ নেই। (দুই) সহীহ হাদীসসমূহে শুধু পাঞ্জেরানা নামায ফরয হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এক হাদীসের শেষে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শবে-মে'রাজে প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেয়া হয়। এখানে যদিও সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে; কিন্তু সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই পাওয়া যাবে। এরপর বলা হয়েছে : يَكُونُ الْقَوْلُ لَكَ

— অর্থাৎ, আমার কথা পরিবর্তিত হয় না। যখন পঞ্চাশ ওয়াক্তের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই দেয়া হবে; যদিও কাজ হাল্কা করে দেয়া হয়েছে।

এসব রেওয়াজের সারমর্ম এই যে, সাধারণ উম্মত এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর উপর পাঞ্জেরানা নামায ছাড়া কোন নামায ফরয ছিল না। আরও এক কারণ এই যে, تَكْوِيْنُ শব্দটি যদি এখানে অতিরিক্ত ফরযের অর্থ হত, তবে এরপরে لِلَّهِ শব্দের পরিবর্তে عَلَيْكَ হওয়া উচিত ছিল, যা ওয়াজিব হওয়ার অর্থ দেয়। لِلَّهِ তো শুধু জায়েয হওয়া ও অনুমতির অর্থ বুঝায়।

তফসীরে মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের ফরয নামায যখন উম্মতের পক্ষে রহিত হয়ে যায়, তখন তা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর পক্ষেও রহিত হয়ে যায় এবং সবার জন্যে নফল থেকে যায়। কিন্তু এমতাবস্থায় প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তাহলে تَكْوِيْنُ বলার কি মানে হবে? তাহাজ্জুদ তো সবার জন্যেই নফল। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর বৈশিষ্ট্য কি? উত্তর এই যে, হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী সমগ্র উম্মতের নফল এবাদত তাদের গোনাহের কাফকারা এবং ফরয নামাযসমূহের ক্রটি পূরণের উপকারে লাগে। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) গোনাহ থেকে এবং ফরয নামাযের ক্রটি থেকেও মুক্ত। কাজেই তাঁর পক্ষে নফল এবাদত সম্পূর্ণ অতিরিক্ত বৈ নয়। তাঁর নফল এবাদত কোন ক্রটি পূরণের জন্যে নয়, বরং তা শুধু অধিক নৈকট্য লাভের উপায়। —(কুরতুবী, মাযহারী)

“মাকামে মাহমুদ” : আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে মাকামে মাহমুদের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। এই মাকাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর জন্যেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট — অন্য কোন পয়গম্বরের জন্যে নয়। এর তফসীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সহীহ হাদীসসমূহে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ হচ্ছে শাফাআতে কুবরার মাকাম। হাশরের ময়দানে যখন সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হবে এবং প্রত্যেক পয়গম্বরের সমীপে শাফাআতের দরখাস্ত করবে, তখন সব পয়গম্বরেরই ওয়র পেশ করবেন। একমাত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ)—ই এই মহান সম্মান লাভ করবেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্যে শাফাআত করবেন। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর ও তফসীরে মাযহারীতে লিখিত রেওয়াজে সমূহের বিবরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

শাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদ নামাযের বিশেষ প্রভাব :
হযরত মুজাদ্দিদ আলফে-সানী (রহঃ) বলেন : এ আয়াতে রসুলুল্লাহ্
(সাঃ)- কে প্রথমে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে,
অতঃপর মাকামে মাহমুদ অর্থাৎ, শাফাআতে ক্বরার ওয়াদা করা হয়েছে।
এ থেকে বোঝা যায় যে, শাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামাযের
বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنِي — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথমে মকার
কাফেরদের উৎপীড়ন এবং রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেয়ার অপকৌশলের
কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এর সাথে একথাও বলা হয়েছিল যে, তাদের
এসব অপকৌশল সফল হবে না। তাদের মোকাবিলায় রসুলুল্লাহ্
(সাঃ)-কে আসল তদবীরের পর্যায়ে শুধু পাঞ্জেলানা নামায কায়ম করা ও
তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরপর পরকালে তাঁকে সব
পয়গম্বরের তুলনায় উচ্চ মকাম অর্থাৎ “মাকামে মাহমুদ” দান করার
ওয়াদা করা হয়েছে। এ ওয়াদা পরকালে পূর্ণ হবে। আলোচ্য وَقُلْ رَبِّ
আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইহকালেই রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কাফেরদের
দুরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দেয়ার কৌশল মদীনায় হিজরতের
আকারে ব্যক্ত করেছেন, অতঃপর وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنِي — আয়াতে মকা
বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছেন।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা
করেন, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মকায় ছিলেন, অতঃপর তাঁকে মদীনায় হিজরত
করার নির্দেশ দেয়া হয়। এর পরিত্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় :

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنِي مَدْلُ صَدَقٍ — এখানে
مخرج ও مدخل — এর অর্থ প্রকাশ করার স্থান ও বহির্গমনের স্থান।
উভয়ের সাথে صدق বিশেষণ যুক্ত হওয়ার অর্থ এই যে, এই প্রবেশ ও
বহির্গমন সব আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী উত্তম পন্থায় হোক। কেননা, আরবী
ভাষায় صدق এমন কাক্সের জন্যে ব্যবহৃত হয়, যা ব্যহতঃ ও অন্তরগত
উভয় দিক দিয়ে সঠিক ও উত্তম হবে। কোরআন পাকে قدم صدق ও صدق
শব্দগুলো এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

‘প্রবেশ করার স্থান’ বলে মদীনা এবং বহির্গমনের স্থান বলে মক্কা
বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হে আল্লাহ্, মদীনায় আমার প্রবেশ
উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। সেখানে কোন অত্যাধিকার ঘটনা যেন না ঘটে
এবং মক্কা থেকে আমার বের হওয়া উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। মাতৃভূমি
এবং বাড়ী-ঘরের মহব্বতে অন্তর যেন জড়িয়ে না পড়ে। এই আয়াতের
তফসীর প্রসঙ্গে আরও বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু এই তফসীরটি
হযরত হাসান বসরী ও কাতাদা থেকে বর্ণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর একে
সর্বাধিক বিশুদ্ধ তফসীর আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে জরীরও এ তফসীরই
গ্রহণ করেছেন। তবে এখানে প্রথমে বহির্গমনের স্থান ও পরে প্রবেশ করার
স্থান উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। এই ক্রম উল্টিয়ে দেয়ার মধ্যে সন্তবতঃ
ইঙ্গিত রয়েছে যে, মক্কা থেকে বের হওয়া স্বয়ং কোন লক্ষ্য ছিল না; বরং
বায়তুল্লাহকে ত্যাগ করে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয় ছিল। অবশ্য
ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে শান্তির আবাসস্থল খোঁজ করা ছিল এখানে
লক্ষ্য। মদীনা প্রবেশের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার আশা ছিল তাই
লক্ষ্যবস্তুরকেই অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের জন্যে মকবুল দোয়া : হিজরতের সময় আল্লাহ্
তাআলা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এ দোয়াটি শিক্ষা দেন যে, মক্কা থেকে
বহির্গমন এবং মদীনায় পৌছা উভয়টি উত্তমভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন
হোক। এ দোয়ার ফলেই হিজরতের সময় পশাদ্ধাবনকারী কাফেরদের
কবল থেকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং
মদীনাকে বাহ্যতঃ ও অন্তরগত উভয় দিক দিয়েই তাঁর জন্যে ও
মুসলমানদের জন্যে উপযোগী করেছেন। এ কারণেই কোন আলেম বলেন
: এই দোয়াটি লক্ষ্য অর্জনের শুরুতে প্রত্যেক মুসলমানদের মনে রাখা
উচিত। প্রত্যেক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দোয়াটি উপকারী। পরবর্তী বাক্য

وَأَجَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سَلَامًا تَرْضَاهُ — এ দোয়ারই পরিণতি। হযরত

কাতাদাহ বলেন : রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) জানতেন যে, শত্রুদের চক্রান্ত-জালের
মধ্যে অবস্থান করে রিসালতের কর্তব্য পালন সাধ্যাতিত ব্যাপার। তাই
তিনি আল্লাহর দরবারে বিজয় ও সাহায্যের দোয়া করেন, যা কবুল হয়
এবং এর শুভফল সবার দৃষ্টিগোচর হয়।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَبَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا

— এ আয়াতটি হিজরতের পর মক্কা

বিজয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বায়তুল্লাহর চতুর্দশে 'তিনশ' ঘাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। এই বিশেষ সংখ্যার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন কোন আলেম বলেন : বছরের প্রত্যেক দিনের জন্যে মুশরিকদের আলাদা আলাদা মূর্তি ছিল এবং তারা প্রত্যহ নির্ধারিত মূর্তিরই উপাসনা করত। (কুরতুবী) রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন সেখানে পৌছেন, তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল,

جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَبَ الْبَاطِلُ এবং তিনি স্বীয় ছড়ি দ্বারা প্রত্যেক মূর্তির বক্ষে আঘাত করে যাচ্ছিলেন।—(বোখারী, মুসলিম)

কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে, এ ছড়ির নীচ দিকে রাক্কা অথবা লোহার রজত ছিল। রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন কোন মূর্তির বুকে আঘাত করতেন, তখন তা উষ্টে পড়ে যেত। এভাবে সব মূর্তিই ভূমিসাৎ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সেগুলো ভেঙ্গে চুরমার করার আদেশ দেন।—(কুরতুবী)

শেরক ও কুফরের চিহ্ন মিটিয়ে দেয়া ওয়াজিব : ইমাম কুরতুবী বলেন : এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, মুশরিকদের মূর্তি ও অন্যান্য মুশরিকসুলভ চিহ্ন মিটিয়ে দেয়া ওয়াজিব। যেসব হাতিয়ার যন্ত্রপাতি গোনাহর কাজে ব্যবহৃত হয়, সেগুলো মিটিয়ে দেয়াও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে মুনাযের বলেন : কাষ্ঠ, পিতল ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত চিত্র ও ভাস্কর্যশিল্পও মূর্তির অন্তর্ভুক্ত। রসুলুল্লাহ (সাঃ) রঙ-বেরঙের চিত্র অঙ্কিত পর্দা ছিড়ে ফেলেছিলেন। এ থেকে সাধারণ চিত্রের বিধান জানা যায়। হযরত ইসা (আঃ) যখন শেষ যমানায় আগমন করবেন, তখন সহীহ হাদীস অনুযায়ী খ্রীষ্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে দেবেন এবং শূকর হত্যা করবেন। শিরক, কুফর ও বাতিলের আসবাবপত্র ভেঙ্গে দেয়া যে ওয়াজিব, এসব বিষয় তারই প্রমাণ।

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوشًا

—কোরআন পাক যে অন্তরের

গুহ ওয়াজিব এবং শেরক, কুফর, কুচরিত্র ও আত্মিক রোগসমূহ থেকে মনের মুক্তিদাতা এটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। কোন কোন আলেমের মতে কোরআন যেমন আত্মিক রোগসমূহের গুহ, তেমনি বাহ্যিক রোগসমূহের অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কোরআনের আয়াত পাঠ করে রোগীর গায়ে ঝুঁ দেয়া এবং তাবিজ লিখে গলায় ঝুলানো বাহ্যিক রোগ নিরাময়ের কারণ হয়ে থাকে। হাদীসের অনেক রেওয়াজেতে এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আবু সাঈদ খুদরীর এই হাদীস সব গ্রহেই বিদ্যমান দেখা যায় যে, সাহাবীদের একটি দল একবার সফররত ছিলেন। কোন এক গ্রামের জনৈক এক সরদারকে বিজু দংশন করলে লোকেরা সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করল : আপনারা এই রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন কি ? সাহাবীরা সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে রোগীর গায়ে ঝুঁ দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এরপর রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি এ কার্যক্রমকে জায়েয বলে মত প্রকাশ করেন।

এমনিভাবে আরও অনেক হাদীস থেকে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর 'কুল আউয়' শীর্ষক সূরাসমূহ পাঠ করে ঝুঁ দেয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَبَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا
وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوشًا وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْبِدُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝ وَإِذْ أَوْفَعْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَا
بِخَانِيهِ ۝ وَإِذْ أَمْسَاهُ الشُّرَكَانُ يُوَسَّوْنَهُ ۝ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى
شَاكِرِيهِ ۝ فَرِيقٌ لِّمَن أَعْلَمُ بِسُنِّهِ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ۝ وَسَيَأْتُونَكَ
عَنِ الرُّوحِ ۝ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ
إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَلَكِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِأَلْسِنَتِنَا وَنُحِيطَ إِلَيْكَ ثُمَّ
لَا تُحِيطُ بِكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكَيْلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ
كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلْ لِّمَن اجْتَمَعَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ عَلٰٓى
أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِشَيْءٍ وَلَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ
بَعْضَ كَلِمَاتِ ۝ وَلَقَدْ صَدَّقَ الْكَافِرِينَ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مَن
كُلِّ مَعْلٰٓى قَالِي أَكْثَرُ الْكَافِرِينَ إِلَّا كُفْرًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ
حَتَّىٰ تَنْزِلَ مِنَ الْأَرْضِ بِبَيِّنَاتٍ ۝ أَوَتَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّن
نَّحِيلٍ ۝ وَنَعْبٌ مَّقْصَرٌ ۝ أَلَمْ نَخْلُقْهُمْ أَوْلَادَهُمْ وَأَسْقَطْنَا السَّمَاءَ
كَمَا زَعَمْتُمْ عَلَيْنَا كِسْفًا ۝ وَتَأْتِي بِاللهِ وَالْمَلَكَةِ فَيَبِيلًا ۝

(৬১) বলুন : সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। (৬২) আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সূচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্যে রহমত। গোনাহগারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। (৬৩) আমি মানুষকে নেয়ামত দান করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দূরে সরে যায়; যখন তাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। (৬৪) বলুন : প্রত্যেকই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে। অতঃপর আপনার পালনকর্তা বিশেষরূপে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পথে আছে। (৬৫) তারা আপনাকে 'রূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন : রূহ আমার পালনকর্তার আদেশঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। (৬৬) আমি ইচ্ছা করলে আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম। অতঃপর আপনি নিজের জন্যে তা আনয়নের ব্যাপারে আমার মোকাবিলায় কোন দায়িত্ব বহনকারী পাবেন না। (৬৭) এ প্রত্যাহার না করা আপনার পালনকর্তার মেহেরবানী। নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর করুণা বিরাট। (৬৮) বলুন : যদি মানব ও জ্বিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে আনয়নের জন্যে জড়ো হয়, এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না। (৬৯) আমি এই কোরআনে মানুষকে বিভিন্ন উপকার দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তুর দ্বিধায়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি। (৭০) এবং তারা বলে : আমরা কখনও আপনাকে বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি তুপ্ত থেকে আমাদের জন্যে একটি বরণা প্রবাহিত করে দিন। (৭১) অথবা আপনার জন্যে খেজুরের ও আঙ্গুরের একটি বাগান হবে, অতঃপর আপনি তার মধ্যে নির্ঝরীগীসমূহ প্রবাহিত করে দেবেন, (৭২) অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তেমনভাবে আমাদের উপর আসমানকে ঋণ-বিশণু করে ফেলে দেবেন অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন।

সাহাবী ও তাবয়ীগণও কোরআনের আয়াত দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। এ আয়াতের অধীনে কুরতুবী এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

وَلَا تَزِدُ الظَّالِمِينَ الْكَفَارًا — এ থেকে জানা যায় যে, বিশ্বাস ও

ভক্তি সহকারে কোরআন পাঠ করলে যেমন কোরআন দ্বারা রোগের চিকিৎসা হয়ে থাকে, তেমনি অশ্রদ্ধা এবং কোরআনের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন ক্ষতি এবং বিপদাপদের কারণও হয়ে থাকে।

فَلَنْ يَسْمَعَ عَنْ شَأْنِهِ এখানে শাক্লে শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে

স্বভাব, অভ্যাস, প্রকৃতি, নিয়ত, রীতি ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সবগুলোর সারমর্ম পরিবেশ। অভ্যাস এবং প্রথা ও প্রচলনের দিক দিয়ে প্রত্যেক মানুষের একটি অভ্যাস ও মানসিকতা গড়ে উঠে। এই অভ্যাস ও মানসিকতা অনুযায়ী তার কাজকর্ম হয়ে থাকে। — (কুরতুবী) এতে মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, মন্দ পরিবেশ, মন্দ সংসর্গ ও মন্দ অভ্যাস থেকে বিরত থাকা দরকার এবং সংলোকদের সংসর্গ ও সং অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। — (জাসাসাস) কেননা, পরিবেশ সংসর্গ এবং প্রথা ও প্রচলিত রীতি দ্বারা মানুষের যে স্বভাব গড়ে উঠে, তার প্রত্যেক কাজ তদনুযায়ীই হয়ে থাকে। ইমাম জাসাসাস এস্থলে শাক্লে —এর এক অর্থ, সমভাবাপন্নও উল্লেখ করেছেন। এদিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমভাবাপন্ন ব্যক্তির সাথে অন্তরঙ্গ হয়। সাধু সাধুর সাথে এবং দুষ্ট দুষ্টের সাথে অন্তরঙ্গ হয় এবং তারই কর্মপন্থা অনুসরণ করে, আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত উক্তি এর নথীর :

أَحْبَبْتُ الْمَيِّتِينَ وَالْمَيِّتُونَ الْحَيِّينَ وَالْكَلْبُتُ الْكَلْبِيْنَ — অর্থঃ মৃত্যু নারী ভ্রষ্ট

পুরুষদের জন্যে এবং পবিত্রা নারী পবিত্র পুরুষদের জন্যে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ পুরুষ ও নারীর সাথে অন্তরঙ্গ হয়। এর সারমর্মও এই যে, খারাপ সংসর্গ ও খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

আলোচ্য ৮৫ আয়াতে রুহ সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব উল্লেখিত হয়েছে। রুহ শব্দটি অভিধান, বাকপদ্ধতি এবং কোরআন পাকে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ তাই, যা এ শব্দ থেকে সাধারণভাবে বোঝা যায়। অর্থঃ —প্রাণ যার বদৌলতে জীবন কায়েম রয়েছে। কোরআন পাকে এ শব্দটি জিবরাঈলের জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে যেমন

وَلَوْلَا رُوحُ الْقُدُّوسِ عَلَى قَلْبِكَ — এবং হযরত ইসা (আঃ) —এর জন্যেও কয়েক আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি স্বয়ং কোরআনও

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا

রুহ বলে কি বোঝানো হয়েছে : এ বিষয়ই এখানে প্রথম প্রণিধানযোগ্য যে, প্রশ্নকারীরা কোন অর্থের দিক দিয়ে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল ? কোন কোন তফসীরবিদ বর্ণনার পূর্বাপর ধারার প্রতি লক্ষ্য করে প্রশ্নটি ওহী, কোরআন অথবা ওহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল সম্পর্কে সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এর পূর্বেও

وَلَوْلَا رُوحُ الْقُدُّوسِ عَلَى قَلْبِكَ — এ কোরআনের উল্লেখ ছিল এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আবার কোরআনের উল্লেখ রয়েছে। এর সাথে মিল রেখে তারা বুঝেছেন যে, এ প্রশ্নও রুহ বলে ওহী,

কোরআন অথবা জিবরাঈলকেই বোঝানো হয়েছে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে ? কে আনে ? কোরআন পাক এর উত্তরে শুধু এতটুকু বলেছে যে, আল্লাহর নির্দেশে ওহী আসে। ওহীর পূর্ণ বিবরণ ও অবস্থা বলা হয়নি।

কিন্তু যেসব সহীহ হাদীসে এ আয়াতের শানে-নুহুল বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীরা জৈব রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং রুহের স্বরূপ অবগত হওয়াই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থঃ, রুহ কি ? মানবদেহে রুহ কিভাবে আগমন করে ? কিভাবে এর দ্বারা জীবজন্তু ও মানুষ জীবিত হয়ে যায় ? সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন : আমি একদিন রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর সাথে মদীনার জনবসতিহীন এলাকায় পথ অতিক্রম করছিলাম। রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর হাতে খুজুর ডালের একটি ছড়ি ছিল। তিনি কয়েকজন ইহুদীর কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। তারা পরস্পরে বলাবলি করছিল : মুহাম্মদ (সাঃ) আগমন করছেন। তাঁকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। অপর কয়েকজন নিষেধ করল। কিন্তু কয়েকজন ইহুদী প্রশ্ন করেই বসল। প্রশ্ন শুনে রসুলুল্লাহ (সাঃ) ছড়িত ভর দিয়ে নিশুপ দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি অনুমান করলাম যে, তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হবে। কিছুক্ষণ পর ওহী নাযিল হলে তিনি এ আয়াত পাঠ করে শোনালেন : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ বলাবাহুল্য, কোরআন অথবা ওহীকে রুহ বলা কোরআনের একটি বিশেষ পরিভাষা ছিল। এখানে তাদের প্রশ্নকে এ অর্থে নেয়া খুবই অবাস্তব। তবে জৈব ও মানবীয় রুহের ব্যাপারটি এমন যে, এর প্রশ্ন প্রত্যেকের মনেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ জন্যেই ইবনে কাসীর, ইবনে জরীর, কুরতুবী, বাহরে মুহীত, রুহুল মা'আনী প্রমুখ সাধারণ তফসীরবিদরাই সাব্যস্ত করেছেন যে, জৈব রুহের স্বরূপ সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হয়েছিল। বর্ণনার পূর্বাপর ধারায় কোরআনের আলোচনা এবং মাঝখানে রুহের প্রশ্নোত্তর বেখান্না বলে প্রশ্ন করা হলে এর উত্তর এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের বিরোধিতা এবং হঠকারিতাপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা এসেছে, যার উদ্দেশ্য ছিল রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর রিসালত পরীক্ষা করা। এ প্রশ্নটিও তারই একটি অংশ; কাজেই বেখান্না নয়। বিশেষ করে শানে নুহুল সম্পর্কে অপর একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে যে, প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য ছিল রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর রিসালত পরীক্ষা করা।

মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন : কোরায়শরা রসুলুল্লাহ (সাঃ) —কে সঙ্গত অসঙ্গত প্রশ্ন করত। একবার তারা মনে করল যে, ইহুদীরা বিদ্বান লোক। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেরও জ্ঞান রাখে। কাজেই তাদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন জেনে নেয়া দরকার; যেগুলো দ্বারা মুহাম্মদের পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। তদনুসারে কোরায়শরা কয়েকজন লোক ইহুদীদের কাছে প্রেরণ করল। তারা শিথিয়ে দিল যে, তোমরা তাঁকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। —(ইবনে কাসীর) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেই এক আয়াতের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইহুদীরা রসুলুল্লাহ (সাঃ) —কে যে প্রশ্ন করেছিল, তাতে এ কথাও ছিল যে, রুহকে কিভাবে আযাব দেয়া হয়। তখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন আয়াত নাযিল হয়নি বিধায় রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাৎক্ষণিক উত্তরদানে বিরত থাকেন। এরপর ফেরেশতা জিবরাঈল

فِي الرُّوحِ مِنْ أَمْرِنَا

আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন। —(ইবনে কাসীর)

প্রশ্ন মক্কায় করা হয়েছিল না মদীনা? : এ আয়াতে শানে নুহুল

সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাসের যে দু'টি হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ইবনে মাসউদের হাদীস অনুযায়ী প্রশ্নটি মদীনায় করা হয়েছিল। এ কারণেই কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতটিকে 'মদনী' সাব্যস্ত করেছেন যদিও সূরা বনী-ইসরাঈলের অধিকাংশই মক্কী। পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুসারে প্রশ্নটি মক্কায় করা হয়েছিল। এদিক দিয়ে গোটা সূরার ন্যায় এ আয়াতটিও মক্কী। এ কারণেই ইবনে কাসীর এ সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে ইবনে মাসউদের হাদীসের উত্তরে বলেছেন যে, সম্ভবতঃ এ আয়াতটি মদীনায় পুনর্বীর নাফিল হয়েছে; যেমন কোরআনের অনেক আয়াতের পুনর্বীর অবতরণ সবার কাছেই স্বীকৃত। তফসীরে মায়হুরী ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রশ্ন মদীনায় এবং আয়াতকে মদনী সাব্যস্ত করেছে। তফসীর মায়হুরী এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছে। (এক) এ রেওয়ায়েতটি বোখারী ও মুসলিমে বর্তমান। এর সনদ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতের সনদের চাইতে শক্তিশালী। (দুই) এতে বর্ণনাকারী ইবনে মাসউদ স্বয়ং নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যতঃ এটাই বোঝা যায় যে, তিনি বিষয়টি কারও কাছে শুনেছেন।

উল্লেখিত প্রশ্নের জওয়াব : প্রশ্নের উত্তরে কোরআন বলেছে :

قُلِ الرَّؤُوفُ مِنْ أَمْرِئِي — এই জওয়াবের ব্যাখ্যায় তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। তন্মধ্যে কাযী সানাউল্লাহ পানিপথীর উক্তিটিই সর্বাধিক বোধগম্য ও স্পষ্ট। তা এই যে, এ জওয়াবে যতটুকু বিষয় বলা জরুরী ছিল এবং যতটুকু বিষয় সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল, ততটুকুই বলে দেয়া হয়েছে। রূহের সম্পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিল জওয়াবে তা বলা হয়নি। কারণ, তা বোঝা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং তাদের কোন প্রয়োজন এটা বোঝার উপর নির্ভরশীলও ছিল না। এখানে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে উত্তরে বলে দিন : রূহ আমার পালনকর্তার আদেশের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, রূহ সাধারণ সৃষ্টজীবের মত উপাদানের সমন্বয়ে এবং জন্ম ও বংশবিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি ; বরং তা সরাসরি আল্লাহ তাআলার আদেশ কُن (হও) দ্বারা সৃজিত। এই জওয়াব একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, রূহকে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করা যায় না। ফলে, রূহকে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করার ফলশ্রুতিতে যেসব সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেগুলো দূর হয়ে গেল। রূহ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান মানুষের জন্যে যথেষ্ট। এর বেশী জ্ঞানের উপর তার কোন ধর্মীয় অথবা পার্শ্ব প্রয়োজন আটকা নয়। তাই প্রশ্নের সেই অংশটিকে অনর্থক ও বাজে সাব্যস্ত করে জওয়াব দেয়া হয়নি; বিশেষতঃ যেক্ষেত্রে এর স্বরূপ বোঝা সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষেও সহজ নয়।

وَلَيْسَ شَيْئًا مِّنْ فَهْرِي — পূর্ববর্তী আয়াতে রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের

প্রয়োজন পরিমাণে উত্তর দিয়ে রূহের স্বরূপ আবিষ্কারের প্রয়াস থেকে একথা বলে নিবৃত্ত করা হয়েছিল যে, মানুষের জ্ঞান যত বেশীই হোক না কেন, বস্তুনিচয়ের সর্বব্যাপী স্বরূপের দিক দিয়ে তা অসম্পূর্ণ। তাই অনাবশ্যক আলোচনা ও খোজাখুজিতে লিপ্ত হওয়া মূল্যবান সময় নষ্ট করারই নামান্তর। وَلَيْسَ شَيْئًا আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে যতটুকুই জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাও তার ব্যক্তিগত জায়গীর নয়। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তাও ছিনিয়ে নিতে পারে। কাজেই বর্তমান জ্ঞানের জন্য তার কৃতজ্ঞ থাকা এবং অনর্থক ও বাজে গবেষণায় সময় নষ্ট না করা উচিত। বিশেষতঃ যখন উদ্দেশ্য গবেষণা করা নয়; বরং অপরকে পরীক্ষা করা ও লজ্জিত করাই উদ্দেশ্য হয়। মানুষ যদি এরূপ করে, তবে এই বক্রতার পরিণতিতে তার অর্জিত জ্ঞানটুকু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। এ আয়াতে যদিও রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উস্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য; অর্থাৎ রসুলের জ্ঞানও যখন তার ক্ষমতাবীন নয়, তখন অন্যের তো প্রশ্নই উঠে না।

قُلْ لِّكُنِ اجْتَمَعَتِ الرُّسُلُ وَلَئِنْ — এ বিষয়বস্তুটি কোরআন পাকের

কয়েকটি আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে। এতে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে সম্বোধন করে দাবী করা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোরআনকে আল্লাহর কলাম স্বীকার না কর; বরং কোন মানবরচিত কলাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানব; এর সমতুল্য কলাম রচনা করে তোমরা দেখিয়ে দাও। আয়াতে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, শুধু মানবই নয়, জ্বিনদেরকেও সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর সবাই মিলে কোরআনের একটি সূরা বরং একটি আয়াতের অনুরূপও রচনা করতে সক্ষম হবে না।

এ বিষয়বস্তুর এখানে পুনরাবৃত্তি সম্ভবতঃ এ কারণে যে, তোমরা আমার রসুলকে নবুওয়ত ও রিসালত পরীক্ষা করার জন্যে রূহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন তাঁর প্রতি করে থাক। তোমরা কেন এসব অনর্থক কাজে ব্যাপৃত রয়েছ? স্বয়ং কোরআনকে দেখে নিলেই তাঁর নবুওয়ত ও রিসালত সম্পর্কে কোন সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকবে না। কেননা, সমগ্র বিশ্বে মানব ও জ্বিন যখন তাঁর সামান্যতম দৃষ্টান্ত রচনা করতে সক্ষম নয়, তখন এটা যে আল্লাহর কলাম, তাতে কি সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে? কোরআনের খোদায়ী কলাম হওয়া যখন এভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও রিসালত সম্পর্কেও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا — আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদিও কোরআনের

মু'জেযা এতটুকু জাঙ্ঘল্যমান যে, এরপর কোন প্রশ্ন ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না; কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ লোক আল্লাহর নেয়ামতের শোকর করে না এবং কোরআনরূপী নেয়ামতকেও মূল্য দেয় না। তাই পঞ্চদষ্টতায় উদভ্রান্ত হয়ে তারা ঘোরাকেরা করে।

অসামঞ্জস্য প্রশ্নের পয়গম্বরসুলভ জওয়াব : আলোচ্য আয়াতসমূহে যে সব প্রশ্ন ও ফরমায়েশ বিশৃঙ্খল স্থাপনের শর্ত হিসেবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে করা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষ এগুলোকে এক প্রকার ঠাট্টা এবং বিশৃঙ্খল স্থাপন না করার বেহুদা বাহানা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারে না। এ ধরনের প্রশ্নের জওয়াবে মানুষ স্বভাবতই রাগের বশবর্তী হয়ে জওয়াব দেয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা স্বীয় পয়গম্বরকে যে জওয়াব শিক্ষা দিয়েছেন, তা প্রশিক্ষানযোগ্য, সম্প্রদায়ের জন্যে চিরস্মরণীয় এবং কর্মের আদর্শ করার বিষয়। সবগুলো প্রশ্নের জওয়াবে তাদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা হয়নি এবং হঠকারিতাপূর্ণ দুটামিও ফুটিয়ে তোলা হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহাত্মক বাক্যও উচ্চারণ করা হয়নি; বরং সাধাশাধা ভাষায় আসল স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, সম্ভবতঃ তোমাদের ধারণা এই যে, আল্লাহর রসূলও সমগ্র খোদায়ী ক্ষমতার মালিক এবং সবকিছু করতে সক্ষম হওয়া উচিত। এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। রসূলের কাজ শুধু আল্লাহর পয়গম্বা পৌছানো। আল্লাহ তাআলা তাঁর রেসালত সম্প্রদায় করার জন্যে অনেক মু'জ্জিয়াও প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো নিছক আল্লাহ তাআলার কুদরত ও ক্ষমতা দ্বারা হয়। রসূল খোদায়ী ক্ষমতা লাভ করেন না। তিনি একজন মানব, কাজেই মানবিক শক্তি বহির্ভূত নন। তবে যদি আল্লাহ তাআলাই তাঁর সাহায্যে স্বীয় শক্তি প্রকাশ করেন, তবে তা ভিন্ন কথা।

মানবের রসূল মানবই হতে পারেন : সাধারণ কাকের ও মুরিকদের ধারণা ছিল, মানব আল্লাহর রসূল হতে পারে না। কেননা, সে মানবীয় অভাব ও প্রয়োজনে অভ্যস্ত হয়। কাজেই সাধারণ মানুষের উপর তার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই যে, তারা তাকে রসূল মনে করে অনুসরণ করবে। তাদের এ ধারণার জওয়াব কোরআন পাকে কয়েক জায়গায় বিভিন্ন শিরোনামে দেয়া হয়েছে। এখানে وَمَا مَنَّمَا لِلنَّاسِ আয়াতে যে জওয়াব

দেয়া হয়েছে, তার সারমর্ম হলো যে, রসূলকে যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়, তাকে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। তারা মানব হলে রসূলেরও মানব হওয়া উচিত। কেননা, ভিন্ন শ্রেণীর সাথে পারস্পরিক মিল ব্যতীত হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের উপকার অর্জিত হয় না। ফেরেশতা ক্ষুধা পিপাসা জানে না, কাম-প্রবৃত্তিরও জ্ঞান রাখে না এবং শীত-গ্রীষ্মের অনুভূতি ও পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি থেকেও মুক্ত। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করা হলে সে মানবের কাছেও উপরোক্তকর্ম কর্ম আশা করতো এবং মানবের দুর্বলতা ও অক্ষমতা উপলব্ধি করতো না। এমনিভাবে মানব যখন বৃষত যে, সে ফেরেশতা, তার কাজকর্মের অনুকরণ করার যোগ্যতা মানুষের নেই, তখনই মানব তার অনুসরণ মোটেই করতে না। সংশোধন ও পথ প্রদর্শনের উপকার তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন আল্লাহর রসূল মানব জাতির মধ্য থেকে হন। তিনি একদিকে মানবীয় ভাবাবেগ ও স্বভাবগত কামনা-বাসনার বাহকও হবেন এবং সাথে সাথে এক প্রকার ফেরেশতাসুলভ শানেরও অধিকারী হবেন- যাতে সাধারণ মানব ও ফেরেশতাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী বুঝে নিয়ে স্বজাতীয় মানবের কাছে পৌছাতে পারেন।

উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা এ সন্দেহও দূর হয়ে গেল যে, মানুষ ফেরেশতার কাছ থেকে উপকার লাভে সক্ষম না হলে রসূল মানব হওয়া

أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ نُحُوفِ أَوْ تَوُفِّي فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ
لِرُفْيَاكَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا تَقْرُوهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ
كُنْتُ إِلَّا نَذِيرًا لِّأَوَّلِ قَوْمٍ وَمَا مَنَّمَا لِلنَّاسِ أَنْ يُؤْمِرُوا بِأَجْدَاءِ
الْهَدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا لَوَاللَّهِ بَشَرًا مِّثْلَ بَشَرِ الْفُلَانِ قُلْ لَوْ كُنَّا فِي
الْأَرْضِ مَلَائِكَةً يَّتَسَوَّنُونَ مَطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ
مَلَكًا رَسُولًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا لِّبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ
بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَنْ يُهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ هُدًىٰ وَمَنْ يَمُذِّقْ
اللَّهُ فَمَا لَهُ مَذِّقٌ قُلْ لَّيْسَ لِلَّهِ إِيْلَٰهَةٌ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ عِصْيَا وُنُقُودًا وَصَلَّوْا لَهُمْ جَهَنَّمَ كَمَا خَلَقْتَ
رَبَّهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا
لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا
يَعْبُدُونَ إِلَّا الْإِنْسَانَ الْمَلَكُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قُلْ وَعَدُ
اللَّهُ أَنْ يَحْكُمَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَ الْآخِرِ فِيهِ وَلَئِنْ لَّا يَدْعُوا
الْأَكْفَرُ قُلْ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَدْرُسُونَ كَرَامِينَ رَحْمَةً رَبِّيَ إِذَا
لَا مَسَاسَ لَكُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا

(৯৩) অথবা আপনার কোন সেনার তৈরী গৃহ হবে অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন এবং আমরা আপনার আকাশে আরোহণকে কখনও বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি অবতীর্ণ করেন আমাদের প্রতি এক গ্রন্থ, যা আমরা পাঠ করব। বলুন : পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, একজন মানব, একজন রসূল (বৈ আমি কে ? (৯৪) 'আল্লাহ কি মানুষকে পয়গম্বর করে পাঠিয়েছেন ? তাদের এই উক্তিই মানুষকে ঈমান আনয়ন থেকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে হেদায়েত। (৯৫) বলুন : যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করত, তবে আমি আকাশ থেকে কোন ফেরেশতাকেই তাদের নিকট পয়গম্বর করে প্রেরণ করতাম। (৯৬) বলুন : আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি তো স্বীয় বান্দাদের বিষয়ে খবর রাখেন ও দেখেন। (৯৭) আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, সে ই তো সঠিক পথ প্রাপ্ত এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাদের জন্যে আপনি আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেন না। আমি কেয়াযতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই নির্বাচিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্যে অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে দিব। (৯৮) এটাই তাদের শাস্তি। কারণ, তারা আমার নির্দর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে : আমরা যখন অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হয়ে উঠিত হবে ? (৯৯) তারা কি দেখেন যে, যে আল্লাহ আসমান ও যমিন সৃজিত করেছেন, তিনি তাদের মত মানুষও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম ? তিনি তাদের জন্যে স্থির করেছেন একটি নির্দিষ্ট কাল, এতে কোন সন্দেহ নেই; অতঃপর জাহান্নাম অস্বীকার ছাড়া কিছু করেন। (১০০) বলুন : যদি আমার পালনকর্তার রহমতের তাগীর তোমাদের হাতে থাকত, তবে ব্যয়িত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অবশ্যই তা ধর রাখত। মানুষ তো অতিশয় কপণ।

সত্ত্বও ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী কিরাণে লাভ করতে পারবে?

প্রশ্ন হয় যে, রসূল ও উম্মতের সমজাতি হওয়া যখন শর্ত, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) জ্বিন জাতির রসূল নিযুক্ত হলে কিরাণে? জ্বিন তো মানবের সমজাতি নয়। উত্তর এই যে, রসূল শুধু মানবই নয়; বরং তিনি ফেরেশতাসুলভ ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদারও অধিকারী। এ কারণে তাঁর সাথে জ্বিনদেরও সম্পর্ক থাকতে পারে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : তোমরা মানব হওয়া সত্ত্বেও দাবী কর যে, তোমাদের রসূল ফেরেশতা হওয়া উচিত। এ দাবী অযৌক্তিক। যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বসবাস করত এবং তাদের প্রতি রসূল প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিত; তবে ফেরেশতাকেই রসূল করা হত। এখানে পৃথিবীতে বসবাসকারী ফেরেশতাদের বিশেষণ **نَسُوتٌ مَّطْبُوتٌ** উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে বিচরণ করে। এ থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাদের প্রতি ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করার প্রয়োজন তখনই হত, যখন পৃথিবীর ফেরেশতারা স্বয়ং আকাশে যেতে না পারত; বরং পৃথিবীতেই বিচরণ করতে হত। পক্ষান্তরে যদি তারা স্বয়ং আকাশে যাওয়ার শক্তি রাখত, তবে পৃথিবীতে রসূল প্রেরণ করার প্রয়োজনই দেখা দিত না।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে: যদি তোমরা আল্লাহর রহমতের ভান্ডারের মালিক হয়ে যাও, তবে তাতেও কৃপণতা করবে। কাউকে দেবে না এ আশঙ্কায় যে, এভাবে দিতে থাকলে ভাণ্ডারই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না। কিন্তু মানুষ স্বভাবগতভাবে ছোটমনা ও কম সাহসী। অকাতরে দান করার সাহস তার নেই।

এখানে সাধারণ তফসীরবিদগণ ‘পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার’ শব্দের অর্থ নিয়েছেন ধনভাণ্ডার। পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, মক্কার কাফেররা ফরমায়েশ করেছিল, যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য নবী হন, তবে মক্কার শুষ্ক মরুভূমিতে নদী-নালা প্রবাহিত করে একে সিরিয়ার মত সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা করে দিন। এর জওয়াব পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা যেন আমাকে খোদাই মনে করে নিয়েছ।

ফলে আমার কাছ থেকে খোদায়ী ক্ষমতা দাবী করছ। আমি তো একজন রসূল মাত্র। খোদা নই যে, তোমরা যা চাইবে, তাই করব। আলোচ্য আয়াতকে যদি এর সাথেই সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, মক্কার মরুভূমিকে নদী-নালা বিধৌত শস্য-শ্যামলা প্রাপ্তরে পরিণত করার ফরমায়েশ যদি আমার রেসালত পরীক্ষা করার জন্য হয়, তবে এর জন্যে কোরআনের অলৌকিকতার মু'জ্জেযাতি যথেষ্ট। অন্য ফরমায়েশের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি জাতীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্যে হয়, তবে সুরণ রেখ, যদি তোমাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী মক্কার ভূখণ্ড তোমাদেরকে সবকিছু দেয়াও হয় এবং ধন-ভাণ্ডারের মালিক তোমাদেরকে করে দেয়া হয়, তবে এর পরিণামেও জাতীয় ও জনগণের সুখ-স্বাস্থ্য হবে না; বরং মানবীয় অভ্যাস অনুযায়ী যার হাতে এই ধন-ভাণ্ডার থাকবে, সে সর্প হয়ে তার উপর বসে যাবে, জনগণের কল্যাণার্থে ব্যয় করতে চাইবে না দারিদ্র্যের আশঙ্কা করবে। এমতাবস্থায় মক্কার গুটিকতক বিস্তারালীর আরও বিস্তারালী ও সুখী হওয়া ছাড়া জনগণের কি উপকার হবে? অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

কিন্তু হাকীমুল উম্মত হযরত ধানভী (রহঃ) বয়ানুল কোরআনে এখানে রহমতের অর্থ নবুওয়ত ও রিসালত এবং ভাণ্ডারের অর্থ নবুওয়তের উৎকর্ষ নিয়েছেন। এ তফসীর অনুযায়ী পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এই যে, তোমরা আমার নবুওয়ত ও রিসালতের জন্য যেসব আগাগোড়াহীন অনর্থক দাবী করছ, সেগুলোর সারমর্ম এই যে, তোমরা আমার নবুওয়ত স্বীকার করতে চাও না। অতঃপর তোমরা কি চাও যে, নবুওয়তের ব্যবস্থাপনা তোমাদের হাতে অর্পণ করা হোক, যাতে তোমরা যাকে ইচ্ছা নবী করে দাও। এপ্রণ করা হলে এর পরিণতি হবে এই যে, তোমরা কাউকে নবুওয়ত দেবে না - কৃপণ হয়ে বসে থাকবে। হযরত ধানভী (রহঃ) এই তফসীর লিপিবদ্ধ করে বলেছেন যে, এটা আল্লাহ তাআলার অন্যতম দান। তফসীরটি খুবই স্থানোপযোগী। এ স্থলে নবুওয়তকে রহমত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা এমন, যেমন—**أَهْمُ يَكُونُونَ** আয়াতে সর্বস্বীকৃত মতে রহমত শব্দের অর্থ নবুওয়ত।

بنی اسرائیل،

۲۹۳

سَبِّحْهُنَ الَّذِي ١٥

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ

এতে মুসা (আঃ)-কে নয়টি প্রকাশ্য

يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

—তফসীরে মাযহরীতে বলা হয়েছে :

কোরআন তেলাওয়াতের সময় জন্দন করা মুস্তাহাব। হযরত আবু হোরাযরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে জন্দন করে, সে জাহান্নামে যাবে না, যে পরজন্ম না দোহন করা দুঃ পুনর্বীর স্তনে ফিরে আসে। (অর্থঃ, দোহন করা দুঃ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনিভাবে আল্লাহর ভয়ে জন্দনকারী ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব)। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে : আল্লাহ তাআলা দু'টি চক্ষুর উপর জাহান্নামের অগ্নি হারাম করেছেন। (এক) যে আল্লাহর ভয়ে জন্দন করে। (দুই) যে ইসলামী সীমান্তের হেফাযতে রাত্রিকালে জাগ্রত থাকে।—(বায়হাকী, হাকেম) হযরত নযর ইবনে সা'দ বলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যে সম্প্রদায়ে আল্লাহর ভয়ে জন্দনকারী রয়েছে, আল্লাহ তাআলা সেই সম্প্রদায়কে তার কারণে অগ্নি থেকে মুক্তি দেবেন।—(জুহুল মা'আনী)

এগুলো সূরা বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ আয়াত। এ সূরার প্রারম্ভেও আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ও তওহীদের বর্ণনা ছিল এবং সর্বশেষ আয়াতগুলোতেও এ বিষয়বস্তুই বিবৃত হয়েছে। কয়েকটি ঘটনার পরিস্ফুটনে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। (এক) রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন দোআয় ‘ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান’ বলে আহবান করলে মুশরিকরা মনে করতে থাকে যে, তিনি দু’আল্লাহকে আহবান করেন। তারা বলাবলি করতে থাকে, যে আমাদেরকে তো একজন ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করেন অথচ নিজেই দু’উপাস্যকে ডাকেন। আয়াতের প্রথম অংশে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা-কেবল দু’টিই নয়, আরও অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে। যে নামেই ডাকা হবে, উদ্দেশ্য একই সন্তা। কাজেই তোমাদের জল্পনা-কল্পনা ব্রাহ্ম।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মক্কায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন নামাযে উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিকরা ঠাট্টা-বিদ্রোপ করত এবং কোরআন, জিবরাসিল ও স্বয়ং আল্লাহ তাআলাকে উদ্দেশ্য করে ধষ্টতাপর্শ কথাবার্তা

(১০১) আপনি বনী ইসরাঈলকে জিঞ্জেস করুন, আমি মুশাকে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দান করেছি। যখন তিনি তাদের কাছে আগমন করেন, ফেরাউন তাকে বলল : হে মুসা, আমার ধারণায় তুমি তো জাদুদ্বন্দ্ব। (১০২) তিনি বললেন : তুমি জান যে, আসমান ও যমীনের পালনকর্তাই এসব নিদর্শনাবলী প্রত্যেক প্রমাণস্বরূপ নামিল করেছেন। হে ফেরাউন, আমার ধারণায় তুমি অবশ্যই দোষেছ। (১০৩) অতঃপর সে বনী ইসরাঈলকে দেশ থেকে উৎখাত করতে চাইল, তখন আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের সবাইকে নিমজ্জিত করে দিলাম। (১০৪) তাৎপর্য আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম : এ দেশে তোমরা বসবাস কর। অতঃপর যখন পরকালের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদেরকে জড়ো করে নিয়ে উপস্থিত হবে। (১০৫) আমি সত্যই এ কোরআন নামিল করেছি এবং সত্যই এটা নামিল হয়েছে। আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদাতা ও ভয়ভরশীল করেই প্রেরণ করেছি। (১০৬) আমি কোরআনকে যতিচিহ্নসহ পৃথক পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী করেছি, যাতে আপনি একে লোকদের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করেন এবং আমি একে যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। (১০৭) বলুন : তোমরা কোরআনকে মান্য কর অথবা অমান্য কর; যারা এর পূর্ব থেকে এলম্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, যখন তাদের কাছে এর তোলাওয়াত করা হয়, তখন তারা নতমস্তকে সেজদায় নুটিয়ে পড়ে (১০৮) এবং বলে : আমাদের পালনকর্তা পবিত্র, মহান। নিঃসন্দেহে আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। (১০৯) তারা ক্রন্দন করতে করতে নতমস্তকে ভূমিতে নুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়। (১১০) বলুন : আল্লাহ বলে আদমের কবর কিভাবে রহমান বলে, যে নামেই আবুল নুন না কেন, সব সৃষ্টির নাম তাঁরই। আপনি নিজের নামায় আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিশাশ্বেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। (১১১) বলুন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিদান সন্তান রাখেন, না তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন শরীর আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি সম্প্রদায় তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে থাকুন।

বলত। এর জওয়াবে আয়াতের শেষাংশ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সশব্দ ও নিঃশব্দ উভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা, মধ্যবর্তী শব্দে পাঠ করলেই প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে যায় এবং সশব্দে পাঠ করলে মুশরিকরা নিপীড়নের যে সুযোগ পেত, তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

তৃতীয় ঘটনা এই যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা আল্লাহ্ তাআলার জন্যে সন্তান সাব্যস্ত করত। আরবরা প্রতিমাদেরকে আল্লাহ্র শরীক বলত। সাবেরী ও অগ্নিপূজারীরা বলত যে, আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নৈকট্যশীল কেউ না থাকলে তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব লাঘব হয়। এ দলত্রয়ের জওয়াবে সর্বশেষ আয়াত নাখিল হয়েছে। এতে তিনটি বিষয়েরই খণ্ডন করা হয়েছে।

দুনিয়াতে সৃষ্টজীব যারা শক্তিলভ করে সে কোন সময় নিজের চাইতে ছোট হয়। যেমন, সন্তান; কোন সময় নিজের সমতুল্য হয়। যেমন, অশ্বীদার এবং কোন সময় নিজের চাইতে বড় হয়। যেমন, সমর্থক ও সাহায্যকারী। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা নিজের জন্যে যথাক্রমে তিনটিই নাকচ করে দিয়েছেন।

মাসআলা : উল্লেখিত আয়াতে নামাযে কোরআন তেলাওয়াতের আদব বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, খুব উচ্চৈঃস্বরে না হওয়া চাই এবং এমন নিঃশব্দেও না হওয়া চাই যে, মুক্তাদীরা শুনতে পায় না। বলাবাহুল্য এ বিধান বিশেষ করে ‘জেহরী’ (সশব্দে পাঠিত) নামাযসমূহের জন্যে। যোহর ও আসরের নামাযে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে পাঠ করা মুতাওয়াতিহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

‘জেহরী’ নামায বলতে ফজর, মাগরিব ও এশার নামায বোঝায়। তাহাজ্জুদের নামাযও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, এক হাদীসে রয়েছে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাজ্জুদের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর কাছ দিয়ে গেলে হযরত আবু বকরকে নিঃশব্দে এবং হযরত ওমরকে উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াতরত দেখতে পান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বললেন : আপনি এত নিঃশব্দে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরয় করলেন : যাকে শোনানো উদ্দেশ্য তাকে শুনিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ্ তাআলা গোপনতম আওয়াযও শ্রবণ করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : সামান্য শব্দ সহকারে পাঠ করুন।

অতঃপর হযরত ওমরকে বললেন : আপনি এত উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরয় করলেন : আমি নিদ্রা ও শয়তানকে বিভাঙিত করে দেয়ার জন্যে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে আদেশ দিলেন, যে অনুচ্চ শব্দে পাঠ করুন। - (তিরমিযী)

নামাযের ভেতরে ও বাইরে সশব্দে ও নিঃশব্দে কোরআন তেলাওয়াত সম্পর্কিত মাসআলা সূরা আ’রাকে বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ আয়াত **وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ** সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, এটি একজায়তের আয়াত। - (আহমদ তাবরানী) এ আয়াতে এরূপ নির্দেশও আছে যে, মানুষ যতই আল্লাহ্ তাআলার এবাদত ও তসবীহ পাঠ করুক, নিজের আমলকে কম মনে করা এবং ত্রুটি স্বীকার করা তার জন্যে অপরিহার্য। - (মায়হারী)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন : আবদুল মুতালিবের পরিবারে যখন কোন শিশু কথা বলার যোগ্য হয়ে যেত, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে এ আয়াত শিখিয়ে দিতেন :

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ

الْمَلِكُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَهْلٌ مِنَ الدِّينِ وَكَوْنُهُ كَوْنًا

হযরত আবু হোরাযরা (রাঃ) বলেন : একদিন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে বাইরে গেলাম। তখন আমার হাত তাঁর হাতে আবদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক দুর্দশাগ্রস্ত ও উদ্ভিন্ন ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার এই দুর্দশা কেন? লোকটি আরয় করল : রোগব্য্যাধি ও দারিদ্র্যের কারণে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য বলে দেই। এগুলো পাঠ করলে তোমার রোগব্য্যাধি ও অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এই : **وَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ وَلَدًا**

-এর কিছুদিন পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবার সেদিকে গমন করলে

লোকটিকে সুখী দেখতে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। সে আরয় করল : যেদিন আপনি আমাকে বাক্যগুলো বলে দেন, সেদিন থেকে নিয়মিতই সেগুলো পাঠ করি। - (মায়হারী)

সূরা বনী ইসরাঈল সমাপ্ত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ
 فِيهِ عِوَجًا ۖ فَيَمْلِكُنِي بِهِ رَبًّا سَاشِدُ بِهِ آمِنٌ لَدُنْهُ وَيُسَبِّحُ
 الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَمْعَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۖ
 مَا كُنْثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۖ وَنَسْنَدُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ
 وَلَدًا ۖ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِابْنِهِمْ كُنْثِيَ كَلِمَةً
 تَخْرِجُهُمْ مِنْ أَثْوَاهِهِمْ إِنَّهُنَّ يُلَاقُونَهُ الْكَافِرِينَ ۖ فَكَلَّمَكَ
 بَاقِعُ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ ۖ بِهِدِ الْحَدِيثَ
 آسَافًا ۖ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ
 أَحْسَنُ عَمَلًا ۖ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۖ
 أَمْ صَبَّيْتُ أَنْ أَصْحَبَ الْكَهْفَ وَالرَّقِيمَ كَانُوا مِنْ
 السَّعْيَةِ حَكِيمًا ۖ إِذْ أَوْى الْقَوَّةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا
 إِنَّا نَمُنُّ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۖ
 فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۖ

(১) সব প্রশংসা আল্লাহুর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি। (২) একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যা আল্লাহুর পক্ষ থেকে একটি ভীষণ বিপদের ভয় প্রদর্শন করে এবং মুমিনদেরকে—যারা সংকর্ম সম্পাদন করে—তাদেরকে সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে। (৩) তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। (৪) এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্যে যারা বলে যে, আল্লাহুর সন্তান রয়েছে। (৫) এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও নেই। কত কঠিন তাদের মুখের কথা! তারা যা বলে তা তো সবই তাহা। (৬) যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশৃঙ্খল স্বপ্ন না করে, তবে তাদের পক্ষাতে সম্ভবতঃ আপনি পরিতাপ করতে হচ্ছে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন। (৭) আমি পৃথিবী'র সব কিছুকে পৃথিবীর জন্যে শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে। (৮) এবং তার উপর যাক্বি'র রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উদ্ভিদশূন্য মাটিতে পরিণত করে দেব। (৯) আপনি কি ধারণা করেন যে, শুধু ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল? (১০) যখন বুঝকরা পাশাডের শুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে তখন দোখা করে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। (১১) তখন আমি কয়েক বছরের জন্যে শুহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই।

আগামীকাল উত্তর দেব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গেলেন। কোরাযশরা কি করে গেল। রসুলুল্লাহ (সাঃ) শুইর আলোকে জগুয়াব দেবার জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে শুই আসার অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু ওয়াদা অনুযায়ী পর দিবস পর্যন্ত শুই আগমন করল না; বরং পনের দিন এ অবস্থায়ই কেটে গেল। ইতিমধ্যে জিবরাঈলও এলেন না এবং কোন শুইও নাথিল হল না। অবস্থাদুটে কোরাযশরা ঠাট্টা-বিদ্রোপ আরম্ভ করে দিল। এতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) খুবই দুঃখিত ও চিন্তিত হলেন।

পনের দিন পর জিবরাঈল সূরা কাহফ নিয়ে অবতরণ করলেন। এতে শুইর কিলমের কারণও বর্ণনা করে দেয়া হল যে, ভবিষ্যতে কোন কাছ করার ওয়াদা করা হলে ইনশাআল্লাহ বলা উচিত। এ ঘটনায় এরূপ না হওয়ার কারণে হুশিয়ার করার জন্যে কিলম শুই নাথিল করা হয়েছে। এ

সম্পর্কে এ সূরায় নিম্নোক্ত আয়াত আসবে :

وَلَا تُؤْثِرُونَ بِالنَّارِ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْهَا كَانُوا يَكْفُرُونَ —এ সূরায় যুবকদের ঘটনাও পুরোপুরি

বর্ণনা করা হয়েছে। তাদেরকে ‘আসহাবে কাহফ’ বলা হয়। পূর্ব ও পশ্চিমে সফরকারী যুলকারনাইনের ঘটনাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে এবং রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের জগুয়াবও — (কুরত্বী, মাযহারী) কিন্তু রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের জগুয়াব সংক্ষেপে দেয়াই সমীচীন ছিল। তাই সূরা বনী ইসরায়েলের শেষে আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ কারণেই সূরা কাহফকে সূরা বনী ইসরায়েলের পরে স্থান দেয়া হয়েছে।—সূর্যতী)

إِنَّا جَعَلْنَا مَآلِ الْأَرْضِ زَيْتُونًا —অর্থাৎ, পৃথিবীর জীবজন্তু,

উদ্ভিদ, জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বস্তুর বনি—এগুলো সবই পৃথিবীর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সাপ, বিছু, হিংসে জন্তু এবং অনেক ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বস্তুও রয়েছে। এগুলোকে পৃথিবীর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য কিরূপে বলা যায়? উত্তর এই যে, দুনিয়াতে যেসব বস্তু বাহ্যতঃ ধ্বংসাত্মক ও খারাপ, সেগুলো একদিক দিয়ে খারাপ হলেও সমষ্টিগতভাবে কোন কিছুই খারাপ নয়। কেননা, প্রত্যেক মন্দ বস্তুর মধ্যে অন্যান্য নানা দিক দিয়ে আল্লাহ তাআলা অনেক উপকারও নিহিত রেখেছেন। বিষাক্ত জন্তু ও হিংসে প্রাণীদের দ্বারা মানুষের চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত হাজারো অভাব পূরণ করা হয়। তাই যেসব বস্তু একদিক দিয়ে মন্দ, বিশৃঙ্খলার চরমে পৌঁছানোর দিক দিয়ে সেগুলোও মন্দ নয়।

শব্দার্থ : كهف - এর অর্থ বিস্তীর্ণ পার্বত্য গুহ। বিস্তীর্ণ না হলে তাকে غار বলা হয়। رقيم - এর শাব্দিক অর্থ مرقوم বা লিখিত বস্তু। এস্থলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতদুটে যাহহাক, সুদী ও ইবনে জোবায়েরের মতে এর অর্থ একটি লিখিত ফলক। সমসাময়িক বাদশাহ্ এই ফলকে আসহাবে কাহফের নাম লিপিবদ্ধ করে গুহার প্রবেশপথে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এ কারণেই আসহাবে-কাহফকে রকীমও বলা হয়। কাতাদা, আতিয়া, আউকী ও মুজাহিদ বলেন : রকীম সে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত উপত্যকার নাম, যাতে আসহাবে-কাহফের গুহা ছিল। কেউ কেউ স্বয়ং পাহাড়টিকেই রকীম বলেছেন। হযরত ইকরিমা বলেন : আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি যে, রকীম কোন লিখিত ফলকের নাম না জনবসতির নাম, তা আমার জানা নেই। কা'ব আহবার, ওয়াহাব ইবনে মুনাঝেহ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম রোমে অবস্থিত আয়লা অর্থাৎ, আকাবার নিকটবর্তী

একটি শহরের নাম। فَرَّقَ شَبَابًا বহুবচন। এর একবচন فتي - অর্থ যুবক। فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَنْزِلَهُمَا - এর শাব্দিক অর্থ কর্ককুর বন্ধ করে দেয়া। অচেতন নিদ্রাকে এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। কেননা, নিদ্রায় সর্বপ্রথম চক্ষু বন্ধ হয়, কিন্তু কান সক্রিয় থাকে। আওয়াজ শোনা যায়। অতঃপর যখন নিদ্রা পরিপূর্ণ ও প্রবল হয়ে যায়, তখন কানও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। জাগরণের সময় সর্বপ্রথম কান সক্রিয় হয়। আওয়াজের কারণে নিদ্রিত ব্যক্তি সচকিত হয়, অতঃপর জাগ্রত হয়।

আসহাবে কাহফ ও রকীমের কাহিনী : এ কাহিনীতে কয়েকটি আলোচ্য বিষয় আছে। (এক) ‘আসহাবে কাহফ’ ও ‘আসহাবে রকীম’ একই দলের দুই নাম, না তারা আলাদা দু’টি দল? যদিও কোন সহীহ হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই, কিন্তু ইমাম বোখারী ‘সহীহ’ নামক গ্রন্থে আসহাবে কাহফ ও আসহাবে রকীমের দু’টি আলাদা আলাদা শিরোনাম রেখেছেন। অতঃপর আসহাবে রকীম শিরোনামের অধীনে তিন ব্যক্তির গুহায় আটকে পড়া, তৎপর দোয়ার মাধ্যমে রাস্তা খুলে যাওয়ার প্রসিদ্ধ কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন, যা সব হাদীস গ্রন্থেই বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান আছে। ইমাম বোখারীর এ কাজ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর মতে আসহাবে কাহফ ও আসহাবে রকীম পৃথক পৃথক দু’টি দল এবং আসহাবে রকীম ঐ তিন ব্যক্তিকে বলা হয়েছে, যারা কোন সময় পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করেছিল। এরপর পাহাড়ের একটি বিরাট পাথর গুহার মুখে পড়ে যাওয়ায় গুহা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের বের হওয়ার পথ থাকে না। আটক ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সংকাজের উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে যে, যদি আমরা এ কাজটি ঠাট্টাভাবে আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তবে নিজ কৃপায় আমাদের পথ খুলে দিন। প্রথম ব্যক্তির দোয়ায় পাথর কিছুটা সরে যায়। ফলে, ভিতরে আলা আসতে থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির দোয়ায় আরও একটু সরে যায় এবং তৃতীয় ব্যক্তির দোয়ায় রাস্তা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) বোখারীর টীকায় বলেছেন যে, উপরোক্ত তিন ব্যক্তির নাম আসহাবে রকীম, হাদীসদুটে এর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। ব্যাপার এতটুকু যে, গুহার ঘটনার বর্ণনাকারী নো’মান ইবনে বশীরের রেওয়ায়েতে কোন কোন রাবী এই কথাগুলো সংযুক্ত করেছেন : নো’মান ইবনে বশীর বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে রকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। এই অতিরিক্ত কথাগুলো ফতহুল বারীতে বাযযার ও তাবারানীর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথমতঃ সেহাহ্ সেস্তা ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসের সাধারণ রাবীদের যেসব রেওয়ায়েত বিদ্যমান আছে, সেগুলোতে কেউ নো’মান ইবনে বশীরের উপরোক্ত বাক্য উদ্ধৃত করেননি। স্বয়ং বোখারীর রেওয়ায়েতও এই বাক্য থেকে মুক্ত। দ্বিতীয়তঃ এই বাক্যও একবার উল্লেখ নেই যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তিকে আসহাবে রকীম বলেছিলেন; বরং বলা হয়েছে যে, রসুল্লাহ (সাঃ) রকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে তিন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন। রকীমের অর্থ সম্পর্কে সাহাবী, তাবয়ী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ উপরে বর্ণিত হয়েছে এটাই তার প্রমাণ যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে রকীমের অর্থ নির্ধারণ সম্পর্কে কোন হাদীস ছিল না। নতুবা রসুলুল্লাহ (সাঃ) কোন অর্থ নির্দিষ্ট করে দিলে সাহাবী, তাবয়ী ও অন্যান্য তফসীরবিদ এর বিপরীতে অন্য কোন অর্থ নেবেন—এটা কিরূপে সম্ভবপর ছিল? এ কারণেই বোখারীর টীকাকার হাফেয ইবনে হাজার আসহাবে কাহফ ও আসহাবে রকীমের

দু'টি আলাদা আলাদা দল হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে একই দলের দুই নাম হওয়াই ঠিক। রকীমের আলোচনার সাথে সাথে গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির আলোচনা এসে গেছে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, এই তিন ব্যক্তিই আসহাবে রকীম ছিল।

হাফয ইবনে হাজার ও অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা অনুযায়ী আসহাবে কাহফ ও আসহাবে রকীম একই দল।

এ কাহিনীর দু'টি অংশ রয়েছে। (এক) এ কাহিনীর আসল উদ্দেশ্য, যদ্বারা ইহুদীদের প্রশ্নের জওয়াব হয়ে যায় এবং মুসলমানদের জন্যে হেদায়েত ও উপদেশ। (দুই) কাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমি-আসল উদ্দেশ্যের সাথে যার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণতঃ ঘটনাটি কোন কালে এবং কোন শহরে ও জনপদে সংঘটিত হয়, যে কাফের বাদশাহর কাছ থেকে পলায়ন করে তাঁরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে কে ছিল? তার ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা কি ছিল? সে তাঁদের সাথে কি ব্যবহার করেছিল, যদ্বন্ধন তাঁরা পলায়ন করতে ও গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন? তাঁদের সংখ্যা কত ছিল? তাঁরা কতকাল ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন? তাঁরা এখনও জীবিত আছেন, না মরে গেছেন?

কোরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞজ্ঞানোচিত মূলনীতি ও বিশেষ বর্ণনাপদ্ধতি অনুযায়ী সমগ্র কোরআনে একটি মাত্র কাহিনী তথা ইউসুফ (আঃ)-এর ইতিবৃত্ত ব্যতীত কোন কাহিনী সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির অনুরূপ পূর্ণ বিবরণ ও ক্রমসহকারে বর্ণনা করেননি; বরং প্রত্যেক কাহিনীর শুধু ঐ অংশই বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন, যা মানবীয় হেদায়েত ও শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আসহাবে কাহফের কাহিনীতেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কোরআন বর্ণিত অংশগুলো এর আসল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অবশিষ্ট যেসব অংশ একান্ত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক, সেগুলো উল্লেখ করা হয়নি। আসহাবে কাহফের সংখ্যা ও ঘুমের সময়কাল সম্পর্কিত প্রশ্নও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদত্ত হয়েছে যে, এ জাতীয় প্রসঙ্গে বেশী চিন্তা-ভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করা সমীচীন নয়। এগুলো আল্লাহর উপরই ছেড়ে দেয়া উচিত।

প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবয়ীগণের এই কর্মপন্থা অনুযায়ী এখানেও কাহিনীর ঐসব অংশ বাদ দেয়া উচিত ছিল, যেগুলো কোরআন ও হাদীস বাদ দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারকেই সর্ববৃহৎ কৃতিত্ব মনে করা হয়। পরবর্তী যুগের তফসীরবিদগণ এ জন্যেই তাঁদের গ্রন্থে কম-বেশী এসব অংশও বর্ণনা করেছেন। তাই আলোচ্য তফসীরে কাহিনীর যেসব অংশ স্বয়ং কোরআনে উল্লেখিত আছে, সেগুলো তো আয়াতের তফসীরের অধীনে বর্ণিত হবেই, এছাড়া অবশিষ্ট ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অংশও প্রয়োজন অনুসারে বর্ণনা করা হচ্ছে। বর্ণনা করার পরও সর্বশেষ ফলাফল এটাই হবে যে, এ ধরনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করা অসম্ভব। কেননা, ইসলাম ও খ্রীষ্টীয় ইতিহাসে এ সম্পর্কে যাকিছু লিখিত আছে, সেগুলো এত বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী যে, একজন গ্রন্থকার যদি স্বীয় গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ইঙ্গিতের সাহায্যে কোন একদিক নিদিষ্ট করেন, তবে অন্যজন এমনিভাবে অন্য দিককে অগ্রাধিকার দান করেন।

আনুবঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুইনের হেফাজতের জন্যে শুহায় আশ্রয়গ্রহণের ঘটনা বিভিন্ন শহর ও ভূখণ্ডে অনেক সংঘটিত হয়েছে : ইতিহাসবিদদের মতভেদের একটি বড় কারণ এই যে, খ্রীষ্টাব্দে বৈরাগ্যকে ধর্মের সর্বপ্রধান অঙ্গ মনে করা হয়েছিল। ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ডেই এ ধরনের ঘটনাবলী এতবেশী সংঘটিত হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহর এবাদতের জন্যে শুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে সারা জীবন সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছেন। এখন সেখানে যেখানে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই আসহাবে কাহ্ফের গারপা হওয়া ইতিহাসবিদদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

আসহাবে কাহ্ফের স্থান ও কাল : তফসীরবিদ কুরতুবী আন্দালুসী তাঁর তফসীর গ্রন্থে এখানে কিছু স্কৃত ও কতিপয় চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন শহরের সাথে ঘটনাগুলো সম্পর্কযুক্ত। কুরতুবী সর্বপ্রথম যাহ্‌হাকের রেওয়াজেতে বর্ণনা করেছেন যে, রকীম রোমের একটি শহরের নাম। এর একটি শুহায় একশ জন লোক শায়িত রয়েছে। মনে হয় তারা যেন ঘুমিয়ে আছে। এরপর তফসীরবিদ ইবনে অতিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি অনেক লোকের মুখে শুনেছি, সিরিয়ার একটি শুহায় কিছুসংখ্যক মৃতদেহ আছে। সেখানকার সেবায়তরা বলে যে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ। শুহায় নিকটে একটি মসজিদ এবং একটি গৃহও নির্মিত আছে : একে রকীম বলা হয়। মৃতদেহগুলোর সাথে একটি মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যমান।

দ্বিতীয় ঘটনা আন্দালুস গার্নাতার (স্পেনের গ্রানাডা)। ইবনে আতিয়া বলেন : গার্নাতায় 'লাশু' নামক গ্রামের অনূরে একটি শুহা আছে। একে রকীম বলা হয়। এই শুহায় কয়েকটি মৃতদেহ এবং তাদের সাথে একটি মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যমান আছে। অধিকাংশ মৃতদেহ মাংসবিহীন শুধু অস্থি-কঙ্কাল এবং কিছুসংখ্যক মৃতদেহে এখনও মাংস আছে। এভাবে বহু শতাব্দী পরেও বিস্ময় উপায়ে তাদের কোন অবস্থা জানা যায় না। অনেকে বলে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ। ইবনে আতিয়া বলেন : এই সববাদ শুনে আমি ৫০৪ হিজরীতে সেখানে পৌঁছে দেখি, বাস্তবিকই মৃতদেহগুলো তেমন অবস্থায়ই পড়ে রয়েছে। তাদের নিকটবর্তী স্থানে একটি মসজিদ ও রোমীয় যুগের একটি গৃহ আছে, যাকে রকীম বলা হয়। মনে হয়, প্রাচীনকালে এটা ছিল একটা রাজপ্রাসাদ। তখনও এর কোন কোন প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। এটা একটা জনশ্রুতি জঙ্গলে অবস্থিত। তিনি আরও বলেন : গার্নাতার উপরিভাগে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। শহরটি রোমীয় স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। শহরের নাম 'রাফিউস' বলা হয়। আমি এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক আশ্চর্য বস্তু এবং কবর দেখেছি। আন্দালুসের অধিবাসী হলেও কুরতুবী এসব ঘটনা বর্ণনা করার পরও এদের কোন একটিরও আসহাবে কাহ্ফ বলতে অপ্রস্তুত। ইবনে আতিয়াও চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে একথা বলেন না যে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ। তাঁরা সামান্য জনশ্রুতি বর্ণনা করেন মাত্র। অপর এক আন্দালুসী তফসীরবিদ আবু হাইয়ান সপ্তম শতাব্দীতে (৬৫৪ হিজরীতে) গার্নাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই বসবাস করেন। তিনিও তফসীর বাহরে-মুহীতে গার্নাতায় এই শুহায় প্রসঙ্গ কুরতুবীর মতই উল্লেখ করেছেন। তিনিও ইবনে আতিয়ার চাক্ষুষ দেখার কথা বর্ণনা করার পর লিখেছেন : আমি যখন আন্দালুসে (অর্থাৎ, কায়রোতে পুনর্বাসিত হওয়ার পূর্বে) ছিলাম, তখন অনেক মানুষ এই শুহাটি দেখতে আসত। তারা বলত যে, যদিও মৃতদেহগুলো এখন পর্যন্ত

ثُمَّ يَكُونُ لَهُمْ لَعْنَةُ الْكَافِرِينَ اهْضِبْ لِمَا لَيْسَ بِكَ اَمَّا ۝
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْنَةُ اَنْبِيَائِهِمْ
وَزَيْتُونَهُمْ هُدًى ۝ وَرَبُّنَا عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَادِرٌ ۝
رَبَّنَا زَيِّنْ لَّنَا السَّلٰبَ وَالْاَرْضَ اَنْ نَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِهَا لَقَدْ
كُنَّا اَدَاْسًا ظٰلِمًا ۝ هُوَ الَّذِى قَوْمًا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهَا اِلٰهَةً اَوْ
لَا يَتُوْنَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ يَّبِيْنٌ فَمَنْ اَظْلَمُ مِنْهُمْ اَفَنَرٰى
عَلَى اللّٰهِ كَيْدًا ۝ اِذَا دَعَا رَبُّهُمْ وَهُمْ مُّعٰذُونَ اِلَّا اللّٰهَ
فَاِلٰى الْكَهْفِ يَنْسِرُوْا رَبُّهُمْ مِنْ دُوْنِهِ وَنَجَّيْنٰهُمْ
مِّنْ اَمْرِهِمْ وَمَقَامٌ ۝ وَرَآى السَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ فَوُزِعْنَ
كَفُوْهُمُ ذٰتِ السِّبْيٰنِ وَاِذَا غَرِبَتْ تَرٰهُمْ ذٰتِ السِّبْيٰلِ
وَهُمْ فِيْ رَهْبَةٍ ۝ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ
اَلَمْ نَجْعَلِ لَّكَ اٰيٰتٍ مُّزِيْنًا ۝ وَ
نَحْسِبُهُمْ اٰيٰتًا ۝ وَهُمْ رُوْدٌ ۝ وَقَدْ جَعَلْنَا ذٰتِ السِّبْيٰنِ وَ
ذٰتِ السِّبْيٰلِ ۝ وَكَلَّمَهُمْ بَابُ سُوْدٍ رَّا عِيْدًا يَّالُوْصِيْدِ ۝ وَطَلَعَتْ
عَلَيْهِمْ لَوْكِيْتٌ مِنْهُمُ فِرَآءٌ ۝ وَلَكِنَّهُمْ رُعْبًا ۝

(১২) অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করি, একথা জানার জন্যে যে, দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ভর করতে পারে। (১৩) আপনার কাছে তাদের ইতিবৃত্তকে সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশৃঙ্খল স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সংগে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। (১৪) আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর তারা বলল : আমাদের পালনকর্তা আসমান ও যমীনের পালনকর্তা; আমরা কখনও তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না। যদি করি, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। (১৫) এরা আমাদেরই স্বজাতি, এরা তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চাইতে অধিক গোনাহগার আর কে? (১৬) তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হলে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের এবাদত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা শুহায় আশ্রয়গ্রহণ কর। আমাদের পালনকর্তা আমাদের জন্যে দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি আমাদের জন্যে আমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন। (১৭) তুমি সূর্যকে দেখবে, যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কেটে ডান দিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কেটে বামদিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চত্বরে অবস্থিত। এটা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ্‌ যাকে সংগে চালায়, সে-ই সংগে প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পৃথক করে, আশনি কখনও তার জন্যে পৃথকদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবেন না। (১৮) তুমি মনে করবে তারা জাহ্নত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পূর্ন পরিবর্তন করাই ডানদিকে ও বামদিকে। তাদের কুকুর ছিল সায়নের পা দু'টি গুহাঘারে প্রসারিত করে। যদি তুমি উকি দিয়ে তাদেরকে দেখতে, তবে পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে।

বিদ্যমান রয়েছে এবং দর্শকরা এগুলো গণনাও করে, কিন্তু সর্বদাই তারা সংখ্যা বলতে ভুল করে। তিনি আরও লিখেছেন : ইবনে আতিয়া যে রাকিউস শহরের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি গার্নাতার কেবলার দিকে অবস্থিত। আমি নিজে এই শহরে বহুবার গিয়েছি এবং তাতে বিরাট বিরাট অসাধারণ পাথর দেখতে পেয়েছি। অতঃপর আবু হাইয়ান লিখেছেন : ‘যে কারণে আসহাবে কাহকের আদালুসে অবস্থিত হওয়া সম্পর্কে প্রবল ধারণা জন্মে, তা এই যে, সেখানে ব্রীটমের চর্চা প্রবল। এমনকি, এটাই তাদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় কেন্দ্র’। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আবু হাইয়ানের মতে আসহাবে কাহকের আদালুসে অবস্থিত হওয়াই অগ্রগণ্য। — (তফসীরে কুরতুবী, নবম খণ্ড, ৩৫৬ পৃঃ)

তফসীরবিদ ইবনে জরীর ও ইবনে আবি হাতেম উভয়ই আওকীর রেওয়াজেতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম একটি উপত্যকার নাম, যা ফিলিস্তিনের পাদদেশে আয়লার (আকাবা) অদূরে অবস্থিত। ইবনে জরীর, ইবনে আবি হাতেম এবং আরও কয়েকজন হাদীসবিদ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রকীম কি আমার জন্য নেই, কিন্তু কা’বে আব্বারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন যে, রকীম এ জনপদকে বলা হয়, যাতে আসহাবে কাহক গুহায় আশ্রয়গ্রহণের পূর্বে বসবাস করত। — (রুহুল-মা’আনী)

ইবনে আবি শায়বা, ইবনে মুন্সের ও ইবনে আবি হাতেম হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর সাথে রোমীয়দের মোকাবেলায় একটি জেহাদে অংশগ্রহণ করি, যাকে ‘গাফওয়ালুল মুখীক’ বলা হয়। এ সময় আমরা কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহকের গুহার নিকট উপস্থিত হই। হযরত মুয়াবিয়া গুহার ভেতরে প্রবেশ করে আসহাবে কাহকের মৃতদেহগুলো প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস বাধা দিয়ে বললেন : এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কেও তাঁদের মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করতে বাধা করেছেন। তিনি তো আপনার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন : ‘‘আপনি তাদেরকে দেখলে পলায়ন করবেন এবং ভয়-ভীতিতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বেন’’। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আব্বাসের বাধা মানলেন না। সম্ভবতঃ এ কারণে যে, কোরআনে তাঁদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা তাঁদের জীবদ্দশায় ছিল। এখনও তাঁদের সে অবস্থা থাকা জরুরী নয়। হযরত মুয়াবিয়া কয়েকজন লোককে দেখার জন্যে প্রেরণ করলেন। তারা গুহার পৌছে যখন ভেতরে প্রবেশ করতে চাইল, তখন একটি দমকা হওয়া এসে তাঁদেরকে গুহা থেকে বের করে দিল। — (রুহুল মা’আনী, ৫ম খণ্ড, ২২৭)

তফসীরবিদদের উল্লেখিত রেওয়াজেতে ও উক্তি যেটামুটিভাবে আসহাবে কাহকের ভিত্তি স্থান নির্দেশ করে। (এক) পারস্য উপসাগরের উপকূলীয় শহর আকাবার (আয়লা) নিকটবর্তী স্থান। হযরত ইবনে আব্বাসের অধিকাংশ রেওয়াজেতে এরই সমর্থন করে।

(দুই) ইবনে আতিয়ার দেখা ও আবু হাইয়ানের সমর্থন দ্বারা এ ধারণা প্রবল হয় যে, এই গুহাটি স্পেনের গ্রানাডায় অবস্থিত। এ দু’টি স্থানের মধ্য থেকে আকাবার একটি শহর অথবা কোন বিশেষ দালান-কোঠার নাম রকীম হওয়াও বর্ণিত আছে। এমনভাবে গ্রানাডায় গুহা সলগ্নু বিরাট ভগ্ন প্রাচীরের নাম রকীম বলা হয়েছে। উপরোক্ত উভয় প্রকার রেওয়াজেতের মধ্যে কেউই এমন অকাট্য কয়লা গ্রহণ করেননি যে, এটাই আসহাবে কাহকের গুহা। বরং উভয় প্রকার রেওয়াজেতে স্থানীয় জনশ্রুতি ও

কিংবদন্তির উপর ভিত্তিপাল।

(তিন) কুরতুবী, আবু হাইয়ান, ইবনে জরীর ইত্যাদি প্রায় সকল তফসীর গ্রন্থের রেওয়াজেতে আসহাবে কাহক যে শহরে বাস করতেন, তার প্রাচীন নাম ‘আফসুস’ এবং ইসলামী নাম ‘তরসুস’ বলা হয়েছে। এ শহরটি যে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মধ্যে দ্বিমত নেই। এতে বোঝা যায় যে, এ গুহাটিও এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। কাজেই এর কোন একটিকে অকাট্যরূপে বিস্তৃত এবং বাকীগুলোকে ব্রাস্ত বলার কোন প্রমাণ নেই। তিনটি স্থানেরই সমান সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এ সম্ভাবনাও কেউ নাকচ করতে পারে না যে, এসব গুহার ঘটনাবলীর নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও এগুলো কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহকের গুহা নাও হতে পারে এবং সে গুহাটি অন্য কোথাও অবস্থিত থাকতে পারে। আর এটাও জরুরী নয় যে, এখানে রকীম কোন শহর অথবা প্রাচীরেরই নাম হবে; বরং এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, রকীম ঐ ফলকের নাম, যার মধ্যে কোন বাদশাহ আসহাবে কাহকের নাম অঙ্কিত করে গুহার মুখে টাঙ্গিয়ে রেখেছিলেন।

আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণা : আধুনিক যুগের কোন কোন ইতিহাসবিদ ও আলেম ব্রীটান ইতিহাস এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের সাহায্যে আসহাবে কাহকের গুহার স্থান ও কাল নির্ণয়ের লক্ষ্যে যথেষ্ট আলোচনা ও গবেষণা করেছেন।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আয়লার (আকাবা) নিকটবর্তী বর্তমান শহর পাট্টাকে প্রাচীন শহর রকীম সাব্যস্ত করেছেন। আরব ইতিহাসবিদরা এর নাম লেখেন ‘বাত্তা’। তিনি বর্তমান ইতিহাস থেকে এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে গুহার চিহ্নও দেখা যায় বলে উল্লেখ করেছেন, যার সাথে মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যাদিও দেখা যায়। এর সমর্থনে তিনি লিখেছেন : বাইবেলের ইশীয় গ্রন্থের অধ্যায় ১৮, আয়াত ২৭-এ যে জায়গাকে ‘রকম’ অথবা ‘রাকেম’ বলা হয়েছে, একেই বর্তমানে পাট্টা বলা হয়। কিন্তু এ বর্ণনায় সন্দেহ করা হয়েছে যে, ইশীয় গ্রন্থে বনী ইবনে ইয়ামীরের ত্যাক্স সম্পত্তি সম্পর্কে যে ‘রকম’ অথবা ‘রাকেমের’ উল্লেখ আছে, সেটা জর্দান নদী ও লৃত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখানে পাট্টা শহর অবস্থিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এজন্যে বর্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এ বর্ণনা মেনে নিতে যোর আপত্তি করেছেন যে, পাট্টা ও রাকেম একই শহর। (এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, মুদ্রণ ১৯৪৬, সপ্তদশ খণ্ড, ৬৫৮ পৃঃ)

অধিকাংশ তফসীরবিদ ‘আফসুস’ নগরীকে আসহাবে কাহকের স্থান সাব্যস্ত করেছেন। এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত রোমকদের সর্ববৃহৎ নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান। এটি তুরস্কের ইজমীর (স্মার্ণা) শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায়।

হযরত মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীও ‘আরদুল কোরআন’ গ্রন্থে পাট্টা শহরের নাম উল্লেখ করে বন্ধনীর ভেতরে রকীম লিখেছেন। কিন্তু এর কোন প্রমাণ তিনি পেশ করেননি যে, পাট্টা শহরের পুরনো নাম রকীম ছিল। মওলানা হিকমুর রহমান ‘কাসাসুল কোরআনে’ একেই গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রমাণস্বরূপ তওরাত ও ‘সহীকা সুইয়ার’ বরাতে দিয়ে পাট্টা শহরের নাম রাকেম বর্ণনা করেছেন। — (দায়েরাতুল মা’আরিফ, আরব থেকে গৃহীত)

জর্দানে আশ্মানের নিকটবর্তী এক বিরান ভূমিতে একটি গুহার সন্ধান

পাওয়া গেলে সরকারী প্রত্যুত্তর বিভাগ ১৯৬৩ ইং সনে সে স্থানটি খননের কাজ আরম্ভ করে। মাটি ও পাথর সরানোর পর অস্থি ও প্রস্তরে পূর্ণ ছয়টি শবদার ও দু'টি সমাধি আবিষ্কৃত হয়। গুহার দক্ষিণ দিকে পাথরে খোদিত বাইজেন্টিনীয় ভাষায় লিখিত কিছু নকশাও আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় লোকদের ধারণা, এ স্থানটিই রকীম এবং এর পাশে আসহাবে কাহফের এই গুহা।

হাকীমুল উম্মত হযরত খানভী (রহঃ) বয়ানুল-কোরআনে তফসীরে হাক্কানীর ব্যাখ্যা দিয়ে আসহাবে কাহফের স্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃত করে লেখেন : যে অত্যাচারী বাদশাহর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আসহাবে কাহফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার সময়কাল ছিল ২৫০ খ্রীষ্টাব্দ। এরপর তিন শ' বছর পর্যন্ত তাঁরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন। ফলে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মের ২০ বছর পূর্বে আসহাবে কাহফ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। তফসীরে-হাক্কানীতেও তাঁদের স্থান 'আফসুস' অথবা 'তরতুস' শহর সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। বর্তমানেও এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে।

এসব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য প্রাচীন তফসীরবিদগণের রেওয়ায়েত ও আধুনিক ঐতিহাসবিদদের বর্ণনা থেকে পেশ করা হল। আমি পূর্বেই আরয় করেছিলাম যে, কোরআনের কোন আয়াত বোঝা এসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয় এবং যে উদ্দেশ্যে কোরআন এ কাহিনী বর্ণনা করেছে, তার কোন জরুরী অংশ এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নয়। রেওয়ায়েত ও বর্ণনা এবং এগুলোর ইঙ্গিতাদিও এত বিভিন্নমুখী যে, সমগ্র গবেষণা এবং অধ্যবসায়ের পরেও কোনরূপ চূড়ান্ত ফয়সালা সম্ভবপর নয়, কিন্তু আজকাল শিক্ষিত মহলে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি যে অসাধারণ ঝোঁক পরিদৃষ্ট হয়, তার পরিতৃপ্তির জন্য এসব তথ্য উদ্ধৃত করা হল। এগুলো থেকে আনুমানিকভাবে এতটুকু জানা যায় যে, এ ঘটনাটি হযরত ইসা (আঃ)-এর পর এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর যমানার কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হয়। অধিকাংশ রেওয়ায়েত এ বিষয়ে একমত। দেখা যায় যে, ঘটনাটি আফসুস অথবা তরতুস শহরের নিকটেই ঘটেছে।

আসহাবে কাহফ এখনও জীবিত আছে কি? এ সম্পর্কে এটাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট যে, তাদের ওফাত হয়ে গেছে। তফসীরে মাযহারীতে ইবনে ইসহাকের বিস্তারিত রেওয়ায়েত রয়েছে যে, আসহাবে কাহফের জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জ্ঞানজানি এবং বাদশাহ বায়দুসীসের কাছে পৌঁছে সাক্ষাতের পর আসহাবে কাহফ বাদশাহর কাছে বিদায় প্রার্থনা করে। বিদায়ী সালামের সাথে তারা বাদশাহর জন্যে দোয়া করে। বাদশাহর উপস্থিতিতেই তারা নিজেদের শয়নস্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ তাআলা তখনই তাদেরকে মৃত্যুদান করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি ইবনে-জরীর ও ইবনে-কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদগণ উল্লেখ করেছেন : “কাতাদা বলেন : হযরত ইবনে আব্বাস হাবীব ইবনে মাসলামার সাথে এক জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রোম দেশে একটি গুহার কাছ দিয়ে যাবার সময় তাঁরা সেখানে মৃত লোকদের হাড় দেখতে পান। এক ব্যক্তি বলল : এগুলো আসহাবে কাহফের হাড়। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন : তাদের হাড় তো তিনশ' বছর পূর্বেই মাটিতে পরিণত হয়ে গেছে।”

কাহিনীর এসব অংশ কোরআনে নেই এবং হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। ঘটনার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা কোরআনের কোন আয়াত বোঝাও

এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতদুটো এসব বিষয়ের কোন অকাটা ফয়সালা করা সম্ভবপর নয়।

فَتَى - إِنَّهُمْ مَرْفُؤَةٌ - এর বহুবচন فَتَى অর্থ যুবক। তফসীরবিদগণ লিখেছেন, এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হেদায়েত লাভের উপযুক্ত সময় হচ্ছে যৌবনকাল। বৃদ্ধ বয়সে পূর্ববর্তী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে শেকড় গেড়ে বসে যে, যতই এর বিপরীত সত্য পরিস্ফুট হোক না কেন, তা থেকে বের হয়ে আসা দুরূহ হয়ে পড়ে। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবায়ে কোরামের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন যুবক। —(ইবনে-কাসীর, আবু হাইয়ান)

وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ فُلُوقِهِمْ - ইবনে-কাসীরের ব্যাখ্যা দিয়ে উপরে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের চিত্ত সুদৃঢ় করার ঘটনা তখন হয়েছে, যখন অত্যাচারী পৌত্তলিক বাদশাহ যুবকদেরকে দরবারে হামির করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে হত্যার আশঙ্কা সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁআলা তাদের অন্তরে স্বীয় মহব্বত, ভীতি ও মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে, এর মোকাবেলায় হত্যা, মৃত্যু ও যে কোন বিপদাপদ সহ্য করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পরিস্কারভাবে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করে যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যের এবাদত করে না—ভবিষ্যতেও করবে না। যারা আল্লাহর জন্যে কোন কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের এ ধরনের সাহায্য হয়ে থাকে।

فَالَّذِينَ اتَّخَذُوا - ইবনে কাসীর বলেন : আসহাবে কাহফের অবলম্বিত কর্মপন্থা ছিল এই যে, যে শহরে থেকে আল্লাহর এবাদত করা যায় না, সে শহর পরিত্যাগ করে গুহায় আশ্রয় নেয়া উচিত। এটাই সব পয়গম্বরের সুন্নত। তাঁরা এরূপ স্থান থেকে হিজরত করে এমন জায়গায় আশ্রয় নেন, যেখানে আল্লাহর এবাদত করা যেতে পারে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা আসহাবে কাহফের তিনটি বিস্ময়কর অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এগুলো তাঁদের কারামত হিসেবে অলৌকিকভাবে প্রকাশ লাভ করেছে।

(এক) দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকা এবং তাতে খাদ্য ইত্যাদি ছাড়াই জীবিত থাকা সর্ববৃহৎ কারামত ও অলৌকিক কাণ্ড। পরবর্তী আয়াতে এর বিবরণ আসবে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই দীর্ঘ নিদ্রাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাদেরকে গুহার অভ্যন্তরে এমনভাবে নিরাপদ রেখেছিলেন যে, সূর্য তাদের কাছ দিয়ে সকাল-বিকাল অতিক্রম করত, কিন্তু গুহার ভেতরে তাদের দেহে রোদ পড়ত না। কাছ দিয়ে অতিক্রম করার উপকারিতা জীবনের স্পন্দন প্রতিষ্ঠা, বাতাস, উত্তাপ ও শৈত্যের সমতা ইত্যাদি ছিল।

ذَٰلِكَ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ - বাক্য থেকেও বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে রোদ থেকে হেফাযতের এই ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলার অপার শক্তির একটি নিদর্শন ছিল। —(মাযহারী)

দীর্ঘ নিদ্রার সময় আসহাবে কাহফ এমতাবস্থায় ছিল যে, দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত : দ্বিতীয় অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে,

আসহাবে কাহফকে এত দীর্ঘকাল নিদ্রায় অভিভূত রাখা সম্বন্ধেও তাদের দেহে নিদ্রার চিহ্নমাত্র ছিল না। বরং দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন : তাদের চক্ষু খোলা ছিল। নিদ্রার কারণে দেহে যে শৈথিল্য আসে তাও তাদের মধ্যে ছিল না। বাহ্যতঃ এ অবস্থাও অসাধারণ এবং একটি কারামতই ছিল। এর কারণ ছিল তাদের হেফযত করা — যাতে নিদ্রিত মনে করে কেউ তাদের উপর হামলা না করে অথবা তাদের আসবাবপত্র চুরি না করে। বিভিন্ন দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন থেকেও দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে পারে। এর আরেক কারণ ছিল এই যে, যাতে এক পার্শ্বকে মাটি খেয়ে না ফেলে।

আসহাবে কাহফের কুকুর : সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে গৃহে কুকুর কিংবা কোন প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সহীহ বোখারীর এক হাদীসে ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেন : যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জন্তুদের হেফযতকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে, প্রত্যহ তার পৃণ্য থেকে দু'কীরাত হ্রাস পায়।— (কীরাত একটি ছোট ওজনের নাম)। হযরত আবু হোরাযরার রেওয়ায়েতে এক তৃতীয় প্রকার কুকুরের ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে : অর্থাৎ, শাসকেত্রের হেফযতের জন্যে পালিত কুকুর।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহর ভক্ত আসহাব কাহফ কুকুর সঙ্গে নিলেন কেন? এর এক উত্তর এই যে, কুকুর পালনের নিষিদ্ধতা শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধান। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টধর্মে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, খুব সম্ভব তাঁরা সম্পদশালী ও পশুপালনকারী ছিলেন। এগুলোর হেফযতের জন্যে কুকুর পালন করতেন। কুকুরের প্রভুভক্তি সুবিদিত। তাঁরা যখন শহর থেকে রওয়ানা হন, তখন কুকুরও তাঁদের অনুসরণ করতে থাকে।

সং সংসর্গের বরকত কুকুরেরও সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে : ইবনে আতিয়া বলেন : আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বলেছেন যে, তিনি ৪৬৯ হিজরীতে

মিসরের জামে মসজিদে আবুল ফযল জওহরীর একটি ওয়ায শুনেছেন। তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : যে ব্যক্তি সংলোকদেরকে ভালবাসে, তাদের নেকীর অংশ সে-ও পায়। দেখ, আসহাবে কাহফের কুকুর তাদেরকে ভালবেসেছে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ তাআলা কোরআনেও তার কথা উল্লেখ করেছেন।

কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে ইবনে আতিয্যার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন : একটি কুকুর যখন সংলোক ও গুণীদের সংসর্গের কারণে এই মর্যাদা পেতে পারে, তখন আপনি অনুমান করুন, যেসব ইমানদার তওহীদী লোক আল্লাহর স্ত্রী ও সংলোকদেরকে ভালবাসে, তাদের মর্যাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় সেসব মুসলমানদের জন্যে সাধুনা ও সুসংবাদ রয়েছে, যারা আমলে কাঁচা, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ)—কে মনে প্রাণে ভালবাসে।

সহীহ বোখারীর হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন : একদিন আমি ও রসূলুল্লাহ (সঃ) মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হল। সে প্রশ্ন করল : ইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ) ! কেয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন : তুমি কেয়ামতের জন্যে কি প্রস্তুতি নিয়েছ (যে, আসার জন্যে ত্যাগছড়া করছ)? একথা শুনে লোকটি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হল। অতঃপর সে বলল : আমি কেয়ামতের জন্যে অনেক নামায, রোযা ও দান-খয়রাত সঞ্চয় করিনি, কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : যদি তাই হয়, তবে (শুনে নাও), তুমি (কেয়ামতে) তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস। হযরত আনাস বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর মুখে এ কথা শুনে আমার এতই আনন্দিত হলাম যে, মুসলমান হওয়ার পর এর চাইতে বেশী আনন্দিত আর কখনো হইনি। হযরত আনাস আরও বলেন : (আলহামদুলিল্লাহ্) আমি আল্লাহকে, তাঁর রসূলকে, আবু বকর ও ওমরকে ভালবাসি এবং আশা করি যে, তাঁদের সাথেই থাকব। — (কুরতুবী)

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِسَيِّئَاتِهِمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ
 كَمْ لَكُمْ قَالَ أَوْ لَبَسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ
 أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ لَكُمْ قَائِلٌ أَحَدُكُمْ يُرْقِيكُمْ هَذَا
 إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا فِيهَا أَلَا تَرَ طَافًا مِّنْكُمْ يَبْزُونَ
 مَنَّهُ وَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا يُشْعِرُونَ بِكُمْ أَحَدًا ①
 إِنَّهُمْ لَأَن يُّظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعَذِّبُوكُمْ
 فِي مَكَاتِهِمْ وَلَكِنْ تَقْلُبُونَ أَلَا تَأْتُونَ ② وَكَذَلِكَ أَغْتَابْنَا
 عَلَيْهِمُ لَعْنَتَنَا وَأَنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا
 رَيْبَ فِيهَا أَذِيْتَنَا عَوْنٌ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ فَقَالُوا بَنُوا
 عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا
 عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمُ مَّسْجِدًا ③ سَيَقُولُونَ
 ثَلَاثَةٌ رَّاَهُمْ كَذِبٌ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَاءُ سَمْعُكُمْ ④
 رَبُّنَا بِالْغَيْبِ يَعْلَمُونَ سَبْعَةٌ وَرَأَيْنَاهُمْ كَذِبٌ
 قَالُوا أَتَعْلَمُونَ بَعْدَ نِعْمَتِ مَا لَكُمْ مِنَ الْآلِ قَلِيلٌ هَٰذَا نَسْتَفْتِيكُمْ
 الْإِمْرَاءَ طَائِفًا وَلَا تَسْقُطَ فِيهِمْ مِّنْهُمْ أَحَدًا ⑤

(১৯) আমি এমনিভাবে তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল : তোমরা কতকাল অবস্থান করছে? তাদের কেউ বলল : একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। কেউ কেউ বলল : তোমাদের পালনকর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করছে। এখন তোমাদের একজনকে তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য পবিত্র। অতঃপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য; সে যেন নম্রতা সহকারে যায় ও কিছুতেই যেন তোমাদের খবর কাটকে না জানায়। (২০) তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না। (২১) এমনিভাবে আমি তাদের খবর প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করছিল, তখন তারা বলল : তাদের উপর সৌম্য নির্মাণ কর। তাদের পালনকর্তা তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হল, তারা বলল : আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করব। (২২) অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে এখন তারা বলবে : তারা ছিল তিন জন; তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর। একথাও বলবে : তারা পাঁচ জন। তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। আরও বলবে : তারা ছিল সাত জন। তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলুন : আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের খবর অশ্প লোকেই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদও করবেন না।

وَكَذَلِكَ — এ শব্দটি তুলনামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক অর্থ দেয়। এখানে দু'টি ঘটনার পারস্পরিক তুলনা বোঝানো হয়েছে। প্রথম ঘটনা আসহাবে কাহফের দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রাভিত্তি থাকা, যা কাহিনীর শুরুতে قَفَرْنَا عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فِي الْكَهْفِ وَبَيْنَ عَيْنَيْنِ عَدَدًا আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা দীর্ঘকালীন নিদ্রার পর সুস্থ থাকা এবং খাদ্য না পাওয়া সত্ত্বেও সবল ও সুঠাম দেহে জাগ্রত হওয়া। উভয় ঘটনা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর তুল্য। তাই এ আয়াতে তাদেরকে জাগ্রত করার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে كذلك শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের নিদ্রা যেমন সাধারণ মানুষের নিদ্রার মত ছিল না, তেমনি তাদের জাগরণও স্বতন্ত্র ছিল। এরপর لِسَيِّئَاتِهِمْ বলা হয়েছে, অর্থাৎ, যাতে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, কতকাল ঘুমানো হয়েছে। এটা জাগ্রত করার আসল কারণ নয়; বরং একটি অভ্যস্ত ঘটনার বর্ণনা। এ কারণেই এর لام صيرورت নাম দিয়েছেন।—(আবু হাইয়ান, কুরতুবী)

মোটকথা, তাদের দীর্ঘ নিদ্রা যেমন কুদরতের একটি নিদর্শন ছিল, এমনিভাবে শত শত বছর পর পানাহার ছাড়া সুস্থ-সবল অবস্থায় জাগ্রত হওয়াও ছিল আল্লাহর অপার শক্তির একটি নিদর্শন। আল্লাহর এটাও ইচ্ছা ছিল যে, শত শত বছর নিদ্রামগ্ন থাকার বিষয়টি স্বয়ং তারাও জানুক। তাই পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এর সূচনা হয় এবং সে ঘটনা দ্বারা চূড়ান্ত রূপ নেয়, যা পরবর্তী وَكَذَلِكَ أَغْتَابْنَا আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের গোপন রহস্য শহরবাসীরা জেনে ফেলে এবং সময়কাল নির্ণয়ে মতানৈক্য সত্ত্বেও দীর্ঘকাল গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার ব্যাপারে সবার মনেই বিশ্বাস জন্মে।

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ — কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল যে, গুহায় অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য হয় এবং তাদের এক দলের উক্তি শুদ্ধ ছিল। এখানে তারই বিবরণ দেয়া হয়েছে। আসহাবে কাহফের এক ব্যক্তি প্রশ্ন তুলল যে, তোমরা কতকাল নিদ্রামগ্ন রয়েছ? কেউ কেউ উত্তর দিল : একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। কেননা, তারা সকাল বেলায় গুহায় প্রবেশ করেছিল এবং জাগরণের সময়টি ছিল বিকাল। তাই মনে করল যে, এটা সেই দিন যেদিন আমরা গুহায় প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্য থেকেই অন্যেরা অনুভব করল যে, এটা সম্ভবতঃ সে দিন নয়। তাহলে কতদিন গেল জানা নেই। তাই তারা বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে বলল : رَبُّكُمْ أَعْلَمُ অতঃপর তারা এ আলোচনাকে অনাবশ্যক মনে করে জরুরী কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল যে, শহর থেকে কিছু খাদ্য আনার জন্যে একজনকে পাঠানো হোক।

إِلَى الْمَدِينَةِ — এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, গুহার নিকটে একটি বড় শহর ছিল। সেখানে তারা পূর্বে বসবাস করত। এ শহরের নাম সম্পর্কে আবু হাইয়ান তফসীর বাহর-মুহীতে বলেন : যে সময়ে আসহাবে কাহফ এ শহর থেকে বের হয়েছিল তখন তার নাম ছিল ‘আফসুস’। বর্তমানে এর

নাম ‘তরসূস।’ কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন : এ শহরের উপর যখন মূর্তিপূজারীদের আধিপত্য ছিল, তখন এর নাম ছিল ‘আফসূস।’ অতঃপর যখন মুসলমান অর্থাৎ, তৎকালীন খ্রীষ্টানগণ শহরটি দখল করে নেয়, তখন এর নাম রেখে দেয় তরসূস।

وَرَوَقُ থেকে জানা যায় যে, তারা শুধায় আসার সময় কিছু টাকা-পয়সাও সাথে এনেছিল। অতএব, বোঝা গেল যে, প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা বৈরাগ্য ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।— (বাহরে-মুহীত)

أَزَى - أَزَى শব্দের অর্থ পাক-সাঁফ। ইবনে জোবায়রের তফসীর অনুযায়ী এখানে হালাল খাদ্য বোঝানো হয়েছে। এর প্রয়োজন এজন্যে দেখা দেয় যে, যখন তারা শহর থেকে বের হয়েছিল, তখন সেখানে মূর্তিদের নামে পশু যবেহ করা হত এবং বাজারে তা-ই বিক্রি করা হত। তাই প্রেরিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, খাদ্য হালাল কিনা, তা যেন যাচাই করে আনা হয়।

এ থেকে জানা গেল যে, শহরে কিংবা যে বাজারে অথবা যে হোটেলে অধিকাংশ হারাম খাদ্য প্রচলিত, সেখানকার খাদ্য যাচাই না করে খাওয়া জায়েয নয়।

رَجْم - رَجْم শব্দের অর্থ পাথর মেরে মেরে হত্যা করা। শুধায় যাওয়ার পূর্বে বাদশাহ্ হুমকি দিয়েছিল যে, তোমাদের এ ধর্ম পরিত্যাগ না করলে তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, তাদের মতে ধর্মত্যাগীদের শাস্তি ছিল প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে হত্যা, যাতে সবাই এতে অংশগ্রহণ করে এবং সমগ্র জাতি যেন ক্রোধ প্রকাশ করে হত্যা করে।

فَأَبْثَرُوا أَحَدَهُمْ — আসহাবে কাহফ নিজেদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে শহরে প্রেরণের জন্যে মনোনীত করে এবং খাদ্য আনার জন্যে তার কাছে অর্থ অর্পণ করে। কুরতুবী বলেন : এ থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়। (এক) অর্থ-সম্পদে অংশীদারিত্ব জায়েয। (দুই) অর্থ-সম্পদের উকিল নিযুক্ত করা জায়েয এবং শরীকানাধীন সম্পদ কোন এক ব্যক্তি অন্যদের অনুমতিক্রমে ব্যয় করতে পারে। (তিন) খাদ্যদ্রব্যে কয়েকজন সঙ্গী শরীক হলে তা জায়েয ; যদিও খাওয়ার পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয় — কেউ কম খায় আর কেউ বেশী খায়।

وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا عَلَيْهِمْ — এ আয়াতে আসহাবে কাহফের রহস্য শহরবাসীদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ার বিষয় এবং পরকাল ও কৈয়ামতের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস অর্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

سَيُؤْتُونَ — অর্থাৎ, তারা বলবে, ‘তারা’ কারা— এ সম্পর্কে দু’রকম সম্ভাবনা আছে—(এক) এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যারা আসহাবে কাহফের আমলে তাদের নাম, বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ করেছিল। তাদের মধ্যেই কেউ কেউ তাদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি, কেউ কেউ দ্বিতীয় উক্তি এবং কেউ কেউ তৃতীয় উক্তি করেছিল।—(বাহর)

(দুই) سَيُؤْتُونَ বাক্যে নাজরানের খ্রীষ্টান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর সাথে আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল। নাজরানের খ্রীষ্টান সম্প্রদায় তিন দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের নাম ছিল ‘মালকানিয়া’। এরা সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম

উক্তি, অর্থাৎ, তিন বলেছিল। দ্বিতীয় দলের নাম ছিল ‘এয়াকুবিয়া’। তারা দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ, পাঁচ বলেছিল। তৃতীয় দল ছিল ‘নাস্তুরিয়া’। তারা তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ, সাত বলেছিল। কেউ কেউ বলেন : তৃতীয় উক্তিটি ছিল মুসলমানদের। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর হাদীস এবং কোরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তৃতীয় উত্তরের বিশ্বস্ততাই প্রমাণিত হয়।— (বাহরে-মুহীত)

وَأَتَيْنَاهُم — এখানে এ বিষয়টি প্রশিধানযোগ্য যে, আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্পর্কে আয়াতে তিনটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে : তিন, পাঁচ ও সাত। প্রত্যেকটি সংখ্যার পর তাদের কুকুরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই উক্তিতে তাদের সংখ্যা ও কুকুরের গণনার মাঝখানে وَأَوْعَاطُهُ (সংযোগকারী ওয়াও) ব্যবহার না করে বলা হয়েছে— كِسْفًا كِسْفًا كِسْفًا কিন্তু তৃতীয় উক্তিতে وَأَوْعَاطُهُ —এর وَأَوْعَاطُهُ বলা হয়েছে।

তফসীরবিদগণ এর কারণ এই লিখেন যে, আরবদের কাছে সংখ্যার প্রথম ধাপ ছিল সাত। সাতের পরে যে সংখ্যা আসত, তা অনেকটা পৃথক বলে গণ্য হত; যেমন আজকাল নয় সংখ্যাটি নয় পর্যন্ত একক সংখ্যা ধরা হয়। দশ থেকে দ্বি-সংখ্যা আরম্ভ হয়। এ কারণেই আরবরা তিন থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যা গণনায় وَأَوْعَاطُهُ ব্যবহার করত না। সাতের পর কোন সংখ্যা বর্ণনা করতে হলে وَأَوْعَاطُهُ এনে পৃথক করে বর্ণনা করত। এজন্যেই এই وَأَوْعَاطُهُ নাম দেয়া হত।— (মাহহারী)

আসহাবে কাহফের নাম : প্রকৃতপক্ষে কোন সहीহ হাদীস থেকে আসহাবে কাহফের নাম সঠিকভাবে প্রমাণিত নেই। তফসীরী ও ঐতিহাসিক রেওয়াজে বিভিন্ন নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাবারানী ‘মুজাম্মে আওসাত’ গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদ সহযোগে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে যে রেওয়াজে বর্ণনা করেছেন, সেটিই বিশ্বস্ততর। এতে তাদের নাম নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে :

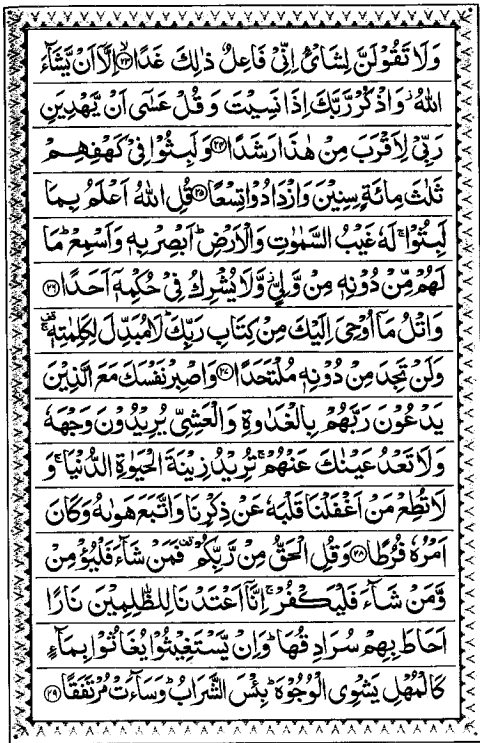
মুকসালমিনা, তামলিখা, মরতুনুস, সনুনুস, সারিনুতুস, যুনওয়াস, কায়াস্তারিতযুনুস।

فَلَا تُنَادِيهِمْ الْوُجَرَاءُ ظَاهِرًا وَلَا تَسْمَعُ فِيهِمْ وَهُمْ أَحَدًا

অর্থাৎ, আপনি আসহাবে কাহফের সংখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের সাথে বৃথা বিতর্ক প্রবৃত্ত হবেন না; বরং সাধারণ আলোচনা করুন। আপনি নিজেও তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত : বর্ণিত উভয় বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—কে যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আলেম সম্প্রদায়ের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক নীতি। কোন প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দিলে জরুরী বিষয়গুলো বর্ণনা করা উচিত। এরপরও যদি কেউ অনাবশ্যক আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়ে, তবে তার সাথে সাধারণ আলোচনা করে বিতর্ক শেষ করে দেয়া বাঞ্ছনীয়। নিজের দাবী প্রমাণ করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে যাওয়া এবং প্রতিপক্ষের দাবী খণ্ডনে অধিক জোর দেয়া অনুচিত। কারণ, এতে বিশেষ কোন উপকারিতা নেই। উপরন্তু অতিরিক্ত আলোচনা ও কথা কাটাকাটিতে মূল্যবান সময়ও নষ্ট হয় এবং পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় নির্দেশ এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ওহীর মাধ্যমে



(২৩) আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলেন না যে, সেটি আমি 'আগামী কাল করব' (২৪) 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' বলা ব্যতিরেকে। যখন ভুলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন এবং বলুন : আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে এর চাইতেও নিকটতম সত্যের পথনির্দেশ করবেন। (২৫) তাদের উপর তাদের গুহায় তিনশ' বছর, অতিরিক্ত আরও নয় বছর অতিবাহিত হয়েছে। (২৬) বলুন : তারা কতকাল অবস্থান করেছে, তা আল্লাহই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শোনেন। তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না। (২৭) আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার যে কিতাব প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে, তা পাঠ করুন। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাঁকে ব্যতীত আপনি কখনই কোন আশ্রয়স্থল পাবেন না। (২৮) আপনি নিজেই তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। (২৯) বলুন : 'সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব, যার ইচ্ছা, বিশ্রাম স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক।' আমি জালেমদের জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি যার বেটনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পূজের ন্যায় পানীয় দেয়া হবে যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। কত নিকট পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়।

আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে যে পরিমাণ তথ্য আপনাকে সরবরাহ করা হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। কারণ, এতটুকুই যথেষ্ট। আরও বেশী জানার জন্যে খোজাখুজি ও মানুষের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার এক উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, তার অজ্ঞতা ও মূর্খতা জনসমক্ষে ফুটে উঠুক—এটাও পয়গম্বরী-চরিত্রের পরিপন্থী। তাই ভাল ও মন্দ উভয় উদ্দেশ্যে অপরকে এ সবুখে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লেখিত চার আয়াতে আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী সমাপ্ত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম দু' আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতকালে কোন কাজ করার ওয়াদা বা স্বীকারোক্তি করলে এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ' বাক্যটি যুক্ত করতে হবে। কেননা, ভবিষ্যতে জীবিত থাকবে কিনা তা কারও জানা নেই। জীবিত থাকলেও কাজটি করতে পারবে কিনা, তারও নিশ্চয়তা নেই। কাজেই মুমিনের উচিত মনে মনে এবং মুখে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহর উপর ভরসা করা। ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বললে এভাবে বলা দরকার : যদি আল্লাহ চান, তবে আমি এ কাজটি আগামীকাল করব। ইনশাআল্লাহ বাক্যের অর্থ তাই।

তৃতীয় আয়াতে একটি বিরোধপূর্ণ আলোচনার ফয়সালা করা হয়েছে। এতে আসহাবে কাহ্ফের আমলের লোকদের মতামতও বিভিন্নরূপ ছিল এবং বর্তমান যুগের ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মতামতও বিভিন্নরূপ। অর্থাৎ, গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার সময়কাল। এ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, এই সময়কাল তিনশ' নয় বছর। কাহিনীর শুরুতে **فَقَرَّبْنَا عَلَيْهِمْ إِذٍ ذِيهِمْ** বলে যে বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, এখানে যেন তাই বর্ণনা করে দেয়া হল।

এরপর চতুর্থ আয়াতে আবার মতভেদকারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আসল সত্য জান না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা। তিনি তিনশ' নয় বছরের সময়কাল বর্ণনা করেছেন। এতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত।

ভবিষ্যত কাজের জন্যে ইনশাআল্লাহ বলা : 'লোবান' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে প্রথম দু' আয়াতের শানে মুহল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, মক্কার কাফেররা যখন ইহুদীদের শিক্ষা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তখন তিনি ইনশাআল্লাহ না বলেই তাদের সাথে আগামীকাল জওয়াব দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। নৈকট্যশীলদেরকে সামান্য ক্রটির জন্যেও হুশিয়ার করা হয়। তাই পনের দিন পর্যন্ত কোন ওহী আগমন করেনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) খুবই চিন্তিত হলেন। মুশরিকরা বিদ্রোহ ও উপহাসের সুযোগ পেল। পনের দিন বিরতির পর যখন এ সুরায় প্রশ্নের জওয়াব নাথিল হল, তখন এর সাথে হেলায়েতের জন্যে এ দু'টি আয়াতও অবতীর্ণ হল যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বলা হলে ইনশাআল্লাহ বলে এ কথার স্বীকারোক্তি করা উচিত যে, প্রত্যেক কাজ আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, এরূপ ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলা যুস্তাহাব। দ্বিতীয়তঃ যদি ভুলক্রমে বাক্যটি না বলা হয়,

তবে যখনই সূর্য হয়, তখনই তা বলা দরকার। আয়াতে বর্ণিত বিশেষ ক্ষেত্রের জন্যে এ বিধান। অর্থাৎ, শুধু বরকতলাত ও দাসত্বের নীকারোক্তির জন্যে এ বাক্য বলা উদ্দেশ্য— কোন শর্ত লাগানো উদ্দেশ্য নয়। কাজেই এ থেকে জরুরী হয় না যে, কেনা-বেচা ও পারস্পরিক চুক্তির মধ্যেও অনুরূপ বিধান হবে। কেনা-বেচার মধ্যে শর্ত লাগানো হয়, এবং উভয়পক্ষের জন্যে শর্ত লাগানোর উপর পারস্পরিক চুক্তি নির্ভরশীল থাকে। এসব ক্ষেত্রেও যদি চুক্তির সময় শর্ত লাগানো ভুলে যায় এবং পরে কোন সময় সূর্যে আসে, তবে যা ইচ্ছা তা শর্ত লাগাতে পারবে না। এ মাসআলায় কোন কোন ফেকাহবিদ ভিন্ন মতও পোষণ করেন।

তৃতীয় আয়াতে শুহায় নিদ্রার সময়কাল তিন শত বছর বলা হয়েছে। কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বাহ্যতঃ এ কথাই বোঝা যায় যে, এই সময়কাল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীরের মতে এটাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের উক্তি। আবু হাইয়ান, কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদও তাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত কাতাদা প্রমুখ থেকে এ সম্পর্কে আরও একটি উক্তি বর্ণিত আছে। তা এই যে, তিন শত বছরের সময়কালের উক্তিটিও উপরোক্ত মতভেদকারীদের কারও কারও পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলার উক্তি হচ্ছে শুধু **اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُوا** বাক্যটি। কেননা, তিন শত নয় বছর নির্দিষ্ট করার কথাটি যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তবে পরে **اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُوا** বলার কোন প্রয়োজন থাকে না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, কোরআন পাক সময়কাল প্রথমে তিন শত বছর বর্ণনা করেছে। এরপর বলেছে যে, এই তিন শতের উপর আরও নয় বেশী। প্রথমেই তিন শত নয় বলেনি কেন? তফসীরবিদগণ এর কারণ লিখেছেন যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে সৌর-বর্ষের প্রচলন ছিল। এই হিসাবে মোট তিনশ'ত বছরই হয়। ইসলামে চান্দ্র-বর্ষ প্রচলিত। চান্দ্র-বর্ষের হিসাবে প্রতি একশ' বছরে তিন বছর বেড়ে যায়। তাই তিনশ' সৌর-বছরে চান্দ্র বছর হিসাবে তিন শত নয় বছর হয়। এই দুই প্রকার বর্ষপঞ্জীর পার্থক্য বোঝাবার জন্যে উপরোক্ত ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

দাওয়াত ও তবলীগের বিশেষ রীতি : **وَأَمَّا نَسَكَ**—এ আয়াতের শানে নুযুল প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোই আয়াত অবতরণের কারণ হতে পারে। বগভী বর্ণনা করেন, মক্কার সরদার ওয়াইনা ইবনে হিশ্ন রসুল্লাহ (সাঃ)—এর দরবারে উপস্থিত হয়। তখন তাঁর কাছে হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর পোশাক ছিন্ন এবং আকার-আকৃতি ফকীরের

মত ছিল। তাঁর মত আরও কিছুসংখ্যক দরিদ্র ও নিঃস্ব সাহাবী মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ওয়াইনা বললঃ এই লোকদের কারণেই আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না এবং আপনার কথা শুনতে পারি না। এমন ছিন্নমূল মানুষের কাছে আমরা বসতে পারি না। আপনি হয় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে রাখুন, না হয় আমাদের জন্যে আলাদা এবং তাদের জন্যে আলাদা মজলিস অনুষ্ঠান করুন।

ইবনে মরদুইয়াহ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া ইবনে খলফ জমহী রসুল্লাহ (সাঃ)—কে পরামর্শ দেন যে, দরিদ্র, নিঃস্ব ও ছিন্নমূল মুসলমানদেরকে আপনি নিজের কাছে রাখবেন না; বরং কোরায়েশ সরদারদেরকে সাথে রাখুন। এরা আপনার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলে ধর্মের খুব উন্নতি হবে।

এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলাচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়—এতে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু নিষেধই নয়—নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, **وَأَمَّا نَسَكَ** অর্থাৎ, আপনি নিজেকে তাদের সাথে বেঁধে রাখুন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, কোন সময় পৃথক হবেন না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্ক ও মনোযোগ তাদের প্রতি নিবদ্ধ রাখুন। কাজে-কর্মে তাদের কাছ থেকেই পরামর্শ নিন। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ, সর্বাবস্থায় আল্লাহর এবাদত ও যিকির করে। তাদের কার্যকলাপ একান্তভাবেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত। এসব অবস্থা আল্লাহর সাহায্য ডেকে আনে। আল্লাহর সাহায্য তাদের জন্যেই আগমন করে। ক্ষণস্থায়ী দূরবস্থা দেখে অস্থির হবেন না। পরিণামে সাহায্য ও বিজয় তরাই লাভ করবে।

কোরায়েশ সরদারদের পরামর্শ কবুল না করার কারণও আয়াতের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের মন আল্লাহর সূর্য থেকে গাফেল এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসারী। এসব অবস্থা মানুষকে আল্লাহর রহমত ও সাহায্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তাদের জন্যে আলাদা মজলিস করার পরামর্শটি তো গ্রহণযোগ্য ছিল। এর ফলে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানো এবং তাদের পক্ষে তা কবুল করা সহজ হত। কিন্তু এ ধরনের মজলিস বন্টনের মধ্যে অব্যাহত ধনীত্বের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানো হত। ফলে দরিদ্র মুসলমানদের মন ভেঙ্গে যেত। তাই আল্লাহ তাআলা তা পছন্দ করেননি এবং এ ব্যাপারে পার্থক্য না করাকেই দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি স্থির করেছেন।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُهُمْ أَجْرَ مَنْ
 أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ وَلَئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ عَدِيدٌ تَجْبِرُونَهُمْ
 أَلَّا يَتَّبِعُوا الْأَمْرَ يُخَوِّنُونَ فِيهِمَا مَنْ أَسَٰرَ وَمَنْ ذَهَبَ وَ
 يَلْمِزُونَ نَبِيًّا بَا خَضِرًا مِنْ سُودَانٍ وَاسْتَبْرَقِي مُتْرِكِينَ
 فِيهَا عَلَى الْأَرَاكِ نِعَمَ الثَّوَابِ وَحَسَنَتِ الرِّفْقُ الْأَضْرِبُ
 لَهُمْ مَثَلًا تَجْلِبُونَ جَعَلْنَا الْأَحْدَاجَ جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ
 وَحَفَفْنَاهُمَا سِجْلًا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۖ كَلَّا إِنَّ الْجَنَّتَيْنِ
 ابْتِغَا كُفْرًا وَلَوْ تَطَوَّعْتَ شَيْئًا ۖ فَجَرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۖ
 وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَادِرُ أَنَا
 أَكْرَمُ مِنْكَ مَا لَؤَاغُزْنُقَرًا ۖ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ
 ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذَا أَبَدًا ۖ
 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ
 خَيْرًا مِنْهَا مُتَبَدِّلًا ۖ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَادِرُ
 أَنَّهُ أَكْرَمُ يَا لَذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ
 سَوَّاهُ رَجُلًا ۖ لَكِنَّكَ هَٰؤُلَاءِ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۖ

জান্নাতীদের অলংকার : يُخَوِّنُونَ فِيهَا এ আয়াতে জান্নাতী পুরুষদেরকেও স্বর্ণের কংকন পরানোর কথা বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অলংকার পরিধান করা পুরুষদের জন্যে যেমন শোভনীয় নয়, তেমনি সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জাও নয়। তাদেরকে কংকন পরানো হলে তারা বিশী হয়ে যাবে।

উত্তর এই যে, শোভা ও সৌন্দর্য প্রথা ও প্রচলনের অনুসারী। এক দেশে যাকে শোভা ও সৌন্দর্য মনে করা হয়, অন্য দেশে প্রায়ই তা ঘৃণার বস্তু বলে বিবেচনা করা হয়। এর বিপরীতও হয়ে থাকে। এমনভাবে এক সময় কোন বিশেষ বস্তু সৌন্দর্য বিবেচিত হয়, অন্য সময়ে তাকেই দোষ মনে করা হয়। জান্নাতে পুরুষদের জন্যেও অলংকার এবং রেশমী বস্ত্র শোভা ও সৌন্দর্য সাব্যস্ত করা হলে তা কারও কাছে অপরিচিত ঠেকবে না। এটা শুধু দুনিয়ার আইন যে, এখানে পুরুষদের জন্যে স্বর্ণের কোন অলংকার, এমনকি স্বর্ণের আংটি, ঘড়ির চেইন ইত্যাদিও ব্যবহার করা জায়েয নয়। এমনভাবে রেশমী বস্ত্রও পুরুষদের জন্যে জায়েয নয়। কিন্তু জান্নাত পৃথক এক জগত। সেখানে এ আইন থাকবে না।

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ শব্দের অর্থ বৃক্ষের ফল এবং সাধারণ ধন-সম্পদ। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ থেকে দ্বিতীয় অর্থ বর্ণিত হয়েছে। (ইবনে-কাসীর) কামুস গ্রন্থে আছে, ثمر শব্দটি বৃক্ষের ফল এবং নানা রকমের ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে জানা যায় যে, লোকটির কাছে শুধু ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্রই ছিল না, বরং স্বর্ণ-রৌপ্য ও বিলাস-বাসনের যাবতীয় সাজ সজ্জামও বিদ্যমান ছিল।

وَأَنَا أَكْرَمُ مِنْكَ مَا لَا অর্থই বোঝায়।

(৩০) যারা বিশ্রাস স্থাপন করে এবং সংকল্প সম্পাদন করে আমি সংকল্পীদের পুরস্কার নষ্ট করি না। (৩১) তাদেরই জন্যে আছে বসবাসের জান্নাত। তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমনতাবস্থায় যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়। (৩২) আপনি তাদের কাছে দু' ব্যক্তির উদাহরণ বর্ণনা করুন। আমি তাদের একজনকে দু' টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছি এবং এ দু' টিকে খজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছি এবং দু'—এর মাঝখানে করেছি শস্যক্ষেত্র। (৩৩) উভয় বাগানই ফলদান করে এবং তা থেকে কিছুই হ্রাস করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি নহর প্রবাহিত করেছি। (৩৪) সে ফল পেল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বলল : আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী। (৩৫) নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল : আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। (৩৬) এবং আমি মনে করি না যে, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। (৩৭) তার সঙ্গী তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল : তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্ষ থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে? (৩৮) কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি না।

وَلَوْ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
 اِنْ تَرَىٰ اَنَآ اَقْلَ مِنْكَ مَا لَوْ وَاَلَّا ۙ عَصَىٰ رَبِّيْ اَنْ
 يُؤْتِيَنِيْ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ
 فُتُصِبَ عَلَيْهَا اَرْقَاقًا ۙ وَيُصِيبْهَا اَوْهَانًا خَلَّةً تَسْتَكْبِرُ
 لَهَا طَلِبًا ۙ ۞ وَاُحِيطْ بِشَرِّهَا ۙ فَاُصْبِحْ يَقْرُبُكَ كَلْبٌ لَّكَّيْهُ عَلَىٰ مَا
 اَتَقَّ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرْوَةِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِيْ
 لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّيْ ۙ اَحَدًا ۙ ۞ وَلَمْ تَكُنْ لَهَا فِتْنَةٌ يَّتَمَرَّوْنَهَا
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ۙ ۞ هٰذَا لِكَ الْوَلَايَةُ
 لِلّٰهِ الْحَقِّ ۙ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۙ ۞ وَاصْبِرْ لَهُمْ
 مِّثْلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَا اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ
 فَاَخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ ۙ فَاُصْبِحَ هَشِيمًا تَذَرُوْهُ
 الرِّبِيُّ ۙ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۙ ۞ الْكَبٰلُ وَ
 الْبُنُوْنَ زَيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبَيْتُ الصَّالِحُ خَيْرٌ
 عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا ۙ ۞ وَيَوْمَ تُنَادِى الْجِبَالُ وَ
 تَرَى الْاَرْضَ بُرْدَةً وَخَرَّتْهُمْ فَلَمْ تَغَارْ مَعَهُمْ اَحَدًا ۙ ۞

مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ — শো' আবুল ইমানে হযরত আনাসের

রেওয়াকে ক্রমে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলে দেয়া হয়, তবে কোন বস্তু তার ক্ষতি করতে পারবে না। (অর্থাৎ, পছন্দনীয় বস্তুটি নিরাপদ থাকবে।) কোন কোন রেওয়াকে আছে, প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু দেখে এই কলেমা পাঠ করলে তা 'চোখলাগা' বা বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকবে।

حَسْبًا হযরত কাতাদাহর মতে এর তফসীর আযাব। ইবনে আব্বাস এর অর্থ নিয়েছেন অগ্নি এবং কেউ কেউ অর্থ নিয়েছেন প্রস্তুত বর্ষণ। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তার বাগান ও ধন-সম্পদের উপর কোন অদৃশ্য বিপদ পতিত হল। ফলে সব ধ্বংস হয়ে গেল। কোরআন পরিষ্কারভাবে কোন বিশেষ বিপদের নামোল্লেখ করেনি। বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, কোন অদৃশ্য আগুন এসে সবগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকেও حَسْبًا শব্দের তফসীরে আগুনই বর্ণিত আছে।

(৩৯) যদি তুমি আমাকে ধনে ও সম্ভানে তোমার চাইতে কম দেখ, তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন একথা কেন বললে না; আল্লাহ্ যা চান, তাই হয়। আল্লাহর দেয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই। (৪০) আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তার (তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে আগুন প্রেরণ করবেন। অতঃপর সকাল বেলায় তা পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে। (৪১) অথবা সকালে তার পানি শুকিয়ে যাবে। অতঃপর তুমি তা তালশ করে আনতে পারবে না। (৪২) অতঃপর তার সব ফল ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য সকালে হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। বাগানটি কাঠসহ পুড়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগল : হায়, আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম। (৪৩) আল্লাহ্ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোক হল না এবং সে নিজেও প্রতিকার করতে পারল না। (৪৪) এরূপ ক্ষেত্রে সব অধিকার সত্য আল্লাহর। তারই পুরস্কার উত্তম এবং তারই প্রদত্ত প্রতিদান শ্রেষ্ঠ। (৪৫) তাদের কাছে পার্থিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায়, যা আমি আকাশ থেকে ন্যায় করি। অতঃপর এর সংমিশ্রনে শ্যামল-সবুজ ভূমি লতা-পাতা নির্গত হয়; অতঃপর তা এমন শুষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ্ এ সবকিছুর উপর শক্তিশালী। (৪৬) ধনৈশ্বর্য ও সম্ভান-সমৃদ্ধি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সংকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদানপ্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্যে উত্তম। (৪৭) যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না।



(৪৮) তারা আপনার পালনকর্তার সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে : তোমরা আমার কাছে এসে গেছ, যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্যে কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। (৪৯) আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে : হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি— সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না। (৫০) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম : আদমকে সেজদা কর, তখন সবাই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জ্বালোদের জন্যে খুবই নিকট বদল। (৫১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজনকালে আমি তাদেরকে সাক্ষ্য রাখিনি এবং তাদের নিজেদের সৃজনকালেও না। এবং আমি এমনও নই যে, বিবাস্তকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবো। (৫২) যেদিন তিনি বলবেন : তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা তখন তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা এ আহ্বানে সাড়া দেবে না। আমি তাদের মধ্যস্থলে রেখে দেব একটি মৃত্যু গহ্বর। (৫৩) অপরাধীরা আগুন দেখে বোম্বো নবে যে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে রাস্তা পরিবর্তন করতে পারবে না। (৫৪) নিশ্চয় আমি এ কোরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বুঝিয়েছি। মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তকদ্বি।

কেয়ামতের দিন সবাইকে বলা

হবে : আজ তোমরা এমনভাবে খালি হাতে কোন আসবাবপত্র না নিয়ে আমার সামনে এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। বোখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বাচনিক বর্ণিত রয়েছে যে, একবার রসুলুল্লাহ (সাঃ) এক ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন : লোকসকল, তোমরা কেয়ামতে তোমাদের পালনকর্তার সামনে খালি পায়ের, খালি গায়ের, পায়ের হেঁটে উপস্থিত হবে। সেদিন সর্বপ্রথম যাকে পোশাক পরানো হবে, তিনি হবেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। একথা শুনে হযরত আয়েশা রাঃ প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রসুলুল্লাহ, সব নারী-পুরুষই কি উলঙ্গ হবে এবং একে অপরেরকে দেখবে? তিনি বললেন : সেদিন প্রত্যেককেই এমন ব্যস্ততা ও চিন্তায় ঘিরে রাখবে যে, কেউ কারও প্রতি দেখার সুযোগই পাবে না। সবার দৃষ্টি থাকবে উপরের দিকে।

কুর্তবী বলেন : এক হাদীসে বলা হয়েছে, মৃতরা বরখাৎ একে অপরের সাথে নিজ নিজ কাফন পরিহিত অবস্থায় মোলাকাত করবে। এই হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা, এ হাদীসে কবর ও বরখাৎের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে; আর উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হাশরের ময়দানের অবস্থা। কোন কোন রেওয়াজে আছে, মৃত ব্যক্তি সে পোশাকেই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে, যাতে তাকে দাফন করা হয়েছিল। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন : মৃতদেরকে ভাল কাফন দিয়া। কেননা, তারা কেয়ামতের দিন এ কাফন পরিহিত হয়েই উঠিত হবে। কেউ কেউ এ হাদীসটিকে শহীদদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন। কেউ কেউ বলেন : এটা সম্ভব যে, হাশরের ময়দানে কিছু লোক পোশাক পরিহিত অবস্থায় এবং কিছু লোক উলঙ্গ অবস্থায় উঠিত হবে। এভাবে উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়।— (মায়হারী)

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۚ

অর্থঃ, হাশরবাসীরা তাদের কৃতকর্মকে উপস্থিত পাবে। তফসীরবিদগণ এর অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানকে উপস্থিত পাবে। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বলতেন : এরূপ অর্থ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। বহু হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, এসব কৃতকর্মই ইহকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির রূপ পরিগ্রহ করবে। তাদের আকার-আকৃতি সেখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সৎকর্মসমূহ জ্ঞানাতের নেয়ামতের আকার ধারণ করবে আর মন্দ কর্মসমূহ জাহান্নামের আগুন ও সাপ-বিজু হয়ে যাবে।

হাদীসে আছে, যারা যাকাত দেয় না, তাদের মাল কবরে একটি বড় সাপের আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবে انا مالك আমি তোমার মাল। সৎকর্ম সূপ্রী মানুষের আকারে কবরের নিঃসঙ্গ অবস্থায় আতঙ্ক দূর করার জন্যে আগমন করবে। কোরবানীর জন্ত পুলিসিরাতের সওয়াবী হবে। মানুষের গোনাহ বোঝার আকারে প্রত্যেকের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হবে।

কোরআনে এতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের সম্পর্কে اِنْسَانًا كَاوُنًا يَكْفُرُ بِمَا كَانَا بলা হয়েছে। অর্থঃ, তারা উদের আগুন ভর্তি করছে। এসব আয়াত ও রেওয়াজেতে সাধারণতঃ রূপক অর্থে ধরা হয়।

وَمَا نَمُرُّ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِرُوا أَرْجَاءَهُمْ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا
رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ
الْعَذَابُ قُبُلًا ۖ وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا
بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آلِي الْبَيْتِ وَمَا آتَيْنَاهُمْ وَأَوْفُوا ۖ وَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَاغْرَبَ يَتَخَلَّى
يَدًا ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ كِتَابًا أَنْ يَقْرَأُوا فِيهِ
أَذَانَهُمْ وَقُرْءَانٌ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا
إِذْ أَبَدْنَا ۖ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤْخِذُكَ بِمَا
كُنتَ تَعْمَلُ لَمْ يَأْخُذْ بِكَ لَوْلَا أَنَّكَ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
مِنْ دُونِهِ مَوَاقِدَ ۚ وَلَيْتَ الْفَرَى أَهْلَكَ لَهُمْ لَنَاظِلًا وَجَعَلْنَا
لَهُمْ لِكُومَهُمْ مَوْعِدًا ۖ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ لَكُلَّ آيَةٍ حَتَّى
أَبْلُغَ جَمْعَ الْبَعْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۖ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ
بَيْنَهُمَا نِسَاءَهُمَا فَأَتَا هُنَّ فِي سَبِيلِكُومِ الْيُوسُفَ ۖ فَلَمَّا
جَاؤَا قَالَ لِفَتْنِهِ إِنِّي أَتَاكَ لَفَتْنًا ۖ لَمْ يَنْصَبْ لَهُمَا نَصَبًا

(৫৫) হেদায়েত আসার পর এ প্রতীক্কাই শুধু মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিবর্ত রাখে যে, কখন আসবে তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি অথবা কখন আসবে তাদের কাছে আযাব সামনাসামনি। (৫৬) আমি রসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরাপেই প্রেরণ করি এবং কাফেররাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে, তা দ্বারা সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলীও যক্ষুরা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়, সেগুলোকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছে। (৫৭) তার চাইতে অধিক জ্বালাম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তী কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেন তা না বোঝে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতার বোঝা। যদি আপনি তাদেরকে সংপথের প্রতি দাওয়াত দেন, তবে কখনই তারা সংপথে আসবে না। (৫৮) আপনার পালনকর্তা ক্ষমশীল, দয়ালু; যদি তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে পাকড়াও করেন, তবে তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন, কিন্তু তাদের জন্যে রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত সময়, যা থেকে তারা সরে যাওয়ার জায়গা পাবে না। (৫৯) এসব জনপদও তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা জ্বালাম হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্যে একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করেছিলাম। (৬০) যখন মুসা তাঁর যুবক (সঙ্গী)-কে বললেন : দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌছা পর্যন্ত আমি আসব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। (৬১) অতঃপর যখন তাঁরা দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছালেন, তখন তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেলেন। অতঃপর মাছটি সমুদ্রে সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি করে নেমে গেল। (৬২) যখন তাঁরা সেস্থানটি অতিক্রম করে গেলেন, মুসা সঙ্গীকে বললেন : আমাদের নাশতা আন। আমরা এই সফরে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি।

ইবলীসের সন্তান-সন্ততি : وَذُرِّيَّتُهُ এ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, শয়তানের সন্তান-সন্ততি ও বংশধর আছে। কেউ কেউ বলেন : এখানে ذُرِّيَّةُ অর্থঃ, বংশধর বলে সাহায্যকারী দল বোঝানো হয়েছে। কাজেই শয়তানের গুরসজাত সন্তানাদি হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু হুমায়দী রচিত ‘কিতাবুল জমায়ে বাইনাস-সহীহাইন’ গ্রন্থে হযরত সালমান ফারেসীর রাঃ রেওয়ায়েতে উল্লিখিত একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেন : তুমি তাদের মধ্য থেকে হযো না, যারা সবার আগে বাজারে প্রবেশ করে অথবা যারা সবার শেষে বাজার থেকে বের হয়। কেননা, বাজার এমন জায়গা, যেখানে শয়তান ডিম-বাচ্চা প্রসব করে রেখেছে। এ থেকে জানা যায় যে, ডিম থেকে শয়তানের বংশধর বৃদ্ধি পায়। এই হাদীসটি উদ্ধৃত করে কুরতুবী বলেন : শয়তানের যে সাহায্যকারী বাহিনী আছে, এ কথা তো অকাট্যরূপেই প্রমাণিত আছে; গুরসজাত সন্তান হওয়া সম্পর্কেও এ হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল।

সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ

সর্বাধিক তর্কপ্রিয়। এর সমর্থনে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে; রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পেস করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হবে : আমার প্রেরিত রসূল সম্পর্কে তোমার কর্মপন্থা কেমন ছিল? সে বলবে : পরওয়ারদেগার, আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাঁদের আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ তাআলা বলবেন : তোমার আমলনামা সামনে রাখা হয়েছে। এতে তো এমন কিছু নেই। লোকটি বলবে : আমি এই আমলনামা মানি না। আল্লাহ বলবেন : আমার ফেরেশতারা তোমার দেখাশুনা করত। তারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। লোকটি বলবে : আমি তাদের সাক্ষ্য মানি না। আমি তাদেরকে চিনি না এবং আমল করার সময় তাদেরকে দেখিনি। আল্লাহ বলবেন : সামনে লগহে-মাহফুয রয়েছে। এতেও তোমার অবস্থা এরূপই লিখিত হয়েছে। সে বলবে : পরওয়ারদেগার, আপনি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দিয়েছেন কি না? আল্লাহ বলবেন : নিশ্চয় জুলুম থেকে তুমি আমার আশ্রয়ে রয়েছ। সে বলবে : পরওয়ারদেগার, যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিনি সেগুলো কিরূপে আমি মানতে পারি? আমার নিজের পক্ষ থেকে যে সাক্ষ্য হবে, আমি তাই মানতে পারি। তখন তার মুখ সীল করে দেয়া হবে এবং তার হাত-পা তার কুফর ও শেরক সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। এরপর তাকে মুক্ত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে।

আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنِهِ এ ঘটনায় ‘মুসা’ বলে প্রসিদ্ধ পয়গম্বর হযরত

মুসা ইবনে ইমরান (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে।

فَتَى এর শাব্দিক অর্থ যুবক। শব্দটিকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক করা হলে অর্থ হয় খাদেম। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী যুবক দেখে খাদেম রাখা হয়, যেন সব রকম কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ভৃত্য ও খাদেমকে যুবক বলে ডাকা একটি ইসলামী শিষ্টাচার। ইসলামের শিক্ষা এই যে, চাকরদেরকেও গোলাম অথবা চাকর বলে সম্বোধন করো না; বরং ভাল খেতাব দ্বারা ডাক। এখানে فَتَى শব্দটিকে মুসা (আঃ)-এর দিকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। তাই অর্থ হবে মুসা (আঃ)-এর খাদেম।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, এই খাদেম ছিল ইউশা' ইবনে নুন ইবনে ইফরাযীম ইবনে ইউসুফ (আঃ)। কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে যে, সে মুসা (আঃ)-এর ভাগ্নেয় ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করা যায় না। সহীহ্ রেওয়াজেতে রয়েছে যে, তার নাম ছিল ইউশা' ইবনে নুন। অবশিষ্ট অবস্থার প্রমাণ নেই।—(কুরতুবী)

عَمْرُو بْنُ مَرْثَدٍ এর শাবিক অর্থ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল। বলাবাহুল্য,

এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে। এখানে কোন জায়গা বোঝানো হয়েছে, কোরআন ও হাদীসে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ইঙ্গিত ও লক্ষণাদি দৃষ্টে তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কাতাদাহ বলেনঃ পারস্য উপসাগর ও রোম সাগরের সঙ্গমস্থল বোঝানো হয়েছে। ইবনে আতিয়্যার মতে আজারবাইজানের নিকটে একটি স্থান, কেউ কেউ জর্দান নদী ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থলের কথা বলেছেন। কেউ বলেনঃ এ স্থানটি তুঞ্জায় অবস্থিত। ইবনে আবী কা'বের মতে এটি আফ্রিকায় অবস্থিত। সুদীর মতে এটি আর্মেনিয়ায় অবস্থিত। অনেকের মতে বাহরে-আন্দালুস ও বাহরে মুহীতের সঙ্গমস্থলই হচ্ছে এই স্থান। মোটকথা, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্ তাআলা মুসা (আঃ)-কে সে স্থানটি নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন।—(কুরতুবী)

হযরত মুসা (আঃ) ও খিথিরের কাহিনী : সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়াজেতে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ একদিন হযরত মুসা (আঃ) বনী-ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : সব মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? হযরত মুসা (আঃ)-এর জ্ঞানামতে তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই বললেন : আমিই সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নৈকট্যশীল বন্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জওয়াব তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেয়াই ছিল আদব। অর্থাৎ, একথা বলে দেয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন, কে অধিক জ্ঞানী। এ জওয়াবের কারণে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মুসা (আঃ)-কে তিরস্কার করে ওহী নাযিল হল যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বন্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী। একথা শুনে মুসা (আঃ) প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক জ্ঞানী হলে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত। তাই বললেন : ইয়া আল্লাহ্, আমাকে তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ্ বললেন : থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বন্দার সাক্ষাত পাবেন। মুসা (আঃ) নির্দেশমত থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর খাদেম ইউশা' ইবনে নুনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর মাথা রেখে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। (মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আরও একটি মু'জ্জিয়া প্রকাশ পেল যে, মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ্ তাআলা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে, সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। ইউশা' ইবনে নুন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করছিলেন। মুসা (আঃ) নিদ্রিত ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা' ইবনে নুন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর কাছে বলতে ভুলে গেলেন এবং সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় মুসা (আঃ)

খাদেমকে বললেন : আমাদের নাশতা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা' ইবনে নুনের মাছের ঘটনা মনে পড়ল। সে ভুলে যাওয়ার ওয়র পেশ করে বলল : শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর বলল : মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন মুসা (আঃ) বললেন : সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। (অর্থাৎ, মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটিই ছিল গন্তব্যস্থল।)

সেমতে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্যে পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তরখণ্ডের নিকটে পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছে। মুসা (আঃ) তদবস্থায়ই সালাম করল খিথির (আঃ) বললেন : এই (জ্ঞানমানবহীন) প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? মুসা (আঃ) বললেন : আমি মুসা। হযরত খিথির প্রশ্ন করলেন : বনী-ইসরাঈলের মুসা? তিনি জওয়াব দিলেন : হ্যাঁ, আমিই বনী-ইসরাঈলের মুসা। আমি আপনার কাছে থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত খিথির বললেন : আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না হে মুসা, আমাকে আল্লাহ্ তাআলা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন, যা আপনার কাছে নেই; পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। মুসা (আঃ) বললেন : ইশাআল্লাহ্, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোন কাজে আপনার বিরোধিতা করব না।

হযরত খিথির বললেন : যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দেই।

একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেলে তাঁরা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মায়ীরা হযরত খিথিরকে চিনে ফেলল এবং কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই খিথির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে হযরত মুসা (আঃ) স্থির থাকতে পারলেন না— বললেন : তারা কোন প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন যাতে সবাই ডুবে যায়? এতে আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খিথির বললেন : আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন মুসা (আঃ) ওয়র পেশ করে বললেন : আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুস্ত হবেন না।

রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন : হযরত মুসা (আঃ)-এর প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে, দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়ে ছিল (ইতিমধ্যে) একটি পাখী এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। খিথির মুসা (আঃ)-কে বললেন : আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয়ে মিলে আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানের মোকবিলায় এমন তুলনাও হয় না, যেমনটি এ পাখীর চঞ্চুর পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানি।

অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কূল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ খিথির একটি বালককে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খিথির স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে

দিলেন। বালকটি মরে গেল। মুসা (আঃ) বললেন : আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গোনাহর কাজ করলেন। খিযির বললেন : আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মুসা (আঃ) দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই বললেন : এরপর যদি কোন প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওখর-আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। ওরা সোজা অস্বীকার করে দিল। হযরত খিযির এই গ্রামে একটি প্রাচীরকে পতনোন্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। মুসা (আঃ) বিস্মিত হয়ে বললেন : আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন; ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। খিযির বললেন : **هَذَا فِرَاقِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ** অর্থাৎ, এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়।

এরপর খিযির উপরোক্ত ঘটনাত্রয়ের স্বরূপ মুসা (আঃ)-এর কাছে বর্ণনা করে বললেন : **ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ سَبْرًا** অর্থাৎ, এ হচ্ছে সেসব ঘটনার স্বরূপ; যেগুলো দেখে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি। রসুলুল্লাহ (সঃ) সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেনঃ মুসা (আঃ) যদি আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে আরও কিছু জানা যেত।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এই দীর্ঘ হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, মুসা বলতে বনী-ইসরাঈলের পয়গম্বর মুসা (আঃ) এবং তাঁর যুবক সঙ্গীর নাম ইউশা' ইবনে নুন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে যে বন্দার কাছে মুসা (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন খিযির (আঃ)। অতঃপর আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

সফরের কতিপয় আদব এবং পয়গম্বরসুলভ সংকলনের একটি নমুনা : **لَا يَرْحَلُ رَجُلٌ مِنْكُمْ مِنْ مَدِينَةٍ أَوْ مَوْضِعٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِطَرِيقٍ يُؤْتِيهِمْ مِنْهَا شَيْءٌ** এ বাক্যটি হযরত মুসা (আঃ) তাঁর সফরসঙ্গী ইউশা' ইবনে নুনকে বলেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সফরের দিক ও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে তাঁর সঙ্গীকে অবহিত করা। সফরের জরুরী বিষয়াদি সম্পর্কে সঙ্গীকে অবহিত করাও একটি আদব। অহংকারীরা তাদের খাদেম ও পরিচালিকাদেরকে সম্বোধনেরই যোগ্য মনে করেন না এবং নিজের সফর সম্পর্কে কোন কিছুই বলে না।

حُفَا শব্দটি **حَقِيقَة** এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে আশি বছরে এক হুকাব। কারও কারও মতে আরও বেশী সময়ে এক হুকাব হয়। এর কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। মুসা (আঃ) সঙ্গীকে বলে দিলেন যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছাতে হবে। আমার সংকল্প এই যে, যতদিনই লাগুক, গন্তব্যস্থলে না পৌছা পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখব। আল্লাহ তাআলার আদেশ পালনে পয়গম্বরদের সংকল্প এমনি দৃঢ় হয়ে থাকে।

খিযিরের চাইতে মুসা (আঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব, তার বিশেষ প্রশিক্ষণ

ও যুজ্জ্বা : **فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسُوا حُفَايَهُمَا فَتَسَيَّلَ لَيْلِيَةً**

فِي الْبَحْرِ কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত মুসা (আঃ) পয়গম্বরকুল্লের মধ্যেও বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তাআলার সাথে কথোপকথনের বিশেষ মর্যাদা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। হযরত খিযিরের নবুওয়ত সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। যদি নবী মেনেও নেয়া যায়, তবে তিনি রসুল ছিলেন না। তাঁর কোন গ্রন্থ নেই এবং কোন বিশেষ উম্মতও নেই। তাই মুসা (আঃ) হযরত খিযিরের চাইতে সর্ববিস্তার বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা নৈকট্যশীলদের সামান্যতম ক্রটিও সংশোধন করেন। তাঁদের প্রশিক্ষণের খাতিরে সামান্যতম ক্রটির জন্যেও তিরস্কার করা হয় এবং সে মাপকাঠিতেই তাঁদের দ্বারা ক্রটি পূরণ করিয়ে নেয়া হয়। আগাগোড়া কাহিনীটি এই বিশেষ প্রশিক্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ। 'আমি সর্বাধিক জ্ঞানী' মুসা (আঃ)-এর মুখ থেকে অসতর্ক মুহূর্তে এ কথাটি বের হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা তা অপছন্দ করেন। তাঁকে ইশিয়ার করার জন্যে এমন এক বন্দার ঠিকানা তাঁকে দিলেন, যার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান মুসা (আঃ)-এর কাছে ছিল না। যদিও মুসা (আঃ)-এর জ্ঞান মর্তব্যর দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু তিনি সেই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। এদিকে আল্লাহ তাআলা মুসা (আঃ)-কে জ্ঞানার্জনের অসীম প্রেরণা দান করেছিলেন। ফলে নতুন জ্ঞানের কথা শুনেই তিনি তা অর্জন করার জন্যে শিক্ষার্থীর বেশে সফর করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছেই খিযিরের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। এখানে প্রধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে এখানেই খিযিরের সাথে মুসা (আঃ)-এর সাক্ষাৎ অনায়াসে ঘটাতে পারতেন অথবা মুসা (আঃ)-কেই পরিষ্কার ঠিকানা বলে দিতে পারতেন। ফলে সেখানে পৌছা কষ্টকর হত না। কিন্তু ঠিকানা অস্পষ্ট রেখে বলা হয়েছে যে, যেখানে মৃত মাছ জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই খিযিরকে পাওয়া যাবে।

বোখারীর হাদীস থেকে মাছ সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই খলতে মাছ রেখে দেয়ার নির্দেশ হয়েছিল। তবে তা খাবার হিসেবে রাখার আদেশ হয়েছিল, না অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা জানা যায় না। তবে উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এই ভাজা মাছটি খাওয়ার জন্যে রাখা হয়েছিল এবং তারা তা থেকে কিছু অংশ খেয়েও ছিলেন। মাছটির অবশিষ্ট অংশই জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়।—(কুরতুবী)

মাছের বিষয়টি ভুলে না গেলে অবশ্য ব্যাপার সেখানেই শেষ হয়ে যেত। অথচ মুসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া ছিল এর উদ্দেশ্য। তাই উভয়েই মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং পূর্ণ একদিন ও একরাত্রির পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করলেন। এটা ছিল তৃতীয় পরীক্ষা। কেননা, এর আগেও ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করতে পারতেন। ফলে সেখানেই মাছের কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং এত দূরবর্তী সফরের প্রয়োজন হত না; কিন্তু মুসা (আঃ) আরও একটু কষ্ট করুক সম্ভবতঃ এটাই ছিল আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায়। তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভূত হয় এবং মাছের কথা মনে পড়ে। অতঃপর সেখান থেকেই তারা পথচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চলে ন।

قَالَ ارْتَبْ إِذَا دُيِّنَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْوَيْتَ وَمَا أَنَسِينِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي
الْجُحْرِ جَنًّا ۖ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْعَثُ ۖ فَاذْهَبْ أَعْلَىٰ الْإِنَارِهِمَا
فَصَلِّ لِرَبِّكَ عِبَادًا مُّزَكَّاتًا ۖ أَتَبْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا
وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ۖ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَبْقَعُكَ عَلَىٰ
أَنْ تُعَلِّمَنِي وَمَا عَلَّمْتَنِي لَئِنْ كُنْتُ تُسْتَطِيعُ
مَعِيَ صَبْرًا ۖ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۖ
قَالَ سَتَجِدُنِي إِذَا نَسِيتُ اللَّهَ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ
قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ
لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّيْفِينِ أَخْرَقَهَا
قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغَوِّىَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۖ
قَالَ أَلَمْ أَكُنْ أَتْلُوكَ بِمَا لَمْ تَسْطِيعْ مَعِيَ صَبْرًا ۖ قَالَ لَا
تُؤَاخِذْنِي بِمَا لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهِ قُوَّةٌ وَلَا تُخَفِّقْنِي مِنْ أَمْرِي عُنَا ۖ
فَاذْهَبْ أَهْلًا حَتَّىٰ إِذَا لَبِيتَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتَنِي
فَنَفْسًا رَّحِيمَةً ۖ يُعَذِّبُ نَفْسًا لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثَكُورًا ۖ

(৬৩) সে বলল : আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তরখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাহের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজে পথ করে নিয়েছে। (৬৪) মুসা বললেন : আমরা তো এ স্থানটিই খুঁজছিলাম। অতঃপর তাঁরা নিজেদের চিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। (৬৫) অতঃপর তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম ও আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। (৬৬) মুসা তাঁকে বললেন : আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেন? (৬৭) তিনি বললেন : আপনি আমার সাথে কিছুতেই ঐশ্বর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। (৬৮) যে বিষয় বোঝা আপনার আয়ত্তাধীন নয়, তা দেখে আপনি ঐশ্বর্যধারণ করবেন কেমন করে? (৬৯) মুসা বললেন : আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ঐশ্বর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না। (৭০) তিনি বললেন : যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি। (৭১) অতঃপর তারা চলতে লাগল : অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল, তখন তিনি তাতে হ্রি করে দিলেন। মুসা বললেন : আপনি কি এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে এতে হ্রি করে দিলেন? নিশ্চয়ই আপনি একটি গুরুতর মন্দ কাজ করলেন। (৭২) তিনি বললেন : আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ঐশ্বর্য ধরতে পারবেন না? (৭৩) মুসা বললেন : আমাকে আমার ভুলের জন্যে অপরাধী করবেন না এবং আমার কাজ আমার উপর কঠোরতা আরোপ করবেন না। (৭৪) অতঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি বাসকের সাক্ষাত পেলেন, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মুসা বললেন : আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? নিশ্চয়ই আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।

মাছের সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথাটি প্রথমবার **سَرَّ** শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ সুড়ঙ্গ। পাছাড়ে রাস্তা তৈরী করার জন্যে অথবা শহরে ভূগর্ভস্থ পথ তৈরী করার উদ্দেশ্যে সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। এ থেকে জানা গেল যে, মাছটি সমুদ্রে যেদিকে যেত, সেদিকে একটি সুড়ঙ্গের মত পথ তৈরী হয়ে যেত। বোখারীর হাদীস থেকে তাই জানা যায়। দ্বিতীয়বার যখন **وَاتَّخَذَ** ইবনে নুন দীর্ঘ সফরের পর এ ঘটনাটি উল্লেখ করেন, তখন **وَاتَّخَذَ** শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা, পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরী হওয়া স্বয়ং একটি অভ্যাসবিরুদ্ধ আশ্চর্য ঘটনা।

হযরত খিযিরের সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর নবুওয়তের প্রশ্ন : কোরআন পাকে ঘটনার মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি; বরং

عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا (আমার বান্দাদের একজন) বলা হয়েছে। বোখারীর

হাদীসে তাঁর নাম খিযির উল্লেখ করা হয়েছে। খিযির অর্থ সবুজ-শ্যামল। সাধারণ তফসীরবিদগণ তাঁর এই নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত, মাটি যেকোনই হোক না কেন। কোরআন পাক একথাও বর্ণনা করে যে, খিযির পয়গম্বর ছিলেন না, একজন ওলী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে তিনি যে নবী ছিলেন, একথা কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা, এই সফরে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, তন্মধ্যে কয়েকটি নিশ্চিতরূপেই প্রচলিত শরীয়ত বিরোধী। আল্লাহর ওহী ব্যতীত শরীয়তের নির্দেশের কোনরূপ ব্যতিক্রম হতে পারে না। নবী ও পয়গম্বর ছাড়া আল্লাহর ওহী কেউ পেতে পারে না। ওলী ব্যক্তিও কাশফ ও এলহামের মাধ্যমে কোন কোন বিষয় জানতে পারেন, কিন্তু তা এমন প্রমাণ নয়, যার ভিত্তিতে শরীয়তের কোন নির্দেশ পরিবর্তন করা যায়। অতএব, প্রমাণিত হয় যে, খিযির আল্লাহর নবী ছিলেন। তাঁকে ওহীর মাধ্যমে কিছুসংখ্যক প্রচলিত শরীয়ত বিরোধী বিশেষ বিধান দান করা হয়েছিল। তিনি যা কিছু করেছেন, তা এই ব্যতিক্রমী বিধানের অনুসরণেই করেছেন। কোরআনের নিষেধাত্মক বাক্যে তার পক্ষ থেকেও এ বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে : **وَمَا كُنَّا عَنْ أَمْرٍ** অর্থাৎ, আমি নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু করিনি; বরং আল্লাহর নির্দেশেই করেছি।

মোটকথা, সাধারণ আলেমদের মতে হযরত খিযির (আঃ) ও একজন নবী। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু অপারিখ দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছিল এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞানও দান করা হয়েছিল। মুসা (আঃ) এগুলো জানতেন না। তাই তিনি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। তফসীর কুরতুবী, বাহরে-মুহীত, আবু হাইয়ান প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে।

কোন ওলীর পক্ষে শরীয়তের বাহ্যিক নির্দেশ অমান্য করা জায়েয নয় : অনেক মূর্খ, পথভ্রষ্ট, সুফীবাদের কলঙ্ক লোক একথা বলে বেড়ায় যে, শরীয়ত ভিন্ন জিনিস আর তরীকত ভিন্ন জিনিস। অনেক বিষয় শরীয়তে হারাম, কিন্তু তরীকতে হালাল। কাজেই কোন ওলীকে প্রকাশ্য কবীর গোনাহে লিপ্ত দেখেও আপত্তি করা ঠিক নয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকেই জানা গেল যে, তাদের এসব কথা পরিষ্কার

ধর্মদ্রোহিতা ও বাতিল। হযরত থিযির (আঃ)-কে দুনিয়ার কোন ওলীর মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না এবং তাঁর কোন শরীয়তের বিরুদ্ধ কাজকে বৈধ বলা যায় না।

সাগরেদের পক্ষে উস্তাদের অনুসরণ অপরিহার্য : **مَلَأْتُمْ** عَلَى أَنْ تَكُونُوا وَمِنْكُمْ رُسُلًا

নবী ও শীর্ষস্থানীয় রসূল হওয়া সত্ত্বেও হযরত থিযিরের কাছে সবিনয় প্রার্থনা করেছেন যে, আমি আপনার জ্ঞান শিক্ষা করার জন্যে আপনার সাহচর্য কামনা করি। এ থেকে বোঝা গেল যে, সাগরেদ গুণে ও গুণ্ডাদ অপেক্ষা অনেক বড় হলেও উস্তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাঁর অনুসরণ করা ওয়াজিব। এটাই জ্ঞানার্জনের আদব।— (কুরত্বী, মাযহাবী)

শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজে নির্বিকার থাকা আলেমের পক্ষে জায়েয

নয় : **إِنَّكَ لَنْ تَسْتَبِيْعَ مَعِيَ صَدْرًا - وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا** হযরত থিযির (আঃ) মুসা (আঃ)-কে বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। আসল তথ্য যখন আপনার জানা নেই, তখন ধৈর্য ধরবেনই বা কেমন করে? উদ্দেশ্য এই যে, আমি যে জ্ঞানলাভ করেছি, তা আপনার জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের। তাই আমার কাজকর্ম আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকবে। আসল তথ্য আপনাকে না বলা পর্যন্ত আপনি নিজ কর্তব্যের খাতিরে আপত্তি করবেন।

মুসা (আঃ) স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে গমনের এবং তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাই তাঁর কোন কাজ প্রকৃতপক্ষে শরীয়ত বিরোধী হবে না, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি ধৈর্যধারণের ওয়াদা করে নিলেন। নতুবা এরূপ ওয়াদা করাও কোন আলেমের জন্যে জায়েয নয়। কিন্তু পরে শরীয়ত সম্পর্কে ধর্মীয় মর্যাদাবোধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৃত ওয়াদা ভুলে গেলেন।

প্রথম ঘটনাটি তেমন গুরুতরও ছিল না। শুধু নৌকাওয়ালাদের আর্থিক ক্ষতি অথবা পানিতে ডুবে যাওয়ার নিছক সম্ভাবনাই ছিল, যা পরে বাস্তবে পরিণত হয়নি। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীতে মুসা (আঃ) আপত্তি না করার ওয়াদাও করেননি। বালক হত্যার ঘটনা দেখে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এ প্রতিবাদের জন্যে কোন গুরুরও পেশ করেননি। শুধু এতটুকু বললেন যে, ভবিষ্যতে প্রতিবাদ করলে আমাকে সাহচর্য দান না করার অধিকার আপনার থাকবে। কেননা, শরীয়তবিরুদ্ধ কাজ বরদাশত করা কোন নবী ও রসূলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে প্রকৃতপক্ষেও যেহেতু তিনি পয়গম্বর ছিলেন, তাই অবশেষে এই রহস্য উদ্ঘাটিত হয় যে, এসব ঘটনা থিযির (আঃ)-এর জন্যে শরীয়তের সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত করে দেয়া হয়েছিল এবং তিনি ওহীর প্রত্যাদেশ অনুযায়ীই এগুলো সম্পাদন করেছিলেন।—(মাযহাবী)

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হয় যে, থিযির (আঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জ্ঞান মুসা (আঃ)-এর জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। কিন্তু উভয় জ্ঞানই যখন আল্লাহ প্রদত্ত, তখন উভয়ের বিধি-বিধান বৈপরীত্য ও বিরোধ কেন? এ সম্পর্কে তফসীর মাযহাবীতে হযরত কাযী সানাউল্লাহ পানিপথীর বক্তব্য সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং আকর্ষণীয়। আমি তাঁর বক্তব্যের যে মর্ম বুঝতে পেরেছি, তার সার-সংক্ষেপ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ওহী ও নবুওয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন, সাধারণতঃ তাঁদেরকে জন-সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁদের প্রতি গ্রহ ও শরীয়ত নাযিল করা হয়। এগুলোতে জনগণের হেদায়েত ও সংশোধনের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ থাকে। কোরআন পাকে যত নবী-রসূলের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের সবার উপরই শরীয়তের আইন প্রয়োগ ও সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তাঁদের কাছে আগত ওহীও ছিল এই দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অপরদিকে কিছু সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্বও তাঁদের উপর রয়েছে। সেসবের জন্যে সাধারণভাবে ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু কোন কোন পয়গম্বরকেও আল্লাহ তাআলা এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্যে বিশেষভাবে নিযুক্ত করেছেন। হযরত থিযির (আঃ) তাঁদেরই একজন। সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কিত দায়িত্ব আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত, যেমন অমুক ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হোক অথবা অমুককে নিপাত করা হোক অথবা অমুককে উন্নতি দান করা হোক। এগুলোর বিধি-বিধানও সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এসব আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে কিছুসংখ্যক এমনও থাকে যে, এক ব্যক্তিকে নিপাত করা শরীয়তের আইন বিরুদ্ধ, কিন্তু অপার্থিব আইনে এই বিশেষ ব্যাপারটিকে শরীয়তের সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রেখে ঐ পয়গম্বরের জন্যে বৈধ করে দেয়া হয়, যার ফিস্মায় সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কিত এই বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় শরীয়তের আওতা বহির্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিজনিত এই নির্দেশটি শরীয়তের আইন-বিশেষজ্ঞদের জানা থাকে না। ফলে তারা একে হারাম বলতে বাধ্য হন এবং যাকে এই আইন থেকে পৃথক রাখা হয়, তিনি যথাস্থানে সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

মোটকথা, যেখানে বৈপরীত্য দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে বিপরীত নয় বরং আনুষঙ্গিক ঘটনা শরীয়তের সাধারণ আইন থেকে ব্যতিক্রম থাকে মাত্র।

তাই এই ব্যতিক্রমটি নবুওয়ত সম্পর্কিত ওহীর মাধ্যমে হওয়া জরুরী। কোন কাশফ ও এলহাম এই ব্যতিক্রমের জন্যে যথেষ্ট নয়। হযরত থিযির কর্তৃক বালক হত্যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ছিল, কিন্তু তাঁকে সৃষ্টিগতভাবে শরীয়তের এই আইনের উল্লেখ রেখে এ কাজের জন্যে আদেশ করা হয়েছিল। নবী নয়— এমন কোন ব্যক্তিকে তাঁর মাপকাঠিতে বিচার করে কোন হারামকে হালাল মনে করা যেমন ভণ্ড সুফীদের মধ্যে প্রচলিত আছে—সম্পূর্ণ ধর্মদ্রোহিতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর।

ইবনে আবী শায়বা হযরত ইবনে আব্বাসের রাঃ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার নাজদাহ হারুরী (খারেজী) ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখল যে, হযরত থিযির (আঃ) নাবালেগ বালককে ক্রীপে হত্যা করলেন, অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নাবালেগ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন? ইবনে আব্বাস জওয়াবে লিখলেন : কোন বালক সম্পর্কে যদি তোমার ঐ জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়, যা থিযির (আঃ)-এর অর্জিত হয়েছিল, তবে তোমার জন্যেও নাবালেগ হত্যা করা জায়েয হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এই যে, থিযির (আঃ) নবুওয়তের ওহীর মাধ্যমে এই জ্ঞানলাভ করেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পর নবুওয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ এখন এই জ্ঞান কেউ লাভ করতে পারবে না।—(মাযহাবী)

এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে শরীয়তের আইনের উল্লেখ সাব্যস্ত করার অধিকার একমাত্র ওহীর অধিকারী পয়গম্বরেরই রয়েছে।

الكهف

১৮

قَالَ الْمَوْلَىٰ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَاصْبِرْ لِي مَا تَسْأَلُنِي عَنْهُ فَإِنِّي أَجِبُكَ

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَاصْبِرْ لِي مَا تَسْأَلُنِي عَنْهُ فَإِنِّي أَجِبُكَ

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَاصْبِرْ لِي مَا تَسْأَلُنِي عَنْهُ فَإِنِّي أَجِبُكَ

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَاصْبِرْ لِي مَا تَسْأَلُنِي عَنْهُ فَإِنِّي أَجِبُكَ

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَاصْبِرْ لِي مَا تَسْأَلُنِي عَنْهُ فَإِنِّي أَجِبُكَ

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَاصْبِرْ لِي مَا تَسْأَلُنِي عَنْهُ فَإِنِّي أَجِبُكَ

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَاصْبِرْ لِي مَا تَسْأَلُنِي عَنْهُ فَإِنِّي أَجِبُكَ

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَاصْبِرْ لِي مَا تَسْأَلُنِي عَنْهُ فَإِنِّي أَجِبُكَ

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَاصْبِرْ لِي مَا تَسْأَلُنِي عَنْهُ فَإِنِّي أَجِبُكَ

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَاصْبِرْ لِي مَا تَسْأَلُنِي عَنْهُ فَإِنِّي أَجِبُكَ

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَاصْبِرْ لِي مَا تَسْأَلُنِي عَنْهُ فَإِنِّي أَجِبُكَ

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَاصْبِرْ لِي مَا تَسْأَلُنِي عَنْهُ فَإِنِّي أَجِبُكَ

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَاصْبِرْ لِي مَا تَسْأَلُنِي عَنْهُ فَإِنِّي أَجِبُكَ

قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَاصْبِرْ لِي مَا تَسْأَلُنِي عَنْهُ فَإِنِّي أَجِبُكَ

(৭৫) তিনি বললেন : আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ঐশ্বর্য ধরে থাকতে পারবেন না। (৭৬) মুসা বললেন : এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। আপনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগ মুক্ত হয়ে গেছেন। (৭৭) অতঃপর তারা চলতে লাগল, অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চাইল, তখন তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন, সেটি তিনি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মুসা বললেন : আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পারিশ্রমিক আদায় করতে পারতেন। (৭৮) তিনি বললেন : এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। এখন যে বিষয়ে আপনি ঐশ্বর্য ধরতে পারেননি, আমি তার তাৎপর্য বলে দিচ্ছি। (৭৯) নৌকাটির ব্যাপার—সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ভেঙে ফেলি। তাদের অশ্রুচোখের দিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। (৮০) বালকটির ব্যাপার—তার পিতা-মাতা ছিল ঈমানদার। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। (৮১) অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে মহত্তর, তার চাইতে পবিত্রতায় ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। (৮২) প্রাচীরের ব্যাপার—সেটি ছিল নগরের দু'জন পিতৃহীন বালকের। এর নীচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সংকর্য পরায়ণ। সুতরাং আপনার পালনকর্তা দয়াবশতঃ ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে ঐশ্বর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এই হল তার ব্যাখ্যা। (৮৩) তারা আপনাকে মূলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন : আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা করব।

أَتَرَفْتُمَا يُتْرَقُ أَهْلَهَا

(আঃ) কুড়াল দ্বারা নৌকার একটি তক্তা বের করে দেন। ফলে নৌকায় পানি ঢুকে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ কারণেই মুসা (আঃ) প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেন। কিন্তু ঐতিহাসিক রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, পানি নৌকায় প্রবেশ করেনি—মু'জ্জযার কারণে হোক কিংবা ঐশ্বর্য (আঃ) কর্তৃক এর কিছুটা মেরামত করার কারণে হোক। বগতীর রেওয়াজেতে আছে যে, এই তক্তার জায়গায় ঐশ্বর্য (আঃ) একটি কাঁচ লাগিয়ে দেন। কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নৌকা ডুবে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। এর দ্বারা উপরোক্ত রেওয়াজেতগুলো সমর্থিত হয়।

حَتَّىٰ إِذَا الْيَاقُوتَا

বালক। যে বালককে ঐশ্বর্য (আঃ) হত্যা করেন, তার সম্পর্কে অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, সে নাবালগ ছিল। পরবর্তী বাক্যে تَفْسَاؤُكُمَا শব্দ থেকেও তার নাবালকত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা زَكِيَّة শব্দের অর্থ গোনাহ থেকে পবিত্র। এ গুণটি হয় পয়গম্বরের মধ্যে পাওয়া যায়, না হয় নাবালগ বাচ্চাদের মধ্যে পাওয়া যায়। নাবালগদের আমলনামায় কোন গোনাহ লিপিবদ্ধ করা হয় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَهْلُ يَرْزُقُ হযরত ঐশ্বর্য (আঃ) যে জনপদে পৌঁছেন এবং যার অধিবাসীরা তাঁর আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করে, হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়াজেতে সেটিকে এস্তাকিয়া ও ইবনে সীরীনের রেওয়াজেতে 'আহিকা' বলা হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত আছে যে, সেটি ছিল আন্দালুসের একটি জনপদ।—(মাহহারী)

كَانَ أَهْلُ الْيَاقُوتَا وَكَانَتْ لِسُلَيْمَانَ

যে, এই নৌকাটি যে দরিদ্রদের ছিল, তারা ছিল দশ ভাই। তন্মধ্যে পাঁচ জন ছিল বিকলাঙ্গ। অবশিষ্ট পাঁচ ভাই মেহনত-মজুরী করে সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত। নদীতে নৌকা চালিয়ে ভাড়া উপার্জন করাই ছিল তাদের মজুরী।

মিসকীনের সংজ্ঞা : কারও কারও মতে মিসকীন এমন ব্যক্তি, যার কাছে কিছুই নেই। কিন্তু আলোচ্য আয়াত থেকে মিসকীনের সঠিক সংজ্ঞা এই জানা যায় যে, অত্যাবশ্যকীয় অভাব পূরণ করার পর যার কাছে নেসাব পরিমাণ মালও অবশিষ্ট থাকে না, সে-ও মিসকীনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আয়াতে হাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে, তাদের কাছে কমপক্ষে একটি নৌকা তো ছিল, যার মূল্য নেসাবের চাইতে কম নয়। কিন্তু নৌকাটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণে নিয়োজিত ছিল। তাই তাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে।—(মাহহারী)

فَارَادُوا أَنْ يُبَدِّلُوا دِينَهُمْ وَرَزَقَهُمُ اللَّهُ كَيْفَ يُرِيدُ غَصْبًا

বগতী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, নৌকাটি যেদিকে যাচ্ছিল, সেখানে একজন জালেম বাদশাহ্ এই পথে চলাচলকারী সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। হযরত ঐশ্বর্য এ কারণে নৌকার একটি তক্তা উপড়ে দেন, যাতে জালেম বাদশাহর লোকেরা ভাঙ্গা দেখে নৌকাটি ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়।

وَاتَّخَذَ হযরত খিযির (আঃ) যে বালকটি হত্যা করেন, তার স্বরূপ এই বর্ণনা করেছেন যে, তার প্রকৃতিতে কুফর ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল। তার পিতা-মাতা ছিল সংকর্মপরায়ণ লোক। হযরত খিযির (আঃ) বলেন : আমার আশঙ্কা ছিল যে, ছেলেটি বড় হয়ে সংকর্মপরায়ণ পিতা-মাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে কুফরে লিপ্ত হয়ে পিতা-মাতার জন্যে ফেৎনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালবাসায় পিতা-মাতার ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

وَأَرْثَاهُ فَأَرَادَ أَنْ يُبَيِّدَهُمَا رَكْمًا خَيْرًا مِنْهُ لَكُلِّ وَهُوَ أَكْرَبُ رَحْمًا

এজন্যে আমি ইচ্ছা করলাম যে, আল্লাহ তাআলা এই সংকর্মপরায়ণ পিতা-মাতাকে এ ছেলের পরিবর্তে তার চাইতে উত্তম সন্তান দান করুক, যার কাজকর্ম ও চরিত্র হবে পবিত্র এবং সে পিতা-মাতার হকও পূর্ণ করবে।

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনিযির ও ইবনে আবী হাতেম আতিয়্যার বাচনিক বর্ণনা করেন যে, নিহত ছেলের পিতা-মাতাকে আল্লাহ তাআলা তার পরিবর্তে একটি কন্যা দান করেন, পরবর্তীকালে যার গর্ভে দু'জন নবী জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তাঁর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা একটি বিরাট উম্মতকে হেদায়েত দান করেন।

وَكَانَ حَسْبُهُ كُرْكُمًا হযরত আবু দারদা রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রাচীরের নীচে রক্ষিত এতীম বালকদের গুপ্তধন ছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার।— (তিরমিযী, হাকিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : সেটি ছিল স্বর্ণের একটি ফলক। তাতে নিম্নলিখিত উপদেশবাক্যসমূহ লিখিত ছিল। হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-ও এই রেওয়ায়েতটি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।— (কুরতুবী)

(১) বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

(২) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে তকদীরে বিশ্বাস করে অথচ দূশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়।

(৩) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে আল্লাহ তাআলাকে রিযিকদাতারূপে বিশ্বাস করে; এরপর প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনর্থক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।

(৪) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে মৃত্যুতে বিশ্বাস রাখে; অথচ আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে।

(৫) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস রাখে; অথচ সংকাজে গাফেল হয়।

(৬) সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে দুনিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন জেনেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে।

(৭) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।

পিতা-মাতার সংকর্মের উপকার সন্তান-সন্ততিরও পায় : **وَأَرْثَاهُ** এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত খিযির (আঃ)-এর মাধ্যমে এতীম বালকদের জন্যে রক্ষিত গুপ্তধনের হেফায়ত এজন্যে করানো হয়

যে, তাদের পিতা একজন সংকর্মপরায়ণ আল্লাহর প্রিয় বন্দা ছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা তার সন্তান-সন্ততির উপকারার্থে এ ব্যবস্থা করেন। মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেন : আল্লাহ তাআলা এক বন্দার সংকর্মপরায়ণতার কারণে তার পরবর্তী সন্তান-সন্ততি, বংশধর ও প্রতিবেশীদের হেফায়ত করেন।— (মায়হারী)

হযরত শিবলী (রহঃ) বলতেনঃ আমি এই শহর এবং সমগ্র এলাকার জন্যে শান্তির কারণ। তাঁর ওফাতের পর তাঁর দাফন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে দায়লামের কাফেররা দাজ্জলা নদী অতিক্রম করে বাগদাদ নগরী অধিকার করে। তখন সবাই বলাবলি করতে থাকে যে, আমাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ চেপেছে, অর্থাৎ, শিবলীর ওফাত ও কাফেরদের হাতে বাগদাদের পতন।— (কুরতুবী, ১১ খণ্ড, ২৯ পৃঃ)

তফসীর মায়হারীতে বলা হয়েছে, আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলেম ও সংকর্মপরায়ণদের সন্তান-সন্ততিদের খাতির করা এবং তাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হওয়া উচিত, যে পর্যন্ত না তারা পুরোপুরি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

أَنْ يَبْيُخَا شَيْئًا شدء শব্দটি এর বহুবচন। অর্থ শক্তি এবং সে বয়স, যাতে মানুষ পূর্ণ শক্তি অর্জন এবং ভালমন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। ইমাম আবু হানীফার রাঃ মতে পঁচিশ বছর বয়স্কম এবং কারও কারও মতে চল্লিশ বছর বয়স্কম। কেননা, কোরআন পাকে রয়েছে **حَتَّىٰ يَأْتِيَ بِلَهُمْ أَشْدَّةُ وَلَدَةٍ لَّيْسَ سَنَةً** (মায়হারী)

হযরত খিযির (আঃ) জীবিত আছেন, না ওফাত হয়ে গেছে : হযরত খিযির (আঃ) জীবিত আছেন, না তাঁর ওফাত হয়ে গেছে ; এ বিষয়ের সাথে কোরআনে বর্ণিত ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। তাই কোরআন ও হাদীসে স্পষ্টতঃ এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। কোন কোন রেওয়ায়েত ও উক্তি থেকে তাঁর অদ্যাবধি জীবিত থাকার কথা জানা যায়। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে এর বিপরীত বিষয় জানা যায়। ফলে এ ব্যাপারে সর্বকালেই আলেমদের বিভিন্মরূপ মতামত পরিদৃষ্ট হয়েছে। যাদের মতে তিনি জীবিত আছেন, তাদের প্রমাণ হচ্ছে মুত্তাদরাক হাকিম কর্তৃক হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত। তাতে বলা হয়েছে : যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে যায়, তখন সাদা-কালো দাড়িওয়ালা জনৈক ব্যক্তি আগমন করে এবং ভিড় ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে কান্নাকাটি করতে থাকে। এই আগন্তুক সাহাবায়ে কেরামের দিকে মুখ করে বলতে থাকে। “আল্লাহর দরবারেই প্রত্যেক বিপদ থেকে সবর আছে, প্রত্যেক বিপুল বিষয়ের প্রতিদান আছে বরং তিনি প্রত্যেক ধ্বংসীল বস্তুর স্থলাভিষিক্ত। তাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর এবং তাঁর কাছেই আগ্রহ প্রকাশ কর। কেননা, যে ব্যক্তি বিপদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়, সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত।

আগন্তুক উপরোক্ত বাক্য বলে বিদায় হয়ে গেলে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও আলী (রাঃ) বললেন : ইনি হযরত খিযির (আঃ)।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে যে, দাজ্জাল মদীনার নিকটবর্তী এক জায়গায় পৌঁছে মদীনা থেকে এক ব্যক্তি তার মোকাবেলার জন্যে বের হবেন। তিনি তৎকালীন লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হবেন কিংবা শ্রেষ্ঠতম লোকদের অন্যতম হবেন। আবু ইসহাক বলেন : এ ব্যক্তি হবেন হযরত খিযির (আঃ)।

ইবনে আবিদদুনিয়া ‘কিতাবুল-হাওয়াতিফে’ বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাঃ) হযরত খিযির (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাঁকে একটি দোয়া বলে দেন। যে ব্যক্তি এই দোয়া প্রত্যেক নামাযের পর পাঠ করবে; সে বিরাত সওয়াব, মাগফেরাত ও রহমতা পাবে। দোয়াটি এই :

يا من لا يشغله سمع عن سمع ويا من لا تغلظه المسائل ويا

من لا يبرم من الحاح الملحني اذقني برد عفوك وحلاوة

مغفرتك -

“হে ঐ সত্তা, যার এক কথা শোনা অন্য কথা শোনার প্রতিবন্ধক হয় না; হে ঐ সত্তা যাকে একই সময়ে করা লাখো-কোটি প্রশ্ন বিভ্রান্ত করে না এবং হে ঐ সত্তা যিনি, দোয়ায় পীড়াপীড়ি করলে এবং বার বার বললে বিরক্ত হন না; আমাকে তোমার ক্ষমার স্বাদ আশ্বাদন করাও এবং তোমার মাগফেরাতের স্বাদ দান কর।’

অতঃপর এ গ্রন্থেই হুবহু এই ঘটনা, এই দোয়া এবং হযরত খিযির (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা হযরত ওমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।

পক্ষান্তরে যারা হযরত খিযির (আঃ)-এর জীবদ্দশা অস্বীকার করে, তাদের বড় প্রমাণ হচ্ছে সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। হযরত ইবনে ওমর বলেন : রসুলুল্লাহ (সাঃ) জীবনের শেষ দিকে এক রাত্রে আমাদেরকে নিয়ে এশার নামায পড়েন। নামায শেষে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন

ارايتمكم ليلتكم هذه فان على رأس مائة سنة منها لا يبقى

ممن هو على ظهر الارض احد -

“তোমরা কি আজকের রাতটি লক্ষ্য করছ? এই রাত থেকে একশ’ বছর আজ যারা পৃথিবীতে আছে, তাদের কেউ জীবিত থাকবে না।”

হযরত ইবনে ওমর অতঃপর বলেন : এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে অনেকই অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন কিন্তু রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, একশ’ বছর অতীত হলে এ শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে।

কেউ কেউ খিযির (আঃ)-এর জীবিত থাকার বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন যে, তিনি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে জীবিত থাকলে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করা তাঁর জন্যে

অপরিহার্য ছিল। কেননা, হাদীসে বলা হয়েছে لو كان موسى حيا لما اوعى وسعد الا اتباعى অর্থাৎ, মুসা (আঃ)- জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁরও গত্যন্তর ছিল না। (কারণ, আমার আগমনের ফলে তাঁর ধর্ম রহিত হয়ে গেছে)। কিন্তু এটা অসম্ভব নয় যে, খিযির (আঃ)-এর জীবন ও নবুওয়ত সাধারণ পয়গম্বরের থেকে ভিন্নরূপ হবে। তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টিগত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাই তিনি সাধারণ মানুষ থেকে আলাদাভাবে নিজের কাজে নিয়োজিত আছেন। শরীয়তে মুহাম্মদীর অনুসরণের ব্যাপারে এটা সম্ভব যে, তিনি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তের পর এ শরীয়তেরই অনুসরণ করে চলেছেন।

আবু হাইয়ান বাহুর-মুহীত গ্রন্থে খিযির (আঃ)-এর সাথে কয়েজন বুযুর্গের সাক্ষাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে، والجمهور على انه مات، অর্থাৎ, সাধারণ আলোমদের মতে তাঁর ওফাত হয়ে গেছে।—(যষ্ঠ খণ্ড ১৪৭ পৃঃ)

তফসীর মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ বলেন : হযরত সাইয়েদ আহমদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী তাঁর কাশ্ফের মাধ্যমে যেকথা বলেছেন, তার মধ্যেই সব বিতর্কের সমাধান নিহিত আছে। তিনি বলেন : আমি নিজে কাশ্ফ জগতে হযরত খিযির (আঃ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন : আমি ও ইলিয়াস (আঃ) উভয়েই জীবিত নই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এরূপ ক্ষমতা দান করেছেন যে, আমরা জীবিত মানুষের বেশ ধারণ করে বিভিন্নভাবে মানুষকে সাহায্য করতে পারি।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, হযরত খিযির (আঃ)-এর মৃত্যু ও জীবদ্দশার সাথে আমাদের কোন বিশ্রাসগত অথবা কর্মগত বিষয় জড়িত নয়। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু বলা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে অতিরিক্ত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কোন একদিকের উপর বিশ্রাস রাখাও আমাদের জন্যে জরুরী নয়। কিন্তু প্রশ্নটি জনগণের মধ্যে বহুল প্রচলিত, তাই উল্লেখিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

وَيَسْأَلُونَكَ অর্থাৎ, তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। কারা প্রশ্ন করেছিল,

এ সম্পর্কে রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা ছিল মক্কার কোরাইশ সম্প্রদায়। মদীনার ইহুদীরা তাদেরকে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও সত্যতা যাচাই করার জন্যে তিনটি প্রশ্ন বলে দিয়েছিল : রূহ, আসহাবে কাহ্ফ ও যুলকারনাইন। তন্মধ্যে দু’টি প্রশ্নের জওয়াব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াব বর্ণিত হচ্ছে যে, যুলকারনাইন কে ছিল এবং তার কি অবস্থা ছিল?—(বাহুরে মুহীত)

নিয়োজিত করেছে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে সেখান থেকে বিভিন্ন শিলালিপি উদ্ধার করেছে এবং সেগুলোর সাহায্যে পুরাতত্ত্বের স্বরূপ আবিষ্কারে অদ্ভুত পূর্ব কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে প্রাপ্ত শিলালিপির মাধ্যমে কোন ঘটনার সমর্থনে সাহায্য পাওয়া গেলেও সেগুলো দ্বারা ঘটনার পাঠোদ্ধার সম্ভবপর নয়। এর জন্যে ঐতিহাসিক রেওয়াজেতসমূহই ভিত্তি হতে পারে। এসব ব্যাপারে প্রাচীনকালে ঐতিহাসিক রেওয়াজেতসমূহের অবস্থা একটু আগেই জানা গেছে যে, এগুলোর মর্যাদা কিসসা-কাহিনীর চাইতে অধিক নয়। প্রাচীন ও আধুনিক তফসীরবিদগণও নিজ নিজ গ্রন্থে এসব রেওয়াজেত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই উদ্ধৃত করেছেন। এখানেও এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু লেখা হচ্ছে। মাওলানা হিফযুর রহমান (রহঃ) ‘কাসাসুল-কোরআন’ গ্রন্থে এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিহাসের কৌতুহলী পাঠক সেখানে দেখতে পারেন।

কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বে শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকারী চার জন সম্রাট অতিক্রান্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে দু’জন ছিলেন মুমিন এবং দু’জন কাফের। মুমিন দু’জন হলেন হযরত সোলায়মান (আঃ) ও যুলকারনাইন এবং কাফের দু’জন নমরুদ ও বখতে-নসর।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যুলকারনাইন নামে পৃথিবীতে একাধিক ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করেছেন এবং এটাও আশ্চর্যের ব্যাপার যে, প্রতি যুগের যুলকারনাইনের সাথেই সিকান্দর (আলেকজান্ডার) উপাধিটিও যুক্ত রয়েছে।

খ্রীষ্টের প্রায় তিনশ’ বছর পূর্বে সিকান্দর নামে একজন সম্রাট প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিলেন। তাকে সিকান্দর গ্রীক, মকদুনী, রুমী, ইত্যাদি উপাধিতেও সুরণ করা হত। তার মন্ত্রী ছিলেন এরিস্টটল এবং তিনি দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে তার রাজ্য জয় করেন। সিকান্দর নামে খ্যাতিলাভকারী সর্বশেষ ব্যক্তি তিনিই ছিলেন। তার কাহিনী অধিক প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ তাকেও কোরআনে উল্লেখিত যুলকারনাইন বলে অভিমত দিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা, তিনি অগ্নিপূজারী মূশরেক ছিলেন। কোরআন পাকে যে যুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে, তার নবী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু ঈমানদার ও সংকর্মপরায়ণ হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। কোরআনের আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

হাদীস ও ইতিহাসবিদ ইবনে-কাসীরের বক্তব্যে প্রথমতঃ জানা যায় যে, সিকান্দর বাদশাহ যিনি ঈসা (আঃ)-এর তিন শত বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন, দারা ও পারস্য সমগ্রাটদের সাথে যার যুদ্ধ হয়েছে এবং যিনি আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন নন।

দ্বিতীয় : **وَأَن كَانَ نَبِيًّا** বাক্য থেকে জানা গেল যে, ইবনে-কাসীরের মতে তার নবী হওয়ার ধারণাটি প্রবল। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবয়ীগণের উক্তি স্বয়ং ইবনে কাসীর আবু তোফায়েলের রেওয়াজেতক্রমে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যুলকারনাইন নবী বা ফেরেশতা ছিলেন না; বরং একজন সংকর্মপরায়ণ মুসলমান ছিলেন। তাই কোন কোন আলেম বলেছেন যে, **أَن** এর সর্বনাম দ্বারা যুলকারনাইনকে নয়—যিযির (আঃ)—কে বোঝানো হয়েছে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, তবে কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন কে এবং কোন্ যুগে ছিলেন? এ সম্পর্কেও আলেমদের উক্তি-বিভিন্নরূপ।

ইবনে কাসীরের মতে তার আমল ছিল সিকান্দর গ্রীক, মকদুনী থেকে দু’হাজার বছর পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আমল। তার উজির ছিলেন হযরত যিযির (আঃ)। ইবনে কাসীর ‘আলবেদায়াহ ওয়ান্নেহায়াহ’ গ্রন্থে এ রেওয়াজেতও বর্ণনা করেছেন যে, যুলকারনাইন পদব্রজে হৃদয়ের উদ্দেশ্যে আগমন করলে হযরত ইবরাহীম (আঃ) মক্কা থেকে বের হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান, তাঁর জন্যে দোয়া করেন এবং কিছু উপদেশও প্রদান করেন। তফসীর ইবনে কাসীরে আযরকীর বরাতে দিয়ে বর্ণিত আছে যে, যুলকারনাইন ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে তওয়াফ করেন এবং কোরবানী করেন।

আবু রায়হান আল-বেরুনী ‘কিতাবুল আসারিল বাকীয়া আনিল কুরানিল খালীয়া’ গ্রন্থে বলেনঃ কোরআনে বর্ণিত যুলকারনাইন হচ্ছে আবু বকর ইবনে সুমাই ইবনে ওমর ইবনে আফরীকায়স হিমইয়ারী। তিনি দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তুবা হিমইয়ারী ইয়ামেনী তার কবিতায় তাঁর জন্যে গর্ববোধ করে বলেছেন : আমার দাদা যুলকারনাইন মুসলমান ছিলেন।

আবু হাইয়ান বাহুরে-মুহীতে এ রেওয়াজেতটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীর ও ‘আল-বেদায়াহ ওয়ান্নেহায়াহ’ গ্রন্থে এর উল্লেখ করার পর বলেন : এই যুলকারনাইন তিন জন ইয়ামেনী সম্রাটের মধ্যে প্রথম সম্রাট ছিলেন। সে-ই সাবা’ কুপের মোকদ্দমায় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পক্ষে ন্যায় ফয়সালা দিয়েছিলেন। এ সমুদয় রেওয়াজেতে যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব, সুনাম ও বংশপরম্পরা সংক্রান্ত মতভেদ সত্ত্বেও তাঁর আমল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আমল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

فَإِن سَأَلْتَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ এখানে প্রশ্নধানেযোগ্য বিষয় যে,

কোরআন পাক **ذَكَرَهُ** সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে **وَشَهِدُوا** এ দু’টি শব্দ কেন ব্যবহার করল? চিন্তা করলে দেখা যাবে, এ দু’টি শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন পাক যুলকারনাইনের আদ্যপাশ কাহিনী বর্ণনা করার ওয়াদা করেনি; বরং তার আলোচনার একাংশ উল্লেখ করার কথা বলেছে। উপরে যুলকারনাইনের নাম ও বংশপরম্পরা সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কোরআন পাক একে অনাবশ্যক মনে করে বাদ দেয়ার কথা প্রথমই ঘোষণা করে দিয়েছে।

وَأَتَيْنَاهُ مِنْ عَلَىٰ مَنِّ سَبِيًّا আরবী অভিধানে **سَبَب** শব্দের অর্থ

এমন বস্তু যদ্বারা লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য নেয়া হয়। যন্ত্রপাতি, বৈষয়িক উপায়াদি, জ্ঞানবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত—(বাহুরে-মুহীত)

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্যে একজন সম্রাট ও রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে যেসব বিষয় অত্যাবশ্যকীয় **وَمِنْ عَلَىٰ مَنِّ** বলে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা যুলকারনাইনকে ন্যায়বিচার, শাস্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও দেশ বিজয়েরই জন্যে সে যুগে যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, তা সবই দান করেছিলেন।

فَأَتَيْنَاهُ مِنْ عَلَىٰ مَنِّ سَبِيًّا অর্থাৎ, সব রকম ও দুনিয়ার সর্বত্র পৌছার উপকরণাদি

তাকে দান করা হয়েছিল, কিন্তু সে সর্বপ্রথম পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে পৌছার উপকরণাদি কাজে লাগায়।

عَلَىٰ رَأْسِ الْبَلَدِ مَعْرُوبَ الشَّيْبِ অর্থাৎ, তিনি পশ্চিম প্রান্তে সে সীমা

পর্যন্ত পৌছে গেলেন, যার পরে কোন জনবসতি ছিল না।

فِي عَيْنَيْ حَٰمِلَةٍ - حَٰمِلَةٍ এর শাব্দিক অর্থ কালো জলাভূমি অথবা

কাদা। এখানে সে জলাশয়কে বোঝানো রয়েছে, যার নীচে কালো রঙের কাদা থাকে। ফলে পানির রঙও কালো দেখায়। সূর্যকে এরূপ জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখার অর্থ এই যে, দর্শক মাত্রই অনুভব করে যে, সূর্য এই জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে। কেননা, এরপর কোন বসতি অথবা স্থলভাগ ছিল না। আপনি যদি সূর্যাস্তের সময় এমন কোন ময়দানে উপস্থিত থাকেন, যার পশ্চিমদিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোন পাহাড়, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদি না থাকে, তবে আপনার মনে হবে যেন সূর্যটি মাটির অভ্যন্তরেই প্রবেশ করছে।

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا অর্থঃ, ঐ কালো জলাশয়ের কাছে যুলকারনাইন

এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আয়াতের পরবর্তী অংশ থেকে জানা যায় যে, সম্প্রদায়টি ছিল কাফের। তাই আল্লাহ তাআলার যুলকারনাইনকে ক্ষমতা দান করলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে প্রথমেই সবাইকে তাদের কুফরের শাস্তি প্রদান কর এবং ইচ্ছা করলে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার কর অর্থাৎ, প্রথমে দাওয়াত, তাবলীগ ও উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ও ঈমান কবুল করতে সম্মত কর। এরপর যারা মানে, তাদেরকে প্রতিদান এবং যারা না মানে তাদেরকে শাস্তি দাও। প্রত্যুত্তরে যুলকারনাইন দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করে বললেন : আমি প্রথমে তাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে সংপথে আনার চেষ্টা করব। এরপরও যারা কুফরে দৃঢ়পদ থাকবে, তাদেরকে শাস্তি দেব। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সংকর্ম করবে, তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।

فَلَمَّا يَلِ الْأَمْرُ الْيَوْمَ এ থেকে জানা যায় যে, যুলকারনাইনকে আল্লাহ

তাআলা নিজেই সম্বোধন করে একথা বলেছেন। যুলকারনাইনকে নবী সাব্যস্ত করা হলে এতে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না যে, ওহীর মাধ্যমেই তাঁকে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে নবী না মানলে কোন পয়গম্বরের মধ্যস্থতায়ই তাঁকে এই সম্বোধন করা হয়ে থাকবে। যেমন, রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত খিযির (আঃ) তাঁর সাথে ছিলেন। এছাড়া এতে নবুওয়তের ওহী না হয়ে আভিধানিক ওহী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন, হযরত মুসা (আঃ)—এর জননীর জন্যে কোরআনে وَأَوْحَيْنَا

হয়েছে। অথচ তিনি যে নবী ও রসূল ছিলেন না, সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আবু হাইয়ান বাহুরে—মুহীতে বলেন : এখানে যুলকারনাইনকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হত্যার ও শাস্তির আদেশ। এ ধরনের আদেশ নবুওয়তের ওহী ব্যতীত দেয়া যায় না—কাশফ, এলহাম অথবা অন্য কোন উপায়ে তা হতে পারে না। তাই হয় যুলকারনাইনকে নবী মানতে হবে, না হয় তাঁর আমলে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে, যার মাধ্যমে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই বিসৃজ্য নয়।

যুলকারনাইন পূর্বপ্রান্তে যে জাতিকে বসবাস করতে দেখেছেন, কোরআন পাক তাদের সম্পর্কে বলেছে যে, তারা গৃহ, তাঁবু, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির দ্বারা রোদ থেকে আত্মরক্ষা করত না, কিন্তু তাদের ধর্ম ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে কিছুই বলেনি এবং যুলকারনাইন তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন, তাও ব্যক্ত করেনি। বলাবাহুল্য, তারাও কাফেরই ছিল এবং যুলকারনাইন তাদের সাথেও এমন ব্যবহারই করেছেন, যা পশ্চিমা জাতির সাথে করেছেন বলে উপরে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। কারণ, পূর্ববর্তী ঘটনার আলোকেই তা বোঝা যায়।—(বাহুরে—মুহীত)

শব্দার্থ : يَوْمَ الْيَوْمِ যে বস্তু কোন কিছুর জন্যে বাধা হয়ে যায়,

সদ তাকে বলা হয়; তা প্রাচীর হোক কিংবা পাহাড় হোক, কৃত্রিম হোক কিংবা প্রাকৃতিক হোক। এখানে سِدِينَ বলে দুই পাহাড় বোঝানো হয়েছে। এগুলো ইয়াজুজ-মাজুজের পথে বাধা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত। যুলকারনাইন এই গিরিপথটি বন্ধ করে দেন।

শব্দটি زُرَّةُ الْوَيْدِ - زِر - শব্দটি زیرে এর বহুবচন। এর অর্থ পাত।

এখানে লৌহখণ্ড বোঝানো হয়েছে। গিরিপথ বন্ধ করার জন্যে নির্মিতব্য প্রাচীর ইট-পাথরের পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল।

الْفَوْزَيْنِ দুই পাহাড়ের বিপরীত মুখী দুই দিক :

طَّرَ অধিকাংশ তফসীরবিদগণের মতে এর অর্থ গলিত তামা। কারও কারও মতে গলিত লোহা অথবা রাঙতা।—(কুরতুবী)

الكهف

৩৫

قَالَ الرَّحْمَنُ

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অর্থাৎ, যে বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সমতল হয়ে যায়।

ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজ কারা এবং কোথায়? যুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজ সম্পর্কে ইসরাঈলী রেওয়াজেতে ও ঐতিহাসিক কিসসা-কাহিনীতে অনেক ভিত্তিহীন অলীক কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদও এগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু স্বয়ং তাঁদের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। কোরআন পাক তাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করেছেন। ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় ততটুকুই, যতটুকু কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তফসীর, হাদীস ও ইতিহাসবিদগণ এর অতিরিক্ত যেসব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো বিশুদ্ধ ও হতে পারে এবং অশুদ্ধ ও হতে পারে। ইতিহাসবিদগণের বিভিন্নমুখী উক্তিগুলো নিছক ইঙ্গিত ও অনুমানের উপর ভিত্তিশীল। এগুলো শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হলেও তার কোন প্রভাব কোরআনের বক্তব্যের উপর পড়ে না।

আমি এখানে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কিত সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো উল্লেখ করছি। এরপর প্রয়োজন অনুসারে ঐতিহাসিক রেওয়াজেতেও বর্ণনা করা হবে।

ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা : কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজ মানব সম্প্রদায়ভুক্ত। অন্যান্য মানবের মত তারাও নূহ (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততি। কোরআন পাক স্পষ্টতই বলেছে : **وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ**

فُرُيَاتٍ অর্থাৎ, নূহের মহাপ্রাবনের পর দুনিয়াতে যত মানুষ আছে এবং থাকবে, তারা সবাই নূহ (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততি হবে। ঐতিহাসিক রেওয়াজেতে এ ব্যাপারে একমত যে, তারা ইয়াকফেসের বংশধর। একটি দুর্বল হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের অবশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ হাদীস হচ্ছে হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রাঃ)-এর হাদীসটি। এটি সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য সব নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। হাদীসবিদগণ একে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। এতে দাঙ্জালের আবির্ভাব, ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের অভ্যুত্থান ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ উল্লেখিত আছে। হাদীসটির অনুবাদ নিম্নরূপ :

হযরত নাওয়াস ইবনে-সামআন (রাঃ) বলেন : রসুলুল্লাহ (সাঃ) একদিন ভোর বেলা দাঙ্জালের আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন, যদ্বারা মনে হচ্ছিল যে, সে নেহাতই তুচ্ছ ও নগণ্য (উদাহরণতঃ সে কানা হবে।) পক্ষান্তরে কিছু কথা এমন বললেন, যদ্বারা মনে হচ্ছিল যে, তার ফেনা অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠোর হবে। (উদাহরণতঃ জন্মাত ও দোষখ তার সাথে থাকবে এবং অন্যান্য আরও অশ্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটবে।) রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বর্ণনার ফলে (আমরা এমন ভীত হয়ে পড়লাম,) যেন দাঙ্জাল খর্ব্বর বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যেই রয়েছে। (অর্থাৎ, অদূরেই বিরাজমান রয়েছে।) বিকালে যখন আমরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আমাদের মনের অবস্থা আঁচ করে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি বুঝে? আমরা আরয় করলাম : আপনি দাঙ্জালের

(৯৭) অতঃপর ইয়াজ্জুজ ও মাজ্জুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হল না। (৯৮) যুলকারনাইন বললেন : এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য। (৯৯) আমি সেদিন তাদেরকে দলে দলে তারঙ্গের আকারে ছেড়ে দেব এবং শিকার্য ফাঁককার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করে আনব। (১০০) সেদিন আমি কাফেরদের কাছে জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব। (১০১) যাদের চক্ষুসমূহের উপর পর্দা ছিল আমার সুরণ থেকে এবং যারা শুনতেও সক্ষম ছিল না। (১০২) কাফেররা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? আমি কাফেরদের অভ্যর্থনার জন্যে জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি। (১০৩) বলুন : আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। (১০৪) তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিবজীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সংকর্ম করছে। (১০৫) তারাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নির্দর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কেয়ামতের দিন তাদের জন্যে আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না। (১০৬) জাহান্নাম - এটাই তাদের প্রতিফল; কারণ, তারা কাফের হয়েছে এবং আমার নির্দর্শনাবলী ও রসুলগণকে বিদ্বেষের বিষয়গ্রন্থে গ্রহণ করেছে। (১০৭) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্যে আছে জন্মাতুল ফেরদাউস। (১০৮) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না। (১০৯) বলুন : আমার পালনকর্তার কথা, লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও।

আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কিছু কথা বলেছেন, যাতে বোঝা যায় যে, তার ব্যাপারটি নেহাভই ভুছ এবং আরও কিছু কথা বলেছেন, যাতে মনে হয়, সে খুব শক্তিসম্পন্ন হবে এবং তার ফেৎনা হবে খুব গুরুতর। এখন আমাদের মনে হয়েছে যে, যেন সে আমাদের নিকটেই খজুরবৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তোমাদের সম্পর্কে আমি যেসব ফেৎনার আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে দাঙ্জালের তুলনায় অন্যান্য ফেৎনা অধিক ভয়েরযোগ্য। (অর্থাৎ, দাঙ্জালের ফেৎনা এতটুকু গুরুতর নয়, যতটুকু তোমার মনে করছ।) যদি আমার জীবদ্দশায় সে আবির্ভূত হয়, তবে আমি নিজে তার মোকাবেলা করব। (কাজেই তোমাদের চিন্তান্বিত হওয়ার কোন কারণ নেই।) পক্ষান্তরে সে যদি আমার পরে আসে, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পরাভূত করার চেষ্টা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানের সাহায্যকারী। (তার লক্ষণ এই যে, সে যুবক, ঘন কঁোকড়ানা চুলওয়ালা হবে। তার একটি চক্ষু উপরের দিকে উন্মিত হবে (এবং অপর চক্ষুটি হবে কানা।) যদি আমি (কুৎসিত চেহারার) কোন ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি, তবে সে হচ্ছে আবদুল ওযযা ইবনে-কুত্না। (জাহেলিয়াত আমলে কুৎসিত চেহারার 'বনু-খোযাআ' গোত্রের এ লোকটির তুলনা ছিল না।) যদি কোন মুসলমান দাঙ্জালের সম্মুখীন হয়ে যায়, তবে সূরা কাহফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে নেয়া উচিত। (এতে সে দাঙ্জালের ফেৎনা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।) দাঙ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা তার মোকাবেলায় সুদৃঢ় থাক।

আমরা আরয করলাম : ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ), সে কতদিন থাকবে। তিনি বললেন : সে চল্লিশ দিন থাকবে, কিন্তু প্রথম দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতই হবে। আমরা আরয করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, আমরা কি তাতে শুধু এক দিনের (পাঁচ ওয়াক্ত) নামাযই পড়ব? তিনি বললেনঃ না; বরং সময়ের অনুমান করে পূর্ণ এক বছরের নামায পড়তে হবে। আমরা আবার আরয করলাম : ইয়া রসূলুল্লাহ, সে কেমন দ্রুতগতিতে সফর করবে? তিনি বললেন : সে মেঘখণ্ডের মত দ্রুত চলবে, যার পেছনে অনুকূল বাতাস থাকে। দাঙ্জাল কোন সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে তাকে মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেবে। তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে সে মেঘমালাকে বর্ষণের আদেশ দেবে। ফলে, বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং মাটিকে আদেশ দেবে; ফলে সে শস্য-শ্যামলা হয়ে যাবে। (তাদের চতুষ্পদ জন্তু তাতে চরবে।) সন্ধ্যায় যখন জন্তুগুলো ফিরে আসবে, তখন তাদের কুঁজ পূর্বের তুলনায় উঁচু হবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর দাঙ্জাল অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকেও কুফরের দাওয়াত দেবে। কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে সেখানকার মুসলমানরা দুর্ভিক্ষে পতিত হবে। তাদের কাছে কোন অর্থ কড়ি থাকবে না। সে শস্যবিহীন অনুর্বর ভূমিকে সম্ভাষণ করে বলবে : তোর গুপ্তধন বাইরে নিয়ে আয়। সেমতে ভূমির গুপ্তধন তার পেছনে পেছনে চলে; যেমন মৌমাছিরা তাদের সরদারের পেছনে পেছনে চলে। অতঃপর দাঙ্জাল একজন ভরপুর যুবক ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে দেবে। তার উভয় খণ্ড এতটুকু দূরত্বে রাখা হবে; যেমন তীর নিক্ষেপকারী ও তার লক্ষ্যবস্তুর মাঝখানে থাকে। অতঃপর সে তাকে ডাক দেবে। সে (জীবিত হয়ে) দাঙ্জালের কাছে প্রফুল্ল চিহ্নে চলে

আসবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ তাআলাই হযরত ঈসা (আঃ)-কে নামিয়ে দেবেন। তিনি দু'টি রঙিন চাদর পরে দামেস্ক মসজিদের পূর্ব দিককার সাদা মিনারে ফেরেশতাদের পাখার উপর পা রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মস্তক অবনত করবেন, তখন তা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে। (মনে হবে যেন এখনই গোসল করে এসেছেন।) তিনি যখন মস্তক উঁচু করবেন, তখনও মোমবাতির মত স্বচ্ছ পানির ফোঁটা পড়বে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস যে কাফেরের গায়ে লাগবে, সে সেখানেই মরে যাবে। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর দৃষ্টির সমান দূরত্বে পৌঁছাবে। হযরত ঈসা (আঃ) দাঙ্জালকে ঝুঁজতে ঝুঁজতে বাবুলুদে গিয়ে তাকে ধরে ফেলবেন। (এই জনপদটি এখনও বায়তুল-মোকাদ্দাসের অদূরে এ নামেই বিদ্যমান।) সেখানে তাকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে আসবেন, স্লেহভরে মানুষের চেহারায় হাত বুলাবেন এবং তাদেরকে জ্ঞানতের সুউচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ শোনাবেন।

এমতাবস্থায় আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করবেন : আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন লোক বের করব, যাদের মোকাবেলা করার শক্তি কারও নেই। কাজেই আপনি মুসলমানদেরকে সমবেত করে তুর পর্বতে চলে যান।

(সেমতে তিনিই তাই করবেন।) অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইয়াজ্জ-মাজ্জের রাস্তা খুলে দেবেন। তাদের দ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নীচে এসে পড়ছে। তাদের প্রথম দলটি তবরিয়া উপসাগরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পানি পান করে এমন অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোন দিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস করতে পারবে না।

ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা তুর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্য মুসলমানরা নিজ নিজ দুর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বস্তুসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মস্তককে একশ' দিনারের চাইতে উত্তম মনে করা হবে। হযরত ঈসা (আঃ) ও অন্যান্য মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। (আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন।) তিনি মহামারী আকারে রোগব্যাদি পাঠাবেন। ফলে, অল্প সময়ের মধ্যে ইয়াজ্জ-মাজ্জের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে তুর পর্বত থেকে নীচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধ হাত পরিমিত স্থানও খালি নেই এবং (মৃতদেহ পচে) অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। (এ অবস্থা দেখে পুনরায়) হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন (যেন এই বিপদও দূর করে দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা এ দোয়াও কবুল করবেন এবং বিরাটাকার পাখী প্রেরণ করবেন, যাদের ঘাড় হবে উটের ঘাড়ের মত। তারা (মৃতদেহগুলো উঠিয়ে যেখানে আল্লাহ ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবে।) কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কোন নগর ও বন্দর এ বৃষ্টি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাঁচের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেন : তোমার পেটের সমুদয় ফল-ফুল উদগীরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। (ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে,) একটি ডালিম একদল লোকের আহ্বারের জন্যে যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরী করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উষ্ট্রের দুধ একদল লোকের জন্যে, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্যে

এবং একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবারের জন্যে যথেষ্ট হবে। (চল্লিশ বছর যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শাস্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকার পর যখন কেয়ামতের সময় সমাগত হবে; তখন) আল্লাহ্ তাআলা একটি মনোরম বায়ু প্রবাহিত করবেন। এর পরশে সব মুসলমানের বগলের নীচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হবে; শুধু কাকের ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তারা ভূপৃষ্ঠে জঙ্ঘ-জানোয়ারের মত খোলাখুলি অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কেয়ামত আসবে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে-ইয়াযীদের রেওয়াজেতে ইয়াজুজ-মাজুজের কাহিনীর আরও অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছে : তবরিয়া উপসাগর অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বায়তুল-মোকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল-খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবে : আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহর আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে (যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।)

দাঙ্গালের কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) রেওয়াজেতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, দাঙ্গাল মদীনা মুনাওয়রা থেকে দূরে থাকবে। মদীনার পথসমূহে আসাও তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সে মদীনার নিকটবর্তী একটি লবণাক্ত ভূমিতে আগমন করবে। তখন সমসাময়িক এক মহান ব্যক্তি তার কাছে এসে বলবেন : আমি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বলছি যে, তুই সেই দাঙ্গাল, যার সংবাদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে দিয়েছিলেন। (একথা শুনে) দাঙ্গাল বলবে : লোক সকল। যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দেই তবে আমি যে খোদা এ ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করবে কি? সবাই উত্তর দেবে : না। অতঃপর সে লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দেবে। লোকটি জীবিত হয়ে দাঙ্গালকে বলবেন : এবার আমার বিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে যে, তুই-ই সে দাঙ্গাল। দাঙ্গাল তাকে পুনরায় হত্যা করতে চাইবে, কিন্তু সমর্থ হবে না। - (মুসলিম)

সহীহ বোখারী ও মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরীর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন : কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-কে বলবেন : আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে তুলে আনুন। তিনি আরম্ভ করবেন, হে পরওয়ারদেগার, তারা কারা? আল্লাহ্ তাআলা বলবেন : প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতী। একথা শুনে সাহাবায়ে কেয়াম শিউরে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমাদের মধ্যে সে একজন জান্নাতী কে হবে? তিনি উত্তরে বললেন : চিন্তা করো না। এই নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী তোমাদের মধ্য থেকে এক এবং ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এক হাজারের হিসেবে হবে। মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র মানবজাতিকে দশ ভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে নয় ভাগে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজের লোক, আর অবশিষ্ট এক ভাগে সারা বিশ্বের মানুষ। - (বুখারী-আ'আনী)

ইবনে-কাসীর “আল-বেদায়া-ওয়ান্নেহায়াহ” গ্রন্থে এসব রেওয়াজেতে উল্লেখ করে বলেন : এতে বোঝা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চাইতে অনেক বেশী হবে।

মুসনাদ আহমদ ও আবু দাউদে হযরত আবু হোরায়রার রেওয়াজেতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ ঈসা (আঃ) অবতরণের পর চল্লিশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। মুসলিমের এক রেওয়াজেতে সাত বছরের কথা বলা হয়েছে। “ফতহুল বারী” গ্রন্থে হাফেজ ইবনে-হাজার একে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করে চল্লিশ বছরে মেয়াদকেই শুদ্ধ বলেছেন। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই দীর্ঘ সময় সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হবে এবং অসংখ্য বরকত প্রকাশ পাবে। পরম্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতার লেশমাত্র থাকবে না। দু'ব্যক্তির মধ্যে কোন সময় খগড়-বিবাদ হবে না। - (মুসলিম ও আহমদ)

বোখারী হযরত আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহর হজ্জ ও ওমরা অব্যাহত থাকবে। - (মায়হরী)

বোখারী ও মুসলিম হযরত যয়নব বিনতে জাহশের রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদিন ঘুম থেকে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তাঁর মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাত এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিলঃ

“আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই।” আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তজনী মিলিয়ে বৃত্ত তৈরী করে দেখান।

হযরত যয়নব (রাঃ) বলেন : একথা শুনে আরম্ভ করলাম : ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমাদের মধ্যে সৎকর্ম পরায়ণ লোক জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, ধ্বংস হতে পারে; যদি অনাচারের আধিক্য হয়। - (আল-বেদায়া ওয়ান্নেহায়াহ) ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে বৃত্ত পরিমাণ ছিদ্র হয়ে যাওয়া আসল অর্থও হতে পারে এবং রূপক হিসেবে প্রাচীরটি দুর্বল হয়ে যাওয়ার অর্থও হতে পারে। - (ইবনে কাসীর, আবু হায়্যান)

মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা হযরত আবু হোরায়রার রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন : ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যহ যুলকারনাইনের দেয়ালটি ঝুঁড়তে থাকে। ঝুঁড়তে ঝুঁড়তে তারা এ লৌহ-প্রাচীরের প্রান্ত সীমার এত কাছাকাছি পৌঁছে যায় যে, অপরপার্শ্বের আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্তু তারা এ কথা বলে ফিরে যায় যে, বাকী অংশটুকু আগামী কাল ঝুঁড়বে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে নেন। পরের দিন ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ্ পাক থেকে তা মেরামতের এ ধারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধ রাখা আল্লাহর ইচ্ছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ্ তাআলা ওদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা মেরনত শেষে বলবে : আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আমরা আগামীকাল অবশিষ্ট অংশটুকু ঝুঁড়ে ওপারে চলে যাব। (আল্লাহর নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তওফীক হয়ে যাবে।) অতএব পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে ভেঙে ফেলবে। অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু ঝুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে।

ইবনে-কাসীর “আল-বেদায়া-ওয়ানুহায়াহ” গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেন : যদি মেনে নেয়া হয় যে, হাদীসের মূল বক্তব্যটি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নয়; বরং কা’ব আহবাবের বর্ণনা, তবে এটা যে ধর্ভব্য ও নির্ভরযোগ্য নয়, তা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি একে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বক্তব্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, ইয়াজ্জু-মাজ্জুজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন শুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্তী হবে। কোরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিদ্র করা যাবে না এটা তখনকার অবস্থা, যখন যুলকারনাইন প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন। কাজেই এতে কোন বৈপরীত্য নেই। তাছাড়া আরো বলা যায় যে, কোরআনে ছিদ্র বলে এপার-ওপার ছিদ্র বোঝানো হয়েছে। হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, তাদের এ ছিদ্র এপার-ওপার হবে। - (বেদায়া, ২য় খণ্ড, ১১২ পৃঃ)

হাফেজ ইবনে-হাজার “ফতহুল বারী” গ্রন্থে এই হাদীসটি আবদ ইবনে-হুমায়দ ও ইবনে-হাব্বানের বরাতে দিয়েও উদ্ধৃত করে বলেছেন : তাঁরা সবাই হযরত কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং কোন কোন হাদীসে সনদের ব্যক্তিবর্গ সহীহ বোখারীর ব্যক্তিবর্গ। তিনি হাদীসটি যে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেননি। তিনি ইবনে-আরাবীর বরাতে দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসে তিনটি মু’জ্জিয়া রয়েছে। (এক) আল্লাহ তাআলা তাদের চিন্তাধারা এদিকে নির্বিশেষ হতে দেননি যে, প্রাচীর খননের কাজ অবিরাম দিবারাৎ অব্যাহত রাখবে। নতুবা দিন ও রাত্রির কর্মসূচী আলাদা নির্ধারণ করে কাজ সমাপ্ত করা এত বড় জাতির পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। (দুই) আল্লাহ তাআলা প্রাচীরের উপরে উঠার পরিকল্পনা থেকেও তাদের চিন্তাধারাকে সরিয়ে রেখেছেন। অথচ ওয়াহব ইবনে-মুনাব্বহর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তারা ক্বিশিল্পে পারদর্শী ছিল। সব রকম যন্ত্রপাতি তাদের কাছে ছিল। তাদের ভূখণ্ডে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষও ছিল। কাজেই প্রাচীরের উপরে আরোহণ করার উপায় সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। (তিন) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের মনে ‘ইনশা’লাহ’ বলার কথা জাগ্রত হলে না। তাদের বের হওয়ার নির্ধারিত সময় আসলেই কেবল তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত হবে।

ইবনে-আরাবী বলেন : এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, ইয়াজ্জু-মাজ্জুজের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাস রাখে। এটাও সম্ভব যে, বিশ্বাস ছাড়াই আল্লাহ তাআলা তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত করিয়ে দেবেন এবং এর বরকতে তারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করবে। - (আসারাতুস-সায়া, সৈয়দ মুহাম্মদ, ১৫৪ পৃঃ) কিন্তু বাহাতঃ বোঝা যায় যে, তাদের কাছেও পয়গম্বরদের দাওয়াত পৌঁছেছে। নতুবা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের জাহান্নামের শাস্তি না হওয়াই উচিত। কোরআন বলে : وَمَا لَكُمْ مَعَدَّةٍ يَوْمَئِذٍ هَٰذَا هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي كُنْتُمْ تُكَذِّبُونَ এতে বোঝা যায় যে, তারাও ঈমানের দাওয়াত লাভ করেছে। কিন্তু তারা কুফরকে আঁকড়ে রেখেছে। তাদের কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহর অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাসী হবে। তবে কেসালত ও আখেরাতে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু এতটুকু বিশ্বাসই ঈমানের জন্যে যথেষ্ট নয়। মোটকথা, ইনশা’লাহ কালেমা

বলার পরও কুফরের অস্তিত্ব থাকতে পারে।

হাদীসসমূহের বর্ণনা থেকে অর্জিত ফলাফল : উল্লেখিত হাদীসসমূহে ইয়াজ্জু-মাজ্জুজ সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে নিম্নলিখিত বিষয়াদি প্রমাণিত হয়েছে :

(১) ইয়াজ্জু-মাজ্জুজ সাধারণ মানুষের মতই মানুষ এবং নৃহ (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততি। অধিকাংশ হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদগণ তাদেরকে ইয়াজ্জু-মাজ্জুজ ইবনে নূহের বংশধর সাব্যস্ত করেছেন। একথাও বলাবাহুল্য যে, ইয়াজ্জু-মাজ্জুজের বংশধর নূহ (আঃ)-এর আমল থেকে যুলকারনাইনের আমল পর্যন্ত দূর-দূরান্তের বিভিন্ন গোত্রে ও বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব সম্প্রদায়ের নাম ইয়াজ্জু-মাজ্জুজ, জরুরী নয় যে, তারা সবাই যুলকারনাইনের প্রাচীরের ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের কিছু গোত্র ও সম্প্রদায় প্রাচীরের এপারেও থাকতে পারে। কিন্তু ইয়াজ্জু-মাজ্জুজ শুধু তাদেরই নাম, যারা বর্বর, অসভ্য ও রক্তপিপাসু, যালেম। মোগল, তুর্কী অথবা মঙ্গোলীয় জাতি যারা সভ্যতা লাভ করেছে, তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা নামের বাইরে।

(২) ইয়াজ্জু-মাজ্জুজের সংখ্যা বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার চাইতে অনেক গুণ বেশী, কমপক্ষে এক ও দশের ব্যবধান। - (২নং হাদীস)

(৩) ইয়াজ্জু-মাজ্জুজের যেসব সম্প্রদায় ও গোত্র যুলকারনাইনের প্রাচীরের কারণে ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে, তারা কেয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত এভাবেই আবদ্ধ থাকবে। তাদের বের হওয়ার সময় মেহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব, অতঃপর দাজ্জালের আগমনের পরে হবে, যখন ঈসা (আঃ) অবতরণ করে দাজ্জালের নিধন কার্য সমাপ্ত করবেন। - (১নং হাদীস)

(৪) ইয়াজ্জু-মাজ্জুজের মুক্ত হওয়ার সময় যুলকারনাইনের প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে সমতলভূমির সমান হয়ে যাবে। - (কোরআন) তখন ইয়াজ্জু-মাজ্জুজের অগণিত লোক একযোগে পর্বতের উপর থেকে অবতরণের সময় দ্রুতগতির কারণে মনে হবে যেন তারা পিছলে পিছলে নীচে গড়িয়ে পড়ছে। এই অপরিসীম বর্বর মানবগোষ্ঠীর সাধারণ জনবসতি ও সমগ্র পৃথিবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠরাজ্যের মোকাবেলা করার সাধ্য কারও থাকবে না। আল্লাহর রসুল হযরত ঈসা (আঃ) ও আল্লাহর আদেশে মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে তুর পর্বতে আশ্রয় নেবেন এবং যেখানে যেখানে কেবলা ও সংরক্ষিত স্থান থাকবে, সেখানেই আত্মগোপন করে প্রাণ রক্ষা করবেন। পানাহারের রসদ-সামগ্রী নিঃশেষ হওয়ার পর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে যাবে। এই বর্বর জাতি অবশিষ্ট জনবসতিকে খতম করে দেবে এবং নদ-নদীর পানি নিঃশেষে পান করে ফেলবে। - (১নং হাদীস)

(৫) হযরত ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরই দোয়ায় এই পঙ্গপাল সদৃশ অগণিত লোক নিপাত হয়ে যাবে। তাদের মৃতদেহ সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং দুর্গন্ধের কারণে পৃথিবীতে বাস করা দুরূহ হয়ে পড়বে। - (১নং হাদীস)

(৬) অতঃপর ঈসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরই দোয়ায় তাদের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত অথবা অদৃশ্য করে দেয়া হবে এবং বিশ্বব্যাপী বাষ্টির মাধ্যমে সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে ধুয়ে পাক-সাঁফ করা হবে। - (১নং হাদীস)

(৭) এরপর প্রায় চল্লিশ বছর পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ভূপৃষ্ঠ তার বরকতসমূহ উদ্দীর্ণণ করে দেবে। কেউ দরিদ্র থাকবে না এবং কেউ কেউকে বিব্রত করবে না। সর্বত্রই শান্তি ও সুখ বিরাজ

করবে।— (৩ নং হাদীস)

(৮) শান্তি ও শৃঙ্খলার সময় কা'বা গৃহের হজ্ব ও ওমরাহ্ অব্যাহত থাকবে। (৪নং হাদীস)

হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)—এর ওফাত হবে এবং তিনি রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর রওজা মোবারকে সমাহিত হবেন। অর্থাৎ, তিনি হজ্ব ও ওমরার উদ্দেশ্যেই হেজ্জাহ সফর করার সময় ওফাত পাবেন।— (মুসলিম)

(৯) রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর জীবনের শেষভাগে স্বপ্ন-ওহীর মাধ্যমে তাঁকে দেখানো হয় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরে একটি ছিদ্র হয়ে গেছে। তিনি একে আরবদের ধ্বংস ও অবনতির লক্ষণ বলে সাব্যস্ত করেন। প্রাচীরে ছিদ্র হয়ে যাওয়াকে কেউ কেউ প্রকৃত অর্থেও নিয়েছেন এবং কেউ কেউ রূপক অর্থে বোঝাচ্ছেন যে, প্রাচীরটি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, ইয়াজ্জুজ-মাজ্জের বের হওয়ার সময় নিকটে এসে গেছে এবং এর আলামত আরব জাতির অধঃপতনরূপে প্রকাশিত হবে। **والله اعلم**

(১০) হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণের পর পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন।— (৩নং হাদীস) তাঁর পূর্বে হযরত মাহদী (আঃ)—এর অবস্থানকাল চল্লিশ বছর হবে। তন্মধ্যে কিছুকাল হবে উভয়ের সহযোগিতায়। সৈয়দ শরীফ বরযঞ্জী “আসারাতুসসায়্যাহ্” গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় লেখেন : দাঙ্গালের হত্যা ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঈসা (আঃ) চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে পঁয়তাল্লিশ বছর। ১১২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : হযরত মাহদী (আঃ) হযরত ঈসা (আঃ)—এর ত্রিশের উপর কয়েক বছর আগে আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে চল্লিশ বছর। এভাবে পাঁচ অথবা সাত বছর পর্যন্ত উভয়ে একত্রে বসবাস করবেন। এই উভয়কালের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ন্যায় ও সুবিচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ভূপৃষ্ঠ তার সব বরকত ও গুণুধন উদ্গীরণ করে দেবে। কেউ ফকীর-মিসকীন থাকবে না। পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার লেশমাত্র থাকবে না। অবশ্য মেহদী (আঃ)—এর শেষ আমলে দাঙ্গাল এসে মক্কা, মদীনা বায়তুল-মোকাদ্দাস ও তুর পর্বত ব্যতীত সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফেৎনা ছড়িয়ে দেবে। এই ফেৎনাটি হবে বিশুর সর্ববৃহৎ ফেৎনা। দাঙ্গালের অবস্থান ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা মাত্র চল্লিশ দিন স্থায়ী হবে। তন্মধ্যে প্রথম দিন এক বছরের, দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে সাধারণ দিনেরই মত। এখানে প্রকৃতপক্ষেই দিনগুলো এমন দীর্ঘ করে দেয়া যেতে পারে। কেননা, শেষযুগে প্রায় সব ঘটনাই অভ্যাস বিরুদ্ধ ঘটবে। এমনও সম্ভব যে, দিন তো প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিকই থাকবে, কিন্তু হাদীস থেকে জানা যায় যে, দাঙ্গাল হবে অসাধারণ যাদুকর। কাজেই তার যাদুর প্রভাবে দিব্যাত্মির পরিবর্তন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ধরা না-ও পড়তে পারে। তারা একে একই দিন দেখবে ও মনে করবে। হাদীসে সে দিনে সাধারণ দিন অনুযায়ী অনুমান করে নামায পড়ার আদেশ বর্ণিত রয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, প্রকৃতপক্ষে দিব্যাত্মির পরিবর্তিত হতে থাকবে, কিন্তু মানুষ তা অনুভব করবে না। তাই এই এক বছরের দিনে তিনশ' ঘণ্টা দিনের নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নতুবা দিনটি প্রকৃতপক্ষে একদিন হলে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী তাতে একদিনের নামাযই ফরয হত। মোটকথা, দাঙ্গালের মোট অবস্থানকাল এমনি ধরনের চল্লিশ দিন হবে।

এরপর হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করে দাঙ্গালকে হত্যা করার মাধ্যমে তার ফেৎনারও অবসান ঘটাবেন। কিন্তু এর সাথে সাথেই ইয়াজ্জুজ-মাজ্জও বের হবে। তারা ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র হত্যা ও লুটতরাজ করবে। তাদের অবস্থানকালও কয়েকদিন মাত্র হবে। এরপর হযরত ঈসা (আঃ)—এর দোয়ায় তারা সবাই একযোগে মারা যাবে। মোটকথা, হযরত মেহদীর আমলের শেষভাগে এবং ঈসা (আঃ)—এর আমলের শুরুভাগে দাঙ্গাল ও ইয়াজ্জুজ-মাজ্জের দু'টি ফেৎনা সংঘটিত হবে। এগুলো সারা বিশুর মানুষকে তছনছ করে দেবে। এই কয়েকদিন পূর্বে এবং পরে সমগ্র বিশু ন্যায় এবং সুবিচার, শান্তি ও বরকত এবং ফল ও শস্যের অভূতপূর্ব আধিক্য হবে। হযরত ঈসা (আঃ)—এর আমলে ইসলাম ব্যতীত কোন কলেমা ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না, কোন দীন-দুহী থাকবে না। হিঙ্গ্র এবং বিষাক্ত জীব-জন্তুও একে অপরকে কষ্ট দেবে না।

ইয়াজ্জুজ-মাজ্জ ও যুলকারনাইনের প্রাচীর সম্পর্কিত এসব তথ্য কোরআন ও হাদীসে উন্মতকে অবহিত করেছে। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা জরুরী এবং বিরোধিতা করা নাজায়েয। যুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? ইয়াজ্জুজ-মাজ্জ কোন জাতি? তারা কোথায় বসবাস করে? এসব ভৌগোলিক আলোচনার উপর ইসলামের কোন আকীদা বিশ্বাস এবং কোরআনের কোন আয়াতের মর্ম ও ব্যাখ্যা নির্ভরশীল নয়। এতদসত্ত্বেও বিরোধী পক্ষের আবেল-তাবেল বকাবকির জওয়াব এবং অতিরিক্ত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আলেমরা এগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এ আলোচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

কুরতুবী স্বয়ং তফসীর গ্রন্থে সুন্দীর বরাতে দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াজ্জুজ-মাজ্জের বাইশটি গোত্রের মধ্য থেকে একশটি গোত্রকে যুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। একটি গোত্র প্রাচীরের এপারে রয়ে গেছে। আর সে গোত্রটি হল তুর্ক। এরপর কুরতুবী বলেন : রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তুর্কদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো ইয়াজ্জুজ-মাজ্জের সাথে খাপ খায়। শেষ যমানায় তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের কথা হুহী মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। অতঃপর কুরতুবী বলেন : বর্তমান সময় তুর্ক জাতির বিপুল সংখ্যক লোক মুসলমানদের মোকাবেলা করার জন্যে অগ্রসরমান। তাদের সঠিক সংখ্যা আলাহ্ তাআলাই জানেন। তিনিই মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচাতে পারেন। মনে হয় যেন তারাই ইয়াজ্জুজ-মাজ্জের অথবা কমপক্ষে তাদের অগ্রসেনাদল।— (কুরতুবী, একাদশ খণ্ড, ৫৮ পৃঃ) কুরতুবীর সময়কাল ষষ্ঠ হিজরী। তখন তাতারীদের ফেৎনা প্রকাশ পায় এবং তারা ইসলামী খেলাফতকে তছনছ করে দেয়। ইসলামী ইতিহাসে তাদের এই ফেৎনা সুবিদিত। তাতারীরা যে মোগল তুর্কদের বংশধর; তাও প্রসিদ্ধ।) কিন্তু কুরতুবী তাদেরকে ইয়াজ্জুজ-মাজ্জের সমতুল্য এবং অগ্রসেনাদল সাব্যস্ত করেছেন। তাদের ফেৎনাকে ইয়াজ্জুজ-মাজ্জের আবির্ভাব বলেননি, যা কয়ামতের অন্যতম আলামত। কেননা, মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ)—এর অবতরণের পর তাঁর আমলে ইয়াজ্জুজ-মাজ্জের আবির্ভাব হবে।

এ কারণেই আলাহ্মা আলুমী তফসীর রুহুল-মা'আনীতে যারা তাতারীদেরকে ইয়াজ্জুজ-মাজ্জ সাব্যস্ত করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেছেন : এরূপ ধারণা করা প্রকাশ্য রকমের পথভ্রষ্টতা এবং হাদীসের বর্ণনার সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ। তবে তিনিও বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে তাতারীদের ফেৎনা ইয়াজ্জুজ-মাজ্জের ফেৎনার সমতুল্য।— (১৬শ খণ্ড, ৪৪ পৃঃ) বর্তমান যুগে কিছুসংখ্যক ইতিহাসবিদ

বর্তমান রাশিয়া অথবা চীন অথবা উভয়কেই ইয়াজুজ-মাজুজ সাব্যস্ত করেন। তাদের উদ্দেশ্য যদি কুরভূবী ও আলুসীর মতই হয় যে, তাদের ফেৎনা ইয়াজুজ-মাজুজের ফেৎনার সমতুল্য, তবে তা ভ্রান্ত হবে না। কিন্তু তাঁরা যদি তাদেরকেই কেয়ামতের আলামতরূপে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হিসেবে সাব্যস্ত করেন, যার সময় ঈসা (আঃ) এর অবতরণের পরে বলা হয়েছে, তবে তা নিশ্চিতই ভ্রান্তি, পঞ্চদ্রষ্টতা ও হাদীসের বর্ণনার বিরুদ্ধাচরণ হবে।

খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায সপ্ত ভূখণ্ডের মধ্য থেকে ষষ্ঠ ভূখণ্ডের আলোচনায় ইয়াজুজ-মাজুজ, যুলকারনাইনের প্রাচীর এবং তাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণজ্ঞানিত নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছেন :

সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে পশ্চিমদিকে তুর্কীদের কাঞ্জাক ও চর্কস নামে অভিহিত গোত্রসমূহ বসবাস করে এবং পূর্বদিকে ইয়াজুজ-মাজুজের বসতি বিদ্যমান। তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে ককেশাস পর্বতমালা অবস্থিত। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই পর্বতমালা চতুর্থ ভূখণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু হয়ে এই ভূখণ্ডেরই শেষ উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর ভূমধ্য সাগর থেকে পৃথক হয়ে উত্তর-পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হয়ে পঞ্চম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ লাভ করেছে। এখান থেকে তা আবার প্রথমদিকে মোড় নিয়েছে এবং সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ করেছে। এখানে পৌছে তা দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম হয়ে চলে গেছে। এই পর্বতমালার মাঝখানে সিকান্দরী প্রাচীর অবস্থিত, আমরা এহিমায যার উল্লেখ করেছি এবং কোরআনও যার সংবাদ দিয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে খরদাযবাহ স্বীয় ভূগোল গ্রন্থে আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহর একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, প্রাচীর খুলে গেছে। এতে তিনি অস্থির হয়ে উঠে বসেন এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে তাঁর মুখপাত্র সালামকে প্রেরণ করেন। সে ফিরে এসে এই প্রাচীরের অবস্থা বর্ণনা করে — (ইবনে খলদুনের ‘মুকাদ্দামা’ ৭৯ পৃঃ)

আব্বাসী খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ কর্তৃক যুলকারনাইনের প্রাচীর পর্যবেক্ষণের জন্যে একটি দল প্রেরণ করা এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসার কথা ইবনে-কাসীরও “আল-বেদায়া ওয়ান্নাহয়াহ” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, এই প্রাচীর লৌহনির্মিত। এতে বড় বড় তালাবন্ধ দরজাও আছে এবং একটি উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। তফসীর কবীর ও তাবারী এই ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেন : যে ব্যক্তি এই প্রাচীর পরিদর্শন করে ফিরে আসতে চায়, গাইড তাকে এমন লত-পাতা বিহীন প্রান্তরে পৌছে দেয়, যা সমরস্বন্দের বিপরীত দিকে অবস্থিত। — (তফসীর কবীর, ৫ম খণ্ড ৫১ পৃঃ)

শুদ্ধেয় ওস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) “আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতে ঈসা (আঃ)” গ্রন্থে ইয়াজুজ-মাজুজ ও যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যতটুকু বর্ণনা করেছেন তা অনুসন্ধান ও রেওয়াজেতের মাপকাঠিতে উৎকৃষ্ট পর্যায়ের। তিনি বলেন : দুশ্বস্তকারী ও বর্বর মানুষদের লন্ঠন থেকে আত্মরক্ষার জন্যে পৃথিবীতে এক নয়— বহু জায়গায় প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন বাদশাহগণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করেছেন। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রসিদ্ধ হচ্ছে চীনের প্রাচীর। এর দৈর্ঘ্য আবু হাইয়ান আন্দালুসী (হিরানের শাহী দরবারের ঐতিহাসিক) বার শ’ মাইল বর্ণনা করেছেন। এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন চীন সম্রাট ‘ফগফু’। এর

নির্মাণের তারিখ আদম (আঃ)—এর অবতরণের তিন হাজার চার শ’ ষাট বছর পর বর্ণনা করা হয়। এই চীন প্রাচীরকে মোগলরা “আনকুদাহ” এবং তুর্কীরা “বুরকুরকা” বলে থাকে। তিনি আরও বলেন : এমনি ধরনের আরও কয়েকটি প্রাচীর বিভিন্ন স্থানে পরিদৃষ্ট হয়।

মওলানা হিফজুর রহমান সিহওয়ারী (রহঃ) কাসাসুল কোরআনে বিস্তারিতভাবে শাহ সাহেবের উপরোক্ত বর্ণনার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছে। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

ইয়াজুজ-মাজুজের লন্ঠন ও ধ্বংসকাণ্ড সাধনের পরিধি বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। একদিকে ককেশিয়ার পাদদেশে বসবাসকারীরা তাদের জলুম ও নির্যাতনের শিকার ছিল এবং অপরদিকে তিব্বত ও চীনের অধিবাসীরাও ছিল সর্বক্ষণ তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। এই ইয়াজুজ-মাজুজের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে একাধিক প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ প্রাচীর হচ্ছে চীনের প্রাচীর। উপরে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রাচীর মধ্য-এশিয়ার বুখারা ও তিরমিযের নিকটে অবস্থিত। এর অবস্থানস্থলের নাম দরবন্দ। এই প্রাচীরটি খ্যাতনামা মোগল সম্রাট তৈমুরের আমলে বিদ্যমান ছিল। রোম সম্রাটের বিশেষ সভাসদ সীলা বজ্র জর্মনীও তার গ্রন্থে এর কথা উল্লেখ করেছেন। আন্দালুসের সম্রাট কান্টাইলের দূত ক্ল্যাফছুও তার ভ্রমণ কাহিনীতে এর উল্লেখ করেছেন। ১৪০৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি সম্রাটের দূত হিসেবে তৈমুরের দরবারে পৌছেন, তখন এ স্থান অতিক্রম করেন। তিনি লিখেন : বাবুল হাদীদের প্রাচীর মুসেলের ঐ পাথে অবস্থিত, যা সমরখন্দ ও ভারতের মধ্যস্থলে বিদ্যমান। — (তফসীরে জওয়াহরুল-কোরআন, তানতাজী, ৯ম খণ্ড, ১৯৮ পৃঃ)

তৃতীয় প্রাচীর রাশিয়ান এলাকা দাগিস্তানে অবস্থিত। এটিও দরবন্দ ও বাবুল আবওয়াব নামে খ্যাত। ইয়াকুত হমভী ‘মুজামুল বুলদানে’, ইন্দরসী ‘জুগরাফিয়া’ এবং বুস্তানী দায়েরাতুল মাআরিফে এর অবস্থা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

দাগিস্তানে দরবন্দ রাশিয়ার একটি শহর। শহরটি কাম্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এটি ৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৪৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৫° পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৪৮° ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। একে দরবন্দে নওশেরওয়া নামেও অভিহিত করা হয়। তবে বাবুল-আবওয়াব নামে তা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

চতুর্থ প্রাচীর বাবুল-আবওয়াব থেকে পশ্চিম দিকে ককেশিয়ার সুউচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। সেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে দারিয়াল নামে একটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ রয়েছে। এই চতুর্থ প্রাচীরটি এখানে কাফকায অথবা জাবালে-কোফা অথবা কাফ পর্বতমালার প্রাচীর নামে খ্যাত। বুস্তানী এ সম্পর্কে বলেন :

এবং এরই (অর্থাৎ, বাবুল-আবওয়াব প্রাচীরের) নিকটে আরও একটি প্রাচীর রয়েছে, যা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। সম্ভবতঃ পারস্যবাসীরা উত্তরাঞ্চলীয় বর্বরদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এটি নির্মাণ করেছেন। এর নির্মাতা সম্পর্কে সঠিক ও বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা জানা যায়নি। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কেউ কেউ একে সিকান্দরের প্রতি, কেউ কেউ পারস্য সম্রাট নওশেরওয়া প্রতী এর সম্বন্ধ নির্দেশ করেছে। ইয়াকুত বলেন : গলিত তামা দ্বারা এটি নির্মিত হয়েছে। — (দায়েরাতুল-মা’আরিফ ৭ম খণ্ড, ৬৫ পৃঃ)

এসব প্রাচীর সবগুলোই উত্তরদিকে অবস্থিত এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে। তাই এগুলোর মধ্যে যুলকারনাইনের প্রাচীর কোনটি, তা নির্ণয় করা কঠিন। শেষোক্ত দু'টি প্রাচীরের ব্যাপারেই অধিক মতভিন্নতা দেখা দিয়েছে। কেননা, উভয়স্থানের নাম দরবন্দ এবং উভয়স্থলে প্রাচীরও বিদ্যমান রয়েছে। উল্লেখিত চারটি প্রাচীরের মধ্যে সবচাইতে বড় ও সবচাইতে প্রাচীন চীনের প্রাচীর যুলকারনাইনের প্রাচীর নয়, এ বিষয়ে সবাই একমত। এটি উত্তরদিকে নয়— দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত। কোরআন পাকের ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরটি উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত।

এখন উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত তিনটি প্রাচীর সম্পর্কিত পর্যালোচনা বাকী রয়ে গেল। তন্মধ্যে মাসউদী, ইসতাকরী, হমভী প্রমুখ ইতিহাসবিদ সাধারণভাবে সে প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেন, যা দাগিস্তান অথবা ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দ নামক স্থানে কাম্পিয়ানের তীরে অবস্থিত। বুখারা ও তিরমিযির দরবন্দে অবস্থিত প্রাচীরকে যারা যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেছেন, তারা সম্ভবতঃ দরবন্দ নাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এখন যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ, দু'টি প্রাচীরের মধ্যে ব্যাপার সীমিত হয়ে গেছে। (এক) দাগিস্তান ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়াবের দরবন্দে প্রাচীর এবং (দুই) আরও উচ্চ কাফকায অথবা কাফ অথবা ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীর : উভয়স্থানে প্রাচীরের অস্তিত্ব ইতিহাসবিদদের কাছে প্রমাণিত রয়েছে।

হযরত মওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) “আকীদাতুল ইসলাম” গ্রন্থে উভয় প্রাচীরের মধ্য থেকে ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এটিই যুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর।

যুলকারনাইনের প্রাচীর এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে, না ভেঙ্গে গেছে : ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিশেষজ্ঞরা আজকাল উপরোক্ত প্রাচীরসমূহের কোনটির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তারা একথাও স্বীকার করেন না যে, ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের পথ অদ্যাবধি বন্ধ রয়েছে। এরই ভিত্তিতে কোন কোন মুসলমান ইতিহাসবিদও একথা বলতে লিখতে শুরু করেছেন যে, কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজ বহু পূর্বেই বের হয়ে গেছে। কেউ কেউ হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঝটিকার বেগে উখিত তাতারীদেরকেই এর নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বর্তমান যুগের পরাশক্তি রাশিয়া, চীন ও ইউরোপীয়দেরকে ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজ বলে দিয়ে ব্যাপারটি সাঙ্গ করে দিয়েছেন। কিন্তু উপরের রহুল মা'আনীর বরাতে দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সহীহ হাদীসসমূহ অস্বীকার করা ছাড়া কেউ একথা বলতে পারে না। কোরআন পাক ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের অভ্যুত্থানকে কেয়ামতের আলামত হিসেবে বর্ণনা করেছে। নাওয়ায ইবনে সামআন প্রমুখ বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের ঘটনাটি ঘটবে দাঙ্গালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আঃ)—এর অবতরণ ও দাঙ্গাল হত্যার পরে। দাঙ্গালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আঃ)—এর অবতরণ যে আজো পর্যন্ত হয়নি, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে যুলকারনাইনের প্রাচীর বর্তমানে ভেঙ্গে গেছে এবং ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের কোন কোন গোত্র এপারে চলে এসেছে— একথা বলাও কোরআন ও হাদীসের কোন সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী নয়— যদি যেনে নেয়া হয় যে, তাদের সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসস্থাপে পরিণতকারী

সর্বশেষ ও সর্বধ্বংসী হামলা এখনও হয়নি ; বরং তা উপরে বর্ণিত দাঙ্গালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আঃ)—এর অবতরণের পরে হবে।

এ ব্যাপারে হযরত ওস্তাদ আল্লামা কাশ্মীরী (রহঃ)—এর সুচিন্তিত বক্তব্য এই : ইউরোপীয়দের এ বক্তব্যের কোন গুরুত্ব নেই যে, তারা সমগ্র ভূপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে যে, কোথাও এই প্রাচীরের অস্তিত্ব নেই। কেননা, স্বয়ং তাদেরই এ ধরনের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, পর্যটন ও অনুেষণের উচ্চতম শিখরে পৌঁছা সত্ত্বেও অনেক অরণ্য, সমুদ্র ও দ্বীপ সম্পর্কে তারা অদ্যাবধি জ্ঞানলাভ করতে পারেনি। এ ছাড়া এরূপ সম্ভাবনাও দূরবর্তী নয় যে, কথিত প্রাচীরটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পাহাড়সমূহের পতন ও পারস্পরিক সংযুক্তির কারণে তা একটি পাহাড়ের আকার ধারণ করে ফেলেছে। কেয়ামতের পূর্বে প্রাচীরটি ভেঙ্গে যাবে অথবা দূরবর্তী পথ ধরে ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের কিছু গোত্র এসে যাবে—কোরআন ও হাদীসের কোন অকাট্য প্রমাণ এ বিষয়েরও পরিপন্থী নয়।

যুলকারনাইনের প্রাচীর কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে— এর পক্ষে বড় প্রমাণ হচ্ছে কোরআন পাকের আয়াত— **وَأَنبَاءَ وَفَرِّقَاتٍ يَمْكُرُ** অর্থাৎ, যুলকারনাইনের এই উক্তি যে, যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি এসে যাবে (অর্থাৎ, ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের বেরিয়ে আসার সময় হবে,) তখন আল্লাহ তাআলা এই লৌহ প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ করে ভূমিসাৎ করে দেবেন। এ আয়াতে **وَعَزَّزْتُ** (আমার পালনকর্তার ওয়াদা) এর অর্থ কেয়ামত নেয়া হয়েছে। অথচ কোরআনের ভাষ্য এই অর্থ অকাট্য নয়; বরং এর পরিস্কার অর্থ এই যে, যুলকারনাইন ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের পথ রুদ্ধ করার যে ব্যবস্থা করেছে, তা সদাসর্বদা যথাযথ থাকা জরুরী নয়। যখন আল্লাহ তাআলা ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের পথ খুলে দেয়ার ইচ্ছা করবেন, তখন এই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও ভূমিসাৎ হয়ে যাবে। এটা কেয়ামতের একান্ত নিকটবর্তী সময়ে হওয়াই জরুরী নয়। সেমতে সব তফসীরবিদই **وَعَزَّزْتُ** এর অর্থে উভয় সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। তফসীর বাহরে—মুহীতে বলা হয়েছেঃ

والوعد يحتتمل ان يراد به يوم القيامة وان يراد به وقت خروج
ياجوج وماجوج -

এটা এভাবেও হতে পারে যে, প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে রাস্তা এখনই খুলে গেছে এবং ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের আক্রমণের সূচনা হয়ে গেছে। ষষ্ঠ হিজরীর তাতারী ফেৎনাকে এর সূচনা সাব্যস্ত করা হোক কিংবা ইউরোপ, রাশিয়া ও চীনের আধিপত্যকে সাব্যস্ত করা হোক। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, এসব সভ্য জাতির আবির্ভাব ও এদের সৃষ্ট ফেৎনাকে কোরআন হাদীসে বর্ণিত ফেৎনা আখ্যা দেয়া যায় না। কারণ, তাদের আবির্ভাব আইন ও কানুনের পন্থায় হচ্ছে। কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত সেই ফেৎনা এমন অকৃত্রিম হত্যাজ্ঞা, লুটতরাজ রক্তপাতের মাধ্যমে হবে, যা পৃথিবীর গোটা জনমণ্ডলীকেই ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে। বরং এর সারমর্ম আবার এই দাঁড়ায় যে, দুষ্কৃতকারী ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের কিছু গোত্র এপারে এসে সভ্য হয়ে গেছে। তারাই ইসলামী দেশসমূহের জন্যে নিঃসন্দেহে বিরাট ফেৎনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের সেসব বর্বর গোত্র হত্যা ও রক্তপাত ছাড়া কিছুই জানে না, তারা এখন পর্যন্ত আল্লাহর বাণীর তফসীর অনুযায়ী এপারে আসেনি। সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশী।

তাদের আবির্ভাব কেয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে।

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিরমিযী ও মুসনাদ আহমদের একটি হাদীস। তাতে উল্লেখিত রয়েছে যে, ইয়াজ্জ-মাজ্জ প্রত্যহই প্রাচীরটি খনন করে। প্রথমতঃ এই হাদীসটি ইবনে কাসীরের মতে **معلول** দ্বিতীয়তঃ এতেও এ বিষয়ের বর্ণনা নেই যে, ইয়াজ্জ-মাজ্জ যেদিন 'ইনশা'লাহ' বলার বরকতে প্রাচীরটি অতিক্রম করবে, সেদিনটি কেয়ামতের কাছাকাছিই হবে। এই হাদীসে এ বিষয়েরও কোন প্রমাণ নেই যে, ইয়াজ্জ-মাজ্জের গোটা জাতি এই প্রাচীরের পাশ্চাতে আবদ্ধ থাকবে। কাজেই তাদের কিছু দল অথবা গোত্র হয়তো দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে এপারে এসে গেছে। আজকালকার শক্তিশালী সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কোন কোন ইতিহাসবিদ একথাও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইয়াজ্জ-মাজ্জ দীর্ঘ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে এপারে আসার পথ পেয়ে গেছে। উপরোক্ত হাদীস এর পরিপন্থী নয়।

যেটিকথা; কোরআন ও হাদীসে এরূপ কোন প্রকাশ্য ও অকাট্য প্রমাণ নেই যে, যুলকারনাইনের প্রাচীর কেয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে অথবা কেয়ামতের পূর্বে এপারের মানুষের উপর তাদের প্রারম্ভিক ও মামুলী আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চূড়ান্ত, ভয়াবহ ও সর্বনাশা আক্রমণ কেয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা ইতিপূর্বে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। মূলকথা এই যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে ইয়াজ্জ-মাজ্জের প্রাচীর ভেঙ্গে রাস্তা খুলে গেছে বলে যেমন অকাট্য ফয়সালা করা যায় না; তেমনি একথাও বলা যায় না যে, প্রাচীরটি কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকা জরুরী। উভয়দিকেরই সম্ভাবনা রয়েছে। **والله اعلم بحقيقة الحال**

بعضهم - **بعضهم** এর সর্বনাম দ্বারা বাহ্যতঃ

ইয়াজ্জ-মাজ্জকেই বোঝানো হয়েছে। তাদের একদল অপরাধলের মধ্যে ঢুকে পড়বে— বাহ্যতঃ এই অবস্থা তখন হবে, যখন তাদের পথ খুলে যাবে এবং তারা পাহাড়ের উচ্চতা থেকে দ্রুতবেগে নীচে অবতরণ করবে। তফসীরবিদগণ অন্যান্য সম্ভাবনাও লিখেছেন।

فَجَعَلَهُم এর সর্বনাম দ্বারা সাধারণ জিন ও মানবজাতিকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের মাঠে সমগ্র জিন ও মানবজাতিকে একত্রিত করা হবে।

أَحْسَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَخْسِرُوا مِثْلَ هَٰذَا

তফসীর বাহরে-মুহীতে বর্ণিত আছে যে, এক্ষেত্রে বাক্য উহা রয়েছে। অর্থাৎ, **يَجِدُ بِهِمْ نَعْمًا وَيَنْتَفِعُونَ بِذَلِكَ الْاِتِّخَاذِ** উদ্দেশ্য এই যে, এসব কাফেররা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছে; তারা কি মনে করে যে, একাজ তাদেরকে উপকৃত করবে এবং এ দ্বারা তাদের কিছুটা কল্যাণ হবে? এই জিজ্ঞাসা অস্বীকারবোধক। অর্থাৎ, এরূপ মনে করা ভ্রান্তি ও মূর্খতা।

يَعْلَوِي (আমার দাস) বলে এখানে ফেরেশতা এবং সেসব পয়গম্বর গণকে বোঝানো হয়েছে দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য ও আল্লাহর শরীকরূপে স্থির করা হয়েছে; যেমন হযরত ওয়ায়ের ও ঈসা (আঃ)। কিছুসংখ্যক আরব ফেরেশতাদেরও উপাসনা করত, পক্ষান্তরে ইহুদীরা ওয়ায়ের (আঃ)-কে এবং খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর শরীকরূপে গ্রহণ করেছে। তাই আয়াতে **الَّذِينَ كَفَرُوا** বলে কাফেরদের

এসব দলকেই বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এখানে “আমার বান্দা” অর্থ নিয়েছেন শয়তান। সুতরাং **الَّذِينَ كَفَرُوا** এর অর্থ হবে যারা শয়তান ও জিনের উপাসনা করে। কেউ কেউ “আমার বান্দা” অর্থ ও সৃজিত এবং মালিকানাধীন বস্তু গ্রহণ করে একে ব্যাপকাকার করে দিয়েছেন। ফলে আশুন, মূর্তি, তারকা ইত্যাদি মিথ্যা উপাস্যও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তফসীরের সারসংক্ষেপে এ অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বাহরে-মুহীতে প্রভৃতি গ্রন্থে প্রথম তফসীরকেই প্রবল সাব্যস্ত করা হয়েছে।

أُولَٰئِكَ এটি **وَالِ** এর বহুবচন। আরবী ভাষায় এ শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে এর অর্থ কাশনির্বাহী, অভাব পূরণকারী, যা সত্য উপাস্যের বিশেষ গুণ। উদ্দেশ্য, তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা।

يَا كَافِرِينَ এখানে প্রথম দুই আয়াত এমন ব্যক্তি ও দলকে

অন্তর্ভুক্ত করেছে, যারা কোন কোন বিষয়কে সং মনে করে তাতে পরিশ্রম করে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তাদের সে পরিশ্রম বৃথা এবং সে কর্মও নিষ্ফল। কুরতুবী বলেন, এ অবস্থা দু'টি কারণে সৃষ্টি হয়। (এক) ভ্রান্তবিশ্বাস এবং (দুই) লোক দেখানো মনোবৃত্তি। অর্থাৎ, সব বিশ্বাস ও ঈমান ঠিক নয়, সে যত ভাল কাজই করুক, যত পরিশ্রমই করুক, পরকালে সবই বৃথা ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হবে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি মানুষকে সম্ভ্রান্ত করার জন্যে লোক দেখানো মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করে সে-ও তার সে কাজের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। এই ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে কোন কোন সাহাবী খারিজী সম্প্রদায়কে এবং কোন কোন তফসীরবিদ মু'তাযেলা, রাওয়াকফে ইত্যাদি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়কে আলাচ্য আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এখানে সেসব কাফেরদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং কেয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে। **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ**

তাই কুরতুবী, আবু হায়্যান, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এখানে প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সেসব কাফের সম্প্রদায়, যারা আল্লাহকেয়ামত ও হিসাব-কিতাব অস্বীকার করে। কিন্তু বাহ্যতঃ তারাও এর ব্যাপক অর্থের সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে না, যাদের অপবিশ্বাস তাদের কর্মকে বরবাদ ও পরিশ্রম নিষ্ফল করে দেয়। হযরত আলী ও সা'দ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী থেকে এ ধরনের উক্তি বর্ণিত আছে—(কুরতুবী)

فَلَا تُؤْمِرُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ অর্থাৎ, তাদের আমল বাহ্যতঃ

বিরাট বলে দেখা যাবে, কিন্তু হিসাবের দাঁড়ি-পাল্লায় তার কোন ওজন হবে না। কেননা, কুফর ও শিরকের কারণে তাদের আমল নিষ্ফল ও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে।

বোখারী ও মুসলিমে আবু হোয়ায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত মতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ কেয়ামতের দিন জনৈক দীর্ঘদেহী স্থলকায় ব্যক্তি আসবে, আল্লাহর কাছে মাছির ডানার সমপরিমাণও তার ওজন হবে না। অতঃপর তিনি বলেন, যদি এর সমর্থন চাও, তবে কোরআনের এই আয়াত পাঠ করঃ **فَلَا تُؤْمِرُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ**

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ কেয়ামতের দিন এমন এমন কাজকর্ম করা হবে, যেগুলো স্থলতার দিক দিয়ে মদীনার পাহাড়সমূহের

১৭

২০৭

১৭



(১০) বলুন : আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন, সংকল্প সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে।

সূরামারইয়াম

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৯৮

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(১) কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ। (২) এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ায় প্রতি, (৩) যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল নিবৃত্তে। (৪) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে; বার্ষিক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে; হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফলমনোরোধ হইনি। (৫) আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। (৬) সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব-বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সন্তোষজনক। (৭) হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহুয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নামকরণ করিনি। (৮) সে বলল : হে আমার পালনকর্তা কেমন করে আমার পুত্র হবে অথচ আমার স্ত্রী যে বন্ধ্যা, আর আমিও যে বার্ষিক্যে শেষ প্রান্তে উপনীত। (৯) তিনি বললেন : এখনি তেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলে দিয়েছেন : এটা আমার পক্ষে সহজ। আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি এবং তুমি কিছুই ছিলে না। (১০) সে বলল : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একটি নির্দশন দিন। তিনি বললেন : তোমার নির্দশন এই যে, তুমি সুস্থ অবস্থায় তিন দিন মানুষের সাথে কথাবার্তা বলবে না। (১১) অতঃপর সে কক্ষ থেকে বের হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে এল এবং ইঙ্গিতে তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করতে বলল :

সমান হবে, কিন্তু ন্যায়বিচারের দাঁড়ি-পাল্লায় কোন ওজনই থাকবে না।

جُذِبَ الْمَرْدُوسِ - এরা ফরুদস - এটি আরবী শব্দ, না অনারব ও বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যারা অনারব বলেন, তারাও ফারসী রোমী, না সূরইয়ানী ইত্যাদি সম্পর্কে নানা মত পোষণ করেন।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : তোমারা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর, তখন জন্মাতুল-ফেরদাউসের প্রার্থনা কর। কেননা, এটা জন্মাতের সর্বোৎকৃষ্ট স্তর। এর উপরেই আল্লাহর আরশ এবং এখান থেকেই জন্মাতের সব নহর প্রবাহিত হয়েছে।— (কুরতুবী)

لَمَّا دُعِيَ الْوَعْدُ উদ্দেশ্য এই যে, জন্মাতের এ স্থানটি তাদের

জন্য অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নেয়ামত। কেননা, আল্লাহ তাআলা এ আদেশ জারি করে দেবেন, যে জন্মাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে কখনও বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশংকা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে। যদি জন্মাতের বাইরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি না থাকে, তবে জন্মাতও একটি কয়েদখানার মত মনে হতে থাকবে। আলোচ্য আয়াতে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, জন্মাতকে অন্যান্য গৃহের আলোকে দেখা মুখতা বৈ নয়। যে ব্যক্তি জন্মাতে যাবে, জন্মাতের নেয়ামত ও চিন্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বস্ত্রসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জন্মাত থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোন সময় মনে জাগবে না।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হাদীসে বর্ণিত শানে-নুযল থেকে সূরা কাহফের শেষ আয়াতে উল্লেখিত বাক্য। وَلَئِنْ لَّمْ يَدْعُوا بِحَبَدٍ وَرَبِّهِ أَحَدًا সম্বন্ধে জানা যায় যে, এখানে উল্লেখিত শিরক দ্বারা “গোপন শিরক” অর্থাৎ, রিয়্যা তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তি বোঝানো হয়েছে।

ইমাম হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জৈনিক মুসলমান আল্লাহর পথে জেহাদ করত এবং মনে মনে কামনা করত যে, জনসমাজে শৌর্য-বীর্য প্রচারিত হোক। তারই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (এ থেকে জানা গেল যে, জেহাদে এরূপ নিয়ত করলে জেহাদের সওয়াব পাওয়া যায় না।)

‘ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আব্বাদুনিয়া’ ‘কিতাবুল ইখলাসে’ তাউস থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জৈনিক সাহাবী রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে বললেন : আমি মাঝে মাঝে যখন কোন সংকল্প সম্পাদনের অথবা এবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি, তখন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিই থাকে আমার উদ্দেশ্যে; কিন্তু সাথে সাথে এ কামনাও মনে জাগে যে, লোকেরা আমার কাজটি দেখুক। রসুলুল্লাহ (সাঃ) একথা শুনে চুপ করে রইলেন। অবশেষে উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। আবু নঈম ‘তরীখে-আসাকির’ গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতে লিখেছেন : জুনদুব ইবনে সুহায়েব যখন নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন অথবা দান-খয়রাত করতেন এবং এসব আমলের কারণে লোকদেরকে তার প্রশংসা করতে দেখতেন, তখন মনে মনে খুব আনন্দিত হতেন। ফলে আমল আরও বাড়িয়া দিতেন। এরই পরিশ্রান্তিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, আয়াতে রিয়াকারীর গোপন শিরক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহর উদ্দেশ্যে হলেও যদি তার সাথে কোনরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে তাও এক প্রকার গোপন শিরক। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ এবং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু অন্য কতিপয় সহীহ হাদীস থেকে এর বিপরীতও জানা যায়। উদাহরণতঃ তিরমিযী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : একবার তিনি রসূলুল্লাহ-এর কাছে আরয় করলেন, আমি মাঝে মাঝে আমার ঘরের ভিতরে জায়নামায়ে (নামাযরত) থাকি। হঠাৎ কোন ব্যক্তি এসে গেলে আমার কাছে ভাল লাগে যে, সে আমাকে নামাযরত অবস্থায় দেখেছে। এটা কি রিয়া হব? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : আবু হোরায়রা, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। এমনভাবে স্থায়ী তুমি দু'টি সওয়াব পাবে। একটি তোমার সে গোপন আমলের জন্য যা তুমি পূর্ব থেকে করছিলে এবং দ্বিতীয়টি তোমার প্রকাশ্য আমলের জন্য যা লোকটি আসার পর হয়েছে। (এটা রিয়া নয়।)

সহীহ-মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, একবার হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন : এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে কোন সংকর্ম করার পর মানুষের মুখে তার প্রশংসা শোনে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : *تلك عاجل بشرى المؤمن* অর্থাৎ, এটা তো মুমিনের নগদ সুসংবাদ (যে তার আমল আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন এবং বান্দাদের মুখে তার প্রশংসা করিয়েছেন।)

তফসীর মাহহারীতে বলা হয়েছে, প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতের তাৎপর্য এই যে, নিজের আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির সাথে স্টজীবের সন্তুষ্টি অথবা নিজের সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিয়তকে শরীক করে নেয়া এমনকি, লোকমুখে প্রশংসা শুনে আমল আরও বাড়িয়ে দেয়া। এটা নিঃসন্দেহে রিয়া ও গোপন শিরক।

তিরমিযী ও মুসলিমে বর্ণিত শেষোক্ত রেওয়ায়েতগুলোর সম্পর্ক হল সে অবস্থার সাথে যে, আমল খাঁটিভাবে আল্লাহর জন্যেই হয়ে থাকে, লোকমুখে সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি ক্রম্পক থাকে না। অতঃপর যদি আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে লোকের মাঝে তার প্রসিদ্ধি সম্পন্ন করে দেন এবং মানুষের মুখ দিয়ে প্রশংসা করিয়ে দেন, তবে রিয়ার সাথে এ আমলের কোন সম্পর্ক নেই। এটা মুমিনের জন্যে (আমল কবুল হওয়ার) অগ্রিম সুসংবাদ। এভাবে বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়।

রিয়ার অশুভ পরিণতি এবং তজ্জন্মে হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী : হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয় সর্বাধিক আশঙ্কা করি, তা হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ, ছোট শিরক কি? তিনি বললেন : রিয়া।—(আহমদ)

বায়হাকী শায়াবুল-ইমান গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করে তাতে অতিরিক্ত আরও বর্ণনা করেছেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যখন বান্দাদের কাজকর্মের প্রতিদান দেবেন, তখন রিয়াকার লোকদেরকে বলবেন : তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেয়ার জন্যে তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করেছিলে। এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্যে কোন প্রতিদান আছে কি না।

হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে,

আল্লাহ তাআলা বলেন : আমি শরীকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উর্ধ্বে। যে ব্যক্তি কোন সংকর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরীক করে, আমি সেই আমল শরীকের জন্যে ছেড়ে দেই। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত ; সে আমলকে খাঁটিভাবে আমি তার জন্যেই করে দেই, যাকে সে আমার সাথে শরীক করেছিল।—(মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনছেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্যে সংকর্ম করে আল্লাহ তাআলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেন ; যার ফলে সে ঘৃণিত ও লাঞ্চিত হয়ে যায়।—(আহমদ, বায়হাকী, মাহহারী)

তফসীর কুরতুবীতে আছে, হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-কে এখলাস ও রিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : এখলাস দ্বারা হচ্ছে সং ও ভাল কর্মের গোপনীয়তা পছন্দ করা এবং মন্দ কর্মের গোপনীয়তা পছন্দ না করা। এরপর যদি আল্লাহ তাআলা তোমার আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেন, তবে তুমি একথা বল : হে আল্লাহ, এটা আপনার অনুগ্রহ ও কৃপা ; আমার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফল নয়।

হাকীম তিরমিযী হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) শিরকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন : *هو فيكم اخفى من ديب* অর্থাৎ, পিপড়ার নিঃশব্দ গতির মতই শিরক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ করে। তিনি আরও বললেন : আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে তোমরা বড় শিরক ও ছোট শিরক (অর্থাৎ, রিয়া) থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তোমরা দৈনিক তিনবার এই দোয়া পাঠ করো *اللهم انى اعوذ بك ان اشرك بك*।

সূরা কাহফের কতিপয় ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য : হযরত আবু দারদা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাঙ্কালের ফেৎনা থেকে নিরাপদ থাকবে। (মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী)

জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে বলল : আমি মনে মনে ঘুম থেকে জেগে নামায পড়তে ইচ্ছা করি ; কিন্তু ঘুম প্রবল হয়ে যায়। তিনি বললেন : তুমি যখন ঘুমাতে যাও তখন সূরা কাহফের শেষ আয়াতগুলো *قُلْ نَحْنُ لِلَّهِ كَاِفُونَ* থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠ কর।

এর ফলে তুমি যখন জাগার ইচ্ছা করবে, আল্লাহ তাআলা তখনই তোমাকে জাগিয়ে দেবেন।—(ছালবী)

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ : ইবনে আরাবী বলেন : আমাদের শায়খ তুরতুসী বলতেন : তোমার মূল্যবান জীবনের সময়গুলো যেন সমসাময়িকদের সাথে প্রতিযোগিতা ও বন্ধ-বান্ধবের মেলামেশার মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে না যায়। দেখ, আল্লাহ তাআলা এই আয়াত দ্বারা তাঁর বর্ণনা সমাপ্ত করেছেন :

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُكَلِّمْ عَاكِفًا وَلَا يُكَلِّمْ بَعِيدًا وَلَا يَكُنْ أَحَدًا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন

সংকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার এবাদতে যেন কাউকে শরীক না করে।—(কুরতুবী)

সূরা কাহ্ফে ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। সূরা মারইয়ামেও এমন ধরনের অত্যুচ্চ একটি বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয়েছে। সম্ভবতঃ এ সম্পর্কের কারণেই সূরা-কাহ্ফের পরে সূরা মারইয়ামকে স্থান দেয়া হয়েছে।—(ব্রহ্ম-শা'আনী)

সূরা মারইয়াম

كَذٰبُكَ এগুলো ঋণিত ও অবোধগম্য বর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই জানেন। বাদার জন্য এর অর্থ অনুেষণ করাও সমীচীন নয়।

يٰۤاٰمَنُوۡنَ এতে জানা গেল যে, দোয়া অনুচ্ছেদের ও গোপনে করা ই উত্তম।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াহ্বাসের বর্ণনা মতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : اَنْ خَيْرَ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْنِيْ অর্থঃ, অনুচ্চ বিকরই সর্বোত্তম এবং যথেষ্ট হয়ে যায় এমন বিকরই শ্রেষ্ঠ। (অর্থঃ, যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশী হয় না এবং কমও হয় না।) — (কুরতুবী)

اِنَّ رَّحْمٰنَ السَّمٰوٰتِ وَالتَّرٰوٰثِ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ অস্থির দুর্বলতা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, অস্থির দেহের ঝুঁটি। অস্থির দুর্বলতা সমস্ত দেহের দুর্বলতার নামান্তর। اشتعال এর শাব্দিক অর্থ প্রজ্বলিত হওয়া, এখানে চুলের শুকনোতাকে আগুনের আলোর সাথে তুলনা করে তা সমস্ত মস্তকে ছড়িয়ে পড়া বোঝানো হয়েছে।

দোয়া করতে গিয়ে নিজের অভাবগ্রস্ততা প্রকাশ করা যোস্তাহাব : এখানে দোয়ার পূর্বে হযরত যাকারিয়া (আঃ) তাঁর দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। এর একটি কারণ এই যে, এমনাবস্থায় সন্তান কামনা না করাই বিষয় ছিল। ইমাম কুরতুবী তাঁর তফসীল গ্রন্থে দ্বিতীয় কারণ বর্ণনা করেছেন এই যে, দোয়া করার সময় নিজের দুর্বলতা, দুর্দশা ও অভাবগ্রস্ততা উল্লেখ করা দোয়া কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ اَنْ تَجْعَلَ لِّىْ رِزْقًا يَّوْمًا وَلَيْلًا এটা মূল্য এর বহুবচন। আরবী ভাষায় এর অর্থ বহুবচন। তন্মধ্যে এক অর্থ চাচাত ভাই ও স্বজন। এখানে উদ্দেশ্য তাই।

পয়গম্বরগণের ধন-সম্পদে উত্তরাধিকারিত্ব চলে না : يٰۤاٰمَنُوۡنَ

وَرِثَةُ اٰلِ يٰۤاٰمَنُوۡنَ অধিকসংখ্যক আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে এখানে উত্তরাধিকারিত্বের অর্থ আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব নয়। কেননা, প্রথমতঃ হযরত যাকারিয়ার কাছে এমন কোন অর্থ সম্পদ ছিল বলেই প্রমাণ নেই, যে কারণে চিন্তিত হবেন যে, এর উত্তরাধিকারী কে হবে। একজন পয়গম্বরের পক্ষে এরূপ চিন্তা করাও অবাস্তব। তাছাড়া সাহাবায়ে

কেরামের ইজ্জাম তথা ঐকমত্য সম্বলিত এক হাদীসে বলা হয়েছে :

—“নিশ্চিই আলেমগণ পয়গম্বরগণের ওয়ারিশ। পয়গম্বরগণ কোন দীনার ও দিরহাম রেখে যান না; বরং তাঁরা ইলম ও জ্ঞান ছেড়ে যান। যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করে, সে বিরাট সম্পদ হাসিল করে।” — (‘আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী)

যয়ং আলোচ্য আয়াতে এরপর يٰۤاٰمَنُوۡنَ বাক্যের اٰلِ يٰۤاٰمَنُوۡنَ যোগ এরই প্রমাণ যে, এখানে আর্থিক উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি। কেননা, যে পুত্রের জন্মলাভের জন্যে দোয়া করা হচ্ছে, তার পক্ষে ইয়াকুব বংশের আর্থিক উত্তরাধিকারী হবে, তাতে তাদের নিকটবর্তী আত্মীয়স্বজনরা এবং তারা হচ্ছে সেসব مٰوٰى তথা স্বজন, যাদের উল্লেখ আয়াতে করা হয়েছে; তারা নিঃসন্দেহে আত্মীয়তায় হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) থেকে অধিক নিকটবর্তী। নিকটবর্তীর বর্তমানে দূরবর্তীর উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করা উত্তরাধিকার আইনের পরিপন্থী।

سَيَكُوۡنُ دَوْلًا আয়াতে সম্পদের উত্তরাধিকারিত্ব বোঝানো হয়নি।

اِنَّ رَّحْمٰنَ السَّمٰوٰتِ وَالتَّرٰوٰثِ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ শব্দের অর্থ সমনামও হয় এবং সমতুল্যও হয়। এখানে প্রথম অর্থ নেয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তাঁর পূর্বে ‘ইয়াহইয়া’ নামে কারও নামকরণ করা হয়নি। নামের এই অনন্যতা ও অভূতপূর্বতাও কতক বিশেষ গুণে তাঁর অনন্যতার ইঙ্গিতবহু ছিল। তাই তাঁকে তাঁর বিশেষ গুণে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় অর্থ নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর কতক বিশেষ গুণ ও অবস্থা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের কারও মধ্যে ছিল না। সেসব বিশেষ গুণে তিনি তুলনাহীন ছিলেন। উদাহরণতঃ চিরকুমার হওয়া ইত্যাদি। এতে জরুরী নয় যে, ইয়াহইয়া (আঃ) পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের চাইতে সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা, তাঁদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ ও মুসা কলীমুল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত ও সুবিদিত।—(মাযহারী)

عٰتِى ৰুশ্ৰাট থেকে উদ্ধৃত। এর অর্থ প্রভাবান্বিত না হওয়া। এখানে অস্থির শুষ্কতা বোঝানো হয়েছে। سَوِيًّا শব্দের অর্থ সুস্থ। শব্দটি একথা বোঝানোর জন্যে যুক্ত করা হয়েছে যে, যাকারিয়া (আঃ)—এর কোন মানুষের সাথে কথা না বলার এ অবস্থার কোন রোগবশতঃ ছিল না। এ কারণেই আল্লাহর মিকর ও এবাদতে তাঁর জিহ্বা তিন দিনই পূর্ববৎ খোলা ছিল; বরং এ অবস্থা মু'জ্জেযা ও গর্ভসঞ্চারের নিদর্শন স্বরূপই প্রকাশ পেয়েছিল। حٰنًا এর শাব্দিক অর্থ হৃদয়ের কোমলতা ও দয়াদ্রুত। এটা হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)—কে স্বতন্ত্রভাবে দান করা হয়েছিল।

يَسْتَبِيحُ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَاتَّبِعْهُ الْكُفْرَ صَيًّا ۖ وَحَنَاتًا
 مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ۖ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ
 جَبَّارًا عَصِيًّا ۖ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ
 يُبْعَثُ حَيًّا ۖ وَأَوْدَعْنِي الْكِتَابَ مَرَمَ ۖ إِذَا تَبَيَّنَتْ مِنْ أَلْهَا
 مَكَنَا شَرْفِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۖ فَأَرْسَلْنَا
 إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ
 بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ ۖ إِنَّ كُنْتُ تَقِيًّا ۖ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ
 لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۖ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ
 يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ عَصِيًّا ۖ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ
 هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَلَنَجْعَلَ لَكَ آيَةً ۖ إِنَّكَ لَمِنَ الْوَحِيدِينَ ۖ وَكَانَ
 أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۖ فَصَلَّمَتْهَا فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۖ
 فَالْحَامِيَ الْمَخَاضِ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ يَلَيْتُنِي مَرْتُ
 قَبْلَ هَذَا ۖ وَكُنْتُ نَسِيًّا نَسِيًّا ۖ فَتَادَبَاهَا مِنْ تَحْتِهَا
 الْأُخْرَى ۖ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۖ وَهَرَوْنِي
 إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ۖ فَسُقِطَ عَلَيْكَ رَطْبًا جَدِيًّا ۖ

(১২) হে ইয়াহুয়া দূত তার সাথে এই গ্রন্থ ধারণ কর। আমি তাকে শৈশবেই বিচারবুদ্ধি দান করেছিলাম। (১৩) এবং নিজের পক্ষ থেকে আগ্রহ ও পবিত্রতা দিয়েছি। সে ছিল পরহেয়গার। (১৪) পিতা-মাতার অনুগত এবং সে উদ্ধত, নাকরমান ছিল না। (১৫) তার প্রতি শান্তি — যেদিন সে জন্মগ্রহণ করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যেদিন জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। (১৬) এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। (১৭) অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা করল। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পূর্ণ মানবকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। (১৮) মারইয়াম বলল : আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহ্‌ভীরু হও। (১৯) সে বলল : আমি তো শুণু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব। (২০) মারইয়াম বলল : কিরূপে আমার পুত্র হবে যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যতিক্রমীও কখনও ছিলাম না? (২১) সে বলল : এমনটিই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজসাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্বীকৃত ব্যাপার। (২২) অতঃপর তিনি গর্তে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। (২৩) প্রসব বেদনা তাঁকে এক বেজুর-বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেন : হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে, যেতাম! (২৪) অতঃপর ক্রেপেতা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়ায দিলেন যে, তুমি দূর হওয়া করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি নহর খারি করেছেন। (২৫) আর তুমি নিজের দিকে বেজুর গাছের কাণ্ডে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক বেজুর পতিত হবে।

يَسْتَبِيحُ শব্দটি নীচ থেকে উদ্ধৃত। এর আসল অর্থ দূরে নিক্ষেপ করা। مَكَانًا এর অর্থ হল জনসমাবেশ থেকে সরে দূরে চলে যাওয়া। تَقِيًّا — অর্থাৎ, পূর্বদিকের কোন নির্জন স্থানে চলে গেলেন। নির্জন স্থানে যাওয়ার কি কারণ ছিল, সে সম্পর্কে সম্ভাবনা ও উক্তি বিভিন্মরূপে বর্ণিত আছে। কেউ বলেন : গোসল করার জন্যে নির্জন স্থানে গিয়েছিলেন। কেউ বলেন : অভ্যাস অনুযায়ী এবাদতে মশগুল হওয়ার জন্যে কক্ষের পূর্বদিকস্থ কোন নির্জন স্থানে গমন করেছিলেন। কুরতুবীর মতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এ কারণেই খ্রীষ্টানরা পূর্বদিককে তাদের কেবলা করেছে এবং তারা পূর্বদিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا — অধিকসংখ্যক তফসীরবিদগণের মতে রূহ বলে জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : স্বয়ং ঈসা (আঃ) — কেই বোঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা মারইয়ামের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী মানবের প্রতিকৃতি তার সামনে উপস্থিত করে দেন। কিন্তু এখানে প্রথম উক্তি অগ্রগণ্য। পরবর্তী বাক্যাবলী থেকে এরই সমর্থন পাওয়া যায়।

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا — ক্রেপেতা তাকে তার আসল আকৃতিতে দেখা

মানুষের জন্যে সহজ নয় — এতে কঠিন ভীতির সঞ্চার হয়; যেমন স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) হেরা গিরিশৃঙ্খায় এবং পরবর্তীকালেও এরূপ ভয়-ভীতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ কারণে হযরত জিবরাঈল মারইয়ামের সামনে মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। মারইয়াম যখন পর্দার ভেতর আগত একজন মানুষকে নিকটে দেখতে পেলেন, তখন তার উদ্দেশ্য অসং বলে আশঙ্কা করলেন। তাই বললেন :

إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ — আমি তোমাদের থেকে আল্লাহ্‌ রহমানের

আশ্রয় প্রার্থনা করি। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, জিবরাঈল একথা শুনে আল্লাহ্‌র কথা শুনে আল্লাহ্‌র নামের সম্মানার্থে কিছুটা পেছনে সরে গেলেন।

إِنَّ كُنْتُ تَقِيًّا — এ বাক্যটি এমন, যেমন — কেউ কোন জালেমের

কাছে অপারগ হয়ে এভাবে ফরিয়াদ করে : যদি তুমি ঈমানদার হও, তবে আমার প্রতি জুলুম করো না। এ জুলুমে বাধা দেয়ার জন্যে তোমার ঈমান যথেষ্ট হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং এই অপকর্ম থেকে বিরত থাকা তোমার জন্যে সমীচীন। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এ বাক্যটি আভিশ্য বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, যদি তুমি আল্লাহ্‌ভীরু হও, তবুও আমি তোমার থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। এর বিপরীত হলে ব্যাপার সুস্পষ্ট। — (মাহহারী)

মৃত্যু কামনার বিধান : মারইয়ামের মৃত্যু-কামনা পার্শ্ব দূরত্বের কারণে হয়ে থাকলে ভাবাবেগে প্রাধান্যকে এর গুণ্য বলা হবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধের আন্তরিকতা থাকে না। পক্ষান্তরে যদি মারইয়াম ধর্মের দিক চিন্তা করে মৃত্যু কামনা করে থাকেন, অর্থাৎ, মানুষ দুর্নাম রটাবে এবং সম্ভবতঃ এর মোকাবেলায় আমি ঐশ্বর্যধারণ করতে পারব না, ফলে বেহুসর হওয়ার গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ব। মৃত্যু হলে এ গোনাহ থেকে বৈচে যেতাম, তবে এরূপ মৃত্যু-কামনা নিষিদ্ধ নয়।

فَكُنْ لِإِسْرَافِي وَفَرِي عَيْنًا وَمَا تَرَى مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا
فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا
فَاتَّبَعْنَاهُ فَوَقَعَ الْحَمْلُ فَأَلَّوْا يُمِرُّهُمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا
يَا خُتْلَىٰ هَؤُلَاءِ مَا كَانَ آبَاؤُكُمْ أَهْلًا سَوَاءً وَكَانَتْ آبَاؤُكُمْ بِبُيُوتِهِمْ
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا
قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَبَعَلْنِي رَبِّي نَبِيًّا
وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا مِّنْ مَّا نَكَلَّ وَوَضَعَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَدْمَتُ
حَنَانِي وَأَنزَلَنِي الْإِلَهَ فِي وَكَلِّمَنِي جِبْرَائِيلُ أَشَقِيًّا
وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ السَّخِرِ الَّذِي فِيهِ يَتَذَكَّرُونَ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَتَّخِذْ مِنِّي وَلِيًّا نَحْنُ صَبِيرُونَ
إِذَا قُضِيَ أَمْرُ الْفَالِقِ إِنَّا فَالِقُ أَمْرِ الْقَوْمِ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ
يَوْمَ يَأْتُوتَنَّا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

(২৬) যখন আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিও : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোযা মানত করেছি। সূতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। (২৭) অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বলল : হে মারইয়াম, তুমি একটি অর্ধচন্দ্র ঘটিয়ে বসেছ। (২৮) হে হারুন-ভাগিনী, তোমার পিতা অসব ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। (২৯) অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বলল : যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? (৩০) সন্তান বলল : আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। (৩১) আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। (৩২) এবং জননীর অন্তঃস্থ থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধৃত ও হতভাগ্য করেননি। (৩৩) আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উদ্ভিত হব। (৩৪) এ-ই মারইয়ামের পুত্র ইসা। সত্যকথা, যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। (৩৫) আল্লাহ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি যখন কোন কাজ করা সিদ্ধান্ত করেন, তখন একথাই বলেন : হও এবং তা হয়ে যায়। (৩৬) তিনি আরও বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তার এবাদত কর। এটা সরল পথ। (৩৭) অতঃপর তাদের মধ্যে দলগুলো পৃথক পৃথক পথ অবলম্বন করল। সূতরাং মহাদিবস আগমনকালে কাফেরদের জন্যে ধ্বংস। (৩৮) সেদিন তারা কি চমৎকার শব্দে এবং দেখবে, যেদিন তারা আমার কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ জ্বালেমরা প্রকাশ্যে বিভ্রান্তি নিয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মারইয়ামকে বলা হয়েছে : তুমি বলে দিও, আমি মৌনতাবলম্বনের মানত করেছি। অথচ বাস্তবে মারইয়াম কোন মানত করেননি। এটা কি মিথ্যা বলার শিক্ষা নয়? উত্তর এই যে, এ শিক্ষার অর্থ হচ্ছে তুমি মানতও করে নিও এবং তা প্রকাশ করে দিও।

মৌনতার রোযা ইসলামী শরীয়তে রহিত হয়ে গেছে : ইসলাম-পূর্বকালে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা এবং কারও সাথে কথা না বলার রোযাও এবাদতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসলাম একে রহিত করে মন্দ কথাবার্তা, গালিগালাজ, মিথ্যা, পরিন্দা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকাকেই জরুরী করে দিয়েছে। সাধারণ কথাবার্তা ত্যাগ করা ইসলামে কোন এবাদত নয়। তাই এর মানত করাও জায়েয নয়। আবু দাউদের রেওয়ায়েতে আছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : لا نبتم بعد احتلام : অর্থাৎ, সন্তান সাবালক হওয়ার পর পিতা মারা গেলে তাকে এতীম বলা হবে না এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মৌনতা অবলম্বন করা কোন এবাদত নয়। প্রসব বেদনায় পানি ও খেজুরের ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও উপকারী। আহাৰ ও পান করার আদেশ বাহ্যতঃ অনুমতি প্রদানের অর্থে বোঝা যায়।

পুরুষ ব্যতীত শুধু নারী থেকে সন্তান হওয়া যুক্তি বিরুদ্ধ নয় : পুরুষের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করা একটি মু'জেয। মু'জেযায় যত অসম্ভাব্যতাই থাকুক, তাতে দোষ নেই; বরং এতে অলৌকিকতা গুণটি আরও বেশী করে প্রকাশ পায়। কিন্তু এতে তেমন কোন অসম্ভাব্যতাও নেই। কারণ, চিকিৎসা শাস্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী নারীর বীর্ষ ধারণশক্তির সাথে সাথে কারক শক্তিও রয়েছে। তাই যদি এই কারকশক্তি আরও বেড়ে গিয়ে সন্তান জন্মের কারণ হয়ে যায়, তবে তা তেমন অসম্ভব ব্যাপার নয়। (বয়ানুল-কোরআন)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মারইয়ামকে খেজুরের গাছ নাড়া দিতে আদেশ করেছেন। অথচ কোনরূপ নাড়া ছাড়াই আপনি-আপনি কোলে খেজুর পতিত হওয়াও আল্লাহর কুদরতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে বোঝা যায় যে, রিযিক হাসিলের জন্যে চেষ্টা ও পরিশ্রম করা তাওয়াফুলের পরিপন্থী নয়।—(ক্বল-মা'আনী)

سَرِيًّا এর আভিধানিক অর্থ ছোট নহর। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরত দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে একটি ছোট নহর জারী করে দেন, অথবা জিবরাঈলের মাধ্যমে জারী করিয়ে দেন। উভয় প্রকার রেওয়ায়েতই রয়েছে। এখানে প্রশ্নবিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মারইয়ামের সান্ত্বনার উপকরণাদি উল্লেখ করার সময় প্রথমে পানি ও পরে খাদ্য তথা খেজুরের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এগুলো ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমে খাদ্য ও পরে পানির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

فَكُنْ لِإِسْرَافِي কাশন সম্ভবতঃ এই যে, মানুষ স্বভাবগতভাবেই আহারের পূর্বে পানি যোগাড় করে, বিশেষতঃ ঐ খাদ্যের বেলায় যা খাওয়ার পর পিপাসিত হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রথমে খাদ্যবস্তু আহার করে ও পরে পানি পান করে।—(ক্বল-মা'আনী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَاتَّبَعْنَاهُ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ এ কথাই বোঝা যায় যে, অদৃশ্য সুসংবাদের মাধ্যমে মারইয়াম যখন নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুর্নাম ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন, তখন নিজের

সদ্যজাত শিশুকে নিয়ে ঘরে ফিরে এলেন। কতদিন পরে ফিরে এলেন, এ সম্পর্কে ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মারইয়াম সন্তান প্রসবের চল্লিশ দিন পর নিফাস থেকে পাক হয়ে ঘরে ফিরে আসেন।—(রহুল-মা'আনী)

شَاوِرِي আরবী ভাষায় **فَرَى** শব্দের আসল অর্থ কর্তন করা ও চিরে ফেলা। যে কাজ কিংবা বস্তু প্রকাশ পেলে অসাধারণ কাটাকাটি হয়, তাকে **فَرَى** বলা হয়। আবু হাইয়ান বলেন : প্রত্যেক বিরাট বিষয়কে **فَرَى** বলা হয় — ভালোর দিক দিয়ে বিরাট হোক কিংবা মন্দের দিক দিয়ে। এখানে শব্দটি বিরাট মন্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দের দিক দিয়ে অনন্য ও বিরাট বস্তুর জন্যেই শব্দটির ব্যবহার সুবিধিত।

يَاكْتُفَرُونَ হযরত মুসা (আঃ) —এর ভাই ও সহচর হযরত হারুন (আঃ) মারইয়ামের আমলের শত শত বছর পূর্বে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এখানে মারইয়ামকে হারুন-ভগ্নি বলা বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে শুদ্ধ হতে পারে না। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বাকে যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) নাজরানবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তখন তারা প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কোরআনে হযরত মারইয়ামকে হারুন-ভগ্নি বলা হয়েছে। অথচ হারুন (আঃ) তার অনেক শতাব্দী পূর্বে দুনিয়া থেকে চলে যান। হযরত মুগীরা এ প্রশ্নের উত্তর জানতেন না। ফিরে এসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর কাছে ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন : তুমি বলে দিলে না কেন যে, বরকতের জন্যে পয়গম্বরদের নামে নাম রাখা এবং তাঁদের প্রতি সম্মান করা ঈমানদারদের সাধারণ অভ্যাস। (মুসলিম-তিরমিযী, নাসায়ী।) এই হাদীসের উদ্দেশ্য দু'রকম হতে পারে। (এক) হযরত মারইয়াম হযরত হারুন (আঃ) —এর বংশধর ছিলেন বলেই তাঁর সাথে সম্পর্ক করা হয়েছে— যদিও তাদের মধ্যে সময়ের অনেক ব্যবধান রয়েছে; যেমন আরবদের রীতি রয়েছে যে, তারা তামিম গোত্রের ব্যক্তিকে **أَخَانِيم** এবং আরবের লোককে **أَخَارِب** বলে অভিহিত করে। (দুই) এখানে হারুন বলে মুসা (আঃ) —এর সহচর হারুন নবীকে বোঝানো হয়নি; বরং মারইয়ামের ভ্রাতার নামও ছিল হারুন এবং এ নাম হারুন নবীর নামানুসারে বরকতের জন্য রাখা হয়েছিল। এভাবে মারইয়াম হারুন-ভগ্নি বলা সত্যিকার অর্থেই শুদ্ধ।

مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا কোরআনের এই বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওলী-আল্লাহ ও সংকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের সন্তান-সন্ততি মন্দ কাজ করলে তাতে সাধারণ লোকদের মন্দ কাজের তুলনায় বেশী গোনাহ হয়। কারণ, এতে তাদের বড়দের লাঞ্ছনা ও দুর্নাম হয়। কাজেই বুঝুদের সন্তানদের উচিত, সংকাজ ও আল্লাহ্‌ভীতিতে অধিক মনোনিবেশ করা।

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, যে সময় পরিবারের লোকজন মারইয়ামকে ভর্ৎসনা করতে শুরু করে, তখন ঈসা (আঃ) মায়ের বুকের দুধ পান করছিলেন। তিনি তাদের ভর্ৎসনা শুনে স্তন্য ছেড়ে দেন এবং বামদিকে পাশ ফিরে তাদের দিকে মনোযোগ দেন। অতঃপর তজ্জনী খাড়া করে বলেন : **إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ** অর্থাৎ, আমি আল্লাহর দাস।

এই প্রথম বাক্যই হযরত ঈসা (আঃ) এই ভুল বোঝাবুঝির নিরসন করে দেন যে, যদিও আমি অলৌকিক উপায়ে জন্মগ্রহণ করেছি; কিন্তু আমি আল্লাহ নই— আল্লাহর দাস। অতএব, কেউ যেন আমার উপাসনায় লিপ্ত না হয়ে পড়ে।

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَحَسْبِيَ اللَّهُ এ বাক্যে হযরত ঈসা (আঃ) তার দুগু

পানের যমানায় আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়ত ও কিতাব লাভের সংবাদ দিয়েছেন, অথচ কোন পয়গম্বর চল্লিশ বছর বয়সের পূর্বে নবুওয়ত ও কিতাব লাভ করেননি। তাই এর মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলার এটা স্থির সিদ্ধান্ত যে, তিনি যখনসময়ে আমাকে নবুওয়ত ও কিতাব দান করবেন। এটা হুবহু এমন, যেমন মহানবী (সাঃ) বলেছেন : আমাকে নবুওয়ত তখন দান করা হয়েছিল, যখন আদম (আঃ) —এর জন্মই হয়নি — তার খামীর তৈরী হচ্ছিল মাত্র। বলাবাহুল্য, এর উদ্দেশ্য হল এই যে, নবুওয়ত দানের ওয়াদা মহানবী (সাঃ) —এর জন্যে অকাটা ও নিশ্চিত ছিল। আলোচ্য আয়াতেও এ নিশ্চয়তাকে 'নবী করেছেন' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। নবী করার কথা প্রকাশ করে প্রকরান্তরে তিনি বলেছেন যে, আমার জননীর প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ আরোপ সম্পূর্ণ বাস্তব। কেননা, আমার নবী হওয়া এবং রেসালত লাভ করা এ বিষয়েরই প্রমাণ যে, আমার জন্মে কোন গোনাহের দখল থাকতে পারে না।

وَأَوْصِي بِالْقَوْلِ وَالزُّكُوفِ —তাকিদ সহকারে কোন কাজের নির্দেশ দেয়া হলে তাকে **وَصِي** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। ঈসা (আঃ) এখানে বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নামায ও যাকাতের ওসিয়ত করেছেন। তাই এর অর্থ এই যে, খুব তাগিদ সহকারে উভয় কাজের নির্দেশ দিয়েছেন।

নামায ও রোযা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী (সাঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রসুলের শরীয়তেই ফরয রয়েছে। তবে বিভিন্ন শরীয়তে এগুলোর আকার-আকৃতি ও ষ্টুটিনাটি বিষয়াদি বিভিন্নরূপ ছিল। হযরত ঈসা (আঃ) —এর শরীয়তেও নামায ও যাকাত ফরয ছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে, ঈসা (আঃ) কোন সময় মালদার হননি। তিনি গৃহ নির্মাণ করেননি এবং অর্থকড়িও সঞ্চয় করেননি। এমতাবস্থায় তাকে যাকাতের আদেশ দেয়ার কি মানে? উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, মালদারের উপর যাকাত ফরয — এটা ছিল তাঁর শরীয়তের আইন। ঈসা (আঃ) ও এই আইনের আওতাভুক্ত ছিলেন যে, কোন সময় নিসাব পরিমাণ মাল একত্রিত হলে তাকেও যাকাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যদি সারা জীবন মালই সঞ্চিত না হয়, তবে তা এই আইনের পরিপন্থী নয়।— (রহুল-মা'আনী)

مَا دَمَّتْ حَيَاتِي অর্থাৎ, নামায ও যাকাতের নির্দেশ আমার জন্যে সর্বকালীন — যে পর্যন্ত জীবিত থাকি। বলাবাহুল্য, এতে পৃথিবীতে অবস্থাকালীন জীবন বোঝানো হয়েছে। কেননা, এসব ক্রিয়াকর্ম এই পৃথিবীতেই হতে পারে এবং পৃথিবীর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। আকাশে উঠানোর পর অবতরণের সময় পর্যন্ত অব্যাহতির যমানা।

وَالْوَالِدَيْنِ এখানে শুধু মাতার কথা বলা হয়েছে, পিতা-মাতার কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি অলৌকিকভাবে পিতা ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছি। শৈশবের এহেন অলৌকিক কথাবার্তা এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ও প্রমাণ।

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের অলীক চিন্তাধারার মধ্যে বাহুল্য ও স্বল্পতা বিদ্যমান ছিল। খ্রীষ্টানরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে 'খোদার বঁটা' বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইহুদীরা তাঁর অবমাননায় এতটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে যে, তাঁকে ইউসুফ মিস্ত্রীর জারজ সন্তান বলে আখ্যায়িত করে। (নাউজুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে উভয় প্রকার বাস্তব

লোকদের বাস্তি বর্ণনা করে তাঁর সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। —
(কুরত্বী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ الْحِسْرَةِ কেয়ামতের দিবসকে পরিতাপের দিবস বলা হয়েছে।

কারণ, জাহান্নামীরা সেদিন পরিতাপ করবে যে, তারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ হলে জন্মাত লাভ করত; কিন্তু এখন তাদের জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে হচ্ছে। পক্ষান্তরে বিশেষ এক প্রকার পরিতাপ জন্মান্তীদেরও হবে। হয়রত মুআযের রেওয়ায়েতে তারারানী ও আবু ইয়াল্লা বর্ণিত হাদীসে রসূল করীম (সাঃ) বলেন : যেসব মুহূর্ত আল্লাহর যিকর ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে, সেগুলোর জন্যে পরিতাপ করা ছাড়া জন্মান্তীদের আর কোন পরিতাপ হবে না। হয়রত আবু হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েতে বগতী বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিই পরিতাপ ও অনুশোচনা করবে। সাহাবায়ে কেয়াম প্রশ্ন করলেন : এই পরিতাপ কিসের কারণে হবে? তিনি বললেন : সৎকর্মশীলদের পরিতাপ হবে এজন্যে যে, তারা আরও বেশী সৎকর্ম কেন করল না, যাতে জন্মান্তের আরও উচ্চস্তর অর্জিত হত। পক্ষান্তরে কুকর্মীরা পরিতাপ করবে যে, তারা কুর্ম থেকে কেন বিরত হল না।

সিদ্দীক কাকে বলে? صديق - শব্দটি কোরআনের

একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংজ্ঞা সম্পর্কে আলেমদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন : যে ব্যক্তি সারা জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেননি, তিনি সিদ্দীক। কেউ বলেন : যে ব্যক্তি বিশ্वास এবং কথা ও কর্মে সত্যবাদী, অর্থাৎ, অন্তরে যেমন বিশ্বাস পোষণ করে, মুখে ঠিক তদ্রূপ প্রকাশ করে এবং তার প্রত্যেক কর্ম ও উঠা-বসা এই বিশ্বাসেরই প্রতীক হয়, সে সিদ্দীক। রুহুল মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদি গ্রন্থে শেখোক্ত অর্থই অবলম্বন করা হয়েছে। সিদ্দীকের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রকৃত সিদ্দীক নবী ও রসূলই হতে পারেন এবং প্রত্যেক নবী ও রসূলের জন্যে সিদ্দীক হওয়া একটি অপরিহার্য গুণ। কিন্তু এর বিপরীতে যিনি সিদ্দীক হন, তাঁর জন্যে নবী ও রসূল হওয়া জরুরী নয়; বরং নবী নয় — এমন ব্যক্তি যদি নবী ও রসূলের অনুসরণ করে সিদ্দীকের স্তর অর্জন করতে পারেন, তবে তিনিও সিদ্দীক বলে অভিহিত হবেন; হয়রত মারইয়ামকে স্বয়ং কোরাআন পাক 'সিদ্দীকা' وَأَنْتَ صَدِيقَةُ উপাধি দান করেছে। সাধারণ উম্মতের সংখ্যাধিক্যের মতে তিনি নবী নন এবং কোন নারী নবী হতেও পারেন না।

বড়দেরকে নসিহত করার পন্থা ও আদব : يَأَيُّهَا

অভিযানের দিক দিয়ে এ শব্দটি পিতার জন্যে সম্মান ও ভালবাসাসূচক সম্বোধন। হয়রত ইবরাহীম খলীল্লাহকে আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেণে গুণান্বিত করেছিলেন। তিনি পিতার সামনে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা মেজাজের সমতা ও বিপরীতমুখী বিষয়বস্তু সন্নিবেশের একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। তিনি একদিকে পিতাকে কুফর ও শিরকে শুধু লিপ্তই নয় — এর উদ্যোক্তা রূপেও দেখেন। এই কুফর ও শিরক মিটানোর জন্যেই তিনি সজ্জিত হয়েছিলেন। অপরদিকে পিতার আদব, মহত্ব ও ভালবাসা। এ দু'টি বিপরীতমুখী বিষয়কে হয়রত খলীল্লাহ (আঃ) চমৎকারভাবে সমন্বিত করেছেন।

يَأَيُّهَا শব্দটি পিতার দয়া ও ভালবাসার প্রতীক। প্রথমতঃ তিনি

وَأَذِّنْ لَهُمْ يَوْمَ الْحِسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُ ثَرْوُ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۖ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ كَانَ صِدِّيقًا ۖ نَبِيًّا ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۖ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْغَيْبِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۖ يَا أَبَتِ أَتَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۖ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابُ الْجَهَنَّمَ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلًا ۖ قَالَ لَوْلَا أَنْتَ عَنْ رَبِّكَ لِيَبْرَأَهُمَا لَكُمْ لَمْ تَتَّبِعْ لَكُمْ وَالْخَيْرُ بَيْنَنَا ۖ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۖ وَأَعْتَرَكُم مَّا كُنْتُمْ عَنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعَاؤِي عَنِ الْآلِ ۖ أَكُونُ بِدَعَاؤِي شَقِيًّا ۖ فَلَمَّا أَتَاهُمْ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ دُونِ اللَّهِ دُونِ اللَّهِ وَهُبْنَا لَهُ لُحُومًا وَسُجُودًا وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۖ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمًا ۖ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِذْ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۖ

(৩৯) আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিন যখন সব ব্যাপারের মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা অনবধানতায় আছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না। (৪০) আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী হব পৃথিবীর এবং তার উপর যারা আছে তাদের এবং আমারই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৪১) আপনি এই কিতাবে ইবরাহীমের কথা বর্ণনা করুন। নিশ্চয় তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী। (৪২) যখন তিনি তার পিতাকে বললেন : হে আমার পিতা, যে শোনে না, দেখে না এবং তোমার কোন উপকারে আসে না, তার এবাদত কেন কর? (৪৩) হে আমার পিতা, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। (৪৪) হে আমার পিতা, শয়তানের এবাদত করো না। নিশ্চয় শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য। (৪৫) হে আমার পিতা, আমি আশঙ্কা করি, দস্যময়ের একটি আযাব তোমাকে স্পর্শ করবে, অতঃপর তুমি শয়তানের সঙ্গী হয়ে যাবে। (৪৬) পিতা বলল : হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাসাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রত্যক্ষভাবে তোমার প্রশ্রয় করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। (৪৭) ইবরাহীম বললেন : তোমার উপর শান্তি হোক, আমি আমার পালনকর্তার কাছে তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি আমার প্রতি মেহেবরান। (৪৮) আমি পরিত্যাগ করছি তোমাদেরকে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের এবাদত কর তাদেরকে; আমি আমার পালনকর্তার এবাদত করব। আশা করি, আমার পালনকর্তার এবাদত করে আমি বঞ্চিত হব না। (৪৯) অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের এবাদত করত, তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করলেন, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবী করলাম। (৫০) আমি তাদেরকে দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাদেরকে দীলম সমুদ্র সুখ্যাতি। (৫১) এই কিতাবে মূসার কথা বর্ণনা করুন, তিনি ছিলেন মনোনীত এবং তিনি ছিলেন রসূল, নবী।

প্রত্যেক বাক্যের শুরুতে এই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন। এরপর কোন বাক্যে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করেননি, যা পিতার অবমাননা অথবা মনোকষ্টের কারণ হতে পারত; অর্থাৎ পিতাকে ‘কাফের’ ‘গোমরাহ’ ইত্যাদি বলেননি; বরং পয়গম্বরুলভ প্রজ্ঞার সাথে শুধু তার দেব-দেবীর অক্ষমতা ও অচেতনতা ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে সে নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারে। দ্বিতীয় বাক্যে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত নবুওয়তের জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বাক্যে কুফর ও শিরকের সম্ভাব্য অশুভ পরিণতি সম্পর্কে পিতাকে হুশিয়ার করেছেন। এরপরও পিতা চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তে অথবা পুত্রসুলভ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা নম্রতা অবলম্বন করার পরিবর্তে কঠোর ভঙ্গিতে পুত্রকে সম্বোধন করল।

হযরত খলীলুল্লাহ **يَا أَيُّهَا** বলে, মিষ্ট ভাষায় পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এর উত্তরে সাধারণের পরিভাষায় **يُنَى** প্রয়োগ করা সমীচীন ছিল। কিন্তু আযর তাঁর নাম নিয়ে **يَا زَيْدُ** বলে, সম্বোধন করল।

অতঃপর তাঁকে প্রস্তরাখাতে হত্যা করার হুমকি এবং বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ জারি করে দিল। এ ক্ষেত্রে হযরত খলীলুল্লাহ এর কি জওয়াব দেন, তা শোনা ও স্মরণ রাখার যোগ্য। তিনি বলেন :

سَلَامُكَ এখানে **سَلَام** শব্দটি দুিবিধ অর্থের হতে পারে। (এক) বয়স্কটের সালাম; অর্থাৎ, কারও সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ভদ্রজ্ঞোচিত পন্থা হচ্ছে কথার উত্তর না দিয়ে ‘সালাম’ বলে পৃথক হয়ে যাওয়া। কোরআন পাক আল্লাহর প্রিয় ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংসায় বলে :

وَلَا تَحَايِلُهُمُ الْجُنُودُ وَأُولَئِكَ অর্থাৎ, মুখরী যখন তাদের সাথে মুখসুলভ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাঁরা তাদের মোকাবেলা করার পরিবর্তে সালাম শব্দ বলে দেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। (দুই), এখানে প্রচলিত সালামই বোঝানো হয়েছে। এতে আইনগত খটকা এই যে, কোন কাফেরকে প্রথমে সালাম করা হাদীসে নিষিদ্ধ। বোখারী ও মুসলিমে আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : ‘স্বীষ্টান ও ইহুদীদের প্রথমে সালাম করো না।’ কিন্তু এর বিপরীতে কোন কোন হাদীসে কাফের, মুশরেক ও মুসলমানদের এক সমাবেশকে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ) সালাম করেছেন বলে প্রমাণিত রয়েছে। বোখারী ও মুসলিমে হযরত উসামার রেওয়ায়েতে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

سَأَلْتُكَ এখানেও উপরোক্ত খটকা বিদ্যমান যে, কোন কাফেরের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ ও নাজায়েয। একবার রসুলে করীম (সাঃ) তাঁর চাচা আবু তালেবকে বলেছিলেন : ‘আল্লাহর কসম, আমি আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব, যে পর্যন্ত না আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে নিষেধ করে দেয়া হয়।’ এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় :-

لِللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلشِّرْكِ অর্থাৎ, নবী ও ঈমানদারদের পক্ষে মুশরেকদের জন্যে ইস্তগফার করা বৈধ নয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) চাচার জন্যে ইস্তগফার ত্যাগ

করেন।

খটকার জওয়াব এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর পিতার সাথে ওয়াদা করা যে, আপনার জন্যে ইস্তগফার করব—এটা নিষেধাজ্ঞার পূর্বকারণ ঘটনা। নিষেধ পরে করা হয়।

وَأَمَّا لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاذْكُرُونِي একদিকে তো

হযরত খলীলুল্লাহ (আঃ) পিতার আদব ও মহব্বতের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে; অপরদিকে সত্য-প্রকাশ ও সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাকে এতটুকুও কলঙ্কিত হতে দেননি। বাড়ী থেকে বের হয়ে যাওয়ার যে আদেশ পিতা দিয়েছিল, আলোচ্য বাক্যে তা তিনি সানন্দে শিরোধার্য করে নেন এবং সাথে সাথে একথাও বলে দেন যে, আমি তোমার দেব-দেবীকে ঘৃণা করি এবং শুধু আমার পালনকর্তার এবাদত করি।

فَلَا تَعْبُدُوهُمْ وَابْعُذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْ آلَ اسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ

পূর্ববর্তী বাক্যে ইবরাহীম (আঃ)—এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, আমি আশা করি, আমার পালনকর্তার কাছে দোয়া করে আমি বক্ষিত ও বিফল মনোরথ হব না। বাহ্যতঃ এখানে গৃহ ও পরিবারবর্গ ত্যাগ করার পর নিঃসঙ্গতার আতঙ্ক ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার দোয়া বোঝানো হয়েছিল। আলোচ্য বাক্যে এই দোয়া কবুল করার কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ) যখন আল্লাহর জন্যে নিজ গৃহ, পরিবারবর্গ ও তাদের দেব-দেবীকে বিসর্জন দিলেন, তখন আল্লাহ তা’আলা তাঁর এই ক্ষতিপূরণার্থে তাঁকে পুত্র ইসহাক দান করলেন। এই পুত্র যে দীর্ঘায়ু ও সম্ভানের পিতা হয়েছিলেন, তাও ‘ইয়াকুব’ (পৌত্র) শব্দ যোগ করে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। পুত্র দান থেকে বোঝা যায় যে, ইতিপূর্বে ইবরাহীম (আঃ) বিবাহ করেছিলেন। কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তা’আলা তাঁকে পিতার পরিবারের চাইতে উত্তম একটি স্বতন্ত্র পরিবার দান করলেন, যা পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণ মহাপুরুষদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল।

كَانَ مَخْلُصًا আল্লাহ তা’আলা যে ব্যক্তিকে নিজের জন্যে খাটি করে নেন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অপর কোন কিছুর দিকে আকৃষ্ট করে না এবং নিজের সমস্ত কামনা-বাসনাকে আল্লাহর জন্যে নিবেদিত করে দেয়, তাকে **مَخْلُص** বলা হয়। পয়গম্বরগণই বিশেষভাবে এ গুণে গুণান্বিত হন; যেমন—কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে :

إِنَّا اخْلَصْنَاهُ অর্থাৎ আমি পয়গম্বরদেরকে পরকাল স্মরণ করার কাজের জন্যে বিশেষভাবে নিয়োজিত করেছি। উম্মতের মধ্যে যেসব কামেল পুরুষ পয়গম্বরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তারাও আংশিকভাবে এই মর্তব্য লাভ করেন। এর আলামত এই যে, তাঁদেরকে গোনাহ ও মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয় এবং তাঁরা আল্লাহর হেফামতে থাকেন।

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ

এই সুপ্রসিদ্ধ পাহাড়টি সিরিয়ায় মিসর ও মাদইয়ানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্তমানেও পাহাড়টি এ নামেই প্রসিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা একেও অনেক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন।

التَّائِمِينَ তুর পাহাড়ের ডানদিকে হযরত মুসা (আঃ)-এর দিক দিয়ে বলা হয়েছে। কেননা, তিনি মাদইয়ানা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তুর পর্বতের বিপরীত দিকে পৌছার পর তুর পাহাড় তাঁর ডান দিকে ছিল।

يَا كَانَاكَانِي ও বিশেষ কথাবার্তাকে এবেং যার সাথে একুপ কথাবার্তা বলা হয়, তাকে نجى বলা হয়।

وَهَبْنَاهُ لِمَنْ رَضِينَا مِنْ عِبَادِنَا

শব্দের অর্থ দান। হযরত মুসা (আঃ) দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর সাহায্যের জন্যে হারানকেও নবী করা হোক। এই দোয়া কবুল করা হয়। আয়াতে وهبنا বলে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি মুসাকে 'হারান' দান করেছি। এ কারণেই হযরত হারান (আঃ)-কে-هبة الله (আল্লাহর দান)-ও বলা হয়।—(মায়হারী)

وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابِ الْإِسْمِ

বাহ্যতঃ এখানে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম (আঃ)-কেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর পিতা ইবরাহীম ও ভ্রাতা ইসহাকের সাথে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়নি; বরং মাঝখানে হযরত মুসার কথা উল্লেখ করার পর তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবতঃ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তাঁর কথা উল্লেখ করাই এর উদ্দেশ্য। তাই আনুশঙ্গিকভাবে উল্লেখ না করে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রেরণাকালের ক্রম অনুসারে পয়গম্বরদের উল্লেখ করা হয়নি। কেননা, হযরত ইদরীস (আঃ)-এর কথা সবার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ সময়কালের দিক দিয়ে তিনি সবার অগ্রে।

كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ ওয়াদা পূরণ করা একটি চারিত্রিক গুণ। প্রত্যেক

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একে জরুরী মনে করে। এর বিপরীত করাকে হীন কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। হাদীসে ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর লক্ষণ বলা হয়েছে। এ জন্যেই আল্লাহর প্রত্যেক নবী ও রসূলই ওয়াদা পালনে সাক্ষ্য; কিন্তু এই বর্ণনা পরস্পরায় বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের সাথে বিশেষ বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য একুপ নয় যে, এই গুণ অন্যদের মধ্যে বিদ্যমান নেই; বরং এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, তাঁর মধ্যে এই গুণটি একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে বিদ্যমান আছে। উদাহরণতঃ এইমাত্র হযরত মুসা (আঃ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মনোনীত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ এ গুণটিও সব পয়গম্বরের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে হযরত মুসা (আঃ) বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন, তাই তাঁর আলোচনায় এর উল্লেখ করা হয়েছে।

ওয়াদা পালনে হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর স্বাতন্ত্র্যের কারণ এই যে, তিনি আল্লাহর সাথে কিংবা কোন বান্দার সাথে যে বিবয়ের ওয়াদা করেছেন, অবিলম্বে ও যত্ন সহকারে তা পালন করেছেন। তিনি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেকে জবাই এর জন্যে পেশ করে দেবেন এবং তজ্জন্মে সবার করবেন। তিনি এ ওয়াদায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। একবার তিনি জৈনক ব্যক্তির সাথে একস্থানে সাক্ষাতের ওয়াদা করেছিলেন; কিন্তু লোকটি সময়মত আগমন না করায় তিনি সেখানে তিন

(৫২) আমি তাকে আহ্বান করলাম তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে এবং গুহতত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যে তাকে নিকটবর্তী করলাম। (৫৩) আমি নিজ অনুগ্রহে তাঁকে দান করলাম তাঁর ভাই হারানকে নবীরাশে। (৫৪) এই কিতাবে ইসমাইলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যপ্রায়ী এবং তিনি ছিলেন রসূল, নবী। (৫৫) তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে নামায় ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তার পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন। (৫৬) এই কিতাবে ইদরীসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী, নবী। (৫৭) আমি তাকে উচ্চ উন্নীত করেছিলাম। (৫৮) এরাই তারা-নবীগণের মধ্য থেকে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নেয়ামত দান করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম, তাদের বংশধর এবং ইবরাহীম ও ইসমাইলের বংশধর এবং যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছি ও মনোনীত করেছি, তাদের বংশধর। তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তখন তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং ক্রন্দন করত। (৫৯) অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামায় নষ্ট করল এবং কুলবস্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। (৬০) কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা তওবা করেছে, বিশ্রাস স্থাপন করেছে। সুতরাং তারা জ্ঞানতে প্রবেশ করবে এবং তাদের উপর কোন জুলুম করা হবে না। (৬১) তাদের স্থায়ী বসবাস হবে যার ওয়াদা দয়াময় আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন। অবশ্যই তাঁর ওয়াদায় তারা পৌছবে। (৬২) তারা সেখানে সালাম ব্যতীত কোন অসার কথাবার্তা শুনবে না এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যা তাদের জন্যে রুখী থাকবে। (৬৩) এটা ঐ জ্ঞানাত যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে পরহেয়গারদেরকে।

দিন এবং কোন কোন রেওয়াজে মতে এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকেন। (মায়হারী) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই—এর রেওয়াজে তিরমিযীতে মহানবী (সাঃ) প্রসঙ্গেও ওয়াদা করে সেখানে তিন দিন অপেক্ষা করার ঘটনা বর্ণিত আছে।—(কুরত্বী)

ওয়াদাপূরণ করার গুরুত্ব ও মর্তবা : ওয়াদা পূরণ করা সকল পয়গম্বর ও সৎকর্মপরাগ মনীষীদের বিশেষ গুণ এবং সম্ভ্রান্ত লোকদের অভ্যাস। এর বিপরীত করা পাপাচারী ও হীন লোকদের চরিত্র। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন **الوعد دين** ওয়াদা একটি ঋণ। অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করা যেমন অপরিহার্য, তেমনি ওয়াদা পূরণে যত্নবান হওয়াও জরুরী। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে : মুমিনের ওয়াদা ওয়াজিব।

ফেকাহবিদগণ বলেছেন : ওয়াদার ঋণ হওয়া এবং ওয়াজিব হওয়ার অর্থ এই যে, শরীয়তসম্মত ওষর ব্যতীত ওয়াদা পূরণ না করা গোনাহ। কিন্তু ওয়াদা এমন ঋণ নয় যে, তজ্জন্মে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায় কিংবা জবরদস্তি আদায় করা যায়। ফেকাহবিদদের পরিভাষায় একে বলা হয় ধর্মতঃ ওয়াজিব—বিচারে ওয়াজিব নয়।—(কুরত্বী)

পরিবার-পরিজন থেকে সম্প্রদায়ের কাজ শুরু করা সম্প্রদায়ের অবশ্য কর্তব্য : **وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ** হযরত ইসমাইল

(আঃ)—এর আরও একটি বিশেষ গুণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি নিজ পরিবার পরিজনকে নামায ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন। এখানে প্রশ্ন হলো যে, পরিবার-পরিজনকে সংকাজের নির্দেশ দেয়া তো প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের দায়িত্বে ওয়াজিব। কোরআন পাকে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে :

فَوَاقْتُمْكَ وَالْطَّيْفُ অর্থাৎ, নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে অগ্নি থেকে রক্ষা কর। সুতরাং ব্যাপারে হযরত ইসমাইল (আঃ)—এর বৈশিষ্ট্য কি? জওয়াব এই যে, বিষয়টি যদিও ব্যাপকভাবে সব মুসলমানের করণীয়; কিন্তু হযরত ইসমাইল (আঃ) এ কাজের জন্যে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ও সর্বপ্রথম চেষ্টা ছিলেন ;

যেমন—মহানবী (সাঃ) —এর প্রতিও বিশেষ নির্দেশ ছিল যে, **كَانَ يُؤْتِي** **عَشِيرَتَكَ الْفَقِيرِينَ** অর্থাৎ, গোত্রের নিকটতম আত্মীয়দেরকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করুন। এ নির্দেশ পালনার্থে তিনি পরিবারবর্গকে একত্রিত করে বিশেষ ভাষণ দেন।

এখানে দ্বিতীয় প্রশ্নাধিনযোগ্য বিষয় এই যে, পয়গম্বরগণ সবাই সমগ্র জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁরা সবাইকে সত্যের পয়গাম পৌছিয়েছেন, খোদায়ী নির্দেশের অনুগামী করেছেন। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারবর্গের কথা উল্লেখ করার কারণ কি? জওয়াব এই যে, পয়গম্বরগণের দাওয়াতের বিশেষ কতিপয় মূলনীতি আছে। ভূমধ্যে একটি এই যে, হেদায়েতের কাজ সর্বপ্রথম নিজ গৃহ থেকে শুরু করতে হবে। নিজ পরিবারের লোকজনের পক্ষে হেদায়েত যেনে নেয়া এবং মানানো অপেক্ষাকৃত সহজও। তাদের দেখাশোনাও সদাসর্বদা করা যায়। তারা যখন কোন বিশেষ রঙে রঞ্জিত হয়ে পাকাপোক্ত হয়ে যায়, তখন একটি ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ব্যাপক দাওয়াত ও অন্যদের সংশোধনে বিরাট সহায়তা করে। মানবজাতির সংশোধনের সর্বাধিক কার্যকরী পন্থা হচ্ছে, একটি বিশুদ্ধ ধর্মীয় পরিবেশ অস্তিত্বে আনয়ন করা। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেক ভাল অথবা মন্দ বিষয় শিক্ষা-দীক্ষা ও উপদেশের চাইতে পরিবেশের মাধ্যমেই অধিক প্রসার লাভ করে।

وَكَانَ يُؤْتِي عَشِيرَتَكَ الْفَقِيرِينَ হযরত ইদরীস (আঃ) নূহ (আঃ)—এর

এক হাজার বছর পূর্বে তাঁর পিতৃপুরুষদের অন্যতম ছিলেন। (মুত্তাদরাক হাকিম) হযরত আদম (আঃ)—এর পর তিনিই সর্বপ্রথম নবী ও রসুল, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ত্রিশটি সীফা নাযিল করেন। (হামাখশারী) হযরত ইদরীস (আঃ) সর্বপ্রথম মানব, যাকে মু'জ্জেয হিসেবে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অকেবিজ্ঞান দান করা হয়েছিল। (বাহরে মুহীত) তিনিই সর্বপ্রথম মানব, যিনি কলমের সাহায্যে লেখা ও বস্ত্র সেলাই আবিষ্কার করেন। তাঁর পূর্বে মানুষ সাধারণতঃ পোশাকের স্থলে জীবজন্তুর চামড়া ব্যবহার করত। ওজন ও পরিমাপের পদ্ধতিও সর্বপ্রথম তিনিই আবিষ্কার করেন এবং অস্ত্র-শস্ত্রের আবিষ্কারও তাঁর আমল থেকেই শুরু হয়। তিনি অস্ত্র নির্মাণ করে কাবিল গোত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন। (বাহরে মুহীত, কুরত্বী, মায়হারী, রুজ্জল মা'আনী)

وَوَعَدْنَا مَكَائِيلَ অর্থাৎ, আমি ইদরীস (আঃ)—কে উচ্চ মর্তব্য সমুন্নত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁকে নবুওয়ত, রেসালত ও নৈকট্যের বিশেষ মর্তবা দান করা হয়েছে। কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, ইদরীস (আঃ)—কে আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন :

অর্থাৎ, এটা কা'বে আব্বারের ইসরাঈলী রেওয়াজে। এর কোন কোনটি বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা স্বীকৃত নয়। কোরআন পাকের আলোচ্য বাক্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় না যে, এখানে মর্তবা উচ্চ করা বোঝানো হয়েছে, না জীবিত অবস্থায় তাকে আকাশে তুলে নেয়া বোঝানো হয়েছে। কাজেই আকাশে তুলে নেয়ার বিষয়টির অস্বীকৃতি অকাটা নয়। কোরআনের তফসীর এর উপর নির্ভরশীল নয়। (বয়ানুল—কোরআন)

রসূল ও নবীর সংজ্ঞায় পার্থক্য ও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক : বয়ানুল—কোরআন থেকে উদ্ধৃত : রসূল ও নবীর সংজ্ঞায় বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। বিভিন্ন আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনার পর আমার কাছে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে, তা এই যে, যিনি উম্মতের কাছে নতুন শরীয়ত প্রচার করেন, তিনি রসূল। এখন শরীয়তটি স্বয়ং রসূলের দিক দিয়ে নতুন হোক, যেমন—তওরাত ইত্যাদি কিংবা শুধু উম্মতের দিক দিয়েই নতুন হোক, যেমন ইসমাইল (আঃ)—এর শরীয়ত; এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর প্রাচীন শরীয়তই ছিল, কিন্তু যে জুরহাম গোত্রের প্রতি তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তারা পূর্বে এ শরীয়ত সম্পর্কে কিছুই জানত না। হযরত ইসমাইল (আঃ)—এর মাধ্যমে তারা এ শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। এ অর্থের দিক দিয়ে রসূলের জন্য নবী হওয়া জরুরী নয়; যেমন—ফেরেশতা রসূল, কিন্তু নবী নন। অথবা যেমন—ঈসা (আঃ)—এর প্রেরিত দূত। আয়াতে তাদেরকে **أَرْسَلْنَاكَ بِالْبُرْهَانِ** বলা হয়েছে, অথচ তারা নবী ছিলেন না।

যার কাছে ওহী আগমন করে, তিনি নবী; তিনি নতুন শরীয়ত প্রচার করুন কিংবা প্রাচীন শরীয়ত। উদাহরণতঃ বনী-ইসরাঈলের অধিকাংশ নবী মুসা (আঃ)—এর শরীয়ত প্রচার করতো। এ থেকে জানা গেল যে, একদিক দিয়ে রসূল শব্দটি নবী শব্দের চাইতে ব্যাপক এবং অন্য দিক দিয়ে নবী শব্দটি রসূল শব্দের চাইতে ব্যাপক। যে আয়াতে উভয় শব্দ একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন উল্লেখিত আয়াতসমূহে **رَسُولًا** বলা হয়েছে, সেখানে কোন খটকা নেই। কেননা, বিশেষ ও ব্যাপকের একত্র সমাবেশ

অযৌক্তিক নয়; কিন্তু যেখানে উভয় শব্দ পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ বাক্যে বলা হয়েছে, সেখানে স্থানের ইঙ্গিতে নবীর অর্থ হবে এমন ব্যক্তি, যিনি পূর্ববর্তী শরীয়ত প্রচার করেন।

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ এখানে শুধু হযরত ইদরীস (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে, وَمِنْهُمْ حَمَلْنَا مَمْنُوتٍ এখানে শুধু হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে, وَمِنْهُمْ ذُرِّيَّتُهُ এখানে ইসমাইল, ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে এবং وَأَسْرَأُوهُمْ এখানে হযরত মুসা, হারুন, যাকারিয়া ইয়াহুইয়া ও ঈসা (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে।

إِذْ أَنْتَلَى إِلَهُكَ الرَّحْمٰنُ خَوْذُوا سَبْجًا ؕ أَوْ يَزِيٓرَ ؕ পূর্ববর্তী

আয়াতসমূহে কয়েকজন প্রধান পয়গম্বরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করে তাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। পয়গম্বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ির আশঙ্কা ছিল; যেমন ইহুদীরা হযরত ওয়ালয়কে এবং খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসাকে খোদাই বানিয়ে দিয়েছে, তাই এই সমষ্টির পর তারা যে আল্লাহর সামনে সেজদাকারী এবং আল্লাহর ভয়ে ভীত ছিলেন, একথা আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে, যাতে সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়িও না হয় এবং অবমাননাও না হয়।—(বয়ানুল-কোরআন)

কোরআন তেলাওয়াতের সময় কান্না অর্থাৎ অশ্রুসজল হওয়া পয়গম্বরের সুনুতঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কোরআনের আয়াত তেলাওয়াতের সময় কান্নার অবস্থা সৃষ্টি হওয়া প্রশংসনীয় এবং পয়গম্বরের সুনুতঃ। রসুলুল্লাহ (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবয়ীন ও ওলী-আল্লাহদের থেকে এ ধরনের বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

কুরতুবী বলেন : কোরআন পাকে সেজদার যে আয়াত তেলাওয়াত করা হয়, তার সাথে মিল রেখে সেজদায় দোয়া করা আলেমদের মতে মুস্তাহাব। উদাহরণতঃ সূরা সেজদায় এই দোয়া করা উচিত :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ السَّاجِدِينَ لوجهك المَسْبُوحِينَ بِحَمْدِكَ
واعوذ بك ان اكون من المستكبرين عن امرك

خلف লামের সাকিন যোগে এ শব্দটির অর্থ মন্দ উত্তরসূরী, মন্দ সন্তান-সন্ততি এবং লামের যবর যোগে এর অর্থ হয় উত্তম উত্তরসূরী এবং উত্তম সন্তান-সন্ততি। (মাহহারী) মুজাহিদ বলেন : কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন সংকল্পপরাণ লোকদের অস্তিত্ব থাকবে না, তখন এরূপ ঘটনা ঘটবে। তখন নামাযের প্রতি কেউ ক্রোড় করবে না এবং প্রকাশ্যে

পাপাচার অনুষ্ঠিত হবে।

নামায অসময়ে অথবা জমাআত ছাড়া পড়া নামায নষ্ট করার শামিল এবং বড় গোনাহ : আয়াতে ‘নামায নষ্ট করা’ বলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, নখরী, কাসেম, মুজাহিদ, ইবরাহীম, ওমর ইবনে আবদুল আযীয প্রমুখ বিশিষ্ট তফসীরবিদদের মতে, অসময়ে নামায পড়া বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : সময়সহ নামাযের আদব ও শর্তসমূহের মধ্যে কোনটিতে ত্রুটি করা নামায নষ্ট করার শামিল, আবার কারও কারও মতে ‘নামায নষ্ট করা’ বলে জমাআত ছাড়া নিজ গৃহে নামায পড়া বোঝানো হয়েছে।—(কুরতুবী, বাহরে মুহীত)

খলীফা হযরত ওমর ফারাক (রাঃ) সকল সরকারী কর্মচারীদের কাছে এই নির্দেশনামা লিখে প্রেরণ করেছিলেন : ‘আমার কাছে তোমাদের সব কাজের মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করে, সে দ্বীনের অন্যান্য বিধি-বিধান আরাও বেশী নষ্ট করবে।—(মুয়াত্তা মালেক)

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের আদব ও রোকন ঠিকমত পালন করছেন না। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কবে থেকে এভাবে নামায পড়ছ? লোকটি বলল : চল্লিশ বছর ধরে। হুযায়ফা বললেন : তুমি একটি নামাযও পড়নি। যদি এ ধরনের নামায পড়েই তুমি মারা যাও, তবে মনে রেখো— মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আনীত আদর্শের বিপরীতে তোমার মৃত্যু হবে।

তিরমীযিতে হযরত আবু মাসউদ আনসারীর বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রসুল করীম (সাঃ) বলেন : ঐ ব্যক্তির নামায হয় না, যে নামাযে ‘একামত’ করে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি রুকু ও সেজদায়, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে অথবা দুই সেজদার মধ্যস্থলে সোজা দাঁড়ানো অথবা সোজা হয়ে বসাকে গুরুত্ব দেয় না, তার নামায হয় না।

شَهَات - وَاتَّبَعُوا الْكُفْرَ (কুপ্রবৃত্তি) বলে দুনিয়ার সেসব আকর্ষণকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে গাফেল করে দেয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন : বিলাসবহুল গৃহ নির্মাণ, পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণকারী যানবাহনে আরোহণ এবং সাধারণ লোকদের থেকে স্বাতন্ত্র্যমূলক পোশাক আয়াতে উল্লেখিত কুপ্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত।—(কুরতুবী)

رَشَادِ الْغَى (আরবী ভাষায় غَى শব্দটি رشاد এর বিপরীত। প্রত্যেক কল্যাণকর বিষয়কে رشاد এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর বিষয়কে غَى বলা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : ‘গাই’ জাহান্নামের একটি গর্তের নাম। এতে সমগ্র জাহান্নামের চাহিতে অধিক আযাবের সমাবেশ রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : ‘গাই’ জাহান্নামের একটি গুহার নাম। জাহান্নামও এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাআলা যাদের জন্যে এই গুহা প্রস্তুত করেছেন তারা হচ্ছে, যে যিনাকার যিনায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে মদ্যপারী মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, যে সুদখার সুদগ্রহণ থেকে বিরত হয় না, যারা পিতা-মাতার অবাধ্যতা করে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে নারী অপরের সন্তানকে তার স্বামীর সন্তানে পরিণত করে।—(কুরতুবী)

لَا يَسْتَوُونَ فِيهَا ؕ لَغْوٌ - (কিস্তোন ফিহা) বলে অনর্থক ও অসার কথাবার্তা,

وَمَا تَنْتَظِرُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا
وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رُبُّكَ فِتْنَةً رَبِّ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ
لَهُ سَمِيًّا ۖ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أَنَا خَرَجًا ۝
أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝
فَوَرَّبُّكَ أَحْسَنُ رُحْمًا ۖ وَالشَّيْطَانُ ثُمَّ لَنَحْضُرَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ
جِثْيًا ۖ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّمًا أَشَدَّ عَلَى الرَّغْمِ
عَيْنًا ۖ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلًا ۖ وَرَأَى
مُتَكَبِّرًا لَا يُؤْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ فِتْنَةً ۖ ثُمَّ لَنُنَبِّئِي
الَّذِينَ اتَّقَوْا وَذَكَرُوا الظِّمِينَ فِيهَا حَبِيبًا ۖ وَإِذَا نُنَادِيهِمُ
أَيُّنَا لَأَبْدُتِ قَالَ الَّذِينَ يَكْفُرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَمْ أَتَى الْفَرِيقَيْنِ
خَيْرٌ مِمَّا مَوَّاهُ أَحْسَنُ نَدَاءً ۖ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ
أَحْسَنُ أَتَانًا ۖ أَوْ رَمَيْنَا ۖ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْهُ
الرَّحْمَنُ مَتَدًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا دَاوَمُوا مُوعَدُونَ ۖ إِنَّا الْعَادَابُ وَإِنَّا
السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ سَرْمَكَانًا ۖ وَأَضَعْتُ جُنْدًا ۖ

(৬৪) (জিবরাঈল বললঃ) আমি আপনার পালনকর্তার আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না, যা আমাদের সামনে আছে, যা আমাদের পশ্চাতে আছে এবং যা এ দুই-এর মধ্যস্থলে আছে, সবই তাঁর এবং আপনার পালনকর্তা বিস্মৃত হওয়ার নন। (৬৫) তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবার পালনকর্তা। সুতরাং তাঁরই বন্দেগী করুন এবং তাতে দৃঢ় থাকুন। আপনি কি তাঁর সমনাম কাউকে জানেন? (৬৬) মানুষ বলেঃ আমার মৃত্যু হলে পর আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব? (৬৭) মানুষ কি সুশ্রবণ করে না যে, আমি তাকে ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছি এবং সে তখন কিছুই ছিল না। (৬৮) সুতরাং আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রে সমবেত করব, অতঃপর অবশ্যই তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চারপাশে উপস্থিত করব। (৬৯) অতঃপর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দয়াময় আল্লাহর সর্বাধিক অবাধ্য, আমি অবশ্যই তাকে পৃথক করে নেব। (৭০) অতঃপর তাদের মধ্যে যারা জাহান্নামে প্রবেশের অধিক যোগ্য, আমি তাদের বিষয়ে ভালোভাবে জ্ঞাত আছি। (৭১) তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তথ্যই পৌছবে না। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা। (৭২) অতঃপর আমি পরহেযগারদেরকে উদ্ধার করব এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব। (৭৩) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তোলাওয়াত করা হয়, তখন কাকেররা মুমিনদেরকে বলেঃ দুই দলের মধ্যে কোনটি মর্তব্যয় শ্রেষ্ঠ এবং কার মজলিস উত্তম? (৭৪) তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি বিনাশ করেছি, তারা তাদের চাইতে সম্পদে ও জীক-জমকে শ্রেষ্ঠ ছিল। (৭৫) বলুন, যারা পশ্চাৎদৃষ্টি আছেন, দয়াময় আল্লাহ তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দেবেন; এমনকি অবশেষে তারা প্রত্যক্ষ করবে যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা আযাব হোক অথবা কেয়ামতই হোক। সুতরাং তখন তারা জানতে পারবে কে মর্তব্যয় নিকৃষ্ট ও দলবলে দুর্বল।

গালিগালাজ এবং পীড়াদায়ক বাক্যালাপ বোঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসিগণ এ থেকে পবিত্র থাকবে। কোনরূপ কষ্টদায়ক কথা তাদের কানে ধ্বনিত হবে না।

إِلَّا এটা পূর্ববাক্যের ব্যতিক্রম। উদ্দেশ্য এই যে, সেখানে যার যে কথা শোনা যাবে, তা শান্তি, নিরাপত্তা ও আনন্দ বৃদ্ধি করবে। পারিতোষিক সালামও এর অন্তর্ভুক্ত। জান্নাতিগণ একে অপরকে সালাম করবে এবং আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের সবাইকে সালাম করবে।—(কুরত্বী)

وَأَمْرٌ رَزَقْنَاهُمْ فِيهَا زَكَاةً وَعَشِيًّا জান্নাতে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং দিন ও রাত্রির অস্তিত্ব থাকবে না। সদা-সর্বদা একই প্রকার আলো থাকবে। কিন্তু বিশেষ পদ্ধতিতে দিন, রাত্রি ও সকাল-সন্ধ্যার পার্থক্য সূচিত হবে। এই রকম সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাতবাসীরা তাদের জীবনোপকরণ লাভ করবে। একথা সুস্পষ্ট যে, জান্নাতিগণ যখন যে বস্তু কামনা করবে, তখনই কালবিলম্ব না করে তা পেশ করা হবে।

এমতাবস্থায় মানুষের অভ্যাস ও স্বভাবের ভিত্তিতে সকাল-সন্ধ্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষ সকাল-সন্ধ্যায় আহ্বারে অভ্যস্ত। আরবরা বলেঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যার পূর্ণ আহ্বার যোগাড় করতে পারে, সে সুখী ও স্বাস্থ্যবান শীল।

হযরত আনাস ইবনে মালেক এই আয়াত তোলাওয়াত করে বললেনঃ এ থেকে বোঝা যায় যে, মুমিনদের আহ্বার দিনে দু'বার হয়—সকাল ও সন্ধ্যায়।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ আয়াতে সকাল-সন্ধ্যা বলে ব্যাপক সময় বোঝানো হয়েছে, যেমন দিবারাত্রি ও পূর্ব-পশ্চিম শব্দগুলোও ব্যাপক অর্থে বলা হয়ে থাকে। কাজেই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জান্নাতীদের খায়েশ অনুযায়ী তাদের খাদ্য সর্দাসর্বদা উপস্থিত থাকবে।—(কুরত্বী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اصْطَابِرَ - শব্দের অর্থ পরিশ্রম ও কষ্টের কাছে দৃঢ় থাকা। ইঙ্গিত রয়েছে যে, এবাদতের স্থায়িত্ব পরিশ্রমসাপেক্ষ। এবাদতকারীর এ জন্যে প্রস্তুত থাকা উচিত।

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ সম্মান। এটা আশ্চর্যের বিষয় বটে, মুশরিক ও প্রতিমা পূজারীরা যদিও এবাদতে আল্লাহ তাআলার সাথে অনেক মানুষ, ফেরেশতা, পাখর ও প্রতিমাকে অংশীদার করেছিল এবং তাদেরকে 'ইলাহ' তথা উপাস্য বলত; কিন্তু কেউ কোনদিন কোন মিথ্যা উপাস্যের নাম আল্লাহ রাখেনি। সৃষ্টিগত ও নিয়ন্ত্রণগত ব্যবস্থাবিনেই দুনিয়াতে কোন মিথ্যা উপাস্য আল্লাহ নামে অভিহিত হয়নি। তাই এই প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়েও আয়াতের বিষয়বস্তু সুস্পষ্ট যে, দুনিয়াতে আল্লাহর কোন সমনাম নেই।

মুজাহিদ, ইবনে জু'যায়ের, কাতাদাহ, ইবনে আব্বাস প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে এসেছে سَمِيٍّ শব্দের অর্থ অনুরূপ সদৃশ বর্ণিত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, পূর্ণতার গুণাবলীতে আল্লাহ তাআলার কোন সমতুল্য, সমকক্ষ নেই।

وَأَمْرٌ رَزَقْنَاهُمْ فِيهَا زَكَاةً وَعَشِيًّا এখানে وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَحْضُرَهُمْ

مع (সহ) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক কাফেরকে তার শয়তানসহ একই শিকলে বেঁধে উঠিত করা হবে। এমতাবস্থায় এ বর্ণনাটি হবে শুধু কাফেরদেরকে সমবেত করা সম্পর্কে। পক্ষান্তরে যদি মুমিন ও কাফের ব্যাপক অর্থে নেয়া হয়, তবে শয়তানদের সাথে তাদের সবাইকে সমবেত করার মর্মার্থ হবে এই যে, প্রত্যেক কাফের তো তার শয়তানের সাথে ঐদা অবস্থায় উপস্থিত হবেই এবং মুমিনগণও এই মাঠে আলাদা থাকবে না; ফলে সবার সাথে শয়তানদের সহঅবস্থান হবে।—(কুরতুবী)

حَوْلَ حَقِّهِمْ হাশরের প্রাথমিক অবস্থায় মুমিন, কাফের, ভাগ্যবান ও হতভাগা সবাইকে জাহান্নামের চারদিকে সমবেত করা হবে। সবাই ভীতিবিহ্বল নতজানু অবস্থায় পড়ে থাকবে। এরপর মুমিন ও ভাগ্যবানদেরকে জাহান্নাম অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। ফলে জাহান্নামের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা পুরোপুরি খুশী, ধর্মদ্রোহীদের দুঃখে আনন্দ এবং জান্নাতলাভের কারণে অধিকতর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

كُلُّ نَفْسٍ مِّنْكُمْ شَيعَةٌ - শব্দে আসল অর্থ কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ মতবাদের অনুসারী। তাই সম্প্রদায় অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের বিভিন্ন দলের মধ্যে যে দলটি সর্বাধিক উদ্ধত হবে, তাকে সবার মধ্য থেকে পৃথক করে অগ্রে প্রেরণ করা হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : অপরাধের আধিক্যের ক্রমানুসারে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অপরাধীদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।—(মায়হারী)

وَأَن يَّزْنُوا وَأَن يَّزْنُوا অর্থ, জাহান্নামে পৌছবে না, এমন কোন মুমিন ও কাফের থাকবে না। এখানে পৌছার অর্থ প্রবেশ নয়—অতিক্রম করা। হযরত ইবনে মাসউদের এক রেওয়াজেতে مرور (অতিক্রম করা) শব্দও বর্ণিত রয়েছে। যদিও প্রবেশ অর্থ নেয়া হয়, তবে মুমিন ও পরহেযগারদের প্রবেশ এভাবে হবে যে, জাহান্নাম তাদের জন্যে শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে, তারা কোনরূপ কষ্ট অনুভব করবে না। হযরত আবু সুমাইয়ার রেওয়াজেতে রসুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কোন সৎ ও পাপাচারী ব্যক্তি প্রথমাবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ থেকে বাদ পড়বে না। কিন্তু তখন মুমিন ও মুত্তাকীদের জন্যে জাহান্নাম শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে; যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর জন্যে নরমাদের অগ্নিকুণ্ডকে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেয়া হয়েছিল। এরপর মুমিনদেরকে এখান থেকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। আয়াতের পরবর্তী تَوَسَّعَ الْكَافِرِينَ الْكَافِرِينَ বাক্যের অর্থ তাই।

خَيْرٌ مَّا وَآخِرُنَا أَحْسَنُ نَدَايَا এখানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে

কাফেররা মুসলমানদের সামনে দু'টি বিষয় উপস্থাপিত করেছে। (এক) পার্শ্ব ধন—দৌলত ও সাজ-সরঞ্জাম এবং (দুই) চাকর-নওকর, দলবল ও পারিষদবর্গ। এসব বস্তু মুসলমানদের তুলনায় কাফেরদের কাছে বেশী ছিল। এ দু'টি বস্তুই মানুষের জন্যে নেশা হিসাবে কাজ করে এবং এগুলোর অহমিকাই ভাল ভাল জ্ঞানী ও সুধীজনকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। এ নেশাই মানুষের সামনে বিগত যুগের বড় বড় পুঞ্জিপতি ও রাজ্যাধিপতিদের দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাস বিস্মৃতি করিয়ে তার বর্তমান অবস্থাকে তার ব্যক্তিগত গুণ-গরিমার ফল এবং স্থায়ী শান্তির উপায়রূপে প্রতিভাত করে দেয়। অবশ্য তাদের কথা স্বতন্ত্র, যারা কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী পার্শ্ব ধন—দৌলত মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিকে ব্যক্তিগত গুণ-গরিমার ফল অথবা চিরস্থায়ী সাধী মনে করে না; সাথে সাথে মুখও আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত ব্যয় করার কাজেও আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলে এবং কোন সময় গাফেল হয় না। তাইই শুধু পার্শ্ব ধন—দৌলতের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণতঃ অনেক পয়গম্বর, যেমন হযরত সোলায়মান (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ) এবং অনেক বিশালী সাহাবী, উম্মতের মধ্যকার অনেক ওলী ও সংকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা অতুল বিত্তবৈভব দান করেছেন এবং সাথে সাথে ধর্মীয় সম্পদ ও অপরিমেয় আল্লাহ ভীতিতেও তাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

কাফেরদের এই বিভ্রান্তি কোরআন পাক এভাবে দূর করেছে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নেয়ামত ও সম্পদ আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয় এবং দুনিয়াতেও একে কোন ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠার লক্ষণ মনে করা হয় না। কেননা, দুনিয়াতে অনেক নির্বোধ মূর্খও এগুলো জ্ঞানী ও বিদ্বজ্জনের চাইতেও বেশী লাভ করে। বিগত যুগের ইতিহাস খুঁজে দেখলে এ সত্য উদ্ঘাটিত হবে যে, পৃথিবীতে এ পরিমাণ তো বটেই, বরং এর চাইতেও বেশী ধন—দৌলত স্তুপীকৃত হয়েছে।

চাকর-নওকর, বন্ধু-বান্ধব ও পারিষদবর্গের অধিক্য সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রথমতঃ দুনিয়াতেই তাদের অন্তঃসারশূন্যতা ফুটে উঠে অর্থাৎ, বিপদের মুহূর্তে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন কোন কাজে আসে না। দ্বিতীয়তঃ যদি দুনিয়াতে তারা সেবাকর্ম নিয়োজিতও থাকে, তবুও তা কয়দিনের জন্যে? মৃত্যুর পর হাশরের মাঠে কেউ কারো সঙ্গী সাধী হবে না।

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْغَيْبُ الصُّلُوحُ
 خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مِمَّا يَكْفُرُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَكْثَرُ عِنْدَ رَبِّنَا
 عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَتَكُنُّ مَأْمُورُونَ وَمَنْ لَكُمْ مِنْ
 الْعَذَابِ مَكًا وَتُزَيَّنُّ لَهُ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ كَذِبُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِيُكَذِّبُوا هَمَّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَا سِيَّكُمْ رُونَ
 بِمَا أَذْنَبْتُمْ وَكَوُنُونَ عَلَيْهِمْ صُغْدًا كَلَّا تَرَكَ اللَّهُ الشَّيْطَانُ
 عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَضَّعُوا لَهُمْ أَكْثَرُ كَلَّا تَعْلَمُونَ كَلَّا عَمَّا
 يَوْمَ تَحْشُرُهُمُ السُّجُنُ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ كُتِبَ لَهُمُ السُّجُنُ
 إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدَّ اللَّهُ لِيَكُونَ الشَّفَاعَةُ الْأَمِينُ اتَّخَذَ عِنْدَ
 الرَّحْمَنِ عَهْدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنِ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا
 إِذَا كُنَّا لِلَّهِ سَمُوتًا يَنْظُرُونَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتُخْرِجُ الْجِبَالُ
 هُكًّا أَنْ دَعَا لِلزَّمِينِ وَلَدًا وَيَلْبِسُ لِلزَّمِينِ أَنْ يَخُونُ وَلَدًا
 إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا الْآلِي الرَّحْمَنِ عَمَّا لَقَدْ
 أَحْضَبَهُمْ وَعَدَّهُمْ عَمَّا وَكَلَّمَهُمْ أَتَيْهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ قُرْآنًا ⑩

(৭৬) যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের পথপ্রাপ্তি বৃদ্ধি করেন এবং স্থায়ী সংকর্ষসমূহ তোমার পালনকর্তার কাছে সওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসেবেও শ্রেষ্ঠ। (৭৭) আপনি কি তাকে লক্ষ্য করেছেন, যে আমার নিদানবলীতে বিশ্বাস করে না এবং বলে : আমাকে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অবশ্যই দেয়া হবে। (৭৮) সে কি অদৃশ্য বিষয় জেনে ফেলেছে, অথবা দয়াময় আল্লাহর নিকট থেকে কোন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হয়েছে? (৭৯) না, এটা ঠিক নয়। সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তার শাস্তি দীর্ঘায়িত করতে থাকব। (৮০) সে যা বলে, মৃত্যুর পর আমি তা নিয়ে নেব এবং সে আমার কাছে আসবে একাকী। (৮১) তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য ইলাহ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা তাদের জন্য সাহায্যকারী হয়। (৮২) কখনই নয়, তারা তাদের এবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষে চলে যাবে। (৮৩) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফেরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে। (৮৪) সুতরাং তাদের ব্যাপারে আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি মাত্র। (৮৫) সেদিন দয়াময়ের কাছে পরহেযগারদেরকে অতিশিরূপে সমবেত করব, (৮৬) এবং অপরারীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাব। (৮৭) যে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না। (৮৮) তারা বলে : দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। (৮৯) নিকট তোমরা তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করছে। (৯০) হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী ঋণ-বিধগ্ন হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। (৯১) এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্য সন্তান আহবান করে। (৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। (৯৩) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। (৯৪) তাঁর কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। (৯৫) কোয়ামতের দিন তাদের সবাই তাঁর কাছে একাকী অবস্থায় আসবে।

لَا يُؤْتِيَنَّكَ مَالًا وَلَا وَلَدًا) বোখারী ও মুসলিমের হযরত শাফাব ইবনে আরতের রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি ‘আস ইবনে ওয়ায়েল কাফেরের কাছে কিছু পাওয়ার তাগাদায় গেলে সে বলল : তুমি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। শাফাব জওয়াব দিলেন : এরূপ করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, চাই কি তুমি মরে পুনরায় জীবিত হতে পার। আ’স বলল : ভালো তো, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হব? এরূপ হলে তাহলে তোমার ঋণ তখনই পরিশোধ করব। কারণ, তখনও আমার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে।—(কুরতুবি)

কোরআন পাক এই আহাম্মক কাফেরের জওয়াবে বলেছে : সে কিরূপে জানতে পারল যে, পুনরায় জীবিত হওয়ার সময়ও তার হাতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি থাকবে? أَكَلِمَةَ الْغَيْبِ সে কি উকি মেরে অদৃশ্যের বিষয়সমূহ জেনে নিয়েছে? اَلَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا অথবা সে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির কোন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছে? বলাবাহুল্য, এরূপ কোন কিছুই হয়নি। এমতাবস্থায় সে মনে এরূপ ধারণা কিরূপে বদ্ধমূল করে নিয়েছে? وَتُزَيَّنُّ لَهُ أَعْيُنُكُمْ وَتُزَيَّنُّ لَهُ أَعْيُنُكُمْ অর্থাৎ, সে যে, ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির কথা বলেছে, তা পরকালে পাওয়া তো দূরের কথা দুনিয়াতেও সে যা প্রাপ্ত হয়েছে, তাও ত্যাগ করতে হবে এবং অবশেষে আমিই তার অধিকারী হব। অর্থাৎ এই ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি তার হস্তচ্যুত হয়ে অবশেষে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) কোয়ামতের দিন সে একা আমার দরবারে উপস্থিত হবে। তার সাথে তখন না থাকবে সন্তান-সন্ততি এবং না থাকবে ধন-দৌলত। وَكَوُنُونَ عَلَيْهِمْ صُغْدًا অর্থাৎ, এই স্বহস্তনির্মিত মূর্তি এবং মিথ্যা উপাস্য, সহায় হওয়ার আশায় কাফেররা যাদের এবাদত করত, তারা এই আশার বিপরীত তাদের শত্রু হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বাকশক্তি দান করবেন এবং তারা বলবে : ইয়া আল্লাহ্, এদেরকে শাস্তি দিন। কেননা, এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য করে নিয়েছিল।

تَوَضَّعُوا لَهُمْ أَكْثَرُ অারবী অভিধানে ফ-অ-হ-শব্দগুলো একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ কোন কাজের জন্যে উৎসাহিত করা। লঘুতা, তীব্রতা ও কম-বেশীর দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য রয়েছে। অ-হ-শব্দের অর্থ পূর্ণ শক্তি, কৌশল ও আন্দোলনের মাধ্যমে কাউকে কোন কাজের জন্যে প্রস্তুত বরং বাধ্য করে দেয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, শয়তানরা কাফেরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না।

عَلَّمَ الْغَيْبَ উদ্দেশ্য এই যে, আপনি তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। শাস্তি সত্ত্বরই হবে। কেননা, আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বসবাসের জন্যে যে গুনাগুনতি দিন ও সময় দিয়েছি, তা দ্রুত পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শাস্তিই শাস্তি। اَلَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا অর্থাৎ, আমি তাদের

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ
وَدًّا ۖ وَآتَاهُمْ تَبَرُّهٖ وَيُنْفِثُ فِيهِمُ الرِّيحَ الْيَمِينُ ۖ وَنَزَّلَ
بِهِ قَوْلًا لَّدَا ۖ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِشُّ
مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا ۝

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ۖ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ۖ أَعِزِّزْ قَوْلِي ۖ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
طه ۝ مَا نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۖ إِلَّا تَذَكُّرًا ۖ لَسَنَ
يُخَوِّضُكَ تَتْرِبًا وَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمُوتِ الْعُلَى ۖ
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۖ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَهَاجَتِ الثُّرَى ۖ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ
فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۖ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْأَلْفُؤْلَةُ الْأَسْمَاءُ
الْحُسْنَى ۖ وَهَلْ أَمْسَكَ حَدِيثَ مُوسَى ۖ إِذْ رَأَى نَارًا فَفَقَالَ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۖ إِنِّي أَنْتَ نَارُ الْعَلِيِّ إِنِّي كُنْتُ مِنْهَا نَبِيًّا ۖ أَوْ
أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۖ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَبُوءُ لِي ۖ إِنِّي أَنَا
رَبُّكَ ۖ فَاسْكَنْتُكَ لِي ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ۝

(১৬) যারা বিশ্রাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ্ ভালবাসা দেন। (১৭) আমি কোরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা পরহেযগারদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। (১৮) তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। আপনি কি তাদের কাহারও সাড়া পান, অথবা তাদের ক্ষীণতম আওয়াজও শুনতে পান?

সূরা ছোয়া-হা

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ১৩৫

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(১) তোয়া-হা (২) আপনাকে ক্রেশ দেবার জন্য আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি। (৩) কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্য, যারা ভয় করে। (৪) এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুদ্র নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। (৫) তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন। (৬) নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে, এতদূরত্বের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই। (৭) যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও কথা বল, তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। (৮) আল্লাহ তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য ইলাহ নেই। সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই। (৯) আপনার কাছে মুসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি। (১০) তিনি যখন আগুন দেখলেন, তখন পরিবারবর্গকে বললেন : তোমরা এখানে অবস্থান কর, আমি আগুন দেখছি। সম্ভবতঃ আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা আগুন পৌঁছে পথের সন্ধান পাব। (১১) অজ্ঞপ্তর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন আওয়াজ আসল হে মুসা, (১২) আমিই তোমার পালনকর্তা, অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছ।

জন্যে গণনা করছি। এর উদ্দেশ্য এই যে, কোন কিছুই বঙ্গাহীন নয়। তাদের বয়সের দিবারাত্রি গণনার মধ্যে রয়েছে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের চলাফেরার এক একটি পদক্ষেপ, তাদের আনন্দও তাদের জীবনের এক একটি মুহূর্ত আমি গণনা করছি। গণনা শেষ হওয়া মাত্র তাদের উপর আযাব ঝাপিয়ে পড়বে।

খলীফা মামুনর রশীদ একবার সূরা মারইয়াম পাঠ করলেন। এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে তিনি দরবারে উপস্থিত আলেম ও ফেকাহবিদগণের মধ্য থেকে ইবনে সামমাকের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন : এ সম্পর্কে কিছু বলুন। ইবনে সামমাক আরম্ভ করলেন : আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসই যেখানে গুনতিকৃত, তখন তো তা খুবই দ্রুত নিঃশেষ হবে।

يَوْمَ نُخَوِّضُ الرِّجَالِ إِلَى الرِّجَالِ ۖ وَفَدَا

শাসনকর্তার কাছে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে গমন করে, তাদেরকে ওফদা বলা হয়। হাদীসে রয়েছে : তারা সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌঁছবে এবং প্রত্যেকের সওয়ারী তাই হবে, যা সে দুনিয়াতে পছন্দ করত। উদাহরণতঃ উট, ঘোড়া প্রভৃতি। কেউ কেউ বলেন : তাদের সংকর্মসমূহ তাদের প্রিয় সওয়ারীর রূপ ধারণ করবে। (ক্লেহল-মা'আনী, কুরতুবী)

وَكَيْفَ يُجَالِ هَكَذَا

ইত্যাদিতে বিশেষ এক প্রকার বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান আছে, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনায় ন্যায় খোদায়ী বিধানাবলী প্রযোজ্য হওয়ার স্তর পর্যন্ত উন্নীত নয়। এই বুদ্ধি ও চেতনার কারণই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহর নামের তসবীহ পাঠ করে, যেমন—কোরআন বলে : وَلَنْ يَرْ

سَمِيَّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۖ

কোন বস্তু দুনিয়াতে নেই। বস্তুসমূহের এই বুদ্ধি ও চেতনাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করলে বিশেষতঃ আল্লাহর জন্যে সন্তান সাব্যস্ত করলে পৃথিবী, পাহাড় ইত্যাদি ভীষণরূপে অস্থির ও ভীত হয়ে পড়ে। হয়ত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : জিন ও মানব ছাড়া সমস্ত সৃষ্টবস্তু শেরকের ভয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় — (ক্লেহল-মা'আনী)

وَكَيْفَ يُجَالِ هَكَذَا

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সমগ্র মানবমণ্ডলীর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের পদক্ষেপ, তাদের লোকমা ও ঢোক আল্লাহর কাছে গণনাকৃত। এতে কম-বেশী হতে পারে না।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۖ

ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহ তাআলা বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান ও সংকর্ম পূর্ণরূপে পরিগ্রহ করলে এবং বাইরের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হলে ঈমানদার সংকর্মশীলদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি পয়দা হয়ে যায়। একজন সংকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য একজন সংকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টজীবের মনেও আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দেন।

বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে হয়রত আবু হুরায়রার

রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন জিবরাঈলকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। অতঃপর জিবরাঈল সব আকাশে একথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর এই ভালবাসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। তিনি আরও বলেন : কোরআন পাকের এই আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمْ رَحْمَةً وَدًّا

(রুহুল-মা'আনী) হারেম ইবনে হাইয়ান বলেন : যে ব্যক্তি সর্বাস্তকরণে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত ইমানদারের অন্তর তার দিকে নিবিষ্ট করে দেন — (কুরত্বী)

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) যখন স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাইল (আঃ)-কে আল্লাহর নির্দেশে মক্কার শুক পর্বতমালা বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁদের জন্যে দোয়া করে বলেছিলেন : **فَجَعَلُوكَ إِقْدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ** হে আল্লাহ আমার নিঃসঙ্গ পরিবার পরিজনদের প্রতি আপনি কিছু লোকের অন্তর আকৃষ্ট করে দিন। এ দোয়ার ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও মক্কা ও মক্কাবাসীদের প্রতি মহব্বতে সমগ্র বিশ্বের অন্তর আপলুত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দূরতীক্রম্য বাধা-বিপত্তি ডিসিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে মানুষ এখানে পৌঁছে এবং বিশ্বের কোণে কোণে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়, তা মক্কার বাজারসমূহে পাওয়া যায়।

أَوَسَمَ لَهُمُورًا বোধগম্য নয় — এমন ক্ষীণতম শব্দকে বলা হয়; যেমন মরণোন্মুখ ব্যক্তি জিহ্বা সঞ্চালন করলে আওয়াজ হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সব রাজ্যাধিপতি, জাঁক-জমকের অধিকারী ও শক্তিশ্রদেরকে যখন আল্লাহ তাআলার আযাব পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেয়, তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের কোন ক্ষীণতম শব্দ এবং আচরণ-আলোড়ন আর শোনা যায় না।

সূরা যোয়া-হা

এই সূরার অপর নাম সূরা কলীম। কারণ, এতে হযরত মুসা কলীমুল্লাহ (আঃ)-এর ঘটনার বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসানদের দারেযীতে হযরত আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন আল্লাহ তাআলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করারও দুই হাজার বছর পূর্বে সূরা তোয়াহ ও সূরা ইয়াসীন, ফেরেশতাদেরকে শোনান, তখন ফেরেশতারা বলেছিলেন : ঐ উষ্মত অত্যন্ত ভাগ্যবান ও বরকতময়, যাদের প্রতি এই সূরাগুলো অবতীর্ণ হবে; তারা পুণ্যবান, যারা এগুলো হেফয করবে এবং তারা অপরিসীম সৌভাগ্যশীল, যারা এগুলো পাঠ করবে। এই বরকতময় সূরাই রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে আগমনকারী ওমর ইবনুল খাত্তাবকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল।

٤٦ — এই শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর অর্থ **يَارِجِل** (হে ব্যক্তি) এবং ইবনে ওমর থেকে **يَا حَبِيبِي** (হে আমার বন্ধু) বর্ণিত আছে। কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, **طه** ও **يس** রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর অন্যতম নাম। কিন্তু হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) ও বিশিষ্ট আলেমগণ এ সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তাই নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন : কোরআন পাকের অনেক সূরার শুরুতে **الم** এর ন্যায় বেশ কিছুসংখ্যক খণ্ড অক্ষর উল্লেখিত হয়েছে। এগুলো **متشابهات** অর্থাৎ, গোপনভেদ যার মর্ম আল্লাহ ব্যতীত অপর কেউ জানে না। **طه** শব্দটিও এরই অন্তর্ভুক্ত।

لَتَشْفَى শব্দটি **لَتَشْفَى** থেকে

উদ্ভূত। এর অর্থ ক্লেশ, পরিশ্রম ও কষ্ট। কোরআন অবতরণের সূচনাভাবে রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম সারারাত এবাদতে দগ্ধমান থাকতেন এবং তাহাজ্জুদের নামাযে কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। ফলে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পা ফুলে যায়। কাফেররা কোন রকমে হেদায়েত লাভ করুক এবং কোরআনের দাওয়াত কবুল করুক—তিনি সারাদিন এ চিন্তায়ই কাটিয়ে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে এই উভয়বিধ ক্লেশ থেকে উদ্ধার করার জন্যে বলা হয়েছে : আপনাকে কষ্টে ও পরিশ্রমে ফেলার জন্যে আমি কোরআন অবতীর্ণ করিনি। সারারাত জাগ্রত থাকা এবং কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার প্রয়োজন নেই। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) নিয়মিতভাবে রাতের সূচনাভাগে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং শেষ রাত্রে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়তেন।

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু দাওয়াত ও প্রচার করা। একাজ সম্পন্ন করার পর কে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং কে দাওয়াত কবুল করল না, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আপনার দায়িত্ব নয়। — (কুরত্বী)—সংক্ষেপিত)

الْأَنذَرُكَ لِمَنْ يَشَاءُ ইবনে কাসীর বলেন : কোরআন অবতরণের

সূচনাভাগে সারারাত তাহাজ্জুদ ও কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে কোন কোন কাফের মুসলমানদের প্রতি বিদ্রোহাণ বর্ষণ করতে থাকে যে, তাদের প্রতি কোরআন তো নয়—সাক্ষাত বিপদ নাযিল হয়েছে; রাতের আরাম নেই, দিনের বেলায়ও শান্তি নেই। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করেছেন যে, সত্য সম্পর্কে বৈধবর; হতভাগা, মুখরা জানে না যে, কোরআন ও কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যে জ্ঞান প্রদান করেছেন তার কল্যাণকারীতা কত গভীর। যারা একে বিপদ মনে করে, তারা নির্বোধ। হযরত মুআবিয়ার বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন **يَقْفَهُ فِي الدِّينِ** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের বিশেষ জ্ঞান ও যুৎপত্তি দান করেন।

এখানে ইবনে-কাসীর অপর একটি সহীহ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি আলেম সমাজের জন্যে খুবই সুসংবাদবহ। এই হাদীসটি হযরত সা'লাব কত্বক ইবনে-হাকাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি এই :

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, ‘কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তাআলা বান্দাদের আমলের ফয়সালা করার জন্যে তাঁর সিংহাসনে উপবেশন করবেন, তখন আলেমগণকে বলবেন : আমি আমার এলম ও হেকমত তোমাদের বুকে এ জন্যেই রেখেছিলাম, যাতে তোমাদের কৃত গোনাহ ও ক্রটি সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেই। এতে আমি কোন পরওয়া করি না।’

কিন্তু এখানে সেসব আলেমগণকেই বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কোরআন বর্ণিত এলমের লক্ষণ অর্থাৎ, আল্লাহর ভয় বিদ্যমান আছে। আয়াতের لَمَّا نَسُوا شব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। যাদের মধ্যে এই আলামত নেই, তারা এই হাদীসের যোগ্যপাত্র নয়।

استواء على العرش - (আরশের উপর সমাসীন হওয়া) সম্পর্কে পূর্ববর্তী বুয়ুর্গগণের উক্তি হচ্ছে যে, এর স্বরূপ ও অবস্থা কারও জ্ঞান নেই। এটা مُنْشِئِهِ তথা দুর্বোধ্য বিষয়াদির অন্যতম। একরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরশের উপর সমাসীন হওয়া সত্য। এ অবস্থা আল্লাহর শান অনুযায়ী হবে। জগতের কেউ তা উপলব্ধ করতে পারে না।

وَأَعْلَى الرَّبِّ আর্র ও ভেজা মাটিকে ٱرى বলা হয় যা মাটি খনন করার সময় নীচ থেকে বের হয়। মানুষের জ্ঞান এই ٱرى পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। এর নীচে কি আছে, তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। সমকালীন নতুন গবেষণা, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও মাটি খুঁড়ে এপার থেকে ওপারে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা বহু বছর ধরে চালানো হয়েছে এবং এসব গবেষণা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলাফল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে, কিন্তু মাত্র ছয় মাইল গভীর পর্যন্তই এসব আধুনিক যন্ত্রপাতি কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। এর নীচে এমন প্রস্তর সদৃশ স্তর রয়েছে, যেখানে খনন কাজ চালাতে সকল যন্ত্রপাতি ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনাও ব্যর্থ হয়েছে। মাত্র ছয় মাইলের গভীরতা পর্যন্তই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে অথচ মৃত্তিকার ব্যাস হাজারো মাইল। তাই একথা স্বীকার করা ছাড়া গতাস্তর নেই যে, পাতালের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলারই বিশেষ গুণ।

يَعْلَمُ الْإِنْسَانُ مَا فِي بَاطِنِ ٱلْأَرْضِ মানুষ মনে যে কথা গোপন রাখে, কারও কাছে তা প্রকাশ করে না, তাকে বলা হয় سر ٱক্ষান্তরে বলে সে কথা বোঝানো হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত মনেও আসেনি, ভবিষ্যতে কোন সময় আসবে। আল্লাহ তাআলা এসব বিষয় সম্পর্কেও স্মারক ওয়াকিফহাল। কোন মানুষের মনে এখন কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি থাকবে, তিনি সবই জানেন। ভবিষ্যত সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও জানে না যে, আগামীকাল তার মনে কি কথা উদিত হবে।

وَهَلْ أَتَىكَ ٱلْحَبْيَةُ ٱلْمُؤَسَّىٰ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কোরআন পাকের মাহাত্ম্য এবং সেই প্রসঙ্গে রসূলের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত মুসা (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক এই যে, রেসালত ও দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে যেসব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ যেসব কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহানবী (সাঃ)-এর জ্ঞান থাকা দরকার যাতে তিনি পূর্ব থেকেই এসব বিপদাপদের

জন্মে প্রস্তুত হয়ে অবিলম্ব খাকতে পারেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَمَا أَكْفَأُكَ عَنْ بَيِّنَاتِ ٱلرُّسُلِ مَآثِرُ ٱلْمُرُوءِ

অর্থাৎ, আমি পয়গম্বরগণের এমন কাহিনী আপনার কাছে এ জন্যে বর্ণনা করি, যাতে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং আপনি নবুওয়তের দায়িত্ব বহন করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান।

এখানে উল্লিখিত মুসা (আঃ)-এর কাহিনীর সূচনা এভাবেঃ একদা তিনি মাদইয়ান পৌছে হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর গৃহে একরূপ চুক্তির অধীনে অবস্থান করতে থাকেন যে, আট অথবা দশ বছর পর্যন্ত তাঁর খেদমত করবেন। তফসীর বাহরে-মুহীতের রেওয়াজে অনুযায়ী তিনি যখন উচ্চ মেয়াদ অর্থাৎ, দশ বছর পূর্ণ করেন তখন শোআয়ব (আঃ)-এর কাছে আরম্ভ করলেনঃ এখন আমি জননী ও ভগ্নির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মিসর যেতে চাই। ফেরাউনের সিপাহীরা তাঁকে গ্রেফতার ও হত্যার জন্যে খোঁজ করছিল। এ আশঙ্কার কারণেই তিনি মিসর ত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে এখন সে আশঙ্কা অবশিষ্ট ছিল না। শোআয়ব (আঃ) তাঁকে স্ত্রী অর্থাৎ, নিজের কন্যাসহ কিছু অর্থকড়ি ও আসবাবপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন। পথিমধ্যে শাম অঞ্চলের শাসকদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কা ছিল, তাই তিনি পরিচিত পথ ছেড়ে অখ্যাত পথ অবলম্বন করলেন। তখন ছিল শীতকাল। স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা এবং তাঁর প্রসবকাল ছিল নিকটবর্তী। সকাল-বিকাল যে কোন সময় প্রসবের সম্ভাবনা ছিল। রাস্তা ছিল অপরিচিত। তাই তিনি মরু অঞ্চলে পথ হারিয়ে তুর পর্বতের পশ্চিমে ও ডান দিকে চলে গেলেন। গভীর অন্ধকার। কনকনে শীত। বরফসিক্ত মাটি। এহেন দুর্ঘোণ-মুহূর্তে স্ত্রীর প্রসব বেদনা শুরু হয়ে গেল। মুসা (আঃ) শীতের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে আগুন জ্বালাতে চাইলেন। তখনকার দিনে দিয়াশলাই-এর স্থলে চকমকি পাথর ব্যবহার করা হত। এই পাথরে আঘাত করলে আগুন জ্বলে উঠত। মুসা (আঃ) এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যর্থ হলেন। আগুন জ্বলল না। এই হতবুদ্ধি অবস্থার মধ্যেই তিনি তুর পর্বতে আগুন দেখতে পেলেন। সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে নূর। তিনি পরিবারবর্গকে বললেনঃ তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি আগুন দেখছি। দেখি, সেখানে গিয়ে আগুন আনা যায় কিনা। সম্ভবতঃ আগুনের কাছে কোন পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও পেতে পারি, যার কাছ থেকে পথের সন্ধান জানতে পারব। পরিবারবর্গের মধ্যে স্ত্রী যে ছিলেন, তা তো সুনিশ্চিত। কোন কোন রেওয়াজে থেকে জানা যায় যে, কোন খাদেমও সাথে ছিল। তাকে উদ্দেশ্য করেও সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, কিছুসংখ্যক লোক সফর সঙ্গীও ছিল, কিন্তু পথ ভুলে তিনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।—(বাহরে-মুহীত)

فَلَمَّا أَتَى ٱلْمَدْيَنَ - অর্থাৎ, যখন তিনি আগুনের কাছে পৌছলেন ;

মুসনাদে-আহমদে ওয়াহাব ইবনে মুনাবেহ্ বর্ণনা করেন যে, মুসা (আঃ) আগুনের কাছে পৌছে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন যে, এটি একটি বিরাট আগুন, যা একটি সতেজ ও সবুজ বৃক্ষের উপর দাঁড় করে জ্বলছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর কারণে বৃক্ষের কোন ডাল অথবা পাতা পুড়েছে না; বরং আগুনের কারণে বৃক্ষের সৌন্দর্য, সজীবতা ও শুষ্কতা আরও বেড়ে গেছে। মুসা (আঃ) এই বিস্ময়কর দৃশ্য কিছুক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকলেন এবং অপেক্ষা করলেন যে, আগুনের কোন স্ফুলিঙ্গ মাটিতে পড়লে তিনি তা ভুলে নেন।

অনেকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন এমন হল না, তখন তিনি কিছু ঘাস ও খড়কুটা একত্রিত করে আগুনের কাছে ধরলেন। বলাবাহুল্য, এতে আগুন লেগে গেলোও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু এগুলো আগুনের কাছে নিতেই আগুন পেছনে সরে গেল। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, আগুন তাঁর দিকে অগ্রসর হল। তিনি অস্থির হয়ে পেছনে সরে গেলেন। মোটকথা, আগুন লাভ করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। তিনি এই অত্যাকর্ষ আগুনের প্রভাবে বিস্ময়াভিভূত ছিলেন, ইতিমধ্যে একটি গায়বী আওয়াজ হল।—(রুহুল-মা'আনী)

মুসা (আঃ) পাহাড়ের পাদদেশে এই ঘটনার সন্মুখীন হন। পাহাড়টি ছিল তাঁর ডানদিকে। এই উপত্যকার নাম ছিল 'তুয়া'।

وَوَيْلٌ لِلْيُوسُفَىٰ إِنَّكَ أَنْتَ رَبُّنَا ۚ فَلَوْلَئِكَ تَخْلَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ آبَائِكَ ۖ وَتُؤْتِيهِمْ مِنْ دُونِكَ ۚ وَتُؤْتِيهِمْ مِنْ دُونِكَ ۚ وَتُؤْتِيهِمْ مِنْ دُونِكَ ۚ — বাহরে-মুহীত, রুহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে আছে, হযরত মুসা (আঃ) এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে সমভাবে শ্রবণ করেন। তার কোন দিক নির্দিষ্ট ছিল না। শুনেছেনও অপরূপ ভঙ্গিতে; শুধু কানে নয়, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। এটা ছিল একটা মু'জেরার মতই। আওয়াজের সারমর্ম ছিল এই যে, যে বস্তুকে তুমি আগুন মনে করছ, তা আগুন নয়—আল্লাহ তাআলার দূতি। এতে বলা হয়, আমিই তোমার পালনকর্তা। হযরত মুসা (আঃ) ক্রুরে নিশ্চিত হলেন যে, এটা আল্লাহ তাআলারই আওয়াজ? এই প্রশ্নের আসল উত্তর এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে, এটা আল্লাহ তাআলারই আওয়াজ। এ ছাড়া মুসা (আঃ) দেখলেন যে, এই আগুনের কারণে বৃক্ষ পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে তার সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে, আওয়াজও সাধারণ মানুষের আওয়াজের ন্যায় একদিক থেকে আসেনি; বরং চতুর্দিক থেকে এসেছে এবং শুধু কানই নয়—হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ আওয়াজ শ্রবণে শরীক আছে; এসব অবস্থা থেকেও তিনি বোঝে নেন যে, এ আওয়াজ আল্লাহ তাআলারই।

মুসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার শব্দযুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন : রুহুল-মা'আনীতে মুসনাদে আহমদের বরাতে ওয়াহাবের রেওয়াজেতে বর্ণিত রয়েছে যে, মুসা (আঃ)—কে যখন 'ইয়া মুসা' শব্দ প্রয়োগে আওয়াজ দেয়া হয়, তখন তিনি 'লাকায়েক' (হাজির আছি) বলে জওয়াব দেন এবং বলেন যে, আমি আওয়াজ শুনছি। কিন্তু কোথা থেকে আওয়াজ দিচ্ছেন, তা জানি না। আপনি কোথায় আছেন? উত্তরে বলা হল : আমি তোমার উপরে, সামনে, পশ্চাতে ও তোমার সাথে আছি। অতঃপর মুসা (আঃ) আরম্ভ করলেন : আমি স্বয়ং আপনার কালাম শুনছি, না আপনার প্রেরিত কোন ফেরেশতার কথা শুনছি? জওয়াব হল :

আমি নিজেই তোমার সাথে কথা বলছি। রুহুল-মা'আনী গ্রন্থকার বলেন : এ থেকে জানা যায় যে, মুসা (আঃ) এই শব্দযুক্ত কালাম ফেরেশতাদের মধ্যস্থতা ব্যতীত নিজে শুনেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল-জমাআতের মধ্যে একদল আলেম এজন্যই বলেন যে, শব্দযুক্ত কালামও চিরন্তন হওয়া সম্ভব শ্রবণযোগ্য। এর কালাম নবীন হয় বলে যে প্রশ্ন তোলা হয়, তার জওয়াব তাদের পক্ষ থেকে এই যে, শব্দযুক্ত কালাম তখনই নবীন হয়, যখন তা বৈষয়িক ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এর জন্যে স্থূলতা ও দিক শর্ত। এরূপ কালাম বিশেষভাবে কানেই শোনা যায়। মুসা (আঃ) কোন নির্দিষ্ট দিক থেকে এ কালাম শোনে ননি এবং শুধু কানেই শোনে ননি; বরং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। বলাবাহুল্য, এ পরিস্থিতি নবীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত।

সম্প্রদায়ের স্থলে জুতা খুলে ফেলা অন্যতম আদব : لَوْلَئِكَ تَخْلَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ آبَائِكَ

জুতা খোলার নির্দেশ দেয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্প্রদায় প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা তার অন্যতম আদব। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোন কোন রেওয়াজেতে থেকে জানা যায়, মুসা (আঃ)—এর পাদুকা দুই ছিল মৃত জন্তুর চর্মনির্মিত। হযরত আলী, হাসান বসরী ও ইবনে জুরায়জ থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে। তাঁদের মতে মুসা (আঃ)—এর পদদ্বয় এই পবিত্র উপত্যকার মাটি স্পর্শ করে বরকত হাসিল করুক—এটাই ছিল জুতা খুলে রাখার উপকারিতা। কেউ কেউ বলেন : বিনয় ও নম্রতার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ দেয়া হয়, যেমন পূর্ববর্তী বুয়ুর্গণ বায়তুল্লাহর তওয়াফ করার সময় এরূপ করতেন।

হাদীসে রয়েছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বশীর ইবনে খাসাসিয়াকে কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটতে দেখে বলেছিলেন : اِذَا كُنْتَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَكَانِ لَوْلَئِكَ تَخْلَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ آبَائِكَ অর্থাৎ, তুমি যখন এ জাতীয় সম্মানযোগ্য স্থান অতিক্রম কর, তখন জুতা খুলে নাও।

জুতা পাক হলে তা পরিধান করে নামায পড়া সব ফেকাহবিদের মতে জায়েয। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে পাক জুতা পরিধান করে নামায পড়া প্রমাণিতও রয়েছে, কিন্তু সাধারণ সুন্নত এরূপ প্রতীক্ষমান হয় যে, জুতা খুলে নামায পড়া হত। কারণ এটাই বিনয় ও নম্রতার নিকটবর্তী—(কুরতুবী)

إِنَّكَ يَا لَوْلَا الْمُؤْتَسِّلِينَ আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অংশকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান দান করেছেন; যেমন বায়তুল্লাহ, মসজিদে-আকসা ও মসজিদে-নববী। তুয়া উপত্যকাও তেমনি পবিত্র স্থানসমূহের অন্যতম। এটা তুর পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত।—(কুরতুবী)

বস্তুগত কেয়ামত অর্থাৎ, মৃত্যুও বিসৃজ্যন কেয়ামত অর্থাৎ, হাশরের দিনকে দূরে মনে করে গাফেল না হোক। (স্কল-মা'আনী)

فَلَا تُصَدِّقُوا — এতে হযরত মুসা (আঃ) —কে লক্ষ্য করে সতর্ক করা হয়েছে যে, ভূমি কাফের ও বৈদ্যমানদের কথায় কেয়ামত সম্পর্কে অসাবধানতার পথ বেছে নিয়ো না। তা'হলে তা তোমার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, নবী ও পয়গম্বরগণ নিশ্চাপ হয়ে থাকেন। তাঁদের তরফ থেকে এরূপ অসাবধানতার সম্ভাবনা নেই। এতদসঙ্গেও মুসা (আঃ) —কে এরূপ বলা আসল উদ্দেশ্য তাঁর উম্মত ও সাধারণ মানুষকে শোনানো। এতে তারা বোঝবে যে, আল্লাহর পয়গম্বরগণকেও যখন এমনভাবে তাকিদ করা হয়, তখন এ ব্যাপারে আমাদের কতটুকু যত্নবান হতে হবে।

وَلَا تُصَدِّقُوا — তোমার হাতে ওটা কি ? — আল্লাহ রাবুল আলামীনের পক্ষ থেকে মুসা (আঃ) —কে এরূপ জিজ্ঞাসা করা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতি কৃপা, অনুকম্পা ও মেহেরবানীর সূচনা ছিল, যাতে বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী দেখা ও খোদায়ী কালাম শোনার কারণে তাঁর মনে যে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়ে যায়। এটা ছিল একটা হৃদয়তাপূর্ণ সন্ধ্যোদন। এছাড়া এই প্রশ্নের আরও একটি রহস্য এই যে, পরক্ৰমেই তাঁর হাতের লাঠিকে একটি সাপ বা অজগরে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমার হাতে কি আছে দেখে নাও। তিনি যখন দেখে নিলেন যে, সেটা কাঠের লাঠি মাত্র, তখন একে সাপে রূপান্তরিত করার মু'জ্জযা প্রদর্শন করা হল। নতুবা মুসা (আঃ) —এর মনে এরূপ সম্ভাবনাও থাকতে পারত যে, আমি বোধ হয় রাতের অন্ধকারে লাঠির স্থলে সাপই ধরে এনেছি।

قَالَ جِي عَصَايَ — মুসা (আঃ) —কে শুধু এতটুকু প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হাতে কি ? এর জওয়াবে লাঠি বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মুসা (আঃ) এখানে আসল জওয়াবের অতিরিক্ত আরও তিনটি বিষয় আরম্ভ করেছেন। (এক) উহা আমার লাঠি। (দুই) আমি একে অনেক কাজে লাগাই; প্রথমতঃ এর উপর ভর দেই; দ্বিতীয়তঃ এর দ্বারা আঘাত করে আমার ছাগপালের জন্যে বৃক্ষত্র বেড়ে ফেলি এবং (তিন) এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও উদ্ধার হয়। এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত জওয়াবে প্রশ্ন ও মহব্বত এবং পরিপূর্ণ আদবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। প্রশ্ন ও মহব্বতের দাবী এই যে, প্রেমাস্পদ যখন অনুকম্পাবশতঃ মনোযোগ দান করেছেন, তখন বক্তব্য দীর্ঘ করা উচিত, যাতে এই সুযোগ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু সাথে সাথে আদবের দাবী এই যে, সীমিতবিশিষ্ট নিঃসঙ্কোচ হয়ে বক্তব্য অধিক দীর্ঘও না হওয়া চাই। এই দ্বিতীয় দাবীর প্রতি লক্ষ্য রেখে উপসংহারে সংক্ষেপে বলেছেন

وَلَا تُصَدِّقُوا — অর্থাৎ, আমি এর দ্বারা আরও অনেক কাজ নেই। এরপর তিনি সেসব কাজের বিস্তারিত বিবরণ দেননি। — (স্কল-মা'আনী, মাযহারী)

তফসীর কুরত্বীতে এ আয়াত থেকে এরূপ মাসআলা বের করা হয়েছে যে, প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে প্রশ্ন যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়নি, জওয়াবে তাও বর্ণনা করে দেয়া জায়েয।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাতে লাঠি রাখা পয়গম্বরগণের সনুত। রসূলুল্লাহ (সঃ) —এরও এই সনুত ছিল। এতে অসংখ্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার নিহিত আছে। — (কুরত্বী)

وَلَا تُصَدِّقُوا — হযরত মুসা (আঃ) —এর হাতের লাঠি আল্লাহর নির্দেশে নিক্ষেপ করার পর তা সাপে পরিণত হয়। এই সাপ সম্পর্কে কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে لَا تُصَدِّقُوا — আরবী অভিধানে ছোট ও সরু সাপকে جَانَبٌ বলা হয়। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, وَلَا تُصَدِّقُوا — অজগর ও বৃহৎ মোটা সাপকে مُصَبِّبٌ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে جَانَبٌ বলা হয়েছে এটা ব্যাপক শব্দ, প্রত্যেক ছোট, বড় মোটা সরু সাপকে جَانَبٌ বলা হয়। সাপটির অবয়ব ও আকৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করার অর্থ সম্ভবতঃ এই যে, এটি যেখানে যে রূপ আকৃতি ধারণের প্রয়োজন হতো তাই ধারণ করতে সক্ষম ছিল। কখনো খুব সরু, কখনো বিশাল আকারের অজগর ইত্যাদি। ইমাম কুরত্বীর বর্ণনা অনুযায়ী চিকন সাপের ন্যায় দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল বলে 'জানুন' বলা হতো। লোকেরা দেখে ভীষণভাবে ভীত হতো বলে 'ছবানুন' বলা হতো।

وَلَا تُصَدِّقُوا إِلَى جَانَحٍ — আসলে জন্তুর পাখাকে বলা হয়। এখানে নিজের বাহুতে অর্থাৎ, বগলের নীচে হাত রেখে যখন বের করবে, তখন তা সূর্যের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে جَانَحٌ এর এরূপ তফসীরই বর্ণিত আছে। — (মাযহারী)

إِذْ هَبَّ لِيُفِثَ — স্বীয় রসুলকে দু'টি বিরট মু'জ্জযার অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করার পর আদেশ করা হয়েছে যে, এখন উদ্ভত ফেরাউনকে ইমানের দাওয়াত দেয়ার জন্যে চলে যাও।

হযরত মুসা (আঃ) যখন খোদায়ী কালামের গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুওয়ত ও রেসালতের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন নিজ সত্তা ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ তাআলারই দারস্থ হলেন। কারণ, তাঁরই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর। এ কাজে যেসব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য, সেগুলো হাসিমুখে বরণ করার মনোবলও আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাই তিনি আল্লাহর দরবারে পাঁচটি বিষয়ে দোয়া করলেন। প্রথম দোয়া رَّبِّ اشْرَئْ لِي صَدْرِي অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার, আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশস্ততা দান করুন যেন নবুওয়তের জ্ঞান বহন করার উপযোগী হয়ে যায়। ইমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটু কথা শুনতে হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দোয়া رَبِّ زَيِّلْ لِي رُزْقِي (অর্থাৎ, আমার কাজ সহজ করে দিন) এই উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিও নবুওয়তেরই ফলশ্রুতি ছিল যে, কোন কাজের কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়। এটাও আল্লাহ তাআলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে কারও জন্যে কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজ কঠিন হয়ে যায়। একারণেই হাদীসে মুসলমানদেরকে নিম্নোক্ত দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তারা নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করবে :

اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير

عليك يسير

(অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করার ব্যাপারে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেননা, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করে দেয়া আপনার পক্ষে সহজ।)

তৃতীয় দোয়া وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - (অর্থাৎ,

আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বোঝতে পারে)। এই জড়তার কাহিনী এই যে, হযরত মুসা (আঃ) দুগু পান করার যমানায় তাঁর জননীর কাছেই ছিলেন এবং জননী ফেরআউনের দরবার থেকে দুধ পান করানোর ভাতা পেতে থাকেন। শিশু মুসা দুধ ছেড়ে দিলে ফেরআউন ও তার স্ত্রী আছিয়া তাঁকে পালক পুত্ররূপে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। এ সময়েই একদিন শিশু মুসা (আঃ) ফেরআউনের দাড়ি ধরে তার গালে এক চপেটাঘাত করে বসেন। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, তিনি একটি ছড়ি হাতে নিয়ে খেলা করছিলেন। এক সময় এই ছড়ি দুরা তিনি ফেরআউনের মাথায় আঘাত করে বসেন। ফেরআউন রাগান্বিত হয়ে তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। স্ত্রী আছিয়া বললেনঃ রাজাধিরাজ! আপনি অব্যব শিশুর অপরাধ ধরবেন না। সে তো এখনও ভাল-মন্দের পার্থক্যও বোঝে না। আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ফেরআউনকে পরীক্ষা করানোর জন্যে আছিয়া একটি পাতে জলস্ত অঙ্গুর ও অপর একটি পাতে মণিমুক্তা এনে মুসা (আঃ)-এর সামনে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, সে অব্যব শিশু। শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে জলস্ত অঙ্গুরটিকে উজ্জ্বল ও সুন্দর মনে করে তা ধরার জন্যে হাত বাড়াবে। মণিমুক্তার চাকচিক্য শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত হয় না। এতে ফেরআউন বোঝতে পারবে যে, সে যা করেছে, অজ্ঞতাবশতঃ করেছে। কিন্তু এখানে কোন সাধারণ শিশু ছিল না; ছিলেন আল্লাহর ভাবী রসূল যার স্বভাব-প্রকৃতি জন্মলগ্ন থেকেই অনন্যসাধারণ হয়ে থাকে। মুসা (আঃ) আগুনের পরিবর্তে মণিমুক্তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াতো চাইলেন, কিন্তু জিবরাঈল তাঁর হাত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পাতে রেখে দিলেন এবং মুসা (আঃ) তথক্ষণে আগুনের স্ফুলিঙ্গ তুলে মুখে পুরে নিলেন। ফলে তাঁর জিহ্বা পুড়ে গেল। এতে ফেরআউন বিশ্বাস করল যে, মুসা (আঃ)-এর এই কর্ম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়; এটা ছিল নিতান্তই বালকসুলভ অজ্ঞতাবশতঃ। এই ঘটনা থেকেই মুসা (আঃ)-এর জিহ্বায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। কোরআনে একেই عَقْدَةٌ বলা হয়েছে এবং এটা দূর করার জন্যেই মুসা (আঃ) দোয়া করেন।—(মায়হারী, কুরতুবী)

প্রথমোক্ত তিনটি দোয়া ছিল সকল কাজে আল্লাহর সাহায্য হাসিল করার জন্যে। তৃতীয় দোয়ায় নিজের একটি দুর্বলতা নিরসনের জন্যে প্রার্থনা জানানো হয়েছে, কারণ রেসালত ও দাওয়াতের জন্যে স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়াও একটি জরুরী বিষয়। পরবর্তী এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসা (আঃ)-এর সব দোয়া কবুল করা হয়। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, জিহ্বার তোলামিও দূরীকরণ হয়ে থাকবে। কিন্তু স্বয়ং মুসা (আঃ) হযরত হারুনকে রেসালতের কাজে সহকারী করার যে দোয়া করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন যে, اَرْفَعُ مَقَامِي لِسَانًا অর্থাৎ, হারুন আমার চাইতে অধিক বিশুদ্ধভাষী। এ থেকে জানা যায় যে, তোলামির প্রভাব কিছুটা অবশিষ্ট ছিল। এছাড়া ফেরাউন হযরত মুসা (আঃ)-এর চরিত্রে যেসব দোষারোপ করেছিল; তন্মধ্যে একটি ছিল এই, وَلَا يَذْكُرُ - অর্থাৎ সে তার বক্তব্য পরিস্কার ব্যক্ত করতে পারে

না। কোন কোন আলেম এর উত্তরে বলেনঃ হযরত মুসা (আঃ) স্বয়ং তাঁর দোয়ায় জিহ্বার জড়তা এতটুকু দূর করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যতটুকুতে লোকেরা তার কথা বোঝতে পারে। বলাবাহুল্য, সে পরিমাণ জড়তা দূর করে দেয়া হয়েছিল। এরপরও তোলামির সামান্য প্রভাব থাকলে তা দোয়া কবুল হওয়ার পরিপন্থী নয়।

চতুর্থ দোয়া وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - অর্থাৎ, আমার পরিবারবর্গ থেকেই আমার জন্যে একজন উযীর করুন। পূর্বোক্ত তিনটি দোয়া ছিল নিজ সন্তা সম্পর্কিত। এই চতুর্থ দোয়া রেসালতের করণীয় কাজ আনজাম দেয়ার জন্যে উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক রাখে। হযরত মুসা (আঃ) সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উযীর নিযুক্তিকে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। অভিধানে উযীরের অর্থই বোঝা বহনকারী। রাষ্ট্রের উযীর তার বাদশাহর বোঝা দায়িত্ব সহকারে বহন করেন। তাই তাকে উযীর বলা হয়। এ থেকে হযরত মুসা (আঃ)-এর পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, তিনি তার উপর অর্পিত বিরাট দায়িত্ব পালন করার জন্য একজন উযীর চেয়ে নিয়েছেন।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা যখন কোন ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং চান যে, সে ভাল কাজ করুক এবং সুচারুরূপে রাষ্ট্র পরিচালনা করুক, তখন তার সাহায্যের জন্য একজন সং উযীর দান করেন। রাষ্ট্রপ্রধান কোন জরুরী কাজ ভুলে গেলে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি যে কাজ করতে চান, উযীর তাতে তাঁর সাহায্য করেন।—(নাসায়ী)

মুসা (আঃ) তাঁর দোয়ায় প্রথমে অনিদিষ্টভাবে বলেছেন যে, উযীর আমার পরিবারভুক্ত ব্যক্তি হওয়া চাই। অতঃপর নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উযীর করতে চাই, তিনি আমার ভাই হারুন—যাতে রেসালতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করতে পারি।

হযরত হারুন (আঃ) হযরত মুসা (আঃ) থেকে তিন অথবা চার বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিন বছর পূর্বেই ইশ্তেকাল করেন। মুসা (আঃ) যখন এই দোয়া করেন, তখন তিনি মিসরে অবস্থান করছিলেন। আল্লাহ তাআলা মুসা (আঃ)-এর দোয়ার ফলে তাঁকেও পয়গম্বর করে দেন। ফেরেশতার মাধ্যমে তিনি মিসরেই এ সংবাদ প্রাপ্ত হন। মুসা (আঃ)-কে যখন মিসরে ফেরআউনকে দাওয়াত দেয়ার জন্যে প্রেরণ করা হয়, তখন হারুন (আঃ)-কে মিসরের বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্যে আদেশ দেয়া হয়। তিনি তাই করেন।—(কুরতুবী)

وَأَشْرِكُوا لِيَّ آيَاتِي - হযরত মুসা (আঃ) হারুন (আঃ)-কে নিজের

উযীর করতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই তা করতে পারতেন। এ অধিকার তাঁর ছিল; কিন্তু বরকতের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত করার দোয়া করেছেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে নবুওয়ত ও রেসালতে শরীক করতেও চাইলেন। কোন নবী ও রসূলের এরূপ অধিকার নেই। তাই এর জন্যে পৃথক দোয়া করেছেন যে, তাঁকে আমার রেসালতের অংশীদার করে দিন।

সংকর্মপরায়ণ সঙ্গী বিকর ও এবাদতেও সাহায্যকারী হয় :

كَيْ سَحَبَكَ كَيْتَرًا وَتَذْكُرَكَ كَيْتَرًا - অর্থাৎ, হযরত হারুনকে উযীর ও

নবুওয়তে অংশীদার করলে এই উপকার হবে যে, আমরা বেশী পরিমাণে আপনার বিকর ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে

যে, তসবীহ ও যিকর মানুষ একাও যত ইচ্ছা করতে পারে। এতে কোন সঙ্গীর কাজের কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু চিন্তা করলে জানা যায় যে, তসবীহ ও যিকরের উপযুক্ত পরিবেশ এবং আল্লাহভক্ত সঙ্গীদের অনেক প্রভাব রয়েছে। যার সঙ্গী-সহচর আল্লাহভক্ত নয়, সে তেটুকু এবাদত করতে পারে না, যতটুকু আল্লাহভক্তদের পরিবেশে একজন করতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকতে চায়, তার উপযুক্ত পরিবেশও তালশ করা উচিত।

এ পর্যন্ত পাঁচটি দোয়া সমাপ্ত হল পরিশেষে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসব দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ দান করা হয়েছে
قَالَ كَذَلِكَ سُلُوكُكَ سُبُلًا — অর্থাৎ, হে মুসা, তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হল।

وَلَقَدْ مَنَّكَ عَلَيْكَ مَرْكَهُ — হযরত মুসা (আঃ)-কে এ সময় বাক্যালোপের গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে, নবুওয়ত ও রেসালত দান করা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ মু'জযা প্রদান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতে তাঁকে সেসব নেয়ামতও সুরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেগুলো জন্মের প্রারম্ভ থেকে এ যাবত প্রতিমুগে তাঁর জন্যে ব্যয়িত হয়েছে। উপর্যুপরি পরীক্ষা এবং প্রাণনাশের আশঙ্কার মধ্যে আল্লাহ তাআলা বিস্ময়কর পন্থায় তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন। পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নেয়ামত উল্লেখিত হয়েছে, বাস্তব ঘটনার দিক দিয়ে সেগুলো পূর্ববর্তী। এগুলোকে এখানে اٰتٰى শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার অর্থ এরূপ নয় যে, এই নেয়ামতগুলো পরবর্তীকালের। বরং اٰتٰى শব্দটি কোন সময় শুধু 'অন্য' অর্থ বোঝায়। এতে অগ্রপশ্চাতের কোন অর্থ থাকে না। এখানেও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (রুহুল-মা'আনী)

মুসা (আঃ)-এর এই আদ্যোপান্ত কাহিনী হাদীসের বরাতে দিয়ে সম্মুখে বর্ণিত হবে।

اِذْ اَوْحَيْنَا اِلٰى اَمِّكَ مَا يُوْحٰى — অর্থাৎ, যখন আমি তোমার মাতার কাছে এমন ব্যাপারে ওহী করলাম, যা ওহীর মাধ্যমেই জানানো যেতে পারত। তা এই যে, ফেরাউন তার সিপাহীদেরকে ইসরাঈলী নবজাত শিশুদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই সিপাহীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে তাঁর মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হল যে, তাকে একটি শিশুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশঙ্কা করো না। আমি তাকে হেফাযতে রাখব এবং শেষে তোমার কাছে কিরিয়ে দেব। বলাবাহুল্য, এসব কথা বিবেকগ্রাহ্য নয়। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা এবং তাঁর হেফাযতের অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা একমাত্র তাঁর পক্ষ থেকে বিবৃতির মাধ্যমেই জানা যেতে পারে।

নবী-রসূল নয়--এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি? وحى শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন গোপন কথা, যা শুধু যাকে বলা হয় সেই জানে অন্য কেউ জানে না। এই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারও বিশেষ গুণ নয়--নবী, রসূল সাধারণ সৃষ্টজীব বরং জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত এতে शामिल হতে পারে।

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلٰى النَّبِیِّ — আয়াতে মোমাছিকে ওহীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা এই অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে। আলোচ্য اَوْحٰى আয়াতেও আভিধানিক অর্থ 'ওহী' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কাজেই এতে মুসা-জননীর নবী অথবা রসূল হওয়া জরুরী হয় না। যেমন - মারইয়ামের কাছেও এভাবে আল্লাহর বাণী পৌঁছেছিল, অথচ বিশিষ্ট আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নবী অথবা রসূল ছিলেন না। এ ধরনের আভিধানিক ওহী সাধারণতঃ ইলহামের আকারে হয়; অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কারও অন্তরে কোন বিষয়বস্তু জাগ্রত করে দেন এবং তাকে নিশ্চিত করে দেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই। ওলী-আল্লাহগণ সাধারণত এ ধরনের ইলহাম লাভ করেছেন। বরং আবু হাইয়ান ও অন্য কিছু সংখ্যক আলেম বলেছেন যে, এ জাতীয় ওহী মাঝে মাঝে ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণতঃ হযরত মারইয়ামের ঘটনায় স্পষ্টতঃ বলা হয়েছে যে, ফেরেশতা জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এই ওহী শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সত্তার সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকে। জনসম্প্রসার এবং তবলীগ ও দাওয়াতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর বিপরীত নবুওয়তের ওহীর উদ্দেশ্যই জনসম্প্রসারের জন্যে কাউকে নিয়োগ করা এবং প্রচার ও দাওয়াতের জন্যে আদিত করা। এরূপ ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে নিজের ওহীর প্রতি নিজেও বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অপরকেও তার নবুওয়ত ও ওহী মানতে বাধ্য করা; যারা না মানে, তাদেরকে কাকের আখ্যা দেয়।

ইলহামী ওহী তথা আভিধানিক ওহী এবং নবুওয়তের ওহী তথা পারিভাষিক ওহীর মধ্যে পার্থক্য তাই। আভিধানিক ওহী সর্বকালেই জারি আছে এবং থাকবে। কিন্তু নবুওয়ত ও নবুওয়তের ওহী শেষনবী মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। কোন কোন ব্যুর্গের উক্তি এটিকে "ওহী-তশরীফী" ও "গায়র-তশরীফী" শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। শায়েখ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর কোন কোন বাক্যের বরাতে দিয়ে নবুওয়তের দাবীদার কাদিয়ানী তার দাবীর বৈধতার প্রমাণ হিসেবে একে উপস্থিত করেছে, যা স্বয়ং ইবনে আরাবীর সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল। এই প্রশ্নের পুরাপুরি আলোচনা ও ব্যাখ্যা আমার পুস্তক 'খতমে নবুওয়তে' বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

اِنْ اَقْبَضَ يَدِيْهِ فِي الْاَيْتُوْبِ فَاقْبَضْ يَدِيْهِ فِي الْيَمِّ فَلْيَقْوِ الْيَمْرُ
 بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوُّكَ وَالتَّقِيْتُ عَلَيْكَ عَجَبَةً
 مِّمَّنِّىْ ؕ وَلْيُصْنَعْ لِّىْ عَيْنِىْ ۚ اِذْ تَنْشِىْ اُخْتُكَ فَمَقُوْلُ هَلْ
 اَدْلَمْتُكَ مِنْ يَمْنُكُ ۚ فَرَجَعْتُكَ اِلَى اُمِّكَ لِيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
 وَلَا تَحْزَنَ ؕ وَتَوَلَّى نَفْسًا فَنَجَّيْتُكَ مِنَ الْعَمْرِ وَقَدَّيْتُكَ
 فَمَقُوْلُ اَفَلَيْدَتْ سِنِّيْنَ فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ ؕ ثُمَّ جِئْتُ عَلَى قَدَرٍ
 يُّمُوْسَى ۚ وَاصْطَمَعْتُكَ لِنَفْسِىْ ۚ اِذْ هَبَّ اَنْتَ وَاُخُوْكَ بِالْبَيْتِ
 وَلَا كِنْيَا فِيْ ذِكْرِىْ ۚ اِذْ هَبَّ اِلَى رُحُوْنِ اِنَّهُ طَعْنٌ ۚ فَمَقُوْلُ اَلَمْ
 قُوْلْ لِّيْمَا لَعَلَّكَ يَبْدُوْكَ اَوْ يَنْشِىْ ۚ فَالْاَرْتِبَا اِنَّمَا نَحْنُ اَنْ
 يُّفَرَّ طَعْنُكُنَا اَوْ اَنْ يُّطْعِنَ ۚ قَالَ لَخَطَا فَاَنْتَا مَعَكُمْ اَسْمُ
 وَاَرْى ۚ فَانْتَبَهَ فَمَقُوْلُ اِنَّا رُسُوْلَا رَبِّكَ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ
 اِسْرَءِيْلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ فَاَنْتَ جَمْعُكَ بِالْيَمْرِ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ
 عَلَى مَنْ اَتَيْنَا الْهَدٰى ۚ اِنَّا نَدْعُوْهُ اِلَيْنَا اَنْ الْعَذَابُ عَلَى مَنْ
 كَذَّبَ وَقُوْلُ ۚ قَالَ فَمَنْ رَّبُّكَ اَيُّوْسَى ۚ قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰ
 كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰى ۚ قَالَ فَاَمَّا الْغُرُوْبُ الْاَوَّلُ ۙ

(৩৯) যে, তুমি (মুসাকে) সিন্দুক রাখ, অতঃপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে
 দাও, অতঃপর দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেবে। তাকে আমার শত্রু ও তার
 শত্রু উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম
 আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত
 হও। (৪০) যখন তোমার ভগিনী এসে বলল : আমি কি তোমাদেরকে বলে
 দেব কে তাকে লালন-পালন করবে। অতঃপর আমি তোমাকে তোমার
 মাতার কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং দুঃখ না পায়।
 তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে এই দুষ্টিভা
 থেকে মুক্তি দেই; আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি
 কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলে; হে মুসা,
 অতঃপর তুমি নির্ধারিত সময়ে এসেছ। (৪১) এবং আমি তোমাকে আমার
 নিজের জন্য তৈরী করে নিয়েছি। (৪২) তুমি ও তোমার ভাই আমার
 নির্দেশাবলীসহ যাও এবং আমার সূরশে শৈথিল্য করো না। (৪৩) তোমরা
 উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। (৪৪) অতঃপর
 তোমরা তাকে নম্র কথা বলা, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত
 হবে। (৪৫) তারা বলল : হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশঙ্কা করি
 যে, সে আমাদের প্রতি জুলুম করবে কিংবা উত্তেজিত হয়ে উঠবে। (৪৬)
 আল্লাহ বললেন : তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সাথে আছি,
 আমি শুনি ও দেখি। (৪৭) অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বল :
 আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রসূল, অতএব আমাদের
 সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না।
 আমরা তোমার পালনকর্তার কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে
 আগমন করছি। এবং যে সংপথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শাস্তি। (৪৮)
 আমরা ওহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে
 নেয়, তার উপর আযাব পড়বে। (৪৯) সে বলল : তবে হে মুসা, তোমাদের
 পালনকর্তা কে? (৫০) মুসা বললেন : আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি
 প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথপ্রদর্শন
 করেছেন। (৫১) ফেরাউন বলল : তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা
 কি?

মুসা জননীর নাম : রহুল-মা' আনীতে আছে যে, তাঁর প্রসিদ্ধ নাম
 'ইউহানিব'। 'ইতকান' গ্রন্থে তাঁর নাম 'লাহইরানা বিনতে ইয়াসমাদ
 ইবনে লাজী' লিখিত রয়েছে। কেউ কেউ তাঁর নাম 'বারেখা' এবং কেউ
 কেউ 'বায়খত' বলেছেন। যারা তাবীয ইত্যাদি করে, তাদের কেউ কেউ
 তাঁর নামের আশ্বর্জনক বেশিষ্ট্য বর্ণনা করে। রহুল-মা' আনীর গ্রন্থকার
 বলেন : আমরা এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি। খুব সম্ভব এগুলো ভিত্তিহীন
 জনশ্রুতি।

فَلْيَقْوِ الْيَمْرُ بِالسَّاحِلِ — এখানে یم শব্দের অর্থ দরিয়া এবং বাহ্যতঃ
 নীলনদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতে এক আদেশ মুসা (আঃ)—এর মাতাকে
 দেয়া হয়েছে যে, এই শিশুকে সিন্দুক পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দ্বিতীয়
 আদেশ নির্দেশসূচকভাবে দরিয়াকে দেয়া হয়েছে যে, সে যেন এই
 সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয়। দরিয়া বাহ্যতঃ চেতনাহীন ও
 বোধশক্তিহীন। একে আদেশ দেয়ার মর্ম বোঝে আসে না। তাই কেউ কেউ
 বলেন যে, এখানে নির্দেশসূচক পদ বলা হলেও আদেশ বোঝানো হয়নি;
 বরং খবর দেয়া হয়েছে যে, দরিয়া একে তীরে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু
 সুস্বাদুশী আলেমগণের মতে এখানে আদেশই বোঝানো হয়েছে এবং
 দরিয়াকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, তাদের মতে জগতের কোন
 সৃষ্টবস্তু বৃক্ষ ও প্রস্তর পর্যন্ত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন নয়, বরং সবার
 মধ্যেই বোধশক্তি ও উপলব্ধি বিদ্যমান রয়েছে। এই বোধশক্তি ও উপলব্ধির
 কারণেই কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সর্ব বস্তু আল্লাহর তসবীহ পাঠে
 মশগুল রয়েছে। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, মানব, জিন ও
 ফেরেস্টা ছাড়া কোন সৃষ্টবস্তুর মধ্যে এই পরিমাণ বোধশক্তি ও চেতনা
 নেই, যে পরিমাণ থাকলে হারাম ও হালালের বিধি-বিধান আরোপিত হতে
 পারে।

يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوُّكَ — অর্থাৎ, এই সিন্দুক ও তন্মুখস্থিত

শিশুকে সমুদ্রের তীর থেকে এমন ব্যক্তি কুড়িয়ে নেবে, যে আমার ও
 মুসার উভয়ের শত্রু; অর্থাৎ ফেরাউন। ফেরাউন যে আল্লাহর দুশমন, তা
 তার কুফরের কারণে সুস্পষ্ট। কিন্তু মুসা (আঃ)—এর দুশমন হওয়ার
 ব্যাপারটি প্রাধান্যযোগ্য। কারণ, তখন ফেরাউন মুসা (আঃ)—এর দুশমন
 ছিল না; বরং তাঁর লালন-পালনে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেছিল।
 এতদসত্ত্বেও তাকে মুসা (আঃ)—এর শত্রু বলা হয় শেষ পরিণামের দিক
 বিবেচনা করে অর্থাৎ অবশেষে ফেরাউনের শত্রুতে পরিণত হওয়ার
 বিষয়টি আল্লাহর জ্ঞানে ছিল। একথা বলাও অযৌক্তিক হবে না যে,
 ফেরাউন ব্যক্তিগত পর্যায়ে তখন মুসা (আঃ)—এর শত্রুই ছিল। সে স্ত্রী
 আসিয়ার মনরক্ষার্থেই শিশু মুসার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল।
 তাই পরে যখন তার মনে সন্দেহ দেখা দিল, তখনই মুসাকে হত্যার
 আদেশ জারি করেছিল, যা আসিয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে প্রতিহত
 হয়ে যায়।—(রহুল-মা' আনী, মাযহারী)

عَجَبَةً — এখানে عَجَبَةً শব্দটি — আদরপীয়

হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন : আমি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে
 তোমার অস্তিত্বের মধ্যে আদরপীয় হওয়ার গুণ নিহিত রেখেছি। ফলে
 যে'ই তোমাকে দেখত, সে-ই আদর করতে বাধ্য হত। হযরত
 ইবনে-আব্বাস ও ইকরামা থেকে এরূপ তফসীরই বর্ণিত হয়েছে।—
 (মাযহারী)

وَلَقَدْ عَلَّمْنَاهُ عَلَى عَيْنِیْ صَنَعَتِ— শব্দ দ্বারা এখানে উত্তম লালন-পালন বোঝানো হয়েছে। আরবে صنعت فرسی বাকপদ্ধতিটি এ অর্থেই বলা হয়, অর্থাৎ, আমি আমার ঘোড়ার উত্তম লালন-পালন করেছি। عَلَى عَيْنِیْ বলে عَلَّمْنَاهُ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা ছিল যে, মুসা (আঃ)-এর উত্তম লালন-পালন সরাসরি আল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে হবে। তাই মিসরের সর্ববৃহৎ ব্যক্তিত্ব ফেরাউনের গৃহে এই উদ্দেশ্যে এমনভাবে সাধন করা হয়েছে যে, সে জানত না নিজের হাতে নিজেরই দুশমনকে লালন-পালন করছে।

إِذْ نَسِیْتَ آثُنَیْ— মুসা (আঃ)-এর ভগিনী সিন্দুকের পেছনে পেছনে গিয়েছিলেন। এর পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে— وَكَذَٰلِكَ ۖ فَوَیْ— অর্থাৎ আমি বার বার তোমাকে পরীক্ষা করেছি। — (ইবনে আব্বাস) অথবা তোমাকে বার বার পরীক্ষায় ফেলেছি। — (যাহ্‌হাক)

হযরত মুসার (আঃ) জীবনের এ দীর্ঘ পরীক্ষার কাহিনী পাঠ করতে হলে নাসারী শরীফ তফসীর অধ্যায়ে হাদীসুল ফুতুন পাঠ করা যেতে পারে।

হযরত মুসার (আঃ) পর পর পরীক্ষার কাহিনী থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয় : কোরআন পাক মুসা (আঃ)-এর কাহিনীকে এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, অধিকাংশ সূরায় এর কিছু না কিছু অংশ বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এই যে, এই কাহিনীতে হাজার হাজার শিক্ষা, রহস্য ও আল্লাহ্ তাআলার অপার শক্তির বিস্ময়কর বিহুপ্রকাশ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে মানুষের ঈমান সুদৃঢ় হয়। এগুলোতে কর্মোদ্দীপনা ও চারিত্রিক সংশোধনের নির্দেশাবলীও প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য সূরায় কাহিনীটি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে; তাই এর শিক্ষা, উপদেশ ও নির্দেশাবলীর কিছু অংশও প্রসঙ্গক্রমে লিপিবদ্ধ করা মুক্তিযুক্ত মনে হয়।

ফেরাউনের নিজের চেষ্টা-তদবীর এবং প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ তাআলার বিস্ময়কর পরিকল্পনা : ফেরাউন যখন জানতে পারল যে, বনী-ইসরাঈলের মধ্যে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করে তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটাতে, তখন সে ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানদের জন্মরোধ করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আদেশ জারি করে। এরপর জাতীয় ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করে এক বছরের ছেলে-মেয়েদেরকে জীবিত রাখার এবং পরবর্তী বছরের ছেলেদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যে বছর ছেলেদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হত, সে বছরই মুসা (আঃ)-কে জননীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ করার ক্ষমতা আল্লাহ্ তাআলার ছিল, কিন্তু নির্বোধ ফেরাউনের উৎপীড়নমূলক পরিকল্পনা পূর্ণরূপে নস্যাৎ করা ও তাকে বোকা বানানোর ইচ্ছায় সন্তান হত্যার বছরেই মুসা (আঃ)-কে ভূমিষ্ঠ করালেন। আল্লাহ্ তাআলা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটালেন, যাতে মুসা (আঃ) স্বয়ং এই খোদাদ্রোহী জালেমের গৃহে লালিত-পালিত হন। ফেরাউন ও তার স্ত্রী পরম ঔৎসুক্যের সাথে মুসাকে নিজেদের গৃহে লালন-পালন করেন। সারা দেশের ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানরা মুসা সন্দেহে নিহত হচ্ছিল, আর মুসা (আঃ) স্বয়ং ফেরাউনের গৃহে আরাম-আয়েশ ও আদর-যত্নের সাথে বয়সের সিঁড়ি অতিক্রম করছিলেন।

মুসা জননীর প্রতি অলৌকিক নেয়ামত এবং ফেরাউনী পরিকল্পনার আরও একটি প্রতিশোধ : মুসা (আঃ) যদি সাধারণ

শিশুদের ন্যায় কোন ধাতীর দুধ কবুল করতেন, তবে তাঁর লালন-পালন শত্রু ফেরাউনের গৃহে এরপরও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে হত। কিন্তু তাঁর মাতা তাঁর বিরহে ব্যাকুল থাকতেন এবং মুসা (আঃ)-ও কোন কাকের মহিলার দুধ পেতেন। আল্লাহ্ তাআলা একদিকে তাঁর পয়গম্বরকে কাকের মহিলার দুধ থেকেও বাঁচিয়ে নিলেন এবং অপরদিকে তাঁর মাতাকেও বিরহের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন; মুক্তিও এমনভাবে দিলেন যে, ফেরাউনের পরিবার তাঁর কাছে স্থগী হয়ে রইল এবং উপটোকন ও উপহারের বৃষ্টিও বর্ষিত হল। নিজেরই প্রাণপ্রতিম সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর বিনিময়ে মুসা-জননী ফেরাউনের রাজদরবার থেকে ভাতাও পেলেন এবং ফেরাউনের গৃহে সাধারণ কর্মচারীদের ন্যায় থাকতে হল না।

শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের জন্যে একটি সুসংবাদ : একে হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে শিল্পপতি তার শিল্পকাজে সওয়াবের নিয়ত রাখে, সে মুসা (আঃ)-এর জননীর ন্যায়। তিনি আপন শিশুকে দুধ পান করিয়ে অপরের কাছ থেকে ভাতা পেয়েছেন। — (ইবনে-কাসীর) উদ্দেশ্য এই যে, কোন রাজমিস্ত্রী মসজিদ, খানকাহ, মাদ্রাসা অথবা কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণকালে যদি শুধু মজুরী ও পয়সা উপার্জনের নিয়ত করে, তবে সে তাই পাবে। কিন্তু যদি সে একরূপ নিয়তও করে যে, এই নির্মাণ কাজ সংকাজে নিয়োজিত হবে এর দ্বারা ধার্মিক ব্যক্তির উপকৃত হবে — এজন্যে একাজকে সে অন্য কাজের উপর অগ্রাধিকার দেয় তবে সে মুসা- জননীর ন্যায় মজুরীও পাবে এবং ধর্মীয় উপকারও লাভ করবে।

আল্লাহ্র বিশেষ বান্দাগণের প্রেমাম্পদসুলভ মাধুর্য প্রাপ্তি : وَالْقَبُورُ ۖ لَقَدْ عَلَّمْنَاهُ بَیْنِیْ— আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বিশেষ বান্দাগণকে বিশেষ এক প্রকার প্রেমাম্পদসুলভ সৌন্দর্য দান করেন। ফলে তাদেরকে দেখে আপন-পর, শত্রু-মিত্র সবাই মহব্বত করতে থাকে। পয়গম্বরগণের স্তর তো অনেক উর্ধ্ব, অনেক ওলীর মধ্যেও এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করা গেছে।

মুসা (আঃ)-এর হাতে ফেরাউনী কাকেরের হত্যাকে ‘ভুলক্রমে হত্যা’ কেন সাব্যস্ত করা হল : মুসা (আঃ) জনৈক ইসরাঈলী মুসলমানকে ফেরাউনী কাকেরের সাথে লড়াইরত দেখে ফেরাউনকে ঘৃণি মারলেন; ফলে সে প্রাণ ত্যাগ করল। মুসা (আঃ) নিজেও এ কাজকে ‘শয়তানের কাজ’ বলে আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ক্ষমাও করা হয়েছে।

কিন্তু এখানে একটি আইনগত প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ফেরাউনী ব্যক্তি কাকের এবং হরবী ছিল। তার সাথে মুসা (আঃ)-এর কোন শান্তিমুখি ছিল না এবং তাকে যিশী কাকেরদের তালিকাভুক্তও করা যেত না, যাদের জান-মাল ও সম্প্রদায়ের হেফায়ত করা মুসলমানদের দায়িত্বে ওয়াজিব। সে ছিল একান্তই হরবী কাকের। ইসলামী শরীয়তের আইনে এরূপ ব্যক্তিকে হত্যা করা গোনাহ্ নয়। এমতাবস্থায় এ হত্যাকে শয়তানের কাজ ও ভুল কি কারণে সাব্যস্ত করা হল ?

বিশিষ্ট তফসীর গ্রন্থসমূহে কেউ কেউ এ প্রশ্নের প্রতি জ্ঞাপন করেননি। আমি যখন হাকীমুল-উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী ধানবী (রহঃ)-এর নির্দেশে “আহ্‌কামুল-কোরআন” গ্রন্থের রচনায় নিয়োজিত ছিলাম, তখন এ প্রশ্ন উত্থাপন করায় তিনি উত্তরে বলছেন : এ কথা ঠিক যে, এই ফেরাউনী কাকেরের সাথে সরাসরি ও প্রকাশ্য কোন শান্তি-চুক্তি অথবা যিশী হওয়া চুক্তি ছিল না। কিন্তু তখন মুসা (আঃ)-এর রাজত্ব ছিল

না এবং সেই নিহত ব্যক্তিরও ছিল না। বরং তারা উভয়েই ফেরাউনের রাজত্বে নাগরিক ছিল এবং একজন অপরজনের পক্ষ থেকে নিরাপদ ছিল। এটা ছিল এক প্রকার অলিখিত কার্যগত যুক্তি। ফেরাউনকে হত্যার ফলে এই কার্যগত চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ হয়েছে। তাই একে ‘ভুলক্রমে হত্যা’ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ভুলটি যেহেতু ইচ্ছাকৃত নয়- ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়েছে, তাই এটা মুসা (আঃ)-এর নবীসুলভ পবিত্রতার পরিপন্থী নয়।

এ কারণেই মাওলানা থানভী (রহঃ) অবিভক্ত ভারতে কোন মুসলমানের পক্ষে কোন হিন্দুর জান-মালের ক্ষতি করা বৈধ মনে করতেন না। কেননা, মুসলমান ও হিন্দু এ উভয় সম্প্রদায়ই তখন ইংরেজদের রাজত্বে বাস করত।

অক্ষমদের সাহায্য ও জনসেবা ইহকাল ও পরকালে উপকারী : হযরত মুসা (আঃ) মাদইয়ান শহরের উপকণ্ঠে দুইজন মহিলাকে দেখলেন যে, তারা অক্ষমতার কারণে তাদের ছাগলকে পানি পান করতে পারছে না। মহিলাদ্বয় সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং মুসা (আঃ) একজন মুসাফির ছিলেন। কিন্তু অক্ষমদের সেবা ভদ্রতা ছাড়া আল্লাহ তাআলার কাছেও পছন্দনীয় কাজ ছিল। তাই তিনি তাদের জন্যে পরিশ্রম স্বীকার করলেন এবং তাদের ছাগলকে পানি পান করিয়ে দিলেন। এ কাজের সওয়াব ও পুরস্কার আল্লাহর কাছে বিরাট। দুনিয়াতেও তাঁর এ কাজকেই প্রবাস জীবনের অসহায়ত্ব ও সমূলীনতার প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে নিজের শান অনুযায়ী জীবন গঠন করার সুযোগ তিনি এর মাধ্যমেই লাভ করেন এবং হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর সেবা ও তাঁর জামাতা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। যৌবনে পদার্পণ করার পর তাঁর মাতাকে যে দায়িত্ব পালন করতে হত, আল্লাহ তাআলা প্রবাস জীবনে তা একজন পয়গম্বরের হাতে সম্পন্ন করিয়ে দিয়েছেন।

দুই পয়গম্বরের মধ্যে চাকর ও মনিবের সম্পর্ক : এর রহস্য ও অভাবনীয় উপকারিতা : মুসা (আঃ) শোআয়ব (আঃ)-এর গৃহে অতিথি হয়ে ফেরাউনী সিপাহীদের কবল থেকে নিশ্চিন্ত হলে শোআয়ব (আঃ) স্বীয় কন্যার পরামর্শক্রমে তাঁকে চাকর রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। এতে আল্লাহর অনেক হেকমত এবং মানবজাতির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত নিহিত রয়েছে।

প্রথমতঃ শোআয়ব (আঃ) আল্লাহর নবী ও রসুল ছিলেন। একজন প্রবাসী মুসাফিরকে চাকুরীর বিনিময় ছাড়াই কিছুদিন নিজ গৃহে আশ্রয় দেয়া তাঁর পক্ষে মোটেই দুষ্কর ছিল না। কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ পয়গম্বরসুলভ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে একথা বোঝে নিয়েছিলেন যে, সংসাহসী মুসা (আঃ) এ ধরনের আতিথ্য কবুল করবেন না এবং অন্যত্র চলে গেলে বিপদগ্রস্ত হবেন। তাই সকল প্রকার লৌকিকতা পরিহার করে লেন-দেনের পথ বেছে নিলেন। এতে অপরের জন্যেও নির্দেশ রয়েছে যে, অন্যের গৃহে গিয়ে তার গলগ্রহ হয়ে যাওয়া ভদ্রতার খেলাফ।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিল মুসা (আঃ)-কে রেসালত ও নবুওয়ত দ্বারা ভূষিত করা। এর জন্যে যদিও কোনরূপ সাধনা ও কর্ম শর্ত নয় এবং কোন সাধনা ও কর্ম দ্বারা তা অর্জন করা যায় না : কিন্তু আল্লাহর চিরাচরিত রীতি এই যে, তিনি পয়গম্বরগণকেও সাধনা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পথে পরিচালনা করেন। কেননা, এটা মানব চরিত্রের উৎকর্ষের উপায় এবং অপরের সংশোধনের প্রধান কারণ হয়ে থাকে। মুসা (আঃ)-এর জীবন এ পর্যন্ত রাজকীয় সম্মান ও জাঁকজমকের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে তাঁকে জনগণের পথপ্রদর্শক ও

সৎস্কারকের গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে হবে। শোআয়ব (আঃ)-এর সাথে শ্রম ও মজুরীর এই চুক্তিতে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন সম্পর্কিত অনুশীলনের গোপন ভেদও নিহিত ছিল।

তৃতীয়তঃ মুসা (আঃ)-এর কাছ থেকে ছাগল চরানোর কাজ নেয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অধিকাংশ পয়গম্বরকে এ কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। ছাগল সাধারণতঃ পাল থেকে আলাদা হয়ে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে। ফলে রাখালের মনে বার বার ক্রোধের উদ্বেগ হয়। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে সে যদি পলাতক ছাগল থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, তবে ছাগল হাতছাড়া হয়ে কোন বাঘের খোরাকে পরিণত হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছামত পরিচালনা করার জন্যে যদি রাখাল ছাগলকে মারপিট করে, ক্ষীণকায় জন্তু হওয়ার কারণে হাত-পা ভেঙ্গে যাওয়া বিচিত্র নয়। এ কারণে রাখালকে অত্যধিক ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হয়। পয়গম্বরগণের সাথে সাধারণ মানব সমাজের ব্যবহারও তদ্রূপ হয়ে থাকে। এতে পয়গম্বরগণ তাদের তরফ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেও পারেন না এবং তাদেরকে কঠোরতার মাধ্যমেও পথে আনতে পারেন না। ফলে ধৈর্য ও সহনশীলতার অভ্যাসের পথই তাঁদেরকে অবলম্বন করতে হয়।

জাদুকর ও পয়গম্বরগণের কাজে সুস্পষ্ট পার্থক্য : ফেরাউন সমবেত জাদুকরদের দেশ ও জাতির বিপদাশঙ্কা সামনে রেখে কাজ করতে বলেছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে একে নিজের কাজ মনে করে অপ্রাণ চেষ্টা সহকারে দায়িত্ব পালন করা তাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু তারা কি করেছে? কাজ শুরু করার আগেই পারিশ্রমিকের ব্যাপারে দর-কষাকষি আরম্ভ করে দিয়েছে।

এর বিপরীতে আল্লাহ-প্রেরিত পয়গম্বরগণ সব মানুষের সামনে এই ঘোষণা রাখেন : **وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ** অর্থাৎ, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। পয়গম্বরগণের প্রচার ও দাওয়াত কার্যকরী হওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রভাব অত্যধিক। ইসলামী বায়তুল-মাল থেকে আলেম, মুফতী ও ওয়ায়েযদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার পর থেকে তাঁরা শিক্ষাদান, ওয়ায ও ইমামতির বেতন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এই বেতন গ্রহণ পরবর্তী ফেকাহবিদগণের মতে অপারগ অবস্থায় জায়েয হলেও জনগণের সৎস্কারের ক্ষেত্রে এর কুফল অস্বীকার করার উপায় নেই। বলাবাহুল্য, বিনিময় গ্রহণ করার ফলে তাঁদের প্রচেষ্টার উপকারিতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

ফেরাউনী জাদুকরদের জাদুর স্বরূপ : ফেরাউনী জাদুকররা তাদের লাঠি ও রশিগুলোকে বাহাতঃ সাপ বানিয়ে দেখিয়েছিল। প্রশ্ন এই যে, এগুলো কি বাস্তবিকই সাপ হয়ে গিয়েছিল? এ সম্পর্কে কোরআন পাকের ভাষা **فَجَاءَ الْيَهُودُ مِنْ سُوْرِهِمْ أَهْلًا سَعِيًّا** - (জাদুর কারণে এগুলো

ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করছে বলে মনে হচ্ছিল) থেকে জানা যায় যে, এগুলো সত্যিকার সাপ হয়ে যায়নি; বরং জাদুকররা এক প্রকার মেসমেরিজমের মাধ্যমে দর্শকদের কল্পনাশক্তিকে ক্রিয়াশীল করে দৃষ্টি-বিব্রাট ঘটিয়ে দিয়েছিল। ফলে এগুলো দর্শকদের কাছে ছুটাছুটিরত সাপ বলে মনে হচ্ছিল।

অবশ্য এ দ্বারা এটা জরুরী নয় যে, জাদুবলে বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তিত হতে পারে না। এখানে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ফেরাউনী জাদুকরদের যাদু বস্তুর স্বরূপ পরিবর্তন করার মত শক্তিশালী ছিল না।

গোত্রগত বিভক্তি সামাজিক কাজ কারবাবের সীমা পর্যন্ত

নিশ্চিনীয় নয় : ইসলাম দেশগত, ভাষাগত, বর্ণগত ও গোত্রগত বিভেদকে জাতীয়তার ভিত্তি স্থির করার তীব্র নিন্দা করেছে এবং এসব বিভেদ মিটানোর জন্যে প্রতি কাজে ও প্রতি পদক্ষেপে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাজনীতির ভিত্তিই হচ্ছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। এতে আরবী, আজমী, ফারসী, হিন্দী ও সিন্ধী সবাই এক জাতির ব্যক্তিবর্গ। বিশুনবী (সাঃ) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করার জন্যে সর্বপ্রথম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একাত্মতা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে কায়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে এই কর্মপদ্ধতি ব্যক্ত করেন যে, আঞ্চলিক, বংশগত ও ভাষাগত বিভেদের মূর্তিকে ইসলাম ভেঙ্গে চূরমার করে দিয়েছে। এদতসত্ত্বেও সামাজিক কাজ-কারবারের সীমা পর্যন্ত এসব পার্থক্যকে মূল্য দেয়ার অনুমতি ইসলামে আছে। কেননা, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন গোত্রের পানাহার ও বসবাসের পদ্ধতি বিভিন্নরূপে হয়ে থাকে। এগুলোর বিপরীত করা খুবই কষ্টকর কাজ।

হযরত মুসা (আঃ) যে বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেছিলেন, তারা বারটি গোত্রে বিভক্ত ছিল। আল্লাহ্ তাআলা এসব গোত্রের পার্থক্যকে সামাজিক কাজ-কারবারে বৈধ রাখেন। ফলে দরিয়ার মধ্যেও প্রত্যেক গোত্রের জন্যে অলৌকিকভাবে আলাদা বারটি রাস্তা প্রকাশ করে দেন। এমনিভাবে তীহ প্রান্তরে পাথর থেকেও অলৌকিকভাবে আলাদা আলাদা বারটি বরণ প্রবাহিত করে দেন, যাতে গোত্র সমূহের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি না হয় এবং প্রত্যেক গোত্র তার নির্ধারিত পানি লাভ করতে পারে।

সমষ্টিগত শৃংখলা বিধানের জন্যে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা : মুসা (আঃ) এক মাসের জন্যে তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পৃথক হয়ে তুর পর্বতে এবাদতে মগ্ন হতে চেয়েছিলেন। তখন হারান (আঃ)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে সাবাইকে নির্দেশ দিলেন যে, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা তার আনুগত্য করবে। পারম্পরিক মতভেদ ও অনৈক্য রোধ করাই ছিল এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। এ থেকে জানা যায় যে, কোন রাষ্ট্র, দল ও পরিবারের প্রধান যদি বিদেশ সফরে গমন করে, তবে প্রশাসনযন্ত্র চালু রাখার জন্যে কাউকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যাওয়া পয়গম্বরদের সুনত।

অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে বড় ধরনের মস্ককেও সাময়িকভাবে বরদাশত করা যায় : মুসা (আঃ)-এর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাঈলের মধ্যে গো-বৎস পূজার অনর্থ মাখাচাড়া দিয়ে উঠেছিল এবং তারা তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। হারান (আঃ) সবাইকে সত্যের দাওয়াত দেন, কিন্তু মুসা (আঃ)-এর ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি কোন দলের সাথে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেননি। এতে মুসা (আঃ) ক্রুদ্ধ হলে তিনি এই অজুহাতই পেশ করেন যে, আমি কঠোরতায় অবতীর্ণ হলে বনী ইসরাঈল শতধাখিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ত।

إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْتُبْ لَوْىٰ

-অর্থাৎ, আমি কোন দল থেকেই কঠোরভাবে বিভিন্ধতা ও নিষ্পৃহতার কথা ঘোষণা করিনি ; কারন তাহলে আপনি ফিরে এসে আমাকে অভিযুক্ত করে বলতেন যে, তুমি বনী ইসরাঈলের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করেছ এবং আমার নির্দেশ পালন করনি।

মুসা (আঃ)-ও তাঁর এ অজুহাতকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেননি; বরং সঠিক মেনে নিয়ে তাঁর জন্যে দোয়া ও ইস্তেগফার করলেন। এ থেকে বোঝা যায়

যে, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকার জন্যে সাময়িকভাবে কোন মন্দ কাজের ব্যাপারে নম্রতা প্রদর্শন করলে তা দুরন্ত হবে।

মুসা (আঃ)-এর কাহিনীর উপরোল্লিখিত হেদায়েতসমূহের শেষে মুসা ও হারান (আঃ)-কে একটি বিশেষ নিদর্শন সহকারে ফেরাউনকে পথ প্রদর্শনের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে। নির্দেশটি এই :

فَوَلَّىٰ كُنُوزَهُ وَكَانَ آلُكَ يَتَّبِعُونَكَ يَسْتَدْرِكُونَكَ

পয়গম্বরসুলভ দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি : এতে বলা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ যতই অব্যাহা এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তাধারার বাহক হোক না কেন, তার সাথেও সংস্কার ও পথ প্রদর্শনের কর্তব্য পালনকারীদের হিতাকাঙ্ক্ষার ভঙ্গিতে নম্রভাবে কথাবার্তা বলতে হবে। এরই ফলশ্রুতিতে সে কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে বাধ্য হতে পারে এবং তার অন্তরে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি হতে পারে।

হযরত মুসা (আঃ) কেন ভয় পেলেন? إِنَّا نَحْنُ মুসা ও হারান (আঃ) এখানে আল্লাহ্ তাআলার সামনে দুই প্রকার ভয় প্রকাশ করেছেন। এক ভয় أَنْ يَفِرُّ أَنْ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এর অর্থ সীমা লঙ্ঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরাউন সম্ভবতঃ আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করার আগেই ক্ষমতার অহমিকায় উত্তেজিত হয়ে উঠবে। দ্বিতীয় ভয় أَنْ يَطْفِئُ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। এর উদ্দেশ্য এই যে, সম্ভবতঃ সে আপনার শানে অসমীচীন কথাবার্তা বলে আরও বেশী অব্যাহতা প্রদর্শন করবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কথাবার্তার শুরুতে মুসা (আঃ)-কে নবুওয়ত ও রেসালত দান করা হলে তিনি হারান (আঃ)-কে তাঁর সাথে শরীক করার আবেদন করেন। তাঁর এ আবেদন কবুল করার সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বলে দেন :

سَنُعَذِّبُكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ مُلْكًا فَلَا يَمِيلُونَ إِلَيْكَ

অর্থাৎ, আমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহু সবল করব এবং তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব। ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না। এছাড়া এ আশ্বাসও দান করেন যে, তুমি যা যা প্রার্থনা করছ, সবই তোমাকে দান করলাম।

فَوَلَّىٰ كُنُوزَهُ وَكَانَ آلُكَ يَتَّبِعُونَكَ يَسْتَدْرِكُونَكَ

উনোচনও ছিল। বক্ষ উনোচনের সারমর্ম এই যে, শত্রুর সম্মুখীন হয়ে অন্তরে কোনরূপ সর্কীর্ণতা ও ভয়ভীতি সৃষ্টি হবে না।

আল্লাহ্ তাআলার এসব ওয়াদার পর এই ভয় প্রকাশের অর্থ কি? এর এক উত্তর এই যে, তোমাদেরকে আধিপত্য দান করব, ফলে শত্রুরা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না এই প্রথম ওয়াদাটি অস্পষ্ট। এর অর্থ প্রমাণ ও যুক্তির আধিপত্যও হতে পারে এবং বৈষয়িক আধিপত্যও হতে পারে। এছাড়া এ ধারণাও হতে পারে যে, প্রমাণাদি শোনা ও মু'জেযা দেখার পরই আধিপত্য হবে। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, ফেরাউন কথা শোনার আগেই তাদেরকে আক্রমণ করে বসবে। বক্ষ উনোচনের জন্যে স্বভাবগত ভয় দূর হয়ে যাওয়াও জরুরী নয়।

দ্বিতীয়ত : ভয়ের বস্তু দেখে স্বভাবগতভাবে ভয় করা সব পয়গম্বরের সুনত। এ ভয় পূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হয়। স্বয়ং মুসা (আঃ) তাঁরই লাঠি সাপে রূপান্তরিত হওয়ার পর তাকে ধরতে ভয় পাচ্ছিলেন, তখন আল্লাহ্ বলেন : لَوْ أَنَّكَ تَرَىٰ مَا فِي يَدَيْكَ

قَالَ عَلَيْهِمَا عِندَ رَبِّي فِي كَيْفٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ۝
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَ
أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ۝
كُلُوا وَارْزُقُوا أَفْعَالَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ۝ وَمِنْهَا
خَلَقْنَاهُمْ وَمِنْهَا نُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا نَخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ
الْبَيْتَ الْكَلْبَ وَآبَى ۝ قَالَ أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَكَ مِن أَرْضِنَا
وَنُيَسِّرَكَ لِلْيَسَارِ ۝ فَلَمَّا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ يَسْعَىٰ مِنَّا لِيُخْرِجَهُ فَجَعَلْنَا بَيْنَنا وَبَيْنَكَ
مَوْعِدًا الْخُلُقُفَ عَنْ وَلَا أَنتَ مَكَاثُومٌ ۝ قَالَ مَوْعِدُكُمْ
يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَن يُخَشِّرَ النَّاسَ شُعْبَى ۝ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ
كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ۝ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيَلَكُمْ آلُكُمْ وَلَئِنَّكُمْ لَتَكُونُنَّ أَعْيُنَ
فِي سِجِّينَ ۝ قَدْ خَابَ مِن أَفْئِدَتِنَا فَأَعْمُوا ۝ قَدْ خَابَ أَمْرُهُمْ
بَيْنَهُمْ وَآسَاءُ النَّجْوَى ۝ قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرَانِ بُرْدَيْنِ ۝
يُخْرِجُكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ وَيُخْرِجُهُمَا وَيَذْهَبُ بِطَرَفَيْكُمْ الْمَثَلِ ۝
فَاجْمِعُوا أَيْدِيَكُمْ وَأْمُرُوا أَصْفَاءَكُمْ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَن اسْتَعْلَىٰ ۝
قَالُوا لِيُؤْمِسَ أَمَّا ن تُلْقَىٰ وَإِنَّا نَكُونُ أَوَّلَ مَن لُّغَىٰ ۝

(৫২) মুসা বললেন : তাদের খবর আমার পালনকর্তার কাছে লিখিত আছে। আমার পালনকর্তা ভ্রান্ত হন না এবং বিস্মৃতও হন না। (৫৩) তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা করেছেন এবং তাতে চলাপথ পথ করেছেন, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা আমি বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। (৫৪) তোমরা আহ্বার কর এবং তোমাদের চতুঃপদ জন্তু চরাও। নিশ্চয় এতে বিবেকবানদের জন্যে নির্দশন রয়েছে। (৫৫) এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃজন করেছি এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং পুনরায় এ থেকেই আমি তোমাদেরকে উত্থিত করব। (৫৬) আমি ফেরাউনকে আমার সব নির্দশন দেখিয়ে দিয়েছি, অতঃপর সে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অমান্য করেছে। (৫৭) সে বলল : হে মুসা, তুমি কি যাদুর জোরে আমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করার জন্যে আগমন করছে? (৫৮) অতঃপর আমরাও তোমার মোকাবেলায় তোমার নিকট অনুরূপ যাদু উপস্থিত করব। সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে একটি ওয়াদার দিন ঠিক কর, যার খেলাফ আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না একটি পরীক্ষার প্রান্তরে। (৫৯) মুসা বলল : তোমাদের ওয়াদার দিন উৎসবের দিন এবং পূর্বাহ্নে লোকজন সমবেত হবে। (৬০) অতঃপর ফেরাউন প্রস্থান করল এবং তারা সব কলাকৌশল জমা করল অতঃপর উপস্থিত হল। (৬১) মুসা (আঃ) তাদেরকে বললেন : দুর্ভাগ্য তোমাদের, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। তাহলে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সে-ই বিফলমনোরথ হয়েছে। (৬২) অতঃপর তারা তাদের কাছে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল। (৬৩) তারা বলল : এই দুইজন নিশ্চিতই যাদুকর, তারা তাদের যাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায় এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা রহিত করতে চায়। (৬৪) অতঃপর তোমরা তোমাদের কলাকৌশল সুসংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে আস। আজ যে জয়ী হবে, সেই সফলকাম হবে। (৬৫) তারা বলল : হে মুসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরা প্রথমে নিক্ষেপ কর।

এমনিভাবে স্বভাবগত ও মানবগত ভয় দেখা দিয়েছে, যা আল্লাহ্ তাআলা সুসংবাদের মাধ্যমে দূর করেছেন। এই ঘটনা প্রসঙ্গেই

فَأَصْبَحَ فِي الْبَيْتِ خَائِبًا فَخَرَّ مِنْهَا خَائِبًا تَائِبًا

এবং আয়াতসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই মানবগত ভয়ের

কারণেই শেষ নবী (সাঃ) মদীনার দিকে এবং কিছু সংখ্যক সাহাবী প্রথমে আবিসিনিয়ার ও পরে মদীনার দিকে হিজরত করেন। আহযাব যুদ্ধে এই ভয় থেকেই আত্মরক্ষার জন্যে পরিচা খনন করা হয়। অথচ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয়ের ওয়াদা বার বার এসেছিল। কিন্তু সত্য এই যে, আল্লাহ্র ওয়াদার প্রতি তারা সবাই পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু মানবের স্বভাবগত তাগিদ অনুযায়ী যে স্বভাবগত ভয় পয়গম্বরের মধ্যেও দেখা দেয়, তা এই বিশ্বাসের পরিপন্থী নয়।

إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمُ وَآزَى আল্লাহ্ তাআলা বললেন : আমি তোমাদের

সাথে আছি। আমি সব শুনব এবং দেখব। সঙ্গে থাকার অর্থ সাহায্য করা। এর পূর্ণ স্বরূপ ও গুণ মানবের উপলব্ধির বাইরে।

মুসা (আঃ) ফেরাউনকে ঈমানের দাওয়াতসহ বনী-ইসরাঈলকে অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে মুক্তি দেয়ারও আহবান জানান : এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরণ যেমন মানব জাতিকে ঈমানের প্রতি পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব বহন করেন, তেমনি স্ব-স্ব উম্মতকে পার্থিব ও অর্থনৈতিক দুর্গতির কবল থেকে মুক্ত করাও তাঁদের অন্যতম কর্তব্য। তাই কোরআন পাকে মুসা (আঃ)-এর দাওয়াতে উভয় বস্তুটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

أَعْلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ আয়াতে প্রথমোক্ত প্রকার নির্দেশ

বিবৃত হয়েছে। মুসা (আঃ) ফেরাউনকে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলার ঐ কাজের কথা বলেছেন, যা সমগ্র সৃষ্ট জগতে পরিব্যাপ্ত এবং কেউ একাজ নিজে অথবা অন্য কোন মানব করেছে বলে দাবী করতে পারে না। ফেরাউন এ কথার কোন জওয়াব দিতে অক্ষম হয়ে আবোল-তাবোল প্রশ্ন তুলে এড়িয়ে গেল এবং মুসা (আঃ)-কে এমন একটি প্রশ্ন করল, যার সত্যিকার জওয়াব জনসাধারণের শ্রুতিগোচর হলে তারা মুসা (আঃ)-এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। প্রশ্নটি এই যে, অতীত যুগে যেসব উম্মত ও জাতি প্রতিমা পূজা করত, আপনার মতে তারা কিরূপ, তাদের পরিণাম কি হয়েছে? উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এর উত্তরে মুসা (আঃ) অবশ্যই বলবেন যে, তারা সবাই গোমরাহ ও জাহান্নামী। তখন ফেরাউন একথা বলার সুযোগ পাবে যে, আপনি তো সারা বিশ্বেই বেওকুফ, গোমরাহ ও জাহান্নামী মনে করেন। একথা শুনে জনসাধারণ তাঁর প্রতি কুধারণা পোষণ করবে। ফলে ফেরাউনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পয়গম্বর মুসা (আঃ) এ প্রশ্নের এমন বিজ্ঞজনাচিহ্নিত জওয়াব দিলেন, যার ফলে ফেরাউনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ফেরাউন قَالَ عَلَيْهِمَا عِندَ رَبِّي فِي كَيْفٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى

অতীত উম্মতদের পরিণতি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। এর উত্তরে মুসা (আঃ) যদি পরীক্ষার বলে দিতেন যে, তারা গোমরাহ ও জাহান্নামী, তবে ফেরাউন এক্রূপ দোষারোপের সুযোগ পেয়ে যেত যে, সে তো শুধু আমাদেরকেই নয়, সারা বিশ্বে গোমরাহ ও জাহান্নামী মনে করে। একথা জনগণের শ্রুতিগোচর হলে তারাও মুসা (আঃ)-এর প্রতি সন্দেহপরায়ণ

হয়ে যেত। মুসা (আঃ) এমন বিজ্ঞজ্ঞানোচিত জওয়াব দিলেন যে, পূর্ণ বস্ত্রব্যও ফুটে উঠেছে এবং ফেরাউনও বিভ্রান্তি ছড়াবার সুযোগ পায়নি। একেই বলে “সাপও মরেছে এবং লাঠিও ভাঙ্গেনি।” তিনি বললেন : তাদের পরিণতি সম্পর্কিত জ্ঞান আমার পালনকর্তার কাছে আছে। আমার পালনকর্তা ভুল করেন না এবং ভুলেও যান না। ভুল করার অর্থ এক কাজ করতে গিয়ে অন্য কাজ হয়ে যাওয়া। ভুলে যাওয়ার অর্থ বর্ণনাসাপেক্ষ নয়।

شَيْءٌ أَزْوَاجًا مِنْ بَيَاتٍ شَيْءٌ শব্দের অর্থ হরেক রকম এবং شَيْءٌ শব্দটি শব্দটির অর্থ বহুবচন। এর অর্থ বিভিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, উদ্ভিদের অগণিত প্রকার সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসব প্রকার গণনা করে শেষ করতে পারে না। এরপর লতা-শুশুম, ফল-ফুল ও বৃক্ষের ছালে আল্লাহ তাআলা এমন এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, চিকিৎসাশাস্ত্র বিশারদগণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। হাজারো বছর ধরে গবেষণা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও কেউ একথা বলতে পারে না যে, এদের সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে, তাই চূড়ান্ত। এসব বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ মানুষ ও তাদের পালিত জন্তু এবং বন্য জন্তুদের খোরাক অথবা ভেষজ হয়ে থাকে। এদের কাঠ গৃহনির্মাণে এবং গৃহে ব্যবহারোপযোগী হাজারো রকমের আসবাবপত্র নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

مَنْزِلَةُ اللَّهِ أَكْبَرُ الْحَقِيقَةِ তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّعْيِ অর্থাৎ, এতে আল্লাহ তাআলার অপার শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে বিবেকবানের জন্যে। نَهْيَةٌ শব্দটি এর বহুবচন। বিবেককে نَهْيَةٌ (নিষেধকারক) বলার কারণ এই যে, বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর কাজ থেকে নিষেধ করে।

প্রত্যেক মানুষের খামিরে বীর্ষের সাথে ঐ স্থানের মাটিও शामिल থাকে যেখানে সে সমাধিস্থ হবে : وَمِنْهَا عَصَاكَ শব্দের সর্বনাম দ্বারা মৃত্তিকা বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এখানে সব মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে; অথচ এক আদম (আঃ) ছাড়া সাধারণ মানুষ মৃত্তিকা দ্বারা নয়, বীর্ষ দ্বারা সৃষ্টিত হয়েছে। আদম (আঃ)–এর সৃষ্টিই কেবল সরাসরি মৃত্তিকা দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। তবে “তোমাদেরকে মৃত্তিকা দ্বারা সৃজন করেছি” বলার কারণ এরূপ হতে পারে যে, মানুষের মূল এবং সবার পিতা হলেন হযরত আদম (আঃ)–তার মধ্যস্থতায় সবার সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া মোটেই অযৌক্তিক নয়। কেউ বলেন : সব বীর্ষ মূলতঃ মাটি থেকেই উৎপন্ন। তাই বীর্ষ দ্বারা সৃষ্টি প্রকৃতপক্ষে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি। কারণ কারণ মতে আল্লাহ তাআলা তাঁর অপার শক্তিবলে প্রত্যেক মানুষের সৃজনে মাটি অন্তর্ভুক্ত করে দেন। তাই প্রত্যেক মানুষের সৃজনকে প্রত্যক্ষভাবে মাটির সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন : কোরআনের ভাষা থেকে বাহ্যতঃ একথাই বোঝা যায় যে, মাটি দ্বারাই প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিত হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণিত এক হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : মাৎগর্ভে প্রত্যেক মানব শিশুর মধ্যে ঐ স্থানের কিছু মাটি शामिल করা হয়, যেখানে আল্লাহর জ্ঞানে তার সমাধিস্থ হওয়া অবধারিত। আবু নাসিম এই হাদীসটি ইবনে সিরীনের তাক্কীরায় উল্লেখ করে বলেছেন

এই বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকেও বর্ণিত রয়েছে। আতা খোরাসানী বলেন : যখন মাৎগর্ভে বীর্ষ স্থিতিশীল হয়, তখন সৃজনকাজে আদিষ্ট ফেরেশতা গিয়ে সে স্থানের মাটি নিয়ে আসে, যেখানে তার সমাধিস্থ হওয়া নির্ধারিত। অতঃপর এই মাটি বীর্ষের মধ্যে शामिल করে দেয়া হয়। কাজেই মানুষের সৃজন মাটি ও বীর্ষ উভয় বস্তু দ্বারাই হয়। আতা এই বস্তুর প্রমাণস্বরূপ এই আয়াত পেশ করেছেন : وَمِنْهَا عَصَاكَ وَمِنْهَا قَبْرُكَ (কুরতুবী)

তফসীরে মাযহারীতে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : প্রত্যেক শিশুর নাবিহে মাটির একটি অংশ রাখা হয়। মৃত্যুর পর সে ঐ স্থানেই সমাধিস্থ হয়, যেখানকার মাটি তার খামিরে शामिल করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন : আমি, আবুবকর ও ওমর একই মাটি থেকে সৃষ্টিত হয়েছি এবং একই জায়গায় সমাধিস্থ হব। খতীব এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করে বলেন : হাদীসটি গরীব। ইবনে জওবী একে মওযুআত অর্থাৎ ভিত্তিহীন হাদীসসমূহের মধ্যে গণ্য করেছেন। কিন্তু শায়খ মুহাদ্দিস রিফা মুহাম্মদ হারেসী বদখশী (রহঃ) বলেন : এই হাদীসের পক্ষে অনেক সাক্ষ্য হযরত ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত রয়েছে। ফলে রেওয়ায়েতটি শক্তিশালী হয়ে গেছে। কাজেই হাদীসটি হাসান (লিগায়রিহি-র) চাইতে কম নয়। - (মাযহারী)

مَكَانَتِي ফেরাউন মুসা (আঃ) ও যাদুকরদের মোকাবেলার জন্যে নিজেই প্রস্তাব করল যে, প্রতিযোগিতাটি এমন জায়গায় হওয়া উচিত, যা ফেরাউন বংশীয় লোকদের ও বনী-ইসরাঈলের লোকদের সমান দূরত্বে অবস্থিত— যাতে কোন পক্ষকেই বেশী দূরে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করতে না হয়। মুসা (আঃ) এই প্রস্তাব সমর্থন করে দিন ও সময় এভাবে নির্দিষ্ট করে দিলেন مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْتَةِ وَأَنَّ مُجِيسَ الْفُلَانِ مَشِيٌّ অর্থাৎ,

এই প্রতিযোগিতা সাজ-সজ্জা দিনে হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য ঈদ অথবা কোন মেলা ইত্যাদিতে সমবেত হওয়ার দিন। এটা কোন্ দিন ছিল, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন : ফেরাউন বংশীয়দের একটি নির্দিষ্ট ঈদের দিন ছিল। সেদিন তারা সাজ-সজ্জার পোশাক পরিধান করে শহরের বাইরে এক জায়গায় সমবেত হত। কেউ কেউ বলেন : এটা ছিল নববর্ষের দিন। কেউ বলেন : এটা শনিবার দিন ছিল যাকে তারা সম্মান করত। আবার কারও মতে এটা আশুরা অর্থাৎ মুহররম মাসের দশম দিবস ছিল।

জ্ঞাতব্য : হযরত মুসা (আঃ) দিন ও সময় নির্ধারণে অত্যন্ত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের ঈদের দিন মনোনীত করেছেন, যাতে ছোট-বড় সকল শ্রেণীর লোকদের সমাবেশ পূর্ব থেকেই নিশ্চিত ছিল। এর অবশ্যস্বাবী পরিণতি ছিল এই যে, এই সমাবেশ অত্যন্ত জমজমাট হবে ও সমগ্র শহরের অধিবাসীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবে। সময় রেখেছেন পূর্বাহ্ন, যা সূর্য বেশ উপরে উঠার পর হয়। এতে এক উপযোগিতা এই যে, এ সময়ে সবাই আপন আপন কাজ সমাধা করে সহজে এই ময়দানে উপস্থিত হতে পারবে। দ্বিতীয় উপযোগিতা এই যে, এই সময়টি আলো প্রকাশের দিক দিয়ে সমস্ত দিনের মধ্যেই উত্তম। এরূপ সময়েই একাগ্রতা ও স্থিরতা সহকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করা হয়। এরূপ সময়ের সমাবেশ থেকে যখন জনতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সমাবেশের বিষয়বস্তু দূর দূরান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়। সেমতে সেদিন যখন আল্লাহ তাআলা মুসা (আঃ)–কে ফেরাউনী যাদুকরদের বিপক্ষে বিজয় দান

করলেন, তখন একদিনেই সমগ্র শহরে বরং দূর দূরান্ত পর্যন্ত এই সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়ে।

فَعَزَّزْتُكُمْ ফেরাউন মুসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় কৌশল হিসাবে যাদুকর ও তাদের সাজ-সরঞ্জাম জমা করে নিল। হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে যাদুকরদের সংখ্যা বাহান্তর ছিল বলে বর্ণিত আছে। সংখ্যা সম্পর্কে অন্যান্য আরও বিভিন্ন উক্তি আছে। চারশ' থেকে নয় লাখ পর্যন্ত তাদের সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। তারা সবাই শামউন নামক জনৈক সরদারের নির্দেশমত কাজ করত। কথিত আছে যে, তাদের সরদার ছিল একজন অন্ধ ব্যক্তি।—(কুরতুবী)

যাদুকরদের প্রতি মুসা (আঃ)-এর পয়গম্বরসূলভ ভাষণ : মু'জ্জযা দ্বারা যাদুর মোকাবেলা করার পূর্বে মুসা (আঃ) যাদুকরদের শুভেচ্ছামূলক উপদেশের কয়েকটি বাক্য বলে আল্লাহর আযাবের ভয় প্রদর্শন করলেন। বাক্যগুলো এইঃ

وَيَكُونُ لَكُمْ رُءُوسًا عَلَى الْمَوْتِ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَقَدْ خَابَ مِنْ أَفْتَرَى

অর্থাৎ, তোমাদের ধ্বংস অত্যাশন্ন। আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ করা না অর্থাৎ তাঁর সাথে ফেরাউন অথবা অন্য কাউকে শরীক করা না। এরূপ করলে আল্লাহ তোমাদিগকে আযাব দ্বারা পিষ্ট করে দেবেন এবং তোমাদেরকে সমূলে উৎপাটিত করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, পরিণামে সে ব্যর্থ ও বঞ্চিত হয়।

বলাবাহুল্য, ফেরাউনের শয়তানী শক্তি ও লোক-লম্ফকের সহায়তায় যারা মোকাবেলা করার জন্যে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিল, এসব উপদেশমূলক বাক্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া তাদের জন্যে সুদূরপর্যায় ছিল। কিন্তু পয়গম্বর ও তাঁদের অনুসারীগণের সত্যের একটি গোপন শক্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকে। তাদের সাদাসিধা ভাষাও পাশাপাশি অন্তরে তীর ও ছুরির ন্যায় ক্রিয়া করে। মুসা (আঃ)-এর এসব বাক্য শ্রবণ করে যাদুকরদের কাতার ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে গেল এবং তাদের মধ্যে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। কারণ, এ জাতীয় কথাবার্তা কোন যাদুকরের মুখে উচ্চারিত হতে পারে না। এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকেই মনে হয়। তাই কেউ কেউ বললেনঃ এদের মোকাবেলা করা সমীচীন নয়। আবার কেউ কেউ নিজের মতেই অটল রইল। فَتَنَّاوَهُمْ بِبَيْنِهِمْ এর অর্থ তাই। এরপর এই

وَأَمَّا رُءُوسُهُمْ فَالْجَنُّونُ কিন্তু অবশেষে মোকাবেলার পক্ষেই সমষ্টির মত প্রকাশ পেল।

তারা বললঃ

إِنْ هَذَا إِلَّا لِسِينِ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ أَرْضِهِمْ بَيْعِهَا

وَيَذَرُوهَا بَطَرٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا

অর্থাৎ, তারা উভয়ে যাদুকর। তারা চায় তাদের যাদুর জোর তোমাদেরকে অর্থাৎ ফেরাউন বংশীয়দেরকে তোমাদের দেশ মিসর থেকে বহিস্কার করে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, যাদুর সাহায্যে তোমাদের দেশ অধিকার করতে চায় এবং তোমাদের সর্বোত্তম ধর্মকে মিটিয়ে দিতে চায়।

مِثْلُ শব্দটি এর মতীলিঙ্গ। এর অর্থ উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যে, ফেরাউনকে খোদা ও ক্ষমতাপালী মান্য কর, যে - এ ধর্মই উত্তম ও সেরা ধর্ম; এরা এই ধর্মকে রহিত করে তদস্থলে নিজেদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কোন কণ্ডেমের সরদার ও প্রতিনিধিদেরকেও 'কণ্ডেমের তরিকা' বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস ও আলী (রাঃ) থেকে তরিকার এই তফসীর বর্ণিত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা তোমাদের কণ্ডেমের সরদার এবং সেরা লোক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে খতম করে দিতে চায়। কাজেই তাদের মোকাবেলায় তোমরা তোমাদের পূর্ণ কলাকৌশল ও শক্তি ব্যয় করে দাও এবং সব যাদুকর সারিবদ্ধ হয়ে একযোগে তাদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হও। فَاجْمَعُوا أَيُّدَكُمْ ثُمَّ اسْتُوا

صَفًا সারিবদ্ধ হওয়া প্রতিপক্ষের মনে ভীতি সঞ্চার করার পক্ষে বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। তাই যাদুকররা সারিবদ্ধ হয়ে মোকাবেলা করল।

যাদুকররা তাদের জ্ঞানপন্থীনতা ফুটিয়ে তোলার জন্যে প্রথমে মুসা (আঃ)-কে বললঃ প্রথমে আপনি নিজের কলাকৌশল প্রদর্শন করবেন, না আমরা করব? মুসা (আঃ) জওয়াবে বললেনঃ بَلِّ الْقَوْمَا অর্থাৎ, প্রথমে আপনারাই নিক্ষেপ করুন এবং যাদুর লীলা প্রদর্শন করুন। মুসা (আঃ)-এর এই জওয়াবে অনেক রহস্য লুক্কায়িত ছিল। প্রথমতঃ মজলিসী শিষ্টাচারের কারণে এরূপ জওয়াব দিয়েছেন। যাদুকররা যখন প্রতিপক্ষকে প্রথমে আক্রমণ করার অনুমতি দানের সংসাহস প্রদর্শন করল, তখন এর ভদ্রজনোচিত জওয়াব ছিল এই যে, মুসা (আঃ)-এর পক্ষ থেকে আরও অধিক সাহসিকতার সাথে তাদেরকে সূচনা করার অনুমতি দেয়া। দ্বিতীয়তঃ যাদুকররা তাদের স্থিরচিন্তা ও চিন্তাহীনতা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে একথা বলেছিল। মুসা (আঃ) তাদেরকেই সূচনা করার সুযোগ দিয়ে নিজের চিন্তাহীনতা ও স্থিরচিন্তার পরিচয় পেশ করেছেন। তৃতীয়তঃ যাতে মুসা (আঃ)-এর সামনে তাদের যাদুর সব লীলা-খেলা এসে যায় এবং এরপরই তিনি তাঁর মু'জ্জযা প্রকাশ করেন। এভাবে একই সময়ে সত্যের বিজয় দিবালোকের মত ফুটে উঠতে পারত। যাদুকররা মুসার (আঃ) কথা অনুযায়ী তাদের কাজ শুরু করে দিল এবং তাদের বিপুল সংখ্যক লাঠি ও দড়ি একযোগে মাটিতে নিক্ষেপ করল। সবগুলো লাঠি ও দড়ি দৃশ্যতঃ সাপ হয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করতে লাগল।

قَالَ بَلْ أَعْمَأَزَ أَجَابًا لَهُمْ وَعَصِيَةً يُحْيِي لِلْيَوْمِ مِنْ يَحْيِي
 أَهْلًا لَسْتُمْ ۖ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ۚ فَلَمَّا لَفِ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۖ وَالْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلَفَّتْ صَاعَتُهُمَا
 صَنَعُوا كَيْدًا سَجِرَ وَلَا يُفْلِحُ السَّاعِرُ حَيْثُ إِلَى ۖ تَأْتِي السَّحَرَةُ
 سَجْدًا ۖ قَالَ الْوَاثِلِيُّ لِطَرِيقٍ هُرُونٍ وَمُوسَى ۖ قَالَ أَمْتَمُّ لَهُ قَبِيلَ
 أَنْ أَذِنَ لَكَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَكَ الْبَرُّ الَّذِي عَلِمْتُمْ السَّحَرَةَ فَلَا تَقْطَعْنَ
 أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ ۚ وَأَوْصَيْنَاكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ
 وَلَعْنَتُنَّ إِنَّمَا سَعْدُ عَادَ أَبَاوَيْقَى ۖ قَالَ الْوَالِدُ ثَوْرًا عَلَى مَا
 جَاءَهُ تَامَنَ الْيَتِيمَ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْصُ مَا أَنْتَ قَاصٍ
 إِنَّمَا تَقْصُوْنَ هَذِهِ السَّيْوَةَ الَّتِي نَبَاهَا كَامَاكِيرَ بِنَا لِيَعْفَرَ لَنَا
 حَطْبًا وَمَا أَكْرَهْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّحَرِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَابْقَى ۖ
 إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجِيبًا ۖ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ
 لَا يَحْيَى ۖ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ
 لَهُمْ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ۖ جَدَّتْ عَدْنٌ تَحْرِي ۖ وَمَنْ تَحْتَهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ حَزْرًا مَنْ تَرَكْنِي ۖ

(৬৬) মুসা বললেন : বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদুর প্রভাবে হঠাৎ তাঁর মনে হল, যেন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো ছুঁটাছুঁটি করছে। (৬৭) অতঃপর মুসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন। (৬৮) আমি বললাম : ভয় করো না, তুমি বিজয়ী হবে। (৬৯) তোমার ডান হাতে যা আছে তুমি তা নিক্ষেপ কর। এটা যা কিছু তারা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কলাকৌশল। যাদুকর যেখানেই থাকুক, সফল হবে না। (৭০) অতঃপর যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। তারা বলল : আমরা হারান ও মুসার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। (৭১) ফেরাউন বলল : আমার অনুমতি দানের পূর্বেই? তোমরা কি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে; দেখছি সেই তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। অতএব আমি অবশ্যই তোমাদের হস্তপদ বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে শুলে চড়াব এবং তোমরা নিশ্চিতরূপেই জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার আযাব কঠোরতর এবং অধিকশন স্থায়ী। (৭২) যাদুকররা বলল : আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেব না। অতএব তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমি তো শুধু এই পার্থিব জীবনেই যা করার করবে। (৭৩) আমরা আমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি— যাতে তিনি আমাদের পাপ এবং তুমি আমাদেরকে যে যাদু করতে বাধ্য করেছে, তা মার্জনা করেন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী। (৭৪) নিশ্চয় যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না। (৭৫) আর যারা তাঁর কাছে আসে এমন ঈমানদার হয়ে যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে সুউচ্চ মর্তব্য। (৭৬) বসবাসের এমন পুশোদ্যান রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরীয়াসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা তাদেরই পুরস্কার, যারা পবিত্র হয়।

এ থেকে জানা যায় যে,

ফেরাউনী যাদুকরদের যাদু ছিল এক প্রকার নজরবন্দী, যা মেসমেরিজমের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে যায়। লাঠি ও দড়িগুলো দর্শকদের দৃষ্টিতেই নজরবন্দীর কারণে সাপ রূপে দৃষ্টিগোচর হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে এগুলো সাপ হয়নি। অধিকাংশ যাদু এরূপই হয়ে থাকে।

অর্থাৎ এ পরিস্থিতি দেখে মুসা

(আঃ) - এর মধ্যে ভয় সঞ্চার হল ; কিন্তু এ ভয়কে তিনি মনের মধ্যে গোপন রাখলেন — প্রকাশ হতে দেননি। এ ভয়টি যদি প্রাণের ভয় হয়ে থাকে, তবে মানবতার খাতিরে এরূপ হওয়া নবুওয়তের পরিপন্থী নয়। কিন্তু বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এটা প্রাণের ভয় ছিল না; বরং তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, এই বিরটি সমাবেশের সামনে যদি যাদুকররা জিতে যায়, তবে নবুওয়তের দাওয়াতের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারবে না। এ কারণেই এর জওয়াবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে : لَكُنْتُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى

এতে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, যাদুকররা জিততে পারবে না। তুমিই বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করবে। এভাবে মুসা (আঃ)-এর উপরোক্ত আশঙ্কা দূর করে দেয়া হয়েছে।

মুসা (আঃ)-কে ওহীর মাধ্যমে বলা হল যে,

তোমার দক্ষিণ হস্তে যা আছে, তা নিক্ষেপ কর। এখানে মুসা (আঃ)-এর লাঠি বোঝানো হয়েছে; কিন্তু তা পরিস্কার উল্লেখ না করে ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের যাদুর কোন মূল্য নেই। এজন্যে পরোয়া করা না এবং তোমার হাতে যা-ই আছে, তাই নিক্ষেপ কর। এটা তাদের সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। সেমতে তাই হল। মুসা (আঃ) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেই তা একটি বিরটি অজগর সাপ হয়ে যাদুর সাপগুলোকে গিলে ফেলল।

যাদুকররা মুসলমান হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল : মুসা (আঃ)-এর লাঠি যখন অজগর হয়ে তাদের কাম্পনিক সাপগুলোকে গ্রাস করে ফেলল, তখন যাদুবিন্দ্য বিশেষজ্ঞ যাদুকরদের বুঝতে বাকী রইল না যে, একাজ যাদুর জোরে হতে পারে না; বরং এটা নিঃসন্দেহে মু'জেযা, যা একান্তভাবে আল্লাহর কুদরতে প্রকাশ পায়। তাই তারা সেজদায় পড়ে গেল এবং ঘোষণা করল : আমরা মুসা ও হারানের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কোন কোন হাদীসে রয়েছে, যাদুকররা ততক্ষণ পর্যন্ত সেজদা থেকে মাথা তোলেনি, যতক্ষণ খোদায়ী কুদরত তাদেরকে জ্ঞানাত ও দোষপ্রত্যক না করিয়ে দেয়। — (রহুল-মা'আনী)

আল্লাহ তাআলা যখন এই বিরটি

সমাবেশের সামনে ফেরাউনের লাঞ্ছনা ফুটিয়ে তুললেন, তখন হতভম্ব হয়ে প্রথমে সে যাদুকরদেরকে বলতে লাগল : আমার অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা কিরূপে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে? সে যেন উপস্থিত জনতাকে বলতে চেয়েছিল যে, আমার অনুমতি ছাড়া এই যাদুকরদের কোন কথা ও কাজ ধর্তব্য নয়। কিন্তু এই প্রকাশ্য মু'জেযা দেখার পর কারও অনুমতির আবশ্যিকতা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে থাকতে পারে না। তাই সে এখন যাদুকরদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উত্থাপন করে বলল : এখন জানা গেল যে, তোমরা সবাই মুসার শিষ্য। এই যাদুকরই

তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা চক্রান্ত করেই তার কাছে নতি স্বীকার করেছ।

فَلَا تَقْرَءُ يَدِيكَوَأَرْسِلْهُمْ مِنْ خَلْفِي

এখন ফেরাউন যাদুকরদেরকে কঠোর শাস্তির হুমকি দিল যে, তোমাদের হস্তপদ এমনভাবে কাটা হবে যে, ডান হাত কেটে বাম পা কাটা হবে। সম্ভবতঃ ফেরাউনী আইনে শাস্তির এই পন্থাই প্রচলিত ছিল অথবা এভাবে হস্তপদ কাটা হলে মানুষের শিকার একটি নমুনা হয়ে যায়। তাই ফেরাউন এ ব্যবস্থাই প্রস্তাব হিসেবে দিয়েছে।

وَأَوْصِيكَرْمَنْ جَذَرُ الثَّمَرِ

অর্থাৎ হস্তপদ কাটার পর তোমাদেরকে খজুর বৃক্ষের শূলে চড়ানো হবে। ক্ষুধা ও পিপাসায় না মরা পর্যন্ত তোমরা খুলে থাকবে।

فَالْوَالِنْ تُؤْثِرُ عَلَى مَا جَاءَ تَائِيَنِ الْيَتِي وَكَذَلِكَ فَطَرْنَا

যাদুকররা ফেরাউনের কঠোর হুমকি ও শাস্তির ঘোষণা শুনে ঈমানের ব্যাপারে এতটুকুও বিচলিত হন না। তারা বললঃ আমরা তোমাকে অথবা তোমার কোন কথাকে এসব নিদর্শন ও মু'জ্জেরার উপর প্রাধান্য দিতে পারি না, যেগুলো মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। হযরত ইকরামা বলেনঃ যাদুকররা যখন সেজদায় গেল, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জল্পাতের উচ্চস্তর ও নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়ে দেন। তাই তারা বললঃ এসব নিদর্শন সত্ত্বেও আমরা তোমার কথা মানতে পারি না। — (কুরতুবী) এবং জগৎ-স্রষ্টা আসমান-যমিনের পালনকর্তাকে ছেড়ে আমরা তোমাকে পালনকর্তা স্বীকার করতে পারি না। فَاُفٍّ مَا بَيْنَ

فَافٍ এখন তোমার যা খুশী, আমাদের সম্পর্কে ফয়সালা কর এবং যে সাজা দেয়ার ইচ্ছা দাও। إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا অর্থাৎ, তুমি আমাদেরকে শাস্তি দিলেও তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবন পর্যন্তই হবে। মৃত্যুর পর আমাদের উপর তোমার কোন অধিকার থাকবে না। আল্লাহ্র অবস্থা এর বিপরীত। আমরা মৃত্যুর পূর্বেও তাঁর অধিকারে আছি এবং মৃত্যুর পরও থাকব। কাজেই তাঁর শাস্তির চিন্তা অগ্রগণ্য।

وَمَا أَكْفَرَهُنَّ أَغْلِيَوْمَ النَّارِ

যাদুকররা এখন ফেরাউনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করল যে, আমাদেরকে যাদু করতে তুমিই বাধ্য করেছ। নতুবা আমরা এই অর্থহীন কাজের কাছেও যেতাম না। এখন আমরা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্র কাছে এই পাপ কাজেরও ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, যাদুকররা স্বেচ্ছায় মোকাবেলা করতে এসেছিল এবং এই মোকাবেলার জন্যে দর-কষাকষিও ফেরাউনের সাথে

করেছিল — অর্থাৎ বিজয় হলে তারা কি পুরস্কার পাবে। এমতাবস্থায় ফেরাউনের বিরুদ্ধে যাদু করতে বাধ্য করার অভিযোগ করা কিরূপে শুদ্ধ হবে? এর এক কারণ এরূপও হতে পারে যে, যাদুকররা প্রথমে শাহী পুরস্কার ও সম্মানের লোভে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত ছিল। পরে তারা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, তারা মু'জ্জেরার মোকাবেলা করতে পারবে না। তখন ফেরাউন তাদেরকে মোকাবেলা করতে বাধ্য করে। দ্বিতীয় কারণ এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, ফেরাউন তার রাজ্যে যাদুশিক্ষা বাধ্যতামূলক করে রেখেছিল। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তিই যাদু শিক্ষা করতে বাধ্য ছিল। — (রাসুল-মা'আনী)

ফেরাউন পক্ষী আছিয়া'র শুভ পরিণতিঃ তফসীরে-কুরতুবীতে বলা হয়েছে, সত্য ও মিথ্যার এই সম্বন্ধের সময় ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া মোকাবেলার শুভ ফলাফলের জন্যে সদা উদগ্রীব ছিলেন। যখন তাঁকে মুসা ও হারুন (আঃ)-এর বিজয়ের সংবাদ শোনানো হল, তখন তিনি কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করলেনঃ আমি মুসা ও হারুনের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নিজ-পক্ষীর সংবাদ শুনে ফেরাউন আদেশ দিলঃ একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উঠিয়ে তাঁর মাথার উপর ছেড়ে দাও। আছিয়া নিজের এই পরিণতি দেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করলেন। আল্লাহ তাআলা পাথর তাঁর মাথায় পড়ার আগেই তাঁর প্রাণ কবজ করে নিলেন। এরপর তাঁর মৃতদেহের উপর পাথর পতিত হল।

إِنَّهُ مِنْ يَّتِي

وَالَّذِي خَرُّوا مِنْ تَرْكِي رَبِّهِمْ حُورًا

ফেরাউনী যাদুকরদের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনঃ এগুলো ঐ যাদুকরদের ইসলামী বিশ্বাস ও পরজগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো ঐ যাদুকরদের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছে, যারা এইমাত্র মুসলমান হয়েছে এবং তারা ইসলামী বিশ্বাস কিংবা ধর্মের কোন শিক্ষাও পায়নি। এসব হযরত মুসা (আঃ) - এর সংসর্গের বরকত এবং তাদের আন্তরিকতার প্রভাবেই আল্লাহ তাআলা তাদের সামনে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের দ্বার মুহূর্তের মধ্যেই উন্মোচিত করে দেন। ফলে তারা প্রাণনাশের নিশ্চিত সম্ভাবনার প্রতিও জ্বঙ্কপ করেনি এবং কঠোরতম শাস্তি ও বিপদের ভয়ও তাদেরকে টলাতে পারেনি। তারা যেন বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে বেলায়েতের ঐ স্তরে উন্নীত হয়ে গেছে, যে স্তরে উন্নীত হওয়া অন্যদের পক্ষে আজীবন চেষ্টা ও সাধনার পরও কঠিন হয়ে থাকে। فَكَرَّ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخُلُقِينَ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

আব্বাস ও উবায়দ ইবনে উমায়র বলেনঃ আল্লাহ্র কদরত লীলা দেখ, তারা দিনের প্রারম্ভে কাকের যাদুকর ছিল এবং দিবাশেষে আল্লাহ্র ওলী ও শহীদ হয়ে গেল। — (ইবনে-কাসীর)।

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اسْرُبْ بِعَادَ فَإِنَّهُمْ
لَهُمْ ظُرُوفٌ بِأَنَافِ الْبَحْرِ يَبْسُ لَا تَجِدُ فِيهَا مِنْكَ مُدْرِكًا وَلَا تُحْشَى ①
فَاتَّبَعَهُمْ فَرَعَوْنَ يَجُودُ ② فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَاءٌ غَاشِيَهُمْ ③
وَأَصْلَ فَرَعُونَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ④ إِلَيْنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ
أَجْمَعُوا لَكُمْ مِنْ عَدُوٍّ وَوَعَدْنَا لَكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى ⑤ كُلُّوْا مِنْ طَبْعِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ⑥ وَمَنْ
يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ⑦ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ
تَابَ ⑧ وَأَمَّا وَعِثْ لَكُمْ هُنْدَى ⑨ وَمَا عَجَّلَكُمُ
عَنِ قَوْمِكِ يُوسَى ⑩ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَشْرَى ⑪
عَجَّلْتُ الْبَيْتَ رَبِّ لِمَ تَضَي ⑫ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا
قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ⑬ فَرَجِعْ
مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ⑭ قَالَ يَقَوْمِ الْكَافِرِينَ ⑮
رَبِّكُمْ وَعَدَا حَسَنًا ⑯ أَقْطَالٌ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ
يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ⑰

(৭৭) আমি মুসার প্রতি এই মর্মে ওহী করলাম যে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও এবং তাদের জন্যে সমুদ্রে শুষ্কপথ নির্মাণ কর। পেছন থেকে এসে তোমাদের ধরে ফেলার আশঙ্কা করো না এবং পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয় করো না। (৭৮) অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল। (৭৯) ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছিল এবং সংপথ দেখায়নি। (৮০) হে বনী-ইসরাঈল! আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছি, তুর পাহাড়ের দক্ষিণ পার্শ্বে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দান করেছি এবং তোমাদের কাছে 'মন্না' ও 'সালওয়া' ন্যায় করছি। (৮১) বলেছি : আমার দেয়া পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং এতে সীমালঙ্ঘন করো না, তা হলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে এবং যার উপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে ধ্বংস হয়ে যায়। (৮২) আর যে ভওবা করে, ঈমান আনে এবং সংকল্প করে অতঃপর সংপথে অটল থাকে, আমি তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমশীল। (৮৩) হে মুসা, তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে ফেলে তুমি ত্বরান্বিত কেন? (৮৪) তিনি বললেন : এই তো তারা আমার পেছনে আসছে এবং হে আমার পালনকর্তা, আমি তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এলাম, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। (৮৫) বললেন : আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি তোমার পর এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। (৮৬) অতঃপর মুসা তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলেন ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায়। তিনি বললেন : হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদেরকে একটি উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতির সময়কাল তোমাদের কাছে দীর্ঘ হয়েছে, না তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার ক্রোধ নেমে আসুক, যে কারণে তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে?

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى যখন সত্য ও মিথ্যা, মু'জ্জেযা ও যাদুর চূড়ান্ত লড়াই ফেরাউন ও ফেরাউন-বংশীয়দের কোমর ভেঙ্গে দিল এবং মুসা ও হারুন (আঃ)-এর নেতৃত্বে বনী-ইসরাঈল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেল, তখন তাদেরকে সেখান থেকে হিজরত করার আদেশ দান করা হল। কিন্তু ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন এবং সামনে পশ্চিমমুখে সমুদ্র অস্তরায় হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। তাই মুসা (আঃ)-কে এই দুইটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বলা হল যে, সমুদ্রে লাঠি মারলেই মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ হয়ে যাবে এবং পশ্চাদ্ধিক থেকে ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবনের আশঙ্কা থাকবে না। এর বিস্তারিত ঘটনা এ সূরাতেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মুসা (আঃ) সমুদ্রে লাঠি মারতেই তাতে বারটি সড়ক নির্মিত হয়ে গেল। প্রত্যেক সড়কের উভয় পার্শ্বে পানির স্থাপন জমাত বরফের ন্যায় পাহাড়সম দণ্ডায়মান হয়ে গেল এবং মাঝখান দিয়ে শুষ্ক পথ দৃষ্টিগোচর হল। সূরা শুআরায় বলা হয়েছে : فَكَانَ كُلُّ فِرْقَةٍ كَلْبَ ظَهِيرِ الْخَلْقِ ① বারটি

সড়কের মধ্যবর্তী পানির প্রাচীরকে আল্লাহ তাআলা এমন করে দিলেন যে, এক সড়ক অতিক্রমকারীরা অন্য সড়ক অতিক্রমকারীদেরকে দেখত এবং কথাবার্তাও বলত। অন্যান্য গোত্রের কি অবস্থা হয়েছে, প্রত্যেকের থেকে এই দৃষ্টিস্তা দূর করার উদ্দেশ্যে এরূপ করা হয়েছিল। —(কুরতুবী)

মিসর থেকে বের হওয়ার সময় বনী-ইসরাঈলের কিছু অবস্থা : তাদের সংখ্যা ও ফেরাউনী সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা : তফসীরে রুহুল মা'আনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসা (আঃ) রাত্রির সূচনাতাগে বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে রওয়ানা হয়ে যান। বনী-ইসরাঈল ইতিপূর্বে শহরবাসীদের মধ্যে প্রচার করে দিয়েছিল যে, তারা ঈদ উৎসব পালন করার জন্যে বাইরে যাবে। এই বাহনায় তারা ঈদের পরে ফেরৎ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিবতীদের কাছ থেকে কিছু অলংকার পত্র ধার করে নেয়। বনী-ইসরাঈলের সংখ্যা তখন ছয় লাখ তিন হাজার এবং অন্য রেওয়াজেতে ছয় লাখ সত্তর হাজার ছিল। এগুলো ইসরাঈলী রেওয়াজেতে বিধায় অতিরঞ্জিত হতে পারে। তবে কোরআন পাক ও হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, তাদের বারটি গোত্র ছিল এবং প্রত্যেক গোত্রের জনসংখ্যা ছিল বিপুল। এটাও খোদায়ী কুদরতের একটি বহিঃপ্রকাশ ছিল যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আমলে বনী ইসরাঈল যখন মিসরে আগমন করে, তখন তারা বার ভাই ছিল। এখন বার ভাইয়ের বার গোত্রের এত বিপুল সংখ্যক লোক মিসর থেকে বের হল যে, তাদের সংখ্যা ছয় লাখেরও অধিক বর্ণনা করা হয়। ফেরাউন তাদের মিসর ত্যাগের সংবাদ অবগত হয়ে সৈন্যবাহিনীকে একত্রিত করল। তাদের মধ্যে সত্তর হাজার কৃষ্ণ বর্ণের খোড়া ছিল এবং অগ্রবর্তী বাহিনীতে সাত লাখ সওয়ার ছিল। পশ্চাদ্ধিক থেকে সৈন্যদের এই সয়লাব এবং সামনে ভূমধ্য সাগর দেখে বনী-ইসরাঈল ঘাবড়ে গেল এবং মুসা (আঃ)-কে বলল : اِنَّا لَنَرٰكَ كَذِبًا ① অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম। মুসা (আঃ) সাধুনা দিয়ে বললেন : اِنَّمَا اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ② আমার সাথে আমার পালনকর্তা

আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। এরপর তিনি আল্লাহর নির্দেশে সমুদ্রে লাঠি মারলেন এবং তাতে বারটি গোত্র এসব সড়ক দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেল। ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী সেখানে পৌঁছে এই বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল যে, সমুদ্রের বুকে এই রাস্তা কিভাবে তৈরী

হয়ে গেল। কিন্তু ফেরাউন সর্গর্বে সৈন্যদেরকে বলল : এগুলো সব আমার প্রতাপের লীলা। এর কারণে সমুদ্রের প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে রাস্তা তৈরী হয়ে গেছে। একথা বলে তৎক্ষণাৎ সে সামনে অগ্নসর হয়ে নিজের ষোড়া সমুদ্রের পথে চালিয়ে দিল এবং গোটা সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাতে আসার আদেশ দিল। যখন ফেরাউন তার সৈন্যবাহিনীসহ সামুদ্রিক পথের মধ্যখানে এসে গেল এবং একটি লোকও তাঁরে রইল না, তখন আল্লাহ তাআলা সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার আদেশ দিলেন এবং সমুদ্রের সকল অংশ পরস্পর মিলিত হয়ে গেল। **فَغَشَّيْهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَاءٌ غَاسِقٌ** বাক্যের সারমর্ম তাই। — (রাসূল-মা'আনী)

وَوَعَدْنَا نُوحًا غَابِطَ الطُّورِ الْأَمِينِ ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া এবং সমুদ্র পার হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা মুসা (আঃ) — কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় বনী-ইসরাঈলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তারা তুর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে চলে আসুক, যাতে মুসা (আঃ) — কে তওরাত প্রদান করা যায় এবং বনী-ইসরাঈল স্বয়ং তাঁর বাক্যলাপের গৌরব প্রত্যক্ষ করে।

وَنَزَّلْنَا سُلَيْمَانَ عَلَى الْمَنِّ وَالسَّلْوَى এটা তখনকার ঘটনা, যখন বনী ইসরাঈল সমুদ্র পার হওয়ার পর সামনে অগ্নসর হয় এবং তাদেরকে একটি পবিত্র শহরে প্রবেশ করার আদেশ দেয়া হয়। তারা আদেশ অমান্য করে। তখন সাজা হিসেবে তাদেরকে তীহ নামক উপত্যকায় আটক করা হয়। তারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই উপত্যকা থেকে বাইরে যেতে সক্ষম হয়নি। এই শাস্তি সত্ত্বেও মুসা (আঃ) — এর বরকতে তাদের উপর বন্দীদশায়ও নানা রকম নেয়ামত বর্ষিত হতে থাকে।

“মান্না” ও “সালওয়া” ছিল এইসব নেয়ামতেরই অন্যতম, যা তাদের আহ্বারের জন্যে দেয়া হত।

যখন মুসা (আঃ) ও বনী-ইসরাঈল ফেরাউনের পশ্চাদ্ধাবন ও সমুদ্র থেকে উদ্ধার পেয়ে সামনে অগ্নসর হল, তখন এক প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে তারা গমন করল। এই সম্প্রদায়ের পূজাপাট দেখে বনী-ইসরাঈল বলতে লাগল : তারা যেমন উপস্থিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে, আমাদের জন্যেও এমনি ধরণের কোন খোদা বানিয়ে দাও। মুসা (আঃ) তাদের বোকামীসুলভ দাবীর জওয়াবে বললেন : তোমরা তো নেহাতই মূর্খ। এই প্রতিমাপূজারী সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবে।

তাদের কর্মপন্থা সম্পূর্ণ বাতিল। **إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ مَّجْهُونٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُمَرِّجُونَ**

هُمُ فِرْعَوْنُ وَطِيلٌ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ তখন আল্লাহ তাআলা মুসা (আঃ) — কে ওয়াদা দিলেন যে, তুমি বনী-ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে তুর পর্বতে চলে এস। আমি তোমাকে তওরাত দান করব। এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্যে কর্মপন্থা নির্দেশ করবে। কিন্তু তওরাত লাভ করার পূর্বে তোমাকে ত্রিশ দিন ও ত্রিশ রাত অবিরাম রোযা রাখতে হবে। এরপর দশ দিন আরও বৃদ্ধি করে এই মেয়াদ চল্লিশ দিন করে দেয়া হল। মুসা (আঃ) বনী-ইসরাঈলসহ তুর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলার এই ওয়াদাদৃষ্টে মুসা (আঃ) — এর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের সীমা রইল না। তিনি তার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে আসার আদেশ দিয়ে নিজে সাগ্রহে আগে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, আমি অগ্রে পৌঁছে ত্রিশ দিব্য-রাত্রির রোযা রাখব। আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা হারান (আঃ) — এর আদেশ মেনে চলবে। বনী-ইসরাঈল হারান (আঃ) — এর সাথে পেছনে চলতে লাগল এবং মুসা (আঃ) দ্রুত গতিতে সম্মুখে অগ্নসর হয়ে গেলেন।

তার ধারণা ছিল যে, তারাও অনতিবিলম্বে তুর পর্বতের নিকটবর্তী হয়ে যাবে। কিন্তু তারা পশ্চিমথে গো-বৎস পূজার সম্মুখীন হয়ে গেল। বনী-ইসরাঈল তিন দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং মুসা (আঃ) — এর পশ্চাতে গমনের প্রক্রিয়া বানচাল হয়ে গেল।

মুসা (আঃ) তুর পর্বতে উপস্থিত হলে আল্লাহ তাআলা বললেন : **أَعَزَّكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوتُونَ** হে মুসা, তুমি স্বীয় সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে দ্রুত কেন চলে এলে।

ত্বরা করা সম্পর্কে মুসা (আঃ) — কে প্রশ্ন ও তার রহস্য : মুসা (আঃ) তার সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে আশা করেছিলেন যে, তারাও বোধ হয় তুর পর্বতের নিকট পৌঁছে গেছে। তার এই ভ্রান্তি দূর করা এবং বনী ইসরাঈল যে গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছে, এই খবর দেয়াই ছিল উপরোক্ত প্রশ্নের বাহ্যতঃ উদ্দেশ্য। (ইবনে-কাসীর) রাসূল-মা'আনীতে কাশশাফের বরাতে দিয়ে বলা হয়েছে : এই প্রশ্নের কারণ ছিল মুসা (আঃ) — কে তার সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া এবং এই ত্বরা করার জন্যে হুশিয়ার করা যে, নবুওয়তের পদের তাগিদ অনুযায়ী কওমের সাথে থাকা, তাদেরকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখা এবং সত্বে আনা উচিত ছিল। তাঁর ত্বরা করার ফলশ্রুতিতে সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। এতে স্বয়ং ত্বরা করার কাজেরও নিন্দা করা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের মধ্যে এই ক্রটি না থাকা বাঞ্ছনীয়। “ইনতিসাক” গ্রন্থের বরাতে দিয়ে আরও বলা হয়েছে যে, এতে মুসা (আঃ) — কে কওমের সাথে সফর করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয় যে, যে ব্যক্তি কওমের নেতা, তার পশ্চাতে থাকা উচিত ; যেমন লূত (আঃ) — এর ঘটনায় আল্লাহ তাআলা তাঁকে নির্দেশ দেন যে, মুমিনদেরকে সাথে নিয়ে শহর থেকে বের হয়ে পড় এবং তাদেরকে অগ্রে রেখে তুমি সবার পশ্চাতে থাক। — **وَأَتْبَعَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ**

আল্লাহ তাআলার উল্লেখিত প্রশ্নের জওয়াবে মুসা (আঃ) নিজ ধারণা অনুযায়ী আরয় করলেন : আমার সম্প্রদায়ও পেছনে পেছনে প্রায় এসেই গেছে। আমি একটু ত্বরা করে এসে গেছি ; কারণ, নির্দেশ পালনে অগ্রে অগ্রে থাকা নির্দেশদাতার অধিক সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে সঞ্চারিত গো-বৎস পূজার সংবাদ দেন যে, সামেরীর পথভ্রষ্ট করার কারণে তারা ক্ষেত্নায় পতিত হয়েছে।

সামেরী কে ছিল? কেউ কেউ বলেন : সামেরী ফেরাউন বংশীয় কিবতী ছিল। সে মুসা (আঃ) — এর প্রতিবেদী এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিল। মুসা (আঃ) যখন বনী ইসরাঈলকে সত্বে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন, তখন সেও সাথে রওয়ানা হয়। কারও কারও মতে সে বনী-ইসরাঈলেরই সামেরী গোত্রের সরদার ছিল। সিরিয়ার এই সামেরী গোত্র সুবিদিত। হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়র বলেন : এ পারস্য বংশোদ্ভূত লোক কিরমানের অধিবাসী ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন : সে গো-বৎস পূজাকারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। কোনরূপে মিসর পৌঁছে সে বনী ইসরাঈলীদের ধর্মে দীক্ষা লাভ করে। কিন্তু তার অন্তরে ছিল কপটতা। — (কুরতুবী) কুরতুবীর টীকায় বলা হয়েছে : সে ভারতবর্ষের জনৈক হিন্দু ছিল এবং গো-পূজা করত। সে মুসা (আঃ) — এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর পুনরায় কুফর অবলম্বন করে অথবা প্রথম থেকেই কপট মনে ইমান প্রকাশ করে।

জনশ্রুতি এই : সামেরীর নাম ছিল মুসা ইবনে যফর। ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, মুসা সামেরী যখন জন্মগ্রহণ

قَالُوا مَا أَخْلَقْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِكَ وَلَكِنَّا حَدِيثًا وَأَوَّلًا مُتَّبِعَةً
 الْقَوْمُ فَقَدْ هَمْنَا فَكَذَّبَكَ الْقَالِي السَّامِرِيُّ فَكَأَخَرَهُ لَهُمْ عَجَلًا
 جَسَدًا آتَاهُ خُورًا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُهُمْ وَإِلَهُ مُوسَى ذُنُوبًا وَكَافًا
 يَرُونَ الْأَبْرَاجَ يَوْمَ قَوْلِهِ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ عَمَّا دَانَا فَتَمَثَّلَ لَهُمْ
 وَأَقْبَلُوا لَهُمْ هَرُونَ مِنْ قَبْلِ يَوْمِهِمْ أَنْ يَفْتَنَهُمْ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ
 رَبُّكَ الرَّحْمَنُ الْكَاتِبُ الْعَمَلِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي وَقَالُوا لَنْ نَسْبِرَ
 عَلَيْهِ عَظِيمًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى قَالَ يُبْهِرُونَ مَا
 مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَكَلًا تَتَّبِعُونَ أَفَسَبِّتُ أَمْرِي
 قَالَ يَبْتِمَوْنَ لَا تُخِذُوا بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ
 تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي قَالَ
 فَبِأَخْطَبِكُمْ يُسَارِعُ إِلَيَّ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ
 فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَّكْتُ سَوَّلَتْ
 لِي نَفْسِي قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا
 سِسْ وَأَنْ لَكَ مَوْعِدًا أَنْ تُنْقِضَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي
 ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّ فِي الْيَوْمِ نَسْفًا ۝

(৮৭) তারা বলল : আমরা তোমার সাথে কৃত ওয়াদা স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি; কিন্তু আমাদের উপর ফেরাউনীদের অলংকারের বোকা চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরা তা নিক্ষেপ করে দিয়েছি। এমনভাবে সামেরীও নিক্ষেপ করেছে। (৮৮) অতঃপর সে তাদের জন্য তৈরী করে বের করল একটা গো-বৎস—একটা দেহ, যার মধ্যে গরুর শব্দ ছিল। তারা বলল : এটা তোমাদের উপাস্য এবং মুসারও উপাস্য, অতঃপর মুসা ভুলে গেছে। (৮৯) তারা কি দেখে না যে, এটা তাদের কোন কথার উত্তর দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি ও উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না? (৯০) হারুন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিলেন : হে আমার কণ্ঠ, তোমরা তো এই গো-বৎস দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছ এবং তোমাদের পালনকর্তা দয়াময়। অতএব, তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। (৯১) তারা বলল : মুসা আমাদের কাছে ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা সদাসর্বদা এর সাথেই সংযুক্ত হয়ে বসে থাকব। (৯২) মুসা বললেন : হে হারুন, তুমি যখন তাদেরকে পথভ্রষ্ট হতে দেখলে, তখন তোমাকে কিসে নিবৃত্ত করল? (৯৩) আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করা থেকে? তবে তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করছ? (৯৪) তিনি বললেন : হে আমার জননী—তনয়, আমার শূশ্রু ও মাথার চুল ধরে আকর্ষণ করো না; আমি আশঙ্কা করলাম যে, তুমি বলবে : তুমি বনী-ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং আমার কথা সুরম্যে রাখনি। (৯৫) মুসা বললেন : হে সামেরী, এখন তোমার ব্যাপার কি? (৯৬) সে বলল : আমি দেখলাম যা অন্যেরা দেখেনি। অতঃপর আমি সেই জেরিত ব্যক্তির পদচিহ্নের নীচ থেকে এক মুঠি মাটি নিয়ে নিলাম। অতঃপর আমি তা নিক্ষেপ করলাম। আমাকে আমার মন এই যন্ত্রণাই দিল। (৯৭) মুসা বললেন : দূর হ, তোর জন্য সারা জীবন এ শাস্তিই রইল যে, তুই বলবি : ‘আমাকে স্পর্শ করো না’ এবং তোর জন্যে একটি নির্দিষ্ট ওয়াদা আছে, যার ব্যতিক্রম হবে না। তুই তোর সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর, যাকে তুই ঘিরে থাকতিয়ে। আমরা সেটি জালিয়ে দেবই। অতঃপর একে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছড়িয়ে দেবই।

করে তখন ফেরাউনের পক্ষ থেকে সমস্ত ইসরাঈলী ছেলে-সন্তানের হত্যার আদেশ বিদ্যমান ছিল।

ফেরাউনী সিপাহীদের হাতে চোখের সামনে স্বীয় পুত্রহত্যার ভয়ে ভীতা জননী তাকে একটি জঙ্গলের গর্তে রেখে উপর থেকে ঢেকে দেয়। এদিকে আল্লাহ তাআলা জিবরাঈলকে শিশুর হেফাজত ও পানাহারের কাজে নিয়োজিত করলেন। তিনি তাঁর এক অঙ্গুলিতে মধু, অন্য অঙ্গুলিতে মাখন এবং অপর অঙ্গুলিতে দুধ এনে শিশুকে চাটিয়ে দিতেন। অবশেষে সে গর্তের মধ্যে থেকেই বড় হয়ে গেল এবং পরিণামে কুফরে লিপ্ত হল ও বনী ইসরাঈলকে পথভ্রষ্ট করল।

أَخْبَرَهُ هَارُونَ مَوْسَى (আঃ) তুদু ও ক্ষুবু

অবস্থায় ফিরে এসে জাভিকে সম্প্রদান করলেন এবং প্রথমে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা স্মরণ করালেন। এই ওয়াদার জন্যে তিনি বনী-ইসরাঈলকে নিয়ে তুর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে রওয়ানা হয়েছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে তওয়ারত প্রাপ্তির কথা ছিল। বলাবাহুল্য, তওয়ারত লাভ করলে বনী ইসরাঈলের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়ে যেত।

أَقْبَلًا عَلَيْهِمُ الْمَهْدُ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার এই ওয়াদার পর

তোমরা কোন দীর্ঘ মেয়াদও তো অতিক্রান্ত হয়নি যে, তোমরা তা ভুলে যেতে পার। এমন তো নয় যে, সুদীর্ঘকাল অপেক্ষার পর তোমরা নিরাশ হয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করছ।

أَمَّا زُحْرَانٌ جِيلٌ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكَ

অথবা অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই, এখন এছাড়া আর কি বলা যায় যে, তোমরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় পালনকর্তার গণ্য ডেকে আনছ।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالُوا مَا أَخْلَقْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِكَ - শব্দটি মীমের যবর এবং

মীমের পেশযোগে ব্যবহৃত হয়। উভয়ের অর্থ এখানে স্ব-ইচ্ছা। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা গো-বৎস পূজায় স্বেচ্ছায় লিপ্ত হইনি; বরং সামেরীর কাজ দেখে বাধ্য হয়েছি। বলাবাহুল্য, তাদের এই দাবী সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সামেরী অথবা তার কর্ম তাদেরকে বাধ্য করেনি। বরং তারা নিজেরাই চিন্তা-ভাবনার অভাবে তাতে লিপ্ত হয়েছে। অতঃপর তারা সামেরীর কর্মের ঘটনা বর্ণনা করেছে :

وَزُرُّكَ أَوَّلًا - শব্দটি ওয়াদা এর বহুবচন।

অর্থ বোঝা। মানুষের পাপও কেয়ামতের দিন বোঝার আকারে পিঠে সওয়ার হবে, তাই পাপকে وزر এবং পাপরাশিকে أَوَّلًا বলা হয়। زينة শব্দের অর্থ এখানে অলংকার এবং কণ্ঠ বলে ফেরাউনের কণ্ঠমকে বোঝানো হয়েছে। বনী-ইসরাঈল ঈদের বাহনায় তাদের কাছ থেকে কিছু অলংকার ধার করেছিল এবং সেগুলো তাদের সাথে ছিল। এগুলোকে أَوَّلًا তথা পাপের বোঝা বলার কারণ এই যে, শারের কথা বলে গৃহীত এসব অলংকার ফেরত দেয়া কর্তব্য ছিল। যেহেতু ফেরত দেয়া হয়নি, তাই এগুলোকে পাপ বলা হয়েছে। ইতিপূর্বে উল্লেখিত ঘটনা থেকে জানা যায় যে, হারুন হারুন (আঃ) তাদেরকে এগুলো যে পাপ, সে সম্পর্কে হুশিয়ার

করে সেগুলোকে একটি গুহে ফেলে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। কোন কোন রেওয়াজে আছে সামেরী তার কুমতলব চরিতার্থ করার জন্যে তাদেরকে বলেছিল এসব অলংকার অপরের ঘন। এগুলো রাখা তোমাদের জন্যে বিপদব্রশ। তার এই কথা শুনে অলংকারগুলো গর্তে নিক্ষেপ করা হয়।

কাকেরদের মাল মুসলমানদের জন্যে কখন হলাল ? এখানে প্রশ্ন হয় যে, যেসব কাকের মুসলিম রাষ্ট্রে আইন মান্য করে বসবাস করে এবং যেসব কাকেরের সাথে জন ও মালের নিরাপত্তা সম্পর্কিত কোন চুক্তি হয়, তাদের মাল তো মুসলমানদের জন্যে হলাল নয়, কিন্তু যেসব কাকের ইসলামী রাষ্ট্রে বিশ্বাসী নয় এবং যাদের সাথে কোন চুক্তিও হয়নি—কেকাহবিদের পরিত্যাগ যাদেরকে “কাকের হরবী” বলা হয়, তাদের মাল মুসলমানদের জন্যে মূলতঃই হলাল। এমতাবস্থায় হারুন (আঃ) এই মালকে **زَرَّ** তথা পাপ কেন বললেন এবং তাদের কবজা থেকে বের করে গর্তে নিক্ষেপ করার আদেশ কেন দিলেন? এর একটি প্রসিদ্ধ জওয়াব বিশিষ্ট তফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, কাকের হরবীর মাল যদিও মুসলমানদের জন্যে হলাল, কিন্তু তা গনীমতের মালের (যুদ্ধবৃত্ত মালের) মতই বিধান রাখে। ইসলামপূর্ব কালে গনীমতের মাল সম্পর্কে এ আইন ছিল যে, তা কাকেরদের কবজা থেকে বের করে আনা জায়েয ছিল, কিন্তু মুসলমানদের জন্যে তা ব্যবহার করা ও ভোগ করা জায়েয নয়। বরং গনীমতের মাল একত্রিত করে কোন টিলা ইত্যাদির উপর রেখে দেয়া হত এক আসমানী আশুন (বজ্র ইত্যাদি) এসে তা গ্রাস করে ফেলত। এটা ছিল তাদের জেহাদ কবুল হওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে যে গনীমতের মালকে আসমানী আশুন গ্রাস করত না, সেই মাল জেহাদ কবুল না হওয়ার লক্ষণরূপে গণ্য হত। ফলে এরূপ মালকে অশুভ মনে করে কেউই তার কাছে যেত না। রসূল করীম (সঃ)—এর শরীয়তে যেসব বিশেষ সুবিধা ও রেয়াত দেয়া হয়েছে, তন্মধ্যে গনীমতের মাল মুসলমানদের জন্যে হলাল করে দেয়াও অন্যতম। সইহ মুসলিমের হাদীসে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এই নীতি অনুযায়ী কিবতীদের যেসব মাল বনী-ইসরাঈলের অধিকারভুক্ত ছিল, সেগুলোকে গনীমতের মাল সাব্যস্ত করা হলেও তাদের জন্যে সেগুলো ভোগ করা বৈধ ছিল না। এ কারণেই এই মালকে **فَرَقَ** (পাশরাশি) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং হযরত হারুন (আঃ)—এর আদেশে সেগুলো গর্তে নিক্ষেপ হয়েছে।

فَقَاتِلْهُمْ—অর্থাৎ, আমরা এসব অলংকারপাতি নিক্ষেপ করে দিয়েছি। উল্লিখিত হাদীসুল কুত্নের বর্ণনা অনুযায়ী এই কাজ হযরত হারুন (আঃ)—এর নির্দেশে করা হয়েছিল। কোন কোন রেওয়াজে আছে, সামেরী তাদেরকে প্ররোচিত করে অলংকারপাতি গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে দেয়। এখানে উভয় কারণে সমাবেশ হওয়াও অবান্তর নয়।

فَتَذَكَّرُكَ الْقَى السَّيِّئِينَ—হাদীসে কুত্নে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়াজে থেকে জানা যায় যে, হারুন (আঃ) সব অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করিয়ে আশুন লাগিয়ে দেন, যাতে সবগুলো গলে এক অবয়বে পরিণত হয় এবং মুসা (আঃ)—এর ক্রি়ে আসার পর এ সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা যায়। সবাই যখন নিজ নিজ অলংকার গর্তে নিক্ষেপ করে দিল, তখন সামেরীও হাতের মুঠি বদ্ধ করে সেখানে পৌছল এবং হারুন (আঃ)—কে জিজ্ঞেস করল : আমিও নিক্ষেপ করব? হারুন (আঃ) মনে করলেন যে, তার হাতেও কোন অলংকার আছে, তাই তিনি নিক্ষেপ

করার আদেশ দিয়ে দিলেন। তখন সামেরী হারুন (আঃ)—কে বলল : আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক—আপনি আমার জন্যে এই মর্মে দোয়া করলেই আমি নিক্ষেপ করব—নতুবা নয়। তার কপটতা ও কুফর হারুন (আঃ)—এর জানা ছিল না। তিনি দোয়া করলেন। তখন সে হাত থেকে যা নিক্ষেপ করল, তা অলংকারের পরিবর্তে মাটি ছিল। সে এই মাটি জিবরাঈল ফেরেশতার ঘোড়ার পায়ে নীচে থেকে সংগ্রহ করেছিল। কারণ, একদা সে এই বিষায়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যে মাটিকে জিবরাঈলের ঘোড়ার পা স্পর্শ করে, সেখানেই সজীবতা ও জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে সে বুঝে নিয়েছিল যে, এই মাটিতে জীবনের স্পন্দন নিহিত আছে। শয়তানের প্ররোচনায় সে এই মাটির দ্বারা একটি জীবিত গো-বৎস তৈরী করতে উদ্যত হল। মোটকথা, এই মাটির নিজস্ব প্রতিক্রিয়া হোক কিংবা হারুন (আঃ)—এর দোয়ার বরকতে হোক—অলংকারাদির গলিত স্রুপ এই মাটি নিক্ষেপের এবং হারুন (আঃ)—এর দোয়া করার সাথে সাথেই একটি জীবিত গো-বৎসে পরিণত হয়ে আওয়াজ করতে লাগল। যে রেওয়াজেতে রয়েছে যে, সামেরীই বনী-ইসরাঈলকে অলংকারাদি গর্তে নিক্ষেপ করতে প্ররোচিত করেছিল, তাতে এ কথাও উল্লিখিত হয়েছে যে, সে অলংকারাদি গলিয়ে একটি গো-বৎসের মূর্তি তৈরী করে নিয়েছিল, কিন্তু তাতে প্রাণ ছিল না। উপরোক্ত মাটি নিক্ষেপের পর তাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এসব রেওয়াজেতে কুবতুবি ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসরাঈলী রেওয়াজেতে বিষয় এগুলো বিশৃঙ্খল করা যায় না। তবে এগুলোকে মিথ্যা বলারও কোন প্রমাণ নেই।

فَأَنزَلُوهُمْ غَزَا جَسَدًا لَّهُمْ خَوَازِ—অর্থাৎ, সামেরী এসব অলংকার দ্বারা একটি গো-বৎস অবয়ব তৈরী করে নিল, তাতে গরুর আওয়াজ ছিল। **جَسَدًا** (অবয়ব) শব্দ দুটি কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, এটা অবয়ব ও দেহ ছিল—তাতে প্রাণ ছিল না। তবে বিশেষ এক কারণে তা থেকে আওয়াজ বের হচ্ছিল। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তি প্রথমই বর্ণিত হয়েছে যে, তাতে প্রাণ ছিল।

فَقَاتِلْهُمْ هَٰذَا لَكُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ—অর্থাৎ, আওয়াজের গো-বৎস দেখে সামেরী ও তার সঙ্গীরা অন্যদেরকে বলল : এটা তোমাদের এবং মুসার খোদা। কিন্তু মুসা বিভ্রান্ত হয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। এ পর্যন্ত বনী-ইসরাঈলের অসার গুণের বর্ণিত হল। মুসা (আঃ)—এর ক্রোশ দেখে তারা এই গুণের পেশ করেছিল। এরপর :

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ إِلَهُهُمُ قَوْلُهُ وَوَلَّيْنَاكَ اللَّهُمَّ قَوْلًا لَّنَا—বাক্য তাদের নিবুদ্ধিতা ও পঞ্চভট্টা বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাস্তবে যদি একটি গো-বৎস জীবিত হয়ে গরুর মত আওয়াজ করতে থাকে, তবে এই জ্ঞানপাপীদের একথা তো চিন্তা করা উচিত ছিল যে, এর সাথে খোদায়ীর কি সম্পর্ক? যে ক্ষেত্রে গো-বৎসটি তাদের কথার কোন জওয়াব দিতে পারে না এবং তাদের কোন উপকার অথবা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না, সে ক্ষেত্রে তাকে খোদা মেনে নেয়ার নিবুদ্ধিতার পেছনে কোন যুক্তি আছে কি?

مَا مَعَكُمْ إِذْ رَأَيْتُمُو صَالُوا الْأَشْيَافِينَ—এখানে অনুসরণের এক অর্থ তো তাই, মুসা (আঃ)—এর কাছে তুর পর্বতে চলে যাওয়া। কোন কোন তফসীরবিদ অনুসরণের এরূপ অর্থ করেছেন যে, তারা যখন পঞ্চভট্ট হয়ে গেল, তখন তুমি তাদের মোকাবেলা করলে না কেন? কেননা, আমার

উপস্থিতিতে এরূপ হলে আমি নিশ্চিতই তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ও যুদ্ধ করতাম। তোমারও এরূপ করা উচিত ছিল।

উভয় অর্থের দিক দিয়ে হারুন (আঃ)-এর বিরুদ্ধে মুসা (আঃ)-এর অভিযোগ ছিল এই যে, এহেন পঞ্চদশতায় হয় তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে, না হয় তাদের থেকে পৃথক হয়ে আমার কাছে চলে আসতে। তাদের সাথে সহ-অবস্থান মুসা (আঃ)-এর মতে ভ্রান্ত ও অন্যায় ছিল। হারুন (আঃ) এই কঠোর ব্যবহার সত্ত্বেও শিষ্টাচারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখে মুসা (আঃ)-কে নরম করার জন্য 'হে আমার জননী-তনয়' বলে সম্বোধন করলেন। এতে কঠোর ব্যবহার না করার প্রতি বিশেষ ইঙ্গিত ছিল। অর্থাৎ, আমি তো তোমার ভ্রাতা বৈ শত্রু নই। তাই আমার গুণের গুণে নাও। অতঃপর হারুন (আঃ) এরূপ গুণের বর্ণনা করলেন : আমি আশঙ্কা করলাম যে, তোমার ফিরে আসার পূর্বে যদি আমি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হই অথবা তাদেরকে ত্যাগ করে বার হাজার সঙ্গী নিয়ে তোমার কাছে চলে যাই, তবে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ দেখা দেবে। তুমি রওয়ানা হওয়ার সময় اَخْلَفْنِي فِي قَوْلِي وَاصْلِحْ বলে আমাকে সম্প্রচারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর পরিস্থিতিতে আমি তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেইনি। (কারণ, এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, তুমি ফিরে এলে তারা সবাই সত্য উপলব্ধি করবে এবং ঈমান ও তওহীদে ফিরে আসবে।) কোরআন পাকের অন্যত্র হারুন (আঃ)-এর গুণের মধ্যে এ কথাও রয়েছে : اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَفْسَفُوْا وَكَانُوْا مُخْتَلِفِيْنَ অর্থাৎ,

বনী-ইসরাঈল আমাকে শঙ্কিত ও দুর্বল মনে করেছে। কেননা, অন্যদের মোকাবেলায় আমার সঙ্গী-সাব্বী ছিল নগণ্য সংখ্যক। তাই তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ - (অর্থাৎ অন্যরা যা দেখেনি, আমি তা দেখেছি।) এখানে জিবরাঈল ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। তাঁকে দেখার ঘটনা সম্পর্কে এক রেওয়াজেই এই যে, যেদিন মুসা (আঃ)-এর মুজ্জেযায় ভূমধ্যসাগরে শুষ্ক রাস্তা হয়ে যায়, বনী-ইসরাঈল এই রাস্তা দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে যায় এবং ফেরাউনী সৈন্যবাহিনী সাগরে নিমজ্জিত হয়, সেদিন জিবরাঈল ষোড়ায় সওয়ার হয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় রেওয়াজেই এই যে, সাগর পাড়ি দেয়ার পর মুসা (আঃ)-কে ত্বর পর্বতে গমনের আদেশ শোনানোর জন্যে জিবরাঈল ষোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছিলেন। সামেরী তাঁকে দেখেছিল, অন্যেরা দেখেনি। ইবনে আব্বাসের এক রেওয়াজেই অনুযায়ী এর কারণ এই যে, সামেরী স্বয়ং জিবরাঈলের হাতে লালিত-পালিত হয়েছিল। তার জননী তাকে গর্ভে নিক্ষেপ করলে জিবরাঈল প্রত্যহ তাকে খাদ্য পৌছানোর জন্যে আগমন করতেন। ফলে সে জিবরাঈলের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ছিল। অন্যদের সাথে পরিচিত ছিল না।—(বয়ানুল-কোরআন)

فَقَبَّلْتُ فَكَفَّتْ مِنْ اٰمْرِ الرَّسُوْلِ - রসূল বলে এখানে আল্লাহ্ প্রেরিত জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। সামেরীর মনে শয়তান একথা জাগ্রত করে দেয় যে, জিবরাঈলের ষোড়ার পা যেখানে পড়ে, সেখানকার মাটিতে জীবনের বিশেষ প্রভাব থাকবে। তুমি এই মাটি তুলে নাও। সে পদচিহ্নের মাটি তুলে নিল। ইবনে-আব্বাসের রেওয়াজেই একথা বর্ণিত হয়েছে : সামেরীর মনে আপনা-আপনি জাগল যে, পদচিহ্নের মাটি যে বস্তুর উপর নিক্ষেপ করে বলা হবে যে, অমুক বস্তু হয়ে যা, তা তাই হয়ে

যাবে। কেউ কেউ বলেন : সামেরী ষোড়ার পদচিহ্নের এই প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিল যে, যেখানেই এর পা পড়ে, সেখানেই অনতিবিলম্বে সবুজ বনানী সৃষ্টি হয়ে যায়। এ থেকেই সে বুকে নেয় যে, এই মাটিতে জীবনের প্রভাব রয়েছে।—(কামালাইন) তফসীরে রুহুল মা'আনীতে এ তফসীরকেই সাহাবী, তাবেরী এবং বিশিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য তফসীরবিদদের থেকে বর্ণিত বলা হয়েছে, অতঃপর এর বিরুদ্ধে আছ-কালকার বাহাদুরীদের পক্ষ থেকে যেসব আশঙ্কি উত্থাপন করা হয়েছে, সেগুলো বশ্তন করা হয়েছে।—(বয়ানুল-কোরআন)

এরপর বনী-ইসরাঈলের জুগীকৃত অলঙ্কারাদি দ্বারা যখন সে একটি গো-বৎসের অবয়ব তৈরী করল, তখন নিজ বিশ্রাস অনুযায়ী এই মাটি গো-বৎসের ভেতরে নিক্ষেপ করল। আল্লাহ্‌র কৃদরতে তাতে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠল এবং গো-বৎসটি হাব্বার করতে লাগল। হাদীসে-ফুজুন বলা হয়েছে যে, সামেরী হারুন (আঃ)-কে বলেছিল : আমি মুঠির ভেতরের বস্ত্র নিক্ষেপ করব; কিন্তু শর্ত এই যে, আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্যে দোয়া করবেন। হারুন (আঃ) তার কপটিতা ও গো-বৎস পূজার বিষয়ে অবগত ছিলেন না, তাই দোয়া করলেন। সে পদচিহ্নের মাটি তাতে নিক্ষেপ করল। তখন হারুন (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে তাতে জীবনের চিহ্ন দেখা দিল। এক রেওয়াজেই বরাতে দিয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পারস্য অথবা ভারতবর্ষের অধিবাসী এই সামেরী গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। মিসরে পৌছে সে মুসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্রাস স্থাপন করে, অতঃপর ধর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা পূর্বেই কপটিতা করে বিশ্রাস স্থাপন করে, এরপর তার কপটিতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই বিশ্রাস প্রকাশের বদৌলতে সে বনী-ইসরাঈলের সাথে সামর পার হয়ে যায়।

وَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ لَا مَوْتَ لَا مَوْتًا - হয়রত মুসা

(আঃ) সামেরীর জন্যে পার্শ্ববর্তী জীবনে এই শাস্তি ঘাণ করবেন যে, সবাই তাকে বর্জন করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, কারণ গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবন এভাবেই সে বন্য জন্তুদের ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। সম্ভবতঃ এই শাস্তিটি একটি আইনের আকারে ছিল, যা পালন করা তার জন্যে এবং অন্যান্য বনী-ইসরাঈলীর জন্যে মুসা (আঃ)-এর তরফ থেকে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছিল। এটোও সম্ভবপর যে, আইনগত শাস্তির উর্ধ্বে স্বয়ং তার সন্তায় ষোড়ায়ী কৃদরতে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যদ্বন্ধন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না ; যেমন এক রেওয়াজেই রয়েছে, মুসা (আঃ)-এর বদ-দোয়ায় তার মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে অথবা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত।—(যা'আলেম) এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদ্‌বাস্তের মত ঘোরাকেরা করত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চাঁককার করে বলতঃ لَا مَوْتَ لَا مَوْتًا অর্থাৎ, আমাকে কেউ স্পর্শ করো না।

সামেরীর শাস্তির ব্যাপারে একটি রহস্য : রুহুল-মা'আনী গ্রন্থে বাহরে-মুহীতের বরাতে দিয়ে বর্ণিত হয়েছে, মুসা (আঃ) সামেরীকে হত্যা করার সংকল্প করেছিলেন ; কিন্তু তার বদান্যতা ও জনসেবার কারণে আল্লাহ্ তাআলা তাকে হত্যা করতে নিষেধ করে দেন। - (বয়ানুল-কোরআন)

طه

৩২

قال العز

لَمَّا كُنْتُمْ فِي الْوَدَّاعِ (অর্থাৎ, আমরা একে আগুনে পুড়িয়ে দেব।) এখানে প্রশ্ন

لَمَّا كُنْتُمْ فِي الْوَدَّاعِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا فَكُنْ لَكَ
نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ كُنْهَاتِ
ذِكْرِ اللَّهِ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ثَلَاثِينَ
فِي وَسْطِهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا كَذَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ فَاسْبُحْرُ
الْعُجْرَيْنِ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ فَكَيْفَ أَخَافَتُنَّ بِبَهْمِهِمْ لَنْ يَسْتَنْصِرُوا
عَشْرًا مَنْ أَعْلَمَ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ
لَيْسَتْ لَهُمُ الْأُمْنَاءُ فَذَكَّرْنَا عَنْ هِجْلٍ قُلْ نَسْفًا
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِصْيَانًا وَأَلَمْ تَعْلَمْ يَوْمَئِذٍ
يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ أَعْوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ
فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَاسْمَعُ الشَّعَاعَةَ إِنْ أَمِنْ أَذَنْ
لَهُ الرِّحْنُ وَرَفَعُوهُ قَوْلًا يَعْلَمُونَ مَا يَنْزِلُ أَيْدِيهِمْ وَخُلُقُهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَذِبُ الْوُجُوهِ لَئِنْ كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ
خَلَابٌ مِنْ حَمَلٍ ظَلَمًا لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَمُؤْمِنِينَ
فَلَا تُخَفُّ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا كَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَ
عَرَفْنَاهُ مِنْ الْأَوَّلِينَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْحَدٌ لَا يُدْرِكُهُ

(৯৮) তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সব বিষয় তাঁর জ্ঞানের পরিমিত। (৯৯) এমনভাবে আমি পূর্বে যা ঘটেছে, তার সংবাদ আপনাদের কাছে বর্ণনা করি। আমি আমার কাছ থেকে আপনাকে দান করেছি পড়ার গ্রন্থ। (১০০) যে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে কেয়ামতের দিন বোঝা বহন করবে। (১০১) তারা তাতে চিরকাল থাকবে এবং কেয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্যে মন্দ হবে। (১০২) যেদিন শিক্ষায় ফুৎকার দেয়া হবে, সে দিন আমি অপরীদেরকে সমবেত করব নীল চকু অবস্থায়। (১০৩) তারা চুপসারে পরস্পরে বলাবলি করবে : তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে। (১০৪) তারা কি বলে তা আমি ভালোভাবে জানি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত উত্তম পক্ষের অনুসারী সে বলবে : তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে। (১০৫) তারা আপনাকে পাহাড় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। অতএব, আপনি বলুন : আমার পালনকর্তা পাহাড়সমূহকে সমূলে উৎপাটন করে বিকিণ্ড করে দিবে। (১০৬) অতঃপর পৃথিবীকে মসৃণ সমতলভূমি করে ছাড়বেন। (১০৭) তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখবে না। (১০৮) সেই দিন তারা আহবানকারীর অনুসরণ করবে, যার কথা এদিক-সেদিক হবে না এবং দয়াময় আল্লাহর ভয়ে সব শব্দ ক্রীণ হয়ে যাবে। সুতরাং যদু ও গুলন ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে না। (১০৯) দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না। (১১০) তিনি জানেন যা কিছু তাদের সামনে ও পশ্চাতে আছে এবং তারা তাকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্ত করতে পারে না। (১১১) সেই চিরজীবী চিরস্থায়ীর সামনে সব মুখমণ্ডল অবনমিত হবে এবং সে ব্যর্থ হবে যে জুলুমের বোঝা বহন করবে। (১১২) যে ঈমানদার অবস্থায় সংকর্ম সম্পাদন করে, সে জুলুম ও ক্রতির আশঙ্কা করবে না। (১১৩) এমনভাবে আমি আরবী ভাষায় কোরআন নাখিল করেছি এবং এতে নানাভাবে সতর্কবাণী ব্যক্ত করেছি, যাতে তারা আল্লাহ্‌তীকর হয় অথবা তাদের অন্তরে চিন্তার খোরাক যোগায়।

হয় যে, এই গো-বৎসটি স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারাদি দ্বারা নির্মিত ছিল। এমতাবস্থায় একে আগুনে পোড়ানো হবে কিরূপে? কেননা, স্বর্ণ-রৌপ্য গলিত ধাতু—দগ্ধ হওয়ার নয়। উত্তর এই প্রথমতঃ এ বিষয়ে মতভেদ আছে যে, গো-বৎসের মধ্যে জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠার পরও তা স্বর্ণ-রৌপ্যই রয়ে গেছে, না এর স্বরূপ পরিবর্তিত হয়ে রক্তমাংসে সম্পন্ন হয়ে গেছে। রক্তমাংসের গো-বৎস হয়ে থাকলে তাকে পোড়ানোর অর্থ হবে জবাই করে পুড়িয়ে দেয়া এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের গো-বৎস হলে পোড়ানোর অর্থ হবে রেতি দ্বারা ঘসে ঘসে কণা করে দেয়া—(দুররে-মনসুর) অথবা কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পোড়ানো—(রাসুল-মা'আনী) অলৌকিকভাবে দগ্ধ করাও অবাস্তব নয়। - (বয়ানুল-কোরআন)

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ كُنْهَاتِ ذِكْرٍ - বিশিষ্ট তফসীরবিদদের সর্বসম্মত মতে এখানে ذکر বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে।

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا - অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কেয়ামতের দিন সে বিরাট পাপের বোঝা বহন করবে। কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বিভিন্নভাবে হতে পারে; যথা— কোরআন তেলাওয়াত না করা, কোরআন পাঠ শিক্ষা করার চেষ্টা না করা, কোরআন ভুল পাঠ করা, অক্ষরসমূহের উচ্চারণ শুদ্ধ না করা, শুদ্ধ পড়লেও উদাসীন হয়ে কিংবা অযত্নে পাঠ করা, জাগতিক অর্থ ও সম্পদ লাভের বাসনায় পাঠ করা। এমনভাবে কোরআনের বিধানাবলী বোঝার চেষ্টা না করাও কোরআন থেকে মুখ ফিরানোর শামিল। বোঝার পর তা আমলে না আনা কিংবা বিরুদ্ধাচরণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ের মুখ ফিরানো। মোটকথা, কোরআনের হকের প্রতি বেপরওয়া হওয়া খুব বড় গোনান্ন। কেয়ামতের দিন এই গোনান্ন ভারী বোঝা হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পিঠে চেপে বসবে। হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের মন্দ কর্ম ও গোনান্নকে কেয়ামতের দিন ভারী বোঝার আকারে পিঠে চাপানো হবে।

يُنْفَخُ الصُّورُ - হয়রত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন : জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল : صور (ছুর) কি? তিনি বললেন : শিক্ষা। এতে ফুৎকার দেয়া হবে। অর্থ এই যে, صور শিক্ষা এর মতই কোন বস্তু হবে। এতে ফেরেশতা ফুৎকার দিলে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তাআলাই জানেন।

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে: (সঃ)-কে বলা হয়েছে, আপনার নবুওয়তের

প্রমাণ ও আপনার উম্মতকে ইশিয়ার করার জন্যে আমি পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অবস্থা ও ঘটনাবলী আপনার কাছে বর্ণনা করি। তন্মধ্যে মুসা (আঃ)-এর বিস্তারিত ঘটনা এই আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এসব কাহিনীর মধ্যে সর্বপ্রথম ও কোন কোন দিক দিয়ে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হযরত আদম (আঃ)-এর কাহিনী। এখান থেকে এই কাহিনী শুরু করা হয়েছে। এতে উম্মতে মুহাম্মদীকে ইশিয়ার করা উদ্দেশ্য যে, শয়তান মানব জাতির আদি শত্রু। সে সর্বপ্রথম তোমাদের আদি পিতা-মাতার সাথে শত্রুতা সাধন করেছে এবং নানা রকমের কৌশল, বাহানা ও শুভেচ্ছামূলক পরামর্শের জাল বিস্তার করে তাদেরকে পদস্খলিত করে দিয়েছে। এর ফলেই তাদের উদ্দেশ্যে জান্নাত থেকে মর্ত্যে অবতরণের নির্দেশ জারী হয় এবং জান্নাতের পোশাক ছিনিয়ে নেয়া হয়। এরপর আল্লাহ তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ভুলের ক্ষমা পেয়ে তিনি রেসালত ও নবুওয়তের উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্ত হন। তাই শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে মানব মাত্রেই নিশ্চিত হওয়া উচিত নয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারে শয়তানী প্ররোচনা ও অপকৌশল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ نَدْوَىٰ وَلَمْ جِدْ لَهُ عَزْمًا

এখানে (বাহুরে মুহীত) উদ্দেশ্য এই যে, এই ঘটনা সম্পর্কে আপনার অনেক পূর্বে আদম (আঃ)-কে তাকিদ সহকারে একটি নির্দেশ দিয়েছিলাম। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলেছিলাম যে, এই বৃক্ষের ফল-ফুল অবধা কোন অংশ আহার করা না, এমন কি এর নিকটেও যেয়ো না। এছাড়া জান্নাতের সব বাগ-বাগিচা ও নেয়ামত তোমাদের জন্যে অব্যাহত। সেগুলো ব্যবহার কর। আরও বলেছিলাম যে, ইবলীস তোমাদের শত্রু। তার কুমন্ত্রণা মেনে নিলে তোমাদের বিপদ হবে। কিন্তু আদম (আঃ) এসব কথা ভুল গেলেন। আমি তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা পাইনি। এখানে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, نسيان ও نسيان লক্ষণীয় শব্দের অর্থ ভুলে যাওয়া, অনবধান হওয়া এবং عزم-এর শাব্দিক অর্থ কোন কাজের জন্যে সংকল্পকে দৃঢ় করা। এ শব্দদ্বয় দ্বারা এখানে কি বোঝানো হয়েছে, তা হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বে একথা জেনে নেয়া জরুরী যে, আদম (আঃ) আল্লাহ তাআলার প্রভাবশালী পয়গম্বরগণের অন্যতম ছিলেন এবং সব পয়গম্বর গোনাহ থেকে পবিত্র থাকেন।

প্রথম শব্দে বলা হয়েছে যে, আদম (আঃ) ভুলে লিপ্ত হয়ে পড়েন। ভুলে যাওয়া মানুষের ইচ্ছাধীন কাজ নয়। তাই একে পাপই গণ্য করা হয়নি। একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে: رَفَعَ عَنْ أَمْتِي الْخَطَا وَالنَّسْيَانَ অর্থাৎ, আমার উম্মতের ভুলবশতঃ গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে।

আদম (আঃ)-এর এই ঘটনা প্রথমতঃ নবুওয়ত ও রেসালতের পূর্বকার। এই অবস্থায় পয়গম্বরগণের কাছ থেকে গোনাহ প্রকাশ্য পাওয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জমাআতের কতক আলোমের মতে নিশাপ হওয়ার পরিপন্থী নয়। দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভুল, যা গোনাহ নয়।

فَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ رَدِّنِي عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ نَدْوَىٰ وَلَمْ جِدْ لَهُ عَزْمًا ۚ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ اسْجُدْ وَالسُّجُودَ فَسَجَدَ إِلَّا الْإِبْلِيسَ ۚ قَالَ أَأَنَا الْإِبْلِيسُ أَمْ أَنَا الْإِنْسَانُ ۚ قَالَ لَا أَتُخَوِّفُكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ۚ فَتَكُونَا مِنَ الْكَافِرِينَ ۚ فَتَنَوَّىٰ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمَلَكَ الْمَلِكِ ۚ فَأَكَلَا مِنْهَا فَمَنْ دَتَا لَهَا سَاوَاهُمَا ۚ وَطَفَفَا يَخِصْفُنْ عَلَيْهِمَا مِنْ رَزَقِ الْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ ۚ فَغَوَىٰ ۚ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۚ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَأَمَّا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ هَدْيِي فَمِنْ آيَاتِهِ هَذَا ۚ قُلْ رَبِّ ارْحَمْنِي ۚ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ۚ وَنَحْشُرْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ ۚ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۚ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَهَا ۚ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ يَنْسَىٰ

(১১৪) সত্যিকার অধীশুর আল্লাহ মহান। আপনার প্রতি আল্লাহর ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে আপনি কোরআন গ্রন্থের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না এবং বলুন : হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (১১৫) আমি ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে দৃঢ়তা পাইনি। (১১৬) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম : তোমরা আদমকে সেজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সেজদা করল। সে অমান্য করল। (১১৭) অতঃপর আমি বললাম : হে আদম, এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন বের করে না দেয় তোমাদের জান্নাত থেকে। তাহলে তোমরা কষ্টে পতিত হবে। (১১৮) তোমাকে এই দেয়া হল যে, তুমি এতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং বস্ত্রহীন হবে না। (১১৯) এবং তোমার পিণ্ডাসও হবে না এবং রৌদ্রেও কষ্ট পাবে না। (১২০) অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলল : হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্তকাল জীবিত থাকার ক্ষমতা কথায় এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা? (১২১) অতঃপর তারা উভয়েই এর ফল ভক্ষণ করল, তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। (১২২) এরপর তার পালনকর্তা তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাকে সুপাশে আনয়ন করলেন। (১২৩) তিনি বললেন : তোমরা উভয়েই এখান থেকে এক সঙ্গে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না। (১২৪) এবং যে আমার সুরক্ষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সঙ্কীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উদ্ভিত করব। (১২৫) সে বলবে : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উদ্ভিত করলেন? আমি তো চক্ষুশাল ছিলাম। (১২৬) আল্লাহ বলবেন : এমনভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব।

কিন্তু আদম (আঃ)—এর উচ্চ মর্তব্য ও নৈকট্যের পরিপ্রেক্ষিতে একেও তাঁর জন্যে গোনাহ্ সাব্যস্ত করা হয়েছে। ফলে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ভর্ৎসনা করেন এবং সতর্ক করার জন্যে এই ভুলকে عَصِيَان (অবাধ্যতা) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

দ্বিতীয় عَزَم শব্দ ব্যবহার করে আয়াতে বলা হয়েছে, আদম (আঃ)—এর মধ্যে عَزَم তথা সংকল্পের দৃঢ়তা পাওয়া যায়নি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর অর্থ কোন কাজে দৃঢ়সংকল্প হওয়া। আদম (আঃ) খোদায়ী নির্দেশ পালন করার পূরাপূরি সিদ্ধান্ত ও সংকল্প করে রেখেছিলেন, কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় এই সংকল্পের দৃঢ়তা ক্ষুণ্ণ হয় এবং ভুল তাঁকে বিচ্যুত করে দেয়।

وَلَقَدْ كَلَّمْنَاكَ - আল্লাহ্ তাআলা আদম (আঃ)—এর কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এটা তারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এতে আদম সৃষ্টির পর সব ফেরেশতাকে আদমের উদ্দেশ্যে সেজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ইবলীসও এই নির্দেশের আওতাভুক্ত ছিল। কেননা, তখন পর্যন্ত ইবলীস জন্মাতের ফেরেশতাদের সাথে একত্রে বাস করত। ফেরেশতারা সবাই সেজদা করল, কিন্তু ইবলীস অঙ্গীকার করল। অন্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এর কারণ ছিল অহংকার। সে বলল : আমি অগ্নিনির্মিত আর সে মৃত্তিকানির্মিত। অগ্নি মাটির তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমি কিরূপে তাকে সেজদা করব? এ কারণে ইবলীস অভিশপ্ত হয়ে জন্মাত থেকে বহিস্কৃত হল। পক্ষান্তরে আদম ও হাওয়ার জন্যে জন্মাতের সব বাগ-বাগিচা ও অক্ষুণ্ণ নেয়ামতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হল। সবকিছু ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে শুধু একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষ সম্পর্কে বলা হল যে, একে (অর্থাৎ, এর ফল-ফুল ইত্যাদিকে) আহ্বার করো না এবং এর কাছও যেয়ো না। সূরা বাক্বারা ও সূরা আ'রাফে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এখানে তা উল্লেখ না করে শুধু অঙ্গীকার সংরক্ষিত রাখা ও তাতে অটল থাকা সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার বাণী বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আদমকে বললেন : দেখ, সেজদার ঘটনা থেকে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইবলীস তোমাদের (অর্থাৎ, আদম ও হাওয়ার) শত্রু। যেন অপকৌশল ও ষোকার মাধ্যমে তোমাদেরকে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। এরূপ করলে এর পরিণতিতে তোমরা জন্মাত থেকে বহিস্কৃত হবে।

وَلَقَدْ كَلَّمْنَاكَ - অর্থাৎ, শয়তান যেন তোমাদেরকে জন্মাত থেকে বের করে না দেয়। ফলে, তোমরা বিপদে ও কষ্টে পড়ে যাবে। تَشْقَى শব্দটি থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দুবিধ—প্রথমটি পারলৌকিক কষ্ট অপরটি হল ইহলৌকিক কষ্ট। অর্থাৎ, দৈহিক কষ্ট ও বিপদ। এখানে দ্বিতীয় অর্থই হতে পারে। কেননা, প্রথম অর্থে কোন পয়গম্বুর দূরের কথা, কোন সংকর্মপরায়ণ মুসলমানের জন্যেও এই শব্দ প্রয়োগ করা যায় না। তাই ফাররা (রহঃ)—এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন : وَان يَأْكُلَ مِنْ كَدِّ يَدَيْهِ - অর্থাৎ, এখানে شَقَاوَت এর অর্থ হাতে খেতে আহ্বার উপার্জন করা। - (কুরত্বী) এখানে স্থানের ইঙ্গিতও দ্বিতীয় অর্থের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। কেননা, পরবর্তী আয়াতে জন্মাতের এমন চারটি নেয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক মানুষের জীবনের স্তম্ভবিশেষ এবং জীবনধারণে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ—অন্ন, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব নেয়ামত জন্মাতে পরিশ্রম ও উপার্জন ছাড়াই পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখান থেকে বহিস্কৃত হলে এসব নেয়ামতও হাতছাড়া হয়ে যাবে। সম্ভবতঃ এই ইঙ্গিতের কারণেই এখানে জন্মাতের বড় বড় নেয়ামতের উল্লেখ না করে

শুধু এমন সব নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর উপর মানবজীবন নির্ভরশীল। এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, শয়তানের কুমন্ত্রণা মেনে নিয়ে তোমরা যেন জন্মাত থেকে বহিস্কৃত না হও এবং এসব নেয়ামত যেন হাতছাড়া না হয়ে যায়। এরূপ হলে পৃথিবীতে এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করতে হবে। তফসীরবিদদের সর্বসম্মত বর্ণনা অনুযায়ী এ হচ্ছে تَشْقَى শব্দের মর্ম। ইমাম কুরত্বী এখানে আরও উল্লেখ করেছেন যে, আদম (আঃ) যখন পৃথিবীতে অবতরণ করলেন, তখন জিবরাঈল জন্মাত থেকে কিছু গম, চাউল ইত্যাদির বীজ এনে মাটিতে চাষ করার জন্যে দিলেন এবং বললেন : যখন এগুলোর চারা গজাবে এবং দানা উৎপন্ন হবে, তখন এগুলো কর্তন করুন এবং পিষে রুটি তৈরী করুন। জিবরাঈল এসব কাজের পদ্ধতিও আদম (আঃ)—কে শিখিয়ে দিলেন। সেমতে আদম (আঃ) রুটি তৈরী করে খেতে বসলেন। কিন্তু হাত থেকে রুটি খসে গিয়ে পাহাড়ের নীচে গড়িয়ে গেল। আদম (আঃ) অনেক পরিশ্রমের পর রুটি কুড়িয়ে আনলেন। তখন জিবরাঈল বললেন : হে আদম, আপনার এবং আপনার সন্তান-সন্ততির রিযিক পৃথিবীতে এমনি পরিশ্রম ও কষ্ট সহকারে অর্জিত হবে।

স্ত্রীর জরুরী ভরণ-পোষণ করা স্বামীর দায়িত্ব : আয়াতের শুরুতে আল্লাহ্ তাআলা আদম (আঃ)—এর সাথে হাওয়ারকেও সম্মোদন করে বলেছেন :

عَذُوْكَ وَوَعْدُكَ فَلَا يَغْوِيْكَ مِنَ الْجَنَّةِ - শয়তান তোমারও শত্রু এবং তোমার স্ত্রীরও শত্রু। কাজেই সে যেন তোমাদের উভয়কে জন্মাত থেকে বহিস্কার করে না দেয়। কিন্তু আয়াতের শেষে تَشْقَى একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। এতে স্ত্রীকে শরীক করা হয়নি। নতুবা স্থানের চাহিদা অনুযায়ী نَفْسِيْهَا বলা হত। কুরত্বী এ থেকে মাসআলা বের করেছেন যে, স্ত্রীর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঞ্জ্রহ করা স্বামীর দায়িত্ব। এসব সামগ্রী উপার্জন করতে গিয়ে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়, তা এককভাবে স্বামী করবে। একারণেই تَشْقَى একবচনের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে অবতরণের পর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উপার্জন করতে যে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে হবে, তা আদম (আঃ)—কেই করতে হবে। কেননা, হাওয়ার ভরণ-পোষণ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঞ্জ্রহ করা তাঁর দায়িত্ব।

মাত্র চারটি বস্তু জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মধ্যে পড়ে : কুরত্বী বলেন : এ আমাদেরকে আরও শিক্ষা দিয়েছে যে, স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর যিম্মায় ওয়াজিব, তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ—আহার, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশী কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ—অপরিসীম নয়। এ থেকেই আরও জানা গেল যে, স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কারও ভরণ-পোষণ শরীয়ত কোন ব্যক্তির দায়িত্বে ন্যস্ত করেছে, তাতেও উপরোক্ত চারটি বস্তুই তার দায়িত্বে ওয়াজিব হবে ; যেমন— পিতা-মাতা অভাবগ্রস্ত ও অপারগ হলে তাঁদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সন্তানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফেকাহ গ্রন্থসমূহে এসম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখিত রয়েছে।

إِنَّ لَكَ الْأَحْزَابَ وَفِيْهَا وَلَا تَعْرَى - জীবনধারণের প্রয়োজনীয় এই চারটি মৌলিক বস্তু জন্মাতে চাওয়া ও পরিশ্রম ছাড়াই পাওয়া যায়। জন্মাতে ক্ষুধা লাগে না—এতে সন্দেহ হতে পারে যে, যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগে, ততক্ষণ তো খাদ্যের স্বাদও পাওয়া যায় না। এমনিভাবে পিপাসার্ত

না হওয়া পর্যন্ত কেউ মিঠা পানির স্বাদ অনুভব করতে পারে না। এই সন্দেহের উত্তর এই যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্নাতে ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্টভোগ করতে হবে না; বরং ক্ষুধা লাগলে খাদ্য পাওয়া যাবে এবং পিপাসা হলে পানীয় পাওয়া যাবে—এতে বিলম্ব হবে না। এছাড়া জান্নাতী ব্যক্তির মন যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা পাবে।

وَعَصَى الْمَرْكُوبَى قَوًى فَتَوَسَّسَ الْيَهُودُ السِّتْرَ

এই আয়াতে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ তাআলা যখন আদম (আঃ) ও হাওয়াকে নির্দিষ্ট বৃক্ষের ফল-ফুল আহার করতে ও তার নিকটবর্তী হতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং ইশিয়ারণ করে দিয়েছিলেন যে, ইবলীস তোমাদের উভয়ের দূশমন, তার ছলনা থেকে বেঁচে থাকবে, যেন তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিস্কৃত করে না দেয়, তখন এতটুকু সুস্পষ্ট নির্দেশের পরও এই মহান পয়গম্বর শয়তানের ষোকা বুঝতে পারলেন না কেন? এটা তো প্রকাশ্য অব্যাহতা ও গোনাহ। আল্লাহর নবী ও রসুল হয়ে তিনি এই গোনাহ কিরূপে করলেন? অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ আলোমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পয়গম্বরগণ প্রত্যেক ছোট-বড় গোনাহ থেকেই পবিত্র থাকেন। এসব প্রশ্নের জওয়াব সূরা বাক্বারার তফসীরে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, সেখানে দ্রষ্টব্য। এ আয়াতে আদম (আঃ) সম্পর্কে প্রথমে عَصَى ও পরে غَوًى বলা হয়েছে। এর কারণও সূরা বাক্বারায় উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শরীয়তের আইনে আদম (আঃ)—এর এই কর্ম গোনাহ ছিল না, কিন্তু তিনি যেহেতু আল্লাহর নবী ও বিশেষ নৈকট্যশীল ছিলেন, তাই তাঁর সামান্য ভ্রান্তিকো ও গুরুতর ভাষায় অব্যাহতা বলে ব্যক্ত করতঃ সতর্ক করা হয়েছে। غَوًى শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে যাওয়া এবং (দুই) পথভ্রষ্ট অথবা গাফেল হওয়া। কুশায়রী, কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ এস্থলে প্রথম অর্থই অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ, আদম (আঃ) জান্নাতে যে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছিলেন, তা বাকী রইল না এবং তাঁর জীবন তিক্ত হয়ে গেল।

পয়গম্বরগণের সম্পর্কে একটি জরুরী নির্দেশ : তাঁদের সম্মানের হেফাজতঃ কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী ‘আহকামুল কোরআন’ গ্রন্থে عَصَى ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। উক্তিতে তাঁর ভাষায় এইঃ

لا يجوز لاحدنا اليوم ان يخبر بذلك عن ادم الا اذا ذكرناه فسى
اثاء قوله تعالى عنه اوقول نبهه فاما ان يبتدى ذلك من قبل
نفسه فليس بجائر لنافى ابائنا الاذنين الينا المائلين لنا فكيف
فى ابينا الاقوم الاعظم الاكرم النبى المقدم الذى عذره الله سبحانه
وتعالى وتاب عليه وغفرله-

“আজ আমাদের কারও জন্যে আদম (আঃ)—কে অব্যাহতা বলা জায়েয নয়, তবে কোরআনের কোন আয়াতে অথবা হাদীসে এরূপ বলা হলে তা বর্ণনা করা জায়েয। কিন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে নিকটতম পিতৃপুরুষদের জন্যেও এরূপ শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যিনি আমাদের আদি পিতা, সবদিক দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষদের চাইতে অগ্রগণ্য, সম্মানিত ও মহান, আল্লাহ তাআলার সম্মানিত পয়গম্বর, আল্লাহ হার তওবা কবুল করেছেন এবং ক্ষমা ঘোষণা করেছেন, তাঁর জন্যে কোন অবস্থাতেই এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা জায়েয নয়।”

এ কারণেই কুশায়রী আবু নছর বলেন : কোরআনে ব্যবহৃত এই শব্দের কারণে আদম (আঃ)—কে গোনাহগার, পথভ্রষ্ট বলা জায়েয নয়।

কোরআন পাকের যেখানেই কোন নবী অথবা রসুল সম্পর্কে এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, সেখানেই হয় উত্তমের বিপরীত বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে, না হয় নবুওয়ত-পূর্ববর্তী বিষয়াদি বোঝানো হয়েছে। তাই কোরআনী আয়াত ও হাদীসের রেওয়াজে প্রসঙ্গে তো এসব বিষয় বর্ণনা করা জায়েয, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তাঁদের সম্পর্কে এরূপ ভাষা ব্যবহার করার অনুমতি নেই।—(কুরতুবী)

أَهْبَطَ مِنْهَا خَبِيرًا - অর্থাৎ, জান্নাত থেকে নেমে যাও উভয়েই। এই

সম্বোধন আদম ও ইবলীস উভয়কেও হতে পারে। এমতাবস্থায় بَقِيَّةُ -এর অর্থ সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে পৌছেও শয়তানের শত্রুতা অব্যাহত থাকবে। যদি বলা হয় যে, শয়তানকে তো এর পূর্বেই জান্নাত থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল, কাজেই এই সম্বোধনে তাকে শরীক করা আবাস্তর; তাহলে এটা হতে পারে যে, এখানে আদম ও হাওয়াকে সম্বোধন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় পারস্পরিক শত্রুতার অর্থ হবে— তাদের সন্তান-সন্ততির পারস্পরিক শত্রুতা। বলাবাহুল্য, সন্তানদের পারস্পরিক শত্রুতা পিতা-মাতার জীবনকেও দুর্বিসহ করে তোলে।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي - এখানে যিকর—এর অর্থ কোরআনও হতে

পারে এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর মোবারক সত্তাও হতে পারে, যেমন—
অন্য আয়াতে وَكَرَّ السُّورُكَ বলা হয়েছে। উভয় অর্থের সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি কোরআন অথবা রসুলের প্রতি বিমুখ হয়, অর্থাৎ, কোরআনের তোলাওয়াত ও বিধি-বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে অথবা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; তার পরিণাম এই : إِنَّ لَهُ

مُؤَبَّهَةً مِّنْكَ وَنَحْنُ نَوْمُ الْقِيَمَةِ أَعْنَى - অর্থাৎ, তার জীবিকা

সংকীর্ণ হবে এবং কেয়ামতে তাকে অন্ধ অবস্থায় উথিত করা হবে। প্রথমোক্ত শাস্তিটি সে দুনিয়াতে পেয়ে যাবে এবং শেষোক্ত আযাব কেয়ামতে হবে।

কাফের ও পাপাচারীর জীবন দুনিয়াতে তিক্ত ও সংকীর্ণ হওয়ার স্বরূপ : এখানে প্রশ্ন হয় যে, দুনিয়াতে জীবিকার সংকীর্ণতা তো কাফের ও পাপাচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; মুমিন ও সংকম্পরায়ণগণও এর সম্মুখীন হন; বরং পয়গম্বরগণ এই পার্থিব জীবনে সর্বাধিক কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করে থাকেন। সহীহ বোখারী ও অন্যান্য সব হাদীস গ্রন্থে সা’দ প্রমুখের রেওয়াজে বর্ণিত আছে যে, রসুলে করীম (সাঃ) বলেন : পয়গম্বরগণের প্রতি দুনিয়ার বাল্য-মুশীবত সবচাইতে বেশী কঠিন হয়। তাঁদের পর যে ব্যক্তি যে স্তরের সংকম্পরায়ণ ও গুলী হয়, সেই অনুযায়ী সে এসব কষ্ট ভোগ করে। এর বিপরীতে সাধারণতঃ কাফের ও পাপাচারীদেরকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশে দেখা যায়। অতএব জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত কোরআনের এই উক্তি পরকালের জন্যে হতে পারে, দুনিয়ার অভিজ্ঞতা এর বিপরীত মনে হয়।

এর পরিষ্কার ও নির্মল জওয়াব এই যে, এখানে দুনিয়ার আযাব বলে কবরের আযাব বোঝানো হয়েছে। কবরে তাদের জীবন দুর্বিসহ করে দেয়া হবে। তাদের বাসস্থান কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপ দেবে যে, তাদের পাজর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। মুসনাদে বাযযারে হযরত আবু হুরায়রার রেওয়াজে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং مَوْجِبُهُ مِّنْكَ -এর তফসীরে বলেছেন যে, এখানে কবর জগত বোঝানো হয়েছে।—(মাযহারী)

وَكَذَلِكَ نَحْيِي مَنْ آسَرَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ
الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأُنْفًى ۝ أَكْثَرُ يُهْدِي لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ
الْقُرُونِ يَشْعُرُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ۝
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزُلَمَاءَ وَاجِلٍ مِّنْهُ ۝
فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ الْيَلِ الْيَلِ فَسَبِّحْهُ وَآطْرَافَ النَّهَارِ
لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝ وَلَئِن كُنْتَ إِلَّا إِلَهَ مَعْنَاهُ أَزْوَاجًا
فَإِنَّهُمْ زَعْمَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَيَفْتِنَهُمْ قَوْلُكَ وَرَبُّكَ رَازٍ
خَيْرٌ وَأُنْفًى ۝ وَأَمَّا أَرْهَافُكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطِرْ عَلَيْهَا لَا
تَسْلُكُ رِزْقًا تَحْنُ نَزْوُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝ وَقَالُوا
لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَاتٌ مِّنَ الصُّحُفِ
الْأُولَىٰ ۝ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا
رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعِ الْبَيِّنَاتِ مِنْ قَبْلِ
أَنْ نُّذِلَّ وَنَحْيَىٰ ۝ قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ۝

(১২৭) এমনিভাবে আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালঙ্ঘন করে এবং পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে। আর পরকালের শাস্তি কঠোরতর এবং অনেক স্থায়ী। (১২৮) আমি এদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। যাদের বাসভূমিতে এরা বিচরণ করে, এটা কি এদেরকে সংপথ প্রদর্শন করল না? নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১২৯) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং একটি কাল নির্দিষ্ট না থাকলে শাস্তি অবশ্যজারী হয়ে যেত। (১৩০) সুতরাং এরা যা বলে সে বিষয়ে ঈর্ষ-ধারণ করুন এবং আপনার পালনকর্তার স্পষ্টপন্থে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন রাত্রির কিছু অংশ ও দিবাভাগে, সম্ভবতঃ তাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন। (১৩১) আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্যে পার্শ্ববর্তীদের সৌন্দর্যধরণ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেয়া রিযিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (১৩২) আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাই না। আমিই আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহ্‌তীকরতার পরিণাম শুভ। (১৩৩) এরা বলে : সে আমাদের কাছে তার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন নিদর্শন আনয়ন করে না কেন? তাদের কাছে কি প্রমাণ আসেনি যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে আছে? (১৩৪) যদি আমি এদেরকে ইতিপূর্বে কোন শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম, তবে এরা বলত : হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি আমাদের কাছে একজন রসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে তো আমরা অপমানিত ও হেয় হওয়ার পূর্বেই আপনার নিদর্শনসমূহ মনে চলতাম। (১৩৫) বলুন, প্রত্যেকেই পথপানে চলে আছে, সুতরাং তোমরাও পথপানে চলে থাক। অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জানতে পারবে কে সরল পথের পথিক এবং কে সংপথ প্রাপ্ত হয়েছে।

হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়র জীবিকার সংকীর্ণতার অর্থ এরূপও বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কাছ থেকে অল্পে তুষ্টির গুণ ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং সাংসারিক লোভ-লালসা বাড়িয়ে দেয়া হবে - (মাযহারী) এর ফলে তাদের কাছে যত অর্থ-সম্পদই সম্ভিত হোক না কেন, আন্তরিক শান্তি তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সদাসর্বদা সম্পদ বৃদ্ধি করার চিন্তা এবং ক্ষতির আশঙ্কা তাদেরকে অস্থির করে রাখবে। সাধারণ ধনীদেব মধ্যে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ ও সুবিদিত। ফলে তাদের কাছে সুখ-সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সম্ভিত হয়; কিন্তু সুখ যাকে বলে, তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। কারণ, এটা অন্তরের স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দে ھدى - ضمير এর فاعل ক্রিয়াদেব ھدى - أَكْثَرُ يُهْدِي لَهُمْ দিকে ফিরে, যা এর মধ্যেই আছে এবং ھدى দ্বারা কোরআন অথবা রসূল বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআন অথবা রসূলুল্লাহ (সাঃ) কি মক্কাবাসীদেরকে এই হেদায়েত দেননি এবং এ সম্পর্কে জ্ঞাত করেননি যে, তোমাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায় ও দল নাক্ষরমানীর কারণে আল্লাহর আযাবে গ্রন্থকতার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, যাদের বাসভূমিতে এখন তোমরা চলাফেরা কর। এখানে فاعل এর ضمير আল্লাহর দিকে ফেরারও সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দেননি।

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ - মক্কাবাসীরা ঈমান থেকে গা বাঁচানোর জন্যে

নানারকম বাহানা খুঁজত এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শানে অশালীন কথাবার্তা বলত। কেউ জাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলত। কোরআন পাক এখানে তাদের এসব যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তার দু'টি প্রতিকার বর্ণনা করেছে। (এক) আপনি তাদের কথাবার্তার প্রতি আক্ষেপ করবেন না; বরং সবর করবেন। (দুই) আল্লাহর এবাদতে মশগুল হয়ে যান। -بِأَعْيُنِنَا ۝ وَاصْبِرْ بِرَبِّكَ- বাক্যে একথা বলা হয়েছে।

শব্দেব নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার ঈর্ষধারণ এবং আল্লাহর স্মরণে মশগুল হওয়া : এ জগতে ছোট-বড়, ভাল-মন্দ কোন মানুষ শত্রুমুক্ত নয়। প্রত্যেকের কোন না কোন শত্রু রয়েছে। শত্রু যতই নগণ্য ও দুর্বল হোক না কেন, প্রতিপক্ষের কোন না কোন ক্ষতি করেই ছাড়ে, যদিও তা মৌখিক গালি-গালাজই হয়। সম্মুখে গালি-গালাজ করার হিম্মত না থাকলে পশ্চাতেই করে। তাই শত্রুর অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা প্রত্যেকেই করে। কোরআন পাক দু'টি বিষয়ের সমষ্টিতে এর চমৎকার ও অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র হিসেবে বর্ণনা করেছে। (এক) সবর ; অর্থাৎ, স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত না হওয়া। (দুই) আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও এবাদতে মশগুল হওয়া। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, একমাত্র এই ব্যবস্থাপত্র দ্বারাই এসব অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে। অন্যথায় যে প্রতিশোধ গ্রহণের চিন্তায় ব্যাপৃত হয়, সে যতই শক্তিশালী, বিরাট ও প্রভাবশালী হোক না কেন, সে প্রায় ক্ষেত্রেই শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না এবং প্রতিশোধের চিন্তা তার জন্যে একটি আলাদা আযাবে পরিণত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং মনে মনে ধ্যান করে যে, এ জগতে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারও কোন

রকম ক্ষতি অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং আল্লাহর সব কাজ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল হয়ে থাকে, তাই যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, এতে অবশ্যই কোন না কোন রহস্য আছে; তখন শত্রুর অনিষ্টপ্রসূত ক্রোধ ও ক্ষোভ আপন-আপনি উধাও হয়ে যায়। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **لَمَّا كَرِهَ اللَّهُ لَكَ اسْتِغْثَاكَ** অর্থাৎ, এই উপায় অবলম্বন করলে আপনি সন্তুষ্টির জীবন-যাপন করতে পারবেন। **وَسْتَغْفِرَ لَكَ ذُنُوبَكَ** - অর্থাৎ, আপনি আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করুন তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে বান্দার আল্লাহর নাম নেয়ার অথবা এবাদত করার তওফীক হয়, এ কাজের জন্যে গর্ব ও অহংকার করার পরিবর্তে আল্লাহর প্রশংসা ও শোকর করাই তার ব্রত হওয়া উচিত। আল্লাহর সুরণ ও এবাদত তাঁরই তওফীক দানের ফলশ্রুতি।

এই **سَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ** - শব্দটি সাধারণ যিকর ও হামদের অর্থেও হতে পারে এবং বিশেষভাবে নামাযের অর্থেও হতে পারে। তফসীরবিদগণ সাধারণতঃ শেষোক্ত অর্থই নিয়েছেন। এর যেসব নির্দিষ্ট সময় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোকেও তাঁরা নামাযের সময় সাব্যস্ত করেছেন। উদাহরণতঃ “সূর্যোদয়ের পূর্বে” বলে ফজরের নামায, “সূর্যাস্তের পূর্বে” বলে যোহর ও আসরের নামায এবং **وَاللَّيْلِ الْاَوَّلِ** - বলে রাত্রিকালীন সব নামায—মাগরিব, এশা ও তাহাজ্জুদসহ বোঝানো হয়েছে। অতঃপর **وَالْاَكْثَرِ النَّهَارِ** বলে এর আরও তাকীদ করা হয়েছে।

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়; বরং মুমিনের জন্যে আশঙ্কার বস্তু : **وَالْمَالُ الدُّنْيَا وَالْمَالُ الْمُنْمُو** -এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে পথ প্রদর্শন করাই লক্ষ্য। বলা হয়েছে, দুনিয়ার ঐশ্বর্যশালী গুঁজিপতিরা হরেক রকমের পার্শ্ব চাকচিক্য ও বিবিধ নেয়ামতের অধিকারী হয়ে বসে আছে। আপনি তাদের প্রতি ক্রক্ষেপও করবেন না। কেননা, এগুলো সব ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ তাআলা যে নেয়ামত আপনাকে এবং আপনার মধ্যস্থতায় মুমিনদেরকে দান করেছেন, তা এই ক্ষণস্থায়ী পার্শ্ব চাকচিক্য থেকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট।

পরিবারবর্গ ও সম্পর্কশীলদেরকে নামাযের আদেশ ও তার রহস্য : **وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا** অর্থাৎ, আপনি পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। বাহ্যতঃ এখানে আলাদা আলাদা দু’টি নির্দেশ রয়েছে। (এক) পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ এবং (দুই) নিজেও নামায অব্যাহত রাখা। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিজের নামায পূরোপুরি অব্যাহত রাখার জন্যেও আপনার পরিবেশ, পরিবারবর্গ ও স্বজনদের নিয়মিত নামাযী হওয়া আবশ্যিক। কেননা, পরিবেশ ভিন্নরূপ হলে মানুষ স্বভাবতঃ নিজেও

অলসতার শিকার হয়ে যায়।

স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও সম্পর্কশীল সবাই **أَهْلُ** শব্দের অন্তর্ভুক্ত। এদের দ্বারাই মানুষের পরিবেশ ও সমাজ গঠিত হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যহ ফজরের নামাযের সময় হযরত আলী ও ফাতেমা (রাঃ)-এর গৃহে গমন করে **الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ** (নামায পড়, নামায পড়) বলতেন। (কুরত্বী)

ধনকুবের ও রাজরাজড়াদের ধনৈশ্বর্য ও জাঁকজমকের উপর যখনই হযরত গুরওয়া ইবনে যোবায়রের দৃষ্টি পড়ত, তখনই তিনি নিজ গৃহে ফিরে আসতেন এবং পরিবারবর্গকে নামায পড়ার কথা বলতেন। অতঃপর আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শোনাতেন। হযরত ওমর ফারাক (রাঃ) যখন রাত্রিকালে তাহাজ্জুদের জন্যে জাগ্রত হতেন, তখন পরিবারবর্গকেও জাগ্রত করে দিতেন এবং এই আয়াত পাঠ করে শোনাতেন। - (কুরত্বী)

যে ব্যক্তি নামায ও এবাদতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ তার রিয়িকের ব্যাপার সহজ করে দেন : **لَا تَشْغَلُكَ رِزْقًا** - অর্থাৎ, আমি আপনার কাছে এই দাবী করি না যে, আপনি নিজের ও পরিবারবর্গের রিয়িক নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা ও কর্মের জোরে সৃষ্টি করুন। বরং এ কাজটি আমি আমার নিজের দায়িত্বে রেখেছি। কেননা, রিয়িক উপার্জন করা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। সে বেশীর মধ্যে মাটিকে নরম ও চামোপযোগী করতে পারে এবং তাতে বীজ নিক্ষেপ করতে পারে, কিন্তু বীজের ভেতর থেকে অঙ্কুর উৎপন্ন করা এবং তাকে ফল-ফুলে সুশোভিত করার মধ্যে মানুষের কোন হাত নেই। এটা সরাসরি আল্লাহ তাআলার কাজ। বৃক্ষ গজানোর পরও মানুষের সকল প্রচেষ্টা তার হেফাজত ও আল্লাহ কর্তৃক সৃজিত ফল-ফুল দ্বারা উপকৃত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদতে মশগুল হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা এই পরিশ্রমের বোঝাও তার জন্যে সহজ ও হালকা করে দেন।

يَبْنِيْهَا فَاَنْزِلُ السَّمَاءَ الْاَوَّلَى - অর্থাৎ, তওরাত, ইঞ্জীল ও ইবরাহিমী সহীফা ইত্যাদি খোদায়ী গ্রন্থ সর্বকালেই শেষ নবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও রেসালতের সাক্ষ্য দিয়েছে। এগুলোর বহিঃপ্রকাশ অবিশ্বাসীদের জন্যে পর্যাণ্ড প্রমাণ নয় কি ?

فَسَعَلَكُم مِّنْ أَصْحَابِ الْاِبْرَاهِيْمَ وَآلِ اِيْمَانَ অর্থাৎ, আজ তো আল্লাহ তাআলা প্রত্যেককে মুখ দিয়েছেন, প্রত্যেকেই তার তরীকা ও কর্মকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ বলে দাবী করতে পারে। কিন্তু এই দাবী কোন কাজে আসবে না। উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ তরীকা তাই হতে পারে, যা আল্লাহর কাছে প্রিয় ও বিশুদ্ধ। আল্লাহর কাছে কোনটি বিশুদ্ধ, তার সন্ধান কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই পেয়ে যাবে। তখন সবাই জানতে পারবে যে, কে ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট ছিল এবং কে বিশুদ্ধ ও সরল পথে ছিল।

সূরা আশ্বিয়ার ফযীলত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : সূরা কাহফ, মাইয়াম, তোয়া-হা ও আশ্বিয়া—এই চারটি সূরা প্রথমভাগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম এবং আমার প্রাচীন সম্পদ ও উপাঙ্গন। আমি সারাক্ষণ এগুলোর হেফাজত করি।—(কুরতুবী)

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ অর্থাৎ, মানুষের কাছ থেকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব নেয়ার দিন অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন ঘনিষে এসেছে। এখানে পৃথিবীর বিগত বয়সের অনুপাতে ঘনিষে আসার কথা বলা হয়েছে। কেননা, এই উম্মতই হচ্ছে সর্বসেব উম্মত; যদি ব্যাপক হিসেব ধরা হয়, তবে কবরের হিসেবও এতে शामिल রয়েছে। প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর পরমুহূর্তেই এই হিসেব দিতে হয়। এজন্যেই প্রত্যেকের মৃত্যুকে তার কেয়ামত বলা হয়েছে।

من مات فقد قامت قيامته—যে ব্যক্তি মরে যায়, তার কেয়ামত তখনই শুরু হয়ে যায়। এ অর্থের দিক দিয়ে হিসেবের সময় ঘনিষে আসার বিষয়টি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট। কারণ, মানুষ যত দীর্ঘায়ুই হোক, তার মৃত্যু দূরে নয়। বিশেষ করে যখন বয়সের শেষ সীমা অজানা, তখন প্রতিমুহূর্তে ও প্রতি পলে মানুষ মৃত্যু-আশঙ্কার সম্মুখীন।

আয়াতের উদ্দ্য মূমিন ও কাফের নির্বিশেষে সব গাফেলকে সতর্ক করা; তারা যেন পার্থিব কামনা-বাসনায় লিপ্ত হয়ে এই হিসেবের দিনকে ভুলে না বসে। কেননা, একে ভুলে যাওয়াই যাবতীয় অনর্থ ও গোনাহের ভিত্তি।

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْمَعُوا وَهُمْ يَكْفُرُونَ

لَا هِيَةَ قُلُوبُهُمْ যারা পরকাল ও কবরের আযাব থেকে গাফেল এবং

তজ্ঞেন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, এটা তাদের অবস্থার অতিরিক্ত বর্ণনা। যখন তাদের সামনে কোরআনের কোন নতুন আয়াত আসে এবং পঠিত হয়, তখন তারা একে কৌতুক ও হাস্য উপহাসচ্ছলে শ্রবণ করে। তাদের অন্তর আল্লাহ ও পরকালের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এর এ অর্থও হতে পারে যে, কোরআনের আয়াত শ্রবণ করার সময় তারা পূর্ববৎ খেলাধুলায় লিপ্ত থাকে, কোরআনের প্রতি মনোযোগ দেয়া না এবং এরূপ অর্থও হতে পারে যে, স্বয়ং কোরআনের আয়াতের সাথেই তারা রক্ত-তামাশা করতে থাকে।

اَفْتَاتُونِ السَّيْرَ وَانْتَوَيْتُمْ يَوْمَ

কানাকানি করে বলে : এই লোকটি যে নিচ্ছেকে নবী ও রসুল বলে দাবী করে, সে তো আমাদের মতই মানুষ—ফেরেশতা তো নয় যে, আমরা তার কথা মেনে নেব। তাদের সামনে আল্লাহর যে কালাম পাঠ করা হত, তার মিষ্টতা, প্রাঞ্জলতা ও ক্রিয়াশক্তি কোন কাফেরও অস্বীকার করতে পারত না। এই কালাম থেকে লোকের দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তারা একে যাদু আখ্যায়িত করে লোকদেরকে বলত যে, তোমরা জান যে, এটা যাদু এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির কাছে যাওয়া এবং এই কালাম শ্রবণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এই কথাবার্তা গোপনে বলার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, মুসলমানরা শুনে ফেললে তাদের এই নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত ধোকাবাজি জনসম্মুখে ফাঁস করে দেবে।

بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَلْهَمُوا যেসব স্বপ্নের মানসিক অথবা শয়তানী

কল্পনা शामिल থাকে, সেগুলোকে অহাম বলা হয়। এ কারণেই এর অনুবাদ “অলিক কল্পনা” করা হয়েছে। অর্থাৎ, অবিশ্বাসীরা প্রথমে কোরআনকে যাদু বলেছে : এরপর আরও অগ্রসর হয়ে বলতে শুরু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ

مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْمَعُوا

وَهُمْ يَكْفُرُونَ لَا هِيَةَ قُلُوبُهُمْ وَأَسْرَأُ السُّعُودِ الَّذِينَ ظَلَمُوا

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّيْرَ وَانْتَوَيْتُمْ يَوْمَ

قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَلْهَمُوا بَلْ هُوَ سَاحِرٌ قَلِيلٌ أَمَّا

بِأَيِّ كَيْفٍ أُنْزِلَ الزُّكُورُ مَا أَصْدَقَ قَوْلَهُمْ مِنْ قَوْلِ الْفُلْكَانِ

أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَسْأَلُكَ إِلَّا الْإِيمَانُ الْيَوْمَ إِلَيْهِمْ

فَسَاءَ مَا أَهْلُ الدِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَتَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ

جَسَدًا أَلْبَانًا كَالَّذِينَ ظَلَمُوا وَمَا كَانُوا لِيُخْلَدِينَ تَوَصَّدَفَ لَهُمُ

الرُّوحُ فَأَنبِئَهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَهَلْ كُنَّا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ

أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ وَصَّيْنَا

مِنْ قَبْلِهِ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ

সূরা আশ্বিয়া

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ১১২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

- (১) মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় নিকটবর্তী; অথচ তারা বেখবর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। (২) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যখনই কোন নতুন উপদেশ আসে, তারা তা খেলার ছলে শ্রবণ করে। (৩) তাদের অন্তর থাকে খেলায় মগ্ন। জালেমরা গোপনে পরামর্শ করে, ‘সে তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; এমতাবস্থায় দেখে-শুনে তোমরা তার যাদুর কবলে কেন পড়?’ (৪) পয়গম্বুর বললেন : নজামগুল ও ভূমগুলের কথাই আমার পালনকর্তা জানেন। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (৫) এছাড়া তারা আরও বলে : অলীক স্বপ্ন; না-সে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে, না সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের কাছে কোন নির্দশন আনয়ন করুক, যেমন নির্দশনই আগমন করেছিলেন পূর্ববর্তীগণ। (৬) তাদের পূর্বে যেসব জনপদ আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা বিশ্রাস স্থাপন করেনি; এখন এরা কি বিশ্রাস স্থাপন করবে? (৭) আপনাদের পূর্বে আমি মানুষই প্রেরণ করেছি, যাদের কাছে আমি গুহী পাঠাতাম। অতএব তোমরা যদি না জান, তবে যারা সুরশ রাখে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। (৮) আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য ভক্ষণ করত না এবং তারা চিরস্থায়ীও ছিল না। (৯) অতপর আমি তাদেরকে দেয়া আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করলাম। সুতরাং তাদেরকে এবং যাদেরকে ইচ্ছা বাচিয়ে দিলাম এবং ধ্বংস করে দিলাম সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে। (১০) আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বােখ না? (১১) আমি কত জনপদের ধ্বংস সাধন করেছি যার অধিবাসীরা ছিল পাপী এবং তাদের পর সৃষ্টি করেছি অন্য জাতি।

রেওয়াকে অনুযায়ী মুসা ইবনে মিশা এবং এক রেওয়াকে অনুযায়ী শোআয়ব বলা হয়েছে। শোআয়ব নাম হলে তিনি মাদইয়ানবাসী শোআয়ব (আঃ) নন, অন্য কেউ। তারা আল্লাহ্ রসুলকে হত্যা করে এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে জ্বৈনক কাফের বাদশাহ্ বুখতে নসরের হাতে ধ্বংস করে দেন। বুখতে নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, যেমন ফিলিস্তীনে বনী-ইসরাঈল বিপথগামী হলে তাদের উপরও বুখতে নসরকে আধিপত্য দান করে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু পরিষ্কার কথা এই যে, কোরআন কোন বিশেষ জনপদকে নির্দিষ্ট করেনি। তাই আয়াতকে ব্যাপক অর্থেই রাখা দরকার। এর মধ্যে ইয়ামনের উপরোক্ত জনপদও शामिल থাকবে।

অর্থ ৭ আমি وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِجْنَ

আকাশ পৃথিবী এবং এতদুভয়ের অন্তর্ভুক্তি সবকিছুকে ক্রীড়া ও খেলার জন্য সৃষ্টি করিনি। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কতক জনপদকে ধ্বংস করার কথা বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে ইশারা করা হয়েছে যে, পৃথিবী ও আকাশ এবং এতদুভয়ের সবকিছুর সৃষ্টি যেমন বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ রহস্য ও উপকারিতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি জনপদসমূহকে ধ্বংস করাও সাক্ষাৎ রহস্যের অধীনে ছিল। এই বিষয়বস্তুটি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পৃথিবী, আকাশ ও সমগ্র সৃষ্টবস্তু সৃজনে আমার পূর্ণ শক্তি অফরন্ত জ্ঞান ও বিচক্ষণতার যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়, তওহীদ ও রেসালতে অবিশ্বাসী কি সেগুলো দেখে না ও বাোঝে না অথবা তারা কি মনে করে যে, আমি এসব বস্তু অনর্থক ও ক্রীড়াচ্ছলের সৃষ্টি করেছি ?

﴿لَيْبٍ﴾ শব্দটি لعب ধাতু থেকে উদ্ভূত। যে কোন লক্ষ্যহীন কাজকে لعب বলা হয় — (রাগীব) যে কাজের পেছনে কোন শুদ্ধ অথবা অশুদ্ধ লক্ষ্যই থাকে না, নিছক সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে لعب বলা হয় ইসলামবিरोधीরা রসুল্লাহ (সাঃ) ও কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে এবং তওহীদ অস্বীকার করে। প্রকৃতির এসব উজ্জ্বল নিদর্শন সত্ত্বেও তারা তওহীদ স্বীকার করে না। সুতরাং তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে যেন দাবী করে যে, এসব বস্তু অনর্থকই এবং খেলার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, এগুলো খেলা এবং অনর্থক নয়। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে বোঝা যাবে সৃষ্ট জগতের এক এক কণা এবং প্রকৃতির এক এক সৃষ্ট কর্মে হাজারো রহস্য লুকায়িত আছে। এগুলো সব আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও তওহীদের নীরব সাক্ষী।

لَوَارِدَنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُوَ الْأَتَّخِذُ لَهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا مُفْعِلِينَ

অর্থাৎ, আমি যদি ক্রীড়াচ্লে কোন কাজ গ্রহণ করতে চাইতাম এবং একাজ আমাকে করতেই হত, তবে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ছিল? একাজ তো আমার নিকটস্থ বস্তু দুরাই হতে পারত।

আরবী ভাষায় لُ শব্দটি অবাস্তুর কাল্পনিক বিষয়াদির জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখানেও لُ শব্দ দ্বারা বর্ণনা শুরু হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, যেসব বোকা উর্ষ্ব জগত ও অখঃজগতের সমস্ত আকর্ষণজনক সৃষ্টবস্তুকে রং তামাশা ও ক্রীড়া মনে করে, তারা কি এতটুকুও বোঝা না যে, খেলা ও রং তামাশার জন্যে এত বিরাট বিরাট কাজ করা হয় না। একাজ যে করে, সে এভাবে করে না। আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, রং তামাশা ও ক্রীড়ার যে কোন কাজ কোন ভাল বিবেকবান মানুষের পক্ষেও সম্ভবপর নয়— আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য তো অনেক উর্ষ্ব।

لهو শব্দের আসল ও প্রসিদ্ধ অর্থ কন্মহীনতার কর্ম। এ অর্থ অনুযায়ীই

উপরোক্ত তফসীর করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন: **لهو** শব্দটি কোন সময় স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে এ অর্থ ধরা হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের দাবী খণ্ডন করা। তারা হয়রত ঈসা ও ওয়ায়র (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি আমাকে সন্তানই গ্রহণ করতে হত, তবে মানবকে কেন গ্রহণ করতাম, আমার নিকটস্থ সৃষ্টিকেই গ্রহণ করতাম। **والله اعلم**

قَذْفٌ - بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ

শব্দের আভিমানিক অর্থ নিক্ষেপ করা ও ছুঁড়ে মারা। يدمغ শব্দের অর্থ মস্তকে আঘাত করা। زفق এর অর্থ যে নিশিচই হয়ে যায়। আয়তের উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবী ও আকাশের অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ আমি খেলার জন্য নয়, বরং বড় বড় রহস্যের উপর ভিত্তিশীল করে সৃষ্টি করেছি। তন্মধ্যে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলাও এক রহস্য। সৃষ্ট জগতের অবলোকন মানুষকে সত্যের দিকে এমনভাবে পথ প্রদর্শন করে যে, মিথ্যা তার সামনে টিকে থাকতে পারে না। এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সত্যকে মিথ্যার উপর ছুঁড়ে মারা হয়, ফলে মিথ্যার মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং মিথ্যা নিশিচই হয়ে পড়ে।

अर्थात् وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ

আমার যেসব বান্দা আমার সান্নিধ্যে রয়েছে, (অর্থাত্, ফেরেশতা) তারা সদাসর্বদা বিরতিহীনভাবে আমার এবাদতে মশগুল থাকে। তোমরা আমার এবাদত না করলে আমার খোদায়ীতে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য দেখা দেবে না। মানুষ স্বভাবতঃ অপরকেও নিজের অবস্থার নিরিখে বিচার করে। তাই মানুষের স্থায়ী এবাদতের পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হতে পারে। (এক) কারও এবাদত করাকে নিজের পদমর্যাদার পরিপন্থী মনে করা। তাই এবাদতের কাছেই না যাওয়া। (দুই) এবাদত করার ইচ্ছা থাকা; কিন্তু মানুষ যেহেতু অল্প কাজে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়, তাই স্থায়ী ও বিরামহীনভাবে এবাদত করতে সক্ষম না হওয়া। এ কারণে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাদের এবাদতে এ দু'টি অন্তরায় নেই। তারা এবাদতে অহংকারও করে না যে, এবাদতকে পদমর্যাদার শেলফ মনে করবে এবং এবাদতে কোন সময় ক্লান্তও হয় না। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুকেই এভাবে পূর্ণতা দান করা হয়েছে

يُسَبِّحُونَ أَكْبَرُ الْأَلْبَابِ

لَا يَفُزُونَ অর্থাৎ ফেরেশতারা রাত দিন তসবীহ পাঠ করে এবং কোন সময়
অলসতা করেন না।

আবদুল্লাহ্‌ ইসনে হারিস বলেন : আমি কা'বে আব্বারকে প্রশ্ন করলাম : তসবীহ পাঠ করা ছাড়া ফেরেশতাদের কি অন্য কোন কাজ নেই? যদি থাকে, তবে অন্য কাজের সাথে সদাসর্বদা তসবীহ পাঠ করা কিরূপে সম্ভবপর হয়? কা'ব বলেন : প্রিয় ভাতৃশূত্র, তোমার কোন কাজ ও বৃত্তি তোমাকে শ্বাস গ্রহণে বিরত রাখতে পারে কি? সত্য এই যে, ফেরেশতাদের তসবীহ পাঠ করা এমন, যেমন— আমাদের শ্বাস গ্রহণ করা ও পলকপাত করা। এ দু'টি কাজ সব সময় ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে এবং কোন কাজে অন্তরায় ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে না।—(কুরতুবী, (বাহ্যর মহীত)

এতে যশরেকদের **أَمَّا تَخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يَسْمُرُونَ**

অর্বাচীনতা কয়েকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। (এক) তারা কেমন নির্বোধ যে, উপাস্য করতে গিয়েও পৃথিবীস্থ সৃষ্টজীবকেই উপাস্য করেছে। এটা

তো উর্ধ্ব জগতের ও আকাশের সৃষ্টিজীব থেকে সর্বাবস্থায় নিকৃষ্ট ও হয়। (দুই) যাদেরকে উপাস্য করেছে, তারা কি তাদেরকে কোন সময় কাউকে জীবিত করতে ও প্রাণদান করতে দেখেছে। সৃষ্টিজীবের জীবন ও মরণ উপাস্যের করায়ত্ত থাকা একান্ত জরুরী।

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ এটা তওহীদের প্রমাণ, যা সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তিশীল এবং যুক্তিগত প্রমাণের দিকেও ইঙ্গিতবহ। এই প্রমাণের বিভিন্ন অভিব্যক্তি কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে উল্লেখিত রয়েছে। অভ্যাসগত প্রমাণের ভিত্তি এই যে, পৃথিবী ও আকাশে দুই খোদা থাকলে উভয়ই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হবে। এমতাবস্থায় উভয়ের নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে পূর্ণরূপে কার্যকরী হওয়া উচিত। অভ্যাসগতভাবে এটা অসম্ভব যে, একজন যে নির্দেশ দেবে, অন্যজনও সেই নির্দেশ দেবে, একজন যা পছন্দ করবে, অন্যজনও তাই পছন্দ করবে। তাই উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতবিরোধ ও নির্দেশ বিরোধ হওয়া অবশ্যসম্ভাবী। যখন দুই খোদার নির্দেশাবলী পৃথিবী ও আকাশে বিভিন্নরূপ হবে, তখন এর ফলশ্রুতি পৃথিবী ও আকাশের ধ্বংস ছাড়া আর কি হবে। এক খোদা চাইবে যে, এখন দিন হোক, অপর খোদা চাইবে এখন রাত্রি হোক। একজন চাইবে বৃষ্টি হোক, অন্যজন চাইবে বৃষ্টি না হোক। এমতাবস্থায় উভয়ের পরস্পরবিরোধী নির্দেশ কিরূপে প্রযোজ্য হবে। যদি একজন পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ও খোদা থাকতে পারবে না। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উভয় খোদা পরস্পরে পরামর্শ করে নির্দেশ জারি করলে তাতে অসুবিধা কি? এর বিভিন্ন উত্তর কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এতটুকু জেনে নেয়া যায় যে, যদি উভয়ই পরামর্শের অধীন হয় এবং একজন অন্যজনের পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করতে না পারে, তবে এতে জরুরী

হয়ে যায় যে, তাদের কেউ সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নয় এবং কেউ স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। বলাবাহুল্য, স্বয়ং সম্পূর্ণ না হয়ে খোদা হওয়া যায় না। সম্ভবতঃ পরবর্তী لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ আয়াতেও এদিকে ইশারা পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি কোন আইনের অধীন, যার ক্রিয়াকর্ম ধরপাকড় যোগ্য, সে খোদা হতে পারে না। খোদা তিনিই হবেন, যিনি কারও অধীন নয়, যাকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার কারও নেই। পরামর্শের অধীন দুই খোদা থাকলে প্রত্যেকেই অপরিহার্যরূপে অপরকে জিজ্ঞাসা করারও পরামর্শ বর্জনের কারণে ধরপাকড় করার অধিকারী হবে। এটা খোদায়ী পদমর্যাদার নিশ্চিত পরিপন্থী।

هَذَا إِذْ كُذِّبَتْ مَنِّي وَذُكِّرْتُمْ قَبْلِي — এর এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, ذُكِّرْتُمْ قَبْلِي বলে কোরআন এবং ذُكِّرْتُمْ قَبْلِي বলে তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী গ্রন্থ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আমার ও আমার সঙ্গীদের কোরআন এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের তওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কোন কিতাবে কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও এবাদত শিক্ষা দেয়া হয়েছে? তওরাত ও ইঞ্জিলের পরিবর্তন সাধিত হওয়া সম্ভবও এ পর্যন্ত কোথাও পরিষ্কার উল্লেখ নেই যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে দ্বিতীয় উপাস্য গ্রহণ কর। বাহরে মুহীতে আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কোরআন আমার সঙ্গীদের জন্যেও উপদেশ এবং আমার পূর্ববর্তীদের জন্যেও। উদ্দেশ্য এই যে, আমার সঙ্গীদের জন্যে তা দাওয়াত ও বিধানাবলী ব্যাখ্যার দিক দিয়ে উপদেশ এবং পূর্ববর্তীদের জন্যে এই দিক দিয়ে উপদেশ যে, এর মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের অবস্থা, কাজকারবার ও কেচ্ছাকাহিনী জীবিত আছে।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ آيَاتِنَا ۚ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَكْفَا عِبَادُونَ ۖ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا
سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ۚ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ
بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ
لَا يُشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُوَ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۖ
وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلْيَنْكُرْ جِهَتَهُ ۚ
كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۖ أَكْذَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ
السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ
تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا جِبَالًا سِجَالًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۖ
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ ۖ
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَالْأَنْثَرَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلًّا
فِي فَلَكَ يُسَبِّحُونَ ۖ وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ
أَفَلَا يَنْدِمُ ۚ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ۖ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْغَيْرِ فِتْنَةً وَأَلْيَا تُنَاسَخُونَ ۖ

(২৫) আপনার পূর্বে আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে এ আদেশই প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর। (২৬) তারা বলল : দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছে। তাঁর জন্য কখনও ইহা যোগ্য নয়; বরং তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা (২৭) তারা আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তাঁর আদেশই কাজ করে। (২৮) তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে, তা তিনি জানেন। তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত। (২৯) তাদের মধ্যে যে বলে যে, তিনি ব্যতীত আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দেব। আমি জালেমদেরকে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। (৩০) কাকেররা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে খুলে দিলাম এবং প্রাণবন্ত সবকিছু আমি পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? (৩১) আমি পৃথিবীতে ভারী বোঝা রেখে দিয়েছি যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি, যাতে তারা পথপ্রাপ্ত হয়। (৩২) আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি, অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে (৩৩) তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে। (৩৪) আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমি অনন্ত জীবন দান করিনি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীব হবে? (৩৫) প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আশ্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান হওয়া তো দূরের কথা, তারা আল্লাহর সামনে এমন ভীত ও বিনীত থাকে যে, আগে বেড়ে কোন কথাও বলে না। এবং তাঁর আদেশের খেলাফ কখনও কোন কাজও করে না। কথায় আগে না বাড়ার অর্থ এই যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোন কথা না বলা হয়, তারা নিজেরা আগে বেড়ে কথা বলার সাহস করে না। এ থেকে আরও জানা গেল যে, মজলিসে বসে প্রথমেই কথা বলা উচিত নয়; বরং যে ব্যক্তি মজলিসের প্রধান, তার কথার জন্যে অপেক্ষা করা উচিত। প্রথমেই অন্যের কথা বলা শিষ্টাচারের পরিপন্থী।

رُؤيت (দেখা) অর্থ জানা, চোখে দেখে জানা হোক কিংবা বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা জানা হোক। কেননা, এরপর যে বিষয়বস্তু আসছে, তার সম্পর্কে কিছু চোখে দেখার সাথে এবং কিছু ভেবে দেখার সাথে।

آن السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

فَتْق ও رَتْق শব্দের অর্থ বন্ধ হওয়া এবং এরা এর অর্থ খুলে দেয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি রত্য ও ফত্য হওয়া এবং এরা এর অর্থ খুলে দেয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি রত্য ও ফত্য হওয়া এবং এরা এর অর্থ খুলে দেয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি রত্য ও ফত্য হওয়া এবং এরা এর অর্থ খুলে দেয়া। উভয় শব্দের সমষ্টি রত্য ও ফত্য হওয়া এবং এরা এর অর্থ খুলে দেয়া।

তফসীরে ইবনে কাসীরে ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে আলোচ্য আয়াতের তফসীর জিজ্ঞাসা করলে তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের দিকে ইশারা করে বললেন : এই শায়খের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর। তিনি যে উত্তর দেন, তা আমাকেও বলে যেয়ো। লোকটি হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পৌঁছে বলল যে, আয়াতে উল্লিখিত رَتْقًا ও فَتْقًا বলে কি বোঝানো হয়েছে? হযরত ইবনে আব্বাস বললেন : পূর্বে আকাশ বন্ধ ছিল। বৃষ্টি বর্ষণ করত না এবং মাটিও বন্ধ ছিল, তাতে বৃক্ষ, তরুলতা ইত্যাদি অঙ্কুরিত হত না আল্লাহ তাআলা যখন পৃথিবীতে মানুষ আবাদ করলেন, তখন আকাশের বৃষ্টি এবং মাটির উৎপাদন ক্ষমতা খুলে দিলেন। লোকটি আয়াতের এই তফসীর জেনে নিয়ে হযরত ইবনে ওমরের কাছে গেল। হযরত ইবনে ওমর এ তফসীর শুনে বললেন : এখন আমি পূর্ণরূপে নিশ্চিত হলাম যে, বাস্তবিকই ইবনে আব্বাসকে কোরআনের ব্যুৎপত্তি দান করা হয়েছে। এর আগে আমি কোরআনের তফসীর সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের বর্ণনাসমূহকে দুঃসাহসিক উদ্যম মনে করতাম এবং পছন্দ করতাম না। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে কোরআনের বিশেষ রুচিষ্টি দান করেছেন। তিনি رَتْقًا ও فَتْقًا এর নির্ভুল তফসীর করেছেন।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

অবশ্যই প্রভাব আছে। চিন্তাবিদদের মতে শুধু মানুষ ও জীবজন্তুই প্রাণী ও আত্মাওয়াল না; বরং উদ্ভিদ এমন কি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা ও

জীবন প্রমাণিত আছে। বলাবাহুল্য, এসব বস্তু সৃজন, আবিষ্কার ও ক্রমবিকাশে পানির প্রভাব অপরিহার্য।

ইবনে কাসীর ইমাম আহমদের সনদ দ্বারা হযরত আবু হুরায়রার এই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে আরম্ভ করলাম; “ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি যখন আপনার সাথে সাক্ষাৎ করি, তখন আমার অন্তর প্রফুল্ল এবং চক্ষু শীতল হয়। আপনি আমাকে প্রত্যেক বস্তু সৃজন সম্পর্কে তথ্য বলে দিন।” জওয়াবে তিনি বললেন : “প্রত্যেক বস্তু পানি থেকে সৃজিত হয়েছে।”

وَجَعَلْنَاهُ الْكَوْكَبَ رَوَائِي أَنْ تَكُونِي بِهِمْ আরবী ভাষায় অস্থির নড়াচড়াকে বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তাআলা পাহাড়সমূহের বোঝা রেখে দিয়েছেন, যাতে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং পৃথিবী অস্থির নড়াচড়া না করে। পৃথিবী নড়াচড়া করলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারীদের অসুবিধা হত। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে পাহাড়সমূহের প্রভাব কি, এ বিষয়ে দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। তফসীর কবীর প্রমুখ গ্রন্থে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাঠকবর্গ দেখে নিতে পারেন। তফসীর বয়ানুলকোরআনে সূরা নমলের তফসীরে মাওলানা আশরাফ আলী খানভীও এ সম্পর্কে জরুরী আলোচনা করেছেন।

فَلَاكُ الْمَغْزَلُ বলা হয়। এ প্রত্যেক বৃত্তাকার বস্তুকে ফলাক বলা হয়। এ কারণেই সূতা কাটার চরকায় লাগানো গোল চামড়াকে ফলাক বলা হয়। (রুহুল মা'আনী) এবং এ কারণেই আকাশকেও ফলাক বলা হয়ে থাকে। এখানে সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ বোঝানো হয়েছে। কোরআনে এ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলা হয়নি যে, এই কক্ষপথগুলো আকাশের অভ্যন্তরে আছে, না বাইরে শূন্যে। মহাশূন্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, কক্ষপথগুলো আকাশ থেকে অনেক নীচে মহাশূন্যে অবস্থিত।

এই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আরও জানা যায় যে, সূর্যও একটি কক্ষপথে বিচরণ করে। আধুনিক দার্শনিকগণ পূর্বে একথা অস্বীকার করলেও বর্তমানে তারাও এর প্রবক্তা হয়ে গেছেন। বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়।

وَمَا جَعَلْنَا لِيَشْرَبْنَ بِرَبِّكَ الْخُلْدَ প্রমাণ সহকারে কাকের ও মুরেরকদের বিভিন্ন দাবী খণ্ডন করা হয়েছে। তাদের দাবীসমূহের মধ্যে ছিল হযরত ঈসা (আঃ) অথবা ওয়ালির (আঃ)—কে আল্লাহর অশ্বীদার অথবা ফেরেশতা ও হযরত ঈসা (আঃ)—কে আল্লাহর সন্তান বলা। এই খণ্ডনের কোন জওয়াব তাদের কাছে ছিল না। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, প্রতিপক্ষ প্রমাণ দিতে অক্ষম হয়ে গেলে তার মধ্যে ক্রোধ ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়। এই বিরক্তির ফলশ্রুতিতেই মকার মুরেরকরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর দ্রুত মৃত্যু—কামনা করত; যেমন—কোন কোন আয়াতে আছে تَرَكْنَاهُ يَوْمَ تَرَىٰ رَبَّكَ الْمُنُونِ (আমরা তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষায় আছি)। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের এই অনর্থক কামনার দু'টি জওয়াব দিয়েছেন। তা এই যে, আমার রসূল যদি শীঘ্রই মারা যান, তবে তাতে তোমাদের কি উপকার হবে? তোমাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, তাঁর ওফাত হলে তোমরা বলবে, সে নবী ও রসূল নয়, রসূল হলে মৃত্যু হত না; তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, তোমরা যেসব নবীর নবুওয়ত স্বীকার কর, তাঁর কি মৃত্যুবরণ করেননি?

তাঁদের মৃত্যুর কারণে যখন তাঁদের নবুওয়ত ও রেসালতে কোন ক্রটি দেখা দেয়নি, তখন এই শেষ নবীর মৃত্যুতে তাঁর নবুওয়তের বিরুদ্ধে অপপ্রচারণা কিরূপে করা যায়? পক্ষান্তরে যদি তাঁর শীঘ্র মৃত্যু দ্বারা তোমরা তোমাদের ক্রোধ ঠাণ্ডা করতে চাও, তবে মনে রেখো, তোমরাও এই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। তোমাদেরকেও মরতে হবে। কাজেই কারও মৃত্যুতে আনন্দিত হওয়ার কি কারণ রয়েছে?

مُتْرُ كِي? এরপর বলা হয়েছে كُنْ تَرَىٰ رَبَّكَ الْمُنُونِ অর্থাৎ জীব-

মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আশ্বাদন করবে। এখানে প্রত্যেক نفس বলে পৃথিবীস্থ জীব বোঝানো হয়েছে। তাদের সবার মৃত্যু অপরিহার্য। ফেরেশতা জীব এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেয়ামতের দিন ফেরেশতাদেরও মৃত্যু হবে কি—না, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : মানুষসহ মর্ত্যের সব জীব এবং ফেরেশতাসহ সব স্বর্গীয় জীব এক মুহূর্তের জন্যে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কেউ কেউ বলেন : ফেরেশতা এবং জিন্নাতের হ্র ও গেলমান মৃত্যুর আওতাবহির্ভূত।—(রুহুল-মা'আনী) আলেমদের সর্বসম্মত মতে আত্মার দেহপিঞ্জর ত্যাগ করাই মৃত্যু। একটি গতিশীল, প্রাণবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম ও নূরানী দেহকে আত্মা বলা হয়। এই আত্মা মানুষের সমগ্র দেহে সঞ্চারিত থাকে, যেমন গোলাপজল গোলাপ ফুলের মধ্যে বিরাজমান। ইবনে কাইয়্যেম আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করে তার একশতটি প্রমাণ উপস্থিত করেছে।—(রুহুল-মা'আনী)

ذَائِقَةُ الْمَوْتِ শব্দে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক জীব মৃত্যুর বিশেষ কষ্ট অনুভব করবে। কেননা, স্বাদ আশ্বাদন করার বাকপদ্ধতিটি এরূপ ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। বলাবাহুল্য, দেহের সাথে আত্মার যে নিবিড় সম্পর্ক, তার পরিপ্রেক্ষিতে আত্মা বের হওয়ার সময় কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক কামেলা থেকে মুক্তি এবং মহান প্রেমাম্পদের সাথে সাক্ষাতের কথা ভেবে কোন কোন আল্লাহুওয়াল্লা মৃত্যুতে যে আনন্দ ও সুখ লাভ করেন, এটা অন্য ধরনের আনন্দ ও সুখ। এই আনন্দ দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদজনিত স্বাভাবিক কষ্টের পরিপন্থী নয়। কারণ, কোন বড় সুখ ও বড় উপকার দৃষ্টিপথে থাকলে তার জন্যে ছোট কষ্ট সহ্য করা সহজ হয়ে যায়।

وَنَبِّئُهُمْ بِالنَّارِ وَالْخَيْرِ সংসারের প্রত্যেক কষ্ট ও সুখ পরীক্ষা :

وَنَبِّئُهُمْ অর্থাৎ, আমি মন্দ ও ভাল উভয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করি। মন্দ বলে প্রত্যেক স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়। যেমন—অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্ট এবং ভাল বলে প্রত্যেক পছন্দনীয় ও কাম্য বিষয় যেমন সুস্থতা, নিরাপত্তা ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এ সংসারে এই উভয় প্রকার বিষয় মানুষের পরীক্ষার জন্যে সামনে আসে। স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়ে সবার করে তার হক আদায় করতে হবে এবং কাম্য বিষয়ে শোকর করে তার হক আদায় করতে হবে। পরীক্ষা এই যে, কে এতে দৃঢ়পদ থাকে এবং কে থাকে না, তা দেখা। বুয়ুর্গগণ বলেন : বিপদাপদে সবার করার তুলনায় বিলাস-বাসন ও আরাম-আয়েশে হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাক অধিক কঠিন। তাই হযরত ওমর (রাঃ) বলেন :

أَرْثَا، بَلِينَا بِالضَّرَاءِ فَصَبَرْنَا وَبَلِينَا بِالسَّرَاءِ فَلَمْ نَصْبِر যখন বিপদে পতিত হলাম, তখন তো সবার করলাম, কিন্তু যখন সুখ ও আরাম-আয়েশে লিপ্ত হলাম, তখন সবার করতে পারলাম না। অর্থাৎ, এর হক আদায়ে দৃঢ়পদ থাকতে পারলাম না।

الْأَشْيَاءِ

২২৭

اقترب للناس

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَآلَهُمْ أَهْلًا
 الَّذِينَ يَدْكُرُ الْهِتَمَ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَفَرُوا ①
 خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُولُكُمْ إِلَيْنِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ②
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ③ لَوْ يَعْلَمُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا
 عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ④ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً
 فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ⑤
 وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا
 مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ⑥ قُلْ مَنْ يَمْلِكُكُمْ بِالنَّارِ
 وَاللَّهُ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ⑦
 أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَسْبَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ
 أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ ⑧ بَلْ مَتَّعْنَاهُمْ أَزْوَاجًا
 أَبْنَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْمُرُوءَاتُ لَا يَرَوْنَ أَنَّ النَّارَ
 الْآرِضَ تَنْقُصُهُمْ أَنْظَرْنَا لَهُمُ الْغَايُونَ ⑨ قُلْ إِنَّمَا
 أَنْذَرُكُمْ بِالْحَقِّ وَالْكَسْبِ الضَّمُّ الدُّعَاءُ إِذَا مَا يَنْذَرُونَ ⑩

(৩৬) কাফেররা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনার সাথে ঠাট্টা করা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ থাকে না, একি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করে? এবং তারা ই তো রহমান-এর আলোচনায় অস্বীকার করে। (৩৭) সৃষ্টিগতভাবে মানুষ দ্বরাপ্রবণ, আমি সত্বরই তোমাদেরকে আমার নির্দশনাবলী দেখাব। অতএব আমাকে শীঘ্র করতে বলো না। (৩৮) এবং তারা বলে : যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এই ওয়াদা কবে পূর্ণ হবে? (৩৯) যদি কাফেররা ঐ সময়টি জ্ঞানত, যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পৃষ্ঠদেশ থেকে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন না। (৪০) বরং তা আসবে তাদের উপর অতর্কিতভাবে, অতঃপর তাদেরকে তা হতবুদ্ধি করে দেবে, তখন তারা তা রোধ করতেও পারবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। (৪১) আপনার পূর্বেও অনেক রসুলের সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়েছে। অতঃপর যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা করত তা উল্টো ঠাট্টাকারীদের উপরই আপতিত হয়েছে। (৪২) বলুন : 'রহমান' থেকে কে তোমাদেরকে হেফাযত করবে রাতে ও দিনে। বরং তারা তাদের পালনকর্তার সুরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। (৪৩) তবে কি আমি ব্যতীত তাদের এমন দেব-দেবী আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করবে? তারা তো নিজেদেরই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং তারা আমার মোকাবেলায় সাহায্যকারীও পাবে না। (৪৪) বরং আমি তাদেরকে এবং তাদের বাপ-দাদাকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলাম, এমনকি তাদের আয়ুষ্কালও দীর্ঘ হয়েছিল। তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে হ্রাস করে আনছি। এরপরও কি তারা বিজয়ী হবে? (৪৫) বলুন : আমি তো কেবল ওহীর মাধ্যমেই তোমাদেরকে সতর্ক করি, কিন্তু বখিরদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে সতর্কবাণী শোনে না।

দ্বরা-প্রবণতা নিন্দনীয় : عجل - শব্দের
 অর্থ দ্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোন কাজ সময়ের পূর্বেই করা। এটা স্বভাব
 দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। কোরআন পাকের অন্যত্রও একে মানুষের দুর্বলতারূপে
 উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে : وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا
 মানুষ অত্যন্ত দ্বরাপ্রবণ। হযরত মুসা (আঃ) যখন বনী-ইসরাঈল থেকে
 অগ্রবর্তী হয়ে তুর পর্বতে পৌঁছে যান, তখন সেখানেও এই দ্বরাপ্রবণতার
 কারণে তাঁর প্রতি রোষ প্রকাশ করা হয়। পয়গম্বর ও সৎকর্মপরায়ণদের
 সম্পর্কে “ভাল কাজে অগ্রগামী থাকাকে” প্রশংসনীয়রূপে বর্ণনা করা
 হয়েছে। বলাবাহুল্য, এটা দ্বরা-প্রবণতা নয়। কারণ, এটা সময়ের পূর্বে
 কোন কাজ করা নয়; রবং এ হচ্ছে সময়ে অধিক সং ও পূণ্যকাজ করার
 চেষ্টা।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের মজ্জায় যেসব দুর্বলতা
 নিহিত রয়েছে, তন্মধ্যে এক দুর্বলতা হচ্ছে দ্বরা-প্রবণতা। স্বভাবগত ও
 মজ্জাগত বিষয়কে আরবরা এরূপ ভঙ্গিতেই ব্যক্ত করে। উদাহরণতঃ
 কারও স্বভাবে ক্রোধ প্রবল হলে আরবরা বলে : লোকটি ক্রোধ দ্বারা
 সৃজিত হয়েছে।

سَأُولُكُمْ إِلَيْنِ — এখানে (নির্দেশনাবলী) বলে রসূলুল্লাহ
 (সাঃ)-এর সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্যদানকারী মু'জেযা ও অবস্থা বোঝানো
 হয়েছে; —(কুরতুবী) যেমন বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে এ জাতীয় নির্দশনাবলী
 স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। পরিণামে মুসলমানদের বিজয় সবার চোখে
 স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল; অথচ তাদেরকে সর্বাধিক দুর্বল ও হেয় মনে করা
 হত।

وَتَضُمُّ الْمَوَازِينَ : কোয়ামতে আমলের ওজন ও দাঁড়িপাল্লা : —এর বহুবচন। অর্থ—

ওজনের যন্ত্র তথা দাঁড়িপাল্লা। আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আমল ওজন করার জন্যে অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা আলাদা দাঁড়িপাল্লা হবে কিংবা ভিন্ন ভিন্ন আমল ওজন করার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন দাঁড়িপাল্লা হবে। কিন্তু উম্মতের অনুসরণীয় আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দাঁড়িপাল্লা একটিই হবে। তবে বহুবচনে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, একটি দাঁড়িপাল্লাই অনেকগুলো দাঁড়িপাল্লার কাজ দেবে। কেননা, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে কোয়ামত পর্যন্ত কত যে সৃষ্টজীব হবে, তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। তাদের সবার আমল এই দাঁড়িপাল্লায়ই ওজন করা হবে। قسط শব্দের অর্থ ইনসাফ, ন্যায্যবিচার। অর্থাৎ, এই দাঁড়িপাল্লা ইনসাফ ও ন্যায্যবিচার সহকারে ওজন করবে — সামান্যও বেশ-কম হবে না। মুস্তাদারকে হযরত সালমান (রাঃ)—এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কোয়ামতের দিন আমল ওজন করার জন্যে এত বিরাট ও বিস্তৃত দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে যে, তাতে আকাশ ও পৃথিবীকে ওজন করতে চাইলে এগুলোরও সংকুলান হয়ে যাবে।— (মাহহারী)

وَأَنَّ كَانَ وَمُثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَيْتَابُهَا — অর্থাৎ হিসাবের দিন এবং আমল ওজন করার সময় মানুষের সমস্ত ছোট-বড়, ভাল-মন্দ আমল উপস্থিত করা হবে, যাতে হিসাব ও ওজনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ : তিরমিযী হযরত আয়েশার রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সামনে বসে বলল : ইয়া রসূলুল্লাহ, আমার দু'টি ক্রীতদাস আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, কাজ-কারবারে কারচুপি করে এবং আমার নির্দেশ অমান্য করে। এর বিপরীতে আমি মুখেও তাদেরকে গালি-গালাজ করি এবং হাতে মারপিটও করি। আমার ও এই গোলামদুয়ের ইনসাফ কিভাবে হবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তাদের নাফরমানী, কারচুপি এবং ওজ্ঞাত ওজন করা হবে। এরপর তোমার গালি-গালাজ ও মারপিট ওজন করা হবে। তুমি যে শাস্তি দাও তা যদি তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তবে অবশিষ্টটুকু তোমার অনুগ্রহ বলে গণ্য হবে। আর যদি অপরাধের তুলনায় শাস্তি বেশী হয়, তবে তোমার বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে। লোকটি একথা শুনে অন্যত্র সরে গেল এবং কান্না জুড়ে দিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তুমি কি কোরআনে এই আয়াত পাঠ করনি وَتَضُمُّ الْمَوَازِينَ الْقِيَمَةَ — লোকটি আরম্ভ করল : এখন তো তাদেরকে মুক্ত করে এই হিসাবের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই।—(কুরতুবী)

الْفَرَكَانَ وَضِيَاءَ وَذَكَرَ الْمُنْتَقِينَ — এই তিনটি গুণই তওরাতের।

অর্থাৎ, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী, অর্থাৎ, মানবাত্মার জন্যে আলো এবং ذَكَر অর্থাৎ মানুষের জন্যে উপদেশ ও হেদায়েতের মাধ্যম। কেউ কেউ বলেন : فرقان বলে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য বোঝানো হয়েছে, যা সর্বত্র মুসা (আঃ)—এর সাথে ছিল ; অর্থাৎ ফেরাউনের মত শত্রুর গৃহে তিনি লালিত-পালিত হয়েছেন, যোকাবেলার সময় আল্লাহ্ তাআলা ফেরাউনকে লালিত করেছেন, এরপর ফেরাউনী

(৪৬) আপনার পালনকর্তার আযাবের কিছুমাত্রও তাদেরকে স্পর্শ করলে তারা বলতে থাকবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা অবশ্যই পাণ্ডী ছিলাম।' (৪৭) আমি কোয়ামতের দিন ন্যায্যবিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি ভুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট। (৪৮) আমি মুসা ও হারুনকে দান করেছিলাম যীমাংসাকারী গ্রন্থ, আলো ও উপদেশ, আল্লাহ্-ভীরুদের জন্যে — (৪৯) যারা না দেখেই তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কোয়ামতের ভয়ে শঙ্কিত। (৫০) এবং এটা একটা বরকতময় উপদেশ, যা আমি নামিল করেছি। অতএব তোমরা কি একে অস্বীকার কর? (৫১) আর, আমি ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে তার সংপৃষ্ঠা দান করেছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে সন্ধ্যা পরিজ্ঞাতও ছিলাম। (৫২) যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন : 'এই মূর্তিগুলো কী, যাদের তোমরা পূজারী হয়ে বসে আছ' ? (৫৩) তারা বলল : আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এদের পূজা করতে দেখেছি। (৫৪) তিনি বললেন : তোমরা প্রকাশ্য গোমরাহীতে আছ এবং তোমাদের বাপ-দাদারাও। (৫৫) তারা বলল : তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ আগমন করেছ, না তুমি কৌতুক করছ? (৫৬) তিনি বললেন : না, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা যিনি নাভোমডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তা, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন ; এবং আমি এই বিষয়েরই সাক্ষ্যদাতা। (৫৭) আল্লাহর কসম, যখন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

الْأَنْبِيَاءُ

২২৮

اقترب للناس

فَجَعَلَهُمْ جُودًا ۖ اِلَّا كَيْدًا لِلّٰهِمْ لَمَّا هُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾
 قَالُوا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَيْتَانِ اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ قَالُوا
 سَمِعْنَا قَتْلَ يَدْرَهُمْ فَقَالَ لَهُ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٥٢﴾ قَالُوا
 قَاتُوْا بِهِ عَلَىٰ اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٣﴾ قَالُوا
 اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْهَيْتَانِ اِبْرٰهِيْمُ ﴿٥٤﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ۖ
 كَيْدُهُمْ هٰذَا فَاسْتَوْفُّوْا اِنْ كُنْتُمْ نَاطِقِيْنَ ﴿٥٥﴾ فَرَجَعُوْا اِلٰى
 اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا اِنَّكُمْ اَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ﴿٥٦﴾ ثُمَّ نَحْسَبُوْا عَلٰى
 رُءُوسِهِمْ لَمَّا عَلِمْتَ مَا هٰؤُلَاءِ يَنْطِقُوْنَ ﴿٥٧﴾ قَالِ اتَّبِعُوْنَ
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ؕ اَوْفِ
 لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٥٨﴾
 قَالُوا حَرِّقُوْهُ وَانصُرُوا الْهَيْتَةَ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ ﴿٥٩﴾
 فَلَمَّا بَايَرُوْا كُوْنِيْ رَدًّا وَسَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٠﴾ وَاَمَّا دُوْ
 بِهٖ كَيْدًا ۖ فَجَعَلَهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿٦١﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا
 اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٢﴾ وَهَمَّيْنَاهُ
 اِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ﴿٦٣﴾

(৫৮) অতঃপর তিনি সেগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন ওদের প্রধানটি ব্যতীত : যাতে তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করে। (৫৯) তারা বলল : আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার কে করল? সে তো নিচয়ই কেন জানিম। (৬০) কতক লোকে বলল : আমরা এক যুবককে তাদের সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে শুনেছি; তাকে ইব্রাহীম বলা হয়। (৬১) তারা বলল : তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা দেখে। (৬২) তারা বলল : হে ইব্রাহীম, তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ ব্যবহার করছে? (৬৩) তিনি কলনে : না, এদের এই প্রধানই তো একাক্ষ করেছি। অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তারা কথা বলতে পারে। (৬৪) অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করল এক বলল : লোকসকল : তোমরাই যে-ইনসাফ। (৬৫) অতঃপর তারা ঝুঁকে পেল মস্তক নত করে : “তুমি তো জান যে, এরা কথা বলে না”। (৬৬) তিনি কলনে : তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর এবাদত কর, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না এক কতিও করতে পারে না? (৬৭) যিক তোমাদের জন্যে এক তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরই এবাদত কর, ওদের জন্যে। তোমরা কি বোঝ না? (৬৮) তারা বলল : একে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের উপাস্যদের সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও। (৬৯) আমি কলাম : ‘হে অগ্নি, তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও’। (৭০) তারা ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে কন্দি ঝাঁটতে চাইল, অতঃপর আমি তাদেরকেই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। (৭১) আমি তাঁকে ও লুতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ণুর জন্যে কল্যাণ রেখেছি। (৭২) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও পুরুষকারবরূপ দিলাম ইয়াকুব এক প্রত্যেককেই সৎকর্মপরায়ণ করলাম।

সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের সময় সমুদ্রে রাজ্য সৃষ্টি হয়ে তিনি রক্ষা পান এবং ফেরাউনী সৈন্যবাহিনী সলিল-সমাধি লাভ করে। এমনভাবে পরবর্তীতে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার এই সাহায্য প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। উভয়টিই তওরাতের বিশেষণ। কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, الْقُرْآن এর পরে وَاو দ্বারা পৃথক করা থেকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে ফরান তওরাত নয়—অন্য কোন বিষয়।

وَتَاللّٰهِ لَآ كَيْدَ لِّدُنِّ اَصْنَامِكُمْ

যে, একখাটি ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের সামনে বলেছিলেন। কিন্তু এতে প্রশ্ন হয় যে, ইব্রাহীম (আঃ) তাদের কাছে اِنِّىْ سَيِّئٌ (আমি অসুস্থ)—এর ওপর পেশ করে তাদের সাথে ঈদের সমাবেশে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত ছিলেন। যখন মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটল, তখন সম্প্রদায়ের লোকেরা অনুসন্ধান রত হল যে, কাজটি কে করল? যদি ইব্রাহীম (আঃ)—এর উপরোক্ত কথা পূর্বেই তাদের জানা থাকত, তবে এতসব ষোঁড়াখুঁজির কি প্রয়োজন ছিল? প্রশ্নমেই তারা বোঝে নিত যে, ইব্রাহীমই একাক্ষ করেছে। এর জগুয়াব হিসেবে তফসীরে সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, ইব্রাহীম একাই এ মনোভাব পোষণ করতেন। সমগ্র সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় তাঁর কোন শক্তি ছিল না। একথা ভেবেই সম্ভবতঃ তাঁর কথার দিকে কেউ জাক্ষেপ করেনি এবং ভুলেও যায়—(বয়ানুল-কোরআন) এটাও সম্ভবপর যে, যারা ষোঁড়াখুঁজি করছিল, তারা অন্য লোক ছিল। ইব্রাহীম (আঃ)—এর কথাবার্তা তারা জানত না। তফসীরবিদদের মধ্যে মুজাহিদ ও কাতাদাহ বলেন : ইব্রাহীম (আঃ) উপরোক্ত কথাটি সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বলেননি; বরং মনে মনে বলেছিলেন। অথবা সম্প্রদায়ের লোকেরা চলে যাওয়ার পর যে দু’একজন দুর্বল লোক সেখানে ছিল, তাদেরকে বলেছিলেন। এরপর মূর্তি ভাঙ্গার ঘটনা ঘটলে যখন ষোঁড়াখুঁজি শুরু হয়, তখন তারা এই তথ্য সরবরাহ করে—(কুরতুবী)

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

جذ جُذًا — এর বহুবচন। এর অর্থ স্বভ।

অর্থাৎ, ইব্রাহীম (আঃ) মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে খণ্ডবিখণ্ড করে দিলেন।

اِلَّا كَيْدًا لِلّٰهِمْ — অর্থাৎ, শুধু বড় মূর্তিটিকে ভাঙ্গার কবল থেকে রেহাই

দিলেন। এটা হয় দৈহিক আকার-আকৃতিতে অন্য মূর্তিদের চাইতে বড় ছিল, না হয় আকার-আকৃতিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও পূজারীরা তাকে বড় বলে মান্য করত।

لَمَّا هُمْ اِلَيْهِ - লম্বের সর্বনাম দ্বারা ইব্রাহীম (আঃ)—কে

বোঝানো হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই বর্ণনা করে আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এ কার্য দ্বারা ইব্রাহীম (আঃ)—এর উদ্দেশ্য ছিল যে, তারা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করুক এবং আমাকে জিজ্ঞেস করুক যে, তুমি একাক্ষ কেন করলে? এরপর আমি তাদেরকে তাদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে জ্ঞাত করব। এর অন্য এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, ইব্রাহীম (আঃ) এ আশায় কাজটি করলেন যে, তাদের উপাস্য মূর্তিদেরকে খণ্ড-বিখণ্ড দেখলে এরা যে পূজার যোগ্য নয়, এ জ্ঞান তাদের মধ্যে ফিরে আসবে। এরপর তারা ইব্রাহীম (আঃ)—এর ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (দুই) কলবী বলেন, সর্বনাম দ্বারা كبير (প্রধান মূর্তি)—কে

বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, তারা কিরে এসে যখন সবগুলো মূর্তিকে ঞ্চ-বিচ্ছদ এবং বড় মূর্তিকে আশ্রিত অক্ষত ও কাঁধে কুড়াল রাখা অবস্থায় দেখবে, তখন সম্ভবতঃ এই বড় মূর্তির দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাকে জিজ্ঞেস করবে যে, এরূপ কেন হল? সে যখন কোন উত্তর দেবে না তখন তার অক্ষমতাও তাদের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি মিথ্যা নয়-- রূপক অর্থে ছিল, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা : **قَالَ بَلْ فَكَّلَ كَيْدَهُمْ هَذَا تَسْتَوْتُمْ**

ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রেক্ষতার করে আনল এবং তাঁর স্বীকারোক্তি নেয়ার জন্যে প্রশ্ন করল : তুমি আমাদের দেবতাদের সাথে এ ব্যবহার করেছ কি? তখন ইবরাহীম (আঃ) জগুয়াব দিলেন : না, এদের প্রধানই একাজ করেছে। যদি তারা কথা বলার শক্তি রাখে, তবে তোমরা তাদেরকেই জিজ্ঞেস কর।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাজটি তো ইবরাহীম (আঃ) করেছিলেন। সুতরাং তা অস্বীকার করা এবং মূর্তিদের প্রধানকে অভিযুক্ত করা বাহ্যতঃ বাস্তববিরোধী কাজ, যাকে মিথ্যা বলা যায়। আল্লাহর দোস্ত হযরত ইবরাহীম (আঃ) এহেন মিথ্যাচারের অনেক উদ্বোধন। এ প্রশ্নের উত্তর দানের জন্যে তফসীরবিদগণ নানা সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে তফসীরের সার-সংক্ষেপ তথা বয়ানুল-কোরআনে যে সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর এ উক্তি ধরে নেয়ার পর্যায়ে ছিল; অর্থাৎ, তোমরা একথা ধরে নাও না কেন যে, একাজ প্রধান মূর্তিই করে থাকবে। ধরে নেয়ার পর্যায়ে বাস্তববিরোধী কথা বলা মিথ্যার আওতায় পড়ে না; যেমন— কোরআনে আছে **إِنْ كُنْ لِلرَّحْمَنِ وَكَيْ**

অর্থাৎ, রহমান ‘আল্লাহ’ এর কোন সম্ভান থাকলে আমি সর্বপ্রথম তাঁর এবাদতকারীদের তালিকাভুক্ত হতাম। কিন্তু নির্মল ও দৃষ্টিহীন জগুয়াব বাহুর-মুহীত, কুরতুবী, রুহুল-মা’আনী ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, এখানে **إِسْنَادٌ مَجَازٍ** তথা রূপক ভঙ্গিতে ইবরাহীম (আঃ) যে কাজ স্বহস্তে করেছেন, তা প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। কেননা, এ মূর্তিটিই ইবরাহীম (আঃ)-কে একাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর সম্প্রদায় এই মূর্তির প্রতি সর্বাধিক সম্মান প্রদর্শন করত। সম্ভবতঃ এ কারণেই বিশেষভাবে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণতঃ যদি কোন বিচারক চুরি করার দায়ে চোরের হস্ত কর্তন করে বলে যে, আমি হস্ত কর্তন করিনি; বরং তোমার কর্ম এবং তোমার বক্রমুখিতাই হস্ত কর্তন করেছে। কেননা, তার কর্মই হস্ত কর্তনের কারণ।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) কার্যভঃ মূর্তি ভাঙকে প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছিলেন। রেওয়াজেতে রয়েছে যে, মূর্তি ভাঙ্গার কুড়ালটি তিনি প্রধান মূর্তির কাঁধে অথবা হাতে রেখে দিয়েছিলেন, যাতে দর্শকমাত্রই ধারণা করে যে, সে-ই একাজ করেছে। এরপর কথার মাধ্যমেও তিনি কাজটি প্রধান মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করেছেন। বলাবাহুল্য, এটা রূপক ভঙ্গি। আরবী ভাষার প্রসিদ্ধ উক্তি **أَبَتِ الرِّبْعُ الْبَقْلَةَ** (অর্থাৎ, বসন্তকালীন বৃষ্টি শস্য উৎপাদন করেছে।) এর দৃষ্টান্ত। উৎপাদনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলা। কিন্তু এ উক্তিতে বাহ্যিক কারণের দিকে উৎপাদনের সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়েছে। একে মিথ্যা অভিহিত করা যায় না। এমনভাবে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রধান মূর্তির দিকে কাজটি কার্যভঃ ও উক্তিগতভাবে সম্বন্ধ করাও কিছুতেই মিথ্যা নয়। অনেক দ্বীনী

উপকারিতার কারণে এই রূপক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি উপকারিতা ছিল এই যে, দর্শকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হোক যে, সম্ভবতঃ পূজ্য অ্যান্য ছোট মূর্তিকে শরীক করার কারণে বড় মূর্তিটি ক্রুদ্ধ হয়ে একাজ করেছে। এই ধারণা দর্শকদের মনে সৃষ্টি হলে তত্ত্বীদের পথ খুলে যায় যে, একটি বড় মূর্তি যখন নিজের সাথে ছোট মূর্তিদের শরীকানা সহ্য করতে পারে না, তখন রাক্বুল আলামীন আল্লাহ তাআলা এই প্রস্তরদের শরীকানা নিজের সাথে কিরূপে যেনে নেন?

দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, তখন তাদের মনে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়া মুক্তিসঙ্গত ছিল যে, যাদেরকে আমরা খোদা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করি, তারা যদি বাস্তবিকই তদ্রূপ হত, তবে কেউ তাদেরকে ভেঙ্গে চুরখার করতে পারত না। তৃতীয় এই যে, যদি তিনি কাজটিকে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করে দেন, তবে যে মূর্তি অন্য মূর্তিদেরকে ভেঙ্গে দিতে পারে, তার মধ্যে বাকশক্তিও থাকে উচিত। তাই বলা হয়েছে : **تَسْتَوْتُمْ**

ইবরাহীম (আঃ) মোটকথা, কোন দৃষ্টিগত আশ্রয় না নিয়ে ইবরাহীম (আঃ)-এর উপরোক্ত উক্তিকে বাহ্যিক অর্থে রেখে বলা যায় যে, ইবরাহীম (আঃ) রূপক ভঙ্গিতে বড় মূর্তির দিকে কাজটির সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন। এরূপ করা হলে তাতে কোনরূপ মিথ্যা ও অবাস্তব সন্দেহ থাকে না। শুধু এক প্রকার গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে।

হাদীসে ইবরাহীম (আঃ)-এর দিকে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করার স্বরূপ : এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, সहीহ হাদীসসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : **— أَنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَكُنْ بِغَيْرِ ثَلَاثَ** অর্থাৎ, ইবরাহীম (আঃ) তিন জায়গা ব্যতীত কোন দিন মিথ্যা কথা বলেননি।—(বোখারী, মুসলিম) অতঃপর এই তিন জায়গার বিবরণ দিতে গিয়ে হাদীসে বলা হয়েছে, তন্মধ্যে দু’টি মিথ্যা খাস আল্লাহর জন্যে বলা হয়েছে। একটি **بَلْ فَكَّلَ كَيْدَهُمْ**—আয়াতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি

ঈদের দিন সম্প্রদায়ের কাছে গুণ পেশ করে **إِنِّي رَيْبٌ** (আমি অসুহ) বলা এবং তৃতীয়টি শত্ৰীর হেফাজতের জন্যে বলা হয়েছে। ঘটনা এই যে, ইবরাহীম (আঃ) শত্ৰী হযরত সারাহসহ সফরে এক জনপদের নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। জনপদের প্রধান ছিল যালেম ও ব্যতিচারী। কোন ব্যক্তির সাথে তার শত্ৰীকে দেখলে সে শত্ৰীকে পাকড়াও করত এবং তার সাথে ব্যতিচার করত। কিন্তু কোন কন্যা পিতার সাথে কিংবা ভগিনী স্বীয় ভাইয়ের সাথে থাকলে সে এরূপ করত না। ইবরাহীম (আঃ)-এর শত্ৰীসহ এই জনপদে পৌছার স্বর কেউ এই যালেম ব্যতিচারীর কাছে পৌছে দিলে সে হযরত সারাহকে প্রেক্ষতার করিয়ে আনল। প্রেক্ষতারকারীরা ইবরাহীম (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করল : এই মহিলার সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্ক কি? ইবরাহীম (আঃ) যালেমের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বলে দিলেন : সে আমার ভগিনী। (এটাই হাদীসে বর্ণিত তৃতীয় মিথ্যা।) কিন্তু এতদসত্ত্বেও সারাহকে প্রেক্ষতার করা হল। ইবরাহীম (আঃ) সারাহকে বলে দিলেন যে, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তুমিও এর বিরপীত বোলা না। কারণ, ইসলামী সম্পর্কে তুমি আমার ভগিনী। এখন এই দেশে আমরা দু’জনই মাত্র মুসলমান এবং ইসলামী বাত্ব্বে সম্পর্কশীল। ইবরাহীম (আঃ) যালেমের যোকাবেলা করতে সক্ষম ছিলেন না। তিনি আল্লাহর কাছে সবিনয় প্রার্থনার জন্যে নামায পড়তে শুরু করলেন। হযরত সারাহ যালেমের সামনে নীত হলেন। সে যখনই কুমতলবে তাঁর দিকে হাত বাড়াল, তখন সে অবশ ও বিকলাস হয়ে পেল। তখন সারাহকে অনুরোধ করল যে, তুমি দোয়া কর, যাতে আমি পূর্ববৎ

সুস্থ হয়ে যাই। আমি তোমাকে কিছুই বলব না। হযরত সারাহর দোয়ায় সে সুস্থ ও সবল হয়ে গেল। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে পুনরায় খারাপ নিয়তে তাঁর দিকে হাত বাড়তে চাইল, কিন্তু আল্লাহর হুকুমে সে আবার অবশ হয়ে গেল। এমনভাবে তিনবার এরূপ ঘটনার পর সে সারাহকে ফেরত পাঠিয়ে দিল। (এ হচ্ছে হাদীসের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ)। এই হাদীসে ইবরাহীম (আঃ)-এর দিকে পরিস্কারভাবে তিনটি মিথ্যার সম্বন্ধ করা হয়েছে, যা নবুওয়তের শান ও পবিত্রতার খেলাফ। কিন্তু এর জওয়াব হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তা এই যে, তিনটির মধ্যে একটিও সত্যিকার অর্থে মিথ্যা ছিল না; বরং এটা ছিল অলংকার শাস্ত্রের পরিভাষায় “তওরিয়া”। এর অর্থ দুর্থাবোধক ভাষা ব্যবহার করা এবং শ্রোতা কর্তৃক এক অর্থ বোঝা ও বক্তার নিয়তে অন্য অর্থ থাকা। জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ফেকাহবিদগণের সর্বসম্মত মতে এই কৌশল অবলম্বন করা জায়েয ও হালাল। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লেখিত হাদীসে এর প্রমাণ এই যে, ইবরাহীম (আঃ) নিজেই সারাহকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে ভগিনী বলেছি। তোমাকে জিজ্ঞেস করা হলে তুমিও আমাকে ভাই বলা। ভগিনী বলার কারণও তিনি বলে দিয়েছেন যে, আমার উভয়েই ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী। বলাবাহুল্য এটাই “তওরিয়া”। এই তওরিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের “তাকায়্যুহ” থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাকায়্যুহর মধ্যে পরিস্কার মিথ্যা বলা হয় এবং তদনুযায়ী কাজও করা হয়। তওরিয়াতে পরিস্কার মিথ্যা বলা হয় না; বরং বক্তা যে অর্থে কথা বলে, তা সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও সত্য হয়ে থাকে; যেমন—ইসলামী সম্পর্কের দিক দিয়ে ভ্রাতা-ভগিনী হওয়া। উল্লেখিত হাদীসের ভাষায় এই কারণটি পরিস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেছে যে, এটা মিথ্যা ছিল না; বরং তওরিয়া ছিল। হুবহু এমনি ধরনের কারণ প্রথমে দুই জায়গায়ও বর্ণনা করা যেতে পারে। **بَلْ فَكَّرَ وَكَيْدُهُ** —এর কারণ একটু আগেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে মূর্তি ভাঙ্গার কাজটিকে রূপক অর্থে বড় মূর্তির দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। **وَأَنَّهُ سَفِيمٌ** বাক্যটিও তদ্রূপ। কেননা, **سَفِيمٌ** (অসুস্থ) শব্দটি যেমন শারীরিক অসুস্থতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, তেমনি মানসিক অসুস্থতা অর্থাৎ চিন্তান্বিত ও অবসাদগ্রস্ত হওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইবরাহীম (আঃ) দ্বিতীয় অর্ধের দিক দিয়েই “আমি অসুস্থ” বলেছিলেন, কিন্তু শ্রোতার একে শারীরিক অসুস্থতার অর্থে বোঝেছিল। এই হাদীসেই “তিনটির মধ্যে দু’টি মিথ্যা আল্লাহর জন্যে ছিল” এই কথাগুলো স্বয়ং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এটা কোন গোনাহের কাজ ছিল না। নতুবা গোনাহের কাজ আল্লাহর জন্যে করার কোন অর্থই হতে পারে না; গোনাহের কাজ না হওয়া তখনই হতে পারে, যখন এগুলো প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা না হয়; বরং এমন বাক্য হয়, যার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে — একটি মিথ্যা ও অপরটি শুদ্ধ।

ইবরাহীম (আঃ)-এর মিথ্যা সংক্রান্ত হাদীসকে দ্রষ্টব্য আখ্যা দেয়া মূর্ততা : মিথ্যা কাদিয়ানী ও অন্যান্য প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ পাশ্চাত্যের পন্ডিভদের মোহগ্রস্ত মুসলমান এই হাদীসটিকে বিশুদ্ধ সনদবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এ কারণে দ্রষ্টব্য ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহর দোস্ত ইবরাহীম (আঃ)-কে মিথ্যাবাদী বলা জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই খলীলুল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলার চাইতে সনদের বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলে দেয়া সহজতর। কেননা, হাদীসটি কোরআনের পরপন্থী। এরপর তারা এ থেকে একটি সামগ্রিক নীতি আবিষ্কার করেছে যে, যে হাদীস কোরআনের পরিপন্থী হবেন, তা যতই শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হোক না কেন, মিথ্যা ও দ্রষ্টব্য আখ্যায়িত হবে। এই

নীতিটি স্বস্থানে সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং মুসলিম উম্মতের কাছে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার পর্যায়ে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীসবিদগণ সারা জীবন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেসব হাদীসকে শক্তিশালী ও বিশুদ্ধসনদ দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীসও এরূপ নেই, যাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা যায়। বরং স্বল্পবুদ্ধিতা ও বক্তৃদ্ধিতার ফলেই নির্দেশিত হাদীসকে কোরআনের বিরোধীরূপে খাড়া করে একথা বলে গা খালাস করা হয় যে, হাদীসটি কোরআন-বিরোধী হওয়ার কারণে নির্ভরযোগ্য ও ধর্তব্য নয়। আলোচ্য হাদীসেই দেখা গেছে যে, “তিনটি মিথ্যা” বলে যে তওরিয়া বোঝানো হয়েছে, তা স্বয়ং হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। এখন তওরিয়া বোঝাতে গিয়ে **كَذِبَات** (মিথ্যা) শব্দ কেন ব্যবহার করা হল? এর কারণ তাই, যা ইতিপূর্বে সূরা তোয়া-হায় মুসা (আঃ)-এর কাহিনীতে হযরত আদম (আঃ)-এর ভুলকে **عَصَى وَغَوَى** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণে উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ, যারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল, তাদের সামান্যতম দুর্বলতাকে এবং আযীমত ত্যাগ করে রুখসত অনুযায়ী আমল করাকেও ক্ষমার চোখে দেখা হয় না। কোরআন পাক এ ধরনের বিষয়ে পয়গম্বরগণের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার ক্রোধবানী প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। সুপারিশ সম্পর্কিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত হাদীসে আছে যে, হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি একত্রিত হয়ে হিসাব-নিকাশ দ্রুত নিশ্চিতি হওয়ার জন্যে পয়গম্বরগণের কাছে সুপারিশ প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক পয়গম্বর তাঁর কোন ক্রটির কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে সাহসী হবেন না। অবশেষে সবাই শেষনবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি এই মহাসুপারিশের জন্যে দন্ডায়মান হবেন। হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ হাদীসে বর্ণিত তওরিয়ার ভঙ্গিতে কথিত এসব বাক্যে নিজের দোষ ও ক্রটি সাব্যস্ত করে ওযর পেশ করবেন। এই ক্রটির দিকে ইশারা করার জন্যে হাদীসে এগুলোকে **كَذِبَات** তথা, ‘মিথ্যা’ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর এরূপ করার অধিকার ছিল এবং তাঁর হাদীস বর্ণনা করার সীমা পর্যন্ত আমাদেরও এরূপ বলার অধিকার আছে। কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আঃ) মিথ্যা বলেছে বললে তা জায়েয হবে না। সূরা তোয়া-হায় মুসা (আঃ)-এর কাহিনীতে কুরতুবী ও বাহরে-মুহীতের বরাত দিয়ে পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন অথবা হাদীসে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে ব্যবহৃত এ ধরনের শব্দ কোরআন তোলাওয়াত, কোরআন শিক্ষা অথবা হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তো উল্লেখ করা যায়, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোন পয়গম্বর সম্পর্কে এ ধরনের শব্দ বলা নাজায়েয ও ধৃষ্টতা বৈ নয়।

উল্লেখিত হাদীসে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও আমল খাঁটি করার সূক্ষ্মতা : হাদীসে ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে উল্লেখিত তিনটি মিথ্যার মধ্য থেকে দু’টি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর জন্যে ছিল, কিন্তু হযরত সারাহ সম্পর্কে কথিত তৃতীয় মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ বলা হয়নি। অথচ স্ত্রীর আবরু রক্ষা করাও সাক্ষাত দ্বীনের কাজ। এ সম্পর্কে তফসীরে-কুরতুবীতে কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী থেকে একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ণিত রয়েছে। ইবনে আরাবী বলেন : তৃতীয়-মিথ্যা সম্পর্কে এরূপ না বলার বিষয়টি সংকর্মপরায়ণ ও ওলীদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। যদিও এটা দ্বীনেরই কাজ ছিল, কিন্তু এতে স্ত্রীর সতীত্ব ও হেরেমের হোফায়ত সম্পর্কিত পার্থিব স্বার্থও জড়িত ছিল। এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়ার কারণেই একে **فِي الْغُلَّةِ** (আল্লাহর মধ্যে) এবং **لِللَّهِ** (আল্লাহর জন্যে) এর তালিকা থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন : **أَكْلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَأَلْوَا** —(খাটি এবাদত আল্লাহর

জন্যেই) স্ত্রীর সতীত্ব রক্ষার এই ব্যাপারটি আমাদের অথবা অন্য কারও হলে নিঃসন্দেহে একেও উপরোক্ত তালিকায় গণ্য করা হত। কিন্তু পয়গম্বরগণের মাহাত্ম্য সবার উপরে। তাঁদের জন্যে এতটুকু পার্থিব স্বার্থ শামিল হওয়াকেও পূর্ণ ইখলাসের পরিপন্থী মনে করা হয়েছে।

ইবরাহীম (আঃ)—এর জন্যে নমরূদের অগ্নিকুন্ড পুষ্পাদ্যানে পরিণত হওয়ার স্বরূপ : যারা যু'জ্জিয়া ও অভ্যাসবিরুদ্ধ কার্যাবলী অস্বীকার করে, তারা এ ব্যাপারে বিচিত্র ও অভিনব অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আসল কথা এই যে, যে গুণ কোন বস্তুর সত্তার জন্যে অপরিহার্য হয়, তা কোন সময় সেই বস্তু থেকে পৃথক হতে পারে না—দর্শনশাস্ত্রের এই নীতি একটি বাতিল ও প্রমাণহীন নীতি। সত্য এই যে, জগতের সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে কোন বস্তুর সত্তার জন্যে কোন গুণ অপরিহার্য নয়। বরং আল্লাহর চিরাচরিত অভ্যাস এই যে, অগ্নির জন্যে উত্তাপ ও প্রজ্জ্বলিত করা জরুরী, পানির জন্যে ঠান্ডা করা ও নির্বাণ করা জরুরী, কিন্তু এই জরুরী অবস্থা শুধু অভ্যাসের পর্যায়েই সীমাবদ্ধ—যুক্তিসঙ্গত নয়। দার্শনিকগণও এর যুক্তিসম্মত হওয়ার কোন গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ পেশ করতে পারেননি; এই অপরিহার্যতা যখন অভ্যাস, তখন আল্লাহ তাআলা যদি কোন বিশেষ রহস্যের কারণে কোন অভ্যাস পরিবর্তন করতে চান, তবে তা পরিবর্তন করে দেন। এই পরিবর্তনে কোন যুক্তিগত অসম্ভাব্যতা নেই। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে অগ্নি নির্বাণও শীতল করার কাজ আর পানি প্রজ্জ্বলন কাজ করতে শুরু করে; অথচ অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই এবং পানি পানিই থাকে; তবে কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা দলের জন্যে তা আল্লাহর নির্দেশে স্থায়ী বেশিষ্ট্য ত্যাগ করে থাকে। পয়গম্বরগণের নবুওয়ত প্রমাণ করার জন্যে আল্লাহ তাআলা নমরূদের অগ্নিকুন্ডকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন : তুই শীতল হয়ে যা। ফলে অগ্নি শীতল হয়ে গেল। যদি **بَرَدًا** (শীতল) শব্দের আগে **وَسَلْمًا** (নিরাপদ) শব্দ না থাকত, তবে অগ্নি হিমশীতল হয়ে অনিষ্টকর হয়ে যেত। নূহ (আঃ)—এর সলিল সমাপ্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে : **أَغْرَقُوا أَقْدَمَهُمْ نَارًا** — অর্থাৎ, তারা পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেছে।

حَرُوتٌ — অর্থাৎ, সমগ্র সম্প্রদায় ও নমরূদ সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল যে, তাকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হোক। ঐতিহাসিক রেওয়াজেতসমূহে বর্ণিত রয়েছে, একমাস পর্যন্ত সমগ্র শহরবাসী জ্বালানী কাষ্ঠ ইত্যাদি সঞ্চার করতে থাকে। এরপর তাতে অগ্নি সংযোগ করে সাত দিন পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অগ্নিশিখা আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে। তখন তারা ইবরাহীম (আঃ)—কে এই জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করল। কিন্তু অগ্নিকুন্ডের নিকটে যাওয়াই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। অগ্নির অসহ্য তাপের কারণে তার ধারে-কাছে যাওয়ার সাধ্য

কারও ছিল না। শয়তান ইবরাহীম (আঃ)—কে ‘মিন্জানিকে’ (এক প্রকার নিক্ষেপণ যন্ত্র) রেখে নিক্ষেপ করার পদ্ধতি বাতলে দিল। যে সময় ইবরাহীম (আঃ) মিন্জানিকের মাধ্যমে অগ্নিসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিলেন, তখন ফেরেশতাকুল বরং দু'লোক ও ভূলাকের সমস্ত সৃষ্টজীব চীৎকার করে উঠল : ইয়া রব, আপনার দোস্তের এ কি বিপদ! আল্লাহ তাদের সবাইকে ইবরাহীম (আঃ)—এর সাহায্য করার অনুমতি দিলেন। ফেরেশতাগণ সাহায্য করার জন্যে ইবরাহীম (আঃ)—কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জওয়াব দিলেন : আল্লাহ তাআলাই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি আমার অবস্থা দেখছেন। জিবরাঈল (আঃ) বললেন : কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি উপস্থিত আছি। উত্তর হল : প্রয়োজন তো আছে, কিন্তু আপনার কাছে নয়, পালনকর্তার কাছে।—(মায়হারী)

—**فَلَمَّا بَيَّنَّا أَنَّهُ عَلَىٰ آيَاتِهِ**

হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ)—এর পক্ষে সম্ভবতঃ অগ্নি অগ্নিই ছিল না; বরং বাতাসে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাহ্যতঃ অগ্নি সত্তার দিক দিয়ে অগ্নিই ছিল এবং ইবরাহীম (আঃ)—এর আশপাশ ছাড়া অন্য সব বস্তুকে দহন করছিল। ইবরাহীম (আঃ)—কে যেসব রশি দ্বারা বেঁধে আশুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলোও পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ)—এর দেহ সামান্য আঁচও লাগেনি।

ঐতিহাসিক রেওয়াজেতসমূহে আছে, ইবরাহীম (আঃ) এই অগ্নিকুন্ডে সাত দিন ছিলেন। তিনি বলতেন : এই সাতদিন আমি যে সুখ ভোগ করেছি, সারা জীবন তা ভোগ করিনি।—(মায়হারী)

—**وَنَجَّيْنَاهُ وَوَضَعْنَاهُ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ**

ইবরাহীম ও লূতকে আমি নমরূদের অধিকারভুক্ত দেশ (অর্থাৎ, ইরাক) থেকে উদ্ধার করে এমন এক দেশে পৌঁছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্যে কল্যাণ রেখেছি অর্থাৎ, সিরিয়া দেশ। সিরিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে অসংখ্য কল্যাণের আবাসস্থল। আভ্যন্তরীণ কল্যাণ এই যে, দেশটি পয়গম্বরগণের পীঠস্থান। অধিকাংশ পয়গম্বর এ দেশেই জন্মগ্রহণ করেছেন। বাহ্যিক কল্যাণ হচ্ছে সুষম আবহাওয়া, নদ-নদীর প্রাচুর্য, ফল-মূল ও সর্বপ্রকার উদ্ভিদের অনন্য সমাহার ইত্যাদি। এগুলোর উপকারিতা শুধু সে দেশবাসীই নয়, বহির্বিশ্বের লোকেরাও ভোগ করে থাকে।

—**وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً**

অনুরোধ অনুযায়ী) পুত্র ইসহাক ও অতিরিক্ত দান হিসেবে পৌত্র ইয়াকুবও নিজের পক্ষ থেকে দান করলাম। দোয়ার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে একে **نافلة** বলা হয়েছে।

وَجَعَلْنَاهُمْ اٰيَةً يُّهْدُونَ بِآيَاتِنَا وَارْحَمْنَا لَهُمْ فَعَلَّ
 الْحَبِيْرُ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَآتٰهُمُ الزَّكٰوةَ وَكَانَ مِنَ السَّاجِدِيْنَ
 وَلَوْ لَا اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي
 كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيْثَ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سَوِيْٓءً
 وَادْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهٗ مِنَ الصَّٰلِحِيْنَ ۝ وَنُوْحًا
 اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنَاهُ وَاهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ
 الْعَظِيْمِ ۝ وَنَصْرَهٗ مِنَ الْقَوْمِ الْاٰفِيْنَ كَذٰلِكَ يَلِيْزُكَ
 اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سَوِيْٓءً فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ اَجْعَلِيْنَ ۝ وَدَاوُدَ
 وَسَلٰمِيْنَ اِذْ يَخْتَكِنُ فِي الْحَوِيْٓءِ اِذْ نَفَخَتْ فِيْهِ عَٰلَمُ
 الْقُوْمِ وَكَذٰلِكَ اٰخِزْنٰهُمْ شٰهِدِيْنَ ۝ فَفَقَّهْنٰهُمَا سُلَيْمٰنَ
 وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَعَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ
 يَسِيْرًا وَالطَّيْرَ وَكَذٰلِكَ اَفْعَلِيْنَ ۝ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ
 لَبُوْسٍ لِّكُمۡ لِتُحْصِيَنَّهُمۡ مِنْ بَآبِئِمْ هَٰذَا اِنَّهُمْ
 شٰكِرُوْنَ ۝ وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّیْحَ عَٰصِفَةً تَجْوِيْ بِاَمْرٍ
 اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيْهَا وَكَذٰلِكَ يَفْعَلِيْنَ ۝

(৭৩) আমি তাদেরকে নেতা করলাম। তাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাঁদের প্রতি ওশী নামিল করলাম সংকর্ম করার, নামায কয়েম করার এবং যাকাত দান করার। তাঁরা আমার এবাদতে ব্যাপ্ত ছিল। (৭৪) এবং আমি লুতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং তাঁকে ঐ জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যারা নোংরা কাজে লিপ্ত ছিল। তারা মন্দ ও ন্যায়মান সম্প্রদায় ছিল। (৭৫) আমি তাকে আমার অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। সে ছিল সংকর্মশীলদের একজন। (৭৬) এবং সূর্য করুন নুহকে; যখন তিনি এর পূর্বে আহ্বান করেছিলেন, তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলাম, অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (৭৭) এবং আমি তাঁকে ঐ সম্প্রদায়ের বিপক্ষে সাহায্য করেছিলাম, যারা আমার নির্দশনাবলীকে অস্বীকার করেছিল। নিশ্চয়, তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। অতঃপর আমি তাদের সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম। (৭৮) এবং সূর্য করুন দাউদ ও সূলায়মানকে, যখন তারা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করছিলেন। তাতে রাতিকালে কিছু লোকের মেঘ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি সূলায়মানকে সে ফয়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা বোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম। (৮০) আমি তাঁকে তোমাদের জন্যে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম, যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতঃপর তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? (৮১) এবং সূলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হত ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছি।

যে জনপদ থেকে লুত (আঃ)-কে উদ্ধার করার কথা আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই জনপদের নাম ছিল সাদুম। এর অধীনে আরও সাতটি জনপদ ছিল। এগুলোকে জিবরাঈল (আঃ) ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন। শুধু লুত (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনদের বসবাসের জন্যে একটি জনপদ অক্ষত রেখে দেয়া হয়েছিল।—(কুরত্বী)

এর বহুবচন। অনেক নোংরা ও অশ্লীল অভ্যাসকে খাবান্ট বলা হয়। “লাওয়াতাত” ছিল তাদের সর্বপ্রধান নোংরা অভ্যাস, যা থেকে বন্য জন্তুরাও বেঁচে থাকে। অর্থাৎ, পুরুষের সাথে পুরুষের কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। এখানে বিরাট অপরাধ হওয়ার দিক দিয়ে এই একটিমাত্র অভ্যাসকে খাবান্ট বলা হয়ে থাকলে তাও অবাস্তব নয়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এ ছাড়া অন্যান্য নোংরা অভ্যাসও যে তাদের মধ্যে ছিল, তাও রেওয়ায়েতসমূহে উল্লেখিত আছে। রুহুল মা’আনীর বরাত দিয়ে তফসীরের সার-সংক্ষেপে সেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এদিক দিয়ে সমষ্টিকে খাবান্ট বলা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়।

এর অর্থ ইবরাহীম ও লুত (আঃ)-এর পূর্বে হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নুহ (আঃ)-এর যে আহ্বানের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা নুহে আছে। তা এই যে, তিনি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বদদোয়া করে বলেছিলেন : رَبِّ لَكَ نَدَى الزُّكُوفِ — وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ — অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার, পৃথিবীর বৃকে কোন কাফের অধিবাসীকে থাকতে দিয়ো না। অন্যত্র আছে, নুহ (আঃ)-এর সম্প্রদায় যখন কোনরূপেই তাঁর উপদেশ মানল না, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, — اَنِّیْ مَخْلُوْبٌ فَانْصُرْ — অর্থাৎ, আমি অপারগ ও অক্ষম হয়ে গেছি, আপনিই তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।

কرب عظیم - فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنَاهُ وَاهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ (মহাসংকট) বলে হয় সমগ্র জাতির বন্যায় নিমজ্জিত হওয়া বোঝানো হয়েছে, না হয় ঐ জাতির নির্ধাতন বোঝানো হয়েছে, যা তারা বন্যার পূর্বে নুহ (আঃ) ও তাঁর পরিবার-বর্গের প্রতি চালাত।

অভিধানে نفث শব্দের অর্থ রাতিকালে শস্যক্ষেত্রে জন্তু ঢুকে পড়ে ক্ষতিসাধন করা।

শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যতঃ মোকদ্দমা ও তার ফয়সালা বোঝা যায়। অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলার কাছে যে ফয়সালা পছন্দনীয় ছিল, তিনি তা সূলায়মানকে বুঝিয়ে দিলেন। মোকদ্দমা ও ফয়সালায় বিবরণ বিভিন্ন তফসীরে বর্ণিত রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, দাউদ (আঃ)-এর ফয়সালাও শরীয়তের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত ছিল না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা সূলায়মান (আঃ)-কে যে ফয়সালা বুঝিয়ে দেন, তাতে উভয়পক্ষের রেওয়াত ও উপকারিতা ছিল। তাই আল্লাহর কাছে তা পছন্দনীয় সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম বগতী হযরত ইবনে আব্বাস, কাতাদাহ ও যুহরী থেকে এভাবে ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন : দুই লোক হযরত দাউদ (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তাদের একজন ছিল ছাগপালের মালিক ও

শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া সওয়াবের কাজ; তবে জনসেবার নিয়ত থাক। এবং শুধু উপার্জন লক্ষ্য না হওয়া শর্ত। পয়গম্বরগণ বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম নিজেরা সম্পন্ন করেছেন বলে বর্ণিত আছে; যেমন দাউদ (আঃ) থেকে শস্য বপন ও কর্তনের কাজ বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ (আঃ) বলেন : যে শিল্পী জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, তার দৃষ্টান্ত মুসা-জনরীর মত। তিনি নিজের সন্তানকেই দুধ পান করিয়েছেন এবং লাভের মধ্যে ফেরআউনের পক্ষ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এমনভাবে যে জনসেবার নিয়তে শিল্পকর্ম করে, সে জনসেবার সওয়াব তো পাবেই; তদুপর শিল্পকর্মের পার্থিব উপকারও সে লাভ করবে। সূরা তোয়াহায় মুসা (আঃ)-এর কাহিনীতে এই হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে বায়ুকে বশীভূত করা এবং এতদসংক্রান্ত মাসআলা : হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, সামরিক ঘোড়া পরিদর্শনে লিপ্ত হয়ে যখন সুলায়মান (আঃ)-এর আসরের নামায ফওত হয়ে যায়, তখন এই উদাসীনতার জন্যে অনুতপ্ত হয়ে তিনি এর মূল কারণ ঘোড়াসমূহকে অকর্মণ্য করে দেন। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি একাজ করেছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে ঘোড়ার চাইতে উত্তম ও দ্রুতগামী সওয়ারী বায়ু দান করলেন। এই ঘটনার বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের তফসীর সূরা সোয়াদে বর্ণিত হবে।

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْفَيْسُفَ - এই বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য

دَاوُدَ এর সাথে সংযুক্ত। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যেমন দাউদ (আঃ)-এর জন্যে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন, যারা তাঁর আওয়াজের সাথে তসবীহ পাঠ করত, তেমনি সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বায়ুতে ভর করে তিনি যথা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে যেতেন। এখানে প্রবিধানযোগ্য যে, দাউদ ইচ্ছা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে যেতেন। এখানে প্রবিধানযোগ্য যে, দাউদ (আঃ)-এর বশীভূতকরণের মধ্যে مع (সাথে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, তাঁর সাথে পর্বত ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম এবং এখানে ل (জন্যে) বর্ণ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, বায়ুকে সুলায়মানের জন্যে বশীভূত করে দিয়েছিলাম। এতে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে যে, উভয় বশীভূতকরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। দাউদ (আঃ) যখন তেলাওয়াত করতেন, তখন পর্বত ও পক্ষীকুল স্বতঃস্ফূর্তভাবে তসবীহ পাঠ শুরু করত, তাঁর আদেশের জন্যে অপেক্ষা করত না। পক্ষান্তরে সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে বায়ুকে তাঁর আদেশের অধীন করে দেয়া হয়েছিল। তিনি

যখন ইচ্ছা, যেদিকে ইচ্ছা বায়ুকে আদেশ করতেন, বায়ু তাঁকে তার বিশাল সিংহাসন এবং লোক লক্ষ্যসহ সেখানে পৌঁছে দিত; যেখানে নামতে চাইতেন, সেখানে নামিয়ে দিত এবং যখন ফিরে আসতে চাইতেন, ফিরিয়ে দিয়ে যেত।—(রাহুল-মা'আনী, বায়যাতী)

তফসীর ইবনে কাসীরে সুলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনের বাতাসে ভর করে চলার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সুলায়মান (আঃ) কাঠের একটি বিরাট ও বিস্তীর্ণ সিংহাসন নির্মাণ করেছিলেন। তিনি পারিষদবর্গ, সৈন্য-সামন্ত ও যুদ্ধাস্ত্রসহ এই সিংহাসনে সওয়ার হয়ে বায়ুকে আদেশ দিতেন। বায়ু এই বিরাটকায় বিস্তৃত ও প্রশস্ত সিংহাসন তুলে নিয়ে যেখানে আদেশ হত, সেখানে পৌঁছে নামিয়ে দিত। এই হাওয়াই সিংহাসন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একমাসের দূরত্ব এবং দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একমাসের দূরত্ব অতিক্রম করত; অর্থাৎ, একদিনে দুই মাসের পথ এর সাহায্যে অতিক্রম করা যেত। ইবনে হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, সুলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনের উপর ছয় লক্ষ আসন স্থাপন করা হত। এগুলোতে সুলায়মান (আঃ)-এর সাথে ঈমানদার মানুষ এবং তাদের পেছনে ঈমানদার জিনরা উপবেশন করত। এরপর সমগ্র সিংহাসনের উপর ছায়া দান করার জন্যে পক্ষীকুলকে আদেশ করা হত, যাতে সূর্যের উত্তাপে কষ্ট না হয়। এরপর আদেশ অনুযায়ী বায়ু এই বিরাট সমাবেশকে যেখানে আদেশ হত, পৌঁছে দিত। কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে যে, এই সফরের সময় সমগ্র পথে সুলায়মান (আঃ) মাথা নত করে আল্লাহর যিকর ও শোকেরে মশগুল থাকতেন, ডানে, বামে তাকাতেন না এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে বিনয় প্রকাশ করতেন।—(ইবনে কাসীর)

عَاصِفَةً এর শাব্দিক অর্থ প্রবল বায়ু। কোরআন পাকের অন্য আয়াতে এই বায়ুর বিশেষণ عَاصِفَةً বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ মৃদু বাতাস, যাতে ধূলা উড়ে না এবং শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হয় না। বাহাতঃ এই দু'টি বিশেষণ পরস্পর বিরোধী। কিন্তু উভয়টির একত্র সমাবেশ এভাবে সম্ভবপর যে, এই বায়ু সন্তানগতভাবে প্রখর ও প্রবল ছিল। ফলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে একমাসের পথ অতিক্রম করত; কিন্তু আল্লাহর কুদরত তাকে এমন করে দিয়েছিল যে, প্রবাহিত হওয়ার সময় শূন্যে তরঙ্গ-সংঘাত সৃষ্টি হত না। বর্ণিত রয়েছে যে, এই সিংহাসনের চলার পথে শূন্যে কোন পাখীরও কোনরূপ ক্ষতি হত না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে জিন ও শয়তানকে বশীভূতকরণ :

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يُفَوِّضُ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكَفَا
لَهُمْ حُطَاتٍ - অর্থাৎ, আমি সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে শয়তানদের
মধ্যে এমন কিছু সংখ্যাককে বশীভূত করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর জন্যে
সমুদ্রে ডুব দিয়ে মণিমুক্তা সংগ্রহ করে আনত, এছাড়া অন্য কাজও করত;
যেমন-অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে, يَعْمَلُونَ كَمَا يَشَاءُونَ مِنْ حَرْبٍ

وَمَبِثَّةَ لُجَانَاتٍ ۚ وَكَانَ الْيَوْمَ الْجَدِيدُ ۚ

অর্থঃ, তারা সূর্যায়মান (আঃ)-এর জন্যে
বেদী, সুউচ্চ প্রাসাদ, মূর্তি ও চৌবাচ্চার ন্যায় পাথরের বড় বড় পেয়ালা
তৈরী করত। সূর্যায়মান তাদের অধিক পরিশ্রমের কাজেও নিয়োজিত
করতেন এবং অভিনব শিল্পকাজও করাতেন এবং আমিই তাদের রক্ষক
ছিলাম।

শীطَان — শতান হচ্ছে বুদ্ধি ও চেতনাবিশিষ্ট অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট সৃষ্টি দেহ। মানুষের ন্যায় তারাও শরীয়তের বিধি-বিধান পালনে আদিষ্ট। এই জ্ঞাতিকে বোঝাবার জন্যে আসলে جَنَات অথবা جنات শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে যারা ঈমানদার নয়— কাফের, তাদেরকেই শয়তান বলা হয়। বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সব জিন সূলায়মান (আঃ)—এর বশীভূত ছিল, কিন্তু মুমিনরা বশীভূতকরণ ছাড়াই সূলায়মান (আঃ)—এর নিদর্শনাবলী ধর্মীয় কর্তব্য হিসেবে পালন করত। তাদের ক্ষেত্রে বশীভূতকরণের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তাই বশীভূতকরণের অধীনে শুধু شَيْطَان তথা কাফের জিনদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কুফর ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও জবরদস্তি সূলায়মান (আঃ)—এর আজ্ঞাধীন থাকত। সম্ভবতঃ এ কারণেই আয়াতের শেষে যোগ করা হয়েছে যে, আমিই তাদেরকে সামলিয়ে রাখতাম। নতুবা কাফের জিনদের তরফ থেকে ক্ষতির আশঙ্কা বরাবরই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার হেফাযতে তারা কোন ক্ষতি করতে পারত না।

একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব : দাঁড় (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ তাআলা সর্বাধিক শক্তি ও ঘন পদার্থকে বশীভূত করেছিলেন; যথা পর্বত, লৌহ ইত্যাদি। সূলায়মান (আঃ)-এর জন্যে দেখাও যায় না এমন সূক্ষ্ম বস্তুকে বশীভূত করেছেন; যেমন বায়ু জিন ইত্যাদি। এতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার শক্তি সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত।—(তফসীর কবীর)

আইয়ুব (আঃ)-এর কাহিনী : আইয়ুব (আঃ)-এর কাহিনী সম্পর্কে অনেক দীর্ঘ ইসরাঈলী রেওয়াজে বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে হাদীসবিদগণ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্ভরযোগ্য মনে করেছেন, এমন রেওয়াজেতই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। কোরআন পাক থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে সর্বর করে যান এবং অবশেষে আল্লাহর কাছে দোয়া করে রোগ থেকে মুক্তি পান। এই অসুস্থতার দিনগুলোতে তাঁর সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব সবই উধাও হয়ে গিয়েছিল, মৃত্যুবরণ করে কিংবা অন্য কোন কারণে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন এবং সব সন্তান ফিরিয়ে দেন; বরং তাদের তুলনায় আরও অধিক দান করেন। কাহিনীর অবশিষ্ট অংশের কিছু প্রামাণ্য হাদীসসমূহে এবং বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক রেওয়াজেসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। হাফযে ইবনে কাসীর কাহিনীর বিবরণ এভাবে দিয়েছেন :

আল্লাহ তাআলা আইয়ুব (আঃ)-কে প্রথম দিকে অগাধ ধন-দৌলত,

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَفْتُو صَوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا
دُونَ ذَلِكَ وَكَثَرَتْ لَهُمْ حِفْطَيْنِ ۝ وَإِيَّابَ إِذْ نَادَى
رَبَّهُ أَتَى مَسْجَى الصُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَ
مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذُكِّرُوا لِلْيَذِبِينَ ۝
وَاسْتَجِيبْ لِلَّذِينَ يُدْعُونَكَ إِلَى الْحَقِّ كُلِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝
وَأَدْخُلْهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الْمُتَرَدِّينَ ۝ وَ
ذَ التَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُخَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ
فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَوْلَا أَنَا أَنْتَ سُبْحَنَكَ ۝
إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ
مِنَ الْعَمْرِ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْهُدَى لِلَّذِينَ يَدْعُونَ
إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ
الْوَارِثِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ نِسَاءً وَاصِلَاتٍ
لَهُ وَوَجَعَلْنَا لَهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ
يَدْعُونَ تَارِعًا وَتَارِعًا وَكَانُوا لِلْغَاثِغِينَ ۝

(৮২) এবং অধীন করেছি শয়তানদের কতককে, যারা তাঁর জন্যে ডুবুরী কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম। (৮৩) এবং সূর্যন করুন আইয়ুবের কথা, যখন তিনি তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন : আমি দুঃখকষ্টে পতিত হয়েছি এবং আপনি দয়াবানদের চাইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। (৮৪) অতঃপর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলাম এবং তাঁর দুঃখকষ্ট দূর করে দিলাম এবং তাঁর পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম, আর তাদের সাথে তাদের সমপরিমাণ আরও দিলাম আমার পক্ষ থেকে কৃপাবশতঃ ; আর এটা এবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ। (৮৫) এবং ইসমাইল, ইদরীস ও যুলফিলের কথা সূর্যন করুন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সরবরাহী। (৮৬) আমি তাঁদেরকে আমার রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তাঁরা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ। (৮৭) এবং মাছওয়ালার কথা সূর্যন করুন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, অতঃপর মনে করেছিলেন যে, আমি তাঁকে মৃত করতে পারব না। অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেন : তুমি বতীত কোন উপাশ্য নেই ; তুমি নির্দোষ আমি গোনাহগার। (৮৮) অতঃপর আমি তাঁর আস্থানে সাড়া দিলাম এবং তাঁকে দৃষ্টিভা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি এমনিভাবে বিনুবাঈদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। (৮৯) এবং যাকারিয়ার কথা সূর্যন করুন, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে একা রেখে না। তুমি তো উত্তম ওয়ালীস। (৯০) অতঃপর আমি তার দোয়া কবুল করেছিলাম, তাকে দান করেছিলাম। ইয়াহুয়া এবং তার জন্যে তার স্ত্রীকে প্রসবযোগ্য করেছিলাম। তারা সংকর্মে রীপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।

সহায়-সম্পত্তি, সুরম্য দালান-কোঠা, যানবাহন, সন্তান-সন্ততি ও চাকর-নওকর দান করেছিলেন। এরপর তাঁকে পয়গম্বরসুলত পরীক্ষায় ফেলা হয়। ফলে, এসবই তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং দেহেও কুষ্ঠের ন্যায় এক প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বাঁধে। জিহ্বা ও অন্তর ব্যতীত দেহের কোন অংশই এই ব্যাধি থেকে মুক্ত ছিল না। তিনি তদবস্থায়ই জিহ্বা ও অন্তরকে আল্লাহর সুরগে মশগুল রাখতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধির কারণে সব শ্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী তাঁকে আলাদা করে লোকালয়ের বাইরে একটি ভাগারে অর্থাৎ, আবর্জনা নিক্ষেপের জায়গায় রেখে দেয়। কেউ তাঁর কাছে যেত না। শুধু তাঁর স্ত্রী তাঁর দেখাশোনা করতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইউসুফ (আঃ)-এর কন্যা অথবা পৌত্রী। তাঁর নাম ছিল লাইয়া বিনতে মেশা ইবনে ইউসুফ (আঃ)।— [ইবনে-কাসীর] সহায়-সম্পত্তি ও অর্থকড়ি সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী মেহনত-মজুরী করে তাঁর পানাহার ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহ এবং তাঁর সেবাস্বত্ব করতেন। আইয়ুব (আঃ)-এর এই পরীক্ষা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল না। রসুলে করীম (সঃ) বলেন : **اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل** অর্থাৎ, পয়গম্বরগণ সবচাইতে বেশী বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তাঁদের পর অন্যান্য সংকর্পরায়ণ পর্যায়ক্রমে বিপদের সম্মুখীন হন। এক রেওয়ায়েতে রয়েছে : প্রত্যেক মানুষের পরীক্ষা তার ঈমানের দৃঢ়তার পরিমাণে হয়ে থাকে। ধর্মপরায়ণতায় যে যত বেশী মজবুত; তার বিপদ এবং পরীক্ষাও তত অধিক হয় (যাতে এই পরিমাণেই মর্তবা আল্লাহর কাছে উচ্চ হয়)। আল্লাহ তাআলা আইয়ুব (আঃ)-কে পয়গম্বরগণের মধ্যে ধর্মীয় দৃঢ়তা ও সবরের বিশিষ্ট স্তর দান করেছিলেন (যেমন দাউদ (আঃ)-কে শোকরের এমন স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছিল)। বিপদাপদ ও সংকটে সবর করার ক্ষেত্রে আইয়ুব (আঃ) উপমেয় ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে মায়সারাহ বলেন : আল্লাহ যখন আইয়ুব (আঃ)-কে অর্থকড়ি, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি জাগতিক নেয়ামত থেকে মুক্ত করে পরীক্ষা করেন, তখন তিনি মুক্ত মনে আল্লাহর সুরগ ও এবাদতে আরও বেশী আত্মনিয়োগ করেন এবং আল্লাহর কাছে আরম্ভ করেন : হে আমার পালনকর্তা ! আমি তোমার শোকর আদায় করি এ কারণে যে, তুমি আমাকে সহায়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি দান করেছ। এদের মহব্বত আমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এরপর এ কারণেও শোকর আদায় করি যে, তুমি আমাকে এসব বস্তু থেকে মুক্তি দিয়েছ। এখন আমার ও তোমার মধ্যে কোন অন্তরায় অবশিষ্ট নেই।

আইয়ুব (আঃ)-এর দোয়া সবরের পরিপন্থী ছিল না : হযরত আইয়ুব (আঃ) পার্থিব ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এমন এক শারীরিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন যে, কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস করত না। তিনি লোকালয়ের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে দীর্ঘ সাত বছর কয়েক মাস পড়ে থাকেন। কোন সময় হা-হতাশ, অস্থিরতা ও অভিযোগের কোন বাক্যও মুখে উচ্চারণ করেননি। সতী সাক্ষী স্ত্রী লাইয়া একবার-আরম্ভ করেন যে, আপনার কষ্ট অনেক বেড়ে গেছে। এই কষ্ট দূর হওয়ার জন্যে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করুন। তিনি জওয়াব দিলেন : আমি সত্তর বছর সুস্থ ও নিরোগ অবস্থায় আল্লাহ তাআলার অসংখ্য নেয়ামত ও দৌলতের মধ্যে দিনতিপাত করেছি। এর বিপরীতে বিপদের সাত বছর অতিবাহিত করা কঠিন হবে কেন? পয়গম্বরসুলত দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সবরের ফলে তিনি দোয়া করারও হিম্মত করতেন না যে, কোথাও সবরের খেলাফ না হয়ে যায়। (অথচ আল্লাহর কাছে দোয়া করা এবং নিজের অভাব ও দুঃখ-কষ্ট পেশ করা

বে-সবরীর অন্তর্ভুক্ত নয়।) অবশেষে এমন একটি কারণ ঘটে গেল, যা তাঁকে দোয়া করতে বাধ্য করল। বলাবাহুল্য, তাঁর এই দোয়া দোয়াই ছিল— বেসবরী ছিল না। আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে তাঁর সবরের স্বাক্ষর রেখে বলেছেন : **وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ وَإِذْ يَحْمِلُكَ إِلَى الصَّخْرِ الْمَعْرُوفِ** (আমি তাকে সবরকারী পেয়েছি)। যে কারণে তিনি দোয়া করতে বাধ্য হন, সেই কারণ বর্ণনায় রেওয়ায়েতসমূহে বিভিন্নরূপ এবং দীর্ঘ কাহিনী রয়েছে। তাই সেগুলো পরিত্যাগ করা হল।

ইবনে আবী হাতেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, আইয়ুব (আঃ)-এর দোয়া কবুল হওয়ার পর তাঁকে আদেশ করা হল : পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করুন। মাটিতে পরিষ্কার পানির ঝরণা দেখা দেবে। এই পানি পান করুন এবং তদ্বারা গোসল করুন। দেহের সমস্ত রোগ-ব্যাধি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। হযরত আইয়ুব (আঃ) তদ্রূপই করলেন। ঝরণার পানি দ্বারা গোসল করতেই ক্ষত-জঙ্ঘরিত ও অস্থিচর্মসার দেহ নিমেষের মধ্যে রক্ত-মাংস ও কেশমণ্ডিত দেহে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্যে জান্নাতের পোশাক প্রেরণ করলেন। তিনি জান্নাতী পোশাক পরিধান করতঃ আবর্জনার স্তূপ থেকে একটু সরে গিয়ে একপাশে বসে রইলেন। স্ত্রী নিত্যকার অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর দেখাশোনা করতে আগমন করলেন, কিন্তু তাঁকে তাঁর স্থানে না পেয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। একপাশে উপবিষ্ট আইয়ুব (আঃ)-কে চিনতে না পেরে তিনি তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন : আপনি জানান কি, এখানে যে রোগাক্রান্ত লোকটি পড়ে থাকতেন, তিনি কোথায় গেলেন? কুদূর ও ব্যাঘ্র কি তাঁকে খেয়ে ফেলেছে? অতঃপর এ ব্যাপারে তিনি কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করলেন। সবকিছু শুনে আইয়ুব (আঃ) বললেন : আমিই আইয়ুব। কিন্তু স্ত্রী তখনও তাঁকে চিনতে না পেরে বললেন : আপনি কি আমার সাথে পরিচয় করছেন? আইয়ুব (আঃ) আবার বললেন : লক্ষ্য করে দেখ, আমিই আইয়ুব। আল্লাহ তাআলা আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং নতুন স্বাস্থ্য দান করেছেন। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন : এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর ধন-দৌলত ফিরিয়ে দিলেন এবং সন্তান-সন্ততিও। শুধু তাই নয়, সন্তানদের সমসংখ্যক বাড়তি সন্তানও দান করলেন।— (ইবনে-কাসীর)

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন : হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর সাত পুত্র ও সাত কন্যা ছিল। পরীক্ষার দিনগুলোতে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা যখন তাঁকে সুস্থতা দান করলেন, তখন সন্তানদেরকেও পুনরায় জীবিত করে দেন এবং স্ত্রীর গর্ভে নতুন সন্তানও এই পরিমাণেই জনগ্ৰহণ করে। একেই কোরআনে **وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ** বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। শা'বী বলেন : এই উক্তি আয়াতের বাহ্যিক অর্থের নিকটতম।— (কুরতুবী)

যুলকিফল নবী ছিলেন, না ওলী : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তিন জন মনীষীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হযরত ইসমাইল ও ইদরীস যে নবী ও রসুল ছিলেন, তা কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে। কোরআন পাকে তাঁদের কথা স্থানে স্থানে আলোচনাও করা হয়েছে। তৃতীয় জন হচ্ছেন যুলকিফল। ইবনে-কাসীর বলেন : তাঁর নাম দু'জন পয়গম্বরের সাথে শামিল করে উল্লেখ করা থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, তিনিও আল্লাহর নবী ছিলেন। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, তিনি পয়গম্বরগণের কাতারভুক্ত ছিলেন

না; বরং একজন সংকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। তফসীরবিদ ইবনে জরীর মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়াসা। (যিনি পয়গম্বর ছিলেন বলে কোরআনে উল্লেখ আছে) বার্বাকো উপনীত হয়ে একজনকে তাঁর খলীফা নিযুক্ত করার ইচ্ছা করলেন, যে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর পক্ষ থেকে পয়গম্বরের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সব সাহাবীকে একত্রিত করে বললেন : আমি আমার খলীফা নিযুক্ত করতে চাই। যার মধ্যে তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকবে, তাকেই আমি খলীফা নিযুক্ত করব। শর্ত তিনটি এই : সদাসর্বদা রোযা রাখা, এবাদতে রাত্রি জাগরণ করা এবং কোন সময় রাগান্বিত না হওয়া। সমাবেশের মধ্য থেকে জনৈক অখ্যাত ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল। তাকে সবাই নিতান্ত সাধারণ লোক বলে মনে করতঃ সে বলল : আমি এই কাজের জন্যে উপস্থিত আছি। হযরত ইয়াসা' জিজ্ঞেস করলেন : তুমি সদাসর্বদা রোযা রাখা, এবাদতে রাত্রি জাগরণ কর এবং কোন সময় গোসসা কর না ? লোকটি বলল : নিঃসন্দেহে এই তিনটি আমল আমার মধ্যে আছে। হযরত ইয়াসা' সম্ভবতঃ তাঁর কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না, তাই সেদিনকার মত তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন আবার সমাবেশকে লক্ষ্য করে একথা বললেন। উপস্থিত সবাই নিশ্চুপ রইল এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তিই আবার দণ্ডায়মান হল। তখন হযরত ইয়াসা' তাকে খলীফা নিযুক্ত করার কথা ঘোষণা করলেন। যুলকিফল এই পদ লাভে সফল হয়েছে দেখেন, শয়তান তার সান্নাঙ্গদেরকে বলল : যাও কোনরূপে এই ব্যক্তি দ্বারা এমন কাজ করিয়ে নাও, যদ্বারা তার এই পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়। সান্নাঙ্গরা অক্ষমতা প্রকাশ করে বলল : সে আমাদের বশে আসার পাত্র নয়। ইবলীস বলল : তাহলে কাজটি আমার হাতেই ছেড়ে দাও, আমি তাকে দেখে নেব। হযরত যুলকিফল স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সারা দিন রোযা রাখতেন এবং সারারাত জাগ্রত থাকতেন। শুধু দুপুরে কিছুক্ষণ নিদ্রা যেতেন। শয়তান ঠিক দুপুরে নিদ্রার সময় উপস্থিত হল এবং দরজার কড়া নাড়া দিল। তিনি জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : কে ? উত্তর হল : আমি একজন বৃদ্ধ ময়লুম। তিনি দরজা খুলে দিলেন। আগন্তুক ভেতরে পৌঁছে দীর্ঘ কাহিনী বলতে শুরু করল যে, আমার সাথে আমার সম্প্রদায়ের বিবাদ আছে। তারা আমার উপর এই জুলুম করেছে, সেই জুলুম করেছে। এভাবে দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। যুলকিফল বললেন : আমি যখন বাইরে যাব, তখন এসো। আমি তোমার বিচার করে দেব।

যুলকিফল বাইরে এলেন এবং আদালত কক্ষে বসে লোকটির জন্যে অপেক্ষা করলেন। কিন্তু সে আগমন করল না। পরের দিন যখন তিনি যোকদ্দমার ফয়সালা করার জন্যে আদালতে বসলেন, তখনও এই বৃদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করলেন ; কিন্তু তাকে দেখা গেল না। দুপুরে যখন নিদ্রার জন্যে গৃহে গেলেন, তখন লোকটি এসে দরজা পিটাতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কে ? উত্তর হল : আমি একজন বৃদ্ধ ময়লুম। তিনি দরজা খুলে দিয়ে বললেন : আমি কি তোমাকে বলিনি যে, মজলিসে বসার সময় এসো। তুমি কালও আসনি, আজ সকাল থেকেও তোমার দেখা নেই। সে বলল : হুযুর, আমার শত্রুপক্ষ খুবই ঘৃণ প্রকৃতি। আপনাকে মজলিসে বসা দেখলে তারা আমার প্রাপ্য পরিশোধ করবে বলে স্বীকার করে নেয়। আপনি যখন মজলিস ত্যাগ করেন, তখন আবার অস্বীকার করে বসে। এই কথাবার্তার মধ্যে সেদিনকার দুপুরও গড়িয়ে গেল এবং নিদ্রা হল না। তিনি বাইরে এসে মজলিসে বৃদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরের দিনও দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, কিন্তু তার পাশ্চাৎ পাওয়া গেল না। তৃতীয় দিন দুপুর হলে তিনি নিদ্রায় ঢুলতে লাগলেন। গৃহে এসে পরিবারের লোকদেরকে বলে দিলেন যে, কেউ যেন কড়া নাড়া না

দেয়। বৃদ্ধ এদিনও আগমন করল এবং কড়া নাড়া দিতে চাইল। সবাই নিষেধ করলে সে জানালা পথে ভেতরে ঢুকে পড়ল এবং দরজায় আঘাত করতে লাগল। যুলকিফল জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, ঘরের দরজা যথারীতি বন্ধ আছে এবং বৃদ্ধ ঘরের ভেতরে উপস্থিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি ভেতর ঢুকলে কি ভাবে ? তখন যুলকিফল চিনতে পারলেন যে, সে শয়তান ছাড়া কেউ নয়। তিনি বললেন : তা হলে তুমি আল্লাহর দুশমন ইবলীস। সে স্বীকার করে বলল : আপনি আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিছুতেই আমার জ্বালে আবদ্ধ হননি। এখন আমি আপনাকে কোনরূপে রাগান্বিত করার চেষ্টা করেছিলাম, যাতে ইয়াসা' নবীর সাথে কৃত গুয়াদা ভঙ্গ হয়। এ উদ্দেশ্যেই আমি এসব কাণ্ড করেছি। এই ঘটনার কারণেই তাঁকে যুলকিফলের খেতাব দান করা হয়। যুলকিফল শব্দের অর্থ অস্বীকার ও দায়িত্ব পূর্ণকারী ব্যক্তি। হযরত যুলকিফল তাঁর অস্বীকার পূর্ণ করেছিলেন।—(ইবনে-কাসীর)

আলোচনার সারমর্ম এই যে, যুলকিফল হযরত ইয়াসা নবীর খলীফা সংকর্মপরায়ণ ওলী ছিলেন। সম্ভবতঃ বিশেষ ও পছন্দনীয় আমলের কারণে আয়াতে পয়গম্বরগণের কাতারে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও আবাস্তব নয় যে, প্রথমে তিনি ইয়াসা' নবীর খলীফাই ছিলেন, পরে আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওয়তের পদও দান করেছিলেন।

وَالْمُؤْمِنُونَ — হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আঃ) —এর কাহিনী

কোরআন পাকের সূরা ইউনুস, সূরা আশ্বিয়া, সূরা ছাফফাত ও সূরা নুনে বিবৃত হয়েছে। কোথাও তাঁর আসল নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও 'যুনুস' এবং কোথাও 'হাযেবুল-হুত' উল্লেখ করা হয়েছে। নুন ও হুত উভয় শব্দের অর্থ মাছ। কাজেই যুন-নুন ও হাযেবুল-হুতের অর্থ মাছওয়াল। ইউনুস (আঃ) —কে কিছুদিন মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়েছিল। এই আশ্চর্য ঘটনার পরিস্থিতিতেই তাঁকে যুন-নুনও বলা হয় এবং হাযেবুল-হুত শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়।

ইউনুস (আঃ) —এর কাহিনী : তফসীর ইবনে-কাসীরে আছে, ইউনুস (আঃ) —কে মুসলের একটি জনপদ নায়নুয়ার অধিবাসীদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ঈমান ও সংকর্মের দাওয়াত দেন। তারা আবাত্যতা প্রদর্শন করে। ইউনুস (আঃ) তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে জনপদ ত্যাগ করেন। এতে তারা ভাবতে থাকে যে, এখন আযাব এসেই যাবে। (কোন কোন রেওয়াজে থেকে জান যায় যে, আযাবের কিছু কিছু চিহ্নও ফুটে উঠেছিল) অনতিবিলম্বে তারা শিরক ও কুফর থেকে তওবা করে নেয় এবং জনপদের সব আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা জঙ্গলের দিকে চলে যায়। তারা চতুর্দশ জন্তু ও বাচ্চাদেরকেও সাথে নিয়ে যায় এবং বাচ্চাদেরকে তাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়। এরপর সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকে। জন্তুদের বাচ্চারা মাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেয়ার কারণে পৃথক শোরগোল করতে থাকে। আল্লাহ তাআলা তাদের খাতি তওবা ও কাকুতি-মিনতি কবুল করে নেন এবং তাদের উপর থেকে আযাব হাটুয়ে দেন। এদিকে ইউনুস (আঃ) ভাবছিলেন যে, আযাব আসার ফলে তার সম্প্রদায় বোধ হয় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলেন যে, আদো আযাব আসেনি এবং তাঁর সম্প্রদায় সুস্থ ও নিরাপদে দিন গুজরান করছে, তখন তিনি চিন্তান্বিত হলেন যে, এখন আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করা হবে। কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল।—(মায়হারী) এর ফলে ইউনুস (আঃ) —এর

প্রাণনাশেরও আশঙ্কা দেখা দিল। তিনি সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে আসার পরিবর্তে ভিনদেশে হিজরত করার ইচ্ছায় সফর শুরু করলেন। পথিমধ্যে একটি নদী পড়ল। তিনি একটি নৌকায় আরোহণ করলেন। ঘটনাক্রমে নৌকা আটকে গিয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। মায়িরা বলল যে, আরোহীদের মধ্যে একজনকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। তাহলে অন্যরা ডুবে মরার কবল থেকে রক্ষা পাবে। এখন কাকে ফেলা হবে, এ নিয়ে আরোহীদের নামে লটারী করা হলে ঘটনাচক্রে এখানে ইউনুস (আঃ)—এর নাম বের হল। (আরোহীরা বোধ হয় তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত ছিল, তাই) তারা তাঁকে নদীতে ফেলে দিতে অস্বীকৃত হল। পুনরায় লটারী করা হল। এবারও ইউনুস (আঃ)—এর নামই বের হল। আরোহীরা তখনও দ্বিধাবোধ করলে তৃতীয়বার লটারী করা হল। কিন্তু নাম ইউনুস (আঃ)—এরই বের হল। এই লটারীর কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ অর্থাৎ, লটারীর ব্যবস্থা করা হলে ইউনুস (আঃ)—এর নামই তাতে বের হয়। তখন ইউনুস (আঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং অনাবশ্যক কাপড় খুলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এদিকে আল্লাহ তাআলা সবুজ সাগরে এক মাছকে আদেশ দিলে সে সাগরের পানি চিরে দ্রুতগতিতে সেখানে পৌঁছে যায় (ইবনে মাসউদের উক্তি) এবং ইউনুস (আঃ)—কে উদরে পুরে নেয়। আল্লাহ তাআলা মাছকে নির্দেশ দেন যে, ইউনুস (আঃ)—এর অস্থি-মাংসের যেন কোন ক্ষতি না হয় ; সে তার খাদ্য নয়, বরং তার উদর কয়েকদিনের জন্যে তাঁর কয়েদখানা। (ইবনে-কাসীর) কোরআনের বক্তব্য ও অন্যান্য বর্ণনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলার পরিষ্কার নির্দেশ ছাড়াই ইউনুস (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই কার্যক্রম আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন। ফলে তিনি অসন্তোষের কারণ হন এবং তাঁকে সমুদ্রে মাছের পেটে অবস্থান করতে হয়।

ইউনুস (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে তিন দিনের মধ্যে আযাব আসার ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। বাহ্যতঃ এটা তাঁর নিজের মতে ছিল না ; বরং আল্লাহর ওহীর কারণে ছিল। পয়গম্বরগণের সনাতন রীতি অনুযায়ী নিজের জনগোষ্ঠীকে পরিভ্যাগ করে চলে যাওয়াটাও বাহ্যতঃ আল্লাহর নির্দেশেই হয়ে থাকবে। এ পর্যন্ত এরূপ কোন ভ্রান্তি ছিল না, যা আল্লাহর অসন্তোষের কারণ হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন সম্প্রদায়ের খাটি তওবা ও কান্নাকাটি কবুল করে তাদের উপর থেকে আযাব অপসৃত করেন, তখন তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে না আসা এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে সফর করা তাঁর নিজস্ব ইজ্তিহাদের ভিত্তিতে ছিল। তাঁর ইজ্তিহাদ ছিল এই যে, এই পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হব এবং আমার দাওয়াত প্রভাব হারিয়ে ফেলব; বরং প্রাণ-নাশেরও আশঙ্কা আছে। তাদেরকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলে তজ্জন্যে আল্লাহ তাআলা ধরপাকড় করবেন না। নিজস্ব ইজ্তিহাদের ভিত্তিতে হিজরতের সংকল্প করা এবং ওহীর অপেক্ষা না করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া যদিও গোনাহ ছিল না, কিন্তু উত্তম পন্থার খেলাফ অবশ্যই ছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তা পছন্দ করেননি। পয়গম্বর ও আল্লাহর নৈকট্যশীলদের মর্ডবা অনেক উর্ধ্বে। তাঁদের অভিরুচি-জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে তাঁদের পক্ষ থেকে সামান্য ত্রুটি হলে তজ্জন্যে গৃহীত করা হয়। এ কারণেই ইউনুস (আঃ) আল্লাহর রোষে পতিত হন।

তফসীরে কুরতুবীতে কুশায়রী থেকেও বর্ণিত আছে যে, বাহ্যতঃ তাঁর পছন্দের বিপরীতে সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব হটে যাওয়ার পরই ইউনুস (আঃ)—এর প্রতি রোষের এই ঘটনা সংঘটিত হয়। মাছের পেটে

কয়েকদিন অবস্থান করাও আযাবদানের উদ্দেশ্যে নয়, শিষ্টাচার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ছিল ; যেমন পিতা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে শাসালে তা শিষ্টাচার শিক্ষাদান গণ্য হয়ে থাকে ; যাতে ভবিষ্যতে সে সতর্ক হয়।—(কুরতুবী) ঘটনা হৃদয়ঙ্গম করার পর এবার আয়াতসমূহে বর্ণিত শব্দাবলীর তফসীর দেখুন।

ذَهَبَ مُغَاظِبًا — অর্থাৎ, ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গেলেন। বাহ্যতঃ এখানে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখ থেকে তাই বর্ণিত রয়েছে। তাঁরা رَبِّ مُغَاظِبًا এর مَفْعُول বলেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে مَغَاظِبَالِهِ অর্থাৎ, পালনকর্তার খাতিরে ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গেলেন। কাকের ও পাগাচারীদের প্রতি আল্লাহর খাতিরে রাগান্বিত হওয়া সাক্ষাত ঈমানের আলামত।—(কুরতুবী, বাহরে-মুহীত)

فَقَرَأْنُنْ أَنْ تَقْبَلَ رَعِيَّةً — অভিমানের দিক দিয়ে نَقَدَر শব্দের তিন রকম অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, যদি قَدَرْت ষাট থেকে উদ্ধৃত হয়, তবে আয়াতের অর্থ হবে, তিনি ধারণা করলেন যে, আমি তাকে কাবু করতে পারব না। বলাবাহুল্য, এরূপ ধারণা কোন পয়গম্বর তো দূরের কথা, সাধারণ মুসলমানও করতে পারে না। কারণ, এরূপ মনে করা প্রকাশ্য কুফর। কাজেই আয়াতে এই অর্থ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়, এটা قَدَر ষাট থেকে উদ্ধৃত হতে পারে। এর অর্থ সংকীর্ণ করা ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْبَلُوا رَعِيَّةً مِنْ عِبَادِهِ — অর্থাৎ, আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা জীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। আতা, সাঈদ ইবনে জুবায়র, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদগণ এ অর্থই নিয়েছেন। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ইউনুস (আঃ) মনে করলেন, উদ্ধৃত পরিস্থিতিতে সম্প্রদায়কে ছেড়ে কোথাও চলে যাওয়ার ব্যাপারে আমার প্রতি কোনরূপ সংকীর্ণ আচরণ করা হবে না। তৃতীয়, তফসীরের অর্থে এটা قَدَر থেকে উদ্ধৃত। এর অর্থ বিচারে রায় দেয়া। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, ইউনুস (আঃ) মনে করলেন, এব্যাপারে আমার কোন ত্রুটি ধরা হবে না। কাতাদাহ, মুজাহিদ, ফাররা প্রমুখ তফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন। মোটকথা, প্রথম অর্থের সম্ভাবনাই নেই, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অর্থ সম্ভবপর।

ইউনুস (আঃ)—এর দোয়া প্রত্যেকের জন্যে, প্রতি যুগের ও প্রতি মকসুদের জন্যে মকবুল وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْفُؤَادَ لِمَنْ يَشَاءُ — অর্থাৎ, আমি যেভাবে ইউনুস (আঃ)—কে দৃষ্টিস্তা ও সংকট থেকে উদ্ধার করেছি, তেমনিভাবে সব মুমিনকেও করে থাকি ; যদি তারা সততা ও আন্তরিকতার সাথে আমার দিকে মনোনিবেশ করে এবং আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ — মাছের পেটে পাঠকৃত হযরত ইউনুস (আঃ)—এর এই দোয়াটি যদি কোন মুসলমান কোন উদ্দেশ্যে হাসিলের জন্যে পাঠ করে, তবে আল্লাহ তাআলা তা কবুল করবেন।—(মাহহরী)

হযরত যাকারিয়া (আঃ)—এর একজন উত্তরাধিকারী পুত্র লাভের একান্ত বাসনা ছিল। তিনি তারই দোয়া করেছেন, কিন্তু সাথে সাথে وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ও বলেছিলেন : অর্থাৎ, পুত্র পাই বা না পাই ; সর্বাবস্থায় আপনিই উত্তম ওয়ারিশ। এটা পয়গম্বরসুলভ শিষ্টাচার প্রদর্শন

وَالَّتِي أَحْصَيْتُ فَرَجَهَا مَفْتَحًا فِيهَا مِنْ دُرُوحًا وَ
 جَعَلَهَا وَابْنًا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ
 أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۝ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ
 بَيْنَهُمْ كُلَّ إِلَيْنَا رُجُوعًا ۝ مَن يَمُوتْ مِنَ الظَّالِمِينَ
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا تَقْرَأْ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ۝ وَ
 حَرَّمَ عَلَى قَرِينَةِ أَهْلِكُنَا أَهْلَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا
 فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝
 وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ
 كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 حَصْبُ جَهَنَّمَ أَتَمُّ لَهَا وَرُدُّونَ ۝ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ
 إِلَهًا مَا أَوْرَدُوا مَا وَكَلُوهَا خَلِيدُونَ ۝ لَهُمْ فِيهَا
 زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ
 لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۝ لَا يَسْمَعُونَ
 حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۝

(৯১) এবং সেই নারীর কথা আলোচনা করুন, যে তার কামপ্রবৃত্তিকে বলে রেখেছিল, অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্বাসীর জন্য নিদর্শন করেছিলাম। (৯২) তারা সকলেই তোমাদের ধর্মের ; একই ধর্মে তো বিশ্বাসী সবাই এবং আমিই তোমাদের পালনকর্তা, অতঃপর আমার বন্দগী কর। (৯৩) এবং মানুষ তাদের কার্যকলাপ দ্বারা পারস্পরিক বিষয়ে ভেদ সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৯৪) অতঃপর যে বিস্ময়ী অবস্থায় সংকর্ম সম্পাদন করে, তার প্রচেষ্টা অস্বীকৃত হবে না এবং আমি তা লিপিবদ্ধ করে রাখি। (৯৫) যেসব জনপদকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত ; (৯৬) যে পর্যন্ত না ইয়াজুজ ও মাজুজকে বন্ধন মুক্ত করে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি থেকে দ্রুত ছুটে আসবে। (৯৭) অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলে কাফেরদের চক্ষু উন্মুক্ত হইবে ; হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ বিষয়ে বৈখবের ছিলাম ; বরং আমরা গোনাহগারই ছিলাম। (৯৮) তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা কর, সেগুলো দোষের ইহুন। তোমরাই তাতে প্রবেশ করবে। (৯৯) এই মৃত্তিরা যদি উপাস্য হত, তবে জাহান্নামে প্রবেশ করত না। প্রত্যেকেই তাতে চিরস্থায়ী হয়ে পড়ে থাকবে। (১০০) তারা সেখানে চীৎকার করবে এবং সেখানে তারা কিছুই শুনতে পাবে না। (১০১) যাদের জন্য প্রথম থেকেই আমার পক্ষ থেকে কল্যাণ নির্ধারিত হয়েছে তারা দোষ থেকে দূরে থাকবে। (১০২) তারা তার ক্ষীণতম শব্দও শুনবে না এবং তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে।

বে নয়। কারণ, পয়গম্বরগণের আসল মনোযোগ আল্লাহ তাআলার দিকেই থাকা উচিত। অন্যের প্রতি মনোযোগ হলেও আসল বিষয় থেকে কেন্দ্রীভূত হয়ে নয়।

وَيَذُرُونَا غَيًّا وَهَبًا —তারা আগ্রহ ও ভয় অর্থাৎ, সুখ ও দুঃখ সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ তাআলাকে ডাকে। এর একরূপ অর্থও হতে পারে যে, তারা এবাদত ও দোয়ার সময় আশা ও ভীতি উভয়ের মাঝখানে থাকে। আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল ও সওয়াবের আশাও সাথে এবং স্বীয় গোনাহ ও ক্রটির জন্যে ভয়ও করে। —(কুরত্ববী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَحَرَّمَ عَلَى قَرِينَةِ أَهْلِكُنَا أَهْلَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ —এখানে 'হারাম' শব্দটি

'শরীয়তগত অসম্ভব' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তফসীরের সারসংক্ষেপে এর অনুবাদ করা হয়েছে 'অসম্ভব'।

لَا يَرْجِعُونَ বাক্যে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে لا অতিরিক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, যে জনপদ ও তার অধিবাসীদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, তাদের জন্যে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসা অসম্ভব। কোন কোন তফসীরবিদ حرام শব্দটিকে এখানে ওয়াজিব ও জরুরী অর্থে ধরে لا কে তার প্রচলিত না-বোধক অর্থে রেখেছেন। তাদের মতে আয়াতের মর্ম এই যে, যে জনপদকে আমি আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছি, তাদের জন্যে দুনিয়াতে ফিরে না আসা ওয়াজিব ও জরুরী। — (কুরত্ববী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পর তওবার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। যদি কেউ দুনিয়াতে এসে সংকর্ম করতে চায়, তবে সেই সুযোগ সে পাবে না। এরপর তো শুধু কেয়ামত দিবসের জীবনই হবে।

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ

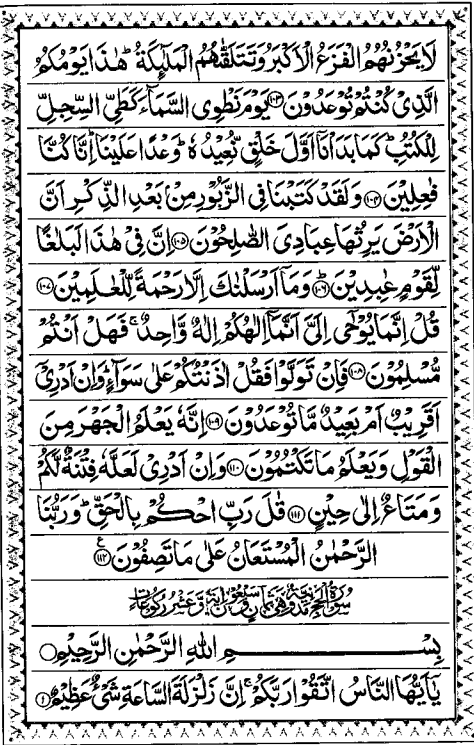
এখানে حتی শব্দটি পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথে সংযুক্তির দিকে ইশারা করে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, যারা কাফের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের পুনরায় দুনিয়াতে জীবিত হয়ে ফিরে আসা অসম্ভব। এই অসম্ভাব্যতার চূড়ান্ত সীমা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, পুনরায় জীবিত হয়ে ফিরে আসা তখন পর্যন্ত অসম্ভব, যে পর্যন্ত ইয়াজুজ মাজুজের ঘটনা সংঘটিত না হয়। এই ঘটনা কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত। সহীহ মুসলিমে হযরত হযায়ফা থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা কয়েকজন সাহাবী একদিন পরস্পর কিছু আলোচনা করছিলাম। ইতিমধ্যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ? আমরা বললাম : আমরা কেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তিনি বললেন : যে পর্যন্ত দশটি আলামত প্রকাশ না পায়, সে পর্যন্ত কেয়ামত কায়ম হবে না। তিনি দশটি আলামতের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশও উল্লেখ করলেন।

আয়াতে ইয়াজুজ-মাজুজের জন্যে فُتِحَتْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, সেই নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তারা কোন বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকবে। কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে যখন আল্লাহ তাআলা চাইবেন যে, তারা বের হোক, তখন এই বাধা সরিয়ে দেয়া হবে। কোরআন পাক থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এই বাধা হচ্ছে যুলকারনাইনের প্রাচীর, যা কেয়ামত নিকটবর্তী হলে খতম হয়ে যাবে। প্রাচীরটি এর পূর্বেও ভেঙ্গে যেতে পারে, কিন্তু রাস্তা তখনই সম্পূর্ণ সুগম

العصر ২২

২২২

اقرب للناس ১৫



(১০৩) মহা ত্রাস তাদেরকে চিন্তান্বিত করবে না এবং ফেরেশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে : আজ তোমাদের দিন, যে দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (১০৪) সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে। (১০৫) আমি উপদেশের পর যবুরে লিখে দিয়েছি যে, আমার সংকল্পপরায়ণ বান্দাগণ অবশেষে পৃথিবীর অধিকারী হবে। (১০৬) এতে এবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্যে পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে। (১০৭) আমি আপনাকে বিশ্বাসীরা জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি। (১০৮) বলুন : আমাকে তো এ আদেশই দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা কি আজীবন হবে? (১০৯) অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দিন : 'আমি তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে সতর্ক করেছি এবং আমি জানি না, তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা নিকটবর্তী না দূরবর্তী। (১১০) তিনি জানেন, যে কথা সন্দেহ বল এবং যে কথা তোমরা গোপন কর। (১১১) আমি জানি না সত্ত্ববতঃ বিলম্বের মধ্যে তোমাদের জন্যে একটি পরীক্ষা এবং এক সময় পর্যন্ত ভোগ করার সুযোগ। (১১২) পয়গম্বরের বললেন : হে আমার পালনকর্তা, আপনি নায়ামুগ্ন ফয়সালা করে দিন। আমাদের পালনকর্তা তো দয়াময়, তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে আমরা তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

সূরা হজ্ব

মদীনায অবতীর্ণ : আয়াত ৭৮

পরম কব্রাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(১) হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয় কেয়ামতের প্রকল্পন একটি ভয়ংকর ব্যাপার।

হবে। সূরা কাহফে ইয়াজুজ-মাজুজ, মূলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানস্থল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে।

حَدِيث শব্দের অর্থ প্রত্যেক উচ্চ ভূমি — বড় পাহাড় হোক কিংবা ছোট ছোট টিলা। সূরা কাহফে ইয়াজুজ-মাজুজের অবস্থানস্থল সম্পর্কিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, তাদের জায়গা পৃথিবীর উত্তরদিকস্থ পর্বতমালায় পশ্চাতে। তাই আবির্ভাবের সময় তাদেরকে উত্তরদিকস্থ পর্বত ও টিলাসমূহ থেকে উছলিয়ে পড়তে দেখা যাবে।

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حُصْبَ جَهَنَّمَ

আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের এবাদত কর, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। দুনিয়াতে কাফেরদের বিভিন্ন দল যেসব মিথ্যা উপাস্যের উপাসনা করেছে, এ আয়াতে তাদের সবার জাহান্নামে প্রবেশ করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, অবৈধ এবাদত তো হযরত ঈসা (আঃ) হযরত ওয়ালর (আঃ) ও ফেরেশতাদেরও করা হয়েছে। অতএব তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? তফসীর কুরতুবীর এক রেওয়াজেতে এই প্রশ্নের জওয়াব প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন : কোরআন পাকের একটি আয়াত সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ করে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ সম্পর্কে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। জানি না, সন্দেহের জওয়াব তাদের জানা আছে বলেই জিজ্ঞাসা করে না, না তারা সন্দেহের ও জওয়াবের প্রতি দৃষ্টিপথই করে না। লোকেরা আরম্ভ করল : আপনি কোন আয়াতের কথা বলছেন? তিনি বললেন : আয়াতটি হলো এই,

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ

বিত্ত্বাচার অবধি থাকে না। তারা বলতে থাকে : এতে আমাদের উপাস্যদের চরম অবমাননা করা হয়েছে। তারা (কিতাবী আলোম) ইবনে যবআরীর কাছে পৌঁছে এ বিষয়ে নালিশ করল। তিনি বললেন : আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তাদেরকে এর সমুচিত জওয়াব দিতাম। আগন্তুকরা জিজ্ঞেস করল : আপনি কি জওয়াব দিতেন? তিনি বললেন : আমি বলতাম যে, খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ) —এর এবং ইহুদীরা হযরত ওয়ালর (আঃ) —এর এবাদত করে। তাদের সম্পর্কে (হে মুহাম্মদ) আপনি কি বলেন? (নাউমুবিলাহ) তাঁরাও কি জাহান্নামে যাবেন? কাফেররা একথা শুনে খুবই আনন্দিত হল যে, বাস্তবিকই মুহাম্মদ এ একথার জওয়াব দিতে পারবেন না। এই ঘটনার পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন :

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُعَذَّبُونَ

অর্থাৎ, যাদের জন্যে আমার পক্ষ থেকে পুণ্য ও সুফল অবধারিত হয়ে গেছে, তারা এই জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে থাকবে।

এই ইবনে যবআরী সম্পর্কেই কোরআন পাকের এই আয়াত নাযিল হয়েছিল :

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ

যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়, তখন আপনার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করে দেয়।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَرَحَ الْكَبِيرَ : হযরত ইবনে আব্বাস বলেন

(মহাত্রাস) বলে শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। এর ফলে সব মৃত জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের জন্যে উখিত হবে। কারও কারও মতে

শিক্ষার প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বী বলেন : শিক্ষায় তিনবার ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকার হবে ত্রাসের ফুৎকার। এতে সারা বিশ্বের মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। আয়াতে একেই **فزع أكبر** বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ফুৎকার হবে বজ্রের ফুৎকার। এতে সব মানুষ মারা যাবে এবং সব কিছু ফাটা হয়ে যাবে। তৃতীয় ফুৎকার হবে পুনরুত্থানের ফুৎকার। এতে সব মৃত জীবিত হয়ে যাবে। এই বজ্রব্যবের সমর্থনে মসনদে আবু ইয়া'লা, বায়হাকী, ইবনে জারীর, তাবারী, ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে হযরত আবু হুরায়রার একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে। — (মাযহারী)

يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءُ كَطَيِّ السِّجِّينِ الْمَكِينِ হযরত ইবনে আব্বাস

সব্দে শব্দের অর্থ করেছেন সহীফা। আলী ইবনে তালহা, আউফী, মুজাহিদ, কাতাদাহ প্রমুখও এই অর্থ করেছেন। ইবনে-কাসীর, ইবনে জরীর প্রমুখও এই অর্থ পছন্দ করেছেন। **سَجَب** শব্দের অর্থ এখানে **مَكْتُوب** অর্থাৎ, লিখিত আয়াতের অর্থ এই যে, কোন সহীফাকে তার লিখিত বিষয়বস্তুসহ যেভাবে গুটানো হয়, আকাশ-মণ্ডলীকে সেইভাবে গুটানো হবে। (ইবনে-কাসীর, রুহুল-মাআনী) **سَجَل** সম্পর্কে এক রেওয়াজে আছে যে, এটা কোন ব্যক্তি অথবা ফেরেশতার নাম। হাদীসবিদগণের কাছে এই রেওয়াজে গ্রাহ্য নয়। আয়াতের মর্ম সম্পর্কে বোঝারীতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীকে গুটিয়ে নিজে হাতে রাখবেন। ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সপ্ত আকাশকে তাদের অর্ন্তবর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ এবং সপ্ত পৃথিবীকে তাদের অর্ন্তবর্তী সব সৃষ্টবস্তুসহ গুটিয়ে একত্রিত করে দেবেন। সবগুলো মিলে আল্লাহ তাআলার হাতে সরিষার একটি দানা পরিমাণ হবে। — (ইবনে কাসীর)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ

الْمُحْسِنُونَ শব্দটি **زبور** এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। এখানে **زبور** বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি আছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের এক রেওয়াজে আছে, আয়াতে **ذَكَرَ** বলে তওরাত এবং **زبور** বলে তওরাতের পর অবতীর্ণ খোদায়ী গ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে, যথা ইঞ্জীল, যবুর ও কোরআন। — (ইবনে জরীর) যাহ্যাক থেকে এরূপ তফসীরই বর্ণিত আছে। ইবনে যয়েদ বলেন : **ذَكَرَ** বলে লওহে মাফুয এবং **زبور** বলে পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ সকল খোদায়ী গ্রন্থই বোঝানো হয়েছে। বাজ্জাজ এ অর্থই পছন্দ করেছেন। — (রুহুল-মাআনী)

الْأَرْضِ অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে এখানে **أَرْض** (পৃথিবী) বলে জন্মান্তের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। ইবনে জরীর ইবনে আব্বাস থেকে এই তফসীর বর্ণনা করেছেন এবং মুজাহিদ, ইবনে যুবায়র, ইকরিমা, সুদী, আবুল আলিয়া থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে। ইমাম রায়ী বলেন : কোরআনের অন্য আয়াতও এর সমর্থন করে। তাতে বলা হয়েছে **أَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَسَبًا وَمِنْ الْجَنَّةِ جَنَّاتٌ** অর্থাৎ,

সংকর্মপরায়ণরা এই পৃথিবীর মালিক হবে। এটাও ইঙ্গিত যে, পৃথিবী বলে জন্মান্তের পৃথিবী বোঝানো হয়েছে। কারণ, দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক তো মুমিন-কাফের সবাই হয়ে যায়। এছাড়া এখানে সংকর্মপরায়ণদের পৃথিবীর মালিক হওয়ার কথাটি কেয়ামতের আলাচনার পর উল্লেখ করা হয়েছে। কেয়ামতের পর জন্মান্তের পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন পৃথিবীর অস্তিত্ব নেই।

ইবনে আব্বাসের অপর এক রেওয়াজে আরও বলা হয়েছে **أَرْض** এর অর্থ এখানে সাধারণ পৃথিবী — অর্থাৎ দুনিয়ার পৃথিবীও এবং জন্মান্তের পৃথিবীও। জন্মান্তের পৃথিবীর মালিক যে এককভাবে সংকর্মপরায়ণগণ হবে, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। তবে এক সময় তারা এককভাবে দুনিয়ার পৃথিবীর মালিক হবে বলেও প্রতিশ্রুতি আছে। কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে এই সংবাদ দেয়া হয়েছে। এক আয়াতে আছে **إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ** পৃথিবী আল্লাহর। তিনি

তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর মালিক করেন এবং শুভ পরিণাম **وَعَالِلَهُ الَّذِينَ** আল্লাহ্‌তীরদের জন্যেই। অপর এক আয়াতে আছে

الْمُؤْمِنُونَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَهُمُ فِي الْأَرْضِ মুমিন ও সংকর্মীদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা করবেন। আরও এক আয়াতে আছে.

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَآلِ الَّذِينَ هُمْ يُؤْمِنُونَ

— নিশ্চয় আমি আমার পয়গম্বরগণকে এবং মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে এবং কেয়ামতের দিন সাহায্য করব। ঈমানদার সংকর্মপরায়ণরা একবার পৃথিবীর বৃহদংশ অধিকারভুক্ত করেছিল। জগদ্বাসী তা প্রত্যক্ষ করেছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই পরিস্থিতি অটুট ছিল। মেহদী (আঃ)-এর যমানায় আবার এ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। — (রুহুল মাআনী, ইবনে কাসীর)

وَأَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ الْغَلِيظِ - **عَالِمِ عَالَمِينَ** এর বহু

বচন। মানব, জিন, জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড়পদার্থসমূহ সবই এর অর্ন্তভুক্ত। রসুলুল্লাহ (সাঃ) সবার জন্যেই রহমতস্বরূপ ছিলেন। কেননা, আল্লাহর যিকর ও এবাদত হচ্ছে সমগ্র সৃষ্টজগতের সত্যিকার রূহ। এ কারণেই যখন পৃথিবী থেকে এই রূহ বিদায় নেবে, তখন পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলার কেউ থাকবে না। ফলে সব বস্তুর মৃত্যু তথা কেয়ামত এসে যাবে। যখন জানা গেল যে, আল্লাহর যিকর ও এবাদত সব বস্তুর রূহ, তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) যেসব বস্তুর জন্যে রহমতস্বরূপ, তা আপন-আপনি ফুটে উঠল। কেননা, দুনিয়াতে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর যিকর ও এবাদত তাঁরই প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার দৌলতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণেই রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন **أَنَا رَحْمَةٌ مَّهْدَاةٌ** আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রহমত। — (ইবনে-আসাকির) হযরত ইবনে ওমরের বাচনিক বর্ণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন **أَنَا رَحْمَةٌ مَّهْدَاةٌ بَرَفَعُ قَوْمَ** অর্থাৎ, আমি আল্লাহ প্রেরিত রহমত, যাতে (আল্লাহর আদেশ পালনকারী) এক সম্প্রদায়কে গৌরবের উচ্চাসনে আসীন করি এবং (আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী) অপর সম্প্রদায়কে অধঃপতিত করে দেই। — (ইবনে-কাসীর)

এ থেকে জানা গেল যে, কুফর ও শেরককে নিষিদ্ধ করার জন্যে কাফেরদেরকে হীনবল করা এবং তাদের মোকাবেলায় জেহাদ করাও সাক্ষাত রহমত। এর ফলে আশা করা যায় যে, অবোধদের জ্ঞান ফিরে আসবে এবং তারা ঈমান ও সংকর্মের অনুসারী হয়ে যাবে।

الحج ২২

২২২

اَقْرَبُ لِلنَّاسِ ১৮

يَوْمَ تَرَوْهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ
وَمَا لَهُمْ حِسَابٌ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝ وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ
شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ ۝ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّ يَصِلَهُ
وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّجِيرِ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ
فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مَن
ثُفْطَةٍ ثُمَّ مَن عِلْقَةٍ ثُمَّ مَن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ
وَمِنكُمْ مَّن يَتُوفَىٰ وَمِنكُمْ مَّن يُدْرَأُ إِلَىٰ الْأَذْلِ الْعُمُرِ
لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ خَا
هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بِهِيْجٍ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ
هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(২) যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যধাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল; অথচ তারা মাতাল নয় বস্তৃত: আল্লাহর আযাব সুকঠিন। (৩) কতক মানুষ অজ্ঞানতাবশত: আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অব্যাহা শয়তানের অনুসরণ করে। (৪) শয়তান সম্পর্কে লিখে দেয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথী হবে, সে তাকে বিভ্রান্ত করবে এবং দোষের আঘাতের দিকে পরিচালিত করবে। (৫) হে লোকসকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখ—) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর বীৰ্য থেকে, এরপর জন্মের রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাঙ্গিত্ববিশিষ্ট ও অপূর্ণাঙ্গিত্ববিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে যাক্ত করার জন্যে। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মৃত্যুগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; তারপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে নিকর্মা বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কে সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে পতিত দেখতে পাও, অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা সতেজ ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বত্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে। (৬) এগুলো এ কারণে যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

সূরা হজ্ব

সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ : এই সূরাটি মকায় অবতীর্ণ না মদীনায় অবতীর্ণ, সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকেই উভয় প্রকার রেওয়াজে বর্ণিত আছে। অধিকসংখ্যক তফসীরবিদগণ বলেন : এই সূরাটি মিশ্র। এতে মকায় অবতীর্ণ ও মদীনায় অবতীর্ণ উভয় প্রকার আয়াতের সমাবেশ ঘটেছে। কুরতুবী এ উক্তিকেই বিশুদ্ধতম আখ্যা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন : এই সূরার কতিপয় বৈচিত্র্য এই যে, এর কিছু আয়াত রাতে, কিছু দিনে, কিছু সফরে, কিছু গৃহে অবস্থানকালে, কিছু মকায়, কিছু মদীনায় এবং কিছু যুদ্ধবস্থায় ও কিছু শান্তিকালে অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া এর কিছু আয়াত রহিতকারী, কিছু আয়াত রহিত এবং কিছু মুহকাম তথা সুস্পষ্ট ও কিছু মুতশাব্বিহ তথা অস্পষ্ট। সূরাটিতে অবতরণের সব প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ সফর অবস্থায় এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রসুলে করীম (সাঃ) উচ্চৈঃস্বরে এর তেলাওয়াত শুরু করেন। সফরসঙ্গী সাহাবায়ে কেয়াম তাঁর আশ্রয়স্থল শুনে এক জাহায্য সমবেত হয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বললেন : এই আয়াতে উল্লিখিত কেয়ামতের ভূকম্পন কোন্ দিন হবে তোমরা জান কি? সাহাবায়ে কেয়াম আরম্ভ করলেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এটা সেই দিনে হবে, যেদিন আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলবেন : যারা জাহান্নামে যাবে, তাদেরকে উঠাও। আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করবেন, কারা জাহান্নামে যাবে? উত্তর হবে, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বললেন : এই সময়েই ত্রাস ও তীতির আধিক্যে বালকরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত হয়ে যাবে। সাহাবায়ে-কেয়াম একথা শুনে তীত-বিহ্বল হয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ, আমাদের মধ্যে কে মুক্তি পেতে পারে? তিনি বললেন : তোমরা নিশ্চিন্ত থাক। যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের এক হাজার ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এবং একজন তোমাদের মধ্য থেকে হবে। এই বিষয়বস্তু সহীহ মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরী থেকে বর্ণিত আছে। কোন কোন রেওয়াজে আছে, সেদিন তোমরা এমন দুই সম্প্রদায়ের সাথে থাকবে যে, তারা যে দলে ভিড়বে, সেই দলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। একটি ইয়াজুজ-মাজুজের সম্প্রদায় ও অপরটি ইবলীস ও তার সাক্ষোপাঙ্গ এবং আদম সন্তানদের মধ্যে যারা তোমাদের পূর্বে মারা গেছে, তাদের সম্প্রদায়। (তাই নয়শত নিরানব্বই এর মধ্যে বৃহত্তর সংখ্যা তাদেরই হবে।) তফসীরে কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে এসব রেওয়াজে বর্ণিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কেয়ামতের ভূকম্পন কবে হবে : কেয়ামত শুরু হওয়া এবং মনুষ্যকুলের পুনরুত্থিত হওয়ার পর ভূকম্পন হবে, না এর আগেই হবে এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন : কেয়ামতের পূর্বে এই পৃথিবীতে এই ভূকম্পন হবে এবং এটা কেয়ামতের সর্বশেষ আলামতরূপে গণ্য হবে। কোরআন পাকের অনেক আয়াতে এর উল্লেখ আছে, যথা—

- (১) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (২) إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (৩) إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْجًا

কেউ কেউ আদম (আঃ)-কে সম্প্রদান সম্পর্কিত উপরোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে বলেছেন যে, ভূকম্পন হাশর-নশর ও পুনরুত্থানের পর হবে। প্রকৃত সত্য এই যে, উভয় উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেয়ামতের পূর্বে ভূকম্পন হওয়াও আয়াত ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং হাশর-নশরের পরে হওয়াও উল্লেখিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

কেয়ামতের এই ভূকম্পনের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং স্তন্যদাত্রী মহিলারা তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা ভুলে যাবে। যদি এই ভূকম্পন কেয়ামতের পূর্বেই এই দুনিয়াতে হয়, তবে এরূপ ঘটনা ঘটান ব্যাপারে কোন খটকা নেই। পক্ষান্তরে হাশর-নশরের পরে হলে এর ব্যাখ্যা এরূপ হবে যে, যে মহিলা দুনিয়াতে গর্ভাবস্থায় মারা গেছে, কেয়ামতের দিন সে তদবস্থায়ই উত্থিত হবে এবং যারা স্তন্যদানের সময় মারা গেছে, তারাও তেমনিভাবে শিশুসহ উত্থিত হবে।—(কুরতুবী)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ۚ
বিতর্ককারী নম্বর ইবনে হারেস সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা এবং কোরআনকে বিগত লোকদের কল্পকাহিনী বলত। কেয়ামতে পুনরুত্থানও সে অস্বীকার করত।—(মাযহারী)

আয়াত যদিও একজন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু তার হুকুম এ ধরনের বদভ্যাসযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে ব্যাপক।

মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির স্তর ও বিভিন্ন অবস্থা :
فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَّوَارٍ ۚ
এই আয়াতে মাতৃগর্ভে মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বোখারী'র এক হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : মানুষের বীর্ষ চল্লিশ দিন পর্যন্ত গর্ভাশয়ে সঞ্চিত থাকে। চল্লিশ দিন পর তা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরও চল্লিশ দিন অতিবাহিত হলে তা মাংসপিণ্ড হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা প্রেরিত হয়। সে তাতে রূহ ফুঁকে দেয়। এ সময়েই তার সম্পর্কে চারটি বিষয় লিখে দেয়া হয় : (১) তার বয়স কত হবে, (২) সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে, (৩) সে কি কি কাজ করবে এবং (৪) পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা।—(কুরতুবী)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদেরই বাচনিক এবং ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে জরীর বর্ণিত অপর এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বীর্ষ যখন কয়েক স্তর অতিক্রম করে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, তখন মানব সৃষ্টির কাজে আদিষ্ট ফেরেশতা আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করে يٰرَبُّ ۚ تَخْلُقُ وَتَعْبُدُ ۚ অর্থাৎ, এই মাংসপিণ্ড দ্বারা মানব সৃষ্টি আপনার কাছে অবধারিত কি না? যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তরে বলা হয় ۚ تَخْلُقُ ۚ তবে গর্ভাশয়ে সেই মাংসপিণ্ডকে পাত করে দেয়া হয় এবং তা সৃষ্টির অন্যান্য স্তর অতিক্রম করে না। পক্ষান্তরে যদি জওয়াবে تَخْلُقُ ۚ বলা হয়, তবে ফেরেশতা জিজ্ঞেস করে, ছেলে না কন্যা, হতভাগা; না ভাগ্যবান, বয়স কত, কি কর্ম করবে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে? এসব প্রশ্নের জওয়াব তখনই ফেরেশতাকে বলে দেয়া হয়।—(ইবনে কাসীর) تَخْلُقُ ۚ وَتَعْبُدُ ۚ শব্দদ্বয়ের এই তফসীর হযরত ইবনে আকবাস থেকেও বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী)

تَخْلُقُ ۚ وَتَعْبُدُ ۚ উল্লেখিত হাদীস থেকে এই শব্দদ্বয়ের তফসীর

এই জানা গেল যে, যে বীর্ষ দ্বারা মানবসৃষ্টি অবধারিত হয়, তা مخلقة এবং যা বিনষ্ট ও পাত হওয়া অবধারিত, তা غير مخلقة কোন কোন তফসীরকারক مخلقة ও غير مخلقة এর এরূপ তফসীর করেন যে, যে শিশুর সৃষ্টি পূর্ণাঙ্গ এবং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ, সুঠাম ও সুস্বয় হয়, সে غير مخلقة অর্থাৎ, পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট এবং যার কতক অঙ্গ অসম্পূর্ণ অথবা দৈহিক গড়ন ইত্যাদি অসম, সে غير مخلقة

تَخْلُقُ ۚ وَتَعْبُدُ ۚ অর্থাৎ, অতঃপর মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদেরকে

দুর্বল শিশুর আকারে বের করি। এ সময় শিশুর দেহ, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, জ্ঞান, নড়াচড়া ও ধারণশক্তি ইত্যাদি সবই দুর্বল থাকে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে এগুলোকে শক্তিদান করা হয় এবং পরিণেবে পূর্ণশক্তির স্তরে পৌঁছে যায়। تَخْلُقُ ۚ وَتَعْبُدُ ۚ এর অর্থ তাই। اشد শব্দটি شدة এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, পর্যায়ক্রমে উন্নতির দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে যতক্ষণ তোমাদের প্রত্যেকটি শক্তি পূর্ণতা লাভ না করে, যা যৌবনকালে প্রত্যাক করা হয়।

أَزَلَّ الْعَبْرُ সেই বয়সকে বলা হয়, যে বয়সে মানুষের বুদ্ধি, চেতনা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ক্রটি দেখা যায়। রসূলে করীম (সঃ) এমন বয়স থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। সা'দের বাচনিক নাসায়ীতে বর্ণিত আছে—রসূলুল্লাহ (সঃ) নিম্নোক্ত দোয়া অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন এবং সা'দ (রাঃ)-ও এই দোয়া তাঁর সন্তানদেরকে মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। দোয়াটি এই :

اللَّهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُكَ مِنَ الْبَخْلِ وَاَعُوْذُكَ مِنَ الْجَبَنِ وَاَعُوْذُكَ
مِنْ اَنْ اَرُدَّ اِلَى اَرْدَلِ الْعَمْرِ وَاَعُوْذُكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ
الْقَبْرِ .

মানব সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর তার বয়সের বিভিন্ন স্তর ও অবস্থা : মুসানাদে-আহমদ ও মুসানাদে আবু-ইয়ালায় বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেকের বাচনিক এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত সন্তানদের সংকর্ম পিতা-মাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। কোন সন্তান অসংকর্ম করলে তা তার নিজের আমলনামায়ও লিখা হয় না এবং পিতা-মাতার আমলনামায়ও রক্ষিত হয় না। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে তার নিজের আমলনামা চালু হয়ে যায়। তখন তার হেফাজত ও তাকে শক্তি যোগানোর জন্যে সঙ্গী দুইজন ফেরেশতাকে আদেশ করা হয়। যখন সে মুসলমান অবস্থায় চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে উম্মাদ হওয়া, কুষ্ঠ ও ধবলকুষ্ঠ এই রোগত্রয় থেকে নিরাপদ করে দেন। যখন পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছে, তখন আল্লাহ তাআলা তার হিসাব হালকা করে দেন। ষাট বছর বয়সে পৌঁছে সে আল্লাহর দিকে রুজুর তওকীক প্রাপ্ত হয়। সত্তর বছর বয়সে পৌঁছে আসমানের অধিবাসী সব ফেরেশতা তাকে মহব্বত করতে থাকে। আশি বছর বয়সে উপনীত হলে আল্লাহ তাআলা তার সংকর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করেন এবং অসংকর্মসমূহ মার্জনা করে দেন। নব্বই বছর বয়সে আল্লাহ তাআলা তার অগ্র-পশ্চাতের সব গোনাহ মাক করে দেন এবং তাকে তার পরিবারের লোকদের ব্যাপারে শাফাআত করার অধিকার দান করেন ও শাফাআত কবুল করেন। তখন তার উপাধি হয়ে যায় “আযীনুল্লাহ ও আসিরুল্লাহ ফিল আরদু” অর্থাৎ, পৃথিবীতে আল্লাহর বন্দী।

الحج ২২

২২২

اقترب للناس ১৫

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَزِيدُ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ
 فِي الْقُبُورِ وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ۖ ثَلَاثِي عَظْفِهِ لِيُخْضَلَ عَنْ
 سَبِيلِ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 عَذَابُ الْحَرِيقِ ۚ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ
 بِظَالِمٍ لِّلْعَالَمِينَ ۖ وَمَنْ النَّاسُ مَنْ يَتَّبِعُ اللَّهَ عَلَى حَوْفٍ
 فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ لِّطَائِفَةٍ ۖ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ فَإِنَّكَ بِهَا
 وَجْهٌ ۚ يَخْشَوْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْخَيْرُ ۚ إِنَّ الْبَشَرَ
 لَشَرٌّ عَوَازٍ ۚ وَمَنْ دُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ
 الصَّلَاةُ الْبَعِيدَةُ ۚ يَدْعُو الْمَنْ عَزَّةٌ أَقْرَبُ مِنْ تَقَعُّبِهِ
 لَيْسَ الْمَوْلَى وَلَيْسَ الْعَشِيرَةُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۚ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ لَكَ
 يَخْشَى اللَّهَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ فَلْيَمِزْ بِسَبِيلِ اللَّهِ
 السَّمَاءَ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۝

(৭) এবং এ কারণে যে, কেয়ামত অবশ্যস্বাভী, এতে সন্দেহ নেই এবং এ কারণে যে, কবরে যারা আছে, আল্লাহ তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (৮) কতক মানুষ জ্ঞান; প্রমাণ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে। (৯) সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে, যাতে আল্লাহর পথ থেকে বিব্রান্ত করে দেয়। তার জন্যে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা আছে এবং কেয়ামতের দিন আমি তাকে দহন-যন্ত্রণা আশ্বাদন করাব। (১০) এটা তোমার দুই হাতের কর্মের কারণে, আল্লাহ বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। (১১) মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দুন্দেব জড়িত হয়ে আল্লাহর এবাদত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে এবাদতের উপর কায়ম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্ববিহীন ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি। (১২) সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যে তার অপকার করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। এটাই চরম পঞ্চবটতা। (১৩) সে এমন কিছুকে ডাকে, যার অপকার উপকারের আগে পৌছে। কত মন্দ এই বন্ধু এবং কত মন্দ এই সঙ্গী। (১৪) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ষ সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরীসমূহ প্রবাহিত হয়। আল্লাহ যা ইচ্ছা জাই করেন। (১৫) সে ধারণা করে যে, আল্লাহ কখনই ইহকালে ও পরকালে রসুলকে সাহায্য করবেন না, সে একটি রশি আকাশ পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিক; এরপর কেটে দিক; অতঃপর দেখুক তার এই কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কি না।

কেননা, এই বয়সে সাধারণতঃ মানুষের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, কোন কিছুতে ঐৎসুক্য বাকী থাকে না। সে বন্দীর ন্যায় জীবন যাপন করে। অতঃপর মানুষ যখন ‘আরযালে ওমর’ তথা নিকর্মা বয়সে পৌছে যায়, তখন সুস্থ ও শক্তিবান অবস্থায় যেসব সংকর্ষ করত, তা অব্যাহতভাবে তার আমলনামায় লিখা হয় এবং কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

عَظْفٍ শব্দের অর্থ পার্শ্ব। অর্থাৎ, পার্শ্ব পরিবর্তনকারী।

এখানে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বোঝানো হয়েছে।

وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يُتَّبِعُ اللَّهَ عَلَى حَوْفٍ বুখারী ও ইবনে আবী

হাতেম হজরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন হিয়রত করে মদীনায় বসবাস করতে শুরু করেন, তখন এমন লোকও এসে ইসলাম গ্রহণ করত, যাদের অন্তরে ইসলাম পাকাপোক্ত ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পর তাদের সম্ভান ও ধন-দৌলতে উন্নতি দেখা গেলে তারা বলত : এই ধর্ম ভাল। পক্ষান্তরে এর বিপরীত দেখা গেলে বলত : এই ধর্ম মন্দ। এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে? বলা হয়েছে যে, তারা ঈমানের এক কিনারায় দণ্ডায়মান আছে। ঈমানের পর যদি তারা পার্শ্ব সুখ ও ধন-সম্পদ লাভ করে, তবে ইসলামে অটল হয়ে যায়, পক্ষান্তরে যদি পরীক্ষাষরুপ কোন বিপদপদ ও পোরেশনীতে পতিত হয়, তবে ধর্ম ত্যাগ করে বসে।

مَنْ كَانَ يَظُنُّ সারকথা এই যে, ইসলামের পথ রুদ্ধকারী শত্রু চায়

যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল ও তাঁর ধর্মকে সাহায্য না করুন। এরূপ শত্রুদের বোঝে নেয়া উচিত যে, এটা তখনই সম্ভবপর, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তের পদ বিলুপ্ত করে দেয়া হবে এবং তাঁর প্রতি ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা যাকে নবুওয়তের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং ওহী দ্বারা ভূষিত করেছেন, ইহকাল ও পরকালে তাঁকে সাহায্য করার পাকাপোক্ত ওয়াদা আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে। যুক্তির দিক দিয়েও এই ওয়াদার খেলাফ হওয়া উচিত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি রসূল ও তাঁর ধর্মের উন্নতির পথ রুদ্ধ করতে চায়, তার সাধ্য থাকলে এরূপ কৌশল অবলম্বন করা উচিত, যাতে নবুওয়তের পদ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়বস্তুটি অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার ভঙ্গিতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে ওহী বন্ধ করতে চাইলে সে কোনরূপে আকাশে পৌছুক এবং সেখান থেকে ওহীর আগমন বন্ধ করে দিক। বলাবাহুল্য, কারও পক্ষে আকাশে যাওয়া ও আল্লাহ তাআলাকে ওহী বন্ধ করতে বলা মোটেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং তার কৌশল যখন কার্যকর নয়, তখন ইসলাম ও ঈমানের বিরুদ্ধে আক্রোশের ফল কি? এই তফসীর হুবহু দুর-মনসুর গ্রন্থে ইবনে সাদ থেকে বর্ণিত আছে। আমার মতে আয়াতের এটাই সর্বোত্তম ও সাবলীল তফসীর। - (বয়ানুল-কোরআন-সহজকৃত)।

কুরভূবী এই তফসীরকেই আবু জা'ফর নাহাস থেকে উদ্ধৃত করে বলেন : এটা সবচাইতে সুন্দর তফসীর। তিনি ইবনে আব্বাস থেকেও এই তফসীর বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ আয়াতের এরূপ তফসীর করেছেন

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنِ ارْتَدَىٰ
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ وَالصَّالِينَ
 وَالْمُجُوسَ وَالَّذِينَ أَتَوْا آلَ إِبْرَاهِيمَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِهِم مَّا يَشَاءُ
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ كَذَرْنَا أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ
 فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَ
 الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ
 عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَمَالَهُ مِنْ مَّكَرٍ إِنَّ اللَّهَ
 يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ هَٰذَا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ فِي رَيْبِهِمْ
 فَالَّذِينَ كَفَرُوا أَفْطَعَتْ لَهُمْ نَارًا مِنْ تَارٍ يُصَبُّ مِنْ
 فَوْقِ رُءُوسِهِمْ أَحْمِيمٌ ۝ يُصْهَرُ بِهِ مَنُ يَتُوبُ لَهُمْ وَالْجَانُّ
 وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۝ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا
 مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝
 إِنَّ اللَّهَ يَدْعُ الْإِنْسَانَ إِلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ
 أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۝

(১৬) এমনভাবে আমি সুস্পষ্ট আয়াতরূপে কোরআন নাযিল করেছি এবং আল্লাহ্-ই যাকে ইচ্ছা হেদায়েত করেন। (১৭) যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, সাবেয়ী, খ্রীষ্টান, অগ্নিগন্ধক এবং যারা মুশরেক, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ অবশ্যই তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। সবকিছুই আল্লাহর দৃষ্টির সামনে। (১৮) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু আছে নভোমণ্ডলে, যা কিছু আছে ভূমণ্ডলে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারা দ্বি পর্বতরাশি বৃক্ষলতা, জীবজন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকের উপর অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ্ যাকে লাক্ষিত করেন, তাকে কেউ সম্পন্ন দিতে পারে না। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন। (১৯) এই দুই বাদী বিবাদী, তারা তাদের পালনকর্তা সম্পর্কে বিভক্ত করে। অতএব যারা কাফের, তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। (২০) ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। (২১) তাদের জন্যে আছে লোহার হাতুড়ি। (২২) তারা যখনই যত্নশায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে : দহনশাস্তি আশ্বাদন কর। (২৩) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যানসমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নিঝরীসমূহ প্রবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী।

যে, এখানে سماء বলে নিজ গৃহের ছাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই; যদি কোন মূর্খ শত্রু কামনা করে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল ও তাঁর ধর্মের সাহায্য না করুক এবং সে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ পোষণ করে, তবে সে বুঝে নিক যে, তার বাসনা কখনও পূর্ণ হবে না। এই বোকাসুলভ আক্রমণের প্রতিকার এছাড়া কিছুই নেই যে, সে তার ছাদে রশি ঝুলিয়ে ফাঁস নিয়ে মরে যাক।—(মাতহরী)

আনুগত্যিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সমগ্র সৃষ্টবস্তুর আনুগত্যশীল হওয়ার স্বরূপ : সমগ্র সৃষ্টজগত স্রষ্টার আশ্রাধীন ও ইচ্ছাধীন। সৃষ্টজগতের এই আশ্রানুগত্যতা দুই প্রকার : (১) সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার অধীনে বাধ্যতামূলক আনুগত্য। মুমিন, কাফের, জীবিত, মৃত, জড়পদার্থ ইত্যাদি কেউ এই আনুগত্যের আওতা বহির্ভূত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই সমভাবে আল্লাহ তাআলার আশ্রাধীন ও ইচ্ছাধীন। বিশু-চরাচরের কোন কণা অথবা পাহাড় আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে এতটুকুও নড়াচড়া করতে পারে না। (২) সৃষ্টজগতের ইচ্ছাধীন আনুগত্য। অর্থাৎ, স্ব-ইচ্ছায় আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী মেনে চলা। এতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য আছে। যারা আনুগত্যশীল করমাবরদার, তারা মুমিন এবং যারা আনুগত্য বর্জন করে ও অস্বীকার করে তারা কাফের। আয়াতে মুমিন ও কাফেরের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, এখানে সেজদা ও আনুগত্য বলে শুধু সৃষ্টিগত আনুগত্য নয়; বরং ইচ্ছাধীন আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। এখানে প্রশ্ন হয় যে, ইচ্ছাধীন আনুগত্য তো শুধু বিবেকবান মানুষ, জিন ইত্যাদির মধ্যে হতে পারে। জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও জড়পদার্থের মধ্যে বিবেক ও চেতনা নেই। এমতাবস্থায় এগুলোর মধ্যে ইচ্ছাধীন আনুগত্য কিভাবে হবে? এর উত্তর এই যে, কোরআন পাকের বহু আয়াত ও বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, বিবেক, চেতনা ও ইচ্ছা থেকে কোন সৃষ্টবস্তুই মুক্ত নয়। সবার মধ্যেই কম-বেশী এগুলো বিদ্যমান আছে। মানব ও জিন জাতিকে আল্লাহ তাআলা বিবেক ও চেতনার একটি পূর্ণস্তর দান করেছেন। এ কারণেই তাদেরকে আদেশ ও নিষেধের অধীন করা হয়েছে। অবশিষ্ট সৃষ্টবস্তুর মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রকারকে সেই প্রকারের প্রয়োজন অনুযায়ী বিবেক ও চেতনা দেয়া হয়েছে। মানব জাতিই সর্বাধিক বিবেক ও চেতনা লাভ করেছে। জন্তু-জানোয়ারের বিবেক ও চেতনা সাধারণতঃ অনুভব করা হয়। উদ্ভিদের বিবেক ও চেতনাও সামান্য চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা চেনা যায়, কিন্তু জড় পদার্থের বিবেক ও চেতনা এতই অল্প ও লুক্কায়িত যে, সাধারণ মানুষ তা বুঝতেই পারে না। কিন্তু তাদের স্রষ্টা ও মালিক বলেছেন যে, তারাও বিবেক ও চেতনার অধিকারী। কাজেই আলোচ্য আয়াতে সে আনুগত্যকে সেজদা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, তা ইচ্ছাধীন আনুগত্য। আয়াতের অর্থ এই যে, মানবজাতি ছাড়াও (জিনসহ) সব সৃষ্টবস্তু স্বৈচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে আল্লাহ তাআলার দরবারে সেজদা করে অর্থাৎ, আশ্রা পালন করে। শুধু মানব ও জিনই দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে—(এক) মুমিন, অনুগত ও সেজদাকারী এবং (দুই) কাফের, অবাস্থ্য ও সেজদার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। সেজদার তওফীক না দিয়ে আল্লাহ তাআলা শেযাক দলকে হেয় করেছেন।

هَٰذَا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ فِي رَيْبِهِمْ ۝ هَٰذَا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ فِي رَيْبِهِمْ

মুমিনগণ এবং তাদের বিপরীতে সব কাফের দল; ইসলামের যুগের হোক কিংবা পূর্ববর্তী যুগসমূহের। তবে এই আয়াত সে দুই পক্ষ সম্পর্কে

অবতীর্ণ হয়েছে, যারা বদরের রণক্ষেত্রে একে অপরের বিপক্ষে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী, হামযা, ওবায়দা (রাঃ) ও কাফেরদের পক্ষ থেকে ওতবা ইবনে রবীয়া, তদীয় পুত্র ওলীদ ও তদীয় ভাতা শায়বা এতে শরীক ছিল। তন্মধ্যে কাফের পক্ষের তিন জনই নিহত এবং মুসলমানদের মধ্য থেকে হযরত আলী ও হামযা অক্ষত অবস্থায় ফিরে এসেছিলেন। ওবায়দা সুরুতর আহত অবস্থায় ফিরে এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর পায়েয় কাছে প্রাণত্যাগ করেন। আয়াত যে এই সম্মুখযোদ্ধাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, তা বুখারী ও মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। কিন্তু বাহ্যতঃ এই হুকুম তাঁদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং সমগ্র উম্মতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—যে কোন যমানার উম্মত হোক না কেন।

জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানোর রহস্য : এখানে সন্দেহ হয় যে, হাতে কংকন পরা নারীদের কাজ এবং এটা তাদেরই অলংকার। পুরুষদের জন্যে একে দোষনীয় মনে করা হয়। উত্তর এই যে, মাখায় মুকুট এবং হাতে কংকন পরিধান করা পুরাকালের রাজা-বাদশাহদের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রচলিত ছিল। হাদীসে বর্ণিত আছে, হিজরতের সফরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে গ্রেফতার করার জন্যে সুরাকা ইবনে মালেক অশুশ্রুত গুপ্তার হয়ে পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিল। আল্লাহর হুকুমে তার ঘোড়ার পা মাটিতে পুঁতে গেলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর দোয়ায় ষোড়টি উদ্ধার পায়। সুরাকা ইবনে মালেক তওবা করায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে ওয়াদা দেন যে, পারস্য সম্রাট কিস্রার কংকন যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে মুসলমানদের হস্তগত হলে তাকে তা দান করা হবে। অতঃপর হযরত ওমর ফারূকের খেলাফতকালে যখন পারস্য বিজিত হয় এবং সম্রাটের কংকন অন্যান্য মালের সাথে আগমন করে, তখন সুরাকা ইবনে মালেক তা দাবী করে বসে এবং তাকে তা প্রদানও করা হয়। মোটকথা সাধারণ পুরুষের মধ্যে যেমন মাখায় মুকুট পরিধান করার প্রচলন নেই, এটা রাজকীয় ভূষণ, তেমনি হাতে কংকন পরিধান করাকেও রাজকীয় ভূষণ মনে করা হয়। তাই জান্নাতীদেরকে কংকন পরিধান করানো হবে। কংকন সম্পর্কে এই আয়াতে এবং সূরা ফাতের বলা হয়েছে যে, তা স্বর্ণ নির্মিত হবে, কিন্তু সূরা নিসায় রৌপ্য নির্মিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তফসীরকারগণ বলেন : জান্নাতীদের হাতে তিন রকম কংকন পরানো হবে—স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত এবং মোতি নির্মিত। এই আয়াতে মোতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।—(কুরতুবী)

রেশমী পোশাক পুরুষদের জন্য হারাম : আলাচ্য আয়াতে আছে যে, জান্নাতীদের পোশাক রেশমের হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের সমস্ত পরিচ্ছদ, বিছানা, পর্দা ইত্যাদি রেশমের হবে। রেশমী বস্ত্র দুনিয়াতে

সর্বোত্তম গণ্য হয়। বলাবাহুল্য, জান্নাতের রেশমের উৎকৃষ্টতার সাথে দুনিয়ার রেশমের মান কোন অবস্থাতেই তুল্য নয়।

ইমাম নাসায়ী, বাযযার ও বাযহাকী আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : জান্নাতীদের রেশমী পোশাক জান্নাতের ফলের ভেতর থেকে বের হবে। হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে আছে, জান্নাতের একটি বৃক্ষ থেকে রেশম উৎপন্ন হবে। জান্নাতীদের পোশাক এই রেশম দ্বারাই তৈরী হবে।—(মাযহাবী)

ইমাম নাসায়ী হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন :

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب فيها في الآخرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة .

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরিধান করবে না। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্য পান করবে, সে পরকালে তা থেকে বঞ্চিত থাকবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে, সে পরকালে এসব পাত্রে পানাহার করবে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : এই বস্ত্রত্রয় জান্নাতীদের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট।—(কুরতুবী)

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এসব কাজ করে এবং তওবা না করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করলেও এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে; যেমন—আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্যপান করে তওবা করে না, সে পরকালে জান্নাতের মদ থেকে বঞ্চিত হবে।—(কুরতুবী)

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, যখন তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে, তখন কোন বস্ত্র থেকে বঞ্চিত রাখলে তার মনে দুঃখ ও পরিতাপ থাকবে। অথচ জান্নাত দুঃখ ও পরিতাপের স্থান নয়। সেখানে কারও মনে বিবাদ ও আফসোস থাকা উচিত নয়। যদি আফসোস না হয়, তবে এই বঞ্চিত করারও উপকারিতা নেই। কুরতুবী এর চমৎকার জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেন : জান্নাতীদের স্থান ও স্তর বিভিন্মরূপ হবে। কেউ উপরের স্তরে এবং কেউ নিম্নস্তরে থাকবে। স্তরের এই ব্যবধান ও পার্থক্য সবাই অনুভবও করবে। কিন্তু সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের অন্তর এমন করে দেবেন যে, তাতে কোন কিছুই পরিতাপ ও আফসোস থাকবে না।

وَهُدُوًا إِلَى الْكَاتِبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ وَهُدُوًا إِلَى صِرَاطِ
الْحَمِيدِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفِ
فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يَرُدَّ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلَمْ ثِقْلَ ظَنِّهِ مِنْ
عَذَابِ اللَّهِ ۚ وَآذِينَ أَتَالَهُمْ مِنْ مَكَانٍ الْيَبِ أَنْ لَا
تُشْرَكَ بِي شَيْءٌ وَظَهَرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَ
الرُّكُومِ السُّجُودِ ۚ وَأَذِينَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَتْرَةٍ عِتْيَى ۚ لِيُشْهِدُوا
مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ
عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهْمَةِ الْأَنْعَامِ ۚ فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ۚ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَشْتَهُمْ
وَلْيُقِيمُوا زُكُوتَهُمْ وَلْيَطَّوُّوا بِالْبَيْتِ الْعَرَبِيِّ ۚ
ذَلِكَ وَمَنْ يُعْطَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّي
وَأَحَلَّكَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يَشُلُّ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۚ

(২৪) তারা পঞ্চদশদিক হয়েছিল সংবাক্যের দিকে এবং পরিচালিত হয়েছিল প্রশংসিত আল্লাহর পন্থাপানে। (২৫) যারা কুফর করে ও আল্লাহর পন্থে বাধা সৃষ্টি করে এবং সেই মসজিদে হারাম থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি প্রস্তুত করেছি স্বীয় ও বহিরাগত সকল মানুষের জন্যে সমভাবে এবং যে মসজিদে হারামে অন্যায়ভাবে কোন ধর্মপ্রাণী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাদেরকে যন্ত্রাদায়ক শাস্তি আশ্বাদন করাব। (২৬) যখন আমি ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করে না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখ তওযাফকারীদের জন্যে, নামাযে দণ্ডায়মানদের জন্যে এবং রুকু-সেজদাকারীদের জন্যে। (২৭) এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের জন্যে বোষণা প্রচার কর। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে। (২৮) যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করে তাঁর দেয়া চতুশদ ভক্ত যবেহ করার সময়। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং দুহু-অভ্যবস্তুকে আহার কর। (২৯) এরপর তারা যেন দেখি ময়লা দূর করে দেয়, তাদের যানত পূর্ণ করে এবং এই সুসংরক্ষিত গৃহের তওযাফ করে। (৩০) এটা প্রকথযোগ্য। আর কেউ আল্লাহর সন্মানযোগ্য বিধানাবলীর প্রতি সন্মান প্রদর্শন করলে পালনকর্তার নিকট তা তার জন্যে উত্তম। উল্লিখিত ব্যতিক্রমগুলো ছাড়া তোমাদের জন্যে চতুশদ ভক্ত হালাল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে সরে থাক;

وَهُدُوًا إِلَى الْكَاتِبِ مِنَ الْقَوْلِ ۖ هযরত ইবনে-আব্বাস বলেন : এখানে কলেমায়ে তাইয়্যেবাহ্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বোঝানো হয়েছে।—(কুরতুবী)

سَبِيلِ اللَّهِ (আল্লাহর পন্থা) বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা নিজেরা তো ইসলাম থেকে দূরে সরে আছেই অন্যদেরকেও ইসলাম থেকে বাধা দেয়।

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ এটা তাদের দ্বিতীয় গোনাহ। তারা মুসলমানদেরকে মসজিদে-হারামে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। ‘মসজিদে-হারাম’ ঐ মসজিদকে বলা হয়, যা বায়তুল্লাহর চতুশার্শে নির্মিত হয়েছে। এটা মক্কার হেরেম শরীফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কিন্তু কোন কোন সময় মসজিদে-হারাম বলে মক্কার সম্পূর্ণ হেরেম শরীফ বোঝানো হয়; যেমন—আলোচ্য ঘটনাতেই মক্কার কাফেররা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে শুধু মসজিদে-হারামে প্রবেশে বাধা দেয়নি; বরং হেরেমের সীমানায় প্রবেশ করতে বাধা দান করেছিল। সহীহ হাদীস দ্বারা তাই প্রমাণিত রয়েছে। কোরআন পাক এ ঘটনায় মসজিদে-হারাম শব্দটি সাধারণ হেরেমের অর্থে ব্যবহার করেছে এবং বলেছে : وَصَدُّوا عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

তফসীরে দূররে-মনসূরে এখানে হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়েছে যে; আয়াতে মসজিদে হারাম বলে হেরেম বোঝানো হয়েছে।

মক্কার হেরেমে সব মুসলমানের সমান অধিকারের তাৎপর্য : মসজিদে-হারাম ও হেরেম শরীফের যে যে অংশে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম পালন করা হয়; যেমন—ছাফা-মারওয়া পাহাড়দুয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মিনার সমগ্র ময়দান, আরাফাতের সম্পূর্ণ ময়দান এবং মুযদালেকার গোটা ময়দান, এসব ভূখণ্ড সারা বিশ্বে মুসলমানদের জন্যে সাধারণ ওয়াকফ। কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত মালিকানা এগুলোর উপর কখনও হয়নি এবং হতেও পারে না। এ বিষয়ে সমগ্র উম্মত ও ফেকাহবিদগণ একমত। এগুলো ছাড়া মক্কা মুকাররমার সাধারণ বাসগৃহ এবং হেরেমের অবশিষ্ট ভূখণ্ড সম্পর্কেও কোন কোন ফেকাহবিদ বলেন যে, এগুলোও সাধারণ ওয়াকফ সম্পত্তি। এগুলো বিক্রয় করা ও ভাড়া দেয়া হারাম। প্রত্যেক মুসলমান যে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারে। তবে অধিক সংখ্যক ফেকাহবিদগণের উক্তি এই যে, মক্কার বাসগৃহসমূহের উপর ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা হতে পারে। এগুলো ক্রয়-বিক্রয় করা ও ভাড়া দেয়া জায়েয। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সফওয়ান ইবনে ওমাইয়্যার বাসগৃহ ক্রয় করে কয়েদীদের জন্যে জেলখানা নির্মাণ করেছিলেন। ইমাম আযম আবু হানীফা (রাঃ) থেকে এ ব্যাপারে উপরোক্ত উভয় প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে। কিন্তু ফতওয়া শেখাত্ উক্তি অনুযায়ী।—(রুহুল-মা' আনী) ফেকাহ গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে হেরেমের যে যে অংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সর্বাবস্থায় সাধারণ ওয়াকফ। এগুলোতে প্রবেশে বাধা দেয়া হারাম। আলোচ্য আয়াত থেকে এই অবৈধতা প্রমাণিত হয়।

وَمَنْ يَرُدَّ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلَمْ অভিধানে الحاد এর অর্থ সরল পথ

থেকে সরে যাওয়া। এখানে ‘এলহাদের’ অর্থ মুজাহিদ ও কাতাদাহর মতে কুফর ও শেরক। কিন্তু অন্য তফসীরকারকগণ একে সাধারণ অর্থে রেখেছেন। ফলে প্রত্যেক গোনাহ ও আল্লাহর নাফরমানী এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি, চাকরকে গালি দেয়া এবং মন্দ বলাও। এই অর্থের প্রতি লক্ষ্য করেই হযরত আতা বলেন : ‘হেরেমে এলহাদ’ বলে এহরাম ব্যতীত হেরেমে প্রবেশ করা এবং হেরেমে নিষিদ্ধ— এমন কোন কাজ করাকে বোঝানো হয়েছে। যেমন— হেরেমে শিকার করা কিংবা হেরেমে কোন বৃক্ষ কর্তন করা ইত্যাদি। যেসব কাজ শরীয়তে নিষিদ্ধ, সেগুলো সর্বত্রই গোনাহ এবং আযাবের কারণ। তবে বিশেষ করে হেরেমের কথা বলার কারণ এই যে, মক্কার হেরেমে সৎকাজের সওয়াব যেমন বেশী হয় তেমনি পাপকাজের আযাবও বহুলাংশে বেড়ে যায়।— (মুজাহিদের উক্তি)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে এই আয়াতের এক তফসীর এরূপও বর্ণিত আছে যে, হেরেম শরীফ ছাড়া অন্যত্র পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই পাপ লিখা হয় না, যতক্ষণ তা কার্যে পরিণত করা না হয়, কিন্তু হেরেমে শুধু পাপকোপিত ইচ্ছা করলেই গোনাহ লিখা হয়। কুরতুবী এই তফসীরই হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন এবং একে বিশুদ্ধ বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হুজ্ব করতে গেলে দু’টি তাঁবু স্থাপন করতেন— একটি হেরেমের অভ্যন্তরে এবং অপরটি বাইরে। যদি পরিবারবর্গ অথবা চাকর-নওকরদের মধ্যে কাউকে কোন কারণে শাসন করার প্রয়োজন হত, তবে তিনি হেরেমের বাইরের তাঁবুতে যেয়ে একাজ করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেন : আমাদেরকে ইহা বলা হয়েছে যে, মানুষ ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির সময় لا والله অথবা بلى والله ইত্যাদি যেসব বাক্য উচ্চারণ করে, এগুলোও হেরেমের অভ্যন্তরে ‘এলহাদ’ করার শামিল।— (মাহহারী)

বায়তুল্লাহ নির্মাণের সূচনা : وَذَرِكُنَ الْإِسْرَافَ مَكَانَ الْبَيْتِ অভিধানে بَيْت শব্দের অর্থ কাউকে ঠিকানা ও বসবাসের গৃহ দেয়া। আয়াতের অর্থ এই : একথা উল্লেখযোগ্য ও সূত্রব্য যে, আমি ইবরাহীম (আঃ)—কে বায়তুল্লাহর অবস্থান স্থলের ঠিকানা দিয়েছি। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইবরাহীম (আঃ) পূর্ব থেকে এই ভূখণ্ডে বসবাস করতেন না। বিভিন্ন রেওয়াজে থেকে প্রমাণিত আছে যে, তাঁকে সিরিয়া থেকে হিজরত করিয়ে এখানে আনা হয়েছিল। مَكَانَ الْبَيْتِ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বায়তুল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)—এর আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। নির্ভরযোগ্য রেওয়াজে বলা হয়েছে যে, এর প্রথম নির্মাণ আদম (আঃ)—কে পৃথিবীতে আনার পূর্বে অথবা সাথে সাথে হয়েছিল। আদম (আঃ)—ও তৎপরবর্তী পয়গম্বরগণ বায়তুল্লাহ তওয়াফ করতেন। নূহ (আঃ)—এর তুফানের সময় বায়তুল্লাহর প্রাচীর উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। তবে ভিত্তি ও নির্দিষ্ট জায়গা বিদ্যমান ছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ)—কে এই জায়গার কাছেই পুনর্বাসিত করা হয় এবং আদেশ দেয়া হয় : أَنْ لَا تُشْرِكُوا شَيْئًا অর্থাৎ, আমার এবাদতে কাউকে শরীক করো না। বলাবাহুল্য, হযরত ইবরাহীম (আঃ) শেরক করবেন, এরূপ কল্পনাও করা যায় না। তাঁর মূর্তি সংহার, মূশরেকদের মোকাবেলা এবং এই ব্যাপারে কঠিন অগ্নিপরীক্ষার ঘটনাবলী পূর্বেই ঘটেছিল। তাই এখানে সাধারণ মানুষকে শোনানো উদ্দেশ্য, যাতে তারা শেরক না করে। দ্বিতীয় আদেশ এরূপ দেয়া হয় وَكَطَرِيبَتَيْنِ আমার গৃহকে পবিত্র রাখ। তখন গৃহ বিদ্যমান ছিল না, কিন্তু বায়তুল্লাহ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীরের নাম নয়; বরং যে পবিত্র ভূখণ্ডে প্রথম বায়তুল্লাহ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং এখন পুনরায় নির্মাণের আদেশ

করা হচ্ছে, তাকেই বায়তুল্লাহ বলা হয়। এই ভূখণ্ডে সবসময় বিদ্যমান ছিল। একে পবিত্র করার আদেশ দানের কারণ এই যে, সে সময়ও জ্বরহাম ও আমালিকা গোত্র এখানে কিছু মূর্তি স্থাপন করে রেখেছিল। তারা এসব মূর্তির পূজা করত।— (কুরতুবী) এটাও সম্ভবপর যে, এই আদেশটি পরবর্তী লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। পবিত্র করার অর্থ কুফর ও শেরক থেকেও পবিত্র রাখা। বাহ্যিক ময়লা আবর্জনা থেকেও পবিত্র রাখা। ইবরাহীম (আঃ)—কে একথা বলার উদ্দেশ্য অন্য লোকদেরকে এ ব্যাপারে সচেতন করা। কারণ, ইবরাহীম (আঃ) নিজেই একাজ করতেন। এতদসত্ত্বেও যখন তাঁকে একাজ করতে বলা হয়েছে, তখন অন্যদের এ ব্যাপারে কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়।

ইবরাহীম (আঃ)—এর প্রতি তৃতীয় আদেশ এই وَادِّنَ فِي الْكَلْبِ অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, বায়তুল্লাহর হুজ্ব তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে।— (বগভী) ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ইবরাহীম (আঃ)—কে হুজ্ব ফরয হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ দেয়া হয়, তখন তিনি আল্লাহর কাছে আরয করলেন : এখানে তো জনমানবহীন বন্য প্রান্তর। ঘোষণা শোনার মত কেউ নেই ; যেখানে জনবসতি আছে সেখানে আমার আওয়াজ কিভাবে পৌঁছেবে? আল্লাহ তাআলা বললেন : তোমার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। বিশেষ পৌছানোর দায়িত্ব আমার। ইবরাহীম (আঃ) মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে আল্লাহ তাআলা তা উচ্চ করে দেন। কোন কোন রেওয়াজে আছে, তিনি আবু কুয়াস পাহাড়ে আরোহণ করে ঘোষণা করেন। দুই কানে অঙ্গুলি রেখে ডানে-বামে এবং পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে বললেন : লোক সকল, তোমাদের পালনকর্তা নিজের গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই গৃহের হুজ্ব ফরয করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন কর।’ এই রেওয়াজে আরও বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম (আঃ)—এর এই আওয়াজ আল্লাহ তাআলা বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়; বরং ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমনকারী ছিল, তাদের সবার কান পর্যন্ত এ আওয়াজ পৌঁছে দেয়া হয়। যার যার ভাগ্যে আল্লাহ তাআলা হুজ্ব লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জওয়াবে لَبَّكَ اللَّهُمَّ লব্কে অর্থাৎ, হাজির হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : ইবরাহীমী আওয়াজের জওয়াবই হচ্ছে হুজ্ব ‘লাব্বাইকা’ বলার আসল ভিত্তি।— (কুরতুবী, মাহহারী)

অতঃপর আয়াতে সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, যা ইবরাহীম (আঃ)—এর ঘোষণাকে সব মানবমণ্ডলী পর্যন্ত পৌছানোর কারণে কেয়ামত পর্যন্তের জন্যে কায়েম হয়ে গেছে। তা এই যে, يَوْمَ تَوَدُّوْا لَكَ وَيَعْلَمُ كُلُّ شَيْءٍ خَفِيٍّ অর্থাৎ, বিশ্বের প্রতিটি প্রত্যন্ত এলাকা থেকেও মানুষ বায়তুল্লাহর দিকে চলে আসবে ; কেউ পদব্রজে, কেউ সওয়ার হয়ে। যারা সওয়ার হয়ে আসবে, তারাও দূর-দূরান্ত দেশ থেকে আগমন করবে। ফলে তাদের সওয়ারীর জন্তুগুলো কশকায় হয়ে যাবে। এই ঘোষণার দিন থেকে আজ পর্যন্ত হাজারো বছর অতীত হয়ে গেছে, বায়তুল্লাহর পানে আগমনকারীদের অবস্থা অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। পরবর্তী পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের উম্মতও এই আদেশের অনুসারী ছিলেন। ইসা (আঃ)—এর পর যে সুদীর্ঘ জাহেলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে,

তাতেও আরবের বাসিন্দারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও হজ্জের বিধান তেমনিভাবে পালন করেছে, যেমন ইবরাহীম (আঃ) থেকে বর্ণিত ছিল।

لَشَهِدُوا مَنَاظِرَهُمْ অর্থাৎ, দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে তাদের এই উপস্থিতি তাদেরই উপকারের নিমিত্ত। এখানে منافع শব্দটি নকর ব্যবহার করে ব্যাপক অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ধর্মীয় উপকার তো অসংখ্য আছেই; পার্থিব উপকারও অনেক প্রত্যক্ষ করা হয়। কমপক্ষে এতটুকু বিষয় স্বয়ং বিস্ময়কর যে, হজ্জের সফরে বিরাট অঙ্কের টাকা ব্যয় হয়, যা কেউ কেউ সারা জীবন পরিশ্রম করে অল্প অল্প সংকয় করে এবং এখানে একই সময়ে ব্যয় করে ফেলে, কিন্তু সারা বিশেষ ইতিহাসে কোথাও এরূপ ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, কোন ব্যক্তি হজ্জ অথবা ওমরায় ব্যয় করার কারণে নিঃশ্ব ও অভাবগ্রস্ত হয়ে গেছে; এ ছাড়া অন্যান্য কাজে যেমন, বিয়ে-শাদীতে, গৃহনির্মাণে টাকা ব্যয় করে নিঃশ্ব ও ফকীর হওয়া হাজারো মানুষ যত্রতত্র দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ তাআলা হজ্জ ও ওমরার সফরে এই বৈশিষ্ট্যও নিহিত রেখেছেন যে, এতে কোন ব্যক্তি পার্থিব দারিদ্র্য ও উপবাসের সম্মুখীন হয় না। বরং কোন কোন রেওয়াজেতে আছে যে, হজ্জ-ওমরায় ব্যয় করলে দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ততা দূর হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ বিষয়টিও সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা যাবে। হজ্জের ধর্মীয় কল্যাণ তো অনেক; তন্মধ্যে নিম্নে বর্ণিত কল্যাণটি কোন অংশে কম নয়। আবু হোরায়রার এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে হজ্জ করে এবং তাতে অশ্লীল ও গোনাহের কার্যাদি থেকে বঁচে থাকে, সে হজ্জ থেকে এমতাবস্থায় ফিরে আসে যেন আজই মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়েছে; অর্থাৎ, জন্মের অবস্থায় শিশু যেমন নিশাপা থাকে, সে-ও তদ্রূপই হয়ে যায়।—(বুখারী, মুসলিম, মায়হারী)

বায়তুল্লাহর কাছে হাজ্জীদের আগমনের এক উপকার তো উপরে বর্ণিত হল যে, তারা তাদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে।

দ্বিতীয় উপকার এরূপ বর্ণিত হয়েছে— وَيَكْرَهُوا السَّمْعَ وَاللَّهْفَ وَيَكْرَهُوا السَّمْعَ وَاللَّهْفَ অর্থাৎ, যাতে নিদিষ্ট

দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে সেসব জন্তুর উপর, যেগুলো আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন। এতে প্রথম জরুরী কথা এই যে, কোরবানীর গোশত ও তা থেকে অর্জিত উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য না থাকা উচিত, বরং আসল বিষয় হচ্ছে আল্লাহর যিকর, যা এই দিনগুলোতে কোরবানী করার সময় জন্তুদের উপর করা হয়। এটাই এবাদতের প্রাণ। কোরবানীর গোশত তাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। এটা বাড়তি নেয়ামত। ‘নিদিষ্ট দিনগুলো’ বলে সেই দিনগুলো বোঝানো হয়েছে, যেগুলোতে কোরবানী করা জায়েয, অর্থাৎ, যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ। مَذَرْتَهُمْ عَنْ مَذَرْتِهِمْ بِهَيْمَةِ الزَّكَاةِ এর অর্থ ব্যাপক, ওয়াজিব হোক কিংবা মোস্তাহাব সব রকম কোরবানী এর অন্তর্ভুক্ত।

وَكَلَّوْهُمْ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ এখানে كلُّ শব্দটি আদেশসূচক পদ হলেও অর্থ ওয়াজিব করা নয়; বরং অনুমতি দান ও বৈধতা প্রকাশ করা; যেমন— কোরআনের وَادْعَهُمْ إِلَى صِرَاطِ اللَّهِ আয়াতে শিকারের আদেশ অনুমতিদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ثَوَّلَ لِقَاءَهُمْ وَثَوَّلَ لِقَاءَهُمْ এর আভিধানিক অর্থ ময়লা, যা মানুষের দেহে জমা হয়। এহরাম অবস্থায় চুল মুগানো, কাটা, উপড়ানো, নখ কাটা, সুগন্ধি ব্যবহার করা ইত্যাদি হারাম। তাই এগুলোর নীচে ময়লা জমা হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্জের কোরবানী সমাপ্ত হলে দেহের ময়লা দূর করে দাও। অর্থাৎ, এহরাম খুলে ফেল, মাথা মুগাও এবং নখ কাট। নাতীর নীচের চুলও পরিষ্কার কর। আয়াতে প্রথমে কোরবানী ও পরে এহরাম খোলার কথা বলা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, এই ক্রম অনুযায়ীই করা উচিত। কোরবানীর পূর্বে নখ কাটা, মাথা মুগানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ। কেউ এরূপ করলে তাকে ক্রটিজনিত কোরবানী করতে হবে।

وَلْيُؤْتُوا ذُرِّيَّهُمْ نذر শব্দটি এর বহুবচন। এর অর্থ মানত।

এর স্বরূপ এই যে, শরীয়তের আইনে যে কাজ কোন ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয়, যদি সে মুখে মানত করে যে, আমি একাজ করব অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে আমার জন্যে একাজ করা জরুরী তবে একেই নয়র বা মানত বলা হয়। একে পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদিও মূলতঃ তা ওয়াজিব ছিল না। তবে এর ওয়াজিব হওয়ার জন্যে কাজটি গোনাহ ও নাজায়েয না হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে শর্ত। যদি কেউ কোন গোনাহর কাজের মানত করে, সেই গোনাহর কাজ করা তার উপর ওয়াজিব নয়; বরং বিপরীত করা ওয়াজিব। তবে কসমের কাফফারা আদায় করা জরুরী হবে। আবু হানীফা (রহঃ) প্রমুখ ফেকাহবিদের মতে কাজটি উদ্ভিষ্ট এবাদত জাতীয় হওয়াও শর্ত; যেমন— নামায, রোযা, সদকা, কোরবানী ইত্যাদি। অতএব যদি কোন ব্যক্তি নফল নামায, রোযা, সদকা ইত্যাদির মানত করে তবে এই নফল তার যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং মানত পূর্ণ করা ওয়াজিব। আলোচ্য আয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়। এতে মানত পূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

মাসআলা : স্মর্তব্য যে, শুধু মনে মনে কোন কাজ করার ইচ্ছা করলেই মানত হয় না, যে পর্যন্ত মানতের শব্দ উচ্চারণ না করে। তফসীরে-মায়হারীতে এস্থলে নয়র ও মানতের বিধি-বিধান বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই।

وَلْيُؤْتُوا يَالَيْتِ الْعَتِيقِ এখানে তওয়াফ বলে তওয়াফে-যেয়ারত বোঝানো হয়েছে, যা যিলহজ্জের দশ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ ও কোরবানীর পর করা হয়। এই তওয়াফ হজ্জের দ্বিতীয় রোকন ও ফরয। প্রথম রোকন আরাকাতের ময়দানে অবস্থান করা। এটা আরও পূর্বে আদায় করা হয়। তওয়াফে-যেয়ারতের পর এহরামের সব বিধান পূর্ণতা লাভ করে এবং পূর্ণ এহরাম খুলে যায়।—(রুহুল-মা’আনী)

بيت عتيق শব্দের অর্থ মুক্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাঁর গৃহের নাম بيت عتيق রেখেছেন ; কারণ আল্লাহ একে কাকের ও অত্যাচারীদের আধিপত্য ও অধিকার থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন।—(রুহুল-মা’আনী) কোন কাকেরের সাধ্য নেই যে, একে অধিকারভুক্ত করে। আসহাবে-ফীল তথা হস্তী-বাহিনীর ঘটনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

حَقَّاءَ يَلَهُ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا
خَرَسَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي
مَكَانٍ سَاجٍ ۝ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْمَ شَعِيرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ
تَفْوَى الْقُلُوبِ ۝ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
مَحْمِلُهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
۝ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ
مَأْصَابِهِمُ وَالْمُؤْتِي الصَّلَاةَ وَبِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُقْفُونَ ۝
وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۝
فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وَجِيتُ جُنُوبَهَا
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَهُ وَالْمَعْرُوفَ ذَٰلِكَ سَعَرْنَاهَا
لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ لَنْ نَبَاِلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْهَا وَلَا
دِمَآؤَهَا وَلَكِنْ يَبَالُغُ الْقَتْلَىٰ مِنْكُمْ كَذَٰلِكَ سَعَرْنَاهَا
لَكُمْ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلِيُبَشِّرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

(৩১) আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সাথে শরীক না করে; এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃত্যোভী পাকী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল। (৩২) এটা প্রকণযোগ্য। কেউ আল্লাহর নামযুক্ত বস্তুসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের আল্লাহুতীতিসূত। (৩৩) চতুশদ জন্তুসমূহের মধ্যে তোমাদের জন্যে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উপকার রয়েছে। অতঃপর এগুলোকে পৌছাতে হবে মুক্ত গৃহ পর্যন্ত। (৩৪) আমি এতোক উম্মতের জন্যে কোরবানী নির্ধারণ করেছি, যাতে তারা আল্লাহর দেয়া চতুশদ জন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। অতএব তোমাদের আল্লাহ তো একমাত্র আল্লাহ সূতরাং তাঁরই আত্মাধীন থাক এবং বিনয়ীগণকে সুসংবাদ দাও; (৩৫) যাদের অন্তর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে বৈধাধারণ করে এবং যারা নামায কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে, (৩৬) এবং কাঁ বার জন্যে উৎসর্গীকৃত উটকে আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন করেছি। এতে তোমাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে। সূতরাং সারিবদ্ধভাবে বাঁধা অবস্থায় তাদের যবেহ করার সময় তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। অতঃপর যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে তোমরা আহার কর এবং আহার করাও যে কিছু যাহ্নগ করে না তাকে এবং যে যাহ্নগ করে তাকে। এমনিভাবে আমি এগুলোকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৩৭) এগুলোর গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছে না, কিন্তু পৌঁছে তাঁর কাছে তোমাদের মনের তাকওয়া। এমনিভাবে তিনি এগুলোকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব ঘোষণা কর এ কারণে যে, তিনি তোমাদের পথ প্রশ্ন করেছেন। সূতরাং সংকমশীলদের সুসংবাদ শুনিয় দিন।

حُومِتِ اللَّهِ - বলে আল্লাহর নির্ধারিত সম্মানযোগ্য বিষয়াদি অর্থাৎ, শরীয়তের বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। এগুলোর সম্মান তথা এগুলো সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা ইহকাল পরকালে সৌভাগ্য লাভের উপায়।

وَأَحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُشْتَلَىٰ عَلَيْهِ - উৎসাহ - বলে উট, গরু, ছাগল, মেহ, দুগ্ধ ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। এগুলো এহরাম অবস্থায়ও হালাল। إِلَّا مَا يُشْتَلَىٰ عَلَيْهِ - বাক্যে যেসব জন্তু ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো অন্যান্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ, মৃত জন্তু, যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি কিংবা যে জন্তুর উপর অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। এগুলো সর্বাবস্থায় হারাম-এহরাম অবস্থায় হোক কিংবা এহরামের বাইরে।

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ - রজস শব্দের অর্থ অপবিত্রতা, ময়লা অথবা ঐশ্বর্য। وَثْنٌ শব্দটিকে এখানে বহুবচন; অর্থ মূর্তি। মূর্তিদেরকে অপবিত্রতা বলা হয়েছে; কারণ; এরা মানুষের অন্তরকে শেরকের অপবিত্রতা দ্বারা পূর্ণ করে দেয়।

قَوْلُ زُورٍ - এর অর্থ মিথ্যা। যা কিছু সত্যের পরিপন্থী, তাই বাতিল ও মিথ্যাভুক্ত। শেরক ও কুফরের বিশ্বাস হোক কিংবা পারম্পরিক লেন-দেন ও সাক্ষ্য প্রদানে মিথ্যা বলা হোক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : বৃহত্তম কবীরা গোনাহ এগুলো : আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া এবং সাধারণ কথাবার্তায় মিথ্যা বলা। তিনি শেষোক্ত শব্দ قَوْلُ الزُّورِ কে বার বার উচ্চারণ করেন। - (বোখারী)

وَمَنْ يُعِظْمَ شَعِيرُ اللَّهِ - এর বহুবচন। এর অর্থ আলামত, চিহ্ন। যে যে বিষয়কে কোন বিশেষ মাযহাব অথবা দলের আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে তার شَعِيرُ বলা হয়। সাধারণের পরিভাষায় যে যে বিধানকে মুসলমান হওয়ার আলামত মনে করা হয়, সেগুলোকে 'শা'আয়ের-ইসলাম' বলা হয়। হজ্জের অধিকাংশ বিধান তদ্রূপই।

مِنْ تَفْوَى الْقُلُوبِ - অর্থাৎ, আল্লাহর আলামতসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন আন্তরিক খোদাতীতির লক্ষণ যার অন্তরে তাকওয়া ও খোদাতীতি থাকে, সে-ই এগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, মানুষের অন্তরের সাথেই তাকওয়ার সম্পর্ক। অন্তরে খোদাতীতি থাকলে তার প্রতিক্রিয়া সব কাজকর্মে পরিলক্ষিত হয়।

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى - অর্থাৎ, চতুশদ জন্তু থেকে দুধ, সওয়ায়ী, মাল পরিবহণ ইত্যাদি সর্বপ্রকার উপকার লাভ করা তোমাদের জন্যে তখন পর্যন্ত হালাল, যে পর্যন্ত এগুলোকে হরম শরীফে যবেহ করার জন্যে উৎসর্গ না কর। হজ্জ অথবা ওমরাকারী ব্যক্তি যবেহ করার জন্যে যে জন্তু সাথে নিয়ে যায় তাকে হাদী বলা হয়। যখন কোন জন্তুকে হরমের হাদী হওয়ার জন্যে উৎসর্গ করা হয় তখন তা থেকে কোন উপকার লাভ

করা বিশেষ কোন অপারগতা ছাড়া জায়েয নয়। যদি কেউ উটকে হাদী করে সাথে নেয়, তার সাথে সওয়ারীর অন্য কোন জন্তু না থাকে এবং পায়ে হাঁটা তার জন্যে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে, তবে এরূপ অপারগতার কারণে সে হাদীর উটে সওয়ার হতে পারে।

ثُمَّ مَحَطُّهَا إِلَى الْيَتِيبِ الْعَيْتِيِّ — এখানে بيت عتيق (সম্মানিত গৃহ)

বলে সম্পূর্ণ হরম বোঝানো হয়েছে। হরম বায়তুল্লাহরই বিশেষ আঙ্গিনা ; যেমন—পূর্ববর্তী আয়াতে ‘মসজিদে-হারাম’ বলে হরম বোঝানো হয়েছে। محل অর্থাৎ, মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার স্থান। এখানে যবেহ করার স্থান বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, হাদীর জন্তু যবেহ করার স্থান বায়তুল্লাহর সন্নিহিত; অর্থাৎ, সম্পূর্ণ হরম। এতে বোঝা গেল যে, হরমের ভিতরে হাদী যবেহ করা জরুরী, হরমের বাইরে জায়েয নয়। হরম মিনার কোবান গাছও হতে পারে; মক্কা মোকাররমার অন্য কোন স্থানও হতে পারে। — (রুহুল-মা’আনী)

وَلِكُلِّ امْتِعَةٍ مَسْكَتٌ — আরবী ভাষায় منسك ও কয়েক

অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) জন্তু কোরবানী করা, (দুই) হজ্জের ক্রিয়াকর্ম এবং (তিন) এবাদত। কোরআন পাকে বিভিন্ন স্থানে এই শব্দটি তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তিন অর্থই হতে পারে। এ কারণেই তফসীরকারক মুজাহিদ প্রমুখ এখানে منسك —এর অর্থ কোরবানী নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এই উম্মতকে কোরবানীর যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা কোন নতুন আদেশ নয়, পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও কোরবানীর আদেশ দেয়া হয়েছিল। কাতাদাহ দ্বিতীয় অর্থ নিয়েছেন। তাঁর মতে আয়াতের অর্থ এই যে, হজ্জের ক্রিয়াকর্ম যেমন এই উম্মতের উপর আরোপ করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও হজ্জ ফরয করা হয়েছিল। ইবনে আরাফা তৃতীয় অর্থ ধরে আয়াতের অর্থ করেছেন যে, আমি আল্লাহর এবাদত পূর্ববর্তী উম্মতদের উপরও ফরয করেছিলাম। এবাদতের পদ্ধতিতে কিছু কিছু পার্থক্য সব উম্মতেই ছিল, কিন্তু মূল এবাদত সবার মধ্যে অভিন্ন ছিল।

وَكُلِّ امْتِعَةٍ مَسْكَتٌ — আরবী ভাষায় خبث শব্দের অর্থ নিম্নাধুনি। এ

কারণে এমন ব্যক্তিকে খবিত বলা হয়, যে নিজেকে হয়ে মনে করে। এ জন্যেই কাতাদাহ ও মুজাহিদ مغبين —এর অর্থ করেছেন বিনয়ী। আমরা ইবনে-আস বলেন : এমন লোকদেরকে مغبين বলা হয়, যারা অন্যের উপর জুলুম করে না। কেউ তাদের উপর জুলুম করলে তারা তার প্রতিশোধ নেয় না। সুফিয়ান বলেন : যারা সুখে-দুখে, স্বাচ্ছন্দ্যে ও অভাব-অনটনে আল্লাহর ফয়সালা ও তকদীরে সন্তুষ্ট থাকে, তারাই مغبين

মাহাত্ম্যের কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয়। আল্লাহর সৎকর্মপরায়ণ বন্দাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ তাআলার যিকর ও নাম শুনে তাদের অন্তরে এক বিশেষ ভীতি সঞ্চার হয়ে যায়।

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ — পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে,

ইসলাম ধর্মের আলামতরূপে গণ্য হয়, এমন বিশেষ বিধি-বিধান ও এবাদতকে شعائر বলা হয়। কোরবানীও এমন বিধানাবলীর অন্যতম। কাজেই এ ধরনের বিধানসমূহ পালন করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

صَوَائِفُ — শবের অর্থ

সারিবদ্ধভাবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন : জন্তু তিন পায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান থাকবে এবং এক পা বাঁধা থাকবে। উটের জন্য এই নিয়ম। দণ্ডায়মান অবস্থায় উট কোরবানী করা সুন্নত ও উত্তম। অবশিষ্ট সব জন্তুকে শোয়া অবস্থায় যবেহ করা সুন্নত।

وَالْأَضْيَافُ جُزُؤُهَا — এখানে وجبت —এর

বলা হয় الشمس وجبت অর্থাৎ, সূর্য ঢলে পড়েছে। এখানে জন্তুর প্রাণ নির্গত হওয়া বোঝানো হয়েছে।

الْقَائِرَةُ وَالْمُعْتَرِ — যাদেরকে কোরবানীর গোশত দেয়া উচিত। পূর্ববর্তী

আয়াতে তাদেরকে يانس বলা হয়েছে। এর অর্থ দৃষ্ট, অভাবগ্রস্ত। এই আয়াতে তদস্থলে قانع و معتر শব্দদ্বয়ের দ্বারা তার তফসীর করা হয়েছে। قانع ঐ অভাবগ্রস্ত ফকীরকে বলা হয়, যে কারও কাছে যাক্ষা করে না, দারিদ্র্য সত্ত্বেও স্বস্থানে বসে থাকে এবং কেউ কিছু দিলে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে معتر ঐ ফকীরকে বলা হয়, যে কিছু পাওয়ার আশায় অন্যত্র গমন করে—মুখে সওয়াল করুক বা না করুক। — (মাযহারী)

এবাদতের বিশেষ পদ্ধতি আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং মনের

لَنْ يَبَالِ اللَّهُ لِحُومِهَا : — তাকওয়া ও আনুগত্যই আসল উদ্দেশ্য :

—বাক্যে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, কোরবানী একটি মহান এবাদত ; কিন্তু আল্লাহর কাছে এর গোশত ও রক্ত পৌঁছে না এবং কোরবানীর উদ্দেশ্যও এগুলো নয়; বরং আসল উদ্দেশ্য জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা এবং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালনকর্তার আদেশ পালন করা। অন্যান্য সব এবাদতের মূল উদ্দেশ্যও তাই। নামাযে উঠা-বসা করা, রোযায় ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর আদেশ পালন করাই আসল লক্ষ্য। আন্তরিকতা ও মহব্বত বর্জিত এবাদত প্রাণহীন কাঠামো মাত্র। কিন্তু এবাদতের শরীয়তসম্মত কাঠামোও এ কারণে জরুরী যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার আদেশ পালনের জন্যে এই কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

وَجَعَلَتْ قُلُوبَهُمْ — এর আসল অর্থ ঐ ভয়ভীতি, যা কারও

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
خَوَّانٍ كَثُورٍ ۚ أُولَئِكَ يَتَقَتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلُمَاءُ وَأَنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ دِيَارِهِمْ يَغْيُرُ حَتَّىٰ
إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَهَادَ مَتَّ صَوَامِعُ وَبِعَمِّ صَلَواتٍ وَمَسْجِدُ يُذَكِّرُ
فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرٌ ۚ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَتَصَدَّقُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيزٌ ۚ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ نَزَّلُوا فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ
وَأَمُودٌ ۚ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۚ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ
مُوسَىٰ فَأَمْلَكْتُ لَلْكُفْرِ بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ ثَمَرًا لِيُذَكِّرَ ۝
فَكَانَ مِنْ قَوْمِهِ قَلِيلٌ أَوْفَىٰ ظَلَمَ لَمْ يَكُنْ حَاوِيَةً عَلَىٰ عُرْسِهِ ۚ
وَبَرٌّ مُعْتَظَةٌ ۚ وَنَصْرٌ شَدِيدٌ ۚ أَفَلَمْ يَتَذَكَّرْ ۚ إِنَّ الْأَرْضَ فَتَكُنْ
لَهُمْ فُلُوقٌ يُقُولُونَ بِهَا ۚ وَإِذَا نَزَعْنَاهَا مِنْهَا ۚ وَأَنْتَ لَا
تَعْلَمُ إِلَّا الضَّرَارَ وَلَكِنْ تَعْلَىٰ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الضُّلُوعِ ۝

(৩৮) আল্লাহ মুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেন। আল্লাহ কোন বিশৃঙ্খলায় কড়াকড়ি পছন্দ করেন না। (৩৯) যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অশ্বাই সক্ষম। (৪০) যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এই অশ্বায়ে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নিজন গির্জা, এবাদতখানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক সুরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তির। (৪১) তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়ম করবে, যাকাত দেবে এবং সংকাজে আদেশ ও অসংকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। (৪২) তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তাদের পূর্বে মিথ্যাবাদী বলেছে কওম নূহ, আদ, সামুদ, (৪৩) ইবরাহীম ও লুতের সম্প্রদায়ও (৪৪) এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরা এবং মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল মুসাকেও। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। অতঃপর কি ভীষণ ছিল আমাকে অস্বীকৃতির পরিণাম। (৪৫) আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল গোনাহগার। এই সব জনপদ এখন ধ্বংসস্থলে পরিণত হয়েছে এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে ও কত সুদূর প্রাঙ্গণ ধ্বংস হয়েছে। (৪৬) তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ত্রম করেনি, যাতে তারা সমবাদার হুদয় ও প্রবণভক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্ততঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।

কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রথম আদেশ : মক্কা মুসলমানদের উপর কাফেরদের নির্ধারিত চরম সীমায় শৌছে গিয়েছিল। এমন কোন দিন যেত না যে, কোন না কোন মুসলমান তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহৃত হয়ে না আসত। মক্কা অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফেরদের যুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মোকাবেলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রসুলে করীম (সাঃ) জওয়াবে বলতেন : সবর কর। আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনতির পরিস্থিতি অব্যাহত রইল।— (কুরত্বী)

যখন রসুলে করীম (সাঃ) মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে বাধ্য হন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় তাঁর মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হয়— **اخرجوا نبهم ليهلكن**— অর্থাৎ এরা তাদের পয়গম্বরকে বহিস্কার করেছে। এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এরই পরিস্থিতিতে মদীনা পৌছার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।— (কুরত্বী)

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, ইবনে হাইয়ান, হাকিম প্রমুখের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন : এই প্রথম আয়াত কাফেরদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে অবতীর্ণ হল। ইতিপূর্বে সন্তরেরও অধিক আয়াতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

জেহাদ ও যুদ্ধের একটি রহস্য : **وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ**—এতে

জেহাদ ও যুদ্ধের রহস্য এবং এটা যে নতুন নির্দেশ নয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মত ও পয়গম্বরদেরকেও কাফেরদের মোকাবেলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরূপ না করা হলে কোন মায়হাব ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকত না এবং সব ধর্ম ও উপাসনালয় বিধ্বস্ত হয়ে যেত।

বিগত যমানায় যত **لَهَادَ مَتَّ صَوَامِعُ وَبِعَمِّ صَلَواتٍ وَمَسْجِدُ**

ধর্মের ভিত্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপর রহিত হয়ে গেছে এবং পরিবর্তিত হয়ে কুফর ও শেরকে পরিণত হয়েছে, সেসব ধর্মের উপাসনালয়সমূহের নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, স্ব স্ব যমানায় তাদের উপাসনালয়গুলোর সম্মান ও সংরক্ষণ ফরয ছিল। আয়াতে সেসব ধর্মের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি কোন সময়ই নবুওয়ত ও ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; যেমন—অগ্নিপূজারী মজুস অথবা মূর্তিপূজারী হিন্দু। কেননা, তাদের এবাদতখানা কোন সময়ই সম্মানাই ছিল না।

শব্দটি **صَوَامِعُ**—এর বহুবচন। এটা খ্রীষ্টানদের সংসার ত্যাগী

দরবেশদের বিশেষ এবাদতখানা **وَبِعَمِّ** শব্দটি **بِعَمِّ** এর বহুবচন। খ্রীষ্টানদের সাধারণ গির্জাকে **بِعَمِّ** বলা হয়। **وَصَلَوَاتُ** শব্দটি **صَلَوَاتُ** এর বহুবচন। ইহুদীদের এবাদতখানাকে **وَصَلَوَاتُ** এবং মুসলমানদের এবাদতখানাকে **وَمَسْجِدُ** বলা হয়।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ ও জেহাদের আদেশ অবতীর্ণ না হলে কোন সময়েই কোন ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। মুসা (আঃ)—এর আমলে **وَصَلَوَاتُ**, ইসা (আঃ)—এর আমলে **وَصَوَامِعُ** এবং

শেষনবী (সাঃ)-এর যমানায় মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত। —
(কুরত্বী)

খোলাফায়ে রাশেদীনের পক্ষে কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী ও তার
প্রকাশ : **الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ** এই আয়াতে তাদেরই বিশেষণ
উল্লেখ করা হয়েছে, যাদের বর্ণনা **الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ**

আয়াতে ছিল ; অর্থাৎ, যাদেরকে তাদের ভিটেমাটি থেকে বিনা কারণে
উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে,
আমি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলে তারা তাদের ক্ষমতাকে
নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, সংকর্মে আদেশ ও অসংকর্মে
নিষেধের কাজে প্রয়োগ করবে। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত মদীনায়
হিজরতের অব্যবহিত পরে তখন অবতীর্ণ হয়, যখন মুসলমানদের কোথাও
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে পূর্বেই বলে
দিলেন যে, তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করলে তা ধর্মের উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ
কার্য সম্পাদনে ব্যয় করবে। এ কারণেই হযরত ওসমান গনী (রাঃ) বলেনঃ
قبل بلاء. অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার এই এরশাদ কর্ম অস্তিত্ব লাভ
করার পূর্বেই কর্মীদের গুণ ও প্রশংসা-কীর্তন করার শামিল। এরপর
আল্লাহ তাআলার এই নিশ্চিত সংবাদ দুনিয়াতে বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

চার জন খোলাফায়ে-রাশেদীন এবং মুহাজিরগণ **الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ** আয়াতের
বিশুদ্ধ প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকেই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করলেন এবং কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ তাদের
কর্ম ও কীর্তি বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা এ
কাজেই ব্যবহার করেন। তাঁরা নামায প্রতিষ্ঠিত করেন, যাকাতের ব্যবস্থা
সুদৃঢ় করেন, সংকাজের প্রবর্তন করেন এবং মন্দ কাজের পথ রুদ্ধ করেন।

এ কারণেই আলেমগণ বলেন : এই আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে,

খোলাফায়ে-রাশেদীন সবাই এই সুসংবাদের যোগ্যপাত্র ছিলেন এবং তাঁদের
আগমনে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তা সত্য, বিশুদ্ধ এবং
আল্লাহর ইচ্ছা, সন্তুষ্টি ও আগমন সংবাদের অনুরূপ ছিল।—
(রুহুল-মা'আনী)

এ হচ্ছে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুশুলের ঘটনাবিত্তিক দিক। কিন্তু
বলাবাহুল্য কোরআনের ভাষা ব্যাপক হলে তা কোন বিশেষ ঘটনার মধ্যে
সীমাবদ্ধ থাকে না ; বরং নির্দেশও ব্যাপক হয়ে থাকে। এ কারণেই
তফসীরবিদ যাহ্যাক বলেন : এই আয়াতে তাদের জন্যেই নির্দেশ রয়েছে,
যাদেরকে আল্লাহ তাআলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন করেন। ক্ষমতাসীন
থাকাকালে তাদের এমনসব কর্ম আনজাম দেয়া উচিত, যেগুলো
খোলাফায়ে-রাশেদীন তাদের যমানায় আনজাম দিয়েছিলেন।—(কুরত্বী)

শিক্ষা ও দূরদৃষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ ধর্মীয় কাম : **أَكْمَرُ**

يَبْرُؤَانِ الْأَرْضَ تَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ —এই আয়াতে শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি

নিষে দেশভ্রমণে উৎসাহিত করা হয়েছে। **تَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ** —বাক্যে
ইঙ্গিত আছে যে, অতীতকাল ও অতীত জাতিসমূহের অবস্থা সরেযমীনে
প্রত্যক্ষ করলে মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তবে শর্ত এই যে, এসব
অবস্থা শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও
দেখতে হবে। ইবনে আবী হাতেম কিতাবুস্তাফাকুরে মালেক ইবনে দীনার
থেকে বর্ণনা করেন : আল্লাহ তাআলা মুসা (আঃ)-কে আদেশ দেন যে,
লোহার জুতা ও লোহার লাঠি তৈরী কর এবং আল্লাহর পৃথিবীতে এত
গোরাফেরা কর যে, লোহার জুতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায় এবং লোহার লাঠি
ভেঙ্গে যায়।—(রুহুল-মা'আনী) এই রেওয়াজেতাতী বিশুদ্ধ হলে এই ভ্রমণ
ও পর্যটনের উদ্দেশ্য জ্ঞান ও চক্ষুস্বানতা অর্জন করা বৈ অন্য কিছু নয়।

الحج ২২

২২৭

اقترب للناس

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পরকালের দিন এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য :
وَأَنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ - অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তার একদিন

দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে। এই দিন বলে কেয়ামতের দিন বোঝানো যেতে পারে। এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান হওয়ার তাৎপর্য এই যে, ভয়াবহ ঘটনাবলী ও ভয়ংকর অবস্থার কারণে এই দিনটি এক হাজার বছরের সমান দীর্ঘ মনে হবে। অনেক তফসীরকারক এখানে এই অর্থই নিয়েছেন।

বাস্তবক্ষেত্রেও পরকালের একদিন সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হতে পারে। কোন কোন হাদীসে এর পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরায়রা বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন নিঃশ্ব মুহাজিরদের উদ্দেশে বললেন, আমি তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দিচ্ছি ; আরও বলছি যে, তোমরা ধনীদেব থেকে অর্ধেক দিন পূর্বে বেহেশতে যাবে আল্লাহর একদিন এক হাজার বছরের সমান হবে। কাজেই নিঃশ্বরা ধনীদেব পাঁচশত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে।—(মায়হাবী)

তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই দ্বিতীয় অর্থটি **كَانَ وَقْدًا زُكَاةً** শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব : সূরা মা'আরেজে পরকালের দিনকে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলা হয়েছে। আয়াত এই - এতেও উপরোক্ত উভয় প্রকার তফসীর হতে পারে। প্রত্যেকের সংকট ভিন্ন ভিন্ন ও কম-বেশী হবে, তাই দিনটি কারও কাছে এক হাজার বছরের সমান এবং কারও কাছে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান অনুভূত হবে। দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী পরকালের দিনকে প্রকৃতই পঞ্চাশ হাজার বছরের ধরা হলে উভয় আয়াত বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়; অর্থাৎ, এক আয়াতে এক হাজার এবং অপর আয়াতে পঞ্চাশ হাজার বছরের উল্লেখ আছে।

এ থেকে জানা যায় যে, রসূল ও নবী এক নয় পৃথক পৃথক অর্থ রাখে। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট উক্তি এই যে, নবী তাঁকে বলা হয়, যাকে জনগণের সংস্কারের উদ্দেশে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়তের পদ দান করা হয় এবং তাঁর কাছে ওহী আগমন করে—তাঁকে কোন স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হোক বা কোন পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট করা হোক। যাকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হয়, তাঁর দৃষ্টান্ত হযরত মুসা, ঈসা (আঃ) ও শৈয়নবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)। এবং যিনি পূর্ববর্তী নবীর কিতাব ও শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট, তাঁর দৃষ্টান্ত হযরত হারুন (আঃ)। তিনি মুসা (আঃ)—এর কিতাব তওরাত ও তাঁরই শরীয়ত প্রচারে আদিষ্ট ছিলেন। 'রসূল' তাঁকে বলা হয়, যাকে স্বতন্ত্র কিতাব ও শরীয়ত দান করা হয়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, যিনি রসূল হবেন তিনি নবীও হবেন। এটা জরুরী; কিন্তু যিনি নবী হবেন তাঁর রসূল হওয়া জরুরী নয়। এই ভাগাভাগি মানুষের ক্ষেত্রে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফেরেশতা ওহী নিয়ে আগমন করেন, তাঁকে রসূল বলা এর পরিপন্থী নয়। সূরা মারইয়ামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

وَيَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّنَ الدُّنْيَا ۚ وَكَأَنَّ مِّن قُرْيَةٍ مَّكَنَتْ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَا آلَ الْاَدْنَىٰ وَالْبَصِيرَةَ ۚ قُلْ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُدْعِي مُمِيزِينَ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۚ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۚ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي الْاِيْتِنَانِ مُعِزِّزِينَ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْحَجِيَّةِ ۚ وَمَا أَسْأَلُكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَّسْوَلٍ ۚ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَشَاءَىٰ ۚ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۚ فَيَمَسُّهُ اللَّهُ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ ۚ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ لِيَجْعَلَ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ۚ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَكُنِيَ شِقَاقَ بَعِيدٍ ۚ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْحِكْمَ أَنَّ اللَّهَ مُخْتَارٌ لِّرَبِّكَ ۚ فَيُؤْمِنُوا بِهِ ۚ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرِيضَةٍ مِّنْهُمْ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ۚ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيلِهِ ۚ

(৪৭) তারা আপনাকে আযাব হুরানিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আপনার পালনকর্তার কাছে একদিন তোমাদের গণনার এক হাজার বছরের সমান (৪৮) এবং আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি এমতাবস্থায় যে, তারা গোনাহগার ছিল। এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি এবং আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৯) বলুনঃ হে লোক সকল। আমি তো তোমাদের জন্যে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ককারী (৫০) সুতরাং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সংকর্য করেছে, তাদের জন্যে আছে পাপ মার্জনা এবং সম্মানজনক রুমী। (৫১) এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্যে চেষ্টা করে, তাড়াই দোযখের অধিবাসী। (৫২) আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রসূল ও নবী প্রেরণ করেছি, তারা যখনই কিছু কল্পনা করেছে, তখনই শয়তান তাদের কল্পনায় কিছু মিশ্রণ করে দিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ দূর করে দেন শয়তান যা মিশ্রণ করে। এরপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়, (৫৩) এ কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষাধরূপ করে দেন, তাদের জন্যে, যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যারা পামাণহৃদয়। গোনাহগাররা দূরবর্তী বিরোধিতায় লিপ্ত আছে; (৫৪) এবং এ কারণেও যে, যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে; তারা যেন জানেন যে, এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য; অতঃপর তারা যেন এতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি বিজয়ী হয়। আল্লাহই বিশ্বাসস্থাপনকারীকে সরল পথ প্রদর্শন করেন। (৫৫) কাফেররা সর্বদাই সন্দেহ পোষণ করবে যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে কেয়ামত এসে পড়ে অথবা এসে পড়ে তাদের কাছে এমন দিবসের শান্তি যা থেকে রক্ষার উপায় নেই।

করে) এবং امنية শব্দের অর্থ ৭৭, আবৃত্তি করা। আরবী অভিধানে এ অর্থও প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আবু হাইয়ান বাহরে-মুহীত গ্রন্থে এবং আরও অনেক তফসীরকারক এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন। হাদীস গ্রন্থাদিতে এস্থলে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যা “গারানিক” নামে খ্যাত। অধিকসংখ্যক হাদীসবিদগণের মতে ঘটনাটি ভিত্তিহীন। কেউ কেউ একে বানোয়াট ও ধর্মপ্রোহীদের আবিষ্কার বলে আখ্যা দিয়েছেন। আর যারা একে ঈর্ষ্যব্যাধি বলেছেন, হাদীসের বাহ্যিক ভাষাদৃষ্টে কোরআন ও সুন্নাহর অকাটা নির্দেশাবলী সম্পর্কে যেসব সন্দেহ দেখা দেয়, তাঁরা সেসব সন্দেহের জওয়াবও দিয়েছেন। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, এই আয়াতের তফসীর এই ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং উপরে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এ আয়াতের সহজ ও সরল ব্যাখ্যা। ঘটনাটিকে অহেতুক আয়াতের তফসীরের অংশ সাব্যস্ত করে সন্দেহ ও সংশয়ের দ্বার উন্মোচন এবং অতঃপর জওয়াবদানে ব্যাপ্ত হওয়া মোটেই লাভজনক কাজ নয়। তাই এ পথ পরিহার করা হল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

سَخَّرَ لَكُمْ مِائِي الْأَرْضِ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ভূপৃষ্ঠের সব

কিছুকে মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। অধীন করার বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থ এরূপ মনে করা হয় যে, তারা মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলবে। এই অর্থের দিক দিয়ে এখানে সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের পাহাড়, নদী, হিংস্রজন্তু, পশুপক্ষী ইত্যাদি হাজারো বস্তু মানুষের আজ্ঞাধীন হয়ে চলে না। কিন্তু কোন কিছুকে মানুষের সার্বক্ষণিক সেবায় নিয়োজিত করে দেয়াও প্রকৃতপক্ষে তার অধীন করে দেয়ারই নামান্তর। এ কারণেই তফসীরের সার-সংক্ষেপে تسخير এর তরজমা “কাজে নিয়োজিত করা” দ্বারা করা হয়েছে। সবকিছুকে মানুষের আজ্ঞাধীন করে দেয়ার শক্তিও আল্লাহ তাআলার ছিল। কিন্তু এর পরিণাম স্বয়ং মানুষের জন্যে ক্ষতিদায়ক হত। কারণ, মানুষের স্বভাব, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন বিভিন্নরূপ। একজন নদীকে একদিকে গতি পরিবর্তনের আদেশ করত, অন্যজন তার বিপরীত দিকে আদেশ করত। এর পরিণাম অনর্থ সৃষ্টি ছাড়া কিছুই হত না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা সবকিছুকে আজ্ঞাধীন তো নিজেরই রেখেছেন, কিন্তু অধীন করার যে আসল উপকার তা মানুষকে পৌছে দিয়েছেন।

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَاسِكٌ - এই বিষয়বস্তুই প্রায় এমন শব্দ সহযোগে

আলোচ্য সূরার ৩৪ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু উভয় স্থলে আলোচ্য শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। সেখানে منسك ও منسك কোরবানীর অর্থে হজ্জের বিধানাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখিত হয়েছিল। এজন্যে সেখানে وَاو সহকারে وَلَكُمْ مَنَاسِكٌ বলা হয়েছিল। এখানে منسك এর অন্য অর্থ (অর্থাৎ, যবেহ করার বিধানাবলী অথবা শরীয়তের বিধানাবলীর জ্ঞান) বোঝানো হয়েছে এবং এটা একটা স্বতন্ত্র বিধান। তাই এখানে وَاو সহকারে বলা হয়নি।

এই আয়াতের তফসীরের সার-সংক্ষেপ এই যে, কোন কোন কাফের মুসলমানদের সাথে তাদের যবেহ করা জন্তু সম্পর্কে অনর্থক তর্ক-বিতর্ক করত। তারা বলত : তোমাদের ধর্মের এই বিবাদ আশ্চর্যজনক যে, যে

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ يَكْفُلُ بِهِكُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَبْطِ الْعُيُوبِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قَالُوا لَوْلِكَ لَكُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ لِيُدْخِلَهُمْ مِّنْ دُونِ صَوْتِهِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيُصْرَفَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِيهِ الْيَلَّ فِي السَّمَاءِ وَيُولِيهِ التَّهَمَاتُ فِي الْيَلَّ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَيُّ ۚ وَإِنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ أَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْفِرُ بِهِ الْأَرْضَ مَخْضَرَّةً ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَلِيُّ الْحَمِيدُ ۝

(৫৬) রাজত্ব সেদিন আল্লাহরই; তিনিই তাদের বিচার করবেন। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম সম্পাদন করে তারা নেয়ামতপূর্ণ কাননে থাকবে (৫৭) এবং যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে তাদের জন্যে লাঞ্ছনাকর শাস্তি রয়েছে। (৫৮) যারা আল্লাহর পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে; আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট রিমিক দাতা। (৫৯) তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে পৌছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, সহনশীল। (৬০) এ তো শুনলে, যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে নিপীড়ন পরিমাণে প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং পুনরায় সে নিপীড়িত হয়, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমশীল। (৬১) এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ রাত্তিকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাত্রির মধ্যে দাখিল করে দেন এবং আল্লাহ সবকিছু শোনেন, দেখেন। (৬২) এটা এ কারণেও যে, আল্লাহই সত্য; আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে, তা অসত্য এবং আল্লাহই সবার উচ্ছে, মহান। (৬৩) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূপৃষ্ঠ সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে। নিশ্চয় আল্লাহ সুক্ষদর্শী, সর্ববিষয়ে খবরদার। (৬৪) নভোমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, সব তাঁরই এবং আল্লাহই অভাবমুক্ত প্রশংসার অধিকারী।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَأَلْعَلَّكَ تَجْرِي
 فِي الْبَحْرِ يَامِرًا ۖ وَلَيْسَ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ
 إِلَّا ابْدَازُهَا إِنَّ اللَّهَ يَإْتِلَاسُ لِرُءُوفٍ رَحِيمٍ ۖ وَهُوَ الَّذِي
 أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝
 لَكِنَّ أَمْرًا جَعَلْنَا مَنَسَكًا هُمْ تَاسِكُونَ فَلَا يَزِيدُكَ فِي
 الْأُمُورِ إِذْ دُرِيَ رَيْكَ إِنَّكَ لَعَلَّ هَذَا مُسْتَقِيمٌ ۝
 وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ اللَّهُ
 يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ أَلَمْ
 تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ
 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا
 لَمْ يَرْزُقْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَالًا لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا الظَّالِمِينَ
 مِنْ نَصِيرٍ ۝ وَإِذْ أَسْتَلَّ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَاتُ تَعْرِفُ فِي
 وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ
 يَتَّبِعُونَ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَاتُ قُلْ أَتَأْتِيَكُمْ سِرٌّ مِنْ ذُلِكُمْ
 أَلَّا تَرَوْهُ وَعَدَّاهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسِّرُ الْمَصِيرُ ۝

(৬৫) তুমি কি দেখ না যে, ভূপৃষ্ঠে যা আছে এবং সমুদ্রে চলমান নৌকা তৎসমুদয়কে আল্লাহ নিজ আদেশে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়ালব। (৬৬) তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে মৃত্যুদান করবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন। নিশ্চয় মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। (৬৭) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্যে এবাদতের একটি নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি, যা তারা পালন করে। অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। আপনি তাদেরকে পালনকর্তার দিকে আহ্বান করুন। নিশ্চয় আপনি সরল পথেই আছেন। (৬৮) তারা যদি আপনার সাথে বিতর্ক করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক জ্ঞাত। (৬৯) তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ, আল্লাহ কেয়ামতের দিন সেই বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। (৭০) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ জানেন যা কিছু আকাশে ও ভূগুণ্ডে আছে এসব কিভাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাহর কাছে সহজ। (৭১) তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছু পূজা করে, যার কোন সনদ নাথিল করা হয়নি এবং সে সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। বস্তুতঃ জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৭২) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃতি করা হয়, তখন তুমি কান্ধেরদে চোখে-মুখে অসন্তোষের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। যারা তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে, তারা তাদের প্রতি মারমুখো হয়ে উঠে। বলুন, আমি কি তোমাদেরকে তদপেক্ষা মন্দ কিছু সংবাদ দেব? তা আশুন; আল্লাহ কাফেরদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। এটা কতই না নিকট প্রত্যাবর্তনস্থল!

জন্তকে তোমরা স্বহস্তে হত্যা কর, তা তো হালাল এবং যে জন্তকে আল্লাহ তাআলা সরাসরি মৃত্যুদান করেন অর্থাৎ, সাধারণ মৃতজন্ত তা হারাম। তাদের এই বিতর্কের জওয়াবে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(রুহুল মা'আনী) অতএব এখানে **منسك** এর অর্থ হবে যবেহ করার নিয়ম। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক উম্মত ও শরীয়তের জন্যে যবেহের বিধান পৃথক পৃথক রেখেছেন। রসুল করীম (সাঃ)—এর শরীয়ত একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত। এই শরীয়তের বিধি-বিধানের মোকাবেলা কোন পূর্ববর্তী শরীয়তের বিধি-বিধান দ্বারা করাও জায়েয নয়; অথচ তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত মতামত ও বাস্তব চিন্তাধারার দ্বারা এর মোকাবেলা করছ। এটা কিরূপে জায়েয হতে পারে? মৃতজন্ত হালাল নয়, এটা এই উম্মত ও শরীয়তেরই বৈশিষ্ট্য নয়; পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহেও তা হারাম ছিল। সুতরাং তোমাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ভিত্তিহীন কথা উপর ভিত্তি করে পয়গম্বরের সাথে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া একেবারেই নিবুদ্ধিতা।—(রুহুল মা'আনী) সাধারণ তফসীরকারকদের মতে **منسك** শব্দের অর্থ এখানে শরীয়তের সাধারণ বিধি-বিধান। কেননা, অভিধানে এর অর্থ নির্দিষ্ট স্থান, যা কোন বিশেষ ভাল অথবা মন্দ কাজের জন্যে নির্ধারিত থাকে। এ কারণেই হজ্জের বিধি-বিধানকে **الحج مناسك** বলা হয়। কেননা, এগুলোতে বিশেষ বিশেষ স্থান বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে নির্ধারিত আছে। (ইবনে-কাসীর) কামুসে **نسك** শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে এবাদত। কোরআনে **وَأَتَاكَ مَنَاسِكَكَ** এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। **مناسك** বলে এবাদতের বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে এই দ্বিতীয় তফসীরও বর্ণিত আছে। ইবনে জরীর, ইবনে-কাসীর, কুতুবী, রুহুল-মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে এই ব্যাপক অর্থের তফসীরই গ্রহণ করা হয়েছে। আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনাও এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, **منسك** বলে শরীয়তের সাধারণ বিধানাবলী বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরেক ও ইসলামবিদ্বেষীরা মুহাম্মদী শরীয়তের বিধানাবলী সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে। তাদের তর্কের ভিত্তি এই যে, তাদের পৈতৃক ধর্মে এসব বিধান ছিল না। তারা কি শোনেনি যে, কোন পূর্ববর্তী শরীয়ত ও কিতাব দ্বারা নতুন শরীয়ত ও কিতাবের মোকাবেলা করা বাতিল। কেননা, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক উম্মতকে তার সময়ে বিশেষ শরীয়ত ও কিতাব দিয়েছেন। অন্য কোন উম্মত ও শরীয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে না আসা পর্যন্ত সেই শরীয়তের অনুসরণ সে উম্মতের জন্যে বৈধ ছিল। কিন্তু যখন অন্য শরীয়ত আগমন করে, তখন তাদেরকে এই নতুন শরীয়তের অনুসরণ করতে হবে। নতুন শরীয়তের কোন বিধান পূর্ববর্তী শরীয়তের বিরোধী হলে প্রথম বিধানকে 'মনসুখ' তথা রহিত এবং দ্বিতীয় বিধানকে 'নাসেখ' তথা রহিতকারী মনে করা হবে। কাজেই যিনি নতুন শরীয়তের বাহক, তাঁর সাথে কাউকে তর্ক-বিতর্কের অনুমতি দেয়া যায় না। আয়াতের সর্বশেষ বাক্য **فَلَا يَزِيدُكَ فِي الْأُمُورِ**—এর সারমর্মও তাই। অর্থাৎ, বর্তমানকালে যখন শেখনবী (সাঃ) একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছেন, তখন তাঁর শরীয়তের সব বিধি-বিধান নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার অধিকার কারও নেই।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, প্রথম তফসীর ও এই দ্বিতীয় তফসীরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই। কারণ, আয়াত যবেহ সম্পর্কিত তর্ক-বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক ও শরীয়তের সব বিধি-বিধান এতে শামিল। ভাষার ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে-অবতরণ স্থলের বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য নয়। কাজেই উভয়

তর্ক-বিতর্কের অনুমতি দেয়া যায় না। আয়াতের সর্বশেষ বাক্য **فَلَا يَزِيدُكَ فِي الْأُمُورِ**—এর সারমর্মও তাই। অর্থাৎ, বর্তমানকালে যখন শেখনবী

(সাঃ) একটি স্বতন্ত্র শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছেন, তখন তাঁর শরীয়তের সব বিধি-বিধান নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার অধিকার কারও নেই।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, প্রথম তফসীর ও এই দ্বিতীয় তফসীরের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই। কারণ, আয়াত যবেহ সম্পর্কিত তর্ক-বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক ও শরীয়তের সব বিধি-বিধান এতে শামিল। ভাষার ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়ে থাকে-অবতরণ স্থলের বৈশিষ্ট্য ধর্তব্য নয়। কাজেই উভয়

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ
تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ
اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ سَيْئَاتٍ لَا يَسْتَفِيدُوا
مِنْهُ صَعَفَ الظَّالِمُ وَالْمُطْلُوبُ ۝ مَا قَدَرُوا اللَّهَ
حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ
الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَوَلَّى اللَّهُ رُجُومَ
الْأُمُورِ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا الصَّكَّاتِ
الَّتِي بُعِثْتُمْ بِهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ عِبَادُوا اللَّهَ
وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ هَذَا
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا
بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

(৭৩) হে লোক সকল! একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা কর, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনকিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। (৭৪) তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা বোঝেনি। নিকৃষ্ট আল্লাহ শক্তির, পরাক্রমশীল। (৭৫) আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রসূল মনোনীত করেন। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্ব দ্রষ্টা। (৭৬) তিনি জানেন যা তাদের সামনে আছে এবং যা পশ্চাতে আছে এবং সবকিছু আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৭৭) হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু কর, সেজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর এবং সংকাজ সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (৭৮) তোমরা আল্লাহর জন্যে শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষাদাতা এবং তোমরা সাক্ষাদাতা হও মানবমণ্ডলির জন্যে। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

তফসীরের সারমর্ম এই হবে যে, আল্লাহ তাআলা যখন প্রত্যেক উম্মতকে আলাদা আলাদা শরীয়ত দিয়েছেন যার মধ্যে বিভিন্নমুখী ঈটিনাটি বিধানও থাকে, তখন কোন পূর্ববর্তী শরীয়তের অনুসারীর এরূপ অধিকার নেই যে, নতুন শরীয়ত সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করবে; বরং নতুন শরীয়তের অনুসরণ তার উপর ওয়াজিব। এ কারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে: **وَأَذِّنْ لِلْعَذَابِ** অর্থাৎ আপনি তাদের আপত্তি বা তর্ক-বিতর্কে প্রভাবান্বিত হবেন না; বরং যথারীতি সত্যের প্রতি দাওয়াতের কর্তব্য পালনে মশগুল থাকুন। কারণ, আপনি সত্য ও সরল পথে রয়েছেন। আপনার বিরোধীরাই পথচ্যুত।

একটি সন্দেহের কারণ: উপরোক্ত আলোচনা থেকে আরও একটি বিষয় জানা গেল যে, মুহাম্মদী শরীয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত মনসূখ হয়ে গেছে। এখন যদি খ্রীষ্টান, ইহুদী ইত্যাদি সম্প্রদায় বলে যে, এই আয়াতে স্বয়ং কোরআন বলেছে যে, প্রত্যেক শরীয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে আগমন করেছে। কাজেই ইসলামের আমলেও যদি আমরা মুসা ও ঈসা (আঃ)-এর শরীয়ত মেনে চলি, তবে মুসলমানদের তাতে আপত্তি করা উচিত নয়। কেননা, স্বয়ং কোরআনই আমাদেরকে এই অবকাশ দিয়েছে। এর উত্তর এই যে, আয়াতে প্রত্যেক উম্মতকে বিশেষ শরীয়ত দেয়ার কথা উল্লেখ করার পর বিশেষ মানবমণ্ডলীকে এ আদেশও দেয়া হয়েছে যে, মুহাম্মদী শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা যেন এর বিরোধিতা না করে। একথা বলা হয়নি যে, মুসলমানরা যেন পূর্ববর্তী শরীয়তের কোন বিধানের বিপক্ষে কথা না বলে। আলোচ্য আয়াতের পরবর্তী আয়াতগুলো দ্বারা এই বিষয়বস্তু আরও ফুটে উঠে। এসব আয়াতে ইসলামের বিপক্ষে তর্ককারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। তিনিই এর শাস্তি দিবেন। **وَلَنْ جَادُوا وَكَفَعَلِ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ نَسْمَلُونَ**

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

একটি উপমা দ্বারা শিরক ও মূর্তিপূজার বোকাসুলভ কাণ্ডের ব্যাখ্যা: **ضُرِبَ مَثَلٌ** - এই শব্দটি সাধারণতঃ কোন বিশেষ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেয়ার জন্যে ব্যবহৃত হয়। এখানে তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে শেরক ও মূর্তিপূজার বোকামী একটি সুস্পষ্ট উপমা দ্বারা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে, যে মূর্তিদেরকে তোমরা কার্যোদ্ধারকারী মনে কর, তারা এতই অসহায় ও শক্তিহীন যে, সবাই একত্রিত হয়ে একটি মাছির ন্যায় নিকৃষ্ট বস্তুও সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করা তো বড় কথা তোমরা রোজাই তাদের সামনে মিষ্টান্ন, ফল-মূল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য রেখে দাও। মাছিরূপে এসে সেগুলো খেয়ে ফেলে। মাছীদের কাছ থেকে নিজেদের ভোগের বস্তুকে বাঁচিয়ে রাখার শক্তিও তাদের হয় না। অতএব তারা তোমাদেরকে বিপদ থেকে কিরণে উদ্ধার করবে? এ কারণেই আয়াতের শেষে **صَعَفَ الظَّالِمُ وَالْمُطْلُوبُ** বলে তাদের মুর্থতা ও বোকামী ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ, যাদের উপাস্যই এমন শক্তিহীন সেই উপাস্যের উপাসক আরও বেশী শক্তিহীন হবে। **مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ** অর্থাৎ, এই নির্বোধ নিমকহরামরা আল্লাহর মর্যাদা বোঝেনি। ফলে এমন সর্বশক্তিমানের সাথে এমন শক্তিহীন

ও চেতনাহীন প্রস্তরসমূহকে শরীক সাব্যস্ত করেছে।

সূরা হুজ্বের সেজদায়ে-তেলাওয়াত : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا** -সূরা হুজ্ব এক আয়াত পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, যাতে সর্বসম্মতিক্রমে সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব। এখানে উল্লেখিত আয়াতে সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব কি না, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আযম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, সুফিয়ান সওরী (রহঃ)-এর মতে এই আয়াতে সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়। কেননা, এতে সেজদার সাথে রুকু ইত্যাদিও উল্লেখিত হয়েছে। এতে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এখানে নামাযের সেজদা বোঝানো হয়েছে, যেমন **وَأَخِضُّوا رُكُوعَكُمْ** আয়াতে সবাই একমত যে, এতে নামাযের সেজদা উদ্দেশ্য। এই আয়াত তেলাওয়াত করলে সেজদা ওয়াজিব হয় না। এমনভাবে আলোচ্য আয়াতেও সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ প্রমুখের মতে, এই আয়াতেও সেজদায়ে-তেলাওয়াত ওয়াজিব। তাঁদের প্রমাণ সেই হাদীস, যাতে বলা হয়েছে : সূরা হুজ্ব অন্যান্য সূরার উপর এই শ্রেষ্ঠত্ব রাখে যে, এতে দু'টি সেজদায়ে তেলাওয়াত আছে। ইমাম আযামের মতে, এই হাদীসটি প্রামাণ্য নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহ ও হাদীসের কিতাবাদিতে দ্রষ্টব্য।

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ - **جهاد** ও **مجاهدة** শব্দের অর্থ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্যে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্যে কষ্ট স্বীকার করা। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলমানরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জেহাদ বলা হয়। **حَقَّ جِهَادِهِ** এর অর্থ আল্লাহর ওয়াস্তে জেহাদ করা, তাতে জাগতিক নাম-যশ ও গণীমতের অর্থ লাভের লালসা না থাকা।

হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন : **حَقَّ جِهَادِهِ** এর অর্থ জেহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা। কোন কোন তফসীরকারকের মতে এখানে জেহাদের অর্থ সাধারণ এবাদত ও আল্লাহর বিধি-বিধান পালনে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা ও পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে তা পালন করা।

যাহ্যাক ও মোকাতিল বলেন : আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর জন্যে কাজ কর, যেমন করা উচিত এবং আল্লাহর এবাদত কর, যেমন করা উচিত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক বলেন : এতুলে জেহাদ বলে নিজ প্রবৃত্তি ও অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জেহাদ করা বোঝানো হয়েছে এবং এটাই **حَقَّ جِهَادِهِ** অর্থাৎ, মখাযোগ্য জেহাদ। ইমাম বগতী প্রমুখ এই উক্তির সমর্থনে একটি হাদীসও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একবার সাহাবায়ে-কেরামের একটি দল কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান শেষে ফিরে এলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন :

তোমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে চমৎকারভাবে ফিরে এসেছ। উদ্দেশ্য এই যে, প্রবৃত্তির অন্যায় কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জেহাদ এখনও অভাৱত আছে। এই হাদীসটি ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করে বলেছেন যে, এর সনদে ত্রুটি আছে।

জ্ঞাতব্য : তফসীরে-মাযহারীতে এই দ্বিতীয় তফসীর অবলম্বন করে আয়াত থেকে একটি তত্ত্ব উদঘাটন করা হয়েছে তা এই যে,

সাহাবায়ে-কেরাম যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে রত ছিলেন, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ তখনও চালু ছিল, কিন্তু হাদীসে একে ফিরে আসার পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবৃত্তির বাসনার বিরুদ্ধে জেহাদ যদিও রণক্ষেত্রেও অব্যাহত ছিল, কিন্তু স্বভাবতই এই জেহাদ শায়েখ-কামেলের সংসর্গলাভের উপর নির্ভরশীল। তাই জেহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিতির পরই তা শুরু হয়েছে।

هُوَ أَجْتَبَاكُمْ উম্মতে মুহাম্মদী আল্লাহর মনোনীত উম্মত : -হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন :

আল্লাহ তাআলা সমগ্র বনী-ইসরাঈলের মধ্য থেকে কেনানা গোত্রকে মনোনীত করেছেন, অতঃপর কেনানার মধ্য থেকে কোরাইশকে, অতঃপর কোরাইশের মধ্য থেকে বনী-হাশেমকে এবং বনী-হাশেমের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন। -(মুসলিম, মাযহারী)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ -অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। 'ধর্মে সংকীর্ণতা নেই'—এই বাক্যের তাৎপর্য কেউ কেউ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এই ধর্মে এমন কোন গোনাহ নেই, যা তওবা করলে মাফ হয় না এবং পরকালীন আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় হতে পারে না। পূর্ববর্তী উম্মতদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মধ্যে এমন কতিপয় গোনাহও ছিল, যা তওবা করলেও মাফ হত না।

হযরত কাযী সানাউল্লাহ তফসীরে-মাযহারীতে বলেন : ধর্মে সংকীর্ণতা নেই, একথার তাৎপর্য এরূপ হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে সকল উম্মতের মধ্য থেকে নিজের জন্যে মনোনীত করেছেন। এর কল্যাণে এই উম্মতের জন্যে ধর্মের পথে কঠিনতর কষ্টও সহজ বরং আনন্দদায়ক হয়ে যায়। পরিশ্রমে সুখ লাভ হতে থাকে। বিশেষতঃ অন্তরে ঈমানের মাধুর্য সৃষ্টি হয়ে গেলে ভারী কাজও হালকা-পাতলা মনে হতে থাকে। হাদীসে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : **جَعَلْتُ قُرَةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ** বলে : -অর্থাৎ, নামাযে আমার চক্ষু শীতল হয়। -(আহমদ, -নাসায়ী, হাকিম)

وَلَكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ -অর্থাৎ, এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ) এর মিল্লাত। এখানে প্রকৃতপক্ষে কোরাইশী মুমিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা সরাসরি ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর। এরপর কোরাইশীদের অনুগামী হয়ে সব মুসলমান এই ফযীলাতে शामिल হয়; যেমন-হাদীসে আছে :

সব মানুষ ধর্মক্ষেত্রে কোরাইশদের অনুগামী। মুসলমান মুসলমান কোরাইশীদের অনুগামী এবং কাফের কাফের কোরাইশীদের অনুগামী।-(মাযহারী)

কেউ কেউ বলেন : আয়াতে সব মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এদিক দিয়ে সবার পিতা যে, নবী করীম (সাঃ) হচ্ছেন উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা; যেমন তাঁর বিবিগণ 'উম্মাহাতুল-মুমেনীন' অর্থাৎ, মুমিনদের মাতা। নবী করীম (সাঃ) যে, হযরত ইবরাহীমের বংশধর; একথা সুস্পষ্ট ও সুবিদিত।

هُوَ سَيُخَالِصُكُمُ مِنَ الْكُفْرِ وَلَهُ هَذَا -অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম

(আঃ) কোরআনের পূর্বে উম্মতে মুহাম্মদী এবং সমগ্র বিশাসী সম্প্রদায়ের জন্যে ‘মুসলিম’ নামকরণ করেছেন; যেমন হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কোরআনে বর্ণিত আছে :

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَوَن ذُرِّيَّتَنَا

—কোরআনে মুমিনদের নামকরণ করা হয়েছে মুসলিম।

যদিও এই নামকরণকারী প্রত্যক্ষভাবে হযরত ইবরাহীম নন, কিন্তু কোরআনের পূর্বে তাঁর এই নামকরণ কোরআনে মুসলিম নামে অভিহিত করার কারণ হয়েছে। তাই এর সম্বন্ধও ইবরাহীম (আঃ)—এর দিকে করে দেয়া হয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ وَأَسْكَنْتُكَ وَأَعْلَيْتُكَ وَكَوْنُوا شُهَدَاءَ عَلَىٰ النَّاسِ

—অর্থাৎ, রসুলুল্লাহ (সাঃ) হাশরের ময়দানে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমি আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান এই উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলাম তখন উম্মতে-মুহাম্মদী তা স্বীকার করবে। কিন্তু অন্যান্য পয়গম্বর যখন এই দাবী করবেন, তখন তাঁদের উম্মতরা অস্বীকার করে বসবে। তখন উম্মতে-মুহাম্মদী সাক্ষ্য দেবে যে, সব পয়গম্বরগণ নিশ্চিতরূপেই তাদের উম্মতের কাছে আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী পৌঁছে দিয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট উম্মতদের পক্ষ থেকে তাদের এই সাক্ষ্যের উপর জেরা হবে যে, আমাদের যমানায় উম্মতে-মুহাম্মদীর অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং তারা আমাদের ব্যাপারে কিরূপে সাক্ষী হতে পারে? উম্মতে-মুহাম্মদীর তরফ থেকে জেরার জওয়াবে বলা হবে : আমরা বিদ্যমান ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু আমরা আমাদের রসুল (সাঃ)—এর মুখে একথা শুনছি, যার সত্যবাদিতায় কোন সন্দেহ নেই। কাজেই আমরা সাক্ষ্য দিতে পারি। অতঃপর তাদের সাক্ষ্য কবুল করা হবে। এই বিষয়বস্তু বোখারী ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরীর হাদীসে বর্ণিত আছে।

فَاتَّخِذُوا الصَّلَاةَ وَاتَّخِذُوا الزَّكَاةَ —উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা

যখন তোমাদের প্রতি এতসব বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যেগুলো উপরে বর্ণিত হয়েছে, তখন তোমাদের কর্তব্য আল্লাহর বিধানাবলী পালনে পুরোপুরি সচেষ্ট হওয়া। বিধানাবলীর মধ্যে এছাড়া শুধু নামায ও যাকাত উল্লেখ করার কারণ এই যে, দৈহিক কর্ম ও বিধানাবলীর মধ্যে নামায সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আর্থিক বিধানাবলীর মধ্যে যাকাত সর্বাধিক গুরুত্ববহ; যদিও শরীয়তের সব বিধান পালন করাই উদ্দেশ্য।

وَاعْتَصِمُوا بِآلِهَادِهِ —অর্থাৎ, সবকাজে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা

কর এবং তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া কর, তিনি যেন তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালের অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিরাপদ রাখেন। কেউ কেউ বলেন : এই বাক্যের অর্থ এই যে, কোরআন ও সুন্নাহকে অবলম্বন কর, সর্বাধিক্য এগুলোকে আঁকড়ে থাক; যেমন এক হাদীসে আছে :

আমি তোমাদের জন্যে দু’টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তোমরা যে পর্যন্ত এ দু’টিকে অবলম্বন করে থাকবে; পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব ও অপরটি আমার সুন্নত। —(মাহযারী)

সূরা হজ্ব সমাপ্ত

المؤمنون ১৩

২২২

قَدْ اَفْلَحَ ১৪

সূরা আল মুমিনুন

সূরা মুমিনুনের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব : মুসনাদে-আহমদের এক রেওয়ায়েতে হযরত ওমর ফারাক (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হত, তখন নিকটবর্তী লোকদের কানে যৌমাছির গুল্লনের ন্যায় আওয়াজ ধ্বনিত হত। একদিন তাঁর কাছে এমনি আওয়াজ শুনে আমরা সদ্যপ্রাপ্ত ওহী শোনার জন্যে থেমে গেলাম। ওহীর বিশেষ অবস্থা সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবলামুখী হয়ে বসে গেলেন এবং নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে লাগলেন :

اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تهرنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وارضا -

অর্থাৎ, “হে আল্লাহ্ আমাদেরকে বেশী দাও—কম দিও না। আমাদের সম্মান বৃদ্ধি কর—লাঞ্ছিত করো না। আমাদেরকে দান কর—বঞ্চিত করো না। আমাদেরকে অন্যের উপর অধিকার দাও—অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ো না এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক এবং আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট কর।” এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এক্ষণে দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে। কেউ যদি এ আয়াতগুলো পুরোপুরি পালন করে, তবে সে সোজা জন্মান্নাতে যাবে। এরপর তিনি উপরোল্লিখিত দশটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন।

ইমাম নাসায়ী তফসীর অধ্যায় ইয়াযীদ ইবনে বাবনুস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র কিরূপ ছিল? তিনি বললেন : তাঁর চরিত্র অর্থাৎ, স্বভাবগত অভ্যাস কোরআনে বর্ণিত আছে। অতঃপর তিনি এই দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন : এগুলোই ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র ও অভ্যাস।—(ইবনে-কাসীর)

قَدْ اَفْلَحَ কি এবং কোথায় ও কিরূপে পাওয়া যায় : **قَدْ اَفْلَحَ** (সাকফ্য) শব্দটি কোরআন ও হাদীসে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আযান ও একামতে দৈনিক পাঁচবার প্রত্যেক মুসলমানকে সাকফ্যের দিকে আহ্বান করা হয়। এর অর্থ প্রত্যেক মনোবাহু পূর্ণ হওয়া ও প্রত্যেক কষ্ট দূর হওয়া।—(কামুস) এই শব্দটি যেমনি সংকীর্ণ, তেমনি সুবিস্তারী অর্থবহ। কোন মানুষ এর চাইতে বেশী কোনকিছু কামনাই করতে পারে না। বলাবাহু, একটি মনোবাহুও অপূর্ণ না থাকা এবং একটি কষ্টও অবশিষ্ট না থাকা—এরূপ পূর্ণাঙ্গ সাকফ্য লাভ করা জগতে কোন মহত্বময় ব্যক্তিরও আয়ত্ত্বাধীন নয়। সপ্তরাজ্যের অধিকারী বাদশাহ্ হোক কিংবা সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও পয়গম্বর হোক, জগতে অবাহিত কোন কিছুই সম্পূর্ণ হওয়া এবং অন্তরে বাসনা জাগ্রত হওয়া মাত্রই অবিলম্বে তা পূর্ণ হওয়া কারও জন্যে সম্ভবপর নয়। অন্য কিছু না হলেও প্রত্যেক নেয়ামতের অবসান ও ধ্বংসের ঝটকা এবং যে কোন বিপদের সম্পূর্ণ হওয়ার আশঙ্কা থেকে তো কেউ মুক্ত নয়।

এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ণাঙ্গ সাকফ্য দুনিয়াতে অর্জিতই হতে পারে না। কেননা, দুনিয়া কষ্ট ও শ্রমের আবাসস্থল এবং এর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব ও স্থিরতা নেই। এই অমূল্য সম্পদ অন্য এক জগতে পাওয়া যায়, যার নাম জন্নাতে। সে দেশেই মানুষের প্রত্যেক মনোবাহু সর্বক্ষণ ও বিনা

সূরা আল মুমিনুন

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ১১৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

- (১) মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, (২) যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নয়;
- (৩) যারা অনর্থক কথা-বার্তার নিষিদ্ধ, (৪) যারা যাকাত দান করে থাকে
- (৫) এক যারা নিজেদের যৌনাক্রমে সংবৃত রাখে। (৬) তবে তাদের স্ত্রী ও মানিকদাস্ত্র দাসীদের ক্ষেত্রে সংবৃত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না।
- (৭) অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালঙ্ঘনকারী হবে। (৮) এক যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে (৯) এক যারা তাদের নামাযসমূহের স্বর রাখে, (১০) তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে, (১১) তারা নীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে চিরকাল থাকবে। (১২) আমি মানুষকে মাটির সারগন্ধ থেকে সৃষ্টি করেছি। (১৩) অতঃপর আমি তাকে শুকবিন্দু রূপে এক সরঞ্জাম আধারে স্থাপন করেছি। (১৪) এরপর আমি শুকবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে এক নড়ন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়! (১৫) এরপর তোমরা মৃত্যুবরণ করবে। (১৬) অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা পুনরুত্থিত হবে। (১৭) আমি তোমাদের উপর সপ্তপাণ সৃষ্টি করেছি এবং আমি সৃষ্টি সমুদ্রে অববাহন নই।

প্রতীক্ষায় অর্জিত হবে।— وَفَعَّلَ مَا لَيْسَ لَهُ ۖ اَرْثًا ۚ تَارًا يَآ حَٰٓئِبَہٗ، تَٰٓئِیْہٗ
পাবে। সেখানে কোন সামান্যতম ব্যথা ও কষ্ট থাকবে না এবং প্রত্যেকেই
একথা বলতে বলতে সেখানে প্রবেশ করবে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْغَمَّ اِلَآ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَدُوْدٌ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْغَمَّ اِلَآ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَدُوْدٌ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْغَمَّ اِلَآ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَدُوْدٌ ۝

অর্থাৎ, “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের থেকে কষ্ট দূর
করেছেন এবং স্বীয় কৃপায় আমাদেরকে এমন এক স্থানে দাখিল করেছেন,
যার প্রত্যেক বস্তু সুপ্রতিষ্ঠিত ও চিরস্থান।” এই আয়াতে আরও ইঙ্গিত
আছে যে, বিশুদ্ধগতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু কষ্ট ও দুঃখের সম্মুখীন
হবে। তাই জ্ঞান্নাতে পা রাখার সময় প্রত্যেকেই বলবে যে, এখন আমাদের
দুঃখ দূর হল। কোরআন পাক সূরা আ’লায় সাফল্য লাভ করার ব্যবস্থাপত্র
দিতে গিয়ে বলেছে : فَذَٰلِكُمْ مِّنْ نَّوْحٰی ۝ অর্থাৎ, যে নিজেই পাপকর্ম
থেকে পবিত্র রেখেছে সে সাফল্যলাভ করেছে। এর সাথে সাথে আরও
ইঙ্গিত করেছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য লাভের জায়গা আসলে পরকাল। যে
সাফল্য কামনা করে, তার কাজ শুধু দুনিয়া নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা নয়।
বলা হয়েছে : اِنَّ دُوْنَكُمْ حَیٰوةً اٰلٰتِیْہِا وَاَلْاٰخِرَةُ خَیْرٌ وَّاَنْتِیْ ۝ অর্থাৎ,
তোমরা দুনিয়ায়ই পরকালের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাক; অথচ
পরকাল উত্তমও, কারণ তাতেই প্রত্যেক মনোবাহ্য অর্জিত ও প্রত্যেক কষ্ট
দূর হতে পারে এবং পরকাল চিরস্থায়ীও।

মোটকথা এই যে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সাফল্য তো একমাত্র
জ্ঞান্নাতেই পাওয়া যেতে পারে—দুনিয়া এর স্থানই নয়। তবে অধিকাংশ
অবস্থার দিক দিয়ে সাফল্য অর্থাৎ, সফলকাম হওয়া ও কষ্ট থেকে মুক্তি
লাভ করা—এটা দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্দাদেরকে দান করে
থাকেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা সেসব মুমিনকে
সাফল্যদান করার ওয়াদা দিয়েছেন, যারা আয়াতে উল্লেখিত সাতটি গুণে
গুণান্বিত। পরকালের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য এবং দুনিয়ার সম্ভাব্য সাফল্য সবই
এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত।

আয়াতে উল্লেখিত সাতটি গুণ : সর্বপ্রথম গুণ হচ্ছে ঈমানদার
হওয়া। কিন্তু এটা একটা বুনিয়াদী ও মৌলিক বিষয় বিধায় একে আলাদা
করে এখানে সে সাতটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই :

প্রথম, নামাযে ‘খুশু’ তথা বিনয়-নয় হওয়া—‘খুশু’র আভিধানিক
অর্থ স্থিরতা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অন্তরে স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ,
আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছুর কম্পনাকে অন্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে উপস্থিত
না করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও স্থিরতা থাকা; অর্থাৎ, অনর্থক নড়াচড়া না
করা।—(বয়ানুল—কোরআন) বিশেষতঃ এমন নড়াচড়া, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)
নামাযে নিষিদ্ধ করেছেন। ফেকাহবিদগণ এ ধরনের নড়াচড়া ‘নামাযের
মাকরুহসমূহ’ শিরোনামে সন্নিবেশিত করেছেন। তফসীরে মাযহারীতে
খুশুর এই সংজ্ঞা হযরত আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।
অন্যান্য মনীষী থেকে খুশুর সংজ্ঞা সম্পর্কে যেসব উক্তি বর্ণিত আছে,
সেগুলো মূলতঃ অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার বিশদ বিবরণ।
উদাহরণতঃ হযরত মুজাহিদ বলেন : দৃষ্টি অবনত ও আওয়াজ ক্ষীণ রাখার
নাম খুশু। হযরত আতা বলেন : দেহের কোন অংশ নিয়ে খেলা না করা
‘খুশু’। হাদীসে হযরত আবু যর থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)
বলেন : নামাযের সময় আল্লাহ তাআলা বন্দার প্রতি সর্বক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ

রাখেন যতক্ষণ না নামাযী অন্য কোনদিকে লক্ষ্য করে। যখন সে অন্য
কোন দিকে লক্ষ্য করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার দিক থেকে দৃষ্টি
ফিরিয়ে নেন।—(আহমদ, নাসায়ী আবু দাউদ—মাযহারী) নবী করীম
(সাঃ) হযরত আনাসকে নির্দেশ দেন : সেজদার জায়গার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ
রাখ এবং ডানে-বায়ে লক্ষ্য করো না।—(বায়হাকী—মাযহারী)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে
নামাযে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন : لَوْ خَشَعْتَ لَبْهَٰذَا ۝ অর্থাৎ, এই ব্যক্তির অন্তরে খুশু থাকলে তার অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গের স্থিরতা থাকত।—(মাযহারী)

পূর্ণ মুমিনের দ্বিতীয় গুণ : অনর্থক বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা।
وَالَّذِیْنَ هُمْ مِّنَ الْغَفُوْرِ مَعْزُوْنٌ ۝ اَلْفُو ۝ অর্থ অনর্থক কথা অথবা
কাজ, যাতে কোন ধর্মীয় উপকার নেই। এর অর্থ উচ্চস্তরের গোনাহ, যাতে
ধর্মীয় উপকার তো নেই-ই, বরং ক্ষতি বিদ্যমান। এ থেকে বিরত থাকা
ওয়াজিব। উপকার ও ক্ষতি উভয়টি না থাকা এর নিম্নস্তর। একে বর্জন
করা ন্যূনপক্ষে উত্তম ও প্রশংসনীয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : من حسن :
اسلام المرء ترکہ ما لا ینفعہ ۝ অর্থাৎ, ‘মানুষ যখন অনর্থক বিষয়াদি
ত্যাগ করে, তখন তার ইসলাম সৌন্দর্য মণ্ডিত হতে পারে।’ এ কারণেই
আয়াতে একে কামেল মুমিনদের বিশেষ গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তৃতীয় গুণ যাকাত : এর আভিধানিক অর্থ পবিত্র করা। পরিভাষায়
মোট অর্থ-সম্পদের একটা বিশেষ অংশ কিছু শর্তসহ দান করাকে যাকাত
বলা হয়। কোরআন পাকে এই শব্দটি সাধারণতঃ এই পারিভাষিক অর্থে
ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। এতে
সন্দেহ করা হয় যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় যাকাত ফরয
হয়নি—মদীনায় হিজরতের পর ফরয হয়েছে। ইবনে-কাসীর প্রমুখ
তফসীরবিদের পক্ষ থেকে এর জওয়াব এই যে, যাকাত মক্কাতেই ফরয
হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুযাম্মেল মক্কায় অবতীর্ণ, এ বিষয়ে সবাই
একমত। এই সূরায় اٰتُوا الزَّكٰوةَ এর সাথে فَاتَّبِعُوا الصَّلٰوةَ এর সাথে
করা হয়েছে, কিন্তু সরকারী পর্যায়ে যাকাত আদায় করার ব্যবস্থাপনা এবং
‘নিসাব’ ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের পর স্থিরীকৃত হয়।
যাঁরা যাকাতকে মদীনায় অবতীর্ণ বিধানাবলীর মধ্যে গণ্য করেছেন, তাঁদের
উদ্দেশ্য তাই। যারা বলেন যে, মদীনায় পৌঁছার পরই যাকাতের আদেশ
অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা এস্থলে যাকাত শব্দের সাধারণ আভিধানিক অর্থ
পবিত্র করা নিয়েছেন। আয়াতে এই অর্থের প্রতি আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে,
সাধারণতঃ কোরআন পাকে যেখানে ফরয যাকাতের উল্লেখ করা হয়,
সেখানে اٰتُوا الزَّكٰوةَ ও فَاتَّبِعُوا الصَّلٰوةَ ইত্যাদি শিরোনামে বর্ণনা
করা হয়। এখানে শিরোনাম পরিবর্তন করে اٰتُوا زَكٰوةً বলাই ইঙ্গিত
করে যে, এখানে পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। এ ছাড়া فِیْہِ
শব্দটি স্বতস্কৃতভাবে فعل (কাজ)—এর সাথে সম্পর্ক রাখে। পারিভাষিক
যাকাত فعل নয়, বরং অর্থ-কড়ির একটা অংশ। فِیْہِ শব্দ দ্বারা এই
অংশ বোঝাতে গেলে ব্যাখ্যা ও বর্ণনার আশ্রয় না নিয়ে উপায় নেই।
মোটকথা, আয়াতে পারিভাষিক অর্থ নেয়া হলে যাকাত যে মুমিনের জন্যে
অপরিহার্য ফরয তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। পক্ষান্তরে যাকাতের অর্থ
আত্মশুদ্ধি নেয়া হলে তাও ফরযই। কেননা, শেরক, রিয়া, অহঙ্কার,
হিংসা, শত্রুতা, লোভ-লালসা, কার্পণ্য ইত্যাদি থেকে নফসকে পবিত্র
রাখাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। এগুলো সব হারাম ও কবীরা গোনাহ।

নফসকে এগুলো থেকে পবিত্র করা ফরয।

চতুর্থ গুণ যোনাককে হারাম থেকে সংযত রাখা : **وَالَّذِينَ هُمْ**
لَهُمْ حُجُورٌ مَّحْظُونَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَخَافُونَ অর্থাৎ, যারা

স্ত্রী ও শরীয়তসম্মত দাসীদের ছাড়া সব পর নারী থেকে যোনাককে সংযত রাখে এবং এই দুই শ্রেণীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়া অন্য কারও সাথে কোন অবৈধ পন্থায় কামবাসনা পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয় না। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে :

وَالَّذِينَ هُمْ অর্থাৎ, যারা শরীয়তের বিধি মোতাবেক স্ত্রী অথবা

দাসীদের সাথে কামবাসনা পূর্ণ করে, তারা তিরস্কৃত হবে না। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এই প্রয়োজনকে প্রয়োজনের সীমা রাখতে হবে—জীবনের লক্ষ্য করা যাবে না। এটা এই পর্যায়েরই কাজ যে, কেউ এলুপ করলে সে তিরস্কারযোগ্য হবে না।

فَإِنَّ يَتَقَىٰ وَآزْوَاجَكَ فَالَّذِينَ هُمْ অর্থাৎ, বিবাহিত স্ত্রী

অথবা শরীয়তসম্মত দাসীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামবাসনা পূর্ণ করা ছাড়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার আর কোন পথ হালাল নয়, যেমন—যিনা তেমনি হারাম নারীকে বিবাহ করায় যিনার হুকুম বিদ্যমান। স্ত্রী অথবা দাসীর সাথে হায়েয-নেফাস অবস্থায় কিংবা অস্বাভাবিক পন্থায় সহবাস করা অথবা কোন পুরুষ অথবা বালক অথবা জীব-জন্তুর সাথে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা—এগুলো সব নিষিদ্ধ ও হারাম। অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের মতে **استمنا** অর্থাৎ, হস্তমৈথুন ও এর অন্তর্ভুক্ত।—(বয়ানুল-কোরআন, কুরতুবী, বাহরে-মুহীত)

পঞ্চম গুণ আমানত প্রত্যর্পণ করা : **وَالَّذِينَ هُمْ**

أَمَانَاتُ আমানত শব্দের আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি বিষয় শামিল, যার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি বহন করে এবং সে বিষয়ে কোন ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা হয়। এর অসংখ্য প্রকার আছে বিধায় এ শব্দটি মূল ধাতু হওয়া সত্ত্বেও একে বহুচনে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে যাবতীয় প্রকার এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়—হুকুকুল্লাহ তথা আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হোক কিংবা হুকুকুল-এবাদ তথা বন্দার হক সম্পর্কিত হোক। আল্লাহর হক সম্পর্কিত আমানত হচ্ছে শরীয়ত আরোপিত সকল ফরয ও ওয়াজিব পালন করা এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরুহ বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করা। বন্দার হক সম্পর্কিত আমানতের মধ্যে আর্থিক আমানত যে অন্তর্ভুক্ত, তা সুবিদিত; অর্থাৎ, কেউ কারও কাছে টাকা-পয়সা গচ্ছিত রাখলে তা তার আমানত প্রত্যর্পণ করা পর্যন্ত এর হেফাজত করা তার দায়িত্ব। এছাড়া কেউ কোন গোপন কথা কারও কাছে বললে তাও তার আমানত। শরীয়তসম্মত অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গোপন তথ্য ফাঁস করা আমানতে খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মজুর ও কর্মচারীকে অর্পিত কাজের জন্যে পারস্পরিক সমঝোতাক্রমে যে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়, তাতে সেই কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং মজুরী ও চাকুরীর জন্যে নির্ধারিত সময়ে সেই কাজই করা এবং অন্য কাজ না করাও আমানত। কামচুরি ও সময়চুরি বিশ্বাসঘাতকতা। এতে জানা গেল যে, আমানতের হেফাজত ও তার হক আদায় করার বিষয়টি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী অর্থবহ। উপরোক্ত বিবরণ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ গুণ অঙ্গীকার পূর্ণ করা : অঙ্গীকার বলতে প্রথমতঃ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বোঝায়, যা কোন ব্যাপারে উভয়পক্ষ অপরিহার্য করে নেয়। এরূপ

চুক্তি পূর্ণ করা ফরয এবং এর খেলাফ করা বিশ্বাসঘাতকতা প্রভারণা তথা হারাম। দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকারকে ওয়াদা বলা হয়; অর্থাৎ, একতরফাভাবে একজন অন্য জনকে কিছু দেয়ার অথবা অন্যজনের কোন কাজ করে দেয়ার ওয়াদা করা। এরূপ ওয়াদা পূর্ণ করাও শরীয়তের আইনে জরুরী ও ওয়াজিব। হাদীসে আছে **المنة** অর্থাৎ, ওয়াদা, এক প্রকার ঋণ। ঋণ আদায় করা যেমন ওয়াজিব, ওয়াদা পূর্ণ করাও তেমনি ওয়াজিব। শরীয়তসম্মত ওয়র ব্যতিরেকে এর খেলাফ করা গোনাহ। উভয় প্রকার অঙ্গীকারের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্যে প্রতিপক্ষ আদালতের মাধ্যমেও বাধ্য করতে পারে, কিন্তু এক তরফা ওয়াদা পূর্ণ করার জন্যে আদালতের মাধ্যমে বাধ্য করা যায় না। ধর্মপরায়ণতার দৃষ্টিভঙ্গিতে একে পূর্ণ করা ওয়াজিব এবং শরীয়তসম্মত ওয়র ব্যতীত এর খেলাফ করা গোনাহ।

সপ্তম গুণ নামাযে যত্নবান হওয়া : **وَالَّذِينَ هُمْ**

يَتَّقُونَ নামাযে যত্নবান হওয়ার অর্থ নামাযের পাকদী করা এবং প্রত্যেক নামায মোস্তাহাব ওয়াস্তে আদায় করা।—(রুহুল-মা'আনী) এখানে **صلوات** শব্দটি বহুচনে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এখানে পাঁচ ওয়াস্তের নামায বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মোস্তাহাব ওয়াস্তে পাকদী সহকারে আদায় করা উদ্দেশ্য। শুরুতেও নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে নামাযে বিনয়-নয় হওয়ার কথা বলা উদ্দেশ্য ছিল। তাই সেখানে **سلوة** শব্দটি একচনে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ, নামায ফরয হোক অথবা ওয়াজিব, সন্নত কিংবা নফল হোক—নামায মাত্রেরই প্রাণ হচ্ছে বিনয়-নয় হওয়া। চিন্তা করলে দেখা যায়, উল্লেখিত সাতটি গুণের মধ্যে যাবতীয় প্রকার আল্লাহর হক ও বন্দার হক এবং এতদসংশ্লিষ্ট সব বিধি-বিধান প্রবর্তিত হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যায় এবং এতে অটল থাকে, সে কামেল মুমিন এবং ইহকাল ও পরকালের সাফল্যেরহকদার।

এখানে এ বিষয় প্রশ্নবিধানযোগ্য যে, এই সাতটি গুণ শুরু করা হয়েছে নামায দ্বারা এবং শেষও করা হয়েছে নামায দ্বারা। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযকে নামাযের মত পাকদী ও নিয়ম-নীতি সহকারে আদায় করলে অবশিষ্ট গুণগুলো আপনা-আপনি নামাযীর মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকবে।

أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتُونَ উল্লেখিত গুণে

গুণান্বিত লোকদেরকে এই আয়াতে জান্নাতুল-ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী বলা হয়েছে। উত্তরাধিকারী বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যেমন উত্তরাধিকারীর মালিকানায আসা অমোঘ ও অনিবার্য, তেমনি এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিদের জান্নাত প্রবেশও সুনিশ্চিত। **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتُونَ** বাক্যের পর সফলকাম ব্যক্তিদের গুণাবলী পুরোপুরি উল্লেখ করার পর এই বাক্য আরও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণাঙ্গ সাফল্য ও প্রকৃত সাফল্যের স্থান জান্নাতই।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلُوفٍ رَّطِينٍ অর্থ সারাংশ এবং

طِينٍ অর্থ আর্দ্র মাটি। অর্থ এই যে, পৃথিবীর মাটির বিশেষ অংশ বের করে তা দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির সূচনা হযরত আদম (আঃ) থেকে এবং তাঁর সৃষ্টি মাটির সারাংশ থেকে হয়েছে। তাই প্রথম সৃষ্টিকে মাটির সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। এরপর এক মানুষের শুভ **تَوَجَّهَتْهُ نَفَقَةٌ** অন্য মানুষের সৃষ্টির কারণ হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে

বলে একথাই বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাথমিক সৃষ্টি মাটি দ্বারা হয়েছে, এরপর সৃষ্টিধারা এই মাটির সুক্ষ্ম অংশ অর্থাৎ, শুক্র দ্বারা চালু করা হয়েছে। গরিত্তসংখ্যক তফসীরবিদগণ আয়াতের এ তফসীরই লিখেছেন। একথা বলাও সম্ভবপর যে, **سَلَوَاتٍ طِينٍ** বলে মানুষের শুক্রই বোঝানো হয়েছে। কেননা, শুক্র খাদ্য থেকে উৎপন্ন এবং খাদ্য মাটি থেকে সৃষ্টি হয়।

মানব সৃষ্টির সপ্তস্তর : আলোচ্য আয়াতসমূহে মানব সৃষ্টির সাতটি স্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম স্তর **سَلَوَاتٍ طِينٍ** অর্থাৎ, মৃত্তিকার সারংশে দ্বিতীয় বীর্ষ, তৃতীয় জমাট রক্ত, চতুর্থ মাংসপিণ্ড, পঞ্চম অস্থি-পিঞ্জর, ষষ্ঠ অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃতকরণ ও সপ্তম সৃষ্টির পূর্ণত্ব অর্থাৎ, রূহ সঞ্চার করণ।

হযরত ইবনে-আব্বাস বর্ণিত একটি অভিনব তত্ত্ব : তফসীরে-কুরতুবীতে এস্থলে হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে এই আয়াতের ভিত্তিতেই ‘শবে-কদর’ নির্ধারণ সম্পর্কিত একটি অভিনব তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তা এই যে, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একবার সমবেত সাহাবিগণকে প্রশ্ন করলেন : রমযানের কোন তারিখে শবে কদর? সবাই উত্তরে ‘আল্লাহ তাআলাই জানেন’ বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হযরত ইবনে-আব্বাস তাঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : আমীরুল-মুমিনীন! আল্লাহ তাআলা সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মানুষের সৃষ্টিও সপ্ত স্তরে সম্পন্ন করেছেন এবং সাতটি বস্তুকে মানুষের খাদ্য করেছেন তাই আমার তো মনে হয় যে, শবে-কদরও রমযানের সাতাশতম রাত্রিতে হবে। খলীফা এই অভিনব প্রমাণ শুনে বিশিষ্ট সাহাবিগণকে বললেন : এই বালকের মাথার চুলও এখন পর্যন্ত পুরোপুরি গজায়নি; অথচ সে এমন কথা বলেছে, যা আপনারা বলতে পারেননি। ইবনে আবি শায়বার মুসনাদে এই দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে। ইবনে-আব্বাস মানব-সৃষ্টির সপ্তস্তর বলে তাই বুঝিয়েছেন, যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের খাদ্যের সাতটি বস্তু সূরা আবাসার আয়াতে উল্লেখিত আছে : **فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَبَلًا فَخَلَّتْ مِنَ السَّمَاءِ نَارٌ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَبَلًا فَخَلَّتْ مِنَ السَّمَاءِ نَارٌ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَبَلًا فَخَلَّتْ مِنَ السَّمَاءِ نَارٌ** এই আয়াতে আটটি বস্তু উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সাতটি মানুষের খাদ্য এবং সর্বশেষ آب জন্তুদের খাদ্য।

মানব সৃষ্টির শেষ স্তর অর্থাৎ, রূহ ও জীবন সৃষ্টি করা : কোরআন পাক এ বিষয়টি এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। বলেছে : **فَنفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا** অর্থাৎ, আমি অতঃপর তাকে এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি দান করেছি। এই বিশেষ বর্ণনার কারণ এই যে, প্রথমোক্ত ছয় স্তর উপাদানও বস্তুজগতের বিবর্তনের সাথে সঞ্চারিত ছিল এবং এই শেষ ও সপ্তম স্তর অন্য জগত, রূহ জগত তথা রূহ দেহে স্থানান্তরিত হওয়ার স্তর ছিল। তাই একে অন্য ধরনের সৃষ্টি বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

প্রকৃত রূহ ও জৈব রূহ : এখানে **فَنفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا** এর তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, শা’বী, ইকরামা, যাহ্যাক, আবুল আলিয়া প্রমুখ তফসীরবিদ ‘রূহ সঞ্চার’ দ্বারা করেছেন। তফসীরে-মাহহারীতে আছে, সম্ভবতঃ এই রূহ বলে জৈব রূহ বোঝানো হয়েছে, কারণ, এটাও বস্তুবাচক ও সুক্ষ্ম দেহবিশেষ, যা জৈব দেহের প্রতি রম্ভে রম্ভে অনুপ্রবিষ্ট থাকে। চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিকরা একে রূহ বলেন। মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করার পর একে সৃষ্টি করা হয়। তাই একে **نَفْس** শব্দ দ্বারা

ব্যক্ত করা হয়েছে। ‘আলমে-আরওয়াহ’ তথা রূহ জগত থেকে প্রকৃত রূহকে এনে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই জৈব রূহের সাথে তার সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। এর স্বরূপ জানা মানুষের সাধ্যাতীত। এই প্রকৃত রূহকে মানব সৃষ্টির বহু পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যদিকালে আল্লাহ তাআলা এসব রূহকে সমবেত করে **أَنزَلْنَا فِيهِ رُوحَنَا** বলেছিলেন। উত্তরে সবাই সম্মত হয়ে **بَلَى** বলে আল্লাহর পালকত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। হা, মানবদেহের সাথে এর সম্পর্ক মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির পরে স্থাপিত হয়। এখানে ‘রূহ সঞ্চার’ দ্বারা যদি জৈব রূহের সাথে প্রকৃত রূহের সম্পর্ক স্থাপন বোঝানো হয়, তবে এটাও সম্ভবপর। মানবজীবন প্রকৃতপক্ষে এই প্রকৃত রূহের সাথে সম্পর্ক রাখে। জৈব রূহের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেলেই মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠে এবং সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষকে মৃত বলা হয়। জৈব রূহও তখন তার কাজ ত্যাগ করে।

تَبَارَكَ الَّذِي أَحْصَى الْخَلْقَ এর আসল অর্থ নতুনভাবে কোন সাবেক নমুনা ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করা, যা আল্লাহ তাআলারই বিশেষ গুণ। এই অর্থের দিক দিয়ে **خَالِقِ** (স্রষ্টা) একমাত্র আল্লাহ তাআলাই। অন্য কোন ফেরেশতা অথবা মানব কোন সামান্যতম বস্তুরও সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না। কিন্তু মাঝে মাঝে **خَالِقِ** ও **تَخْلُقِ** শব্দ কারিগরীর অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কারিগরীর স্বরূপ এর বেশী কিছু নয় যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরত দ্বারা এই বিশু ভূমণ্ডলে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরী করা। একাজ প্রত্যেক মানুষই করতে পারে এবং এই অর্থের দিক দিয়ে কোন মানুষকেও কোন বিশেষ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বলে দেয়া হয়। স্বয়ং কোরআন বলেছে : **إِنِّي أَشَقُّ لَدُّنَ الْطَّيْنِ كَيْفَةَ الظَّيْرِ** (আঃ) সম্পর্কে বলেছে : এসব ক্ষেত্রে **خَالِقِ** শব্দ রূপকভঙ্গিতে কারিগরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এমনিভাবে এখানে **خَالِقِينَ** শব্দটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ, সাধারণ মানুষ কারিগরীর দিক দিয়ে নিজেদেরকে কোন বস্তুর সৃষ্টিকর্তা মনে করে থাকে। যদি তাদেরকে রূপকভাবে সৃষ্টিকর্তা বলাও হয়, তবে আল্লাহ তাআলা সব সৃষ্টিকর্তা অর্থাৎ, কারিগরের মধ্যে সর্বোত্তম কারিগর।

ثُمَّ لَنَرْجِعَنَّ ذَلِكَ لَكُم بِمَنْ পূর্ববর্তী ১২-১৪ তিন আয়াতে মানব সৃষ্টির প্রাথমিক স্তর উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন ১৫ ও ১৬ আয়াতে তার শেষ পরিণতির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে : তোমরা সবাই এ জগতের আসা ও বসবাস করার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হবে। কেউ এর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। অতঃপর বলা হয়েছে : **ثُمَّ لَنَرْجِعَنَّ ذَلِكَ لَكُم بِمَنْ** - অর্থাৎ, মৃত্যুর পর আবার কেয়ামতের

দিন তোমাদেরকে জীবিত করে পুনরুত্থিত করা হবে, যাতে তোমাদের ক্রিয়াকর্মের হিসাবান্তে তোমাদেরকে আসল ঠিকানা জান্নাত অথবা জাহান্নামে পৌঁছে দেয়া হয়। এ হচ্ছে মানুষের শেষ পরিণতি। অতঃপর সূচনা ও পরিণতি অন্তর্বর্তীকালীন অবস্থা এবং তাতে মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও নেয়ামতরাজির অঙ্গ-বিস্তার বর্ণনা আছে, যা পরবর্তী আকাশ সৃষ্টির আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكَ نُفُوسًا مِّن مِّن طَرَفٍ - **طَرَفٍ** শব্দটি **طَرَفٍ** এর বহুবচন। একে স্তরের অর্থেও নেয়া যায়। অর্থ এই যে, স্তরে স্তরে সপ্ত

المؤمنون

২২৭

تدافعهم

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَقَدَرُوا فِالسَّكَّةِ فِي الْأَرْضِ وَوَأَنزَلْنَا عَلَى
 ذَهَابٍ بِهِ لَقْدِيرُونَ ۖ فَانْشَأْنَا لَهُمُ فِيهَا جَنَّتَيْنِ مِن نَّخِيلٍ وَ
 أَغْنَيْنَا فِيهَا أُكُلَهُنَّ لِكَثْرَةِ رِزْقِنَا أَتَانَهُنَّ ۖ وَأَنزَلْنَا
 عُجْرًا مِّنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبِيْهُتُ بِالدَّهْنِ وَصِغَةِ اللَّكْلِ ۖ وَ
 إِن لَّكُمُ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ لِّمَن يَّفَكِّرُ ۖ وَمِمَّا يُّظْهِرُهَا وَأَكْلُهَا
 مَتَاعٌ ۖ كَثِيرَةٌ مِّمَّا تَاتَانَهُنَّ ۖ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ عِلْونٌ ۖ
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَّقُوْهُرْ عُتْدُوا لِلَّهِ مَا لَكُم
 مِّنَ الْإِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۖ فَقَالَ الْمَلَأُ الْدِّينِ كُفْرًا مِّنْ
 قَوْمِهِ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ نُوحًا ۖ وَنُوحًا
 اللَّهُ أَكْثَرُ لِمَلِكَةٍ كَآسِمَةً ۖ هَٰذَا إِنِّيٰ أَبَاتُ الْكَافِرِينَ ۖ إِنَّ هُوَ
 إِلَّا رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَاتَّبَعُوهُ حَتَّىٰ جَاءَ حَيْثُ وَصَّيْنَا
 بِهِمَا كَذِبُونَ ۖ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمَا أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا
 وَوَحْيِنَا ۖ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُوْرُ فَاسْلُكْ فِيْهَا مَن مِّنْ
 زَوْجَيْنِ اشْتَدَّ وَاهْلَكَ الْأَمْنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
 وَمُهمٌّ وَلَا تَحْطِإْنِي فِي الْأَذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُّعْرَفُونَ ۝

(১৮) আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমান মত অতঃপর আমি জমিনে স্তরফন করি এবং আমি তা অপসারণ ও করতে সক্ষম। (১৯) অতঃপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্যে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্যে এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক। (২০) এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্যে তৈল ও ব্যঞ্জন উৎপন্ন করে। (২১) এবং তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্যে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্যে তাদের মধ্যে প্রচুর উপকারিতা আছে। তোমরা তাদের কতককে ভক্ষণ কর। (২২) তাদের পিঠে ও জলখানে তোমরা আরোহণ করে চলাফেরা করে থাক। (২৩) আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল : হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর বন্দগী কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন মাদুদ নেই। তোমরা কি ভয় কর না! (২৪) তখন তার সম্প্রদায়ের কাকের-প্রখনার বলেছিল : এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নয়। সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চায়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই নাখিল করতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এরূপ কথা শুনি। (২৫) সে তো এক উন্মাদ ব্যক্তি বৈ নয়। সুতরাং কিছুকাল তার ব্যাপারে অপেক্ষা কর। (২৬) নূহ বলেছিল : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সাহায্য কর, কেননা, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (২৭) অতঃপর আমি তার কাছে আদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে এবং আমার নির্দেশে নৌকা তৈরী কর। এরপর যখন আমার আদেশ আসে এবং চুল্লী প্রাণিত হয়, তখন নৌকায় তুলে নাও, প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবারবর্গকে, তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূর্বে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাদের ছাড়া। এবং তুমি জালমদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না। নিশ্চয় তারা নিষিদ্ধিত হবে।

আকাশ তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। طريقة এর প্রসিদ্ধ অর্থ রাস্তা। এ অর্থও হতে পারে। কারণ, সবগুলো আকাশ বিধানাবলী নিয়ে পৃথিবীতে যাতায়াতকারী ফেরেশতাদের পথ।

وَمَا كُنَّا عَنْ الْقُلُوبِ غَافِلِينَ এতে বলা হয়েছে যে, আমি মানুষকে

শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেইনি। এবং আমি তাদের ব্যাপারে বেষবরও হতে পারি না; বরং তাদের পালন, বসবাস ও সুখের সরঞ্জামও সরবরাহ করেছি। আকাশ সৃষ্টি দ্বারা এ কাজের সূচনা হয়েছে। এরপর আকাশ থেকে বারিবর্ষণ করে মানুষের জন্যে খাদ্য ও ফল-ফুল দ্বারা সুখের সরঞ্জাম সৃষ্টি করেছি। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَقَدَرُوا فِالسَّكَّةِ فِي الْأَرْضِ وَوَأَنزَلْنَا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقْدِيرُونَ

মানুষকে পানি সরবরাহের অভুলনীয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থা : এই আয়াতে আকাশ থেকে বারিবর্ষণের আলোচনার সাথে يَنْدَرُ কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে খুবই দুর্বল। ফলে যেসব জিনিস তার জীবনের জন্যে অপরিহার্য, সেগুলো নির্ধারিত পরিমাণের বেশী হয়ে গেলে তার জন্যে বিশেষ ক্ষতিকর এমনকি আঘাত হয়ে যায়। যে পানির অপর নাম জীবন, সেই পানি প্রয়োজনের চাইতে বেশী বর্ষিত হয়ে গেলে প্লাবন এসে যায় এবং মানুষ ও তার জীবন-জীবিকার জন্যে বিপদ ও আঘাত হয়ে পড়ে। তাই আকাশ থেকে বারিবর্ষণও পরিমিতভাবে হয়, যা মানুষের অভাব দূর করে দেয় এবং সর্বনাশের কারণ হয় না। তবে যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা কোন কারণে প্লাবন-তুফান চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করেন, সেসব ক্ষেত্রে ভিন্ন।

অতঃপর আরবের মেজায় ও রুচি অনুযায়ী এমন কিছুসংখ্যক বস্তুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো পানি দ্বারা উৎপন্ন। বলা হয়েছে, খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান পানি সেচের দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়েছে।

لَكُمْ فِيهَا فَاوَكَةٌ كَثِيرَةٌ বাক্যে অন্যান্য ফলের কথাও আলোচনা

করা হয়েছে, অর্থাৎ, এসব বাগানে তোমাদের জন্যে খেজুর ও আঙ্গুর ছাড়া হাজারো প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছি। এগুলো তোমরা শুধু মুখরোচক হিসেবেও খাও এবং কোন কোন ফল গোলাজাত করে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ কর। وَأَمَّا مَا تَأْكُلُونَ বাক্যের মতলব তাই। এরপর বিশেষ করে যয়তুন ও তার তৈল সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। কেননা, এর উপকারিতা অপরিমিত। যয়তুনের বৃক্ষ তুর পর্বতে উৎপন্ন হয় বিধায় এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে

وَنَجْعَرُ حَزْرًا مِّنْ طُورِ سَيْنَاءَ সায়ানা ও সিনিন সেই স্থানের

নাম, যেখানে তুর পর্বত অবস্থিত। যয়তুনের তৈল মালিশ ও বাতি জ্বালানোর কাজেও আসে এবং ব্যঞ্জনেরও কাজ দেয়। তাই বলা হয়েছে

تَنبِيْهُتُ بِالدَّهْنِ وَصِغَةِ اللَّكْلِ যয়তুন বৃক্ষের জন্যে বিশেষতঃ তুর

পর্বতের উল্লেখ করার কারণ এই যে, এই বৃক্ষ সর্বপ্রথম তুর পর্বতেই উৎপন্ন হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন : তুফানে-নূহের পর পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়েছিল, তা ছিল যয়তুন।—(মায়হারী)

المؤمنون

২২৭

قَدْ اُفْلَحَ

مَا تَسْئَلُ مِنْ أَمْرٍ أَجَلْهَا مَا يَسْتَأْخِرُونَ ۖ ثُمَّ أَرْسَلْنَا
رُسُلَنَا تَارًا أُكْلَمَ أَجَاءُ رُسُلِهِمْ لَنْ يَكُونُوا يَلْمِعِينَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا ۖ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لَذِينَ يُوْمِنُونَ ۖ ثُمَّ
أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۖ
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ۖ فَجَاءَهُمُ
أَنْوَارٌ لِّبُشْرَىٰ ۖ وَثَلَاثَةٌ مِّنْهُمْ أَنَا عِندَ رَبِّكُم بِمَا كُنتُمْ
فَعَاكِرِينَ ۖ الْفُتَّانِينَ ۖ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ۖ وَجَعَلْنَا بَيْنَ مِثْمَرٍ وَآمَةٍ سَائِرًا وَادِيَ غَمَامًا إِلَىٰ
رَبِّكَ ۖ وَآتَ قَارُونَ وَمُوسَىٰ الْيَأْسَ ۖ قَالَ لَوْلَا أَنِّي ظَلَمْتُ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۖ وَإِنَّ هَذِهِ أَهْلَكْنَاهُمْ أَنفَةً
وَاحِدَةً ۖ وَأَنَّا نَبُذُكُمْ قَائِلِينَ ۖ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا
كُلٌّ حَزْبٌ ۖ بِأَلَدٍ رَّبُّهُمْ فَخَوْنٌ ۖ وَلَقَدْ رَمَقْنِي فِي عَصِيٍّ ۖ وَهَمَّ
حِينَئِذٍ ۖ يَخْسِفُونَ ۖ أَنَا لَيْدُهُمْ مِنْ تَحْتِ ۖ وَبَيْنَ ۖ نَسْرُهُ
لَهُمْ فِي الْخَيْدِ ۖ بَلْ لَّيْسَ يَشْعُرُونَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ
رَبِّهِمْ يَشْغَفُونَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۖ

(৪৩) কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্ট কালের অগ্রে যেতে পারে না এবং পশ্চাতেও থাকতে পারে না। (৪৪) এরপর আমি একাদিক্রমে আমার রসূল প্রেরণ করেছি। যখনই কোন উম্মতের কাছে তাঁর রসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছে। অতঃপর আমি তাদের একের পর এক ধ্বংস করেছি এবং তাদেরকে কাহিনীর বিষয়ে পরিণত করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক অবিশ্বাসীরা। (৪৫) অতঃপর আমি মুসা ও হারুনকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলী ও সুস্পষ্ট সন্দেশ, (৪৬) ফেরাউন ও তার অমাত্যদের কাছে অতঃপর তারা অহংকার করল এবং তারা উদ্ধৃত সম্প্রদায় ছিল। (৪৭) তারা বলল : আমরা কি আমাদের মতই এ দুই ব্যক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করব; অথচ তাদের সম্প্রদায় আমাদের দাস? (৪৮) অতঃপর তারা উভয়কে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। (৪৯) আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যাতে তারা সংপথ পায়। (৫০) এবং আমি মরিয়ম তনয় ও তাঁর মাতাকে এক নিদর্শন দান করেছিলাম এবং তাদেরকে এক অবস্থানেযোগ্য স্বচ্ছ পানি বিশিষ্ট টিলায় আশ্রয় দিয়েছিলাম। (৫১) হে রসূলগণ, পবিত্র বস্ত্র আহ্বার করুন এবং সংকাজ করুন। আপনারা যা করেন সে বিষয়ে আমি পরিজ্ঞাত। (৫২) আপনারদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনারদের পালনকর্তা; অতএব আমাকে ভয় করুন। (৫৩) অতঃপর মানুষ তাদের বিষয়কে বহুধা বিভক্ত করে দিয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত হচ্ছে। (৫৪) অতএব তাদের কিছুকালের জন্যে তাদের অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত থাকতে দিন। (৫৫) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ধন-সম্পদ ও সম্মান-সমৃদ্ধি দিয়ে যাচ্ছি। (৫৬) তাতে করে তাদেরকে দ্রুত মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছি? বরং তারা বোঝে না। (৫৭) নিশ্চয় যারা তাদের পালনকর্তার ভয়ে সন্ত্রস্ত, (৫৮) যারা তাদের পালনকর্তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে,

সামুদ সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাও সম্ভবপর যে, **يَوْمَئِذٍ** শব্দের অর্থ আযাব হলে আ'দ সম্প্রদায়ও উদ্দেশ্য হতে পারে।

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَحَيَاتُنَا الْآخِرَةُ بَيْنَهُنَّ إِنَّا لَآخِرُونَ

পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। সুতরাং জীবন-মরণ এই দুনিয়ারই এবং কোন পুনরুজ্জীবন নেই। কেয়ামতে অবিশ্বাসী সাধারণ কাফেরদের কথা তাই। যারা মুখে এই অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তারা তো খোলাখুলি কাফেরই, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল অনেক মুসলমানেরও কথা ও কাজের মধ্যে এই অস্বীকৃতি ফুটে ওঠে। তারা পরকাল ও কেয়ামতের হিসাবের প্রতি কোন সময় লক্ষ্যও করে না। আল্লাহ তাআলা ঈমানদারগণকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর **كَلِمَاتٍ** - **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّ مِلَّةٍ كَلِمَاتٍ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا**

আভিধানিক অর্থ পবিত্র ও উত্তম বস্তু। ইসলামী শরীয়াতে যেসব বস্তু হারাম করা হয়েছে, সেগুলো পবিত্র ও নয় এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে উত্তম বা কাম্যও নয়। তাই **كَلِمَاتٍ** দ্বারা শুধু বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে পবিত্র ও হালাল বস্তুসমূহই বোঝাতে হবে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণকে তাঁদের সময়ে দুই বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এক হালাল ও পবিত্র বস্তু আহ্বার কর, দুই সংকর্ম কর। আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরগণকে নিষ্পাপ রেখেছিলেন, তাঁদেরকেই যখন একথা বলা হয়েছে, তখন উম্মতের জন্যে এই আদেশ আরও পালনীয়। বস্তুতঃ আসল উদ্দেশ্যও উম্মতকে এই আদেশের অনুগামী করা।

আলেমগণ বলেন : এই দু'টি আদেশকে একসাথে বর্ণনা করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সংকর্ম সম্পাদনে হালাল খাদ্যের প্রভাব অপরিহার্য। খাদ্য হালাল হলে সংকর্মের তওফীক আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে খাদ্য হারাম হলে সংকর্মের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তাতে নানা বিপত্তি প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, কেউ কেউ সুদীর্ঘ সফর করে এবং ধূলি-ধূসরিত থাকে। এরপর আল্লাহ্র সামনে দোয়ার জন্যে হাত প্রসারিত করে ইয়া রব, ইয়া রব-বলে ডাকে, কিন্তু তাদের খাদ্যও হারাম এবং পানীয়ও হারাম। পোশাকও হারাম দ্বারা তৈরী হয় এবং হারাম পথেই তাদের খাদ্য আসে। এরূপ লোকদের দোয়া কিরূপে কবুল হতে পারে?—(কুরতুবী)

এ থেকে বোঝা গেল যে, এবাদতে ও দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে হালাল খাদ্যের অনেক প্রভাব আছে। খাদ্য হালাল না হলে এবাদত ও দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য হয় না।

وَلَا هَذِهِ أَهْلَكْنَاهُمْ أَنفَةً وَاحِدَةً - **شَدِيدٌ** শব্দটি সম্প্রদায় ও কোন বিশেষ

পয়গম্বরের জাতির অর্থে প্রচলিত ও সুবিদিত। কোন সময় তরীকা ও দ্বীনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন **وَجَدْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ إِيمًا** আয়াতে দ্বীন ও তরীকা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও এই অর্থ বোঝানো হয়েছে।

نَقَطْنَاهُمْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا - **زُبُرٌ** শব্দটি এর বহুবচন। এর

অর্থ কিতাব। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা সব পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতকে মূলনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে

وَالَّذِينَ هُمْ يَرْجُوهَ لَا يُخَيَّبُونَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اتَّوُوا
قُلُوبُهُمْ وَجْهًا أَتَمَّهُمْ عَلَىٰ رَيْبِهِمْ لَاجِعُونَ ﴿١١﴾ وَأُولَٰئِكَ يَسْرِغُونَ
فِي الْخَيَّاتِ وَهُمْ لَا يَسْقُونَ ﴿١٢﴾ وَلَا يُحْكَمُ فَنَسْلًا إِلَّا وَسْعَهَا
وَلَكِنَّا نَكْتُبُ يَتَّقِي بِآلِقَىٰ وَهُمْ لَا يُفَكِّمُونَ ﴿١٣﴾ قُلْ لَّكُم مِّنْهُ
خَبَرٌ مِّنْ هَذَا وَأَكْثُهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا لُجُلُونَ ﴿١٤﴾
حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُزَاقَهُمْ فِي الْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجُورُونَ ﴿١٥﴾ لَا تُخَيِّرُوا
الْيَوْمَ مَنَّا وَلَا نَحْنُ لَكُمْ رُحَمَاءُ ﴿١٦﴾ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُسَلِّي عَلَيْكُمْ فَلَمَنَّاكُمْ
عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنَكَّبُوا مَعُونًا ﴿١٧﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِرَبِّهِمْ سِرًّا تُهَجَّرُونَ ﴿١٨﴾
أَقَامَ دِينَهُمْ وَأَقَامَ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩﴾
أَمْ لَهُمْ خِرَافَةٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ
بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٢١﴾ وَلَوْ أَسْرَعْنَا لَعَمَلِكُمْ
لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ لَئِنْ لَّمْ يَدْعُوا لَدُنْكُمْ
عَن دُرِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٢﴾ أَمْ تَأْتِيَهُمُ الْخَبَرُ جَاءَ خَبَرًا يَرِيكَ خَيْرًا
وَهُمْ سَوَّاءُ لِّلْزَلِيلِينَ ﴿٢٣﴾ وَأَلَا تَأْتِيهِمُ الْخَبَرُ لَمَّا كَانَتْ تُحْمَلُونَ
وَأَلَا تَأْتِيهِمُ الْخَبَرُ لَمَّا كَانَتْ تُحْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

(৬০) যারা তাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করে না (৬০) এবং যারা যা দান করবার, তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, (৬১) তারা ই কল্যাণ দ্রুত অর্জন করে এবং তারা তাতে অগ্রগামী। (৬২) আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না। আমার এক কিতাব আছে, যা সত্য ব্যত করে এবং তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। (৬৩) না, তাদের অন্তর এ বিষয়ে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন, এ ছাড়া তাদের আরও কাল রয়েছে, যা তারা করছে (৬৪) এমনকি, যখন আমি তাদের ঐশ্বর্যশালী লোকদেরকে শান্তি দ্বারা পাকড়াও করব, তখনই তারা চীৎকার জুড়ে দেবে। (৬৫) অদ্য চীৎকার করো না। তোমরা আমার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। (৬৬) তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শোনানো হত, তখন তোমরা উল্টো পায়ে সরে পড়তে। (৬৭) অহংকার করে এ বিষয়ে অর্থহীন গম্প-গুজব করে যেতে। (৬৮) অতএব তারা কি এই কালাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? না তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে, যা তাদের পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি? (৬৯) না তারা তাদের রসুলকে চেনে না, ফলে তারা তাঁকে অস্বীকার করে? (৭০) না তারা বলে যে, তিনি পাগল? বরং তিনি তাদের কাছে সত্য নিয়ে আগমন করেছেন এবং তাদের অধিকাংশ সত্যকে অগ্রহণ করে। (৭১) সত্য যদি তাদের কাছে কামনা-বাসনার অনুসারী হত, তবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিসৃঙ্খল হয়ে পড়ত। বরং আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ, কিন্তু তারা তাদের উপদেশ অনুশ্রাবন করে না। (৭২) না আপনি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চান? আপনার পালনকর্তার প্রতিদান উত্তম এবং তিনিই রিয়িকদাতা। (৭৩) আপনি তো তাদেরকে সোজা পথে দাওয়াত দিচ্ছেন; (৭৪) আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

একই দ্বীন ও তরীকা অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু উম্মতগণ তা মানেনি। তারা পরস্পর বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ তরীকা ও কিতাব আলাদা করে নিয়েছে। زیر শব্দটি কোন সময় زیرে এরও বহুবচন হয়। এর অর্থ খণ্ড ও উপদল। এখানে এই অর্থই সুস্পষ্ট। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তারা বিশ্বাস ও মূলনীতিতেও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মুজতাহিদ ইমামগণের শাখাগত মতবিরোধ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, এসব মতবিরোধের ফলে দ্বীন ও মিল্লাত পৃথক হয়ে যায় না এবং এরূপ মতভেদকারীদেরকে ভিন্ন সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয় না। এই ইজ্তিহাদী ও শাখাগত মতবিরোধকে সাম্প্রদায়িকতার রং দেয়া মুর্থতা, যা কোন মুজতাহিদের মতেই জায়েয নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلْيَأْتِكُمْ شَرَابٌ - وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ حَسَاسَةً
উদ্ধৃত। এর অর্থ দেয়া ও খরচ করা। তাই দান-খয়রাত দ্বারা এর তফসীর
করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)

১৩
 ১৪
 ১৫
 ১৬
 ১৭
 ১৮
 ১৯
 ২০
 ২১
 ২২
 ২৩
 ২৪
 ২৫
 ২৬
 ২৭
 ২৮
 ২৯
 ৩০
 ৩১
 ৩২
 ৩৩
 ৩৪
 ৩৫
 ৩৬
 ৩৭
 ৩৮
 ৩৯
 ৪০
 ৪১
 ৪২
 ৪৩
 ৪৪
 ৪৫
 ৪৬
 ৪৭
 ৪৮
 ৪৯
 ৫০
 ৫১
 ৫২
 ৫৩
 ৫৪
 ৫৫
 ৫৬
 ৫৭
 ৫৮
 ৫৯
 ৬০
 ৬১
 ৬২
 ৬৩
 ৬৪
 ৬৫
 ৬৬
 ৬৭
 ৬৮
 ৬৯
 ৭০
 ৭১
 ৭২
 ৭৩
 ৭৪
 ৭৫
 ৭৬
 ৭৭
 ৭৮
 ৭৯
 ৮০
 ৮১
 ৮২
 ৮৩
 ৮৪
 ৮৫
 ৮৬
 ৮৭
 ৮৮
 ৮৯
 ৯০
 ৯১
 ৯২
 ৯৩
 ৯৪
 ৯৫
 ৯৬
 ৯৭
 ৯৮
 ৯৯
 ১০০

وَأَعْمَالُ الرِّجَالِ ذَٰلِكَ

অর্থাৎ, তাদের পথভ্রষ্টতার জন্যে তো এক
 শেরক ও কুফরের আবরণই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তারা এতেই ফাস্ত ছিল না,
 অন্যান্য ককর্মও অনবরত করে যেত।

مُتَرَفِّعُهُ শব্দটি ترف থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রশংসা ও

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যশীল হওয়া। এখানে কওমকে আযাবে গ্রেফতার করার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এতে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু ঐশ্বর্যাশালীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা ই দুনিয়ার বিপদাপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে নেয়। কিন্তু আল্লাহর আযাব যখন আসে, তখন সর্বপ্রথম তারা ই অসহায় হয়ে পড়ে। এ আয়াতে তাদেরকে যে আযাবে গ্রেফতার করার কথা বলা হয়েছে, হয়রত ইবনে আব্বাস বলেন যে, এতে সে আযাব বোঝানো হয়েছে যা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারি দ্বারা তাদের সরদারদের উপর পতিত হয়েছিল। কারও কারও মতে এই আযাব দ্বারা দুর্ভিক্ষের আযাব বোঝানো হয়েছে, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর বদদোয়ার কারণে মক্কাবাসীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে, তারা মৃত জন্তু, কুকুর এবং অস্থি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়েছিল। রসুলে করীম (সাঃ) কাফেরদের জন্যে খুবই কম বদদোয়া করেছিলেন। কিন্তু এ স্থলে মুসলমানদের উপর তাদের নির্ধাতন সীমা ছাড়িয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে এরূপ দোয়া করেন—

اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسنى يوسف
(বোখারী, মুসলিম, কুরতুবী)

سَنِينَ كَسْنَى

অধিকাংশ তফসীরকারের মতে ৫

শব্দের সর্বনাম হরমের দিকে ফেরে, যা পূর্বে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। হরমের সাথে কোরাইশদের গভীর সম্পর্ক এবং একে নিয়ে তাদের গর্ব সুবিদিত ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অর্থ এই যে, মক্কার কোরাইশদের আল্লাহর আয়াতসমূহ শুনে মুখ ঘুরিয়ে সরে যাওয়া এবং না মানার কারণ হরমের সাথে সম্পর্ক ও তদ্ভাবধানপ্রসূত অহংকার ও গর্ব ছিল। سَمْر শব্দটি سمر থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ চাঁদনী রাত্রি। চাঁদনী রাত্রে বসে গল্প-গুজব করা ছিল আরবদের অভ্যাস। তাই سمر শব্দটি গল্পগুজব করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। سامر বলা হয় গল্প গুজবকারীকে। শব্দটি একবচন হলেও বহুবচনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে বহুবচনের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। মুশরিকরা যে, আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, তার এক কারণ ছিল হরমের সাথে সম্পর্ক, তদ্ভাবধানজনিত অহংকার ও গর্ব, দ্বিতীয় কারণ বর্ণিত হয়েছে এই যে, তারা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট গল্প-গুজবে মেতে থাকে, এটাই তাদের অভ্যাস। আল্লাহর আয়াতসমূহের প্রতি তাদের কোন ঔৎসুক্য নেই।

هَجَرَ

শব্দটি هجر থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাজে প্রলাপ ও গালি-গালাজ। আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করার এটা তৃতীয় কারণ। অর্থাৎ, তারা বাজে প্রলাপোক্তি ও গালিগালাজে অভ্যস্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে এমনি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ বাক্য তারা বলত।

এশার পর গল্প-গুজব করে সময় নষ্ট করা : রাত্রিকালে কিসসা-কাহিনী বলার প্রথা আরব-আজমে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। এতে অনেক ক্ষতিকর দিক ছিল এবং বৃথা সময় নষ্ট হত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই প্রথা মিটানোর উদ্দেশ্যে এশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং এশার পর অনর্থক কিসসা-কাহিনী বলা নিষিদ্ধ করে দেন। এর পেছনে

রহস্য ছিল এই যে, এশার নামাযের সাথে সাথে মানুষের সেদিনের কাজকর্ম শেষ হয়ে যায়। এই নামায সারাদিনের গোনাহসমূহের কাফফারাও হতে পারে। কাজেই এটাই তার দিনের সর্বশেষ কাজ হওয়া উত্তম। যদি এশার পর অনর্থক কিসসা-কাহিনীতে লিপ্ত হয়, তবে প্রথমতঃ এটা স্বয়ং অনর্থক ও অপছন্দনীয়; এছাড়া এই প্রসঙ্গে পরনিদ্রা, মিথ্যা এবং আরও বহু রকমের গোনাহ সংঘটিত হয়। এর আরেকটি কুপরিণতি এই যে, বিলম্বে নিদ্রা গেলে প্রত্যুষে জাগ্রত হওয়া সম্ভবপর হয় না। এ কারণেই হয়রত ওমর (রাঃ) এশার পর কাউকে গল্প-গুজবে মগ্ন দেখলে শাসিয়ে দিতেন এবং কতককে শাস্তিও দিতেন। তিনি বলতেন : গীষ নিদ্রা যাও; সম্ভবতঃ শেষরাতে তাহাজ্জুদ পড়ার তওফীক হয়ে যাবে—(কুরতুবী)

أَفَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتٌ أَنْ يَسُبُّوا رُسُلَهُ

পার্থক্য পাঁচটি এমন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যা মুশরিকদের জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে কোন না কোন স্তরে প্রতিবন্ধক হতে পারত। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ই যে অনুপস্থিত, তাও সাথে সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যেসব কারণ তাদের জন্যে ঈমানের পথে অন্তরায় হতে পারত, তার একটিও এখানে বর্তমান নেই। পক্ষান্তরে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে যেসব কারণ হতে পারে, সেগুলো সবই বর্তমান রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের অস্বীকার নির্ভেজাল শত্রুতা ও হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয়। পরবর্তী আয়াতে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে : بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ

وَالْحَقُّ رُسُلُهُمْ

অর্থাৎ, রেসালত অস্বীকার করার কোন যুক্তিসঙ্গত ও স্বভাবজাত কারণ তো বর্তমান নেই; এতদসত্ত্বেও তাদের অস্বীকারের কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সত্য নিয়ে আগমন করেছেন, আর তারা সত্যকেই অপছন্দ করে—শুনতে চায় না। এর কারণ কুপ্রবৃত্তি ও কুবাসনার আধিক্য, রাজত্ব ও ক্ষমতার মোহ এবং মুখ্যদের অনুসরণ। ঈমান ও নবুওয়ত স্বীকার করে নেয়ার পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে যে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে এটিও একটি।

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنْ يَدْعُوا

অর্থাৎ, তাদের অস্বীকারের এক কারণ হতে পারত এই যে, যে ব্যক্তি সত্যের দাওয়াত ও নবুওয়তের দাবী নিয়ে আগমন করেছেন, তিনি ভিন্ন দেশের লোক। তাঁর বর্ণা, অভ্যাস, চালচলন ও চরিত্র সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। এমতাবস্থায় তারা বলতে পারত যে, আমরা এই নবীর জীবনালেক্ষা সম্পর্কে অবগত নই; কাজেই তাঁকে নবী ও রসূল মেনে কিরূপে অনুসরণ করতে পারি? কিন্তু এখানে তো এরূপ অবস্থা নয়। বরং একথা সুস্পষ্ট ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্প্রদায়তম কোরাইশ বংশে এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং শৈশব থেকে শুরু করে তাঁর যৌবন ও পরবর্তী সমগ্র যম্যনা তাদের সামনেই অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁর কোন কর্ম, কোন অভ্যাসই তাদের কাছে গোপন ছিল না। নবুওয়ত দাবী করার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র কাফের সম্প্রদায় তাঁকে ‘সাদিক’ ও ‘আমীন’—সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে সম্বোধন করত। তাঁর চরিত্র ও কর্ম সম্পর্কে কেউ কোনদিন কোন সন্দেহই করেনি। কাজেই তাদের এ অজুহাতও অচল যে, তারা তাঁকে চেনে না।

المؤمنون

২৭৮

تدافعهم

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا فِيهِمُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা আযাবে পতিত হওয়ার সময় আল্লাহর কাছে অথবা রসুলের কাছে ফরিয়াদ করে। আমি যদি তাদের ফরিয়াদের কারণে দয়াপরবশ হয়ে আযাব সরিয়ে দেই, তবে মজ্জাগত অব্যাহতার কারণে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরক্ষণেই ওরা আবার নাকরমানীতে মশগুল হয়ে যাবে। এ আয়াতে তাদের এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদেরকে একবার এক আযাবে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু রসুলে করীম (সাঃ)-এর দোয়ার বরকতে আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা আল্লাহর কাছে নত হয়নি এবং কুফর ও শিরককেই আঁকড়ে থাকে।

মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়ায় তা দূর হওয়া : পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষের আযাব সওয়ার হওয়ার দোয়া করেছিলেন। ফলে তারা যেরতর দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং মৃত জন্তু, কুকুর ইত্যাদি ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে আবু সুফিয়ান রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে মদীনায় উপস্থিত হয় এবং বলে : আমি আপনাকে আত্মীয়তার কসম দিচ্ছি? আপনি কি একথা বলেননি যে, আপনি বিশুবাসীদের জন্যে রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন? তিনি উত্তরে বললেন : নিঃসন্দেহে আমি একথা বলেছি এবং বাস্তবেও তাই। আবু সুফিয়ান বলল : আপনি স্বগোত্রের প্রধানদেরকে তো বদর যুদ্ধে তরবারী দ্বারা হত্যা করেছেন। এখন যারা জীবিত আছে, তাদেরকে ক্ষমা দিয়ে হত্যা করছেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যাতে এই আযাব আমাদের উপর থেকে সরে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলেন। ফলে, তৎক্ষণাৎ আযাব খতম হয়ে গেল। এর পরিপ্রেক্ষিতেই وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ আয়াত নাযিল হয়।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আযাবে পতিত হওয়া এবং অতঃপর তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পরও তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হয়নি। বাস্তব ঘটনা তাই ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়ায় দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেল, কিন্তু মক্কার মুশরিকরা তাদের শিরক ও কুফরে পূর্ববৎ অটল রইল।—(মায়হারী)

وَهُوَ يُجِزُّ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ

আযাব, মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আশ্রয় দান করেন এবং কারও সাধ্য নেই যে, তার মোকাবেলায় কাউকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আযাব ও কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে নেয়। দুনিয়ার দিক দিয়েও একথা সত্য যে, আল্লাহ তাআলা যার উপকার করতে চান, তাকে কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যাকে কষ্ট ও আযাব দিতে চান, তা থেকেও কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। পরকালের দিক দিয়েও এই বিষয়বস্তু নির্ভুল যে, যাকে তিনি আযাব দেবেন, তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না এবং যাকে জ্ঞানাত ও সুখ দেবেন, তাকে কেউ ফেরাতে পারবে না।—(কুরতুবী)

(৭৫) যদি আমি তাদের প্রতি দয়া করি এবং তাদের কষ্ট দূর করে দেই, তবুও তারা তাদের অব্যাহতায় দিশেহারা হয়ে লেগে থাকবে। (৭৬) আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, কিন্তু তারা তাদের পালনকর্তার সামনে নত হল না এবং কাকুতি-মিনতিও করল না। (৭৭) অবশেষে যখন আমি তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির দূর খুলে দেব, তখন তাতে তাদের আশা ভঙ্গ হবে। (৭৮) তিনি তোমাদের কান, চোখ ও অঙ্গকরণ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা খুবই অল্প কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে থাক। (৭৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রেখেছেন এবং তারই দিকে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (৮০) তিনিই প্রাণ দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং দিব-রাত্রির বিবর্তন তাঁরই কাছ, তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (৮১) বরং তারা বলে যেমন তাদের পূর্ববর্তীরা বলত। (৮২) তারা বলে : যখন আমরা মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? (৮৩) অতীতে আমাদেরকে এবং আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এই ওয়াদাই দেয়া হয়েছে। এটা তো পূর্ববর্তীদের কল্প-কথা বৈ কিছুই নয়। (৮৪) বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান, তবে বল। (৮৫) এখন তারা বলবে : সবই আল্লাহর। বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা কর না? (৮৬) বলুন : সপ্তাকাশ ও মহা-আরশের মালিক কে? (৮৭) এখন তারা বলবে : আল্লাহ। বলুন, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? (৮৮) বলুন : তোমাদের জানা থাকলে বল, কার হাতে সব বস্তুর কর্তৃত্ব, যিনি রক্ষা করেন এবং যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না? (৮৯) এখন তারা বলবে : আল্লাহর। বলুন : তাহলে কোথা থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে?

بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَايُونَ ﴿١٠﴾ مَا تَغْنَدُ اللَّهُ مِنْ
وَالِدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْإِلَهِ إِذْ أَتَاهَبَ كُلُّ الْوَالِدِ أَخًا لَكَ
وَأَعْلَاكِبُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبُحَنِ اللَّهِ تَحْيَا يَصِفُونَ ﴿١١﴾ عَلِيمُ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٢﴾ قُلْ رَبِّ إِمَّا
تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿١٣﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾ وَإِنِّي أَتَعَلَّى أَنْ تُرِيدَكَ مَا يُعَدُّهُمْ لِقَدَرُونَ ﴿١٥﴾
إِذْ قَرَأَ بِاللَّيْلِ أَحْسَنَ السَّنَادَةِ تَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿١٦﴾
وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿١٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ
رَبِّ أَنْ يَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ
ارْجِعُونِ ﴿١٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ
قَالَ لَهَا وَهِيَ زَادَتْهُمْ رُجُوعًا إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا نُفِخَ
فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢١﴾
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتْلِفُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ
مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ
خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾ تَلَفَهُمْ وَجْوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿٢٤﴾

(১০) কিছুই নয়, আমি তাদের কাছে সত্য পৌঁছিয়েছি, আর তারা তো মিথ্যাবাদী। (৯১) আল্লাহ কোন সম্ভাবন গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন যাবদ নেই। থাকলে প্রত্যেক যাবদ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রবল হয়ে যেত। তারা যা বলে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। (৯২) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তারা শরীক করে, তিনি তা থেকে উর্ধ্বে। (৯৩) বলুন : ‘হে আমার পালনকর্তা! যে বিষয়ে তাদেরকে গুয়াদা দেয়া হয়েছে তা যদি আমাকে দেখান, (৯৪) হে আমার পালনকর্তা! তবে আপনি আমাকে গোনাহগার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন না।’ (৯৫) আমি তাদেরকে যে বিষয়ের গুয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে দেখাতে অবশ্যই সক্ষম। (৯৬) মন্দের জগুয়াবে তাই বলুন, যা উত্তম। তারা যা বলে, আমি সে বিষয়ে সবিশেষ অবগত। (৯৭) বলুন : ‘হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি, (৯৮) এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।’ (৯৯) যখন তাদের কারও কাছে যত্ন আসে, তখন সে বলে : ‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন, (১০০) যাতে আমি সংকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।’ কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে পর্দা আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। (১০১) অতঃপর যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। (১০২) যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম, (১০৩) এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিষেদের ক্ষতিসাধন করবে, তারা দোষখেই চিরকাল বসবাস করবে। (১০৪) আপনাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ رَبِّ إِنَّمَا تَرِيَّتِي مَائِدَةً وَرَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

এই দুই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনের অনেক আয়াতে মুশরিক ও কাফেরদের উপর আযাবের ভয় প্রদর্শন উল্লেখিত হয়েছে। কেসামতে এই আযাব হওয়া তো অকাট্য ও নিশ্চিতই, দুনিয়াতে হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এই আযাব দুনিয়াতে হয়, তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলের পরে হওয়ারও সম্ভাবনা আছে এবং তাঁর যমানায় তাঁর চোখের সামনে তাদের উপর কোন আযাব আসার সম্ভাবনাও আছে। দুনিয়াতে যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর কোন আযাব আসে, তখন মাঝে মাঝে সেই আযাবের প্রতিক্রিয়া শুধু জ্বালেমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং সংলোকও এর কারণে পার্শ্বি কষ্টে পতিত হয়। তবে পরকালে তারা কোন আযাব ভোগ করবে না, বরং এই পার্শ্বি কষ্টের কারণে তারা সওয়াবও পাবে। কোরআন পাক বলে : **وَأَقْرَأْنِيهِ أَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ أَمْ كُنْتُمْ امْتِرَافَةً** অর্থাৎ, এমন আযাবকে ভয় কর, যা এসে গেলে শুধু জ্বালেমদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং অন্যরাও এর কবলে পতিত হবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে এই দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, হে আল্লাহ, যদি তাদের উপর আপনার আযাব আমার সামনে এবং আমার চোখের উপরই আসে, তবে আমাকে এই জ্বালেমদের সাথে রাখবেন না। রসুলুল্লাহ (সাঃ) নিশাপ ছিলেন বিধায় আল্লাহর আযাব থেকে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁকে এই দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যাতে সওয়াব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করেন এবং তাঁর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন। — (কুরতুবী)

وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ تَرْيَاكَ مَانِعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ অর্থাৎ, আমি আপনার

সামনেই তাদের উপর আযাব দেখিয়ে দিতে পুরোপুরি সক্ষম। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এই উষ্মতের উপর ব্যাপক আযাব না আসার গুয়াদা হয়ে গেছে। আল্লাহ্ বলেন : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ অর্থাৎ, আপনার বর্তমানে আমি তাদেরকে শরসে করব না। কিন্তু বিশেষ লোকদের উপর বিশেষ অবস্থায় দুনিয়াতেই আযাব আসা এর পরিপন্থী নয়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আপনাকেও তাদের আযাব দেখিয়ে দিতে সক্ষম। মক্কাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধার আযাব এবং বদের যুদ্ধে মুসলমানদের তরবারির আযাব রসুলন্লাহ্ (সঃ)—এর সামনেই তাদের উপর পতিত হয়েছিল।

— অর্থাৎ, আপনি মন্দকে উত্তম

দ্বারা, জুলুমকে ইনসাফ দ্বারা এবং নির্দয়তাকে দয়া দ্বারা প্রতিহত করুন। এটা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রদত্ত উত্তম চরিত্রের শিক্ষা, যা মুসলমানদের পারস্পরিক কাজ কারবারে সর্বদাই প্রচলিত আছে। জুলুম ও নির্যাতনের জওয়াবে কাফের ও মুশরিকদের ক্ষমা ও মার্জনাই করতে থাকা এবং তাদেরকে প্রত্যাঘাত না করার নির্দেশ পরবর্তীকালে জেহাদের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক জেহাদের অবস্থায়ও এই সচরিত্রতার অনেক প্রতীক অবশিষ্ট রাখা হয়েছে, যেমন— কোন নারীকে হত্যা না করা, শিশু হত্যা না করা, ধর্মীয় পুরোহিত, যারা মুসলমানদের মোকাবেলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তাদেরকে হত্যা না করা। কাউকে হত্যা করা হলে তার

নাক, কান ইত্যাদি ‘মুছলা’ না করা ইত্যাদি। তাই পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—কে শয়তান ও তার প্ররোচনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যাতে ঠিক যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁর পক্ষ থেকে শয়তানের প্ররোচনায় ন্যায় ও সুবিচার-বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ না পায়। দোয়াটি এই :

وَقُلْ رَبِّ اعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُونِ

হুম — শব্দের অর্থ প্রতারণা করা, চাপ দেয়া। পশ্চাদ্ধিক থেকে আওয়াজ দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শয়তানের প্ররোচনা ও চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এটা একটা সুদূরপ্রসারী অর্থবহ দোয়া। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলমানদেরকে এই দোয়া পড়ার আদেশ করেছেন, যাতে ক্রোধ ও গোস্ফার অবস্থায় মানুষ যখন বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে পড়ে, তখন শয়তানের প্ররোচনা থেকে এই দোয়ার বরকতে নিরাপদ থাকতে পারে। এ ছাড়া শয়তান ও জিনদের অন্যান্য প্রভাব ও আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও এ দোয়াটি পরীক্ষিত। হযরত খালেদ (রাঃ)—এর রাত্রিকালে নিদ্রা আসত না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—তাকে নিম্ন বর্ণিত দোয়াটি পাঠ করে শোয়ার আদেশ দিলেন। তিনি পড়া শুরু করলে অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তি পান। দোয়াটি এই :

اعوذ بكلمات الله التامة من غضب الله وعقابه ومن شر عبادهم ومن همزات الشيطان وان يحضرون .

অন-ইয়ুহুরুন —সহীহ মুসলিমে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : শয়তান সব কাজে সর্বাবস্থায় তোমাদের কাছে আসে এবং সব কাজে অন্তরকে পাপকর্মে প্ররোচিত করতে থাকে।—(কুরতুবী)

এই প্ররোচনা থেকেই আশ্রয় প্রার্থনার জন্যে দোয়াটি শেখানো হয়েছে।

رَبِّ ارْحَمْنِي —অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় যখন কাফের ব্যক্তি পরকালের আযাব অবলোকন করতে থাকে, তখন এরূপ বাসনা প্রকাশ করে, আফসোস, আমি যদি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতাম এবং সংকর্ষ করে এই আযাব থেকে রেহাই পেতাম।

ইবনে জরীর ইবনে জুরায়জের রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন : মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তি রহমতের ফেরেশতা ও রহমতের আয়োজন সামনে দেখতে পায়। ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করে : তুমি কি পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও? সে বলে, আমি দুঃখ-কষ্টের জগতে ফিরে গিয়ে কি করব? আমাকে এখন আল্লাহর কাছে নিয়ে যাও। কাফেরকে একথা জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, অর্থাৎ, আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

رَبِّ ارْحَمْنِي

كَذَلِكَ نَقُولُهُمْ قَالَتْ اِنَّهُمْ رَبِّكَ يَوْمَ تَأْتِي سُرَّتْكَ

ব্রুজ —এর শাব্দিক অর্থ অন্তরায় ও পৃথককারী বস্তু। দুই অবস্থা অথবা দুই বস্তুর মাঝখানে যে বস্তু আড়াল হয় তাকে বরখা বলা হয়। এ কারণেই মৃত্যুর পর কেয়ামত ও হাশর পর্যন্ত কালকে বরখা বলা হয়। কারণ, এটা ইহলৌকিক জীবন ও পারলৌকিক জীবনের মাঝখানে সীমা প্রাচীর।

আয়াতের অর্থ এই যে, মরণোন্মুখ ব্যক্তির ফেরেশতাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোর কথা বলা শুধু একটি কথা মাত্র, যা সে বলতে বাধ্য। কেননা, এখন আযাব সামনে এসে গেছে। কিন্তু এখন এই কথার কোন ফায়দা নেই। কারণ, সে বরখা পৌছে গেছে। বরখা থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসে না এবং কেয়ামত ও হাশর-নশরের পূর্বে পুনর্জীবনও পায় না, এটাই আইন।

وَإِذَا نُوْعِيَ فِي السَّوْرِ فَلَا اسْتِثْنَاءَ بَيْنَهُمْ —কেয়ামতের দিন দু’বার শিগায় ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের ফলে যমীন-আসমান ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব ধ্বংস হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের ফলে পুনরায় সব মৃত জীবিত হয়ে উষিত হবে। কোরআন পাকের

فِي السَّوْرِ فَإِذَا نُوْعِيَ فِي السَّوْرِ فَأَمْرٌ يُؤْتِي السَّوْرَ

আলোচ্য আয়াতে শিগায় প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে, না দ্বিতীয় ফুৎকার— এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনে জুরায়জের রেওয়াজেতে হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, এই আয়াতে প্রথম ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন এবং আতার রেওয়াজেতে ইবনে আব্বাস থেকেও বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। তফসীরে-মায়হরীতে একেই সঠিক বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের ভাষ্য এই যে, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে হাশরের ময়দানে আনা হবে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমগ্র মানবজাতির জমজমাট সমাবেশের সামনে খাড়া করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একজন ঘোষণা করবে, সে অমুকের পুত্র অমুক। যদি কারও কোন প্রাপ্য তার যিম্মায় থাকে, তবে সে সামনে এসে তা আদায় করুক। তখন এমনি সংকটময় সময় হবে যে, পুত্র আনন্দিত হবে পিতার যিম্মায় নিজের কোন প্রাপ্য আছে দেখলে এবং পিতা আনন্দিত হবে পুত্রের যিম্মায় নিজের কোন প্রাপ্য দেখলে। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-বোনের মধ্যে কারও যিম্মায় কারও প্রাপ্য থাকলে সেও তা আদায় করতে উদ্যত ও সচেষ্ট হবে। এই সংকটময় সময় সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে فَلَا اسْتِثْنَاءَ بَيْنَهُمْ —বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তখন পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন কোন উপকারে আসবে না। কেউ কারও প্রতি রহম করবে না।

প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় বিভোর থাকবে। নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু তাই

يَوْمَ يُنْفِذُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُخِيهِ وَأَصْحَابَتِهِ وَبَيْنِهِ

অর্থাৎ, সেদিন প্রত্যেক মানুষ তার ভাই, পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির কাছ থেকে দূরে পলায়ন করবে।

হাশের মুমিন ও কাফেরের অবস্থার পার্থক্য : কিন্তু এ আয়াতে কাফেরদের অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে—মুমিনগণের নয়। কারণ, উপরে কাফেরদের প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। মুমিনদের অবস্থা সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন বলে যে, اَتَقْنَاهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ —অর্থাৎ, সংকটপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও আল্লাহ তাআলা (সিমানদার হওয়ার শর্তে) তাদের পিতাদের সাথে সংযুক্ত করে দেবেন। হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে যখন সবাই পিপসার্ত হবে, তখন যেসব মুসলমান সন্তান অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তারা জান্নাতের পানি নিয়ে বের হবে। মানুষ তাদের কাছে পানি চাইবে।

المؤمنون ১৩

১৫০

তাদাফলম



তারা বলবে, আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে তালাশ করছি। এ পানি তাদের জন্যেই — (মাহহারী)

এমনিভাবে হয়ত ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে ইবনে আসাকির বর্ণিত এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন বংশগত অথবা বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (কেউ কারও উপকার করতে পারবে না) — আমার বংশ ও আমার বৈবাহিক সম্পর্কজনিত আত্মীয়তা ব্যতীত। আলেমগণ বলেন : নবী করীম (সাঃ) —এর বংশের মধ্যে সমগ্র মুসলমান উম্মতও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারণ, তিনি উম্মতের পিতা এবং তাঁর পুণ্যময়ী বিবিগণ উম্মতের মাতা। মোটকথা, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক কাজে আসবে না, কিন্তু এটা কাফেরদের অবস্থা। মুমিনগণ একে অপরের সুপারিশ ও সাহায্য করবে এবং তাদের সম্পর্ক উপকারী হবে।

وَلَا يَكْسِبُ اَلٌ — অর্থাৎ, পরস্পর কেউ কারও সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ — অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এই আয়াত সম্পর্কে হয়ত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : হাশরে বিভিন্ন অবস্থানস্থল হবে এবং প্রত্যেক অবস্থানস্থলের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। এমনও সময় আসবে, যখন কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করবে না। এরপর কোন অবস্থানস্থলে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক হ্রাস পেলে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে। — (মাহহারী)

فَمَنْ تَقَاتَلَ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তির নেকীর পাল্লা ভারী হবে, সে-ই হবে সফলকাম। পক্ষান্তরে যার নেকীর পাল্লা হাল্কা হবে, সে দুনিয়াতে নিজেই নিজের ক্ষতি করেছে। এখন সে চিরকালের জন্যে জাহান্নামে থাকবে। এ আয়াতে শুধু কামেল মুমিন ও কাফেরদের ব্যাপারেই তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে, এখানে তাদেরই আমল ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। কামেল মুমিনদের পাল্লা ভারী হবে এবং সফলকাম হবে। কাফেরদের পাল্লা হাল্কা হবে। ফলে, তাদেরকে চিরকালের জন্যে জাহান্নামে থাকতে হবে।

وَهُمْ فِيهَا يُخَوَّنُونَ — অর্থাৎ, এমনি ব্যক্তিকে বলা হয়, যার গুণ্ডদুয় মুখের দাঁতকে আবৃত করে না। এক গুণ্ড উপরে উন্মিত এবং অপর গুণ্ড নীচে ঝুলে থাকে, ফলে দাঁত বের হয়ে থাকে। এটা খুব বীভৎস আকার হবে। জাহান্নামে জাহান্নামী ব্যক্তির গুণ্ডদুয়ও তদ্রূপ হবে এবং দাঁত খোলা ও বেরিয়ে থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا تَكَلِمُوْنَ — হয়ত হাসান বসরী বলেন : এটা হবে জাহান্নামীদের সর্বশেষ কথা। এরপরই কথা না বলার আদেশ হয়ে যাবে। ফলে, তারা কারও সাথে বাক্যালাপ করতে পারবে না ; জন্তুদের ন্যায় একজন অপরাধীদের দিকে তাকিয়ে খেউ খেউ করবে। বায়হাকী মুহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেন : কোরআনে জাহান্নামীদের পাঁচটি আবেদন উদ্ধৃত করা হয়েছে। তন্মধ্যে চারটির জওয়াব দেয়া হয়েছে এবং পঞ্চমটির জওয়াবে বলা হয়েছে। এটাই হবে তাদের শেষ কথা। এরপর

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরার প্রথম আয়াতটি ভূমিকাস্বরূপ, যদ্বারা এর বিধানাবলীর বিশেষ গুরুত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। বিধানাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যতিচারের শাস্তি—যা সূরার উদ্দেশ্য—উল্লেখ করা হয়েছে। সতীত্ব ও তজ্জন্মে দৃষ্টির হেফাযত, অনুমতি ব্যতিরেকে কারও গৃহে যাওয়া ও দৃষ্টিপাত করার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধানাবলী পরে বর্ণিত হবে। ব্যতিচার সতর্কতার এমন বাধা ডিক্রিয়ে সতীত্বের বিপক্ষে চরম সীমায় উপনীত হওয়া এবং খোদায়ী বিধানাবলীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করার নামাস্তর। এ কারণেই ইসলামে মানবিক অপরাধসমূহের যেসব শাস্তি কোরআনে নির্ধারিত রয়েছে, তন্মধ্যে ব্যতিচারের শাস্তি সবচাইতে কঠোরতর ও অধিক। ব্যতিচার স্বয়ং একটি বৃহৎ অপরাধ; তদুপর সে নিজের সাথে আরও শত শত অপরাধ নিয়ে আসে এবং সমগ্র মানবতার ধ্বংসের আকারে এর ফলাফল প্রকাশ পায়। পৃথিবীতে যত হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনাবলী সংঘটিত হয়; অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ ঘটনার কারণ কোন নারী ও তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক। তাই সূরার প্রথমে এই চরম অপরাধ ও নির্লজ্জতার মূলোৎপাটনের জন্যে এর শরীয়তানুগ শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

ব্যতিচার একটি মহা অপরাধ এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি; তাই শরীয়তে এর শাস্তিও সবচাইতে গুরুতর রাখা হয়েছে : কোরআন পাক ও মৃত্যুপ্রাপ্তির হাদীস চারটি অপরাধের শাস্তি ও তার পন্থা স্বয়ং নির্ধারিত করেছে এবং কোন বিচারক ও শাসনকর্তার মতামতের উপর ন্যস্ত করেনি। এসব নির্দিষ্ট শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় ‘হুদুদ’ বলা হয়। এগুলো ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তি এভাবে নির্ধারিত করা হয়নি; বরং শাসনকর্তা অথবা বিচারক অপরাধীর অবস্থা, অপরাধের গুণাগুণ, পরিবেশ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে যে পরিমাণ শাস্তিকে অপরাধ দমনের জন্যে যথেষ্ট মনে করে, সেই পরিমাণ শাস্তি দিতে পারে। এ ধরনের শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় ‘তা’যীরাত’ (দণ্ড) বলা হয়। হুদুদ চারটি : চুরি, কোন সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ, মদ্যপান করা এবং ব্যতিচার করা। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেক অপরাধই স্বস্থলে গুরুতর, জগতের শাস্তি-শৃঙ্খলার জন্যে মারাত্মক এবং অনেক অপরাধের সমষ্টি, কিন্তু সবগুলোর মধ্যেও ব্যতিচারের অশুভ পরিণতি মানবিক সমাজ ব্যবস্থাকে যেমন মারাত্মক আঘাত হানে, তেমনটি বোধ হয় অন্য কোন অপরাধে নেই।

(১) কোন ব্যক্তির কন্যা, ভগিনী ও স্ত্রীর উপর হাত রাখা তাকে ধ্বংস করার নামাস্তর। সম্ভ্রান্ত মানুষের কাছে ধন-সম্পদ, সহায়-সম্পত্তি ও নিজের সর্বস্ব কোরবানী করা ততটুকু কঠিন নয়, যতটুকু তার অঙ্গরমহলের উপর হাত রাখা কঠিন। এ কারণেই দুনিয়াতে রোজ্জই এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় যে, যাদের অঙ্গরমহলের উপর হাত রাখা হয়, তারা জীবন-পণ করে ব্যতিচারীর প্রাণসংহার করতে উদ্যত হয় এবং এই প্রতিশোধম্পূর্ণ বংশের পর বংশকে বরবাদ করে দেয়।

(২) যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যতিচার ব্যাপক আকার ধারণ করে, সেখানে কারও বংশই সংরক্ষিত থাকে না; জননী, ভগিনী, কন্যা ইত্যাদির সাথে বিবাহ হারাম; যখন এসব সম্পর্কও বিলীন হয়ে যায়, তখন আপন কন্যা ও ভগিনীকেও বিবাহে আনার সম্ভাবনা আছে, যা ব্যতিচারের চাইতেও কঠোরতর অপরাধ।

(৩) চিন্তা করলে দেখা যায় যে, জগতের যেখানেই অশাস্তি ও অনর্থ

দেখা দেয়, তার অধিকাংশ কারণই নারী এবং তার চাইতে কম কারণ অর্থ-সম্পদ। যে আইন নারী ও ধন-সম্পদের সংরক্ষণ সঠিকভাবে করতে পারে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে না দেয়, সে আইনই বিশু শাস্তির রক্ষাকবচ হতে পারে। আলোচ্য আয়াতে এই শাস্তি এভাবে বর্ণিত হয়েছে : **الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ** এতে

ব্যতিচারিণী নারীকে অশ্রে এবং ব্যতিচারী পুরুষকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্তি উভয়ের একই। বিধানাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণ রীতি এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পুরুষদেরকে সম্বোধন করে আদেশদান করা হয়, নারীরাও এতে প্রসঙ্গতঃ অন্তর্ভুক্ত থাকে; তাদেরকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনই মনে করা হয় না। সমগ্র কোরআনে **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** পুংলিঙ্গ পদবাচ্য ব্যবহার করে যেসব বিধান বর্ণিত হয়েছে,

সেগুলোতে নারীরাও উল্লেখ ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্ভবতঃ এর রহস্য এই যে, আল্লাহ তাআলা নারী জাতিকে সংগোপনে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনভাবে তাদের আলোচনাকেও পুরুষদের আলোচনার আবরণে ঢেকে রাখা হয়েছে। তবে এই পদ্ধতিদৃষ্টে কেউ এরূপ সন্দেহ করতে পারত যে, এসব বিধান পুরুষদের জন্যেই নির্দিষ্ট, নারীরা এগুলো থেকে মুক্ত। তাই বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহে স্বতন্ত্রভাবে নারীদের উল্লেখও করে দেয়া হয়; যেমন **وَأَمِّنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ** যে ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের উল্লেখ উদ্দেশ্য থাকে, সেখানে স্বাভাবিক ক্রম এরূপ হয় যে, অশ্রে পুরুষ ও পশ্চাতে নারীর উল্লেখ থাকে। চুরির শাস্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী **وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْلَعُوا أَيْدِيَهُمَا** বলা হয়েছে। এতে চোর পুরুষকে চোর নারীর অশ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ব্যতিচারের শাস্তি বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমতঃ নারীর উল্লেখ প্রসঙ্গতঃ রাখাকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি; বরং স্পষ্টতঃ উল্লেখকেই উপযুক্ত মনে করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ নারীকে পুরুষের অশ্রে উল্লেখ করা হয়েছে, এতে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। নারী অবলা এবং তাকে স্বভাবতই দয়ার পাত্রী মনে করা হয়। তাকে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা না হলে কেউ সন্দেহ করতে পারত যে, সম্ভবতঃ নারী এই শাস্তির আওতাধীন নয়। নারীকে অশ্রে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ব্যতিচার একটি নির্লজ্জ কাজ। নারী দ্বারা এটা সংঘটিত হওয়া চরম নির্ভীকতা ও ওদাসীনের ফলেই সম্ভবপর। কেননা, আল্লাহ তাআলা তার স্বভাবে মজ্জাগতভাবে লজ্জা ও সতীত্ব সংরক্ষণের শক্তিশালী প্রেরণা গচ্ছিত রেখেছেন এবং তার হেফাযতের অনেক ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। কাজেই তার পক্ষ থেকে একাজ ঘটা পুরুষের তুলনায় অধিকতর অন্যায়। চোরের অবস্থা এর বিপরীত পুরুষকে আল্লাহ তাআলা উপার্জনের শক্তি দিয়েছেন। তাকে গায়ে খেটে নিজের প্রয়োজনাদি মিটানোর সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন। এগুলো বাদ দিয়ে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করা পুরুষের জন্যে খুবই লজ্জা ও দোষের কথা। নারীর অবস্থা তদ্রূপ নয়। সে চুরি করলে পুরুষের তুলনায় তা লঘু ও স্বল্পস্তরের অপরাধ হবে।

فَلْيُجْلِدُوا - **جلد** শব্দের অর্থ চাবুক মারা। শব্দটি **جلد** (চামড়া) থেকে উদ্ভূত। কারণ, চাবুক সাধারণতঃ চামড়া দ্বারা তৈরী করা হয়। কোন কোন তফসীরকার বলেন : **جلد** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, এই বেত্রাঘাতের প্রতিক্রিয়া চামড়া পর্যন্তই সীমিত থাকা চাই এবং মাংস পর্যন্ত না পৌঁছা চাই। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) বেত্রাঘাতের শাস্তিকে কার্যের

মাধ্যমে এই মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন। যে চাবুক যেন এত শক্ত না হয় যে, মাংস পর্যন্ত উপড়ে যায় এবং এমন নরমও যেন না হয় যে, বিশেষ কোন কষ্টই অনুভব না হয়। এস্থলে অধিকাংশ তফসীরবিদ এই হাদীসটি সনদ ও ভাষাসহ উল্লেখ করেছেন।

একশ' বেত্রাঘাতের উল্লেখিত শাস্তি শুধু অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্যে নির্দিষ্ট; বিবাহিতদের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা : স্মর্তব্য যে, ব্যতিচারের শাস্তি সংক্রান্ত বিধি-বিধান পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে এবং লম্বু থেকে শুরুতরের দিকে উন্নীত হয়েছে; যেমন মনের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কেও এমনি ধরনের পর্যায়ক্রমিক বিধান স্বয়ং কোরআনে বর্ণিত আছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। ব্যতিচারের শাস্তি সম্পর্কিত সর্বপ্রথম বিধান সূরা নিসার ১৫ ও ১৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :

— 'তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যতিচার করে, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের চার জন পুরুষকে সাক্ষী আন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে নারীদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখা যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু ঘটে, অথবা আল্লাহ তাদের জন্যে অন্য কোন পথ করে দেন এবং তোমাদের যে পুরুষ এই অপকর্ম করে, তাকে শাস্তি দাও। অতঃপর সে যদি তওবা করে সংশোধিত হয়ে যায়, তবে তাদের চিন্তা পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তওবা কবুলকারী, দয়ালু।' এই আয়াতদ্বয়ের পূর্ণ তফসীর সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। ব্যতিচারের শাস্তির প্রাথমিক যুগ সম্মুখে উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে এখানে আয়াতদ্বয়ের পুনরুল্লেখ করা হল। আয়াতদ্বয়ে প্রথমতঃ ব্যতিচার প্রমাণের বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, চার জন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার হবে। দ্বিতীয়তঃ ব্যতিচারের শাস্তি নারীর জন্যে গৃহে আবদ্ধ রাখা এবং উভয়ের জন্যে কষ্ট প্রদান করা উল্লেখিত হয়েছে। এতদসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ব্যতিচারের শাস্তি সংক্রান্ত এই বিধান সর্বশেষ নয়— ভবিষ্যতে অন্য বিধান আসবে। আয়াতের **أَوْ يَجْزَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَيِّئًا** অংশের মর্ম তাই।

উল্লেখিত শাস্তিকে নারীদেরকে গৃহে অন্তরীণ রাখাকে তখনকার মত যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং উভয়কে শাস্তি প্রদানের বিষয়টি যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এই শাস্তি ও কষ্ট প্রদানের কোন বিশেষ আকার, পরিমাণ ও সীমা বর্ণনা করা হয়নি। বরং কোরআনের ভাষা থেকে জানা যায় যে, ব্যতিচারের প্রাথমিক শাস্তি শুধু 'তা'যীর' তথা দণ্ডবিধির আওতাধীন ছিল, যার পরিমাণ শরীয়তের পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়নি; বরং বিচারক ও শাসনকর্তার বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। তাই আয়াতে 'কষ্ট প্রদানের' অস্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই **أَوْ يَجْزَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَيِّئًا** বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে এসব অপরাধীর জন্যে অন্য ধরনের শাস্তি প্রবর্তিত হওয়া অসম্ভব নয়। সূরা নূরের উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস মন্তব্য করলেন : সূরা নিসায় **أَوْ يَجْزَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَيِّئًا** বলে যে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্যে অন্য কোন পথ করবেন, সূরা নূরের এই আয়াত সেই পথ ব্যক্ত করে দিয়েছে; অর্থাৎ, পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যে একশ' বেত্রাঘাত করার শাস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছে। এতদসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস একশ' বেত্রাঘাতের শাস্তিকে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর জন্যে নির্দিষ্ট করে বললেন : **يعنى الرجم والجلد للثيب والجلد للبر** অর্থাৎ, সেই পথ ও ব্যতিচারের শাস্তি নির্ধারণ এই যে, বিবাহিত পুরুষ ও নারী এ অপরাধ করলে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে এবং অবিবাহিত পুরুষ ও নারী করলে একশ' বেত্রাঘাত করা

হবে।

'হযরত ওমর ফারাক (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর মিস্বরে উপবিষ্ট অবস্থায় বললেন : আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ (সাঃ)—কে সত্যসহ প্রেরণ করেন এবং তাঁর প্রতি কিতাব নাযিল করেন। কিতাবে যেসব বিষয় অবতীর্ণ হয়, তন্মধ্যে প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধানও ছিল, যা আমরা পাঠ করেছি, স্মরণ রেখেছি এবং হৃদয়ঙ্গম করেছি। অতঃপর রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও প্রস্তরাঘাতে হত্যা করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও করেছি। এখন আমি আশঙ্কা করছি যে, সময়ের চাকা আবর্তিত হওয়ার পর কেউ একথা বলতে না শুরু করে যে, আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহর কিতাবে পাই না। ফলে সে একটি ধর্মীয় কর্তব্য পরিত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। মনে রেখো, প্রস্তরাঘাতে হত্যার বিধান আল্লাহর কিতাবে সত্য এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রতি প্রযোজ্য— যদি ব্যতিচারের শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত হয় অথবা গর্ভ ও স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়।— (মুসলিম ২য় খণ্ড, ৬৫ পৃঃ)

এই রেওয়াজে সহীহ বুখারীতে আরও বিস্তারিত বর্ণিত আছে। — (বোখারী, ২য় খণ্ড, ১০০৯ পৃঃ)

জরুরী জ্ঞাতব্য : এস্থলে বিবাহিত ও অবিবাহিত শব্দগুলো শুধু সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে। আসলে 'মুহসিন' ও 'গায়র-মুহসিন' অথবা 'ছাইয়েব' ও 'বিকর' শব্দই হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় মুহসিন এমন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে শুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে। বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই এ অর্থ বোঝানো হয়। তবে সহজভাবে ব্যক্তকরণের উদ্দেশ্যে অনুবাদে শুধু বিবাহিত বলা হয়।

ব্যতিচারের শাস্তির পর্যায়ক্রমিক তিন স্তর : উপরোক্ত রেওয়াজে ও কোরআনী আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে : প্রথমে ব্যতিচারের শাস্তি লম্বু রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ, বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিজ বিবেচনা অনুযায়ী অপরাধী পুরুষ ও নারীকে কষ্ট প্রদান করবে এবং নারীকে গৃহে অন্তরীণ রাখবে। এই বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরের বিধান সূরা নূরে বিবৃত হয়েছে যে, উভয়কে একশ' করে চাবুক মারতে হবে। তৃতীয় স্তরের বিধান রসুলুল্লাহ (সাঃ) উল্লেখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন যে, অবিবাহিতদের বেলায় শুধু একশ' বেত্রাঘাত করতে হবে; কিন্তু বিবাহিতদের শাস্তি রজম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা।

ইসলামী আইনের কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ প্রমাণের জন্যে শর্তাবলীও কড়া রাখা হয়েছে : উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসলামে ব্যতিচারের শাস্তি সর্বাধিক কঠোর। এতদসঙ্গে ইসলামী আইনে এই অপরাধ প্রমাণের জন্যে শর্তাবলীও অত্যন্ত কড়া আরোপ করা হয়েছে, যাতে সামান্যও ত্রুটি থাকলে অথবা সন্দেহ দেখা দিলে ব্যতিচারের চরম শাস্তি হদ মাফ হয়ে অপরাধ অনুযায়ী শুধু দণ্ডমূলক শাস্তি অবশিষ্ট থেকে যায়। অন্যান্য ব্যাপারাদিতে দুই জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুই জন নারীর সাক্ষ্য প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ব্যতিচারের হদ জারি করার জন্যে চার জন পুরুষ সাক্ষীর চাঞ্চুষ ও দ্যুত্বহীন সাক্ষ্য জরুরী; যেমন সূরা নিসার আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই সাক্ষ্য দ্বিতীয় সাবধানতা ও কঠোরতা এই যে, যদি সাক্ষ্যের জরুরী কোন শর্ত অনুপস্থিত থাকার কারণে সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হয়, তবে সাক্ষ্যদাতাদের নিস্তার নেই। ব্যতিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাদের

বিবাহের দিকে ইশারা করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুশরিক পুরুষের সাথে মুসলমান নারীর বিবাহ এবং মুশরিকা নারীর সাথে মুসলমান পুরুষের বিবাহ যে হারাম, তা তো কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় একমত। এ ছাড়া ব্যাতিচারী পুরুষের সাথে সতী নারীর বিবাহ অথবা ব্যাতিচারিণী নারীর সাথে সং পুরুষের বিবাহ অবৈধ বলেও এ বাক্য থেকে জানা যায়। এই অবৈধতা বিশেষভাবে তখন হবে, যখন সং পুরুষ ব্যাতিচারিণী নারীকে বিবাহ করে তাকে ব্যাতিচারে বাধা না দেয়; বরং বিবাহের পরও ব্যাতিচারে সম্মত থাকে। কেননা, এমতাবস্থায় এটা হবে দায়ুসী (ভেড়ুয়াপনা) যা শরীয়তে হারাম। এমনিভাবে কোন সম্প্রদায় সতী নারী যদি কোন ব্যাতিচারে অভ্যস্ত পুরুষকে বিবাহ করে এবং বিবাহের পরও ব্যাতিচারে সম্মত থাকে, তবে তা হারাম ও কবীরা গোনাহ। কিন্তু এতে তাদের পারম্পরিক বিবাহ অশুদ্ধ কিংবা বাতিল হওয়া জরুরী নয়। শরীয়তের পরিভাষায় হারাম শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়।— (এক) কাজটি গোনাহ। যে তা করে, সে পরকালে শাস্তিযোগ্য এবং ইহকালেও বাতিল বলে গণ্য। কোন পার্শ্ব বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য নয়; যেমন কোন মোশরিকা নারীকে অথবা চিরতরে হারাম এমন নারীকে বিবাহ করা। এরূপ বিবাহ কবীরা গোনাহ এবং শরীয়তে অস্তিত্বহীন। ব্যাতিচার ও এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। (দুই) কাজটি হারাম। অর্থাৎ, শাস্তিযোগ্য গোনাহ, কিন্তু দুনিয়াতে কাজটির কিছু ফল প্রকাশ পায় ও শুদ্ধ হয়; যেমন কোন নারীকে ধোকা দিয়ে অথবা অপহরণ করে এনে শরীয়তানুযায়ী দু'জন সাক্ষীর সামনে তার সম্মতিক্রমে বিবাহ করা। এখানে কাজটি অবৈধ ও গোনাহ হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং সম্ভাবনা পিতার সম্ভান হিসেবে গণ্য হবে। এমনিভাবে ব্যাতিচারিণী ও ব্যাতিচারী যদি ব্যাতিচারের উদ্দেশ্যে এবং কোন পার্শ্ব স্বার্থের কারণে বিবাহ করেও ব্যাতিচার থেকে তওবা না করে, তবে তাদের এই বিবাহ হারাম, কিন্তু পার্শ্ব বিধানে বাতিল ও অস্তিত্বহীন নয়। বিবাহের শরীয়তারোপিত ফলাফল— যেমন ভরণ-পোষণ, মোহরানা, উত্তরাধিকার স্বত্ব ইত্যাদি সব তাদের উপর প্রযোজ্য হবে। এভাবে **وَحْوَ** শব্দটি আয়াতে মুশরিকা নারীর ক্ষেত্রে প্রথম অর্থে এবং ব্যাতিচারিণী ও ব্যাতিচারীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থে বিশুদ্ধ ও সঠিক। কোন কোন তফসীরকার আয়াতটিকে মনসূখ তথা রহিত বলেন, কিন্তু বর্ণিত তফসীর অনুযায়ী আয়াতটিকে মনসূখ বলার প্রয়োজন নেই।

ব্যাতিচার সম্পর্কিত তৃতীয় বিধান : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যাতিচার অন্যান্য অপরাধের তুলনায় সমাজকে অধিক নষ্ট ও কলুষিত করে। তাই শরীয়ত এর শাস্তি সব অপরাধের চাইতে বেশী কঠোর রেখেছে। এক্ষেপে কেউ যাতে কোন পুরুষ অথবা নারীর প্রতি বিনা প্রমাণে ব্যাতিচারের অপবাদ আরোপ করার দুসাহস না করে সেজন্য ব্যাতিচার প্রমাণ করার বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্বদান করাই ন্যায় ও সুবিচারের দাবী। শরীয়তে ব্যাতিচার প্রমাণ করার জন্যে চার জন ন্যায্যপরায়ে পুরুষের সাক্ষ্য জরুরী। এই প্রমাণ ব্যতিরেকে কেউ যদি কারও প্রতি প্রকাশ্য ব্যাতিচারের অপবাদ আরোপ করে, তবে শরীয়ত এই অপবাদ আরোপ করাকেও কঠোর অপরাধ সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, কোন ব্যক্তি কারও প্রতি ব্যাতিচারের অপবাদ আরোপ করার দুসাহস তখনই করবে, যখন সে নিজে চোখে এই অপকর্ম সন্ধানিত হতে দেখবে এবং শুধু তাই নয়, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসও করবে যে, তার সাথে আরও তিন জন পুরুষ এ অপকর্ম প্রত্যক্ষ করেছে এবং তারা সাক্ষ্য দেবে। কেননা, যদি

অন্য সাক্ষী না-ই থাকে কিংবা চার জনের চাইতে কম থাকে কিংবা তাদের সাক্ষাদানে সন্দেহ থাকে, তবে একা এই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়ে অপবাদ আরোপের শাস্তির ঝুঁকি নেয়া কোন অবস্থাতেই পছন্দ করবে না।

মুহসিনাত কারা : محسنات احسان শব্দটি **احسان** থেকে উদ্ভূত। শরীয়তের পরিভাষায় **احسان** দুই প্রকার। একটি ব্যাতিচারের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও অপরটি অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। **احسان** এই যে, যার বিরুদ্ধে ব্যাতিচার প্রমাণিত হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে এবং শরীয়তসম্মত পন্থায় কোন নারীকে বিবাহ করে তার সাথে সঙ্গমও হতে হবে। এরূপ ব্যক্তির প্রতি রক্ষম তথা প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে অপবাদ আরোপের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য **احسان** এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি ব্যাতিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়, তাকে জ্ঞানসম্পন্ন, বালগ, মুক্ত ও মুসলমান হতে হবে, সং হতে হবে অর্থাৎ, পূর্বে কখনও তাঁর বিরুদ্ধে ব্যাতিচার প্রমাণিত হয়নি। আলোচ্য আয়াতে মুহসিনাতের অর্থ তাই।— (জাসাস)

اَلَّذِيْنَ تَاُوْمِنُ مِنْ حَيْثُ اَنْزِلَ الْاٰیٰتُ অর্থাৎ, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যাতিচারে মিথ্যা অপবাদ আরোপের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায় এবং প্রতিপক্ষের দাবীর কারণে হদ কার্যকর হয়, তার একটি শাস্তি তো তাৎক্ষণিক বাস্তবায়িত হয়ে গেছে; তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হয়েছে; দ্বিতীয় শাস্তি চিরকাল জারি থাকবে। তা এই যে, কোন মোকদ্দমায় তার সাক্ষ্য কবুল করা হবে না, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহ তাআলার কাছে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তওবা পূর্ণ না করে। এরূপ তওবা করলেও হানাকী আলেমগণের মতে তার সাক্ষ্য কবুল করা হয় না। হাঁ, তবে গোনাহ মাফ হয়ে যায়, যেমন **اَلَّذِيْنَ تَاُوْمِنُ مِنْ حَيْثُ اَنْزِلَ الْاٰیٰتُ** তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে। **وَاَمْلِكُوا لِلّٰهِ عِزًّا** অর্থাৎ, যাদের উপর অপবাদের হদ কার্যকর করা হয়েছে, তারা যদি তওবা করে এবং নিজেদের অবস্থা শোষণায়, অপবাদ আরোপকৃত ব্যক্তি দ্বারাও ক্ষমা করিয়ে নেয় তবে আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল, দয়ালু।

اَلَّذِيْنَ تَاُوْمِنُ বাক্যের এই ব্যতিক্রম ইমাম আবু হানীফা ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে পূর্ববর্তী আয়াতের শুধু শেষ বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে, অর্থাৎ, **وَاَمْلِكُوا لِلّٰهِ عِزًّا** অতএব এই ব্যতিক্রমের উদ্দেশ্য এই যে, যার উপর অপবাদের হদ জারি করা হয়, সে ফাসেক, কিন্তু যদি সে ঝাঁট মনে তওবা করে এবং উল্লেখিতভাবে নিজের অবস্থা শোষণায়, তবে সে ফাসেক থাকবে না এবং তার পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে। এর ফলশ্রুতি এই যে, আয়াতের শুরুতে দুনিয়ার যে দু'টি শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ, আশিটি বেত্রাঘাত করা ও সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া— এ শাস্তিদ্বয় তওবা সত্ত্বেও স্বস্থানে বহল থাকবে। কেননা, প্রথম বড় শাস্তিটি তো কার্যকর হয়েই গেছে। দ্বিতীয় শাস্তিটিও হদেরই অংশবিশেষ। এ বিষয়ে সবাই একমত যে তওবা দূরা হদ মাফ হয় না; যদিও পরকালীন আযাব মাফ হয়ে যায়। অতএব দ্বিতীয় শাস্তি সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হওয়া তওবা দূরা মাফ হবে না। ইমাম শাফেয়ী ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে উল্লেখিত ব্যতিক্রম পূর্ববর্তী আয়াতের সব বাক্যের সাথে সম্পর্ক রাখে। এর অর্থ হবে এই যে, তওবা করার ফলে যেমন সে ফাসেক থাকবে না, তেমনি তার সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যাত হবে না। জাসাস ও মাযহরীতে উভয়পক্ষের প্রমাণাদি ও জগুয়াব বিস্তারিত

উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

ব্যভিচার সম্পর্কিত চতুর্থ বিধান লেআন : ملائنة و لعان
শব্দের অর্থ একে অপরের প্রতি আত্মাহুত অভিলাষ ও ক্রোধের বদদোয়া করা। শরীয়তের পরিভাষায় স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বিশেষ পদ্ধতিতে কয়েকটি শপথ দেয়াকে লেআন বলা হয়। যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে অথবা সন্তান সম্পর্কে বলে যে, সে আমার গুপ্তজাত নয়, অপরপক্ষে স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যাবাদী অভিহিত করে দাবী করে যে, তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশিষ্টি বেত্রাঘাত প্রদান করা হোক, তখন স্বামীকে স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করতে বলা হবে। সে যদি যথাবিহিত চার জন সাক্ষী পেশ করে দেয়, তবে স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের হদ প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে সে চার জন সাক্ষী পেশ করতে না পারলে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে লেআন করানো হবে। প্রথমে স্বামীকে বলা হবে যে, সে কোরআনে উল্লেখিত ভাষায় চার বার সাক্ষ্যদান করুক যে, সে এ ব্যাপারে সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলুক যে, সে মিথ্যাবাদী হলে তার প্রতি আত্মাহুত অভিলাষ বর্ষিত হবে।

স্বামী যদি এসব কথা থেকে বিরত থাকে, তবে যে পর্যন্ত নিজের মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার না করে অথবা উপরোক্ত ভাষায় পাঁচ বার কসম না খায়, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। সে যদি মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা স্বীকার করে, তবে তার উপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি পাঁচ বার কসম খেয়ে নেয়, তবে স্ত্রীর কাছ থেকে কোরআনে বর্ণিত ভাষায় পাঁচ বার কসম নেয়া হবে। যদি সে কসম খেতে অস্বীকার করে তবে যে পর্যন্ত সে স্বামীর কথার সত্যতা স্বীকার না করে এবং নিজের ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে। এরূপ স্বীকারোক্তি করলে তার উপর ব্যভিচারের শাস্তি প্রয়োগ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি উপরোক্ত ভাষায় কসম খেতে সম্মত হয়ে যায় এবং কসম খেয়ে নেয়, তবে লেআন পূর্ণতা লাভ করবে। এর ফলশ্রুতিতে পার্থিব শাস্তির কবল থেকে উভয়েই বেঁচে যাবে। পরকালের ব্যাপার আত্মা তাআলাই জানেন যে, তাদের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী পরকালের শাস্তি ভোগ করবে। কিন্তু দুনিয়াতেও যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেআন হয়ে গেল, তখন তারা একে অপরের জন্যে চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। স্বামীর উচিত হবে তাকে তালাক দিয়ে মুক্ত করে দেয়া। সে তালাক না দিলে বিচারক উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিতে পারবেন। এটা তালাকেরই অনুরূপ হবে। এখন তাদের মধ্যে পুনর্বিবাহও হতে পারবে না।

ইসলামী শরীয়তে লেআনের আইন স্বামীর মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত কোন ব্যক্তির প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন করার আইনের পরিশ্রেক্ষিতে এটা জরুরী যে, অভিযোগ উত্থাপনকারী ব্যক্তি চার জন চাক্ষুষ সাক্ষী পেশ করবে। যদি তা করতে না পারে, তবে উল্টো তার উপরই ব্যভিচারের অপবাদের হদ জারি করা হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে তো এটা সম্ভবপর যে, যখন চার জন সাক্ষী পাওয়া দুষ্কর হয়, তখন ব্যভিচারের অভিযোগ উত্থাপন না করে চুপ ঘেরে থাকবে, যাতে অপবাদের শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকে, কিন্তু স্বামীর পক্ষে ব্যাপারটি খুবই নাজুক। সে যখন স্বচক্ষে দেখবে অথচ সাক্ষী নেই, তখন যদি সে মুখ খোলে, তবে অপবাদ আরোপের শাস্তি ভোগ করবে; আর যদি মুখ না খোলে, তবে আজীবন মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে এবং জীবন-ধারণও দুর্বিসহ হয়ে পড়বে। এ কারণে স্বামীর ব্যাপারটিকে সাধারণ

আইনের আওতা-বহির্ভূত করে স্বতন্ত্র আইনের রূপ দেয়া হয়েছে। এ থেকে আরও জানা গেল যে, লেআন শুধু স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারেই হতে পারে। অন্যদের বিধান পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত বিধানের অনুরূপ। হাদীসের কিতাবাদিতে এ স্থলে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে লেআন আয়াতের শানে-নুযুল কোন ঘটনাটি, এ সম্পর্কে তফসীরকারদের উক্তি বিভিন্মরূপ। কুরতুবী আয়াতের অবতরণ দু'বার ধরে উভয় ঘটনাকে শানে নুযুল সাব্যস্ত করেছেন। বোখারীর টীকাকার হাফেয ইবনে-হাজ্জার এবং মুসলিমের টীকাকার ইমাম নবতী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে একই অবতরণের মধ্যে উভয় ঘটনাকে শানে-নুযুল আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য অধিক স্পষ্ট, যা পরে বর্ণিত হবে। একটি ঘটনা হেলাল ইবনে উমাইয়া ও তার স্ত্রীর, যা সহীহ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাসের জবানী বর্ণিত আছে। এই ঘটনার প্রাথমিক অংশ ইবনে আব্বাসেরই জবানী মুসনাদে আহমদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন : যখন কোরআনে অপবাদের হদ

সম্পর্কিত **وَالَّذِينَ يَزْنُونَ الْمُهْصَنَاتِ فَاُولَٰئِكَ يَمْلِكُونَ بِالْعَبَاثَةِ فَاُولَٰئِكَ جَزَاءُ** আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ, এতে কোন নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী পুরুষের জন্যে জরুরী করা হয়েছে যে, হয় সে স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করবে, তন্মধ্যে একজন সে নিজে হবে, না হয় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে আশিষ্টি বেত্রাঘাত করা হবে এবং চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যখ্যাত হবে। এই আয়াত শুনে আনসারদের সরদার হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আরম্ভ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ, আয়াতগুলো কি ঠিক এভাবেই নাহিল হয়েছে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) সা'দ ইবনে উবাদার মুখে এরূপ কথা শোনে বিস্মিত হলেন? তিনি আনসারগণকে সম্বোধন করে বললেন : তোমরা কি শুনলে, তোমাদের সরদার কি কথা বলছেন? আনসারগণ বলল : ইয়া রসূলুল্লাহ, আপনি তাঁকে তিরস্কার করবেন না। তাঁর একথা বলার কারণ তাঁর তীব্র আত্মমর্যদাবোধ। অতঃপর সা'দ ইবনে উবাদা নিজেই আরম্ভ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ : আমার পুরোপুরি বিশ্বাস রয়েছে যে, আয়াতগুলো সত্য এবং আত্মা তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি আশ্চর্যবোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তার উপর তিন পুরুষ সওয়ার হয়ে আছে, তখন কি আমার জন্যে বৈধ হবে না যে, আমি তাকে শা'সাই এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেই; না আমার জন্যে এটা জরুরী যে, আমি চার জন লোক এনে অবস্থা দেখাই এবং সাক্ষী করি? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ করব, ততক্ষণে কি তারা উদ্দেশ্য সাধন করে পলায়ন করবে না? এস্থলে হযরত সা'দের ভাষা বিভিন্মরূপ বর্ণিত আছে, সবগুলোর সারমর্ম একই—(কুরতুবী)

অপবাদের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত অবতরণ ও সা'দ ইবনে উবাদার এই কথাব্যবহার অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হল। হেলাল ইবনে উমাইয়া এশার সময় ক্ষেত থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর সাথে একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখলেন এবং তাদের কথাব্যবহার নিজ কানে শোনলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। সকালে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি খুব দুঃখিত হলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করলেন। এদিকে আনসারগণ একত্রিত হয়ে বলতে লাগল যে, আমাদের সরদার সা'দ যে কথা বলেছিলেন, এক্ষণে আমরা তাতেই লিপ্ত হয়ে পড়লাম।

এখন শরীয়তের আইন অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেলাল ইবনে উমাইয়াকে আশিটি বেত্রাঘাত করবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু হেলাল ইবনে উমাইয়া জোর দিয়ে বললেন : আল্লাহর কসম, আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন। বোখারীর রেওয়াজে আরও বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেলালের ব্যাপার শুনে কোরআনের বিধান মোতাবেক তাকে বলেও দিয়েছিলেন যে, হয় দাবীর স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর, না হয় তোমার পিঠে অপবাদের শাস্তিস্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত পড়বে। হেলাল উত্তরে আরম্ভ করলেন : যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ তাআলা অবশ্য এমন কোন বিধান নাযিল করবেন, যা আমার পিঠকে অপবাদের শাস্তি থেকে মুক্ত করে দেবে। এই কথাবার্তা চলছিল, এমনতাবস্থায় জিবরাঈল (আঃ) লেআনের আইন সম্পর্কিত আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন ; অর্থাৎ, ... وَلَئِنْ يَمْزِنَ رَبُّكَ لِي لَآتِيَنَّكَ الْكِتَابُ وَتُبَيِّنَ لَهُ مَا فِيهِ رُشْدُكَ وَسَعْدُكَ

আবু ইয়াল্লা এই রেওয়াজেটাই হয়ত আনাস (রাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, লেআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেলাল ইবনে উমাইয়াকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমার সমস্যার সমাধান নাযিল করেছেন। হেলাল আরম্ভ করলেন : আমি আল্লাহ তাআলার কাছে এই আশাই পোষণ করেছিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেলালের স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন। স্বামী-স্ত্রীর উপস্থিতিতে স্ত্রীর জবানবন্দী নেয়া হল। সে বলল : আমার স্বামী হেলাল ইবনে উমাইয়া আমার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তোমাদের মধ্যে একজন যে মিথ্যাবাদী, তা আল্লাহ তাআলা জানেন। জিজ্ঞাস্য এই যে, তোমাদের কেউ কি আল্লাহর আযাবের ভয়ে তওবা করবে এবং সত্য কথা প্রকাশ করবে? হেলাল আরম্ভ করলেন : আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ; আমি সম্পূর্ণ সত্য কথা বলেছি। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আয়াত অনুযায়ী উভয়কে লেআন করানোর আদেশ দিলেন। প্রথমে হেলালকে বলা হল যে, তুমি কোরআনে বর্ণিত ভাষায় চার বার সাক্ষ্য দাও, অর্থাৎ, আমি আল্লাহকে হাজির ও নাযির বিশ্বাস করে বলছি যে, আমি সত্যবাদী। হেলাল আদেশ অনুযায়ী চার বার সাক্ষ্য দিলেন। পঞ্চম সাক্ষ্যের কোরআনী ভাষা এরূপ : “যদি আমি মিথ্যা বলি, তবে আমার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।” এই সাক্ষ্যের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেলালকে বললেন : দেখ হেলাল, আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির তুলনায় অনেক হালকা। আল্লাহর আযাব মানুষের দেয়া শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। এর ভিত্তিতেই ফয়সালা হবে। কিন্তু হেলাল আরম্ভ করলেন : আমি কসম খেয়ে বলতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে এই সাক্ষ্যের কারণে পরকালের আযাব দেবেন না। এরপর তিনি পঞ্চম সাক্ষ্যের শব্দগুলোও উচ্চারণ করে দিলেন। অতঃপর হেলালের স্ত্রীর কাছ থেকেও এমনি ধরনের চার সাক্ষ্য অথবা কসম নেয়া হল। পঞ্চম সাক্ষ্যের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : একটু থাম। আল্লাহকে ভয় কর। এই সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য। আল্লাহর আযাব মানুষের আযাব অর্থাৎ, ব্যভিচারের শাস্তির চাইতে অনেক কঠোর। একথা শুনে সে কসম খেতে ইতস্ততঃ করতে লাগল। এ অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলে অবশেষে সে বলল : আল্লাহর কসম, আমি আমার গোত্রকে লালিত্তি করব না। অতঃপর সে পঞ্চম সাক্ষ্যও একথা বলে দিয়ে দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হলে

আমার উপর আল্লাহর গজব হবে। এভাবে লেআনের কার্যধারা সমাপ্ত হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উভয় স্বামী-স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন অর্থাৎ, তাদের বিবাহ নাকচ করে দিলেন। তিনি আরও ফয়সালা দিলেন যে, এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলে কথিত হবে—পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে না। কিন্তু সন্তানটিকে ঠিকত্বও করা হবে না।—(মায়হারী)

দ্বিতীয় ঘটনাও বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। ঘটনার বিবরণ ইমাম বগভী ইবনে-আব্বাসের রেওয়াজেতে এভাবে উল্লেখ করেছেন : অপবাদের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)মিম্বরে দাঁড়িয়ে তা মুসলমানদেরকে শুনিয়ে দিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে আসেম ইবনে আদী আনসারীও ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আরম্ভ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ, আমার প্রাণ আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমাদের মধ্যে কেউ যদি তার স্ত্রীকে কোন পুরুষের সাথে লিপ্ত দেখে, তবে দেখা ঘটনা বর্ণনা করার কারণে তাকে আশিটি বেত্রাঘাত করা হবে, চিরতরে তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হবে এবং মুসলমানগণ তাকে ফাসেক বলবে। এমনতাবস্থায় আমরা সাক্ষী কোথা থেকে আনব? সাক্ষীর খোঁজে বের হলে সাক্ষী আসা পর্যন্ত তারা কার্যসিদ্ধি করে পলায়ন করবে। এটা ছবছ প্রথম ঘটনায় সা'দ ইবনে মুযাযের উচ্চাপিত প্রশ্ন।

এক শুক্রবার এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। এরপর একটি ঘটনা ঘটল। আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ওমায়ের বিবাহ আসেম ইবনে আদীর চাচাত বোন খাওলার সাথে হয়েছিল। ওমায়ের একদিন তার স্ত্রীকে শরীক ইবনে সাহমার সাথে লিপ্ত দেখতে পেলেন। শরীকও আসেম ইবনে আদীর চাচাত ভাই ছিল। ওমায়ের আসেমের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন। আসেম ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি’ পাঠ করলেন এবং পরবর্তী দিন জুমআর নামাযের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আরম্ভ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ, বিগত জুমআয় আমি আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম পরিতাপের বিষয় এই যে, আমি নিজেই এতে জড়িত হয়ে পড়েছি। কেননা, আমার পরিবারের মধ্যেই এরূপ ঘটনা ঘটে গেছে। ইমাম বগভী উভয়কে উপস্থিত করা এবং তাদের মধ্যে লেআন করানোর ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।—(মায়হারী) বুখারী ও মুসলিমে সাহল ইবনে সা'দ সায়েদীর রেওয়াজেতে এর সার-সংক্ষেপ এভাবে বর্ণিত আছে যে, ওয়াযমের আজলানী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আরম্ভ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ, যদি কেউ তার স্ত্রীর সাথে ভিন্ন পুরুষকে দেখে, তবে সে কি তাকে হত্যা করবে, যার ফলে তাকেও হত্যা করা হবে? তার কি করা উচিত? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : আল্লাহ তাআলা তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে বিধান নাযিল করেছেন। যাও স্ত্রীকে নিয়ে এস। বর্ণনাকারী সাহল বলেন : তাদেরকে এনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদের মধ্যে লেআন করালেন। যখন উভয়পক্ষ থেকে পাঁচটি সাক্ষ্য পূর্ণ হয়ে লেআন সমাপ্ত হল, তখন ওমায়মের বললেন : ইয়া রসূলুল্লাহ, এখন যদি আমি তাকে স্ত্রীরূপে রাখি, তবে এর অর্থ এই হয় যে, আমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছি। তাই আমি তাকে তিন তালাক দিলাম।—(মায়হারী)

উপরোক্ত ঘটনাদুয়ের মধ্য থেকে প্রত্যেকটি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লেআনের আয়াত এর পরিশ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হাকেম ইবনে হাজ্জার ও ইমাম বগভী উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানকল্পে বলেছেন যে, মনে হয় প্রথম ঘটনা হেলাল ইবনে উমাইয়ার ছিল এবং লেআনের আয়াত এরই পরিশ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর ওয়াযমের এমনি ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়। হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনা তার জ্ঞান ছিল না।

الخور

৩৫২

قَدْ اَفْلَحَ ۝

وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ
 لِكَاذِبٍ كَذِبٌ ۝ اَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْاَلَمُوهُ الْاَوَّلُ الْاَوَّلُ الْاَوَّلُ الْاَوَّلُ الْاَوَّلُ
 مِنَ الصِّدِّيقِينَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ
 تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ وَلَا
 تَحْسَبُوْهُ شَيْئًا وَلَٰكِنْ هُوَ خَبَرٌ لِّكُلِّ اٰمِرٍ مِّنْهُمْ تَا كَتَبَ
 مِنَ الْاِنۡجِيلِ الَّذِي تَوَلٰٓى زَكَرِيَّا وَهُمَا عَنْ عَذَابٍ عَظِيْمٍ ۝ وَلَوْلَا
 اِذۡ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَفۡئِيۡهِمْ خَبَرًا وَّكَانُوا
 هٰذَا فَاۡفِكٌ مِّنۡكُمْ ۝ وَلَوْ اَنَّكُمْ عَلِمْتُمْ اَنَّ اَرْبَعَةً شٰهَدَآءُ فَاَدَّاهُمۡ
 يٰۤاَشۡهَادُ فَاٰلَيْكَ عِنۡدَ اللَّهِ هُمُ الْكَذِبُوْنَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
 عَلَيۡكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا فَضَحْتُمْ وِيۡهٖ
 عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ اِذۡ تَقُوۡنَ اَنَّ اَلَيْسَ لَكُمۡ بِاَشۡهَادٍ مَّا
 لَيْسَ لَكُمۡ بِهِ عِلۡمٌ وَتَحْسَبُوۡنَهُ نَبِيۡنَا وَهُوَ عِنۡدَ اللَّهِ عَظِيْمٌ ۝ وَلَوْ
 لَوْلَا اِذۡ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوۡنُ لَنَا اَنۡ نَّكۡفُرَ بِهٰذَا اَلۡسَبۡبِ
 هٰذَا يٰۤاَهۡلَ اَنۡفُسِكُمۡ ۝ يٰۤاَشۡهَادُ اَلَا اِنَّ تَعُوۡذَ الْوَلٰٓئَةَ اَلَا اِنَّ
 كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيۡنَ ۝ وَيٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اَلَا اِنَّ اللَّهَ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ۝

(৮) এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহর কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী; (৯) এবং পক্ষমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে। (১০) তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ তওবা কবুলকারী, প্রজ্ঞাময় না হলে কত কিছুই যে হয়ে যেত। (১১) যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্যে ধারণা মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে, যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। (১২) তোমরা যখন একথা শুনে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটা তো নিজল্লা অপবাদ? (১৩) তারা কেন এ ব্যাপারে চার জন সাক্ষী উপস্থিত করেনি; অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। (১৪) যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে তোমরা যা চর্চা করছিলে, তজ্জন্মে তোমাদেরকে গুরুতর আযাব স্পর্শ করত। (১৫) যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল। (১৬) তোমরা যখন এ কথা শুনে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ তো পবিত্র, মহান। এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। (১৭) আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। (১৮) আল্লাহ তোমাদের জন্যে কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

কাজেই এ ব্যাপারে যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে পেশ করা হল তখন তিনি বললেন : তোমার ব্যাপারে ফয়সালা এই। এর স্বপক্ষে ইঙ্গিত এই যে, হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় হাদীসের ভাষা হচ্ছে جبرئيل এবং ওমায়রের ঘটনায় ভাষা হচ্ছে قد نزل الله فيك এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তোমার অনুরূপ এক ঘটনায় এর বিধান নাযিল করেছেন।—(মায়হারী)

মাসআলা : বিচারকের সামনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লেআন হয়ে গেলে স্ত্রী স্বামীর জন্যে চিরতরে হারাম হয়ে যায়, যেমন দুগ্ধ পান করানোর ফলেও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন চিরতরে অবৈধ হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : الملاعنان لا يجتمعان লেআনের সাথে সাথেই স্ত্রী স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে যায়, কিন্তু ইন্দুতের পর স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করতে চাইলে ইমাম আযমের মতে তা তখনই জায়েয হবে, যখন স্বামী তাকে তালাক দেয় কিংবা মুখে বলে দেয় যে, আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। স্বামী এরূপ না করলে বিচারক তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ জারি করবেন এবং তাও তালাকের অনুরূপ হবে। এরপর তিন হায়েয অতিবাহিত হলে স্ত্রী অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে।—(মায়হারী)

মাসআলা : লেআনের পর এই গর্ভ থেকে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, সে স্বামীর সাথে সর্বক্ষমুক্ত হবে না; তাকে তার মাতার সাথে সর্বক্ষমুক্ত করা হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেলাল ইবনে উমাইয়া ও ওমায়রের আজলানী উভয়ের ঘটনায়ই এই ফয়সালা দিয়েছিলেন।

লেআনের পর যে মিথ্যাবাদী, তার পরকালীন আযাব আরও বেড়ে যাবে, কিন্তু দুনিয়ার শাস্তি থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে। এমনভাবে তাকে দুনিয়াতে ব্যতিচারীণী ও সন্তানকে জারয সন্তান বলাও কারও জন্যে জায়েয হবে না। হেলাল ইবনে উমাইয়ার ঘটনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফয়সালায় একথাও বলেছিলেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বাপর সম্পর্ক : পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা আন-নূরের অধিকাংশ আয়াত সতীত্ব ও পবিত্রতা সুরক্ষণের জন্যে প্রবর্তিত বিধানাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর বিপরীতে সতীত্ব ও পবিত্রতার ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও এর বিরুদ্ধাচরণের জাগতিক শাস্তি ও পারলৌকিক মহা বিপদের কথা আলোচনা করা হয়েছে। তাই পরস্পরায় প্রথমে ব্যাচারের হদ, অতঃপর অপবাদের হদ ও পরে লেআনের কথা বর্ণিত হয়েছে। অপবাদের হদ প্রসঙ্গে চার জন সাক্ষীর অবর্তমানে কোন সতী-সাক্ষী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করাকে মহাপাপ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এরূপ অপবাদ আরোপকারীর শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত প্রবর্তন করা হয়েছে। এ বিষয়টি সাধারণ মুসলিম সতী নারীদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ষষ্ঠ হিজরীতে কতিপয় মুনাফিক উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিন্দীকা (রাঃ)-এর প্রতি এমন ধরনের অপবাদ আরোপ করেছিল এবং তাদের অনুসরণ করে কয়েকজন মুসলমানও এ আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। ব্যাপারটি সাধারণ মুসলমান সতী নারীদের পক্ষে অত্যধিক গুরুতর ছিল। তাই কোরআন পাকে আল্লাহ তাআলা হযরত আয়েশার পবিত্রতা ও সতীত্ব বর্ণনা করে এস্থলে উপরোক্ত দশটি আয়াত নাযিল করেছেন। এসব আয়াতে হযরত আয়েশার পবিত্রতা ঘোষণা করতঃ তাঁর ব্যাপারে যারা কুংসা রটনা ও অপপ্রচারে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের

সবাইকে হুশিয়ার করা হয়েছে এবং ইহকাল ও পরকালে তাদের বিপদ বর্ণনা করা হয়েছে। এই অপবাদ রটনার ঘটনাটি কোরআন ও হাদীসে 'ইফকের ঘটনা' নামে খ্যাত। ইফক শব্দের অর্থ জঘন্য মিথ্যা অপবাদ। এসব আয়াতের তফসীর বোঝার জন্যে অপবাদের কাহিনীটি জেনে নেয়া অত্যন্ত জরুরী। তাই প্রথমে সংক্ষেপে কাহিনীটি বর্ণনা করা হচ্ছে।

মিথ্যা অপবাদের কাহিনী : বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে এই ঘটনাটি অসাধারণ দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সংক্ষেপ বর্ণনা এই যে, ষষ্ঠ হিজরীতে যখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বনী মুত্তালিক নামান্তরে মুরায়সী যুদ্ধে গমন করেন, তখন বিবিদের মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে নারীদের পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই হযরত আয়েশার (রাঃ) উটের পিঠে পর্দাবিশিষ্ট আসনের ব্যবস্থা করা হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রথমে পর্দাবিশিষ্ট আসনে সওয়ার হয়ে যেতেন। এরপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিত। এটা ছিল নিত্যকার অভ্যাস। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায ফেরার পথে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। এক মনযিলে কাফেলা অবস্থান গ্রহণ করার পর শেষ রাতে প্রস্থানের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হল যে, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যে এখান থেকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তাই প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হয়। হযরত আয়েশার পায়খানায় যাওয়ার প্রয়োজন ছিল ; তিনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল। তথ্য তিনি হার তালাশ করতে লাগলেন। বেশ কিছু সময় অভিযাহিত হয়ে গেল। স্বস্থানে ফিরে এসে দেখলেন যে, কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেছে। রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আয়েশার পর্দাবিশিষ্ট আসনটিকে যথারীতি উটের পিঠে সওয়ার করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং বাহকরা মনে করেছে যে, তিনি ভেতরেই আছেন। উঠানোর সময়ও সন্দেহ হল না। কারণ, তিনি তখন অল্পবয়স্কা ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন। ফলে আসনটি যে শূন্য — এরূপ ধারণাও কারও মনে উদয় হল না। হযরত আয়েশা ফিরে এসে যখন কাফেলাকে পেলেন না, তখন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা ও স্থিরচিত্ততার পরিচয় দিলেন এবং কাফেলার পশ্চাতে দৌড়াদৌড়ি করা কিংবা এদিক-ওদিক তালাশ করার পরিবর্তে স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে রইলেন। তিনি মনে করলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তদীয় সঙ্গীগণ যখন জনতে পারবে যে, আমি আসনে অনুপস্থিত, তখন আমার খোঁজে তাঁরা এখানে আসবেন। কাজেই আমি এদিক-সেদিক চলে গেলে তাঁদের জন্যে তালাশ করে নেয়া কঠিন হবে। তাই তিনি স্বস্থানেই চাদর গায়ে দিয়ে বসে রইলেন। সময় ছিল শেষ রাত্রি। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

অপরদিকে সাক্ষ্যদান ইবনে মুয়াত্তালকে রসূলুল্লাহ (সঃ) এ কাজের জন্যে নিযুক্ত করেছিলেন যে, তিনি কাফেলার পশ্চাতে সফর করবেন এবং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছু পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নেবেন। তিনি সকাল বেলায় এখানে পৌঁছলেন। তখন পর্যন্ত প্রভাত-রশ্মি ততটুকু উজ্জ্বল ছিল না। তিনি শুধু একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখতে পেলেন। কাছে এসে হযরত আয়েশাকে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দাধরা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠের সাথে তাঁর মুখ থেকে 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' উচ্চারিত হয়ে গেল। এই বাক্য হযরত আয়েশার কানে পড়ার সাথে সাথে তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। হযরত সাক্ষ্যদান নিজের উট কাছে এনে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাতে সওয়ার হয়ে গেলেন এবং নিজে উটের নাকের রশি ধরে পায়ে

হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে তিনি কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল দুশত্রু, মুনাফিক ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শত্রু। সে একটা সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল। এই হতভাগা আবোল-তাবোল বকতে শুরু করল। কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও কানকথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল। পুরুষদের মধ্যে হযরত হাসান, মিস্তাহ এবং নারীদের মধ্যে হামনাহ ছিল এ শ্রেণীভুক্ত। তফসীরে দূররে-মনসূরে ইবনে মরদুবিয়াহর বরাতে দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের এই উক্তিই বর্ণিত আছে যে, **عنه ای عبد الله بن ابی حسان ومسطح وحنة**

যখন এই মুনাফিক-রটিত অপবাদের চর্চা হতে লাগল, তখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) এতে খুবই দুঃখিত হলেন। হযরত আয়েশার তো দুঃখের সীমাই ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণও তীব্রভাবে বেদনাহত হলেন। একমাস পর্যন্ত এই আলোচনা চলতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ তাআলা হযরত আয়েশার পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারী এবং এতে অংশগ্রহণকারীদের নিন্দায় উপরোক্ত আয়াতসমূহ নাযিল করেন। আয়াতগুলোর তফসীর পরে বর্ণিত হবে। অপবাদের হদ-এ বর্ণিত কোরআনী-বিধি অনুযায়ী অপবাদ আরোপকারীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য তলব করা হল। তারা এই ভিত্তিহীন খবরের সাক্ষ্য কোথা থেকে আনবে? ফলে রসূলুল্লাহ (সঃ) শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করলেন। প্রত্যেককে আশিটি বেত্রাঘাত করা হল। বাঘযার ও ইবনে মরদুবিয়াহ হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) তিন জন মুসলমান মিস্তাহ, হামনাহ ও হাসানদের প্রতি হদ প্রয়োগ করেন। তাবারানী হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) আসল অপবাদ-রচয়িতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রতি দ্বিগুণ হদ প্রয়োগ করেন। অতঃপর মুসলমানরা তওবা করে নেয় এবং মুনাফিকরা তাদের অবস্থায় কায়ম থাকে।—(বয়ানুল-কোরআন)

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য : ইমাম বগভী উপরোক্ত আয়াতসমূহে তফসীরে বলেছেন : হযরত আয়েশার এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো অন্য কোন মহিলার ভাগ্যে জ্বোটেনি। তিনি নিজেও আল্লাহর নেয়ামত প্রকাশার্থে এসব বিষয় গর্বভরে বর্ণনা করতেন। প্রথম, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিবাহে আসার পূর্বে ফেরেশতা জিবরাঈল একটি রেশমী কাপড়ে আমার ছবি নিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আগমন করেন এবং বলেন : এ আপনার স্ত্রী।—(তিরমিযী) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, জিবরাঈল তাঁর হাতের তালুতে এই ছবি নিয়ে এসেছিলেন।

দ্বিতীয়, রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁকে ছাড়া কোন কুমারী বালিকাকে বিবাহ করেননি। তৃতীয়, তাঁর কোলে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ওফাত হয়। চতুর্থ, হযরত আয়েশার গৃহেই তিনি সমাধিস্থ হন। পঞ্চম, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি তখনও ওই অবতীর্ণ হত, যখন তিনি হযরত আয়েশার সাথে এক লেপের নীচে শায়িত থাকতেন। অন্য কোন বিবির এরূপ বৈশিষ্ট্য ছিল না। ষষ্ঠ, আসমান থেকে তাঁর দোহমুক্ততার বিষয় অবতীর্ণ হয়েছে। সপ্তম, তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খলীফার কন্যা এবং সিদ্দীকা ছিলেন। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই ইাদেরকে ক্ষমা ও সন্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছে, তিনি তাঁদেরও অন্যতম।

হযরত আয়েশার ফকীহ ও পণ্ডিতসুলভ জ্ঞানানুসন্ধান এবং বিজ্ঞজনেচিতি বক্তব্য দেখে হযরত মুসা ইবনে তালহা (রাঃ) বলেনঃ আমি আয়েশা সিদ্দীকার চাইতে অধিক শুদ্ধভাষী ও প্রাজ্ঞভাষী কাউকে দেখিনি।—(তিরমিযী)

তফসীরে-কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তাআলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার সাক্ষ্য দ্বারা তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করেন। হযরত মারইয়ামের প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তাআলা তাঁর শিশু পুত্র ঈসা (আঃ)-এর সাক্ষ্য দ্বারা তাঁকে দোষমুক্ত করেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকার প্রতি অপবাদ আরোপ করা হলে আল্লাহ তাআলা কোরআনের দশটি আয়াত নাখিল করে তাঁর দোষমুক্ততা ঘোষণা করেন, যা তাঁর গুণ ও জ্ঞান-গরিমাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْهُمْ - অর্থ শব্দের আভিধানিক

অর্থ পাশ্চটে দেয়া, বদলে দেয়া। যে জঘন্য মিথ্যা সত্যকে বাতিলরূপে, বাতিলকে সত্যরূপে বদলে দেয় এবং ন্যায্যপরায়ণ আল্লাহ্‌তীরূপকে ফাসেক ও ফাসেককে আল্লাহ্‌তীরা পরহেযগার করে দেয়, সেই মিথ্যাকে **إِفْكٌ** বলা হয়। **عُصْبَةٌ** শব্দের অর্থ দশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত লোকের দল। এর কম-বেশীর জন্যেও এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। **مِّنْهُمْ** বলে মুমিনদেরকে বোঝানো হয়েছে। এই অপবাদের প্রকৃত রচয়িতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুমিন নয়—মুনাফিক ছিল, কিন্তু মুনাফিকরা মুসলমানী দাবী করত বিধায় তাদের ক্ষেত্রেও মুমিনদের বাহ্যিক বিধানাবলী প্রযোজ্য হত। তাই **مِّنْهُمْ** শব্দে তাকেও शामिल করা হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে দু'জন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক এতে জড়িত হয়। রসুলুল্লাহ (সাঃ) আয়াত নাখিল হওয়ার পর তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। অতঃপর মুমিনগণ সবাই তওবা করে এবং আল্লাহ তাআলা তাঁদের তওবা কবুল করেন। হযরত হাসসান ও মিসতাহ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। তাঁরা উভয়েই বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদর যোদ্ধাদের জন্যে আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে মাগফেরাত ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই হযরত আয়েশার সামনে কেউ হাসসানকে মন্দ বললে তিনি তা পছন্দ করতেন না; যদিও তিনি অপবাদের শাস্তি-প্রাপ্তদের অন্যতম ছিলেন। হযরত আয়েশা বলেতেনঃ হাসসান রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে কবিতা রচনার মাধ্যমে কাফেরদের চমৎকার মোকাবেলা করেছেন। কাজেই তাঁকে মন্দ বলা সঙ্গত নয়। হাসসান কোন সময় হযরত আয়েশার কাছে আগমন করলে তিনি সসম্মুখে তাঁকে আসন দিতেন।—(মাহহারী)

لَا تَحْسَبُوهُ كَرِهًا - এতে নবী করীম (সাঃ) হযরত আয়েশা,

সাক্ষ্যদায়ক ও সকল মুমিন-মুসলমানকে সম্মোদন করা হয়েছে। তাঁরা সবাই এই গুজবের কারণে মর্মান্বিত ছিলেন। অর্থ এই যে, এই গুজবকে তোমরা খারাপ মনে করো না। কেননা, আল্লাহ তাআলা কোরআনে তাঁদের দোষমুক্ততা নাখিল করে তাঁদের সম্মান আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং যারা এই কুকাণ্ড করেছিল, তাদের সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী নাখিল করেছেন, যা কেয়ামত পর্যন্ত পঠিত হবে।

إِنَّمَا أَفْكُكُمْ بِمَا تَكْفُرُونَ - অর্থ, যারা এই

অপবাদের যতটুকু অংশ নিয়েছে, সে পরিমাণে তার গোনাহ লিখিত হয়েছে এবং সে অনুপাতেই তার শাস্তি হবে। যে ব্যক্তি এই খবর রচনা করে চালু করেছে, সে সর্বাধিক আযাব ভোগ করবে, যে খবর শুনে

সমর্থন করেছে, সে তদপেক্ষা কম এবং যে শুনে নিশ্চুপ রয়েছে, সে আরও কম আযাবের যোগ্য হবে।

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُمُ فَكَفِّرْ لَهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ - অর্থ শব্দের অর্থ বড়।

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি অপবাদে বড় ভূমিকা নিয়েছে অর্থাৎ, একে রচনা করে চালু করেছে, তার জন্যে গুরুতর আযাব রয়েছে। বলাবাহুল্য, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবনে-উবাই।—(বগতী)

لَوْلَا إِدْخِيلُهُمْ فِي النَّارِ لَأَكْبَرُوا - অর্থ, তোমরা যখন এই অপবাদের সংবাদ শুনলে, তখন

মুসলমান পুরুষ ও নারী নিজেদের সম্পর্কে অর্থাৎ, মুসলমান ভাই-বোনদের সম্পর্কে সুধারণা করলে না কেন এবং একথা বললে না কেন যে, এটা প্রকাশ্য মিথ্যা? এ আয়াতে কয়েকটি বিষয় প্রশিধানযোগ্য।

প্রথমতঃ **لَأَكْبَرُوا** শব্দ দ্বারা কোরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের দুর্নাম রটায় ও তাকে লাঞ্চিত করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজেকেই লাঞ্চিত করে। কারণ, ইসলামের সম্পর্ক সবাইকে এক করে দিয়েছে। এ ধরনের সবক্ষেত্রে কোরআন এই ইঙ্গিত ব্যবহার করেছে। যেমন এক জায়গায় বলা হয়েছে **وَلَا تَكُونُوا أَقْسَامًا** অর্থাৎ, তোমাদের নিজেদের প্রতি দোষারোপ করো না। উদ্দেশ্য, কোন মুসলমান পুরুষ ও নারীর প্রতি দোষারোপ করো না।

এই আয়াতে দ্বিতীয় প্রশিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে স্থানের দিকে লক্ষ্য করলে **لَوْلَا إِدْخِيلُهُمْ فِي النَّارِ لَأَكْبَرُوا** সম্মোদন পদে বলা উচিত ছিল; যেমন গুরুত্রে **سَيَعْلَمُونَ** সম্মোদন পদে বলা হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাক এই সৎক্ষিপ্ত বাক্য ছেড়ে দিয়ে পদ্ধতি পরিবর্তন করতঃ সম্মোদনপদের পরিবর্তে **ظَنَّ النَّاسُ** বলেছে। এতে হাক্ষা ইঙ্গিত রয়েছে যে, যাদের দ্বারা এই কাজ সংঘটিত হয়েছে, তারা এই কাজের প্রেক্ষাপটে মুমিন কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কেননা, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে এটাই ছিল ঈমানের দাবী।

এখানে তৃতীয় প্রশিধানযোগ্য বিষয় এই, আয়াতের শেষ বাক্য **هَذَا فَكُّكُمْ بِهِ** এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, খবরটি শোনামাত্রই মুসলমানদের 'এটা প্রকাশ্য মিথ্যা' বলে দেয়াই ছিল ঈমানের দাবী।

لَوْلَا إِدْخِيلُهُمْ فِي النَّارِ لَأَكْبَرُوا - অর্থ, তোমরা যখন এই অপবাদের

খবর রটনাকারীদের কথা চালু করার পরিবর্তে মুসলমানদের উচিত ছিল

তাদের কাছে প্রমাণ দাবী করা। ব্যাভিচারের অপবাদ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত প্রমাণ চার জন সাক্ষী ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তাদের কাছে এরূপ দাবী করা উচিত যে, তোমরা তোমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর, নতুবা মুখ বন্ধ কর। দ্বিতীয় বাক্য বলা হয়েছে, যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারল না, তখন আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্যাবাদী।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ - অর্থ

যেসব মুসলমান ভুলক্রমে এই অপবাদে কোন

لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ أَنْ تَتَّخِذَ الْفَلَاحَةَ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَعْنًا
عَذَابَ الْكَفْرِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَ
الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ
يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاحِشَاتِ لَعْنَةُ اللَّهِ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَبْدَأُ عَلَيْهِمُ
الْعَذَابُ وَأَلَيْسَ لَهُمْ دَاعٍ يَمْلِكُ أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ يُؤْقِعُ لَهُمُ
اللَّهُ ذُنُوبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٤﴾ أَلَمْ يَجْعَلِ
لِلْمُحْسِنِينَ وَالْمُتَّقِينَ الْإِمَامَاتِ وَالَّذِينَ هُمْ يُوقِعُونَ
لِلْمُطَّيِّبِينَ أُولَئِكَ مَرْيُومٌ وَمِمَّا يَفْتُلُونَ أَمْ مَعْرُوفٌ وَرَزَقْنَاهُمْ

(১৯) যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (২০) যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত এবং আল্লাহ দয়ালু, মেহেরবান না হতেন, তবে কত কিছুই হয়ে যেত। (২১) হে ঈমানদারগণ, তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন। (২২) তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমশীল, পরম করুণাময়। (২৩) যারা সতী-সাম্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে শিক্ত এবং তাদের জন্যে রয়েছে গুরুতর শাস্তি। (২৪) যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহবা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা কত; (২৫) সেদিন আল্লাহ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী। (২৬) দুসরিত্রা নারীকুল দুসরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং দুসরিত্র পুরুষকুল দুসরিত্রা নারীকুলের জন্যে। সছরিত্রা নারীকুল সছরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং সছরিত্র পুরুষকুল সছরিত্রা নারীকুলের জন্যে। তাদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, তার সাথে তারা সম্পর্কহীন। তাদের জন্যে আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

না কোনরূপে অংশ গ্রহণ করেছিল, এরপর তওবা করেছিল এবং কেউ কেউ শাস্তিও ভোগ করেছিল এই আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এই আয়াত তাদের সবাইকে একথাও বলেছে যে, তোমাদের অপরাধ খুবই গুরুতর ছিল। এর কারণে দুনিয়াতেও আযাব আসতে পারত, যেমন পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর এসেছে এবং পরকালেও কঠোর শাস্তি হত। কিন্তু মুসলমানদের সাথে আল্লাহ তাআলার আচরণ দয়া ও অনুগ্রহমূলক ইহকালেও এবং পরকালেও। তাই এই শাস্তি তোমাদের উপর থেকে অস্থগিত হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রথমে তিনি ইসলাম ও ঈমানের তওফীক দিয়েছেন, এরপর রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সৎসঙ্গ দান করেছেন। এটা আযাব অবতরণের পথে প্রতিবন্ধক। এরপর কৃত গোনাহের জন্যে সত্যিকার তওবার তওফীক দিয়েছেন এবং তওবা কবুল করেছেন। পরকালে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার প্রভাবে তোমাদেরকে ক্ষমা, মার্জনা ও মাগফেরাতের ওয়াদা দিয়েছেন।

إِذْ تَلَقَوْهُ تَلَفًا - শব্দের মর্ম এই যে, একে অন্যের কাছে

জিজ্ঞাসা ও বর্ণনা করে। এখানে কোন কথা শুনে তার সত্যাসত্য যাচাই না করে সামনে চালু করে দেয়া বোঝানো হয়েছে।

وَعَسَوْهُ تَبَيَّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزِيمٌ - অর্থাৎ, তোমরা একে তুচ্ছ

ব্যাপার মনে করেছিলে যে, যা শোনলে তাই অন্যের কাছে বলতে শুরু করেছিলে। তোমরা সত্যাসত্য যাচাই না করে এমন কথা চালু করে দিয়েছিলেন, যদ্বন্ধন অন্য মুসলমান দারুণ মর্মান্বিত হয় লাক্ষিত হয়, এবং তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُكَافِرُونَ كِبَارًا أَنْ تَنْتَكِرُوا هَذَا نَسِجَتَكُمْ

সাহাবায়ে-কেরামকে উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেয়া হয়েছে :

انشلا- শব্দের অর্থ কসম খাওয়া। হযরত আয়েশার প্রতি অপবাদের ঘটনায় মুসলমানদের মধ্যে মিসতাহ ও হাসসান জড়িয়ে পড়েছিলেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাদের প্রতি অপবাদের হদ প্রয়োগ করেন। তাঁরা উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী এবং বদর-যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। কিন্তু তাঁদের দ্বারা একটি ভুল হয়ে যায় এবং তাঁরা ষাটি তওবার তওফীক লাভ করেন। আল্লাহ তাআলা যেমন হযরত আয়েশার দোষমুক্ততা নাযিল করেন, এমনিভাবে এই মুসলমানদের তওবা কবুল করা ও ক্ষমা করার কথাও ঘোষণা করে দেন।

মিসতাহ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর আত্মীয় ও নিঃস্ব ছিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। যখন অপবাদের ঘটনার সাথে তাঁর জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হল, তখন কন্যা-বৎসল পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক কন্যাকে এমন কষ্টদানের কারণে স্বাভাবিকভাবেই মিসতাহর প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি কসম খেয়ে বসলেন, ভবিষ্যতে তাকে কোনরূপ আর্থিক সাহায্য করবেন না। বলাবাহুল্য, কোন বিশেষ ফকিরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা নির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ মুসলমানের উপর ওয়াজিব নয়। কেউ কারো আর্থিক সাহায্য করার পর যদি বন্ধ করে দেয়, তবে গোনাহর কোন কারণ

নেই। কিন্তু সাহায্যে কেরামের দলকে আল্লাহ তাআলা বিশ্বের জন্যে একটি আদর্শ দলরূপে গঠন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তাই একদিকে বিচ্যুতিকারীদেরকে ঋণী তওবা এবং ভবিষ্যত সংশোধনের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং অপরদিকে যারা স্বাভাবিক মনোকষ্টের কারণে গরীবদের সাহায্য ত্যাগ করার কসম খেয়েছিলেন, তাদেরকেও আদর্শ চরিত্রের শিক্ষা আলোচ্য আয়াতে দান করেছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে, তারা যেন কসম ভঙ্গ করে কাফ্ফারা দিয়ে দেয়। গরীবদের আর্থিক সাহায্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া তাদের উচ্চমর্যাদার পক্ষে সমীচীন নয়। আল্লাহ তাআলা যেমন তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন, তেমনি তাদেরও ক্ষমা ও মার্জনা প্রদর্শন করা উচিত।

হযরত মিসতাহকে আর্থিক সাহায্য করা হযরত আবু বকরের দায়িত্ব বা ওয়াজিব কর্তব্য ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা কথারূপে এভাবে বলেছেন : যেসব জ্ঞানী-শুণীকে আল্লাহ তাআলা ধর্মীয় উৎকর্ষতা দান করেছেন এবং যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করার আর্থিক সঙ্গতিও রাখে, তাদের এরূপ কসম খাওয়াই উচিত নয়। আয়াতে **وَأُولَ الْفَضْلِ** ও **وَالسَّعَةِ** এ অর্থই ব্যক্ত হয়েছে।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে : **اَلْكَافِرُونَ اَنْ يَغْفِرَ لِلّٰهِ** অর্থাৎ, তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের গোনাহ মার্ফ করবেন? আয়াত শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বলে উঠেন : **وَاللّٰهُ اَنِ احَبُّ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لِي** অর্থাৎ আল্লাহর কসম আল্লাহ আমাকে মার্ফ করুন, আমি অবশ্যই তা পছন্দ করি। এরপর তিনি হযরত মিসতাহর আর্থিক সাহায্য পুনর্বহাল করে দেন এবং বলেন : এ সাহায্য কোন দিন বন্ধ হবে না।—(বুখারী, মুসলিম)

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَاسْوَدُّواْ وَاسْوَدُّواْ وَمَا كَانُواْ لَمْ يَكُنُوْا

অর্থাৎ যেদিন তাদের বিরুদ্ধে স্বয়ং তাদের জিহ্বা ও হস্তপদাদি কথা বলবে এবং তাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্য দেবে। হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন যে গোনাহ্গার তার গোনাহ্ স্বীকার করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে মার্ফ করে দেবেন এবং হাশরের মাঠে সবার দৃষ্টি থেকে তার গোনাহ্ গোপন রাখবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সেখানেও অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এ কাজ করিনি; পরিদর্শক ফেরেশতারা ভুলে এটা আমার আমলনামা লিখে দিয়েছে, তখন তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। তখন তারা বলবে এবং সাক্ষ্য দেবে। **اَلْيَوْمَ نَخْتُمُ** আয়াতে একথাই বর্ণিত হয়েছে। তবে এতে মুখে মোহর মেরে দেয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের জিহ্বা সাক্ষ্য দেবে। উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, তারা তাদের জিহ্বাকে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে না যে, সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছা বলে দেবে।

যেমন দুনিয়াতে এরূপ করার ক্ষমতা আছে, বরং তাদের জিহ্বা তাদের ইচ্ছার বিপরীতে সত্য কথা স্বীকার করবে। এটাও সম্ভবপর যে, এক সময় মুখ ও জিহ্বাকে বন্ধ করে দেয়া হবে। এরপর জিহ্বাকে সত্য কথা বলার আদেশ প্রদান করা হবে।

**اَشْهَدُكَ الْيَمِيْنُ وَالْشَّيْءُ الْيَمِيْنُ وَالْكَافِرُ
الْكَافِرُ وَالْكَافِرُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ
يَقُولُونَ اَمْ مِّنْ مَّوَدَّةٍ بَيْنَنَا**

অর্থাৎ, দুচরিত্রা নারীকুল দুচরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং দুচরিত্র পুরুষকুল দুচরিত্রা নারীকুলের জন্যে উপযুক্ত। সচরিত্রা নারীকুল সচরিত্র পুরুষকুলের জন্যে এবং সচরিত্র পুরুষকুল সচরিত্রা নারীকুলের জন্যে উপযুক্ত। এদের সম্পর্কে লোকে যা বলে, এরা তা থেকে পবিত্র। এদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।

এই সর্বশেষ আয়াতে প্রথমতঃ সাধারণ বিধি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবে যোগসূত্র রেখেছেন। দুচরিত্রা, ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারী পুরুষের প্রতি এবং দুচরিত্র ও ব্যভিচারী পুরুষ দুচরিত্রা নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এমনিভাবে সচরিত্রা নারীদের আগ্রহ সচরিত্র পুরুষদের প্রতি এবং সচরিত্র পুরুষদের আগ্রহ সচরিত্রা নারীদের প্রতি হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আগ্রহ অনুযায়ী জীবনসঙ্গী খোঁজ করে নেয় এবং প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী সে সেরগুই পায়।

এই সামগ্রিক অভ্যাস ও রীতি থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক পয়গম্বরগণকে আল্লাহ তাআলা পত্নীও তাঁদের উপযুক্তরূপ দান করেন। এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ তাআলা বাহ্যিক পবিত্রতা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় তাঁরই মত রমনীকুল দান করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা এই বিবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্টতমা ছিলেন। স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি যার ঈমান নেই, সে-ই হযরত আয়েশা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে। কোরআন পাকে বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ ও হযরত লূত (আঃ)-এর বিবিগণ কাফের ছিল। কিন্তু তাদের সম্পর্কে এ কথাও প্রমাণিত আছে যে, কাফের হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্যভিচার ও পাপাচারে লিপ্ত ছিল না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : **مَا بَغَتْ امْرَاَةٌ نَبِيًّا** অর্থাৎ, কোন পয়গম্বরের বিবিই কোনদিন ব্যভিচার করেনি।—(দুরের-মনসুর) এ থেকে জানা গেল যে, পয়গম্বরের বিবি কাফের হবে—এটা তো সম্ভবপর, কিন্তু ব্যভিচারিণী হবে—এটা সম্ভবপর নয়। কেননা, ব্যভিচারী স্বাভাবিকভাবেই জনগণের ঘৃণার পাত্র। কিন্তু কুফর প্রকৃতিগতভাবে ঘৃণার কারণ হয় না।—(বয়ানুল-কোরআন)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْأَلُوا
وَسْأَلُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ وَإِنْ تَمْنَوْا
فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ رَجِعُوا
فَارْجِعُوا وَارْؤُا أَنْ لَكُمْ وَاللَّهُ يَتَعَوَّنُ مِنْ أَغْيَابِكُمْ ۚ جَاءَتْ
أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْهِنُونَ
وَمَا تُكْسِرُونَ ۚ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا
أَوْرَاقَهُمْ ذَلِكَ أَدْنَى لِمَا رِئَاكَ اللَّهُ خَيْرٌ لِمَا يَصْنَعُونَ ۚ وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِرِجْلِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أُولَئِكَ يُبْهِنُونَ أُولَئِكَ يُبْهِنُونَ أَوْ
أَبْنَائَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانَهُنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ
بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَآلُ النَّسَبِ مِنْ
أُولَئِكَ الْأَرْبَابُ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَلَدُ الَّذِينَ لَا يُظْهَرُونَ عَلَى
عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(২৭) হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ বতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা সুরক্ষা রাখ। (২৮) যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্যে অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন। (২৯) যে গৃহে কেউ বাস করে না, যাতে তোমাদের সামগ্রী আছে এমন গৃহে প্রবেশ করতে তোমাদের কোন পাপ নেই এবং আল্লাহ জানেন তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর। (৩০) মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাস্থের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্যে খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। (৩১) ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার গুঁড়না বন্ধদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক অধিকারভুক্ত বাদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্যে জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।

অনুমতি ছাড়া কারোও গৃহে প্রবেশ করো নাঃ পরিতাপের বিষয়, ইসলামী শরীয়ত এ ব্যাপারটিকে যতই গুরুত্ব দিয়েছে, কোরআনে এর বিস্তারিত বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়েছে এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে এর প্রতি জোর দিয়েছেন, সেই পরিমাণেই মুসলমানরা আজকাল এ ব্যাপারে উদাসীন। লেখা-পড়া জানা সং লোকেরাও একে গোনাহ মনে করে না এবং একে বাস্তবায়িত করার চেষ্টাও করে না। জগতের অন্যান্য সভ্য জাতি একে অবলম্বন করে তাদের সমাজ সুসংহত করে নিয়েছে, কিন্তু মুসলমানরাই সবার পেছনে পড়ে রয়েছে। ইসলামী বিধি-বিধানসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম এই বিধানের প্রতিই উপেক্ষা প্রদর্শন শুরু হয়েছে। মোটকথা, অনুমতি চাওয়া কোরআন পাকের একটি অপরিহার্য বিধান, যাতে সামান্য অলসতা ও পরিবর্তনকেও হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) কোরআনের আয়াত অস্বীকার করার মতো গুরুতর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বাস্তবিকই বর্তমানে মুসলমানরা এসব বিধানের প্রতি এমন উপেক্ষা প্রদর্শন করে চলছে, যেন তাদের মতে এগুলো কোরআনের বিধানই নয়। ইনাল্লাহু

অনুমতি চাওয়ার রহস্য ও উপকারিতা : আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে বসবাসের জায়গা দিয়েছেন। তা মালিকানাধীন হোক কিংবা ভাড়া করা হোক, সর্বাবস্থায় তারই গৃহ তার আবাসস্থল। আবাসস্থলের আসল উদ্দেশ্য শান্তি ও আরাম। কোরআন পাক অমূল্য নেয়ামতরাজির উল্লেখ প্রসঙ্গে এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেঃ

جَلَّ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ مَسْكًا
অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের গৃহে তোমাদের জন্যে শান্তি ও আরামের ব্যবস্থা করেছেন। এই শান্তি ও আরাম তখনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে, যখন মানুষ অন্য কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত নিজ গৃহে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ ও বিশ্রাম করতে পারে। তার স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা গৃহের আসল উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে দেয়ার নামান্তর। এটা খুবই কষ্টের কথা। ইসলাম কাউকে অহেতুক কষ্ট দেয়াকে হারাম করেছে। অনুমতি চাওয়া সম্পর্কিত বিধানাবলীর একটি বড় উপকারিতা হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতায় বিঘ্ন সৃষ্টি ও কষ্টদান থেকে বিরত থাকা, যা প্রত্যেক সম্ভাব্য মানুষের যুক্তিসঙ্গত কর্তব্যও বটে। দ্বিতীয় উপকারিতা স্বয়ং সাক্ষাতপ্রার্থী। সে যখন অনুমতি নিয়ে ভদ্রজনেচিতিভাবে সাক্ষাত করবে, তখন প্রতিপক্ষ তার বক্তব্য যত্নসহকারে শুনবে। তার কোন অভাব থাকলে তা পূরণ করার প্রেরণা তার অন্তরে সৃষ্টি হবে। এর বিপরীতে অভদ্রজনেচিতি পন্থায় কোন ব্যক্তির উপর বিনানুমতিতে চড়াও হয়ে গেলে সে তাকে আকস্মিক বিপদ মনে করে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় করে দিতে চেষ্টা করবে এবং হিতাকাঙ্খার প্রেরণা থাকলেও তা নিস্তেজ হয়ে যাবে। অপরদিকে আগন্তুক ব্যক্তি মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার পাশে পাশী হবে।

তৃতীয় উপকারিতা নির্লজ্জতা ও অশ্রীলতা দমন। কারণ, বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশ করলে মাহরাম নয়, এমন নারীর উপর দৃষ্টি পড়া এবং অন্তরে কোন রোগ সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। এদিকে লক্ষ্য করেই অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলীকে কোরআন পাক ব্যতিচার, অপবাদ ইত্যাদি শাস্তির বিধি-বিধান সংলগ্নে বর্ণনা করেছে।

চতুর্থ উপকারিতা এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে নিজ গৃহের নির্জনতায় এমন কাজ করে, যে সম্পর্কে অপরকে অবহিত করা সমীচীন মনে করে না। যদি কেউ অনুমতি ব্যতিরেকে গৃহে ঢুকে পড়ে, তবে ভিন্ন লোক তার

গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। কারো গোপন কথা জবরদস্তি জানার চেষ্টা করাও গোনাহ্ এবং অপরের জন্যে কষ্টের কারণ। অনুমতি গ্রহণের কিছু মাসআলা আলাচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। প্রথমে এগুলো ব্যাখ্যা ও বিবরণ দেখা যেতে পারে। অবশিষ্ট বিবিধ ও মাসআলা পরে বর্ণিত হবে।

মাসআলা : আয়াতে **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যা পুরুষের জন্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নারীরাও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত, যেমন কোরআনের অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষদেরকে সম্বোধন করা সত্ত্বেও মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কতিপয় বিশেষ মাসআলা এর ব্যতিক্রম। তবে এগুলোর ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে বিশেষত্বের কথাও বর্ণনা করে দেয়া হয়। সাহাবয়ে কোরামের স্ত্রীগণের অভ্যাসও তাই ছিল। তাঁরা কারো গৃহে গেলে প্রথমে অনুমতি নিতেন। হযরত উম্মে আয়াস (রাঃ) বলেন : আমরা চার জন মহিলা প্রায়ই হযরত আয়েশার গৃহে যেতাম এবং প্রথমে তাঁর কাছে অনুমতি চাইতাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা ভেতরে প্রবেশ করতাম — (ইবনে-কাসীর)

মাসআলা : এই আয়াতের ব্যাপকতা থেকে জানা গেল যে, অন্য কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়ার বিধান নারী, পুরুষ, মাহরাম ও গায়র-মাহরাম সবাই শামিল রয়েছে। নারী নারীর কাছে গেলে অথবা পুরুষ পুরুষের কাছে গেলে সবার জন্যেই অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব। এমনভাবে এক ব্যক্তি যদি তার মা, বোন অথবা কোন মাহরাম নারীর কাছে যায়, তবুও অনুমতি চাওয়া আবশ্যিক। ঈমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে আতা ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল : আমি আমার মাতার কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাইব? তিনি বললেন : হাঁ, অনুমতি চাও। সে বলল : ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি তো আমার মাতার গৃহেই বসবাস করি। তিনি বললেন, তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। লোকটি আবার বলল : ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি তো সর্বদা তাঁর কাছেই থাকি। তিনি বললেন : তবুও অনুমতি না নিয়ে গৃহে যেয়ো না। তুমি কি তোমার মাতাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখা পছন্দ কর? সে বলল : না। তিনি বললেন : তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যিক। কেননা, গৃহে কোন প্রয়োজনে তার অপ্রকাশযোগ্য কোন অঙ্গ খোলা থাকতে পারে — (মায়হারী)

এই হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হল যে, আয়াতে তোমাদের নিজেদের গৃহ বলে এমন গৃহ বোঝানো হয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একা থাকে—পিতা-মাতা, ভাই-বোন প্রমুখ থাকে না।

মাসআলা : যে গৃহে শুধু নিজের স্ত্রী থাকে তাতে প্রবেশ করার জন্যে যদিও অনুমতি চাওয়া ওয়াজিব নয় : কিন্তু মোস্তাহাব ও সুন্নত এই যে, সেখানেও হঠাৎ বিনা খবরে যাওয়া উচিত নয়; বরং প্রবেশের পূর্বে পদধ্বনি দ্বারা অথবা গলা খেঁড়ে হুশিয়ার করা দরকার। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী বলেন, আবদুল্লাহ যখন বাইরে থেকে গৃহে আসতেন, তখনই প্রথমে দরজার কড়া নেড়ে আমাকে হুশিয়ার করে দিতেন, যাতে তিনি আমাকে অপছন্দনীয় অবস্থায় না দেখেন। — (ইবনে-কাসীর) এক্ষেত্রে অনুমতি চাওয়া যে ওয়াজিব নয়, তা এ থেকে জানা যায় যে, ইবনে জুরায়জ হযরত আতাকে জিজ্ঞেস করলেন : নিজের স্ত্রীর কাছে যাওয়ার সময়ও কি অনুমতি চাওয়া জরুরী? তিনি বললেন : না। ইবনে-কাসীর এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলেন : এর অর্থ ওয়াজিব নয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও মোস্তাহাব ও উত্তম।

অনুমতি গ্রহণের সুন্নত তরীকা : আয়াতে **حَتَّى تَسْمَعُوا** **وَيَسْمَعُوا مِنْ أَهْلِهَا** বলা হয়েছে; অর্থাৎ, দুইটি কাজ না করা পর্যন্ত

কারও গৃহে প্রবেশ করা না। প্রথম **استيناس** শাব্দিক অর্থ খ্রীতি বিনিময় করা। বিশিষ্ট তফসীরকারগণের মতে এর অর্থ অনুমতি হাসিল করা। এখানে **استيناس** শব্দ উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতি লাভ করার দ্বারা প্রতিপক্ষ পরিচিত ও আপন হয়—সে আতঙ্কিত হয় না। দ্বিতীয় কাজ এই যে, গৃহের লোকদেরকে সালাম কর। কোন কোন তফসীরকার এর অর্থ নিয়েছেন যে, প্রথমে অনুমতি লাভ কর এবং গৃহে প্রবেশের সময় সালাম কর। কুরত্বী এই অর্থই পছন্দ করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতে অগ্র-পশ্চাৎ নেই। তিনি আবু আইয়ুব আনসারীর হাদীসের সারমর্ম তাই সাব্যস্ত করেছেন। মাওয়ারী বলেন, যদি অনুমতি নেয়ার পূর্বে গৃহের কোন ব্যক্তির উপর দৃষ্টি পড়ে, তবে প্রথমে সালাম করবে, এরপর অনুমতি চাইবে। নতুবা প্রথমে অনুমতি নেবে এবং গৃহে যাওয়ার সময় সালাম করবে। কিন্তু অধিকাংশ হাদীস থেকে সুন্নত তরীকা এটাই জানা যায় যে, প্রথমে বাইরে থেকে সালাম করবে, এরপর নিজের নাম নিয়ে বলবে যে, অমুক ব্যক্তি সাক্ষাত করতে চায়।

ঈমাম বোখারী আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি প্রথমে অনুমতি চায়, তাকে অনুমতি দিও না। কারণ, সে সুন্নত তরীকা ত্যাগ করেছে। — (রুহুল-মা'আনী) আবু দাউদের এক হাদীসে আছে, বনী আমেরের জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বাইরে থেকে বলল : **السلام** আমি কি ঢুকে পড়ব? তিনি খাদেমকে বললেন : লোকটি অনুমতি চাওয়ার নিয়ম জানে না। বাইরে গিয়ে তাকে নিয়ম শিখিয়ে দাও। সে বলল : **السلام عليكم ادخل** অর্থাৎ, সালাম করার পর বলবে যে, আমি প্রবেশ করতে পারি কি? খাদেম বাইরে যাওয়ার আগেই লোকটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথা শুনে **السلام عليكم ادخل** বলল। অতঃপর তিনি তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন। — (ইবনে-কাসীর) বায়হাকী হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেছেন **لا تأذن لمن لا يبيد بالسلام** — অর্থাৎ, যে প্রথমে সালাম করে না, তাকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিও না। — (মায়হারী) এই ঘটনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) - দু'টি সংশোধন করেছেন — প্রথমে সালাম করা উচিত এবং **ادخل** - এর স্থলে **السلام** শব্দের ব্যবহার অসমীচীন। কেননা, **السلام** শব্দটি **ولوح** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন সংকীর্ণ জায়গায় ঢুকে পড়া। শব্দটি মজিহত ভাষার পরিপন্থী। মোটকথা, এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, আয়াতে যে সালাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা অনুমতি চাওয়ার সালাম। অনুমতি গ্রহণের জন্যে বাইরে থেকে এই সালাম করা হয়, যাতে ভেতরের লোক এদিকে মনোনিবেশ করে এবং অনুমতি চাওয়ার বাক্য শোনে। গৃহে প্রবেশ করার সময় যথারীতি পুনরায় সালাম করতে হবে।

মাসআলা : উপরে হাদীসগুলো থেকে প্রথমে সালাম ও পরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। এতে নিজের নাম উল্লেখ করে অনুমতি চাওয়াই উত্তম। হযরত ওমর ফারাক (রাঃ) তাই করতেন। একবার তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দ্বারে এসে বললেন, **السلام** **علي رسول الله** অর্থাৎ, সালামের পর বললেন, ওমর প্রবেশ করতে পারে কি? — (ইবনে-কাসীর) সহীহ মুসলিমে আছে, হযরত আবু মুসা হযরত ওমরের কাছে গেলেন এবং

অনুমতি চাওয়ার জন্যে বললেন, السلام عليكم هذا ابو موسى السلام عليكم هذا الاشعري বলেছেন, এরপর আরও নির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যে আশআরী বলেছেন। এর কারণ এই যে, অনুমতি প্রার্থীকে না চেনা পর্যন্ত নিরুদ্বেগে জওয়াব দেয়া যায় না।

لَا تَقُولُ لَمْ يَجْعَلْ فَإِنَّهُمْ لَكَ الْمَوَالِكُ — অর্থাৎ, যদি

আপনাকে আপাততঃ ফিরে যেতে বলা হয়, তখন আপনার হৃদয়টিতে ফিরে আসা উচিত। একে খারাপ মনে করা অথবা সেখানেই অটল হয়ে বসে থাকা উভয়ই অসঙ্গত। পূর্ববর্তী কালের জঁকেন বুয়ুর্গ বলেন : আমি সারা জীবন এই আশায় ছিলাম যে, কারো কাছে গিয়ে অনুমতি চাই এবং সে আমাকে জওয়াবে ফিরে যেতে বলে, তখন আমি ফিরে এসে কোরআনের এই আদেশ পালনের সওয়াব হাসিল করি; কিন্তু হায়, এই নেয়ামত কখনও আমার ভাগ্যে জুটল না।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَكُمْ مُسْتَوْدِعِينَ فَهَذَا مَثَلُهُ

مَثَلُهُ — শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুকে ভোগ করা, ব্যবহার করা এবং তদ্বারা উপকৃত হওয়া। যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, তাকেও مَثَلُهُ বলা হয়। এই আয়াতে আভিধানিক অর্থই বোঝানো হয়েছে। ‘অনুবাদ করা হয়েছে’ ভোগ অর্থাৎ, ভোগ করার অধিকার। হযরত আবু বকর সিদ্দীক থেকে বর্ণিত আছে, যখন বিনানুমতিতে কারও গৃহে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত উল্লেখিত আয়াত নাথিল হয়, তখন তিনি রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে আরম্ভ করলেন : ইয়া রসুলুল্লাহ, এই নিষেধাজ্ঞার পর কোরাইশদের ব্যবসাজীবী লোকেরা কি করবে? মক্কা ও মদীনা থেকে সুদূর শামদেশ পর্যন্ত তারা বাণিজ্যিক সফর করে। পশ্চিমধ্যে স্থানে স্থানে সরাইখানা আছে। তারা এগুলোতে অবস্থান করে। এগুলোতে কোন স্থায়ী বাসিন্দা থাকে না। এখানে অনুমতি চাওয়ার কি উপায়? কার কাছ থেকে অনুমতি লাভ করা হবে? এর পরিশ্রেক্ষিত উপরোক্ত আয়াত নাথিল হয় —(মায়হারী) শানে নুযুলের এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আয়াতে بَيُّوتَكُمْ مُسْتَوْدِعِينَ বলে এমন গৃহ বোঝানো হয়েছে, যা কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাসগৃহ নয়; বরং সেটাকে ভোগ করার ও সেখানে অবস্থান করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। যেমন, বিভিন্ন শহরে ও প্রান্তরে এই উদ্দেশ্যে নির্মিত মুসাফিরখানা সমূহ এবং একই কারণে মসজিদ, খানকাহ, ধর্মীয় পাঠাগার, হাসপাতাল, ডাকঘর, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, জাতীয় চিত্রবিনোদন কেন্দ্র ইত্যাদি সব জনহিতকর প্রতিষ্ঠানও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এসব স্থানে প্রত্যেকেই বিনানুমতিতে প্রবেশ করতে পারে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পর্দাপ্রথা : নির্লজ্জতা দমন ও সতীত্ব সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় : মহিলাদের পর্দা সম্পর্কিত প্রথম আয়াত সূরা আহযাবে উম্মুল মুমিনীন হযরত যখনব বিনতে জাহাশের সাথে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর বিবাহের সময় অবতীর্ণ হয়। এর তারিখ কারো মতে তৃতীয় হিজরী এবং কারো মতে পঞ্চম হিজরী। তফসীর ইবনে-কাসীর ও নায়লুল আওতার গ্রন্থে পঞ্চম হিজরীকে অগ্রগণ্যতা দান করা হয়েছে। রূকন-মা’আনীতে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, পঞ্চম হিজরীর যিলকদ মাসে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, পর্দার আয়াত এই বিয়ের সময়ই অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা নূরের আলোচ্য আয়াতসমূহ বনী-মুস্তালিক

যুদ্ধ অথবা মুরাইসী যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে সংঘটিত অপবাদের ঘটনার সাথে সাথে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধ ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত হয়। এই আলোচনা থেকে জানা যায় যে, সূরা নূরের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ পরে এবং সূরা আহযাবের পর্দা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ আগে অবতীর্ণ হয়। সূরা আহযাবের আয়াতসমূহ নাথিল হওয়ার সময় থেকেই পর্দার বিধানাবলী প্রবর্তিত হয়। তাই সূরা আহযাবেই ইনশা-আল্লাহ পর্দা সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হবে। এখানে শুধু সূরা নূরের আয়াতসমূহের তফসীর লিখিত হচ্ছে।

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ يُضْطَوْنَ أَكْبَرُ مِنْهُمُ يَضْطَوْنَ فَزُجِّهِمْ ذَلِكَ أَكْبَرُ

لَهُمْ مِنَ اللَّهِ حُجْرٌ لَا يَصْنَعُونَ — শব্দটি غَض থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ

কম করা এবং নত করা।—(রাগিব) দৃষ্টি নত রাখার অর্থ দৃষ্টিকে এমন বস্তু থেকে ফিরিয়ে নেয়া যার প্রতি দেখা শরীয়তে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। ইবনে-কাসীর ও ইবনে-হাইয়্যান এ তফসীরই করেছেন। বেগানা নারীর প্রতি বদ-নিয়তে দেখা হারাম এবং বিনা নিয়ত দেখা মাকরুহ—এ বিধানটি এর অন্তর্ভুক্ত। কোন নারী অথবা পুরুষের গোপনীয় অঙ্গের প্রতি দেখাও এর মধ্যে দাখিল। (চিকিৎসা ইত্যাদির কারণে প্রয়োজনীয় অঙ্গ এ থেকে ব্যতিক্রমভূক্ত।) এ ছাড়া কারো গোপন তথ্য জানার জন্য তার গৃহে উকি মেরে দেখা এবং যেসব কাজে দৃষ্টি ব্যবহার করা শরীয়ত নিষিদ্ধ করেছে, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত।

وَضَعُفُهُمْ يَوْمَئِذٍ فَزُجِّهِمْ — যৌনাঙ্গ সংযত রাখার অর্থ এই যে, কুপ্রবৃত্তি

চরিতার্থ করার যত পন্থা আছে, সবগুলো থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখা। এতে ব্যভিচার, পুংমথুন, দুই নারীর পারস্পরিক ঘর্ষণ—যাতে কামভাব পূর্ণ হয় এবং হস্তমথুন ইত্যাদি সব অবৈধ কর্ম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য অবৈধ ও হারাম পন্থায় কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা এবং তার সমস্ত ভূমিকাকে নিষিদ্ধ করা। তন্মধ্যে কাম-প্রবৃত্তির প্রথম ও প্রারম্ভিক কারণ হচ্ছে—দৃষ্টিপাত করা ও দেখা এবং সর্বশেষ পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। এ দু’টিকে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করে হারাম করে দেয়া হয়েছে। এতদুভয়ের অন্তর্ভুক্তি হারাম ভূমিকাসমূহ—যেমন কথাবার্তা শোনা, স্পর্শ করা ইত্যাদি প্রসঙ্গক্রমে এগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

ইবনে কাসীর হযরত ওবায়দা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যদ্বারা আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ হয়, তাই কবীরা। কিন্তু আয়াতে তার দুই প্রান্ত—সূচনা ও পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। সূচনা হচ্ছে চোখ তুলে দেখা এবং পরিণতি হচ্ছে ব্যভিচার। তাবারানী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

দৃষ্টিপাত শয়তানের একটি বিষাক্ত শর। যে ব্যক্তি মনের চাহিদা সন্তুষ্ট ও দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, আমি তার পরিবর্তে তাকে সুদৃঢ় ঈমান দান করব, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।

সহীহ মুসলিমে হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী থেকে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইচ্ছা ছাড়াই হঠাৎ কোন বেগানা নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হলে সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।—(ইবনে-কাসীর) হযরত আলী (রাঃ)—এর হাদীসে আছে, প্রথম দৃষ্টি মাফ এবং দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত গোনাহ। এর উদ্দেশ্যও এই যে, প্রথম দৃষ্টিপাত

অকস্মাৎ ও অনিচ্ছাকৃত হওয়ার কারণে ক্ষমার্হ। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম দৃষ্টিপাতও ক্ষমার্হ নয়।

শুশ্রূষবিহীন বালকদের প্রতি ইচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করার বিধান ও অনুরূপ : ইবনে-কাসীর লিখেছেন : পূর্ববর্তী অনেক মনীষী শুশ্রূষবিহীন বালকদের প্রতি অপলক নেত্র তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন এবং অনেক আলেমের মতে এটা হারাম। সম্ভবতঃ এটা তখনকার ব্যাপারে, যখন বদনয়িত ও কামভাব সহকারে দেখা হয়।

বেগানাকে দেখা হারাম সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ :
وَكُلُّ لَوْطَةٍ يُضَوِّنُ مِنْ لَهَاوْنٍ

সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের জন্যে ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু জোর দেয়ার জন্যে তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মাহ্রাম ব্যতীত কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীদের জন্যে হারাম। অনেক আলেমের মতে নারীদের জন্যে মাহ্রাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি দেখা সর্বাবস্থায় হারাম; কামভাব সহকারে বদ-নয়িতে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। তার প্রমাণ হযরত উম্মে-সালমা বর্ণিত হাদীস যাতে বলা হয়েছে : একদিন হযরত উম্মে-সালমা ও মায়মুনা (রাঃ) উভয়েই রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে-মাকতুম তথায় আগমন করলেন। এই ঘটনার সময়কাল ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ করলেন। উম্মে-সালমা আরয় করলেন : ইয়া রসুলুল্লাহ, সে তো অন্ধ, সে আমাদেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তাকে দেখছ।— (আবু দাউদ, তিরমিযী) অপর কয়েকজন ফেকাহবিদ বলেন : কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্যে দোষনীয় নয়। তাদের প্রমাণ হযরত আয়েশার হাদীস, যাতে বলা হয়েছে : একবার ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় কিছু সৎযাক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এই কুচকাওয়াজ নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তাঁর আড়ালে দাঁড়িয়ে হযরত আয়েশাও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত দেখে যান। রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে নিষেধ করেননি। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুমত। আয়াতের ভাষাদুটে আরো বোঝা যায় যে, বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে যদি এক নারী অন্য নারীর গোপন অঙ্গ দেখে, তবে তাও হারাম। কেননা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষের গোপন অঙ্গ এবং সমস্ত দেহ মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতীত বাকীগুলো নারীর গোপন অঙ্গ। সবার কাছেই এসব জায়গা গোপন রাখা ফরয। কোন পুরুষ কোন পুরুষের গোপন অঙ্গ যেমন দেখতে পারে না, তেমনি কোন নারী অপর কোন নারীর গোপন অঙ্গও প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সুতরাং পুরুষ কোন নারীর গোপন এবং নারী কোন পুরুষের গোপন অঙ্গ দেখলে তা আরও সন্দেহাতীত রূপে হারাম হবে। এটা আলোচ্য আয়াতের বিধান দৃষ্টি নত রাখার পরিপন্থী। কেননা, আয়াতের উদ্দেশ্য শরীয়তে নিষিদ্ধ এমন প্রত্যেক বস্তু থেকে দৃষ্টি নত রাখা। এতে নারী কর্তৃক নারীর গোপন অঙ্গ দেখাও অন্তর্ভুক্ত।

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفِتْنَةَ يَكُونُوا مِنَ الْمُنْكَرِينَ

يُؤْتُونَكَ وَيُؤْتُونَكَ مِنَ الْفِتْنَةِ

অভিধানে زينت এমন বস্তকে বলা হয়, যদ্বারা মানুষ নিজেকে সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য করে। এটা উৎকৃষ্ট বস্তু হতে পারে এবং অলংকারও হতে পারে। এসব বস্তু যদি কোন নারীর দেহে না থেকে পৃথকভাবে থাকে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে এগুলো দেখা পুরুষদের জন্যে হালাল; যেমন বাজারে বিক্রির জন্যে মেয়েলী পোশাক ও অলংকার ইত্যাদি দেখায় কোন দোষ নেই। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতে زينت এর অর্থ নিয়েছেন সাজ-সজ্জার স্থান; অর্থাৎ, যেসব অঙ্গে সাজ-সজ্জার অলংকার ইত্যাদি পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, সাজ-সজ্জার স্থানসমূহ প্রকাশ না করা মহিলাদের উপর ওয়াজিব।— (রুহুল-মা'আনী) আয়াতের পরবর্তী অংশে নারীর এই বিধান থেকে দু'টি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে : একটি যার প্রতি দেখা হয়, তার হিসেবে এবং অপরটি যে দেখে, তার হিসেবে।

পর্দার বিধানের ব্যতিক্রম : প্রথম ব্যতিক্রম হচ্ছে مَظْهَرُهَا অর্থাৎ, নারীর কোন সাজ-সজ্জার অঙ্গ পুরুষের সামনে প্রকাশ করা বৈধ নয়, অবশ্য সেসব অঙ্গ ব্যতীত, যেগুলো আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে অর্থাৎ, কাজকর্ম ও চলাফেরার সময় সেসব অঙ্গ স্বভাবতঃ খুলেই যায়। এগুলো ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো প্রকাশ করার মধ্যে কোন গোনাহ নেই।— (ইবনে-কাসীর) এতে কোন কোন অঙ্গ বোঝানো হয়েছে এ সম্পর্কে হযরত ইবনে-মাসউদ ও হযরত ইবনে-আব্বাসের তফসীর বিভিন্ন রূপ। হযরত ইবনে মাসউদ বলেন مَظْهَرُهَا বাক্যে উপরের কাপড়; যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এগুলো সাজ-সজ্জার পোশাককে আবৃত রাখার জন্যে পরিধান করা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, প্রয়োজনবশতঃ বাইরে যাওয়ার সময় যেসব উপরের কাপড় আবৃত করা সম্ভবপর নয়, সেগুলো ব্যতীত সাজ-সজ্জার কোন বস্তু প্রকাশ করা জায়েয নয়। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন : এখানে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোন নারী প্রয়োজনবশতঃ বাইরে যেতে বাধ্য হলে কিংবা চালাফেরা ও লেন-দেনের সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালু আবৃত রাখা খুবই দুর্ভাগ্য। অতএব হযরত ইবনে-মাসউদের তফসীর অনুযায়ী নারীর জন্যে বেগানা পুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও খোলা জায়েয নয়। শুধু উপরের কাপড় বোরকা ইত্যাদি প্রয়োজনবশতঃ খুলতে পারে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে-আব্বাসের তফসীর অনুযায়ী মুখমণ্ডল এবং হাতের তালুও বেগানা পুরুষদের সামনে প্রকাশ করা জায়েয। এ কারণে ফেকাহবিদগণের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই একমত যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালুর প্রতি দৃষ্টিপাত করার কারণে যদি অনর্থ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে এগুলো দেখাও জায়েয নয় এবং নারীর জন্যে এগুলো প্রকাশ করাও জায়েয নয়। এমনিভাবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, গোপন অঙ্গ আবৃত করা যা নামাযে সর্বসম্মতিক্রমে ফরয এবং নামাযের বাইরে বিশুদ্ধতম উক্তি অনুযায়ী ফরয, তা থেকে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু ব্যতিক্রমভুক্ত। এগুলো খুলে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ ও দূরস্ত হবে।

কাযী বায়যাতী ও 'খাযেন' এ আয়াতের তফসীরে বলেন : নারীর আসল বিধান এই যে, সে তার সাজ-সজ্জার কোনকিছুই প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্য তাই মনে হয়। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে

স্বভাবতঃ যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে পারবে। বোরকা, চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। নারী কোন প্রয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেন-দেনের প্রয়োজনে কোন সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষমার — গোনাহ নয়। কিন্তু এই আয়াত থেকে কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও পুরুষদের জন্যে জায়েয; বরং পুরুষদের জন্যে দৃষ্টি নত রাখার বিধানই প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাত খুলতে বাধ্য হয়, তবে শরীয়তসম্মত ওয়র ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা পুরুষদের জন্যে অপরিহার্য। এই ব্যাখ্যা পূর্বোল্লিখিত উভয় তফসীরই স্থান পেয়েছে। ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ মাযহাবও এই যে, বেগানা নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও বিনা প্রয়োজনে জায়েয নয়। যাওয়াজের গ্রন্থে ইবনে-হাজার মকী শাফেয়ী ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও এই মাযহাব বর্ণনা করেছেন। নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো খোলা অবস্থায়ও নামায হয়ে যায়, কিন্তু বেগানা পুরুষদের জন্যে এগুলো দেখা শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে জায়েয নয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেসব ফেকাহবাদের মতে মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখা জায়েয, তাঁরাও এ বিষয়ে একমত যে, অনর্থ দেখা দেয়ার আশঙ্কা থাকলে মুখমণ্ডল ইত্যাদি দেখাও নাজায়েয। বলাবাহুল্য, মানুষের মুখমণ্ডলই সৌন্দর্য ও শোভার আসল কেন্দ্র। এটা অনর্থ, ফাসাদ, কামাধিক্য ও গাফিলতির যুগ। তাই বিশেষ-প্রয়োজন যেমন চিকিৎসা অথবা তীব্র বিপদাশঙ্কা ছাড়া বেগানা পুরুষের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখমণ্ডল খোলা নারীর জন্যে নিষিদ্ধ এবং তার দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টিপাত করাও বিনা প্রয়োজনে পুরুষদের জন্যে জায়েয নয়।

وَيَقْرُونَ مَعْرِفُونَ عَلَىٰ نَبِيِّنَ ۚ অর্থাৎ, তারা যেন বন্ধদেশে ওড়না ফেলে রাখে। خمر শব্দটি خمار এর বহুবচন। অর্থ ঐ কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তদ্বারা-গলা ও বক্ষ আবৃত হয়ে যায়। جوب শব্দটি جيب এর বহুবচন-এর অর্থ জামার কলার। প্রাচীনকাল থেকে জামার কলার বন্ধদেশে থাকাই প্রচলিত। তাই জামার কলার আবৃত করার অর্থ বন্ধদেশ আবৃত করা। আয়াতের শুরুতে সাজ-সজ্জা প্রকাশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই বাক্যে সাজ-সজ্জা গোপন রাখার তাকিদ এবং একটা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এর আসল কারণ জাহেলিয়াত যুগের একটি প্রথার বিলোপ সাধন করা। সে যুগে নারীরা ওড়না মাথার উপর ফেলে তার দুই প্রান্ত পৃষ্ঠদেশে ফেলে রাখত। ফলে গলা, বন্ধদেশ ও কান অনাবৃত থাকত। তাই মুসলমান নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন এরূপ না করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত পরস্পর উলটিয়ে রাখে, এতে সকল অঙ্গ আবৃত হয়ে পড়ে। — (রুহুল মা'আনী) এরপর দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এমন পুরুষদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যাদের কাছে শরীয়তে পর্দা নেই। এই পর্দা না থাকার কারণ দ্বিবিধ। (এক), যেসব পুরুষকে ব্যতিক্রমভূক্ত করা হয়েছে, তাদের তরফ থেকে কোন অনর্থের আশঙ্কা নেই। তারা মাহরাম। আল্লাহ তাআলা তাদের স্বভাবকে দৃষ্টিগতভাবে এমন করেছেন, তারা এসব নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ করে; স্বয়ং তাদের পক্ষ থেকে কোন অনর্থের সম্ভাবনা নেই। (দুই), সদাসর্বদা এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পরের প্রতি সহজ ও সরল হয়ে থাকে। স্মার্তব্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহরামকে যে ব্যতিক্রমভূক্ত করা হয়েছে এটা পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম — গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যে গোপন অঙ্গ নামাযে

খোলা জায়েয নয়, তা দেখা মাহরামদের জন্যেও জায়েয নয়।

আলোচ্য আয়াতে পর্দা থেকে আট প্রকার মাহরাম পুরুষের এবং চার প্রকারের অন্যান্য ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে অবতীর্ণ সূরা আহযাবের আয়াতে মাত্র সাত প্রকার উল্লেখিত হয়েছে। সূরা নূরের আয়াতে পাঁচ প্রকার অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে যা পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

হুশিয়ায়ী : সুরণ রাখা দরকার যে, এ স্থলে মাহরাম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বামীও এর অন্তর্ভুক্ত। ফেকাহবাদের পরিভাষায় যার সাথে বিবাহ শুদ্ধ নয়, তাকে মাহরাম বলা হয়। কিন্তু এই অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বার জন ব্যতিক্রমভূক্ত লোকের পূর্ণ বিবরণ এরূপ : প্রথম স্বামী, যার কাছে স্ত্রীর কোন অঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুমত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন منه ولا راي مني و لا راي مني و لا راي مني (রাঃ) আমার বিশেষ অঙ্গ দেখেননি এবং আমি ও তাঁর বিশেষ অঙ্গ দেখিনি।

দ্বিতীয়, পিতা, দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়, শ্বশুর। তাতে দাদা, পরদাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চতুর্থ, নিজ গর্ভজাত সন্তান। পঞ্চম, স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ষষ্ঠ, ভ্রাতা। সহোদর, মৈত্রেয় ও বৈপিত্রেয় সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মামা, খালা ও ফুফার পুত্র, যাদেরকে সাধারণ পরিভাষায় ভাই বলা হয়, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা গায়ের-মাহরাম। সপ্তম, ভাতৃপুত্র। এখানেও সহোদর, মৈত্রেয় বৈপিত্রেয়, ভ্রাতার পুত্র বোঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অষ্টম, ভগ্নিপুত্র। এখানেও সহোদরা, মৈত্রেয় ও বৈপিত্রেয়া বোন বোঝানো হয়েছে। এই আট প্রকার হলো মাহরাম। নবম اَوْلِيَاءُ অর্থাৎ, নিজেদের স্ত্রীলোক; উদ্দেশ্য মুসলমান স্ত্রীলোক। তাদের সামনেও এমনসব অঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই ব্যতিক্রম পর্দার বিধান থেকে — গোপন অঙ্গ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব অঙ্গ তার মাহরাম পুরুষদের সামনে খুলতে পারে না, সেগুলো কোন মুসলমান স্ত্রীলোকের সামনেও খোলা জায়েয নয়। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খোলা ভিন্ন কথা।

نِسَاءُ ۚ মুসলমান স্ত্রীলোক বলা থেকে জানা গেল যে, কাফের মুশরিক স্ত্রীলোকদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। তারা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন : এ থেকে জানা গেল যে, কাফের নারীদের সামনে অঙ্গ প্রকাশ করা কোন মুসলমান নারীর জন্যে জায়েয নয়। কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবিদের সামনে কাফের রমণীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারো মতে কাফের নারী বেগানা পুরুষের মত। কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলমান ও কাফের উভয় প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন; অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। ইমাম রাযী বলেন : প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুসলমান কাফের; সব নারীই نِسَاءُ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী ব্যুৎপত্তি কাফের নারীদের কাছে পর্দা করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা মোস্তাহাব আদেশ। রুহুল মা'আনীতে মুফতী আল্লামা আলুসী এই উক্তি অবলম্বন করে বলেছেন : এই উক্তিই আজকাল মানুষের অবস্থার সাথে বেশী খাপ খায়। কেননা, আজকাল মুসলমান নারীদের কাফের নারীদের কাছে পর্দা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

দশম প্রকার اَوْلِيَاءُ ۚ অর্থাৎ, যারা নারীদের

মালিকানাধীন। এতে দাস-দাসী উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ফেকাহবিদের মতে এখানে শুধু দাসী বোঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কাছে সাধারণ মাহরামের ন্যায় পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত সাইদ ইবনে মুসাইয়্যেব তাঁর সর্বশেষ উক্তিতে বলেন: لا يغرنكم اية النور فانه في الاماء دون الذكور অর্থাৎ, তোমরা সূরা নূরের আয়াতদুটো বিভ্রান্ত হয়ো না যে, مَلَكَاتٍ مُّسْتَكْنَى শব্দের মধ্যে দাসরাও শামিল রয়েছে। এই আয়াতে শুধু দাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী ও ইবনে সিরীন বলেন: পুরুষ দাসের জন্যে তার প্রভু নারীর বেশ পর্যন্ত দেখা জায়েয নয়।— (রুহুল-মা'আনী) এখন প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে যখন শুধু দাসীদেরকেই বোঝানো হয়েছে তখন তারা তো পূর্ববর্তী مَلَكَاتٍ مُّسْتَكْنَى শব্দের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাদেরকে আলাদা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি? জাসসাস এর জওয়াবে বলেন: نِسَاءً শব্দটি বাহ্যিক দিক দিয়ে শুধু মুসলমান নারীদের জন্যে প্রযোজ্য। দাসীদের মধ্যে যদি কেউ কাকেরও থাকে, তবে তাকে ব্যতিক্রমভুক্ত করার জন্যে এই শব্দটি আলাদা আনা হয়েছে।

একাদশ প্রকার اَوَّلِيَّاتٍ مِّنَ الرَّحَالِ হযরত ইবনে আব্বাস বলেন: এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোক বোঝানো হয়েছে, যাদের নারী জাতির প্রতি কোন আগ্রহ ও ঔৎসুক্যই নেই।— (ইবনে-কাসীর) ইবনে জরীর এই বিষয়বস্ত্তই আবু আবদুল্লাহ, ইবনে জুবারর, ইবনে আতিয়া প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই আয়াতে এমনসব পুরুষকে বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোন আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রূপ-গুণের প্রতিও কোন ঔৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। হযরত আয়েশার (রাঃ) হাদীসে আছে, জনৈক নপুংসক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবিরের কাছে আসা-যাওয়া করত। বিবিগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত اَوَّلِيَّاتٍ مِّنَ الرَّحَالِ এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আগমন করতেন। রসূলুল্লাহ তখন তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন।

এ কারণেই ইবনে হাজার মক্কী মিনহাজের টীকায় বলেন: পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন, লিঙ্গকর্তিত অথবা খুব বেশী বৃদ্ধ হয়, তবুও সে غَيْرُ اَوَّلِيٍّ শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব।

এখানে اَوَّلِيَّاتٍ শব্দের সাথে غَيْرُ اَوَّلِيٍّ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধ ইন্দ্রিয়বিকল লোক, যারা অনাহুত মেহমান হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্যে গৃহে ঢুকে পড়ে, তারা ব্যতিক্রমভুক্ত। একথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, তখন এমনি ধরনের কিছু নির্বোধ লোক বিদ্যমান ছিল। তারা অনাহুত হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্যে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করত। বিধানের আসল ভিত্তি নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল হওয়ার উপর—অনাহুত মেহমান হওয়ার উপর নয়।

দ্বাদশ প্রকার اَوَّلِيَّاتٍ مِّنَ الرَّحَالِ এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে বোঝানো হয়েছে, যে এখনও সাবালকত্বের নিকটবর্তীও হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনিয়ত ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বৈষম্য। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে মোরাহিক অর্থাৎ, সাবালকত্বের নিকটবর্তী। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব।— (ইবনে কাসীর) ইমাম জাসসাস বলেন: এখানে طفل বলে এমন বালককে বোঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ কারবারের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বোঝে না। এ পর্যন্ত পর্দা থেকে ব্যতিক্রমভুক্তদের বর্ণনা সমাপ্ত হল।

وَالرَّحَالُ بِأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بِأَحْوَالِ نِسَائِهِمْ مِنْ زِينَتِهِنَّ অর্থাৎ, নারীরা যেন সজ্ঞারে পদক্ষেপ না করে, যদ্বন্ধন অলঙ্কারাদিন আওয়াজ ভেঙ্গে উঠে এবং তাদের বিশেষ সাজ-সজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

وَتُؤْتَوْنَ إِلَى الْمَرْحُومَةِ اَيَّ الْمَرْحُومَةِ অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর। এই আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকে দুটি নত রাখার আদেশ অতঃপর নারীদেরকে এমনি আদেশ এবং শেষে নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের কাছে পর্দা করার আলাদা আলাদা আদেশদান করার পর আলোচ্য বাক্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কামপ্রবৃত্তির ব্যাপারটি খুবই সূক্ষ্ম। অপরের তা জানা কঠিন, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সমান দেদীপ্যমান। তাই উল্লেখিত বিধানসমূহে কোন সময় যদি কারো দ্বারা কোন ক্রটি হয়ে যায়, তবে তার জন্যে তওবা করা নেহায়েত জরুরী। সে অতীত কর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ কর্মের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্যে কৃত সৎকল্প হবে।

النور ۲۴

۴۵۵

قد اقلد ۱۸

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অর্থ। বহুবচন। এ - ایم شہادتیں ایامی - وَأَنْتُمْ حُكَّاءُ الْآيَاتِ وَمِنْكُمْ

প্রত্যেকটি এমন নর ও নারী, যার বিবাহ বর্তমান নেই; আসলেই বিবাহ না করার কারণে হোক কিংবা বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের মৃত্যু অথবা তালকের কারণে হোক। এমন নর ও নারীদের বিবাহ সম্পাদনের জন্যে তাদের অভিভাবকদেরকে আদেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের বর্ণনানুসারে একথা প্রমাণিত হয় এবং এ ব্যাপারে ইমামগণও একমত যে, নিজের বিবাহ নিজেই সম্পাদন করার জন্যে কোন পুরুষ ও নারীর প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নেয়ার পরিবর্তে অভিভাবকদের মাধ্যমে একাজ সম্পাদন করা ই বিবাহের মসনুন ও উত্তম পন্থা। এতে অনেক ধর্মীয় ও পার্শ্বি উপকারিতা রয়েছে। বিশেষতঃ মেয়েদের বিবাহ তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে, এটা যেমন একটা নির্লজ্জ কাজ, তেমনি এতে অশ্লীলতার পথ খুলে যাওয়ারও সম্ভব সন্তাবনা থাকে। এ কারণেই কোন কোন হাদীসে নারীদেরকে অভিভাবকদের মাধ্যম ছাড়া নিজের বিবাহ নিজেরা সম্পাদন করা থেকে বাধাও দেয়া হয়েছে। ইমাম আযম ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে, এই বিধানটি একটি বিশেষ সুনুত ও শরীয়তগত নির্দেশের মর্যাদা রাখে। যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক বালিকা নিজের বিবাহ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত ‘কুফু’ তথা সমতুল্য লোকের সাথে সম্পাদন করে, তবে বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদিও সুনুতের বিরোধিতার কারণে বালিকাটি তিরস্কারের যোগ্য হবে, যদি সে কোনরূপ বাধ্যবাধকতার পরিস্থিতিতে এই পদক্ষেপ না নিয়ে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে অভিভাবকের মাধ্যমে না হলে প্রাপ্তবয়স্ক বালিকার বিবাহই বাতিল ও না হওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে। এটা বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহের আলোচনা ও উভয়পক্ষের প্রমাণাদির বর্ণনা করার স্থান নয়। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আলোচ্য আয়াত থেকে অধিকতরভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, বিবাহে অভিভাবকদের মধ্যস্থতা বাঞ্ছনীয়। এখন কেউ যদি অভিভাবকদের মধ্যস্থতা ছাড়াই বিবাহ করে, তবে তা শুদ্ধ হবে কিনা আয়াত ও ব্যাপারে নিশ্চূপ; বিশেষতঃ এ কারণেও যে, **إيامى** (বিবাহহীন লোক) শব্দের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারী উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক বালকদের বিবাহ অভিভাবকের মধ্যস্থতা ছাড়া সবার মতেই শুদ্ধ — কেউ একে বাতিল বলে না। এমনভাবে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, প্রাপ্তবয়স্ক বালিকা নিজে বিবাহ নিজেই সম্পাদন করলে তাও শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে সুনতবিরোধী কাজ করার কারণে বালক-বালিকা উভয়কে তিরস্কার করা হবে।

বিবাহ ওয়াজিব, না সুন্নত, না বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপ : মুক্ততাহিদি ইমামগণ প্রায় সবাই একমত যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে প্রবল ধারণা এই যে, সে বিবাহ না করলে শরীয়তের সীমার ভেতরে থাকতে পারবে না, গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং বিবাহ করার শক্তি-সামর্থ্যও রাখে, এরূপ ব্যক্তির জন্যে বিবাহ করা ফরয় অথবা ওয়াজিব। সে যতদিন বিবাহ না করবে, ততদিন গোনাহ্‌গার থাকবে। হাঁ, যদি বিবাহের উপায়াদি না থাকে; যেমন কোন উপযুক্ত নারী পাওয়া না গেলে কিংবা মুআজ্জল মোহর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহের সীমা পর্যন্ত আর্থিক সঙ্গতি না থাকলে তার বিধান পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সে যেন উপায়াদি সঞ্গ্রহের চেষ্টা অব্যাহত রাখে এবং যতদিন উপায়াদি সঞ্গ্রহীত না হয়, ততদিন নিজেকে বশে রাখে ও ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে। এরূপ ব্যক্তির

[illegible]

(৩২) তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সংকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বস্ব। (৩৩) যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অস্বাভাবিক করে দেন। তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্যে লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে অর্থ-কড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পারিষদ জীবনের সম্পদের নালসায় তাদেরকে ব্যতিচারে বাধ্য করো না। যদি কেহ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৪) আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের কিছু দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহ ভীতদের জন্যে দিয়েছি উপদেশ। (৩৫) আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উদাহরণ যেন একটি কুলঙ্গি, যাতে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচাপাত্রে স্থাপিত, কাঁচাপাত্রটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ্য। তাতে পুত্রঃপরিচয় যত্নবৃক্ষের তৈল প্রজ্জ্বলিত হয়, যা পূর্বমুখী নয় এবং পশ্চিমমুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও তার তৈল যেন আলোকিত হওয়ার নিকটবর্তী। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্যে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (৩৬) আল্লাহ যেসব গ্রন্থকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উল্লেখ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।

জন্মে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এরশাদ করেন যে, সে উপর্যুপরি রোযা রাখবে। রোযার ফলে কাশোস্তেজনা ভিত্তিত হয়ে যায়।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত শুকাফ (রাঃ)—কে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার স্ত্রী আছে কি ? তিনি বলেন : না ! আবার জিজ্ঞেস করলেন : কোন শরীয়তসম্মত বান্দী আছে কি ? উত্তর হল : না। প্রশ্ন হল : তুমি কি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যবান ? উত্তর হল : হু। উদ্দেশ্য এই যে, তুমি কি বিবাহের প্রয়োজনীয় ব্যয়নির্বাহের সামর্থ্য রাখ ? তিনি উত্তরে হু বলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন : তাহলে তো তুমি শয়তানের তাই। তিনি আরও বললেন : বিবাহ আমাদের সুন্নত। আমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি নিকৃষ্টতম, যে বিবাহহীন এবং তোমাদের শূন্যদের মধ্যে সে সর্বাধিক নীচ, যে বিবাহ না করে মারা গেছে।—(মায়হারী)

যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে পোনাহর আশঙ্কা প্রবল, ফেকাহবিদদের মতে এই হাদীসটিও সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শুকাফের অবস্থা সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর জন্য ছিল যে, সে সবার করতে পারে না। এমনিভাবে মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিবাহ করার আদেশ দিয়েছেন এবং বিবাহহীন থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।—(মায়হারী) এমনি ধরনের আরও অনেক হাদীস আছে। সবগুলো হাদীসই সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেক্ষেত্রে বিবাহ না করলে পোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল থাকে। এর বিপরীতে এ ব্যাপারেও সব ফেকাহবিদ একমত যে, কোন ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা থাকে যে, সে বিবাহ করলে পোনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে, উদাহরণতঃ সে দাপত্যজীবনের হক আদায় করার শক্তি রাখে না, স্ত্রীর উপর জুলুম করবে কিংবা অন্য কোন পোনাহ নিশ্চিত হয়ে যাবে, তবে এরূপ ব্যক্তির জন্যে বিবাহ করা হারাম অথবা মকরুহ।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী অর্থাৎ, বিবাহ না করলেও যার পোনাহের সম্ভাবনা প্রবল নয় এবং বিবাহ করলেও কোন পোনাহের আশঙ্কা জোরদার নয়, এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে ফেকাহবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ বলেন, তার পক্ষে বিবাহ করা উত্তম এবং কেউ বলেন, বিবাহ না করাই উত্তম। ইমাম আহমদ আবু হানীফার মতে নফল এবাদতে মশগুল হওয়ার চাইতে বিবাহ করা উত্তম। ইমাম শাফেয়ী বলেন, নফল এবাদতে মশগুল হওয়া উত্তম। এই মতভেদের আসল কারণ এই যে, বিবাহ সম্ভাগতভাবে পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়াদির ন্যায় একটি মোবাহ্ তথা শরীয়তসিদ্ধ কাজ। যদি কেউ এই নিয়তে বিবাহ করে যে, এর মাধ্যমে সে পোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং সুসন্তান জন্মদান করবে, তবে তা এবাদতে পরিণত হয়ে যায় এবং সে এরও সওয়াব পায়। মানুষ যদি এরূপ সদৃক্ষেপে যে কোন মোবাহ্ কাজ করে, তা পরোক্ষভাবে তার জন্যে এবাদত হয়ে যায়। পানাহার, নিদ্রা ইত্যাদিও এরূপ নিয়তের ফলে এবাদত হয়ে যায়। এবাদতে মশগুল হওয়া আপন সওয়াব একটি এবাদত। তাই ইমাম শাফেয়ী এবাদতের উদ্দেশ্যে একান্তবাসকে বিবাহের চাইতে উত্তম বলেন। ইমাম আবু হানীফার মতে বিবাহের মধ্যে এবাদতের দিক অন্যান্য মোবাহ্ কর্মসমূহের তুলনায় প্রবল। সতীহ্ হাদীসসমূহে বিবাহকে পয়গম্বুরগণের ও স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর সুন্নত আখ্যা দিয়ে এর উপর যথেষ্ট জোর দেয়া হয়েছে। এসব হাদীসের সমষ্টি থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ সাধারণ মোবাহ্ কর্মসমূহের ন্যায় একটি মোবাহ্ কর্ম নয়; বরং এটা পয়গম্বুরগণের সুন্নত। এতে এবাদতের মর্যাদা শুধু নিয়তের কারণে নয়; বরং পয়গম্বুরগণের সুন্নত হওয়ার কারণেও বলবৎ থাকে। কেউ বলতে পারে যে, এভাবে তো পানাহার ও

নিদ্রাও পয়গম্বুরগণের সুন্নত। কারণ, তাঁরা সবাই এসব কাজ করেছেন। এর উত্তর সুস্পষ্ট যে, এগুলো পয়গম্বুরগণের কাজ হওয়া সত্ত্বেও কেউ একথা বলেননি এবং কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি যে, পানাহার ও নিদ্রা পয়গম্বুরগণের সুন্নত, বরং একে সাধারণ মানবীয় অভ্যাসের অধীন পয়গম্বুরগণের কর্ম আখ্যা দেয়া হয়েছে। বিবাহ এরূপ নয়। বিবাহকে সুস্পষ্টভাবে পয়গম্বুরগণের সুন্নত এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর নিষেধের সুন্নত বলা হয়েছে।

فَلَا تَقْضُوا مِنْ أَنْ يَكُونَ أَرْوَاجُكُمْ অর্থাৎ, নারীদেরকে বিবাহে বাধা না দেয়া অভিভাবকদের জন্যে অপরিহার্য। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)ও বলেছেন, তোমাদের কাছে যদি কেউ বিবাহের পয়গাম নিয়ে আসে, তবে তার চরিত্র পছন্দনীয় হলে অবশ্যই বিবাহ সম্পাদন করে দাও। এরূপ না করলে দেশে বিপুল পরিমাণে অনর্থ দেখা দেবে।—(তিরমিযী)

সারকথা এই যে, প্রভুরা যাতে বিবাহের অনুমতি দিতে ইতস্ততঃ না করে, সেজন্য এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্বয়ং বিবাহ সম্পাদন করা তাদের যিম্মায় ওয়াজিব।

إِنْ يَكُونُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ যেসব দরিদ্র মুসলমান ধর্ম-কর্মের হেফাজতের জন্যে বিবাহ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই; আয়াতে তাদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে। তারা যখন ধর্মের হেফাজত ও সুন্নতে রসূল (সাঃ) পালন করার সদৃক্ষেপে বিবাহ করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও দান করবেন। যাদের কাছে দরিদ্র লোকেরা বিবাহের পয়গাম নিয়ে যায় আয়াতে তাদের প্রতিও নির্দেশ আছে যে, তারা যেন শুধু বর্তমান দারিদ্র্যের কারণেই বিবাহে অস্বীকৃতি না জানায়। অর্থকড়ি ক্ষণস্থায়ী বস্তু। এই আছে এই নেই। কাজের যোগ্যতা আসল জিনিস। এটা বিদ্যমান থাকলে বিবাহে অস্বীকৃতি জানান উচিত নয়।

হযরত ইবনে-মাসউদ বলেন : তোমরা যদি ধনী হতে চাও, তবে বিবাহ কর। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন إِنْ يَكُونُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ اللَّهُ (ইবনে-কাসীর)

হশিয়ায়ীঃ তফসীরে মায়হারীতে বলা হয়েছে : স্মরণ্য যে, বিবাহ করার কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ধনাঢ্যতা দান করার ওয়াদা তখন, যখন পবিত্রতা সংরক্ষণ ও সুন্নত পালনের নিয়তে বিবাহ করা হয়, অতঃপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করা হয়। এর প্রমাণ পরবর্তী আয়াতঃ

وَلْيَسْتَعِظِ الَّذِينَ لَا يَكُونُونَ بِكَ حَافِي فَيُفِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

অর্থাৎ, যারা অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না এবং বিবাহ করলে আশঙ্কা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করার কারণে পোনাহগার হয়ে যাবে, তারা যেন পবিত্রতা ও ধর্মসংহারে অপেক্ষা করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মালদার করে দেন। এই ঘেরের জন্যে হাদীসে একটি কৌশলও বলে দেয়া হয়েছে যে, তারা বেশী পরিমাণে রোযা রাখবে। তারা এরূপ করলে আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে বিবাহের সামর্থ্য পরিমাণে অর্থ-সম্পদ দান করবেন।

وَأَوْفُوا بِمَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَاءَوْا أَرْথাৎ, আল্লাহ তোমাদের যে ধন-

সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। সাধারণভাবে

মুসলমানদেরকে এবং বিশেষভাবে মালিকদেরকে এই সম্বোধন করা হয়েছে। গোলামের মুক্তি যখন নির্ধারিত পরিমাণ টাকা মালিককে অর্পণ করার উপর নির্ভরশীল থাকবে, তখন মুসলমানদের এ ব্যাপারে তার সাহায্য করা উচিত। যাকাতের অর্থও তাকে দিতে পারবে। মালিকদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে, যাতে নিজেরাও তার সাহায্য করে অথবা চুক্তির বিনিময়ে কিছু হ্রাস করে দেয়। সাহায্যে কেয়াম তাই করতেন। তাঁরা চুক্তির বিনিময়ে সামর্থ্য অনুযায়ী তৃতীয়াংশ, চতুর্থীংশ অথবা আরও কম হ্রাস করে দিতেন।—(মায়হারী)

নূরের সংজ্ঞা : নূরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ইমাম গাযালী বলেন :

অর্থাৎ, যে বস্তু নিজে নিজে প্রকাশমান ও উজ্জ্বল এবং অপরাপর বস্তুকেও প্রকাশমান ও উজ্জ্বল করে। তফসীরে-মায়হারীতে বলা হয়েছে, নূর প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অবস্থার নাম, যাকে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রথমে অনুভব করে, অতঃপর এর মাধ্যমে চোখে দেখা যায়, এমনসব বস্তুকে অনুভব করে। যেমন, সূর্য ও চন্দ্রের কিরণ তার বিপরীতে অবস্থিত ঘন পদার্থের উপর পতিত হয়ে প্রথমে তাকে আলোকিত করে; অতঃপর সেখান থেকে কিরণ প্রতিফলিত হয়ে অন্যান্য বস্তুকে আলোকিত করে। এ থেকে জানা গেল যে, নূর শব্দটি তার আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ তাআলার সত্তার জন্যে প্রযোজ্য নয়। কেননা, তিনি পদার্থও নন এবং পদার্থজাতও নন; বরং এগুলোর বহু উর্ধ্বে। কাজেই আয়াতে আল্লাহ তাআলার সত্তার জন্যে ব্যবহৃত ‘নূর’ শব্দটির অর্থ সকল তফসীরবিদের মতে ‘মুনাওয়ের’ অর্থাৎ, ঔজ্জ্বল্যাদানকারী। অথবা অতিশয়ার্যবোধক পদের ন্যায় নূরওয়ালাকে ‘নূর’ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে; যেমন দানশীলকে ‘দান’ বলে ব্যক্ত করা হয় এবং ন্যায়পরায়ণ ন্যায়পরায়ণতা বলে দেয়া হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে বসবাসকারী সব সৃষ্টিক্রীড়ার নূর দাতা। এই নূর বলে হেদায়েতের নূর বোঝানো হয়েছে। ইবনে-কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর তফসীর এরূপ বর্ণনা করেছেন : **اللَّهُ هَادِي أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীদের হেদায়েতকারী।

মুমিনের নূর : **مَثَلُ نُورٍ كَشَفُوهُ** মুমিনের অন্তরে আল্লাহ তাআলার যে নূর-হেদায়েত আসে, এটা তার একটা বিচিত্র দৃষ্টান্ত। ইবনে-জরীর হযরত উবাই ইবনে কা’ব থেকে এর তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন : “এটা সেই মুমিনের দৃষ্টান্ত, যার অন্তরে আল্লাহ তাআলা ঈমান ও কোরআনের নূর-হেদায়েত রেখেছেন”। আয়াতে প্রথমে আল্লাহ তাআলা নিজের নূর উল্লেখ করেছেন **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** অতঃপর মুমিনের অন্তরের নূর উল্লেখ করেছেন **مَثَلُ نُورٍ** উবাই ইবনে কা’ব এই আয়াতের কেরআতও **مَثَلُ نُورٍ** এর পরিবর্তে **مِنْ نُورٍ** এর অর্থ পড়তেন। সাঈদ ইবনে জুবারের এই কেরআত এবং আয়াতের এই অর্থ হযরত ইবনে-আব্বাস থেকেও বর্ণনা করেছেন। ইবনে-কাসীর এই রেওয়াজে বর্ণনা করার পর লিখেছেন : **مَثَلُ نُورٍ** এর সর্বনাম দ্বারা তাকে বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দু’রকম উক্তি আছে। (এক), এই সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর নূর হেদায়েত যা মুমিনের অন্তরে সৃষ্টিগতভাবে রাখা হয়েছে, তার দৃষ্টান্ত **مَثَلُ نُورٍ** এটা হযরত ইবনে-আব্বাসের উক্তি। (দুই), সর্বনাম দ্বারা মুমিনকেই বোঝানো হয়েছে।

বাক্যের বর্ণনাথারা থেকে মুমিনই বোঝা যায়। তাই দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, মুমিনের বক্ষ একটি তাকের মত এবং এতে তার অন্তর একটি প্রদীপ সদৃশ। এতে যে স্বচ্ছ যয়তুন তৈলের কথা বলা হয়েছে, এটা নূর-হেদায়েতের দৃষ্টান্ত যা মুমিনের স্বভাবে গৃহীত রাখা হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য আপনা-আপনি সত্যকে গ্রহণ করা। যয়তুন তৈল অগ্নি স্পর্শে প্রজ্বলিত হয়ে যেমন অপরকে আলোকিত করে, এমনিভাবে মুমিনের অন্তরে রাখা নূর-হেদায়েত যখন খোদায়ী ওহী ও জ্ঞানের সাথে মিলিত হয়, তখন আলোকিত হয়ে বিশ্বকে আলোকিত করে দেয়। সাহায্যে-কেয়াম ও তাবয়ীপণ এই দৃষ্টান্তকে বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এর কারণও সম্ভবতঃ এই যে, এই নূর দ্বারা শুধু মুমিনই উপকারলাভ করে। নতুবা এই সৃষ্টিগত নূর-হেদায়েত যা সৃষ্টির সময় মানুষের অন্তরে রাখা হয়, তা বিশেষভাবে মুমিনের অন্তরেই রাখা হয় না; বরং প্রত্যেক মানুষের মস্তিষ্ক ও স্বভাবে এই নূর-হেদায়েত রাখা হয়। এরই প্রতিক্রিয়া জগতের প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ভূখণ্ড এবং প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় যে, তারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর মহান কুদরতের প্রতি সৃষ্টিগতভাবে বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তারা আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা ও ব্যাখ্যা যত ভুলই করুক, কিন্তু আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই বিশ্বাসী। তবে কিছুসংখ্যক বস্তুবাদীর কথা ভিন্ন। তাদের স্বভাবধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে তারা আল্লাহর অস্তিত্বই অস্বীকার করে।

একটি সহীহ হাদীস থেকে এই ব্যাপক অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে, **كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ** অর্থাৎ, প্রত্যেকটি শিশু কিতরতের উপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতা-মাতা তাকে কিতরতের দাবী থেকে সরিয়ে ব্রাহ্মণ্যে পরিচালিত করে। এই কিতরতের অর্থ ঈমানের হেদায়েত। ঈমানের হেদায়েত ও তার নূর প্রত্যেক মানুষকে সৃষ্টি করার সময় তার মধ্যে রাখা হয়। যখন পয়গম্বর ও তাঁদের নায়েবদের মাধ্যমে তাদের কাছে ওহীর জ্ঞান পৌঁছে, তখন তারা সহজেই তা গ্রহণ করে নেয়। তবে স্বভাবধর্ম বিকৃত কতিপয় লোকের কথা ভিন্ন। তারা নিজেদের কুসমের দ্বারা সৃষ্টিগত নূরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। সম্ভবতঃ এ কারণেই আয়াতের শুরুতে নূর দান করার কথাটি ব্যাপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে ভূমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সবাই শামিল। এতে মুমিন ও কাফেরেরও প্রভেদ করা হয়নি। কিন্তু আয়াতের শেষে বলা হয়েছে **يَعْلَمُ اللَّهُ نُورُورٍ مِّنْ نَّارِهِ** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা, তাঁর নূরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন। এখানে আল্লাহর ইচ্ছার শর্তটি সেই সৃষ্টিগত নূরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রাখা হয়; বরং এর সম্পর্ক কোরআনের নূরের সাথে, যা প্রত্যেকের অর্জিত হয় না। যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তওকীক পায়, তারাই এই নূর লাভ করে। নতুবা আল্লাহর তওকীক ছাড়া মানুষের চেষ্টাও অনর্থক, বরং মাঝে মাঝে ক্ষতিকরও হয়।

নবী করীম (সাঃ)-এর নূর : ইমাম বগভী বর্ণিত এক রেওয়াজেতে আছে, একবার হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) কা’ব আহবারকে জিজ্ঞেস করলেন : এই আয়াতের তফসীরে আপনি কি বলেন? কা’ব আহবার তওরাত ও ইব্রীলে সুপণ্ডিত মুসলমান ছিলেন। তিনি বললেন : এটা রসুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র অন্তরের দৃষ্টান্ত। মিশকাত তথা তাক মানে তাঁর বক্ষদেশ, **نُورٍ** তথা কাঁচপাত্র মানে তাঁর পুতঃপবিত্র অন্তর এবং **مُضَيَّرٌ** তথা প্রদীপ মানে নবুওয়ত। এই নবুওয়তরূপী নূরের বৈশিষ্ট্য এই

যে, প্রকাশিত ও ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই এতে মানবমণ্ডলীর জন্যে আলো ও ঐচ্ছল্য ছিল। এরপর ওহী ও ঘোষণা এর সাথে সংযুক্ত হলে এটা এমন নূরে পর্যবসিত হয়, যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকোচ্ছল করে দেয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর নবুওয়ত প্রকাশ বরং তাঁর জন্মেরও পূর্বে তাঁর নবুওয়তের সুসংবাদবাহী অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে। হাদীসবিদগণের পরিভাষায় এসব ঘটনাকে ‘এরহাসাত’ বলা হয়। কেননা, ‘মুজ্জিয়া’ শব্দটি বিশেষভাবে এমন ঘটনাবলী বোঝাবার জন্যে প্রয়োগ করা হয়, যেগুলো নবুওয়তের দাবীর সত্যতা প্রকাশ করার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন পয়গম্বরের হাতে প্রকাশিত হয়। পক্ষান্তরে নবুওয়ত দাবীর পূর্বে এ ধরনের অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রকাশ পেলে তার নাম দেয়া হয় ‘এরহাসাত’। এ ধরনের অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। শায়খ জালালুদ্দীন সুমুতী (রহঃ) ‘খাসায়েসে কোবরা’ গ্রন্থে, আবু নায়ীম ‘দালায়েল-নবুওয়ত’ গ্রন্থে এবং অন্যান্য আলেমগণও স্বতন্ত্র গ্রন্থাদিতে এসব ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। তফসীরে-মাযহারীতেও অনেক তথ্য বর্ণিত হয়েছে।

যয়তুন তৈলের বৈশিষ্ট্য : شَجَرَةٌ تَزِيَّتُهَا أَتَتْهُ عَذْرَاءٌ এতে প্রমাণিত হয়

যে, যয়তুন ও যয়তুন-বৃক্ষ কল্যাণময় ও উপকারী। আলেমগণ বলেন : আল্লাহ তাআলা এতে অগণিত উপকারিতা নিহিত রেখেছেন। একে প্রদীপে ব্যবহার করা হয়। এর আলাে অন্যান্য তৈলের আলোর চাইতে অধিক স্বচ্ছ হয়। একে রুটির সাথে ব্যঞ্জনের স্থলে ব্যবহার করা হয়। এর ফলও ভক্ষিত হয়। এর তৈল বের করার জন্যে কোন যন্ত্র অথবা মাড়াইকল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না—আপনা-আপনি ফল থেকে তৈল বের হয়ে আসে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যয়তুন তৈল খাও এবং শরীরে মালিশও কর। কেননা, এটা কল্যাণময় বৃক্ষ —(মাযহারী)

فِي يَوْمِئِذٍ لَّنِ الْوَلَدُ نَرْفَعُ وَنَكْفِيهِمْ أَهْلَهُمْ لَهُمْ فِي الْغُلُوِّ وَالْهَلَالِ

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা অন্তরে নিজের নূরে-হেদায়েত রাখার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এবং শেষে বলেছেন : এই নূর দ্বারা সে-ই উপকার লাভ করে, যাকে আল্লাহ চান ও তওফীক দেন। আলোচ্য আয়াতে এমন মুমিনদের আবাসস্থল ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে যে, এরূপ মুমিনদের আসল আবাসস্থল, যেখানে তারা প্রায়ই বিশেষতঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়ে দৃষ্টিগোচর হয় — সেসব গৃহ, যেগুলোকে উচ্চ রাখার জন্যে এবং যেগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার জন্যে আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন। এসব গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ, সর্বদা এমন লোকেরা আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করে, যাদের বিশেষ গুণাবলী পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এই বক্তব্যের ভিত্তি এই যে, আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী يَوْمِئِذٍ এর সম্পর্ক يَوْمِئِذٍ বাক্যের সাথে হবে। কেউ কেউ এর সম্পর্ক يَوْمِئِذٍ উহ্য শব্দের সাথে করেছেন, যার প্রমাণ পরবর্তী يَوْمِئِذٍ শব্দটি।

কিন্তু প্রথমোক্ত সম্পর্ক বাক্যের বর্ণনামাধারা দৃষ্টে উত্তম মনে হয়। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তে উল্লেখিত আল্লাহ তাআলার নূরে-হেদায়েতে পাওয়ার স্থান সেসব গৃহ, যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এসব গৃহ হচ্ছে

মসজিদ।

মসজিদ : আল্লাহর ঘর, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব : কুরতুবী একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং প্রমাণ হিসেবে হযরত আনাস বর্ণিত এই হাদীসটি পেশ করেছেন, যাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

“— যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমাকে মহব্বত করে। যে আমার সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন আমার সাহাবিগণকে মহব্বত করে। যে সাহাবিগণের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন কোরআনকে মহব্বত করে। যে কোরআনের সাথে মহব্বত রাখতে চায়, সে যেন মসজিদসমূহকে মহব্বত করে। কেননা, মসজিদ আল্লাহর ঘর। আল্লাহ এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন এবং এতে বরকত রেখেছেন। মসজিদও আল্লাহর হেফাযতে এবং মসজিদের সাথে সম্পর্কিতরাও আল্লাহর হেফাযতে থাকে। তারা নামাযে মশগুল হয়, আল্লাহ তাদের কার্যাবলী করেন এবং অভাব দূর করেন। তারা মসজিদে থাকা অবস্থায় আল্লাহ তাআলা পশ্চাতে তাদের জিনিসপত্রের হেফাযত করেন।—(কুরতুবী)

لَزْنٌ থেকে لَزْنٌ الشَّيْءُ أَنْ يَرْفَعُ — অর্থ এর رفع مساجد উদ্ধৃত। অর্থ অনুমতি দেয়া। رَفَعُ শব্দটি رفع থেকে উদ্ধৃত। অর্থ উচ্চ করা, সম্মান করা। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা মসজিদসমূহকে উচ্চ করার অনুমতি দিয়েছেন। অনুমতি দেয়ার মানে আদেশ করা এবং উচ্চ করার মানে সম্মান করা। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন : উচ্চ করার অর্থে আল্লাহ তাআলা মসজিদসমূহে অনর্থক কাজ ও কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন।—(ইবনে-কাসীর)

ইকরিমা ও মুজাহিদ বলেন : رفع বলে মসজিদ নির্মাণ বোঝানো হয়েছে; যেমন কা’বা নির্মাণ সম্পর্কে কোরআনে বলা হয়েছে,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ الْبَيْتِ — এখানে رفع قواعد বলে ভিত্তি নির্মাণ বোঝানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী বলেন : رفع مساجد বলে মসজিদসমূহের সম্মান, ইযযত ও সেগুলোকে নাপাকী ও নোংরা বস্তু থেকে পবিত্র রাখা বোঝানো হয়েছে। যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে, মসজিদে কোন নাপাকী আনা হলে মসজিদ এমন কুঞ্জিত হয়, যেমন আগুনের সম্পর্শে মানুষের চামড়া কুঞ্জিত হয়। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর উক্তি এই যে, যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে নাপাকী, নোংরাশি ও পীড়াদায়ক বস্তু অপসারণ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে জাহান্নামে গৃহ নির্মাণ করে দেন।—(ইবনে মাজাহ)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে বাসগৃহের মধ্যেও মসজিদ অর্থাৎ, নামায পড়ার বিশেষ জায়গা তৈরী করার এবং তাকে পবিত্র রাখার জন্যে আদেশ করেছেন।—(কুরতুবী)

প্রকৃত কথা এই যে, رَفَعُ শব্দের অর্থে মসজিদ নির্মাণ করা, পাক-পবিত্র রাখা এবং মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাক-পবিত্র রাখার মধ্যে নাপাকী ও নোংরাশি থেকে পবিত্র রাখা এবং দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পবিত্র রাখা উভয়ই দাখিল। এ কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) রসুন ও পিয়াজ খেয়ে মুখ না ধুয়ে মসজিদে গমন করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ হাদীস গ্রন্থসমূহে একথা বর্ণিত আছে। সিগারেট, হক্কা, পান, তামাক খেয়ে মসজিদে যাওয়াও তেমন নিষিদ্ধ। মসজিদে দুর্গন্ধযুক্ত কেরোসিন তৈল জ্বালানোও তেমন নিষিদ্ধ।

সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) বলেন : আমি দেখেছি, রসুলুল্লাহ (সাঃ) যে ব্যক্তির মুখে রসুন অথবা পৈয়গ্জের দুর্গন্ধ অনুভব করতেন, তাকে মসজিদ থেকে বের করে 'বাকী' নামক স্থানে পাঠিয়ে দিতেন এবং বলতেন : যে ব্যক্তি রসুন-পৈয়গ্জ খেতে চায়, সে যেন উত্তমরূপে পাকিয়ে খায় যাতে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। এ হাদীসের আলোকে ফেকাহুবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন রোগে আক্রান্ত যে, তার কাছে দাঁড়ালে কষ্ট হয়, তাকেও মসজিদ থেকে সরিয়ে দেয়া যায়। তার নিজেরও উচিত যতদিন এই রোগ থাকে, ততদিন গৃহে নামায পড়া।

رفع مساجد এর অর্থ অধিকাংশ সাহাবী ও তাবয়ীগণের মতে মসজিদ নির্মাণ করা এবং তাকে প্রত্যেক মন্দ বস্তু থেকে পাক-পবিত্র রাখা। কেউ কেউ মসজিদের বাহ্যিক শানশওকত ও সুউচ্চ নির্মাণ-কৌশলকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের প্রমাণ এই যে, হযরত ওসমান (রাঃ) শাল কাঠ দ্বারা মসজিদে নববীর নির্মাণগত শানশওকত বৃদ্ধি করেছিলেন এবং হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয মসজিদে নববীতে সুদৃশ্য কারুকার্য ও নির্মাণগত সৌন্দর্য বর্ধনে যথেষ্ট যত্নবান হয়েছিলেন। তখন ছিল বিশিষ্ট সাহাবীগণের যুগ; কিন্তু কেউ তাঁর একাঙ্ক অপছন্দ করেননি। পরবর্তী বাদশাহরা তো মসজিদ নির্মাণে অটল অর্ধকড়ি ব্যয় করেছেন। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক তাঁর খেলাফতকালে দামেশকের জামে মসজিদ নির্মাণ ও সুসজ্জিত করণে সমগ্র সিরিয়ার বার্ষিক আমদানির তিন গুণেরও অধিক অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তাঁর নির্মিত এই মসজিদ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। ইমাম আযম আবু হানীফার মতে যদি নাম-যশ খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে না হয়, আল্লাহর নাম ও আল্লাহর ঘরের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কেউ সুরমা, সুউচ্চ ও মজবুত সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করে, তবে নিষেধ নেই; বরং সওয়াব আশা করা যায়।

মসজিদের কতিপয় ক্ষয়ীলত : আবু দাউদে হযরত আবু উমামাহ বর্ণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি গৃহে গুয়ু করে ফরয নামাযের জন্যে মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব সেই ব্যক্তির সমান,

যে এহরাম বৈধে গৃহ থেকে হজ্জের জন্যে যায়। যে ব্যক্তি এশরাকের নামায পড়ার জন্যে গৃহ থেকে গুয়ু করে মসজিদের দিকে যায়, তার সওয়াব ওমরাকারীর অনুরূপ। এক নামাযের পরে অন্য নামায ইল্লিয়ীনে লিখিত হয় যদি উভয়ের মাঝখানে কোন কাজ কিংবা কথাবার্তা না বলে। হযরত বুরায়দাহর রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যারা অঙ্ককারে মসজিদে গমন করে, তাদেরকে কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ শুনিবে দাও।—(মুসলিম)

যেসব গৃহ আল্লাহর যিকর, কোরআন শিক্ষা বা ধর্ম শিক্ষার জন্যে নির্মিত, সেগুলোও মসজিদের অনুরূপ : তফসীরে বাহরে-মুহীতে আবু হাইয়ান বলেন : কোরআনের **مَسَاجِدُ** শব্দটি ব্যাপক। এতে যেমন মসজিদ বোঝানো হয়েছে, তেমনি যেসব গৃহে কোরআন শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা, ওয়াজ-নসীহত অথবা যিকরের জন্যে বিশেষভাবে নির্মিত, সেগুলোও বোঝানো হয়েছে, যেমন মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি। এগুলোর প্রতিও আদব ও সন্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য।

مَسَاجِدُ বাক্যে **مَسَاجِدُ** শব্দের বিশেষ রহস্য : তফসীরবিদগণ সবাই একমত যে, এখানে **مَسَاجِدُ** শব্দের অর্থ আদেশ করা। কিন্তু প্রশ্ন হয় যে, এখানে **أمر** ও **حكم** শব্দের পরিবর্তে **مَسَاجِدُ** শব্দ ব্যবহার করার রহস্য কি? রূহুল-মা'আনীতে এর একটি সুস্বল্প রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এতে সংকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে শিক্ষা ও উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং আদেশের অপেক্ষা না করে শুধু অনুমতি লাভের আশায় থাকে।

وَيَذْكُرُوا الْمَوْتِ এখানে তসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) তাহযীদ (প্রশংসা কীর্তন), নফল নামায, কোরআন তোলাওয়াত, ওয়াজ-নসীহত, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদি সর্বপ্রকার যিকর বোঝানো হয়েছে।

২৩ নূর

২৫৭

১৮ অক্ষর

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

رَجَالٌ لَا تُلْمُوهُمْ تَبَارَةً وَلَا بِيَعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةِ وَ

যেসব — মুমিন

আল্লাহ তাআলার নূর হেদায়েতের বিশেষ স্থান-মসজিদকে আবাদ রাখে, এখানে তাদের বিশেষ গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। এখানে رجال শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান আসলে পুরুষদের জন্যে, নারীদের জন্যে গৃহে নামায পড়া উত্তম।

মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকীতে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : قمر بيوتهم : অর্থাৎ, নারীদের উত্তম মসজিদ তাদের গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকাণ্ড।

অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামই ব্যবসাজীবী ছিলেন : এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের বেশীর ভাগই ব্যবসায়ী অথবা শিল্পী ছিলেন। ফলে তাঁদেরকে বাজারেই অবস্থান করতে হত। কেননা, আল্লাহর স্মরণে ব্যবসাবাগিচ্য অন্তরায় না হওয়া ব্যবসাজীবীদেরই গুণ হতে পারে। নতুবা একথা বলা অনর্থক হবে। - (রাহুল-মা'আনী)

يَأْتُونَ يَوْمًا مَسْكُوبٌ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

এটা পূর্ববর্তী আয়াতে

উল্লিখিত মুমিনদের সর্বশেষ গুণ। এতে বলা হয়েছে যে, তারা সর্বদা আল্লাহর ফিকর, আনুগত্য ও এবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত ও ভয়শূন্য হয়ে যায় না; বরং কেয়ামতের হিসাবের ভয়ে ভীত থাকে। এটা আল্লাহ-প্রদত্ত নূর হেদায়েতেরই শুভ প্রতিক্রিয়া। পরিশেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের কর্মের উৎকৃষ্টতম প্রতিদান দেবেন। এরপর বলা হয়েছে, وَرَبِّدْنَاهُمْ مِنْ قَلِيلٍ অর্থাৎ, শুধু কর্মের প্রতিদানই

শেষ নয়; বরং আল্লাহ নিজ কৃপায় তাদেরকে বাড়তি নেয়ামতও দান করবেন। وَاللَّهُ يُرِيدُ مِنْ نِسَاءِ بَعْضِ رِجَالٍ

কোন আইনের অধীন নন এবং তাঁর ভাণ্ডারে কোন সময় অভাবও দেখা দেয় না। তিনি যাকে ইচ্ছা, অপরিমিত রুখী দান করেন। এ পর্যন্ত যেসব সংকর্মপরায়াণ মুমিনের বন্ধ নূর-হেদায়েতের তাক এবং যারা বিশেষভাবে নূর-হেদায়েতকে গ্রহণ করে, সেসব মুমিনের আলোচনা ছিল। অতঃপর সেসব কাফেরের কথা বলা হচ্ছে, যাদের স্বভাবে আল্লাহ তাআলা নূর-হেদায়েতের উপকরণ রেখেছিলেন, কিন্তু যখন এই উপকরণকে ঔজ্জ্বল্য দানকারী ওহী তাদের কাছে পৌঁছল, তখন তারা তা অস্বীকার করে নূর থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল এবং অতল অন্ধকারেই রয়ে গেল। তারা কাফের ও অস্বীকারকারী — এ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনার পর বলা হয়েছে : وَمَنْ لَمْ يُجِبِلْ اللَّهُ نُورًا قَدَامَهُ مِنْ نُورِ

এই বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেররা নূর-হেদায়েত থেকে বঞ্চিত। তারা খোদায়ী বিধি-বিধানের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে স্বভাবজাত নূরকেও বিলীন করে দিয়েছে। সুতরাং তারা আল্লাহর নূর কোথায় পাবে ?

আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, শুধু জ্ঞান ও গুণের উপকরণ সংগৃহীত হলেই কেউ জ্ঞানী ও গুণী হয়ে যায় না; বরং এটা একান্ত আল্লাহর দান। এ কারণেই অনেক মানুষ, যারা দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর, তারা পরকালের ব্যাপারে অত্যন্ত জ্ঞানী ও চক্ষুশান হয়ে থাকে। এমনিভাবে এর বিপরীতে যারা দুনিয়ার কাজকর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত পারদর্শী ও বিচক্ষণ বলে গণ্য হয়, তাদের অনেকেই পরকালের ব্যাপারে

رَجَالٌ لَا تُلْمُوهُمْ تَبَارَةً وَلَا بِيَعًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةِ وَ
إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخْتَفُونَ بَعْضُهُمْ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ
لِيُجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَرَبِّدْنَاهُمْ مِنْ قَلِيلٍ وَاللَّهُ يَرِيدُ
مَنْ نِسَاءِ بَعْضِ رِجَالٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالْعَمَّا لَهُمْ كَسْرَابٍ
يَقْبَعُهُ نَحْسُهُ الْقَطْمَانُ مَا حَقَّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ سَبَا
وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ قُوَّةً حُسَابَةً وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ
كَطَلَبْتَنِي بِخَيْرِ لِحْيٍ يَقْشَهُ مَوْزٍ مِنْ قُوَّةٍ مَوْزٍ مِنْ قُوَّةٍ
سَبَابٌ ظَلَمْتُ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْبَرْتَهُ كَيْدَ
بِرْمَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِلْ اللَّهُ نُورًا قَدَامَهُ مِنْ نُورِ اللَّهِ تَرَأَى
اللَّهُ يَسْبَحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَتْ كُلُّ قَدْرٍ
عَلِمَ صَلَاتَهُ وَنَسَبَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَيَلَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ الْغَيْبُ وَاللَّهُ يُرِيدُ سَبَابًا
يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَا مَأْدَى الْوَدَقِ يَجُوزُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُرْزَلُ
مِنْ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ
يَعْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَابِقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

(৩৭) এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়ম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ টপ্পে যাবে। (৩৮) (তারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে,) যাতে আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, অপরিমিত রুখী দান করেন। (৩৯) যারা কাফের, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। এমনকি, সে যখন তার কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না এবং পায় সেখানে আল্লাহকে, অতঃপর আল্লাহ তার হিসাব চুকিয়ে দেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৪০) অথবা (তাদের কর্ম) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্ভেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে ঘন কালো মেঘ আছে। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোন জ্যোতিই নেই। (৪১) তুমি কি দেখ না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা এবং উড়ন্ত পক্ষীকূল তাদের পাখা বিস্তার করতঃ আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই তার যোগ্য এবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। তারা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (৪২) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৩) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পৃষ্ঠীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখে; অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিখারা নির্গত হয়। তিনি আকাশস্থিত শিলাত্বপ থেকে শিলাবর্ষণ করেন এবং তা দূরা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা, তা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎবলক দৃষ্টিশক্তি যেন বিলীন করে দিতে চায়।



(৪৪) আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্নগণের জন্যে চিন্তার উপকরণ রয়েছে। (৪৫) আল্লাহ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কতক বুকে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চার পায়ে ভর দিয়ে চলে; আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (৪৬) আমি তো সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালনা করেন। (৪৭) তারা বলে : আমরা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি বিশাস স্থাপন করেছি এবং আনুগত্য করি; কিন্তু অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা বিশাসী নয়। (৪৮) তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রসুলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৯) সত্য তাদের স্বপক্ষে হলে তারা বিনীতভাবে রসুলের কাছে ছুটে আসে। (৫০) তাদের অন্তরে কি রোগ আছে, না তারা ধোঁকাষ পড়ে আছে; না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুল তাদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং তাই তো অবিচারকারী। (৫১) মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে : আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তাই সফলকাম। (৫২) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তাই কৃতকার্য। (৫৩) তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর কসম খেয়ে বলে যে, আপনি তাদেরকে আদেশ করলে তারা সবকিছু ছেড়ে বের হবেই। বলুন : তোমরা কসম খেয়ে না। নিয়মানুযায়ী তোমাদের আনুগত্য, তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে জ্ঞাত।

বেওকুফ ও মুখ হয়ে থাকে।—(মাহহারী)

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ

আয়াতের শুরুতে বলা হয়েছে যে,

নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক সৃষ্টবস্ত্ত আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় মশগুল। এই পবিত্রতা ঘোষণার অর্থ হযরত সুফিয়ানের বর্ণনামতে এই যে, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর প্রত্যেক বস্ত্ত আসমান, যমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, উপাদান চতুষ্টয় অগ্নি, পানি, মাটি, বাতাস সবাইকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং যাকে যে কাজের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, সে সর্বক্ষণ সে কাজে ব্যাপ্ত আছে এর চুল পরিমাণও বিরোধিতা করে না। এই আনুগত্যকেই তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বলা হয়েছে। সারকথা এই যে, তাদের পবিত্রতা বর্ণনা অবশ্যগত — উক্তিগত নয়। তাদের দেখেই মনে হয় যে, তারা আল্লাহ তাআলাকে পবিত্র ও সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে তাঁর আনুগত্যে ব্যাপ্ত আছে।

যমখশারী ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন : এটা অবাস্তব নয় যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্ত্তর মধ্যে এতটুকু বোধশক্তি ও চেতনা নিহিত রেখেছেন, যদ্বারা সে তার স্রষ্টা ও প্রভুর পরিচয় জ্ঞানতে পারে এবং এটাও অবাস্তব নয় যে, তাদেরকে বিশেষ প্রকার বাকশক্তি দান করা হয়েছে ও বিশেষ প্রকার তসবীহ ও এবাদত শেখানো হয়েছে, যাতে তারা মশগুল থাকে। এই শেষ বাক্যে এ বিষয়বস্ত্তর প্রতি ইঙ্গিত

পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তাআলার তসবীহ ও নামাযে সমগ্র সৃষ্টজগতই ব্যাপ্ত আছে, কিন্তু প্রত্যেকের নামায ও তসবীহর পদ্ধতি ও আকার বিভিন্নরূপ। ফেরেশতাদের পদ্ধতি ভিন্ন, মানুষের পদ্ধতি ভিন্ন এবং উদ্ভিদের অন্য পদ্ধতিতে নামায ও তসবীহ আদায় করে। জড়পদার্থের পদ্ধতিও ভিন্নরূপ। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াত থেকেও এই বিষয়বস্ত্তর সমর্থন পাওয়া যায়। বলা হয়েছে :

أَنطى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَهُوَ ذِي الْأَرْوَاحِ, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্ত্ত সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পথ প্রদর্শন করেছেন। এই পথ প্রদর্শন এছাড়া কিছুই নয় যে, সে সর্বদা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যাপ্ত থেকে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এছাড়া তার নিজের জীবনধারণের প্রয়োজনাদি সম্পর্কেও তাকে এমন পথ প্রদর্শন করা হয়েছে যে, বড় বড় চিন্তাশীলদের চিন্তা তার কাছে হার মানে। বসবাসের জন্যে সে কেমন আশ্চর্যজনক বাসা, গর্ত ইত্যাদি তৈরী করে এবং খাদ্য ইত্যাদি হাসিল করার জন্যে কেমন কেমন কৌশল অবলম্বন করে!

وَيُزِيلُ مِنَ السَّمَاءِ مِثْرًا مِّمَّا يُمْذَرُّ فَكَالٍ يُكَامِلُ وَيُفْلِحُ الْكَافِرُ. এখানে মেঘমালা এবং জ্বাল মানে বড় বড় মেঘখণ্ড। ১৮ এর অর্থ শিলা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াত বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তাবারী প্রমুখ এ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : বিশর নামক জৈনিক মুনাফিক ও এক ইহুদীর মধ্যে জমি সংক্রান্ত কলহ-বিবাদ ছিল। ইহুদী তাকে বলল : চল, তোমাদেরই রসুল দ্বারা এর মীমাংসা করিয়ে নেই। মুনাফিক বিশর ছিল অন্যায়ের উপর। সে জানত যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর এজলাসে মোকদ্দমা গেলে তিনি ন্যায়বিচার করবেন এবং সে হেরে যাবে। কাজেই সে অস্বীকার করল এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরিবর্তে কা'ব ইবনে আশরাফ ইহুদীর

التور ১৩

৩৫৮

قَدْ اُخْلِفَ ۱৮

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ
مَاحِلٌ وَعَلَيْكُمْ مَآ حِيلَ لَكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى
الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
آتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ لَا تَحْسِبَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَآمَنُوا وَفَوَّادُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَالنَّارُ وَلَيْسَ
الْمُصِيرُ إِلَّا يُنْفِئُهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ذَلِكَ مَرْثٌ مِنْ
قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ
وَمِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ ظُلُومٌ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى
بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

(৫৪) বলুন : আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসুলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তার উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে সে দায়ী এবং তোমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে তোমরা দায়ী। তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য কর, তবে সং পথ পাবে। রসুলের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া। (৫৫) তোমাদের মধ্যে যারা বিশাস স্থাপন করে ও সংকল্প করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদূর করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন। তারা আমার এবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবখা। (৫৬) নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রসুলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (৫৭) তোমরা কাফেরদেরকে পৃথিবীতে পরাক্রমশালী মনে করো না। তাদের ঠিকানা অগ্নি। কতই না নিকট এই প্রত্যাবর্তনস্থল! (৫৮) হে মুমিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বশ্র খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর। এই তিন সময়ে তোমাদের দেহ খোলায় সময়। এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্যে কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাওয়াত করতেই হয়। এমনভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

কাছে মোকদ্দমা নিয়ে যেতে বলল। এর পরিশ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

সাফল্য লাভের চারটি শর্তঃ **وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُخْلِصْ** এই আয়াতে চারটি বিষয় বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এই চারটি বিষয় যথাযথ পালন করে, সে-ই দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম।

একটি আশ্চর্য ঘটনা : তফসীর-কুরতুবীতে এস্থলে হযরত ফারাকে আযমের একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও পারস্পরিক পার্থক্য ফুটে উঠে। হযরত ফারাকে আযম একদিন মসজিদে নববীতে দণ্ডায়মান ছিলেন। হঠাৎ জনৈক রুমী গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলতে লাগল :

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله হযরত ফারাকে আযম জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কি ? সে বলল : আমি আল্লাহর ওয়াস্তে মুসলমান হয়ে গেছি। হযরত ফারাকে আযম জিজ্ঞেস করলেন : এর কোন কারণ আছে কি ? সে বলল : হ্যাঁ, আমি তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অনেক গ্রন্থ পাঠ করেছি। কিন্তু সম্প্রতি জনৈক মুসলমান কয়েদীর মুখে একটি আয়াত শুনে জানতে পারলাম যে, এই ছোট আয়াতটির মধ্যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত রয়েছে। এতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আগত। ফারাকে আযম জিজ্ঞেস করলেন : আয়াতটি কি ? রুমী ব্যক্তি উল্লেখিত আয়াতটিই তেলাওয়াত করল এবং সাথে সাথে তার অভিনব তফসীরও বর্ণনা করল যে, **وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ**

وَرَسُولَهُ রসুলের সুন্নতের সাথে, **وَيُخْلِصْ** অতীত জীবনের সাথে এবং **وَيُكَفِّرْ** ভবিষ্যত জীবনের সাথে সম্পর্ক রাখে। মানুষ যখন এই চারটি বিষয় পালন করবে, তখন তাকে **فَانْزِلْ** এর সুসংবাদ দেয়া হবে। তথা সফলকাম সে ব্যক্তি, যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে স্থান পায়। ফারাকে আযম একথা শুনে বললেন : রসুলে করীম (সাঃ)-এর কথায় এর সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন : **اوتيت جوامع الكلم** অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আমাকে সুদূরপ্রসারী অর্থবোধক বাক্যাবলী দান করেছেন। এগুলোর শব্দ সংকিপ্ত এবং অর্থ সুদূর বিস্তৃত।—(কুরতুবী)

আনুযঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নুযুল : কুরতুবী আবুল-আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) ওহী অবতরণ ও নবুওয়ত ঘোষণার পর দশ বছর কাফের ও মুশরেকদের ভয়ে ভীত অবস্থায় মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করেন। এরপর মদীনায হিজরতের আদেশ হলে সেখানেও সর্বদা মুশরেকদের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। একবার জনৈক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে আরম্ভ করল : ইয়া রসুলুল্লাহ, আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় শান্তিতে ও সুখে বসবাস করব—এরূপ সময় কি কখনও আসবে ? রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এরূপ সময় অতিসত্বরই আসবে। এর পরিশ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।—(কুরতুবী, বাহর) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা আয়াতে বর্ণিত ওয়াদা উম্মতে-মুহাম্মদীকে তার অস্তিত্বলাভের পূর্বেই তওরাত ও

ইজ্জালে দিয়েছিলেন। — (বাহরে-মুহীত)

আল্লাহ তাআলা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে তিনটি বিষয়ের ওয়াদা দিয়েছেন। (১) আপনার উম্মতকে পৃথিবীর খলীফা ও শাসনকর্তা করা হবে, (২) আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামকে প্রবল করা হবে এবং (৩) মুসলমানদেরকে এমন শক্তি ও শৌর্যবীর্য দান করা হবে যে, তাদের অন্তরে শত্রুর কোন ভয়-ভীতি থাকবে না। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পুণ্যময় আমলে মক্কা, খায়বর, বাহরাইন, সমগ্র আরব উপত্যকা ও সমগ্র ইয়ামন তাঁরই হাতে বিজিত হয় এবং তিনি হিজরের অগ্নিপূজারী ও শাম দেশের কতিপয় অঞ্চল থেকে জিমিয়া কর আদায় করেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাউকিস, আশ্মান ও আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী প্রমুখ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করেন ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। তাঁর ওফাতের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) খলীফা হন। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর যে দুন্দু-সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, তিনি তা খতম করেন এবং পারস্য, সিরিয়া ও মিসর অভিযুদ্ধে সৈন্যাভিযান করেন। বসরা ও দামেস্ক তাঁরই আমলে বিজিত হয় এবং অন্যান্য দেশেরও কতক অংশ করতলগত হয়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীকের ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে ওমর ইবনে খাতাবকে পরবর্তী খলীফা নিযুক্ত করার ইলহাম করেন। ওমর ইবনে খাতাব খলীফা নিযুক্ত হয়ে শাসনব্যবস্থা এমনভাবে সুবিন্যস্ত করলেন যে, পয়গম্বরগণের পর পৃথিবী এমন সুন্দর ও সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা আর প্রত্যক্ষ করেনি। তাঁর আমলে সিরিয়া পুরোপুরি বিজিত হয়। এমনিভাবে সমগ্র মিসর ও পারস্যের অধিকাংশ করতলগত হয়। তাঁর হাতে কায়সার ও কিসরা সমূলে নিশিচু হয়। এরপর ওসমানী খেলাফতের আমলে ইসলামী বিজয়ের পরিধি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাক্কাত দেশসমূহ, আন্দালুস ও সাইপ্রাস পর্যন্ত, দূরপ্রাচ্যে চীন ভূখণ্ড পর্যন্ত এবং ইরাক, খোরাসান ও আহওয়ায় ইত্যাদি সব তাঁর আমলেই মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়। সহীহ হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আমাকে সমগ্র ভূখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত একত্রিত করে দেখানো হয়েছে। আমার উম্মতের রাজত্ব যেসব এলাকা পর্যন্ত পৌঁছেবে সেগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এই প্রতিশ্রুতি ওসমানী খেলাফতের আমলেই পূর্ণ করে দেন। — (ইবনে-কাসীর) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, খেলাফত আমার পরে ত্রিশ বছর থাকবে। এখানে খেলাফত অর্থ খেলাফতে রাশেদা, যা সম্পূর্ণরূপে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদর্শের উপর ভিত্তিশীল ছিল। এই খেলাফত হযরত আলী (রাঃ) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কেননা, ত্রিশ বছরের মেয়াদ হযরত আলী (রাঃ) পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যায়।

এই আয়াত রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তের প্রমাণ। কেননা, আয়াতে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী স্ববহু পূর্ণ হয়েছে। এমনিভাবে আয়াতটি খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের সত্যতা, বিশুদ্ধতা ও আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ারও প্রমাণ। কেননা, আয়াতে আল্লাহ তাআলা যে প্রতিশ্রুতি স্বীয় রসূল ও উম্মতকে দিয়েছিলেন, তার পুরোপুরি বিকাশ তাঁদের আমলে হয়েছে। যদি তাঁদের খেলাফতকে সত্য ও বিশুদ্ধ স্বীকার করা না হয়; যেমন রাফেযীদের ধারণা, তবে বলতে হবে যে, কোরআনের এই প্রতিশ্রুতি হযরত মাহদীর আমলে পূর্ণ হবে। এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার বৈ নয়। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, শত শত বছর পর্যন্ত সমগ্র উম্মত অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিনাতিপাত করবে এবং কেয়ামতের নিকটতম

সময়ে ক্ষণকালের জন্যে তারা রাজত্বলাভ করবে। এই প্রতিশ্রুতিতেই সেই রাজত্ব বোঝানো হয়েছে। নাউযবিলাহ। সত্য এই যে, ঈমান ও সংকর্মের যেসব শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেসব শর্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল এবং আল্লাহর ওয়াদাও সম্পূর্ণরূপে তাদের আমলে পূর্ণ হয়েছে। তাঁদের পরে ঈমান ও সংকর্মের সে মাপকাঠি আর বিদ্যমান নেই; এবং খেলাফত ও রাজত্বের সে গাভীর্যও আর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ

শব্দের আভিধানিক অর্থ অকৃতজ্ঞতা এবং পারিভাষিক অর্থ ঈমানের বিপরীত। এখানে উভয় প্রকার অর্থই বোঝানো যেতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, যখন আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেন, মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় শক্তি, শান্তি ও স্থিরতা লাভ করে এবং তাদের ধর্ম সুসংহত হয়ে যায়, তখনও যদি কোন ব্যক্তি কুফর করে অর্থাৎ, ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে, তবে এরূপ লোকেরাই সীমা লংঘনকারী। প্রথমাবস্থায় ঈমানের গণ্ডি অতিক্রম করে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় আনুগত্যের সীমা পার হয়ে যায়। কুফর ও অকৃতজ্ঞতা সর্বদা, সর্বাবস্থায় মহাপাপ, কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি এবং শোহ বীর্য ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এসব কাজ দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়। তাই **بَعْدَ ذَلِكَ** বলে একে জোরদার করা হয়েছে। ইমাম বগভী বলেন : তফসীরবিদ আলেমগণ বলেছেন যে, কোরআনের এই বাক্য সর্বপ্রথম সেসব লোকের উপর প্রতিফলিত হয়েছে, যারা খলীফা হযরত ওসমান (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল। তাদের দ্বারা এই মহাপাপ সংঘটিত হওয়ার পর পর আল্লাহ তাআলার উল্লেখিত নেয়ামতসমূহও হ্রাস পেয়ে যায়। তারা পারস্পরিক হত্যামজ্জের কারণে ভয় ও ত্রাসের শিকারে পরিণত হয়। যারা ছিল পরস্পর ভাই ভাই, তারা একে অন্যকে হত্যা করতে থাকে। বগভী নিজস্ব সনদ দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামের নিম্নোক্ত ভাষণ উদ্ধৃত করেছেন। তিনি হযরত ওসমানের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হওয়ার সময় এই ভাষণটি দেন। ভাষণটি এই :

“যেদিন রসুলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায পদার্পন করেন, সেদিন থেকে আল্লাহর ফেরেশতারা তোমাদের শহর পরিবেষ্টন করে তোমাদের হেফাযতে নিয়োজিত রয়েছে। যদি তোমরা ওসমানকে হত্যা কর, তবে এই ফেরেশতারা ফিরে চলে যাবে এবং কখনও প্রত্যাবর্তন করবে না। আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাকে হত্যা করবে, সে আল্লাহর সামনে হস্তকর্তিত অবস্থায় হামির হবে ; তার হাত থাকবে না। সাবধান, আল্লাহর তরবারি এখনও পর্যন্ত কোষবদ্ধ আছে। আল্লাহর কসম, যদি এই তরবারি কোষ থেকে বের হয়ে পড়ে, তবে কখনো কোষে ফিরে যাবে না। কেননা, যখন কোন নবী নিহত হন, তখন তাঁর পরিবর্তে সত্তর হাজার মানুষ নিহত হয় এবং যখন কোন খলীফাকে হত্যা করা হয়, তখন পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করা হয়।” — (মাযহারী)

সেমতে হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যার পর যে পারস্পরিক হত্যাাকাণ্ড আরম্ভ হয়, তা মুসলমানদের মধ্যে অব্যাহতই রয়েছে। হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীরা খেলাফত ও ধর্মীয় সংহতির ন্যায় নেয়ামতের বিরোধিতা এবং অকৃতজ্ঞতা করেছিল, তাদের পর রাফেযী ও খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা খোলাফায়ে-রাশেদীনের বিরোধিতায় দলবদ্ধ হয়েছিল। এই ঘটনা পরস্পরার মধ্যেই হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের মর্মান্তিক দৃষ্টটনা সংঘটিত হয়।

আত্মীয়স্বজন ও মাহরামদের জন্যে বিশেষ সময়ে অনুমতি গ্রহণের আদেশ : সামাজিকতা ও পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতের উত্তম রীতিনীতি ইতিপূর্বে এই সূরার ২৭, ২৮, ২৯ আয়াতে ‘অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী’ শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কারও সাথে সাক্ষাত করতে গেলে অনুমতি ব্যতীত তার গৃহে প্রবেশ করো না। পুরুষের গৃহ হোক কিংবা নারীর, আগন্তুক পুরুষ হোক কিংবা নারী সবার জন্যে অন্যের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ ওয়াজিব করা হয়েছে। কিন্তু এসব বিধান ছিল বাইরে থেকে আগমনকারী অপরিচিতদের জন্যে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে অন্য এক প্রকার অনুমতি গ্রহণের বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর সম্পর্ক এমন আত্মীয় ও মাহরাম ব্যক্তিদের সাথে, যারা সাধারণতঃ এক গৃহে বসবাস করে ও সর্বক্ষণ যাতায়াত করতে থাকে, আর তাদের কাছে নারীদের পর্দাও জরুরী নয়। এ ধরনের লোকদের জন্যে গৃহে প্রবেশের সময় খবর দিয়ে কিংবা কমপক্ষে সশব্দ পদচারণা করে অথবা গলা ঝেড়ে প্রবেশের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই অনুমতি গ্রহণ এরূপ আত্মীয়দের জন্যে ওয়াজিব নয়—মোস্তাহাব। এটা তরক করা মকরুহ তানযিহী।

এটা হচ্ছে গৃহে প্রবেশের পূর্বের বিধান। কিন্তু গৃহে প্রবেশের পর তারা সবাই এক জায়গায় একে অপরের সামনে থাকে এবং একে অপরের কাছে যাতায়াত করে। এমতাবস্থায় তাদের জন্যে তিনটি বিশেষ নির্জনতার সময়ে আরও এক প্রকার অনুমতি চাওয়ার বিধান আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তিনটি সময় হচ্ছে ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে বিশ্রাম গ্রহণের সময় এবং এশার নামাযের পরবর্তী সময়। এই তিন সময়ে মাহরাম, আত্মীয়স্বজন এমনকি সমঝদার অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা এবং দাস-দাসীদেরকেও আদেশ করা হয়েছে তারা যেন কারও নির্জন কক্ষে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ না করে। কেননা, এসব সময়ে মানুষ স্বাধীন ও খোলাখুলি থাকতে চায়, অতিরিক্ত বস্ত্রও খুলে ফেলে এবং মাঝে মাঝে স্ত্রীর সাথে খোলাখুলি মেলামেশায় মশগুল থাকে। এসব সময়ে কোন বুদ্ধিমান বালক অথবা গৃহের কোন নারী অথবা নিজ সন্তানদের মধ্যে কেউ অনুমতি ব্যতীত ভেতরে প্রবেশ করলে প্রায়ই লজ্জার সন্মুখীন হতে হয় ও অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়, কমপক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির খোলাখুলিভাব ও বিশ্রামে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়া তো বলাই বাহুল্য। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের জন্যে বিশেষ অনুমতি চাওয়ার বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এসব বিধানের পর একথাও বলা হয়েছে যে,

অর্থাৎ, এসব সময় ছাড়া একে অপরের কাছে অনুমতি ব্যতীত যাতায়াত করায় কোন দোষ নেই।

এখানে প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকেই আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে, এই-এই সময়ে জিজ্ঞেস না করে ভেতরে এসো না। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, ছেলেদের বয়স যখন সাত বছর হয়ে যায়, তখন নামায শিক্ষা দাও এবং পড়ার আদেশ কর। দশ বছর বয়স হয়ে গেলে কঠোরভাবে নামাযের আদেশ কর এবং দরকার হলে মারপিটের মাধ্যমে নামায পড়তে বাধ্য কর। এমনভাবে এখানে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীকে অনুমতি গ্রহণের আসল আদেশ দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত বাক্যে বলা হয়েছে যে, তিন সময় ছাড়া অন্য সময় যদি

তোমরা বিনানুমতিতে তাদেরকে আসতে দাও, তবে তোমাদের উপর এবং অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে তারা এলে তাদের উপর কোন **جُنَاحٌ** নেই। **جُنَاحٌ** শব্দটি সাধারণতঃ গোনাহ্ অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিছক ‘অসুবিধা’ ও ‘দোষ’ অর্থেও আসে। এখানে **جُنَاحٌ** এর অর্থ তাই। অর্থাৎ, কোন অসুবিধা নেই। এর ফলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের গোনাহ্গার হওয়ার সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল—(বয়ানুল-কোরআন)

মাসআলা : আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে **يَسْتَأْذِنُ الْاِيْمَانُ الْمَلَائِكَةُ**

এর অর্থ মালিকানাধীন দাস ও দাসী উভয়ই शामिल রয়েছে। দাস যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়, তবে সে মাহরাম নয়, অপরিচিত ব্যক্তির অনুরূপ হুকুম রাখে। তার নারী প্রভুকেও তার কাছে পর্দা করতে হবে। তাই এখানে এর অর্থ হবে দাসী কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক দাস যারা সর্বদাই গৃহে যাতায়াতে অভ্যস্ত।

মাসআলা : এই বিশেষ অনুমতি গ্রহণ আত্মীয়দের জন্যে ওয়াজিব, না মোস্তাহাব, এ ব্যাপারে আলেম ও ফেকাহবিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এই বিধান এখনও কার্যকর আছে, না রহিত হয়ে গেছে, এতেও তারা মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ ফেকাহবিদদের মতে আয়াতটি মুহকাম ও অরহিত এবং নারী পুরুষ সবার জন্যে এর বিধান ওয়াজিব।—(কুরতুবী) কিন্তু এর ওয়াজিব হওয়ার কারণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণতঃ মানুষ এই তিন সময়ে নির্জনতা কামনা করে, এসময়ে প্রায়ই স্ত্রীর সাথেও লিপ্ত থাকে এবং মাঝে মাঝে আবৃত অঙ্গও খুলে যায়। যদি কেউ সাবধানতা অবলম্বন করতঃ এসব সময়েও আবৃত অঙ্গ গোপন রাখার অভ্যাস গড়ে তোলে এবং স্ত্রীর সাথে মেলামেশাও কেবল তখনই করে, যখন কারও আগমনের সম্ভাবনা থাকে না, তবে তার জন্যে আত্মীয় ও অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকে অনুমতি গ্রহণে বাধ্য করাও ওয়াজিব নয় এবং আত্মীয়দের জন্যেও ওয়াজিব নয়। তবে এটা সর্বাবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম। কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে এর আমল যেন পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এ কারণেই হযরত ইবনে-আব্বাস এক রেওয়াজেতে এ ব্যাপারে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেছেন এবং অন্য এক রেওয়াজেতে যারা আমল করে না, তাদের কিছুটা ওযর বর্ণনা করেছেন।

প্রথম রেওয়াজেটি ইবনে-কাসীর ইবনে-আবী হাতেমের সনদে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন : তিনটি আয়াতের আমল লোকেরা ছেড়েই দিয়েছে। তন্মধ্যে একটি অনুমতি চাওয়ার আয়াত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خَرَجْتُمْ مِّنَ الْبُيُوتِ فَاسْتَأْذِنُوا এতে আত্মীয়-

স্বজন ও অপ্রাপ্তবয়স্কদেরকেও অনুমতি গ্রহণের শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে **وَإِذَا خَرَجْتُمْ مِّنَ الْبُيُوتِ فَاسْتَأْذِنُوا** এতে উত্তরাধিকার বটনের সময় ওয়ারিশদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বিধি অনুযায়ী অংশীদার নয়, এমন কিছু আত্মীয় বটনের সময় উপস্থিত হলে তাদেরকেও কিছু দান কর, যাতে তারা মনঃক্ষুণ্ণ না হয়। তৃতীয় আয়াত হচ্ছে **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ** এতে বলা হয়েছে যে, সে ব্যক্তি সর্বাধিক সন্মান ও সম্ভ্রমের পাত্র, যে সর্বাধিক মোস্তাহকী।

দ্বিতীয় রেওয়াজেতে ইবনে-আবী হাতেমেরই সূত্র ধরে হযরত ইকরিমা থেকে বর্ণিত আছে যে, দুই ব্যক্তি হযরত ইবনে-আব্বাসকে আত্মীয়দের অনুমতি গ্রহণ সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলল যে, কেউ তো এই আদেশ পালন করে না। হযরত ইবনে-আব্বাস বললেন, আদ্বাহ পর্দাশীল। তিনি পর্দার হেফাযত পছন্দ করেন।



(৫৯) তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়। এমনভাবে আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৬০) বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য্য প্রকাশ না করে তাদের বস্ত্র খুলে রাখে। তাদের জন্যে দোষ নেই, তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬১) অন্ধের জন্যে দোষ নেই, খঞ্জের জন্যে দোষ নেই, রোগীর জন্যে দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যেও দোষ নেই যে, তোমরা আহ্বার করবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগিনীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহ্বার কর অথবা পৃথকভাবে আহ্বার কর, তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ কর, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দোয়া। এমনভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝে নাও।

এখানে পরবর্তী আয়াতে একটি তৃতীয় ব্যতিক্রমও নারীর ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে বৃদ্ধা নারীর প্রতি কেউ আকর্ষণ বোধ করে না এবং সে বিবাহেরও যোগ্য নয়, তার জন্যে পর্দার বিধান শিথিল করা হয়েছে যে, অনাত্মীয় ব্যক্তিও তার পক্ষে মাহরামের ন্যায় হয়ে যায়। মাহরামদের কাছে যেসব অঙ্গ আবৃত করা জরুরী নয়, এই বৃদ্ধা নারীর জন্যে বেগানা পুরুষদের কাছেও সেগুলো আবৃত রাখা জরুরী নয়। তাই বলা হয়েছে وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ এর তফসীর উপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এরূপ বৃদ্ধা নারীর জন্যে বলা হয়েছে যেসব অঙ্গ মাহরামের সামনে খোলা যায়—যে মাহরাম নয়, এরূপ ব্যক্তির সামনেও সেগুলো খুলতে পারবে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে যদি সাজ-সজ্জা না করে। পরিশেষে আরও বলা হয়েছে وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ ৷ অর্থাৎ, সে যদি মাহরাম নয় এরূপ ব্যক্তিদের সামনে আসতে পুরোপুরি বিরত থাকে, তবে তা তার জন্যে উত্তম।

গৃহে প্রবেশের পরবর্তী কতিপয় বিধান ও সামাজিক রীতিনীতি : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কারও গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সেসব বিধান ও রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশের পর মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব। আয়াতের মর্ম ও বিধানবালী হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে প্রথমে সেই পরিস্থিতি জেনে নেয়া উচিত, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কোরআন পাক ও রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর সাধারণ শিক্ষার মধ্যে হক্কুল-এবাদ তথা বন্দার হকের হেফাযতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তা কোন মুসলমানের অজানা নয়। অপরের অর্থ-সম্পদে তার অনুমতি ব্যতীত হস্তক্ষেপ করার কারণে ভীষণ শাস্তিবাহী উচ্চারিত হয়েছে। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বশেষ রসুলের সংসর্গে থাকার জন্যে এমন ভাগ্যবান লোকদের মনোনীত করেছিলেন, যারা আল্লাহ ও রসুলের আদেশের প্রতি উৎকর্ষ হয়ে থাকতেন এবং প্রত্যেকটি আদেশ পালনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করতেন। কোরআনী শিক্ষার বাস্তবায়ন ও তার সাথে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর পবিত্র সংসর্গের পরশপাথর দ্বারা আল্লাহ তাআলা এমন একটি দল সৃষ্টি করেছিলেন, যাদের জন্যে ফেরেশতারাও গর্ববোধ করে। অপরের অর্থ-সম্পদে তার ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত সামান্যতম হস্তক্ষেপ সহ্য না করা, কাউকে সামান্যতম কষ্টপ্রদান থেকে বিরত থাকা এবং এ ব্যাপারে খোদাতীতির উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠিত থাকা, এগুলো সকল সাহাবীরই গুণ ছিল। এ ধরনেরই কয়েকটি ঘটনা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর আমলে সংঘটিত হয় এবং এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধানবালী অবতীর্ণ হয়। তফসীরবিদগণ এসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। কেউ এক ঘটনাকে এবং কেউ অন্য ঘটনাকে আয়াতে শানে নুযূল সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এতে কোন বিরোধ নেই। ঘটনাবলীর সমষ্টিই আয়াতের শানে নুযূল। ঘটনাবালী নিম্নরূপ :

(১) ইমাম বগতী তফসীরবিদ সাঈদ ইবনে জুবায়র ও যাহহাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, জগতের সাধারণ রীতি এবং অধিকাংশ লোকের স্বভাব এই যে, খঞ্জ, অন্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তির সাথে বসে খেতে তারা ঘৃণা বোধ করে।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা এ ধরনের বিকলাঙ্গ ছিলেন, তাঁরা মনে করলেন যে, আমরা কারও সাথে বসে একত্রে আহার করলে সম্ভবতঃ তার কষ্ট হবে। তাই তাঁরা সুস্থ ব্যক্তিদের সাথে আহারে যোগদান থেকে বিরত থাকতে লাগলেন। অন্ধ ব্যক্তিও চিন্তা করল যে, কয়েকজন একত্রে আহারে বসলে ন্যায় ও মানবতা এই যে, একজন অপরজনের চাইতে বেশী খাবে না। আমি অন্ধ, তাই অনুমান করতে পারি না। সম্ভবতঃ অন্যের চাইতে বেশী খেয়ে ফেলব। এতে অন্যের হক নষ্ট হবে। খঞ্জ ব্যক্তি ধারণা করল, আমি সুস্থ লোকের মত বসতে পারি না, দু'জনের জায়গা নিয়ে ফেলি। আহারে অন্যের সাথে বসলে সম্ভবতঃ তার কষ্ট হবে। তাঁদের এই চরম সাবধানতার ফলে স্বয়ং তাঁরাই অসুবিধা ও কষ্টের সম্মুখীন হতেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে তাঁদেরকে অন্যের সাথে একত্রে আহার করার অনুমতি এবং এমন চুলচেরা সাবধানতা পরিহার করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন।

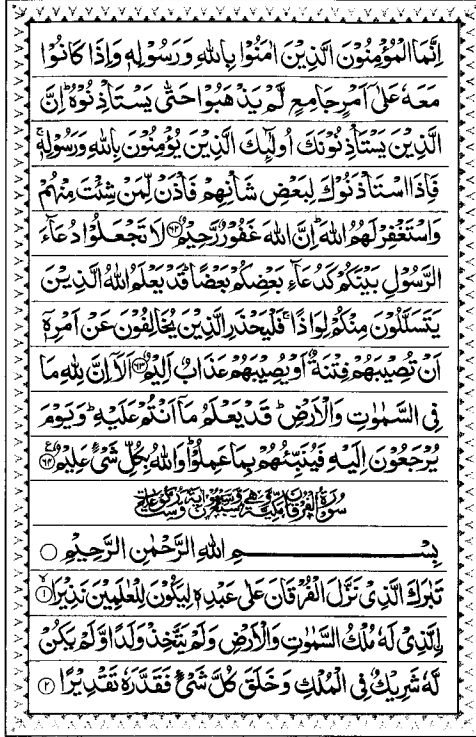
(২) বগভী ইবনে-জরীরের জবানী হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যা উপরোক্ত ঘটনার অপর পিঠ। তা এই যে, কোরআন পাকে **لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالطَّل** অর্থৎ, তোমরা একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়াভাবে খেয়ে না। আয়াতটি নাফিল হলে সবাই অন্ধ, খঞ্জ ও রুগ্ন ব্যক্তিদের সাথে বসে খাওয়ার ব্যাপারে ইতস্ততঃ করতে লাগল, তারা ভাবল, রুগ্ন ব্যক্তি তো স্বভাবতঃই কম আহার করে, অন্ধ উৎকৃষ্ট খাদ্য কোনটি তা জানতে পারে না এবং খঞ্জ সোজা হয়ে বসতে অক্ষম হওয়ার কারণে খোলাখুলিভাবে খেতে পারে না। অতএব সম্ভবতঃ তারা কম আহার করবে এবং আমরা বেশী খেয়ে ফেলব। এতে তাদের হক নষ্ট হবে। যৌথ খাদ্যদ্রব্যে সবার অংশ সমান হওয়া উচিত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এ ধরনের সূক্ষ্মদর্শিতা ও লৌকিকতা থেকে তাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সবাই একত্রে আহার কর। মামুলী কম-বেশী হওয়ার চিন্তা করো না।

(৩) সায়ীদ ইবনে-মুসাইয়েব বলেন : মুসলমানগণ জেহাদে যাওয়ার সময় নিজ নিজ গৃহের চাবি বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে যেত এবং

বলে যেত যে, গৃহে যা কিছু আছে, তা তোমরা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা সাবধানতাবশতঃ তাদের গৃহ থেকে কিছুই খেত না। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। মুসনাতে বাযযারে হযরত আয়েশা থেকেও বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) কোন যুদ্ধে গমন করলে সাধারণ সাহাবিগণও তাঁর সাথে জেহাদে যোগদান করতে আকাঙ্ক্ষী হতেন। তাঁরা তাদের গৃহের চাবি দরিদ্র বিকলাঙ্গদের হাতে সোপর্দ করে অনুমতি দিতেন যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তোমরা আমাদের গৃহে যা আছে, তা পানাহার করতে পার। কিন্তু তারা চরম আল্লাহ্ ভীতিবশতঃ আপন মনের ধারণায় ‘অনুমতি হয়নি’ আশঙ্কা করে পানাহার থেকে বিরত থাকত। বগভী হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, আলোচ্য আয়াতের **وَأَصْرِيْكَ** (অর্থৎ, বন্ধুর গৃহে পানাহার করায় দোষ নেই) শব্দটি হারেস-ইবনে আমরের ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি কোন এক জেহাদে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে চলে যান এবং বন্ধু মালেক ইবনে যায়েদের হাতে গৃহ ও গৃহবাসীদের দেখাশোনার ভার সোপর্দ করেন। হারেস ফিরে এসে দেখলেন যে, মালেক ইবনে যায়েদ দুর্বল ও শুষ্ক হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার গৃহে খাওয়া-দাওয়া আমি পছন্দ করিনি।—(মাযহারী) বলাবাহুল্য, এ ধরনের সব ঘটনাই আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ হয়েছে।

মাসআলা : পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যেসব গৃহে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত পানাহার করার অনুমতি এই আয়াতে দেয়া হয়েছে, তার ভিত্তি এই যে, আরবের সাধারণ লোকচার অনুযায়ী এসব নিকট আত্মীয়দের মধ্যে লৌকিকতার বলাই ছিল না।

দ্বিতীয় কাজ গৃহে প্রবেশের আদব-কায়দা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন অনুমতিক্রমে গৃহে প্রবেশ কর, তখন সেখানে যত মুসলমান আছে, তাদেরকে সালাম বল। আয়াতে **وَأَعْلَنَ لَّهُمْ** বলে তাই বোঝানো হয়েছে। কেননা, মুসলমান সকলেই এক অভিন্ন দল। অনেক সহীহ হাদীসে মুসলমানদের পরস্পরে একে অন্যকে সালাম করার উপর খুব জোর দেয়া হয়েছে এবং এর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।



(৬২) মুমিন তো তারা; যারা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি বিশাস স্থাপন করে এবং রসুলের সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে শরীক হলে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত চলে যায় না। যারা আপনার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, তাইরাই আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশাস স্থাপন করে। অতএব তারা আপনার কাছে তাদের কোন কাজের জন্যে অনুমতি চাইলে আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দিন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (৬৩) রসুলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরকে আহ্বানের মত গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে সেরে পড়ে। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে। (৬৪) মনে রেখো, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তা আল্লাহরই। তোমরা যে অবস্থায় আছ তা তিনি জানেন। যেদিন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে, সেদিন তিনি বলে দেবেন তারা যা করেছে। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ই জানেন।

সূরা আল-ফুরকান

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৭৭

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(১) পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বন্দার প্রতি ফয়সালার গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশুদ্ধগতের জন্যে সতর্ককারী হয়, (২) তিনি হলেন যার রয়েছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে শোষিত করেছেন পরিমিতভাবে।

আলোচ্য আয়াতে দু'টি আদেশ বর্ণিত হয়েছে। এক—যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) মুসলমানদেরকে কোন ধর্মীয় জেহাদ ইত্যাদির জন্যে একত্রিত করবেন, তখন ঈমানের দাবী হল সমবেত হওয়া এবং তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে সমাবেশ ত্যাগ না করা। কোন প্রয়োজন দেখা দিলে তাঁর কাছ থেকে যথারীতি অনুমতি গ্রহণ করা। এতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, বিশেষ অসুবিধা ও প্রয়োজন না থাকলে অনুমতি প্রদান করুন। এই প্রসঙ্গে মুনাফিকদেরও নিন্দা করা হয়েছে, যারা ঈমানের দাবীর বিরুদ্ধে দুর্গামের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে মজলিসে উপস্থিত হয়, কিন্তু এরপর কারও আড়ালে চুপিসারে সেরে পড়ে।

আহযাব যুদ্ধের সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন আরবের মুশরিক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের যুক্তফ্রন্ট সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণ করে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে পরিখা খনন করেন। এ কারণেই একে ‘গযওয়ায়ে খন্দক’ তথা পরিখার যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়।—(কুরতুবী)

বায়হাকী ও ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং এবং সকল সাহাবী পরিখা খননে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মুনাফিকরা প্রথমতঃ আসতেই চাইত না। এসেও লোক দেখানোর জন্যে সামান্য কাজ করে চুপিসারে সেরে পড়ত। এর বিপরীতে মুসলমানগণ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করে যেত এবং প্রয়োজন দেখা দিলে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে প্রশ্নান করত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(মায়হারী)

এই আদেশ রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর মজলিসের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, না ব্যাপক? ফেকাহবিদগণ সবাই একমত যে, এই আদেশ একটি ধর্মীয় ও ইসলামী প্রয়োজনের খাতিরে জারি করা হয়েছে, এক্ষণ প্রয়োজন প্রতি যুগেই হতে পারে, তাই এটা বিশেষভাবে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর মজলিসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং মুসলমানদের প্রত্যেক ইমাম ও আমীর তথা রাষ্ট্রীয় কর্ণধার ও তার মজলিসেরও এই বিধান। তিনি সবাইকে একত্রিত হওয়ার আদেশ দিলে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিনানুমতিতে ফিরে যাওয়া নাজায়েয।—(কুরতুবী, মায়হারী, বয়ানুল-কোরআন) বলাবাহুল্য, স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর মজলিসের জন্যে এই আদেশ অধিক জোরদার এবং এর বিরোধিতা প্রকাশ্য দুর্ভাগ্য; যেমন মুনাফিকরা তা করেছে। ইসলামী সামাজিকতার রীতিনীতির দিক দিয়ে এই আদেশ পারস্পরিক সমাবেশ ও সাধারণ সভা-সমিতির জন্যেও কমপক্ষে মোস্তাহাব ও উত্তম। মুসলমানগণ যখন কোন মজলিসে কোন সমষ্টিগত ব্যাপার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা অথবা কর্মপন্থা গ্রহণ করার জন্যে একত্রিত হয়, তখন চলে যেতে হলে সভাপতির অনুমতি নিয়ে যাওয়া উচিত।

দ্বিতীয় আদেশ সর্বশেষ আয়াতে এই দেয়া হয়েছে যে, لَا تَجْعَلُوْا دَعَاَ

الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ এর অর্থ রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর তরফ থেকে মুসলমানদেরকে ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা اِلَى اضافة الفاعل) আয়াতের অর্থ এই যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন ডাকেন, তখন একে সাধারণ মানুষের ডাকার মত মনে করো না যে, সাড়া দেয়া, না দেয়া

ইচ্ছাধীন; বরং তখন সাড়া দেয়া ফরয হয়ে যায় এবং অনুমতি ছাড়া চলে যাওয়া হারাম হয়ে যায়। আয়াতের বর্ণনাধারার সাথে এই তফসীর অধিক খাপ খায়। তাই মাযহাবী ও বয়ানুল-কোরআনে এই তফসীর গ্রহণ করা হয়েছে। এর অপর একটি তফসীর হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে ইবনে-কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, دُعَاءُ الرَّسُولِ এর অর্থ মানুষের তরফ থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কোন কাজের জন্যে ডাকা। (ব্যাকরণগত কায়দার দিক দিয়ে এটা المفعول الى المفعول)

এই তফসীরের ভিত্তিতে আয়াতের অর্থ এই যে, যখন তোমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কোন প্রয়োজনে আহ্বান কর অথবা সম্বোধন কর, তখন সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁর নাম নিয়ে ‘ইয়া মুহাম্মদ’ (সাঃ) বলবে না— এটা বেআদবী; বরং সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা ‘ইয়া রসূলুল্লাহ’ অথবা ‘ইয়া নবীআল্লাহ’ বলবে। এর সারমর্ম এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি সম্মান ও সম্মম প্রদর্শন করা মুসলমানদের জন্যে ওয়াজিব এবং যা আদবের পরিপন্থী কিংবা যদ্বারা তিনি ব্যথিত হন, তা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। এই আদেশের অনুরূপ সূরা হুজুরাতে আরও কতিপয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উদাহরণতঃ

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ
অর্থাৎ, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে কথা বল, তখন আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখ। প্রয়োজনানিতিরক্ত উচ্চৈঃস্বরে কথা বলো না; যেমন লোকেরা পরস্পর বলে। আরও একটি উদাহরণ, إِنَّ الَّذِينَ يَنْذُرُكَ مِنْ وَرَاءِ
অর্থাৎ, তিনি যখন গৃহে অবস্থান করেন, তখন বাইরে থেকে আওয়াজ দিয়ে ডেকো না; বরং বের হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাক।

হিশিয়ারী : এই দ্বিতীয় তফসীরে বুয়ূর্গ এবং বড়দেরও একটি আদব জানা গেল। তা এই যে, মুকব্বী ও বড়দেরকে নাম নিয়ে ডাকা বেআদবী। সম্মানসূচক উপাধি দ্বারা আহ্বান করা উচিত।

সূরা আল-ফুরকান

সূরার বৈশিষ্ট্য : অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে সমগ্র সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। হযরত ইবনে আব্বাস ও কাতাদাহ তিনটি আয়াতকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ এবং কিছু আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ।—(কুরতুবী) এ সূরার সারমর্ম কোরআনের মাহাত্ম্য এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও রিসালতের সত্যতা বর্ণনা করা এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব প্রদান করা।

بَرَكَاتُ শব্দটি বরকত থেকে উদ্ভূত। বরকতের অর্থ প্রভূত কল্যাণ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : আয়াতের অর্থ এই যে, প্রত্যেক কল্যাণ ও

বরকত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। فَرَقَانَ কোরআন পাকের উপাধি। এর আভিধানিক অর্থ, পার্থক্য করা। কোরআন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বর্ণনা করে এবং মু'জ্জযার মাধ্যমে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের প্রভেদ ফুটিয়ে তোলে। তাই একে ফোরকান বলা হয়।

الْمُلْكَيْنِ এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালত ও নবুওয়ত সমগ্র বিশৃঙ্খলতার জন্যে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ এরূপ নন। তাঁদের নবুওয়ত ও রেসালত বিশেষ দল ও বিশেষ স্থানের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের যে ছয়টি বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে একটি এই যে, তাঁর নবুওয়ত সমগ্র বিশৃঙ্খলতার জন্যে ব্যাপক।

تَخْلِيْق - تَقْدِير এর পর তদ্বির উল্লেখ করা হয়েছে। تَخْلِيْق এর অর্থ কোনরূপ নমুনা ব্যতিরেকেই কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করা। তা যেমনই হোক।

প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুর বিশেষ বিশেষ রহস্য : تَقْدِير এর ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা যে বস্তুই সৃষ্টি করেছেন, তার গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যকে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সে কাজের উপযোগী করেছেন, যে কাজের জন্যে বস্তুটি সৃজিত হয়েছে। আকাশের গঠন-প্রকৃতি ও আকার-আকৃতি সে কাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল, যার জন্যে আল্লাহ তাআলা আকাশ সৃষ্টি করেছেন। গ্রহ ও নক্ষত্র সৃজনে এমনসব উপাদান রাখা হয়েছে, যেগুলো তার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। ভূপৃষ্ঠে ও তার গর্ভে সৃজিত প্রত্যেকটি বস্তুর গঠন-প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, কোমলতা ও কঠোরতা সে কাজের উপযোগী যার জন্যে এগুলো সৃজিত হয়েছে। ভূপৃষ্ঠকে পানির ন্যায় তরল করা হয়নি যে, তার উপরে কিছু রাখলে ডুবে যায় এবং পাথর বা লোহার ন্যায় শক্তও করা হয়নি যে, খনন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা, ভূপৃষ্ঠকে খনন করার প্রয়োজনও আছে, যাতে ভূগর্ভ থেকে পানি বের করা যায় এবং এতে ভিত্তি খনন করে সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করা যায়। পানিকে তরল করার মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত আছে। বাতাসও তরল, কিন্তু পানি থেকে ভিন্নরূপ। পানি সর্বত্র আপন-আপনি পৌছে না। এতে মানুষকে কিছু পরিশ্রম করতে হয়। বাতাসকে আল্লাহ তাআলা বায়তামূলক নেয়ামত করেছেন; কোনরূপ আয়াস ছাড়াই তা সর্বত্র পৌছে যায়; বরং কেউ বাতাস থেকে বেঁচে থাকতে চাইলে তার জন্যে তাকে যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করতে হয়। সৃষ্ট বস্তুসমূহের রহস্য বিস্তারিত বর্ণনা করার স্থান এটা নয়। প্রত্যেকটি সৃষ্টবস্তুই কুদরত ও রহস্যের এক অপূর্ব নমুনা। ইমাম গাযালী (রহঃ) এ বিষয়ে المخلوقات الله বিষয়ে আলী নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করেছেন।

আলাচ্য আয়াতসমূহে শুরু থেকেই কোরআনের মাহাত্ম্য এবং যার প্রতি তা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে عِيْدِهِ খেতাব দিয়ে তাঁর সম্মান ও গৌরবের বিস্ময়কর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কেননা, কোন সৃষ্ট মানবের জন্যে এর চাইতে বড় সম্মান কল্পনা করা যায় না যে, স্রষ্টা তাকে ‘আমার’ বলে পরিচয় দেন।

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّا يُخْلِقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا
وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا
إِنْفِكٌ لِأَقْرَبِهِ وَأَمَانَةٌ عَلَيْهِ قَوْمُ الْآخِرُونَ فَقَدْ جَاءُوا
ظُلُمًا وَرُؤُوسًا وَقَالُوا السَّاطِطُونَ الْأَوَّلِينَ اتَّخَذَهَا فِيهِ
نُصْلًا عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَوَّلِيَاءَ قُلْ أَتَزَكَّى أَلَا أَعْلَمُ الْيَسْرَ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُوًّا رَحِيمًا وَقَالُوا
مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشِئُ فِي الْأَسْوَاقِ
لَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَهُ مَوْلَاكَ لَمَلِكٌ يَكُونُ مَعَهُ نَذِيرٌ أَوَّلِيَاءُ
إِلَيْهِ كَذَّبُوا وَيَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ
إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْجُورًا أَنْظَرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ
الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَظْهِمُونَ سَيِّئًا تَبَرَّكَ الَّذِي
إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ فُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا
بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدُوا لِلْمَنِّ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَجِيرًا ۝

(৩) তারা তাঁর পরিবর্তে কত উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না এবং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং নিজেদের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনেরও তারা মালিক নয়। (৪) কাফেররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ নয়, যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছে। অবশ্যই তারা অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। (৫) তারা বলে, এগুলো তো পুরাকালের রূপকথা, যা তিনি লিখে রেখেছেন। এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর কাছে শেখানো হয়। (৬) বলুন, একে তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য অবগত আছেন। তিনি ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (৭) তারা বলে, এ কেমন রসূল যে, খাদ্য আহরণ করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে? তাঁর কাছে কেন কোন ফেরেশতা নাযিল করা হল না যে, তাঁর সাথে সতর্ককারী হয়ে থাকত? (৮) অথবা তিনি ধন-ভাণ্ডার প্রাপ্ত হলেন না কেন, অথবা তাঁর একটি বাগান হল না কেন, যা থেকে তিনি আহরণ করতেন? জালেমরা বলে, তোমরা তো একজন জাদুগুরু ব্যক্তিরই অনুসরণ করছ। (৯) দেখুন, তারা আপনার কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। অতএব তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, এখন তারা পথ পেতে পারে না। (১০) কল্যাণময় তিনি, যিনি ইচ্ছা করলে আপনাকে তদপেক্ষা উত্তম বস্তু দিতে পারেন—বাগ-বাগিচা, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত হয় এবং দিতে পারেন আপনাকে প্রাসাদসমূহ। (১১) বরং তারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে এবং যে কেয়ামতকে অস্বীকার করে, আমি তার জন্যে অগ্নি প্রস্তুত করেছি।

এখান থেকে রসূল্লাহ (সাঃ) এর বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তি ও তার জওয়াবের বর্ণনা শুরু হয়ে কিছুদূর পর্যন্ত চলেছে।

তাদের প্রথম আপত্তি ছিল এই যে, কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কালাম নয়; বরং মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেই তা মিছামিছি উদ্ভাবন করেছেন অথবা পুরাকালের উপকথা ইহুদী, খ্রীষ্টানদের কাছে শুনে নিজের সঙ্গীদের দ্বারা লিখিয়ে নেন। যেহেতু তিনি নিজে নিরক্ষর—লেখাও জানেন না, পড়াও জানেন না, তাই লিখিত উপকথাগুলো সকাল-সন্ধ্যায় শ্রবণ করেন, যাতে মুখস্থ হয়ে যায়, এরপর মানুষের কাছে গিয়ে বলেন যে, এটা আল্লাহর কালাম।

কোরআন এই আপত্তির জবাবে বলেছে, **أَتَزَكَّى أَلَا أَعْلَمُ الْيَسْرَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** এর সারমর্ম এ যে, এই কালাম স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় যে,

এর নাযিলকারী আল্লাহ তাআলা সেই পবিত্র সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপন রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এ কারণেই তিনি কোরআনকে এক অলৌকিক কালাম করেছেন এবং বিশুকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, যদি তোমরা একে আল্লাহর কালাম বলে স্বীকার না কর, কোন মানুষের কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানুষ; এর অনুরূপ কালাম বেশী না হলেও একটি সূরা বরং একটি আয়াতই রচনা করে দেখাও। আরবের বিশুদ্ধ ও প্রাজ্ঞলভ্য লোকদের জন্যে এই চ্যালেঞ্জের জওয়াব দেয়া মোটেই কঠিন ছিল না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা পলায়নের পথ বেছে নিয়েছে এবং কোরআনের এক আয়াতের মোকাবেলায় অনুরূপ অন্য আয়াত রচনা করে আনার দুঃসাহস কারও হয়নি। অথচ তারা রসূল্লাহ (সাঃ) এর বিরোধিতায় নিজেদের ধন-সম্পত্তি বরং সম্ভান-সমৃদ্ধি ও প্রাণ পর্যন্ত ব্যয় করে দিতে কুণ্ঠিত ছিল না। কিন্তু কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা লিখে আনার মত ছোট্ট কাজটি করতে তারা সক্ষম হল না। এটা এ বিষয়ের জাজ্জল্যমান প্রমাণ যে, কোরআন কোন মানবরচিত কালাম নয়। নতুবা অন্য মানুষও এরূপ কালাম রচনা করতে পারত। এটা সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলারই কালাম। অলঙ্কারগুণ ছাড়া এর অর্থ-সম্ভার ও বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিহিত রয়েছে, যা একমাত্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়ে জ্ঞাতসত্তার পক্ষ থেকেই সম্ভবপর হতে পারে। এই বিষয়বস্তুর পূর্ণ বিবরণ সূরা বাক্বারায় বিশদ আলোচনার আকারে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় আপত্তি ছিল এই যে, যদি তিনি রসূল হতেন, তবে সাধারণ মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন না, বরং ফেরেশতাদের মত পানাহারের ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকতেন। এটাও না হলে কমপক্ষে তাঁর কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এত ধন-ভাণ্ডার অথবা বাগ-বাগিচা থাকত যে, তাঁকে জীবিকার কোন চিন্তা করতে হত না, হাটে-বাজারে চলাফেরা করতে হত না। এছাড়া তিনি যে আল্লাহর রসূল একথা আমরা কিরূপে মানতে পারি? প্রথমতঃ তিনি ফেরেশতা নন, দ্বিতীয়তঃ কোন ফেরেশতা তাঁর সাথে থাকেও না যে, তাঁর সাথে তাঁর কালামের সত্যায়ন করত। তাই মনে হয়, তিনি যাদুগ্রন্থ। ফলে তাঁর মস্তিষ্ক বিকল হয়ে গেছে এবং আগাগোড়াই বঙ্গাহীন কথাবার্তা বলেন। আলোচ্য আয়াতে এর সৎক্ষিপ্ত জওয়াব দেয়া হয়েছে যে,

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَظْهِمُونَ

الفرقان

২৫৭

قَدْ اَفْلَحَ

إِذَا رَأَوْهُم مِّنْ مَّكَانٍ يَسِيرٍ سَمِعُوا لَهُا تَنفِيطًا وَرَفِيرًا ۝
 وَإِذَا الْقَوَاہِمَ مَكَانًا مَّصِيفًا مَّقْرَنِينَ دُعَوَاهُنَّ لَكَ
 تَبِيرًا ۝ لَا تَعْلَمُوا الْيَوْمَ بُرًّا وَاجِدًا وَادْعُوا أَشْجُورًا
 كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ
 الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ
 خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدٌ مَسْئُولًا ۝ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ
 وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَلَمْ أَضَلَّكُمْ
 عِبَادِي فَكُلًّا أَمْ لَهُمْ صُلُوًّا السَّبِيلِ ۝ قَالُوا سُبْحَانَكَ
 مَا كَانَ يَشْفَعِي لَنَا إِنَّا نَحْنُ مِنَ دُونِكَ مِنْ أُولَئِكَ وَ
 لَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا
 بُرًّا ۝ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَغِيثُونَ صَرْفًا
 وَلَا تَعْمَلُونَ ۝ وَمَنْ يَظْلِمْ فَنُفِئْهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۝
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا الرُّسُلَ الَّتِي أَلَّاهُمْ لِيَاجُتَنَّبُوا
 الْكُفْرَ وَهُمْ يُنْشَوْنَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ
 لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝

(১২) অগ্নি যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনেতে পাবে তার গর্জন ও হুঙ্কার। (১৩) যখন এক শিকলে কয়েকজন বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সঙ্কীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন সেখানে তারা মৃত্যুকে ডাকবে। (১৪) বলা হবে, আচ্ছ তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকো না— অনেক মৃত্যুকে ডাক। (১৫) বলুন এটা উত্তম, না চিরকাল বসবাসের জাহান্নাত, যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে মুস্তাকীদেরকে? সেটা হবে তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তন স্থান। (১৬) তারা চিরকাল বসবাসরত অবস্থায় সেখানে যা চাইবে, তাই পাবে। এই প্রার্থিত ওয়াদা পূরণ আপনার পালনকর্তার দায়িত্ব। (১৭) সেদিন আল্লাহ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের এবাদত করত তাদেরকে, সেদিন তিনি উপাস্যদেরকে বলবেন, তোমরাই কি আমার এই বন্দাদেরকে পথভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রান্ত হয়েছিলে? (১৮) তারা বলবে— আপনি পবিত্র, আমরা আপনার পরিবর্তে অন্যকে মুকবীররূপে গ্রহণ করতে পারতাম না; কিন্তু আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন, ফলে তারা আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি। (১৯) (আল্লাহ মুশরিকদেরকে বলবেন,) তোমাদের কথা তো তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করল, এখন তোমরা শাস্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং সাহায্যও করতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে যে গোনাহ্গার আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আশ্বাসন করাব। (২০) আপনার পূর্বে যত রসূল প্রেরণ করেছি, তারা সবাই শাস্তি গ্রহণ করতে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের এককে অপরের জন্যে পরীক্ষারূপ করেছি। দেখি, তোমরা সব কর কিনা। আপনার পালনকর্তা সব কিছু দেখেন।

অর্থাৎ, দেখুন, এরা আপনার সম্পর্কে কেমন অজুত কথাবার্তা বলে। এর অর্থ এই যে, এরা সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এখন তাদের পথ পাওয়ার কোন উপায় নেই।

আনুযমিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তের বিরুদ্ধে কাকের ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের সক্ষিপ্ত জগুয়াব দেয়া হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর কিছু বিশদ বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমরা মূর্খতা ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে একথা বলছ যে, তিনি আল্লাহর রসূল হলে তাঁর কাছে আগা ধন-ভাণ্ডার থাকত, বিপুল সম্পত্তি ও বাগ-বাগিচা থাকত, যাতে তিনি জীবিকার চিন্তা থেকে মুক্ত থাকেন। এর উত্তর এই যে, এরূপ করা আমার জন্যে মোটেই কঠিন নয় যে, আমি আমার রসূলকে বিরাট ধনভাণ্ডার দান করি এবং বৃহত্তম রাষ্ট্রের অধিপতি করি; যেমন ইতিপূর্বে আমি হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)-কে আগা ধন-দৌলত ও বিশুব্যাপী নজিরবিহীন রাজত্ব দান করে এই শক্তিসামর্থ্য প্রকাশও করেছি। কিন্তু সর্বসাধারণের উপযোগিতা ও অনেক রহস্যের ভিত্তিতে পয়গম্বর সম্প্রদায়কে বস্তুনিষ্ঠ ও পার্শ্বি ধন-দৌলত থেকে পৃথকই রাখা হয়েছে। বিশেষ করে নবীকুল-শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ যাস্তফা (সাঃ)-কে আল্লাহ তাআলা সাধারণ দরিদ্র মুসলমানগণের কাতারে এবং তাদের অনুরূপ অবস্থার মধ্যে রাখাই পছন্দ করেছেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও নিজের জন্যে এই অবস্থাই পছন্দ করেছেন। মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযীতে হযরত আবু উমামার জবানী রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমার পালনকর্তা আমাকে বলেছেন, আমি আপনার জন্যে সমগ্র মক্কাভূমি ও তার পর্বতসমূহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেই। আমি আরও করলাম : না, হে আমার পালনকর্তা, আমি একদিন পেট ভরে খেয়ে আপনার শোকর আদায় করব ও একদিন উপবাস করে সবার করব— এ অবস্থাই আমি পছন্দ করি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমি ইচ্ছা প্রকাশ করলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সাথে থোরাকেরা করত —(মায়হারী)

সারকথা এই যে, আল্লাহ তাআলার হাজারো রহস্য এবং সাধারণ মানুষের উপযোগিতার ভিত্তিতেই পয়গম্বরগণ সাধারণতঃ দরিদ্র ও উপবাসক্লিষ্ট থাকতেন। এটাও তাঁদের বাধ্যতামূলক অবস্থা নয়; বরং তাঁরা চাইলে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে বিস্তৃশালী ও ঐশ্বর্যশালী করতে পারতেন। কিন্তু তাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, ধন-দৌলতের প্রতি তাঁদের কোন ঔৎসুক্যই হয় নাই। তাঁরা দারিদ্র্য ও উপবাসকেই পছন্দ করতেন।

কাকেরদের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, তিনি পয়গম্বর হলে সাধারণ মানুষের মতই পানাহার করতেন না এবং জীবিকা উপার্জনের জন্যে হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন না। এই আপত্তির ভিত্তি, অনেক কাকেরের এই ধারণা যে, আল্লাহর রসূল মানব হতে পারে না— ফেরেশতাই রসূল হওয়ার যোগ্য। কোরআন পাকের বিভিন্ন স্থানে এর উত্তর দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই উত্তর দেয়া হয়েছে যে, যেসব পয়গম্বরকে তোমার ও নবী ও রসূল বলে স্বীকার কর, তাঁরাও তো মানুষই ছিলেন; তাঁরা মানুষের মত পানাহার করতেন এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করতেন। এ থেকে তোমাদের বুঝে নেয়া উচিত ছিল যে, পানাহার করা ও

জান্নাত হারাম ও নিষিদ্ধ।—(মায়হারী)

مَسْتَقَرٍّ - خَيْرٌ مِّنْ مَّكَانٍ مَّكَانٍ

আবাসস্থল। مقبل শব্দটি قِبْلَةٌ থেকে উদ্ভূত—এর অর্থ দুপুরে বিশ্রাম করার স্থান। এখানে مقبل এর উল্লেখ সম্ভবতঃ এ কারণেও বিশেষভাবে করা হয়েছে যে, এক হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা দুপুরের সময় সৃষ্টজীবের হিসাবনিকাশ সমাপ্ত করবেন এবং দুপুরে নিদ্রার সময় জান্নাতবাসীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে পৌঁছে যাবে।—(কুরতুবী)

عَنِ النَّفْسِ عَنِ النَّفْسِ عَنِ النَّفْسِ

আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তা থেকে একটি হলকা মেঘমালা নীচে নামবে, যাতে কেরেশতারা থাকবে। এই মেঘমালা চাঁদোয়ার আকারে আকাশ থেকে আসবে এবং এতে আল্লাহ তাআলার দ্যুতি থাকবে, আশেপাশে থাকবে কেরেশতাদের দল। এটা হবে হিসাব-নিকাশ শুরু হওয়ার সময়। তখন কেবল খোলার নিমিত্তই আকাশ বিদীর্ণ হবে। এটা সেই বিন্দুর নয়, যা শিশ্যায় ফুৎকার দেয়ার সময় আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করার জন্যে হবে। কেননা, আয়াতে যে মেঘমালা অবতরণের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বিতীয়বার শিশ্যায় ফুৎকার দেবার পর হবে। তখন আকাশ ও পৃথিবী পুনরায় বহল হয়ে যাবে।—(বয়ানুল-কোরআন)

يَوْمَئِذٍ يَكُونُ لَكَ يَوْمَئِذٍ لَمْ تَكُنْ لَكَ لَكَ

এই আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার ফলে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এর বিধান ব্যাপক। ঘটনাটি এই : ওকবা ইবনে আবী মুযীত মক্কার অন্যতম মুশরেক সর্দার ছিল। সে কোন সফর থেকে ফিরে আসলে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করত এবং প্রায়ই রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর সাথেও সাক্ষাত করত। একবার নিয়ম অনুযায়ী সে শহরের গণ্যমান্য লোকদের দাওয়াত করল এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)—কেও আমন্ত্রণ জানাল। সে তাঁর সামনে খানা উপস্থিত করলে তিনি বললেন, আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করতে পারি না, যে পর্যন্ত তুমি সাক্ষ্য না দাও যে, আল্লাহ এক, এবাদতে তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আমি তাঁর রসূল। ওকবা এই কলমে উচ্চারণ করল এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) শর্ত অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণ করলেন।

উবাই ইবনে-খালফ ছিল ওকবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে যখন ওকবার ইসলাম গ্রহণের কথা জানতে পারল, তখন খুবই রাগান্বিত হল। ওকবা ওযর পেশ করল যে, কোরাইশ বংশের সম্মানিত অতিথি মুহাম্মদ (সঃ) আমার গৃহে আগমন করেছিলেন। তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে ফিরে গেলে তা আমার জন্য অবমাননাকর ব্যাপার হত। তাই আমি তাঁর মনোরঞ্জননের জন্যে এই কলমে উচ্চারণ করেছি। উবাই বলল : আমি তোমার এই ওযর কবুল করব না, যে পর্যন্ত তুমি গিয়ে তার মুখে খুখু নিক্ষেপ না করবে। হতভাগ্য ওকবা বন্ধুর কথায় সায দিয়ে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শনে সম্মত হল এবং তদ্রূপ করেও ফেলল। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেও উভয়কে লাক্ষিত করেছেন। তারা উভয়ে বদর যুদ্ধে নিহত হয়।—(বগতী) আয়াতে তাদের পরকালীন শাস্তির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তি সামনে দেখে তারা পরিতাপ সহকারে হস্তদুয় দর্শন করবে এবং বলবে : হায় আমি যদি অমুককে অর্থাৎ, উবাই ইবনে খালফকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম।—(মায়হারী, কুরতুবী)

দুস্কর্মপরাগণ ও ধর্মহীন বন্ধুর বন্ধু কেয়ামতের দিন অনুতাপ ও দুঃখের কারণ হবে : তফসীরে-মায়হারীতে আছে, আয়াতটি যদিও

বিশেষভাবে ওকবার ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু এর ভাষা যেমন ব্যাপক, তার বিধানও তেমনি ব্যাপক। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে সম্ভবতঃ আয়াতে বন্ধুর নামের পরিবর্তে فُلَانًا (অমুক) শব্দ অবলম্বন করা হয়েছে। আয়াতে বিধৃত হয়েছে যে, যে দুই বন্ধু পাপ কাজে সম্মিলিত হয় এবং শরীয়তবিরোধী কার্যাবলীতে একে অপরের সাহায্য করে, তাদের সবারই বিধান এই যে, কেয়ামতের দিন তারা এই বন্ধুত্বের কারণে কান্নাকাটি করবে। মুসনাদে-আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর জবানী রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : لَا تَصَاحِبِ الْأَمْرَ وَلَا يَأْكُلُ مَالَكَ الْاَتَقَى কোন অমুসলিমকে সঙ্গী করো না এবং তোমার ধন-সম্পদ (বন্ধুত্বের দিক দিয়ে) যেন পরহেযগার ব্যক্তিই খায়। অর্থাৎ, পরহেযগার নয়, এমন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করো না। হযরত আবু হুরায়রার জবানী রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : عَلَى دِينَ خَلِيلٍ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مِنْ يَخَالِلِ (অভ্যাসগতভাবে) বন্ধুর ধর্ম ও চালাচলন অবলম্বন করে। তাই কিরূপ লোককে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে, তা পূর্বেই ভেবে দেখা উচিত।—(বোখারী)

হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ)—কে জিজ্ঞেস করা হল যে, আমাদের মজলিসী বন্ধুদের মধ্যে কারা উত্তম? তিনি বললেন, مَنْ ذَكَرَكَ بِاللَّهِ رُؤْيَاهُ وَزَادَ فِي عِلْمِكَ مَنَظَرَهُ وَذَكَرَكَ بِالْآخِرَةِ عَمَلَهُ অর্থাৎ, যাকে দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়, যার কথাবার্তায় তোমার জ্ঞান বাড়ে এবং যার কাজ দেখে পরকালের স্মৃতি তাজ্জা হয়।—(কুরতুবী)

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ بِإِذْنِهِ

অর্থাৎ, রসূল মুহাম্মদ (সঃ) বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় এই কোরআনকে পরিত্যাগ করেছে। আল্লাহর দরবারে রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর এই অভিযোগ কেয়ামতের দিন হবে, না এই দুনিয়াতেই এই অভিযোগ করেছেন, এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত আছে যে, তিনি দুনিয়াতেই এই অভিযোগ পেশ করেছেন এবং জগত্বাবে তাঁকে সাদ্ধুনা দেয়ার জন্যে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, وَكَذَلِكَ

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ

অর্থাৎ, আপনার শত্রুরা কোরআন অমান্য করলে তজ্জন্য আপনার সবার করা উচিত। কেননা, এটাই আল্লাহর চিরন্তন রীতি যে, প্রত্যেক নবীর কিছুসংখ্যক অপরাধী শত্রু থাকে এবং পয়গম্বরগণ তজ্জন্য সবার করেছেন।

কোরআনকে কার্যতঃ পরিত্যক্ত করাও মহাপাপ : কোরআনকে পরিত্যক্ত ও পরিত্যক্ত করার বাহ্যিক অর্থ কোরআনকে অস্বীকার করা, যা কাকেরদেরই কাজ। কিন্তু কোন কোন রেওয়াজেতে থেকে এ কথাও জানা যায় যে, যে মুসলমান কোরআনে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু রীতিমত তেলাওয়াত করে না এবং আমলও করে না, সে-ও এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আনাসের রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلِقَ مَصْحَفَهُ لَمْ يَتَعَاهَدَهُ وَلَمْ يَنْظُرْ فِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا بِهِ يَقُولُ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ عَبْدَكَ هَذَا اخَذَنِي مَهْجُورًا فَاقْضَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ .

যে ব্যক্তি কোরআন শিক্ষা করে, কিন্তু এরপর তাকে বৈধ গৃহে ঝুলিয়ে

১৫৫০

২৭৭

১৭৭৭

وَلَا يَتُوبُكَ إِلَّا بِشَىْءٍ لَّاحِقٍ وَأَحْسَنُ تَقْوِيلًا ۝ الَّذِينَ
يُخْسِرُونَ عَلَىٰ أَيْمَانِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ سَمِعُوا مَا كَانُوا أَصْلُ
سَيِّئًا ۚ لَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ
وَزَيْرًا ۚ فَتَلَّكَ الْأَمْثَالَ ۚ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَذُوقُوا
تَذْوِيرَهُ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ كَذَّبُوا الرَّسُولَ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ
آيَةً ۚ وَأَعَذْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۚ وَعَادًا وَثَمُودًا ۚ
أَصْحَابَ الرَّيْسِ وَقَوْمَ الْيَمِينِ ۚ ذَٰلِكَ كَيْفَ يَكْفُرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ
الْأَمْثَالُ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَتْلُو حَقِيقَةً لِّكُلِّ الْقَوْمِ ۚ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَوْمِ
أَمْطَرْتُ مَطَرًا ۚ لَقَدْ كَانُوا يَكْفُرُونَ ۚ وَكَانُوا لَا
يَرْجِعُونَ ۚ تَنْوَارًا ۚ وَكَذَٰلِكَ ۚ وَإِنْ يَسْتَعْجِلْكَ الْأَمْثُلُ ۚ هَٰذَا
الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۚ إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْبَةِ ۚ لَوْ
لَا أَنَّ صِدْقًا عَلَيْنَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ
مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۚ أَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهُهُ هَوًى ۚ أَفَأَنْتَ
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۚ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ الْكُفْرَ هُمْ يَسْمَعُونَ
أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْإِنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۚ

(৩৩) তারা আপনার কাছে কোন সমস্যা উপস্থাপিত করলেই আমি আপনাকে তার সঠিক জওয়াব ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি। (৩৪) যাদেরকে মুখ খুঁড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্রিত করা হবে, তাদেরই স্থান হবে নিকট এবং তারাও পঞ্চভট। (৩৫) আমি তো মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তাঁর সাথে তাঁর ভাতা হারুনকে সাহায্যকারী করেছি। (৩৬) অতঃপর আমি বলেছি, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের কাছে যাও, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি। (৩৭) নূহের সম্প্রদায় যখন রসূলগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানবমণ্ডলীর জন্য নিদর্শন করে দিলাম। জালেমদের জন্য আমি যজ্ঞাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৩৮) আমি ধ্বংস করেছি আদ, সামুদ, কূপারী এবং তাদের মধ্যবর্তী অনেক সম্প্রদায়কে। (৩৯) আমি প্রত্যেকের জন্যই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি এবং প্রত্যেককেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছি। (৪০) তারা তো সেই জনপদের উপর দিয়েই যাতায়াত করে, যার ওপর বর্ষিত হয়েছে মন্দ বৃষ্টি। তবে কি তারা তা প্রত্যক্ষ করে না? বরং তারা পুনরুজ্জীবনের আশঙ্কা করে না। (৪১) তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন আপনাকে কেবল বিদ্রোহের পাত্ররূপে গ্রহণ করে, বলে, ‘এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ ‘রসূল’ করে প্রেরণ করেছেন?’ (৪২) সে তো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগণের কাছ থেকে সরিয়েই দিত, যদি আমরা তাদেরকে ঠাঁকড়ে ধরে না থাকতাম। তারা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন জানতে পারবে কে অধিক পঞ্চভট। (৪৩) আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার বিশ্বাসদার হবেন? (৪৪) আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অশব্দ বোঝে? তারা তো চতুশদ জন্তুর মত; বরং আরও পঞ্চভট।

রাফে, রীতিমত তেলাওয়াত করে না এবং তার বিধানাবলীও পালন করে না, কেয়ামতের দিন সে গলায় কোরআন খুলন্ত অবস্থায় উঠিত হবে। কোরআন আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে বলবে, আপনার এই বন্দা আমাকে ত্যাগ করেছিল। এখন আপনি আমার ও তার ব্যাপারে ফয়সালা দিন।—(কুরত্বী)

সূরার শুরু থেকে কাকের ও মুশরিকদের আশুতিসমূহের জওয়াব দেয়া হচ্ছিল। ৩২ তম আয়াতে সেই পরম্পরারই অংশ। আপত্তির জওয়াবে কোরআনকে ক্রমে ক্রমে অবতীর্ণ করার এক তাৎপর্য এই বর্ণিত হয়েছে যে, এর মাধ্যমে আপনার অন্তরকে মজবুত রাখা উদ্দেশ্য। পর্যায়ক্রমে অবতারণার মধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর অন্তর মজবুত হওয়ার বিবিধ কারণ আছে। প্রথমতঃ এর ফলে মুখস্থ রাখা সহজ হয়েছে। একটি বৃহৎকার গ্রন্থ এক দফায় নাখিল হয়ে গেলে এই সহজসাধ্যতা থাকত না। সহজে মুখস্থ হতে থাকার ফলে অন্তরে কোনরূপ পেরেশানী থাকে না। দ্বিতীয়তঃ কাকেররা যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি অথবা তাঁর সাথে কোন অশালীন ব্যবহার করত, তখনই তাঁর সাধুনার জন্যে কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত। সমগ্র কোরআন এক দফায় নাখিল হলে সেই বিশেষ ঘটনা সম্পর্কিত সাধুনাবাণী কোরআন থেকে খুঁজে বের করার প্রয়োজন দেখা দিত এবং মস্তিষ্ক সেদিকে ধাবিত হওয়াও স্বাভাবিক জরুরী ছিল না। তৃতীয়তঃ আল্লাহ সঙ্গ আসছেন, এই অনুভূতিই অন্তর মজবুত হওয়ার প্রধানতম কারণ। আল্লাহর পয়গাম আগমন সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ সঙ্গ আসছেন। পর্যায়ক্রমে নাখিল হওয়ার রহস্য এই তিনের মধ্যেই সীমিত নয়, আরও অনেক রহস্য রয়েছে। তন্মধ্যে কতক সূরা বনী ইসরাঈলের *إِنَّمَا أَوْفَوْتَ رَبُّكَ بِالْحَقِّ ۖ وَأَقْبَلَتْ* আয়াতে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।—(বয়ানুল-কোরআন)

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا এতে ফেরাউন সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে

যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। অথচ তখন পর্যন্ত তওরাত মুসা (আঃ)—এর প্রতি অবতীর্ণ হয়নি। কাজেই এখানে তওরাতের আয়াতে মিথ্যারোপ করার অর্থ হতে পারে না; বরং এ আয়াতের অর্থ হয় তওহীদের প্রমাণাদি, যা প্রত্যেক মানুষ নিজ বুদ্ধি-জ্ঞান দ্বারা বুঝতে পারে, এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা না করাকেই মিথ্যারোপ করা বলা হয়েছে, না হয় পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের ঐতিহ্য, যা কিছু না কিছু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে মিথ্যারোপ দ্বারা সেসব ঐতিহ্যের অস্বীকৃতি বোঝানো হয়েছে। যেমন কোরআন পাকের *وَلَقَدْ* আয়াতে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শিক্ষা তাদের কাছে বর্ণিত হয়ে এসেছে।—(বয়ানুল-কোরআন)

নূহের সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। অথচ তাদের যুগের পূর্বে কোন রসূল ছিলেন না এবং তারাও কোন রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করেনি। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা হযরত নূহ (আঃ)—এর প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ধর্মের মূলনীতি সব পয়গম্বরেরই অভিনু, তাই একজনের প্রতি মিথ্যারোপ সবার প্রতি

الفُرْقَانُ

২৫

وَقَالَ الَّذِينَ

أَلَمْ نَزَلْ إِلَىٰ رِبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ سَاءَ لَعْنَةٍ
 جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۚ لَوَ قَبَضْنَاهُ لِنَابِقْصَاصٍ يَّابِرًا ۝
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ
 النَّهَارَ تُنُورًا ۚ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا لِّبَنِي
 رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۚ لِنُخْرِجَ بِهِ لَبَدَةً
 مَّيِّتًا وَنُخْرِجَ مِنْهَا خَضِرًا حَيًّا وَمَا أَكَلَتْ مِنْ أَشْجَارٍ كَثِيرًا ۚ وَلَقَدْ
 صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۚ وَلَوْ
 شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ لَّذِيذًا ۚ وَكَذَّبُوا عَنْهُمْ الْأُكْحُرِينَ وَ
 جَاهِدَهُمْ فِيهِ ۚ فَجَاءَ أَكْثَرُ الْوَحْيِ مِنَ الْيَمِينِ ۚ هَذَا
 عَذَابٌ قَاتِلٌ ۚ وَهَذَا أَمْرٌ ۚ أَجَابُوا لِمَا جَاءَهُمْ بِبَيْنِهِمَا رِجَالًا
 مَّجْرُومًا ۚ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ
 صُهْرًا ۚ وَكَانَ رِبِّكَ قَدِيرًا ۚ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ
 ظُهُورًا ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ
 عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَرَادْتُمْ إِلَّا أَنْ يَتَّخِذُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ سَبِيلًا ۝

(৪৫) তুমি কি তোমার পালনকর্তাকে দেখ না, তিনি কিভাবে ছায়াকে বিলম্বিত করেন? তিনি ইচ্ছা করলে একে স্থির রাখতে পারতেন। এরপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। (৪৬) অতঃপর আমি একে নিজের দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি। (৪৭) তিনিই তো তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন আবরণ, নিদ্রাকে বিশ্রাম এবং দিনকে করেছেন বাইরে গমনের জন্যে। (৪৮) তিনিই স্বীয় রহমতের প্রাক্কালে বাতাসকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। এবং আমি আকাশ থেকে পরিব্রতা অর্জনের জন্যে পানি বর্ষণ করি, (৪৯) তদ্বারা মৃত ভূভাগকে সঞ্জীবিত করার জন্যে এবং আমার সৃষ্ট জীবজন্তু ও অনেক মানুষের ভূষা নিবারণের জন্যে। (৫০) এবং আমি তা তাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে বিতরণ করি, যাতে তারা স্মরণ করে। কিন্তু অধিকাংশ লোক অকৃতজ্ঞতা ছাড়া কিছুই করে না। (৫১) আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন ভয় প্রদর্শনকারী প্রেরণ করতে পারতাম। (৫২) অতএব আপনি কাফেরদের অনুগত করবেন না এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর সঙ্গ্রাম করুন। (৫৩) তিনিই সমান্তরালে দুই সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন, এটি মিষ্ট, তৃষ্ণা নিবারক ও এটি লোনা, বিষাদ, উভয়ের মাঝখানে রেখেছেন একটি অস্ত্রায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল। (৫৪) তিনিই পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন মানবকে, অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম। (৫৫) তারা এবাদত করে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছু, যা তাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। কাফের তো তার পালনকর্তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী। (৫৬) আমি আপনাকে সুসংবাদ ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করেছি। (৫৭) বলুন, আমি তোমাদের কাছে এর কোন বিনিময় চাই না, কিন্তু যে ইচ্ছা করে, সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক।

মিথ্যারোপ করার শামিল।

অভিশানে رس শব্দের অর্থ কাঁচা কূপ। কোরআন পাক ও কোন সহীহ হাদীসে তাদের বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখিত হয়নি। ইসরাঈলী রেওয়াজে বিভিন্নরূপ। অধিক গ্রহণযোগ্য উক্তি এই যে, তারা ছিল সামুদ্র গোত্রের অবশিষ্ট জনসমষ্টি এবং তারা কোন একটি কূপের ধারে বাস করত — (কামুস, দুবরে-মনসুর) তাদের শাস্তি কি ছিল, তাও কোরআনে ও কোন সহীহ হাদীসে বিবৃত হয়নি। — (বয়ানুল-কোরআন)

শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসরণ এক প্রকার মূর্তিপূজা : اَرَبَيْتَ
এই আয়াতে ইসলাম ও শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তির অনুসারীকে প্রবৃত্তির পূজারী বলা হয়েছে। যহরত ইবনে আব্বাস বলেন, শরীয়তবিরোধী প্রবৃত্তিও এক প্রকার মূর্তি যার পূজা করা হয়। তিনি এর প্রমাণ হিসেবে এই আয়াত তেলাওয়াত করেন। — (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার সর্বময় ক্ষমতা এবং বন্দার প্রতি তাঁর নেয়ামত ও অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে, যার ফলে আল্লাহ তাআলার তওহীদও প্রমাণিত হয়।

أَلَمْ نَزَلْ إِلَىٰ رِبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلَّ ۚ রৌদ্র ও ছায়া দু'টি এমন নেয়ামত,

যা ছাড়া মানুষের জীবন ও কাজ-কারবার চলতে পারে না। সর্বদা ও সর্বত্র রৌদ্রই রৌদ্র থাকলে মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্যে যে কি ভীষণ বিপদ হত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ছায়ার অবস্থাও ভিন্নরূপ নয়। সর্বদা ও সর্বত্র কেবল ছায়া থাকলে, রৌদ্র না আসলে মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক থাকতে পারে না এবং অন্যান্য হাজারো কাজ এতে বিঘ্নিত হবে। আল্লাহ তাআলা সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা এই নেয়ামত দুটি সৃষ্টি করে এগুলোকে মানুষের জন্যে আরাম ও শান্তির উপকরণ করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা দুনিয়ার সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিশেষ বিশেষ কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে যখন কারণগুলো অস্তিত্ব লাভ করে, তখন এই বস্তুসমূহও অস্তিত্ব লাভ করে এবং কারণের অনুপস্থিতিতে বস্তুও অনুপস্থিত থাকে। কারণ, শক্তিশালী কিংবা বেশী হলে ঘটনার অস্তিত্বও শক্তিশালী ও বেশী হয়ে যায়। কারণ দুর্বল কিংবা কম হলে ঘটনাও দুর্বল কিংবা কম হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা শস্য ও তৃণলতা উৎপন্ন করার কারণ মাটি, পানি ও বায়ুকে, আলোর কারণ চন্দ্র-সূর্যকে এবং বৃষ্টির কারণ মেঘমালা ও বায়ুকে করে রেখেছেন। তিনি এসব কারণ ও তাঁর প্রভাবাদির মধ্যে এমন অটুট ও শক্ত বন্ধন প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন যে, হাজারো বছর ধরে তাতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা দেয়নি। সূর্য ও তার গতি এবং তা থেকে সৃষ্ট দিবারাত্রি ও রৌদ্র-ছায়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এমন অটুট ব্যবস্থা দৃষ্টিগোচর হয় যে, শত শত বরং হাজার হাজার বছরের মধ্যে তাতে এক মিনিট বরং এক সেকেন্ডেরও পার্থক্য হয় না। চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদির যন্ত্রপাতিতে কখনও দুর্বলতা আসে না এবং এগুলোর সংস্কার ও মেরামতেরও প্রয়োজন হয় না। যখন থেকে পৃথিবী অস্তিত্ব লাভ করেছে, তখন থেকে এক নিয়মে এবং একই গতিতে তা গতিশীল রয়েছে। অঙ্ক কষে হাজার বছর পরের ঘটনার সময় বলে দেয়া যায়।

কারণ ও ঘটনার এই অটুট ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তাআলার সর্বময় ক্ষমতার অভাবনীয় দৃষ্টান্ত এবং তাঁর অপার রহস্যের অকাট্য প্রমাণ।

ব্যবস্থাপনার এই দক্ষতাই মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীনতায় ফেলে দিয়েছে। মানুষের দৃষ্টিতে এখন শুধু বাহ্যিক কারণাদিই রয়ে গেছে। তারা এসব কারণকেই সবকিছুর প্রভা ও প্রভু মনে করতে শুরু করেছে। আসল শক্তি, যিনি কারণাদি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কারণাদির আবরণেই আবৃত হয়ে গেছেন। তাই পয়গম্বরগণ ও খোদায়ী কিতাবসমূহ মানুষকে বার বার হুশিয়ার করে দিয়েছে যে, দৃষ্টি সামান্য উর্ধ্বে তোল এবং তীক্ষ্ণ কর। প্রকৃত কারণাদির যবনিকার অন্তরালে যিনি এই ব্যবস্থাপনার পরিচালক, তাঁকে দেখলেই স্বরূপ উদঘাটিত হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত বর্ণনাই বিধৃত হয়েছে।

আয়াতে গাফেল মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা প্রত্যহ দেখে—সকালে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া পশ্চিম দিকে লম্বমান থাকে, এরপর আস্তে আস্তে হ্রাস পেয়ে দুপুরে নিঃশেষ অথবা নিঃশেষিত প্রায় হয়ে যায়। এরপর সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে গেলে এই ছায়াই আস্তে আস্তে পূর্বদিকে বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রত্যেক মানুষ রোজই এই রৌদ্র ও ছায়ার উপকারিতা লাভ করে এবং স্বচক্ষে দেখে যে, এ সবগুলো সূর্যের উদয়, উর্ধ্বে গমন এবং পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার অপরিহার্য পরিণতি ও ফল। কিন্তু সূর্য গোলকের সৃষ্টি এবং তাকে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় রাখার কাজটি কে করেছে, এটা চর্মচক্ষে ধরা পড়ে না। এর জন্যে অন্তর্চক্ষু ও দিব্যদৃষ্টি দরকার।

আলোচ্য আয়াতে মানুষকে অন্তর্চক্ষু দান করাই উদ্দেশ্য যে, ছায়ার হ্রাস বৃদ্ধি যদিও তোমাদের দৃষ্টিতে সূর্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু একথাও চিন্তা কর যে, সূর্যকে এমন অতুচ্ছল করে কে সৃষ্টি করল এবং তার গতিকে একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনার অধীনে কে কায়ম রাখল? হার সর্বময় ক্ষমতা এগুলো করেছে, প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই রৌদ্র-ছায়ার নেয়ামত দান করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে এই রৌদ্র-ছায়াকে এক অবস্থায় স্থির রাখতে পারতেন। যেখানে রৌদ্র, সেখানে সর্বদাই রৌদ্র থাকত এবং যেখানে ছায়া, সেখানে সর্বদাই ছায়া থাকত। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি এরূপ করেননি।

মানুষকে এই স্বরূপ সম্পর্কে অবগত করার জন্যে ছায়ার প্রত্যাবর্তন ও হ্রাস পাওয়াকে আলোচ্য আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে : **مَضْنُهُ** **الْبَتَّاءُ صَائِرًا** অর্থাৎ, অতঃপর ছায়াকে আমি নিজেদের দিকে গুটিয়ে নেই। বলাবাহুল্য, আল্লাহ তাআলা শরীর, শারীরিক বিষয় এবং দিকের উর্ধ্বে। তাঁর দিকে ছায়া সংকুচিত হওয়ার অর্থ এটাই যে, তাঁর সর্বময় ক্ষমতার দ্বারাই এসব কাজ হয়।

রাত্রিকে নিদ্রার জন্যে এবং দিনকে কর্মব্যস্ততার জন্যে নির্ধারণের রহস্য : **وَالَّذِينَ جَعَلْنَا لَكُمْ لَيْلًا وَنَوْمًا سُبَاتًا وَجَعَلْنَا** **النَّهَارَ** আয়াতে রাত্রিকে ‘লেবাস’ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। লেবাস যেমন মানব-দেহকে আবৃত করে, রাত্রিও তেমনি একটি প্রাকৃতিক আবরণ, যা সমগ্র সৃষ্ট-জগতের উপর ফেলে দেয়া হয় **سَبَاتٌ** শব্দটি **سَبَاتٌ** থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ ছিন্ন করা। এমন বস্ত্র, যদ্বারা অন্য বস্তকে ছিন্ন করা হয়।

নিদ্রাকে আল্লাহ তাআলা এমন করেছেন যে, এর ফলে সারাদিনের

ক্লান্তি ও শ্রান্তি ছিন্ন তথা দূর হয়ে যায়। চিন্তা ও কল্পনা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মস্তিষ্ক শান্ত হয়। তাই **سَبَاتٌ** এর অর্থ করা হয় আরাম, শান্তি। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি রাত্রিকে আবৃতকারী করেছি, অতঃপর তাতে মানুষ ও প্রাণীদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিয়েছি, যা তাদের আরাম ও শান্তির উপকরণ।

এখানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবনযোগ্য। প্রথম, নিদ্রা যে আরাম বরণ আরামের প্রাণ, তা সবাই জানে, কিন্তু আলোর মধ্যে নিদ্রা আসা স্বভাবতঃই কঠিন হয়। নিদ্রা এলেও দ্রুত ভেঙ্গে যায়। আল্লাহ তাআলা নিদ্রার উপযোগী করে রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং শীতলও করেছেন। এমনভাবে রাত্রি একটি নেয়ামত এবং নিদ্রা দ্বিতীয় নেয়ামত। তৃতীয় নেয়ামত এই যে, সারা বিশৃঙ্খল মানুষ ও জীব-জন্তুর নিদ্রা একই সময় রাতে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। নতুবা একজনের নিদ্রার সময় অন্যজন থেকে ভিন্ন হলে যখন কিছু লোক নিদ্রামগ্ন থাকত, তখন অন্য লোকেরা কাজে লিপ্ত ও হুটগোলের কারণ হয়ে থাকত। এমনভাবে যখন অন্যদের নিদ্রার সময় আসত, তখন যারা কাজ করত ও চলাফেরা করত, তারা তাদের নিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করত। এছাড়া প্রত্যেক মানুষের অনেক দরকার অন্য মানুষের সাথে জড়িত থাকে। এর ফলে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতাও গুরুতররূপে বিঘ্নিত হত।

এসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যদি কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি হত যে, সবাইকে নিদ্রার জন্যে একই সময় নির্দিষ্ট করতে হবে, তবে প্রথমতঃ এরূপ চুক্তি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া সহজ ছিল না। তদুপরি চুক্তি যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা, তা তদারক করার জন্যে হাজারো বিভাগ খুলতে হত। এতদসত্ত্বেও সাধারণ আইনগত ও চুক্তিগত পদ্ধতিতে স্থিরীকৃত বিষয়াদিতে ঘৃণ, রেয়াত ইত্যাদি কারণে যেসব ক্রটি-বিচ্যুতি সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়, এতে তাও বরাবর পরিলক্ষিত হত।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় সর্বময় ক্ষমতা দ্বারা নিদ্রার একটি বাধ্যতামূলক সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর এ সময়েই নিদ্রা আসে। কখনও কোন প্রয়োজনে জাগ্রত থাকতে হলে এর জন্যে আয়াস সহকারেই ব্যবস্থা করতে পারে।

فَبَرَكْنَا لَهُمُ السَّنَاسَ الْفَافِقِينَ অর্থাৎ, **نَشْرُ** বাক্যে দিনকে **نَشْرُ** জীবন বলা হয়েছে। কেননা, এর বিপরীত অর্থাৎ, নিদ্রা এক প্রকার মৃত্যু। এই জীবনের সময়কেও সমগ্র মানব মণ্ডলীর মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে এক করে দেয়া হয়েছে। নতুবা কিছু কারখানা ও দোকান দিনে বন্ধ থাকত, রাতে খুলত এবং সেগুলো খুললে অন্যগুলো বন্ধ হয়ে যেত। ফলে উভয়েই ব্যবসায়িক অসুবিধার সম্মুখীন হত।

রাত্রিকে নিদ্রার জন্যে নির্দিষ্ট করে আল্লাহ তাআলা যেমন একটি বড় অনুগ্রহ করেছেন, তেমনিভাবে জীবন ধারণের অন্যান্য পারস্পরিক অভিন্ন প্রয়োজনের জন্যেও এমন এক ও অভিন্ন সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। উদাহরণতঃ সকাল-সন্ধ্যায় ক্ষুধা ও আহারের প্রয়োজন একটি অভিন্ন বিষয়। এসব সময়ে সবাই এর চিন্তা করে। ফলে প্রত্যেকের জন্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ সহজ হয়ে যায়। হোটেল ও রেস্তোরাঁ এসব সময়ে খাদ্যদ্রব্যে ভরপুর হয়ে উঠে। প্রত্যেক গৃহে ষাণ্ডা-দাওয়ার ব্যস্ততার জন্যে এসব সময় নির্দিষ্ট। নির্দিষ্টকরণের এই নেয়ামত আল্লাহ তাআলা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে রেখে দিয়েছেন।

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا - **طَهُورًا** শব্দটি আরবী ভাষায়

অতিশয়ার্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এমন জিনিসকে طهر বলা হয়, যা নিজেও পবিত্র এবং অপরকেও তদ্বারা পবিত্র করা যায়। আল্লাহ তাআলা পানিকে এই বিশেষ গুণ দান করেছেন যে, সে নিজেও পবিত্র এবং তদ্বারা সর্বপ্রকার অপবিত্রতাকেও দূর করা যায়। সাধারণতঃ আকাশ থেকে কোন সময় বৃষ্টির আকারে এবং কোন সময় বরফ ও শিলার আকারে পতিত পানিই মানুষ ব্যবহার করে। অতঃপর এই পানিই পাহাড়-পর্বতের শিরা-উপশিরা মাধ্যমে প্রাকৃতিক পাইপ লাইনের আকারে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই পানি কোথাও আপনা-আপনি বরগার আকারে নির্গত হয়ে ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হতে থাকে এবং কোথাও মৃত্তিকা খনন করে কূপের আকারে বের করা হয়। সব পানিই নিজে পবিত্র ও অপরকে পবিত্রকারী। কোরআন, সুন্নাহ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ইজমা এর প্রমাণ।

انسى اناسى - وَتُؤْتِيهِمْ مِنْهَا فُجُورًا وَنُفُورًا

—এর বহুবচন এবং কেউ কেউ বলেন, انسان—এর বহুবচন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানি দ্বারা আল্লাহ তাআলা মাটিকে সিক্ত করেন এবং জীব-জন্তু ও অনেক মানুষেরও তৃষ্ণা নিবারণ করেন। এখানে প্রশ্নাধিকারযোগ্য যে, জীব-জন্তু যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করে, তেমনি মানুষও সবাই এই পানি দ্বারা উপকৃত হয় ও তৃষ্ণা নিবারণ করে। এতদসত্ত্বেও আয়াতে ‘অনেক মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ করি’ বলার কারণ কি? এতে বোঝা যায় যে, অনেক মানুষ এই পানি থেকে বঞ্চিত। উত্তর এই যে, এখানে ‘অনেক মানুষ’ বলে প্রান্তরের অধিবাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা সাধারণতঃ বৃষ্টির পানির উপর ভরসা করেই জীবন অতিবাহিত করে। নগরের অধিবাসীরা নহরের কিনারায় কূপের ধারে-কাছেই বসবাস করে। ফলে তারা বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকে না।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِ لَكُم مِّنْهُ وَمِنْهَا شَرِبْتُمْ

মানুষের মধ্যে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আনি; কোন সময় এক জনপদে এবং কোন সময় অন্য জনপদে বর্ষণ করি। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, প্রায়ই মানুষের মধ্যে জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে যে, এ বছর বৃষ্টি বেশী, এ বছর কম। এটা প্রকৃত সত্যের দিক দিয়ে সঠিক নয়; বরং বৃষ্টির পানি প্রতিবছর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একই রূপে অবতীর্ণ হয়; তবে আল্লাহর নির্দেশে এর পরিমাণ কোন জনপদে বেশী দেয়া হয় এবং কোন জনপদে কম করে দেয়া হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হ্রাস করে কোন জনপদের অধিবাসীদেরকে শান্তি দেয়া ও হুশিয়ার করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টিও আঘাত হয়ে যায়। যে পানি আল্লাহর বিশেষ রহমত, তাকেই অক্স ও নাকরমানদের জন্যে আযাব ও শাস্তি করে দেয়া হয়।

وَكَانَ هُذَيْفَةُ : كَوْرِ الْأَنْبَاءِ : وَكَانَ هُذَيْفَةُ : كَوْرِ الْأَنْبَاءِ

—এ আয়াত মক্কার অবতীর্ণ। তখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহের বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়নি। তাই এখানে জেহাদকে به অর্থাৎ, কোরআনের সাথে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআনের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের সাথে বড় জেহাদ করুন। কোরআনের মাধ্যমে জেহাদ করার অর্থ তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং কোরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে সর্বপ্রথম চেষ্টা করা, মুখে হোক, কলমের সাহায্যে হোক কিংবা অন্য কোন পন্থায় হোক—এখানে সবগুলোকেই বড় জেহাদ বলা হয়েছে।

وَهُوَ الَّذِي يُرِي الْبَحْرَيْنِ لَهَا عَذَابٌ قُرَاتٌ وَهَذَا الْمَاءُ مُخْتَلِطٌ

وَجَلَّ بِمُحَمَّدٍ رُفْعًا وَخَيْرًا مَّحْمُودًا

দেয়া। এ কারণেই চারগভূমিকে مَرَجٌ বলা হয়। সেখানে জন্তু-জানোয়ার স্বাধীনভাবে বিচরণ করে ও ঘাস খায়। عَذَابٌ মিঠা পানিকে বলা হয়। وَهَذَا الْمَاءُ—এর অর্থ সুপেয় এর অর্থ লোনা এবং مُخْتَلِطٌ—এর অর্থ তিক্ত বিষাদ।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় কৃপা ও অপর রহস্য দ্বারা পৃথিবীতে দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। (এক) সর্ববৃহৎ যাকে মহাসাগর বলা হয়। গোটা পৃথিবী এর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ এ জলধির বাইরে উন্মুক্ত, যাতে সারা বিশ্বের মানবসমাজ বসবাস করে। এই সর্ববৃহৎ দরিয়ার পানি রহস্যবশতঃ তীব্র লোনা ও বিষাদ। পৃথিবীর স্থলভাগে আকাশ থেকে বর্ষিত পানির ঝর্ণা, নদ-নদী, নহর ও বড় বড় দরিয়া আছে। এগুলোর পানি সবই মিষ্ট ও সুপেয়। মানুষের নিজের তৃষ্ণা নিবারণে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে এরূপ পানিরই প্রয়োজন, যা আল্লাহ তাআলা স্থলভাগে বিভিন্ন প্রকারে সরবরাহ করেছেন। সমুদ্রে স্থলভাগের চাইতে অনেক বেশী সামুদ্রিক জন্তু-জানোয়ার বসবাস করে। এগুলো সেখানেই মরে, সেখানেই পচে এবং সেখানেই মাটি হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীর পানি ও আবর্জনা অবশেষে সমুদ্রে পতিত হয়। যদি সমুদ্রের পানি মিষ্ট হত, তবে মিষ্ট পানি দ্রুত পচনশীল বিধায় দু’চার দিনেই পচে যেত। এই পানি পচে গেলে তার দুর্গন্ধে ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের জীবন-ধারণ দুরূহ হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে এত তীব্র লোনা, তিক্ত ও তেজস্ক্রিয় করে দিয়েছেন যেন সারা বিশ্বের আবর্জনা তাতে পতিত হয়ে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখানে বসবাসকারী যে সকল সৃষ্টজীব সেখানে মরে তাও পচতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমতঃ এই নেয়ামত ও অনুগ্রহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আল্লাহ তাআলা দুই প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এই সর্বময় ক্ষমতা বিধৃত হয়েছে যে, যেখানে মিঠা পানির নদী অথবা নহর সমুদ্রে পতিত হয় এবং মিঠা ও লোনা উভয় পানি একাকার হয়ে যায়, সেখানে দেখা যায় যে, উভয় পানি কয়েক মাইল পর্যন্ত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, কিন্তু পরস্পর মিশ্রিত হয় না, অথচ উভয়ের মাঝখানে কোন অনতিক্রম্য অন্তরায় থাকে না।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصُهْرًا

পিতা-মাতার দিক থেকে যে সম্পর্ক ও আত্মীয়তা হয়, তাকে نسب বলা হয় এবং স্ত্রীর তরফ থেকে যে আত্মীয়তা হয়, তাকে صهر বলা হয়। এসব সম্পর্ক ও আত্মীয়তা আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত। মানুষের সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন যাপনের জন্যে এগুলো অপরিহার্য। কারণ, একা মানুষ কোন কাজই করতে পারে না।

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেই, আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান তোমাদের কাছে পৌছাই এবং ইহকাল ও পরকালে তোমাদের সাফল্যের জন্যে চেষ্টা করি। এতে আমার কোন পার্থিব স্বার্থ নেই। আমি এই শ্রমের কোন পুরস্কার বা প্রতিদান তোমাদের কাছে চাই না। এছাড়া আমার কোন উপকারও নেই। যার মন চায়, সে আল্লাহর পথ অবলম্বন করবে। বলাবাহুল্য, কোন ব্যক্তি আল্লাহর পথে আসলে উপকার তারই হবে। একে নিজের উপকার বলা পয়গম্বরসুলভ স্নেহ-মমতার দিকে ইঙ্গিত যে, আমি তোমাদের উপকারকেই নিজের

وَوَكَّلْ عَلَى النَّبِيِّ الَّذِي لَأَيُّمُوتَ وَيَسْمَعُ صَيْدَهُ وَكَفَى بِهِ
يَذْنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرٌ لِّلَّذِي خَلَقَ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا فِي سِتْرَةٍ إِنَّا وَكَّلْنَاهُ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ
بِهِ خَيْرُهُ وَإِذَا فِئْلُ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا
الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَكَذَّبَ الَّذِينَ
جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ
أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ
هُدًى وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ
لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا
عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا
وَمُعَامَلًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ
يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ
مَعَ الْكُلُوبِ الْهَاجِلِينَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَمًا

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অর্থঃ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা, অতঃপর নিজ অবস্থা অনুযায়ী আরশের উপর সমাসীন হওয়া, এগুলো সব দয়াময় আল্লাহর কাজ। এ বিষয়ে সত্যায়ন ও অনুসন্ধান করতে হলে কোন ওয়াকিফহাল ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর। ‘ওয়াকিফহাল’ বলে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং অথবা জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। এর অর্থ পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহের পণ্ডিতবর্গও হতে পারে, যারা নিজ নিজ পয়গম্বরের মাধ্যমে এ ব্যাপারে জ্ঞাত হয়েছিল। — (মায়হারী)

এর অর্থ আরবরা সবাই জানত; কিন্তু আল্লাহর জন্যে শব্দটি তারা ব্যবহার করত না। তাই প্রশ্ন করল যে, রহমান কে এবং কি?

تَكَذَّبَ الَّذِينَ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

يُذْنِبُوا - وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ

أَوْ أَرَادَ شُكُورًا -

(৫৮) আপনি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই এবং তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন। তিনি বান্দার গোনাহ সম্পর্কে যথেষ্ট খবরদার। (৫৯) তিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের অর্ন্তবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। তাঁর সম্পর্কে যিনি অবগত, তাকে জিজ্ঞেস কর। (৬০) তাদেরকে যখন বলা হয়, দয়াময়কে সেজদা কর, তখন তারা বলে, দয়াময় আবার কে? তুমি কাউকে সেজদা করার আদেশ করলেই কি আমরা সেজদা করব? এতে তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি পায়। (৬১) কল্যাণময় তিনি, যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন সূর্য ও মীপ্তিময় চন্দ্র। (৬২) যারা অনুসন্ধানপ্রিয় অথবা যারা কৃতজ্ঞতাপ্রিয় তাদের জন্যে তিনি রাত্রি ও দিবস সৃষ্টি করেছেন পরিবর্তনশীলরূপে। (৬৩) রহমান—এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম। (৬৪) এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সেজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান হয়ে; (৬৫) এবং যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দাও। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; (৬৬) বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিষ্ঠুর জায়গা! (৬৭) এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী। (৬৮) এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ্ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যতিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।

এসব আয়াতে মানুষকে বলা উদ্দেশ্য যে, আমি আকাশে বড় বড় নক্ষত্র সূর্য, চন্দ্র, এদের মাধ্যমে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন, অঙ্ককার, আলো এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমগ্র সৃষ্টজগত এ কারণে সৃষ্টি করেছি, যাতে চিন্তাশীলরা এগুলো থেকে আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা ও তওহীদের প্রমাণাদি সঙ্গ্রহ করতে পারে এবং কৃতজ্ঞ বন্দারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ লাভ করে। অতএব দুনিয়াতে যে ব্যক্তির সময় চিন্তা-ভাবনা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছাড়াই অতিবাহিত হয়ে যায়, তার সময় অযথা নষ্ট হয় এবং তার পুঞ্জিও ধ্বংস হয়ে যায়।

ইবনে আরবী বলেন, আমি শহীদে আকবরের কাছে শুনেছি যে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত, যার বয়স ষাট বছর হয় এবং তার অর্ধেক ত্রিশ বছর নিদ্রায় অতিবাহিত হয়ে যায় ও ছয় ভাগের এক অর্থাৎ, দশ বছর দিবাভাগে বিশ্রাম গ্রহণে অতিবাহিত হয়ে অবশিষ্ট মাত্র বিশ বছর কাজে লাগে। কোরআন পাক এস্থলে বড় বড় নক্ষত্র, গ্রহ ও সৌরজগতের কথা উল্লেখ করার পর একথাও বলেছে যে, কোরআন এসব বিষয়ের উল্লেখ বার বার এজন্যে করে, যাতে তোমরা এগুলোর সৃষ্টি, গতি ও এ থেকে উদ্ভূত প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এগুলোর স্রষ্টা ও পরিচালককে চিন এবং কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁকে স্মরণ কর; এখন নভোমণ্ডল ও সৌরজগতের স্বরূপ ও আকার কি, এগুলো আকাশের অভাঙরে অবস্থিত, না বাইরে শূন্য জগতে অবস্থিত—এ প্রশ্নের সাথে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোন বিষয় জড়িত নয় এবং এগুলোর স্বরূপ জানা মানুষের জন্যে সহজও নয়। যারা সারা জীবন এসব বিষয়ের গবেষণায় ব্যয় করেছেন, তাদের স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়

যে, তারাও কোন অকাট্য ও চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌছতে পারেননি। তারা যে যে সিদ্ধান্তে পৌছেন, তাও বিজ্ঞানীদের বিপরীত গবেষণার ফলে সংশয়ান্বিত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তাই তফসীরে এর চাইতে বেশী কোন আলোচনায় যাওয়াও কোরআনের জরুরী খেদমত নয়। কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, চন্দ্র পৌছা এবং সেখানকার মাটি, শিলা, এবং গুহা-পাহাড়ের আলোকচিত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর কীর্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কোরআন পাক এসব বিষয় সম্পর্কে মানুষকে যে সত্যানুসন্ধানের সবক দিতে চায়, তারা তাদের গবেষণা প্রচেষ্টার অহংকারে বিভোর হয়ে তা থেকে আরও দূরে সরে পড়েছে এবং সাধারণ লোকদের চিন্তা-ধারাকেও বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। কেউ এসব বিষয়কে কোরআন বিরোধী মনে করে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করে বসে আবার কেউ কোরআন পাকের কদর বর্ণনা করতে শুরু করে। তাই এ প্রশ্নের প্রয়োজন মাফিক বিস্তারিত আলোচনা জরুরী। সূরা হিজরের

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
আয়াতের অধীনে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, সূরা আল-ফোরকানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সেই আলোচনা নিম্নরূপ :

প্রাচীন ও আধুনিক সৌর বিজ্ঞানের মতবাদ ও কোরআন পাকের বাণী : جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا এ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, بروج অর্থাৎ, গ্রহ-উপগ্রহ আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। কেননা, فِي অব্যয়টি পাত্রের অর্থ দেয়। এমনভাবে সূরা নূহে আছে :

أَلَمْ تَرَ أَكَيْفَ خَلَقْنَا السَّمَاءَ سَئِدًى مِّنْ طِينٍ ۖ وَجَعَلْنَا الْقَمَرَ فِجْوَةً
سَئِدًى مِّنْ طِينٍ -এর সর্বনাম سَئِدًى -এতে نُورًا وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا -কে বোঝায়। এ থেকে বাহ্যতঃ এটা বোঝা যায় যে, চন্দ্র আকাশমণ্ডলীর অভ্যন্তরে আছে। কিন্তু এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, কোরআনে سماء শব্দটি একটি বিরাটকায় এবং ধারণা ও কল্পনাতীত বিস্তৃতিশীল সৃষ্টবস্তুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোরআনের বর্ণনা আনুযায়ী এই সৃষ্টবস্তুর মধ্যে দরজা আছে এবং দরজাগুলোর মধ্যে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত। এই সৃষ্টবস্তুর সংখ্যা সাত বলা হয়েছে। سماء শব্দটির আরও একটি অর্থ আছে: অর্থাৎ আকাশের দিকে অবস্থিত প্রত্যেক সুউচ্চ বস্তুকেও سماء বলা হয়। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্য পরিমণ্ডল, যাকে আজকালকার পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়, এটাও سماء শব্দের অর্থের আওতাভুক্ত। وَاتَّخَذُوا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ও এমনি ধরনের

অন্য যেসব আয়াতে আকাশ থেকে পানি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোকে অধিকাংশ তফসীরবিদ দ্বিতীয় অর্থেই ধরেছেন। কারণ, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার আলোকেও একথা প্রমাণিত যে, বৃষ্টি মেঘমালা থেকে বর্ষিত হয়, সেসব মেঘমালার উচ্চতার কোন তুলনাই আকাশের উচ্চতার সাথে হয় না। স্বয়ং কোরআন পাকও অন্যান্য আয়াতে মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার কথা স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে لَنُنَزِّلُ مَاءً مِّنْ سَحَابٍ مِّنْ ثَعْلَبٍ ۚ وَاتَّخَذُوا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا -এতে مَزْن শব্দটি মَزْن -এর বহুবচন। এর অর্থ শুভ মেঘমালা। আয়াতের অর্থ এই যে, শুভ মেঘমালা থেকে তোমরা বৃষ্টি বর্ষণ করবে, না আমি করছি? অন্যত্র বলা হয়েছে وَاتَّخَذُوا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا এখানে معصرات -এর অর্থ পানিভর্তি মেঘ। আয়াতের অর্থ এই যে, আমিই পানিভর্তি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ

করি। কোরআন পাকের এসব বর্ণনা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যেসব আয়াতে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলোতে অধিকাংশ তফসীরবিদ سماء শব্দের দ্বিতীয় অর্থই নিয়েছেন, অর্থাৎ, শূন্য পরিমণ্ডল।

সারকথা এই যে, কোরআন পাক ও তফসীরবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী سماء শব্দটি শূন্য পরিমণ্ডল ও আকাশলোক উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় যেসব আয়াতে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের পাত্র হিসেবে فِي السَّمَاءِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোর অর্থে উভয় সম্ভাবনাই বিদ্যমান। অর্থাৎ, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ আকাশলোকের অভ্যন্তরেও হতে পারে এবং আকাশের নীচে শূন্য পরিমণ্ডলেও হতে পারে। এই উভয় সম্ভাবনার বর্তমানে কোন অকাট্য ফয়সালা করা যায় না যে, কোরআন নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহকে আকাশের অভ্যন্তরে সন্নিবিষ্ট করেছে অথবা আকাশের বাইরের শূন্য পরিমণ্ডলে ; বরং কোরআনের ভাষাদৃষ্টে উভয়টিই সম্ভবপর। সৃষ্টজগতের গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা যাই প্রমাণিত হবে, কোরআনের কোন বর্ণনা তার পরিপন্থী হবে না।

সৃষ্টজগতের স্বরূপ ও কোরআন : এখানে নীতিগতভাবে একথা বোঝে নেয়া জরুরী যে, কোরআন পাক কোন বিজ্ঞান অথবা সৌরবিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, যার আলোচ্য বিষয় হবে সৃষ্টজগতের স্বরূপ অথবা আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার, গতি ইত্যাদির বর্ণনা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোরআন আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সৃষ্টজগতের কথা বার বার উল্লেখ করে এবং এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত দেয়। কোরআন পাকের এসব আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে কেবল এমন কতিপয় বিষয় মানুষকে বলতে চায়, যেগুলো তার বিশ্বাস ও মতবাদ সংশোধনের সাথে জড়িত অথবা তার ধর্মীয় ও পার্শ্ব উপকারের সাথে সম্পর্কিত। উদাহরণতঃ কোরআন পাক আকাশ, পৃথিবী নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ ও তাদের গতি এবং গতি থেকে উদ্ভূত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা বার বার এ কারণে উল্লেখ করেছে, যাতে মানুষ এগুলোর বিস্ময়কর নির্মাণ-কৌশল ও অলৌকিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে এ বিশ্বাস করে যে, এগুলো আপনা থেকে অস্তিত্ব লাভ করেনি। এগুলোর সৃষ্টিকর্তা যিনি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময়, সর্বাধিক বিজ্ঞ এবং সর্বোপরি ক্ষমতাশালী ও শক্তিশর। এই বিশ্বাসের জন্যে আকাশমণ্ডলীর, শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের উপাদানের স্বরূপ, এগুলোর আসল আকার ও আকৃতি এবং গোটা ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অবস্থা জানা কস্মিনকালেও জরুরী নয়। বরং এর জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট, যতটুকু প্রত্যেকেই নিজের চোখে দেখে ও বোঝে। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য নক্ষত্রের উদয়-অস্ত, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি, দিবারাত্রির পরিবর্তন, বিভিন্ন ঋতুতে ও বিভিন্ন ভূখণ্ডে দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা, যাতে হাজারো বছর ধরে এক মিনিট, এক সেকেন্ডেরও পার্থক্য হয়নি—এসব বিষয় দ্বারা ন্যূনতম জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করতে বাধ্য হয় যে, এসব বিজ্ঞজ্ঞানোচিত ব্যবস্থাপনা আপন-আপনি চলমান নয় ; বরং এর একজন পরিচালক আছেন। এতটুকু বোঝার জন্যে কোনরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণা, মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। কোরআন পাকও এর প্রতি আহ্বান জানানয়। কোরআন শুধু এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনারই দাওয়াত দেয়, যা সাধারণ চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জিত হতে পারে। এ কারণেই রসুলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি

তৈরী করা অথবা এগুলো সংগ্রহ করা এবং আকাশলোকের আকার-আকৃতি নির্ণয় করার প্রতি মোটেই কোন গুরুত্ব দেননি। সৃষ্টজগৎ সম্পর্কিত আয়াতসমূহে চিন্তা-ভাবনা করার অর্থ যদি এর স্বরূপ, আকার-আকৃতি ও গতির দর্শন জানাই হত, তবে এর প্রতি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর গুরুত্ব না দেয়া অসম্ভব ছিল; বিশেষতঃ যখন এসব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা, শিক্ষা ও শেখানোর কাজ দুনিয়াতে তৎকালেও বিদ্যমান ছিল। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ে পণ্ডিত গবেষণাকারী লোকের অভাব ছিল না। হযরত ঈসা (আঃ)-এর পাঁচ শত বছর পূর্বে ফিশাগোর্সের মতবাদ এবং এর অব্যবহিত পরে বেংলীমুসের মতবাদ বিশ্বে প্রচলিত ও প্রসারিত ছিল। তখনকার পরিস্থিতির উপযোগী মানমন্দিরের যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে পবিত্র সত্তার প্রতি এসব আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং যেসব সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যক্ষভাবে তাঁর কাছে এসব আয়াত পাঠ করেন, তারা কোন সময় এদিকে জ্ঞক্ষেপও করেননি। এ থেকে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সৃষ্টজগত সম্পর্কিত এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার উদ্দেশ্য কামিনকালেও তা ছিল না, যা আজকাল আধুনিকতাপ্রিয় আলেমগণ ইউরোপ ও তার গবেষণায় প্রভাবান্বিত হয়ে অবলম্বন করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, মহাশূন্য ভ্রমণ, চন্দ্র, মঙ্গলগ্রহ ও শুক্রগ্রহ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা কোরআন পাকের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার শামিল।

নির্ভুল তথ্য এই যে, কোরআন পাক প্রাচীন অথবা আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয় না, এ বিষয়ে আলোচনা করে না এবং বিরোধিতাও করে না। সৃষ্ট-জগত ও সৃষ্টবস্তু সম্পর্কিত সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কোরআন পাকের বিজ্ঞানোচিত নীতি ও পন্থা এটাই যে, সে প্রত্যেক জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ততটুকুই গ্রহণ করে ও বর্ণনা করে, যতটুকু মানুষের ধর্মীয় ও পার্শ্বি প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কশীল, যতটুকু সে অনায়াসে অর্জন করতে পারে এবং যতটুকু অর্জনে সে আনুমানিক নিশ্চয়তাও লাভ করতে পারে। যেসব দার্শনিকসুলভ ও অনাবশ্যক আলোচনা গবেষণা সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত, যা অর্জন করার পরও অকাট্যরূপে বলা যায় না যে, এটাই নির্ভুল; বরং সন্দেহ ও অস্থিরতা আরও বাড়ে, কোরআন এ ধরনের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করে না। কেননা, কোরআনের দৃষ্টিতে মানুষের মনযিলে-মকসুদ এসব পৃথিবী ও আকাশস্থ সৃষ্টজগতের উর্ধ্বে সৃষ্টির ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন যাপন করে জন্মাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত ও শান্তি অর্জন করা। এর জন্যে সৃষ্টজগতের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা জরুরী নয় এবং এ সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান লাভ করাও মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। প্রতি যুগের বৈজ্ঞানিক ও সৌরবিজ্ঞান বিশারদদের কোন মতবাদ ও গবেষণাকেই নিশ্চিত ও সর্বশেষ বলা যায় না। মানবীয় প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান, সৌরজগত, শূন্য পরিমণ্ডলের সৃষ্টজগত, মেঘ ও বৃষ্টি, মহাশূন্য, ভূগর্ভস্থ স্তর, পৃথিবীতে সৃষ্ট মখলুক, জড়পদার্থ, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, মনুষ্যজগত মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি বিষয়াদির মধ্য থেকে কোরআন পাক কেবল এগুলোর নির্বাচ ও চাক্ষুষ অংশ এই পরিমাণে গ্রহণ করে, যদ্বারা মানুষের ধর্মীয় পার্শ্বি প্রয়োজনও অভাব পূরণ হয়। সে মানুষকে অনাবশ্যক তথ্যানুসন্ধানের পন্থিলে নিমজ্জিত করে না। তবে কোথাও কোথাও কোন বিশেষ মাসআলার প্রতি ইঙ্গিত অথবা স্পষ্টোক্তিও পাওয়া যায়।

কোরআনের তফসীরে দার্শনিক মতবাদসমূহের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতার বিশুদ্ধ মাপকাঠি : প্রাচীন ও আধুনিক সত্যপন্থী

আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাকে যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত আছে, যদি কোন প্রাচীন অথবা আধুনিক মতবাদ সেগুলোর বিরুদ্ধে যায়, তবে তার কারণে কোরআনের আয়াতে টানা-হেঁচড়া ও সদর্থ বর্ণনা করা বৈধ নয়, বরং সেই মতবাদকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেয়া হবে। তবে যেসব বিষয়ে কোরআনে কোন স্পষ্টোক্তি নেই; কোরআনের ভাষায় উভয় অর্থেরই অবকাশ আছে; সেখানে যদি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন একটি মতবাদ শক্তিশালী হয়ে যায়, তবে কোরআনের আয়াতকেও সেই অর্থে ধরে নেয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই।

যেমন, আলোচ্য আয়াত **جَعَلْنَا لِكُلِّ نَفْسٍ مِّنْهُنَّ مِيزَانَ** সম্পর্কে বলা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত আছে, না আকাশের বাইরে শূন্য পরিমণ্ডলে আছে, এ সম্পর্কে কোরআন পাক কোন স্পষ্ট কয়সালা দেয়নি। আজকাল মহাশূন্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছতে পারে। এতে ফিশাগোর্সীয় মতবাদই সমর্থন লাভ করেছে। দার্শনিক ফিসাগোর্স বলেন, নক্ষত্রসমূহ আকাশে প্রোথিত নয়। কোরআন পাক ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী আকাশ একটি প্রাচীর বেতনী, যাতে দরজা আছে এবং দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। তাতে যে কোন ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে না। এক্ষেপে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করা হবে যে, নক্ষত্রসমূহকে শূন্য পরিমণ্ডলে সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা কোন সদর্থ নয়; বরং দুই অর্থের মধ্য থেকে একটিকে নির্দিষ্টকরণ। কিন্তু যদি কেউ মূলতই আকাশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে; যেমন আজকাল কোন কোন আধুনিক সৌরবিজ্ঞানী একথা বলেন অথবা কেউ যদি দাবী করে যে, রকেট ও বিমানের সাহায্যে আকাশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভব; তবে কোরআনের দৃষ্টিতে এরূপ দাবী ভ্রান্ত সাব্যস্ত হবে। কেননা, কোরআন পাক একাধিক আয়াতে স্পষ্টভাবে বলেছে যে, আকাশে দরজা আছে এবং সেসব দরজা বিশেষ অবস্থায় খোলা হয়। এসব দরজায় ফেরেশতাদের পাহারা আছে। প্রত্যেকেই যখন ইচ্ছা, আকাশে প্রবেশ করতে পারে না। উপরোক্ত দাবীর কারণে আয়াতের কোনরূপ সদর্থ বর্ণনা করা হবে না; বরং দাবীকেই ভ্রান্ত আখ্যা দেয়া হবে।

এমনিভাবে কোরআন পাকের **وَلَا فِي فَلَكٍ سُمْجُونٌ** আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, নক্ষত্রসমূহ নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। এ ব্যাপারে বেংলীমুসীয় মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেয়া হবে। তার মতে নক্ষত্রসমূহ আকাশগাঙ্গে প্রোথিত। তারা নিজেরা গতিশীল নয়; বরং আকাশের বিচরণের কারণে তারা বিচরণ করে।

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে যারা সৌরজগত সম্পর্কে বেংলীমুসীয় মতবাদের ভক্ত ছিলেন, তাঁরা কোরআনের সেসব আয়াতের সদর্থ বর্ণনা করতেন, যেগুলো দ্বারা বেংলীমুসীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোন কিছু বোঝা যেত। এমনিভাবে আজকাল কিছুসংখ্যক লেখক যেসব আয়াতকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের বিরোধী মনে করেন, তারা সেগুলোতে সদর্থ বর্ণনা করে সৌরবিজ্ঞানের অনুকূলে নেয়ার চেষ্টা করেন। এই উভয় পন্থাই অবৈধ; পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য। তবে বাস্তব ঘটনা এই যে, এ পর্যন্ত আধুনিক সৌরবিজ্ঞান যেসব নতুন গবেষণা উপস্থাপিত করেছে, তাতে আকাশের অস্বীকৃতি ছাড়া কোরআন ও সুন্নতের খেলাফ কোন কিছু নেই। কিছুসংখ্যক লোক জ্ঞানের ক্রটিবশতঃ এগুলোকে কোরআন ও সুন্নতের খেলাফ মনে করতঃ সদর্থের পেছনে পড়ে যায়।

বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ তফসীরবিদ সাইয়্যেদ মাহমুদ আলুসী বাগদাদীর তফসীরে রুহুল-মা'আনী পূর্ববর্তী মনীষীগণের তফসীরসমূহের চমৎকার সংক্ষিপ্ত সার এবং আরব, অনারব, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে জনপ্রিয় ও প্রামাণ্য তফসীর। এই তফসীরকার যেমন কোরআন ও সুন্নাহ গভীর জ্ঞানী, তেমনি প্রাচীন এবং আধুনিক দর্শন ও সৌর-বিজ্ঞানেও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তিনি তাঁর তফসীরে বৈজ্ঞানিক গবেষণাদি সম্পর্কে উপরোক্তোক্ত মূলনীতিই অবলম্বন করেছেন। তাঁর পৌত্র আব্দুল্লাহ সাইয়্যেদ মাহমুদ শুকরী আলুসী এসব বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে কোরআন পাকের আলোকে আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের মতবাদসমূহের সমর্থন পেশ করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য আধুনিকতাপ্রিয় আলোচনার ন্যায় কোরআনের আয়াতে কোন প্রকার সন্দেহের আশ্রয় নেয়া হয়নি। আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের সমর্থনে লিখিত তাঁর কয়েকটি বাক্য এখানে উদ্ধৃত করে দেয়াই যথেষ্ট। তিনি বলেন :

رأيت كثيرا من قواعدها لا يعارض النصوص الواردة في الكتاب
والسنة على أنها لو خالفت شيئا من ذلك لم يلتفت إليها ولم
نزول النصوص لاجلها والتأويل فيها ليس من مذاهب السلف
الحرية بالقبول بل لا بد أن نقول أن المخالف لها مشتمل على خلل
فيه فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح بل كل منهما
يصالح الآخر ويؤيده .

“আমি আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের অনেক রীতি-নীতিকে কোরআন ও সুন্নাহর বিপক্ষে দেখিনি। এতদসত্ত্বেও যদি তা কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী হয়, তবে আমরা সেদিকে মুখ ফেরাব না এবং এর কারণে কোরআন ও সুন্নাহর সন্দেহ করব না। কেননা, এরূপ সন্দেহ পূর্ববর্তী মনীষীগণের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত মাযহাবে নেই। বরং আমরা তখন একথা বলব যে, যে মতবাদ কোরআন ও সুন্নাহবিরোধী, তাতে কোন না কোন ত্রুটি আছে। কারণ, সুস্থ বিবেক কোরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপক্ষে যেতে পারে না; বরং একটি অপরটির সত্যায়ন ও সমর্থন করে।”

সারকথা এই যে, সৌরজগত, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের গতি ও আকার-আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা কোন নতুন বিষয়বস্তু নয়। হাজার হাজার বছর পূর্বে থেকে এসব প্রশ্নের তথ্যানুসন্ধান অব্যাহত আছে। মিসর, শাম, ভারতবর্ষ, চীন ইত্যাদি দেশে এসব বিষয়ের চর্চা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ শত বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুরু ফিশাগোর্স ইতালীর কুতুনা শিক্ষালয়ে এ বিষয়ে নিয়মিত শিক্ষা দিতেন। তাঁর পর খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় একশত চল্লিশ বছর পূর্বে এই শাস্ত্রের দ্বিতীয় গুরু বেংলীমুস রুমীর আবির্ভাব ঘটে। সে সময়েই অপর এক দার্শনিক হেয়ারথোস খ্যাতি লাভ করেন। তিনি জ্যামিতিক কোণ পরিমাপের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন।

সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে ফিশাগোর্স ও বেংলীমুসের মতবাদ সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ছিল। বেংলীমুস সমসাময়িক রাষ্ট্র ও জনগণের সহযোগিতা লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে তাঁর মতবাদ এত প্রসার লাভ করে যে, এর মোকাবেলায় ফিশাগোর্সের মতবাদ অখ্যাতই থেকে যায়। যখন আরবী ভাষায় গ্রীক দর্শনের অনুবাদ হয়, তখন বেংলীমুসের মতবাদই আরবী গ্রন্থাদিতে স্থানান্তরিত হয় এবং জ্ঞানীগণের মধ্যে সাধারণভাবে এই মতবাদই পতিচিতি লাভ করে। অনেক

তফসীরকার কোরআনের আয়াতের তফসীরেও এই মতবাদকে সামনে রেখে আলোচনা প্রবৃত্ত হন। হিজরী একাদশ শতাব্দী ও খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয়দের মধ্যে নবজাগরণের সূচনা হয় এবং ইউরোপীয় চিন্তাবিদগণ এসব বিষয়ে কাজ শুরু করেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোপারনিক, জার্মানীতে কিলার এবং ইতালীতে গ্যালিলিও প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তারা নতুনভাবে এসব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং সবাই একমত হন যে, সৌরজগতের আকার-আকৃতি সম্পর্কে বেংলীমুসের মতবাদ ভ্রান্ত এবং ফিশাগোর্সের মতবাদ নির্ভুল। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী এবং হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আইজ্যাক নিউটন বিজ্ঞানে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার ফিশাগোর্সের মতবাদকে আরো শক্তিশালী করে। তিনি গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, ভারী বস্তু শূন্যে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে পতিত হওয়ার কারণ তা নয়, যা বেংলীমুসীয় মতবাদে ব্যক্ত হয়েছে যে, পৃথিবীর মধ্যস্থলে কেন্দ্র আছে এবং সব ভারী বস্তু স্বভাবতই কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। নিউটন এই মতবাদ ব্যক্ত করেন যে, সমস্ত নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে মধ্যাকর্ষণ শক্তি রয়েছে। পৃথিবীও এমন একটি শক্তি, এতেও মহাকর্ষণ বর্তমান। যে সীমা পর্যন্ত এই মধ্যাকর্ষণের প্রভাব-বলয় বিস্তৃত, সেখান থেকে প্রত্যেক ভারী বস্তু নীচে পতিত হবে। কিন্তু যদি কোন বস্তু এই মধ্যাকর্ষণের প্রভাব-বলয়ের বাইরে চলে যায়, তবে তা আর নীচে পতিত হবে না।

অধুনা সোভিয়েত মার্কিন বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মুসলিম দার্শনিক আবু রায়হান আল-বেরুনীর গবেষণার সাহায্যে রকেট ইত্যাদি আবিষ্কার করতঃ এ বিষয়ে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন যে, বিপুল শক্তি ও দ্রুতগতির কারণে রকেট যখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ভেদ করে বাইরে চলে যায়, তখন তা আর নীচে পতিত হয় না; বরং একটি কৃত্রিম উপগ্রহের আকার ধারণ করতঃ তার কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকে। এসব কৃত্রিম উপগ্রহের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশেষজ্ঞরা গ্রহ পর্যন্ত পৌছার কৌশল উদ্ভাবন করতে শুরু করেন এবং অবশেষে চন্দ্র পদার্পন করতে সক্ষম হন। বর্তমান কালের বিজ্ঞানের সব শত্রু-মিত্র এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। এখন পর্যন্ত বার বার চন্দ্রপৃষ্ঠে গমন, সেখানকার মাটি, শিলা ইত্যাদি আনয়ন এবং বিভিন্ন চিত্র সঞ্চারের কাজ অব্যাহত আছে। অন্যান্য গ্রহ পর্যন্ত পৌছার প্রচেষ্টাও হচ্ছে এবং মহাশূন্য পরিভ্রমার ও পরিমাপের অনুশীলন চালু রয়েছে।

তন্মধ্যে সাফল্যের সাথে মহাশূন্য ভ্রমণ শেষে প্রত্যাবর্তনকারী মার্কিন নভোচারী জন গ্লেন স্বীয় সাফল্যের প্রতি শত্রু-মিত্র সবারই আশ্বা অর্জন করেছেন। তাঁর একটি বিবৃতি আমেরিকার খ্যাতনামা মাসিক ‘রিডার্স ডাইজেস্ট’—এ এবং তার উর্দু অনুবাদ আমেরিকা থেকে প্রকাশিত উর্দু মাসিক ‘সায়রবীন’—এ বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ উদ্ধৃত করা হল। এ থেকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত হয়। জন গ্লেন তার দীর্ঘ প্রবন্ধে মহাশূন্যের অভিনব বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

এটাই একমাত্র বস্তু, যা মহাশূন্যে আব্দুল্লাহর অস্তিত্ব নির্দেশ করে এবং একথা বোঝায় যে, এমন কোন শক্তি আছে, যে এগুলোকে কেন্দ্রের সাথে জড়িত রাখে। অতঃপর লিখেন :

এতদসত্ত্বেও মহাশূন্যে পূর্বে থেকেই যে ক্রিয়াকর্ম অব্যাহত রয়েছে, তদৃষ্টে আমাদের প্রচেষ্টা খুবই নগণ্য। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও পরিমাপে মহাশূন্য পরিমাপ অসম্ভব ব্যাপার।

অতঃপর উড়োজাহাজের যান্ত্রিক শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করে লিখেন :

কিন্তু একটি নিশ্চিত ও ইন্দ্রিয়বহির্ভূত শক্তি ছাড়া এর ব্যবহার সীমিত ও অনর্থক হয়ে যায়। কেননা, লক্ষ্য অর্জনের জন্যে জাহাজকে গতিপথ নির্দিষ্ট করতে হয়। এ কাজটি কম্পাসের সাহায্যে সমাধা করা হয়। যে শক্তি কম্পাসকে গতিশীল রাখে, সে আমাদের পক্ষ-ইন্দ্রিয়ের জন্যে প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। একে আমরা দেখতে পারি না, শুনতে পারি না এবং তার ঘ্রাণ নিতে পারি না। অথচ ফলাফলের বিকাশ পরিষ্কার বোঝাতে থাকে যে, এখানে কোন গোপন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান। অতঃপর সব ভ্রমণ-পরিভ্রমণের ফলাফল হিসেবে লিখেন : খ্রীষ্টধর্মের মূলনীতি ও মতবাদের স্বরূপও ঠিক তাই। যদি আমরা এসব মূলনীতিকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করি, তবে আমাদের ইন্দ্রিয় যদিও এগুলোকে অনুভব করতে অক্ষম, কিন্তু এই পথপ্রদর্শক শক্তির ফলাফল ও প্রভাব আমরা নিজেদের ও অন্যান্য ভাইদের জীবনে খোলা চোখে দেখতে পারব। এ কারণেই আমরা আমাদের জ্ঞানার ভিত্তিতে বলি যে, এই সৃষ্টজগতে একটি পথপ্রদর্শক শক্তি বিদ্যমান রয়েছে।

এ হচ্ছে নভোচারী ও গ্রহবিজ্ঞানীদের লবু অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সারমর্ম। মার্কিন নভোচারীর উপরোক্ত বিবৃতি থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, এসব প্রচেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সৃষ্টজগতের গোপন রহস্য ও তার স্বরূপ পর্যন্ত পৌছা তো দূরের কথা, সীমাহীন ও অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রের আবর্তনের কথা জেনে মনের উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে যায়। তাঁকে একথা স্বীকার করতে হয়েছে যে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা এগুলোর পরিমাপ করা অসম্ভব এবং আমাদের সব প্রচেষ্টা এর মোকাবেলায় হৎসামান্য ও নগণ্য। সারকথা এই যে, সৃষ্টজগত, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের এই ব্যবস্থাপনা আপনা-আপনি নয়; বরং কোন মহান ও ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত শক্তির আদেশাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ কথাটিই পয়গম্বরগণ প্রথম পদক্ষেপেই সাধারণ মানুষকে বলে দিয়েছিলেন এবং কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে এর প্রতি বিশ্বাস করার জন্যে আকাশ পৃথিবী, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

আপনি দেখলেন, পৃথিবীতে বসে মহাশূন্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের তথ্যানুসন্ধান এবং আকার-আকৃতি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনাকারিগণ যেমন এসব বস্তুর স্বরূপ পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি এবং অবশেষে নিজেদের অপারগতা ও অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়েছে, তেমনি পৃথিবী থেকে লাখে মাইল উচ্চে ভ্রমণকারী ও চন্দ্রগ্রহের পাথর, মাটি, শিলা ও চিত্র সংগ্রহকারীগণও এসবের স্বরূপ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে এর চাইতে বেশী সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

এসব তথ্যানুসন্ধান মানব ও মানবতাকে কি দান করেছে? : মানুষের চেষ্টা-সাধনা, চিন্তাগত ক্রমোন্নতি ও বিস্ময়কর আবিষ্কার নিঃসন্দেহে স্বস্থানে বৈধ ও সাধারণ দৃষ্টিতে প্রশংসার্য, কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, যে ঐশ্বরজালিকতা দ্বারা মানব ও মানবতার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য-উপকার হয় না, তা চিন্তাবিদ ও দার্শনিকদের কাজ হতে পারে না। দেখা দরকার যে, এই পঞ্চাশ বছরের অক্লান্ত সাধনা এবং কোটি অর্বুদ টাকা, যা অনেক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার জন্যে যথেষ্ট হত, তার বহুৎসব করে এবং চন্দ্র পৌছে সেখানকার মাটি, শিলা, কুড়িয়ে এনে মানব ও মানবতার কি উপকার সাধিত হয়েছে? বিপুল সংখ্যক মানব এখন ক্ষুধায় মরছে, তাদের বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান নেই। এই সাধনা ও

প্রচেষ্টা তাদের দারিদ্র্য ও বিপদাপদের কোন সমাধান দিতে পেরেছে কি? অথবা তাদের রোগ-ব্যাদির কবল থেকে মুক্তির কোন ব্যবস্থা করেছে কি? অথবা তাদের জন্যে অন্তরগত শান্তি ও আরামের কোন উপকরণ সঞ্গ্রহ করেছে কি? নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, এসব প্রশ্নের জওয়াবে ‘না’ ব্যতীত কেউ কিছু বলতে পারবে না।

এ কারণেই কোরআন ও সুন্নাহ মানুষকে এমন নিষ্কল কাজে লিপ্ত করা থেকে বিরত থাকে এবং কেবল দু’টি দিকের প্রতি লক্ষ্য করে মানুষকে সৃষ্টজগত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার দাওয়াত দেয়। প্রথম, মানুষ যাতে এসব অত্যাস্র্য প্রভাবাদি দেখে সত্যিকার প্রভাব সৃষ্টিকারী ও ইন্দ্রিয় বহির্ভূত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে শক্তি এই ব্যবস্থার পরিচালক। তারই নাম আল্লাহ্ দ্বিতীয়, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের উপকারের জন্যে পৃথিবীতে ও আকাশে যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু গচ্ছিত রেখেছেন। মানুষের কাজ এই যে, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা সাধনার সাহায্যে এসব বস্তুকে ভূপৃষ্ঠের গোপন ভাণ্ডার থেকে বের করা এবং ব্যবহারের পদ্ধতি শিক্ষা করা। প্রথম দিকটি আসল লক্ষ্য এবং দ্বিতীয় দিকটি নিছক প্রয়োজন মেনোনের জন্যে—কাজেই দ্বিতীয় পর্যায়ের। তাই এতে প্রয়োজনানিরিক্ত মনোনিবেশ পছন্দনীয় নয়। সৃষ্টজগত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার এ দু’টি দিকই মানুষের জন্যে যেমন সহজ, তেমনি ফলুপ্রসূ। এগুলোর ফলাফল সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে কোন মতভেদও নেই। তাদের সব মতভেদ সৌরজগত এবং গ্রহ-উপগ্রহের আকার-আকৃতি ও স্বরূপের সাথে সম্পৃক্ত। কোরআন এগুলোকে অনাবশ্যক ও অর্জনের অযোগ্য সাব্যস্ত করে বাদ দিয়েছে। মিসরের মুফতী আল্লামা নজীত তাঁর গ্রন্থ ‘তওফীফুর রহমান’—এ সৌর বিজ্ঞানকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। একভাগ, গুণগত যা আকাশস্থ উপগ্রহের গতি ও হিসাব সম্পর্কিত। দ্বিতীয় ভাগ কার্যগত, যা এসব হিসাব জ্ঞানার উপযোগী প্রাচীন ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত। তৃতীয়ভাগ পদার্থগত, যা সৌরজগত ও গ্রহ-উপগ্রহের আকার-আকৃতি এবং স্বরূপ সম্পর্কিত। তিনি আরও লিখেন, প্রথমোক্ত দুই প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ নেই বলই চলে। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য সত্ত্বেও অধিকাংশ ফলাফলে সবাই একমত। তাদের যোর মতভেদ কেবল তৃতীয় ভাগে সীমিত।

চিন্তা করলে দেখা যায়, প্রথমোক্ত দুই প্রকারই মানুষের প্রয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত। তৃতীয় প্রকার যেমন অনাবশ্যক, তেমনি সুকঠিন। এ কারণেই কোরআন সুন্নাহ এবং সাধারণভাবে পয়গম্বরও এই তৃতীয় প্রকারের আলোচনায় মানুষকে জড়িত করেননি।

এই বিশদ বর্ণনার সারমর্ম এই যে, সৃষ্টার অস্তিত্ব, তওহীদ ও তাঁর অদ্বিতীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সৌরজগত, শূন্য পরিমণ্ডল ও ভূজগত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হুবহু কোরআনের উদ্দেশ্য। কোরআন যত্নতর এর প্রতি দাওয়াত দেয়। এসব বস্তুর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত আছে, এদিক দিয়ে এসব বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করাও প্রয়োজনের সীমা পর্যন্ত কোরআনের উদ্দেশ্য। কোরআন এর প্রতিও দাওয়াত দেয়। তবে উভয় দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য। তা এই যে, কেউ যেন অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদিকেই আসল লক্ষ্য স্থির করে তাতে আকর্ষণ নিমজ্জিত হয়ে না পড়ে; বরং বর্তমান জীবনকে আসল জীবনের পানে একটি সফর সাব্যস্ত করে তদনুযায়ী তাতে লিপ্ত হয়। তৃতীয় দিকটি যেহেতু মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং তা অর্জন সুকঠিনও, তাই কোরআন তাতে জীবন পাত করা থেকে বিরত থাকার

প্রতি ইঙ্গিত করে। এ থেকে আরো বোঝা গেল যে, বর্তমান বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নতি ও তথ্যসম্পদকে হুবহু কোরআনের উদ্দেশ্য মনে করা ভুল। কিছুসংখ্যক আধুনিকপন্থী আলেম তাই মনে করেন। এমনিভাবে কোরআনকে এগুলোর বিরোধী বলাও ভ্রান্ত। কিছুসংখ্যক রক্ষণশীল আলেম তাই বলেন। সত্য এই যে, কোরআন এসব বিষয় বর্ণনা করার জন্যে আগমন করেনি। কোরআনের আলোচ্য বিষয় তা নয়। মানুষের জন্যে এগুলো অর্জন করা সহজ নয় এবং মানুষের প্রয়োজনের সাথে এর কোন সম্পর্কও নেই। কোরআন এসব ব্যাপারে নিশ্চুপ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা দ্বারা কোন কিছু প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে কোরআনের পরিপন্থী বলা শুদ্ধ নয়। চন্দ্রপৃষ্ঠে পৌছা, বসবাস করা, সেখানকার খনিজ দ্রব্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া ইত্যাদি কোন বিষয় প্রমাণিত হয়ে গেলে তা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই এবং যে পর্যন্ত প্রমাণিত না হয়, অনর্থক তা নিয়ে ধ্যান-ধারণার জাল বোনা এবং তাতে জীবনপাত করে দেয়াও কোন বুদ্ধিমত্তা নয়।

সূরা আল-ফোরকানের বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালত ও নবুওয়তের প্রমাণ এবং এতদসম্পর্কে কাফের ও মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তিসমূহের জওয়াব। এতে কাফের মুশরিক এবং নির্দেশাবলী অমান্যকারীদের শাস্তির প্রসঙ্গও উল্লেখিত হয়েছে। সূরার শেষ প্রান্তে আল্লাহ তাআলা সেই বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা রেসালতে পূর্ণরূপে বিশ্বাসী এবং যাদের বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস সব আল্লাহ ও রসূলের ইচ্ছার অনুসারী ও শরীয়তের নির্দেশাবলীর সাথে সুসামঞ্জস।

কোরআন পাক এমন বিশেষ বান্দাদেরকে ‘ইবাদুর রহমান’—রহমানের বান্দা উপাধি দান করেছে। এটা তাদের জন্যে সর্ববৃহৎ সম্মান। এমনিতে তো সমগ্র সৃষ্ট-জীবই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহর দাস এবং তাঁর ইচ্ছার অনুসারী। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কিছু বলতে পারে না; কিন্তু এখানে দাসত্ব বলে আইনগত ও ইচ্ছাগত দাসত্ব বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, স্বেচ্ছায় নিজের অস্তিত্ব, নিজের সমস্ত কামনা-বাসনা ও কর্মকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করে দেয়া, এ ধরনের বিশেষ বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা ‘নিজের বান্দা’ অভিহিত করে সম্মান দান করেছেন এবং সূরার শেষ পর্যন্ত তাদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। মাঝখানে কুফর ও গোনাহ থেকে তওবা ও তার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে।

এখানে বিশেষ বান্দাদেরকে ‘নিজের বান্দা’ বলে সম্মানসূচক উপাধি-দান করা উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার জন্যে আল্লাহ তাআলার সুন্দর নামসমূহ ও গুণবাচক বিশেষণাবলীর মধ্য থেকে এখানে শুধু ‘রহমান’ শব্দকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবতঃ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, প্রিয় বান্দাদের অভ্যাস ও গুণাবলী আল্লাহ তাআলার রহমান (দয়াময়) গুণের ভাষ্যকার ও প্রতীক হওয়া উচিত।

আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলী ও আলামতঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের তেরটি গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশ্বাস সংশোধন, দৈহিক ও আর্থিক যাবতীয় ব্যক্তিগত কর্মে আল্লাহ ও রসূলের বিধান ও ইচ্ছার অনুসরণ, অপর মানুষের সাথে সামাজিকতা ও সম্পর্ক স্থাপনের প্রকারভেদ, দিব্যারাি এবাদত পালনের সাথে আল্লাহ্‌ভীতি যাবতীয় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রয়াস, নিজের সাথে সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের সংশোধন চিন্তা ইত্যাদি বিষয়বস্তু शामिल আছে।

তাদের সর্বপ্রথম গুণ **عَبَادٌ** হওয়া। **عَبَادٌ** শব্দটি **عَبَدَ** এর বহুবচন। অর্থ বান্দা, দাস; যে তার প্রভুর মালিকানাধীন এবং যার সমস্ত ইচ্ছা ও ক্রিয়াকর্ম প্রভুর আদেশ ও মর্জির উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ তাআলার বান্দা কথিত হওয়ার যোগ্য সে ব্যক্তি হতে পারে, যে তার বিশ্বাস, চিন্তাধারা, প্রত্যেক ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যেকটি আচরণ ও স্থিরতাকে পালনকর্তার আদেশ ও ইচ্ছার অনুগামী রাখে এবং যখন যে আদেশ হয়, তা পালনের জন্যে সদা উৎকর্ষ থাকে।

দ্বিতীয় গুণ : **يَسْتَوْنُ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا** — অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নম্রতা সহকারে চলাফেরা করে। **هَوْنًا** শব্দের অর্থ এখানে স্থিরতা, গাভীর, বিনয় অর্থাৎ, গর্বভরে না চলা, অহংকারী ন্যায় পা না ফেলা। খুব ধীরে চলা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, বিনা প্রয়োজনে ধীরে চলা সুন্নতবিরোধী। শামায়লের হাদীস থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) খুব ধীরে চলতেন না; বরং কিছুটা দ্রুতগতিতে চলতেন। হাদীসের ভাষা এরূপ **كَانَ اسْرًا** — অর্থাৎ চলার সময় পথ যেন তাঁর জন্যে কৃষ্টিত হত। — (ইবনে কাসীর) এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের ন্যায় ধীরে চলাকে অহংকার ও কৃত্রিমতার আলামত হওয়ার কারণে মকরুহ সাব্যস্ত করেছেন। হয়রত ওমর ফারুক (রাঃ) জনৈক যুবককে খুব ধীরে চলতে দেখে জিজ্ঞেস করেনঃ তুমি কি অসুস্থ? সে বললঃ না। তিনি তার প্রতি চাবুক উঠালেন এবং শক্তিসহকারে চলার আদেশ দিলেন। — (ইবনে কাসীর)

হয়রত হাসান বসরী **يَسْتَوْنُ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا** — আয়াতের তফসীরে বলেন, খাঁটি মুমিনদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চক্কু, কর্ণ, হাত, পা আল্লাহর সামনে হীন ও অক্ষম হয়ে থাকে। অঙ্গ লোকেরা তাদেরকে দেখে অপারগ ও পঙ্গু মনে করে; অথচ তারা রুগ্নও নয় এবং পঙ্গুও নয়; বরং সুস্থ ও সবল। তবে তাদের উপর আল্লাহ্‌ ভীতি প্রবল, যা অন্যদের উপর নেই। তাদেরকে পার্থিব কাজকর্ম থেকে পরকালের চিন্তা নিবৃত্ত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে না এবং তার সমস্ত চিন্তা দুনিয়ার কাজেই ব্যাপ্ত, সে সর্বদা দুঃখই দুঃখ ভোগ করে। কারণ, সে তো দুনিয়া পুরোপুরি পায় না এবং পরকালের কাজে অংশগ্রহণ করে না। যে ব্যক্তি পানাহারের বস্তুর মধ্যেই আল্লাহর নেয়ামত সীমিত মনে করে এবং উত্তম চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করে না, তার জ্ঞান খুবই অল্প এবং তার জন্যে শাস্তি তৈরী রয়েছে। — (ইবনে কাসীর)

তৃতীয় গুণ : **وَلَا تَطْغَوْا فِي الْمَظْهَرِ وَالْوَسْطِ** — অর্থাৎ, যখন অজ্ঞতাসম্পন্ন লোক তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে, সালাম। এখানে **جَاهِلُونَ** শব্দের অনুবাদ ‘অজ্ঞতাসম্পন্ন’ করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এর অর্থ বিদ্যাহীন ব্যক্তি নয়; বরং যারা মুখতার কাজ ও মুখতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে, যদিও বাস্তবে বিদ্বানও বটে। সালাম শব্দ বলে এখানে প্রচলিত সালাম বোঝানো হয়নি; বরং নিরাপত্তার কথাবার্তা বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী নাহহাম থেকে বর্ণনা করে যে, এখানে **سَلَامٌ** শব্দটি **تَسْلِيمٌ** থেকে নয়; বরং **تَسْلَمٌ** থেকে উদ্ভূত; যার অর্থ নিরাপদ থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, মুখদের জওয়াবে তারা নিরাপত্তার কথাবার্তা বলে, যাতে অন্যেরা কষ্ট না পায় এবং তারা নিজেরা গোনাহ্‌গার না হয়। হয়রত মুজাহিদ, মোকাতিল প্রমুখ থেকে এই তফসীরই বর্ণিত আছে। — (মায়হারী)

চতুর্থ গুণ : **وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا** — অর্থাৎ তারা রাত্রি

যাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সেজ্জদা করা অবস্থায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায়। এবাদতের রাত্রি জাগরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এ সময়টি নিদ্রা ও আরামের। এতে নামায ও এবাদতের জন্যে দণ্ডায়মান হওয়া যেমন বিশেষ কষ্টকর, তেমনি এতে লোকদেখানো ও নামাযশের আশংকাও নেই। উদ্দেশ্য এই যে, তারা দিব্যারাত্রি আল্লাহর এবাদতে মশগুল থাকে। দিব্যভাগে শিক্ষাদান, প্রচার, জেহাদ ইত্যাদি কাজ থাকে এবং রাত্রিকালে আল্লাহর সামনে এবাদত করে। হাদীসে তাহাজ্জুদের নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযী হযরত আবু উমামা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়। কেননা, এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সব নেক বান্দার অভ্যাস ছিল। এটা তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের কাফ্যারা এবং গোনাহ থেকে নিবৃত্তকারী।—(মাযহারী)

হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, যে ব্যক্তি এশার পর দুই অথবা ততোধিক রাকআত পড়ে নেয়, সেও তাহাজ্জুদের ফযীলতের অধিকারী **بَاتَ لِلَّهِ سَاجِدًا وَقَائِمًا** — (মাযহারী, বগতী)। হযরত ওসমান গণীর জবানী রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতের সাথে আদায় করে, সে যেন অর্ধ রাত্রি এবাদতে অতিবাহিত করল এবং যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে আদায় করে তাকে অবশিষ্ট অর্ধেক রাত্রিও এবাদতে অতিবাহিতকারী গণ্য করা হবে।

—(আহমদ, মুসলিম, মাযহারী)

পঞ্চম গুণ : **وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا ذِلَّةَ جَهَنَّمَ** — অর্থাৎ এই প্রিয় বান্দাগণ দিব্যারাত্রি এবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নিকশিত হয়ে বসে থাকে না; বরং সর্বদা আল্লাহকে ভয় করে এবং আখেরাতের চিন্তায় থাকে, যদ্বন্দ্বন কার্যতঃ চেষ্টাও অব্যাহত রাখে এবং আল্লাহর কাছে দোয়াও করতে থাকে।

ষষ্ঠ গুণ : **وَالَّذِينَ إِذَا أَفْقَرُوا** — অর্থাৎ, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ব্যয় করার সময় অপব্যয় করে না এবং কৃপণতা ও ক্রটিও করে না বরং উভয়ের মধ্যবর্তী সমতা বজায় রাখে। আয়াতে **اسراف** এবং এর বিপরীতে **اقتار** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

এর অর্থ সীমা অতিক্রম করা। শরীয়তের পরিভাষায় হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ ইবনে জুরায়জের মতে আল্লাহর অবাধ্যতার কাছে ব্যয় করা **اسراف** তথা অপব্যয়; যদিও তা এক পয়সা হয়। কেউ কেউ বলেন, বৈধ ও অনুমোদিত কাজে প্রয়োজনানতিরিক্ত ব্যয় করাও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, **تبذير** তথা অনর্থক ব্যয় কোরআনের আয়াত দ্বারা হারাম ও গোনাহ। আল্লাহ বলেন

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَالْأَخْوَانِ الشَّيْطَانِ —এদিক দিয়ে এই তফসীরের

সারমর্মও হযরত ইবনে-আব্বাস প্রমুখের তফসীরের অনুরূপ হয়ে যায়; অর্থাৎ, গোনাহর কাছে যা-ই করা হয়, তা অপব্যয়।—(মাযহারী)

اقتار শব্দের অর্থ ব্যয়ে ক্রটি ও কৃপণতা করা। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ যেসব কাজে আল্লাহ ও রসূল ব্যয় করার আদেশ দেন, তাতে কম ব্যয় করা। (সুতরাং মোটেই ব্যয় না করা উত্তমরূপে এর অন্তর্ভুক্ত হবে।) এই তফসীরও হযরত ইবনে-আব্বাস, কাতাদাহ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।—(মাযহারী) আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের গুণ এই যে, তারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে অপব্যয় ও ক্রটির মাঝখানে সততা ও মিতাচারের পথ অনুসরণ করে।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, **من فقه الرجل قصده في معيشته** অর্থাৎ, ব্যয় করতে গিয়ে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।—(আহমদ, ইবনে-কাসীর)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণিত অপর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : **ما عال من اقتصد** — অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ব্যয় কাজে মধ্যবর্তিতা ও সমতার উপর কায়ম থাকে, সে কখনও ফকীর ও অভাবগ্রস্ত হয় না।—(আহমদ, ইবনে-কাসীর)

পূর্বোক্ত ছয়টি **وَالَّذِينَ لَا يَرْغَبُونَ مَمَالٍ هَالِكَةٍ** গুণের মধ্যে আনুগত্যের মূলনীতি এসে গেছে। এখন গোনাহ ও অবাধ্যতার প্রধান প্রধান মূলনীতি বর্ণিত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম মূলনীতি বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ, তারা এবাদতে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না এতে জানা গেল যে, শিরক সর্ববৃহৎ গোনাহ।

অষ্টম গুণ : **وَالَّذِينَ لَا يَتَّبِعُونَ النَّفْسَ** এখন থেকে কার্যগত গোনাহসমূহের মধ্যে কতিপয় প্রধান ও কঠোর গোনাহ সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এসব গোনাহর কাছে যায় না। তারা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয় না। বিশ্বাস ও কর্মের এই তিনটি বড় গোনাহ বর্ণনা করার পর আয়াতে এরশাদ হচ্ছে,

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا — অর্থাৎ, যে ব্যক্তি উল্লেখিত গোনাহসমূহ করবে, সে তার শাস্তি ভোগ করবে। এ স্থলে আবু উবায়দা **اثام** শব্দের তফসীর করেছেন গোনাহর শাস্তি। কেউ কেউ বলেন : **اثام** জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম, যা নির্মম শাস্তিতে পূর্ণ। কোন কোন হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।—(মাযহারী)

الشعراء

২৭৬

وقال الذين

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يُضَعِّفُ لَهُ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخَذُّ فِيهِ مَهْلِكًا ۝ الرَّكْنَ
 تَابَ وَامِنْ وَعَمِلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلْيَاكُفِّرْ بِكُفْرِهِ إِنَّ اللَّهَ سِتَارُكُمْ
 حَسْبُكَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلْ صَالِحًا
 فَإِنَّهُ يُؤْتِيهِ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ
 إِذَا مَرُّوا بِالْغَمَامِ وَإِذَا أُنذِرُوا بِالْأَذَىٰ لَآ يَتَذَكَّرُونَ ۝ لَمْ
 يَجْعَلْهُمُ اللَّهُ عَقْمًا غَيْرًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا
 مِنْ أَدْوَانِ دُرٍّ لَبِيبًا وَقَافِرًا أَتِينًا وَجَعَلْنَا الْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝
 أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرَّةَ بَاصِرًا وَالْوَيْلُ لَكُمْ فِيهَا خَرَّةً ۝ وَسَلَامًا
 خَالِدِينَ فِيهَا حَسْبَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝ قُلْ مَا يَعْبُودُكُمْ
 رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ عَنْهُ ۝ يَكُونُ لَكُمْ أَرْثًا
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ عَذَابَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 طَسْمَةً ۝ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ لَكَلَّمَ بَاحِثُ
 نَفْسِكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝ إِنْ تَشَاءْ نَنْزِلْ عَلَيْهِمْ
 مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۝

(৬৯) কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তথ্য লাঞ্চিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। (৭০) কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমশীল, পরম দয়ালু। (৭১) যে তওবা করে ও সংকর্ম করে, সে ফিরে আসার স্থান আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। (৭২) এবং যারা মিথ্যা কাজে যোগদান করে না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভ্রষ্টভাবে চলে যায়। (৭৩) এবং যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বোঝানো হলে তাতে অঙ্ক ও বহির সদৃশ আচরণ করে না। (৭৪) এবং যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুতাকীদে জন্যে আদর্শরূপ কর। (৭৫) তাদেরকে তাদের সব্বের প্রতিদানে জন্মোত্তে কক্ষ দেয়া হবে এবং তাদেরকে তথ্য দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। (৭৬) তথ্য তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থানস্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উত্তম! (৭৭) বলুন, আমার পালনকর্তা পরওয়া করেন না যদি তোমরা তাঁকে না ডাক। তোমরা মিথ্যা বলেছ। অতএব সত্ত্ব নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি।

সূরা আশ-শো'আরা

মক্কায় অবতীর্ণ : ২২৭ আয়াত

আল্লাহর নামে শুরু, যিনি পরম মেহেরবান, অপরিসীম দয়ালু।

(১) আ, সীন, যীম। (২) এগুলো মুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) তারা বিশ্বাস করে না বলে আপনি হয়তো মর্মব্যথায় আত্মঘাতী হবেন। (৪) আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে আকাশ থেকে তাদের কাছে কোন নির্দশ নাখিল করতে পারি। অতঃপর তারা এর সামনে নত হয়ে যাবে।

অতঃপর উল্লেখিত অপরাধসমূহ যারা করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত হচ্ছে। আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনাদ্বারা থেকে একথা নির্দিষ্ট যে, এই শাস্তি বিশেষভাবে কাফেরদের হবে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। কেননা, প্রথমে তো يُضَعِّفُ لَهُ الْعَذَابُ কথাটি মুসলমান গোনাহগারদের জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে না। কারণ, তাদের এক গোনাহের জন্যে একই শাস্তি কোরআন ও হাদীসে উল্লেখিত আছে। শাস্তির অবস্থাগত অথবা পরিমাণগত বৃদ্ধি মুমিনদের জন্যে হবে না। এটা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য কুফরের যে শাস্তি, যদি কাফের ব্যক্তি কুফরের সাথে অন্য পাপও করে, তবে সেই শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে যাবে দ্বিতীয়তঃ এই শাস্তি সম্পর্কে আয়াতে يُضَعِّفُ لَهُ الْعَذَابُ কথাটিও বলা হয়েছে; অর্থাৎ, তারা চিরকাল এই আয়াতে লাঞ্চিত অবস্থায় থাকবে। কোন মুমিন চিরকাল আয়াতে থাকবে না। মুমিন যত বড় পাপই করুক, পাপের শাস্তি ভোগ করার পর তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হবে। মোটকথা এই যে, যারা শিরক ও কুফরের সাথে সাথে হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি বর্ধিত হবে, অর্থাৎ, কঠোরও হবে এবং চিরস্থায়ীও হবে। অতঃপর বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যাদের শাস্তির কথা এখানে বলা হল, এরূপ কঠোর অপরাধী যদি তওবা করে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে সংকর্ম করতে থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। উদ্দেশ্য এই যে, তওবার পর তাদের আমলনামায় পুণ্য থেকে যাবে। কেননা, আল্লাহ তাআলার ওয়াদা এই যে, শিরক ও কুফর অবস্থায় যত পাপই করা হোক না কেন, তওবা করতঃ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সেসব বিগত পাপ মাফ হয়ে যাবে। কাজেই অতীতে তাদের আমলনামা যদিও গোনাহ ও মন্দ কর্মে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এখন ঈমান গ্রহণ করার কারণে সেগুলো সব মাফ হয়ে গেছে এবং গোনাহ ও মন্দ কর্মের স্থান ঈমান ও সংকর্ম দখল করে নিয়েছে। মন্দ কর্মসমূহকে পুণ্যে পরিবর্তিত করার এই তফসীর হযরত ইবনে-আব্বাস, হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে জুবায়র, মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। —(মায়হারী)

ব্যবহৃত : وَمَنْ تَابَ وَعَمِلْ صَالِحًا فَإِنَّهُ يُؤْتِيهِ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

এটা পূর্বোক্ত الرَّكْنَ تَابَ وَامِنْ وَعَمِلْ عَمَلًا صَالِحًا বাক্যে বিধৃত বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি। কুরতুবী কাফকাল থেকে বর্ণনা করেন যে, এই তওবা পূর্বোক্ত তওবা থেকে ভিন্ন ও আলাদা। কারণ, প্রথমটি ছিল কাফের ও মুশরিকদের তওবা, যারা হত্যা ও ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়েছিল, এরপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। ফলে তাদের মন্দ কর্মসমূহ পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেয়া হয়। এখন মুসলমান পাণীদের তওবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই প্রথমোক্ত তওবার সাথে وَمَنْ অর্থাৎ, বিশ্বাস

স্থাপনের কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় তওবায় তার উল্লেখ নেই। এতে বোঝা যায় যে, এটা তাদের তওবা, যারা পূর্ব থেকে মুমিনই ছিল; কিন্তু অনবধানতাবশতঃ হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এরূপ লোক তওবা করার পর যদি মৌখিক তওবা করেই ক্ষান্ত না হয়, বরং ভবিষ্যতের জন্যে তাদের কর্মও সংশোধন করে, তবে তাদের তওবাকে বিশুদ্ধ ও সঠিক মনে করা হবে। এ

কারণেই শর্ত হিসেবে তওবার প্রাথমিক অবস্থা উল্লেখ করার পর তার জওয়াবে শুধু **يُؤْتِي** উল্লেখ করা শুদ্ধ হয়েছে। কেননা, শর্তে শুধু যৌথিক তওবার উল্লেখ আছে এবং জওয়াবে যে তওবা উল্লেখিত হয়েছে, তা সংকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি তওবা করে, অতঃপর সংকর্ম দূরায় তওবার প্রমাণ দেয়, তাকে বিশুদ্ধরূপে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী মনে করা হবে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অতীত গোনাহ থেকে তওবা তো করে; কিন্তু ভবিষ্যত ক্রিয়াকর্মে এর কোন প্রমাণ দেয় না, তার তওবা যেন তওবাই নয়। আয়াতের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার এই যে, যে মুসলমান অনবধানতাবশতঃ পাপে লিপ্ত হয়, অতঃপর তওবা করে এবং তওবার পর কর্মও এমন করে, যদ্বারা তওবার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে এ তওবাও আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে এবং বাহ্যতঃ এর উপকারিতাও তাই হবে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, তার মন্দ-কাজকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেয়া হবে।

আল্লাহর বিশেষ ও প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা চলছিল। মাঝখানে পাপের পর তওবা করার বিধান-বলী বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর পুনরায় অবশিষ্ট গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে।

দশম শূণ : **وَالَّذِينَ لَا يَشْفَعُونَ الزُّورَ** - অর্থাৎ, তারা মিথ্যা ও বাতিল

মজলিসে যোগদান করে না। সর্ববৃহৎ মিথ্যা ও বাতিল তো শেরক ও কুফর। এরপর সাধারণ পাপ কর্ম মিথ্যা কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রিয় বান্দাগণ এরূপ মজলিসে যোগদান করা থেকেও বিরত থাকে। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, এর অর্থ মুশরিকদের ঈদ, মেলা ইত্যাদি। হযরত মুজাহিদ ও মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া বলেন, এখানে গান-বাজনার মাহফিল বোঝানো হয়েছে। আমার ইবনে-কায়েম বলেন, নির্লজ্জতা ও নৃত্যগীতের মাহফিল বোঝানো হয়েছে। যুহরী ও ইমাম মালেক বলেন, মদ্যপান করা ও করানোর মজলিস বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে-কাসীর) সত্য এই যে, এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এগুলো সবই মিথ্যা ও বাতিল মজলিস। আল্লাহর নেক বান্দাদের এরূপ মজলিস পরিহার করে থাকা উচিত। কেননা, ইচ্ছা করে বাজে ও বাতিল কর্ম দেখা ও তাতে যোগদান করার সমপর্যায়ভুক্ত।—(মাহহারী) কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতের **يَشْفَعُونَ** শব্দটিকে **شهادة** অর্থাৎ, সাক্ষ্য দেয়ার অর্থে নিয়েছেন।

তাদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। মিথ্যা সাক্ষ্য যে মহাবিপদ ও কবীরা গোনাহ, তা কোরআন ও সন্নতে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। বোখারী ও মুসলিমে হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) মিথ্যা সাক্ষ্যকে সর্ববৃহৎ কবীরা গোনাহ আখ্যা দিয়েছেন।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিযোগ প্রমাণিত হয়ে যায়, তাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত করা দরকার। এছাড়া তার মুখে চুন-কালি মেখে বাজারে ঘুরিয়ে লালিত করা দরকার। এরপর দীর্ঘদিন কয়েদখানায় আবদ্ধ রাখা প্রয়োজন।—(মাহহারী)

একাদশ শূণ : **وَالَّذِينَ لَا يَشْفَعُونَ الزُّورَ** - অর্থাৎ, যদি অনর্থক

ও বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে তারা ঘটনাক্রমে কোনদিন গমন করে, তবে গাষ্ট্রীয় ও ভদ্রতা সহকারে চলে যায়। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের মজলিসে তারা যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে যোগদান করে না, তেমনি যদি ঘটনাক্রমে তারা এমন মজলিসের কাছ দিয়েও গমন করে, তবে পাপাচারের এসব মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্রতা বজায় রেখে চলে যায়। অর্থাৎ, মজলিসের

কাজকে মন্দ ও ঘৃণ্য জ্ঞান সত্ত্বেও পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে না এবং নিজেদেরকে তাদের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে অহংকারে লিপ্ত হয় না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একদিন ঘটনাক্রমে বাজে মজলিসের কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি সেখানে না দাঁড়িয়ে সোজা চলে যান। রসুলুল্লাহ (সাঃ) একথা জ্ঞানতে পেয়ে বললেন, ইবনে মাসউদ কবীরী অর্থাৎ, ভদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, যাতে অনর্থক মজলিসের কাছ দিয়ে ভদ্র ও সম্প্রদায় লোকদের ন্যায় চলে যাওয়ার নির্দেশ আছে।—(ইবনে-কাসীর)

দ্বাদশ শূণ : **وَالَّذِينَ لَا يَشْفَعُونَ الزُّورَ** - অর্থাৎ, এই প্রিয় বান্দাগণকে যখন আল্লাহ আয়াত ও আযোবাতের কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তারা এসব আয়াতের প্রতি অজ্ঞ ও বধিরদের ন্যায় মনোযোগ দেয় না; বরং শ্রবণশক্তি ও অস্তৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ন্যায় এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে ও তদনুযায়ী আমল করে। অনবধান ও বোকা লোকদের ন্যায় এরূপ আচরণ করে না যে, তারা যেন শোনেইনি কিংবা দেখেইনি। এই আয়াতে দু'টি বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। (এক) আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর পতিত হওয়া অর্থাৎ, গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করা। এটা প্রশংসনীয়, কাম্য ও বিরাট পুণ্য কাজ। (দুই) অজ্ঞ ও বধিরদের ন্যায় পতিত হওয়া; অর্থাৎ, কোরআনের আয়াতসমূহের প্রতি মনোনিবেশ করা হয় বটে, কিন্তু আমলের ব্যাপারে এমন করা যেন শোনেইনি ও দেখেইনি অথবা আমলও করা হয়, কিন্তু বিশুদ্ধ মূলনীতি এবং সাহাবা তাবয়ীগণের মতামতের খেলাফ নিজের মতে কিংবা জনশ্রুতির অনুসরণে ভ্রান্ত আমল করা। এটাও এক রকম অজ্ঞ-বধির হয়েই পতিত হওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

শরীয়তের বিধানাবলী পাঠ করাই যথেষ্ট নয় : আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর আয়াতের প্রতি মনোনিবেশই না করা এবং অজ্ঞ ও বধিরের ন্যায় আচরণ করার যেমন নিন্দা করা হয়েছে; তেমনি না বুঝে, না শুনে নিজের মতামতের উপর ভিত্তি করে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবে মনোনিবেশ করা এবং আমল করারও নিন্দা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর ইবনে-আওন থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত শা'বীকে জিজ্ঞেস করেন, যদি আমি এমন কোন মজলিসে উপস্থিত হই, যেখানে সবাই সেজদারত আছে এবং আমি জ্ঞানি না, এটা কোন প্রকার সেজদা, তবে আমিও কি তাদের সাথে সেজদায় শরীক হয়ে যাব? হযরত শা'বী বললেন, না। না বুঝে না শুনে কোন কাজে লেগে যাওয়া মুমিনের জন্যে বৈধ নয়; বরং বুঝে-শুনে আমল করা তার জন্যে জরুরী। তুমি যখন সেজদার সেই আয়াতটি শোননি, যার ভিত্তিতে তারা সেজদা করছে এবং তুমি তাদের সেজদার স্বরূপও জ্ঞান না, তখন এভাবে তাদের সাথে সেজদায় শরীক হয়ে যাওয়া জায়েয নয়।

ত্রয়োদশ শূণ : **وَالَّذِينَ لَا يَشْفَعُونَ الزُّورَ** - এতে নিজ সন্তান-সন্ততি ও

স্ত্রীদের জন্যে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করা হয়েছে যে, তাদেরকে আমার জন্যে চোখের শীতলতা স্বরূপ করে দিন। চোখের শীতলতা করার উদ্দেশ্য হযরত হাসান বসরীর তফসীর অনুযায়ী তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যে মশগুল দেখা। একজন মানুষের জন্যে এটাই চোখের শীতলতা। যদি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীদের বাহ্যিক স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সুখ-স্বচ্ছন্দ্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়, তবে তাও দূরস্ত।

এখানে এই দোয়া দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর শ্রিয় বান্দাগণ কেবল নিজেদের সংশোধন ও সংকর্ম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না : বরং তাদের সম্ভান-সম্মতি ও শত্রীদেরও আমল সংশোধন এবং চরিত্র উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টারই অংশ হিসেবে তাদের সংকর্ম পরায়ণতার জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে দোয়ার এই অংশটিও প্রনিধানযোগ্য

وَلَكُمْ مِنَ الْمُنَافِقِينَ إِمَامًا

আমাদেরকে মুশাকীগণের নেতা ও ইমাম করে দিন। এতে বাহ্যতঃ নিজের জন্যে জাঁকজমক, পদমর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দোয়া আছে, যা কোরআনের অন্যান্য আয়াতদ্বয়ে নিষিদ্ধ, যেমন এক আয়াতে আছে : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ

الَّتِي سَبَّحُوا بِهَا آلَ اللَّهِ عَنَ الْبُاطِلِ وَإِنَّهُمْ بِهَا ضَالُّونَ ۚ

আমি পরকালের গৃহ তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা ভূপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে না এবং অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। তাই কোন কোন আলেম এই আয়াতের তফসীরে বলেন : প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবার-পরিজনদের ইমাম ও নেতা স্বাভাবিকভাবে হয়েই থাকে। কাজেই এই দোয়ার সারমর্ম এই যে, আমাদের সম্ভান-সম্মতি ও পরিবার-পরিজনকে মুশাকী করে দিন। তারা মুশাকী হয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এই ব্যক্তি মুশাকীগণের ইমাম ও নেতা কবিত হবেন। সুতরাং এখানে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দোয়া করা হয়নি ; বরং সম্ভান-সম্মতি ও শত্রীদেরকে মুশাকী করার দোয়া করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম নাযরী বলেন, এই দোয়ায় নিজের জন্যে কোন সরদারী ও নেতৃত্ব প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য নয় ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, আমাদেরকে এরূপ যোগ্য করে দিন, যাতে মানুষ ধর্ম ও আমলে আমাদের অনুসরণ করে এবং আমাদের জ্ঞান ও আমল দ্বারা তারা উপকৃত হয়। ফলে আমরা এর সওয়াব পাব। হযরত মকজুল শামী বলেন, দোয়ার উদ্দেশ্য নিজের জন্যে তাকওয়া ও আল্লাহুতীতির এমন উচ্চস্তর অর্জন করা, যদ্বারা মুশাকীগণ লাভবান হয়। কুরতুবী উভয় উক্তি বর্ণনা করার পর বলেন, উভয় উক্তির সারকথা একই ; অর্থাৎ, যে সরদারী ও নেতৃত্ব ধর্ম ও পরকালের উপকারার্থে তলব করা হয়, তা নিন্দনীয় নয়—জায়েয। পক্ষান্তরে لَا يُرِيدُونَ عِلًّا আয়াতে সেই সরদারী ও নেতৃত্বই নিন্দা করা হয়েছে, যা পার্শ্বি সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের নিমিত্ত হয়। وَاللَّهُ أَعْلَمُ এ পর্যন্ত 'ইবদুর রহমান' অর্থাৎ, কামেল মুমিনদের প্রধান গুণাবলীর বর্ণনা সমাপ্ত হল। অতঃপর তাদের প্রতিদিন ও পরকালীন মর্তবার বিষয় বর্ণিত হচ্ছে।

وَأُولَٰئِكَ يُرِيدُونَ الْعِزَّةَ ۚ

তথা উপরতলার কক্ষ। বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত এমন বলাখানা পাবে, যা সাধারণ জন্মানুগতগণের কাছে তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তারকা-নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়।—(বোখারী, মুসলিম, মাযহরী) মুসনাদ আহমদ, বায়হাকী, তিরমিযী ও হাকিমের হযরত আবু মালেক আশআরী থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, জন্মাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ) এসব কক্ষ কাদের জন্যে ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নম্র ও পবিত্র কথাবার্তা বলে, প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাতে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে।—(মাযহরী)

وَالَّذِينَ فِيهَا يُنَادُوا لِلَّهِ أَتَانَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ

—অর্থাৎ, জন্মাতের অন্যান্য নেয়ামতের

সাথে তারা এই সম্মানও লাভ করবে যে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে যোবারকবাদ জানাবে এবং সালাম করবে। এ পর্যন্ত ষাটি মুমিনদের বিশেষ অভ্যাস, কর্ম ও এ সবার প্রতিদিন ও সওয়াবের আলোচনা ছিল। শেষ আয়াতে পুনর্বীর কাকের ও মুশরিকদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

فَنَسِئَ الْيَكْرِمُ إِلَىٰ لَوْلَاكَ مَا كُنَّا ۚ

—এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে অনেক উক্তি আছে। উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে যা লিখিত হয়েছে, তাই অধিক স্পষ্ট ও সহজ। তা এই যে, আল্লাহর কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব থাকত না যদি তোমাদের পক্ষ থেকে তাকে ডাকা ও তাঁর এবাদত করা না হত। কেননা, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই আল্লাহর এবাদত করা। যেমন অন্য আয়াতে আছে : وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدَنِ

—অর্থাৎ, আমি মানব ও জিনকে আমার এবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি। এ হচ্ছে একটি সাধারণ বিধির বর্ণনা যে, এবাদত ব্যতীত মানুষের কোন মূল্য, গুরুত্ব ও সম্মান নেই। এরূপ রেসালত এবং এবাদতে অবিশ্বাসী কাকের ও মুশরিকদেরকে বলা হয়েছে : فَكَذَّبْتُمْ ۖ — অর্থাৎ, তোমরা সবকিছুকে মিথ্যাই বলে দিয়েছ। এখন আল্লাহর কাছে তোমাদের কোন গুরুত্ব নেই।

فَتَوَلَّىٰ يَكُونُ لِزَامًا ۚ

—অর্থাৎ, এখন এই মিত্যারোপ ও কুফর তোমাদের কষ্টহার হয়ে গেছে। তোমাদেরকে জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাবে লিপ্ত না করা পর্যন্ত এটা তোমাদের সাথে থাকবে।

সূরা আশ-শোআরা

لَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ ۚ لَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الْيَوْمَ ۚ

করতে করতে বিখ্যাত (গদাঁদের একটি শিরা) পর্যন্ত পৌছ। এখানে অর্থ হলো নিজেকে কষ্ট ও ক্লেশ পতিত করা। আল্লামা আসকারী বলেন, এ ধরনের স্থানে বাক্যের আকার স্ববরবোধক হলেও প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য, নিষেধ করা। অর্থাৎ, হে পয়গম্বর, স্বজাতির কুফর ও ইসলামের প্রতি পৃষ্ঠপোষক দেখে দুঃখ ও বেদনায় আত্মঘাতী হবেন না। এই আয়াত থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, ভাগ্যে ঈমান নেই—কোন কাকের সম্পর্কে এরূপ জানা গেলেও তার কাছে ধর্ম প্রচারে বিরত হওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ জানা গেল যে, ক্লেশ স্বীকারে সমতা দরকার। যে ব্যক্তি হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকে তার জন্যে অধিক দুঃখ না করা উচিত।

إِنْ تَنَادَوْا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَوْفِينَ

ফলত্বা লাহা খাসেমিন বলেন, আসল বাক্য হচ্ছে إِنَّا نَفَعُهَا خَاسِعِينَ অর্থাৎ, কাকেররা এই বড় নিদর্শন দেখে অনুগত ও নত হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে বিনয়ের স্থান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে اعْنَان (গদাঁদ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, নত হওয়া ও বিনয়ী হওয়ার ভাব সর্বপ্রথম গদাঁদে প্রকাশ পায়। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, আমি নিজ তওহীদ ও কুদরতের এমন

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَائِنَةً
مُعْرِضِينَ ۝ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْ يَسْأَلُوا مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَبْنَتْ قَتَائِبًا مِنْ ثُلٍّ
ذَوْجٍ كَرِيمٍ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ
أَنْتَ الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ۝ قَوْمُ فِرْعَوْنَ أَكْثَرُ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ رَبِّ
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينِي ۝ وَيَضَعِيكَ صَدْرِي ۝ وَكَانَ يُسْأَلُ لِمَ لَا
تَنْزِيلُ إِلَهُ هَؤُلَاءِ ۝ وَلَهُمْ عَلَى ذُنُوبٍ قَلِيلٌ ۝ فَقَالَ
قَالَ كَلَامًا فَادْهَبْ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَهُ مُسْتَمِعُونَ ۝ فَآتَيْنَا فِرْعَوْنَ
فَقَوْلًا رَأَى رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَنْ أَرْسَلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ
قَالَ أَلَمْ تَرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۝
وَقَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الْبَغْيَ فَلَمَكْتَ وَآنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ قَالَ فَعَلِمَ
إِذْ أَوَّلْنَا مِنَ الْقَارُونِ ۝ فَعَرَضْتَ بَيْنَكُمْ لِيُخَفِّيَكُمْ فَوَهَبَ لِي
رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ وَتَرَكْنَا وَجْهًا عَلًى
أَنْ عِبَدْتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

(৫) যখনই তাদের কাছে রহমান-এর কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) অতএব তারা তো মিথ্যারোপ করেছেই; সুতরাং যে বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তার যথার্থ স্বরূপ শীঘ্রই তাদের কাছে পৌছবে। (৭) তারা কি ভূপৃষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? আমি তাতে সর্বত্রকার বিশেষ-বস্তু কত উদ্গত করেছি। (৮) নিশ্চয় এতে নির্দশন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশাসী নয়। (৯) আপনার পালনকর্তা তো পরাক্রমশালী পরম দয়ালু। (১০) যখন আপনার পালনকর্তা মুসাকে ডেকে বললেন; তুমি পাপিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিকট যাও; (১১) ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নিকট; তারা কি ভয় করে না? (১২) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে দেবে। (১৩) এবং আমার মন হতবল হয়ে পড়ে এবং আমার জিহবা অচল হয়ে যায়। সুতরাং হারুনের কাছে বার্তা প্রেরণ করুন। (১৪) আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আছে। অতএব আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (১৫) আল্লাহ বলেন, কখনই নয়, তোমরা উভয়ে যাও আমার নির্দশনাবলী নিয়ে। আমি তোমাদের সাথে থেকে শোনব। (১৬) অতএব তোমরা ফেরাউনের কাছে যাও এবং বল, আমরা বিশ্বজগতের পালনকর্তার রসূল। (১৭) যাতে তুমি বনী-ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও। (১৮) ফেরাউন বলল, আমার কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের মধ্যে জীবনের বহু বছর কাটিয়েছ। (১৯) তুমি সেই-তোমরা অপরাধ যা করবার করেছে। তুমি হলে কৃত্যু। (২০) মুসা বলল, আমি সে অপরাধ তখন করেছি, যখন আমি ভ্রান্ত ছিলাম। (২১) অতঃপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করলাম। এরপর আমার পালনকর্তা আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে পরময়র করেছেন। (২২) আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা বলছ, তা এই যে, তুমি বনী-ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছ। (২৩) ফেরাউন বলল, বিশ্বজগতের পালনকর্তা আমার কি?

কোন নির্দশন প্রকাশ করতেও সক্ষম, যাতে শরীয়তের নির্দেশাবলী ও খোদায়ী স্বরূপ জাঙ্ঘল্যমান হয়ে সামনে এসে যায় এবং কারো পক্ষে অস্বীকার করার যো না থাকে। কিন্তু এসব নির্দেশ ও তত্ত্ব জাঙ্ঘল্যমান না হওয়া বরং চিন্তা-ভাবনার উপর নির্ভরশীল থাকাই রহস্যের দাবী। চিন্তা-ভাবনাই মানুষের পরীক্ষা এবং এর ভিত্তিতেই সওয়াব ও আযাব বর্তিত। জাঙ্ঘল্যমান বিষয়সমূহকে স্বীকার করা তো একটি স্বাভাবিক ও অবশ্যজ্ঞাবী ব্যাপার। এতে এবাদত ও আনুগত্যের শান নেই।— (কুরত্বী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

دَوْرُ এর শাব্দিক অর্থ যুগল। এ কারণেই পুরুষ ও স্ত্রী, নর ও নারীকে دَوْرُ বলা হয়। অনেক বৃক্ষের মধ্যেও নর ও নারী থাকে, সেগুলোকে এদিক দিয়ে دَوْرُ বলা যায়। কোন সময় এ শব্দটি বিশেষ প্রকার ও শ্রেণীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ হিসেবে বৃক্ষের প্রত্যেক প্রকারকে دَوْرُ বলা যায়। دَوْرُ শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট ও পছন্দনীয় বস্তু।

আনুগত্যের জন্যে সহায়ক উপকরণ প্রার্থনা করা বাহানা

আনুষঙ্গিক বিষয় : قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينِي - وَيَضَعِيكَ صَدْرِي
وَلَا يُطِيعُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَهُ هَؤُلَاءِ وَلَهُمْ عَلَى ذُنُوبٍ قَلِيلٌ
أَنْ يَقْتُلُونِ

এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন আদেশ পালনের ব্যাপারে কোন সহায়ক বস্তু প্রার্থনা করা বাহানা অনুষণ নয়; বরং বৈধ। যেমন মুসা (আঃ) আল্লাহর আদেশ পেয়ে তার বাস্তবায়ন সহজ ও ফলপ্রসূ করার জন্যে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। কাজেই এখানে একথা বলা ভুল হবে যে, হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর আদেশকে নির্দিষ্টায় শিরোধার্য করে নিলেন না কেন এবং দেবী করলেন কেন? কারণ, মুসা (আঃ) যা করেছেন, তা আদেশ পালনেরই পর্যায়ে করেছেন।

হযরত মুসা (আঃ) এর জন্যে ضلال শব্দের অর্থ : قَالَ فَعَلِمَ : إِذْ أَوَّلْنَا مِنَ الْقَارُونِ : তুমি এক কিবতীকে হত্যা করেছিলে ফেরাউনের এই অভিযোগের জওয়াবে মুসা (আঃ) বললেন, : হা, আমি হত্যা অবশ্যই করেছিলাম; কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ছিল না; বরং কিবতীকে তার ভুল বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে ঘুষি মেরেছিলাম যার ফলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সারকথা এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড নবুওয়তের পরিপন্থী। আর এ হত্যাকাণ্ড অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়েছিল। কাজেই এখানে ضلال শব্দের অর্থ অজ্ঞাত তথা অনিচ্ছাকৃতভাবে কিবতীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া। হযরত কাতাদাহ ও ইবনে যায়দের রেওয়ায়েত থেকে এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। আরবী ভাষায় ضلال শব্দের অর্থ একাধিক এবং সর্বত্রই এর অর্থ পথভ্রষ্টতা হয় না। এখানেও এর অনুবাদ 'পথভ্রষ্ট' করা ঠিক নয়।

মহিমাবিত্ত আল্লাহর সত্তা ও স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা মানুষের

জন্যে সম্ভবপর নয় : قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিমাবিত্ত আল্লাহর স্বরূপ জানা সম্ভবপর নয়। কারণ, ফেরাউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে। মুসা (আঃ) স্বরূপ বর্ণনা করার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলার গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ তাআলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় এবং

الشعر ১৭

২৭৭

وقال الذين

قَالَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا لَهُمْ هَذَا سَحَرُ
 قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ فِيهِ إِلَّا رُسُلُ الْفِتْنَةِ يَخْلُفُونَ ۝ قَالَ رَبِّ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا لَهُمْ هَذَا سَحَرُ ۝ قَالَ رَبِّ
 لَيْسَ لِي عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ فَذَرْهُمْ ۝ قَالَ رَبِّ لَيْسَ لِي عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ فَذَرْهُمْ
 قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ فِيهِ إِلَّا رُسُلُ الْفِتْنَةِ يَخْلُفُونَ ۝ قَالَ رَبِّ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا لَهُمْ هَذَا سَحَرُ ۝ قَالَ رَبِّ
 لَيْسَ لِي عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ فَذَرْهُمْ ۝ قَالَ رَبِّ لَيْسَ لِي عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ فَذَرْهُمْ
 قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ فِيهِ إِلَّا رُسُلُ الْفِتْنَةِ يَخْلُفُونَ ۝ قَالَ رَبِّ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا لَهُمْ هَذَا سَحَرُ ۝ قَالَ رَبِّ
 لَيْسَ لِي عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ فَذَرْهُمْ ۝ قَالَ رَبِّ لَيْسَ لِي عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ فَذَرْهُمْ
 قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ فِيهِ إِلَّا رُسُلُ الْفِتْنَةِ يَخْلُفُونَ ۝

(২৪) মুসা বলল, তিনি নাজেমুল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী
 সবকিছুর পালনকর্তা যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (২৫) ফেরাউন তার
 পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি শূদ্ধ না? (২৬) মুসা বলল, তিনি
 তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও পালনকর্তা। (২৭)
 ফেরাউন বলল, তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রসূলটি নিশ্চয়ই বদ্ধ
 পাকল। (২৮) মুসা বলল, তিনি পূর্ব, পশ্চিম ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব
 কিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বোঝ। (২৯) ফেরাউন বলল, তুমি যদি
 আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর, তবে আমি অবশ্যই
 তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব। (৩০) মুসা বলল, আমি তোমার কাছে
 কোন স্পষ্ট বিষয় নিয়ে আগমন করলেও কি? (৩১) ফেরাউন বলল, তুমি
 সভাবাদী হলে তা উপস্থিত কর। (৩২) অতঃপর তিনি লাঠি নিক্ষেপ
 করলে মুহূর্তের মধ্যে তা সুস্পষ্ট অঙ্গুর হয়ে গেল। (৩৩) আর তিনি
 তার হাত বের করলেন, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে সুস্পষ্ট প্রতিভাত
 হলো। (৩৪) ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, নিশ্চয় এ একজন সুদক্ষ
 জাদুকর। (৩৫) সে তার জাদু বলে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে
 বহিস্কার করতে চায়। অতঃপর তোমাদের মত কি? (৩৬) তারা বলল,
 তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দিন এবং শহরে শহরে ঘোষক প্রেরণ
 করুন। (৩৭) তারা যেন আপনার কাছে প্রত্যেকটি দক্ষ জাদুকরকে
 উপস্থিত করে। (৩৮) অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে জাদুকরদেরকে একত্রিত
 করা হল। (৩৯) এবং জনগণের মধ্যে ঘোষণা করা হল, তোমরাও সমবেত
 হও, (৪০) যাতে আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি—যদি তারা
 বিজয়ী হয়। (৪১) যখন জাদুকররা আগমণ করল, তখন ফেরাউনকে
 বলল, যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে আমরা পূর্বস্কার পাব তো? (৪২)
 ফেরাউন বলল, ইহা এবং তখন তোমরা আমার নৈকট্যপালীদের অন্তর্ভুক্ত
 হবে। (৪৩) মুসা (আঃ) তাদেরকে বললেন, নিক্ষেপ কর তোমরা যা
 নিক্ষেপ করবে।

এরূপ প্রশ্ন করাই অযথা।—(রাসূল মা'আনী)

أَن لَّيْسَ مَسْأَلَتِي لِمُؤَلِّمِي

বনী ইসরাঈল ছিল শাম দেশের
 বাসিন্দা। তাদেরকে স্বদেশে যেতে ফেরাউন বাধা দিত। এভাবে চার শত
 বছর ধরে তারা ফেরাউনের বন্দীশালায় গোলামীর জীবন যাপন
 করছিল। তখন তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ছয় লাখ খ্রিষ্ট হাজার। মুসা
 (আঃ) ফেরাউনকে সত্যের পয়গাম পৌছানোর সাথে সাথে বনী
 ইসরাঈলের প্রতি নির্ঘাতন থেকে বিরত হওয়ার এবং তাদেরকে স্বাধীন
 ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।—(কুরতুবী)

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

পয়গম্বরসূলভ বিতর্কের একটি নমুনা ও তার কার্যকরী
 রীতিনীতি : দুই তিন্মুখী চিন্তাধারার বাহক ব্যক্তি ও দলের মধ্যে
 আদর্শগত বাকবিতণ্ডা যাকে পরিভাষায় মুনাযারা বা বিতর্ক বলা হয়,
 প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণভাবে এই বিতর্ক একটি
 হারজিতের খেলায় পর্যবসিত হয়ে গেছে। মানুষের দৃষ্টিতে বিতর্কের
 সারমর্ম এতটুকুই যে, নিজের দাবী সর্বাবস্থায় উঠে থাকতে হবে যদিও এর
 লাভি নিজেরও জানা হয়ে যায়। এই দাবীকে নির্ভুল ও জোরদার প্রমাণ
 করার জন্যে সাক্ষ্য-প্রমাণ ও যোগ্যশক্তি নিঃশেষে ব্যয় করতে হবে।
 এমনিভাবে প্রতিপক্ষের কোন দাবী সত্য ও নির্ভুল হলেও তা ঝড়ন করতে
 হবে এবং খণ্ডনে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করতে হবে। ইসলামই এই বিতর্কে
 বিশেষ সমতা আনয়ন করেছে। এর মূলনীতি, ধারা, পদ্ধতি ও সীমা
 নির্ধারণ করে একে প্রচার ও সংশোধনকার্যের একটি উপকারী ও কার্যকরী
 হাতিয়ারে পরিণত করেছে।

আলোচ্য আয়াতে এর একটি সংক্ষিপ্ত নমুনা লক্ষ্য করা যায়। হযরত
 মুসা ও হারান (আঃ) যখন ফেরাউনের মত স্বৈরাচারী ও খোদায়ী
 দাবীদারকে তার দরবারের সত্যের পয়গাম পৌছানোর, তখন সে মুসা
 (আঃ)—এর ব্যক্তিগত দু'টি বিষয় দ্বারা বিরোধী আলোচনা ও তর্কবিতর্কের
 সূত্রপাত করল, যেমন সূচ্যুর প্রতিপক্ষ সাধারণতঃ যখন আসল বিষয়ের
 জগুয়াব দিতে সক্ষম হয় না; তখন অপর পক্ষের ব্যক্তিগত দুর্বলতা বোঝ
 করে এবং বর্ণনা করে, যাতে সে লজ্জিত হয়ে যায় এবং জনমনে তার
 ভাবমূর্ত্তি ক্ষুণ্ণ হয়। এখানেও ফেরাউন দু'টি বিষয় বর্ণনা করল। (এক)
 তুমি আমাদের লালিত-পালিত এবং আমাদের গৃহে থেকে যৌবনে পদার্পন
 করেছ। তোমার প্রতি আমাদের অনেক অনুগ্রহ আছে। কাজেই তোমার
 সাধ্য কি যে, আমাদের সামনে কথা বল। (দুই) তুমি একজন কিবতীকে
 অহেতুক হত্যা করেছ। এটা যেমন জুলুম, তেমনি নিমকহারামী ও
 কৃতঘ্নতা। যে সম্প্রদায়ের স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছ এবং যৌবনে
 পদার্পন করেছ, তাদেরই একজনকে তুমি হত্যা করেছ। এর বিপরীতে
 হযরত মুসা (আঃ)—এর পয়গম্বরসূলভ জগুয়াব দেখুন। প্রথমতঃ তিনি
 জগুয়াবে প্রশ্নের ক্রম পরিবর্তন করে কিবতীর হত্যাকাণ্ডের জগুয়াব প্রথমে
 দিলেন; যা ফেরাউন পরে উল্লেখ করেছিল এবং গৃহে লালিত-পালিত
 হওয়ার অনুগ্রহ, যা ফেরাউন প্রথমে উল্লেখ করেছিল, তার জগুয়াব
 পরে দিলেন। এই ক্রমপরিবর্তনের রহস্য এক্ষণে মনে হয় যে, তাঁর
 দুর্বলতার কারণে হত্যার বিষয়কে পাশ কাটিয়েই যাওয়া হয় এবং অন্য
 বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আল্লাহর রসূল
 এর জগুয়াবকেই অগ্রাধিকার দিলেন এবং জগুয়াবও যেটিমুটি দোষ
 স্বীকারের মাধ্যমেই দিলেন। প্রতিপক্ষ বলবে যে, তিনি দোষ স্বীকার করে

فَالْقَوَاعِبُ لَهُمْ عَذَابُهُمْ وَكَانُوا بِعَذَابِهِ قَارِعُونَ إِنَّ الَّذِينَ
 الْغُلَبُونَ ۝ وَالْقُلُوبُ مَوَسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝
 فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سِحْرُهُمْ ۝ قَالُوا الْمَكَارِبُ الْغُلَبِينَ ۝ رَبِّ مُوسَىٰ
 وَهَارُونَ ۝ قَالَ أَمْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِيَ لَكُمُ الْأَذَىٰ ۚ لَكُمُ الْعَذَابُ الْبَاقِي ۝
 عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَمَّا سَوَوْا قُلُوبَهُمْ قَالُوا قَطِيعٌ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ
 مِنْ خِلَافٍ وَلَا تَصِلُ إِلَيْكُمْ أَصَابِعُكُمْ ۝ قَالُوا الْإِصْبَارُ زَانَا إِلَىٰ
 رَبِّنَا مُتَقَبِّلِينَ ۚ إِنَّا فَاطِمَةٌ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا كُنَّا أَكْثَرَ
 الْفَاسِقِينَ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِلِّيٍّ ۚ إِنَّكَ مُبْصِرٌ
 فَارْسَلْ فَرَعُونَ فِي الْمَدَائِنِ خَبِيرِينَ ۚ إِنَّ هَؤُلَاءِ سِرَافَةٌ
 قَالِيُونَ ۝ وَأَنَّهُمْ لِنَا لَغَابِطُونَ ۚ وَكَانُوا لَجِيمَةً خَذِرُونَ ۝
 فَأَخْرَجَهُم مِّنْ جَدَّتِ وَعِيُونِ ۚ وَكَانُوا وَمَعَهُمُ كَرِيمٌ ۚ كَذَلِكَ
 وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ ۚ فَلَمَّا زَاوَاهُ
 الْجَمْعُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَمَكْرُورٌ ۚ قَالَ كَلَّا إِنِّي مَعَ
 رَبِّي سَمِيعٌ ۚ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ
 فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْكَلَبِ الْهَلِيمِ ۚ وَاتَّبَعْنَا الْأَمْرَيْنِ ۚ

(৪৪) অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং বলল, ফেরাউনের ইযযতের কসম, আমরাই বিজয়ী হব। (৪৫) অতঃপর মুসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করল, ইহাৎ তা তাদের অলীক কীতিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। (৪৬) তখন জাদুকররা সেজন্য নত হয়ে গেল। (৪৭) তারা বলল, আমরা রশ্বল আলামীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, (৪৮) যিনি মুসা ও হারুনের রব। (৪৯) ফেরাউন বলল, আমার অনুমতি দানের পূর্বেই তোমরা কি তাকে যেনে নিলে? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা পরিণাম জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করব এবং তোমাদের সবাইকে শূন্য চড়াব। (৫০) তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করব। (৫১) আমরা আশা করি, আমাদের পালনকর্তা আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি মার্জন করবেন। কারণ, আমরা বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে অগ্রণী। (৫২) আমি মুসাকে আদেশ করলাম যে, আমার বন্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে যাও; নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাৎদল করা হবে। (৫৩) অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে সন্ত্রাস্ত্রকরদেরকে প্রেরণ করল, (৫৪) নিশ্চয় এরা (বনী-ইসরাঈলরা) ক্ষুদ্র একটি দল। (৫৫) এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্দেশ্যে চলে গেল। (৫৬) এবং আমরা সবাই সदा শঙ্কিত। (৫৭) অতঃপর আমি ফেরাউনের দলকে তাদের বাগ-বাগিচা ও বর্ণাসমূহ থেকে বহিকার করলাম। (৫৮) এবং ধন-ভাণ্ডার ও নোদারম স্থানসমূহ থেকে। (৫৯) এরূপই হয়েছিল এবং বনী-ইসরাঈলকে করে দিলাম এসবের মালিক। (৬০) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাৎদল করল। (৬১) যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মুসার সঙ্গীরা বলল, আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম। (৬২) মুসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছে আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেন। (৬৩) অতঃপর আমি মুসাকে আদেশ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত কর। ফলে, তা বিনীর্ণ হয়ে গেল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতসদৃশ হয়ে গেল। (৬৪) আমি সেখান অপর দলকে পৌছিয়ে দিলাম।

পরাজয় যেনে নিয়েছেন, তিনি মোটেই এদিকে আক্কেপ করেননি।

হযরত মুসা (আঃ) জওয়াবেই কথা স্বীকার করে নিনেন যে, এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে ভুল ও বিচ্যুতি হয়ে গেছে; কিন্তু সাথে সাথে এ সত্যও ফুটিয়ে তুললেন যে, এটা একটা সদ্ভূষণ প্রসাদিত পদক্ষেপ ছিল, যা ঘটনাক্রমে অব্যাহতি পরিণতি লাভ করে ফেলে। লক্ষ্য ছিল, কিবতীকে ইসরাঈলীর প্রতি জুলুম থেকে বিরত করা। এই লক্ষ্যই তাকে একটি ঘৃণি মারা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে সে এতে মারা গেল। তাই এ হত্যাকাণ্ড ছিল নাস্তিপ্রসূত। কাজেই আমার নবুওয়ত দাবীর সত্যতায় এটা কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। আমি এই ভুল জনতে পেরে আইনগত ধর-পাকড়ের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেলাম। আল্লাহ তাআলা অতঃপর আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং আমাকে নবুওয়ত ও রেসালত দ্বারা ভূষিত করেন।

الْقَوَاعِبُ لَهُمْ عَذَابُهُمْ ۝ অর্থাৎ, হযরত মুসা (আঃ) জাদুকরদেরকে

বললেন, তোমাদের যা জাদু প্রদর্শন করবার, প্রদর্শন কর। এতে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে দেখলে সন্দেহ হয় যে, মুসা (আঃ) তাদেরকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ দিচ্ছেন কেমন করে? কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা মুসা (আঃ)-এর পক্ষ থেকে জাদু প্রদর্শনের নির্দেশ ছিল না, বরং তাদের যা কিছু করবার ছিল, তা বাতিল করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তবে যেহেতু প্রকাশ করা ব্যতীত বাতিল করা অসম্ভব ছিল, তাই তিনি জাদুকরদেরকে জাদু প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছেন; যেমন, কোন আল্লাহদ্রোহীকে বলা হয় যে, তুমি তোমার আল্লাহদ্রোহীতার প্রমাণাদি পেশ কর, যাতে আমি সেগুলোকে বাতিল প্রমাণ করতে পারি। কলাবাহুল্য, একে আল্লাহদ্রোহীতায় সম্মতি বলা যায় না।

আনুভঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يُؤَرِّثُ فَرَعُونَ এ বাক্যটি জাদুকরদের জন্যে কসম পর্যায়ের।

মুর্খতায়ুগে এর প্রচলন ছিল। পরিতাপের বিষয়! আজকাল মুসলমানদের মধ্যেও এরূপ কসম প্রচলিত হয়ে গেছে, যা এর চাইতেও মন্দ। উদাহরণতঃ বাদশাহর কসম, তোমার বাপের কবরের কসম ইত্যাদি। এ ধরনের কসম শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয; বরং এগুলো সম্পর্কে একথা বলা ভুল হবে না যে, আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম স্বাওয়া যেমন বিরাট পাপ, এসব নামের সত্য কসম স্বাওয়াও তার চাইতে কম পাপ নয়।—(রুহুল-মা'আনী)

فَالْقَوَاعِبُ لَهُمْ عَذَابُهُمْ ۝ অর্থাৎ, যখন ফেরাউন

জাদুকরদেরকে বিশাস স্থাপন করার কারণে হত্যা, হস্তপদ কর্তন ও শূন্য চড়ানোর হুমকি দিল, তখন জাদুকররা অত্যন্ত তাক্ষিলাতের জওয়াব দিল, তুমি যা করতে পার, করো আমাদের কোন ক্ষতি নেই। আমরা নিহত হলেও পালনকর্তার কাছে পৌছে যাব। সেখানে আরামই আরাম।

এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে, আত্মীবন জাদুর কুফরে লিপ্ত, ফেরাউনের উপাস্যতা স্বীকারকারী এবং ফেরাউনের পূজা-অর্চনাকারী এই জাদুকররা মুসা (আঃ)-এর মুজ্জযা দেখে স্বজাতির বিপক্ষে, ফেরাউনের মত স্বৈরাচারী সম্রাটের বিরুদ্ধে ঈমানের কথা ঘোষণা করল কিরূপে? এটা নিতান্তই বিস্ময়কর ব্যাপার। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, এখানে শুধু ঈমানের ঘোষণাই নয়; বরং ঈমানের এমন গভীর রক্তও প্রকাশ পেয়েছে যে, কেয়ামত ও পরকাল যেন তাদের চোখের সামনে

উদ্ধাসিত হয়ে গেছে, তারা পরকালের নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করেছে। ফলে দুনিয়ার যে কোন শান্তি ও বিপদকে উপেক্ষা করে তারা

فَافْضِلْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ (তোমরা যা করবার, করে ফেল) বলে দিয়েছে।

এটাও প্রকৃতপক্ষে মুসা (আঃ)-এরই মু'জ্জযা, যা লাঠি ও সুশস্ত্র হাতের মু'জ্জযার চাইতে কোন অংশে কম নয়। এ ধরনের অনেক ঘটনা আমাদের প্রিয় রসূল মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর হাতে প্রকাশ পেয়েছে। এক মিনিটের মধ্যে সমস্ত বছরের কাফেরের মধ্যে এমন অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে যে, সে শুধু মুমিনই নয়; বরং যোদ্ধা সেজে শহীদ হওয়ার বাসনা প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

وَأَوْرَثَهُمُ الْبَنَاتِ وَالْأَمْوَالَ

—এ আয়াতে বাহ্যতঃ বলা হয়েছে যে,

ফেরআউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বিষয় সম্পত্তি, বাগ-বাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক তাদের নিমজ্জিত হওয়ার পর বনী-ইসরাঈলকে করে দেয়া হয়। কিন্তু এতে একটি ঐতিহাসিক জটিলতা এই যে, স্বয়ং কোরআনের একাধিক আয়াত সাক্ষ্য দেয়, ফেরআউন সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর বনী-ইসরাঈল মিসরে প্রত্যাবর্তন করেনি; বরং তাদের আসল আবাসস্থল পবিত্রভূমি শামের দিকে রওয়ানা হয়ে যায়। সেখানেই তারা এক কাফের জাতির সাথে জেহাদ করে তাদের শহর অধিকার করার আদেশ প্রাপ্ত হয়। বনী-ইসরাঈল এই আদেশ পালনে অস্বীকৃত হয়। ফলে আযাব হিসেবে তীরের উন্মুক্ত ময়দানে একটি প্রাকৃতিক জেলখানা সৃষ্টি করে দেয়া হয়। তারা সে ময়দান থেকে বের হতে পারত না। এমতাবস্থায়ই চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এই তীহ প্রান্তরেই তাদের উভয় পয়গম্বর হযরত মুসা ও হারুন (আঃ) ওফাত পান। এর পরেও ইতিহাসগ্রন্থ থেকে একথা প্রমাণিত হয় না যে, বনী-ইসরাঈল কোন সময় দলবদ্ধ জাতিগত পরিচিতি ও মর্যাদা নিয়ে মিসরে প্রবেশ করেছে। কাজেই ফেরআউন সম্প্রদায়ের বিষয়-সম্পত্তি ও ধন-ভাণ্ডারের উপর বনী-ইসরাঈলের অধিকার ক্রিপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? তফসীর রাসুল মা'আনীতে এ আয়াতের অধীনেই এ প্রশ্নের দু'টি জওয়াব তফসীরবিদ হযরত হাসান ও কাতাদাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত হাসান বলেন, আলোচ্য আয়াতে বনী-ইসরাঈলকে ফেরআউনদের পরিত্যক্ত সহায়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করার কথা ব্যক্ত হয়েছে; কিন্তু একথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে, এই ঘটনা ফেরআউনের ধ্বংসের তাক্ষণিক পর ঘটবে। তীহ প্রান্তরের ঘটনার চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরেও যদি তারা মিসরে প্রবেশ করে থাকে, তবে আয়াতের অর্থে কোনরূপ তফাৎ দেখা দেয় না। ইতিহাস থেকে তাদের দলবদ্ধভাবে মিসরে প্রবেশ করার কথা প্রমাণিত না থাকার আপত্তি মোটেই ধর্তব্য নয়। কারণ, তখনকার ইতিহাস ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের লিখিত মিথ্যা বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। কাজেই এহেন ইতিহাসের উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। এ কারণে কোরআনের আয়াতে কোনরূপ সদর্থ করার প্রয়োজন নেই। হযরত কাতাদাহ বলেন, এই ঘটনাটি কোরআন পাকের একাধিক সূরায় ব্যক্ত হয়েছে, যেমন সূরা আ'রাফের আয়াত ১৩৬, ১৩৭-এ, সূরা কাসাসের আয়াত ৫-এ, সূরা দোখানের আয়াত ২৫ থেকে ২৮-এ এবং সূরা শো'আরার আলোচ্য ৫৯ আয়াতে এ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। এসব আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, বনী-ইসরাঈলকে বিশেষভাবে

ফেরআউন সম্প্রদায়ের পরিত্যক্ত বাগ-বাগিচা ও বিষয়-সম্পত্তির মালিক করা হয়েছিল। এর জন্যে বনী-ইসরাঈলের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী। কিন্তু এসব আয়াতের ভাষায় এ বিষয়েরও সুস্পষ্ট অবকাশ বিদ্যমান রয়েছে যে, বনী-ইসরাঈলকে ফেরআউন সম্প্রদায়ের অনুরূপ বাগ-বাগিচা ও ধন-ভাণ্ডারের মালিক করা হয়েছিল। এর জন্যে তাদের মিসরে প্রত্যাবর্তন করা জরুরী নয়; বরং অনুরূপ বাগ-বাগিচা শাম দেশেও অর্জিত হতে পারে। সূরা আ'রাফের আয়াত اَتَىٰ بُرْكُؤُنَا শব্দ থেকে বাহ্যতঃ শামদেশকেই বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন পাকের একাধিক আয়াতে بُرْكُؤُنَا ইত্যাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলে শামদেশ সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হযরত কাতাদাহ বলেন যে, বিনা প্রয়োজনে কোরআনের আয়াতের সাথে ইতিহাসের সংঘর্ষ দেখানো দূরন্ত নয়। সারকথা এই যে, যদি ঘটনাবলীর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফেরআউনের ধ্বংসের পর বনী-ইসরাঈল কোন সময়ই সমষ্টিগতভাবে মিসর অধিকার করেনি, তবে হযরত কাতাদাহর তফসীর অনুযায়ী উল্লেখিত সব আয়াতে শামদেশে, তার বাগ-বাগিচা ও অর্থ-ভাণ্ডারের মালিক হওয়া বোঝানো যেতে পারে। واللَّهُ اعلم

قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ قَالِ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

—পশ্চাৎদাবনকারী ফেরআউনী সৈন্যবাহিনী যখন তাদের সামনে এসে যায়, তখন সমগ্র বনী-ইসরাঈল চীৎকার করে উঠল, হায়, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম! আর ধরা পড়ার মধ্যে সন্দেহ ও দেরীই বা কি ছিল, পশ্চাতে অতিবিক্রম সেনাবাহিনী এবং সম্মুখে সমুদ্র অন্তরায়। এই পরিস্থিতি মুসা (আঃ)-এরও অগোচরে ছিল না। কিন্তু তিনি দৃঢ়তার হিমালয় হয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্রাসী ছিলেন। তিনি তখন ও সজোরে বললেন كَلَّا আমরা কিছুতেই ধরা পড়তে পারি না। কারণ এই বললেন যে, اِنِّى مَعِ رَبِّى سَيَهْدِينِ আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন। তিনি আমাদের পথ বলে দেবেন। ঈমানের পরীক্ষা এরূপ স্থলেই হয়ে থাকে। মুসা (আঃ)-এর চোখে-মুখে ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র ছিল না। তিনি যেন উদ্ধারের পথ চোখে দেখে যাচ্ছিলেন। হুবহু এমনি ধরনের ঘটনা হিজরতের সময় সওর গিরিগুহার আত্মগোপনের সময় আমাদের রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর সাথেও ঘটেছিল। পশ্চাৎদাবনকারী শত্রু এই গিরিগুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সামান্য নীচে দৃষ্টিপাত করলেই তিনি তাদের সামনে পড়ে যেতেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) অস্থিরতা প্রকাশ করলে তিনি হুবহু এই উত্তরই দেন اَتَاكَ مَا تَسْتَعِزُّ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। এই ঘটনার মধ্যে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। যে, মুসা (আঃ) বনী-ইসরাঈলকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলেছিলেন اِنِّى مَعِ رَبِّى আমার সাথে আমার পালনকর্তা আছেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) জওয়াবে مَعَنَا বলেছেন। অর্থাৎ আমাদের উভয়ের সাথে আল্লাহ আছেন। এটা উস্মতে মুহাম্মাদীর বৈশিষ্ট্য যে, এ উস্মতের ব্যক্তিগত ও তাদের রসূল খোদায়ী সঙ্গ দ্বারা ভূষিত।

অবধারিত; তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করা অবৈধ ও হারাম। কেননা, আয়াতের অর্থ এই যে, নবী ও মুমিনদের জন্যে মুশরেকদের মাগফেরাতের দোয়া করা দ্রুতহীনরূপে নাজায়েয; যদি তারা নিকটাত্তীয ও হয়, যদিও তাদের জাহান্নামী হওয়া সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

একটি জিজ্ঞাসা ও জওয়াব : وَأَغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفَّارُ

—এ আয়াত থেকে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞার পর হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর মুশরেক পিতার জন্যে কেন মাগফেরাতের দোয়া করলেন? আল্লাহ্ রাব্বুল ইয়ত নিজেই কোরআন মজীদে এ প্রশ্নের জওয়াব দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُولًا خَلِيلٍ

জওয়াবের সারমর্ম এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) পিতার জন্যে তাঁর জীবদ্দশায় ঈমানের তওফীক দানের নিয়তে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করেছিলেন। ঈমানের পর মাগফেরাত নিশ্চিত ছিল। অথবা ইবরাহীম (আঃ)—এর ধারণা ছিল যে, তাঁর পিতা গোপনে ঈমান কবুল করেছে, যদিও তা প্রকাশ করেনি। কিন্তু পরে যখন তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর পিতা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করেছে, তখন তিনি নিজের পূর্ণ নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে দেন।

পিতার কুফর ও শেরক পিতার জীবদ্দশাতেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) জানতে পেরেছিলেন, না তার মৃত্যুর পর, না কেয়ামতের দিন জানবেন, এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ সূরা তওবায় উল্লেখিত হয়েছে।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

কেয়ামতের দিন কোন অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কারো কোন উপকারে আসবে না। একমাত্র সে ব্যক্তি মুক্তি পাবে, যে সুস্থ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর কাছে পৌঁছবে। এই আয়াতের استثناء কে منقطع সাব্যস্ত করে কেউ কেউ তফসীর করেছেন যে, সেদিন কারো অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না, একমাত্র কাজে

আসবে নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ, যাতে শেরক ও কুফর নেই। এই বাক্যের দৃষ্টান্ত হল, যদি কেউ যাদের সম্পর্কে কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, যাদেরকে কাছে অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততিও আছে কি? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যদি এর উত্তরে বলে যে, সুস্থ অন্তঃকরণই তার অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। এর অর্থ এই যে, অর্থ-সম্পদ সন্তান-সন্ততি তো কিছুই নেই, তবে এগুলোর পরিবর্তে তার কাছে তার নিজের সুস্থ অন্তঃকরণ আছে। এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতের সার-বিষয়বস্তু দাঁড়ায় এই যে, সেদিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কোন কাজেই আসবে না, কাজে আসবে শুধু নিজের ঈমান ও সংকর্ম। একেই ‘সুস্থ অন্তঃকরণ’ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদদের মতে প্রসিদ্ধ তফসীর এই যে, আয়াতের استثناء টি متصل এবং অর্থ এই যে, কেয়ামতের দিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন ব্যক্তির কাজে আসবে না সেই ব্যক্তি ছাড়া, যার অন্তঃকরণ সুস্থ অর্থাৎ, সে ঈমানদার। সারকথা এই যে, কেয়ামতেও এসব বস্তু উপকারী হতে পারে; কিন্তু শুধু ঈমানদারের জন্যেই উপকারী হবে - কাফেরের কোন উপকারে আসবে না। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ স্থলে وَالْأَكْبَرُونَ বলা হয়েছে, যার অর্থ পুত্র সন্তান। সাধারণ সন্তান-সন্ততি উল্লেখ না করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, দুনিয়াতেও বিপদের সময় পুত্র সন্তানের কাছ থেকে উপকারের আশা করা যায়। কন্যা-সন্তানদের কাছ থেকে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা দুনিয়াতেও বিরল। তাই কেয়ামতে বিশেষ করে পুত্র-সন্তানদের উপকারী না হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ দুনিয়াতে এদের কাছ থেকে উপকারের আশা হত।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় এই যে, قلب سليم এর শাব্দিক অর্থ সুস্থ অন্তঃকরণ। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, এতে সেই অন্তঃকরণ বোঝানো হয়েছে, যা কলেমায়ে তওহীদে সাক্ষ্য দেয় এবং শেরক থেকে পবিত্র। এই বিষয়বস্তুই মুজাহিদ, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব থেকে ভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন, সুস্থ অন্তঃকরণ একমাত্র মুমিনের হতে পারে। কাফেরের অন্তঃকরণ রূগ্ন হয়ে থাকে; যেমন কোরআন বলে قُلُوبُهُمْ مُرْسُورٌ

وَرَبِّتِ الْجَحْمُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْمَانُكُمْ تَعْتَدُونَ ۖ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَصُرُونَ لَكُمْ أَنْ تَقُولُوا فِيمَا
 هُمْ وَالْعَالُونَ ۚ وَجُنُودٌ لَيْسَ أَجْمَعُونَ ۚ قَالُوا وَهُمْ فِي مَا
 يَخْتَصِمُونَ ۚ قَالَ لَقِيَ صَلَّى مَبِينٌ ۚ اذْهَبُوا بِرَبِّ
 الْمَلِكِينَ ۚ وَمَا أَصْلَكُمْ إِلَّا الْمُسْلِمُونَ ۚ مَا لَكُمْ مِنْ شُفَعِينَ ۚ
 وَكَأَصْدِيقِي خَيْرٌ ۚ فَلَاؤُكُمْ لَمَّا كُنْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ
 لَكَلَّامٌ الْعَرِيزُ الرَّحِيمُ ۚ كَذَبَتْ قَوْمٌ نَبِيًّا إِذَا قَالَ لَهُمْ
 أَخُوهُمْ نُزُورُ الْكَافِرُونَ ۚ إِنِّي لَمُ رَسُولٌ أَمِينٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ
 أَطِيعُوا ۚ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنِّي خَوْفِي الْإِطَاعِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ۚ قَالُوا الْاُؤْمُونَ لَكَ وَابْعَثْ
 الْأَرْكَانَ ۚ قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ إِنَّ حِسَابَهُمْ
 الْأَعْلَى رَبِّي لَوَسْطَعُونَ ۚ وَمَا أَرْكَانُ الْمُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّ آتَا
 الْأَنْدِيَّةَ مُبِينٌ ۚ قَالُوا لَيْنَ كَمْ تَكُنْ نُزُورُ لَتَكُونَنَّ
 مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۚ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ۚ

(৯১) এবং বিপথগামীদের সামনে উদ্ঘোষিত করা হবে জাহান্নাম। (৯২) তাদেরকে বলা হবে : তারা কোথায়, তোমরা যাদের পূজা করতে (৯৩) আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে, অথবা তারা প্রতিশোধ নিতে পারে? (৯৪) অতঃপর তাদেরকে এবং পশ্চট্টদেরকে অসম্মুখি করে নিরুপেক্ষ করে (৯৫) এবং ইবলীস বাহিনীর সকলকে। (৯৬) তারা তথ্য কথ্য কাটাকাটিতে লিপ্ত হয়ে বলবে : (৯৭) আল্লাহর কসম, আমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিলাম, (৯৮) যখন আমরা তোমাদেরকে বিশৃং-পালনকর্তার সমতুল্য গণ্য করতাম। (৯৯) আমাদেরকে দুইকক্ষীরাই মোমরাহ করেছিল। (১০০) অতএব আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই (১০১) এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই। (১০২) হায়, যদি কোনরূপে আমরা পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেতাম, তবে আমরা বিশৃং-পালনকারী হয়ে যেতাম। (১০৩) নিশ্চয়, এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশৃং-পালনকারী। (১০৪) আনবার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১০৫) নূহের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যারোপ করেছে। (১০৬) যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বললেন, “তোমাদের কি ভয় নেই? (১০৭) আমি তোমাদের জন্য বিশৃং-পালনকারী। (১০৮) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১০৯) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না, আমার প্রতিদান তো বিশৃং-পালনকর্তাই দেবেন। (১১০) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।” (১১১) তারা বলল, আমরা কি তোমাকে যেনে নেব যখন তোমার অনুসরণ করছে ইতরজনরা? (১১২) “নূহ বললেন, তারা কি কাজ করছে, তা জানা আমার কি দরকার? (১১৩) তাদের হিসাব নেয়া আমার পালনকর্তারই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে। (১১৪) আমি মুমিনগণকে তড়িয়ে দেয়ার লোক নই। (১১৫) আমি তো শুধু একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।” (১১৬) তারা বলল, “হে নূহ, যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে।” (১১৭) নূহ বললেন, “হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায় তো আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে।

অর্থ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং পারিবারিক সম্পর্ক পরকালে ঈমানের শর্তে উপকারী হতে পারে : আলোচ্য আয়াতের বহুল প্রচলিত তফসীর অনুযায়ী জানা যায় যে, মানুষের অর্থ-সম্পদ কেয়ামতের দিনেও কাজে আসতে পারে, যদি সে মুসলমান হয়। এটা এভাবে যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেছিল কিংবা কোন সদকায় জারিয়া করেছিল, যদি সে ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করে মুমিনদের তালিকাভুক্ত হয়, তবে এ ব্যয়কৃত অর্থ ও সদকায় জারিয়ার সওয়াব হাশরের ময়দানে ও হিসাবের দাঁড়িপাল্লায়ও তার কাজে আসবে। পক্ষান্তরে সে যদি মুসলমান না হয় কিংবা আল্লাহ না করুন মৃত্যুর পূর্বে বৈধমান হয়ে যায়, তবে দুনিয়াতে সম্পাদিত কোন সংকর্ম তার কাজে আসবে না। সন্তান-সন্ততির ব্যাপারেও তাই। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান হলে পরকালেও সে তার সন্তান-সন্ততির উপকার পেতে পারে। এটা এভাবে যে, তার মৃত্যুর পর তার সন্তান-সন্ততি তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করবে অথবা সওয়াব পৌছাবে অথবা সে তার সন্তান-সন্ততিকে সংকর্মপরায়ণরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। এখন তাদের সংকর্মের সওয়াব আপনা-আপনি সেও পেতে থাকবে এবং তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হতে থাকবে। অথবা হাশরের ময়দানে সন্তান-সন্ততি তার জন্যে সুপারিশ করবে। যেমন, কোন কোন হাদীসে সন্তান-সন্ততির সুপারিশ ও তা কবুল হওয়ার বিষয় প্রমাণিত আছে : বিশেষতঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের সুপারিশ। এমনভাবে সন্তান-সন্ততি যদি মুসলমান হয় এবং তাদের সংকর্ম পিতা-মাতার সংকর্মের স্তরে না পৌঁছে, তবে পরকালে আল্লাহ তা’আলা বাপ-দাদার খাতিরে তাদেরকেও বাপ-দাদার উচ্চতম স্তরে পৌছিয়ে দেবেন। কোরআন পাকে বিষয়টি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে —

أَعْتَابَهُمْ وَرَبَّهُمْ ۚ أَرْثَاهُ ۚ أَمَامِي ۚ أَمَامِي ۚ أَمَامِي ۚ أَمَامِي ۚ
 তাদের সন্তান-সন্ততিকেও মিলিত করে দেব। আলোচ্য আয়াতের উল্লেখিত প্রসিদ্ধ তফসীর থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসে যেখানেই কেয়ামতে পারিবারিক সম্পর্ক কাজে না আসার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই উদ্দেশ্য এই যে, যারা মুমিন নয়, তাদের কাজে আসবে না। এমন কি, পয়গম্বরের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীও যদি মুমিন না হয়, তবে তাঁর পয়গম্বুরী দ্বারা কেয়ামতের দিন তাদের কোন উপকার হবে না যেমন, হযরত লুত (আঃ)-এর পুত্র, নূহ (আঃ)-এর স্ত্রী এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার ব্যাপার তাই। কোরআন পাকের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহের মর্মও তাই হতে পারে —

يَوْمَ يَقُودُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُيُوبُ — فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

এবং لَا يَخْرُجُ وَالْإِطَاعِ عَنْ وَلَدِهِ

সংকাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিধান : وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, শিক্ষাদান ও প্রচারকার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দূরস্ত নয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষীগণ একে হারাম বলেছেন। কিন্তু পরবর্তীগণ অপারক অবস্থায় একে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। এর পূর্ণ বিবরণ, لَا تَسْأَلُونَ بِالنِّبِيِّ كَيْفَ كَانَ ۚ আয়াতের অধীনে এসে গেছে।

الشعراء ৩৭

২৫২

وقال الذين ১৭

فَأَقْصَى بَنِي وَيْلَهُمْ تُعَارَفُ وَيَسْأَلُونَ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
 فَأَجْبِئْهُمْ وَنُصْرَتُهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۝ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ
 الْبَاقِينَ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ كَذَّبَتْ عَادُ الْإِمْسَلِينَ ۝ إِذْ
 قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَالَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ۝ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۝ إِنْ
 أَرَأَيْتُمْ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ أَتَنْبُوْنَ بِحُلٍ رَبِيعٍ أَلِیَةٍ تَعْبُونَ ۝ وَ
 تَسْتَكْبِرُونَ مَصَارِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۝ وَإِذْ أَطْشَمْتُمْ بَشْشَمَ
 جَبَّارِينَ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَالَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ۝ وَأَتَّقُوا الَّذِي أَمَّاكُمْ وَمَا
 تَعْمَلُونَ ۝ أَمَّاكُمْ بِأَعْلَامٍ وَأَنْبِيَاءٍ ۝ وَجِئْتُكُمْ وَغِيْبُونَ ۝ إِنِّي
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَعْطَسْتَ
 أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَارِثِينَ ۝ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا
 نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۝ فَلَذِيؤُهُ فَاهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۝
 مَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هَارُونَ ۝

(১১৮) অতএব, আমার ও তাদের মধ্যে কোন ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে ও আমার সংগী মুমিনগণকে রক্ষা করুন।" (১১৯) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীগণকে বোকাই করা নৌকায় রক্ষা করলাম। (১২০) এরপর অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করলাম। (১২১) নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে এবং তাদের অধিকাংশই বিশাসী নয়। (১২২) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১২৩) আদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১২৪) তখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বললেন : 'তোমাদের কি ভয় নেই? (১২৫) আমি তোমাদের বিশুদ্ধ রসূল। (১২৬) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১২৭) আমি তোমাদের কাছে এর জন্য প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো পালনকর্তা দেবেন। (১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অথবা নিদর্শন নির্মাণ করছ? (১২৯) এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে? (১৩০) যখন তোমরা আঘাত হান, তখন জ্বালাম ও নিশ্চুরের মত আঘাত হান। (১৩১) অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৩২) ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে সেসব বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা জান। (১৩৩) তোমাদেরকে দিয়েছেন চতুষ্পদ জন্তু ও পুত্র-সন্তান, (১৩৪) এবং উদ্যান ও বরগা। (১৩৫) আমি তোমাদের জন্যে মহাদিবসের শান্তির আশংকা করি।" (১৩৬) তারা বলল, তুমি উপদেশ দাও অথবা উপদেশ নাই দাও, উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। (১৩৭) এসব কথাবার্তা পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস বৈ নয়। (১৩৮) আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হব না। (১৩৯) অতএব, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে লাগল এবং আমি তাদেরকে নিপাত করে দিলাম। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশাসী নয়। (১৪০) এবং আপনার পালনকর্তা, তিনি তো প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৪১) সামুদ সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৪২) যখন তাদের ভাই সালেহ, তাদেরকে বললেন, "তোমরা কি ভয় কর না ?

জ্ঞাতব্য : এ স্থলে فَاتَّقُوا اللَّهَ وَالَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ আয়াতটি তাকীদের জন্যে এবং একথা ব্যক্ত করার জন্যে আনা হয়েছে যে, রসূলের আনুগত্য ও আল্লাহকে ভয় করার জন্যে কেবল রসূলের বিশুদ্ধতা ও ন্যায়পরায়ণতা অথবা কেবল প্রচারকার্যে প্রতিদান না চাওয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু যে রসূলের মধ্যে সবগুলো গুণই বিদ্যমান আছে, তার আনুগত্য করা ও আল্লাহকে ভয় করা তো আরও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

ভদ্রতা ও নীচতার ভিত্তি কর্ম ও চরিত্র-পরিবার ও জাঁকজমক

নয় : قَالُوا الْاَوَّلُونَ لَكَ وَابَّعَكَ الْاَوَّلُونَ قَالَ وَمَا عَلَيْنَا بِمَا كَانُوا يَمْلِكُونَ — এ আয়াতে প্রথমতঃ মূশরেকদের এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে

যে, তোমার অনুসারী সকলেই নীচ লোক। আমরা সম্প্রদায় ভদ্রজন হয়ে তাদের সাথে কিরূপে একাত্ম হতে পারি? নূহ (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃত হওয়ার এটাই ছিল কারণ। নূহ (আঃ) জওয়াবে বললেন, আমি তাদের কাজকর্মের অবস্থা জানি না। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা পারিবারিক ভদ্রতা অথবা ধন-সম্পদ, সম্মান ও জাঁকজমককে ভদ্রতার ভিত্তি মনে কর, এটা ভুল; বরং সম্মান ও অপমান অথবা ভদ্রতা ও নীচতা প্রকৃতপক্ষে কর্ম ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। তোমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে ইতরজন বলে দেয়াটা তোমাদের মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম ও চরিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। তাই প্রকৃতপক্ষে কে ইতরজন এবং কে ভদ্রজন, আমরা তার ফয়সালা করতে পারি না। — (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

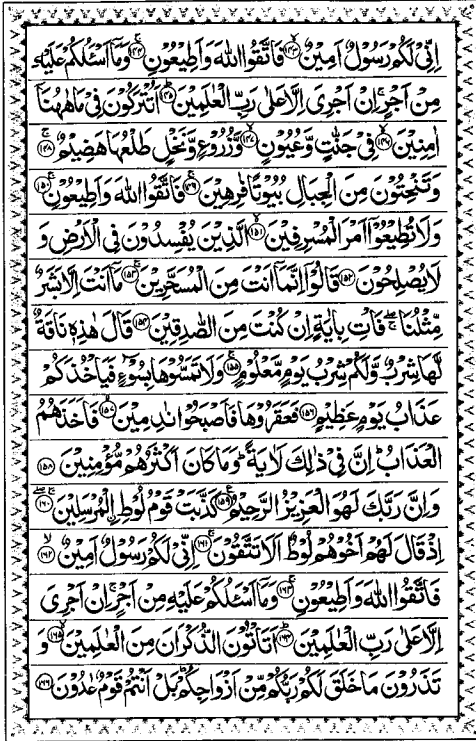
কতিপয় দুর্কহ শব্দের ব্যাখ্যা : أَتَنْبُوْنَ بِحُلٍ رَبِيعٍ أَلِیَةٍ تَعْبُونَ — ইবনে জরীর হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেন যে, رُبْعٌ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথকে বলা হয়। হযরত মুজাহিদ থেকে ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, رُبْعٌ উচ্চস্থানকে বলা হয় এবং এ থেকেই النِّبَاتِ رَبْعِ উদ্ভূত হয়েছে। অর্থাৎ, বৃক্ষীল উদ্ভিদ। رُبْعٌ এর আসল অর্থ নিদর্শন। এস্থলে সুউচ্চ স্মৃতিসৌধ বোঝানো হয়েছে। تَعْبُونَ শব্দটি عِبْت থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অযথা, যাতে কোন প্রকার উপকার নেই। এখানে অর্থ এই যে, তারা অযথা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করত, যার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে শুধু গর্ব করাই উদ্দেশ্য থাকত। مَصَارِعَ শব্দটি مَصْنَع — এর বহুবচন। হযরত কাতাদা বলেন, مَصَارِعَ বলে পানির চৌবাচ্চা বোঝানো হয়েছে; কিন্তু হযরত মুজাহিদ বলেন যে, এখানে সুদৃঢ় প্রাসাদ বোঝানো হয়েছে। لَعَلَّكُمْ ইমাম বোখারী সহীহ বোখারীতে বর্ণনা করেন যে, এখানে لَعَلَّ শব্দটি تشبيه অর্থাৎ, রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে-আব্বাস এর অনুবাদে বলেন كانكم تخلصون — অর্থাৎ, যেন তোমরা চিরকাল থাকবে। — (রুহুল মাআনী)

বিনা প্রয়োজনে অট্টালিকা নির্মাণ করা নিন্দনীয় : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিনা প্রয়োজনে গৃহ নির্মাণ ও অট্টালিকা নির্মাণ করা শরীয়ত মতে দুর্কহীয়। হযরত আনাসের জবাবী ইমাম তিরমিযী বর্ণিত এই হাদীসের অর্থও তাই— অর্থাৎ, প্রয়োজনাতিরিক্ত দালান-কোঠার

الشعراء

২৫২

وقال الذين



(১৪৩) আমি তোমাদের বিশৃঙ্খল পয়গম্বর। (১৪৪) অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৪৫) আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন। (১৪৬) তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেয়া হবে? (১৪৭) উদ্যানসমূহের মধ্যে এবং বরগাসমূহের মধ্যে? (১৪৮) শস্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে? (১৪৯) তোমরা পাহাড় কেটে জাঁকজমকের গৃহ নির্মাণ করছ। (১৫০) সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৫১) এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের আদেশ মান্য কর না; (১৫২) যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শাস্তি স্থাপন করে না। (১৫৩) “তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রন্থদের একজন। (১৫৪) তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ বৈ নও। সুতরাং যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর।” (১৫৫) সালেহ বললেন, “এই উষ্ট্রী, এর জন্যে আছে পানি পানের পাল্লা এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পাল্লা— নিদীষ্ট এক-এক দিনের। (১৫৬) তোমরা একে কোন কষ্ট দিও না। তাহলে তোমাদেরকে মহাদিবসের আযাব পাকড়াও করবে। (১৫৭) তারা তাকে বধ করল। ফলে, তারা অনুতপ্ত হয়ে গেল। (১৫৮) এরপর আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল। নিশ্চয় এতে নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (১৫৯) আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৬০) নূতের সম্প্রদায় পয়গম্বরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৬১) যখন তাদের ভাই লুত তাদেরকে বললেন, “তোমরা কি ভয় কর না? (১৬২) আমি তোমাদের বিশৃঙ্খল পয়গম্বর। (১৬৩) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৬৪) আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তা দেবেন। (১৬৫) সারা জাহানের মানুষের মধ্যে তোমরাই কি পুরুষদের সাথে কুক্ষর কর? (১৬৬) এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে বর্জন কর? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।”

মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। হয়রত আনাসের অপর একটি রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় — অর্থাৎ, প্রত্যেক দালান-কোঠা তার মালিকের জন্যে বিপদ, কিন্তু যে দালান-কোঠা জরুরী তা বিপদ নয়। রাসূল মা’আনীতে বলা হয়েছে, বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ব্যতীত সুউচ্চ দালান নির্মাণ করা মুহাম্মদী শরীয়তেও নিষিদ্ধ ও দূষণীয়।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَتُخْرَجُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِبُيُوتٍ مُّزَيَّنَاتٍ

হয়রত ইবনে আব্বাস থেকে
এর তফসীরে বলা হয়েছে অহংকারী। আবু সালেহ ও ইমাম রাগেবের মতে تُخْرَجُونَ এর তফসীর হাডীস অর্থাৎ, নিপুণ। অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে এমন কারিগরি শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা সহজেই পাহাড়কে গৃহে রূপান্তরিত করতে পার। সারকথা এই যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

উপকারী পেশা আল্লাহর নেয়ামত, যদি তাকে মন্দ কাজে ব্যবহার করা না হয় : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, উৎকৃষ্ট পেশা আল্লাহ তাআলার নেয়ামত এবং তদ্বারা উপকার লাভ করা জায়েয। কিন্তু তা দূরা যদি গোনাহ, হারাম কার্য অথবা বিনা প্রয়োজনে তাতে মগ্ন থাকা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে সেই পেশা অবলম্বন না-জায়েয; যেমন পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে বিনা প্রয়োজনে দালানের উচ্চতার নিন্দা করা হয়েছে।

وَتَذَرُونَ مَأْخَلَكُمْ

অস্বাভাবিক কর্ম স্ত্রীর সাথেও হারাম :
وَتَذَرُونَ مَأْخَلَكُمْ আয়াতের من অব্যয়টি বর্ণনাবোধক হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের যৌন অভিলাষ পূরণের জন্যে আল্লাহ তাআলা স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা তাদেরকে ছেড়ে সমজাত পুরুষদেরকে যৌন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যবস্তুরে পরিণত করছ। এটা হীনমন্যতার পরিচায়ক। من অব্যয়টি এখানে تبعيض এর জন্যেও হতে পারে। এমতাবস্থায় ইঙ্গিত হবে যে, তোমাদের স্ত্রীদের যে স্থান তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যা স্বাভাবিক, সেই স্থান ছেড়ে স্ত্রীদের সাথে এমন অস্বাভাবিক কাজ তোমরা কর, যা নিশ্চিতই হারাম। এই দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে এ বিষয়ও প্রমাণিত হয় যে, নিজ স্ত্রীর সাথে অস্বাভাবিক কর্ম করা হারাম। হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ ব্যক্তির প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ (রাসূল মাআনী)

الشعيرة ২২

২৮৫

وقال الذين ١٩

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ এখানে عَجُوزٌ বলে লুত (আঃ)-এর স্ত্রীকে বোঝানো হয়েছে। সে কওমে লুতের এই কুকর্মে সম্মত ছিল এবং কাফের ছিল।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ النَّازِرِينَ এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সমকামীকে প্রাচীর চাপা দিয়ে অথবা উচ্চ স্থান থেকে নীচে নিক্ষেপ করে শাস্তি দেয়া জায়েয। হানাকী আলেমদের মাযহাব তাই। কেননা, লুত সম্প্রদায়কে এমনভাবে নিপাত করা হয়েছিল। তাদের জনপদকে উপরে তুলে উল্টা করে মাটিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। — (শামীঃ কিতাবুল হুদূদ)

وَرُؤُوسَ الْبَاقِطَاتِ الْمُسْتَوِيَةِ কারো কারো মতে قسط গ্রীক শব্দ, যার অর্থ ন্যায্য ও সুবিচার। কেউ কেউ একে আরবী শব্দ قسط থেকে উদ্ধৃত বলেছেন।

এর অর্থও সুবিচার। উদ্দেশ্য এই যে, দাঁড়িপাল্লা এবং এমন ধরনের মাপ ও ওজনের অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে সোজা ও সরলভাবে ব্যবহার কর, যাতে কম হওয়ার আশংকা না থাকে।

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ অর্থাৎ, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না। উদ্দেশ্য এই যে, চুক্তি অনুযায়ী যার যতটুকু প্রাপ্য, তাকে তার চাইতে কম দেয়া হারাম; তা কোন মাপ ও ওজনের বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু। এ থেকে জানা গেল যে, কোন শ্রমিক-কর্মচারী নির্ধারিত সময় চুরি করলে এবং কম সময় ব্যয় করলে তাও এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম মালেক মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ফারাক (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে আসরের নামাযে শরীক না হতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে কিছু অজ্ঞাহত পেশ করল। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, فَتَفْتِ اَرْثَاً, তুমি ওজনে কম করেছ। যেহেতু নামায ওজনের বস্তু নয়, وَفَاءٌ وَتَطْنِيفٌ তাই এই হাদীস উদ্ধৃত করার পর ইমাম মালেক বলেন, وَفَاءٌ وَتَطْنِيفٌ অর্থাৎ, প্রাপ্য অনুযায়ী করা অথবা কম করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হতে পারে। শুধু মাপ ও ওজনের সাথেই এই বিধান সংশ্লিষ্ট নয়; বরং কারো হক কম দেয়া, তা যেভাবেই হোক না কেন — হারাম। وَيَنْلِمْطَقِينَ আয়াতে একথা বর্ণিত হয়েছে।

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الظَّلَاةِ এই আয়াতের ঘটনা এই যে, আল্লাহ তাআলা এই সম্প্রদায়ের উপর তীব্র গরম চাপিয়ে দেন। ফলে তারা গৃহের ভেতরে ও বাইরে কোথাও শান্তি পেত না। এরপর তিনি তাদের নিকটবর্তী এক মাঠের উপর গাঢ় কাল মেঘ ধারণ করেন। এই মেঘের নীচে সুশীতল বায়ু ছিল। গরমে অস্থির সম্প্রদায় দৌড়ে দৌড়ে এই মেঘের নীচে জমায়েত হয়ে গেল, তখন মেঘমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে অগ্নি বর্ষণ শুরু করল। ফলে সবাই ছাই-ভস্ম হয়ে গেল। — (রুহুল মা'আনী)

قَالُوا إِن لَّمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ۖ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ۖ رَبِّ نَجِّنِي وَأَقِلِّ مَعَايِمُنَ ۖ فَتَجَنَّبَهُ وَآهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ۖ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ۖ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ النَّازِرِينَ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۖ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۖ إِنِّي كُنتُ رَسُولَ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۖ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِن أَعْرِضَ إِلَّا عَنِّي رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ أَذُوقُوا الْكَفَالَ ۖ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَتُؤَدُّونَ إِلَى الْفِطْرَيْنِ ۖ أَلَمْ تَكُونُوا مِن قَبْلِكُمْ أَسْيَافًا لَهُمْ وَأَنْعَامًا ۖ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ ۖ فَتَقَسَّدُوا مِن تَحْتِهَا ۖ وَأَلْقَوْا إِلَى الْوَيْلَةِ الْأُولَى ۖ إِنَّ ظَنَّاكُم لَكُنَ الْكَذِبِينَ ۖ فَاسْقِطْ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ ۖ إِنَّ كَذِبَكُمْ مِنَ الْغَايِبِ ۖ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعْلَمُ بِمَا لَعُنُونَ ۖ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَاةِ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۖ

(১৬৭) তারা বলল, “হে লুত, তুমি যদি বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাকে বহিস্কৃত করা হবে।” (১৬৮) লুত বললেন, “আমি তোমাদের এই কাজকে ঘৃণা করি। (১৬৯) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে, তা থেকে রক্ষা কর।” (১৭০) অতঃপর আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করলাম। (১৭১) এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। (১৭২) এরপর অন্যদেরকে নিপাত করলাম। (১৭৩) তাদের উপর এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করলাম। ভীতি-প্রদর্শিতদের জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকট। (১৭৪) নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্রাসী নয়। (১৭৫) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৭৬) বনের অধিবাসীরা পয়গমুরগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। (১৭৭) যখন তাদের বস্তু কম দিও না এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে ফিরো না। (১৭৮) ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোক-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন। (১৭৯) তারা বলল, তুমি তো জাদুগুস্তদের অন্যতম। (১৮০) তুমি আমাদের মত মানুষ বৈ তো নাও। আমাদের ধারণা-তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। (১৮১) অতঃপর, যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের কোন টুকরো আমাদের উপর ফেলে দাও। (১৮২) শোঁ আয়ব বললেন, তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমার পালনকর্তা ভালরূপে অবহিত। (১৮৩) অতঃপর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে দিল। ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করল। নিশ্চয় সেটা ছিল এক মহাদিবসের আযাব।

إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ
 لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۚ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ تَزِيلُ بِهِ
 الرُّسُلَ الْهَادِينَ ۖ عَلَى قَلْبِكَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۖ يٰطٰسِرٰنِ
 عَرَبِيَّيْنِ ۖ وَإِنَّهُ لَكُنْزٌ اَلْاَزْكَيْنِ ۖ وَكَوْنُكُمَا اَيُّهُ اَنْ
 يَّعْلَمَهُ عُلَمٰوُ اٰبِئِى اِسْرٰءِئِيلَ ۖ وَكُوْنُكُمَا عَلَى بَعْضِ اَلْاَحْجٰثِ ۖ
 فَفَرَّقَا عَلَيْهِمَا مَا كَانُوْا بِهِ مُؤْمِنِيْنَ ۚ كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ
 الْمُجْرِمِيْنَ ۖ لَذٰلِكَ يَكُونُوْنَ بِهِ حٰثِي ۚ وَرَوَّ اَلْعَدٰلَ اِلَ الْاَكْمٰمِ ۖ وَبَيَّنَّ
 بَيِّنَتَهُ ۚ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۖ يَتَّقُوْا اٰهْلَ عَنِّ مُنْظَرُوْنَ ۖ ۝
 اَقْبِعَا اِيْمًا يَسْتَعْجِلُوْنَ ۖ اَلْوَعِيْتُ اِنْ مَتَّعْتُمُ سِنِيْنَ ۖ ثُمَّ
 جَاءَهُمْ مَا كَانُوْا يُوعَدُوْنَ ۖ مَا كُنْزُهُمْ مَّا كَانُوْا يُمْتَعُوْنَ ۖ
 وَمَا هَلَكْنَا مِنْ قَرِيْبٍ اِلَّا هَلَاكُنْمُزُوْنَ ۖ وَذِكْرِيْ ۚ وَمَا كُنَّا
 ظٰلِمِيْنَ ۖ وَمَا تَزَلْنَا بِهٖ الشَّيْطٰنِ ۖ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا
 يَسْتَطِيعُوْنَ ۖ لَآهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعٌ وَّلَوْنٌ ۖ فَلَا تَدْعُ مَعَ
 اٰلِهٰهَا اٰخَرَفَتُوْنَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ ۖ وَانْذَرْتَشِيْرَتَكَ
 الْاَقْرَبِيْنَ ۖ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۖ

(১৯০) নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না। (১৯১) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রবল পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (১৯২) এই কোরআন তো বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ। (১৯৩) বিশুদ্ধ ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছে (১৯৪) আপনার অন্তরে, যাতে আপনি তীতি-প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন, (১৯৫) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১৯৬) নিশ্চয় এর উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। (১৯৭) তাদের জন্যে এটা কি নিদর্শন নয় যে, বনী-ইসরাঈলের আলেকগণ এটা অবগত আছে? (১৯৮) যদি আমি একে কোন ভিন্ন ভাষায় প্রতি অবতীর্ণ করতাম, (১৯৯) অতঃপর তিনি তা তাদের কাছে পাঠ করতেন, তবে তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না। (২০০) এমনভাবে আমি গোনাহ্গারদের অন্তরে অবিশ্বাস সঞ্চার করেছি। (২০১) তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে না, যে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ না করে মর্মস্তদ আঘাত; (২০২) অতঃপর তা আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে পড়বে, তারা তা বুঝতেও পারবে না। (২০৩) তখন তারা বলবে, আমরা কি অবকাশ পাব না? (২০৪) তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত কামনা করে? (২০৫) আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই, (২০৬) অতঃপর যে বিষয়ে তাদেরকে গয়াদা দেয়া হত, তা তাদের কাছে এসে পড়ে, (২০৭) তখন তাদের ভোগ-বিলাস তা তাদের কি উপকারে আসবে? (২০৮) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি; কিন্তু এমতাবস্থায় যে, তার সতর্ককারী ছিল। (২০৯) স্মরণ করানোর জন্যে, এবং আমার কাক্স অন্যায়াচরণ নয়। (২১০) এই কোরআন শয়তানরা অবতীর্ণ করেনি। (২১১) তারা এ কাজের উপযুক্ত নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। (২১২) তাদেরকে তো শ্রবণের জায়গা থেকে দূরে রাখা রয়েছে। (২১৩) অতএব, আপনি আল্লাহর সাথে অন্য উপাসাকে আহ্বান করবেন না। করলে শাস্তিতে পতিত হবেন। (২১৪) আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন। (২১৫) এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হোন।

শব্দ ও অর্থসম্ভারের সমষ্টির নাম কোরআন : **يٰسٰرٍ عَرَبِيّ** আয়াত থেকে জানা গেল যে, আরবী ভাষায় লিখিত কোরআনই কোরআন। অন্য যে কোন ভাষায় কোরআনের কোন বিষয়বস্তুর অনুবাদকে কোরআন বলা হবে না।

وَإِنَّهُ لَكُنْزٌ اَلْاَزْكَيْنِ থেকে বাহ্যতঃ এর বিপরীতে একথা জানা যায় যে, কোরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোন ভাষায় থাকলে তাও কোরআন। কেননা, **زُيِّرَ** এর সর্বনামটি বাহ্যতঃ কোরআনকে বোঝায়। **زُيِّرَ** শব্দটি **زُيِّرَ** এর বহুবচন। এর অর্থ কিতাব। আয়াতের অর্থ এই যে, কোরআন পাক পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। বলাবাহুল্য, তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাব আরবী ভাষায় ছিল না। কেবল কোরআনের অর্থসম্ভার সেসব কিতাবে উল্লেখিত আছে বলেই আয়াতে বলা হয়েছে যে, কোরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও আছে। অধিকাংশ উম্মতের বিশ্বাস এই যে, কোন সময় শুধু কোরআনের বিষয়বস্তুর ব্যাপক অর্থে কোরআন বলে দেয়া হয়। কারণ, কোন কিতাবের বিষয়বস্তুই আসল উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে কোরআন উল্লেখিত হওয়ার অর্থও এই যে, কোরআনের কোন কোন বিষয়বস্তু সেগুলোতেও বিবৃত হয়েছে। অনেক হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুত্তাদরাক হাকমে বর্ণিত হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমাকে সূরা বাক্বুরা 'প্রথম আলোচনা' থেকে দেয়া হয়েছে, সূরা তোয়াহা ও যেসব সূরা **طٰسِرٰ** দ্বারা শুরু হয় এবং যেসব সূরা **حٰم** দ্বারা শুরু হয়, সেগুলো মুসা (আঃ)-এর ফলক থেকে দেয়া হয়েছে। এছাড়া সূরা ফাতেহা আরশের নীচ থেকে প্রদত্ত হয়েছে। তাবারানী, হাকেম, বায়হাকী প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন যে, সূরা মূলক তওরাতে বিদ্যমান আছে এবং সূরা সাব্বিহিস্মা সম্পর্কে তো স্বয়ং কোরআন বলে যে,

إِنَّ هٰذَا اِلٰهِي الشُّعْبِ اَلْاَوَّلِ صُغُوْبِ اِبْرٰهِيْمَ وَنُوْنِ অর্থাৎ, এই সূরার বিষয়বস্তু হযরত ইবরাহীম ও মুসা (আঃ)-এর সহীফাসমূহেও আছে। সব আয়াত ও রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, কোরআনের অনেক বিষয়বস্তু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও বিদ্যমান ছিল। এতে এটা জরুরী নয় যে, এসব বিষয়বস্তুর কারণে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের যে অংশে এসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তাকে কোরআন বলতে হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ এর প্রবক্তা নয়; বরং অধিকাংশের বিশ্বাস এই যে, কোরআন যেমন শুধু শব্দের নাম নয়, তেমনি শুধু অর্থসম্ভারের নামও নয়। যদি কেউ কোরআনেরই বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন জায়গা থেকে চয়ন করে নিম্নরূপ বাক্য গঠন করে, **الحمد لله العزيز الرحيم الذي له ملك السماوات وهو رب العالمين خالتي المستعان** তবে একে কেউ কোরআন বলতে পারবে না।

এমনিভাবে শুধু কোরআনের অর্থসম্ভার অন্য কোন ভাষায় বিধৃত হলে তাকেও কোরআন বলা যায় না।

নামাযে কোরআনের অনুবাদ পাঠ করা সর্বসম্মতক্রমে অবৈধ : এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায় এ বিষয়ে একমত যে, নামাযে করণ তেলাওয়াতের স্থলে কোরআনের শব্দাবলীর অনুবাদ ফারসী, উর্দু, ইংরেজী ইত্যাদি কোন ভাষায় পাঠ করা অপারক অবস্থা ছাড়া যথেষ্ট নয়। কোন

কোন ইমাম থেকে এ সম্পর্কে ভিন্ন উক্তিও বর্ণিত রয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে সেই উক্তির প্রত্যাহারও প্রমাণিত রয়েছে।

কোরআনের বাংলা অনুবাদকে বাংলা কোরআন বলা জায়েয নয় : এমনভাবে আরবীর মূল বাক্যাবলী ছাড়া শুধু কোরআনের অনুবাদ কোন ভাষায় লেখা হলে তাকে সেই ভাষার কোরআন বলা জায়েয নয়; যেমন আজকাল অনেকেই শুধু বাংলা অনুবাদকে ‘বাংলা কোরআন’ ইংরেজী অনুবাদকে ‘ইংরেজী কোরআন’ বলে থাকে। এটা না-জায়েয ও ধৃষ্টতা। মূল বাক্যাবলী ছাড়া কোরআনকে অন্য কোন ভাষার ‘কোরআন’ নামে প্রকাশ করা এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করা না-জায়েয।

أَكْرَمَ بَيْنَنَا مَنَعَهُمُ رَيْسِينَ এ আয়াতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়াতে দীর্ঘ জীবন লাভ করাও আল্লাহ্ তাআলার একটি নেয়ামত। কিন্তু যারা এই নেয়ামতের নাশাকরী করে, বিশ্রাস স্থাপন করে না, তাদের দীর্ঘ জীবনের নিরাপত্তা ও অবকাশ কোন কাজে আসবে না। ইমাম যুহরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয প্রতিদিন সকালে তাঁর শাশু ধরে নিজেকে সম্বোধন করে এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন أَكْرَمَ بَيْنَنَا مَنَعَهُمُ এরপর আরোহে কাঁদত থাকতেন।

وَأَنْزَلَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنْزَلَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ - শব্দের অর্থ পরিবারবর্গ। বিশেষণ যুক্ত করে তাদের মধ্যেও নিকটতমদেরকে বোঝানো হয়েছে। এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, সমগ্র উম্মতের কাছে রেসালত প্রচার করা ও তাদেরকে সতর্ক করা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ফরয ছিল। আয়াতে বিশেষভাবে পরিবারের লোকদেরকে সতর্ক করার আদেশ দানের রহস্য কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, এতে তবলীগ ও দাওয়াতকে সহজ ও কার্যকর করার এমন একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। পদ্ধতিটি এই যে, পরিবারের সদস্যবর্গ অন্যদের তুলনায় নিকটবর্তী। কাজেই প্রত্যেক ভাল ও কল্যাণকর কাজে তারা অন্যদের চাইতে অগ্রণী থাকার অধিকার রাখে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত পরিচয়ের কারণে তাদের মধ্যে কোন মিথ্যা দাবীদার সুবিধা

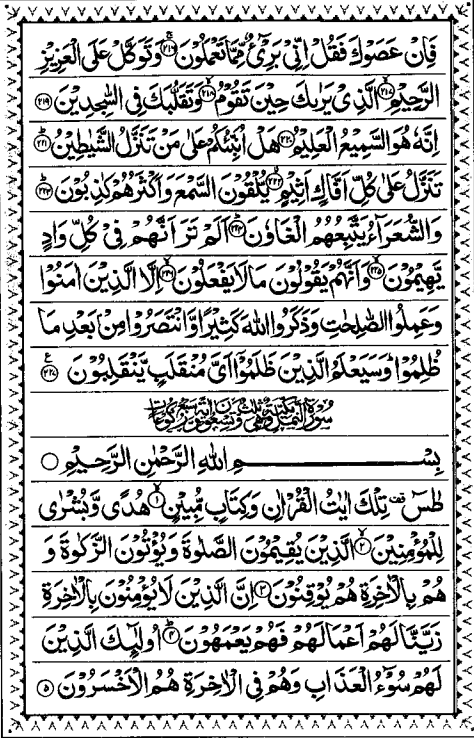
করতে পারে না। যার সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব পরিবারের লোকদের মধ্যে সুবিদিত, তার সত্য দাওয়াত কবুল করা তাদের জন্যে সহজও। নিকটতম আত্মীয়রা যখন কোন আন্দোলনের সমর্থক হয়ে যায়, তখন তাদের সহমর্মিতা এবং সাহায্যও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। লোকেরা দলগত দিক দিয়েও তার সমর্থন করতে বাধ্য হয়। যখন সত্য ও সত্যতার ভিত্তিতে নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের একটি পরিবেশ তৈরী হয়ে যায়, তখন প্রাত্যহিক জীবনে প্রত্যেকের পক্ষে ধর্মের নির্দেশাবলী পালন করা সহজ হয়ে যায় এবং তাদেরকে নিয়ে একটি ক্ষুদ্র শক্তি তৈরী হয়ে অপরাপর লোকদের কাছে দাওয়াত পৌছানোর কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

فَوَافِقُكُمْ وَأَقْرَبُكُمْ نَارًا অর্থাৎ, নিজেকে এবং নিজের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। এতে পরিবারবর্গকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের স্কন্ধে অর্পণ করা হয়েছে। এটা কর্ম ও চরিত্র সংশোধনের সহজ-সরল উপায়। চিন্তা করলে দেখা যায়, যে পর্যন্ত পরিবেশ অনুকূল না হয়, সেই পর্যন্ত কোন মানুষের পক্ষে নিজে সংকর্ম ও সচ্চরিত্রতার অনুসারী হওয়া এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা স্বভাবগতভাবে সম্ভবপর হয় না। সমস্ত গৃহ যদি একজন পক্ষ পূর্ণরূপে নামায পালন করতে চায়, তবে পাকা নামাযীর পক্ষেও যথামত হক আদায় করা সুকঠিন হবে। আজকাল হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এর কারণ এই নয় যে, বাস্তবে তা পরিত্যাগ করা কঠিন কাজ; বরং কারণ এই যে, সমগ্র পরিবেশ ও সমগ্র জ্ঞাতি-গোষ্ঠী যে ক্ষেত্রে গোনাহে লিপ্ত, সেখানে একা এক ব্যক্তির পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে সত্যের এই পয়গাম শুনিতে দেন। তখন তারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকৃত হলেও আস্তে আস্তে পরিবারের লোকদের মধ্যে ইসলাম ও ইমান প্রবেশ লাভ করতে শুরু করে। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পিতৃব্য হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম অনেকটা শক্তি সঞ্চার করে।

النمل ২৫

২৫৫

وقال الذين



(২১৬) যদি তারা আপনার অব্যাহতা করে, তবে বলে দিন, তোমরা যা কর, তা থেকে আমি মুক্ত। (২১৭) আপনি ভরসা করুন পরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর, (২১৮) যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি নামাযে দণ্ডায়মান হন, (২১৯) এবং নামাযীদের সাথে উঠাবসা করেন। (২২০) নিশ্চয় তিনি সর্বশোভা, সর্বজ্ঞানী। (২২১) আমি আপনাকে বলব কি কার নিকট শয়তানরা অবতরণ করে? (২২২) তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, গোনাহকারের উপর। (২২৩) তারা শ্রুত কথা এনে দেয় এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (২২৪) বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। (২২৫) তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদবাস্ত হয়ে ফিরে? (২২৬) এবং এমন কথা বলে, যা তারা করে না। (২২৭) তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকল্প করে এবং আল্লাহকে খুব স্মরণ করে এবং নিষিদ্ধিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিষিদ্ধনকারীরা সীতাই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কিরূপ?

সূরা-নমল

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত ৯৩

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) জ্ঞা-সীন : এগুলো আল-কোরআনের আয়াত এবং আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের। (২) মুমিনদের জন্যে পথনির্দেশ ও সুসংবাদ। (৩) যারা নামায কায়ম করে, যাকাত প্রদান করে এবং পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে। (৪) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকাণ্ডকে সুশোভিত করে দিয়েছি। অতএব, তারা উদবাস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (৫) তাদের জন্যেই রয়েছে মন্দ শাস্তি এবং তাইই পরকালে অধিকক্ষতিগ্রস্ত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কবিতার সংজ্ঞা : وَالشُّعْرُ أَوَّلُ نَبِيهِمُ الْغَاوُونَ অভিধানে এমন

বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়, যাতে শুধু কাল্পনিক ও অবাস্তব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়। এর জন্যে ছন্দ, ওজন এবং সমিল শব্দ ইত্যাদিও শর্ত নয়। তর্কশাস্ত্রেও এ ধরনের বিষয়বস্তুকে ‘কবিতাধর্মী প্রমাণ’ এবং কবিতা-দাবীযুক্ত বাক্য বলা হয়। পারিভাষিক কবিতা ও গজলেও সাধারণতঃ কাল্পনিক বিষয়াদিরই প্রাধান্য থাকে। তাই কবিদের ভাষায় ছন্দযুক্ত সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে কবিতা বলা হয়ে থাকে। কোন শاعرٌ شاعرٌ كُتِبَ بِهِ — لِشَاعِرٍ كُتِبَ ইত্যাদি আয়াতে পারিভাষিক কবিতার অর্থ ধরে বলেছেন যে,

মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে ওজনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দবিশিষ্ট বাক্যাবলী নিয়ে আগমনকারী বলত। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, কাফেরদের উদ্দেশ্য এটা ছিল না। কারণ, তারা কবিতার রীতি-নীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত ছিল। বলাবাহুল্য, কোরআন কবিতাবলীর সমষ্টি নয়।

একজন অনারব ব্যক্তিও এরূপ কথা বলতে পারে না। প্রাজ্ঞল ও বিশুদ্ধভাষী আরবরা বলা দূরের কথা; বরং কাফেররা তাঁকে আসল ও আভিধানিক অর্থে কবি অর্থাৎ, কাল্পনিক বিষয়াদি নিয়ে আগমনকারী বলত। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে (নাউমুল্লাহ) মিথ্যাবাদী বলা। কারণ, شعر (কবিতা) মিথ্যার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং كَذِبٌ তথা মিথ্যাবাদীকে شاعرٌ বলা হয়। তাই প্রমাণাদিকে কবিতাধর্মী প্রমাণাদি বলা হয়ে থাকে। মোটকথা এই যে, ছন্দযুক্ত ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীকে যেমন কবিতা বলা হয়, তেমনি ধারণাপ্রসূত আনুমানিক বাক্যাবলীকেও কবিতা বলা হয়। এটা তর্কশাস্ত্রের পরিভাষা।

وَالشُّعْرُ أَوَّلُ نَبِيهِمُ الْغَاوُونَ আলোচ্য আয়াতে কবিতার পারিভাষিক

ও প্রসিদ্ধ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, যারা ওজনবিশিষ্ট ও সমিল শব্দযুক্ত বাক্যাবলীর রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। ফতহুল-বারীরা এক রেওয়াজেই থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়াজেই এই যে, এই আয়াত নাযিল হবার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান ইবনে সাবেত, কা’ব ইবনে মালেক প্রমুখ সাহাবী কবি ত্রন্দনরত অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন। আমরাও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কি উপায়? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আয়াতের শেষাংশে পাঠ কর। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমাদের কবিতা যেন অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লেখিত ব্যতিক্রমীদের শামিল। এর পরিশ্রেষ্ঠিতে তফসীরকারগণ বলেছেন, আয়াতের প্রথমাংশে মুশরেক কবিদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, পথভ্রষ্ট লোক, অব্যাহা শয়তান ও উদ্ধত জিন তাদেরই কবিতার অনুসরণ করত এবং তা বর্ণনা করত। — (ফতহুল-বারী)।

ইসলামী শরীয়তে কাব্যচর্চার মান : উল্লেখিত আয়াতের প্রথমাংশ থেকে কাব্যচর্চার কঠোর নিন্দা এবং তা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় হওয়া বোঝা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাব্যচর্চা সর্বাবস্থায় মন্দ নয়; বরং যে কবিতায় আল্লাহ

তাআলার অবাধ্যতা করা হয় কিংবা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোন ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয় অথবা যে কবিতা অশ্লীল ও অশ্লীলতার প্রেরণাদাতা, সেই কবিতাই নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা গোনাহ ও অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে পবিত্র সেগুলোকে আল্লাহ তাআলা **الْأَلْوَيْنَ مَتَوَّعِيْلُو**

الشُّطْرِي আয়াতের মাধ্যমে ব্যতিক্রমভূক্ত করে দিয়েছেন। কোন কোন কবিতা তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু এবং ওয়াজ ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ার কারণে এবাদত ও সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত। হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে আছে, **ان من الشعر لحكمة** অর্থাৎ, কতক কবিতা জ্ঞানগর্ভ হয়ে থাকে।—(বোখারী) হাফেয ইবনে হাজার বলেন, এই রেওয়ায়েতে ‘হেকমত’ বলে সত্যভাষণ বোঝানো হয়েছে। ইবনে বাত্তাল বলেন, যে কবিতায় আল্লাহ তা'আলার একত্ব, তাঁর যিকর এবং ইসলামের প্রতি ভালবাসা বর্ণিত হয়, সেই কবিতা কামা ও প্রশংসনীয়। উপরোক্ত হাদীসে এরূপ কবিতাই বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে যে কবিতায় মিথ্যা ও অশ্লীল বর্ণনা থাকে, তা নিন্দনীয়। এর আরও সমর্থন নিম্নবর্ণিত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে পাওয়া যায়। (১) ওমর ইবনে শারীদ তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ) আমার মুখ থেকে উমাইয়া ইবনে আবু সলভের একশ' লাইন পর্যন্ত কবিতা শ্রবণ করেন। (২) মুতারিক বলেন, আমি কুফা থেকে বসরা পর্যন্ত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ)—এর সাথে সফর করেছি। প্রতি মনযিলেই তিনি কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। (৩) তাবারী প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ী সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা কবিতা রচনা করতেন, শুনতেন এবং শোনাতেন। (৪) ইমাম বোখারী বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) কবিতা বলতেন। (৫) আবু ইয়লা ইবনে ওমর থেকে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, কবিতার বিষয়বস্তু উত্তম ও উপকারী হলে কবিতা ভাল এবং বিষয়বস্তু মন্দ ও গোনাহের হলে কবিতা মন্দ।—(ফতহুল বারী)

তফসীরে কুরতুবীতে আছে, মদীনা মুনাওয়ারার দশ জন জ্ঞানে-গরিমায় সেরা ফেকাহবিশারদের মধ্যে ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ প্রসিদ্ধ সজ্জনশীল কবি ছিলেন। কাবী যুবায়র ইবনে বাক্বারের কবিতাসমূহ একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে সংরক্ষিত ছিল। কুরতুবী আবু আমরের উক্তি বর্ণনা করেন যে, উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু সম্বলিত কবিতাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কেউ মন্দ বলতে পারেন না। কেননা, ধর্মীয় ব্যাপারে অনুসৃত প্রধান সাহাবিগণের মধ্যে কেউ এমন ছিলেন না, যিনি কবিতা রচনা করেননি অথবা অপরের কবিতা আবৃত্তি করেননি কিংবা শোনেননি ও পছন্দ করেননি।

যেসব রেওয়ায়েতে কাব্যচর্চার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর স্মরণ, এবাদত ও কোরআন থেকে গাফেল হয়ে কাব্যচর্চায় নিমগ্ন হওয়া নিন্দনীয়। ইমাম বোখারী একে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে হযরত আবু হোরাযরার এই রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন :

لان يتلى جوف رجل قبحا يراه خير من ان يتلى شعرا

অর্থাৎ, পুঞ্জ দ্বারা পেট ভর্তি করা কবিতা দ্বারা ভর্তি করার চাইতে উত্তম। ইমাম বোখারী বলেন, আমার মতে এর অর্থ এই যে, কবিতা আল্লাহর স্মরণ, কোরআন ও জ্ঞানচর্চার উপর প্রবল হয়ে গেলে তা মন্দ এবং পরাভূত থাকলে মন্দ নয়। এমনভাবে যেসব কবিতা অশ্লীল বিষয়বস্তু, অপরের প্রতি ভরসনা, বিদ্রূপ অথবা অন্য কোন শরীয়ত-বিরোধী বিষয়বস্তু সম্বলিত হয়, সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে হারাম ও না-জায়েয। এটা শুধু কবিতার বেলায়ই নয়, গদ্যে এমন ধরনের বিষয়বস্তু বিবৃত হলে তাও হারাম।—(কুরতুবী)

খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) প্রশাসক আদী ইবনে নযলাকে অশ্লীল কবিতা বলার অপরাধে পদচ্যুত করে দেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রাঃ) আমার ইবনে রবীয়া ও আবুল আহওয়াসকে এই একই অপরাধে দেশান্তরিত করার আদেশ দেন। অতঃপর আমার ইবনে রবীয়া তওবা করলে তা গ্রহণ করা হয়।!—(কুরতুবী)

যে জ্ঞান ও শাস্ত্র আল্লাহ ও পরকাল থেকে মানুষকে গাফেল করে দেয়, তা নিন্দনীয় : ইবনে আবী জমরাহ বলেন, যে জ্ঞান ও শাস্ত্র অন্তরকে কঠোর করে দেয়, আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে বিমুখ করে এবং বিশ্বাসে সন্দেহ, সংশয় ও আত্মিক রোগ সৃষ্টি করে, তার বিধানও নিন্দনীয় কবিতার অনুরূপ।

সূরা আন-নমল,

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

زَكَاتُهُمْ اَعْمَالُهُمْ অর্থাৎ যারা আখেরাতে বিশ্বাস করে না, আমি

তাদের দৃষ্টিতে তাদের কুকর্মকে শোভন করে দিয়েছি। ফলে তারা সেগুলোকেই উত্তম মনে করে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত থাকে। কোন কোন তফসীরবিদ এই আয়াতের তফসীরে বলেন যে, এখানে **اَعْمَالُهُمْ** বলে তাদের সংকর্ম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তো সংকর্মকে সুশোভিত করে তাদের সামনে রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু জালেমরা এদিকে জাল্পপণ্ড করেনি; বরং কুফর ও শেরকে লিপ্ত রয়েছে। ফলে তারা পথ-ভ্রষ্টতার মধ্যে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু প্রথমোক্ত তফসীর অধিক স্পষ্ট। কারণ, প্রথমতঃ সুশোভিত করার কথাটি অধিকাংশ কুকর্মের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

زَيْنٌ لِّكَثْرٍ مِنَ الشُّرِكَيْنِ — زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَيَوَةُ الدُّنْيَا

সংকর্মের জন্য এই শব্দের ব্যবহার খুবই কম;

যেমন

حَبَابُ الْإِنَّمِ الْوَيْسَانِ وَزَيْنٌ فِي قُلُوبِهِمْ দ্বিতীয়তঃ আয়াতে

উল্লিখিত **اَعْمَالُهُمْ** (তাদের কর্ম) শব্দ একথা বোঝায় যে, এর অর্থ কুকর্ম-সংকর্ম নয়।

وَأَنَّكَ لَتَلَقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۚ إِذْ قَالَ مُوسَى
لِأَخِي هَارُونَ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا تَأْكُلُ مِنْهَا عِجْرًا وَيَأْكُلُ مِنْهَا شِهَابًا قَبَسٌ
فَكُلُّهُمْ نَاصِبُونَ ۖ فَلَمَّا جَاءَهَا نُورٌ أَنْ يُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ
مَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ يُؤْمِنُ رَبُّكَ أَنَّ اللَّهَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ وَالَّذِي عَصَاكَ فَلَئِمَّا رَأَاهَا قَهْرًا كَانَهَا جَانٌّ
وَلِي مُدَبِّرًا لَمْ يَعْقِبْ يُؤْمِنُ رَبُّكَ أَنَّكَ إِذَا جِئْتَ لَدَى
الْمُرْسَلِينَ ۖ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا بِكُلِّ جُنْدٍ مَعَكَ سَوْءٌ ۖ وَالَّذِينَ
عَفُوًّا رَحِيمٌ ۖ وَأَجْعَلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مَرْمًا
غَيْرَ سَوْءٍ ۖ تَتَّبِعُ آيَاتِ الْفُرْقَانِ ۖ وَفَرُّوْنَ وَفَرُّوْهُ ۖ كَانُوا
قَوْمًا مُفْسِدِينَ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْبَأْسُ أَجْمَعًا قَالُوا هَذَا
سِحْرٌ مُبِينٌ ۖ وَخُذُوا بِهَا وَاسْتَيْقِنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظْمًا
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۖ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ
سُلَيْمَ ۖ عَلَاقَةَ الْحَدِيدِ ۖ الَّذِي فَكَّلْنَا عَلَى كَيْثَرٍ مِنْ عِبَادِهِ
الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَوَدَّ سُلَيْمُ أَنْ دَاوُدَ وَقَالَ لَأَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا
مَنْطِقَ الظُّلُمِ وَأَوْثَقْنَا مَنْ عَلَى هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْبَرُّ ۖ

(৬) এবং আপনাকে কোরআন প্রদত্ত হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানময় আল্লাহর কাছ থেকে। (৭) যখন মুসা তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন : ‘আমি অগ্নি দেখেছি, এখন আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্যে কোন খবর আনতে পারব অথবা তোমাদের জন্যে জ্বলন্ত অস্ত্র নিয়ে আসতে পারব যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। (৮) অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে আসলেন, তখন আওয়াজ হল, ধন্য তিনি, যিনি আগুনের স্থানে আছেন এবং যারা আগুনের আশেপাশে আছেন। বিশু ভাহানের পালনকর্তা আল্লাহ পরিব্র ও মহিমান্বিত। (৯) হে মুসা, আমি আল্লাহ, প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১০) আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি। অতঃপর যখন তিনি তাকে সর্পের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখলেন, তখন তিনি বিপন্ন দিকে ছুটে লাগলেন এবং শেখন ফিরেও দেখলেন না। হে মুসা, ভয় করবেন না। আমি যে রয়েছে, আমার কাছে পয়গম্বরগণ ভয় করেন না। (১১) তবে যে বাড়বাড়ি করে এরপর মন্দ কর্মের পরিবর্তে সংকল্প করে। নিশ্চয় আমি ক্ষমালী, পরম দয়ালু। (১২) আপনার হাত আপনার বগলে ঢুকিয়ে দিন, সুশ্রুত হয়ে বের হবে নির্দোষ অবস্থায়। এগুলো ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনিত নয়টি নিদর্শনের অন্যতম। নিশ্চয় তারা ছিল পাশাচরী সম্প্রদায়। (১৩) অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু। (১৪) তারা অন্যায় ও অহংকার করে নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখুন, অনর্থকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। (১৫) আমি অবশ্যই দাউদ ও সূলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। তাঁরা বলেছিলেন, ‘আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠ দান করেছেন। (১৬) সূলায়মান দাঁড়িয়ে উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘হে লোকসকল, আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সবকিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব।

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَخِي ۖ

মানুষের নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে স্বাভাবিক উপায়াদি অবলম্বন করা তাওয়াফুলের পরিপন্থী নয়ঃ মুসা (আঃ) এখানে দু’টি প্রয়োজনের সম্মুখীন হন। (এক), বিস্মৃত পথ জিজ্ঞাসা। (দুই), অগ্নি থেকে উত্তাপ আহরণ করা। কেননা, রাত্রি ছিল কনকনে শীতের। তাই তিনি তুর পাহাড়ের দিকে যেতে সচেষ্ট হন। কিন্তু সাথে সাথে এই লক্ষ্যে সফলতার পূর্ণ বিশ্বাস ও দাবী করার পরিবর্তে তিনি এমন ভাষা ব্যবহার করলেন, যাতে বান্দাসুলভ বিনয় ও আল্লাহ তাআলার কাছে আশা ব্যক্ত হয়। এতে বোঝা যায় যে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র অর্জনের জন্যে চেষ্টা-চরিত্র করা তাওয়াফুলের পরিপন্থী নয়। তবে নিজের চেষ্টার উপর ভরসা করার পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত। তাঁকে আগুন দেখানোর মধ্যেও সম্ভবতঃ এই রহস্য ছিল যে, এতে তাঁর উপর উভয় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত — পথ পাওয়া এবং উত্তাপ আহরণ করা।—(রহুল-মা’আনী)।

এখানে হযরত মুসা (আঃ) ۖ

ক্রিয়াপদটি বহুবচনে বলেছেন। অথচ তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ, শোআব (আঃ)—এর কন্যাও ছিলেন। তার জন্যে সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন সম্রাট লোকদের মধ্যে একজনকেও সম্মোদন করলে বহুবচন ব্যবহার করা হয়। রসুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর পত্নীদের জন্যে বহুবচনের পদ ব্যবহার করেছেন বলে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

সাধারণ মজলিসে নির্দিষ্ট করে স্ত্রীর আলোচনা না করা বরং

ইশারা-ইঙ্গিতে বলা উত্তম : قَالَ مُوسَى لِأَخِي ۖ বলা হয়েছে।

اهل শব্দের মধ্যে স্ত্রী এবং গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিও शामिल থাকে। এখানে মুসা (আঃ)—এর সাথে একমাত্র তাঁর স্ত্রীই ছিলেন, অন্য কেউ ছিল না, কিন্তু এই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মজলিসে কেউ স্ত্রীর আলোচনা করলে ব্যাপক শব্দের মাধ্যমে করা উচিত। যেমন সাধারণভাবে একথা বলার প্রচলন আছে যে, আমার পরিবারের লোক একথা বলে।

فَلَمَّا جَاءَهَا نُورٌ أَنْ يُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ
مَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

মুসা (আঃ)—এর আগুন দেখা এবং আগুনের মধ্য থেকে আওয়াজ আসার স্বরূপ : মুসা (আঃ)—এর এই ঘটনা কোরআন পাকের অনেক সূরায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নামলের আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কিত দু’টি বাক্য চিন্তা-সাপেক্ষ — প্রথম ۖ

وَالَّذِينَ ظَلَمُوا بِكُلِّ جُنْدٍ مَعَكَ سَوْءٌ ۖ وَالَّذِينَ عَفُوًّا رَحِيمٌ ۖ

سُورَةُ التَّوْحِيدِ ১৭ এবং দ্বিতীয় ۖ

وَوَدَّ سُلَيْمُ أَنْ دَاوُدَ وَقَالَ لَأَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنْطِقَ الظُّلُمِ وَأَوْثَقْنَا مَنْ عَلَى هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْبَرُّ ۖ

পূর্বের আয়াতে মুসা (আঃ) এর লাঠির মূ'জেযা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে একথাও বলা হয়েছে যে, লাঠিকে সর্প হয়ে যেতে দেবে মুসা (আঃ) নিজের ভয়ে পালাতে থাকেন। এরপরও মুসা (আঃ) এর দ্বিতীয় মূ'জেযা সুশুভ হাতের বর্ণনা আছে। মাঝখানে এই ব্যতিক্রম কেন উল্লেখ করা হল এবং এটা **منقطع استثناء** না **متصل** - এ সম্পর্কে তফসীলকার গণের উক্তি বিভিন্মরূপ। কেউ কেউ একে **منقطع** সাব্যস্ত করেছে। তখন আয়াতের বিষয়বস্তু হবে এই যে, পূর্বের আয়াতে পয়গম্বরগণের মধ্যে ভয় না থাকার কথা বলা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাদের কথাও আলাচনা করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ, যাদের দ্বারা কোন ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, এরপর তওবা করে সংকর্ম অবলম্বন করে। তাদের ক্রটি-বিচ্যুতি যদিও আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন, কিন্তু ক্ষমার পরেও গোনাহের কোন কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনা আছে। ফলে

তারা সর্বদা ভীত থাকে। পক্ষান্তরে **استثناء** সাব্যস্ত করা হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, আল্লাহর রসূল ভয় করেন না তাদের ব্যতীত, যাদের দ্বারা ক্রটি-বিচ্যুতি অর্থাৎ, সগীরা গোনাহ্ হয়ে যায়। এরপর তা থেকেও তওবা করে নেন। এই তওবার ফলে সগীরা গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। কারণ, পয়গম্বরগণের যেসব পদস্খলন হয়, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সগীরা কবীরা কোন প্রকার গোনাহ্ নয়। তবে আকার থাকে গোনাহের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো ইজ্জতিহাদী ভ্রান্তি। এই বিষয়বস্তুর মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মুসা (আঃ)-এর দ্বারা কিবতী-হত্যার যে পদস্খলন ঘটেছিল, তা যদিও আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া তখনও বিদ্যমান ছিল এবং মুসা (আঃ)-এর মধ্যে ভয়-ভীতি সঞ্চারিত ছিল। এই পদস্খলন না ঘটলে সাময়িক ভয়-ভীতিও হত না।—(কুরতুবী)

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ آدَاوَةً وَسُلَيْمَانَ

বলাবাহুল্য, এখানে পয়গম্বরগণের নবুওয়ত রেসালত সম্পর্কিত জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। এর ব্যাপক আওতায় অন্যান্য জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত হলে তা অবাস্তব নয়; যেমন হযরত দাউদ (আঃ)-কে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত দাউদ ও সূলায়মান (আঃ) এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁদেরকে নবুওয়ত ও রেসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। রাজত্বও এমন নজিরবিহীন যে, শুধু মানুষের উপর নয়—জিন ও জন্তু-জানোয়ারদের উপরও তাঁরা শাসনও পরিচালনা করতেন। এসব মহান নেয়ামতের পূর্বে আল্লাহ তাআলার জ্ঞানরূপী নেয়ামত উল্লেখ করা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত হয়েছে যে, জ্ঞানরূপী নেয়ামত অন্যান্য সব নেয়ামতের উর্ধ্বে।—(কুরতুবী)

পয়গম্বরগণের মধ্যে অর্থসম্পদের উত্তরাধিকার হয় না :

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ বলে এখানে জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকার

বোঝানো হয়েছে—আর্থিক উত্তরাধিকার নয়। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন نحن معاشر الانبياء لا نورث অর্থাৎ, পয়গম্বরগণ উত্তরাধিকারী হন না এবং কেউ তাঁদের উত্তরাধিকারীও হয় না। তিরমিযী ও আবু দাউদে হযরত আবুদুদারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, رثت العلماء والانبيا وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم অর্থাৎ, আলমগণ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী; কিন্তু পয়গম্বরগণের মধ্যে জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকার হয়ে থাকে—আর্থিক উত্তরাধিকার হয় না। হযরত আবু আবদুল্লাহর রেওয়ায়েত এই বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে দেয়। তা এই যে, হযরত সূলায়মান (আঃ) হযরত দাউদ (আঃ)-এর উত্তরাধিকারী এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত সূলায়মান (আঃ)-এর উত্তরাধিকারী।—(রহুল-মা'আনী) যুক্তির দিক দিয়েও এখানে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো যেতে পারে না। কারণ, হযরত দাউদ (আঃ)-এর ওফাতের সময় তাঁর উনিশ জন পুত্র সন্তানের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝানো হলে এই পুত্রদের সবাই উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় বিশেষভাবে হযরত সূলায়মান (আঃ)-কে উত্তরাধিকারী বলার কোন অর্থ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে উত্তরাধিকার এখানে বোঝানো হয়েছে, তাতে জাতারা অংশীদার ছিল না; বরং একমাত্র সূলায়মান (আঃ) উত্তরাধিকারী হন। এটা শুধু জ্ঞান ও নবুওয়তের উত্তরাধিকারই হতে পারে। এর সাথে আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর রাজত্বও হযরত সূলায়মান (আঃ)-কে

দান করেন এবং এতে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে তাঁর রাজত্ব জিন, জন্তু, জানোয়ার ও বিহংকুলের উপরও সম্প্রসারিত করে দেন। বায়ুকে তাঁর নির্দেশাধীন করে দেন। এসব প্রমাণের পর তাবারীর সেই রেওয়ায়েত ভ্রান্ত হয়ে যায়, যাতে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পরিবারস্থ কোন কোন ইমামের বরাত দিয়ে আর্থিক উত্তরাধিকার বোঝাতে চেয়েছেন।—(রহুল-মা'আনী)

হযরত সূলায়মান (আঃ)-এর ওফাত ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্মের মাঝখানে এক হাজার শতাব্দী বহরের ব্যবধান বিদ্যমান। ইহুদীরা এক হাজার চারশ' বহরের ব্যবধান বর্ণনা করে। সূলায়মান (আঃ)-এর বয়স পঞ্চাশ বহরের কিছু বেশী ছিল।—(কুরতুবী)

অহংকারবশতঃ না হলে নিজের জন্যে বহুবচন পদ ব্যবহার করা

জায়েয : ----- عَيْنًا مَطْنِي الْكَلِمَاتِ وَتَرْبِيَّتًا —হযরত সূলায়মান (আঃ) একা হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্যে বহুবচনের পদ রাজকীয় ব্যাপকজ্ঞতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন, যাতে প্রজাদের মধ্যে ভক্তিপ্রযুক্ত ভয় সৃষ্টি হয় এবং তারা আল্লাহর আনুগত্যে ও সূলায়মান (আঃ)-এর আনুগত্যে শৈথিল্যও প্রদর্শন না করে। এমনিভাবে গভর্ণর, শাসনকর্তা ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ তাদের অধীনস্থদের উপস্থিতিতে নিজের জন্যে বহুবচনের পদ ব্যবহার করলে তাতে দোষ নেই, যদি তা শাসনতান্ত্রিক এবং নেয়ামত প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়।—অংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্যে না হয়।

বিহংকুল ও চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যেও বুদ্ধি-চেতনা বিদ্যমান : এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পশু-পক্ষী ও সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের মধ্যেও কিছু পরিমাণে বুদ্ধি ও চেতনা বর্তমান। তবে তাদের চেতনা এ পরিমাণ নয়, যাতে শরীয়তের নির্দেশাবলী পালনে তারা আদিষ্ট হতে পারে। মানব ও জিনকে পূর্ণ মাত্রায় বুদ্ধি ও চেতনা দান করা হয়েছে। ফলে তারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী পালনের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। ইমাম শাফে (রহঃ) বলেন, পাখীদের মধ্যে কবুতর সর্বাধিক বুদ্ধিমান। ইবনে অতিয়্যা বলেন, পিপীলিকা মেথাবী ও বুদ্ধিমান প্রাণী। তার দ্রাঘশক্তি অত্যন্ত প্রখর। যে কোন বীজ তার হাতে এলে সে গুটাকে দৃষ্টিগত করে ফেলে, যাতে তা অঙ্কুরিত না হয়। এরূপ করে সে শীতকালের জন্যে তার খাদ্যের ভাণ্ডার সঞ্চিত করে রাখে।—(কুরতুবী)

জ্ঞাতব্যঃ আয়াতে হুদহুদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষভাবে مَطْنِي الْكَلِمَاتِ অর্থাৎ পক্ষীকুলের বুলির উল্লেখ করা হয়েছে। হুদহুদ পাখী জাতীয় প্রাণী। নতুবা হযরত সূলায়মান (আঃ)-কে সমস্ত পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গের বুলি শেখানো হয়েছিল। পরের আয়াতে পিপীলিকার বুলি বোঝার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী তাঁর তফসীরে এখানে বিভিন্ন পক্ষীর বুলি ও সূলায়মান (আঃ) কর্তৃক তার বিবরণ দান বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রায় প্রত্যেক পক্ষীর বুলি কোন না কোন উপদেশ বাক্য।

وَأُوتِينَا كُلَّ شَيْءٍ

— আভিধানিক দিক দিয়ে كل শব্দের মধ্যে কোন বস্তুর সমস্ত ব্যক্তিসত্তা শামিল থাকে। কিন্তু প্রায়ই সামগ্রিক ব্যাপকতা বোঝানো হয় না; বরং কোন বিশেষ লক্ষ্য পর্বস্ত ব্যাপকতা বোঝানো হয়; যেমন এখানে সেসব বস্তুর ব্যাপকতা বোঝানো হয়েছে, যেগুলো রাজ্য পরিচালনা ও রাজ্যশাসনে প্রয়োজনীয়। নতুবা একথা সহজবোধ্য যে, উড়োজাহাজ, মোটর, রেলগাড়ী ইত্যাদি হযরত সূলায়মান (আঃ)-এর কাছে ছিল না।

وَحِثُّ الْمُسْلِمِينَ جُودُهُ مِنَ الْبَيْتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَّيْرِ ثُمَّ يُرْجَوْنَ
 حَتَّى إِذَا اتَّوَعَلَ وَإِذِ الْمَلِكِ قَالَتْ مَلَكَةُ يَأْتِيهَا الْمَلَأُ ادْخُلُوا
 مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطَبُكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُودُهُ وَهُمْ لَا يَسْتَعْرُونَ
 فَتَنَسَّمَ صَاحِبُكَ مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ ارْزُقْنِي أَنْ لَشْكُرَ
 نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْصَبْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّْ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
 تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَقَعَّدَ
 الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدًى هَذَا كَانَ مِنْ أَلْقَائِنِي
 لَأَغْشِيَنَّكَ عَذَابًا أَشَدَّ أَلَا أَدَّبْتُكَ وَأَكْبَدْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
 يُبِينُ فَمَكَتْ غَيْرَ مُبِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ حُطِّ بِهِ وَ
 جَنَّاتِكَ مِنْ سِوَايُنِي يُقِينُ إِنِّي وَحَدَّثْتُ أُمَّةً مِثْلَهُمْ
 وَأَوْفَيْتُ مِنْ كُلِّ سَائِلٍ وَأَكْهَدْتُ عِظِيمُهُ وَحَدَّثْتُ قَوْمًا
 يَجْعَلُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ رَزَقِينَ لَمْ يَشْعُرُوا بِهَا
 فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَا يَجْعَلُونَ
 الذِّنَى يَخْرُجُ مِنَ الْغَيْبِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ
 وَمَا تُعْلِنُونَ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ الْآلَاءُ هُورًا عِزُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

(১৭) সুলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল। —
 ঙ্খিন, মানুষ ও পক্ষীকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যাঘে বিভক্ত
 করা হল। (১৮) যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছল,
 তখন এক পিপীলিকা বলল, 'হে পিপীলিকা দল, তোমরা তোমাদের গৃহে
 প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে
 তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে।' (১৯) তার কথা শুনে সুলায়মান
 মুচকি হাসলেন এবং বললেন, 'হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে
 সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
 করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করছে
 এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সংকর্ম করতে পারি এবং আমাকে
 নিজ অনুগ্রহে তোমার সংকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।' (২০)
 সুলায়মান পক্ষীদের ষোড়শ-খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, 'কি হল,
 হৃদহৃদকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? (২১) আমি অবশ্যই
 তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে
 উপযুক্ত কারণ।' (২২) কিছুক্ষণ পরেই হৃদহৃদ এসে বলল, 'আপনি যা
 অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে 'সাবা'
 থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। (২৩) আমি এক নারীকে
 সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে
 এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। (২৪) আমি তাকে ও তার
 সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে।
 শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যবলী সুশোভিত করে দিয়েছে।
 অতঃপর তাদেরকে সংপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতঃপর তারা সংপথ
 পায় না। (২৫) তারা আল্লাহকে সেজদা করে না কেন, যিনি নভোমণ্ডল
 ও ভূমণ্ডলের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন যা তোমরা গোপন
 কর ও যা প্রকাশ কর। (২৬) আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি
 মহা-আরশের মালিক।'

رَبِّ ارْزُقْنِي — এটা وزع থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ বিরত
 রাখা। এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি
 নেয়ামতের কৃতজ্ঞতাকে সর্বদা সাথে রাখি, তা থেকে কোন সময় পৃথক না
 হই। মোটকথা এই যে, সর্বক্ষণ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এর আগে
 আয়াতের ثُمَّ يُرْجَوْنَ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, বাহিনীকে
 প্রাচুর্যের কারণে বিরত রাখা, যাতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়।

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ — এখানে রোযার অর্থ কবুল। অর্থাৎ, হে

আল্লাহ, আমাকে এমন সংকর্মের তওফীক দিন, যা আপনার কাছে
 মকবুল হয়। রহুল মা'আনীতে এর মাধ্যমে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে,
 সংকর্ম মকবুল হওয়াই জরুরী নয়; বরং এটা কিছু শর্তের উপর
 নির্ভরশীল। এ কারণেই পয়গম্বরগণ তাঁদের সংকর্মসমূহ মকবুল হওয়ার
 জন্যেও দোয়া করতেন; যেমন হযরত ইবরাহীম ও ইসমাইল (আঃ) কাবা
 গৃহ নির্মাণের সময় দোয়া করেছিলেন رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا — এতে বোঝা গেল
 যে, কোন সংকর্ম সম্পাদন করেই নিশ্চিত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়; বরং তা
 কবুল হওয়ার জন্যে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করাও বাঞ্ছনীয়।

সংকর্ম মকবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র অনুগ্রহ ব্যতীত জ্ঞানাতো
 প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে না : وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ
 الصَّالِحِينَ — সংকর্ম সম্পাদন এবং তা মকবুল হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ
 তাআলার কৃপা দ্বারাই জ্ঞানাতো প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। রসুলুল্লাহ
 (সঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি তার কর্মের উপর ভরসা করে জ্ঞানাতো যাবে
 না। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আপনিও কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমিও।
 কিন্তু আমাকে আমার আল্লাহ্র অনুগ্রহ বেটন করে আছে।—
 (রহুল-মা'আনী)

হযরত সুলায়মান (আঃ)—ও এসব বাক্যে জ্ঞানাতো প্রবেশ করার জন্যে
 খোদায়ী কৃপা ও অনুগ্রহের দোয়া করছেন অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাকে
 সেই কৃপাও দান কর, যদ্বারা জ্ঞানাতের উপযুক্ত হই।

وَتَقَعَّدَ الطَّيْرُ — এর শাব্দিক অর্থ কোন জনসমাবেশে
 উপস্থিত ও অনুপস্থিতির খবর নেয়া। তাই এর অনুবাদে ষোড়শ নেয়া ও
 পর্যবেক্ষণ করা বলা হয়েছে। হযরত সুলায়মান (আঃ)—কে আল্লাহ
 তাআলা মানব, জিন, জন্তু ও পশু-পক্ষীদের উপর রাজত্ব দান
 করেছিলেন। রাজ্যশাসনের নীতি অনুযায়ী সর্বস্তরের প্রজাদের দেখাশোনা
 করা ও ষোড়শ-খবর নেয়া শাসনকর্তার অন্যতম কর্তব্য। এই নীতির
 পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতে বলা হয়েছে— وَتَقَعَّدَ الطَّيْرُ — অর্থাৎ, সুলায়মান

(আঃ) তাঁর পক্ষী প্রজাদেরকে পরিদর্শন করলেন এবং দেখলেন যে, তাদের
 মধ্যে কে উপস্থিত এবং কে অনুপস্থিত। রসুলুল্লাহ (সঃ)—এরও এই
 সূত্রভাষ্য ছিল। তিনি সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা সম্পর্কে ষোড়শ-খবর
 নিতেন। যে ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকতেন, তিনি অসুস্থ হলে দেখার জন্যে
 তশরীফ নিয়ে যেতেন, সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং কেউ কোন কষ্টে
 থাকলে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা করতেন।

শাসকের জন্যে জনসাধারণের এবং গীর-মুশরীফের জন্যে শিষ্য ও
 মুরীদদের ষোড়শ-খবর নেয়া জরুরী : আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত
 হয় যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) সর্বস্তরের প্রজাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন

এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতেন। এমন কি, যে হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যাও দুনিয়াতে অন্যান্য পাখীর তুলনায় কম, সেই হুদহুদও তাঁর দৃষ্টির অগোচরে থাকেনি। বরং বিশেষভাবে হুদহুদ সম্পর্কে তাঁর প্রশ্ন করার এক কারণ এটাও হতে পারে যে, হুদহুদ পক্ষীকুলের মধ্যে কম সংখ্যক ও দুর্বল। তাই প্রজাদের মধ্যে যারা দুর্বল, তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে তিনি অধিক যত্নবান হয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁর খেলাফতের আমলে পয়গম্বরগণের এই সুনতকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করেন। রাতের অন্ধকারে তিনি মদীনার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন, যাতে সবার অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেন। কাউকে কোন বিপদ ও কষ্টে পতিত দেখলে তিনি তাকে সাহায্য করতেন। এ ধরনের অজস্র ঘটনা তাঁর জীবনীতে উল্লেখিত আছে। তিনি বলতেন, যদি ফোরাত নদীর কিনারায় কোন ব্যাঘ্র কোন ছাগলছানাকে গিলে ফেলে, তবে এর জন্যও ওমরকে প্রশ্ন করা হবে।—(কুরতুবী)

এ হচ্ছে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালনের রীতি-নীতি, যা পয়গম্বরগণ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যা বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন এবং যার ফলে মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনসাধারণ সুস্থ-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করত। তাঁদের পর পৃথিবী এমন সুবিচার, ইনসাফ ও সাধারণ বিপ্লুর শান্তি, সুখ ও নিশ্চয়তার সে দৃশ্য আর দেখেনি।

مَالِي لَأَزِيَّ الْهُدُودُ مَا كَانَ مِنَ الْفُلَيْنِ — সুলায়মান (আঃ)

বললেন, আমার কি হল যে, আমি হুদহুদকে সমাবেশে দেখতে পাচ্ছি না।

আত্মসমালোচনা : এখানে স্থান ছিল একথা বলার—“হুদহুদের কি হল যে, সে সমাবেশে উপস্থিত নেই” বলার ভঙ্গি পরিবর্তন করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, হুদহুদ ও অন্যান্য পক্ষীকুলের অধীনস্থ হওয়া আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। হুদহুদের অনুপস্থিতি দেখে শুরুতে হযরত সুলায়মান (আঃ) এর মনে এই আশংকা দেখা দিল যে, সম্ভবতঃ আমার কোন ক্রটির কারণে এই অনুগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং এক শ্রেণীর পাখী অর্থাৎ, হুদহুদ গায়ব হয়ে গেছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ কেন হল? সুকী-বুয়ুগদেরও অভ্যাস তাই। তাঁরা যখন কোন নেয়ামত হ্রাস পেতে দেখেন অথবা কোন কষ্ট ও উদ্বেগে পতিত হন, তখন তা নিরাসনের জন্যে বৈষয়িক উপায়াদির দিকে মনোযোগ দানের পূর্বে আত্ম-সমালোচনা করেন যে, আমি দ্বারা আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কি কোন ক্রটি হল, যদ্বরন এই নেয়ামত প্রত্যাহার করা হয়েছে? কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে এ স্থলে বুয়ুগদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, اِذَا فَقَدُوا اَمَالَهُمْ تَفَقَّدُوا اَعْمَالَهُمْ অর্থাৎ, তাঁরা যখন উদ্দেশ্যে সফল হন না, তখন নিজেদের কার্যাবলীর খবর নেন যে, তাঁদের দ্বারা কি ক্রটি হয়ে গেছে।

এই প্রাথমিক আত্মসমালোচনা ও চিন্তা-ভাবনার পর সুলায়মান (আঃ) বললেন, اَمِنْ مِّنَ الْفُلَيْنِ — এখানে ام শব্দটি — এর সমার্থবোধক।—(কুরতুবী) অর্থাৎ, হুদহুদকে দেখার ব্যাপারে আমার দৃষ্টি ভুল করেনি, বরং সে উপস্থিতই নয়।

পক্ষীকুলের মধ্যে হুদহুদকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা : হযরত আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হয়, এতসব পক্ষীর মধ্যে শুধু হুদহুদকে খোজার কি কারণ ছিল? তিনি বললেন, সুলায়মান (আঃ) তখন এমন জায়গায়

অবস্থানরত ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ তাআলা হুদহুদ পক্ষীকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তুসমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত স্বর্ণরাসমূহকে দেখতে পায়। হযরত সুলায়মান (আঃ) হুদহুদের কাছে জ্ঞানতে চেয়েছিলেন যে, এই প্রান্তরে কতটুকু গভীরতায় পানি পাওয়া যাবে এবং কোথায় মাটি খনন করলে প্রচুর পানি পাওয়া যাবে। হুদহুদ জায়গা চিহ্নিত করে দিলে তিনি জিনদেরকে মাটি খনন করে পানি বের করার আদেশ দিতেন। তারা ক্ষিপ্ৰগতিতে খনন করে পানি বের করতে পারত। হুদহুদ তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও শিকারীর জালে আবদ্ধ হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস বলেন — فَيَأْوِفَانِ كَيْفَ بَرَى الْهَدُودُ بَاطِنَ الْأَرْضِ وَهُوَ لَا يَرَى الْفَنَ حِينَ يَفْعُ فِيهِ جَنَانِيْغًا ! এই সত্য জেনে নাও যে, হুদহুদ পাখী মাটির গভীরে অবস্থিত বস্তুকে দেখে, কিন্তু মাটির উপর বিস্তৃত জাল তার নজরে পড়ে না, যাতে সে আবদ্ধ হয়ে যায়।

উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা কারও জন্যে যে কষ্ট অথবা সুখ অবধারিত করে দিয়েছেন, তার বাস্তবরূপ লাভ করা অবশ্যস্বাবী। কোন ব্যক্তি জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা অথবা গায়ের জোরে ও অর্থের জোরে তা থেকে বাঁচতে পারেনা।

رَعَوَيْتُ عَنَّا بِأَشَدِّ دِينٍ الْوَلَا كَذِبَتُهُ — প্রাথমিক চিন্তা-ভাবনার পর এটা হচ্ছে শাসকসুলত নীতির প্রকাশ যে, অনুপস্থিতকে শাস্তি দিতে হবে।

যে জন্তু কাজে অলসতা করে, তাকে সুস্থ শাস্তি দেয়া জায়েয : হযরত সুলায়মান (আঃ) এর জন্যে আল্লাহ তাআলা জন্তুদেরকে এরূপ শাস্তি দেয়া হালাল করে দিয়েছিলেন; যেমন সাধারণ উষ্মতের জন্যে জন্তুদেরকে যবাই করে তাদের মাংস, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া এখন হালাল। এমনভাবে পালিত জন্তু গাভী, বলদ, গাধা, ঘোড়া, উট ইত্যাদি কাজে অলসতা করলে প্রয়োজনমাসিক প্রহারের সুস্থ শাস্তি দেয়া এখনও জায়েয। অন্যান্য জন্তুকে শাস্তি দেয়া আমাদের শরীয়তে নিষিদ্ধ।—(কুরতুবী)

اَلَا يَتَذَكَّرُ لِمَنْ يَّخْلُقُ — অর্থাৎ, হুদহুদ যদি তার অনুপস্থিতির কোন উপযুক্ত অজুহাত পেশ করে, তবে সে এই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, অতিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া বিচারকের কর্তব্য। উপযুক্ত ওযর পেশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া উচিত।

اَحْطَظَّ بِمَا لَمْ يَحْطُ بِهِ — অর্থাৎ, হুদহুদ তার ওযর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলল, আমি যা অবগত, আপনি তা অবগত নন। অর্থাৎ, আমি এমন এক সংবাদ এনেছি, যা আপনার জ্ঞান ছিল না।

পয়গম্বরগণ আলেমুল গায়ব ছিলেন না : ইয়ায কুরতুবী বলেন, এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, পয়গম্বরগণ আলেমুল গায়ব নন যে, সবকিছুই তাঁদের জ্ঞান থাকবে।

وَجَعَلْنَاكَ مِنْ سِرَافِيْنَ كَثِيْرٍ — “সাবা” ইয়াযমেনের একটি প্রসিদ্ধ শহর, যার অপর নাম মাআরিবও। সাবা ও ইয়াযমেনের রাজধানী সানআর মধ্যে তিন দিনের দূরত্ব ছিল।

ছোট কি বড়কে বলতে পারে যে, আমার জ্ঞান আপনার চাইতে বেশী? : হুদহুদের উপরোক্ত কথাবার্তা দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করেন যে, কোন শাগরেদ তার গুস্তাদকে এবং আলেম নয় এমন কোন ব্যক্তি

আলেমকে বলতে পারে যে, এ বিষয়ের জ্ঞান আপনার চাইতে আমার বেশী—যদি বাস্তবিকই এ বিষয়ে তার জ্ঞান অন্যের চাইতে বেশী হয়ে থাকে। কিন্তু রুহুল মাআনীতে বলা হয়েছে, পীর ও মুকব্বীদের সামনে এ ধরনের কথাবার্তা শিষ্টাচার-বিরোধী। কাজেই বজ্রনীয়। হুদহুদের উক্তিকে প্রমাণরূপে পেশ করা যায় না। কারণ, সে শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে এবং গুণকে জোরদার করার জন্যে এ কথা বলেছে। এহেন প্রয়োজনে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ধরনের কোন কথা বললে তাতে দোষ নেই।

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً سَمِيحَةً — অর্থ আমি এক নারীকে পেয়েছি, সে

সাবা সম্প্রদায়ের রাণী। অর্থাৎ, তাদের উপর রাজত্ব করে। সাবার এই সম্রাজ্ঞীর নাম ইতিহাসে বিলকীস বিনতে শারাহীল বলা হয়েছে। কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, তার জননী জিন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তার নাম ছিল মালআমা বিনতে শীসান।—(কুরতুবী)। তার পিতামহ হুদহুদ ছিল সমগ্র ইয়ামনের একচ্ছত্র সম্রাট। তার চল্লিশটি পুত্র-সন্তান ছিল। সবাই সম্রাট হয়েছিল। বিলকীসের পিতা শারাহীল জনৈকা জিন নারীকে বিবাহ করেছিল। তারই গর্ভে বিলকীসের জন্ম হয়। জিন নারীকে বিবাহ করার বিভিন্ন কারণ বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, সে সাম্রাজ্য ও রাজত্বের অহংকারে অন্য লোকদেরকে বলত, তোমাদের কেউ কুলে-কৌলিন্যে আমার সমান নও। তাই আমি বিবাহই করব না। আমি অসম বিবাহ পছন্দ করি না। এর ফলশ্রুতিতে লোকেরা জনৈকা জিন নারীর সাথে তার বিবাহ ঘটিয়ে দেয়।—(কুরতুবী) প্রকৃতপক্ষে মানুষই ছিল তার সমগোত্র। কিন্তু সে মানুষকে হয় ও নিকৃষ্ট মনে করে তার সমান স্বীকার করেনি। সম্ভবতঃ এই অহংকারের ফলেই আল্লাহ্ তার বিবাহ এমন নারীর সাথে অবধারিত করে দেন, যে তার সমানও ছিল না এবং স্বজাতিও ছিল না।

জিন নারীর সাথে মানুষের বিবাহ হতে পারে কি? এ ব্যাপারে কেউ কেউ এ কারণে সন্দেহ করেছেন যে, তাঁরা জিন জাতিকে মানুষের ন্যায় সন্তান উৎপাদনের যোগ্য মনে করেন না। ইবনে আরাবী তাঁর তফসীর গ্রন্থে বলেন, এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ, সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, মানব জাতির অনুরূপ জিনদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন ও নারী-পুরুষের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে, জিন নারীকে বিবাহ করা মানুষের জন্যে হালাল কিনা? এতে ফেকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকেই জায়েয বলেছেন। কেউ কেউ জঙ্ঘ-জানোয়ারের ন্যায় ভিন্ন জাতি হওয়ার কারণে হারাম সাব্যস্ত করেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ “আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান” কিতাবে উল্লেখিত আছে। তাতে মুসলমান পুরুষের সাথে মুসলমান জিন নারীর বিবাহের কয়েকটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের সন্তানাদি জন্মগ্রহণের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বিবাহকারী বিলকীসের পিতা মুসলমানই ছিল না, তাই এ বিষয় নিয়ে এখানে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নেই। তার কর্ম দ্বারা এই

বিবাহের বৈধতা-অবৈধতা প্রমাণ করা যায় না। শরীয়তে সন্তান পিতার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। বিলকীসের পিতা মানব ছিল। তাই বিলকীস মানব নন্দিনীই সাব্যস্ত হবে। কাজেই কোন কোন রেওয়াজেতে সুলায়মান (আঃ) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন বলে যে উল্লেখ আছে, তা দ্বারা জিন নারীকে বিবাহ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না। কারণ, বিলকীস নিজে জিন ছিল না। সুলায়মান (আঃ)-এর বিবাহ সম্পর্কে আরও বর্ণনা পরে আসছে।

নারীর জন্যে বাদশাহ্ হওয়া অথবা কোন সম্প্রদায়ের নেত্রী ও শাসক হওয়া জায়েয কিনা? : সহীহ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীরা তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এই সংবাদ জানার পর মন্তব্য করেছিলেন, امْرَأَةٌ وَلَوْ اَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ, যে জাতি তাদের শাসনক্ষমতা একজন নারীর হাতে সমর্পণ করেছে, তারা কখনও সাফল্য লাভ করতে পারবে না। এ কারণেই আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন নারীকে শাসনকর্তৃত্ব, খেলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা যায় না; বরং নামাযের ইমামতির ন্যায় বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ, শাসন-কর্তৃত্বও একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত। বিলকীসের সম্রাজ্ঞী হওয়া দ্বারা ইসলামী শরীয়তের কোন বিধান প্রমাণিত হতে পারে না, যে পর্যন্ত একথা প্রমাণিত না হয় যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) বিলকীসকে বিবাহ করেছিলেন এবং বিবাহের পর তাকে রাজসিংহাসনে বহাল রেখেছিলেন। একথা কোন সহীহ রেওয়াজেতে দ্বারা প্রমাণিত নেই।

وَأَوْتَيْتُ مَن لِّى سُلْطٰنً — অর্থাৎ, কোন সম্রাট ও শাসনকর্তার জন্যে

যেসব সাজ সরঞ্জাম দরকার, তা সবই বিদ্যমান ছিল। সেই যুগে যেসব বস্তু অনাবিষ্কৃত ছিল, সেগুলো না থাকা এর পরিপন্থী নয়।

وَلَهَا عِشْرَتٌ عَظِيْمٌ — আরশের শাস্তিক অর্থ রাজসিংহাসন। হযরত

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, বিলকীসের সিংহাসন ৮০ হাত দীর্ঘ, ৪০ হাত প্রস্থ এবং ৩০ হাত উচ্চ ছিল এবং মোতি, ইয়াকুত ও মণিমাণিক্য দ্বারা কারুকার্য খচিত ছিল। তার পায়া ছিল মোতি ও জুওহরের এবং পর্দা ছিল রেশমের। একের পর এক সাতটি তালাবদ্ধ প্রাচীরের অভ্যন্তরে সিংহাসনটি সংরক্ষিত ছিল।

وَجِدْهُمْ قَوْمًا يُفَيْدُونَ لِلشَّيْءِ — এতে জানা গেল যে,

বিলকীসের সম্প্রদায় নক্ষত্রপূজারী ছিল। তারা সূর্যের এবাদত করত। কেউ কেউ বলেন, অগ্নিপূজারী ছিল।—(কুরতুবী)

فَصَدَّقَهُمْ عَلَيْهِمْ وَرَبِّ اِنَّ الشَّيْطٰنَ — এর সম্পর্ক

الشَّيْطٰن এর সাথে। অর্থাৎ, আল্লাহকে সেজদা না করার কথা শয়তান তাদের মনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল অথবা শয়তান তাদেরকে সত্য পথ থেকে এভাবে নিবৃত্ত করল যে, আল্লাহকে সেজদা করবে না।

পত্র লেখার কতিপয় আদব : إِنَّهُ مِنْ سَمِيعٍ وَاتَّكَ بِسْمِ اللَّهِ

কোরআন পাক মানব জীবনের কোন দিক সম্পর্কেও দিক নির্দেশ না দিয়ে ছাড়েনি। চিঠিপত্র প্রেরণের মাধ্যমে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাও মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিষয়। এ স্থলে সাবার সন্ধ্যাজ্ঞী বিলকীসের নামে হযরত সূলায়মান (আঃ)-এর পত্র আদ্যোপান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এটা একজন পয়গম্বরের চিঠি। কোরআন পাক একে উত্তম আদর্শ হিসেবে উদ্ধৃত করেছে। তাই এই পত্রে পত্র লিখন সম্পর্কে যেসব দিক নির্দেশ পাওয়া যায়, সেগুলো মুসলমানদের জন্যেও অনুসরণীয়।

প্রেরক প্রথমে নিজের নাম লিখবে, এর পর প্রাপকের : এই পত্রে সর্বপ্রথম দিক নির্দেশ এই যে, পত্রটি সূলায়মান (আঃ) নিজের নাম দ্বারা শুরু করেছেন। প্রাপকের নাম কিভাবে লিখেছেন, কোরআনের ভাষায় তার উল্লেখ নেই। কিন্তু এ থেকে এটুকু জানা গেল যে, সর্বপ্রথম প্রেরকের নাম লেখা পয়গম্বরের সুনীত। এর উপকারিতা অনেক। উদাহরণতঃ পত্র পাঠ করার পূর্বেই প্রাপক জানতে পারবে যে, সে কার পত্র পাঠ করছে, যাতে সে সেই পরিবেশে পত্রের বিষয়বস্তু পাঠ করে এবং চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাতে কার পত্র, কোথা থেকে আসল, প্রাপক কে এরূপ খোজাখুঁজি করার কষ্ট ভোগ করতে না হয়। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বর্ণিত ও প্রকাশিত সব পত্রেই তিনি এই পন্থাই অবলম্বন করেছেন। তিনি محمد من عبد الله ورسوله এ কথার মাধ্যমে পত্র শুরু করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যখন কোন বড়জন ছোটকে পত্র লেখে, তার নাম অগ্রে থাকলে তা আপত্তির বিষয় নয়। কিন্তু ছোটজন যদি তার পিতা, গুস্তাদ, গীর অথবা কোন মুকুব্বীর কাছে পত্র লেখে, তখন নাম অগ্রে থাকা আদবের খেলাফ হবে না কি? তার এরূপ করা উচিত কিনা? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কোরামের কর্ম-ধারা বিভিন্নরূপ। অধিকাংশ সাহাবী সুনীতের অনুসরণকে আদবের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে যেসব চিঠি লিখেছেন, সেগুলোতেও নিজেদের নাম অগ্রে রেখেছেন। রুহুল মা'আনীতে বাহুরে মুহীতের বরাতে দিয়ে হযরত আনাস (রাঃ)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে—

ما كان احد اعظم حرمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اصحابه اذا كتبوا اليه كتابا بدأوا بانفسهم قلت وكتاب علاء الحضرمي يشهد له على ماروي .

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাইতে অধিক সম্মানযোগ্য কেউ ছিল না; কিন্তু সাহাবায়ে কোরাম যখন তাঁর কাছেও পত্র লিখতেন, তখন নিজেদের নামই প্রথম লিপিবদ্ধ করতেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামে আলায়ী হযরামীর পত্র এই বর্ণনার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

তবে রুহুল মা'আনীতে উপরোক্ত রেওয়াজে উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, এই আলোচনা উত্তম অনুত্তম সম্পর্কে—বেথতা সম্পর্কে নয়। যদি কেউ নিজের নাম শুরুতে না লিখে পত্রের শেষে লিখে দেয়, তবে তাও জায়েয। ফকীহ আবুল-লাইস 'বুতান' গ্রন্থে বলেন, যদি কেউ প্রাপকের নাম দ্বারা পত্র শুরু করে, তবে এর বেথতা সম্পর্কে দ্বিমত নেই। কেননা, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পন্থাও নির্দিষ্টায প্রচলিত আছে।

পত্রের জওয়াব দেয়াও পয়গম্বরের সুনীত : তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, ক্যারও পত্র হস্তগত হলে তার জওয়াব দেয়া সমীচীন। কেননা, অনুপস্থিত ব্যক্তির পত্র উপস্থিত ব্যক্তির সালামের স্থলাভিষিক্ত।

এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি পত্রের জওয়াবকে সালামের জওয়াবের ন্যায় ওয়াজিব মনে করতেন। — (কুরতুবী)

চিঠিপত্রে বিস্মিল্লাহ লেখা : হযরত সূলায়মান (আঃ)-এর উল্লিখিত পত্র এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর লিখিত সব পত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, পত্রের শুরুতে 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লেখা পয়গম্বরের সুনীত। এখন বিস্মিল্লাহ লেখক নিজের নামের পূর্বে লিখবে না পরে, এ সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পত্রাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, বিস্মিল্লাহ সর্বাগ্রে এবং নিজের নাম এর পরে লিপিবদ্ধ করতে হবে। এরপর প্রাপকের নাম লিখবে। কোরআন পাকে হযরত সূলায়মান (আঃ)-এর নাম পূর্বে ও বিস্মিল্লাহ পরে লিখিত আছে। বাহাউঃ এ থেকে বিস্মিল্লাহ পরে লেখারও বৈধতা জানা যায়। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম ইয়াযীদ ইবনে রুমান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সূলায়মান (আঃ) প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্র এভাবে লিখেছিলেনঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان بن داود الى بليقيس ابنة دى شرح قومها . ان لاعتلوا الخ .

বিলকীস তার সম্প্রদায়কে পত্রের মর্ম শোনানোর সময় সূলায়মান (আঃ)-এর নাম আগে উল্লেখ করেছে। কোরআন পাকে বিলকীসের উক্তিই উদ্ধৃত হয়েছে। সূলায়মান (আঃ)-এর আসল পত্রে বিস্মিল্লাহ আগে ছিল না পরে, কোরআনে এ সম্পর্কে বর্ণনা নেই। এটাও সম্ভবপর যে, সূলায়মান (আঃ)-এর নাম খামের উপরে লিখিত ছিল এবং ভেতরে বিস্মিল্লাহ দ্বারা শুরু করা হয়েছিল। পত্র শোনানোর সময় বিলকীস সূলায়মান (আঃ)-এর নাম অগ্রে উল্লেখ করেছে।

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ أَتُوقِنُ فِي أَمْرِي مَا كُنْتَ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ

শব্দটি ফরাসী থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিশেষ প্রশ্নের জওয়াব দেয়া। এখানে পরামর্শ দেয়া এবং নিজের মত প্রকাশ করা বোঝানো হয়েছে। সন্ধ্যাজ্ঞী বিলকীসের কাছে যখন সূলায়মান (আঃ)-এর পত্র পৌঁছল, তখন সে তার সভাসদদেরকে একত্রিত করে ঘটনা বর্ণনা করল এবং তাদের পরামর্শ তলব করল যে, এ ব্যাপারে কি করা উচিত। সে তাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করার পূর্বে তাদের মনোরঞ্জননের জন্য একথাও বলল, আমি তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। এর ফলেই সেনাধ্যক্ষগণ ও মন্ত্রীবর্গ এর জওয়াবে পূর্ণ তৎপরতা সহকারে আদেশ পালনের জন্যে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করল।

হযরত — عَنْ أَوْسَةَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالْأَمْرُ لَكَ
কাতাদা বলেন, আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, বিলকীসের পরামর্শ-সভার সদস্য তিনশ' ভেদে ছয় ছিল এবং তাদের প্রত্যেকেই দশ হাজার লোকের নেতা ও প্রতিনিধি ছিল।

এ থেকে জানা গেল যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের পদ্ধতি সুপ্রাচীন। ইসলাম পরামর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দান করেছে এবং রাষ্ট্রের কর্মচারীদেরকে পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য করেছে। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ওহী আগমন করত এবং তিনি খোদারী নির্দেশ লাভ করতেন। এ কারণে কোন পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছিল না; কিন্তু উম্মতের জন্যে সুনীত প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তাঁকেও আদেশ করা হয়েছে وَشَاوَرَهُمْ - অর্থাৎ, আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে সাহাবায়ে কোরামের

সাথে পরামর্শ করুন। এতে একদিকে যেমন সাহাবায় কেরামের সন্তুষ্টি বিধান করা হয়। অপরদিকে ভবিষ্যৎ রাজকর্মচারীদেরকে পরামর্শের মাধ্যমে কাজ করার তাকীদও হয়ে যায়।

সুলায়মান (আঃ)—এর পত্রের জওয়াবে বিলকীসের প্রতিক্রিয়াঃ রাষ্ট্রের অমাত্যবর্গকে পরামর্শে শরীক করে তাদের সহযোগিতা অর্জন করার পর সম্রাজ্ঞী বিলকীস নিজেই একটি মত স্থির করল, যার সারমর্ম এই ছিল : হযরত সুলায়মানের পরীক্ষা নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, তিনি বাস্তবিকই আল্লাহর পয়গম্বর কি-না। তিনি আল্লাহর আদেশ পালন করে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, না তিনি একজন আধিপত্যবাদী সম্রাট? এই পরীক্ষা দ্বারা বিলকীসের লক্ষ্য ছিল এই যে, বাস্তবিকই তিনি পয়গম্বর হলে তাঁর আদেশ পালন করা হবে এবং বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না। পক্ষান্তরে যদি তিনি আধিপত্যবাদের নেশায় আমাদেরকে দাসে পরিণত করতে চান, তবে তার মোকাবেলা কিভাবে করা হবে, সে সম্পর্কে চিন্তা করা হবে। এই পরীক্ষার পদ্ধতি সে এইরূপ স্থির করল যে, সুলায়মান (আঃ)—এর কাছে কিছ উপটোকন প্রেরণ করা হবে। যদি তিনি উপটোকন পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যান, তবে বোঝা যাবে যে, তিনি একজন সম্রাটই। পক্ষান্তরে তিনি পয়গম্বর হলে ইসলাম ও ঈমান ব্যতীত কোন কিছুতে সন্তুষ্ট হবেন না। এই বিষয়বস্তু ইবনে জরীর একাধিক সনদে হযরত ইবনে-আব্বাস, মুজাহিদ, ইবনে জুরায়জ ও ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেছেন। একথাই এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, **وَأَنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهُمُ**

يَهْدِيكَ قَوْلُ رَبِّكَ إِلَى الْبُرْهَانِ — অর্থাৎ, আমি সুলায়মান ও তাঁর সভাসদদের কাছে কিছু উপটোকন পাঠাচ্ছি। এরপর দেখব; যেসব দূত উপটোকন নিয়ে যাবে, তারা কিরে এসে কি পরিস্থিতি বর্ণনা করে।

সুলায়মান (আঃ) বিলকীসের উপটোকন গ্রহণ করলেন না :

قَالَ أَتُؤْتُونَ بِمَالٍ فَمَا آتَيْنَا اللَّهُ مِثْلَ مَا تُؤْتُونَ

—অর্থাৎ, যখন বিলকীসের দূত উপটোকন নিয়ে সুলায়মান (আঃ)—এর কাছে পৌছল, তখন তিনি দূতদেরকে বললেন, তোমরা কি অর্থ-সম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও?

আমাকে আল্লাহ যে অর্থ-সম্পদ দিয়েছে, তা তোমাদের অর্থ-সম্পদের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। তাই আমি এই উপটোকন গ্রহণ করব না। এগুলো ফেরত নিয়ে যাও এবং তোমাদের উপটোকন নিয়ে তোমরা সুখী থাক।

কোন কাফেরের উপটোকন গ্রহণ করা জায়েয কিনা? : হযরত সুলায়মান (আঃ) সম্রাজ্ঞী বিলকীসের উপটোকন কবুল করেননি। এ থেকে জানা যায় যে, কাফেরের উপটোকন গ্রহণ করা জায়েয নয় অথবা ভাল নয়। মাসআলা এই যে, কাফেরের উপটোকন গ্রহণ করার মধ্যে যদি নিজের কিংবা মুসলমানদের কোন স্বার্থ বিঘ্নিত হয় কিংবা তাদের পক্ষে মতামত দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে কাফেরের উপটোকন গ্রহণ করা জায়েয নয়। —(রুহুল মা'আনী) হাঁ, যদি উপটোকন গ্রহণ করলে কোন ধর্মীয় উপকার সাধিত হয়; যেমন এর মাধ্যমে কোন কাফের ব্যক্তির মুসলমানদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার অতঃপর মুসলমান হওয়ার আশা থাকে কিংবা তার কোন অনিষ্ট এর মাধ্যমে দূর করা যায়, তবে কবুল করার অবকাশ আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সুনত এ ব্যাপারে এই যে, তিনি কোন কোন কাফেরের উপটোকন কবুল করেছেন এবং কারও কারও প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বোখারীর টীকা ‘উমদাতুল কারী’তে এবং সিয়ারে কবীরের টীকায় হযরত কা’ব ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত আছে যে, বারার ভাই আমার ইবনে মালেক কাফের মুশরিক অবস্থায় কোন প্রয়োজনে মদীনায়া আগমন করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর খেদমতে দু’টি অশু এবং দু’টি বস্ত্রজোড়া উপটোকন হিসেবে পেশ করল। তিনি একথা বলে তার উপটোকন ফিরিয়ে দিলেন যে, আমি মুশরিকের উপটোকন গ্রহণ করি না। আয়ায ইবনে হোমার মাজাশেয়ী তাঁর খেদমতে একটি উপটোকন পেশ করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মুসলমান? সে বলল, না। তিনি তার উপটোকন একথা বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে মুশরিকদের দান গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এর বিপরীতে এরূপ রেওয়াজেতও বিদ্যমান আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন কোন মুশরিকের উপটোকন কবুল করেছেন। বর্ণিত আছে যে, আবু সুফিয়ান মুশরিক অবস্থায় তাঁকে একটি চামড়া উপহার দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং জনৈক খ্রীষ্টান একটি অত্যুজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র উপটোকন হিসেবে পেশ করলে তিনি তা কবুল করেন।

এই রেওয়াজেত উদ্ধৃত করে শামসুল-আয়েম্মা বলেন, আমার মতে কারণ ছিল এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কারও কারও উপটোকন প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে তার ইসলাম গ্রহণের আশা করছিলেন। পক্ষান্তরে কারও কারও উপটোকন গ্রহণ করার মধ্যে তার মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই তার উপটোকন কবুল করেছেন। —(উমদাতুল-কারী)

বিলকীস উপটোকন প্রত্যাখ্যান করাকে নবী হওয়ার আলামত সাব্যস্ত করেছিল। এটা এ কারণে নয় যে, নবীর জন্যে মুশরিকের উপটোকন কবুল করা জায়েয নয়, বরং সে প্রকৃতপক্ষে ঘৃণ্য হিসেবে উপটোকন প্রেরণ করেছিল, যাতে এর মাধ্যমে সে সুলায়মান (আঃ)—এর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে।

সুলায়মান (আঃ)—এর দরবারে বিলকীসের উপস্থিতি : কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়াজেতের বরাত দিয়ে লেখেন, বিলকীসের দূতগণ নিজেরাও ভীত ও হতভম্ব হয়ে প্রত্যাবর্তন করল। সুলায়মান (আঃ)—এর যুদ্ধ ঘোষণার কথা শুনিয়া দিলে বিলকীস তার সম্প্রদায়কে বলল, পূর্বেও আমার এই ধারণাই ছিল যে, সুলায়মান দুনিয়ার সম্রাটদের ন্যায় কোন সম্রাট নন; বরং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে বিশেষ পদমর্যাদাও লাভ করেছেন। আল্লাহর পয়গম্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামান্তর। এরূপ শক্তি আমাদের নেই। একথা বলে সে সুলায়মান (আঃ)—এর দরবারে হাযির হওয়ার প্রস্ততি শুরু করে দিল। বার হাজার সেনাধ্যক্ষকে সাথে নিল, যাদের প্রত্যেকের অধীনে এক লক্ষ করে সৈন্য ছিল। হযরত সুলায়মান (আঃ)—কে আল্লাহ তাআলা এমন প্রতাপ দান করেছিলেন যে, তাঁর দরবারে কেউ প্রথমে কথা বলার সাহস করত না। একদিন তিনি দূরে ধূলিকণা উড়তে দেখে উপস্থিত সভাসদদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? তারা বলল, হে আল্লাহর নবী, সম্রাজ্ঞী বিলকীস সদল-বলে আগমন করেছেন। কোন কোন রেওয়াজেত আছে, যখন সে সুলায়মান (আঃ)—এর দরবার থেকে ফরসখ অর্থাৎ, প্রায় তিন মাইল দূরে ছিল, তখন হযরত সুলায়মান (আঃ) তাঁর সেনাবাহিনীকে সম্মুখন করে বললেন,

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُو الْأَعْيُنَ بِأَيْدِيكُمْ يَوْمَئِذٍ بِعِشْمَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنِي مُسْلِمِينَ

সুলায়মান (আঃ) পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন যে, বিলকীস তাঁর দাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে আত্মসমর্পণ করে আগমন করছে। এমতাবস্থায় তিনি

النمل ৭৮

২৮১

وقال الذين

قَالَ الَّذِينَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ
 أَنْ يَرْسُدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ
 هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْكُفْرِ وَمَنْ
 شَكَرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيَ غَفِيرٌ
 كَرِيمٌ ۝ قَالَ يَبْنَؤُا هَآءِهِمْ أَنْظَرْتَهُمْ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا
 مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۝ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا
 عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ
 كُنَّا مُسْلِمِينَ ۝ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ۝ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ
 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا قَالَ إِنَّهُ
 صَرْحٌ مُتَدَوِّنٌ مِمَّا رِبْدُهُ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَ
 أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَقَدْ أَسْأَلْنَا إِلَى
 نُفُودِ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَآذَاهُمْ فِرَقَنَ
 يُفَضِّلُونَ ۝ قَالَ يَفُورُونَ سَتَجِدُنَآ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ
 الْحِسَّةِ لُزًا سَتَجِدُنَآ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ۝

(৪০) কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সূলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অত্যন্ত কৃপাশীল। (৪১) সূলায়মান বললেন, বিলকীসের সামনে তার সিংহাসনের আকার-আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিশা নেই? (৪২) অতঃপর যখন বিলকীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আমরা আশ্চর্য হয়ে গেছি। (৪৩) আল্লাহ্র পরিবর্তে সে যার এবাদত করত, সেই তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল। নিশ্চয় সে কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। (৪৪) তাকে বলা হল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সূলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলকীস বলল, যে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সূলায়মানের সাথে বিশৃঙ্খল জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্র কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। (৪৫) আমি সামুদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সালেহকে এই মর্মে প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহ্র এবাদত কর। অতঃপর তারা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হল। (৪৬) সালেহ বললেন, যে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কল্যাণের পূর্বে দ্রুত অকল্যাণ কামনা করছ কেন? তোমরা আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না কেন? সম্ভবতঃ তোমরা দয়ালুও হবে।

ইচ্ছা করলেন যে, সে রাজকীয় শক্তি ও শান-শওকতের সাথে একটি পয়গম্বরসুলভ মু'জ্জিয়াও প্রত্যক্ষ করুক। এটা তার বিশ্বাস স্থাপনে অধিক সহায়ক হবে। সূলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা জিন বশীভূত রাখার সাধারণ মু'জ্জিয়া দান করেছিলেন। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাআলার ইঙ্গিত পেয়ে তিনি ইচ্ছা করলেন যে, বিলকীসের এখানে শৌহার পূর্বেই তার সিংহাসন কোনরূপে এখানে শৌহা দরকার। তাই পারিষদবর্গকে (তাদের মধ্যে জিনও ছিল) সম্বোধন করে এই সিংহাসন নিয়ে আসার জন্য বলে দিলেন। বিলকীসের সমস্ত ধন-সম্পদের মধ্য থেকে রাজকীয় সিংহাসনকে বেছে নেয়াও সম্ভবতঃ এ কারণে ছিল যে, এটাই তার সর্বাধিক সংরক্ষিত বস্তু ছিল। সিংহাসনটি সাতটি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি সুরক্ষিত মহলে তালাবদ্ধ অবস্থায় ছিল। বিলকীসের আপন লোকেরাও সেখানে গমন করত না। দরজা ও তাল না ভেঙ্গে সেটা বেহাত হয়ে যাওয়া এবং এত দূরবর্তী স্থানে শৌহা যাওয়া আল্লাহ্ তাআলার অগাধ শক্তি বলেই সম্ভবপর ছিল। এটা বিলকীসের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার অপরিমিত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপনের বিরাট উপায় হতে পারত। এর সাথে এ বিশ্বাসও অবশ্যস্বাভাবী ছিল যে, সূলায়মান (আঃ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই কোন বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। ফলে তাঁর হাতে এমন অলৌকিক বিষয়াদি প্রকাশ লাভ করেছে।

এর — মুসলিম শব্দটি — قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنِي مُسْلِمِينَ

বহুবচন। এর আভিধানিক অর্থ অনুগত, আত্মসমর্পণকারী। পরিভাষায় ঈমানদারকে মুসলিম বলা হয়। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আত্মসমর্পণকারী, অনুগত। কারণ, তখন সম্রাজ্ঞী বিলকীসের ইসলাম গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং সে হযরত সূলায়মান (আঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করার পর মুসলমান হয়েছিল। কোরআনের পরবর্তী আয়াতের ভাষা থেকে তাই বোঝা যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অর্থঃ, যার কাছে কিতাবের قَالَ الَّذِينَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ

জ্ঞান ছিল, সে বলল। এই ব্যক্তি কে? এ সম্পর্কে এক সম্ভাবনা যে, স্বয়ং সূলায়মান (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্র কিতাবের সর্বাধিক জ্ঞান তাঁরই ছিল। এমতাবস্থায় গোটা ব্যাপারটিই একটা মু'জ্জিয়া এবং বিলকীসকে পয়গম্বরসুলভ মু'জ্জিয়া দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই এ ব্যাপারে আপত্তির কোন কিছু নেই। কিন্তু কাতাদা প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে ইবনে জরীর বর্ণনা করেন এবং কুরতুবী একেই অধিকাংশের উক্তি সত্যব্যস্ত করেছেন যে, এই ব্যক্তি সূলায়মান (আঃ)-এর একজন সহচর ছিল। ইবনে ইসহাক তার নাম আসিফ ইবনে বারখিয়া বর্ণনা করেছেন। তিনি সূলায়মান (আঃ)-এর বন্ধু ছিলেন এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে তাঁর খালাত ভাই ছিলেন। তিনি ইসমে আযম জানতেন। ইসমে আযমের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা উচ্চারণ করে যে দোয়াই করা হয়, তা কবুল হয় এবং যাই চাওয়া হয়, তাই পাওয়া যায়। এ থেকে জরুরী নয় যে, সূলায়মান (আঃ) ইসমে আযম জানতেন না। কেননা, এটা অবাস্তব নয় যে, সূলায়মান (আঃ) তাঁর এই মহান কীর্তি তাঁর উম্মতের কোন ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হওয়ায় অধিক উপযোগী মনে করেছেন। ফলে বিলকীসকে তা আরও বেশী প্রভাবিত করবে। তাই নিজে এই কাজ করার পরিবর্তে সহচরদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন — اِكْرِمُوْنِي

হেকাম) এমতাবস্থায় এই ঘটনা আসিফ ইবনে বারখিয়ার কারামত হবে।

মু'জ্জেযা ও কারামতের মধ্যে পার্থক্য : প্রকৃত সত্য এই যে, মু'জ্জেযার মধ্যে স্বভাবগত কারণাদির কোন দখল থাকে না ; বরং এটা সরাসরি আল্লাহ তাআলার কাজ। কোরআন পাকে বলা হয়েছে—

وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَكَرَّ اللَّهُ رُكْبَى - কারামতের অবস্থাও

হুবহু তদ্রূপ। এতেও স্বভাবগত কারণাদির কোন দখল থাকে না ; বরং সরাসরি আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে কোন কাজ হয়ে যায়। মু'জ্জেযা ও কারামত—এ উভয়টিরই প্রকাশ ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যদি কোন আলৌকিক কাজ ওহীর অধিকারী পয়গম্বরের হাতে প্রকাশ পায়, তবে তাকে মু'জ্জেযা বলা হয়। পক্ষান্তরে এরূপ কাজই নবী ব্যতীত অন্য কারও হাতে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। আলোচ্য ঘটনায় যদি এই রেওয়াজেত সহীহ হয় যে, বিলকীসের সিংহাসন আনার কাজটি সূলায়মান (আঃ)—এর সহচর আসিফ ইবনে বারখিয়ার হাতে সম্পন্ন হয়েছে, তবে একে কারামত বলা হবে। প্রত্যেক ওলীর গুণাবলী তাঁর পয়গম্বরের গুণাবলীর প্রতিবিম্ব এবং তাঁর কাছ থেকেই অর্জিত হয়ে থাকে। তাই উম্মতের ওলীদের হাতে যেসব কারামত প্রকাশ পায়, সেগুলো পয়গম্বরের মু'জ্জেযারূপে গণ্য হয়ে থাকে।

বিলকীসের সিংহাসন আনয়নের ঘটনা কারামত না তাসাররুফ : শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী একে আসিফ ইবনে বারখিয়ার তাসাররুফ সাব্যস্ত করেছেন। পরিভাষায় তাসাররুফের অর্থ কম্পনা ও দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ করে বিস্ময়কর কাজ প্রকাশ করা। এর জন্যে নবী, ওলী এমন কি মুসলমান হওয়াও শর্ত নয়। এটা মেসমেরিজমের অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া। সুফী ব্যুর্গগণ মুরীদদের সংশোধনের নিমিত্ত মাঝে মাঝে এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগান। ইবনে আরাবী বলেন, পয়গম্বরের তাসাররুফের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। তাই হযরত সূলায়মান (আঃ) এ কাজে আসিফ ইবনে বারখিয়াকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোরআন পাক

এই তাসাররুফকে عَلَّمَنَّ الْكِتَابَ (কিতাবের জ্ঞান) - এর ফলশ্রুতি বলেছে। এতে এই অর্থই অগ্রগণ্য হয় যে, এটা কোন দোয়া অথবা ইসমে আয়মের ফল ছিল, যার তাসাররুফের সাথে কোন সম্পর্ক নেই; বরং এটা কারামতেরই সমার্থবোধক।

أَنَا إِلَٰهِيكَ بِهَ قَبْلَ أَنْ تَرْتَعَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ - আমি এই সিংহাসন

চোখের পলক মারার আগেই এনে দেব—আসিফের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, কাজটি তাঁর নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা দ্বারা হয়েছে। এটা তাসাররুফের আলামত। কেননা, কারামত ওলীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এই সন্দেহের জওয়াব এই যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তাআলা তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করলে আমি একাজ এত দ্রুত করে দেব।

সূলায়মান (আঃ)—এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? এতটুকু বর্ণনা করেই উল্লেখিত আয়াতসমূহে বিলকীসের কাহিনী সমাপ্ত করা হয়েছিল যে, সূলায়মান (আঃ)—এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেল। এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কোরআন পাক নিশ্চুপ। এ কারণেই জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উয়য়নাকে জিজ্ঞেস করল, সূলায়মান (আঃ)—এর সাথে বিলকীসের বিবাহ হয়েছিল কি? তিনি বললেন, তার ব্যাপার وَاسْتَمْتَّ مَعَهُ سُلَيْمَانُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ, কোরআন এ পর্যন্ত তার অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা পরিত্যাগ করে দিয়েছে। অতএব, আমাদের এ বিষয়ে খোঁজ নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইবনে আসাকির হযরত ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেন যে, এরপর হযরত সূলায়মান (আঃ)—এর সাথে বিলকীস পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যান এবং তাকে তার রাজত্ব বহাল রেখে ইয়ামনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রতি মাসে হযরত সূলায়মান (আঃ) সেখানে গমন করতেন এবং তিন দিন অবস্থান করতেন। হযরত সূলায়মান (আঃ) বিলকীসের জন্যে ইয়ামনে তিনটি নজিরবিহীন ও অনুপম প্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন বলেও বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে।

النمل

২৮২

وَقَالَ الَّذِينَ

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالُوا الْكَيْدَ نَابِكِ وَيَسَنَ مَعَكَ قَالَ طَئِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ
 أَنْتُمْ قَوْمٌ مُقْتَنُونَ ۝ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ شَجَاعٌ يُطِيسِدُونَ
 فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصَيِّحُونَ ۝ قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا آلِهَتِنَا اللَّهُ لَتُنَزِّلَنَّ
 أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَحْكُمَنَّ ۝ وَلِيْلَهُ مَا شَهِدْنَا مَعَكَ أَهْلَهُ وَآلَا الصُّرُفُونَ
 وَمَكْرُؤًا مَسْكُورًا وَمَكْرُؤًا مَسْكُورًا ۝ كَانُوا يَنْظُرُونَ ۝ كَانُوا يَنْظُرُونَ
 كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنْ آدَمُ مَرْتَمَهُمْ وَقَوْمُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ فَنَزَلَ
 إِلَهُهُمْ خَاوِيَةً بَنَاءً ظَلَمُوا ۝ أَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝
 وَاجْتَبَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ وَلَوْ لَا إِذْ قَالَ
 لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۝ إِنْ كُنْمْ
 لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْبَنَاتِ ۝ أَنْتُمْ قَوْمٌ
 تَحْجَهُونَ ۝ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُو آلَ
 لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِنَا ۝ أَنْهُمْ أَتَّاسٌ يَبْتَغُونَ ۝ فَانْجَيْنَاهُ
 أَهْلَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ ۝ فَذَرْنَاهُمْ مِنَ الْغَيْرِ ۝ وَأَمْطَرْنَا
 عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۝ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۝ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ
 عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ۝ اللَّهُ غَيْرُ الْمُمِشِرِ كُونَ ۝

শব্দে অর্থ দল। এখানে নয় ব্যক্তির মধ্য থেকে প্রত্যেককেই রহু বলায় কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তারা তাদের অর্থ-সম্পদ, জাঁকজমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে সম্প্রদায়ের প্রধানরূপে গণ্য হত এবং প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন দল ছিল। কাজেই এই নয় ব্যক্তিকে নয় দল বলা হয়েছে। তারা ছিল হিব্রু জনপদের প্রধান। হিব্রু শামদেশের একটি স্থানের নাম।

لَتُنَزِّلَنَّ أَهْلَهُ ثُمَّ لَنَحْكُمَنَّ ۝ وَلِيْلَهُ مَا شَهِدْنَا مَعَكَ أَهْلَهُ وَآلَا الصُّرُفُونَ

উদ্দেশ্য এই যে, আমরা সবাই মিলে রাতের অন্ধকারে তার উপর ও তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর উপর হানা দেব এবং সবাইকে হত্যা করব। এরপর তার হত্যার দাবীদার তদন্ত করলে আমরা বলে দেব, আমরা তো তাকে হত্যা করিনি এবং কাউকে হত্যা করতেও দেখিনি। একথাই আমরা সত্যবাদী গণ্য হব। কারণ, রাতের অন্ধকারে কে কাকে মেরেছে, তা আমরা নির্দিষ্ট করে জানবো না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কাফেরদের এই স্বনামখ্যাত বাছাই করা বদমায়েশরা কুফর, শিরক, হত্যা ও লুণ্ঠনের অপরাধ নির্বিবাদে করে যাচ্ছে কোন চিন্তা ছাড়াই; কিন্তু এখানে এ চিন্তা তারাও করেছে যে, তারা যেন মিথ্যা না বলে এবং যেন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হয়। এ থেকে অনুমান করুন যে, মিথ্যা কত বড় গোনাহ। বড় বড় অপরাধীরাও আত্মসম্মান রক্ষার্থে মিথ্যা বলত না। আয়াতে দ্বিতীয় প্রশ্নাধিকারযোগ্য বিষয় এই যে, যে ব্যক্তিকে তারা সালেহ্ (আঃ)—এর ওলী তথা দাবীদার বলেছে, সে তো সালেহ্ (আঃ)—এরই পরিবারভূক্ত ছিল। তাকে তারা হত্যা তালিকার বাইরে কেন রাখল? জওয়াব এই যে, সম্ভবতঃ সে পারিবারিক দিক দিয়ে ওলী ছিল। কিন্তু কাফের ছিল এবং কাফেরদের সাথে সংঘর্ষ ছিল। সালেহ্ (আঃ) ও তাঁর স্বজনদের হত্যার পর সে বংশগত সম্পর্কের কারণে খুনের বদলা দাবী করবে। এটাও সম্ভবপর যে, সে মুসলমান ছিল, কিন্তু প্রভাংশালী হওয়ার কারণে তাকে হত্যা করলে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দিত। তাই তাকে বাদ দেয়া হয়েছে।

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই বাক্যে রসুলে করীম (সাঃ)—কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। কারণ, আপনার উম্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আযাব থেকে নিরাপদ করে দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরও আল্লাহ্ র মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন। অধিকাংশ তফসীরবিদ এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। কারও কারও মতে এই বাক্যটিও লুত (আঃ)—কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আয়াতে الَّذِينَ اصْطَفَى বাক্যে বাহ্যতঃ পয়গম্বরগণকেই বোঝানো হয়েছে; যেমন অন্য আয়াতে وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ বলা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এখানে সাহাবায়ে কেলাম (রাঃ)—কে বোঝানো হয়েছে। সুফিয়ান সওরী এ মতই গ্রহণ করেছেন।

আয়াতে الَّذِينَ اصْطَفَى বলে সাহাবায়ে কেলামকে বোঝানো হলে এই আয়াত দ্বারা পয়গম্বরগণ ছাড়া অন্যদেরকে সালাম বলার জন্যে ‘আলাইহিস সালাম’ বলার বৈধতা প্রমাণিত হয়। সূরা আহযাবের صَلَوَاتُ عَلَیْهِ وَسَلَامٌ আয়াতের তফসীরে ইনশাআল্লাহ তাআলা এ

(৪৭) তারা বলল, ‘তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে আমরা অকল্যাণের প্রতীক মনে করি।’ সালেহ্ বলেনল, ‘তোমাদের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহর কাছে, বরং তোমরা এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। (৪৮) আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশময় অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াইত এবং সংশোধন করত না। (৪৯) তারা বলল, ‘তোমরা পরস্পরে আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাকে ও তার পরিবারবর্গকে হত্যা করব। অতঃপর তার দাবীদারকে বলে দেব যে, তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ করিনি। আমরা নিশ্চয়ই সত্যবাদী। (৫০) তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক চক্রান্ত করেছিলাম। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। (৫১) অতঃপর, দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণাম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নেস্তানামুদ করে দিয়েছি। (৫২) এই তো তাদের বড়ীয়র—তাদের অবিশ্বাসের কারণে জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিশ্চয় এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে নির্দশন আছে। (৫৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং পরহেযগার ছিল, তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। (৫৪) স্মরণ কর লুতের কথা, তিনি তাঁর কণ্ঠকে বলেছিলেন, তোমরা কেন অঙ্গীল কাজ করছ? অথচ এর পরিণতির কথা তোমরা অবগত আছ। (৫৫) তোমরা কি কামতপ্তির জন্য নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক বর্বর সম্প্রদায়। (৫৬) উত্তরে তাঁর কণ্ঠ শুধু এ কথাটিই বললো, ‘লুত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের কর দাও। এরা তো এমন লোক যারা শুধু পাকপবিত্র সাজতে চায়। (৫৭) অতঃপর তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম তাঁর স্ত্রী ছাড়া। কেননা, তার জন্যে ধ্বংসপ্রাপ্তদের ভাগ্যই নির্ধারিত করেছিলাম। (৫৮) আর তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম মুসলধারে বৃষ্টি। সেই সতর্কত্বদের উপর কতই না মারাত্মক ছিল সে বৃষ্টি। (৫৯) বল, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি। শ্রেষ্ঠ কে! আল্লাহ্, না ওরা—তারা যাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে।

النمل ২৫

৩৪২

امن خلق ২

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبًا وَنُفُوسًا
لَمُعْرَجُونَ ۖ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن
قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ قُلْ سِيرُوا
فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَلٰٓئٍ مِّمَّا يَكْفُرُونَ ۝
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ
عَلَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي سَتَعْلَمُونَ ۝
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِن أَكْثَرُهُمْ لَا
يَشْكُرُونَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا
يُعْلِنُونَ ۝ وَمِمَّا نَزَّلْنَا فِي التَّوْرَةِ الْآيَاتُ
كُتِبَ فِيهَا تَمِيمٌ ۖ وَإِن هَذَا الْقُرْآنُ يَقْضَىٰ عَلَىٰ سِنَىٰ
إِسْرَآءِيلَ أَكْثَرُ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ وَإِنَّ
لَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ
يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝
فَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝

(৬৭) কাফেররা বলে, যখন আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা মৃত্তিকা হয়ে যাব, তখনও কি আমাদেরকে পুনরুজ্জিত করা হবে? (৬৮) এই ওয়াদাপ্রাপ্ত হয়েছি আমরা এবং পূর্ব থেকেই আমাদের বাপ-দাদারা। এটা তো পূর্ববর্তীদের উপকথা বৈ কিছু নয়। (৬৯) বলুন, পৃথিবী পরিভ্রমণ কর এবং দেখ অপরাধীদের পরিশ্রুতি কি হয়েছে। (৭০) তাদের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করেছে এতে মনঃক্ষুব্ধ হবেন না। (৭১) তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এই ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে? (৭২) বলুন, অসম্ভব কি, তোমরা যত দ্রুত কামনা করছ তাদের কিয়দংশ তোমাদের পিঠের উপর এসে গেছে। (৭৩) আপনার পালনকর্তা মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু তাদের অধিকাংশই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৭৪) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে আপনার পালনকর্তা অবশ্যই তা জানেন। (৭৫) আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কোন গোপন ভেদ নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে না আছে। (৭৬) এই কোরআন বনী ইসরাঈল যেসব বিষয়ে মতবিরোধ করে, তার অধিকাংশ তাদের কাছে বর্ণনা করে। (৭৭) এবং নিশ্চিতই এটা মুমিনদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। (৭৮) আপনার পালনকর্তা নিজ শাসনক্ষমতা অনুযায়ী তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ। (৭৯) অতএব, আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন।

হয়ে থাকে। এমনভাবে মুসাফির সফর অবস্থায় তার আত্মীয়-স্বজন, শ্রিয়জন ও দরদী স্বজনদের কাছ থেকে পৃথক থাকার কারণে নিঃসহায় হয়ে থাকে। পিতা সন্তানদের জন্যে পিতামূলত স্নেহ-মমতা ও বাৎস্যল্যের কারণে কখনও বদ-দোয়া করতে পারে না, যে পর্যন্ত তার মন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না যায় এবং নিজেকে সত্যিকার বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে আল্লাহকে ডাকে। হাদীসবিদ আজরী হযরত আবু যর (রাঃ)-এর জবাবী রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর উক্তি এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া কখনও রদ করব না, যদিও সে কাফের হয়।—(কুরতুবী) যদি কোন নিঃসহায়, মজলুম; মুসাফির অনুভব করে যে, তার দোয়া কবুল হয়নি, তবে কু-খারগার বশবর্তী ও নিরাশ না হওয়া উচিত। কারণ, মাঝে মাঝে দোয়া কবুল হলেও রহস্য ও উপকারিতাবশতঃ দেহীতে প্রকাশ পায়। অথবা তার উচিত নিজের অবস্থা যাচাই করা যে, তার অখলাস ও আল্লাহর প্রতি মনোযোগে কোন ত্রুটি আছে কিনা।

رَسُولُ اللَّهِ - قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

(সাঃ)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদেরকে বলে দিন, যত মখলুক আকাশে আছে; যেমন ফেরেশতা, যত মখলুক পৃথিবীতে আছে; যেমন মানবজাতি, জিন, জাতি ইত্যাদি—তাদের কেউ গায়বের খবর জানে না, আল্লাহ ব্যতীত। আলোচ্য আয়াত পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে এবং পরিষ্কারভাবে এ কথা ব্যক্ত করেছে যে, গায়ব তথা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণ—এতে কোন ফেরেশতা অথবা নবী-রসূলও শরীক হতে পারে না। এ বিষয়ের জরুরী ব্যাখ্যা সূরা আনআমের ৫৯ আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

بَلْ اَذْكُرْكُمۡ فِي الْاٰخِرَةِ - بَلْ هُمۡ فِي شَكٍّ مِّنۡهَا بَلْ هُمۡ وَتَمٰنَا عَمُونَ

— اَذْكُرْكُ শব্দে বিভিন্ন রূপের কেরাআত আছে এবং অর্থ সম্পর্কেও নানা জনের নানা উক্তি রয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ তফসীরের কিতাবাদিতে এর বিবরণ দেখে নিতে পারেন। এখানে এতটুকু বুঝ নেয়া যথেষ্ট যে, কোন কোন তফসীরকার অَذْكُرْكُ শব্দের অর্থ নিয়েছেন تَكْمِل অর্থাৎ, পরিপূর্ণ হওয়া এবং اَذْكُرْكُ -কে - اَذْكُرْكُ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে আয়াতের অর্থ এই সাব্যস্ত করেছেন যে, পরকালে এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, তখন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ পরিষ্কৃত হয়ে সামনে এসে যাবে। তবে তখনকার জ্ঞান তাদের কোন কাজে লাগবে না। কারণ, দুনিয়াতে তারা পরকালকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করত। পক্ষান্তরে কোন কোন তফসীরকারের মতে اَذْكُرْكُ শব্দের অর্থ ضَل অর্থাৎ, ও غَاب এবং اَذْكُرْكُ -কে - اَذْكُرْكُ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, পরকালের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান উধাও হয়ে গেছে। তারা একে বুঝতে পারেনি।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ ক্ষমতা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত করে সপ্রমাণ করা হয়েছে যে, কেয়ামতের বাস্তবতা এবং তাতে মৃতদের পুনরুজ্জীবন যুক্তির নিরিখে সম্ভবপর। এতে কোন যুক্তিগত জটিলতা নেই। যৌক্তিক সম্ভাব্যতার সাথে এর অবশ্যপ্রাপ্ত বাস্তবতা পয়গম্বরগণের ও এশী কিতাবাদির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতার উপর সংবাদের বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য হওয়া নির্ভরশীল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, এর সংবাদদাতা কোরআন এবং কোরআনের সত্যবাদিতা অনস্বীকার্য। এমন কি, বনী-ইসরাঈলের

إِنَّكَ لَأَشْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا
وَكُنَّا مُذْذِرِينَ ۝ وَمَا أَنتَ بِهَادٍ الْعَمَىٰ عَنْ صُلُبِهِمْ
إِنَّ تُسْمِعُ الْأَمَنَ يُؤْمِنُ يَا أَيُّهَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝ وَ
إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ
تُكَلِّمُهُم أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا الْأُولَىٰ ۝ وَ
يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ
بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ وَكُنْتُمُ
بِآيَاتِنَا وَكَمْ تَحِيظُونَ ۝ إِذَا جَاءُوكَ فَكَلِّمُوا
وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَنُّوا فَهُمْ كَاطِعُونَ ۝
الْحَيُّوْا أَجْعَلْنَا الْبَيْتَ لِبَيْتِكُمْ أَفِيءَ وَهُوَ أَتَوْا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَيَوْمَ يُنْفَخُ
فِي الصُّورِ فَتُفْرِعَ مِنَ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا أَمَنَ سَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ ذَخِيرًا ۝ وَتَرَى الْجِبَالِ
تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ تَدُورُ مَدَارًا ۝ وَتَرَى الْوُجُوهَ
الَّذِينَ اتَّقَوْا كُلَّ شَيْءٍ رَّأَتْهُ خَيْرًا بِمَا تَفْعَلُونَ ۝

(৮০) আপনি আহ্বান শোনাতে পারবেন না মৃতদেরকে এবং বধিরকেও নয়, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (৮১) আপনি অন্ধদেরকে তাদের পঞ্চভট্টতা থেকে ফিরিয়ে সংপথে আনতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরকে শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। অতএব, তারাই আত্মবাহ। (৮২) যখন প্রতিশ্রুতি (কেয়ামত) সমাগত হবে, তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। এ কারণে যে, মানুষ আমার নির্দর্শনসমূহে বিশ্বাস করত না। (৮৩) যেদিন আমি একত্রিত করব একেকটি দলকে সেসব সম্প্রদায় থেকে, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত; অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে। (৮৪) যখন তারা উপস্থিত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিলে? অথচ এগুলো সম্পর্কে তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। না তোমরা অন্য কিছু করেছিলে? (৮৫) জুলুমের কারণে তাদের কাছে আযাবের ওয়াদা এসে গেছে। এখন তারা কোন কিছু বলতে পারবে না। (৮৬) তারা কি দেখে না যে, আমি রাত্রি সৃষ্টি করেছি তাদের বিশ্রামের জন্যে এবং দিনকে করেছি আলোকময়। নিশ্চয় এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে নির্দর্শনাবলী রয়েছে। (৮৭) যেদিন সিক্রায় ফুৎকার দেওয়া হবে, অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা সবাই ভীতবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়। (৮৮) ভূমি পর্বতমালাকে দেখে অচল মনে কর, অথচ সেদিন এগুলো মেঘমালায় মত চলমান হবে। এটা আল্লাহর কারিগরী, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছ, তিনি তা অবগত আছেন।

আলেমদের মধ্যে যেসব বিষয়ে কঠোর মতবিরোধ ছিল এবং যার মীমাংসা ছিল সুদূরপরাহত, কোরআন পাক সেসব বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশুদ্ধ ফয়সালার পথ নির্দেশ করেছে। বলাবাহুল্য, যে আলেমদের মতবিরোধে বিচার-বিশ্লেষণ ও ফয়সালা করে তার সর্বাধিক জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ হওয়া নেহায়েত জরুরী। এতে বোঝা গেল যে, কোরআন সর্বাধিক জ্ঞান-সম্পন্ন এবং সত্যবাদী সংবাদদাতা। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবার জন্যে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদের বিরোধিতায় মনঃক্ষণ হবেন না। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আপনার ফয়সালা করবেন। আপনি আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। কেননা, আল্লাহ সত্যকে সাহায্য করেন এবং আপনি যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তা নিশ্চিত।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সমগ্র মানব জাতির প্রতি রসুলে করীম (সাঃ)-এর স্নেহ, মমতা ও সহানুভূতির অন্ত ছিল না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, তিনি সবাইকে আল্লাহর পয়গাম শুনিয়ে জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করে নেবেন। কেউ তাঁর এই পয়গাম কবুল না করলে তিনি নিদারুণ মর্মবেদনা অনুভব করতেন এবং এমন দুঃখিত হতেন, যেমন কারও সন্তান তার কথা অমান্য করে অগ্নিতে ঝাপ দিতে যাচ্ছে। তাই কোরআন পাক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাহাবা প্রদান করেছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে *وَلَا تَحْزَنْ* এবং *وَأَكْثَرُكَ فِي صَبْرِ* বাক্যসমূহ এই সাহাবা প্রদান সম্পর্কিত শিরোনামই ছিল। আলোচ্য আয়াতেও সাহাবার বিষয়বস্ত্ত বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনি সত্যের পয়গাম পৌছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। যারা এই পয়গাম কবুল করেনি, তাতে আপনার কোন দোষ ও ত্রুটি নেই, যদ্বন্ধন আপনি দুঃখিত হবেন; বরং তারা কবুল করার যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের যোগ্যতাহীনতাকে তিনটি উদাহরণ দ্বারা সপ্রমাণ করা হয়েছে। (এক) তারা সত্য কবুল করার ব্যাপারে পুরোপুরি মৃতদেহের অনুরূপ। মৃতদেহ কারও কথা শুনে লাভবান হতে পারে না। (দুই) তাদের উদাহরণ বধিরের মত, যে বধির হওয়ার সাথে সাথে শুনতেও অনিচ্ছুক। কেউ তাকে কিছু শোনাতে চাইলে সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে। (তিন) তারা অন্ধের মত। অন্ধকে কেউ পথ দেখাতে চাইলেও সে দেখতে পারে না। এই তিনটি উদাহরণ বর্ণনা করার পর পরিশেষে বলা হয়েছে:

إِنَّ تُسْمِعُ الْأَمَنَ يُؤْمِنُ يَا أَيُّهَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ — অর্থাৎ, আপনি

তো কেবল তাদেরকে শোনাতে পারেন, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে এবং আনুগত্য গ্রহণ করে। এই পূর্ণ বিষয়বস্ত্তর মধ্যে এটা সুস্পষ্ট যে, এখানে শোনা ও শোনানোর অর্থ নিছক কানে অওয়াজ পৌছানয়; বরং এর অর্থ এমন শোনা, যা ফলপ্রদ হয়। যে শ্রবণ ফলপ্রদ নয়, কোরআন উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে তাকে বধিরতারূপে ব্যক্ত করেছে। আপনি শুধু তাদেরকেই শোনাতে পারেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে—আয়াতের এই বাক্য যদি শোনানোর অর্থ কেবল কানে আওয়াজ পৌছানোই হত, তবে কোরআনের এই উক্তি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা বিরোধী হয়ে যেত। কেননা, কাকেরদের কানে আওয়াজ পৌছানো এবং তাদের শ্রবণ ও জ্ঞপ্তি দেয়ার প্রমাণ অসংখ্য। কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না। এ থেকে বোঝা গেল যে, এখানে ফলদায়ক শ্রবণ বোঝানো হয়েছে। তাদেরকে মৃতদেহের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। এর অর্থও এই যে, মৃতরা যদি কোন সত্য কথা শুনেও ফেলে এবং তখন তা কবুলও করতে চায়, তবে

এটা তাদের জন্যে উপকারী নয়। কেননা, তারা দুনিয়ার কর্মক্ষেত্র অতিক্রম করে চলে গেছে। এখানে ঈমান ও কর্ম উপকারী হতে পারত। মৃত্যুর পর বরযখ ও হাশরের ময়দানে তো সব কাফেরই ঈমান ও সংকর্মের বাসনা প্রকাশ করবে, কিন্তু সেটা ঈমান ও কর্ম গৃহীত হওয়ার সময় নয়। কাজেই আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, মৃতরা কারও কোন কথা শুনতেই পারে না। প্রকৃতপক্ষে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে এই আয়াত নিশ্চুপ। মৃতরা কারও কথা শুনতে পারে কিনা, এটা স্বস্থানে লক্ষণীয় বিষয় বটে।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা : সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যেসব বিষয়ে পরস্পর মতভেদ করেছেন, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি সেগুলোর অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) মৃতদের শ্রবণ প্রামাণ্য সাব্যস্ত করেন। হযরত উস্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) এর বিপরীত বলেন যে, মৃতরা শ্রবণ করতে পারে না। এ কারণেই অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়ীও দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। কোরআন পাকে প্রথমতঃ এই সূরা নামলে এবং দ্বিতীয়তঃ সূরা রুমে প্রায় একই ভাষায় এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সূরা ফাতেরে বিষয়টি এভাবে বিধৃত হয়েছে :

وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ — অর্থাৎ, যারা কবরস্থ হয়ে গেছে,

তাদেরকে আপনি শোনাতে পারবেন না।

উক্ত আয়াতত্রয়ে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোন আয়াতেই এরূপ বলা হয়নি যে, মৃতরা শুনতে পারবে না; তিনটি আয়াতেই বলা হয়েছে যে, মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না। তিনটি আয়াতেই এভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা থাকতে পারলেও আমরা নিজেদের ক্ষমতাবলে তাদেরকে শোনাতে পারি না।

এই আয়াতত্রয়ের বিপরীতে শহীদদের সম্পর্কে একটি চতুর্থ আয়াত একথা প্রমাণ করে যে, শহীদগণ তাদের কবরে বিশেষ এক প্রকার জীবন লাভ করেন এবং সে জীবন উপযোগী জীবনোপেক্ষণও তারা প্রাপ্ত হন। তাঁদের জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সুসংবাদ শোনানো হয়। আয়াত এই :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِهِمْ أَتْلُوكُمُوهُمْ وَأَنذَرْتَهُمْ

يُرَدُّونَ فِي حَيَاتِهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَذُكِّرُوا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا حَافِظَةٌ وَلَا يُذَكَّرُونَ

يَلْعَنُوا لَهُمْ مِنْ حَقِّهِمْ أَكْثَرُ عَلَيْهِمْ وَأَكْثَرُ لَهُمْ جَزَاءُ

এই আয়াত এ বিষয়ের প্রমাণ যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকতে পারে। শহীদদের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতার সাক্ষ্যও এই আয়াত দিচ্ছে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো বিশেষভাবে শহীদদের জন্যে প্রযোজ্য—সাধারণ মৃতদের জন্যে নয়, তবে এর জওয়াব এই যে, এই আয়াত দ্বারা কমপক্ষে এতটুকু তো সপ্রমাণ হয়েছে যে, মৃত্যুর পরেও মানবাত্মার মধ্যে চেতনা, অনুভূতিও এ জগতের সাথে সম্পর্ক বাকী থাকতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা শহীদদেরকে যেমন এই মর্যাদা দান করেছেন যে, তাঁদের আত্মার সম্পর্ক দেহ ও কবরের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি আল্লাহ্ তাআলা যখন ইচ্ছা করবেন, অন্যান্য মৃতকেও এই সুযোগ দিতে পারবেন। মৃত ব্যক্তিরও শ্রবণ করার ক্ষমতা থাকতে পারে, এই মতের প্রবক্তা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের উক্তিও একটি সহীহ হাদীসের উরূপ ভিত্তিশীল। হাদীস এই :

مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيَسْلَمُ

عَلَيْهِ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ .

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পরিচিত কোন মুসলমান ভাইয়ের কবরের কাছ দিয়ে গমন করে, অতঃপর তাকে সালাম করে, আল্লাহ্ তাআলা সেই মৃত মুসলমানের আত্মা তার মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়ে দেন, যাতে সে সালামের জওয়াব দেয়।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি তার মৃত মুসলমান ভাইয়ের কবরে গিয়ে সালাম করলে সে তার সালাম শোনে এবং জওয়াব দেয়। এটা এভাবে হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা তখন তার আত্মা দুনিয়াতে ফেরত পাঠিয়ে দেন। এতে দুটি বিষয় প্রমাণিত হল। (এক) মৃতরা শুনতে পারে এবং (দুই) তাদের শোনা এবং আমাদের শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়। বরং আল্লাহ্ তাআলা যখন ইচ্ছা করেন, শুনিয়ে দেন। এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, মুসলমানের সালাম করার সময় আল্লাহ্ তাআলা মৃতের আত্মা ফেরত এনে সালাম শুনিয়ে দেন এবং তাকে সালামের জওয়াব দেয়ার শক্তি দান করেন। এছাড়া অন্যান্য অবস্থা ও কথাবার্তা সম্পর্কে অকটি ফয়সালা করা যায় না যে, মৃতরা সেগুলো শোনবে কিনা। তাই ইমাম গাযালী ও আল্লামা সুবকী প্রমুখের সূচিভিত্তি অভিমত এই যে, সহীহ হাদীস ও উপরোক্ত আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত যে, মাঝে মাঝে মৃতরা জীবিতদের কথা-বার্তা শোনে, কিন্তু এর কোন প্রমাণ নেই যে, প্রত্যেক মৃত সর্বাবস্থায় প্রত্যেকের কথা অবশ্যই শোনে। এভাবে আয়াত ও রেওয়াজেতসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। এটা সম্ভবপর যে, মৃতরা একসময়ে জীবিতদের কথাবার্তা শোনে এবং অন্য সময় শোনতে পারে না। এটাও সম্ভব যে, কতক লোকের কথা শোনে এবং কতক লোকের কথা শোনে না, অথবা কতক মৃত শোনে এবং কতক মৃত শোনে না। কেননা, সূরা নমল, সূরা রুম ও সূরা ফাতেরের আয়াত দ্বারাও একথা প্রমাণিত যে, মৃতদেরকে শোনানো আমাদের ক্ষমতাধীন নয়; বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা শুনিয়ে দেন। তাই যে যে ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস দ্বারা শ্রবণ প্রমাণিত আছে, সেখানে শ্রবণের বিশৃঙ্খল রাখা দরকার এবং যেখানে প্রমাণিত নেই, সেখানে উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে—অকটিয়ারূপে শোনে বলারও অবকাশ নেই এবং শোনে না বলারও সুযোগ নেই।

ভূগর্ভের জীব কি, কোথায় এবং কবে নির্গত হবে : মুসনাদে আহমদে হযরত হুযায়ফা (রাঃ)—এর বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে পর্যন্ত দশটি নিদর্শন প্রকাশ না পায়, সে পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না। (১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া, (২) ধূম নির্গত হওয়া, (৩) অদ্ভুত একটি জীবের আবির্ভাব হওয়া, (৪) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হওয়া, (৫) ঈসা (আঃ)—এর অবতরণ, (৬) দাঙ্গাল, (৭) তিনটি চন্দ্র গ্রহণ—(এক) পশ্চিম, (দুই) পূর্বে এবং (তিন) আরব উপদ্বীপে; (৮) এক অগ্নি, যা আদন থেকে নির্গত হবে এবং সব মানুষকে হাকিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবে। মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্যে অবস্থান করবে, অগ্নিও সেখানে থেমে যাবে। এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে। ۱. ۱. শব্দের তিন-এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জন্তুটি অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট হবে। আরও জানা যায় যে, এই জীবটি সাধারণ জন্তুদের প্রজনন প্রক্রিয়া মোতাবেক জন্মগ্রহণ করবে না; বরং অকস্মাৎ ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। এই হাদীস থেকে একথাও বোঝা যায় যে, এই আবির্ভাব কেয়ামতের

সর্বশেষ আলামতসমূহের অন্যতম। এরপর অনতিবিলম্বেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। ইবনে কাসীর আবু দাউদ তায়ালিসির বরাতে দিয়ে হযরত তালহা ইবনে-ওমরের এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেন যে, ভূগর্ভের এই জীব মক্কার সাফা পর্বত থেকে নির্গত হবে। সে মশকের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে মসজিদে-হারামে কৃষ্ণ প্রস্তর ও মকামে ইব্রাহীমের মাথখানে পৌছে যাবে। মানুষ একে দেখে পালাতে থাকবে। একদল লোক সেখানেই থেকে যাবে। এই জন্তু তাদের মুখমণ্ডল তারকার ন্যায় উজ্জ্বল করে দেবে। এরপর সে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করবে এবং প্রত্যেক কাফেরের মুখমণ্ডলে কুফরের চিহ্ন ঐকে দেবে। কেউ তার নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। সে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরকে চিনবে।—(ইবনে-কাসীর) মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর মুখে একটি অবিস্মরণীয় হাদীস শ্রবণ করেছি। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কেয়ামতের সর্বশেষ আলামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। সূর্য উপরে উঠার পর ভূগর্ভের জীব নির্গত হবে। এই আলামতদ্বয়ের মধ্যে যে-কোন একটি প্রকাশ হওয়ার অব্যবহিত পরেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।—(ইবনে-কাসীর)

শায়খ জামালুদ্দীন মহল্লী বলেন, জীব নির্গত হওয়ার সময় ‘সং কাজে আদেশ ও অসং কাজে নিষেধ’—এর বিধান বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং এরপর কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করবে না। অনেক হাদীস ও বর্ণনায় এই বিষয়বস্তু পাওয়া যায়।—(মাহহারী) এ স্থলে ইবনে-কাসীর প্রমুখ ভূগর্ভের জীবের আকার-আকৃতি ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। কোরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, এটা একটা কিছুতকিমাকার জীব হবে এবং সাধারণ প্রজনন প্রক্রিয়ার বাইরে ভূগর্ভ থেকে নির্গত হবে। মক্কা মোকাররমায় এর আবির্ভাব হবে, অতঃপর সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করবে। সে কাফের ও মুমিনকে চিনবে এবং তাদের সাথে কথা বলবে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এতটুকু বিষয়ের উপরই বিশ্वास রাখা দরকার। এর অধিক জানানর চেষ্টা করা জরুরী নয় এবং তাতে কোন উপকারও নেই।

ভূগর্ভের জীব মানুষের সাথে কথা বলবে, এর অর্থ কি? এই প্রশ্নের জওয়াবে কেউ কেউ বলেন যে, কোরআনে উল্লেখিত বাক্যটিই হবে তার কথা। অর্থাৎ, **إِنَّ الْكَاسَّ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ** এই বাক্যটি সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শোনাবে। বাক্যের অর্থ এই : অনেক মানুষ আজকের পূর্বে আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করবে না। উদ্দেশ্য এই যে, এখন সে সময় এসে গেছে। এখন সবাই বিশ্বাস করবে। কিন্তু তখনকার বিশ্বাস আইনতঃ ধর্তব্য হবে না। হযরত ইবনে আক্বাস, হাসান বসরী ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে এবং অপর এক রেওয়ায়েতে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এই জীব সাধারণ কথাবার্তার অনুরূপ মানুষের সাথে কথা বলবে।—(ইবনে-কাসীর)

فَقَمَرٌ رُؤُوسُونَ এ শব্দটি **زُوع** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাধা দেয়া। অর্থাৎ, অগ্রবর্তী অংশকে বাধা দান করা হবে, যাতে পেছনে পড়া লোক তাদের সাথে মিলে যায়। কেউ কেউ **زُوع** শব্দের অর্থ নিয়েছেন ঠেলে দেয়া। অর্থাৎ, তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে হাশরের মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে। **وَلَمْ تُبَيِّنْطَرِهَا عَالِمًا** এতে ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ তাআলার আয়াতসমূহে মিথ্যা বলা স্বয়ং একটি গুরুতর অপরাধ ও গোনাহ ; বিশেষতঃ যখন কেউ চিন্তা-ভাবনাও ও বোঝা-শোনার চেষ্টা না করেই

মিথ্যা বলতে থাকে। এমতাবস্থায় এটা দ্বিগুণ অপরাধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায় যে, যারা চিন্তা-ভাবনা করা সত্ত্বেও সত্যের সন্ধান পায় না এবং চিন্তা-ভাবনাই তাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়, তাদের অপরাধ কিছুটা লঘু। তবে তা সত্ত্বেও আল্লাহর অস্তিত্ব ও তওহীদে মিথ্যারোপ করা তাদেরকে কুফর, পথভ্রষ্টতা ও চিরস্থায়ী আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ, এগুলো এমন জাজ্বল্যমান বিষয় যে, এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার আশি ক্কা করা হবে না।

--- **فَنَزَعَ** - **وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَتَنَزَعُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ** শব্দের অর্থ অস্থির ও উদ্ভিগ্ন হওয়া। অন্য এক আয়াতে এ স্থলে **فَزِعَ** শব্দের পরিবর্তে **صَعِقَ** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ অজ্ঞান হওয়া। যদি উভয় আয়াতকে সিদ্ধার প্রথম ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উভয় শব্দের সারমর্ম হবে এই যে, সিদ্ধার ফুৎ দেয়ার সময় প্রথমে সবাই অস্থির উদ্ভিগ্ন হবে, এরপর অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং অবশেষে মরে যাবে। কাতাদাহ প্রমুখ তফসীরকার এই আয়াতকে দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যারপর সকল মৃত পুনরুজ্জীবন লাভ করবে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সবাই জীবিত হওয়ার সময় ভীতিবিহ্বল অবস্থায় উদ্ভিত হবে। কেউ কেউ বলেন যে, তিন বার সিদ্ধার ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারে সবাই অস্থির হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ফুৎকারে অজ্ঞান হয়ে মরে যাবে এবং তৃতীয় ফুৎকারে হাশর-নশর কায়ম হবে এবং সকল মৃত জীবিত হয়ে যাবে। কিন্তু কোরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস থেকে দুই ফুৎকারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।—(কুরতুবী, ইবনে-কাসীর) ইবনে মোবারক হাসান বসরী (রাঃ) থেকে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, উভয় ফুৎকারের মাথখানে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে।—(কুরতুবী)

উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের সময় কিছুসংখ্যক লোক ভীতিবিহ্বল হবে না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)—এর এক হাদীসে আছে যে, তাঁরা হবেন শহীদ। হাশরে পুনরুজ্জীবন লাভের সময় তাঁরা মোটেই অস্থির হবেন না।—(কুরতুবী) সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেছেন যে, তাঁরা হবেন শহীদ। তাঁরা হাশরের সময় তরবারি ঝাণ্ডা অবস্থায় আরশের চারি পার্শ্বে সমবেত হবেন। কুশায়রী বলেন, পয়গম্বরগণ আরও উত্তমরূপে এই শ্রেণীভুক্ত। কারণ, তাঁদের জন্যে রয়েছে শহীদদের মর্যাদা এবং এর উপর নবুওয়তের মর্যাদাও।—(কুরতুবী)

উদ্দেশ্য এই **وَنَزَى الْجِبَالَ تَحْصِيهَا جَاوِدًا وَفِي تَرْوَرٍ السَّحَابِ** যে, পাহাড়সমূহ স্থানচ্যুত হয়ে মেঘমালার ন্যায় চলমান হবে। দর্শক মেঘ-মালাকে স্বস্থানে স্থির দেখতে পায়, অথচ আসলে তা দ্রুত চলমান থাকে। যে বিশাল বস্তুর শুরু ও শেষ প্রান্ত মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, সে বস্তু যখন কোন একদিকে চলমান হয় তখন তা যতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হোক না কেন, মানুষের দৃষ্টিতে তা অচল ও স্থিতিশীল মনে হয়। সুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ঘন কাল মেঘে সবাই তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। এরূপ কাল মেঘ এক জায়গায় অচল ও স্থির মনে হয়, অথচ তা প্রকৃতপক্ষে চলমান থাকে। এই মেঘের গতিশীলতা দর্শক যখন বুঝতে পারে, তখন তা আকাশের দিগন্ত উজ্জ্বল করে দূরে চলে যায়।

মোটকথা এই যে, পাহাড়সমূহের অচল হওয়া দর্শকের দৃষ্টিতে এবং চলমান হওয়া বাস্তব সত্যের দিক দিয়ে। অধিকাংশ তফসীরবিদ আয়াতের উদ্দেশ্য তাই সাব্যস্ত করেছেন।

--- **صُنِعَ** - **صُنِعَ لِلَّهِ الْكِتَابُ أَنْ يُفَنَّ كُلَّ شَيْءٍ** শব্দের অর্থ কারিগরিবিদ্যা,

[illegible]

(১৫) যে কেউ সংকর্ষ নিয়ে আসবে, সে ডেব্‌কুঁড়র প্রতিদান পাবে এক সেদিন তারা গুরুতর অধিরাজ থেকে নিরাপদ থাকবে। (১৬) এক যে যদ্বাচ্ছা নিয়ে আসবে, তাকে অগ্নিতে অস্ত্রমুখে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করছিলে, তারই প্রতিফল তোমরা পাবে। (১৭) আমি তো কেবল এই নারায়ণ জুঁর এবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে সম্পানিত করেছেন। এক সব কিছু ঠাইই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি যেন আমি আজীবনহদের একজন হই। (১৮) এক যেন আমি কোরআন পাঠ করে শোনাই। পর যে ব্যক্তি সংপথে চলে, সে নিজের কল্যাণার্থেই সংপথে চলে এক কেউ পথভ্রষ্ট হলে আশনি বলে দিন, আমি তো কেবল একজন ভীতি প্রদর্শনকারী। (১৯) এক আরও কনু, 'সমস্ত প্রকাশ অন্তরাহু। সত্ত্বই তিনি ঠায় নির্দশিসমূহ জোয়দেয়ক দেখাবেন। তখন তোমরা তা চিনতে পারবে। এক তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আপনাদের পালনকর্তা থাকেন না।

मृदाधान-कागाम

মহান্নব অকতীর্ন : আয়াত ৮৮

मयाभिन्न, पञ्च कर्माभिन्न आत्माश्च नास्ते उक्तं करहि

(১) ভা-গীন-বীথ। (২) এগুলো সুশৃঙ্খলিতভাবে আয়াত। (৩) আমি আপনার কাছে মুসা ও হারোনের বৃত্তান্ত সত্য সহকারে বর্ণনা করছি ইয়মদাদার সম্প্রদায়ের জন্যে। (৪) হারোউন তার দেশে উদ্ভট হয়েছিল এক সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এক নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিচয় সে ছিল অশ্রু-সৃষ্টিকারী। (৫) দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আবার ইচ্ছা হল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, তাদেরকে নেতা করার এক তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার।

নিশ্প। انتان শব্দটি انتان থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন কিছুকে মজবুত ও
সংহত করা। বাহ্যতঃ এই বাক্যটি পূর্ববর্তী সব বিষয়বস্তুর সাথে
সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, দিবারাত্রির পরিবর্তন এক সিদ্ধান্ত ফুৎকার থেকে
নিয়ে হাশর-নাশর পর্যন্ত সব অবস্থা। উদ্দেশ্য এই যে, এগুলো মোটেই
বিস্ময় ও আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা, এগুলোর স্রষ্টা কোন সীমিত জ্ঞান
ও শক্তিসম্পন্ন মানব অথবা কেরেশতা নয় ; বরং বিশুদ্ধাছানের
পালনকর্তা। যদি এই বাক্যটির সম্পর্ক নিকটতম
وَرَبِّیْ الْجَمَلِ تَصَوُّرًا جَدِيدًا আশ্রাতের সাথে করা যায়, তবে উদ্দেশ্য
হবে এই যে, পাহাড়সমূহের এই অবস্থা দর্শকের দৃষ্টিতে অচল, কিন্তু
বাস্তবে চলমান ও গতিশীল ইত্ত্বায়া মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কেননা,
এটা বিশুদ্ধাছানের পালনকর্তার কারিগরি, যিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এটা শশর-নশর ও হিঙ্গাব-
 مِنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا

নিকাশের পরবর্তী পরিণতির বর্ণনা, حسنة বলে এখানে কলোয়ায়ে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বোঝানো হয়েছে—(কাতাদাহর উক্তি)। কেউ কেউ সামান্য এবাদত ও আনুগত্য অর্থ নিয়েছেন। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি সংকর্ম করবে, সে তার কর্মের চাইতে উৎকৃষ্টতর প্রতিদান পাবে। কলাবাহুল্য, সংকর্ম তখনই সংকর্ম হয়, যখন তার মধ্যে প্রথম শর্ত ইম্যান বিদ্যমান থাকে। ‘উৎকৃষ্টতর প্রতিদান’ বলে জন্মান্তের অক্ষয় নেয়ামত এবং আযাব ও যাবতীয় কষ্ট থেকে চিরমুক্তি বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এই যে, এক নেকীর প্রতিদান দশ গুণ থেকে নিয়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত পাওয়াযাবে।—(মোহাম্মদী)

وَهُمْ مِنْ قَرْعٍ - বলে প্রত্যেক বড় বিপদ ও

পেরেশানী বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেক
অন্যন্তৃত্বীয় পরহেযগারও পরিণামের ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারে না
এক খাফা উচিতও নয়; যেমন কোরআন পাক বলে إِنَّ عَذَابَ

আব্বাস, পালনকর্তার আঘাব থেকে কেউ নিষ্কৃত ও
 তাবনাযুক্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। এ কারণই পয়গম্বুরগণ, সাহাবায়ে
 কোরাম ও জলীফ সদাসর্বদা ভীত ও কণ্ঠিত থাকতেন। কিন্তু সেদিন
 হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত হলে যারা সংকর্ম নিয়ে আগমনকারী হবে, তারা
 সর্বপ্রকার ভয় ও দৃষ্টিভা থেকে মুক্ত ও প্রশান্ত হবে।

رَبِّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ অধিকার তরুণীরবিশেষ যতে بلدة বলে যদা

যেখানকারমাকে বোঝানো হয়েছে। আদ্বায তাআলা তো বিনু-দ্বাহানের পালনকর্তা এবং নতামগুল ও তুমগুলের পালনকর্তা। এখানে বিশেষ করে মকার পালনকর্তা বলার কারণ মকার মাহাত্ম্য ও সম্মানিত হওয়ার বিষয়বস্ত প্রকাশ করা। محرم শব্দটি محرم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাধারণ সম্মান ও হয়ে থাকে। এই সম্মানের কারণে মকা ও পবিত্র ভূমির যেসব বিধান প্রযুক্তি হয়েছে, সেগুলোও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন কেউ হেরেমে আশ্রয় নিলে সে নিরাপদ হয়ে যায়। হেরেমে প্রতিশোধ গ্রহণ করা ও হত্যাকাণ্ড সম্পাদন বৈধ নয়। হেরেমের ভূমিতে শিকার বধ করাও জায়েয নয়। বৃক্ষ কর্তন করা জায়েয নয়। এসব বিধানের কতকংশ

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا আয়াতে, কতকাংশ সূরা মায়ের শুরুতে এবং

কতকাল **لَا تَسْكُرُوا الْقُسْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ** আয়াতে বর্ণিত হয়ে গেছে।

मृगा आन-नायन मयां

وَنُفِثَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَرَبَّرُوهُمْ وَجَدُّهُمْ
 مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ
 اَرْضِعِيهِ فَإِذَا اخْضَبَتْ عَلَيْهِ فَاقْنِي فِي الْعَمَلِ وَلَا تَحْزَانِي وَلَا
 تَحْزَنِي إِنَّا رَازِدُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝
 فَالْقَطْطَةُ الَّتِي فَرَعُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ
 فَارْعُونَ وَهَامَانَ وَجُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ۝ وَقَالَتِ
 أُمُّرَاتُ فِرْعَوْنَ قَوَّيْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُونَهُ
 عَلَىٰ أَنْ يَتَّبِعَنَا أَكُفِّرَنَّ كَذِبَهُ وَلِكُلِّ أَهْمٍ لَا يَشْعُرُونَ ۝
 وَأَصْبَحَ قُودًا أُمِّ مُوسَىٰ فَرَعًا إِنَّ كَادَتْ لَتَكِيدَنِي بِهِ
 لَوْلَا أَنْ رِيطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝
 وَقَالَتِ لَأُخْصِيهَ فَضِيهَ بَصُرْتُ بِهِ عَنِ جُنُبٍ وَهُمْ
 لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ السَّرَاصِمَ مِنْ قَبْلِ فَكَانَتْ
 هَلْ أَذْكَمَ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ
 نَاصِحُونَ ۝ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ
 وَلَنَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(৬) এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত। (৭) আমি মুসা-জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে পরিয়ায় নিষ্কণ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পয়গম্বরগণের একজন করব। (৮) অতঃপর ফেরাউন-পরিবার মুসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল। (৯) ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোন ধরন ছিল না। (১০) সকালে মুসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মুসাজনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্বাসীগণের মধ্যে। (১১) তিনি মুসার ভগিনীকে বললেন, তার পেছন পেছন যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাকে দেখে যেতে লাগল। (১২) পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে মুসা থেকে বিরত রেখেছিলাম। মুসার ভগিনী বলল, 'আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি, যারা তোমাদের জন্যে একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙ্ক্ষী? (১৩) অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না।

মকায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যে সূরা আল-কাসাস সর্বশেষ সূরা। হিজরতের সময় মক্কা ও জুহুফা (রাবেগ)-এর মাঝখানে এই সূরা অবতীর্ণ হয়। কোন কোন রেওয়াজে আছে, হিজরতের সফরে রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন জুহুফা অর্থাৎ, রাবেগের নিকটে পৌছেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলেন, হে মুহাম্মদ, আপনার মাতৃভূমির কথা আপনার মনে পড়ে কি? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ মনে পড়ে বৈ-কি। অতঃপর জিবরাঈল তাঁকে এই সূরা শুনালেন। এই সূরার শেষভাগে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, পরিণামে মক্কা ইব্রাহীমী হয়ে আপনার অধিকারভুক্ত হবে আয়াতটি এই: **إِنَّ الَّذِي فَرَضَ**।

ইব্রাহীমী সূরা কাসাসে সর্বপ্রথম মুসা (আঃ)-এর কাহিনী প্রথমে সংক্ষেপে ও পরে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। অর্ধেক সূরা পর্যন্ত মুসা (আঃ)-এর কাহিনী ফেরাউনের সাথে এবং শেষভাগে কার্রনের সাথে উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত মুসা (আঃ)-এর কাহিনী সমগ্র কোরআনে কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত আকারে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা কাহফে তাঁর কাহিনী খিযির (আঃ)-এর সাথে বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে। এরপর সূরা তোয়াহায় বিস্তারিত ঘটনা আছে এবং এরই কিছু বিবরণ সূরা আন-নামলে অতঃপর সূরা আল-কাসাসে এর পুনরাবলোচনা রয়েছে। সূরা তোয়াহায় মুসা (সাঃ)-এর জন্যে বলা হয়েছে **وَفُتِّنَاكَ فُتُونًا** ইমাম নাসায়ী প্রমুখ হাদীসবিদ এই কাহিনীর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

وَرَبُّنَا يُنَزِّلُ عَلَىٰ الرَّسُولِ الْوَحْيَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ الْوَحْيِ اسْتَشْفَعُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ آيَةً এই আয়াতে বিধিলিপির মোকাবেলায় ফেরাউনী কৌশলের শুধু ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হওয়ার কথাই নয়; বরং ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গকে চরম বোকা বরং অন্ধ বানানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যে বালক সম্পর্কে স্বপ্ন ও স্বপ্নের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ফেরাউন শক্তি হয়েছিল এবং যার কারণে বনী-ইসরাঈলের অসংখ্য নবজাতক ছেলে সন্তানকে হত্যা করার আইন জারি করেছিল, তাকে আল্লাহ তাআলা এই ফেরাউনেরই গৃহে তারই হাতে লালিত-পালিত করালেন এবং জননীর মনস্তাটীর জন্যে তারই কোলে বিস্ময়কর পন্থায় পৌছে দিলেন। তদুপরি ফেরাউনের কাছ থেকে স্তন্যদানের খরচ যা, কোন কোন রেওয়াজেতে দৈনিক এক দীনার বর্ণিত হয়েছে—আদায় করা হয়েছে। স্তন্যদানের এই বিনিময় একজন কাকের হরবীর কাছ থেকে তার সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই এর বৈধতায়ও কোনরূপ ত্রুটি নেই। যে বিপদাশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে সমগ্র সাম্রাজ্যের উপর অত্যাচারের স্তীম রেলার চালানো হয়েছিল, অবশেষে তা তারই গৃহ থেকে অগ্নেয়গিরির এক ভয়ঙ্কর লাভা হয়ে বিস্ফোরিত হল এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা আল্লাহ তাআলা তাকে চর্মচক্ষে দেখিয়ে দিলেন। **وَرَبُّنَا يُنَزِّلُ عَلَىٰ الرَّسُولِ الْوَحْيَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ الْوَحْيِ اسْتَشْفَعُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُمْ آيَةً** পর্যন্ত আয়াতের সারমর্ম তাই।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ—শব্দটি এখানে আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে—নবুওয়তের ওহী বোঝানো হয়নি।

القصص ১৮

৩৮৮

অমস খুত্বা ২

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ آسَافَةَ الْكَلْبِ وَأَسْتَوَىٰ - এরা শাদিক অর্থ শক্তি ও জোরের

চরম সীমায় পৌছায়। মানুষ শৈশবের দুর্বলতা থেকে আস্তে আস্তে শক্তি-সামর্থ্যের দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর এমন এক সময় আসে, যখন তার অন্তিমে যতটুকু শক্তি আসা সম্ভবপর, সবটুকুই পূর্ণ হয়ে যায়। এই সময়কেই আশ্‌ বলা হয়। এটা বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির মেজাজ অনুসারে বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারণ এই সময় তাড়াতাড়ি আসে এবং কারও দেহীতে। কিন্তু আবদ ইবনে হুমায়দের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তেত্রিশ বছর বয়সে আশ্‌ এর যমিনা আসে। একেই পরিণত বয়স বলা হয়। এতে দেখে বৃদ্ধি একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত পৌছে যেতে যায়। এরপর চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিরতিকাল। একে শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। চল্লিশ বছরের পর অবনতি ও দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে। এ থেকে জানা গেল যে, استوى তথা পরিণত বয়স তেত্রিশ বছর থেকে শুরু হয়ে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বর্তমান থাকে।—(রহুল-মা' আনী, কুরত্বী)

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ آسَافَةَ الْكَلْبِ وَأَسْتَوَىٰ - বলে নবুওয়ত ও রেসালত এবং বলে

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ - বিধি-বিধানের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে।

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ - অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে মিসর নগরী

বোঝানো হয়েছে। এতে প্রবেশ করার প্রসঙ্গ থেকে বোঝা গেল যে, মুসা (আঃ) মিসরের বাইরে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। অতঃপর একদিন এমন সময়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন, যা সাধারণ লোকদের অসাবধানতার সময় ছিল অতঃপর কিবতী-হত্যার ঘটনায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সময়ে মুসা (আঃ) তাঁর সত্য ধর্ম প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। এরই ফলে কিছু লোক তাঁর অনুগত হয়েছিল। তাঁদেরকে তাঁর অনুসারীদল বলা হত। وَمِنْ شُعْبَةٍ শব্দটি এর সাক্ষ্য দেয়। এসব ইঙ্গিত থেকে ইবনে-ইসহাক ও ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়ায়েত এই যে, মুসা (আঃ) যখন জ্ঞান-বুদ্ধি লাভ করলেন এবং সত্য ধর্মের কিছু কিছু কথা মানুষকে বলতে শুরু করলেন, তখন ফেরাউন তাঁর শত্রু হয়ে যায় এবং তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে। কিন্তু শ্রী আসিয়ার অনুরোধে সে তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। তবে তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করে। এরপর মুসা (আঃ) অন্যত্র বসবাস করতে থাকেন এবং মাঝে মাঝে গোপনে মিসর নগরীতে আগমন করতেন।

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ - বলে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে দুপুর বোঝানো হয়েছে। এ সময় মানুষ নিবিড়ায় মশগুল থাকত।—(কুরত্বী)

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ - বাক- فَتَحَىٰ عَلَيْهِ - ওক- فَتَحَىٰ عَلَيْهِ

পদ্ধতিতে قضاء ও فَتَحَىٰ عَلَيْهِ তখন বলা হয়, যখন কারণ ও তব্বীলা সম্পূর্ণ সাক্ষ করে দেখা হয়। তাই এখানে এর অর্থ হত্যা করা।—(মামহুরী)

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ - এই আয়াতের

সারমর্ম এই যে, মুসা (আঃ) থেকে অনিচ্ছায় প্রকাশিত কিবতী-হত্যার ঘটনাকেও তিনি তাঁর নবুওয়ত ও রেসালতের পদমর্যাদার পরিপন্থী এবং তাঁর পয়গম্বরসুলত মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে তাঁর পোনাহ্‌ সাব্যস্ত করে আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে কমা প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলাও কমা

(১৪) যখন মুসা বোমবে পদার্পণ করলেন এবং পরিণত বয়স্ক হয়ে গেলেন, তখন আমি তাঁকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানদান করলাম। এমনভাবে আমি স্বকণ্ঠস্বরে প্রতীদান দিয়ে থাকি! (১৫) তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল বেব্বর। তখন তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তাঁর নিজ দলের এক অন্য জন তাঁর শত্রু দলের। অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মুসা তাকে ঘুমি মারলেন এক এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মুসা কালেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু, বিবাস্তকারী। (১৬) তিনি কালেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর জুন্স করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্‌ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দায়ালু। (১৭) তিনি কালেন, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনও অপর্যায়ীদের সাহায্যকারী হব না। (১৮) অতঃপর তিনি প্রজ্ঞাতে উঠলেন সে শহরে ভীত-শঙ্কিত অবস্থায়। ইহাং তিনি দেখলেন, গভকল্য যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, সে চাঁচকার করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। মুসা তাকে কালেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পক্ষবৈরী ব্যক্তি। (১৯) অতঃপর মুসা যখন উত্তরের শত্রুকে শায়েস্তা করতে চাইলেন, তখন সে বলল, গভকল্য তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল, সে রকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে বৈরাচ্য হতে চাচ্ছ এক সন্ধি স্থাপনকারী হতে চাও না। (২০) এসময় শহরের প্রান্ত থেকে একব্যক্তি ছুটে আসল এক বলল, হে মুসা, রাজ্যের পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব, তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী।

করেছেন। এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, এই কিবতী কাকের শরীয়তের পরিভাষায় হরবী কাকের ছিল, যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করাও বৈধ ছিল। কেননা, সে কোন ইসলামী রাষ্ট্রের খিস্মী তথা আশ্রিত ছিল না এবং মুসা (আঃ)-এর সাথেও তার কোন চুক্তি ছিল না। এমতাবস্থায় মুসা (আঃ) একে ‘শয়তানের কাক’ ও গোনাহ্ কেন সাব্যস্ত করেছেন? এর হত্যা তো বাহ্যতঃ সওয়াবের কাক হওয়া উচিত ছিল। কারণ, সে একজন মুসলমানের উপর জুলুম করেছিল। তাকে বাঁচানোর জন্যে এই হত্যা সংঘটিত হয়েছিল।

উত্তর এই যে, চুক্তি কোন সময় লিখিত হয় এবং কোন সময় কার্যগতও হয়। লিখিত চুক্তি যেমন সাধারণতঃ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে খিস্মীদের সাথে চুক্তি অথবা অমুসলিম রাষ্ট্রের সাথে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ধরনের চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার কারণে হারাম হয়ে থাকে। এমনিভাবে কার্যগত চুক্তিও অবশ্য পালনীয় এবং বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।

কার্যগত চুক্তি এরূপ : যে স্থানে মুসলমান এবং কিছুসংখ্যক অমুসলিম অন্য কোন রাষ্ট্রে পরস্পর শান্তিতে বসবাস করে, একে অপরের উপর হামলা করা অথবা লুটতরাজ করাকে উভয়পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করে; সেইস্থানে এ ধরনের জীবন যাপন ও আদান-প্রদানও এক প্রকার কার্যগত চুক্তি গণ্য হয়ে থাকে। এর বিরুদ্ধাচরণ বৈধ নয়।

সারকথা এই যে, এই কার্যগত চুক্তির কারণে কিবতীকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হলে তা জায়েয হত না, কিন্তু হযরত মুসা (আঃ) তাকে প্রাণে মরার ইচ্ছা করেন নি; বরং ইসরাঈলী লোকটিকে তার জুলুম থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে হাতে প্রহার করেছিলেন। এটা স্বভাবতঃ হত্যার কারণ হয় না। কিন্তু কিবতী এতেই মারা গেল। মুসা (আঃ) অনুভব করলেন যে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্যে আরও কম মাত্রার প্রহারও যথেষ্ট ছিল কাজেই এই বাড়বাড়ি তাঁর জন্যে জায়েয ছিল না। এ কারণেই তিনি একে শয়তানের কাক আখ্যা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

জ্ঞাতব্য : এটা হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহঃ)-এর সূচিস্থিত অভিমত, যা তিনি আরবী ভাষায় ‘আহকামুল কোরআন’-সূরা কাাসা লেখার সময় ব্যক্ত করেছিলেন। এটা তাঁর সর্বশেষ গবেষণার ফল। কেননা, ১৩৬২ হিজরীর

২রা রজব তারিখে তিনি ইহকাল ত্যাগ করেন। ইন্না লিল্লাহি.....।

কোন কোন তফসীরকারক বলেন, কিবতীকে হত্যা করা যদিও বৈধ ছিল, কিন্তু পয়গম্বরগণ বৈধ কাজও ততক্ষণ করেন না, যতক্ষণ বিশেষভাবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুমতি ও ইশারা না পান। এক্ষেত্রে মুসা (আঃ) বিশেষ অনুমতির অপেক্ষা না করেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তাই নিজ শান অনুযায়ী একে গোনাহ্ সাব্যস্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।—(রহুল-মা’আনী)

—হযরত قَالَ رَبِّ بِمَا أَفْعَدْتُ عَلَىٰ قَتْلِ الْوَلَدِ الَّذِي لِي مِنَ

মুসা (আঃ)-এর এই বিচ্যুতি আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করলেন। তিনি এর শোকার আদায় করণার্থে আরম্ভ করলেন, আমি ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে সাহায্য করব না। এ থেকে বোঝা গেল যে, মুসা (আঃ) যে ইসরাঈলীর সাহায্যার্থে একাজ করেছিলেন, দ্বিতীয় ঘটনার পর প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সে নিজেই কলহশ্রিয় ছিল। কলহ-বিবাদ করা তার অভ্যাস ছিল। তাই তিনি তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে ভবিষ্যতে কোন অপরাধীকে সাহায্য না করার শপথ গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ স্থলে مجرمين (অপরাধী)-এর তফসীরে كافرين (কাকের) বর্ণিত আছে। কাতাদাহ-এর বক্তব্যও এর কাছাকাছি। এই তফসীরের ভিত্তিতে মনে হয়, মুসা (আঃ) যে ইসরাঈলীকে সাহায্য করেছিলেন, সে-ও মুসলমান ছিল না, তবে মজলুম মনে করে তাকে সাহায্য করেছিলেন। মুসা (আঃ)-এর এই উক্তি থেকে দু’টি মাসআলা প্রমাণিত হয়।

(১) মজলুম কাকের ফাসেক হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত। (২) কোন জালেম অপরাধীকে সাহায্য করা জায়েয নয়। আলেমগণ এই আয়াতদুট্টে অত্যাচারী শাসনকর্তার চাকুরীকেও অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, এতে জুলুমে অংশগ্রহণ বোঝা যায়। পূর্ববর্তী মনীষীগণের কাক থেকে এ সম্পর্কে একাধিক রেওয়াজেও বর্ণিত আছে।—(রহুল-মা’আনী) কাকের অথবা জালেমদের সাহায্য-সহযোগিতার নানাবিধ পন্থা বর্তমান। এর বিধিবিধান ফেকাহের গ্রন্থাবলীতে বিশদভাবে উল্লিখিত রয়েছে। বর্তমান লেখক আরবীতে লিখিত ‘আহকামুল কোরআন’ গ্রন্থে এ আয়াত প্রসঙ্গে বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তাহকীক করেছে। জ্ঞানব্রুণী বিদ্বজ্জন তা দেখে নিতে পারেন।

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ
السَّبِيلِ ۖ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ
النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذْودُنِ
قَالَ مَحْطَبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا تَسْقِي حَتَّى يُصَدِّ الرَّعَاءُ وَأَبُونا
شَيْخٌ كَبِيرٌ ۖ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي
لَمَأْتِرْتُكَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَفَعِلْ ۖ إِنِّي أَنَا وَابْنُ امْرَأَتِي
مُسْتَغْنَاءٌ ۖ قَالَتْ إِنَّ ابْنِي يَأْتِيكُم بِالخَبْرِ آجِرًا مَأْسُومًا
فَلَمَّا جَاءَهُمْ وَنَظَرُوا عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۖ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا ابْنَتِ اسْتَجِرِي ۖ إِنَّا
مِنْ أَسْتَجَرْتِ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ۖ قَالَ ابْنِي أَزِيدُكَ ۖ إِنَّا
إِحْدَى ابْنَتَي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْتِرِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ۖ وَإِنِ اتَّخَذْتَ
عَمْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَهْمًا ۖ إِنِّي
شَاءَ اللَّهُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۖ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ إِنَّمَا الظَّالِمِينَ
قَصَصْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝

(২১) অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন পথ দেখতে দেখতে। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে জ্বালাময় সশ্রদ্ধায়ের কবল থেকে রক্ষা কর। (২২) যখন তিনি মাদইয়ান অভিযুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। (২৩) যখন তিনি মাদইয়ানের কূপের ধারে পৌঁছলেন, তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত। এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন স্ত্রীলোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত রাখালা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। (২৪) অতঃপর মুসা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাখিল করবে, আমি তার মুখাশেকী। (২৫) অতঃপর বালিকাদুয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন, তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করেন। অতঃপর মুসা যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি জ্বালাময় সশ্রদ্ধায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। (২৬) বালিকাদুয়ের একজন বলল পিতা, তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, আপনার চাকর হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। (২৭) পিতা মুসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদুয়ের একজনকে তোমার বিবাহে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরী করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ চাহেন তো তুমি আমাকে সংকল্পপরায়ণ পাবে। (২৮) মুসা বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হল। দু'টি মেয়েদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধ কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, তাতে আল্লাহ্র উপর ভরসা।

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ - শামদেশের একটি শহরের নাম মাদইয়ান।

মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম (আঃ)-এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। এই অঞ্চল ফেরাউনী রাষ্ট্রের বাইরে ছিল। মিসর থেকে এর দূরত্ব ছিল আট মনযিল। মুসা (আঃ) ফেরাউনী সিপাহীদের পশ্চাদ্ধাবনের স্বাভাবিক আশংক্যবোধ করে মিসর থেকে হিজরত করার ইচ্ছা করলেন। বলাবাহুল্য, এই আশংক্যবোধ নবুওয়ত ও তাওয়াঙ্কুল কোনটিরই পরিপন্থী নয়। মাদইয়ানের দিক নির্দিষ্ট করার কারণ সম্ভবতঃ এই ছিল যে, মাদইয়ানেও ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের বসতি ছিল। মুসা (আঃ)ও এই বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মুসা (আঃ) সম্পূর্ণ নিঃসম্মল অবস্থায় মিসর থেকে বের হন। তাঁর সাথে পাথেয় বলতে কিছুই ছিল না এবং রাস্তাও জানা ছিল না। এই সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করে বললেন,

عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ - অর্থাৎ, আশা করি আমার

পালনকর্তা আমাকে সোজা পথ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ্ তাআলা এই দোয়া কবুল করলেন। তফসীরাকরণ বর্ণনা করেন, এই সফরে মুসা (আঃ)-এর খাদ্য ছিল বৃক্ষপত্র। হযরত ইবনে-আব্বাস বলেন, এটা ছিল মুসা (আঃ)-এর সর্বপ্রথম পরীক্ষা। তাঁর পরীক্ষাসমূহের বিশদ বিবরণ সূরা তোয়াহায় একটি দীর্ঘ হাদীসের বরাতে দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

مَاءٌ - وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ

মানে বলে একটি কূপকে বোঝানো হয়েছে, যা থেকে এই জনপদের অধিবাসীরা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাত। وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ

امْرَأَتَيْنِ تَذْودُنِ - অর্থাৎ, দু'জন রমণীকে দেখলেন, তারা তাদের

ছাগপালকে পানির দিকে যেতে বাধা দিচ্ছিল, যাতে তাদের ছাগলগুলো অন্যদের ছাগলের সাথে মিশে না যায়।

قَالَ مَحْطَبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا تَسْقِي حَتَّى يُصَدِّ الرَّعَاءُ وَأَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ

- অর্থাৎ, শব্দের অর্থ শান, অবস্থা, উদ্দেশ্য এই যে, মুসা

(আঃ) রমণীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? অন্যদের ন্যায় কূপের কাছে এনে পানি পান করও না কেন? তারা জন্তুদ্বয় দিল, আমাদের অভ্যাস এই যে, আমরা পুরুষের সাথে মেলামেশা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ছাগলগুলোকে পানি পান করাই না, যে পর্যন্ত তারা কূপের কাছে থাকে। তারা চলে গেলে আমরা ছাগলগুলোকে পানি পান করাই। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, তোমাদের কি কোন পুরুষ নেই যে, নারীদেরকে একাঙ্গে আসতে হয়েছে? রমণীদ্বয় এই সম্ভাব্য প্রশ্নের জওয়াবও সাথে সাথে দিয়ে দিল যে, আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি একাঙ্ক করতে পারেন না। তাই আমরা করতে বাধ্য হয়েছি।

এই ঘটনা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল : (১) দুর্বলদেরকে সাহায্য করা পয়গম্বরগণের সূত্র। মুসা (আঃ) দু'জন রমণীকে দেখলেন যে, তারা ছাগলকে পানি পান করাতে এসে ভিড়ের কারণে সুযোগ পাচ্ছে না। তখন তিনি তাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন।

(২) বেগানা নারীর সাথে প্রয়োজনবশতঃ কথা বলায় দোষ নেই, যে পর্যন্ত

কোন অনর্থের আশংকা না হয়। (৩) আলোচ্য ঘটনাটি তখনকার, যখন মহিলাদের পর্দা অত্যাবশ্যকীয় ছিল না। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্তও এই ধারা অব্যাহত ছিল। মদিনায় হিজরত করার পর মহিলাদের জন্যে পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পর্দার আসল লক্ষ্য তখনও স্বভাবসত্তা ভঙ্গতা ও লজ্জা-শরমের কারণে নারীদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই রমসীদুয় প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পুরুষদের সাথে ফেলাফেলা পছন্দ করেনি এবং নিজেরাই কষ্ট স্বীকার করেছে। (৪) এখবরদের কাজের জন্যে নারীদের বাইরে যাওয়াও তখনও পছন্দনীয় ছিল না। একারণেই রমসীদুয় তাদের পিতার বার্ষিক্যের গুণের বর্ণনা করেছে।

কপূর থেকে পানি তুলে তাদের ছাগলকে পান করিয়েছেন। কোন কোন রেণুগায়াকে আছে, রাখালদের অভ্যাস ছিল যে, তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর পর একটি ভারী পাথর দ্বারা কুশের মুখ বন্ধ করে দিত। ফলে রমণীদ্বয় তাদের উচ্ছ্রিষ্ট পানি পান করাত। এই ভারী পাথরটি দল জনে মিলে হানাস্তরিত করত। কিন্তু মুসা (আঃ) একাকী পাথরটি সরিয়ে দেন এবং কুপ থেকে পানি উৎসলন করেন। সম্ভবতঃ এ কারণেই রমণীদ্বয়ের একজন মুসা (আঃ) সম্পর্কে পিতার কাছে বলেছিল, যে শক্তিশালী — (কুরত্বী)

لَمْ تَوَلِّ إِلَى الْقَبْلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

—মুসা (আঃ) সাত দিন থেকে কোনকিছু আহার করেননি। তখন এক বৃক্ষের ছায়ায় এসে আল্লাহ তাআলার সামনে নিজের অবস্থা ও অভাব পেশ করলেন। এটা দেখা করার একটা সূক্ষ্ম পদ্ধতি। **لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** সময় বন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয় ; যেমন **لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** আয়াতে। কোন কোন সময় শক্তির অর্থেও আসে ; যেমন **لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ** —আয়াতে। আবার কোন সময় এর অর্থ হয় আহার্য। আলোচ্য আয়াতে তাই উদ্দেশ্য। —(কুরত্বী)

কোরআনী রীতি অনুযায়ী - فَيَا أَيُّهَا أَحَدُهُمَا تَشْفِ عَلَى اسْتِغْنَاءِ

এখানে কাহিনী সঞ্চিত করা হয়েছে। পূর্ণ ঘটনা এরূপ : রমণীদ্বয় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বাড়ী পৌঁছে গেলে বৃদ্ধ পিতা এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কন্যাদ্বয় ঘটনা বলে বলল। পিতা দেখলেন, লোকটি অসুস্থই রয়েছে ; তাকে এর প্রতিদান দেয়া উচিত। তাই তিনি কন্যাদ্বয়ের একজনকে তাকে ডেকে আনার জন্যে প্রেরণ করলেন। বালিকাটি লজ্জাঙ্কুড়িত পদক্ষেপে সেখানে পৌঁছল। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পর্দার নিয়মিত বিধানাবলী অবতীর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও সতী রমণীশপ পুরুষদের সাথে বিনাদ্বিবাঘ কথাবার্তা কলত না। প্রয়োজনবশতঃ সেখানে পৌঁছে বালিকাটি লজ্জা সহকারে কথা বলেছে। কোন কোন তফসীলে কথা হয়েছে যে, সে আত্মনি

দুৱা মুখমণ্ডল আবৃত করে কথা বলেছে। তক্ষসীয়ে আরও বলা হয়েছে যে, মুসা (আঃ) তার সাথে পথ চলার সময় বললেন, তুমি আমার পঁচাত্তে চল এবং রাস্তা বলে দাও। কলাবাহন্য, বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত থেকে বেঁচে থাকই ছিল এর লক্ষ্য। সম্ভবতঃ এ কারণেই বালিকাটি তাঁর সম্পর্কে পিতার কাছে বিশুদ্ধতার সাক্ষ্য দিয়েছিল। এই বালিকাদুয়ের পিতা কে ছিলেন, এ সম্পর্কে তক্ষসীরকারকণ্ঠ মতভেদ করেছেন। কিন্তু কোরআনের আয়াতসমূহ থেকে বাহ্যতঃ এ কথাই বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন হযরত শোয়াযব (আঃ)। যেমন এক আয়াতে আছে

(کُورِ ثُبٰی)۔ وَ اِلٰی مَدَیْنِ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا

لَنْ أُنَیْسَ عَوْدًا — বালিকাটি নিজেই নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে

আমন্ত্রণ জানাতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি; বরং তার পিতার পয়গাম জানিয়ে দিয়েছে। কারণ, কোন বেগানা পুরুষকে স্বয়ং তার আমন্ত্রণ জানানো লজ্জা-শরমের পরিপন্থী ছিল।

—अर्थात्, शोयायब (आः)— إِنَّ خَيْرَ مَنْ لَسَّاجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

এর এক কন্যা তার পিতার নিকট আরথ্য করল, গৃহের কাজের জন্য আপনার একজন চাকরের প্রয়োজন আছে। আপনি তাকে নিযুক্ত করুন। কারণ, চাকরের মধ্যে দু'টি গুণ থাকা আবশ্যিক। (এক) কাজের শক্তি-সামর্থ্য ও যোগ্যতা এবং (দুই) বিশুদ্ধতা। আমরা পাশ্বর তুলে পানি পান করানো দুরা তার শক্তি-সামর্থ্য এবং পশ্চিমধ্যে আমাকে পঞ্চাতে রেখে পথচলা দুরা তার বিশুদ্ধতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

অর্থাৎ বালিকাদ্বয়ের

পিতা হযরত শোয়ায়ব (আঃ) নিজেই নিজের পক্ষ থেকে কন্যাকে হযরত মুসার (আঃ) বিবাহে দান করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে পাত্রীর অভিভাবকের উচিত পাত্রপক্ষ থেকে প্রস্তাব আসার অপেক্ষা না করা। বরং নিজের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব উত্থাপন করা পয়গম্বরগণের সূনত। উদাহরণতঃ হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর কন্যা হাফসা বিধবা হওয়ার পর নিজেই হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উসমান গনী (রাঃ)-এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন। - (কুরতবী)

মাসআলা : **عقد** শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের ব্যাপার

পিতা সম্পন্ন করেছেন। ফেকাহবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কন্যার অভিভাবক তার বিবাহকর্তৃক সম্পন্ন করবে; কন্যা নিজে করবে না। তবে কোন কন্যা প্রয়োজন ও বাধ্য-বাধকতার চাপে নিজের বিবাহ নিজেই সম্পন্ন করলে তা দুরূহ হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আম্মের মতে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। আলোচ্য আয়াত এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা দেয়নি।

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ - অর্থাৎ, মুসা (আঃ) চাকরীর নির্দিষ্ট আট

বছর বাধ্যতামূলক এবং দুই বছর ঐচ্ছিক মেয়াদ পূর্ণ করলেন। এখানে প্রশ্ন হয় যে, মুসা (আঃ) আট বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন, না দশ বছরের? সহীহ বোখারীতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাসকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, অধিক মেয়াদ অর্থাৎ, দশ বছর পূর্ণ করেছিলেন। পয়গম্বরগণ যা বলেন তা পূর্ণ করেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ)ও প্রাপককে তার প্রাপ্যের চাইতে বেশী দিতেন এবং তিনি উম্মতকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে, চাকরী, পারিশ্রমিক ও কেনাবেচার ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করবে।

نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ إِنْ أَتَا اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ

—এই বিষয়বস্তু সূরা তোয়াহা ও সূরা নমলে বর্ণিত হয়েছে। সূরা তোয়াহায় **نُودِيَ أَنْ نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ** এবং আলোচ্য সূরায় **إِنْ أَتَا اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ** বলা হয়েছে। বিভিন্ন সূরায় উল্লেখিত এসব আয়াতের ভাষা বিভিন্নরূপ হলেও অর্থ প্রায় একই। প্রত্যেক জায়গায় উপযুক্ত ভাষায় ঘটনা বিধৃত হয়েছে। অগ্নির আকারে এই তাজদালী ছিল —রূপক তাজদালী। কারণ, সন্তাগত তাজদালী এই দুনিয়াতে কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। সন্তাগত তাজদালীর দিক দিয়ে স্বয়ং মুসা (আঃ) —কে **لَنْ تَرِيَنِي** বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে না।—মানে, আমার সন্তাকে দেখতে পারবে না।

سَعْيُكُمْ دُورًا هَانُ وَبَرَكَاتُكُمْ هَانُ : فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ

—তুর পর্বতের এই স্থানকে কোরআন পাক ‘বরকতময় ভূমি’ বলেছে। বলাবাহুল্য, এর বরকতময় হওয়ার কারণ আল্লাহর তাজদালী, যা আশুনের আকারে এ স্থানে প্রদর্শিত হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, যে স্থানে কোন গুরুত্বপূর্ণ সংকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সে স্থানও বরকতময় হয়ে যায়।

وَيَا بَيْتُكَ وَبَيْتُكَ : هُوَ أَفْضَلُ مِثْلِي لِسَانًا

—এ থেকে জানা গেল যে, ওয়ায ও প্রচারকার্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রশংসনীয় বর্ণনাভঙ্গি কাম্য। এই গুণ অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো নিশ্চিনীয় নয়।

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَأْكُلُ مِنْ أَيْتِمِكُمْ وَمِنْ أَبْخَارِ الْأَرْضِ وَفَرَّقَ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ①
فَلَمَّا أَنَّهُ نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُّوْسَىٰ إِلَىٰ أَنْ أَتَا اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ②
وَأَنْ أُنْزِلَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يٰيُّوْسَىٰ أَفَإِنِّي أَفِيلٌ وَلَا تَخَفْ إِنَّا كُنَّا مِنَ الْإِنْسَانِ ③
أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَنِّبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضِكَ مِنْ غَيْرِ سُوٍّ وَأَقْضِ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلَمَّا زَيَّيْنَاهُ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَفَأَنْتُمْ كَاتِبُونَ ④
قَالَ رَبِّ إِنِّي مَثَلَكُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَآخَذَ أَنْ يَفْقَهُوْنَ ⑤
وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي لِسَانًا فَأَسْلَمْتُ بَيْنَهُمَا
يَصِدْقِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ⑥
قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَجَعَلْنَا لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّدِنَا أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ⑦

(২৯) অতঃপর মুসা (আঃ) যখন সেই মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তুর পর্বতের দিক থেকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবতঃ আমি সেখান থেকে তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসতে পারি অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। (৩০) যখন সে তার কাছে পৌঁছল, তখন পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার জন প্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আগুয়াজ দেয়া হল, হে মুসা! আমি আল্লাহ, বিশ্ব পালনকর্তা। (৩১) আরও বলা হল, তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে লাঠিকে সর্পের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতে দেখল, তখন সে মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে পালাতে লাগল এবং পেছন ফিরে দেখল না। হে মুসা, সামনে এস এবং ভয় করে না। তোমার কোন আশংকা নেই। (৩২) তোমার হাত বগলে রাখ। তা বের হয়ে আসবে নিরাময় উজ্জ্বল হয়ে এবং ভয় হেতু তোমার হাত তোমার উপর চেপে ধর। এই দু'টি ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের প্রতি তোমার পালনকর্তার তরফ থেকে প্রমাণ। নিশ্চয় তারা পাপাচারী সম্প্রদায়। (৩৩) মুসা বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। কাজেই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে। (৩৪) আমার ভাই হারুন, সে আমা অপেক্ষা প্রাঞ্জলভাষী। অতএব, তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্যে প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন জানাবে। আমি আশংকা করি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে। (৩৫) আল্লাহ বললেন, আমি তোমার বাহু শক্তিশালী করব তোমার ভাই দ্বারা এবং তোমাদের প্রাধান্য দান করব। ফলে, তারা তোমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। আমার নির্দর্শনাবলীর জোরে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা প্রবল থাকবে।

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رِجْسٌ
مُفْتَرٍ وَمَا سَوَّعْنَا لَهُمْ فِي آيَاتِنَا إِلَّا أَلْوِينَ ۝ وَقَالَ
مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا جَاءَهُمْ مِنَ عَذَابِيهِ وَمَنْ يُكُونُ
لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝ وَقَالَ فِرْعَوْنُ
يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي
يَهُامُنْ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَعَلَّ الظَّالِمِينَ إِلَى
إِلَهِ مُوسَى وَإِلَى آلِ فِرْعَوْنَ مِنَ الْكَذِبِيِّينَ ۝ وَاسْتَكْبَرَ
هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَكَلَّوْا أَهْلَهُمُ الْيَتَامَى
لَا يُرْجِعُونَ ۝ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَجَعَلْنَاهُمْ أَهْلَةً
يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ۝
وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ
مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ
مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّعَالَمِهِمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

(৩৬) অতঃপর মুসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে পৌঁছল, তখন তারা বলল, এতো অলীক জাদু মাত্র। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এ কথা শুনিনি। (৩৭) মুসা বলল, আমার পালনকর্তা সম্যক জানেন যে তার নিকট থেকে হেদায়েতের কথা নিয়ে আগমন করেছে এবং যে প্রাপ্ত হবে পরকালের গৃহ। নিশ্চয় জালেমরা সফলকাম হবে না। (৩৮) ফেরাউন বলল, হে পারিষদবর্গ, আমি জানি না যে, আমি ব্যতীত তোমাদের কোন উপাস্য আছে। হে হামান, তুমি ইট পোড়াও, অতঃপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর, যাতে আমি মুসার উপাস্যকে উকি মেরে দেখতে পারি। আমার তো ধারণা এই যে, সে একজন মিথ্যাবাদী। (৩৯) ফেরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাঘত হতে হবে না। (৪০) অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তৎপর আমি তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব দেখ, জালেমদের পরিণাম কি হয়েছে। (৪১) আমি তাদেরকে নেতা করেছিলাম। তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত। কেয়ামতের দিন তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। (৪২) আমি এই পৃথিবীতে অভিষাপকে তাদের পক্ষাঘাত লাগিয়ে দিয়েছি এবং কেয়ামতের দিন তারা হবে দুর্দশাগ্রস্ত। (৪৩) আমি পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর মুসাকে কিতাব দিয়েছি মানুষের জন্যে জ্ঞানবতিকা, হেদায়েত ও রহমত, যাতে তারা সুরণ রাখে।

فَأَوْقِدْ لِي يَهُامُنْ عَلَى الطِّينِ — ফেরাউন সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ

করার ইচ্ছা করেছিল। তাই সে উইর হামানকে মাটির ইট পুড়ে পাকা করার আদেশ করল। কারণ, কাঁচা ইট দ্বারা বিশাল ও সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত হতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, ফেরাউনের এই ঘটনার পূর্বে পাকা ইটের প্রচলন ছিল না। সর্বপ্রথম ফেরাউন এটা আবিষ্কার করেছে। ঐতিহাসিক রেওয়াজেতে আছে, হামান এই প্রাসাদ নির্মাণের জন্যে পঞ্চাশ হাজার রাজমিস্ত্রী যোগাড় করল। মজুর এবং কাঠ ও লোহার কাজ যারা করত, তাদের সংখ্যা ছিল এর অতিরিক্ত। প্রাসাদটি এত উচ্চ নির্মিত হয়েছিল যে, তখনকার যুগে এত উচ্চ প্রাসাদ কোথাও ছিল না। প্রাসাদের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহ তাআলা জিবরাঈলকে আদেশ করলেন। তিনি এক আঘাতে একে ত্রিখণ্ডিত করে ভূমিসাগরে করে দিলেন। ফলে ফেরাউনের হাজারো সিপাহী-এর নীচে চাপা পড়ে প্রাণ ত্যাগ করে। — (কুরতুবী)

وَجَعَلْنَاهُمْ أَهْلَةً يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা

ফেরাউনের পারিষদবর্গকে দেশ ও জাতির নেতা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ভ্রান্ত নেতারা জাতিকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত। এখানে অধিকাংশ তফসীরকার জাহান্নামের দিকে আহ্বান করাকে রূপক অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ, জাহান্নাম বলে কুফরী কাজকর্ম বোঝানো হয়েছে, যার ফল ছিল জাহান্নাম ভোগ করা। কিন্তু মাওলানা সাইয়্যদ আমিনুজ্জার শাহ কাশ্মীরী (রঃ)—এর সূচিভিত্তি অভিমত (ইবনে আরাবীর অনুকরণে) এই ছিল যে, হুবহু কাজকর্ম পরকালের প্রতিদান হবে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব কাজকর্ম করে, বরযখে ও হাশরে সেগুলোই আকার পরিবর্তন করে পদার্থের রূপ ধারণ করবে। সংকরসমূহ পুষ্ণ ও পুষ্ণোদ্যান হয়ে জাহান্নামের নেয়ামতে পর্যবসিত হবে এবং কুফর ও জুলুমের কার্যসমূহ সর্প, বিছু এবং নানারকম আযাবের আকৃতি ধারণ করবে। কাজেই দুনিয়াতে যে ব্যক্তি মানুষকে কুফর ও জুলুমের দিকে আহ্বান করে, সে প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামের দিকেই আহ্বান করে; যদিও এ দুনিয়াতে কুফর ও জুলুম জাহান্নাম তথা আগুনের আকারে নয়। এদিক দিয়ে আয়াতে কোন রূপকতা নেই। এই অভিমত গ্রহণ করা হলে কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে রূপকতার আশ্রয় নেয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে; উদাহরণতঃ مَنْ يَصْلُحْ وَيُقَالُ ذَرَّةٌ خَيْرٌ আয়াতে এবং وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاسِرًا আয়াতে

وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ — শব্দের বহুবচন।

অর্থাৎ, বিকৃত। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে কালবর্ণ এবং চক্ষু নীলবর্ণ ধারণ করবে।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى

بَصَائِرَ — পূর্ববর্তী সম্প্রদায় বলে নূহ, হুদ, সালেহ ও লুত (আঃ)

এর সম্প্রদায় সমূহকে বোঝানো হয়েছে। তারা মুসা (আঃ)—এর পূর্বে অবাস্যতার কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। بَصَائِرَ শব্দটি بصيرة —এর

القصاص ২৮

২৭৭

امن خلق ২০

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِ إِذْ قَضَيْتَ إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَتْ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ تَأْوِي إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَنَبَّأُ عَلَيْهِمُ الْيَتِيمَ ۝ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مِمَّا لَمْ يَذْكُرُوا ۝ وَلَكِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ يَلْمِزُوكَ لَمَّا فَدَمْتِ أَيْدِيَهُمْ فَيَقُولُوا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعِ آيَاتِكَ وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَكَلَّمَا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالَ لَوْلَا أَوْفَى بِمِثْلِ أَوْفَى مُوسَى ۝ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا لَهَا أَوْفَى مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ فَسَوَّاهُ لِلْآيَةِ كَيْلَ كُفْرُورٍ ۝ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَهُوَ هَذَا مِنْهُمَا اتَّبَعْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ لَا يُبَيِّنُونَ ۝ أَمْ هُمْ مِمَّنْ أَحْكَلَّ مِنْ أَسْأَلِهِمْ هَوْلًا بِخَيْرٍ هُدًى مِنَ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

(৪৪) মুসাকে যখন আমি নির্দেশনামা দিয়েছিলাম, তখন আপনি পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না এবং আপনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না। (৪৫) কিন্তু আমি অনেক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম, অতঃপর তাদের অনেক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। আর আপনি মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে ছিলেন না যে, তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করতেন। কিন্তু আমিই ছিলাম রসূল প্রেরণকারী। (৪৬) আমি যখন মুসাকে আওয়াজ দিয়েছিলাম, তখন আপনি তুর পর্বতের পার্শ্বে ছিলেন না। কিন্তু এটা আপনার পালনকর্তার রম্যত্বরূপ, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে ভীতি প্রদর্শন করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আগমন করেনি, যাতে তারা সুরণ রাখে। (৪৭) আর এ জন্য যে, তাদের কৃতকর্মের জন্যে তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলত, হে আমাদের পালনকর্তা, তুমি আমাদের কাছে কোন রসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা তোমার আয়াতসমূহের অনুসরণ করতাম এবং আমরা বিশৃঙ্খল স্থাপনকারী হয়ে যেতাম। (৪৮) অতঃপর আমার কাছ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য আগমন করল, তখন তারা বলল, মুসাকে যে রূপ দেয়া হয়েছিল, এই রসূলকে সে রূপ দেয়া হল না কেন? পূর্বে মুসাকে যা দেয়া হয়েছিল, তারা কি তা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল, উভয়ই জাদু, পরস্পরে একাত্ম। তারা আরও বলেছিল, আমরা উভয়কে মানি না। (৪৯) বলুন, তোমরা সত্যবাদী হলে এখন আল্লাহর কাছ থেকে কোন কিভাবে আন, যা এতদূর থেকে উত্তম পঞ্চদর্শক হয়। আমি সেই কিভাবে অনুসরণ করব। (৫০) অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হেদায়েতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।

বহুবচন। এর শাস্তিক অর্থ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি। এখানে সেই নূর বোঝানো হয়েছে। যা আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেন। এই নূর দ্বারা মানুষ বস্তুর স্বরূপ দেখতে পারে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। (আঃ)-এর উম্মত

বোঝানো হলে তাতে কোন খটকা নেই। কারণ, সেই উম্মতের জন্য তওরাতই ছিল জ্ঞানের আলোকবর্তিকা। পক্ষান্তরে যদি নাস শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীসহ সমগ্র মানবজাতিকে বোঝানো হয়, তবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, উম্মতে মুহাম্মদীর আমলে যে তওরাত বিদ্যমান আছে, তা পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকৃত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় একে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা বলা কিরূপে ঠিক হবে? এ ছাড়া এ থেকে জরুরী হয় যে, মুসলমানদেরও তওরাত দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত। অথচ হালীসের এই ঘটনা সুবিদিত যে, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তওরাতের উপদেশাবলী পাঠ করার অনুমতি চাইলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) রাগান্বিত হয়ে বললেন, বর্তমান যুগে মুসা জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর কোন গতান্তর ছিল না। এর সারমর্ম এই যে, তোমার উচিত আমার শিক্ষা অনুসরণ করা। তওরাত ও ইনজিলের শিক্ষা দেখা তোমার জন্যে ঠিক নয়। কিন্তু এর জওয়াবে একথা বলা যায় যে, সেই যুগের আহলে-কিতাবের হাতে তওরাতের যে কপি ছিল, তা ছিল পরিবর্তিত এবং যুগ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগ; যাতে কোরআন-অবতরণ অব্যাহত ছিল। তখন কোরআনের পূর্ণ হেফযতের উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন কোন সাহাবীকে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন, যাতে মানুষ কোরআনের সাথে হাদীসকেও জুড়ে না দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে অন্য কোন রহিত খোদারী গ্রন্থ পড়া ও পড়ানো সাবধানতার পরিপন্থী ছিল। এ থেকে জরুরী নয় যে, সর্বাবস্থায় তওরাত ও ইনজিল পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই কিতাবসমূহের যে যে অংশে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে, সে সব অংশ পাঠ করা ও উদ্ধৃত করা সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত ও প্রচলিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও কা'ব আহবার এ ব্যাপারে সমধিক প্রসিদ্ধ। অন্য সাহাবিগণও তাদের একাঙ্ক অপছন্দ করেননি। কাজেই আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে, তওরাত ও ইনজিলে যেসব অপরিবর্তিত বিষয়বস্তু অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে, এবং জ্ঞানের আলোকবর্তিকারূপে আছে, সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ। কিন্তু বলাবাহুল্য, এগুলো দ্বারা একমাত্র তাঁরাই উপকৃত হতে পারেন, যারা পরিবর্তিত ও অপরিবর্তিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম এবং শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বুঝতে পারেন। তাঁরা হলেন বিশেষজ্ঞ আলেম শ্রেণী। জনসাধারণের উচিত এ থেকে বেঁচে থাকা। নতুবা তারা বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সত্য ও মিথ্যা বিমিশ্রিত অন্যান্য কিতাবের বিশান তাই। জনসাধারণের এগুলো পাঠ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষজ্ঞগণ পাঠ করলে কোন ক্ষতি নেই।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لِئُنْذِرَ قَوْمًا مِمَّا لَمْ يَذْكُرُوا —এখানে কওম বলে হযরত ইসমাইল

(আঃ)-এর বংশধর আরবদেরকে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইসমাইলের পর থেকে শেষ নবী (সাঃ) পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হননি। সূরা ইয়াসীনেও এই বিষয়বস্তু আলোচিত হবে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে—وَلَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ ۝ এমন কোন উম্মত নেই, যার মধ্যে আল্লাহর কোন পয়গম্বর আসেননি। কিন্তু

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١﴾
 اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٢﴾ وَاذْأَيْتُنِي عَلَيْهِمْ
 قَالُوا الْمَنَاجِبُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٣﴾
 أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَبِذَرُّوا
 بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٤﴾ وَإِذْ أَسْمِعُوا
 النَّعْوَ عَرُضًا عَنْهُمْ وَقَالُوا لَنَّا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَتَّبِعُوا الْجَبِلِينَ ﴿٥﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ
 أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ
 بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٦﴾ وَقَالُوا لَئِنْ تَبِعَ الْهِنْدِيُّ مَعَكَ تَتَخَفُ
 مِنْ أَرْضِنَا لَوْ كُنَّا نَكُنْ لَهُمْ حَرَمًا إِنَّا لَنَجْعَلِيكَ الْيَوْمَ ثَمَرَ
 كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِمَّنْ كَذَبْنَا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧﴾
 وَلَوْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنٍ لَاطْرَأَتْ عَلَيْهِمُ مَا فِطْرَتُكَ عَلَيْهِمْ
 لَمْ تُنْشِكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ كُنَّا حُشْنُ الْوَرِثِينَ ﴿٨﴾ وَ
 مَا كَانِ رَيْكَ مَهْلِكُ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ سُوْرًا لِيَتْلُوا
 عَلَيْهِمُ الْآيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مَهْلِكُ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٩﴾

(৫১) আমি তাদের কাছে উপর্যুপরি বাণী পৌছিয়েছি। যাতে তারা অনুধাবন করে। (৫২) কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এতে বিশ্বাস করে। (৫৩) যখন তাদের কাছে এটা পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য। আমরা এর পূর্বেও অজ্ঞাবহ ছিলাম। (৫৪) তারা দুইবার পুনরাবৃত্তি হবে তাদের সবারের কারণে। তারা মন্দের জওয়াবে ভাল করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। (৫৫) তারা যখন অবান্ত্রিত বাজে কথাবার্তা শ্রবণ করে, তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের জন্যে আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। (৫৬) আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সংপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তাআলাই যাকে ইচ্ছা সংপথে আনয়ন করেন। কে সংপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন। (৫৭) তারা বলে, যদি আমরা আপনার সাথে সুপথে আসি, তবে আমরা আমাদের দেশ থেকে উৎখাত হবে। আমি কি তাদের জন্যে একটি নিরাপদ 'হরম' প্রতিষ্ঠিত করিনি? এখানে সর্বত্রকার ফল-মূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিমিক্ষরূপে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। (৫৮) আমি অনেক জনপদ ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা তাদের জীবন যাপনে মদমত্ত ছিল। এগুলোই এখন তাদের ঘর-বাড়ী। তাদের পর এগুলোতে মানুষ সামান্যই বসবাস করেছে। অবশেষে আমিই মালিক রয়েছি। (৫৯) আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তার কেন্দ্রস্থলে রসূল প্রেরণ না করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন এবং আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার বাসিন্দারা জুলুম করে।

নবী-রসূলের আগমন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এই উদ্ভূতও নয়।

توصيل شذات - وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

থেকে উদ্ধৃত। এর আসল আভিধানিক অর্থ রশির সূতায় আরো সূতা মিলিয়ে রশিকে মজবুত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা কোরআন-পাকে একের পর এক হেদায়েত অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর বার বার পুনরাবৃত্তিও করা হয়েছে, যাতে শ্রোতার প্রভাবান্বিত হয়।

তবলীগ ও দাওয়াতের কতিপয় রীতি : এ থেকে জানা গেল যে, সত্য কথা উপর্যুপরি বলা ও পৌছাতে থাকা পয়গম্বরগণের তবলীগের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। মানুষের অস্বীকার ও মিথ্যারোপ তাঁদের কাজে ও কর্মসংক্রান্ত কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারত না। সত্যকথা একবার না মানা হলে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার ও চতুর্থবার তাঁরা পেশ করতে থাকতেন। কারও মধ্যে প্রকৃত অন্তর সৃষ্টি করে দেয়ার সাধ্য তো কোন সহায় উপদেশদাতার নেই। কিন্তু নিজের অক্সান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন আপোহীন। আজকালও যারা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করেন, তাদের এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

—এই আয়াতে সেসব اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ আলহে কিতাবের কথা বলা হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর নবুওয়ত ও কোরআন অবতরণের পূর্বেও তওরাত ও ইনজীল প্রদত্ত সুসংবাদে ভিত্তিতে কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর নবুওয়তে বিশ্বাসী ছিল। এরপর যখন তিনি প্রেরিত হন, তখন সাবেক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কালবিলম্ব না করে মুসলমান হয়ে যায়। হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর পারিষদবর্গের মধ্য থেকে চল্লিশ জনের একটি খ্রীতনিষিদ্ধ যখন মদীনায় উপস্থিত হয় তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) খায়বর যুদ্ধে ব্যাপ্ত ছিলেন। তারাও জেহাদে অংশ গ্রহণ করল। কেউ কেউ আহতও হল, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ নিহত হল না। তারা যখন সাহাবায়ে কোরামের আর্থিক দুর্দশা দেখল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে অনুরোধ জানাল যে, আমরা আল্লাহর রহমতে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী জাতি। আপনি অনুমতি দিলে আমরা দেশে প্রত্যাবর্তন করে সাহাবায়ে কোরামের জন্যে অর্থসম্পদ সরবরাহ করব। এর পরিশ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ থেকে পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। —(মায়হারী) হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত জাফর (রাঃ) মদীনায় হিজরতের পূর্বে যখন আবিসিনিয়ায় গমন করেন এবং নাজ্জাশীর দরবারে ইসলামী শিক্ষা পেশ করেন, তখনই আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেন। তারা ছিল খ্রীষ্টান এবং তওরাত ও ইনজীল উল্লেখিত রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর আগমনের সুসংবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত। —(মায়হারী)

‘মুসলিম’ শব্দটি উদ্ভূত মুহাম্মদীর বিশেষ উপাধি, না সব উদ্ভূতের জন্যে ব্যাপক? اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ —অর্থাৎ, আলহে কিতাবের এই আলেমগণ বলল, আমরা তো কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই মুসলমান ছিলাম। এখানে ‘মুসলিম’ শব্দের আভিধানিক অর্থ (অনুগত, অজ্ঞাবহ) নিলে বিষয়টি পরিষ্কার যে, তাদের কিতাবের কারণে

কোরআন ও শেষ নবী সম্পর্কে তাদের যে বিশ্বাস অর্জিত হয়েছিল, সেই বিশ্বাসকেই ইসলাম' ও মুসলিমীন' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমরা তো পূর্বেই এতে বিশ্বাসী ছিলাম। পক্ষান্তরে যে অর্থের দিক দিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীকে 'মুসলিম' বলা হয়, সেই অর্থ নিলে এতে প্রমাণিত হয় যে, 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' শব্দ কেবলমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ উপাধি নয়; বরং সব পয়গম্বরের ধর্ম ছিল ইসলাম এবং তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলিম। কিন্তু কোরআন পাকের কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, ইসলাম ও মুসলিম শব্দ এই উম্মতের জন্যেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট, যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর উক্তি স্বয়ং কোরআনেই আছে যে, **هُوسُنُّكَ الْمُسْلِمِينَ**—আল্লাহা সুযুতী এই বৈশিষ্ট্যেরই প্রবক্তা।

এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা আছে। তাঁর মতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো পূর্বে থেকেই ইসলাম গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম সব পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং এই উম্মতের জন্যে বিশেষ উপাধি—এতদুভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, এটা সম্ভবপর যে, গুণগত অর্থের দিক দিয়ে ইসলাম সকলের অভিন্ন ধর্ম হবে এবং মুসলিম উপাধি শুধু এই উম্মতের বিশেষ উপাধি হবে। উদাহরণতঃ সিদ্দীক, ফারুক ইত্যাদি উপাধির কথা বলা যায়। এগুলো বিশেষভাবে হযরত আবুবকর ও ওমরের উপাধি, কিন্তু গুণগত অর্থের দিক দিয়ে অনার্যও সিদ্দীক ও ফারুক হতে পারেন।

أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ—অর্থাৎ, আহ্লে কিতাবের

মুমিনদেরকে দুইবার পুরস্কৃত করা হবে। কোরআন পাকে এমনি ধরনের প্রতিশ্রুতি রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর পবিত্রা বিবিগণের সম্পর্কেও বর্ণিত হয়েছে।

বলা হয়েছে—**وَمَنْ يُقْسِمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ**

أَجْرُهُمَا مَرَّتَيْنِ—সহীহ বুখারীর এক হাদীসে তিন ব্যক্তির জন্যে দুইবার পুরস্কার দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) যে কিতাবধারী পূর্বে তার পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। (২) যে অপরের মালিকানাধীন গোলাম এবং আপন প্রভুরও আনুগত্য করে এবং আল্লাহ ও রসুলেরও ফরমাবরণদারী করে। (৩) যার মালিকানায় কোন বাদী ছিল। এই বাদীর সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করা তার জন্যে জায়েয ছিল। কিন্তু সে তাকে গোলামী থেকে মুক্ত করে বিবাহিতা স্ত্রী করে নিল।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, এই কয়েক প্রকার লোককে দুইবার পুরস্কৃত করার কারণ কি? এর জওয়াবে বলা যায় যে, তাদের প্রত্যেকের আমল যেহেতু দুটি, তাদেরকে দুইবার পুরস্কার প্রদান করা হবে। কিতাবধারী মুমিনের দুই আমল এই যে, সে পূর্বে এক পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, এরপর রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি ঈমান এনেছে। পবিত্র বিবিগণের দুই আমল এই যে, তাঁরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর আনুগত্য ও মহব্বত রসুল হিসেবেও করেন এবং স্বামী হিসেবেও করেন। গোলামের দুই আমল তার দ্বিমুখী আনুগত্য, আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য এবং প্রভুর আনুগত্য। বাদীকে মুক্ত করে যে বিবাহ করে, তার এক আমল মুক্ত করা এবং দ্বিতীয় আমল বিবাহ করা। কিন্তু এই জওয়াবে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দুই আমলের দুই পুরস্কার ইনসাফভিত্তিক হওয়ার কারণে সবার জন্যে ব্যাপক। এতে কিতাবধারী মুমিন অথবা পবিত্রাগণের কোন বৈশিষ্ট্য নেই; বরং যে কেউ দুই আমল করবে, সে দুই পুরস্কার পাবে। এই প্রশ্নের জওয়াব সম্পর্কে আমি আহকামুল কোরআন সূরা কাসাসে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছি। কোরআনের ভাষা থেকে যা প্রমাণিত হয়, তা এই যে, এখানে উদ্দেশ্য শুধু দুই পুরস্কার নয়। কেননা, এটা প্রত্যেক

আমলকারীর জন্যে সাধারণ কোরআনি বিধি **أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ**—অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা কোন আমলকারীর আমল বিনষ্ট করেন না। বরং সে যতই সংকর্ম করবে, তারই হিসেবে পুরস্কার পাবে। তবে উল্লেখিত প্রকারসমূহে দুই পুরস্কারের অর্থ এই যে, তাদেরকে প্রত্যেক আমলের দ্বিগুণ সওয়াব দেয়া হবে। প্রত্যেক নামাযের দ্বিগুণ, রোযা, সদকা, হজ্জ, ওমরা ইত্যাদি প্রত্যেকটির দ্বিগুণ সওয়াব তারা লাভ করবে। কোরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দুই পুরস্কারের জন্যে সংক্ষিপ্ত শব্দ ছিল **اجرين** কিন্তু কোরআন এর পরিবর্তে বলেছে **أَجْرُهُمْ مَرَّتَيْنِ**—এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এর উদ্দেশ্য তাদের প্রত্যেক আমল দুইবার লিখা হবে এবং প্রত্যেক আমলের জন্যে দুই সওয়াব দেয়া হবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, তাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণ কি? এর সুস্পষ্ট জওয়াব এই যে, আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা আছে, তিনি বিশেষ কোন আমলকে অন্যান্য আমলের চাইতে শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করতে পারেন এবং এর পুরস্কার বাড়িয়ে দিতে পারেন। কারও এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই যে, আল্লাহ তাআলা রোযার সওয়াব এত বাড়িয়ে দিলেন কেন? যাকাত ও সদকার সওয়াব এত বাড়ালেন না কেন? এটা সম্ভবপর যে, আলোচ্য আয়াতে ও বুখারীর হাদীসে যেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, এগুলোর মর্তব্য অন্যান্য আমলের চাইতে কোন না কোন দিক দিয়ে বেশী। তাই এই পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে। কোন কোন আলম যে দ্বিগুণ শ্রমকে এর কারণ সাব্যস্ত করেছেন, তারও সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। আয়াতের শেষ বাক্যে **بِمَا صَبَرُوا** এর প্রমাণ হতে পারে। অর্থাৎ, শ্রমে সবার করা দ্বিগুণ সওয়াবের কারণ।

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ الشَّيْئَةَ—অর্থাৎ, তারা মন্দকে ভাল দ্বারা দূর করে। এই মন্দ ও ভাল বলে কি বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে তফসীরকারকদের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ বলেন, ভাল বলে এবাদত এবং মন্দ বলে গোনাহ বোঝানো হয়েছে। কেননা, পুণ্য কাজ অসংকাজকে মিটিয়ে দেয়। এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মুয়ায ইবনে জাবালকে বলেন, **اتبع السنة الحسنة تحمها**—অর্থাৎ, গোনাহের পর নেক কাজ কর। নেককাজ গোনাহকে মিটিয়ে দেবে। কেউ কেউ বলেন, ভাল বলে জ্ঞান ও সহনশীলতা এবং মন্দ বলে অজ্ঞতা ও অনবধানতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তারা অপরের অজ্ঞতার জওয়াব জ্ঞান ও সহনশীলতা দ্বারা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, এগুলো সবই ভাল ও মন্দের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ আছে : প্রথম, কারও দ্বারা কোন গোনাহ হয়ে গেলে তার প্রতিকার এই যে, এরপর সংকাজে সচেতন হতে হবে। সংকাজ গোনাহের কাফফারা হয়ে যাবে; যেমন উপরে মুয়াযের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়, কেউ কারও প্রতি উৎপীড়ন ও মন্দ আচরণ করলে শরীয়তের আইনে যদিও সমান সমান হওয়ার শর্তে প্রতিশোধ নেয়া জায়েয আছে, কিন্তু প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে মন্দের প্রত্যুত্তরে ভাল এবং উৎপীড়নের প্রত্যুত্তরে অনুগ্রহ করাই উত্তম। এটা উৎকট চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তর। ইহকালে ও পরকালে এর উপকারিতা অনেক। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে এই পথনির্দেশটি আরও সুস্পষ্ট ভাষায় বিধৃত হয়েছে। বলা হয়েছে—

وَدْعُوا إِلَىٰ حَيْثُ أَحْسَنَ فَإِنَّ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

অর্থাৎ, মন্দ ও যুলুমকে উৎকৃষ্ট পন্থায় প্রতিহত কর। (যুলুমের পরিবর্তে অনুগ্রহ কর)। এরূপ করলে যে ব্যক্তি ও তোমার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْكُوا لِلَّذِينَ هُم مَوْتٌ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ - অর্থাৎ, তাদের একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র

এই যে, তারা কোন অজ্ঞ শত্রুর কাছ থেকে নিজেদের সম্পর্কে যখন অর্থহীন ও বাজে কথাবার্তা শোনে, তখন তার জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে একথা বলে দেয়, আমার সালাম গ্রহণ কর। আমি অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না। ইমাম জাসাস বলেন, সালাম দুই প্রকার। (এক) মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অভিবাদনমূলক সালাম। (দুই) সন্ধি ও বর্জনমূলক সালাম। অর্থাৎ, প্রতিপক্ষকে বলে দেয়া যে, আমি তোমার অসার আচরণের প্রতিশোধ নেব না। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

‘হেদায়েত’ শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) শুধু পথ দেখানো। এর জন্যে জরুরী নয় যে, যাকে পথ দেখানো হয়, সে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেই যাবে। (দুই) পথ দেখিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বরং সব পয়গম্বর যে হাদী অর্থাৎ, পথপ্রদর্শক ছিলেন এবং হেদায়েত যে তাঁদের ক্ষমতাসীম ছিল, তা বলাই বাহুল্য। কেননা, এই হেদায়েতই ছিল, তাঁদের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য। এটা তাঁদের ক্ষমতাসীম না হলে তাঁরা নবুওয়ত ও রেসালতের কর্তব্য পালন করবে কিরূপে? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) হেদায়েতের উপরে ক্ষমতাসীম নন। এতে দ্বিতীয় অর্থের হেদায়েত বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রচার ও শিক্ষার মাধ্যমে আপনি কারও অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেবেন এবং তাকে মুমিন বানিয়ে দিবেন, এটা আপনার কাজ নয়। এটা সরাসরি আল্লাহ তাআলার ক্ষমতাসীম। হেদায়েতের অর্থ ও তার প্রকারসমূহের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সূরা বাকারার শুরুতে উল্লেখিত হয়েছে।

সহীহ মুসলিমে আছে এই আয়াত রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পিতৃব্য আবু তালেব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে কোনরূপেই ইসলাম গ্রহণ করুক। এর প্রেক্ষাপটে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলা হচ্ছে যে, কাউকে মুমিন-মুসলমান করে দেয়া আপনার ক্ষমতাসীম নয়। তফসীরে রুহুল মা’আনীতে আছে, আবু তালেবের ঈমান ও কুফরের ব্যাপারে বিনা প্রয়োজনে আলোচনা, বিতর্ক ও তাকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। কারণ, এতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মনোকষ্টের সম্ভাবনা রয়েছে।

وَقَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ هَذَا الْفُجُورُ مِنْكُمْ لَنَنْكَرَنَّ مِنْكُمْ - অর্থাৎ, হারেস

ইবনে ওসমান প্রমুখ মক্কার কাফের তাদের ঈমান কবুল না করার এক কারণ এই বর্ণনা করল যে, আপনার শিক্ষাকে সত্য মনে করি, কিন্তু আমাদের আশংকা এই যে, আপনার পথনির্দেশ মেনে আমরা আপনার সাথে একাত্ম হয়ে গেলে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করে দেয়া হবে। —(নাসায়ী) কোরআন পাক তাদের এই খোঁড়া অজুহাতের তিনটি জওয়াব দিয়েছে :

(১) أَوَلَمْ نَكُنْ لَكُمْ حَرَمًا الْمُنَاجِي إِلَى اللَّهِ ثُمَّ لَمْ تُنْصَرُوا

অর্থাৎ, তাদের এই অজুহাত বাতিল। কারণ, আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে মক্কাবাসীদের হেফাযতের জন্যে একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন। তা এই যে, তিনি মক্কার ভূখণ্ডকে নিরাপদ হারাম করে দিয়েছেন। সমগ্র আরবের গোত্রসমূহ কুফর, শিরক ও পারম্পরিক শত্রুতা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে একমত ছিল যে, মক্কার হরমের অভ্যন্তরে হত্যা ও যুদ্ধবিগ্রহ খোরতম হারাম। হরমের অভ্যন্তরে পিতার হত্যাকারীকে পেলে পুত্র চরম প্রতিশোধস্বপ্ন সত্ত্বেও তাকে হত্যা করতে বা প্রতিশোধ নিতে পারত না। অতএব যে প্রভু নিজ কৃপায় কুফর ও শিরক সত্ত্বেও তাদেরকে এই ভূখণ্ডে নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছেন, ঈমান কবুল করলে তিনি তাদেরকে ধ্বংস হতে দেবেন, এ আশংকা চরম মুর্থতা বৈ কিছু নয়। ইয়াহুইয়া ইবনে-সালাম বলেন, আয়াতের অর্থ এই যে, তোমরা হরমের কারণে নিরাপদ ছিলে, আমার দেয়া রিয়িক স্বত্বদে খেয়ে যাচ্ছিলে এবং আমাকে পরিত্যাগ করে অন্যের এবাদত করছিলে। এই অবস্থার কারণে তো তোমাদের ভয় হল না উল্টা ভয় হল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে। —(কুতুবী) আলোচ্য আয়াতে হরমের দুইটি গুণ বর্ণিত হয়েছে : (১) এটা শান্তির আবাসস্থল, (২) এখানে বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে সর্ব প্রকার ফল-মূল আমদানী হয়, যাতে মক্কার বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজন সহজে মেটাতে পারে।

মক্কার হরমে প্রত্যেক প্রকার ফল-মূল আমদানী হওয়া বিশেষ কুদরতের নিদর্শন : মক্কা মোকাররমা, যাকে আল্লাহ তাআলা নিজ গৃহের জন্যে সারা বিশ্বের মধ্য থেকে মনোনীত করেছেন, এটা এমন একটি স্থান যে, এখানে পার্থিব জীবনোপকরণের কোন বস্তু সহজে পাওয়া যাবার কথা নয়। কেননা, গম, ছোলা, চাউল ইত্যাদি মানুষের সাধারণ খাদ্যের উৎপাদনও এখানে না হওয়ার পর্যায়ে ছিল। ফল-মূল তরকারি ইত্যাদির তো কোন কথাই নেই। কিন্তু মক্কার এসব বস্তুর প্রাচুর্য দেখে বিবেক-বুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রতি বছর হজ্জের মওসুমে মক্কার তিন লাখ জনসংখ্যার উপর আরও বার থেকে পনের লাখ মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে যায়, যারা গড়ে দুই-আড়াই মাস সেখানে বাস করে। কিন্তু কখনও শোনা যায়নি যে, তাদের মধ্যে কেউ কোন দিন খাদ্যের অভাব ভোগ করেছে। বরং সবাই প্রত্যক্ষ করে যে, এখানে দিবা-রাত্রির সকল সময়ে প্রচুর পরিমাণ তৈরী খাদ্য পাওয়া যায়। কোরআন পাকের

ثَبَرْتُ كُلَّ شَيْءٍ শব্দে চিন্তা করলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সাধারণ পরিভাষায় ثَبَرْتُ শব্দটি বৃক্ষের সাথে সম্পর্ক রাখে। কাজেই স্থান ছিল এরূপ বলার : ثَمَرَاتُ كُلِّ شَجَرٍ এর পরিবর্তে ثَبَرْتُ كُلَّ شَيْءٍ বলার মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে যে, ثَبَرْتُ শব্দের অর্থ এখানে শুধু ফল-মূল নয়; বরং এর অর্থ যে কোন উৎপাদন। মিল কারখানায় নির্মিত সামগ্রীও মিল-কারখানার ثَبَرْتُ তথা উৎপাদন। এভাবে আয়াতের সারমর্ম হবে এই যে মক্কার হরমে শুধু আহাৰ্য ও পানীয় দ্রব্যাদিই আমদানী হবে না; বরং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সবকিছুই এখানে সরবরাহ করা হবে। তাই আজ খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে যে, মক্কা যেমন প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের খাদ্য ও উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, জগতের অন্য কোন দেশেই বোধহয় তদ্রূপ পাওয়া যায় না। এ হচ্ছে মক্কার কাফেরদের অজুহাতের জওয়াব যে, যিনি তোমাদের কুফর ও শিরক সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি এতসব অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের দেশকে যাবতীয় বিপদাশঙ্কা থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন এবং এদেশে কোন কিছুই উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের উৎপাদিত দ্রব্য-সামগ্রী এখানে এনে সমাবেশ করেছেন, সেই

বিশ্বস্ততার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে এসব নেয়ামত হাতছাড়া হয়ে যাবে—এরূপ আশংকা করা চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা বৈ নয়।

(২) এরপর তাদের অজুহাতের দ্বিতীয় জওয়াব এই : وَكَذَلِكَ

مِنْ قَوْلِهِمْ إِذْ طُرِدْتَ مِنْهُنَّ عَصِيْبَةً এতে বলা হয়েছে যে, জগতের অন্যান্য

কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কুফর ও শেরকের কারণে তারা কিভাবে নিপাত হয়েছে। তাদের বসত-বাটি, সুদৃঢ় দুর্গ ও প্রতিরক্ষামূলক সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে। অতএব কুফর ও শেরকই হচ্ছে প্রকৃত আশঙ্কার বিষয়। এটা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। তোমরা এমনিই বোকা ও নির্বোধ যে, কুফর ও শেরকের কারণে বিপদাশঙ্কা বোধ কর না, ঈমানের কারণে বিপদাশঙ্কা বোধ কর।

(৩) তৃতীয় জওয়াব এই : وَمَا أَوْتَيْنَهُمْ شَيْئًا فَكَذَّبُوا بِرِجْوَاهِ الْخِيَارِ

এতে বলা হয়েছে, যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে ঈমান কবুল করার ফলে তোমাদের কোন ক্ষতি হয়েই যায়, তবে তা ক্ষণস্থায়ী। এ জগতের ভোগ-বিলাস, আরাম-আয়েশ ও ধন-দৌলত যেমন ক্ষণস্থায়ী, কারও কাছে চিরকাল থাকে না, তেমনি এখানকার কষ্টও ক্ষণস্থায়ী—দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই বুদ্ধিমানের উচিত, সেই কষ্ট ও সুখের চিন্তা করা, যা চিরস্থায়ী, অক্ষয়। চিরস্থায়ী ধন ও নেয়ামতের খাতিরে ক্ষণস্থায়ী কষ্ট সহ্য করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

لَوْ تَرَىٰٓ إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِمُ الْأُولِيَآءَ - অর্থাৎ, অতীত সম্প্রদায়সমূহের

যেসব জনপদকে আল্লাহুর আযাব দূরা-বিক্ষেপ্ত করা হয়েছিল, এখন পর্যন্ত সেগুলোতে মানুষ সামান্যই মাত্র বসবাস করছে। বাজ্জায়ের উক্তি অনুযায়ী এই ‘সামান্য’র অর্থ যদি যৎসামান্য বাসস্থান কিংবা আবাস নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য হবে এই যে, সামান্য সংখ্যক বাসগৃহ ব্যতীত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহের কোন বাসগৃহ পুনরায় আবাদ হয়নি। কিন্তু হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, ‘সামান্য’-র অর্থ সামান্যক্ষণ বা সামান্য সময় অর্থাৎ এসব জনপদে কেউ থাকলেও সামান্যক্ষণ থাকে, যেমন কোন পথিক অল্পক্ষণের জন্যে কোথাও বসে বিশ্রাম নেয়। একে জনপদের আবাদী বলা যায় না।

حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ مِّثْلِهِمْ - শব্দটি মূল ও ভিত্তির অর্থেও

বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। امها এর সর্বনাম দ্বারা قری বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, জনপদসমূহের মূল কেন্দ্রস্থল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা কোন সম্প্রদায়কে তখন পর্যন্ত ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত তাদের প্রধান প্রধান নগরীতে কোন রসুলের মাধ্যমে সত্যের পয়গাম না পৌঁছে দেন। সত্যের দাওয়াত পৌঁছার পর যখন লোকেরা তা কবুল করে না, তখন জনপদসমূহের উপর আযাব নেমে আসে।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলার পয়গাম্ভরণ সাধারণতঃ বড় বড় শহরে প্রেরিত হতেন। তাঁরা ছোট শহর ও গ্রামে আসতেন না। কেননা, এরূপ শহর ও গ্রাম সাধারণতঃ শহরের অধীন হয়ে থাকে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও এবং শিক্ষাগত প্রয়োজনেও প্রধান শহরে কোন বিষয় ছড়িয়ে পড়লে তার আলোচনা আশপাশের ছোট শহর ও গ্রামে আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়ে; এ কারণেই কোন বড় শহরে রসুল প্রেরিত হয়ে দাওয়াত পেশ করলে এই দাওয়াত ছোট শহর ও গ্রামে স্বভাবতই পৌঁছে যেতো। ফলে সংশ্লিষ্ট সবার উপর আল্লাহুর পয়গাম কবুল করা ফরয হয়ে যেতো এবং অস্বীকার ও মিথ্যারোপের কারণে সবার উপর আযাব নেমে আসাই ছিল স্বাভাবিক।

নির্দেশ ও আইন-কানুনে ছোট শহর ও গ্রাম বড় শহরের অধীন :

এ থেকে জানা গেল যে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনাদির ক্ষেত্রে যেমন ছোট ছোট জনপদ বড় শহরের অধীন হয়ে থাকে, সেখান থেকেই তাদের প্রয়োজনাদি মিটে থাকে, তেমনি কোন নির্দেশ পালন করা সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহের উপরও অপরিহার্য হয়ে যায়। না জানা অথবা না শোনার ওয়র গ্রহণযোগ্য হয় না।

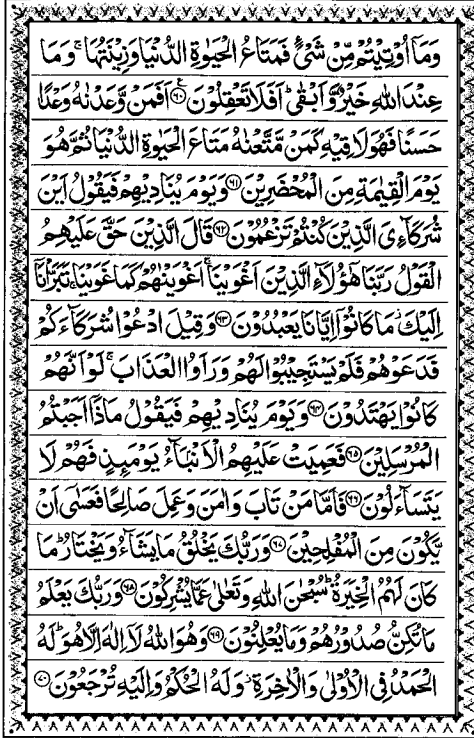
এ জন্যে রমযান ও ঈদের চাঁদের প্রশ্নেও ফেকাহবিদগণ বলেন যে, এক শহরে শরীয়তসম্মত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা বিচারপতির নির্দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট জনপদসমূহেরও তা মেনে নেয়া জরুরী। কিন্তু অন্য শহরবাসীদের জন্যে এটা তখন সেই শহরের বিচারপতি কর্তৃক এই সাক্ষ্য প্রমাণ স্বীকার করে নিয়ে আদেশ জারী না করা পর্যন্ত জরুরী হবে না।—(ফতোয়া গিয়াসিয়া)

القصاص ২৮

৩৭৮

অনখলু ৮

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়



(৬০) তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা পার্শ্ববর্তী জীবনের ভোগ ও শোভা বৈ নয়। আর আল্লাহর কাছে যা আছে, তা উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বোঝ না? (৬১) যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যাকে আমি পার্শ্ববর্তী জীবনের ভোগ-সভার দিয়েছি, অতঃপর তাকে কেয়ামতের দিন অপরাধীরাপে হাযির করা হবে? (৬২) যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে আওয়াজ দিয়ে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক দাবী করতে, তারা কোথায়? (৬৩) যাদের জন্যে শাস্তির আদেশ অবধারিত হয়েছে, তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! এদেরকেই আমরা পথভ্রষ্ট করেছিলাম। আমরা তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম, যেমন আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। আমরা আপনার সামনে দায়মুক্ত হিচ্ছি। তারা কেবল আমাদেরই এবাদত করত না। (৬৪) বলা হবে, তোমরা তোমাদের শরীকদের আহ্বান কর। তখন তারা ডাকাবে। অতঃপর তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা আযাব দেখবে। হায়! তারা যদি সংপথ প্রাপ্ত হত। (৬৫) যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রসূলগণকে কি জওয়াব দিয়েছিলে? (৬৬) অতঃপর তাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে না। (৬৭) তবে যে তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্য করে, আশা করা যায়, সে সফলকাম হবে। (৬৮) আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। তাদের কোন ক্ষমতা নেই। আল্লাহ্ পবিত্র এবং তারা যাকে শরীক করে, তা থেকে উর্ধ্ব। (৬৯) তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, আপনার পালনকর্তা তা জানেন। (৭০) তিনিই আল্লাহ্। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইহকাল ও পরকালে তাঁরই প্রশংসা। বিধান তাঁরই ক্ষমতাবান এবং তোমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَمَاعِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْغَى - অর্থাৎ, দুনিয়ার ধন - সম্পদ ও

বিলাস-ব্যসন সবই ধ্বংসশীল। দুনিয়ার কাজকর্মের যে প্রতিদান পরকালে পাওয়া যাবে, তা এখনকার ধন-সম্পদ ও বিলাস-ব্যসন থেকে গুণগত দিক দিয়েও অনেক উত্তম এবং চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ধন-সম্পদ যতই উৎকৃষ্ট হোক, পরিশেষে ধ্বংস ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিম্নস্তরের ও ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অধিকতর সুখদায়ক ও চিরস্থায়ী জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিতে পারেন না।

বুদ্ধিমান তাকেই বলে, যে দুনিয়ার ঝামেলায় কম মগ্ন থাকে এবং পরকালের চিন্তা বেশী করে : ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, যদি কেউ মৃত্যুর সময় ওসিয়ত করে যে, তার ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি যেন সর্বাধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দান করা হয়, তবে এই ধন-সম্পদের শরীয়তসম্মত প্রাপক হবে—যারা আল্লাহ্ তাআলার এবাদত ও আনুগত্যে মশগুল রয়েছেন। কেননা, বুদ্ধির দাবী এটাই এবং দুনিয়াদারদের মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান তারা। এই মাসআলা হানাফী মযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব দুবরে মুখতারেও উল্লেখিত আছে।

হাশরের ময়দানে কাফের ও মুশরেকদেরকে প্রথম প্রশ্ন শেরক সম্পর্কে করা হবে। অর্থাৎ, যেসব শয়তান ইত্যাদিকে তোমরা আমার শরীক বলতে এবং তাদের কথামত চলতে, তারা আজ কোথায়? তারা তোমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারে কি? জওয়াবে মুশরিকদের একথা বলাই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের কোন দোষ নেই। আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শিরক করিনি; বরং এই শয়তানরা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল। তাই আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং শয়তানদের মুখ থেকে একথা বের করাবেন যে, আমরা বিভ্রান্ত করেছি ঠিকই, কিন্তু আমরা তাদেরকে বাধ্য করিনি। এজন্যে আমরাও অপরাধী, কিন্তু অপরাধ থেকে মুক্ত তারাও নয়। কারণ, আমরা যেমন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, এর বিপরীতে পয়গম্বরগণ ও তাঁদের নায়বগণ তাদেরকে হেদায়েতও করেছিলেন এবং প্রমাণাদি দ্বারা তাদের কাছে সত্যও ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তারা স্বেচ্ছায় পয়গম্বরগণের কথা অগ্রাহ্য করেছে এবং আমাদের কথা মেনে নিয়েছে। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে দোষমুক্ত হতে পারে? এ থেকে জানা গেল যে, সত্যের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সামনে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সত্যের দাওয়াত কবুল না করে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া কোন ধর্ষব্য ও ঘর নয়।

وَرَبِّكَ يُخَوِّلُ مَا يَشَاءُ مِنْ آيَاتٍ - এই আয়াতের এক অর্থ তফসীরের

সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, وَيَخَوِّلُ -এর অর্থ বিধান জারীর ক্ষমতা। আল্লাহ্ তাআলা একাই যখন সৃষ্টিকর্তা, তাঁর কোন শরীক নেই, তখন বিধান জারীতেও তিনি একক। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টজীবের মধ্যে বিধান জারী করেন। সারকথা এই যে, সৃষ্টিগত ক্ষমতায় যেমন আল্লাহর কোন শরীক নেই, তেমনি বিধান জারী করার ক্ষমতায়ও তাঁর কোন অংশীদার নেই। এর অপর এক অর্থ ইমাম বগভী তাঁর তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে কাইয়াম যাদুল মা'আদের ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, وَيَخَوِّلُ -এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা মানবজাতির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা সম্প্রদানের জন্যে মনোনীত করেন। বগভীর উক্তি অনুযায়ী এটা মুশরিকদের এই কথার জওয়াব لَوْلَا نَزَّلَ لَهَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْنَيْنِ -অর্থাৎ এই কোরআন আরবের দু'টি বড় শহর মক্কা ও মদ্যনায়

মধ্য থেকে কোন প্রধান ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ করা হল না কেন? এরূপ করলে এর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হত। একজন পিতৃহীন দরিদ্র লোকের প্রতি নাহিল করার রহস্য কি? এর জওয়াবে বলা হয়েছে যে, যে মালিক সমগ্র সৃষ্টিজগতকে কোন অশীদারের সাহায্য ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেছেন, কোন বান্দাকে বিশেষ সম্মান দানের জন্যে মনোনীত করার ক্ষমতাও তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনি তোমাদের এই প্রস্তাবের অনুসারী হবেন কেন যে, অমুক যোগ্য, অমুক যোগ্য নয়?

এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর এবং এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের বিশুদ্ধ মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছা : হাফেয ইবনে কাইয়্যাম এই আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান উদ্ভাবন করেছেন। তা এই যে, দুনিয়াতে এক স্থানকে অন্য স্থানের উপর অথবা এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। এই শ্রেষ্ঠত্ব দান সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপার্জন ও কর্মের ফল নয়; বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে স্রষ্টার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি। তিনি সপ্ত-আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে উর্ধ্ব আকাশকে অন্যগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অথচ সবগুলো আকাশের উপাদান একই ছিল। তিনি জান্নাতুল ফেরদাউসকে অন্য সব জান্নাতের উপর, জিবরাঈল, মীকাঈল, ইসরাফীল প্রমুখ বিশেষ ফেরেশতাগণকে অন্য ফেরেশতাদের উপর, পয়গম্বরগণকে সমগ্র আদমসন্তানের উপর, তাঁদের মধ্যে দৃঢ়চেতা পয়গম্বরকে অন্য পয়গম্বরগণের উপর, ইবরাহীম খলীল ও হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে অন্য দৃঢ়চেতা পয়গম্বরগণের উপর, ইসমাইল (আঃ)-এর বংশধরকে সমগ্র মানবজাতির উপর, কোরাইশকে তাদের সবার উপর,

মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সব বনী হাশেমের উপর এবং এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য মনীষীকে অন্য মুসলমানদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এগুলো সব আল্লাহ তাআলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি।

এমনিভাবে পৃথিবীর অনেক স্থানকে অন্য স্থানের উপর, অনেক দিন ও রাতকে অন্য দিন ও রাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করাও আল্লাহ তাআলার মনোনয়ন ও ইচ্ছার প্রভাব। মোটকথা, শ্রেষ্ঠত্ব ও অশ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি এই মনোনয়ন ইচ্ছাই। তবে শ্রেষ্ঠত্বের অপর একটি কারণ মানুষের কর্মকাণ্ডও হয়ে থাকে। যেসব স্থানে সৎকর্ম সম্পাদিত হয়, সেসব স্থানও সৎকর্ম অথবা সৎকর্মপ্রায়ণ বান্দাদের বসবাসের কারণে পবিত্র ও পুণ্যময় হয়ে যায়। এই শ্রেষ্ঠত্ব উপার্জন ইচ্ছা ও সৎকর্মের মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। সারকথা এই যে, দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি দু'টি। একটি ইচ্ছাদীন, যা সৎকর্ম ও উত্তম চরিত্র দ্বারা অর্জিত হয়। আল্লামা ইবনে কাইয়্যাম এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং পরিশেষে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনকে সব সাহাবীর উপর এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে হযরত আবু বকর, অতঃপর ওমর ইবনে খাত্তাব অতঃপর ওসমান গনী অতঃপর আলী মুর্তাযা (রাঃ)-এর ক্রমকে উপরোক্ত উভয় মাপকাঠি দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। হযরত শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (রহঃ)-এরও একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা, এই বিষয়বস্তুর উপর ফার্সী ভাষায় লিখিত আছে। বর্তমান লেখক এর “বো’দিত তাফসীল লি মাস আলাতিত তাফসীল” নামে উর্দু তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া আমি ‘আহকামুল কোরআন’ সূরা কাসাসেও আরবী ভাষায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুধীবর্গ অনুসন্ধানসূ হলে সেখানে দেখে নিতে পারেন।

أَرَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْإِلَّهَ سَمْدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يُرِيدُ
بِضْيَاؤُكُمْ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْإِلَٰهَ سَمْدًا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يُرِيدُ بِضْيَاؤُكُمْ أَفَلَا تَسْمَعُونَ

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাতের সাথে তার একটি উপকারিতা উল্লেখ করেছেন। بِضْيَاؤُكُمْ অর্থাৎ, রাতে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে। এর বিপরীতে দিনের সাথে بِضْيَاؤُكُمْ বলে তার কোন উপকারিতা উল্লেখ করেননি। কারণ এই যে, দিবালোক নিজ সন্তাগতভাবে উত্তম। অন্ধকার থেকে আলোক যে উত্তম তা সুবিদিত। আলোকের অসংখ্য উপকারিতা এত সুবিদিত যে, তা বর্ণনা করার মোটেই প্রয়োজন নেই। রাত হচ্ছে অন্ধকার, যা সন্তাগতভাবে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী নয়। বরং মানুষের আরাম ও বিশ্রামের কারণে এর শ্রেষ্ঠত্ব। তাই একে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। এ কারণেই দিনের ব্যাপারের শেষে أَفَلَا تَسْمَعُونَ এবং রাতের ব্যাপারের শেষে أَفَلَا تَسْمَعُونَ বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, দিনের শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও উপকারিতা এত বেশী যে, তা দৃষ্টিসীমায় আসতে পারে না, তবে শোনা যায়। তাই أَفَلَا تَسْمَعُونَ বলা হয়েছে। কেননা, মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির সিংহভাগ কর্মের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। চোখে দেখা বিষয় সব সময় কানে শোনা বিষয়ের তুলনায় কম। রাতের উপকারিতা দিনের উপকারিতার তুলনায় কম। তা দেখাও যেতে পারে। তাই أَفَلَا تَسْمَعُونَ বলা হয়েছে।—(মাহহারী)

সূরা কাসাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ফেরাউন ও ফেরাউন-বংশীয়দের সাথে মুসা (আঃ)—এর একক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে তাঁরই সম্প্রদায়ভুক্ত কারনের সাথে তাঁর দ্বিতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, দুনিয়ার ধন-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এর মহব্বতে ডুবে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয় : وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ لِلْحَيَاةِ الدُّنْيَا কারনের কাহিনীতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ধন-সম্পদ অর্জিত হওয়ার পর সে এই উপদেশ বেমালুম ভুলে যায়। এর নেশায় বিভোর হয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে ক্তম্মতা করে এবং ধন-সম্পদে ফকীর-মিসকিনের প্রাপ্য অধিকার আদায় করতেও অস্বীকৃত হয়। এর ফলে তাকে ধনভাগ্যসহ ভূগর্ভে বিলীন করে দেয়া হয়।

قَارُونُ—সম্ভবতঃ হিব্রু ভাষার একটি শব্দ। তার সম্পর্কে কোরআন থেকে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, সে মুসা (আঃ)—এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসা (আঃ)—এর সাথে তার সম্পর্ক কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে-আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে তাকে মুসা (আঃ)—এর চাচাত ভাই বলা হয়েছে। এছাড়া আরও উক্তি আছে।—(কুরতুবী, রূহুল-মা'আনী)

রূহুল-মা'আনীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েত থেকে বলা হয়েছে যে, কারুন তওরাতের হাফেয ছিল এবং তওরাত তার অন্য সবার চাইতে বেশী মুখস্থ ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সামেরীর অনুরূপ কপট বিশ্বাসী প্রমাণিত হল। তার কপট বিশ্বাসের কারণ ছিল পার্শ্বি সম্মান ও

(৭১) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি রাত্রিকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে, যে তোমাদেরকে আলোক দান করতে পারে? তোমরা কি তবুও কর্পপাত করবে না? (৭২) বলুন, ভেবে দেখ তো, আল্লাহ যদি দিনকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ ব্যতীত এমন উপাস্য কে আছে যে তোমাদেরকে রাত্রি দান করতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তোমরা কি তবুও ভেবে দেখবে না? (৭৩) তিনিই স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্যে রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৭৪) যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করত, তারা কোথায়? (৭৫) প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে আমি একজন সাক্ষী আলাদা করব; অতঃপর বলব, তোমাদের প্রমাণ আন। তখন তারা জ্ঞানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহর এবং তারা যা গড়ত, তা তাদের কাছ থেকে উঠাও হয়ে যাবে। (৭৬) কারুন ছিল মুসার সম্প্রদায়ভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি দুষ্টামি করতে আরম্ভ করল। আমি তাকে এত ধন-ভাগ্য দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলল, দস্ত করো না, আল্লাহ দাস্তিকদেরকে ভালবাসেন না। (৭৭) আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেনো না। তুমি অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেননা।

জাঁকজমকের প্রতি অগাধ ও অন্যায মোহ। মুসা (আঃ) ছিলেন সমস্ত বনী ইসরাঈলের নেতা এবং তাঁর লাভা হারুন (আঃ) ছিলেন তাঁর উখীর ও নবুওয়তের অংশীদার। এতে কারুনের মনে হিঙ্গো জাগে যে, আমিও তাঁর জাতি ভাই এবং নিকট স্বজন। এই নেতৃত্বে আমার অংশ নেই কেন? সেমতে সে মুসা (আঃ)-এর কাছে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত বিষয়। এতে আমার কোন হাত নেই। কিন্তু কারুন এতে সন্তুষ্ট হল না এবং মুসা (আঃ)-এর প্রতি হিংসাপরায়াস হয়ে উঠে।

قَتَلَهُ عَلَىٰ عَقِبِهِ - قَتَلَ কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থ-জুলুম করা। আয়াতের অর্থ এই যে, সে ধন-সম্পদের নেশায় অপরের প্রতি জুলুম করতে লাগল। ইয়াহুইয়া ইবনে সালাম ও সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন, কারুন ছিল বিত্তশালী। ফেরাউন তাকে বনী ইসরাঈলের দেখানোয়ার কাছে নিযুক্ত করেছিল। এই পদে থাকে অবস্থায় সে বনী-ইসরাঈলের উপর নির্যাতন চালায়।—(কুরতুবী)

এর অপর অর্থ অহংকার করা। অনেক তফসীরবিদ এই অর্থ ধরেই বলেছেন যে, কারুন ধন-দৌলতের নেশায় বিভোর হয়ে বনী-ইসরাঈলের মোকাবেলায় অহংকার করতে থাকে এবং তাদেরকে লালিত ও হেয় প্রতিপন্ন করে।

كَانَ كَنُزًا - وَاتَّيْنَهُ مِنَ الْكَوْنِ - কন শব্দটি কনু এর বহুবচন। এর অর্থ ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডার। শরীয়তের পরিভাষায় কনু এমন ধন-ভাণ্ডারকে বলা হয়, যার যাকাত দেয়া হয়নি। হযরত আতা থেকে বর্ণিত আছে যে, কারুন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর একটি বিরাট ভূগর্ভস্থ ধন-ভাণ্ডারপ্রাপ্ত হয়েছিল।—(রহল মা'আনী)

عَصِيَّةً - لَكُونُوا بِالْغَيْبَةِ - শব্দের অর্থ বোকার ভাৱে ঝুঁকিয়ে দেয়া। عَصِيَّة শব্দের অর্থ দল। উদ্দেশ্য এই যে, তার ধন-ভাণ্ডার ছিল বিরাট। এগুলোর চাবি এত অধিকসংখ্যক ছিল যে, তা বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। বলাবাহুল্য, চাবি সাধারণতঃ হালকা গুজনের হয়ে থাকে, যাতে বহন করা ও সঙ্গে রাখা কষ্টসাধ্য না হয়। কিন্তু প্রচুরসংখ্যক হওয়ার কারণে কারুনের চাবির গুজন এত বেশী ছিল, যা একদল লোকও সহজে বহন করতে পারত না। (রহু)

فَرَحَ - لَقَرْنَا - এর শাব্দিক অর্থ আনন্দ, উল্লাস। কোরআন পাক

অনেক আয়াতে এই فَرَحَ কে নিন্দনীয়রূপে ব্যক্ত করেছে, যেমন এই আয়াতে বলা হয়েছে إِنَّ اللَّهَ لَكَنُفٌ لِّلْمُحْسِنِينَ - অন্য এক আয়াতে وَفَرَحَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا ثُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ آلِ فِرْعَوْنَ أَن يُؤْتُوا مَا فِي الْبَنَاتِ কিন্তু কোন কোন আয়াতে এর অনুমতি বরং এক ধরনের আদেশও বর্ণিত আছে যেমন وَتَوَسَّوْا فَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ আয়াতে এক فَرِحَ آيَاتِنَا আয়াতে। এসব আয়াতের সমষ্টি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সেই আনন্দ ও উল্লাস নিন্দনীয় এবং নিষিদ্ধ, যা দত্ত ও অহংকারের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এটা তখনই হতে পারে, যখন এই আনন্দকে নিজস্ব ব্যক্তিগত গুণ ও ব্যক্তিগত অধিকার মনে করা হয়—আল্লাহ্ তআলার অনুগ্রহ ও দয়া মনে না করা হয়। যে আনন্দ এই সীমা পর্যন্ত পৌঁছে না, তা নিষিদ্ধ নহে, বরং একদিক দিয়ে কায্য। কারণ, এতে আল্লাহ্ তআলার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

وَاتَّوَفَّيْنَاكَ اللَّهُ الْكَارِ الْخَيْرَةَ وَلَا تَحْسَبَنَّكَ مِنَ الْغَافِلِينَ

—অর্থাৎ, ঈমানদারগণ কারুনকে এই উপদেশ দিল, আল্লাহ্ তোমাকে যে অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, তদ্বারা পরকালীন শান্তির ব্যবস্থা কর এক দুনিয়াতে তোমার যে অংশ আছে তা ভুলে যেয়ো না।

দুনিয়ার অংশ কি? এ সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার বলেন, এর অর্থ মানুষের বয়স এক এই বয়সের মধ্যে করা হয় এমন কাজকর্ম, যা পরকালে কাজে আসতে পারে। সদ্কা-বয়রাতসহ অন্যান্য সব সৎকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাসসহ অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে এ অর্থই বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী) একতাবস্থায় দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের তাসিদ ও সমর্থন হবে। প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে, তোমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন অর্থাৎ, টাকা-পয়সা, বয়স, শক্তি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি-এগুলোকে পরকালের কাজে লাগাও। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে তোমার অংশ ততটুকুই যতটুকু পরকালের কাজে লাগবে। অবশিষ্টাংশ তো গুয়ারিসদের প্রাপ্য। কোন কোন তফসীরকার বলেন, দ্বিতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাকে আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন, তদ্বারা পরকালের ব্যবস্থা কর, কিন্তু নিজের সাংসারিক প্রয়োজনও ভুলে যেয়ো না যে, সবকিছু দান করে নিজে কাফাল হয়ে যাবে। বরং যতটুকু প্রয়োজন, নিজের জন্যে রাখ। এই তফসীর অনুযায়ী দুনিয়ার অংশ বলে জীবন ধারণের উপকরণ বোঝানো হয়েছে।

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَدْرَأَهُ
 أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْفُرُونَ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ
 جَمْعًا وَلَا يَتَذَكَّرُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُبْجِرُونَ ۖ تَحْزِينٌ عَلَىٰ قَوْمِهِ
 فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْلِيَّتْ ۖ لَنَا
 مِثْلُ مَا لَهُمْ ۖ قَالُوا قَدْ أُولُوا لَكُمُ الْمَالَ أَعْطَيْنَاكُمْ أَكْثَرَ
 أَوْ تُؤْتَوْنَ ۖ وَبَلَّغَكُمْ رُؤُوسَ الْبُيُوتِ ۖ وَبَدَأُوا فِي الْأَرْضِ
 كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ يَتَسَوَّوْنَ ۖ مِنَ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ
 الْمُنْصَرِفِينَ ۖ وَأَصْحَابُ الرِّزْقِ لَمِنْ قِبَلِهِ ۖ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَفَقَدُوا
 لَوْلَا أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْخُسْفَاءَ ۖ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
 الْكَافِرُونَ ۖ وَلَئِكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا
 يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۖ
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا وَرَدَّ ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
 يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ۖ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ

‘এলম’- কারও কারও মতে এখানে ‘এলম’

বলে তওরাতের জ্ঞান বোঝানো হয়েছে। যেমন রেওয়াজেতে আছে যে, কারান তওরাতের হাফেয ও আলেম ছিল। মুসা (আঃ) যে সত্তর জনকে তুর পর্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মনোনীত করেছিলেন, কারান তাদেরও অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু এই জ্ঞান-গরিমার ফলে তার মধ্যে গর্ব ও অহংকার দেখা দেয় এবং সে একে ব্যক্তিগত পরাকাস্তা মনে করে বসে। তার উপরোক্ত উক্তির অর্থ তাই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তা আমার নিজস্ব জ্ঞানগত গুণের কারণে পেয়েছি। তাই আমি নিজেকেই এর প্রাপক। এতে আমার প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। কিন্তু ব্যত্যতঃ বোঝা যায় যে, এখানে এলম বলে অর্থনৈতিক কলাকৌশল বোঝানো হয়েছে। উদাহরণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি যা কিছু পেয়েছি, তাতে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের কোন দখল নেই এটা আমি আমার বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতা দ্বারা অর্জন করেছি। মূর্খ কারান একথা বুঝল না যে, বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা, শিল্প অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য—এগুলোও তো আল্লাহ তাআলারই দান ছিল;—তার নিজস্ব গুণ গরিমা ছিল না।

‘কাকরনের উপরোক্ত উক্তির

আসল জওয়াব তো তাই ছিল, যা উপরে লিখিত হয়েছে; অর্থাৎ, যদি স্বীকার করে নেয়া যায় যে, তোমার ধন-সম্পদ তোমার বিশেষ কর্মতৎপরতা ও কারিগরি জ্ঞান দ্বারাই অর্জিত হয়েছে তবুও তো তুমি আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে মুক্ত হতে পার না। কেননা, এই কারিগরি জ্ঞান ও উপার্জনশক্তিও তো আল্লাহ তাআলার দান। এই জওয়াব যেহেতু অত্যন্ত সুস্পষ্ট, তাই কোরআন পাক একে উপেক্ষা করে এই জওয়াব দিয়েছে যে, ধরে নাও, তোমার অর্থ-সম্পদ তোমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারাই অর্জিত হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং এই ধন-সম্পদের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। অর্থের প্রাচুর্য কোন মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় এবং অর্থ সর্বাবস্থায় তার কাজে লাগে না। প্রমাণ হিসেবে কোরআন পাক অতীত যুগের বড় বড় ধনকুবেরদের দৃষ্টান্ত পেশ করেছে। তারা যখন অবাব্যতার পথে চলতে থাকে, তখন আল্লাহর আযাব তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করে। তখন অগাধ ধন-সম্পদ তাদের কোন কাজে আসেনি।

الَّذِينَ أُوتُوا ۖ—এই আয়াতে

الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا—অর্থৎ, আলেমদের মোকাবেলায় বলা হয়েছে। এতে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ভোগসম্ভার কামনা করা এবং একে লক্ষ্য স্থির করা আলেমদের কাজ নয়। আলেমদের দৃষ্টি সর্বদা পরকালের চিরস্থায়ী সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। তাঁরা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই দুনিয়ার ভোগসম্ভার উপার্জন করেন এবং তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন।

الَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا—এ আয়াতে

পরকালের মুক্তি ও সাফল্য শুধু তাদের জন্য নির্ধারিত বলা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে ঐক্যতা ও অনর্থের ইচ্ছা করেন না। ‘এলম’ শব্দের অর্থ অহংকার তথা নিজেকে অন্যের চাইতে বড় মনে করা ও অন্যকে ঘৃণিত ও হেয় মনে করা। ‘ফসাদ’ বলে, অপরের উপর জুলুম বোঝানো হয়েছে।—(সুফিয়ান

(৭৮) সে বলল, আমি এই ধন আমার নিজস্ব জ্ঞান-গরিমা দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি। সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, যারা শক্তিতে ছিল তার চাইতে প্রবল এবং ধন-সম্পদে অধিক প্রাচুর্যশীল? পাণ্ডীদেরকে তাদের পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে না। (৭৯) অতঃপর কারান জাঁকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে বের হল। যারা পার্শ্ববর্তী কামনা করত, তারা বলল, হায়, কারান যা প্রাপ্ত হয়েছে, আমাদেরকে যদি তা দেয়া হত! নিশ্চয় সে বড় ভাগ্যবান (৮০) আর যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, মিক তোমাদেরকে, যারা ঈমানদার এবং সংকর্মী, তাদের জন্যে আল্লাহর দেয়া সওয়াবই উৎকৃষ্ট। এটা তারাই পায়, যারা সবারকারী। (৮১) অতঃপর আমি কারানকে ও তার প্রাসাদকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন দল ছিল না, যারা তাকে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেকে আত্মরক্ষা করতে পারল না। (৮২) গতকল্য যারা তার মত হওয়ার বাসনা প্রকাশ করেছিল, তারা প্রত্যুষে বলতে লাগল, হায়, আল্লাহ তাঁর বন্দাদের মধ্যে যার জন্যে ইচ্ছা রিখিক বর্ষিত করেন ও হাস করেন। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করলে আমাদেরকেও ভূগর্ভে বিলীন করে দিতেন। হায়, কাফেররা সফলকাম হবে না। (৮৩) এই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঐক্যতা প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। খোদাতীরদের জন্যে শুভ পরিণাম। (৮৪) যে সংকর্ম নিয়ে আসবে, সে তদপেক্ষা উত্তম ফল পাবে এবং যে মন্দ কর্ম নিয়ে আসবে, এরূপ মন্দ কর্মীরা সে মন্দ কর্ম পরিমাণেই প্রতিফল পাবে।

التكوير

২৭৫

امن خلق

সওরী)



বিশেষতঃ হরম ও বায়তুল্লাহকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে, কিন্তু যিনি কোরআন নাযিল করেছেন এবং তা মেনে চলা ফরয করেছেন, তিনি অবশেষে আপনাকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন : রসুলুল্লাহ (সাঃ) হিজরতের সময় রাত্রিবেলায় সগর গিরিগুহা থেকে বের হন এবং মক্কা থেকে মদীনাগামী প্রচলিত পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে সফর করেন। কারণ, শত্রুপক্ষ তাঁর পশ্চাদ্ভাবন করছিল। যখন তিনি মদীনার পথের প্রসিদ্ধ মনযিল রাবেগের নিকটবর্তী জোহ্ফা নামক স্থানে পৌছলেন, তখন মক্কার পথ দৃষ্টিগোচর হল এবং বায়তুল্লাহ ও স্বদেশের স্মৃতি মনে আলোড়ন সৃষ্টি করল। তখনই জিবরাঈল (আঃ) এই আয়াত নিয়ে আগমন করলেন। এই আয়াতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, জন্মভূমি মক্কা থেকে আপনার এই বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী। পরিশেষে আপনাকে পুনরায় মক্কায় পৌছে দেয়া হবে। এটা ছিল মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ। এ কারণেই ইবনে-আব্বাসের এক রেওয়াজে বলা হয়েছে যে, এই আয়াত জোহ্ফায় অবতীর্ণ হয়েছে বিদায় মক্কীও নয়, মদনীও নয়।—কুরতুবী

কোরআন শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় ও উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় : আলোচ্য আয়াতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিজয়ী বেশে পুনরায় মক্কা প্রত্যাবর্তনের সুসংবাদ এক হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যে পবিত্র সত্তা আপনার প্রতি কোরআন ফরয করেছেন, তিনি আপনাকে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়দান করে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন তেলাওয়াত ও কোরআনের নির্দেশ পালন করাই এই সাহায্য ও প্রকাশ্য বিজয়ের কারণ হবে।

عَلَيْكُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ - এখানে وَجَّهَ বলে আল্লাহ তাআলার সত্তাকে বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলার সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। কোন কোন তফসীরকার বলেন, وَجَّهَ বলে এমন আমল বোঝানো হয়েছে, যা একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে করা হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে আমল আল্লাহর জন্যে ঐচ্ছিকভাবে করা হয়, তাই অবশিষ্ট থাকবে—এছাড়া সব ধ্বংসশীল।

সূরা আল-কাসাস সমাপ্ত

সূরা আল আনকাবুত

وَمِنْ أَمْرٍ - وَكَأَنَّكَ شَيْءٌ - শব্দটি وَكَأَنَّكَ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পরীক্ষা। ইমানদার বিশেষতঃ পয়গম্বরস্বরূপে এ জগতে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরিশেষে বিজয় ও সাফল্য তাঁদেরই হাতে এসেছে। এসব পরীক্ষা কোন সময় কাকের ও পাপাচারীদের শত্রুতা এবং তাদের নির্বাতনের মাধ্যমে হয়েছে, যেমন অবিকল পয়গম্বর, শেখনবী মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর সাহাবীস প্রায়ই এ ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সীরাতে ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলী এ ধরনের ঘটনাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ। কোন সময় এই পরীক্ষা গ্রাম-ব্যাধি ও অন্যান্য কষ্টের মাধ্যমে হয়েছে। যেমন হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর হয়েছিল। কারণ ও কারণে বেলায় সর্বপ্রকার পরীক্ষার সমাবেশও করে দেয়া হয়েছে।

রেওয়াজেতদ্বয়ে আলোচ্য আয়াতের শানে-নুসুল সেসব সাহাবী, যারা মদীনায় হিজরতের প্রাকালে কাকেরদের হাতে নির্বাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যাপক। সর্বকালের আলেম, সৎকর্মপ্রায় ও ওলাস বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন এবং হতে থাকবেন।—(কুরতুবী)

فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا - অর্থাৎ, এসব পরীক্ষা বিপদাপদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ঝাঁট-অঝাঁট এক সং ও অসামুদ্র মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য কৃষ্টিয়ে তুলবেন। কেননা, ঝাঁটদের সাথে কর্পট বিশৃঙ্গীদের মিশ্রণের ফলে মাঝে মাঝে ঝাঁট কতিয়ামিত হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য সং, অসং এবং ঝাঁট-অঝাঁট পার্থক্য কৃষ্টিয়ে তোলা। একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং কারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তাআলার তো প্রত্যেক মানুষের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা তার জন্মের পূর্বেই জানা রয়েছে। তবুও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ এই যে, এই পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছেও প্রকাশ করে দেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহঃ) মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (রহঃ) থেকে এর আরও একটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সাধারণ মানুষ ঝাঁট ও অঝাঁটের পার্থক্য সম্পর্কে যে পদ্ধতিতে জ্ঞানলাভ করে, কোরআনে মাঝে মাঝে সেই পদ্ধতিতেও আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষ পরীক্ষার মাধ্যমেই এতদূত্বের পার্থক্য জানে। তাই তাদের রুচি অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার মাধ্যমে আমি জেনে ছাড়ব কে ঝাঁট এক কে ঝাঁট নয়। অথচ অনাদিকাল থেকেই এসব বিষয় আল্লাহ তাআলার জানা আছে।

وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا حَسَنًا الَّذِي كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ وَوَعَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهِدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۝ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَدَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا كُنتُمْ بِمُطِيعِينَ ۝ وَمَنْ خُطِبَ إِلَيْكُمْ فَمَا لَكُمْ إِذَا أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلُوا هَكَذَا أَوْ لَا تَقُولُوا إِنَّمَا أَنتُم مُّنَافِقُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ وَلَيَسْأَلَنَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

(৬) যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে। আল্লাহ্ বিশ্বাসী থেকে বে-পরওয়া। (৭) আর যারা বিশ্वास স্থাপন করে ও সংকল্প করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব। (৮) আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু তোমরা করতে (৯) যারা বিশ্वास স্থাপন করে ও সংকল্প করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সংকল্পদ্বারা অন্তর্ভুক্ত করব। (১০) কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহ্র উপর বিশ্वास স্থাপন করেছি; কিন্তু আল্লাহ্র পথে যখন তারা নিখাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নিখাতিতকে আল্লাহ্র আধাবের মত মনে করে। যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আসে তখন তারা বলতে থাকে, ‘আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম।’ বিশ্বাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ্ কি তা সত্যক অবগত নন? (১১) আল্লাহ্ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা বিশ্वास স্থাপন করেছে এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন যারা মুনাফক। (১২) কাফেররা মুমিনদেরকে বলে, ‘আমাদের পথ অনুসরণ কর। আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব। অথচ তারা পাপভার কিছুতেই বহন করবে না। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী (১৩) তারা ঈজ্জাদের পাপভার এবং তার সাথে আরও কিছু পাপভার বহন করবে। অবশ্য তারা যেসব মিথ্যা কথা উদ্ভাবন করে, সে সম্পর্কে কেয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে।

‘হিতাকাঙ্ক্ষা’ ও সদুদ্দেশ্য প্রাণোদিত হয়ে অপরকে কোন কাজ করতে বলাকে বলা হয়। — (মাযহরী)

‘وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ’ — ‘বালদ্যুহুসন’ — এর অর্থ সৌন্দর্য। এখানে সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যবহারকে অতিশয়ার্থে حسن বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

‘وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ’ — অর্থাৎ, পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর অবাধ্যতা না হয়, সেই সীমা পর্যন্ত পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সম্ভবনকে কুফর ও শেরক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে কিছুতেই তাদের আনুগত্য করা যাবে না; যেমন হাদীসে আছে, ‘لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق’ অর্থাৎ আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে কোন মানুষের আনুগত্য করা বৈধ নয়।

আলোচ্য আয়াত হযরত সা’দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি দশ জন জন্মান্তরে সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন এবং অত্যধিক পরিমাণে মাতৃভক্ত ছিলেন। তাঁর মাতা হেমনা বিনতে আবু সুফিয়ান পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে খুবই মর্মহত হয়। সে পুত্রকে শাসিয়ে শপথ করল, আমি তখন পর্যন্ত আহায ও পানীয় গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত তুমি পৈতৃক ধর্মে ফিরে না আস। আমি এমনভাবে ক্ষুধা ও পিপাসায় মৃত্যুবরণ করব, যাতে তুমি মাতৃহস্তা রূপে বিশ্বাসীর দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হও। — (মুসলিম ও তিরমিযী) এই আয়াত হযরত সা’দকে মাতার আবদার রক্ষা করতে নিষেধ করল।

বগভীর রেওয়াজে আছে, হযরত সা’দের জননী একদিন একরাত মতান্তরে তিন দিন তিন রাত শপথ অনুযায়ী অনশন ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে হযরত সা’দ উপস্থিত হলেন। মাতৃভক্তি পূর্ববৎ ছিল; কিন্তু আল্লাহ্র ফরমানের মোকাবেলায় তা ছিল তুচ্ছ। তাই জননীকে সন্তোষান করে তিনি বললেন : ‘আম্মাজান, যদি আপনার দেহে একশ’ আত্মা থাকত, এবং একটি একটি করে বের হতে থাকত, তা দেখেও আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতাম না। এখন আপনি ইচ্ছা করলে পানাহার করুন অথবা মৃত্যুবরণ করুন। আমি আমার ধর্ম ত্যাগ করতে পারি না। এ কথায় নিরাশ হয়ে তাঁর মাতা অনশন ভঙ্গ করল।

‘وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا’ কাফেরদের পক্ষ থেকে ইসলামের পথ রুদ্ধ করার এবং মুসলমানগণকে বিভ্রান্ত করার বিভিন্ন অপকৌশল বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কখনও শক্তি ও অর্থ প্রদর্শন করে এবং কখনও সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে মুসলমানগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও তাদের এমন একটি অপকৌশল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, কাফেররা মুসলমানগণকে বলত, তোমরা অহেতুক পরকালে শান্তির ভয়ে আমাদের পথে চলছ না। আমরা কথা দিচ্ছি, যদি তোমাদের কথাই সত্য হয় যে, আমাদের পথে চললে পরকালে শান্তি পেতে হবে, তবে তোমাদের পাপভার আমরাই বহন করব। যা কিছু শান্তি হবে, আমাদেরই হবে। তোমাদের গায়ে আঁচও লাগবে না।

এমন ধরনের এক ব্যক্তির ঘটনা সূরা নজ্জের শেষ রুকুতে উল্লেখ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ
إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَنذَرَهُ الظَّوْفَرَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ الْفِئْتَانِ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝
وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَانْتَهُوا ذِكْرُكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
أَوْثَانًا وَتَخْلَعُونَ إِفْكًا إِنَّا أَعْيَيْنَ لَكُمْ آيَاتِنَا فَاتَّبِعُوا
عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝
وَإِنْ تَكْفُرْ بَاقًا فَقَدْ كَذَّبَ أَسْمُرُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلِی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝
أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ كُلُّ شَيْءٍ وَفَى الْآرْضِ
فَنَظَرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۝

(১৪) আমি নূহ (আঃ)-কে তাঁর সন্তদ্বয়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। তিনি তাদের মধ্যে পক্ষাণ কম এক হাজার করে অবস্থান করেছিলেন। অতঃপর তাদেরকে মহাপ্লাবন গ্রাস করেছিল। তারা ছিল পাপী। (১৫) অতঃপর আমি তাঁকে ও নোকায়েইসকে রক্ষা করলাম এক নোকায়ে নির্দীন করলাম নিম্বাণীর জন্যে। (১৬) সূর্য্য কর ইব্রাহীমকে। যখন তিনি তাঁর সন্তদ্বয়কে বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর এক তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা যোগ্য। (১৭) তোমরা তো আল্লাহ্‌র পরিবর্তে কেন প্রতিমারই পূজা করছ এক মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদের এবাদত করছ, তারা তোমাদের গ্রন্থিকের মানিক নয়। কাজেই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রন্থিক তালান কর, তাঁর এবাদত কর এক তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (১৮) তোমরা যদি মিথ্যাবাদী বল, তবে তোমাদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যাবাদী বলেছে। স্মৃতিতে পয়গমর পৌছে দেয়াই তো রসুলের দায়িত্ব। (১৯) অর্য কি দেখে না যে, আল্লাহ্‌ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেন অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করেন? এটা আল্লাহ্‌র জন্য সহজ। (২০) কনুন, 'তোমরা পৃথিবীতে বসবাস কর এক দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ পুনরায় সৃষ্টি করেন। নিচয় আল্লাহ্‌ সবকিছু করতে সক্ষম। (২১) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এক যার প্রতি ইচ্ছা রহস্যত করেন। তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

করা হয়েছে। বলা হয়েছে, **أَفَرَأَيْتُمُ اللَّيْلَ إِذَا تَوَلَّىٰ وَاسْطَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ**

এতে উল্লিখিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তিকে তার কাকের সংসীরা এ বলে প্রতারণিত করল যে, তুমি আমাদেরকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমরা কেয়ামতের দিন তোমার আযাব নিজেরা ভোগ করে তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। সে কিছু অর্থকড়ি দেয়া শুরু করেও তা বন্ধ করে দিল। তার নিবৃত্তিতা ও বাজে কাছ সূরা নজমে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ মুসলমানগণের সাথে কাকেরদের এমন ধরনের একটি উক্তি আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা এর জওয়াবে বলেছেন, **وَمَا هُمْ بِمُحِيلِينَ مِن خَلْقِهِمْ**

অর্থঃ, কেয়ামতের ভয়াবহ আযাব দেখে তারা

তাদের পাপভার বহন করতে সাহসী হবে না। কাজেই তাদের এই ওয়াদা মিথ্যা। সূরা নজমে আরও বলা হয়েছে যে, তারা যদি কিছু পাপভার বহন করতে প্রস্তুতও হয়, তবুও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদেরকে এই ক্ষমতা দেয়া হবে না। কেননা, একজনের পাপে অন্যজনকে পাকড়াও করা ন্যায়-নীতির পরিপন্থী।

দ্বিতীয়তঃ বলা হয়েছে যে, তোমাদের পাপভার বহন করে তারা তোমাদেরকে মুক্ত করে দেবে— একথা তো বাস্তব ও মিথ্যা, তবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা ও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা স্বয়ং একটি বড় পাপ। এই পাপভারও তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে তারা নিজেদের পাপভারও বহন করবে এবং যাদের বিভ্রান্ত করেছিল, তাদের পাপভারও এক সাথে বহন করবে।

যে পাপের প্রতি দাওয়াত দেয়, সে-ও পাপী; আসল পাপীর যে শাস্তি হবে, তার প্রাপ্যও তাই : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি অপরকে পাপকাজে লিপ্ত করতে অনুপ্রাণিত করে অথবা পাপকাজে তাকে সাহায্য করে, সে-ও আসল পাপীর অনুরূপ অপরাধী। হযরত আবু হুরায়রা ও আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সংকর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের কারণে সংকর্ম করবে, তাদের সবার কর্মের সওয়াব দাওয়াতদাতার আমলনামায়ও লেখা হবে এবং সংকর্মীদের সওয়াব মোটেই হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতা ও পাপ কাজের প্রতি দাওয়াত দেয়, যত লোক তার দাওয়াতের ফলে এই পাপ কাজে লিপ্ত হবে, তাদের সবার পাপভার এই দাওয়াতদাতার ঘাড়ের চাপবে এবং আসল পাপীদের পাপ মোটেই হ্রাস করা হবে না।— (কুরত্ববী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাকেরদের বিরোধিতা ও মুসলমানদের উপর নির্ধাতনমূলক অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে নির্ধাতনমূলক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে সামুনা দেয়ার জন্যে পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মাতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রাচীনকাল থেকেই সত্যপন্থীদের উপর কাকেরদের তরফ থেকে নির্ধাতনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এসব-উৎপীড়নের কারণে তাঁরা কোন সময় সাহস হারাননি। তাই আপনিও কাকেরদের উৎপীড়নের পরওয়া করবেন না এবং রেসালতের কর্তব্য পালনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকুন।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আঃ)-এর কাহিনী

العنكبوت ৭৭

২০.

امن خلق ২.

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكْسِبُونَ نَصَبًا ۝ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْبَتَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۚ فَيُكْفَرُ بِبَعْضٍ وَيُكْفَرُ بِبَعْضٍ ۚ وَاللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ۝ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَادٍ ۚ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ۖ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَوَعَدْنَا لَهُ آسَافًا وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ۚ وَأَتَيْنَاهُ الْإِسْرَافَ فِي الدُّنْيَا ۚ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَكِينٌ ۝ الضَّالِّينَ ۚ وَوُتُوًّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَنَا تُؤْمِنُونَ ۝ الْفَاحِشَةَ مِمَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝

(২২) তোমরা স্থলে ও অন্তরীক্ষে আল্লাহকে অপারগ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন হিতাকাঙ্ক্ষী নেই, সাহায্যকারীও নেই। (২৩) যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাত অস্বীকার করে, তারাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে এবং তাদের জন্যেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (২৪) তখন ইবরাহীমের সম্প্রদায়ের এছাড়া কোন জওয়াব ছিল না যে, তারা বলল, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর। অতঃপর আল্লাহ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন। নিচয় এতে বিশ্বাসী লোকদের জন্যে নির্দশনাবলী রয়েছে। (২৫) ইবরাহীম বললেন, পার্শ্বি জীবনে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা রক্ষার জন্যে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে প্রতিমাগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছ। এরপর কেয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লানত করবে। তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২৬) অতঃপর তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন লূত। ইবরাহীম বললেন, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ করছি। নিচয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২৭) আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব, তাঁর বংশধরদের মধ্যে নবুওয়ত ও কিতাব রাখলাম এবং দুনিয়াতে তাঁকে পূরস্কৃত করলাম। নিচয় পরকালেও সে সংকলকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (২৮) আর ধ্রোণ করছি লূতকে। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অনীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে পৃথিবীর কেউ করেনি।

উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমতঃ এর কারণ এই যে, তিনিই প্রথম পয়গম্বর, যিনি কুফর ও শেরকের মোকাবেলা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁর সম্প্রদায়ের তরফ থেকে তিনি যতটুকু নির্ধারিত হয়েছিলেন, অন্য কোন পয়গম্বর ততটুকু হননি। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশেষভাবে সুদীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবন কাকেরদের নিপীড়নের মধ্যে অতিবাহিত হয়। কোরআনে বর্ণিত তাঁর বয়স সাড়ে নয়শ বছর তো অকাট্য ও নিশ্চিতই। কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, এটা তাঁর প্রচার ও দাওয়াতের বয়স। এর আগে এবং প্লাবনের পরেও তাঁর আরও বয়স আছে।

মোটকথা, এই অসাধারণ সুদীর্ঘ বয়স অবিরাম দাওয়াত ও তবলীগে ব্যয় করা এবং প্রতিক্ষেত্রেই কাকেরদের তরফ থেকে নানারকম উৎপীড়ন ও মারপিট সহ্য করা সত্ত্বেও কোন সময় সাহস না হারানো— এগুলো সব নূহ (আঃ)—এরই বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় কাহিনী হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি অনেক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নমরূদের অগ্নি, অতঃপর শাম থেকে হিজরত করে এক তরলতাহীন জনশূন্য প্রান্তরে অবস্থান, আদরের দুলালকে যবেহ করার ঘটনা ইত্যাদি। হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত লূত (আঃ) ও তাঁর উষ্মতের ঘটনাবলী এবং সূরার শেষ পর্যন্ত অন্য কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উষ্মতের অবস্থা এগুলো সব রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও উষ্মত মুহাম্মদীর সামুদ্রার জন্যে এবং তাদেরকে ধর্মের কাজে দৃঢ়পদ রাখার জন্যে বর্ণিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক স্মার্তব্য বিষয়

হযরত লূত (আঃ) — فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ۖ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي

ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর ভাগ্নেয়। নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে ইবরাহীম (আঃ)—এর মু'জেযা দেখে সর্বপ্রথম তিনি মুসলমান হন। তিনি এবং তাঁর পত্নী সারা, যিনি চাচাত বোনও ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন, দেশত্যাগের সময় হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর সঙ্গী হন। কুফার একটি জনপদ কাওসা ছিল তাঁদের স্বদেশ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন,

إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي অর্থাৎ, আমি আমার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে দেশ-

ত্যাগ করছি। উদ্দেশ্য এই যে, এমন কোন জায়গায় যাব, যেখানে পালনকর্তার এবাদতে কোন বাধা নেই।

হযরত নব্বী ও কাতাদাহ বলেন, إِنِّي مُهَاجِرٌ হযরত ইবরাহীমের

উক্তি। কেননা, এর পরবর্তী বাক্য وَوَعَدْنَا لَهُ آسَافًا وَيَعْقُوبَ -

কে - إِنِّي مُهَاجِرٌ হযরত ইবরাহীমের উক্তি। কেননা, এর পরবর্তী বাক্য وَوَعَدْنَا لَهُ آسَافًا وَيَعْقُوبَ - কে হযরত লূত (আঃ)—এর উক্তি প্রতিপন্ন করেছেন। কিন্তু পূর্বপার বর্ণনাদুই প্রথম তফসীরই উপযুক্ত। হযরত লূত (আঃ)—ও এই হিজরতে শরীক ছিলেন, কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর অধীন হওয়ার কারণে যেমন হযরত সারার কথা উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি হযরত লূত (আঃ)—এর হিজরতের কথাও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

দুনিয়ার সর্বপ্রথম হিজরত : হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রথম পয়গম্বর, যাকে দুীনের খাতিরে হিজরত করতে হয়েছিল। পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি এই হিজরত করেন।— (কুরতুবী)

কোন কোন কর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও পাওয়া যায় :

إِنَّمَا لَنَا تُونُ الرِّجَالِ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ
 فِي تَادِيَةِ الْمَنَكَرِ قُبَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِنَّكَ قَالُوا
 أَتُؤْتُوا بَعْدَ آبِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ قَالَ رَبِّ
 اضْضُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ۚ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا
 إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُمْلِكُوا هَٰؤُلَاءَ ۖ هَٰؤُلَاءِ
 الْقَرِيبُ ۚ إِنَّ أَهْلَكُمَا كَانُوا ظَالِمِينَ ۚ قَالَ إِنَّ فِيهِمَا
 لَوُطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لِلنَّجِيثَةِ وَاهْلِكِ
 إِلَّا مَرَاتَهُ ۚ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ۚ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ
 رُسُلُنَا لُوطًا سِيقِي بِهِمْ وَصَاقِي بِهِمْ ذُرْعًا قَالُوا
 لَا تَخَفْ ۚ وَلَا تَحْزَنْ ۚ إِنَّا مُنْقِضُونَ أَهْلَكَ ۚ إِلَّا
 مَرَاتَكَ ۚ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ۚ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ
 هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۖ
 وَلَقَدْ تَرَكْنَا مَنَافِئَ آيَةِ الْيَتِيمَةِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۖ وَالْي
 مَدِينِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ
 ارْجُوا يَوْمَ الْآخِرِ وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ

(২৯) তোমরা কি পুংমধুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ? জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায় কেবল একথা বলল, আমাদের উপর আল্লাহর আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও। (৩০) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (৩১) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। নিশ্চয় এর অধিবাসীরা জালেম। (৩২) সে বলল, এই জনপদে তো লুতও রয়েছে। তারা বলল, সেখানে কে আছে, তা আমরা ভাল জানি। আমরা অবশ্যই তাকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করব তাঁর স্ত্রী ব্যতীত; সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (৩৩) যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লুতের কাছে আগমন করল, তখন তাদের কারণে সে বিস্ময় হয়ে পড়ল এবং তার মন সংকীর্ণ হয়ে গেল। তারা বলল, ভয় করবেন না এবং দ্রুত করবেন না। আমরা আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষা করবই আপনার স্ত্রী ব্যতীত, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (৩৪) আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর আকাশ থেকে আযাব নাজিল করব তাদের পাপাচারের কারণে। (৩৫) আমি বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে এতে একটি স্পষ্ট নির্দেশ রেখে দিয়েছি। (৩৬) আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শোআয়বকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, শেষ দিবসের আশা রাখ এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না।

অর্থাৎ, আমি ইবরাহীম (আঃ)-এর আত্মত্যাগ ও অন্যান্য সংকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেও দান করেছি। তাঁকে মানবজাতির প্রিয় ও নেতা করেছি। ইহুদী, খ্রীষ্টান, প্রতিমাপূজারী সবাই তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ও নিজদিককে তাঁর অনুসৃত বলে স্বীকার করে। পরকালে তিনি সংকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। এ থেকে জানা গেল যে, কর্মের আসল প্রতিদান তো পরকালে পাওয়া যাবে, কিন্তু তার কিছু অংশ দুনিয়াতেও নগদ দেয়া হয়। অনেক নির্ভরযোগ্য হাদীসে অনেক সংকর্মের পার্শ্ব উপকারিতা ও অসংকর্মের পার্শ্ব অনিষ্ট বর্ণিত হয়েছে।

এখানে লুত (আঃ) - وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّمَا لَنَا تُونُ الرِّجَالِ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ

তাঁর সম্প্রদায়ের তিনটি গুরুতর পাপের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম, পুংমধুনে, দ্বিতীয়, রাহাজানি এবং তৃতীয়, মজলিসে সবার সামনে অপকর্ম করা। কোরআন পাক তৃতীয় পাপকাজটি নির্দিষ্ট করেনি। এ থেকে জানা যায় যে, যে কোন গোনাহ প্রকাশ্যে করাও একটি স্বতন্ত্র গোনাহ। কোন কোন তফসীরকারক এ স্থলে সেসব গোনাহ একটি একটি করে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো এই নির্লজ্জেরা তাদের প্রকাশ্য মজলিসে করত। উদাহরণতঃ পথিকদের গায়ে পাখর ছুঁড়ে মারা এবং তাদের প্রতি বিদ্রোহিতাৎ ধ্বনি দেয়া। উস্ম-হানী (রাঃ)-এর এক হাদীসে এসব অপকর্মের উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বলেন, তাদের প্রসিদ্ধ অশ্লীল কাজটি তারা গোপনে নয়, প্রকাশ্য মজলিসের সবার সামনে করত।— (নাউযবিলাহ)

আয়াতে উল্লেখিত প্রথম গোনাহটিই সর্বাধিক মারাত্মক। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে কেউ এই অপকর্ম করত না। বনের পশুরাও এ থেকে বেঁচে থাকে। এটা যে, ব্যভিচারের চাইতেও গুরুতর অপরাধ, এ ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مُسْتَبْر - وَكَانُوا مُسْتَبْرِينَ - থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চক্ষুসন্ধানত।

এর অর্থ চক্ষুসন্ধানত। উদ্দেশ্য এই যে, যারা কুফর ও শেরক করে করে আযাব ও ধ্বংসে পতিত হয়েছে, তারা মোটেই বেওকুফ অথবা উম্মাদ ছিল না। বৈষয়িক কাজে অত্যন্ত চালাক ও হুশিয়ার ছিল। কিন্তু তাদের বুদ্ধি ও চালাকী বস্তুজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। তারা একথা বোঝেনি যে, সৎ ও অসত্যের পুরস্কার এবং শাস্তির কোন্ দিন আসা উচিত, যাতে পুরোপুরি সুবিচার হবে। কারণ দুনিয়াতে অধিকাংশ জালেম ও অপরাধী বুক ফুলিয়ে ঘুরাফেরা করে এবং ময়লুম ও বিপদগ্রস্ত কোনঠাসা হয়ে থাকে। এই সুবিচারের দিনকে কেয়ামত ও পরকাল বলা হয়। এ ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ অকেজো।

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ ٱلْغَيْبِ ۚ ٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَٰفِلُونَ

অর্থাৎ, তারা জাগতিক কাজ কর্ম খুব বোঝে; কিন্তু পরকালের ব্যাপারে উদাসীন।

কোন কোন তফসীরবিদ وَكَانُوا مُسْتَبْرِينَ বাক্যের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, তারা পরকালেও বিশ্বাসী ছিল এবং সে তাঁকে সত্য মনে করত; কিন্তু পার্শ্ব স্বার্থ তাদেরকে অস্বীকারে বাধ্য করে রেখেছিল।

وَإِنَّ أَوْفَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنَكَبُوتِ - মাকড়সাকে বলা হয়। মাকড়সা বিভিন্ন প্রকার আছে। কোন কোন মাকড়সা মাটিতে

২৭. النكبات

২০. ২

২০. خلق

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَ تَهُمَ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
 جُثَمِينَ ﴿١﴾ وَعَادُوا شُرُودًا أَقْدَبِينَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِكُمْ
 وَرَوَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
 وَكَانُوا مُسْتَبِيرِينَ ﴿٢﴾ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَارُونَ
 جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا
 سَاقِيْنَ ﴿٣﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَسْلَمْنَا عَلَيْهِ
 حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذْنَا فِيهِ الصَّيْحَةَ وَمِنْهُمْ مَّنْ حُكِّنَا
 بِهِنَّ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْرَفْنَا مَا كَانُوا اللَّهُ يَظْلِمُهُمْ
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
 مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِعَبَابٍ
 وَإِنَّ أَوَّهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾
 إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَصْرِفْهَا لِلْأُنَاسِ وَمَا
 يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٧﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
 فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

(৩৭) কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল এবং নিজেদের গৃহে উপড় হয়ে পড়ে রইল। (৩৮) আমি আঁ দ ও সামুদিকে ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়ী-ঘর থেকেই তাদের অবস্থা তোমাদের জন্য হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সংপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল হুশিয়ার। (৩৯) আমি কারুন, ফেরাউন ও হামানকে ধ্বংস করেছি। মুসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল অতঃপর তারা দেশে দস্ত করেছিল। কিন্তু তারা জ্বিতে যায়নি। (৪০) আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছি। তাদের কারও প্রতি ধারণা করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড বাতাস, কাউকে পেয়েছে বজ্রপাত, কাউকে আমি বিলীন করেছি ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছি নিমজ্জিত। আল্লাহ তাদের প্রতি যুলুম করার ছিলেন না; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে। (৪১) যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরাধে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করে তাদের উদাহরণ মাকড়সা। সে ঘর বানায়। আর সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল, যদি তারা জানত। (৪২) তারা আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুকে ডাকে, আল্লাহ তা জানেন। তিনি শক্তিশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪৩) এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্যে দেই, কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বোঝে। (৪৪) আল্লাহ যথার্থরূপে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। এতে নিদর্শন রয়েছে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে।

বাসস্থান তৈরী করে। বাহ্যতঃ এখানে তা বোঝানো হয়নি। এখানে সে মাকড়সা বোঝানো হয়েছে, যে জাল তৈরী করে এবং তাতে ঝুলতে থাকে। এই জালের সাহায্যে সে মশা-মাছি শিকার করে। বলাবাহুল্য, জন্তু জানোয়ারের যত প্রকার বাসা ও ঘর বিদিত আছে, তন্মধ্যে মাকড়সার জালের তার দুর্বলতর। এই তার সামান্য বাতাসেও ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের এবাদত করে এবং অন্যের উপর ভরসা করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার জাল, যা অত্যন্ত দুর্বল। এমনভাবে যারা কোন প্রতিমা অথবা কোন মানুষের উপর ভরসা করে, তাদের ভরসা এমন, যেমন মাকড়সা তার জালের উপর ভরসা করে।

মাসআলা : মাকড়সাকে হত্যা করা এবং তার জাল পরিস্কার করা সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন উক্তি আছে। কেউ কেউ এটা পছন্দ করেন না। কেননা, এই ক্ষুদ্র জন্তুটি হিজরতের সময় সওর গিরিগুহার মুখে জাল টেনে দেয়ার কারণে সম্মানের পাত্র হয়ে গেছে। খতীব হযরত আলী (রাঃ) থেকে একে হত্যা করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সা'লাবী ও ইবনে আতিয়া হযরত আলী থেকেই বর্ণনা করেন যে, طهروا بيوتكم

— من نسج العنكبوت فان تركه يورث الفخر থেকে তোমাদের গৃহ পরিস্কার রাখ। গৃহে জাল রেখে দিলে দারিদ্র্য দেখা দেয়। উভয় রেওয়াজেই সনদ নির্ভরযোগ্য নয়। তবে অন্যান্য হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় রেওয়াজেই সমর্থন হয়, যাতে বলা হয়েছে যে, গৃহ ও গৃহের আঙিনা পরিস্কার রাখ। — (রাবুল-মা'আনী)

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَصْرِفْهَا لِلْأُنَاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

মাকড়সার জাল দ্বারা মুশরিকদের উপহাস্যদের দৃষ্টান্ত দেয়ার পর এখন বলা হয়েছে যে, আমি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দ্বারা তওহীদের স্বরূপ বর্ণনা করি; কিন্তু এসব দৃষ্টান্ত থেকেও কেবল আলেমগণই জ্ঞান আহরণ করে। অন্যরা চিন্তা-ভাবনাই করে না। ফলে সত্য তাদের সামনে ফোটে না।

আল্লাহর কাছে আলেম কে? : ইমাম বগভী হযরত জাবের থেকে বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, সেই আলেম, যে আল্লাহর কালাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাঁর এবাদত পালন করে এবং তাঁর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে।

এ থেকে জানা গেল যে, কোরআন ও হাদীসের কিছু শব্দ বোঝে নিলে কেউ আল্লাহর কাছে আলেম হয় না, যে পর্যন্ত কোরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অভ্যাস গড়ে না তোলে এবং যে পর্যন্ত সে কোরআন অনুযায়ী আমল না করে।

মুসনাদে আহমদের এক রেওয়াজেই হযরত আমর ইবনে আস বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে থেকে এক হাজার দৃষ্টান্ত শিক্ষা করেছি। ইবনে-কাসীর এই রেওয়াজেই উদ্ধৃতি দিয়ে লেখেন, এটা হযরত আমর ইবনে আসের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে তাদেরকেই আলেম বলেছেন, যারা আল্লাহ ও রসূল বর্ণিত দৃষ্টান্তসমূহ বোঝে।

হযরত আমর ইবনে মুরা বলেন, আমি যখন এমন কোন আয়াতে পৌছি, যা আমার বোধগম্য নয়, তখন মনে খুব দুঃখ পাই। কেননা, আল্লাহ বলেছেন:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَصْرِفْهَا لِلْأُنَاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

(ইবনে-কাসীর)

أَتْلُ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالنَّكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝ وَلَا تَجِدُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا
يَالْتَبِئْهُمْ حَتَّىٰ أَتَىٰ أَحْسَنَ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا
بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالْهَمُّ وَاحِدٌ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ
أَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ
مَنْ يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ۝ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ
مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ أُرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ۝
بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ
بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ
إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٍ وَذِكْرٌ لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ نَحْنُ بِاللَّهِ بَيِّنٌ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدٌ الْعِلْمُ بِلِلَّهِ تَنْزِيلُ
وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

(৪৫) আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কয়েম করুন। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর। (৪৬) তোমরা কিতাবখারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে না, কিন্তু উত্তম পন্থায়; তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে বে-ইনসাফ। এবং বল, আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের উপাস্য ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তাঁরই আজ্ঞাবহ। (৪৭) এভাবেই আমি আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি। অতঃপর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম, তারা একে মেনে চলে এবং এদেরও (মক্কাবাসীদেরও) কেউ কেউ এতে বিশ্বাস রাখে। কেবল কাফেররাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৪৮) আপনি তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোন কিতাব লিখেননি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত। (৪৯) বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে ইহা (কোরআন) তো স্পষ্ট আয়াত। কেবল বে-ইনসাফরাই আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে। (৫০) তারা বলে, তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে তার প্রতি কিছু নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? বলুন, নিদর্শন তো আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আমি তো একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। (৫১) এটা কি তাদের জন্যে যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী লোকদের জন্যে রহমত ও উপদেশ আছে। (৫২) বলুন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট। তিনি জানেন যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে আছে। আর যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারা ইচ্ছিত্রস্ত।

অতল মাওযী - পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কয়েকজন পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতদের আলোচনা ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান উদ্ধৃত কাফের এবং তাদের উপর বিভিন্ন রকম আযাবের বর্ণনা ছিল। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুমিনদের জন্যে সান্ত্বনাও রয়েছে যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ বিরোধীদের কেমন নির্যাতন সহ্য করেছেন এবং এ বিষয়ের শিক্ষাও রয়েছে যে, তবলীগ ও দাওয়াতের কাজে কোন অবস্থাতেই সাহস হারানো উচিত না।

মানব সংশোধনের সফলকাম ও পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র : আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দাওয়াতের একটি সফলকাম কিন্তু পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপত্র বলে দেয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থাপত্র পালন করলে পূর্ণ ধর্ম পালন করার পথ সুগম হয়ে যায় এবং এই পথে অভ্যাসগতভাবে যত বাধা-বিপত্তি দেখা দেয়, সব দূর হয়ে যায়। এই অমোঘ ব্যবস্থাপত্রের দু'টি অংশ আছে, কোরআন তেলাওয়াত ও নামায কয়েম করা উম্মতকে উভয় বিষয়ের অনুবর্তী করাই এখানে আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু উৎসাহ ও জোর দানের জন্যে উভয় বিষয়ের নির্দেশ প্রথমতঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেয়া হয়েছে, যাতে উম্মতের আগ্রহ বাড়বে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কার্যগত শিক্ষার ফলে তাদের পক্ষে আমল করা সহজ হয়ে যায়।

তন্মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত তো সব কাজের প্রাণ ও আসল ভিত্তি। এরপর নামাযকে অন্যান্য ফরয কর্ম থেকে পৃথক করে বর্ণনা করার এই রহস্যও বর্ণিত হয়েছে যে, নামায স্বকীয়ভাবেও একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত এবং ধর্মের স্তম্ভ। এর উপকারিতা এই যে, যে ব্যক্তি নামায কয়েম করে, নামায তাকে অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আয়াতে ব্যবহৃত 'فحشاء' শব্দের অর্থ এমন সুস্পষ্ট মন্দ কাজ, যাকে মুমিন কাফের নির্বিশেষে প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই মন্দ মনে করে; যেমন ব্যভিচার, অন্যায় হত্যা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি। পক্ষান্তরে মনকর এমন কথা ও কাজকে বলা হয়, যার হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়ত বিশারদগণ একমত। কাজেই ফিকাহবিদগণের ইজতিহাদী মতবিরোধের ব্যাপারে কোন এক দিককে মনকর বলা যায় না। 'فحشاء' শব্দদ্বয়ের মধ্যে যাবতীয় অপরাধ এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গোনাহ দাখিল হয়ে গেছে। যেগুলো স্বয়ং নিঃসন্দেহরূপে মন্দ এবং সংকর্মের পক্ষে সর্ববৃহৎ বাধা।

নামায যাবতীয় পাপকর্ম থেকে বিরত রাখে, এর অর্থ : একাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীসদৃষ্টে অর্থ এই যে, নামাযের মধ্যে বিশেষ একটি প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে। যে ব্যক্তি নামায কয়েম করে, সে গোনাহ থেকে মুক্ত থাকে, তবে শর্ত এই যে, শুধু নামায পড়লে চলবে না; বরং কোরআনের ভাষা অনুযায়ী 'أقامت صلاة' হতে হবে। 'أقامت' এর শাব্দিক অর্থ সোজা খাড়া করা। যাতে কোন একদিকে ঝুঁকে না থাকে। তাই 'أقامت صلاة' এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেভাবে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রীতিনীতি পালন সহকারে নামায আদায় করেছেন এবং সারা জীবন যৌথিক শিক্ষাও দান করেছেন, ঠিক সেভাবে নামায আদায় করা। অর্থাৎ, শরীর, পরিধানবস্ত্র নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া, নিয়মিত জমাআতে নামায পড়া এবং নামাযের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সূনত অনুযায়ী সম্পাদন করা। এগুলো প্রকাশ্য রীতিনীতি। অপ্রকাশ্য রীতিনীতি এই যে, আল্লাহর সামনে এমনভাবে বিনয়বনত ও একাগ্রতা সহকারে দাঁড়ানো যেন

তার কাছে আবেদন-নিবেদন করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি এভাবে নামায কায়ম করে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনা-আপনি সংকর্মের তওফীক প্রাপ্ত হয় এবং যাবতীয় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তওফীকও। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামায পড়া সত্ত্বেও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে না, বুঝতে হবে যে, তার নামাযের মধ্যেই ত্রুটি বিদ্যমান। ইমরান ইবনে হুসাইন থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْتَلِي عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالنَّكَرِ** এই আয়াতের অর্থ কি? তিনি বললেন, **مَنْ لَمْ تَنْهَ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالنَّكَرِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ** অর্থাৎ, যে ব্যক্তিকে তার নামায অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে না, তার নামায কিছুই নয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-মাসউদের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার নামাযের আনুগত্য করে না, তার নামায কিছুই নয়। বলাবাহুল্য, অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত থাকাই নামাযের আনুগত্য।

হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, যার নামায তাকে সংকর্ম সম্পাদন করতে এবং অসংকর্ম থেকে বেঁচে থাকতে উদ্বুদ্ধ না করে, তার নামায তাকে আল্লাহ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়।

ইবনে কাসীর উপরোক্ত তিনটি রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করার পর বলেন, এগুলো রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি নয়; বরং ইমরান ইবনে হুসাইন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে তাঁরা এসব উক্তি করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রসূল করীম (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করল, অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকাল হলে চুরি করে। তিনি বললেন, সত্ত্বরই নামায তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে।—(ইবনে-কাসীর)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও আছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই কথার পর সেই ব্যক্তি চুরির অভ্যাস পরিত্যাগ করে এবং তওবা করে নেয়।

একটি সন্দেহের জওয়াব : এখানে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, অনেক মানুষকে নামাযের অনুবর্তী হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় গোনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয় কি?

এর জওয়াবে কেউ কেউ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত থেকে এতটুকু জানা যায় যে, নামায নামাযীকে গোনাহ করতে বাধা প্রদান করে; কিন্তু কাউকে কোন কাজ করতে বাধা প্রদান করলে সে তা থেকে বিরতও হবে, এটা জরুরী নয়। কোরআন হাদীসও তো সব মানুষকে গোনাহ করতে নিষেধ করে। কিন্তু অনেক মানুষ এই নিষেধের প্রতি জ্ঞাপন না করেই গোনাহ করতে থাকে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই অবলম্বন করা হয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন, নামাযের নিষেধ করার অর্থ শুধু আদেশ প্রদান করা নয়; বরং নামাযের মধ্যে এই বিশেষ প্রতিক্রিয়া নিহিত আছে যে, যে ব্যক্তি নামায পড়ে, সে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার তওফীক প্রাপ্ত হয়। যার এরূপ তওফীক হয় না, চিন্তা করলে প্রমাণিত হবে যে, তার নামাযে কোন ত্রুটি রয়েছে এবং সে নামায কায়ম করার যথার্থ হক আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছে। পূর্বোক্ত হাদীস থেকে এই বিষয়বস্তুর সমর্থন

পাওয়া যায়।

وَلِكُلِّ دِينٍ عَذَابٌ - অর্থাৎ, আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি তোমাদের সব ক্রিয়াকর্ম জানেন। এখানে ‘আল্লাহর স্মরণ’-এর এক অর্থ এই যে, বান্দা নামাযে অথবা নামাযের বাইরে আল্লাহকে স্মরণ করে, তা সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয় অর্থ এইরূপও হতে পারে যে, বান্দা যখন আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ ওয়াদা অনুযায়ী স্মরণকারী বান্দাকে ফেরেশতাদের সমাবেশও স্মরণ করেন।

(فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عَظِيمًا) আল্লাহর এই স্মরণ এবাদতকারী বান্দার সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত। এ স্থলে অনেক সাহাবী ও তাবয়ী থেকে এই দ্বিতীয় অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে-জরীর ও ইবনে-কাসীর একেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে এতে এদিকেও ইঙ্গিত আছে যে, নামায পড়ার মধ্যে গোনাহ থেকে মুক্তির আসল কারণ হল আল্লাহ স্বয়ং নামাযীর দিকে অভিনিবেশ করেন এবং ফেরেশতাদের সমাবেশে তাকে স্মরণ করেন। এর কল্যাণেই সে গোনাহ থেকে মুক্তি পায়।

وَلِكُلِّ دِينٍ عَذَابٌ - অর্থাৎ, কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক কর। উদাহরণতঃ কঠোর কথাবার্তার জওয়াব নম্র ভাষায়, ক্রোধের জওয়াব সহনশীলতার সাথে এবং মূর্খতাসূলত হট্টগোলার জওয়াব গাভীরপূর্ণ কথাবার্তার মাধ্যমে দাও।

إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا - কিন্তু যারা তোমাদের প্রতি জুলুম করে - তোমাদের গাভীরপূর্ণ নম্র কথাবার্তা এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মোকাবেলায় জেদ ও হঠকারিতা করে, তারা এই অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র নয়। তাদেরকে কঠোর ভাষায় জওয়াব দেয়া জায়েয, যদিও তখনও তাদের অসদাচরণের জওয়াবে অসদাচরণ না করা এবং যুলুমের জওয়াবে যুলুম না করাই শ্রেয়; যেমন কোরআনের অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে: **وَإِنْ عَابَبْتُمْ فَعَابَبُوا** - অর্থাৎ, তোমরা যদি তাদের কাছ থেকে অন্যায ও অবিচারের সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে এরূপ করার অধিকার তোমাদের আছে, কিন্তু যদি সবর কর তবে এটা অধিক শ্রেয়ঃ।

আলোচ্য আয়াতে কিতাবধারীদের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা নহলে মুশরিকদের সাথেও তর্কের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ আছে। এখানে বিশেষভাবে কিতাবধারীদের কথা বলার কারণ পরবর্তী একটি বাক্য, যাতে বলা হয়েছে— আমাদের ও তোমাদের ধর্মে অনেক বিষয় অভিন্ন। তোমরা চিন্তা করলে ইসলাম গ্রহণ করার পথে কোন অস্ত্রায় থাকা উচিত নয়। এরশাদ হয়েছে **وَقَوْلُهُمْ** অর্থাৎ, কিতাবধারীদের সাথে তর্ক বিতর্ক করার সময় তাদেরকে নিকটে আনার জন্যে তোমরা একথা বল যে, আমরা মুসলমানগণ সেই ওহীতেই বিশ্বাস করি, যা আমাদের পয়গম্বরের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সেই ওহীতেও বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্বরের মধ্যস্থতায় প্রেরিত হয়েছে। কাজেই আমাদের সহিত বিরোধিতার কোন কারণ নেই।

আয়াতে বর্তমান তওরাত ও ইনজীলের বিষয়বস্তু সত্যায়নের নির্দেশ আছে কি? এই আয়াতে কিতাবধারীদের প্রতি অবতীর্ণ তওরাত ও ইনজীলের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস স্থাপনের কথা এভাবে বলা হয়েছে, আমরা এসব কিতাবের প্রতি এই অর্থে সৎক্ষিপ্ত ইমান রাখি যে, আল্লাহ

তাআলা এইসব কিতাবে যা কিছু নাযিল করেছেন, তাতে আমরা বিশ্वास করি। এতে একথা জরুরী হয় না যে, বর্তমান তওরাত ও ইনজীলের সব বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের ঈমান আছে। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলেও এসব কিতাবে অসংখ্য পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে, মুসলমানদের ঈমান শুধু সেসব বিষয়বস্তুর প্রতি। যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মুসা ও ঈসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল পরবর্তী বিষয়বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

বর্তমান তওরাত ও ইনজীলকে সত্যও বলতে নাই এবং মিথ্যাও বলতে নেই : সহীহ বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, কিতাবধারীরা তাদের তওরাত ও ইনজীল আসল হিব্রু ভাষায় পাঠ করত এবং মুসলমানদেরকে আরবী অনুবাদ শোনাত। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা কিতাবধারীদেরকে সত্যবাদী বলো না এবং মিথ্যাবাদীও বলো না; বরং একথা বল **مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ** অর্থাৎ, আমরা সংক্ষেপে সেই ওহীতে বিশ্বাস করি, যা তোমাদের পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা যেসব বিবরণ দাও, সেগুলো আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য নয়। তাই আমরা এর সত্যায়ন কিংবা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকি।

তফসীর গ্রন্থসমূহে তফসীরকারগণ কিতাবীদের যেসব রেওয়াজে উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলোরও অবস্থা তদ্রূপ। সেগুলো উদ্ধৃত করার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ঐতিহাসিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা। কোন কিছুর বৈধতা ও অবৈধতা এসব রেওয়াজে দ্বারা প্রমাণ করা যায় না।

وَالَّذِينَ تَتْلُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا تُحِطُهُ بِمِثْلِكَ إِذْ أُنْزِلَتْ

الْأَنْبِيَاءُ অর্থাৎ, আপনি কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করতেন না এবং কোন কিতাব লিখতেও পারতেন না; বরং আপনি ছিলেন নিরক্ষর। যদি আপনি লেখাপড়া জানতেন, তবে মিথ্যাবাদীদের জন্যে অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকত যে, আপনি পূর্ববর্তী তওরাত ও ইনজীল পাঠ করেছেন কিংবা উদ্ধৃত করেছেন এবং কোরআন যা কিছু বলে, তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেরই উদ্ধৃতি মাত্র, কোন নতুন বিষয়বস্তুর নয়।

নিরক্ষর হওয়া রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি বড় মু'জ্জ্বা : আল্লাহ তাআলা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়্যত প্রমাণ করার জন্যে যেসব

সুস্পষ্ট মু'জ্জ্বা প্রকাশ করেছেন, তন্মধ্যে তাঁকে পূর্ব থেকে নিরক্ষর রাখাও অন্যতম। তিনি লিখিত কোন কিছু পাঠ করতে পারতেন না এবং নিজে কিছু লিখতেও সক্ষম ছিলেন না। এই অবস্থায়ই জীবনের চল্লিশটি বছর তিনি মক্কাবাসীদের সামনে অতিবাহিত করেন। তিনি কোন কিতাবধারীদের সাথে মেলামেশা করেননি যে, তাদের কাছ থেকে কিছু শুনেন নেবেন। কারণ, মক্কায় কোন কিতাবধারী বাস করত না। চল্লিশ বছর পূর্তির পর হঠাৎ তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এমন কালাম উচ্চারিত হতে থাকে যা বিষয়বস্তু ও অর্থের দিক দিয়ে ছিল মু'জ্জ্বা, তেমনি শাব্দিক বিশুদ্ধতা ও ভাষালঙ্কারের দিক দিয়েও ছিল অতুলনীয়।

কোন কোন আলেম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি প্রথমদিকে নিরক্ষর ছিলেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেন। প্রমাণ হিসেবে তারা হুদায়বিয়া ঘটনার একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন যাতে বলা হয়েছে, সন্ধিপত্র লেখা হলে তাতে প্রথমে **من محمد عبد الله** লিখিত ছিল। এতে মুশরিকরা আপত্তি তুলল যে, আমরা আপনাকে রসুল মেনে নিলে এই ঝগড়া কিসের? তাই আপনার নামের সাথে 'রসুলুল্লাহ' শব্দটি আমাদের কাছে গ্রহণীয় নয়। লেখক ছিলেন হযরত আলী মুর্তাযা (রাঃ)। রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে শব্দটি মিটিয়ে দিতে বললেন। তিনি আদবের খাতিরে এরূপ করতে অস্বীকৃত হলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজে কাগজটি হাতে নিয়ে শব্দটি মিটিয়ে দিলেন এবং তদস্থলে **من محمد عبد الله** লিখে দিলেন।

এই রেওয়াজে রসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজে লিখে দিয়েছেন বলা হয়েছে। এ থেকে তাঁরা বোঝে নিয়েছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) লেখা জানতেন। কিন্তু সত্য এই যে, সাধারণ পরিভাষায় অপরের দ্বারা লেখানোকেও 'সে লিখেছে' বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, এই ঘটনায় আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'জ্জ্বা হিসেবে তিনি নিজের নামও লিখে ফেলেছেন। এতদ্ব্যতীত নামের কয়েকটি অক্ষর লিখে দিলেই কেউ নিরক্ষতার সীমা পেরিয়ে যায় না। লেখার অভ্যাস গড়ে না উঠা পর্যন্ত তাকে অক্ষরজ্ঞানহীন ও নিরক্ষরই বলা হবে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) লেখা জানতেন— বিনা প্রমাণে এরূপ বললে তাঁর কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না; বরং চিন্তা করলে দেখা যায় যে, নিরক্ষর হওয়ার মধ্যেই তাঁর বড় শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রয়েছে।

وَيَسْتَعِجُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّيَمُنَّ الْعَذَابُ
وَلِيَأْتِيَهُمْ بَقِيَّتُهُمْ وَمَنْ لَا يَسْعُرُونَ ۝ يَسْتَعِجُونَكَ بِالْعَذَابِ وَ
إِنْ جَاءَهُمْ كَرْحِيظَةٌ يَأْكُلُونَهَا فِي يَوْمٍ يُفْصِلُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ
تَوَقُّعِهِمْ وَمَنْ حَسِبَ أَنَّجِيْلَهُمْ يَقُولُ دُوْقُوا مَا أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝
يُعَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ۝
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَامِلِينَ ۝ الَّذِينَ
صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَكَانَ مِنْ دَائِرَةِ الْكَفْلِ
رَبُّهَا اللَّهُ يَرْفُئُهَا وَإِيَّاهُ ۝ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَلَكِنْ
سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَخَرَجَ الشَّسَّ وَالْقَمَرَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَيُّ الْيَوْمِئِذِينَ ۝ أَلَمْ يَبْسُطِ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ وَلَكِنْ
سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَاهُ بِإِذْنِ اللَّهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ
مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

(৫৩) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি আযাবের সময় নির্ধারিত না থাকত, তবে আযাব তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই আকস্মিকভাবে তাদের কাছে আযাব এসে যাবে, তাদের খবরও থাকবে না। (৫৪) তারা আপনাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে; অথচ জাহান্নাম কাফেরদেরকে ধ্বংস করছে। (৫৫) যেদিন আযাব তাদেরকে ধ্বংস করবে মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে। আল্লাহ বলেন, তোমরা যা করতে, তার স্বাদ গ্রহণ কর। (৫৬) হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। অতএব তোমরা আমারই এবাদত কর। (৫৭) জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমরা আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (৫৮) যারা বিশাস স্থাপন করে ও সংকল্প করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে জাহান্নামের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার তলদেশে প্রমত্তশয়নমুহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার কর্মীদের। (৫৯) যারা সবর করে এবং তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে। (৬০) এমন অনেক জন্তু আছে, যারা তাদের খাদ্য সঞ্চিত রাখে না। আল্লাহই রিমিক দেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৬১) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে ‘আল্লাহ’। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? (৬২) আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিমিক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা হাস করেন। নিশ্চয়, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত। (৬৩) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বাজে না।

০ সূরার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত মুসলমানগণের প্রতি কাফেরদের শত্রুতা, তওহীদ ও রেসালত অস্বীকার এবং সত্য ও সত্যপন্থীদের পথে নানারকম বাধা-বিঘ্ন বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানগণের জন্যে কাফেরদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করা, সত্য প্রচার করা এবং দুনিয়াতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার একটি কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এই কৌশলের নাম ‘হিজরত’ তথা দেশত্যাগ। অর্থাৎ, যে দেশে সত্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেই দেশ পরিত্যাগ করা।

হিজরতের বিধি-বিধান ও এ সম্পর্কিত সন্ধেহের নিরসন : আল্লাহ বলেছেন, আমার পৃথিবী প্রশস্ত। কাজেই কারও এই ওয়র গ্রহণ করা হবে না যে, অমুক শহরে অথবা অমুক দেশে কাফেররা প্রবল ছিল বিধায় আমরা তওহীদ ও এবাদত পালনে অপারগ ছিলাম। তাদের উচিত, যে দেশে কুফর ও অবাধ্যতা করতে বাধ্য করা হয়, আল্লাহর জন্যে সেই দেশত্যাগ করা এবং এমন কোন স্থান তলাশ করা, যেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে আল্লাহর নির্দেশাবলী নিজেদেরও পালন করতে পারে এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারে। একেই হিজরত বলা হয়।

স্বদেশ পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাবার মধ্যে মানুষ স্বভাবতঃ দুই প্রকার আশংকা ও বাধার সন্মুখীন হয়। (এক) নিজের প্রাণের আশংকা যে, স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলে পশ্চিমধ্যে স্থানীয় কাফেররা বাধা দেবে এবং যুদ্ধ করতে উদ্যত হবে। এ ছাড়া অন্য কাফেরদের সাথেও প্রাণঘাতী সংঘর্ষের আশংকা বিদ্যমান থাকে। পরবর্তী আয়াতে এই আশংকার জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ** অর্থাৎ, জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কেউ কোথাও কোন অবস্থাতেই মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না। কাজেই মৃত্যুর ভয়ে অস্থির হওয়া মুমিনের কাজ হতে পারে না। হেফাযতের যত ব্যবস্থাই সম্পন্ন করা হোক না কেন, মৃত্যু সর্বাবস্থায় আগমন করবে। মুমিনের বিশ্বাস এই যে, আল্লাহর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মৃত্যু আসতে পারে না। তাই স্বস্থানে থাকা অথবা হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়ার মধ্যে মৃত্যুর ভয় অন্তরায় না হওয়া উচিত। বিশেষতঃ আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন করা অবস্থায় মৃত্যু আসা চিরস্থায়ী সুখ ও নেয়ামতের কারণ। পরকালে এই সুখ ও নেয়ামত পাওয়া যাবে। পরবর্তী দুই আয়াতে এর উল্লেখ আছে **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ**

হিজরতের পথে দ্বিতীয় আশংকা এই যে, অন্য দেশে যাওয়ার পর রুখী রাজগারের কি ব্যবস্থা হবে? জন্মস্থানে তো মানুষ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি, কিছু নিজের উপার্জন দ্বারা বিষয়-সম্পত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। হিজরতের সময় এগুলো সব এখানে থেকে যাবে। কাজেই পরবর্তী পর্যায়ে জীবননির্বাহ কিরূপে হবে? পরের আয়াতত্রয়ে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, অর্জিত আসবাবপত্রকে রিমিকের যথেষ্ট কারণ মনে করা ভুল। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলাই রিমিক দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে বাহ্যিক আয়োজন ছাড়াও রিমিকদান করেন এবং ইচ্ছা না করলে সব আয়োজন সত্ত্বেও মানুষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে। প্রমাণস্বরূপ প্রথম বলা হয়েছে, **وَكَانَ مِنْ دَائِرَةِ الْكَفْلِ** অর্থাৎ, চিন্তা

কর, পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন হাজারো জীব-জন্তু আছে যারা খাদ্য সঞ্চয় করার কোন ব্যবস্থা করে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা নিজ কৃপায় প্রত্যহ তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করেন। পশ্চিগণ বলেন, সাধারণ জীব-জন্তু একগুণই। কেবল পিপীলিকা ও ইদুর তাদের খাদ্য গর্তে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে। পিপীলিকা শীতকালে বাইরে আসে না। তাই গ্রীষ্মকালে গর্তে খাদ্য সঞ্চয়ের জন্যে চেষ্টা করে। জনশ্রুতি এই যে, পক্ষীকুলের মধ্যে কাকও তার খাদ্য বাসায় সঞ্চিত রাখে, কিন্তু রাখার পর বেমালামু ভুলে যায়। মোটকথা, পৃথিবীর অসংখ্য ও অগণিত প্রকার জীব-জন্তুর মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা এই যে, তারা খাদ্য সংগ্রহ করার পর আগামীকালের জন্যে তা সঞ্চিত রাখে না এবং এর প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামও তাদের নেই। হাদীসে আছে, পক্ষীকুল সকলে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে। তাদের না আছে ক্ষেত-খলা, না আছে জমি ও বিষয়-সম্পত্তি। তারা কোন কারখানা অথবা অফিসের কর্মচারীও নয়। তারা আল্লাহ্ তাআলার উশ্মুক্ত পৃথিবীতে বিচরণ করে এবং পেটচুক্তি খাদ্যলাভ করে। এটা একদিনের ব্যাপার নয়—বরং তাদের আজীবন কর্মধারা।

রিষিকের আসল উপায় আল্লাহর দান, পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, স্বয়ং কাফেরদের জিজ্ঞেস করুন, কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে? চন্দ্র-সূর্য কার আজ্ঞাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। বৃষ্টি কে বর্ষণ করে? বৃষ্টি দ্বারা মাটি থেকে উদ্ভিদ কে উৎপন্ন করে? এসব প্রশ্নের জওয়াবে মুশরিকরাও স্বীকার করবে যে, এসব আল্লাহরই কাজ। আপনি বলুন, তা হলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে অপরের পূজাপাট ও অপরকে অভিভাবক কিরাপে মনে কর?

মোটকথা, হিজরতের পথে দ্বিতীয় বাধা ছিল জীবিকার চিন্তা। এটাও মানুষের ভুল। জীবিকা সরবরাহ করা মানুষের অথবা তার উপার্জিত সাজ-সরঞ্জামের আয়ত্তাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহর দান। তিনিই এ দেশে এর সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছিলেন, অন্য দেশেও তিনি তা দিতে পারেন। সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াও তিনি জীবনোপকরণ দান করতে সক্ষম। কাজেই এটা হিজরতের পথে অন্তরায় হওয়া ঠিক নয়।

হিজরত কখন ফরয অথবা ওয়াজিব হয়? : হিজরতের সংজ্ঞা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণ সূরা নিসা-এর ৯৭ থেকে ১০০ আয়াতে এবং বিধি-বিধান এই সূরাই ৮৯ আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে। একটি বিষয়বস্তু সেখানে বর্ণিত হয়নি, তাই এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খোদায়ী নির্দেশে মক্কা থেকে হিজরত করেন এবং সব মুসলমানকে সামর্থ্য থাকলে হিজরত করার আদেশ দেন, তখন মক্কা থেকে হিজরত করা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার উপর ‘ফরযে আইন’ ছিল। অবশ্য যাদের হিজরত করার সামর্থ্যই ছিল না, তাদের কথা ভিন্ন।

সে যুগে হিজরত শুধু ফরযই নয়; মুসলমান হওয়ার আলামত ও শর্তরূপেও গণ্য হত। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হিজরত করত না, তাকে মুসলমান গণ্য করা হত না এবং তার সাথে কাফেরের অনুরূপ ব্যবহার করা হত। সূরা নিসা ৮৯ আয়াতে অর্থাৎ, لَا يَجُوزُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

আয়াতে একথা বলা হয়েছে। তখন ইসলামে হিজরতের মর্যাদা ছিল কলেমায়ে শাহাদতের অনুরূপ। এই কলেমা যেমনি ফরয, তেমনি মুসলমান হওয়ার শর্তও। শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই কলেমা মুখে উচ্চারণ না করলে অন্তরে বিশ্বাস থাকলেও সে মুসলমান গণ্য হবে না। তবে যে ব্যক্তি এই কলেমা মুখে উচ্চারণ করতে অক্ষম, তার কথা ভিন্ন। এমনিভাবে যারা হিজরত করতে সক্ষম ছিল না, তাদেরকে উপরোক্ত আইনের আওতাবহির্ভূত রাখা হয়। সূরা নিসা (৯৮) إِلَّا الْمُسْكِينُونَ আয়াতে তাই বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মক্কা অবস্থান করছিল, إِنَّ الدِّينَ وَفِيهِمُ الْبَيْتُ থেকে পর্যন্ত আয়াতে তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিবানী উচ্চারিত হয়েছে।

মক্কা বিজিত হয়ে গেলে হিজরতের উপরোক্ত আদেশে রহিত হয়ে যায়। কারণ, তখন মক্কা স্বয়ং দারুল-ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন এই মর্মে আদেশ জারী করেন, لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ অর্থাৎ, মক্কা বিজিত হওয়ার পর মক্কা থেকে হিজরত অনাবশ্যক। কোরআন ও হাদীস দ্বারাই মক্কা থেকে হিজরত ফরয হওয়া, অতঃপর তা রহিত হওয়া প্রমাণিত। ফেকাহবিদগণ এই বিশেষ ঘটনা থেকে নিম্নোক্ত মাসআলা চয়ন করেছেন :

মাসআলা : যে শহর অথবা দেশে ধর্মের উপর কায়ম থাকার স্বাধীনতা নেই, যেখানে কুফর, শিরক অথবা শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য করা হয়, সেখান থেকে হিজরত করে ধর্মপালনে স্বাধীনতা সম্পন্ন দেশে চলে যাওয়া ওয়াজিব, তবে যার সফর করার শক্তি নেই কিংবা তদ্রূপ স্বাধীন ও মুক্ত দেশই যদি পাওয়া না যায় তাহলে এমতাবস্থায় তার ওযর আইনতঃ গ্রহণীয় হবে।

মাসআলা : কোন দারুল-কুফরে ধর্মীয় বিধানাবলী পালন করার স্বাধীনতা থাকলে সেখান থেকে হিজরত করা ফরয ও ওয়াজিব নয়, কিন্তু মোস্তাহাব। অবশ্য এজন্যে দারুল-কুফর হওয়া জরুরী নয়; বরং ‘দারুল ফিস্ক’ (পাপাচারের দেশ) যেখানে প্রকাশ্যে শরীয়তের নির্দেশাবলী অমান্য করা হয়, সেখান থেকেও হিজরত করার হুকুম একরূপ। যদিও শাসক মুসলমান হওয়ার কারণে একে দারুল-ইসলাম বলা হয়ে থাকে।

হাফেয ইবনে হাজার ফতহুল-বারীতে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হানাফী মাযহাবের কোন ধারাই এর পরিপন্থী নয়। মুসনাদে আহমদে আবু ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, بِلَادِ اللَّهِ وَالْعِبَادِ عِبَادَ اللَّهِ حَيْثَمَا أَصَبْتَ خَيْرًا

অর্থাৎ, সব নগরীই আল্লাহর নগরী এবং সব বান্দা আল্লাহর বান্দা। কাজেই যেখানে তুমি কল্যাণের সামগ্রী দেখতে পাও, সেখানেই অবস্থান কর।—(ইবনে-কাসীর)

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন, যে শহরে ব্যাপকহারে গোনাহ ও অশ্লীল কাজ হয়, সেই শহর ছেড়ে দাও। হযরত আতা বলেন, কোন শহরে তোমাকে গোনাহ করতে বাধ্য করা হলে সেখান থেকে পালিয়ে যাও।—(ইবনে কাসীর)

وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَوَلَهْوَ كَذِبٌ ۚ وَانَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ
 لَھٰی الْحَيٰوةَ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ۙ فَاِذَا رَکِبُوْا فِی الْفَلَکِ دَعَوْا
 اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّیْنَ ؕ فَلَمَّا نَجَّوْهُمْ اِلَی الدَّرَآءِ اَهُم
 یُشْرِکُوْنَ ۝ۙ لَیْکُمْ رَاۤیِبَاتٌ مِّنْهُنَّ وَلَیْسَ مَعَهُنَّ قِسْوَفٌ
 یَّعْلَمُوْنَ ۝ۙ اَوَلَمْ یَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَ الْمَوْتِ وَنَحْطِفُ النَّاسَ
 مِنْ حَوْلِهِمْ اَنْفِیَالًا طٰلِی ۙ یُؤْمِنُوْنَ وَیَنْجِعُهُ اللّٰهُ یُکْفِرُوْنَ ۝ۙ
 وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اَفْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ کَذِبًا ۙ اَوْ کَذَّبَ بِالْحَقِّ
 لَمَّا جَآءَ ۙ اَلْیَسَّیْنِ فِیْ جَهَنَّمَ مَثْوٰی لِّلْکٰفِرِیْنَ ۝ۙ وَالَّذِیْنَ
 جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیْهُمْ سَبِیْلًا ۙ وَانَّ اللّٰهَ لَعَمْرُ الْمُحْسِنِیْنَ ۝ۙ
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ۙ
 اَلَمْ ۙ عَلَیْبَتِ الرَّوْمِ ۙ فِیْ اَذْنِی الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْۢ بَعْدِ
 عَلَیْهِمْ سِیْعًا یَّوْنٰ ۙ فِیْ بَضْعِ سِنَیْنِ ؕ هٰذَا الَّذِیْ اُمِرْنَا
 قَبْلَ ۙ وَمِنْۢ بَعْدِ ۙ وَیَوْمَ ۙ یَقْرَعُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ۙ
 یَنْصُرُ اللّٰهُ یَنْصُرُ مَنْ یَّشَآءُ ۙ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۝ۙ

(৬৪) এই পার্শ্ববর্তী জীবন-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত। (৬৫) তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে। (৬৬) যাতে তারা তাদের প্রতি আমার দান অস্বীকার করে এবং ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকে। সত্ত্বরই তারা জানতে পারবে। (৬৭) তারা কি দেখে না যে, আমি একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল করেছি। অথচ এর চতুর্দিশে দিক দ্বারা আছে, তাদের উপর আক্রমণ করা হয়। তবে কি তারা মিথ্যায়ই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করবে? (৬৮) যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা গড়ে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তাকে অস্বীকার করে, তার কি শ্রবণ রাখা উচিত নয় যে, জাহান্নামই সেসব কাফেরের আশ্রয়স্থল হবে? (৬৯) যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করব। নিশ্চয় আল্লাহ সংকল্পপরায়ণদের সাথে আছেন।

সূরা আর-রুম

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৬০

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু।

(১) আলিফ-লাম-মীম, (২) রোমকরা পরাক্রান্ত হয়েছে, (৩) নিকটবর্তী এলাকায় এবং তারা তাদের পরাক্রমের পর অতিসত্ত্বর বিজয়ী হবে, (৪) কয়েক বছরের মধ্যে। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে। (৫) আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের এই অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি, সূর্য ও চন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, বারিবর্ষণ ও তদ্বারা উদ্ভিদ উৎপন্ন করার সমস্ত কাজ-কারবার যে আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন, একথা তারাও স্বীকার করে। এ ব্যাপারে কোন প্রতিমা ইত্যাদিতে তারা শরীক মনে করে না। কিন্তু এরপরও তারা খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে শরীক সাব্যস্ত করে। এর কারণ বলা হয়েছে যে, **اِنَّهُمْ لَكٰفِرُوْنَ** অর্থাৎ; তাদের অধিকাংশই বোঝে না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তারা উম্মাদ পাগল তো নয়; বরং চালাক ও সমঝদার। দুনিয়ার বড় বড় কাজ-কারবার সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। এতে তাদের অবুঝ হয়ে যাওয়ার কারণ কি? এর জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে এই দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়া এবং দুনিয়ার বৈশয়িক ও ধ্বংসশীল কামনা-বাসনার আসক্তি তাদেরকে পরকাল ও পরিণামের চিন্তা-ভাবনা থেকে অন্ধ ও অবুঝ করে দিয়েছে। অথচ এই পার্শ্ববর্তী জীবন ক্রীড়া-কৌতুক অর্থাৎ, সময় ক্ষেপণের বৃত্তি বৈ কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনই প্রকৃত ও অক্ষয় জীবন।

وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَوَلَهْوَ كَذِبٌ ۚ وَانَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَھٰی الْحَيٰوةَ

— এখানে **حیوان** শব্দটির ধাতুগত অর্থ হচ্ছে হায়াত তথা জীবন —
(কুরতুবী)

এতে পার্শ্ববর্তী জীবনকে ক্রীড়াকৌতুক বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্রীড়াকৌতুকের যেমন কোন স্থিতি নেই এবং এর দ্বারা কোন বড় সমস্যার সমাধান হয় না, অল্পক্ষণ পরেই সব তামাশা খতম হয়ে যায়, পার্শ্ববর্তী জীবনের অবস্থাও তদ্রূপ।

পরবর্তী আয়াতে মুশরিকদের আরও একটি মন্দ অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তারা জগৎ সৃষ্টির কাজে আল্লাহকে একক স্বীকার করা সত্ত্বেও খোদায়ীতে প্রতিমাদেরকে অংশীদার মনে করে। তাদের এই অবস্থার চাইতেও আশ্চর্যজনক অবস্থা এই যে, তাদের উপর যখন কোন বড় বিপদ পতিত হয়, তখনও তারা বিশ্বাস ও স্বীকার করে যে, এ ব্যাপারে কোন প্রতিমা আমাদের সাহায্যকারী হতে পারে না। বিপদ থেকে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই উদ্ধার করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, তারা যখন সমুদ্রে ভ্রমণরত থাকে এবং জাহাজ নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তখন এই আশংকা দূর করার জন্যে কোন প্রতিমাকে ডাকার পরিবর্তে তারা একমাত্র আল্লাহ তাআলাকেই ডাকে। আল্লাহ তাআলা তাদের অসহায়ত্ব এবং সাময়িকভাবে জগতের সব অবলম্বন থেকে বিচ্ছিন্নতার ভিত্তিতে তাদের দোয়া কবুল করেন এবং উপস্থিত ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু জালেমরা যখন তীরে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, তখন পুনরায় প্রতিমাদেরকে শরীক বলতে শুরু করে।

رَادَّآیِی الْفَلَکِ — আয়াতের উদ্দেশ্য তাই।

এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, কাফের ও যখন নিজেকে অসহায় মনে করে তখন আল্লাহকেই ডাকে এবং বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ব্যতীত এই বিপদ থেকে তাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না, তখন আল্লাহ

তাআলা কাফেরেরও দোয়া কবুল করে নেন। কেননা, সে مضطّر তথা অসহায়। আল্লাহ তাআলা অসহায়ের দোয়া কবুল করার ওয়াদা করেছেন।—(কুরতুবী)

অন্য এক আয়াতে আছে وَمَا دَعَا الْكُفْرَانَ إِلَّا فِي مَلِيلٍ অর্থাৎ, কাফেরদের দোয়া গ্রহণযোগ্য নয়। বলাবাহুল্য, এটা পরকালের অবস্থা। সেখানে কাফেররা আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য দোয়া করবে; কিন্তু কবুল করা হবে না।

..... أُولَٰئِكَ جَاءُواكَ جَحْرًا حَرَمًا إِنَّا উপরের আয়াতসমূহে মক্কার মুশরিকদের মূর্ত্যাসূলভ কর্মকাণ্ড আলোচিত হয়েছিল যে, সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা পাথরের স্বনির্মিত প্রতিমাকে তার খোদায়ীর অংশীদার সাব্যস্ত করে। তারা আল্লাহ তাআলাকে শুধু জগৎ সৃষ্টির মালিক মনে করে না; বরং বিপদ থেকে মুক্তি দেয়াও তাঁরই ক্ষমতাধীন বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু মুক্তির পর আবার শিরকে লিপ্ত হয়। কোন কোন মুশরিকের এক অজুহাত এরূপও পেশ করা হত যে, তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনীর ধর্মকে সত্য ও সঠিক বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার মধ্যে তারা তাদের প্রাণনাশের আশংকা অনুভব করে। কারণ, সমগ্র আরব ইসলামের বিরোধী। তারা মুসলমান হয়ে গেলে অবশিষ্ট আরব তাদেরকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করবে এবং প্রাণে বধ করবে।—(রুহুল-মা'আনী)

এর জওয়াবে আল্লাহ তাআলা বলেন যে, তাদের এই অজুহাতও অন্তঃসার শূন্য। আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহর কারণে মক্কাবাসীদেরকে এমন মাহাত্ম্য দান করেছেন, যা পৃথিবীর কোন স্থানের অধিবাসীদের ভাগ্যে জুটেনি। আল্লাহ বলেন, আমি সমগ্র মক্কাভূমিকে হরম তথা আশ্রয়স্থল করে দিয়েছি। মুমিন, কাফের নির্বিশেষে আরবের বাসিন্দারা সবাই হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এতে খুন খারাবি হারাম মনে করে। মানুষ তো মানুষ, এখানে শিকার বধ করা এবং বৃক্ষ কর্তন করাও সবার মতে অবৈধ। বহিরাগত কোন ব্যক্তি হরমে প্রবেশ করলে সে-ও হত্যার কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অতএব মক্কার বাসিন্দারা যদি ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাণনাশের আশংকা আছে বলে অজুহাত পেশ করে, তবে সেটা ঝোড়া অজুহাত বৈ নয়।

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِرَأْسِهَا - এর আসল অর্থ ধর্মের পথে বাধা বিপত্তি দূর করার জন্যে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা। কাফের ও পাশিষ্ঠদের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি এবং প্রবৃত্তি ও শয়তানের পক্ষ থেকে আগত বাধা-বিপত্তি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে জেহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকার হচ্ছে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবতীর্ণ হওয়া।

উভয় প্রকার জেহাদের পরিশ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতে ওয়াদা করা হয়েছে যে, যারা জেহাদ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করি। অর্থাৎ, যেসব ক্ষেত্রে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা অথবা উপকার ও অপকার সন্দেহ জড়িত থাকে, কোন পথ ধরতে হবে তা চিন্তা করে কুল-কিনারা পাওয়া যায় না, সেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা জেহাদকারীদেরকে সোজা, সরল ও সুগম পথ বলে দেন। অর্থাৎ, যে পথে তাদের কল্যাণ নিহিত, সে পথের দিকে মনকে আকৃষ্ট করে দেন।

ইলম অনুযায়ী আমল করলে ইলম বাড়ে : এই আয়াতের তফসীরে হযরত আবুদাদা বলেন, আল্লাহ ইলম অনুযায়ী আমল করার জন্যে যারা জেহাদ করে, আমি তাদের সামনে নতুন নতুন ইলমের দ্বার খুলে দেই। ফুযায়ল ইবনে আযায় বলেন, যারা বিদ্যাজর্জনে ব্রতী হয়, আমি

তাদের জন্যে আমলও সহজ করে দেই।—(মায়হারী)

সূরা আল-আনকাবূত সমাপ্ত

সূরা আর-রুম

সূরা অবতরণ এবং রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী : সূরা আনকাবূতের সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর পথে জেহাদ ও মুজাহাদা করে, আল্লাহ তাদের জন্যে তাঁর পথ খুলে দেন। আয়াতে তাদের জন্যে উদ্দেশ্য সফলতার সুসংবাদও প্রদত্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরা রুম যে ঘটনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, তা সেই খোদায়ী সাহায্যেরই একটি প্রতীক। এই সূরায় রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষই ছিল কাফের। তাদের মধ্যে কারও বিজয় এবং কারও পরাজয় বাহ্যতঃ ইসলাম ও মুসলমানদের জন্যে কোন কৌতূহলের বিষয় ছিল না। কিন্তু উভয় কাফের দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক এবং রোমকরা ছিল খৃষ্টান আহলে কিতাব। ফলে এরা ছিল মুসলমানদের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী। কেননা, ধর্মের অনেক মূলনীতি—যথা পরকালে বিশ্বাস, রেসালত ও গৃহীতে বিশ্বাস ইত্যাদিতে তারা মুসলমানদের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে রোম সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্রে এই অভিন্ন মতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি পত্রে কোরআনের এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন : تَمَّالِ الْكَلْبَةِ سَوَاءٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ আহলে কিতাবদের সাথে মুসলমানদের এসব নৈকট্যই নিম্নোক্ত ঘটনার কারণ হয়েছিল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মক্কা অবস্থানকালে পারসিকরা রোমকদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করে। হাফেয ইবনে-হাজার প্রমুখের উক্তি অনুযায়ী তাদের এই যুদ্ধ শাম দেশের আয়রুআত ও বুসরার মধ্যস্থলে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে মক্কার মুশরিকরা পারসিকদের বিজয় কামনা করত। কেননা, শিরক ও প্রতিমা পূজায় তারা ছিল পারসিকদের সহযোগী। অপরপক্ষে মুসলমানদের আন্তরিক বাসনা ছিল রোমকরা বিজয়ী হোক। কেননা, ধর্ম ও মহাবের দিক দিয়ে তারা ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু হল এই যে, তখনকার মত পারসিকরা যুদ্ধে জয়লাভ করল। এমন কি তারা কনষ্টান্টিনোপলও অধিকার করে নিল এবং সেখানে উপাসনার জন্যে একটি অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করল। এটা ছিল পারস্য সম্রাট পারভেজের সর্বশেষ বিজয়। এরপর তার পতন শুরু হয় এবং অবশেষে মুসলমানদের হাতে সম্পূর্ণ নিষ্টিত হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

এই ঘটনায় মক্কার মুশরিকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং মুসলমানদেরকে লজ্জা দিতে লাগল যে, তোমরা যাদের সমর্থন করত, তারা হেরে গেছে। ব্যাপার এখানেই শেষ নয়; বরং আহলে-কিতাব রোমকরা যেমন পারসিকদের মোকাবেলায় পরাজয় বরণ করেছে, তেমনি আমাদের মোকাবেলায় তোমরাও একদিন পরাজিত হবে। এতে মুসলমানরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত হয়।—(ইবনে-জরীর, ইবনে আবী হাতেম)

সূরা রূমের প্রাথমিক আয়াতগুলো এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছর পরেই

রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন এসব আয়াত শুনলেন, তখন মকর চতুর্দশী এবং মুশরিকদের সমাবেশ ও বাজারে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন, তোমাদের হর্ষাৎকল্ল হওয়ার কোন কারণ নেই। কয়েক বছরের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। মুশরিকদের মধ্যে উবাই ইবনে খাল্ফ কথ্য বলল এবং বলল, তুমি মিথ্যা বলছ। এরূপ হতে পারে না। হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহর দূশমন, তুই-ই মিথ্যাবাদী। আমি এই ঘটনার জন্যে বাজি রাখতে প্রস্তুত আছি। যদি তিন বছরের মধ্যে রোমকরা বিজয়ী না হয়, তবে আমি তোকে দশটি উষ্ট্রী দেব। উবাই এতে সম্মত হল। (বলাবাহুল্য, এটা ছিল জুয়া, কিন্তু তখন জুয়া হারাম ছিল না।) একথা বলে হযরত আবু বকর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলেন। রসূল করীম (সাঃ) বললেন, আমি তো তিন বছরের সময় নির্দিষ্ট করিনি। কোরআনে এর জন্যে يَضْرِبُكُمْ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে এই ঘটনা ঘটতে পারে। তুমি যাও এবং উবাইকে বল যে, আমি দশটি উষ্ট্রীর স্থলে একশ' উষ্ট্রী বাজি রাখছি, কিন্তু সময়কাল তিন বছরের পরিবর্তে নয় বছর এবং কোন কোন রেওয়াজে মতে সাত বছর নির্দিষ্ট করছি। হযরত আবু বকর আশেপাশে পালন করলেন এবং উবাইও নতুন চুক্তিতে সম্মত হল।—(ইবনে জরীর, তিরমিযী)

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এই ঘটনা সংঘটিত হয় এক সাত বছর পূর্ণ হওয়ার পর বদর যুদ্ধের সময় রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন উবাই ইবনে খাল্ফ বেঁচে ছিল না। হযরত আবু বকর তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে একশ' উষ্ট্রী দাবী করে আদায় করে নিলেন।

কোন কোন রেওয়াজে আছে, উবাই যখন আশংকা করল যে, হযরত আবু বকরও হিজরত করে যাবেন, তখন সে বলল, আপনাকে ছাড়ব না, যতক্ষণ না আপনি একজন জামিন পেশ করেন। নিরাশ্রিত সময়ে রোমকরা বিজয়ী না হলে সে আমাকে একশ' উষ্ট্রী পরিশোধ করবে। হযরত আবু বকর তদীয় পুত্র আবদুল্ল রহমানকে জামিন নিযুক্ত করলেন।

যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) বাজিতে জিতে গেলেন এবং একশ' উষ্ট্রী লাভ করলেন, তখন সেগুলো নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, উষ্ট্রীগুলো সদকা করে দাও। আবু ইয়লা ও ইবনে আসকরে বারা ইবনে আযেব থেকে এ স্থলে এরূপ তামা বর্ণিত আছে : هَذَا السَّعْتُ تَصْلُقُ بِهِ —এটা হারাম। একে সদকা করে দাও।—(ব্রহ্ম-মা'আনী)

জুয়া : কোরআনের আয়াত অনুযায়ী জুয়া অকাটা হারাম। হিজরতের পর যখন মদ্যপান হারাম করা হয়, তখন জুয়াও হারাম করা হয় এবং একে 'শরতানী অপকর্ষ' আখ্যা দেয়া হয়।

إِنَّمَا الْحَرَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْكَرُ رَضُّونَ عَلَى الشَّيْطَانِ

বলে জুয়ার বিভিন্ন প্রকারকেই হারাম করা হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) উবাই ইবনে খাল্ফের সাথে যে দু'তরফা লেন-দেন ও হার-জিতে বাজি রেখেছিলেন, এটাও এক প্রকার জুয়াই ছিল। কিন্তু ঘটনাটি হিজরতের পূর্বকাল। তখন জুয়া হারাম ছিল না।

কাজেই এ ঘটনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে জুয়ার যে মাল আনা হয়েছিল, তা হারাম মাল ছিল না।

তাই এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই মাল সদকা করে দেয়ার আদেশ কেন দিলেন? বিশেষ করে অন্য এক রেওয়াজেতে এ সম্পর্কে سَعْت শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। এটা কিরূপে সঙ্গত হবে? ফেকাহবিদগণ এর জওয়াবে বলেন, এই মাল যদিও তখন হালাল ছিল, জুয়ার মাধ্যমে অর্থোপার্জন তখনও রসূলুল্লাহ (সাঃ) পছন্দ করতেন না। তাই আবু বকরের মর্যাদার পরিপন্থী মনে করে এই মাল সদকা করে দেয়ার আদেশ দেন। এটা এমন-যেমন মদ্যপান হালাল থাকার সময়ও রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) কখনও মদ্যপান করেননি।

যে রেওয়াজেতে سَعْت শব্দ উল্লেখিত হয়েছে, প্রথমতঃ হাদীসবিদগণ সেই রেওয়াজেতকে সহীহ বলে স্বীকার করেননি। যদি অগত্যা সহীহ মেনে নেয়া হয়, তবে سَعْت শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথম প্রসিদ্ধ অর্থ হারাম। দ্বিতীয় অর্থ মকরহ ও অপছন্দনীয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, كَسِبَ الْحَجَامُ سَعْتًا এখানে অধিকাংশ ফেকাহ-বিদের মতে سَعْت — এর অর্থ মকরহ ও অপছন্দনীয়। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী মুফরাদাতুল-কোরআনে এবং ইবনে-আসীর 'নেহযা' গ্রন্থে سَعْت শব্দের বিভিন্ন অর্থ আরবদের বাক-পদ্ধতি ও হাদীসের মাধ্যমে সপ্রমাণ করেছেন।

ফেকাহবিদদের এই জওয়াব এ কারণেও গ্রহণ করা জরুরী যে, বাস্তবে এই মাল হারাম থাকলে নীতি অনুযায়ী যার কাছ থেকে নেয়া হয়েছিল, তাকেই ফেরত দেয়া অপরিহার্য ছিল। হারাম মাল সদকা করার আদেশ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং যখন মালিক জানা না থাকে কিংবা তার কাছে পৌছানো দুঃস্বপ্ন হয় কিংবা তাকে ফেরত দেয়ার মধ্যে অন্য কোন শরীয়তসিদ্ধ অপকারিতা নিহিত থাকে, তখনই হারাম মাল সদকা করা যায়। এক্ষেত্রে ফেরত না দেয়ার এরূপ কোন কারণ বিদ্যমান নেই।

وَيَوْمَئِذٍ يَقَرُّ الْمُؤْمِنُونَ بِصَفْوَةِ اللَّهِ — অর্থাৎ, যেদিন রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, সেদিন আল্লাহর সাহায্যের কারণে মুসলমানরা উৎকল্ল হবে। বাক্যবিন্যাস পদ্ধতির দিক দিয়ে বাহ্যতঃ এখানে রোমকদের সাহায্য বোঝানো হয়েছে। তারা যদিও কাকের ছিল, কিন্তু অন্য কাকেরদের তুলনায় তাদের কুফর কিছুটা হালকা ছিল। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে সাহায্য করা আবাস্তর নয়। বিশেষতঃ যখন তাদেরকে সাহায্য করলে মুসলমানরাও আনন্দিত হয় এবং কাকেরদের মোকাবেলায় তাদের জিত হয়।

এখানে মুসলমানদের সাহায্যও বোঝানো যেতে পারে। দুই কারণে এটা সম্ভবপর। (এক) মুসলমানরা রোমকদের বিজয়কে কোরআন ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণরূপে পেশ করেছিল। তাই রোমকদের বিজয় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাহায্য ছিল। (দুই) তখনকার দিনে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যই ছিল কাকেরদের দুই পরাশক্তি। আল্লাহ তাআলা তাদের এককে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে উভয়কে দুর্বল করে দেন, যা ভবিষ্যতে মুসলমানদের বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।—(ব্রহ্ম-মা'আনী)

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ

—অর্থাৎ, পার্থিব জীবনের এক পিঠ তাদের নখদর্পণে। ব্যবসা কিরূপে করবে, কিসের ব্যবসা করবে, কোথা থেকে কিনবে, কোথায় বেচবে কৃষিকাজ কিভাবে করবে, কবে বীজ বপন করবে, কবে শস্য কাটবে, দালান-কোঠা কিভাবে নির্মাণ করবে, বিলাস-ব্যসনের উপকরণ কিভাবে আহরণ করবে—এসব বিষয় তারা সম্যক অবগত। কিন্তু এই পার্থিব জীবনেরই অপর পিঠ সম্পর্কে তথাকথিত বড় বড় পণ্ডিত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অথচ এই পিঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্থিব জীবনের স্বরূপ ও তার আসল লক্ষ্যকে ফুটিয়ে তোলা। অর্থাৎ, একথা প্রকাশ করা যে, দুনিয়া একটা মুসাক্ষিরানা। এখান থেকে আজ্ঞা না হয় কাল যেতেই হবে। মানুষ এখানকার নয়; বরং পরকালের বাসিন্দা। এখানে কিছুদিনের জন্যে আল্লাহর ইচ্ছায় আগমন করেছে মাত্র। এখানে তার কাজ এই যে, স্বদেশে সুখে কালাতিপাত করার জন্যে এখান থেকে সুখের সামগ্রী সংগ্রহ করে সেখানে শ্রেণণ করবে। বলাবাহুল্য, এই সুখের সামগ্রী হচ্ছে ঈমান ও সংকর্ম।

এবার কোরআন পাকের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করুন। —يَعْلَمُونَ—এর সাথে نَكَرَةً কে ظَاهِرًا বলা হয়েছে। এতে প্রকৃতপক্ষে তারা বাহ্যিক জীবনকেও পুরোপুরি জানে না—এর শুধু এক পিঠ জানে এবং অপর পিঠ জানে না। আর পরকাল সম্পর্কে তো সম্পূর্ণই বেখবর।

পরকাল থেকে গাফেল হয়ে দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বুদ্ধিমত্তা নয় : কোরআন পাক বিশ্বে খ্যাতনামা ধনেশুখশীল ও ভোগ-বিলাসী জাতিসমূহের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাদের অশুভ পরিণতিও দুনিয়াতে সবার সামনে এসেছে। আর পরকালের চিরস্থায়ী আযাব তো তাদের ভাগ্যলিপি হয়েছে। তাই এসব জাতিকে কেউ বুদ্ধিমান ও দার্শনিক বলতে পারে না। পরিতাপের বিষয়, আজকাল যে ব্যক্তি অধিকতর অর্থ সঞ্চয় করতে পারে এবং বিলাস-ব্যসনের উৎকৃষ্টতর সামগ্রী যোগাড় করতে সমর্থ হয়, তাকেই সর্বাধিক বুদ্ধিমান বলা হয়, যদিও সে মানবতাবোধ থেকেও বঞ্চিত হয়। যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ লোককে বুদ্ধিমান বলা বুদ্ধির অবমাননা বৈ নয়। কোরআন পাকের ভাষায় একমাত্র তাই বুদ্ধিমান, যারা আল্লাহ ও পরকাল চিনে, তার জন্যে আমল করে এবং সাংসারিক প্রয়োজনাদিকে প্রয়োজন পর্যন্তই সীমিত রাখে—جَاهِلِينَ فِي الْآخِرَةِ

وَآخِرَ الْأَيَّامِ الْأُولَى الْأُولَى الَّذِينَ يَنْزُرُونَ إِلَهُهُ

—আয়াতের অর্থ তাই।

উল্লেখিত আয়াতত্রয় পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর পরিশিষ্ট ও তার সাক্ষ্যস্বরূপ। অর্থাৎ, তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্য ও ধ্বংসশীল বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হয়ে জগৎরূপী কারখানার স্বরূপ ও পরিণাম সম্পর্কে বেখবর হয়ে গেছে। যদি তারা নিজেরাও মনে মনে চিন্তা করত এবং ভাবত, তবে এ সৃষ্টি রহস্য তাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে যেত যে, আল্লাহ তাআলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে অনর্থক ও বেকার সৃষ্টি করেননি। এগুলো সৃষ্টি করার কোন মহান লক্ষ্য ও বিরাট রহস্য রয়েছে। তা এই যে, মানুষ এ অগণিত নেয়ামতরাজির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে চিনবে এবং এই খোঁজে ব্যাপৃত হবে যে, তিনি কি কি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং কি কি কাজে অসন্তুষ্ট। অতঃপর তাঁর সন্তুষ্টির কাজ সম্পাদনে সচেষ্ট হবে

(৬) আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (৭) তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক জানে এবং তারা পরকালের খবর রাখে না। (৮) তারা কি তাদের মনে ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। (৯) তারা কি পৃথিবীতে ব্রহ্মণ করে না অতঃপর দেখে না যে; তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি কি হয়েছে? তারা তাদের চাইতে শক্তিশালী ছিল, তারা যখন চাষ করত এবং তাদের চাইতে বেশী আবাদ করত। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের প্রতি জুলুমকারী ছিলেন না। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজদের প্রতি জুলুম করেছিল। (১০) অতঃপর যারা মন্দ কর্ম করত, তাদের পরিণাম হয়েছে মন্দ। কারণ, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। (১১) আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এরপর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১২) যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরার্থীরা হতান হয়ে যাবে। (১৩) তাদের দেবতাগুলোর মধ্যে কেউ তাদের সুপারিশ করবে না এবং তারা তাদের দেবতাকে অস্বীকার করবে। (১৪) যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (১৫) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সংকর্ম করেছে, তারা জন্মতে সমাদৃত হবে।

এবং অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বেঁচে থাকবে। একথাও বলাবাহুল্য যে, এই উভয় প্রকার কাজের কিছু প্রতিদান ও শাস্তি হওয়াও জরুরী। নতুবা সৎ ও অসৎকে একই দাঁড়ি-পাল্লায় রাখা ন্যায় ও সুবিচারের পরিপন্থী। একথাও জানা যে, এই দুনিয়া মানুষের ভাল অথবা মন্দ কাজের প্রতিদান পুরোপুরি পাওয়ার স্থান নয়; বরং এখানে প্রায়ই এরূপ হয় যে, পেশাদার অপরাধীরা হাসি-খুশী জীবন-যাপন করে এবং সৎ ও সাধু ব্যক্তির বিপদাপদে জড়িত থাকে।

কাজেই এমন একসময় আসা জরুরী, যখন এসব কাজ-কারবার স্বতম হয়ে যাবে, ভাল ও মন্দ কর্মের হিসাব-নিকাশ হবে এবং ভাল কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেয়া হবে। এই সময়েরই নাম কৈয়ামত ও পরকাল।

সারকথা এই যে, তারা যদি চিন্তা-ভাবনা করত, তবে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সে সবকিছুই সাক্ষ্য দিত যে, এগুলো চিরস্থায়ী নয়—ক্ষণস্থায়ী। এরপর অন্য জগত আসবে, যা চিরস্থায়ী হবে। প্রথম আয়াতের সারমর্ম তাই — **أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ** — এই বিষয়বস্তুটি একটি যুক্তিতত্ত্ব প্রমাণ। পরবর্তী আয়াতে পৃথিবীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, চাক্ষুষ ও অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়সমূহকে এর প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয়েছে এবং মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে যে,

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي الْأَرْضِ — অর্থাৎ, মক্কাবাসীরা এমন এক ভূখণ্ডের অধিবাসী, যেখানে না আছে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ এবং না আছে সুউচ্চ ও সুরম্য দালান-কোঠা। কিন্তু তারা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শাম ও ইয়ামান সফর করে। এসব সফরে তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের পরিণাম প্রত্যক্ষ করে না? তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে বড় বড়

কীর্তি স্থাপনের যোগ্যতা দান করেছিলেন। তারা যত্নবশত খনন করে সেখান থেকে পানি বের করত এবং তদ্বারা বাগ-বাগিচা ও কৃষিক্ষেত্র সিক্ত করত। ভূগর্ভস্থ গোপন ভাণ্ডার থেকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও বিভিন্ন প্রকার খনিজ ধাতু উত্তোলন করত এবং তদ্বারা মানুষের উপকারার্থে বিভিন্ন প্রকার শিল্পদ্রব্য তৈরী করত। তারা ছিল তৎকালীন সুলভ জাতি। কিন্তু তারা বৈষয়িক ও ক্ষণস্থায়ী বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে আল্লাহ ও পরকাল বিস্মৃত হয়। সুরগ করিয়ে দেয়ার জন্যে আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা কোন দিকেই লক্ষ্য করেনি এবং পরিণামে দুনিয়াতেও আযাবে পতিত হয়। তাদের জনপদসমূহের জনশূন্য ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, চিন্তা কর, এই আযাবে তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন জুলুম হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে? অর্থাৎ, তারা নিজেরাই আযাবের কারণাদি সঞ্চয় করেছে।

فَهَمَّ بِئِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ — **حَبْرٌ** শব্দটি থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আনন্দ, উল্লাস। জ্ঞানাতীতগণ যত প্রকার আনন্দ লাভ করবে, সবই এই শব্দের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একে ব্যাপক রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, **فَلَا تَحْزَنْ نَفْسُكَ إِنَّكَ أَنتَ مِنَ الْغَائِبِينَ** অর্থাৎ, দুনিয়াতে কেউ জানে না যে, তার জন্যে জ্ঞানাতীত চক্ষু শীতল করার কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে। কোন কোন তফসীরকার এই আয়াতের অধীনে যে বিশেষ বিশেষ আনন্দদায়ক বস্তুসমূহ উল্লেখ করেছেন এগুলোর সবই এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ

সব্বোহা الله
সকালে, অর্থাৎ, সন্ধ্যায় জিন তুস্বিহুন - অর্থাৎ, জিন তুসুন
এই বাক্যটি প্রমাণ হি
মাঝখানে আনা হয়েছে। অর্থাৎ, সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করা
জরুরী। কারণ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তিনিই একমাত্র প্রশংসার যোগ্য
এবং এতদুভয়ের বাসিন্দারা তাঁর প্রশংসায় মশগুল। আয়াতের
শেষভাগে وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ বলে আরও দুই সময়ের পবিত্রতা বর্ণনা
করার আদেশ দেয়া হয়েছে। অপরাহ্ন তথা আসরের সময় এবং মধ্যাহ্ন
তথা সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে পড়ার পরবর্তী সময়।

বর্ণনায় সন্ধ্যাকে সকালের অগ্রে এবং অপরাহ্নকে মধ্যাহ্নের অগ্রে রাখা
হয়েছে। সন্ধ্যাকে অগ্রে রাখার এক কারণ এই যে, ইসলামী তারিখ সন্ধ্যা
তথা সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু হয়। আসরের সময়কে যোহরের অগ্রে
রাখার এক কারণ সম্ভবতঃ এই যে, আসরের সময় সাধারণতঃ
কাজ-কারবারে ব্যাপৃত থাকার সময়। এতে দোয়া, তসবীহ অথবা নামায
সম্পন্ন করা স্বভাবতঃ কঠিন। এ কারণেই কোরআনে وسطى صلوٰة তথা
আসরের নামাযের বিশেষ তাকীদ বর্ণিত হয়েছে—

حَافِظُوا أَعْلَى الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةَ الْوُسْطَى

আলোচ্য আয়াতের ভাষায় নামাযের উল্লেখ নেই। কাজেই সর্বপ্রকার
উক্তিগত ও কর্মগত যিকর এর অন্তর্ভুক্ত। যিকরের যত প্রকার আছে,
তন্মধ্যে নামায সর্বশ্রেষ্ঠ। তাই নামায আরও উত্তমরূপেই আয়াতের মধ্যে
দাখিল আছে বলা যায়। এ কারণেই কোন কোন আলেম বলেন, এই
আয়াতে পাঞ্চেগানা নামায ও সেসবের সময়ের বর্ণনা আছে। হযরত
ইবনে-আব্বাস (রাঃ)—কে কেউ জিজ্ঞেস করল, কোরআনে পাঞ্চেগানা
নামাযের স্পষ্ট উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন, হাঁ। অতঃপর তিনি প্রমাণ
হিসাবে এই আয়াত পেশ করলেন। অর্থাৎ, جِئْتُمْ تُسُبِّحُونَ শব্দে মাগরিবের
নামায, جِئْتُمْ تُصْبِحُونَ শব্দে ফজরের নামায, عِشْيَا শব্দে আসরের নামায
এবং جِئْتُمْ تُظْهِرُونَ শব্দে যোহরের নামায উল্লেখিত হয়েছে। অন্য এক
আয়াতে এশার নামাযের প্রমাণ আছে; অর্থাৎ, وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
হযরত হাসান বসরী বলেন, جِئْتُمْ تُسُبِّحُونَ শব্দে মাগরিব ও এশা উভয়
নামায ব্যক্ত হয়েছে।

জ্ঞাতব্য : আলোচ্য আয়াত হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর দোয়া এবং
এ দোয়ার কারণে কোরআন পাকে তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয়
وَأَرْسَلْنَاهُمَا ذَيْنِى وَآلِهِمُ الَّذَيْنِى
—হযরত ইবরাহীম (আঃ) সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করতেন।

হযরত মুআয ইবনে আনাস থেকে বর্ণিত আছে যে, কোরআন পাকে
হযরত ইবরাহীমের অঙ্গীকার পূর্ণ করার যে প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, তার
কারণ ছিল এই দোয়া।

আবু দাউদ, তাবারানী, ইবনে সুন্নী প্রমুখ হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ
فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُصَوَّرُونَ ۝ فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ
تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۝ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ نُخْرِجُكُمْ ۝ وَمِنَ الْآيَةِ أَنَّ خَلْقَكُمْ
مِنْ أَرْضٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ كَافِرٌ مُتَنَبِّرُونَ ۝ وَمِنَ الْآيَةِ أَنَّ خَلْقَ
لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝
وَمِنَ الْآيَةِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَاكَفَ السِّتْرِ
وَالْوَاكِمَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝ وَمِنَ الْآيَةِ
مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَمِنَ الْآيَةِ بُرُؤُكُمْ
خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ فَيَمْسِكُ بِهِ الْأَرْضُ
بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

(১৬) আর যারা কাকের এবং আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের
সাক্ষাতকারকে মিথ্যা বলছে, তাদেরকেই আযাবের মধ্যে উপস্থিত করা
হবে। (১৭) অতএব, তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা স্মরণ কর সন্ধ্যায় ও
সকালে, (১৮) এবং অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে
তাঁরই প্রশংসা। (১৯) তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বহির্গত করেন,
জীবিত থেকে মৃতকে বহির্গত করেন, এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে
পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবে তোমরা উশ্বিত হবে। (২০) তাঁর
নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি মুস্তিকা থেকে তোমাদের
সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ। (২১) আর
এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে
তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে
শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া
সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী
রয়েছে। (২২) তাঁর আরও এক নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের
সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের
জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৩) তাঁর আরও নিদর্শন : রাতে ও দিনে
তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর কৃপা অনুেষণ। নিশ্চয় এতে মনোযোগী
সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (২৪) তাঁর আরও নিদর্শন—তিনি
তোমাদেরকে দেখান বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসার জন্যে এবং আকাশ থেকে
পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর তাকে
পুনরুজ্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী
রয়েছে।

বর্ণনা করেন যে, **وَكَذَلِكَ نُنْزِلُكَ فِي الْقُرْآنِ** থেকে পর্যন্ত এই তিন আয়াত সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে এই দোয়া পাঠ করে, তার সারাদিনের আমলের ক্রটিসমূহ এর বরকতে দূর করে দেয়া হয় এবং যে সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়ে, তার রাত্রিকালীন আমলের ক্রটি দূর করে দেয়া হয়।—(রুহুল-মা'আনী)

সূরা রুমের শুরুতে রোমক ও পারসিকদের যুদ্ধের ঘটনা শোনানোর পর অবিশ্বাসী কাফেরদের পথভ্রষ্টতা ও সত্যের প্রতি উদাসীনতার কারণ সাব্যস্ত করা হয় যে, তারা ধ্বংসশীল পার্শ্ববর্তী জীবনকে লক্ষ্য স্থির করে পরকাল থেকে বিমুখ হয়ে পড়েছে। এরপর কেয়ামতে পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানকে যেসব বাহাদুরী অবাস্তব মনে করতে পারত, তাদেরকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জওয়াব দেয়া হয়েছে। প্রথমে নিজের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার অতঃপর চতুর্দশটি জাতিসমূহের অবস্থা ও পরিণাম পর্যবেক্ষণ করার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান। তাঁর কোন শরীক ও অংশীদার নেই। এসব সাক্ষ্য-প্রমাণের অনিবার্য ফল দাঁড়ায় এই যে, এবাদতের যোগ্য একমাত্র তাঁর একক সত্তাকেই সাব্যস্ত করতে হবে। তিনি পয়গম্বরগণের মাধ্যমে কেয়ামত কায়ম হওয়ার বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষের পুনরুজ্জীবিত হয়ে হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার যে সংবাদ দিয়েছেন, তাতে বিশ্বাস করতে হবে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এই পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ প্রজ্ঞার ছয়টি প্রতীক 'শক্তির নিদর্শনাবলী' শিরোনামে বণিত হয়েছে। এগুলো আল্লাহ তাআলার অনুপম শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন।

খোদায়ী কুদরতের প্রথম নিদর্শন : মানুষের ন্যায় সৃষ্টির সেরা ও জগতের শাসককে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করা। জগতে যত প্রকার উপাদান আছে, তন্মধ্যে মৃত্তিকা সর্বনিকট উপাদান। এতে অনুভূতি, চেতনা ও উপলব্ধির নাম-গন্ধও দৃষ্টিগোচর হয় না। অগ্নি, পানি, বায়ু ও মৃত্তিকা এই উপাদান-চতুষ্টয়ের মধ্যে মৃত্তিকা ছাড়া সবগুলোর মধ্যে কিছু না কিছু গতি ও চেতনার আভাস পাওয়া যায়। মৃত্তিকা তা থেকেও বঞ্চিত। মানব সৃষ্টির জন্যে আল্লাহ তাআলা একেই মনোনীত করেছেন। ইবলীসের পথভ্রষ্টতার কারণও তাই হয়েছে যে, সে অগ্নি-উপাদানকে মৃত্তিকা থেকে সেরা ও শ্রেষ্ঠ মনে করে অহংকারের পথ বেছে নিয়েছে। সে বুঝল না যে, ভদ্রতা ও আভিজাত্যের চাবিকাঠি স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা মহান করতে পারেন।

মানব সৃষ্টির উপাদান যে মৃত্তিকা, একথা হযরত আদম (আঃ)-এর দিক দিয়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। তিনি সমগ্র মানব জাতির অস্তিত্বের মূলভিত্তি, তাই অন্যান্য মানুষের সৃষ্টিও পরোক্ষভাবে তাঁরই সাথে সম্পৃক্ত হওয়া অবাস্তব নয়। এটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ মানুষের প্রজ্ঞান বীর্ষের মাধ্যমে হলেও বীর্ষ যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত, তন্মধ্যে মৃত্তিকা প্রধান।

খোদায়ী কুদরতের দ্বিতীয় নিদর্শন : দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলা নারী জাতিতে সৃষ্টি করেছেন। তারা পুরুষের সঙ্গিনী হয়েছে। একই উপাদান থেকে একই স্থানে এবং একই খাদ্য থেকে উৎপন্ন সন্তানদের মধ্যে এই দু'টি প্রকারভেদ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখশরী, আভ্যাস ও চরিত্রের সুস্পষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহর পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার জন্যে এই সৃষ্টিই যথেষ্ট

নিদর্শন। এরপর নারী জাতি সৃষ্টি করার রহস্য ও উপকারিতার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : **لَسْتُ أَزَالُهَا** — অর্থাৎ, তোমরা তাদের কাছে পৌছে শাস্তি লাভ কর, এ কারণেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের যত প্রয়োজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত সবগুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সবগুলোর সারমর্ম হচ্ছে মানসিক শাস্তি ও সুখ। কোরআন পাক একটিমাত্র শব্দে সবগুলোকে সন্নিবেশিত করে দিয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, বৈবাহিক জীবনের যাবতীয় কাজ-কারবারের সারমর্ম হচ্ছে মনের শাস্তি ও সুখ। যে পরিবারে এটা বর্তমান আছে, সেই পরিবারে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। যেখানে মানসিক শাস্তি অনুপস্থিত, সেখানে আর যাই থাকুক বৈবাহিক জীবনের সাফল্য নেই। একথাও বলাবাহুল্য যে, পারস্পরিক শাস্তি তখনই সম্ভবপর যখন নারী ও পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি শরীয়তসম্মত বিবাহের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেসব দেশ ও জাতি এর বিপরীত হারাম রীতি-নীতি প্রচলিত করেছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, তাদের জীবনে কোথাও শাস্তি নেই। জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় সাময়িক যৌন-বাসনা চরিতার্থ করার নাম শাস্তি হতে পারে না।

বৈবাহিক জীবনের লক্ষ্য : আলোচ্য আয়াত পুরুষ ও নারীর দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য মনের শান্তিকে স্থির করেছে। এটা তখনই সম্ভবপর, যখন উভয়পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজ্ঞান হয় এবং তা আদায় করে নেয়। নতুবা অধিকার আদায়ের সপ্রাণ পারিবারিক শাস্তি বরদাদ করে দেবে। এই অধিকার আদায়ের এক উপায় ছিল আইন প্রণয়ন করে তা প্রয়োগ করা ; যেমন অন্যদের অধিকারের বেলায় তাই করা হয়েছে। অর্থাৎ, একে অপরের অধিকার হরণকে হারাম করে তজ্জন্য কঠোর শাস্তিবণী শোনানো হয়েছে। শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ত্যাগ ও সহমর্মিতার উপদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, শুধু আইনের মাধ্যমে কোন জাতিকে সঠিক পথে আনা যায় না, যে পর্যন্ত তার সাথে আল্লাহুতীতি যুক্ত করে দেয়া না হয়। এ কারণেই সামাজিক ব্যাপারাদিতে বিমি-বিধানের সাথে সমগ্র কোরআনে সর্বত্র **أَتَقَرُّوْا** ইত্যাদি বাক্য পরিশিষ্ট হিসেবে জুড়ে দেয়া হয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে **إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ** — অর্থাৎ, এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন আছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে একটি নিদর্শন এবং শেষভাগে একে 'অনেক নিদর্শন' বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আয়াতে উল্লেখিত বৈবাহিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক ও তা থেকে অর্জিত পার্শ্ব ও ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে এটা এক নয়—বহু নিদর্শন।

খোদায়ী কুদরতের তৃতীয় নিদর্শন : তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন, বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণনাবলি এবং বিভিন্ন স্তরের বর্ণবৈষম্য; যেমন কোন স্তর শ্বেতকায়, কেউ কৃষ্ণকায়, কেউ লালচে এবং কেউ হলদেটে। এখানে আকাশ ও পৃথিবী সৃজন তো শক্তির মহানিদর্শন বটেই, মানুষের ভাষার বিভিন্নতাও কুদরতের এক বিস্ময়কর লীলা। ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আরবী, ফারসী, হিন্দী, তুর্কী, ইংরেজী ইত্যাদি কত বিভিন্ন ভাষা আছে। এগুলো বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রচলিত। তন্মধ্যে কোন কোন ভাষা পরস্পর এত ভিন্নরূপ যে, এদের মধ্যে পারস্পরিক কোন সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয় না। স্বর ও উচ্চারণভঙ্গির বিভিন্নতাও ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে শামিল। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক পুরুষ, নারী, বালক ও

বৃদ্ধের কঠম্বরে এমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন যে, একজনের কঠম্বর অন্য জনের কঠম্বরের সাথে পুরোপুরি মিল রাখে না। কিছু না কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। অথচ এই কঠম্বরের যন্ত্রপাতি তথা জিহ্বা, ঠোঁট, তালু ও কঠনালী সবার মধ্যেই অভিন্ন ও একরূপ। ﴿وَلِلَّهِ الْحُكْمُ الْحَكِيمُ﴾

এমনিভাবে বর্ষ-বৈষম্যের কথা বলা যায়। একই পিতা-মাতা থেকে একই প্রকার অবস্থায় দুই সন্তান বিভিন্ন বর্ণের জন্মগ্রহণ করে। এ হচ্ছে সৃষ্টি ও কারিগরির নৈপুণ্য। এরপর ভাষা ও স্বর বিভিন্ন হয়। মানব জাতির বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে কি কি রহস্য নিহিত আছে, তা এক অতিদীর্ঘ আলোচনা। সামান্য চিন্তা-ভাবনা দূরা অনেক রহস্য বুঝে নেয়া কঠিনও নয়।

কুদরতের এই আয়াতে আকাশ, পৃথিবী; ভাষার বিভিন্নতা, বর্ণের বিভিন্নতা এবং বহুবিধ প্রসঙ্গে অনেক শক্তি ও প্রজ্ঞার নিদর্শন বিদ্যমান আছে। এগুলো এত সুস্পষ্ট যে, অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক চক্ষুমান ব্যক্তিই তা দেখতে পারে। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَالَمِينَ﴾—অর্থাৎ, এতে জ্ঞানীদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে।

খোদায়ী কুদরতের চতুর্থ নিদর্শন : মানুষের রাতে ও দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া এমনিভাবে রাতে ও দিবাভাগে জীবিকা অনুেষণ করা। এই আয়াতে দিনে-রাতে নিদ্রাও বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবিকা অনুেষণও। অন্য কতক আয়াতে নিদ্রা শুধু রাতে এবং জীবিকা অনুেষণ শুধু দিনে করা হয়েছে। কারণ এই যে, রাতের আসল কাজ নিদ্রা যাওয়া এবং জীবিকা অনুেষণের কাজও কিছু চলে। দিনে এর বিপরীতে আসল কাজ জীবিকা অনুেষণ করা এবং কিছু নিদ্রা ও বিশ্রাম গ্রহণেরও সময় পাওয়া যায়। তাই উভয় বক্তব্যই স্ব স্ব স্থানে নির্ভুল। কোন কোন তফসীরকার সদর্পের আশ্রয় নিয়ে এই আয়াতেও নিদ্রাকে রাত্রির সাথে এবং জীবিকা অনুেষণকে দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত দেখিয়েছেন। কিন্তু এর প্রয়োজন নেই।

নিদ্রা ও জীবিকা অনুেষণ তাওয়াফুলের পরপরিপী নয় : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নিদ্রার সময় নিদ্রা যাওয়া এবং জাগরণের সময় জীবিকা অনুেষণ করাকে মানুষের জন্মগত স্বভাবে পরিণত করা হয়েছে। এই উভয় বিষয়ের অর্জন মানুষের চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয় ; বরং এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দান। আমরা দিন-রাত প্রত্যক্ষ করি যে, নিদ্রা ও বিশ্রামের উৎকৃষ্টতর আয়োজন সত্ত্বেও কোন

কোন সময় নিদ্রা আসে না। মাঝে মাঝে ডাক্তারী বটিকাও নিদ্রা আনয়নে ব্যর্থ হয়ে যায়। আল্লাহ্ যাকে চান উন্মুক্ত মাঠে রোদ ও উত্তাপের মধ্যেও নিদ্রা দান করেন।

জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দিনরাত প্রত্যক্ষ করা হয়। দুই ব্যক্তি সমান সমান জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন, সমান অর্থসম্পন্ন, সমান পরিশ্রম সহকারে জীবিকা উপার্জনের একই ধরনের কাজ নিয়ে বসে, কিন্তু একজন উন্নতি লাভ করে এবং অপরজন ব্যর্থ হয়। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াকে উপায়াদির উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। এর পেছনে অনেক রহস্য ও উপকারিতা আছে। তাই জীবিকা উপার্জন উপায়াদির মাধ্যমেই করা অপরিহার্য। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ আসল সত্য বিন্ধুত না হওয়া। উপায়াদিকে উপায়াদিই মনে করতে হবে এবং আসল রিকিদ্দাতা হিসাবে উপায়াদির দৃষ্টিকেই মনে করতে হবে।

এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَوْمٍ يُعَذِّبُونَ﴾—অর্থাৎ, যারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, তাদের জন্যে এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। এতে শ্রমের প্রসঙ্গ করার কারণও সম্ভবতঃ এই যে, দৃশ্যভঃ নিদ্রা আপনা-আপনিই আসে, যদি আরামের জায়গা বেছে নিয়ে শয়ন করা হয়। এভাবে পরিশ্রম, মজুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দূরাও জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর অদৃশ্য হাতের কারসাজি চর্মচক্ষুর অন্তরালে থাকে। পয়স-পয়সগণ তা বর্ণনা করেন। তাই বলা হয়েছে, এসব নিদর্শন তাদের জন্যেই উপকারী, যারা পয়স-পয়সগণের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং যখন বোধ্য হয়, তখন মনে নেয়—কোন হঠকারিতা করে না।

খোদায়ী কুদরতের পঞ্চম নিদর্শন : পঞ্চম নিদর্শন এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে বিদ্যুতের চমক দেখান। এতে উহার পতিত হওয়ার এবং ক্ষতিকারিতারও আশংকা থাকে এবং এর পচাত্তে বৃষ্টির আশাবাদও সঞ্চার হয়। তিনি এই বৃষ্টির দ্বারা শুষ্ক এবং মৃত মৃত্তিকাকে জীবিত ও সতেজ করে তাতে রকমারি প্রকারের বৃক্ষ ও ফল-ফুল উৎপন্ন করেন। এই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَوْمٍ يُعَذِّبُونَ﴾

—অর্থাৎ, এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। কেননা, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি এবং তদ্বারা উদ্ভিদ ও ফল-ফুলের সৃজন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, একথা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারাও বোঝা যেতে পারে।

হয়েছে যে, আল্লাহর ফিতরত বলে সেই ফিতরত বোঝানো হয়েছে, যার উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

ফিতরত বলে কি বোঝানো হয়েছে : এ সম্পর্কে তফসীরকারদের অনেক উক্তির মধ্যে দুইটি উক্তি প্রসিদ্ধ।

(এক) ফিতরত বলে ইসলাম বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে মুসলমান সৃষ্টি করেছেন। যদি পরিবেশ কোন কিছু খারাপ না করে, তবে প্রতিটি জন্মগ্রহণকারী শিশু ভবিষ্যতে মুসলমানই হবে। কিন্তু অভ্যাসগতভাবেই পিতা-মাতা তাকে ইসলামবিরোধী বিষয়াদি শিক্ষা দেয়। ফলে সে ইসলামের উপর কায়ম থাকে না। বোখারী ও মুসলিম বর্ণিত এক হাদীসে তাই ব্যক্ত হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন : এটাই অধিকাংশ পূর্ববর্তী মনীষীর উক্তি।

(দুই) ফিতরত বলে যোগ্যতা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনার ও তাঁকে মেনে চলার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এর ফলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে যদি সে যোগ্যতাকে কাজে লাগায়।

কিন্তু প্রথম উক্তির বিরুদ্ধে কয়েকটি আপত্তি রয়েছে। (এক) এই আয়াতেই পরে বলা হয়েছে, **لَا تَبْدِيلَ لِمِثْقَا أَلْفٍ** এখানে **الله خلق** বলে পূর্বোল্লিখিত **الله** **فَطَرَتْ** —কেই বোঝানো হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, আল্লাহর এই ফিতরকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অথচ বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর পিতা-মাতা মাঝে-মাঝে সন্তানকে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান করে দেয়। যদি ফিতরতের অর্থ ইসলাম নেয়া হয়, যাতে পরিবর্তন না হওয়ার কথা স্বয়ং এই আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে, তা কিরূপে সহীহ হবে? এই পরিবর্তন তো সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়। সর্বত্রই মুসলমানদের চাইতে কাফের বেশী পাওয়া যায়। ইসলাম অপরিবর্তনীয় ফিতরত হলে এই পরিবর্তন কিরূপে ও কেন?

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, হযরত খিযির (আঃ) যে বালককে হত্যা করেছিলেন, তার সম্পর্কে সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে, এই বালকের ফিতরতে কুফর ছিল। তাই খিযির (আঃ) তাকে হত্যা করেন। ফিতরতের অর্থ ইসলাম নিলে প্রত্যেকেরই মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করা জরুরী। কাজেই এই হাদীস তার পরিপন্থী। তৃতীয় আপত্তি এই যে, ইসলাম যদি মানুষের ফিতরতে রক্ষিত এমন কোন বিষয় হয়ে থাকে, যার পরিবর্তন করতেও সে সক্ষম নয়, তবে এটা কোন ইচ্ছাধীন বিষয় হল না। এমতাবস্থায় ইসলাম দ্বারা পরকালের সওয়াব কিরূপে অর্জিত হবে। কারণ, ইচ্ছাধীন কাজ দ্বারাই সওয়াব পাওয়া যায়।

চতুর্থ আপত্তি এই যে, সহীহ হাদীসের অনুরূপ ফেকাহবিদগণের মতে সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে পিতা-মাতার অনুসারী মনে করা হয়। পিতা-মাতা কাফের হলে সন্তানকে কাফের ধরা হয় এবং তার কাফ-দাফন ইসলামী নিয়মে করা হয় না।

এসব আপত্তি ইমাম তুরপুশতী ‘মাসাবীহ’ গ্রন্থের টীকায় বর্ণনা করেছেন। এর ভিত্তিতেই তিনি ফিতরতের অর্থ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় উক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই সৃষ্টিগত যোগ্যতা সম্পর্কে একথাও ঠিক যে, এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না। যে ব্যক্তি পিতা-মাতা অথবা অন্য কারও প্ররোচনায় কাফের হয়ে যায়, তার মধ্যে ইসলামের সত্যতা চিনে নেবার যোগ্যতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। খিযির (আঃ)—এর হাতে নিহত বালক কাফের হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও এতে জরুরী হয় না যে,

তার মধ্যে সত্যকে বোঝার যোগ্যতাই ছিল না। এই আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতাকে মানুষ নিজ ইচ্ছায় ব্যবহার করে। তাই এর কারণে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হওয়ার বাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট। পিতা-মাতা সন্তানকে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান করে দেয়ার যে কথা বোখারী ও মুসলিমে আছে, তার অর্থও ফিতরতের দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, তার যোগ্যতা যদিও জন্মগত ও আল্লাহ প্রদত্ত ছিল এবং তাকে ইসলামের দিকেই নিয়ে যেত, কিন্তু বাধা-বিপত্তি অন্তরায় হয়ে গেছে এবং তাকে সেদিকে যেতে দেয়নি। পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত প্রথম উক্তির অর্থও বাহ্যতঃ মূল ইসলাম নয়; বরং ইসলামের এই যোগ্যতাই বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীগণের উক্তির এই অর্থ মোহাদ্দিস-ই-দেহলভী (রহঃ) মেশকাতের টীকা ‘লুমআতে’ বর্ণনা করেছেন।

‘হুজ্বাতুল্লাহিল বালেগাহ্’ গ্রন্থে লিখিত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)—এর আলোচনা দ্বারা এরই সমর্থন পাওয়া যায়। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন মন ও মেজাজের অধিকারী অসংখ্য প্রকার জীব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক জীবের প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ এক প্রকার যোগ্যতা রেখে দিয়েছেন, যদ্বারা সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। **أَنَّى لَمْ تَخْلُقْهُ تَحْتَ هَذَى** —আয়াতের মর্মও তাই। অর্থাৎ, যে জীবনকে স্রষ্টা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি পথ প্রদর্শনও করেছেন। আলোচ্য যোগ্যতাই হচ্ছে সেই পথ প্রদর্শন। আল্লাহ তাআলা মোমাছির মধ্যে বৃক্ষ ও ফুল চেনা, বেছে নেয়া এবং রস পেতে আহরণ করে চাক এনে সঞ্চিত করার যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন। এমনভাবে মানুষের প্রকৃতিতে এমন যোগ্যতা রেখেছেন, যদ্বারা সে আপন স্রষ্টাকে চিনতে পারে, তার কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য করতে পারে। এরই নাম ইসলাম।

لَا تَبْدِيلَ لِمِثْقَا أَلْفٍ —উল্লিখিত বক্তব্য থেকে এই বাক্যের উদ্দেশ্যও ফুটে উঠেছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত ফিতরত তথা সত্যকে চেনার যোগ্যতা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। ভ্রান্ত পরিবেশ কাফের করতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ করতে পারে না।

এ থেকেই **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** — আয়াতের মর্মও পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে আমার এবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্যে সৃষ্টি করিনি। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের প্রকৃতিতে আমি এবাদতের আগ্রহ ও যোগ্যতা রেখে দিয়েছি। তারা একে কাজে লাগালে তাদের দ্বারা এবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজ সম্ভব হতে পারে না।

বাতিলপন্থীদের সংসর্গ এবং ভ্রান্ত পরিবেশ থেকে দূরে থাকা ফরয : **لَا تَبْدِيلَ لِمِثْقَا أَلْفٍ** বাক্যটি খবর আকারের। অর্থাৎ, খবর দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ফিতরতকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু এতে এক অর্থ আদেশেরও আছে। অর্থাৎ, পরিবর্তন করা উচিত নয়। তাই এই বাক্য থেকে এ কথাও বোঝা গেল যে, মানুষকে এমনসব বিষয় থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা উচিত, যা তার সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে নিক্ষেপ অথবা দুর্বল করে দেয়। এসব বিষয়ের বেশীর ভাগ হচ্ছে ভ্রান্ত পরিবেশ ও কুসংসর্গ অথবা নিজ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী ও পর্যবেক্ষক না হয়ে বাতিলপন্থীদের পুস্তকাদি পাঠ করা।

وَأَيُّسُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُرْكَاتِ —পূর্বের আয়াতে মানব প্রকৃতিতে সত্য গ্রহণের যোগ্য করার আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে

الروم

৭৭

অন্ত মাওযী

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا لَهُمْ نُسُبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَفْقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَأْسِهِمْ يَشْرِكُونَ بِهِ لَقَدْ أُفْكَرُوا بِهِمَا وَلَقَدْ نُفِثُوا بِهِمُ وَمَا كَانُوا بِأَشْيَافِهِمْ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَفْقَهُوا ضُرُّهُمْ يَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عِزًّا وَإِلَى النَّاسِ يَنْصِبُونَ ۝ وَإِذَا فَعَلْنَا لِلنَّاسِ فَضْلًا كَانُوا مِنْهُمْ يَرْحَمُونَ ۝ وَإِذَا فَعَلْنَا لِلنَّاسِ فَضْلًا كَانُوا مِنْهُمْ يَرْحَمُونَ ۝ وَإِذَا فَعَلْنَا لِلنَّاسِ فَضْلًا كَانُوا مِنْهُمْ يَرْحَمُونَ ۝ وَإِذَا فَعَلْنَا لِلنَّاسِ فَضْلًا كَانُوا مِنْهُمْ يَرْحَمُونَ ۝

(৩৩) মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তারা তাদের পালনকর্তাকে আহ্বান করে তাঁরই অভিযুগী হয়ে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে রহমতের স্বাদ আশ্বাদন করান, তখন তাদের একদল তাদের পালনকর্তার সাথে শিরক করতে থাকে, (৩৪) যাতে তারা অস্বীকার করে যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব, মজা লুটে নাও, সত্ত্বরই জানতে পারবে। (৩৫) আমি কি তাদের কাছে এমন কোন দলীল নাখিল করেছি, যে তাদেরকে আমার শরীক করতে বলে? (৩৬) আর যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ আশ্বাদন করাই, তারা তাতে আনন্দিত হয় এবং তাদের কৃতকর্মের ফলে যদি তাদেরকে কোন দুর্দর্শী পায়, তবে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা রিমিক বর্ধিত করেন এবং হ্রাস করেন। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্যে নির্দশনাবলী রয়েছে। (৩৮) আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দিন এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরও। এটা তাদের জন্যে উত্তম, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। তারাই সফলকাম। (৩৯) মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অস্তুরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে। (৪০) আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিমিক দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দেবেন, এরপর তোমাদের জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এসব কাজের মধ্যে কোন একটিও করতে পারবে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও মহান। (৪১) স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আশ্বাদন করতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।

প্রথমে সত্য গ্রহণের উপায় বলা হয়েছে যে, নামায কায়ম করতে হবে। কেননা, নামায কার্যক্ষেত্রে ঈমান, ইসলাম ও আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করে। এরপর বলা হয়েছে — وَكَذَٰلِكَ يُؤْمِنُ الْمُشْرِكُونَ — অর্থাৎ, যারা শিরক করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না। মুশরিকরা তাদের ফিতরত তথা সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে কাজে লাগায়নি। এরপর তাদের পঞ্চভট্টতা বর্ণিত হচ্ছে : وَنَازِلِينَ رُجُومًا وَيُنْفِثُونَ كَوَاكِبًا — অর্থাৎ, এই মুশরিক তারা, যারা স্বভাব ধর্মে ও সত্য ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে অথবা স্বভাব ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে গেছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শিعة শব্দটি شيعَة —এর বহুবচন। কোন একজন অনুসৃতের অনুসারী দলকে শিعة বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, স্বভাব ধর্ম ছিল তওহীদ। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সব মানুষেরই একে অবলম্বন করে এক জাতিতে একদল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তারা তওহীদকে ত্যাগ করে বিভিন্ন লোকের চিন্তাধারার অনুগামী হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারা ও অভিমতে বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা মতাবলম্বি বানিয়ে নিয়েছে। তাদের কারণে জনগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। শয়তান তাদের নিজ নিজ মতাবলম্বিকে সত্য প্রতিপন্ন করার কাজে এমন ব্যাপৃত করে দিয়েছে যে, كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ غُرُورٌ — অর্থাৎ, প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে হর্ষোৎফুল্ল। তারা অপরের মতবাদকে ভ্রান্ত আখ্যা দেয়। অথচ তারা সবাই ভ্রান্ত পথে পতিত রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ — পূর্বের আয়াতে

বলা হয়েছিল যে, রিমিকের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। তিনি যার জন্যে ইচ্ছা রিমিক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্যে ইচ্ছা হ্রাস করে দেন। এ থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি আল্লাহ প্রদত্ত রিমিককে তার যথার্থ খাতে ব্যয় করে, তবে এর কারণে রিমিক হ্রাস পায় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি কৃপণতা করে এবং নিজের ধন-সম্পদ সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে, তবে এর ফলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায় না।

এই বিষয়বস্তুর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এবং হাসান বসরী (রহঃ)-এর মতে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ যে ধন-সম্পদ দান করেছেন, তাতে কৃপণতা করো না; বরং তা হুটচিটে যথার্থ খাতে ব্যয় কর। এতে তোমার ধন-সম্পদ হ্রাস পাবে না। এর সাথে সাথে আয়াতে ধন-সম্পদের কয়েকটি ঋাতও বর্ণনা করা হয়েছে। (এক) আত্মীয়-স্বজন, (দুই) মিসকীন, (তিন) মুসাফির। অর্থাৎ, আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাদেরকে দান কর এবং তাদের জন্যে ব্যয় কর। সাথে সাথে আরও বলা হয়েছে যে, এটা তাদের প্রাপ্য, যা আল্লাহ তোমাদের ধন-সম্পদে शामिल করে দিয়েছেন। কাজেই দান করার সময় তাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছ বলে বড়ই করো না। কেননা, প্রাপকের প্রাপ্য পরিশোধ করা ইনসাফের দাবী; কোন অনুগ্রহ নয়।

ذِي الْقُرْبَىٰ বলে বাহ্যতঃ সাধারণ আত্মীয় বোঝানো হয়েছে, মাহরাম হোক বা না হোক। حَقٌّ বলেও ওয়াজিব—যেমন পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য আত্মীয়ের হক কিংবা শুধু অনুগ্রহমূলক হক—সবই বোঝানো হয়েছে। অনুগ্রহমূলক দান অন্যদের করলে যে সওয়াব পাওয়া যায়, আত্মীয়-স্বজনকে করলে তার চাইতে বেশী সওয়াব

পাওয়া যায়। এমন কি, তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : যে ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন গরীব, সে তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের দান করলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়। কেবল আর্থিক সাহায্যই আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য নয় ; বরং তাদের দেখাশোনা, দৈহিক সেবা এবং তা সম্ভব না হলে মুনপক্ষে মৌখিক সহানুভূতি ও সাহায্যদানও তাদের প্রাপ্য। হযরত হাসান বলেন, যার আর্থিক সম্বলতা আছে, তার জন্যে আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য হল আর্থিক সাহায্য করা। পক্ষান্তরে যার সম্বলতা নেই, তার কাছে দৈহিক সেবা ও মৌখিক সহানুভূতি প্রাপ্য।—(কুরতুবী)

আত্মীয়-স্বজনের পরে মিসকীন ও মুসাফিরের প্রাপ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এটাও ব্যাপক অর্থে তথা সম্বলতা থাকতে আর্থিক সাহায্য, নতুবা সদ্যবহার।

وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا فِي مَوَالِي النَّاسِ —এই আয়াতে একটি কুপ্রথার সংস্কার করা হয়েছে, যা সাধারণ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রচলিত আছে। তা এই যে, আত্মীয়-স্বজনরা সাধারণতঃ একে অপরকে যা দেয় তাতে এদিকে দৃষ্টি রাখা হয় যে, সে-ও আমাদের সময়ে কিছু দেবে; বরং প্রথাগতভাবে কিছু বেশী দেবে। বিয়ে-শাদী ইত্যাদি অনুষ্ঠানাদিতে এদিকে লক্ষ্য করেই উপহার-উপটোকন দেয়া হয়। আয়াতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, আত্মীয়দের প্রাপ্য আদায় করার বেলায় তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করবে না এবং কোন প্রতিদানের দিকে দৃষ্টি রাখবে না। যে ব্যক্তি এই নিয়তে দেয় যে, তার ধন-সম্পদ আত্মীয়দের ধন-সম্পদে शामिल হয়ে কিছু বেশী নিয়ে ফিরে আসবে, আল্লাহর কাছে তার দানের কোন মর্যাদা ও সওয়াব নেই। কোরআন পাক এই ‘বেশী’-কে رِزْوَانٌ (সুদ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করেছে যে, এটা সুদের মতই ব্যাপার।

মাসআলা : প্রতিদান পাওয়ার আশায় উপটোকন দেয়া ও দান করা খুবই নিন্দনীয় কাজ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে দান অথবা উপহার পায়, তার জন্যে নৈতিক শিক্ষা এই যে, সে-ও সুযোগমত এর প্রতিদান দেবে। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ কোন উপটোকন দিলে সুযোগমত তিনিও তাকে উপটোকন দিতেন। এটা ছিল তাঁর অভ্যাস।—(কুরতুবী) তবে এই প্রতিদান এভাবে দেয়া উচিত নয় যে, প্রতিপক্ষ একে তার দানের প্রতিদান মনে করতে থাকে।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الرِّزْوَانِ كَيْفَ يُبَيِّنُ النَّاسِ —অর্থাৎ, স্থলে, জলে তথা সারা বিশ্বে মানুষের কুর্মেয়র কারণে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। তফসীরে রুহুল-মা‘আনীতে বলা হয়েছে, ‘বিপর্যয়’ বলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার ঘটনাবলীর প্রাচুর্য, সব কিছু থেকে বরকত উঠে যাওয়া, উপকারী বস্তুর উপকার কম এবং ক্ষতি বেশী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি আপদ-বিপদ বোঝানো হয়েছে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, এসব পার্শ্ব বিপদাপদের কারণ মানুষের গোনাহ ও কুর্মেয়র, তন্মধ্যে শিরক ও কুফর সবচাইতে মারাত্মক। এরপর অন্যান্য গোনাহ আসে।

অন্য এক আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ أَنَّكُمْ كَسَبْتُمُوهَا —অর্থাৎ, তোমাদেরকে যেসব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলো তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণে। অনেক গোনাহ তো আল্লাহই ক্ষমাই করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, এই দুনিয়ায় বিপদাপদের সত্যিকার কারণ তোমাদের গোনাহ; যদিও দুনিয়াতে এসব গোনাহের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হয় না এবং প্রত্যেক গোনাহর কারণেই বিপদ আসে না। বরং অনেক গোনাহ তো ক্ষমা করে দেয়া হয়।

কোন কোন গোনাহর কারণেই বিপদ আসে। দুনিয়াতে প্রত্যেক গোনাহর কারণে বিপদ আসলে একটি মানুষও পৃথিবীতে বেঁচে থাকত না। বরং অনেক গোনাহ তো আল্লাহ মাফই করে দেন। যেগুলো মাফ করেন না, সেগুলোরও পুরোপুরি শাস্তি দুনিয়াতে দেন না; বরং সামান্য স্বাদ আশ্বাদন করানো হয় মাত্র; যেমন এই আয়াতের শেষে আছে, لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ —যাতে আল্লাহ তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি আশ্বাদন করান। এরপর বলা হয়েছে, কুর্মেয়র কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ প্রেরণ করাও আল্লাহ তাআলার কৃপা ও অনুগ্রহই। কেননা, পার্শ্ব বিপদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গাফেল মানুষকে সাবধান করা, যাতে সে গোনাহ থেকে বিরত হয়। এটা পরিণামে তার জন্যে উপকারপ্রদ ও একটি বড় নেয়ামত। তাই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

দুনিয়াতে বড় বড় বিপদ মানুষের গোনাহের কারণে আসে : তাই কোন কোন আলেম বলেন, যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে, সে সারা বিশ্বে মানুষ, চতুষ্পদ জন্তু ও পশু-পক্ষীদের প্রতি অবিচার করে। কারণ, তার গোনাহর কারণে অনাবৃষ্টি ও অন্য যেসব বিপদাপদ দুনিয়াতে আসে, তাতে সব প্রাণীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কেয়ামতের দিন এরা সবাই গোনাহ্গার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।

শাকীক যাহেদ বলেন, যে ব্যক্তি হারাম মাল খায়, সে কেবল যার কাছ থেকে এই মাল নেয়া হয়েছে, তার প্রতিই জুলুম করে না ; বরং সমগ্র মানব জাতির প্রতিই অবিচার করে থাকে।—(রাহুল-মা‘আনী) কারণ, প্রথমতঃ একজনের জুলুম দেখে অন্যদের মধ্যেও জুলুম করার অভ্যাস গড়ে উঠে এবং এটা সমগ্র মানবতাকে গ্রাস করে নেয়। দ্বিতীয়তঃ তার জুলুমের কারণে দুনিয়াতে বিপদাপদ আসে, যদ্বারা সব মানুষই কন্ম-বেশী প্রভাবান্বিত হয়।

একটি আপত্তির জওয়াব : সহীহ হাদীসসমূহে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই বাণী বিদ্যমান রয়েছে যে, দুনিয়া মুমিনের জেলখানা এবং কাফেরের জন্নাৎ। কাফেরকে তার সং কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই ধন-সম্পদ ও স্বাস্থ্যের আকারে দান করা হয়। মুমিনের কর্মসমূহের প্রতিদান পরকালের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হয়। আরও বলা হয়েছে, দুনিয়াতে মুমিনের দুষ্টান্ত একটি নাজুক শাখাবিশেষ, যাকে বাতাস কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে নিয়ে যায়। আবার কোন সময় সোজা করে দেয়। এমতাবস্থায়ই সে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যায়। অন্য এক হাদীসে আছে اشد الناس بلاء —অর্থাৎ, দুনিয়াতে পয়গম্বরগণের উপর সর্বাধিক বিপদাপদ আসে। এরপর তাঁদের নিকটবর্তী, অতঃপর তাঁদের নিকটবর্তীদের উপর আসে।

এসব সহীহ হাদীস বাহ্যতঃ আয়াতের বিপরীত। দুনিয়াতে সাধারণভাবে প্রত্যক্ষও করা হয় যে, মুমিন-মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে এবং কাফেররা বিলাসিতায় মগ্ন থাকে। আয়াত অনুযায়ী যদি দুনিয়ার বিপদাপদ ও কষ্ট গোনাহর কারণে হত, তবে ব্যাপার উল্টো হত।

জওয়াব এই যে, আয়াতে গোনাহকে বিপদাপদের কারণ বলা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু পূর্ণাঙ্গ কারণ বলা হয়নি যে, কারণ ও উপর কোন বিপদ আসলে তা একমাত্র গোনাহর কারণেই আসবে এবং যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হবে, সে অবশ্যই গোনাহ্গার হবে। বরং নিয়ম এই যে, কারণ সংঘটিত হলে ঘটনা অধিকাংশ সময় সংঘটিত হয়ে যায় এবং কখনও অন্য কারণ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
 مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ۖ قَاتِمٌ وَجْهًا لِلَّذِينَ
 الْفَكْرِ مِنَ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَنَّهُ يَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمٌ مِّنْ
 يَّصْدَقُونَ ۖ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 فَلَا يَتَّبِعْهُمُ يَتَّبِعْهُ ۖ لِيُجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَكَرِيمٌ ۚ الْكَافِرِينَ ۖ وَمِنَ الْيَتَامَىٰ
 أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُمِيزَاتٍ ۚ وَلِيُذِيقَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ وَلِيُخَبِّرَ
 أَقْلًا بِأَمْرِهِ ۚ وَلِيُتَعَوَّذُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّهُمْ يَتَشْكُرُونَ ۖ وَ
 لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ فَاتَّبَعْنَاهُمْ مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۚ وَكَانَ حَقًّا
 عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلَ الرِّيحَ
 فَتَنفِثُ سَحَابًا يَكْسِطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ
 كِسْفًا فَيَكْوِي الْوُودَ ۚ يَخْبِرُ مِنْ خَلَالِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ
 مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۖ وَإِنْ
 كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمُبْسِرِينَ ۖ

(৪২) বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। (৪৩) যে দিবস আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাহত হবার নয়, সেই দিবসের পূর্বে আপনি সরল রাস্তা থেকে প্রতিষ্ঠিত করুন। সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৪৪) যে কুফর করে, তার কুফরের জন্যে সে-ই দায়ী এবং যে সংকর্ম করে, তারা নিজেদের পথই শুধরে নিচ্ছে। (৪৫) যারা বিশ্বাস করেছে ও সংকর্ম করেছে যাতে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রতিদান দেন। নিশ্চয় তিনি কাফেরদের ভালবাসেন না। (৪৬) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের আশ্বাসন করান এবং যাতে তাঁর নির্দেশে জাহাজসমূহ বিচরণ করে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তাল্লাশ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (৪৭) আপনার পূর্বে আমি রসূলগণকে তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি। মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (৪৮) তিনি আল্লাহ, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা পৌছান; তখন তারা আনন্দিত হয়। (৪৯) তারা প্রথম থেকেই তাদের প্রতি এই বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পূর্বে নিরাশ ছিল।

অন্তরায় হয়ে যাওয়ার ফলে প্রথম কারণের প্রভাব জাহির হয় না; যেমন কেউ দাস্ত আনয়নকারী ওষুধ সম্পর্কে বলে যে, এটা সেবন করলে দাস্ত হবে। একথা এস্থলে ঠিক, কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য ওষুধ ও যথাযথ খাদ্য অথবা জলবায়ুর প্রভাবেও দাস্ত হয় না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন উপসর্গের কারণে দুর নিরাময়কারী ওষুধের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় না; ঘূমের বটিকা সেবন করেও অনেক সময় ঘূম আসে না।

কাজেই আয়াতের সারমর্ম এই যে, গোনাহর কারণে বিপদাপদ আসা, এটাই গোনাহর আসল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মাঝে মাঝে অন্যান্য কারণও এর প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। ফলে বিপদাপদ প্রকাশ পায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন গোনাহ ছাড়াই বিপদাপদ আসাও এর পরিপন্থী নয়। কারণ, আয়াতে বলা হয়নি যে, গোনাহ না করলে কেউ কোন বিপদে পতিত হয় না। অন্য কোন কারণেও বিপদাপদ আসা সম্ভবপর; যেমন পয়গম্বর ও ওলীগণের বিপদাপদের কারণ গোনাহ নয়; বরং তাঁদেরকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা, এসব বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে।

এছাড়া কোরআন পাক সব বিপদাপদকে গোনাহর ফল সাব্যস্ত করেনি; এবং যেসব বিপদ সমগ্র বিশ্ব অথবা সমগ্র শহর কিংবা জনপদকেই ঘিরে ফেলে এবং তার প্রভাব থেকে সাধারণ মানুষ ও জন্তুর মুক্ত থাকা সম্ভব হয় না। সেসব বিপদাপদকে সাধারণতঃ গোনাহর এবং বিশেষতঃ প্রকাশ্য গোনাহর ফল সাব্যস্ত করেছে। ব্যক্তিগত কষ্ট ও বিপদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। বরং এ ধরনের বিপদ কখনও পরীক্ষার জন্যেও প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তার পরকালীন মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে এই মুসীবত প্রকৃতপক্ষে তার জন্যে রহমত হয়ে দেখা দেয়। তাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাউকে বিপদে পতিত দেখে একথা বলা যায় না যে, সে অত্যন্ত গোনাহগার। এমনভাবে কাউকে সুখী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল দেখে এরূপ বলা যায় না যে, সে খুব সংকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। হ্যাঁ, ব্যাপকাকারের বিপদাপদ—যেমন দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, বরকত নষ্ট হয়ে যাওয়া ইত্যাদির প্রধান কারণ মানুষের প্রকাশ্য গোনাহ ও পাপাচার হয়ে থাকে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জ্ঞাতব্য : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রহঃ) ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা’ গ্রন্থে বলেন, এ জগতে ভাল-মন্দ, বিপদ-সুখ, কষ্ট ও আরামের কারণ দু'প্রকার; (এক) বাহ্যিক ও (দুই) আভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক কারণ বলতে বৈষয়িক কারণই বোঝায়, যা সবার দৃষ্টিগ্ৰাহ্য বোধগম্য কারণ। আভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে মানুষের কর্মকাণ্ড এবং তার ভিত্তিতে ফেরেশতাদের সাহায্য-সমর্থন অথবা অভিশাপ ও ঘৃণা। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের কারণ সমুদ্র থেকে উষিত বাষ্প, মৌসুমী বায়ু যা উপরের বায়ুতে পৌঁছে বরফে পরিণত হয়, অতঃপর সূর্যকিরণে গলিত হয়ে বর্ষিত হয়। কিন্তু হাদীসে এসব বিষয়কে ফেরেশতাদের কর্ম বলা হয়েছে। বাস্তবে এতদুভয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। একই বিষয়ের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তাই বাহ্যিক হেতু বিজ্ঞানীদের উল্লেখিত কারণ হতে পারে এবং আভ্যন্তরীণ কারণ ফেরেশতাদের কর্ম-উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে গেলেই বৃষ্টিপাত আশানুরূপ ও প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পন্ন হয় এবং তার একত্রীকরণ না হলে বৃষ্টিপাতে ত্রুটি দেখা দেয়।

হযরত শাহ সাহেব বলেন, এমনভাবে দুনিয়ার আপদ-বিপদের কিছু

কারণও প্রাকৃতিক-বৈষয়িক, যা সং-অসং চেনে না। অগ্নির কাজ জ্বালানো। সে মুতাকী ও পাপাচারী নির্বিশেষে সবাইকে জ্বালাবে। তবে যদি বিশেষ ফরমান দ্বারা তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, তবে তা ভিন্ন কথা। যেমন নমরদের অগ্নিকে ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেয়া হয়েছিল। পানি ওজনবিশিষ্ট বস্তুকে নিমজ্জিত করার জন্যে। সে এ কাজ করবেই। এমনিভাবে অন্যান্য উপাদানসমূহও আপন-আপন কাজে নিয়োজিত আছে। এই প্রাকৃতিক কারণ কারণও জন্যে সুখকর হয় এবং কারণও জন্যে বিপদাপদেরও কারণ হয়ে পড়ে।

এসব বাহ্যিক কারণের ন্যায় মানুষের নিজের ভাল-মন্দ কর্মকাণ্ড এবং বিপদাপদও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয়ে থাকে। যখন কোন ব্যক্তি অথবা দলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার কারণ একত্রিত হয়ে যায়, তখন সেই ব্যক্তি অথবা দল জগতে পূর্ণমাত্রায় সুখ ও শান্তিলাভ করে। সবাই এটা প্রত্যক্ষ করে। এর বিপরীতে যে ব্যক্তি অথবা দলের জন্যে প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণও বিপদাপদ আনয়ন করে এবং তার নিজের কর্মকাণ্ডও বিপদ ও কষ্ট ডেকে আনে, সেই ব্যক্তি অথবা দলের বিপদও পূর্ণমাত্রায় হয়ে থাকে, যা সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়।

মাঝে মাঝে এমনও হয় যে, প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক কারণ তো বিপদাপদের উপরই একত্রিত আছে, কিন্তু তার সংকর্ম শান্তি ও সুখ দাবী করে। এমতাবস্থায় তার এসব আভ্যন্তরীণ কারণ তার বাহ্যিক বিপদ দূরীকরণ অথবা হ্রাস করার কাজেই ব্যয়িত হয়ে যায়। ফলে তার সুখ ও আরাম পূর্ণমাত্রায় সামনে আসে না। এর বিপরীতে মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক কারণসমূহ সুখ ও আরাম চায়, কিন্তু আভ্যন্তরীণ কারণ অর্থাৎ, তার কাজকর্ম মন্দ হওয়ার কারণে বিপদাপদ চায়। এ ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী চাহিদার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবনে না সুখ-শান্তি পূর্ণমাত্রায় থাকে এবং না প্রভূত বিপদাপদ তাকে ঘিরে রাখে।

এমনিভাবে কোন কোন সময় প্রাকৃতিক কারণসমূহকে কোন উচ্চস্তরের নবী-রসূল ও গুলীয়ে কামেলের জন্যে প্রতিকূল করে তাঁর পরীক্ষার জন্যেও ব্যবহার করা হয়। এই বিষয়টি বুঝে নিলে আয়াত ও হাদীসসমূহের পারস্পরিক যোগসূত্র ও একত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠে। পরস্পর বিরোধিতা অবশিষ্ট থাকে না।

বিপদের সময় পরীক্ষা ও বিপদে ফেলা অথবা শান্তি ও আশাবের মধ্যে পার্থক্য : বিপদাপদ দ্বারা কিছু লোককে তাদের গোনাহর শান্তি দেয়া হয় এবং কিছু লোককে মর্যাদা বৃদ্ধি অথবা কাফকারার জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ বিপদে নিক্ষেপ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রে বিপদাপদের আকার একই রূপ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় উভয়ের পার্থক্য কিরূপে বোঝা যাবে? এর পরিচয় শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (রহঃ) লিখেছেন যে, যে সাধু ব্যক্তি

পরীক্ষার্থে বিপদাপদে পতিত হয়, আল্লাহ্ তাঁর অন্তর প্রশান্ত করে দেন। সে এসব বিপদাপদে রোগীর তিক্ত ওষুধ খেতে অথবা অপারেশন করাতে কষ্ট সত্ত্বেও সম্পন্ন থাকার মত সন্তুষ্ট থাকে; বরং এর জন্যে সে টাকা-পয়সা ব্যয় করে, সুপারিশ যোগাড় করে। যেসব পাপীকে শান্তি হিসাবে বিপদে ফেলা হয়, তাদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের হা-হুতাশ ও হৈ-চৈ এর অন্ত থাকে না। মাঝে মাঝে অকৃতজ্ঞতা এমন কি, কুফরী বাক্যে পর্যন্ত পৌছে যায়।

হযরত মওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহঃ) এক পরিচয় এই বর্ণনা করেছেন যে, যে বিপদের কারণে মানুষ আল্লাহর প্রতি অধিক মনোযোগী, অধিক সতর্ক এবং তওবা ও এস্তেগফারের প্রতি অধিক আগ্রহী হয়, সে বিপদ শান্তির বিপদ নয়; বরং মেহেরবানী ও কৃপা। পক্ষান্তরে যার অবস্থা এরূপ হয় না, বরং হা-হুতাশ করতে থাকে এবং পাপকার্যে অধিক উৎসাহী হয়, তার বিপদ খোদায়ী গযব ও আযাবের আলামত।

فَلْتَعْلَمْنَ اَنَّ الْاَزِيْزَ اَجْرُمُوْا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ

— অর্থাৎ, আমি অপরাধী কাফেরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা কৃপাবশতঃ মুমিনের সাহায্য করাকে নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। বাহ্যতঃ এর ফলে কাফেরদের মোকাবেলায় মুসলমানদের কোন সময় পরাজিত না হওয়া উচিত ছিল। অথচ অনেক ঘটনা এর খেলাফও হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এর জওয়াব আয়াতের মধ্যেই নিহিত আছে যে, মুমিন বলে কাফেরদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর ওয়াস্তে জেহাদ করে, তাদের বোঝানো হয়েছে। এমন খাটি লোকদের প্রতিশোধই আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং তাদের বিজয়ী করেন। যেখানে এর বিপরীত কোন কিছু ঘটে, সেখানে জেহাদকারীদের পদস্থলন তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে থাকে; যেমন ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে স্বয়ং কোরআনে আছে — اِنَّمَا اَسْرَزَهُمُ الشَّيْطٰنُ بِعَضْوٍ مَّا كَسَبُوْا অর্থাৎ, তাদের কতক ভ্রান্ত কর্মের কারণে শয়তান তাদের পদস্থলন ঘটিয়ে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্ তাআলা পরিণামে মুমিনদেরই বিজয় দান করেন—যদি তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। ওহুদ যুদ্ধে তাই হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শুধু নামে মুমিন, আল্লাহর বিধানাবলীর অবাধ্য এবং কাফেরদের বিজয়ের সময়ও গোনাহ থেকে তওবা করে না, তারা এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আল্লাহর সাহায্যের যোগ্য পাত্র নয়। এমনি যোগ্যতা ব্যতিরেকেও আল্লাহ্ তাআলা দয়াবশতঃ সাহায্য ও বিজয় প্রদান করে থাকেন। অতএব, এর আশা করা এবং দোয়া করতে থাকা সর্বাবস্থায় উপকারী।

فَانظُرْ إِلَى الثَّرِيبِ إِنَّ اللَّهَ كَيْفَ يَتَنَبَّأُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
 إِنَّ ذَلِكَ لَمُنْجَى الْمُؤْمِنِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَلَقَدْ
 أَرْسَلْنَا رِيحًا فَاوْدَ مُصْفِرًا لِّظُلُومٍ مِّنْ بَعْدِ مَا يُكْفَرُونَ ۝ إِنَّكَ
 لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
 وَاتَّانَتْ بِهَا رُعُوبَةُ الْعَنِيِّ عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝ أَلَمْ يَكُنْ أَتَى خَلْقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ
 ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ
 ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ۝ وَيَوْمَ
 تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ
 كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أَزْنَوْا الْعِلْمَ وَ
 الْإِنْسَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا
 يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ قِيَوْمَئِذٍ لَا تَسْمَعُ
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَةً رَّحْمَةً وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝ وَلَقَدْ
 خَرَّ يَبْرَأَ النَّاسُ فِي هَذَا الْفُلْكِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتُمُ
 بِآيَةٍ كَافِرُونَ ۝ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ۝

(৫০) অতএব, আল্লাহর রহমতের ফল দেখে নাও, কিভাবে তিনি মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। নিশ্চয় তিনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৫১) আমি যদি এমন বায়ু প্রেরণ করি যার ফলে তারা শস্যকে হলদে হয়ে যেতে দেখে, তখন তো তারা অবশ্যই অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৫২) অতএব, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না এবং বহিরকেও আহ্বান শোনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। (৫৩) আপনি অন্ধদেরও তাদের পঞ্চব্রট্টা থেকে পঞ্চ দেখাতে পারবেন না। আপনি কেবল তাদেরই শোনাতে পারবেন, যারা আমার আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। কারণ, তারা মুশলমান। (৫৪) আল্লাহ, তিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন, অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ষক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (৫৫) যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহুরেরও বেশী অবস্থান করিনি। এমনভাবে তারা সত্যনিমুখ হত। (৫৬) যাদের জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে, তারা বলবে, তোমরা আল্লাহর কিভাবে মতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছি। এটাই পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা তা জানতে না। (৫৭) সেদিন জ্বালামুখের ওয়র-আপত্তি তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তওবা করে আল্লাহর সন্তানি লাভের সুযোগও তাদের দেয়া হবে না। (৫৮) আমি এই কোরআনে মানুষের জন্য সর্কণকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। আপনি যদি তাদের কাছে কোন নির্দশ উপস্থিত করেন, তবে কাফেররা অবশ্যই বলবে, তোমরা সবাই মিথ্যাপন্থী।

فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না। মৃতদের মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতা আছে কিনা, সাধারণ মৃতরা জীবিতদের কথা শোনে কিনা-সূরা নমলের তফসীরে এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এই সূরার একটি বড় অংশ কেয়ামত অস্বীকারকারীদের আপত্তি নিরসনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার সর্বশক্তি ও পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার অনেক নিদর্শন বর্ণনা করে অবনবধান মানুষকে সচেতন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। উল্লেখিত প্রথম আয়াতে এক নতুন ভঙ্গিতে এই বিষয়বস্তু প্রমাণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষ স্বভাবতই দ্বরা-প্রিয়। সে বর্তমানের বিষয়ে মগ্ন হয়ে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হয়ে যেতে অভ্যস্ত। তার এই অভ্যাসই তাকে অনেক মারাত্মক ভ্রান্তিতে নিপতিত করে। যৌবনে তার মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় শক্তি থাকে। সে এই শক্তির নেশায় মত্ত হয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং বিশেষ কোন ভাবে গতিবদ্ধ থাকা তার কাছে কষ্টকর মনে হয়। মানুষকে হুশিয়ার করার জন্যে আলোচ্য আয়াতে শক্তি ও দুর্বলতার দিক দিয়ে মানুষের অস্তিত্বের একটি পরিপূর্ণ চিত্র পেশ করা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, মানুষের সূচনাও দুর্বল এবং পরিণতিও দুর্বল। মাঝখানে কিছু দিনের জন্যে সে শক্তিলভ করে। এই ক্ষণস্থায়ী শক্তির যমানায় নিজের পূর্বের দুর্বলতা ও পরবর্তী দুর্বলতাকে বিস্মৃত না হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বরং যে দুর্বলতা অতিক্রম করে সে শক্তি ও যৌবন পর্যন্ত পৌছেছে, তার বিভিন্ন স্তর সর্বদা সামনে রাখা আবশ্যিক।

خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ — বাক্যে মানুষকে এই শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, তুমি তোমার আসল ভিত্তি দেখে নাও তা কতটুকু দুর্বল; বরং তুমি তো ছিলে সাক্ষাত দুর্বলতার প্রতীক। তুমি ছিলে এক ফোঁটা নির্জীব, চেতনাহীন, অপবিত্র ও নোংরা বীর্ষ। এ বিষয়ে চিন্তা কর যে, কার শক্তি ও প্রজ্ঞা এই নোংরা ফোঁটাকে প্রথমে জমট রক্তে, অতঃপর রক্তকে মাংসে রূপান্তরিত করেছে। এরপর মাংসের মধ্যে অস্থি গঠিত হয়েছে। অতঃপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করেছে। ফলে ক্ষুদ্র একটি অস্তিত্ব ভ্রাম্যমাণ ফ্যাক্টরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এতে হাজার হাজার বিচিত্র স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সংযুক্ত রয়েছে। আরও বেশী চিন্তা করলে দেখবে যে, এ একটা ফ্যাক্টরীই নয়; বরং ক্ষুদ্র একটি জগত। এর অস্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের নমুনা শামিল রয়েছে। এর নির্মাণ কাজও কোন বিশাল ওয়ার্কশপেও নয়; বরং মাতৃগর্ভের তিনটি অঙ্ককারে সম্পন্ন হয়েছে। নয় মাস এই সংকীর্ণ ও অঙ্ককার প্রকোষ্ঠে মাতৃগর্ভের রক্ত ও আবর্জনা খেয়ে খেয়ে মানুষের অস্তিত্ব সৃজিত হয়েছে।

فَرَأَى النَّاسَ يَنْزِلُ عَنْ السَّمَاءِ এরপর আল্লাহ তাআলা তার বিকাশ লাভের জন্যে পথ সুগম করে দিয়েছেন। এ জগতে আসার পর তার অবস্থা ছিল এই:

أَرْجَمُكُمْ مِّنْ ظُلُومٍ أَمْهَتَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا — অর্থাৎ, আল্লাহ

তাআলা মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদের যখন বের করলেন, তখন তোমরা কিছুই জানতে না। এখন শিক্ষা-দীক্ষার পালা শুরু হল। সর্বপ্রথম তিনি জন্মনের কৌশল শিক্ষা দিলেন, যাতে মাতা-পিতা তোমাদের প্রতি মনোযোগী হয়ে তোমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণে সচেষ্ট হয়। এরপর ঠোঁট ও মাটি চোপে জননীর বক্ষ থেকে দুধ বের করার বিদ্যা শিক্ষা দিলেন, যাতে

তোমরা খাদ্য সংগ্রহ করতে পার। কার সাধ্য ছিল যে, এই বোধশক্তিহীন শিশুকে তার বর্তমান প্রয়োজনের জন্যে যথেষ্ট এ দু'টি বিদ্যা শিক্ষা দেয়? তার স্রষ্টা ব্যতীত কারও এরূপ করার শক্তি ছিল না। এ তো এক ক্ষীণ শিশু। একটু বাতাস লাগলেই বিমর্ষ হয়ে যাবে। সামান্য শীতে কিংবা গরমে অসুস্থ হয়ে পড়বে। নিজের কোন প্রয়োজন চাওয়ার ক্ষমতা নেই এবং কোন কষ্টও দূর করতে সক্ষম নয়। এখন থেকে চলুন এবং যৌবনকাল পর্যন্ত তার ক্রমোন্নতির সিঁড়িগুলো সম্পর্কে চিন্তা করে দেখুন, কুদরত ও শক্তির বিস্ময়কর নুমা সামনে আসবে।

ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ قُرْءَانَ — এখন সে শক্তির সিঁড়িতে পা রেখে আকাশ-কুসুম পরিকল্পনায় মেতে উঠেছে, চন্দ্র ও মঙ্গল-গ্রহে জাল পাততে শুরু করেছে, জলে ও স্থলে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করেছে এবং নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎ বিস্মৃত হয়ে مِنْ أَسَدُ مَثَاقِئَةٍ (আমার চাইতে অধিক শক্তিশালী কে?)—এর শ্লোগান দিতে দিতে এতদূর পৌঁছে গেছে যে, আপন স্রষ্টা ও তাঁর বিধানাবলীর অনুসরণ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে জাগ্রত করার জন্য আল্লাহ বলেন, ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ قُرْءَانَ وَشَيْبَةً — হে গাফেল, খুব মনে রেখ তোমার এই শক্তি ক্ষণস্থায়ী। তোমাকে আবার দুর্বল অবস্থায় ফিরে যেতে হবে। ধীরে ধীরে দুর্বলতা বৃদ্ধি পাবে এবং একসময়ে চুল সাদা হয়ে বার্ষিক ফুটে উঠবে। এরপর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই আকার-আকৃতি পরিবর্তন করা হবে। পৃথিবীর ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থে নয়—নিজ অস্তিত্বের দেয়ালে লিখিত এই গোপন লিপি পাঠ করলে এ বিশাস ছাড়া উপায় থাকবে না যে, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ — অর্থাৎ, এগুলো সব সেই রাব্বুল

ইয়ত্তেরই কারসাজি, তিনি যা ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। জানেও তিনি শ্রেষ্ঠ, কুদরতেও তিনি শ্রেষ্ঠ। এরপরও কি তিনি মৃতদেহকে যখন ইচ্ছা, পুনরায় সৃষ্টি করতে পারেন কিনা এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ আছে?

অতঃপর আবার কেয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রলাপোক্তি ও মুর্থতা বর্ণিত হচ্ছে:

— অর্থাৎ, যেদিন কেয়ামত অস্বীকারকারীরা তখনকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলীতে অভিভূত হয়ে কসম খাবে যে, তারা এক মুহূর্তের বেশী অবস্থান করেনি। এর অর্থ দুনিয়ার অবস্থান হতে পারে। কারণ, তাদের দুনিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। কিন্তু এখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছে। মানুষ স্বভাবতই সুখের দিনকে সর্গক্ষিপ্ত মনে করে। তাই তারা কসম খেয়ে বলবে যে, দুনিয়াতে তাদের অবস্থান খুবই সর্গক্ষিপ্ত ছিল।

এখানে কবর ও বরযখের অবস্থান অর্থ হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। এর উদ্দেশ্য হলো এই যে, আমরা মনে করেছিলাম কবরে তথা বরযখে দীর্ঘকাল অবস্থান করতে হবে এবং কেয়ামত বহু বছর পরে স্বেচ্ছাটিত হবে। কিন্তু ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেছে। আমরা বরযখে অল্প কিছুক্ষণ থাকতেই কেয়ামত এসে হামির। তাদের এরূপ মনে হওয়ার কারণ এই যে, কেয়ামত তাদের জন্যে সুখকর নয়; বরং বিপদই বিপদ হয়ে দেখা দেবে। মানুষের স্বভাব এই যে, বিপদে পড়ে অতীত সুখের দিনকে সে খুবই সর্গক্ষিপ্ত মনে করে। কাফেররা যদিও কবরে তথা বরযখেও আযাব ভোগ করবে, কিন্তু কেয়ামতের আযাবের তুলনায় সেই আযাব আযাব নয়—সুখ মনে হবে এবং সেই সময়কালকে সর্গক্ষিপ্ত মনে করে কসম খাবে যে, কবরে তারা মাত্র এক মুহূর্ত অবস্থান করেছে।

পরিমাণের বিবরণ এবং ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা আদায় করা ও যথার্থ খাতে ব্যয় করার ব্যবস্থাপনা হিজরী দ্বিতীয় সনে সম্পন্ন হয়েছে।

اَشْتَرَى - وَمِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْتَوِي لَهُوَ الْحَدِيثُ

ধানিক অর্থ ক্রয় করা। কোন কোন সময় এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করার অর্থেও اَشْتَرَى শব্দ ব্যবহৃত হয়। اَشْتَرُوا الصَّلَاةَ بِأَهْلِيهَا ইত্যাদি আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে। মক্কার মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনে হারেস বাণিজ্য ব্যাপদেশে বিভিন্ন দেশ সফর করত। সে একবার পারস্য দেশ থেকে কেসরা প্রমুখ আঙ্গমী সম্রাটগণের ঐতিহাসিক কাহিনীর বই ক্রয় করে আনল এবং মক্কার মুশরিকদেরকে বলল, মুহাম্মদ তোমাদেরকে আদ, সামুদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কিসসা-কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইস ফেন্দ্রিয়ার প্রমুখ পারস্য সম্রাটগণের সেরা কাহিনী শুনাই। মক্কার মুশরিকরা অত্যন্ত আগ্রহভরে তার আনিত কাহিনী শুনতে থাকে। কারণ, এগুলোতে শিক্ষা বলতে কিছু ছিল না যা পালন করার শ্রম স্বীকার করতে হয়; বরং এগুলো ছিল চটকদার গল্পগুচ্ছ। এর ফলে অনেক মুশরিক, যারা এর আগে কোরআনের অলৌকিকতা ও অদ্বিতীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ পোষণ করত এবং গোপনে গোপনে শুনতও, তারাও কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ছুতা পেয়ে গেল।— (রুহুল-মা'আনী)

দূররে মনসুরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, উল্লেখিত ব্যবসায়ী বিদেশ থেকে একটি গায়িকা বাদী ক্রয় করে এনে তাকে কোরআন শ্রবণ থেকে মানুষকে ফেরানোর কাজে নিয়োজিত করলো। কেউ কোরআন শ্রবণের ইচ্ছা করলে তাকে গান শোনার জন্যে সে বাদীকে আদেশ করত ও বলত, মুহাম্মদ তোমাদেরকে কোরআন শুনিয়ে নামায পড়া, রোযা রাখা এবং ধর্মের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়ার কথা বলে। এতে কষ্টই কষ্ট। এস এ গানটি শুন এবং উল্লাস কর।

আলোচ্য আয়াতটি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই অবতীর্ণ হয়েছে; এতে لَهُوَ الْحَدِيثُ ক্রয় করার অর্থ আঙ্গমী সম্রাটগণের কিসসা-কাহিনী অথবা গায়িকা বাদী ক্রয় করা। শানে-নুযুলের প্রতি লক্ষ্য করলে আয়াতে اَشْتَرَى শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ ক্রয় করা।

পরে বর্ণিত اَشْتَرَى - এর ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে اَشْتَرَى শব্দটিরও এ স্থলে ব্যাপক অর্থ হবে। অর্থাৎ এক কাজের পরিবর্তে অন্য কাজ অবলম্বন করা। ক্রীড়া-কৌতুকের উপকরণ ক্রয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

كَهُوَ الْحَدِيثُ - বাক্যটিতে حَدِيث শব্দের অর্থ কথা, কিসসা-কাহিনী এবং كَهُوَ শব্দের অর্থ গাফেল হওয়া। যেসব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে গাফেল করে দেয় সেগুলোকে كَهُوَ বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকেও كَهُوَ বলা হয়, যার কোন উল্লেখযোগ্য উপকারিতা নেই, কেবল সময় ক্ষেণ অথবা মনোরঞ্জননের জন্যে করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে كَهُوَ الْحَدِيثُ - এর অর্থ ও তফসীর কি, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্মরূপ। হযরত ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস ও জাবের (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়েতে তফসীর করা হয়েছে গান-বাদ্য করা।— (হাকেম, বায়হাকী)

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদগণের মতে গান, বাদ্যযন্ত্র ও

অনর্থক কিসসা-কাহিনীসহ যেসব বস্তু মানুষকে আল্লাহর এবাদত ও স্মরণ থেকে গাফেল করে, সেগুলো সবই كَهُوَ الْحَدِيثُ - বোঝানো ও বায়হাকী স্ব-স্ব কিতাবে كَهُوَ الْحَدِيثُ - এর এ তফসীরই অবলম্বন করেছেন। তাঁরা বলেন, كَهُوَ الْحَدِيثُ - اَشْتَرَى - لَهُوَ الْحَدِيثُ هُوَ الْغَنَاءُ وَاشْبَاهُهُ - বলে গান ও তদনুরূপ অন্যান্য বিষয় বোঝানো হয়েছে (যা আল্লাহর এবাদত থেকে গাফেল করে দেয়)। বায়হাকীতে আছে كَهُوَ الْحَدِيثُ - ক্রয় করার অর্থ গায়ক পুরুষ অথবা গায়িকা নারী ক্রয় করা কিংবা তদনুরূপ এমন অনর্থক বস্তু ক্রয় করা যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়। ইবনে জরীরও এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করেছেন।— (রুহুল-মা'আনী) তিরমিযীর এক রেওয়ায়েতে থেকেও এরূপ ব্যাপক অর্থ প্রমাণিত হয়। এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, গায়িকা বাদীদের ব্যবসা করো না। অতঃপর তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যবসা সম্পর্কেই وَمِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْتَوِي আয়াত নাযিল হয়েছে।

ক্রীড়া-কৌতুক ও তার সাজ-সরঞ্জামাদি সম্পর্কে শরীয়তের বিধান : প্রথম লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক কেবল নিন্দার স্থলেই ক্রীড়া ও খেলাধুলার উল্লেখ করেছে। এই নিন্দার সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে মকরুহ হওয়া।— (রুহুল-মা'আনী, কাশ্শাফ) আলোচ্য আয়াতটি ক্রীড়া-কৌতুকের নিন্দায় সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

মুস্তাদরাক হাকেম বর্ণিত হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, 'পার্শ্বব সকল খেলাধুলা বাতিল; কিন্তু তিনটি বাতিল নয়; (১) তীর-ধনুক নিয়ে খেলা, (২) অশুকে প্রশিক্ষণ দানের খেলা এবং (৩) নিজের স্ত্রীর সাথে হাস্যরসের খেলা। এ তিন প্রকার খেলা বৈধ।

এ হাদীসে প্রত্যেক খেলাকে বাতিল সাব্যস্ত করে যে তিনটি বিষয়ের ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়। কেননা, খেলা এমন কাজকে বলা হয়, যাতে কোন উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ও পার্শ্বব উপকারিতা নেই। বস্তুতঃ উপরোক্ত তিনটি বিষয়ই উপকারী। এগুলোর সাথে অনেক ধর্মীয় ও পার্শ্বব উপকারিতা জড়িত। তীর নিক্ষেপ ও অশুকে প্রশিক্ষণ দেয়া তো জেহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস সন্তান প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যকে পূর্ণতা দান করে। এগুলোকে কেবল দৃশ্যতঃ ও বাহ্যিক দিক দিয়ে খেলা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো খেলা নয়। অনুরূপভাবে এই তিনটি বিষয় ছাড়া আরও অনেক কাজ আছে, যেগুলোর সাথে ধর্মীয় ও পার্শ্বব উপকারিতা সম্পৃক্ত রয়েছে এবং কেবল দৃশ্যতঃ সেগুলোকে খেলা মনে করা হয়। অন্যান্য হাদীসে সেগুলোকেও বৈধ এবং কতককে উত্তম কাজ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, যেসব কাজ প্রকৃতপক্ষে খেলা; অর্থাৎ, যাতে কোন ধর্মীয় ও পার্শ্বব উপকারিতা নেই, সেগুলো অবশ্যই নিন্দনীয় ও মকরুহ। তবে কতক একেবারে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, কতক প্রকাশ্য হারাম এবং কতক কমপক্ষে মকরুহ তানযিহী অর্থাৎ, অনুত্তম। যেসব কাজ প্রকৃতই খেলা, তার কোনটিই এ বিধানের বাইরে নয়। হাদীসে যেসব খেলাকে ব্যতিক্রমভুক্ত প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলো আসলে খেলার অন্তর্ভুক্তই নয়।

(১) যে খেলা দ্বীন থেকে পথভ্রষ্ট হওয়ার অথবা অপরকে পথভ্রষ্ট করার উপায় হয়, তা কুফর) যেমন আলোচ্য وَمِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْتَوِي

لَهُوَ الْحَكِيمُ আয়াতে এর কুফর ও পঞ্চভট্টতা হওয়া বর্ণিত হয়েছে এবং এর শাস্তি অবমাননাকর আখ্যাব উল্লেখ করা হয়েছে, যা কাফেরদের শাস্তি। কারণ, আয়াতটি নযর ইবনে হারেসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। সে এই খেলাকে ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষকে পঞ্চভট্ট করার কাজে ব্যবহার করেছিল। তাই এ খেলা হারাম তো বটেই, কুফর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

(২) যে খেলা মানুষকে ইসলামী বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নেয় না; কিন্তু কোন হারাম কাজে ও গোনাহে লিপ্ত করে দেয়, এরূপ খেলা কুফর নয়; কিন্তু হারাম ও কঠোর গোনাহ। যেমন জুয়ার ভিত্তিতে হারজিতে সকল প্রকার খেলা অথবা যে খেলা নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয কর্মে অন্তরায় হয়।

অশ্লীল কবিতা, উপন্যাস এবং বাতিলপন্থীদের পুস্তক পাঠ করাও না-জায়েয : বর্তমান যুগে অধিকাংশ যুবক-যুবতী অশ্লীল উপন্যাস, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠে অভ্যস্ত। এসব বিষয় উপরোক্ত হারাম খেলারই অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে পঞ্চভট্ট বাতিলপন্থীদের চিন্তাধারা অধ্যয়ন করাও সর্ব সাধারণের জন্যে পঞ্চভট্টতার কারণ বিধায় না-জায়েয। তবে গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ জওয়াব দানের উদ্দেশ্যে এগুলো পাঠ করলে তাতে আপত্তির কারণ নেই।

(৩) যেসব খেলায় কুফর নেই এবং কোন প্রকার গোনাহ নেই, সেগুলো মকরুহ। কারণ, এতে অনর্থক কাজে শক্তি ও সময় বিনষ্ট করা হয়।

খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান : উপরোক্ত বিবরণ থেকে খেলার সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানও জানা গেছে যে, যেসব সাজ-সরঞ্জাম কুফর অথবা হারাম খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলো ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম এবং যেগুলো মকরুহ খেলায় ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর ব্যবসা করাও মকরুহ। পক্ষান্তরে যেসব সাজ-সরঞ্জাম বৈধ ও ব্যতিক্রমভূক্ত খেলায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলোর ব্যবসাও বৈধ এবং যেগুলো বৈধ ও অবৈধ উভয় প্রকার খেলায় ব্যবহার করা হয়; সেগুলোর ব্যবসাও অবৈধ।

অনুমোদিত ও বৈধ খেলা : পূর্বে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে যে, যে খেলায় কোন ধর্মীয় ও পার্শ্ব উপকারিতা নেই, সেসব খেলাই নিষিদ্ধ ও নিষিদ্ধ। যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে অথবা অন্য কোন ধর্মীয় ও পার্শ্ব উপকারিতা লাভের জন্যে অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার জন্যে খেলা হয়, সে খেলা শরীয়ত অনুমোদন করে, যদি তাতে বাড়াবাড়ি না করা হয় এবং এতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম বিঘ্নিত না হয়। আর ধর্মীয় প্রয়োজনের নিয়তে খেলা হলে তাতে সওয়াবও আছে।

উপরে বর্ণিত হাদীসে তিনটি খেলাকে নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে—তীর নিক্ষেপ, অশারোহণ এবং স্ত্রীর সাথে হাস্যরস করা। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনামতে এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ‘মুমিনের শ্রেষ্ঠ খেলা সাতার কাটা এবং নারীর শ্রেষ্ঠ খেলা সূতা কাটা।’

সহীহ মুসলিমও মুসনাদে আহমদে হযরত সালাম ইবনে আকওয়া বর্ণনা করেন, জনৈক আনসারী দৌড়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। প্রতিযোগিতায় কেউ তাঁকে হারাতে পারত না। তিনি একদিন ঘোষণা করলেন কেউ আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত

আছে কি? আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। অতঃপর প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হয়ে গেলাম। এ থেকে জানা গেল যে, দৌড় প্রতিযোগিতা বৈধ।

খ্যাতনামা কুস্তিগীর রোকানা একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সাথে কুস্তিতে অবতীর্ণ হলে তিনি তাকে ধরাশায়ী করে দেন।—(আবু দাউদ)

আবিসিনিয়ার কতিপয় যুবক মদীনা তাইয়েয়ায় সামরিক কলা-কৌশল অনুশীলনকল্পে বর্ষা ইত্যাদি নিয়ে খেলায় প্রবৃত্ত ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)—কে নিষেধ পেছনে দাঁড় করিয়ে তাদের খেলা উপভোগ করাছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন খেলাধুলা অব্যাহত রাখ। (বায়হাকী, কানয) কতক রেওয়াজেতে আরও আছে তোমাদের ধর্মে শুকতা ও কঠোরতা পরিলক্ষিত হোক — এটা আমি পছন্দ করি না।

অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁরা কোরআন ও হাদীস সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ততার ফলে অবসন্ন হয়ে পড়তেন, তখন অবসাদ দূর করার জন্যে মাঝে মাঝে আরবে প্রচলিত কবিতা ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা মনোরঞ্জন করতেন।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে “তোমরা মাঝে মাঝে অন্তরকে বিশ্রাম ও আরাম দেবে।—(আবু দাউদ) এ থেকে অন্তর ও মস্তিষ্কের বিনোদন এবং এর জন্যে কিছু সময় বের করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

কতক খেলা, যেগুলো পরিস্কার নিষিদ্ধ : এমনও কতক খেলা রয়েছে যেগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করেছেন, যদিও সেগুলোতে কিছু কিছু উপকারিতা আছে বলেও উল্লেখ করা হয়, যেমন দাবা, চওসর ইত্যাদি। এগুলোর সাথে হারজিত ও টাকা-পয়সার লেনদেন জড়িত থাকলে এগুলো জুয়া ও অকাট্য হারাম। অন্যদায় কেবল চিন্তাবিনোদনের উদ্দেশ্যে খেলা হলেও হাদীসে এসব খেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত বুরায়দা (রাঃ)—এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি চওসর খেলায় প্রবৃত্ত হয়, সে যেন তার হাতকে শূকরের রক্তে রঞ্জিত করে। অনুরূপভাবে এক হাদীসে দাবা খেলোয়াড়ের প্রতি অভিশাপ বর্ণিত হয়েছে।—(নসবুররায়হ)

এমনিভাবে কবুতর নিয়ে খেলা করাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। (আবু দাউদ, কানয) এই নিষেধাজ্ঞার বাহ্যিক কারণ এই যে, সাধারণভাবে এসব খেলায় মগ্ন হলে মানুষ জরুরী কাজকর্ম এমন কি নামায, রোযা ও অন্যান্য এবাদত থেকেও অসাবধান হয়ে যায়।

গান ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কিত বিধান : কয়েকজন সাহাবী উল্লেখিত আয়াতে لَهُوَ الْحَكِيمُ - এর তফসীর করেছেন গান-বাজনা করা। অন্য সাহাবিগণ ব্যাপক তফসীর করে বলেছেন যে, আয়াতে এমন যে কোন খেলা বোঝানো হয়েছে, যা মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দেয়।

কোরআন পাকের لَا يَسْمَعُونَ الْوَزْوَ আয়াতে ইমাম আবু হানীফা, মুজাহিদ মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়া প্রমুখ আলেমগণ وَزْوَ শব্দের তফসীর করেছেন গান-বাজনা।

আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও ইবনে হাব্বান বর্ণিত হযরত আবু মালেক আশ আরীর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

“আমার উম্মতের কিছু লোক যদের নাম পাশ্টিয়ে তা পান করবে। তাদের সামনে গায়িকারা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করবে। আল্লাহ

তাআলা তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং কতকের আকৃতি বিকৃত করে বানর ও শূকরে পরিণত করে দেবেন।”

হযরত ইবনে আক্বাস (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা মদ, জ্বা, তবলা ও সারেসী হারাম করেছেন। তিনি আরও বলেন, নেশাগ্রস্ত করে এমন প্রত্যেক বস্তু হারাম।— (আহমদ, আবু দাউদ)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “যখন জেহাদলবু সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা হবে, যখন গচ্ছিত বস্তুকে লুটের মাল গণ্য করা হবে, যাকাতকে জরিমানার মত কঠিন মনে করা হবে, যখন পার্থিব সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হবে, যখন মানুষ স্ত্রীর আনুগত্য ও মাতার অব্যাহতা শুরু করবে, যখন বন্ধুকে নিকটে টেনে নেবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, যখন মসজিদসমূহে হট্টগোল হবে, যখন পাপাচারী কুকর্মী ব্যক্তি গোত্রের নেতা হবে, যখন নীচতম ব্যক্তি তার সম্প্রদায়ের প্রধান হবে, যখন দুষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে তাদের অনিষ্টের ভয়ে, যখন গায়িকা নারী ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন হবে, যখন মদ্যপান শুরু হবে, যখন মুসলিম সম্প্রদায়ের পরবর্তী লোকগণ পূর্ববর্তীগণকে অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা প্রতীক্ষা কর একটি লাল বর্ণযুক্ত বায়ুর, ভূমিকম্পের, ভূমিধ্বসের, আকার-আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়ার এবং কিয়ামতের এমন নিদর্শনসমূহের যেগুলো একের পর এক প্রকাশ হতে থাকবে, যেমন কোন মালার সুতা ছিড়ে গেলে দানাগুলো একের পর এক খসে পড়তে থাকে।”

এতস্তিন্ন বহু প্রমাণ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস রয়েছে, যাতে গান-বাদ্য হারাম ও না-জায়েয বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কবাণী রয়েছে এবং কঠিন শাস্তির ঘোষণা রয়েছে।

বাদ্যযন্ত্র ব্যতীত সুললিত কণ্ঠ উপকারী তথ্যপূর্ণ কবিতা পাঠ নিষিদ্ধ নয় : অপরপক্ষে কতক রেওয়ায়েত থেকে গান বৈধ বলেও জানা যায়। এ দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান এই যে, তবলা, সারিন্দা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রযুক্ত নারীকণ্ঠ নিঃসৃত গান হারাম। যেমন উপরোক্ত কোরআনী আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু কেবল সুললিত কণ্ঠ যদি কোন কবিতা পাঠ করা হয় এবং পাঠক কোন নারী বা কিশোর না হয়, সাথে সাথে কবিতার বিষয়বস্তু অশ্লীল বা অন্য কোন পাপ-পঙ্কিতাযুক্ত

না হয় তবে জায়েয।

কোন কোন সূফী সাধক গান শুনেছেন বলে যে কথা প্রচলিত আছে তা এধরনের বৈধ গানেরই অন্তর্ভুক্ত। কেননা, তাদের শরীয়তের অনুসরণ ও রসূল (সাঃ)—এর অনুগমন দিবালোকের ন্যায় সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট। তাঁদের সম্পর্কে এরূপ পাপে জড়িয়ে পড়ার ধারণাও করা যেতে পারে না। অনুসন্ধানী সূফীগণ নিজেরাই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়েছেন।

এই আয়াতে মহান আল্লাহ পাক এই বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত আকাশকে কোন স্তম্ভবিহীনভাবে সুবিশাল ছাদরূপে সৃষ্টি করাকে তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও সৃষ্টি-কৌশলের উজ্জ্বল নিদর্শন বলে বর্ণনা করেছেন।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, এবং সাধারণভাবে প্রচলিত যে, আকাশ একটি গোলাকার বস্তু এবং এরূপ গোলাকার বস্তুতে সাধারণত কোন স্তম্ভ থাকে না। তাহলে আকাশের স্তম্ভ না থাকার কি বিশিষ্টা থাকতে পারে ?

এর উত্তর এই যে, কোরআনে করীম যে রূপভাবে অধিকাংশ জায়গায় পৃথিবীকে বিছানা বলে আখ্যায়িত করেছে— এতে পৃথিবী বাহ্যতঃ গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী। কিন্তু এর বিশালত্ব ও সুবিস্তীর্ণতার দরুন সাধারণ দৃষ্টিতে তা সমতল বলে প্রতীয়মান হয়। এই সাধারণ ধারণার উপর ভিত্তি করেই বিছানা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে আকাশ একটি ছাদের মত পরিদৃষ্ট হয়—যা নির্মাণের জন্য সাধারণতঃ স্তম্ভের প্রয়োজন। সাধারণভাবে প্রচলিত এরূপ ধারণা অনুযায়ীই আকাশকে স্তম্ভবিহীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা—কুদরতে কামেলা প্রকাশ ও প্রমাণের জন্য এই সুবিশাল গোলকের সৃষ্টিই যথেষ্ট। ইবনে-কাসীর এবং কিছুসংখ্যক তফসীরকারগণের গবেষণা নিঃসৃত সিদ্ধান্ত এই যে, কোরআন-হাদীস অনুসারে আকাশ ও পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার হওয়ার প্রমাণ মেলে না। বরং কোরআনের কোন কোন আয়াত ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তা গুম্বজাকৃতি বলে জানা যায়। তাদের বক্তব্য এই যে, এক সহীহ হাদীসে সূর্য আরশের পাদদেশে পৌঁছে সেজদা করে বলে যে বর্ণনা রয়েছে, আকাশ পূর্ণ গোলাকার হওয়ার পরই তা হওয়া সম্ভব। কেননা, কেবল এ অবস্থাতেই এর উর্ধ্ব ও নিম্নদিক নির্ধারিত হতে পারে।— পরিপূর্ণ গোলকের কোন দিককে উপর বা নীচ বলা চলে না।

هَذَا خَلَقَ اللَّهُ فَرَدُّنِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنَ دُونِي مَلِكُ
الظُّلُمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ
لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَكِيمٌ وَلَوْ قَالَ لَقُيُنُ لَأَيُّنَهُ وَهُوَ يَعِظُهُ يَأْتِي لِأَشْرِكُ بِاللَّهِ
إِنَّ الشِّرْكَ أَظْلَمُ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَلَّتْهُ
أُمُّهُ وَهَذَا عَلَى وَهْنٍ وَفَضَّلَهُ فِي عَمَلَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَلِلْوَٰلِدَيْنِ
إِلَى الْمَوْصِيٍّ وَإِنْ جَاهِدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ
بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُ الْمَانِ الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَآثِمٌ
سَيِّئٌ مَنْ آتَى إِلَى قَوْمٍ رَجَعَهُمْ فَأَتَتْهُمُ بِمَا كُفَرُوا
تَعْمَلُونَ يَأْتِيهِمْ أَن تَكَ مَقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ
فَتَكُنْ فِي صَفْوَةٍ أَوْ فِي السَّمُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَأْتِيهِمْ أَقْبَمُ الصَّلَاةِ وَأَمْرٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا عَنِ الْمُتَكَبِّرِ وَاصِدٌ عَلَى مَا أَصَابَكَ
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا
تَتَّبِعْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَأَخْبِتُ كُلَّ غَاثٍ لَخُورٍ

(১১) এটা আল্লাহর সৃষ্টি, অতঃপর তিনি ব্যতীত অন্যেরা যা সৃষ্টি করেছে, তা আমাকে দেখাও। বরং জ্বালেনেরা সৃষ্টি পঞ্চব্রতায় পতিত আছে।
(১২) আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি এই মর্মে যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে কৃতজ্ঞ হয়, সে তো কেবল নিজ কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহ অত্যন্ত মূঢ়, প্রশংসিত। (১৩) যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলল : হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করা না। নিচয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। (১৪) আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সন্তানবহুরের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে গরশ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু' বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। (১৫) পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক হির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সন্তোষে সহঅবস্থান করবে। যে আমার অতিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো। (১৬) হে বৎস, কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর গর্তে অবধা আকাশে অবধা ডু-গর্তে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিচয় আল্লাহ গোপন ভেদ জানেন, সবকিছুর শবর রাখেন। (১৭) হে বৎস, নামায কয়েম কর, সৎকাছে আদেশ দাও, মন্দকাছে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবার কর। নিচয় এটা সাহসিকতার কাজ। (১৮) অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে পর্বতের পদচারণা করো না। নিচয় আল্লাহ কোন দান্তিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ

ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেরের বর্ণানুযায়ী মহাত্মা লোকমান হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর ভাগ্নে ছিলেন। মুকাতেল তাঁর খালাতো ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। 'বায়যাবী' ও অন্যান্য তফসীরে রয়েছে যে, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন এবং হযরত দাউদ (আঃ)-এর সময়েও বেঁচে ছিলেন।

তফসীরে দূরে মনসুরে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণানুযায়ী লোকমান জ্ঞানক আবিসিনিয় ক্রীতদাস ছিলেন—কাঠ চেরার কাজ করতেন। (ইবনে আবী শাইবাহ, আহমদ ইবনে হারীর ও ইবনুল মুযির প্রমুখ 'মুহদ' নামক গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা করেছেন)। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকটে তাঁর (লোকমান) অবস্থাদি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন যে, তিনি ঢেপ্টা নাকবিশিষ্ট, বেঁটে আকারের আবিসিনিয় ক্রীতদাস ছিলেন। মুজাহিদ (রাঃ) বলেন যে, তিনি কাটা পা ও পুরো ঠোঁটবিশিষ্ট আবিসিনিয় ক্রীতদাস ছিলেন—(ইবনে কাসীর)

জ্ঞানক কৃষ্ণকায় হাবশী হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিরের খেদমতে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করতে হাযির হয়। হযরত সাঈদ তাকে সামান্য দিয়ে বললেন, তুমি কৃষ্ণকায় বলে দুঃখ করো না। কারণ, কালো বর্ণধারীদের মধ্যে এমন ভিন জন মহান ব্যক্তি আছেন, যারা মানবকুলে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত—হযরত বেলাল, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব কর্তৃক মুক্ত গোলাম হযরত 'মাহজা' এবং হযরত লোকমান (আঃ)।

হযরত লোকমান কোন নবী ছিলেন না; বরং ওলী, প্রজ্ঞাবান ও বিশিষ্ট মনীষী ছিলেন : ইবনে কাসীর বলেন যে, প্রাচীন ইসলামী মনীষীবৃন্দ এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবী ছিলেন না। কেবল হযরত ইকরিমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু এর বর্ণনাসূত্র (সনদ) দুর্বল। ইমাম বাবী বলেন যে, একথা সর্বসম্মত যে, তিনি বিশিষ্ট ফকীহ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন, নবী ছিলেন না। — (মাহহাজী)

ইবনে কাসীর (রাঃ) বলেন যে, তাঁর সম্পর্কে হযরত কাতাদাহ (রাঃ) থেকে এক বিস্ময়কর রেওয়াজে আছে যে, আল্লাহ পাক হযরত লোকমানকে নবুওয়ত ও হেকমত (প্রজ্ঞা)-দুয়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের সুযোগ দেন। তিনি হেকমতই (প্রজ্ঞা) গ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, তাঁকে নবুওয়ত গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছিল। তিনি আরও বলেন যে, "যদি আমার প্রতি এটা গ্রহণ করার নির্দেশ হয়ে থাকে, তবে তা শিরোমার্ঘ। অন্যথায় আমাকে কমা করুন।"

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, মনীষী লোকমানের নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনি হেকমতকে (প্রজ্ঞা) নবুওয়ত থেকে সমধিক প্রস্থযোগ্য কেন মনে করলেন, যখন আপনাকে যে কোন একটা গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়েছিল? তিনি বললেন যে, নবুওয়ত বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি তা আমার ইচ্ছা ব্যতীত প্রদান করা হতো, তবে স্বয়ং মহান আল্লাহ তার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন; যাতে আমি সে কর্তব্যসমূহ পালন করতে সক্ষম হই। কিন্তু যদি আমি তা স্বেচ্ছায় চেয়ে নিতাম, তবে সে দায়িত্ব আমার উপর বর্তাতো। — (ইবনে কাসীর)

যখন মহাত্মা লোকমানের নবী না হওয়ার কথা অধিকাল ইসলামী বিশেষজ্ঞ কর্তৃক স্বীকৃত, তখন তাঁর প্রতি কোরআনে বর্ণিত যে নির্দেশ

لَا تُكْفِرُوا (আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর)-তা এল্হামের মাধ্যমেও হতে পারে; যা আল্লাহর গুলীশ লাভ করে থাকেন।

মহাত্মা লোকমান হযরত দাউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে শরীয়তী মাসআলাসমূহ সম্পর্কে জনগণের নিকট ফতোয়া দিতেন। হযরত দাউদ (আঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর তিনি এ ফতোয়া প্রদান কার্য পরিত্যাগ করেন এই বলে যে, এখন আর তার প্রয়োজন নেই। কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, তিনি ইসরাঈল গোত্রের বিচারপতি ছিলেন। হযরত লোকমানের বহু জ্ঞানগর্ভ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। গুয়াহাট ইবনে মুনায্বেহ বলেন যে, আমি হযরত লোকমানের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দশ হাজারের চাইতেও বেশী অধ্যায় অধ্যয়ন করেছি। — (কুতুবি)

একদিন হযরত লোকমান এক বিরাট সমাবেশে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বহু জ্ঞানগর্ভ কথা শোনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলো যে, আপনি কি সে ব্যক্তি-যে আমার সাথে অমুক বনে ছাগল চরাতে? লোকমান বলেন, হ্যাঁ-আমিই সে লোক। অতঃপর লোকটি বললো, তবে আপনি এ মর্যাদা কিভাবে লাভ করলেন যে, খোদার গোটা সৃষ্টিকূল আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং আপনার বাণী শোনার জন্যে দূর-দূরান্ত থেকে এসে জমায়েত হয়? উত্তরে লোকমান বললেন যে, এর কারণ আমার দু'টি কাজ-এক) সর্বদা সত্য বলা, (দুই) অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা পরিহার করা। অপর এক রেওয়াজে আছে যে, হযরত লোকমান বলেছেন যে, এমন কতকগুলো কাজ আছে যা আমাকে এ স্তরে উন্নীত করেছে। যদি তুমি তা গ্রহণ কর, তবে তুমিও এ মর্যাদা ও স্থান লাভ করতে পারবে। সে কাজগুলো এই : নিজের দুটি নিম্নমুখী রাখা এবং মুখ বন্ধ করা, হালাল জীবিকাতে তুট খাকা, নিজের লজ্জাহীন সংরক্ষণ করা, সত্য কথায় অটল থাকা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, যেহ্মানের আদর-আপ্যায়ন ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, প্রতিবেশীর প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথা পরিহার করা। — (ইবনে কাসীর)

এসব জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হলো আকীদাসমূহের পরিশুদ্ধতা। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম কথা হলো কোন প্রকারের অংশীদারিত্ব স্থির না করে আল্লাহ পাককে গোটা বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু বলে বিশ্বাস করা। সাথে সাথে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনা-আরাধনায় অংশী স্থাপন না করা। আল্লাহ পাকের কোন সৃষ্ট বস্তুকে স্রষ্টার সমমর্যাদাসম্পন্ন মনে করার মত গুরুতর অপরাধ দুনিয়াতে আর কিছু হতে পারে না। তাই তিনি বলেছেন لَيْسَ لَكَ شَرِكٌ (হে আমার প্রিয় বৎস, আল্লাহর অংশী স্থির করো না, অংশী স্থাপন করা গুরুতর জুলুম)। পরবর্তী পর্যায়ে মনীষী লোকমানের অন্যান্য-উপদেশাবলী ও জ্ঞানগর্ভ বাণীসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যা তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্মোহন করে এরশাদ করেছিলেন। শিরক যে গুরুতর অপরাধ; সূতরাং কোন অবস্থাতেই এর নিকটবর্তী না হওয়ার হেদায়েতের উদ্দেশে আল্লাহ পাক অন্য এক নির্দেশ দান করেন।

মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাঁদেরকে মান্য করা করণ : আল্লাহ পাক করণময় যে, যদিও সন্তানের প্রতি পিতা-মাতাকে মান্য করার ও তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিশেষ তাকীদ রয়েছে এবং নিজের (আল্লাহর) প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতিও তা করার জন্য সন্তানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু শিরক এমন গুরুতর অন্যায় মারাত্মক অপরাধ যে, মাতা-পিতার নির্দেশ,

এমন কি বাধ্য করলে পরও কারো পক্ষে তা জায়েয হয়ে যায় না। যদি কারো পিতা-মাতা তাকে আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপনে বাধ্য করতে চেষ্টা করতে থাকেন, এ বিষয়ে পিতা-মাতার কথাও রক্ষা করা জায়েয নয়।

এখানে যখন পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালন এবং তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তখন এর হেকমত ও অন্তর্নিহিত রহস্য এই বর্ণনা করেছেন যে, তার মা ধরাধামে তার আবির্ভাব ও অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও অবশ্যনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। — নয় মাস কাল উদরে ধারণ করে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। আবার ভূমিট হওয়ার পরও দু'বছর পর্যন্ত সন্তানদানের কঠিন ঝামেলা গোহাতে হয়েছে। যাতে দিন-রাত মাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে তাঁর দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সন্তানের লালন-পালন ক্ষেত্রে মাকেই যেহেতু অধিক ঝুঁকি-ঝামেলা বহন করতে হয়, সেজন্য শরীয়তে মায়ের স্থান ও অধিকার পিতার অগ্রে রাখা হয়েছে। وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ

بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّهُ وَفَوَاحِشُ عَنِ ذُنُوبِهِ ۚ وَإِلَىٰ رَبِّكَ مَرْجِعُ ۖ إِنَّكَ جَاهِدُكَ ۚ ۝ ১৫ ৷ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন-বিষয়ে পিতা-মাতাকে মান্য করাও হারাম।

ইসলামের অনন্য ন্যায়নীতি : যদি পিতা-মাতা আল্লাহর অংশী স্থাপনে বাধ্য করার চেষ্টা করেন, তখন আল্লাহর নির্দেশ হল তাঁদের কথা না মানা। এমতাবস্থায় মানুষ স্বভাবতঃ সীমার মধ্যে স্থির থাকে না। এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সন্তানের পক্ষে পিতা-মাতার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ ও অশোভন আচরণ করে তাঁদেরকে অপমানিত করার সম্ভাবনা ছিল। ইসলাম তো ন্যায়নীতির জ্বলন্ত প্রতীক— প্রত্যেক বস্তুরই একটি সীমা আছে। তাই অংশী স্থাপনের বেলায় পিতা-মাতার অনুসরণ না করার নির্দেশের সাথে সাথে এ হুকুমও প্রদান করেছে : وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَهْلُ عَيْنٍ ۚ ১৬ ৷

—অর্থাৎ, দু'দানের বিরুদ্ধে তো তাঁদের কথা মানবে না, কিন্তু পার্শ্বিক কাজকর্ম যথা শারীরিক সেবা-যত্ন বা ধন-সম্পদ ব্যয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেন কার্প্য প্রদর্শিত না হয়। তাঁদের প্রতি বেআদবী ও অশালীনতা প্রদর্শন করো না। তাঁদের কথাবার্তার এমনভাবে উত্তর দিবে না, যাতে অহেতুক মনোবেদনার উদ্বেক করে। মোটকথা, শিরক-কুফরীর ক্ষেত্রে তাঁদের কথা না মানার কারণে যে মর্মশাঁড়ার উদ্বেক হবে, তা তো অপারকতা হেতু বরদাশত করবে, কিন্তু প্রয়োজনকে তার সীমার মধ্যেই রাখতে হবে। অন্যান্য ব্যাপারে যেন মনোকষ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন থাকবে।

দ্বিতীয় উপদেশ আকারেদ সম্পর্কে : অটুট বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মাঝে যা কিছু আছে, এর প্রতিটি বিন্দুকণা আল্লাহ পাকের অসীম জ্ঞানের আওতাধীন এবং সবকিছুর উপর তাঁর পূর্ণ ক্ষমতা ও আধিপত্য রয়েছে। কোন বস্তু যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যায় না, অনুরূপভাবে কোন বস্তু যত দূরই অবস্থিত থাকে না কেন অথবা কোন বস্তু যত গভীর আঁধার বা ঘবনিকার অন্তরালেই থাকে না কেন—মহান আল্লাহর জ্ঞান ও দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না এবং তিনি যে কোন বস্তুকে যখন ও যেখানে ইচ্ছা উপস্থিত করতে পারেন। يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوا زَكٰتَ ۙ فَسَيُزَكِّىْكُمْ ۚ ۝ ১৭ ৷ এর মর্মার্থ তাই। যাবতীয় বস্তু মহান আল্লাহর জ্ঞান ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়ে

لَعْنَتِ

৭১২

اٰتِلْ مَا رَدٰى ۳

وَأَقْبِدْ فِي شَبَابِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ
لَصَوْتُ الْحَيْرِ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ تَافِيَ السَّمَوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ رِعَا ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۚ وَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ ۖ وَ
إِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْمِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْتَبِهُ مَا مَوْعِدُنَا
عَلَيْهِ إِنْ آتَانَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ۚ
وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ
بِأُحْوَظِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۖ وَمَنْ قَرَأَ
يَعْرُوكَ لَقَدْ آتَيْنَا مَرْحُومًا فَتَبَيَّنَ لَهُمَا عَمَلُهُمَا إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۖ نُنَبِّئُكُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى
عَذَابٍ غَلِيظٍ ۖ وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ لِلَّهِ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۖ وَلَوْ كُنَّا
فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَفْكَرَ وَالْبَحْرُ مِصْدَرَةٌ مِنْ بَعْدِهَا
سَبْعَةُ أَحْقَارٍ مَا نَفَذْتُ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو جَبَرٍ ۖ

থাকা—ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস এবং একত্ববাদের আকীদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলীল।

তৃতীয় উপদেশ কর্ম পরিশুদ্ধতা সম্পর্কে : অবশ্য করণীয় কাজ তো অনেক। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নামায, এটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অন্যান্য কার্যাবলীর পরিশুদ্ধির কারণ এবং মাধ্যমও বটে। যেমন, নামায সম্পর্কে মহান পালনকর্তার এরশাদ রয়েছে — “নিশ্চয়ই নামায যাবতীয় অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে।” এজন্য অবশ্য করণীয় সং কাজগুলোর মধ্য হতে শুধু নামাযের বর্ণনা দিয়েই যথেষ্ট করেছেন। يَبْنِيْ اٰخِرَ الصَّلٰوةِ — অর্থাৎ হে বৎস, নামায প্রতিষ্ঠা কর। যেমন আগে বলা হয়েছে যে, নামায প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামায পড়ে নেয়া নয়, বরং যাবতীয় অংগসমূহ ও নিয়মাবলী পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা, যথাসময়ে আদায় করা, এর উপর স্থায়ী ও দৃঢ়পদ থাকা—এ সবই নামায প্রতিষ্ঠার অন্তর্গত।

চতুর্থ উপদেশ চরিত্র সংশোধন সম্পর্কে : ইসলাম একটি সমষ্টিগত ধর্ম—ব্যক্তির সাথে সাথে সমষ্টির সংশোধন এ জীবনব্যবস্থার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংগ। এজন্য নামাযের ন্যায় অবশ্য করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজের সাথে সাথেই সংকাজের আদেশ ও অসংকাজ থেকে নিষেধ—এ অবশ্য করণীয় কর্তব্যের বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে—মানুষকে সংকাজের প্রতি আহ্বান কর ও অসংকাজ থেকে বিরত রাখ। (এক) নিজের পরিশুদ্ধি, (দ্বিতীয়) গোটা মানবকূলের পরিশুদ্ধি—এর উভয়টাই পালন করতে বেশ দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করতে হয়, শ্রম—সাধনার প্রয়োজন হয়। এর উপর দৃঢ়পদ থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ করে সৃষ্টিকূলের পরিশুদ্ধির উদ্দেশে সংকাজের আদেশের প্রতিদানে দুনিয়ায় সর্বদা শত্রুতা ও বিরোধিতাই জুটে থাকে। সুতরাং এ উপদেশের সাথে সাথে এরূপ উপদেশও প্রদান করা হয়েছে যে, وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا صَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ

وَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ — অর্থাৎ, এসব কাজ সম্পন্ন করতে যে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে, তাতে ঐযর্থধারণ করে স্থিরতা অবলম্বন করবে।

পঞ্চম উপদেশ সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে وَلَا تَصْرَخْكَ ۖ — এর উৎপত্তি ধাতু থেকে—যার অর্থ উঠের এক প্রকার ব্যাধি—যার ফলে এর ঘাড় বেঁকে যায়। যেমন মানুষের ঝিচুনি নামক প্রসিদ্ধ ব্যাধি, যার ফলে মুখমণ্ডল ঝাঁকা হয়ে যায়। এর অর্থ চেহারা ফিরিয়ে রাখা। যার মর্ম এই যে, লোকের সাথে সাক্ষাত বা কথোপকথনের সময় মুখ ফিরিয়ে রেখো না—যা তাদের প্রতি উপেক্ষা ও অহংকারের নিদর্শন এবং ভদ্রোচিত স্বভাব ও আচরণের পরিপন্থী। وَلَا تَنْسِفِي

الْأَرْضِ مَرَحًا — শব্দের অর্থ গর্বভরে ঝুঙ্কতের সহিত বিচরণ করা—অর্থাৎ, আল্লাহ ভূমিকে যাবতীয় বস্তু হতে নত ও পতিত করে সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের সৃষ্টিও এ মাটি দিয়েই। তোমরা এর উপর দিয়েই চলাফেরা কর—নিজের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা কর। আত্মাভিমানীদের ধারা অনুসরণ করে অহংকারভরে বিচরণ করো না। সুতরাং এরপর বলেছেন إِنَّ اللَّهَ لَكُنُيُتٌ عَلَىٰ كُلِّ خَطِيئَةٍ غَوْرٌ — আল্লাহ পাক কোন

অহংকারী আত্মাভিমানীকে পছন্দ করেন না।

আনুষঙ্গিক স্তব্ধতা বিষয়

وَأَقْبِدْ فِي شَبَابِكَ — অর্থাৎ, নিজ গতিতে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, দৌড়-ধাপসহও চলা না, যা বভ্যতা ও শালীনতার পরিপন্থী। হাদীস শরীফে আছে যে, দ্রুতগতিতে চলা মুমিনের সৌন্দর্য ও মর্যাদাহানিকর

(১৯) পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন কর এবং কঠোর নিয়মিত করে। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অশ্লীলকর। (২০) তোমরা কি দেখ না আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যাকিছু আছে, সবই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? এমন লোকও আছে; যারা জ্ঞান, পথনির্দেশ ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বাকবিত্তা করে। (২১) তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাহিল করেছেন, তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছি, তারই অনুসরণ করব। শয়তান যদি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির দিকে দাওয়াত দেয়, তবুও কি? (২২) যে ব্যক্তি সংকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহ অভিযুক্ত করে, সে এক মজবুত হাতল ধারণ করে। সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর দিকে। (২৩) যে ব্যক্তি কুফরী করে, তার কুফরী যেন আপনাকে চিহ্নিত না করে। আমারই দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর আমি তাদের কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করব। অন্তরে যাকিছু রয়েছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ পরিজ্ঞাত। (২৪) আমি তাদেরকে স্বপ্নকালের জন্যে তোমাবিলাস করতে দেব, অতঃপর তাদেরকে বাধ্য করব গুরুতর শাস্তি ভোগ করতে। (২৫) আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। বলুন, সকল প্রশংসাই আল্লাহর। বরং তাদের অধিকাংশই জ্ঞান রাখে না। (২৬) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে যাকিছু রয়েছে সবই আল্লাহর। আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসার। (২৭) পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে পালকি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(জামে সগীর হযরত আবু হোরাযরা থেকে বর্ণিত)। এভাবে চলার ফলে নিজেরও দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে বা অপরের দুর্ঘটনার কারণও ঘটতে পারে। আবার অত্যধিক মশরু গতিতেও চলা না—যা সেসব গর্বশ্রীত আত্মাভিমানীদের অভ্যাস, যারা অন্যান্য মানুষের চাইতে নিজের অসার কৌলীনা ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে চায়। অথবা সেসব শ্রীলোকদের অভ্যাস, যারা অত্যধিক লজ্জা-সংকাচের দরুন দ্রুতগতিতে বিচরণ করে না। অথবা অক্ষম ব্যাধিগ্রস্তদের অভ্যাস। প্রথমটি তো হারাম। দ্বিতীয়টি যদি নারী জাতির অনুসরণে করা হয় তাও না-জায়েয। আর যদি এ উদ্দেশ্য না থাকে, তবে পুরুষের পক্ষে এটা একটা কলঙ্ক। তৃতীয় অবস্থায় আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন—সুস্থ থাকা সত্ত্বেও রোগগ্রস্তদের রূপ ধারণ করা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন যে, সাহাবায়ে কেরামকে ইহুদীদের মত দৌড়াতে বারণ করা হতো। আবার খ্রীষ্টানদের ন্যায় ধীর গতিতে চলতেও বারণ করা হতো; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণের নির্দেশ ছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) জৈনকে ব্যক্তিকে অত্যন্ত মশরু গতিতে চলতে দেখলেন। মনে হচ্ছিল যেন সে এক্ষণি পড়ে যাবে। সুতরাং তিনি লোকটির নিকটে তার এরূপভাবে চলার কারণ জিজ্ঞেস করাতো সে বললো যে, সে একজন আলেম ও ক্বারী বলে এরূপভাবে চলে। এর পরিশ্রেক্ষিতে হযরত আয়েশা (রাঃ) ফরমান যে, খলীফা ওমর (রাঃ)—এর চাইতে অনেক উন্নতমানের ক্বারী। কিন্তু তিনি যখন পথ চলতেন তখন মধ্যম গতিতে চলতেন। তিনি কথা বলার সময় এমন আওয়াজে বলতেন যেন অপর লোক অনায়াসে তা শুনতে পায়।

وَإِغْضُ مِنْ صَوْتِكَ — অর্থাৎ, তোমাদের স্বর ক্ষীণ কর। যার অর্থ স্বর প্রয়োজনানতিরিক্ত উচ্চ করো না এবং হট্টগোল করো না। যেমন এমাত্ ফারুকে আযম সম্পর্কে বলা হলো যে, তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যেন উপস্থিত জনমণ্ডলী অনায়াসে তা শুনতে পায়, কোন প্রকার অসুবিধা না হয়।

অতঃপর বলা হয়েছে : إِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْوَلَوَاتِ لَصَوْتُ الْحَيْرِ — অর্থাৎ, চতুর্দশ জন্তুসমূহের মধ্যে গাধার চীৎকারই অত্যন্ত বিকট ও শ্রুতিকটু। এখানে সামাজিক শিষ্টাচার সম্পর্কে চারটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। (১) লোকের সঙ্গে সাক্ষাত ও কথোপকথনকালে আত্মসন্ত্রিতার সুরে মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে। (২) ধরাপৃষ্ঠে অহংকারভরে বিচরণ করতে বারণ করা হয়েছে। (৩) মধ্যবর্তী চাল-চলন গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (৪) উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর আচার-আচরণেও এসব গুণের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল।

শামায়েলে তিরমিযীতে হযরত হুসাইন (রাঃ) ফরমান—আমি আমার পিতা হযরত আলী (রাঃ)—এর নিকট মানুষের সাথে উঠা-বসা ও মেলামেশার কালে আ হযরত (সাঃ)—এর আচার-ব্যবহার ও প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন : ‘নবীজী (সাঃ)—কে সর্বদা প্রসন্ন ও হাস্যোচ্ছল মনে হতো—তার চরিত্রে নম্রতা, আচার-ব্যবহারে বিনয় বিদ্যমান ছিল। তার স্বভাব মোটেই রুক্ষ ছিল না, কথাবার্তাও নীরস ছিল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বা অগ্নীল কথা বলতেন না, কারো প্রতি দোষারোপ করতেন না। কৃপণতা প্রকাশ করতেন না। যেসব দ্রব্য মনঃপূত হতো না

সেগুলোর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করতেন না। কিন্তু (সেগুলো হালাল হলে এবং তার প্রতি কারো আকর্ষণ থাকলে) তা থেকে তাদেরকে নিরাশ করতেন না। এবং সে সম্পর্কে কোন মন্তব্যও করতেন না (বরং নীরবতা অবলম্বন করতেন), তিন বস্ত সম্পূর্ণভাবে (চিরতরে) বর্জন করেছিলেন। (১) ঝগড়া-বিবাদ, (২) অহংকার, (৩) অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন কাজে আত্মনিয়োগ করা।

মহান আল্লাহর সর্বব্যাপী অসীম জ্ঞান ও অসাধারণ ক্ষমতার দৃশ্যাবলী অবলোকন করা সত্ত্বেও কাকের ও মুরিকগণ স্বীয় শিরক ও কুফরীতে অনড় রয়েছে বলে সূরার প্রারম্ভে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী আর অপরপক্ষে স্বভাবসুলভ অনুগত মুমিনগণের প্রশংসা-স্তুতি ও শুভ পরিণতির বর্ণনা ছিল। মধ্যস্থলে মহামতি লোকমানের উপদেশাবলীও এক প্রকার সেসব বিষয়ের পরিপূরকই ছিল। উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ পাকের সর্বব্যাপী ও সর্বতোমুখী জ্ঞান ও ক্ষমতা এবং সৃষ্টিকুলের প্রতি তাঁর অজস্র কৃপা ও কল্যাণরাজি বর্ণনা করে পুনরায় তওহীদের প্রতি আহবান করা হয়েছে।

سَخَّرَ لَكُمَا فِي الْأَرْضِ — অর্থাৎ, আল্লাহ পাক নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের যাবতীয় বস্তু তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। অনুগত করে দেয়ার অর্থ কোন বস্তুকে কারো আজ্ঞাবহ করে দেয়া। প্রশ্ন হতে পারে যে, ভূ-মণ্ডলের সকল বস্তু তো আজ্ঞাবহ নয়। বরং অনেক বস্তুই তো মানুষের মজির বিপরীত কাজ করে। বিশেষ করে যেসব বস্তু নভোমণ্ডলে বিদ্যমান, সেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ হওয়ার তো কোন সম্ভাবনাই নেই। উত্তর এই যে, تَسْخِيرُ অর্থ কোন বস্তুকে কোন বিশেষ কাজে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োজিত করে রাখা। আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু মানুষের অনুগত করে দেয়ার অর্থ এই যে, সেসব বস্তু মানুষের সেবা ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত করে দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে অনেক বস্তু তো এমন যে, সেগুলোকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করার সাথে সাথে তাদের আজ্ঞাবহও করে দেয়া হয়েছে—তারা যখন যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ব্যবহার করে। আবার কতক বস্তু এমনও আছে, যেগুলো মানুষের কাজে তো লাগিয়ে দেয়া হয়েছে —ফলে তা মানব-সেবায় যথারীতি অবশ্যই নিয়োজিত—কিন্তু প্রতিপালকোচিৎ হেকমতের পরিশ্রেক্ষিতে সেগুলোকে মানুষের অনুগত করে দেয়া হয়নি। যেমন, নভোমণ্ডলে অবস্থিত সৃষ্টিজগত, গ্রহ-নক্ষত্র, বজ্র-বিদ্যুৎ, বৃষ্টি-বাদল প্রভৃতি; যেগুলো মানুষের আজ্ঞাবহ করে দেয়া হলে পর সেগুলোর উপর মানুষের স্বভাব, রুচি, প্রকৃতি ও অবস্থাবলীর বিভিন্নতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হতো। একজন কামনা করতো যে, সূর্য অনতিবিলম্বে উদিত হোক। আবার অপরজন তার নিজস্ব প্রয়োজনে এর বিলম্বে উদয়ই কামনা করতো। একজন বৃষ্টি কামনা করতো; অপরজন উষ্ণ প্রান্তরে সফরে আছে বলে বৃষ্টি না হওয়াই কামনা করতো। এমতাবস্থায় এরূপ পরস্পর বিপরীতধর্মী চাহিদা আকাশমণ্ডলের বস্তুসমূহের কার্যক্রমে বৈপরীত্য ও বৈসাদৃশ্যের উদ্ভব ঘটাতে। এজন্যই আল্লাহ পাক এসব বস্তু মানবসেবায় নিয়োজিত অবশ্যই রেখেছেন; কিন্তু তার আজ্ঞাবহ করে রাখেননি। এও এক প্রকারের করায়ত্তকরণই বটে।

وَأَسْبَغَ — অর্থ পরিপূর্ণ করে দেয়া। যার অর্থ আল্লাহ পাক তোমাদের উপর তাঁর প্রকাশ্য — অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। প্রকাশ্য নেয়ামত বলতে সেসব নেয়ামতকেই বোঝায়, যা মানুষ তার পক্ষেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুধাবন করতে পারে। যেমন, মনোরম আকৃতি, মানুষের সুঠাম ও সংবদ্ধ

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রত্যেক অংগ এমন সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে তৈরী করা যেন তা মানুষের কাজে সর্বাধিক সহায়কও হয় অথচ আকৃতি-প্রকৃতিতেও কোন প্রকারের বিকৃতি না ঘটায়। অনুরূপভাবে জীবিকা, ধন-সম্পদ, জীবন-যাপনের মাধ্যমসমূহ, সুস্থতা ও কুশলবাস্তা—এসবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নেয়ামত ও অনুকম্পাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তদ্রূপ দীন ইসলামকে সহজ ও অনায়াসলব্ধ করে দেয়া, আল্লাহ-রসূলের অনুসরণ ও আনুগত্য প্রদর্শনের তওফীক প্রদান, অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় ও প্রভাবশীলতা এবং শত্রুদের মোকাবেলায় মুসলমানদের প্রতি সাহায্য ও সহায়তা—এসবই প্রকাশ্য নেয়ামতসমূহের পর্যায়ভুক্ত। আর গোপনীয় নেয়ামত সেগুলো, যা মানব হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত—যথা ঈমান, আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ এবং জ্ঞান-বুদ্ধি, সচরিত্র, পাপসমূহ গোপন করা ও অপরাধসমূহের ভরিত্র শাস্তি আরোপিত না হওয়া ইত্যাদি।

وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ — এই আয়াতে মহান

আল্লাহ তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, তাঁর ক্ষমতার ব্যবহার এবং তাঁর নেয়ামত (কৃপা ও দয়াসমূহ) যে একেবারে অসীম ও অফুরন্ত,—কোন ভাষার সাহায্যে তা প্রকাশ করা চলে না, কোন কলম দিয়ে তা লিপিবদ্ধ করা চলে না, এ তথ্যটুকুই সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি এরূপভাবে উদাহরণ পেশ করেছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যত বৃক্ষ আছে, যদি সেগুলোর সব শাখা-প্রশাখা দিয়ে কলম তৈরী করা হয় এবং বিশ্বের সাগরসমূহের পানি কালিতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয় এবং এসব কলম আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-গরিমা এবং তাঁর ক্ষমতা ব্যবহারের বিবরণ লিখতে আরম্ভ করে, তবে সমুদ্রের পানি নিঃশেষ হয়ে যাবে; তবু তাঁর অফুরন্ত প্রজ্ঞা ও মহিমার বর্ণনা শেষ হবে না। কেবল একটি মাত্র সমুদ্র কেন—যদি অনুরূপ আরো সাত সমুদ্রও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়, তবুও সব সাগর শেষ হয়ে যাবে তথাপি আল্লাহ পাকের মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। كَذِبْتُكَ — র ভাবার্থ আল্লাহ পাকের জ্ঞানপূর্ণ ও প্রজ্ঞাময় বাক্যাবলী —(রূহ ও মায়হারী) আল্লাহ পাকের মহিমা, কৃপা ও করুণাও এর অন্তর্ভুক্ত। সাত সমুদ্র অর্থ এ নয় যে, সাত সমুদ্রের সংখ্যা সাতটিই; বরং অর্থ এই যে, এক সমুদ্রের সাথে আরো সাতটি সমুদ্র সংযুক্ত হয়েছে বলে যদি ধরেও নেয়া হয়, তা সত্ত্বেও এসবগুলির পানি দিয়ে আল্লাহর প্রজ্ঞাময় বাক্যসমূহ লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে সাতের সংখ্যা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে—সীমিত করে দেয়া উদ্দেশ্য নয়। যার

প্রমাণ কোরআনের অন্য এক আয়াত—যেখানে বলা হয়েছে—‘আল্লাহর মহিমাচক বাণীসমূহ প্রকাশ করতে যদি সমুদ্রকে কালিতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়, তবে সমুদ্র শুণ্য হয়ে যাবে—কিন্তু সে বাণীসমূহ শেষ হবে না। আর শুধু এ সমুদ্র নয়, অনুরূপ আরো সমুদ্র অন্তর্ভুক্ত করলেও অবস্থা একই থাকবে।’ এ আয়াতে بِرَبِّكَ বলে এরূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি এ ধারা বহুদূর পর্যন্ত চলতে থাকে যে, এক সমুদ্রের সাথে অনুরূপ অপর সমুদ্র সংযুক্তও হয়ে তার সাথে অনুরূপ তৃতীয়টা অনুরূপ চতুর্থটা—মোটকথা সমুদ্রসমূহের যতগুণ বা সংখ্যাই মেনে নেয়া হোক না কেন, এসবগুলোর পানি কালি হলেও আল্লাহর মহিমা প্রকাশক বাণীসমূহ লিখে শেষ করতে পারবে না। যুক্তি-বুদ্ধির দিক দিয়ে একথা সুস্পষ্ট যে সমুদ্র সাতটি কেন সাত হাজারও যদি হয়, তবুও তা সীমাবদ্ধ, শেষ অবশ্যই হবে—কিন্তু كَذِبْتُكَ অর্থাৎ, আল্লাহর বাক্যাবলী অসীম ও অনন্ত—কোন সীমাবদ্ধ অসীমকে কিরূপে সীমিত করতে পারে?

কতক রেওয়াজে আছে যে, এ আয়াত ইহুদী পাদ্রীদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাথিল হয়েছে। মহানবী হযরত (সাঃ) যখন মদীনায়ে তশরীফ আনেন তখন কিছুসংখ্যক ইহুদী পাদ্রী হাযির হয়ে কোরআনের আয়াত

وَمَا أَوْثَقْتُمُ الْعِلْمَ إِلَّا كَيْلًا (অর্থাৎ, তোমাদেরকে অতি সামান্য

পরিমাণ জ্ঞানই প্রদান করা হয়েছে) প্রসঙ্গে আপত্তির সুরে বললো, আপনি (নবীজী) বলেন যে, তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। এতে আপনি কি শুধু আপনাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। না আমাদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মহানবী হযরত (সাঃ) বললেন—আমার উদ্দেশ্য সকলেই। অর্থাৎ, আমাদের জাতি এবং ইহুদী-খৃষ্টানগণও। তখন তারা আপত্তি করে বললো—আমাদেরকে তো আল্লাহ পাক তওরাত প্রদান করেছেন—যা سِتْرًا لِّلْحَيِّ الْقَيُّومِ অর্থাৎ, সকল বস্তুর (রহস্য) বর্ণনাকারী। তিনি বললেন, এও আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় অতি নগণ্য। আবার তওরাতে যেসব জ্ঞান রয়েছে, সে সম্পর্কেও তোমরা পূরোপুরি অবহিত নও। কিন্তু আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় যাবতীয় আসমানী গ্রন্থ এবং সমস্ত নবীগণের সমষ্টিগত জ্ঞানও অতিশয় কিঞ্চিৎকর ও নগণ্য। এ বক্তব্যের সমর্থনেই এ আয়াত নাথিল হয়েছে।

وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ (ইবনে-কাসীর)

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَحْيَاكُمْ إِلَّا يَوْمَ يَوْمِ الْآخِرَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَشَهِيدٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾
 اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يُولِيْهُ الْاَيُّلَ فِي الْهَآرِ وَيُوَلِّيْهِ الْهَآرَ فِي الْاَيُّلِ
 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ يَّجُوزِيْ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَاَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ لَخَبِيرٌ ﴿٢٢﴾ اِنَّ اِلَهَآءَكُمْ اِلَّا هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ
 مِنْ دُوْنِهٖ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿٢٣﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ
 الْفَلَكَ يَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ يَمْعَمُ لَا يُرِيْكُم مِّنْ اَيِّهَا اِنَّ فِيْ
 ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٢٤﴾ وَاِذَا غَشِيَكَ مَوجٌ كَاطِلٌ
 دَعَاُ اللّٰهَ خَلَصٰتِيْنَ لَهٗ الْيَوْمَ ؕ فَلَمَّا اَخْلَصْهُمُ اِلَى الْبَرِّ
 قَبِلَهُمْ مُّقْتَصِدًا وَمَا يَجْحَدُ بِآيٰتِنَا اِلَّا كُلُّ فِتْنَارٍ كَقُوْرٍ ﴿٢٥﴾
 يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ وَاِلٰهَ
 عَن وَّلَدٍ ؕ لَكُمْ اَوَّلُوْدٌ هُوَ جَارِعٌ اَنْ يَّوَدَّ اَنْ يَّوَدَّ اَنْ يَّوَدَّ
 اَللّٰهُ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّكُمْ اَمْۤ اِيُوَدُّ الدُّنْيَا ؕ وَلَا يَعْزُبُ عَنْكُمْ بِاللّٰهِ
 الْعُرُوْدُ ﴿٢٦﴾ اِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَاَنْ
 يَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدَاُ
 وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تُنۢوِكُ اِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿٢٧﴾

(২৮) তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান বৈ নয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শোনে, সবকিছু দেখেন। (২৯) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পরিচর্যা করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার খবর রাখেন? (৩০) এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহ্-ই সত্য এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে সব মিথ্যা। আল্লাহ্ সর্বোচ্চ, মহান। (৩১) তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নির্দেশাবলী প্রদর্শন করেন? নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে নিদর্শন রয়েছে। (৩২) যখন তাদেরকে মেঘমালা সদৃশ তরংগ আচ্ছাদিত করে নেয়, তখন তারা খাটি মনে আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলভাগের দিকে উদ্ধার করে আনেন, তখন তাদের কেউ কেউ সরল পথে চলে। কেবল মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই আমার নির্দেশাবলী অস্বীকার করে। (৩৩) হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর এবং ভয় কর এমন এক দিবসকে, যখন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও তার পিতার কোন উপকার করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য। অতএব, পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয় এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রত্যেক শয়তানও যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। (৩৪) নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপাঞ্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সববিষয়ে সত্যক জ্ঞাত।

উপরোল্লিখিত ৩৩নং আয়াতে মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সমগ্র মানবকুলকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তাআলা ও কেয়ামত দিবস সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে সেজন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ** - অর্থাৎ, হে মানব জাতি! স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় কর। এক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের মূল বা অন্য কোন গুণাবচক নামের স্থলে 'রব'—(পালনকর্তা) বিশেষণটি চয়ন করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্‌কে ভয় করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কোন হিসেে জন্ত বা শত্রু সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে মনে যেরূপ ভয়ের উদ্রেক হয়ে থাকে, সেরূপ ভয় নয়। কেননা, আল্লাহ্ পাক তো তোমাদের পালনকর্তা—সুতরাং তাঁর সম্পর্কে এ ধরনের কোন আশংকা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং এক্ষেত্রে সে ধরনের ভয় বোঝানো হয়েছে, যা বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনের প্রতি তাঁদের মান-মর্যাদা ও প্রতাপ-প্রতিপত্তির পরিশ্রেক্ষিতে হয়ে থাকে। যেমন, পুর পিতাকে এবং ছাত্র তার শিক্ষককে ভয় করে। অথচ এরা তার শত্রু বা ক্ষতিসাধনকারী কেউ নয়। কিন্তু তাঁদের সম্মত ও প্রভাব হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে। তাই তাদেরকে পিতা এবং গুরুদের নির্দেশ অনুসরণ ও পালনে বাধ্য করে। এখানেও একথাই বোঝানো হয়েছে—যেন আল্লাহ্ পাকের মহান মর্যাদা ও প্রতাপ তোমাদের হৃদয়ে পুরোপুরি স্থান করে নেয়, যেন তোমরা অনায়াসে তাঁর নবীর অনুসরণ ও নির্দেশ পালন করতে পার।

وَإِخْشَآؤَآءِ مَا لَا يَجُوزِي وَالِدَ عَنْ وَلَدٍ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ
 অর্থাৎ, সেদিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতাও নিজের পুত্রের উপকার করতে পারবে না। অনুরূপভাবে কোন পুত্রও পিতার কোন কল্যাণ করতে পারবে না।

এখানে ঐ শ্রেণীর পিতা-পুত্রকে বোঝানো হয়েছে যাদের মধ্যে একজন মুমিন, অপরজন কাফের। কেননা মুমিন পিতা কিংবা পুত্র স্বীয় কাফের পুত্রের কিংবা পিতার শাস্তি বিদ্‌মাত্রও হ্রাস করতে পারবে না।

এরূপ নির্দিষ্টকরণের কারণ, কোরআন করীমের অন্যান্য আয়াতসমূহ এবং হাদীসের বিভিন্ন রেওয়াজে—যেখানে একধা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন পিতা-মাতা সন্তানের জন্য এবং সন্তান পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে। আর এ সুপারিশ দ্বারা তারা লাভবান ও সফলকাম হবে। কোরআনে করীমে রয়েছে : **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ**

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করেছে—আর তারাও মুমিনে পরিণত হয়েছে; আমি এ সন্তান-সন্ততিদেরকে তাদের পিতা-মাতার মর্যাদায় উন্নীত করে দেব। যদিও তাদের কার্যাবলী এ স্তরে পৌঁছার উপযোগী নয়। কিন্তু সং পিতা-মাতার কল্যাণে কেয়ামতের দিন তারা এ ফল লাভ করতে সক্ষম হবে, কিন্তু এক্ষেত্রে শর্ত এই যে, সন্তানকে মুমিন হতে হবে—যদিও কাজকর্মে কোন ত্রুটি ও শৈথিল্য থেকে থাকে।

جَعَلْتُ عَدُوَّيَّ يَخْلُفُهَا
 অর্থাৎ, তারা অক্ষয় ও অবিনশ্বর স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবে এবং এক্ষেত্রে তাদের যোগ্য হিসাবে প্রতিপন্ন পিতা-মাতা, শ্রীগণ ও পুত্র-পরিজনও তাদের সাথে প্রবেশ

করবে। যোগ্য বলতে মুমিন হওয়া বোঝানো হয়েছে।

এ ৩৩ ও ৩৪নং আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি, অনুরূপভাবে স্বামী এবং স্ত্রী মুমিন হওয়ার ক্ষেত্রে যদি সমশ্রেণীভুক্ত হয়, তবে হাশর ময়দানে একের দ্বারা অপরের উপকার সাধিত হবে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন হাদীসের রেওয়াজে সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করার কথা বর্ণিত আছে। সুতরাং উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত বিধি যে হাশর ময়দানে কোন পিতা সন্তানের বা কোন সন্তান পিতার কোন উপকার সাধন করতে পারবে না— তা শুধু সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যখন এদের মধ্যে একজন মুমিন এবং অপরজন কাফের হবে।—(মাহহারী)

অপর আয়াতে পাঁচটি বস্তুর জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্ পাকেরই জন্য নির্দিষ্ট থাকে এবং অপর কোন সৃষ্টির সে জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এর মাধ্যমেই সূরায় লোকমান শেষ করা হয়েছে।

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُرِى الْغَيْبَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّا اكْتَسَبَ إِلَّا دَمَدًا وَمَتَذَكَّرُ نَفْسٌ إِلَّا نَفْسٌ تَنبُذُ

অর্থাৎ, কেয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ পাকেরই রয়েছে (অর্থাৎ, কোন্ বছর কোন্ তারিখে সম্ভটিত হবে) এবং তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও মাতৃগর্ভে কি আছে তা তিনিই জানেন (অর্থাৎ, কন্যা না পুত্র; কোন্ আকৃতি-প্রকৃতির) এবং আগামীকাল কি অর্জন করবে তা কোন ব্যক্তি জানে না। (অর্থাৎ, ভাল-মন্দ কি লাভ করবে) অথবা কোন্ স্থানে মৃত্যুবরণ করবে, তাও কেউ জানে না।

প্রথম তিন বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান যদিও একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো এ গুণলোর জ্ঞান নেই। কিন্তু বাক্যবিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গি থেকে একথাই বোঝা যায় যে, এসব বস্তুর জ্ঞান কেবল আল্লাহ্ পাকের অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারেই সীমিত রয়েছে। অবশ্য অবশিষ্ট বস্তুদ্বয় সম্পর্কে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো এ গুণলোর তথ্য ও তত্ত্ব জানা নেই। এ পাঁচ বস্তুকে সূরায় আনআমের আয়াতে مَزَاجِ الْغَيْبِ (অদৃশ্য জগতের চাবিসমূহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে)।

এলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যঃ বরেন্য গুস্তাদ শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ ওসমানী (রহঃ) তাঁর তফসীরের সংশ্লিষ্ট টীকায় এক সংক্ষিপ্ত অখচ ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যবহ তথ্য প্রকাশ করেছেন। যদ্বারা উল্লেখিত সব ধরনের প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়। তা এই যে, গায়ব দু'প্রকারের। (এক) অদৃশ্য নির্দেশাবলী, যথা শরীয়তের নির্দেশাবলী, আল্লাহ্ পাকের যাত ও সিকত, সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত জ্ঞানও এর অন্তর্গত, যাকে এলমে আকায়দ বলা হয়। আর শরীয়তের সেসব নির্দেশাবলী—যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের কোন্ কোন্ কাজ পছন্দনীয়, কোনগুলো অপছন্দনীয়, তা জানা যায়। এসব বস্তু গায়ব বা অদৃশ্যই বটে।

দ্বিতীয় প্রকারঃ اَكْوَانٌ غَيْبِيَّةٌ (অদৃশ্য ঘটনাবলী) অর্থাৎ, ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর সংশ্লিষ্ট জ্ঞান। প্রথম শ্রেণীভুক্ত অদৃশ্য বস্তুসমূহের জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলা নবী ও রসূলগণকে (সঃ) প্রদান করেছেন। যার উল্লেখ কোরআনে কন্সমি এরূপভাবে রয়েছে—

فَلَا تَطْرُقُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا أَسْرَأَ مِنْكَ رُسُولُ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাকের মনোনীত ও পছন্দনীয় রসূল ব্যতীত অন্য

কেউ তাঁর গোপনীয় ও অদৃশ্য তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার —اَكْوَانٌ غَيْبِيَّةٌ (ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য ঘটনাবলী)—এর পূর্ণ জ্ঞান তো আল্লাহ্ কাউকে প্রদান করেন না—তা সম্পূর্ণভাবে সেই মহান সত্তার সাথে নির্দিষ্ট। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ঘটনার আংশিক জ্ঞান যখন এবং যতটুকু ইচ্ছা প্রদান করেন। যা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত বলে একে এলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান বলা চলে না; বরং গোপন বার্তা বলা হয়।

আয়াতের শব্দাবলী সংশ্লিষ্ট তথ্যাদিঃ এ আয়াতে পাঁচ বস্তুর জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট থাকার কথা বিশেষ গুরুত্বসহ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং পাঁচ বস্তুকে একই শিরোনামভুক্ত করে এ গুণলোর জ্ঞান মহান আল্লাহ্রই জন্য নির্দিষ্ট করে অন্য কোন সৃষ্টির এ জ্ঞান নেই, একথা বলে দেয়াই বাহ্যতঃ বাঞ্ছনীয় ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু উল্লেখিত আয়াতে এমনটি করা হয়নি। বরং প্রথম তিন বস্তুর জ্ঞান তো ইতিবাচকভাবে আল্লাহ্ পাকের জন্যই নির্দিষ্ট থাকার কথা বর্ণনা করা হয়েছে ও অপর দু'বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো কোন জ্ঞান নেই বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আবার প্রথম তিন বস্তুর মধ্য হতে কেয়ামতের বর্ণনা এরূপভাবে করা হয়েছে —إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ অর্থাৎ কেয়ামতের তথ্য কেবল আল্লাহ্ পাকেরই জানা রয়েছে। দ্বিতীয় বস্তুর বর্ণনা শিরোনাম পাণ্ডিত্যে ক্রিয়াবাচক বাক্যে এরূপভাবে করা হয়েছে وَيُرِى الْغَيْبَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন। এখানে বৃষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানের কোন উল্লেখই নেই বরং এখানে অবতরণ করার উল্লেখ রয়েছে। তৃতীয় বস্তুর বর্ণনা আবার শিরোনাম পাণ্ডিত্যে এরূপভাবে করা হয়েছে وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ শিরোনামের এরূপ পরিবর্তন বাক্যবিন্যাসের এক প্রকার রীতিও বলা যেতে পারে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আরো কিছু অভিনব তত্ত্ব ও তাৎপর্য পরিলক্ষিত হবে। যা হযরত ধানবী 'বয়ানুল কোরআনে' বর্ণনা করেছেন।

যার সংক্ষিপ্ত-সার এই যে, শেখোক্ত দু'বস্তু অর্থাৎ, আগামীকাল মানুষ কি উপার্জন করবে এবং সে কোন্ স্থানে মৃত্যুবরণ করবে— যা মানুষের নিজ সত্তা-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার, মানুষের এ গুণলোর জ্ঞান অর্জন করার সম্ভাবনা হয়তো থাকতে পারতো। এ সম্ভাবনা অপনোদনের উদ্দেশ্যে এ দুয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কোন জ্ঞান নেই বলে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যদ্বারা প্রথম তিন বস্তুর জ্ঞান ও তথ্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো না থাকার কথা অতি উত্তমভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কেননা, যখন মানুষ নিজ কার্যাবলী ও উপার্জনাতি এবং নিজ পরিণতি অর্থাৎ, মৃত্যু ও মৃত্যুস্থল সম্পর্কে কিছু জানে না, তখন আকাশ, বৃষ্টিবর্ষণ ও মাতৃগর্ভের গভীর অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন ভ্রম সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে কি? সর্বশেষ বস্তুতে কেবল মৃত্যুস্থল সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান না থাকার কথা বলা হয়েছে। অখচ মৃত্যুস্থলের ন্যায় মৃত্যুক্ষণও মানুষের জানা নেই। কারণ এই যে, মৃত্যুস্থল নির্দিষ্টভাবে জানা না থাকলে বাহ্যিক অবস্থাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ এ সম্পর্কে কিছুটা অনুধাবন করতে পারে যে, সে যেখানে বসবাস করছে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে। অন্ততঃ যে স্থানে মারা যাবে সে স্থানটি দুনিয়াতে তো বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে মৃত্যুক্ষণ—যা অনাগত ভবিষ্যৎকাল; এখনো অস্তিত্ব পর্বস্ত লাভ করেনি। সুতরাং যে ব্যক্তি মৃত্যুস্থান কার্যতঃ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা জানে না, তার সম্পর্কে এরূপ ধারণা কিভাবে করা যেতে পারে যে, মৃত্যুক্ষণ—যার এখনো অস্তিত্বও নেই, তা সে জেনে নিতে সক্ষম হবে।

মোটকথা, এখানে এক বস্তুর নিষেধের সাথে সাথে অপর বস্তুসমূহের



সূরা সেজদাহ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩০

পরম করুণাময় ও মহান দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ।

(১) আলিফ-লাম-যীম, (২) এ কিভাবেব অবতরণ বিশুপালনকর্তার নিকট থেকে এতে কোন সন্দেহ নেই। (৩) তারা কি বলে, এটা সে মিথ্যা রচনা করেছে? বরং এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। সম্ভবতঃ এরা সুপথ প্রাপ্ত হবে। (৪) আল্লাহ, যিনি নোভামণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশে বিরাজমান হয়েছেন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না? (৫) তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতঃপর তা তাঁর কাছে পৌছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। (৬) তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু, (৭) যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন এবং কাদামাটি থেকে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। (৮) অতঃপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। (৯) অতঃপর তিনি তাকে সুষম করেন, তাতে রূহ সঞ্চার করেন এবং তোমাদেরকে দেন কর্ণ, চক্ষু ও অভ্যন্তরকণ। তোমরা সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১০) তারা বলে, আমরা মৃত্যিকায় মিশ্রিত হয়ে গেলেও পুনরায় নতুন করে সৃষ্টিত হব কি? বরং তারা তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতকে অস্বীকার করে।

নিষেধও অতি উদ্ভটভাবে বোধগম্য হয়ে যায়। তাই এ দু'বস্তুকে নেতিবাচক শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমোক্ত তিন বস্তু প্রকাশ্যতঃই মানুষের নাগালের বাইরে বলে তাতে মানুষের জ্ঞানের কোন অধিকার না থাকারই সুস্পষ্ট। এ জন্যে এক্ষেত্রে ইঁ সূচক শিরোনাম অবলম্বন করে সেগুলো হক তাআলারই জন্য নির্দিষ্ট বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

এগুলোর মধ্যে প্রথম বাক্য বিশেষ্যবাচক ও পরবর্তী দু'বাক্য ক্রিয়াবাচক বাক্যরূপে ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবতঃ এ প্রজ্ঞা ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে যে, কেয়ামত তো এক সুনির্দিষ্ট বিষয়—এতে কোন নতুনত্ব নেই। পক্ষান্তরে সম্ভান ধারণ ও বৃষ্টি বর্ষণের বিষয়টা ঠিক এমনটি নয়—এতে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব আরোপিত হতে থাকে। কিন্তু ক্রিয়াবাচক বাক্য নতুনত্ব প্রকাশ করে। এ জন্যই একে উভয় স্থানেই ব্যবহার করা হয়েছে। আবার এ দুয়ের মধ্যেও হামলের (সম্ভান ধারণ) ক্ষেত্রে তো আল্লাহ পাকের এলমের উল্লেখ রয়েছে **وَيَسْأَلُ مَنَاسِيْرُهُمْ** (অর্থাৎ, মার্গগর্ভে কি রয়েছে তা তিনিই জানেন) এবং বৃষ্টি বর্ষণের ক্ষেত্রে এলমের উল্লেখ নেই। এর কারণ এই যে, এখানে বৃষ্টি বর্ষণের কথা উল্লেখ করে আনুশঙ্গিকভাবে এও ব্যক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, বৃষ্টির সাথে মানব জাতির অগণিত কল্যাণ ও উপকার বিজড়িত, তা মহান আল্লাহ কর্তৃকই বর্ষিত হয়। এতে অন্য কারো কোন কর্তৃত্ব বা ভূমিকা নেই। অতএব, এ সম্পর্কিত জ্ঞান বাক্যের বর্ণনাদঙ্গি থেকেই প্রমাণিত হয়।

সূরা সেজদাহ

ভয় প্রদর্শক বলে রসূলকে (সাঃ)
 বোঝানো হয়েছে। যার মর্ম এই যে, মহানবী (সাঃ) —এর পূর্বে মক্কার
 কুরাইশগণের নিকট কোন নবী আগমন করেননি। কিন্তু এর দ্বারা এ কথা
 বোঝায় না যে, এ পর্যন্ত নবীগণের দাওয়াতও তাদের নিকট পৌঁছেনি।
 কেননা, কোরআন করীমের অপর এক আয়াতে স্পষ্টভাবে এরশাদ হয়েছে
 যে, **وَلَا مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ** —অর্থাৎ, দুনিয়াতে এমন কোন
 সম্প্রদায় নেই যার মাঝে আল্লাহ পাক সম্পর্কে কোন ভয় প্রদর্শক এবং
 তাঁর পক্ষ থেকে কোন দাওয়াত প্রদানকারীর আগমন হয়নি।

এ আয়াতে ^{১৩}شَدِيدٌ শব্দটি সাধারণ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ, আল্লাহ পাকের প্রতি আহবানকারী, চাই তিনি রসূল ও পয়গম্বর হোন বা তাদের কোন প্রতিনিধি বা ধর্মীয় আলেম হোন। এ আয়াত দ্বারা সকল সম্প্রদায় ও দলসমূহের নিকটে তওহীদের দাওয়াত পৌছে গেছে বলে বোঝা যায়। একথা যথাস্থানে সম্পূর্ণ সঠিক এবং আল্লাহ পাকের সর্বব্যাপী করুণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন ইমাম আবু হাইয়ান বলেন যে, তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত কোন কালে, কোন স্থানে এবং কোন সম্প্রদায়ে কখনো ছিন্ন ও ক্ষুণ্ণ হয়নি। যখন এক নবুওয়তের উপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর সে নবুওয়তভিত্তিক জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ নিতান্ত গণ্যসংখ্যক হয়ে পড়তেন, তখন অপর নবী বা রসূল প্রেরিত হতেন। এতে বোঝা যায় যে, আরব সম্প্রদায়সমূহের মধ্যেও সম্ভবতঃ তওহীদের দাওয়াত পূর্ব থেকেই পৌছেছিল, কিন্তু এজন্য এটা আবশ্যক নয় যে, এ দাওয়াত স্বয়ং কোন নবী বা রসূল বহন করে এনেছিলেন — হতে পারে তাঁদের প্রতিনিধি আলেমগণের মাধ্যমে

পৌছেছিল, সুতরাং এ সূরা এবং সূরায় ইয়াসিন ও অন্যান্য সূরার যেসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আরবের কোরাইশ গোত্রে তাঁর পূর্বে কোন **رَسُولٌ** (ভয় প্রদর্শক) আগমন করেননি তখন **رَسُولٌ** বলতে এর পারিভাষিক তথ্যানুযায়ী নবী-রসূলকেই বোঝাবে এবং অর্থ হবে এই যে, এ সম্প্রদায়ে মহানবীর পূর্বে কোন রসূল বা নবী আগমন করেননি। যদিও অন্যান্য উপায়ে তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত এখানেও পৌছেছিল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে প্রেরণের পূর্বে বহু ব্যক্তি সম্পর্কে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁরা ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)—এর দ্বীনের (জীবন বিধান) উপর অবস্থিত ছিলেন। তওহীদের (একত্ববাদ) প্রতি তাদের ঈমান ছিল। প্রতিমা পূজা করতে ও প্রতিমার নামে কোরবানী করতে তাঁরা ঘৃণা প্রকাশ করতেন।

রুহুল মা'আনীতে মুসা ইবনে ওক্বা থেকে এ রেওয়ায়েত বর্ণিত করা হয়েছে যে, ওমর ইবনে নুফায়েল যিনি মহানবী (সাঃ)—এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর সাথে সাক্ষাতও করেছিলেন। কিন্তু নবুওয়ত লাভের পূর্বে তাঁর ইন্তেকাল ঐ সালে হয়, যে সালে কোরাইশগণ বায়তুল্লাহ পুনঃ নির্মাণ করেন এবং এটা তাঁর নবুওয়ত লাভের পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা।—মুসা ইবনে ওক্বাহ্ তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কোরাইশদেরকে প্রতিমা পূজা থেকে বিরত রাখতেন এবং প্রতিমার নামে কোরবানী করাকে গর্হিত ও অশোভন বলে মন্তব্য করতেন। তিনি পৌত্তলিকদের জবাইকৃত জন্তুর গোশত খেতেন না।

আবু দাউদ তাইয়ালেসী ওমর ইবনে নুফায়েল-তনয় হযরত সায়ীদ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে (যিনি আশারায়ে-মোবশুরার অন্তর্ভুক্ত সাহাবী ছিলেন) এ রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি নবীজীর খেদমতে আরম্ভ করেছিলেন, আমার পিতার অবস্থা আপনি জানেন যে, তিনি তওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—প্রতিমা পূজার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। এমতাবস্থায় আমি তাঁর মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতে পারি কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমান যে, হাঁ, তাঁর মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করা জায়েয। তিনি কেয়ামতের দিন এক স্বতন্ত্র উম্মতরূপে উঠবেন। (রুহুল মা'আনী)

অনুরূপভাবে গুরাকাহ্ বিন নাওফেল যিনি হুযর (সাঃ)—এর নবুওয়ত প্রাপ্তির প্রারম্ভিক স্তরে এবং কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা পূর্বে বর্তমান ছিলেন—তিনি তওহীদের উপরই বিশাস রাখতেন এবং রসূলুল্লাহকে (সাঃ) দ্বীন প্রচারে সাহায্য করতে সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি পরলোকগমন করেন। এসব ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, আরব জাতিসমূহ আল্লাহর তওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত থেকে তো বঞ্চিত ছিলেন না, কিন্তু তাদের মাঝে কোন নবীর আবির্ভাব ঘটেনি। আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। এ তিন আয়াত—কোরআন যে সত্য এবং রসূল্লাহ যে প্রকৃত নবী তা প্রমাণ করে।

কেয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য : **فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا تَسْأَلُونَ** অর্থাৎ, সেদিনের পরিমাণ তোমাদের গণনানুসারে এক হাজার বছর হবে এবং সূরায় মা'আরেজের আয়াতে রয়েছে—**فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ** অর্থাৎ সেদিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর হবে।

এর এক সহজ উত্তর তো এই—যা বয়ানুল কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেদিনটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হবে বিষয় মানুষের নিকট অতিশয় দীর্ঘ বলে মনে হবে। এরূপ দীর্ঘানুভূতি নিজ নিজ ঈমান ও আমলানুপাতে হবে। যারা বড় অপরাধী তাদের নিকট সুদীর্ঘ এবং যারা কম অপরাধী

তাদের নিকট কম দীর্ঘ বলে বোধ হবে। এমনকি সেদিন কিছু লোকের নিকট এক হাজার বছর বলে মনে হবে, আবার কারো কারো নিকট পঞ্চাশ হাজার বছর বলে মনে হবে। তফসীরে রুহুল মা'আনীতে ওলামা ও সুফীগণ কর্তৃক উক্ত আয়াতের আরো কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু তা সবই কাল্পনিক ও অনুমান প্রসূত। কোনটাই কোরআনের মর্মভিত্তিক বা বিশাসযোগ্য নয়। সুতরাং সলফে সালেহীন—সাহাবয়ে কেরাম ও তাবিয়ীন কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নিরাপদ—তা হলো, তাঁরা পঞ্চাশ ও একের এ পার্থক্য আল্লাহ পাকের জ্ঞান ও অবগতির উপরই ছেড়ে দিয়েছেন এবং এ তত্ত্ব তাঁদের জ্ঞান নেই বলেই ক্রান্ত হয়েছেন।

এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন : **هَما يومان ذكركهما الله تعالى في كتابه الله تعالى اعلم بهما وَاَكْرَهَ اَنْ اعلم** অর্থাৎ, এ দুদিন সম্পর্কে আল্লাহ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত এবং আল্লাহ পাকের গ্রন্থের যে বিষয় সম্পর্কে অবহিত নই সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা অবাস্তবীয় বলে মনে করি। (ইহা আবদুর রাজ্জাক ও হাকেম বর্ণনা করেছেন এবং তা বিশুদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন।)

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ অর্থাৎ যিনি যাবতীয় বস্তু অত্যন্ত সুন্দর ও নিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন। কারণ এ বিশুদ্ধগতে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা এ জগতের কল্যাণ ও মঙ্গলোপযোগী করেই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এর প্রতিটি বস্তুই মূলতঃ এক বিশেষ সৌন্দর্যের অধিকারী। এদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ও সুন্দর করে মানবকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন এরশাদ করেছেন। **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** অর্থাৎ নিশ্চয় আমি মানবকে অতি সুন্দর গঠন ও উত্তম আকৃতি-প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু বাহ্যতঃ যত অশ্লীল ও অকল্যাণকরই মনে হোক না কেন—কুকুর, শূকর, সাপ, বিছু, সিংহ, বাঘ প্রভৃতি বিষধর ও হিংস্র জন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে অকল্যাণকর বলে মনে হয়। কিন্তু গোটা বিশ্বের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনায় এগুলোর কোনটাই অপকৃত্ত অমঙ্গলকর নয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত খানভী (রহঃ) বলেছেন যে, যাবতীয় মৌলিক এবং আনুষঙ্গিক বস্তু **كُلُّ شَيْءٍ** এর অন্তর্গত। অর্থাৎ, যেসব বস্তু মৌলিক সত্তার অধিকারী ও দৃশ্যমান যথা—প্রাণীজগত, উদ্ভিত জগত, জড় জগত প্রভৃতি এবং আনুষঙ্গিক অদৃশ্য বস্তু যথা, স্বভাব-চরিত্র ও আমলসমূহ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এমন কি যেগুলো কুচরিত্র ও কুস্বভাব বলে কবিত যথা, ক্রোধ, লোভ, যৌন-কামনা প্রভৃতিও প্রকৃতিগতভাবে খারাপ নয়। যথাস্থানে ও যথাসময়ে ব্যবহৃত না হওয়ার দরুন এগুলো অপকৃত্ত ও অকল্যাণকর প্রতিপন্ন হয়।

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ — ইতিপূর্বে একথাই ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক বিশুদ্ধ-জগতের যাবতীয় বস্তু অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর এর মাঝে সর্বাধিক সুন্দর ও মনোরম মানুষের আলোচনা করেছেন। এর সাথে তাঁর পূর্ণ ও অনন্য ক্ষমতা প্রকাশার্থ একথাও ব্যক্ত করেছিলেন যে, মানবকে আমি সর্বোত্তম ও সেরা সৃষ্টি করে তৈরী করেছি। তার সৃষ্টি উপকরণ সর্বোন্নত ও সর্বোৎকৃষ্ট বলে সে শ্রেষ্ঠ নয়, বরং তার সৃষ্টি উপকরণ তো নিকৃষ্টতম বস্তু — বীর্ষ। অতঃপর তাঁর অনন্য ক্ষমতা ও অসাধারণ সৃষ্টিকৌশল প্রয়োগ করে এই নিকৃষ্টতম বস্তুকে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন সেরা সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করেছেন।

قُلْ يَتُوبُ إِلَيْكُمْ مَلِكُ الْيَوْمِ الَّذِي وَكَّلَ بِكُمْ تَمِيمًا إِلَىٰ رَبِّكُمْ
 تَرْجِعُونَ ۖ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُبْرَمُونَ تَأْكُسُ أُنُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 رَبًّا أَكْثَرَ تَعَلُّفًا لِّمَنْعَةٍ لِّصَاحِبِهَا فَتُؤْوُونَ ۖ وَ
 لَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَٰكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي
 لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۖ فَذُوقُوا بِمَا
 نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا لَأَنبِيئُكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا
 كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ لَمَّا دُخِلَ الَّذِينَ فِي الْأَنْدَادِ وَابْهَاطُوا
 سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۖ تَتَجَافَىٰ
 جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
 رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۖ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِّمَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ
 أَعْيُنٍ مَّا زَكَّيْنَا كَأَنَّهُمْ يَبْتَغُونَ ۖ أَكْفَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ
 فَاسِقًا لَّا يَتُوبُونَ ۖ إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ
 جَدَّتِ الْمَآوَىٰ نَزَلْنَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ سَفَّوْا
 فَمَا وَهُمْ إِلَّا النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَ
 قِيلَ لَهُمْ دُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ تُكَذِّبُونَ ۝

পূর্ববর্তী আয়াতে

কেয়ামত অস্বীকারকারিগণের প্রতি সতর্কবাণী এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ সম্পর্কে তাদের যে বিস্ময়—তার উত্তর ছিল। এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, নিজের মৃত্যু সম্পর্কে যদি চিন্তা-ভাবনা কর, তবে এতে আল্লাহপাকের কুদরতে কামেলা ও অনন্য ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাবে। তোমরা নিজ অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতাবশতঃ মনে কর যে, মৃত্যু আপনা-আপনিই সঘ্যটিত হয়; কিন্তু ব্যাপার এমনটি নয় — বরং আল্লাহ পাকের নিকটে তোমাদের মৃত্যুর এক নির্দিষ্ট ক্রম রয়েছে, এ সম্পর্কে ফেরেশতাদের মাধ্যমে এক বিশেষ ব্যবস্থাপনাও নির্ধারিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে আজরাসিল (আঃ) — এর ভূমিকাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সমস্ত প্রাণী জগতের মৃত্যু তাঁর উপর ন্যস্ত, যার মৃত্যু যখন এবং যে স্থানে নির্ধারিত ঠিক সে সময়েই তিনি তার প্রাণ বিয়োগ ঘটাবেন। আলোচ্য আয়াতে এর বর্ণনাই রয়েছে এখানে **الْيَوْمِ الَّذِي** এক বচনে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অপর এক আয়াতে রয়েছে **الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْيَوْمَ** — অর্থাৎ ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ বিয়োগ ঘটায়—এখানে **مَلَائِكَةً** বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, আজরাসিল (আঃ) একাকী একাক্ষ সম্পন্ন করেন না; বহু ফেরেশতা তাঁর অধীনে একাক্ষ অংশগ্রহণ করেন।

আত্মাবিয়োগ ও মালাকুল-মউত সম্পর্কে কিছু বিশ্লেষণ : প্রখ্যাত মুফাস্সির মুজাহিদ বলেন, মালাকুল-মউতের সামনে গোটা বিশ্ব কোন ব্যক্তির সামনে রক্ষিত বিভিন্ন খাবার সামগ্রীপূর্ণ একটা থালার মত তিনি যাকে চান তুলে নেন। বিষয়টি এক মারফু হাদীসেও আছে (ইমাম কুরতুবী তাফকিরাতে এটি বর্ণনা করেছেন)। অপর এক হাদীসে রয়েছে যে, নবীজী (সাঃ) একদা জনৈক সাহাবীর শিয়রে মালাকুল মউতকে দেখে বললেন যে, আমার সাহাবীর সাথে সহজ ও কোমল ব্যবহার করে। মালাকুল-মউত উত্তরে বললেন, আপনি নিশ্চিত থাকুন-আমি প্রত্যেক মুমিনের সাথে নরম ব্যবহার করে থাকি এবং বলেন যে, যত মানুষ গ্রাম-গঞ্জে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বত বা সমুদ্র সৈকতে বসবাস করছে—আমি তাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন পাঁচ বার দেখে থাকি। এজন্য এদের ছোট-বড় প্রত্যেক সম্পর্কে আমি প্রত্যক্ষভাবে পুরোপুরি জ্ঞাত। অতঃপর বলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ), এগুলো যা কিছু হয় সব আল্লাহর হুকুমে। অন্যথায় আল্লাহর হুকুম ব্যতীত আমি কোন মশারও প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে সক্ষম নই।

মালাকুল-মউতই কি অন্যান্য জীবজন্তুরও প্রাণ বিয়োগ ঘটান? উল্লেখিত হাদীসের রেওয়ায়েত দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ পাকের অনুমতি সাপেক্ষে মশার মৃত্যুও মালাকুল-মউতই ঘটায়। হয়রত ইমাম মালেকও এক প্রশ্নের উত্তরে এ রকমই বলেন। কিন্তু অন্যান্য কতিপয় রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণের দ্বারা আত্মার বিয়োগ ঘটানো কেবল মানুষের জন্য নির্দিষ্ট কেবল তার মর্যাদার দরুন—অন্যান্য জীব-জন্তু আল্লাহর অনুমতিক্রমে ফেরেশতাগণের মাধ্যম ব্যতীত আপনা-আপনিই মৃত্যুবরণ করে।—(কুরতুবী'র বরাত দিয়ে ইবনে আতিয়্যাহ বর্ণনা করেন)

এ বিষয়ই আবু শায়েখ, ওকাইলী, দায়লমী, প্রমুখ হয়রত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবীজী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গ সবই আল্লাহ পাকের প্রশংসা-স্তুতিতে মগ্ন। (এই

(১১) বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। (১২) যদি আপনি দেখতেন যখন অপরার্থীরা তাদের পালনকর্তার সামনে নতশির হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম ও শ্রবণ করলাম। এখন আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, আমরা সংকর্ম করব। আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে গেছি। (১৩) আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এ উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। (১৪) অতএব এ দিবসকে ভুলে যাওয়ার কারণে তোমরা মজ্জা আশ্বাদন কর। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে স্থায়ী আযাব ভোগ কর। (১৫) কেবল তরাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের পালনকর্তার স্প্রশংসে পবিত্রতা বর্ণনা করে। (১৬) তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিমিক দিয়েছি, তা থেকে বায় করে। (১৭) কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুকায়িত আছে। (১৮) ঈমানদার ব্যক্তি কি অবাখের অনুরূপ? তারা সমান নয়। (১৯) যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের কৃতকর্মের আপ্যায়নস্বরূপ বসবাসের জাহান্নাম। (২০) পক্ষান্তরে যারা অবাধ্য হয়, তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তথায় ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের যে আযাবকে মিথ্যা বলতে, তার স্বাদ আশ্বাদন কর।

হল এগুলোর জীবন) যখন এদের গুণ-কীর্তন বন্ধ হয়ে যায়, তখনই আল্লাহ পাক এদের প্রাণ বিয়োগ ঘটান। জীব-জন্তুর মৃত্যু মালাকুল-মউতের উপর ন্যস্ত নয়। ঠিক একই মর্মে এক হাদীস হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।—(মাযহরী)

অপর এক হাদীস রয়েছে যে, যখন আল্লাহ পাক আযরাঈল (আঃ) এর উপর গোটা বিশ্বের মৃত্যু সন্ধ্যতনের দায়িত্ব অর্পণ করেন, তখন তিনি (আযরাঈল) নিবেদন করেন; হে প্রভু আপনি আমার উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করলেন যার ফলে বিশ্ব জগৎ ও গোটা মানবজাতি আমাকে ভরসনা করবে এবং আমার প্রসঙ্গ উঠলে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করবে। প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তাআলা বললেন : আমি এর সূরাহা এভাবে করেছি যে, জগতে রোগ-ব্যাদি ও অন্যান্যরূপে মৃত্যুর কিছু বাহ্যিক কারণ রেখে দিলাম যার ফলে প্রত্যেক মানুষ সেসব উপলক্ষ ও রোগ-ব্যাদিকে মৃত্যুর কারণরূপে আখ্যায়িত করবে এবং তুমি তাদের অপবাদ থেকে রক্ষা পাবে। — (কুরতবী)

ইমাম বগভী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন —যত প্রকারের রোগ-ব্যাদি ক্ষত ও আঘাত রয়েছে—এসবই মৃত্যু দূত-মানুষকে তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতঃপর যখন মৃত্যুকণ ঘনিয়ে আসে, তখন মালাকুল-মউত মৃত্যু পথযাত্রীকে সম্বোধন করে বলেন, ওগো আল্লাহর বান্দা, আমার আগমনের পূর্বে তোমাদেরকে সাবধান করে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আমি রোগ-ব্যাদি ও দুর্ঘোণ-দুর্বিপাকরূপে কত সংবাদ কত দূত পাঠিয়েছি। এখন আমি পৌঁছে গেছি। এরপর আর কোন সংবাদ প্রদানকারী বা কোন দূত আসবে না। এখন তুমি স্বীয় প্রভুর নির্দেশ বাধ্যতামূলকভাবে পালন করবে—চাই স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক।—(মাযহরী)

মাসআলা : কারো আত্মা বের করে নিয়ে আসার নির্দেশ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত মালাকুল-মউত কারো মৃত্যুকণ সম্পর্কে কিছুই জানেন না।— (আহমদ কর্তৃক মা' মার থেকে বর্ণিত—মাযহরী)

نَحْنُ أَتَيْنَا جُؤَيْمُوعَ بْنِ النَّصَّارِ يَدُ عَوْنٍ رَكْعَةً حَقًّا وَكَلِمَةً পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাকের, মশারক ও কেয়ামত অস্বীকারকারীদের প্রতি সতর্কবাণী ছিল। অতঃপর (اَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) থেকে খাটি ও নিষ্ঠাবান মুমিনগণের বিশেষ গুণাবলী ও তাদের সুমহান মর্যাদাসমূহের বর্ণনা রয়েছে। উল্লেখিত আয়াতে মুমিনগণের এক গুণ এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের শরীরের পার্শ্বদেশে শয্যা থেকে আলাদা থাকে এবং শয্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহ পাকের যিকর ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করে। কেননা, এরা আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি ও শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর করুণা ও পুণ্যের আশা করে থাকে। আশা-নিরাশাপূর্ণ এ অবস্থা তাদেরকে যিকর ও দোয়ার জন্য ব্যাকুল করে রাখে।

তাহাজ্জদের নামায : অধিকাংশ মুফাসসেরগণের মতে শয্যা পরিত্যাগ করে যিকর ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করার অর্থ তাহাজ্জ ও নফল নামায—যা ঘুম থেকে উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়। হাদীসের অপরাপর রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত মাযায ইবনে জাবাল থেকে বর্ণিত আছে; তিনি বলেন যে, আমি একদা নবীজীর

সঙ্গে সফরে ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি আরজ করলাম; ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ), আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন যার মাধ্যমে আমি বেহেশত লাভ করতে পারি এবং দোষখ থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আল্লাহ পাক যার জন্যে তা সহজ করে দেন তার পক্ষে তা লাভ করা অতি সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল এই যে, আল্লাহর এবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন অশ্লীলার স্থাপন করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জ সম্পন্ন করবে। অতঃপর তিনি বললেন—এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে দেই, (তা এই যে,) রোযা ঢাল স্বরূপ। (যা শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়) এবং সদকা মানুষের পাপানল নির্বাণিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের গভীর রাতের নামায; এই বলে কোরআন মজীদে উল্লেখিত আয়াত تَحِيَّاتِي جُؤَيْمُوعَ بْنِ النَّصَّارِ তেলাওয়াত করেন।

হযরত আবুদারদা (রাঃ), কাতাদাহ (রাঃ) ও যাহহাক (রাঃ) বলেন যে, সেসব লোকও শয্যা থেকে শরীরের পার্শ্বদেশে পৃথক হয়ে থাকা গুণের অধিকারী, যারা এশা ও ফজর উভয় নামায জামাআতের সাথে আদায় করেন। তিরমিযী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বিশুদ্ধ সনদসহ বর্ণিত আছে যে, উল্লেখিত আয়াত تَحِيَّاتِي جُؤَيْمُوعَ بْنِ النَّصَّارِ যারা এশার নামাযের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে, এশার জামাআতের জন্য প্রতীক্ষারত থাকেন, তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, এ আয়াত সেসব লোক সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নফল নামায আদায় করে করে কাটান (মুহাম্মদ বিন নসর এই হাদীসটি রেওয়ায়েত করেন)। এ আয়াত সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি শুয়ে বসে বা পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থায় চোখ উন্মীলনের সাথে সাথে আল্লাহ পাকের যিকরে লিপ্ত হন তাঁরাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে-কাসীর ও অন্যান্য তফসীরকারগণ বলছেন যে, এসব বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে শেষরাতে নামাযই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন,—কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী মানবমণ্ডলীকে একত্রিত করবেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক আহবানকারী, যার আওয়াজ সমগ্র সৃষ্টিকূল শুনতে পাবে, দাঁড়িয়ে আহবান করবেন,— হে হাশর ময়দানে সমবেত জনমণ্ডলী! আজ তোমরা জানতে পারবে যে, আল্লাহ পাকের নিকটে সর্বাধিক সন্মান ও মর্যাদার অধিকারী কে? অনন্তর সে ফেরেশতা تَحِيَّاتِي جُؤَيْمُوعَ بْنِ النَّصَّارِ

(যাদের পার্শ্বদেশে শয্যা থেকে পৃথক থাকে) এরূপ-গুণের অধিকারী লোকগণকে দাঁড়াতে আহবান জানাবেন। এ আওয়াজ শোনে এসব লোক দাঁড়িয়ে পড়বেন—যাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য—(ইবনে-কাসীর)। এই রেওয়ায়েতেরই কোন কোন শব্দে রয়েছে যে, এদেরকে হিসাব গ্রহণ ব্যতীতই বেহেশতে প্রেরণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য সমগ্র লোক দাঁড়াবে এবং তাদের হিসাব গ্রহণ করা হবে।—(মাযহরী)

وَلَنُذِيقَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْجَاحِدِينَ مُتَمَقِّمُونَ ۝ وَلَقَدْ اتَّخَذْنَا مُوسَى الْكَتَبَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۝ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يُعَذِّبُونَ بِهَا الْمُزِلَّاتِصَابُ وَآثُورَ كَانُوا بِالآيَاتِنَا يُوَفِّقُونَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يُفَصِّلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا هَدَيْنَا مَوْسَىٰ قَبْلَ هَٰذَا أَن يَقُولُوا لِلْقُرُونِ يَنْشُرُونَ لَكُمْ صُورًا مِّن صُورِ الْأَنْعَامِ فَأَنفُسُهُمْ أَكْفَرُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِنَّا كُنَّا صَادِقِينَ ۝ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا أَنفُسُهُمْ وَلَهُمْ مَنَظَرُونَ ۝ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانظُرْ إِلَيْهِمْ مَّنْظَرُونَ ۝

(২১) গুরু শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে লঘু শাস্তি আশ্বাদন করাব, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (২২) যে ব্যক্তিকে তার পালনকর্তার আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দান করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার চেয়ে যালেম আর কে? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দেব। (২৩) আমি মুসাকে কিভাবে দিয়েছি, অতএব আপনি কোরআন প্রাপ্তির বিষয়ে কোন সন্দেহ করবেন না। আমি একে বনী ইসরাঈলের জন্যে পথ প্রদর্শক করেছিলাম। (২৪) তারা সবার করত বিধায় আমি তাদের মধ্য থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথ প্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। (২৫) তারা যে বিষয়ে মত বিরোধ করছে, আপনার পালনকর্তাই কেয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন। (২৬) এতে কি তাদের চোখ খোলেনি যে, আমি তাদের পূর্বে অনেক সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদের বাড়ী-ঘরে এরা বিচরণ করে। অবশ্যই এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। তারা কি শোনে না? (২৭) তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি উষর ভূমিতে পানি প্রবাহিত করে শস্য উদ্ভূত করি, যা থেকে ভক্ষণ করে তাদের জন্তুয়া এবং তারা। তারা কি দেখে না? (২৮) তারা বলে তোমরা সত্যবাদী হলে বল কবে হবে এই ফয়সালা? (২৯) বলুন, ফয়সালায় দিনে কাকেরদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। (৩০) অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে।

وَلَنُذِيقَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

(নিকটতম শাস্তি) বলে (নিকটতম অর্থ) বলে ইহলৌকিক বিপদাপদ ও রোগ-ব্যাহিকে বোঝানো হয়েছে এবং বৃহত্তম শাস্তি (এডাব) বলতে পারলৌকিক শাস্তি বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহর দিকে যারা ফিরে আসে তাদের পক্ষে ইহলৌকিক বিপদাপদ রহমতস্বরূপ : যার মর্ম এই যে, আল্লাহ পাক অনেক মানুষকে তাদের কৃত পাপের জন্য সাবধান করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ইহকালে তাদের উপর নানাবিধ দৃষ্ট-যন্ত্রণা ও রোগ-ব্যাহি চাপিয়ে দেন, যেন তারা সতর্ক হয়ে পাপ থেকে ফিরে আসে এবং পরকালের কঠিনতম শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

অবশ্য যেসব লোক এরূপ দুর্যোগ-দুর্বিপাক সত্ত্বেও আল্লাহর প্রতি ধাবিত না হয়— তাদের পক্ষে এটা দ্বিগুণ শাস্তি, (একটা) দুনিয়াতেই নগদ, (দ্বিতীয়টা) পরকালের কঠিনতম শাস্তি। কিন্তু নবী ও ওলীগণের উপর যে বিপদাপদ আসে, তাদের ব্যাপার এদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এগুলো তাদের পক্ষে পরীক্ষা স্বরূপ—যার মাধ্যমে তাদের মর্যাদা উন্নত হতে থাকে। যার লক্ষণ ও পরিচয় এই যে, এরূপ বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাহির সময়ও তাঁরা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এক প্রকারের আত্মিক শাস্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকেন।

—এ শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ—এ আয়াতে কার সাথে সাক্ষাৎ বোঝানো হয়েছে সে সমুদ্রে মুফাসসেরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। —র- ‘যমীর’ (সর্বনাম) কিতাব-অর্থৎ কোরআনের দিকে ধাবিত করে এই অর্থ করা যায় যে, যেরূপভাবে মহান আল্লাহ হযরত মুসা (আঃ) কে গ্রন্থ প্রদান করেছেন অনুরূপভাবে আপনার প্রতিও আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না।

যেমন কোরআন সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, وَرَأَيْكَ كَتَبْنَا الْفُرْآنَ — অর্থৎ, এবং নিশ্চয় আপনাকে কোরআন প্রদান করা হবে।

হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদাহ (রাঃ) —এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, —র- যমীর (সর্বনাম) হযরত মুসা (আঃ) —এর দিকে ধাবিত হয়েছে এ আয়াতে হযরত মুসা (আঃ) —এর সাথে রসুলুল্লাহর (সাঃ) সাক্ষাতের সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আপনি এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করবেন না যে, হযরত মুসা (আঃ) —এর সাথে আপনার সাক্ষাৎ সংঘটিত হবে। সুতরাং যে রাব্বের রাতে এক সাক্ষাৎকার সংঘটিত হওয়ার কথা বিশুদ্ধ হাদীসমূহ দ্বারা প্রমাণিত; অতঃপর কেয়ামতের দিন সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাও প্রমাণিত আছে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) —এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, হযরত মুসাকে (আঃ) ঐশী গ্রন্থ প্রদানের দরুন যেভাবে মানুষ তাঁকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছে এবং নানাভাবে দৃষ্ট-যন্ত্রণা দিয়েছে, আপনিও এসব কিছু সম্পৃক হবেন বলে নিশ্চিত থাকুন। তাই কাকেরদের প্রদত্ত দৃষ্ট-যন্ত্রণার ফলে আপনি মনক্ষপ হবেন না; বরং নবীগণের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়া স্বাভাবিক রীতি মনে করে আপনি তা বরদাশত করুন।

কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের পরিচালক ও নেতা হওয়ার দু'টি শর্ত : **وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ إِمَّةً لِكُلِّ بَلَدٍ ۖ وَكَانُوا بِلَايَتِنَا** — অর্থাৎ, আমি ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মাঝে কিছু লোককে নেতা ও অগ্রপথিক নিযুক্ত করেছিলাম যারা তাঁদের পয়গম্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মহান প্রভুর নির্দেশানুসারে লোকদেরকে হেদায়েত করতেন—যখন তাঁরা বৈর্যধারণ করতেন এবং আমার বাণীসমূহের উপর স্থির বিশ্বাস স্থাপন করতেন।

ইসরাঈল বংশের ওলামাগণের মধ্য হতে কতককে যে, জাতির নেতা ও পুরোধার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে, তার দু'টি কারণ রয়েছে। এ আয়াতে সে দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে—(১) বৈর্যধারণ করা, (২) আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর অটুট বিশ্বাস স্থাপন করা। আরবী ভাষায় সবার করার অর্থ অত্যন্ত বিস্তৃত ও ব্যাপক। এর শাব্দিক অর্থ অনড় ও দৃঢ়বদ্ধ থাকা। এখানে সবার দ্বারা আল্লাহ পাকের আদেশসমূহ পালনে অটল ও দৃঢ়পদ থাকা এবং আল্লাহ পাক যেসব বস্তু বা কাজ হারাম ও গর্হিত বলে নির্দেশ করেছেন সেগুলো থেকে নিজেদের বিরত রাখা। শরীয়তের যাবতীয় নির্দেশাবলীই এর অন্তর্গত—যা এক বিরাট কর্মগত দক্ষতা ও সাফল্য। এর দ্বিতীয় কারণ আল্লাহ পাকের আয়াতসমূহের উপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন — আয়াতসমূহের মর্ম অনুধাবণ করা এবং অনুধাবণান্তে তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা— উভয়ই এর অন্তর্গত। এটা এক বিরাট জ্ঞানগত দক্ষতা ও সাফল্য।

সারকথা : আল্লাহ পাকের নিকটে নেতৃত্ব ও পৌরোহিত্যের যোগ্য কেবল সেসব লোকই যারা কর্ম ও জ্ঞান উভয়দিকে পূর্ণতা লাভ করেছে। এখানে কর্মগত পূর্ণতা ও দক্ষতাকে জ্ঞানগত পূর্ণতা ও দক্ষতার পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ জ্ঞানের স্থান স্বভাবতঃ কর্মের পূর্বে। এতে ইঙ্গীত করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকটে কর্মহীন শিক্ষা ও জ্ঞানের কোন মূল্য নেই।

ইবনে-কাসীর এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে কিছুসংখ্যক ওলামার মন্তব্য উদ্ধৃত করেন; তা এই — **بالصبر واليقين تنال الامامة في الدين** — অর্থাৎ, ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমেই ঈমানের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করা যায়।

أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّسُلُ أَلَمَّا تَسْتَوْفُوا إِلَى الْأَرْضِ الْغُرَىٰ فَخُرُوبُهَا رُجُمًا

অর্থাৎ, তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি যদ্বারা নানা প্রকারের শস্যাদি উদগত হয়। **جز** শুষ্ক ভূমিকে বলা হয় যেখানে কোন বৃষ্ণলতা উদগত হয় না।

ভূমিতে পানি প্রবাহের বিশেষ কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা : শুষ্ক ভূমিতে পানি প্রবাহে অনন্তর সেখানে নানাবিধ উদ্ভিদ ও তরু-লতা উদগত হওয়ার বর্ণনা কোরআনে কসরীমের বিভিন্ন জায়গায় এভাবে করা হয়েছে যে,

ভূমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হয়— ফলে ভূমি রসালো হয়ে শস্যাদি উৎপাদনের যোগ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এ আয়াতে বৃষ্টির স্থলে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে শুষ্ক ভূমির দিকে পানি প্রবাহিত করে গাছপালা উদগত করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, অন্য কোন ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে সেখান থেকে নদী-নালায় মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে যেসব শুষ্ক ভূ-ভাগে সাধারণতঃ বৃষ্টি হয় না সেদিকে প্রবাহিত করা হয়।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কতক ভূমি এমন নরম ও কোমল হয় যে, তা বৃষ্টি বহন করার যোগ্যও নয়। —সেখানে পুরোপুরি বৃষ্টি বর্ষিত হলে দালান-কোঠা বিধবস্ত হবে, গাছপালা মূলাংপাটিত হয়ে যাবে। তাই এরূপ ভূমি সম্পর্কে আল্লাহ পাক এ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন যে, অধিক পরিমাণে বৃষ্টি কেবল সেসব ভূমিতেই বর্ষিত হয় যেগুলো তা বহন করার যোগ্যতা রাখে। অতঃপর পানি প্রবাহিত করে এমন ভূমি অভিযুক্ত নিয়ে যাওয়া হয় যেগুলোর বৃষ্টি বহনের ক্ষমতা নেই। —যেমন মিসরের ভূমি। কিছুসংখ্যক তসফীরকার ইয়ামন ও শামের কতক ভূমি এরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। —যেমন ইবনে আব্বাস ও হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের সকল ভূমিই এর অন্তর্ভুক্ত। মিসরের ভূমি বিশেষভাবে এর অন্তর্গত—সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু আবিসিনিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশসমূহ থেকে বৃষ্টির পানি নীল নদ দিয়ে মিসরে পৌঁছে—সাথে করে সেখানকার অত্যন্ত উর্বর লাল পলিমাটি বহন করে আনে। তাই মিসরবাসীরা সেখানে বৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর নতুন পানি ও পলিমাটি দ্বারা উপকৃত হয়।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ — অর্থাৎ কাফেররা পরিহাসচ্ছলে বলে থাকে যে, কখন কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে বিজয়ের কথা বলেন তা কখন সংঘটিত হবে? —আমরা তো এর কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না। —আমরা তো মুসলমানদেরকে ভীত সন্ত্রস্তভাবে আত্মগোপন করে থাকতে দেখি।

এর উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলেন : **لَقَدْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا تَنفَعُ الْكَافِرِينَ** — অর্থাৎ, আপনি (সাঃ) তাদের বলে দিন যে, তোমরা যে আমাদের বিরুদ্ধে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছো সেদিন তোমাদের জন্য সমূহ বিপদ বয়ে আনবে। কেননা, যখন আমরা বিজয় লাভ করবো, সেদিন তোমরা কঠিন শাস্তিতে জড়িয়ে পড়বে। তা ইহকালে হোক যেমন বদরের যুদ্ধে কিংবা পরকালে।

কোন কোন বিজ্ঞজন **مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ** এর অর্থ কেয়ামতের দিন বলে বর্ণনা করেছেন।



সূরা আল-আহযাব

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত - ৭৩

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ।

(১) হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফের ও কপট বিশ্বাসীদের কথা মানবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (২) আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়, আপনি তার অনুসরণ করুন। নিশ্চয় তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন। (৩) আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। কার্যনির্বাহীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪) আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে দুটি স্বয়ং স্থাপন করেননি। তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা 'মিহার' কর, তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষাপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন। (৫) তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয় ডাক। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মুমিন ও মুহাজিরগণের মধ্যে যারা আত্মীয়, তারা পরস্পরে অধিক ঘনিষ্ঠ। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতে চাও, করতে পার। এটা লগহে-মাহফুযে লিখিত আছে।

সূরা তুল-আহযাব মদীনায় অবতীর্ণ হয়। এর অধিকাংশ আলাচ্য বিষয় আল্লাহ পাক সমীপে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিশিষ্ট স্থান ও উচ্চ মর্যাদা সঞ্চিত। এ সূরার বিভিন্ন শিরোনামায় রসুল (সাঃ)-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আবশ্যকতা এবং তাঁকে দুঃখ-যন্ত্রণা দেয়া হারাম হওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। সূরার অবশিষ্ট বিষয়সমূহও এগুলোরই পরিপূরক ও সহায়ক।

শানে নুযলঃ এ সূরা নাযিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে কয়েকটি রেওয়াজে রয়েছে। একটি এই যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) হিজরতের পর যখন মদীনায় তশরীফ নিয়ে যান, তখন মদীনার আশে-পাশে বনু কোরায়জা, বনু নযীর, বনু কায়নুকা প্রভৃতি কতিপয় ইহুদী গোত্র বসবাস করত। রাহমাতুল্লিল আলামীনের এটাই একান্ত কামনা ছিল যেন এসব লোক মুসলমান হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এসব ইহুদীর মধ্য থেকে কয়েক ব্যক্তি নবীজীর (সাঃ) খেদমতে যাতায়াত করতে আরম্ভ করে এবং কপট ও বর্ণচোরা রূপ ধারণ করে নিজেদেরকে মৌখিকভাবে মুসলমান বলে প্রকাশ করতে থাকে, কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না। কিছু লোক মুসলমান হলে অপরাপরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছানো সহজতর হবে মনে করে নবীজী এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাদেরকে স্বাগতম জানানেন। এদের সাথে বিশেষ সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন, এবং ছোট-বড় সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। এমন কি ওদের দ্বারা কোন অসংগতিপূর্ণ কাজ স্বেচ্ছিতে হলে পরও ধর্মীয় কল্যাণের কথা চিন্তা করে সেগুলোর প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করতেন না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সূরায়ে আহযাবের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে।—(ফুরত্বী)

ইবনে জরীর (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে অপর এক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, হিজরতের পর ওলীদ ইবনে মুগীরা, মুগীরা ও শাইবা ইবনে রবীয়া মদীনায় পৌছে মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে হুমুরে পাকের খেদমতে এ প্রস্তাব পেশ করে যে, যদি আপনি ইসলামের প্রতি দাওয়াতের কাজ পরিত্যাগ করেন, তবে আমরা আপনাকে মক্কার অর্থেক সম্পদ প্রদান করবো। আবার মদীনার মুনাফিক ও ইহুদীরা এই মর্মে ভীতি প্রদর্শন করে যে, যদি তিনি নিজ দাবী ও দাওয়াত থেকে বিরত না থাকেন, তবে আমরা তাকে হত্যা করে ফেলবো। এমতাবস্থায় এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়।—(ক্লহুদ-মা'আনী)

সাঁ'লাবী ও ওয়াহেদী এক তৃতীয় ঘটনা সনদহীনভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় মক্কার কাফের ও নবীজীর মাঝে 'যুদ্ধ নয় চুক্তি' স্বাক্ষরিত হওয়ার পর যখন আবু-সুফিয়ান, ইকরিমা ইবনে আবু জাহল ও আবুল আ'ওয়াল সালামী মদীনায় পৌছে নবীজীর খেদমতে নিবেদন করলো যে, আপনি আমাদের উপাস্য দেব-দেবীদের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ পরিহার করুন এবং কেবল বলুন যে, (পরকালে) এরাও সুপারিশ করবে এবং উপকার ও কল্যাণ সাধন করবে। যদি আপনি এমনটি করেন, তবে আমরাও আপনার পালনকর্তার নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করবো। এভাবে আমাদের পারস্পরিক বিবাদ মিটে যাবে।

তাদের একথা রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় বোধ হলো। মুসলমানগণ এদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। নবীজী (সাঃ) এরশাদ করলেন যে, আমি এদের সাথে সন্ধি

চুক্তিতে আবদ্ধ বলে এমনটি হতে পারে না। ঠিক এই সময় এ আয়াতসমূহ নাযিল হয়—(রুহুল মা'আনী)

এসব রেওয়াজে যদিও বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু এদের মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। এসব ঘটনাবলীও উল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হতে পারে।

এ আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দুটো নির্দেশ রয়েছে—প্রথম, **اَللّٰهُمَّ** অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় কর, দ্বিতীয় **وَلَا تُطِيعُوا** **اَلْكُفْرَ**—অর্থাৎ, অবিশ্বাসীদের অনুসরণ করো না। আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এসব লোককে হত্যা করা চুক্তিভঙ্গের শামিল—যা সম্পূর্ণ হারাম এবং কাফেরদের অনুসরণ না করার নির্দেশ এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এসব ঘটনাবলী সম্পর্কে কাফেরদের যা মতামত তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়, যার বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে আসছে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান যে, সমগ্র কোরআনের কোথাও তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন করা হয়নি। যেমনটি অন্যান্য নবীগণকে সম্বোধনের বেলায় করা হয়েছে। যেমন— **يا ابراهيم** - **يا نوح** - **يا موسى** - **يا ادم** প্রভৃতি। বরং খাতামুননবিয়্যিন (সাঃ)-কে কোরআন পাকের যেখানেই সম্বোধন করা হয়েছে—তাঁর উপাধি—নবী বা রসূল প্রভৃতির মাধ্যমে করা হয়েছে। কেবল চার জায়গায়, তিনি যে রসূল তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে, তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যা একান্ত জরুরী ছিল।

এখানে মহানবী (সাঃ)-কে সম্বোধন করে দুটো নির্দেশ দেয়া হয়েছে—(এক) আল্লাহ পাককে ভয় করার—অর্থাৎ, মক্কার মুশরেকদের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা যেন লঙ্ঘন করা না হয়। (দুই) মুশরেক, মুনাক্ফক ও ইহুদীদের মতামত গ্রহণ না করার। প্রশ্ন হতে পারে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তো যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত। চুক্তিভঙ্গ করা মহাপাপ—(কবীরা গোনাহ) এবং উপরে শানে-নুহুল প্রসঙ্গে কাফের মুশরেকদের যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো গ্রহণ করা তো মারাত্মক পাপ; আর তিনি (নবীজী) এ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র—সুতরাং এ নির্দেশের কি প্রয়োজন ছিল? রুহুল মা'আনীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এসব নির্দেশের অর্থ ভবিষ্যতে এগুলোর উপর স্থির থাকা—যেমনভাবে তিনি এ ঘটনার সময়ও এসব হুকুমের উপর অটল ছিলেন এবং **اَللّٰهُمَّ**—এর নির্দেশ প্রথম উল্লেখ করার কারণ এই যে, মুসলমানগণ শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ মক্কার মুশরেকদেরকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করছিল। সুতরাং চুক্তি লঙ্ঘন থেকে বেঁচে থাকার জন্য **اَللّٰهُمَّ**—এর মাধ্যমে প্রথম হেদায়েত করা হয়েছে। অপরপক্ষে যেহেতু কোন মুসলমান মুশরেক-কাফেরদের অনুসরণের ইচ্ছাও পোষণ করতেন না, তাই এর উল্লেখ পরে করা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, এ আয়াতে যদিও নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু উদ্দেশ্য গোটা উম্মত—তিনি তো ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, —তাঁর দ্বারা আল্লাহ পাকের নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু বিধান গোটা উম্মতের জন্য এবং সেটা বর্ণনার জন্যই এই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে যে, সম্বোধন করা হয়েছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যার ফলে হুকুমের গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। কেননা, যে বিষয়ে আল্লাহর রসূলকেও সম্বোধন করা হয়েছে,

সেক্ষেত্রে কোন মানুষই এর আওতা বহির্ভূত থাকতে পারে না।

ইবনে-কাসীর বলেন যে, এ আয়াতে কাফের ও মুশরেকদের অনুসরণ থেকে বারণ করার মূল উদ্দেশ্য এই যে, তিনি যেন তাদের সাথে কোন ব্যাপারে পরামর্শ না করেন—তাদেরকে অত্যধিক উঠাবসা, মেলামেশার সুযোগ না দেন। কেননা, এদের সঙ্গে অত্যধিক মেলামেশা ও শলা-পরামর্শ করা অনেক সময় এদের কথা গ্রহণ করার কারণরূপে পরিণত হতে পারে। সুতরাং যদিও নবীজীর পক্ষে তাদের কথা গ্রহণের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখা এবং নিজের পরামর্শে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দান থেকেও নবীজীকে বারণ করা হয়েছে। পরন্তু এক্ষেত্রে **اطاعت** (অনুসরণ করা) শব্দ এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, এরূপ পরামর্শ ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্বভাবতঃ তাদের মতামতের কিছুটা অনুপ্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং পরোক্ষভাবে হলেও তাদের মতামত কিছুটা প্রভাবান্বিত করতে পারে; এরূপ কোন সুযোগও যাতে না হয়, তারই পথ বন্ধ করা হয়েছে। তাঁর পক্ষে ওদের অনুসরণের তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, উল্লেখিত আয়াতে কাফেরদের পক্ষ থেকে শরীয়ত বিরোধী ও হকের পরিপন্থী উক্তি অতি স্বাভাবিক এবং সেগুলোর অনুসরণ না করার নির্দেশও একান্ত যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মুনাক্ফকগণ যদি আপনার নিকটে প্রকাশ্যভাবে কোন ইসলাম বিরোধী উক্তি করে, তবে তো তারা আর মুনাক্ফক থাকে না—পরিষ্কার কাফের হয়ে যায়—এমতাবস্থায় তাদের কথা স্বভাবতঃই বলায় প্রয়োজনীয়তা কি? এর উত্তর এই হতে পারে যে, মুনাক্ফকগণ একেবারে স্পষ্টভাবে তো ইসলাম বিরোধী কোন উক্তি করতো না, কিন্তু অন্যান্য কাফেরদের সমর্থনে কথা বলতো।

শানে নুহুল প্রসঙ্গে মুনাক্ফকদের যে ঘটনা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, যদি এটাকেই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলে ধরে নেয়া হয়, তবে তো কোন কথাই থাকে না। কেননা, এ ঘটনানুযায়ী যেসব ইহুদী কপটভাবে নিজেরদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে; তাদের সাথে বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতে নবীজীকে বারণ করা হয়েছে।

এ আয়াতের উপসংহার **اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا**—বলে আল্লাহকে ভয় করার এবং কাফের ও মুনাক্ফকদের অনুসরণ না করার পূর্ব বর্ণিত যে হুকুম তার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, যে আল্লাহ যাবতীয় কর্মের পরিণতি ও ফলাফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়—মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও মংগল তাঁর পরিজ্ঞাত। একথা এজন্য বলা হয়েছে যে, কাফের ও মুনাক্ফকদের কোন কোন কথা এমনও ছিল যদ্বারা অন্যান্য-অশান্তি লাঘব এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সম্ভাবপূর্ণ পরিবেশ স্থাপন এরূপ, অন্যান্য কল্যাণ ও উপকার সাধনে সহায়ক হতো। কিন্তু এদের সাথে এরূপ সৌজন্যমূলক আচরণও মংগলের পরিপন্থী বলে হক তা'আলা নবীজীকে তা করতে বারণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর পরিণাম শুভ নয়।

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَيْنِ يَدَيْكَ اَللّٰهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا

এটা পূর্ববর্তী হুকুমেরই অবশিষ্টাংশ—যেন আপনি কাফের ও মুনাক্ফকদের কথায় পড়ে তাদের অনুসরণ না করেন, বরং ওহীর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকিছু পৌঁছেছে, আপনি সাহাবায়ে কেলামসহ কেবল তাই অনুসরণ করুন। যেহেতু সাহাবায়ে কেলাম ও সমগ্র মুসলমানই এ সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত; তাই বহুবচন **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ**

ব্যবহার করে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

وَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عِلْمًا — এটাও পূর্ববর্তী হুকুমের সমাপনী অংশবিশেষ। এরশাদ হয়েছে যে, আপনি এসব লোকের কথায় পড়ে কোন কাজে উদ্যোগী হবেন না, স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন ও লক্ষ্য অর্জনে কেবল আল্লাহর উপরে ভরসা করুন। কেননা, অভিভাবকরূপে তিনিই যথেষ্ট। তাঁর বর্তমানে আপনার অন্য কারো সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন নেই।

মাসআলা : উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, দীন সংরক্ষণ কোন বিষয়ে কাফেরদের পরামর্শ গ্রহণ করা জায়েয নয়। অবশ্য অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তাদের পরামর্শ গ্রহণে কোন দোষ নেই।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি কাফের ও মুনাফিকদের পরামর্শনিযায়ী কাজ না করা ও তাদের কথায় কর্ণপাত না করার নির্দেশ রয়েছে। উল্লেখিত আয়াতসমূহে কাফেরদের মাঝে প্রচলিত তিনটি কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয়েছে। প্রথমতঃ বর্বর যুগে আরববাসীরা অসাধারণ মেধাবী লোকের বক্ষাভ্যন্তরে দু'টি অন্তঃকরণ আছে বলে মনে করত। দ্বিতীয়তঃ নিজ পত্নীদের সম্পর্কে এপ্রথা প্রচলিত ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে তার মায়ের পিঠ বা অন্য কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করে বলতো যে, তুমি আমার পক্ষে আমার মায়ের পিঠের সমতুল্য, যাকে তাদের পরিভাষায় 'যিহার' বলা হতো; তবে 'যিহার' কৃত সে স্ত্রী তার জন্যে চিরকালের জন্য হারাম হয়ে যেত। طهار এর উৎপত্তি طهر থেকে—যার অর্থ—পিঠ।

তৃতীয়তঃ তাদের মধ্যে এরূপ প্রথা ছিল যে, যদি কোন ব্যক্তি অপর কারো পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করতো, তবে এ পোষ্যপুত্র তার প্রকৃত পুত্র বলেই পরিচিত হতো এবং তারই পুত্র বলে সম্প্রদান করা হতো; এ পোষ্যপুত্র সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পুত্রেরই মর্যাদাভূক্ত হতো। যথা—তারা প্রকৃত সন্তানের ন্যায়ই মীরাসের অংশীদার হতো এবং বংশ ও রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে যেসব নারীর সাথে বিয়ে-শাদী হারাম—এ পোষ্যপুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এরূপই মনে করা হতো। যেমন—বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার পরও ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা যেক্ষণ হারাম, অনুরূপভাবে পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীও সে ব্যক্তির পক্ষে হারাম বলে মনে করা হতো।

বর্বর যুগের এই তিনটি ভ্রান্ত ধারণা ও কুপ্রথার মধ্যে প্রথমটি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে ইসলামী শরীয়তে একে রদ করা বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। এটা তো একান্তই শরীরতত্ত্ব বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপার যে, মানুষের বক্ষাভ্যন্তরে একটি অন্তঃকরণ থাকে, না দু'টি অন্তঃকরণ থাকে। এর স্পষ্ট অসারতা সর্বজন জ্ঞাত। এজন্য সম্ভবতঃ এর অসারতার বর্ণনা অপর দু'টো বিষয়ের সমর্থনে ভূমিকাস্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বর্বর যুগের অধিবাসীদের মানুষের বক্ষ-মাঝে দু'টি অন্তঃকরণ আছে বলে যে বিশ্বাসের অসারতা ও অযৌক্তিকতা যেমন সাধারণ-অসাধারণ সর্বজনবিদিত, অনুরূপভাবে তাদের 'যিহার' ও পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক।

অবশিষ্ট দু'টি বিষয়-যিহার ও পালক পুত্রের হুকুম—এগুলো এমন সব সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত, ইসলামে যেগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আল্লাহ পাক যার বিস্তারিত বিবরণ ও খুঁটিনাটি

পর্যন্ত কোরআনে প্রদান করেছেন। অন্যান্য বিষয়ের মত নিছক মূলনীতিগুলো উল্লেখ করে সবিস্তার বিশ্লেষণের ভার নবীজীর (সাঃ) উপর ন্যস্ত করেননি। এ দু'টি ব্যাপারে বর্বর আরবগণ নিজেদের খেয়াল-খুশীমত হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েয সংশ্লিষ্ট স্বকীয় কল্পনাপ্রসূত বিধি-বিধান প্রণয়ন করে রেখেছিল। এসব অমূলক ধারণা ও প্রথাসমূহের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করে যা প্রকৃত সত্য তা উদ্ঘাটন করে দেয়া সত্য ধর্ম ইসলামের অবশ্য কর্তব্য ছিল—তাই বলা হয়েছে—وَجَعَلَ

أَزْوَاجَهُمْ إِلَىٰ أَنْظُرُونَ مِنْهُمْ وَأَمَّا

যে, যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে মায়ের সদৃশ বলে ঘোষণা করে, তবে তার পক্ষে সে স্ত্রী প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরদিনের তরে হারাম হয়ে যায়। তোমাদের এরূপ বলার ফলে সে স্ত্রী প্রকৃত মা হয়ে যায় না। তোমাদের প্রকৃত মা তো সে-ই-যার উদর থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছ।

এ আয়াতে 'যিহার-এর' দরুন স্ত্রী চিরতরে হারাম হয়ে যাওয়ার জাহেলিয়াত যুগের ভ্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এরূপ বলার ফলে শরীয়তের কোন প্রতিক্রিয়া হয় কিনা, এ সম্পর্কে 'সুরায়ে মোজাদালায়' এরূপ বলাকে পাপ বলে আখ্যায়িত করে এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ বলার পর যদি যিহারের কাফফারা আদায় করে; তবে স্ত্রী তার জন্যে হালাল হয়ে যাবে। 'সুরায়ে মোজাদালায়' যিহারের কাফফারার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয় পালক পুত্র সংশ্লিষ্ট। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে وَجَعَلَ

دَعَىٰ - ادْعَاء - এর বহুবচন, যার অর্থ পালক

ছেলে—আয়াতের মর্ম এই, যেমন কোন মানুষের দু'টি অন্তঃকরণ থাকে না এবং যেমন স্ত্রীকে মা বলে সম্প্রদান করলে সে প্রকৃত মা হয়ে যায় না; অনুরূপভাবে তোমাদের পোষ্য ছেলেও প্রকৃত ছেলেতে পরিণত হয় না। অর্থাৎ, অন্যান্য সন্তানদের ন্যায় সে মীরাসেরও অংশীদার হবে না এবং বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। সুতরাং সন্তানের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী যেমন পিতার জন্যে চিরতরে হারাম, কিন্তু পোষ্যপুত্রের স্ত্রী পালক পিতার তরে তেমনভাবে হারাম হবে না।

যেহেতু এই শেঘোক্ত বিষয়ের প্রতিক্রিয়া বহু ক্ষেত্রে পড়ে থাকে; সুতরাং এ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যখন পালক ছেলেকে ডাকবে বা তার উল্লেখ করবে, তখন তা তার প্রকৃত পিতার নামেই করবে। পালক পিতার পুত্র বলে সম্প্রদান করবে না। কেননা, এর ফলে বিভিন্ন ব্যাপারে নানাবিধ সন্দেহ ও জটিলতা উদ্ভবের আশঙ্কা রয়েছে।

বোখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আমরা যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)—কে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ (সাঃ) বলে সম্প্রদান করতাম। (কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে পালক ছেলেরূপে গ্রহণ করেছিলেন।) এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা এ অভ্যাস পরিত্যাগ করি।

মাসআলা : এদ্বারা বোঝা যায়, অনেকে যে অপরের সন্তানকে নিজ পুত্র বলে আহ্বান করে, তা যদি নিছক স্নেহজনিত হয়—পালক পুত্রে পরিণত করার উদ্দেশ্যে না হয়, তবে যদিও জায়েয, কিন্তু তবুও বাহ্যতঃ যা নিষিদ্ধ, তাতে জড়িত হওয়া সমীচীন নয়।—(রুহুল বয়ান, বায়যাবী)

এ ব্যাপারটা কুয়াইশদেরকে চরম বিবাস্তিতে ফেলে এক গুরুতর পাপে লিপ্ত করে রেখেছিল। এমন কি নবীজী (সঃ)-কে পর্যন্ত এ অপবাদ দেয়ার বৃষ্টতা প্রদর্শন করেছিল যে, তিনি নিছক পুত্রের তলাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে নিয়ে করেছেন। অথচ যাদের (রাঃ) তাঁর সম্বন্ধ ছিলেন না; বরং পালক পুত্র ছিলেন। যার বিবরণ এ সূরাতে পরে আছে।

পূর্বই বর্ণিত হয়েছে যে, ‘সূরায় আহযাবের’ অধিকাংশ আলোচ্য বিষয় রসুলুল্লাহ (সঃ) প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁকে দুষ-কট দেয়া হযরাম হওয়া সম্প্রদিত। সূরার প্রারম্ভে মুশরেক ও মুনাফেকদের প্রদত্ত জ্বালা-বজ্রাঘাত বর্ণনা দেয়ার পর রসুলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রাসঙ্গিক নানাবিধ উপদেশ প্রদান করা হয়েছিল। অতঃপর অন্ধকার যুগের তিনটি অবৈতিক প্রকার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে শেষ কুপ্রথাটি সম্পর্কে আলোচনার একটি সম্পর্ক নবীজীকে যত্নাদান সম্পর্কিত ছিল। কেননা, কাকেররা হযরত যাদের তলাক প্রাপ্তা স্ত্রী পুণ্যবতী যখনবের (রাঃ) সাথে নবীজীর বিবাহ অনুষ্ঠানকালে জাহেলী যুগের এই পোষ্যপুত্রজনিত কুপ্রচার ভিত্তিতে অপবাদ দেয় যে, তিনি নিজের ছেলের তলাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন। সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত নবীজীকে যত্না প্রদান সংক্রান্ত বিষয়বস্তু ছিল। আলোচ্য ৬ নং আয়াতে সমস্ত সৃষ্টিকুলের চাইতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও তাঁর অনুসরণ অধিক প্রয়োজনীয় বলে বর্ণনা করে বলা হয়েছে **أَوَّلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ - الَّذِينَ أَوَّلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ** -এর সারর্থ্য এই যে, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে মহানবীর (সঃ) নির্দেশ পালন করা স্বীয় পিতা-মাতার নির্দেশের চাইতেও অধিক আবশ্যকীয়। যদি পিতা-মাতার হুকুম তাঁর (সঃ) হুকুমের পরিপন্থী হয়, তবে তা পালন করা জায়েয নয়। এমন কি তাঁর (সঃ) নির্দেশকে নিজের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার চাইতেও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সহীহ বোখারী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযুরে পাক (সঃ) এরশাদ করেছেন : ‘এমন কোন মুমিনই নেই যার পক্ষে আমি (সঃ) ইহকাল ও পরকালে সমস্ত মানবকুলের চাইতে অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও আপনজন নেই। যদি তোমাদের মনে চায়, তবে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য কোরআনের আয়াত— **أَوَّلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ** - পাঠ করতে পার।’

وَأَزْوَاجُهُمْ - তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে উম্মতে মুসলিমার মা বলে আখ্যায়িত করার অর্থ-ভক্তি-শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মায়ের পর্যায়ভূক্ত হওয়া। যা-ছেলের সম্পর্ক-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহকাম, যথা—পরস্পর বিয়ে-শাদী হারাম হওয়া। মুহরিম হওয়ার পরিলক্ষিত্তে পরস্পর পর্দা না করা এবং মীরাসে অংশীদারিত্ব প্রভৃতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, আয়াতের শেষে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আর নবীজীর শুদ্ধাচারিণী পত্নীগণের সাথে উম্মতের বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়ার কথা অন্য এক

আয়াতে ভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিয়ে অনুষ্ঠান হারাম হওয়া মা হওয়ার কারণেই ছিল, এমনটি হওয়া জরুরী নয়।

মাসআলা : উপরোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নবীজীর পুণ্যবতী বিবিগণের (রাঃ) মাধ্যমে কারো প্রতি সামান্যতম বে-আদবী কিংবা অশিষ্টাচার ও এজন্য হারাম যে, তাঁরা উম্মতের মা। উপরন্তু তাঁদেরকে দুষ দিলে নবীজীকেও দুষ দেয়া হয়, যা চরমভাবে হারাম।

শব্দগত - **أَوَّلُوا الْأَرْحَامَ** - وَأَوَّلُوا الْأَرْحَامَ بِعَضْمِ أَوَّلَىٰ بِعَضْمِ

শদার্থানুযায়ী সকল আত্মীয়-স্বজনই এর অন্তর্ভুক্ত-চাই সেসব ব্যক্তিবর্গ—যাদেরকে ফকীহগণ ‘আসাবাত’ (عصبات) বলে আখ্যায়িত করেছেন বা যাদেরকে বিশেষ পরিভাষানুযায়ী ‘আসাবাতে’র মোকাবেলায় **أَوَّلُوا الْأَرْحَامَ** নামে নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য কোরআনী আয়াতের মর্ম পরবর্তীকালে গৃহীত ফেকাহর এ পরিভাষা নয়।

সারকথা এই যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) ও তদীয় পত্নীগণের সাথে মুসলিম উম্মতের সম্পর্ক যদিও পিতা-মাতার চাইতেও উন্নততর ও অগ্রস্থানীয়, কিন্তু মীরাসের ক্ষেত্রে তাদের কোন স্থান নেই; বরং মীরাস বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে বন্টিত হবে।

ইসলামের সূচনাকালে মীরাসের অংশীদারিত্ব ঈমান ও আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। পরবর্তী সময়ে তা রহিত করে আত্মীয়তার সম্পর্কেই অংশীদারিত্ব নির্ধারণের ভিত্তি ধার্য করে দেয়া হয়েছে। স্বয়ং কোরআন করীমই তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছে। এতদসংশ্লিষ্ট রহিতকারী ও রহিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে সূরায় আনফালে প্রদত্ত হয়েছে। আয়াতে **الْمُؤْمِنِينَ** এর পরে আবার **وَالْمُؤْمِنَاتِ** এর উল্লেখ এক্ষেত্রে তাঁদের বিশিষ্টতা ও স্বাভাবিক প্রকাশের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

কোন কোন মনীষীর মতে এখানে ‘মু’মিনীন’ বলে আনসারগণকে বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এ আয়াত হিজরতের মাধ্যমে মীরাসে অধিকার প্রদান সংক্রান্ত পূর্ববর্তী হুকুমের রহিতকারী (নাসেখ) বলে বিবেচিত হবে। কেননা, নবীজী হিজরতের প্রারম্ভিককালে মুহাজিরীন ও আনসারের মাঝে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে হিজরতের ফলে উত্তরাধিকার লাভ সংক্রান্ত সে হুকুমও রহিত করা হয়েছে।—(কুরতুবী)

অর্থাৎ, উত্তরাধিকার তো **أَلَّا تَقُولُوا لَإِلَٰهِكُمْ مُّشْرُكُونَ**

কেবল আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতেই লাভ করা যাবে। কোন অনাত্মীয় উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। কিন্তু ঈমানী ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের কারণে কাউকে কিছু প্রদান করতে চাইলে সে অধিকার বহাল থাকবে—নিজ জীবদশায়ও দান ও উপটোকন হিসেবে তাদেরকে প্রদান করতে পারবে এবং মৃত্যুর পর তাদের জন্য ওসিয়তও করা যাবে।

وَلَا تَأْخُذْ تَاوِينَ الَّذِينَ يُبَيِّنُ مِثْلَهُمْ وَمِنْكُمْ وَهُمْ قَوْلُهُمْ
وَمَوْسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّثْلًا لَّعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ الصِّدِّيقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودُ
فَارِسَيْنَا عَلَيْهِمْ رَمِيًا فَوَجَدْتُمُوهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُمُ خَبِيرًا
بَصِيرًا إِذْ جَاءَكُمْ تَوْكَدٌ مِنْكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ
رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ بَارِقَةً فَلَمَّاتِ الْفُلُوبُ النَّجَارُ وَتَشْتَبَهُنَّ بِاللَّهِ
الظُّنُونُ هَذَا الَّذِي كَذَّبُوا عَنْكُمْ وَرَأَوُا رَسُولَ اللَّهِ فَاتَّبَعُوهُ
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا هَلْ
يَنْتَرِبُ لِمَقَامِكُمْ فَاذْجَعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنَ النَّبِيِّ
يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنَّا زُرِّيْتُمْ بِالْأَقْصَى
فَرَارًا وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ
لَأَوْتَاهَا مَا لَبِئْتَ أُولَئِكَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ كَانُوا عَاكِفًا عَلَى الْوَاقِعِ
مَنْ قَبْلَ لَابِئْتُمْ الْأَوْبَانَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

(৭) যখন আমি পয়গম্বরগণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, ইবরাহীম, মুসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম এবং অঙ্গীকার নিলাম তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার— (৮) সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্যে। তিনি কাকেরদের জন্য যজ্ঞাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। (৯) হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে রক্তবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। (১০) যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিগ্রহণ হচ্ছিল, প্রাণ কঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করছিলে। (১১) সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং জীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল। (১২) এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রসুলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়। (১৩) এবং যখন তাদের একদল বলেছিল হে ইয়াসরেববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ী-ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। (১৪) যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, অতঃপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না। (১৫) অথচ তারা পূর্বে আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহ্র অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

এ সূরার শুরুতে নবী করীম (সঃ)—কে তাঁর উপর অবতরিত ওহী অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে “আপনার উপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে ওহী অবতরিত হয়েছে, তা অনুসরণ করুন।” আর আলোচ্য আয়াত **الَّذِينَ آمَنُوا بِالْمُؤْمِنِينَ** এর মাধ্যমে মুমিনগণের উপর পয়গম্বর (সঃ)—এর নির্দেশাবলী পালন করা ওয়াজিব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ দুটো কথাই আরো অধিক প্রমাণ ও প্রকাশের উদ্দেশে উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে দুটি বিষয় বিবৃত হয়েছে। অর্থাৎ, সাহেবে ওহীর পক্ষে তাঁর উপর অবতরিত ওহীর এবং অন্যান্যদের পক্ষে সাহেবে ওহীর অনুসরণ করা ওয়াজিব—অপরিসংখ্য।

নবীগণের অঙ্গীকার গ্রহণ : উল্লেখিত আয়াতে নবীগণ থেকে যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণের কথা আলোচিত হয়েছে তা সমস্ত মানবকুল থেকে গৃহীত সাধারণ অঙ্গীকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন, মেশকাত শরীফে ইমাম আহমদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে—“রসালত ও নবুওয়ত সংক্রান্ত অঙ্গীকার নবী ও রসূলগণ থেকে স্বতন্ত্ররূপে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যথা আল্লাহ্র পাকের বানী **وَلَا تَأْخُذْ تَاوِينَ الَّذِينَ يُبَيِّنُ مِثْلَهُمْ**”

নবী (আঃ)—গণ থেকে গৃহীত এ অঙ্গীকার ছিল নবুওয়ত ও রেসালত বিষয়ক দায়িত্বসমূহ পালন এবং পরস্পর সত্যতা প্রকাশ ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান সম্পর্কিত। ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ হযরত কাতাদা (রাঃ) থেকে অনুগ্রহ রেওয়ায়েত করেছেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে একথাও নবীগণের (আঃ) এ অঙ্গীকারভুক্ত ছিল যেন তাঁরা সকলে এ ঘোষণাও করেন যে—“মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র রসূল, তাঁর পরে কোন নবী আসবেন না।”

وَمِنْكُمْ نُوْحٌ—সাধারণভাবে সমস্ত নবীগণের কথা উল্লেখের পর পাঁচ জনের নাম বিশেষভাবে এজন্ম উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীকুলের মধ্যে তাঁরা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। এঁদের মধ্যে রসূলে মকবুল (সঃ)—এর আবির্ভাব সকলের শেষে হয়ে থাকলেও **وَمِنْكُمْ** শব্দের মাধ্যমে নবীজীকে সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। যার কারণ হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : আমি (নবীকুলের মাঝে) সৃষ্টিপূর্ণ দিক দিয়ে আসে, কিন্তু আবির্ভাব ও নবুওয়ত প্রাপ্তির দিক দিয়ে সকলের পরে।—(যাযহরী)

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্র (সঃ) অন্যান্য ও মহান মর্যাদার বর্ণনা এবং মুসলমানদের প্রতি তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণ ও পদাঙ্ক অনুসরণের নির্দেশ ছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আহযাব (সম্মিলিত বাহিনী) যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কিত কোরআন পাকের এ দুঃকৃত্ত অবতীর্ণ হয়েছে।—যাতে মুসলমানদের উপর কাকের ও মুশরিকদের সম্মিলিত আক্রমণ ও কঠিন পরিবেষ্টনের পর মুসলমানদের প্রতি মহান আল্লাহ্র নানাবিধ অনুগ্রহবাছি এবং রসূলুল্লাহ্র (সঃ) বিভিন্ন মুজ্জিবাত বর্ণনা রয়েছে। আর আনুশঙ্গিকভাবে জীবনের বিভিন্ন দিক স্পষ্টতই বহুবিধ হেলায়েত ও নির্দেশাবলী রয়েছে। এসব অমূল্য নির্দেশাবলীর দরুন কুরত্বী ও মাযহারীসহ সব বিশিষ্ট তফসীরকারকগণই আহযাবের ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। আহযাব যুদ্ধে মুসলমানদের কঠিন বিশদ ও দুঃকটে পতিত হওয়ার কথা বর্ণনা করে এ মহাবিশ্বের সময়ে মুসলমানদের এক অবস্থা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে—**وَكُنْتُمْ لِللَّهِ كَافِرًا**—অর্থাৎ

[illegible]

(১৬) বলুন। তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর, তবে এ পলায়ন তোমাদের কাছে আসবে না। তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে। (১৭) বলুন। কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুকম্পার ইচ্ছা? তারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যদাতা পাবে না। (১৮) আল্লাহ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের কাছে এস। তারা কইই যুদ্ধ করে। (১৯) তারা তোমাদের প্রতি কুট্যবোধ করে। যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির মত চোখ উন্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। অতঃপর যখন বিপদ টলে যায় তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তারা মুমিন নয়। তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর জন্যে সহজ। (২০) তারা মনে করে শত্রুবাহিনী চলে যায়নি। যদি শত্রুবাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিত, তবেই ভাল হত। তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করত। (২১) যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক সুরণ করে, তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (২২) যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল, তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ইমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল।

আল্লাহ পাক সম্পর্কে তোমরা বিভিন্ন ধারণা পোষণ করছিলে। এসব ধারণা দ্বারা সেসব ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণাসমূহকেই বোঝানো হয়েছে—যেগুলো সঙ্কটকালে মানব মনে উদয় হয়—যেমন, মৃত্যু আসন্ন ও অনিবার্য; বাঁচার আর কোন উপায় নেই ইত্যাদি। এরূপ ইচ্ছা বহির্ভূত ধারণা ও কল্পনাসমূহ পরিপক্ব ঈমান বা পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। অবশ্য এগুলো চরম দুর্বিপাক ও কঠিন বিপদের পরিচায়ক ও সাক্ষ্যবাহক। কেননা, পর্বতবৎ অনড় ও দৃঢ়দ সাহায্যে কেরামের অন্তরেও এ ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে।

মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অঙ্গীকারসমূহকে ভাঁওতা ও প্রতারণা বলে আখ্যায়িত করতে লাগল :

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنِفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

—অর্থাৎ, যখন কপটবিশ্বাসী এবং ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট
লোকেরা বলতে লাগল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের এসব
অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বই কিছুই নয়। এতো ছিল তাদের
আভ্যন্তরীণ কুফরীর বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তী পর্যায়ে যেসব মুনাফিক
কার্যতঃ—বাহিকভাবে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক ছিল তাদের
দু'শ্রেণী ছিল। প্রথম শ্রেণী—যারা কিছু না বলেই পালাতে লাগল এবং
বলতে লাগল

ইয়াসরেববাসীর। তোমাদের টিকে থাকার উপায় নেই, সুতরাং ফিরে চল। আর অপর শ্রেণী যারা ছল-চাতুরী বের করে হযরত (শঃ)-এর নিকট ফিরে যাওয়ার আবেদন করল। তাদের অবস্থা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে

وَيَسْتَأْذِنُ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ أَن يُبَدِّلُوا الْكُتُبَ لَعَلَّ بَعْضٌ يَتَذَكَّرُ لِمَا يَكْفُرُونَ ۚ إِنَّهُمْ يَبُغُونَهُمْ أَكْثَرُ ۚ وَبِهِمْ عَدُوٌّ غَيْبٌ ۚ وَرِجْسٌ لِّبَنِي آدَمَ ۚ بَنِي آدَمَ ۚ وَبَنِي نُوحَ ۚ وَبَنِي إِبْرَاهِيمَ ۚ وَبَنِي إِسْمَاعِيلَ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي رَجْسٍ مِّنْ عِندِ رَبِّكَ ۚ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۚ

অর্থাৎ, এদের

মাঝে একদল নবীজীর নিকট এই বলে ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইতে লাগল যে, আমাদের বাড়ী অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। কোরআন করীম এদের ছল-চাতুরীর স্বরূপ উঘাটন করে দিয়েছে যে, এ সবকিছুই মিথ্যা। আসলে এরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যেতে চায়, পরবর্তী কয়েক আয়াতে এদের কু-কীর্তি, অপকৃষ্টতা এবং মুসলমানদের সাথে এদের শত্রুতা অত্যন্তরূপে এদের করুণ ও মর্মস্পন্দ পরিণতির বর্ণনা রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এরপর অকপট ও খাঁটি মুসলিমগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে এদের অসম দৃঢ়তার প্রশংসা করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণ-অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা ও অপরিহার্যতাকে মূলনীতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। —

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রসুলুল্লাহর (সাঃ) মধ্যে উত্তম অনুপম আদর্শ রয়েছে। এদ্বারা রসুলুল্লাহর (সাঃ) বাণীসমূহ ও কার্যাবলী উভয়ই অনুসরণের স্ক্রম রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু বিশিষ্ট মুফাসসেরগণের মতে এর বাস্তব ও কার্যকরীরূপ এই যে, যেসব কাজ করা বা পরিহার করা সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সাঃ) দ্বারা অবশ্য করণীয় স্তর পর্যন্ত পৌছেছে বলে প্রমাণিত, তা অনুসরণ ওয়াজিব ও অপরিহার্য। আর যেগুলো করা বা বর্জন করা উত্তম (মুস্তাহাব) হওয়ার স্তর পর্যন্ত পৌছেছে, তা করা বা বর্জন করা আমাদের ক্ষেত্রে ও মুস্তাহাবের স্তরেই থাকবে।—তা আমান্য করা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَيَنْهَمُ
 مَنْ قَضَىٰ عَلَيْهِ وَهُمْ مَن يَنْظُرُونَ وَمَا لَكُمْ لَا تُبَاقِلُونَ
 اللَّهُ الصُّدُوقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيَعَذِّبُ الْمُتَفَعِّلِينَ إِنْ سَاءَ أَوْ
 يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِعَيْثِهِمْ لَمْ يَأْتُوا خَيْرًا وَلَوْ كَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ
 وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۝ وَانزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ
 الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهُمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرَمَقُوا
 تَهْتَلُونَ وَنَارِيضُونَ قُرَيْشًا ۝ أَوَرَزَكُمُ اللَّهُ رُحْمًا وَأَرْحَمُ
 أَمْوَالِهِمْ وَأَرْحَمُ نَظْمِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَرْوَاحِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
 وَزَيَّادَهَا فَتَعَالَىٰ أَمْتَعِكُمْ وَأَسْرَحُكُمْ سَرَّاحًا جِيدًا ۝
 وَلَنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارِ الْآخِرَةَ فَإِنَّ
 اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْجَزَاءِ عَظِيمًا ۝ لَيْسَ أَلِ
 النَّبِيِّ مِنْ بَنَاتٍ مِّثْلُكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّؤَيَّدَةٍ ۝ يُضَعِّفُ
 لَهَا الْعَذَابَ ضِعْفَيْنِ ۝ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

(২৩) মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মতুবরন করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে। তারা তাদের সংকল্প মাটেই পরিবর্তন করেনি। (২৪) এটা এজন্যে যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার কারণে প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৫) আল্লাহ কাকেরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্যে যেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ শক্তিশ্বর, পরাক্রমশালী। (২৬) কিতাবীদের মধ্যে যারা কাকেরদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা একদলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ। (২৭) তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘর-বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূ-খণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন, যেখানে তোমরা অভিযান করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়োপরি সর্বশক্তিমান। (২৮) হে নবী! আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্শ্বি জীবন ও তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। (২৯) পক্ষান্তরে যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসুল ও পরকাল কামনা কর, তবে তোমাদের সংকল্পপরায়ণদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৩০) হে নবী পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাছ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। এটা আল্লাহর জন্যে সহজ।

উল্লেখিত আয়াতসমূহের সর্বশেষে তিন আয়াতে বনু-কোরাযযার ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

وَانزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ۝ অর্থাৎ, যে সকল আহলে কিতাব সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর সহযোগিতা করেছে, আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কোরামের প্রতি ভীতি সঞ্চার করে তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত দুর্গ থেকে নীচে নামিয়ে দেন এবং তাদের ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ী মুসলমানগণের স্বত্বভুক্ত করে দেন।

সর্বশেষ আয়াতে মুসলমানদের অদূর ভবিষ্যতে জয়যাত্রার সুসংবাদ দান করা হয়েছে যে, এখন থেকে কাকেরদের অগ্রাভিযানের অবসান এবং মুসলমানদের বিজয় যুগের সূচনা হলো। আর এমনসব ভূ-খণ্ড তাদের অধিকারভুক্ত হবে যেগুলোর উপর কখনো তাদের পদচারণা পর্যন্ত হয়নি। যার বাস্তবায়ন সাহাবায়ে কোরামের যুগে বিশ্বমানব প্রত্যক্ষ করেছে। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের এক বিশাল ও সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁদের অধিকারভুক্ত হয়। আল্লাহ পাক যা চান তাই করেন।

এই সূরার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সেসব বস্তু ও কার্যাবলী পরিহার করার প্রতি তাগিদ দেয়া, যেগুলো রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কষ্ট ও মর্ম বেদনার কারণ হতে পারে। এতদ্বিন্ত তাঁর (সাঃ) আনুগত্য ও সম্ভ্রান্তি বিধান সম্পর্কিত নির্দেশাবলীও রয়েছে। উপরে বর্ণিত পরিহার যুদ্ধের বিস্তারিত ঘটনার মধ্যে রসুলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি কাকের ও মুনাফিকদের অসহনীয় দুঃখ-কষ্ট প্রধান পরিণামে নির্যাতনকারী কাকের ও মুনাফিকদের চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননা এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অতুলনীয় বিজয় ও সাফল্যের বিবরণ ছিল। সত্বে সত্বে সেসব নিষ্ঠাবান মুমিনগণের প্রশংসা এবং পরকালে তাঁদের উচ্চ মর্যাদারও বর্ণনা ছিল, যারা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদেশ-ইঙ্গিতে নিজেদের সর্বস্ব কোরবান করে দিয়েছিলেন।

উপরোক্তোক্ত আয়াতসমূহে নবীজীর (সাঃ) পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যেন তাঁদের কোন কথা ও কাজের দ্বারা হুযুর পাকের (সাঃ) প্রতি কোন দুঃখ-যন্ত্রণা না পৌছে; সেদিকে যেন তাঁরা যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করেন। আর তা তখনই হতে পারে, যখন তাঁরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসুলের (সাঃ) প্রতি পূর্ণভাবে অনুগত থাকবেন। এ প্রসঙ্গে পুণ্যবতী পত্নীগণকে (রাঃ) সম্বোধন করে কয়েকটি নির্দেশ রয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ আয়াতসমূহে তাঁদেরকে যে তালাক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, এ সম্পর্কিত পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ) কর্তৃক স্বেচ্ছিত এক বা একাধিক এমন ঘটনা রয়েছে, যা নবীজীর মর্জির পরিপন্থী ছিল, যদ্বারা রসুলুল্লাহ (সাঃ) অনিচ্ছাকৃতভাবেই দুঃখ পান।

এসব ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনা যা সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত জাবেরের (রাঃ) রোগগ্রস্ততায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, একদিন পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ) সমবেতভাবে রসুলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে তাঁদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী পেশ করেন। বিশিষ্ট মুফাস্সের আবু হাইয়ান এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা তফসীরে বাহরে-মুহীতে প্রদান করেন যে, আহযাব যুদ্ধের পর বনু-নবীর

ও বনু-কোরাযযার বিজয় এবং গনীমতের মাল বন্টনের ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। এ পরিপ্রেক্ষিতে পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ) ভাবলেন যে, মহনবী (সাঃ) হয়ত এসব গনীমতের মাল থেকে নিজস্ব অংশ রেখে দিয়েছেন। তাই তাঁরা সমবেতভাবে নিবেদন করলেন—ইয়া রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)। পারস্য ও রোমের সম্রাজ্ঞীরা নানাবিধ গহনাপত্র ও বহু মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করে থাকে। তাদের সেবা-যত্নের জন্য অগণিত দাস-দাসী রয়েছে। আমাদের দারিদ্র্যপীড়িত জীর্ণ-শীর্ণ করুণ অবস্থা তো আপনি স্বয়ংই দেখতে পাচ্ছেন। তাই মেহেরবানীপূর্বক আমাদের জীবিকা ও অন্যান্য খরচাদির পরিমাণ খানিকটা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করুন।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রাঃ) পক্ষ থেকে দুনিয়াদার ভোগ-বিলাসী রাজ-রাজড়াদের পরিবেশে বিদ্যমান জৌলুস ও সুযোগ-সুবিধা কিছুটা হলেও প্রদানের দাবীতে উপস্থাপিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ কারণে বিশেষভাবে মর্মাহত হন যে, তাঁরা এতদিনের সংসর্গ এবং প্রশিক্ষণ লাভের পরও নবী গৃহের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। ফলে নবীজী (সাঃ) যে দুঃখিত হবেন তা তাঁরা ধারণা করতে পারেননি। সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রাচুর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি দেখে তাঁদের মাঝে খানিকটা প্রাচুর্যের অভিলাষ উদয় হয়েছিল। ভাষ্যকার আবু হাইয়ান বলেন যে, আহযাবের যুদ্ধের পর এ ঘটনা বর্ণনার দ্বারা একথাই সমর্থিত হয় যে, নবী পত্নীগণের (রাঃ) এ দাবীই ছিল তাঁদেরকে তালক গ্রহণের অধিকার প্রদানের কারণ।

কোন কোন রেওয়াজে অনুসারে পরবতী সূরায় তাহরীমে সবিস্তারে বর্ণিত হয়ত যখনবের (রাঃ) গৃহে মধুপানের কারণে স্ত্রীগণের (রাঃ) পারস্পরিক আত্মমর্যাদাবোধের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিই তালকের অধিকার প্রদানের কারণ। এক্ষণে যদি উভয় ঘটনা কাছাকাছি সময়েই সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে উভয় কারণরূপে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু অধিকার প্রদান সংক্রান্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলী দ্বারা একথারই সমর্থন অধিক মিলে যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে কোন প্রকারের আর্থিক দাবীই এর কারণ ছিল। কেননা, আয়াতে এরশাদ হয়েছে اِنَّكَ تَكْفُلُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَرَبِّهَا অর্থাৎ, যদি তোমরা পার্থিব জীবনের জৌলুস ও চাকচিক্য কামনা কর.....।

এ আয়াতে সকল পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে (রাঃ) অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, তাঁরা নবীজীর (সাঃ) বর্তমান দারিদ্র্যপীড়িত চরম আর্থিক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা বরণ করে হয় তাঁর (সাঃ) সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখে জীবন যাপন করবেন অথবা তালকের মাধ্যমে তাঁর থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। প্রথমবস্থায় অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরস্কার এবং পরকালে স্বতন্ত্র ও সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী হবেন। আর দ্বিতীয় অবস্থা, অর্থাৎ—তালক গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেও তাঁদেরকে দুনিয়ার আপরাপর লোকের ন্যায় বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না; বরং সুনুত মোতাবেক যুগল বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করে সসম্মানে বিদায় দেয়া হবে।

তিরমিযী শরীফে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন অধিকার প্রদানের এ আয়াত নাযিল হয়, তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে এটি প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন। আয়াত শোনানোর পূর্বে বলেন যে, আমি তোমাকে একটি কথা বলব—উত্তরটা কিন্তু তাড়াহুড়া করে দেবে না। বরং তোমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শের

পর দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, আমাকে আমার পিতা-মাতার সাথে পরামর্শ না করে মতামত প্রকাশ করা থেকে যে বারণ করেছিলেন, তা ছিল আমার প্রতি তাঁর (সাঃ) এক অপার অনুগ্রহ। কেননা, তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল যে, আমার পিতা-মাতা কক্ষনো আমাকে রসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের পরামর্শ দেবেন না। এ আয়াত শোনার সংগে সংগেই আমি আরয় করলাম যে, এ ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার পরামর্শ গ্রহণের জন্য আমি যেতে পারি কি? আমি তো আল্লাহ পাক, তাঁর রসুল ও পরকালকে বরণ করে নিছি। আমার পরে অন্যান্য সকল পুণ্যবতী পত্নীগণকে (রাঃ) কোরআনের এ নির্দেশ শোনানো হলো। আমার মত সবাই একই মত ব্যক্ত করলেন; রসুলুল্লাহর (সাঃ) সাথে দাম্পত্য সম্পর্কের মোকাবেলায় ইহলৌকিক প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেউ গ্রহণ করলেন না।—(তিরমিযী শরীফে এ হাদীস সহীহ ও হাছান বলে মন্তব্য করা হয়েছে।)

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের (রাঃ) একটি বেশিষ্টা : يُسَيِّئَةُ النَّبِيِّ مَنْ تَزَوَّجَهَا مِنْهُمْ وَ يُؤْتِيَتْ مِنْهُمْ وَ هَذِهِ آيَةُ مَنْ تَزَوَّجَهَا مِنْهُمْ وَ هَذِهِ آيَةُ مَنْ تَزَوَّجَهَا مِنْهُمْ (রাঃ) এ বেশিষ্টা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা যদি ঘটনাক্রমে কোন পাপ কাজ করেন, তবে তাঁদেরকে অন্যান্য মহিলাগণের তুলনায় দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করা হবে। অর্থাৎ, তাঁদের একটি পাপ অন্যদের দুটি পাপের সমান হবে। অনুরূপভাবে তাঁদের দ্বারা কোন নেক কাজ সংঘটিত হলেও অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবেন।

একদিক দিয়ে আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সে আমলের প্রতিদান যা তারা অধিকার প্রদানের আয়াত নাযিল হওয়ার পর পার্থিব ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের উপর নবীজীর (রাঃ) সাথে দাম্পত্য সম্পর্কে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। যার বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাঁদের একটি আমলকে দু'য়ের মানে উন্নত করেছেন। আর গোনাহর বেলায় দ্বিগুণ শাস্তিলাভও তাঁদের স্বতন্ত্র মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতেই হয়েছে।

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের উপর আল্লাহ পাকের অনুগ্রহরাজি ছিল অতি মহান। কেননা, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে নবীজীর (সাঃ) পত্নীরূপে মনোনীত করেছেন—তাঁদের গৃহে ওই নাযিল করেছেন। সুতরাং তাঁদের নগণ্য ক্রটি-বিচ্যুতি আর দুর্বলতাও বড় বলে বিবেচিত হবে।

فَاحْشَةُ مُبِينَةٍ - فَاحْشَةُ আরবী ভাষায় অশ্লীলতা, ব্যভিচার প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ শব্দটি সাধারণ পাপ-পঙ্কিলতা অর্থেও কোরআনে বহু জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে فَاحْشَةُ শব্দ যিনা বা ব্যভিচার অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। কেননা, আল্লাহ পাক সমস্ত নবীর স্ত্রীকুলকে এই জঘন্য ক্রটি থেকে মুক্ত রেখেছেন। সমস্ত আশ্বিয়া (আঃ)—এর স্ত্রীগণের মধ্যে কারো দ্বারা এরূপ অপকর্ম সংঘটিত হয়নি। হযরত লূত ও নূহ (সাঃ)—এর স্ত্রীগণ তাঁদের ধর্ম থেকে পরাশ্রমুখ ছিল-অবাধ্যতা ও ওঙ্কড়া প্রদর্শন করেছিল, যার শাস্তিও তারা লাভ করেছিল, কিন্তু তাদের কারো উপরই ব্যভিচারের অপবাদ ছিল না। আযওয়াজে মোতাহহারাত থেকে কোন প্রকারের অশালীনতা ও অশ্লীলতার বহিঃপ্রকাশ তো সম্ভবই ছিল না। সুতরাং এ আয়াতে فَاحْشَةُ অর্থ সাধারণ গোনাহ বা রসুলুল্লাহর (সাঃ) কষ্টের কারণ হওয়া বোঝানো হয়েছে। এখানে فَاحْشَةُ শব্দের সাথে مُبِينَةٍ শব্দের দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়। কেননা, যেনা বা ব্যভিচার কখনো প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত হয় না। বরং তা পর্দার আড়ালে গোপনে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং فَاحْشَةُ مُبِينَةٍ

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا
تُؤْتِيَهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۝ لِيَسَاءَ
الَّذِي كَسَبَتْ كَأَحْسَنِ مِنَ السَّاءِ إِنْ أَتَقْنَتْ فَلَا تَخْشَعَنَّ
يَا قَوْلُ قَيْطَمَةَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝ وَأَذْكُرْنَ مَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۝
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْمُحْفَظِينَ
فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

(৩১) তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অনুগত হবে এবং সংকর্ম করবে, আমি তাকে দু'বার পুরস্কার দেব এবং তার জন্য আমি সম্মানজনক রিমিক প্রস্তুত রেখেছি। (৩২) যে নবী পরীক্ষণ। তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুদ্বাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে। (৩৩) তোমরা গৃহভাঙ্তরে অবস্থান করবে—মুখতা মুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। নামায কায়ম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে। হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণপুরে পূত-পবিত্র রাখতে। (৩৪) আল্লাহর আয়াত ও জ্ঞানগত কথা, যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয় তোমরা সেগুলো স্মরণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ স্মৃদ্যদর্শী, সর্ববিষয়ে খবর রাখেন। (৩৫) নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ, ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যোনাঙ্গ হেফাযতকারী পুরুষ, যোনাঙ্গ হেফাযতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী—তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

এর অর্থ সাধারণ পাপ বা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়া। বিশিষ্ট মুফাসসেরগণের মধ্যে মোকাতেল ইবনে সোলাইমান এ আয়াতে ‘ফাহেশা’র অর্থ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাফরমানী বা তাঁর নিকট এমন দাবী পেশ করা যা তাঁর (সাঃ) পক্ষে পূরণ করা কঠিন বলে ব্যক্ত করেছেন।—
(বায়হাকী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পুণ্যবতী স্ত্রীগণের প্রতি বিশেষ হেদায়েত : **يُسَاءُ الدِّيْنِ لِسُتْنٍ**
كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَقِيْتُنَّ فَلَا تَضَعْنَ بِاَلْقَوْلِ -পূর্ববতী আয়াত-

সমূহে পূণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ)—কে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সমীপে এমনসব দাবী পেশ করতে বারণ করা হয়েছে; তাঁর পক্ষে যা পূরণ করা কঠিন বা যা তাঁর মহান মর্যাদার পক্ষে অশোভনীয়। যখন তাঁরা তা মেনে নিয়েছেন তখন সাধারণ নারীদের তুলনায় এসময় তাঁদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাঁদের এক আমলকে দু'য়ের সমতুল্য করে দেয়া হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের কর্মের পরিসংখ্যিক এবং রসুলুল্লাহর (সাঃ) সান্নিধ্য ও দাম্পত্য সম্পর্কের যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য কয়েকটি হোয়ায়েত দান করা হয়েছে। এসব হেদায়েত যদিও পূণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং সমগ্র মুসলিম নারীকুলের প্রতিই তা নির্দেশিত। কিন্তু এখানে তাঁদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করে তাঁদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, এসব আমল ও আহুকাম তো সমগ্র মুসলিম রমণীকুলের প্রতি ওয়াজিব ও অবশ্য পালনীয়। তাই এগুলোর প্রতি তাঁদের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

নবীজীর (সাঃ) পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের
চাইতে শ্রেষ্ঠ কি? আয়াতের শব্দাবলী দ্বারা বাহ্যিকভাবে বোঝা যায়,
রসূলুল্লাহর (সাঃ) পুণ্যবতী স্ত্রীগণ বিশ্বের সমস্ত নারীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু হযরত মরিয়ম (সাঃ) সম্পর্কে কোরআনের বাণী এই اَمَّا هِيَ اَصْطَفٰكَ وَطَهَّرَكُ وَاَصْلَحٰكَ عَلٰى رِسَالَةِ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আপনাকে মনোনীত করেছেন, পবিত্র ও কালিমাযুক্ত করেছেন এবং বিশেষ সমস্ত নারীকূলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।' এতে হযরত মরিয়ম (আঃ) সমস্ত নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়। তিরিমিযী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন—সমগ্র রমণীকূলের মধ্যে হযরত মরিয়ম, উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা, হযরত ফাতেমা এবং ফেরাউন পত্নী হযরত আসিয়াহী (রাঃ) তেমাাদের জন্যে যথেষ্ট। এ হাদীসে হযরত মরিয়মের সাথে আরো তিন জনকে নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে আযওয়াজ্জে মোতাহহারাতের যে শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মার্যাদার কথা বলা হয়েছে, তা এক বিশেষ দিক বিবেচনায়—নবী পন্থী হিসেবে। এদিক দিয়ে তাঁরা নিঃসন্দেহে সমস্ত রমণীকুলের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এদ্বারা সকল দিক দিয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না—যা কোরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের পরিপন্থী।—(মায়হারী)

ان التَّقِيْنَ আল্লাহ পাক তাঁদের
 كُنْى كَحَامِلِ مِنَ التَّوْبَةِ এরপর
 নবী পত্নী হিসেবে যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তারই ভিত্তিতে এ শর্ত। এর
 উদ্দেশ্য এ বিষয়ে সতর্ক করে দেয়া যেন তারা নবীজীর (সাঃ) পত্নী হওয়ার
 উপর ভরসা করে বসে না থাকেন। বস্তুতঃ তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের শর্ত হলো

তাকওয়া এবং আহকামে ইলাহিয়ার অনুসরণ ও অনুকরণ।—(কুরতুবী ও মাযহারী)

এরপর আযওয়াজে মোতাহহারাতের উদ্দেশ্যে কয়েকটি হেদায়েত রয়েছে।

প্রথম হেদায়েত : নারীদের পর্দা সম্পর্কিত, তাদের কণ্ঠ ও বাক্যলাপ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত **فَلَا تَقْفُضْنَ بِالْقَوْلِ** অর্থাৎ, যদি পরপুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে বাক্যলাপের সময় কৃত্রিমভাবে নারী কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে। অর্থাৎ, এমন কোমলতা, যা শ্রোতার মনে অব্যাহিত কামনা সঞ্চার করে। যেমন এরপরে বিবৃত হয়েছে **فَيُطَمِّعُ الْكَافِرِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ** অর্থাৎ,

এরূপ কোমল কণ্ঠে বাক্যলাপ করা না, যাতে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকের মনে কুলালসা ও আকর্ষণের উদ্বেক করে। ব্যাধি অর্থ নেফাক (কপটতা) বা এর শাখা বিশেষ। প্রকৃত মুনাফিকদের মনে এমন লালসার সঞ্চার হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু কোন লোক খাটি মুমিন হওয়া সম্ভবও যদি কোন হারামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে সে মুনাফিক নয় সত্য, কিন্তু অবশ্যই দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট। এরূপ দুর্বল ঈমান, যা হারামের দিকে আকৃষ্ট করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তা কপটতারই শাখাবিশেষ।—(মাযহারী)

প্রথম হেদায়েতের সারমর্ম এই যে, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করা উচিত যাতে কোন অপরিচিত দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোন কামনা ও লালসার উদ্বেক তো করবেই না; বরং তার নিকটও যেন ঘেঁষতে না পারে। আয়াতে বর্ণিত বাক্যলাপ-সংশ্লিষ্ট হেদায়েতসমূহ শ্রবণ করার পর উম্মাহাভুল মুমিনীগণের কেউ যদি পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বলতেন, তবে মুখে হাত রেখে বলতেন— যাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যায়। এজন্যই হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে। ‘নবী করীম (সাঃ) নারীদেরকে নিজ নিজ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাক্যলাপ করতে বিশেষভাবে বারণ করেছেন।—(তাবারানী, মাযহারী)।

দ্বিতীয় হেদায়েত : পূর্ণ পর্দা করা সম্পর্কিত **وَرَفْنًا فِي بِيُوتِكُنَّ**

—অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর এবং জাহেলিয়াত যুগের নারীদের মত দেহ সৌন্দর্য ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে ঘোরাক্ষেপা করো না। এখানে পূর্ববর্তী জাহেলিয়াতযুগ বলে ইসলামপূর্ব অন্ধ যুগকে বোঝানো হয়েছে—যা বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। এ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এরপর আবার অপর কোন অজ্ঞতার প্রাদুর্ভাবও ঘটতে পারে, যে সময় একই রকম নির্লজ্জতা ও পর্দাহীনতা বিস্তার লাভ করবে। সেটা সম্ভবতঃ এ যুগেরই অজ্ঞতা যা অধুনা বিশ্বের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত আসল হুকুম এই যে, নারীগণ গৃহেই অবস্থান করবে। অর্থাৎ, শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে বের হবে না। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, যেভাবে ইসলামপূর্ব অজ্ঞ যুগের নারীরা প্রকাশভাবে বেপর্দা চলাফেরা করত—তোমরা সেরকম চলাফেরা করো না। **يُزَيِّنُ** শব্দের মূল অর্থ প্রকাশ ও প্রদর্শন করা। এখানে এর অর্থ পরপুরুষ সমীপে নিজের রূপ প্রদর্শন করা। যেমন, অন্য আয়াতে রয়েছে **عَرِيسَةً بَرِيعَةً** (অর্থাৎ, সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে)। নারীদের পর্দা সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা ও বিস্তারিত আহকাম এ সূরারই পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। এখানে কেবল উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হচ্ছে। এ আয়াতে পর্দা সম্পর্কিত দু’টি বিষয় জানা গেছে। প্রথমতঃ—প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ পাকের নিকট

নারীদের বাড়ী থেকে বের না হওয়াই কাম্য—গৃহকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে; এতেই তারা পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে। বস্তুতঃ শরীয়ত-কাম্য আসল পর্দা হল গৃহের অভ্যন্তরে অনুসৃত পর্দা।

দ্বিতীয়তঃ একথা জানা গেছে যে, শরয়ী প্রয়োজনের তাকিদে যদি নারীকে বাড়ী থেকে বের হতে হয়, তবে যেন সৌন্দর্য ও দেহ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে বের হয়; বরং বোরকা বা গোটা শরীর আবৃত করে ফেলে এমন চাদর ব্যবহার করে বের হবে। যেমন, সামনে সূরা আহযাবেরই **يُذِنُ لَكَ يَتَزَيَّنُ مِنْ جَلْبَابٍ** —আয়াতে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

গৃহে অবস্থান প্রয়োজন সম্পর্কিত হুকুমের অন্তর্গত নয় : **وَرَفْنًا فِي بِيُوتِكُنَّ** দ্বারা নারীদের ঘরে অবস্থান ওয়াজিব করে দেয়া হয়েছে। যার মর্ম এই যে, নারীর পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে তো নিষিদ্ধ ও হারাম। কিন্তু প্রথমতঃ এ আয়াতেই **وَلَا تَكُنَّ** দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনের পরিশ্রেক্ষিতে বের হওয়া নিষিদ্ধ নয়, বরং সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ এই সূরার পরবর্তীতে উল্লেখিত **يُذِنُ لَكَ يَتَزَيَّنُ مِنْ جَلْبَابٍ** আয়াতে এ হুকুমই রয়েছে যে, বিশেষ প্রয়োজনের পরিশ্রেক্ষিতে মেয়েদের বোরকা বা অন্য কোন প্রকারের পর্দা করে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি আছে।

এতদ্বিন্ন রসুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীস দ্বারাও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ যে এ হুকুমের অন্তর্গত নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেখানে আযওয়াজে মোতাহহারাতকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, ‘প্রয়োজনের পরিশ্রেক্ষিতে তোমাদেরকে বাড়ী থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।’ এছাড়া পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পরও রসুল্লাহ (সাঃ)—এর আমল এ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, প্রয়োজনীয় স্থলে মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমন, হজ্জ ও ওমরার সময় হযুর (সাঃ)—এর সাথে তাঁর বিবিগণের গমনের কথা বহু বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপভাবে তাঁর (সাঃ) সাথে তাঁদের বিভিন্ন যুদ্ধে গমন করাও প্রমাণিত রয়েছে। আবার অনেক রেওয়ায়েতে এ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণ পিতা-মাতা ও অন্যান্য মুহর্রিম আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে নিজদের বাড়ী থেকে বের হতেন এবং আত্মীয়-স্বজনের রোগ-ব্যাধির তথ্য নিতে যেতেন ও শোকানুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করতেন। এছাড়া নবীজীর (সাঃ) জীবদ্দশায় তাদের মসজিদে যাওয়ারও অনুমতি ছিল।

শুধু হযুরের (সাঃ) সাথে ও তাঁর সময়েই এমন ঘটেনি; বরং হযুরের ইচ্ছাকালের পরও হযরত সাওদা ও যয়নব বিনতে জাহ্শ (রাঃ) ব্যতীত অন্যান্য স্ত্রীগণের হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে গমন করার প্রমাণ রয়েছে। আর এ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামও (রাঃ) কোন আপত্তি তোলেননি।

সারকথা এই যে, কোরআন পাকের ইঙ্গিত, নবীজীর আমল ও সাহাবাগণের ইজমা অনুসারে প্রয়োজন স্থলসমূহ **وَرَفْنًا فِي بِيُوتِكُنَّ** আয়াতের মর্মের অন্তর্গত নয়, হজ্জ-ওমরাও যার অন্তর্ভুক্ত। আর স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি, নিজের পিতা-মাতা, মুহর্রিম আত্মীয়দের সহিত সাক্ষাৎ, অসুস্থ থাকা বিষয় এদের সেবা-শুশ্রূষা, অনুরূপভাবে যদি কারো জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সামান্য বা অন্য কোন পছন্দ না থাকে,

তবে চাকুরী ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বের হওয়াও এরই আওতাভুক্ত। প্রয়োজন স্থলসমূহে বের হওয়ার জন্য শর্ত হলো—অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের না হওয়া; বরণ বোরকা বা বড় চাদর পরে বের হওয়া।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)—এর বসরা গমন এবং উই যুদ্ধে (জংগে জামাল) তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে রাফেযীদের অসার ও অযৌক্তিক মন্তব্য :

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, কোরআন পাকের ইঙ্গিত, রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর আমল এবং সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) ইজমা (সর্বসম্মত রায়) দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রয়োজনীয় স্থলসমূহ **وَرْنَ يَبِيعُونَ**—আয়াতের আওতা বহির্ভূত। হজ্জ ও ওমরা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রয়োজনসমূহ যার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত উম্মে সালামা এবং সফিয়া (রাঃ) হজ্জ উপলক্ষে মক্কা তشرীফ নেন, তাঁরা সেখানে হযরত ওসমানের (রাঃ) শাহাদত ও বিদ্রোহ-সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মান্বিত হন এবং মুসলমানদের পারস্পরিক অনৈক্যের ফলে মুসলিম উম্মতের সংহতি বিনষ্ট হওয়া আর সম্ভাব্য অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় বিশেষভাবে উৎকণ্ঠিত ও উদ্বেগাকুল হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত নো'মান ইবনে বশীর, হযরত কা'ব ইবনে আযরা এবং আরো কিছুসংখ্যক সাহাবী (রাঃ) মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কা পৌছেন। কেননা, হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীগণ এদেরকেও হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এরা বিদ্রোহীদের সাথে শরীক হতে পারেননি। বরং একাজ থেকে তাদেরকে বারণ করছিলেন। হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যার পর বিদ্রোহীরা এদেরকেও হত্যার পরিকল্পনা করে। তাই তাঁরা প্রাণ নিয়ে মক্কা মোয়াজ্জমা এসে পৌছেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার (রাঃ) খেদমতে এসে পরামর্শ চান। হযরত সিদ্দীকা (রাঃ) তাঁদেরকে পরামর্শ দিলেন যে, যে পর্যন্ত বিদ্রোহীরা হযরত আলীকে পরিবেষ্টিত করে থাকবে সে পর্যন্ত যেন তাঁরা মদীনায় ফিরে না যান। আর যেহেতু হযরত আলী (রাঃ) বিদ্রোহীদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার ও বিচার-বিধান থেকে বিরত থাকছেন; সুতরাং আপনারা কিছুকাল যেখানে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেন, সেখানে গিয়ে অবস্থান করুন। যে পর্যন্ত আমীরুল মুমিনীন (রাঃ) পরিস্থিতি আয়ত্তে এনে শৃংখলা বিধানে সক্ষম না হন, সে পর্যন্ত আপনারা বিদ্রোহীদেরকে আমীরুল মুমিনীনের চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করতে থাকুন, যাতে আমীরুল মুমিনীন এসব বিদ্রোহীর বাড়াবাড়ির প্রতিকার এবং ওদের প্রতিহত করতে সক্ষম হন।

এসব মহাত্মাব্দ একথায় রাযী হয়ে বসরা চলে যেতে মনস্থ করেন। কেননা, তখন সেখানে মুসলিম সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল। এসব মহাত্মাব্দ সেখানে যেতে মনস্থির করার পর তাঁরা উম্মুল মুমিনীন হযরত সিদ্দীকার (রাঃ) খেদমতে আরম্ভ করলেন যে, যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত তিনিও যেন তাঁদের সাথে বসরাতেই অবস্থান করেন।

সে সময়ে হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীদের দাপট ও দৌরাভ্য এবং তাদের প্রতি আমীরুল মুমিনীন হযরত আলীর (রাঃ) শরীয়তী শাস্তি প্রয়োগে অক্ষমতার কথা স্বয়ং নাহজুল-বালাগতের রেওয়াজেতেও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য যে, নাহজুল-বালাগা শিয়া পণ্ডিতবর্গের নিকট বিশেষ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে সমাদৃত। এই গ্রন্থে রয়েছে যে, হযরত

আলী (রাঃ)—কে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক সূহদ ও অন্তরঙ্গ বন্ধুবর্গ পর্যন্ত এই মর্মে পরামর্শ দেন যে, যদি আপনি হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীদের যথোচিত শাস্তি বিধান করেন, তবেই তা বিশেষ কল্যাণ ও সুফল বয়ে আনবে। প্রতিউত্তরে হযরত আমীরুল মুমিনীন ফরমান যে, ভাই সকল! তোমরা যা বলছ সে সম্পর্কে আমি অজ্ঞ নই। কিন্তু এসব হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের দ্বারা মদীনা পরিবেষ্টিত থাকা অবস্থায় তা কি করে সম্ভব? তোমাদের ক্রীতদাস ও পার্শ্ববর্তী বেদুঈনরা পর্যন্ত তাদের সাথে রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি তাদের শাস্তির নির্দেশ জারী করে দেই, তবে তা কার্যকরী হবে কিভাবে?

হযরত সিদ্দীকা (রাঃ) একদিকে আমীরুল-মুমিনীনের (রাঃ) অক্ষমতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াক্ফহাল ছিলেন। অপরদিকে হযরত ওসমানের (রাঃ) শাহাদতের কারণে মুসলমানগণ যে চরমভাবে মর্মান্বিত হয়েছে সে সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। হযরত ওসমানের (রাঃ) হত্যাকারীরা আমীরুল-মুমিনীনের (রাঃ) মজলিসসমূহে শরীরে শরীক থাকা সত্ত্বেও তিনি একান্ত অক্ষম ছিলেন বলে তাদের শাস্তি বিধান ও তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ বিলম্বিত হচ্ছিল, যারা আমীরুল মুমিনীনের (রাঃ) এই অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিল না, এ ব্যাপারেও তারা তাঁকে (রাঃ) অভিযুক্ত করছিল। যাতে এ অভিযোগ-অনুযোগ অন্য কোন অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলার সূচনা না করে, সেজন্য জনগণকে ধৈর্যধারণের অনুরোধ করা, আমীরুল-মুমিনীনের শক্তি সঞ্চার করে রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করা এবং পারস্পরিক অভিযোগ-অনুযোগ ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে উম্মতের মাঝে শান্তি ও সংহতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি (হযরত সিদ্দীকা) বসরা রওয়ানা করেন। এসময়ে ভাগ্নে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়র (রাঃ) প্রমুখও তাঁর সাথে ছিলেন। এ সফরের যে উদ্দেশ্য স্বয়ং উম্মুল মুমিনীন (রাঃ) হযরত কা'কার (রাঃ) নিকট ব্যক্ত করেছেন তা পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণিত হবে। এই চরম অশান্তি ও অরাজকতার সময় মুমিনদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা যে কত মহান ও গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি খেদমত ছিল, তা একেবারে সুস্পষ্ট এতদুদ্দেশ্যে যদি উম্মুল মুমিনীনের (রাঃ) স্বীয় মুহরেম আত্মীয়-স্বজনের সাথে উটের হাওদায় পূর্ণ পর্দার মধ্যে বসরা গমনকে কেন্দ্র করে 'তিনি কোরআনী আহকামের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন' বলে শিয়া ও রাফেযী সম্প্রদায় অপপ্রচার করে থাকে, তবে তার কোন যৌক্তিকতা ও সারবত্তা আছে কি?

মুনাফেক ও দুষ্কৃতকারীদের যে অপকীর্তি পরবর্তী পর্যায়ে গৃহযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) কোন ধারণা বা কল্পনাও ছিল না। এ আয়াতের তফসীরের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

নবীজীর বিবিগণের প্রতি কোরআনের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম হোদায়েতঃ **وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ** অর্থাৎ, নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত প্রদান কর এবং মহান আল্লাহ ও তাঁর রসুলের (সাঃ) অনুসরণ কর। দু-হোদায়েত সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপের সময় আপত্তিকর কোমলতা ও নাড়ুকতা পরিহার,—বিনা প্রয়োজনে গৃহভাষ্যর থেকে বের হওয়া এবং এ আয়াতে রয়েছে তিন হোদায়েত। এ হল সর্বমোট পাঁচ হোদায়েত—যা নারীকুল সম্পর্কিত অভ্যন্তর গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়সমূহের অন্তর্গত।

এ পাঁচটি হোদায়েতের সব কয়টি সমস্ত মুসলমানের প্রতি

সমভাবে প্রযোজ্য : উপরোক্ত হেদায়েতসমূহের মধ্যে শেষোক্ত তিনটি নবীজীর পুণ্যবতী বিবিগণের জন্য নির্দিষ্ট না হওয়া সম্পর্কে তো কারো সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন মুসলিম নারী-পুরুষই নামায, যাকাত এবং আল্লাহ ও রসুলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আওতা-বহির্ভূত নয়। বাকী রইল নারীকুলের পর্দা সংশ্লিষ্ট অবশিষ্ট দু'টি হেদায়েত। একটু চিন্তা করলে এও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাও কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং সমস্ত মুসলিম নারীর প্রতিও একই হুকুম।

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

এ আয়াতে পূর্ববর্তী বিশেষ সম্বোধনের তাৎপর্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট আমল (কর্ম) পরিশুদ্ধির বিশেষ হেদায়েতের মর্ম ও তাৎপর্য নবীজীর গৃহবাসীগণকে যাবতীয় আবিলতা ও কলুষতা বিমুক্ত করে দেয়া।

رَجْسٌ শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো প্রতিমা ও বিগ্রহ, আবার কখনো নিছক পাপ অর্থে, কখনো আযাব অর্থে, কখনো কলুষতা ও অপবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে।—(বাহরে মুহীত)

আয়াতে আহলে বাইতের মর্ম কি? উপরোক্ত আয়াতসমূহে নবী-পত্নীগণকে সম্বোধন করা হয়েছিল বলে স্ত্রীলিঙ্গবাচক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে পুণ্যবতী স্ত্রীগণের সাথে সাথে তাঁদের সন্তান-সন্ততি এবং পিতা-মাতাও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। সেজন্যই পুর্লিঙ্গপদ **عَنكُمْ وَيُطَهِّرَكُمْ** ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কোন কোন মুফাস্সেরের মতে আহলে বায়েত দ্বারা কেবল নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকেই বোঝানো হয়েছে। হযরত ইকরিমা এবং হযরত মোকাতিল এমতই পোষণ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়েরের রেওয়ায়েতও তিনি আহলে বায়েতের অর্থ পুণ্যবতী স্ত্রীগণ (রাঃ) বলেই মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু হাদীসের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে, যেগুলো ইবনে কাসীর এখানে নকল করেছেন—এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, হযরত ফাতেমা, হযরত হাসান-হুসাইনও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন, মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ) বাড়ী থেকে বাইরে তশরীফ নিতে যাচ্ছিলেন। সে সময় তিনি একটি কালো রুমী চাদর জড়ানো ছিলেন। এমন সময় সেখানে হযরত হাসান, হযরত হুসাইন, হযরত ফাতেমা ও হযরত আলী (রাঃ) এঁরা সবাই একের পর এক তশরীফ আনেন। নবীজী (সাঃ) এঁদের সবাইকে চাদরের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আয়াত **إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ**

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا তেলাওয়াত করেন। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে এরূপ রয়েছে যে, আয়াত তেলাওয়াত করার পর তিনি **اللهم هؤلاء أهل بيتي** (হে আল্লাহ এরাই আমার আহলে বাইত)।—(ইবনে জরীর)

ইবনে-কাসীর এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করে বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে মুফাসসিরগণ প্রদত্ত এসব মতে মধ্যে পরস্পর কোন বিরোধ নেই। যারা বলেন যে, এ আয়াত পুণ্যবতী স্ত্রীগণের শানে নাযিল হয়েছে—এবং আহলে বাইত বলে তাঁদেরকেই বোঝানো হয়েছে, তাঁদের এ মতে অন্যান্যগণও—আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরিপন্থী নয়। সুতরাং

এটাই ঠিক যে, পুণ্যবতী স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অন্তর্গত। কেননা, এ আয়াতের শানে নুযুলও এই। শানে নুযুলের মর্ম আয়াতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আবার নবীজীর এরশাদ মোতাবেক হযরত ফাতেমা, আলী, হাসান-হুসাইন (রাঃ) ও আহলে বাইত।

وَأَذْكُرَنَّ مَا يَشُكُّ فِي بُيُوتِكُمْ مِنَ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

আর্থ কোরআন আর **حِكْمَت** অর্থ রসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রদত্ত শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁর সুনুত ও আদর্শ। যেমন, অধিকাংশ তফসীরকারগণ **حِكْمَت** এর তফসীর সুনুত বলে বর্ণনা করেছেন। **أَذْكُرَنَّ** শব্দে দু'টি ভাবার্থ হতে পারে—(১) এসব বিষয় স্বয়ং সুরণ রাখা—যার ফলশ্রুতি ও পরিচয় হলো এগুলোর উপর আমল করা। (২) কোরআন পাকের যাকিছু তাঁদের গৃহে, তাঁদের সামনে নাযিল হয়েছে বা রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদেরকে যেসব শিক্ষা প্রদান করেছেন, উম্মতের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে সেসবের আলোচনা করা এবং তাদেরকে সেগুলো পৌছে দেয়া।

ফায়েরদা : ইবনে আরাবী আহ্কামুল-কোরআন নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর নিকট থেকে কোন আয়াতে কোরআন বা হাদীস শোনে তবে তা অন্যান্য লোকের নিকট পৌছে দেয়া তার অবশ্য কর্তব্য। এমন কি কোরআনের যেসব আয়াত নবীজীর পুণ্যবতী স্ত্রীগণের গৃহে নাযিল হয়েছে অথবা নবীজীর (সাঃ) নিকট থেকে তাঁরা যেসব শিক্ষা লাভ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে অপর লোকের সাথে আলোচনা করা তাঁদের উপরও বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ পাকের এ আমানত উম্মতের অপরাপর লোকদের নিকট পৌছানো তাঁদের (পুণ্যবতী স্ত্রীগণের) অপরিহার্য কর্তব্য।

কোরআনের নাম হাদীসের সংরক্ষণ : এ আয়াতে যেরূপভাবে কোরআনের প্রচার-প্রসার ও শিক্ষা প্রদান উম্মতের জন্যে বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে হেকমত শব্দের মাধ্যমে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর হাদীসসমূহের প্রচার এবং শিক্ষা প্রদানও বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়েছে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সর্বাবস্থায়ই এ নির্দেশ পালন করেছেন। সহীহ বোখারী শরীফে হযরত মাআয (রাঃ) সম্পর্কেও এরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি রসুলুল্লাহর (সাঃ) নিকট থেকে একখানা হাদীস শোনেন, কিন্তু জনগণ এর প্রতি যথাযথ মর্যাদা আরোপ না করতে পারে অথবা কোন ভুল বোঝাবুঝিতে পতিত হতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করে তিনি তা সর্ব সাধাণের সামনে বর্ণনা করেননি। কিন্তু যখন তাঁর (মাআযের) মৃত্যুকক্ষ ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি জনগণকে একত্রিত করে তাদের সামনে সে হাদীস পেশ করলেন এবং বললেন যে, নিছক ধর্মীয় স্বার্থে আমি এ যাবত এ সম্পর্কে কারো সাথে আলোচনা করিনি। কিন্তু এক্ষণে আমার মৃত্যু অত্যাসন্ন। সুতরাং উম্মতের এ আমানত তাদের হাতে পৌছে দেয়া একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। হযরত মাআয হাদীসে-রসুল উম্মতের নিকট না পৌছানোর পাশে যাতে পতিত না হন সেজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে জনগণকে ডেকে এ হাদীস শুনিয়ে দেন।

এ ঘটনাও এ সাক্ষ্যই প্রদান করে যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামই কোরআনের এ হুকুম পালন ওয়াজিব ও অবশ্য করণীয় বলে মনে করতেন। আর সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হাদীসসমূহ জনগণের নিকট পৌছাবার ব্যবস্থা করতেন বলে হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব কোরআনের কাছাকাছি হয়ে পড়লো। এ সম্পর্কে সন্দেহের অবতারণা করা কোরআন পাকে সন্দেহের অবতারণা করারই নামান্তর।

কোরআনে পাকে সাধারণভাবে পুরুষদেরকে সম্বোধন করে নারীদেরকে আনুষঙ্গিকভাবে তার অন্তর্ভুক্ত করে দেয়ার তাৎপর্য : যদিও নারী-পুরুষ উভয়ই কোরআন পাকের সাধারণ নির্দেশাবলীর আওতাধীন, কিন্তু সাধারণতঃ সম্বোধন করা হয়েছে পুরুষদেরকে। আর নারী জাতি পরোক্ষভাবে এর অন্তর্গত। সর্বত্র **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** শব্দ-সমষ্টি ব্যবহার করে আনুষঙ্গিকভাবে নারীদেরকেও সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, নারীদের সকল বিষয়ই প্রচ্ছন্ন ও গোপনীয়। এর মধ্যেই তাদের মর্যাদা নিহিত। বিশেষ করে সমস্ত কোরআনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, কেবল হযরত মরিয়ম বিনতে ইমরান ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের নাম কোরআন পাকে উল্লেখ নেই। যেখানে তাদের প্রসংগ এসেছে, সেখানে পুরুষের সাথে তাদের সম্পর্কসূচক শব্দ যথা **أَمْوَآتُ** ফেরাউন পত্নী ও **نُورِ** নূহপত্নী প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত মরিয়মের বিশেষত্ব সম্ভবতঃ এই যে, কোন পিতার সাথে হযরত ঈসার (সাঃ) সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর ছিল না। তাই মায়ের সাথেই তাঁকে সম্পর্কযুক্ত করতে হয়েছিল এবং এ কারণেই মরিয়মের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।—(আল্লাহ্ পাকই সর্বাধিক জ্ঞাত।)

কোরআন করীমের এই প্রকাশভঙ্গি যদিও এক বিশেষ প্রজ্ঞা, যৌক্তিকতা ও মঙ্গলের ভিত্তিতেই অনুসৃত হয়েছিল ; কিন্তু এর পরিস্রব্ধিতে নারীদের হীনমন্যতাবোধের উদ্বেক হওয়া একান্ত স্বাভাবিক ছিল। তাই বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে এমন বহু রেওয়াজে রয়েছে, যাতে নারীরা রাসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে এ মর্মে আরম্ভ করেছে যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি—আল্লাহ্ পাক কোরআনের সর্বত্র পুরুষদেরই উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকেই সম্বোধন করেন। এদ্বারা বোঝা যায় যে, আমাদের (নারীদের) মাঝে কোন প্রকার পুণ্য ও কল্যাণই নেই। সুতরাং আমাদের কোন এবাদতই গ্রহণযোগ্য নয় বলে আশঙ্কা হচ্ছে। তিরমিযী শরীফে হযরত উস্মে আশ্শামা থেকে, আবার কোন কোন রেওয়াজে হযরত আসমা বিনতে উমায়স (রাঃ) থেকেও এ ধরনের আবেদন উপস্থাপনের কথা বর্ণিত আছে—আর এসব রেওয়াজে এ আবেদন উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ নামিল হওয়ার কারণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতসমূহে নারীদেরকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা প্রদান এবং তাদের আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তাবলী সংশ্লিষ্ট বিশেষ আলোচনা রয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ্ পাক সমীপে মান-মর্যাদা ও তাঁর নৈকট্য লাভের ভিত্তি হল সংকার্যাবলী, আল্লাহর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার। এ ক্ষেত্রে

নারী-পুরুষের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই।

অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকরের নির্দেশ এবং তার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য : ইসলামের স্তম্ভ পাঁচ প্রকারের এবাদত। যথা—নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও জেহাদ। কিন্তু সমস্ত কোরআনে এর মধ্য থেকে এবাদত অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ নেই। কিন্তু কোরআন পাকের বহু আয়াতে আল্লাহর যিকর অধিক পরিমাণে করার নির্দেশ রয়েছে। সুরায়ে আনফাল, সুরায়ে জুমআ এবং এই সুরায় **وَالَّذِينَ كَفَرُوا** (অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণকারীগণ ও স্মরণকারিগণ) বলা হয়েছে। এর তাৎপর্য প্রথমতঃ এই যে, আল্লাহর যিকর যাবতীয় এবাদতের প্রকৃত রূহ। হযরত মাআয ইবনে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকটে জিজ্ঞেস করল যে, মুজাহিদগণের মাঝে সর্বাধিক প্রতিদান ও সওয়াবের অধিকারী কোন ব্যক্তি হবে? তিনি (সাঃ) বললেন : যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর যিকর করবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করল যে, রোযাদারদের মধ্যে সর্বোচ্চ সওয়াবের অধিকারী কে হবে? তিনি বললেন, যে আল্লাহর যিকর সবচেয়ে বেশী করবে। এরূপভাবে নামায, যাকাত, হজ্ব, সদকা প্রভৃতি সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করল। তিনি প্রতিবার এ উত্তরই দিলেন যে, যে ব্যক্তি সর্বাধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করবে, সে-ই সর্বোচ্চ প্রতিদান লাভ করবে।—(ইবনে কাসীর থেকে আহমদ বর্ণনা করেছেন।)

দ্বিতীয়তঃ যাবতীয় এবাদতের মধ্যে যিকরই সহজতর। এটা আদায় করা সম্পর্কে শরীয়তও কোন শর্ত আরোপ করেনি—অযুসহ বা বিনা অযুতে উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে সব সময়ে আল্লাহর যিকর করা যায়। এর জন্যে মানুষের কোন পরিশ্রমই করতে হয় না ; কোন অবসরেরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর লাভ ও ফলশ্রুতি এত বেশী ও ব্যাপক যে, আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে পার্থিব কাজকর্মও এবাদতে রূপান্তরিত হয়। আহার গ্রহণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দোয়া ; বাড়ী থেকে বের হওয়ার ও ফিরে আসার দোয়া, সফরে রওয়ানা করা ও সফরকালীন বাড়ী ফিরে আসার দোয়া, কোন কারবারের সূচনাপর্বে ও শেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নির্দেশিত দোয়া— প্রভৃতি দোয়াসমূহের সারমর্ম এই যে, মুসলমান যেন কোন সময়েই আল্লাহ সম্পর্কে অমনোযোগী ও গাফেল থেকে কোন কাজ না করে, আর তায়া যদি সকল কাজকর্মে এ নির্ধারিত দোয়াসমূহ পড়ে নেয়, তবে পার্থিব কাজ দুইনে (ধর্মে) পর্যবসিত হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতসমূহও এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা প্রসঙ্গেই নাথিল হয়েছে।

এক ঘটনা এই যে, হযরত য়ায়েদ বিন হারেসা (রাঃ) এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ছিলেন। অঙ্গতর যুগে রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে অতি অল্প বয়সে ‘ওকার’ নামক বাজার থেকে খরিদ করে এনে মুক্ত করে দেন। আর আরব দেশের প্রধানুযায়ী তাঁকে পোষ্য-পুত্রের গৌরবে ভূষিত করে লালন-পালন করেন। মক্কাতে তাঁকে ‘মুহাম্মদের (সাঃ) পুত্র য়ায়েদ’ নামে সম্বোধন করা হত। কেরাআনে করীম এটাকে অঙ্গতর যুগের ভ্রান্ত রীতি আখ্যায়িত করে তা নিষিদ্ধ করে দেয় এবং পোষ্যপুত্রকে তার প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে নির্দেশ দেয়। এ প্রসঙ্গেই এ সূরার প্রথমার্শের আয়াতসমূহ **أَدْعُوهُمْ لِأَسْمَائِهِمْ** নাথিল হয়েছে? এসব হুকুম নাথিল হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) য়ায়েদ ইবনে মুহাম্মদ (সাঃ) নামে ডাকা পরিহার করেন এবং তাঁর পিতা হারেসার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে থাকেন।

একটি সূক্ষ্ম বিষয় : সমগ্র কোরআনে নবীগণ (সাঃ) ব্যতীত কোন শ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতম সাহাবাবীর নামেরও উল্লেখ নেই। একমাত্র য়ায়েদ ইবনে হারেসার (রাঃ) নাম রয়েছে। কোন কোন মহাত্মা এর তাৎপর্য এই বর্ণনা করেছেন যে, কোরআনের নির্দেশানুসারে রসুলুল্লাহর (সাঃ) সাথে তাঁর পুত্রস্বের সম্পর্ক হিন্ন করে দেয়ার ফলে এক বিশেষ সম্মান থেকে বঞ্চিত হন। আল্লাহ পাক কোরআন করীমে তাঁর নাম অন্তর্ভুক্ত করে এরই বিনিময় প্রদান করেছেন।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করতেন। হযরত আয়েশা সিন্দীকা (রাঃ) ফরমান যে, যখনই তিনি (সাঃ) য়ায়েদ বিন হারেসকে কোন সৈন্যবাহিনীভুক্ত করে পাঠিয়েছেন—তাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ইসলামের এই ছিল গোলামীর মর্যাদা—শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের পর যারা যোগ্য প্রতিপন্ন হয়েছেন তাঁদেরকে নেতার মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।

য়ায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) যৌবনে পদার্পনের পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজ ফুফাত বোন হযরত যয়নব বিনতে জাহশকে (রাঃ) তাঁর নিকট বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব পাঠান। হযরত য়ায়েদ (রাঃ) যেহেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন সুতরাং হযরত যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ এ সম্বন্ধ স্থাপনে এই বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, আমরা বংশ মর্যাদায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে... **وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ** নাথিল হয়। যাতে হেদায়েত হয়েছে যে, যদি রসুলুল্লাহ (সাঃ) কারো প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে কোন কাজের নির্দেশ দান করেন, তবে সে কাজ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। শরীয়তানুযায়ী তা না করার অধিকার থাকে না। শরিয়তে একাজ যে লোক পালন করবে না, আয়াতের শেষে একে স্পষ্ট গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত যয়নব ও তাঁর ভাই এ আয়াত শুনে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিয়েতে রাব্বী হয়ে যান। অতঃপর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

(৩৬) আল্লাহ ও তাঁর রসুল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। (৩৭) আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর য়ায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক হিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্রা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক হিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে। (৩৮) আল্লাহ নবীর জন্যে যা নির্ধারণ করেন, তাতে তাঁর কোন বাধা নেই। পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর চিরাচরিত বিধান। আল্লাহর আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত। (৩৯) সেই নবীগণ আল্লাহর পয়গাম প্রচার করতেন ও তাঁকে ভয় করতেন। তাঁরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করতেন না। হিসাব গ্রহণের জন্যে আল্লাহ যথেষ্ট। (৪০) মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রসুল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত। (৪১) মুমিনগণ তোমারা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। (৪২) এবং সকাল বিকাল আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। (৪৩) তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর ক্ষেত্রশতাগণও রহমতের দোয়া করেন—অঙ্কার থেকে তোমাদেরকে আলোকে বের করার জন্য। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।

যার মোহর দশটি লাল দীনার (প্রায় চার তোলা স্বর্ণ) ও ষাট দেহহাম (প্রায় আঠারো তোলা রৌপ্য) এবং একটি ভারবাহী জন্তু, কিছু গৃহস্থালী আসবাবপত্র আনুমানিক পঁচিশ সের আটা ও পাঁচ সের জেব্বুর—রসুলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেন। (ইবনে কাসীর)। অধিকাংশ মুফাস্সেরিনের মতে এ ঘটনাই এ আয়াতের শানে নুযল।

ইবনে কাসীর প্রমুখ মুফাস্সিরগণ অনুরূপ আরো দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একটি হলো জুলায়বীরের (রাঃ) ঘটনা যে, তিনি কোন এক আনসার সাহাবীর মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এই আনসার ও তাঁর পরিবার-পরিজন এ সম্পর্ক স্থাপনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবাই রাযী হয়ে যান এবং যথারীতি বিয়েও সম্পন্ন হয়ে যায়। নবীজী (সাঃ) তাদের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকা কামনা করে দোয়া করলেন। সাহাবায়ে কোরাম বলেন যে, তার গৃহে এত বরকত ও ধন-সম্পদের এত অধিক ছিল যে, মদীনার গৃহসমূহের মধ্যে এ বাড়ীটিই ছিল সর্বাধিক উন্নত ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং এর খরচের অঙ্কই ছিল সব চাইতে বেশী। পরবর্তীকালে হযরত জুলায়বীর (রাঃ) এক জেহাদে শাহাদত বরণ করেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর দাফন-কাফন নিজ হাতে সম্পন্ন করেন।

অনুরূপভাবে উম্মে কুলসুম বিনতে ওকবা ইবনে আবী মুযীত সম্পর্কেও হাদীসের রেওয়াজেতসমূহে এক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।—(ইবনে কাসীর, কুরতুবী)। প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলোর মাঝে কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই। এরূপ একাধিক ঘটনাই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ হতে পারে।

বিষয়ে শাদীতে বংশগত সমতাও রক্ষার নির্দেশ এবং তার স্তর : উল্লেখিত বিয়েতে হযরত যযনব ও তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহর (রাঃ) প্রথম পর্যায়ে অসম্মতির কারণ ছিল, উভয় পক্ষে বংশগত সমতা ও সামঞ্জস্য না থাকা এবং এ কারণ সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে-শাদী সমমর্যাদাসম্পন্ন বংশে দেয়া উচিত। এখন প্রশ্ন উঠে যে, এক্ষেত্রে হযরত যযনব (রাঃ) ও তাঁর ভাইয়ের আপত্তি কেন গৃহীত হলো না ?

উত্তর এই যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দম্পতিদ্বয়ের উভয়পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সমতা ও সাদৃশ্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কোন কাফেরের সহিত কোন মুসলিম মেয়ের বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যদিও মেয়ে এতে সম্মত থাকে। কেননা, এটা কেবল মেয়ের অধিকার নয় যে, শুধু তার সম্মতির কারণেই তা রহিত হয়ে যাবে; বরং আল্লাহর হুকুম ও অধিকার এবং আল্লাহ কর্তৃক আরোপিত ফরয ও অবশ্য পালনীয় নির্দেশ। পক্ষান্তরে বংশগত ও অর্থনৈতিক সমতার ব্যাপারটা এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, কেননা, এটা হলো মেয়ের অধিকার। আর বংশগত সমতার অধিকারের বেলায় মেয়ের সাথে সাথে তার অভিভাবকগণও শরীক। যদি কোন বিবেক সম্পন্ন পূর্ণ বয়স্ক মেয়ে ধনাত্মক পরিবারভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কোন দরিদ্র ছেলের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে রাযী হয়ে নিজস্ব অধিকার পরিহার করে তবে তার সে অধিকার রয়েছে। কোন বিশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে কোন মেয়ে ও অভিভাবকবৃন্দ যদি বংশগত সমতার দাবী পরিহার করে এমন এক ব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে রাযী হয়ে যায়, যেটা বংশগতভাবে তাদের চাইতে হয়, তবে তাদের এ অধিকার রয়েছে। বরং ধর্মীয় মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহার করা বিশেষ প্রশংসনীয় ও কাম্য। এজন্যই রসুলুল্লাহ (সাঃ) বহু ক্ষেত্রে ধর্মীয় মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে এ অধিকার পরিহার পূর্বক বিয়ের কাজ সম্পন্ন করার

পরামর্শ দিয়েছেন।

কোরআন করীমের ব্যাখ্যা ও মর্মনিষায়ী একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উম্মতের প্রত্যেকের উপর রসুলুল্লাহ (সাঃ) হুকুম ও অধিকার সব চাইতে বেশী। এমনকি স্বয়ং নিজের চাইতেও বেশী। তাই হযরত যযনব ও আবদুল্লাহর ব্যাপারে যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) বংশগত সমতার অধিকার পরিহার করে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার সাথে বিয়েতে সম্মতি দানের নির্দেশ দেন, তখন এই হুকুমের সামনে নিজেদের মতামত ও অধিকার পরিত্যাগ করা তাদের উপর ফরয ও অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এতে তাঁরা অসম্মতি প্রকাশ করলে এ আয়াত নাযিল হয়।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, যখন স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-ও বংশগত সমতা বজায় রাখা প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন, তবে তা রাখলেন না কেন? এর উত্তর উল্লেখিত বর্ণনার মাঝেই প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, অন্য কোন ধর্মীয় মঙ্গলের দিক বিবেচনা করে এই বংশগত সমতা পরিহারযোগ্য। রসুলুল্লাহ (সাঃ) জীবদ্দশায়ও এরূপ ধর্মীয় মঙ্গলের কথা বিবেচনা করে বংশগত সমতার অবর্তমানেও বহু বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে মূল মাসআলার উপর কোন প্রভাব পড়ে না।

কুফু বা সমতার মাসআলা : বিয়ে শাদী এমন এক ব্যাপার যে, এতে দম্পতির উভয়ের মাঝে স্বভাবগত সাদৃশ্য না থাকলে বিয়ের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়, পরস্পরের হুকুম ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ক্রটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়—পরস্পর কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করে। তাই শরীয়তে সমতা ও পারস্পরিক সাদৃশ্য বিধানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কোন উচ্চ পরিবারের ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত নীচ পরিবারের লোককে অপকৃষ্ট বলে মনে করবে। ইসলামে মান-মর্যাদার মূলভিত্তি তাকওয়া, নিক্কা ও ধর্ম পরায়ণতা। এক্ষেত্রে বংশগত কৌলিন্য যতই থাক না কেন, আল্লাহর নিকটে এর সবিশেষ গুরুত্ব নেই। নিছক সামাজিক রীতিনীতি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য বিয়ে-শাদীতে সমতা রক্ষার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে তাদের অভিভাবকগণের মাধ্যমেই স্বেচ্ছিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ, প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের পক্ষেও নিজের বিয়ের ব্যাপার নিজে উদ্যোগী হয়ে করা সংগত নয়—লজ্জা ও সন্ত্রাসের দিক বিবেচনায় এ দায়িত্ব পিতা-মাতা ও অন্যান্য অভিভাবকবৃন্দের উপরই ন্যস্ত থাকা উচিত। তিনি আরো এরশাদ করেছেন যে, মেয়েদের বিয়ে সমকক্ষ পরিবারেই দেয়া উচিত। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) 'কিতাবুল আসার' নামক গ্রন্থে হযরত ফারাকে আযমের (রাঃ) উক্তি বর্ণিত করেছেন যে, আমি এ মর্মে ফরমান জারী করে দেব—যে কোন সম্ভ্রান্ত খ্যাতনামা বংশের মেয়েকে অপেক্ষাকৃত অখ্যাত স্বল্প মর্যাদাসম্পন্ন পরিবারে বিয়ে দেয়া না হয়। অনুরূপভাবে হযরত আয়েশা ও হযরত আনাস (রাঃ)—এর প্রতি বিশেষ তাকীদ দিয়েছেন, যেন সমতা রক্ষার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হয়, যা বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে।

সারকথা এই যে, বিয়ে-শাদীতে উভয় পক্ষের সমতা ও সাদৃশ্যের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ শরীয়তের বিশেষভাবে কাম্য—যাতে উভয়ের মধ্যে সঙ্গীতি ও মনের মিল স্থাপিত হয়। কিন্তু কুফুর (সার্বিক সমতা বিধান) চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কল্যাণ ও মঙ্গলের দিক যদি সামনে আসে তবে কনে ও তার অভিভাবকবৃন্দের পক্ষে তাদের এ

অধিকার পরিত্যাগ করে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে নেয়া জায়েয। বিশেষ করে কোন ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে এরূপ করা উত্তম ও অধিককাম্য।

দ্বিতীয় ঘটনা : নবীজীর (সাঃ) নির্দেশ মোতাবেক হযরত য়ায়েদ বিন হারেসার সাথে হযরত যয়নবের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু তাদের স্বভাব প্রকৃতিতে মিল হয়নি। হযরত য়ায়েদ (রাঃ) হযরত যয়নব (রাঃ) সম্পর্কে ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ব, গোত্রগত কৌলিন্যাত্মিকতা এবং আনুগত্য ও শৈথিল্য প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপন করতেন। অপরদিকে নবীজীকে (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে জানানো হয় যে, হযরত য়ায়েদ (রাঃ) হযরত যয়নবকে তালাক দিয়ে দেবেন ; অতঃপর হযরত যয়নব (রাঃ) হুযুরে পাকের (সাঃ) পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবেন। একদিন হযরত য়ায়েদ (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসব অনুযোগ পেশ করতে গিয়ে হযরত যয়নবকে তালাক দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। নবীজী (সাঃ) যদিও আল্লাহ পাক কর্তৃক অবহিত হয়েছিলেন যে, ঘটনার পরিণতি এ পর্যায়ে গিয়ে গড়াবে যে, হযরত য়ায়েদ (রাঃ) হযরত যয়নব (রাঃ)-কে তালাক দিয়ে দেবেন, অতঃপর হযরত যয়নব (রাঃ) নবীজীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন। কিন্তু দু' কারণে তিনি হযরত য়ায়েদকে তালাক দিতে বারণ করলেন। প্রথমতঃ তালাক দেয়া যদিও শরীয়তে জায়েয ; কিন্তু পছন্দনীয় ও কাম্য নয়। বরং বৈধ বস্তুসমূহের মাঝে নিকৃষ্টতম ও সর্বাধিক অবাঞ্ছনীয়। আর পার্থিব দিক থেকে কোন কার্য সংঘটিত হওয়া শরীয়তের হুকুমকে প্রভাবান্বিত করে না। দ্বিতীয়তঃ নবীজীর (সাঃ) অন্তরে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, যদি হযরত য়ায়েদ তালাক দেয়ার পর তিনি হযরত যয়নবের পাণি গ্রহণ করেন, তবে আরববাসী বর্বর যুগের প্রচলিত প্রথানুযায়ী এই অপবাদ দেবে যে, তিনি নিজ পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন। যদিও কোরআনে পাক সূরায় আহযাবের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্বর যুগের এ কুপ্রথাকে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলে খণ্ডন করে দিয়েছে। এরপর কোন-মুনিরের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টির আশংকা ছিল না ; কিন্তু যে কাফেরদের কোরআনের প্রতি কোন আস্থা নেই, তারা বর্বরযুগের প্রথানুযায়ী পালকপুত্রকে সকল ব্যাপারে প্রকৃত পুত্রতুল্য মনে করে অপবাদের ঝড় তুলবে।—এ আশংকাও তালাক প্রদান থেকে হযরত য়ায়েদকে বারণ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বন্ধুসুলত দরদমাখা শাসনবাক্য কোরআন পাকের এ আয়াতসমূহে নাযিল হয়।

وَأَذِّنْ لِلَّذِينَ اتَّعَمَلُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَأَتَمَّتْ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَقِي فِي نَفْسِكَ مَا لِلَّهِ مُبِيدِيهِ وَتَحْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ
أَحَقُّ أَنْ تَحْشَى

অর্থঃ “(সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন) যখন আল্লাহ পাক ও আপনি নিজে যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তাকে বলছিলেন যে, তুমি নিজের স্ত্রীকে তোমার বিবাহধীন থাকতে দাও।” এ ব্যক্তি হযরত য়ায়েদ। আল্লাহ পাক তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত করে তার প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয়তঃ নবীজীর সাহচর্য লাভের গৌরব প্রদান করেন এবং নবীজী তাঁর প্রতি প্রথম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন—তাঁকে গোলামী থেকে অব্যাহতি দানের মাধ্যমে। দ্বিতীয়তঃ নবীজী (সাঃ) তাঁকে এমন শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে গড়ে তোলেন যে, তাঁর প্রতি বিশিষ্ট সাহায্যে কেবলমাত্র পরম্পরা প্রদর্শন করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত য়ায়েদের

প্রতি নবীজীর (সাঃ) প্রয়োগকৃত উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। “নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহধীন থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।” এক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ এ মর্মেও হতে পারে যে, তালাক একটি অপকৃষ্ট ও গর্হিত কাজ, সুতরাং এ থেকে বিরত থাক। আবার এ অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে যে, বিবাহধীন বহাল রাখার পর স্বভাবগত গরমিল ও অবজ্ঞার দরুন তাঁর অধিকারসমূহ আদায়ের বেলায় যেন কোন প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন না করেন। তাঁর (সাঃ) এ উক্তি এ জায়গায় সম্পূর্ণ ঠিক ও যথার্থই ছিল। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার এবং অন্তরে হযরত যয়নবের পাণি গ্রহণের বাসনা উদ্ভবের পর হযরত য়ায়েদের প্রতি তালাক না দেয়ার উপদেশ এক প্রকারের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক হিতাকাংখার বহিঃপ্রকাশেরই পর্যায়ভুক্ত ছিল, যা রসুলের পদমর্যাদার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। বিশেষ করে এ কারণে যখন এর সাথে জনমণ্ডলীর অপবাদের আশঙ্কাও বিদ্যমান ছিল। তাই উল্লেখিত আয়াতে শাসন বাক্যের ভাষা ছিল এরূপ যে, ‘আপনি যে কথা মনে মনে লুকিয়ে রাখছিলেন তা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন।’ যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত যয়নবের সহিত আপনার পরিণয় সম্পর্ক স্থাপনের সংবাদ সম্পর্কে আপনি অবহিত হয়েছেন এবং আপনার অন্তরেও বিয়ের বাসনার উদ্ভব করেছে তখন এ ইচ্ছা ও বাসনা গোপন রেখে এমন প্রকারের বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক আলোচনা করেছেন যা আপনার মর্যাদার পরিপন্থী। জনমণ্ডলীর অপবাদের ভয় সম্পর্কে ফরমান যে, আপনি মানুষকে ভয় করছেন, অথচ ভয় তো করা উচিত কেবল আল্লাহকে। অর্থাৎ, যখন আপনি জ্ঞাত ছিলেন যে, এ ব্যাপার আল্লাহর পক্ষ থেকেই সংঘটিত হবে—এতে যখন তাঁর অসন্তুষ্টির কোন আশংকাই নেই তখন নিছক মানুষের ভয়ে এ ধরনের উক্তি মুক্তিযুক্ত হয়নি।

এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট উপরে বর্ণিত বিবরণ ‘তফসীরে ইবনে কাসীর’ ‘কুরতুবী’ ও ‘রুহুল মা’আনী’ থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং আয়াত **وَتَقِي فِي نَفْسِكَ مَا لِلَّهِ مُبِيدِيهِ** এর ব্যাখ্যা এই যে, আপনি অন্তরে যে বিষয় গোপন রেখেছেন তা এ বাসনা যে, হযরত য়ায়েদ (রাঃ) হযরত যয়নবকে তালাক দিলে পর আপনি তাঁর পাণি গ্রহণ করবেন।

বস্তুতঃ কোরআন পাকের শব্দাবলীতেও হযরত যয়নুল আবেদীনের (রাঃ) রেওয়াজেতে উপরে বর্ণিত এ তফসীরেরই সমর্থন মেলে। কেননা, এ আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ পাক বলে দিচ্ছেন যে, অন্তরে লুকায়িত বস্তু তাই ছিল যে, আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে যে বিষয় প্রকাশ করেছেন তা হলো হযরত যয়নবের সাথে হুযুরের (সাঃ) বিয়ে। যেমন—বলেছেন **زَوَّجْنَاكَ** অর্থাৎ, আমি আপনাকে তাঁর (হযরত যয়নব) সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দিলাম।—(রুহুল মা’আনী)।

পক্ষান্তরে হযরত যয়নবের (রাঃ) বিয়ের ঘটনার সাথে তথাকথিত পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে হারাম হওয়া সংক্রান্ত বর্বর যুগের প্রচলিত কুপ্রথা ও ভ্রান্ত ধারণা কার্যকরভাবে অপনোদনের এক বিশেষ শরীয়তী উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। কেননা, সমাজ প্রচলিত কুপ্রথার কার্যকরভাবে মূল উৎপাতন তখনই সম্ভব যখন হাতে কলমে বাস্তবে করে দেখান হয়। হযরত যয়নবের বিয়ে সংশ্লিষ্ট আল্লাহ পাকের নির্দেশ এ উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্যই ছিল।

এ প্রসঙ্গে বোঝা যায়, যেন রসুলুল্লাহ (সাঃ) সূরায় আহযাবের প্রথম আয়াতসমূহে বর্ণিত এই হুকুমের মৌখিক প্রারম্ভই যথেষ্ট বলে মনে করতেন। এর কার্যকর ও বাস্তব প্রয়োগের তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার

প্রতি লক্ষ্য করেননি। তাই জানা ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছিলেন। উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্‌পাক এটি সংশোধন করে তা প্রকাশ করেছেন- -

অর্থঃ আমি আপনার সাথে যখনবের
 اَوْعِيَا بِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا
 বিয়ে সম্পন্ন করেছি যাতে মুসলমানগণ নিজ্বের পালক পুত্রের তালাক
 প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করতে গিয়ে কোন জটিলতার সম্মুখীন না হয়।

—এর শাব্দিক অর্থ—আপনার সাথে তাঁর বিয়ে স্বয়ং আমি সম্পন্ন করে দিয়েছি। এর ফলে একথা বোঝা যায় যে, এ বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ পাক সম্পন্ন করে দেয়ার মাধ্যমে বিয়ে-শাদীর সাধারণভাবে প্রচলিত শর্তাবলীর ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এ বিয়ের প্রতি বিশেষ মর্যাদা আরোপ করেছেন। আবার এর অর্থ একরূপও হতে পারে যে, এ বিয়ের নির্দেশ আমি প্রদান করলাম, এখন আপনি শরীয়তী বিধি-বিধান ও শর্তাবলী মোতাবেক তা সম্পন্ন করে নিন। মুফাসসিরগণের মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রথম অর্থ এবং কিছু সংখ্যক দ্বিতীয় অর্থ অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মন্তব্য করেছেন।

অন্যান্য স্ত্রীলোকের সম্মুখে হয়রত যখনবের একপ উক্তি যে, তোমাদের বিয়ে তো তোমাদের পিতা-মাতা কর্তৃক সম্পন্ন হয়; কিন্তু আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ পাক আকাশে সম্পন্ন করেছেন-যা বিভিন্ন রেওয়াজেতে পরিলক্ষিত হয়। একথা উপরোক্ত উভয় অর্থের বেলায়ই প্রযোজ্য। যা প্রথম অর্থে অধিক স্পষ্ট; অবশ্য দ্বিতীয় অর্থও এর পরিপন্থী নয়।

বিভিন্ন সন্দেহ ও প্রশ্নাবলীর উত্তরের সূচনা :

এ আয়াতের মাধ্যমে
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ خَلَّوْا مِن قَبْلِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا
এ বিয়ের প্ররিশ্রেষ্ঠিতে উদ্ধৃত সন্দেহসমূহের উত্তরের সূচনা এক্রপভাবে
করা হয়েছে যে, অন্যান্য পুণ্যবতী স্ত্রীগণ থাকা সত্ত্বেও এ বিয়ের পেছনে
কি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল?—এরশাদ হয়েছে যে, এটা আল্লাহ পাকের
চিরন্তন বিধান যা কেবল মুহাম্মদের (সাঃ) জন্যই নির্দিষ্ট নয়; আপনার
পূর্ববতী নবীগণের কালেই ধর্মীয় স্বার্থ ও মঙ্গলামঙ্গলের কথা বিবেচনা করে
বহুসংখ্যক স্ত্রীলোকের পানি গ্রহণের অনুমতি ছিল। যম্বাধো হযরত দাউদ
ও হযরত সুলায়মান (আঃ)—এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত
দাউদ ও হযরত সুলায়মান (আঃ)—এর যথাক্রমে একশত ও তিনশত স্ত্রী
ছিল। সুতরাং রসুলুল্লাহর (সাঃ) বেলায়ও বিভিন্ন ধর্মীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য
রেখে এ বিয়েসং একাধিক বিয়ের অনুমতি লাভ বিচিত্র কিছু নয়। এটা
নবুওয়ত ও রোসালতের মহান মর্যাদা ও তাকওয়া পরহেযগারীর পরিপন্থীও
নয়। সর্বশেষ বাক্যে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, বিয়ে—শাদী—অর্থাৎ
কার সাথে কার বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে তা মানুষের জীবিকার ন্যায় আল্লাহ
পাক কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পূর্ব-নির্ধারিত ব্যাপার। এ সম্পর্কে ভাগ্যলিপিতে
যা আছে তাই বাস্তবায়িত হবে। এক্ষেত্রেও হযরত য়ায়েদ ও হযরত
যয়নবের স্বভাব প্রকৃতির বিভিন্নতা, হযরত য়ায়েদের অসম্মুষ্টি—পরিশেষে
তালাক প্রদানের সংকল্প, এ সবকিছুই ভাগ্যলিপির পর্যায়ক্রমিক
বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

পরবর্তী পর্যায়ে, অতীত কালে যেসব নবীগণের (আঃ) বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি ছিল বলে উপরে জানা গেছে ; তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে **الَّذِينَ يَبْتِغُونَ رِيسَالَتِ** অর্থাৎ এসব মহীয়ান নবীগণ (আঃ) সবাই আল্লাহ পাকের বাণীসমূহ

নিজ নিজ উম্মতের নিকটে পৌঁছিয়েছেন।

একটি জ্ঞানগর্ভ নিগূঢ়তত্ত্ব : সম্ভবতঃ এতে নবীগণের (আঃ) বহুসংখ্যক স্ত্রী থাকার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, তাঁদের (আঃ) যাবতীয় কাজকর্ম ও বাণীসমূহ উন্মত পর্যন্ত পৌছা একান্ত আবশ্যিক। পুরুষদের জীবনের এক বিরাট অংশ ঘরোয়া পরিবেশে স্ত্রী ও পুত্র পরিজনের সাথে কাটাতে হয়। এ সময় যেসব গুহী নাথিল হয়েছে বা স্বয়ং নবীজী যেসব নির্দেশ প্রদান করেছেন অথবা কোন কাজ করেছেন—এগুলো সবই উন্মতের আমানত স্বরূপ, যেগুলো কেবল পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মাধ্যমেই সহজতরভাবে উন্মতের নিকট পৌছানো সম্ভব ছিল। পৌছানোর অন্যান্য পদ্ধতি জটিলতা মুক্ত নয়। তাই নবীগণের (আঃ) অধিক সংখ্যক স্ত্রী থাকলে তাঁদের পারিবারিক জীবনের কার্যক্রম ও কথাবার্তা এবং তাদের ঘরোয়া পরিবেশের চরিত্র ও রূপ রেখা সাধারণ উন্মত পর্যন্ত পৌছা সহজতর হবে।

নবীগণের (আঃ) যে অপর এক গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে তা এই— **وَيُحْشَوْنَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ** —অর্থাৎ এসব মহাত্মাবৃন্দ

আল্লাহ পাককে ভয় করেন এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করেন না। ধর্মীয় কল্যাণ ও মঙ্গলার্থে কোন কাজ বা বিষয় প্রকাশ্য ও সরাসরি তবলীগের জন্য যদি তাঁরা আদিষ্ট হন তবে এতে তাঁরা কোন প্রকারের শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না। এরূপ করতে গিয়ে তাঁরা কোন মহলের কটাক্ষপাত ও বিরূপ সমালোচনারও কোন পরোয়া করেন না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে যখন সমগ্র নবীকুলেরই এরূপ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁরা আল্লাহ পাক ভিন্ন আর কাউকে ভয় করেন না। অথচ এর পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে وَخَشِيَ النَّاسَ (অর্থাৎ আপনি মানুষকে ভয় করেন)—এটা কিভাবে সম্ভব? উত্তর এই যে, উল্লেখিত আয়াতে নবীগণের (আঃ) আল্লাহ পাক ভিন্ন অন্য কাউকে ভয় না করা—এটা কেবল রেসালত-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এবং তবলীগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাঝে এমন এক বিষয় সম্পর্কে কটাক্ষপাতের ভয় উদ্ভেক করেছে, যা ছিল বাহ্যতঃ একটি পার্থিব কাজ। তবলীগ ও রেসালতের সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু উল্লেখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে যখন আপনার নিকট একথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এ বিয়ে বাস্তব ও কার্যকর তবলীগ এবং রেসালতের অংশবিশেষ, তখন কারো কটাক্ষপাত ও নিন্দাবাদের ভয় তাঁর কর্তব্য পথেও কোন বাধা বা প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে পারেনি। তাই অবিশ্বাসী কাকেরদের পক্ষ থেকে নানাবিধ আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও এ বিয়েকে বাস্তবরূপ প্রদান করা হয়েছিল। বস্তুতঃ অদ্যাবধিও এ সম্পর্কে বিভিন্ন অবাস্তর প্রশ্নের অবতারণা হতে দেখা যায়।

উল্লেখিত আয়াতে সেসব লোকের ধারণা অপনোদন করা হয়েছে যারা বর্বর যুগের প্রথা অনুযায়ী হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে (রাঃ) নবীজীর সন্তান বলে মনে করতো এবং তিনি হযরত যয়নবকে (রাঃ) তালাক দেয়ার পর নবীজীর সাথে তাঁর বিয়ে সংঘটিত হওয়ায় তাঁর প্রতি পুত্রবধূকে বিয়ে করেছেন বলে কটাক্ষ করত। এ ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, হযরত যায়েদের পিতা রসুলুল্লাহ (সাঃ) নন বরং তাঁর পিতা হারেসা (রাঃ)। কিন্তু এ বিষয়টির প্রতি বিশেষ তাকীদ দেয়াচ্ছিলে এরশাদ হয়েছে

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ

অর্থাৎ

রসুলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন। যে ব্যক্তির

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন। যে ব্যক্তির

সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কোন পুরুষ নেই, তাঁর প্রতি এরূপ কটাক্ষ করা কিভাবে যুক্তিসংগত হতে পারে যে, তাঁর পুত্র রয়েছে এবং তার পরিত্যক্তা স্ত্রী নবীজীর পুত্রবধূ বলে তাঁর জন্য হারাম হবে।

এই মর্মার্থ প্রকাশের জন্যে সংক্ষিপ্ত শব্দ সমষ্টি (أَبَا أَحَدٍ مِنْكُمْ) বললেই চলত। তদস্থলে কোরআনে হাকীমে অতিরিক্ত رَجُلٌ শব্দ ব্যবহার করে এরূপ সন্দেহ অপনোদন করা হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর তো হযরত খাদীজার (রাঃ) গর্ভস্থ তিন পুত্র-সন্তান কাসেম, তাইয়েব ও তাহের এবং হযরত মারিয়ার গর্ভস্থ এক সন্তান ইব্রাহীম—মোট চার পুত্র-সন্তান ছিলেন। কেননা, এরা সবাই শৈশবাবস্থায় ইন্তেকাল করেন। এরা কেউই (পূর্ণ বয়স্ক) পুরুষ পর্যায়ে পৌঁছেননি। আবার এরূপও বলা যেতে পারে যে, এ আয়াত নাযিল হওয়াকালে কোন পুত্র সন্তান ছিল না। কাসেম, তাইয়েব তাহের (রাঃ) তো ইতিমধ্যেই ইন্তেকাল করেছিলেন। আর ইব্রাহীম তখন পর্যন্ত জন্মলাভই করেননি।

বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্ন ও কটাক্ষের উত্তর এ বাক্য দ্বারা ইহা হয়ে গিয়েছিল। কিছু পরবর্তী পর্যায়ে অপরাপর সন্দেহাবলী দূরীকরণার্থে এরশাদ করেন—وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ আরবী ভাষায় لَكِنْ শব্দ পূর্ববর্তী বাক্যে কোন প্রকারের সন্দেহের অবকাশ থাকলে তা দূরীকরণার্থে ব্যবহৃত নয়। এস্থলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে যখন একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি উম্মতের অন্তর্গত কোন পুরুষের পিতা নন; তখন এরূপ সন্দেহের উদ্রেক করতে পারে যে, নবীগণ প্রত্যেকেই তো নিজ নিজ উম্মতের জনক। এ পরিপ্রেক্ষিতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) সকল পুরুষ—বরং সমগ্র নারী-পুরুষের পিতা। তাঁর প্রতি পিতৃত্ব আরোপের কথা অস্বীকার করা প্রকারান্তরে নুবওয়তকেই অস্বীকার করার নামান্তর।

وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ শব্দের মাধ্যমে এর উত্তর দেয়া হয়েছে যে, প্রকৃত ঔরসী পিতা—যে ভিত্তিতে বিয়ে শাদী হলাল, হারাম সংক্রান্ত নির্দেশাবলী আরোপিত হয়—তা ভিন্ন জিনিস। আর নবী হিসেবে গোটা উম্মতের আত্মিক পিতা হওয়া বিভিন্ন জিনিস, এর সাথে উল্লেখিত আহকামের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং সম্পূর্ণ বাক্যের মর্মার্থ দাঁড়াল যে, তিনি উম্মতের অন্তর্গত কোন পুরুষের পিতা নন; কিন্তু আধ্যাত্মিক পিতা সকলেরই।

এর মাধ্যমে কতক মুশারেককৃত অপর এক কটাক্ষেরও উত্তর হয়ে গেল। তা এই যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) অপুত্রক। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে কারো মাধ্যমে তাঁর বাণী ও কর্মধারা গতিশীল থাকতে পারে ও তাঁর বংশ বজায় থাকতে পারে এমন কোন পুত্রসন্তান তাঁর নেই। কিছু কাল পরেই এগুলো মিটে যাবে। উপরোক্ত শব্দসমূহের দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যদিও তাঁর ঔরসজাত পুত্র-সন্তান নেই, কিন্তু তাঁর নুবওয়ত মিশনের প্রসার ও অগ্রগতি সাধনের জন্য ঔরসজাত পুত্র-সন্তানের কোন প্রয়োজন নেই। এ দায়িত্ব রূহানী সন্তানগণই পালন করে যাবেন। যেহেতু তিনি আল্লাহর রসুল এবং রসুল উম্মতের রূহানী পিতা; সুতরাং তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে তোমাদের সকলের চাইতে অধিক সন্তানের অধিকারী।

এখানে যেহেতু রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর বর্ণনা এসেছে এবং নবী হিসাবে তিনি বিশেষ ও অনন্য মর্যাদার অধিকারী, সুতরাং পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ বিশেষণে ভূষিত করার মাধ্যমে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি নবীকূলের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্যও বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম জন। خَاتَم শব্দে দু'প্রকারের কেৱাত রয়েছে। ইমাম

হাসান ও ইমাম আসেমের কেৱাতে خَاتَم এর ৫-৮ এর উপর যবর রয়েছে। অন্যান্য ইমামগণের কেৱাতনুমায়ী উক্ত ৫-৮ যের বিশিষ্ট। কিন্তু উভয়ের সারমর্ম এক ও অভিন্ন—অর্থাৎ নবীগণের আবির্ভাব ধারার সমাপ্তি সাধনকারী। কেননা خَاتَم—উভয়ের একই অর্থ 'শেষ'। আবার উভয় শব্দ মোহরের অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় অর্থের বেলায়ও সারকথা 'শেষ' অর্থই দাঁড়ায়। কেননা, কোন বস্তু বন্ধ করে দেয়ার জন্য মোহর সর্বশেষেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেরও যবর বিশিষ্ট خَاتَم শব্দ উভয়টার উভয় অর্থই কামুস, সিহাহ, লিসানুল-আরব, তাজুল-উরুস প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় আরবী অভিধানসমূহে রয়েছে।

যাহোক, خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ এমন এক গুণ বা নুবওয়ত ও রেসালতের পূর্ণতার ক্ষেত্রে তাঁর সর্বোচ্চ স্থান ও মর্যাদার সাক্ষ্য বহন করে। কেননা, প্রত্যেক বস্তুই ক্রমানুয়ে উন্নতির দিকে ধাবিত হয় এবং সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেলে এর পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। আর সর্বশেষ পরিণতিই এর মোক্ষম উদ্দেশ্য; স্বয়ং কোরআনও তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে : اٰلَیْكُمْ

اٰلَیْكُمْ اَرْسَلْتُ لَكُمْ رُسُلًا وَاسْمَعْتُمْ عَلَيْهِمْ وَحُتًی অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের দ্বীন (জীবন-বিধান) পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতও (অনুগ্রহ) পূর্ণ করে দিলাম।

পূর্ববর্তী নবীগণের দ্বীনও নিজ নিজ যুগানুসারে পরিপূর্ণই ছিল, কোনটাই অসম্পূর্ণ ছিল না। কিন্তু সার্বিক পরিপূর্ণতার কথা সর্বোত্তমাবে নবীজীর দ্বীনের প্রতিই প্রযোজ্য, যা পূর্ববর্তী সবারই জন্য দলীল স্বরূপ এবং সে দ্বীন কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে।

এ ক্ষেত্রে وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ বিশেষণ সংযোজনের ফলে এ বিষয়টোও একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, নবীজী যেহেতু সমগ্র উম্মতের জনকের মর্যাদায় ভূষিত, সুতরাং তাঁকে অপুত্রক বলে আখ্যায়িত করা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। কেননা وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ শব্দদ্বয় একথাও ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, পরবর্তীকালে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী গোটা মানবকূলই তাঁর (নবীজীর) উম্মতভুক্ত। তাই তাঁর উম্মতের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের চাইতে অনেক বেশী হবে। ফলে নবীজীর (সাঃ) আখ্যাত্মিক সন্তানও অন্যান্য নবীগণের চাইতে বেশী হবে। وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ বিশেষণটি একথাও বোঝাচ্ছে যে, সমগ্র উম্মতের প্রতি হযরতের (সাঃ) স্নেহ-মমতা অন্যান্য নবীগণের তুলনায় অধিকতর। তাঁর পরে কোন ওহী বা নবীর আগমন হবে না বলে তিনি কেয়ামত পর্যন্ত উজ্জ্বত যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধান ও যাবতীয় প্রয়োজনাদি মেটাবার পথ বাতলে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী নবীগণের একথা ভাবতে হতো না। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, জাতির মাঝে গোমরাহী ও বিভ্রান্তি প্রসার লাভ করলে তাঁদের পর অন্যান্য নবীগণ আবির্ভূত হয়ে এসবের সংশোধন ও সম্প্রসারণ সাধন করবেন। কিন্তু খাতামুল আন্বিয়ার (সাঃ) একথাও ভাবতে হতো যে, কেয়ামত পর্যন্ত উম্মত যে বিভিন্নমুখী অবস্থা ও সমস্যার সম্মুখীন হবে সেগুলো সম্পর্কে উম্মতকে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ তাঁকেই দিতে হবে। যে সম্পর্কে রসুলুল্লাহর (সাঃ) বিভিন্ন হাদীস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, তাঁর পর অনুসরণযোগ্য যেসব ব্যক্তিরগণের আবির্ভাব ঘটবে তাঁদের অধিকাংশের নামই তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে ভবিষ্যতে অন্যান্য ও অসত্যের যত ধ্বজাধারী প্রাদুর্ভাব ঘটবে ওদেরও যাবতীয় লক্ষণ, অবস্থা ও তথ্যাদি এমন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন, যেন একজন সাধারণ চিন্তাশীলেরও এ সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। এ কারণেই রসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, আমি তোমাদের জন্য এমন উজ্জ্বল

ও জ্যোতিস্মান পথ রেখে গেলাম যেখানে দিবারাত্রি দুটোই সমান—কখনো পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই।

এ আয়াতে একথাও প্রাধান্যযোগ্য যে, উপরে হযুর (সাঃ)—এর উল্লেখ 'রসূল' বিশেষণে করা হয়েছে। এজন্য বাহ্যতঃ خاتم المرسلين خاتم الرسل শব্দের ব্যবহার অধিক যুক্তিসংগত ছিল বলে মনে হয়। অথচ কোরআনে হাকীম তদহুল وَخَاتَمُ الرِّسَالِ শব্দ গ্রহণ করেছে।

কারণ এই যে, অধিকাংশ আলেমগণের মতে নবী ও রসূলের মাঝে পার্থক্য শুধু একটাই—তা এই যে, নবী সেসব ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকূলের পরিশুদ্ধি ও সৎস্কার সাধনের জন্য প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের প্রতি ওহী নাযিল করে ধন্য করেছেন, চাই তাঁদের জন্য কোন স্বতন্ত্র আসমানী গ্রন্থ ও স্বতন্ত্র শরীয়ত নির্ধারিত হয়ে থাকুক—অথবা পূর্ববর্তী কোন নবীর গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসারীগণের হেদায়েতের জন্য আদিত্ত হয়ে থাকুক—যেমন হযরত হারুন (আঃ) হযরত মুসার (আঃ) গ্রন্থ ও শরীয়তের অনুসারীগণের হেদায়েতের জন্য আদিত্ত হয়েছিলেন।

অপরপক্ষে রসূল শব্দটি বিশেষভাবে ঐ নবীর প্রতি প্রযোজ্য, যাকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও শরীয়ত প্রদান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে রসূল শব্দের চাইতে নবী শব্দের মর্মার্থে ব্যাপকতা অধিক। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এই যে, তিনি (সাঃ) নবীকূলের আগমন দ্বারা সমাপ্তকারী ও সর্বশেষ আগমনকারী। চাই তিনি স্বতন্ত্র শরীয়তের অধিকারী নবী হউন বা পূর্ববর্তী অনুসারী হউন। এ দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ পাকের নিকটে যত প্রকারের নবী হতে পারেন তাঁর (নবীজী) মাধ্যমে ঐদের সবার পরিসমাপ্তি ঘটবে। তাঁর পরে অন্য কোন নবী প্রেরিত হবেন না।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর প্রতি দুঃখ-যন্ত্রণা পৌছানো থেকে বিরত থাকার মর্মে প্রদত্ত উপদেশাবলী প্রসঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে হযরত য়ায়েদ ও যয়নবের (রাঃ) ঘটনা এবং রসূলুল্লাহর (সাঃ) সর্বশেষ নবী হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়েও তাঁর অনন্য ও অনুপম গুণাবলী বিবৃত হয়েছে। আর তাঁর সন্তা ও গুণাবলী গোটা বিশেষ মুসলমানদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত বলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে উল্লেখিত আয়াতে অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাকের যিকরের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَكْثِرُوا لِلَّهِ ذِكْرًا - হযরত ইবনে আক্বাস

(রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ পাক যিকর ব্যতীত এমন কোন ফরযই আরোপ করেননি যার পরিসীমা ও পরিমাণ নির্ধারিত নেই। নামায দিনে পাঁচ বার এবং প্রত্যেক নামাযের রাকাত নির্দিষ্ট। রমজানের রোজা নির্ধারিত কালের জন্য। হজ্জও বিশেষ স্থানে বিশেষ অনুষ্ঠানাদি ও সুনির্দিষ্ট কর্ম-ক্রিয়ার নাম। যাকাতও বছরে একবারই ফরয হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর যিকর এমন এবাদত, যার কোন সীমা বা সংখ্যা নির্ধারিত নেই। বিশেষ সময়কালও নির্ধারিত নেই অথবা এর জন্য দাঁড়ানো বা বসার কোন বিশেষ অবস্থাও নির্ধারিত নেই। এমনকি পবিত্র এবং অযুসহ থাকারও কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি। সফরে থাকুক বা বাড়ীতে অবস্থান করুক, সুস্থ থাকুক বা অসুস্থ, স্থলভাগ হোক বা জলভাগ, রাত হোক বা দিন—সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকরের হুকুম রয়েছে।

এজন্যই এটি বর্জন করলে বর্জনকারীর কোন কৈফিয়তই গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি না সৈ অনুভূতিহীন ও বেদ্বন্দ্ব হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে অন্যান্য এবাদতের বেলায় অসুস্থতা ও অপরাগততার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে অকর্ম বিবেচনা করে এবাদতের পরিমাণ হ্রাস বা একেবারে মাফ হয়ে যাওয়ার

অবকাশও রয়েছে। কিন্তু যিকরুল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোন শর্ত আরোপ করেননি। তাই এটি বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন অবস্থাতেই কোন ওয়র গ্রহণযোগ্য হবে না। অধিকন্তু এর ফযিলত-বরকতও অগণিত।

ইমাম আহমদ (রাঃ) হযরত আবুদ্বারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে-কোরামকে সম্বোধন করে ফরমান যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বস্তুর সন্ধান দেব না যা তোমাদের যাবতীয় আমলের চাইতে উত্তম, তোমাদের প্রভুর নিকটে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য, তোমাদের মর্যাদা বিশেষভাবে বর্দ্ধনকারী, আল্লাহর রাস্তায় সোনা-রূপা দান করা এবং আল্লাহর পথে জেহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করতে গিয়ে তাদেরকে হত্যা করা বা নিজে শাহাদত বরণ করার চাইতে উত্তম? সাহাবায়ে কোরাম আরয করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ), সেটা কি বস্তু ; কোন্ আমল? রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমান— ذكر الله عزوجل 'মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ পাকের যিকর।'—(ইবনে-কাসীর) ইমাম আহমদ ও ইমাম তিরমিযী আরো রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ফরমান : আমি নবীজীর (সাঃ) নিকট থেকে এমন এক দোয়া শিক্ষালাভ করেছি যা কখনো পরিত্যাগ করি না। তা এই :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي اعظم شكرك واتبع نصيحتك واكثر ذكرك واحفظ وصيتك (ابن كثير)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে অধিক পরিমাণে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের, তোমার উপদেশের অনুসারী হওয়ার, অধিক পরিমাণে তোমার যিকর করার এবং তোমার ওসিয়ত সংরক্ষণের যোগ্য করে দাও।—(ইবনে-কাসীর)

এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ পাকের নিকট অধিক পরিমাণে তাঁর যিকরের তওফিক প্রদানের জন্য দোয়া করেছেন।

জ্ঞানেক বেদুঈন রসূলুল্লাহর (সাঃ) খেদমতে আরয করলো যে, ইসলামের আমল তথা, ফরয ও ওয়াজেবসমূহ তো অসংখ্য। আপনি আমাকে এমন একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সবকিছু অন্তর্ভুক্তকারী কথা বলে দিন, যা সুদৃঢ়ভাবে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : “তোমার যবান যেন সর্বদা আল্লাহর যিকরে তর-তাজা থাকে।”—(মুসনাদ আহমদ ও ইবনে কাসীর) হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমান : “তুমি আল্লাহর যিকর এত অধিক পরিমাণে কর যেন লোকে তোমাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করে।”—(মুসনাদ-আহমদ, ইবনে-কাসীর)।

وَسَيُحْيِي بَكْرَةً وَأَصِيلًا অর্থাৎ, সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। সকাল-সন্ধ্যায় দ্বারা সকল সময়কেই বোঝানো হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকরে বিশেষ বরকত ও তাকীদ রয়েছে বলে আয়াতে এ দু'সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় আল্লাহর যিকর কোন বিশেষ সময়ের জন্য সীমিত ও নির্দিষ্ট নয়।

هُوَ الَّذِي يُضِلُّ لَكُمْ صُلُوبَكُمْ وَأَعْيُنَكُمْ — অর্থাৎ, “যখন তুমি অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকরে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় যিকর করতে থাকবে, বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অজস্র ধারায় রহমত ও অনুকম্পা বর্ষণ করতে থাকবেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের জন্য দোয়া করতে থাকবেন।”

يَحْيَىٰ نَوْمُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۖ يَا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِنْكَ أَرْسِلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَكَذَلِكَ أَعْمَلُ
اللَّهُ بِأَذْيَابِهِ وَسِرَاجًا مُبِيرًا ۚ وَكَثِيرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ يَأْتِيهِمْ مِنَ
اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا ۚ وَلَا تَطِيعُ الْكُفْرُ ۚ وَالْمُتَّقِينَ وَدَعَا لَهُمْ
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تُكَاذِبُوا ۚ وَالْمُؤْمِنَاتُ نَمَّ طَائِفَتُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْتُلُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَاوَةٍ تَعْتَدُوهُنَّ ۚ فَمَتَىٰ هُنَّ
وَسِرَّتُهُنَّ سِرًّا حَاجِبِيًّا ۚ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنْكَ أَحْلَلْنَا
لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
وَمَا قَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَدَّ عَيْنِكَ وَبَدَّ عَيْنِكَ وَبَدَّ
خَالِكَ وَبَدَّ خَالِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ۚ وَأَمَّا رَأَىٰ
مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهُ لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا
مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

(৪৪) যেদিন আল্লাহর সাথে মিলিত হবে; সেদিন তাদের অভিবাদ হবে সন্মান। তিনি তাদের জন্যে সন্মানজনক পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন। (৪৫) হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। (৪৬) এক আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকরণ এক উচ্ছল প্রবীণরূপে। (৪৭) আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে। (৪৮) আপনি কাকের ও মুসাক্কদের অনুগ্রহ করবেন না এক তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করুন ও আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ কাফিরবিরোধীরূপে যথেষ্ট। (৪৯) মুমিনগণ! যেমরা যখন মুমিন নারীদেরকে বিবাহ কর, অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে ভালক দিয়ে দাও, তখন তাদেরকে ইচ্ছত পালনে বাধ্য করার অধিকার তোমাদের নেই। অতঃপর তোমরা তাদেরকে কিছু দেবে এক উত্তম পছন্দ বিদায় দেবে। (৫০) হে নবী! আপনার জন্যে আপনার স্ত্রীসংকে ফলান করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরনা প্রদান করেন। আর দাসীদেরকে ফলান করেছি, যাদেরকে আল্লাহ আপনার করায়ত্ত করে দেন এক বিবাহের জন্যে বৈধ করেছি আপনার চোচাতো ভগ্নি, কুচাতো ভগ্নি, স্বস্তো ভগ্নি ও ঝানো ভগ্নিকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে। কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সে-ও ফলাল। এটা বিশেষ করে আপনারই জন্যে—অন্য মুমিনদের জন্যে নয়। আপনার অনুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। মুমিনদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে যা নির্ধারিত করেছি আখ্যার জন্যে আছে। আল্লাহ কক্ষালী, দয়ালু।

উল্লেখিত আয়াতে **صلوة** শব্দটি আল্লাহ পাকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে এবং ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু উভয় স্থলে এর অর্থ এক নয়, আল্লাহর **صلوة** অর্থ, তিনি রহমত নাযিল করেন। আর ফেরেশতাগণের অর্থ, তারা আল্লাহর দরবারে রহমত বর্ষণের জন্যে দোয়া করেন।

হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর পক্ষে **صلوة** অর্থ রহমত, ফেরেশতাদের পক্ষে মাগফেরাত কামনা করা এবং পরস্পর একে অপরের পক্ষে এর অর্থ দোয়া—**صلوة** এ তিন অর্থই ব্যবহৃত হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

صلوة - এরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ—যা

মুমিনগণের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অর্থাৎ, যেদিন আল্লাহ পাকের সাথে এদের সাক্ষাৎ ঘটবে—তখন তাঁর পক্ষ থেকে এদেরকে সালাম অর্থাৎ, আসসালামু আলাইকুমের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানানো হবে। ইমাম রাগেব প্রমুখের মতে, আল্লাহ পাকের সংগে সাক্ষাতের দিন হলো কেয়ামতের দিন। আবার কোন কোন তফসীরকারকের মতে এ সাক্ষাতের সময় হলো বেহেশতে প্রবেশকাল যেখানে তাদের প্রতি আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে। আবার কোন কোন মুফাসসির মৃত্যু দিবসকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের দিন বলে মন্তব্য করেছেন। সেদিন সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহ সমীপে উপস্থিত হওয়ার দিন। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মালাকুল-মউত যখন কোন মুমিনের প্রাণ বিয়োগ ঘটাতে আসেন, তখন তাঁর প্রতি সুসংবাদ পৌছানো হয় যে, আপনার পালনকর্তা আপনার জন্যে সালাম প্রেরণ করেছেন। আর **لنا** শব্দ এই তিন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই এসব উক্তির মাঝে কোন বিরোধ ও অসামঞ্জস্য নেই। বস্তুতঃ এ তিন অবস্থাতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম পৌছানো হবে।—(রুহুল-মা'আনী)

মাসআলা : এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মুসলমানদের পারস্পরিক অভিবাদন ও সম্ভাষণ আসসালামু আলাইকুম হওয়া উচিত; বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের প্রতি হোক, অথবা ছোটদের পক্ষ থেকে বড়দের প্রতি হোক।

রসূলুল্লাহর (সাঃ) বিশেষ গুণাবলী : **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنْكَ أَرْسِلْنَاكَ**

—এটা **شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا** ۚ **وَكَذَلِكَ أَعْمَلُ اللَّهُ** ۚ **بِأَذْيَابِهِ** ۚ **وَسِرَاجًا مُبِيرًا**

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বিশেষ গুণাবলী ও বেশিষ্টাসমূহের পুনরুল্লেখ। এখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পাঁচটি গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ **دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ** ۚ তিনি কেয়ামতের দিন উম্মতের জন্যে সাক্ষ্য প্রদান করবেন। যেমন সহীহ বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে এক সুদীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে। যার কিয়দংশ হলো এই : কেয়ামতের দিন হযরত নূহ (আঃ) উপস্থিত হলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, আপনি আমার বাণী ও বার্তাসমূহ আপনার উম্মতের নিকটে পৌছিয়ে ছিলেন কি? তিনি আরয় করবেন যে, আমি যথার্থিতি পৌছে দিয়েছি। অতঃপর তাঁর উম্মতগণ একথা অস্বীকার করবে যে, তিনি ওদের নিকট আল্লাহর বার্তা পৌছে দিয়েছেন। অতঃপর হযরত নূহ (আঃ)—কে জিজ্ঞেস

করা হবে যে, আপনার এ দাবীর স্বপক্ষে কোন সাক্ষী আছে কি? তিনি আরয় করবেন যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর উম্মত এর সাক্ষী। কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে যে, তিনি সাক্ষী হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদীকে পেশ করবেন এবং এ উম্মত তাঁর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করবে। তখন হযরত নুহের (আঃ) উম্মত এই বলে জেরা করবে যে, তারা আমাদের ব্যাপারে কিভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে—সে সময়ে এদের তো জন্মই হয়নি। আমাদের সুদীর্ঘ কাল পর এদের জন্ম। উম্মতে মুহাম্মদীর নিকটে এ জেরার উত্তর চাইলে পর তারা বলবে যে, সে সময়ে আমরা অবশ্য উপস্থিত ছিলাম না। কিন্তু আমরা এ সংবাদ আমাদের রসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকটে শুনেছি, যার উপর আমাদের পূর্ণ ঈমান ও আটুট বিশ্বাস রয়েছে। এ সময় রসূলুল্লাহর (সাঃ) নিকট থেকে তাঁর উম্মতের এ কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

সরকথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজ সাক্ষ্যের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতের কথা এই বলে সমর্থন করবেন যে, নিঃসন্দেহে আমি তাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছিলাম।

আর مبشر অর্থ সুসংবাদ প্রদানকারী, যার মর্মার্থ এই যে, তিনি স্বীয় উম্মতের মধ্য থেকে সং ও শরীয়তানুসারী ব্যক্তিবর্গকে বেহেশতের সুসংবাদ দেন এবং নذیر অর্থ তীতি প্রদর্শনকারী। অর্থাৎ, তিনি অব্যাহত ও নীতিচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে আযাব ও শাস্তির ভয়ও প্রদর্শন করেন।

داع الى الله—এর অর্থ তিনি উম্মতকে আল্লাহ পাকের সত্তা ও অস্তিত্ব এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করবেন। دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ কে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ—এর সংগে সম্পর্কযুক্ত করায় বোঝা যায় যে, তিনি মানবমণ্ডলীকে আল্লাহ পাকের দিকে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষেই আহ্বান করেন। এ শর্তের সংযোজন ইংগিতই করে যে, তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ অত্যন্ত কঠিন—যা আল্লাহর অনুমতি ও সাহায্য ব্যতীত মানুষের সাধ্যের বাইরে। راجع অর্থ প্রদীপ মনির জ্যোতির্ময়। রসূলুল্লাহর (সাঃ) পঞ্চম গুণ ও বৈশিষ্ট্য এই বলা হয়েছে যে, তিনি জ্যোতিস্মান প্রদীপ বিশেষ। আবার কতক মনীষী راجع مনির—এর মর্মার্থ কোরআন পাক বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোরআন পাকের বর্ণনাধারা ও প্রকাশভঙ্গী দ্বারা এ কথাই বোঝা যায় যে, ইহাও হযরত (সাঃ)—এরই বৈশিষ্ট্য ও গুণ বিশেষ।

কোরআনে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই গুণাবলী তওরাতেরও উল্লেখ রয়েছে। যেমন, ইমাম বুখারী (রাঃ) উদ্ধৃত করেছেন যে, হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) এরশাদ করেন যে, আমি একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের (রাঃ)—এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনুরোধ করলাম যে, তওরাতের রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর যেসব গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে মোহেরবাণী পূর্বক আমাকে সেগুলো বলে দিন। তিনি এরশাদ করলেন, আমি তা অবশ্যই বলবো। আল্লাহর কসম! রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেসব গুণাবলীর বর্ণনা কোরআনে রয়েছে তা তওরাতেরও রয়েছে। অতঃপর বললেনঃ

“হে নবী (সাঃ)। নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদ প্রদানকারী, তীতি প্রদর্শনকারী এবং উম্মীদের (নিরক্ষরদের) আশ্রয়স্থল ও রক্ষাশ্বরূপে প্রেরণ করেছি। আপনি আমার বান্দাও রসূল। আমি আপনার নাম متوكل (আল্লাহর উপর ভরসাকারী) রেখেছি। আপনি কঠোর ও রুদ্ধ স্বভাববিশিষ্ট নন। বাজারে হে হস্তোড়কারীও নন। আর না আপনি অনায়াস দ্বারা অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণকারী। বরং আপনি ক্ষমা করে দেন। পথভ্রষ্ট ও বক্র উম্মতকে সঠিক পথে দাঁড়া না করিয়ে এবং

তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলা পর্যন্ত আল্লাহ পাক আপনাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন না। আপনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ অস্তিত্ব, বরির কান ও রুদ্ধ হৃদয়সমূহ খুলে দেবেন।”

উল্লেখিত আয়াতসমূহে বিয়ে ও তালাক সশ্রুতি এমন সাতটি হুকুমের আলোচনা রয়েছে যেগুলো কেবল রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যে নির্দিষ্ট এক এরূপ বিশেষীকরণ রসূলুল্লাহর (সাঃ) স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বিশেষ সম্মানের পরিচায়ক। এগুলোর মধ্যে কতক হুকুম তো এমন যে রসূলুল্লাহর সাথে সেগুলোর বিশেষীকরণ একেবারে স্পষ্ট ও স্বাচ্ছন্দ্যমান। আবার কতক এমন সেগুলো যদিও সমস্ত মুসলমানের প্রতি প্রযোজ্য কিন্তু তাতে এমন কিছু ছোট বাট শর্তাবলী রয়েছে যা কেমন রসূলুল্লাহর (সাঃ) জন্যেই নির্দিষ্ট

প্রথম হুকুম : وَأَحْلَلْنَا لَكَ زَوْجَكَ الْيَتِيمَ الْأُتْرُقَ অর্থ,

আমি আপনার জন্যে আপনার বর্তমান স্ত্রীদম্পত্যকে, যাদের মোহরানা আদায় করে দিয়েছেন, হালাল করে দিয়েছি। এ হুকুম বাহ্যতঃ সমস্ত মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু এতে বিশেষীকরণের কারণ এই যে, আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় মহানবীর (সাঃ) সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ চারের অধিক স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ মুসলমানের পক্ষে এক সঙ্গে চারের অধিক স্ত্রী রাখা হালাল নয়। সুতরাং তার জন্যে এক সাথে চারের অধিক স্ত্রী হালাল করে দেয়া কেবল তাঁরই বৈশিষ্ট্য ছিল।

আর এ আয়াতে যে الْيَتِيمَ الْأُتْرُقَ বলা হয়েছে, এটা হালাল হওয়ার শর্ত নয় বরং বাস্তব ঘটনার প্রকাশ মাত্র যে, কত মহিলা নবীজীর (সাঃ) সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন নবীজী (সাঃ) তাদের সবার মোহরানা নগদ আদায় করে দিয়েছেন, বাকী রাখেননি। তাঁর (সাঃ) স্বভাবই এরূপ ছিল যে, যে জিনিস আদায়ের দায়িত্ব তাঁর উপর আরোপিত ছিল, তা কালবিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করে দায়যুক্ত হয়ে যেতেন। এ ঘটনা প্রকাশের মাঝে সাধারণ মুসলমানদের জন্য তার অনুরূপ করার প্রেরণা রয়েছে।

দ্বিতীয় হুকুম : وَمَا مَلَكَ يَتِيمَكَ وَمَنْ ذَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ অর্থ,

হুম্মের (সাঃ) মালিকানাধীনে যেসব নারী রয়েছেন তাঁরা তাঁর জন্যে হালাল। এ আয়াতে وَمَنْ ذَاكَ اللَّهُ عَلَيْهِ শব্দের উৎপত্তি হয়েছে مِنْ ذَاكَ থেকে—পারিভাষিক অর্থে مِنْ সেসব সম্পর্কে বোঝায় যা কার্কেদের থেকে বিনামূল্যে বা সঙ্কিসূত্রে লাভ হয়। আবার কখনো مِنْ শব্দ সাধারণ গণীমতের মাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বকমাল আয়াতে এর উল্লেখ কোন শর্ত হিসেবে নয় যে, আপনার জন্যে কেবল সেসব দাসীই হালাল যা “ফার” مِنْ বা গণীমতের মাল হিসেবে আপনার অংশে পড়েছে। বরং তিনি যাদেরকে মূল্যের বিনিময়ে খরিদ করেছেন তারাও এর অন্তর্গত।

কিন্তু এই হুকুমে বাহ্যিকভাবে রসূলুল্লাহর (সাঃ) কোন স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নেই, এ হুকুম সমস্ত উম্মতের জন্য। যে দাসী গণীমতের মাল হিসেবে ভাগে পড়ে বা দাম দিয়ে খরিদ করা হয় তা তাদের জন্য হালাল। কিন্তু সমস্ত আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গি এটাই চায় যে, উক্ত আয়াতসমূহে যেসব হুকুম রয়েছে তাতে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে কিছু না কিছু বিশেষীকরণ অবশ্যই রয়েছে। এজন্যই রুদ্ধ মা’আনীতে দাসীদের হালাল হওয়া প্রসঙ্গেও রসূলুল্লাহর (সাঃ) এক বৈশিষ্ট্য এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঘেরপভাবে আপনার পরে আপনার মহিয়সী স্ত্রীদম্পত্যের বিয়ে কারো সাথে জায়েয নয়, অনুরূপভাবে যে দাসীকে আপনার জন্য হালাল করা হয়েছে

আপনার পরে সেও অন্য কারো জন্য হালাল হবে না। যেমন হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ)-কে রোম সম্রাট মাক্কাস উপঢৌকন হিসেবে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং যেমন করে তাঁর (সাঃ) পরে মহিয়ারী স্ত্রীগণের কারো সাথে বিয়ে জায়েয ছিল না, এদের বিয়েও কারো সাথে জায়েয রাখা হয়নি।

তৃতীয় হুকুম : خَالٍ وَ عَمٍّ وَ ابْنٍ عَمٍّ এ আয়াতে

একবচন এবং خَالَاتٍ وَ عَمَّاتٍ বহুবচন রূপে গ্রহণের অনেক কারণ আছে বলে আলেমগণ বর্ণনা করেছেন। তফসীরে রুহুল মা'আনী, আবু হাইয়ান বর্ণিত এ কারণ গ্রহণ করেছেন যে, আরবী পরিভাষাই এরূপ—আরবী কবিতাই এর প্রমাণ—যাতে এর বহুবচন ব্যবহৃত হয় না, একবচনই ব্যবহৃত হয়।

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আপনার জন্য চাচা ও ফুফু এবং মামা ও খালার কন্যাগণকে হালাল করে দেয়া হয়েছে। চাচা ও ফুফুর মাঝে পিতৃ বংশীয়। মেয়ে এবং মামা ও খালার মাঝে মাতৃ বংশীয়া সকল মেয়ে তাদেরকে বিবাহ করার বৈধতা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিশেষত্ব নয়; বরং সকল মুসলমানের জন্যে তাদেরকে বিবাহ করা হালাল। কিন্তু তাঁরা আপনার সাথে মক্কা থেকে হিজরত করেছে—এ কথাটি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য। সারকথা এই যে, সাধারণ উম্মতের জন্যে পিতৃ ও মাতৃকুলের এসব কন্যা কোন শর্ত ছাড়াই হালাল—হিজরত করুক অথবা না করুক; কিন্তু রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে কেবল তাঁরাই হালাল, যারা তাঁর সাথে হযরত করে। “সাথে হিজরত” করার জন্যে সফরের সঙ্গে থাকা অথবা একই সময়ে হিজরত করা জরুরী নয়; বরং যে কোন প্রকারে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ন্যায় হিজরত করাই উদ্দেশ্য। ফলে এসব কন্যার মধ্যে যারা কোন কারণে হিজরত করেনি, তাদেরকে বিবাহ করা

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে হালাল রাখা হয়নি। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা আবু তালেবের কন্যা উম্মেহানী (রাঃ) বলেন : আমি মক্কা থেকে হিজরত না করার কারণে আমাকে বিবাহ করা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে হালাল ছিল না। আমি তোলাকাদের মধ্যে গণ্য হতাম। মক্কা বিজয়ের সময় রসুলুল্লাহ (সাঃ) যাদেরকে হত্যা অথবা বন্দী না করে মুক্ত করে দিচ্ছিলেন, তাদেরকে “তোলাকা” বলা হত। (রুহুল মা'আনী, জাসসাস)।

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে বিবাহের জন্যে হিজরতের উপরোক্ত শর্ত কেবল মাতৃ ও পিতৃ বংশীয়া কন্যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল সাধারণ উম্মতের মহিলাদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত ছিল না; বরং তাদের শুধু মুসলমান হওয়াই যথেষ্ট ছিল। পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রে হিজরতের শর্ত আরোপ করার রহস্য সম্ভবতঃ এই যে, পরিবারের মেয়েদের মধ্যে সাধারণতঃ বংশগত কৌলিন্যের গর্ব ও অহমিকা বিদ্যমান থাকে। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহধর্মিণী হওয়ার জন্যে এটা সমীচীন নয়। হযরতের শর্ত আরোপ করে এই গর্ব ও অহমিকার প্রতিকার করা হয়েছে। কারণ হিজরত কেবল সে নারীই করবে, সে আল্লাহ ও রসুলের ভালবাসাকে গোটা পরিবার, দেশ ও বিষয় সম্পত্তির ভালবাসার উপর প্রাধান্য দেবে। এছাড়া হিজরতের সময় মানুষ নানাবিধ দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয় এবং অল্লাহর পথে সহ্য করা দুঃখ কষ্ট কর্ম সংশোধনে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে।

চতুর্থ বিধান : وَأَمْرًا مِّنْهُنَّ أَنْ تَزَوَّجْنَ بِنِهَايَةِ إِرَادَةِ

النِّسَاءِ أَنْ يَسْتَكْبِحَهُنَّ خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ, যদি কোন মুসলমান মহিলা নিজেকে আপনার কাছে নিবেদন করে, অর্থাৎ, দেনমোহর ব্যতিরেকে আপনার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় এবং আপনিও তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হন, তবে আপনার জন্যে দেনমোহর ব্যতীতও বিবাহ হালাল। এই বিধান বিশেষভাবে আপনার জন্যে—অন্য মুমিনদের জন্য নয়।

উপরোক্ত বিধান যে একান্তভাবে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। কেননা, সাধারণ লোকের জন্যে বিবাহে দেনমোহর অপরিহার্য শর্ত। এমনকি, বিবাহের সময় যদি কোন নারী বলে, দেনমোহর নেব না কিংবা কোন পুরুষ বলে, দেনমোহর দেব না—এই শর্তে বিবাহ করছি, তবে তাদের এসব উক্তি ও শর্ত শরীয়তের আইনে অসার হবে বরং “মোহরে মিসল” ওয়াজিব হবে।

এই বিধানের সাথে সম্পৃক্ত خَالِصَةً বাক্যটিকে কেউ কেউ কেবল চতুর্থ বিধানের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত বলেছেন। কিন্তু ‘যমখশরী’ প্রমুখ তফসীরবিদ একে উল্লেখিত সকল বিধানের সাথে জুড়ে দিয়েছেন; অর্থাৎ সবগুলো বিধানই রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে বলা হয়েছে : لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ —আপনার অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আপনার জন্যে এসব বিশেষ বিধান দেয়া হল। উল্লেখিত বিশেষ বিধানসমূহের প্রথম বিধান হচ্ছে—চারের অধিক পত্নী রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে হালাল এবং চতুর্থ বিধান হচ্ছে—দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহ করা হালাল। এই বিধানদ্বয়ের মধ্যে অসুবিধা দূরীকরণ এবং অতিরিক্ত সুবিধা দানের বিষয়টি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। কিন্তু অবশিষ্ট দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম বিধানে বাহ্যতঃ তাঁর উপর অতিরিক্ত কড়া কড়ি আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদিও বাহ্যতঃ এসব কড়া কড়ি অসুবিধা বৃদ্ধি করে; কিন্তু এতে আপনার অনেক উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এসব কড়া কড়ি না থাকলে আপনি অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন, যা মনোকষ্টের কারণ হত। তাই অতিরিক্ত কড়া কড়ির মধ্যেও আপনার অসুবিধা দূরীকরণই উদ্দেশ্য।

পঞ্চম বিধান : আয়াতের مِّنْهُنَّ শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, সাধারণ মুসলমানদের জন্যে ইহুদী ও খ্রীষ্টান নারীদেরকে বিবাহ করা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী হালাল হলেও রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে হালাল নয়; বরং এক্ষেত্রে নারীর ঈমানদার হওয়া শর্ত।

রসুলে করীম (সাঃ)-এর উপরোক্ত পাঁচটি বিশেষ বিধান বর্ণনা করার পর সাধারণ মুসলমানদের বিধান সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে :

فَدَعَيْنَا مَنَافِرَ ضُنَّاعِيَهُمْ فِيْ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ

সাধারণ মুসলমানদের বিবাহের জন্যে আমি যা ফরয করেছি, তা আমি জ্ঞানি—উদাহরণতঃ সাধারণ মুসলমানদের বিবাহ দেনমোহর ব্যতিরেকে হতে পারে না এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টান নারীদের সাথে তাদের বিবাহ হতে পারে। এরূপভাবে পূর্বোক্ত বিধানসমূহে যেসব কড়া কড়ি ও শর্ত রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবাহের জন্যে জরুরী, সেগুলো অন্যদের বেলায় প্রযোজ্য নয়।



(৫১) আপনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। আপনি যাকে দূরে রেখেছেন, তাকে কামনা করলে তাতে আপনার কোন দোষ নেই। এতে অধিক সম্ভাবনা আছে যে, তাদের চক্ষু নীতল থাকবে; তারা দুঃখ পাবে না এবং আপনি যা দেন, তাতে তারা সকলেই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমাদের অন্তরে যা আছে, আল্লাহ জানেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। (৫২) এরপর আপনার জন্যে কোন নারী হালাল নয় এবং তাদের পরিবারে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয় যদিও তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করে, তবে দাসীর ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপর সজাগ নজর রাখেন। (৫৩) হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা খাওয়ার জন্য আহ্ব্য রন্ধনের অপেক্ষা না করে নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমরা আহূত হলে প্রবেশ করো, অতঃপর খাওয়া শেষে আপনা আপনি চলে যেয়ো, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে যেয়ো না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের কাছে সংকোচ বোধ করেন; কিন্তু আল্লাহ সত্যকথা বলতে সংকোচ করেন না। তোমরা তাঁর পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাঁদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ। আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্যে বৈধ নয়। আল্লাহর কাছে এটা গুরুতর অপরাধ। (৫৪) তোমরা খোলাখুলি কিছু বল অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

অতঃপর ষষ্ঠ বিধান : تَرْجَىٰ مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤَيَّ الْيَكَمَلُ مَن تَشَاءُ
 ত্রুয় শব্দটি - ترجى থেকে উদ্ভূত। অর্থ পেছনে রাখা এবং ত্রুয় শব্দটি - يؤي থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ নিকটে আনা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি বিবিগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পারেন। এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে বিশেষ বিধান। সাধারণ উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তির একাধিক পত্নী থাকলে সকলের মধ্যে সমতা বিধান জরুরী এবং বৈধম্যমূলক আচরণ করা হারাম। সমতার মানে ভরণ-পোষণে ও রাত্রি যাপনের সমতা করা। অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সমান সংখ্যক রাত্রি যাপন করতে হবে, কম-বেশী করা হারাম। কিন্তু এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং আয়াতের শেষে আরও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, আপনি যে পত্নীকে একবার দূরে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ইচ্ছা করলে তাকে পুনরায় কাছে রাখতে পারেন। وَمَن ابْتِغَىٰ مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ

আল্লাহ তাআলা রসূল করীম (সাঃ)-এর সম্মানার্থে তাকে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করার হুকুম থেকে মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই ব্যতিক্রম ও অনুমতি সত্ত্বেও কার্যতঃ সর্বদাই সমতা বজায় রেখেছেন।

এতে রসূলুল্লাহ — ذَلِكُمْ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا تَحْزَنَ وَرِضَيْنَ

(সাঃ)-কে পত্নীগণের মধ্যে সমতা বিধানের আদেশ থেকে অব্যাহতি দান এবং তাঁকে সর্বপ্রকার ক্ষমতাদানের কারণ ও রহস্য বর্ণিত হয়েছে। এর রহস্য এই যে, এতে সকল পত্নীর মন সন্তুষ্ট থাকবে এবং তাঁরা যা পাবেন, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এই বিধান তো বাহ্যতঃ পত্নীগণের পছন্দ ও বাসনার বিপরীত হওয়ার কারণে তাদের মর্মবেদনার কারণ হতে পারে। একে পত্নীগণের সন্তুষ্টির কারণ কিরূপে আখ্যায়িত করা হল? এর জবাব বর্ণিত হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে অধিকারই অসন্তুষ্টির আসল কারণ হয়ে থাকে। কারও কাছে কিছু পাওনা থাকলে সে যদি তা আদায় করতে ত্রুটি করে তবেই পাওনাদার দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যার কাছে কারও কোন পাওনা নেই, সে যদি সামান্য দয়াও প্রদর্শন করে, তবে প্রতিপক্ষ খুবই আনন্দিত হয়। এখানেও যখন বলা হয়েছে যে, পত্নীগণের মধ্যে সমতা বিধান করা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে জরুরী নয়; বরং তিনি এ ব্যাপারে স্বাধীন, তখন তিনি যে পত্নীকে যতটুকু মনোযোগ ও সজ্ঞ দান করবেন, তাকে সে এক অনুগ্রহ ও দান মনে করে সন্তুষ্ট হবে।

واللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ

عَلِيمًا حَكِيمًا অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা জানেন তোমাদের অন্তরে কি

আছে। তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। উল্লিখিত আয়াতসমূহে এ পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবাহের সাথে কোন না কোন দিক দিয়ে সম্পর্ক রাখ, এরূপ বিধানসমূহ বিধৃত হয়েছে। এরপরও এমন ধরনের কতক বিধান বর্ণিত হবে। মধ্যস্থলে এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের অন্তরে যা আছে জানেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। বাহ্যতঃ পূর্ববর্তী ও

পরবর্তী বিষয়বস্তুর সাথে একথা কোন সম্পর্ক রাখে না। রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে—বর্ণিত বিধানসমূহের মধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর জন্যে চারের অধিক পত্নীগ্রহণের অনুমতি এবং দেনমোহর ব্যতিরেকে বিবাহের অনুমতি দেখে কারও মনে শয়তানী কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা ছিল। তাই মধ্যস্থলে আলোচ্য আয়াত নির্দেশ দিয়েছে যে, মুসলমানরা যেন তাদের অন্তরকে এ ধরনের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, এসব বিশেষত্ব আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, যা অনেক রহস্য ও উপযোগিতার উপর ভিত্তিশীল।

সপ্তম বিধান : لَيْسَ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَٰكِنْ نَّبَذَلْ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَكَوَلَّيْنَاهُ حُسْنَهُنَّ অর্থ, অতঃপর আপনার জন্যে অন্য মহিলাকে বিবাহ করা হালাল নয় এবং বর্তমান পত্নীগণের মধ্যে কাউকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যকে বিবাহ করাও হালাল নয়।

এ আয়াতে مِنْ بَعْدُ শব্দের দূরকম তফসীর হতে পারে—(১) সেই নারীগণের পরে যারা বর্তমানে আপনার বিবাহে আছে, অন্য কাউকে বিবাহ করা হালাল নয়। কোন কোন সাহাবী ও তফসীরবিদ থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে, যেমন হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা নবী পত্নীগণকে দু'টি বিষয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছিলেন—সাংসারিক ভোগবিলাস লাভের উদ্দেশ্যে রসূলের (সাঃ) সঙ্গ ত্যাগ করা অথবা দুঃখ-কষ্ট ও সুখ যাই পাওয়া যায় তাকে বরণ করে নিয়ে তাঁর স্ত্রী হিসাবে থাকা। সে মতে পূণ্যময়ী পত্নীগণ সকলেই অতিরিক্ত ভরণ-পোষণের দাবী পরিত্যাগ করে সর্ববিস্তার রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর পত্নীত্বে থাকাকেও বেছে নেন। এরই পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সন্তোকেও এই নয় পত্নীর জন্যে সীমিত করে দেন। ফলে তাঁদের ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করা বৈধ রইল না।—(রুহুল মা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা নবী-পত্নীগণকে একমাত্র তাঁর জন্যেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। ফলে তাঁর ওফাতের পরও তাঁরা অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারতেন না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেন যে, তিনি তাঁদের ব্যতীত অন্য কোন নারীকে বিবাহ করতে পারবেন না। এক রেওয়াজে হযরত ইকরিমা (রাঃ) থেকেও এই তফসীর বর্ণিত আছে।

(২) অপর এক রেওয়াজে হযরত ইকরিমা, ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ থেকে مِنْ بَعْدُ শব্দের দ্বিতীয় তফসীর من بعد الاصناف অর্থ, বর্ণিত আছে। অর্থাৎ, আয়াতের শুরুতে আপনার জন্যে যত প্রকার নারী হালাল করা হয়েছে, তাঁদের ব্যতীত অন্য কোন প্রকার নারীকে বিবাহ করা আপনার জন্যে হালাল নয়।

সূত্রাং مِنْ بَعْدُ শব্দের অর্থ এই যে, যেসব প্রকার নারী তাঁর জন্যে হালাল করা হয়েছে; কেবল তাঁদের মধ্যেই আপনার বিবাহ হতে পারে। সাধারণতঃ নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়াই শর্ত এবং পরিবারের নারীদের মধ্যে মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে হিজরত করাও শর্ত। যাদের মধ্যে এই শর্তদ্বয় অনুপস্থিত, তাদেরকে বিবাহ করা হালাল নয়। এই তফসীর অনুযায়ী আলোচ্য বাক্যে কোন নতুন বিধান ব্যক্ত হয়নি, এবং পূর্বোক্ত বিধানেরই তাকীদ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে মাত্র। এ আয়াতের কারণে নয় জনের পর অন্য নারীকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যায়নি; বরং মুমিন নয়,

এমন নারীকে ও হিজরত করেনি পরিবারের এমন নারীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়েছে মাত্র।

وَلَا يَنْبَغُ لِلرَّسُولِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ بَعْدِ مَا نَزَلَ بِهِ الرُّسُلُ الْأُولَى আলাচ্য আয়াতের দ্বিতীয় তফসীর অনুযায়ী এ বাক্যের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, বর্তমান স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্য নারীদেরকে বর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে বিবাহ করা যদিও জায়েয; কিন্তু এটা জায়েয নয় যে, একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বহাল করবেন। অর্থাৎ নিছক পরিবর্তন মানসে কোন বিবাহ বৈধ নয়। পরিবর্তনের নিয়ত ব্যতীত যত ইচ্ছা বিবাহ করতে পারেন।

পক্ষান্তরে প্রথম তফসীর অনুযায়ী অর্থ এই হবে যে, বর্তমান পত্নী তালিকায় নতুন কোন মহিলার সংযোজনও করতে পারবেন না এবং কাউকে পরিবর্তনও করতে পারবেন না। অর্থাৎ একজনকে তালাক দিয়ে তার স্থলে অন্যজনকে বিবাহ করতে পারবেন না।

আলাচ্য আয়াতসমূহে ইসলামী সামাজিকতার কতিপয় রীতি-নীতি ও বিধান বিবৃত হয়েছে। পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, এসব আয়াতে বর্ণিত রীতি-নীতিগুলো প্রথমে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর গৃহ ও তাঁর পত্নীগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে; যদিও এগুলো তাঁর ব্যক্তিসত্তার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। প্রথম বিধান ঋণওয়ার দাওয়াত ও মেহমানের কতিপয় রীতি-নীতি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ وَلَا اسْتَئْذِنُوا مِنْهُنَّ

আয়াতে দাওয়াত ও আপ্যায়ন সম্পর্কিত তিনটি রীতি-নীতি বর্ণিত হয়েছে। এসবগুলো সকল মুসলমানের জন্যে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য; কিন্তু যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে, তা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর গৃহে সংঘটিত হয়েছিল। তাই শিরোনামে بَيُّوتِ النَّبِيِّ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম রীতি এই যে, নবী (সাঃ)—এর গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না। বলা হয়েছেঃ

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُدْزَنَ لَكُمْ

দ্বিতীয় রীতি এই যে, প্রবেশের অনুমতি এমন কি, ঋণওয়ার দাওয়াত হলেও সময়ের পূর্বে উপস্থিত হয়ে আহ্বায় প্রস্তুতির অপেক্ষায় বসে থেকো না। اِنَّا شব্দের অর্থ এখানে অপেক্ষাকারী এবং نَاطِرٌ - عَيْنٌ ظَاهِرَةٌ শব্দের অর্থ খাদ্য রন্ধন করা। আয়াতে لَا تَدْخُلُوا নিষেধাজ্ঞা থেকে দু'টি ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে—একটি اِنْ كَانَ يُدْزَنُ لَكُمْ এর اِنْ শব্দ দ্বারা এবং অপরটি عَيْنٌ শব্দ দ্বারা। এর অর্থ এই যে, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না এবং সময়ের পূর্বে এসে খাদ্য রন্ধনের অপেক্ষায় বসে থেকো না; বরং যথাসময়ে আহ্বান করা হলে গৃহে প্রবেশ করবে। বলা হয়েছে—

وَلَكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا

তৃতীয় রীতি এই যে, ঋণওয়া শেষে নিজ নিজ কাজে ছড়িয়ে পড়। পরস্পরে কথাবার্তা বলার জন্যে গৃহে অনড় হয়ে বসে থেকো না। বলা হয়েছেঃ

وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَبِهُوا وَلَا مُسْتَأْذِنِينَ

মাসআলা : এই রীতি সেই ক্ষেত্রে, যেখানে ঋণওয়ার পর দাওয়াত

প্রাপ্তদের বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্যে কষ্টের কারণ হয় ; যেমন সে একাজ সেরে অন্য কাজে মশগুল হতে চায় কিংবা তাদেরকে বিদায় দিয়ে অন্য মেহমানদেরকে খাওয়াতে চায়। উভয় অবস্থায় দাওয়াত প্রাপ্তদের বসে থাকা তার জন্যে কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে সাধারণ অবস্থা ও নিয়ম দৃষ্টে জানা যায় যে, আহ্বারের পর দাওয়াত প্রাপ্তদের বেশীক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্যে কষ্টের কারণ হবে না, সেখানে এই রীতি প্রযোজ্য নয়। আজকালকার দাওয়াতসমূহে তাই প্রচলিত আছে। আয়াতের পরবর্তী বাক্য এর প্রমাণ, যাতে বলা হয়েছে :

إِنْ ذُلُّكُمْ كَانَ يُوْذَى الْبَنِيَّ فَيَسْتَعِجِلُّكُمْ وَلِلَّهِ الْآسِنَةُ مِنَ الْحَقِّ

অর্থাৎ, আহ্বারের পর কথাবার্তায় মশগুল হতে নিষেধ করার কারণ এই যে, এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কষ্ট অনুভব করতেন। কারণ, মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা অন্দরমহলে করা হত। সেখানে মেহমানদের বেশীক্ষণ বসে থাকা যে কষ্টের কারণ, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

দ্বিতীয় বিধান নারীদের পর্দা :

وَأَسْكَنْتُوهُنَّ مِمَّا فَتَحْتُ لَكُمْ مِنْ دُونِ الْحَرَامِ وَتَوَارَى

এতে শানে-নুযুলের বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে বর্ণনা এবং বিশেষভাবে নবী-পত্নীগণের উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্যে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বিধানের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোন ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র বস্তু ইত্যাদি নেয়া জরুরী হলে সামনে এসে নেবে না ; বরং পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। আরও বলা হয়েছে যে, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে।

পর্দার বিশেষ গুরুত্ব : এখানে প্রাধান্যযোগ্য বিষয় এই যে, এস্থলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পুণ্যাত্মা পত্নীগণকে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পাক-সাঁফ রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। পূর্বোল্লিখিত الْيَدُ وَهَبَ عَنْكُمْ الرَّجُلُ أَهْلَ الْبَيْتِ আয়াতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অপরদিকে যেসব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেয়া হয়েছে, তারা হলেন রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবায়ে কেরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা ফেরেশতাগণেরও উর্ধ্বে।

কিন্তু এসব বিষয় সত্ত্বেও তাঁদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্যে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। আজ এমন ব্যক্তি কে? যে তার মনকে সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র মন অপেক্ষা এবং তার স্ত্রীর মনকে পুণ্যাত্মা নবীপত্নীগণের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবী করতে পারে? আর এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোন অনিষ্টের কারণ হবে না?

আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতরণের হেতু : এসব আয়াতের শানেনুযুলে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়। এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। ঘটনাবলীর সমষ্টি এ আয়াত অবতরণের হেতু হতে পারে। আয়াতের শুরুতে দাওয়াতের শিষ্টাচার বর্ণিত হয়েছে যে, ডাকা না হলে খাওয়ার জন্যে যাবে না এবং খাওয়ার অপেক্ষায় পূর্ব থেকে বসে থাকবে না। ইবনে আবী হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এর শানে নুযুল এই যে, এই

আয়াত এমন লোভী ও পরভোজী লোকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা দাওয়াত ছাড়াই কারও গৃহে যেয়ে খাওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে।

পর্দা সম্পর্কিত দ্বিতীয় বিধানের শানে-নুযুল সম্পর্কে ইমাম বুখারী দু'টি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাসের (রাঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়েত এই যে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) ! আপনার কাছে সং-অসং হরেক রকমের লোক আসা-যাওয়া করে, আপনি পত্নীগণকে পর্দা করার আদেশ দিলে খুবই ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত নাযিল হয়।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত ফারাক আযমের (রাঃ) উক্তি বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

“আমি আমার পালনকর্তার সাথে তিনটি বিষয়ে একইরূপ মতে পৌঁছেছি—

(১) আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এই মর্মে বাসনা প্রকাশ করলাম যে, আপনি মকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিলে ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা আদেশ নাযিল করলেন, তোমরা মকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নাও। (২) আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপনার পত্নীগণের সামনে সং-অসং প্রত্যেক ব্যক্তি আসে। আপনি তাদেরকে পর্দার আদেশ দিলে ভাল হত। এর পরিপ্রেক্ষিতে পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হল। (৩) নবী-পত্নীগণের মধ্যে যখন পারস্পরিক আত্মমর্যাদাবোধ ও ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তখন আমি বললাম, যদি রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দেন, তবে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের অপেক্ষা উত্তম পত্নী তাঁকে দান করবেন। অতঃপর ঠিক এই ভাষায়ই কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে গেল।”

জ্ঞাতব্য : হযরত ফারাক আযমের (রাঃ) কথায় শিষ্টাচার লক্ষ্যণীয়। তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে একথা বলতে চেয়েছিলেন, আমার পালনকর্তা তিনটি বিষয়ে আমার সাথে একই মতে পৌঁছেছেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, পর্দার আয়াতের স্বরূপ সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। কারণ, আমি ছিলাম এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) বিবাহের পর বধূবেশে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গৃহে আগমন করেন এবং গৃহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওলীমার জন্যে কিছু খাদ্য প্রস্তুত করান এবং সাহাবায়ে কেরামকে দাওয়াত করেন। খাওয়ার পর কিছু লোক পারস্পরিক কথাবার্তার জন্যে সেখানেই অনড় হয়ে বসে রইল। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং যয়নব (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি সংকোচবশতঃ প্রাচীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছিলেন। লোকজনের এভাবে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কষ্ট অনুভব করছিলেন। তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে অন্য পত্নীদের সাথে সাক্ষাৎ ও সালামের জন্যে চলে গেলেন। তিনি ফিরে এসে দেখলেন যে, লোকজন তেমনি বসে রয়েছে। তাঁকে ফিরে আসতে দেখে তাদের সম্বিৎ ফিরে এল এবং স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘরে প্রবেশ করে অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় বের হয়ে এলেন। আমি সেখানেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি পর্দার আয়াত يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا فِي الْبَيْتِ الْكَافِرِينَ পাঠ করে শোনালেন, যা তখনই অবতীর্ণ হয়েছিল।

এ ঘটনা বর্ণনা করে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি এসব আয়াত অবতরণের সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তি ছিলাম। আমার সামনেই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছিল। — (তিরমিযী)

পর্দার আয়াতের শানে—নূমুল সম্পর্কে বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনাত্রয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। তিনটি ঘটনাই একত্রে আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে।

তৃতীয় বিধান রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর ওফাতের পর কারও সাথে তাঁর পত্নীগণের বিবাহ বৈধ নয় : وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُزْوَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُزْوَا زَوَاجَهُ وَنَبِيِّهِ
এর পূর্বের বাক্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কষ্ট হয়, এমন প্রত্যেক কথা ও কাজ হারাম করা হয়েছিল। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাঁর ওফাতের পর তাঁর পত্নীগণের সাথে কারও বিবাহ হালাল নয়।

উপরে বর্ণিত সব বিধানে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর পত্নীগণকে সম্বোধন করা হলেও বিধানাবলী সকল উম্মতের জন্যও ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু এই সর্বশেষ বিধানটি এরূপ নয়। কেননা, সাধারণ উম্মতের জন্যে বিধান এই যে, স্বামীর মৃত্যুর পর ইদত অতিবাহিত হলে স্ত্রী অপরকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু নবী পত্নীগণের জন্যে বিশেষ বিধান এই যে, তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর ওফাতের পর কাউকে বিবাহ করতে পারবেন না।

এর কারণ এটাই হতে পারে যে, তারা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী মুমিনগণের জননী। তবে তাঁদের জননী হওয়ার প্রভাব তাঁদের আত্মিক সম্ভানদের উপর এভাবে প্রতিফলিত হয় না যে, তারা পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী হয়ে একে অপরকে বিবাহ করতে পারবে না। বরং বিবাহের অবৈধতা তাঁদের ব্যক্তিসত্ত্বা পর্যন্ত সীমিত রাখা হয়েছে।

এরূপ বলাও অবাস্তব নয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পবিত্র রওজা শরীফে জীবিত আছেন। তাঁর ওফাত কোন জীবিত স্বামীর আড়াল হয়ে

যাওয়ার অনুরূপ। এ কারণেই তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হয়নি এবং এর ভিত্তিতেই তাঁর পত্নীগণের অবস্থা অপরাপর বিধবা নারীদের মত হয়নি।

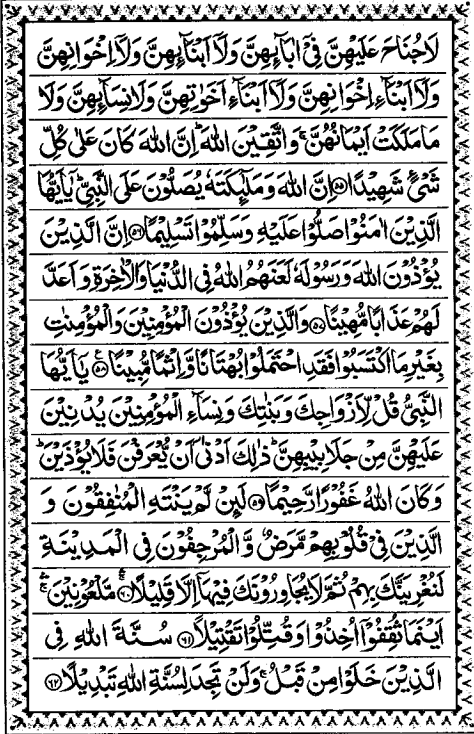
আরও একটি রহস্য এই যে, শরীয়তের নিয়মানুযায়ী জ্ঞান্নাতে প্রত্যেক নারী তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে অবস্থান করবে। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) তাঁর পত্নীকে ওসিয়ত করেছিলেন, তুমি জ্ঞান্নাতে আমার স্ত্রী থাকতে চাইলে আমার পর দ্বিতীয় বিবাহ করো না। কেননা জ্ঞান্নাতে সর্বশেষ স্বামীই তোমাকে পাবে।—(কুরতুবী)

তাই আল্লাহ তাআলা নবী-পত্নীগণকে পয়গম্বরের পত্নী হওয়ার যে গৌরব ও সম্মান দুনিয়াতে দান করেছেন, পরকালে তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে তাঁদের বিবাহ অপরের সাথে হারাম করে দিয়েছেন।

এছাড়া কোন স্বামী স্বভাবগতভাবে এটা পছন্দ করে না যে, তার স্ত্রীকে অপরে বিবাহ করুক। কিন্তু এই স্বাভাবিক মনোবাসনা পূর্ণ করা সাধারণ মানুষের জন্যে শরীয়তের আইনে জরুরী নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর এই স্বাভাবিক বাসনার প্রতিও আল্লাহ তাআলা সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এটা তাঁর বিশেষ সম্মান।

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া অথবা তাঁর ইস্তিকালের পর তাঁর পত্নীগণকে বিবাহ করা আল্লাহ তাআলার কাছে গুরুতর পাপ।

إِنْ يُبْدُوا إِلَيْكَ إِهْرَاقُ شَعْرَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِحَيْثُ عَظِيمًا আয়াতের শেষে পুনরাবৃত্তি করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা অন্তরের গোপন ইচ্ছা ও চিন্তাধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তোমরা কোন কিছু গোপন কর বা প্রকাশ কর সবই আল্লাহর সামনে প্রকাশমান। এতে জোর দেয়া হয়েছে, উল্লিখিত বিধানাবলীর ব্যাপারে যেন কোন প্রকার সন্দেহ, সংশয় ও কুমন্ত্রণাকে অন্তরে স্থান না দেয়া হয় এবং এগুলোর বিরোধিতা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা হয়।



(৫৫) নবী-পত্নীগণের জন্যে তাঁদের পিতা পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, সহধর্মিণী নারী এবং অধিকারভূক্ত দাসদাসীগণের সামনে যাওয়ার ব্যাপারে গোনাহ নেই। নবী-পত্নীগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সব বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। (৫৬) আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর জন্যে রহমতের তরে দোয়া কর এবং তাঁর প্রতি সালাম প্রেরণ কর। (৫৭) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদের প্রতি ইহকাল ও পরকালে অভিসম্পাত করেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন অবমাননাকর শাস্তি (৫৮) যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাণের বোঝা বহন করে। (৫৯) হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু (৬০) মুনাফেকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব। অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অংশই থাকবে। (৬১) অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং প্রাণে বধ করা হবে। (৬২) যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আপনি আল্লাহর রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না।

এর পূর্ববর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য উল্লেখিত হয়েছিল এবং প্রসঙ্গক্রমে নবী-পত্নীগণের পর্দার বিষয় আলোচিত হয়েছিল। এর পরেও পর্দার কিছু বিধান বর্ণিত হবে। মাঝখানে সেই বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে, যার জন্যে এসব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে এবং তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর মাহাত্ম্য প্রকাশ এবং তাঁর সম্মান, মহব্বত ও আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ দান।

আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদেরকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি দরদ ও সালাম প্রেরণ করার আদেশ দান করা। কিন্তু তা এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রথমে আল্লাহ স্বয়ং নিজের ও তাঁর ফেরেশতাগণের দরদ পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর সাধারণ মুমিনগণকে দরদ প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছেন। এতে তাঁর মাহাত্ম্য ও সম্মানকে এত উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে যে, রসূলের (সাঃ) শানে যে কাজের আদেশ মুসলমানদেরকে দেয়া হয়, সেকাজ স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণও করেন। অতএব যে মুমিনগণের প্রতি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর অনুগ্রহের অঙ্গ নেই, তাদের তো এ কাজে খুব যত্নবান হওয়া উচিত। এ বর্ণনাভঙ্গীর আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে করে দরদ ও সালাম প্রেরণকারী মুসলমানদের একটি বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এমন এক কাজে শরীক করে নিয়েছেন, যা তিনি নিজেও করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও।

সালাত ও সালামের অর্থ : আরবী ভাষায় সালাত শব্দের অর্থ রহমত, দোয়া, প্রশংসাকীর্তন। আয়াতে আল্লাহ তাআলার প্রতি যে সালাত সম্পৃক্ত করা হয়েছে এর অর্থ তিনি রহমত নাযিল করেন। ফেরেশতাগণ সালাত প্রেরণ করেন কথার অর্থ তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর জন্যে রহমতের দোয়া করেন। আর সাধারণ মুমিনদের তরফ থেকে সালাতের অর্থ দোয়া ও প্রশংসাকীর্তনের সমষ্টি। তফসীরবিদগণ এ অর্থই লিখেছেন। ইমাম বুখারী আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলার সালাতের অর্থ রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সম্মান ও ফেরেশতাগণের সামনে প্রশংসাকীর্তন করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সম্মান দুনিয়াতে এই যে, তিনি তাঁর নাম সম্মুত করেছেন। ফলে আযান, একামত ইত্যাদিতে আল্লাহর নামের সাথে সাথে তাঁর নামও শামিল করে দিয়েছেন, তার ধর্ম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রবল করেছেন; তাঁর শরীয়তের কাজ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন এবং তাঁর শরীয়তের হেফায়তের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। — পক্ষান্তরে পরকালে তাঁর সম্মান এই যে, তাঁর স্থান সমগ্র সৃষ্টির উর্ধ্বে রেখেছেন এবং যে সময় কোন পয়গম্বর ও ফেরেশতার সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকবে না, তখনও তাঁকে সুপারিশের ক্ষমতা দিয়েছেন, যাকে “মাকামে-মাহমুদা” বলা হয়।

এই অর্থদৃষ্টে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, হাদীস অনুযায়ী দরদ ও সালামে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সাথে তাঁর বংশধর ও সাহাবীগণকেও শামিল করা হয়। কাজেই আল্লাহর সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনে তাঁর সাথে অন্যকে কিরূপে শরীক করা যায়? এর জওয়াব রূহুল মা’আনী ইত্যাদি কিতাবে এই দেয়া হয়েছে যে, সম্মান ও প্রশংসাকীর্তনের অনেক স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর রসূলুল্লাহ (সাঃ) লাভ করেছেন এবং এক স্তরে বংশধর, সাহাবী এবং সাধারণ মুমিনগণও শামিল রয়েছেন।

একটি সন্দেহের জওয়াব : (এক) — সালাত শব্দ দ্বারা একই

সময়ে একাধিক অর্থ (রহমত, দোয়া ও প্রশংসা) নেয়াকে পরিভাষায় “ওমূমে মুশতারিক” বলা হয়, যা কারও কারও মতে জায়েয নয়। কাজেই এস্থলে সালাত শব্দের এক অর্থ নেয়াই সঙ্গত অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্মান, প্রশংসা ও শুভেচ্ছা। অতঃপর এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হলে এর সারমর্ম হবে রহমত, ফেরেশতাগণের পক্ষ থেকে হলে দোয়া, ও এস্তেগফার এবং সাধারণ মুমিনগণের তরফ থেকে হলে দোয়া, প্রশংসা ও সম্মানের সমষ্টি অর্থ হবে।

সালাম শব্দটি ধাতু, এর অর্থ সালামত ও নিরাপত্তা। এর উদ্দেশ্য ক্রটি, দোষ ও বিপদাদপ থেকে নিরাপদ থাকা। “আসসালামু আলাইকা” বাক্যের অর্থ এই যে, দোষক্রটি বিপদাদপ থেকে নিরাপত্তা আপনার সঙ্গী হোক। আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী এটা *على* অব্যয় ব্যবহারের স্থান নয়। কিন্তু প্রশংসার অর্থ শামিল থাকার কারণে *على* অব্যয় যোগে *عليك* অথবা *عليكم* বলা হয়।

কেউ কেউ এখানে “সালাম” শব্দের অর্থ নিয়েছেন আল্লাহর সত্তা। কেননা, এটা তাঁর সুন্দরতম নামসমূহের অন্যতম। অতএব “আসসালামু আলাইকুম” বাক্যের অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ আপনার হেফায়ত ও দেখাশোনার যিম্মাদার।

মাসআলা : অধিকাংশ ইমাম এ বিষয়ে একমত যে, কেউ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাম উল্লেখ করলে অথবা শুনলে দরদ পাঠ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কেননা, হাদীসে এরূপ ক্ষেত্রে দরদ পাঠ না করার কারণে শাস্তিবানী বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : *رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصل على* অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরদ পাঠ করেন না।

অন্য এক হাদীসে আছে— *البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على*—সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে দরদ পাঠ করেন না।

০ একই মজলিসে বার বার নাম উচ্চারণ হলে একবার দরদ পাঠ করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেকবার পাঠ করা মুস্তাহাব। মুহাদ্দিগণই সর্বাধিক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাম উচ্চারণ করতে পারেন। কারণ, হাদীস চর্চাই তাঁদের সার্বক্ষণিক কাজ। এতে বার বার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাম আসে। তাঁরা প্রত্যেক বার দরদ ও সালাম পাঠ করেন ও লেখেন। সমস্ত হাদীস গ্রন্থ এর সাক্ষ্য দেয়। বার বার দরদ ও সালাম লিপিবদ্ধ করলে কিতাবের পৃষ্ঠা সংখ্যা বেড়ে যাবে—তাঁরা এ বিষয়েরও পরওয়া করেননি। অধিকাংশ ছোটখাট হাদীসে দু’এক লাইনের পরে এবং কোথাও কোথাও এক লাইনেই একাধিকবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নাম আসে। কিন্তু হাদীসবিদগণ কোথাও দরদ ও সালাম বাদ দেননি।

০ মুখে নাম উচ্চারণ করলে যেমন দরদ ও সালাম ওয়াজিব, তেমনি কলমে লেখার সময়ও দরদ ও সালাম লেখা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে সংক্ষেপে “সাঃ” লেখাও যথেষ্ট নয়। সম্পূর্ণ দরদ ও সালাম লেখা বিধেয়।

০ দরদ ও সালাম উভয়টি পাঠ করাই উত্তম ও মুস্তাহাব। কিন্তু কেউ উভয়ের মধ্যে যে কোন একটি পাঠ করলে অধিকাংশ ফেকাহবিদের মতে তাতে কোন গোনাহ নেই। ইমাম নভভী একে মাকরুহ বলেছেন। ইবনে হাজার হাযসমীর মতে এর অর্থ মাকরুহ তানযীহী। আলমগণ উভয়টিই পাঠ করেন এবং মাঝে মাঝে যে কোন একটিও পাঠ করেন।

০ পয়গম্বরগণ ব্যতীত কারও জন্যে সালাত তথা দরদ ব্যবহার করা

অধিকাংশ আলেমদের মতে বৈধ নয়। ইমাম বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের এই কতোয়া বর্ণনা করেছেন :

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুসলমানদেরকে সেসব কাজকর্মের ব্যাপারে হুশিয়ার করা হয়েছিল, যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে কষ্টদায়ক। কিছুসংখ্যক মুসলমান অজ্ঞতা অথবা অনবধানতাবশতঃ অনিচ্ছাকৃতভাবে এ ধরনের কাজকর্মে লিপ্ত হত; যেমন দাওয়াত ব্যতিরেকেই তাঁর গৃহে চলে যাওয়া অথবা দাওয়াতের নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে এসে বসে থাকা অথবা ঋণায়ার পর পারস্পরিক কথাবার্তায় মশগুল হয়ে বিলম্ব করা ইত্যাদি। এসব কাজের ব্যাপারে *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْزُقُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ* আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছিল।

এসব কষ্ট অনিচ্ছায় ও অনবধানতাবশতঃ হয়ে যেত। তাই এ ব্যাপারে কেবল হুশিয়ার করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে সেই কষ্টের উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইসলামের শত্রু কাফের ও মনাফেকদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাপূর্বক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেয়া হত। এতে দৈহিক নির্যাতনও দাখিল আছে, যা বিভিন্ন সময়ে কাফেরদের হাতে তিনি ভোগ করতেন এবং আত্মিক কষ্টও দাখিল আছে, যা বিদ্‌প, দোষারোপ ও নবী-পত্নীগণের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তাঁকে দেয়া হত। এই ইচ্ছাপূর্বক কষ্টদানের কারণে অভিসম্পাত এবং কঠোর শাস্তিবানীও আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তাআলাকে কষ্টদানের কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এমন কাজকর্ম করা ও কথাবার্তা বলা, যা স্বভাবতঃ মর্মপিড়ার কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তা প্রভাব-গ্রহণজনিত সকল ক্রিয়ার উর্ধ্বে। তাঁকে কষ্ট দেয়ার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু স্বভাবতঃ পীড়াদায়ক কাজকর্মকে এখানে পীড়া ও কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

এখানে আল্লাহকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্য কি, এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে কষ্ট দেয়ার অর্থ এমন কাজকর্ম ও কথাবার্তা, যেগুলো সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মৌখিকভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, এসব কাজ আল্লাহ তাআলার কষ্টের কারণ হয়। উদাহরণতঃ বিপদাপদের সময় মহাকালকে গালমন্দ দেয়া। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুর কর্তা আল্লাহ তাআলা। কিন্তু কাফেররা মহাকালকে কর্তা মনে করে গালি দিত। ফলে এই গালি আসল কর্তা পর্যন্তই পৌছত। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ করা আল্লাহ তাআলার কষ্টের কারণ। সুতরাং আয়াতে আল্লাহকে কষ্ট দেয়ার অর্থ এ ধরনের কথাবার্তা ও কাজকর্ম করা।

অন্য তফসীরবিদগণ বলেন, এখানে প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কষ্ট প্রতিরোধ করা এবং এর জন্যে শাস্তিবানী বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কিন্তু আয়াতে রসূলের কষ্টকে আল্লাহর কষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, রসূলকে কষ্ট দেয়া প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই কষ্ট দেয়া। এ সম্পর্কিত একটি হাদীস পরে উল্লেখ করা হবে। কোরআন পাকের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনাদুষ্টেও এই তফসীরটি অগ্রগণ্য। কারণ, পূর্বেও রসূলের কষ্ট বর্ণিত আছে এবং পরেও তাই বর্ণিত হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কষ্টই যে আল্লাহ তাআলার কষ্ট, একথা আবদুর রহমান ইবনে মুগাফফাল মুযানী (রাঃ)এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয় :

“রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করো না। কেননা, যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসে, সে আমার

ভালবাসার কারণে তাদেরকে ভালবাসে আর যে তাদের সাথে শত্রুতা রাখে, সে আমার সাথে শত্রুতা রাখার কারণে শত্রুতা রাখে। যে তাদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়, যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, যে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ সত্ত্বরই তাকে পাকড়াও করবেন।” —(মায়হারী)

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর কষ্টের কারণে আল্লাহ তাআলার কষ্ট হয়। অনুরূপভাবে আরও জানা গেল যে, কোন সাহাবীকে কষ্ট দিলে অথবা তাঁর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর কষ্ট হয়।

এক রেওয়াজেতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতটি হযরত আয়েশা (রাঃ)—এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রাঃ)—এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপের দিনগুলোতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফেকের ঘরে কিছু লোক সমবেত হয়ে এই অপবাদ প্রচার ও প্রসারিত করার কথাবার্তা বলত। তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের কাছে অভিযোগ পেশ করে বলেন : লোকটি আমাকে কষ্ট দেয়। —(মায়হারী)

রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে যে কোন প্রকারে কষ্ট দেয়া কুফরী : যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে কোন প্রকার কষ্ট দেয়, তাঁর সত্তা অথবা গুণাবলীতে প্রকাশ্য অথবা ইঙ্গিতে কোন দোষ বের করে, সে কাফের হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াত দৃষ্টে তার প্রতি আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত ইহকালেও হবে এবং পরকালেও। —(মায়হারী)

৫৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে কোন মুসলমানকে কষ্ট ও মিথ্যা অপবাদ দেয়া হারাম — যদি তারা আইনতঃ এর যোগ্য না হয়। সাধারণ মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ কথাটি যুক্ত করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে কারও কোন অপকর্মে জড়িত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, যার প্রতিফল স্বরূপ তাকে কষ্ট দেয়া শরীয়তের আইনে জায়েয। প্রথম আয়াতে আল্লাহ ও রসুলকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপার ছিল। তাই তাতে উপরোক্ত শর্ত যুক্ত করা হয়নি। কারণ সেখানে কষ্ট দান বৈধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

কোন মুসলমানকে শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্ট দেয়া হারাম : **وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ** আয়াত দ্বারা কোন মুসলমানকে শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতিরেকে কষ্টদানের অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : “কেবল সে—ই মুসলমান, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে; কেউ কষ্ট না পায় আর কেবল সে—ই মুমিন, যার কাছ থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে নিরুদ্বেগ থাকে। —(মায়হারী)

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সাধারণ মুসলমান নারী ও পুরুষকে কষ্ট দেয়া হারাম ও মহাপাপ এবং বিশেষ করে রসুলে করীম (সাঃ)—কে পীড়া দেয়া কুফর ও অভিসম্পাতের কারণ। মুনাফেকদের পক্ষ থেকে সব মুসলমান ও রসুলুল্লাহ (সাঃ) দুই প্রকারে কষ্ট পেতেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব নির্যাতন বন্ধের ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে নারীদের পর্দা সংক্রান্ত কিছু অতিরিক্ত বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। মুনাফেকদের দ্বিধা নির্যাতনের একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের দাসীরা কাজ কর্মের জন্য বাইরে গেলে দুষ্ট প্রকৃতির মুনাফেকরা তাদেরকে উত্যক্ত করত এবং মাঝে মাঝে দাসী সম্বন্ধে স্বাধীন নারীদেরকেও উত্যক্ত করত। ফলে সাধারণভাবে মুসলমানগণ এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) কষ্ট পেতেন।

দ্বিতীয় নির্যাতন ছিল এই যে, তারা সদাসর্বদা মিথ্যা খবর রটনা করত। উদাহরণতঃ এখন অমুক শত্রুপক্ষ মদীনা আক্রমণ করবে এবং সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। প্রথম প্রকার নির্যাতন থেকে স্বাধীন নারীদেরকে বাচানোর তাৎক্ষণিক ও সহজ ব্যবস্থা ছিল স্বাধীন নারীদের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়ে তোলা। কারণ, মুনাফেকরা স্বাধীন নারীদের পারিবারিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শক্তি-সামর্থ্যের কারণে তাদেরকে সচরাচর উত্যক্ত করার সাহস পেত না। পরিচয়ের অভাবেই এরূপ ঘটনা সংঘটিত হত। তাই স্বাধীন নারীদের পরিচয় ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন ছিল, যাতে তারা অতি সহজে দুষ্টদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়।

অপরদিকে শরীয়ত স্বাধীন নারী ও দাসীদের পর্দার মধ্যে প্রয়োজন বশতঃ একটি পার্থক্যও রেখেছে। স্বাধীন নারীরা তাদের মাহরাম ব্যক্তির সামনে যতটুকু পর্দা করে, দাসীদের জন্যে গৃহের বাইরেও ততটুকু পর্দা রাখা হয়েছে। কারণ প্রভুর কাজকর্ম করাই দাসীর কর্তব্য, এতে তাকে বার বার বাইরেও যেতে হয়। এমতাবস্থায় মুখমণ্ডল ও হাত আবৃত রাখা কঠিন ব্যাপার। স্বাধীন নারীরা কোন প্রয়োজনে বাইরে গেলেও বার বার যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। কাজেই পূর্ণ পর্দা পালন করা কঠিন নয়। তাই স্বাধীন নারীদেরকে আদেশ করা হয়েছে, তারা যেন লম্বা চাদর মাথার উপর থেকে মুখমণ্ডলের সামনে বুলিয়ে নেয়, যাতে পর পুরুষের দৃষ্টিতে মুখমণ্ডল না পড়ে। ফলে তাদের পর্দাও পূর্ণাঙ্গ হয়ে গেল এবং দাসীদের থেকে স্বাতন্ত্র্যও ফুটে উঠল। অতঃপর মুনাফেকদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শুনিয়া দাসীদের হেফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা যদি বিরত না হয়, তবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইহকালেও তাঁর নবী ও মুসলমানদের হাতে সাজা দেবেন।

উল্লেখিত আয়াতে স্বাধীন নারীর পর্দার জন্যে আদেশ দেয়া হয়েছে;

وَأَنذَرْنَا থেকে **يُنِزُّنَ** শব্দটি **يُنِزُّنَ** এতে **يُنِزُّنَ** শব্দটি **يُنِزُّنَ** থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ নিকটে আনা। **جَلْبَابٍ** শব্দটি **جَلْبَابٍ** এর বহুবচন। অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। এই চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন : এই চাদর ওড়নার উপরে পরিধান করা হয়। —(ইবনে-কাসীর)

ইমাম মুহম্মদ ইবনে সিরীন বলেন : আমি হযরত ওবায়দা সালমানী (রাঃ)—কে এই আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাবের আকার-আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর মুখমণ্ডলের উপর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বামচক্ষু খোলা রেখে **وَأَنذَرْنَا** ও **جَلْبَابٍ** এর তফসীর কার্যতঃ দেখিয়ে দিলেন।

মস্তকের উপরদিক থেকে মুখমণ্ডলের উপর চাদর লটকানো হচ্ছে **يُنِزُّنَ** শব্দের তফসীর — অর্থাৎ নিজের উপর চাদরকে নিকটবর্তী করার অর্থ চাদরকে মস্তকের উপরদিক থেকে লটকানো।

এ আয়াত পরিষ্কারভাবে মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করেছে। ফলে উপরে বর্ণিত পর্দার প্রথম আয়াতের বিষয়বস্তুর সমর্থন

হয়ে গেছে। তাতে বলা হয়েছিল যে, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু সতরের অন্তর্ভুক্ত না হলেও অনর্থের আশংকায় এগুলো আবৃত করা জরুরী। শুধুমাত্র অপারগতা এই লক্ষ্য বহির্ভূত।

জরুরী জ্ঞাতব্যঃ এ আয়াত স্বাধীন নারীদেরকে এক বিশেষ ধরনের পর্দার আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা মস্তকের উপর দিক থেকে চাদর লটকিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলবে, যাতে সাধারণ বাদীদের থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠে এবং দুটদের কবল থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। উল্লেখিত কর্নায় এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এর অর্থ এরূপ কখনও নয় যে, ইসলাম সতীত্ব সংরক্ষণে স্বাধীন নারী ও বাদীদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেছে এবং স্বাধীন নারীদের সতীত্ব সংরক্ষণ করে বাদীদেরকে ছেড়ে দিয়েছে। বরং প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্য লম্পটরাই করে রেখেছিল। তারা স্বাধীন নারীদের উপর হস্তক্ষেপ করার দুঃসাহস করত না; কিন্তু বাদীদেরকে উত্যান্ত করতে দিখা করত না। শরীয়ত তাদের স্ট পার্থক্যকে এভাবে কাজে লাগিয়েছে যে অধিকাংশ নারী তাদেরই স্বীকৃত নীতির মাধ্যমে আপনা আপনি নিরাপদ হয়ে গেছে।

এখন বাদীদের সতীত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারটিও ইসলামে স্বাধীন নারীদের অনুরূপ ফরয ও জরুরী। কিন্তু এর জন্য আইনগত কঠোরতা অবলম্বন করা ব্যতীত গতান্তর নেই। তাই পরবর্তী আয়াতে এ আইনও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা এই কুর্কম থেকে বিরত হবে না, তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করা হবে না; বরং যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই পাকড়াও করা হবে এবং শাস্তি দেয়া হবে। এ আইন বাদীদের সতীত্বও স্বাধীন নারীদের অনুরূপ সংরক্ষিত করে দিয়েছে।

মুসলমান হওয়ার পর ধর্ম ত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড : আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদের দ্বিধা দূষ্কর্মের উল্লেখ করার পর তা থেকে বিরত না হলে এই শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে যে, **مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَانْفِذُوا إِلَيْهِ قَوْلَ الْبَيْتِ لَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ شَيْئًا** অর্থাৎ, ওরা যেখানেই থাকবে অভিসম্পাত ও লাঞ্ছনা

ওদের সঙ্গী হবে এবং যেখানেই পাওয়া যাবে, গ্রেফতার করতঃ হত্যা করা হবে। এটা সাধারণ কাফেরদের শাস্তি নয়। কোরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, কাফেরদের জন্য শরীয়তে এরূপ আইন নেই; বরং তাদের জন্য আইন এই যে, প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হবে, তাদের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করা হবে। এর পরও ইসলাম গ্রহণ না করলে মুসলমানদের অনুগত যিস্মী হয়ে থাকার আদেশ দেয়া হবে। তারা এটা মেনে নিলে তাদের জানমাল ও ইয়যত-আবরুর হেফাজত করা মুসলমানদের মতই ফরয হয়ে যাবে। তবে কেউ যদি তা না মানে এবং যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আছে।

আলোচ্য আয়াতে তাদেরকে সর্বাবস্থায় বন্দী ও হত্যার আদেশ শোনানো হয়েছে। এর কারণ এই যে, ব্যাপারটি ছিল মুনাফিকদের, তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলত। কোন মুসলমান ইসলামের বিধানাবলীর প্রকাশ্য বিরোধিতা করলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে মুরতাদ বলা হয়। তার সাথে শরীয়তের কোন আপোষ নেই। তবে সে তওবা করে মুসলমান হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। নতুবা তাকে হত্যা করা হবে। রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সুস্পষ্ট উক্তি এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্মপরম্পরা দ্বারা এটাই প্রমাণিত। মুসায়লামা কাযযাব ও তার দলের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে-কেরামের একমত্রে জেহাদ পরিচালনা এবং মুসায়লামার হত্যা এর যথেষ্ট প্রমাণ। আয়াতের শেষে একে আল্লাহ তাআলার শাস্তি রীতি বলা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, পূর্ববর্তী পয়গমুরগণের শরীয়তেও মুরতাদের শাস্তি হত্যাই ছিল।

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল :

(১) নারীরা প্রয়োজনবশতঃ গৃহ থেকে বের হলে লম্বা চাদরে সর্বাবস্থায় আবৃত করে বের হবে এবং চাদরটি মাথার উপরদিক থেকে ঝুলিয়ে মুখমণ্ডলও আবৃত করবে। প্রচলিত বোরকাও এ চাদরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

(২) মুসলমানদের উদ্বিগ্ন ও উৎকর্ষার কারণ হয়, এরূপ কোন শুভব ছড়ানো হারাম।

এরূপ ছিলেন, তার প্রমাণ কোরআনের অনেক ঘটনায় রয়েছে। এসব ঘটনায় তিনি যেভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, সেভাবেই কবুল হয়েছে। এসব দোয়ার মধ্যে বিস্ময়কর দোয়া এই যে, তিনি হাজন (আঃ)—কে পয়গম্বর করার দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা তা কবুল করে তাঁকে তাঁর রেসালতে অংশীদার করে দেন। অথচ রেসালতের পদ কাউকে কারও সুপারিশের ভিত্তিতে দান করা হয় না। — (ইবনে-কাসীর)

পয়গম্বরগণকে যাবতীয় ক্রটিমুক্ত রাখা আল্লাহর রীতি : এ ঘটনায় সম্প্রদায়ের দোষারোপের জওয়াবে নির্দেশিত প্রমাণের বিষয়টিকে আল্লাহ তাআলা এত অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন যে, আলৌকিকভাবে প্রস্তুত ঋণ কাশড় নিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে এবং মুসা (আঃ) নিরুপায় হয়ে মানুষের সামনে উলঙ্গ অবস্থায় হাজির হয়েছেন। এই গুরুত্ব প্রধান এদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর পয়গম্বরগণের দেহকে ঋণাত্মক হুঁত থেকে সাধারণভাবে পবিত্র ও মুক্ত রেখেছিলেন। বোখারীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সকল পয়গম্বরকেই উচ্চবংশে জন্মদান করা হয়েছে। কেননা সর্বসাধারণ যে বংশ ও পরিবারকে নিকৃষ্ট ও হীন মনে করে, সে পরিবারের কারও কথা শোনা ও মানা তাদের জন্যে কঠিন হয়। অনুরূপভাবে পয়গম্বরগণের ইতিহাসে কোন পয়গম্বরের অন্ধ, কানা, মুক অথবা বিকলাঙ্গ হওয়ারও প্রমাণ নেই। হযরত আইয়ুব (আঃ)—এর ঘটনা দ্বারা এতে আপত্তি তোলা যায় না। কারণ সেটা খোদারী রহস্য অনুযায়ী একটা বিশেষ পরীক্ষার জন্যে ক্লেশহান্নী ব্যাধি ছিল, যা পরে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল।

এর قول সিদ্দ - يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَوَكَّلُوْا عَلَيْهِ سَدِيدٌ এত তফসীর সত্য কথা, সরল কথা, সঠিক কথা করা হয়েছে। ইবনে কাসীর সবগুলো উদ্ধৃত করে বলেন, সবই ঠিক। কোরআন পাক এস্থলে صادق - مستقيم ইত্যাদি শব্দ বাদ দিয়ে সিদ্দ শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা এ শব্দের মধ্যে সবগুলো গুণাবলীই বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই কাশেফী রুহুল-বয়ানে বলেন, قول সিদ্দ এমন কথা যা সত্য তাতে মিথ্যার নামগন্ধও নেই, সঠিক যাতে ভুলের নামগন্ধ নেই, গাঠীর্থপূর্ণ যাতে রসিকতার নামগন্ধও নেই, কোমল যা হৃদয় বিদারক নয়।

মুখ সংশোধন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কর্মসংশোধনের কার্যকর উপায় : এ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি মূল আদেশ হচ্ছে খোদাভীতি অবলম্বন করা। এর স্বরূপ যাবতীয় খোদায়ী বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য। অর্থাৎ, যাবতীয় আদেশ পালন করা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ ও মাকরুহ কাজ থেকে বিরত থাকা। বলাবাহুল্য, এটা মানুষের জন্য সহজ কাজ নয়। তাই খোদাভীতির আদেশের পর একটি বিশেষ কর্মের নির্দেশ দেয়া হয়েছে; অর্থাৎ, কথাবার্তা সংশোধন করা। এটাও খোদাভীতিরই এক অংশ; কিন্তু এমন অংশ, যা কারায়ত্ত হয়ে গেলে খোদাভীতির অবশিষ্ট অংশগুলো আপনা-আপনি অর্জিত হতে থাকে। যেমন, এ আয়াতেই সঠিক কথা অবলম্বনের ফলশ্রুতিতে تَتَذَكَّرُ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ এর ওয়াদা করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি মুখকে ভুলপ্রাপ্তি থেকে নিবৃত্ত রাখ এবং সঠিক ও সরল কথা বলার অভ্যস্ত হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের সর্বকর্ম সংশোধন করে দেবেন। আয়াতের শেষে আরও ওয়াদা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা এরূপ ব্যক্তির ক্রটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।

কোরআনী বিধানসমূহে সহজকরণের বিশেষ গুরুত্ব : কোরআন পাকের সাধারণ পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যায় যে, যেখানেই কোন কঠিন ও দুরূহ আদেশ দেয়া হয়, সেখানেই তা সহজ করার নিয়মও

বলে দেয়া হয়। খোদাভীতি সমস্ত ধর্মকর্মের নির্যাস এবং এতে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করার ব্যাপার। তাই সাধারণভাবে যেখানে আল্লাহকে ভয় করার আদেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে এর পরেই এমন কর্ম বলে দেয়া হয়েছে, যা অবলম্বন করলে খোদাভীতির অন্যান্য স্তম্ভ পালন করা আল্লাহর পক্ষ থেকে সহজ করে দেয়া হয়। আলাচ্য আয়াতে اتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের পর وَتَوَكَّلُوْا عَلَيْهِ سَدِيدٌ শিক্ষা দেয়া এরই একটি নমুনা। এর পূর্বের আয়াতে اتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের পর اَلَا تَتَذَكَّرُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِالْمُنٰفِقِيْنَ বলে এ বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহর সৎ ও শ্রিয় বান্দাদেরকে কষ্ট দেয়া খোদাভীতির পথে একটি বৃহৎ বাধা। এটা পরিত্যাগ করলে খোদাভীতি সহজ হয়ে যাবে।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে اَتَّقُوا اللّٰهَ وَتَوَكَّلُوْا عَلَيْهِ سَدِيدٌ এতে খোদাভীতিকে সহজ করার জন্যে এমন লোকদের সৎসর্গ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, যারা কথায় ও কাজে সাদা। এর মানে যারা আল্লাহর ওলী। আরও এক আয়াতে اتَّقُوا اللّٰهَ আদেশের সাথে وَتَتَذَكَّرُ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত সে আগামীকাল অর্থাৎ, কেয়ামতের দিনের জন্যে কি পুঁজি প্রেরণ করেছে। এর সারমর্ম পরকাল চিন্তা। এটা খোদাভীতির সকল স্তম্ভকেই সহজ করে দেয়।

০ সমগ্র সূরায় রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর সম্মান, সম্ভ্রম ও আনুগত্যের উপর জোর দেয়া হয়েছে। সূরার উপসংহারে এই আনুগত্যের সুউচ্চ মর্যাদা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য ও তাঁদের আদেশাবলী পালনকে “আমানত” শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

আমানতের উদ্দেশ্য : এখানে আমানত শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবয়ী প্রমুখ তফসীরবিদগণের অনেক উক্তি বর্ণিত আছে, যেমন শরীয়তের ফরয কর্মসমূহ, সতীত্বের হেফাজত, ধন-সম্পদের আমানত, অপরিব্রততার গোসল, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, ধর্মের যাবতীয় কর্তব্য ও কর্ম এই আমানতের অন্তর্ভুক্ত। — (কুরতুবী)

তফসীরে মায়হরীতে বলা হয়েছে, শরীয়তের যাবতীয় আদেশ নিষেধের সমষ্টিই আমানত।

সারকথা এই যে, আমানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে শরীয়তের বিধানাবলী দ্বারা আদিত হওয়া, যেগুলো পুরোপুরি পালন করলে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত এবং বিরোধিতা অথবা ক্রটি করলে জাহান্নামের আযাব প্রতিশ্রুত। কেউ কেউ বলেন, আমানতের উদ্দেশ্য খোদায়ী বিধানাবলীর ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা, যা বিশেষ স্তরের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেষ্টার উপর নির্ভরশীল। উন্নতি এবং খোদায়ী প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এই বিশেষ যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। যেসব সূঁ বস্তুর মধ্যে এই যোগ্যতা নেই, তারা স্বস্থানে যতই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, তারা তাদের স্থান থেকে উন্নতি করতে পারে না। এ কারণেই আকাশ, পৃথিবী এমনকি, ফেরেশতাগণের মধ্যেও উন্নতি নেই। তারা নেকটোর নিজ নিজ স্থানেই অনড় হয়ে আছে। তাদের অবস্থা এই — وَمَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ مَا مَلَأُوْهُ

অর্থাৎ আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

আমানতের এই অর্থ অনুযায়ী আমানত সম্পর্কিত সকল হাদীস ও

রেওয়াকে পূরস্পর সামঞ্জস্যশীল হয়ে যায়। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তিঃসমূহও এতে প্রায় একমত হয়ে যায়।

আমানত কিরূপে পেশ করা হয়েছিল : উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করেছিলাম। তারা সকলেই এর বোঝা বহন করতে অস্বীকার করল এবং এর যথার্থ হক আদায় করার ব্যাপারে ভীত হয়ে গেল। কিন্তু মানুষ এই বোঝা বহন করে নিল।

এখানে চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা বাহ্যতঃ অপ্রাণীবাচক ও চেতনাহীন বস্তু। তাদের সামনে আমানত পেশ করা এবং তাদের প্রত্যুত্তর দেয়া কি প্রকারে সম্ভব হল ?

কেউ কেউ একে রূপক ও উপমা সাব্যস্ত করেছেন। যেমন কোরআন পাক এক জায়গায় উপমাধরূপ বলেছে : **لَوْ اَنَّكَ تَظَاهَرُ الْفُرَّانَ عَلَى**

جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ অর্থাৎ আমি এই কোরআন পর্বতের উপর নামিল করলে আপনি দেখতেন যে, পর্বতও এর ভারে নুয়ে পড়ত এবং আল্লাহ্র ভয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। এখানে ধরে নেয়ার পর্যায়ে এই উপমা বর্ণিত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে পর্বতের উপরে অবতীর্ণ করা উদ্দেশ্য নয়। **اِنَّا عَرَضْنَا** আয়াতও তাঁদের মতে তেমনি একটি উপমা।

কিন্তু অধিকাংশ আলোমের মতে এটা ঠিক নয়। কেননা, এর প্রমাণস্বরূপ যে আয়াত পেশ করা হয়েছে, তাতে কোরআন পাক **هُ** শব্দ ব্যবহার করে ব্যাপারটি যে নিছক ধরে নেয়ার পর্যায়ে, তা নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একে কোন প্রমাণ ব্যতিরেকে রূপক ও উপমা মেনে নেয়া বৈধ হবে না। যদি প্রমাণ পেশ করা হয় যে, এসব বস্তু অচেতন ও জড়, এদের সাথে প্রশ্নোত্তর হতে পারে না, তবে তা কোরআনের অন্যান্য বর্ণনা দৃষ্টে প্রত্যাখ্যাত হবে। কারণ, কোরআন পাকের স্পষ্ট এরশাদ এই :

وَلَمَّا مَسَّىٰ لَآئِكِ يُنَادُوا رَبَّهُمْ نَادٍ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ্র হামদ, পবিত্রতা ঘোষণা করে। বলাবাহুল্য, আল্লাহকে চেনা এবং তাঁকে স্রষ্টা, মালিক, সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে তাঁর স্তুতি পাঠ করা চেতনা ও উপলব্ধি ব্যতীত সম্ভবপর নয়। তাই এ আয়াত দৃষ্টে একথা প্রমাণিত হয় যে, উপলব্ধি ও চেতনা সকল সৃষ্টবস্তুর মধ্যে এমন কি, জড় পদার্থের মধ্যেও বিদ্যমান আছে। এই উপলব্ধি ও চেতনার ভিত্তিতেই তাদেরকে সম্বোধন করা যায় এবং তারা উত্তরও দিতে পারে। উত্তর শব্দ ও অক্ষরের মাধ্যমেও হতে পারে। এতে বুদ্ধিগত কোন অসম্ভাব্যতা নেই। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালাকে বাকশক্তি দিতে পারেন। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আকাশ পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আক্ষরিক অর্থেই আমানত পেশ করা হয়েছে এবং তারা আক্ষরিক অর্থেই এ বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এতে কোন উপমা অথবা রূপকতা নেই।

আমানত ইচ্ছাশীল পেশ করা হয়েছিল, বাধ্যতামূলকভাবে নয় : এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং যখন আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করলেন, তখন তাদের তা বহন করতে অস্বীকার করার শক্তি কিরূপে হল ? আল্লাহ্র অবাধ্যতার কারণে তাদের তো নিস্তানাবুদ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এছাড়া আকাশ ও পৃথিবী যে

আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ ও অনুগত, তা কোরআনের আয়াত **اِنَّا كُنَّا عِندَ رَبِّكَ** বাক্যটি দ্বারাও প্রমাণিত। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা যখন তাদেরকে নির্দেশ দিলেন আমার আদেশ পালন করার জন্যে সানন্দে অথবা বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত হও, তখন তারা উত্তরে বলল, আমরা সানন্দে উপস্থিত আছি।

এ প্রশ্নের জওয়াব এই যে, এ আয়াতে তাদেরকে এক শাসকসুলভ অনুবর্তিতার আদেশ দেয়া হয়েছিল, যাতে একথাও বলে দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা রাঙ্গী হও অথবা গররাবী, সর্বাবস্থায় এ আদেশ মানতে হবে। কিন্তু আমানত পেশ করার আয়াত এরূপ নয়। এতে আমানত পেশ করে তাদেরকে কবুল করা ও কবুল না করার এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল।

ইবনে-কাসীর ইবনে-আব্বাস, হাসান বসরী, মুজাহিদ প্রমুখ একাধিক সাহাবী ও তাবয়ী থেকে আমানত পেশ করার এই বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে আকাশের সামনে অতঃপর পৃথিবীর সামনে এবং শেষে পর্বতমালার সামনে ইচ্ছাশীল আকারে এ বিষয় পেশ করেন যে, আমার আমানতের বোঝা নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে তোমরা বহন কর। প্রত্যেকেই বিনিময় কি, তা জ্ঞানতে চাইলে বলা হল, তোমরা পূর্ণরূপে আমানত বহন করলে অর্থাৎ বিধানাবলী পুরোপুরি পালন করলে পুরস্কার, সওয়াব এবং আল্লাহ্র কাছে বিশেষ সম্মান লাভ করবে। পক্ষান্তরে বিধানাবলী পালন না করলে অথবা ত্রুটি করলে আযাব ও শাস্তি দেয়া হবে। একথা শুনে এসব বিশালকায় সৃষ্টি জওয়াব দিল, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা এখনও আপনার আজ্ঞাবহ দাস; কিন্তু আমাদেরকে যখন এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তখন আমরা এ বোঝা বহন করতে নিজেদেরকে অক্ষম পাচ্ছি। আমরা সওয়াবও চাই না এবং আযাবও ভোগ করার শক্তি রাখি না।

তফসীরে-কুতুবীতে উদ্ধৃত হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ)-এর বাচনিক রেওয়াকেতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন, আমি আমার আমানত আকাশ ও পৃথিবীর সামনে পেশ করেছিলাম তখন তারা এই বোঝা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। এখন তুমি কি এর নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে এই আমানত বহন করতে সম্মত আছ? আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে পালনকর্তা, এর বিনিময় কি প্রতিদান পাওয়া যাবে? উত্তর হল, পূর্ণাঙ্গ অনুগত্য করলে পুরস্কার পাবে (যা আল্লাহ্র নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও জ্ঞানাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতের আকারে হবে)। পক্ষান্তরে যদি এই আমানত পণ্ড কর, তবে শাস্তি পাবে। আদম (আঃ) আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টিতে উন্মত্তি লাভের আগ্রহে এ বোঝা বহন করে নিলেন। বোঝা বহনের পর যোহর থেকে আসর পর্যন্ত যতটুকু সময়, ততটুকু সময়ও অতিবাহিত হতে পারেনি, ইতিমধ্যে শয়তান তাকে সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চত্রয়তায়া লিপ্ত করে দিল এবং তিনি জ্ঞানাত থেকে বহিস্কৃত হলেন।

আমানত কখন পেশ করা হয়েছিল? উপরে বর্ণিত রেওয়াকেতে থেকে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির পূর্বেই আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে আমানত পেশ করা হয়েছিল। আদম সৃষ্টির পর তাঁর কাছে একথাও প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তোমার পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর সামনেও এই আমানত পেশ করা হয়েছে। তাদের শক্তি ছিল না বিষয় তারা অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, **اَسْتُكْرِمُ** অস্বীকার গ্রহণের পূর্বে এই

আমানত পেশ করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কেননা, এই অঙ্গীকার আমানতের বোঝা বহন করার প্রথম দফা এবং পদের শপথ করার স্থলাভিষিক্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে আমানত বহনের যোগ্যতা জরুরী ছিল : আল্লাহ তাআলা আদি তকদীরে স্থির করে নিয়েছিলেন যে, তিনি আদম (আঃ)–কে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করবেন। এ প্রতিনিধিত্ব তাকেই দান করা যেত, যে খোদায়ী বিধানাবলী মেনে চলার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারত। কেননা, এই প্রতিনিধিত্বের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করবে এবং মানব জাতিকে খোদায়ী বিধানাবলীর আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ করবে। তাই সৃষ্টিগতভাবে হযরত আদম (আঃ) এই আমানত বহন করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অথচ তিনি জানতেন যে, বিশালকায় সৃষ্টবস্ত্ত এ ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।—(মায়হারী)

إِنَّكَ كَانَتْ لَكُمْ مَعَهُ جَوَازٌ - ظِلْمٌ অর্থ নিজের প্রতি যুলুমকারী এবং জবল এর মর্মান্থ পরিণামের ব্যাপারে অজ্ঞ। এ বাক্য থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এতে সর্বাবস্থায় মানুষের নিন্দা করা হয়েছে যে, এই অব্যবস্থিত সাধ্যাতীত বিরাট বোঝা বহন করে নিজের প্রতি যুলুম করেছে; কিন্তু কোরআনী বর্ণনাদৃষ্টে বাস্তবে তা নয়। কেননা মানুষ বলে হযরত আদম (আঃ) বোঝানো হলে তিনি তো নিশাপ পয়গম্বর। তিনি নিজের উপর অর্জিত দায়িত্ব পুরোপুরি আদায় করেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁকে আল্লাহর প্রতিনিধি করে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। তাঁকে ফেরেশতাদের দ্বারা সেজদা করানো হয়। পরকালে তাঁর মর্যাদা ফেরেশতাদেরও উর্ধ্ব রাখা হয়। পক্ষান্তরে মানুষ বলে সমগ্র মানবজাতি বোঝানো হলে তাদের মধ্যে লাখো পয়গম্বর রয়েছেন এবং কোটি কোটি সংকর্ষপরায়ণ গুলী রয়েছেন, যাদের প্রতি ফেরেশতাগণও ঈর্ষা করেন। তাঁরা কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তাঁরা এই খোদায়ী আমানতের যথার্থই হকদার ছিলেন। তাঁদের কারণে কোরআন পাক মানব জাতিকে “আশরাফুল মখলুকাত” আখ্যায়িত করেছে। বলা হয়েছে وَكَذَلِكَ نُمِيتُكُم بِاللَّيْلِ وَإِنَّكُمْ لَكُم بِآيَاتِنَا أَكْثَرٌ مِنْ دُونَ ذَلِكَ - অর্থ প্রমাণিত হল যে, আদম (আঃ) ও সমগ্র মানব জাতি - কেউই নিন্দার পাত্র নয়। এ কারণেই তফসীরবিদগণ বলেন যে, উপরোক্ত বাক্যটি নিন্দার জন্যে নয়; বরং অধিকাংশ ব্যক্তির বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করার জন্যে অবতারণা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মানব জাতির অধিকাংশ যালেম ও অজ্ঞ প্রমাণিত হয়েছে। তারা এই আমানতের হক আদায় করেনি এবং

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকাংশের অবস্থা বিধায় একে মানব জাতিরই অবস্থা বলে দেয়া হয়েছে।

সারকথা এই যে, আয়াতে বিশেষভাবে সেই ব্যক্তিবর্গকে যালেম ও অজ্ঞ বলা হয়েছে, যারা শরীয়তের আনুগত্যে সফলকাম হয়নি এবং আমানতের হক আদায় করেনি। কাকের, মুনাফিক ও পাপাচারী মুসলমান সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে যুযায়ের, হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখ থেকে এই তফসীর বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী)

কেউ কেউ বলেন, ظِلْمٌ وَ جَوَلٌ শব্দদ্বয় এ স্থলে সরল গোবোচারা অর্থে আদরের সুখে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে আল্লাহ তাআলার মহব্বতে ও তাঁর নৈকট্যের আশায় পরিণামের কথা চিন্তা করেনি। এভাবে এ শব্দদ্বয় গোটা মানবজাতির জন্যেও হতে পারে। তফসীরে মায়হারীতে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহঃ) ও অন্যান্য সুফী ব্যুর্গ থেকে এ ধরনের বিষয়বস্ত্ত বর্ণিত আছে।

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ এখানে لام অব্যয়টি কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা অর্থে নয়; বরং ব্যাকরণের পরিভাষায় একে لام عاقبة বলা হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, পরিণামে আল্লাহ তাআলা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেবেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে পুরস্কৃত করবেন। এক আরবী কবিতায় এই لام এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে وَلِدُوا لِلْمَوْتِ وَبَنُوا لِلْخِرَابِ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ কর পরিণামে মৃত্যুর জন্যে এবং নির্মাণ কর পরিণামে বিধ্বস্ত হওয়ার জন্যে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক জন্মগ্রহণকারীর পরিণাম মৃত্যু এবং প্রত্যেক নির্মাণের পরিণাম ধ্বংস।

وَحَكَمُ الْإِنْسَانِ এর সাথে এ বাক্যটি সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, মানুষ যে আমানতের বোঝা বহন করেছে, এর পরিণামে মানুষ দু’দলে বিভক্ত হয়ে যাবে — (এক) কাকের, মুনাফিক ইত্যাদি, যারা অবাধ্য হয়ে আমানত নষ্ট করে দেবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। (দুই) মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী। যারা আনুগত্যের মাধ্যমে আমানতের হক আদায় করবে। তাদের সাথে অনূগ্রহ ও ক্ষমা সুন্দর ব্যবহার করা হবে।

পূর্বে ظِلْمٌ وَ جَوَلٌ শব্দদ্বয়ের এক তফসীরে বলা হয়েছে যে, এটা সমগ্র মানবজাতির জন্যে নয়; বরং বিশেষ ধরনের লোকদের জন্যে বলা হয়েছে, যারা খোদায়ী আমানতকে নষ্ট করে দেবে। উপরোক্ত সর্বশেষ বাক্যেও এ তফসীরের সমর্থন রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

عِلْوُ النَّبِيِّ এটা শব্দের বিশেষণ, পূর্বে যার শপথ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার গুণাবলীর মধ্য থেকে এখানে অদৃশ্য জ্ঞান ও সর্বব্যাপী জ্ঞানকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এখানে কেয়ামত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। কাফেরদের কেয়ামত অস্বীকার করার বড় কারণ ছিল এই যে, সমস্ত মানুষ মরে মাটি হয়ে গেলে সেই মাটির কণাসমূহও পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং সারা পৃথিবীতে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করা, অতঃপর প্রত্যেক মানুষের কণাকে অন্য মানুষের কণা থেকে আলাদা করে তার অস্তিত্বে সংযুক্ত করা কেমন করে সম্ভবপর? একে অসম্ভব মনে করার ভিত্তি এটাই ছিল যে, তারা আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও কুদরতকে নিজেদের জ্ঞান ও কুদরতের অনুরূপ মনে করে রেখেছিল। আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন যে, তাঁর জ্ঞান বিশ্বব্যাপী। আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত সবকিছু তিনি জানেন। কোন বস্তু কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাও তিনি জানেন। এমন সর্বব্যাপী জ্ঞান সম্পন্ন সত্তার জন্যে মানুষের কণাসমূহকে আলাদাভাবে সারা বিশ্ব থেকে একত্রিত করা এবং সেগুলো দ্বারা পুনরায় দেহ গঠন করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ

এখানে কেয়ামতে অবিশ্বাসীদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারা বিদ্রোহ ও উপহাস করে বলত, এস, আমরা তোমাদেরকে এমন এক অদ্ভুত ব্যক্তির সন্ধান দেই, যে বলে তোমরা পূর্ণরূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমাদেরকে পুনরায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে, অতঃপর তোমাদেরকে বর্তমান আকার-আকৃতিতেই জীবিত করা হবে।

বলাবাহুল্য এক অদ্ভুত ব্যক্তি বলে এখানে নবী করীম (সাঃ)-কে বোঝাতো, যিনি কেয়ামত ও তাতে মৃতদের জীবিত হওয়ার খবর দিতেন এবং সেসবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে বলতেন। কাফেররা সকলেই তাঁকে পূর্ণরূপে চিনত ও জানত। কিন্তু এখানে এভাবে উল্লেখ করেছে যেন তারা তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানে না। উপহাস এবং তাচ্ছিল্য প্রকাশের জন্যই এরূপ ভঙ্গিতে কথা বলা হয়েছিল।

مُزِقُّكُمْ - শব্দটি مَزَقَ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ চিরা ও খণ্ড-বিখণ্ড করা। قُلُّ مَزَقٍ - এর অর্থ মানবদেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া। অতঃপর কাফেররা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খবর দেয়া সম্পর্কে তাদের ধারণা এভাবে ব্যক্ত করেছে।



সূরা সাবা

মক্কা অবতীর্ণ : আয়াত ৫৪,

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহর নামে শুরু

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি নভোমণ্ডলে যা আছে এবং ভূমণ্ডলে যা আছে সবকিছুর মালিক এবং তাঁরই প্রশংসা পরকালে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (২) তিনি জানেন যা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, যা সেখান থেকে নির্গত হয়, যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় এবং যা আকাশে উদ্ভিত হয়। তিনি পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল। (৩) কাফেররা বলে, আমাদের উপর কেয়ামত আসবে না। বলুন, কেন আসবে না? আমার পালনকর্তার শপথ-অবশ্যই আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে তাঁর আগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু, না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ-সমস্তই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে। (৪) তিনি পরিণামে যারা মুমিন ও সংকর্ম পরায়ণ, তাদেরকে প্রতিদান দেবেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিমিক। (৫) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়, তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬) যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, তারা আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে অবতীর্ণ কোরআনকে সত্য জ্ঞান করে এবং এটা মানুষকে পরাক্রমশালী, প্রশংসার আল্লাহর পথপ্রদর্শন করে। (৭) কাফেররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদেরকে খবর দেয় যে; তোমরা সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও তোমরা নতুন সৃষ্টি হবে?

أَتَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ يَرْجُو نَجْدًا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا
 بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَهُمْ
 بِهَمِّ الْأَرْضِ أَوْ تُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ
 لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا مَقْضًى
 لِّجِبَالِ أَوِي مَعَهُ وَالظُّلُمَ ۚ وَكَانَ الْخَوْدُ ۚ إِنَّ أَعْمَلَ
 سُلَيْمَ ۚ وَقَدْ رَفَعْنَا السُّرُدَ ۚ وَعَمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنَّ بِمَا كَانُوا
 يَصْنَعُونَ ۚ وَلَسْلَيْمِينَ ۚ الرِّيحَ عُنْدَ هَاشِمٍ وَرَوَّاحَهَا شَهْرُ ۚ
 أَسْأَلُكَ عَيْنَ الْفَطْرِ ۚ وَنَ الْيَمِّ ۚ مِّنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِأَذْنِ
 رَبِّهِ ۚ وَمَنْ يَزِغْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا ۚ إِنَّهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝
 يَعْمَلُونَ لِمَا نَشَاءُ ۚ مِنْ تَحَارِبٍ وَتَمَازِيلٍ وَحُجَابٍ كَالْحِجَابِ
 وَقَدْ وَرِثِيَتْ أَعْمَالُ دَاوُدَ شُكْرًا وَكَيْلًا ۚ وَمِنْ عِبَادِي
 الشُّكْرُ ۚ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ۚ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ
 إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ۚ فَلَمَّا خَوَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ
 أَن كَانُوا يُعْمَلُونَ الْعِيبَ ۚ مَا لِيُتَوَانِي الْعَذَابُ الْبَهِيمُ ۝

(৮) সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে, না হয় সে উদ্ভাদ এবং যারা পরকালে অবিশ্বাসী, তারা আমাকে ও ঘোর পঞ্চাষ্টতায় পতিত আছে। (৯) তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আকাশের কোন ষণ্ড তাদের উপর পতিত করব। আল্লাহ্ অভিযুক্ত প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (১০) আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। আমি তাঁর জন্যে লৌহকে নরম করেছিলাম। (১১) এবং তাকে বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ষ তৈরী কর, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সংকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু কর, আমি তা দেখি। (১২) আর আমি সোলায়মানের অধীন করেছিলাম বায়ুকে, যা সকালে এক মাসের পথ এবং বিকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আমি তার জন্যে গলিত তামার এক বরশা প্রবাহিত করেছিলাম। কতক জিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি জ্বলন্ত অগ্নির-শাস্তি আশ্বাদন করাব। (১৩) তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউসদপল বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। হে দাউদ পরিবার। কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করে যাও। আমার বান্দাদের মধ্যে অস্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ। (১৪) যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যু ঘটলাম, তখন দুশ পোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সোলায়মানের লাঠি ধরে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাক্ষ্যনাশুর শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।

উদ্দেশ্য এই যে, দেহ ছিন্ন-

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত কপা একত্রিত হয়ে যানবদেহে পরিণত হওয়া এবং জীবিত হওয়া একটি উদ্ভট কথা। একে যেনে নেয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই তাঁর এই স্ববর হয় জেনে শুনে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা না হয় সে উদ্ভাদ, যার কথার কোন সঠিক ভিত্তি থাকে না।

তকসীরে বর্ণিত হয়েছে যে,

এ আয়াতে কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তুসমূহে চিন্তা করলে এবং আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কুদরত প্রত্যক্ষ করলে কাকেরা কেয়ামতকে অস্বীকার করতে পারবে না। সাথে সাথে আয়াতে অবিশ্বাসীদের জন্যে শাস্তির সতর্কবাণীও রয়েছে। অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবীর বিশাল সৃষ্টবস্তু তোমাদের জন্যে বিরাট নেয়ামত। এগুলো প্রত্যক্ষ করার পরও তোমরা অবিশ্বাস ও অস্বীকারে অটল থাকলে আল্লাহ্ এসব নেয়ামতকেই তোমাদের জন্যে আঘাতে রূপান্তরিত করে দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। ফলে পৃথিবী তোমাদেরকে গ্রাস করে নেবে; আকাশ ষণ্ড-বিষণ্ড হয়ে তোমাদের উপর পতিত হবে।

অর্থাৎ, দাউদকে আমি আমার অনুগ্রহ

দান করেছিলাম। فضل এর শাব্দিক অর্থ অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এমন বিশেষ গুণাবলী যা অন্যের চেয়ে অতিরিক্ত হিসাবে তাকে দান করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক পয়গম্বরকে কিছু কিছু বিশেষ স্বাতন্ত্র্যমূলক গুণাবলী দান করেছেন। এগুলোকে তাঁদের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব মনে করা হয়। হযরত দাউদ (আঃ)-এর বিশেষ গুণাবলী এই ছিল যে, তাকে রেসালতের সাথে সাথে সারা বিশ্বের রাজত্বও দান করা হয়েছিল। তিনি এমন সুমধুর কন্ঠস্বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, আল্লাহর যিকির অথবা যকুর তেলাওয়াত করতে শুরু করলে পক্ষীকুলও শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় তা শোনার জন্যে সমবেত হয়ে যেত। এমনভাবে তাকে একাধিক বিশেষ মু'জ্জেবা দান করা হয়েছিল, যা পরে বর্ণিত হবে।

শব্দটি تَارِبٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বার বার

করা। আল্লাহ্ তাআলা পর্বতমালাকে আদেশ দিয়েছিলেন, যখন দাউদ (আঃ) আল্লাহর যিকির ও তসবীহ পাঠ করেন, তখন তোমরাও সেসব বাক্য বার বার আবৃত্তি কর। (ইবনে-কাসীর)

হযরত দাউদ (আঃ)-এর সাথে পর্বতমালার এই তসবীহ পাঠ সেই সাধারণ তসবীহ থেকে ভিন্ন, যাতে সমস্ত সৃষ্টি অংশীদার এবং যা সর্বদা ও সর্বকালে অব্যাহত রয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে : وَلَنُتَبِّئَنَّهُ

অর্থাৎ, জগতের সব

কিছুই আল্লাহ্ তাআলার স্রষ্টাংশ তসবীহ পাঠ করে; কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ বোঝে না। আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত তসবীহ ছিল হযরত দাউদ (আঃ)-এর একটি মু'জ্জেবা। তাই এ তসবীহ সাধারণ প্রোভারাতাও গুনত এবং বাক্যত।

এতে বোঝা যাচ্ছে যে, দাউদ (আঃ)-এর কন্ঠের সাথে পর্বতমালার কন্ঠ ফোনো প্রতিধ্বনিরূপে ছিল না, যা সাধারণভাবে কোন গম্ভূজে

অথবা কূপে আওয়াজ দিলে সে আওয়াজ ফিরে আসার কারণে শোনা যায়। কেননা, কোরআন পাক একে দাউদ (আঃ)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহরূপে উল্লেখ করেছেন। প্রতিফলিত সাধে কারণ শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্বের কোন সম্পর্ক নেই। এটা তো প্রত্যেকেই এমন কি কাকেরও সৃষ্টি করতে পারে।

وَالْقَالَةُ الرَّبُّ رَبِّي أَنَّىٰ أَعْمَلُ ۚ فَأَنشَأْنَا لَهُ مَثَلًا وَإِنَّا لَمَنصُورُونَ ۚ

অর্থঃ আমি তাঁর জন্যে লোহকে নরম করে দিয়েছিলাম। এটা ছিল তাঁর দ্বিতীয় মূ'জেবা। হযরত হাসান বসরী, কাতাদাহ, আনাস প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, আল্লাহ তাআলা মূ'জেবারূপে লোহকে তাঁর জন্যে যোমের মত নরম করে দিয়েছিলেন। লোহ দ্বারা কোন কিছুই তৈরী করতে অসমর্থ প্রয়োজন হত না। হাতুড়ি অথবা অন্য কোন হাতিয়ারেরও প্রয়োজন ছিল না। অতঃপর আয়াতে বলা হয়েছে যে, তিনি যাতে অন্যায়সে লৌহবর্ষ তৈরী করতে পারেন, সেজন্যে লোহকে তাঁর জন্যে নরম করে দেয়া হয়েছিল। অন্য এক আয়াতে আরও আছে—

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبِيسٍ لِّكُلِّ مَوْسِمٍ مِّنْهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ

অর্থঃ, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাঁকে বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন। এখানে পরবর্তী وَفَعَّلْنَاهُ لَبِيسًا বাক্যটি এ শিক্ষাদানের পরশিষ্ট।

لَبِيسٌ تَقْدِيرٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ একই জাতীয় ও একই প্রকার করে তৈরী করা। —এর শাব্দিক অর্থ বয়ন করা। উদ্দেশ্য এই যে, বর্ম নির্মাণে তার কড়া সমূহের যথাযথভাবে সংযুক্ত করা যাতে একটি ছোট ও একটি বড় না হয়। ফলে মজবুতও হবে এবং দেখতেও সুন্দর হবে। এ তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—(ইবনে কাসীর)।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, নিষ্পকর্মে বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখাও পছন্দনীয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে এর নির্দেশ দিয়েছেন।

كَعْبَةٌ كَعْبَةٌ وَفَعَّلْنَاهُ لَبِيسًا ۚ —এর অর্থ করেছে যে, এই নিষ্পকর্মের জন্যে সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নেয়া উচিত—সারাক্ষণ এতে মগন থাকা উচিত নয়, যাতে এবাদত ও রাজকার্যে ব্যাঘাত না ঘটে। এ তফসীর থেকে জানা গেল যে, নিষ্পী ও শ্রমিকদেরও উচিত এবাদত ও জ্ঞান লাভের জন্যে কিছু সময় বাঁচিয়ে নেয়া এবং সময় বিধিচ্ছ করা।

শিল্প ও কারিগরির স্বীকৃতি : আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আবিষ্কার ও তৈরী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং একে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর মহান পয়গম্বরগণকে শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত নূহ (আঃ)—কে জাহাজ নির্মাণ কৌশল এমনভাবে শেখানো হয়েছিল। বলা হয়েছে : وَأَوْصَيْنَاهُ الْفُلَ أَن يَتَّقِي ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ

অর্থঃ, আমার সামনে জাহাজ নির্মাণ করা। অনুরূপভাবে অন্য পয়গম্বরগণকেও বিভিন্ন নিষ্পকর্ম শিক্ষা দেয়া বিভিন্ন রেওয়াজে প্রমাণিত আছে। হাক্কেছ শামসুদ্দীন যাহ্বী রচিত “আওশিসুন্নবতী” নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, গৃহনির্মাণ, বপ্তবয়ন, খাদদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, মালপত্র আনা-নেয়ার জন্যে চাকাবিশিষ্ট গাড়ী তৈরী করে চালানো ইত্যাদি মানব জীবনের সকল প্রয়োজনীয় নিষ্পকাজ আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শিল্পজীবী মানুষকে হেয় মনে করা গোনাহ : আরবে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন নিষ্পকাজ অবলম্বন করত এবং কোন নিষ্পকে হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করা হত না। পেশা ও শিল্পের ভিত্তিতে কড়কে কম ও বেশী

সম্মানী মনে করা হত না এবং এর ভিত্তিতে সমাজও গড়ে উঠত না। এগুলো কেবল আমাদের এ উপমহাদেশের একশ্রেণীর লোকের আবিষ্কার। তাদের সাথে বসবাস করার কারণে মুসলমানদের মধ্যেও এসব কুপ্রথা শিকড় গেড়ে বসেছে।

দাউদ (আঃ)—কে বর্ম নির্মাণ কৌশল শিক্ষা দেয়ার রহস্য : তফসীরে ইবনে-কাসীরে বর্ণিত আছে—হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর রাজত্বকালে ছদ্মবেশে বাজারে গমন করতেন এবং বিভিন্ন দিক থেকে আগত লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, দাউদ কেমন লোক? তাঁর রাজত্বে ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সব মানুষ সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কারও কোন অভিযোগ ছিল না। তাই যাকেই প্রশ্ন করা হত, সেই দাউদ (আঃ)—এর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও ন্যায় বিচারের কারণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত।

আল্লাহ তাআলা তাঁর শিক্ষার জন্যে একজন ফেরেশতা মানুষ বেশে প্রেরণ করেন। দাউদ (আঃ) যখন বাজারে যাওয়ার জন্যে ছদ্মবেশে বের হলেন, তখন এই ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ হল। অভ্যাস অনুযায়ী তাকেও তিনি সেই প্রশ্ন করলেন। মানবরূপী ফেরেশতা জওয়াব দিল, দাউদ খুব ভাল লোক। নিজের জন্যে এবং উম্মত ও প্রজাদের জন্যে তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি। তবে তাঁর মধ্যে এমন একটি অভ্যাস আছে, যা না থাকলে তিনি পুরোপুরি কামেল মানুষ হয়ে যেতেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেটা কি অভ্যাস? ফেরেশতা বলল, তিনি তাঁর ও তাঁর পরিবারের ভরণ-পোষণ বায়তুল মাল তথা সরকারী ধনাগার থেকে গ্রহণ করেন।

একথা শুনে হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহ তাআলার কাছে কাকূতি-কিনতি ও দোয়া করতে থাকেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ, আমাকে এমন কোন হস্তশিল্প শিক্ষা দিন, যার পারিশ্রমিক দ্বারা আমি নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণ চালাতে পারি এবং জনগণের সেবা ও রাজকার্য বিনা পারিশ্রমিকে আনজাম দিতে সক্ষম হই। আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে বর্মনির্মাণ কৌশল শিখিয়ে দিলেন। পয়গম্বরসুলত সম্মানস্বরূপ তাঁর জন্যে লোহকে যোমের মত নরম করে দেয়া হল, যাতে কাজটি সহজ হয় এবং অল্প সময়ে জীবিকা উপার্জন করে তিনি অবশিষ্ট সময় এবাদত ও রাজকার্যে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন।

মাসআলা : স্বীকৃতি অথবা বাদশাহ তাঁর পূর্ণ সময় রাজকার্য সম্পাদনে ব্যয় করেন বিধায় তাঁর পক্ষে বায়তুল মাল থেকে ভরণ-পোষণের জন্য বেতন গ্রহণ করা জায়েয। কিন্তু জীবিকার অন্য কোন উপায় সম্ভব হলে তা অধিক পছন্দনীয়। হযরত দাউদ (আঃ)—এর জন্যে আল্লাহ তাআলা সারা বিশ্বের ধন-ভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন। ধনেশ্বর, মনি-মানিক্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্য ছিল ; আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁকে সরকারী ধনাগার ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করার অনুমতিও দান করা হয়েছিল।

আয়াতে নিশ্চয়তাও দেয়া হয়েছিল যে, আপনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করুন। আপনার কাছে হিসেব চাওয়া হবে না। কিন্তু পয়গম্বরকে আল্লাহ তাআলা যে সুউচ্চ মর্যাদায় রাখতে চান, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর দাউদ (আঃ) এত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কায়িক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন।

আলেকগণ শিক্ষা ও প্রচারকার্য আনজাম দিয়ে থাকেন। কাযী

(বিচারক) ও মুফতী জনগণের কাজে তাঁদের সময় ব্যয় করেন। তাঁদের বেলায়ও একই বিধান। তাঁরা বায়তুলমাল থেকে ভরণ-পোষণের ব্যয় গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু জীবিকার জন্য কোন উপায় থাকলে এবং তা কর্তব্যকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করলে তাই উত্তম।

হযরত দাউদ (আঃ) নিজের এই কর্ম-নীতির ভিত্তিতে স্বীয় আমল ও অভ্যাস সম্পর্কে জনগণের অবোধ ও স্বাধীন মতামত জানার যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন, তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ নিজের দোষ নিজে জানে না বিধায় অপরের কাছ থেকে জেনে নেয়া উচিত। হযরত ইমাম মালেকও এ বিষয়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা কি, তা তিনি জানতে চেষ্টা করতেন।

وَلَسَيُنْزِلَنَّ إِلَيْنَا مَوْجِدًا مِّنْ فَضْلِهِ ۖ وَرَوَّاحًا حَمِيمًا ۝ — দাউদ (আঃ) —এর

বিশেষ শ্রেষ্ঠ ও অনুগ্রহ উল্লেখ করার পর হযরত সোলায়মান (আঃ) —এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সেখানে হযরত দাউদ (আঃ) —এজন্য আল্লাহ তাআলা পর্বতমালা ও পক্ষীকুলকে বশীভূত করে দিয়েছিলেন। অনুক্রমভাবে বায়ুকে সোলায়মান (আঃ) —এর অধীন করে দিয়েছিলেন। সোলায়মান (আঃ) তাঁর সিংহাসনে পরিবার-পরিজন ও সভাসদসহ আরোহণ করতেন। বায়ু তাঁর আজ্ঞাধীন হয়ে তিনি যেখানে ইচ্ছা করতেন সিংহাসনটি সেখানে নিয়ে যেত। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : এটি কর্মের প্রতিদানে সোলায়মান (আঃ) —এর জন্যে বায়ুকে অধীন করে দেয়া হয়েছিল। একদিন তিনি অশু পরিদর্শনে এতই মশগুল হয়ে পড়েন যে, আসরের নামায কাযা হয়ে যায়। এই আমনোযোগিতার কারণ ছিল অশু। তাই, এ কারণ খতম করার জন্যে অশুসমূহকে কোরবানী করে দিলেন। কেননা, তাঁর শরীয়তে গুরু মহিষের ন্যায় অশু কোরবানীও জায়েয ছিল। এসব অশু তাঁর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ছিল। তাই, সরকারী ক্ষতির প্রশ্নই উঠে না। কোরবানী করার কারণে নিজের ধন-সম্পদ নষ্ট করার প্রশ্নও দেখা দেয় না। সূরা ছোয়ায়েদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সোলায়মান (আঃ) তাঁর আরোহণের জন্ত কোরবানী করেছিলেন। তাই, আল্লাহ তাআলা তাঁকে আরোহণের জন্যে আরও উত্তম বাহন দান করলেন — (কুরতুবী)।

গুরু শব্দের অর্থ সকাল বেলায় চলা এবং رَوَّاح শব্দের অর্থ বিকালে চলা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সোলায়মান (আঃ) —এর সিংহাসন বাতাসের কাঁধে সওয়ার হয়ে এক মাসের পথ অতিক্রম করত, অতঃপর বিকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এক মাসের পথ অতিক্রম করত। এভাবে দু'মাসের দূরত্ব একদিনে অতিক্রম করত।

وَأَسْأَلُكَ عَيْنَ الْوَقْرِ ۖ — অর্থাৎ, আমি সোলায়মান (আঃ) —এর জন্যে তাহার প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, তামার ন্যায় শক্ত ধাতুকে আল্লাহ তাআলা সোলায়মান (আঃ) —এর জন্যে পানির ন্যায় বহমান তরল পদার্থে পরিণত করে দেন, যা প্রস্রবণের ন্যায় প্রবাহিত হত এবং উত্তপ্তও ছিল না। অনায়াসেই এতে পাত্রাদি তৈরী করা যেত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইয়ামনে অবস্থিত এই প্রস্রবণের দূরত্ব অতিক্রম করতে তিন দিন তিন রাত্রি লাগত। মুজাহিদ বলেন, ইয়ামনের সান'আ থেকে এই প্রস্রবণ শুরু হয়ে তিন দিন তিন রাত্রির পথ পর্যন্ত পানির ন্যায় প্রবাহিত ছিল। ব্যাকরণবিদ খলীল বলেন, আয়াতে ব্যবহৃত قَطْر শব্দের অর্থ গলিত তামা। — (কুরতুবী)।

سَفَرْنَا — وَرَمِنَ الْجِبِّ مَن مِّنْهُمْ لَيْسَ بِبَدِيٍّ

ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থ এই যে, আমি কিছু জিনকে সোলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম, যারা তাঁর সামনে তাঁর পালনকর্তার আদেশক্রমে কাজ করত। 'সামনে' বলার তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদিকে মানুষের অধীন করার ন্যায় জিনকে সোলায়মান (আঃ) —এর অধীন করা ছিল না। বরং এর ধরন ছিল এই যে, তারা চাকর-বাকরের মত অর্পিত দায়িত্ব পালন করত।

وَمِنْ كِبَرِهِمْ وَهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِيرٌ ۚ — অর্থাৎ, কোন

জিন যদি সোলায়মান (আঃ) —এর আনুগত্য না করে, তবে তাকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে পরকালে জাহান্নামের আযাব বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, দুনিয়াতেও আল্লাহ তাআলা তাদের উপর একজন ফেরেশতা নিয়োজিত রেখেছিলেন। সে অব্যাহত জিনকে আগুনের চাবুক মেরে মেরে কাজ করতে বাধ্য করত — (কুরতুবী)। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জিন জাতি আগুনের তৈরী। কাজেই আগুন তাদের মধ্যে কি ক্রিয়া করবে? এর জওয়াব এই যে, আগুন দ্বারা জিন সৃজিত হওয়ার অর্থ তাই, যা মাটির দ্বারা মানব সৃজিত হওয়ার অর্থ। অর্থাৎ, মানব অস্তিত্বের প্রধান উপাদান মাটি। কিন্তু তাকে মাটি ও পাথর দ্বারা আঘাত করা হলে সে কষ্ট পায়। এমনিভাবে জিন জাতির প্রধান উপাদান আগুন কিন্তু নির্ভেজাল ও তেজস্ক্রিয় অগ্নিতে তারাও জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

يَحْضُرُونَ لَأَمْرَيْنَا فَمِنَ الْمُحَرَّبِينَ

এ আয়াতে সে সব কাজের কিছু বিবরণ দেয়া হয়েছে, যা সোলায়মান (আঃ) জিনদের দ্বারা করাতেন। مُحَرَّبِينَ শব্দটি محارب —এর বহুবচন। অর্থ গৃহের শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ অংশ। বাদশাহ অথবা বড় লোকেরা নিজেদের জন্যে যে সরকারী বাসভবন নির্মাণ করে, তাকেও محارب বলা হয়। এ শব্দটি حرب থেকে উদ্ভূত। অর্থ যুদ্ধ। এ ধরনের বাসভবনকে সাধারণতঃ অপরের নাগাল থেকে সুরক্ষিত রাখা হয় এবং এর জন্যে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করা হয়। এর সাথে মিল রেখে গৃহের বিশেষ অংশকে محارب বলা হয়। মসজিদে ইমামের দাঁড়াবার জায়গাকেও এই স্বাতন্ত্র্যের কারণেই محارب বলা হয়। কখনও মসজিদ অর্থেই مُحَرَّبِينَ শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালে اسرائيل بنى محارِبَ এবং ইসলাম যুগে صحابه محارب বলে তাঁদের মসজিদ বোঝানো হতো।

تَبَائِلٌ শব্দটি تَبَالٍ —এর বহুবচন। অর্থ চিত্র বিগ্রহ ইবনে আরাবী আহ্‌কামুল কোরআনে বলেন, চিত্র দু'প্রকার হয়ে থাকে—প্রাণীদের চিত্র ও অপ্রাণীদের চিত্র। অপ্রাণীও দু'প্রকার—(এক) জড়পদার্থ, যাতে হ্রাসবৃদ্ধি হয় না; যেমন পাথর, মৃত্তিকা ইত্যাদি। (দুই) হ্রাসবৃদ্ধি হয় এমন পদার্থ; যেমন বৃক্ষ, ফসল ইত্যাদি। জিনরা হযরত সোলায়মান (আঃ) —এর জন্যে উপরোক্ত সর্বপ্রকার বস্তুর চিত্র নির্মাণ করত। প্রথমতঃ تَبَائِلٌ শব্দের ব্যাপক ব্যবহার থেকে একথা জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ ঐতিহাসিক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সোলায়মান (আঃ) —এর সিংহাসনের উপর পাখীদের চিত্র অঙ্কিত ছিল।

ইসলামে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ : আলোচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, সোলায়মান (আঃ) —এর শরীয়তে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার ছিল না। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, তারা পুণ্যবান ব্যক্তিদের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁদের চিত্র নির্মাণ করে উপসনালয়ে রাখত, যাতে তাঁদের উপাসনার কথা স্মরণ করে তারাও উপাসনায় উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তারা এসব চিত্রকেই উপাস্য স্থির

করে নিয়েছে এবং মূর্তিপূজা শুরু হয়ে গেছে। এভাবে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে প্রাণীদের চিত্র মূর্তিপূজা প্রচলনে সহায়ক হয়েছে।

ইসলাম কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে এটা আল্লাহর অমোঘ বিধান। তাই এতে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, মূল হারাম বস্তু যেমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি তার উপায় ও নিকটবর্তী সহায়ক কারণসমূহকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মূল মহা-অপরাধ হচ্ছে শেরক ও মূর্তিপূজা। একে নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে যেসব ছিদ্রপথে মূর্তিপূজার অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে, সেসব পথেও পাহারা বসিয়ে দেয়া হয়েছে এবং মূর্তিপূজার উপায় ও নিকটবর্তী কারণসমূহকেও হারাম করে দেয়া হয়েছে। এই নীতির ভিত্তিতেই প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার হারাম করা হয়েছে। অনেক সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা এই নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত রয়েছে।

جُنْدَلٌ - শব্দটি جَفْنَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ বড় পাত্র। যেমন টব ইত্যাদি।
جَوَابٌ - শব্দটি جَابِيَةٌ -এর বহুবচন। অর্থ ছোট চৌবাচ্চা। উদ্দেশ্য এই যে, ছোট চৌবাচ্চার সমান পানি ধরে, এমন বড় পাত্র নির্মাণ করত।
تُدَوِّرُ - শব্দটি قَدَرٌ -এর বহুবচন। অর্থ ডেগ।

ثَوْبِيَّتٌ - স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, এমন বড় ও ভারী ডেগ নির্মাণ করত যা নাড়ানো যেত না। সম্ভবতঃ এগুলো পাথর খোদাই করে পাথরের চুল্লির উপরেই নির্মাণ করা হত, যা স্থানান্তর করার যোগ্য ছিল না।
তফসীরবিদ যাহ্যাক এ তফসীরই করেছেন।

وَكَيْلٌ مِّنْ عِبَادِ الشُّكْرِ - হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)-এর প্রতি বিশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ও তাঁদের পরিবারবর্গকে এই আয়াতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার আদেশ দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতার স্বরূপ ও তার বিধান : কুরতুবী বলেন, কৃতজ্ঞতার স্বরূপ হচ্ছে নেয়ামত দাতার নেয়ামত স্বীকার করা ও তাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করা। কারও দেয়া নেয়ামতকে তার ইচ্ছার বিপরীতে ব্যবহার করা অকৃতজ্ঞতা। এ থেকে জানা গেল যে, কৃতজ্ঞতা কেবল মুখশই নয়, কর্মের মাধ্যমেও হতে হয়। কর্মগত কৃতজ্ঞতা হচ্ছে নেয়ামতদাতার নেয়ামতকে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী ব্যবহার করা। আবু আবদুর রহমান সুলাযী বলেন, নামায, রোযা যাবতীয় সংকর্মই কৃতজ্ঞতা। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী বলেন, খোদাভীতি ও সংকর্মের নাম কৃতজ্ঞতা।—(ইবনে কাসীর)

আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাক কৃতজ্ঞতার আদেশ প্রসঙ্গে اشكروني -সংক্ষিপ্ত শব্দ না বলে اعملوا شكرًا বাক্য ব্যবহার করে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত করেছে যে, দাউদ-পরিবারের কাছ থেকে কর্মগত কৃতজ্ঞতা কাম্য। সে মতে হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ) এবং তাঁদের পরিবারবর্গ মৌখিকভাবে ও কর্মের মাধ্যমে এই আদেশ পালন করেছেন। তাঁদের গৃহে এমন কোন মুহূর্ত যেত না যাতে ঘরের কেউ না কেউ এবাদতে মশগুল না থাকত। পরিবারের লোকজনকে সময় ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। ফলে দাউদ (আঃ)-এর জায়নামায কোন সময় নামাযী শূন্য থাকত না।—(ইবনে কাসীর)

বুশায়ী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলার কাছে হযরত দাউদ (আঃ)-এর নামায অধিক প্রিয়। তিনি অর্থ

রাত্রি ঘুমাতে, অতঃপর রাতের এক তৃতীয়াংশ এবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং শেষের এক ষষ্ঠাংশে ঘুমাতে। আল্লাহ তাআলার কাছে হযরত দাউদ (আঃ)-এর রোযাই অধিক প্রিয়। তিনি একদিন অন্তর অন্তর রোযা রাখতেন।—(ইবনে কাসীর)

হযরত ফুয়ায়েল (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই আদেশ অবতীর্ণ হলে তিনি আরয় করলেন, হে আমার পালনকর্তা, আমি আপনার শুকরিয়া কিভাবে আদায় করব? আমার মৌখিক অথবা কর্মগত শুকরিয়া তো আপনারই দান। এর জন্যেও তো শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বললেন, অর্থাৎ, হে দাউদ! এখন তুমি আমার শুকরিয়া আদায় করবে। কেননা, যথাযথ শুকরিয়া আদায়ে তুমি তোমার অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পেরেছ এবং মুখে তা স্বীকার করবে।

হাকীম তিরমিযী ও ইমাম জাসাস্ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন اَعْمَلُوا لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মিস্বরে দাঁড়িয়ে আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন, তিনটি কাজ যে ব্যক্তি সম্পন্ন করবে সে দাউদ পরিবারের বৈশিষ্ট্য লাভ করতে সক্ষম হবে। সাহাবায়ে-কোরাম আরয় করলেন ইয়া রসূলুল্লাহ তিনটি কাজ কি? তিনি বললেন, (১) সন্তুষ্টি ও ক্রোধ উভয় অবস্থায় ন্যায্য-বিচারে কায়ম থাকা, (২) স্বাচ্ছন্দ্য ও দারিদ্র্য উভয় অবস্থায় মিতাচার অবলম্বন করা এবং (৩) গোপন ও প্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা।—(কুরতুবী, আহকামুল- কোরআন- জাসাস্)।

وَكَيْلٌ مِّنْ عِبَادِ الشُّكْرِ - শুকরিয়ার আদেশ দানের পর এ বাস্তব সত্যও ভুলে ধরা হয়েছে যে, কৃতজ্ঞ বান্দাদের সংখ্যা অল্পই হবে। এতেও মুমিনগণকে কৃতজ্ঞতায় উৎসাহিত করা হয়েছে।

لَقَدْ فَضَّلْنَا عَلَيْهِ الْيُسْرَ - আয়াতে منساة শব্দের অর্থ লাঠি। কেউ কেউ বলেন, এটা আবিসিনিয় ভাষার শব্দ এবং কারও মতে আরবী শব্দ। نَسَاء শব্দের অর্থ সরানো, পেছনে নেয়া। লাঠির সাহায্যে মানুষ ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে থাকে। তাই লাঠিকে منساة অর্থাৎ, সরানোর হাতিয়ার বলা হয়। এ আয়াতে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করে অনেক শিক্ষা ও পথনির্দেশের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে।

সোলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর বিস্ময়কর ঘটনা : এ ঘটনায় অনেক পথনির্দেশ রয়েছে। উদাহরণতঃ হযরত সোলায়মান (আঃ) অদ্বিতীয় ও অনুপম সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। সমগ্র বিশ্বের উপরেই নয় বরং জিনজাতি, পক্ষীকুল ও বায়ুর উপরও তাঁর হুকুম কার্যকর ছিল। কিন্তু এতসব উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পাননি। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর মৃত্যু আগমন করেছে। বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ দাউদ (আঃ) শুরু করেছিলেন এবং সোলায়মান (আঃ) তা শেষ করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে কিছু নির্মাণ কাজ অবশিষ্ট ছিল। কাজটি অবাধ্যতাপ্রবণ জিনদের দায়িত্বে ন্যস্ত ছিল। তারা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ভয়ে কাজ করত। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ অবগত হতে পারলে তৎক্ষণাৎ কাজ ছেড়ে দিত। ফলে নির্মাণ অসমাপ্ত থেকে যেত। সোলায়মান (আঃ) খোদায়ী নির্দেশে এর ব্যবস্থা এই করলেন যে, মৃত্যুর পূর্বক্ষেপে তিনি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে তাঁর মেহরাবে প্রবেশ করলেন। মেহরাবটি স্বচ্ছ কাঁচের নির্মিত ছিল। বাইরে থেকে ভেতরের

সবকিছু দেখা যেত। তিনি নিয়মানুযায়ী এবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে আত্মা বের হয়ে যাওয়ার পরও দেহ লাঠির সাহায্যে স্বস্থানে অনড় থাকে। যথাসময়ে তাঁর আত্মা দেহপিঞ্জর ছেড়ে গেল। কিন্তু লাঠির উপর ভর করে তাঁর দেহ অনড় থাকায় বাইরে থেকে মনে হত, তিনি এবাদতেই মশগুল রয়েছেন। কাছে গিয়ে দেখার সাধ্য জিনদের ছিল না। তারা তাঁকে জীবিত মনে করে দিনের পর দিন কাজ করতে থাকে। অবশেষে এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণকাজও সমাপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ্ সোলায়মান (আঃ)—এর লাঠিতে উইপোকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কোরআন পাকে একে ‘দাব্বাতুল আরদ’ বলা হয়েছে। উইপোকা ভেতরে ভেতরে লাঠি খানা খেয়ে ফেলে। লাঠির ভর খতম হয়ে গেলে সোলায়মান (আঃ)—এর অসাড় দেহ মাটিতে পড়ে। তখন জিনরা জানতে পারে তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে।

জিনদের আল্লাহ্ তাআলা দূর-দূরান্তের পথ কয়েক মুহূর্তে অতিক্রম করার শক্তি দান করেছেন। তারা এমন পরিস্থিতি ও ঘটনা জানত, যা মানুষের জানা ছিল না। তারা যখন এসব ঘটনা মানুষের কাছে বর্ণনা করত, তখন মানুষ এগুলোকে গায়বের খবর মনে করত এবং বিশ্বাস করত যে, জিনরাও গায়বের খবর জানে। স্বয়ং জিনরাও সম্ভবতঃ অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করত। মৃত্যুর এই অভূতপূর্ব ঘটনা এ বিষয়ের স্বরূপ খুলে দিল। স্বয়ং জিনরাও টের পেল এবং সব মানুষও বায়ে নিল যে, জিনরা আলেমুল গায়ব (অদৃশ্য জ্ঞানী) নয়। কারণ, তারা অদৃশ্য বিষয়ে স্জাত হলে সোলায়মান (আঃ)—এর মৃত্যু সম্পর্কে এক বছর পূর্বেই স্জাত হয়ে যেত এবং সারা বছরের হাড় ভাঙ্গা খাটুনি থেকে নিষ্কৃতি পেত। আয়াতের শেষ বাক্য

فَلَا تَحْزَنْكَ يَتَّيْتُ الْجِنَّ أَنَّ كَوْنَهُمْ لَكُمْ غِيبٌ مَا لَكُمْ بِهَا عَذَابٌ مِمَّنْ

আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। একে عذاب মমিন বলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনিকে বোঝানো হয়েছে যাতে বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করার জন্য সোলায়মান (আঃ) জিনদেরকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর এই বিস্ময়কর ঘটনা আংশিক কোরআন পাকের আলোচ্য আয়াতে এবং আংশিক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত রয়েছে।—(ইবনে-কাসীর)

এ অত্যশ্চর্য ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও অর্জিত হয় যে, মৃত্যুর কবল থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই। আরও বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা যে কাজ করতে চান তার ব্যবস্থা যেভাবে ইচ্ছা করতে পারেন। এ ঘটনায় তাই হয়েছে। এতে জানা যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ততক্ষণ পর্যন্তই নিজদের কাজ করে যায়, যতক্ষণ আল্লাহ্ তাআলা চান। তিনি না চাইলে সবকিছু নিশ্চিত হয়ে পড়ে; যেমন এ ঘটনায় লাঠির ভর উইপোকাকার মাধ্যমে খতম করে দেয়া হয়েছে। জিনদের বিস্ময়কর কাজকর্ম, কীর্তি ও বাহ্যতঃ গায়বী বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার ঘটনাবলী দেখে এ বিষয়ের আশংকা ছিল যে, মানুষ তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নেবে। মৃত্যুর এই অভাবিত ঘটনা এ আশংকার মূলেও কুঠারঘাত করেছে। সবাই জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা সম্পর্কে চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করেছে।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আরও জানা গেল যে, মৃত্যুকালে সোলায়মান (আঃ) দু’টি কারণে এই বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। (এক) বায়তুল-মোকাদ্দাস নির্মাণের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করা এবং (দুই) মানুষের সামনে জিনদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা ফুটিয়ে তোলা, যাতে

তাদের এবাদতের আশংকা না থাকে।—(কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, সোলায়মান (আঃ) বায়তুল-মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ সমাপনান্তে আল্লাহ্ তাআলার কাছে কয়েকটি দোয়া করেন, যা কবুল হয়। তন্মধ্যে একটি দোয়া এই যে, যে ব্যক্তি নামাযের নিয়তে এ মসজিদে প্রবেশ করবে। (অন্য কোন পার্থিব উদ্দেশ্য থাকবে না,) মসজিদ থেকে বের হওয়ার পূর্বে তাকে গোনাহ্ থেকে এমন পবিত্র করে দিন, যেমন সে মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণের সময় ছিল।

সুন্দীর রেওয়ায়েতে আছে, বায়তুল-মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপনান্তে সোলায়মান (আঃ) কৃতজ্ঞতাররূপে বার হাজার গরু, বিশ হাজার ছাগল কোরবানী করে মানুষকে ভোজে আপ্যায়িত করেন এবং আনন্দ উদযাপন করেন। অতঃপর ‘ছহরার’ উপর দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্ তাআলার কাছে এসব দোয়া করেন— হে আল্লাহ্! আপনিই আমাকে শক্তি ও সম্পদ দান করেছেন। ফলে বায়তুল-মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। হে আল্লাহ্! আমাকে এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার তওফীক দিন এবং আমাকে আপনার দ্বীনের উপর ওফাত দিন। হেদায়েত প্রাপ্তির পর আর আমার অন্তরে কোন বক্রতা সৃষ্টি করবেন না। হে আমার পালনকর্তা! যে ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করবে, আমি তার জন্য আপনার কাছে পাঁচটি বিষয় প্রার্থনা করছি—(১) গোনাহ্গার ব্যক্তি তওবা করার জন্য এ মসজিদে প্রবেশ করলে আপনি তার তওবা কবুল করুন এবং তার গোনাহ্ মাফ করুন। (২) যে ব্যক্তি কোন ভয় ও আশংকা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এ মসজিদে প্রবেশ করবে, আপনি তাকে অভয় দিন এবং আশংকা থেকে মুক্তি দিন। (৩) রুগ্ন ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে আরোগ্য দান করুন। (৪) নিঃশ্ব ব্যক্তি এ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে ধনাত্মক করুন। (৫) এ মসজিদে প্রবেশকারী যতক্ষণ এখানে থাকে, ততক্ষণ আপনি তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন। তবে কেউ কোন অন্যায় ও অধর্মের কাজে লিপ্ত হলে তার প্রতি নয়।—(কুরতুবী)

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, বায়তুল-মোকাদ্দাস নির্মাণের কাজ সোলায়মান (আঃ)—এর জীবদ্দশায়ই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পূর্ব বর্ণিত ঘটনাও এর পরিপন্থী নয়। কারণ, বড় বড় নির্মাণ কাজে মূল নির্মাণ সমাপ্ত হয়ে গেলেও কিছু কিছু কাজ অবশিষ্ট থাকে। এখানেও সে ধরনের কাজই বাকী ছিল। এর জন্যে সোলায়মান (আঃ) উপরোক্ত কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর পর সোলায়মান (আঃ) লাঠিতে ভর দিয়ে এক বছর দণ্ডায়মান থাকেন। (কুরতুবী) কতক রেওয়ায়েতে আছে, জিনরা যখন জানতে পারল যে, সোলায়মান (আঃ) অনেক পূর্বেই মারা গেছে কিন্তু তারা টের পায়নি, তখন তাঁর মৃত্যুর সময়কাল জানার জন্যে একটি কাঠে উইপোকা ছেড়ে দিল। একদিন এক রাত্রিতে যতটুকু কাঠ উইপোকায় খেল, সেটি হিসাব করে তারা আবিষ্কার করল যে, সোলায়মান (আঃ)—এর লাঠি উইয়ে খেতে এক বছর সময় লেগেছে।

বগভী ইতিহাসবিদদের বরাতে দিয়ে বর্ণনা করেন যে, সোলায়মান (আঃ)—এর মোট বয়স তেরো বছর হয়েছিল। তিনি চল্লিশ বছর কাল রাজত্ব করেন। তের বছর বয়সে তিনি রাজকাব্য হাতে নেন এবং চতুর্থ বছরে বায়তুল-মোকাদ্দাসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন।—(মাযহরী, কুরতুবী)



(১৫) সাবার অধিবাসীদের জন্যে তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নির্দর্শন—দুটি উদ্যান, একটি ডানদিকে, একটি বামদিকে। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিযিক খাও এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। স্বাস্থ্যকর শহর এবং ক্ষমাশীল পালনকর্তা (১৬) অতঃপর তারা অবশ্যতাকরল ফলে আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম প্রহল বন্যা! আর তাদের উদ্যানবৃক্ষকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দুই উদ্যানে, যাতে উদগত হয় বিশ্বাদ ফলমূল, ঝাঁউ গাছ এবং সামান্য কুলবৃক্ষ। (১৭) এটা ছিল কুফরের কারণে তাদের প্রতি আমার শাস্তি। আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেই না। (১৮) তাদের এবং বেসব জনপদের লোকদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেগুলোতে ব্রশ নির্ধারিত করেছিলাম। তোমরা এসব জনপদে রাতে ও দিনে নিরাপদে ব্রশ কর। (১৯) অতঃপর তারা বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের ব্রশের পরিসর বাড়িয়ে দাও। তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। ফলে আমি তাদেরকে উপাখ্যানে পরিত করলাম এবং সম্পূর্ণরূপে ছিঁবিচ্ছিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ষেবশীল কৃতজ্ঞের জন্যে নির্দর্শনাবলী রয়েছে। (২০) আর তাদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করল। ফলে তাদের মধ্যে মুমিনদের একটি দল ব্যতীত সকলেই তার পথ অনুসরণ করল। (২১) তাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা ছিল না, তবে কে পরকালে বিশ্বাস করে এবং কে তাতে সন্দেহ করে, তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আপনার পালনকর্তা সব বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক। (২২) বরুন, তোমরা তাদেরকে আহবান কর, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহ্ ব্যতীত। তারা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের অণু পরিমাণ কোন কিছু মালিক নয়, এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহ্ সহায়কও নয়।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

রেসালত ও কেয়ামতে অবিশ্বাসী কাকেরদেরকে আল্লাহ্ তাআলার সর্বময় ক্ষমতা সম্পর্কে হুসিয়ার করার উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের হাতে সংঘটিত বিস্ময়কর ঘটনা ও মো'জেযা বর্ণিত হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে প্রথমে হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)—এর ঘটনাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এ প্রসঙ্গেই সাবা সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্ তাআলার অগণিত নেয়ামত বর্ষণ, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার কারণে তাদের প্রতি আযাব অবতরণের আলাচনা আলোচ্য আয়াতসমূহে করা হয়েছে।

সাবা সম্প্রদায় ও তাদের প্রতি আল্লাহ্ বিশেষ নেয়ামতরাজি : ইবনে কাসীর বলেন, ইয়ামনের সম্রাট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধি হচ্ছে সাবা। তাবাবেয়া সম্প্রদায়ও সাবা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা ছিল সে দেশের ধর্মীয় সম্প্রদায়। সূরা নমলে সোলায়মান (আঃ)—এর সাথে রাণী বিলকীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনিও এ সম্প্রদায়েরই একজন ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সামনে জীবনোপকরণের দূর উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং পয়গম্বরগণের মাধ্যমে এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার আদেশ দান করেছিলেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারা এ অবস্থার উপর কায়ম থাকে এবং সর্বপ্রকার সুখ ও শান্তি ভোগ করতে থাকে। অবশেষে ভোগবিলাসে মগ্ন হয়ে তারা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে, এমন কি আল্লাহ্ তাআলাকে অস্বীকার করতে থাকে। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে হুসিয়ার করার জন্যে তের জন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তাঁরা তাদেরকে সংপথে আনার জন্যে সর্ব-প্রযত্নে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের চেষ্টান্যায় হয়নি। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর বন্যার আযাব প্রেরণ করেন। ফলে তাদের শহর ও বাগ-বাগিচা বিধ্বস্ত হয়ে যায়।—(ইবনে কাসীর)

ইয়াম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, জৈনক ব্যক্তি রসুল্লাহ্ (সাঃ)—কে জিজ্ঞেস করল : কোরআনে উল্লেখিত ‘সাবা’ কোন পুরুষের নাম, না নারীর, না কোন ভূ-খণ্ডের নাম? রসুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, সাবা একজন পুরুষের নাম। তার দশটি পুত্র সন্তান ছিল। তন্মধ্যে ছয় জন ইয়ামনে এবং চার জন শাম দেশে বসতি স্থাপন করে। ইয়ামনে বসবাসকারী ছয় পুত্রের নাম মাদজাজ, কেন্দা, ইয়দ, আশ'আরী, আনমার, হিমইয়ার, (তাদের থেকে ছয়টি গোত্র জন্মলাভ করে) এবং শাম দেশে বসবাসকারীদের নাম লখম, জুযাম, আমেলা, গাস্‌সান (তাদের গোত্রসমূহ এ নামেই সুবিদিত)। এ রেওয়াজেতটি হাফেজ ইবনে আবদুল বারও তার ‘আলকাসদু ওয়াল উমামু বেমায়েফতে আস্ সাবিলিল আরবি ওয়াল আজম’ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

বংশতালিকা বিশেষজ্ঞ আলেমগণের বরাতে দিয়ে ইবনে কাসীর বলেন, এরা দশ জন সাবার ঔরসজাত ও প্রত্যক্ষ পুত্র ছিল না। বরং তার দ্বিতীয়, তৃতীয় অথবা চতুর্থ পুরুষে এরা জন্মগ্রহণ করেছিল। অতঃপর তাদের গোত্রসমূহ শাম ও ইয়ামনে বিস্তার লাভ করে এবং তাদেরই নামে পরিচিত হয়।

সাবার আসল নাম ছিল আবদে শাম্‌স। সাবা আবদে শামস ইবনে ইয়াশহাব ইবনে কাহ্তান থেকে তার বংশতালিকা বোঝা যায়। ইতিহাসবিদগণ লেখেন, সাবা আবদে শামস তার আমলে শেখনবী মুহাম্মদ (সাঃ)—এর আগমনের সুসংবাদ মানুষকে শুনিয়েছিল। সম্ভবতঃ তওরাত ও ইনজীল থেকে সে এ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছিল। অথবা

জ্যোতিষী ও অতিস্বীয়বাদীদের মাধ্যমে অবগত হয়েছিল। রসুলুল্লাহ (সঃ)—এর শানে সে কয়েক লাইন আরবী কবিতাও বলেছিল। এসব কবিতায় তাঁর আবির্ভাবের উল্লেখ করে বাসনা প্রকাশ করেছিল যে, আমি তাঁর আমলে থাকলে তাঁকে সাহায্য করতাম এবং আমার সম্প্রদায়কে তাঁর প্রতি বিশ্রাস স্থাপন করতে বলতাম।

সাবার সন্তানদের ইয়ামনে ও শামে বসতি স্থাপন করার ঘটনাটি তাদের উপর বন্যার আঘাত আসার পরবর্তী ঘটনা। বন্যার পর তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল।—(ইবনে কাসীর) কুরতুবী সাবা সম্প্রদায়ের সময়কাল হযরত ঈসা (আঃ)—এর পরে এবং রসুলুল্লাহ (সঃ)—এর পূর্বে উল্লেখ করেছেন। فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعُورِ। আব্বী অভিধানে 'ع' শব্দের একাধিক অর্থ সুবিদিত। তফসীরকারগণ প্রত্যেক অর্থের দিক দিয়েই এ আয়াতের তফসীর করেছেন। কিন্তু কামুস, সেহাহ, জওহরী ইত্যাদি অভিধানে বর্ণিত অর্থ কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। এসব অভিধানে 'ع' এর অর্থ লেখা হয়েছে বাঁধ, যা পানি আটকানোর জন্যে নির্মাণ করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাসও 'ع'—এর অর্থ বাঁধই বর্ণনা করেছেন।—(কুরতুবী)

ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী এই বাঁধের ইতিহাস এইঃ ইয়ামনের রাজধানী সানআ থেকে তিন মনযিল দূরে মাআরেব নগরী অবস্থিত ছিল। এখানে ছিল সাবা সম্প্রদায়ের বসতি। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায় শহরটি অবস্থিত ছিল বিধায় উভয় পাহাড়ের উপর থেকে বৃষ্টির পানি বন্যার আকারে নেমে আসত। ফলে শহরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যেত। দেশের সম্রাটগণ (তাদের মধ্যে রাণী বিলকীসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়) উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি শক্ত ও মজবুত বাঁধ নির্মাণ করলেন। এ বাঁধ পাহাড় থেকে আগত বন্যার পানি রোধ করে পানির একটি বিরাট ভাণ্ডার তৈরী করে দেয়। পাহাড়ী ঢলের পানিও এতে সঞ্চিত হতে থাকে। বাঁধের উপরে-নীচে ও মাঝখানে পানি বের করার তিনটি দরজা নির্মাণ করা হয় যাতে সঞ্চিত পানি সুশৃঙ্খলভাবে শহরের লোকজনের মধ্যে এবং তাদের ক্ষেতে ও বাগানে পৌঁছানো যায়। প্রথমে উপরের দরজা খুলে পানি ছাড়া হত। উপরের পানি শেষ হয়ে গেলে মাঝখানের এবং সর্বশেষে নীচের তৃতীয় দরজা খুলে দেয়া হত। পরবর্তী বছর বৃষ্টির মওসুমে বাঁধের তিনটি স্তরই আবার পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত। বাঁধের নীচে পানি সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে একটি সুবৃহৎ আধার নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে পানির বারটি খাল তৈরী করে শহরের বিভিন্ন দিকে পৌঁছানো হয়েছিল। সব খালে একই গতিতে পানি প্রবাহিত হত এবং নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাত।

শহরের ডানে ও বায়ে অবস্থিত পাহাড়দুয়ের কিনারায় ফল-মূলের বাগান তৈরী করা হয়েছিল। এসব বাগানে খালের পানি প্রবাহিত হত। এসব বাগান পরস্পর সলংগু অবস্থায় পাহাড়ের কিনারায় দু'সারিতে বহুদূর পর্যন্ত ছিল। এগুলো সংখ্যায় অনেক হলেও কোরআন পাক جَنَّاتٍ অর্থাৎ, দু'টি বাগানের কথা ব্যক্ত করেছে। কারণ, এক সারির সমস্ত বাগান পরস্পর সলংগু হওয়ার কারণে এক বাগান এবং অপর সারির সমস্ত বাগানকে একই কারণে দ্বিতীয় বাগান বলে অভিহিত করা হয়েছে।

এসব বাগানে সবরকম বৃক্ষ ফল-মূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। কাতাদাহ্ প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী একজন লোক মাথায় খালি খুড়ি নিয়ে গমন করলে গাছ থেকে পতিত ফলমূল দ্বারা তা আপনা-আপনি ভরে যেত; হাত লাগানোরও প্রয়োজন হত না।—(ইবনে কাসীর)

أَلْبَانًا—لُؤْلُؤًا مِّنْ زَيْتُونٍ وَنَضْوَءًا شُكُوءًا وَاللَّهُ بَلَدًا طَيِّبَةً وَرَبِّ عَفْوَ

তাআলা পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তোমরা আল্লাহ্ প্রদত্ত এই অফুরন্ত জীবনোপকরণ ব্যবহার কর এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সংকর্ম ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য করতে থাক। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের এ শহরকে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর শহর করেছেন। শহরটি নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত ছিল এবং আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ ছিল। সমগ্র শহরে মশা-মাছি, ছারপোকা ও সাপ-বিচ্ছুর মত ইতর প্রাণীর নামগন্ধও ছিল না। বাইরে থেকে কোন ব্যক্তি শরীয়ে ও কাপড়-চোপড় উকুন ইত্যাদি নিয়ে এ শহরে পৌঁছালে সেগুলো আপনা-আপনি মরে সাফ হয়ে যেত।—(ইবনে কাসীর)

بَلَدًا طَيِّبَةً—এর সাথে وَرَبِّ عَفْوَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব নেয়ামত ও ভোগ-বিলাস কেবল পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং শুকরিয়া আদায় করতে থাকলে পরকালে আরও বৃহৎ ও স্থায়ী নেয়ামতের ওয়াদা রয়েছে। কারণ, এসব নেয়ামতের স্রষ্টা ও তোমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল। শুকরিয়া আদায়ে ঘটনাক্রমে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তিনি ক্ষমা করবেন।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعُورِ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা সুবিস্তৃত

নেয়ামত ও পয়গম্বরগণের হুশিয়ারী সত্ত্বেও যখন সাবা সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে বিমুখ হল, তখন আমি তাদের উপর বাঁধভাঙ্গা বন্যা ছেড়ে দিলাম। বন্যাকে বাঁধের সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ এই যে, যে বাঁধ তাদের হেফাযত ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় ছিল, আল্লাহ্ তাআলা তাকেই তাঁদের বিপর্যয় ও মুসিবতের কারণ করে দিলেন। তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তাআলা যখন এ সম্প্রদায়কে বাঁধ ভাঙ্গা বন্যা দ্বারা ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন এই সুবৃহৎ বাঁধের গোড়ায় অঙ্ক ইদুর নিয়োজিত করে দিলেন। তারা এর ভিত্তি দুর্বল করে দিলেন। বৃষ্টির মওসুমে পানির চাপে দুর্বল ভিতের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়ে গেল। অবশেষে বাঁধের পেছনে সঞ্চিত পানি সমগ্র উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়ল। শহরের সমস্ত ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত হল এবং গাছপালা উজাড় হয়ে গেল। পাহাড়ের কিনারায় দু'সারি উদ্যানের পানি শুকিয়ে গেল।

ওহাব ইবনে মুনাবিহ্ বর্ণনা করেন, তাদের কিতাবে লিখিত ছিল যে, এ বাঁধটি ইদুরের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সে মতে বাঁধের কাছে ইদুর দেখে তারা বিপদ সংকেত বোঝতে পারল। ইদুর নিধনের উদ্দেশ্যে তারা বাঁধের নীচে অনেক বিড়াল ছেড়ে দিল যাতে ইদুররা বাঁধের কাছে আসতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র তকদীর প্রতিরোধ করার সাধ্য কার? বিড়ালরা ইদুরের কাছে হার মানল এবং ইদুরেরা বাঁধের ভিত্তিতে প্রবিশ্ট হয়ে গেল।—(ইবনে কাসীর)

ঐতিহাসিক বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লোক ইদুর দেখা মাত্রই সেস্থান ত্যাগ করে আস্তে আস্তে অন্যত্র সরে গেল। অবশিষ্টরা সেখানেই রয়ে গেল; কিন্তু বন্যা শুরু হলে তারাও স্থানান্তরিত হয়ে গেল এবং অধিকাংশই বন্যায় প্রাণ হারাল। মোটকথা, সমস্ত শহর জনশূন্য হয়ে গেল। যেসব অধিবাসী অন্য দেশে চলে গিয়েছিল, তাদের কিছু বিবরণ উপরে মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। ছয়টি গোত্র ইয়ামনে এবং চারটি গোত্র শাম দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মদীনার বসতিও তাদের কতক গোত্র থেকে শুরু হয়। ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বন্যার ফলে শহর ধ্বংস

হওয়ার পর তাদের দু'সারি উদ্যানে অবস্থা পরবর্তী আয়াত এভাবে বিধৃত হয়েছে : **وَلَدَلْنَاهُمْ مَجَادِلَهمْ فَجَنَّبَهُمُ الْمَسْجِدَ ذَاتِ الْحِلَّةِ** অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তাদের মূল্যবান ফল-মূল্যের বৃক্ষের পরিবর্তে তাতে এমন বৃক্ষ উৎপন্ন করলেন, যার ফল ছিল বিষাদ। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে **حُطِّطَ** এর অর্থ এরাফ বৃক্ষ। জওহরী লিখেন, এক প্রকার এরাফ বৃক্ষে কিছু ফল ধরে এবং তা খাওয়াও হয়। কিন্তু এই বৃক্ষের ফলও বিষাদ ছিল। আবু ওবায়দা বলেন, তিস্ত ও কাঁটাবিশিষ্ট বৃক্ষকে **حُطِّطَ** বলা হয়। **أَيْل** শব্দের অর্থ খাউ গাছ, যার কোন ফল খাওয়ার যোগ্য হয় না। কেউ কেউ বলেন, **أَيْل** এর অর্থ বাবলা গাছ যা কাঁটাবিশিষ্ট হয় এবং যার ফল ছাগলকে খাওয়ানো হয়।

سِدْر—এর অর্থ কুলগাছ। এর এক প্রকার বাগানে যত্ন সহকারে লাগানো হয় এবং ফল হয় সুস্বাদু। এরূপ গাছে কাঁটা কম এবং ফল বেশী হয়। অপর প্রকার জ্বলী কুলগাছ। এটা জঙ্গলে ঝুঁদগত ও কাঁটাবিশিষ্ট বাড় হয়ে থাকে এবং কাঁটা বেশী ও ফল কম হয়ে থাকে। আয়াতে **سِدْر** শব্দের সাথে **لَيْلِي** যুক্ত করে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সেই বাগানে কুলগাছও জ্বলী কিংবা ঝুঁদগত ছিল, যাতে ফল কম ও টক হয়ে থাকে।

ذَلِكَ جَزَاءُهمْ بِمَا كَفَرُوا—অর্থাৎ, আমি এ শাস্তি তাদেরকে কুফরের কারণে দিয়েছিলাম।

জ্ঞাতব্য : এ ঘটনায় বলা হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ্ তাআলা তের জন পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন। অথচ পূর্বে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, সাবা সম্প্রদায় ও ঈশাভাঙ্গা বন্যার ঘটনা হযরত ঈসা (আঃ)—এর পর ও রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর পূর্বে অস্তবর্তীকালে সংঘটিত হয়েছিল। একে **فترة**—এর কাল বলা হয়। অধিকাংশ আলোচকের মতে এ সময়ে কোন নবী রসুল প্রেরিত হয়নি। অতএব এই তের জন পয়গম্বর প্রেরণ কিরূপে শুদ্ধ হতে পারে? এর জওয়াবে রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে। ঈশাভাঙ্গা বন্যার ঘটনা অস্তবর্তীকালে সংঘটিত হলে একথা জরুরী হয় না যে, এই পয়গম্বরগণও সে সময়েই আগমন করেছিলেন। এটা সম্ভবপর যে, তাঁরা অস্তবর্তীকালের পূর্বেই আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাদের কুফর ও অবাধ্যতা অস্তবর্তীকালে তাদের উপর নাযিল করা হয়েছিল।

وَكُلَّ نَفْسٍ مِّنْهُمُ لَا تَكْفُرُ—**كُفِّرُوا** শব্দের অর্থ অতিশয় কুফরকারী। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি অতিশয় কুফরকারী ব্যক্তিকে কাউকে শাস্তি দেই না। এটা বাহ্যতঃ সেসব আয়াত ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী, যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, মুসলমান গোনাহগারকেও তাদের কর্ম অনুযায়ী জাহান্নামের শাস্তি দেয়া হবে যদিও পরিণামে শাস্তি ভোগ করার পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হবে। এই খটকার জওয়াবে কেউ কেউ বলেন, এখানে যে কোন শাস্তি উদ্দেশ্য নয়; বরং সাবা সম্প্রদায়ের অনুরূপ ব্যাপক আযাব বোঝানো হয়েছে। এরূপ আযাব বিশেষভাবে কাকেরদের জন্যে নির্দিষ্ট। মুসলমানদের উপর এরূপ আযাব আসে না।—(রুহুল মা'আনী)

হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, **لَا يَمُوتُ لِيَمُوتَ** অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা সত্য বলেছেন যে, মন্দ কাজের যথাযোগ্য শাস্তি কাকের ব্যক্তিকে কাউকে দেয়া হয় না। (ইবনে কাসীর) মুমিনকে তার গোনাহের মধ্যেও কিছুটা অবকাশ দেয়া হয়।

রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, এ আয়াতের আক্ষরিক অর্থই উদ্দেশ্য। শাস্তি হিসেবে শাস্তি—কেবল কাকেরকেই দেয়া যায়। মুসলমান

পাশীকে যে শাস্তি দেয়া হয়, তা কেবল দৃশ্যতঃ শাস্তি হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য থাকে, তাকে গোনাহ থেকে পবিত্র করা। উদাহরণতঃ স্বর্ণকে আগুনে পোড়ার উদ্দেশ্য তার ময়লা দূর করা। এমনভাবে কোন মুমিনকে পাপের কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হলে তার উদ্দেশ্য হবে তার দেহের সেই অংশ স্থালিয়ে দেয়া, যা হারাম দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। এটা হয়ে গেলে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। তখন তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করা হবে।

وَجَعَلْنَا لِيَهْمُ رَبِّهمُ الْغَرَى الْاَيْتِي يَرْكُضُونَهَا فَاُولَئِكَ

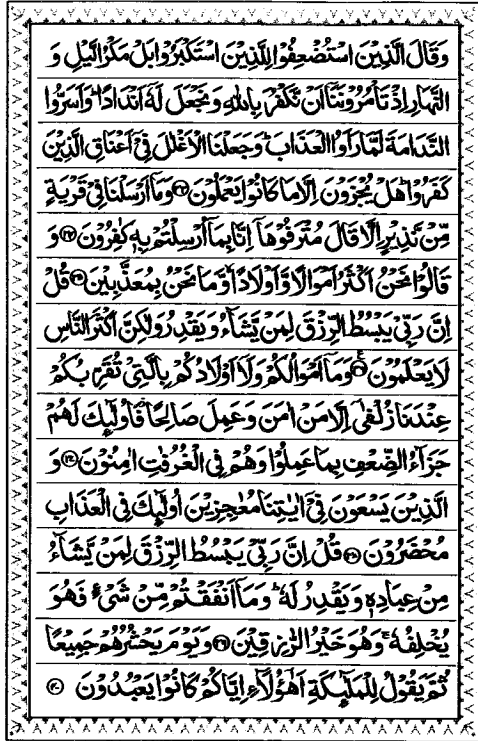
وَنَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ—এ আয়াতে সাবাবাসীদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার আরও একটি নেয়ামত ও তাদের অকৃতজ্ঞতা এবং মূর্খতার আলোচনা রয়েছে। তারা স্বয়ং এই নেয়ামতের পরিবর্তন করে কঠোরতার দোয়া ও বাসনা প্রকাশ করেছিল। **الْغَرَى الْاَيْتِي يَرْكُضُونَهَا** বলে শাম দেশের গ্রামাঞ্চল বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত নাযিল হওয়ার কথা একাধিক আয়াতে শাম দেশের জন্যে বর্ণিত আছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যেসব জনপদকে আল্লাহ্ তাআলা বরকত দান করেছিলেন তাদেরকে প্রায়ই ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে শামের সফর করতে হত। মাআরেব শহর থেকে শামের দূরত্ব ছিল অনেক। রাস্তাও সহজ ছিল না। আল্লাহ্ তাআলা সাবাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের শহর মাআরেব থেকে শাম পর্যন্ত অল্প অল্প দূরত্বে জনবসতি প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এসব জনবসতি সড়কের কিনারায় অবস্থিত ছিল। তাই আয়াতে **فَاُولَئِكَ** দৃশ্যমান জনপদ বলা হয়েছে। এসব জনবসতির ফলে কোন মুসাফির গৃহ থেকে বেরিয়ে দুপুরে বিশ্রাম অথবা খাদ্যগ্রহণ করতে চাইলে অনায়াসেই কোন জনপদে পৌঁছে নিয়মিত খাদ্যগ্রহণ করে বিশ্রাম করতে পারত। অতঃপর যোহরের পর রওযানা হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্য বস্তীতে পৌঁছে রাতি অতিবাহিত করতে পারত। **وَنَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ** বাক্যের অর্থ এই যে, জনবসতিগুলো এমন সুখ ও সমান দূরত্ব গড়ে উঠেছিল যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক বস্তী থেকে অন্য বস্তীতে পৌঁছা যেত।

سَيَرُوا فِيهَا لَيْلِي وَايَّامًا مِّنْ يَّامِنَ—এটা সাবা সম্প্রদায়ের প্রতি

তৃতীয় নেয়ামত। অর্থাৎ, বস্তীসমূহের সমান দূরত্বের কারণে সমতালে পথ অতিক্রম করা হত। পথও সবটুকু নিরাপদ ছিল। চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। দিবারাত্রি সর্বক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে সফর করা যেত।

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيِّنَاتٍ اَسْمَارُنَا وَطَلَبُوا اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُم

اَحَادِيثَ وَمَرْقُومَهُمْ كُلَّ مَرْقِيٍّ—অর্থাৎ, জালেমরা আল্লাহ্ তাআলার উপরোক্ত নেয়ামতের মূল্য বুঝল না। তারা না-শোকরী করে নিজেরাই দোয়া করল, হে আমাদের পালনকর্তা। আমাদের জন্যে ভ্রমণের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন। নিকটবর্তী গ্রাম যেন না থাকে। মাঝখানে জঙ্গল ও জনহীন প্রান্তর থাকুক, যাতে কিছু কষ্টও সহ্য করতে হয়। তাদের অবস্থা ছিল বনী-ইসরাঈলের অনুরূপ, যারা কোনরূপ কষ্ট ও শ্রমের ব্যতিরেকেই মাল্লা ও সালওয়া রিযিক হিসেবে পেত। এতে অতিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ্, এর পরিবর্তে আমাদেরকে সবজি ও তরকারী দান করুন। আল্লাহ্ তাআলা সাবাবাসীদের না-শোকরীর কারণে তাদেরকে উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে সম্পূর্ণ বরবাদ ও সর্বস্বহারী করে দেয়া হয়। ফলে দুনিয়াতে তাদের ভোগবিলাস ও ধনেশুখের কাহিনীই রয়ে গেছে



(৩৩) দুর্বলরা অহংকারীদেরকে কলবে, বরং তোমরাই তো নিরাশ্রয় চক্রান্ত করে আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেন আমরা আল্লাহকে না মানি এক তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করি। তারা যখন শান্তি দেখবে, তখন মনের অনুতাপ মনেই রাখবে। বসন্তে আমি কাকেরদের গলায় বেড়ী পরাব। তারা সে প্রতিফলই পেয়ে থাকে যা তারা করত। (৩৪) কেন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করা হলেই তাঁর বিত্তশালী অধিবাসীরা কলতে শুরু করেছে, তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা মানি না। (৩৫) তারা আরও বলেছে, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধ, সূতরাং আমরা শান্তিপ্রাপ্ত হব না। (৩৬) বলুন আমার পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা রিষিক বাড়িয়ে দেন এক পরিমিত দেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না। (৩৭) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতি তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করবে না। তবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তারা তাদের কর্মের বহুগুণ প্রতিদান পাবে এবং তারা সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। (৩৮) আর যারা আমার আয়াতসমূহকে চ্যাব করার অশেষায়ে নিপুণ হয়, তাদেরকে আশ্রমে উপস্থিত করা হবে। (৩৯) বলুন, আমার পালনকর্তা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিষিক বাড়িয়ে দেন এক সীমিত পরিমাণে দেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিষিক দাতা। (৪০) যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদেরকে কলবেন, এরা কি তোমাদেরই পূজা করত ?

এভাবে তাদের নীচের আকাশের ফেরেশতারা উপরের ফেরেশতাগণকে একই প্রশ্ন করে। এভাবে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত সওয়াল ও জওয়াব পৌছে যায়।—(মাযহরী)

বিজর্কে প্রতিপক্ষের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং উত্তেজনা থেকে বিরত থাকা : **وَأَنَّا أَتَيْنَاكَ لَمْ تَحْمِلْ مَدَىٰ أَوْفَىٰ ضَلَّيْ شَيْبٍ**

—এতে মুশরিক ও কাকেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। সুস্পষ্ট প্রমাণাদির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলাই স্রষ্টা, মালিক ও সর্বশক্তিমান। এতে মূর্তিদের অক্ষমতা ও দুর্বলতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। এসব বিষয়ের পর মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে একথা বলাই সম্ভব ছিল যে, তোমরাই মূর্খ ও পথভ্রষ্ট। তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে মূর্তি ও শয়তানদের পূজা কর। কিন্তু কোরআন পাক এক্ষেত্রে যে বিজ্ঞানোচিত বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করেছে, তা দাওয়াত, তবলীগ ও ইসলাম বিরোধীদের সাথে বিকৃতকারীদের জন্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ। এ আয়াতে তাদেরকে কাকের বা পথভ্রষ্ট বলার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, এসব সুস্পষ্ট প্রমাণাদির আলোকে কোন সমঝদার ব্যক্তি তওহীদ ও শিরক উভয়টিকে সত্য বলে মানতে পারে না এবং তওহীদপন্থী ও শিরকপন্থী উভয়কে সত্যপন্থী আখ্যা দিতে পারে না। বরং এটা নিশ্চিত যে, এতদুভয়ের মধ্যে একদল সত্যপথে ও অপর দল ভ্রান্তপথে আছে। এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর এবং ফয়সালা কর যে, আমরা সৎপথে আছি, না তোমরা। প্রতিপক্ষকে কাকের ও পথভ্রষ্ট বললে সে উত্তেজিত হয়ে যেত। তাই তা বলা হয়নি এবং সহনুভূতিমূলক বর্ণনাভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে, যাতে কঠোরপ্রাণ প্রতিপক্ষও চিন্তা করতে বাধ্য হয়।—(কুরতুবী, বয়নুল কোরআন।)

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের এবং আল্লাহ্ যে সর্বশক্তিমান তার বর্ণনা ছিল। আলোচ্য আয়াতে রেসালতের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আমাদের রসূল করীম (সঃ) বিশুর সমগ্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জাতিসমূহের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন।

وَاللَّيْلِ শব্দটি আরবী বাকপদ্ধতিতে সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে কোন ব্যতিক্রম থাকে না। বাকপ্রকরণে শব্দটি **حَال** বিধায় **كَانَ لِلنَّاسِ** বলাই সম্ভব ছিল। কিন্তু রেসালতের ব্যাপকতা বর্ণনার লক্ষ্যে শব্দটিকে আগে রাখা হয়েছে।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পার্শ্বিক ধন-সম্পদ ও সম্মানকে আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার দলীল মনে করা যৌক্তিক : পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে পার্শ্বিক ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের নেশায় লোকেরা সর্বদাই সত্যের বিরোধীতা এবং পয়গম্বর ও সৎলোকদের সাথে শত্রুতার পথ অবলম্বন করেছে। শুধু তাই নয়, তারা সত্যপন্থীদের যোকাবেলায় নিজেদের অবস্থার উপর নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট থাকার এই দলীলও উপস্থাপিত করেছে যে, আল্লাহ্ তাআলা যদি আমাদের কার্যকলাপ ও অভ্যাস-আচরণ পছন্দ না করবেন, তবে আমাদেরকে পার্শ্বিক ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও শাসন ক্ষমতায় কেন সমৃদ্ধ করবেন। কোরআন পাক এর জওয়াব বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দিয়েছে। এমনি ধনের এক ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং এতে এই অসার দলীলের জওয়াব দান করা হয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত আছে, জাহেলিয়াত আমলে দু'ব্যক্তি এক শরীকী ব্যবসা করত। কিছুদিন পর এক ব্যক্তি সেস্থান পরিত্যাগ করে কোন সমুদ্রোপকূলবর্তী এলাকায় চলে যায়। যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবির্ভূত হলেন এবং তাঁর নবুওয়ত সম্পর্কে জানাজানি হল, তখন উপকূলবর্তী সঙ্গী মক্কার সঙ্গীর কাছে চিঠি লিখে নবুওয়ত দাবীর ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল। জওয়াবে মক্কার সঙ্গী লিখল, কোরাইশ গোত্রের কেউ তাঁর অনুসরণ করে না। কেবল নিঃশব্দ, দরিদ্র ও নিম্নস্তরের লোকজনই তার সাথে রয়েছে। উপকূলবর্তী সঙ্গী তার ব্যবসা-বাণিজ্য ত্যাগ করে মক্কার আগমন করল এবং সঙ্গীকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। সে তওরাত' ইনজিল ইত্যাদি প্রাচীন গ্রন্থ কিছু কিছু অধ্যয়ন করত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কিসের দাওয়াত দেন? রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাওয়াতের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো বিবৃত করলেন। তাঁর মুখে ইসলামের দাওয়াত শুনা মাত্রই আগন্তুক বলে উঠল : **أشهد أنك رسول الله** - (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চতই আল্লাহর রসূল)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার দাওয়াতের সত্যতা কিরূপে জানতে পারলে? সে আরম্ভ করল, (জ্ঞান বুদ্ধির মাধ্যমে আপনার দাওয়াতের সত্যতা জানতে পেরেছি এবং এর লক্ষণ এই দেখেছি যে,) পূর্বে যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, শুরুতে তাঁদের সকলের অনুসারী দরিদ্র, নিঃশব্দ ও নিম্নস্তরের লোকই ছিল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য **وَأَنَّكَ لَكَيِّدٌ مِّمَّنْ كَذَبُوا** আয়াত অবতীর্ণ হয়। - (ইবনে কাসীর, মাযহার) **مُتَرَفٍّ** শব্দটি **تَرَفٍّ** থেকে উদ্ভূত।

অর্থ ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য। **مُتَرَفٍّ** বলে বিতশালী ও সরদারকে বোঝানো হয়েছে। ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, যখনই আমি কোন রসূল প্রেরণ করছি, তখনই ধনৈশ্বর্য ও ভোগ-বিলাসে লালিত-পালিত লোকেরা কুফর ও অস্বীকারের মাধ্যমে তাঁর মোকাবেলা করেছে।

৩৫ নং আয়াতে তাদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ أَكْثَرِ الْأَوَّلَاءِ وَالْآخِرِينَ - অর্থাৎ, আমরা ধনেজনে সবদিক দিয়েই তোমাদের অপেক্ষা বেশী সমৃদ্ধ। সুতরাং আমরা আযাবে পতিত হব না। (বাহ্যতঃ তাদের উক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা শান্তিযোগ্য হলে আমাদেরকে এই বিপুল ধনৈশ্বর্য কেন দিতেন?) ৩৬ ও ৩৭ আয়াতে তাদের জওয়াব দেয়া হয়েছে যে,

فَلَنْ يَنْبَغِيَ لِلرِّزْقِ لَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ এবং **وَأَنَّ الْأَوَّلَاءِ وَالْآخِرِينَ**

জওয়াবের সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর কাছে প্রিয়-অপ্রিয় হওয়ার দলীল নয়; বরং সৃষ্টিগত সুবিবেচনার ভিত্তিতে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা অগাধ ধন-সম্পদ দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা কম দেন। এর রহস্য তিনিই জানেন। ধন-সম্পদের প্রাচুর্যকে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার দলীল মনে করা মূর্খতা। আল্লাহর প্রিয় হওয়া একমাত্র ঈমান ও সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এগুলো অর্জন করে না, ধন-সম্পদ ও সম্মান-সম্ভতির প্রাচুর্য তাকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র করতে পারে না।

এ বিষয়বস্তুটি কোরআন পাক বিভিন্ন আয়াতে ব্যক্ত করেছে। এক আয়াতে আছে :

الْحَبِيبُونَ أَمْثَلُكُمْ مِنْ قَالٍ وَيَزِينُ سِرًّا لَكُمْ - অর্থাৎ, তারা কি মনে করে যে, আমি ধন-সম্পদ ও সম্মান-সম্ভতি দ্বারা তাদেরকে যে সাহায্য করি, তা তাদের জন্যে

পরিণাম ও পরকালের দিক দিয়েও মঙ্গলজনক! (কখনই নয়।) বরং তারা আসল সত্য সম্পর্কে বে-খবর। (অর্থাৎ, যে ধন-সম্পদ ও সম্মান-সম্ভতি মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দেয়, তা তার জন্যে শাস্তিস্বরূপ।)

হযরত আবু হোরায়া (রাঃ)-এর রেওয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের রূপ ও ধন-সম্পদ দেখেন না, তিনি তোমাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। (আহমদ, ইবনে কাসীর)

فَأَذِّنْ لَكُمْ حَزْرًا الْقَعُونَ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُوبِ الْمُنُونِ

এতে ঈমানদার ও সংকল্পশীলদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তারাই আল্লাহর প্রিয়জন। দুনিয়াতে কেউ তাদের মূল্য বুঝুক বা না বুঝুক, পরকালে তারা দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে। **ضعف** অর্থ এক বস্তুর দ্বিগুণ অথবা বহুগুণ হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে বিতশালীরা যেমন তাদের বিত্ত বাড়ানোর কাজে ব্যাপৃত থাকে, তেমনি আল্লাহ তাআলা পরকালে মুমিন ও সংকল্পীদের কর্মের প্রতিদান বাড়িয়ে দেবেন। এক কর্মের প্রতিদান দশগুণ হবে এবং এতেই সীমিত থাকবে না, আন্তরিকতা ও অন্যান্য কারণে এক কর্মের প্রতিদান সাতশ' গুণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে বলে সহীহ হাদীসসমূহে প্রমাণিত রয়েছে বরং তার বেশীও হতে পারে। তারা জ্ঞানাতের সুউচ্চ প্রসাদসমূহে চিরকালের জন্যে দৃগু ও কষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে। ঘরের যে অংশ অন্য অংশ থেকে উচু ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয় তাঁকে **غرفة** বলে। এরই বহুবচন **غرفات** - (মাযহারী)

এ ৩৯ নং আয়াতটি প্রায় অনুরূপ শব্দেই পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে। এখানে বাহ্যতঃ এ বিষয়বস্তুরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তবে এতে সামান্য পার্থক্য এই যে, এখানে **لَنْ يَشَاءُ** শব্দের পরে **وَيَقْدِرُ** এবং **وَيَقْدِرُ** শব্দের পরে **لَمْ** অতিরিক্ত সংযুক্ত হয়েছে। **وَيَقْدِرُ** শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, এ বিধানটি বিশেষ বান্দা অর্থাৎ, মুমিনদের জন্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিনগণ যেন ধন-সম্পদের মহত্ত্বতে এমন ভুবে না যায় যে, আল্লাহ প্রদর্শিত হক ও খাতে ব্যয় করতে কার্পণ্য করতে থাকে। পূর্ববর্তী আয়াতে সেসব কাফের ও মুশরেকদেরকে সস্বোদন করা হয়েছিল, যারা পার্শ্ব ধন-সম্পদ ও সম্মান-সম্ভতি নিয়ে গর্ব করত এবং এগুলোকে পরকালীন সাফল্যের দলীল বলে বর্ণনা করত। ফলে সস্বোদিত ব্যক্তি ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটা নিছক পুনরাবৃত্তি রয়নি।

কেউ কেউ আয়াতদ্বয়ের এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম আয়াতে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে রিয়িক বটনের উল্লেখ ছিল। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহস্য ও পার্শ্ব কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাউকে অধিক এবং কাউকে অল্প রিয়িক দেন। আর এ আয়াতে একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ, একই ব্যক্তি কখনও আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে, কখনও দারিদ্র্য ও রিক্ততার সম্মুখীন হয়। এ আয়াতে **وَيَقْدِرُ** শব্দের পরে বর্ণিত **لَمْ** সর্বনামে এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই ভাষা অনুযায়ীও নিছক পুনরাবৃত্তি রইল না; বরং প্রথম আয়াত বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে এবং এ আয়াত একই ব্যক্তির বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

যে ব্যয় শরীয়ত সম্মত নয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই; হযরত জাবেরের হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, সংকাজ সদকা। মানুষ নিজের ও পরিবার পরিজনদের জন্যে যা ব্যয় করে, তাও সদকার পর্যায়ে পড়ে। সম্মান ও আবরু রক্ষার্থে যা ব্যয় করা হয়, তাও সদকা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আদেশ অনুযায়ী ব্যয় করে তাকে বিনিময় দান আল্লাহ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যে ব্যয় অযথা, প্রয়োজনাতিরিক্ত

سورة

২২২

ومن يعنت

قَالُوا اُصْبَحْنَا اَنْتَ وَلَيْكُنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ
 الْاِيْنَ اَكْثَرُهُمْ يَوْمَهُمْ مُؤْمِنُونَ ۝ قَالِ يَوْمَ لَا يُغْنِيكَ عَنْكَ
 بَعْضُ النَّفْسِ فَمَّا تَدْعُوْهُمْ اَلَّذِيْنَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا دُوْنًا عَذَابٌ
 اَلْوَالِدِيْنَ الَّذِيْنَ كُنتُمْ يَهْتَكِرُوْنَ ۝ وَاِذَا تُثْلٰى عَلَيْهِمُ الْاِيْتَانِ
 يَنْتَبِهُنَّ وَقَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ جِئْنَا بِكَ مِنْ دُوْنِ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَنْ مَا كَانُوا
 يَعْبُدْنَ اٰبَاءَكُمْ وَقَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ اَفَاكُ فَتَقْتَرٰى ۝ وَقَالَ
 الَّذِيْنَ نَقَرُوا الْحَقَّ لِمَاجِدُهُمْ اِنَّ هٰذَا الَّذِيْ كُنتُمْ تُبْغَوْنَ
 وَمَا اَنْتُمْ بِمَعْنٰى ۝ كُنْتُمْ يَدْعُوْنَهُمْ وَمَا اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ بَلٰكًا
 مِنْ تَنْذِيْرٍ ۝ وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُلُّهُمْ اَوْفٰى
 مَا اٰتٰهُمْ فَكَذَّبُوْا رُسُلِيْ ۝ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٌ ۝ قُلْ اِنَّمَا
 اَعْظُمُ دِيْنًا وَاِجْعَلُوْا اَنْ تَقُوْا لِلّٰهِ مَثَقًا ۝ وَفَرَادٰى شَعْرٌ
 تَتَفَكَّرُوْنَ ۝ اَمْ لِيْصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنْدٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ
 بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۝ قُلْ مَا سَا اَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرِ
 فَهَوْلَكُمْ اِنْ اَجْبَرٰى اِلَّا اَعْلٰى اللّٰهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 شَهِِيْدٌ ۝ قُلْ اِنْ رَّبِّيْ يُغْنِيْكَ يَا حَقِيْقٌ عَمَّا تَعْلَمُ الْغِيُوْبُ ۝

(৪১) ফেরেশতারা বলবে, আমি নি পবিত্র, আমরা আপনার পক্ষে, তাদের পক্ষে নই; বরং তারা জিনদের পূজা করত। তাদের অধিকাংশই শয়তানে বিশৃঙ্গী। (৪২) অতএব আজকের দিনে তোমরা একে অপরের কোন উপকার ও অপকার করার অধিকারী হবে না। আর আমি জ্বালনদেরকে বলব, তোমরা আগুনের যে শান্তিকে মিথ্যা বলতে তা আশ্বাসন কর। (৪৩) যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয়, তখন তারা বলে, তোমাদের বাপ-দাদারা যার এবাদত করত এ লোকটি যে তা থেকে তোমাদেরকে বাঁধা দিতে চায়। তারা আরও বলে, এটা মনগড়া মিথ্যা বৈ নয়। আর কাকেরদের কাছে যখন সত্য আগমন করে, তখন তারা বলে, এতো এক সুস্পষ্ট যাদু। (৪৪) আমি তাদেরকে কোন কিতাব দেইনি, যা তারা অধ্যয়ন করবে এবং আপনার পূর্বে তাদের কাছে কোন সতর্ককারী স্মরণ করিনি। (৪৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছে। আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম, এরা তার এক দশমাংশও পায়নি। এরপরও তারা আমার রসূলগণকে মিথ্যা বলেছে। অতএব কেমন হয়েছে আমার শাস্তি। (৪৬) বলুন, আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি : তোমরা আল্লাহর নামে এক একজন করে ও দু'দু'জন করে দাঁড়াও, অভ্যঙ্গর চিন্তা-ভাবনা কম-তোমাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই। তিনি তো আসন্ন কঠোর শাস্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করেন যাত্র। (৪৭) বলুন, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না বরং তা তোমরাই রাখ। আমার পুরস্কার তো আল্লাহর কাছে রয়েছে। প্রত্যেক বস্তুই তাঁর সামনে। (৪৮) বলুন, আমার পালনকর্তা সত্য দ্বীন অবতরণ করেছেন। তিনি আলোমূলগায়ব।

নির্মাণ কাজে অথবা পাপ কাজে করা হয়, তার বিনিময়ের ওয়াদা নেই।

হযরত জাবরের শিষ্য ইবনুল মুনকাদির এই হাদীস শুনে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আবরু রক্ষার্থে ব্যয় করার অর্থ কি? তিনি বললেন, এর অর্থ যে ব্যক্তিকে দান না করলে দোষ বের করবে, নিন্দাবাদ করে ফিরবে অথবা গালমন্দ করবে বলে মনে হয়, সম্মান রক্ষার্থে তাকে দান করা।— (কুরতুবা)

যে বস্তুর ব্যয় হ্রাস পায় তার উৎপাদনও হ্রাস পায় : এ আয়াতের ইঙ্গিত থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্যে যে সমস্ত ব্যবহার্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো যে পর্যন্ত ব্যয়িত হতে থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে সেগুলোর পরিপূরকও হতে থাকে। যে বস্তু বেশী ব্যয়িত হয়, আল্লাহ তাআলা তার উৎপাদনও বাড়িয়ে দেন। জীব-জানোয়ারের মধ্যে ছাগল ও গরু সর্বাধিক ব্যয়িত হয়। এগুলো যবেহ করে গোশত খাওয়া হয়। কোরবানী, কাফফারা, মান্নত প্রভৃতিতে যবেহ করা হয়। এগুলো যত বেশী কাজে লাগে, আল্লাহ তাআলা সে অনুপাতে এগুলোর উৎপাদনও বৃদ্ধি করেন। আমরা সর্বত্রই এটা প্রত্যক্ষ করি। সর্বদা ছুরির নীচে থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে ছাগলের সংখ্যা বেশী। কুকুর ও বিড়ালের সংখ্যা এত নয়, অথচ এগুলোর সংখ্যাই বেশী হওয়া উচিত ছিল। কারণ, এরা একই গর্ভ থেকে চার পাঁচটি পর্যন্ত বাচ্চা প্রসব করে। গরু ছাগল বেশীর চেয়ে বেশী দু'টি বাচ্চা প্রসব করে। তদুপরি এগুলোকে সর্বদাই যবেহ করা হয়। পক্ষান্তরে কুকুর বিড়ালকে কেউ হাতও লাগায় না। এতদসত্ত্বেও একটা অনবীকার্য যে, দুনিয়াতে গরু-ছাগলের সংখ্যা কুকুর বিড়ালের তুলনায় অনেক বেশী। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে যেদিন থেকে গো-হত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে সেখানে গরুর উৎপাদনও অপেক্ষাকৃত হ্রাস পেয়েছে। নতুবা যবেহ না হওয়ার কারণে প্রতিটি বস্ত্তী ও বাড়ী গরুতে ভরপুর থাকা উচিত ছিল।

আরবরা যখন থেকে পরিবহনের কাজে উটের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছে, তখন থেকে সেখানে উটের উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছে। কোরবানীর মোকাবেলায় অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টির আশংকা ব্যক্ত করে আজকাল যে বিশ্বাসীসুলভ আলোচনার অবতারণা করা হয়, উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে তার অসারতা প্রমাণিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

عشر কারও মতে معشار শব্দের অর্থ عشر

অর্থাৎ দশ ভাগের একভাগ। কারও মতে العشر অর্থ 'একশ' ভাগের একভাগ এবং কারও মতে العشير অর্থ 'একহাজার ভাগের একভাগ। বলাবাহুল্য শব্দটিতে عشر এর তুলনায় অতিশয়তা আছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে এই যে, পূর্ববর্তী উম্মাতকে পার্থিব ধৈনশুর্ষ, শাসনক্ষমতা, সুদীর্ঘ বয়স, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্য, ইত্যাদি যে পরিমাণে দান করা হয়েছিল, মক্কাবাসীরা তার দশ ভাগের এক বরং হাজার ভাগের এক ভাগও পায়নি। তাই পূর্ববর্তীদের অবস্থা ও অন্তত পরিণাম থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তারা পয়গম্বগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আযাবে পতিত হয়েছিল এবং সে আযাব যখন এসে যায়, তখন তাদের শক্তি, সামর্থ্য, বীরত্ব, ধৈনশুর্ষ ও সুরক্ষিত দুর্গ কোন কাজেই আসেনি।

মক্কার কাকেরদের প্রতি দাওয়াত : اِنَّمَا اَعْظُمُ دِيْنًا وَاِجْعَلُوْا اَنْ تَقُوْا لِلّٰهِ مَثَقًا—এতে

মক্কাবাসীদের উপর প্রমাণ চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে সত্যানুসন্ধানের একটি সংক্ষিপ্ত পথ বলে দেয়া হয়েছে। তা এই যে, তোমরা শুধুমাত্র একটি কাজ কর—‘আল্লাহর উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর অর্থ ইন্দিয়গ্রাহ্য দাঁড়ানো নয় যে, বসা অথবা শোয়া থেকে সটান দাঁড়াতে হবে; বরং বাকপদ্ধতিতে এর অর্থ হয় কোন কাজের জন্যে তৎপর হওয়া। এখানে **لَا** আল্লাহর উদ্দেশ্যে শব্দটি যোগ করার উদ্দেশ্য এই যে, একান্তভাবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বিগত ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হও, যাতে অতীত ধারণা ও কর্ম সত্য গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক না হয়। দু’ দৃ’ জন ও এক একজন বলার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং অর্থ এই যে, দু’টি পন্থায় চিন্তা-ভাবনা করা যায়, (এক)—একান্তে ও নির্জনতায় নিজে নিজে চিন্তা-ভাবনা করা এবং (দুই) — বন্ধুবর্গ ও মুকুব্বীদের সাথে পরামর্শক্রমে পারস্পরিক পর্যালোচনার পর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। তোমরা এই উভয় পন্থা অথবা এতদুভয়ের মধ্যে পছন্দমত যে কোন একটি পন্থা অবলম্বন কর।

ثُمَّ تَتَكَلَّمُوا এটা **أَنْ تَقُولُوا** বাক্যের সাথে সংযুক্ত। এতে দাঁড়ানোর লক্ষ্য ব্যক্ত হয়েছে যে, সব পুরাতন ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে একান্তভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মোহাম্মাদ (সাঃ) —এর দাওয়াতে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে তৎপর হয়ে যাও। এ দাওয়াতে সত্য কি মিথ্যা তা ভেবে দেখ। তা একাই কর অথবা অন্যান্যদের সাথে পরামর্শক্রমেই কর।

অতঃপর এই চিন্তা-ভাবনার একটি সুস্পষ্ট পন্থা বলে দেয়া হয়েছে যে, দলবল ও অর্থকড়ির প্রাচুর্যহীন, একা এক ব্যক্তি যদি তার স্বজাতি বরং সমগ্র বিশ্বের বিরুদ্ধে তাদের যুগযুগব্যাপী বন্ধনুল বিশ্বাসের বিপরীতে কোন ঘোষণা দেয়, তবে তা দু’উপায়েই সম্ভব। (এক) হয় ঘোষণাকারী বন্ধ পাগল ও উন্মাদ হবে, ফলে নিজের হিতাহিত চিন্তা না করে সমগ্র জাতিকে শত্রুতে পরিণত করে বিপদ ডেকে আনবে নয়তো (দুই) তাঁর ঘোষণা আমোষ সত্য হবে এবং তিনি হবেন আল্লাহর প্রেরিত রসূল। তাই আল্লাহর আদেশ পালনে কারও পরওয়া করেন না।

এখন তোমরা মুস্তমনে চিন্তা কর, এতদুভয়ের মধ্যে বাস্তব ঘটনা কোনটি? এভাবে চিন্তা করলে তোমাদের পক্ষে নিশ্চিতভাবে এ বিশ্বাস করা ছাড়া গতান্তর থাকবে না যে, মোহাম্মাদ (সাঃ) উন্মাদ ও পাগল হতে পারেন না। তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি, বিবেচনা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে সমগ্র মক্কা ও গোটা কোরাইশ সম্যক অবগত। তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর স্বজাতীর

মঝেই অতিবাহিত হয়েছে। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত কার্যকলাপ তাদের সামনে সংঘটিত হয়েছে। কখনও কেউ তাঁর কথা ও কর্মকে জ্ঞানবুদ্ধি, গাম্ভীর্য ও শালীনতার পরিপন্থী পায়নি। কেবল এক কলেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’ বতীতে আজও কেউ তাঁর কোন কথা ও কর্ম সম্পর্কে জ্ঞানবুদ্ধির বিপরীত হওয়ার ধারণা করতে পারে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি উন্মাদ হতে পারেন না। আয়াতের পরবর্তী **مَا يَصْحِكُ** বাক্যে তাই প্রকাশ করা হয়েছে। **صَاحِبِكُمْ** (তোমাদের সঙ্গী) শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোন বহিরাগত অজ্ঞাত পরিচয় মুসাফির ব্যক্তির মুখ থেকে স্বজাতীর বিরুদ্ধে কোন কথা শুনে কেউ হয়তো তাকে উন্মাদ বলতে পারে। কিন্তু তিনি তো তোমাদের শহরের বাসিন্দা, তোমাদের গোত্রেরই একজন এবং তোমাদের দিবরাতির সঙ্গী। তাঁর কোন অবস্থা তোমাদের অগোচরে নয়। ইতিপূর্বে তোমরা কখনও তাঁর। সম্পর্কে এ ধরনের সন্দেহ করনি।

যখন পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তিনি উন্মাদ নন, তখন শেষোক্ত বিষয়ই নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি আল্লাহর নির্ভীক রসূল। আয়াতে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছেঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لِّكُلِّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَدَابٍ شَدِيدٍ - অর্থাৎ, তিনি তো

কেবল কোয়ামতের ভয়াবহ আযাব থেকে মানুষকে সতর্ক করেন।

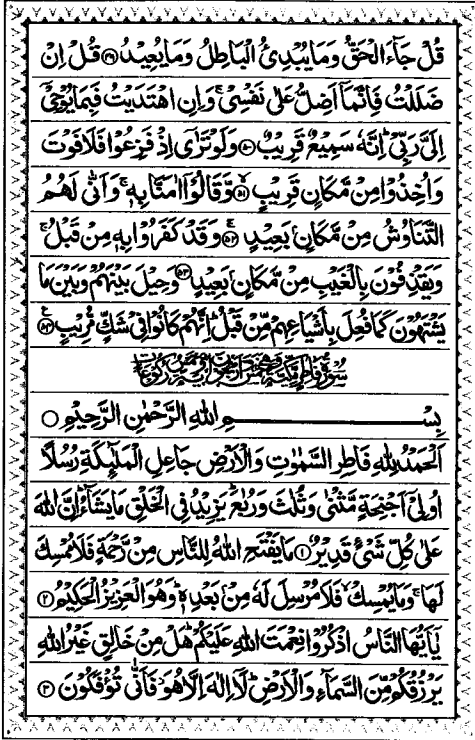
إِنْ رَأَى يَغْفِرُ بِالْحَقِّ عَمَلُهُ الْفُؤُوبِ অর্থাৎ, আমার আলেমুল-গায়ব

পালনকর্তা সত্যকে মিথ্যার উপর ছুড়ে মারেন। ফলে মিথ্যা চুরমার হয়ে যায়। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, **فَذَلِكُمْ - وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكُمْ** - শব্দের

আভিধানিক অর্থ ছুড়ে মারা। এখানে উদ্দেশ্য হল মিথ্যার মোকাবেলায় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। বিষয়টি **فَذَلِكُمْ** শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে, মিথ্যার উপর সত্যের আঘাতের গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি হয়। এটা একটা উপমা। কোন ভারী বস্তুকে হালকা বস্তুর উপর নিক্ষেপ করলে যেমন তা চুরমার হয়ে যায়, তেমনিভাবে সত্যের মোকাবেলায় মিথ্যাও চুরমার হয়ে যায়। তাই অতঃপর বলা হয়েছে

وَمَا يَذِّبُكَ إِلَّا بِأَبْطَلٍ وَمَآ يَذِّبُكَ অর্থাৎ, সত্যের মোকাবেলায় মিথ্যা এমন

পর্যদন্ত হয়ে যায় যে, তা কোন বিষয়ের সূচনা বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য থাকে না।



(৪৯) বলুন, সত্য আগমন করেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে এবং না পারে পুনঃ প্রত্যাবর্তিত হতে। (৫০) বলুন, আমি পক্ষপাতি হলে নিজের ক্ষতির জন্যেই পক্ষপাতি হব; আর যদি আমি সম্পদ প্রাপ্ত হই, তবে তা এ জন্যে যে, আমার পালনকর্তা আমার প্রতি ওই প্রেরণ করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বপ্রোক্ত, নিকটবর্তী। (৫১) যদি আপনি দেখতেন, যখন তারা জীতসম্ভব হয়ে পড়বে, অজ্ঞের পালিয়েও বাঁচতে পারবে না এবং নিকটবর্তী স্থান থেকে ধরা পড়বে। (৫২) তারা বলবে, আমরা সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কিন্তু তারা এতদূর থেকে তার নাগাল পাবে কেমন করে? (৫৩) অথচ তারা পূর্ব থেকে সত্যকে অস্বীকার করছিল। আর তারা সত্য হতে দূরে থেকে অজ্ঞাত বিষয়ের উপর মন্তব্য করত। (৫৪) তাদের ও তাদের বাসনার মধ্যে অন্তরাল হয়ে গেছে, যেমন— তাদের সত্যিখন্দের সাথেও এরূপ করা হয়েছে, যারা তাদের পূর্বে ছিল। তারা ছিল বিবাস্তিকর সন্দেহ পতিত।

সূরা ফাতির

মক্কা অবতীর্ণ: আয়াত ৪৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা এবং কেরেশগণকে করেছে বার্তাবাহক— তারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা যোগ করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সক্ষম। (২) আল্লাহ মানুষের জন্য অনুগ্রহের মধ্য থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং তিনি যা বারণ করেন, তা কেউ প্রেরণ করতে পারে না তিনি ব্যতীত। তিনি পরাক্রমশালী প্রজাময়। (৩) হে মানুষ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিষিক দান করে? তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কোথাও কিংবা যাহা?

আনুযঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এটা হাশর দিবসের অবস্থা। তখন কাকের ও পাপাচারীরা ভীত-বিহ্বল হয়ে পালাতে চাইবে। কিন্তু পরিণাম পাবে না দুনিয়াতে কোন অপরাধী পলায়ন করলে তাকে ধোঁজ করতে হয়; সেখানে তাও হবে না; বরং সবাই স্বস্থানে গ্রেফতার হবে, কেউ পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে না। কেউ কেউ একে অন্তিম কষ্ট ও মুমূর্ষু অবস্থা বলে সাব্যস্ত করেছেন। যখন মৃত্যুর সময় হবে এবং তাদের উপর ভীতি উপস্থিত হবে, তখন ফেরেশতাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না; বরং স্বস্থানেই আত্মা বের হয়ে যাবে।

অর্থ - وَكَانُوا الْمَتَابَ إِنَّا لَمُهْمُ التَّمَاشِ مِنْ مَّكَانٍ يَبِيدُ

হাত বাড়িয়ে কোন কিছু তুলে নেয়া। বলাবাহুল্য, যে বস্তু বেশী দূরে নয়, হাতের নাগালের মধ্যে, তাই হাত বাড়িয়ে তোলা যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাকের ও মুশরেকেরা কেয়ামতের দিন সত্যাসত্য সামনে এসে যাওয়ার পর বলবে, আমরা কোরআনের প্রতি অথবা রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। কিন্তু তারা জানে না যে, ইমানের স্থান তাদের থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। কেননা, কেবল পার্থিব জীবনের ইমানই গ্রহণীয়। পরকাল কর্মজগৎ নয়। সেখানকার কোন কর্ম হিসাবে ধরা যাবে না। তাই এটা কেমন করে সম্ভব যে, তারা ইমানরূপী ধন হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে?

অর্থ - وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقُولُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ يَبِيدُ

কোন বস্তু নিষ্ক্ষেপ করা। আরবী বাকপদ্ধতিতে প্রমাণ ব্যতিরেকে নিষ্ক কল্পনিক কথাবার্তা বলাকে بِالْغَيْبِ رَجْم অথবা بِالْغَيْبِ বলে ব্যক্ত করা হয়। অর্থাৎ, সে অন্ধকারে তীর চালায়, যার কোন লক্ষ্যস্থল নেই। এখানে مِنْ مَّكَانٍ يَبِيدُ এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যা কিছু বলে, তা তাদের মন থেকে দূরে থাকে—মনে তার বিশ্বাস রাখা না।

অর্থ - وَجِئَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ

উদ্ভিষ্ট বস্তুর মাঝখানে পর্দার অন্তরাল করে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়েছে। কেয়ামতের অবস্থায়ও এ বিষয়টি প্রযোজ্য। কেয়ামতে তারা মুক্তি ও জ্ঞানাতের আকাঙ্ক্ষী হবে; কিন্তু তা লাভ করতে পারবে না। দুনিয়াতে মৃত্যুর বেলায়ও এটা প্রযোজ্য। দুনিয়াতে তাদের লক্ষ্য ছিল পার্থিব ধন-সম্পদ। মৃত্যু তাদের ও তাদের এই উদ্দেশ্যের মাঝখানে অন্তরায় হয়ে তাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে।

অর্থ - شِيعَةَ شَكَاةٍ شِيعَةَ - كَأَنفُلٍ بَاشِيًا عَنْهُمْ

অনুসারী ও সত্যি। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হয়েছে অর্থাৎ, তাদের অভীষ্ট ও ইঙ্গিত বস্তু থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হয়েছে তা ইতিপূর্বে তাদের মতই কুফরী কর্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদেরকে দেয়া হয়েছে। কেননা, তারা সবাই সন্দেহে নিপতিত ছিল। অর্থাৎ, রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর রেশালত এবং কোরআনের আল্লাহর কালাম হওয়ার বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ও ইমান ছিল না।

সূরা ফাতির

جَاعِلِ الْمَلَكُوتِ رُسُلًا

কেরেশগণকে রসূল অর্থাৎ, বার্তাবাহক করার বাহ্যিক অর্থ এই যে, তাদেরকে আল্লাহর দূত নিযুক্ত করে

وَلَا يَلْبِثُ يَوْمًا وَلَئِنْ كَذَّبَتْ رُسُلُكَ مِنْ قَبْلِكَ إِلَى اللَّهِ رُجْعُ
الْأُمُورِ لَيَأْتِيَنَّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْغُرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ
عَدُوًّا لَكُمْ يَدْعُو إِلَى كُفْرٍ وَنَارٍ مِنَ النَّارِ فَاصْبِرْ إِلَى الذِّكْرِ
كَمَا وَعَدَ اللَّهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّهُمْ
مَغْفُورٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ آمَنَ رُسُلُكَ لَهُ سَوَّاهُ عَلَيْهِ قَرَاءَةً حَسَنَةً فَإِنَّ
اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ عَنْكَ
عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ لِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ أَزِيدُ أَسْأَلُ
الرَّحْمَنَ مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْعَلِيمَ لِمَا يَشَاءُ وَاللَّهُ
بَعْدَ مَوْتِي أَزِيدُ الشُّعُورُ مَنْ كَانَ رُبُّهُ الْوَاحِدُ فَالْحَقُّ الْعَزَّةُ
جَمِيعًا إِلَيْهِ يُصْعَدُ الْكُلُّ لَطِيفٌ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ رِفْعَةٌ وَ
الَّذِينَ يَكْفُرُونَ السَّيِّئَاتِ اللَّهُمَّ عَذَابُ شَدِيدٍ وَكَرَامَاتُ الْوَلَدِ هُوَ
يُؤْتِيهِ اللَّهُ خَلْقًا مِمَّنْ تَرَاهُ ثُمَّ تَغْفِرُ ثُمَّ تَجْعَلُ لَهُمْ
أَزْوَاجًا وَأَتَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضُرُّهُ الْأَعْيُنُ وَأَنْتَ سَمِيعٌ وَ
مُعْتَقٌ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عَمْرٍؤُا لَيْسَ بِذَلِكَ عَلَى اللَّهِ سِيَرٌ ۝

(৪) তারা যদি আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকেও তো মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। আল্লাহর প্রতিই যাবতীয় বিষয় প্রত্যাবর্তিত হয়। (৫) হে মানুষ, নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং, পার্শ্ববর্তীকন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে। এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। (৬) শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়। (৭) যারা কুফর করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব। আর যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে কমা ও মহাপুরস্কার। (৮) যাকে মন্দকর্ম পোভনীয় করে দেখানো হয়, সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পঞ্চবট করেন এক যাকে ইচ্ছা সংকর্ম প্রদর্শন করেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্যে অনুতাপ করে নিজেকে ধ্বংস করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন তারা যা করে। (৯) আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু যেখানো সঞ্চারিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূ-খণ্ডের দিকে পরিতালিত করি, অতঃপর তদ্বারা সে ভূ-খণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্চারিত করে দেই। এমনভাবে হবে পুনরুত্থান। (১০) কেউ সম্মান চাইলে জেনে রাখুক, সমস্ত সম্মান আল্লাহরই জন্যে। তাঁরই দিকে আরোহণ করে সংকর্মা এক সংকর্ম তাকে জুলে নেয়। যারা মন্দ কার্যের চক্রান্তে লেগে থাকে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে। (১১) আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্ষ থেকে, তারপর করেছেন তোমাদেরকে যুগল। কোন নারী গর্ভধারণ করে না এক সন্তান প্রসব করে না, কিন্তু তাঁর জ্ঞাতসারে। কোন বস্তু ব্যক্তি বয়স পায় না এক তার বয়স হ্রাস পায় না, কিন্তু তা লিখিত আছে কিতাবে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।

পয়গম্বরগণের কাছে পাঠানো হয়। তারা আল্লাহর ওহী ও হুকুম আহ্বান পৌছে দেয়। রসূল অর্ধ এখানে মাধ্যমও হতে পারে। অর্থাৎ, তারা সাধারণ সৃষ্টি ও আল্লাহ তাআলার মাধ্যমে মাধ্যম হয়ে থাকে। সৃষ্টির মধ্যে পয়গম্বরগণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের ও আল্লাহ তাআলার মধ্যেও ফেরেশতারা ওহীর মাধ্যম হয় এবং সাধারণ সৃষ্টি পর্যন্ত আল্লাহর রহমত অথবা আযাব পৌছানোর কাজেও ফেরেশতারা ই মাধ্যম হয়ে থাকে।

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা — اُولَى الْاَمْرِ مَشَى وَنَزَلَ وَرَجَعَ

ফেরেশতাপ্রাপ্তকে পালকবিশিষ্ট ডানা দান করেছেন যদ্বারা তারা উড়তে পারে। এর কারণ সুস্পষ্ট যে, তারা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দূরত্ব বার বার অভিক্রম করে। এটা দ্রুতগতি সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই সম্ভবপর। উড়ার মাধ্যমে দ্রুতগতি হয়ে থাকে।

ফেরেশতাপ্রাপ্তের পাখার সংখ্যা বিভিন্ন। কারও দুই দুই, কারও তিন তিন এবং কারও চার চার খানা পাখা রয়েছে। এখানেই শেষ নয়। মুসলিমের হাদীসে হযরত জিবরাঈল (আঃ) —এর ছয়শ' পাখা রয়েছে বলে প্রমাণিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ চার পর্যন্ত উল্লেখিত হয়েছে। — (কুরতুবী, ইবনে কাসীর)

يُرِيدُنِي الْفَلَقُ مَائِدَةً — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে

যত বেশী ইচ্ছা যোগ করতে সক্ষম। বাহ্যতঃ এটা পাখার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, ফেরেশতাপ্রাপ্তের পাখা দু' —চারের মধ্যেই সীমিত নয়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা আরও অনেক বেশী হতে পারে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতও তাই। যুহরী, কাতাদাহ প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, এখানে অধিক সৃষ্টি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাতে ফেরেশতাদের পাখার অধিক্যও অন্তর্ভুক্ত। দৈহিক সৌন্দর্য, চরিত্র মাধুর্য, সুললিত কণ্ঠ এবং বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর সংযোজনও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আবু হাইয়ান বাহুরে মুহীতে এ মতের আলোকেই তফসীর করেছেন। এ তফসীর থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যে সৌন্দর্য ও পরাকাষ্ঠা অর্জন করে, তা আল্লাহ তাআলার দান ও নেয়ামত। এজন্যে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

كَاشَفَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رُحُوْفِهِمْ لَهَا — এখানে রহমত বলে

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার নেয়ামত বোঝানো হয়েছে। যেমন, ঈমান, জ্ঞান, সংকর্ম, নবুওয়ত ইত্যাদি এবং রিয়িক, সাজ-সরঞ্জাম, সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ, ইযযত-আবরু ইত্যাদি। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা যার জন্যে স্বয়ং অনুগ্রহের দরজা খুলে দেয়ার ইচ্ছা করেন, তাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

এমনিভাবে দ্বিতীয় বাক্যের অর্থও ব্যাপক। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যা বারণ করেন, তা কেউ খুলতে পারে না। সেমতে আল্লাহ তাআলা কোন বান্দা থেকে দুনিয়ার বিপদাপদ ফিরিয়ে রাখতে চাইলে তাকে কষ্ট দেয়ার সাধ্য কারও নেই। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা কোন কারণ বশতঃ কোন বান্দাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে, তাকে তা দেয়ার সাধ্য কারও নেই। — (আবু হাইয়ান)

আনুবাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْغُرُورُ — শব্দটি আধিক্যবোধক। অর্থাৎ, অতি

প্রবঞ্চক। এতে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে। তার কাজই মানুষকে

প্রতারণিত করে কুফর ও গোনাহে লিপ্ত করা। ‘শয়তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোকা না দেয়’—এর অর্থ শয়তান যেন মন্দ কর্মকে শোভনীয় করে তোমাদেরকে তাতে লিপ্ত করে না দেয়। তখন তোমাদের অবস্থা হবে যে, তোমরা গোনাহ করার সাথে সাথে মনে করতে থাকবে যে, তোমরা আল্লাহর প্রিয় এবং তোমাদের শাস্তি হবে না।—(কুরত্বী)

وَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

ইমাম বগভী হযরত

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করেছিলেন : হে আল্লাহ ওমর ইবনে খাতাব অথবা আবু জাহলের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তি ও সামর্থ্য দান কর। আল্লাহ তাআলা ওমর ইবনে খাতাবকে সৎপথ প্রদর্শন করে ইসলামের শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেন এবং আবু জাহল তার পথব্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে থাকে। তখনই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।—(মাহহারী)

إِلَّا يُضِلُّهُمُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ

পূর্বের আয়াতে

বলা হয়েছে যে, কেউ সম্মান ও ক্ষমতা কামনা করলে তার জেনে রাখা উচিত যে, তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও সাধ্যে নেই। তারা যাদেরকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছে অথবা সম্মান পাওয়ার আশায় যাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে রেখেছে, তারা কাউকে সম্মান দিতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে সম্মান ও ক্ষমতা লাভের পন্থা বর্ণিত হয়েছে। এই পন্থার দু’টি অংশের প্রথমটি হচ্ছে সংবাক্য অর্থাৎ, কলেমায়ে তাওহীদ এবং আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান। আর দ্বিতীয় অংশ সংকর্ম। অর্থাৎ, অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তদনুযায়ী শরীয়তের অনুসরণে কর্ম সম্পাদন করা। হযরত শাহ আবদুল কাদির (রহঃ) ‘মুযেহল কোরআনে’ বলেন সম্মান লাভের এই ব্যবস্থাপত্র সম্পূর্ণ নির্ভুল ও পরীক্ষিত। তবে শর্ত এই যে, আল্লাহর যিকর ও সংকর্ম যথারীতি স্থায়ী হতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত স্থায়ীভাবে এই যিকর ও সংকর্ম করলে আল্লাহ তাআলা তাকে ইহ ও পরকালে অক্ষয় ও অতুলনীয় সম্মান দান করেন।

আলোচ্য আয়াতে এই দু’টি অংশ ব্যক্ত করার জন্যে বলা হয়েছে : সংবাক্য আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এবং সংকর্ম তাকে পৌছায়।

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

বাক্যের ব্যাকরণিক প্রকরণে কয়েকটি সম্ভাব্যতা বিদ্যমান রয়েছে এবং প্রত্যেক সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। তফসীরবিদগণ এসব সম্ভাব্যতার প্রেক্ষাপটে এর ভিন্ন ভিন্ন তফসীর করেছেন। প্রথম সম্ভাব্যতা অনুযায়ী তরজমা করা হয়েছে যে, সংবাক্য আল্লাহর দিকে আরোহণ করে, কিন্তু তার উপায় হয় সংকর্ম। হযরত ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, ইবনে জুবায়ের, মুজাহিদ, যাহহাক, শহর ইবনে হাওশব প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদও এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহর দিকে আরোহণ করা ও করানোর অর্থ আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া। তাই এ বাক্যের সারমর্ম এই যে, কলেমায়ে তাওহীদ হোক অথবা অন্য কোন যিকর-তসবীহই হোক—কোনটিই সংকর্ম ব্যতিরেকে আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। সংকর্মের প্রধান অংশ হচ্ছে আত্মিক বিশ্বাস। অর্থাৎ, আল্লাহ ও তাঁর তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা। এটি ব্যতীত কলেমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কিংবা অন্য কোন যিকর মকবুল নয়।

সংকর্মের অন্যান্য অংশ হচ্ছে নামায, রোযা ইত্যাদি সম্পাদন এবং হারাম ও মাকরুহ কর্ম বর্জন। এসব কর্মও পূর্ণরূপে কবুল হওয়া শর্ত।

অতএব, যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে না, সে মুখে যতই কলেমায়ে তাওহীদ উচ্চারণ করুক—আল্লাহ তাআলার কাছে কিছুই কবুল হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে; কিন্তু অন্যান্য সংকর্ম সম্পাদন করে না অথবা তাতে ত্রুটি করে, তার যিকর ও কলেমায়ে তাওহীদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না, বরং সে চিরকালীন আযাব থেকে মুক্তি পাবে এবং সে পরিপূর্ণ কবুলিয়ত লাভ করতে পারবে না। ফলে সংকর্ম বর্জন ও ত্রুটি পরিমাণে আযাব ভোগ করবে।

এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা কোন কথাকে কাজ ছাড়া এবং কোন কথা ও কাজকে নিয়ত ছাড়া এবং কোন কথা, কাজ ও নিয়তকে সুনত অনুযায়ী না হওয়া পর্যন্ত কবুল করেন না।—(কুরত্বী)

সূতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, যে কোন কাজ সুনত অনুযায়ী হওয়া তা পূর্ণরূপে কবুল হওয়ার শর্ত। কথা, কর্ম ও নিয়ত প্রভৃতি ঠিক হওয়ার পর যদি কর্মপন্থা সুনত যোতাবেক না হয়, তবে সেগুলো পূর্ণরূপে কবুল হবে না।

বাস্তব সত্য এই যে, কলেমায়ে তাওহীদ ও তসবীহ যেমন সংকর্ম ব্যতীত যথেষ্ট নয়, তেমনি সংকর্ম এবং আল্লাহর হুকুম—আহকাম ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ যেনে চলাও যিকর ব্যতীত ফোটে উঠে না; প্রচুর যিকরই সংকর্মকে শোভনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে থাকে।

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অধিকাংশ

তফসীরবিদের মতে এ আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা যাকে দীর্ঘ জীবন দান করেন, তা পূর্বই লগ্নেই মাহফুযে লিখিত রয়েছে। অনুরূপভাবে স্বপ্ন জীবনও পূর্ব থেকে লগ্নেই মাহফুযে লিপিবদ্ধ থাকে। যার সারমর্ম দাঁড়াল এই যে, এখানে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং গোটা মানবজাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয় এবং কাউকে তার চেয়ে কম। ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এই তফসীর বর্ণনা করেছেন। জাসসাস, হাসান বসরী ও যাহহাক প্রমুখের মতও তাই। কেউ কেউ বলেন, যদি আয়াতের অর্থ একই ব্যক্তির বয়সের হ্রাসবৃদ্ধি ধরে নেয়া যায়, তবে বয়স হ্রাস করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স আল্লাহ তাআলা যা লিখে দিয়েছেন, তা নিশ্চিত কিন্তু এই নির্দিষ্ট বয়সক্রম থেকে একদিন অতিবাহিত হলে একদিন হ্রাস পায়, দু’দিন অতিবাহিত হলে দু’দিন হ্রাস পায়। এমনভাবে প্রতিটি দিন ও প্রতিটি নিঃশ্বাস তার জীবনকে হ্রাস করতে থাকে। এই তফসীর শা’রী, ইবনে জুবায়ের, আবু মালেক, ইবনে আতিয়া ও সুদী থেকে বর্ণিত আছে।—(রহুল-মা’আনী)

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইমাম নাসায়ী বর্ণিত হযরত আনাস ইবনে মালেকের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, “যে ব্যক্তি চায় যে, তার রযিক প্রশস্ত ও জীবন দীর্ঘ হোক, তার উচিত আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।” বোখারী, মুসলিম ও আবু দাউদেও এই হাদীস বর্ণিত আছে। এই হাদীস থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের ফলে জীবন দীর্ঘ হয়। কিন্তু অপর এক হাদীস এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দিয়েছে। হাদীসটি এই :

ঃ ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতে হযরত আবুদারদা (রাঃ) বলেন, আমরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বলেন, (বয়স তো আল্লাহ তাআলার কাছে একই বলে নির্দিষ্ট ও অবধারিত) নির্দিষ্ট সে যেমাদ পূর্ণ হয়ে গেলে কাউকে এক মুহূর্তও অবকাশ দেয়া হয় না। তবে জীবন দীর্ঘ হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِلٌ شَرَابُهُ وَ
 هَذَا امِلٌ آجَاهٌ وَمَنْ جُلَّ تَأْكُلُونَ لِحَاطِرٍ وَأَنْتُمْ تَعْرِفُونَ
 حَلِيَّةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لَبَتُوا مِنْ
 قَصْبِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ يُؤْتِيهِ الْيَكْلُ فِي الْفَهَارِ وَيُؤْتِيهِ الْفَهَارِ
 فِي الْيَكْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى
 ذَلِكُمُ اللَّهُ يَكْلُمُ لَهَ الْفُلْكَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا
 يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَابٍ ۝ إِنْ تَدْعُهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَكَوْ
 سِمَعُوا أَسْمَاءَكُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ قِيَمَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَوْمَ يَشْرِكُكُمْ
 وَلَا يَنْفَعُكُمْ وَمِثْلَ خَبِيرٍ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى
 اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ ۝ إِنْ يَشَاءُ يَنْفَعُكُمْ
 وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝ وَ
 لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۝ وَإِنْ تَدْعُهُمْ شَفَاعَةً إِلَىٰ جِهَتِهَا
 لَا يَسْمَعُ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۝ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۝ إِنَّمَا تُنذِرُ
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۝ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

(১২) দু'টি সমুদ্র সমান হয় না — একটি মিঠা ও তৃষ্ণানিবারক এবং
 অপরটি লোনা। উভয়টি থেকেই তোমরা তাজা গোশত (মৎস্য) আহর
 কর এবং পরিখানে ব্যবহার্য গয়নাগাটি আহরণ কর। তুমি তাতে তার বুক
 চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তার অনুহই অনুেষণ কর এবং
 যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১৩) তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রতি
 করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রতি করেন। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে
 নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকটি আবর্তন করে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত।
 ইনি আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তাঁর পরিবর্তে তোমরা
 যাদেরকে ডাক, তারা ভুছ খেজুর আঁটিরও অধিকারী নয়। (১৪) তোমরা
 তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের সে ডাক শুনে না। শুনেও তোমাদের
 ডাকে সাড়া দেয় না। কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শেরক অস্বীকার
 করবে। বস্ত্রভূ আল্লাহ্র ন্যায় তোমাকে কেউ অবহিত করতে পারবে না।
 (১৫) হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ্র গলগ্রহ। আর আল্লাহ্ তিনি অব্যবমুক্ত,
 প্রশংসিত। (১৬) তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিনষ্ট করে এক নতুন
 সৃষ্টির উদ্ভব করবেন। (১৭) এটা আল্লাহ্র পক্ষে কঠিন নয়। (১৮) কেউ
 অপারের বোঝা বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুতর ভার বহন করতে
 অন্যকে আহবান করে কেউ তা বহন করবে না — যদি সে নিকটবর্তী
 আত্মীয়ও হয়। আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করেন, যারা তাদের
 পালনকর্তাকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে কেউ
 নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, স্ত্রী কল্যাণের জন্যেই।
 আল্লাহ্র নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন।

তাআলা তাকে সংকর্ষপরায়ণ সম্ভান-সম্ভতি দান করেন। তারা সে ব্যক্তির
 জন্য দোয়া করতে থাকে। সে না থাকলেও কবরে তাদের দোয়া পেতে
 থাকে। (অর্থাৎ, মৃত্যুর পরও সে জীবিতাবস্থায় ন্যায় লাভ করতে থাকে।
 ফলে তার বয়স যেন বেড়ে গেল। ইবনে-কাসীর উভয় রেওয়াজেই বর্ণনা
 করেছেন।) সারকথা, যেসব হাদীসে কোন কোন কর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে
 যে, এগুলো সম্পাদন করলে বয়স বেড়ে যায়, সেগুলোর অর্থ বয়সের
 বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنْ تَدْعُهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَكَوْ

অর্থাৎ, তোমরা যে সমস্ত মূর্তি, কডক নবী ও ফেরেশতার পূজা কর;
 বিপদ মুহূর্তে তাদেরকে আহবান করলে প্রথমতঃ তারা শুনেতেই পারবে
 না। কেননা, মূর্তির মধ্যে শ্রবণের যোগ্যতাই নেই। নবী ও ফেরেশতাদের
 মধ্যে যোগ্যতা থাকলেও তারা সর্বত্র বিদ্যমান নয়, এবং প্রত্যেকের কথা
 শুনে না। অতঃপর বলা হয়েছে, ফেরেশতা ও নবী যদি ধরে নেয়ার পর্যায়ে
 শুনেও, তবে তারা তোমাদের আবেদন পূর্ণ করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্
 তাআলার অনুমতি ব্যতিরেকে তারা তাঁর কাছে কারও জন্যে সুপ্রার্থণা
 করতে পারে না।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াত
 তার পক্ষেও নয় — বিপক্ষেও নয়। সূরা রূমে এই আলোচনার বিস্তারিত
 প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۝

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন কোন মানুষ অন্য
 মানুষের পাপভার বহন করতে পারবে না। প্রত্যেককে নিজের বোঝা
 নিজেই বহন করতে হবে। সূরা আনকাবুতে বলা হয়েছে : وَلِكُلِّ

وَلِكُلِّ قِسْمٌ ۝ অর্থাৎ, যারা পঞ্চবট করে, তারা নিজেদের
 পঞ্চবটতার বোঝাও বহন করবে এবং তৎসহ তাদের বোঝাও বহন করবে,
 যাদেরকে পঞ্চবট করেছিল। এর অর্থ এমন নয় যে, যাদেরকে পঞ্চবট
 করেছিল, তাদের বোঝা তারা কিছুটা হালকা করে দেবে। বরং তাদের
 বোঝা তাদের উপর পুরোপুরিই থাকবে, কিন্তু পঞ্চ-বটকারীদের অপরাধ
 দ্বিগুণ হওয়ার কারণে তাদের বোঝাও দ্বিগুণ হয়ে যাবে — একটি পঞ্চবট
 হওয়ার ও অপরটি পঞ্চবট করার। অতএব উভয় আয়াতে কোন বৈপরীত্য
 নেই।
 হযরত ইকরিমা উল্লেখিত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, সেদিন
 এক পিতা তার পুত্রকে বলবে, তুমি জান যে, আমি তোমার প্রতি কেমন
 স্নেহশীল ও সদয় পিতা ছিলাম। পুত্র স্বীকার করে বলবে, নিশ্চয় আপনার
 স্বপ্ন অসংখ্য। আমার জন্যে পৃথিবীতে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন।
 অতঃপর পিতা বলবে, বৎস, আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী। তোমার
 পুণ্যসমূহের মধ্য থেকে আমাকে যৎসামান্য দিয়ে দাও এতে আমার মুক্তি
 হয়ে যাবে। পুত্র বলবে, পিতা আপনি সামান্য বস্ত্রই চেয়েছেন — কিন্তু
 আমি কি করব, যদি আমি তা আপনাকে দিয়ে দেই, তবে আমারও যে সে
 অবস্থা হবে। অতএব আমি অক্ষম। অতঃপর সে তার সহধর্মীণীকেও এই
 কথা বলবে যে, দুনিয়াতে আমি তোমার জন্যে সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি।
 আজ তোমার সামান্য পুণ্য আমি চাই। তা দিয়ে দাও। সহধর্মীণীও পুত্রের
 অনুগ্রহ জওয়াব দেবে।

وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظُّلُمَاتِ وَالْأَتْرَافَ
وَالْأَقْلَامَ وَلَا الْحُرُوفَ وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظُّلُمَاتِ وَالْأَتْرَافَ
إِنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي
الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مَنْ
وَلَّى كَيْدِيكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ
أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَيْفَ كَانَ كَيْدُكَ ثُمَّ آتَى
اللَّهُ الْإِسْلَامَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
زَرْعًا كَثِيرًا وَرَبَّ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّجَافِ وَالذَّوَابِ
وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ إِنْ الَّذِينَ
يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا زَكَاةً
ذَرَوْا مَتْرَعَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ

(১৯) দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন সমান নয়। (২০) সমান নয় অন্ধকার ও আলো।
(২১) সমান নয় ছায়া ও তপ্তরোদ। (২২) আরও সমান নয় জীবিত ও
মৃত। আল্লাহ প্রকাশ করেন যাকে ইচ্ছা। আপনি কবরে শায়িতদেরকে
জানাতে সক্ষম নন। (২৩) আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী। (২৪)
আমি আপনাকে সত্যবাক্যসহ পাঠিয়েছি সবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।
এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাতে সতর্ককারী আসেনি। (২৫) তারা যদি
আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করে, তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ
করেছিল। তাদের কাছে তাদের রসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শন, সহীফা এবং
উজ্জ্বল কিতাবসহ এসেছিলেন। (২৬) অতঃপর আমি কাকেরদেরকে ধৃত
করেছিলাম। কেমন ছিল আমার আযাব। (২৭) তুমি কি দেখনি আল্লাহ
আকাশ থেকে বৃষ্টিবর্ষণ করেন, অতঃপর তুম্বরা আমি বিভিন্ন বর্ণের
ফল-মূল উদ্ভব করি। পর্বতসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বর্ণের গিরিপথ
— সাদা, লাল ও নিকষ কালো কৃষ্ণ, (২৮) অনুরূপভাবে বিভিন্ন বর্ণের
মানুষ, জন্তু, চতুষ্পদ প্রাণী রয়েছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই
কেবল তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাময়। (২৯)
যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কয়েম করে এবং আমি যা
দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা
আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না।

হযরত ইকরিমা বলেন, وَلَا تَرْوُلُوا زُرُفًا وَلَا تَرْوُلُوا زُرُفًا বাক্যের অর্থ তাই।
কোরআন পাক একাধিক আয়াতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ এ আয়াতের শুরুতে কাকেরদের—
কে মৃতদের সাথে এবং মুমিনগণকে জীবিতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।
এরই সাথে সামঞ্জস্য রেখে مَنْ فِي الْقُبُورِ (কবরস্থ লোক)—এর অর্থ হবে
কাকের। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি যেমন মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না,
তেমনি এই জীবিত কাকেরদেরও বোঝাতে পারবেন না।

এ আয়াত পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে শ্রবণ করানোর অর্থ
উপকারী ও কার্যকররূপে শোনানো।

ফল-মূলের আলাবান ফল-মূলের আলাবান ফল-মূলের আলাবান

বৈচিত্র্যকে ব্যাকরণিক প্রকরণের দিক দিয়ে অবস্থাজ্ঞাপক বানিয়ে
শব্দটিকে বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর পাহাড়, মানুষ, চতুষ্পদ
প্রাণী ইত্যাদির আলাবান তথা বর্ণ-বৈচিত্র্যকে এর আকারে
অর্থ, বর্ণ, বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ফল-মূলের
বর্ণ-বৈচিত্র্য এক অবস্থায় স্থির থাকে না— প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে
থাকে। কিন্তু পাহাড়, মানুষ ও জীব-জন্তুর বর্ণ সাধারণতঃ অপরিবর্তিত
থাকে।

আর পর্বতের ক্ষেত্রে جُدَدٌ বলা হয়েছে। جُدَدٌ শব্দটি جَدَّة এর বহুবচন।
এর প্রসিদ্ধ অর্থ ছোট গিরিপথ, যাকে جاده ও বলা হয়। কেউ কেউ جَدَّة
এর অর্থ নিয়েছেন অংশ বা খণ্ড। উভয় অবস্থার উদ্দেশ্য পাহাড়ের বিভিন্ন
অংশের বিভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট হওয়া। এতে সর্বপ্রথম সাদা ও সর্বশেষে কাল রঙ
উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝখানে লাল উল্লেখ করে مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ বলা
হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, দুনিয়াতে আসল বর্ণ দু'টি— সাদা
ও কাল। অবশিষ্ট সব বর্ণ এ দু'টির বিভিন্ন স্তরের সংমিশ্রণে গঠিত হয়।

كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ অধিকাংশ তফসীর-
বিদের মতে এখানে كَذَلِكَ শব্দের পর বিরতি রয়েছে যা এ বিষয়ের
আলামত যে, এটা পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ,
সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিভিন্ন প্রকারে ও বর্ণে প্রজ্ঞাসহকারে সৃষ্টি করা আল্লাহ
তাআলার অসীম শক্তি ও প্রজ্ঞার উজ্জ্বল নিদর্শন।

কোন কোন রেওয়াজে থেকে বোঝা যায় যে, كَذَلِكَ শব্দের সম্পর্ক
পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে। অর্থাৎ, ফল-মূল, পাহাড়, মানুষ, ও জীবজন্তু
সর্বদা বিভিন্ন রকম। কেউ এর সর্বোচ্চ মর্যাদা অর্জন করে এবং কেউ কম।
এটা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। যার জ্ঞান যে পর্যায়ের তার খোদা-তীতিও
সে পর্যায়ের হয়ে থাকে। — (রুহুল-মা'আনী)

إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে
এতে নবী করীম (সাঃ)- কে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল যে,
আপনার সতর্কীকরণ ও প্রচারের উপকার তারাই লাভ করে, যারা না
দেখে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। এর সাথে সংগতি রেখে আলোচ্য
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ আয়াতে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যারা খোদাতীতি

অর্জন করেছে। পূর্বে যেমন কাফের ও তাদের অবস্থা আলোচিত হয়েছে, তেমনি এখানে ওলী-আল্লাহগণের প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। ﴿ٱلْمُحْسِنُونَ﴾ শব্দটি আরবীতে সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তাই এ বাক্যের বাহ্যিক অর্থ এই যে, কেবল আলেম ও জ্ঞানীগণই আল্লাহকে ভয় করে। কিন্তু ইবনে আতিয়্য প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, ﴿ٱلْمُحْسِنُونَ﴾ শব্দটি যেমন সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রকাশ করে তেমনি কারও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়ও এটি ব্যবহৃত হয়। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ খোদাভীতি আলেমগণের বিশেষ ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে আলেম নয় তার মধ্যে খোদাভীতি না থাকা জরুরী হয় না।— (বাহরে মুহীত, আবু হাইয়ান।)

আয়াতে علماء বলে এমন লোক বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সত্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্টবস্তু সামগ্রী, তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আল্লাহর দয়া-করুণা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন। কেবল আরবী ভাষা, ব্যাকরণ-অলংকারাদি সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিকেই কোরআনের পরিভাষায় আলেম বলা হয় না, যে পর্যন্ত সে আল্লাহর মারফত উপরোক্তরূপে অর্জন না করে।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, সে ব্যক্তিই আলেম যে একান্তে ও জনসমক্ষে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তা কামনা করে এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, সে তাকে ঘৃণা করে।

সারকথা, যার মধ্যে যে পরিমাণ খোদাভীতি হবে, সে সেই পরিমাণ আলেম হবে। আহমদ ইবনে সালেহ মিসরী বলেন, অধিক রেওয়ায়েত ও অধিক জ্ঞান দ্বারা খোদাভীতির পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং কোরআন ও সূন্যাহর অনুসরণ দ্বারা এর পরিচয় পাওয়া যায়।— (ইবনে-কাসীর)

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রহঃ) বলেন— এ আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যার মধ্যে খোদাভীতি নেই, সে আলেম নয়।— (মামহারী)

তবে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আল্লাহর ভয় নেই; এমনও তো অনেক আলেম দেখা যায়— উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ বলার আর অবকাশ নেই। কেননা, উপরের বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর কাছে কেবল আরবী জ্ঞানার নাম এলম এবং যে তা জানে তার নাম আলেম নয়। যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, কোরআনের পরিভাষায় সে আলেমই নয়। তবে এই ভয় কোন সময় কেবল বিশ্রাসগত ও যৌক্তিক হয়ে থাকে। এর কারণে মানুষ নিজের উপর জোর দিয়ে শরীয়তের বিধিনিষেধ পালন করে। আবার কখনও এই ভয় বহুমূল অভ্যাসের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ পর্যায়ে শরীয়তের অনুসরণ মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায়। এই দুই স্তরের ভয়ের মধ্যে প্রথমটি অবলম্বন করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং এটা আলেমের জন্যে জরুরী। দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা উত্তম— জরুরী নয়।— (বয়ানুল-কোরআন)

পূর্ববর্তী এক আয়াতে খোদাতত্ত্ব-জ্ঞানী হক্কানী আলেমগণের একটি বৈশিষ্ট্য—আল্লাহর প্রতি ভয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। বিষয়টির সম্পর্ক ছিল অন্তরের সাথে। আলাচ্য প্রথম আয়াতে তাদেরই এমন কতিপয় গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হচ্ছে, যেগুলোর সম্পর্ক দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে। অর্থাৎ, এগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আদায় করা হয়। তন্মধ্যে প্রথম গুণ হচ্ছে তেলাওয়াতে কোরআন। আয়াতে এমন লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা নিয়মিতভাবে সর্বদা কোরআন

তেলাওয়াত করে।

দ্বিতীয় গুণ নামায কয়েম করা এবং তৃতীয় গুণ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা। এর সাথে ‘গোপনে ও প্রকাশ্যে’ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্যে অধিকাংশ এবাদত গোপনে করাই উত্তম। কিন্তু ধর্মীয় উপযোগীতার কারণে মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও জরুরী হয়ে যায়। যেমন, মিনারে আযান দিয়ে অধিকতর লোক সমাগমের ব্যবস্থা করে জমাআতে নামায আদায় করার বিধান রয়েছে। এমনভাবে অপরকে উৎসাহিত করার জন্যে মাঝে মাঝে আল্লাহর পথে প্রকাশ্যে দান করা জরুরী হয় যায়। নামায ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের ক্ষেত্রে ফেকাহবিদগণ বলেন, ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ হলে প্রকাশ্যে করা উত্তম। এছাড়া নফল নামায ও নফল ব্যয় গোপনে করাই বাঞ্ছনীয়।

যারা উপরোক্ত তিনটি গুণের অধিকারী, তাদের সম্পর্কে অতঃপর বলা হয়েছে ﴿يُؤْتُونَ زَكَاةً ۖ كُنَّ تَبَتُّونَ﴾ শব্দটি بَار থেকে উদ্ভূত।

অর্থ বিনষ্ট হওয়া। আয়াতে অর্থ হচ্ছে যে, তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে লোকসানের আশংকা নেই। প্রার্থী বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে দুনিয়াতে মুমিনের জন্যে কোন সংকাজে সওয়াব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা, পূর্ণ ক্ষমা ও বখশিস কেবল মানুষের কর্মের বিনিময়েই সম্ভবপর নয়। মানুষ যত কর্মই করুক আল্লাহর মহিমা ও প্রাপ্য এবাদতের পক্ষে তা যথেষ্ট হতে পারে না। কাজেই আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কারও মাগফেরাত হবে না। এক হাদীসে তাই বলা হয়েছে। এছাড়া অনেক সংকর্মে গোপন শয়তানী অথবা রিপূগত চক্রান্তও शामिल হয়ে যায়। ফলে সে সংকর্ম কবুল হয় না। মাঝে মাঝে সংকর্মের পাশাপাশি কোন মন্দ কর্মও হয়ে যায় যা সংকর্ম কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাই আয়াতে ﴿يُؤْتُونَ﴾ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাবতীয় সংকর্ম সম্পাদন করার পরও মুক্তি ও উচ্চ মর্যাদা লাভে নিশ্চিত হওয়ার অধিকার কারও নেই— বেশীর চেষ্টে বেশী আশাই করতে পারে।— (রুহুল-মা’আনী)

সংকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে : এ আয়াতে বর্ণিত সংকর্মসমূহকে রূপক অর্থে ও উদাহরণ স্বরূপ ব্যবসা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে ঈমান এবং আল্লাহর পথে জেহাদকেও ব্যবসা বলা হয়েছে।

সংকর্মের তুলনা ব্যবসায়ের সাথে এ অর্থে যে, ব্যবসায়ী এ আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করে যে, এতে তার পুঁজি বৃদ্ধি পাবে এবং মুনাফা অর্জিত হবে। কিন্তু দুনিয়ার প্রতিটি ব্যবসায় মুনাফার সাথে সাথে লোকসানেরও আশংকা থাকে। আলাচ্য আয়াতে ব্যবসায়ের সাথে ﴿يُؤْتُونَ﴾ শব্দ যোগ করে ইশারা করা হয়েছে যে, পরকালের এই ব্যবসায় লোকসান ও ক্ষতির কোন আশংকা নেই। সংকর্মপরায়ণ বান্দাগণ সংকর্মে কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে দুনিয়ার সাধারণ ব্যবসায়ের মত কোন ব্যবসা করে না, বরং তারা এমন এক ব্যবসায়ের প্রার্থী, যাতে কখনও লোকসান হয় না। ‘তারা প্রার্থী’— একথা বলে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা। তিনি প্রার্থীদেরকে নিরাশ করবেন না; বরং তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। পরবর্তী বাক্যে আরও বলা হয়েছে যে, তাদের আশা তো কেবল কর্মের পূর্ণ প্রতিদান পাওয়া পর্যন্ত সীমিত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বীয় কৃপায় তাদের আশা অপেক্ষাও বেশী দান করবেন।

لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ
 شَكُورٌ ۝ وَالَّذِينَ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا
 لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ثُمَّ أَوْرَثْنَا
 الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
 وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُرِيدُ اللَّهُ ذَلِكَ
 هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَكُونَ
 فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا جَبَرُوتٌ
 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا
 لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۝ وَالَّذِينَ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 لَكُمْ مَسَافِهَةٌ فِيهَا وَلَمْ يَمْسَسْ بِهَا الْغُورِبُ ۝ وَالَّذِينَ نَكَرُوا
 لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا تَقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يَخَفُفُ
 عَنْهُمْ مِنْ وَعْدِهَا كُنْ لَكَ تَجَرِي كُلُّ كُفُورٍ ۝ وَهُمْ
 يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ
 الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۝ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ
 تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا الْعَذَابَ لِلظَّالِمِينَ ۝ ثُمَّ نُصِيبُ

(৩০) পরিশ্রমে তাদেরকে আল্লাহ তাদের সওয়াব পুরোপুরি দেন এক নিজ অনুগ্রহে আরও বেশী দেন। নিচয় তিনি কমাশীল, গুণগ্রাহী।
 (৩১) আমি আপনার প্রতি যে কিতাব প্রত্যাদেশ করেছি, তা সত্য — পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী। নিচয় আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সব জানেন, দেখেন। (৩২) অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যস্থতা অকলমুনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নির্দেশক্রমে কন্যাপের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ। (৩৩) তারা প্রবেশ করবে বসবাসের জন্মতে। তথায় তারা স্বর্ণনির্মিত, যেতি খচিত রুবন দ্বারা অলঙ্কৃত হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (৩৪) আর তারা কলবে— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। নিচয় আমাদের পালনকর্তা কমাশীল, গুণগ্রাহী। (৩৫) যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন, তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না স্ফাতি। (৩৬) আর যারা কাকের হয়েছেন, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আশ্রন। তাদেরকে সূত্রর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শান্তিও লাভ করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শান্তি দিয়ে থাকি। (৩৭) সেখানে তারা আত চাঁচকার করে কলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সংকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (আল্লাহ বলবেন,) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতঃপর আশ্বাসন কর। জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।

لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ এখানে لِيُوقِيَهُمْ শব্দটি লি-উকি-ই-হুম শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, তাদের ব্যবসায় লোকসান তো হবেই না, উপরন্তু আল্লাহ তাদের প্রতিদান ও সওয়াব পুরোপুরি দেয়ার পরেও স্বীয় অনুগ্রহে তাদের ধারণাভীত অনেক বেশী দেন।

এই বেশীর মধ্যে আল্লাহ তাআলার সে সওয়াদাও অন্তর্ভুক্ত, যাতে বলা হয়েছে, মুমিনের পুরস্কার আল্লাহ তাআলা বহুগুণ বেশী দান করেন, যা কমপক্ষে কৃতকর্মের দশগুণ এবং বেশীর পক্ষে সাতশ' গুণ বা তার চেয়েও বেশী। অন্যান্য পাণীর জন্যে মুমিনের সুপারিশ কবুল করাও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের শামিল। এ অনুগ্রহের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুমিনের প্রতি দুনিয়াতে যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছিল, পরকালে মুমিন তার জন্যে সুপারিশ করবে। ফলে জাহান্নামের ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও মুমিনের সুপারিশে সে মুক্তি পাবে।—(মায়হরী)

বলাবাহুল্য, সুপারিশ কেবল ইমানদারের জন্যে হতে পারবে, কাকের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেয়া হবে না। এমনভাবে জন্মতে আল্লাহ তাআলার দীদারও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের প্রধান অংশ।

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا—

পর সংযোগ স্থাপনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। ফলে বোঝা যায় পূর্বাপর উভয় বাক্য অভিন্ন গুণ বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। পূর্ববর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু পূর্বে এবং পরবর্তী বাক্যের বিষয়বস্তু পরে বোঝায়। অতঃপর এই পূর্বাপর কখনও কালের দিক দিয়ে এবং কখনও মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়েও হয়। এ আয়াতে মু অব্যয় দ্বারা পূর্বের আয়াতে বর্ণিত اَوْحَيْنَا বাক্যের উপর عطف করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আমি এই সত্য ও পূর্ববর্তী ঐশী কিতাবসমূহের সমর্থক কোরআন প্রথমে আপনার কাছে প্রত্যাদেশ করেছি। এরপর আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকেও এর অধিকারী করেছি। এখন এটা সুস্পষ্ট যে, কোরআন ওহীর মাধ্যমে রসুলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছে প্রেরণ করা মর্যাদা ও স্তরের দিক দিয়ে অগ্রা এবং উম্মতে মোহাম্মদীকে দান করা পশ্চাতে হয়েছে। উম্মতকে কোরআনের অধিকারী করার অর্থ এও হতে পারে যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) উম্মতের জন্যে অর্থ-কড়ি ও বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার রেখে যাওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর কিতাব রেখে গেছেন।

উম্মতে মুহাম্মদী বিশেষতঃ আলেমগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য : الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا অর্থাৎ, আমার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। অধিকাংশ তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন উম্মতে মুহাম্মদী। এতে আলেমগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্যান্য মুসলমানগণ আলেমগণের মধ্যস্থতায় এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا বলে উম্মতে মুহাম্মদীকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাঁর প্রত্যেকটি অবতীর্ণ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন। (অর্থাৎ, কোরআন পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সমর্থক ও সত্রেকক বিষয় সমস্ত ঐশীগ্রহের বিষয়বস্তুর সমষ্টি। এর উত্তরাধিকারী হওয়া যেন সমস্ত আসমানী কিতাবেরই

উত্তরাধিকারী হওয়া।) অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস বলেন :

“এ উম্মতের যালেমদেরকেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করা হবে, মধ্যপন্থীদের হিসাব সহজভাবে নেয়া হবে, আর যারা সংকর্মে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসাবে জন্নাতে প্রবেশ করানো হবে।—(ইবনে-কাসীর)

আয়াতের **اصْطَفَيْنَا** শব্দ দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর সর্ববৃহৎ শ্রেষ্ঠত্ব পরিষ্কৃত হয়েছে। কেননা, এ শব্দটি কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হয়েছে। এক আয়াতে আছে — **اِنَّهُ**

يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ অন্য এক আয়াতে আছে : **اِنَّ لَآلِهَ اصْطَفَىٰ اَلَمْ وَتَوْحَاوَالِ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلِ عِمْرٰنَ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ**

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা উম্মতে-মুহাম্মদীকে **اصْطَفَا** অর্থাৎ, মনোনয়নে পয়গম্বরগণের সাথে শরীক করে দিয়েছেন। তবে মনোনয়নের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। পয়গম্বর ও ফেরেশতাগণের মনোনয়ন উচ্চস্তরে এবং উম্মতে মুহাম্মদীর মনোনয়ন এর পরের স্তরে হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদী তিন প্রকার : **فَوْنَمُ طَائِفَتَيْنِ وَفَوْنَمُ** এই বাক্যটি প্রথমোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা। অর্থাৎ, আমি যাদেরকে মনোনীত করে কোরআনের অধিকারী করেছি, তারা তিন প্রকার। যালেম, মধ্যপন্থী ও সংকর্মে অগ্রগামী।

ইবনে-কাসীর এই প্রকারত্রয়ের তফসীর এভাবে করেছেন : যালেম সে ব্যক্তি যে কোন কোন ফরয ও ওয়াজিব কাজে ত্রুটি করে এবং কোন কোন নিষিদ্ধ কাজেও জড়িত হয়ে পড়ে। মধ্যপন্থী সে ব্যক্তি, যে সমস্ত ফরয ও ওয়াজিব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কার্য থেকে বৈতে থাকে; কিন্তু মাঝে মাঝে কোন কোন মোস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয় এবং কোন কোন মাকরুহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। সংকর্মে অগ্রগামী সে ব্যক্তি, যে যাবতীয় ফরয, ওয়াজিব ও মোস্তাহাব কর্ম সম্পাদন করে এবং যাবতীয় হারাম ও মাকরুহ কর্ম থেকে বৈতে থাকে; কিন্তু কোন কোন মোহাব বিষয়, এবাদতে ব্যাপৃত থাকার কারণে অথবা হারাম সন্দেহে ছেড়ে দেয়।—(ইবনে-কাসীর)

একটি সন্দেহ ও তার জগুয়াব : উল্লেখিত তফসীর থেকে প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, যালেমও আল্লাহ তাআলার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। একে বাহ্যতঃ অবাস্তব মনে করে কেউ কেউ বলেছেন যে, যালেম উম্মতে মুহাম্মদী ও মনোনীতদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ তিন প্রকার লোকই উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত এবং **اصْطَفَيْنَا** গুণের বাইরে নয়। এটি হল উম্মতে মুহাম্মদীর মুমিন বান্দাদের একান্ত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কার্যতঃ ত্রুটিমুক্ত, সেও এই মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। ইবনে-কাসীর এ প্রসঙ্গে এ সম্পর্কিত সমুদয় হাদীস সমাবেশ করেছেন।

উম্মতে মুহাম্মদীর আলেম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি আমার মনোনীত বান্দাদেরকে আমার কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি। বলাবাহুল্য, আল্লাহর কিতাব ও রসূল (সাঃ)-এর শিক্ষার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী হচ্ছেন ওলামায়ে কেরাম। হাদীসেও বলা হয়েছে — **العلماء ورثة الانبياء** — এর সারমর্ম এই যে, যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রচারকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং নিষ্ঠাসহকারে এ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন, তারা আল্লাহ মনোনীত বান্দা ও গুণী। হযরত সা'লাব ইবনে হাকাম (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা

আলেমগণকে সম্বোধন করে বলবেন, আমি তোমাদের বক্ষে আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা শুধু এজন্যে রেখেছিলাম যে, তোমরা যে কর্মই কর না কেন, তোমাদেরকে ক্ষমা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই, সে আলেমগণের তালিকাভুক্ত নয়; তাই আল্লাহ্ ভীতির রঙে রঞ্জিত আলেমগণকেই এই সম্মোহন করা হবে। তাঁদের পক্ষে নিশ্চিন্ত হয়ে পাপ কর্মে লেগে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তবে মানুষ হিসেবে তারাও মাঝে-মাঝে ভুল-ত্রুটি করেন। হাদীসে তাই বলা হয়েছে যে, তোমাদের কর্ম যেমনই হোক, মাগফেরাত তোমাদের জন্যে অবধারিত।—(ইবনে কাসীর)

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, হাশরে আল্লাহ তাআলা সবাইকে একত্রিত করবেন, অতঃপর আলেমগণকে এক বিশেষ জায়গায় সমবেত করে বলবেন :

“আমি তোমাদের অন্তরে আমার এলেম এ জন্যে রেখেছিলাম যে, আমি জ্ঞানতাম (যে, তোমরা এই আমানতের হক আদায় করবে।) তোমাদেরকে আযাব দেয়ার জন্যে তোমাদের বক্ষে আমি আমার এলেম রাখিনি। যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।—(মাহহারী)

জ্ঞাতব্য : আয়াতে সর্বপ্রথম জালেম, অতঃপর মিতাচারী বা মধ্যপন্থী ও সর্বশেষে সংকর্মে অগ্রগামী উল্লেখিত হয়েছে। এই ধারাবাহিকতার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, যালেমের সংখ্যা সর্বাধিক, তাদের চেয়ে কম মিতাচারী মধ্যপন্থী এবং আরও কম সংকর্মে অগ্রগামী। যাদের সংখ্যা বেশী, তাদেরকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে।

ذٰلِكَ هُوَ الْقَضَآءُ الْكَبِيْرُ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُوْنَهَا يَحْكَمُوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرٍ وَّهَبٍ وَّاَنۡوَابٍ وَّاِلَاسۡمٰعِيْلَ وَاٰخَرُوْنَ

অর্থাৎ, শুরুতে আল্লাহ তাআলা তাঁর মনোনীত বান্দাগণের মধ্যে তিন প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন — **ذٰلِكَ هُوَ الْقَضَآءُ الْكَبِيْرُ** অর্থাৎ, এদেরকে মনোনীতদের মধ্যে গণ্য করা আল্লাহ তাআলার মহা অনুগ্রহ। প্রতিদিন স্বরূপ তারা জন্নাতে যাবে, তাদেরকে স্বর্ণের কংকন এবং মুক্তার অলংকার পরানো হবে। তাদের পোষাক হবে রেশমের।

দুনিয়াতে পুরুষদের জন্যে স্বর্ণের অলংকার ও রেশমী পোষাক উভয়টি পরিধান করা হারাম। এর বিনিময়ে জন্নাতে তাদেরকে এসব বস্তু দেয়া হবে। এরূপ বলা ঠিক হবে না যে, অলংকার নারীর ভূষণ, পুরুষদের জন্যে শোভনীয় নয়। কেননা, দুনিয়ার অবস্থার সাথে জন্নাতে ও পরকালের অবস্থার তুলনা করা একান্ত নির্বুদ্ধিতা।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জন্নাতিদের মস্তকে মুক্তা খচিত মুকুট থাকবে। এর নিম্নস্তরের মুক্তার আলোকে সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত উদ্ভাসিত হবে।—(মাহহারী)

তফসীরবিদগণ বলেন, প্রত্যেক জন্নাতীর হাতে একটি স্বর্ণ নির্মিত ও একটি রৌপ্যনির্মিত কংকন থাকবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের এক আয়াতে স্বর্ণ নির্মিত এবং এক আয়াতে রৌপ্য নির্মিত কংকনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ তফসীর দৃষ্টে উভয় আয়াতে কোন বৈপরীত্য নেই।—(কুরতুবী)

দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্র ও রেশমী পোষাক ব্যবহার করবে, সে জন্নাতে এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। হযরত হযায়ফা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, রেশমী পোষাক পরিধান

করো না; সোনা-রূপার পাত্রে পানি পান করো না এবং এসবের দ্বারা তৈরী পাত্রে আহার করো না। কারণ, এগুলো দুনিয়াতে কাফেরদের জন্যে এবং তোমাদের জন্যে পরকালে। — (বোখারী-মুসলিম)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ — অর্থাৎ, জান্নাতীরা

জান্নাতে প্রবেশ করার সময় বলবে, আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। এই দুঃখ কি? এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি আছে। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার দুঃখই এর অন্তর্ভুক্ত। দুনিয়াতে মানুষ যত রাজাধিরাজ অথবা নবী ও ওলী হোক না কেন, দুঃখকষ্টের কবল থেকে কারও নিষ্কৃতি নেই।

এ কারণেই সুফীবর্গ দুনিয়াকে “দারুল-আহযান” দুঃখ কষ্টের আলয় বলেন। আয়াতে উল্লিখিত দুঃখের মধ্যে প্রথমতঃ দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ, দ্বিতীয়তঃ কেয়ামত ও হাশর-নশরের দুঃখ-কষ্ট, তৃতীয়তঃ হিসাব-নিকাশের দুঃখ-কষ্ট এবং চতুর্থতঃ জাহান্নামের শাস্তি ও দুঃখ কষ্টও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের এসব দুঃখ-কষ্টই দূর করে দেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন যারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমায় বিশ্বাসী, তারা মৃত্যুর সময়, কবরে ও হাশরে কোথাও উৎকর্ষা বোধ করে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তারা কবর থেকে উঠার সময় الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ বলতে বলতে উঠছে। — (তিবরানী, মাযহারী)

হযরত আব্দারদার হাদীসে বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত যালেম শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা এ উক্তি করবে। কেননা, হাশরে সে প্রথমে দুঃখ-কষ্ট ও উদ্বেগের সম্মুখীন হবে। অবশেষে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ পাওয়ার কারণে তার এসব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। এ হাদীসটি ইবনে ওমরের হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা, যালেম ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় হাশরেও একটি অতিরিক্ত দুঃখের সম্মুখীন হবে, যা জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দূর হয়ে যাবে। সারকথা, সংকর্মে অগ্রগামী, মিতাচারী ও যালেম সকল শ্রেণীর জান্নাতীই এ উক্তি করবে; কিন্তু প্রত্যেকের দুঃখের তালিকা আলাদা আলাদা হওয়া অবাস্তব নয়।

ইমাম জাসাস বলেন, পার্থিব জীবনে চিন্তা-ভাবনা ও দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত না থাকাই মুমিনের শান। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, দুনিয়া মুমিনের জন্যে কয়েদখানা। এ কারণেই রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও প্রধান সাহাবীগণের জীবনালেখ্যে দেখা যায়, তাদেরকে প্রায়ই চিন্তিত ও বিমর্ষ দেখা যেত।

الَّذِينَ آمَنُوا أَرْزُقْنَاهُمْ مِن تَحْتِ الْأَرْضِ أَمْ لَيْسَ فِيهَا خَازِنٌ

وَلَيْسَ فِيهَا الْخَازِنُ

আয়াতে জান্নাতের কতিপয় বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে। (এক) জান্নাতে বসবাসের জায়গা। এর বিলুপ্তি অথবা সেখান থেকে বহিস্কৃত হওয়ার কোনও আশংকা নেই। (দুই) সেখানে কেউ কোন দুঃখের সম্মুখীন হবে না। (তিন) সেখানে কেউ কোন ক্লান্তিও বোধ করবে না। দুনিয়াতে মানুষ ক্লান্ত হয় এবং কাজকর্ম পরিহার করে নিদ্রার প্রয়োজন অনুভব করে জান্নাত এ থেকে পবিত্র হবে। কোন কোন হাদীসেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত রয়েছে। — (মাযহারী)

أَوَلَمْ نَجْعَلْ لَهُم مَّا يَنْزِلُ عَنْ سُبْحَانِهِ تَذْكِرًا وَجَعَلْنَا الْوَيْدَ

জাহান্নামে যখন কাফেররা ফরিযাদ করবে যে, হে আমাদের পালনকর্তা; আমাদেরকে এ আযাব থেকে মুক্ত করুন, আমরা সংকর্মে কবর এবং অতীত কুর্কম ছেড়ে দেব, তখন জওয়াব দেয়া হবে যে, আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যাতে চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করে বিশুদ্ধ পথে আসতে পারে? হযরত আলী ইবনে হুসাইন ইবনে জয়নুল আবেদীন (রাঃ) বলেন, এর অর্থ সতের বছর বয়স। হযরত কাতাদাহ আঠার বছর বয়স বলেছেন। আসল অর্থ সাবালক হওয়ার বয়স। এতে সতর বা আঠারোর পার্থক্য হতে পারে। কেউ সতের বছরে এবং কেউ আঠারো বছরে সাবালক হতে পারে। শরীয়তে এ বয়সটি প্রথম সীমা, যাতে প্রবেশ করার পর মানুষকে নিজের ভাল-মন্দ বোঝার জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়। তাই সাধারণ কাফেরদেরকে উপরোক্ত কথাটি বলা হবে, তারা বয়োবৃদ্ধ হোক অথবা অল্পবয়স্ক। তবে যে ব্যক্তি সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার পরও সতর্ক হয়নি এবং প্রকৃতির প্রমাণাদি দেখে ও পয়গম্বরগণের কথাবার্তা শুনে সত্যের পরিচয় গ্রহণ করেনি সে অধিক ঝিকারযোগ্য হবে।

সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি কেবল সাবালক হওয়ার বয়স পায়, তাকেও আল্লাহ তাআলা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বোঝার ক্ষমতা দান করেন। সে তা না বুঝলে তিরস্কার ও আযাবের যোগ্য হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দীর্ঘ বয়স পায়, তার সামনে আল্লাহর প্রমাণাদি আরও পূর্ণ হয়ে যায়। সে কুফর ও গোনাহ থেকে বিরত না হলে অধিকতর শাস্তি ও তিরস্কারের যোগ্য হবে।

হযরত আলী মুর্তা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা যে বয়সে গোনাহগার বান্দাদেরকে লজ্জা দেন, তা হচ্ছে ষাট বছর। হযরত ইবনে আব্বাসও এক রেওয়ায়েতে চল্লিশ ও অন্য রেওয়ায়েতে ষাট বছর বলেছেন। এ বয়সে মানুষের উপর আল্লাহর প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যায় এবং মানুষের জন্যে কোন ওয়র আপত্তি পেশ করার অবকাশ থাকে না। ইবনে-কাসীর হযরত ইবনে আব্বাসের দ্বিতীয় রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সতের আঠারো বছর সংক্রান্ত রেওয়ায়েতও ষাট বছরের রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সতের আঠার বছর বয়সে মানুষ চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারে। এ কারণেই এ বয়স থেকে সে শরীয়তের বিধানাবলী পালনে আদিত হয়। কিন্তু ষাট বছর এমন সুদীর্ঘ বয়স যে, এতেও কেউ সত্যের পরিচয় লাভ না করলে তার ওয়র আপত্তি করার কোন অবকাশ থাকে না। এ কারণেই উম্মতে মুহাম্মদীর বয়সের গড় ষাট থেকে সত্তর বছর পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে وَجَعَلْنَا الْوَيْدَ এতে ইশারা করা হয়েছে যে, মানুষকে সাবালকত্বের বয়স থেকে কমপক্ষে তার স্রষ্টা ও মালিককে চিনা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি প্রদান করা হয়। এ কাজের জন্যে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি যথেষ্ট ছিল; কিন্তু আল্লাহ তাআলা শুধু তা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং তার বুদ্ধিকে সাহায্য করার জন্যে ভীতি-প্রদর্শনকারীও প্রেরণ করেছেন। “নযীর” শব্দের অর্থ ভীতি প্রদর্শনকারী। প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই নযীর তথা ভীতি প্রদর্শনকারী যে স্বীয় কৃপাশুণে নিজের লোকদেরকে ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়। কোরআন পাকে এ শব্দের দ্বারা পয়গম্বরগণ ও তাঁদের নায়েব আলেমগণকে বোঝানো হয়। আয়াতের সারমর্ম এই যে, সত্য মিথ্যার পরিচয় লাভ করার জন্যে আমি জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছি, পয়গম্বরও প্রেরণ করেছি।

إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ مُرِيدَاتِ
 الصُّدُورِ ۖ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ حَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مَن كَثُرَ
 قَوْلُهُ كُفْرًا وَلَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا
 مَقْتًا وَلَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ
 شُرَكَاءَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي أَذًا حَقُّوا
 مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ أُنْزِلَتْهُمْ كُتُبًا
 فَهُمْ عَلَى بَيِّنَاتٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يُبَدِّلُونِ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا الْأَعْرَافُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ لَكُمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 أَنْ تَزُولَا وَلَكِنَ وَالَّتَا إِن أَسْكَنْهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ
 بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۚ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ
 أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ أَحَدٍ
 الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ أَذْهَبَ الْأُمُورَ ۚ لَئِنْ سَأَلْتُمُوهُ
 فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَجِيبُ الْمَكْرَ السَّيِّئِ إِلَّا
 بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ الْأُولَىٰ ۚ فَكُنْ يَحْدِ
 لُسُنُكَ اللَّهُ يَبْدِئُهَا وَلَنْ يُخْلِقَ اللَّهُ تَحْوِيلًا ۝

(৩৮) আল্লাহ আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি
 অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত। (৩৯) তিনিই তোমাদেরকে
 পৃথিবীতে স্বীয় প্রতিনিধি করেছেন। অতএব যে কুফরী করবে তার কুফরী
 তার উপরই বর্তাবে। কাকেরদের কুফর কেবল তাদের পালনকর্তার
 ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাকেরদের কুফর কেবল তাদের কৃতিই বৃদ্ধি
 করে। (৪০) বলুন, তোমরা কি তোমাদের সে শরীকদের কথা ভেবে
 দেখেছ, যাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা ডাক? তারা পৃথিবীতে কিছু
 সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে দেখাও। না আসমান সৃষ্টিতে তাদের কোন
 অংশ আছে, না আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা তার
 দলীলের উপর কায়ম রয়েছে, বরং জালেমরা একে অপরকে কেবল
 প্রতারণামূলক ওয়াদা দিয়ে থাকে। (৪১) নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও
 যমীনে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে
 তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমশালী।
 (৪২) তারা জোর শপথ করে বলত, তাদের কাছে কোন সতর্ককারী
 আগমন করলে তারা অন্য যে কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর সংপথে
 চলেবে। অতঃপর যখন তাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করল, তখন
 তাদের ঘৃণাই কেবল বেড়ে গেল। (৪৩) পৃথিবীতে ঔদ্ধত্যের কারণে এবং
 কূচক্রের কারণে। কূচক্র কূচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। তারা কেবল
 পূর্ববর্তীদের দশারই অপেক্ষা করছে। অতএব আপনি আল্লাহর বিধান
 পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোন রকম বিচ্যুতিও
 পাবেননা।

এরা খলিফা শব্দটি - هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ حَلِيفَ فِي الْأَرْضِ
 বহুবচন। অর্থ স্থলাভিষিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষকে একের পর
 এক ভূমি, বাসগৃহ ইত্যাদির মালিক করেছে। একজন চলে গেলে অন্যজন
 তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এতে আল্লাহ তাআলার দিকে রুখ করার জন্য
 শিকা রয়েছে। আয়াতে উষ্মতে মুহাম্মদীকেও বলা হতে পারে যে, আমি
 নিগত জাতিসমূহের পরে তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে তোমাদেরকে মালিক ও
 ক্ষমতাপালী করেছি। সূত্রাং পূর্ববর্তীদের অবস্থা থেকে তোমাদের শিকা
 গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। জীবনের সুবর্ণ সুযোগকে হেলায় হারিও না।

إِنَّ اللَّهَ يُبْسِكُ السَّمَوَاتِ — আকাশসমূহকে স্থির রাখার অর্থ এরূপ
 নয় যে, তাদের গতিশীলতা রহিত করে দেয়া হয়েছে; বরং এর অর্থ স্বস্থান
 থেকে বিচ্যুত হওয়া ও টলে যাওয়া। — لَنْ تَزُولَا — শব্দটি এর পক্ষে সাক্ষ্য
 দেয়। সূত্রাং এ আয়াতে আকাশ স্থিতিশীল অথবা গতিশীল — এ বিষয়ের
 কোন প্রমাণ নেই।

لَا يَحِيطُ بِأَرْثٍ وَلَا يَحِيطُ — وَلَا يَحِيطُ الْمَكْرَ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ
 — অর্থাৎ, কূচক্রের শাস্তি অন্য কারও উপর পতিত হয় না —
 কূচক্রীর উপরই পতিত হয়। যে ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট কামনা করে, সে
 নিজেই অনিষ্টের শিকার হয়ে যায়।

এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, দুনিয়াতে অনেক সময় কূচক্রীদের
 চক্রান্ত সফল হতে দেখা যায় এবং যার কৃতি করার উদ্দেশ্য থাকে, তার
 কৃতি হয়ে যায়। এর জওয়াবে দেখা হয়েছে যে, এটা তুচ্ছ কৃতি। আর
 কূচক্রীর কৃতি হচ্ছে পারলৌকিক আয়ব, যা যেমন গুরুতর, তেমনি
 চিরস্থায়ী। এর বিপরীতে পার্থিব কৃতি তুচ্ছ ব্যাপার।

কেউ কেউ এর জওয়াবে বলেন, কোন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে
 চক্রান্ত করা ও তার উপর যুলুম করার প্রতিফল জালেমের উপর প্রায়ই
 দুনিয়াতেও পতিত হয়। মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কোরাযী বলেন : তিনিটি
 কাজ যারা করে, তারা দুনিয়াতেও প্রতিফল ও শাস্তির কবল থেকে রেহাই
 পাবে না। (এক) কোন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে কষ্ট
 দেয়া, (দুই) যুলুম করা এবং (তিন) অস্বীকার ভঙ্গ করা।—
 (ইবনে-কাসীর)

বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অসহায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি রাখে না
 অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও সবর করে, তার উপর
 জুলুমের শাস্তি থেকে দুনিয়াতেও কাউকে বাঁচতে দেখা যায়নি।

সূত্রাং আয়াতে সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়নি ; বরং অধিকাংশ
 ঘটনার দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنُوا أَشْدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۖ وَلَوْ يُوَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا
كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ
يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِمُ بصيرًا
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَسْ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ عَلَىٰ صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ۚ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۚ لِشَدِيدِ رِقَابٍ ۚ مَا أَتَىٰ
أَبَاؤَهُمْ فُتُورٌ غَفُورٌ ۚ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا فِيْهِ آيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۚ إِلَى
الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۚ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۚ

(৪৪) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। অথচ তারা তাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল। আকাশ ও পৃথিবীতে কোন কিছুই আল্লাহকে অপারগ করতে পারে না। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। (৪৫) যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন সে নির্দিষ্ট মেয়াদ এসে যাবে তখন আল্লাহর সব বান্দা তাঁর দৃষ্টিতে থাকবে।

সূরা ইয়াসীন

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৮০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) ইয়া-সীন, (২) প্রজন্মায় কোরআনের কসম (৩) নিশ্চয় আপনি প্রেরিত রসুলগণের একজন, (৪) সরল পথে প্রতিষ্ঠিত। (৫) কোরআন পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ, (৬) যাতে আপনি এমন এক জাতিতে সতর্ক করেন, যাদের পূর্ব পুরুষগণকেও সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফেল। (৭) তাদের অধিকাংশের জন্যে শাস্তির বিষয় অবধারিত হয়েছে। সুতরাং তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (৮) আমি তাদের গর্দানে চিরকু পর্যন্ত বেড়ী পরিয়েছি। ফলে তাদের মস্তক উদ্ধৃমুখী হয়ে গেছে। (৯) আমি তাদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর তাদেরকে আবৃত করে দিয়েছি, ফলে তারা দেখে না।

সূরা ইয়াসীনের ফযিলতঃ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের (রাঃ) রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, يس قلب القرآن অর্থাৎ, সূরা ইয়াসীন কোরআনের হৃদপিণ্ড। এ হাদীসে আরও আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন আল্লাহ ও পরকালের কল্যাণ লাভের নিয়তে পাঠ করে, তার মাগফেরাত হয়ে যায়। তোমরা তোমাদের মৃতদের উপর এ সূরা পাঠ কর। — (রুহুল-মা'আনী, মাযহারী)

ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, সূরা ইয়াসীনকে কোরআনের হৃদপিণ্ড বলার কারণ এমনও হতে পারে যে, এ সূরায় কেয়ামত ও হাশর-নশরের বিষয় বিশদ ব্যাখ্যা ও অলংকার সহকারে বর্ণিত হয়েছে। পরকালে বিশ্বাস ঈমানের এমন একটি মূলনীতি, যার উপর মানুষের সকল আমল ও আচরণের বিশুদ্ধতা নির্ভরশীল। পরকালতীতিই মানুষকে সংকর্মে উদ্ধুদ্ধ করে এবং অবৈধ বাসনা ও হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে। অতএব দেহের সুস্থতা যেমন অন্তরের সুস্থতার উপর নির্ভরশীল তেমনি ঈমানের সুস্থতা পরকাল চিন্তার উপর নির্ভরশীল। (রুহুল-মা'আনী) এ সূরার নাম যেমন সূরা-ইয়াসীন প্রসিদ্ধ, তেমন এক হাদীসে এর নাম “আযীমা”ও বর্ণিত আছে। অপর এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, তওরাতে এ সূরার নাম “মুয়িম্বাহ” বলে উল্লেখিত আছে। অর্থাৎ, এ সূরা তার পাঠকের জন্যে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ ও বরকত ব্যাপক করে দেয়। এ সূরার পাঠকের নাম “শরীফ” বর্ণিত আছে। আরও বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন এর সুপারিশ “রবীয়া” গোত্র অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের জন্যে কবুল হবে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম “মুদাফিয়াও” বর্ণিত আছে, অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকদের থেকে বলা-মুসিবত দূর করে। কতক রেওয়ায়েতে এর নাম “কাযিয়া” - ও উল্লেখিত হয়েছে, অর্থাৎ, এ সূরা পাঠকের প্রয়োজন মিটায়। — (রুহুল-মা'আনী)

হযরত আবু যুর (রাঃ) বর্ণনা করেন, মরনোমুখ ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হলে তার মৃত্যু সহজ হয়। — (মাযহারী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবারের (রাঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন তার অভাব-অনটনের বেলায় পাঠ করে, তবে তার অভাব পূরণ হয়ে যায়। — (মাযহারী)

ইয়াহুইয়া ইবনে কাসীর বলেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে স্বস্থিতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে, সে সকাল পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে। তিনি আরও বলেন, আমাকে এ বিষয়টি এমন এক ব্যক্তি বলেছেন, যিনি এর বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। — (মাযহারী)

يس শব্দ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, এটা খণ্ড বাক্য। এর অর্থ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ কথাই বলা হয়েছে। আহ্কামুল-কোরআনে বর্ণিত ইমাম মালেকের উক্তি এই যে, এটা আল্লাহ তাআলার অন্যতম নাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এক রেওয়ায়েতে তাই বর্ণিত রয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, এটা আবিসিনিয় শব্দ। এর অর্থ “হে মানুষ” আর এখানে মানুষ বলে নবী করীম (সাঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে জুবারেরের (রাঃ) বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, “ইয়াসীন” রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম। রুহুল-মা'আনীতে আছে, ইয়া ও সীন — এ দু'টি অক্ষর দ্বারা নবী করীম (সাঃ)-এর নাম রাখার মধ্যে বিরাট রহস্য নিহিত।

ইয়াসীন কারও নাম রাখা কিরূপ ? ইয়াম মালেক এটা পছন্দ করেননি। কারণ, তাঁর মতে এটা আল্লাহ্ তাআলার অন্যতম নাম এবং এর সঠিক অর্থ জানা নেই। কাজেই এর অর্থ خالق و رازق এর ন্যায় আল্লাহ্ তাআলার বৈশিষ্ট্যমূলক কোন নাম হওয়াও সম্ভব। তবে শব্দটি ياسين বর্ণমালার মাধ্যমে লেখা হলে তা কারও নাম রাখা জায়েয। কারণ, কোরআনে سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ উল্লেখিত আছে। (ইবনে আরাবী)

إِنَّمَا زُكِّيَتْ زَكَاةً وَأَسْكَنَ - অর্থাৎ, আরবদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবত কোন সতর্ককারী পয়গম্বর আগমন করেননি। পিতৃপুরুষ অর্থ নিকটবর্তী পিতৃপুরুষ। আরবদের উর্ধ্বতন পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর সাথে হযরত ইসমাইল (আঃ)—এর পর বহু শতাব্দী ধরে আরবদের মধ্যে কোন পয়গম্বর আবির্ভূত হননি। তবে দুইনের প্রচারকার্য সব সময়ই অব্যাহত ছিল, যার উল্লেখ কোরআন পাকের আয়াতেও আছে। এছাড়া وَلَئِنْ مِنْ أَشْءٍ إِلَّا غَلَفْنَا عَنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ আয়াত দৃষ্টেও জানা যায় যে, আল্লাহ্ রহমত কোন জাতিকে কোন সময়ই দাওয়াত ও সতর্কীকরণ থেকে বঞ্চিত রাখেনি। এতদসত্ত্বেও প্রতিনিষিদের মাধ্যমে দাওয়াত ততটুকু কার্যকর হয় না, যতটুকু স্বয়ং পয়গম্বরের দাওয়াত ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। তাই আয়াতে আরবদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন সতর্ককারী আগমন করেনি। এরই ফলস্বরূপ তাদের মধ্যে সাধারণভাবে শিক্ষা-দীক্ষার কোন সুদৃঢ় ব্যবস্থা ছিল না। আর এ কারণেই তাদের উপাধি ছিল ‘উম্মী’ অর্থাৎ নিরক্ষর।

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِذْ يُكْوِّمُونَ تَابِعَاتِهِمْ عِندَ الْمُشْرِكِينَ

أَعْمَأَقَتَهُمُ آفَالُ الْكَافِرِينَ

আল্লাহ্ তাআলা কুফর ও ঈমান এবং জাহান্নাম ও জাহান্নামের উভয় রাস্তা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। ঈমানের দাওয়াতের জন্যে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ করেছেন। মানুষকে ভাল মন্দ বিবেচনা করে যে কোন রাস্তা অবলম্বন করার ক্ষমতাও দান করেছেন। কিন্তু যে হতভাগা কুদরতের

নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে না, পয়গম্বরগণের দাওয়াতের প্রতি কর্পপাত করে না এবং আল্লাহ্ কিতাব সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করে না, সে স্বেচ্ছায় যে পথ অবলম্বন করে নেয়, আল্লাহ্ তাআলা তার জন্যে সে পথেরই উপকরণ সংগ্রহ করে দেন। যে কুফর অবলম্বন করে, তার জন্যে কুফরে উন্নতি লাভেরই ব্যবস্থা হতে থাকে। এ বিষয়টিই لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَآلِهِمْ هُمْ أَكْثَرُ ضَلَالٍ قَالَ إِنَّمَا أَتَى النَّاسَ الْكُفْرُ فَنَاسُوا اللَّهَ فَنَسِوا عَنْ آلِهِمْ هُمْ أَكْثَرُ ضَلَالٍ قَالَ إِنَّمَا أَتَى النَّاسَ الْكُفْرُ فَنَاسُوا اللَّهَ فَنَسِوا عَنْ آلِهِمْ هُمْ أَكْثَرُ ضَلَالٍ

অতঃপর তাদের অবস্থার একটি উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তাদের অবস্থা এমন যার গলদেশে বেড়ী পরিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে মুখমণ্ডল ও চক্ষুদুই উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে — নীচের দিকে তাকাতেই পারে না। অতএব তারা নিজেদেরকে কোন গর্তে পতিত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে না।

দ্বিতীয় উদাহরণ এমন— যেন কারও চারিদিকে দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা এই চার দেয়ালের অভ্যন্তরে আবদ্ধ হয়ে বাইরের বিষয়াদি সম্পর্কে বৈখর হয়ে গেছে। ফলে এভাবে বাইরের সে কাকেরদের চারদিকেও যেন তাদের বিদ্রোহ ও হঠকারিতা অবরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে। সেই সত্য বিষয়াদি যেন তাদের কানে পৌঁছতেই পারে না।

ইয়াম রাযী বলেন, দৃষ্টির বাধা দু’রকম হয়ে থাকে। একটি বাধা এমন যার কারণে সঞ্চিত ব্যক্তি আপন সন্তোষ দেখতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয় বাধা এমন যার ফলে নিজের আশেপাশে কিছুই দেখে না। কাকেরদের জন্যে সত্য দর্শনের পথে উভয় প্রকার বাধাই বিদ্যমান ছিল। তাই প্রথম উদাহরণে প্রথমোক্ত বাধা বর্ণিত হয়েছে। যার গলা নীচের দিকে নোয়াতে পারে না, যে নিজের অস্তিত্বও দেখতে পারে না। দ্বিতীয় উদাহরণ শেষোক্ত বাধা বিবৃত হয়েছে। এতে সঞ্চিত ব্যক্তি আশেপাশের কোন কিছুই দেখতে পায় না।— (গ্রাহল-মা’আনী)

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ①
 إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبُ ②
 فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ③ وَإِذَا حُنَّ النَّفْسُ ④
 وَكُنْتُ مَاقَدُ مَوَاوَاثِهِمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي ⑤
 إِمَامٍ مُبِينٍ ⑥ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ⑦ إِذْ ⑧
 جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ⑨ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا ⑩
 فَكَثَّرْنَا بِاتْنِ الْفُلْكَ ⑪ إِنَّا الْيَوْمَ مُرْسَلُونَ ⑫ قَالُوا ⑬
 مَا أُنْذِرُكُمْ إِلَّا بُشْرًا وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا السَّمَاءَ ⑭ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا السَّمَاءَ ⑮
 إِن أَنْتُمْ إِلَّا كَذِبُونَ ⑯ قَالُوا رَبَّنَا يُعَلِّمُ الْكِتَابَ الْغَيْبُ ⑰
 لَمْ يُسَلِّمْهُمْ ⑱ وَمَا عَلَّمْنَا إِلَّا الْبَلْغَةَ الْبَيْنِينَ ⑲ قَالُوا ⑳
 إِنَّا نَطِّقُونَ بِكُلِّ شَيْءٍ لَمْ تَنْهَهُوا إِلَّا زَجَبًا ㉑ وَلَيْسَ كُتُوبُهُمْ ㉒
 مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ㉓ قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ ㉔ إِن ㉕
 ذُرِّيَّتُكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ㉖ وَجَاءَ مِنْ أَصْحَابِ ㉗
 الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَمْعَى قَالِ يَقُومُ أَتِيعُوا الْمُرْسَلِينَ ㉘
 أَتِيعُوا مَنْ لَا يُبْعَثُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ㉙

(১০) আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তাদের পক্ষ দৃষ্টিই সমান; তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (১১) আপনি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পারেন, যারা উপদেশ অনুসরণ করে এবং দয়াময় আল্লাহকে না দেখে ভয় করে। অতএব আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিন ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের। (১২) আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি। (১৩) আপনি তাদের কাছে সে জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যখন সেখানে রসূলগণ আগমন করেছিলেন। (১৪) আমি তাদের নিকট দু জন রসূল প্রেরণ করেছিলাম, অতঃপর ওরা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে। তারা সবাই বলল, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১৫) তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, রহমান আল্লাহ কিছুই নাথিল করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে যাচ্ছ। (১৬) রসূলগণ বলল, আমাদের পরওয়ারদেগার জ্ঞান, আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (১৭) পরিস্কারভাবে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব। (১৮) তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে অন্তত-অকল্যাণকর দেখছি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণ হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে। (১৯) রসূলগণ বলল, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই। এটা কি এজন্যে যে, আমরা তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি? বস্তুতঃ তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় বৈ নও। (২০) অতঃপর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর। (২১) অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোন বিনিময় কামনা করে না, অথচ তারা সুপথ প্রাপ্ত।

وَكُنْتُ مَاقَدُ مَوَاوَاثِهِمْ - অর্থাৎ, আমি তাদের সেসব কর্ম

লিপিবদ্ধ করব, যা তারা পূর্বাঙ্কে প্রেরণ করে। কর্ম সম্পাদনকে ‘পূর্বাঙ্কে প্রেরণ করা’ বলে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যেসব ভাল-মন্দ কর্ম দুনিয়াতে কর, সেগুলো এখানেই খতম হয়ে যায় না; বরং এগুলো তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের সম্বল হয়ে তোমাদের মৃত্যুর পূর্বেই পৌঁছে যায়, যার সাথে পর-জীবনে সাক্ষাৎ ঘটে। তা সংকর্ম হলে জান্নাতের কুসুমাস্তীর্ণ উদ্যানে পরিণত হবে এবং অসংকর্ম হলে জাহান্নামের অঙ্গারের আকার ধারণ করবে। লিপিবদ্ধ করার আসল উদ্দেশ্য সংরক্ষিত করা। লিপিবদ্ধ করাও এর এক উপায়, যাতে ভুল-ভ্রান্তি ও কম-বেশী হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

কর্মের মত তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লেখা হয় : وَاتَّارَهُمْ অর্থ তাদের সম্পাদিত কর্মসমূহের ন্যায়, কর্মসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লিপিবদ্ধ করা হয়। اثار এর অর্থ কর্মের ক্রিয়া তথা ফলাফল, যা পরবর্তীকালে প্রকাশ পায় ও টিকে থাকে উদাহরণতঃ কেউ মানুষকে দ্বীনী শিক্ষা দিল, বিধি-বিধান বর্ণনা করল অথবা কোন পুস্তক রচনা করল, যদ্বারা মানুষের দ্বীনী ফায়দা হয় অথবা ওয়াকফ ইত্যাদি ধরনের কোন জনহিতকর কাজ করল— তার এই সংকর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যতদূর পৌঁছেবে এবং যতদিন পর্যন্ত পৌঁছতে থাকবে, সবই তার আমলনামায় লিখিত হতে থাকবে। অনুরূপভাবে কোন রকম মন্দকর্ম যার মন্দ ফলাফল ও ক্রিয়া পৃথিবীতে থেকে যায়— কেউ যদি নিপীড়নমূলক আইন-কানুন প্রবর্তন করে কিংবা এমন কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যা মানুষের আমল-আখলাকে ধ্বংস করে দেয় কিংবা মানুষকে কোন মন্দ পথে পরিচালিত করে, তবে তার এ মন্দকর্মের ফলাফল ও প্রভাব যে পর্যন্ত থাকবে এবং যতদিন পর্যন্ত তা দুনিয়াতে কায়েম থাকবে, ততদিন তার আমলনামায় সব লিখিত হতে থাকবে। যেমন, এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

যে ব্যক্তি কোন উত্তম প্রথা প্রবর্তন করে, তার জন্যে রয়েছে এর সওয়াব এবং যত মানুষ এই প্রথার উপর আমল করবে, তাদের সওয়াব—অথচ পালনকারীদের সওয়াব মোটেও হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন কুপ্রথা প্রবর্তন করে, সে তার গোনাহ ভোগ করবে এবং যত মানুষ এই কুপ্রথা পালন করতে থাকবে, তাদের গোনাহও তার আমলনামায় লিখিত হবে— অথচ পালনকারীদের গোনাহ হ্রাস করা হবে না।—(ইবনে-কাসীর)

اثر শব্দের অর্থ পদাংকও হয়ে থাকে। হাদীসে আছে; কেউ নামাযের জন্যে মসজিদে গমন করলে তার প্রতি পদক্ষেপে সওয়াব লেখা হয়। কোন কোন রেওয়াজে থেকে জানা যায় যে, আয়াতে اثر বলে এই পদাংকই বোঝানো হয়েছে। নামাযের সওয়াব যেমন লেখা হয়, তেমনি নামাযে যাওয়ার সময় যত পদক্ষেপ হতে থাকে তাও প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পুণ্য লিখিত হয়। মদীনা তাইয়েয্যে যাদের বাসগৃহ মসজিদে নববী থেকে দূরে অবস্থিত ছিল, তাঁরা মসজিদের কাছাকাছি বাসগৃহ নির্মাণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদেরকে তা থেকে বারণ করে বললেন, তোমরা যেখানে আছ, সেখানেই থাক। দূর থেকে হেঁটে মসজিদে এলে সময় বিনষ্ট হয় না। পদক্ষেপ যত বেশী হবে, তোমাদের সওয়াব তত বেশী হবে। ইবনে-কাসীর এ সম্পর্কিত

রেওয়ালেতসমূহ একত্রিত করে দিয়েছেন।

এতে এমন প্রশ্ন দেখা যায় যে, সূরাটি মকায় অবতীর্ণ। আর হাদীসসমূহে উল্লেখিত ঘটনা মদীনা তাইয়েবার, এটা কিরূপে সম্ভবপর? জওয়াব এই যে, আয়াতের অর্থ এই মর্মে ব্যাপক যে, প্রত্যেক কর্মের ফলাফলও লেখা হয়। এ আয়াতটি মকাত্তেই অবতীর্ণ হয়ে থাকবে। কিন্তু পরবর্তীকালে মদীনায় উপরোক্ত ঘটনা সংঘটিত হলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রমাণ হিসাবে আয়াতটি উল্লেখ করেন এবং পদাঙ্কেও কর্মের ফলাফল হিসাবে গণ্য করেন, যেগুলো লিখিত হওয়ার কথা আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে বর্ণিত উভয় তফসীরের বাহ্যিক বৈপরীত্যও দূর হয়ে যায়। — (ইবনে-কাসীর)

وَاعْرِضْ لَهُمْ مَثَلًا صَاحِبَ الْمَرْيَةِ - কোন বিষয় প্রমাণ করার জন্যে অনুরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করাকে ... বলা হয়। পূর্বোল্লিখিত কাফেরদেরকে হুশিয়ার করার উদ্দেশ্যে কোরআন পাক দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীনকালের একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন যা এক জনপদে সংঘটিত হয়েছিল।

কাহিনীতে উল্লেখিত জনপদ কোন্টি? কোরআন পাক এই জনপদের নাম উল্লেখ করেনি। ঐতিহাসিক বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে আব্বাস, কা'বে আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাযেব্ প্রমুখের উদ্ধৃতিক্রমে জনপদের নাম ইন্তাকিয়া উল্লেখ করেছেন। আবু হাইয়ান ও ইবনে-কাসীর বলেন, তফসীরবিদগণ থেকে এর বিপরীতে কোন উক্তি বর্ণিত নেই। মু'জামুল-বুলদানের বর্ণনা অনুযায়ী ইন্তাকিয়া শামদেশের একটি প্রাচীন নগরী। যা তার সমৃদ্ধি ও স্থাপত্যের জন্যে প্রসিদ্ধ ছিল। এ নগরীর দুর্গ ও নগর-প্রাচীন দর্শনীয় বস্তু ছিল। এতে খ্রীষ্টানদের বড় বড় স্বর্ণ-রৌপ্যের কারুকার্য খচিত সুশোভিত গির্জা অবস্থিত রয়েছে। এটি একটি উপকূলীয় নগরী। ইসলামী আমলে শামবিজয়ী হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল-জাররাহ (রাঃ) এ শহরটি জয় করেছিলেন। মুজামুল-বুলদানে আরও উল্লেখ আছে যে, এ কাহিনীতে বর্ণিত হাবীব নাজ্জারের সমাধি এ শহরেই অবস্থিত। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এর যোয়ারত করতে আসে। যার বিবরণ পরে বর্ণনা করা হবে। এই বর্ণনা থেকে আরও জানা যায় যে, আয়াতে উল্লেখিত জনপদ হচ্ছে— এই ইন্তাকিয়া নগরী। তবে এখানে কোন নগরী নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং তার প্রয়োজনও নেই।

إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَهُكُمُ مُّرْسَلُونَ বর্ণিত জনপদে তিন জন রসুল প্রেরিত হয়েছিলেন। এ আয়াতে তারই বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রথমে দু'জন রসুল প্রেরিত হলে জনপদের অধিবাসীরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলে

আখ্যায়িত করতে শুরু করে এবং অমান্য করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁদের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৃতীয় একজন রসুল প্রেরণ করলেন। অতঃপর রসুলত্রয় সম্মিলিতভাবে জনপদ-বাসীদেরকে বললেন, إِنَّا إِلَهُكُمُ مُّرْسَلُونَ (আমরা অবশ্যই তোমাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হয়েছি)।

এখানে রসুলের অর্থ কি এবং এ রসুল কারা ছিলেন? রসুল ও মুরসাল শব্দ দু'টি কোরআন পাকে সাধারণতঃ নবী ও পয়গম্বর অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ প্রেরণ করাকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এটাও এ বিষয়ের ইঙ্গিত যে, এখানে রসুলের অর্থ নবী ও পয়গম্বর। ইবনে-ইসহাক, হযরত ইবনে-আব্বাস, কা'বে আহবার ও ওয়াহাব ইবনে মুনাযিহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই জনপদে প্রেরিত তিন জনই আল্লাহ তাআলার পয়গম্বর ছিলেন। তাঁদের নাম সাদেক, সদুক ও শালুম বলে বর্ণিত রয়েছে। এক রেওয়ালেতে তৃতীয় জনের নাম শামউনও উল্লেখ করা হয়েছে। — (ইবনে-কাসীর)

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ - শব্দের অর্থ অশুভ ও অলক্ষণে মনে করা। উদ্দেশ্য এই যে, শহরবাসীরা প্রেরিত লোকদের কথা আমান্য করল এবং বলতে লাগল, তোমরা অলক্ষণে। কোন কোন রেওয়ালেতে বর্ণিত আছে যে, তাদের অবাধ্যতা এবং রসুলগণের কথা অমান্য করার কারণে জনপদে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায়। ফলে তারা তাঁদেরকে অলক্ষণে বলল। অথবা অন্য কোন কষ্ট-দুর্ভোগ হয়ে থাকবে। কাফেরদের সাধারণ অভ্যাস এই যে, কোন বিপদাপদ দেখলে তার কারণ হেদায়েতকারী ব্যক্তিবর্গকে সাব্যস্ত করে।

قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ - অর্থাৎ, তোমাদের অমঙ্গল তোমাদের সাথেই। অর্থাৎ, এ অমঙ্গল তোমাদেরই কুক্রমের ফল। طَائِفُ শব্দটি প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গল অর্থে বলা হয়। কিন্তু কখনও অমঙ্গলের প্রতিদান অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। — (ইবনে-কাসীর, কুতুবী)

وَجَاءَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَوْحِيَةٌ - প্রথম আয়াতে ঘটনাস্থলকে قَرْيَةٍ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার অর্থ সাধারণ জনপদ; তা— ছোট বস্তিই হোক অথবা বড় কোন শহর। আর এ আয়াতে সে জায়গাটিকে مَدِينَةٌ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে, যা কেবল বড় শহর অর্থেই ব্যবহৃত হয়। এতে জানা গেল যে, ঘটনাস্থলটি কোন বড় শহরই ছিল। সুতরাং এতে সে উক্তিরই সমর্থন হয়, যাতে একে ইন্তাকিয়া বলা হয়েছে। আয়াতে বর্ণিত أَهْلُ الْمَدِينَةِ অর্থ এই যে, শহরের কোন একপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে এল। رَجُلٌ يَسْتَسْقِیْ শব্দটি سَمِعَ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ দৌড়ানো। কাজেই অর্থ দাঁড়াল যে, নগরীর দূরবর্তী কোন এক প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এল।

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَالَّذِي تُرْجَعُونَ
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠০

(২২) আমার কি হল যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে, আমি তাঁর এবাদত করব না? (২৩) আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্যান্যদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করব? করণাময় যদি আমাকে কষ্টে নিপতিত করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার কোনই কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে রক্ষাও করতে পারবে না। (২৪) এরূপ করলে আমি প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হব। (২৫) আমি নিশ্চিতভাবে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব আমার কাছ থেকে শুনে নাও। (২৬) তাকে বলা হল, জন্মতে প্রবেশ কর। সে বলল হায়, আমার সম্প্রদায় যদি কোন ক্রমে জানতে পারত— (২৭) যে আমার পরওয়ারদগোঁর আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (২৮) তারপর আমি তার সম্প্রদায়ের উপর আকাশ থেকে কোন বাহিনী অবতীর্ণ করিনি এবং আমি (বাহিনী) অবতরণকারীও না। (২৯) বস্তুতঃ এ ছিল এক মর্যাদা। অতঃপর সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। (৩০) বান্দাদের জন্যে আক্ষেপ যে, তাদের কাছে এমন কোন রসূলই আগমন করেনি যাদের প্রতি তারা বিদ্রূপ করে না। (৩১) তারা কি প্রত্যক্ষ করে না, তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যে, তারা তাদের মধ্যে আর ফিরে আসবে না। (৩২) ওদের সবাইকে সমবেত অবস্থায় আমার দরবারে উপস্থিত হতেই হবে। (৩৩) তাদের জন্যে একটি নিদর্শন যত পথিবী। আমি একে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, তারা তা থেকে ভক্ষণ করে। (৩৪) আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং প্রবাহিত করি তাতে নিকরিনী। (৩৫) যাতে তারা তার ফল খায়। তাদের হাত একে সৃষ্টি করে না। অতঃপর তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না কেন? (৩৬) পবিত্র তিনি, যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, তাদেরই মানুষকে এবং যা তারা জানে না, তার প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। (৩৭) তাদের জন্যে এক নিদর্শন রাতি, আমি তা থেকে দিনকে অপসারিত করি, তখনই তারা অন্ধকারে থেকে যায়।

শহরের প্রান্ত থেকে আগন্তুক ব্যক্তির ঘটনা : কোরআন পাক তাঁর নাম ও অবস্থা উল্লেখ করেনি। ইবনে ইসহাক হযরত ইবনে-আব্বাস, কা'ব আহবার ও গুয়াহাব ইবনে মুনাবেহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর নাম ছিল হাবীব। তাঁর পেশা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, তিনি 'নাঙ্কার' অর্থাৎ, ছুতার ছিলেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনিও প্রথমে মূর্তি পূজারী ছিলেন। পূর্বে প্রেরিত রসূলদ্বয়ের সাথে সাক্ষাতের পর তাঁদের শিক্ষায় অথবা তাঁদের মো'জ্জেয়া দেখে তিনি মুসলমান হয়ে যান এবং কোন এক গুহায় এবাদতে মশগুল হন। তিনি যখন সংবাদ পেলেন যে, শহরবাসীরা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলে তাঁদেরকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তিনি আপন সম্প্রদায়ের স্তোভে ও রসূলগণের প্রতি সহানুভূতির মনোভাবে নিয়ে দ্রুত সম্প্রদায়ের মধ্যে উপস্থিত হলেন এবং তাদেরকে রসূলগণের অনুসরণ করার উপদেশ দিলেন। অবশেষে তিনি নিজের ঈমান ঘোষণা করে বললেন, **إِنِّي أَسْنُبُ بِكُمْ فَاسْمُوعُونَ** - অর্থাৎ, আমি তোমাদের পালনকর্তার প্রতি

বিশ্বাস স্থাপন করলাম—তোমরা শুনে রাখ। এ ঘোষণাটি সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যেও হতে পারে এবং এতে 'তোমাদের পালনকর্তা' বলে বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও তারা তা স্বীকার করত না। ঘোষণাটি রসূলগণের উদ্দেশ্যেও হতে পারে এবং **فَاسْمُوعُونَ** বলার উদ্দেশ্য এই যে, আপনারা শুনুন এবং আল্লাহর সামনে আমার ঈমানের সাক্ষ্য দিন।

— অর্থাৎ, উপদেশ **قَالَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ** দানের উদ্দেশ্যে শহরের প্রান্ত থেকে আগত ব্যক্তিকে বলা হল; জন্মতে প্রবেশ কর। বাহ্যতঃ কোন ফেরেশতার মাধ্যমে তা বলা হয়েছে। জন্মতে প্রবেশ করার অর্থ এ সুসংবাদ দেয়া যে, জন্মতে তোমার জন্যে অবধারিত হয়ে গেছে। সময় এলে অর্থাৎ, হাশর-নশরের পর তুমি তা লাভ করবে। — (কুরত্বী)

এছাড়া এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, তাকে তাঁর জন্মাতের স্থান তখন দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। এছাড়া বরযখ অর্থাৎ, কবর জগতেও জন্মতীদেরকে জন্মাতের ফল-ফুল ও আরাম-আয়েশের উপকরণ পৌছানো হয়। তাই তার বরযখে পৌছা একদিক দিয়ে জন্মাতেই প্রবেশ করার শামিল।

কোরআন পাকের উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, লোকটিকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। কেননা, কেবল জন্মতে প্রবেশ অথবা জন্মাতের বিষয়াদি দেখা মৃত্যুর পরই সম্ভবপর।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় হযরত ইবনে-আব্বাস, মুকাতিল, মুজাহিদ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, হাবীব ইবনে ইসমাইল নাঙ্কার নামক এক ব্যক্তি সেই ব্যক্তিরই অন্যতম, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর আবির্ভাবের দশ বছর পূর্বে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ডুব্বা আকবর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর আগমনের সংবাদ পাঠ করে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ওয়ারাকা ইবনে নওফেল রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তাঁর প্রতি বিশ্বাসী হয়েছিলেন।—(বোখারী)

এটা একমাত্র তাঁরই বৈশিষ্ট্য যে, জন্ম ও নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই তিন ব্যক্তি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন। অন্য কোন পয়গম্বরের বেলায়

এমন হয়নি।

ওয়াহাব ইবনে মুনায্বেহ বর্ণনা করেন, হাবীব নায্জার কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ছিলেন। তাঁর বাসগৃহ শহরের সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কাম্পনিক উপাস্যদের কাছে আরোগ্য লাভের দোয়া করতে করতে তার সত্তর বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। প্রেরিত রসূলগণ ঘটনাক্রমে সে প্রান্তবর্তী দূর দিয়ে ইস্তাকিয়া শহরে প্রবেশ করলে সর্বপ্রথম তার সাথেই তাঁদের দেখা হয়। তাঁরা তাকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করার এবং এক আল্লাহর উপাসনা করার দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন, আপনাদের দাবী যে সত্য, তার কোন প্রমাণ বা নির্দশন আছে কি? তাঁরা হাঁ বললে তিনি স্বীয় কুষ্ঠরোগের কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা এ ব্যাধি দূর করতে পারেন কি? রসূলগণ বললেন, হাঁ, আমরা আমাদের পরওয়ারদেগারের কাছে দোয়া করব। তিনি তোমাকে রোগমুক্ত করবেন। তিনি বললেন, আশ্চর্যের কথা, আমি সত্তর বছর ধরে দেব-দেবীদের কাছে দোয়া করছি; কিন্তু কোনই উপকার পাইনি। আপনাদের পরওয়ারদেগার একদিনে কিরূপে আমার অবস্থা পাল্টে দেবেন? রসূলগণ বললেন, হাঁ আমাদের রব সর্বশক্তিমান। তুমি যাদেরকে উপাস্য স্থির করেছ, তাদের কোন গুরুত্বই নেই। তারা কারও উপকার বা অপকার করতে পারে না। একথা শুনে হাবীব আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন। রসূলগণ তাঁর জন্যে দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা তাকে সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করে দিলেন। ফলে তাঁর ঈমান আরও দৃঢ়তর হয়ে গেল। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, সারাদিনে যা উপার্জন করব, তার অর্ধেক আল্লাহর পথে ব্যয় করে দেব। সুতরাং যখন রসূলগণের বিরুদ্ধে শহরবাসীদের বিক্ষোভের সংবাদ পেলেন, তখন তিনি ছুটে এলেন এবং সম্প্রদায়কে বুঝিয়ে স্বীয় ঈমান ঘোষণা করে দিলেন। ফলে গোটা সম্প্রদায় তাঁর শত্রু হয়ে গেল এবং সবাই তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, লাথি মেরে মেরে সবাই তাকে শহীদ করে দিল। কতক রেওয়াযেতে প্রস্তর বর্ষণের কথা আছে। বেদম প্রহারের সময়ও তিনি **رب اهد قومي** (হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে হেদায়েত দান করুন) বলে যাচ্ছিলেন।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَسْمَعُونَ يُسْمَعُونَ بِمَا تَقُولُ وَنَبِيُّكَ وَمَنْ الْمُرِيدُونَ

— হাবীব নায্জার বীরত্বের সাথে আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে বিশেষ সম্মান ও অনুগ্রহমূলক ব্যবহার করে জন্মতে প্রবেশের আদেশ দেন। তিনি যখন এই সম্মান, অনুগ্রহ ও জন্মতের নেয়ামতসমূহ প্রত্যক্ষ করলেন, তখন সম্প্রদায়ের কথা স্মরণ করে বাসনা প্রকাশ করলেন যে, হয় আমার সম্প্রদায় যদি আমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হত যে, রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের প্রতিদানে আল্লাহ তাআলা আমাকে কেমন অনুগ্রহ, সম্মান ও চিরস্থায়ী নেয়ামত দান করেছেন, তবে সম্ভবতঃ তারাও বিশ্বাস স্থাপন করত। আলোচ্য আয়াতে এই বাসনাই ব্যক্ত হয়েছে।

পয়গম্বরসুলভ দাওয়াত ও সৎস্কার : প্রেরিত রসূলত্রয় মুশরেক ও কাফেরদের সাথে যেভাবে কথা বলেছেন, তাদের কঠোর ও তিক্ত কথার যেভাবে জওয়াব দিয়েছেন, অনুরূপভাবে তাঁদের দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণকারী হাবীব নায্জার স্বীয় সম্প্রদায়ের সামনে যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন, সেসব বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এতে ধর্ম প্রচারক ও সৎস্কারকার্যে ব্রতী লোকদের জন্যে চমৎকার পথনির্দেশ রয়েছে।

রসূলগণের উপদেশমূলক প্রচার ও শিক্ষার জওয়াবে মুশরেকরা তিনটি

কথা বলেছে :

(১) তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, আমরা তোমাদের কথা মানব কেন?

(২) করুণাময় আল্লাহ কারও প্রতি কোন পয়গাম ও কিতাব নাযিল করেননি।

(৩) তোমরা নিজলা মিথ্যা কথা বলছ।

চিন্তা করুন, নিঃস্বার্থ উপদেশমূলক আলাপ-আলোচনার জওয়াবে এরূপ উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তার কি জওয়াব হতে পারত? কিন্তু রসূলগণ কি জওয়াব দিলেন। তাঁরা শুধু বললেন, **رَبَّنَا بَعَثْنَا لَنَا الْبَيْتَ الْمُبِينُ** অর্থাৎ, হে আমাদের পালনকর্তা, জানেন, আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। আরও বললেন, **وَمَاعَلَيْنَا لَكَ الْبَيْتَ الْمُبِينُ** অর্থাৎ, আমাদের কর্তব্য আমরা পালন করেছি এবং আল্লাহর পয়গাম সুস্পষ্টভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এখন মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। লক্ষ্য করুন, তাঁদের ভাষায় প্রতিপক্ষের উচ্চাভিলাষিক কথাবার্তার কোন প্রতিক্রিয়া আছে কি? কেমন স্নেহপূর্ণ জওয়াব দিয়েছেন।

এরপর মুশরেকরা আরও বলল, তোমরা অলক্ষ্যে, তোমাদের কারণেই আমরা বিপদাপদে পড়েছি। এর নির্দিষ্ট জওয়াব ছিল এই : অলক্ষ্যে তোমরা নিজেরাই। তোমাদের কুর্মের কুফল তোমাদের গলার হার হয়েছে। কিন্তু রসূলগণ এ বিষয়টি অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে তারাই যে অলক্ষ্যে, তা পরিষ্কার হয়নি। তাঁরা বললেন, **طَائِفَةٌ مِّنكُمْ** অর্থাৎ, তোমাদের অমঙ্গলই তোমাদের সাথে রয়েছে। অতঃপর আবার স্নেহের ভঙ্গিতে বললেন, **بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِئُونَ** অর্থাৎ, তোমরা চিন্তা কর, আমরা তোমাদের কি ক্ষতি করলাম। আমরা তো কেবল তোমাদেরকে শুভেচ্ছামূলক উপদেশই দিয়েছি। হাঁ, তাঁদের সর্বাপেক্ষা কঠোর বাক্য ছিল এই : **بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِئُونَ** অর্থাৎ, তোমরাই সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। তোমরা তিলকে তালে পরিণত কর।

এ হচ্ছে রসূলগণের সলোপ। এখন তাঁদের দাওয়াতে সাড়াদানকারী নওমুসলিমের সলোপের প্রতিও লক্ষ্য করুন। তিনি প্রথম দু'টি কথা বলে সম্প্রদায়কে রসূলগণের কথা মেনে নেয়ার আহবান জানালেন। প্রথম এই যে, চিন্তা কর, এরা দূর-দূরান্ত থেকে তোমাদেরকে উপদেশ দেয়ার জন্যে এসেছেন। সফরের কষ্ট সহ্য করেছেন, তদুপরি তোমাদের কাছে কোন রকম বিনিময়ও কামনা করেন না। এরূপ নিঃস্বার্থ লোকদের কথা চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে। দ্বিতীয় এই যে, তাঁরা যা বলেছেন, তা একান্ত, জ্ঞান-বুদ্ধি, ন্যায়-নীতি ও হেদায়েতের কথা। এরপর সম্প্রদায়কে তাদের ব্রাণ্ডি ও পঞ্চদ্রষ্টা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর এবাদত পরিত্যাগ করে স্বহস্ত-নির্মিত মূর্তিকে ত্রাণকর্তা মনে করে বসেছ। অথচ তারা তোমাদের এতটুকু উপকার করার শক্তি রাখেন না এবং আল্লাহর কাছেও তাদের কোন মর্যাদা নেই যে, সুপারিশ করে তোমাদেরকে বিপদমুক্ত করবে।

কিন্তু হাবীব নায্জার কথাগুলো তাদেরকে সরাসরি না বলে নিজের সাথে সংযুক্ত করার পন্থা অবলম্বন করলেন।

وَمَالِيَ لَأَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي — অর্থাৎ, এভাবে তিনি প্রতিপক্ষের জন্যে উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় যখন তাঁর নয়তা ও সৌজন্যবোধের প্রতি জ্রাক্ষপও করল না এবং তাঁকে হত্যা করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখনও তিনি

বদদোয়ার পরিবর্তে আল্লাহর কাছে প্রাণ সঁপে দিলেন। বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে সুমতি দান করুন।

বর্তমান যুগের প্রচারক ও সংস্কারকগণ সাধারণভাবে এই পয়গম্বরসুলভ আদর্শ পরিত্যাগ করেছেন। ফলে মানুষের মধ্যে তাদের দাওয়াত ও প্রচার ফলপ্রসূ হচ্ছে না। বক্তৃতা-বিবৃতিতে মনের ক্ষোভ মেনো এবং প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্ভাদাত্মক বাক্য বর্ণন করাকে আজকাল বাহাদুরী জ্ঞান করা হয়, যা প্রতিপক্ষকে আরও বেশী জেদ ও হঠকারিতার আবর্তে নিক্ষেপ করে।

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَى قَوْمٍ مِنْ بَعْدِهِ وَإِذَا هُمْ خَوِدُونَ

এতে মিথ্যারোপকারী ও হাবীব নায্জারকে শহীদকারী সম্প্রদায়ের উপর আসমানী আযাবের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। এর ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে আযাব দেয়ার জন্যে আমাকে আকাশ থেকে ফেরেশতাদের কোন বাহিনী পাঠাতে হয়নি এবং এরূপ বাহিনী পাঠানো আমার রীতিও নয়। কারণ, আল্লাহর একজন ফেরেশতাই বড় বড় শক্তিশালী বীর সম্প্রদায়কে মুহূর্তে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কাজেই তাঁর জন্যে ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করার কি প্রয়োজন। এরপর তাদের উপর আগত আযাবের বিষয় বর্ণনা করে বলা হয়েছে, একজন ফেরেশতার বিকট চীৎকারের ফলে তারা সবাই নিখর-নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতা জিব্রীল আমীন শহরের দরজার দুই বাহু ধরে এমন কঠোর ও বিকট আওয়াজ দিলেন, যার ফলে সবাইই প্রাণবাযু বেরিয়ে গেল। তাদের মৃত্যুকে কোরআন خَوِدُونَ শব্দে ব্যক্ত করেছে। خامد এর অর্থ আগুন নিভে যাওয়া। প্রত্যেক প্রাণীর প্রাণ সহজাত তাপের উপর নির্ভরশীল। এই তাপ খতম হওয়ার নামই মৃত্যু।

সূরা ইস্যাসীনের অধিকতর বিষয়বস্তু হচ্ছে কুদরতের নিদর্শনাবলী এবং আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ও অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করে পরকাল সপ্রমাণ করা এবং হাশর-নশরের বিশ্বাসে মানুষকে পাকাপোক্ত করা। উল্লেখিত আয়াতসমূহে কুদরতের এমন ধরনের নিদর্শনাবলী বর্ণিত হয়েছে। এগুলো একদিকে আল্লাহ তাআলার পূর্ণ শক্তির প্রকট প্রমাণ এবং অপরদিকে মানুষ ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ নেয়ামত ও অনুগ্রহ এবং সেগুলোর অভাবনীয় রহস্যের সাক্ষী।

প্রথম আয়াতে ধরিত্রীর দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে, যা সবসময় সব মানুষের সামনে রয়েছে। শুষ্ক ধরিত্রীর উপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। ফলে তাতে এক প্রকার জীবন সঞ্চারিত হয় এবং উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও ফল-মূল জন্মায়। অতঃপর এসব বৃক্ষকে বৃদ্ধি করা ও অব্যাহত রাখার জন্যে ভূ-গর্ভে ও ভূ-পৃষ্ঠে প্রস্রবণ প্রবাহিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ - অর্থাৎ, বায়ু, মেঘমালা এবং ধরিত্রীর সমস্ত শক্তিকে

কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য মানুষ যাতে সেসব বৃক্ষের ফল-মূল ভক্ষণ করতে পারে। এগুলো তো প্রত্যক্ষ বিষয়, অতঃপর মানুষকে এমন এক বিষয়ে হুশিয়ার করা হয়েছে, যার জন্যে সমগ্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কাজে মানুষের কোন হাত নেই : বলা হয়েছে وَمَا عَلَّمْنَاهُ الْبُيُوتَ অধিকাংশ তফসীরবিদ এর অনুবাদ করেছেন, তাদের হাত এসব ফল তৈরী করেনি। এ বাক্যটি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছে যে, একটু চিন্তা কর, এই শস্য-শ্যামল ধরিত্রীতে এ ছাড়া তোমার কাজ কি যে, তুমি মাটিতে বীজ বপন করেছ, তাকে সিক্ত করেছ, নরম করেছ যাতে অংকুরোদগমে অসুবিধা না হয়। কিন্তু বীজ থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন করা, বৃক্ষকে পত্র-পল্লবে সম্বিজিত করা এবং তাকে ফলে ও ফুলে সমৃদ্ধ করা— এসব কাজে তোমার কি হাত আছে? এগুলো তো একান্তভাবে সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলারই কাজ। তাই এসব বস্তু দ্বারা উপকার লাভ করায় সেই স্রষ্টা ও মালিককে বিস্মৃত না হওয়া তোমার অবশ্য কর্তব্য।

মানুষের খাদ্য ও জীবজন্তুর খাদ্যের বিশেষ পার্থক্য : ইবনে জরীর প্রমুখ তফসীরবিদ وَمَا عَلَّمْنَاهُ বাক্যের ما কে موصول এর অর্থে ধরে অনুবাদ করেছেন এসব বস্তু সৃষ্টি করেছি, যাতে মানুষ এগুলোর ফল-মূল ভক্ষণ করে এবং সেই বস্তুও ভক্ষণ করে, যা এসব উদ্ভিদ ও ফল-মূল দিয়ে মানুষ স্বহস্তে তৈরী করে। উদাহরণতঃ ফল-মূল দিয়ে নানারকম হালুয়া, আচার, চাটনি ইত্যাদি তৈরী করা হয়। সারকথা এই যে, ফল-মূল মানুষের কর্ম ছাড়াও খাওয়ার সুযোগ্য করে সৃজিত হয়েছে এবং এক এক ফল দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সুখাদ্য ও উপাদেয় বস্তু তৈরী করার নৈপুণ্যও আল্লাহ তাআলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় ফল সৃষ্টি করা যেমন একটি নেয়ামত, তেমনি ফল দিয়ে নানা রকমের সুখাদ্য ও উপাদেয় খাদ্য তৈরীর নৈপুণ্য শিক্ষা দেয়াও একটি নেয়ামত। এই তফসীর উদ্ধৃত করে ইবনে কাসীর বলেন, হযরত মাসউদের এক কেরাত দ্বারাও এই তফসীরটি সমর্থিত হয়। তাঁর কেরাতে ما শব্দের পরিবর্তে وَمَا عَلَّمْنَاهُ الْبُيُوتَ রয়েছে।

وَالْيَوْمَ نَأْتِيهِمْ مِنْ أَلْفِ سَفَرَةٍ مَخِرَّةٍ وَأْلَافٍ كَافَّةٍ — এখানে আকাশে ও দিগন্তে

বিস্তৃত সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। سَفَرٍ এর শাব্দিক অর্থ চামড়া বের করা। কোন জন্তুর দেহ থেকে চামড়া অথবা অন্য কোন বস্তুর উপর থেকে আবরণ সরিয়ে দিলে ভিতরের বস্তু প্রকাশ পায়। এ দৃষ্টান্তে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে অন্ধকারই আসল; আলোক বৈপত্তিক বিষয়। এটা গ্রহ ও তারকার মাধ্যমে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে নেয়। আল্লাহ তাআলার ব্যবস্থাবীনে নির্দিষ্ট সময়ে আলোকে উপর থেকে সরিয়ে নিলে অন্ধকারই থেকে যায়। একেই রাত্রি বলা হয়।

১১

১১৩

১১

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

অর্থঃ

সূর্য তার অবস্থানস্থলের দিকে চলতে থাকে। এই অবস্থানস্থল ও স্থানগত ও কালগত উভয় প্রকার হতে পারে। **মস্তু** শব্দটি কখনও ভ্রমণের শেষ সীমার অর্থেও ব্যবহৃত হয় যদিও সাথে সাথে বিরতি না দিয়ে দ্বিতীয় ভ্রমণ শুরু হয়ে যায়। — (ইবনে-কাসীর)

কোন কোন তফসীরবিদ এখানে কালগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন; অর্থাৎ, সেই সময়, যখন সূর্য তার নির্দিষ্ট গতি সমাপ্ত করবে। সে সময়টি কেয়ামতের দিন। এ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, সূর্য তার কক্ষ পথে মজবুত ও অটল ব্যবস্থাবধানে পরিভ্রমণ করছে। এতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয় না। সূর্যের এই গতি চিরস্থায়ী নয়। তার একটি বিশেষ অবস্থানস্থল আছে; যেখানে পৌছে তার গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কেয়ামতের দিন। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত আছে। — (ইবনে-কাসীর)

কতক তফসীরবিদ কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসের ভিত্তিতে আয়াতে স্থানগত অবস্থানস্থল অর্থ নিয়েছেন।

আবু যর গফারী (রাঃ) একদিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে সূর্যাস্তের সময় মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, আবু যর, সূর্য কোথায় অস্ত যায় জান? আবু যর বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, সূর্য চলতে চলতে আরশের নীচে পৌছে সেজদা করে। অতঃপর বললেন, **وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا** আয়াতে **মস্তু** বলে তাই বোঝানো হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকেও এই সম্বন্ধে হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে, প্রত্যেক সূর্য আরশের নীচে পৌছে সেজদা করে এবং নুতন পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি লাভ করে নতুন পরিভ্রমণ শুরু করে। অবশেষে এমন একদিন আসবে, যখন তাকে নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি দেয়া হবে না, বরং পশ্চিমে অস্ত গিয়ে পশ্চিম থেকেই উদিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। এটা হবে কেয়ামত সন্নিবিষ্ট হওয়ার একটি আলামত। তখন তওবা ও ইমানের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং কোন গোনাহগার, কাকের ও মুশরিকের তওবা কবুল করা হবে না। — (ইবনে কাসীর)

নামাযের ওয়াক্তসমূহের পরিচয়, কেবলার দিক নির্ধারণ, বছর, মাস ও দিন তারিখের সঠিক ধারণা, প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান অঙ্ক শাস্ত্রের হিসাবাদির মাধ্যমেও অর্জন করা যায়। কিন্তু শরীয়ত এগুলোর ভিত্তি অঙ্ক শাস্ত্রের ঐটিনাটি বিশ্লেষণের উপর রাখার পরিবর্তে সাধারণের প্রত্যক্ষকরণের উপর রেখেছে। চাঁদের হিসাবে বছর, মাস ও দিন-তারিখে নির্ধারিত হয়; কিন্তু চাঁদ হল কি হল না, তার ভিত্তি কেবল চাঁদ দেখা ও প্রত্যক্ষ করার উপর রাখা হয়েছে। এর ভিত্তিতেই হজ্জ ও রোযার তারিখ নির্ধারিত হয়। চাঁদের ক্রমবৃদ্ধি, আত্মগোপন ও উদয়ের রহস্য সম্পর্কে কতিপয় সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলে কোরআন তার জওয়াবে বলে **قُلْ فِي سَوَاقِئِكَ لِلَّهِ وَالْحَجِّ** অর্থঃ, আপনি উত্তরে বলুন, চাঁদের এসব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য মাসের শুরু, শেষ ও দিন-তারিখ জেনে হজ্জের দিন নির্দিষ্ট করা। এ জওয়াব ব্যস্ত করেছে যে, তোমাদের প্রশ্ন অনর্থক। এ

(৩৮) সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন করে। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ। (৩৯) চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন ফর্মালি নির্ধারিত করেছি। অবশেষে সে পুরাতন কক্ষর শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। (৪০) সূর্য কখন পোত পারে না চন্দ্রের এবং রাশি অস্ত্র চলে না দিনের। প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সঞ্চার করে। (৪১) তাদের জন্যে একটি নির্দেশ এই যে, আমি তাদের সমস্ত-সমস্তিকে বোঝাই নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। (৪২) এক তাদের জন্যে নৌকার অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে। (৪৩) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিষ্পত্তি করতে পারি, তখন তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই এবং তারা পরিব্রাণও পাবে না। (৪৪) কিন্তু আমারই পক্ষ থেকে কৃপা এবং তাদেরকে কিছুকাল জীবনোপভোগ করার সুযোগ দেয়ার কারণে তা করি না। (৪৫) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা সামনের আশাব ও পশ্চনের আশাবকে ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তখন তারা তা অগ্রাহ্য করে। (৪৬) যখনই তাদের পালনকর্তার নির্দেশাবলীর মধ্য থেকে কোন নির্দেশ তাদের কাছে আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখে ফিরিয়ে দেয়। (৪৭) যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় কর। তখন কাকেররা ভূমিনগরকে বলে, ইচ্ছা করলেই আল্লাহ্ যাকে ষাওয়াতে পারতেন, আমরা তাকে কেন ষাওয়াব? তোমরা তো ষাওয়াত বিভ্রান্তিতে পতিত রয়ছ। (৪৮) তারা বলে, তোমরা সভাবানী হল কল এই ওয়ালা কবে পূর্ণ হবে? (৪৯) তারা কেবল একটা ভয়াবহ শব্দের অংশগণ করছে, যা তাদেরকে আশাত করবে তাদের পরস্পরিক বাকবিতণ্ডাকালে। (৫০) তখন তারা ওহিযত করতেও সক্ষম হবে না। এক তাদের পরিবার-পরিজনদের কাছেও ফিরে যেতে পারবে না। (৫১) নিশ্চয় ঝুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা করণ থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুট চলেবে। (৫২) তারা কলবে, হায় আমাদের দুর্বর্তি। কে আমাদেরকে মিথ্যাহল থেকে উদ্ধৃত করল? রহমান আল্লাহ্ জে এরই ওয়ালা নিয়েছিলেন এক রসূলগণ সত্য বলেছিলেন।

রহস্য জ্ঞানার উপর তোমাদের কোন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয় নির্ভরশীল নয়। তাই তোমাদের ধর্মীয় ও পার্শ্ব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক রাখে, এমন প্রশ্ন করাই দরকার।

এ ভূমিকার পর আসল ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য করুন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরত ও প্রজ্ঞার কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর মানুষকে তওহীদ ও সর্বব্যাপী কুদরতে বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সর্ব প্রথম পৃথিবীর কথা উল্লেখ করে বলেছেন, **وَالْأَرْضَ لَهَا رِزْقٌ** অতঃপর পানি বর্ষণ করে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার কথা বলেছেন, **وَالْأَرْضَ لَهَا رِزْقٌ** এ বিষয়টি সব মানুষই দেখে ও জানে। এরপর আকাশ ও আকাশ সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচনা শুরু করে প্রথমে দিবা ও রাত্রির দৈনন্দিন পরিবর্তনের উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, **وَالْأَرْضَ لَهَا رِزْقٌ** এরপর সর্ববৃহৎ গ্রহ সূর্য ও চন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে সূর্য সম্পর্কে বলেছেন, **وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَوْدِعَةٍ** চিন্তা করুন, এর উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা

যে, সূর্য আপনা আপনি, নিজ ইচ্ছায় ও শক্তি বলে বিচরণ করে না। সে একজন পরাক্রমশালী ও বিচক্ষণ সন্তার নির্ধারিত নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করে যাচ্ছে।

অর্থ **عرجون - وَالْقَرَرُ قَدَرُهُ مَنَازِلٌ حَتَّىٰ آدَاكَ الْعُرْجُونَ الْقَدِيرُ** শুক খেজুর শাখা, যা বৈকে ধনুকের মত হয়ে যায়। **مَنَازِلٌ** শব্দটি منزل এর বহুবচন। অর্থ অবতরণস্থল। আল্লাহ তাআলা চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের চলার জন্যে বিশেষ সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এই সীমাকেই ‘মনযিল’ বলা হয়।

চন্দ্রের মনযিল : চন্দ্র এক মাসে তার পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে। তাই তার মনযিল ত্রিশ অথবা উনত্রিশটি হয়ে থাকে। প্রত্যেক মাসে চন্দ্র কমপক্ষে একদিন উষাও হয়ে থাকে। ফলে সাধারণভাবে তার মনযিল আটশাটটি বলা হয়। সৌরবিজ্ঞানীরা এসব মনযিলের বিপরীতে অবস্থিত নক্ষত্রসমূহের সাথে মিল রেখে এগুলোর বিশেষ বিশেষ নাম রেখেছেন। জাহেলিয়াত যুগের আরবেও এসব নামেই মনযিলসমূহ চিহ্নিত হত। কোরআন পাক এসব পারিতোষিক নামের উল্লেখ। চন্দ্র বিশেষ বিশেষ দিনে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, কোরআন মনযিল বলে শুধু সে দূরত্বকেই বুঝিয়ে থাকে।

সূর্য ইউনুসে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সূর্য ইউনুসের আয়াত এই : **جَعَلَ الشَّمْسُ وَجْهَهَا لِقَارِعَتِهَا وَأَوْدَعَهُ رِثْقًا ثَقِيلًا** এতে সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। পার্থক্য এই যে, চন্দ্রের মনযিলসমূহ চাক্ষুস চোখে চেনা যায় এবং সূর্যের মনযিলসমূহ অঙ্ক শাস্ত্রের হিসাবের মাধ্যমে জানা যায়। **حَتَّىٰ آدَاكَ الْعُرْجُونَ الْقَدِيرُ** বাক্যে মাসের শেষে চাঁদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। চাঁদ ষোল কলায় পরিপূর্ণ হওয়ার পর হ্রাস পেতে পেতে মাসের শেষে ধনুকের আকার ধারণ করে। আরবদের পরিবেশ উপযোগী “শুক খজুর শাখার মত” বলে এর দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে।

অর্থ, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই নিজ নিজ কক্ষপথে সঞ্চার করে। **فَلَا يَكُن فِي فَلَكَ يُسْوَرُونَ** শাব্দিক অর্থ আকাশ নয়, বরং সেই বৃত্ত যাতে কোন গ্রহ বিচরণ করে। সূর্য আয়িয়ায় এ আয়াত সম্পর্কে বলা

হয়েছে যে, এর দ্বারা বোঝা যায়, চন্দ্র আকাশ গাত্রে প্রোথিত নয়। বাংলায় মুসলিম মতবাদ প্রমাণ করে যে, চন্দ্র আকাশগাত্রে প্রোথিত। কোরআনের আয়াত থেকে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের নীচে এক বিশেষ কক্ষ পথে বিচরণ করে। আধুনিক গবেষণা এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের অবতরণের ঘটনাবলী এ বিষয়টিকে নিশ্চিত করেছে।

وَالْقَمَرَ إِنَّا لَمُخْلِطُونَ فِي الْمَاءِ الْبَحْرَ وَالْخَالِ

— এতে সমুদ্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে

কুদরতের বহিঃপ্রকাশ আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা নৌকাসমূহকে স্বয়ং ভারী বস্তু দ্বারা বোঝাই হওয়া সত্ত্বেও পানির উপর চলার যোগ্য করে দিয়েছেন। পানি এগুলোকে নিমজ্জিত করার পরিবর্তে দূর-দূরান্তের দেশে পৌঁছে দেয়। বলা হয়েছে, আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকে নৌকায় আরোহণ করিয়েছি। এখানে সন্তান-সন্ততির কথা বলার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সন্তান-সন্ততি মানুষের বড় বোঝা। বিশেষতঃ যখন তারা চলাফেরার যোগ্য না থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তোমরাই কেবল নৌকাসমূহে আরোহণ কর না, বরং সন্তান-সন্ততি ও তাদের সমস্ত আসবাবপত্রও এসব নৌকা বহন করে। **وَالْقَمَرَ إِنَّا لَمُخْلِطُونَ فِي الْمَاءِ الْبَحْرَ وَالْخَالِ**

বাক্যের অর্থ এই যে, মানুষের আরোহণ ও বোঝা বহনের জন্যে কেবল নৌকাই নয়, নৌকার অনুরূপ আরও যানবাহন সৃষ্টি করেছি। আরবরা তাদের প্রথা অনুযায়ী এর অর্থ নিয়েছে উটের সওয়াযী। কারণ, বোঝা বহনে উট সমস্ত জন্তুর সেরা। বড় বড় বোঝার স্থপ নিয়ে দেশ-বিদেশ সফর করে। তাই আরবরা উটকে **سفينه البر** অর্থাৎ, স্থলের জাহাজ বলে থাকে।

কোরআনে উড়োজাহাজের উল্লেখ : কিন্তু কোরআন এখানে উট অথবা অন্য কোন বিশেষ যানবাহনের উল্লেখ করেনি, বরং অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে। ফলে এতে এমনসব যানবাহন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা অধিকতর মানুষ ও তাদের আসবাবপত্র বহন করে মনযিলে মকসুদে পৌঁছে দেয়। এটা সুস্পষ্ট যে, বর্তমান যুগে যেসব যানবাহন প্রচলিত আছে তন্মধ্যে আয়াতে প্রধানতঃ উড়োজাহাজই বোঝানো হয়েছে। নৌকার সাথে এর উপমাও এর সমর্থক। পানির জাহাজ যেমন পানির উপর সঞ্চার করে পানি তাকে নিমজ্জিত করে না, তেমনি উড়োজাহাজ বাতাসে সঞ্চার করে। বাতাস তাকে নীচে ফেলে দেয় না। কোরআন পাক আলোচ্য বাক্যটি অস্পষ্ট রেখেছে, যাতে কেয়ামত পর্যন্ত যত যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সবই এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পৃথিবী, আকাশ ইত্যাদিতে আল্লাহ তাআলার শক্তি ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে আল্লাহর পরিচয় লাভ ও তওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। এছাড়া এ দাওয়াত কবুলের ফলস্বরূপ জ্ঞানাতের চিরস্থায়ী নেয়ামত ও সুখের ওয়াদা এবং কবুল না করার কঠোর শাস্তির সত্যবর্ণনাও বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে ও পরবর্তী আয়াতসমূহে মক্কার কাফেরদের বক্রতা বিবৃত হয়েছে যে, তাদের উপর সওয়াবের ওয়াদা কিংবা শাস্তির ভীতি প্রদর্শন কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে কাফেরদের সাথে মুসলমানদের দুটি সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানরা যখন তাদের বলে, তোমরা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় কর, যা দুনিয়াতেই তোমাদের সামনেও আসতে পারে এবং পরকালে আসা তো নিশ্চিতই। তোমরা এ শাস্তিকে ভয় করে বিশ্বাস স্থাপন করলে

যে কোয়ামতের শুয়াদা দিয়েছিলেন, এই হল সে কোয়ামত। রসূলগণ তোমাদেরকে সে সত্য সংবাদই শুনিয়েছিলেন, কিন্তু তোমরা অন্ধকূপ করনি। এখানে আল্লাহ্‌র ‘রহমান’ গুণটি উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি তো স্বীয় রহমতেই তোমাদের জন্যে এ আশাব শেখে বেঁচে থাকার বহু ব্যবস্থা করেছিলেন। পূর্বাঁহে এর শুয়াদা দেয়া এবং কিতাব ও পন্থগম্বুরগণের মাধ্যমে এর স্ববর তোমাদের কাছে পৌঁছানো আল্লাহ্‌র ‘রহমান’ গুণেরও বহিঃপ্রকাশ ছিল।

إِنْ أَصْحَبَ الْجَنَّةَ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَهَبْهُنَّ

জাহান্নামীদের দূরবস্থা
বর্ণনা করার পর কেয়ামতে জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা তাদের চিত্তবিনোদনে মশগুল থাকবে। **فَهَبْنَهُنَّ** এর অর্থ আনন্দিত, স্বাচ্ছন্দ্যময়। **فِي شُغْلٍ** এর এক অর্থ এমনও হতে পারে যে, তারা জাহান্নামীদের দূরবস্থা থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবে।

এ স্থলে **فِي شُغْلٍ** সংযুক্ত করার কারণ এ ধারণা নিরসন করাও হতে পারে যে, জাহান্নামে ফরশ-ওয়াজিব কোন এবাদত থাকবে না এবং জীবিকা উপার্জনেরও কোন প্রয়োজন থাকবে না। এমন বেকার অবস্থায় মানুষ সাধারণতঃ অস্বস্তি বোধ করে। তাই বলা হয়েছে যে, জাহান্নামীরা বিনোদনমূলক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে। কাজেই অস্বস্তিবোধ করার প্রশ্নই দেখা দেয় না।

فَهَبْنَهُنَّ শব্দের অর্থ জাহান্নামের ছর এবং দুনিয়ার স্ত্রী

সবাই অস্বস্তিত।

وَأَهْلُهَا يُكْفَرُونَ শব্দটি **دَعْوَة** থেকে উদ্ভূত। অর্থ আহ্বান করা।

অর্থাৎ, জাহান্নামীরা যে বস্তুকেই ডাকবে, তা পেয়ে যাবে। কোরআন করীম এক্ষেত্রে **يَسْتَلُونَ** বলেনি। কেননা, চেয়ে লাভ করাও এক প্রকার শ্রম ও কষ্ট, যা থেকে জাহান্নাম পবিত্র। সেখানে প্রতিটি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীই উপস্থিত থাকবে।

وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ হাশরের ময়দানে প্রথমে মানুষ

বিক্রিপ্ত অবস্থায় সমবেত হবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে - **يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكَ كَثْرَتُ زَوْجِكَ شَيْئًا** অর্থাৎ, তারা হবে বিক্রিপ্ত পত্নপালের মত। কিন্তু পরে কর্মের ভিত্তিতে তাদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করা হবে। কাফের, মুমিন, সংকরী ও অসংকরী লোকগণ পৃথক পৃথক জায়গায় অবস্থান করবে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, **وَأَزْوَاجُهُمْ يُؤْجِبُهُمْ** অর্থাৎ, যখন মানুষকে জোড়া জোড়া করা হবে। আলোচ্য আয়াতেও এই পৃথকীকরণ ব্যক্ত হয়েছে।

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَوْمَ آدَمُ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ অর্থাৎ, সমস্ত

মানুষ এমনকি, জিনদেরকেও কেয়ামতের দিন বলা হবে, আমি কি তোমাদেরকে দুনিয়াতে শয়তানের এবাদত না করার আদেশ দেইনি? এখানে প্রশ্ন হয় যে, কাফেররা সাধারণতঃ শয়তানের এবাদত করত না, বরং দেব-দেবী অথবা অন্য কোন বস্তুর পূজা করত। কাজেই তাদেরকে শয়তানের এবাদত করার অভিযোগে কেমন করে অভিযুক্ত করা যায়? জওয়াব এই যে, প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক অবস্থায় কারও আনুগত্য করার নামই এবাদত। তারাও চিরকাল শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ করেছিল বিধায় তাদেরকে শয়তানের এবাদতকারী বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি অর্থের মহব্বতে এমনসব কাজ করে, যদ্বারা অর্থ বৃদ্ধি পায় এবং স্ত্রীর মহব্বতে এমনসব কাজ করে যদ্বারা স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়, হাদীসে তাদেরকে অর্থের দাস ও স্ত্রীর দাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

يَوْمَ تَخْرُجُ عَلَى أَهْوَالِهِمْ হাশরে হিসাব- নিকাশের জন্যে

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْغَةً وَاحِدَةً وَأَذَانٌ لَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ لِلَّذِينَ اتَّخَذُوا

فَالْيَوْمَ لَا تَنْظُرُونَ سِيئًا وَلَا تَحْزَنُونَ إِلَّا مَا أَنتُمْ تَعْمَلُونَ

أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَهَبْنَهُنَّ وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ

عَلَى الْأَرْوَاحِ مُتَكَبِّرُونَ فَاهْلُهَا يُكْفَرُونَ وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ

سَلَامٌ وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَوْمَ آدَمُ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِلَّا أَنْتُمْ

مُتَكَبِّرُونَ وَإِنْ أَصْحَبَ الْجَنَّةَ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَهَبْنَهُنَّ

وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ

وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ

وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ

وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ

وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ

وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ

وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ

وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ

وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ

وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ وَأَمَّا زَوْجُكَ الْكَافِرُ

(৫৩) এটা তো হবে কেবল এক মহানাদ। সে মুহূর্তেই তাদের সবাইকে আযার সামনে উপস্থিত করা হবে। (৫৪) আজকের দিনে কারও প্রতি অনুমতি করা হবে না এবং তোমরা যা করবে কেবল তারই প্রতিদান পাবে। (৫৫) এদিন জাহান্নামীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। (৫৬) তারা এক তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়ায় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে। (৫৭) সেখানে তাদের জন্যে থাকবে ফল-মূল এবং যা চাইবে। (৫৮) কল্পনাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম'। (৫৯) হে অপরাধীরা, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। (৬০) হে বনী-আদম! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের এবাদত করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (৬১) এবং আযার এবাদত কর। এটাই সর্বল পথ। (৬২) শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পঞ্চভেদ করেছে। তবুও কি তোমরা বুঝনি? (৬৩) এই সে জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো। (৬৪) তোমাদের কুফরের কারণে আজ এতে প্রবেশ কর। (৬৫) আজ আমি তাদের মুখে যোহর এঁটে দেব তাদের হাত আযার সাথে কাশা কলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। (৬৬) আমি ইচ্ছা করলে তাদের দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথের দিকে দৌড়াতে চাইলে কেমন করে দেখতে পেত। (৬৭) আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে স্ব স্ব স্থানে আকার বিকৃত করতে পারতাম, ফলে তারা আগের চলতে পারত না এবং পেছনের দিকে যেতে পারত না। (৬৮) আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্ণাবস্থায় ফিরিয়ে নেই। তবুও কি তারা বুঝে না? (৬৯) আমি রসুলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্যে পোতশীল নয়। এটা তো এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কোরআন। (৭০) যাতে তিনি সতর্ক করেন জীবিতকে এবং যাতে কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপস্থিতির সময় প্রথমে প্রত্যেকেই যা ইচ্ছা ওযর বর্ণনা করার স্বাধীনতা পাবে। মুশরিকরা সেখানে কসম করে কুফর ও শিরক অস্বীকার করবে। তারা বলবে, وَاللّٰهُ رَبُّنَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ কেউ বলবে, আমাদের আমলনামায় ফেরেশতা যা কিছু লিখেছে, আমরা তা থেকে মুক্ত। তখন আল্লাহ্ তাআলা তাদের মুখে মোহর এঁটে দেবেন, যাতে তারা কোন কিছুই বলতে না পারে। অতঃপর তাদেরই হাত, পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রাজসাক্ষী করে কথা বলার যোগ্যতা দান করা হবে। তারা কাফেরদের যাবতীয় কার্যকলাপের সাক্ষ্য দেবে। আলোচ্য আয়াতে হাত ও পায়ের কথা উল্লেখিত হয়েছে। অন্য আয়াতে মানুষের কর্ণ, চক্ষু ও চর্মের সাক্ষ্য দানের উল্লেখ রয়েছে।

تَعْمِيرُ شَكْلِ نَعْمٍ - وَمَنْ مَّيْمَرُهُ يُنْكَسِرُ فِي الْعَلَقِ أَكَلًا يَغِيظُونَ

থেকে উদ্ধৃত। অর্থ দীর্ঘায়ু দান করা। نَكْسِ শব্দটি থেকে উদ্গত। অর্থ উপড় করা। এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পূর্ণ শক্তি ও প্রজ্ঞার আরও একটি বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, প্রত্যেক মানুষ ও প্রাণী সর্বদা আল্লাহ্র কর্মের অধীনে থাকে এবং তাঁর কর্ম তাদের মধ্যে অবিরাম অব্যাহত থাকে। একটি নোরা ও নিশ্চাণ ফোটা থেকে তাদের অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে। জননীর গর্ভাশয়ের তিন অঙ্ককারে এই ক্ষুদ্র জগতের সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এই অস্তিত্বের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। অতঃপর আত্মা সঞ্চার করে তাকে জীবিত করা হয়েছে। নয় মাস জননী গর্ভে লালিত হয়ে সে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকার ধারণ করেছে এবং পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে। পূর্ণাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও তার প্রতিটি অঙ্গ দুর্বল প্রকৃতি তার উপযুক্ত খাদ্য তার মায়ের স্তনে সৃষ্টি করে তাকে ধাপে ধাপে শক্তি দান করেছেন। অতঃপর যৌবন পর্যন্ত অনেক স্তর অতিক্রম করে তার যাবতীয় শক্তি সূঠম ও সবল হয়েছে। ফলে সে শক্তি ও শৌর্য দাবী করতে শুরু করেছে এবং তার মধ্যে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার মনোবল সৃষ্টি হয়েছে।

অতঃপর আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করলেন, তখন তার সমস্ত বল ও শক্তি হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এই হ্রাস প্রাপ্তিও অনেক স্তর অতিক্রম করে অবশেষে বার্ধক্যের শেষ সীমানায় উপনীত হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এখানে পৌছে সে আবার সে স্তরেই পৌঁছে গেছে, যে স্তরটি শৈশবে অতিক্রম করেছিল। তার সকল অভ্যাস ও ক্রিয়াকর্ম বদলে গেছে। যেসব বস্তু এক সময় তার সর্বাধিক প্রিয় ছিল, সেগুলোই এখন সর্বাধিক ঘৃণিত হয়ে গেছে। পূর্বে যা ছিল সুখের বিষয়, এখন তা হয়ে গেছে কষ্টের বিষয়। আলোচ্য আয়াতে একেই উপড় করা বলা হয়েছে।

মানুষ দুনিয়াতে চোখে দেখা অথবা কানে শোনা বিষয়ের প্রতি সর্বাধিক আস্থা পোষণ করে। বার্ধক্যে পৌঁছলে এগুলোও আস্থাভাজন থাকে না। শ্রবণশক্তির দুর্বলতার কারণে কথাবার্তা পূর্ণরূপে বোঝা কঠিন হয় এবং দৃষ্টি শক্তির বেকল্যের কারণে সঠিকভাবে দেখা দুরূহ হয়ে পড়ে।

মানুষের অস্তিত্বে এসব পরিবর্তন যেমন আল্লাহ্ তাআলার বিস্ময়কর কৃদরতের বহিঃপ্রকাশ, তেমনি এতে মানুষের প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহও বিদ্যমান। যুগ্ম মানুষের অস্তিত্বে যেসব শক্তি গচ্ছিত রেখেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সরকারী যন্ত্রপাতি। এগুলো তাকে দান করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এগুলোর মালিক তুমি নও এবং এগুলো চিরস্থায়ীও নয়। অবশেষে তোমার কাছ থেকে ফেরত নেয়া হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময়ে

সবগুলো শক্তি একযোগে ফেরত নেয়া বাহ্যতঃ সঙ্গত ছিল। কিন্তু কল্পনাময় আল্লাহ্ এগুলো ফেরত নেয়ার জন্যেও দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তি নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং ক্রমানুয়ে ফেরত নিয়েছেন, যাতে মানুষ সাবধান হয়ে পরকালের সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

وَأَعْلَنَ الْيُذُرَ - নবুওয়ত অমান্যকারী কাফেররা মানুষের মনে

কোরআনের বিস্ময়কর প্রভাবের কথা অস্বীকার করতে পারত না। কারণ, এটা ছিল সাধারণ প্রত্যক্ষ বিষয়। তাই তারা কখনও কোরআনকে যাদু এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে যাদুকর বলত এবং কখনও কোরআনকে কবিতা এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে কবি বলে আখ্যা দিত। এভাবে তারা প্রমাণ করতে চাইত যে, এই অনন্য সাধারণ প্রভাব খোদায়ী কалам হওয়ার কারণে নয়, বরং হয় এটা যাদু, যা মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে, না হয় কবিতা, যা সাধারণের মনে সাড়া জাগাতে পারে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমি নবীকে কবিতা ও কাব্য শিক্ষা দেইনি এবং তা তাঁর জন্যে শোভনীয়ও নয়। সুতরাং তাঁকে কবি বলা বাস্তব।

এখানে প্রশ্ন দেখা যায় যে, কাব্য রচনা আরব জাতির মজ্জাগত বিষয়। তাদের নারী ও বালক-বালিকারাও অনগল কবিতা বলে। কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে তারা সম্যক জ্ঞাত। সুতরাং তারা কিসের ভিত্তিতে কোরআনকে কবিতা এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে কবি বলেছে? কারণ, কোরআন কবিতার ছন্দ ও শেষ অক্ষরের মিল মেনে চলেনি। একে কোন মূর্খ এবং কাব্য চর্চা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও কবিতা বলতে পারে না।

এর জওয়াব এই যে, কবিতা আসলে কাল্পনিক স্বরচিত বিষয়কে বলা হয়, তা পদোই হোক অথবা গদ্যে। কোরআনকে কবিতা এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে কবি বলার পেছনে কাফেরদের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁর আনীন কалам নিছক কাল্পনিক গল্প-গুজব অথবা তারা বোঝাতে চেয়েছিল যে, পদ্য ও কবিতা যেমন বিশেষ প্রভাব রাখে, এর প্রভাবও ঠিক তেমনি। ইমাম জাসসাস রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞাসা করল, রসুলুল্লাহ (সাঃ) কখনও কোন কবিতা আবৃত্তি করতেন কি? তিনি উত্তরে বললেন, সাধারণতঃ করতেন না; তবে ইবনে-তুরফার এক পংক্তি কবিতা তিনি একবার আবৃত্তি করেছিলেন।

পংক্তিটি এইঃ

سَتَبْدِي لَكَ الْاَيَّامَ مَا كُنْتَ جَاهِلًا

وَيَاتِيكَ بِالْاَيَّامِ مَنْ لَمْ تَزِدْ

তিনি একে ছন্দ পরিবর্তন করে, بِاَلْاَيَّامِ مَنْ لَمْ تَزِدْ আবৃত্তি করলে হযরত আবুবকর (রাঃ) আরয় করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ্, কবিতাটি এভাবে নয়। তখন তিনি বললেন, আমি কবি নই এবং কাব্যচর্চা আমার জন্যে শোভনীয়ও নয়।

তিরমিযী, নাসায়ী ও ইমাম আহমদ এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে কাসীরও তাঁর তফসীরে-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ থেকে

প্রতীয়মান হল যে, স্বয়ং কোন কবিতা রচনা করা তো দুরের কথা, তিনি অন্যের কবিতা আবৃত্তি করাও নিজের জন্যে শোভনীয় মনে করতেন না।

الصَّٰمِتَاتِ

২২৭

وما ২২

আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ عِلَآءٍ لَّيْسَ لَهَا مِثْلُ شَيْءٍ مَّا كُنُوْنَ

— আয়াতে চতুশদ জন্তু সৃজনে মানুষের উপকারিতা এবং প্রকৃতির অসাধারণ কারিগরি উল্লেখ করার সাথে আল্লাহ তাআলার আরও একটি মহা অনুগ্রহ বিধৃত হয়েছে। তা এই যে, চতুশদ জন্তু সৃজনে মানুষের কোনই হাত নেই। এগুলো একান্তভাবে প্রকৃতির স্বস্থ নির্মিত। আল্লাহ তাআলা মুমিনকে কেবল চতুশদ জন্তু দ্বারা উপকার লাভের সুযোগ ও অনুমতিই দেননি, বরং তাদেরকে এগুলোর মালিকও করে দিয়েছেন। ফলে তারা এগুলোতে সর্বপ্রকারে মালিকসুলত অধিকার প্রয়োগ করতে পারে। নিজে এগুলোকে কাছে লাগাতে পারে অথবা এগুলো বিক্রী করে সে মূল্য দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

মালিকানার মূল কারণ আল্লাহর দান, পুঞ্জি ও শ্রম নয় :
আজকাল নতুন নতুন অর্থনৈতিক মতবাদের মধ্যে জোরেজোরে আলোচনা চলছে যে, বস্ত্তনিচয়ের মালিকানায় পুঞ্জি মূল কারণ, না শ্রম? পুঞ্জিবাদি অর্থনীতির প্রবক্তারা পুঞ্জিকেই মূল কারণ সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তারা শ্রমকে মালিকানার আসল কারণ আখ্যা দেয়। আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, বস্ত্তনিচয়ের মালিকানায় এতদূত্বের কোনই প্রভাব নেই। কোন বস্ত্তর সৃষ্টিই মানুষের করায়ত্ত নয়। এটা সরাসরি আল্লাহর কাজ। বুদ্ধি ও বিবেকের দাবী এই যে, যে যে বস্ত্ত সৃষ্টি করে, তার মালিকও সেই হবে। এভাবে মূল ও সত্যিকার মালিকানা জগতের বস্ত্তনিচয়ের মধ্যে আল্লাহ তাআলারই। যে কোন বস্ত্তর মধ্যে মানুষের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর দানের করণে হতে পারে। বস্ত্তনিচয়ের মালিকানার প্রমাণ ও তা হস্তান্তরের আইন আল্লাহ তাআলা তাঁর পয়গম্বরগণের মাধ্যমে পৃথিবীতে জারি করেছেন। এই আইনের বিরুদ্ধে কেউ কোন বস্ত্তর মালিক হতে পারে না।

وَلَكُلِّهَا هُمْ এতে আরও একটি অনুগ্রহ ও নেয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উট, ঘোড়া, হাতী, কলদ ইত্যাদি অধিকাংশ জীব-জন্তু মানুষ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। তাদের সামনে মানুষ একান্তই দুর্বল। ফলে এসব জন্তু মানুষের বশীভূত না হওয়াই ছিল যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এগুলো সৃষ্টি করে যেমন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনই এসব জন্তুকে স্বভাবগতভাবে মানুষের বশীভূতও করে দিয়েছেন। ফলে একজন বালকও একটি শক্তিশালী ঘোড়ার মুখে অনায়াসে লাগাম পরিয়ে দিতে পারে। এরপর তার পিঠে চেপে বসে যত্রতত্র নিয়ে যেতে পারে। এটাও মানুষের কোন বাহাদুরী নয়; একমাত্র আল্লাহ তাআলার দান।

وَلَهُمْ جَنَّاتُ جَعْدُونَ এখানে جَعْدُ এর অর্থ প্রতিপক্ষ নেয়া হলে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য হিঁর করেছে, তারাই কোয়ামতের দিন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাসান ও কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ আয়াতের তফসীর এই যে, কাকেররা সাহায্য পাওয়ার আশায় মূর্তিদেরকে উপাস্য হিঁর করেছিল, কিন্তু অবস্থা হচ্ছে এই যে, স্বয়ং তারাই মূর্তিদের সেবাদাস ও সিপাহী হয়ে গেছে। তারা মূর্তিদের হেফাজত করে। কেউ বিরুদ্ধে গেলে তারা গুদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করে। অথচ তাদেরকে সাহায্য করার যোগ্যতা

وَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ عِلَآءٍ لَّيْسَ لَهَا مِثْلُ شَيْءٍ مَّا كُنُوْنَ
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهُمْ رَاوِيَهُمْ وَمِنْهُمْ مَّا يَكُوْنُوْنَ ۝ وَلَهُمْ فِيْهَا مِمَّا امْسَاوُ
وَمَشَارِبٌ اَقْدَارٌ لَّشُرْكُوْنَ ۝ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لَّعَلَّهُمْ
يُبْصِرُوْنَ ۝ لَّا يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرُهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ۝ فَلَا
يُغْنِيْكَ تَوَلَّيْهُمْ اَنَّا نَعْلَمُ مَا يَلُوْنُوْنَ وَمَا يُعْلِيْنُوْنَ ۝ وَلَمْ يَرَوْا اَنَّا
اَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نُّطْفَةٍ وَّاِذَا هُمْ خَوِيْصَةٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَصَرَبْنَا مِمَّا شَاءُوْا
لَيْسَ خَلْقُهُمْ قَالٍ مِنْ تَحِيّ الْعِظَامِ وَهِيَ رِيْبَةٌ ۝ قُلْ يُبَيِّنُهَا الَّذِيْ
اَنشَأَهَا اَوَّلَ نَفْثَةٍ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ عِلْمٍ اَلَدِّيْ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ
الشَّجَرِ الْاُخْصَرَ نَارًا ۝ اِذَا اَنْتُمْ مِّنْهُ تُؤْتَدُوْنَ ۝ وَلَكِنَّ الَّذِيْ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ يَشْفَعُ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰى وَهُوَ
الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۝ اِنَّمَا اَسْرَارُكَ اَرَادَ سِتْرَانِ ۝ يَقُوْلُ لَهُ مَنْ يَّكُوْنُ ۝
فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ يَبْدِئُ مَكُوْلٰتٍ كُلِّ سَاعٍ ۝ اِلَيْهِ رُجْعُوْنَ ۝
سُبْحٰنَ الَّذِيْ يَبْدِئُ مَكُوْلٰتٍ كُلِّ سَاعٍ ۝ اِلَيْهِ رُجْعُوْنَ ۝
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝
وَالصَّٰمِتَاتِ صَمَٰتٌ ۝ فَالزَّحٰرِطِ وَزَجْرًا ۝ فَالْثَّلٰثِطِ وَزَكْرًا ۝

(৭১) তারা কি দেখে না, তাদের জন্যে আমি আমার নিজ হাতের তৈরী বস্ত্তর দ্বারা চতুশদ জন্তু সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তারাই এগুলোর মালিক।
(৭২) আমি এগুলোকে তাদের হাতে অসহায় করে দিয়েছি। ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। (৭৩) তাদের জন্যে চতুশদ জন্তুর মধ্যে অনেক উপকারিতা ও পানীয় রয়েছে। তবুও কেন তারা শুকরিয়া আদায় করে না? (৭৪) তারা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে। (৭৫) অথচ এসব উপাস্য তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে না এবং এগুলো তাদের বাহিনী রূপে গৃহ হয়ে আসবে। (৭৬) অতএব তাদের কথা যেন আপনাকে দূষিত না করে। আমি জানি যা তারা গোপনে করে এবং যা তারা প্রকাশ্যে করে। (৭৭) মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি রীষ থেকে? অতঃপর তখনই সে হয়ে গেল প্রকাশ্য বাকবিত্তাকারী। (৭৮) সে আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা কব্বা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থিসমূহকে যখন সেগুলো পথে পথে গলে যাবে? (৭৯) কলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সত্যক অবগত। (৮০) যিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেন। তখন তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালাও। (৮১) যিনি নজোমগুল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হাঁ, তিনি মহাশয়, সর্বজ্ঞ। (৮২) তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায়। (৮৩) অতএব পবিত্র তিনি, যার হাতে সবকিছুর রাজত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

সূরা আস-সাফ্বাত

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ১৮২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ তাআলার নামে শুরু—

(১) শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, (২) অতঃপর ধমকিয়ে জীবিত প্রদর্শনকারীদের, (৩) অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের—

মূর্তিদের নেই।

أَكْمَرُ الْإِنْسَانِ أَلَّا عَقَلَهُ مِنْ طِفْلِ — সূরা ইয়াসীনের আলোচ্য

সর্বশেষ পাঁচটি আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে, যা কোন কোন রেওয়াজে উবাই ইবনে খলফের ঘটনা বলে এবং কোন কোন রেওয়াজে আ'স ইবনে ওয়ায়েলের ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উভয়ের তরফ থেকে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রথম রেওয়াজে তটি বায়হাকী শো' আবুল-ঈমান এবং দ্বিতীয় রেওয়াজে তটি ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি এই যে, আ'স ইবনে ওয়ায়েল মক্কা উপত্যকা থেকে একটি পুরাতন হাড় কুড়িয়ে তাকে স্বহস্তে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলল, এই যে হাড়টি চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় দেখছেন, আল্লাহ তাআলা একেও জীবিত করবেন কি? রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা তোমাকে মৃত্যু দেবেন, পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে দাখিল করবেন। — (ইবনে-কাসীর)

وَحَيِّهِمْ أর্থاً, নিকট বার্ষ থেকে স্ট এ মানুষ আল্লাহর কুদরত অস্বীকার করে কেমন খোলাখুলি বাকবিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়েছে।

وَوَرَّوْا لَنَا مَثَلًا আ'স ইবনে ওয়ায়েল পুরাতন হাড়কে স্বহস্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এর পুনরুজ্জীবন অসম্ভব মনে করেছিল। এখানে ضرب مثل (দৃষ্টান্ত বর্ণনা) বলে এ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে :

وَكَيْ حَلَفًا অর্থاً, এ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার সময় সে নিজের সৃষ্টি তত্ত্ব ভুলে গেল যে, নিকট, নাপাক ও নিষ্ঠাণ একটি শুক্রবিন্দুতে প্রাণসঞ্চার করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি সে এই মূল তত্ত্ব বিস্মৃত না হত, তবে এরূপ দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে খোদায়ী কুদরতকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে পারত না।

جَلَّ لِلْمُؤْمِنِينَ الشَّجَرُ الْكَافِرُونَ আরবে মারখ ও ইফার নামক দুই ধরনের বৃক্ষ ছিল। আরবরা এই দুই প্রকারের দু'টি শাখা মিসওয়াকের পরিমাণে কেটে নিত। অতঃপর সম্পূর্ণ তাজা ও রস ভর্তি শাখাদ্বয়কে পরস্পর ঘষে আগুন জ্বালাত। আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। — (কুরতুবী)

এছাড়া আয়াতের মর্ম এও হতে পারে যে, প্রত্যেক বৃক্ষ শুরুতে সবুজ ও সতেজ থাকার পর পরিশেষে শুকিয়ে আগুনের ইন্ধন হয়ে যায়। কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থও তাই :

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّارِ الْيَسْبِي تَوْرُونَ ؕ أَنشَأْتُمْ شَجَرَهَا مَرْغِينَ الشَّيْثُونَ

— অর্থاً, তোমরা কি সে আগুনের প্রতি লক্ষ্য কর না, যাকে তোমরা প্রজ্জ্বলিত করে কাজে লাগাও? যে বৃক্ষ এই আগুনের স্ফুলিঙ্গ হয়, সেটি কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমি?

কিন্তু আলোচ্য আয়াতে شجر শব্দের সাথে اخضر (সবুজ) বিশেষণ

উল্লেখ থাকায় বাহ্যিক অর্থ সে বিশেষ বৃক্ষই হবে যা থেকে সবুজতা সত্ত্বেও আগুন নির্গত হয়।

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ কোন কিছু তৈরী করতে চাইলে প্রথমে উপকরণ সংগ্রহ করে, অতঃপর কারিগর ডাকে, অতঃপর বেশ কিছুকাল কাজ করার পর বাঙ্কিত বস্তুটি তৈরী হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন এতসব সাত-পাঁচের প্রয়োজন হয় না। তিনি যখন যে বস্তু সৃষ্টি করতে চান, তখন সে বস্তুকে কেবল আদেশ দেয়াই যথেষ্ট হয়। তিনি যে বস্তুকে 'হয়ে যা' বলেন, তা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। এতে জরুরী হয় না যে, প্রত্যেক বস্তুই তাৎক্ষণিকভাবে সৃজিত হবে; বরং স্রষ্টার রহস্যের অধীনে যে বস্তুর তাৎক্ষণিক সৃষ্টি উপযোগী হয়, তা তাৎক্ষণিকভাবেই সৃজিত হয়। পক্ষান্তরে যে বস্তুর পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি কোন রহস্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তাকে পর্যায়ক্রমেই সৃষ্টি করা হয়। এমতাবস্থায় প্রথমই পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টির আদেশ জারি করা হয় অথবা প্রত্যেক পর্যায়ে আলাদাভাবে (হয়ে যা) আদেশ জারি করা হয়।

সূরা আস-সাফফাত

সূরার বিষয়বস্তু : এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কায় অবতীর্ণ অন্যান্য সূরার মত এর মৌলিক বিষয়বস্তুও ঈমানতত্ত্ব। এতে তওহীদ, রেসালত ও আখেরাতের বিশ্वासসমূহ বিভিন্ন পন্থায় প্রমাণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদাসমূহেরও খণ্ডন করা হয়েছে। এতে জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থাসমূহের চিত্রায়ন হয়েছে। পয়গম্বরগণের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত বিশ্वासসমূহ প্রমাণ করা এবং কাফেরদের সন্দেহ ও আপত্তি নিরসনের পর অতীতে যারা এসব বিশ্वासকে সত্য বলে স্বীকার করেছে, তাদের সাথে আল্লাহ তাআলা কি আচরণ করেছেন এবং যারা অস্বীকার ও শিরকের পথ অবলম্বন করেছে, তাদের পরিণতি কি হয়েছে সেসব বিষয় বিবৃত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নূহ (আঃ), হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁদের পুত্রগণ, হযরত মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ), হযরত ইলিয়াস (আঃ), হযরত লুত (আঃ) ও হযরত ইউনুস (আঃ)—এর ঘটনাবলী কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহর কন্যা' বলে অভিহিত করত। কাজেই, এ সূরার উপসংহারে বিশদভাবে এ বিশ্वासের খণ্ডন করা হয়েছে। সূরার সামগ্রিক বর্ণনাবঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, এতে বিশেষভাবে ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করা সক্রোশ বিশেষ বিষয়ের খণ্ডন করাই লক্ষ্য। এ কারণেই সূরাটি ফেরেশতাগণের শপথ এবং তাদের আনুগত্যের গুণাবলী বর্ণনার মাধ্যমে শুরু করা হয়েছে।

إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ وَإِنَّ رَبَّ السَّمَاءِ الدُّنْيَا رَبُّنَا إِلَهُ الْكَوْكَبِ وَحَقَّقَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ تَارِدٍ لَا يَتَّبِعُونَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ وَيَقْدِرُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُخْرًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَأَصَابٌ إِلَّا مَنْ خَلَفَ التَّخْفَةَ فَاتَّبَعْنَاهُ فَأَبَى قَائِبٌ فَاسْتَقْبَلَهُمْ أَهْلُهَا شَدِيدًا خَلْقًا مِمَّنْ خَلَقْنَا إِنْ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِنْ دُرُّوا إِلَى الْآيَةِ كَذِبُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ مِنْهَا وَكَانُوا إِنْ هَذَا إِلَّا حُجُومٌ يَمِينٌ أَمْ لَا أَمْسَأُ وَمَا تَكُونُ إِلَّا أَعْيُنُهُمْ الْيَتِيمُونَ وَأَبَاؤُكَ الْكَافِرُونَ قُلْ نَعْمَ وَأَنْتُمْ دُخْرُونَ قَالُوا هِيَ زَجْرَةٌ لِلْجِبَدِ قَالُوا هُمْ يَنْظُرُونَ قَالُوا لَوْ لَنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ لَهَذَا يَوْمَ الْقِصَلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْتُمُونَ أَفُحْمُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْأَجُهُمْ وَمَا تَكُونُ إِلَّا عِيدُونَ هُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا هُمْ إِلَى عِطَافِ الْحِجْرِ وَيَقْتُلُهُمُ اللَّهُ مَسْئُورُونَ مَا لَكُمْ لِكُنْتُمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ الْيَوْمِ تَسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلْ بِعُضُدِهِمْ عَلَى بَعْضِ نَسَائِهِمْ قَالُوا لَوْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنْ الْيَمِينِ قَالُوا لَوْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنْ الْيَمِينِ

(৪) নিচয় তোমাদের মা'বুদ এক। (৫) তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা এবং পালনকর্তা উদয়চলসমূহের। (৬) নিচয় আমি নিকটবর্তী আকাশকে তারকারাজির দ্বারা সুশোভিত করেছি। (৭) এবং তাকে সংরক্ষিত করেছি প্রত্যেক অবস্থা শয়তান থেকে। (৮) ওরা উর্বর জম্বুজাতের কোনকিছু শ্রবণ করতে পারে না এবং চার দিক থেকে তাদের প্রতি উচ্চা নিক্ষেপ করা হয়। (৯) ওদেরকে বিভ্রান্তনের উদ্দেশ্যে। ওদের জন্যে রয়েছে বিরামহীন শাস্তি। (১০) তবে কেউ হৌ মেরে কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উচ্চাগুলি তার পশ্চাৎপদ করে। (১১) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি? আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এটেল মাটি থেকে। (১২) বরং আপনি বিস্ময় বোধ করেন আর তারা বিদ্রূপ করে। (১৩) যখন তাদেরকে বোঝানো হয়, তখন তারা বোঝে না। (১৪) তারা যখন কোন নিদর্শন দেখে তখন বিদ্রূপ করে (১৫) এবং বলে, কিছুই নয়, এয়ে স্পষ্ট যাদু। (১৬) আমরা যখন মরে যাব, এবং মাটি ও হাড় পরিত্যক্ত হয়ে যাব, তখন কি আমরা পুনরুৎপত্তি হব? (১৭) আমাদের পিতৃপুরুষগণও কি? (১৮) বলুন, হাঁ এবং তোমরা হবে লালিত। (১৯) বস্তুতঃ সে উত্থান হবে একটি বিকট শব্দ মাত্র—যখন তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। (২০) এবং বলবে, দুর্ভাগ্য আমাদের। এটাই তো প্রতিফল দিবস। (২১) বলা হবে, এটাই ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (২২) একত্রিত কর গোনাহগারদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং যাদের এবাদত তারা করত (২৩) আল্লাহ ব্যতীত। অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহান্নামের পথে, (২৪) এবং তাদেরকে ধামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হক্কে, (২৫) তোমাদের কি হল যে, তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? (২৬) বরং তারা আজকের দিনে আত্মসমর্পনকারী। (২৭) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (২৮) বলবে, তোমরা তো আমাদের কাছে ডান দিক থেকে আসতে। (২৯) তারা বলবে, বরং তোমরা তো বিশাশীই ছিলে না।

প্রথম বস্তু তওহীদ : সূরাটিতে তওহীদ তথা একত্ববাদ সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রথম চার আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হল একতা বর্ণনা করা যে, إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ (অর্থাৎ, নিশ্চিতই তোমাদের মা'বুদ একজন।) কিন্তু বর্ণনার আগে তিনটি বিষয়ের শপথ করা হয়েছে। এসব শপথের নির্ভেজাল শাসনিক অনুবাদ এই :- শপথ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোদের, অতঃপর শপথ প্রতিরোধকারীদের, অতঃপর শপথ কোরআনে তোলাওয়াতকারীদের। কিন্তু এ তিন প্রকার লোক কারা? কোরআনে তার সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই। ফলে এর তফসীরে বিভিন্ন রকম উক্তি করা হয়েছে। কেউ বলেন : এখানে আল্লাহর পথে জেহাদকারী গাজীদেবকে বোঝানো হয়েছে, যারা মিথ্যা শক্তির বিরুদ্ধে বাহার প্রাচীর দাঁড় করার জন্যে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় এবং সারিবদ্ধ হওয়ার সময় যিকর তথা তসবীহ ও কোরআন তোলাওয়াতে মশগুল থাকে।

কেউ বলেন : আয়াতে সেসব নামাযীকে বোঝানো হয়েছে, যারা মসজিদে সারিবদ্ধ হয়ে শয়তানী চিন্তা-ভাবনা ও কাজকর্মের প্রতি বাধা আরোপ করে এবং নিজেদের সমগ্র ধ্যান ধারণাকে যিকর ও তোলাওয়াতে নিবদ্ধ করে দেয়।—(তফসীরে কবীর ও কুরতুবী) এতদ্ব্যতীত কোরআনের ভাষার সাথে তেমন সামঞ্জস্যশীল নয়, এ ধরনের আরও কিছু তফসীর বর্ণিত রয়েছে।

কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে স্বীকৃত তফসীর এই যে, আয়াতে ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে এবং তাদেরই তিনটি বিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম বিশেষণ হচ্ছে وَالصَّفَّاتِ صَفًّا এটি صف শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন জনসমষ্টিকে এক সরল রেখায় সন্নিবেশিত করা।—(কুরতুবী) কাজেই আয়াতের অর্থ হবে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো ব্যক্তিবর্গ।

এ সূরায়ই এরপরেও ফেরেশতাগণের সারিবদ্ধ হওয়ার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। ফেরেশতাগণের উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে وَإِلَّا لَتَنفَخُنَّ الْمَافِقُونَ অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এটা কখন হয়? এ প্রশ্নের জওয়াবে তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ) ও কাতাদাহ (রাঃ) প্রমুখ বলেন যে, ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা শূন্য পথে সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় উৎকর্ষ থাকে। যখনই কোন আদেশ হয়, তখনই তা কার্যে পরিণত করে।—(মায়হারী) কারণ কারও মতে এটা কেবল এবাদতের সময়ই হয়। অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ যখন এবাদত, যিকর ও তসবীহে মশগুল হয়, তখন সারিবদ্ধ হয়।—(তফসীরে কবীর)

শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ : আলাচ্য আয়াত থেকে জানা গেল যে, দুইনের প্রত্যেক কাজে নিয়ম ও শৃঙ্খলা ও উত্তম রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা কাম্য এবং আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয়। বলাবাহুল্য, আল্লাহ তাআলার এবাদত হোক কিংবা তাঁর আদেশ পালন হোক, উভয় কর্ম সারিবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে এলোমেলোভাবে একত্রিত হয়েও ফেরেশতাগণ সম্পাদন করতে পারত, কিন্তু এহেন বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে তাদেরকে সারিবদ্ধ হওয়ার তওফীক দেয়া হয়েছে। আয়াতে তাদের উত্তম গুণাবলীর মধ্যে সর্বপ্রথমে এ গুণটি উল্লেখ করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থা আল্লাহ তাআলার খুবই পছন্দনীয়।

নামাযে সারিবদ্ধ হওয়ার গুরুত্ব : বস্তুত মানবজাতিকেও এবাদতের সময় সারিবদ্ধ হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তৎপ্রতি জোর দেয়া হয়েছে। হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ্ বর্ণনা করেন যে, একদিন রসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে বললেন : তোমরা (নামাযে) সারিবদ্ধ হও না কেন, যেমন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার সামনে সারিবদ্ধ হয়? সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন : ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার সামনে কিভাবে সারিবদ্ধ হয়? তিনি জওয়াব দিলেন : তারা কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে গা ঘেঁষে দাঁড়ায় (অর্থাৎ, মাঝখানে জায়গা খালি রাখে না) — (তফসীরে মাযহারী)

নামাযের কাতার পূর্ণ করা ও সোজা রাখার উপর জোর দিয়ে এত অধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলো একত্রে সংগ্রহ করলে একটি পূর্ণ পুস্তিকা রচিত হতে পারে। হযরত আবু মাসউদ বদরী (রাঃ) বলেন : রসুলে করীম (সাঃ) নামাযে আমাদের কাঁধে হাত লাগিয়ে বলতেন : সোজা হয়ে থাক, আগে পিছে থেকো না। নতুবা তোমাদের অন্তরে অনৈক্য মাখাচাড়া দিয়ে উঠবে।—(মুসলিম, নাসায়ী)।

ফেরেশতাগণের দ্বিতীয় বিশেষণ **فَالْمُزَكَّاتُ** বর্ণিত হয়েছে। এটা **زجر** থেকে উৎপন্ন। অর্থ প্রতিরোধ করা, ধমক দেয়া, অভিশাপ দেয়া। হযরত থানভী (রহঃ) এর অনুবাদ করেছেন প্রতিরোধকারী। ফলে এ শব্দের সবগুলো সম্ভাব্য অর্থ এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। ফেরেশতাগণ কিসের প্রতিরোধ করে? কোরআন পাকের পূর্বাপর বর্ণনার প্রেক্ষিতে অধিকাংশ তফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, এখানে ফেরেশতাগণের সে কর্মকাণ্ড বোঝানো হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা শয়তানদেরকে উর্ধ্ব জগতে পৌঁছেতে বাধা দান করে। খোদ কোরআন পাকে এ সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা পরে উল্লেখিত হবে।

তৃতীয় বিশেষণ হচ্ছে **فَالْمُزَكَّاتُ** অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ ‘মিকর’ এর তেলাওয়াত করে। মিকরের মর্মার্থ উপদেশ বাক্যও হয় এবং আল্লাহর স্মরণও হয়। প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে যেসব উপদেশ নাযিল করেছেন, তারা সেগুলো তেলাওয়াত করে। এ তেলাওয়াত পূণ্য অর্জন ও এবাদত হিসেবেও হতে পারে অথবা ওহী বহনকারী ফেরেশতাগণ পয়গম্বরগণের সামনে উপদেশপূর্ণ প্রশী গ্রন্থ তেলাওয়াতের মাধ্যমে যে পয়গাম পৌঁছান, তাও বোঝানো যেতে পারে। পক্ষান্তরে ‘মিকর’ – এর অর্থ আল্লাহর স্মরণ নেয়া হলে উদ্দেশ্য হবে এই যে, তারা যেসব বাক্য পাঠে রত থাকে, সেগুলো আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা জ্ঞাপন করে।

কোরআন পাক এখানে ফেরেশতাগণের উল্লেখিত বিশেষণ বর্ণনা করে আনুগত্য ও দাসত্বের সব ক’টি গুণই সন্নিবেশিত করে দিয়েছে। অর্থাৎ, এবাদতের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে থাকা, আল্লাহর অবধ্যতা থেকে শয়তানী শক্তিসমূহকে প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহর বিধানাবলী ও উপদেশাবলী নিজে পাঠ করা ও অপরের কাছে পৌঁছানো। বলাবাহুল্য দাসত্বের কোন কর্মকাণ্ড এ তিনটি শাখার বাইরে থাকতে পারে না। অতএব উল্লেখিত চারখানি আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়াল এই যে, যে সব ফেরেশতা দাসত্বের যাবতীয় গুণের অধিকারী তাদের শপথ—একজনই তোমাদের সত্য মা’বুদ।

ফেরেশতাগণের শপথ করার কারণ : এ সূরায় বিশেষভাবে ফেরেশতাগণের শপথ করার কারণ এই যে, মক্কার কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা বলে অভিহিত করত। সেমতে সূরার

শুরুতেই ফেরেশতাগণের শপথ করে তাদের এমন গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে তাদের পরিপূর্ণ দাসত্ব প্রকাশ পায়। ফেরেশতাগণের এসব দাসত্ব জ্ঞাপক গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করলে তোমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের সম্পর্ক পিতা ও কন্যার নয়, বরং তাদের মধ্যে দাস ও প্রভুর সম্পর্ক।

আল্লাহ তাআলার নামে শপথ : কোরান পাকে আল্লাহ তাআলা ইমান ও বিশ্বাস সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়ের উপর জোর দেয়ার জন্যে বিভিন্ন ধরনের শপথ করেছেন। কখনও আপন সন্তার এবং কখনও বিশেষ বিশেষ সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বহু প্রশ্ন দেখা দিতে পারে বিষয় কোরআন পাকের তফসীরে এটি একটি স্বতন্ত্র ও মৌলিক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। হাফেয ইবনে কাইয়্যাম (রহঃ) এ সম্পর্কে ‘আস্তিবইয়ান ফী আকসামিল কোরআন’ নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। আল্লামা সুযুতী (রহঃ) উসুলে তফসীর সম্পর্কিত ‘এতকান’ গ্রন্থের ৬৭ তম অধ্যায়ে এ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে তার কিছু জরুরী অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম প্রশ্ন : আল্লাহ তাআলার শপথ করার ফলে প্রশ্ন আগে যে, তিনি তো পরম স্বয়ত্তর ও অমুখাপেক্ষী। কাউকে আশ্রিত করার জন্যে শপথ করার তাঁর কি প্রয়োজন?

এতকানে আবুল কাসেম কুশায়রী (রহঃ) থেকে এ প্রশ্নের জওয়াবে বর্ণিত রয়েছে যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার জন্যে শপথ করার কোনই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মানুষের প্রতি তাঁর অপার স্নেহ ও করুণাবশতই তিনি তা করেছেন। যাতে তারা কোন না কোন উপায়ে সত্য বিষয় কবুল করে নেয় এবং আযাব থেকে অব্যাহতি পায়। জনৈক মরুবাসী

وَفِي السَّمَاءِ رُزُقُهُمْ وَمَا تَوْعَدُونَ قَوْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَشَهِيدٌ

আয়াত শুনে বলতে লাগল : আল্লাহর মত মহান সন্তাকে কে অসম্ভব করল এবং কে তাঁকে শপথ করতে বাধ্য করল?

সারকথা, মানুষের প্রতি স্নেহ ও করুণাই শপথ করার কারণ। সাংসারিক বিবাদ-বিসংবাদ মীমাংসা করার সুবিদিত পন্থা যেমন দাবীর স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করার এবং সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে শপথ করা, তেমনি আল্লাহ তাআলা মানুষের এই পরিচিত পন্থাই নিজেও অবলম্বন করেছেন। তিনি কোথাও **شَهِدَ اللَّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** এবং কোথাও শপথ বাক্যের দ্বারা যেমন **أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ**

দ্বিতীয় প্রশ্ন : সাধারণতঃ শপথ করা হয় নিজের চেয়ে উত্তম সন্তার। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করেছেন, যা আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম তো নয়ই, বরং সব দিক দিয়েই অধম।

উত্তর এই যে, আল্লাহ তাআলা অপেক্ষা বড় কোন সত্তা যখন নেই এবং হতেও পারে না, তখন আল্লাহ তাআলার শপথ যে, সাধারণ সৃষ্টির শপথের মত হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। তাই আল্লাহ তাআলা কোথাও আপন সন্তার শপথ করেছেন যেমন **أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ** এ ধরনের শপথ কোরআন পাকে সাত জায়গায় বর্ণিত হয়েছে — কোথাও আপন কর্ম, গুণাবলী এবং কোরআনের শপথ করেছেন, যেমন — **وَالسَّمَاءِ وَمَا بَيْنَهُمَا**

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَا وَنَحْنُ وَمَا سَوَّيْنَاهَا এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কারণ, সৃষ্টবস্তু আধ্যাত্মজ্ঞানের মাধ্যম বিষয় পরিণামে

আল্লাহর সত্তা থেকে পৃথক নয়।— (ইবনে-কাইয়েম)

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে সৃষ্টবস্তুর শপথ করা হয়েছে। কোথাও কোন সৃষ্ট বস্তুর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করার লক্ষ্যে তার শপথ করা হয়েছে, যেমন-কোরআন পাকে রসুলে করীম (সাঃ)—এর আয়ুষ্কালের শপথ করে বলা হয়েছেঃ **لَعَنَّاكَ اللَّهُ كَلِمَةً سَكْرَةً مِمَّا قِيلَ** ইবনে মরদুবিয়াহ্ হযরত ইবনে-আব্বাসের উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা অধিক সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। তাই সমগ্র কোরআনে কোন নবী ও রসুলের সত্তার শপথ উল্লেখিত হয়নি; কেবল রসুলে করীম (সাঃ)—এর আয়ুষ্কালের শপথ উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে **وَالشُّرُوكُ كَذِبٌ مُّطْوَرٌ** — এর শপথও তুর পর্বত ও কিতাবের মহত্ব প্রকাশ করার জন্যে করা হয়েছে।

মাঝে মাঝে কল্যাণবল্ল হওয়ার কারণে কোন কোন বস্তুর শপথ করা হয়— যেমন, **وَالْيَتِيمَ وَالْزَّيُّونَ** কোন কোন ক্ষেত্রে কোন সৃষ্ট বস্তুর শপথ করা হয় এজন্যে যে, সে বস্তুর সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার মহান কুদরতের পরিচায়ক এবং বিশু সৃষ্টির পরিচয় লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপায় হয়ে থাকে। তবে সাধারণতঃ যে বস্তুর শপথ করা হয়, তার কিছু না কিছু প্রভাব সে বিষয়বস্তু প্রমাণে অবশ্যই থাকে, যার জন্যে শপথ করা হয়। প্রতিটি শপথের ক্ষেত্রে চিন্তা করলে এই প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

তৃতীয় প্রশ্ন : সাধারণ মানুষের জন্যে শরীয়তের প্রসিদ্ধ বিধান এই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কারও শপথ করা বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা যে সৃষ্টবস্তুর শপথ করেছেন, তা কি এ বিষয়ের প্রমাণ নয় যে, অন্যের জন্যেও গায়রুল্লাহর শপথ করা বৈধ? এ প্রশ্নের জওয়াবে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেনঃ

‘আল্লাহ তাআলা সৃষ্ট যে কোন বস্তুর শপথ করার এখতিয়ার রাখেন, কিন্তু অন্য কারও জন্যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন কিছুর শপথ করা বৈধ নয়।—(মাহহারী)

উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যদি নিজেকে আল্লাহ তাআলার অনুরূপ মনে করে, তবে তা নিতান্তই ভ্রান্ত ও বাতিল হবে। শরীয়ত সাধারণ মানুষের জন্যে গায়রুল্লাহর শপথ নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার ব্যক্তিগত কাজকে এর বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা বাতিল।

এখন উল্লেখিত আয়াতসমূহের তফসীর লক্ষ্য করুন।

প্রথম চার আয়াতে ফেরেশতাগণের শপথ করে বলা হয়েছে যে, তোমাদের সত্য মা’বুদ এক আল্লাহ্। শপথের সাথে সাথে উল্লেখিত ফেরেশতাগণের গুণাবলী সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলে যদিও এগুলো তওহীদেরই দলীল বলে মনে হয়, কিন্তু পরবর্তী হয় আয়াতে আলাদাভাবে তওহীদের দলীল বর্ণনা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

رَبُّ الْمَلَكُوتِ وَالْأَرْضِ وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ

— তিনি পালন-

কর্তা আসমানসমূহের, যমীনের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর এবং তিনি পালনকর্তা উদয়াচলসমূহের। অতএব যে সত্তা এতসব মহাসৃষ্টির স্রষ্টা ও পালনকর্তা, এবাদতের যোগ্যও তিনিই হবেন। সমগ্র সৃষ্টজগত তাঁর অস্তিত্ব ও একত্বের দলীল। এখানে **مُشَارِق** শব্দটি **مُشْرِق** এর বহুবচন। সূর্য বহুরের প্রতিদিন এক নতুন জায়গা থেকে উদিত হয়। তাই উদয়াচল অনেক। এ কারণেই এখানে বহুবচন পদবাচ্য হয়েছে।

السَّمَاءُ الدُّنْيَا — এখানে

অর্থ পৃথিবীর নিকটতম আকাশ। উদ্দেশ্য এই যে, আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি। এখন এটা জরুরী নয় যে, তারকারাজি আকাশগাত্রেই খচিত হবে, বরং আকাশ থেকে পৃথক হলেও পৃথিবী থেকে দেখলে আকাশেই খচিত বলেই মনে হবে। তারকারাজির কারণে গোটা আকাশ বলমল করতে থাকে। এখানে কেবল এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য যে, এই তারকা শোভিত আকাশ সাক্ষ্য দেয় যে, এগুলো আপনা-আপনি অস্তিত্ব লাভ করেনি, বরং একজন স্রষ্টা এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। যে সত্তা এসব মহান বস্তুকে অস্তিত্ব দান করতে সক্ষম তাঁর কোন শরীক বা অংশীদারের প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া মুশরিকদের কাছেও একথা স্বীকৃত যে, সমগ্র সৌরজগতের স্রষ্টাই আল্লাহ তাআলা। অতএব আল্লাহকে স্রষ্টা ও মালিক জেনেও অন্যের এবাদত করা সত্যি সত্যিই মহা অবিচার ও যুলুম।

কোরআন পাকের দৃষ্টিকোণে তারকারাজি আকাশগাত্রে গাঁথা, না আকাশ থেকে আলাদা, এছাড়া সৌর বিজ্ঞানের সাথে কোরআনের সম্পর্ক কি?— এই আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ‘সূরা-হিজরে’ বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ حَيَاطِينَ وَنَارًا থেকে

পৃথক আয়াতসমূহে শোভা ও সাজ-সজ্জা ছাড়া তারকারাজির আরও একটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলোর সাহায্যে দুট প্রকৃতির শয়তানদেরকে উর্ধ্ব জগতের কথাবার্তা শোনা থেকে বিরত রাখা হয়। শয়তানরা গায়েবী সংবাদ শোনার জন্যে আকাশের কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাদেরকে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শোনার সুযোগ দেয়া হয় না। কোন শয়তান যৎসামান্য শুনে পালালে তাকে শিখায়িত উচ্চাপিণ্ডের আঘাতে ধুংস করে দেয়া হয়, যাতে সে পৃথিবীতে পৌছে ভক্ত অতিন্দ্রিয়বাদী ও জ্যোতিষীদেরকে কিছু বলতে না পারে। এই জ্বলন্ত উচ্চাপিণ্ডকে **نَارُ السَّامِ** বলা হয়েছে।

উচ্চাপিণ্ডের কিছু বিবরণ সূরা হিজরে উল্লেখিত হয়েছে। তবুও এখানে এতটুকু বলে দেয়া প্রয়োজন যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতে উচ্চাপিণ্ড প্রকৃতপক্ষে ভূ-ভাগে উৎপন্ন এক প্রকার উপাদান, যা বাষ্পের সাথে উপরে উঠিত হয় এবং অগ্নিমণ্ডলের নিকটে পৌছে বিস্ফোরিত হয়ে যায়। কিন্তু কোরআন পাকের বাহ্যিক ভাষা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উচ্চাপিণ্ড ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোন উপাদান নয়, বরং উর্ধ্বজগতেই তা উৎপন্ন হয়। এখানে প্রাচীন তফসীরবিদগণের বক্তব্য ছিল এই যে, উচ্চাপিণ্ড সম্পর্কে গ্রীক দার্শনিকদের ধারণা নিছক অনুমান ও আদর্শের উপর নির্ভরশীল। কাজেই এর ভিত্তিতে কোরআনের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। এছাড়া ভূ-ভাগে উৎপন্ন কোন উপাদান উপরে পৌছে বিস্ফোরিত হয়ে গেলেও তা কোরআনের পরিপন্থী নয়।

কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এ প্রশ্নই খতম করে দিয়েছে। আধুনিক কালের বিজ্ঞানীদের ধারণা এই যে, উচ্চাপিণ্ড অসংখ্য তারকারাজিরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যা সাধারণতঃ বড় আকারের ইটের সমান হয়ে থাকে। এগুলো মহাশূন্যে অবস্থান করে এবং ৩০ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এগুলোর সমষ্টিতেই ‘উচ্চা’ (Shooting Star) বলা হয়। পৃথিবীর নিকটবর্তী হলে এরা পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হয়। তখন প্রচণ্ড বেগে এ উচ্চা ভূ-পৃষ্ঠের দিকে ছুটে আসে। বায়ুমণ্ডলের নিম্ন স্তরে ৬০ মাইল দূরত্বে পৌছলে তা বাতাসের ঘর্ষণে

প্রজ্বলিত ও ভস্মীভূত হয়। উর্ধ্বাকাশে পরিলক্ষিত অধিকাংশ উল্কাই বায়ুমণ্ডলে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যায়। (ইংরেজীতে এগুলোকে Meteoroid বলা হয়)। আগষ্টের ১০ তারিখ এবং নভেম্বরের ২৭ তারিখে এগুলো অধিক পরিলক্ষিত হয় এবং ২০ শে এপ্রিল, ২৮শে নভেম্বর, ১৮ই অক্টোবর ও ৬, ৯ ও ১৩ই ডিসেম্বরের রাতে হ্রাস পায়— (আল জাওয়াহির)

আধুনিক বিজ্ঞানের এই গবেষণা কোরআন পাকের বর্ণনার সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। যারা উল্কাপিণ্ডের সাহায্যে শয়তান ধ্বংস করাকে অলীক মনে করে, তাদের সম্পর্কে তানুতাতী মরহুম ‘আল্ জাওয়াহির’ গ্রন্থে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন :

কোরআন পাক সাময়িক সৌর-বিজ্ঞানের বিপরীতে কোন কথা বলুক, এটা আমাদের পূর্বপুরুষদের একশ্রেণীর জ্ঞানী ও দার্শনিকদের কাছে অসহনীয় ছিল। কিন্তু তফসীরবিদগণ তাদের ‘বৈজ্ঞানিক’ মতবাদ গ্রহণ করে কোরআনকে পরিত্যাগ করতে সম্মত হননি। বরং তারা বৈজ্ঞানিক মতবাদ পরিত্যাগ করে কোরআনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। কিছুদিন পর আপন-আপনিই একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও বাতিল ছিল। এখন বলুন, যদি আমরা স্বীকার করে নেই যে, এই তারকারাজি শয়তানদেরকে জ্বালায় পোড়ায় এবং কষ্ট দেয়, তবে এতে বাধা কিসের? আমরা কোরআন পাকের এই বর্ণনা স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় আছি যখন বিজ্ঞানও অবশেষে এ সত্য স্বীকার করে নেবে— (আল-জাওয়াহির ১৪ পৃঃ অষ্টম খণ্ড)

আসল উদ্দেশ্য : এখানে আকাশমণ্ডলী, তারকারাজি ও উল্কাপিণ্ডের আলোচনার এক উদ্দেশ্য তওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদ প্রমাণ করা। অর্থাৎ, যে সত্তা এককভাবে এই সুবিশাল সৌর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনিই এবাদত ও উপাসনার যোগ্য। দ্বিতীয়তঃ এতে তাদের ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যারা শয়তানদেরকে দেবতা অথবা উপাস্য সাব্যস্ত করে। কারণ, শয়তান এক বিতাড়িত ও পরাভূত সৃষ্টজীব। খোদায়ীর সাথে তাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

এছাড়া এই বিষয়বস্তুর ভেতর ওদেরও পরিপূর্ণ খণ্ডন রয়ে গেছে, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি অবতীর্ণ কোরআন তথা ওহীকে অতীন্দ্রিয় বিষয় বলে আখ্যায়িত করতো। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন পাক অতীন্দ্রিয়বাদীদের বিরোধিতা করে। তাদের জানা বিষয়সমূহের সর্ববৃহৎ উৎস হচ্ছে শয়তান। অথচ কোরআন বলে যে, শয়তানদের উর্ধ্ব জগত পর্যন্ত পৌছা সম্ভবপর নয়। তারা অদৃশ্য জগতের সত্য সংবাদ সঞ্চার করতে পারে না। অতীন্দ্রিয়বাদ সম্পর্কে কোরআন বর্ণিত এ বিশ্বাসের পর কোরআন ক্রিপ্পে অতীন্দ্রিয়বাদ হতে পারে? এভাবে আলোচ্য আয়াতসমূহ তওহীদ ও রেসালত উভয় বিষয়বস্তুর সত্যতার প্রতি ইংগিত বহন করে। অতঃপর এসব নভোমণ্ডলীয় সৃষ্ট বস্তুর মাধ্যমেই পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে।

তওহীদের বিশ্বাস সপ্রমাণ করার পর আলোচ্য ১১ থেকে ১৮ এই আটটি আয়াতে পরকালের বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে মুশরিকদের উত্থাপিত সন্দেহের জওয়াবও দেয়া হয়েছে। সর্ব প্রথম আয়াতে মানুষের পুনরুজ্জীবন যে সম্ভবপর, তার পক্ষে জোরালো যুক্তি পেশ করা হয়েছে। এই যুক্তির সারমর্ম এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত মহান

সৃষ্টবস্তুরূপে মোকাবেলায় মানুষ নেহায়েত দুর্বল সৃষ্টজীব। তোমরা যখন একথা স্বীকার কর যে, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা, চন্দ্র, তারকারাজি, সূর্য ও উল্কাপিণ্ডের ন্যায়, বস্তুসমূহকে স্বীয় কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তখন তার জন্যে মানুষের মত দুর্বল প্রাণীকে মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জীবিত করা কঠিন হবে কেন? শুরুতে যেমন তিনি তোমাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করে তোমাদের দেহে আত্মা সঞ্চারিত করেছিলেন, তেমনিভাবে মৃত্যুর পর যখন তোমরা পুনরায় মাটিতে পরিণত হয়ে যাবে, তখনও আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবেন।

‘আমি তাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি’—একথার এক অর্থ এই যে, তাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) মাটি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিলেন। দ্বিতীয় অর্থ প্রত্যেক মানুষই মাটি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন। কারণ, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের মূল উপাদান পানি মিশ্রিত মাটি। কেননা, প্রত্যেক মানুষের জন্ম বীর্য থেকে এবং বীর্য রক্ত দ্বারা গঠিত হয়। রক্ত খাদ্যের নির্যাস। খাদ্য যে কোন আকারেই থাকুক না কেন, উদ্ভিদ তার মূল পদার্থ, আর উদ্ভিদ মাটি ও পানি থেকে উৎপন্ন।

মোটকথা, প্রথম আয়াতে পরকাল বিশ্বাসের যুক্তিভিত্তিক দলীল পেশ করা হয়েছে এবং এটা স্বয়ং তাদের কাছেই এ প্রশ্ন রেখে শুরু করা হয়েছে যে, তোমরা কঠিনতর সৃষ্টজীব, না আমি যাদের উল্লেখ করেছি তারা কঠিনতর? জওয়াব বর্ণনা সাপেক্ষ ছিল না। অর্থাৎ, উল্লেখিতদের সৃষ্টিই কঠিনতর। তাই জওয়াব উল্লেখ করার পরিবর্তে একথা বলে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, “আমি তাদেরকে এঁটেল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।”

পরকালের যুক্তিপ্রমাণ শুনে মুশরিকরা যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করত, পরবর্তী পাঁচ আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে। মুশরিকদের সামনে পরকালের দূরকম প্রমাণ বর্ণনা করা হত। (১) যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ। যেমন, ১১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং (২) ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ। অর্থাৎ, তাদেরকে মো’জ্জেযা দেখিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর নবুওয়ত বর্ণনা করে বলা হত, তিনি আল্লাহর নবী। নবী কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না। তাঁর কাছে ঐশী সংবাদাদি আগমন করে। তিনি যখন বলেছেন যে, কেয়ামত আসবে, হাশর-নশর হবে এবং মানুষের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে, তখন তাঁর এসব সংবাদ নিশ্চিত সত্য। এসব মেনে নেয়া উচিত। যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি শুনে মুশরিকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে :

بَلْ كَذَّبُوا وَيَسْتَكْبِرُونَ وَلَئِنْ كُنَّا إِلَّا يَدْرُكُونَ — অর্থাৎ, আপনি তো

তাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও তারা পথে আসছে না। কিন্তু তারা উল্টো আপনার প্রমাণাদির প্রতি বিদ্রোহাণ বর্ষণ করে। তাদেরকে যতই বোঝানো হোক, তারা বোঝে না। ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির বেলায় তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে :

لَا تَأْتِيهِمْ سَاعَةٌ وَلَا يَذْكُرُونَ — অর্থাৎ, তারা আপনার নবুওয়ত ও

শেষ পর্যন্ত পরকালে বিশ্বাস জ্ঞাপন করতে পারে— এমন কোন মো’জ্জেযা দেখলে তাকেও বিদ্রোহাণে উড়িয়ে দিয়ে বলতে থাকে, এটা প্রকাশ্য যাদু। তাদের কাছে এই উপহাস ও ঠাট্টার একটি মাত্র দলীল আছে। তা এই যে,

لَا تَأْتِيهِمْ سَاعَةٌ وَلَا يَذْكُرُونَ

অর্থাৎ, এটা আমাদের কম্পনায়ও আসে না যে, আমরা অথবা আমাদের পিতৃপুরুষগণ মাটি ও হাড়ে পরিণত হওয়ার পর কেমন করে

পুনরুত্থিত হবে? ফলে আমরা কোনও যুক্তিভিত্তিক দলীল মানি না এবং কোন মোজ্বেয়া ইত্যাদিও স্বীকার করি না। আল্লাহ্ তাআলা এর জওয়াবে পরিশেষে একটি মাত্র বাক্য উল্লেখ করেছেন : **فَلْيَعْمُوا كَثِيرٌ دُخْرُونَ** অর্থাৎ, আপনি বলে দিন, হাঁ, তোমরা অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত হবে এবং লালিত ও অপমাণিত হয়ে জীবিত হবে।

পরকালের সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা প্রমাণ করার পর আল্লাহ্ তাআলা ১৯-২৬ আয়াতসমূহে হাশর-নশরের কিছু ঘটনা এবং পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর কাকের ও মুসলমানগণ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, তার আলোচনা করেছেন।

১৯ নং আয়াতে মৃতদের জীবিত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যে, **وَأَنفُثْنَا نَجْوَاهُ يَوْمَئِذٍ فَزَعَوْا لَنَجْوَئُهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ القبْرِ وَنَجْوَئُهُمْ** — অর্থাৎ, কৈয়ামত তো কেবল একটি বিকট আওয়াজ। আরবী ভাষায় **نَجْوَاهُ** শব্দের একাধিক অর্থ হয়ে থাকে। এক অর্থ গৃহপালিত পশুদেরকে প্রহসনাদাত্য করার জন্যে এমন আওয়াজ করা, যা শুনে তারা প্রস্থান করতে থাকে। এখানে মৃতদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে ইসরাফীল (আঃ) —এর শিংগায় দ্বিতীয় ফুৎকার বোঝানো হয়েছে। একে **نَجْوَاهُ** বলে ব্যক্ত করার কারণ এই যে, জন্তুদেরকে চালনা করার জন্যে যেমনি কিছু আওয়াজ করা হয়, তেমনি মৃতদেরকে জীবিত করার জন্যেও এই ফুৎকার দেয়া হবে। —(কুরত্বী)।

যদিও আল্লাহ্ তাআলা শিংগায় ফুৎকা দেয়া ছাড়াই মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম, কিন্তু হাশর ও নশরের দৃশ্যকে ভীতিপূর্ণ করার জন্যে শিংগায় ফুৎকা দেয়া হবে। (তফসীরে-কবীর) কাকেরদের উপর ফুৎকারের প্রভাব হবে এই যে, **وَأَنفُثْنَا نَجْوَاهُ يَوْمَئِذٍ فَزَعَوْا لَنَجْوَئُهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ القبْرِ وَنَجْوَئُهُمْ** —সহসাই তারা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। অর্থাৎ, দুনিয়াতে যেমন তারা প্রত্যক্ষ করতো তেমনি সেখানেও প্রত্যক্ষ করতে পারবে। কেউ কেউ এর মর্ম এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তারা অস্তির অবস্থায় একে অপরকে দেখতে শুরু করবে। —(কুরত্বী)।

أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ — অর্থাৎ, যারা শিরকের ন্যায় গুরুতর জুলুম করেছে, তাদেরকে এবং তাদের সতীর্থদেরকে একত্রিত কর। এখানে সতীর্থদের জন্যে **أَزْوَاجٌ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ “জোড়া”। এ শব্দটি স্বামী ও স্ত্রীর অর্থেও বহুল ব্যবহৃত। এ কারণেই কোন কোন তফসীরবিদ—এর অর্থ মুশরিক পুরুষদের ‘মুশরিক স্ত্রী’ বর্ণনা

করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে **أَزْوَاجٌ** —এর অর্থ সতীর্থই।

এ ছাড়া **وَمَا كُنَّا مُعِدِّينَ** —বাক্য দ্বারা বলে দেয়া হয়েছে যে, মুশরিকদের কাছে তাদের মিথ্যা উপাস্য প্রতিমা ও শয়তানদেরকেও একত্রিত করা হবে, দুনিয়াতে তারা যাদেরকে আল্লাহ্র সাথে অংশীদার করত। এভাবে হাশরের ময়দানে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্ব সকলের দৃষ্টিতে সন্দেহাতীতভাবে ফুটে উঠবে।

এরপর ফেরেশতাগণকে আদেশ করা হবে :

فَأَمُّرٌ مِّنْ رَبِّكَ وَأَطِيعُوا — অর্থাৎ, এদেরকে জাহান্নামের পথ

প্রদর্শন কর। তখন ফেরেশতাগণ ওদেরকে নিয়ে পুলসিরাতের নিকটে পৌছলে পুনরায় আদেশ হবে : **وَقَوْمَهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا** —এদেরকে থামাও, এদেরকে প্রশ্ন করা হবে। সেমতে সেখানে তাদেরকে বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করা হবে, যা কোরআন ও হাদীসের বহু স্থানে বর্ণিত রয়েছে।

হাশরের ময়দানে বড় বড় কাকের সর্দার তাদের অনুগামীদের সাথে সমবেত হয়ে একে অপরের কোন সাহায্য করতে পারবে না বরং তারা পরস্পর কথা কাটাকাটি শুরু করে দেবে। ২৭-৪০ আয়াতসমূহে একথা কাটাকাটিরই কিছুটা চিত্র ফুটিয়ে তুলে উভয় দলের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতসমূহের মর্ম সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উল্লেখযোগ্য।

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ —এ বাক্যে **يَخْشَى** শব্দের একাধিক

অর্থ হতে পারে। এক অর্থ শক্তি ও বল। উপরে এ অর্থ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা বেশ প্রবলভাবে আমাদের নিকট আসতে এবং বল প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে। এ তফসীরই অধিক পরিচ্ছন্ন ও প্রকৃষ্ট। এ ছাড়া **يَخْشَى** —এর অর্থ শপথও হয়ে থাকে। তাই কেউ কেউ এর তফসীর করেছেন যে, তোমরা আমাদের নিকট শপথ নিয়ে আসতে। অর্থাৎ, শপথ করে করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করতে যে, আমাদের ধর্ম সঠিক এবং রসুলের শিক্ষা (নাউযুবিল্লাহ) ভ্রান্ত। কোরআনের ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত উভয় তফসীরই স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাটে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَافِينَ ﴿١٠٠﴾ هَٰؤُلَاءِ
قَوْلُ رَبِّنَا إِذَا كُنَّا الْبُغُورَ ﴿١٠١﴾ فَأَوَّيْتُمْ كَمَا كُنَّا عَالِينَ ﴿١٠٢﴾ وَإِنَّمَا
يَوْمَ مِيزَانُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿١٠٣﴾ إِنَّا كُنَّا لَكَ نَفْعًا بِالْعَمْرِوَيْنِ ﴿١٠٤﴾
إِنَّمَا كُنَّا لَكَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّهِ إِلَّا اللَّهُ يَنْتَسِرُونَ ﴿١٠٥﴾ وَيَقُولُونَ
إِنَّمَا السَّارِكُوا مِنَ الْمَغَارِ لِيَعْمَلُوا ﴿١٠٦﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصْدَقَ
الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٧﴾ إِنَّا كُنَّا لَبِقْوِ الْعَذَابِ الْآلِيمِ ﴿١٠٨﴾ وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١١٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ
مَعْلُومٌ ﴿١١١﴾ قَوَائِمٌ ۖ هُمْ كَذُرُّومٌ ﴿١١٢﴾ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿١١٣﴾ عَلَى سُرُرٍ
مُنْتَشِلِينَ ﴿١١٤﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاهِنٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿١١٥﴾ بَعْضُهُمْ لَدَى
الْشَّرَابِ ۖ لَا فِيهَا عَمَلٌ وَلَا لَهُمْ عَنْهَا إِنْزُومٌ ﴿١١٦﴾ وَعِنْدَهُمْ قُبُورٌ
الظُّرُوفِ عَيْنٌ ﴿١١٧﴾ مَا هُنَّ بَعْضٌ شَتُونَ ﴿١١٨﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
يَتَسَاءَلُونَ ﴿١١٩﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿١٢٠﴾ يَقُولُ
إِنِّي أَتَىكَ لَمَنِ الْمَصْدَقَيْنِ ﴿١٢١﴾ إِذْ أَوْثَقْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۖ وَعَظَمًا
عَرَاكِلَ يَتُونُ ﴿١٢٢﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُقْتُلِعُونَ ﴿١٢٣﴾ فَأَقْلَمَ
قَوَائِمَ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿١٢٤﴾ تَالِ اللَّهِ إِن كَذَّبَ لَتَلَذِثْنِي ﴿١٢٥﴾

—এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান

হলে যে, যদি কেউ অপরকে অবৈধ কাজের দাওয়াত দেয় এবং তাকে পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করে, তবে পাপ কাজের প্রতি আহ্বান জানানোর কারণে আযাব অবশ্যই তাকেও ভোগ করতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তার আমন্ত্রণ কবুল করে, সে-ও আপন কর্মের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। ‘আমাকে অমুক ব্যক্তি পথভ্রষ্ট করেছিল’ একথা বলে সে পরকালে আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। তবে যদি সে পাপ কাজটি স্বেচ্ছায় না করে বরং জোর-জবরদস্তিতে পড়ে প্রাণ রক্ষার্থে করে থাকে, তবে ইনশাআল্লাহ্ সে ক্ষমা পাবে বলে আশা করা যায়।

জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর ৪১-৬১ আয়াতসমূহে জাহান্নামীদের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দশ আয়াতে সাধারণ জাহান্নামীদের আরাম-আয়েশ বিবৃত হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে একজন বিশেষ জাহান্নামীর শিক্ষাপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দশ আয়াতে বর্ণিত কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

—এ আয়াতের শাব্দিক অর্থ এই যে, তাদের

জন্ম এমন রুখী তথা খাদ্য-সামগ্রী রয়েছে, যার অবস্থা জানা হয়ে গেছে। তফসীরবিদগণ এর বিভিন্ন মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন, এতে বিভিন্ন সুরায় বর্ণিত বেহেশতী খাদ্য-সামগ্রীর বিশদ বিবরণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাকীমুল উম্মত হযরত খানভী (রহত্) এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন।

فَاَكْهَةٌ শব্দটি -এর বহুবচন। (যে ক্ষুধার প্রয়োজন মেটানোর

জন্মে নয়; বরং স্বাদ হাসিল করার জন্যে খাওয়া হয়, তাকেই আরবী ভাষায় **فُكْرَا** বলা হয়। ফল-মূলও স্বাদ হাসিল করার জন্যে খাওয়া হয়। তাই এর অনুবাদ করা হয় ‘ফল-মূল’। অন্যথায় এর অর্থ ফল-মূলের অর্থের চেয়ে ব্যাপক। ইমাম রাযী **فُكْرَا** শব্দ থেকে এ সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেছেন যে, জন্মাতে যেসব খাদ্য-সামগ্রী দেয়া হবে, তা সবই স্বাদ ভোগ করার জন্যে দেয়া হবে—ক্ষমা মেটানোর জন্যে নয়।

وَهُمْ مُكْرَمُونَ — বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, জান্নাতীদেরকে এ

রিষিক পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদাসহকারে দেয়া হবে। কারণ, সম্মান ব্যতীত সুস্থাদু খাদ্যও বিশ্বাদ হয়ে যায়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, কেবল খানা খাওয়ালেই মেহমানের হক আদায় হয়ে যায় না বরং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও তার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

—এটা জান্নাতীদের মজলিসের চিত্র। তারা

রাজ্যসনে মুখোমুখি হয়ে বসবে। কারও দিকে কারও পিঠ থাকবে না। এর বাস্তব চিত্র কি হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই সঠিক জানেন। কেউ কেউ বলেন, মজলিসের পরিমি এত সুদূর বিস্তৃত হবে যে, একে অপরের দিকে পিঠ করার প্রয়োজন হবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা জ্ঞানাতীদেরকে এমন দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি দান করবেন, যার ফলে তারা দূরে উপবিষ্টদের সাথে স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারবে।

—لَدَى—শব্দটি আসলে ধাতু। অর্থ সুস্বাদু হওয়া। তাই

কেউ কেউ বলেন, এখানে আসলে ছিল ذات لذة — অর্থাৎ, স্বাদবিশিষ্ট।

(৩০) এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কড়ত্ব ছিল না, বরং তোমরাই ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। (৩১) আমাদের বিপক্ষে আমাদের পালনকর্তার উক্তিই সত্য হয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই স্বাদ আবাদন করতে হবে। (৩২) আমরা তোমাদেরকে পঞ্চাষ্ট করেছিলাম। কারণ, আমরা নিজেরাই পঞ্চাষ্ট ছিলাম। (৩৩) তারা সবাই সেদিন শান্তিতে শরীর হবে। (৩৪) অপরাধীদের সাথে আমি এমন ব্যবহার করে থাকি। (৩৫) তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তখন তারা ওঁকতা প্রদর্শন করত (৩৬) এবং বলত, আমরা কি এক উদ্ভাবক কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব? (৩৭) না, তিনি সত্যসহ আগমন করেছেন এবং রসূলগণের সত্যতা স্বীকার করেছেন। (৩৮) তোমরা অবশ্যই বেদনাদায়ক শাস্তি আবাদন করবে। (৩৯) তোমরা যা করতে, তারই প্রতিফল পাবে। (৪০) তবে তারা নয়, যারা আল্লাহর বাছাই করা বান্দা। (৪১) তাদের জন্যে রয়েছে নির্ধারিত রুখী (৪২) ফল-ফুল এবং তারা সম্প্রানিত, (৪৩) নেয়ামতের উদ্যানসমূহ (৪৪) মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন। (৪৫) তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হতে বাধ্য পানপাত্র, (৪৬) সুখে যা পানকারীদের জন্যে সুখাদ্য। (৪৭) তাদের বাচ্চা বাচ্চা উপাদান নেই এবং তারা তা পান করে মালালও হবে না। (৪৮) তাদের কাছে থাকবে নত, আত্মলোচনা তরুণগণ, (৪৯) যেন তারা সুরক্ষিত ডিম। (৫০) অতঃপর তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (৫১) তাদের একজন বলবে, আমরা এক সঙ্গী ছিলাম। (৫২) সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, (৫৩) আমরা যখন মরে যাব এবং যাটি ও হাড়ে পরণিত হবে, তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হবে? (৫৪) আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি তাকে উকি দিয়ে দেখতে চাও? (৫৫) অতঃপর সে উকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাফখানে দেখতে পাবে। (৫৬) সে বলবে, আল্লাহর কসম, তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে।

এটা ধাতু হলেও ধাতু কর্তার অর্থে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।
এমতাবস্থায় অর্থ হবে, সেই পানীয় পানকারীদের জন্যে ‘সাক্ষাৎ স্বাদ’
হবে।

عَوْنٌ - رَفِيعًا عَوْنٌ -এর অর্থ কেউ ‘মাথাব্যথা’ এবং কেউ
‘পেটব্যথা’ বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ ‘দুর্গন্ধ ও আবর্জনা’ কেউ
‘মতিব্রম হওয়া’ উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দটি উল্লেখিত সব
অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে। হাকেম ইবনে জরীর বলেন, এখানে عَوْنٌ -এর
অর্থ আপদ। অর্থাৎ, জন্মান্তের শরাবে দুনিয়ার শরাবের মত কোন আপদ
হবেনা।

فَيْزُ الْكَرْبِ - অর্থাৎ, জন্মান্তের হৃদয়ের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে,
তারা হবে ‘আনতনয়না’। যেসব স্বামীর সাথে আল্লাহ তাআলা তাদের
দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে দেবেন, তারা তাদের ছাড়া কোন ভিন্ন
পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। আল্লামা ইবনে জওযী বর্ণনা করেন যে,
তারা তাদের স্বামীদেরকে বলবে, —আমার পালনকর্তার ইচ্ছ্যতের কসম,
জন্মান্তে তোমার চেয়ে উত্তম ও সুশ্রী পুরুষ আমার দৃষ্টিগোচর হয় না। যে
আল্লাহ আমাকে তোমার স্ত্রী এবং তোমাকে আমার স্বামী করেছেন, সমস্ত
প্রশংসা তাঁরই।

আল্লামা ইবনে জওযী فَيْزُ الْكَرْبِ -এর আরও একটি অর্থ এই
বর্ণনা করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীদের দৃষ্টি নত রাখবে। অর্থাৎ, তারা
নিজেরা এমন ‘অনিদা সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি নিবেদিতা’ হবে যে,
স্বামীদের মনে অন্য কোন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করার বাসনাই হবে না। —
(তফসীর যাদুল মাসীর)

كَأَنَّهُمْ يَبِغُونَ - এখানে জন্মান্তের হৃদগণকে লুকানো ডিমের
সাথে তুলনা করা হয়েছে। আরবদের কাছে এই তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত
ছিল। যে ডিম পাখার নিচে লুকানো থাকে, তার উপর বাইরের ধূলিকণার
কোন প্রভাব পড়ে না। ফলে তা খুব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন থাকে। এছাড়া এর

রঙ সাদা হলুদাভ হয়ে থাকে, যা আরবদের কাছে রমণীদের সর্বাধিক
চিন্তাকর্ষক রঙ হিসাবে গণ্য হত। তাই এর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

এক জন্মান্তী ও তার কাফের সঙ্গী : প্রথম দশ আয়াতে
জন্মান্তীদের ব্যাপক অবস্থা বর্ণনা করার পর কোন এক জন্মান্তীর বিশেষ
আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সে জন্মান্তের মজলিসে পৌছার পর
তার এক কাফের বন্ধুর কথা স্মরণ করবে। বন্ধুর দুনিয়াতে থাকাকালে
পরকাল অস্বীকার করত। অতঃপর আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে সে
জাহান্নামের অভ্যন্তরে উকি দিয়ে সে বন্ধুর সাথে কথা বলার সুযোগ পাবে।
কোরআন পাকে এই জন্মান্তী ব্যক্তির নাম-ঠিকানা উক্ত হয়নি। তাই
নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, সে কে? এতদসত্ত্বেও কোন কোন তফসীরবিদ
ধারণা করেছেন যে, সে মুমিন ব্যক্তিটির নাম ‘ইয়াহুদাহ’ এবং তার
কাফের সঙ্গীর নাম ‘মাতরুস’। তারাই সে সঙ্গীদ্বয়, যাদের উল্লেখ সূরা
কাহফের وَافِرٌ لَهُمْ مَثَلٌ يُكَلِّفُونَ আয়াতে করা হয়েছে।—(মাফহারী)।

কুসংসর্গ থেকে আত্মরক্ষার শিক্ষা : মেটকথা, জন্মান্তী ব্যক্তি
যে-ই হোক না কেন, এখানে এ ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য
মানুষকে শিক্ষা দেয়া যে, প্রত্যেকটি মানুষের উচিত তার বন্ধু মহলকে
যাচাই করে দেখা যে, তাদের মধ্যে কেউ তাকে জাহান্নামের পরিণতির
দিকে নিয়ে যাচ্ছে কি না। কুসংসর্গের সম্ভাব্য ধ্বংসকারিতার সঠিক
অনুমান পরকালেই হবে। তখন এ ধ্বংসকারিতা থেকে আত্মরক্ষার কোন
পথই খোলা থাকবে না। তাই দুনিয়াতেই যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে বন্ধুত্ব ও
একাত্মতার সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। প্রায়ই কোন কাফের অথবা
খোদাদ্রোহী ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পর মানুষ অজ্ঞাতেই তার
চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকে। এটা
পরকালীন পরিণতির জন্যে চরম বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়।

الصَّفَات

২৩৭

২৩ وما

وَلَوْلَا رَحْمَةُ رَبِّي لَكُنْتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝ أَقْبَاتُ
 يَسْتَعِينُ ۝ الْأَمْوَنَاتُ الْأُولَى وَمَا عُنْ بِمُعْذِرِينَ ۝ إِنْ
 هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْعُظَمَى ۝ لَيْسَ هَذَا إِلَّا عَمَلُ الْعَمَلُونَ ۝ أَذْكَ
 خَيْرٌ لِّزُلْ أَمْرُ شَجَرَةِ الرَّقُومِ ۝ إِنْ جَعَلْنَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ۝
 إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۝ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ زُرُّوسُ
 الشَّيْطَانِ ۝ وَأَنْتُمْ لَا تَكُونُونَ مِنْهَا قَائِلُونَ ۝ وَمِنْهَا الْبَطُونُ ۝
 ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَيْمٍ ۝ ثُمَّ إِنَّ رَمِيقَهُمْ لَكُلَّ
 الْجَحِيمِ ۝ إِنَّهُمْ الْقَوَائِمُ ضَالِّينَ ۝ فَهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ
 يَهْرَعُونَ ۝ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَقَدْ
 أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ۝ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُتَنَبِّئِينَ ۝ الرَّاعِمَاتُ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ ۝ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْمَ
 فَلْيَعْمَلِ الْمُجِبِّينَ ۝ وَجَنَّتْهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعُظَمَى
 وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝
 سَلَّمَ عَلَى نُوْمٍ فِي الْعَمَلِينَ ۝ إِنْ كَذَلِكَ يَجْزَى الْمُحْسِنِينَ ۝
 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْأَخْرِينَ ۝

(৫৭) আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের
 সাথেই উপস্থিত হতাম। (৫৮) এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না। (৫৯) আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমরা শান্তি প্রাপ্তও হব না। (৬০) নিশ্চয়
 এ-ই মহা সাফল্য। (৬১) এমন সাফল্যের জন্যে পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা
 উচিত। (৬২) এই কি উত্তম আগ্যায়ন, না যাকুম বৃক্ষ? (৬৩) আমি
 যালেমদের জন্যে একে বিপদ করেছি। (৬৪) এটি একটি বৃক্ষ, যা উদগত
 হয় জাহান্নামের মূলে। (৬৫) এর গুচ্ছ শয়তানের মস্তকের মত। (৬৬)
 কাফেররা একে ভক্ষণ করবে এবং এর দ্বারা উদর পূর্ণ করবে। (৬৭)
 তদুপর তাদেরকে দেয়া হবে। ফুটন্ত পানির মিশ্রণ, (৬৮) অতঃপর তাদের
 প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের দিকে। (৬৯) তারা তাদের পূর্বপুরুষদেরকে
 পেয়েছিল বিপথগামী। (৭০) অতঃপর তারা তাদের পদাংক অনুসরণে
 তৎপর ছিল। (৭১) তাদের পূর্বেও অগ্রবর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী
 হয়েছিল। (৭২) আমি তাদের মধ্যে ভীতিপ্রদর্শনকারী প্রেরণ
 করেছিলাম। (৭৩) অতঃপর লক্ষ্য করুন, যাদেরকে ভীতিপ্রদর্শন করা
 হয়েছিল, তাদের পরিণতি কি হয়েছে। (৭৪) তবে আল্লাহর বাছাই করা
 বান্দাদের কথা ভিন্। (৭৫) আর নূহ আমাকে ডেকেছিল। আর কি
 চমৎকারভাবে আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। (৭৬) আমি তাকে ও
 তার পরিবারবর্গকে এক মহাশংকেট থেকে রক্ষা করেছিলাম। (৭৭) এবং
 তার বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছিলাম। (৭৮) আমি তার জন্যে
 পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (৭৯) বিশ্বাসীদের মধ্যে নূহের
 প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। (৮০) আমি এভাবেই সংকল্প পরায়ণদেরকে
 পূরস্কৃত করে থাকি। (৮১) সে ছিল আমার ইমানদার বন্দাদের অন্যতম।
 (৮২) অতঃপর আমি অপরাপর সবাইকে নিমজ্জিত করেছিলাম।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মৃত্যুর বিলুপ্তিতে বিস্ময় প্রকাশ : এখানে জ্ঞানাতী ব্যক্তি সম্পর্কে
 উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে জ্ঞানাতের নেয়ামতসমূহ লাভ করে আনন্দের
 আতিশয্যে বলবে : আমাদের আর কখনও মৃত্যু হবে না কি ! এ বাক্যের
 উদ্দেশ্য এই নয় যে, সে জ্ঞানাতের অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করবে না, বরং
 চরম পর্যায়ের আনন্দ অর্জিত হওয়ার পর মানুষ প্রায়ই এমন কথা বলে
 ফেলে, যেন তার আনন্দ অর্জিত হয়েছে বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। জ্ঞানাতী
 ব্যক্তির বাক্যটিও এমনি ধরনের।

অবশেষে কোরআন পাক এ ঘটনার আসল শিক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ
 করে বলছে : **لَيْسَ هَذَا إِلَّا عَمَلُ الْعَمَلُونَ** অর্থাৎ, এমনি ধরনের
 সাফল্যের জন্যে আমলকারীদের আমল করা উচিত।

জাহান্নাম ও জ্ঞানাত উভয়ের কিছু কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর
 আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি লোককে এ বিষয়টির মূল্যায়ন করার দায়িত্ব
 দিয়েছেন যে, উভয়ের মধ্যে কোন্টি উত্তম তা চিন্তা করে দেখ। সেমতে
 ৬২-৭৪ আয়াতে বলা হয়েছে **أَذْكَ خَيْرٌ لِّزُلْ أَمْرُ شَجَرَةِ الرَّقُومِ**
 যেসব নেয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো উত্তম, না জাহান্নামীদের
 খাদ্য যাকুম বৃক্ষ উত্তম?

যাকুম কি? যাকুম নামের এক রকম বৃক্ষ আরব উপদ্বীপের তাহমা
 অঞ্চলে পাওয়া যায়। আল্লামা আলুসী লিখেন : এটা অন্যান্য অনূর্বর মর
 এলাকায়ও উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ বলেন, এটা সে বৃক্ষ যাকে উর্দুতে
 ‘খোহুড’ বলা হয়। এরই কাছাকাছি আরও একটি বৃক্ষ ভারতবর্ষে
 নাগফন’ বাংলায় ক্ষণীমনসা নামে খ্যাত। কেউ কেউ একেই যাকুম বলে
 সাব্যস্ত করেছেন এবং এটাই অধিক যুক্তিসম্মত। এ সম্পর্কে
 তফসীরবিদদের বিভিন্ন মত রয়েছে যে, দুনিয়ার এ যাকুমই জাহান্নামীদের
 খাদ্য হবে, না সেটা অন্য কোন বৃক্ষ? কেউ কেউ বলেন : আয়াতে দুনিয়ার
 যাকুমই বোঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের যাকুম
 হবে ভিন্ন বৃক্ষ; দুনিয়ার যাকুমের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বাহ্যতঃ
 মনে হয়, পৃথিবীতে যেমন সাপ-বিছ প্রভৃতি রয়েছে, তেমনি জাহান্নামেও
 আছে। কিন্তু জাহান্নামের সাপ-বিছ দুনিয়ার সাপ-বিছ অপেক্ষা বহুগুণে
 ভয়ঙ্কর হবে। এমনিভাবে জাহান্নামের যাকুমও প্রজাতি হিসাবে দুনিয়ার
 যাকুমের মত হলেও দুনিয়ার যাকুম অপেক্ষা অনেক বেশী কষ্টভঙ্ক হবে।

إِنَّا جَعَلْنَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ অর্থাৎ, আমি যাকুম বৃক্ষকে যালেমদের
 জন্যে ফেৎনা বানিয়েছি। এক্ষেত্রে কোন কোন তফসীরবিদ ‘ফেৎনার’ অর্থ
 করেছেন আযাব। অর্থাৎ, এ বৃক্ষকে আযাবের হাতিয়ার বানিয়েছি। কিন্তু
 অধিকাংশ তফসীরবিদের বক্তব্য এই যে ফেৎনার অর্থ ‘পরীক্ষা।’ উদ্দেশ্য
 এই যে, এ বৃক্ষের আলোচনা করে আমি পরীক্ষা করতে চাই যে, কে এর
 প্রতি বিশ্বাস করে, আর কে বিদ্রূপ করে? সেমতে আরবের কাফেররা এ
 পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা এ আযাবকে ভয় করে বিশ্বাস
 স্থাপন করার পরিবর্তে উপহাস ও ঠাট্টার পথ বেছে নিয়েছে। বর্ণিত আছে
 যে, কাফেরদেরকে যাকুম খাওয়ানোর আলোচনাসম্মিলিত আয়াতসমূহ
 অবতীর্ণ হলে আবু জাহ্ল তার সহচরদেরকে বলল : তোমাদের বন্ধু
 (মুহাম্মদ) বলে যে, আগুনের ভেতরে নাকি একটি বৃক্ষ আছে, অথচ
 আগুন বৃক্ষকে হজম করে ফেলে। খোদার কসম, আমরা জানি যে, খেজুর
 ও মাখনকে যাকুম বলা হয়। অতঃপর এসো এই খেজুর ও মাখন খেয়ে

নাও।—(দূররে মনসূর) আসলে বর্বরীয় ভাষায় খেজুর ও মাখনকে যাকুম বলা হয়। তাই আবু জাহল বিদ্রোপের এই পন্থা অবলম্বন করেছে। আল্লাহ তাআলা একটি মাত্র বাক্যে উভয় বিষয়ের জওয়াব দিয়ে দিয়েছেন :

إِنَّمَا سَجَّرَ حُمْرٌ فِي أَصْلِ الْحَبِيرِ অর্থাৎ, যাকুম তো জাহান্নামের গভীরে উদগত একটি বৃক্ষ। কাজেই এর অর্থ খেজুর ও মাখন নয় এবং আগুনের ভেতরে বৃক্ষ থাকার আপত্তিও যুক্তিসঙ্গত নয়। বৃক্ষটি যখন আগুনেই জন্ম লাভ করে, তখন আল্লাহ তাআলা এতে এমন বেশিষ্ট্য দিয়ে রেখেছেন যে, তা আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আগুনের সাহায্যে বিকশিত হয়। দৃষ্টান্তরূপ আগুনের মধ্যে জীবিত থাকতে পারে, এমন অনেক প্রাণী পৃথিবীতেও বিদ্যমান রয়েছে। আগুন তাদেরকে দহন করার পরিবর্তে আরও বিকশিত করে।

طَلْمَهَا كَأَنَّ مَوْسَى الشَّيْطَانِ — এতে যাকুম ফলকে শয়তানের মাখার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেউ কেউ এখানে شَيْطَانٍ এর অনুবাদ করেছেন, সাপ। অর্থাৎ, যাকুম ফল সাপের মত হয়ে থাকে। ফণিমনসা এ কারণেই বলা হয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, এখানে شَيْطَانٍ বলে তার সাধারণ অর্থই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই সে, যাকুম ফল শয়তানের মাখার ন্যায় কুৎসিত।

পূর্ববর্তী আয়াতে আলোচনা ছিল যে, প্রথম উম্মতদের কাছেও সতর্ককারী পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছিলেন, অধিকাংশ লোকই তাদের কথা মানেনি। ফলে তাদের পরিণতি খুবই অশুভ হয়েছে। এখানে ৭৫-৮২ আয়াতে এরই কিছু বিশদ বিবরণ পেশ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্ব প্রথম

হযরত নূহ (আঃ)—এর ঘটনা বিবৃত হয়েছে। অবশ্য তা বিস্তারিতভাবে সূরা হুদে বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে আয়াতসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় বিষয় উল্লেখ করা হচ্ছে।

وَلَقَدْ نَادَيْنَاوْهُ — এতে নূহের যে প্রার্থনা বোঝানো হয়েছে যাতে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে, “হে পরোয়ারদেগার, পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্যে একজনও অবশিষ্ট রেখো না।” বলে আবেদন জানান।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ — (আমি তার বংশধরকেই অবশিষ্ট রেখেছি।)

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত নূহ (আঃ)—এর সময়ে আগত জলোচ্ছ্বাসে পৃথিবীর অধিকাংশ জনবসতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এর পর তাঁরই তিন পুত্র থেকে সারা বিশ্বে মানব গোষ্ঠী বিস্তার লাভ করে।

وَوَكَّلْنَا عَلَيْهِ فِي الْغَمِّ نَوُحًا مِّنَ الْعَالَمِينَ — (আমি তার জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয়টি প্রচলিত রেখেছি যে, নূহের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বাসীদের মধ্যে।)—এর মর্মার্থ এই যে, আমি নূহ (আঃ)—এর পরবর্তী লোকদের দৃষ্টিতে তাকে সম্মানিত ও মহিমাম্বিত করে দিয়েছি। ফলে তারা কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর জন্যে নিরাপত্তার দোয়া করতে থাকবে। বাস্তব ঘটনাও তাই। সুতরাং বিশ্বে সমস্ত আসমানী ধর্ম গ্রন্থে হযরত নূহ (আঃ)—এর নবুওয়ত ও পবিত্রতায় বিশাসী মুসলমানদের কথা তো বলাই বাহুল্য, ইহুদী ও খ্রীষ্টানরাও তাঁকে নিজেদের নেতা বলে মান্য করে।

الصَّفَاتِ

৭৫.

৩৩৩

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا بِرُؤْيَيْنَا ۖ إِذْ جَاءَتْ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝
 إِذْ قَالَ لِرَبِّهِ وَوَقُومِهِ مَاذَا أَعْتَبُونَ ۖ قَالُوا مَا أَعْتَبُونَا اللَّهُ
 وَرُؤْيُونَا ۖ قَالُوا لَكُمْ رَبُّنَا الْعَلِيمِينَ ۖ قَطَّرْنَا نَقْرَةً فِي الثُّورِ ۖ
 فَقَالَ إِنِّي سَعِيدٌ ۖ قَاتِلُوا عَنْتَهُ مَذْيَبِينَ ۖ قَرَأَ إِلَى الْهَيْمِ
 فَقَالَ آلَا تَأْتَاكُونَ ۖ قَالُوا لَمْ نَسْطِقُونَ ۖ قَرَأَ عَلَيْهِ هُوَ
 صَوْرًا بِالْيَمِينِ ۖ قَالُوا وَاللَّهِ يَرْتُونَ ۖ قَالَ أَعْبُدُون مَا
 تَشْتَهُونَ ۖ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا الْبُتُولَةُ بَنَاتَانَا
 فَأَلْفَوْهُنَّ فِي الْحَيَاةِ ۖ فَادْرَأُوهُنَّ كَيْدًا فَجَعَلَهُنَّ الْمَسْكِينِينَ ۖ
 وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَعِيدٌ ۖ رَبِّي هَبْ لِي مِنَ
 الصَّالِحِينَ ۖ قَبَسَ لَهُ بِعِلْمِهِ حَلِيمٌ ۖ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ
 قَالَ يَبْنَؤُنِي إِنِّي أَرَى فِي السَّمَاءِ إِنِّي أَذْهَبُ ۖ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ۖ
 قَالَ يَا بَنَاتِ اجْعَلْنَ مَاؤُنَّ سَجْدَتِي ۖ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
 الصَّابِرِينَ ۖ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَكَلَّمَ الْحَبِيبِينَ ۖ وَكَامَنَ لَكُنَّ بِأَرْبَعِينَ
 قَدْ صَدَّقَتْ الرُّؤْيَا ۖ إِنَّكَ لَكُلِّكَ نَجْوَى الْمُحْسِنِينَ ۖ وَإِنْ
 هَذَا إِلَّا الْهُوَ الْبَلَاءُ الْيَمِينِ ۖ وَكَذَّبَتْهُ بِدَجْرِ عَظِيمٍ ۖ

(৬৩) আর নূশাঈদদেরই একজন ছিল ইবরাহীম। (৬৪) যখন সে তার পালনকর্তার নিকট সুস্থ হিঁটে উপস্থিত হয়েছিল, (৬৫) যখন সে তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিল : তোমরা কিসের উপাসনা করছ? (৬৬) তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত মিথ্যা উপাস্য কামনা করছ? (৬৭) বিশুদ্ধগতের পালনকর্তা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? (৬৮) অতঃপর সে একবার তরকাদের প্রতি লক্ষ্য করল। (৬৯) এবং বলল : আমি পীড়িত। (৭০) অতঃপর তারা তার প্রতি শিষ্ট ক্রিয়াকে চলে গেল। (৭১) অতঃপর সে তাদের দেবালয়ে গিয়ে দুকল এক বলল : তোমরা খাচ্ছ না কেন? (৭২) তোমাদের কি হল যে, কথা বলছ না? (৭৩) অতঃপর সে প্রকল আঘাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। (৭৪) তখন লোকজন তার দিকে ছুটে এলো ভীত-সন্ত্রস্ত পদে। (৭৫) সে বলল : তোমরা স্বহস্ত নির্মিত পাথরের পূজা কর কেন? (৭৬) অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমরা যা নির্মাণ করছ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। (৭৭) তারা বলল : এর জন্যে একটি ভিত নির্মাণ কর এক অতঃপর তাকে আগুনে জ্বপে নিক্ষেপ কর। (৭৮) তরকদের তারা তার বিরুদ্ধে মহা স্বভাবের আঁটতে চাইল, কিন্তু আমি তাদেরকেই পরাস্ত করে দিলুম। (৭৯) সে বলল : আমি আমার পালনকর্তার দিকে চললাম, তিনি আমাকে পক্ষপাতি করেন। (৮০) হে আমার পরওয়ারদেগার। আমাকে এক সম্পূর্ণ দান কর। (৮১) সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। (৮২) অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাকোঁরা করার ব্যয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাকে বলল : কস? আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি, এখন তোমার অতিমত কি দেখ। সে বললঃ পিতঃ! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাই করুন। আল্লাহ চাইলে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। (৮৩) যখন পিতা-পুত্র উভয়েই অনুগত প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তাকে যবেহ করার জন্যে শায়িত করল, (৮৪) তখন আমি তাকে ডেকে কলাম : হে ইবরাহীম, (৮৫) তুমি তো যবুকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সত্যকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। (৮৬) নিচয় এটা এক সুশ্রুটি পরীক্ষা। (৮৭) আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ করার জন্যে এক যখন ভক্ত।

হযরত নূহ (আঃ)—এর ঘটনার পর কোরআন পাক হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর পুত্রপরিবার জীবনের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করেছে। উভয় ঘটনায় হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর জন্যে অপূর্ণ ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার প্রথম ঘটনাটি বিবৃত হয়েছে, যার বিশদ বিবরণ সূরা আশ্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে ৮৩-৮৮ আয়াতে ঘটনাটি যে ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বটে।

وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا بِرُؤْيَيْنَا — যৌলিক মতবাদ ও পন্থা-পদ্ধতিতে

একমত লোকের দলকে আরবী ভাষায় شيعه বলা হয়। এখানে رُؤْيَيْنَا শব্দের সর্বনাম দ্বারা বাহ্যতঃ নূহ (আঃ)—কে বোঝানো হয়েছে। তাই আয়াতের মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পূর্বসূরী পয়গম্বর নূহ (আঃ)—এর পন্থাবলম্বী ছিলেন এবং ধর্মের যৌলিক নীতিসমূহে উভয়েরই পরিপূর্ণ একমত্যা ছিল। উভয়ের শরীয়তও একই রকম অথবা কাছাকাছি ছিল। উল্লেখ্য যে, কোন কোন ঐতিহাসিক রেওয়াজেত অনুযায়ী হযরত নূহ ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর মাঝে দু'হাজার ছ'শ চল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। তাদের মাঝে হযরত হুদ ও সালেহ (আঃ) ব্যতীত কোন নবী আবির্ভূত হননি।—(কাশশাফ)

إِذْ جَاءَتْ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ — এর নির্ভেজাল শাস্তিক অনুবাদ এই যে,

যখন তিনি আগমন করলেন তাঁর পালনকর্তার নিকট পরিচ্ছন্ন অন্তরে। আল্লাহর নিকট আগমন করার অর্থ আল্লাহর দিকে রুখ করা, তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করা এবং তাঁর এবাদত করা। এর সাথে “পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে” কথাটি যুক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর কোন এবাদত ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয় না, যতক্ষণ এবাদতকারীর মন প্রান্ত বিশ্বাস ও মন্দ প্রেরণা থেকে পবিত্র না হয়।

قَطَّرْنَا نَقْرَةً فِي الثُّورِ فَقَالَ إِنِّي سَعِيدٌ এসব আয়াতের পটভূমিকা

এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর সম্প্রদায় এক বিশেষ দিনে উৎসব উদযাপন করত। নির্ধারিত পরবর্তে দিনে তারা ইবরাহীম (আঃ)—কেও আমন্ত্রণ জানাল যে, আপনিও আমাদের সাথে উৎসবে চলুন। উদ্দেশ্য, হযরত ইবরাহীম (আঃ) উৎসবে যোগদান করলে হয়তো তাদের ধর্মের প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে নিজের ধর্মের দাওয়াত ত্যাগ করবেন—(দূররে মনসুর, ইবনে জরীর) কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) মনে মনে এই সুযোগকে অন্যভাবে ব্যবহার করতে চাইলেন যে, গোটা সম্প্রদায় উৎসব উদযাপন করতে চলে যাবে, তখন আমি তাদের দেবমন্দিরে প্রবেশ করে প্রতিমাসমূহকে ভেঙ্গে চূরমার করে দেব। যাতে তারা কিরে এসে মিথ্যা উপাস্যদের অসহায়ত্বের বাস্তব দৃশ্য স্চক্ষে দেখতে পায়। হয়তো বা এতে করে তাদের কারো কারো অন্তরে নিজেদের প্রতিমাসমূহকে অসহায় ও অক্ষম দেখে ইমান জাগ্রত হবে এবং সে শিরক থেকে তওবা করে নেবে। এ উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে উৎসবে যেতে অস্বীকার করলেন। আর অস্বীকারের পথ এই বেছে নিলেন যে, প্রথমে তারকার দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করলেন এবং অতঃপর বললেন : আমি অসুস্থ। সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে অপরাগ মনে করে ছেড়ে উৎসবে চলে গেল।

এ ঘটনার সাথে একাধিক তফসীর ও ফেকাহ সঙ্ক্রান্ত আলোচনার

সম্পর্ক রয়েছে। নিম্নে সেসব আলোচনার সারমর্ম উল্লেখ করা হল।

তারকার দিকে দৃষ্টিপাত করার উদ্দেশ্য : সর্ব প্রথম আলোচনা এই যে, জওয়াব দেয়ার পূর্বে ইবরাহীম (আঃ) যে তারকার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তার উদ্দেশ্য কি ছিল? কেউ কেউ বলেন : এটা নিছক একটা উদ্দেশ্যহীন ও অনিচ্ছাধীন কর্ম ছিল। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চিন্তা করার সময় মানুষ মাঝে মাঝে অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় আকাশের দিকে দেখতে থাকে। হয়রত ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন উৎসবে যোগদান করার দাওয়াত দেয়া হল, তখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এ দাওয়াত কিভাবে এড়ানো যায়। এই ভাবনার মধ্যেই তিনি অনিচ্ছায় তারকার দিকে দেখতে থাকেন এবং এরপর জওয়াব দেন। এ ব্যাখ্যাটি বাহ্যতঃ অমলিন মনে হলেও কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির আলোকে একে সঠিক বলে মনে নেয়া কঠিন। কারণ, প্রথমত : কোরআন পাকের বর্ণনাপদ্ধতি এই যে, সে ঘটনাবলীর কেবল গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী অংশই বর্ণনা করে এবং অনাবশ্যক বিবরণ বাদ দেয়। খোদা আলোচ্য আয়াতসমূহেই ঘটনার বেশ কয়েকটি অংশ উহ্য রয়েছে। এমনকি, ঘটনার পূর্ণ পটভূমিও বর্ণনা করা হয়নি। তাই এটা বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয় যে, কোরআন পাক ঘটনার পটভূমিকা তো দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকায় বাদ দিয়েছে অথচ ঘটনার সাথে দূরের সম্পর্কও নেই, এমন একটি নিশ্চিত অনিচ্ছাধীন কর্ম পূর্ণ এক আয়াতে ব্যক্ত করেছে। দ্বিতীয়তঃ তারকারাজিকে দেখার মধ্যে বিশেষ কোন রহস্য না থাকলে এবং এটা নিতান্তই অনিচ্ছাধীন কর্ম হলে আরবী ব্যাকরণ দৃষ্টে **فَقَطَّرَ نَظْرَهُ فِي النُّجُومِ** বলা উচিত ছিল — **فِي النُّجُومِ** নয়।

এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তারকারাজিকে দেখার মধ্যে ইবরাহীম (আঃ)-এর দৃষ্টিতে কোন বিশেষ উপযোগিতা ছিল। তাই কোরআন পাকও গুরুত্ব সহকারে এর উল্লেখ করেছে। এখন সে উপযোগিতা কি ছিল? এ প্রশ্নের জওয়াবে অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন : প্রকৃতপক্ষে হয়রত ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায় জ্যোতিঃশাস্ত্রের নিতান্ত ভক্ত ছিল। তাই তারকারাজি দেখে দেখে জওয়াব দিলেন, যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করে যে, তিনি নিজের অসুস্থতা সম্পর্কে যা বলেছেন, তা ভিত্তিহীন নয়, বরং তারকারাজির গতিবিধি লক্ষ্য করেই বলেছেন। ইবরাহীম (আঃ) নিজে যদিও জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশাসী ছিলেন না; কিন্তু উৎসবে যোগদান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে তিনি সে পন্থাই অবলম্বন করলেন, যা তাদের দৃষ্টিতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য। তিনি মুখে জ্যোতিঃশাস্ত্রের কোন বরাত দেননি এবং এ কথাও বলেননি যে, তারকারাজিকে দেখার উদ্দেশ্য জ্যোতিঃশাস্ত্রের সাহায্য নেয়া। তাই এতে মিথ্যার নাম-গন্ধও আবিষ্কার করা যায় না।

এখানে সন্দেহ হতে পারে যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর এই কর্ম দ্বারা হয়তো সে কাফেররা উৎসাহিত হয়ে থাকবে। যারা কেবল জ্যোতিঃশাস্ত্রেই বিশাসী ছিল না, বরং জগতের কাজ-কারবারে তারকারাজিকে সত্যিকার প্রভাবশালী বলেও মনে করত। এর জওয়াব এই যে, কাফেররা উৎসাহিত তখন হত, যখন ইবরাহীম (আঃ) পরবর্তী সময়ে পরিস্কারভাবে তাদের পন্থভ্রষ্টতা বর্ণনা না করতেন। এখানে তো যাবতীয় কলাকৌশলই অবলম্বন করা হচ্ছিল, তাদেরকে তওহীদের দাওয়াত অধিকতর কার্যকররূপে দেয়ার উদ্দেশ্যে। সেমতে এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই হয়রত ইবরাহীম (আঃ) সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটি পন্থভ্রষ্টতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন। তাই কেবল এই অস্পষ্ট কর্ম দ্বারা কাফেরদের উৎসাহিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এখানে আসল লক্ষ্য ছিল

উৎসবে যোগদানের দাওয়াত এড়িয়ে যাওয়া, যাতে তওহীদের দাওয়াতের জন্যে অধিক কার্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

ইবরাহীম (আঃ)-এর অসুস্থতার তাৎপর্য : আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তৃতীয় আলোচনা এই যে, হয়রত ইবরাহীম (আঃ) স্বগোত্রের আমন্ত্রণের জওয়াবে বলেছিলেন : **إِنِّي سَقِيمٌ** আমি অসুস্থ। এখানে প্রশ্ন এই যে, তিনি কি বাস্তবিকই তখন অসুস্থ ছিলেন? কোরআন পাকে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। কিন্তু সহীহ বুখারীর এক হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি তখন এমন অসুস্থ ছিলেন না যে, মেলায় যেতে পারেন না। তাই প্রশ্ন উঠে, তিনি একথা কেমন করে বললেন?

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে এ বাক্যের সাহায্যে হয়রত ইবরাহীম (আঃ) — “তওরিয়া” করেছিলেন। তওরিয়ার অর্থ এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তবের প্রতিকূলে এবং বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তবের অনুকূলে। এখানে ইবরাহীম (আঃ)-এর বাক্যের বাহ্যিক অর্থ তো এটাই যে, ‘আমি এখন অসুস্থ, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দিষ্ট অর্থ তা ছিল না। আসল অর্থ কি ছিল, সে সম্পর্কে তফসীরবিদগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ বলেন, এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানসিক সঙ্কোচন, যা স্বগোত্রের মুশরিকসুলভ কাণ্ডকীর্তি দেখে তাঁর মনে সৃষ্টি হচ্ছিল। এখানে **سَقِيمٌ** শব্দের ব্যবহার থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ, এটা **مريض** শব্দ অপেক্ষা অর্থের দিক দিয়ে অনেকটা হালকা। ‘আমার মন খারাপ বলেও এ অর্থ অনেকটা ব্যক্ত করা যায়। বলাবাহুল্য, এ বাক্যে ‘মানসিক সঙ্কোচন’ অর্থেরও পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, **إِنِّي سَقِيمٌ** বলে ইবরাহীম (আঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। কারণ, আরবী ভাষায় **اسم فاعل** এর পদবাচ্য বহুল পরিমাণে ভবিষ্যত কালের জন্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন, কোরআন পাকে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে— **إِنَّا نَحْنُ وَإِسْمَاعِيلُ** এর বাহ্যিক অর্থ আপনিও মৃত এবং তারাও মৃত। কিন্তু এখানে এরূপ অর্থ উদ্দেশ্য নয়, বরং অর্থ হল, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে। এমনভাবে হয়রত ইবরাহীম (আঃ) **إِنِّي سَقِيمٌ** এর অর্থ নিয়েছিলেন যে, “আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব।” একথা বলার কারণ এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক মানুষের অসুস্থ হওয়া স্থির নিশ্চিত। কেউ বাহ্যিকভাবে অসুস্থ না হলেও মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে মন-মেজাজে ক্রটি সংঘটিত হওয়া অবশ্যসম্ভাবী।

যদি কেউ এসব ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়, তবে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এই যে, হয়রত ইবরাহীম (আঃ) তখন বাস্তবিকই কিছুটা অসুস্থ ছিলেন; তবে উৎসবে যোগদানে প্রতিবন্ধক হতে পারে, এমন অসুস্থতা ছিল না। তিনি তাঁর মামুলী অসুস্থতার কথাই এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন, যাতে শ্রোতার মনে করে নেয় যে, তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কাজেই মেলায় যাওয়া সম্ভবপর নয়। ইবরাহীম (আঃ)-এর তওরিয়া এ ব্যাখ্যা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত এবং সম্ভোজনক। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে ইবরাহীম (আঃ)-এর উক্তি **إِنِّي سَقِيمٌ** এর জন্যে **كُذِّبَ** (মিথ্যা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। উপরোক্ত ব্যাখ্যা দৃষ্টে এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে, এর অর্থ তওরিয়া, যা বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে মিথ্যা মনে হয়, কিন্তু বক্তার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করলে মিথ্যা হয় না। এ হাদীসেরই কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে :

এগুলোর মধ্যে কোন মিথ্যা এরূপ নয়, যা আল্লাহর দ্বীনের প্রতিরক্ষা ও

সমর্থনে বলা হয়নি।

এ বাক্যটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এখানে **كُذِبَ** শব্দটি সাধারণ অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ রাখে। এ হাদীস সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত বিবরণ সূরা আশ্বিয়ার **بَلَّغْنَاكَ كُذِبَ** আয়াতের অধীনে বর্ণিত হয়েছে।

তওরিয়্যার শরীয়তসম্মত বিধান : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে এ বিষয়টি জানা যায় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তওরিয়্যা করা জায়েয। তওরিয়্যা দুই প্রকার। (এক) - উক্তিগত। অর্থাৎ, এমন কথা বলা, যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তব ঘটনার প্রতিফল, কিন্তু বস্তুর উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তব ঘটনার অনুকূল। (দুই) - কর্মগত। অর্থাৎ, এমন কাজ করা, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধারণ দর্শকের বোঝে নেয়া উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন। একে ‘**ঈহাম**’-ও বলা হয়। তারকারাছির দিকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দৃষ্টিপাত করাও অমিকাশে তফসীরবিদের মতে ঈহামই ছিল এবং নিজে থেকে অসুস্থ বলা ছিল তওরিয়্যা।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত উভয় প্রকার তওরিয়্যা স্বল্প রসূলে করীম (সাঃ) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনার পথে ছিলেন এবং কাকেররা তাঁর সন্ধান করছিল, তখন পথে এক ব্যক্তি হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল : ইনি কে? হযরত আবুবকর জওয়াব দিলেন : **هو هادى يدينى** “ইনি আমার পঞ্চপ্রদর্শক, আমাকে পথ দেখান।” এতে লোকটি সাধারণ পঞ্চপ্রদর্শক বোঝেই চলে যায়। অথচ হযরত আবুবকরের উদ্দেশ্য ছিল, “ইনি আমার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক।” — (রুহুল মা’আনী)

এমনিভাবে হযরত কা’ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জেহাদের জন্যে কোন দিকে যেতে হলে মদীনা থেকে বের হওয়ার সময় সেদিকে রওয়ানা হওয়ার পরিবর্তে অন্যদিকে রওয়ানা হতেন, যাতে দর্শকরা সঠিক গন্তব্যস্থল জানতে না পারে। এটা ছিল কর্মগত তওরিয়্যা তথা ঈহাম। — (মুসলিম)

কৌতুক ও হাস্যরসের ক্ষেত্রেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে তওরিয়্যার প্রমাণ আছে। শামায়েল তিরমিযীতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার এক বৃদ্ধাকে দেখে কৌতুকচ্ছলে বললেন : কোন বৃদ্ধা জন্মতে যাবে না। বৃদ্ধা একথা শুনে হায় আফসোস শুরু করলে তিনি এর ব্যাখ্যা করে বললেন : বৃদ্ধাদের জন্মতে না যাওয়ার অর্থ এই যে, তারা বৃদ্ধাশ্রয় জন্মতে যাবে না - যোড়শী যুবতী হয়ে যাবে।

পুত্র কোরবানীর ঘটনা : ৯৯-১১০ আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পবিত্র জীবনালেখ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র জন্যে তাঁর একমাত্র পুত্রের কোরবানী পেশ করেছিলেন। এখানে কয়েকটি ঐতিহাসিক বিবরণ বর্ণনা করা হচ্ছে।

..... **وَكُلَّامًا بَالِغًا إِلَىٰ رَبِّهِ** — (ইবরাহীম (আঃ) বললেন : আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের দিকে চললাম।) দেশবাসীর তরফ থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়েই তিনি একথা বলেছিলেন। সেখানে তাঁর ভাগিনেয় লূত (আঃ) ব্যতীত কেউ তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেনি। পরওয়ারদেগারের দিকে চলে যাওয়ার অর্থ দারুল-কুফর পরিত্যাগ করে আমার পরওয়ারদেগার যেখানে আদেশ করেন, সেখানে চলে যাব। সেখানে আমি তাঁর এবাদত করতে পারব। সেমতে তিনি পত্নী সারা ও ভাগিনেয় হযরত লূতকে সাথে নিয়ে গেলেন এবং ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে অবশেষে সিরিয়ায় পৌঁছলেন। তখনো পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কোন

সন্তান ছিলনা। তাই তিনি পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত দোয়া করলেন।

رَبِّهِ يٰكُفِّرْ بَدَنِي (পরওয়ারদেগার, আমাকে সংপূত্র দান কর।) তাঁর এ দোয়া কবুল হয় এবং আল্লাহ তাআলা তাঁকে এক পুত্রের সুস্বাদ দেন।

فَكَرَّمَهُ بِإِسْحَاقَ — (অতঃপর আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুস্বাদ দিলাম।) “সহনশীল” বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ নবজাত তার জীবনে সবর, ধৈর্য ও সহনশীলতার এমন পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে, যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার কেউ পেশ করতে পারবে না। এ পুত্রের জন্মলাভের ঘটনা এই : হযরত সারা যখন দেখলেন যে, তাঁর গর্ভে কোন সন্তান হচ্ছে না, তখন তিনি নিজেকে কষ্টাই মনে করলেন। এদিকে মিসরের সম্রাট ফেরাউন তার হাজেরা নাম্নী কন্যাকে হযরত সারার খেদমতের জন্যে দান করেছিল। হযরত সারা হাজেরাকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর খেদমতে দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি তাকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে নিলেন। এ হাজেরার গর্ভেই এ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তার নাম রাখেন ইসমাইল।

فَلَمَّا بَلَغَ مِمَّا مَلَاقَتْهُ الْكَافِرَاتِ الْيُفَىٰ كَانَ فِي الْأُفَىٰ أَذًى

— (অতঃপর যখন পুত্র পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম (আঃ) বললেন : বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি।) কোন কোন রেওয়াজে থেকে জানা যায় যে, এই স্বপ্ন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে উপর্যুপরি তিন দিন দেখানো হয়। — (কুতুবী) একথা স্বীকৃত সত্য যে, পঞ্চপুরুষগণের স্বপ্নও গৃহীত বটে। তাই এ স্বপ্নের অর্থ ছিল এই যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি একমাত্র পুত্রকে যবেহ করার হুকুম হয়েছে। এ হুকুমটি সরাসরি কোন ফেরেশতায় মাধ্যমেও নাহিল করা যেত, কিন্তু স্বপ্নে দেখানোর তাৎপর্য হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আনুগত্য পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাওয়া। স্বপ্নের মাধ্যমেও প্রদত্ত আদেশে মানব মনের পক্ষে ভিন্ন অর্থ করার যেকোন অবকাশ ছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) ভিন্ন অর্থের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র আদেশের সামনে মাথা নত করে দেন। — (তফসীর-কবীর)

এছাড়া এখানে আল্লাহ তাআলার প্রকৃত লক্ষ্য হযরত ইসমাইল (আঃ)-কে যবেহ করা ছিল না কিংবা ইবরাহীম (আঃ)-কেও এ আদেশ দেয়া ছিল না যে, প্রাণপ্রতিম পুত্রকেই যবেহ করে ফেল। বরং উদ্দেশ্য ছিল যে, নিজের পক্ষ থেকে যবেহ করার সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করে যবেহ করতে উদ্যত হয়ে যাও। বস্তুতঃ এ নির্দেশ সরাসরি যৌষিক দেয়া হলে তাতে পরীক্ষা হতো না। তাই তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, তিনি পুত্রকে যবেহ করছেন। এতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) বোঝে নিলেন যে, যবেহ করার নির্দেশ হয়েছে এবং তিনি যবেহ করতে পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। এভাবে পরীক্ষাও পূর্ণতা লাভ করল এবং স্বপ্নও সত্যে পরিণত হল। অথচ যৌষিক আদেশের মাধ্যমে হলে তাতে পরীক্ষা হত না। অতীত পরে রহিত করতে হত। এ বিষয়টি কত যে ভীষণ পরীক্ষা সেদিকে ইঙ্গিত করার জন্যে এখানে **فَلَمَّا بَلَغَ مِمَّا مَلَاقَتْهُ الْكَافِرَاتِ الْيُفَىٰ** কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, অনেক কামনা-বাসনা ও দোষা-প্রার্থনার পর পাওয়া এই প্রাণপ্রতিম পুত্রকে কোরবানী করার নির্দেশ এমন সময় দেয়া হয়েছিল, যখন পুত্র পিতার সাথে চলা-ফেরার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল এবং লালন-পালনের দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করার পর এখন সময় এসেছিল আপদ-বিপদে তাঁর পার্শ্বে দাঁড়ানোর। তফসীরবিদগণ লিখেছেন যে, সে

সময় হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর বয়স ছিল তের বছর। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি সাবালক হয়ে গিয়েছিলেন। — (মাযহরী)

لَمَّا كَانَتْ اَرْبَعَةَ عَشَرَ (অতএব তুমিও ভেবে দেখ, তোমার অতিমত কি?) হযরত ইবরাহীম (আঃ) একথা হযরত ইসমাইলকে এজন্যে জিজ্ঞেস করেননি যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালনে কোনরূপ সন্দেহ ছিলেন। বরং প্রথমতঃ তিনি পুত্রের পরীক্ষাও নিতে চেয়েছিলেন যে, এ পরীক্ষায় সে কতদূর উত্তীর্ণ হয়? দ্বিতীয়তঃ পয়গম্বরদের চিরন্তন কর্মপদ্ধতি এই যে, তাঁরা আল্লাহর আদেশ পালনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, কিন্তু আনুগত্যের জন্যে সর্বদা উপায়সী ও যত্নসম্পন্ন সহজ পথ অবলম্বন করেন। যদি ইবরাহীম (আঃ) পূর্বাঙ্কে কিছু না বলেই পুত্রকে যবেহ করতে উদ্যত হতেন, তবে বিষয়টি উভয়ের পক্ষেই কঠিন হয়ে যেতে পারত। তিনি পরামর্শের ভিত্তিতে ব্যাপারটি উল্লেখ করলেন, যাতে পুত্র পূর্ব থেকেই আল্লাহর নির্দেশের কথা জেনে যবেহর ব্যাপারে প্রস্তুত হতে পারে। এছাড়া পুত্রের মনে কোনরূপ দ্বিধা-দুন্দু সৃষ্টি হলেও তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সম্মত করা যাবে। — (রহুল মা'আনী, বয়ানুল-কোরআন)

কিন্তু সে পুত্রও ছিলেন স্বীকৃতপুত্রই পুত্র, তাবী পয়গম্বর। তিনি জওয়াব দিলেন : يَا أَبَتِ اِنَّكَ اَكْبَرُ (পিতঃ আপনাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা সেয়ে ফেলুন।) এতে হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর অতুলনীয় বিনয় ও আত্মনিবেদনের পরিচয় তো পাওয়া যায়ই, তদুপরি প্রতীয়মান হয় যে, এহেন কঠি বয়সেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে কি পরিমাণ স্নেহ ও জ্ঞান দান করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সামনে আল্লাহর কোন নির্দেশের বরাত দেননি—বরং একটি স্বপ্নের কথা বলেছিলেন যত্র। কিন্তু ইসমাইল (আঃ) বোঝে গিলেন যে, পয়গম্বরদের স্বপ্নও শুই হয়ে থাকে। কাজেই এ স্বপ্নও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর একটি নির্দেশ। অতএব তিনি জওয়াবে স্বপ্নের পরিবর্তে নির্দেশের কথা বললেন।

হযরত ইসমাইল (আঃ) নিজের পক্ষ থেকে পিতাকে এ আশ্বাসও দিলেন যে, سَيَكُنْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীদের মধ্যে পাবেন।) এ বাক্যে হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর চূড়ান্ত আদব ও বিনয় লক্ষ্যণীয়। প্রথমতঃ তিনি “ইনশাআল্লাহ” বলে ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছেন এক ও ওয়াদার দাবীর যে বাহ্যিক আকার ছিল, তাও স্বতম করে দিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি একথাও বলতে পারতেন, “ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন”, কিন্তু এর পরিবর্তে তিনি বললেন, “সবরকারীদের মধ্যে পাবেন।” এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সবর ও সহনশীলতা একা আমারই কৃতিত্ব নয়, বরং দুনিয়াতে আরও বহু সবরকারী হয়েছেন। ইনশাআল্লাহ আমিও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। এভাবে তিনি উপরোক্ত বাক্যে অহংকার, ও অহমিকার নাম গন্ধটুকু পর্যন্ত স্বতম করে দিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় ও বশ্যতা প্রকাশ করেছেন। — (রহুল মা'আনী) এর দ্বারা এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, মানুষ কোন ব্যাপারে নিজের উপর যত আত্মবিশ্বাসই পোষণ করুক না কেন, পর্ব ও অহংকার প্রকাশ পেতে পারে এমন দাবী করা মোটেই উচিত নয়। কোথাও এমন কথা বলার প্রয়োজন হলে তাহা এমন হওয়া উচিত যাতে নিজের পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা প্রকাশ পায়।

لَمَّا كَانَتْ اَرْبَعَةَ عَشَرَ (যখন তাঁরা উভয়েই নত হয়ে গেলেন।) শব্দের অর্থ নত হওয়া, অনুগত হওয়া ও কবীভূত হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা যখন আল্লাহর নির্দেশের সামনে নত হয়ে পিতা-পুত্রকে যবেহ করতে এক পুত্র যবেহ হতে সম্মত হলেন। এরপর কি হল, তা এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতা-পুত্রের এই আত্ম নিবেদনমূলক কার্যক্রম এমন বিশ্বশ্রবক ও অভাবিত ছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ইতিহাস ও তফসীরভিত্তিক কোন কোন রেওয়াজেতে জানা যায় যে, শয়তান তিন বার হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে প্রতারিত করার চেষ্টা করে এক ইবরাহীম (আঃ) প্রত্যেক বারই তাকে সাতটি কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাড়িয়ে দেন। অদ্যাবধি এই প্রশংসনীয় কাজের স্মৃতি যীনায তিন বার কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। অবশেষে পিতা-পুত্র উভয়েই যখন এই অভিনব এবাদত উদযাপন করার উদ্দেশ্যে কোরবানগাহে পৌছলেন, তখন ইসমাইল (আঃ) পিতাকে বললেন, পিতঃ আমাকে খুব শক্ত করে ধৈষে নিন, যাতে আমি বেশী ছটকট করতে না পারি। আপনার পরিবেশ বশতও সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিটা তাতে না পড়ে। এতে আমার সওয়াব হাস পেতে পারে। এছাড়া রক্ত দেখলে আমার মা অশ্লিক ব্যাকুল হবেন। আপনার ছুরিটাও ধার দিয়ে নিন এক তা আমার প্লায় দ্রুত চলাবেন যাতে আমার প্রাণ সহজে বের হয়ে যায়। কারণ, মৃত্যু বড় কঠিন ব্যাপার। আপনি আমার মায়ের কাছে পৌছে আমার সলাম বলবেন। যদি আমার জামা তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চান, তবে নিয়ে যাবেন। হয়তো এতে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন। একমাত্র পুত্রের মুখে এসব কথা শুনে পিতার মানসিক অবস্থা যে কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) দৃঢ়তার অটল পাহাড় হয়ে জওয়াব দিলেন : বস, আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্যে তুমি আমার চমৎকার সহায়ক হয়েছ। অতঃপর তিনি পুত্রকে চুম্বন করলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নেত্র তাকে ধৈষে গিলেন।

وَلَمَّا كَانَتْ اَرْبَعَةَ عَشَرَ (এবং তাকে উপড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেন যে, তাকে কাত করে এমনভাবে শুইয়ে দিলেন, যাতে কপালের এক দিক মাটি স্পর্শ করেছিল। (মাযহরী) আভিধানিক দিক দিয়ে এ তফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ, আরবী ভাষায় كَبَّرَ কপালের দুই পার্শ্বকে বলা হয়। কপালের মধ্যস্থলকে বলা হয় مَكَّة-এ কারণেই হযরত খানজী (রহঃ) এর অনুবাদ করেছেন, বালুর উপর শুইয়ে দিলেন। কিন্তু অন্যান্য কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ করেছেন “উপড় করে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।” যাই হোক ঐতিহাসিক রেওয়াজেতে এভাবে শোয়ানোর কারণ বর্ণিত হয়েছে যে, শুরুতে ইবরাহীম (আঃ) তাকে সোজা করে শুইয়ে দিলেন, কিন্তু বার বার ছুরি চালানো সত্ত্বেও পলা কাটছিল না। কেননা, আল্লাহ তাআলা স্বীয় ক্রুরত পিতলের একটি টুকরা মাঝখানে অন্তরায় করে দিয়েছিলেন। তখন পুত্র নিজেই আবদার করে বললেন পিতঃ আমাকে কাত করে শুইয়ে দিন। কারণ, আমার মুখমণ্ডল দেখে আপনার মধ্যে পৈতৃক স্নেহ উথলে উঠে। ফলে পলা পূর্ণরূপে কাটা হয় না এছাড়া ছুরি দেখে আমিও ঘাবড়ে যাই। সেমতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাকে এভাবে শুইয়ে ছুরি চালাতে থাকেন। — (মাযহরী)

وَلَمَّا كَانَتْ اَرْبَعَةَ عَشَرَ (আমি তাকে ডেকে

বললাম : হে ইবরাহীম তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ।) অর্থাৎ, আল্লাহর আদেশ পালনে তোমার যা করণীয় ছিল, তাতে সত্যি নিজের পক্ষ থেকে কোন ক্রটি রাখনি। (স্বপ্নও সম্ভবতঃ এ বিষয়টিই শোনা হইছিল যে, ইবরাহীম (আঃ) যবেহ করার জন্য পুত্রের প্লায় ছুরি চালাচ্ছেন।) এখন এই পরীক্ষা পূর্ণ হয়ে গেছে। তাই তাকে ছেড়ে দাও।

الْفَتْتِ ৩৮

৩৫১

৩৩ وما

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۖ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ۖ كَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۖ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَبَشِّرْهُ
 بِأَسْمٰقَ نَبِيَّآءٍ مِّنَ الصّٰلِحِينَ ۖ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْحٰقَ وَ
 مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا الْحُسَيْنَ ۖ وَظَلَمْنَا لِنَفْسِهِ مِيزِينَ ۖ وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ
 مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ وَخَيَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۖ
 وَنَصَرْنَاهُمْ فَمَا نَالُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۖ وَلَآئِيْنَاهُمَا الْكِتَابُ الْمُسْتَبِينَ ۖ
 وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۖ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي
 الْآخِرِينَ ۖ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۖ إِنَّكَ ذٰلِكَ نَجْزِي
 الْمُحْسِنِينَ ۖ إِنَّهُمْ مِّنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَكَانَ الْيَاسَ
 كِينُ الْمُؤْمِلِينَ ۖ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَلَا تَتَّقُونَ ۚ اَتَدْعُونَ
 بَعْلًا وَتَذَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۖ اَللّٰهُ رَكَّبَكُمْ وَابَاكُمْ
 الْاَوَّلِينَ ۖ فَكَذَّبُوهُ فَاتَّبَعُوْهُ لَهْزَعًا رَّجُلًا ۚ اَلَا عِبَادَ اَللّٰهِ
 الْمُخْلَصِينَ ۖ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۖ سَلَامٌ عَلَىٰ
 اِلٰٓيَاسِينَ ۖ إِنَّكَ ذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۖ إِنَّهُ مِنْ
 عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَآلِ لُوطًا كِىْنَ الْمُتَّصِلِينَ ۖ

(১০৮) আমি তার জন্যে এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি যে, (১০৯) ইবরাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১১০) এমনিভাবে আমি সংকীর্ণদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১১১) সে ছিল আমার বিশ্বাসী বন্দাদের একজন। (১১২) আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের, সে সংকীর্ণদের মধ্যে থেকে একজন নবী। (১১৩) তাকে এবং ইসহাককে আমি বরকত দান করেছি। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সংকীর্ণ এবং কতক নিজেদের উপর স্পষ্ট জুলুমকারী। (১১৪) আমি অনুগ্রহ করেছিলাম মুসা ও হারুনের প্রতি। (১১৫) তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়কে উদ্ধার করেছি মহা সংকট থেকে। (১১৬) আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম, ফলে তারা ই ছিল বিজয়ী। (১১৭) আমি উভয়কে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব। (১১৮) এবং তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করেছিলাম। (১১৯) আমি তাদের জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (১২০) মুসা ও হারুনের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১২১) এভাবে আমি সংকীর্ণদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১২২) তারা উভয়েই ছিল আমার বিশ্বাসী বন্দাদের অন্যতম। (১২৩) নিচয়ই ইলিয়াস ছিল রসূল। (১২৪) যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল : তোমরা কি ভয় কর না? (১২৫) তোমরা কি 'বা আল' দেবতার এবাদত করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে (১২৬) যিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা? (১২৭) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা অবশ্যই শ্রেষ্ঠতার হয়ে আসবে। (১২৮) কিন্তু আল্লাহ তাআলার খাঁটি বন্দাগণ নয়। (১২৯) আমি তার জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয় রেখে দিয়েছি যে, (১৩০) ইলিয়াসের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। (১৩১) এভাবেই আমি সংকীর্ণদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১৩২) সে ছিল আমার বিশ্বাসী বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (১৩৩) নিচয় লূত ছিলেন রসূলগণের একজন।

إِنَّا ذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ — (আমি খাঁটি বন্দাদেরকে এমনি প্রতিদিন দিয়ে থাকি।) অর্থাৎ, আল্লাহর কোন বন্দা যখন আল্লাহর আদেশের সামনে নতশির হয়ে নিজের সমস্ত ভাবাবেগকে কোরবান করতে উদ্যত হয়ে যায়, তখন আমি পরিশেষে তাকে পার্শ্বব কষ্ট থেকেও বাঁচিয়ে রাখি এবং পরকালের সওয়াবও তার আমলনামায় লিখে দেই।

وَكَذٰلِكَ نَجْزِي عَظِيْمٌ — (আমি যবেহ করার জন্যে এক মহান জীব এর বিনিময়ে দিলাম।) বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) উপরোক্ত গায়েবী আওয়ায শুনে উপরের দিকে তাকালে হযরত জিবরাঈলকে একটি ভেড়া নিয়ে দাঁড়ানো দেখলেন।

মোটকথা, এ জ্ঞাতী ভেড়া হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দেয়া হলে তিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে পুত্রের পরিবর্তে সেটি কোরবানী করলেন। একে عَظِيْم (মহান) বলার কারণ এই যে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছিল এবং এর কোরবানী কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না! —(মায়হারী)

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا الْحُسَيْنَ وَظَلَمْنَا لِنَفْسِهِ مِيزِينَ (তাদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে কিছু সংকীর্ণ এবং কিছু নিজেদের প্রকাশ্য ক্ষতি সাধনে লিপ্ত।) এ আয়াতের মাধ্যমে ইহুদীদের এই মিথ্যা ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে যে, পয়গম্বরগণের বংশধর হওয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তির জন্যে যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছে যে, কোন সংলোকের সাথে বংশগত সম্পর্ক থাকা মুক্তির জন্যে যথেষ্ট নয়, বরং এটা মানুষের নিজের বিশ্রাস ও কর্মের উপর ভিত্তিগত।

১১৪-১২২ আয়াতসমূহে তৃতীয় ঘটনা হযরত মুসা ও হারুন (আঃ) সম্পর্কিত। এ ঘটনা ইতিপূর্বে কয়েক জায়গায় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এখানে বর্ণিত সেসব ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। এখানে ঘটনাটি উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর খাঁটি ও অনুগত বন্দাদেরকে কিভাবে সাহায্য করেন এবং তাদেরকে কি কি নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন। সেমতে এখানে আল্লাহ তাআলা মুসা ও হারুন (আঃ)-এর প্রতি তাঁর নেয়ামতসমূহের আলোচনা করেছেন। আল্লাহর নেয়ামতসমূহ দু'ধরনের হয়ে থাকে—(এক) ধনাত্মক নেয়ামত, অর্থাৎ, উপকারী وَكَذٰلِكَ مَنَّآ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ — আয়াতে এধরনের নেয়ামতের দিকে ইংগিত রয়েছে। (দুই) ঋণাত্মক নেয়ামত। অর্থাৎ, ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখার নেয়ামত। পরবর্তী নেয়ামতসমূহে এ ধরনের নেয়ামতেরই বিবরণ দেয়া হয়েছে।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) : ১২৩-১৩২ আয়াতসমূহে চতুর্থ ঘটনা হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর বর্ণনা। আয়াতসমূহের তফসীলের পূর্বে হযরত ইলিয়াস (আঃ) সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল :

কোরআন পাকে মাত্র দু'জায়গায় হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর আলোচনা দেখা যায়—সূরা আনআমে ও সূরা সাফফাতের আলোচ্য আয়াতসমূহে। সূরা আনআমে কেবল পয়গম্বরগণের তালিকায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু কোন ঘটনা বর্ণনা করা হয়নি। তবে এখানে খুবই সংক্ষেপে তাঁর দাওয়াত ও প্রচারের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

যেহেতু কোরআন পাকে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর জীবনালেখ্য বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসেও তা নেই, তাই তাঁর সম্পর্কে তফসীরের কিভাবে দিতে যেসব বিভিন্ন উক্তি ও বিচ্ছিন্ন রেওয়াজে পাওয়া যায়, এগুলোর অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়াজে থেকে গৃহীত।

অল্প সংখ্যক তফসীরবিদের বক্তব্য এই যে, ইলিয়াস হযরত ইদরীস (আঃ)-এরই অপর নাম, এই দু' ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেউ কেউ আরও বলেন যে, হযরত ইলিয়াস (আঃ) ও হযরত যিমির (আঃ) অভিন্ন ব্যক্তি। (দুরের মনসুর) কিছু অনুসন্ধানবিদগণ দু'টি উক্তিই ষণ্ডন করেছেন। কোরআন পাকও হযরত ইদরীস এবং হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর আলোচনা এমন পৃথক পৃথকভাবে করেছে যে, উভয়কে একই ব্যক্তি সাব্যস্ত করার কোন অবকাশ দেখা যায় না। তাই ইবনে কাসীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বলেন যে, তাঁরা যে আলাদা আলাদা রসূল, এটাই সহীহ।—(আলবেদায়াওয়ানুহা)।

নবুওয়ত লাভের সময়কাল ও স্থান : হযরত ইলিয়াস (আঃ) কখন এবং কোথায় প্রেরিত হয়েছিলেন, কোরআন ও হাদীস থেকে তাও জানা যায় না। কিছু ঐতিহাসিক রেওয়াজে এ বিষয়ে প্রায় একমত যে, তিনি হযরত হিয়কীল (আঃ)-এর পর এবং হযরত আল-ইয়াস' (আঃ)-এর পূর্বে বনী ইসরাঈলের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এ সময়ে হযরত সেলায়মান (আঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের অপকর্মের কারণে বনী ইসরাঈলের সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক অংশকে 'ইয়াহুদাহ' অথবা 'ইয়াহুদিয়াহ' বলা হত। এর রাজধানী ছিল বায়তুল-মোকাদ্দাসে অবস্থিত। আর অপর অংশের নাম ছিল 'ইসরাঈল'। এর রাজধানী তৎকালীন সামেরাহ এবং বর্তমান নাবলুসে অবস্থিত ছিল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) জর্দানে 'অলআদ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখনকার ইসরাঈলের শাসনকর্তার নাম বাইবেলে আশিয়াব এবং আরবী ইতিহাসে 'আজিব' অথবা 'আশিব' বলে উল্লেখিত রয়েছে। তার স্ত্রী ঈযবীল 'বা'আল' নামক এক দেবমূর্তির পূজা করত। সে ইসরাঈলে বা'আলের নামে এক সুবিশাল বহ্যভূমি নির্মাণ করে বনী ইসরাঈলকে মূর্তি পূজায় আকৃষ্ট করেছিল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ ভূখণ্ডে তওহীদ প্রচার করার এবং বনী ইসরাঈলকে মূর্তি পূজা থেকে বিরত রাখার নির্দেশ লাভ করেন।—(তফসীরে ইবনে জরীর, ইবনে কাসীর, মাযহরী, বাইবেলের কিভাবে সালাতীন)।

স্ব সম্প্রদায়ের সাথে সংঘর্ষ : অন্যান্য পয়গম্বরগণকেও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সাথে গুরুতর সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে, হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর বেলাও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে কোরআন পাকে এসব সংঘর্ষের বিস্তারিত বিবরণদানের পরিবর্তে কেবল এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক অংশটি বিবৃত হয়েছে যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল এবং কয়েকজন নিষ্ঠাবান লোক ছাড়া কেউ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করল না। ফলে পরকালে তাদেরকে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।

কোন কোন তফসীরবিদ এখানে এ সংঘর্ষের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করেছেন। প্রচলিত তফসীরিসমূহের মধ্যে তফসীরে মযহারীতে আল্লামা বগভীর বরাত দিয়ে হযরত ইলিয়াস (আঃ) সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখিত ঘটনাবলীর প্রায় সবটুকুই বাইবেল থেকে গৃহীত। অন্যান্য তফসীরেও এসব ঘটনার কিছু অংশ ওয়াহাব ইবনে মুনাবেহ, কা'বে আহবার প্রমুখের বরাত সহকারে বর্ণিত হয়েছে, তাদের

অধিকাংশই ইসরাঈলী রেওয়াজে বর্ণনা করেছেন।

এ সমস্ত রেওয়াজের অভিন্ন সার-সংক্ষেপ এই যে, হযরত ইলিয়াস (আঃ) ইসরাঈলীদের শাসনকর্তা আশিয়াব ও তার প্রজাবৃন্দকে বা'আল দেবমূর্তির পূজা করতে নিষেধ করলেন এবং তওহীদের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু দু'একজন সত্যপন্থী ছাড়া কেউ তাঁর কথায় কর্পাত করল না, বরং তাঁকে নানাভাবে উত্থাপ্ত করার চেষ্টা করল। এমনকি, বাদশাহ আশিয়াব ও রানী ঈযবীল তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করল। ফলে তিনি সুদূর এক শুহায় আশ্রয় নিলেন এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন যেন ইসরাঈলের অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। তাতে করে দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্যে যদি তিনি তাদেরকে মো'জ্জেবা প্রদর্শন করেন, তাহলে হয়তো তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। এই দোয়ার ফলে ইসরাঈলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।

এরপর হযরত ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহর আদেশে সম্রাট আশিয়াবের সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন : এই দুর্ভিক্ষের কারণ আল্লাহর নাকরমানী। তোমরা এখনও নাকরমানী থেকে বিরত হলে এ আযাব দূর হতে পারে। আমার সত্যতা পরীক্ষা করারও এটা সুবর্ণ সুযোগ। তুমি বলে থাক যে, ইসরাঈল সাম্রাজ্যে তোমাদের উপাস্য বা'আল দেবতার সাড়ে চারশ' নবী আছে। তুমি একদিন তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত কর। তারা বা'আল-এর নামে কোরবানী পেশ করুক আর আমি আল্লাহর নামে কোরবানী পেশ করব। যার কোরবানী আকাশ থেকে অগ্নিবিদ্যুৎ এসে ভস্ম করে দেবে, তার ধর্মই সত্য বলে সাব্যস্ত হবে। সবাই এ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিল।

সেমতে "কোহে করফল" নামক স্থানে উভয় পক্ষের সমাবেশ হল। বা'আল দেবতার মিথ্যা নবীরা তাদের কোরবানী পেশ করল। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বা'আলের উদ্দেশ্যে অনুন্নয়-বিনয় সহকারে প্রার্থনা করল, কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অতঃপর হযরত ইলিয়াস (আঃ) কোরবানী পেশ করলে আকাশ থেকে অগ্নিবিদ্যুৎ এসে তা ভস্ম করে দিল। এ দৃশ্য দেখে অনেকেই সেজদায় পড়ে গেল। তাদের সামনে সত্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। কিন্তু বা'আল দেবের মিথ্যা নবীরা এর পরেও সত্য গ্রহণ করল না, ফলে হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে কায়শুন উপত্যকায় হত্যা করিয়ে দিলেন।

এই ঘটনার পর মুঘলধারে বৃষ্টি হল এবং সম্পূর্ণ ভূখণ্ড শুষ্ক মুখে সাফ হয়ে গেল। কিন্তু আশিয়াবের পত্নী ঈযবীলের তাতেও চক্ষু খুলল না। সে বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে উষ্টা হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর শত্রু হয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার প্রস্তুতি শুরু করল। হযরত ইলিয়াস (আঃ) খবর পেয়ে পুনরায় সামেরাহ থেকে আত্মগোপন করলেন এবং কিছু দিন পর বনী-ইসরাঈলের অপর রাষ্ট্র ইয়াহুদিয়াহ পৌঁছে দীনের তকলীস আরম্ভ করলেন। কারণ, সেখানেও আস্তে আস্তে বা'আল পূজার আশিপত্য ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানকার সম্রাট ইহরামও হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর কথা শুনল না। অবশেষে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী সেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। কয়েক বছর পর তিনি আবার ইসরাঈলে ফিরে এলেন এবং আশিয়াব ও তদীয় পুত্র আশিয়ায়াকে সত্য পথে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা পূর্ববৎ কুর্মেই লিপ্ত রইল। অবশেষে তাদেরকে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক ব্যাধির শিকার করে দেয়া হল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার পয়গম্বরকে তুলে নিলেন।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) জীবিত আছেন কি ? ইতিহাসবিদ ও

তফসীরবিদদের মধ্যে এখানে এ বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে যে, ইলিয়াস (আঃ) জীবিত আছেন, না মৃত্যুবরণ করেছেন? তফসীরে মাযহরীতে বগভীর বরাতে দিয়ে বর্ণিত দীর্ঘ রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, ইলিয়াস (আঃ)—কে অগ্নিঅশ্বে সওয়ার করিয়ে আকাশে তুলে নেয়া হয় এবং তিনি হযরত ঈসা (আঃ)—এর মতই জীবিত রয়েছেন। আল্লামা সুয়ুতী ও ইবনে আসাকির হাকেম প্রমুখের বরাতে দিয়ে একাধিক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জীবিত আছেন। কা’বে আহবার বর্ণনা করেন যে, চার জন পয়গম্বর এখানে জীবিত আছেন। হযরত খিযির ও হযরত ইলিয়াস—এ দু’জন পৃথিবীতে এবং হযরত ঈসা ও হযরত ইদরীস আকাশে জীবিত আছেন। (দুররে মনসুর) এমনকি, কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, হযরত খিযির ও হযরত ইলিয়াস (আঃ) প্রতি বছর রমযান মাসে বায়তুল-মোকাদ্দাসে একত্রিত হন এবং রোযা রাখেন।—(কুরতুবী)

কিন্তু হাকেম ও ইবনে কাসীরের মত অনুসন্ধানবিদ আলেমগণ এসব রেওয়ায়েতকে বিশ্বাস করেননি।

সারকথা, হযরত ইলিয়াস (আঃ)—এর জীবিত থাকার বিষয়টি কোন নির্ভরযোগ্য ইসলামী রেওয়ায়েতে দ্বারা প্রামাণ্য নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে নীরব থাকাই উত্তম পথ। ইসরাঈলী রেওয়ায়েতে সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর শিক্ষা এই যে, “এগুলোকে সত্যও বলবে না এবং মিথ্যাও বলবে না।” ইলিয়াস (আঃ)—এর ব্যাপারে এ শিক্ষা গ্রহণ করাই উচিত।

আয়াতসমূহের তফসীর লক্ষ্যণীয় —

اَتَذْكُرُونَ (তোমরা কি বা’আল দেবতার পূজা কর?)

“বা’আল”—এর আভিধানিক অর্থ স্বামী, মালিক ইত্যাদি কিন্তু এটা হযরত ইলিয়াস (আঃ)—এর সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবমূর্তির নাম ছিল। বা’আল পূজার ইতিহাস খুবই প্রাচীন। হযরত মুসা (আঃ)—এর যমানায় সিরিয়া অঞ্চলে এর পূজা হত এবং এটা ছিল তাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা। সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর— বা’আলবাক্বাকেও এ দেবতার নামেই নামকরণ করা হয়েছে। কারও কারও ধারণা এই যে, আরবদের প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি হবালও এই বা’আলেরই অপর নাম।—(কাছাছুল-কোরআন)

وَتَذْكُرُونَ احْسَنَ الْخَالِقِينَ (এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করেছ?)

এখানে উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তাআলা। “সর্বোত্তম স্রষ্টা”—এর অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কোন স্রষ্টা হতে পারে। বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে সমস্ত মিথ্যা উপাস্যকে তোমরা স্রষ্টা বলে সাব্যস্ত করে রেখেছ, তিনি ওদের সবার তুলনায় অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল।—(কুরতুবী) কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এখানে خلق শব্দটি صانع (নির্মাতা) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি সমস্ত নির্মাতার সেরা ও উত্তম নির্মাতা। কেননা, অন্যান্য নির্মাতারা কেবল বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করে কোন বস্তু তৈরী করে। কোন বস্তুকে নাস্তি থেকে আন্তিত্বে আনয়ন করা তাদের ক্ষমতার বাইরে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তাআলা অস্তিত্বহীন বস্তুকে অস্তিত্ব দান করার নিজস্বভাবেই ক্ষমতা রাখেন।—(যমানুল-কোরআন)

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সৃষ্টিগুণকে সম্পৃক্ত করা জায়েয নয় : এখানে সূর্যব্য যে, خلق শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। অর্থাৎ, কোন বস্তুকে নাস্তি থেকে নিজস্ব ক্ষমতায় অস্তিত্বে আনয়ন করা। তাই এটা আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণ। অন্য কারও সাথে এ গুণের সংযুক্তি জায়েয নয়। আমাদের যুগে প্রচলিত রীতি রয়েছে যে, লেখকদের রচনা, কবিদের কবিতা এবং চিত্র শিল্পীদের চিত্রকর্মকে তাদের সৃষ্টি বলে দেয়া হয়। এটা মোটেই বৈধ নয়। স্রষ্টা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ হতে পারে না। তাই লেখকদের লেখাকে চিত্তার ফসল অথবা রচনা ইত্যাদি বলাই উচিত—সৃষ্টি নয়।

فَلِكُلِّ دُؤْلَةٍ وَآلِهَةٍ مُّخَصَّرُونَ — (অতঃপর ওরা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন

করল। ফলে ওদেরকে গ্রেফতার করা হবে।) উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ সত্য রসুলের প্রতি মিথ্যারোপ করার মজা তাদেরকে আশ্বাদন করতে হবে। এর অর্থ পরকালের আযাব এবং দুনিয়ার অশুভ পরিণতি উভয়ই হতে পারে। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ইলিয়াস (আঃ)—কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতিতে ইয়াহুদাহ্ ও ইসরাঈল উভয় সাম্রাজ্যই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এর বিশদ বিবরণ তফসীরে মাযহরীতে এবং বাইবেলে পাওয়া যাবে।

اِرْكَبُوا الدَّابَّةَ الْمَخْلُوعِينَ — এখানে مخلصين শব্দের লাম—এর উপর

‘যবর’ রয়েছে। এর অর্থ হল এমন লোক যাদেরকে নিখাদ করা হয়েছে।

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে তাঁর আনুগত্য এবং পুরস্কার ও সওয়াবের জন্যে খাটি করে নিয়েছেন। সুতরাং এর অনুবাদ নিষ্ঠাবান অপেক্ষা “মনোনীত” করা অধিক সমীচীন।

سَلَامٌ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ “ইলিয়াসীন” ও ইলিয়াস (আঃ)—এর আর এক নাম। আরবরা প্রায়ই অনারব নামের শেষে “ইয়া” ও “নুন” বর্ণ সংযুক্ত করে দেয়। যেমন, سينا থেকে سنين বলে। এখানেও তেমনি দু’টি বর্ণ সংযুক্ত করা হয়েছে।

১৩৩-১৩৮ আয়াতসমূহে পঞ্চম ঘটনা হযরত লূত (আঃ)—এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনা পূর্বে কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। তাই এখানে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। এখানে মক্কার লোকদেরকে বিশেষভাবে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফরে সাদুমের সে এলাকা দিবারাত্রি অতিক্রম কর, যেখানে এসব দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তোমরা এ থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ কর না। ‘সকাল’ ও ‘সন্ধ্যা’ বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আরবরা সাধারণতঃ এ সময়েই এ এলাকা অতিক্রম করত। কাযী আবু সাঈদ বলেন : খুব সম্ভব সাদুম এলাকাটি রাস্তার এমন মনযিলে অবস্থিত ছিল, যেখান থেকে প্রস্থানকারীরা ভোরে রওয়ানা হত এবং আগমনকারীরা সন্ধ্যায় আগমন করত।—(তফসীরে-আবু সঈদ)

إِذْ يَحْيِيهِ وَاهْلَهُ أُجْمَعِينَ ۖ إِلَّا خَوْفًا مِنَ الْعَبِيدِينَ ۖ ثُمَّ
دَمَرْنَا الْوَهْدِينَ ۖ وَانْكُمُتْهُمْ عَلَيْهِمْ مُصْحِحِينَ ۖ وَإِبَائِلَ
أَقْلَامَ الْعَمَلِينَ ۖ وَلَئِنْ يُوَسَّسْ لَكُمْ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذَا تَبَيَّنَ إِلَى
الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۖ فَمَا هُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ۖ
فَالْعَمَةُ الْحَوْثُ ۖ وَهُوَ يَلْمِ ۖ فَكُلُّوْا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْحِقِينَ ۖ
لَلَيْتِ فِي ظَنِّي إِلَى نَوْمٍ يُبَيِّنُونَ ۖ فَكَيْدُهُ بَالَعَرَاءَ ۖ وَهُوَ
سَوِيءٌ ۖ وَأَبْتَنَّا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ۖ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى
وَأَسَاءَ آلِهِ أَوْ يَزِيدُونَ ۖ فَامْتَأَمَّتْهُمْ إِلَى جَيْنٍ ۖ
فَاسْتَقْبَلَهُمُ الرِّبِّيُّ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ۖ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ
إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ۖ أَلَا أَنَّهُمْ مِّنْ أَقْبَاهِمُ لَيُكَوَّلُونَ ۖ
وَكَلَّ اللَّهُ ۖ وَأَنَّهُمْ لَكِنُيُونَ ۖ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۖ
مَا لَكُمْ سِيْفَ تَحْكُمُونَ ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۖ أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ
مُبِينٌ ۖ فَاتَّوَلَّوْا بِسُلْطٰنِكُمْ ۖ إِن تَنْتَوِصِدُونَ ۖ وَجَعَلُوا آيَاتِنَا
وَبَيْنَ الْحَيَّةِ كَسْبًا ۖ وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْيَحْنَةُ أَنَّهُمْ لَمُخَضَّرُونَ ۖ
سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۖ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۖ

(১৩৪) যখন আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করেছিলাম; (১৩৫) কিন্তু এক বৃদ্ধকে ছাড়া; সে অন্যান্যদের সঙ্গে থেকে গিয়েছিল। (১৩৬) অতঃপর অবশিষ্টদেরকে আমি সমূলে উৎপাটিত করেছিলাম। (১৩৭) তোমরা তাদের ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে গমন কর ভোর বেলায় (১৩৮) এবং সন্ধ্যায়, তার পরেও কি তোমরা বোঝ না? (১৩৯) আর ইউনুসও ছিল পয়গম্বরগণের একজন। (১৪০) যখন পালিয়ে তিনি বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন। (১৪১) অতঃপর লটারী (সুরতি) করলে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। (১৪২) অতঃপর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল, তখন তিনি অপরাধী গণ্য হয়েছিলেন। (১৪৩) যদি তিনি আল্লাহ্‌র তসবীহ পাঠ না করতেন, (১৪৪) তবে তাঁকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত মাছের পেটেই থাকতে হত। (১৪৫) অতঃপর আমি তাঁকে এক বিস্তীর্ণ-বিজন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম, তখন তিনি ছিলেন রুগ্ন। (১৪৬) আমি তাঁর উপর এক লড়াবিলাই বৃক্ষ উদগত করলাম। (১৪৭) এবং তাঁকে, লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করলাম। (১৪৮) তারা বিশ্বাস স্থাপন করল অতঃপর আমি তাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম। (১৪৯) এবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তোমার পালনকর্তার জন্যে কি কন্যা সন্তান রয়েছে এবং তাদের জন্যে কি পুত্র-সন্তান? (১৫০) না কি আমি তাদের উপস্থিতিতে ফেরেশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি? (১৫১) জেনো, তারা মনগড়া উক্তি করে যে, (১৫২) আল্লাহ্‌ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। নিচয় তারা মিথ্যাবাদী। (১৫৩) তিনি কি পুত্র-সন্তানের স্থলে কন্যা-সন্তান পছন্দ করেছেন? (১৫৪) তোমাদের কি হল? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? (১৫৫) তোমরা কি অনুশ্রবণ কর না? (১৫৬) না কি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোন দলীল রয়েছে? (১৫৭) তোমরা সভাবাদী হলে তোমাদের কিতাব আন। (১৫৮) তারা আল্লাহ্‌ ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে, অথচ ঈশ্বরের জ্ঞানে যে, তারা প্রেক্ষতার হয়ে আসবে। (১৫৯) তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্‌ পবিত্র। (১৬০) তবে যারা আল্লাহ্‌র নিষ্ঠাবান বন্দা, তারা প্রেক্ষতার হয়ে আসবেন।

১৩৯-১৪৮ সূরায় সর্বশেষ ঘটনা হযরত ইউনুস (আঃ)-এর বর্ণনা করা হয়েছে। ঘটনাটি সূরা ইউনুসের শেষভাগে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। তবে বিশেষভাবে আয়াতগুলো সম্পর্কে কতিপয় জরুরী বিষয় নিয়ে উল্লেখ করা হল।

وَلَئِنْ يُوَسَّسْ لَكُمْ الْمُرْسَلِينَ - কোন কোন তফসীর ও ইতিহাসবিদ এ

বিষয়ে আলোকপাত করেছেন যে, হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের ঘটনার পূর্বেই রসূল পদে বরিত হয়েছিলেন, না পরে বরিত হয়েছেন? কেউ কেউ বলেন যে, মাছের ঘটনার পরে তিনি রসূল হন। কিন্তু কোরআন পাকের বাহ্যিক বর্ণনা এবং অনেক রেওয়াজে তদুপে এটাই প্রবল যে, তিনি পূর্বেই রসূলপদে অভিষিক্ত ছিলেন। মাছের ঘটনা পরে সংঘটিত হয়।

إِذَا تَبَيَّنَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ - (যখন তিনি পলায়ন করেন যাত্রী

বোঝাই নৌকার দিকে। اِبَان শব্দের অর্থ প্রভুর নিকট থেকে কোন গোলামের পালিয়ে যাওয়া। হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জন্যে এ শব্দ ব্যবহার করার কারণ এই যে, তিনি তাঁর পরওয়ারদেগারের ওহীর অপেক্ষা না করেই রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। পয়গম্বরগণ, আল্লাহ্‌র নেকটাপ্রাপ্ত বন্দা। তাঁদের সামান্য পদসম্মলনও বিরাটাকারে ধরপাকড়ের কারণ হয়ে যায়। এ কারণেই এই কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

فَمَا هُمْ - (অর্থাৎ, তিনি লটারী তথা সুরতির সম্মুখীন হলেন। (এই

সুরতি তখন করা হয়, যখন নৌকা নদীর মাঝখানে তুফানে পড়ে এবং অতিরিক্ত বোঝাই হওয়ার কারণে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ সময় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এক ব্যক্তিকে নদীতে ফেলে দেয়া হোক। কাকে ফেলে দেয়া হবে, তা নির্ধারণকল্পে এই সুরতি পরীক্ষা করা হয়েছিল যে, লোকটি কে?

فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ - (অতঃপর তিনি পরাজিত হলেন।) ادْحَاض

এর আভিধানিক অর্থ কাউকে অকৃতকার্য করে দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, লটারীতে তাঁরই নাম বের হয়ে এল এবং তিনি নিজেকে নদীতে নিক্ষেপ করলেন। এতে আত্মহত্যার সন্দেহ করা উচিত নয়। কারণ, নদীর কিনারা সত্তবত্তঃ নিকটেই ছিল। তিনি সাঁতার কেটে কিনারায় পৌঁছার ইচ্ছায় নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন।

فَكُلُّوْا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسْحِقِينَ - এ আয়াত থেকে একথা অনুমান

করা ঠিক নয় যে, ইউনুস (আঃ) তসবীহ পাঠ না করলে মাছটি কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকত। বরং উদ্দেশ্য এই যে, এ মাছের পেটেই ইউনুস (আঃ)-এর কবর হয়ে যেত।

তসবীহ ও এস্তেগফার দ্বারা বিপদাপদ দূর হয় : এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, বিপদাপদ দূর করার ক্ষেত্রে তসবীহ ও এস্তেগফার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সূরা আশ্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে যে, ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় বিশেষভাবে এ কলমা পাঠ করতেন :

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ - এ কলমার

বরকতেই আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁকে এই পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করেন। তিনি মাছের পেট থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসেন। এ জন্যেই বুয়ুর্গানের চিরাচরিত রীতি এই যে, তাঁরা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত বিপদাপদের

সময় উল্লেখিত কলেমা সোয়া লাখ বার পাঠ করেন। এর বরকতে আল্লাহ্ তাআলা বিপদ দূর করেন।

আবু দাউদ হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের এক রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : মাছের পেটে হযরত ইউনুস (আঃ)—এর পণ্ডিত দোয়া যে কোন মুসলমান যে কোন উদ্দেশ্যে পাঠ করবে, তার দোয়া কবুল হবে।—(করতুবী)

فَبَدَّلْنَا بِالْعِزِّ وَهُوَ سَوِيٌّ — (অতঃপর আমি তাঁকে প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম। তিনি তখন পীড়িত ছিলেন।) কোন কোন রেওয়াজেতে থেকে জানা যায় যে, মাছের পেটে থাকার কারণে ইউনুস (আঃ) তখন খুবই দুর্বল ছিলেন। তাঁর শরীরে কোন লোমও অবশিষ্ট ছিল না।

وَكَانَتْ عَلَيْهِ وَشَقِيرًا وَمِنْ يَنْطَلِين — (আমি তাঁর উপর এক লতাবিশিষ্ট বৃক্ষও উদগত করে দিয়েছিলাম।) কাণুবিহীন বৃক্ষকে يَنْطَلِين বলা হয়। রেওয়াজেতে লাউ গাছের কথা উল্লেখ আছে। ছায়ার জন্যে এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। شَجَرَةً শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হয় আল্লাহ্ তাআলা লাউ গাছকেই কাণুবিশিষ্ট করে দিয়েছিলেন, না হয় অন্য কোন বৃক্ষ ছিল যার উপর লতাপাতা জড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, যাতে ছায়া ঘন হয়। অন্যথায় শুধু লতার দ্বারা ছায়া পাওয়া কঠিন।

وَأَسْنَدْنَا إِلَى يَمِئَةِ الْيَمِينِ — (আমি তাকে এক লাখ অথবা ততোধিক লোকের প্রতি পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম।) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলা তো সর্বজ্ঞ, সবকিছুর খবর রাখেন, তিনি এই সন্দেহ প্রকাশ করলেন কেন? এর জওয়াব এই যে, এক লাখ অথবা ততোধিক বাক্যটি সাধারণ মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, একজন সাধারণ মানুষ তাদেরকে দেখলে একথা বলত যে, তাদের সংখ্যা এক লাখ অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী। হযরত খানভী (রাঃ) বলেন : এখানে সন্দেহ প্রকাশ উদ্দেশ্যই নয়। তাদেরকে এক লাখও বলা যায়, ততোধিকও বলা যায়। কারণ, ভগ্নাংশের প্রতি লক্ষ্য না করলে তাদের সংখ্যা এক লাখ ছিল এবং ভগ্নাংশও গণনা করা হলে এক লাখের কিছু বেশী ছিল।—(বয়ানুল—কোরআন)

এ বাক্যটি যেহেতু মাছের ঘটনার পরে উল্লেখিত হয়েছে, তাই এর ভিত্তিতে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, ইউনুস (আঃ) এ ঘটনার পরে নবুওয়ত লাভ করেছিলেন। আল্লামা বগভী এমনও বলেছেন যে, এ আয়াতে তাঁকে নায়নুয়ার দিক প্রেরণ করার উল্লেখ নেই; বরং মাছের ঘটনার পরে তাঁকে অন্য এক সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাদের সংখ্যা ছিল এক লাখ অথবা ততোধিক। কিন্তু কোরআন পাক ও হাদীস থেকে এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। এখানে ঘটনার শুরুতেই ইউনুস (আঃ)—এর রেসালত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, মাছের ঘটনা রসূল হওয়ার পরে সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর এখানে বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করার কারণ এই যে, সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে পুনরায় সেখানেই প্রেরণ করা হয়েছিল। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা অস্পসংখ্যক লোক ছিল না, বরং তাদের সংখ্যা ছিল লাখেরও উপরে।

وَأَنزَلْنَاهُ إِلَىٰ حَبِيزٍ — (বস্তৃতঃ তারা বিশ্বাস স্থাপন করল, ফলে আমি তাদেরকে কিছুকাল পর্যন্ত জীবনোপভোগ করতে দিলাম।) “কিছুকাল পর্যন্ত” উদ্দেশ্য এই যে, যতদিন তারা পুনরায় কুফর ও শিরকে লিপ্ত না হল, ততদিন তারা আযাব থেকেও বেঁচে রইল।

এপর্যন্ত পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী, উপদেশ ও শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণিত

হয়েছিল। এখন ১৪৯-১৬৬ আয়াতে আবার তওহীদ সপ্রমাণ করা ও শিরক বাতিল করার আসল বিষয়বস্তু বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে এক বিশেষ ধরণের শিরক খণ্ডন করা হয়েছে। মকার কাফেরদের বিশ্বাস ছিল যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র কন্যা এবং জ্বিন সরদার-দুহিতারা ফেরেশতাগণের জননী। আল্লামা ওয়াহেদী বলেন : এ বিশ্বাস কোরাইশ গোত্র ছাড়াও জুহাইনা, বনু সালমা, বনু-খোযা'আ ও বনু সালীহদের মধ্যেও বদ্ধমূল ছিল।—(তফসীর-কবীর)

إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ এসব আয়াতে কাফেরদের উপরোক্ত বিশ্বাস খণ্ডনের দলীল পেশ করা হয়েছে। প্রথমতঃ তোমাদের এ বিশ্বাস স্বয়ং তোমাদের প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ, তোমরা কন্যা-সন্তানকে লজ্জার কারণ মনে কর। যে বস্তু তোমাদের জন্যে লজ্জাজনক, তা আল্লাহ্র জন্যে কেন লজ্জাজনক হবে না? এরপর তোমরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যা বলে সাব্যস্ত করছে। তোমাদের কাছে এর কোন দলীল আছে কি? কোন দাবী প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিন রকম দলীল হতে পারে—(১) চাক্ষুষ দলীল, (২) ইতিহাসভিত্তিক দলীল অর্থাৎ, এমন ব্যক্তির উক্তি, যার সত্যতা সর্বজন স্বীকৃত এবং (৩) যুক্তিভিত্তিক দলীল। প্রথমোক্ত দলীল নিশ্চিত অনুপস্থিত। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা যখন ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেন, তখন তোমরা উপস্থিত ছিলে না। কাজেই ফেরেশতাগণ যে নারী, তাই জানা সম্ভব নয়।

أَمْ خَلَقَتِ الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ — আয়াতের মর্ম তাই। ইতিহাসভিত্তিক দলীলও তোমাদের কাছে নেই। কারণ, সর্বজন স্বীকৃত সত্যবাদী ব্যক্তির উক্তিই ধর্তব্য হয়ে থাকে। অথচ যারা এই বিশ্বাসের প্রবক্তা, তারা মিথ্যাবাদী। সুতরাং তাদের উক্তি দলীল হতে পারে না।

أَلَا تَهْتَفُونَ لَهُمْ أَنُؤْتُونَ — আয়াতের অর্থ তাই। পক্ষান্তরে যুক্তিপূর্ণ দলীলও তোমাদের সমর্থন করে না। কারণ, স্বয়ং তোমাদের ধারণা অনুযায়ী পুত্র-সন্তানের মোকাবেলায় কন্যা-সন্তান হীন। এখন যে সত্তা সমগ্র সৃষ্টজগতের সেরা তিনি নিজের জন্যে হীন বস্তু কেমন করে পছন্দ করতে পারেন? أَصْطَفَى النَّبَاتَ عَلَى النَّبِيِّن আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। এখন একটি মাত্র পথ অবশিষ্ট থাকে। তা এই যে, কোন আসমानी কিতাব ওহীর মাধ্যমে তোমাদেরকে এই বিশ্বাস শিক্ষা দিয়েছে। এমনটি হয়ে থাকলে সে ওহী ও কিতাব এনে দেখাও। أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ

فَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْوَحْيَ — আয়াতের অর্থ তাই।

হঠকারীদের জন্যে আক্রমণাত্মক উত্তরই অধিক উপযুক্ত : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, যারা হঠকারিতায় বদ্ধপরিকর, তাদেরকে আক্রমণাত্মক জওয়াব দেয়াই অধিক উপযুক্ত। আক্রমণাত্মক জওয়াব বলা হয় প্রতিপক্ষের দাবী তারই অন্য কোন স্বীকৃত নীতি দ্বারা খণ্ডন করা। এতে এটা জরুরী হয় না যে, সেই অন্য নীতি আমরাও স্বীকার করি; বরং প্রায়ই সে নীতিও ভ্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিপক্ষকে বোঝানোর জন্যে একে কাজে লাগানো হয়। এখানে আল্লাহ্ তাআলা তাদের বিশ্বাস খণ্ডন করার জন্যে স্বয়ং তাদেরই এই নীতি ব্যবহার করেছেন যে, কন্যা-সন্তান লজ্জা ও দোষের বিষয়। বলাবাহুল্য, এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ তাআলার মতেও কন্যা-সন্তান লজ্জার বিষয়। এছাড়া এর অর্থ এমনও নয় যে, কাফেররা ফেরেশতাগণকে আল্লাহ্র কন্যাসন্তান না বলে পুত্র-সন্তান বললে সঠিক হত। বরং এটা ইলহামী জওয়াব, যার

হবেন। এতে প্রশ্ন হতে পারে যে, কোন কোন পয়গম্বর তো দুনিয়াতে বিজয়ী হননি। জওয়াব এই যে, জানা পয়গম্বরগণের মধ্যে অধিকাংশ পয়গম্বরের সম্প্রদায় মিথ্যারোপের অপরাধে আঘাতে পতিত হয়েছে, কিন্তু পয়গম্বরগণকে আঘাত থেকে দূরে রাখা হয়েছে। মাত্র কয়েকজন পয়গম্বর দুনিয়াতে শেষ পর্যন্ত বৈষয়িক বিজয় লাভ করতে সক্ষম হননি, কিন্তু যুক্তিতর্কে তাঁরাই সর্বদা উর্ধ্বে রয়েছেন এবং আদর্শগত বিজয় লাভ করেছেন। তবে এই বিজয়ের বৈষয়িক আলামত পরীক্ষা ইত্যাদির মত বিশেষ কোন উপযোগিতার কারণে পরকাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। হযরত খানজী (রহঃ)—এর ভাষায় এর দৃষ্টান্ত এমন যে, কোন ঘণিত দস্যু কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার সাথে সফররত অবস্থায় পথিমধ্যে দস্যুস্বভাবে লিপ্ত হলে সরকারী কর্মকর্তা খোদা-প্রদত্ত অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কারণে হয়ত দস্যুকে তোষামোদ করবেন; কিন্তু রাজধানীতে পৌঁছে দস্যুকে গ্রেফতার করে শাস্তি দেবে। সুতরাং এই সাময়িক প্রতিপত্তির কারণে দস্যুকে শাসক এবং কর্মকর্তাকে শাসিত বলা যায় না। বরং আসল অবস্থার দিক দিয়ে দস্যু প্রতিপত্তিসত্ত্বেও শাসিত এবং সরকারী কর্মকর্তা পরাভূত অবস্থায়ও শাসক। এ বিষয়টিই হযরত ইবনে-আব্বাস সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, **ان لم ينصروا في الاخرة** — **في الدنيا ينصروا في الاخرة** (যয়নুল-কোরআন)

কিন্তু সর্বদা মনে রাখা দরকার যে, পার্থিব বিজয় হোক কিংবা পারলৌকিক বিজয়, কোন জাতি কেবল বংশগত বৈশিষ্ট্য অথবা ধর্মের সাথে নামে মাত্র সম্পর্কের দ্বারা তা অর্জন করতে পারে না। বরং মানুষ যখন নিজেকে আল্লাহর বাহিনীর একজন সৈনিকরূপে গড়ে তোলে, তখনই তা অর্জিত হতে পারে। এর অপরিহার্য মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্যকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এখানে **جندنا** (আমার বাহিনী) শব্দটি ব্যক্ত করছে যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে সে নিজের সকল কর্মশক্তি শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যয় করার জন্য আল্লাহর সাথে চুক্তি করে। এই শর্তের উপরই বৈষয়িক অথবা আদর্শগত, পার্থিব অথবা পারলৌকিক বিজয় নির্ভরশীল।

وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا كُلَّ أَتْرَافٍ مِّنْهَا — (যখন সে আঘাত তাদের আঙিনায় নেমে আসবে, তখন যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সে সকাল বেলাটি হবে খুবই মন্দ।) আরবী বাক-পদ্ধতিতে আঙিনায় নেমে আসার অর্থ কোন বিপদ একেবারে সামনে এসে উপস্থিত হওয়া বোঝায়। “সকাল” বলার কারণ এই যে, আরবে শত্রুরা সাধারণতঃ এ সময়েই আক্রমণ পরিচালনা করত। রসূলুল্লাহ (সাঃ)—ও তাই করতেন। তিনি কোন শত্রুর ভূখণ্ডে রাত্রি বেলায় পৌঁছালেও আক্রমণের জন্যে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।—(মায়হারী) হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন সকাল বেলায় খয়বর দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন এই বাক্যাবলী উচ্চারণ করেন : **انا اذا نزلنا** — **بأساحة قوم فساء صباح المنذرين** (অর্থাৎ, আল্লাহ মহান। খয়বর বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি, তখন যাদেরকে পূর্ব-সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের সকাল খুবই মন্দ হয়।)

উপরোক্ত ১৮০-১৮২ আয়াতগুলোর মাধ্যমে সূরা সাফ্যাত সমাপ্ত করা হয়েছে। সত্য বলতে কি, এই সুন্দর সমাপ্তির ব্যাখ্যার জন্যে বিরাট পুস্তক দরকার। সংক্ষেপে বলা যায় যে, আল্লাহ তাআলা এই সংক্ষিপ্ত তিনটি আয়াতের মধ্যে সূরার সমস্ত বিষয়বস্তু ভরে দিয়েছেন। তওহীদের

বর্ণনা দ্বারা সূরার সূচনা হয়েছিল, যার সারমর্ম ছিল এই যে, মুশরিকরা আল্লাহ সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণনা করে, আল্লাহ তাআলা সেগুলো থেকে পবিত্র। সেমতে আলাচ্য প্রথম আয়াতে সে দীর্ঘ বিষয়বস্তুর দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। এরপর সূরায় পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছিল। সেমতে দ্বিতীয় আয়াতে সেগুলোর দিকে ইশারা করা হয়েছে। অতঃপর পুংখানপুংখরূপে কাফেরদের বিশ্বাস, সন্দেহ ও আপত্তিসমূহ যুক্তি ও উক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করে বলা হয়েছিল যে, শেষ বিজয় সত্যপন্থীরাই অর্জন করবে। এসব বিষয়বস্তু যে ব্যক্তিই জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারে পাঠ করবে, সে অবশেষে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও স্তুতি পাঠ করতে বাধ্য হবে। সেমতে এই প্রশংসা ও স্তুতির উপরই সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

এছাড়া এই তিন আয়াতে ইসলামের বুনিয়াদী বিশ্বাস—তওহীদ ও রেসালতের বিষয় প্রত্যক্ষভাবে এবং পরকালের বিষয় পরোক্ষভাবে স্থান পেয়েছে। এগুলো সপ্রমাণ করাই ছিল সূরার আসল লক্ষ্য। এতদসঙ্গে এ শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে তার প্রত্যেকটি প্রসঙ্গ, ভাষণ ও বৈঠক আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা ও প্রশংসা দিয়ে সমাপ্ত করবে। সেমতে আল্লাম কুরতুবী এক্ষেত্রে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)—এর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে নামায সমাপনান্তে **سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْوَرْدَةِ عَمَّا يُصِفُونَ** এই আয়াত তিনটি তেলাওয়াত করতে একাধিকবার শুনেছি। এছাড়া কতিপয় তফসীর গ্রন্থে এ মর্ম হযরত আলী (রাঃ)—এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি কয়েমতের দিন পূর্ণমাত্রায় পুরস্কার পেতে চায়, তার প্রত্যেক বৈঠক শেষে এই আয়াতত্রয় তেলাওয়াত করা উচিত। এ উক্তিই ইবনে হাতেম হযরত শা'বীর বাচনিক রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন।—(তফসীর ইবনে-কাসীর)

سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْوَرْدَةِ عَمَّا يُصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সূরা ছোয়াদ

শানে নুযূল : এই সূরার প্রাথমিক আয়াতগুলোর পটভূমিকা এই যে, রসূলে-করীম (সাঃ)—এর পিতৃব্য আবুতালেব ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও ভ্রাতুষ্পুত্রের পূর্ণ দেখা-শোনা ও হেফাযত করে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন কোরাইশ সরদাররা এক পরামর্শসভায় মিলিত হল। এতে আবু জহ্ল, আ'স ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে এয়াগুস ও অন্যান্য সরদার যোগদান করল। তারা পরামর্শ করল যে, আবু তালেব রোগাক্রান্ত। যদি তিনি পরলোকগমন করেন এবং তার অবর্তমানে আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)—এর বিরুদ্ধে কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি, তবে আরবের লোকেরা আমাদেরকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে। বলবে : আবু তালেবের জীবদ্দশায় তো তারা মুহাম্মদ (সাঃ)—এর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারল না, এখন তার মৃত্যুর পর তাকে উৎপীড়নের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। তাই আমরা আবু তালেব জীবিত থাকতেই তার সাথে মুহাম্মদ (সাঃ)—এর ব্যাপারে একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চাই, যাতে সে আমাদের দেব-দেবীর নিন্দাবাদ পরিত্যাগ করে।

সেমতে তারা আবু তালেবের কাছে গিয়ে বলল : আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা করে। অতঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُ وَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا سِحْرٌ
كَذَّابٌ أَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ٥
وَانطَلَقَ الْمَلَكُ مَظْمُونًا إِنَّ أَشْمُقًا وَاصِدُّوْا عَلَى الْهَيْكَلِ ثُمَّ إِنَّ هَذَا
لَشَيْءٌ يُرَآءُ مَا سَمِعْتُمُ بِهَذَا فِي الْمَلَةِ الْآخِرَةِ إِنَّ هَذَا إِلَّا
اٰخِرُ لَآئٍ اٰزْرَأْنَا عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ يَمْيِنُ اٰبِلَ مُنْ فِي شَيْءٍ مِّنْ
ذِكْرِ بَلِّ تَبَايُدُ وَقُوعًا عَذَابٍ اَمْرَعُنْدَهُمْ خَزَائِنَ رَحْمَةِ
رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ اَمْرُهُمْ تَمْكُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَوُوا فِي السَّيَابِ ٦ جَعَلْنَا مَاءَهُمْ كَالْمِزِجِ
الْاَحْزَابِ ٧ كَذَّبَتْ قَبِيلُهُمْ قَوْمٌ زُرِعُوا وَعَادُوْهُمْ ذُو الْاَوْدَاغِ
وَشُوْدُوْهُمْ قَوْمٌ لُّوْطٍ وَاَصْحَابُ نَيْفَةٍ اُولَئِكَ الْاَحْزَابُ ٨ اِنْ
كُلَّ الْاَكْكَابِ الرُّسُلُ فَتَحَ عِقَابٌ وَاَيَنْظُرُ هَؤُلَاءِ
اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ تَوَاتٍ ٩ وَقَالُوا رَبَّنَا
عَجَلْنَا لَكَ وَقَتًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ١٠ اَصْبِرْ عَلَى مَا
يَقُولُوْنَ ١١ وَاذْكُرْ عِمْدَنَا ذَا الْاَوْدَاغِ اِنَّهُ اَوَّابٌ ١٢
اِذَا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَمِيِّ وَالْاَشْرَاقِ ١٣

(৪) তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফেররা বলে এ-তো এক মিথ্যাচারী যাদুকর। (৫) সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে। নিচয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। (৬) তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় দৃঢ় থাক। নিচয়ই এ বক্তব্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। (৭) আমরা সবকে ধর্মের এ ধরনের কথা শুনি। এটা মনগড়া ব্যাপার বৈ নয়। (৮) আমাদের মধ্য থেকে শুধু কি তারই প্রতি উপদেশবাণী অবতীর্ণ হল? বস্তুতঃ ওরা আমার উপদেশ সম্পর্কে সন্দিহান; বরং ওরা এখনও আমার মার আশ্বাদন করেনি। (৯) না কি তাদের কাছে আপনার পরাক্রান্ত দয়াবান পালনকর্তার রহমতের কোন ভাণ্ডার রয়েছে? (১০) না কি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর উপর তাদের সাম্রাজ্য রয়েছে? থাকলে তাদের আকাশে আরোহণ করা উচিত রশি বুলিয়ে। (১১) এক্ষেত্রে বহু বাহিনীর মধ্যে ওদেরও এক বাহিনী আছে, যা পরাজিত হবে। (১২) তাদের পূর্বের মিথ্যারোপ করেছিল নূহের সম্প্রদায়, আদ, কীলক বিশিষ্ট ফেরাউন, (১৩) সামুদ, লূতের সম্প্রদায় ও আইকার লোকেরা। এরাই ছিল বহু বাহিনী। (১৪) এদের প্রত্যেকেই পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। ফলে আমার আযাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (১৫) কেবল একটি মহানাদের অপেক্ষা করছে, যাতে দম ফেলার অবকাশ থাকবে না। (১৬) তারা বলে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের প্রাপ্য হিসাব দিবসের আগেই দিয়ে দাও। (১৭) তারা যা বলে তাতে আপনি সরব করুন এবং আমার শক্তিশালী হাফা দাঁড়কে স্মরণ করুন। সে ছিল আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (১৮) আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত;

দেব-দেবী সম্পর্কে এছাড়া কিছুই বলতেন না যে, এগুলো চেতনহীন, নিষ্প্রাণ মূর্তি মাত্র; তোমাদের সৃষ্টাও নয়, অনুদাতাও নয়। তোমাদের কোন লাভ-লোকসান তাদের করায়ত্ত নয়। আবু তালেব রসুল্লাহ (সাঃ)-কে মজলিসে ডেকে এনে বললেন : ভ্রাতুষ্পুত্র, এ কোরাইশ সরদাররা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে যে, তুমি নাকি তাদের উপাস্য দেব-দেবীর নিন্দা কর। তাদেরকে তাদের ধর্মে ছেড়ে দাও এবং তুমি আল্লাহর এবাদত করে যাও। এ সম্পর্কে কোরাইশের লোকেরাও বলাবলি করে।

অবশেষে রসুল্লাহ (সাঃ) বললেন : চাচাজান, “আমি কি তাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেবো না, যাতে তাদের মঙ্গল রয়েছে?” আবু তালেব বললেন : সে বিষয়টা কি? তিনি বললেন : আমি তাদেরকে এমন একটি কলেমা বলতে চাই, যার বদলেতে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং তারা সমগ্র অনারবের অধীশুর হয়ে যাবে। একথা শুনে আবু জহ্ল বলে উঠল : বল, সেই কলেমা কি? তোমার পিতার কসম আমরা এক কলেমা নয়, দশ কলেমা বলতে প্রস্তুত। রসুল্লাহ (সাঃ) বললেন : ব্যস “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” বলে দাও। একথা শুনে সবাই পরিশেষে বস্ত্র খেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং বলল : আমরা কি সমস্ত দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করে মাত্র একজনকে অবলম্বন করব? এ যে, বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার। এ ঘটনার প্রেক্ষাপটেও সুরা ছোয়াদের আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে-কাসীর)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَانطَلَقَ الْمَلَكُ مَظْمُونًا (তাদের সরদাররা একথা বলে প্রস্থান

করল)—এতে উল্লেখিত ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তওহীদের দাওয়াত শুনে তারা মজলিস ত্যাগ করেছিল।

وَمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ এর শাব্দিক অর্থ “কীলকওয়ালা ফেরাউন”। এর তফসীরে তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেন : এতে তার সাম্রাজ্যের দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই হযরত থানভী (রহঃ) এর তরজমা করেছেন—“যার ঝুটি আমূল বিদ্ধ ছিল।” কেউ কেউ বলেন : সে মানুষকে চিৎ করে শুইয়ে তার চার হাত-পায়ে কীলক এঁটে দিত এবং তার উপরে সাপ-বিছুর ছেড়ে দিত। এটাই ছিল তার শাস্তি দানের পদ্ধতি। কেউ কেউ বলেন : সে রশি ও কীলক দ্বারা বিশেষ এক প্রকার খেলা খেলত। কেউ কেউ আরও বলেন : এখানে কীলক বলে অট্টালিকা বোঝানো হয়েছে। সে সুদৃঢ় অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল।—(কুরতুবী)

اُولَئِكَ الْاَحْزَابُ এটা مُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ব্যাকের বর্ণনা। অর্থাৎ, এ আয়াতে যেসব দলের ইঙ্গিত করা হয়েছিল, তারা এরাই। হযরত থানভী (রহঃ) এ অর্থ অনুযায়ীই তফসীর করেছেন। কিন্তু অন্য তফসীরবিদগণ এর অর্থ করেছেন, এরাই ছিল সে দল অর্থাৎ, প্রকৃত শৌর্যবীর্যের অধিকারী সম্প্রদায়ই ছিল আদ, সামুদ প্রমুখ। তাদের মোকাবেলায় মক্কার মুশরিকরা তো তুচ্ছ ও নগণ্য। তারাও যখন খোদায়ী আযাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি, তখন এই মুশরিকরা কি আত্মরক্ষা করবে?—(কুরতুবী)

اُولَئِكَ الْاَحْزَابُ আরবীতে قَوْمٌ এর একাধিক অর্থ হয়। (এক) একবার দুগ্ধ দোহনের পর পুনরায় স্তনে দুগ্ধ আসার মধ্যবর্তী সময়কে قَوْمٌ বলা হয়। (দুই) সুখ-শান্তি। উদ্দেশ্য এই যে, ইসরাফিলের শিকার ফুঁক

অনবরত চলতে থাকবে এতে কোন বিরতি হবে না।—(কুরতুবী)

عَجَلْنَاكَ আসলে কাউকে পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতি সমূলিত দলীল দস্তাবেজকে قط বলা হয়। কিন্তু পরে শব্দটি “অংশ” অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। এখানে তা-ই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, পরকালের শাস্তি ও প্রতিদানে আমাদের যা অংশ রয়েছে, তা এখানেই আমাদেরকে দিয়ে দিল।

কাফেরদের ঠাট্টা-বিদ্রোপের কারণে রসুলুল্লাহ (সাঃ) মর্মবেদনা অনুভব করতেন। এই মর্মবেদনা দুরীকরণের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনার জন্যে আল্লাহ তাআলা এখানে অতীত পয়গম্বরগণের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। সেমতে আলোচ্য আয়াতসমূহেও রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে সবার শিক্ষা দিয়ে কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَإِذْ كُنَّا عَبْدًا لَّادُوْدَ الْاٰدِي — (সুরণ করুন, আমার বান্দা দাউদকে যে ছিল শাস্তিশালী।) প্রায় সমস্ত তফসীরবিদই এর একই ধরনের অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, দাউদ (আঃ) খুবই শক্তি ও সাহসিকতার পরিচয় দিতেন। (إِذْ كُنَّا لَادُوْدَ الْاٰدِي) (নিশ্চয় তিনি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।) বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় নামায ছিল দাউদ (আঃ)-এর নামায এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোযা ছিল দাউদ (আঃ)-এর রোযা। তিনি অর্ধরাত্রি নিদ্রা যেতেন, এক তৃতীয়াংশ এবাদত করতেন এবং পুনরায় রাত্রির ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন এবং তিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন। শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি কখনও পশ্চাদপসরণ করতেন না। নিঃসন্দেহে দাউদ (আঃ) আল্লাহর দিকে খুব প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।—(ইবনে-কাসীর)

এবাদতের উপরোক্ত পদ্ধতি সর্বাধিক পছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, এতে কষ্ট বেশী হয়। সারা জীবন রোযা রাখলে মানুষ রোযায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে কিছুদিন পর রোযায় কোন কষ্টই অনুভূত হয় না। কিন্তু একদিন পর পর রোযা রাখলে কষ্ট অব্যাহত থাকে। এছাড়া এই পদ্ধতিতে মানুষ এবাদতের সাথে সাথে নিজের পরিবার-পরিজনের এবং আত্মীয়-স্বজনের অধিকারও পূরোপুরি আদায় করতে পারে।

إِذْ كُنَّا لَادُوْدَ الْاٰدِي — এ আয়াতে দাউদ (আঃ)-এর সাথে পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের এবাদতে ও তসবীহে শরীক হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এর ব্যাখ্যা সূরা আশ্বিয়া ও সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ পাঠকে আল্লাহ তাআলা এখানে দাউদ (আঃ)-এর প্রতি নেয়ামত

হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এটা দাউদ (আঃ)-এর প্রতি নেয়ামত হল কেমন করে? পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহ পাঠে তাঁর বিশেষ কি উপকার হত?

এর এক উত্তর এই যে, এতে দাউদ (আঃ)-এর একটি মো'জ্জযা প্রকাশ পেয়েছে। বলাবাহুল্য, মো'জ্জযা এক বড় নেয়ামত। এছাড়া হযরত খানজী (রহঃ)-এর এক সুস্মৃ জওয়াবে বলেন : পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের তসবীহর ফলে যিকরের এক বিশেষ আনন্দ ঘন পরিবেশ সৃষ্টি হত। ফলে এবাদতে স্ফূর্তি, সজীবতা ও সাহসিকতা অনুভূত হত। সঙ্গবদ্ধ যিকরের আরও একটি উপকারিতা এই যে, এতে যিকরের বরকত পরস্পরের উপর প্রতিফলিত হতে থাকে। সুকী বুয়ুগগণের মধ্যে যিকরের একটি বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। এতে যিকরের অবস্থায় ধ্যান করা হয় যে, সমগ্র সৃষ্টজগৎ যিকর করে যাচ্ছে। আত্মশুদ্ধি ও এবাদত স্পাহয় এ পদ্ধতির প্রভাব বিস্ময়কর। আলোচ্য আয়াতে এই বিশেষ পদ্ধতির ভিত্তিও পাওয়া যায়।—(মাসায়েলে মুলুক)

চাশতের নামায : بِالنَّيْتِ وَالْاِشْرَاقِ যোহরের পর থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত সময়কে عشی বলা হয়। আর اشراق এর অর্থ সকাল, যখন সূর্যের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এই আয়াতকে চাশতের নামায শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। চাশতের নামাযকে সালাতে আওয়াবীন এবং কেউ কেউ সালাতে এশরাকও বলেন। পরবর্তীতে “সালাতে আওয়াবীন” নাম মাগরিবের পরে ছয় রাকাতের জন্যে এবং “সালাতে এশরাক” নাম সূর্যোদয় সলগ্ন দুই অথবা চার রাকাতাত নফল নামযের জন্যে অধিক খ্যাত হয়ে গেছে।

চাশতের নামায দুই রাকাতাত থেকে বার রাকাতাত পর্যন্ত যত রাকাতাত ইচ্ছা পড়া যায়। হাদীসে এর অনেক উপকারিতা বর্ণিত হয়েছে। তিরমিযীতে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাতাত নামায নিয়মিত পড়ে, তার গোনাহ মাফ করা হয় যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমান হয়। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ বলেন : যে ব্যক্তি চাশতের বার রাকাতাত নামায পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে জন্মতে স্বর্গের প্রাসাদ তৈরী করে দেবেন।—(কুরতুবী)

আলেমগণ বলেন : চাশতের নামায দুই থেকে বার পর্যন্ত যত রাকাতাত ইচ্ছা পড়া যায়। কিন্তু এর জন্যে কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করে নিয়মিত পড়াই উত্তম। এই নিয়মিত সংখ্যা চার রাকাতাত হওয়াই শ্রেয়। কেননা, চার রাকাতাত পড়াই রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এরও নিয়ম ছিল।

وَالْظَّالِمُ خَشَوْتُ مِثْلَ لَهٗ ۖ أَوَابٌ ۝ وَشَدَّ دَانُكُ وَابْتَدَأَ الْحِكْمَةَ
وَوَصَّلَ الْخَطَابَ ۝ وَهَلْ لَّيْسَ بِكَ نَبِيُّ الْحَقِّ ۖ أَذْهَبَ وَوَلَّى الْحَرَابَ ۝
أَزْدَعُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَحْتَفِضُنَا بِغَى
بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا يَحْيَى وَلَا تَشْطِطْ وَاهْرُبْ إِلَى
سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ شِعْرٌ يَسْمَعُونَ نِعْمَةً مِنِّي
فَنَجَّى وَاحِدَةً فَقَالَ الْفُلَيْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۝ قَالَ لَقَدْ
كَلَّمْتُكَ بِسُؤَالٍ فَجَعَلْتَ لِي رَجَاةً ۖ وَإِنْ كُنْتُ مِنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَمْنِي بِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ نَّاهُمْ وَلَقَدْ دَاوُدُ إِنَّمَا قَاتَلَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ۖ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحَسَنُ
مَآبٍ ۝ يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ
إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا سَاءُوا
يَوْمَ الْحِسَابِ ۝ وَأَوَلَقَدْ آتَيْنَاكَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَابْنَيْنِهَا بِإِطْلَاقِ
ذَلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَقْوِيلَ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَلِئِنْ لَّمْ يَرْ
أَوْ

(১৯) আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হত। সবাই ছিল তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। (২০) আমি তাঁর সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগীজ। (২১) আপনার কাছে দাবীদারদের বৃত্তান্ত পৌছেছে, যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে এবাদতখানায় প্রবেশ করেছিল। (২২) যখন তারা দাঁড়ের কাছে অনুপ্রবেশ করল, তখন সে সম্ভ্রান্ত হয়ে পড়ল। তারা বলল : ভয় করবেন না! আমরা বিদ্যমান দুটি পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছে। অতএব, আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। (২৩) সে আমার ভাই, সে নিরানব্বই দুস্খার মালিক আর আমি মালিক একটি মাত্র দুস্খার। এরপরও সে বলে : এটিও আমাকে দিয়ে দাও। সে কথাবার্তায় আমার উপর বলপ্রয়োগ করে। (২৪) দাউদ বলল : সে তোমার দুস্খাটিকে নিজের দুস্খাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও সংকল্প সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। দাঁড়দের খেয়াল হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করল। (২৫) আমি তার সে অপরাধ ক্ষমা করলাম। নিশ্চয় আমার কাছে তার জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্তব্য ও সুন্দর আবাসস্থল। (২৬) হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি, এ কারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভুল যায়। (২৭) আমি আসমান-যমীনে ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছু অযথা সৃষ্টি করিনি। এটা কাফেরদের ধারণা। অতএব, কাফেরদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ অর্থঃ জাহান্নাম।

وَابْتَدَأَ الْحِكْمَةَ وَوَصَّلَ الْخِطَابَ - (আমি তাকে হেকমত ও

ফয়সালাকারী বাগীজা দান করেছি।) হেকমত অর্থ প্রজ্ঞা। অর্থাৎ, আমি তাকে অসাধারণ বিবেকবুদ্ধি দান করেছিলাম। কেউ কেউ হেকমতের অর্থ নিয়েছেন নবুওয়ত। وَوَصَّلَ الْخِطَابَ এর বিভিন্ন তফসীর করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর ভাবার্থ অসাধারণ বাগীজ। হযরত দাউদ (আঃ) উচ্চস্তরের বক্তা ছিলেন। বক্তৃতায় হামদ ও সালাতের পর بعد اما শব্দ সর্বপ্রথম তিনিই বলেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, এর ভাবার্থ সর্বোত্তম বিচারশক্তি। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাঁকে বগড়া-বিবাদ মেটানো ও বাদানুবাদ মীমাংসা করার শক্তি দান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে শব্দগুলোর মধ্যে একই সময়ে উভয় অর্থের পুরোপুরি অবকাশ রয়েছে। হযরত খানভী (রহঃ) যে ভরজমা করেছেন, তাতেও উভয় অর্থ একত্রিত থাকতে পারে।

আলোচ্য ২১-২৫ আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কোরআন পাকে এ ঘটনা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তাতে কেবল এতটুকু বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর এবাদতখানায় বিবাদমান দু'টি পক্ষ পাঠিয়ে কোন এক বিষয়ে তাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন। দাউদ (আঃ) এ পরীক্ষার ফলে সতর্ক হয়ে যান এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। আল্লাহ তাআলাও তাঁকে ক্ষমা করে দেন। কোরআন পাকের আসল লক্ষ্য এখানে এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা যে, হযরত দাউদ (আঃ) সব ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার দিকে রুকু করতেন এবং কোন সময় সামান্য ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটলেও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনায় রত হয়ে যেতেন। তাই এখানে এসব বিষয়ের বিবরণ দেয়া হয়নি যে, সে পরীক্ষা কি ছিল, দাউদ (আঃ) কি ভুল করেছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিলেন এবং যা আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন?

তাই কোন কোন অনুসন্ধানী ও সাবধানী তফসীরবিদ এসব আয়াতের ব্যাখ্যা বলেন : আল্লাহ তাআলা বিশেষ রহস্য ও উপযোগিতার কারণে তাঁর প্রমিতযশা পয়গম্বরের এসব ক্রটি-বিচ্যুতি ও পরীক্ষার বিশদ বিবরণ দেননি। আমাদেরও এর পেছনে পড়া উচিত নয়। যতটুকু বিষয় কোরআন পাকে উল্লেখিত হয়েছে, ততটুকুতেই ঈমান রাখা দরকার। হাফেয ইবনে কাসীরের মত অনুসন্ধানী তফসীরবিদও এ নীতিই অনুসরণ করে ঘটনার বিবরণ দানে বিরত রয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটা সর্বাধিক সাবধানী ও বিপদমুক্ত পথ। এ কারণেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত আছে - **يَهْمُوا مَا يَهْمُهُ اللَّهُ** অর্থঃ, আল্লাহ যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। বলাবাহুল্য, এতে এমনসব বিষয়কে অস্পষ্ট রাখতে বলা হয়েছে, যেগুলোর সাথে আমাদের কর্ম এবং হালাল ও হারামের সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কর্ম সম্পর্কিত বিষয়সমূহের অস্পষ্টতা স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে দূর করে দিয়েছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত খানভী (রহঃ) এই যাচাই ও ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন : মোকদ্দমার দু'পক্ষ প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করে এবং ধূততাপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা শুরু করে। মোকদ্দমা পেশ করার আগেই তারা হযরত দাউদ (আঃ)-কে ন্যায় বিচার করার এবং অবিচার না করার উপদেশ দিতে থাকে। কোন সাধারণ ব্যক্তি হলে এ ধরনের ধূততার কারণে তাদের জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে উল্টো শাস্তি দিত। আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ

(আঃ)—কে পরীক্ষা করলেন যে, তিনিও ক্রোধান্বিত হয়ে তাদেরকে শাস্তি দেন, না পয়গম্বরসুলভ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের কথাবার্তা শুনে।

হযরত দাউদ (আঃ) এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, কিন্তু একটি ভুল রয়ে গেল। তা এই যে, ফয়সালা দেয়ার সময় জালেমকে সম্বোধন না করে তিনি মজলুমকে সম্বোধন করলেন। এ থেকে এক প্রকার পক্ষপাতিত্ব বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি অবিলম্বে সতর্ক হয়ে গেলেন এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। আল্লাহ্ তাআলাও তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।—(বয়ানুল—কোরআন)

কোন কোন তফসীরবিদ ভুলের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আঃ) বিবাদীকে চুপ থাকতে দেখে তার বিবৃতি শোনা ব্যতিরেকেই কেবল বাদীর কথা শুনে এমন উপদেশ দেন যা থেকে মোটামুটি বাদীর সমর্থন হচ্ছিল। অথচ আগে বিবাদীকে তার বক্তব্য পেশ করতে বলা উচিত ছিল। দাউদ (আঃ) যদিও কেবল উপদেশের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলেছিলেন এবং মোকদ্দমার ফয়সালা দেননি, তবুও এটা তাঁর মত সম্মানিত পয়গম্বরের পক্ষে সমীচীন ছিল না এ কারণেই তিনি পরে হুশিয়ার হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন।—(রুহুল—মা'আনী)

কেউ কেউ বলেন : হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর সময়সূচী যেভাবে নির্ধারণ করেছিলেন, তাতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই তাঁর গৃহের কোন না কোন ব্যক্তি এবাদত, যিকর ও তসবীহে মশগুল থাকত। একদিন তিনি আল্লাহ্ তাআলার দরবারে নিবেদন করলেন : হে আমার পালনকর্তা, দিন ও রাতের মধ্যে এমন কোন মুহূর্ত যায় না, যখন দাউদের পরিবারের কেউ না কেউ আপনার এবাদত, যিকর ও তসবীহে নিয়োজিত থাকে না। আল্লাহ্ বললেন : দাউদ, এটা আমার দেয়া তওফীকের কারণেই হয়। আমার সাহায্য না থাকলে তোমার এরূপ করার সাধ্য নেই। আমি একদিন তোমাকে তোমার অবস্থার উপর ছেড়ে দেব। সেমতে আল্লাহ্ তাআলার এই উক্তির পর উপরোক্ত ঘটনা সত্যটি হয়। দাউদ (আঃ)—এর এবাদতে নিয়োজিত থাকার সময় এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তাঁর সময়সূচী বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। তিনি বিবাদ মীমাংসা করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর পরিবারের অন্য কেউ তখন এবাদত ও যিকরে মশগুল ছিল না। এতে দাউদ (আঃ) বোঝতে পারেন যে, আল্লাহ্‌র কাছে এবাদতের গর্ব প্রকাশ করা ভুল ছিল। তাই তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও সেজদায় লুটিয়ে পড়েন। মুস্তাদরাক হাকমে সহীহ সনদ সহকারে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাসের একটি উক্তি দ্বারাও এ ব্যাখ্যার সমর্থন হয়।—(আহকামুল কোরআন)।

উপরোক্ত সবগুলো ব্যাখ্যার অভিন্ন স্বীকৃত বিষয় এই যে, মোকদ্দমাটি কাল্পনিক নয়—সত্যিকার ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং দাউদ (আঃ)—এর যাচাই ও পরীক্ষার সাথে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। এর বিপরীতে অনেক তফসীরবিদের ব্যাখ্যার সারমর্ম এই যে, মোকদ্দমার পক্ষদ্বয় মানুষ নয়—ফেরেশতা ছিল এবং আল্লাহ্ তাআলা দাউদ (আঃ)—এর সামনে একটি কাল্পনিক মোকদ্দমা পেশ করার জন্যে তাদেরকে পাঠিয়েছিলেন যাতে দাউদ (আঃ) নিজের ভুল বোঝাতে পারেন।

অধিকাংশ তফসীরবিদ শেষোক্ত দু'টি ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সাহায্যে কেরামের কোন কোন উক্তি থেকেও এ দু'টি ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায়।—(রুহুল মা'আনী, তফসীরে আবু সউদ, যাদুল মাসীর, তফসীরে কবীর ইত্যাদি)।

﴿ذُكِّرُوا﴾ (যখন তারা এবাদতখানার প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করল)। محراب আসলে বাড়ীর উপর তলা অথবা কোন গৃহের

সম্মুখভাগকে বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিশেষভাবে মসজিদ অথবা এবাদতখানার সামনের অংশকে বোঝানোর জন্যে শব্দটি ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। কোরআনে এটি এবাদতখানার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা সুযুতী লিখেন, আজকাল মসজিদসমূহে যে বৃত্তাকারের মেহরাব নির্মাণ করা হয়, তা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর আমলে ছিল না।—(রুহুল মা'আনী)

﴿فَرَّغَ مِنْهُمْ﴾ (হযরত দাউদ (আঃ) তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন।) ঘাবড়ানোর কারণ সুস্পষ্ট। অসময়ে দু'ব্যক্তির পাহারা ডিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা সাধারণতঃ মন্দ অভিপ্রায়ই হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক ভীতি নবুওয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থী নয় : এ থেকে জানা গেল যে, কোন ভয়াবহ জিনিস দেখে স্বাভাবিকভাবে ভীত হয়ে যাওয়া নবুওয়ত ও ওলীত্বের পরিপন্থী নয়। তবে এই ভীতিকে মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল করে কর্তব্য কাজ ছেড়ে দেয়া অবশ্যই মন্দ।

কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের শানে বলা হয়েছে ﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا﴾ ﴿يَا﴾ (তারা আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ভয় করেন না।) অতঃপর প্রশ্ন হতে

পারে যে, এখানে হযরত দাউদ (আঃ) ভীত হলেন কেন? জওয়াব এই যে, ভয় দু'রকম হয়ে থাকে। এক ভয় ইতর প্রাণীদের কষ্ট দেয়ার আশংকায় হয়ে থাকে। আরবীতে একে خوف বলা হয়। দ্বিতীয় ভয় কোন মহান ব্যক্তির মাহাত্ম্য, প্রতাপ ও প্রভাবের কারণে হয়ে থাকে। আরবীতে একে خشيّة বলা হয়। (মুফরদাতে রাগিব) শেষোক্ত ভয় আল্লাহ্ ব্যতীত কারও জন্যে হওয়া উচিত নয়। তাই পয়গম্বরগণ আল্লাহ্ ব্যতীত কারও প্রতি এ ধরনের ভয়ে ভীত হতেন না। তবে স্বাভাবিক পর্যায়ে ইতর বস্তুর ভয় তাঁদের মধ্যেও ছিল।

অনিয়ম দেখলে প্রকৃত অবস্থা জানা পর্যন্ত সবর করা উচিত ﴿ثَوَابُ الْعَنَانِ﴾ —(তারা বলল : আপনি ভীত হবেন না।) আগন্তুকরা একথা

বলে তাদের বক্তব্য শুরু করে দেয় এবং দাউদ (আঃ) চুপচাপ তাদের কথা শুনে থাকেন। এ থেকে জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি হঠাৎ নিয়মের ব্যতিক্রম করে ফেললে সাথে সাথেই তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়, বরং প্রথমে তার কথা শুনে নেয়া দরকার, যাতে জানা যায় যে, এরূপ ব্যতিক্রম করার বৈধতা ছিল কিনা। অন্য কেউ হলে আগন্তুকদের উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ বকাবকি শুরু করে দিত, কিন্তু দাউদ (আঃ) আসল ব্যাপার জানার জন্যে অপেক্ষা করেছেন। তিনি মনে করেছেন যে, সম্ভবতঃ এরা অসুবিধাগ্রস্ত ﴿وَالشُّكُّ﴾ (এবং অবিচার করবেন না।) আগন্তুকদের কথা বলার এ ভঙ্গি বাহ্যতঃ ধৃষ্টতাপূর্ণ ছিল। প্রথমতঃ প্রাচীর ডিঙিয়ে অসময়ে আসা, অতঃপর এসেই দাউদ (আঃ)—এর মত মহান পয়গম্বরকে সুবিচার করার এবং অবিচার থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দেয়া—এগুলোর সবই ছিল কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। কিন্তু দাউদ (আঃ) সবর করেন এবং তাদেরকে গালমন্দ করেননি।

অভাবগ্রস্তদের ভুলভ্রান্তিতে বড়দের যথাসম্ভব ষৈর্ষ ধরা উচিত : এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্ তাআলা যাকে উচ্চ পদমর্যাদা দান করেন এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনাদি তার সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে, তার উচিত অভাবগ্রস্তদের অনিয়ম ও কথাবার্তায় ভুলভ্রান্তিতে যথাসম্ভব ষৈর্ষ ধরা। এটাই তার পদমর্যাদার দাবী। বিশেষভাবে শাসক, বিচারক ও মুফতীগণের এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।—(রুহুল মা'আনী)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجِيَّتِكَ إِلَىٰ رَسَائِكَ — (দাউদ (আঃ))

বললেন, সে তোমার দুশীকে তার দুশ্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে।) এখানে দু'টি বিষয় প্রাধান্যযোগ্য— (১) হযরত দাউদ (আঃ) এ কথাটি কেবল বাদীর বর্ণনা শুনেই বলে দিয়েছেন—বিবাদীর বিবৃতি শুনে ননি। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটাই ছিল তাঁর ভুল, যে কারণে তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু অন্যান্য তফসীরবিদগণ বলেন, প্রকৃতপক্ষে এখানে মোকদ্দমার পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হচ্ছে না; কেবল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। দাউদ (আঃ) নিশ্চয়ই বিবাদীর কথাও শুনে থাকবেন। ফয়সালার এটাই সুবিদিত পন্থা।

এছাড়া এমনও হতে পারে যে, আগন্তুকরা যদিও তাঁর কাছে আদালতী মীমাংসা কামনা করেছিল, কিন্তু তখন আদালত অথবা কাছারির সময় ছিল না এবং সেখানে রায় কার্যকর করার প্রয়োজনীয় উপায়ও ছিল না। তাই দাউদ (আঃ) বিচারকের পদমর্যাদায় নয়—মুক্তীর পদমর্যাদায় ফতোয়া দেন। মুক্তীর কাজ ঘটনার তদন্ত করা নয় বরং, প্রশ্ন মোতাবেক জওয়াব দেয়া।

কাজ-কারবারে শরীক হওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা প্রয়োজন :

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الظُّلُمَاتِ الَّتِي يَفْعَلُ الْمُؤْمِنُونَ فَوَاحِشَ مَا فِي سُلُوكِهِمْ

(শরীকদের অনেকেই একে অন্যের প্রতি বাড়াবাড়ি করে থাকে।) এতে বলা হয়েছে যে, দু' ব্যক্তি কোন কাজ-কারবারে শরীক হলে প্রায়ই একের দ্বারা অপরের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়। কোন সময় এক ব্যক্তি একটি কাজকে মামুলী ভেবে করে ফেলে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা গোনাহের কারণ হয়ে যায়। তাই কাজ-কারবারে খুবই সাবধানতা আবশ্যিক।

وَكُلٌّ مَّا كَانَتْ تَحْتَ يَدَيْهِ (দাউদের ধারণা হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা

করেছি।) মোকদ্দমার বিবরণকে যদি হযরত দাউদ (আঃ) এর ভুলের দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা হয় তবে এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে ভুলের সাথে এর কোন সম্পর্ক না থাকলেও উভয় পক্ষের মোটামুটি অবস্থা এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল যে, এরা পরীক্ষার্থে প্রেরিত হয়েছে। একদিকে তারা মোকদ্দমার ফয়সালা ত্বরান্বিত করার জন্যে বিলম্ব সহ্য করেনি এবং সাহসিকতার সাথে প্রাচীর ভিঙিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেছে। অপরদিকে মোকদ্দমা পেশ করার সময় বিবাদী চূপচাপ বসে রয়েছে এবং কথায় ও কাজে বাদীর কথা নির্দিষ্ট যেনে নিয়েছে।

যদি বাদীর বর্ণিত ঘটনা বিবাদী পূর্বই সমর্থন করত, তবে ফয়সালার জন্যে দাউদ (আঃ) এর কাছে আসার কোন প্রয়োজনই ছিল না। দাউদ (আঃ) এর ফয়সালা যে বাদীর পক্ষে হবে, এটা সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও বুঝতে পারত। পক্ষদ্বয়ের এই রহস্যপূর্ণ তৎপরতা ব্যক্ত করছিল যে, এটি একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। দাউদ (আঃ) ও টের পেয়ে গেলেন যে, এরা আল্লাহ প্রেরিত এবং এতে আমার পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য। কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, ফয়সালা শোনার পর তারা একে অপরের প্রতি তাকিয়ে মুচকি হাসল এবং মুহূর্তের মধ্যে আকাশে চলে গেল।

فَاسْتَفْتَرَاكَ وَكَرَّرَا إِلَيْكَ وَأَتَاكَ (অতঃপর তিনি তাঁর পরওয়ানার

দেগারের দরবারে প্রার্থনা করলেন এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়ে রুজু হলেন।) এখানে “রুজু” শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে, এখানে সেজদা বোঝানো হয়েছে। হানাফী আলেমগণের মতে এ আয়াত তেলাওয়াত করলে সেজদা ওয়াজেব হয়।

وَأَنَّ لَهُ جُنْدًا تَكْرُؤًا وَحَسَنَ مَّأَبٍ — (নিশ্চয় দাউদের জন্যে আমার কাছে বিশেষ নৈকট্য ও শুভ পরিণতি রয়েছে।) এ আয়াতের মাধ্যমে ঘটনার সমাপ্তি টেনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত দাউদ (আঃ) যে ভুলই করে থাকুন, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা ও রুকু'র পর আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভুল-ভ্রান্তির জন্য সতর্ক করতে হলে প্রজ্ঞার প্রয়োজন : এ ঘটনা সম্পর্কিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দাউদ (আঃ) এর বিচ্যুতি যাই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা সরাসরি ওহীর মাধ্যমেও তাঁকে এ বিষয়ে হুশিয়ার করতে পারতেন। কিন্তু এর পরিবর্তে একটি মোকদ্দমা পাঠিয়ে হুশিয়ার করার এই বিশেষ পন্থা কেন অবলম্বন করা হল? প্রকৃতপক্ষে এখানে যারা “সংকাজে আদেশ ও অসংকাজে নিষেধের” কর্তব্য পালন করে, তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে তার ভুলত্রাস্তি সম্পর্কে হুশিয়ার করতে হলে তা প্রজ্ঞা সহকারে করতে হবে। একাজে এমন পন্থা অবলম্বন করা উচিত, যাতে সর্শ্বেষ্ট ব্যক্তি নিজেই নিজের ভুল উপলব্ধি করতে পারে এবং যৌথিকভাবে হুশিয়ার করার প্রয়োজনই দেখা না দেয়। এর জন্যে এমন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কাজ করা অধিক কার্যকর যাতে কারও মনে কষ্ট না লাগে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ও ফুটে উঠে।

০ হযরত দাউদ (আঃ) কে আল্লাহ তাআলা নবুওয়তের সাথে শাসনক্ষমতা এবং নামাযও দান করেছিলেন। সুতরাং আলোচ্য ২৬ নং আয়াতে শাসন কার্যের জন্যে তাঁকে একটি মৌলিক পথ নির্দেশ দান করা হয়েছে। এ নির্দেশ নামায় তিনটি মৌলিক বিষয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

(১) আমি আপনাকে পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি করেছি, (২) সেমতে আপনার মূল কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়শূণ্য ফয়সালা করা, (৩) এ কর্তব্য পালনের জন্যে নফসানী খেয়ালখুশীর অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা একটি অপরিহার্য শর্ত।

পৃথিবীতে প্রতিনিধি করার অর্থ সূরা বাক্বারায় বর্ণিত হয়েছে। এ থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের এ মূলনীতি ফুটে উঠে যে, সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তাআলারই। পৃথিবীর শাসকবর্গ তারই নির্দেশানুযায়ী চলার জন্য আদিষ্ট। কেউ এর বাইরে যাবে না সুতরাং মুসলমানদের শাসনকর্তা, উপদেষ্টা পরিষদ অথবা আইনসভা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা অথবা সম্পাদনা করতে পারলেও আইন রচনা করতে পারে না। তারা আল্লাহর আইনসমূহের উপস্থাপক মাত্র।

ন্যায় প্রতিষ্ঠাই ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল কর্তব্য : এখানে একথাও পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের বুনয়াদী কাজ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে প্রশাসনিক ব্যাপারাদি ও কলহ-বিবাদ মীমাংসার ক্ষেত্রে সুবিচার ও ইনসাফ কায়েম করা।

ইসলাম একটি চিরন্তন ধর্ম : তাই সে শাসনকার্যের জন্যে সেসব প্রশাসনিক ঝুটিনাটি নির্দিষ্ট করেনি, যেগুলো সময় ও পরিস্থিতির পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে যায়, বরং সে কতগুলো মৌলিক নির্দেশ দান করেছে, যার আলোকে সর্ব যুগের উপযোগী প্রশাসনিক ঝুটিনাটি নিজে থেকেই মীমাংসা করা যায়। এ কারণেই এখানে বলে দেয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্রের আসল কাজ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এর প্রশাসনিক বিশ্লেষণ সর্ব যুগের সুখী মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক : সেমতে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ থেকে পৃথক থাকবে, না একীভূত থাকবে—এ ব্যাপারে

অপরিবর্তনীয় কোন নির্দিষ্ট বিধান দেয়া হয়নি যা কোন কালেই পরিবর্তিত হতে পারবে না। যদি কোন যুগে শাসকবর্গের বিশৃঙ্খতা ও সততায় পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা যায়, তবে বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথক সম্মত বিলোপ করা সম্ভব। কোন যুগে শাসকবর্গ এক্সল আস্থাভাজন না হলে বিচার বিভাগকে শাসনবিভাগ থেকে পৃথকও রাখা যায়।

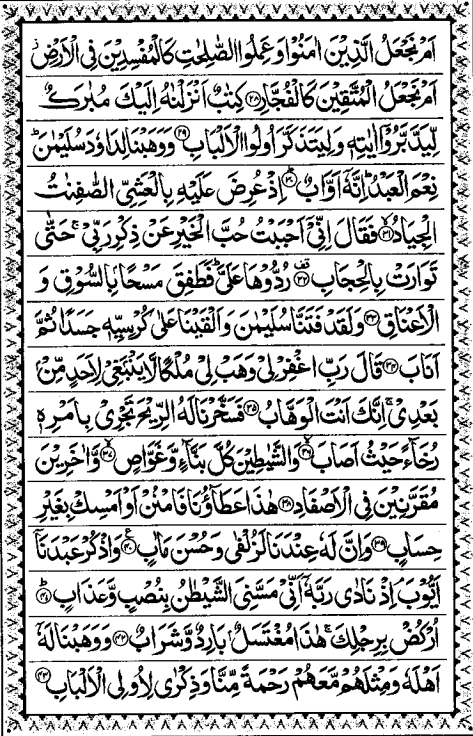
হযরত দাউদ (আঃ) আল্লাহর মনোনীত পরমসুন্দর ছিলেন। তাঁর চেয়ে অধিক বিশৃঙ্খতা ও সততার দাবী কে করতে পারত? তাই তাঁকে একই সময়ে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করে কসড়া-বিবাদ মীমাংসার দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছিল। খেলাফতের রাশেদীনের মধ্যেও এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। আমিরুল মু'মেনীন নিজেই বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। পরবর্তী ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে এ পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয় এবং আমিরুল মু'মেনীনকে শাসন বিভাগের এবং প্রধান বিচারপতিকে বিচার বিভাগের প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

তৃতীয় যে নির্দেশের উপর আলোচ্য আয়াতে সর্বাধিক জোর দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে 'খ্যাল-খুশীর' অনুসরণ করা না এবং হিসাব দিবসের কথা সর্বদা মনে রেখা। যেহেতু এটা সুবিচার প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি, তাই এর উপর সর্বাধিক জোর দেয়া হয়েছে। যে শাসক অথবা বিচারকের অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং পরকালের চিন্তা থাকবে, সে-ই সত্যিকার অর্থে ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে। তা না হলে আপনি যত উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর আইনই রচনা করুন না কেন, খ্যাল-খুশীর দুরন্তপনা সর্বত্র নতুন ছিগুপথ বের করে নেবে। খ্যাল-খুশীর উপস্থিতিতে কোন উৎকৃষ্টতার আইনব্যবস্থাই ন্যায় ও সুবিচার কায়েম করতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস এবং বর্তমান যুগের পরিস্থিতিই এর সাক্ষ্য বহন করে।

দায়িত্বশীল পদে নিয়োগের জন্য সর্বপ্রথম দেখার বিষয় চরিত্র : এখান থেকে আরও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে, শাসক, বিচারক অথবা কোন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করার জন্যে সর্বপ্রথম দেখতে হবে, তার মধ্যে ষোদাভীতি ও পরকাল চিন্তা আছে কিনা এবং তার চরিত্র ও কর্ম কিরূপ? যদি বোঝা যায়, তার অন্তরে ষোদাভীতির পরিবর্তে খ্যাল-খুশীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তবে সে যত উচ্চ ডিগ্রীধারীই হোক না কেন, নিজ বিষয়ে যত বিশেষজ্ঞ ও কর্মঠই হোক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে সে কোন উচ্চপদের যোগ্য নয়।

আয়াতসমূহের সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা : আলোচ্য ২৫-২৯ নং আয়াতসমূহে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, বিশেষতঃ পরকালের বিশ্বাস সপ্রমাণ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)-এর ঘটনাবলীর মাধ্যমে খুব সূক্ষ্ম ধারাবাহিকতা সহকারে উল্লেখিত হয়েছে। ইমাম রাযী বলেন : যদি কোন ব্যক্তি হঠকরিভাবতঃ কোন বিষয় বুঝতে না চায়, তবে তার সাথে বিজ্ঞানোচিত পন্থা এই যে, আলোচ্য বিষয়বস্তু ছেড়ে দিয়ে কোন অসংলগ্ন কথা শুরু করতে হবে। যখন তার চিন্তাধারা প্রথম বিষয় থেকে সরে যাবে, তখন কথা প্রসঙ্গেই তাকে প্রথম বিষয়টি মনে নিতে বাধ্য করতে হবে। এখানে পরকাল সপ্রমাণ করার জন্যে এ পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আঃ)-এর ঘটনার পূর্বে কাসকেরদের হঠকরিভার আলোচনা চলছিল, যা

وَالْأَوَّلَاءِ إِنَّا عَجِلْنَا بِكَ وَكُنَّا أَكْبَلُ نِزْمِ الْحِسَابِ আয়াতে এসে শেষ হয়েছিল। এর সারমর্ম ছিল এই যে, তারা পরকাল অস্বীকার করে এক পরকালের প্রতি বিদ্রূপ করে। এরই সাথে সাথে পরে বলা হয়েছে যে, اَصْدِرْ عَلَى مَا يَنْوَلُونَ وَأَذْكَرْ عِنْدَنَا ذِكْرًا (তাদের কথাবার্তায় সবার করুন এবং আমার বান্দা দাউদকে সুরশ করুন।) এভাবে একটি নতুন বিষয় শুরু করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু দাউদ (আঃ)-এর ঘটনা একথা বলে শেষ করা হয়েছে যে, হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। সুতরাং তুমি মানুষের মধ্যে ইনসাক সহকারে কনসালা করবে। এখন আলোচ্য আয়াত থেকে এক অনুভূত পন্থায় পরকাল সপ্রমাণ করা হয়েছে। কারণ, যে সত্তা তার প্রতিনিধিকে পৃথিবীতে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার আদেশ দেয় এবং কুসর্যীদেরকে শাস্তি ও সৎকর্যীদেরকে শাস্তি দিতে বলে, সে কি নিজে এই স্ট্রজগতে সুবিচার ও ইনসাক প্রতিষ্ঠিত করবে না? অবশ্যই সে ভালমন্দ সবাইকে এক নাতি দিয়ে ইকবার পরিবর্তে পাগাচারীদেরকে শাস্তি দেবে এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করবে। এটাই তার প্রজ্ঞার দাবী এবং এটাই জগৎ সৃষ্টির লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে কেয়ামত ও পরকাল অবশ্যম্ভাবী। যারা পরকাল অস্বীকার করে, তারা যেন পরোক্ষভাবে এ দাবীই করে যে, এ জগৎ এমনি উদ্দেশ্যহীন ও অযথা সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে ভালমন্দ সব মানুষ জীবন যাপন করে মরে যাবে এবং এরপর তাদের জিজ্ঞাসাকারী কেউ থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞায় যারা বিশৃঙ্খলী তারা একথা কিছুতেই মনে নিতে পারে না।



(২৮) আমি কি বিশাশী ও সংকামীদেরকে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টকারী কাফেরদের সমতুল্য করে দেব? না খোদাতীরুদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব। (২৯) এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ্য করে এবং বুঝিয়ানগণ যেন তা অনুশ্রবণ করে। (৩০) আমি দাউদকে সোলায়মান দান করেছি। সে একজন উত্তম বান্দা। সে ছিল প্রত্যাভবতশীল। (৩১) যখন তার সামনে অপরাধে উৎকট অশুরাজি পেশ করা হল, (৩২) তখন সে বলল : আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের স্মরণে বিস্মৃত হয়ে সম্পদের মহব্বতে মগ্ন হয়ে পড়েছি—এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। (৩৩) এগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল। (৩৪) আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিম্রাণ দেহ। অতঃপর সে রুজু হল। (৩৫) সূলায়মান বলল : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। (৩৬) তখন আমি বাতাসকে তার অনুগত করে দিলাম, যা তার হুকুমে অবশ্যে প্রবাহিত হত যেখানে সে পৌঁছাতে চাইত। (৩৭) আর সকল শয়তানকে তার অধীন করে দিলাম অর্থাৎ, যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুরুরী। (৩৮) এবং অন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকত শৃঙ্খলে। (৩৯) এগুলো আমার অনুগ্রহ, অতঃপর, এগুলো কাউকে দাও অথবা নিজ রেখে দাও—এর কোন হিসেব দিতে হবে না। (৪০) নিশ্চয় তার জন্যে আমার কাছে রয়েছে মর্যাদা ও শুভ পরিণতি। (৪১) স্মরণ করুন, আমার বান্দা আইয়ুবের কথা, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহ্বান করে বলল : শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট পৌছিয়েছে। (৪২) তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর। অরণ্য নির্গত হল গোসল করার জন্যে শীতল ও পান করার জন্যে। (৪৩) আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও অনেক আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং বুঝিয়ানদের জন্যে উপদেশস্বরূপ।

— (আমি কি বিশাশী ও সংকামীদেরকে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টকারীদের সমান গণ্য করে দেব, না পরহেযগারদেরকে পাপাচারীদের সমান করে দেব?) অর্থাৎ, এমন কখনও হতে পারে না। বরং উভয় দলের পরিণতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। এ থেকেই জানা গেল যে, পরকালীন বিধানাবলীর ক্ষেত্রে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হবে। এ পৃথিবীতে হয়তো এমনটি সম্ভবপর যে, কাফেররা মুমিন অপেক্ষা বস্ত্রনিষ্ঠ সুখ-শান্তিপ্রাপ্ত হবে। এ থেকে একথাও বলা যায় না যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কাফেরের পার্থিব অধিকার মুমিনের সমান হতে পারে না, বরং কাফেরকে মুসলমানের সমান মানবিক অধিকার দেয়া যেতে পারে। সেমতে ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, তাদেরকে যাবতীয় মানবিক অধিকার মুসলমানদের সমানই দেয়া হবে।

০ আলোচ্য ৩০-৩৩ নং আয়াতসমূহে হযরত সূলায়মান (আঃ) এর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। এ ঘটনার প্রসিদ্ধ বিবরণের সারমর্ম এই যে, হযরত সূলায়মান (আঃ) অশুরাজি পরিদর্শনে এমনভাবে মগ্ন হয়ে পড়েন যে, নামায পড়ার নিয়মিত সময় আসার অভিবাহিত হয়ে যায়। পরে সম্ভব ফিরে পেয়ে তিনি সমস্ত অশু ব্যবহ কর দেন। কেননা, এগুলোর কারণেই আল্লাহর স্মরণ বিস্মৃত হয়েছিল।

এ নামায নফল হলেও কোন আপত্তির কারণ নেই। কেননা, পয়গম্বরগণ এতটুকু ক্ষতিও পূরণ করার চেষ্টা করে থাকেন। পক্ষান্তরে তা ফরয নামায হলে ভুলে যাওয়ার কারণে তা কাযা হতে পারে এতে কোন গোনাহ হয় না। কিন্তু সূলায়মান (আঃ) স্বীয় উচ্চ মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে এরও প্রতিকার করেছেন।

এ তফসীরটি কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনে কাসীরের ন্যায় অনুসন্ধানী আলেমও এই তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আল্লামা সুযুতী বর্ণিত রসুলে করীম (সাঃ)—এর এক উক্তি থেকেও এই তফসীরের সমর্থন পাওয়া যায়।

কিন্তু এতে সন্দেহ হয় যে, অশুরাজি আল্লাহ প্রদত্ত একটি পুরস্কার ছিল। নিজের সম্পদকে এভাবে বিনষ্ট করা একজন পয়গম্বরের পক্ষে শোভা পায় না। তফসীরবিদগণ এর জওয়াবে বলেন যে, এ অশুরাজি সূলায়মান (আঃ)—এর ব্যক্তিগত মালিকাবধীন ছিল। তার শরীয়তে গুরু, ছাগল ও উটের ন্যায় অশু কোরবানী করাও বৈধ ছিল। তাই তিনি অশুরাজি বিনষ্ট করেননি; বরং আল্লাহর নামে কোরবানী করেছেন।

কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহের আরও একটি তফসীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তাতে ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, হযরত সোলায়মান (আঃ)—এর সামনে জেহাদের জন্যে তৈরী অশুরাজি পরিদর্শনের নিমিত্ত পেশ করা হলে সেগুলো দেখে তিনি খুব আনন্দিত হন। সাথে সাথে তিনি বললেন : এই অশুরাজির প্রতি আমার যে মহব্বত ও মনের টান, তা পার্থিব মহব্বতের কারণে নয় ; বরং আমার পালনকর্তার স্মরণের কারণেই। কারণ, এগুলো জেহাদের উদ্দেশে তৈরী করা হয়েছে। জেহাদ একটি উচ্চস্তরের এবাদত। ইতিমধ্যে অশুরাজির দল তাঁর দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। তিনি আদেশ দিলেন : এগুলোকে আবার আমার সামনে উপস্থিত কর। সেমতে পুনরায় উপস্থিত করা হলে তিনি অশুরাজির

গলাদেশে ও পায়ে আদর করে হাত বুলালেন।

এই তফসীর অনুযায়ী عَنْ وَرَدِي عَنْ কারবার্বে ব্যবহৃত হয়েছে এবং عَنْ وَرَدِي এর সর্বনাম দ্বারা অশুরাজিই বোঝানো হয়েছে। এখানে عَنْ এর অর্থ কর্তন করা নহ; বরং আদর করে হাত বুলালো।

প্রাচীন তফসীরবিদগণের মধ্যে হাফেয ইবনে জরীর, তাবারী, ইমাম রায়ী প্রমুখ এ তফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কেননা, এই তফসীর অনুযায়ী সম্পদ নষ্ট করার সন্দেহ হয় না।

কোরআন পাকের ভাষ্যদূটে উভয় তফসীরের অবকাশ আছে। কিন্তু প্রথম তফসীরের গক্ষে একটি হাদীস থাকায় তার শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

সূর্য কিরিয়ে আনার কাহিনী : কেউ কেউ প্রথম তফসীর অবলম্বন করে আরও বলেছেন যে, আসরের নামায কাযা হয়ে যাওয়ার পর সোলায়মান (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার কাছে অথবা ফেরেশতগণের কাছে সূর্যকে পুনরায় কিরিয়ে আনার নিবেদন জানান। সেমতে সূর্যকে কিরিয়ে আনা হলে তিনি নিয়মিত এবাদত পূর্ণ করেন। এরপর পুনরায় সূর্য অন্তর্মিত হয়। তাদের মতে عَنْ وَرَدِي কার্যের সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে।

কিন্তু আল্লামা আলসী প্রমুখ অনুসন্ধানী তফসীরবিদগণ এই কাহিনী খণ্ডন করে বলেছেন : عَنْ وَرَدِي কার্যের সর্বনাম দ্বারা অশুরাজিই বোঝানো হয়েছে— সূর্য নয়। এর কারণ এটা নয় যে, সূর্যকে পুনরায় কিরিয়ে আনার ক্ষমতা আল্লাহ তাআলার নেই বরং কারণ এই যে, এ কাহিনী কোরআন ও হাদীসের কোন দলীল দ্বারা প্রামাণ্য নয়।—(রুহুল মা'আনী)

আল্লাহর স্মরণে শৈথিল্য হলে নিজের উপর শাস্তি নির্ধারণ করা ধর্মীয় মর্যাদাবোধের দাবী : সর্বাবস্থায় এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন সময় আল্লাহর স্মরণে শৈথিল্য হয়ে গেলে নিজেকে শাস্তি দেয়ার জন্যে কোন মুবাহ (অনুমোদিত) কাজ থেকে বঞ্চিত করে দেয়া জায়েয। সূফী বুফুর্গণের পরিভাষায় একে ‘গায়রত’ বলা হয়।—(বয়ানুল—কোরআন)

কোন সংকাজের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যে নিজের উপর এ ধরনের শাস্তি নির্ধারণ করা আত্মতুষ্টির একটি ব্যবস্থা। এ ঘটনা থেকে এর বৈধতা বরং পছন্দনীয়তা জানা যায়। হযুরে আকরাম (সঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আবু জুহায়ম (রাঃ) তাঁকে একটি শাখী চাদর উপহার দেন। চাদরটি ছিল কারুকার্যখচিত। তিনি চাদর পরিধান করে নামায পড়লেন এবং ফিরে এসে হযরত আয়েশাকে বললেন, চাদরটি আবু জুহায়মের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও। কেননা, নামাযে আমার দৃষ্টি এর কারুকার্যের উপর পড়ে গিয়েছিল এবং আমার মনোনিবেশে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।—(আহকামুল—কোরআন)

এমনিভাবে হযরত আবু তালহা (রাঃ) একবার তাঁর বাগানে নামাযরত অবস্থায় একটি পাখী দেখে কিছুক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে যান। ফলে নামাযের নিবিষ্টতা নষ্ট হয়ে যায়। পরে তিনি বাগানটি সদকা করে দেন।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই উদ্দেশ্যের জন্যে বৈধ শাস্তি নির্ধারণ করা উচিত। কারণ, অহেতুক কোন সম্পদ বিনষ্ট করা জায়েয নয়। সুতরাং সম্পদ বিনষ্ট হয়, এরূপ কোন কাজ করা বৈধ নয়। সূফীগণের মধ্যে হযরত শিবলী (রঃ) একবার এ ধরনের শাস্তি হিসেবে তাঁর বশত আলিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু শায়খ আবদুল ওয়াহ্যাব শে'রানী (রঃ)—এর মত অনুসন্ধানী সূফী বুফুর্গণ তাঁর এই কর্মকে সঠিক বলে আখ্যা

দেননি।—(রুহুল মা'আনী)

ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যের কাজকর্ম দেখাশোনা করা শাসনকর্তার উচিত : এ ঘটনা থেকে আরও জানা যায় যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অধীনস্থ বিভাগসমূহের কাজকর্ম স্বয়ং দেখাশোনা করা উচিত; কাজকর্ম অধীনস্থদের উপর ছেড়ে নিশ্চিত বসে থাকা উচিত নয়। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আঃ) অধীনস্থদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও স্বয়ং অশুরাজি পরিদর্শন করেন। বলিফা হযরত ওমর (রাঃ)—এর কর্ম থেকেও তাই প্রমাণিত আছে।

এক এবাদতের সময় অন্য এবাদতে মশগুল থাকা ভুল : এ ঘটনা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, এক এবাদতের নির্দিষ্ট সময় অন্য এবাদতে ব্যয় করা অনুচিত। কলাবাস্তা, জেহাদের অশু পরিদর্শন করা একটি বৃহত্তম এবাদত, কিন্তু সময়টি ছিল এ এবাদতের পরিবর্তে নামাযের জন্যে নির্দিষ্ট। তাই হযরত সোলায়মান (আঃ) একে ভুল গণ্য করে তার প্রতিকার করেছেন। এ কারণেই আমাদের ফেকাহবিদগণ লিখেন : জুমআর আযানের পর যেমন ক্রয়-বিক্রয়ে মশগুল থাকা জায়েয নয়, তেমনি জুমআর নামাযের প্রস্তুতি ছাড়া অন্য কোন কাজে মশগুল হওয়াও বৈধ নয়, যদিও তা তেলাওয়াতে কোরআন অথবা নফল পড়ার এবাদত হয়।

০ আলোচ্য ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা হযরত সোলায়মান (আঃ)—এর আরও একটি পরীক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে, এই পরীক্ষার সময় একটি নিশ্রাণ দেহ সোলায়মান (আঃ) —এর সিংহাসনে রেখে দেয়া হয়েছিল। এখন সে নিশ্রাণ দেহটি কি ছিল, একে সিংহাসনে রাখার অর্থ কি এবং এর মাধ্যমে পরীক্ষা কিভাবে হল, এসব বিবরণ কোরআন পাকে বিদ্যমান নেই এবং কোন সহীহ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নেই। তাই হাফেয ইবনে কাসীরের সে মনোভাব এখানেও তাই দেখা যায় যে, কোরআন পাক যে বিষয়কে অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে। তার বিশদ বিবরণ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কেবল এ বিষয়ের উপর ইমান রাখা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা সোলায়মান (আঃ)—কে কোনভাবে পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহর দিকে আরও বেশী রুজু হয়েছিলেন। এতেই কোরআন পাকের আসল লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যায়।

তবে কোন কোন তফসীরবিদ এ পরীক্ষার বিবরণ বোদ্ধ করারও প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা এ ক্ষেত্রে একাধিক সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে কোন কোনটি নির্ভেজাল ইসরাঈলী রেওয়াজেত থেকে গৃহীত। উদাহরণতঃ হযরত সোলায়মান (আঃ)—এর রাজত্বের রহস্য তাঁর আঁটির মধ্যে নিহিত ছিল। একদিন এক শয়তান এই আঁটি করাযস্ত করে নেয় এবং এর কারণে সে সোলায়মান (আঃ)—এর সিংহাসনে তাঁরই আকৃতি ধারণ করে বাদশাহরূপে জেঁকে বসে। চল্লিশ দিন পর সোলায়মান (আঃ) সে আঁটি একটি মাছের পেট থেকে উদ্ধার করেন এবং পুনরায় সিংহাসন লাভ করতে সমর্থ হন। এই রেওয়াজেতটি আরও কতিপয় কাহিনীসহ কয়েকটি তফসীরগ্রন্থেও উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু হাফেজ ইবনে কাসীর এ ধরনের সমস্ত রেওয়াজেতই ইসরাঈলী গণ্য করার পর লিখেন :

“আহলে-কিতাবের একটি দল হযরত সোলায়মান (আঃ)—কে পয়গম্বর বলেই মানে না। বাহ্যতঃ এসব মিথ্যা কাহিনী তাদেরই অপকীর্তি।” সুতরাং এ ধরনের রেওয়াজেতকে আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলা কিছুতেই জায়েয নয়।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আরও একটি ঘটনা সহীহ বুখারী ইত্যাদি কিতাবে বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতের সাথে এ ঘটনার কিছু সাদৃশ্য দেখে কেউ কেউ একে আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনার সারমর্ম এই : একবার হযরত সোলায়মান (আঃ) স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, এ রাত্রিতে আমি সকল বিবির সঙ্গে সহবাস করব এবং তাদের প্রত্যেকের গর্ভ থেকে এক একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার সময় তিনি “ইনশাআল্লাহ” বলতে ভুলে গেলেন। একজন মহামান্য পয়গম্বরের এ ক্রটি আল্লাহ তাআলা পছন্দ করলেন না এবং আল্লাহ পাক তাঁর এ প্রয়াস নিষ্ফল করে দিলেন। ফলে বিবিগণের মধ্যে মাত্র একজনের গর্ভ থেকে একটি মৃত ও পার্শ্ববর্তী সন্তান জন্মিল।

কোন কোন তফসীরবিদ এ ঘটনার ভিত্তিতে বলেন : সিংহাসনে নিষ্ঠাপ দেহ রাখার অর্থ এই যে, সূলায়মান (আঃ)-এর জ্ঞানেক চাকর এ মৃত সন্তানকে এনে তাঁর সিংহাসনে রেখে দেয়। এতে সূলায়মান (আঃ) বুঝে নেন যে, এটা তাঁর ইনশাআল্লাহ না বলার ফল। সেমতে তিনি আল্লাহর দিকে রুজু হলেন এবং কমা প্রার্থনা করলেন।

কাযী আবুস সউদ, আল্লামা আনুসী প্রমুখের মত কতিপয় বিজ্ঞ তফসীরবিদও এ তফসীর অবলম্বন করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত ধানভী (রহঃ) বয়ানুল-কোরআনের তদনুসার তফসীর করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাকেও আয়াতের অকৃতি তফসীর বলা যায় না। কারণ, এ ঘটনার সবগুলো রেওয়াজেতের মধ্যে কোথাও এরূপ নির্দর্শন পাওয়া যায় না যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) ঘটনাটি আলোচ্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারীর হাদীসটি কিতাবুল জেহাদ, কিতাবুল-আশিয়া, কিতাবুল-আইয়ান প্রভৃতি অধ্যায়ের একাধিক তরিকায় উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কিতাবুল-তফসীরে সূরা ছোয়াদের তফসীর প্রসঙ্গে কোথাও এর উল্লেখ নেই। বরং **مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا** আয়াতের অধীনে অন্য একটি রেওয়াজেত উদ্ধৃত করেছেন। অথচ এই হাদীসের কোন বরাত পর্যন্ত দেননি। এ থেকে বোঝা যায় যে, ইমাম বুখারীর মতেও হাদীসটি আলোচ্য আয়াতের তফসীর নয়। বরং রসূলুল্লাহ (সঃ) অন্যান্য পয়গম্বরের যেমন অন্যান্য আরও অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তেমনভাবে এটাও একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এটা কোন আয়াতের তফসীর হওয়া জরুরী নয়।

তৃতীয় এক তফসীর ইমাম রাযী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, সোলায়মান (আঃ) একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে এত দুর্বল হয়ে পড়েন যে, যখন তাঁকে সিংহাসনে বসানো হত, তখন মনে হত যেন একটি নিষ্ঠাপ দেহ সিংহাসনে রেখে দেয়া হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে সুস্থতা দান করেন। তখন তিনি আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু হয়ে শুকরিয়া আদায় করেন এবং কমা প্রার্থনা করেন। এছাড়া তিনি ভবিষ্যতের জন্যে নজিরবিহীন রাজত্বের জন্যেও দোয়া করেন।

কিন্তু এ তফসীরও অনুমানভিত্তিক। কোরআন পাকের ভাষ্যের সাথে এর তেমন মিল নেই এবং কোন রেওয়াজেতও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বাস্তব সত্য এই যে, আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার নিশ্চিত বিবরণ জানার কোন উপায় আমাদের কাছে নেই। আমরা এ জন্যে আদিষ্টও নই। সুতরাং এতটুকু ইমান রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা সোলায়মান (আঃ)-কে কোন পরীক্ষা করেছিলেন, যার ফলে তিনি আল্লাহ তাআলার দিকে অধিকতর রুজু হয়েছেন।

কোরআন পাকে এই ঘটনা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য মানুষকে দাওয়াত দেয়া যে, তারা কোন বিপদাপদ অথবা পরীক্ষায় পতিত হলে তাদের পক্ষেও সোলায়মান (আঃ)-এর মত আল্লাহ তাআলার দিকে পূর্বাপেক্ষা অধিক রুজু হওয়া উচিত। বস্তুতঃ সোলায়মান (আঃ)-এর পরীক্ষার বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহ তাআলার উপর সমর্পণ করাই বাঞ্ছনীয়।

وَسَبِّحْ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَمْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ — (আমাকে এমন সাম্রাজ্য দিন যা আমার পরে কেউ পেতে পারবে না)। কেউ কেউ এ দোয়ার অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আমার আমলে আমার মত বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী অন্য কেউ যেন না হয়। তাঁদের মতে ‘আমার পরে’ শব্দটির অর্থ ‘আমাকে ছাড়া’। হযরত ধানভীও এরূপ অনুবাদই করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ দোয়ার অর্থ এই যে, আমার পরেও কেউ যেন এরূপ সাম্রাজ্যের অধিকারী না হয়। সুতরাং বাস্তবও তাই দেখা যায়। হযরত সূলায়মান (আঃ)-কে যেরূপ সাম্রাজ্য দান করা হয়েছিল, তেমন রাজত্বের অধিকারী পরবর্তী কালে কেউ হতে পারেনি। কেননা, বাতাস অধিনস্ত হওয়া, জিন জাতির বশীভূত হওয়া এগুলো পরবর্তীকালে কেউ লাভ করতে পারেনি। কেউ কেউ বিভিন্ন আমল ও সাধনার মাধ্যমে কোন কোন জিনকে বশীভূত করে নেয়। এটা তার পরিপন্থী নয়। কেননা, হযরত সূলায়মান (আঃ)-এর জিন বশীভূত করণের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না। আমল বিশেষজ্ঞরা দু’একজন অথবা কয়েকজন জিনকে বশীভূত করে নেয়া ; কিন্তু সূলায়মান (আঃ) জিনদের উপর যেরূপ সর্বব্যাপী রাজত্ব কায়ম করেছিলেন, তদ্রূপ কেউ কায়ম করতে পারেনি।

রাজত্ব ও শাসন ক্ষমতা লাভের দোয়া : এখানে সাধারণ রাধা দরকার যে, পয়গম্বরের কোন দোয়া আল্লাহ তাআলার অনুমতি ব্যতিরেকে হয় না। হযরত সূলায়মান (আঃ) এ দোয়াটিও আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমেই করেছিলেন। ক্ষমতালভই এর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং এর পেছনে আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী প্রয়োগ করা ও সত্যকে সমুন্নত করার অনুপ্রেরণাই কার্যকর ছিল। আল্লাহ তাআলা জানতেন যে, রাজত্ব লাভের পর সূলায়মান (আঃ) এসব মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যেই কাজ করবেন এবং প্রতিপত্তি লাভের বাসনা তার অন্তরে স্থান পাবে না। তাই তাকে এরূপ দোয়ার অনুমতি দেয়া হয় এবং তা কবুলও করা হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্যে নিজের পক্ষ থেকে শাসনক্ষমতা প্রার্থনা করা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এতে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ লাভের কামনা-বাসনা শামিল হয়ে যায়। সেমতে কেউ যদি এরূপ বাসনা থেকে মুক্ত থাকবে বলে দৃঢ় বিশ্বাসী হয় এবং সত্যকে সমুন্নত করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ক্ষমতা লাভ করার প্রত্যাশী না হয়, তবে তার জন্যে রাজত্ব লাভের দোয়া করা বৈধ।—(রুইল মা’আনী)।

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا — (শুচলিত অবস্থায় —) জিন জাতিকে বশীকরণ এবং তারা যে যে কাজ করত, তার বিবরণ সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, অবশ্য জিনদেরকে সূলায়মান (আঃ) শেকলে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এখন এটা জরুরী নয় যে, এগুলো দৃষ্টিগ্রাহ্য লোহার শেকলই হবে। বরং জিনদেরকে আবদ্ধ করার জন্যে অন্য কোন পন্থাও অবলম্বন করা সম্ভব, যা সহজে বোঝাবার জন্যে এখানে শেকল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

রসূলে করীম (সঃ)-কে সবার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এখানে আইয়ুব (আঃ)-এর কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে। এ কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ সূরা

وَحُدَّيْبِيكَ ضَعُفًا فَاعْرَبْ بِهِ وَلَا تَحْتَسِبْ أَنَا وَحَدَّيْنَاهُ صَابِرًا
 نَعْمَ الْغِيَاثُ إِنَّكَ أَزَابٌ ۝ وَأَذْكُرْ جَبْدَكَ الْبُرْهَانِ وَأَسْقِ وَيَعْقُوبَ
 أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۝ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الْكَلَامِ
 وَإِنَّمَا عِنْدَنَا لَكِلِينِ الْمُصْطَفَيْنِ الْآخِرِينَ ۝ وَأَذْكُرْ سُبْحَانَ وَ
 السَّعَةِ وَالْكَفْلِ وَكُلَّ مَنَ الْأَخْيَارِ ۝ هَذَا ذِكْرٌ وَإِن
 لِّلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَآبٍ ۝ جَدَّبَ عَيْنٌ مَّفْصَحَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝
 مُكَيِّبِينَ فِيهَا يُدَافِعُونَ فِيهَا يُفْلِكُهَا كَثِيرٌ وَشَرَّابٍ ۝
 وَعِنْدَهُمْ ثِمَارٌ وَلَهُمْ فِيهَا مَخْرُجٌ ۝ هَذَا مَأْوَاهُمْ وَلَهُمْ
 الْحِسَابُ ۝ إِن هَذَا لِرِزْقِنَا مَا لَهُ ۝ مَن تَعَالَى ۝ هَذَا ذِكْرٌ
 لِّلظَّالِمِينَ لِّتَوَارِثِ ۝ لِّجَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَقْسِمُ إِلَيْهَا هَذَا
 فَلْيَذُوقُوا حَيْبَهُمْ وَعَسَاءُ ۝ وَأَخْرَجْنَا مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجَ ۝ هَذَا
 نَوْمٌ مِّنْجَوْهُمْ مَعَهُ لَامْرَجًا إِلَيْهِمْ ۝ أَنَّهُمْ صَالُوا النَّارَ ۝ قَالَ
 بَلْ أَنْتُمْ لَامْرَجًا إِلَيْهِمْ ۝ أَنْتُمْ قَدْ مَرُّوهُ لَأَقْبَسُ الْقَرَارِ ۝
 قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدْ مَرَّ لَنَا هَذَا ۝ أَرَدَهُ عَذَابًا صَعْفًا لِّلنَّارِ ۝
 وَقَالُوا مَا لَنَا لَنَرَى رِجَالًا كَذَلِكَ نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ۝

(৪৪) তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা নাও, তদ্বারা আঘাত কর এবং লশঙ্ক ভক্ত করো না। আমি তাকে পেলাম সবরকারী। চমৎকার বান্দা সে। নিশ্চয় সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। (৪৫) সূর্য্য করুন, হাত ও চোখের অধিকারী আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা। (৪৬) আমি তাদের এক বিশেষ গুণ তথা পরকালের সূর্য্য দ্বারা স্বাতন্ত্র্য দান করেছিলাম। (৪৭) আর তারা আমার কাছে মনোনীত ও সংলাকদের অন্তর্ভুক্ত। (৪৮) সূর্য্য করুন, ইসমাঈল, আল ইয়াসা ও যুলকিফলের কথা। তারা প্রত্যেকেই শুণীজন। (৪৯) এ এক মহৎ আলোচনা। খোদাতীক্ষদের জন্যে রয়েছে উত্তম ঠিকানা—(৫০) তথা স্থায়ী বসবাসের জন্মাত; তাদের জন্যে তার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। (৫১) সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে। তারা সেখানে চাইবে অনেক ফল-মূল ও পানীয়। (৫২) তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না সমবয়স্কা রমণীগণ। (৫৩) তোমাদেরকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে বিচারদিবসের জন্যে। (৫৪) এটা আমার দেয়া রিযিক যা শেষ হবে না। (৫৫) এটা তো শুনলে, এখন দুইদেবর জন্যে রয়েছে নিকট ঠিকানা (৫৬) তথা জাহান্নাম। তারা সেখানে প্রবেশ করবে। অতএব, কত নিকট সেই আবাসস্থল। (৫৭) এটা উত্তম পানি ও পুঙ্ক; অতএব তারা একে আশ্বাদন করুক। (৫৮) এ ধরনের আরও কিছু শাস্তি আছে। (৫৯) এই তো একদল তোমাদের সাথে প্রবেশ করছে। তাদের জন্যে অভিনন্দন নেই। তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৬০) তারা বলবে, তোমাদের জন্যেও তো অভিনন্দন নেই। তোমরাই আমাদেরকে এ বিপদের সম্মুখীন করেছ। অতএব, এটি কতই না ভৃগ্য আবাসস্থল। (৬১) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে, আপনি জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। (৬২) তারা আরও বলবে, আমাদের কি হল যে, আমরা যাদেরকে মন্দ লোক বলে গণ্য করতাম, তাদেরকে এখানে দেখছি না।

আম্বিয়ায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বর্ণিত হচ্ছে—

مَسْنَى الشَّيْطَانِ يُضَيِّبُ وَعَذَابٌ — (শয়তান আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট

দিয়েছে। এ যন্ত্রণা ও কষ্টের বিবরণ দিতে গিয়ে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, হযরত আইয়ুব (আঃ) যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তা শয়তানের প্রবলতার কারণে দেখা দিয়েছিল। ঘটনা এই যে, একবার ফেরেশতাগণ আইয়ুব (আঃ) এর খুব প্রশংসা করলে শয়তান প্রতিহিংসায় অস্থির হয়ে গেল। সে আল্লাহ তাআলার দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করল : আমাকে তার দেহ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর এমন প্রবলতা দেয়া হোক, যদ্বারা আমি তার সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আল্লাহ তাআলারও উদ্দেশ্য ছিল আইয়ুব (আঃ) কে পরীক্ষা করা। তাই শয়তানকে তার প্রার্থিত অধিকার দেয়া হল। অতঃপর সে তাঁকে রোগাক্রান্ত করে দিল।

কিন্তু বিস্তৃত তফসীরবিদগণ এ কাহিনী খণ্ডন করে বলেন : কোরআন পাকের বর্ণনা অনুযায়ী শয়তান পয়গম্বরগণের উপর প্রবলতা অর্জন করতে পারে না। তাই এটা সম্ভব নয় যে, শয়তান আইয়ুব (আঃ) কে রোগাক্রান্ত করে দেবে।

কেউ কেউ বলেন, রূগ্নাবস্থায় শয়তান আইয়ুব (আঃ) এর অন্তরে কুমন্ত্রণা জাগ্রত করত। এতে তিনি আরও অধিক কষ্ট অনুভব করতেন। আলোচ্য আয়াতে তাই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা তাই যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আইয়ুব (আঃ) এর রোগ কি ছিল ? কোরআন পাকে কেবল বলা হয়েছে যে, আইয়ুব (আঃ) কোন গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রোগটি কি ছিল তা উল্লেখ করা হয়নি। হাদীসেও রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে এর কোন বিবরণ বর্ণিত নেই। তবে কোন কোন সাহাবীর উক্তি থেকে জানা যায় যে, তাঁর সর্বাস্থে ফোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। ফলে ঘৃণাভরে লোকেরা তাঁকে একটি আবর্জনার স্থাপে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু গবেষক তফসীরবিদগণ এ রেওয়াজেতের সত্যতা স্বীকার করেননি। তাঁরা বলেন, মানুষের ঘৃণা উদ্বেক করার মত কোন রোগে পয়গম্বরগণকে আক্রান্ত করা হয় না। সুতরাং হযরত আইয়ুব (আঃ) এর রোগও এমন হতে পারে না। বরং এটা কোন সাধারণ রোগই ছিল। কাজেই উপরোক্ত রেওয়াজেত নির্ভরযোগ্য নয়।—(রুহুল-মা'আনী, আহ্‌কামুল কোরআন থেকে সংক্ষেপিত)।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَحُدَّيْبِيكَ ضَعُفًا — (তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তৃণশলা লও।)

আইয়ুব-পত্নীর প্রতি আল্লাহ তাআলার এই বিশেষ অনুগ্রহের দ্বারা কয়েকটি মাস্‌আলা জানা যায়।

ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আইয়ুবের (আঃ) অসুস্থতার সময় একদা শয়তান চিকিৎসকের বেশে আইয়ুবের (আঃ) পত্নীর সাথে সাক্ষাত করেছিল। তিনি ওকে চিকিৎসক মনে করে স্বামীর চিকিৎসা করতে অনুরোধ করেন। শয়তান বলল, এই শর্তে চিকিৎসা করতে পারি যে, আরোগ্য লাভ করলে একথার স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আমিই তাঁকে আরোগ্য দান করেছি। এ স্বীকৃতিটুকু

হাড়া আমি আর কোন পারিশ্রমিক চাই না।

শ্রী হযরত আইয়ুবকে একথা বললে, তিনি বললেন,—তোমার সরলতা দেখে সত্যি দুঃখ হয়। ওতো শয়তান ছিল।

এ ঘটনার বিশেষতঃ তাঁর শ্রীর মুখ দিয়ে শয়তান কর্তৃক এমন একটা প্রস্তাব তাঁর সামনে উচ্চারিত করানোর বিষয়টা তিনি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি খুব দুঃখ পেলেন। কারণ, প্রস্তাবটা ছিল শেরকীতে লিপ্ত করার একটা সুস্থ অপ্রয়াস। তাই তিনি শপথ করে বসলেন যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে সুস্থ করে তুললে শ্রীর এ অপরাধের জন্য তাঁকে একশত বেত্রাঘাত করব।

সে ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ পাক নির্দেশ দিচ্ছেন, কহম ভঙ্গ করো না, বরং হাতে এক মুঠো তপলাকা নিয়ে তদ্বারা শ্রীকে একশত বেত্রাঘাত করে কহম পূর্ণ কর।

এ ঘটনা থেকে জানা গেল, যদি কোন ব্যক্তি কাউকে একশ বেত্রাঘাত করার প্রতিজ্ঞা করে এবং পরে পৃথক পৃথক একশ বেত্রাঘাত করার পরিবর্তে সবগুলো বেতের একটি আঁটি ভৈরী করে নিয়ে তদ্বারা একবার আঘাত করে, তবে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়। তাই হযরত আইয়ুব (আঃ) কে এরূপ করার হুকুম করা হয়েছিল। ইমাম আবু হানীফার মাযহাব তাই। কিন্তু আল্লামা ইবনে হমাম লিখেছেন যে, এর জন্যে দু'টি শর্ত রয়েছে—(১) সশ্রুতি ব্যক্তির গায়ে প্রত্যেকটি বেত দৈর্ঘ্য-প্রস্থে লাগতে হবে এবং (২) এর কারণে কিছু না কিছু কষ্ট অবশ্যই পেতে হবে। যদি মোটেই কষ্ট না পায়, তবে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে না। হযরত খানতী বয়ানুল—কোরআনে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার যে উক্তি করেছেন, তার অর্থও সম্ভবতঃ তাই। নতুবা হানাফী ফকীহগণ পরিস্কার উল্লেখ করেছেন যে, উপরোক্ত শর্তদ্বয়সহ আঘাত করা হলে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়ে যায়।—(ফতহুল কাদীর)

শরীয়তের দৃষ্টিতে কৌশল : দ্বিতীয় মাসআলা এই যে, কোন অসমীচীন অথবা মাকরুহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার জন্যে শরীয়তসম্মত কোন কৌশল অবলম্বন করা জায়েয। বলাবাহুল্য, হযরত আইয়ুব (আঃ) এর প্রতিজ্ঞার আসল দাবী এই যে, তিনি তাঁর শ্রীকে পূর্ণ একশ বেত্রাঘাত করবেন। কিন্তু তাঁর পত্নী যেহেতু নিরপরাধ ছিলেন এবং স্বামীর নজিরবিহীন সেবাশ্রুশ্রা করেছিলেন, তাই আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আইয়ুব (আঃ) কে একটি কৌশল শিক্ষা দিলেন এবং বলে দিলেন যে, এভাবে তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। তাই ঘটনাটি কৌশলের বৈধতা জ্ঞাপন করে।

কিন্তু সুরণ রাখা দরকার যে, এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা তখনই জায়েয যখন একে শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্য বানচাল করার উপায় না করা হয়। পক্ষান্তরে যদি কৌশলের উদ্দেশ্য কোন হকদারের হক বাতিল করা হয় অথবা প্রকাশ্য হারাম কাজকে তার মূলপ্রাণ বজায় রেখে নিজের জন্যে হালাল করা হয়, তবে এরূপ কৌশল সম্পূর্ণ না-জায়েয। উদাহরণতঃ যাকাত থেকে পা বাঁচানোর জন্যে কেউ কেউ বছর পূর্ণ হওয়ার সামান্য আগেই নিজের ধন-সম্পদ শ্রীর মালিকানায় সমর্পণ করে কিছুদিন পর শ্রী স্বামীর মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়। যখন পরবর্তী বছর কাছাকাছি হয়, তখন স্বামী আবার শ্রীকে দান করে দেয়। এভাবে স্বামী-শ্রীর মধ্যে কারও উপর যাকাত ওয়াজেব হয় না। এরূপ কৌশল শরীয়তের উদ্দেশ্যকে বানচাল করাই অপচেষ্টা। তাই হারাম। এর শাস্তি হয় তো যাকাত আদায় না করার শাস্তির চেয়েও গুরুতর হবে।—(ফতহুল-আ'আনী)।

অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা : তৃতীয় মাসআলা এই যে, কোন ব্যক্তি কোন অসমীচীন, বাস্তব অথবা অবৈধ কাজের প্রতিজ্ঞা করলে প্রতিজ্ঞা হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফকারা দিতে হবে। যদি কাফকারা ওয়াজেব না হত, তবে আইয়ুব (আঃ) কে কৌশল শিখানো হত না। এতদসঙ্গে সুরণ রাখা উচিত যে, কোন অসমীচীন কাজের প্রতিজ্ঞা করলে তা ভেঙ্গে কাফকারা আদায় করাই শরীয়তের বিধান। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি কোন প্রতিজ্ঞা করে, অতঃপর দেখে যে, এ প্রতিজ্ঞার বিপরীত কাজ করাই উত্তম, তবে তার উচিত উত্তম কাজটি করা এবং প্রতিজ্ঞার কাফকারা আদায় করা।

أُولَى الْكَفَى وَالْكَفَى —এর শাব্দিক অর্থ তাঁরা হস্ত ও দৃষ্টিবিশিষ্ট ছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা তাঁদের জ্ঞানগত ও কর্মগত শক্তি আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে নিয়োজিত করতেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যেই ব্যয়িত হওয়া উচিত। যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এতে ব্যয়িত হয় না, সেগুলোর থাকা না থাকা উভয়ই সমান।

পরকালচিন্তা পয়গম্বরগণের স্বাতন্ত্র্যমূলক গুণ : ذِكْرُ الْمَلَكِ —শাব্দিক অর্থ গৃহের সুরণ। গৃহ বলে এখানে পরকাল বোঝানো হয়েছে। পরকালের পরিবর্তে গৃহ বলে হৃদয়ার করা হয়েছে যে, পরকালই মানুষের আসল গৃহ। অতএব, পরকাল চিন্তাকেই তাদের যাবতীয় চিন্তা ও কর্মের ভিত্তি করা উচিত। এ থেকে জানা গেল যে, পরকাল চিন্তা মানুষের চিন্তাগত ও কর্মগত শক্তিকে অধিকতর ঔজ্জ্বল্য দান করে। কোন কোন খোদাশ্রোহীর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে, পরকাল চিন্তা মানুষের শক্তিসমূহকে ভোতা করে দেয়।

হযরত আল ইয়াসা (আঃ) : وَالْيَسَّ (আল ইয়াসা [আঃ] কে সুরণ করুন।) হযরত আল ইয়াসা' (আঃ) বনী ইসরাঈলের অন্যতম পয়গম্বর। কোরআন পাকে মাত্র দু'জায়গায় তাঁর উল্লেখ দেখা যায় এখানে ও সূরা আনআমে। কিন্তু কোথাও তাঁর বিস্তারিত অবস্থা উল্লেখ করা হয়নি বরং পয়গম্বরগণের তালিকায় তাঁর নাম গণনা করা হয়েছে মাত্র।

ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত ইলিয়াস (আঃ) এর চাচাত ভাই এবং তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন। ইলিয়াস (আঃ) এর পর তাঁকেই নবুওয়ত দান করা হয়। বাইবেলে তাঁর বিস্তারিত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাতে তাঁর নাম 'ইলিশা' ইবনে সাকেত উল্লেখিত হয়েছে।

وَعَنْهُمْ قُضِرَتِ الْأَرْكَانُ —(তাদের কাছে আনতনয়না সম বয়স্কা রমণীগণ থাকবে।) অর্থাৎ, জন্মভেদে হ্রগণ থাকবে। “সমবয়স্কা”—এর এক অর্থ তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে এবং অপর অর্থ স্বামীদের সমবয়স্কা হবে। প্রথম অর্থে সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, তাদের পরস্পর ভালবাসা, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক হবে—সপত্নীসূলত হিংসা-বিরোধ ও ঘৃণা থাকবে না। বলাবাহুল্য, এটা স্বামীদের জন্যে পরম সুখের ব্যাপার।

স্বামী-শ্রীর মধ্যে বয়সের মিল থাকা উত্তম : দ্বিতীয় অর্থে স্বামীদের সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, এর কারণে মনের ও মতের মিল অধিক হবে। ফলে একে অপরের সুখ ও কৌতুহলের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখবে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বামী-শ্রীর বয়সের তারতম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ, এ থেকেই পারস্পরিক ভালবাসা জন্মায় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক মধুময় ও স্থায়ী হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার সার-সংক্ষেপ : **عَلَى الْاِنْسَانِ** এ সূরার আসল লক্ষ্য রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর রেসালত প্রমাণ এবং কাফেরদের দাবী খণ্ডন করা। সূরার শুরুতেই এটা স্পষ্ট ছিল। এ প্রসঙ্গে পয়গমুরগণের ঘটনাবলী দ্বিবিধ কারণে উল্লেখ করা হয়েছে—(এক) রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে সামান্য দেয়া যে, পূর্ববর্তী পয়গমুরগণের মত আপনিও কাফেরদের অহেতুক কার্যকলাপে সবার করুন। (দুই) এসব ঘটনা থেকে তারাও শিক্ষালাভ করুক, যারা একজন সত্য পয়গমুরের রেসালত অস্বীকার করে যাচ্ছে। এর পর মুমিনদের শুভ পরিণতি ও কাফেরদের তীব্র শাস্তির চিত্র অঙ্কন করে কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং হুশিয়ার করা হয়েছে যে, যাদের অনুকরণ করে আজ তোমরা রসুল করীম (সাঃ)—এর প্রতি মিথ্যারোপ করছ, কেয়ামতের দিন তারাই তোমাদের সাহায্য সহায়তা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। তারা তোমাদেরকে গালমন্দ করবে এবং তোমরা তাদের প্রতি অভিশংসাত বর্ষণ করবে।

এসব বিষয়বস্তুর পর উপসংহারে আবার আসল দাবী অর্থাৎ, রেসালতের প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। প্রমাণাদি পেশ করার সাথে সাথে উপদেশ প্রসঙ্গে দাওয়াতও দেয়া হয়েছে।

উর্ধ্ব জগতের مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَائِكَةِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ

কোন জ্ঞানই আমার ছিল না যখন তারা কথাবার্তা বলছিল।) অর্থাৎ আমার রেসালতের উচ্ছল প্রমাণ এই যে, আমি তোমাদেরকে উর্ধ্ব জগতের বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত করে থাকি যা ওঁহী হাড়া অন্য কোন উপায়েই আমার জ্ঞানার কথা নয়। এসব বিষয়াদির এক অর্থ সেসব আলোচনা, যা আদম সৃষ্টির সময় আল্লাহ্ তাআলা ও ফেরেশতাগণের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সূরা বাক্বারায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ফেরেশতাগণ বলেছিল, **أَجْعَلُ مِنْهُمْ نَفْسًا وَمِنْهُمْ وَبِطْرًا**

الذمائم — আপনি কি পৃথিবীতে এমন কিছু সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে
অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং রক্তগঙ্গা বহাবে? এসব কথাবার্তাকে এখানে
اختصام বলে ব্যক্ত করা হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ “ঝগড়া করা” অথবা
“বাকবিতণ্ডা করা।” অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, ফেরেশতাগণের এই প্রশ্ন
কোন আপত্তি অথবা বাকবিতণ্ডার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং তারা কেবল
আদম সৃষ্টির রহস্য জানতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন ও উত্তরের বাহ্যিক
আকার বাকবিতণ্ডার অনুরূপ হয়ে গিয়েছিল বিধায় একে اختصام শব্দ
দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে কোন ছোট বড়কে কোন প্রশ্ন করলে
বড় তার আলোচনা প্রসঙ্গে কৌতুকবশতঃ এ প্রশ্নোত্তরকে ঝগড়া বলে
ব্যক্ত করে দেয়।

— (যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে

বলেন। এখানে আল্লাহ তাআলা ও ফেরেশতাগণের উপরোক্ত কথাবার্তার প্রতি ইঙ্গিত করার সাথে সাথে এদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, ইবলীস নিছক প্রতিহিংসা ও অহংকারবশতঃ আদম (আঃ)-কে সেজ্জদা করতে অস্বীকার করেছিল। তেমনিভাবে আরবের মুশরিকরাও প্রতিহিংসা ও অহংকারের কারণে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত অস্বীকার করে যাচ্ছে। ফলে ইবলীসের যে পরিণতি হয়েছে, তাদেরও তাই হবে।—
(তফসীরে-কবীর)

إِنَّا خَلَقْنَا سِدِّي - এখানে আদম (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন

(৬৩) আমরা কি অহেতুক তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র করে নিয়েছিলাম, না আমাদের দৃষ্টি ভুল করছে? (৬৪) এটা অর্থাৎ, জাহান্নামীদের পারস্পরিক বাক-বিতণ্ডা অবশ্যস্বাভাবিক। (৬৫) বলুন, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং এক পরাক্রমশালী আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। (৬৬) তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর পালনকর্তা, পরাক্রমশালী, মার্ত্তনাকারী। (৬৭) বলুন, এটি এক মহাসংবাদ, (৬৮) যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। (৬৯) উর্ধ্ব জগৎ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না যখন ফেরেশতারা কথাবার্তা বলছিল। (৭০) আমার কাছে এ গুণীই আসে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (৭১) যখন আপনাদের পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। (৭২) যখন আমি তাকে সুঘন করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার সম্মুখে সেজদায় নত হয়ে যেয়ে। (৭৩) অতঃপর সমস্ত ফেরেশতাই একযোগে সেজদায় নত হল, (৭৪) কিন্তু ইবলীস; সে অহংকার করল এবং অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (৭৫) আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিংবা বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? (৭৬) সে বলল: আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুনের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। (৭৭) আল্লাহ বললেন: বের হয়ে যা, এখান থেকে। কারণ, তুমি অভিশপ্ত। (৭৮) তোর প্রতি আমার এ অভিশাপ বিচার দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে। (৭৯) সে বলল, হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৮০) আল্লাহ বললেন: তোকে অবকাশ দেয় হলু (৮১) সে সময়ের দিন পর্যন্ত যা জানা। (৮২) সে বলল, আপনাদের ইচ্ছামতের কসম, আমি অবশ্যই তাদের সবাইকে বিপথগামী করে দেব।

الزمر

২৫৭

২২



(৬৩) তবে তাদের মধ্যে যারা আপনার ঋণী বান্দা, তাদেরকে ছাড়া।
(৬৪) আল্লাহ বললেন : তাই ঠিক, আর আমি সত্য বলছি - (৬৫) তোর দ্বারা আর তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব। (৬৬) বনুন, আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না আর আমি লৌকিকতাকারীও নই। (৬৭) এটা তো বিশ্বাসীর জন্যে এক উপদেশ মাত্র। (৬৮) তোমরা কিছুকাল পরে এর সংবাদ অবশ্যই জানতে পারবে।

সূরা আল-যুমার

মকায় অবতীর্ণ : আয়াত ৭৫।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহর নামে শুরু—

- (১) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।
- (২) আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব, আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবাদত করুন। (৩) জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ এবাদত আল্লাহরই নিমিত্ত। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের এবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সংপক্ষে পরিচালিত করেন না। (৪) আল্লাহ যদি সজ্ঞান গ্রহণ করার ইচ্ছা করতেন, তবে তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যা কিছু ইচ্ছা মনোনীত করতেন, তিনি পবিত্র। তিনি আল্লাহ, এক, পরাক্রমশালী। (৫) তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথায়যাভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই বিচরণ করে নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত। জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমশালী।

যে, আমি নিজ হাতে তাঁকে সৃষ্টি করেছি। সকল তফসীরবিদই এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষের ন্যায় আল্লাহ তাআলারও হাত আছে, এখানে তা বোঝানো হয়নি। কেননা, আল্লাহ তাআলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কাজেই এর অর্থ হল আল্লাহর কুদরত। আরবী ভাষায় يد শব্দটি কুদরত অর্থে বহুল ব্যবহৃত। উদাহরণতঃ এক আয়াতে আছে بِيدِ غَفَاةٍ الزَّكَارِ অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি আদমকে নিজ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছি। এমনিতে সৃষ্ট জগতের সব কিছুই আল্লাহর কুদরত দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন কোন বস্তুর বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করতে চান, তখন তাকে বিশেষভাবে নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেন। যেমন কা' বাকে বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) সালেহ (আঃ)—এর উল্লেখ "নাকাতুল্লাহ" (আল্লাহর উল্লেখ), ইসা (আঃ)—কে কালেমাতুল্লাহ (আল্লাহর বাক্য) অথবা "রুহুল্লাহ" (আল্লাহর রাহ) বলা হয়েছে। এখানেও হয়রত আদম (আঃ)—এর সম্মান প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এই সম্পর্ক করা হয়েছে।— (কুরতুবী)

আনুষঙ্গিক স্ভাতব্য বিষয়

লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার নিন্দা : وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (আমি কৃত্রিমতাপ্রিয় নই।) উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার আশ্রয়ে নবুওয়ত, রেসালত ও জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ করছি না, বরং আল্লাহর বিধি-বিধানই যথায়যাভাবে প্রচার করছি। এ থেকে জানা গেল যে, লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। সেমতে এর নিদ্যয় বুখারী ও মুসলিমে হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)—এর একটি উক্তিও বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন :

“লোকসকল ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে জানে, সে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করুক, কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান নেই, তার ক্ষেত্রে الله اعلم (আল্লাহ ভাল জানেন) বলে কান্স থাকুক। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল সম্পর্কে বলেছেন ۝ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ —(রহুল- মা'আনী)

সূরা আল-যুমার

আনুষঙ্গিক স্ভাতব্য বিষয়

শব্দের - فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ الْأَكْلَاءُ الَّذِينَ أَخْلَصُوا অর্থ এখানে এবাদত অথবা আনুগত্য। অর্থাৎ, ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধান মেনে চলা। এর পূর্ববর্তী বাক্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে সম্বোধন করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্যকে তাঁরই জন্যে ঋণীত করুন, যাতে শিরক, রিয়া ও নাম-যশের নাম-গন্ধও না থাকে। এরই তাকীদার্থে দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়েছে যে, ঋণীত এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যেই শোভনীয়। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এর যোগ্য নয়।

হয়রত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে আরয করল : ইয়া রসূলুল্লাহ, আমি মাঝে মাঝে দান-খয়রাত করি অথবা কারও প্রতি অনুগ্রহ করি। এতে আমার নিয়ত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিও থাকে এবং এটাও থাকে যে, মানুষ আমার প্রশংসা করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : সে সত্তার কসম, যার

হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহ তাআলা এমন কোন বস্তু কবুল করেন না, যাতে অন্যকে শরীক করা হয়। অতঃপর তিনি প্রমাণ স্বরূপ **الْكَافِرُونَ** আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন।—(কুরত্বী)

নিষ্ঠা অনুপাতে আল্লাহর নিকট আমল গৃহীত হয় : কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহর কাছে আমলের হিসাব গণন। দ্বারা নয়—ওজন দ্বারা হয়ে থাকে **وَنُزَعُ الْمَوَازِينَ الْقَيْسَرِيَّةَ** এবং উল্লিখিত আয়াতসমূহের বক্তব্য এই যে, আল্লাহর কাছে আমলের মূল্যায়ন ও ওজন নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়তের অনুপাতে হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, পূর্ণ ঈমান ব্যতিরেকে নিয়ত পূর্ণরূপে খাটি হতে পারে না। কেননা, পূর্ণ খাটি নিয়ত এই যে, আল্লাহ ব্যতীত কাউকে লাভ-লোকসানের মালিক গণ্য করা যাবে না। নিজের কাজকর্মে কাউকে ক্ষমতাশালী মনে করা যাবে না এবং কোন এবাদত ও আনুগত্যে অপরের কল্পনা ও ধ্যান করা যাবে না। অনিচ্ছাধীন কল্পনা-কল্পনা আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন।

যে সাহায্যে কোরাম মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম সারিতে অবস্থিত, তাঁদের আমল ও সাধনার পরিমাণ তেমন একটা বেশী দেখা যাবে না কিন্তু এতদসঙ্গেও তাঁদের সামান্য আমল ও সাধনা অবশিষ্ট উম্মতের বড় বড় আমল ও সাধনার চেয়ে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠ তো তাঁদের পূর্ণ ঈমান ও পূর্ণ নিষ্ঠার কারণেই ছিল।

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن دُونِهِ أَتْلَاوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ يُرْسِلُ إِلَى اللَّهِ وَلَهُ

এ হল আরবের মুশরেকদের অবস্থা। তখনকার দিনে সাধারণ মুশরেকরাও প্রায় এ বিশ্বাসই রাখত যে, আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং সব কিছুতে ক্ষমতাশালী। শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করলে তারা নিজদের কল্পনা অনুযায়ী ফেরেশতাগণের আকার-আকৃতিতে মূর্তি-বিগ্রহ তৈরী করল। অতঃপর এই বিশ্বাস পোষণ করে নিল যে, এসব মূর্তি-বিগ্রহের প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করলে সে ফেরেশতাগণ সন্তুষ্ট হবে, যাদের আকৃতিতে মূর্তি-বিগ্রহ নির্মিত হয়েছে। ফেরেশতাগণ আল্লাহর নৈকট্যশীল। অথচ তারা জানত যে, এসব মূর্তি তাদেরই হাতের তৈরী। এদের কোন বুদ্ধি-জ্ঞান, চেতনা-চৈতন্য, ও শক্তি-বল কিছুই নেই। তারা আল্লাহ তাআলার দরবারকে দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের দরবারের মতই ধারণা করে নিয়েছিল। রাজ দরবারের নৈকট্যশীল ব্যক্তি কারও প্রতি প্রসন্ন হলে রাজার কাছে সুপারিশ করে তাকেও রাজার নৈকট্যশীল করে দিতে পারে। তারা মনে করত, ফেরেশতাগণও রাজকীয় সভাসদবর্গের ন্যায় যে কারও জন্যে সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু তাদের এসব ধারণা

শয়তানী, বিভ্রান্তি ও ভিত্তিহীন কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রথমতঃ এসব মূর্তি-বিগ্রহ ফেরেশতাগণের আকৃতির অনুরূপ নয়। হলেও আল্লাহর নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ নিজদের পূজা-অর্চনায় কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় এমন যে কোন বিষয়কে তারা স্বভাবগতভাবে ঘৃণা করে। এতদ্ব্যতীত তারা আল্লাহর দরবারে স্বতঃপ্রসাদিত হয়ে কোন সুপারিশ করতে পারে না, যে পর্যন্ত না তাদেরকে আল্লাহ তাআলা কোন বিশেষ ব্যক্তির ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি দেন।

لَوْلَا أَنِ الْمَلَكُ إِذْ تَخَذَ الْوَكِيلَ—যারা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর সন্তান বলে আখ্যা দিত, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনকল্পে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার পর্যায়ে বলা হয়েছে, যদি আল্লাহ তাআলার কোন সন্তান হত, তবে তা তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত হওয়া অসম্ভব। কেননা, জ্বরদস্তি সন্তান তাঁর উপর চাপতে পারে না। যদি আল্লাহর ইচ্ছা হত, তবে তাঁর সন্তা ব্যতীত সবই তো তাঁর সৃষ্ট, অতএব, তাদের মধ্য থেকেই কাউকে সন্তানরূপে গ্রহণ করতেন। সন্তান ও সন্তান জন্মদাতা উভয়ের সমজাত হওয়া অত্যাব্যশ্যক। অথচ সৃষ্টি স্রষ্টার সমজাত হতে পারে না। তাই সৃষ্টিকে সন্তানরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব।

تَكْوِينِ অর্থ এক বস্তুকে অপর বস্তুর উপর রেখে তাকে আচ্ছাদিত করে দেয়া। কোরআন পাক দিবারাত্রির পরিবর্তনকে এখানে সাধারণের জন্যে **تَكْوِينِ** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। রাত্রি আগমন করলে যেন দিনের আলোর উপর পর্দা রেখে দেয়া হয় এবং দিনের আগমনে রাত্রির অন্ধকার যেন যবনিকার অন্তরালে চলে যায়।

كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى—এ থেকে জানা যায় যে, সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই বিচরণ করে। সৌর বিজ্ঞান ও ভূ-তত্ত্বের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা কোরআন পাক অথবা যে কোন আসামানী গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রসঙ্গক্রমে কোথাও কোন বিষয় বর্ণিত হলে তার উপর ঈমান রাখা ফরয। বৈজ্ঞানিকদের প্রাচীন ও আধুনিক গবেষণা তো নিত্য পরিবর্তনশীল বিষয়; কিন্তু কোরআন পাকের তথ্যবলী অপরিবর্তনীয়। আলোচ্য আয়াত এতটুকু ব্যক্ত করেছে যে, চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই গতিশীল। এর উপর বিশ্বাস রাখা ফরয। এখন আমাদের সামনে সূর্যের উদয় ও অস্ত পৃথিবীর ঘূর্ণন দ্বারা হয়, না স্বয়ং সূর্যের ঘূর্ণন দ্বারা হয়, তা কোরআন পাক বর্ণনা করেনি। অতিজ্ঞতার আলোকে যা জানা যায়, তা মেনে নিতে আপত্তি নেই।

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُنَاجَلَتْكُمْ مِنْهَا وَجَعَلَ ذُرِّيَّتَكُمْ مِنْهَا لَكُمْ
 مِنَ الْأَنْعَامِ شُرَكِيَّةً ثُمَّ يَمْنَعُكُمْ فِي بَطُونٍ وَمَنْعُكُمْ خَلْقًا مِمَّنْ
 بَدَّخَلْنِي فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثِ ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ تَالِي تَصَرُّفُونَ إِنَّ تَكْفُرًا وَإِنْ أَرَادَ اللَّهُ عَذَابُكُمْ وَلَا
 يَرْضَى لِبِيعَادِ الْكُفَرِ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
 وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ أَلَّيْنَاكُمْ رِبَّكُمْ مُجْعَلُكُمْ قِيَامَكُمْ يَوْمَ تَبْعُونَ إِيَّاهُ
 عَلَى كُلِّ بَنَاتٍ الصُّدُورِ وَأَذَانُ الْإِنْسَانِ حُذُودًا رُبَّةً
 مُبِينًا لِلَّهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ مُبْدِيَةً مِنْهُ لَيْسَ مَا كَانَ بِدَعْوِ اللَّهِ إِلَيْهِ
 مِنْ قَبْلٍ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْتَ إِذَا الْبَيْضُ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ مَتَّعُ
 بِكُمُ الْأَافِيَّةَ وَلِيْلَاةً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّا هُوَ قَائِدٌ
 أَنَا الْإِيلَ سَاجِدٌ أَفْقَالِي مَا يَجْزُرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو أَحْمَدَةً رَبِّهِ
 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
 يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ قُلْ لِبِيعَادِ الَّذِينَ آمَنُوا النَّفْعُ
 وَرَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ
 وَاسِعَةٌ ۝ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(৬) তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে। অতঃপর তা থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে আট প্রকার চতুশদ জন্তু অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাড়গর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অঙ্কারে। তিনি আল্লাহ্, তোমাদের পালনকর্তা, সাম্রাজ্য তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হইছ? (৭) যদি তোমরা অস্বীকার কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদের থেকে বেগরওয়া। তিনি তাঁর বান্দাদের কাকের হয়ে পড়া পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তিনি তোমাদের জন্যে তা পছন্দ করেন। একের পাপ ভার অন্যে বহন করবে না। অতঃপর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কর্ম সম্বন্ধে অবহিত করবেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরে বিষয় সম্পর্কেও অবগত। (৮) যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একগ্রচিষ্টে তার পালনকর্তাকে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন তাকে নেয়ামত দান করেন, তখন সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, যার জন্যে পূর্বে ডেকেছিল এবং আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে; যাতে করে অপরকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। বলুন, তুমি তোমার কুফর সহকারে কিছুকাল জীবনোপভোগ করে নাও। নিশ্চয় তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। (৯) যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়িয়ে এবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালনকর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না: বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান। (১০) বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সংকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সর্বকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।

وَأَنزَلْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ — আয়াতে চতুশদ জন্তু সৃষ্টিকে বাক্য করা হয়েছে, যার অর্থ আকাশ থেকে নাথিল করা। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোর সৃষ্টিতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ পানির প্রভাব অত্যধিক। তাই এগুলোও যেন আকাশ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে বলা যায়। মানুষের পোশাকের ক্ষেত্রেও কোরআন পাক এ শব্দ ব্যবহার করেছে। বলা হয়েছে— قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا — খনিজ পদার্থ লোহার ক্ষেত্রেও তাই বলা হয়েছে— وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ — সবগুলোর সারমর্মই এই যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরতে এগুলো সৃষ্টি করে মানুষকে দান করেছেন।—(কুরতুবা)

خَلْقًا مِمَّنْ بَدَّخَلْنِي فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثِ — এতে মানব সৃষ্টির অন্তর্নিহিত খোদায়ী কুদরতের কিছু রহস্য উন্মোচন করা হয়েছে। প্রথমতঃ আল্লাহর কুদরতে এটাও ছিল যে, তিনি মায়ের পেটে সন্তানকে একই সময়ে পূর্ণাঙ্গরূপে সৃষ্টি করতে পারতেন, কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে এরূপ করেননি, বরং خَلْقًا مِمَّنْ بَدَّخَلْنِي তথা পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ফলে যে নারীর গর্ভে এই ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি হতে থাকে, সে ধীরে ধীরে এই বোকা বহনে অভ্যস্ত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই অনুপম সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে শত শত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং রক্ত ও প্লাজা সঞ্চালনের জন্যে চুলের মত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিরা-উপশিরার স্থান করা হয়। কিন্তু সাধারণ শিক্ষীদের মত একাজ কোন খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে করা হয় না বরং তিনটি অঙ্ককারের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়, যেখানে কোন মানুষের পক্ষে কিছু সৃষ্টি করা তো দূরের কথা চিন্তা-কল্পনাও সেখানে পৌছার পথ পায় না।

إِنَّ تَكْفُرًا وَإِنْ أَرَادَ اللَّهُ عَذَابُكُمْ وَلَا — অর্থাৎ, তোমাদের ঈমান দ্বারা আল্লাহর কোন উপকার হয় না এবং কুফর দ্বারাও কোন ক্ষতি হয় না। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আমার বান্দারা, যদি তোমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকগণ এবং জিন ও মানব সবাই চূড়ান্ত পাপাচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তবুও আমার রাজত্ব বিন্দু পরিমাণও হ্রাস পায় না।—(ইবনে কাসীর)

وَلَا يَرْضَى لِبِيعَادِ الْكُفَرِ — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের কুফর পছন্দ করেন না। এখানে رضاء শব্দের অর্থ মহব্বত করা অথবা আপত্তি ব্যতিরেকে কোন কাজের ইচ্ছা করা। এর বিপরীতে سخط শব্দ ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ কোন কিছুকে অপছন্দ করা অথবা আপত্তিকর সাব্যস্ত করা যদিও তার সাথে ইচ্ছাও জড়িত থাকে।

আহলে সুনুত ওয়াল জমাআতের বিশ্বাস এই যে, দুনিয়াতে কোন ভাল অথবা মন্দ কাজ, ঈমান অথবা কুফর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তাই প্রত্যেকটি কাজের অস্তিত্ব লাভের জন্যে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা শর্ত। তবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও পছন্দ কেবল ঈমান ও ভাল কাজের সাথেই সম্পৃক্ত। কুফর, শিরক ও পাপাচার তিনি পছন্দ করেন না। শায়খুল ইসলাম নাজী 'উসুল ও যাদওয়াবেত গ্রন্থে লিখেছেন :

সত্যপন্থীদের মাযহাব তকদীরে বিশ্বাস করা। আরও এই যে, ভাল-মন্দ সমস্ত সৃষ্ট বস্তু আল্লাহর আদেশ ও তকদীর দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করে এবং আল্লাহ তাআলা এগুলো সৃষ্টির ইচ্ছাও করেন। কিন্তু তিনি

পাণাচারকে অপছন্দ করেন যদিও কোন উপযোগিতার কারণে এসব পাণাচার সৃষ্টির ইচ্ছা করেন। এই উপযোগিতা কি, তা তিনি জানান—
(রুল-মা'আনী)

إِنَّ هُوَ قَوْلُكَ إِنَّكَ الْكَلِيلُ — এই বাক্যের পূর্বে কাফেরদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে কুফর ও পাণাচারের স্বাদ উপভোগ করে নাও। অবশেষে তোমরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। এরপর এ বাক্যে অনুগত মুমিনের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং একে إِنَّكَ প্রশ্রবোধক শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। তফসীরবিদগণ বলেন, এর পূর্বে একটি বাক্য উহা রয়েছে, অর্থাৎ, কাফেরকে বলা হবে—তুমি উত্তম, না সে অনুগত মুমিন বান্দা উত্তম, যার কথা এখন উল্লেখ করা হবে? إِنَّكَ শব্দের কয়েক রকম তরজমা করা হয়েছে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, এর অর্থ আনুগত্যশীল। শব্দটি যখন বিশেষভাবে নামাযের ক্ষেত্রে বলা হয়, যেমন وَفُؤْمُوا لِلَّهِ فُؤْمِتَيْنِ —তখন এর অর্থ হবে সে ব্যক্তি, যে নামাযে দৃষ্টি নত রাখে এবং এদিক-সেদিক দেখে না, নিজের কোন অঙ্গ অথবা কাপড় নিয়ে খেলা করে না এবং দুনিয়ার কোন বিষয় ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযে সুরণ করে না। ভুল ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনা এর পরিপন্থী নয়।—
(কুরতুবী)

إِنَّكَ الْكَلِيلُ —এর অর্থ রাত্রির প্রহরসমূহ। অর্থাৎ, রাত্রির শুরুভাগ, মধ্যবর্তী ও শেষাংশ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি হাশরের ময়দানে সহজ হিসাব কামনা করে, তার উচিত হবে আল্লাহ যেন তাকে রাত্রির অন্ধকারে সেজদারত ও দাঁড়ানো অবস্থায় পান। তার মধ্যে পরকালের চিন্তা এবং রহমতের প্রত্যাশাও থাকা দরকার। কেউ কেউ মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়কেও إِنَّكَ الْكَلِيلُ বলেছেন।—(কুরতুবী)

وَأَرْضُ اللّٰهُ وَاسِعَةٌ —এর পূর্বের বাক্যে সংকাজের নির্দেশ রয়েছে। এতে কেউ আপত্তি করতে পারত যে, আমি যে শহরে অথবা রাষ্ট্রে বাস করছি কিংবা যে পরিবেশে আটকে আছি তা সংকাজের প্রতিবন্ধক। এর জওয়াব এ বাক্যে দেয়া হয়েছে যে, কোন বিশেষ রাষ্ট্র কিংবা শহর অথবা বিশেষ পরিবেশ থেকে যদি শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালন করা দূস্কর হয়, তবে তা ত্যাগ করা উচিত, আল্লাহর পৃথিবী সুপ্রশস্ত। সুতরাং

আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনের উপযোগী কোন স্থানে ও পরিবেশে গিয়ে বসবাস করা দরকার। এতে অনুপযুক্ত পরিবেশ থেকে হিজরত করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হিজরতের বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নিসায় বর্ণিত হয়েছে।

يَغْيُرْ حَسَابٍ - إِشْمَايُوقُ الضَّرِيْقُونَ أَجْرُهُمْ يَغْيُرْ حَسَابٍ

অর্থ সবারকারীদের সওয়াব কোন নির্ধারিত পরিমাণে নয়—অপরিসীম ও অগণিত দেয়া হবে। হাদীসে তাই বর্ণিত হয়েছে। কেউ কেউ এর অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, দুনিয়াতে কারও কাছে কারও কোন প্রাপ্য থাকলে তাকে নিজের প্রাপ্য দাবী করে আদায় করতে হয়। কিন্তু আল্লাহর কাছে দাবী ব্যতিরেকেই সবারকারীরা তাদের সওয়াব পাবে।

হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন ইনসাফের দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। দাতাগণ আগমন করলে তাদের দান খয়রাত ওজ্ঞন করে সে হিসাবে পূর্ণ সওয়াব দান করা হবে। এমনভাবে নামায, হজ্জ ইত্যাদি এবাদতকারীদের এবাদত মেনে তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে। অতঃপর বাল-মুসিবতে সবারকারীরা আগমন করলে তাদের জন্যে কোন ওজ্ঞন ও মাপ হবে না, বরং তাদেরকে অপরিমিত ও অগণিত সওয়াব দেয়া হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

إِشْمَايُوقُ الضَّرِيْقُونَ أَجْرُهُمْ يَغْيُرْ حَسَابٍ

—ফলে যাদের পাখিৰ জীবন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হয়েছে, তারা বাসনা প্রকাশ করবে—হায়, দুনিয়াতে আমাদের দেহ কাঁচির সাহায্যে কতিত হলে আজ আমরাও সবারের এমন প্রতিদান পেতাম।

ইমাম মালেক (রহঃ) এ আয়াতে صَابِرِينَ —এর অর্থ নিয়েছেন, যারা দুনিয়াতে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টে সবার করে। কেউ কেউ বলেন, যারা পাপকাজ থেকে সংযম অবলম্বন করে, আয়াতে তাদেরকে صَابِرِينَ বলা হয়েছে। কুরতুবী বলেন, صَابِرُونَ শব্দকে অন্য কোন শব্দের সাথে সংযুক্ত না করে ব্যবহার করলে তার অর্থ হয় পাপকাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার কষ্ট সহ্যকারী। পক্ষান্তরে বিপদাপদে সবারকারীর অর্থে ব্যবহার করা হলে তার সাথে সে বিপদও সংযুক্ত হয়ে উল্লেখিত হয়। যেমন বলা হয়—
صَابِرٌ عَلَىٰ كَذَا অর্থাৎ, অমুক বিপদে সবারকারী।

أَمَّنْ شَرَّ اللَّهِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ مِّنْ رَبِّهِ قَوِيْلٌ
لِّلْقِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ اللَّهُ
نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّتَابِقًا تَقْتَضِيهِ جُلُودُ
الَّذِينَ يُخَشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَوْنَ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ أَمَّنْ يَتَّبِعِ يَوْجُهُمْ سَوَاءَ الْعَذَابِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۝ كَذَّبَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَاتَّخَذَهُمُ الْعَذَابُ مِّنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝
فَإِذَا هُمُ لِلَّهِ الْغَازِيْنَ فِي الْحُيُوتِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ
أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ صَرَّفَ لِلنَّاسِ فِي هَذَا
الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ قُلْ إِنَّا رِجَالٌ
ذُو عُرُوْجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ
شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّلرَّجُلِ قُلُوبُ يَسْتَكِنُونَ
أَحَدُهُمْ لَبِئْسَ أَكْرَمًا لِّعِبَادِكُمْ ۝ إِنَّكَ مِثْلُ وَآلِهِمْ
يَسْتَكِنُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۝

(২২) আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে। (সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়) যাদের অন্তর আল্লাহর সূর্যের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্যে দুর্ভাগ্য। তারা সুপুষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে। (২৩) আল্লাহ উত্তম বাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুন্ড পুন্ড পঠিত। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরূপ তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর সূর্যে বিনয় হয়। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পঞ্চদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পঞ্চদর্শক নেই। (২৪) যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার মুখ দ্বারা অশুভ আঘাত চেকাবে এবং এরূপ জ্বালেনদেরকে বলা হবে, তোমরা যা করতে, তার হাদ আশ্বাদন কর, — সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়? (২৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যারোপ করেছিল, ফলে তাদের কাছে আঘাত এমনভাবে আসল, যা তারা কল্পনাও করত না। (২৬) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাল্হানার হাদ আশ্বাদন করলেন, আর পরকালের আঘাত হবে আরও গুরুতর—যদি তারা জানত। (২৭) আমি এ কোরআনে মানুষের জন্যে সব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে; (২৮) আরবী ভাষার এ কোরআন বক্তৃতামূলক, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলে। (২৯) আল্লাহ এক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন: একটি লোকের উপর পরস্পর বিরোধী কল্পজন মালিক রয়েছে, আরেক ব্যক্তির প্রভু মার একজন—তাদের উভয়ের অবস্থা কি? (৩০) নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। (৩১) অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা সবাই তোমাদের পালনকর্তার সামনে কথা কাটাকাটি করবে।

ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীদের কথাবার্তা শুনে ও তাদের রীতিনীতি আচার-আচরণ পরখ করার পর ইসলামকেই গ্রহণ করেছেন।—(সূরত্বী)

يُنَبِّئُكُمْ — শব্দটি ينبوع এর বহুবচন। অর্থ ভূমি থেকে নির্গত ঝর্ণা। উদ্দেশ্য এই যে, আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করাই এক বড় নেয়ামত, কিন্তু একে ভূগর্ভে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা না করা হলে মানুষ তদ্বারা কেবল বৃষ্টির দিনে অথবা এর অব্যবহিত পরে কয়েকদিন উপকৃত হতে পারত। অথচ পানির অপর নাম জীবন। পানি ব্যতীত মানুষ একদিনও বাচতে পারে না। তাই আল্লাহ তাআলা কেবল এ নেয়ামত নাযিল করেই ক্ষান্ত হননি, একে সংরক্ষিত করার জন্যেও বিস্ময়কর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। কিছু পানি তো ভূমির গর্ভে, চৌবাচ্চায় ও পুকুরসমূহে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অনেক বড় ভাণ্ডারকে বরফে পরিণত করে পর্বতের চূড়ায় তুলে রাখা হয়। ফলে পানি পচে যাওয়ার ও দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অতঃপর সে বরফ আস্তে আস্তে গলে পর্বতের শিরা-উপশিরার পথে ভূমিতে নেমে আসে এবং স্থানে স্থানে ঝর্ণার আকারে আপনা-আপনি নির্গত হয়। এরূপ নদী-নালায় আকার ধারণ করে সমতল ভূমিতে প্রবাহিত হতে থাকে।

এই পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ কোরআনে পাকে সূর্যয়ে মু'মেনুন
فَاسْأَلُوا فِي الْأَرْضِ وَرَأَيْتُمْ عَلَىٰ ذَهَابٍ لِّقُلُوبِهِمْ
—আয়াতের তফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে।

فَسَلَّ الْأَوَّلَىٰ — ফসল উৎপন্ন হওয়ার সময় এবং পাকার সময় তার উপর বিভিন্ন রং বিবর্তিত হতে থাকে। যেহেতু সব রংই বিবর্তনশীল ও নিত্যনতুন তাই حال শব্দটিকে ব্যাকরণিক নিয়মে... (বর্তমানকাল বাচক) প্রয়োগ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

إِنِّي ذَٰلِكَ لَكُلِّ الْأَوَّلَىٰ — অর্থাৎ পানি বর্ষণ, তাকে

সংরক্ষিত করে মানুষের কাছে লাগানো, তদ্বারা নানা রকমের উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপন্ন করা, বৃক্ষের উপর দিয়ে বিভিন্ন রঙের বিবর্তনের পর তা শুকিয়ে খাদ্যশস্য আলাদা এবং ভূমি আলাদা হওয়া এসব বিষয়ের মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক উপদেশ রয়েছে। এগুলো আল্লাহর মহান কুদরত ও প্রজ্ঞার দলীল। এগুলো দেখে মানুষ নিজের সৃষ্টির রহস্যও অবগত হতে পারে, যা স্রষ্টাকে চেনার ও জানার উপায় হতে পারে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এর — أَمَّنْ شَرَّ اللَّهِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُوْرٍ مِّنْ رَبِّهِ

শাব্দিক অর্থ উন্মুক্ত করা, ছড়ানো ও প্রশস্ত করা। বক্ষ উন্মোচনের অর্থ অন্তরের প্রশস্ততা। এর উদ্দেশ্য অন্তরে এরূপ যোগ্যতা থাকা যে, আল্লাহর সৃষ্টিগত নির্দেশাবলী—আকাশ, পৃথিবী ও মানব সৃষ্টি ইত্যাদিতে চিন্তা-ভাবনা করে শিক্ষা ও উপকার লাভ করতে পারে এবং অবতীর্ণ কিতাব ও বিধি-বিধান চিন্তা-ভাবনা করে লাভবান হতে পারে। এর বিপরীতে আসে অন্তরের সংকীর্ণতা (قَسَارَتِ قُلُوبٍ) কোরআনের لِّلْقِيَةِ قُلُوبِهِمْ আয়াতে এবং এস্থলের يَجْعَلُ صَدْرَهُ قَبِيحًا مَّحْرَجًا আয়াতে বক্ষ উন্মোচনের বিপরীত অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সামনে أَمَّنْ شَرَّ اللَّهِ صَدْرَهُ আয়াতখানি তেলাওয়াত করলে আমরা شرح মত তথা বক্ষ উন্মোচনের অর্থ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: ইমানের নূর মানুষের অন্তরে প্রবেশ করলে অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে আল্লাহর বিধি-বিধান হৃদয়ঙ্গম করা এবং সে অনুযায়ী আমল

করা তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। আমরা আরয করলাম ইয়া রসূলুল্লাহ্ এর লক্ষণ কি? তিনি বললেন : **الانابة الى دار الخلود والتجاني**
عن دار الغرور والتاهب للموت قبل نزوله

এর লক্ষণ হচ্ছে, চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি অনুরাগী হওয়া, ধোকার বাসস্থান (অর্থাৎ, দুনিয়ার আনন্দ-কোলাহল) থেকে দূরে সরে থাকা এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করা।—(রুহুল মা'আনী)

আলোচ্য আয়াতটি **أَمَّنْ** প্রশ্নবোধক শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তির অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে এবং সে তার পালনকর্তার তত্ব থেকে আগত নূরের আলোকে কর্ম সম্পাদন করে, সে কি সে ব্যক্তির সমান, যে সংকীর্ণ অন্তর ও কঠোর প্রাণ? এর বিপরীতে কঠোর প্রাণ ব্যক্তির উল্লেখ পরবর্তী আয়াতে করা হয়েছে।

تَوَلَّى لِلْيَاسَةِ قَسَاوَةً শব্দের অর্থ কঠোর প্রাণ হওয়া, কারও প্রতি দয়ার্দ্র না হওয়া। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকর ও বিধানাবলী থেকে কোন প্রভাব কবুল করে না।

اللَّهُ تَزَلَّ أَحْسَنَ الْعَيْشِ كَيْفَ تَشَاءُ - এর পূর্ববর্তী

আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল — **يَتَوَلَّوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَوَلَّوْنَ أَحْسَنَهُ** - এ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, সমগ্র কোরআনই **أَحْسَنَ الْعَيْشِ** তথা উত্তম বাণী।

حديث-এর শাব্দিক অর্থ এমন কথা অথবা কাহিনী, যা বর্ণনা করা হয়। কোরআনকে 'উত্তম বাণী' বলে আখ্যায়িত করার মর্ম এই যে, মানুষ যা কিছু বলে, তন্মধ্যে উত্তম বাণী হচ্ছে কোরআন। অতঃপর কোরআনের কতিপয় বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে—(১) **أَحْسَنُ** - এর অর্থ কোরআনের বিষয়বস্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এর এক আয়াতের ব্যাখ্যা ও সত্যায়ন অন্য আয়াত দ্বারা হয়। এতে পরস্পর বিরোধিতা নেই। (২) **تَزَلَّى** এটা **مَنْشَى** -এর বহুবচন। অর্থাৎ, কোরআনে একই বিষয়বস্তু বার বার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে তা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। (৩) **تَتَوَلَّوْنَ** - এর অর্থ, যারা আল্লাহর মাহাত্ম্যে ভীত, কোরআন পাঠ করে তাদের

দেহের লোম শিউরে উঠে। (৪) **أَحْسَنُ** অর্থাৎ, কোরআন তেলাওয়াতের প্রভাবে কখনও আঘাতের কণা শুনে দেহের লোম শিউরে উঠে এবং কখনও রহমত ও মাগফেরাতের বর্ণনা শুনে দেহ ও অন্তর সবই আল্লাহর সুরসে নরম হয়ে যায়। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের সাধারণ অবস্থা তাই ছিল। তাঁদের সামনে কোরআন পাঠ করা হলে তাঁদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে যেত এবং দেহের লোম শিউরে উঠত।—(কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ্র ভয়ে যে বান্দার লোম শিউরে উঠে, আল্লাহ্ তার দেহকে আগুনের জন্যে হারাম করে দেন—(কুরতুবী)

أَمَّنْ تَتَوَلَّى يَوْمَهُ -এতে জাহান্নামের ভয়াবহতার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষের অভ্যাস এই যে, কোন কষ্টদায়ক বিষয়ের সম্মুখীন হলে মানুষ তার মুখমণ্ডলকে বাঁচানোর জন্যে হাত ও পা-কে ঢালরূপে ব্যবহার করে। কিন্তু জাহান্নামীরা হাত-পায়ের দ্বারা প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। তাদের আঘাত সরাসরি তাদের মুখমণ্ডলে পতিত হবে। সে প্রতিরক্ষা করতে চাইলে মুখমণ্ডলকেই ঢাল বানাতো পারবে।

কেননা, তাকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।—(নাইয়ুবিল্লাহ)

তফসীরবিদ 'আতা ইবনে যায়েদ বলেন, জাহান্নামীকে জাহান্নামে হাত-পা বেঁধে হিচড়ে নিক্ষেপ করা হবে।—(কুরতুবী)

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُ مَيِّتٌ -যে ভবিষ্যৎকালে মরবে, তাকে **مَيِّتٌ** এবং যে অতীতকালে মরে গেছে, তাকে **مَيِّتٌ** বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং আপনার শত্রু-মিত্র সবাই মৃত্যুবরণ করবে। এরূপ বলার উদ্দেশ্য সবাইকে পরকাল চিন্তায় মনোযোগী করা এবং পরকালের কাজে আত্মনিয়োগে উৎসাহিত করা। প্রসঙ্গতঃ একথাও বলে দেয়া উদ্দেশ্য যে, সৃষ্টির সেরা এবং পয়গম্বরকূলের মধ্যমনি হওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মৃত্যুর আওতাভবির্ভূত নন, যাতে তাঁর ইস্তিকালের পর মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি না হয়।—(কুরতুবী)

হাশরের আদালতে ময়লুমের হক কিরূপে আদায় করা হবে?

يَوْمَ الْوَيْلَةِ عِنْدَ رَبِّكَ تَتَوَلَّوْنَ -হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে **يَوْمَ** শব্দের মধ্যে মুমিন, কাফের, মুসলমান, জালেম ও ময়লুম সবাই অন্তর্ভুক্ত। তারা সবাই নিজ নিজ মোকদ্দমা আল্লাহ্ তাআলার আদালতে দায়ের করবে এবং আল্লাহ্ তাআলা যালেমকে ময়লুমের হক দিতে বাধ্য করবেন। বুখারীতে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ধরন বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, কারও যিম্মায় কারও কোন হক থাকলে তার উচিত দুনিয়াতেই তা আদায় করা অথবা ক্ষমা নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। কেননা, পরকালে দীনার-দেরহাম থাকবে না যে, তা দিয়ে হক আদায় করা যাবে। সেখানে জালেম ব্যক্তির কিছু সংকর্ম থাকলে তা জুলুমের পরিমাণে তার কাছ থেকে নিয়ে ময়লুম ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হবে। তার কাছে কোন সংকর্ম না থাকলে ময়লুমের গোনাহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে।

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক দিন সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান, নিঃশ্ব কে? তাঁরা আরয করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্, (সাঃ) আমরা তো তাকেই নিঃশ্ব মনে করি, যার কাছে নগদ অর্থকড়ি এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেন : আমার উম্মতের মধ্যে সত্যিকার নিঃশ্ব সে ব্যক্তি, যে কেসামতের দিন অনেক নামায, রোযা ও হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু দুনিয়াতে সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারও বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করেছিল, কারও অর্থকড়ি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেছিল, কাউকে হত্যা করেছিল এবং কাউকে প্রহার করে দুঃখ দিয়েছিল—এসব ময়লুম সবাই আল্লাহ্র সামনে তাদের যুলুমের প্রতিকার দাবী করবে।—ফলে তার সংকর্মসমূহ তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে। যদি তার সংকর্ম নিঃশেষ হয়ে যায় এবং ময়লুমের হক অবশিষ্ট থাকে তবে ময়লুমের গোনাহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতএব, এ ব্যক্তি সবকিছু ধাকা সত্ত্বেও কেসামতে নিঃশ্ব হয়ে যাবে। সেই প্রকৃত নিঃশ্ব।

যুলুম ও হকের বিনিময়ে সবরকম আমল দেয়া হবে কিন্তু ঈমান দেয়া হবে না : তফসীরে মাযহারীতে লিখিত আছে, ময়লুমের হকের বিনিময়ে যালেমের আমল দেয়ার অর্থ এই যে, ঈমান ব্যতীত অন্যান্য আমল দেয়া হবে। কেননা, সব যুলুমই কর্মগত গোনাহ—কুফর নয়। কর্মগত গোনাহসমূহের শাস্তি হবে সীমিত। কিন্তু ঈমান একটি অসীম

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ
إِذْ جَاءَهُ الْكَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۝ وَالَّذِي جَاءَ
بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ لَهُمْ مَا
يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاُ الْمُحْسِنِينَ ۝ يُكْفِرُ اللَّهُ
عَنْهُمْ أَسْمَاءَ الَّذِينَ عَلِمُوا بِجُرْئِهِمْ خَبَرَهُمْ بِأَحْسَنِ
الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ الْكَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ
بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝
وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۝ الْكَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ
ذِي انْتِقَامٍ ۝ وَلَٰكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَإِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ
ضُرَّتِي أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِي قُلْ
حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ قُلْ لَّيَقَوْمُ
اغْتَبُوا عَلَىٰ مَكَائِكُمْ لَٰئِي عَامِلٌ ۝ فَتَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝
مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّثْلُهُ ۝

(৩২) যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য আগমন করার পর তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে অধিক যালেম আর কে হবে? কাফেরদের বাসস্থান জাহান্নামে নয় কি? (৩৩) যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যকে সত্য মেনে নিয়েছে; তারাই তো খোদাতীরা। (৩৪) তাদের জন্যে পালনকর্তার কাছে তাই রয়েছে, যা তারা চাইবে। এটা সংকসীদের পুরস্কার (৩৫) যাতে আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের উত্তম কর্মের পুরস্কার তাদেরকে দান করেন। (৩৬) আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোন পঞ্চদর্শক নেই। (৩৭) আর আল্লাহ যাকে পঞ্চদর্শন করেন, তাকে পঞ্চদর্শকারী কেউ নেই। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? (৩৮) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে—আল্লাহ। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে। (৩৯) বলুন, হে আমার কণ্ঠ, তোমরা তোমাদের জায়গায় কাজ কর, আমিও কাজ করছি। স্বপ্নই জানতে পারবে (৪০) কার কাছে অবমাননাকর আঘাত এবং চিরস্থায়ী শাস্তি নেমে আসে।

আমল, এর পুরস্কারও অসীম। অর্থাৎ, চিরকাল জাহান্নাতে বসবাস করা; যদিও তা গোনাহের শাস্তি ভোগ করা এবং কিছুকাল জাহান্নামে অবস্থান করার পরে হয়। এর সারমর্ম এই যে, যালেমের ঈমান ব্যতীত সব সংকসমি যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে কেবল ঈমান বাকী থাকবে, তখন তার কাছ থেকে তা হিনিয়ে নেয়া হবে না, বরং মখলুমদের গোনাহ তার উপর চাপিয়ে হক আদায় করা হবে। ফলে সে গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে জাহান্নাতে প্রবেশ করবে এবং অনন্তকাল সেখানে থাকবে। মাযহারীর বর্ণনা মতে ইমাম বায়হাকীও তাই বলেছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ-র صدق জায়গায় এ দু' জায়গায় وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ এবং وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ আনিত শিক্ষাসমূহ, তা কোরআনই হোক অথবা হাদীস হোক। এর সত্যায়নকারী সব মুমিন-মুসলমানই অন্তর্ভুক্ত।

— কাফেররা একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামকে একথা বলে ভয় দেখিয়েছিল যে, যদি আপনি আমাদের প্রতিমাদের প্রতি বে-আদাবী প্রদর্শন করেন, তবে তাদের কোপানল থেকে আপনাকে কেউ বাচাতে পারবে না; তাদের প্রভাব খুব সাংঘাতিক। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং জওয়াবে বলা হয় যে, আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন?

সে জন্যেই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে বান্দার অর্থ নিয়েছে বিশেষ বান্দা অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ)। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থই অবলম্বন করা হয়েছে। অন্যান্য তফসীরবিদগণ বলেন যে, এখানে যে কোন বন্দা বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতের অপর এক কেরাত عباده বর্ণিত আছে। এ কেরাত দ্বিতীয় তফসীরের সমর্থক। বিষয়বস্তু সর্বাবস্থায় ব্যাপক; অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক বান্দার জন্যেই যথেষ্ট।

অর্থ, — وَخَوِّفْكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ শিক্ষা ও উপদেশ : কাফেররা আপনাকে তাদের মিথ্যা উপাস্যদের কোপানলের ভয় দেখায়। এ আয়াত পাঠ করে পাঠকবর্ণ সাধারণতঃ মনে করে যে, এটা আর কি, এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি কাফেরদের হুমকি বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। তারা এ বিষয়টি অনুশাবন করতে চেষ্টা করে না যে, এতে আমাদের জন্যে কি পথনির্দেশ রয়েছে। অথচ সুস্পষ্ট ব্যাপার এই যে, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে ভয় দেখিয়ে বলে, তুমি অমুক হারাম অথবা পাপ কাজ না করলে তোমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অথবা শাসকশ্রেণী তোমার প্রতি রাগান্বিত হবেন এবং তোমার ক্ষতি করবেন, এরূপ ভীতি প্রদর্শনকারী ব্যক্তিও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সে মুসলমান হয়। আমাদের সমাজে এরূপ ঘটনার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। অধিকাংশ চাকুরির ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানাবলী অমান্য করবে, না অফিসারবর্গের কোপানলের শিকার হবে, এরূপ টানা-পোড়েনের সশ্মুখীন হতে হয়। আলোচ্য আয়াত তাদের সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা কি তোমাদের হেফাযতের জন্যে যথেষ্ট নন? তোমরা ঝাটিভাবে আল্লাহর জন্যে গোনাহ না করার সংকল্প করলে এবং আল্লাহর বিধানাবলীর বিপক্ষে কোন শাসক ও কর্মকর্তার রক্তচক্ষুর পরওয়া না করলে আল্লাহর সাহায্য তোমাদের সাথে থাকবে। বেশীর চেয়ে বেশী চাকুরি নষ্ট হয়ে গেলেও আল্লাহ তাআলা তোমাদের জীবিকার অন্য ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজেই এ ধরনের চাকুরি ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা থাক মুসলমানের কর্তব্য। কোন উপযুক্ত জায়গা পেয়ে গেলে অনতিবিলম্বে এ ধরনের চাকুরি ত্যাগ করা উচিত।

اللَّهُ يَتَوَلَّى الْإِنْسَانَ

মৃত্যু ও নিদ্রাকালীন প্রাণ হরণের পার্থক্য : **حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا** - **تَوَفَى** এর শাব্দিক অর্থ লওয়া ও করায়ত্ত করা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, প্রাণীদের প্রাণ সর্বাবস্থায় ও সর্বক্ষেণই আল্লাহ তাআলার আয়ত্তাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা তা হরণ করতে ও ফিরিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ তাআলার এ কুদরত প্রত্যেক প্রাণীই প্রত্যাহ দেখে ও অনুভব করে। নিদ্রার সময় তার প্রাণ আল্লাহ তাআলার এক প্রকার করায়ত্তে চলে যায় এবং জাগ্রত হওয়ার পর ফিরে পায়। অবশেষে এমন এক সময় আসবে, যখন তা সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়ে যাবে এবং ফিরে পাওয়া যাবে না।

তফসীরে মাযহারীতে আছে, প্রাণ হরণ করার অর্থ তার সম্পর্ক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া। কখনও বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সবদিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, এরই নাম মৃত্যু। আবার কখনও শুধু বাহ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। আভ্যন্তরীণভাবে যোগাযোগ থাকে। এর ফলে কেবল বাহ্যিকভাবে জীবনের লক্ষণ, চেতনা ও ইচ্ছাভিত্তিক নড়াচড়ার শক্তি বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় এবং আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে দেহের সাথে প্রাণের সম্পর্ক বাকী থাকে। ফলে সে শ্বাস গ্রহণ করে ও জীবিত থাকে। এটা এভাবে করা হয় যে, মানুষের প্রাণকে ‘আলমে মিছাল’ অধ্যয়নের দিকে নিবিষ্ট করে এ জগৎ থেকে বিমুখ ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়, যাতে মানুষ পরিপূর্ণ আরাম লাভ করতে পারে। যখন আভ্যন্তরীণ সম্পর্কও বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, তখন দেহে জীবন সম্পূর্ণরূপে খতম হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতে **تَوَفَى** শব্দটি উপরোক্ত উভয় প্রকার প্রাণ হরণের অর্থকেই অন্তর্ভুক্ত করে। মৃত্যু ও নিদ্রার উপরোক্ত পার্থক্যের সমর্থন হযরত আলী (রাঃ)-এর এক উক্তি থেকেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, ‘নিদ্রার সময় মানুষের প্রাণ তার দেহ থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু প্রাণের একটি রেশ দেহে বাকী থাকে। ফলে মানুষ জীবিত থাকে। এ রেশের মাধ্যমেই সে স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন আলমে মিছালের দিকে প্রাণের নিবিষ্ট থাকা অবস্থায় দেখা হলে তা সত্য স্বপ্ন হয় এবং সেদিক থেকে দেহের দিকে ফিরে আসার সময় দেখলে তাতে শয়তানের কারসাজি শামিল হয়ে যায়। ফলে সেটা সত্য স্বপ্ন থাকে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘নিদ্রাবস্থায় প্রাণ দেহ থেকে বেরিয়ে যায় ; কিন্তু জাগরণের সময় এক নিমেষের চেয়েও কম সময়ে দেহে ফিরে আসে।

فِى اللَّهِ فَاِطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - **سَهِى** মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামায কিসের দ্বারা শুরু করতেন? তিনি বললেন, তিনি যখন তাহাজ্জুদের জন্যে উঠতেন, তখন এ দোয়া পাঠ করতেন :

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَاسْرَافِيلَ فَاطْرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ

يَخْتَلِفُونَ أِهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِأَنْذِكَ أَنْتَ تَهْدِي مِنَ

تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ) বলেন, আমি কোরআন পাকের এমন এক আয়াত জানি যা পাঠ করে দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হয়।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ
فَنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا وَتَمَّ أَنْتَ عَلَيْهِمْ
يُوكِّلُ ۖ اللَّهُ يَتَوَلَّى الْإِنْسَانَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ
تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ
يُرْسِلُ الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۝ أَمْ آخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُعْعَاءً ۖ قُلْ
أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْكُمُونَ ۖ قُلْ لِلَّهِ
الشَّعَاعَةُ جَمِيعًا ۚ لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ الْإِلَهِ
تُرْجَعُونَ ۝ وَادَّكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْهُبَتْ قُلُوبُ الْكَافِرِينَ
لَا يَكُونُونَ إِلَّا لُغْوًا ۚ وَادَّكِرَ الْكَافِرِينَ مِنْ ذُرِّيَةِ إِدَّاهُمْ
يَسْتَنْشِرُونَ ۖ قُلْ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۖ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتِنُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۖ وَبِكَ الْهُمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَ ۝

(৪১) আমি আপনার প্রতি সত্য ধর্মসহ কিতাব নাখিল করেছি মানুষের কল্যাণকামে। অতঃপর যে সংগে আসে, সে নিজের কল্যাণের জন্যেই আসে, আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে নিজেরই অনিষ্টের জন্যে পথভ্রষ্ট হয়। আপনি তাদের জন্যে দায়ী নন। (৪২) আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে। অতঃপর যার মৃত্যু অবস্থারিত করেন, তার প্রাণ ছাড়েন না এবং অন্যান্যদের ছেড়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। নিশ্চয় এতে চিত্তশালী লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৪৩) তারা কি আল্লাহ ব্যতীত সুপারিশকারী গ্রহণ করেছে? বলুন, তাদের কোন এখতিয়ার না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও? (৪৪) বলুন, সমস্ত সুপারিশ আল্লাহরই ক্ষমতাধীন, আসমান ও যমীনে তাঁরই সাদ্রাজ্য। অতঃপর তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৪৫) যখন ঋণীভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে। (৪৬) বলুন, হে আল্লাহ, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। (৪৭) যদি গোনাহগারদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে অবশ্যই তারা কেয়ামতের দিন সে সবকিছুই নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেবে। অথচ তারা দেখতে পাবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন শাস্তি, যা তারা কল্পনাও করত না।

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
- (কুরত্বী)

হযরত সুফিয়ান সওরী
وَبَدَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنُوا يَحْتَسِبُونَ
(রহঃ) এ আয়াত পাঠ করে বললেন, ধ্বংস হোক লোক দেখানো
এবাদতকারীরা, ধ্বংস হোক লোক দেখানো এবাদতকারীরা, এ আয়াত
তাদের সম্পর্কেই, যারা দুনিয়াতে মানুষকে দেখানোর জন্যে সংকল্প করত
এবং লোকেরাও তাদেরকে সং মনে করত। তারা ধোঁকায় ছিল যে, এসব
সংকল্প পরকালে তাদের মুক্তির উপায় হবে। কিন্তু এগুলোতে যেহেতু
নিষ্ঠা ছিল না, তাই আল্লাহর কাছে এরূপ সংকল্পের কোন পুরস্কার ও
সওয়াব নেই। ফলে পরকালে তাদের ধারণার বিপরীতে শাস্তি হতে
থাকবে।—(কুরত্বী)

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ সম্পর্কে একটি
গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চনির্দেশ : হযরত রবী ইবনে খাইসমকে কেউ হযরত
হোসাইন (রাঃ) - এর শাহাদত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি এক দীর্ঘশ্বাস
ছেড়ে
قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمُ الْغَيْبِ أَنتَ تَعْلَمُ بَيْنَ عِبَادِكَ
আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন, অতঃপর বললেন : সাহাবায়ে কেরামের
পারস্পরিক মতবিরোধ সম্পর্কে যখন তোমার মনে ঝটকা দেখা দেয়,
তখন এ আয়াত পাঠ করে নিও।—রুহুল মা'আনী এই ঘটনা বর্ণনা করে
বলেন : এটি একটি বিরাট আদব ও শিক্ষা। এটা সদাসর্বদা মনে রাখা
উচিত।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلِ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا - হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন,
কিছু লোক ছিল, যারা অন্যায় হত্যা করেছিল এবং অনেক করেছিল।
আরও কিছু লোক ছিল, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং অনেক করেছিল।
তারা এসে রসূলুল্লাহ (সঃ) -এর কাছে আরজ করল : আপনি যে ধর্মের
দাওয়াত দেন, তা তো খুবই উত্তম, কিন্তু চিন্তার বিষয় হল এই যে, আমরা
অনেক জঘন্য গোনাহ্ করে ফেলেছি। আমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করি,
তবে আমাদের তওবা কবুল হবে কি? এর পরিশ্রেক্ষিতই আলোচ্য
আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(কুরত্বী)

তাই আয়াতের বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, মৃত্যুর পূর্বে প্রত্যেক বড়
গোনাহ্ এমনকি শিরক ও কুফর থেকে তওবা করলেও তওবা কবুল হয়।
সত্যিকার তওবা দ্বারা সবরকম গোনাহ্ই মাফ হতে পারে। তাই আল্লাহর
রহমত থেকে কারও নিরাশ হওয়া উচিত নয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এই আয়াতটি
গোনাহ্গারদের জন্যে কোরআনের সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক আয়াত। কিন্তু
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন :

وَأَنَّ رَبَّكَ لَذَلِيلٌ لِلنَّاسِ عَلَى ظُهُورِهِمْ - আয়াতই হল সর্বাধিক
আশার আয়াত।

وَإِنَّمَا أَحْسَنَ مَا تُؤْتِلُ الْيَكْرَ - এখানে 'উত্তম অবতীর্ণ বিষয়' বলে
কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। সমগ্র কোরআনই উত্তম। একে এদিক
দিয়েও উত্তম বলা যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর
ইত্যাদি স্বত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তন্মধ্যে উত্তম ও পূর্ণতম কিতাব
হচ্ছে কোরআন।—(কুরত্বী)

وَبَدَّ اللَّهُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَاسِرِينَ
يَسْتَهْزِئُونَ ۖ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَادِيَهُ إِذَا
خَوْلَهُ يَغِيثُهُ ۖ إِنَّمَا رِزْقُهُ عَلَى عِلْمٍ لِّئَلَّا يَفْسُدَ
وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۖ قَالُوا لَهُمْ سَيِّئَاتُ
مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ قَوْلِكَ وَسَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا
مَا كَسَبُوا وَأَهُمْ بِمُعْجِزَاتِنَا ۖ أَوْ كَرِهُوا لَعْنَتَنَا ۖ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ۚ قُلِ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْضُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ يَجْمَعُ
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۖ وَابْتَغُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ۖ لَعَلَّكُمْ تَصْزَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ أَحْسَنَ
مَا أُتِرُوا ۖ الْيَكْرَ مِنْ رَبِّكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بِقِتَّةٍ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۖ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ عُصْرَتِي عَلَىٰ
مَا قَرَّبْتُ فِي جَنَّةِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمَنِ السَّخِرُونَ ۚ

(৪৮) আর দেখবে, তাদের দুর্কর্মসমূহ এবং যে বিষয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ
করত, তা তাদেরকে ঘিরে নেবে। (৪৯) মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ
করে, তখন সে আমাকে ডাকতে শুরু করে, এরপর আমি যখন তাকে
আমার পক্ষ থেকে নেয়ামত দান করি, তখন সে বলে, এটা তো আমি
পূর্বের জন্যে মতেই প্রাপ্ত হয়েছি। অথচ এটা এক পরীক্ষা, কিন্তু তাদের
অধিকাংশই বোঝে না। (৫০) তাদের পূর্ববর্তীরাও তাই বলত, অতঃপর
তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন উপকারে আসেনি। (৫১) তাদের দুর্কর্ম
তাদেরকে বিপদে ফেলেছে, এদের মধ্যেও যারা পাপী, তাদেরকেও
অতিসঙ্কট তাদের দুর্কর্ম বিপদে ফেলেবে। তারা তা প্রতিহত করতে সক্ষম
হবে না। (৫২) তারা কি জানেনি যে, আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা রিযিক বৃদ্ধি
করেন এক পরিমিত দেন। নিশ্চয় এতে কিছুসী সখ্যদায়ের জন্যে
নির্দোষকালী রয়েছে। (৫৩) বলুন, হে আমার বন্দাদাস যারা নিজদের
উপর ক্রুশ করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না। নিশ্চয়
আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ্ মাফ করেন। তিনি ক্ষমশীল, পরম দয়ালু। (৫৪)
তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অভিমুখী হও এক তাঁর আজ্ঞাবহ হও
তোমাদের কাছে আশাব আসার পূর্বে। এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে
না ; (৫৫) তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ উত্তম বিষয়ের অনুসরণ কর
তোমাদের কাছে অতর্কিত ও অজ্ঞাতসারে আশাব আসার পূর্বে, (৫৬)
যাতে কেউ না বলে, হায়, হায়, আল্লাহ্ সকালে আমি কর্তব্যে অবহেলা
করেছি এক আমি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলাম।

اَوْ تَقُولُ لَوْ اَنَّ اللهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ التَّقِيْنَ ۝ اَوْ
 تَقُولُ حَيْثُ تَرَى الْعَذَابَ لَؤُنْ لِي كُزَّةٌ فَأَكُوْنَ مِنَ
 الْمُحْسِنِيْنَ ۝ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ الْبَيِّنَاتُ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ
 وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ۝ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ
 عَلَىٰ اَللّٰهِ وَجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى
 لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝ وَيَسْئَلُ اللهَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِعَاقِبَتِهِمْ لَا
 يَسْأَلُهُمُ السُّوْءَ وَلَا هُمْ يَجْزَوْنَ ۝ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
 الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ اللهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝ قُلْ
 اَفَتَعْبُدُوْا اِلٰهًا تَمْرُوْنَ فِيْ اَعْبَادِهَا الْجَهْلُوْنَ ۝ وَلَقَدْ
 اَوْحٰى اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اَلَيْسَ اَشْرَكَتُ
 لِيَّعْبُدَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝ بَلِ اَللّٰهُ
 فَاعْبُدُوْا ذِكْرًا مِّنَ الشَّكْرِ ۝ وَمَا قَدَّرَ اللهُ حَتّٰى
 قَدَّرَ ۝ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَلْوَمُوْنَ
 مَطْوِيَّاتًا بَيِّنٰتٍ ۝ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

(৫৭) অথবা না বলে, আল্লাহ যদি আমাকে পঞ্চপ্রদর্শন করতেন, তবে অবশ্যই আমি পরহেয়গারদের একজন হতাম। (৫৮) অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় না বলে, যদি কোনরূপে একবার ফিরে যেতে পারি, তবে আমি সংকল্পপরায়ণ হয়ে যাব। (৫৯) হা, তোমার কাছে আমার নির্দেশ এসেছিল; অতঃপর ভূমি তাকে মিথ্যা বলেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলে। (৬০) যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কেয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কাল দেখবেন। অহংকারীদের আবাসস্থল জাহান্নামে নয় কি? (৬১) আর যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকত, আল্লাহ তাদেরকে সাফল্যের সাথে মুক্তি দেবেন, তাদেরকে অনিষ্ট স্পর্শ করবে না এবং তারা চিহ্নিতও হবে না। (৬২) আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। (৬৩) আসমান ও যমীনের চাবি তাঁরই নিকটে। যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তারাই কতিগ্রস্ত। (৬৪) বলুন, হে মুর্খরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের এবাদত করতে আদেশ করছ? (৬৫) আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি কতিগ্রস্তদের একজন হবেন। (৬৬) বরং আল্লাহরই এবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন। (৬৭) তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে।

এ-এই তিনটি আয়াতে সে বিষয়বস্তুরই ব্যাখ্যা ও তাকীদ করা হয়েছে, যা পূর্বকার তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, কোন বৃহত্তম অপরাধী, কাফের, পাপাচারীও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তওবা করলে আল্লাহ তার সমস্ত অতীত গোনাহ মাফ করে দেন। কিন্তু একথা ভুল গেলে চলবে না যে, তওবার সময় হল মৃত্যুর পূর্বে। মৃত্যুর পরে কেয়ামতের দিন কেউ তওবা করলে অথবা অনুতপ্ত হলে তাতে কোন উপকার হবে না।

কোন কোন কাফের ও পাপাচারী কেয়ামতের দিন বিভিন্ন বাসনা প্রকাশ করবে। কেউ অনুতাপ করে বলবে, হায়, আমি আল্লাহর আনুগত্যে কেন শৈথিল্য করেছিলাম! কেউ সেখানেও তকদীরের উপর দোষ চাপিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইবে। সে বলবে, যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে পঞ্চপ্রদর্শন করতেন, তবে আমিও মুস্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত থাকতাম। কিন্তু আল্লাহ পঞ্চপ্রদর্শন না করলে আমি কি করব? কেউ বাসনা করবে যে, আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলে আমি পাকাপোক্ত মুসলমান হয়ে যাব এবং আল্লাহর বিধানাবলী পুরোপুরি মেনে চলব। কিন্তু তখনকার এসব অনুতাপ ও বাসনা কোন কাজেই আসবে না।

উপরোক্ত তিন রকম বাসনা তিন ধরনের লোকদেরও হতে পারে এবং একই দলের পক্ষ থেকেও হতে পারে। তারা একের পর এক করে তিন রকম বাসনাই ব্যক্ত করবে। কেননা, সর্বশেষ বাসনা, যাতে পুনরায় দুনিয়াতে ফিরে আসার আশা প্রকাশ করা হয়েছে, এটা আযাব প্রত্যক্ষ করার পরেই হবে। এতে বাহ্যতঃ জ্ঞান যায় যে, পূর্বোক্ত দু'টি বাসনা আযাব প্রত্যক্ষ করার পূর্বকার। কেয়ামতের দিন শুরুতেই তারা নিজেদের কর্মের ত্রুটিবিচ্যুতি স্মরণ করে বলবে:

يُسْتَرْوٰى عَلَى مَا قَرَّرْتُ فِيْ جَنَّةِ اَللّٰهِ

—এরপর গুণের ও বাহানা করে বলবে, আল্লাহ হেদায়েত করলে আমরাও অনুগত মুস্তাকী হয়ে যেতাম। কাজেই আমাদের কি দোষ! এরপর আযাব প্রত্যক্ষ করে বাসনা করবে, আমাদেরকে যদি পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দেয়া হত। আল্লাহ তাআলা আলাচ্য তিনটি আয়াতে বলে দিয়েছেন, আল্লাহর মাগফেরাত ও রহমত খুব বিস্তৃত; কিন্তু তা লাভ করতে হলে মৃত্যুর পূর্বে তওবা করতে হবে। আমি এখনই বলে দিচ্ছি—মৃত্যুর পরে যেন তোমরা পরিতাপ না কর এবং এ ধরনের অনর্থক বাসনা প্রকাশ না কর।

بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ الْبَيِّنَاتُ اَلَيْسَ لَكَ ذِكْرٌ

আল্লাহ তাআলা হেদায়েত করলে আমরা পরহেয়গার হয়ে যেতাম—এখানে কাফেরদের এ উক্তিও জওয়াব দেয়া হয়েছে। এর সারকথা এই যে, আল্লাহ পুরোপুরিই হেদায়েত করেছিলেন এবং কিতাব ও আয়াত প্রেরণ করেছিলেন। তবে হেদায়েত করার পর কাউকে আনুগত্যে বাধ্য করেননি, বরং সত্য ও মিথ্যা যে কোন পথ অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন। এটাই ছিল বান্দার পরীক্ষা। এর উপরই ছিল তার সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল। সে স্বেচ্ছায় গোমরাহির পথ অবলম্বন করেছে, এজন্য সে নিজেই দায়ী।

অথবা শব্দটি مَقَالِيْدُ - لَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

এর বহুবচন। অর্থ তালার চাবি। কেউ কেউ বলেন, শব্দটি আসলে ফারসী থেকে আরবীতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফারসীতে চাবিকে কলিদ বলা হয়। আরবী রূপান্তর করে প্রথমে একে مَقَالِيْدُ করা হয়েছে। এরপর

৩৭৭

৩৭৭

৩৩

وَنُفَعُ فِي الصُّورِ مَصْرَعَيْنِ مَنْ فِي السَّنَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
 الْأَمِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُخْرِجُ فِيهِ أُخْرَى قَادَاهُمْ قِيَامَهُ يَنْظُرُونَ ⑤
 وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالسَّاعِ
 وَالشَّهَادَةِ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ⑥ وَوَقَّيْتُ
 كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ⑦ وَسَيُقَرِّبُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُرَّارًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَبَسَّ
 أُولَئِكَ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا جَاءُوهَا كَانُوا عَلَيْهَا خَائِدِينَ وَبُذِلَتْ لَهُمْ الْأَسْبَاطُ
 يَتَلَوْنَهَا وَيَقُولُونَ سَاءَ رَبُّنَا الَّذِي أَلْوَاحَ الْوَعْدِ كَانَ يَمُونُ ⑧
 هَذَا قَوْلُ الْأَوَّلِينَ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ⑨
 قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فِيمَا نُفِيسُ مَثْوًى
 الْمُتَكَبِّرِينَ ⑩ وَسَيُقَرِّبُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْبَيْعَةِ زُرَّارًا
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِينُنَّ قَادِخُولُوهَا خَالِدِينَ ⑪ وَقَالُوا
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ
 نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ نَنُغَمُّ أَجْرَ الْعَامِلِينَ ⑫

(৬৮) শিগায় ফুক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেঁধে হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার শিগায় ফুক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। (৬৯) পৃথিবী তার পালনকর্তার নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা স্থাপন করা হবে, পয়গম্বরগণ ও সাক্ষীগণকে আনা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে—তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (৭০) এভাবে যা করেছে, তার পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। তারা যা কিছু করে, সে সম্পর্কে আল্লাহ সত্যক অবগত। (৭১) কাকেরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাকিয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বর আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ আনুষ্ঠিত করত এবং সতর্ক করত এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে? তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু কাকেরদের প্রতি শাস্তির স্কুম্বাই বাস্তবায়িত হয়েছে। (৭২) বলা হবে, তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে প্রবেশ কর, সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্যে। কত নিকট অহংকারীদের আবাসস্থল। (৭৩) যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উদ্ভূত দরজা দিয়ে জাহান্নামে পৌঁছাবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ কর। (৭৪) তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জাহান্নামের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। মেহনতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার।

এর বহুবচন অলিঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে।—(রাকুল-মা'আনী) চাবি কারও হাতে থাকা তার মালিক ও নিয়ন্ত্রক হওয়ার লক্ষণ। তাই আয়াতের মর্মার্থ দাঁড়ায় এই যে, আকাশ ও পৃথিবীতে লুকায়িত সকল ভাণ্ডারের চাবি আল্লাহর হাতে। তিনিই এগুলোর রক্ষক, তিনিই নিয়ন্ত্রক, যখন ইচ্ছা যাকে ইচ্ছা, যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন না। হাদীস শরীফে—

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا

عظيم—এই কলেমাকে আকাশ ও পৃথিবীর চাবি বলা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল এ কলেমা পাঠ করে, তাকে আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীর ভাণ্ডারসমূহের নেয়ামত দান করেন। ইবনে জওযী এ ধরনের রেওয়াজকে মনগড়া বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য হাদীসবিদগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যা আমলের ফযীলতে ষতব্য হতে পারে।—(রাকুল-মা'আনী)

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا نَفْثَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالشُّجُورُ مَطْوِيَّاتٌ يَبِينُ

কেয়ামতের দিন পৃথিবী আল্লাহর মুঠোতে থাকবে এবং আকাশ তাঁজ করা অবস্থায় তার ডান হাতে থাকবে। পূর্ববর্তী আলেমগণের মতে আক্ষরিক অর্থেই এমনটি হবে। কিন্তু আয়াতের বিষয়বস্তু—এর অন্তর্ভুক্ত, যার স্বরূপ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। এর স্বরূপ জানার চেষ্টা করাও সাধারণ লোকের জন্য নিষিদ্ধ। বিশ্লেষণ করতে হবে যে, আল্লাহর যা উদ্দেশ্য তা সত্য ও বিস্তৃত। এ আয়াতের বাহ্যিক ভাষা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলার 'মুঠি' ও 'ডান হাত' আছে। এগুলো দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অথচ আল্লাহ তাআলা দেহ ও দেহত্ব থেকে পবিত্র ও মুক্ত। তাই আয়াতের উপসংহারে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এগুলোকে নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করা না। আল্লাহ এগুলো থেকে পবিত্র سُبْحَتَهُ وَقِيلَ عَنَّا يُذِكرُونَ

পূর্ববর্তী আলেমগণ আলোচ্য আয়াতকে দৃষ্টান্ত ও রূপক সাব্যস্ত করে এর অর্থ করেছেন যে, 'এ বস্তু আমার মুঠিতে ও ডান হাতে, এরূপ বলে রূপক ভঙ্গিতে বোঝানো হয় যে, বস্তুটি পূর্ণরূপে আমার করায়ত্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন। আয়াতে তাই বোঝানো হয়েছে।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

صَوِّعَ مَنْ فِي السَّنَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الْأَمِنْ شَاءَ اللَّهُ

এর শাস্তিক অর্থ বেঁধে হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে বেঁধে হবে, অতঃপর মারা যাবে। যারা পূর্বেই মৃত, তাদের আত্মা বেঁধে হয়ে যাবে।—(বয়ানুল-কোরআন) — الْأَمِنْ شَاءَ اللَّهُ — দূরের মনসুরের রেওয়াজে অনুযায়ী এই ব্যতিক্রমের মধ্যে চার ফেরেশতা—জিবরাঈল, মিকাইল, ইসরাফীল ও আযরাঈল এবং কোন কোন রেওয়াজে অনুযায়ী আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও অন্তর্ভুক্ত। তাদের ব্যতিক্রমের অর্থ এই যে, শিগায় ফুকের প্রভাবে তাদের মৃত্যু হবে না। কিন্তু পরে তারাও মারা যাবে। আল্লাহ ব্যতীত তখন কেউ জীবিত থাকবে না। ইবনে কাসীর এ ব্যাখ্যাই অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন, তাদের মধ্যেও সবশেষে আযরাঈলের মৃত্যু হবে। সূরা নমলেও এ ধরনের এক আয়াত বর্ণিত রয়েছে। সেখানে صَوِّعَ—এর পরিবর্তে فَرَعَ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানেও এর কিছু বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

وَجِئَتْ بِالسَّاعِ وَالشَّهَادَةِ — অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে হিসাব—

وَنَزَى الْمَلَائِكَةُ حَافَتَيْنِ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ وَأَقْبَصَ يَدَهُمَا وَالسَّاقُونَ وَالسَّائِمُونَ رُبَّ الْعَالَمِينَ ۝
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
لَحْمٌ تَنْزِيلُ الْكَتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝ غَافِرُ الذَّنْبِ
وَأَكْبِلُ الْغُوبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الْقُلُوبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْبَصِيرُ ۝ مَا يَجِدُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا
يُغْنِيكَ تَعْلِفُهُمْ فِي الْيَلَدِ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ۝
الْأَحْزَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ
لِيَأْخُذُوا وَجَدُوا لِرَبِّ الْبَاطِلِ لِيُدْخِلَهُمْ فِي الْفِتْنِ فَأَخَذَتْهُمُ
فَلَيْتَ كَانَ عَقْلِي ۝ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ لِرَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ
كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ
حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

(৭৫) আপনি ফেরেশতগণকে দেখবেন, তারা আরশের চার পাশ ঘিরে তাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছে। তাদের সবার মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে। বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিশুপালক আল্লাহর।

मुराधान-मुग्धिन

মহায়া অবতীর্ণঃ আশ্বাত ৮৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহর নামে শুরু :

(১) হা-মীম—(২) কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, (৩) পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন। (৪) কাকেররাই কেবল আল্লাহর আশ্রয় সম্পর্কে বিতর্ক করে। কাজেই নগরীসমূহে তাদের বিচরণ যেন আপনাকে বিভ্রান্তিতে না ফেলে। (৫) তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, আর তাদের পরে অন্য অনেক দলও। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ পয়গম্বরকে আক্রমণ করার ইচ্ছা করেছিল এবং তারা মিথ্যা বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল, যেন সত্যধর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। কেমন ছিল আমার শাস্তি! (৬) এভাবে কাকেরদের বেলায় আপনার পালনকর্তার এ বাক্য সত্য হল যে, তারা জাহান্নামী। (৭) যারা আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের পালনকর্তার স্মরণশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের পালনকর্তা, আপনার রহমত ও ক্ষমা সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতএব, যারা তওবা করে এবং আপনার পথে চলে, তাদেরকে ক্ষমা করুন। এবং জাহান্নামের আশ্রয় থেকে বন্ধা করুন।

নিকাশের সময় সমস্ত পয়গম্বরগণও উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য সাক্ষীও উপস্থিত থাকবে। সাক্ষীগণের এ তালিকায় স্বয়ং পয়গম্বরগণও থাকবেন। যেমন, এক আয়াতে আছে—

إِذْ أَجْمَعُوا عَلَى الْقَتْلِ مُحَمَّدٌ -

ফেরেশতাগণও থাকবে। যেমন, কোরআনে আছে—

مَعَهُ الرُّسُلُ وَشُعْبَةُ

—উম্মতে মোহাম্মদীও থাকবে। যেমন, এক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَكُنْتُمْ أَشْهَادًا عَلَى النَّاسِ এবং স্বয়ং মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও থাকবে।
وَكُنْتُمْ نَائِبِينَ لَكُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُكُمْ যেমন, কোরআনে বলা হয়েছে —

উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞানাতীদেব
নিজের প্রাসাদ ও বাগ-বাগিচা তো থাকবেই, উপরন্তু তাদেরকে অন্য
জ্ঞানাতীদেব কাছে সাক্ষাৎ ও বেড়ানোর জন্যে গমন করার অনুমতিও দেয়া
হবে—(তিবরানী) আবু নরীম ও জিয়ার এক রেওয়াজেতে হযরত আয়েশা
(রাঃ) বলেন : এক ব্যক্তি রসুলে করীম (সঃ)—এর কাছে উপস্থিত হয়ে
আরম্ভ করল, ইয়া রসুলুল্লাহ্, আপনার প্রতি আমার ভালবাসা এত
সুগভীর যে, বাড়ীতে গেলেও আপনাকেই স্মরণ করি এবং পুনরায়
আপনার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি ঘের্ষ ধরতে পারি না। কিন্তু
যখন আমি আমার মৃত্যু ও আপনার ওফাতের কথা স্মরণ করি, তখন
বিমর্ষ হয়ে পড়ি। কারণ, মৃত্যুর পর আপনি তো জ্ঞান্নাতে পয়গম্বরগণের
সাথে উচ্চাসনে আসীন থাকবেন, আর আমি জ্ঞান্নাতে গেলেও নিম্নস্তরেই
স্থান পাব। কাজেই আমার চিন্তা এই যে, আপনাকে কিরাপে দেখব ?
রসুলুল্লাহ্ (সঃ) তার কথা শুনে কোন জওয়াব দিলেন না। অবশেষে
জিবরাঈল (আঃ) নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে আগমন করলেন :

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رِجَالًا

এই আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ও রসুলের আনুগত্য করতে থাকলে মুসলমানগণ পণ্যগম্বর ও সিদ্দীক প্রমুখের সঙ্গেই থাকবে। আর আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তারা উচ্চস্তরে গমনাগমনেরও অনুমতি লাভ করবে।

મુસ્લા આલ-મુ'મિન

সূরার বৈশিষ্ট্য ও ক্ষয়ীলত : এখান থেকে সূরা আহকাফ পর্যন্ত সাতটি সূরা ‘হা-মীম’ বর্ণযোগে শুরু হয়েছে। এগুলোকে আল-হা-মীম অথবা ‘হাওয়ামীম’ বলা হয়। হয়রত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আল-হা-মীম কোরআনের রেশমী বস্ত্র, অর্থাৎ, সৌন্দর্য। মুসইর ইবনে কদাম বলেন, এগুলিকে عرائس অর্থাৎ, নববধূ বলা হয়। হয়রত ইবনে আব্বাস বলেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি নির্ধার্স থাকে, কোরআনের নির্ধার্স হল আল-হা-মীম অথবা হাওয়ামীম। — (ফাযায়েলুল কোরআন)

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) কোরআনের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এক ব্যক্তি পরিবার-পরিজনদের বসবাসের জন্যে জায়গার খুঁজে বের হল। সে এক শস্য শ্যামল প্রান্তর দেখে খুব আনন্দিত হল। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সে হঠাৎ উর্বর বাগ-বাগিচাও দেখতে পেল। এগুলো দেখে সে বলতে লাগল, আমি তো বৃষ্টির প্রথম শ্যামল্য দেখেই বিস্ময় বোধ করছিলাম, এটা তো আরও বিস্ময়কর। এখন বুঝুন, প্রথম শ্যামলের উদাহরণ হল সাধারণ কোরআন। আর উর্বর বাগ-বাগিচা হল আল-হাযীম। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এ কারণেই বলেন, আমি যখন

কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে আল-হামীমে পৌছি, তখন এতে আমার চিত্ত যেন বিনোদিত হয়ে উঠে।

বিপদাপদ থেকে হেফাযত : মুসনাদ বাযযারে আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে আয়াতুল কুরসী এবং সূরা মুমিনের প্রথম তিন আয়াত **الْأَمِينِ** পর্যন্ত পাঠ করবে সে সেদিন যে কোন কষ্ট ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।—(ইবনে কাসীর)

শত্রু থেকে হেফাযত : আবু দাউদ ও তিরমিযীতে হযরত মুহাল্লাব ইবনে আবু সফরাহ (রাঃ)—এর সনদে রসুলুল্লাহ (সাঃ) কোন এক জেহাদের রাতিকালীন হেফাযতের জন্যে বলেছিলেন, রাত্রে তোমরা আক্রান্ত হলে **حَسْبُ لَنَا يَنْصُرُونَ** পড়ে নিও। অর্থাৎ, হা-মীম শব্দ দ্বারা দোয়া করতে হবে যে, শত্রুরা সফল না হোক। কোন কোন রেওয়ায়েতে **يَنْصُرُونَ حَسْبُ** (নুন ব্যতিরেকে) বর্ণিত আছে। এর অর্থ এই যে, তোমরা হা-মীম-বললে শত্রুরা সফল হবে না। এ থেকে জানা গেল যে, হা-মীম শত্রু থেকে হেফাযতের দুর্গা।—(ইবনে কাসীর)

একটি বিস্ময়কর ঘটনা : হযরত সাবেত বেনানী (রহঃ) বলেন, দু'রাকআত নামায পড়ার জন্যে আমি একটি বাগানে গেলাম এবং নামাযের পূর্বে সূরা মুমিনের **الْأَمِينِ** পর্যন্ত তিন আয়াত পাঠ করলাম। হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি আমার পেছনে সাদা একটি খচ্চরে সওয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার দেহে ছিল এয়ামেনী পোশাক। লোকটি আমাকে বলল, যখন তুমি **عَافِرُ الذَّنْبِ** পড় তখন তার সাথে এই দোয়াও পাঠ করো **يَا غَافِرُ الذَّنْبِ اغْفِرْ لِي** অর্থাৎ, হে পাপ ক্ষমাকারী আমাকে ক্ষমা করুন, যখন **وَكَايِلُ النَّوْبِ** পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো **يَا قَابِلُ التَّوْبِ اقْبَلْ تَوْبَتِي** অর্থাৎ, হে তওবা কবুলকারী, আমার তওবা কবুল করুন, যখন **شَدِيدُ الْوَقَايِبِ** পড়, তখন এর সাথে এই দোয়া পাঠ করো **يَا شَدِيدَ الْعِقَابِ لَا تَعَابِنِي** অর্থাৎ, হে কঠোর শাস্তিদাতা, আমাকে শাস্তি দেবেন না এবং যখন **ذِي الطَّلَوِ** পড়, তখন এর সাথে এ দোয়া পাঠ করো **يَا ذَا الطَّلَوِ طَلْ عَلَيَّ بِخَيْرٍ** অর্থাৎ, হে অনুগ্রহকারী, আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

সাবেত বেনানী বলেন, এ উপদেশ শোনার পর আমি সেদিকে তাকিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না। আমি তার খুঁজে বাগানের দরজায় এসে লোকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন এয়ামেনী পোশাক পরিহিত ব্যক্তি এ পথে গিয়েছে কি? সবাই বলল, আমরা এমন কোন লোক দেখিনি।

সমাজ সংস্কারে এসব আয়াতের প্রভাব এবং সংস্কারকদের জন্যে হযরত ওমর ফারুকের এক মহান নির্দেশ : ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতিমের সনদে বর্ণনা করেন, সিরিয়ার জৈনে প্রভাবশালী শক্তিশ্বর ব্যক্তি হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)—এর নিকট আসা-যাওয়া করত। কিছুদিন পর্যন্ত তার আগমন বন্ধ থাকায় তিনি লোকদের কাছে তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল, আমিরুল মুমিনীন, তার কথা বলবেন না, সে তো মদ্য পান করে বিভোর হয়ে থাকে। অতঃপর খলীফা তার সচিবকে ডেকে বললেন, তার কাছে এ চিঠি লিখ—

ওমর ইবনে খাত্তাবের পক্ষ থেকে অমুকের পুত্র অমুকের নামে—তোমার প্রতি সালাম। অতঃপর আমি তোমার জন্যে সে আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি পাপ ক্ষমাকারী,

তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা এবং বড় সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

অতঃপর তিনি মজলিসে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, সবাই মিলে তার জন্যে দোয়া কর, যেন আল্লাহ তাআলা তার মন ফিরিয়ে দেন এবং তার তওবা কবুল হয়। তিনি দুতের হাতে চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, লোকটির নেশার ঘোর না কাটা পর্যন্ত তার হাতে চিঠি দিও না এবং অন্য কারো কাছেও দিও না। লোকটি খলীফার চিঠি পেয়ে তা পাঠ করল এবং চিন্তা করতে লাগল, এতে আমাকে শাস্তির ভয়ও দেখানো হয়েছে এবং ক্ষমা করারও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। অতঃপর সে কান্না শুরু করল এবং এমন তওবা করল যে, জীবনে কখনও আর মদের কাছেও গেল না।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এই প্রতিক্রিয়ার সংবাদ পেয়ে বললেন, এ ধরনের ব্যাপারে তোমাদের এমনি করা উচিত। যখন কোন মুসলমান ভাই শাস্তিতে পতিত হয়, তখন তাকে ঠিক পথে আনার চিন্তা করো না, তাকে আল্লাহর রহমতের ভরসা দাও এবং আল্লাহর কাছে তার তওবার জন্যে দোয়া কর। তোমরা তার বিপক্ষে শয়তানের সাহায্যকারী হয়ে না। অর্থাৎ, তাকে গালমন্দ করে অথবা রাগান্বিত করে যদি দ্বীন থেকে আরও দূরে সরিয়ে দাও, তবে তাই হবে শয়তানের সাহায্য।—(ইবনে কাসী)

যারা সমাজ সংস্কার তথা তবলীগ ও দাওয়াতের কাজ করে, তাদের জন্যে এ কাহিনীর মধ্যে মূল্যবান নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তিকে সংশোধন করা উদ্দেশ্য থাকে, তার জন্যে নিজেও দোয়া কর, এরপর কৌশলে তাকে ঠিক পথে আন। তাকে উত্তেজিত করলে কোন ফায়দা তো হবেই না; বরং শয়তানকে সাহায্য করা হবে। শয়তান তাকে আরও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করে দেবে। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন :—**حَسْبُ** কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটা আল্লাহর নাম। কিন্তু পূর্ববর্তী ইমামগণের মতে এসব খণ্ডিত শব্দগুলোই **مُتَشَبِّهَاتُ** যার একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন; অথবা এগুলো আল্লাহ ও রসুলের মধ্যকার কোন গোপন সংকেত।

عَافِرُ الذَّنْبِ পাপ ক্ষমাকারী ও **وَكَايِلُ النَّوْبِ** তওবা কবুলকারী - এ দু'টি শব্দ অর্থের দিক দিয়ে এক হলেও আলাদা আলাদা আনা হয়েছে। কারণ, প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তাআলা তওবা ব্যতিরেকেও বান্দার পাপ ক্ষমা করতে সক্ষম এবং তওবাকারীদেরকে ক্ষমা করা তার একটি গুণ।

ذِي الطَّلَوِ এর শাস্তিক অর্থ প্রশস্ততা ও ধনাত্মতা কিন্তু সামর্থ্য এবং কৃপা ও অনুগ্রহের অর্থেও ব্যবহৃত হয়।—(মাহহারী)

مَكِيلٌ فِي الْإِيتِ الْمَوْلَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى এই আয়াত কোরআন সম্পর্কে বিতর্ককে কুফর সাব্যস্ত করেছে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

ان جَدَّالَ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ অর্থাৎ, কোরআন সম্পর্কে কোন কোন বিতর্ক কুফর।—(মাহহারী)

এক হাদীসে আছে, একদিন রসুলুল্লাহ (সাঃ) দু'ব্যক্তিকে কোরআনের কোন এক আয়াত সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করতে শুনে ক্রোধান্বিত হয়ে বাইরে চলে আসেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দিয়েছিল।—(মাহহারী)

رَبِّهَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ لَهُمْ مَن مِّنْ صَلَحٍ
مِّنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝ وَهُمْ فِيهَا فِي سِدْرٍ مِّنْ تَبِّ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ
فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا يَأْتِيَانِ دُونَ كَقَتَّ اللَّهُ أَكْبَرُ مِن تَقَاتِهِمْ أَنفُسَهُمْ
إِذْ يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَكَفَرُوا ۚ قَالُوا إِنَّا آمَنَّا
بِالنَّبِيِّينَ وَآيَاتِهِمَا أَفْتَنَيْنَا قَاعَهُمْ فَيَا بَأْسَ أَهْلَ الْكُفْرِ
خُورُوا مِن سِجْنٍ ۝ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ
كَفَرْتُمْ وَلَٰكِن يُّدْعَىٰ بِهِ تَوَافُؤًا قَالُوا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا
وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا مَن يَشَاءُ ۚ قَادِعُوا اللَّهَ مَخْلُوصِينَ لَهُ
الَّذِينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ
يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْزِلَ
يَوْمَ السَّلَاقِ ۚ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ۚ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ
مِنْهُمْ شَيْءٌ يَوْمَئِذٍ يَلْبَسُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝

(৬) হে আমাদের পালনকর্তা, আর তাদেরকে দাখিল করুন চিরকাল বসবাসের জন্মতে, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৭) এবং আপনি তাদেরকে অমঙ্গল থেকে রক্ষা করুন। আপনি যাকে সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবেন, তার প্রতি অনুগ্রহই করবেন। এটাই মহাসাফল্য। (৮) যারা কাকের তাদেরকে উচ্চস্থানে বলা হবে, তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের আজকের এ ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহর ক্ষোভ অধিক ছিল, যখন তোমাদেরকে ঈমান আনতে বলা হয়েছিল, অতঃপর তোমরা কুফরী করেছিলে। (৯) তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা। আপনি আমাদেরকে দু' বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু' বার জীবন দিয়েছেন। এখন আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতঃপর এখনও নিশ্চিতির কোন উপায় আছে কি? (১০) তোমাদের এ বিপদ এ কারণে যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হত, তখন তোমরা কাকের হয়ে যেতে, আর যখন তাঁর সাথে শরীককে ডাকা হত, তখন তোমরা বিশৃঙ্খল স্থাপন করত। এখন আদেশ তাই, যা আল্লাহ করবেন, যিনি সর্বোচ্চ, মহান। (১১) তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে নাযিল করেন রুহী। চিহ্ন-তাবনা তরাই করে, যারা আল্লাহর দিকে রুহু থাকে। (১২) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ঈটি বিশৃঙ্খল সহকারে ডাক, যদিও কাকেররা তা অপছন্দ করে। (১৩) তিনিই সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মালিক, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তত্ত্বপূর্ণ বিষয়াদি নাযিল করেন, যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে। (১৪) যেদিন তারা বের হয়ে পড়বে, আল্লাহর কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর।

উপরোক্ত বিতর্কের অর্থ কোরআনের আয়াতে খুঁত বের করা, অনর্থক সন্দেহ সৃষ্টি করে তাতে বাকবিতণ্ডা করা অথবা কোন আয়াতে এরূপ অর্থ করা, যা অন্য আয়াত ও সুন্নাহের পরিপন্থী। এটা কোরআন বিকৃত করার নামান্তর। নতুবা কোন অস্পষ্ট অথবা সংক্ষিপ্ত বাক্যের অর্থ বোঝা, দুর্বোধ্য বাক্যের সমাধান অনুেষণ করা অথবা কোন আয়াত থেকে বিধানাবলী চয়ন করার কাছে পারস্পরিক আলোচনা গবেষণা করা উপরোক্ত বিতর্কের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটা পুণ্য কাজ।— (বায়যাতী, কুতুবী, মাযহরী)

فَلَا يَزِيدُكَ تَقَلُّبُهُ فِي الْإِلَاحِ কোরায়শরা শীতকালে এখানে এক গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় বাসিজ্যিক সফরে যেত। বায়তুল্লাহর সেবক হওয়ার সুবাদে সমস্ত আরবে তাদের সম্মান ও সুখ্যাতি ছিল। কলে তারা নিরাপদে সফর করত এবং আগাম বাসিজ্যিক মুনাফা অর্জন করত। এর মাধ্যমেই তাদের ধনাঢ্যতা ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলাম ও রসুলুল্লাহ (সঃ)—এর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাদের এই সুখ্যাতি ও প্রভাব কয়েক দশক তাদের জন্যে গর্ব ও অহংকারের বিষয় ছিল। তারা বলত, আমরা আল্লাহর কাছে অপরাধী হলে এসব নেয়ামত ও ধনেশ্বর ছিনিয়ে নেয়া হত। এই পরিস্থিতির কারণে কিছুসংখ্যক মুসলমানের মাঝেও সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বিশেষ তাৎপর্য ও কল্যাণের ভিত্তিতে তাদেরকে সাময়িক অবকাশ দিয়ে দেখেছেন। এতে আপনি অথবা মুসলমানরা যেন ঠোকাই না পড়েন। সাময়িক অবকাশের পর তারা আঘাতে পতিত হবে এবং বর্তমান প্রভাব-প্রতিপত্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। বস্তুতঃ বদর যুদ্ধে এর সূচনা হয়ে মক্কা বিজয় পর্যন্ত হয়ে বছরে কোরাইশদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

الَّذِينَ يَخِشُونَ الْعَرْشَ مِن مَّوَلَا আরশ বহনকারী ক্রেপেশতা বর্তমানে চার জন এবং কয়েকশতের দিন আট জন হয়ে যাবে। আরশের চারপাশে কত ক্রেপেশতা আছে, তার সংখ্যা আল্লাহ তাআলাই জানেন। কোন কোন রেওয়াজেতে তাদের সারির সংখ্যা লাখ পর্যন্ত বর্ণিত আছে তাদেরকে 'কারকরী' বলা হয়। তারা সবাই আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলীল ক্রেপেশতা। তাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ ক্রেপেশতাপ মুমিনদের জন্যে, বিশেষতঃ যারা গোনাহ থেকে তওবা করে এবং শরীয়তের পথে চলে, তাদের জন্যে বিভিন্ন দোয়া করেন। এটা হয় আল্লাহ তাআলার আদেশের কারণে, না হয় তাদের স্বভাব ও অভ্যাসই আল্লাহর নেক বান্দাদের জন্যে দোয়ায় মশগুল থাকা। এ কারণেই হযরত মুতরিক ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে মুমিনদের সর্বাধিক হিতাকাঙ্ক্ষী আল্লাহর ক্রেপেশতাপ। মুমিনদের জন্যে তাঁরা দোয়া করেন যে, তাদেরকে ক্ষমা করা হোক, জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা হোক এবং চিরস্থায়ী জন্মতে দাখিল করা হোক।

وَمَن صَلَحَ مِّنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ - তাদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা মাপকোত্তের যোগ্য, অর্থাৎ, যারা ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকেও এদের সাথেই জন্মতে দাখিল করুন।

এ থেকে জানা গেল যে, মুক্তির জন্যে ঈমান শর্ত। ঈমানের পর অন্যান্য সংকর্ষ মুসলমানদের বাপ-দাদা, পতি-পত্নী ও সন্তানসন্তান নিম্নস্তরের হলেও আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাদের

পূর্বপুরুষগণকেও জান্নাতে তাদের স্তরেই স্থান দেবেন, যাতে তাদের আনন্দ ও সন্তুষ্টি পূর্ণ হয়। কোআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে

الْمُتَّقِينَ يَوْمَئِذٍ فِي النَّعِيمِ

হযরত সাঈদ ইবনে জেবায়র (রাঃ) বলেন, মুমিন জান্নাতে পৌছে তার পিতা, পুত্র, ভাই প্রমুখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে যে, তারা কোথায়? তাকে বলা হবে, তারা তোমার মত আমল করেনি। (তাই তারা এখানে পৌছতে পারবে না)। মুমিন বলবে, আমি যে আমল করেছি, তা কেবল নিজের জন্যেই করিনি-তাদের জন্যেও করেছি। এরপর তাদেরকেও জান্নাতে দাখিল করার আদেশ হবে।— (ইবনে-কাসীর)

এ রেওয়াজে উদ্ধৃত করে তফসীরে মাহহারীতে বলা হয়েছে, এটা সাহাবীর উক্তি হলেও রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর উক্তির পর্যায়ভুক্ত। এ থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে, আয়াতে যে صلاحية তথা যোগ্যতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তার অর্থ শুধু ঈমান, আমলসহ ঈমান নয়।

وَرَجَاتِ الدَّرَجَاتِ —এর অর্থ করেছেন গুণাবলী। অতএব, رَجَاتِ الدَّرَجَاتِ —এর অর্থ তাঁর পূর্ণত্বের গুণাবলী সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। ইবনে কাসীর একে বাহ্যিক আঙ্গিকে রেখে বলেছেন যে, এর অর্থ ‘তাঁর মহান আরশ সমুচ্চ’। আল্লাহর আরশ সমস্ত পৃথিবী ও আকাশসমূহে পরিব্যাপ্ত এবং সবার ছাদস্বরূপ উচ্চ। সূরা মাআরেজে বলা হয়েছে—

مِنَ الْمُؤَذَى الْمَعَارِجِ نَزَّوَالِ الْمَلَكَةِ وَ الرَّؤُوسِ الْيَوْمِ كَانَتْ
مَقْدَارُ الْخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

এ আয়াত সম্পর্কে ইবনে-কাসীরের গবেষণাপ্রসূত অভিমত এই যে, আয়াতে উল্লিখিত পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ হল সে দুরত্বের বিশ্লেষণ যা মাটির সপ্তম স্তর থেকে আরশ পর্যন্ত রয়েছে। তাঁর মতে এ ব্যাখ্যা বহু সংখ্যক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তফসীরবিদের কাছে অগ্রগণ্য। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, অনেক আলোমের মতে আল্লাহর আরশ একটি লাল ইয়াকুত প্রস্তর দ্বারা নির্মিত, যার ব্যাস পঞ্চাশ হাজার বছরের দুরত্বের সমান। এমনিভাবে তার উচ্চতা মাটির সপ্তম স্তর থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরের দুরত্বের সমান। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, رَجَاتِ الدَّرَجَاتِ —এর অর্থ আল্লাহ তাআলা মুমিন-মুসাকীদের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী। যেমন, কোরআনের অন্যান্য আয়াতও এর সাক্ষ্য বহন করে। এক আয়াতে আছে,

هُمُ دَرَجَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ —অন্য এক আয়াতে আছে رَفَعَهُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّسَبِهِ

—এর মর্ম এই যে, হাশরের ময়দানকে যেহেতু একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেয়া হবে, যাতে কোন পাহাড়, গর্ত অথবা দালান-কোঠা ও বৃক্ষের আড়াল

থাকবে না; তাই সবাই উন্মুক্ত ময়দানে দৃষ্টির সামনে থাকবে।

وَلَيِّنَ الشَّلَاقِي لَيِّنَ الْمُنْكَ الْيَوْمِ উল্লেখিত আয়াতসমূহে এ বাক্যটি لَيِّنَ الْمُنْكَ الْيَوْمِ —এর পরে এসেছে। বলাবাহুল্য, لَيِّنَ الْمُنْكَ তথা সাক্ষাত ও সমাবেশের দিন দ্বিতীয় ফুৎকের পরে হবে। এমনিভাবে لَيِّنَ الْمُنْكَ الْيَوْمِ —এর ঘটনাও তখন হবে, যখন দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে নতুন ভূপৃষ্ঠ সমতল করে দেয়া হবে, যাতে কোন আড়াল থাকবে না। এরপরে لَيِّنَ الْمُنْكَ বাক্যটি আনার কারণে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলার এ বাণী দ্বিতীয় ফুৎকের মাধ্যমে সবকিছু পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরে বাস্তবায়িত হবে। কুরতুবী এর সমর্থনে হযরত অবদুল্লাহ ইবনে মসউদের একটি হাদীস পেশ করেছেন। হাদীসটি এই : সমস্ত মানুষ এমন এক পরিষ্কার ভূ-খণ্ডে একত্রিত হবে, যাতে কেউ কোন গোনাহ করেনি। তখন আল্লাহর আদেশে এক ঘোষক ঘোষণা করবে, لَيِّنَ الْمُنْكَ الْيَوْمِ (আজকের দিনে রাজত্ব কার?)

মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সবাই এর জওয়াবে বলবে اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ মুমিনরা তো তাদের বিশ্বাস ও আকীদা অনুযায়ী আনন্দ ও হৃষ্টচিত্তে একথা বলবে। কিন্তু কাফেররা বাধ্য হয়ে দুঃখ সহকারে একথা স্বীকার করবে।

কিন্তু অন্য কোন কোন রেওয়াজ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা এ উক্তি তখন করবেন, যখন প্রথম ফুৎকের পর সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং জিবরাঈল, মীকায়ীল, ইস্রাফীল ও আযরাঈল প্রমুখ নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণও মৃত্যুবরণ করবেন এবং এক আল্লাহর সন্তা ব্যতীত কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই পরিবেশে আল্লাহ বলবেন, ‘আজকের দিনে রাজত্ব কার?’ তখন যেহেতু কোন জওয়াবদাতা থাকবে না, তাই আল্লাহ নিজেই জওয়াব দেবেন : ‘প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহর।’ হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এতে আল্লাহ তাআলাই প্রশ্নকারী এবং জওয়াবদাতাও তিনিই। মুহাম্মদ ইবনে কা’ব কুরায়ীও তাই বলেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও ইবনে ওমর (রাঃ)—এর এ হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়—কেন্দ্রমতের দিন আল্লাহ তাআলা সমগ্র পৃথিবীকে বাম হাতে এবং সমগ্র আসমানসমূহকে ডান হাতে গুটিয়ে বলবেন, اِنَّا الْمَلِكُ

وَأَرْثُ الْغَالِبِينَ অর্থঃ, আমিই বাদশাহ ও প্রভু, আজ প্রতাপশালী ও অহংকারীরা কোথায়? তফসীর দুররে মনসুরে উল্লেখিত দু’টি রেওয়াজে উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে ; এ প্রশ্নটি উপরোক্ত একবার প্রথম ফুৎকারের সময় এবং আর একবার দ্বিতীয় ফুৎকারের সময় দু’বারই হয়তো উচ্চারিত হবে। বয়ানুল-কোরআনে বলা হয়েছে, দু’বার মেনে নেয়ার উপরই কোরআন পাকের তফসীর নির্ভরশীল নয়, বরং এটা সম্ভবপর যে, উল্লেখিত আয়াতে প্রথম ফুৎকের পরবর্তী ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। তখন সবাইকে উপস্থিত ধরে নিয়ে এই কালেমা বলা হবে।



يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآلَيْنِ - অপরের অন্তরে নর-নারীর প্রতি কামদৃষ্টিতে তাকানো এবং কাউকে দেখে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া অথবা অন্য অনুভব করতে পারে না এমনভাবে তাকানো, এগুলোই দৃষ্টির চুরি। আল্লাহ্ তাআলার কাছে এগুলো গোপন নয়, দেদীপ্যমান।

আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ফেরাউন বংশীয় মুমিন : উপরে স্থানে স্থানে তওহীদ ও রেসালত অস্বীকারকারীদের প্রতি শাস্তিবাহী উচ্চারণ প্রসঙ্গে কাকেরদের বিরোধিতা ও হঠকারিতা উল্লেখিত হয়েছে। এর ফলে স্বভাবগত কারণে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দৃষ্টিত ও চিন্তান্বিত হতেন। তাঁর সান্ত্বনার জন্যে উপরোক্ত প্রায় দু'রকুতে হযরত মুসা (আঃ) ও ফেরাউনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে ফেরাউন ও ফেরাউন গোত্রের সাথে একজন মহৎ ব্যক্তির দীর্ঘ কথোপকথন উক্ত হয়েছে, যিনি ফেরাউন গোত্রের একজন হওয়া সত্ত্বেও মুসা (আঃ)-এর মোজ্জেযা দেখে ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু উপযোগিতার পরিশ্রমকিতে নিজের ঈমান তখন পর্যন্ত গোপন রেখেছিলেন। কথোপকথনের সময় তার ঈমানও জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

মোকাতেল, সুদী, হাসান বসরী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন, ইনি ফেরাউনের চাচাত ভাই ছিলেন। কিবতী হত্যার ঘটনায় যখন ফেরাউনের দরবারে মুসা (আঃ)-কে পাষ্টা হত্যা করার পরামর্শ চলছিল, তখন তিনিই শহরের এক প্রান্ত থেকে দৌড়ে এসে মুসা (আঃ)-কে অবহিত করেছিলেন এবং মিসরের বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সূরা কাসাসে এ ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَكُونُ

এই মুমিন ব্যক্তির নাম কেউ কেউ 'হাবীব' বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে হাবীব সেই ব্যক্তির নাম, যার কাহিনী সূরা ইয়াসীনে ব্যক্ত হয়েছে। সোহায়লীর মতে, এই মুমিন ব্যক্তির নাম 'শামআন'। কেউ কেউ তার নাম 'হিয়কীল' বলেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে তাই বর্ণিত আছে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, সিদ্দীক কয়েকজন মাত্র। একজন সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত হাবীব নাম্জদার, দ্বিতীয় ফেরাউন বংশীয় মুমিন ব্যক্তি এবং তৃতীয় হযরত আবু বকর। ইনি সবার শ্রেষ্ঠ।—(কুরতুবী)

يَكُونُ إِيْمَانًا — এ থেকে জানা গেল যে, কেউ জনসমক্ষে তার ঈমান প্রকাশ না করলে এবং অন্তরে পাকাপোক্ত বিশ্রাস পোষণ করলে সে মুমিন বলে গণ্য হবে। কিন্তু কোরআন-হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, ঈমান মকবুল হওয়ার জন্যে কেবল অন্তরের বিশ্রাসই যথেষ্ট নয়; বরং মুখে স্বীকার করা শর্ত। মৌখিক স্বীকারোক্তি না করা পর্যন্ত কেউ মুমিন হবে না। তবে জনসমক্ষে ঘোষণা করা জরুরী নয়। এর প্রয়োজন কেবল এ জন্যে

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذُرِّيَّتِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ ۖ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بَيَوْمِ الْحِسَابِ ۖ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ ۚ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَلْيَلْعِكُمْ بِذَنبِ الْوَاحِشِينَ ۚ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا فَلْيَصْبِرْكُمْ بَعْضُ الَّذِينَ يَوْدَعُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ سَافٍ ۚ كَذَّابٌ ۖ يَقُولُ لَكُمْ أَتَأْتِكُمُ الْيَوْمَ ظَهْرِي فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنَ بَنِي اللَّهِ ۖ إِنَّ جَاءَنَا مَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرَيْكُمْ إِلَّا أَلْهَامًا أَرَىٰ ۖ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَوْمَئِذٍ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۖ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمَ لِلْعِبَادِ ۖ وَيَقُولُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۖ

(২৬) ফেরাউন বলল; তোমরা আমাকে ছাড়, মুসাকে হত্যা করতে দাও, ডাকুকে সে তার পালনকর্তাকে। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। (২৭) মুসা বলল, যারা হিসাব দিবসে বিশ্বাস করে না এমন প্রত্যেক অহংকারী থেকে আমি আমার ও তোমাদের পালনকর্তার আশ্রয় নিয়ে নিয়েছি। (২৮) ফেরাউন গোত্রের এক মুমিন ব্যক্তি, যে তার ঈমান গোপন রাখত, সে বলল, তোমরা কি একজনকে এজন্যে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার পালনকর্তা আল্লাহ, অথচ সে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট আগমন করেছে? যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার মিথ্যাবাদিতা তার উপরই চাপবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তবে সে যে শাস্তির কথা বলছে, তার কিছু না কিছু তোমাদের উপর পড়বেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী, মিথ্যাবাদীকে পথ প্রদর্শন করেন না। (২৯) হে আমার কণ্ঠ, আজ এদেশে তোমাদেরই রাজত্ব, দেশময় তোমরাই বিতরণ করছ; কিন্তু আমাদের আল্লাহর শাস্তি এসে গেলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বলল, আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বোঝাই, আর আমি তোমাদেরকে মরুলের পথই দেখাই। (৩০) সে মুমিন ব্যক্তি বলল : হে আমার কণ্ঠ, আমি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের মতই বিপদসঙ্কুল দিনের আশংকা করি। (৩১) যেমন, কণ্ঠে নুহ, আদ, সামুদ ও তাদের পরবর্তীদের অবস্থা হয়েছিল। আল্লাহ বন্দাদের প্রতি কোন যুলুম করার ইচ্ছা করেন না। (৩২) হে আমার কণ্ঠ, আমি তোমাদের জন্যে প্রচণ্ড হাঁক-ডাকের দিনের আশংকা করি,

যে, মানুষ যে পর্যন্ত তার ঈমান সম্বন্ধে জানতে না পারবে, সে পর্যন্ত তার সাথে মুসলমানসুলভ ব্যবহার করতে পারবে না।—(কুরতুবী)

ফেরাউন গোত্রের মুমিন ব্যক্তি তার কণ্ঠস্বাক্ষরে ফেরাউন ও ফেরাউন পরিবারকে বিভিন্ন ভঙ্গিতে সত্য ও ঈমানের দিকে দাওয়াত দেন এবং তাদেরকে মুসা-হত্যার প্রচেষ্টা থেকেও বিরত রাখেন।

এ তনাদী এটা তনাদ — وَيَقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ

সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থ একে অপরকে ডাক দেয়া। কেয়ামতের দিন প্রচণ্ড ডাকাডাকি হবে বলে একে **يَوْمُ النِّسَاءِ** বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, কেয়ামতের দিন জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যারা আল্লাহ্ বিরোধী, তারা দণ্ডায়মান হোক। এতে তরুদীর অধীকারকারীদেরকে বোঝানো হবে। অতঃপর জন্মাতীরা জাহান্নামীদেরকে এবং জাহান্নামীরা জন্মাতী ও আ'রাফ-বাসীদেরকে ডেকে কথাবার্তা বলবে। তখন প্রত্যেক ভাগ্যবান ও হতভাগার নাম পিতার নামসহ ডেকে ফলাফল ঘোষণা করা হবে যে, অমূকের পুত্র অমুক ভাগ্যবান ও সফলকাম হয়েছে। এরপর সে কোনদিন হতভাগা হবে না এবং অমূকের পুত্র অমুক হতভাগ্য হয়েছে, অতঃপর সে কখনো ভাগ্যবান হবে না।—(মাযহরী) মুসনাদে বাযযার ও বাযহাকীতে বর্ণিত হযরত আনাসের রেওয়াজেতে থেকে জানা যায় যে, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের এই ঘোষণা আমল শুদ্ধনের পর হবে।

হযরত আবু হাযেম আ'রাজ (রাঃ) নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন, হে আ'রাজ, কেয়ামতের দিন ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাণী দণ্ডায়মান হোক—তুমি তাদের সাথে দণ্ডায়মান হবে। আবার ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাণী দণ্ডায়মান হোক—তুমি তাদের সাথেও দণ্ডায়মান হবে। আরও ঘোষণা হবে অমুক প্রকার পাণী দণ্ডায়মান হোক—তুমি তখনও দণ্ডায়মান হবে। আমি মনে করি, প্রত্যেক গোনাহের ঘোষণার সময় তোমাকে দণ্ডায়মান হতে হবে। কারণ, তুমি সর্বপ্রকার গোনাই সঞ্চয় করে রেখেছ।—(মাহতরী)

المؤمن ٢٠

٩٤٢

فمن اظلم ۲۲

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ - অর্থাৎ, তোমরা যখন পেছনে ফিরে প্রত্যাবর্তন

করবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে যখন জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, এটা তখনকার অবস্থার বর্ণনা। এর সারমর্ম এই যে, **يَوْمَ الْقِسَافَةِ**—এর তফসীরে উল্লিখিত ঘোষণাবলী সমাপ্ত হওয়ার পর তাদেরকে হিসাবের জায়গা থেকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

কোন কোন তফসীরবিদের মতে এটা দুনিয়াতে প্রথম ফুঁকের সময়কার অবস্থা। যখন প্রথম ফুঁক দেয়া হবে এবং পৃথিবী বিদারিত হবে, তখন মানুষ এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাতে চাইবে, কিন্তু চতুর্দিকে ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে, পলায়নের কোন পথ থাকবে না। তাদের মতে **يَوْمَ النَّارِ** বলতে প্রথম ফুঁকের সময় বোঝানো হয়েছে। তখন চতুর্দিক থেকে আতঁচীংকার শোনা যাবে। হযরত ইবনে আব্বাস ও যাহ্‌হাক থেকে বর্ণিত আয়াতের অপর কেরাত **نَدَّ** থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এটা **نَدَّ** শব্দ থেকে উদ্গত, যার অর্থ পলায়ন করা। এ তফসীর অনুযায়ী **يَوْمَ النَّارِ** এর অর্থও পলায়নের দিন এবং **تَوَلَّوْنَ مُدْبِرِينَ** -এরই ব্যাখ্যা।

তফসীরে মাহহরীতে উদ্ধৃত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর এক দীর্ঘ হাদীসে কেয়ামতের দিন তিন ফুকের উল্লেখ আছে। প্রথম ফুকের ফলে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে ব্যস্ততা, অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা দেখা দেবে। একে ‘নফখায়ে ফাযা’ বলা হয়। দ্বিতীয় ফুকের ফলে সবাই বেহুশ হয়ে মারা যাবে। একে ‘নফখায়ে ছা’ক’ বলা হয়। তৃতীয় ফুকের ফলে সবাই পুনরুজ্জীবিত হবে। একে ‘নফখায়ে নশর’ বলা হয়। প্রথম ফুকই দীর্ঘায়িত হয়ে দ্বিতীয় ফুকে পরিণত হবে। কাজেই উভয়ের সমষ্টিকেই সাধারণভাবে প্রথম ফুক বলা হয়ে থাকে। এ হাদীসেও নফখায়ে ফাযা’র সময় লোকজনের এদিক-ওদিক পলায়নের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে، وهو الذى يقول الله عنه يوم الناد - ফলে জানা গেল যে, আয়াতে يَوْمَ النَّاد বলে প্রথম ফুকের সময় মানুষের এদিক-ওদিক ব্যাকুল ছটাছুটি বোঝানো হয়েছে। والله اعلم

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَرٍ جَبَّارٍ - अर्थात् -

ও হামানের অন্তর যেমন মুসা (আঃ) ও মুমিন ব্যক্তির উপদেশে প্রভাবান্বিত হয়নি, এমনভাবে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক উদ্ধত, স্বৈরাচারীর অন্তরে মোহর এঁটে দেন। ফলে তাতে ঈমানের নূর প্রবেশ করে না এবং সে ভাল-মন্দের পার্থক্য করতে পারবে না। আয়াতে **مُكِنِّ** ও **جَنَّ** শব্দদ্বয়কে **فُكِّنَ** -এর বিশেষণ করা হয়েছে। কারণ, সকল নৈতিকতা ও ক্রিয়াকর্মের উৎস হচ্ছে অন্তর। অন্তর থেকেই ভাল-মন্দ কর্ম জন্ম লাভ করে। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে, মানুষের দেহে একটি মাংসপিণ্ড (অর্থাৎ, অন্তর) এমন আছে, যা ঠিক থাকলে সমগ্র দেহ ঠিক থাকে এবং যা নষ্ট হলে সমগ্র দেহ নষ্ট হয়ে যায়।—(কুরতবী)

—এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأْمُرُ ابْنِي بِمَصْرًا

ফেরাউন তার মন্ত্রী হামানকে আদেশ দিল যে, একটি গগনচুম্বী সূঁচ প্রাসাদ নির্মাণ কর। আমি এতে আরোহণ করে খোদাকে দেখে নিতে চাই। বলাবাহুল্য, এরূপ বোকাসুলভ পরিকল্পনা কোন স্বল্প বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও করতে পারে না। মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি ফেরাউন যদি বাস্তবিকই এরূপ পরিকল্পনা করে থাকে, তবে এটা তার চরম বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মন্ত্রীসভার যদি এই আদেশ পালন করে থাকে, তবে

يَوْمَ تَوَلَّوْنَ مَذْهَبِيْنَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ مِّنْ نَّصْرِ اللَّهِ فَهَالِكُ مَا هَآءِهٖ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَنَآرَ لَكُمْ فِي شَاكٍ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قَالْتُمْ لَن نَّبْعَثَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ هُوَ مُضِلٌّ مُّتَعَذِّبٌ ۚ ۝ الْيٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ يُعْبَدُونَ إِنَّا إِلَٰهٌ وَإِلَهُ رَبِّكَ سَاطِنٌ أَنفُسُكُمْ كَبْرًا مِّمَّا تَعْبُدُونَ اللَّهَ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذٰلِكَ يُطَهِّرُهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّكَيِّدٌ جَبَّارٌ ۚ ۝ وَقَالَ فِرْعَوْنُ لِهَآءُنَا ابْنُ إِلَىٰ صِرَاطٍ عَلِيِّ ۖ أَلْبَنَّا الْاَسْبَابُ ۖ ۝ اَسْبَابُ السَّمَوٰتِ فَاطْلُمُ إِلَىٰ اِلَٰهٍ مُّوَسَّىٰ وَاِنِّي لَظَنُّنُهٗ كَاذِبًا ۖ وَكَذٰلِكَ يُزَيِّنُ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۚ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِي تَبَابٍ ۝ ۝ وَقَالَ الَّذِي اٰمَنَ يَتَقَوَّمُوا لِشِعْوِي اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۚ يَتَقَوَّمُوا اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۚ وَانَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ ۚ ۝ اَلْقَرَارُ ۝ مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يَجْزِي الْاَمْعَالُهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَاوَلِيْكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يَوْمَ فَرُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(৩৩) যেদিন তোমরা পেছনে ফিরে পলায়ন করবে; কিন্তু আল্লাহ্ থেকে তোমাদেরকে রক্ষাকারী কেউ থাকবে না। আল্লাহ্ যাঁকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (৩৪) ইতিপূর্বে তোমাদের কাছে ইউসুফ সম্পূর্ণ প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিলেন, অতঃপর তোমরা তার অনীত বিষয়ে সন্দেহই পোষণ করতে। অবশেষে যখন সে মারা গেল, তখন তোমরা বলতে শুরু করলে, আল্লাহ্ ইউসুফের পরে আর কাউকে রসুলরূপে পাঠাবেন না। এমনভাবে আল্লাহ্ সীলান্বিতকারী, সম্প্রদায়ী ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করেন। (৩৫) যারা নিজেদের কাছে আগত কোন দলীল ছাড়াই আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের একাজ আল্লাহ্ ও মুমিনদের কাছে বুঝই অসম্ভবযজ্ঞক। এমনভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক অহংকারী-বৈরাচ্যারী ব্যক্তির অন্তরে মোহের এট্টে দেন। (৩৬) ফেরাউন বলল, হে হামান, তুমি আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর, হয়তো আমি পৌঁছে যেতে পারব (৩৭) আকাশের পথে, অতঃপর উঁকি মেরে দেখব মুসার আল্লাহকে। বস্ততঃ আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই ফেরাউনের কাছে সুশোভিত করা হয়েছিল তার মন্দ কর্মকে এবং সোজা পথ থেকে তাকে বিরত রাখা হয়েছিল। ফেরাউনের চক্রান্ত বর্ষ হওয়ারই ছিল। (৩৮) মুমিন লোকটি বলল : হে আমার কণ্ঠ, তোমরা আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাদেরকে সংপথ প্রদর্শন করব। (৩৯) হে আমার কণ্ঠ, পার্শ্বিৎ এ জীবন তো কেবল উপভোগের বস্তু, আর পরকাল হচ্ছে স্থায়ী বসবাসের গৃহ। (৪০) যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে পুণ্য অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সংকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখায় তাদেরকে যে-হিসাব রিখিক দেয়া হবে।

المؤمن

২৫২

فمن اظلم

وَيَقُولُ مَا إِلَىٰ دَعْوَتِهِ إِلَىٰ النَّجْوَىٰ وَتَدْعُوَنِي إِلَىٰ الْثَّارِ
 تَدْعُوَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ
 وَأَنَا أَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الْعِزِّ وَالْمَقَارِ ۖ لَاجِرْمَ أَكْبَادًا تَدْعُوَنِي
 إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَّرَدًّا
 إِلَىٰ اللَّهِ وَأَنْ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ فَسْتَكُونُ
 مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَقِصُّ أَمْرِي إِلَىٰ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ
 بِالْعِبَادِ ۖ قَوْلُهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكُرُوا وَمَا
 بِأَلٍ فَرَعُونَ سُوءَ الْعَذَابِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُرْصِدُونَ عَلَيْهِمَا
 عُقْدًا وَعِشْيًا وَيَوْمَ تُقَامُ السَّاعَةُ تَدْخِلُوا آلَ
 فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۖ وَإِذْ يَتَحَفَّضُونَ فِي النَّارِ
 فَيَقُولُ الضُّعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ
 تَبَعًا فَأَهْلَ أَنْتُمْ مُنْعُونَ عَنَّا فَوَيْبًا مِنَ النَّارِ ۖ
 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدِ احْكَمَ
 بَيْنَ الْعِبَادِ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِغَلَظَةِ جَهَنَّمَ
 ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ۖ

(৪১) হে আমার কণ্ঠ, ব্যাপার কি, আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও জাহান্নামের দিকে (৪২) তোমরা আমাকে দাওয়াত দাও, যাতে আমি আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সাথে শরীক করি এমন বস্তুকে, যার কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই পরাক্রমশালী, ক্রমাশীল আল্লাহর দিকে। (৪৩) এতে সন্দেহ নেই যে, তোমরা আমাকে যার দিকে দাওয়াত দাও, ইহকালে ও পরকালে তার কোন দাওয়াত নেই। আমাদের প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকে এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামী। (৪৪) আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে। (৪৫) অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের চক্রান্তের অন্তি থেকে রক্ষা করলেন এবং ফেরাউন গোত্রকে শোচনীয় আযাব গ্রাস করল। (৪৬) সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর। (৪৭) যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে, অতঃপর দুর্বলরা অহংকারীদেরকে বলবে, আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা এখন জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে নিবৃত্ত করবে কি? (৪৮) অহংকারীরা বলবে, আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ফয়সালা করে দিয়েছেন। (৪৯) যারা জাহান্নামে আছে, তারা জাহান্নামের রক্ষীদেরকে বলবে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে বল, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের আযাব লাঘব করে দেন।

এটা 'হু' রাজার গবু মস্তীরই' বাস্তব প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কোন রাজ্যাধিপতির তরফ থেকে এরূপ বোকাসুলত পরিকল্পনা আশা করা যায় না। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটা ফেরাউনও জানত যে, যত উচ্চ প্রাসাদই নির্মাণ করা হোক না কেন, তা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। কিন্তু সে লোকজনকে বোকা বানানো ও দেখানোর জন্যে এ কাণ্ড করেছিল। কোন সহীহ ও শক্তিশালী রেওয়াজেই থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, এরূপ কোন আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। কুরতুবী বর্ণনা করেন যে, এই সুউচ্চ নির্মাণকাণ্ড শুরু করা হয়েছিল। যা উচ্চতায় পৌঁছা মাত্রই বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَسْتَكُونُ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَقِصُّ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

—এটা স্বগোত্রকে সত্যের দিকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যে মুমিন ব্যক্তির সর্বশেষ বাক্য। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আচ্ছ তোমরা আমার কথায় কর্পাত করছ না, কিন্তু আযাব যখন তোমাদেরকে গ্রাস করবে, তখন আমার কথা স্মরণ করবে। তবে সে স্মরণ নিশ্চল হবে। এই দীর্ঘ কথোপকথন, উপদেশ ও দাওয়াতের ফলে যখন মুমিন ব্যক্তির ইমান জনসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন তিনি ভাবনায় পড়লেন যে, তারা তার প্রতি নির্যাতন চালানোর চেষ্টা করবে। তাই বললেন, আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেছি। তিনি তাঁর বান্দাদের রক্ষক। মোকাবেলা বলেন, তাঁর খাখরা অনুযায়ী ফেরাউন গোত্রের লোকেরা তাঁর প্রতি নির্যাতনে তৎপর হলে তিনি পাহাড়ের দিকে পালিয়ে তাদের নাগালের বাইরে চলে যান। পরবর্তী আয়াতে তা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

قَوْلُهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكُرُوا وَمَا بِأَلٍ فَرَعُونَ سُوءَ الْعَذَابِ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাকে ফেরাউন গোত্রের ষড়যন্ত্রের অন্তি থেকে রক্ষা করলেন এবং বোদ ফেরাউন গোত্রকে কঠোর আযাব গ্রাস করে নিল। মুমিন ব্যক্তিকে রক্ষা করার বিশদ বিবরণ কোরআন পাকে উল্লেখিত হয়নি। কিন্তু ভাষাদৃষ্টে জানা যায় যে, ফেরাউন গোত্র তাকে হত্যা করার ও কষ্ট দেয়ার জন্যে অনেক ষড়যন্ত্র করেছিল। ফেরাউন গোত্র যখন সলিল সমাধি লাভ করল, তখন এই মুমিন বান্দাকে মুসা (আঃ)—এর সাথে রক্ষা করা হয়, এরপর পরকালের মুক্তি তো বলাই বাহুল্য।

إِنَّ اللَّهَ يُرْصِدُونَ عَلَيْهِمَا عُقْدًا وَعِشْيًا وَيَوْمَ تُقَامُ السَّاعَةُ تَدْخِلُوا آلَ

إِلَ فَرَعُونَ أَشَدَّ الْعَذَابِ—এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, ফেরাউন গোত্রের আত্মসমূহকে কাল পাখীর আকৃতিতে প্রত্যাহ সকাল-সন্ধ্যা দু'বার জাহান্নামের সামনে হাথির করা হয় এবং জাহান্নামকে দেখিয়ে বলা হয়, এটা তোমাদের আবাসস্থল।—(মামহারী)

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)—এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তাকে কবর জগতে সকাল-সন্ধ্যা সে স্থান দেখানো হয়, যেখানে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর সে পৌঁছবে। সে স্থান দেখিয়ে প্রত্যাহ তাকে বলা হয়, তুমি অবশেষে এখানে পৌঁছবে। কেউ জন্মাতী হলে তাকে জন্মাতের স্থান এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামের স্থান দেখানো হয়।

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا أَتَىٰ
 قَالُوا قَادُ عَوَا وَمَا ذَعُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
 إِنَّكَ أَنْتَ نَصْرُ رَبِّنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَيَوْمِ يُقُومُ الْأَشْهَادُ ۖ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ
 مَعُونَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۖ وَلَقَدْ
 آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا نَبِيَّ أِمْرَؤِيلَ الْكِتَابَ ۖ
 هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ۖ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ
 اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
 بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آلِ
 اللَّهِ يَعْرِضُونَ سُلْطَانَهُمْ إِنَّ فِي صُدُورِهِمُ الْأَكْبَرُ
 مَا هُمْ بِبَالِيغِيهِ ۖ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
 الْبَصِيرُ ۖ لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَمَا
 يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الشُّرَكَاءُ قَلِيلٌ مِمَّا تَدَّكَّرُونَ ۝

(৫০) রক্ষীরা বলবে, তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিহ তোমাদের রসূল আসেননি? তারা বলবে হাঁ। রক্ষীরা বলবে, তবে তোমরাই দোয়া কর। বস্ত্রভা কামেরদের দোয়া নিশ্চলই হয়। (৫১) আমি সাহায্য করব রসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে। (৫২) সেদিন যালেমদের ওয়র-আপত্তি কোন উপকারে আসবে না, তাদের জন্যে থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্যে থাকবে মদ গৃহ। (৫৩) নিশ্চয় আমি মুসাকে হেদায়েত দান করেছিলাম এবং বনী ইসরাঈলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম। (৫৪) বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশ ও হেদায়েত সুস্পষ্ট। (৫৫) অতএব, আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আপনি আপনার গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপনার পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (৫৬) নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের কাছে আগত কোন দলীল ব্যতিরেকে, তাদের অন্তরে আছে কেবল আত্মশ্রুতি, যা অর্জনে তারা সফল হবে না। অতএব, আপনি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি সবকিছু শুনে, সবকিছু দেখে। (৫৭) মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সৃষ্টি কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না। (৫৮) অন্ধ ও চক্ষুমান সমান নয়, আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকল্প করে এবং কুক্ষী। তোমরা অন্ধই অনুধাবন করে থাক।

কবরের আযাব : কবরের আযাব যে সত্য, উপরোক্ত আয়াত তার প্রমাণ। এছাড়া অনেক মুতাওয়াযাতের হাদীস এবং 'উম্মতের ইজমা' এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

এ আয়াতে - إِنَّكَ أَنْتَ نَصْرُ رَبِّنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا আল্লাহ তাআলার ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি তাঁর রসূল ও মুমিনগণকে সাহায্য করেন ইহকালেও এবং পরকালেও। বলাবাহুল্য, এ সাহায্য কেবল শত্রুদের বিরুদ্ধেই সীমিত। অধিকাংশ পয়গম্বরের ক্ষেত্রে এর বাস্তবতা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কিন্তু কোন কোন পয়গম্বরের যেমন, ইয়াহুইয়া, যাকারিয়া ও শোয়ায়ব (আঃ)-কে শত্রুরা শহীদ করেছে এবং কতককে দেশান্তরিত করেছে। যেমন, ইবরাহীম ও খাতামুল আশ্বিয়া মুহাম্মদ (সাঃ)। তাঁদের ক্ষেত্রে আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের ব্যাপারে সন্দেহ হতে পারে।

ইবনে কাসীর ইবনে জরীরের বরাত দিয়ে এর জওয়াব দেন যে, আয়াতে বর্ণিত সাহায্যের অর্থ শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ, তা পয়গম্বরের বর্তমানে তাঁদেরই হাতে হোক, কিংবা তাঁদের ওফাতের পরে হোক। এর অর্থ কোনরূপ ব্যতিক্রম ছাড়াই সমস্ত পয়গম্বরের ও মুমিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পয়গম্বরের-হত্যাকারীদের আযাব ও দুর্দশার বর্ণনা দ্বারা ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। হযরত ইয়াহুইয়া, যাকারিয়া ও শোয়ায়ব (আঃ)-এর হত্যাকারীদের উপর বহিঃশত্রু চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, যারা তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্চিত করে হত্যা করেছে। নমরুদকে আযাব দেয়া হয়েছে। ইসা (আঃ)-এর শত্রুদের উপর আল্লাহ তাআলা রোমকদের চাপিয়ে দেন। তারা তাদেরকে লাঞ্চিত করেছে। কায়ামতের প্রাক্কালে আল্লাহ তাআলা তাঁকে শত্রুদের উপর প্রবল করবেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শত্রুদেরকে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের হাতেই পরাভূত করেছেন। তাদের বড় বড় সরদার নিহত হয়েছে, কিছু বন্দী হয়েছে এবং অবশিষ্টরা মক্কা বিজয়ের দিন গ্রেফতার হয়েছে। অবশ্য রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর ধর্মই জগতের সমস্ত ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং তাঁর জীবদ্দশায়ই সমগ্র আরব উপদ্বীপে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

وَيَوْمَ يُقُومُ الْأَشْهَادُ - যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে। অর্থাৎ, কায়ামতের দিন। সেখানে পয়গম্বরের ও মুমিনগণের জন্যে আল্লাহর সাহায্য বিশেষভাবে প্রকাশ লাভ করবে।

إِنَّ فِي صُدُورِهِمُ الْأَكْبَرُ مَا هُمْ بِبَالِيغِيهِ - অর্থাৎ, তারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে কোন দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকে বিতর্ক করে। উদ্দেশ্য এ ধর্মকে অস্বীকার করা। এর কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, তাদের অন্তরে অহংকার রয়েছে। তারা বড়ত্ব চায় এবং নির্বুদ্ধিতাবশতঃ মনে করে যে, তাদের ধর্মে কায়ম থাকলে এ বড়ত্ব অর্জিত হতে পারে। এ ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হবে। কোরআন পাক বলে দিয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করা ব্যতীত তারা তাদের কল্পিত বড়ত্ব ও নেতৃত্ব লাভ করতে পারবে না। —(কুরত্বী)

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذُفُرَيْنِ

দোয়ার স্বরূপ : দোয়ার শাব্দিক অর্থ ডাকা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন প্রয়োজনে ডাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনও যিকরকেও দোয়া বলা হয়। উস্মতে মুহাম্মদীয়ার বিশেষ সম্মানের কারণে এই আয়াতে তাদেরকে দোয়া করার আদেশ করা হয়েছে এবং তা কবুল করার ওয়াদা করা হয়েছে। যারা দোয়া করে না, তাদের জন্যে শাস্তিবানী উচ্চারণ করা হয়েছে।

কা'বে আহবার থেকে বর্ণিত আছে, পূর্ব যুগে কেবল পয়গম্বর-গণকেই বলা হত, দোয়া করুন; আমি কবুল করব। এখন এই আদেশ সকলের জন্যে ব্যাপক করে দেয়া হয়েছে এবং এটা উস্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য।—ইবনে কাসীর)

এ আয়াতের তফসীরে নো'মান ইবনে বশীর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ان الدعاء هو العباداة, দোয়াই এবাদত। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।—(ইবনে কাসীর)

তফসীরে মাহহারীতে বলা হয়েছে, আরবী ব্যাকরণিক নিয়মে ان الدعاء هو العباداة বাক্যের এক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, এবাদতেরই নাম দোয়া। অর্থাৎ, প্রত্যেক দোয়াই এবাদত। দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, প্রত্যেক এবাদতই দোয়া। এখানে অর্থ এই যে, শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে দোয়া ও এবাদত যদিও পৃথক পৃথক, কিন্তু উভয়ের ভাবার্থ এক। অর্থাৎ, প্রত্যেক দোয়াই এবাদত এবং প্রত্যেক এবাদতই দোয়া। কারণ এই যে, এবাদত বলা হয় কারণ সামনে চূড়ান্ত দীনতা অবলম্বন করাকে। বলাবাহুল্য, নিজেকে কারও মুখাপেক্ষী মনে করে তার সামনে সওয়ালের হস্ত প্রসারিত করা বড় দীনতা, যা এবাদতের অর্থ। এমনিভাবে প্রত্যেক এবাদতের সারমর্মও আল্লাহর কাছে মাগফেরাত ও জ্ঞানাত তলব করা এবং ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করা। এ কারণেই এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার হামদ ও প্রশংসায় এমন মশগুল হয় যে, নিজের প্রয়োজন চাওয়ারও অবসর পায় না, আমি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশী দেব। (অর্থাৎ, তার অভাব পূরণ করে দেব।) তিরমিযী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে :

من شغله القرآن عن مسألتى اعطيته افضل ما اعطى السائلين

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াতে এমনিভাবে মশগুল হয় যে, আমার কাছে প্রয়োজন চাওয়ারও সময় পায় না, আমি তাকে যারা চায়, তাদের চেয়ে বেশী দেব। এ থেকে বোঝা গেল যে, প্রত্যেক এবাদতই দোয়ার মত ফায়দা দেয়।

আরাফাতের হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আরাফাতে আমার দোয়া ও পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের দোয়া এই কলমো :

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على

كل شئ قدير —এতে এবাদত ও যিকরকে দোয়া বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে দোয়া অর্থে এবাদত বর্জনকারীকে জাহান্নামের শাস্তিবানী শোনানো হয়েছে, যদি সে অহংকারবশতঃ বর্জন করে। কেননা, অহংকারবশতঃ দোয়া বর্জন করা কুফরের লক্ষণ, তাই সে জাহান্নামের

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذُفُرَيْنِ ۝ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ آيَاتٍ لَتَسْكُنُوا فِيهَا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِي كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالِي تَوْفُكُونَ ۝ كَذَلِكَ يُؤَفِّكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَمَوْرَكُهُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَافَعَكُمْ مِنَ الْعَلِيِّتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَذَكَّرْكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ قُلْ إِنِّي نَبِيٌّ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِلرَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(৫৯) কেয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৬০) তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব। যারা আমার এবাদতে অহংকার করে তারা সত্তরই জাহান্নামে দাখিল হবে লাহিত হয়ে। (৬১) তিনিই আল্লাহ, যিনি রাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বিশ্বামের জন্যে এবং দিবসকে করেছেন দেখার জন্যে। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। (৬২) তিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা, সবকিছুর স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছ? (৬৩) এমনিভাবে তাদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। (৬৪) আল্লাহ পৃথিবীকে করেছেন তোমাদের জন্যে বাসস্থান, আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন এবং তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন পরিচ্ছন্ন রিযিক। তিনি আল্লাহ, তোমাদের পালনকর্তা। বিশৃঙ্খলতার পালনকর্তা, আল্লাহ বরকতময়। (৬৫) তিনি চিরজীবী, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকে ডাক তাঁর খাঁটি এবাদতের মাধ্যমে। সমস্ত প্রশংসা বিশৃঙ্খলতার পালনকর্তা আল্লাহর। (৬৬) বলুন, যখন আমার কাছে আমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে গেছে, তখন আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যার পূজা কর, তার এবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আমাকে আদেশ করা হয়েছে বিশৃঙ্খল পালনকর্তার অনুগত থাকতে।

যোগ্য হয়ে যায়। নতুবা সাধারণ দোয়া ফরয বা ওয়াজিব নয়। দোয়া না করলে গোনাহ হয় না। তবে দোয়া করা সমস্ত আলেমের মতে মোস্তাহাব ও উত্তম এবং হাদীস অনুযায়ী বরকত লাভের কারণ।—(মায়হরী)

দোয়ার ক্ষমীলত : রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আল্লাহর কাছে দোয়া অপেক্ষা অধিক সম্মানিত কোন বিষয় নেই।—(তিরমিযী)

তিনি আরও বলেন, الدعاء مخ العبادে দোয়া এবাদতের মগজ।—(তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। কেননা, আল্লাহ তাআলা যাক্বা ও প্রার্থনা পছন্দ করেন। অভাব-অনটনের সময় সচ্ছলতার জন্যে দোয়া করে রহমত প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করা সর্ববৃহৎ এবাদত।—(তিরমিযী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তার প্রয়োজন প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হন।—(তিরমিযী)

তফসীরে মায়হরীতে এসব রেওয়াজে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, দোয়া না করার কারণে আল্লাহর গণ্যের হুমকি তখন প্রযোজ্য, যখন কেউ নিজে থেকে বড় ও বেপরোয়া মনে করে দোয়া ত্যাগ করে। إِنَّ الْإِنْسَانَ يَسْفِكُونَ آয়াত থেকে তাই প্রমাণিত হয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমরা দোয়া করতে অপারক হয়ে না ; কেননা, দোয়াসহ কেউ ক্ষেত্রপ্রাপ্ত হয় না।—(ইবনে হাব্বান)

এক হাদীসে আছে, দোয়া মুমিনের হাতিয়ার, ধর্মের স্তম্ভ এবং আকাশ ও পৃথিবীর নূর।—(হাকেম)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যার জন্যে দোয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, তার জন্য রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। নিরাপত্তা প্রার্থনা করা অপেক্ষা কোন পছন্দনীয় দোয়া আল্লাহর কাছে করা হয়নি।—(তিরমিযী) عَانِيَتْ তথা ‘নিরাপত্তা’ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবহ। এতে অনিষ্ট থেকে হেফায়ত ও প্রত্যেক অভাব-অনটন পূরণই অন্তর্ভুক্ত।

কোন গোনাহ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া করা হারাম। এরূপ দোয়া কবুল হয় না।

দোয়া কবুলের ওয়াদা : উপরোক্ত আয়াতে ওয়াদা রয়েছে যে, বন্দা আল্লাহর কাছে যে দোয়া করে, তা কবুল হয়। কিন্তু মানুষ মাঝে মাঝে দোয়া কবুল না হওয়াও প্রত্যক্ষ করে। এর জওয়াবে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, মুসলমান আল্লাহর কাছে যে দোয়াই করে, আল্লাহ তা দান করেন, যদি তা কোন গোনাহ অথবা সম্পর্কচ্ছেদের দোয়া না হয়। দোয়া কবুল হওয়ার উপায় তিনটি। ভ্রমধ্যে কোন না কোন উপায়ে দোয়া কবুল হয়। (এক) যা চাওয়া হয়, তাই পাওয়া। (দুই) প্রার্থিত বিষয়ের পরিবর্তে পরকালের কোন সওয়াব ও পুরস্কার দান করা এবং (তিন) প্রার্থিত বিষয় না পাওয়া। কিন্তু কোন সম্ভাব্য আপদ-বিপদ সবে যাওয়া।—(মায়হরী)

দোয়া কবুলের শর্ত : উপরোক্ত আয়াতে বাহ্যতঃ কোন শর্ত উল্লেখ

নেই। এমন কি মুসলমান হওয়াও দোয়া কবুলের শর্ত নয়। কাফের ব্যক্তির দোয়াও আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। ইবলীস কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকার দোয়া করেছিল। আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেছেন। দোয়ার জন্যে কোন সময় এবং ওয় শর্ত নয়। তবে নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে কোন কোন বিষয়কে দোয়া কবুলের পথে বাধা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। হযরত আবু হোরাযার (রাঃ) রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কোন কোন লোক খুব সক্ষম করে এবং আকাশের দিকে হাত তুলে ‘ইয়া রব’ ‘ইয়া রব’ বলে দোয়া করে ; কিন্তু তাদের পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পন্থায় অর্জিত। এমতাবস্থায় তাদের দোয়া কিরূপে কবুল হবে?—(মুসলিম)

এমনিভাবে অসাধন বেপরোয়া ও অন্যমনস্কভাবে দোয়ার বাক্যাবলী উচ্চারণ করলে তাও কবুল হয় না বলেও হাদীসে বর্ণিত আছে।—(তিরমিযী)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহর নেয়ামত ও পরিপূর্ণ শক্তি-সামর্থ্যের কতিপয় নিদর্শন পেশ করে তওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে।

جَعَلَ لَكُمُ الْآيَاتِ لِيَسْتَكْبِرُوا وَالتَّحَايِيرُ

— চিন্তা করুন, নিদ্রা কত বড় নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা সকল শ্রেণীর মানুষ বরং জন্তু-জানোয়ারকে পর্যন্ত স্বভাবগতভাবে নিদ্রার একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সে সময়টিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে নিদ্রার উপযোগী করে দিয়েছেন। এখন রাত্রিবেলায় নিদ্রা আসা সকলেরই স্বভাব ও মজ্জায় পরিণত করে দেয়া হয়েছে। নতুবা মানুষ কাজ-কারবারের জন্যে যেমন নিজ নিজ স্বভাব ও সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী সময় নির্দিষ্ট করে, নিদ্রাও যদি তেমনই ইচ্ছাধীন ব্যাপার হত এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ে নিদ্রার পরিকল্পনা করত, তবে নিদ্রিতরাও নিদ্রার সুখ পেত না এবং জাগ্রতদেরও কাজ-কারবারের শৃঙ্খলা বজায় থাকত না। কারণ, মানুষের প্রয়োজন পারস্পরিক জড়িত থাকে। বিভিন্ন সময়ে নিদ্রা গেলে জাগ্রতদের সেই কাজ, যা নিদ্রিতদের সাথে জড়িত, বিঘ্নিত হয়ে যেত এবং নিদ্রিতদের সেই কাজও পণ্ড হয়ে যেত, যা জাগ্রতদের সাথে জড়িত। যদি কেবল মানুষের নিদ্রার সময় নির্দিষ্ট থাকত এবং জন্তু-জানোয়ারের নিদ্রার সময় ভিন্ন হত, তবুও মানুষের কাজের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হত।

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ

— মানুষের আকৃতি আল্লাহ তাআলা সকল প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র ও উৎকৃষ্ট করে গঠন করেছেন। তাকে চিন্তা ও হৃদয়ঙ্গম করার শক্তি দিয়েছেন। সে হস্ত-পদ দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বস্তু ও শিল্পসামগ্রী তৈরী করে নিজের সুখের ব্যবস্থা করে নেয়। তার পানাহারও সাধারণ জন্তু-জানোয়ার থেকে স্বতন্ত্র। জন্তু-জানোয়াররা মুখে ঘাস খায় ও পান করে আর মানুষ হাতে সাহায্য করে। সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য এক জাতীয়, কেউ শুধু ঘাসে খায়, কেউ ঘাস ও লতা-পাতা খায়। কিন্তু মানুষ তার খাদ্যকে বিভিন্ন প্রকার বস্তু, ফল-মূল, তরী-তরকারী, মাংস ও মসলা দ্বারা মুখরোচক ও স্বাদযুক্ত করে খায়। এক এক ফল দ্বারা রকমারী খাদ্য-আচার, মোরকা ও চাটনী তৈরী করে খায়।

فَرَزَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَلْقِ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَفْثَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ تَعْلَمُونَ أَشْيُوخًا
وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَلَّى مِنْ قَبْلٍ وَلْيَبْلُغُوا أَجَلَ مَسْنَىٰ وَلَكُمْ
تَعْلَمُونَ ۝ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرُ أَهْلِ
يَوْمٍ لَهُ أَنْ يَحْيِي لَكَ لَنْ يَمُوتَ ۚ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَخْلَوْنَ فِي
آيَاتِ اللَّهِ أَنْ يَصْرَفُونَ ۚ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَهُمْ
أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلًا مَسُوفَ يَعْلَمُونَ ۚ إِذَا الْأَعْلَىٰ فِي
أَعْيُنِهِمْ ۚ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ۚ فِي الْحَبِيلَةِ ثُمَّ فِي
الْكَارِ يُسْحَرُونَ ۚ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ مَا كُنْتُمْ تُخْلَعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَمَّا كَانُ لَهُمْ قَوْلٌ مِّنْ عَوَارِ
قَبْلُ شَيْءًا كَذِبًا يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ۚ وَلَكُمْ بِهَاجِلِكُمْ
تَقَرُّ حُوقٌ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ وَبِالْأَنْتُمْ تَتَرَحَّوْنَ ۚ
أَدْخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ فِيهَا فَمِنْ مَتَوًى
الْمُتَكَبِّرِينَ ۚ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ وَمَا تُرِيدُكَ
بَعْضَ الَّذِي يُعَدُّ لَهُمْ أَوْ تَوَفِّيكَ ۚ وَالْآيَاتُ يُجْعَلُونَ ۚ

(৬৭) তিনিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা, অতঃপর শুকনো মাটির দ্বারা, অতঃপর জমাত রক্ত দ্বারা, অতঃপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, অতঃপর বার্ধক্যে উপনীত হও। (তোমাদের কারও কারও এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং তোমরা নির্ধারিত কালে পৌছ এবং তোমরা যাতে অনুধাবন কর। (৬৮) তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দেন। যখন তিনি কোন কাজের আদেশ করেন, তখন একথাই বলেন, হয়ে যা—তা হয়ে যায়। (৬৯) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা কোথায় ফিরেছে? (৭০) যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি, সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে। অতঃপর, সত্তরই তারা জানতে পারবে, (৭১) যখন বেড়ি ও শৃঙ্খল তাদের গলদেশে পড়বে। তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে (৭২) ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হবে, (৭৩) অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, কোথায় গেল যাদেরকে তোমরা শরীক করতে (৭৪) আল্লাহ ব্যতীত? তারা বলবে, তারা আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে; বরং আমরা তো ইতিপূর্বে কোন কিছুই পূজাই করতাম না। এমনভাবে আল্লাহ কাফেরদেরকে বিভ্রান্ত করেন। (৭৫) এটা এ কারণে যে, তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে আনন্দ-উল্লাস করতে এবং এ কারণে যে, তোমরা ঔদ্ধত্য করতে। (৭৬) প্রবেশ কর তোমরা জাহান্নামের দরজা দিয়ে সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্যে। কত নিকৃষ্ট দাস্তিকদের আবাসস্থল। (৭৭) অতঃপর আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতঃপর আমি কাফেরদেরকে যে শাস্তির ওয়াদা দেই, তার কিয়দংশ যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই অথবা আপনার প্রাণ হরণ করে নেই, সবাবস্থায় তারা তো আমারই কাছে ফিরে আসবে।

—এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, জাহান্নামীদেরকে প্রথমে حميم অর্থাৎ, ফুটন্ত পানিতে ও পরে جحيم অর্থাৎ, জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এ থেকে আরও জানা যায় যে, জাহান্নামের বাইরের কোন স্থান, যার ফুটন্ত পানি পান করানোর জন্যে জাহান্নামীদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। সূরা সাফফাতের আয়াত ثُمَّ إِنَّهُمْ لَالِ الْجَحِيمِ থেকেও তাই জানা যায়। কোন কোন আয়াত থেকে জানা যায় যে, حميم ও جحيم একই স্থান এবং حميم—এর মধ্যেই جحيم অবস্থিত। আয়াতটি এইঃ

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ فِيهَا خَالِدِينَ

এতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হামীমও জাহান্নামের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

চিন্তা করলে জানা যায় যে, এতদূত্বের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। জাহান্নামেরই অনেক স্তরে বিভিন্ন প্রকার আযাব থাকবে। এর মধ্যে এক স্তর হামীম অর্থাৎ, ফুটন্ত পানিরও থাকবে। স্বতন্ত্র ও আলাদা হওয়ার কারণে একে জাহান্নামের বাইরেরও বলা যায় এবং জাহান্নামেরই এক স্তর হওয়ার কারণে একে জাহান্নামও বলা যায়। ইবনে-কাসীর বলেন, জাহান্নামীদেরকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় কখনও টেনে হামীমে এবং কখনও জাহীমে নিক্ষেপ করা হবে।

— অর্থাৎ, জাহান্নামে পৌছো মুশরিকরা বলবে —
আমাদের উপাস্য প্রতিমা ও শয়তান আজ উধাও হয়ে গেছে। অর্থাৎ, আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, যদিও তারা জাহান্নামের কোন কোণে পড়ে আছে। তারাও যে জাহান্নামেই থাকবে, এ সম্পর্কে অন্য এক আয়াতে বলা

يَكُونُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبٌ جَهَنَّمَ — হয়েছেঃ

فَرَحَ — بِمَا كُنْتُمْ تَقْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِالْأَنْتُمْ تَتَرَحَّوْنَ

—এর অর্থ আনন্দিত ও উল্লাসিত হওয়া এবং فرح—এর অর্থ দস্ত করা, অর্থ-সম্পদের অহংকারী হয়ে অপরের অধিকার খর্ব করা। فرح সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় ও হারাম। পক্ষান্তরে فرح অর্থাৎ, আনন্দ যদি ধন-সম্পদের নেশায় আল্লাহকে ভুলে গোনানোর কাজ দ্বারা হয়, তবে হারাম ও না-জায়েয। আলাচ্য আয়াতে এই আনন্দই বোঝানো হয়েছে। কারানের কাহিনীতেও فرح এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে—

— অর্থাৎ, আনন্দ-উল্লাস করো না।

আল্লাহ তাআলা আনন্দ-উল্লাসকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আনন্দ-উল্লাসের আবেগে স্তর হল পার্থিব নেয়ামত ও সুখকে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও দান মনে করে তজ্ঞন্যে আনন্দ প্রকাশ করা। এটা জায়েয, মোস্তাহাব বরং আদিত কর্তব্য। এ আনন্দ সম্পর্কে কোরআন বলে, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

আলাচ্য আয়াতে فرح—কে সর্বাবস্থায় আযাবের কারণ বলা হয়েছে এবং فرح—এর সাথে بِغَيْرِ الْحَقِّ কথাটি যুক্ত করে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, অন্যায় ও অবৈধ ভোগের মাধ্যমে আনন্দ করা হারাম এবং ন্যায় ও বৈধ ভোগের কারণে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আনন্দিত হওয়া এবাদত ও সওয়াবের কাজ।

—এ আয়াত থেকে জানা যায়

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ وَمَا تُرِيدُكَ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ قُتِلَ وَأُتِيَ بِهِمْ مِّمَّنْ لَّمْ يَأْتِ
بِالْبَيِّنَاتِ وَإِن يَدْعُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُم مُّشْرِكُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْزِلْنَاهُ مِنْ سَمَاءٍ مِّن لَّدُنِّي جَعَلْ لَّكُمُ الْأَقْسَامَ
لَأَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا مِّنْهَا وَمِنهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُم فِيهَا مَنَافِعُ
وَلِتُبْنِعُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَىٰ لِقَائِكُمْ
تُحْمَلُونَ ۝ وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيَشْهَدَ عَلَىٰ آلِهِمْ أَنَّهُم مُّكْرِبُونَ ۝
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرًا مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَ
أَثَرًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝
فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُم بِآيَاتِنَا تَوَحَّشُوا لِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَفْتِرُونَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْا بَاسَنَا
قَالُوا الْمَنَّا يَاللَّهُ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا يَمْكُرُونَ ۝
فَلَمْ يَكُن لَّهُمْ تَفَعُّلٌ لِّمَا كَانُوا يَاسَأُونَ سَأَلُوا اللَّهَ
الْكِبْرَىٰ فَدَخَلَتْ فِي عِبَادَةِ وَخَسِرَ هَٰذَا الْكُفْرُونَ ۝

(৭৬) আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে বিবৃত করিনি। আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন নির্দর্শন নিয়ে আসা কোন রসূলের কাজ নয়। যখন আল্লাহর আদেশ আসবে, তখন ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে মিথ্যাপন্থীর ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৭৬) আল্লাহ তোমাদের জন্যে চতুর্দশ জন্ত সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন কোনটিকে বাহন হিসাবে ব্যবহার কর এবং কোন কোনটিকে ভক্ষণ কর। (৮০) তাতে তোমাদের জন্যে অনেক উপকারিতা রয়েছে। আর এজন্যে সৃষ্টি করেছেন যাতে সেগুলোতে আরোহণ করে তোমরা তোমাদের অসীম প্রয়োজন পূর্ণ করতে পার। এগুলোর উপর এবং নৌকার উপর তোমরা বাহিত হও। (৮১) তিনি তোমাদেরকে তাঁর নির্দর্শনবলী দেখান। অতএব, তোমরা আল্লাহর কোন্ কোন্ নির্দর্শনকে অস্বীকার করবে? (৮২) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রম করেনি? করলে দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছে। তারা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী এবং শক্তি ও কীর্তিতে অধিক প্রবল ছিল, অতঃপর তাদের কর্ম তাদেরকে কোন উপকার দেয়নি। (৮৩) তাদের কাছে যখন তাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, তখন তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমার দস্ত প্রকাশ করেছিল। তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টাবিক্ষ্রণ করেছিল, তাই তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছিল। (৮৪) তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল, আমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করলাম এবং যাদেরকে শরীক করতাম, তাদেরকে পরিহার করলাম। (৮৫) অতঃপর তাদের এ ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করল। আল্লাহর এ নিয়মই পূর্ব থেকে তাঁর বন্দাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। সেক্ষেত্রে কাফেররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

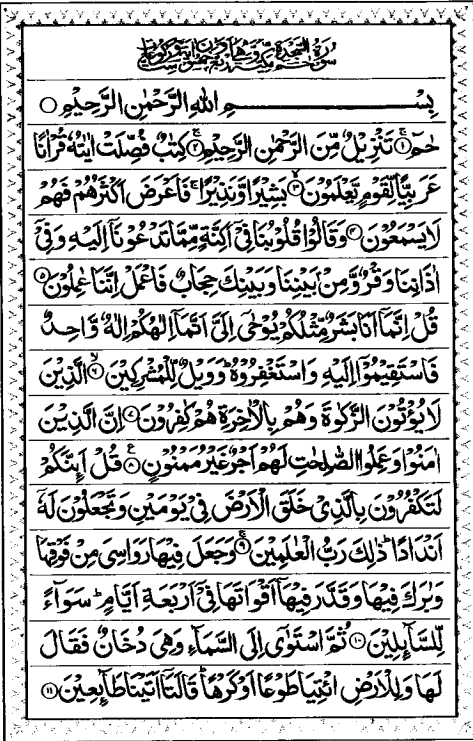
যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সানন্দে কাফেরদের আযাবের অপেক্ষা করছিলেন। তাই তাঁর সান্ত্বনার জন্যে আয়াতে বলা হয়েছে, আপনি সবর করুন। আল্লাহ তাআলা কাফেরদের আযাবের ব্যাপারে যে ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে—আপনার জীবদশায় অথবা ওফাতের পরে। কাফেরদের আযাবে অপেক্ষা করা বাহ্যতঃ ‘রহমাতুল্লিল আলামীন’ (বিশুদ্ধগতের জন্যে রহমত) গুণের পরিপন্থী। কিন্তু অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়ার লক্ষ্য যদি নির্যাতিত-নিরপরাধ মুমিনদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়, তবে অপরাধীদেরকে সাজা দেয়া দয়া ও অনুকম্পার পরিপন্থী নয়। কোন অপরাধীকে শাস্তি দেয়া কারও মতেই দয়ার পরিপন্থীরূপে গণ্য হয় না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ - অর্থাৎ, এই অপরিণামদর্শী কাফেরদের কাছে যখন আল্লাহর পয়গম্বরগণ তওহীদ ও ঈমানের স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করলেন, তখন তারা নিজেদের জ্ঞান-গরিমাকে পয়গম্বরগণের জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও সত্য মনে করে পয়গম্বরগণের উক্তি শুনতে প্রবৃত্ত হল। কাফেররা যে জ্ঞান নিয়ে গর্বিত ছিল, সেটা হয় তাদের নিরেট মূর্খতা ছিল। অর্থাৎ, তারা সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য মনে করে একেই জ্ঞান-গরিমারূপে আখ্যায়িত করেছিল, না হয় এর অর্থ ছিল পার্শ্বি ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকর্মের জ্ঞান। এতে বাস্তবিকই তারা পারদর্শী ছিল। গ্রীক দার্শনিকদের ‘ইলাহিয়াত’ সম্পর্কিত অধিকাংশ জ্ঞান ও গবেষণা প্রথমোক্ত নিরেট মূর্খ শ্রেণীর জ্ঞান-গরিমার দৃষ্টান্ত। তাদের এসব জ্ঞানের কোন দলীল নেই। এগুলোকে জ্ঞান বলা জ্ঞানের অবমাননা বৈ নয়। কাফেরদের পার্শ্বি জ্ঞানের উল্লেখ কোরআন পাক সূরা রূমে এভাবে করেছে -

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ
অর্থাৎ, তারা পার্শ্বি জীবন ও তার উপকার অর্জনের বিষয়ে তো কিছু জানে, বোঝে; কিন্তু পরকাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন, যেখানে অনন্তকাল ধাকতে হবে এবং যেখানকার সুখ ও দুঃখ চিরস্থায়ী। আলোচ্য আয়াতেও যদি দুনিয়ার বাহ্যিক জ্ঞান, অর্থ নেয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কৈয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে এবং পরকালের সুখ ও কষ্ট সম্পর্কে অজ্ঞ উদাসীন, তাই নিজেদের বাহ্যিক জ্ঞানে আনন্দিত ও বিভোর হয়ে পয়গম্বরগণের জ্ঞানের প্রতি আক্ষেপ করে না।—(মায়হারী)

...فَلَمْ يَكُن لَّهُمْ تَفَعُّلٌ... অর্থাৎ, আযাব সম্মুখে আসার পর তারা ঈমান আনছে। এ সময়কার ঈমান আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় ও ধর্তব্য নয়। হাদীসে আছে—يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَغْفِرْ মুমূর্ষু অবস্থা ও মৃত্যু কষ্ট শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা বন্দার তওবা কবুল করেন। মৃত্যু কষ্ট শুরু হলে পর তওবা করলে কবুল হয় না। এমনভাবে আসমানী আযাব সামনে এসে যাওয়ার পর কারও তওবা ও ঈমান কবুল হয় না।



সূরা হা-মীম সেজদাহ

মক্কা অবতীর্ণ, আয়াত ২৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহর নামে শুরু—

(১) হা-মীম, (২) এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। (৩) এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কোরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য, (৪) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনে না। (৫) তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বোবা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব, আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। (৬) বলুন, আমিও তোমাদের মতই মানুষ, আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের যাবুদ একমাত্র যাবুদ, অতএব তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তাঁর কাছে কন্যা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ, (৭) যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। (৮) নিশ্চয় যারা বিশ্वास স্থাপন করে ও সংকল্প করে, তাদের জন্যে রয়েছে অকুরন্ত পুরস্কার। (৯) বলুন, তোমরা কি সে সমাজকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু' দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ হির কর? তিনি তো সমস্ত বিশ্বের পালনকর্তা। (১০) তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন— পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্যে। (১১) অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধূসর, অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা বেছায় আসলাম।

পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্যের জন্যে ‘আল-হা-মীম’ অথবা ‘হাওয়ামীম’ নামক সাতটি সূরার নামের সাথে আরও কিছু শব্দ সংযোজন করা হয়। উদাহরণতঃ সূরা মু'মিনের হামীমকে ‘হা-মীম’ আল-মু'মিন’ এবং আলোচ্য সূরার হা-মীমকে ‘হা-মীম আসসাজ্জদাহ’ অথবা হা-মীম ‘ফুসসিলাত’ও বলা হয়। এ সূরার এ দু'টি নাম সুবিদিত।

এ সূরার প্রথম সম্প্রদানের পাত্র আরবের কোরায়শ গোত্র, তাদের সামনে কোরআন নাযিল হয়েছে এবং তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। তারা কোরআনের আলৌকিকতা প্রত্যক্ষ করেছে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অসংখ্য মো'জ্জিয়া দেখেছে। এতদসঙ্গেও তারা কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা, শ্রবণ করাও পছন্দ করেনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শুভেচ্ছামূলক উপদেশের জওয়াবে অবশেষে তারা বলে দিয়েছে, আপনার কথাবার্তা আমাদের বুকে আসে না, আমাদের অন্তর এগুলো কবুল করে না এবং আমাদের কানও এগুলো শুনতে প্রস্তুত নয়। আপনার ও আমাদের মাঝখানে অন্তরাল আছে। সুতরাং এখন আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমাদেরকে আমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন।

সূরার প্রথম পাঁচ আয়াতের ভাবার্থ তাই। এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিশেষভাবে কোরায়শকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, কোরআন আরবী ভাষায় তোমাদের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে এর বিষয়বস্তু বুঝতে তোমাদের বেগ পেতে না হয়। এতদসঙ্গে কোরআনের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম - تفصیل - ফুসসিলাত - এর আসল অর্থ বিষয়বস্তু পৃথক পৃথকভাবে বিবৃত করা, এখানে উদ্দেশ্য খুলে খুলে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা — পৃথকভাবে হোক কিংবা একত্রে। কোরআন পাকের আয়াতসমূহে বিধানাবলী, কাহিনী, বিশ্वास, মিথ্যাপন্থীদের খণ্ডন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বস্তু আলাদা আলাদাও বর্ণিত হয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়বস্তুকে উদাহরণ দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কোরআন পাকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশেষণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। অর্থাৎ, যারা মেনে চলে, তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখের সুসংবাদ এবং যারা মেনে চলে না, তাদেরকে অনন্ত আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে।

এসব বিশেষণ বর্ণনা করে পরিশেষে لَقَوْمٌ قَلِيلُونَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ, কোরআন পাকের আরবী ভাষায় নাযিল হওয়া, স্পষ্ট ও পরিষ্কার হওয়া এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হওয়া— এসব বিষয় তাদের জন্যে উপকারী হতে পারে, যারা চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয়ঙ্গম করার ইচ্ছা করে। কিন্তু আরব কোরায়শরা এসব সত্যও কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে—হৃদয়ঙ্গম করা দূরের কথা, শোনাও পছন্দ করেনি। لَقَوْمٌ قَلِيلُونَ আয়াতে তাই উল্লেখিত হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে কাকেরদের একটি প্রস্তাব : আলোচ্য সূরায় কোরায়শ কাকেরদের প্রত্যক্ষভাবে সম্প্রদান করা হয়েছে। তারা কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রাথমিক যুগে বলপূর্বক ইসলামী আন্দোলনকে নস্যাত করার এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসীদেরকে নানাভাবে নির্ধাতনের মাধ্যমে ভীত-সন্ত্রস্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু ইসলাম তাদের মর্জির বিপরীতে দিন দিন সমৃদ্ধ ও শক্তিশালীই হয়েছে। প্রথমে ওমর ইবনে খাতাবের ন্যায় অসম সাহসী বীর পুরুষ ইসলামে দাখিল হন। অতঃপর সর্বজনস্বীকৃত কোরায়শ সরদার

হামযা মুসলমান হয়ে যান। ফলে কোরায়শ কাফেররা ভীতি প্রদর্শনের পথ পরিত্যাগ করে শ্রোভাভণ্ড ও প্রচারণার মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার কৌশল চিন্তা করতে শুরু করে। এমন ধরনের এক ঘটনা হাফেয ইবনে কাসীর মুসনাদে বাযযার, আবু ইয়া'লা ও বগভীর রেওয়ায়েত থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এসব রেওয়ায়েতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকায় ইবনে কাসীর বগভীর রেওয়ায়েতকে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তবের নিকটবর্তী সাব্যস্ত করেছেন। এ সবার পর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের কিতাব 'আস-সীরত' থেকে ঘটনাটি উদ্ধৃত করে একে সব রেওয়ায়েতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাই এস্থলে ঘটনাটি ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী বলেন, আমার কাছে রেওয়ায়েত পৌছেছে যে, কোরাইশ সরদার ওতবা ইবনে রবীয়া একদিন একদল কোরাইশসহ মসজিদে হারামে উপবিষ্ট ছিল। অপরদিকে রসুলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদের এক কোণে একাকী বসেছিলেন। ওতবা তার সঙ্গীদেরকে বলল, তোমরা যদি মত দাও, তবে আমি মুহাম্মদের সাথে কথাবার্তা বলি। আমি তার সামনে কিছু লোভনীয় বস্তু পেশ করব। যদি সে কবুল করে, তবে আমরা সেসব বস্তু তাকে দিয়ে দেব — যাতে সে আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান থেকে নিবৃত্ত হয়। এটা তখনকার ঘটনা, যখন হযরত হামযা মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন এবং ইসলামের শক্তি দিন দিন বেড়ে চলছিল। ওতবার সঙ্গীরা সম্মুখের বলে উঠল, হে আবুল ওলীদ, (ওতবার ডাকনাম,) আপনি অবশ্যই তার সাথে আলাপ করুন।

ওতবা সেখান থেকে উঠে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে গেল এবং কথাবার্তা শুরু করল : প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! আপনি জানেন, কোরাইশ বংশে আপনার অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মান রয়েছে। আপনার বংশ সুদূর বিস্তৃত এবং আমরা সবাই আপনার কাছে সম্মানার্থ। কিন্তু আপনি জাতিতে এক গুরুতর সংকটে জড়িত করে দিয়েছেন। আপনার আনিত দাওয়াত জাতিতে বিভক্ত করে দিয়েছে, তাদেরকে বোকা ঠাণ্ডিয়েছে, তাদের উপাস্য দেবতা ও ধর্মের গায়ে কলঙ্ক আরোপ করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে কাফের আখ্যায়িত করেছে। এখন আপনি আমার কথা শুনুন। আমি কয়েকটি বিষয় আপনার সামনে পেশ করছি, যাতে আপনি কোন একটি পছন্দ করে নেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আবুল ওলীদ, বলুন, আপনি কি বলতে চান। আমি শুনব।

আবুল ওলীদ বলল : ভ্রাতুষ্পুত্র! যদি আপনার পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ অর্জন করা হয়, তবে আমরা ওয়াদা করছি, আপনাকে কোরাইশ গোত্রের সেরা বিত্তশালী করে দেব। আর যদি শাসনক্ষমতা অর্জন করা লক্ষ্য হয়, তবে আমরা আপনাকে কোরাইশের প্রধান সরদার মেনে নেব এবং আপনার আদেশ ব্যতীত কোন কাজ করব না। আপনি রাজত্ব চাইলে আমরা আপনাকে রাজ্যরূপেও স্বীকৃতি দেব। পক্ষান্তরে যদি কোন জিন অথবা শয়তান আপনাকে দিয়ে এসব কাজ করায় বলে আপনি মনে করেন এবং আপনি সেটাকে বিতাড়িত করতে অক্ষম হয়ে থাকেন, তবে আমরা আপনার জন্যে চিকিৎসক ডেকে আনব; সে আপনাকে এই কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে। এর যাবতীয় ব্যয়ভার আমরাই বহন করব। কেননা, আমরা জানি, মাঝে মাঝে জিন অথবা শয়তান মানুষকে কানু করে ফেলে এবং চিকিৎসার ফলে তা সেরে যায়।

ওতবার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : আবুল ওলীদ! আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন,

এবার আমার কথা শুনুন। সে বলল, অবশ্যই শুনব।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কোন জওয়াব দেয়ার পরিবর্তে আলোচ্য সূরা 'ফুসসিলাত' তেলাওয়াত করতে শুরু করে দিলেন। বাযযার ও বগভীর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) তেলাওয়াত করতে করতে যখন

পর্যন্ত পৌছলেন, তখন ওতবা তাঁর মুখে হাত রেখে দিল এবং বংশ ও আত্মীয়তার কসম দিয়ে বলল, আমার প্রতি দয়া করুন, আর পাঠ করবেন না। ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে আছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) তেলাওয়াত শুরু করলে ওতবা চুপচাপ শুনতে থাকে এবং হাতের পিঠ পিছনে লাগিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) সেজদার আয়াতে পৌছে সেজদা করলেন এবং ওতবাকে বললেন : আবুল ওলীদ! আপনি যা শুনবার শুনলেন। এখন আপনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। ওতবা সেখান থেকে উঠে তার লোকজনের দিকে চলল। তারা দূর থেকে ওতবাকে দেখে পরস্পর বলতে লাগল, আল্লাহর কসম, আবুল ওলীদের মুখমণ্ডল বিকৃত দেখা যাচ্ছে। সে যে মুখ নিয়ে এখন থেকে গিয়েছিল, সে মুখ আর নেই। ওতবা মজলিসে পৌছলে সবাই বলল, বলুন, কি খবর আনলেন। ওতবা বলল, খবর এই :

আল্লাহর কসম! আমি এমন কালাম শুনেছি, যা জীবনে কখনও শুনিনি। আল্লাহর কসম, সেটা জাদু নয়, কবিতা নয় এবং অতীন্দ্রিয়-বাদীদের শয়তান থেকে অর্জিত কথাও নয়। হে কোরায়শ সম্প্রদায়, তোমরা আমার কথা মেনে নাও এবং ব্যাপারটি আমার কাছে সোপর্দ কর। আমার মতে তোমরা তার মোকাবেলা ও তাঁকে নির্ধাতিত করা থেকে সরে আস এবং তাঁকে তাঁর কাজ করতে দাও। কেননা, তাঁর এই কালামের এক বিশেষ পরিণতি প্রকাশ পাবেই। তোমরা এখন অপেক্ষা কর। অবশিষ্ট আরবদের আচরণ দেখে যাও। যদি তারাই কোরায়শের সহযোগিতা ব্যতীত তাঁকে পরাভূত করে ফেলে, তবে বিনা শ্রমেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর সে যদি সবার উপর প্রবল হয়ে যায়, তবে তার রাজত্ব হবে তোমাদেরই রাজত্ব; তার ইহযত হবে তোমাদেরই ইহযত। তখন তোমরাই হবে তার সাফল্যের অংশীদার।

তার সঙ্গীরা তার একথা শুনে বলল, আবুল ওলীদ, তোমাকে তো মুহাম্মদ কথা দিয়ে জাদু করেছে। ওতবা বলল, আমারও অভিমত তাই। এখন তোমাদের যা মন চায়, তাই কর।

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ - এ ক্ষেত্রে কাফেরদের তিনটি উক্তি উদ্ধৃত

হয়েছে। এক, আমাদের অন্তরে পর্যা পড়ে আছে, ফলে আমরা আপনার কথা বুঝতে পারি না। দুই, আমাদের কান বধির, ফলে আপনার কথা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না এবং তিন, আমাদের ও আপনার মাঝখানে অন্তরাল রয়েছে। কোরআন এসব উক্তি নিন্দার ছলে উদ্ধৃত করেছে। ফলে এসব উক্তি ভ্রান্ত মনে হয়। কিন্তু অন্যত্র কোরআন নিজেই তাদের এরূপ অবস্থা বর্ণনা করেছে। সূরা আনআমের আয়াতে আছে—
وَصَلَّاهُمْ لِقَائِهِمْ وَأَنْ يَسْمَعُوا وَأَنْ يَذَّكَّرُوا -এমন ধরনের আয়াত সূরা বনী-ইসরাঈল ও সূরা কাহফেও রয়েছে।

এর জওয়াব এই যে, কাফেরদের এরূপ বলার উদ্দেশ্য ছিল একথা বোঝানো যে, আমরা অক্ষম ও অপারক, আমাদের অন্তরে আবরণ, কানে ছিপি এবং আপনার ও আমাদের মধ্যবর্তী অন্তরাল আছে। এমতাবস্থায় আমরা কিরূপে আপনার কথা শুনব ও মানব? কোরআন তাদের অবস্থা

বর্ণনা করে তাদেরকে অক্ষম ও অপারক সাব্যস্ত করেনি, বরং এর সারমর্ম এই যে, তাদের মধ্যে আল্লাহর আয়াতসমূহ শ্রবণ করার ও বোঝবার পূর্ণ যোগ্যতা ছিল, কিন্তু তারা যখন সেদিকে কর্পপাত করল না এবং বোঝবার ইচ্ছাও করল না, তখন শাস্তিস্বরূপ তাদের উপর অমনোযোগিতা ও মূর্খতা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তাও ইচ্ছাশক্তি হিনিয়ে নিয়ে নয়, বরং এখনও তারা ইচ্ছা করলে শোনার ও বোঝার যোগ্যতা ফিরে আসবে। — (বয়ানুল-কোরআন)

কাফেরদের অস্বীকার ও ঠাট্টা-বিদ্বেষের পয়গম্বরসুলভ জওয়াব : কাফেররা তাদের অন্তরের উপর আবরণ ও কানে ছিপি থাকার কথা স্বীকার করে একথা বোঝায়নি যে, তারা বাস্তবিকই নির্বোধ ও বহির, বরং এটা ছিল এক প্রকার ঠাট্টা। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে এই পাশবিক ঠাট্টা-বিদ্বেষের এ জওয়াব শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আপনি তাদের মোকাবেলায় কোন কঠোর কথা বলবেন না, বরং বিনয়ের সাথে বলুন, আমি আল্লাহ নই যে, যা ইচ্ছা তাই করতে পারব, বরং আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। পার্থক্য এই যে, আল্লাহ ওই প্রেরণ করে আমাকে সম্পৃক্ত প্রদর্শন করেছেন এবং ওহীর সমর্থনে বিভিন্ন মো'জ্জেযা দান করেছেন। এর ফলে তোমাদের উচিত ছিল আমার প্রতি বিশ্বাসী হওয়া। এখন আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা এবাদত ও আনুগত্যে একমাত্র আল্লাহর অভিযুক্তী হয়ে যাও এবং অতীত গোনাহের জন্যে তওবা করে নাও।

শেষ বাক্যে সুসংবাদদান ও সতর্ককরণের উভয় দিক তাদের সামনে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, মুশরিকদের জন্যে রয়েছে চরম দুর্ভোগ এবং মুমিনদের জন্যে রয়েছে চিরস্থায়ী সওয়াব। মুশরিকদের দুর্ভোগের কারণ এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, لَيْسَ لَهُمْ فِيهَا حِسَابٌ অর্থাৎ, তারা যাকাত প্রদান করে না। এতে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। প্রথম এই যে, আয়াতটি মকায় অবতীর্ণ, আর যাকাত ফরয হওয়ার আদেশ মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, ফরয হওয়ার পূর্বেই কাফেরদেরকে যাকাত প্রদান না করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা কিরূপে সম্ভব হয়েছে?

ইবনে-কাসীর এর জওয়াবে বলেন যে, আসলে যাকাত প্রাথমিক যুগেই নামাযের সাথে ফরয হয়ে গিয়েছিল। সূরা মুযাযিমলের আয়াতে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু নেসাবের বিবরণ এবং আদায় করার ব্যবস্থাপনা মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই একথা বলা ঠিক নয় যে, মকায় যাকাত ফরয ছিল না।

কাফেররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট কিনা : দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অনেক ফেকাহবিদের মতে কাফেররা ইসলামের শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট নয়। অর্থাৎ, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের বিধানাবলী তাদের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। তাদের প্রতি আরোপিত আদেশ এই যে, তারা প্রথমে ঈমান গ্রহণ করবে। ঈমানের পরে ফরয কর্মসমূহের বিধান আসবে। অতএব, তাদের উপর যখন যাকাতের আদেশ আরোপিত নয়, তখন এটা না করার কারণে তারা শাস্তির পার্হ হবে কেন?

জওয়াব এই যে, অনেক ফেকাহবিদের মতে কাফেররাও শাখাগত কর্মসমূহ পালনে আদিষ্ট। তাদের মতে আয়াতে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। যারা কাফেরদেরকে আদিষ্ট বলে গণ্য করেন না, তারা বলতে পারেন যে, আয়াতে যাকাত না দেয়ার কারণে নিন্দা করা হয়নি, বরং তাদের যাকাত না দেয়ার ভিত্তি ছিল কুফর এবং যাকাত না দেয়া কুফরেরই আলামত

ছিল। তাই তাদেরকে শাসানোর সারমর্ম এই যে, তোমরা মুমিন হলে যাকাত প্রদান করত। তোমাদের দোষ মুমিন না হওয়া। — (বয়ানুল-কোরআন)

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ইসলামী বিধানাবলীর মধ্যে নামায সর্বাপেক্ষে। এর উল্লেখ না করে বিশেষভাবে যাকাতের উল্লেখ করার রহস্য কি? কুরত্বী প্রমুখ এর জওয়াবে বলেন যে, কোরাযশ ছিল ধনাত্মক সম্ভাব্য। দান-খয়রাত ও গরীবের সাহায্য করা তাদের বিশেষ গুণ ছিল। কিন্তু যারা মুসলমান হয়ে যেত, কোরাযশরা তাদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক সাহায্য থেকেও বঞ্চিত করত। এর নিন্দা করার জন্যেই বিশেষভাবে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে।

لَهُمْ أَجْرٌ مِّنْهُنَّ শব্দের অর্থ বিচ্ছিন্ন। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন ও সংকীর্ণদেরকে পরকালে স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার দেয়া হবে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ এই করেছেন যে, মুমিন ব্যক্তির অন্তঃস্থ আমল কোন সময় কোন অসুস্থতা, সঙ্কর কিংবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ তরক হয়ে গেলেও সে আমলের পুরস্কার ব্যাহত হয় না, বরং আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে আদেশ করেন, আমার বান্দা সুস্থ অবস্থায় অথবা অবসর সময়ে যে আমল নিয়মিত করত, তার গুণের অবস্থায় সে আমল না করা সত্ত্বেও তার আমলনামায় তা লিখে দাও। এ বিষয়বস্তুর হাদীস সহীহ বোখারীতে হযরত আবু মুসা আশআরী থেকে, শরহ-সুন্নায়ে হযরত ইবনে ওমর ও আনাস (রাঃ) থেকে এবং রাবীনে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। — (মাযহরী)

আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদেরকে তাদের শিরক ও কুফরের কারণে এক সাবলীল ভঙ্গিতে হসিয়াত করা উদ্দেশ্য। এতে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিগুণ তথা বিরাটাকার আকাশ ও পৃথিবীকে অসংখ্য রহস্যের উপর ভিত্তিগত করে সৃষ্টি করার বিশদ বিবরণ দিয়ে তাদেরকে এই বলে শাসানো হয়েছে যে, তোমরা এমন নির্বোধ যে, মহান স্রষ্টা ও সর্বশক্তিমানের সাথেও অপরকে শরীক সাব্যস্ত কর? এমনি ধরনের হসিয়াতী ও বিবরণ সূরা বাক্বারার তৃতীয় রুকুতে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে—

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَشْوَكَاءَ مَا خَلَقَ اللَّهُ يُبْدِئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَ الْأَرْضِ جَبِيْنًا سَبْعَ سَوَاتٍ إِلَى السَّمَاءِ فَتُصَوَّرْنَ سَبْعَ سَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

সূরা বাক্বারার এসব আয়াতে সৃষ্টির দিন নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং বিবরণও দেয়া হয়নি। আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবী কোনটির পর কোনটি এবং কোন কোন দিনে সৃষ্টিত হয়েছে : বয়ানুল কোরাযনে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহঃ) বলেন, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয় এমনিতে কোরাযন পাকে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে বহু জায়গায় বিবৃত হয়েছে, কিন্তু কোনটির পরে কোনটি সৃষ্টিত হয়েছে, এর উল্লেখ সম্ভবতঃ মাত্র তিন আয়াতে করা হয়েছে — (এক), — হা-মীম সাবদর আলোচ্য আয়াত, (দুই) — সূরা বাক্বারায় উল্লেখিত আয়াত এবং (তিন) — সূরা নাহযাতের নিম্নোক্ত আয়াত :

مَنْتُمْ أَشَدَّ عِلَاقًا أَمْ السَّمَاءُ بِمَا وَلَدَكُمْ مِنْهَا مَا تَصِفُ أَعْيُنُ
لَيْكَهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا الْوُحُوشَ وَالْإِنْسَ بِمَا تَصِفُ أَعْيُنُهَا
وَمِنْهَا وَالْجِبَالُ آسِنُهَا

বাহ্যদৃষ্টিতে এসব বিষয়বস্তুর মধ্যে কিছু বিরোধও দেখা যায়। কেননা, সূরা বাক্বুরা ও সূরা হা-মীম সেজদার আয়াত থেকে জানা যায় যে, আকাশের পূর্বে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এবং সূরা নাযেয়াতের আয়াত থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, আকাশ সৃষ্টি হওয়ার পরে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। সবগুলো আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে আমার মনে হয় যে, প্রথমে পৃথিবীর উপকরণ সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায়ই ধূমকুঞ্জের আকারে আকাশের উপকরণ নির্মিত হয়েছে। এরপর পৃথিবীকে বর্তমান আকারে বিস্তৃত করা হয়েছে এবং এতে পর্বতমালা, বৃক্ষ ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর আকাশের তরল ধূমকুঞ্জের উপকরণকে সপ্ত আকাশে পরিণত করা হয়েছে। অশা করি সবগুলো আয়াতই এই বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বাকী প্রকৃত অবস্থা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। — (বয়ানুল কোরআন-সূরা বাক্বুরা)

সহীহ বোখারীতে এ আয়াতের অধীনে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে কতিপয় প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। তাতে হযরত ইবনে আব্বাস এ আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাই মাওলানা খানভী (রহঃ) উপরে বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরে উদ্ধৃত এর ভাষা নিম্নরূপ :

মদীনার ইব্দীরা রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর নিকট উপস্থিত হয়ে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে রবিবার ও সোমবার দিন, পর্বতমালা ও খনিজ দ্রব্যাদি মঙ্গলবার দিন, উদ্ভিদ, রূপা, অন্যান্য বস্তুনিচয় ও জনশূন্য প্রান্তর বুধবার দিন সৃষ্টি করেন। এতে ষোলো চার দিন সময় লাগে। আলোচ্য **سَوَاءٌ لَّكَ الْيَوْمَ** পর্যন্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে। অতঃপর বললেন, এবং বৃহস্পতিবার দিন আকাশ সৃষ্টি করেন। আর শুক্রবার তারকারাজি, সূর্য, চন্দ্র ও কেশেতা সৃষ্টি হয়। শুক্রবার দিনের তিন প্রহর বাকী থাকতে এসব কাজ সমাপ্ত হয়। এই প্রহরত্রয়ের দ্বিতীয় প্রহরে সন্তান্য বিপদাদি সৃষ্টি করা হয় এবং তৃতীয় প্রহরে আদম (আঃ)—কে সৃষ্টি করা হয়। তাঁকে জ্ঞানাত হুন দেয়া হয় এবং ইবলীসকে আদেশ করা হয় আদমের উদ্দেশে সেজদা করতে। ইবলীস অস্বীকার করলে তাকে জ্ঞানাত থেকে বহিস্কার করা হয়। এসব কাজ তৃতীয় প্রহরের শেষ পর্যন্ত সমাপ্তি লাভ করে। — (ইবনে-কাসীর)

ইবনে-কাসীরের মতে হাদীসটি **غريب** (অর্থাৎ, তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূত্র পরম্পরায় বর্ণিত।)

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত আবু হেয়ায়রার বাচনিক এক রেওয়াজেতে জগৎ সৃষ্টির শুরু শনিবার থেকে ব্যক্ত হয়েছে। এই হিসাব মতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সাত দিনে হয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু কোরআনের আয়াত থেকে পরিস্কারভাবে জানা যায় যে, এই সৃষ্টিকাজ

ছয় দিনে হয়েছে। এক আয়াত আছে :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ مَسَاءً مُنِ لَيْلٍ

— অর্থাৎ, আমি আকাশ পৃথিবী ও এতদুভয়ের

মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। এ কারণে হাদীসবিদগণ উপরোক্ত রেওয়াজেতটি অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ রেওয়াজেতটিকে কা'বে আহবারের উক্তি বলেও অভিহিত করেছেন। — (ইবনে-কাসীর)

ইবনে-আব্বাসের বাচনিক প্রথমোক্ত রেওয়াজেতও ইবনে-কাসীরের মতে অগ্রাহ্য। এর এক কারণ এই যে, এতে আদম (আঃ)—এর সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির সাথে শুক্রবারের শেষ প্রহরে এবং একই প্রহরেই সেজদার আদেশ ও ইবলীসকে জ্ঞানাত থেকে বহিস্কারের বিষয় উল্লেখিত হয়েছে।

অষ্ট কোরআনের একাধিক আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টরূপে জানা যায় যে, আদম সৃষ্টির ঘটনা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির অনেক পরে হয়েছে। তখন পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পূর্ণাঙ্গায়া বিদ্যমান ছিল এবং জিন ও শয়তানরা সেখানে বসবাসরত ছিল। সে সময়েই বলা হয়েছিল **إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً** (মায়হাবী)

সারকথা এই যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিনকাল ও ক্রম সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহের মধ্য থেকে কোনটিকেই কোরআনের ন্যায় অকাট্য ও নিশ্চিত বলা যায় না। বরং এগুলো ইসরাইলী রেওয়াজেত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ইবনে-কাসীর মুসলিম ও নাসাইর বর্ণনা সম্পর্কেও তাই বলেছেন। তাই কোরআনের আয়াতকেই মূলভিত্তি সাব্যস্ত করে উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা উচিত। আয়াতসমূহকে একত্রিত করার ফলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি হয়েছে। সূরা হা-মীম সেজদার আয়াত থেকে দ্বিতীয়তঃ জানা যায় যে, পৃথিবী, পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি ইত্যাদি সৃষ্টিতে পূর্ণ চার দিন লেগেছে। তৃতীয়তঃ জানা যায় যে, আকাশমণ্ডলীর সৃজনে দু'দিন ব্যয়িত হয়েছে। এতে পূর্ণ দু'দিনের বর্ণনা নাই, বরং পুরোপুরি দু'দিন না লাগারও কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সর্বশেষ দিন শুক্রবারের কিছু অংশ বেঁচে গিয়েছিল। এসব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই বোঝা যায় যে, ছয় দিনের মধ্য থেকে প্রথম চার দিন পৃথিবী সৃজনে এবং অবশিষ্ট দু'দিন আকাশ সৃজনে ব্যয়িত হয়েছে এবং পৃথিবী আকাশের পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সূরা নাযেয়াতের আয়াতে পরিস্কার বলা হয়েছে যে, আকাশ সৃষ্টির পরে পৃথিবীকে বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ করা হয়েছে। তাই বয়ানুল-কোরআনের বক্তব্য অবাস্তব নয় যে, পৃথিবী সৃষ্টির কাজ দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম দু'দিনে পৃথিবী ও তার উপরিতাগের পর্বতমালা ইত্যাদির উপকরণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর দু'দিনে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি হয়েছে। এরপর দু'দিনে পৃথিবীর বিস্তৃতি ও তৎমধ্যবর্তী পর্বতমালা, বৃক্ষরাজি, নদ-নদী, ঝরণা ইত্যাদির সৃষ্টি সম্পন্ন করা হয়েছে। এভাবে পৃথিবী সৃষ্টির চার দিন উপযুক্তি রইল না। সূরা হা-মীম সেজদার আয়াতে প্রথমে **خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ** দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলে মুশরিকদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে। অতঃপর আলাদা করে বলা হয়েছে — **وَجَعَلَ فِيهَا دَارًا مِّنْ قَبْلُ وَبَارَأَ**

—এতে তফসীরবিদগণ একমত যে, এই চার দিন প্রথমোক্ত দু'দিনসহ পৃথক চার দিন নয়। নতুবা সর্বমোট আট দিন হয়ে যাবে, যা কোরআনের বর্ণনার বিপরীত।

এখন চিন্তা করলে জানা যায় যে, **خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ** বলার পর

যদি পর্বতমালা ইত্যাদির সৃষ্টিও দু'দিনে বলা হত, তবে মোট চারদিন আপন-আপনিই জানা যেত, কিন্তু কোরআন পাক পৃথিবী সৃষ্টির অবশিষ্টাংশ উল্লেখ করে বলেছে, এ হল মোট চার দিন। এতে বাহ্যতঃ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এই চার দিন উপর্যুপরি ছিল না; বরং দু'ভাগে বিভক্ত ছিল — দু'দিন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে এবং দু'দিন তার পরে। আয়াতের *من فوقها راسي من فوقها* বাক্যে আকাশ সৃষ্টির পরবর্তী অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

وَصَوَّرَ فِيهَا زَاوِيَّ مِّنْ قُوتٍ — ভারসাম্য ঠিক রাখার জন্যে পৃথিবীতে পর্বতমালা সৃজিত হয়েছে। কোরআনের একাধিক আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে। এর জন্যে পর্বতমালাকে পৃথিবীর উপরিভাগে সুউচ্চ করে স্থাপন করা জরুরী ছিল না; বরং ভূগর্ভেও স্থাপন করা যেত। কিন্তু পর্বতমালাকে ভূ-পৃষ্ঠের উপরে স্থাপন করা এবং মানুষ ও জীব-জন্তুর নাগালের বাইরে উচ্চ করার মধ্যে পৃথিবীবাসীর জন্য হাজারো বরং অসংখ্য উপকারিতা ছিল। তাই আয়াতে *مِّنْ قُوتٍ* বলে এই নেয়ামতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اقوات — وَكَذَٰلِكَ أَتَتْكُمُ الْآيَةُ سَوَاءٌ لِّلشَّالِيَيْنِ শব্দটি *قوت*—এর বহুবচন। অর্থ রিযিক, রুখী, খাদ্য। মানুষের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল দ্রব্যসামগ্রীও এর অন্তর্ভুক্ত। — (যাদুল-মাসীর)

হযরত হাসান ও সুদী এ আয়াতের তফসীরে বলেন, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর প্রতি অংশে তার অধিবাসীদের উপযোগী রিযিক ও রুখী নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। নির্দিষ্ট করার অর্থ এই যে, প্রত্যেক ভূ-খণ্ডে নির্দিষ্ট বস্তুসমূহ নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন। এর ফলে প্রত্যেক ভূ-খণ্ডের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। প্রত্যেক ভূ-খণ্ডে তার অধিবাসীদের মেজাজ ও রুচি মোতাবেক বিভিন্ন প্রকার খনিজ দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে।

এতে প্রত্যেক ভূ-খণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ বিস্তারিত হয়েছে। কোন ভূ-খণ্ডে গম, কোন ভূ-খণ্ডে চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য রয়েছে। কোথাও তুলা, কোথাও পাট, কোথাও সেব, আঙ্গুর এবং কোথাও আম এবং কলা উৎপন্ন হতে দেখা যায়। ইকরিমা ও যাহহাকের উক্তি অনুযায়ী এতে এ উপকারও আছে যে, বিশ্বের সব দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য ও সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। কোন ভূ-খণ্ডই অন্য ভূ-খণ্ডের প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। পারস্পরিক স্বার্থের উপরই পারস্পরিক সহযোগিতার মজবুত প্রাচীর নির্মিত হতে পারে। ইকরিমা বলেন, কোন কোন ভূ-খণ্ডে লবণ স্বর্ণের ন্যায় ওজন করেও বিক্রয় করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে যেন তার অধিবাসীদের খাদ্য, বাসস্থান, পোশাক ইত্যাদি প্রয়োজনের একটি মহা-গুদামে পরিণত করে দিয়েছেন। এতে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী ও বসবাসকারী কোটি কোটি মানুষ ও অসংখ্য জীব-জন্তুর প্রয়োজনীয় সব দ্রব্যসামগ্রী রেখে দিয়েছেন। পৃথিবীর গর্ভে এগুলো বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কেয়ামত পর্যন্ত নির্গত

হতে থাকবে। মানুষের কাজ এই যে, সে এগুলো ভূ-গর্ভ থেকে বের করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করবে। অতঃপর *سَوَاءٌ لِّلشَّالِيَيْنِ* বাক্যটি অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে *أَرْجَعُ الْآيَاتِ*—এর সাথে সম্পৃক্ত। অর্থ এই যে, এসব মহান সৃষ্টি ঠিক চার দিনে সমাপ্ত হয়েছে। সাধারণের পরিভাষায় যাকে চার বলে দেয়া হয়, তা কোন সময় চার থেকে কম ও কোন সময় চার থেকে কিছু বেশীও হয়ে থাকে। কিন্তু ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে তাকে চারই বলে দেয়া হয়। আয়াতে *سَوَاءٌ* শব্দ যোগ করে এই সম্ভাবনা নাকচ করে বলা হয়েছে যে, একাজ পূর্ণ চার দিনেই হয়েছে। *لِّلشَّالِيَيْنِ*—এর অর্থ এই যে, যারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তাদের জন্যে এই গণনা। ইবনে-জরীর ও দুররে-মনসুরে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীরা এই জিজ্ঞাসা করেছিল। তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব সৃষ্টি ঠিক চার দিনে হয়েছে। —(ইবনে-কাসীর, কুরতুবী, রুহুল-মা'আনী)

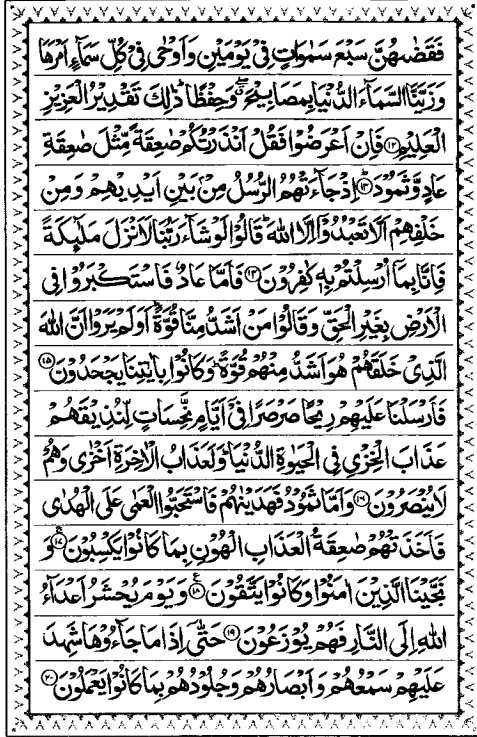
ইবনে-যায়েদ প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ ... وَكَذَٰلِكَ أَتَتْكُمُ الْآيَةُ

لِّلشَّالِيَيْنِ —এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। তারা *سائلين*—এর অর্থ নিয়েছেন, প্রত্যাশী ও অভাবী। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী তাদের উপকারার্থ সৃষ্টি করা হয়েছে। যারা এগুলোর প্রত্যাশী ও অভাবী। প্রত্যাশী ও অভাবী ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে অপরের কাছে সওয়ালের হাত বাড়ায়। তাই তাকে *سائلين* বলে ব্যক্ত করা হয়েছে—(বাহুরে-মুহীত)

ইবনে-কাসীর এ তফসীর উদ্ধৃত করে বলেন, এটা কোরআনের এ আয়াতের অনুরূপ *اعطاكم من كل ما سألتموه* অর্থাৎ, তোমরা যা চেয়েছ, তা সবই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। এখানেও চাওয়ার অর্থ অভাবী হওয়া। চাওয়াই শর্ত নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এসব বস্তু তাদেরকেও দিয়েছেন, যারা চায়নি।

فَقَالَ لَهُمْ وَالَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ لَا فِئَاءَ لِّلَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا تُبَدَّلُ الْأَيُّهُنَ কোন কোন তফসীরবিদের মতে, আকাশ ও পৃথিবীকে এই আদেশ দেয়া এবং প্রত্যুত্তরে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করা আক্ষরিক অর্থে নয়; বরং রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীকে আল্লাহ তা'আলার প্রত্যেক আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত দেখা গেছে। কিন্তু ইবনে আতিয়া ও অন্যান্য অনুসন্ধানী তফসীরবিদ বলেন যে, এখানে কোন রূপক অর্থ নাই; বরং আক্ষরিক অর্থেই বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে সম্বোধন বোঝার চেতনা, অনুভূতি ও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন এবং জওয়াব দেয়ার জন্যে তাদেরকে বাকশক্তিও দান করা হয়েছিল। তফসীরে বাহুরে-মুহীতে এ তফসীরকেই উত্তম বলা হয়েছে।

ইবনে কাসীর এ তফসীর উদ্ধৃত করে কারও কারও এ উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, পৃথিবীর পক্ষ থেকে এই জওয়াব সেই ভূ-খণ্ড দিয়েছিল, যার উপর বায়তুল্লাহ নির্মিত হয়েছে এবং আকাশের সেই অংশ জওয়াব দিয়েছিল, যা বায়তুল্লাহর বরাবরে অবস্থিত এবং যাকে “বায়তুল-মামুর” বলা হয়।



(১২) অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দু' দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর বাসস্থান। (১৩) অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলুন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করলাম এক কঠোর আযাব সম্পর্কে আদ ও সামুদের আযাবের মত (১৪) যখন তাদের কাছে রসূলগণ এসেছিলেন সম্পূর্ণ দিক থেকে এবং পেছন দিক থেকে এ কথা বলতে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও পূজা করো না। তারা বলেছিল, আমাদের পালনকর্তা ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন, অতএব, আমরা তোমাদের অনীত বিষয় অমান্য করলাম। (১৫) যারা ছিল আদ, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করল এবং বলল, আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তির কে? তারা কি লঙ্ঘ্য করেনি যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তির? বস্তুতঃ তারা আমার নির্দর্শনাবলী অস্বীকার করত। (১৬) অতঃপর আমি তাদেরকে পার্শ্ববর্তী জীবনে লাঞ্ছনার আযাব আশ্বাদন করানোর জন্যে তাদের উপর প্রেরণ করলাম বক্ষাবায়ু বেশ কতিপয় অন্তত দিনে। আর পরকালের আযাব তো আরও লাঞ্ছনাকর এমনতাবস্থায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। (১৭) আর যারা সামুদ, আমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছিলাম, অতঃপর তারা সংপথের পরিবর্তে অন্ধ ধাক্কাই পছন্দ করল। অতঃপর তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে অবমাননাকর আযাবের বিপদ এসে পড়ত করল। (১৮) যারা কিনূস স্থাপন করেছিল ও সাবখানে চলত, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম। (১৯) যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে। এবং গুদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। (২০) তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ডুক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا مَرْصُورًا এটা طَيْفَةً এরই ব্যাখ্যা, যা পূর্বের আয়াতে আদ ও সামুদের طَيْفَةً বলে বর্ণিত হয়েছে। طَيْفَةً শব্দের আসল অর্থ অচেতন ও বেবশকারী বস্তু। এ কারণেই বস্তুকেও طَيْفَةً বলা হয়। আকস্মিক বিপদ অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আদ সম্প্রদায়ের উপর চাপানো ঝড়ও একটি طَيْفَةً ছিল। একেই ریح صرصر নামে বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ বক্ষাবায়ু, যাতে বিকট আওয়াজ থাকে। — (কুরত্ববী)

যাহ্যক বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তিন বছর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন। কেবল প্রবল শুষ্ক বাতাস প্রবাহিত হত। অবশেষে আট দিন ও সাত রাত্রি পর্যন্ত উপর্যুপরি তুফান চলতে থাকে। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, এ ঘটনা শাওয়ালের শেষ দিকে এক বুধবার থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বস্তুতঃ যে কোন সম্প্রদায়ের উপর আযাব এসেছে, তা বুধবারেই এসেছে। — (কুরত্ববী, মাযহারী)

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের মঙ্গল চাইলে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং প্রবল বাতাসকে তাদের থেকে নিবৃত্ত রাখেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ কোন জাതിকে বিপদগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের উপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন এবং প্রবল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে।

فَإِذَا لَوْ رَحِمْنَا إِسْلَامًا এরই ব্যাখ্যা, যা পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং প্রবল বাতাসকে তাদের থেকে নিবৃত্ত রাখেন। পক্ষান্তরে আল্লাহ কোন জাতিতে বিপদগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের উপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন এবং প্রবল বাতাস প্রবাহিত হতে থাকে। — (মাযহারী, বয়ানুল-কোরআন)

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا এটা وَزَع থেকে উদ্ভূত। অর্থ বাধা দেয়া, নিষেধ করা। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই নিয়েছেন যে, বিপুল সংখ্যক জাহান্নামীকে হাশরের ময়দান ও হিসাবের জায়গার দিকে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষিপ্ততা এড়ানোর উদ্দেশ্যে অগ্রবর্তী অংশকে থামিয়ে দেয়া হবে, যাতে যারা পেছনে পড়ে, তারাও তাদের সাথে এসে মিলিত হতে পারে, কেউ কেউ এর অনুবাদ করেছেন, তাদেরকে হিসাবের জায়গার দিকে হাকিয়ে, থাক্ক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। — (কুরত্ববী)

سَمِيعًا

২৯০

فَسِاطِرُ

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَقَالُوا الْجُودُ هُوَ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ
الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَرَأَيْتُمْ
تُزَجَّوْنَ ۝ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ
سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ
لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي
ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَنْذَرَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَائِرِينَ ۝ فَإِنْ
يَصْبِرُوا فَالْكَافِرُ يُغْوَىٰ لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ
الْمُعْجِبِينَ ۝ وَقَفَّضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا
خَائِرِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَأَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ
وَالْقَوَائِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَلَمَّا دُبِّرُوا الَّذِينَ
كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَتَجْزِيَنَّهُمْ أَصْوَارُ الَّذِينَ كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝ ذَلِكَ جَزَاءُ عَذَابِ اللَّهِ الشَّارِعَ لَهُمْ فِيهَا
دَارُ الْآخِرَةِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۝

..... وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ
মানুষ গোপনে কোন গোনাহ ও অপরাধ করতে চাইলে অপরের কাছে গোপন করতে পারে, কিন্তু নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাছে গোপন করতে পারে না। যখন একথা জানা যায় যে, আমাদের কর্ণ, চক্ষু, হাত, পা ও দেহের ত্বক আসলে আমাদের নয়; বরং রাজসাক্ষী, তাদেরকে আমাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা সত্য সাক্ষ্য দেবে, তখন গোপনে কোন অপরাধ ও গোনাহ করার কোন পথই উন্মুক্ত থাকে না। সুতরাং এই অপমান থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরাধই না করা। কিন্তু তোমরা যারা তওহীদ ও রেসালত স্বীকার কর না, তোমাদের চিন্তাই এদিকে ধাবিত হয় না যে, তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও কথা বলতে শুরু করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর সামনে সাক্ষ্য দেবে। তবে এতটুকু বিষয় প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম যে, যিনি আমাদেরকে একটি নিকট বস্তু থেকে সৃষ্টি করে শ্রোতা ও চক্ষুস্মান মানুষ করেছেন, লালন-পালন করে পরিণত বয়সে উপনীত করেছেন, তাঁর জ্ঞান কি আমাদের যাবতীয় কর্ম ও অবস্থাকে বেটনকারী হবে না? কিন্তু তোমরা এই জাজ্বল্যমান বিষয়ের বিপরীতে এরূপ বিশাস পোষণ করতে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অনেক কাজ-কর্মের খবর রাখেন না। কাজেই তোমরা কুফর ও শিরক করতে সাহসী হয়েছিলে। বলাবাহুল্য, তোমাদের এ বিশাসই তোমাদেরকে বরবাদ করেছে।

হাশরে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদান : সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠলেন, অতঃপর বললেন, তোমরা জ্ঞান, আমি কি কারণে হেসেছি? আমরা আরয় করলাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই জানেন। তিনি বললেন, আমি সে কথা স্মরণ করে হেসেছি, বা হাশরে হিসাবের জায়গায় বন্দা তার পালনকর্তাকে বলবে। সে বলবে যে পরওয়ারদেগার, আপনি কি আমাকে যুলুম থেকে আশ্রয় দেননি? আল্লাহ বলবেন, অবশ্যই দিয়েছি। তখন বন্দা বলবে, তাহলে আমি আমার হিসাব নিকাশের ব্যাপারে অন্য কারও সাক্ষ্য সন্তুষ্ট নই। আমার অস্তিত্বের মধ্য থেকেই কোন সাক্ষী না দাঁড়ালে আমি সন্তুষ্ট হব না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, كُلُّ شَيْءٍ بِفِيكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسْبًا অর্থাৎ, ভাল কথা, তুমি নিজেই তোমার হিসাব করে নাও। এরপর তার মুখে মোহর এঁটে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে, তোমরা তার ক্রিয়া-কর্ম বর্ণনা কর। এতে প্রত্যেক অঙ্গ কথা বলতে শুরু করবে এবং সত্য সাক্ষ্য দেবে। এরপর তার মুখ খুলে দেয়া হবে। তখন সে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে, অর্থাৎ, তোমরা ধ্বংস হও, আমি তো দুনিয়াতে যাকিছু করেছি, তোমাদেরই সুখের জন্যে করেছি। এখন তোমরাই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে শুরু করলে।

হযরত আবু হোরায়া (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, এ ব্যক্তির মুখে মোহর এঁটে দেয়া হবে এবং উরুকে বলা হবে, তুমি কথা বল এবং তার ক্রিয়াকর্ম বর্ণনা কর। তখন মানুষের উরু, মাংস, অস্থি সকলেই তার কর্মের সাক্ষ্য দেবে। — (মোহহারী)

হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, অনাগত দিন মানুষকে ডেকে বলে, আমি নতুন দিন। তুমি যাকিছু আমার মধ্যে করবে, কেয়ামতের দিন আমি সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেব। তাই তোমার

(২১) তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (২২) তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না — এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। (২৩) তোমাদের পালনকর্তা সম্বন্ধে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ। (২৪) অতঃপর যদি তারা সবার করে, তবুও জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল। আর যদি তারা ওযরখাহী করে, তবে তাদের ওযর কবুল করা হবে না। (২৫) আমি তাদের পেছনে সঙ্গী লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অতঃপর সঙ্গীরা তাদের অগ্র-পশ্চাদের আমল তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছিল। তাদের ব্যাপারেও শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হল, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী জিন ও মানুষের ব্যাপারে। নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত। (২৬) আর কাকেররা বলে, তোমরা এ কোরআন প্রবণ করো না এবং এর আবৃত্তিতে হটগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জরী হও। (২৭) আমি অবশ্যই কাকেরদেরকে কঠিন আযাব আশ্বাদন করাব এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও হীন কাজের প্রতিফল দেব। (২৮) এটা আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি-জাহান্নাম। তাতে তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী আবাস, আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করার প্রতিফলরূপ।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرَنَا الَّذِينَ أَصْلَحُوا مِنَ الْبَرِّ
وَالْإِنِّسِ نَجَعُهَا نَحْنُ أَقْدَامًا يَكُونُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۖ
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ بِالْعِلَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ
تُوعَدُونَ ۖ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِالْعِلَّةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى الْأَنْفُسُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۚ نَزَّلْنَاهُنَّ
غُفُورًا رَّحِيمًا ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۖ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَالْأَسَنَةُ
لَا بِالسَّيِّئَةِ إِذْ هِيَ بِالْأَيْمَنِ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۖ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا
يُلْقِيهَا إِلَّا دُحْرَظٌ عَظِيمٌ ۖ وَإِنَّمَا تَرَفَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ تَرْغُ
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ وَمَنِ الْيَتِيمَ الْبَيْتُ وَالْقَهَّارُ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا سَعِيدٌ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا سَعِيدٌ وَاللَّهُ
الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِذًا تَعْبُدُونَ ۖ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ
عِنْدَ رَبِّكَ يَسْتَعِظُونَ لَهُ بِالْبَاقِلِ وَالنَّارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۖ

ওমর (রাঃ) বলেন- আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় বিধি তথা আদেশ ও নিষেধের উপর অবিচলিত থাকা এবং তা থেকে শৃংগালের ন্যায় এদিক-ওদিক পলায়নের পথ বের না করার নাম **استقامت** — (মায়হারী)

তাই আলেমগণ বলেন, **استقامت** সংক্ষিপ্ত হলেও এতে শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন এবং হারাম ও মকরহ বিষয়াদি থেকে সার্বক্ষণিক বেঁচে থাকা शामिल রয়েছে। তফসীয়ে-কাশাফে আছে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ — একখাটি বলা তখনই শুদ্ধ হতে পারে, যখন অন্তরে বিশ্বাস করা হয় যে, আমি প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক পদক্ষেপেই আল্লাহ তা'আলার প্রশিক্ষণাধীন, তাঁর রহমত ব্যতিরেকে আমি একটি শ্বাসও ছাড়তে পারি না। এর দাবী এই যে, মানুষ এবাদতে অটল-অবিচল থাকবে এবং তার আত্মা ও দেহ কেশাগ্র পরিমাণও আল্লাহর দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হবে না।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ছাফাফী (রাঃ) একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আরম্ভ করলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ), আমাকে এমন এক পূর্ণাঙ্গ বিষয় বলে দিন যা শোনার পর অন্য কারও কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন থাকবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, **استقم** অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের স্বীকারোক্তি কর; অতঃপর তাতে অবিচল থাক। — (মুসলিম) এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, ঈমান ও তার দাবী অনুযায়ী সংকর্মেও অবিচলিত থাক।

এ কারণেই হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) **استقامت**-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন : ফরয কর্মসমূহ আদায় করা। হযরত হাসান বসরী বলেন, **استقامت** এই যে, যাবতীয় কাজে আল্লাহর আনুগত্য কর এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাক। এ থেকে জানা গেল যে, **استقامت** —এর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা তাই, যা উপরে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। জাসসাস ও ইবনে-জরীর এই তফসীর আবুল আলিয়া থেকে উদ্ধৃত করে তাই গ্রহণ করেছেন।

تَتَزَكَّىٰ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ — ফেরেশতাগণের এই অবতরণ ও সন্তোষধন হযরত ইবনে-আব্বাসের উক্তি অনুযায়ী মৃত্যুর সময় হবে। কাতাদাহ বলেন — হাশরে কবর থেকে বের হওয়ার সময় হবে এবং ওকী' ইবনে জাররাহ বলেন, তিন সময়ে হবে — প্রথম মৃত্যুর সময়, অতঃপর কবরের অভ্যন্তরে, অতঃপর হাশরে কবর থেকে উথিত হওয়ার সময়। বাহরে-মুহীতে আবু হাইয়ান বলেন — আমি তো বলি যে, মুমিনদের কাছে ফেরেশতাগণের অবতরণ প্রত্যহ হয় এবং এর প্রতিক্রিয়া ও বরকত তাদের কাজকর্মে পাওয়া যায়। তবে চাক্ষুষ দেখা ও তাদের শোনা উপরোক্ত সময়েই হবে।

হযরত সাবতে বেনানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সূরা হা-মীম সেজদা তেলাওয়াত করতঃ আলোচ্য আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে বললেন, আমি এই হাদীস প্রাপ্ত হয়েছি যে, মুমিন যখন কবর থেকে উথিত হবে, তখন দুনিয়াতে যেসব ফেরেশতা তার সাথে থাকত, তারা এসে বলবে, তুমি ভীত ও চিন্তিত হইয়া না; বরং প্রতিশ্রুত জন্মান্তরে সুসংবাদ শোন। তাদের কথা শুনে মুমিন ব্যক্তি আশুস্ত হয়ে যাবে। — (মায়হারী)

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُوْنَ فَتَسْأَلُوْهُمُ عَنْهَا كَمَا تَسْأَلُوْنَ عَنْ ذٰلِكَ اَنْتُمْ غٰفِرُوْنَ

ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা জান্নাতে মনে যা চাইবে তাই পান্নে এবং যা দাবী করবে তাই সরবরাহ করা হবে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিটি বাসনা পূর্ণ করা হবে — তোমরা চাও বা না চাও। অতঃপর **تُؤْتٰى** তথা আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে

যে, এমন অনেক নেয়ামতও পাবে, যার আকাঙ্ক্ষাও তোমাদের অন্তরে সৃষ্টি হবে না। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বস্তুও আসে যার কল্পনাও পূর্বে করা হয় না, বিশেষতঃ যখন কোন বড় লোকের মেহমান হয়। — (মায়হারী)

হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, জান্নাতে কোন পাখী উড়তে দেখে তোমাদের মনে তার মাংস খাওয়ার বাসনা সৃষ্টি হবে। তৎক্ষণাৎ তা ভাজা করা অবস্থায় সামনে আনীত হবে। কতক রেওয়াজেতে আছে, তাকে আগুন ও ধোঁয়া কোন কিছুই স্পর্শ করবে না। আপন-আপনি রান্না হয়ে সামনে এসে যাবে। — (মায়হারী)

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যদি জান্নাতী ব্যক্তি নিজ গৃহে সন্তান জন্মের বাসনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব, শিশুর দুধ ছাড়ানো এবং যৌবনে পদার্পণ সব এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে। — (মায়হারী)

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّنْ ذٰلِكَ — এটা মুমিনদের দ্বিতীয় অবস্থা। অর্থাৎ তারা কেবল নিজেদের ঈমান ও আমল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না; বরং অপরকেও দাওয়াত দেয়। বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে? এ থেকে বোঝা গেল যে, মানুষের সেই কথাই সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট যাতে অপরকে সত্যের দাওয়াত দেয়া হয়। এতে মুখে, কলমে, অন্য কোনভাবে ইত্যাদি সর্বপ্রকার দাওয়াতই शामिल রয়েছে। আযানদাতাও এতে দাখিল আছে। কেননা, সে মানুষকে নামাযের দিকে আহ্বান করে। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আলোচ্য আয়াত মুয়াযযিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং **وَكَيْفَ صَلَاتِهَا** বাক্যের পর **وَعَلَى اللَّهِ** বলে আযান-একামতের মধ্যস্থলে দু'রাকআত নামায বোঝানো হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আযান ও একামতের মাঝখানে যে দোয়া করা হয়, তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। — (মায়হারী)

হাদীসে আযান ও আযানের জওয়াব দেয়ার অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত রয়েছে। যদি বেতন ও পারিশ্রমিকের দিকে লক্ষ্য না করে খাটিভাবে আল্লাহর ওয়াস্তে আযান দেয়া হয়। — (মায়হারী)

وَلَا تَتَّبِعُوا السَّيِّئَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ এখান থেকে আল্লাহর পক্ষে দাওয়াতকারীদেরকে বিশেষ পথনির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তারা মন্দের জওয়াবে ভাল ব্যবহার করবে এবং সবর ও অনুগ্রহ করবে।

وَلَكُمْ فِيْهَا فَاوِزٌ مِّنْهُنَّ — অর্থাৎ, দাওয়াতকারীরা অতি উত্তম পন্থায় মন্দকে প্রতিহত করবে। এটাই তাদের অভ্যস্ত গুণ হওয়া উচিত যে, মন্দের জওয়াবে মন্দ না করে বরং ক্ষমা করা উত্তম কাজ। অতি উত্তম ক্ষমা এই যে, যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তাকে ক্ষমাও করবে, অধিকন্তু তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন — এই আয়াতের নির্দেশ এই যে, যে ব্যক্তি তোমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে, তার মেঝাবোলায় তুমি সবর কর, যে তোমার প্রতি মূর্খতা প্রকাশ করে, তুমি তার প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন কর এবং যে তোমাকে জ্বালাতন করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর। — (মায়হারী)

রেওয়াজেতে আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি গালি দিল অথবা মন্দ বলল। তিনি জওয়াবে বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও এবং আমি অপরাধী ও মন্দ হই, তবে আল্লাহ তা'আলা যেন আমাকে ক্ষমা করেন। পক্ষান্তরে যদি তুমি মিথ্যা বলে থাক, তবে আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাকে ক্ষমা করেন। — (কুরতুবী)



(৩৯) তাঁর এক নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতঃপর আমি যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন সে শস্যশ্যামল ও সফীত হয়। নিশ্চয় যিনি একে জীবিত করেন, তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। নিশ্চয় তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (৪০) নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে বক্রতা অবলম্বন করে, তারা আমার কাছে গোপন নয়। যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ, না যে কেয়ামতের দিন নিরাপদে আসবে? তোমরা যা ইচ্ছা কর, নিশ্চয় তিনি দেখেন যা তোমরা কর। (৪১) নিশ্চয় যারা কোরআন আসার পর তা অস্বীকার করে, তাদের মধ্যে চিন্তা-ভাবনার অভাব রয়েছে। এটা অবশ্যই এক সম্মানিত গ্রন্থ। (৪২) এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিকে থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৪৩) আপনাকে তো তাই বলা হয়, যা বলা হত পূর্ববর্তী রসূলগণকে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার কাছে রয়েছে ক্ষমা এবং রয়েছে যত্নাদায়ক শাস্তি। (৪৪) আমি যদি একে অনারব ভাষায় কোরআন করতাম, তবে অবশ্যই তারা বলত, এর আয়াতসমূহ পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, কিতাব অনারব ভাষার আর রসূল আরবীভাষী। বলুন, এটা বিশুদীসদের জন্য হেদায়েত ও রোগের প্রতিকার। যারা মুমিন নয়, তাদের কানে আছে ছিপি, আর কোরআন তাদের জন্যে অন্ধকার। তাদেরকে যেন দূরবর্তী স্থান থেকে আহবান করা হয়। (৪৫) আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতে মতভেদ সৃষ্টি হয়। আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত। তারা কোরআন সমুদ্রে এক অবস্থিকর সন্দেহে লিপ্ত। (৪৬) যে সংকর্ষ করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই করে, আর যে অসংকর্ষ করে, তা তার উপরই বর্তাবে। আপনার পালনকর্তা বন্দাদের প্রতি যাটেই যুলুম করেন না।

لَا تَجْعَلُوا — এ আয়াত থেকে

প্রমাণিত হয় যে, সেজদা একমাত্র জগৎপন্থী আল্লাহরই প্রাপ্য। তিনি ব্যতীত কোন নক্ষত্র অথবা মানব ইত্যাদিকে সেজদা করা হারাম। এই সেজদা এবাদতের নিয়তে হোক অথবা নিছক সন্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হোক, সর্বাবস্থায় উম্মতের ইজমাবলে এটি হারাম। পার্থক্য এই যে, কেউ এবাদতের নিয়তে সেজদা করলে সে কাফের হয়ে যাবে এবং কেউ নিছক সন্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সেজদা করলে তাকে কাফের বলা হবে না, কিন্তু হারামকারী ও ফাসেক বলা হবে।

এবাদতের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সেজদা করা কোন উম্মত ও শরীয়তে হালাল ছিল না। কেননা, এটা শিরক এবং প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তেই শিরক ছিল হারাম। তবে সন্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সেজদা করা পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে বৈধ ছিল। পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে হযরত আদমকে সেজদা করার আদেশ সমস্ত ফেরেশতাকে দেয়া হয়েছিল। ইউসুফ (আঃ) কে তাঁর পিতা ও ভ্রাতাগণ সেজদা করেছিল। কোরআনে এর উল্লেখ আছে। কিন্তু ফেকাহবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইসলামে এই আদেশ রহিত করা হয়েছে এবং আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সেজদা করা সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়েছে।

وَمَنْ لَّا يَسْجُدْ — এ বিষয়ে ফেকাহবিদগণ একমত যে, এ সূরাতে তেলাওয়াতের সেজদা ওয়াজিব, কিন্তু কোন্ আয়াতে ওয়াজিব এতে মতভেদ রয়েছে। কাযী আবু বকর আহকামুল কোরআনে লিখেন, হযরত আলী ও ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রথম আয়াত অর্থাৎ, **إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** এর শেষে সেজদা করতেন। ইমাম মালেক তাই অবলম্বন করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ, **لَا تَسْجُدُوا** —এর শেষে সেজদা করতেন। হযরত ইবনে ওমরও তাই বলেছেন। এ কারণে মসরুক, আবু আবদুর রহমান, ইবরাহীম নখয়ী, ইবনে সিরীন, কাতাদাহ প্রমুখ ফেকাহবিদগণ দ্বিতীয় আয়াত শেষেই সেজদা করতেন। আহকামুল কোরআনে আরও বলা হয়েছে, হানাফী মযহাবের আলেমগণও তাই বলেন। এ মতভেদের কারণে দ্বিতীয় আয়াত শেষে সেজদা করা ই সাবধানতার প্রতীক। কেননা, আসলে প্রথম আয়াতে সেজদা ওয়াজিব হলে তখন তাও আদায় হয়ে যাবে এবং দ্বিতীয়টিতে ওয়াজিব হলেও আদায় হয়ে যাবে।

আনুষ্ঠানিক স্ফাতব্য বিষয়

কুম্বরের বিশেষ প্রকার ‘এলহাদ’-এর সংজ্ঞা ও বিধান : **إِنَّ**

الَّذِينَ يُبْعِدُونَ فِي الْبَيْنِ — এর পূর্বের আয়াতে যারা রেসালত ও তওহীদকে খোলাখুলি অস্বীকার করত, তাদেরকে শাসনো হয়েছিল এবং তাদের আযাব বর্ণনা করা হয়েছিল। এখান থেকে অস্বীকারের এক বিশেষ প্রকার এলহাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। **الحد و الحد** —এর আভিধানিক অর্থ একদিকে বন্ধে পড়া। এক পার্শ্বে খনন করা, কবরকেও এ কারণেই **حد** বলা হয়। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় কোরআনী আয়াত থেকে পাশ কাটিয়ে যাওয়াকে এলহাদ বলা হয়। খোলাখুলি পাস কাটিয়ে যাওয়া, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে উভয়টিতে এলহাদ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণভাবে এলহাদ হচ্ছে কোরআন ও তার আয়াতসমূহের প্রতি বাহ্যতঃ ইমান দাবী করা, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কোরআন, সুন্নাহ ও অধিকাংশ উম্মতের বিপরীত অর্থ বর্ণনা করা, যদ্বারা

কোরআনের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এলহাদের অর্থ তাই বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, **الاحاد هو وضع الكلام على غير موضعه** আয়াতের **لَا يَجْعَلُونَ** বাক্যটিও এ অর্থের ইঙ্গিত বহন করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, এলহাদ এমন একটি কুফর, যাকে তারা গোপন করতে চাইত। তাই আল্লাহ বলেছেন যে, তারা আমার কাছে তাদের কুফর গোপন করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াত স্পষ্ট ব্যক্ত করছে যে, কোরআনের আয়াতকে প্রকাশ্য ভাষায় অস্বীকার করা অথবা অসত্য অর্থ বর্ণনা করে কোরআনের বিধানাবলীকে বিকৃত করার চেষ্টা করা সবই কুফর ও গোমরাহী।

সারকথা এই যে, এলহাদ এক প্রকার কপটতামূলক কুফর। অর্থাৎ, মুখে কোরআন ও কোরআনের আয়াতসমূহ যেনে নেয়ার দাবী ও স্বীকারোক্তি করা, কিন্তু আয়াতসমূহের এমন মনগড়া অর্থ বর্ণনা করা, যা কোরআন ও সূন্যাহর অন্যান্য বর্ণনা ও ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) কিতাবুল খেরাজে বলেন, **كذلك الزنادقة الذين يلدون وقد كانوا يظهرون الاسلام** সে যিদ্দিকরাও তেমনি, যারা এলহাদ করে এবং মুখে মুসলমানিত্বের দাবী করে।

এ থেকে জানা যায় যে, মূলহিদ ও ফিল্কীক সম-অর্থে এমন কাফেরকে বলা হয়, যে মুখে ইসলাম দাবী করলেও প্রকৃতপক্ষে আয়াতসমূহের কোরআন, সূন্যাহ ও ইজমা বিরোধী মনগড়া অর্থ বর্ণনা করার অজুহাতে ইসলামের বিধানাবলীকে পাশ কাটিয়ে চলে।

একটি বিজ্ঞানির অবসান : আকায়েদের কিতাবসমূহে এ নিয়ম বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোন অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুফরী বাক্য অবলম্বন করে, সে কাফের নয়। এখন এ নীতিটি যদি ব্যাপক অর্থে নেয়া হয় যে, যে কোন অকাটা ও নিশ্চিত বিধানে অর্থ উদ্ভাবন করলেও এবং যে কোন ধরনের অসত্য অর্থ উদ্ভাবন করলেও কাফের হবে না, তবে দুনিয়াতে মুশরিক, প্রতিমা-পূজারী ও ইহুদী-খ্রীষ্টানদের মধ্যে কাউকেই কাফের বলা যায় না। কেননা, প্রতিমা-পূজারী মুশরিকদের অর্থ উদ্ভাবন তো কোরআনে উল্লেখিত আছে যে, **مَا تَعْبُدُونَ إِلَّا الْإِطْلَاقَ**

إِلَى اللَّهِ وَلِئَالِي অর্থাৎ, আমরা প্রকৃতপক্ষে প্রতিমাদের পূজা এজন্যে করি যাতে তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল করে দেয়। অতএব, প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহরই এবাদত করি। কিন্তু কোরআন তাদের উদ্ভাবিত এ অর্থ বর্ণনা সত্ত্বেও তাদেরকে কাফেরই বলেছে। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের অর্থ বর্ণনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত, কিন্তু কোরআন ও সূন্যাহর বর্ণনায় এতদসত্ত্বেও তাদেরকে কাফের বলা হয়েছে। সূতরাং বোঝা গেল যে, অর্থ উদ্ভাবনকারীকে কাফের না বলার ভাবার্থ ব্যাপক নয়।

এ কারণেই আলেম ও ফেকাহবিদগণ বলেন যে, অর্থ উদ্ভাবনের কারণে কাউকে কাফের বলা যায় না, তার জন্যে শর্ত এই যে, তা ধর্মের জরুরী বিষয়াদিতে অকাটা অর্থের বিপরীতে না হওয়া চাই। ধর্মের জরুরী বিষয়াদির শানে ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তি পরস্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বিষয়াদি, যেগুলো সম্পর্কে অশিক্ষিত মুর্থ মহলও ওয়াকিফহাল, যেমন পাণ্ডেপাণা নামায ফরয হওয়া, ফজরের দু'রাকআত ও যোহরের চার রাকআত ফরয হওয়া, রমযানের রোযা ফরয হওয়া; সুদ, মদ ও শূকর হারাম হওয়া ইত্যাদি। যদি কোন ব্যক্তি এসব বিষয় সম্পর্কে কোরআনের আয়াতে এমন কোন অর্থ উদ্ভাবন করে, যদ্বারা মুসলমানদের

মধ্যে ব্যক্তি পরস্পরায় প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ পাণ্টে যায়, তবে সে নিশ্চিতরূপেও সর্বসম্মতভাবে কাফের হয়ে যাবে। কেননা, এটা প্রকৃত-প্রস্তাবে রসুল্লাহ (সাঃ)-এর শিক্ষাকে অস্বীকার করার নামান্তর। অধিকাংশ আলেমের মতে ঈমানের সংজ্ঞাই এই যে, **تصديق النبي صلى** এমন সব বিষয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর সত্যায়ন করা, যেগুলোর বর্ণনা ও আদেশ জাঙ্ঘল্যমানরূপে তাঁর কাছ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। অর্থাৎ, আলেমগণ তো জানেনই — সর্বসাধারণও জানে।

কাজেই এর বিপরীতে কুফরের সংজ্ঞা এই যে, রসুল্লাহ (সাঃ) নিশ্চিত ও জাঙ্ঘল্যমানরূপে যেসব বিষয় নিয়ে আগমন করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোনটিকে অস্বীকার করা।

অতএব, যে ব্যক্তি ধর্মের জরুরী বিষয়াদিতে অর্থ উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিধান পরিবর্তন করে, সে রসুল্লাহ (সাঃ)-এর আনীত শিক্ষাকেই অস্বীকার করে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَكَبَاحَةٌ فَعُوقُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ - অধিকাংশ

তফসীরবিদ বলেন, এ আয়াতে **ذَكَرَ** বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। ব্যাকরণের দিক দিয়ে **إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ** বাক্যটি পূর্ববর্তী **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا** বাক্য থেকে **بَلَدٌ** হয়েছে। কাজেই উভয় বাক্যের একই বিশান হবে এবং সারমর্ম হবে এই যে, তারা আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না। বিধায় আযাব থেকেও বাঁচতে পারবে না।

لَا يَأْتِيهِمُ الْإِطْلَاقُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَلَا مِنْ خَلْفِهِمْ এতে বর্ণিত হয়েছে

যে, কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত। কাতাদাহ ও সুদী বলেন, আয়াতে **بِاطِلٌ** বলে শয়তানকে বোঝানো হয়েছে এবং সম্পূর্ণ দিক ও পশ্চাদিক বলে সমস্ত দিক বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শয়তান কোনদিক থেকেই এ কিতাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং এতে কোনরূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না।

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, জিন অথবা মানব কোন প্রকার শয়তানই কোরআনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সক্ষম নয়। রাকফী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ কোরআনে দশটি পারা এবং কেউ কেউ বিশেষ আয়াত সংযোজন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আবু-হাইয়ান বলেন, বাতিল শব্দটি কেবলমাত্র শয়তানের জন্যেই প্রযোজ্য নয়; বরং শয়তানের পক্ষ থেকে হোক অথবা অন্য কারও পক্ষ থেকে হোক, যে কোন বাতিল কোরআনে প্রবর্তিত হতে পারে না। অতঃপর তিনি তাবারীর বরাত দিয়ে আয়াতের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, কোন বাতিলপন্থীর সাধ্য নেই যে, সামনে এসে এ কিতাবে কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করে। এমনভাবে পেছন দিক থেকে গোপনে এসে এর অর্থ বিকৃত করার ও এলহাদ করার সাধ্যও কারও নেই।

তাবারীর তফসীর এ স্থানের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, কোরআনে এলহাদ ও পরিবর্তনের পথ দু'টিই - এক খোলাখুলিভাবে কোরআনে কোন পরিবর্তন করার চেষ্টা করা। একে **مَنْ يَنْتَهِ** বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই বাহ্যতঃ ঈমান দাবী করা, কিন্তু গা ঢাকা দিয়ে অসত্য অর্থ সংযোজনের মাধ্যমে কোরআনের অর্থ পরিবর্তন সাধন করা। একে **وَلَا يَنْتَهِ** বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সারকথা এই যে, এ কিতাব আল্লাহর কাছে সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত। এর ভাষায় পরিবর্তন বা পরিবর্ধন

করার শক্তি যেমন কারও নেই, তেমনি এরঅর্থ সম্ভার বিকৃত করে বিধানাবলীর পরিবর্তন করার সাধ্যও কারও নেই। যখনই কোন হতভাগা এরূপ করার ইচ্ছা করেছে, তখনই সে লালিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং কোরআন তার নাপাক কৌশল থেকে পাক-পবিত্র রয়েছে। কোরআনের ভাষায় যে পরিবর্তন করার উপায় নেই, তা প্রত্যেকে দেখে এবং বোঝে। কোরআন চৌদ্দশ বছর অবধি সারা বিশ্বে পঠিত হচ্ছে এবং লাখো মানুষের বুক সংরক্ষিত আছে। কেউ একটি যের ও যবরে ভুল করলেও বৃদ্ধ থেকে নিয়ে বালক পর্যন্ত এবং আলেম থেকে নিয়ে জাহেল পর্যন্ত লাখো মুসলমান তার ভুল ধরার জন্যে দাঁড়িয়ে যায়। **وَأَنَّكَ الْكُفُّونَ** বলে আল্লাহ তা'আলা কেবল কোরআনের ভাষা সংরক্ষণের দায়িত্বই নেননি; বরং এর অর্থ-সম্ভারের হেফাজত করাও আল্লাহ তা'আলারই দায়িত্ব। তিনি আপন রসূল ও তাঁর প্রত্যক্ষ শাগরেদ অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে কোরআনের অর্থ-সম্ভার এমন সংরক্ষিত করে দিয়েছেন যে, কোন বেদ্বীন-মূলহেদ অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে এতে পরিবর্তন সাধন করতে চাইলে সর্বত্র সর্বঘূর্ণে হাজারো আলেম তা খণ্ডনে প্রবৃত্ত হয়ে যান। ফলে সে ব্যর্থ ও অপমানিত হয়। সত্য বলতে কি, **وَأَنَّكَ الْكُفُّونَ** বাক্যে **كَ**-এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে এবং কোরআন কেবল ভাষার নাম নয়; বরং ভাষা ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমষ্টিকে কোরআন বলা হয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, যারা বাহ্যতঃ মুসলমান তারা খোলাখুলিভাবে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু আয়াতসমূহে অসত্য অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অকাট্য বর্ণনার বিপরীত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। তাদের এ ধরনের পরিবর্তন থেকেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের হেফাজত করেছেন। ফলে কারও মনগড়া অর্থ প্রসার লাভ করতে পারে না। কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা এবং আলেমগণ তার মুখোশ উন্মোচিত করে দেন। সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী কেয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এমন দল থাকবে, যারা পরিবর্তনকারীদের পরিবর্তনের মুখোশ উন্মোচিত করে কোরআনের সঠিক অর্থ জনসমক্ষে ফুটিয়ে তুলবে। তারা মানুষের কাছে নিজেদের কুফর যতই গোপন করুক, আল্লাহর কাছে গোপন করতে

পারবে না। আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সতর্ক, তখন তাদের এ অপকর্মের শাস্তি ভোগ করাও অপরিহার্য।

أَعْلَمُ بِمَا تُكْرِمُونَ — আরব ব্যতীত দুনিয়ার অপর জাতিসমূহকে ‘আজম’ বলা হয়। যদি শব্দটির প্রথমে আলিফ যোগ করে **اعجم** বলা হয়, তবে এর অর্থ হয় অপ্রাজ্ঞল বাক্য। তাই যে ব্যক্তি আরবী নয়, তাকে আজমী বলা হবে, যদিও সে প্রাজ্ঞল ভাষা বলে। বস্তুতঃ **اعجم** বলা হবে তাকেই, যে ব্যক্তি প্রাজ্ঞল ভাষা বলতে পারে না। — (কুরতুবী)

আয়াতের মর্মার্থ এই যে, আমি যদি আরবী ভাষা ব্যতীত অপর কোন ভাষায় কোরআন নাখিল করতাম, তবে কোরায়শরা অভিযোগ করত যে, এ কিতাব আমরা বুঝি না। তারা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলত, রসূল তো আরবী আর কিতাব হল কিনা অনারব, অপ্রাজ্ঞল ভাষায়।

فَلَوْلَاذِيْنَ اٰتٰوْهُمُ الْكِتٰبَ — এখানে কোরআনের দু'টি গুণ ব্যক্ত হয়েছে — (এক) কোরআন হেদায়েত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করে। (দুই) কোরআন আরোগ্যদানকারী। কুফর, শিরক, অহংকার, হিন্সা, লোভ-লালসা ইত্যাদি আত্মিক রোগ যে কোরআনের মাধ্যমে নিরাময় হয়, তা বলাই বাহুল্য। কোরআন বাহ্যিক ও দৈহিক রোগেরও প্রতিকার। অনেক দৈহিক রোগের চিকিৎসা কোরআনী দোয়া দ্বারা হয় এবং সফলও হয়।

أُولَٰئِكَ يَنْتَظِرُونَ مِنْكُمْ يَوْمَ الْبَيْتِ এটা একটা দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি কথা বোঝে, অনারবরা তাকে বলে **انت تسمع من قريب** অর্থাৎ, তুমি নিকটবর্তী স্থান থেকে শুনছ। আর যে কথা বোঝে না, তাকে বলে **انت تنادي من بعيد** অর্থাৎ, তোমাকে দূর থেকে ডাকা হচ্ছে। — (কুরতুবী)

উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেহেতু কোরআনের নির্দেশাবলী শোনার ও বোঝার ইচ্ছা রাখে না, তাই তাদের কান যেন বধির এবং চক্ষু অন্ধ। তাদেরকে হেদায়েত করা এমন, যেমন কাউকে অনেক দূর থেকে ডাক দেয়া, ফলে তার কানে আওয়াজ পৌছে না এবং সে সাড়া দিতে পারে না।

حَمْدُ السَّعَادَةِ

৩৮৩

المية ২৫

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَذَادُوا عَزِيْزٍ অর্থাৎ, কাফের লোকদের অভ্যাস এই যে,

আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কোন নেয়ামত, ধন-সম্পদ, ইচ্ছত ও নিরাপত্তা দিলে সে তাতে মগ্ন ও বিভোর হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে আরও দূরে চলে যায় এবং তার অহংকার ও উদাসীনতা আরও বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে সে কোন বিপদের সম্মুখীন হলে আল্লাহ্র কাছে সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে। সুদীর্ঘ দোয়াকে এখানে **عَزِيْزٍ** অর্থাৎ, প্রশস্ত দোয়া বলা হয়েছে। এতে আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে। কেননা, যে বস্তুর প্রশস্ত ও বড়, তা যে দৈর্ঘ্যও বড় হবে, তা আপনা-আপনিই বোঝা যায়। এ কারণেই জান্নাতের বিস্তৃতি বর্ণনা করার ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'আলা **عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ** বলেছেন। অর্থাৎ, জান্নাত এত বিস্তৃত যে, তার প্রস্থের মধ্যে সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীর সংকুলান হয়ে যায়।

সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, দোয়ার মধ্যে কাকূতি-মিনতি, কান্নাকাটি ও বার বার বলা উত্তম। — (বোখারী, মুসলিম) সেমতে দীর্ঘ দোয়া করা প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু এখানে কাফেরদের নিন্দা দীর্ঘ দোয়ার কারণে করা হয়নি; বরং তার এ সামগ্রিক অভ্যাসের কারণে করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নেয়ামত পেলেই সে অহংকারে মেতে উঠে এবং বিপদের সম্মুখীন হলেই দুঃখ বর্ণনা করে ফিরে। এতে তার উদ্দেশ্য দোয়া নয়; বরং হা-হতাশ করা ও মানুষের কাছে তা গেয়ে ফেরা।

سُرِّيْهِمْ الْيَتَانِي الْاَفَاكِي وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ, আমি আমার

কুদরত ও তওহীদের নিদর্শনাবলী তাদেরকে দেখাই বিশৃঙ্খলভাবে এবং তাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেও। **افكى افان** — এর বহুবচন, অর্থ দিগন্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বিশৃঙ্খলতার ছোট-বড় সৃষ্টি তথা আকাশ, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যে কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা আল্লাহ্র অস্তিত্ব, তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান ও কুদরত এবং তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দেয়। এর চাইতে আরও নিকটবর্তী বস্তু স্বয়ং মানুষের প্রাণ ও দেহ। তার এক একটি অঙ্গ এবং তাতে কর্মরত সৃষ্টি ও নাজুক যন্ত্রপাতির মধ্যে তার আরাম ও সুখের বিস্ময়কর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতিকে এমন মজবুত করা হয়েছে যে, সন্তর-আশি বছর পর্যন্তও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। মানুষের গ্রন্থিসমূহে যে শিথিল লাগানো হয়েছে, তা মানুষের তৈরী হলে ইস্পাত নির্মিত শিথিল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খতম হয়ে যেত। মানুষের হাতের চামড়া এবং তাতে অঙ্কিত রেখাও সারা জীবনে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এসব ব্যাপারে যদি সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও চিন্তা-ভাবনা করে, তবে সে এ বিশ্রাসে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, তার অবশ্যই একজন স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা আছেন, যার জ্ঞান ও কুদরত অসীম এবং যার কোন সমকক্ষ হতে পারে না।

تَبَرَّكَ اللهُ أَحْسَنُ الْوَالِدِيْنَ

সূরা হা-মীম সেজদাহ সমাপ্ত

اَلَيْسَ بِرُكُوْعٍ عَلٰمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخٰوِزُهُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ
اَلْاَمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اَثَرٍ وَلَا تَرٰعُهَا اَلْاَبْعَالُ وَتَوِيْمُ
يُنَادِيَهُمْ اَنْ شُرَكَاءِيْ قَالُوْا اَلَّذٰلِكَ مَا مِثْلَانِ شَهِيْدٌ
وَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَدْعُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوْا مَا لَهُمْ مِنْ
مَّخِيْضٍ ۝ اَلَيْسَ الْاِنْسَانُ مِنْ دَعَاۤءِ الْخَيْرِ وَاِنْ مَسَّهُ الشُّرُّ
فَيُتَوَسَّسُ فَوْطُوْا ۝ وَلٰكِنْ اَدْعٰهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْۢ بَعْدِ ضَرٰرٍ
مِّنْهُ لِيَقُوْلَ لِهٰذَا الَّذِيْ وَاٰتٰنَا السَّاعَةَ فَاَلَيْمَةُ تَوَدُّ اَنْ
تُرْجِعَ اِلٰى رَبِّيْ اِنْ اِلٰى عِنْدَهُ لَلْحُسْنٰى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِاٰمَانِعِلُوْا وَلَنَذِيْقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ۝ وَاِذَا
اَتَمَمْنَا عَلٰى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَارِجَانِيْهِ وَاِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ
فَذَادُوا عَزٰى ۝ عَزِيْزٌ ۝ قُلْ اَرَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ
ثَمَرٌ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْۢ بَعْدِ اِمْلَاقٍ هُوَ فِيْ شِقَاقٍ ۝ اَعْيٰبُ ۝
سُرِّيْهِمْ الْيَتَانِي الْاَفَاكِي وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَّبِعُنَ لَهُمُ
اِنَّهُ الْحَقُّ اَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنْكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِِيْدٌ ۝ اَلَا
اَتَعْمُرُنِيْ مَرْيَةَ مِنْ لِّقَآءِ رَبِّيْهِمْ اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ ۝

(৪৭) কেয়ামতের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই জানা। তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন ফল আধারমুক্ত হয় না এবং কোন নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, আমার শরীকরা কোথায়? সেদিন তারা বলবে, আমরা আপনাকে বলে দিয়েছি যে, আমাদের কেউ এটা স্বীকার করে না। (৪৮) পূর্বে তারা যাদের পূজা করত, তারা উধাও হয়ে যাবে এবং তারা বুঝে নেবে যে, তাদের কোন নিকৃতি নেই। (৪৯) মানুষ উন্নতি কামনায় ক্লান্ত হয় না; যদি তাকে অমঙ্গল স্পর্শ করে, তবে সে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে পড়ে; (৫০) বিপদাপদ স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার অনুগ্রহ আশ্বাদন করাই, তখন সে বলতে থাকে, এটা যে আমার যোগ্য প্রাপ্য; আমি মনে করি না যে, কেয়ামত সংঘটিত হবে। আমি যদি আমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাই, তবে অবশ্যই তার কাছে আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে। অতএব, আমি কাফেরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করব এবং তাদেরকে অবশ্যই আশ্বাদন করাব কঠিন শাস্তি। (৫১) আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সুদীর্ঘ দোয়া করতে থাকে। (৫২) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়, অতঃপর তোমরা একে অমান্য কর, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? (৫৩) এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়? (৫৪) শুনে রাখ, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত রয়েছে। শুনে রাখ, তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।

التوراة

২৪২

المائدة

সূরা আশ-শূরা

يَنْظُرُونَ —এতে হাদীসের বরাত দিয়ে উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাদের বোঝার চাপে আকাশে এমন আওয়াজ সৃষ্টি হয়, যেমন কোন বস্তুর উপর ভারী বোঝা পতিত হলে সৃষ্টি হয়। এতে বোঝা গেল যে, ফেরেশতাদের ওজন আছে এবং তা ভারী। এটা অবাস্তবও নয়। কেননা, এটা স্বীকৃত যে, ফেরেশতাগণও দেহবিশিষ্ট যদিও তা খুব সুক্ষ্ম। বহুসংখ্যক সুক্ষ্ম দেহও একত্রিত হলে ভারী হওয়া অসম্ভব নয়।—(বয়ানুল—কোরআন)।

أَمْرِ الْقُرْأَى . لَنْتُنْزِلَ أَمْرَ الْقُرْأَى এর অর্থ সকল জনপদ ও শহরের মূল ও ভিত্তি। এখানে মক্কা মোকাররম বোঝানো হয়েছে। এই নামকরণের হেতু এই যে, এ শহরটি সমগ্র বিশ্বের শহর-জনপদ এমনকি ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ। মুসনাদে আহমদের রেওয়াজে আদী ইবনে হামরা যুহরী বলেন, রসুলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করছিলেন এবং হামরা নামক স্থানে ছিলেন তখন আমি শুনেছি তিনি মক্কাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

انك خير ارض الله واحب ارض الله الى ولولا انى اخرجت منك ماخرجت —তুমি আমার কাছে আল্লাহ তাআলার সমগ্র পৃথিবী থেকে শ্রেষ্ঠ এবং সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা অধিক প্রিয়। যদি আমাকে তোমার থেকে বহিষ্কার করা না হত, তবে আমি কখনও স্বেচ্ছায় তোমাকে ত্যাগ করতাম না।

وَمِنْ حَوْلِهَا —অর্থাৎ, মক্কা মোকাররম আশপাশ। এর অর্থ আশপাশের আরব দেশসমূহও হতে পারে এবং পূর্ব-পশ্চিম বিশ্বও হতে পারে।

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمَهُ إِلَى اللَّهِ — অর্থাৎ, যে

ব্যাপারে ও যে কাজে তোমাদের পারস্পরিক মতভেদ হয়, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছেই সমর্পিত রয়েছে। কেননা, আল্লাহর ফয়সালাই আসল ফয়সালা। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে **إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ** —অন্যান্য অধিকাংশ আয়াতে রসুলের এবং কোন কোন আয়াতে শাসকবর্গের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেসব আয়াত এর পরিপন্থী নয়। কেননা, রসুল ও শাসকবর্গের ফয়সালা একদিক দিয়ে আল্লাহ তাআলারই ফয়সালা হয়ে থাকে। তাঁরা ওহীর মাধ্যমে অথবা কিতাব ও সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করলে তা আল্লাহর ফয়সালা হওয়া সুস্পষ্ট। আর যদি তাঁরা ইজতিহাদ দ্বারা ফয়সালা করেন, তবে ইজতিহাদের ভিত্তিও কোরআন ও সুন্নাহ হয়ে থাকে। তাই এ ফয়সালাও প্রকാരান্তরে আল্লাহ তাআলারই ফয়সালা। মুজতাহিদগণের ইজতিহাদও এদিক দিয়ে খোদায়ী বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই আলেমগণ বলেন, কোরআন ও সুন্নাহ বোঝার যোগ্যতা রাখে না, এমন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে মুফতীর ফতোয়াই শরীয়তের বিধান।

সূরা আশ-শূরা

মক্কা অবতীর্ণ, আয়াত ৫৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহর নামে শুরু

- (১) হা-যীম, (২) আইন, সীন, ক্বা-ফ। (৩) এমনভাবে পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। (৪) নভোমণ্ডলে যা কিছু আছে এবং ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর। তিনি সমুদ্র, মহান। (৫) আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় আর তখন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। শুনে রাখ, আল্লাহই ক্ষমশালী, পরম করুণাময়। (৬) যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। আপনার উপর নয় তাদের দায়-দায়িত্ব। (৭) এমনভাবে আমি আপনার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন নাখিল করেছি, যাতে আপনি মক্কা ও তার আশ-পাশের লোকদের সতর্ক করেন এবং সতর্ক করেন সমাবেশের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল জ্ঞানীরাও এবং একদল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (৮) আল্লাহ ইচ্ছা করলে সমস্ত লোককে এক দলে পরিণত করতে পারেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। আর যালেমদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। (৯) তারা কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক স্থির করেছে? পরন্তু আল্লাহই তো একমাত্র অভিভাবক। তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। (১০) তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে সোপর্দ। ইনিই আল্লাহ—আমার পালনকর্তা। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তাঁরই অতিমুখী হই।

فَاطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 مِنَ الْأَنْحَامِ أَزْوَاجًا ذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَيْفَ شَيْءٌ وَهُوَ
 السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ
 الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ يُجِزِلُ شَيْءٌ عَلَيْهِمْ سِرٌّ لَكُمْ
 مِنَ الَّذِينَ مَاطِطِي بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا
 وَصَّيْنَاهُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ
 لَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَهُهُ اللَّهُ
 يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝ وَمَا
 تَقْرَأُوا مِنَ الْأَمْرِ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا لِيَهُمْ وَلَوْلَا
 كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ
 إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَقَدْ لَعَنُوا مِنْهُ رَبِّي ۝
 وَلَئِنْ لَكَ فَادِرٌ أَسْتَوِمُّكُمْ لَمَّا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَهُمْ
 وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمَرْتُ لِأَعْدِلَ
 بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَشِيدٌ وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالٌ وَلَكُمْ أَعْمَالٌ لَكُمْ لَا
 حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْعَلُ بَيْنَنَا وَاللَّهِ الْبَصِيرُ ۝

(১১) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুশদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনে, সব দেখেন। (১২) আকাশ ও পৃথিবীর চাৰি তাঁর কাছে। তিনি যার জন্যে ইচ্ছা রিমিক বৃদ্ধি করেন এবং পরিমিত করেন। তিনি সব বিষয়ে জ্ঞানী। (১৩) তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না। আপনি মূশরেকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আমন্ত্রণ জানান, তা তাদের কাছে দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে পথ প্রদর্শন করেন। (১৪) তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা পারস্পরিক বিভেদের কারণে মতভেদ করে। যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত রয়েছে। (১৫) সূতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং হুকুম অনুযায়ী অবিলম্ব থাকুন; আপনি তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করবেন না। বলুন, আল্লাহ্ যে কিতাব নামিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্ আমাদের পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। আমাদের জন্যে আমাদের কর্ম এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম। আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে বিবাদ নেই। আল্লাহ্ আমাদেরকে সমবেত করবেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন হবে।

سِرٌّ لَكُمْ مِنَ الَّذِينَ مَاطِطِي بِهِ نُوحًا — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার প্রদত্ত বাহ্যিক ও দৈহিক নেয়ামত উল্লেখিত হয়েছিল। এখান থেকে আধ্যাত্মিক নেয়ামতসমূহের বর্ণনা শুরু হচ্ছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে এক মজবুত ও সুদৃঢ় ধর্ম দান করেছেন, যা সমস্ত পয়গম্বরেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত ধর্ম। আয়াতে পাঁচ জন পয়গম্বরের উল্লেখ রয়েছে। সর্বপ্রথম নূহ (আঃ) ও সর্বশেষ আমাদের রসূল (সাঃ) এবং মাঝখানে পয়গম্বরগণের পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) —এর নাম উল্লেখ রয়েছে। কুফর ও শিরক সত্ত্বেও আরবের লোকেরা হযরত ইবরাহীম (আঃ) —এর নবুওয়ত স্বীকার করত। কোরআন অবতরণের সময় হযরত মুসা ও ঈসা (আঃ) —এর ভক্ত ইহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম (আঃ) —এর পরে এ দু'জন পয়গম্বরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আযহাবেও পয়গম্বরগণের অঙ্গীকার গ্রহণ প্রসঙ্গে এ পাঁচ জন পয়গম্বরেরই নাম উল্লেখিত হয়েছে।

وَلَا تَخْذَلْهُمْ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَمِنْكُمْ وَمِنْهُمْ — পার্থক্য এই যে, সূরা আযহাবে শেষ নবী (সাঃ) —এর নাম প্রথমে এবং নূহ (আঃ) —এর নাম শেষে রয়েছে। এতে সম্ভবত : ইঙ্গিত রয়েছে যে, খাতামুল আশিয়া (সাঃ) যদিও আবির্ভাবের দিক দিয়ে সবার শেষে এসেছেন কিন্তু নবুওয়ত বটনে সবার অগ্র। এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমি সৃষ্টি ক্ষেত্রে সকল পয়গম্বরের অগ্রবর্তী এবং আবির্ভাবে শেষে। — (ইবনে মাজা, দারেমী)

এখন প্রশ্ন হয় যে, হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম পয়গম্বর। তাঁর নামের উল্লেখের দ্বারা পয়গম্বরগণের আলোচনা শুরু করা হল না কেন? জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে আগমনকারী সর্বপ্রথম পয়গম্বর ছিলেন আদম (আঃ)। মৌলিক বিশ্বাস ও ধর্মের প্রধান প্রধান বিষয়াদিতে তিনিও অভিন্ন ছিলেন, কিন্তু তাঁর আমলে মানুষের মধ্যে কুফর ও শিরক ছিল না। কুফর ও শিরকের সাথে দুন্দু হযরত নূহ (আঃ) —এর আমল থেকে শুরু হয়েছে। কাজেই এ ধরনের গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার দিক দিয়ে নূহ (আঃ) —ই প্রথম পয়গম্বর। তাই তাঁর মাধ্যমেই পয়গম্বরগণের আলোচনা শুরু করা হয়েছে।

أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ — এটা পূর্ববর্তী বাক্যেরই ব্যাখ্যা।

অর্থাৎ, যে দ্বীন বা ধর্মমতে পয়গম্বরগণ সকলেই অভিন্ন ও এক, সে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখ, তাতে বিভেদ ও অনৈক্য বৈধ নয়; বরং ধ্বংসের কারণ।

ধর্ম প্রতিষ্ঠিত রাখা ফরয এবং বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম : এ আয়াতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টির নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। ধর্ম বলে সকল পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্মকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, মৌলিক বিশ্বাস—যেমন তওহীদ, রেসালত, পরকালে বিশ্বাস এবং মৌলিক এবাদত।—যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের বিধান মেনে চলা। এ ছাড়া চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রতারণা অপরকে বিনা কারণে নিপীড়ন করা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার মত অনাচারসমূহের নিষিদ্ধতা। এগুলো সমস্ত এশী ধর্মেরই অভিন্ন ও সর্বসম্মত বিষয়। শাখা বিধানসমূহে পয়গম্বরগণের শরীয়তে আংশিক বিভিন্নতাও রয়েছে। কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে : لِكُلِّ جَمَاعَةٍ شَرِيعَةٌ وَمِنْهَا جَاهِلِيَّةٌ — অতএব

পয়গম্বরগণের অভিন্ন বিধানাবলীতে বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম এবং ধ্বংসের কারণ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, একদিন রসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর এর ডানে ও বায়ে আরও কয়েকটি রেখা টেনে বললেন, ডান-বামের এসব রেখা শয়তানের আবিস্কৃত পথ। এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সে পথেই চলার উপদেশ দেয়। অতঃপর তিনি মখাবতী সরল রেখার দিকে ইশারা করে বললেন : **وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ**

مُسْتَقِيمٌ—এটা আমার সরল পথ। তোমরা এরই অনুসরণ কর।—(মায়হারী)

এ দৃষ্টান্তে সরল পথ বলে পয়গম্বরগণের অভিন্ন ধর্মের পথই বোঝানো হয়েছে। এতে শাখা-প্রশাখা বের করা ও বিভেদ সৃষ্টি করা হারাম ও শয়তানের কাজ। এ সম্পর্কে হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

أَرْثَا، مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِرَارًا فَفَدَّ خَلْعَ رِقَّةِ الْإِسْلَامِ عَنْ عَقَبِهِ—যে ব্যক্তি মুসলমানদের জামাত থেকে অর্থহাত পরিমাণও দূরে সরে পড়ে, সে-ই ইসলামের বন্ধনই তার কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল। তিনি আরও বলেন, **يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ**—অর্থাৎ, জামাতের উপর আল্লাহর রহমতের হাত রয়েছে। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, শয়তান মানুষের জন্য ব্যাব্রস্বরূপ। বাঘ ছাগলের পেছনে লাগে অতঃপর যে ছাগল পালের পেছনে অথবা এদিক ওদিক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে সেটির উপরই পতিত হয়। তাই তোমাদের উচিত দলের সঙ্গে থাকা—পৃথক না থাকা।—(মায়হারী)

সারকথা এই যে, এ আয়াতে সকল পয়গম্বর কর্তৃক অনুসৃত অভিন্ন ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখার আদেশ রয়েছে। এতে মতভেদকে **تَفَرُّقٌ** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাদীসে এ মতভেদকেই ঈমানের জন্যে বিপদজনক ও ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে।

مُجْتَهِدٌ ইমামগণের শাখাগত মতভেদ এতে দাখিল নয় : শাখাগত মাসআলার ব্যাপারে যে ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে কোন স্পষ্ট বিধান নেই, অথবা কোন বাহ্যিক বৈপরীত্য আছে, সেখানে মুজ্তাহিদ ইমামগণ নিজ নিজ ইজতিহাদ দ্বারা বিধান বর্ণনা করেছেন এবং এতে মতাদর্শের বিভিন্নতার কারণে পরস্পরের মধ্যে মতভেদও হয়েছে। আয়াতে নিষিদ্ধ মতভেদের সাথে এই মতভেদের কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের মতভেদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর আমল থেকে সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যে হয়ে আসছে এবং এটা যে উম্মতের জন্যে রহমতস্বরূপ, এ বিষয়ে ফেকাহদিগণ একমত।

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِلْمُتَشَرِّكِينَ مَآثِنَ ضَلُوكِهِمْ—অর্থাৎ, তওহীদ সত্য প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তওহীদের দাওয়াত মুশরিকদের কাছে কঠিন ঠেকে। এর কারণ, খেয়ালখুশী ও শয়তানী শিক্ষার অনুসরণ এবং সরলপথ বর্জন। এরপর বলা হয়েছে—

اللَّهُ يَجْعَلُ الْيُسْرَىٰ أَيْسَرَ وَيَجْعَلُ الْيُسْرَىٰ أَيْسَرَ—অর্থাৎ, সরলপথ প্রাপ্তির দু'টিই উপায়। (এক) আল্লাহ তাআলা স্বয়ং কাউকে সরলপথের জন্যে মনোনীত করে তার স্বভাব ও মজ্জাকে তার উপযোগী করে দিলেন। যেমন, পয়গম্বর ও ওলীগণকে দেয়া হয়েছিল। তাদের সম্পর্কে কোরআন বলে :

إِنَّا اخْلَصْنَاهُ بِخَلْقِهِ—অর্থাৎ, আমি তাদেরকে

বিশেষ কাজের জন্যে খাঁটিভাবে তৈরী করে নিয়েছি। বিশেষ বিশেষ পয়গম্বর সম্পর্কে কোরআনে **مُخْلَصٌ** (অর্থাৎ, মনোনীত) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের অর্থও তাই। এ ধরনের হেদায়েত খুবই সীমিত। সরলপথ প্রাপ্তির দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে—যে ব্যক্তি আল্লাহর অভিযুখী হয় এবং তাঁর দীন মেনে চলার ইচ্ছা করে, আল্লাহ তাকে সত্য ধর্মের হেদায়েত দান করেন। **وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ يَسْرَتِهِ**—বাক্যের অর্থ তাই। এ উপায়ের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। অতএব, মুশরেকদের কাছে তওহীদের দাওয়াত কঠিন ঠেকার কারণ এই যে, তারা ধর্মকে বোঝার এবং তা মেনে চলার ইচ্ছাও করে না।

وَمَا تَقْزُوهَ الْأَرْمَنَ يَخِرَّ سَاجِدًا لِلْإِلَهِ—হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে কোরাইশ কাকেরদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, সত্যধর্ম ও সরলপথের প্রতি তাদের বিমুখতা এমনভাবেও নির্বুদ্ধিতা প্রসূত ছিল, তদুপরি আল্লাহর পক্ষ থেকে জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা এরূপ করেছে। জ্ঞান এসে যাওয়ার অর্থ হযরত ইবনে আব্বাসের মতে, যাবতীয় জ্ঞান-গরিমার উৎস রসুলে করীম (সাঃ)—এর আগমন। কেউ কেউ এই অর্থ বর্ণনা করেন যে, পূর্ববর্তী উম্মতরা নিজেদের পয়গম্বরগণের ধর্ম থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন রয়েছে, অথচ তাদের কাছে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে সরলপথের সঠিক জ্ঞান এসে গিয়েছিল। পূর্ববর্তী উম্মতদের কথা বলা হোক অথবা কোরাইশ কাকেরদের কথা বলা হোক—উভয় অবস্থায় তারা নিজেরা তো পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিলই, রসুলগণকেও তাদের পথে চালানোর প্রয়াসী ছিল। তাই অতঃপর রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে :

فَإِنَّكَ فَادِرٌ وَأَسْتَوْكِبُكَ أَمْرٌ وَلَا تَسْتَعِمْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمْنٌ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأَمْرٌ لِأَعْوَالٍ يَبْتَغُوا اللَّهَ رَبَّنَا وَرَبَّكُمْ لَنَا
أَعْمَالًا وَلَكُمْ أَعْمَالٌ لَكُمْ رَحْمَةً وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا
وَاللَّهُ الْمَوْجِدُ

হাফয ইবনে-কাসীর বলেন, দশটি বাক্য সম্বলিত এই আয়াতের প্রত্যেকটি বাক্যে বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কোরআনে আয়াতুল কুরসীই এর একমাত্র নথী। তাতেও দশটি বিধান বিধৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম বিধান হচ্ছে **فَإِنَّكَ فَادِرٌ**—অর্থাৎ, যদিও মুশরেকদের কাছে আপনার তওহীদী দাওয়াত কঠিন মনে হয়, তথাপি আপনি এ দাওয়াত ত্যাগ করবেন না এবং উপর্যুপরি দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখুন। দ্বিতীয় বিধান **وَأَسْتَوْكِبُكَ أَمْرٌ** অর্থাৎ, আপনি এ ধর্মে নিজে অবিচল থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যাবতীয় বিশ্রাম, কর্ম, চরিত্র, অভ্যাস ও সামাজিকতার যথাযথ সমতা ও তারসাম্য কায়ম রাখুন। কোন দিকেই যেন কোনরূপ বাড়াবাড়ি না হয়। বলাবাহুল্য, এরূপ দৃঢ়তা সহজসাধ্য নয়। এ কারণেই কোন কোন সাহাবী রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে তাদের চুলে পাক ধরে যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাস করলে তিনি বললেন : **شَيْئَنِي هُوَ** অর্থাৎ, সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। সূরা হুদেও এই আদেশ এ ভাষায়ই ব্যক্ত হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় বিধান—

وَلَا تَسْعَىٰ أَهْوَاءَهُمْ—অর্থাৎ, প্রচারের দায়িত্ব পালনে আপনি কারও বিরোধিতার পরওয়া করবেন না। চতুর্থ বিধান—**وَقُلْ أَمْنٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ**

আশুরা

৮৭

আলি ইব্রাহীম

وَالَّذِينَ يُخَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُمْ جَزَاءُ
 دَاحِضَةٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
 اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْبَيِّنَاتِ وَمَا يُدْرِكُ
 لَعْلَ السَّاعَةِ قَوْلِي ۖ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ
 أَذْأَنْ الَّذِينَ يُبَايِعُونَ فِي السَّاعَةِ لِقَىٰ صَالِيٍّ يَعْجِلُ ۖ
 اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ
 مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ
 كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
 مِنْ شَيْءٍ ۖ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ
 مَالَهُمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ
 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ تَرَى الظَّالِمِينَ
 مُشْفِقِينَ وَمِنَّا كَسِبُوا وَهُوَ أَقْرَبُ بِهِمْ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا
 يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۖ

(১৬) আল্লাহর ঈদ মেনে নেয়ার পর যারা সে সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়, তাদের বিতর্ক তাদের পালনকর্তার কাছে বাতিল, তাদের প্রতি আল্লাহর গণ্ডি এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর আযাব। (১৭) আল্লাহই সত্যসহ কিতাব ও ইনসানের মানদণ্ড নাথিল করেছেন। আপনি কি জানেন, সম্ভবতঃ কেয়ামত নিকটবর্তী। (১৮) যারা তাতে বিশ্বাস করে না তারা তাকে তড়িৎ কামনা করে। আর যারা বিশ্বাস করে, তারা তাকে ভয় করে এবং জানে যে, তা সত্য। জেনে রাখ, যারা কেয়ামত সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা দূরবর্তী পঞ্চদশতায় লিপ্ত রয়েছে। (১৯) আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা, রিযিক দান করেন। তিনি প্রবল, পরাক্রমশালী (২০) যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্যে সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তার কিছু দিয়ে দেই এবং পরকালে তার কোন অংশ থাকবে না। (২১) তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুযায়ী আল্লাহ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে কয়সলা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (২২) আপনি কাকেরদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্যে জীতসম্ভ্রান্ত দেখবেন। তাদের কর্মের শাস্তি অবশ্যই তাদের উপর পতিত হবে। আর যারা মুমিন ও সংকর্মী, তারা জন্মোত্তের উদ্যানে থাকবে। তারা যা চাইবে, তাই তাদের জন্যে তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। এটাই বড় পুরস্কার।

مِنْ كُتُبٍ - অর্থাৎ, আপনি ঘোষণা করুন : আল্লাহ তাআলা যত

কিতাব নাথিল করেছেন, সবগুলোর প্রতি আমি বিশ্বাসী। পঞ্চম বিধান—
 وَأَمَرْتُ لِرَافِدٍ بَيْنَهُمْ -এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, পারস্পরিক
 বিবাদ-বিসংবাদের কোন যোকদ্দমা আমার কাছে আসলে তাতে ন্যায়
 বিচার করার নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। কেউ কেউ এখানে এল এর
 অর্থ করেছেন সত্য। তারা এ আয়াতের অর্থ করেছেন, আমি আদর্শ
 হয়েছি যে, ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধান তোমাদের মধ্যে সমান সমান রাখি,
 প্রত্যেক নবী ও প্রত্যেক কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং সব বিধান পালন
 করি—এরূপ নয় যে, কোন বিধান মানবো আর কোনটি অমান্য করব।
 অথবা কোনটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব ও কোনটির প্রতি করব না। ষষ্ঠ
 বিধান—
 اللَّهُ رَبُّنَا - অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের সকলের পালনকর্তা। সপ্তম
 বিধান
 لَأَعْمَلَكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُ - অর্থাৎ, আমাদের কর্ম আমাদের
 কাছে আসবে। তোমাদের তাতে কোন লাভ-লোকসান হবে না এবং
 তোমাদের কর্ম তোমাদের কাছে আসবে। আমার তাতে কোন লাভ ও
 ক্ষতি নেই। কেউ কেউ বলেন, মক্কায় যখন কাকেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ
 করার আদেশ অবতীর্ণ হয়নি, তখন এ আয়াত নাথিল হয়েছিল। পরে
 জেহাদের আদেশ অবতীর্ণ হওয়ায় এই বিধান রহিত হয়ে যায়। কেননা,
 জেহাদের সারমর্ম এই যে, যারা উপদেশ ও অনুরোধে প্রভাবিত হয় না,
 যুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পরাভূত করতে হবে। তাদেরকে তাদের অবস্থার
 উপর ছেড়ে দিলে চলবে না। কেউ কেউ বলেন, আয়াতটি রহিত হয়নি
 এবং উদ্দেশ্য এই যে, দলীলের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর
 তোমাদের না মানা কেবল শত্রুতা ও হঠকারিতা বশতঃই হতে পারে।
 শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর এখন প্রমাণাদির আলোচনা অর্থহীন।
 তোমাদের কর্ম তোমাদের সামনে এবং আমার কর্ম আমার সামনে থাকবে।
 —(কুরত্ববী)

অষ্টম বিধান—
 لَأُحِبَّاهُ بَيْنَهُمْ - অর্থাৎ, সত্য স্পষ্ট ও প্রমাণিত
 হওয়ার পরও যদি তোমরা শত্রুতাকেই কাছে লাগাও, তবে তর্ক-বিতর্কের
 কোন অর্থ নেই। কাজেই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এমন কোন বিতর্ক
 নেই। নবম বিধান—
 اللَّهُ يَجْعَلُ بَيْنَكُمْ - অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন আল্লাহ
 তাআলা আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যেকের কর্মের
 প্রতিদান দেবেন। দশম বিধান—
 وَاللَّهُ الْوَاسِعُ - অর্থাৎ, আমরা সকলেই
 তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করব।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্বের আয়াতসমূহে পয়গম্বরগণের সর্বসম্মত ধর্মের প্রতি বিবাসীকে
 দাওয়াত এবং তাতে প্রতিষ্ঠিত ও অবিচলিত থাকার উপদেশ দেয়া
 হয়েছিল। কিন্তু যেসব কাকের শুনতে ও মানতেই রাবী নয়, তারা
 এরপরেও মুসলমানদের সাথে বাকবিতণ্ডা শুরু করে দেয়। রেওয়ায়েতে
 আছে যে, কিছুসংখ্যক ইহুদী ও খ্রীষ্টান এ বিতর্ক উপস্থিত করল যে,
 আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে এসেছেন এবং আমাদের কিতাব
 তোমাদের কিতাবের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই আমাদের ধর্ম তোমাদের
 ধর্ম অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কোন কোন রেওয়ায়েতে এই বিষয়টি
 কোরাইশ কাকেরদের উত্থাপিত বলে বর্ণিত রয়েছে। কেননা, তারা
 নিজেদেরকে প্রাচীন ধর্মের অনুসারী বলে আখ্যায়িত করত।

কোরআন পাক উল্লেখিত আয়াতসমূহে বর্ণনা করেছে যে, ইসলাম ও কোরআনের আবেদন মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে এবং স্বয়ং তোমাদের জ্ঞানী-গুণী ও ন্যায়পন্থী ব্যক্তিবর্গও মুসলমান হয়ে গেছে। সুতরাং এখন তোমাদের বাকবিতণ্ডা অসার ও পথভ্রষ্টতা বৈ নয়। তোমরা না মানলে গণ্য তোমাদের উপরই পড়বে। অতঃপর উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এবং এতে আল্লাহর হুক ও বন্দার হকের জন্যে পূর্ণাঙ্গ আইন-কানুন রয়েছে। **أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْبَيِّنَاتِ** এখানে ‘কিতাব’ বলে কোরআনসহ সমস্ত ঐশীগ্রন্থকে বোঝানো হয়েছে এবং ‘হুক’ বলে পূর্বোক্ত সত্যধর্মকে বোঝানো হয়েছে। **مِيزَان**—এর শাব্দিক অর্থ দাঁড়ি-পাল্লা। এটা যেহেতু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং অধিকার পূর্ণ মাত্রায় দেয়ার একটি মানদণ্ড তাই হযরত ইবনে আব্বাস এর তফসীর করেছেন ন্যায় বিচার। মুজাহিদ বলেন, মানুষ যে দাঁড়ি-পাল্লা ব্যবহার করে এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং হক শব্দের মধ্যে আল্লাহর যাবতীয় হুক এবং **مِيزَان** শব্দের মধ্যে বন্দার যাবতীয় হকের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

‘মুমিনরা কেয়ামতকে ভয় করে’—এর অর্থ কেয়ামতের ভয়াবহতাজনিত বিশ্বাসগত ভয়। পরন্তু নিজেদের কর্মগত ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি লক্ষ্য করলে এ ভয় অপরিহার্যরূপে দেখা দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে কোন মুমিনের মধ্যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রবল হয়ে তা এ ভয়কে ছাপিয়ে যায়—তা আয়াতের পরিপন্থী নয়। যেমন, মৃত্যুর পর কবরে কোন কোন মৃতের যথানীতি কেয়ামতের আগমন কামনার বিষয় প্রমাণিত রয়েছে। কারণ, কবরে ফেরেশতাদের কাছ থেকে রহমত ও মাগফেরাতের সুসংবাদ শুনে কেয়ামতের ভয় স্তিমিত হয়ে যাবে।

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ — অভিধানে **لَطِيفٌ** শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস—এর অনুবাদ করেছেন ‘দয়ালু’ এবং মুকাতিল করেছেন ‘অনুগ্রহকারী’।

হযরত মুকাতিল বলেন, আল্লাহ তাআলা সমস্ত বন্দার প্রতিই দয়ালু। এমনকি কাকের এবং পাপাচারীর উপরও দুনিয়াতে তাঁর নেয়ামত বর্ষিত হয়। বন্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপা অসংখ্য প্রকার। তাই তফসীরে কুরতুবী **لَطِيفٌ** শব্দের অনেক অর্থ বর্ণনা করেছেন। সবগুলোর সারমর্মই দয়ালু ও অনুগ্রহকারী।

আল্লাহ তাআলা রিযিক সমগ্র সৃষ্টির জন্যে ব্যাপক। স্থলে ও জলে বসবাসকারী যেসব জন্তু সম্পর্কে কেউ কিছুই জানে না, আল্লাহর রিযিক তাদের কাছেও পৌঁছে। আয়াতে যাকে ইচ্ছা রিযিক দেন, বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে তফসীরে মাযহরীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার রিযিক অসংখ্য প্রকার। জীবনধারণের উপযোগী রিযিক সবাই পায়। এরপর বিশেষ প্রকারে রিযিক বটনে তিনি বিভিন্ন স্তর ও মাপ রেখেছেন। কাউকে ধন-সম্পদের রিযিক অধিক দান করেছেন। কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তির, কাউকে জ্ঞান ও মারফতের এবং কাউকে অন্যান্য প্রকার রিযিক দিয়েছেন। এভাবে প্রত্যেক মানুষ অপরের মুখাপেক্ষীও থাকে এবং এই মুখাপেক্ষিতাই তাদেরকে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতায় উদ্বুদ্ধ করে, যার উপর মানব সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

হযরত জা’ফর ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, রিযিকের ব্যাপারে বন্দাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুকম্পা দু’রকম। (এক)—তিনি কাউকে তার শারা জীবনের রিযিক এক যোগে দান করেন না। এরূপ করলে তার হেফাযত দুর্বল হয়ে পড়ত এবং শত হেফাযতের পরেও তা পচা-গলা থেকে নিরাপদ থাকত না।—(মাযহরী)

একটি পরীক্ষিত আমল : মাওলানা শাহ আবদুল গণী ফুলপুরী (রহঃ) বলেন, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় সন্তর বার **اللَّهُ لَطِيفٌ** আয়াতটি **الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ**—পর্যন্ত নিয়মিত পাঠ করবে, সে রিযিকের অভাব-অনটন থেকে মুক্ত থাকবে। তিনি আরও বলেন, এটি বহুল পরীক্ষিত আমল।

قُلْ إِنَّمَا أَدْعِي إِلَىٰ آلِ الْوَدَّ وَالْحَقِّ—সার-সংক্ষেপে বর্ণিত এ আয়াতের তফসীর অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকেই বর্ণিত রয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমাদের সবার কাছে আমার আসল হুক এই যে, তোমরা আমার রেসালতকে স্বীকৃতি দাও এবং নিজেদের সৌভাগ্য ও সাফল্যের জন্যে আমার অনুগত্য কর। তোমরা এটা না করলে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু আমার একটি মানবিক ও পারিবারিক হুকও রয়েছে, যা তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমাদের অধিকাংশ গোত্রে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। আত্মীয়তার অধিকার ও আত্মীয় বাৎসল্যের প্রয়োজন তোমরা অস্বীকার কর না। অতএব, আমি তোমাদের শিক্ষা, প্রচার ও কর্ম সংশোধনের যে দায়িত্ব পালন করি, এর কোন পারিশ্রমিক তোমাদের কাছে চাই না। তবে এতটুকু চাই যে, তোমরা আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখ। মানা না মানা তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু শত্রুতা প্রদর্শনে তো কমপক্ষে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত।

বলাবাহুল্য, আত্মীয়তার অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা স্বয়ং তাদেরই কর্তব্য ছিল। একে কোন শিক্ষা ও প্রচারকার্যের পারিশ্রমিক বলে অভিহিত করা যায় না। আয়াতে একে রূপক অর্থে পারিশ্রমিক বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি তোমাদের কাছে এটাই চাই। এটা প্রকৃতপক্ষে কোন পারিশ্রমিক নয়। তোমরা একে পারিশ্রমিক মনে করলে ভুল হবে। এ বাক্যের নবীর দুনিয়ার প্রত্যেক ভাষাতেই বিদ্যমান রয়েছে। কবি মুতানাব্বী বলেন :

ولا عيب فيهم غيران سيوفهم .. بهن فلول من قراع الكتائب

অর্থাৎ, কোন এক গোত্রের বীরত্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে এছাড়া কোন দোষ নেই যে, অহরহ যুদ্ধ ও মারামারির কারণে তাদের তরবারিতে দাঁত সৃষ্টি হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, বীরের জন্যে এটা কোন দোষ নয় বরং নৈপুণ্য। জৈনক উর্দু কবি

তার বিশুস্ততার গুণকে দোষরূপে ব্যক্ত করে নিজের নির্দোষতাকে বড় করে দেখিয়েছেন।

সরাকথা এই যে, আত্মীয় বাৎসল্য বাস্তবে পারিশ্রমিক নয়। কাজেই আমি এছাড়া তোমাদের কাছে আর কিছুই চাই না।

বোখারী ও মুসলিমে আলোচ্য আয়াতের এ তফসীরই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে। যুগে যুগে পয়গম্বরগণ নিজ নিজ সম্প্রদায়কে পরিস্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমি তোমাদের মঙ্গলার্থে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তার কোন বিনিময় তোমাদের কাছে চাই না। আমার প্রাপ্য আল্লাহ তাআলাই দেবেন। অতএব, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সকলের সেবা পয়গম্বর হয়ে স্বজাতির কাছে কেমন করে বিনিময় চাইবেন?

ইমাম শা’বী বলেন, আমি এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হয়ে হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখলে তিনি জওয়াবে লিখে পাঠালেন :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وسط الناس في قريش

রসূলুল্লাহ (সঃ) কোরাইশদের যে পোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তার প্রত্যেকটি শাখা-পরিবারের সাথে তাঁর আত্মীয়তার জরাজীর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। তাই আল্লাহ বলেছেন, আপনি স্মরণেরদেরকে বলুন, দাওয়াতে জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাই না। আমি চাই, তোমরা আত্মীয়তার ঋতিরে আমাকে তোমাদের মধ্যে অবস্থে থাকতে দাও এবং আমার হেফাজত কর।—(রুহুল-মা'আনী)

ইবনে জরীর প্রমুখ আরও বর্ণনা করেন—

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যদি আমার অনুসরণে অধীকৃতি ও জ্ঞাপন কর, তবুও তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে অস্বত তার প্রতি তো লক্ষ্য রাখবে। আরবের অন্যান্য লোক আমার হেফাজত ও সাহায্যে অগ্রণী হলে তোমাদের জন্যে তা পৌরুষের বিষয় হবে না।—(রুহুল-মা'আনী)

হযরত ইবনে আব্বাস থেকেই আরও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াতটি নাযিল হলে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আপনার আত্মীয় কারা? তিনি কালেন, আলী, কাতেমা ও তাদের সন্তান-সন্ততি। এ রেওয়াজেভের সনদ খুব দুর্বল। তাই সুমুতী ও হাফেয ইবনে হাজার প্রমুখ একে অগ্রাহ্য বলেছেন। এছাড়া এ রেওয়াজেভের অর্থ এই যে, আমি আমার কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে এতটুকু চাই যে, তোমরা আমার সন্তান-সন্ততির প্রতি লক্ষ্য রাখ। এটা পয়গম্বরশপ নিষেধতা সেরা ও শ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের উপযুক্ত কথা হতে পারে না। সুতরাং সঠিক তফসীর তাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। রাক্ষসী সম্প্রদায় এ রেওয়াজেভ কেবল পছন্দই করেনি, এর উপর বিরাট বিরাট আশার দুর্দণ্ড রচনা করেছে, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

নবী পরিবারের সম্মান ও মহত্ত্ব : উপরে এতটুকুই বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের কাজের বিনিময়ে জাতির কাছে স্বীয় সন্তানদের প্রতি মহত্ত্ব প্রদর্শনের আবেদন করেননি। এর অর্থ এই নয় যে, রসূল পরিবারের মাথাভাড়া ও মহত্ত্ব কোন গুরুত্বের অধিকারী

নয়। যে কোন হতভাগা পঞ্চদশ ব্যক্তিই এরূপ ধারণা করতে পারে। সত্য এই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সম্মান ও মহত্ত্ব সবকিছুর চাইতে বেশী হওয়া আমাদের ইমানের অঙ্গ ও ভিত্তি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে যার যত নিকট সম্পর্ক আছে, তার সম্মান ও মহত্ত্ব এবং সে অনুপাতে জরুরী হওয়া অপরিহার্য। গুরুত্বপূর্ণ সন্তান সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয়। তাই তাদের মহত্ত্ব নিশ্চিতরূপে ইমানের অঙ্গ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বিবিধ ও অন্যান্য সাহায্যে কেবলমাত্র সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে হবে, অথচ তাঁদেরও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নৈকট্য ও আত্মীয়তার বিভিন্নরূপে সম্পর্ক রয়েছে।

সারকথা এই যে, নবী পরিবার ও নবী বংশের মহত্ত্ব নিয়ে কোন সময় মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়নি। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের মহত্ত্ব অপরিহার্য। তবে বিরোধ সেখানে দেখা দেয়, যেখানে অন্যদের সম্মানে আঘাত হানা হয়। নতুবা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বংশধর হিসেবে যত দূর সম্পর্কের সৈয়দই হোক না কেন, তাদের মহত্ত্ব ও সম্মান সৌভাগ্য ও সওয়াবের কারণ। অনেকেই এ ব্যাপারে শৈথিল্যের পরিচয় দিতে শুরু করলে হযরত ইমাম শাফে'রী (রহঃ) কয়েক লাইন কবিতায় তাদের তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁর কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হল। এতে প্রকৃতপক্ষে তিনি অধিকাংশ আলোচ্য মতাদর্শই ভুলে ধরেছেন—

: হে আশুরোহী, তুমি মুহাম্মাদ উপত্যকার অদূরে থাখ। প্রত্যুবে যখন হাজীদেব্র প্রোত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় মীনার দিকে রওয়ানা হবে, তখন সেখানকার প্রত্যেক বাসিন্দা ও পঞ্চাটরীকে ডেকে তুমি ঘোষণা কর, যদি কেবল মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বংশধরের প্রতি মহত্ত্ব রাখলেই মানুষ রাক্ষসী হয়ে যায়, তবে বিশুদ্ধজগতের সমস্ত জিন ও মানব সাক্ষী থাকুক, আমিও রাক্ষসী।

التَّوْرَى

২৮৬

المِيزَة

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নবুওয়ত, রেসালত ও কোরআনকে বাস্তব ও আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অপপ্রচার আখ্যাদানকারীদেরকে একটি সম্ভাবন নীতি বর্ণনা করে জওয়াব দিয়েছেন। নীতিটি এই যে, পয়গম্বরের মো'জেযা ও যাদুকরের যাদু—এ দুই এর মধ্যে কোনটিই আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছু করতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলাই স্বীয় অনুগ্রহে পয়গম্বরের নবুওয়ত সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে মো'জেযা দান করেন। এতে পয়গম্বরের কোন এখতিয়ার থাকে না।

এমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলা যাদুকরের যাদুকণ্ডে পরীক্ষার তিষ্ঠিতে চালু হতে দেন। কিন্তু যাদু ও মো'জেযার মধ্যে এবং যাদুকর ও পয়গম্বরের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যে তিনি এই নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মিছামিছি নবুওয়ত দাবী করে, তার হাতে কোন যাদুও সফল হতে দেন না; নবুওয়ত দাবী করার পূর্ব পর্যন্তই তার যাদু কার্যকর হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে আল্লাহ্ যাকে নবুওয়ত দান করেন, তাঁকে মো'জেযাও দেন এক সমুজ্জ্বল করেন। এভাবে স্বাভাবিক গতিতেই তাঁর নবুওয়ত সপ্রমাণ করে দেন। এছাড়া স্বীয় কালামের আয়াতের সত্যায়নও নাযিল করেন।

কোরআন পাকও এক মো'জেযা। সারা বিশ্বের জিন ও মানব এর এক আয়াতের নমুনাও রচনা করতে অক্ষম। তাদের এই অক্ষমতা নবী (সঃ)-এর আঘলেই সপ্রমাণ হয়ে গেছে এবং আজ পর্যন্ত সপ্রমাণ আছে। এমন সুস্পষ্ট মো'জেযা উপরোক্ত নীতি অনুযায়ী কোন মিথ্যা নবীর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেতে পারে না। অতএব, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ওহী ও রেসালত সম্পর্কিত দাবী সম্পূর্ণ সত্য ও বিশুদ্ধ। যারা একে বাস্তব ও অপপ্রচার বলে, তারা নিজেরাই বিবাস্তি ও অপপ্রচারে লিপ্ত।

দ্বিতীয় আয়াতে কাফেরদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, এখনও কুফর থেকে বিরত হও এবং তওবা কর। আল্লাহ্ তাআলা পরম দয়ালু। তিনি তওবাকারীদের তওবা কবুল করেন এবং তাদের পাপ মার্জনা করেন।

তওবার স্বরূপ : তওবার শাস্তিক অর্থ ফিরে আসা। শরীয়তের পরিভাষায় কোন গোনাহ থেকে ফিরে আসাকে তওবা বলা হয়। তওবা বিশুদ্ধ ও হৃদয় হওয়্যার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে।

(এক)—বর্তমানে যে গোনাহে লিপ্ত রয়েছে, তা অবিলম্বে বর্জন করতে হবে, (দুই)—অতীতের গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হতে হবে এবং (তিন)—চরিত্রায়েতে সে গোনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। এক কোন ক্ষয় কাছ ছেড়ে থাকলে তা আদায় অথবা কাফা করতে হবে। গোনাহ যদি বন্দায় বৈষয়িক হক সম্পর্কিত হয়, তবে শর্ত এই যে, প্রাপক জীবিত থাকলে তাকে সে হক-সম্পদ ফেরত দেবে অথবা মাক করিয়ে নেবে। প্রাপক জীবিত না থাকলে তার ওয়ারিসদেরকে ফেরত দেবে। কোন ওয়ারিস না থাকলে বায়তুল মালে জমা দেবে। যদি বায়তুলমালও না থাকে অথবা তার ব্যবস্থাপনা সঠিক না হয় তবে প্রাপকের পক্ষ থেকে সদকা করে দেবে। বৈষয়িক নয়, এমন কোন হক হলে—যেমন, কাউকে অন্যায়ভাবে জ্বালাতন করলে, গালি দিলে, অথবা কারও গীবত করলে যেভাবেই সম্ভবপর হয় তাকে সন্তুষ্ট করে ক্ষমা নিতে হবে।

সকল তওবার জন্যেই আল্লাহ্র ওয়াস্তে গোনাহ বর্জন করতে হবে,

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَيِّنُ اللَّهُ عِبَادَةَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَنَّانُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَمَنْ يَقُولُ
حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ مِنْ حَسَنَاتٍ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كُذِبًا وَإِنَّا لِلَّهِ يُخَيِّرُكَ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَيَمْحُ
اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُخَيِّرُ الْحَقَّ بِحُكْمِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعُوذُ غِنِ السَّيِّئَاتِ
وَيَعْلَمُ مَا تُكْتُمُونَ ۝ وَيُخَيِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَهُوَ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ وَلَوْ
بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ نَّزَّلَ بِقَدَرٍ
مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ يَعْلَمُ خَيْرٌ مَّا تَرَى ۝ وَهُوَ الَّذِي يَنْزِلُ الْغَيْثَ
مِنْ أَعْدَاقِ السَّمَاوَاتِ وَيُنْزِلُ مِنْهَا مَاءً فَتَخْرُجُ مِنْهَا شُعْبَاتُ
مِنْ الْأَنْهَارِ فَتَجْعَلُ السَّيِّئَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهَا مِنْ حَيَاةٍ
وَهُوَ عَلَىٰ جَمِيعِ شَيْءٍ لَدُنَّ رَبِّكَ مُوَاظِمٌ ۝ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا
كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعُوذُ غِنِ السَّيِّئَاتِ ۝ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ
فِي الْأَرْضِ ۝ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

(২৩) এরই সুসংবাদ দেন আল্লাহ্ তার সৈন্য বান্দাকে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকল্প করে। কবুল, আমি আমার দাওয়াতের জন্যে তোমাদের কাছে কেবল আত্মীয়তাভাজিত সোধাদ চাই। যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্যে তাতে পুণ্য বাড়িয়ে দেই। নিচর আল্লাহ্ কমাকারী, গুণগ্রাহী। (২৪) নাকি তারা একথা বলে যে, তিনি আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা করেছেন? আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনার অন্তরে মোহর এঁটে দিতেন। বস্ত্রে তিনি মিথ্যাকে বিচ্ছিন্ন দেন এক নিম্ন বাক্য দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিচর তিনি অন্তরনিহিত বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত। (২৫) তিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন, পাপসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমাদের কৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। (২৬) তিনি যুমিন ও সংকল্পীদের দোয়া শোনেন এক তাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ বাড়িয়ে দেন। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। (২৭) যদি আল্লাহ্ তাঁর সকল বান্দাকে গ্রন্থ রিযিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ নাযিল করেন। নিচর তিনি তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন। (২৮) যানুস নিরাশ হয়ে যাওয়ার পরে তিহি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এক স্বীয় রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনিই কারনিবাহী, প্রশাসিত। (২৯) তাঁর এক নির্দল নাজেযতল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি এক এতদুত্তরের মধ্যে তিনি যেসব জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি স্বধন ইচ্ছা, এগুলোকে একত্রিত করতে সক্ষম। (৩০) তোমাদের উপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্কটই ফল এক তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ কমা করে দেন। (৩১) তোমরা পৃথিবীতে পলায়ন করে আল্লাহকে অক্ষম করতে পার না এক আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন কারনিবাহী নেই, সাহায্যকারীও নেই।

শারীরিক দুর্বলতা ও অক্ষমতার কারণে গোনাহ বর্জন করলে তওবা হবে না। যাবতীয় গোনাহ থেকে তওবা করাই শরীয়তের কাম্য। কিন্তু কোন বিশেষ গোনাহ থেকে তওবা করলেও আল্লে সুনুতের মতানুযায়ী সে গোনাহ মাফ হবে, কিন্তু অন্যান্য গোনাহ বহাল থাকবে।

পূর্বাপর সম্পর্ক ও শানে-নুযল : আলাচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা তওহীদ সপ্রমাণ করার জন্যে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি বিশৃঙ্খলতাকে এক মজবুত ও অটল ব্যবস্থাপনার সূত্রে গ্রথিত করে রেখেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, বিশৃঙ্খলতের এই অটল ব্যবস্থাপনা এ বিষয়ের দলিল যে, একজন প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ সত্তা একে পরিচালনা করছেন।

পৃথিবীতে জারিকৃত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তাআলা এই বিষয়বস্তুর সূচনা করেছেন। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে এই বিষয়টির সম্পর্ক এই যে, পূর্বের আয়াতসমূহে বিবৃত হয়েছিল, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের এবাদত ও দোয়া কবুল করেন। এতে প্রশ্ন দেখা দিতে পারত যে, মুসলমানরা অনেক সময় পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে দোয়া করে, কিন্তু তাদের সে উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। এরূপ ঘটনা বিরল নয়; বরং প্রায়ই সংঘটিত হতে দেখা যায়। এ খটকার জওয়াব উল্লেখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে দেয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, মানুষের প্রত্যেকটি বাসনা পূর্ণ হওয়া মাঝে মাঝে স্বয়ং মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উপযোগিতার পরিপন্থী হয়ে থাকে। কাজেই কোন সময় কোন মানুষের দোয়া বাহ্যতঃ কবুল না হলে এর পশ্চাতে বিশৃঙ্খলতের এমন কিছু স্বার্থ নিহিত থাকে, যা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষকেই সব রকম রিযিক ও নেয়ামত দান করা হলে দুনিয়ার প্রজ্ঞাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অচল হয়ে যেতে বাধ্য। - (তফসীরে-কবীর)

কোন কোন রেওয়াজে থেকে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। রেওয়াজেতে আছে যে, আলাচ্য আয়াত সেসব মুসলমান সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়; যারা কাকেরদের ঐশ্ব্যের প্রাচুর্য দেখে নিজেরাও সেরূপ প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়ার বাসনা প্রকাশ করত। ইমাম বগভীর রেওয়াজেতে সাহাবী খালাব ইবনে আরত (রাঃ) বলেন, আমরা যখন বনু-কুরায়যা, বনু-নুযায়ের ও বনু-কায়নুকার অগাধ ধন-সম্পদ দেখলাম, তখন আমাদের মনেও ধনাঢ্য হওয়ার বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলাচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত ওমর ইবনে হরায়স (রাঃ) বলেন, সুফফায় অবস্থানকারীদের মধ্যে কেউ কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এরূপ আকাংখা প্রকাশ করেছিল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও বিত্তশালী করে দিন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।—(রুহুল-মা'আনী)

দুনিয়াতে ঐশ্ব্যের প্রাচুর্য বিপর্যয়ের কারণ : আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সব মানুষকে সবরকম রিযিক ও নেয়ামত প্রচুর পরিমাণে দেয়া হলে তাদের পারস্পরিক হানাহানি সীমা ছাড়িয়ে যেত। কারণ, ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে কেউ কারও মুখাপেক্ষী থাকত না এবং কেউ কারও কাছে নতি স্বীকার করত না। অপরদিকে ধনাঢ্যতার এক বৈশিষ্ট্য এই যে, ধন যতই বাড়়ে, লোভ-লালসাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এর অপরিহার্য পরিণতি দাঁড়াত এই যে, একে অপরের সম্পত্তি ক্রায়াণ্ডকরার জন্যে জোরজবরদস্তির প্রয়োগ ব্যাপক হয়ে যেত। মারামারি-কাটাকাটি ও অন্যান্য কুর্ম সীমা ছাড়িয়ে যেত। তাই আল্লাহ তাআলা সব মানুষকে সব রকম নেয়ামত না দিয়ে এভাবে বন্টন করেছেন

যে, কাউকে, ধন-সম্পদ বেশী দিয়েছেন, কাউকে স্বাস্থ্য ও শক্তি অধিক পরিমাণে যুগিয়েছেন, কাউকে রূপ ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং কাউকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরের তুলনায় বেশী সরবরাহ করেছেন। ফলে প্রত্যেকেই কোন না কোন বিষয়ে অপরের মুখাপেক্ষী এবং এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপরই সভ্যতার ভীত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

وَلَكِنْ يَتُوبُ إِلَىٰ رَبِّهِ الْكَافِرُ
বাক্যের অর্থও তাই যে, আল্লাহ তাঁর নেয়ামতসমূহ বিশেষ পরিমাণে মানুষকে দান করেছেন। এরপর (وَلَكِنْ يَتُوبُ إِلَىٰ رَبِّهِ الْكَافِرُ) বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সম্যক জানেন কার জন্যে কোন নেয়ামত উপযুক্ত এবং কোন নেয়ামত ক্ষতিকর। তাই তিনি প্রত্যেককে তার উপযোগী নেয়ামত দান করেছেন। তিনি যদি কারও কাছ থেকে কোন নেয়ামত হিনিয়ে নেন, তবে সমগ্র বিশ্বের উপযোগিতার ভিত্তিতেই হিনিয়ে নেন। এটা মোটেই জরুরী নয় যে, আমরা প্রত্যেক ব্যক্তির উপযোগিতা বুঝতে সক্ষম হব। কারণ, এখানে প্রত্যেকেই তার জ্ঞানের এক সীমিত পরিধির মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করে। আর আল্লাহ তাআলার সামনে রয়েছে সমগ্র বিশৃঙ্খলতের অন্তর্হীন উপযোগিতার ক্ষেত্র। কাজেই তাঁর সমস্ত রহস্য অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। এর একটি ইন্দিয়গ্রাহ্য দৃষ্টান্ত এই যে, একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রপ্রধান মাঝে মাঝে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের পরিপন্থী নির্দেশও জারি করেন। ফলে তারা বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বিপদে পতিত ব্যক্তি যেহেতু নিজ স্বার্থের সীমিত গণ্ডিতে থেকে চিন্তা করে, তাই রাষ্ট্রপ্রধানের এই পদক্ষেপ তার দৃষ্টিতে অযৌক্তিক ও অসমীচীন প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যার দৃষ্টি গোটা দেশ ও জাতির প্রতি নিবদ্ধ এবং যে মনে করে যে, ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে গোটা দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া যায় না, সে এই পদক্ষেপকে মন্দ বলতে পারে না। অতএব, যে সত্তা সমগ্র বিশৃঙ্খলত পরিচালনা করছেন, তাঁর প্রজ্ঞা ও রহস্য মানুষ কিরূপে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে? এই দৃষ্টিকোণে চিন্তা করলে কোন ব্যক্তিকে বিপদাপদে পতিত দেখে মনে যেসব কুধারণা ও জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি হয়, সেগুলো আপনা-আপনিই উবে যেতে পারে।

এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, বিশ্বের সব মানুষই সমান ধন-সম্পদের অধিকারী হোক এটা সম্ভবপর নয়, কাম্যও নয় এবং বিশ্ব ব্যবস্থাপনার সৃষ্টিগত উপযোগিতাও এর পক্ষে নয়। সূরা মুখরুফের
فَمَنْ قَسَمَ بِاللَّهِ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ
আয়াতের তফসীরে ইনশাআল্লাহ এই বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুরোপুরি আলোচনা করা হবে।

জান্নাত ও দুনিয়ার পার্থক্য : এখানে খটকা দেখা দিতে পারে যে, জান্নাতে তো সমস্ত মানুষকেই সর্বপ্রকার নেয়ামত প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা হবে। সেখানে তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে না কেন? জওয়াব এই যে, দুনিয়াতে বিপর্যয়ের কারণ ধন-সম্পদের প্রাচুর্যসহ লোভ-লালসার প্রেরণা, যা ধনাঢ্যতার সাথে সাথে সাধারণতঃ বৃদ্ধিই পেতে থাকে। এর বিপরীতে জান্নাতে তো নেয়ামতসমূহের ব্যাপক বৃষ্টি বর্ষিত হবে, কিন্তু লোভ-লালসা ও অবাধ্যতার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হবে। ফলে কোনরূপ বিপর্যয় দেখা দেবে না। তাফসীরের সার-সংক্ষেপ মওলা খানভী (রহঃ) 'বর্তমান অবস্থায়' কথাটি সংযুক্ত করে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন— (বয়ানুল-কোরআন)

দুনিয়াতে ধন-সম্পদের প্রাচুর্যের মাধ্যমে লোভ-লালসার প্রেরণা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হল না কেন? এখন এই আপত্তি উত্থাপন করা

নিশ্চিতই অর্থহীন। কেননা, দুনিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ভাল ও মন্দে সমন্বিত একটি বিশু রচনা করা। এটা ব্যতীত জগৎ সৃষ্টির মূল রহস্য-মানুষকে পরীক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং দুনিয়াতে মানুষের এসব প্রেরণা নিশ্চিত করে দেয়া হলে দুনিয়া সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই অর্জিত হত না। পক্ষান্তরে জ্ঞানুতে কেবল কল্যাণই থাকবে—মন্দে কোন অস্তিত্বই থাকবে না। তাই সেখানে এসব প্রেরণা খতম করে দেয়া হবে।

وَهُوَ الَّذِي يُزِيلُ الْعَذَابَ عَنْ قَوْمٍ مَّا أَفْقَرُوا (মানুষ নিরাশ হয়ে গেলে

তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন।) ভূ-পৃষ্ঠে পানির তীব্র প্রয়োজন দেখা দিলে বৃষ্টি বর্ষণ করাই আল্লাহর সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এখানে “নিরাশ হওয়ার পর” বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মাঝে মাঝে আল্লাহ তাআলা সাধারণ নিয়মের বিপরীতে বৃষ্টি বর্ষণে বিলম্বও করেন। ফলে মানুষ নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হতে থাকে। এতে পরীক্ষা ছাড়া এ বিষয় ইশিয়ার করারও উদ্দেশ্য থাকে যে, বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি সবই আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যখন ইচ্ছা মানুষের পাপাচারের কারণে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন, যাতে মানুষ তাঁর রহমতের প্রতি মনোনিবেশ করে তাঁর সামনে কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করে। নতুবা বৃষ্টির জন্য এমন ধরাবাঁধা সময় নির্ধারিত থাকলে যার চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম হয় না, তবে মানুষ একে বাহ্যিক কারণের অনুগামী মনে করে আল্লাহর কুদরতের প্রতি বিমুগ্ধ হয়ে পড়ত। এখানে ‘নিরাশ’ বলে নিজেদের তদ্বির থেকে নিরাশ হওয়া বোঝানো হয়েছে। নতুবা আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ্য কুফর।

وَمَا يَكْفُرُ مِنْهُمْ شَيْئًا —অভিধানে নিজ ক্ষমতা বলে চলাফেরা ও

নড়াচড়া করতে সক্ষম প্রত্যেক বস্তুকে **شَيْءٌ** বলা হয়। পরে শব্দটি কেবল জীব-জন্তু অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক চলমান বস্তু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে চলমান সৃষ্টবস্তু সম্পর্কে সবাই অবগত। আকাশে চলমান সৃষ্টবস্তুর অর্থ ফেরেশতাও হতে পারে এবং এমন জীবজন্তুও হতে পারে, যা এখনও মানুষের কাছে আবিষ্কৃত হয়নি।

উদ্দেশ্য এই যে, যদিও বিশ্বব্যবস্থার উপযোগিতাবশতঃ আল্লাহ তাআলা সব মানুষকে ধনাঢ্যতা দান করেননি; কিন্তু বিশৃঙ্খলতার ব্যাপক উপকারী বস্তু দ্বারা সব মানুষকেই উপকৃত করেছেন। বৃষ্টি, মেঘ, ভূ-পৃষ্ঠ

আকাশ এবং এগুলোর যাবতীয় সৃষ্টবস্তু মানুষের উপকারার্থে সৃজিত হয়েছে। এগুলো সবাই আল্লাহর তওহীদ ব্যক্ত করে। এরপর কারও কোন কষ্ট হলে তা তার ক্তকর্মের ফলেই হয়। সুতরাং কষ্টে পতিত হয়ে আল্লাহ তাআলাকে ভৎসনা করার পরিবর্তে তার উচিত নিজেই দোষত্রুটি দেখা।

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ

ব্যাক্যের অর্থ তাই। হযরত হাসান থেকে বর্ণিত আছে— এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সে সত্তার কসম, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তির গায়ে কোন কাঠের আঁচড় লাগে, অথবা কোন শিরা ধড়ফড় করে অথবা পা পিছলে যায়, তা সবই তার গোনাহর কারণে হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক গোনাহর শাস্তি দেন না, বরং যেসব গোনাহর শাস্তি দেন না সেগুলোর সংখ্যাই বেশী। হযরত আশরাফুল-মাশায়েখ বলেন, দৈহিক পীড়া ও কষ্ট যেমন গোনাহর কারণে হয়, তেমনি আত্মিক ব্যাধিও কোন গোনাহের ফলশ্রুতিতে হয়ে থাকে। এক গোনাহ হয়ে গেলে তা অন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। হাফেয ইবনে কাইয়্যাম ‘দাওয়ায়ে-শাকী’ গ্রন্থে লিখেন,—গোনাহর এক নগদ শাস্তি এই যে, এর পরেই মানুষ অন্য গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। এমনিভাবে সংকর্মের এক নগদ প্রতিদান এই যে, এক সংকর্ম অন্য সংকর্মের দিকে আকর্ষণ করে।

বায়যাতী প্রমুখ বলেন, এ আয়াত বিশেষভাবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের দ্বারা গোনাহ সংঘটিত হতে পারে। পয়গম্বরগণ নিশাপ হয়ে থাকেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা ও উম্মাদ ব্যক্তি দ্বারা কোন গোনাহ হতে পারে না। তারা যদি কোন কষ্ট ও বিপদে পড়ে, তবে তারা এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কষ্টের অন্যান্য কারণ ও রহস্য থাকতে পারে। যেমন মর্যাদা উন্নীত করা ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে এসব রহস্যও মানুষ পূর্ণরূপে জানতে পারে না।

কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, যেসব গোনাহের শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে যায়, মুমিন ব্যক্তি সেগুলো থেকে পরকালে অব্যাহতি লাভ করবে। হাকেম ও বগভী হযরত আলীর রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।—(মায়হরী)

وَمِنَ الْيَتَامَىٰ الْيَتَامَىٰ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۚ إِنَّ يَتَامَىٰ يَتِيمِكُمُ الرَّفِيعُ
فَيَقْلَنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ ۚ أَوْ يُوقِنُ أَنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَيْفٍ ۚ وَيَعْلَمُ
الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آلِ يَتَامَىٰ لَهُمْ مِنْ حُجُجٍ ۚ فَمَا أَرْسَلْنَا
مِنْ نَبِيٍّ قَبْلَ آتِ الْيَتَامَىٰ ۚ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْغَىٰ
لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَيْبٍ مِّنْهُمْ ۚ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ
كِبْرَ الْأَعْمَىٰ وَالْفَوَاحِشَ ۚ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۚ
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ
بَيْنَهُمْ ۚ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۚ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ
الْبَغْيُ هُمْ يَكْتُمُونَ ۚ وَحَرُّوا أَسْبَاطَهُمْ ۚ سِبْطَهُمْ مِّثْلَهَا
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۚ
وَلَمَنِ اتَّقَىٰ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ
سَبِيلٍ ۚ إِنَّ السَّبِيلَ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ
يَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۚ وَلَمَنِ صَدْرٌ غَفِيرٌ ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۚ

(৩২) সমুদ্রে ভাসমান পর্বতসম জাহাজসমূহ তাঁর অন্যতম নিদর্শন।

(৩৩) তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে ধামিয়ে দেন। তখন জাহাজসমূহ সমুদ্রপৃষ্ঠে নিশ্চল হয়ে পড়ে যেন পাহাড়। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক সবারকারী, কৃতজ্ঞের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৩৪) অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্যে সেগুলোকে ধ্বংস করে দেন এবং অনেকেকে ক্ষমাও করে দেন (৩৫) এবং যারা আমার ক্ষমতা সম্পর্কে বিতর্ক করে, তারা যেন জানে যে, তাদের কোন পলায়নের জায়গা নেই। (৩৬) অতএব, তোমাদেরকে যা দেয়া হয়েছে তা পার্শ্ববর্তী জীবনের ভোগ মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে, তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্যে, যারা বিশ্রাস স্থাপন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করে, (৩৭) যারা বড় গোনাহ ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে, (৩৮) যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কয়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে, (৩৯) যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (৪০) আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে; নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন নাই। (৪১) নিশ্চয় যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধেও কোন অভিযোগ নেই। (৪২) অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের উপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্যে রয়েছে যত্নপাদায়ক শাস্তি। (৪৩) অবশ্যই যে সবার করে ও ক্ষমা করে নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, দুনিয়ার নেয়ামতসমূহ অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল এবং পরকালের নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ ও চিরন্তন। পরকালের নেয়ামতসমূহ অর্জনের সর্বপ্রধান শর্ত ঈমান। ঈমান ব্যতিরেকে সেখানে এসব নেয়ামত কেউ লাভ করতে পারবে না। কিন্তু ঈমানের সাথে যদি সংকর্ম ও পুরোপুরি সম্পাদন করা হয়, তবে পরকালের নেয়ামত শুরুতেই অর্জিত হয়ে যাবে। নতুবা গোনাহ ও ক্রটির শাস্তি ভোগ করার পর অর্জিত হবে। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সর্বপ্রথম শর্ত ঈমান বর্ণিত হয়েছে। এরপর বিশেষ বিশেষ কর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো ব্যতীত আইন অনুযায়ী পরকালের নেয়ামতসমূহ শুরুতেই পাওয়া যাবে না, বরং গোনাহের শাস্তি ভোগ করার পর পাওয়া যাবে। 'আইন অনুযায়ী' বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে সমস্ত গোনাহ মাফ করে শুরুতেই পরকালের নেয়ামতসমূহ মহাপাপীকেও দিতে পারেন। তিনি কোন আইনের অধীন নন। এখন এখানে শুরুত্ব সহকারে উল্লেখিত কর্ম ও গুণাবলী লক্ষ্য করুন :

প্রথম গুণ— **وَعَلَىٰ رَيْبٍ مِّنْهُمْ** — অর্থাৎ, সর্বকাজে ও সর্বাবস্থায় পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। তিনি ব্যতীত অপরকে সত্যিকার কার্যনির্বাহী মনে করে না। দ্বিতীয় গুণ— **وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبْرَ الْأَعْمَىٰ** — অর্থাৎ, যারা মহাপাপ বিশেষতঃ অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে। মহাপাপ তথা কবীরা গোনাহ কি, তার বিশদ বিবরণ সূরা নেসায় বর্ণিত হয়েছে।

কবীরা গোনাহসমূহের মধ্যে সমস্ত গোনাহই অন্তর্ভুক্ত। তবে অশ্লীল গোনাহকে আলাদা করে বর্ণনা করার তাৎপর্য এই যে, অশ্লীল গোনাহ সাধারণ কবীরা গোনাহ অপেক্ষা তীব্রতর ও সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় হয়ে থাকে। এর দ্বারা অন্যরাও প্রভাবিত হয়। নির্লজ্জ কাজকর্ম বোঝানোর জন্যে **فَوَاحِش** শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, ব্যভিচার ও তার ভূমিকাসমূহ। এছাড়া যেসব কুর্কর্ম ধৃষ্টতা সহকারে প্রকাশ্যে করা হয়, সেগুলোকেও **فَوَاحِش** তথা অশ্লীল বলা হয়। কেননা, এগুলোর কু প্রভাবও যথেষ্ট তীব্র এবং গোটা মানব সমাজকে কলুষিত করে।

তৃতীয় গুণ— **وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ** — অর্থাৎ, তারা রাগান্বিত হয়েও ক্ষমা করে। এটা সক্রিয়তার উত্তম নমুনা। কেননা, কারও ভালবাসা অথবা কারও প্রতি ক্রোধ যখন প্রবল আকার ধারণ করে, তখন সুস্থ, বিবেকবান ও বুদ্ধিমান মানুষকেও অন্ধ ও বধির করে দেয়। সে বৈধ-অবৈধ, সত্য-মিথ্যা ও আপন কর্মের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলে। কারও প্রতি ক্রোধ হলে সে সাধ্যমত ঝাল মেটানোর চেষ্টা করে। আল্লাহ তাআলা মুমিন ও সংকর্মীদের এগুণ বর্ণনা করেছেন যে, তারা ক্রোধের সময় কেবল বৈধ-অবৈধের সীমায় অবস্থান করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং অধিকার থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা প্রদর্শন করে।

চতুর্থ গুণ— **وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ** — এর অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন আদেশ পাওয়া মাত্রই বিনা দ্বিধায় তা কবুল করতে ও পালন করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। যে আদেশ মনের অনুকূলে হোক অথবা প্রতিকূলে। এতে ইসলামের সকল ফরয কর্ম পালন এবং হারাম ও মাকরহ কর্ম থেকে বেঁচে থাকা দাখিল রয়েছে। ফরয কর্মসমূহের মধ্যে নামায

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর বৈশিষ্ট্যও এই যে, এটা পালন করলে অন্যান্য ফরয কর্ম পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকারও তওফীক হয়ে যায়। তাই এর উল্লেখ স্বতন্ত্রভাবে করা হয়েছে। বলা হয়েছে وَاتَّقُوا الصَّلَاةَ অর্থাৎ তারা সকল ওয়াজিব ও আদবসহ বিশুদ্ধরূপে নামায পড়ে।

পঞ্চম গুণ وَأَمَّا سُورَةُ بَيِّنَةٍ — অর্থাৎ, তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে স্থিরাবৃত্ত হয়। অর্থাৎ, যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শরীয়ত কোন বিশেষ বিধান নির্দিষ্ট করেনি, সেগুলো মীমাংসার কাজে তারা পরস্পর পরামর্শ করে। এখানে امر শব্দের অনুবাদ ‘গুরুত্বপূর্ণ বিষয়’ করা হয়েছে। কেননা, সাধারণের পরিভাষায় امر শব্দ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূরা আলে ইমরানের وَسَأَوْفُّهُمْ فِي الْأَثَرِ আয়াতের তফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং একথাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদি এবং সাধারণ লেন-দেনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সবই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে-কাসীর বলেন, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ গ্রহণ করা ওয়াজীব।

ইমাম জাসসাস আহকামুল-কোরআনে বলেন, এ আয়াত থেকে পরামর্শের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। এতে আমাদের প্রতি পরামর্শসাপেক্ষ কাজে তাড়াহুড়া না করার, নিজস্ব মতকেই প্রাধান্য দিয়ে কাজ না করার এবং জ্ঞানী ও সুবীর্গের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে।

পরামর্শের গুরুত্ব ও পন্থা : খতীব বাগদাদী হযরত আলী মুতজ্জা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার অবর্তমানে আমরা যদি এমন কোন ব্যাপারের সম্মুখীন হই, যাতে কোরআনের কোন ফয়সালা নেই এবং আপনার পক্ষ থেকেও কোন ফয়সালা না পাই, তবে আমরা সে ব্যাপারে কি করব? রসুলুল্লাহ (সাঃ) জওয়াবে বললেন— এর জন্যে আমার উম্মতের এবাদতকারীদেরকে একত্রিত করবে এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কর্তব্য স্থির করবে; কারও একক মতে ফয়সালা করো না।

রুহুল-মা’আনীর গ্রন্থকার বলেন, যে পরামর্শ এভাবে না নিয়ে বে-এলম ও বে-দ্বীন লোকদের কাছ থেকে নেয়া হয়, তার সুফলের চেয়ে কুফলই বেশী হবে।

বায়হাকী বর্ণিত হযরত ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)

বলেন, যে ব্যক্তি কোন কাজের ইচ্ছা করে তাতে পরামর্শ গ্রহণ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে সঠিক বিষয়ের দিকে হেদায়েত করবেন। অর্থাৎ, যে কাজের পরিণতি তার জন্যে মঙ্গলজনক ও উত্তম, সে কাজের দিকে তার মনের গতি ফিরিয়ে দেবেন। এমনি ধরনের এক হাদীসে ইমাম বোখারী আল-আদাবুল মুফরাদে হযরত হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি উল্লেখিত আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন :

ما تشاور قوم قط الا هداوا لارشاد امرهم — যখন কোন সম্প্রদায় পরামর্শক্রমে কাজ করে, তখন তাদেরকে অবশ্যই সঠিক পথনির্দেশ দান করা হয়।

এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যতদিন পর্যন্ত তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিস্তারিত দানশীল হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সম্পন্ন হবে, ততদিন ভূ-পৃষ্ঠে তোমাদের বসবাস করা অর্থাৎ, জীবিত থাকা ভাল। পক্ষান্তরে যখন তোমাদের শাসকবর্গ তোমাদের মন্দ ব্যক্তি হবে, তোমাদের বিস্তারিত কৃপণ হবে এবং তোমাদের কাজকর্ম নারীদের হাতে ন্যস্ত হবে—তারা যেভাবে ইচ্ছা কাজ করবে, তখন তোমাদের বসবাসের জন্যে ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা ভূগর্ভই শ্রেয় হবে। অর্থাৎ, বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই উত্তম হবে।—(রুহুল-মা’আনীর)

ষষ্ঠ গুণ— وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُقْنُونَ — অর্থাৎ, তারা আল্লাহ প্রদত্ত রিমিক থেকে সংকাজে ব্যয় করে। ফরয যাকাত, নফল দান-খয়রাত সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কোরআনের সাধারণ বর্ণনাপদ্ধতি অনুযায়ী নামাযের সাথে যাকাত ও সদকার উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। এখানে নামাযের আলোচনার পরে পরামর্শের বিষয় বর্ণনা করে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযের জন্যে মসজিদসমূহে দৈনিক পাঁচ বার লোকজন সমবেত হয়। পরামর্শসাপেক্ষ বিষয়াদিতে পরামর্শ নেয়ার কাজেও এ সমাবেশকে ব্যবহার করা যায়।—(রুহুল-মা’আনীর)

সপ্তম গুণ— وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ فَهُمْ يَنْتَصِرُونَ — অর্থাৎ, তারা অত্যাচারিত হয়ে সমান সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং এতে সীমালঙ্ঘন করে না। এটা প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় গুণের ব্যাখ্যা ও বিবরণ। তৃতীয় গুণ ছিল এই যে, তারা শত্রুকে ক্ষমা করে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ক্ষমা করলে অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। তখন প্রতিশোধ গ্রহণই উত্তম বিবেচিত হয়। আয়াতে এরই বিধান বর্ণিত হয়েছে যে, কোথাও প্রতিশোধ গ্রহণ শ্রেয়ঃ বিবেচিত হলে সেখানে সাম্যের সীমা লঙ্ঘন না করার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। সীমা লঙ্ঘিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণও অত্যাচারে পর্যবসিত হবে। এ কারণেই পরে বলা হয়েছে— وَجَزَاءُ

سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا — অর্থাৎ, মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই হয়ে থাকে। তোমার যতটুকু আর্থিক অথবা শারিরীক ক্ষতি কেউ করে, তুমি ঠিক ততটুকু ক্ষতিই তার কর। তবে শর্ত এই যে, তোমার মন্দ কাজটি যেন পাপকর্ম না হয়। উদাহরণতঃ কেউ তোমাকে বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দিলে তোমার জন্যে তাকেও বলপূর্বক মদ পান করিয়ে দেয়া জায়েয হবে না।

আয়াতে যদিও সমান সমান প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু পরে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ — অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ক্ষমা করে এবং আপোষ-নিশ্চিন্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। এতে নির্দেশ রয়েছে যে, ক্ষমা করাই

الحقودى ৩২

২৮৭

اليه يرد ২৮

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ مِنْ يَعْدِيهِ وَيُتْرَى الظَّالِمِينَ
لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ۖ وَتَرَاهُمْ
يُعْرَضُونَ عَلَيْهِمْ خَشِيعِينَ مِنَ الدَّلَالِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيفٍ
وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَبِيرِينَ الَّذِينَ خَبَرُوا أَنَّهُمْ وَأَقْبَلَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ۖ وَمَا كَانَ لَهُمْ
مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُوهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
مِنْ سَبِيلٍ ۖ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ مَكْرُوهٍ
مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ لَوْ كُنْتُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ ۖ وَإِنْ أَعْرَضُوا
فَمَا أَوَّلُكُمْ عَلَيْهِمْ حَيْثُ أَنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْبَلَاءَ رَأَاهُ إِذَا أَذْمَنَّا
الْإِنْسَانَ مِرَارَةً فَرَّ بِهَا وَإِنْ تَضَيَّقَتْ مِنْهَا فَمَا قَدَّ مَتَّ
أَيُّدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَوُورٌ ۖ لِلَّهِ تِلْكَ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۖ
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يُعَبِّدُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا وَهَبَ لِمَنْ يَشَاءُ الدُّكُورَ
أَوْ الذُّكُورَ جُوعًا وَدُرًّا وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا وَهَبَ لِمَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ
قَدِيرٌ ۖ وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
أَوْ رِسَالٍ رَسُولًا يُخَوِّفُ بِأَذْيَابِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى حَكِيمٍ ۝

(৪৪) আল্লাহ যাকে পঞ্চভট করেন, তার জন্যে তিনি ব্যতীত কোন কার্যনির্বাহী নেই। পাপাচারীরা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন আপনি তাদেরকে দেখবেন যে, তারা বলছে আমাদের ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি? (৪৫) জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করার সময় আপনি তাদেরকে দেখবেন, অপমানে অবনত এবং অর্থ নির্মীলিত দৃষ্টিতে তাকায়। মুমিনরা বলবে, কেয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারা, যারা নিজেদের ও তাদের পরিবার-পরিজনদের ক্ষতি সাধন করেছে। শুনে রাখ, পাপাচারীরা স্থায়ী আযাবে থাকবে। (৪৬) আল্লাহ তাআলা ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না, যে তাদেরকে সাহায্য করবে। আল্লাহ তাআলা যাকে পঞ্চভট করেন, তার কোন গতি নেই। (৪৭) আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য কর। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তা নিরোধকারী কেউ থাকবে না। (৪৮) যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা। আমি যখন মানুষকে আমার রহমত আশ্বাদন করাই, তখন সে উল্লসিত হয়, আর যখন তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের কোন অনিষ্ট ঘটে, তখন মানুষ খুব অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (৪৯) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ তাআলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দান করেন, (৫০) অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশালী। (৫১) কোন মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন; কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পদার অভ্যন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন দূত প্রেরণ করবেন, অতঃপর আল্লাহ যা চান, সে তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞাময়।

উত্তম। পরবর্তী দু'আয়াতে এরই আরও বিবরণ দেয়া হয়েছে।

ক্ষমা ও প্রতিশোধ গ্রহণে সুখম ফয়সালা : হযরত ইবরাহীম নখরী (রহঃ) বলেন, পূর্ববর্তী মনীষীগণ এটা পছন্দ করতেন না যে, মুমিনগণ পাপাচারী লোকদের সামনে নিজেদেরকে হয়ে প্রতিপন্ন করবেন। ফলে তাদের ধৃষ্টতা আরও বেড়ে যাবে। তাই যেক্ষেত্রে ক্ষমা করার ফলে পাপাচারীদের ধৃষ্টতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেয়াই উত্তম। ক্ষমা করা তখন উত্তম, যখন অত্যাচারী ব্যক্তি অনুতপ্ত হয় এবং তার পক্ষ থেকে অত্যাচার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে। কাহী আবুবকর ইবনে আরাবী ও কুরতুবী এ নীতিই পছন্দ করেছেন। তারা বলেন, ক্ষমা ও প্রতিশোধ দু'টিই অবস্থা ভেদে উত্তম। যে ব্যক্তি অন্যায় করার পর লজ্জিত হয়, তাকে ক্ষমা করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি স্বীয় জেদে ও অত্যাচারে অটল থাকে, তার ক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেয়াই উত্তম।

বয়ানুল-কোরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আলোচ্য দু'আয়াতে খাঁটি মুমিন ও সৎকর্মীদের দু'টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। হুর্বিফুরুন—এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, তারা ক্রোধের সময় নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলে না; বরং তখনও ক্ষমা ও অনুকম্পা তাদের মধ্যে প্রবল থাকে। ফলে ক্ষমা করে দেয়। পক্ষান্তরে হুর্বিফুরুন—বাক্যে বলা হয়েছে যে, কোন সময় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রেরণা তাদের মধ্যে জাগ্রত হলেও তারা তাতে ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করে না, যদিও ক্ষমা করে দেয়া উত্তম।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রাথমিক আয়াতসমূহে তাদের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে, যারা মুমিন সৎকর্মীদের বিপরীতে কেবল দুনিয়ার আরাম-আশেষ ও সুখ-শান্তি কামনা করে। এরপর اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ—বাক্যে তাদেরকে কেয়ামতের আযাব আসার পূর্বে তওবা করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দেয়া হয়েছে যে, আপনার বারংবার প্রচার ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি তাদের চৈতন্য ফিরে না আসে, তবে আপনি দুঃখিত হবেন না। وَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَوَّلُكُمْ عَلَيْهِمْ حَيْثُ أَنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْبَلَاءَ رَأَاهُ إِذَا أَذْمَنَّا—বাক্যের মর্ম তাই।

..... وَلِلَّهِ تِلْكَ السَّمُوتُ

তাআলার সর্বময় ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা বর্ণনা করে তওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টির আলোচনার পর خَلَقَ বলে কুদরতের একটি বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি প্রত্যেক ছোট বড় বস্তু সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যখন ইচ্ছা, যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির উল্লেখ করে বলা হয়েছে।

يُعَبِّدُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا وَهَبَ لِمَنْ يَشَاءُ الدُّكُورَ أَوْ الذُّكُورَ جُوعًا وَدُرًّا

وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا وَهَبَ لِمَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

অর্থাৎ, মানব সৃষ্টিতে কারও ইচ্ছা, ক্ষমতা এমনকি, জ্ঞানেরও কোন দখল নেই। পিতা-মাতা মানবসৃষ্টির বাহ্যিক মাধ্যম হয়ে থাকে মাত্র। সন্তান প্রজননে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতারও কোন দখল নেই। দখল থাকা তো দূরের কথা, সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্বে মাতাও জানে না যে, তার গর্ভে কি আছে এবং কিভাবে গঠিত হচ্ছে। আল্লাহ তাআলাই কাউকে কন্যা-সন্তান,

কাউকে পুত্র সন্তান, কাউকে পুত্র-কন্যা উভয়ই দান করেন এবং কাউকে সম্পূর্ণ বন্ধ্যা করে রাখেন—তার কোন সন্তানই হয় না।

এসব আয়াতে সন্তানের প্রকার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কন্যা-সন্তানের উল্লেখ করেছেন, আর পুত্র-সন্তানের উল্লেখ করেছেন পরে। এ ইঙ্গিতদ্বষ্টে হযরত ওয়াহেদা ইবনে আসকা বলেন, যে নারীর গর্ভ থেকে প্রথমে কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে পুণ্যময়ী।—(কুরত্বী)

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াত ইহুদীদের এক হঠকারিতামূলক দাবীর জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে। বগতী ও কুরত্বী প্রমুখ লিখেছেন, ইহুদীরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে বলল, আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। কেননা, আপনি মুসা (আঃ)—এর ন্যায় আল্লাহ তাআলাকে দেখেন না এবং তাঁর সাথে সামন-সামনি কথাবার্তাও বলেন না।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, একথা সত্য নয় যে, মুসা (আঃ) আল্লাহ তাআলাকে দেখেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর সারমর্ম এই যে, এ দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার সাথে সরাসরি ও সামন-সামনি কথা বলা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। স্বয়ং হযরত মুসা (আঃ)—ও সামন-সামনি কথা শুনে নি, বরং যবনিকার অন্তরাল থেকে আওয়াজ শুনেছেন মাত্র।

এ আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, কোন মানুষের সাথে আল্লাহ তাআলার কথা বলার তিনটি মাত্র উপায় রয়েছে। (এক) **وَحَيًّا** অর্থাৎ, কোন বিষয় অন্তরে জাগ্রত করে দেয়া। এটা জাগ্রত অবস্থায়ও হতে পারে এবং নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নের আকারে হতে পারে। অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) **رُؤِيَ فِي رُؤْيَى** বলতেন। অর্থাৎ, এ বিষয়টি আমার অন্তরে জাগ্রত করা হয়েছে। পয়গম্বরগণের স্বপ্নও ওহী হয়ে থাকে। এতে শয়তানের কারসাজি থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় সাধারণতঃ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শব্দ অবতীর্ণ হয় না; কেবল বিষয়বস্তু অন্তরে জাগ্রত হয়, যা পয়গম্বরের নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন।

দ্বিতীয় উপায় **أَوْحَيْنَا وَكَانَ فِي جَبْهٍ** অর্থাৎ, জাগ্রত অবস্থায় যবনিকার অন্তরাল থেকে কোন কথা শোনা। মুসা (আঃ) তুর পর্বতে এভাবেই আল্লাহ তাআলার কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি আল্লাহ তাআলার সাক্ষাত

লাভ করেননি। তাই **رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ** বলে সাক্ষাতের আবেদন জানান, যার নেতিবাচক জওয়াব **لَنْ نَرِيَنَّكَ** বলে দেয়া হয়।

দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাতের অন্তরায় যবনিকাটি এমন কোন বস্তু নয়, যা আল্লাহ তাআলাকে ঢেকে রাখতে পারে। কেননা, তাঁর সর্বব্যাপী নূরকে কোন বস্তুই ঢাকতে পারে না। বরং মানুষের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতাই এ সাক্ষাতের পথে অন্তরায় হয়ে থাকে। জন্মাতে মানুষের দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে দেয়া হবে। ফলে সেখানে প্রত্যেক জন্মাতী আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভে ধন্য হবে। সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী আহলে সুনুত ওয়াল জমাআতের মাযহাবও তাই।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত এ নীতি দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দুনিয়াতে কোন মানুষ আল্লাহ তাআলার সাথে সামন-সামনি কথা বলতে পারে না। আলোচনা যেহেতু মানুষ সম্পর্কে, তাই আয়াতে বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা বাহ্যতঃ ফেরেশতাগণের সাথেও আল্লাহ তাআলার সামন-সামনি কথা হয় না। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে জিবরাঈল (আঃ)—এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আমি অনেক কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম, তবুও আমার এবং আল্লাহ তাআলার মধ্যে সত্তর হাজার পর্দা রয়ে গিয়েছিল। কোন কোন আলেমের উক্তি অনুযায়ী যদি মে'রাজ-রজনীতে আল্লাহ তাআলার সাথে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর মুখোমুখি কথাবার্তা প্রমাণিত হয়, তবে তা উপরোক্ত নীতির পরিপন্থী নয়। কেননা, সে কথাবার্তা এ জগতের নয়—আরশে হয়েছিল।

তৃতীয় উপায়— **أَوْحَيْنَا سُلُوكًا** — অর্থাৎ, জিবরাঈল প্রমুখ কোন ফেরেশতাকে কলাম দিয়ে প্রেরণ করা এবং পয়গম্বরকে তার পাঠ করে শুনানো। এটাই ছিল সাধারণ পন্থা। কোরআন পাক সম্পূর্ণ এ উপায়ে ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে। উপরোক্ত বিবরণে **وَحْي** শব্দটিকে অন্তরে নিক্ষেপ করার অর্থে নেয়া হয়েছে। কিন্তু শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ তাআলার সব ধরনের কালামের অর্থে ব্যবহৃত হয়। বোখারীর একদীর্ঘ হাদীসে ফেরেশতার মাধ্যমে কথাবার্তাকেও ওহীর একটি প্রকার গণ্য করা হয়েছে। তাতে আরও বলা হয়েছে যে, ফেরেশতার মাধ্যমে আগত ওহীও দু'রকম। কখনও ফেরেশতা আসল আকৃতিতে আসেন এবং কখনও মানুষের আকৃতিতে।

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَاحِ وَالْإِنْقَامِ
مَاتَرَكُونَ ۖ لَسَوْعَاتٍ لَّهُمْ قُحُورٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا رُءُوسَكُمْ وَتَبْتِغُوا
أَسْوَاقَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ وَتَقُولُوا سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا
لَهُ مُقْرِنِينَ ۖ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۝ وَجَعَلُوا لَهُ مِن
عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۝ أَمْ اتَّخَذُوا أَعْلٰنَ
بَنَاتٍ وَأَصْنَعُوا بِالْبَنِينَ ۝ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا غَرِبَ
لِلرَّحْمَنِ مِثْلًا طَلَّ وَجْهُهُ سُودًا أَوْ هُوَ ظَلِيمٌ ۖ وَمِنْ يَبْتَشِّرُهُ
فِي الْحَيٰةِ وَهُوَ فِي الْإِحْصَاءِ غَيْرٌ مُّبِينٌ ۖ وَجَعَلُوا الْمَلَٰئِكَةَ
الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ إِنَاثًا فَسَدَّوْا لَهُمْ سُبْحٰنَ
شَهَادَتِهِمْ وَيَسْتَلُونَ ۖ وَقَالُوا الْوَسْءُ الرَّحْمٰنِ مَلْعُونٌ ۖ أَمْ أَنِ
مَالَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۖ أَمْ أَنِ
كُنِيَٰمِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۖ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا
آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ۖ وَكَذٰلِكَ مَا
أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرِكُوهَا
إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ۖ

(১২) এবং যিনি সবকিছুর যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং নোকা ও চতুষ্পদ জন্তকে তোমাদের জন্যে যানবাহনে পরিণত করেছেন, (১৩) যাতে তোমরা তাদের পিঠের উপর আরোহণ কর। অতঃপর তোমাদের পালনকর্তার নেয়ামত সুরণ কর এবং বল পবিত্র তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। (১৪) আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। (১৫) তারা আল্লাহ্র বন্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্র অংশ স্থির করেছে। বাস্তবিক মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ। (১৬) তিনি কি তাঁর সৃষ্টি থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদের জন্যে মনোনীত করেছেন পুত্র-সন্তান? (১৭) তারা রহমান আল্লাহ্র জন্যে যে কন্যা-সন্তান বর্ণনা করে, যখন তাদের কাউকে তার সংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং ভীষণ মনস্তাপ ভোগ করে। (১৮) তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্র জন্যে বর্ণনা করে, যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কিত কথা বলতে অক্ষম? (১৯) তারা নারী স্থির করে ফেরেশতাগণকে, যারা আল্লাহ্র বন্দা। তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে। এখন তাদের দাবী নিষিদ্ধ করা হবে এবং তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। (২০) তারা বলে, রহমান আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আমরা ওদের পূজা করতাম না। এ বিষয়ে তারা কিছুই জানে না। তারা কেবল অনুমানে কথা বলে। (২১) আমি কি তাদেরকে কোরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি, অতঃপর তারা তাকে আঁকড়ে রেখেছে? (২২) বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত। (২৩) এমনভাবে আপনার পূর্বে আমি যখন কোন জনপদে কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই তাদের বিভ্রান্তালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলছি।

প্রচারকের পক্ষে নিরাশ হয়ে বসে থাকা উচিত নয় :

أَفَضْرِبَ عَنكُمُ الَّذِي تَرْتَفَعُونَ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّشْرِقِينَ (আমি কি তোমাদের কাছ

থেকে এ উপদেশ গ্রহণ প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা সীমাতিক্রমকারী সম্প্রদায়) উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা আবাত্যতায় যতই সীমা অতিক্রম কর না কেন, আমি তোমাদেরকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান পরিত্যাগ করব না। এ থেকে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত ও তবলীগের কাজ করে, তার উচিত প্রত্যেকের কাছে পয়গাম নিয়ে যাওয়া এবং কোন দলের কাছে তবলীগ শুধু এ কারণে পরিত্যাগ করা উচিত নয় যে, তারা চরম পর্যায়ের মূলহিদ, বে-দীন অথবা পাপাচারী।

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا (তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে বিছানা

করেছেন।) উদ্দেশ্য এই যে, পৃথিবীর বাহ্যিক আকার বিছানার মত এবং এতে বিছানার অনুরূপ আরাম পাওয়া যায়। সুতরাং এটা গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَاحِ وَالْإِنْقَامِ مَاتَرَكُونَ (তোমাদের জন্যে

নোকা ও চতুষ্পদ জন্ত সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ কর।) মানুষের যানবাহন দু'প্রকার। (এক) যা মানুষ নিজের শিল্পকৌশল দ্বারা নিজেই তৈরী করে। (দুই) যার সৃষ্টিতে মানুষের শিল্পকৌশলের কোন দখল নেই। 'নোকা' বলে প্রথম প্রকার যানবাহন এবং চতুষ্পদ জন্ত বলে দ্বিতীয় প্রকার যানবাহন বোঝানো হয়েছে। সর্বাবস্থায় উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের ব্যবহারের যাবতীয় যানবাহন আল্লাহ তাআলার মহা অবদান। চতুষ্পদ জন্ত যে অবদান, তা বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। এগুলো মানুষের চেয়ে কয়েক গুণ বেশী শক্তিশালী হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এগুলোকে মানুষের এমন বশীভূত করে দিয়েছেন যে, একজন বালকও ওদের মুখে লাগাম অথবা নাকে রশি লাগিয়ে যথা ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারে। এমনভাবে যেসব যানবাহন তৈরীতে মানুষের শিল্পকৌশলের দখল আছে, সেগুলোও আল্লাহ তাআলারই অবদান। উড়াবিমান থেকে শুরু করে মামুলী সাইকেল পর্যন্ত যদিও বাহ্যতঃ মানুষ নির্মাণ করে, কিন্তু এগুলোর নির্মাণের কৌশল আল্লাহ ব্যতীত কে শিক্ষা দিয়েছে? সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলাই মানুষের মস্তিষ্কে এমন শক্তি দান করেছেন যে, লোহাকেও মোমে পরিণত করে ছাড়ে। এছাড়া এগুলোর নির্মাণে যে কাঁচামাল ব্যবহৃত হয়, তা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সরাসরি আল্লাহ্র সৃষ্টি।

ثُمَّ تَوَلَّوْا رُءُوسَكُمْ وَتَبْتِغُوا (এবং যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার

অবদান সুরণ কর)। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষের কর্তব্য হল সত্যিকার দাতা আল্লাহ তাআলার নেয়ামতসমূহ ব্যবহার করার সময় অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করার পরিবর্তে এ বিষয়ের ধ্যান করা যে, এগুলো আমার প্রতি আল্লাহ্র দান। কাজেই তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তাঁর উদ্দেশ্য বিনয় ও অসহায়ত্ব ব্যক্ত করা আমার উপর ওয়াজিব। সৃষ্ট জগতের নেয়ামতসমূহ মুমিন ও কাফের উভয়েই ব্যবহার করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, কাফের চরম উদাসীনতা ও বেপরওয়া মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করে আর মুমিন আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহকে চিন্তায়

উপস্থিত রেখে তাঁর সামনে বিনয়ানত হয়। এ লক্ষ্যই কোরআন ও হাদীসে বিভিন্ন কাজ আনজাম দেয়ার সময় সবার ও শোকরের বিষয়বস্তুসম্বলিত বিভিন্ন দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। মানুষ যদি দৈনন্দিন জীবনে উঠাবসা ও চলা-ফেরায় এসব দোয়া নিয়মিত পাঠ করে তবে তার প্রত্যেক বৈধ কাজই এবাদত হয়ে যেতে পারে। এসব দোয়া আল্লামা জয়ীর কিতাব 'হিসনে হাসীনে' এবং মাওলানা আশরাফ আলী খানভীর কিতাব 'মোনাজাতো মকবুলে' দ্রষ্টব্য।

সফরের দোয়া : سُبْحَنَ الَّذِي سَمَوَاتُهُ مَرْجَاتٌ (পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন)। এটা যানবাহনে বসে পাঠ করার দোয়া। রসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে একাধিক রেওয়াজে প্রমাণিত আছে যে, তিনি সওয়ারীর জন্তর উপর বসার সময় এই দোয়া পাঠ করতেন। আরোহণ করার মোস্তাহাব পদ্ধতি হযরত আলী (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে যে, সওয়ারীতে পা রাখার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলবে, অতঃপর সওয়ার হওয়ার পরে 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করে سُبْحَنَ الَّذِي سَمَوَاتُهُ مَرْجَاتٌ থেকে শুরু করে سُبْحَنَ الَّذِي سَمَوَاتُهُ مَرْجَاتٌ পর্যন্ত পাঠ করবে।— (কুরত্বী)

وَمَا آتَاكَ مِنْ شَيْءٍ (আমরা এমন ছিলাম না যে, একে বশীভূত করব)। এটা যাত্রিক যানবাহনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা, আল্লাহ তাআলা মৌল উপাদান সৃষ্টি না করলে অথবা তাতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া না রাখলে অথবা মানুষের মস্তিষ্কে সেসব বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের শক্তিদান না করলে সমগ্র সৃষ্টি একত্রিত হয়েও এমন যানবাহন সৃষ্টি করতে সক্ষম হত না।

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকেই ফিয়ে যাব)। এ বাক্য শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, মানুষের উচিত পার্থিব সফরের সময় পরকালের কঠিন সফরের কথা স্মরণ করা, যা সর্বাবস্থায় সংঘটিত হবে। সে সফর সহজে অতিক্রম করার জন্যে সংকল্প ব্যতীত কোন সওয়ারী কাজে আসবে না।

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادٍ جُزْأً (তারা আল্লাহর বন্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহর অংশ স্থির করেছে)। এখানে অংশ বলে সন্তান বোঝানো হয়েছে। মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে 'আল্লাহর কন্যা-সন্তান' আখ্যা দিত। 'সন্তান' না বলে 'অংশ' বলে মুশরেকদের এই বাতিল দাবীর যুক্তিভিত্তিক খণ্ডনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে তা এভাবে যে, আল্লাহ তাআলার কোন সন্তান থাকলে সে আল্লাহ তাআলার অংশ হবে। কেননা, পুত্র পিতার অংশ হয়ে থাকে। যুক্তিসংগত নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বস্তু স্বীয় অস্তিত্বের জন্যে তার অংশসমূহের প্রতি মুখাপেক্ষী। এ থেকে জরুরী হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ তাআলাও তাঁর সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী হবেন। বলাবাহুল্য যে কোন প্রকার মুখাপেক্ষিতা আল্লাহর মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

أَوَمِنْ يُنْقِضُوا إِلَيْكَ الشَّيْءَ (যে অলংকার ও সাজ - সজ্জায় লালিত - পালিত হয়) -এ থেকে জানা গেল যে, নারীর জন্যে অলংকার ব্যবহার এবং শরীয়তসম্মত সাজ-সজ্জা অবলম্বন করা জায়েয। এ বিষয়ের ইজমাও আছে। কিন্তু বর্ণনাপদ্ধতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সারা দিনমান সাজ-সজ্জা ও প্রসাধনে ডুবে থাকা সমীচীন নয়। এটা বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতার লক্ষণ ও কারণ।

وَمَنْ يَخْصُرْ عَمْرَهُ طِينِينَ (এবং সে বিতর্কে কথা বলতেও অক্ষম)। উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ নারী মনের ভাব জ্ঞোরেশোরে ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পুরুষদের সমান সক্ষম নয়। এ কারণেই বিতর্কে নিজেদের দাবী সপ্রমাণ করা ও প্রতিপক্ষের দাবী প্রমাণ সহকারে খণ্ডন করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এটা অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কাজেই কোন কোন নারী যদি বাকপটুতায় পুরুষদেরকেও হারিয়ে দেয়, তবে সেটা এ আয়াতের পরিপন্থী হবে না। কেননা, অধিকাংশের লক্ষ্যই সাধারণতঃ নীতি বর্ণনা করা হয়। নারীদের অধিকাংশ এরূপই বটে।



(২৪) সে বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছ, আমি যদি তদপেক্ষা উত্তম বিষয় নিয়ে তোমাদের কাছে এসে থাকি, তবুও কি তোমরা তাই বলবে? তারা বলত তোমরা যে বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছ, তা আমরা মানব না। (২৫) অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখুন, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে। (২৬) যখন ইবরাহীম তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (২৭) তারে আমার সম্পর্ক তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, তিনিই আমাকে সংপথ প্রদর্শন করবেন। (২৮) এ কথাটিকে সে অক্ষয় বাণীরূপে তার সন্তানদের মধ্যে রেখে গেছে, যাতে তারা আল্লাহর দিকেই আকৃষ্ট থাকে। (২৯) পরন্তু আমিই এদেরকে ও এদের পূর্বপুরুষদেরকে জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি, অবশেষে তাদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আগমন করেছে। (৩০) যখন সত্য তাদের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, এটা যাদু, আমরা একে মানি না। (৩১) তারা বলে, কোরআন কেন দুই জনপদের কোন প্রধান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হল না? (৩২) তারা কি আপনার পালনকর্তার সহমত বন্ধন করে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পাখিবি জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অপরকে সেবক রূপে গ্রহণ করে। তারা যা সঙ্কল্প করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা উত্তম। (৩৩) যদি সব মানুষের এক যতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে দিভ্যত তাদের গৃহের জন্যে রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপর তারা চড়ত (৩৪) এবং তাদের গৃহের জন্যে পরজাতি দাস এবং পালক দিভ্যত, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। (৩৫) এবং স্বর্ণনির্মিতও দিভ্যত। এগুলো সবই তো পাখিবি জীবনের ভোগ সামগ্রী মাত্র। আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাঁদের জন্যেই যারা ভয় করে।

وَأَذَقَالِ بُرُؤِهِمْ পূর্ববর্তী আয়াতের শেষে বলা হয়েছিল, মুশরেকদের কাছে তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণ ব্যতীত শিরকের কোন দলীল নেই। বলাবাহুল্য, সুস্পষ্ট যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদি থাকা সত্ত্বেও কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা খুবই অযৌক্তিক ও গর্হিত কাজ। এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি পূর্বপুরুষদেরই অনুকরণ করতে চাও, তবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসরণ কর না কেন, যিনি তোমাদের সম্ভ্রান্ততম পূর্বপুরুষ এবং যার সাথে সম্পর্ক রাখাকে তোমরা গর্বের বিষয় মনে কর? তিনি কেবল তওহীদেই বিশ্বাসী ছিলেন না, বরং তাঁর কর্মপন্থা পরিষ্কার ব্যক্ত করে যে, যুক্তিভিত্তিক ও ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণাদির উপস্থিতিতে কেবল পূর্বপুরুষদের অনুকরণ করা বৈধ নয়। তিনি যখন দুনিয়াতে প্রেরিত হন, তখন তাঁরা গোটা সম্প্রদায় তাদের পূর্বপুরুষদের অনুকরণে শিরকে লিপ্ত ছিল। কিন্তু তিনি পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের পরিবর্তে সুস্পষ্ট প্রমাণাদির অনুসরণ করে সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করে বলেন, إِنِّي بَرَأءُ مِمَّا تَعْبُدُونَ তোমরা যাদের পূজা কর, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি কুক্রমী ও অবিশ্বাসী দলের মধ্যে বসবাস করে এবং তাদের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে নীরব থাকে, তাকেও তাদের সমমনা মনে করার আশংকা থাকে, তাহলে কেবল তার বিশ্বাস ও কর্ম ঠিক করে নেয়াই যথেষ্ট হবে না, বরং সেই দলের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে তার সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করাও জরুরী হবে। সেমতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কেবল নিজের বিশ্বাস ও কর্মকে মুশরেকদের থেকে স্বতন্ত্র করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং মুখে ও সর্বসমক্ষে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছেন।

وَصَلَّاهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ (তিনি একে তাঁর সন্তানদের মধ্যে একটি চিরন্তন বাণীরূপে রেখে গেছেন।) উদ্দেশ্য এই যে, তিনি তাঁর তওহীদী বিশ্বাসকে নিজের সত্য পর্যন্তই সীমিত রাখেননি, বরং তাঁর বংশধরকেও এ বিশ্বাসে অটল থাকার ওসিয়ত করেছেন। সেমতে তাঁর বংশধরদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক লোক তওহীদপন্থী ছিল। স্বয়ং মক্কা মোকাররমা ও তার আশপাশে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত অনেক সুস্থমনা ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরেও ইবরাহীম (আঃ)-এর মূল ধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, নিজেকে ছাড়াও সন্তান-সন্ততিকে বিশুদ্ধ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করাও মানুষের অন্যতম কর্তব্য। পয়গম্বরগণের মধ্যে হযরত ইয়াকুব (আঃ) সম্পর্কেও কোরআন বর্ণনা করেছে যে, তিনি ওফাতের সময় পুত্রদেরকে বিশুদ্ধধর্মে কায়ম থাকার ওসিয়ত করেছিলেন। সুতরাং যে কোন সন্তাব্য উপায়ে সন্তান-সন্ততির কর্ম ও চরিত্র সংশোধনে পূর্ণ প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা যেমন জরুরী, তেমনি পয়গম্বরগণের সুনত বটে। সন্তানদের সংশোধনের অনেক পদ্ধতি রয়েছে যা স্থান বিশেষে অবলম্বন করা যায়। কিন্তু শায়খ আবদুল ওয়াহাব শা'রানী (রহঃ) 'লাতায়ফুল মিনান' গ্রন্থে একটি কার্যকরী পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, পিতা-মাতা সন্তানদের সংশোধনের জন্যে সমস্তে দোয়া করবেন। পরিতাপের বিষয়, এই সহজ পদ্ধতির প্রতি আজকাল

ব্যাপক উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। অবশ্য স্বয়ং পিতা-মাতারই এর অশুভ পরিণতি প্রত্যক্ষ করে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা মুশরেকদের একটি আপত্তির জওয়াব দিয়েছেন। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালতের ব্যাপারে এ আপত্তি করত। প্রকৃতপক্ষে তারা শুরুতে একথা বিশ্বাস করতই সম্মত ছিল না যে, রসূল কোন মানুষ হতে পারে। কোরআন পাক তাদের এ মনোভাব কয়েক জায়গায় উল্লেখ করেছে যে, আমরা মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কিরূপে রসূল মানতে পারি, যখন সে সাধারণ মানুষের মতই পানাহার করে এবং বাজারে চলাফেরা করে? কিন্তু যখন কোরআনের একাধিক আয়াতে ব্যক্ত করা হল যে, কেবল মুহাম্মদ (সাঃ)-ই নন দুনিয়াতে এ যাবৎ যত পয়গম্বর আগমন করেছেন, তারা সবাই মানুষ ছিলেন, তখন তারা পায়তারা পরিবর্তন করে বলতে শুরু করল যে, যদি কোন মানুষকেই নবুওয়ত সমর্পণ করার ইচ্ছা ছিল, তবে মক্কা ও তায়েফের কোন বিস্তান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে সমর্পণ করা হল না কেন? মুহাম্মদ (সাঃ) তো কোন প্রভাবশালী, ধনী ব্যক্তি নন। কাজেই তিনি নবুওয়ত লাভের যোগ্য নন। রেওয়ায়েতে আছে যে, এ ব্যাপারে তারা মক্কার ওলীদ ইবনে মুগীরা ও ওতবা ইবনে রবীয়া এবং তায়েফের ওরওয়া ইবনে মাসউদ সফকী, হাবীবা ইবনে আমরা সফকী অথবা কেননা ইবনে আবদে ইয়া'লীলের নাম পেশ করেছিল।—(রুহুল-মা'আনী)

মুশরেকদের এ আপত্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা দু'টি উত্তর দিয়েছেন। প্রথম জওয়াব উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের দ্বিতীয় আয়াতে এবং দ্বিতীয় জওয়াব এর পরবর্তী আয়াতে দেখা হয়েছে। যথাস্থানেই এর ব্যাখ্যাও করা হবে। প্রথম জওয়াবের সারমর্ম এই যে, এব্যাপারে তোমাদের নাক গলানোর কোন অধিকার নেই যে, আল্লাহ কাকে নবুওয়ত দিচ্ছেন এবং কাকে দিচ্ছেন না। নবুওয়তের বটন তোমাদের হাতে নয় যে, কাউকে নবী করার পূর্বে তোমাদের মত নিতে হবে। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে। তিনিই মহান। উপযোগিতা অনুযায়ী একাজ সমাধা করেন। তোমাদের অস্তিত্ব, জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা নবুওয়ত বটনের দায়িত্ব লাভের যোগ্যই নয়। নবুওয়ত বটন তো অনেক উচ্চস্তরের কাজ, তোমাদের মর্যাদা, অস্তিত্ব ও স্বয়ং তোমাদের জীবিকা ও জীবিকার আসবাবপত্র বটনের দায়িত্ব পালনেরও উপযুক্ত নয়। কারণ, আমি জানি তোমাদেরকে এ দায়িত্ব দেয়া হলে তোমরা একদিনও জগতের কাজ-কারবার পরিচালনা করতে সক্ষম হবে না এবং গোটা বাবস্থাপনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ তাআলা পার্থিব জীবনে তোমাদের জীবিকা বটনের দায়িত্বও তোমাদের হাতে সোপর্দ করেননি, বরং একাজ নিজের হাতেই রেখেছেন। অতএব, যখন নিম্নস্তরের একাজ তোমাদেরকে সোপর্দ করা যায় না, তখন নবুওয়ত বটনের মত মহান কাজ কিরূপে তোমাদের হাতে সোপর্দ করা যাবে। আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য তো এতটুকুই, কিন্তু মুশরেকদেরকে জওয়াব দান প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যেসব ইঙ্গিত দিয়েছেন, সেগুলো থেকে কতিপয় অর্থনৈতিক মূলনীতি চয়ন করা যায়। এখানে এগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দ্রব্রী।

জীবিকা বটনের প্রাকৃতিক ব্যবস্থা : عَنْ قَسَمَ بَيْنَهُمْ رَوْحُهُمْ

আমি তাদের মধ্যে জীবিকা বটন করেছি। উদ্দেশ্য এই যে, আমি আমার অশার প্রজ্ঞার সাহায্যে বিশেষ জীবনব্যবস্থা এমন করেছি যে, এখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রয়োজনাদি মিটানোর ক্ষেত্রে অপরের সাহায্যের মুখাপেক্ষী এবং সকল মানুষ এই পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার সূত্র গ্রথিত হয়ে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে যাচ্ছে। আলোচ্য আয়াতটি

খোলাখুলি ব্যক্ত করেছে যে, আল্লাহ তাআলা জীবিকা বটনের কাজ (সোশ্যালিজমের ন্যায়) কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মানবিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সোপর্দ করেননি, যে পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থির করবে যে, সমাজের প্রয়োজনাদি কি কি, সেগুলো কিভাবে মিটানো হবে, উৎপাদিত সম্পদকে কি হারে কি কি কাজে লাগানো হবে এবং এগুলোর মধ্যে আয়ের বটন কিসের ভিত্তিতে করা হবে? এর পরিবর্তে এ সমস্ত কাজ আল্লাহ তাআলা নিজের হাতে রেখেছেন। নিজের হাতে রাখার অর্থ এটা যে, তিনি প্রত্যেককে অপরের মুখাপেক্ষী করে বিশ্বব্যবস্থা এমনভাবে সাজিয়েছেন যে, এতে অস্বাভাবিক ইজারাদারী ইত্যাদির মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি না করা হলে এ ব্যবস্থাটি আপনা-আপনি এসব সমস্যার সমাধান করে দেয়। পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার এই ব্যবস্থাকে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিভাষায় 'আমদানি-রফতানির' ব্যবস্থা বলা হয়। আমদানি-রফতানির স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে বস্তুর আমদানি কম অথচ চাহিদা বেশী, তার মূল্য বৃদ্ধি পায়। কাজেই উৎপাদন যন্ত্রগুলোর সেই বস্তু উৎপাদনে অধিক মূল্য দেবে সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। অতঃপর যখন আমদানি রফতানির তুলনায় বেড়ে যায়, তখন মূল্য হ্রাস পায়। ফলে সে বস্তুর অধিক উৎপাদন লাভজনক থাকে না এবং উৎপাদন যন্ত্রগুলো এর পরিবর্তে অন্য কাজে ব্যাপৃত হয়ে যায়, যার প্রয়োজন বেশী। ইসলাম আমদানি ও রফতানির এসব শক্তির মাধ্যমেই সম্পদ উৎপাদন ও বটনের কাজ নিয়েছে এবং সাধারণ অবস্থায় জীবিকা বটনের কাজ কোন মানবিক প্রতিষ্ঠানের হাতে সোপর্দ করেনি। এর কারণ এই যে, পরিকল্পনা প্রণয়নের যত উন্নত পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হোক না কেন, এর মাধ্যমে বিষয়াদি সাধারণতঃ স্বাভাবিক ব্যবস্থার অধীনেই পরিচালিত হয়। জীবনের অধিকাংশ সামাজিক সমস্যা এমনভাবে স্বাভাবিক পন্থায় আপনা-আপনি সমাধান প্রাপ্ত হয়। এগুলোকে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রণয়নের সোপর্দ করা জীবনে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা ছাড়া কিছু নয়। উদাহরণতঃ দিন কাজের জন্যে এবং রাত্রি নিদ্রার জন্যে। এ বিষয়টি কোন চুক্তি অথবা মানবিক পরিকল্পনা প্রণয়নের অধীনে স্থিরীকৃত হয়নি, বরং প্রকৃতির স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আপনা-আপনি এ ফয়সালা করে দিয়েছে। এমনভাবে কে কাকে বিয়ে করবে এ বিষয়টি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত ব্যবস্থার অধীনে আপনা থেকেই সম্পন্ন হয় এবং একে পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সমাধান করার কল্পনা কারও মধ্যে জাগ্রত হয়নি। উদাহরণতঃ কে জ্ঞান ও কারিগরির কোন বিভাগকে নিজের কার্যক্ষেত্র রূপে বেছে নিবে, এ বিষয়টি মানসিক আগ্রহ ও অনুরাগের পরিবর্তে সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর সোপর্দ করা একটা অযথা জবরদস্তি মাত্র। এতে প্রাকৃতিক নিয়মে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এমনভাবে জীবিকা ব্যবস্থাও আল্লাহ তাআলা নিজের হাতে রেখে প্রত্যেকের মনে সেই কাজের প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যা তার জন্যে অধিক উপযুক্ত এবং যা সে সুস্থভাবে আনন্দের সাথে পারে। সেমতে প্রত্যেক ব্যক্তি এমনকি একজন ঝাড়ুদারও নিজের কাজ নিয়ে আনন্দিত ও গর্বিত থাকে—ثُمَّ جَعَلْنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَهْلَهُمْ তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায় ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৈধ ও অবৈধ উপায়ে সম্পদ একত্রিত করে অপরের জন্যে রিয়িকের দ্বারা বন্ধ করে দেয়ার স্বাধীনতা দেয়নি; বরং আমদানির উপায়সমূহের মধ্যে হালাল ও হারামের পার্থক্য করে সুদ, ফটকা বাজী, জুয়া, মজদদারী ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এরপর বৈধ আমদানিতেও যাকাত, ওশর ইত্যাদি কর আরোপ করে সেসব অনিষ্টের মূলাংগাটন করেছে, যা বর্তমান পুঁজিবাদীব্যবস্থায় পাওয়া যায়। এতদসঙ্গেও কখনও ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তা ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে সরকারের হস্তক্ষেপ বৈধ রেখেছে।

সামাজিক সাম্যের তাৎপর্য : وَرَفَعْنَا لَكُمْ نُورًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ

আমি এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি। এ থেকে জানা গেল যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের আয় সম্পূর্ণভাবে সমান হোক—এ অর্থ সামাজিক সাম্য কাম্যও নয় এবং সম্ভবপরও নয়। আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক মানুষের দায়িত্বে কিছু কর্তব্য আরোপ করেছেন এবং কিছু অধিকার দিয়েছেন আর এতদুভয়ের মধ্যে স্বীয় প্রজ্ঞার ভিত্তিতে এ গড় নির্বাচন করে দিয়েছেন যে, যার কর্তব্য যত বেশী, তার অধিকারও তত বেশী। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সৃষ্ট জীবের দায়িত্বে-কর্তব্য খুব কম আরোপ করা হয়েছে। তারা হালাল ও হারাম, জায়েয ও নাজায়েযের আওতাধীন নয়। তাই তাদের অধিকার সবচেয়ে কম। সেমতে তাদের ব্যাপারে মানুষকে প্রশস্ত স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। মানুষ নামে মাত্র কিছু বিধি-নিষেধ পালন করে যেভাবে ইচ্ছা, তাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সেমতে কোন কোন জীবকে মানুষ কেটে ভক্ষণ করে, কোন কোনটি পিঠে সওয়ার হয় এবং কোনটিকে পদতলে পিষ্ট করে, কিন্তু একে এসব জীবের অধিকার হরণ বলে গণ্য করা হয় না। কারণ, তাদের কর্তব্য কম বিধায় তাদের অধিকারও কম। সৃষ্টজগতের মধ্যে সর্বাধিক কর্তব্য মানুষ ও জিনের দায়িত্বে আরোপ করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকটি কথা ও কর্ম এবং উঠা ও বসার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলার কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। তারা তাদের দায়িত্ব পালন না করলে পরকালে কঠোর শাস্তির যোগ্য হবে। তাই আল্লাহ্ তাআলা মানুষ ও জিনকে অধিকারও সবচেয়ে বেশী দিয়েছেন। পরস্পরভাবে মানুষের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, যার দায়িত্ব ও কর্তব্য অপরের তুলনায় বেশী, তার অধিকারও বেশী। মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্বাধিক দায়িত্ব যেহেতু পয়গম্বরগণের উপর আরোপিত হয়েছে তাই তাদেরকে অধিকারও অন্যদের তুলনায় বেশী দেয়া হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায়ও আল্লাহ্ তাআলা এই মাপকাঠির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি যতটুকু দায়িত্ব বহন করে, তাকে ততটুকু অসুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বলাবাহুল্য, মানুষের কর্তব্যে সমতা আনয়ন করা একেবারে অসম্ভব এবং তাতে তফাৎ হওয়া অপরিহার্য। এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পূর্ণ অপরের সমান হবে। কেননা, আর্থ-সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষের সৃষ্টিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার উপর নির্ভরশীল। এর মধ্যে দৈহিক শক্তি, স্বাস্থ্য, বিবেক, বয়স, মেধা, দক্ষতা, কর্মতৎপরতা ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকেই খোলা চোখে অবলোকন করতে পারে যে, এসব গুণের দিক দিয়ে সকল মানুষের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করার সাধ্য সর্বাধিক উন্নত সমাজতাত্ত্বিক সরকারেরও নেই। মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভার মধ্যে যখন পার্থক্য অপরিহার্য, তখন তাদের কর্তব্যেও পার্থক্য হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী হবে। অর্থনৈতিক অধিকার ও কর্তব্যের উপরই নির্ভরশীল বিষায় আমদানিতেও পার্থক্য হওয়া অপরিহার্য। কেননা, কর্তব্যে পার্থক্য রেখে যদি সকলের আমদানি সমান করে দেয়া হয়, তবে এর মাধ্যমে কখনও ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কিছু লোকের আমদানি তাদের কর্তব্যের তুলনায় বেশী এবং কিছু লোকের কম হবে, যা সুস্পষ্ট অবিচার। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, আমদানিতে পূর্ণ সাম্য কোন যুগেই ইনসাফভিত্তিক হতে পারে না। সুতরাং সমাজতন্ত্র তার চরম উন্নতির যুগে (পূর্ণ মাত্রায় সাম্যবাদের যুগে) যে সাম্যের দাবী করে, তা কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় ও ইনসাফভিত্তিক নয়। (১) তবে কার কর্তব্য বেশী, কার কম এবং এ হারে কার ততটুকু

অধিকার হওয়া উচিত, এটা নির্ধারণ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন কাজ। এটা সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্যে মানুষের কাছে কোন মাপকাঠি নেই। মাঝে মাঝে দেখা যায় একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার এক ঘণ্টায় এত টাকা আয় করে, যা একজন অদক্ষ শ্রমিক সারাদিন অনেক মণ মাটি বয়েও আয় করতে পারে না। কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখতে একে তো শ্রমিকের সারাদিনের স্বাধীন পরিশ্রম ইঞ্জিনিয়ারকে প্রদত্ত গুরু দায়িত্বের সমান হতে পারে না, এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারের আমদানি কেবল এক ঘণ্টার পরিশ্রমের প্রতিদান নয়; বরং এতে বছরের পর বছর মস্তিস্ক ক্ষয় ও অধ্যবসায়ের প্রতিদানেরও অংশ আছে, যা সে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা অর্জনের ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং তাতে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে সহ্য করেছে। সমাজতন্ত্র তার প্রাথমিক স্তরে আয়ের এই পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েছে। সেমতে সকল সমাজতাত্ত্বিক দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বেতনের বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেই তাদের পদস্খলন ঘটেছে যে, উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের তহবিলে দিয়ে জনগণের কর্তব্য নির্ধারণ ও তদনুযায়ী আমদানি বন্টনের কাজ সরকারের কাছে ন্যস্ত করেছে। অথচ উপরে বর্ণিত রয়েছে যে, কর্তব্য ও অধিকারের মধ্যে অনুপাত কয়েম রাখার জন্যে মানুষের কাছে কোন মাপকাঠি নেই। সমাজতন্ত্রের কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সারা দেশের মানুষের জীবিকা নির্ধারণের কাজ সরকারের কতিপয় কর্মীর হাতে এসে গেছে। তারা যাকে যতটুকু ইচ্ছা, দেয়ার এবং যতটুকু ইচ্ছা, না দেয়ার ক্ষমতা লাভ করেছে। প্রথমতঃ এতে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির জন্যে প্রশস্ত ময়দান খোলা রয়েছে, যার সিঁড়ি বেয়ে আমলাতন্ত্র ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ যদি সরকারের সকল কর্মীকে ফেরেশতাও ধরে নেয়া হয় এবং তারা বাস্তবিকই ন্যায় ও সুবিচারের ভিত্তিতে দেশে আমদানি বন্টন করতে আগ্রহী হয়, তবে তাদের কাছে এমন কোন মাপকাঠি আছে কি যদ্বারা তারা একজন ইঞ্জিনিয়ার ও একজন শ্রমিকের কর্তব্যের পার্থক্য এবং তদনুপাতে তাদের আমদানির ইনসাফভিত্তিক পার্থক্য সম্পর্কে ফয়সালা দিতে পারে ?

বাস্তব ঘটনা এই যে, এ বিষয়ের ফয়সালা মানব বুদ্ধির অনুভূতির উর্ধ্বে। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ একে নিজের হাতে রেখেছেন। আলোচ্য

وَ رَفَعْنَا لَكُمْ نُورًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ইঙ্গিত

করেছেন যে, এই পার্থক্য নির্ধারণের কাজ আমি মানুষকে সোপর্দ করার পরিবর্তে নিজের হাতে রেখেছি। এর অর্থ এখানে তাই যে, দুনিয়াতে প্রত্যেকের প্রয়োজন অপরের সাথে জড়িত করে দেয়া হয়েছে। ফলে প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্যে অপরকে ততটুকু দিতে বাধ্য, যতটুকু সে যোগ্য। এখানেও পারস্পরিক মুখাপেক্ষিতার উপর ভিত্তিলাই আমদানি ও রফতানির ব্যবস্থা প্রত্যেকের আমদানী নির্ধারণ করে। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই নিজে ফয়সালা করে যে, যতটুকু কর্তব্য সে নিজ দায়িত্বে নিয়েছে, তার কতটুকু বিনিময় তার জন্য যথেষ্ট। এর কম পাওয়া গেলে সে সেই কাজ করতে সম্মত হয় না এবং বেশী চাইলে প্রতিপক্ষ তাকে কাজে নিয়োজিত করে না। لَيْسَ بَيْنَهُمْ بَعْضُكُمْ بِفَاضِلٍ বাক্যের অর্থ তাই যে, আমি আমদানিতে পার্থক্য একারণে রেখেছি, যাতে একজন অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নেয়। নতুবা সকলের আমদানি সমান হলে কেউ কারও কোন কাজে আসত না।

তবে কতক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই বড় বড় পুঁজিপতিরা আমদানি ও রফতানির এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থেকে অবৈধ ফায়দা লুটে পারে, তারা গরীবদেরকে তাদের প্রকৃত প্রাপ্য অপেক্ষা কম মজুরীতে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। ইসলাম প্রথমতঃ হালাল-হারাম ও

জায়েয-নাফায়েযের সুদূরপ্রসারী বিধি-বিধানের সাহায্যে এবং দ্বিতীয়তঃ নৈতিক আচরণাবলী ও পরকাল চিন্তার মাধ্যমে এহেন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পথে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলেছে। যদি কখনও কোন স্থানে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে যায়, তবে ইসলাম রাষ্ট্রে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সীমা পর্যন্ত মজুরী নির্ধারণের ক্ষমতা দান করেছে। বলাবাহুল্য, এটা কেবল অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পর্যন্ত সীমিত বিষয় এর জন্যে উৎপাদনের সকল উৎস সরকারের হাতে সমর্পণ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, এর ক্ষতি উপকারের তুলনায় অনেক বেশী।

ইসলামী সাম্যের অর্থ : উল্লেখিত ইঙ্গিতসমূহ থেকে একথা স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে যে, আমদানিতে পুরোপুরি সাম্য ও ন্যায্য সুবিচারের দাবী নয়। এ সাম্য কার্যতঃ কোথাও কায়ম হয়নি এবং হতে পারে না। এটা ইসলামেওঁর কাম্য নয়। তবে ইসলাম আইন, সামাজিকতা ও অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এর অর্থ এই যে, উল্লেখিত প্রাকৃতিক কর্মপদ্ধতি অনুসারে যার যতটুকু অধিকার নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তা অর্জন করার আইনগত ও সমাজগত অধিকারে সকলেই সমান এ বিষয়ের কোন অর্থ হয় না যে, একজন ধনী, প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ও পদাধিকারী ব্যক্তি তার অধিকার সম্প্রদানে ও সহজে অর্জন করবে, আর গরীব বেচারী তার অধিকার অর্জনের জন্যে দূরে দূরে ধাক্কা খেয়ে ফিরবে এবং লাল্চিত ও অপমানিত হবে, আইন ধনীর অধিকার সংরক্ষণ করবে আর গরীবদের বেলায় আইনের বাণী নিভতে কঁাদবে। এ বিষয়টি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)

কলীফা হওয়ার পর এক ভাষণে তুলে ধরেছিলেনঃ আমি যে পর্যন্ত দুর্বলের অধিকার আদায় করে না দেই, সে পর্যন্ত আমার কাছে দুর্বল অপেক্ষা শক্তিশালী কেউ নেই এবং আমি যে পর্যন্ত সবলের কাছ থেকে অধিকার আদায় না করি, সে পর্যন্ত সবল অপেক্ষা দুর্বল আমার কাছে কেউ নেই।

এমনিভাবে নির্ভেজাল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে ইসলামী সাম্যের অর্থ এই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই উপার্জনের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। ইসলাম এটা পছন্দ করে না যে, কয়েকজন বড় বড় ধনপতি ধন-সম্পদের উৎসমুখ দখল করে নিজেদের ইজারাদারী প্রতিষ্ঠিত করে নেবে এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্যে বাজারে বসাও দুর্কর করে তুলবে।

সেমতে সুদ, ফটকাবাজী, জুয়া, মজদুদারী এবং ইজারাদারী ভিত্তিক বাণিজ্যিক চুক্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া যাকাত, ঞ্গর, খেৱাজ, ভরণ-পোষণের ব্যয়, দান-খয়রাত ও অন্যান্য কর আরোপ করে এমন পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা, শ্রম ও গুঁজি অনুপাতে উপার্জনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে একটি সুখী সমাজ গড়ে উঠতে পারে। এত সবেৱ পরেও আমদানিতে যে পার্থক্য থেকে যাবে, তা প্রকৃতপক্ষে অপরিহার্য। মনুষ্যকুলের মধ্যে যেমন রূপ, সৌন্দর্য, শক্তি, স্বাস্থ্য, জ্ঞানবুদ্ধি, মেধা, সন্তান-সন্ততির বিদ্যমান পার্থক্য মেটানো সম্ভবপর নয়, তেমনি এ পার্থক্যও বিলোপ হওয়ার নয়।

ধনদৌলতে প্রাচুর্য শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় : কাফেররা বলেছিল, মক্কা ও তায়েফের কোন বড় ধনাঢ্য ব্যক্তিকে পয়গম্বর করা হল না কেন? আলোচ্য আয়াতসমূহে এর দ্বিতীয় জওয়াব দেয়া হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে নবুওয়তের জন্যে কিছু যোগ্যতা ও শর্ত থাকা জরুরী। কিন্তু ধন-দৌলতের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে কাউকে নবুওয়ত দেয়া যায় না। কেননা, ধন-দৌলত আমার দৃষ্টিতে এত নিকট ও হেয় যে, সব মানুষের কাফের হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে আমি সব কাফেরের উপর স্বর্ণ-রৌপ্যের বৃষ্টি বর্ষণ করতাম। তিরমিযীর এক হাদীসে রসুল্লাহ (সাঃ) বলেন, *لو كانت الدنيا تعمل عند الله جناح بعوضة ماستى كافرا* অর্থাৎ, দুনিয়া যদি আল্লাহর কাছে মশার এক পাখার সমানও মর্যাদা রাখত, তবে আল্লাহ তাআলা কোন কাফেরকে দুনিয়া থেকে এক ঢোক পানিও দিতেন না। এ থেকে জানা গেল যে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্যও কোন শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয় এবং এর অভাবও মানুষের মর্যাদাহীন হওয়ার আলামত নয়। তবে নবুওয়তের জন্যে কতিপয় উচ্চস্তরের গুণ থাকা অত্যাৱশ্যক। সেগুলো মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই কাফেরদের আপত্তি সম্পূর্ণ অসার ও বাতিল।

আয়াতে “সব মানুষ কাফের হয়ে যেত” এর অর্থ বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কাফের হয়ে যেত। নতুবা আল্লাহর কিছু বান্দাহ আজ্ঞাও আছে, যারা বিশ্বাস করে যে, কুফরী অবলম্বন করে তারা ধন-দৌলতে স্নাত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তারা ধন-দৌলতের খাতিরে কুফরী অবলম্বন করে না। একরূপ কিছু লোক সম্ভবতঃ তখনও ঈমানকে আঁকড়ে থাকত। কিন্তু তাদের সংখ্যা হত আটার মধ্যে লবণের তুল্য।

الرَّحْمٰنُ

২৭১

المِیة ۳

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَنْ يُشْكِرْ لِلَّهِ الْكَافِرَاتِ كُفْرًا فَهُنَّ لَهُ أَجْرُهُنَّ وَمَنْ لَا يَشْكُرْ يَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِينَ

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপদেশ অর্থাৎ কোরআন ও ওহী থেকে জেনেগুনেন বিশ্বাস হয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই। সে দুনিয়াতেও তার সহচর হয়ে থাকে এবং তাকে সংকর্ম থেকে নিবৃত্ত করে, কুর্মে উৎসাহিত করে এবং পরকালেও যখন সে কবর থেকে উত্থিত হবে, তখন তার সঙ্গে থাকবে। অবশেষে উভয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (কুরত্বী) এ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর স্মরণ থেকে বিশ্বস্ততার এতটুকু শাস্তি দুনিয়াতেই পাওয়া যায় যে, তার সংসর্গ খারাপ হয়ে যায় এবং মানুষ-শয়তান অথবা জিন-শয়তান তাকে সংকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে অসংকর্মের নিকটবর্তী করে দেয়। সে পঞ্চত্রয়তার যাবতীয় কাজ করে, অথচ মনে করে যে, খুব ভাল কাজ করছে। (কুরত্বী) এখানে যে শয়তানকে নিয়োজিত করার কথা বলা হয়েছে, সে সেই শয়তান থেকে ভিন্ন, যে প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরের সাথে নিয়োজিত রয়েছে। কেননা, সেই শয়তান মুমিনের নিকট থেকে বিশেষ বিশেষ সময়ে সরেও যায়, কিন্তু এ শয়তান সদাসর্বদা জোঁকের মত লেগেই থাকে। — (বয়ানুল-কোরআন)

এ আয়াতের দু'রকম তফসীর হতে পারে — وَلَنْ يَفْعَلَ الْيَوْمَ (এক) যখন তোমাদের কুফর ও শিরক প্রমাণিত হয়ে গেছে, তখন পরকালে তোমাদের এ পরিতাপ কোন কাজে আসবে না যে, হায়, এই শয়তান যদি আমা থেকে দূরে থাকত। কেননা, তখন তোমরা সবাই আযাবে শরীক থাকবে।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য তফসীর এই যে, সেখানে পৌছার পর তোমাদের ও শয়তানদের আযাবে শরীক হওয়া তোমাদের জন্যে মোটেই উপকারী হবে না। দুনিয়াতে অবশ্য এরূপ হয় যে, একই বিপদে কয়েকজন শরীক হলে প্রত্যেকের দুঃখ কিছুটা হালকা হয় বলে, কিন্তু পরকালে যেহেতু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকবে এবং কেউ কারও দুঃখ হটাতে পারবে না, তাই আযাবে শরীক হওয়া কোন উপকার দিবে না। এমতাবস্থায় **كُفْرًا** হবে **يَنْفَعُ** ক্রিয়ার কর্তা।

সুখ্যাতি ধর্মে পছন্দনীয় **وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ لَذَّةٌ الْحَمِيمِ** (এ কোরআন আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য খুবই সম্মানের বস্তু) **ذَكَرَ** এর অর্থ এখানের সুখ্যাতি। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআর পাক আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্য মহাসম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। ইমাম রাযী বলেন, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুখ্যাতি একটি কাম্য বিষয়। তাই আল্লাহ তা' আলা এখানে একে অনুগ্রহস্বরূপ উল্লেখ করেছেন এবং এ কারণেই

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই দোয়া করেছিলেন — **وَاجْعَلْنِي لِسَانَ** (তফসীর কবীর) কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, সুখ্যাতি তখনই উত্তম, যখন তা জীবনের লক্ষ্য না হয়ে সংকর্মের দৌলতে আপনা-আপনি অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে মানুষ যদি সুখ্যাতির লক্ষ্যেই সংকর্ম করে, তবে এটা রিয়া, যা সংকর্মের যাবতীয় উপকারিতা বিনষ্ট করে দেয় এবং পাপের বোঝা বড় হয়। আয়াতে “আপনার সম্প্রদায়” বলে কারও কারও মতে কোরাইশ গোত্রকে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু আল্লামা কুরত্বী বলেন, এতে সমগ্র উম্মতকে বোঝানো হয়েছে। কোরআন পাক সকলের জন্যেই সম্মান ও সুখ্যাতির কারণ। **وَسَلَّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ** (আপনার পূর্বে আমি যেসব পয়গম্বর প্রেরণ করেছি,

(৩৬) যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। (৩৭) শয়তানরাই মানুষকে সংপথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সংপথে রয়েছে। (৩৮) অবশেষে যখন সে আমার কাছে আসবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব-পক্ষিমের দূরত্ব থাকত। কত হীন সঙ্গী সে। (৩৯) তোমরা যখন কুফর করছিলে, তখন তোমাদের আজকের আযাবে শরীক হওয়া কোন কাজে আসবে না। (৪০) আপনি কি বহিরকে শোনাতে পারবেন? অথবা যে অন্ধ ও যে নস্ট পঞ্চত্রয় লিপ্ত, তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারবেন? (৪১) অতঃপর আমি যদি আপনাকে নিয়ে যাই, তবু আমি তাদের কাছে থেকে প্রতিপোষ নেব। (৪২) অথবা যদি আমি তাদেরকে যে আযাবের ওয়াদা দিয়েছি, তা আপনাকে দেখিয়ে দেই, তবু তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। (৪৩) অতএব, আপনার প্রতি যে ওহী নাখিল করা হয়, তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে রয়েছেন। (৪৪) এটা আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের জন্যে উল্লেখিত থাকবে এবং শীঘ্রই আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন। (৪৫) আপনার পূর্বে আমি যেসব রসুল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত আমি কি কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম এবাদতের জন্যে? (৪৬) আমি যুসাকে আমার নির্দশনাবলী দিয়ে ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, অতঃপর সে বলেছিল, আমি বিশু পালনকর্তার রসুল। (৪৭) অতঃপর সে যখন তাদের কাছে আমার নির্দশনাবলী উপস্থাপন করল, তখন তারা হাস্যবিদ্রোহ করতে লাগল। (৪৮) আমি তাদেরকে যে নির্দশনই দেখাতাম, তাই হত পূর্ববর্তী নির্দশন অপেক্ষা বৃহৎ এবং আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম, যাতে তারা ফিরে আসে। (৪৯) তারা বলল, হে যাদুকর, তুমি আমাদের জন্যে তোমার পালনকর্তার কাছে সে বিষয় প্রার্থনা কর, যার ওয়াদা তিনি তোমাকে দিয়েছেন; আমরা অবশ্যই সংপথ অবলম্বন করব।

الرَّحُوفِ

৭৭২

البقرة

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غِطَاءَ الْغَيْبِ إِذَا هُمْ يَنْتُهِونَ ۚ وَيَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ
 فِي قَوْمِهِ قَالِ قَوْمِ الْمَلِكُ بِمَرْءٍ مِنْكُمْ وَهَذِهِ الْأَهْلُ
 يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ أَفَلَا يَنْتَبِهُونَ ۚ أَمْ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْذِرِينَ هَذَا الَّذِي قُلْتُمْ
 مَهْيَنَ وَلَا يَجِئُ الْبَاقِيُونَ ۚ قَالُوا أَلْقِ عَلَيْهِ سُورَةَ مِثْلِ
 أُوحِيَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ مُقَرَّنِينَ ۚ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاغَوْا
 فِيهِمْ كَذِبًا وَأَوْفَاءُ لِقَوْلِهِمْ ۚ فَلَمَّا أَسْمَا أَنْتُمْ مَنُومُونَ ۚ فَاعْرِضْهُمْ
 أَعْمَى ۚ فَجَعَلَهُمْ سَلَافًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ۚ وَلَمَّا خُصِرَ
 ابْنُ زُرَّارٍ مِّثْلًا إِذَا قَوْلُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۚ وَقَالُوا الْهَذَا خَيْرُ
 أَمْوَالِهِمْ صَبْرًا ۚ لَكَ الْبَدَلُ ۚ لَبِثَ قَوْمٌ خُصِمُونَ ۚ إِنَّ هُوَ
 إِلَّا عِبْدٌ آتَيْنَاهُ عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مِثْلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا ۚ قَالُوا
 تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَأُتِيَ الْقَوْمُ ۚ فَانْزِلْ لَهُمُ
 السَّاعَةَ ۚ فَلَا تَنْتَرُونَ بِهَا ۚ أَعْيُونُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۚ
 وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۚ وَ
 لَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ
 لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ

(৭০) অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিলাম, তখনই তারা অস্বীকার ভঙ্গ করতে লাগলো। (৭১) ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে ডেকে বলল, হে আমার কণ্ঠ, আমি কি মিসরের অধিপতি নই? এই নদীগুলো আমার নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়, তোমরা কি দেখ না? (৭২) আমি যে শ্রেষ্ঠ, এ ব্যক্তি থেকে, যে নীচ এবং কথা বলতেও সক্ষম নয়। (৭৩) তাকে কেন স্বর্গবলয় পরিধান করানো হল না, অথবা কেন আসল না তার সঙ্গে ফেরেশতগণ দল বেঁধে? (৭৪) অতঃপর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে দিল, ফলে তারা তার কথা মনে নিল। নিচুয় তারা ছিল পাগাচারী সম্প্রদায়। (৭৫) অতঃপর যখন আমাকে রাগান্বিত করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম। তাদের সবাইকে। (৭৬) অতঃপর আমি তাদেরকে করে দিলাম অতীত লোক ও দৃষ্টান্ত পরবর্তীদের জন্যে। (৭৭) যখনই মরিয়ম-তনয়ের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হল, তখনই আপনার সম্প্রদায় হুঁসিলা গুরু করে দিল (৭৮) এবং বলল, আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ, না সে? তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যেই করে। বক্তৃত্ত তারা হল এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়। (৭৯) সে তো এক বান্দাই বাটে, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করছি এবং তাকে করছি বনী-ইসরাঈলের জন্যে আদর্শ। (৮০) আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম, যারা পৃথিবীতে একের পর এক বসবাস করত। (৮১) সুতরাং তা হল কোয়াদের নির্দর্শন। কাজেই তোমরা কোয়ামতে সন্দেহ করো না এবং আমার কথা মান। এটা এক সরল পথ। (৮২) শয়তান যেন তোমাদেরকে নিবৃত্ত না করে। সে তোমাদের প্রকল্য শত্রু। (৮৩) ইসা যখন স্পষ্ট নির্দর্শনসহ আগমন করল, তখন বলল, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং তোমরা যে, কোন কোন বিষয়ে মতভেদ করছ তা ব্যক্ত করার জন্যে এসেছি। অতঃপর, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মান।

আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন) এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ তো ওফাত পেয়ে গেছেন। তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করার আদেশ কিরূপে দেয়া হল? কোন কোন তফসীরবিদ এর জওয়াবে বলেন যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ তাআলা যদি মো'জেযাশ্বরূপ পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণকে আপনার সাথে সাক্ষাত করিয়ে দেন, তবে তাদেরকে একথা জিজ্ঞেস করুন। সেমতে মে'রাজ রজনীতে রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সকল পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত ঘটেছিল। কুরতুবী বর্ণিত কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, রসুলুল্লাহ (সঃ) পয়গম্বরের ইমামত শেষে তাঁদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন। কিন্তু এসব রেওয়ায়েতের সনদ জানা যায়নি। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গম্বরের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফায় ঝুঞ্জে দেখুন এবং তাদের উম্মতের আলেমগণকে জিজ্ঞেস করুন। সেমতে বনী-ইসরাঈলের পয়গম্বরের সহীফাসমূহে বিকৃতি সত্ত্বেও তওহীদের শিক্ষা ও শিরকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের শিক্ষা আজ পর্যন্তও বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণতঃ বর্তমান বাইবেলের কিছু বাক্য উদ্ধৃত করা হল।

বর্তমান তওরাতে আছে : যাতে তুমি জান যে, খোদাওয়াদই খোদা, তিনি ব্যতীত কেউই নেই।—(এস্তেছনা—৩৫—৪)

শুন হে ইসরাঈল, খোদাওয়াদ আমাদেরই এক খোদা।—(এস্তেছনা ৪—৬) হযরত আশিহিয়া (আঃ)-এর ছহীফায় আছে :

আমিই খোদাওয়াদ, অন্য কেউ নয়। আমাকে ছাড়া কোন খোদা নেই, যাতে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত লোকেরা জানে যে, আমাকে ছাড়া কেউ নেই, আমিই খোদাওয়াদ, আমাকে ছাড়া অন্য কেউ নেই। (ইয়াহিয়া ৬-৫ : ৪৫)

হযরত ইসা (আঃ)-এর এ উক্তিও বর্তমান বাইবেলে রয়েছে :

‘হে ইসরাঈল, শুন, খোদাওয়াদ আমাদের খোদা একই খোদাওয়াদ। তুমি খোদাওয়াদ তোমার খোদাকে সমস্ত মনে সমস্ত প্রাণে এবং প্রিয় বিবেক ও সমগ্র শক্তি দ্বারা ভালবাস। (মরকাস ১২-২৯ মাত্তা ২২-৩৬)

বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার মোনাজাতে বলেছিলেন :

এবং চিরন্তন জীবন এই যে, তারা তুমি একক ও সত্য আল্লাহকে এবং ইসা মসীহকে—যাকে তুমি প্রেরণ করেছ—চিনবে (ইউহান্না ৩-১৭)

হযরত মুসা (আঃ)-এর ঘটনা পূর্বে বার বার উল্লেখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনা বিস্তারিতভাবে সূরা আরাফে বিবৃত হয়েছে। এখানে তাঁর ঘটনা সূর্য করাণের উদ্দেশ্য এই যে, রসুলুল্লাহ (সঃ) ধনাত্ম ছিলেন না বলে কাকেরা তাঁর নবুওয়তে যে সন্দেহ করত, তা কোন নতুন নয়, বরং ফেরাউন ও তার সভাসদরা এমন সন্দেহ মুসা (আঃ)-এর নবুওয়তেও করেছিল। ফেরাউনের বক্তব্য ছিল এই যে, আমি মিসর সাম্রাজ্যের অধিপতি, আমার প্রাসাদসমূহের পাদদেশে নদ-নদী প্রবাহিত, ফলে আমি মুসা (আঃ) থেকে শ্রেষ্ঠ। কাজেই আমাকে বাদ দিয়ে সে কিরূপে নবুওয়ত লাভ করতে পারে? কিন্তু তার এই সন্দেহ যেমন তার কোন কাজে আসল না, সে সম্প্রদায়সহ নিমজ্জিত হল, তেমনি মক্কার কাকেরদের আপত্তিও তাদেরকে ইহকাল ও পরকালের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেবে না।

আনুযঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَا يَجِئُ الْبَاقِيُونَ (এবং সে কথারও শক্তি রাখে না) যদিও মুসা

(আঃ)-এর দোয়ার ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর মুখের তোতলামী দূর করে

দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর পূর্ববস্থাই ফেরাউনের মনে ছিল। তাই সে মুসা (আঃ)-এর প্রতি এই দোষ আরোপ করল। এখানে ‘কথা বলার শক্তি’ বলে প্রমাণাদির সাবলীলতা ও প্রাঞ্জলতাও বোঝানো যেতে পারে। ফেরাউনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমাকে সন্তুষ্ট করার মত পর্যাপ্ত-প্রমাণ মুসা (আঃ)-এর কাছে নেই। অথচ এটা ছিল ফেরাউনের নিছক অপবাদ। নতুবা মুসা (আঃ) দলীল-প্রমাণের সাহায্যে ফেরাউনকে চূড়ান্তরূপে লাঞ্ছিত করে দিয়েছেন।—(তফসীরে কবীর, রুহুল মা’আনী)

فَاسْتَعِظْ قَوْمَهُ - এর দু’রকম অনুবাদ হতে পারে। (এক) ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে সহজেই তার অনুগত করে নিল— **طَلَبَ مِنْهُمْ الْخَفَةَ** **وَجَدَهُمْ خَفِيفَةً** **فِي مَطَارِعِهِ** (দুই) সে তার সম্প্রদায়কে বেগুফ পেল **وَجَدَهُمْ خَفِيفَةً** **فِي مَطَارِعِهِ**—(রুহুল-মা’আনী)

ثُمَّ اسْتَوْنَا - এটা **اسف** থেকে উদ্ভূত। আভিধানিক অর্থ অনুতাপ। কাছেই বাক্যের শাদিক অর্থ, ‘অতঃপর যখন তারা আমাকে অনুতপ্ত করল। অনুতাপ ক্রোধের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই এর পারিভাষিক অনুবাদ সাধারণতঃ এভাবে করা হয়—যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল। আল্লাহ তাআলা অনুতাপ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়ামূলক অবস্থা থেকে পবিত্র। তাই এর অর্থ হবে, তারা এমন কাজ করল যদ্বারা আমি তাদেরকে শাস্তিদানের সংকল্প গ্রহণ করলাম।—(রুহুল মা’আনী)

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذْ قَامُوا مِنْهُ يُبَيِّنُونَ - এসব

আয়াতের শানে নুযুলে তফসীরবিদগণ তিন প্রকার রেওয়াজে বর্ণনা করেছেন। প্রথম এই যে, একবার রসূলুল্লাহ (সঃ) কোরাইশদেরকে সম্বোধন করে বললেন, **يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَا خَيْرَ فِي أَحَدٍ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ**—অর্থাৎ, হে কোরাইশগণ, আল্লাহ ব্যতীত যারই এবাদত করা হয়, তার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। কোরাইশরা বলল, খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর এবাদত করে; কিন্তু আপনি নিজেই বলেন যে, তিনি আল্লাহ তা’আলার সংকল্প পরায়ণ বান্দা ও নবী ছিলেন। তাদের এই আপত্তির জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।—(কুরতুবী)

দ্বিতীয় রেওয়াজে এই যে, কোরআন পাকের আয়াত — **ثُمَّ اسْتَوْنَا** (তোমরা নিজেরা এবং তোমরা ঘেসব প্রতিমার পূজা কর, তারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে)। আয়াতটি অবতীর্ণ হলে, আবদুল্লাহ ইবনু যিবা’রা (যে তখনও কাফের ছিল) বলল, আমার কাছে এ আয়াতের চমৎকার জওয়াব রয়েছে। তা এই যে, খ্রীষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর এবাদত করে এবং ইহুদীরা হযরত ওয়ায়ের (আঃ)-এর পূজা করে। অতএব, তারা উভয়েই কি জাহান্নামের ইন্ধন হবে? একথা শুনে মুশরেক কোরাইশরা খুবই আনন্দিত হল। এর জওয়াবে আল্লাহ তাআলা **إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُعَذَّبُونَ** আয়াত এবং সূরা যুখরুফের আলোচ্য আয়াত নাযিল করলেন।—(ইবনে-কাসীর)

তৃতীয় রেওয়াজে এই যে, একবার মক্কার মুশরেকরা মিছা-মিছিই প্রচার করতে লাগল যে, মুহাম্মদ (সঃ) খোদায়ী দাবী করার ইচ্ছা রাখেন। তাঁর বাসনা এই যে, খ্রীষ্টানরা যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-এর পূজা করে, এমনভাবে আমরাও তাঁর পূজা করি। এর পরিশেষে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। প্রকৃতপক্ষে রেওয়াজে তিনটির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কাফেররা সবগুলো কথাই বলে থাকবে, যার জওয়াবে আল্লাহ তাআলা এমন আয়াত নাযিল করেন, যাতে তিন আপত্তির জওয়াব হয়ে যায়। আয়াতসমূহে সর্বশেষ আপত্তির জওয়াব সুস্পষ্ট। কেননা, যারা

হযরত ঈসা (আঃ)-এর এবাদত শুরু করেছে, তারা তা আল্লাহর কোন আদেশ বলে মনে করেন এবং ঈসা (আঃ)-এরও এরূপ বাসনা ছিল না, কোরআনও তাদের সমর্থন করে না। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণের কারণে তারা ঈসা (আঃ) সম্পর্কে এই বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। কোরআন এ বিভ্রান্তি প্রবলভাবে খণ্ড করে। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে সম্ভবপর যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) খ্রীষ্টানদের দেখাদেখি নিজেও খোদায়ী দাবী করে বসলেন?

প্রথম ও দ্বিতীয় রেওয়াজেই কাফেরদের আপত্তির সারমর্ম প্রায় এক। আলোচ্য আয়াত থেকে এর জওয়াব এভাবে বের হয়, যারা জাহান্নামের ইন্ধন হবে এবং যাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, তারা হয় নিষ্শাণ উপাস্য, যেমন, পাথরের মূর্তি, না হয় প্রাণী; কিন্তু নিজেই নিজের এবাদতের আদেশ দেয় কিংবা তা পছন্দ করে, যেমন, শয়তান, ফেরাউন, নমরুদ প্রভৃতি। হযরত ঈসা (আঃ) তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা, তিনি কোন পর্যায়ে নিজের এবাদত পছন্দ করতেন না। খ্রীষ্টানরা তাঁর কোন নির্দেশের কারণে তাঁর এবাদত করে না, বরং তাঁকে আমি আমার কুদরতের এক নিদর্শন করে পিতা ব্যতীত সৃষ্টি করেছিলাম, যাতে মানুষ জানে যে, আল্লাহ তাআলা কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু খ্রীষ্টানরা এর ভুল অর্থ নিয়ে তাকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। অথচ এটা স্বয়ং ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতের পরিপন্থী ছিল। তিনি সর্বদা তওহীদ শিক্ষা দিয়েছেন। মোটকথা, এবাদতে তাঁর অসন্তুষ্টির কারণে তাঁকে অন্যান্য উপাস্যের কাতারে শামিল করা যায় না।

এতে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত কাফেরদের আরও একটি আপত্তির জওয়াব হয়ে গেছে। তা এই যে, আপনি নিজে যাকে শ্রেষ্ঠ বলেন (অর্থাৎ, ঈসা (আঃ) তাঁরও তো এবাদত হয়েছে)। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অপরের এবাদত মন্দ নয়। আয়াতে এর জওয়াব সুস্পষ্ট যে, ঈসা (আঃ)-এর এবাদত আল্লাহ তা’আলার ইচ্ছারও বিরুদ্ধে ছিল এবং স্বয়ং ঈসা (আঃ)-এর দাওয়াতেরও পরিপন্থী ছিল। কাছেই এর মাধ্যমে শিরকের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করা যায় না।

وَلَوْ شَاءَ لَحَبَسْنَا مِنْكُمْ فِى الْاَرْضِ لَنَعْلَمَنَّ - এটা

খ্রীষ্টানদের সে বিভ্রান্তির জওয়াব, যার ভিত্তিতে তারা ঈসা (আঃ)-কে উপাস্য স্থির করেছিল। পিতা ব্যতীত জন্ম গ্রহণের বিষয়টিকে তারা তাঁর খোদায়ীর প্রমাণস্বরূপ পেশ করেছিল। আল্লাহ তাআলা এর খণ্ডনে বলেন, এটা তো নিছক আমার কুদরতের এক প্রদর্শনী ছিল। আমি স্বভাবাতীত কাজ করারও ক্ষমতা রাখি। পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করা খুব বেশী স্বভাবাতীত কাজ নয়। কেননা, হযরত আদমকে পিতা-মাতা ব্যতীত সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে এমন কাজও করতে পারি, যার নবীর এপর্যন্ত কায়ম হয়নি। অর্থাৎ, মানুষের ঔরসে ফেরেশতাও সৃষ্টি করতে পারি।

وَلَوْ لَوِىَ السَّاعَةُ (এবং নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা [আঃ] কেয়ামতে

বিশ্বাস স্থাপন করার একটি উপায়।) এর দু’রকম তফসীর করা হয়েছে। তফসীরে সার-সংক্ষেপে উল্লেখিত প্রথম তফসীর এই যে, হযরত ঈসা (আঃ) অত্যাশঙ্কিত বিপরীতে পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন, এটা এ বিষয়ের দলীল যে, আল্লাহ তাআলা বাহ্যিক কারণ ব্যতিরেকেও মানুষ সৃষ্টি করতে পারেন। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃতদেরকে পুনরুজ্জীবন দান করা তাঁর জন্যে মোটেই কঠিন নয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরায় আকাশ থেকে

الرَّحُوفِ

৭৭৫

المية ৩৩

إِنَّ اللَّهَ مُرَبِّيٌّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
 فَأَخَذْنَا الْأَحْزَابَ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ
 عَذَابِ يَوْمِ الْيَوْمِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ
 بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ الْأَخْلَاقُ يَوْمَئِذٍ بِغَضٍّ لِيُغْضِ
 عَذَابُ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝ لِيُجِيبُوا الْخَوْفَ عَلَيْهِمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ
 تَعْتَوُونَ ۝ أَلَمْ يَكُنْ أَمْرًا بِالْأَيْنِ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ۝ ادْخُلُوا
 الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ۝ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصَفَافٍ
 مِنْ ذَهَبٍ وَالْكَوَابِ ۝ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَكُنُّ
 الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَلَكُمْ فِي الْجَنَّةِ الْأَنْهَارُ الَّتِي أَوْفَرْتُمْوَهَا
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا
 تَأْكُلُونَ ۝ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝
 لَا يُفَرِّغُهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْسُوُونَ ۝ وَمَا كُنْتُمْ بِأَعْيُنِنَ
 لَكُنْ كَانُوا أَهْمَ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَادَوْا لِلْمَلِكِ لِغَضٍّ عَلَيْكَ
 رَبُّكَ قَالَ إِنَّهُمْ مُكْرِمُونَ ۝ لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ
 أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ۝ أَمْ يَكُونُ أَمْراً يَأْتِيكُمْ مِنْ مُرُومٍ ۝

(৬৪) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তাঁর এবাদত কর। এটা হল সরল পথ। (৬৫) অতঃপর তাদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন দল মতভেদ সৃষ্টি করল। সুতরাং যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ। (৬৬) তারা কেবল কেয়ামতেরই অপেক্ষা করছে যে, আকস্মিকভাবে তাদের কাছে এসে যাবে এবং তারা খবরও রাখবে না। (৬৭) বন্ধুর্গ সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, তবে খোদাতীকর নয়। (৬৮) হে আমার বন্দাগণ, তোমাদের আজ কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। (৬৯) তোমরা আমার আয়াতসমূহে নিশ্চাস স্থাপন করেছিলে এবং তোমরা আত্মবাহ ছিলে। (৭০) জন্মতে গ্রহণ কর তোমরা এবং তোমাদের বিবিগণ সানন্দে। (৭১) তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্গের ধান ও পানপাত্র এবং তখায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। তোমরা তখায় চিরকাল থাকবে। (৭২) এই যে জন্মাতের উত্তরাধিকারী তোমরা হয়েছ, এটা তোমাদের কর্মের ফল। (৭৩) তখায় তোমাদের জন্যে আছে প্রচুর ফল-মূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে। (৭৪) নিশ্চয় অপরার্থীরা জাহান্নামের আযাবে চিরকাল থাকবে। (৭৫) তাদের থেকে আযাব লাভ করা হবে না এবং তারা তাতেই থাকবে হতশ হয়ে। (৭৬) আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি; কিন্তু তারাই ছিল জালেম। (৭৭) তারা ডেকে বলবে, হে যালেম, পালনকর্তা আমাদের কিসসাই শেষ করে দিন। সে বলবে, নিশ্চয় তোমরা চিরকাল থাকবে। (৭৮) আমি তোমাদের কাছে সত্যার্থ পৌঁছিয়েছি; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্যার্থে নিষ্পন্থ। (৭৯) তারা কি কোন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছে? তাহলে আমিও এক ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছি।

অবতরণ কেয়ামতের আলামত। সেমতে শেষ যুগে তাঁর পুনরাগমন ও দাঙ্গাল হত্যা মুতাওয়াতিহর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। সূরা মায়েদায় এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

وَلَكِنْ لَكُمْ بِغَضٍّ الَّذِي تَعْتَمِدُونَ فِيهِ (এবং যাতে আমি

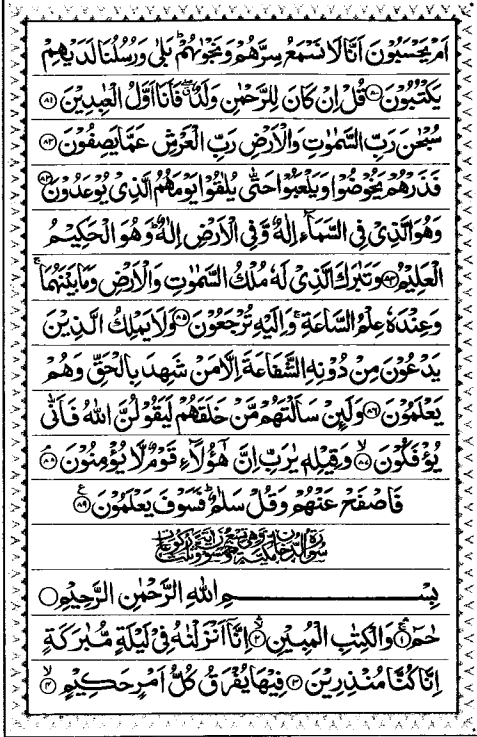
তোমাদের কোন কোন বিরোধপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করে দেই।) বনী ইসরাঈলের মধ্যে হঠকাকিতা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তাই তারা কোন কোন বিধি-বিধান বিকৃত করে দিয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ) সেগুলোর স্বরূপ তুলে ধরেন। ‘কোন কোন বলার কারণ এই যে, কোন কোন বিষয় একান্তই পার্থিব ছিল। তাই তিনি সেগুলোর মতভেদ দূর করার প্রয়োজন মনে করেননি।—(বয়ানুল-কোরআন)

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

الْأَخْلَاقُ يَوْمَئِذٍ بِغَضٍّ (খোদাতীকরের ছাড়া সকল বন্ধুবর্গই

সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে।) এ আয়াত পরিষ্কার ব্যক্ত করেছে যে, মানুষ যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে দুনিয়াতে গর্ব করে এবং যার জন্যে হালাল ও হারাম এক করে দেয়, কেয়ামতের দিন সে সম্পর্ক কেবল নিষ্ফলই হবে না, বরং শত্রুতায় পর্যবসিত হবে। হাফেয ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীরে হযরত আলী (রাঃ)—এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, দুই মুমিন বন্ধু ছিল এবং দুই কাকের বন্ধু। মুমিন বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজনের ইস্তেকাল হলে তাকে জন্মাতের সুসংবাদ শুনানো হল। তখন তার আজীবন বন্ধুর কথা মনে পড়লে সে দোয়া করল,—ইয়া আল্লাহ, আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রসুলের আনুগত্য করার আদেশ দিত, সংকাজে উৎসাহ দিত, অসং কাজ থেকে নিষেধ করত এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের বিষয় স্মরণ করিয়ে দিত। কাজেই হে আল্লাহ, আমার পরে তাকে পথপ্রদ করবেন না, যাতে সেও জন্মাতের দৃশ্য দেখতে পারে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন সন্তুষ্ট, তার প্রতিও তেমনি সন্তুষ্ট হোন। এই দোয়ার জওয়াবে তাকে বলা হবে, যাও, তোমার বন্ধুর জন্যে আমি যে পুরস্কার ও সওয়াব রেখেছি, তা যদি তুমি জানতে পার, তবে কাঁদবে কম, হাসবে বেশী। এরপর অপর বন্ধুর ইস্তেকাল হয়ে গেলে উভয়ের রূহ একত্রিত হবে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে বলবেন, তোমরা একে অপরের প্রশংসা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই অপরের সম্পর্কে বলবে, সে শ্রেষ্ঠ ভাই, শ্রেষ্ঠ সঙ্গী ও শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

এর বিপরীতে কাকের বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে একজন মারা গেলে তাকে জাহান্নামের ঠিকানা জানানো হবে। তখন তার বন্ধুর কথা মনে পড়বে এবং সে দোয়া করবে, ইয়া আল্লাহ, আমার অমুক বন্ধু আমাকে আপনার ও আপনার রসুলের অবাধ্যতা করার আদেশ দিত, মন্দ কাজে উৎসাহ দিত এবং ভাল কাজে বাধা দিত। সে আমাকে বলত যে, আমি কখনও আপনার কাছে হামির হব না। কাজেই হে আল্লাহ, আমার পরে তাকে হেদায়াত দেবেন না, যাতে সেও জাহান্নামের দৃশ্য দেখে, যা আপনি আমাকে দেখিয়েছেন। আপনি আমার প্রতি যেমন অসন্তুষ্ট, তেমনি তার প্রতিও অসন্তুষ্ট থাকুন। এরপর অপর বন্ধুরও মৃত্যু হয়ে যাবে এবং উভয়ের রূহ একত্রিত হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা একে অপরের সম্ভ্রা বর্ণনা কর। তখন তাদের প্রত্যেকেই পরস্পরের সম্পর্কে বলবে, সে নিকৃষ্ট ভাই, নিকৃষ্ট সঙ্গী এবং নিকৃষ্ট বন্ধু। এ কারণেই ইহকাল ও পরকাল—এ



৮০) তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শ শুনি না? হ্যাঁ, শুনি। আমার ফেরেশতগণ তাদের নিকটে থেকে লিপিবদ্ধ করে। (৮১) বলুন, দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান থাকলে আমি সর্ব প্রথম তার এবাদত করব। (৮২) তারা যা বর্ণনা করে, তা থেকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা, আরশের পালনকর্তা পবিত্র। (৮৩) অতএব, তাদেরকে বাকচাচুরী ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দিন সেই দিবসের সাক্ষাত পর্যন্ত, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়। (৮৪) তিনিই উপাস্য নভোমণ্ডলে এবং তিনিই উপাস্য ভূমণ্ডলে। তিনি প্রজাময়, সর্বজ্ঞ। (৮৫) বরকতময় তিনিই, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যার। তাঁরই কাছে আছে কেয়ামতের জ্ঞান এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (৮৬) তিনি ব্যতীত তারা যাদের পূজা করে, তারা সুপারিশের অধিকারী হবে না, তবে যারা সত্য স্বীকার করত ও বিশ্বাস করত। (৮৭) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (৮৮) রসুলের এই উক্তি কসম, হে আমার পালনকর্তা, ও সম্প্রদায় তো বিশ্বাস স্থাপন করে না। (৮৯) অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং বলুন, 'সালাম'। তারা শীঘ্রই জনতে পারবে।

সূরা আদ দোখান

মকায় অবতীর্ণ, : আয়াত ৫৯

(১) হা-যীম (২) শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের (৩) আমি একে নাফিল করেছি এক বরকতময় রাতে, নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। (৪) এ রাতে প্রত্যেক প্রজাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।

উভয় দিক বিচারে উৎকৃষ্ট বন্ধুত্ব তাই, যা আল্লাহর ওয়াস্তে হয়। যে দু'জন মুসলমানের মধ্যে আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব হয়, তাদের ফযীলত ও মহত্ত্ব অনেক হাদীসে বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে একটি এই যে, হাশরের ময়দানে তারা আল্লাহর আরশের ছায়াতলে থাকবে। 'আল্লাহর ওয়াস্তে' বন্ধুত্বের অর্থ অপরের সাথে কেবল সত্যিকার ধর্মপরায়ণতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা। সেমতে ধর্মীয় শিক্ষার গুণ্ডা, শায়েখ, মুশ্দি, আলেম ও আল্লাহভক্তদের প্রতি এবং সারা মুসলিম বিশ্বে মুসলমানদের প্রতি নিঃস্বার্থ মহব্বত পোষণ করা এর অন্তর্ভুক্ত।

আনুশঙ্গিক স্নাতব্য বিষয়

(যদি রহমান আল্লাহর কোন সন্তান থাকত, তবে আমিই সর্বপ্রথম তার এবাদত করতাম)। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর সন্তান হওয়া কোন পর্যায়ে সম্ভব। বরং উদ্দেশ্য একথা ব্যক্ত করা যে, আমি কোন শক্রতা ও হঠকারিতাবশতঃ তোমাদের বিশ্বাস অস্বীকার করছি না; বরং প্রমাণাদির আলোকেই করছি। বিশুদ্ধ প্রমাণাদি দ্বারা আল্লাহর সন্তান থাকা প্রমাণিত হলে আমি অবশ্যই তা মেনে নিতাম। কিন্তু সর্বপ্রকার দলীল এর বিপক্ষে। কাজেই মেনে নেয়ার প্রশ্নই উঠে না। এ থেকে জানা গেল যে, মিথ্যাপন্থীদের সাথে বিতর্কের সময় নিজের সত্যপ্রিয়তা ফুটানোর উদ্দেশ্যে একথা বলা জায়েয ও সমীচীন যে, তোমার দাবী সত্য প্রমাণিত হলে আমি মেনে নিতাম। কেননা, মাঝে মাঝে ঐশ্বর্যের কথায় প্রতিপক্ষের মনে নম্রতা সৃষ্টি হয়, যা তাকে সত্য গ্রহণে উৎসাহিত করে।

এ - وَقِيلَ لَهُ رَبِّ إِنَّا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُمِنُونَ - বাক্যটি অবতারণার উদ্দেশ্য কাফেরদের উপর গযব নাফিল হওয়ার যে বহুবিধ গুরুতর, অপরাধকে 'রহমতুল্লিল-আলামীন' ও শফীউল মুয়মিনীন' রূপে প্রেরিত রসূল (সাঃ) স্বয়ং তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং বলছেন যে, তারা বার বার বলা সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করে না। এখন অনুমান করা যায় যে, তারা রসূল (সাঃ)-এর উপর কি পরিমাণ নির্ধারিত চালিয়েছে। আমুলী কষ্ট পেয়ে রহমতুল্লিল আলামীন (সাঃ) আল্লাহ তাআলার কাছে এমন বেদনা মিশ্রিত অভিযোগ করতেন না। এ তফসীর অনুযায়ী وَقِيلَ এর এক আয়াত পূর্বে السَّلَامَةِ শব্দের উপর معطوف হয়েছে। এ আয়াতের আরও কয়েকটি তফসীর করা হয়েছে। উদাহরণতঃ او অক্ষরটি কসমের অর্থ বোঝায় এবং إِنَّ هَؤُلَاءِ কসমের জওয়াব। এসব তফসীর রুহুল মা'আনীতে দ্রষ্টব্য।

وَقُلْ سَلَامٌ - পরিশেষে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, বিরোধীদের দলীল ও আপত্তির জওয়াব দিন, কিন্তু তারা অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রদর্শনে কিংবা দুর্দাম রটনায় প্রবৃত্ত হলে তার জওয়াব তাদের ভাষায় না দিয়ে নিশ্চুপ থাকুন। 'সালাম বলুন'-এর অর্থ আসসালামু আলাইকুম বলা নয়। কেননা, কোন অমুসলিমকে এই ভাষায় সালাম করা বৈধ নয়। বরং এটা এক বাকপদ্ধতি। কারও সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হলে বলা হয়, 'আমার পক্ষ থেকে সালাম' অথবা 'তোমাকে সালাম করি।' এতে সত্যিকারভাবে সালাম উদ্দেশ্য থাকে না, বরং উদ্দেশ্য-এই যে, আমি সুন্দরভাবে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই। কাজেই এ আয়াত দ্বারা কাফেরদেরকে السلام عليك বলা অথবা سلام বলা বৈধ প্রতিপন্ন করা অসঙ্গত। —(রুহুল মা'আনী)

সূরা যুহরুফ সমাপ্ত

সূরা আদ দোখান

সূরার ফযীলত : হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জুম্মাআর রাতিতে সূরা দোখান পাঠ করে, সকাল হওয়ার আগেই তার গোনাহ্ মাফ হয়ে যায়। হযরত আবু উমামার রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি জুম্মাআর রাতিতে অথবা দিনে সূরা দোখান পাঠ করবে আল্লাহ তাআলা তার জন্যে জন্মাতে গৃহ নির্মাণ করবেন।—(কুরতুবী)

উল্লেখিত আয়াতসমূহে কোরআনের মাহাত্ম্য ও কতিপয় বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে **لَيْلَةُ الْقَدْرِ** (সুস্পষ্ট কিতাব) বলে কোরআনকে বোঝানো হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কসম করে বলেছেন, আমি একে এক মোবারক রাতিতে নাখিল করেছি এবং এর উদ্দেশ্য গাফেল মানুষকে সতর্ক করা।

لَيْلَةُ الْقَدْرِ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে শবে-কদর বোঝানো হয়েছে, যা রমযান মাসের শেষ দশকে হয়। এ রাতিকে ‘মোবারক’ বলার কারণ এই যে, এ রাতিতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অসংখ্য কল্যাণ ও বরকত নাখিল হয়। সূরা কদরে **لَيْلَةُ الْقَدْرِ** আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন পাক শবে-কদরে নাখিল হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানেও বরকতের রাত্টি বলে শবে-কদরই বোঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা পয়গম্বগণের প্রতি যত কিতাব নাখিল করেছেন, তা সবই রমযান মাসেরই বিভিন্ন তারিখে নাখিল হয়েছে। হযরত কাতাদাহ বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর সইফাসমূহ রমযানের প্রথম তারিখে, তওরাত ছয় তারিখে, যবুর বার তারিখে, ইঞ্জীল আঠার তারিখে এবং কোরআন পাক চব্বিশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর পঁচিশের রাত্টিতে অবতীর্ণ হয়েছে।—(কুরতুবী)

কোরআন শবে-কদরে নাখিল হয়েছে, এর অর্থ এই যে, লগুহে-মাহফুয থেকে সমগ্র কোরআন দুনিয়ার আকাশে এ রাত্টিতেই নাখিল করা হয়েছে। অতঃপর তেইশ বছরে অল্প অল্প করে রসুলুল্লাহ (সাঃ)–এর প্রতি নাখিল হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রতি বছর যতটুকু কোরআনের অবতরণ অবধারিত ছিল, ততটুকুই শবে-কদরে দুনিয়ার আকাশে নাখিল করা হত।—(কুরতুবী)

ইকরিমাহ প্রমুখ কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াতে বরকতের রাত্টি বলে শবে-বরাত অর্থাৎ, শা’বান মাসের পনের

তারিখের রাত্টি বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এ রাত্টিতে কোরআন অবতরণ কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার পরিপন্থী।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ—এবং **لَيْلَةُ الْقَدْرِ**

এর ন্যায় সুস্পষ্ট বর্ণনা সত্ত্বেও বলা যায় না যে, কোরআন শবে-বরাতে নাখিল হয়েছে। তবে কোন কোন রেওয়ায়েতে শা’বানের পনের তারিখকে শবে-বরাত অথবা ‘লায়লাতুসসফ’ নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং এর বরকতময় হওয়া ও এতে রহমত নাখিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে কোন কোন রেওয়ায়েতে রহমত নাখিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, **فِيهَا يُرْفَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْ أَمْرِهِ**

أَمْرُؤَيْنِ এ রাত্টিতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা আমার পক্ষ থেকে করা হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ কোরআন অবতরণের রাত্টি অর্থাৎ, শবে-কদরে সৃষ্টি সম্পর্কিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা স্থির করা হয়, যা পরবর্তী শবে-কদর পর্যন্ত এক বছরে সংঘটিত হবে। অর্থাৎ, এ বছর কারা কারা জন্মগ্রহণ করবে, কে কে মারা যাবে এবং এ বছর কি পরিমাণ রিযিক দেয়া হবে। মাহদতী বলেন, এর অর্থ এই যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে পূর্বাঙ্কে স্থিরীকৃত সকল ফয়সালা এ রাত্টিতে সর্বশেষ ফেরেশতাগণের কাছে অর্পণ করা হয়। কেননা, কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বর্ণনা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তাআলা এসব ফয়সালা মানুষের জন্মের পূর্বেই সৃষ্টিলাগ্নে লিখে দিয়েছেন। অতএব, এ রাত্টিতে এগুলোর স্থির করার অর্থ এই যে, যে ফেরেশতাগণের মাধ্যমে ফয়সালা ও তকদীর প্রয়োগ করা হয়, এ রাত্টিতে সারা বছরের বিধানাবলী তাদের কাছে অর্পণ করা হয়।—(কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে শবে-বরাত সম্পর্কেও বলা হয়েছে যে, এতে জন্ম-মৃত্যুর সময় ও রিমিকের ফয়সালা লেখা হয়। এ থেকেই কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতে ‘বরকতের রাত্টি’র অর্থ নিয়েছেন শবে-বরাত। কিন্তু এটা শুদ্ধ নয়। কেননা, এখানে সর্বাগ্রে কোরআন অবতরণের উল্লেখ রয়েছে এবং কোরআন অবতরণ যে রমযান মাসে হয়েছে, তা কোরআনের বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত। শবে-বরাত সম্পর্কিত উল্লেখিত কোন কোন রেওয়ায়েতকে ইবনে কাসীর অগ্রাহ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং কাযী আবুবকর ইবনে আরাবী সর্বশেষ বর্ণনাগুলোর ‘নির্ভরযোগ্য নয়’ বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনে আরবী শবে-বরাতের ফযীলত স্বীকার করেন না। তবে কোন কোন মাশায়েখ দুর্বল হলেও হাদীসগুলোকে কবুল করেছেন। কেননা, ফযীলত সম্পর্কিত দুর্বল রেওয়ায়েত কবুল করার অবকাশ রয়েছে।

তিনি **يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ** - আয়াত সম্পর্কে শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করলেন, এই দোখানের কি অর্থ, আপনারা জানেন? অতঃপর নিজেই বললেন, এটা এক ধূম, যা কেয়ামতের দিন নির্গত হবে এবং মুনাফিকদের কর্ণ ও চক্ষু নষ্ট করে দেবে। পক্ষান্তরে মুমিনদের মধ্যে এর কারণে কেবলমাত্র সর্দির উপসর্গ সৃষ্টি হবে।

মসররক বলেন, ওয়ায়েযের একথা শুনে আমরা আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের কাছে গেলাম। তিনি শায়িত ছিলেন—ব্যস্ত—সমস্ত হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের নবীকে (সাঃ)—এই পথনির্দেশ দিয়েছেন — **مَا سَأَلَ كَرِهُتُمْ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ** - অর্থাৎ, আমি তোমাদের কাছে আমার সেবা কর্মের 'কোন বিনিময় চাই না এবং আমি কোন কথা বানিয়ে বলি না। কাজেই যে আলেম হবে, সে যা জানে না, তা পরিস্কার বলে দেবে, আমি জানি না; আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। নিজে কোন কথা বানিয়ে বলা উচিত নয়। অতঃপর তিনি বললেন, এখন আমি তোমাদেরকে এ আয়াতের তফসীর সম্পর্কিত ঘটনা শুনাই। কাফেররা যখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর দাওয়াতে কবুল করতে অস্বীকার করল এবং কুফরীকেই আঁকড়ে রইল, তখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের জন্য বদদোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ্ এদের উপর ইউসুফ (আঃ)—এর আমলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দিন। ফলে কাফেররা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে পতিত হল। এমনকি, তারা অস্থি এবং মৃত জন্তুও ভক্ষণ করতে লাগল। তারা আকাশের দিকে তাকালে ধূম ব্যতীত কিছুই দৃষ্টিগোচর হত না। এক রেওয়াজে আছে, তাদের কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার তীব্রতায় সে কেবল ধূমের মত দেখত। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ **فَأَتَيْنَا يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ** - আয়াতখানি তেলাওয়াত করলেন। দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনগণ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর কাছে আবেদন করল, আপনি আপনার মুযার গোত্রের জন্য আল্লাহ্র কাছে বৃষ্টি দোয়া করুন। নতুবা আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) দোয়া করলে, বৃষ্টি হল। তখন **إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ** - আয়াত নাযিল হল। অর্থাৎ, আমি কিছু দিনের জন্য তোমাদের থেকে আযাব প্রত্যাহার করে নিছি। কিন্তু তোমরা বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবার কুফরের দিকে ফিরে যাবে। বাস্তবে তাই হল, তারা তাদের পূর্ববস্থায় ফিরে গেল। তখন আল্লাহ্ তাআলা **يَوْمَ تَبُطُّشُ**

الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى - আয়াত নাযিল করলেন। অর্থাৎ যদি আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব, সেদিনের ভয় কর। অতঃপর ইবনে-মসউদ বললেন, এই প্রবল পাকড়াও বদরযুদ্ধে হয়ে গেছে। এই ঘটনা বর্ণনা করার পর তিনি আরও বললেন, পাঁচটি বিষয় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, দোখান তথা ধূম, রোম, চাঁদ, পাকড়াও ও লেযাম।—(ইবনে-কাসীর) দোখান অর্থ মল্লার দুর্ভিক্ষ। রোম অর্থ সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা সূরা রূমে রোমকদের বিষয় সম্পর্কে বর্ণিত আছে **وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عِلْمِهِمْ** - চন্দ্র অর্থ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, যা **إِذَا تَبَّتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّتْ** - আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। পাকড়াও অর্থ বদরযুদ্ধে কোরাইশ কাফেরদের পরিশ্রুতি। লেযাম অর্থ **سُوفَ يَكُونُ لِزَامًا** আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাওয়া যায়—(১) আকাশে ধূম দেখা দেবে এবং সবাইকে আচ্ছন্ন করবে, (২) মুশরেকরা আযাবে অতিষ্ঠ হয়ে ঈমানের ওয়াদা করতঃ

আল্লাহ্র কাছে দোয়া করবে, (৩) তাদের ওয়াদা মিথ্যা প্রমাণীত হবে এবং পরে তারা বে-ঈমানী করবে, (৪) তাদের মিথ্যা ওয়াদা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্যে আযাব প্রত্যাহার করবেন এবং বলে দেবেন, তোমরা ওয়াদায় কায়ম থাকবে না এবং (৫) আল্লাহ্ তাআলা পুনরায় তাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করবেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের তফসীর অনুযায়ী সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথমোক্ত চারটি মল্লাবাসীদের উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হওয়া এবং তা দূর হওয়ার অন্তর্বর্তী সময়েই পূর্ণ হয়েছে এবং পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণীটি বদর যুদ্ধে পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু এই তফসীর কোরআনের বাহ্যিক ভাষার সাথে সঙ্গতি রাখে না। কোরআনের ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, আকাশ প্রকাশ্য ধূম দ্বারা আচ্ছাদিত হবে এবং সমস্ত মানুষ এই ধূম দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে। কিন্তু তফসীর থেকে এগুলো কিছুই প্রমাণিত হয় না। বরং জানা যায় যে, এই ধূম তাদের বিপদের তীব্রতার ফলশ্রুতি। এ কারণেই ইবনে-কাসীর কোরআনের বাহ্যিক ভাষা দৃষ্টে এ বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এ ধূম কেয়ামতের অন্যতম আলামত। একে অগ্রাধিকার দেয়ার আরও কারণ এই যে, এটা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর উক্তি দ্বারা প্রমাণীত। পক্ষান্তরে ইবনে মসউদের তফসীর তাঁর নিজস্ব ধারণাপ্রসূত। কিন্তু ইবনে-কাসীরের অগ্রাধিকার দেয়া তফসীরে বাহ্যতঃ খটকা আছে। তা এই যে, আয়াতে আছে **إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ**

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَذَرُ - অথচ কেয়ামতে কাফেরদের থেকে কোন সময় আযাব প্রত্যাহার করা হবে না। সূত্রান্তে কিছু দিনের জন্যে আযাব প্রত্যাহারের বিষয়টি কিরূপে শুদ্ধ হবে? ইবনে-কাসীর বলেন, এ আয়াতের 'দু'টি অর্থ হতে পারে (এক) উদ্দেশ্য এই যে, আমি যদি তোমাদের কথা অনুযায়ী আযাব প্রত্যাহার করি এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেই, তবে তোমরা পূর্ববৎ কুফরীই করতে থাকবে।

কোরআনের অন্য আয়াতে এই বিষয়বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

وَلَوْ جِئْتَهُمْ وَكُنْتُمْ مَلَائِكَةً لَّكُنَّا نَافِيًا لَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمْنُونُ - অন্য এক আয়াতে আছে **وَأَوْرَدُوا الْعَادُوَ إِلَى أَسْفَلِهَا** - কশফ এذاب - এর মানে যদিও আযাবের কারণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আযাব তোমাদের নিকটে এসে গেছে, কিন্তু কিছু দিন আমি তা পিছিয়ে দেব। ইউসুফ (আঃ)—এর কণ্ঠের ব্যাপারেও এমনভাবে এذاب عنهم **كُفْنَا لَهُمْ** বলা হয়েছে। অথচ তাদের উপর আযাবের লক্ষণাদি প্রকাশ পেয়েছিল মাত্র। আযাব আসার তখনও বিলম্ব ছিল। একেই এذاب কশফ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সারকথা এই যে, ধূমের ভবিষ্যদ্বাণীকে কেয়ামতের আলামত গণ্য করা হলে **كَاشِفُو الْعَذَابِ** আয়াত দ্বারা কোন খটকা দেখা দেয় না এবং এ তফসীর অনুযায়ী

تَبُطُّشُ الْبَطْشَةُ الْكُبْرَى - এর অর্থ হবে কেয়ামত দিবসের পাকড়াও। আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের তফসীরকে বদর যুদ্ধের পাকড়াও বলা হয়েছে। এটাও স্বস্থানে শুদ্ধ। কারণ এটাও প্রবল পাকড়াও ছিল। কিন্তু এতে জরুরী হয় না যে, কেয়ামতে আরও প্রবল পাকড়াও হবে না। এটাও অবাস্তব মনে হয় না যে, কোরআন পাক কাফেরদেরকে আলোচ্য আয়াতসমূহে এক ভাবী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছে। এরপর তাদের উপর যে কোন আযাব এসেছে, তাকেই তাঁরা এ আয়াতের প্রতীক মর্মে করে আয়াতসমূহ উল্লেখ করেছেন। ফলে এটা যে কেয়ামতের আলামত, তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন স্বয়ং ইবনে-মসউদ থেকে বর্ণিত আছে—

وَنَصَمَةٍ كَانُوا فِيهَا يَهِينُونَ ﴿٢٧﴾ وَأَوْفُوا بِمَاؤَاخِرِينَ ﴿٢٨﴾
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ
نَجَّيْنَا لُوطِيَّ إِسْرَءِيلَ مِنَ الْغَدَابِ الْمُهَيَّيْنِ ﴿٣٠﴾ مَنْ دَفَعْنَاهُ
كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ اخْتَارْنَاهُمْ عَلَىٰ آلِهِمْ
الَّذِينَ هُمْ أَغْنَيْنَاهُمْ مِنَ الْيَتِيمِ الْيَتِيمِينَ ﴿٣٢﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ
لَيَقُولُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ فِي الْأَمْرِ لَشَيْءًا الْأَوَّلَىٰ وَمَا عُنَّ بِمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾
فَأَتُوا بِإِبْرَإِيمَآءَ إِذْ كَانُوا صُورَةً ﴿٣٥﴾ هُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلدِّينِ ﴿٣٦﴾ مِنْ قَبْلِهِمْ أَفَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا مُعْجِزِينَ ﴿٣٧﴾ وَمَا
خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِلْيَتِيمِ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ
وَيَمَاقِلَهُمْ أَصْحَابِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَوْلَىٰ عَنْ مَوْلَىٰ شَيْئًا وَلَا
مُعْتَصِرِينَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ تَحِمَّ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾
إِنَّ شَجَرَتَ الزُّوْمِ طَعَامُ الْآخِرَةِ ﴿٤٣﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي
فِي الْبُطُونِ ﴿٤٤﴾ كَغَلِّ الْحَبِيبِ ﴿٤٥﴾ خَذُوهُ وَاعْتَبُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ
الْحَبِيبِ ﴿٤٦﴾ ثُمَّ صُوبُوا قَوْيَ رَبِّهِمْ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيبِ ﴿٤٧﴾

(২৭) কত সূক্ষ্ম উপকরণ, যাতে তারা যোগসঙ্গ করত। (২৮) এমনই হয়েছিল এবং আমি এগুলোর মালিক করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। (২৯) তাদের জন্যে ক্রন্দন করেন আকাশ ও পৃথিবী এবং তারা অবকাশও পায়নি। (৩০) আমি বনী-ইসরাঈলকে অপমানজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার করেছি। (৩১) ফেরাউন সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। (৩২) আমি ছেনেস্তনে তাদেরকে বিপুলসীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। (৩৩) এবং আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনবলী দিয়েছিলাম যাতে ছিল স্পষ্ট সাহায্য। (৩৪) কাফেররা বলেই থাকে, (৩৫) প্রথম মৃত্যুর মাধ্যমেই আমাদের সবকিছুর অবসান হবে এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না। (৩৬) তোমরা যদি সভাবাদী হও, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে এস। (৩৭) ওরা শ্রেষ্ঠ, না তুচ্ছার সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি ওদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। ওরা ছিল অপরাধী। (৩৮) আমি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি; (৩৯) আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই বোঝে না। (৪০) নিশ্চয় ফয়সালার দিন তাদের সবাই নির্ধারিত সময়, (৪১) যেদিন কোন কিছুই কোন কিছু উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪২) তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন, তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী দয়াময়। (৪৩) নিশ্চয় যাক্বুম বৃক্ষ (৪৪) পানীয় খাদ্য হবে; (৪৫) গলিত তাম্রের মত পেটে ফুটে থাকবে। (৪৬) যেমন ফুটে পানি। (৪৭) একে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে, (৪৮) অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আঘাত ঢেলে দাও,

ধুমু দু'টি। একটি অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। (অর্থাৎ, মক্কার দুর্ভিক্ষের সময়।) আর যেটি বাকী আছে, সেটি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে দেবে। এতে মুমিনের মধ্যে কেবল সর্দির অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং কাফেরের দেহের সমস্ত রক্ত ছিন্ন করে দেবে। তখন আল্লাহ তাআলা ইয়ামনের দিক থেকে দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত করবেন, যা প্রত্যেক মুমিনের প্রাণ হরণ করবে এবং কেবল দুই প্রকৃতির কাফেরকুল অবশিষ্ট থাকবে।—(রুহুল-মা'আনী)

রুহুল মাআনীর গ্রন্থকার এই রেওয়াজেবের সত্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এটা প্রমাণিত হলেও কোরআন ও হাদীসের সাথে তাঁর অবলম্বিত তফসীরের কোন বৈপরীত্য থাকে না।

وَأَنِّي حَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ زُرْعَتِي (তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা না কর, তজ্জন্মে আমি আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তার শরণাপন্ন ছিছি।) ৱম শব্দের অর্থ প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। এর অপর অর্থ কাউকে গালি দেয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থই হতে পারে, কিন্তু প্রথম অর্থ নেয়াই অধিক সঙ্গত। কেননা, ফেরাউনের সম্প্রদায় মুসা [আঃ]-কে হত্যার হুমকি দিচ্ছিল।

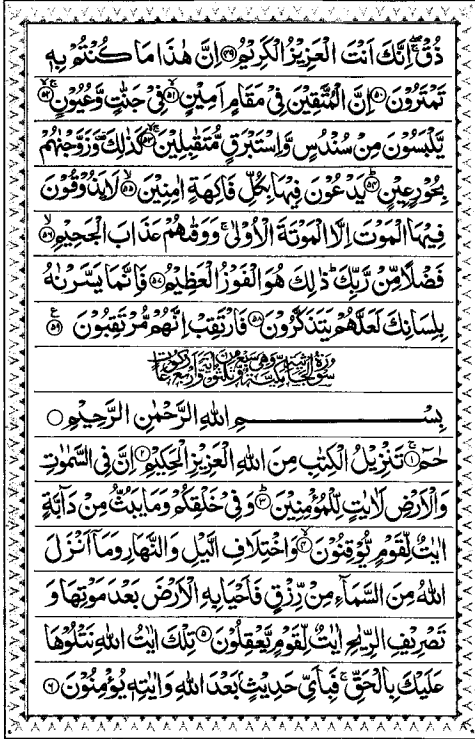
وَأَنِّي حَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ زُرْعَتِي (সমুদ্রকে শাস্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও।) মুসা (আঃ) সঙ্গীগণসহ সমুদ্র পার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে কামনা করবেন যে, সমুদ্র পুনরায় আসল অবস্থায় ফিরে যাক, যাতে ফেরাউনের বাহিনী পার হতে না পারে। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলে দিলেন, তোমরা পার হওয়ার পর সমুদ্রকে শাস্ত ও অচল অবস্থায় থাকতে দাও এবং পুনরায় পানি চলমান হওয়ার চিন্তা করো না—যাতে ফেরাউন শুষ্ক ও তৈরী পথ দেখে সমুদ্রের মধ্যস্থলে প্রবেশ করে। তখন আমি সমুদ্রকে চলমান করে দেব এবং তারা তাতে নিমজ্জিত হবে।—(ইবনে-কাসীর)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَوْفُوا بِمَاؤَاخِرِينَ (আমি এক ভিন্ন জাতিকে সেসবের উত্তরাধিকারী করে দিলাম।) সূরা শোয়ারায় বলা হয়েছে যে, এই ‘ভিন্ন জাতি’ হচ্ছে বনী ইসরাঈল। অবশ্য বনী ইসরাঈল পুনরায় মিসরে আগমন করেছিল বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সূরা শোয়ারার তফসীরে এর জগুয়াবও দেয়া হয়েছে।

আকাশ ও পৃথিবীর ক্রন্দন : فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

(অতঃপর তাদের জন্যে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করেনি।) উদ্দেশ্য এই যে, তারা পৃথিবীতে কোন সৎকর্ম করেনি যে, তাদের মৃত্যুতে পৃথিবী ক্রন্দন করবে এবং তাদের কোন সৎকর্ম আকাশেও পৌছায়নি যে, তাদের জন্য আকাশ অশ্রুপাত করবে। একাধিক রেওয়াজে দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, কোন সৎকর্মপরায়ণ বান্দার মৃত্যু হলে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। এরপর তিনি প্রমাণস্বরূপ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ আয়াতখানি তেলাওয়াত করেন। ইবনে-আকাস থেকেও এমন ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে।—(ইবনে-কাসীর) শোরায়হ ইবনে ওবায়দ (রাঃ)—এর অন্য এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, প্রবাসে মৃত্যুবরণ করার দরুন, যে মুমিন ব্যক্তির জন্যে কোন ক্রন্দনকারী থাকে না, তার জন্যে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করে। এর সাথেও তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং বলেন, পৃথিবী ও আকাশ কোন কাফেরের জন্যে ক্রন্দন করে না।—(ইবনে-জরীর) হযরত আলী (রাঃ)—ও সৎলোকের



(৪৯) স্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো সস্বাদিত, সস্বাদ্য! (৫০) এ সম্পর্কে তোমরা সন্দেহে পতিত ছিলে। (৫১) নিশ্চয় খোদাতীরা নিরাপদ স্থানে থাকবে— (৫২) উদ্যানরাজি ও নিবারণীসমূহে। (৫৩) তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমীবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে। (৫৪) এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে আনতলোচনা স্ত্রী দেব। (৫৫) তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে। (৫৬) তারা সেখানে মৃত্যু আবাদন করবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। (৫৭) আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহা সাফল্য। (৫৮) আমি আপনার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা স্মরণ রাখে। (৫৯) অতএব, আপনি অপেক্ষা করুন, তারাও অপেক্ষা করছে।

সূরা আল জাসিয়া

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩৭

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহর নামে শুরু

(১) হা-যীম, (২) পরাক্রান্ত, প্রভ্রাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এ কিতাব। (৩) নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে মুমিনদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৪) আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং চারদিকে ছড়িয়ে রাখা জীব জন্তুর সৃজনের মধ্যেও নিদর্শনাবলী রয়েছে বিশাসীদের জন্য। (৫) দিবারাত্রির পরিবর্তনে, আল্লাহ আকাশ থেকে যে রিম্বিক (বাঁটি) বর্ষণ করেন অতঃপর পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন, তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বুদ্ধিমানদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৬) এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি আপনার কাছে আবৃতি করি যথাযথরূপে। অতএব, আল্লাহ ও তাঁর আয়াতের পর তারা কোন কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে?

জাহান্নামে প্রবেশ করার আগেই খাওয়ানো হবে। কেননা, এখানে যাকুম খাওয়ানোর পর জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়ার আদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সূরা ওয়াকেরার আয়াত **هٰذَا نَزَّلْنَاهُ مِنَ الْغَيْثِ** থেকেও কেউ কেউ তাই বুঝেছেন। কেননা, দাওয়াতের পূর্বে মেহমানদেরকে যে আদর-আপ্যায়ন করা হয়, তাদের মতে তাকেই **نَزَلَ** বলা হয়। পরবর্তী খাদ্যকে **ضِيَافَةٌ** অথবা **مَادِيَةٌ** বলা হয়। কোরআনের ভাষায় জাহান্নামে প্রবেশের পরে যাকুম খাওয়ানোরও সম্ভাবনা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে পরে জাহান্নামে টেনে নেয়ার আদেশের অর্থ এই হবে যে, তারা পূর্বেই জাহান্নামে ছিল; কিন্তু যাকুম খাওয়ানোর পর তাদেরকে আরও লাক্ষিত ও কষ্টদানের জন্যে জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাওয়া হবে।—(বয়ানুল-কোরআন)

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এসব আয়াতে জাহান্নামের চিরন্তন নেয়ামতসমূহের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং প্রায় সকল প্রকার নেয়ামতই এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কেননা, মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু সাধারণতঃ ছয়টি (১) উত্তম বাসগৃহ (২) উত্তম পোষাক, (৩) আকর্ষণীয় জীবনসঙ্গিনী (৪) স্ব্বাস্থ্য খাদ্য (৫) এসব নেয়ামতের স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা এবং (৬) দুঃখ-কষ্ট থেকে পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকার আশ্বাস। এখন এ ছয়টি বস্তুই জাহান্নামীদের জন্যে প্রমাণিত করে দেয়া হয়েছে। এখানে বাসস্থানের কৈ 'নিরাপদ' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিপদমুক্ত হওয়াই বাসস্থানের প্রধান গুণ।

—এর অর্থ যথাক্রমে চিকন ও মোটা রেশমীবস্ত্র।

—এর অর্থ এক কে অন্যের যুগল করে দেয়া। পরে শব্দটি বিবাহ করানোর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থের প্রেক্ষিতে এখানে উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামী পুরুষদের বিয়ে সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদের সাথে যথা নিয়মে সম্পন্ন করা হবে। জাহান্নামে পার্শ্ববি-বিধানের বাধ্যবাধকতা থাকবে না কিন্তু সম্মানার্থ এসব বিয়ে সম্পন্ন হবে। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, সুন্দরী আনতলোচনা রমণীদেরকে জাহান্নামী পুরুষদের যুগল করে দেয়া হবে এবং দান হিসেবে দেয়া হবে। এর জন্যে দুনিয়ার ন্যায় বিবাহ বন্ধনের প্রয়োজন নেই। —**اَلَيْسَ لَدُنَّكَ فِيْهَا الْمَوْتُ الْاَوَّلُ ۝** —অর্থাৎ, একবার মৃত্যুর পর আর কোন মৃত্যু হবে না। এ নিয়ম জাহান্নামীদের জন্যেও। কিন্তু সেটা তাদের জন্যে অধিক কঠোর এবং জাহান্নামীদের জন্যে অধিক আনন্দ ও সুখের বিষয় হবে। কারণ, যত বড় নেয়ামতই হোক, তা বিলুপ্ত হওয়ার কল্পনা নিশ্চিতরাপেই মনে বিপদের রেখাপাত করে। জাহান্নামী যখন কল্পনা করবে যে, এসব নেয়ামত তাদের কাছ থেকে কখনও ছিনিয়ে নেয়া হবে না, তখন এটা তাদের আনন্দকে আরও বৃদ্ধি করে দেবে।

(সূরা দোখান সমাপ্ত)

চেটা-প্রচেটা হয়ে থাকে। এখানে এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তোমাদেরকে সমুদ্রে জাহাজ চালনার শক্তি দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পার। এরূপ অর্থও সম্ভবপর যে, সমুদ্রে আমি অনেক উপকারী বস্তু সৃষ্টি করে সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি, যাতে তোমরা সেগুলো খুঁজ করে উপকৃত হও। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে জানা গেছে যে, সমুদ্রে এত অধিক খনিজ-সম্পদ এবং ধন-দৌলত লুক্কায়িত আছে, যা স্থলেও নেই।

قُلْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَفِي هَٰذَا حَيٰوةٌ وَلَٰكِيۡنَ لَّعَلَّهُمْ يَرْجِعُوۡنَ (আপনি মুমিনদের-

কে বলুন, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে, যারা আল্লাহর সে দিনগুলো সম্পর্কে বিশ্বাস রাখে না।) এক রেওয়াজে অনুযায়ী আয়াতের শানে নুযল এই যে, মক্কায় জনৈক মুশরেক হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনা করেছিল। হযরত ওমর এর বিনিময়ে তাকে শান্তি দেয়ার সংকল্প করেন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়। এই রেওয়াজে অনুযায়ী আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। অপর এক রেওয়াজে অনুযায়ী বনী মুত্তালিক যুদ্ধে রসুলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণসহ মুরাইসী নামক এক কূপের ধারে শিবির স্থাপন করেন। মুনাক্কে সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও মুসলিম বাহিনীতে शामिल ছিল। সে তার গোলামকে কূপ থেকে পানি উঠানোর জন্য প্রেরণ করলে তার ফিরে আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। আবদুল্লাহ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, হযরত ওমরের এক গোলাম কূপের কিনারায় বসা ছিল। সে রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও হযরত আবু বকরের মশক ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত কাউকে পানি উঠানোর অনুমতি দিল না। আবদুল্লাহ বলল, আমাদের মধ্যে ও তাদের মধ্যে এই প্রবাদবাক্যই চমৎকার খাটে যে, কুকুরকে মোটা-তাজ্জা করলে সে তোমাকেই খেয়ে ফেলবে। হযরত ওমর (রাঃ) এ বিষয় অবগত হয়ে তরবারি হস্তে আবদুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন। এর পরিক্ষেপিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই রেওয়াজে অনুযায়ী আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ।—(কুরত্বী, রাদ্ধ-মা'আনী) সনদ খোজাখুজির পর যদি উভয় রেওয়াজে সহীহ প্রমাণিত হয়, তবে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, আয়াতটি আসলে মক্কায় নাযিল হয়েছিল, অতঃপর বনী মুত্তালিক যুদ্ধে একই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় রসুলুল্লাহ (সাঃ) আয়াতটি সেখানেও তেলাওয়াত করে ঘটনার সাথে খাপ খাইয়ে দেন। শানে নুযল সম্পর্কিত রেওয়াজেসমূহে প্রায়ই এ ধরনের ব্যাপার ঘটেছে। এটাও সম্ভবপর যে, জিবরাঈল (আঃ) সুরণ করিয়ে দেয়ার জন্য পুনরায় একই আয়াত বিন মুত্তালিক যুদ্ধের সময়

নিয়ে আগমন করেন। উসুলে তফসীরের পরিভাষায় একে শানে নুযলে মুকাররার (বার বার অবতরণ) বলা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে اٰمَنُوْا শব্দের অর্থ পরকালে প্রতিদান ও শান্তি সম্পর্কিত আল্লাহ তাআলার ব্যাপারাদি। اٰمَنُوْا শব্দটি ঘটনাবলী ও ব্যাপারাদির অর্থে আরবীতে বহুল প্রচলিত।

এখানে দ্বিতীয় অনুধাবনযোগ্য বিষয় এই যে, আয়াতে ‘মুরেকদেরকে বলে দিন’ না বলে ‘যারা আল্লাহর ব্যাপারাদিতে বিশ্বাস রাখে না, তাদেরকে বলে দিন’ বলা হয়েছে। এতে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে যে, তাদেরকে আসল শান্তি পরকালে দেয়া হবে। যেহেতু তারা পরকাল বিশ্বাস করে না, তাই এ শান্তি তাদের জন্যে অপ্রত্যাশিত হবে। অপ্রত্যাশিত কষ্ট অনেক বেশী হয়ে থাকে। ফলে তাদের ভবিষ্যৎ আশাব খুব কঠোর হবে এবং এর মাধ্যমে তাদের সকল কুকর্মের পুরোপুরি প্রতিশোধ নেয়া হবে। কাজেই দুনিয়াতে ছোটখাট ধর-পাকড় করার চিন্তা আপনি করবেন না।

কেউ কেউ বলেন, এই আয়াতের আদেশ জেহাদের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু অধিকাংশের বক্তব্য এই যে, জেহাদের বিধানের সাথে এই আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই। এতে সাধারণ সামাজিক কাজ-কারবারে ছোটখাট বিষয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করার শিক্ষা রয়েছে, যা প্রতি যুগে প্রযোজ্য। আজও এ শিক্ষা কার্যকর রয়েছে। অতএব, একে রহিত বলা ঠিক নয়। বিশেষতঃ এর শানে-নুযল যদি বিন মুত্তালিকের যুদ্ধকালীন ঘটনা হয়, তবে জেহাদের আয়াত একে রহিত করতে পারে না। কারণ, জেহাদের আয়াত এর অনেক আগেই অবতীর্ণ হয়েছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালত সপ্রমাণ করা। এ প্রসঙ্গে কাফেরদের উৎপীড়নের মুখে তাঁকে সাহুনাও দেয়া হয়েছে। اِنَّ رَّبِّكَ يَقۡضِيۡ بَيۡنَهُمۡ (এ পর্যন্ত আয়াতসমূহ থেকে দু'টি বিষয় জানা যায়) —(এক)—বনী ইসরাঈলকে কিতাব ও নবুওয়ত দিয়ে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সমর্থন এবং (দুই) তাঁকে সাহুনা দেয়া যে, বনী ইসরাঈল যে কারণে মতভেদ করেছিল, আপনার সম্প্রদায়ও সে কারণেই মতভেদ করছে, অর্থাৎ দুনিয়া-প্রীতি ও পারস্পরিক বিদ্বেষ। কারণ, এটা নয় যে, আপনার প্রমাণাদিতে কোন ত্রুটি আছে। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না।—(বয়ানুল-কোরআন)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِّ عِزَّةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّيَبْنَا بِهَا وَلَا تَكْنُ عِزًّا
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ أَفَلَمْ يَكُنْ لَّيْلٌ مِّنَ اللَّيْلِ تَقُولُ أَعَنَّاكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَوْ
 إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ وَاللَّهُ وَلَىٰ الْمُتَّقِينَ ۝
 هَذَا بَصُلُّكَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝
 حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الشَّيْءَ أَنْ نَحْنُ لَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا
 وَغَرَّبُوا الشَّيْءَ سَوَاءً عِندَ اللَّهِ وَمَا تَكُونُ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝
 خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُخْرِجَ كُلَّ قَوْمٍ مِّنْهَا
 كَيْدٌ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝
 أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوًىٰ وَاصْلَهُ اللَّهُ
 عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَفَىٰ عَلَىٰ بَصَرِهِ وَغَشَّىٰ فُؤَادَهُ
 فَلَيْدِيءٍ مِّنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝
 وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا أَلْهَابُهَا
 الدُّنْيَا لَنُؤْتِيَنَّهَا وَمَا يُكَلِّمُكَ إِلَّا الدُّهُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ
 مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝
 وَإِذَا تَنَاسَلْنَا نَبَاتٍ
 مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابِتْ يَا بَنَاتِ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقَاتٍ ۝
 قُلِ اللَّهُ يُحْكِمُ لَكُمْ شُرُوعَكُمْ ثُمَّ يُبَيِّنُ لَكُمْ شُرُوعَكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ
 يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِّ عِزَّةٍ مِّنَ الْأَمْرِ (এরপর আমি আপনাকে ধর্মের

এক বিশেষ তরীকার উপর রেখেছি।) এখানে স্মর্তব্য যে, ইসলাম-ধর্মের কিছু মৌলিক বিশ্বাস রয়েছে, যেমন তওহীদ, পরকাল ইত্যাদি এবং কিছু কর্মজীবন সম্পর্কিত বিধি-বিধান রয়েছে। মৌলিক বিশ্বাস প্রত্যেক নবীর উদ্ভবের জন্যই এক ও অভিন্ন। এতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। কিন্তু কর্মগত বিধান বিভিন্ন পয়গম্বরের শরীয়তে যুগের যুগের চাহিদা অনুসারে পরিবর্তিত হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে এসব কর্মগত বিধানকেই ‘ধর্মের এক বিশেষ তরীকা’ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ কারণেই ফেকাহবিদগণ এ আয়াত থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, উদ্ভব-মুহাম্মাদীর জন্য কেবল শরীয়তে মুহাম্মাদীর বিধানাবলীই অবশ্য পালনীয়। পূর্ববর্তী উদ্ভবদের প্রাপ্ত বিধানাবলী কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের জন্যে অবশ্য পালনীয় নয়। সমর্থনের এক প্রকার এই যে, কোরআন অথবা হাদীসে স্পষ্ট বলা হবে যে, অমুক নবীর উদ্ভবের এ বিধান তোমাদের জন্যেও অবশ্য পালনীয়; আর দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কোরআন পাক অথবা রসুলুল্লাহ (সাঃ) পূর্ববর্তী কোন উদ্ভবের কোন বিধান প্রশংসাহেলে বর্ণনা করবেন এবং বিধানটি আমাদের যুগে রহিত হয়ে গেছে, একত্র বলা থেকে বিরত থাকবেন। এতেও বোঝা যায় যে, বিধানটি আমাদের শরীয়তে অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় এই বিধান শরীয়তে মুহাম্মাদীর অংশ হিসেবেই অবশ্য পালনীয় হবে।

(১৮) এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞানদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। (১৯) আল্লাহর সামনে তারা আপনার কোন উপকারে আসবে না। যালেমরা একে অপরের বন্ধু। আর আল্লাহ পরহেযগারদের বন্ধু। (২০) এটা মানুষের জন্যে জ্ঞানের কথা এবং বিলাসী সম্পদারের জন্যে হেলায়েত ও রহস্য। (২১) যারা দুষ্কর্ম উপার্জন করেছে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সে লোকদের মত করে দেব, যারা ঈমান আনে ও সংকল্প করে—এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু কি সমান হবে? তাদের দাবী কত মন্দ। (২২) আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জনের ফল পায়। তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না। (২৩) আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশীকে স্থায়ী উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পঞ্চভট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পঞ্চদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা কর না? (২৪) তারা বলে, আমাদের পার্শ্ববর্তী জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও ঝাঁচি মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে। (২৫) তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন একথা বলা ছাড়া তাদের কোন যুক্তিই থাকে না যে, তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে এস। (২৬) আপনি বলুন, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, অতঃপর মৃত্যু দেন, অতঃপর তোমাদেরকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না।

পরজগৎ এবং তাতে প্রতিদান ও শাস্তি যুক্তির আলোকেই অপরিহার্য : উল্লেখিত ১১-২২ নং আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে প্রতিদান ও শাস্তি অপরিহার্য হওয়ার একটি যুক্তি বর্ণিত হয়েছে। যুক্তিটি এই যে, এটা প্রত্যক্ষ ও অনস্বীকার্য সত্য যে, দুনিয়াতে ভাল বা মন্দ কাজের পূর্ণ প্রতিফল পাওয়া যায় না, বরং সাধারণভাবে কাফের ও পাপাচারীরা অতুল ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার অনুগতশীল বান্দা উপবাস, দারিদ্র্য ও বিপদাপদে জড়িত থাকে। প্রথমতঃ দুনিয়াতে দুষ্করিত অপরাধীদের অপরাধ অধিকাংশ সময়ই জানা যায় না, জানা গেলেও অধিকাংশ সময় তারা ধরা পড়ে না। আবার ধরা পড়লেও হালাল-হারাম ও সত্য-মিথ্যার পরওয়া না করে তারা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার পথ খুঁজে নেয়। শত শত অপরাধীর মধ্যে কেউ যদি শাস্তি পায়ও তবে তাও তার অপরাধের পূর্ণ শাস্তি হয় না। এভাবে খোদাদ্রোহী ও খেয়াল-খুশীর অনুসারীরা ইহজীবনে সদন্তে প্রকাশ্য ঘুরে বেড়ায়। আর ঈমানদারগণ শরীয়তের অনুসরণ করে অনেক টাকা-পয়সা ও ভোগ-বিলাসকে হারাম মনে করে ত্যাগ করে এবং বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্যেও কেবল বৈধপন্থা অবলম্বন করে। অতএব, যদি ইহজগতের পর পরজগৎ ও পুনরুজ্জীবন এবং প্রতিদান ও শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে, তবে ইহজগতে কোন চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, হত্যা ইত্যাদিকে অপরাধ বলা নির্বৃদ্ধিতা বৈ কিছুই নয়। এ ধরনের অপরাধীরা দুনিয়াতে প্রায়ই সফল জীবন-যাপন করে। চোর ও ডাকাত, এক রাত্রিতে এত ধন-সম্পদ উপার্জন করে নেয়, যা একজন গ্রাজুয়েট সারা বছর চাকরী ও পরিশ্রম করে উপার্জন করতে পারে না। এখন পরকাল ও হিসাব-নিকাশ না থাকলে এই চোর-ডাকাতকে এই ভদ্র-গ্রাজুয়েট অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলতে হবে। অথচ এটা কোন বিবেকবান ব্যক্তি বলতে পারে না। তবে ইহজগতে এদের বিরুদ্ধে প্রত্যেক

المائدة

১৫

المائدة

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَرَوَى كُلُّ أُمَّةٍ جَلِيلَةٍ - وَرَوَى এর অর্থ নতজন্ম হয়ে বসা। ভয়ের

কারণে এভাবে বসবে। كُلُّ أُمَّةٍ (প্রত্যেক দল) শব্দ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, মুমিন, কাফের, সং ও অসং নির্বিশেষে সকলেই হাশরের ময়দানে ভয়ে নতজন্ম হয়ে বসবে। কোন কোন আয়াত ও রেওয়াজেতে রয়েছে যে, হাশরের ময়দানে পয়গম্বর ও সংকর্মপরায়াণ ব্যক্তিগণ ভীত হবেন না। এটা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়; কেননা, অল্পকিছুকালের জন্যে এই ভয় ও ভ্রাস পয়গম্বর ও সংলোকদের মধ্যেও দেখা দেয়া সম্ভবপর। কিন্তু যেহেতু খুব অল্প সময়ের জন্যে এই ভয় দেখা দেবে, তাই একে না হওয়ার পর্যায়ে রেখে দেয়া হয়েছে। এটাও সম্ভবপর যে, ‘প্রত্যেক দল’ বলে অধিকাংশ হাশরবাসী বোঝানো হয়েছে। كُلُّ جَلِيلَةٍ মাঝে মাঝে অধিকাংশের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ جَلِيلَةٍ এর অর্থ করেছেন নামাযে বসার ন্যায় বসা। এমতাবস্থায় কোন ঝটকা থাকে না। কেননা, এটা আদবের বসা—ভয়ের নয়।

كُلُّ أُمَّةٍ تَنْدَعِي إِلَىٰ رَبِّهَا অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এখানে

কিতাব অর্থ দুনিয়াতে ফেরেশতাগণের লিখিত আমলনামা। হাশরের ময়দানে এসব আমলনামা উড়িয়ে দেয়া হবে এবং প্রত্যেকের আমলনামা তার হাতে পৌছে যাবে। তাকে বলা হবে, اِقْرَأْكِتَابَكَ كُلِّ نَفْسٍ

الْيَوْمَ عَلَيْكَ حِسَابًا অর্থাৎ, তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর এবং

নিজেই হিসাব কর কি প্রতিফল তোমার পাওয়া উচিত। আমলনামার দিকে আহ্বান করার অর্থ আমলের হিসাবের দিকে আহ্বান করা।

সূরা আল-জাসিয়া সমাপ্ত

(২৭) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহরই। যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (২৮) আপনি প্রত্যেক উম্মাতকে দেখবেন নতজন্ম অবস্থায়। প্রত্যেক উম্মাতকে তাদের আমলনামা দেখতে বলা হবে। তোমরা যা করতে, অন্য তোমাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। (২৯) আমার কাছে রক্ষিত এই আমলনামা তোমাদের সম্পর্কে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম। (৩০) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সংকর্ম করেছে, তাদেরকে তাদের পালনকর্তা স্বীয় রহমতে দাখিল করবেন। এটাই প্রকাশ্য সাফল্য। (৩১) আর যারা কুফর করেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের কাছে কি আয়াতসমূহ পঠিত হত না? কিন্তু তোমরা অহংকার করেছিলে এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়। (৩২) যখন বলা হত, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কেয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে আমরা জানি না কেয়ামত কি? আমরা কেবল ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। (৩৩) তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিক্রপ করত, তা তাদেরকে গ্রাস করবে। (৩৪) বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম এবং তোমাদের সাহায্যকারী নেই। (৩৫) এটা এজন্যে যে তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছিলে এবং পার্শ্ববর্তী জীবন তোমাদেরকে প্রভাবিত করেছিল। সুতরাং আজ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে না এবং তাদের কাছে তওবা চাওয়া হবে না। (৩৬) অতএব, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, ভূ-মণ্ডলের পালনকর্তা ও নভোমণ্ডলের পালনকর্তা আল্লাহরই প্রশংসা। (৩৭) নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে তাঁরই গৌরব। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
حَمْدٌ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
مَا خَلَقْنَا السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ
مُسَعًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ
مَتَّكِعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ
أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمُوتِ أَرُونِي يَكُفُّنَ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ
أَشْرَؤُا مِنْ عِلْمِ إِبْرَاهِيمَ كُنُوزَ صَدِيقَيْنِ ۝ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْبَيْعَةِ وَلَمْ عَنْ
دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ ۝ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَ
كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۝ وَإِذَا نَسَّاهُمْ لِنِسْيَانِنَا بَيْنِ يَدَيْ
قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّيْلِ لَكَ جَاءَ هُمْ هَذَا إِعْرَاضُونَ ۝
أَمْ يَقُولُونَ افْعَلْهُ قُلْ إِنْ أَفْعَلْتُهُ فَلَا ضَرَرَ لَكُمْ
لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعِلُونَ فَبِذِكْرِ لِي بِهِ
شَهِيدٌ الْبَيِّنَاتِ وَيُبَيِّنُكُمْ لَكُمْ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

সূরা আল-আহকাফ

মকায় অবতীর্ণ, আয়াত ৩৫

পরম করুণাময় ও অসীমদাতা আল্লাহর নামে শুরু—

- (১) হা-যীম, (২) এই কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৩) নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু আমি যথাযথভাবেই এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আর কাকেররা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪) বলুন, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর, তাদের বিষয়ে ভেবে দেখেছ কি? দেখাও আমাকে তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? অথবা নভোমণ্ডল সৃজনে তাদের কি কোন অংশ আছে? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান আমার কাছে উপস্থিত কর—যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৫) যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর পূজা করে, যে ক্রয়মত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না, তার চেয়ে অধিক পঞ্চদশ আর কে? তারা তো তাদের পূজা সম্পর্কেও বেখবর। (৬) যখন মানুষকে হাশরে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের এবাদত অস্বীকার করবে। (৭) যখন তাদেরকে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনানো হয়, তখন সত্য আগমন করার পর কাকেররা বলে, এ তো প্রকাশ্য জাদু। (৮) তারা কি বলে যে, রসূল একে রচনা করেছে? বলুন, যদি আমি রচনা করে থাকি, তবে তোমরা আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করার অধিকারী নও। তোমরা এ সম্পর্কে যা আলোচনা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সত্যক অবগত। আমার ও তোমাদের মধ্যে তিনি সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। তিনি ক্ষমশালী, দয়াময়।

সূরা আল-আহকাফ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَتَّكِعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

দাবী বাতিল করার জন্যে তাদের দাবীর স্বপক্ষে দলীল চাওয়া হয়েছে। কেননা, সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত কোন দাবী গ্রহণীয় হয় না। দলীলের যত প্রকার রয়েছে, সবগুলো আয়াতে উল্লেখ করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, মুশরেকদের দাবীর পক্ষে কোন প্রকার দলীল নেই। তাই এহেন দলীলবিহীন দাবীতে অটল থাকা নিরোপ পঞ্চদশতা। আয়াতে দলীলকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (এক) যুক্তিভিত্তিক দলীল। এর খণ্ডনে বলা হয়েছে

أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ

দ্বিতীয় প্রকার ইতিহাস ভিত্তিক দলীল। বলাবাহুল্য, আল্লাহর ব্যাপারে কেবল সেই ইতিহাসভিত্তিক দলীলই গ্রহণীয় হতে পারে, যা স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। যেমন, তওরাত, ইঞ্জিল, কোরআন ইত্যাদি ঐশী কিতাব অথবা আল্লাহর মনোনীত নবী ও রসূলগণের উক্তি। এই দুই প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারের খণ্ডনে বলা হয়েছে

أَرُونِي يَكُفُّنَ مِنْ قَبْلِ هَذَا

অর্থঃ, তোমাদের মূর্তি পূজার কোন দলীল থাকলে কোন ঐশী কিতাব পেশ কর, যাতে মূর্তি পূজার অনুমতি দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থঃ, রসূলগণের উক্তি খণ্ডন করতে বলা হয়েছে,

أَوْ أَشْرَؤُا مِنْ عِلْمِ إِبْرَاهِيمَ

কিতাব আনতে না পারলে কমপক্ষে রসূলগণের পরম্পরাগত কোন উক্তি পেশ কর। তাও পেশ করতে না পারলে তোমাদের কথা ও কাজ পঞ্চদশতা বৈ কিছুই নয়।

اشارة শব্দটি ساحة-شجاعة এর ওজনে একটি ধাতু। অর্থ নকল,

রেওয়াকে। এ কারণে ইকরিমা ও মুকাতিল—এর তফসীরে ‘পয়গম্বরগণ থেকে রেওয়াকে’ বলেছেন। (কুরতুবী) সারকথা এই যে, দু’রকম ইতিহাসভিত্তিক দলীল গ্রহণযোগ্য – কোন পয়গম্বরের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং লোক পরম্পরায় প্রমাণিত পয়গম্বরের উক্তি। আয়াতে

أَوْ أَشْرَؤُا مِنْ عِلْمِ إِبْرَاهِيمَ

বলে তাই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ অন্যান্য আরও কিছু তফসীর করেছেন, যা কোরআনের ভাষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

۴ - وَمَا أَفْرِضِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنْ إِنْ أَكْبَرُ إِلَّا مَا يُؤْتَى إِلَى

আয়াতে **إِنْ أَنْزَلْنَا** ব্যাকটি ব্যতিক্রম নির্দেশ করে। অর্থ এই যে, আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, তা ব্যতীত আমি জানি না। এর ভিত্তিতে তফসীরবিদ যাহ্যাক এ আয়াতের যে তফসীর করেছেন, তার সারমর্ম এই যে, আমি একমাত্র ওহীর মাধ্যমে অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান লাভ করতে পারি। ওহীর মাধ্যমে আমাকে যে বিষয় জানানো হয় না, তা আমার ব্যক্তিগত বিষয় হোক অথবা উস্মাতের মুমিন ও কাফেরের বিষয় হোক অথবা ইহকালের বিষয় হোক কিংবা পরকালের বিষয় হোক—তা আমি জানি না। অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে আমি যা কিছু বলি, তা সবই ওহীর আলোকে বলে থাকি। কোরআন পাকে উল্লেখিত আছে যে, **أَلَمْ نَأْتِ الْبَنِيَّانَ بِالْبَيِّنَاتِ** তাআলা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে অনেক অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান দান করেছিলেন। এক আয়াতে আছে **وَمَا يَكْفُرُ الْغَيْبُ لِنُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ** জাহান্নাম, জান্নাত, হিসাব, নিকাশ, শাস্তি, প্রতিদান ইত্যাদি পারলৌকিক বিষয়ের বিবরণ তো স্বয়ং কোরআন পাকে অনেক রয়েছে। ইহকালের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর অনেক বিবরণও পরম্পরাগত সহীহ হাদীসসমূহে রসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, উল্লেখিত আয়াতের সারমর্ম এতটুকু যে, আমি অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানে আল্লাহ তাআলার মত নই এবং জ্ঞানে স্বেচ্ছাশীলও নই; বরং ওহীর মাধ্যমে আমাকে যতটুকু বলে দেয়া হয়, আমি ততটুকুই বর্ণনা করি।

তক্ষীরে রুসল মা'আনীতে এ উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, আমার বিশ্বাস, রসুলুল্লাহ (সাঃ) ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে বিদায় নেননি, যতদিন আল্লাহর সন্তা, গুণাবলী এবং পরকালের ও ইহকালের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁকে ওহীর মাধ্যমে অবহিত করা হয়নি। তবে যাদেদ আগামীকাল কি করবে, তার পরিণাম কি হবে ইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষের ঈন্টিনাটি অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকা কোন উৎকর্ষের বিষয় নয় এবং এগুলো না জ্ঞানলেও নবওয়তের উৎকর্ষ হ্রাস পায় না।

রসুল্লাহ (সাঃ)-এর অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কিত আদব : এ ব্যাপারে আদব এই যে, তিনি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন না, এরূপ বলা সঙ্গত নয়। বরং এভাবে বলা দরকার যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে অদৃশ্য বিষয়াদির অনেক জ্ঞান দান করেছিলেন যা অন্য কোন পয়গম্বরকে দেননি। কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতে পার্শ্বি অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে ‘আমি জানি না’ বলা হয়েছে—পারলৌকিক অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে নয়। কেননা, পারলৌকিক বিষয়ে তিনি খোলাখুলি বলে দিয়েছেন যে, মুমিন জান্নাতে যাবে এবং কাফের জাহান্নামে যাবে—(কুরত্ববী)

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَاَمَنَ وَاسْتَبْرَأَ ثُمَّ

এ আয়াতের এবং সূরা - **أُولَئِكَ لَمْ يَأْتِ أَنْ يَعْلَمْهُ عَلَّمُوا ابْنِ إِسْرَءِيلَ**

শোয়ারার আয়াতের অর্থ একই রকম। সারমর্ম এই যে, যেসব ইহুদী ও খ্রীষ্টান রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালত ও কোরআন অমান্য করে, তারা স্বয়ং তাদের কিভাবে সম্পর্কেও অজ্ঞ। কেননা, বনী ইসরাইলের অনেক আলেম তাদের কিভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। সে আলেমগণের সাক্ষ্যও কি এই মর্মেদের জন্যে যথেষ্ট নয়? এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاةِ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَى مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ
إِنْ أَتَيْتُمُ الْإِسْلَامَ تَحِيًّا وَإِنَّمَا الْإِثْمُ بِكُمْ يُقِيمُونَ قَوْلَ رَبِّهِمْ
إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي
إِسْرَءِيلَ عَلَى نَفْسِهِ قَامَنَ وَاسْتَكْبَرَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ زَاغَ يَدَيْهِ الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَوَلَمْ يَكُنْ خَيْرًا مِمَّا
سَبَقُوا أَلَيْسَ بِهِمْ عَذَابٌ قَبِيلٌ ۖ وَأَذْكَرُهُمْ فَأَبَىٰ فَصَبَّوْهُنَ هَذَا أَفَنُكَّ قَبِيلٌ ۖ
وَمَنْ قَبِيلَهُ كُنْ يَٰ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ
لِّسَانِكَ ۖ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَتَنَبَّأُ لِلْمُحْسِنِينَ ۖ إِنْ
الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَاؤُا فَلَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ۖ وَلِلَّهِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ الْخَالِدِينَ فِيهَا لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يُعْلَنُ
عَمَلُهُمْ ۖ وَوَقَيْنَا الْإِنْسَانَ بُوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِطْرُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ
أَشَدَّهُ وَلَئِنَّ رَجُلَيْنِ سَفَهَ قَالَ رَبِّ ارْجِعْنِي ۖ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ
وَأَصْلَحْ لِي ۖ لَوْ دُرِّي عَنِّي لَأَتَيْنُكَ إِلَيْكَ وَلَئِنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝

(৩) বলুন, আমি তো কোন নতুন রসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে। আমি কেবল তারই অনুসরণ করি, যা আমার প্রতি ওহী করা হয়। আমি স্পষ্ট সত্যকারী বৈ নই। (১০) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয় এবং তোমরা একে অমান্য কর এবং বনী ইসরাঈলের একজন সাক্ষী এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে এতে বিশ্বাস স্থাপন করে; আর তোমরা অহংকার কর, তবে তোমাদের চেয়ে অধিকতর আর কে হবে? নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অবিবেচকদেরকে পথ দেখান না। (১১) আর কাকেররা মুমিনদের বলতে লাগল যে, যদি এ দ্বীন ভাল হত, তবে এরা আমাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারত না। তারা যখন এর মাধ্যমে সুখ পায়নি, তখন শীঘ্রই বলবে, এ তো এক পুরাতন মিথ্যা। (১২) এর আগে মূসার কিতাব ছিল পঞ্চদশক ও রহমতরূপ। আর এই কিতাব তার সমর্থক আরবী ভাষায়, যাতে যালেমদেরকে সতর্ক করে এবং সংকল্পপরায়ণদেরকে সুসংবাদ দেয়। (১৩) নিশ্চয় ফারন বল, আমাদের পালনকারী আল্লাহ্‌ অতঃপর অবিচল থাকে, তারের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। (১৪) তারা ইচ্ছাভীরে অস্বীকারী। তারা তথ্য চিরকাল থাকবে। তারা যে কর্ম করত, এটা তারই প্রতিফল। (১৫) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চন্দ্রিণ বছরে পৌছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নেয়াযতের শোকর করি, যা তুমি দান করছে আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সংকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সংকল্পপরায়ণ কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আত্মবিস্ময়ের অনাতম।

নবুওয়ত দাবীকে শ্রাস্ত এবং কোরআনকে আমার রচনা বল। এর এক জগুয়াব পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ বাস্তবে নবী না হয়ে নিজেকে নবী বলে মিথ্যা দাবী করলে তার দুনিয়াতেই নিপাত হয়ে যাওয়া জরুরী, যাতে জনসাধারণ প্রভাবিত না হয়। এ জগুয়াবই যথেষ্ট, কিন্তু তোমরা যদি না মান তবে এ সম্ভাবনার প্রতিও লক্ষ্য কর যে, আমার দাবী যদি সত্য হয় এবং কোরআন আল্লাহর কিতাব হয় আর তোমরা একে অমান্য করেই যাও, তবে তোমাদের পরিণতি কি হবে, বিশেষতঃ যখন তোমাদের বনী-ইসরাঈলেরই কোন মান্যবর ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, এটা আল্লাহর কিতাব, অতঃপর সে নিজেকে মুসলমান হয়ে যায়? এ জ্ঞান লাভের পরও যদি তোমরা জেদ ও অহংকারে অটল থাক, তবে তোমরা গুরুতর শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে।

আয়াতে বনী ইসরাঈলের কোন বিশেষ আলেমের নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং এটাও নির্দিষ্ট করা হয়নি যে, এ সাক্ষ্য আয়াত অবতরণের পূর্বেই জনসমক্ষে এসে গেছে, না ভবিষ্যতে আসবে। তাই বনী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার উপর আয়াতের অর্থ নির্ভরশীল নয়। খ্যাতনামা ইহুদী আলেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালামসহ যত ইহুদী ও খ্রীষ্টান ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন, তারা সবাই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। যদিও আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এই আয়াত নাযিল হওয়ার পরে মদীনায় ইসলাম গ্রহণ করেন। এ আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছিল।

হযরত সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, যাহ্‌হাক প্রমুখ তফসীরবিদগণ তাই বলেছেন। এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পরিপন্থী নয়। এমতাবস্থায় আয়াতটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে গণ্য হবে।—(ইবনে কাসীর)

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَّوْاكَ وَتَلَاكَ اَهংকার ও গর্ব মানুষের জ্ঞানবুদ্ধিকেও বিকৃত করে দেয়। অহংকারী ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিকেই ভালমন্দের মাপকাঠি বলে মনে করতে থাকে। সে যা পছন্দ করে না, অন্যেরা তা পছন্দ করলে সে সবাইকে বোকা মনে করে, অথচ বাস্তবে নিজেকে বোকা। কাকেরদের এ ধরনের অহংকার ও গর্বই আলোচ্য আয়াতে বিবৃত হয়েছে। ইসলাম ও ঈমান তাদের পছন্দনীয় ছিল না। তাই অন্যান্য ঈমান-প্রেমিকদের সম্পর্কে তারা বলত, ঈমান যদি ভালই হত, তবে সর্বগ্রাে তা আমাদের পছন্দনীয় হত। এই হতচ্ছাড়াদের পছন্দের কি মূল্য।

ইবনে মুনিযির প্রমুখ এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) যখন মুসলমান ছিলেন না, তখন তাঁর রানী নাম্নী এক বাদী ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই অপরাধে তিনি বাদীকে প্রচুর মারধর করতেন, যাতে সে ইসলাম ত্যাগ করে। তখন কোরাইশ কাকেররা বলত, ইসলাম ভাল হলে রানীনের মত নীচ বাদী আমাদেরকে পেছনে ফেলে যেতে পারত না। এর পরিশ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।—(মায়হারী)

وَمَنْ يَبْغِ الْكَرْبُ مَوْسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً এ আয়াত থেকে প্রথমতঃ প্রমাণ পাওয়া গেল যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) কোন অভিনব রসূল এবং কোরআন কোন অভিনব কিতাব নয় যে, এতে বিশ্বাস স্থাপনে আপত্তি হবে। বরং এর আগে মুসা (আঃ) রসূলরূপে আগমন করেছেন এবং তাঁর প্রতি তওরাত নাযিল হয়েছিল। ইহুদী ও খ্রীষ্টান কাকেররাও তা স্বীকার করে। দ্বিতীয়তঃ এতে وَرَحْمَةً বাক্যেরও সমর্থন আছে। কেননা, মুসা

(আঃ) ও তওরাত রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও কোরআনের সত্যতার সাক্ষ্যদাতা।

পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে জালেমদের জন্যে শাস্তিবাদী এবং মুমিনদের জন্যে সাক্ষ্যের সুসংবাদ ছিল। আলোচ্য ১৩ ও ১৪ নং আয়াত তারই পরিশিষ্ট। প্রথম অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ تَتْلُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَنْزِيْلًا আয়াতে অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ভঙ্গিতে সমগ্র ইসলাম, ঈমান ও সৎকর্মসমূহকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। اَلَّذِيْنَ বাক্যে সমগ্র ঈমান এবং اسْتِقَامَةً শব্দের মধ্যে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের অবিচল থাকা ও তদনুযায়ী পূর্ণমাত্রায় আমল করা দাখিল রয়েছে। اسْتِقَامَةً এর গুরুত্বের ব্যাখ্যা সূরা হা-মীম সেক্সদায় বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ঈমান ও ঈমানে অবিচল থাকার কারণে গুণাদা করা হয়েছে যে, তাদের ভবিষ্যতে কোন দুঃখ কষ্টের ভয় নেই এবং অতীত কষ্টের কারণেও তারা পরিতাপ করবে না। পরের আয়াতে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তাদের এই সুখ চিরন্তন ও স্থায়ী হবে। পরবর্তী ১৫-১৮ নং আয়াতে মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এর বিপরীত কর্মের নিন্দা করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে মানুষের প্রতি পিতা-মাতার অনুগ্রহ সন্তানের জন্যে শ্রম ও কষ্ট স্বীকার এবং পরিণত বয়সে পৌছার পর মানুষকে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করার বিশেষ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ইবনে কাসীরের ভাষায় পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এর সম্পর্ক ও যোগসূত্র এই যে, কোরআন পাক সাধারণভাবে যেখানে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদতের দিকে দাওয়াত দেয়, সেখানে সাথে সাথে পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্যবহার, তাদের সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করে। বিভিন্ন সূরার অনেক আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী এখানেও আল্লাহর তওহীদের প্রতি দাওয়াতের সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কুরত্বীতে বর্ণিত যোগসূত্র এই যে, এতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে এক প্রকার সাদ্বনা দেয়া হয়েছে যে, আপনি ঈমান ও তওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখুন। কেউ কবুল করবে এবং কেউ করবে না। এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, মানুষ তাদের পিতা-মাতার ক্ষেত্রেও সবাই সমান নয়। কেউ পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করে এবং কেউ সদ্যবহার করে না।

মোটকথা, এ আয়াত চতুটয়ের আসল বিষয়বস্তু হল পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার শিক্ষা দেয়া। অবশ্য এতে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য শিক্ষাও এসে গেছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে থেকে জানা যায় যে, এসব আয়াত হযরত আবুবকর (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। এর ভিত্তিতেই তফসীরে মায়হারীতে وَرَحْمَةً لِّلْاِنْسَانِ বাক্যে انسان এর অর্থ নেয়া হয়েছে, হযরত আবু বকর (রাঃ)। বলাবাহুল কোরআনের কোন আয়াত অবতরণের কারণ কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা ঘটনা হলেও আয়াতের নির্দেশ সবার জন্যেই ব্যাপক হয়ে থাকে। এখানেও যদি আয়াতটির অবতরণের কারণ হযরত আবু বকর হয়ে থাকেন এবং আয়াতে উল্লেখিত বিশেষ গুণাবলী তাঁরই গুণাবলী হয়ে থাকে, তবুও আয়াতসমূহের উদ্দেশ্য ব্যাপকভাবে সবাইকে শিক্ষা দান করা। আসল আয়াতকে ব্যাপক রাখা হলে হযরত আবু বকর (রাঃ) আয়াতে বর্ণিত শিক্ষার প্রথম প্রতীক হবেন এবং যৌবনে পদার্পণ ও চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়া সম্পর্কিত বিশেষ গুণাবলী হবে দৃষ্টান্তস্বরূপ। এখন আয়াতসমূহের বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা দেখুনঃ

وَرَحْمَةً لِّلْاِنْسَانِ بِرَحْمَةٍ وَرَحْمَةٍ - رحمة শব্দের অর্থ তাকীদপূর্ণ নির্দেশ এবং احسان এর অর্থ সদ্যবহার। এতে সেবা-যত্ন, আনুগত্য,

সম্মান ও সম্ভ্রম প্রদর্শনও অন্তর্ভুক্ত।

كَرِهَ - শব্দের অর্থ সে কষ্ট, যা

মানুষ কোন কারণবশতঃ সহ্য করে থাকে এবং كَرِهَ এর অর্থ সে কষ্ট, যা সহ্য করতে অন্য কেউ বাধ্য করে। এ থেকেই كَرِهَ শব্দের উৎপত্তি। এ বাক্যটি প্রথম বাক্যেরই তাকীদ। অর্থাৎ, পিতা-মাতার সেবা-মন্ত্র ও আনুগত্য জরুরী হওয়ার এক কারণ এই যে, তারা তোমাদের জন্যে অনেক কষ্টই সহ্য করেন। বিশেষতঃ মাতার কষ্ট অনেক বেশী হয়ে থাকে। তাই এখানে কেবল মাতার কষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। মাতা দীর্ঘ নয় মাস তোমাদেরকে গর্ভে ধারণ করে। এ ছাড়াও এসময়ে তাকে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। এরপর প্রসবকালে অসহনীয় প্রসব বেদনার পর তোমরা ভূমিষ্ঠ হও।

মাতার হক পিতা অপেক্ষা বেশী : আয়াতের শুরুতে পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এ স্থলে কেবল মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, মাতার পরিশ্রম ও কষ্ট অপরিহার্য ও জরুরী। গর্ভধারণের সময়ে কষ্ট, প্রসব বেদনার কষ্ট সর্ববিস্তার ও সব সন্তানের ক্ষেত্রে মাতাকেই সহ্য করতে হয়। পিতার জন্যে লালন-পালনের কষ্ট সহ্য করা সর্ববিস্তার জরুরী হয় না। পিতা ধনাঢ্য হলে এবং তার চাকর-বাকর থাকলে অপরের মাধ্যমে সন্তানের দেখাশুনা করতে পারে, কিংবা বিদেশে অবস্থান করে ভরণ-পোষণের অর্থ প্রেরণ করতে পারে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) সন্তানের উপর মাতার হক বেশী রেখেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন- **صَلِّ امْكُ ثُمَّ امْكُ ثُمَّ ابَاكَ** অর্থাৎ, মাতার সাথে সদ্যবহার কর, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর মাতার সাথে, অতঃপর পিতার সাথে, অতঃপর নিকট আত্মীয়ের সাথে।

وَحَمْلُهُ وَطِفْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا - এ বাক্যেও মাতার কষ্ট বর্ণিত হয়েছে

যে, সন্তানকে গর্বে ধারণ ও প্রসবের কষ্টের পরও মাতা রেহাই পায় না। এর পরে সন্তানের খাদ্যও আল্লাহ তাআলা মাতার স্তনে রেখে দিয়েছেন। মাতা তাকে স্তন্যদান করে। আয়াতে বলা হয়েছে যে, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়াও ত্রিশ মাসে হয়। হযরত আলী (রাঃ) এই আয়াতদৃষ্টে বলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। কেননা, **وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ** আয়াতে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল পূর্ণ দু' বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং এখানে গর্ভধারণ ও স্তন্যদান উভয়ের সমকাল বর্ণিত হয়েছে ত্রিশ মাস। অতএব, স্তন্যদানের দু' বছর অর্থাৎ, চব্বিশ মাস বাদ দিলে গর্ভধারণের জন্যে ছয় মাসই অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং এটাই হবে গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল। রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে জনৈক মহিলার গর্ভ থেকে ছয় মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে গেলে তিনি একে অবৈধ গর্ভ সাব্যস্ত করে শাস্তির আদেশ জারী করেন। কেননা, সাধারণ নিয়ম ছিল নয় এবং সর্বনিম্ন সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া। হযরত আলী (রাঃ) এই সংবাদ অবগত হয়ে খলীফাকে শাস্তি কার্যকর করতে বারণ করলেন এবং আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। খলীফা তার যুক্তিপ্ৰমাণ কবুল করে শাস্তির আদেশ প্রত্যাহার করে নেন।—(কুরত্বী)

এ কারণেই সমস্ত আলেমগণ একমত যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস হওয়া সম্ভবপর। এখন সর্বোচ্চ সময়কাল কি, এ

সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। তাব কোরআন এ সম্পর্কে কোন ফয়সালা দেয়নি।

আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস নির্ধারিত। এর কম সময়ে সন্তান সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করতে পারে না। তবে সর্বোচ্চ কতদিন সন্তান গর্ভে থাকতে পারে, এ সম্পর্কে অভ্যাস বিভিন্মরূপ। এমনভাবে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল দু' বছর নির্ধারিত। বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রে আরও ছয়মাস সময় বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু সর্বনিম্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নেই। কোন কোন নারীর দুধই হয় না এবং কারও কারও দুধ কয়েক মাসেই শুকিয়ে যায়। কতক শিশু মায়ের দুধ পান করে না অথবা মায়ের দুধ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়। ফলে অন্য দুধ পান করাতে হয়।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ الشَّدَءَ وَنَكْرَ الرَّضِيعِ سَنَةً -এর শাব্দিক অর্থ

শক্তি সামর্থ্য। সূরা আনআমে এর তফসীর করা হয়েছে 'প্রাপ্তবয়স' বলে।

وَنَكْرَ الرَّضِيعِ سَنَةً -এর অর্থ নিয়েছেন। অতঃপর

কে বয়সের অপর একটি স্তর সাব্যস্ত করেছেন। হাসান বসরীর মতে

وَنَكْرَ الرَّضِيعِ سَنَةً -এর অর্থ উভয়টি সমার্থবোধক। আয়াতে প্রথমে

সন্তানের গর্ভধারণ, অতঃপর স্তন্যপানের সময়কাল বর্ণনা করার পর

حَتَّىٰ يَأْتِيَ বলায় অর্থ এই যে, এরপর সে প্রাপ্তবয়স্ক ও শক্তিশালী

হল এবং জ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করল। এ সময় সে ব্রষ্টা ও পালনকর্তার

অভিমুখী হওয়ার তওফীক লাভ করল। ফলে এই বলে দোয়া করতে

لَاغِلَ رَبِّ ارْزُقْهُ أَنْ يَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَحَلِّ

وَالِدَيْهِ وَأَنْ يَحْتَمِلَ صَلَاتَهُ تَرْفَعَهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي دُرَرِي وَأَنْ يَنْتَكِلَ

إِلَيْكَ وَلِيٍّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে

শক্তি দিন, যাতে আমি আপনার নেয়ামতের শোকর আদায় করি, যা

আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি

আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করি, আমার পিতা-মাতাকেও সৎকর্ম প্ররায়ণ

করুন। আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আমি আপনার একজন

আজ্ঞাবহ। এখানে সবগুলো ক্রিয়ার অতীত পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ

থেকে ব্যাহতঃ বোঝা যায় যে, এটা কোন বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ ব্যক্তির

বর্ণনা, যা আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে স্বেচ্ছাচিন্তে হয়ে থাকবে। একারণেই

তফসীরে মায়হারীতে বলা হয়েছে যে, এগুলো সব হযরত আবু বকর

(রাঃ)-এর অবস্থা। এগুলোই ব্যাপক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে

অন্য মুসলমানগণও এতে উদ্ভূত হয় এবং এরূপ করে। কুরত্বীতে বর্ণিত

হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়াজেতে দলীল। সে রেওয়াজেতে বলা

হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজার অর্ধকড়ি

দিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশে সিরিয়া সফরে যান, তখন হযরত আবুবকর সে

সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর। এ

বয়সকেই **بَلَدٌ شَدَّ** বলা হয়েছে। এ সফরে তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর

অসাধারণ অবস্থা অবলোকন করে তার একান্ত ভক্ত হয়ে যান। সফর

থেকে ফিরে এসে তিনি অধিকাংশ সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহচর্যে

অতিবাহিত করতেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ

হলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবুওয়ত দান করলেন। তখন আবু বকর

(রাঃ)-এর বয়স ছিল আটত্রিশ বছর। পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই

الإحتاف

৫০

حُرم

أُولَئِكَ الَّذِينَ تَقْبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَعَالٍ وَأَنْتُمْ عَنْهُمْ مُبْغِضُونَ ۚ وَالَّذِينَ
 فِي أَنْصَابِ الْحَيْرَةِ وَعَدَ الصِّدِّيقُ الَّذِينَ كَانُوا يُوعَدُونَ ۚ وَالَّذِينَ
 قَالَ لَوْلَا دِينِي أَوْ كَمَا أَتَوَدَّ نَبِيُّ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَّاتِ الْقُرُونُ
 مِنْ قَبْلِي ۚ وَهَاسِئِينَ اللَّهُ وَبِكَ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۚ
 فَقُولْ مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هُوَ عَلَىٰ
 قَوْلِهِمْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْإِنْسِ وَالْأَنْبِيَاءِ
 كَانُوا خِصْمِينَ ۚ وَلَوْلَىٰ ذِكْرُ اللَّهِ لَفَعَلْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
 وَهُمْ لَا يُفْلَهُونَ ۚ وَلَوْ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ الْأَشْرَارِ
 أَذْهَبْتُمْ طَيْفَهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ الدُّنْيَا وَاسْتَبَعْتُمْ بِهَا قَائِلَهُمْ
 تُحْزِنُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي
 الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۚ وَأَذْكُرُوا أَنَا
 عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ وَمَنْ خَلَقَهُ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ
 عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَا وَكُنَّا
 عَنِ الْهُدَىٰ قَائِلِينَ ۚ إِنَّا نَبَأُكَ نَأْنُ كُنْتَ مِنَ الضَّالِّينَ ۚ

(১৬) আমি এমন লোকদের সুকর্মগুলো কবুল করি এবং মন্দকর্মগুলো মার্জনা করি। তারা জন্মাতাদের তালিকাভুক্ত সেই সত্য ওয়াদার কারণে যা তাদেরকে দেওয়া হয়। (১৭) আর যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বলে, ঈদ তোমাদেরকে, তোমরা কি আমাকে স্বর দাও যে, আমি পুনরুজ্জীবিত হব, অথচ আমার পূর্বে বহু লোক গত হয়ে গেছে? আর পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, দুর্ভাগ্য তোমার তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তখন সে বলে, এটা তো পূর্বজীদের উপকথা বৈ নয়। (১৮) তাদের পূর্বে যে সব জিন ও মানুষ গত হয়েছে, তাদের মধ্যে এ ধরনের লোকদের প্রতিও শাস্তিবানী অব্যাহত হয়ে গেছে। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। (১৯) প্রত্যেকের জন্যে তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর রয়েছে, যাতে আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেন। বস্ত্তঃ তাদের প্রতি ফুলুম করা হবে না। (২০) যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের কাছে উপস্থিত করা হবে সেদিন বলা হবে, তোমরা তোমাদের সুখ পার্শ্বি জীবনেই নিঃশেষ করছে এবং সেগুলো ভোগ করেছ সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানের আঘাতের শাস্তি দেয়া হবে; কারণ, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করতে এবং তোমরা পাপাচার করতে। (২১) আঁ দ সঈদাদের ভাইয়ের কথা স্মরণ করুন, তার পূর্বে ও পরে অনেক সতর্ককারী গত হয়েছিল, সে তার সম্ভ্রদায়কে বানুকাময় উচ্চ উপত্যকায় এ মর্মে সতর্ক করেছিল যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও এবাদত করো না। আমি তোমাদের জন্যে এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি। (২২) তারা বলল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য দেব-দেবী থেকে নিবৃত্ত করতে আগমন করেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দাও, তা নিয়ে আস।

ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁর বয়স যখন চল্লিশ বছর হয়ে গেল, তখন তিনি উল্লেখিত দোয়া করলেন। আয়াতে وَلَكُمْ لَبِيبٌ سَنَةٌ বলে তাই বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর দোয়াও কবুল করেন এবং নয় জন মুসলমান ও কাফেরদের হাতে নির্ধাতিত গোলাম ক্রয় করে, মুক্ত করার তওফীক দান করেন। এমনভাবে তাঁর দোয়া وَأَمْرٌ فِي ذِي ذَرْبٍ কবুল হয়। বস্ত্ত : তাঁর সম্ভানদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে ইসলাম গ্রহণ করেননি। আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবু বকরকেই এই বৈশিষ্ট্য দান করেন যে, তিনি নিজেও মুসলমান হন এবং পিতা-মাতা ও সম্ভান-সম্পত্তি সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তাঁরা সবাই রসুলে করীম (সাঃ)-এর পবিত্র সংসর্গ লাভ করেন। তফসীরে রুহুল মাআনীতেও একথা বর্ণিত রয়েছে। এখন প্রশ্ন হয় যে, তাঁর পিতা আবু কুহফা মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হয়েছিলেন, আর এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই তখন পিতা-মাতার প্রতি নেয়ামত দেয়ার কথা কেমন করে উল্লেখ করা হল? জওয়াব এই যে, কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। এরূপ হলে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না। আর যদি মক্কায় অবতীর্ণ হয়, তবে অর্থ হবে ইসলামের নেয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত হওয়ার দোয়া। (রুহুল মাআনী) এই তফসীর দৃষ্টে যদিও সবগুলো অবস্থা হযরত আবু বকরের বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু আয়াতের বিধান সবার জন্যেই প্রযোজ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য সমস্ত মুসলমানকে নির্দেশ দেয়া যে, মানুষের বয়স চল্লিশ বছরের নিকটবর্তী হয়ে গেলে তার মধ্যে পরকাল চিন্তা প্রবল হওয়া উচিত। অতীত গোনাহ থেকে তওবা করে ভবিষ্যতে সেগুলো থেকে আত্মরক্ষায় পুরোপুরি যত্নবান হওয়া দরকার। কেননা, অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে, চল্লিশ বছর বয়সে যে অভ্যাস ও চরিত্র গড়ে উঠে, তা পরিবর্তন করা কঠিন হয়ে থাকে।

হযরত ওসমান (রাঃ)-বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, মুমিন বান্দা যখন চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা হিসাব সহজ করে দেন, ষাট বছর বয়সে পৌছালে সে আল্লাহর দিকে রুখ হওয়ার তওফীক লাভ করে, সত্তর বছর বয়সে পৌছালে আকাশের অধিবাসীরা তাকে ভালবাসতে শুরু করে, আশি বছর বয়সে পৌছালে আল্লাহ তাআলা তার সৎকর্মসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং মন্দ কর্মগুলোকে মিটিয়ে দেন এবং যখন সে নব্বই বছর বয়সে পৌছে, তখন আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত অতীত গোনাহ মাফ করে দেন, তাকে তার পরিবারের লোকজনের জন্যে সুপারিশ করার অধিকার দেন এবং আকাশে তার নামের সাথে اسير الله في الارض লিখে দেন। অর্থাৎ, সে পৃথিবীতে আল্লাহ কয়েদী।—(ইবনে কাসীর) বলাবাহুল্য, হাদীসে সে মুমিন বান্দাকে বোঝানো হয়েছে, যে শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুসারী হয়ে ষোদাভীতি সহকারে জীবন অতিবাহিত করে।

আনুষ্ঠানিক জাতব্য বিষয়

أُولَئِكَ الَّذِينَ تَقْبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَعَالٍ وَأَنْتُمْ عَنْهُمْ مُبْغِضُونَ

অর্থাৎ, উপরোক্ত গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এটাও ব্যাপক বিধান। তবে হযরত আবু বকরের ক্ষেত্রে এটা সর্বপ্রথম প্রযোজ্য। হযরত আলী (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি থেকেও আয়াতের ব্যাপকতা বোঝা যায়। মুহাম্মদ ইবনে হাতেম বর্ণনা করেন, একবার আমি আমীরুল মুমেনীন

হযরত আলীর (রাঃ) নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে আরও কিছু লোক উপস্থিত ছিল। তারা হযরত ওসমান (রাঃ)-এর চরিত্রে কিছু দোষ আরোপ করলে তিনি বললেন :

كان عثمان رضى الله عنه من الذين قال الله تعالى فيهم :

أُولَئِكَ الَّذِينَ تَتَّبِعُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا تَوْكَلُوا وَتَجَازُونَ سُبُلَهُمْ فِي
أَحْضَبِ الْحَيَاةِ وَعَدَّ الصَّدِيقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

قال والله عثمان واصحاب عثمان رضى الله عنهم قالها ثلاثا .

অর্থাৎ, হযরত ওসমান (রাঃ) সে লোকদের অন্যতম ছিলেন, যাদের কথা আল্লাহ্ তাআলা **أُولَئِكَ الَّذِينَ تَتَّبِعُ** আয়াতে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্‌র কসম ! ওসমান ও তাঁর সঙ্গীদের ক্ষেত্রেই এই আয়াত প্রযোজ্য। এ বাক্যটি তিনি তিনবার বললেন।—(ইবনে কাসীর)

وَالَّذِي قَالَ لِلْوَدَّيْهِمَا كُنتَا পূর্বের আয়াতসমূহে মাতা-পিতার সেবাস্বত্ব ও আনুগত্য সম্পর্কিত নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছিল। এ আয়াতে সে ব্যক্তির আযাব ও শাস্তি উল্লেখিত হয়েছে, যে পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার ও কটুত্ব করে। বিশেষতঃ পিতা-মাতা যখন তাকে ইসলাম ও সংকর্মের দিকে দাওয়াত দেয়, তখন তাদের কথা অমান্য করা দ্বিগুণ পাপ। ইবনে কাসীর বলেন, যে কোন লোক পিতা-মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করবে, তার ক্ষেত্রেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে।

মারওয়ান এক ভাষণে বলেছিল, এ আয়াত হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সইহ্‌ বুখারীর রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) মারওয়ানের এই দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। কোন সইহ্‌ রেওয়ায়েতে আয়াতটি কোন বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে

বর্ণিত নেই।

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ

أَذْهَبَتْهُمُ إِلَىٰ جَهَنَّمَ فِي سِيَاطِلِ اللَّذَاتِ অর্থাৎ, কাকেরদেরকে বলা

হবে, তোমরা কিছু ভাল কাজ দুনিয়াতে করে থাকলে তার প্রতিদানও তোমাদেরকে পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের আকারে দেয়া হয়েছে। এখন পরকালে তোমাদের কোন প্রাপ্য নেই। এ থেকে জানা যায় যে, কাকেরদের যেসব সংকাজ ইমানের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় নয়; পরকালে সেগুলো মূল্যহীন; কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে সেগুলোর প্রতিদান দিয়ে দেন। কাজেই কাকেররা দুনিয়াতে যেসব বিষয়-বৈভব, ধন-দৌলত, মান-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি লাভ করে, সেগুলো তাদের দানশীলতা, সহনুভূতি, সততা ইত্যাদি সংকর্মের প্রতিফল হয়ে থাকে। মুমিনদের জন্যে এরূপ নয়। তারা দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি নেয়ামত লাভ করলেও পরকালের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে না।

দুনিয়ার সুখ-সামগ্রী ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা : আলোচ্য আয়াতে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকার কারণে কাকেরদের উদ্দেশে শাস্তিবাহী উচ্চারিত হয়েছে। তাই রসুলুল্লাহ (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বর্জন করার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের জীবনালেখ্য এর সাক্ষ্য দেয়। রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)-কে ইয়ামন প্রেরণ করার সময় এ উপদেশ দেন : দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থেকো। হযরত আলীর রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অল্প রিযিক নিতে সম্মত হয়ে যায়, আল্লাহ্‌ তাআলাও তার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হয়ে যান।—(মাহাহরী)

قَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ مَوَدَّةَ بَنِي آدَمَ بَاطِلًا تَبْطُلُونَ ۖ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ
 قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّطْمَئِنَّا بِئِنَّ هُوَ أَلَسَّعَجَلْتُمْ بِهِ زُجْرًا
 فِيهَا عَادَ ابْنُ الْإِيمَةِ ۖ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا
 فَأَصْبَحُوا نَادِيًا إِلَى الْمَسَلَّةِ فَهَمُّ كَذَلِكَ تَجْزَى الْقَوْمُ
 الْمَجْرُمِينَ ۖ وَلَقَدْ مَكَنْتُمْ فِي مَآرِنٍ مُّكْتُمٍ فِيهِ
 وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَبَصَرًا وَأَفْئِدَةً ۖ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ
 سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ
 كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ
 يَسْتَهْزِءُونَ ۖ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا وَكَلَّمْنَا مِنَ الْقُرَى
 وَصَرَفْنَا آلَاتِ لَعْنِهِمْ فَيُجْعَلُونَ ۖ فَلَوْلَا نَصْرُهُمْ
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةٍ بَلْ ضَلُّوا
 عَنْهُمْ ۖ وَذَلِكَ أَفْكَهُم مَّا كَانُوا يَقْتُرُونَ ۖ وَإِذْ صَرَفْنَا
 إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِبْتِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۖ فَلَمَّا حَضَرُوهُ
 قَالُوا أَصْنَعُوا فُلْمًا قِصًى وَتَوَالَّى قَوْلِهِمْ مُّتَنَذِرِينَ ۝

(২৩) সে বলল, এ জ্ঞান তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আমি যে বিষয়সহ স্মেরিত হয়েছি, তা তোমাদের কাছে পৌছাই। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়। (২৪) (অতঃপর) তারা যখন শান্তিকে যেধরূপে তাদের উপত্যকা অভিযুক্তী দেখল, তখন বলল, এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। বরং এটা সেই বস্তু, যা তোমরা তাড়াহুড়ি চেয়েছিলে। এটা বায়ু এতে রয়েছে মর্মভঙ্গ শান্তি। (২৫) তার পালনকর্তার আদেশে সেসব কিছুকে ধ্বংস করে দেবে। অতঃপর তারা ভোর বেলায় এমন হয়ে গেল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হ'ল না। আমি অপরায়ী সম্প্রদায়কে এমনভাবে শান্তি দিয়ে থাকি। (২৬) আমি তাদেরকে এমন বিষয়ে ক্ষমতা দিয়েছিলাম, যে বিষয়ে তোমাদেরকে ক্ষমতা দেইনি। আমি তাদের দিয়েছিলাম, কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়, কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসল না, যখন তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করল এবং তাদেরকে সেই শান্তি গ্রাস করে নিল, যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিক্রম করত। (২৭) আমি তোমাদের আশপাশের জনপদসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছি এবং বার বার আয়াতসমূহ শুনিয়েছি, যাতে তারা ফিরে আসে। (২৮) অতঃপর আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে সান্নিধ্য লাভের জন্যে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়। (২৯) যখন আমি একদল জিনকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম, তারা কোরআন পাঠ শুনছিল। তারা যখন কোরআন পাঠের জায়গায় উপস্থিত হল, তখন পরস্পর বলল, চুপ থাক। অতঃপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল।

আয়াতসমূহের ষোগসূত্র : উপরে 'আদ সম্প্রদায়ের কাহিনী' বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন তাদেরই মত অন্যান্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয়েছে, যাদেরকে কুফর ও পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে বিভিন্ন আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়েছিল। তাদের জনপদের ধ্বংসাবশেষ মক্কাবাসীদের সফরের পথে অবস্থিত ছিল। এসব ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যে সংক্ষেপে তাদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।)

আমি তোমাদের আশপাশের আরও জনপদ (কুফর ও শিরকের কারণে) ধ্বংস করে দিয়েছি। (যেমন, সামুদ ও লুতের সম্প্রদায়। মক্কাবাসীরা সিরিয়া সফরে এসব জনপদ অতিক্রম করত। মক্কার এক দিকে ইয়ামন ও অপরদিকে সিরিয়া অবস্থিত ছিল। তাই 'مَا حَوْلَكُمْ' বলা হয়েছে।) এবং আমি (ধ্বংস করার পূর্বে তাদের উপদেশের জন্যে) বার বার নিদর্শনসমূহ দেখিয়েছি, যাতে তারা (কুফর ও শিরক থেকে) বিরত হয়। (কিন্তু তারা বিরত হ'ল না এবং ধ্বংস হয়ে গেল।) অতঃপর আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে নৈকট্য লাভের জন্যে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল (ধ্বংস ও আযাবের সময়) তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা (অর্থাৎ, তাদেরকে উপাস্য ও সুপারিশকারী মনে করা) ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়। (বাস্তবে তারা উপাস্য ছিল না।)

মক্কার কাফেরদেরকে শোানোর জন্যে পূর্বকার আয়াতসমূহে কুফর ও অহংকারের নিন্দা ও ধ্বংসকারিতা বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে লজ্জা দেয়ার উদ্দেশ্যে জিনদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, জিনরা অহংকার ও গর্বে তোমাদের চেয়েও বেশী, কিন্তু কোরআন শুনে তাদের অন্তরও বিগলিত হয়ে গেছে এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা জিনদের চেয়ে বেশী জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন; কিন্তু তোমরা ইসলাম গ্রহণ করছ না। (জিনদের কোরআন শ্রবণ ও ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সহীহ হাদীসসমূহে এভাবে বর্ণিত হয়েছে -

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পর থেকে জিন জাতিকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহ থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। সেমতে তাদের কেউ সংবাদ শোনার মানসে উপরে গেলে তাকে উচ্চাপিণ্ড নিক্ষেপ করে বিতাড়িত করা হত। জিনরা এই নতুন পরিস্থিতির কারণ উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হ'ল এবং তাদের বিভিন্ন দল কারণ অনুসন্ধানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। একদল হেজাজেও পৌছল। সেদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) কয়েকজন সাহাবীসহ 'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর 'ওকায' বাজারে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। আরবরা আমাদের যুগের প্রদর্শনীর মত বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ বিশেষ দিনে মেলার আয়োজন করত। এসব মেলায় বহুলোক উপস্থিত থাকত, দোকান খোলা হত এবং সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হত। ওকায নামক স্থানে প্রতি বছর এমনি ধরনের এক মেলা বসত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্ভবতঃ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করছিলেন। নাখলা নামক স্থানে তিনি যখন ফজরের নামাযের কোরআন পাঠ করছিলেন, তখন জিনদের অনুসন্ধানী দলটি সেখানে গিয়ে পৌছল। তারা কোরআন পাঠ শুনে বলতে লাগল, এই সে নতুন ঘটনা, যার কারণে আমাদেরকে আকাশের সংবাদ সংগ্রহে নিবৃত্ত করা হয়েছে।—(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী)

অন্য এক রেওয়াজেতে আছে যে, জিনরা সেখানে পৌছে পরস্পর

قَالُوا لَقَوْمٌ مُتَّبِعُونَ كَذِبًا يُزِيلُ مَنْ بَعْدَ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَوْمٌ
يُحِبُّونَ إِعْرَافَ اللَّهِ وَإِيمَانَهُ يَفْعَلُونَ مِمَّا قَدْ دُرِيَهُمْ وَعِجْرُهُمْ
مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ وَمَنْ لَا يُحِبِّ دَعَايَ اللَّهِ فَلَيْسَ يَنْجِيهِ فِي
الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
أَلَمْ يَخْلُقْنَا وَإِنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَكَمْ يَسْعَى
بِخَلْقِهِمْ يَقْدِرُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا اللَّهُ الَّذِي كُنَّا
قَالَوًا بَلَىٰ وَرَبَّنَا كَذَلِكُمْ تَقْرُونَ قَا ضَرَبُوا
كَمَا صَبَرُوا أُولَٰئِكَ الْعُزْمَةُ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ
يَوْمَئِذٍ مَالٌ مَدُونٌ لَّكَ يَوْمَئِذٍ الْأَسَافَةُ مِمَّنْ تَهَارَتُوا
بَلَمَّا كُنْتُمْ فِيهَا أَلَا لَقَوْمٌ مُّفْسِقُونَ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّقُوا عَلَنَ سَبِيلِ اللَّهِ أَصْلَ أَعْمَالِهِمْ

(৩০) তারা বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাব শুনেছি, যা মুসার পর অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সব কিতাবের সত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে। (৩১) হে আমাদের সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য কর এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদের গোনাহ্ মার্জনা করবেন। (৩২) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মানবে না, সে পৃথিবীতে আল্লাহকে অপারক করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না। এ ধরনের লোকই প্রকাশ্য পঞ্চত্রয়তায় লিপ্ত। (৩৩) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে কোন ক্রান্তিবোধ করেননি, তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? কেন নয়, নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (৩৪) যেদিন কাফেরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে, সেদিন বলা হবে, এটা কি সত্য নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ আমাদের পালনকর্তার শপথ। আল্লাহ বলবেন, আযাব আযাদান কর। কারণ, তোমরা কুফরী করতে। (৩৫) অতএব, আপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম্বরণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করেননি। ওদেরকে যে বিষয়ে গুয়াদা দেয়া হত, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা সুস্পষ্ট অবগতি। এখন তারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যারা পাপাচারী সম্প্রদায়।

সূরা মুহাম্মদ

মদিনায় অবতীর্ণ : আয়াত ৩৮

(১) যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করে দেন।

বলতে লাগল, চূপ করে কোরআন শুন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) নামায শেষ করলে জিনরা ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল এবং তদন্তকার্যের রিপোর্ট পেশ করে একথাও বলল, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। তোমাদেরও ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সাঃ) সূরা জিন অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই জিনদের গমনাগমন এবং তাদের কোরআন পাঠ শুনে ইসলাম গ্রহণের বিষয় কিছুই জানতেন না। সূরা জিনে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেন।—(ইবনুল মুনির)

আরও এক রেওয়াজেতে আছে, নসীবাঈন নামক স্থানের অধিবাসী এই জিনদের সংখ্যা ছিল নয় অথবা সাত। তাদের প্রচারের ফলে পরবর্তীকালে আরও তিন শত জিন ইসলাম গ্রহণের জন্যে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়।—(রুহুল-মা'আনী) অন্যান্য হাদীসে জিনদের আগমনের ঘটনা অন্যভাবেও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে একাধিক ঘটনা বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে এসব বর্ণনায় কোন বৈপরীতা নেই। হয়রত ইবনে আক্বাস থেকে বর্ণিত আছে যে, জিনরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বার বার আগমন করেছে।

খাফফাযী বলেন, সবগুলো হাদীস একত্রিত করলে দেখা যায় যে, জিনদের আগমনের ঘটনা ছয় বার সংঘটিত হয়েছে।—(বয়ানুল-কোরআন)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

জিনদের আগমনের ঘটনাই উপরোক্ত আয়াতসমূহে বিধৃত হয়েছে।

‘কিতাব পরে’ কিতাব পরে’ বলার কারণে কোন কোন

তফসীরবিদ বলেন যে, আগন্তুক জিনরা ইহুদী ধর্মাবলম্বী ছিল। কেননা, মুসা (আঃ)-এর পর ঈসা (আঃ)-এর প্রতি যে ইজ্রীল অবতীর্ণ হয়েছিল তাদের উক্তিতে তার উল্লেখ নেই, কিন্তু ইজ্রীলের উল্লেখ না করাই তাদের ইহুদী হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ নয়। কেননা ইজ্রীলের উল্লেখ না করার এক কারণ এও হতে পারে যে, ইজ্রীল অধিকাংশ বিধি-বিধান তওরাতেরই অনুসারী। কিন্তু কোরআন তওরাতের মত একটি স্বতন্ত্র কিতাব। এর বিধি-বিধান ও শরীয়ত তওরাত থেকে অনেক ভিন্নতর। তাই একথা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য হতে পারে যে, কোরআনই তওরাতের অনুরূপ স্বতন্ত্র কিতাব।

অব্যয়টি আসলে ‘কোন কোন’-এর

অর্থ নির্দেশ করে। এখানে এই অর্থ নেয়া হলে বাক্যের ফায়দা এই হবে যে, ইসলাম গ্রহণ করলে কোন কোন গোনাহ্ মাফ হবে, অর্থাৎ, আল্লাহর হক মাফ হবে—বান্দার হক মাফ হবে না। কেউ কেউ অব্যয়টিকে অতিরিক্ত সাব্যস্ত করেছেন। এমতাবস্থায় এ ব্যাখ্যা নিম্নয়োজন।

সূরা মুহাম্মদ

সূরা মুহাম্মদের অপর নাম সূরা কিতাল। কেননা, এতে “কিতাল” তথা জেহাদের বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরেই এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। এমনকি, এর একটি আয়াত **وَالَّذِينَ كَفَرُوا** সম্পর্কে হয়রত ইবনে আক্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَرُ عَنْهُمْ سُبْحَانَكَ وَأَسْلَمَ بِهَا لَهُمْ ①
ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ
وَأَذَانُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاصْرَبِ الرَّقَابَ حَتَّىٰ إِذَا أَغْنَيْنَاهُمْ
مُنْذُ وَالْوُثْقَانِ وَآمَنَّا بَعْدَ وَآمَنَّا فِدَاءً حَتَّىٰ نَضْمَ الْحَرْبِ
أَوْزَارَهُ ② ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنُنَصِّرَهُمُ الْمَالَ وَالْحِينَ لَيُبْنُوا
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ أَمْثَالُهُمْ
سِيَّاهُ ③ وَنُصِّلَهُمُ بِهَا لَهُمْ وَيَذَرُهُمُ اللَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ④
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَنْ تَصْرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيَنْبِذَ
أَقْدَامَكُمْ ⑤ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَاتَّبَعْنَاهُمْ وَأَسْلَمَ أَمْثَالَهُمْ ⑥
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبِطْ أَعْمَالَهُمْ ⑦
أَفْكَرُ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وَيَكْفُرُ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَرًا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ⑧ ذَلِكَ
بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ⑨

(২) আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সংকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মাফনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। (৩) এটা এ কারণে যে, যারা কাফের, তারা বাতিলের অনুসরণ করে এবং যারা বিশ্বাসী, তারা তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে আগত সত্যের অনুসরণ করে। এমনভাবে আল্লাহ মানুষের জন্যে তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন। (৪) অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান যার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রু পক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে। একথা শুনলে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। (৫) তিনি তাদেরকে পঞ্চপ্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। (৬) অতঃপর তিনি তাদেরকে জন্মভাবে দাখিল করবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। (৭) হে বিশ্বাসীগণ। যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করবেন। (৮) আর যারা কাফের, তাদের জন্যে আছে দুর্গতি এবং তিনি তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন। (৯) এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা নাখিল করেছেন, তারা তা পছন্দ করে না। অতএব, আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। (১০) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি অতঃপর দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং কাফেরদের অবস্থা এরূপই হবে। (১১) এটা এজন্যে যে, আল্লাহ মুমিনদের হিতৈষী বন্ধু এবং কাফেরদের কোন হিতৈষী বন্ধু নাই।

যে, এটি মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত। কেননা, এই আয়াতটি তখন নাখিল হয়েছিল, যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন এবং মক্কার জনবসতি ও বায়তুল্লাহর দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেন : হে মক্কা নগরী। জগতের সমস্ত নগরের মধ্যে তুমিই আমার কাছে প্রিয়। যদি মক্কার অধিবাসীরা আমাকে এখান থেকে বহিস্কার না করত, তবে আমি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কখনও তোমাকে ত্যাগ করতাম না। তফসীরবিদগণের পরিভাষায় যে আয়াত হিজরতের সফরে অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মক্কায় অবতীর্ণ আয়াত বলে অভিহিত করা হয়। ষোটকথা এই যে, এই সূরা মদীনায়ে হিজরতের অব্যবহিত পরেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং মদীনায়ে পৌছেই কাফেরদের সাথে জেহাদ ও যুদ্ধের বিধানাবলী নাখিল হয়েছে।

وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (আল্লাহর পথ) বলে ইসলামকে বোঝানো হয়েছে। أَفْكَرُ أَمْثَالَهُمْ বলে কাফেরদের ঐ সকল কর্ম বোঝানো হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে সংকর্ম। যেমন ফকীর-মিসকীনকে সাহায্য ও সহায়তা করা, প্রতিবেশীর সমর্থন ও হেফাজত করা, উদারতা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এসব কর্ম যদিও প্রকৃতপক্ষে সংকর্ম, কিন্তু ঈমানসহ হলেই পরকালে এগুলো দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। কাফেরদের এধরনের সংকর্ম পরকালে তাদের জন্যে মোটেই উপকারী হবে না। তবে তাদের সংকর্মের বিনিময়ে ইহকালেই তাদেরকে আরাম ও সুখ দান করা হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَمْثَالُ مَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ যদিও পূর্ববর্তী বাক্যেও ঈমান ও সংকর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালত ও তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীও শামিল রয়েছে, কিন্তু এই দ্বিতীয় বাক্যে একথা স্পষ্টভাবে পুনরুল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই সত্য ব্যক্ত করা যে, শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সমস্ত শিক্ষা সর্বাঙ্গকরণে গ্রহণ করার উপরই ঈমানের আসল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

وَأَسْلَمَ بِهَا لَهُمْ - শব্দটি কখনও অবস্থার অর্থে এবং কখনও অন্তরের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে উভয় অর্থ নেয়া যায়। প্রথম অর্থে আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা তাদের অবস্থাকে অর্থাৎ, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কর্মকে ভাল করে দেন। দ্বিতীয় অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরকে ঠিক করে দেন। এর সারমর্মও সমস্ত কাজকর্ম ঠিক করে দেয়া। কেননা, কাজকর্ম ঠিক করে দেয়া অন্তর ঠিক করে দেয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

আলোচ্য আয়াত থেকে দু'টি বিষয় প্রমাণিত হয়। (এক) যুদ্ধের মাধ্যমে কাফেরদের শৌর্য-বীর্য নিঃশেষ হয়ে গেলে তাদেরকে হত্যার পরিবর্তে বন্দী করতে হবে। (দুই) অতঃপর এই যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলমানদের দু'রকম ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ কৃপাবশতঃ তাদেরকে কোন রকম মুক্তিপণ ও বিনিময় ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেয়া। দ্বিতীয়তঃ মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া। মুক্তিপণ এরূপও হতে পারে যে, আমাদের কিছুসংখ্যক মুসলমান তাদের হাতে বন্দী থাকলে তাদের বিনিময়ে কাফের বন্দীদেরকে মুক্ত করা এবং এরূপও হতে পারে যে, কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেয়া। এই বিধান পূর্ববর্তিত সূরা আনফালের বিধানের বাহ্যতঃ খেলাফ। সূরা আনফালে বদর যুদ্ধের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে

ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সতর্কবাণী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন : আমাদের এই সিদ্ধান্তের কারণে আল্লাহ তাআলার আযাব নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। যদি এই আযাব আসত, তবে ওমর ইবনে খাত্তাব ও সা'দ ইবনে মুয়ায (রাঃ) ব্যতীত কেউ তা থেকে রক্ষা পেত না। কেননা, তাঁরা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার বিপক্ষে ছিলেন। এই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মা'আরেফুল-কোরআনের চতুর্থ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সারকথা এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদরের বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়াও নিষিদ্ধ ছিল। সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত এই উভয় বিষয়কে সিদ্ধ সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই অধিকাংশ সাহাবী ও ফেকাহবিদ বলেন যে, সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। তফসীরে মাযহরীতে আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), হাসান, আতা (রহঃ), প্রমুখ অধিকাংশ সাহাবী ও ফেকাহবিদের উক্তি তাই। সওরী, শাফেয়ী, আহমদ, ইশহাক (রহঃ) প্রমুখ ফেকাহবিদ ইমামগণের মাযহাবও তাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল। তখন কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেয়া নিষিদ্ধ ছিল। পরে যখন মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য ও সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন সূরা মুহাম্মদে কৃপা করা ও মুক্তিপণ নেয়ার অনুমতি দান করা হয়। তফসীরে মাযহরীতে কাযী সানাউল্লাহ একথাটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, এ উক্তিই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। কেননা, স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ) একে কার্যে পরিণত করেছেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনও একে কার্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন। তাই এই আয়াত সূরা আনফালের আয়াতকে রহিত করে দিয়েছে। কারণ এই যে, সূরা আনফালের আয়াত বদর যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। বদর যুদ্ধ হিজরতের দ্বিতীয় সালে সংঘটিত হয়েছিল। আর রসুলুল্লাহ (সাঃ) ষষ্ঠ হিজরীতে হুদয়বিয়ার ঘটনার সময় সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াত অনুযায়ী বন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার মক্কার আশি জন কাকের রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে অতিক্রান্ত হত্যা করার ইচ্ছা নিয়ে তানয়ীম পাহাড় থেকে নীচে অবতরণ করে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে জীবিত গ্রেফতার করেন এবং মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ফাতহের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجُوا مِنْ دِينِهِمْ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ شَيْءٌ إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُتَسَاوِينَ

এক রেওয়াজে অনুযায়ী ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) —এর সিদ্ধান্ত এই যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে মুক্তিপণ ব্যতিরেকে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেয়া জায়েয নয়। এ কারণেই হানাফী আলেমগণ সূরা মুহাম্মদের আলোচ্য আয়াতকে ইমাম আযমের মতে রহিত ও সূরা আনফালের আয়াতকে রহিতকারী সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তফসীরে মাযহরী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, সূরা আনফালের আয়াত পূর্বে এবং সূরা মুহাম্মদের আয়াত পরে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই সূরা মুহাম্মদের আয়াতই রহিতকারী এবং সূরা আনফালের আয়াত রহিত। ইমাম আযমের গৃহীত মত এবং অধিকাংশ সাহাবী ও ফেকাহবিদের অনুরূপ অর্থও, মুক্ত করা জায়েয বলে তফসীরে মাযহরীতে বর্ণনা করেছে। তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, যদি এতেই মুসলমানদের উপকারিতা নিহিত থাকে। তফসীরে মাযহরীর মতে এটাই বিশুদ্ধ ও পছন্দনীয়। হানাফী আলেমগণের মধ্যে

আল্লামা ইবনে হুমাম (রহঃ) ফতহুল কাদীর গ্রন্থে এই অভিমতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি লিখেন : কদুরী ও হেদায়ায় বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আযমের মতে বন্দীদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করা যায় না। এটা ইমাম আযমের এক রেওয়াজেই। কিন্তু তাঁর কাছ থেকেই অপর এক রেওয়াজে ‘সিয়ারে-কবীরে’ জমহুরের উক্তির অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, মুক্ত করা জায়েয। উভয় রেওয়াজেই মধ্য শেখোক্ত রেওয়াজেই অধিক স্পষ্ট। ইমাম তাহাতী (রহঃ) ‘মা'আনিউল-আসারে’ একেই ইমাম আযমের মাযহাব সাব্যস্ত করেছেন।

সারকথা এই যে, সূরা মুহাম্মদ ও সূরা আনফালের উভয় আয়াত অধিকাংশ সাহাবী ও ফেকাহবিদের মতে রহিত নয়। মুসলমানদের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী মুসলমানদের শাসনকর্তা এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একটিকে উপযুক্ত মনে করবে, সেটিই প্রয়োগ করতে পারবে। কুরতুবী রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা প্রমাণিত করেছেন যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে কখনও হত্যা করা হয়েছে, কখনও গোলাম করা হয়েছে, কখনও মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং কখনও মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ে মুসলমান বন্দীদেরকে মুক্ত করানো এবং কিছু অর্থকড়ি নিয়ে ছেড়ে দেয়া এই উভয় ব্যবস্থাই মুক্তিপণ নেয়ার অন্তর্ভুক্ত এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের গৃহীত কর্মপন্থা দ্বারা উভয় ব্যবস্থাই প্রমাণিত আছে। এই বক্তব্য পেশ করার পর ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেন, এ থেকে জানা যায় যে, এ ব্যাপারে যেসব আয়াতকে রহিতকারী ও রহিত বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো তদ্দপ নয়; বরং সবগুলো অকাট্য আয়াত। কেননা, কাকেররা যখন বন্দী হয়ে আমাদের হাতে আসবে, তখন মুসলিম শাসনকর্তা চারটি ধারার মধ্য থেকে যে কোনটি প্রয়োগ করতে পারবেন। তিনি উপযুক্ত মনে করলে বন্দীদেরকে হত্যা করবেন, উপযুক্ত বিবেচনা করলে তাদেরকে গোলাম ও বান্দী করে নেবেন, মুক্তিপণ নেয়া উপযুক্ত মনে করলে অর্থকড়ি নিয়ে অথবা মুসলমান বন্দীদের বিনিময়ে ছেড়ে দেবেন। অথবা কোনরূপ মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্ত করে দেবেন। এরপর কুরতুবী লিখেন :

: মদীনার আলেমগণ তাই বলেন এবং এটাই ইমাম শাফেয়ী ও আবু ওবায়দ (রহঃ) —এর উক্তি। ইমাম তাহাতী, ইমাম আবু হানীফার (রহঃ) এই উক্তি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর প্রসিদ্ধ মত সেটিই যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে মুসলিম শাসনকর্তার চারটি ক্ষমতা : উপরোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মুসলিম শাসনকর্তা যুদ্ধবন্দীদেরকে হত্যা করতে পারবেন এবং তাদেরকেও গোলাম বানাতে পারবেন। এই প্রশ্নে উম্মতের সবাই একমত। মুক্তিপণ নিয়ে অথবা মুক্তিপণ ব্যতিরেকেই ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে যদিও কিছু মতভেদ আছে, কিন্তু অধিকাংশের মতে এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ।

ইসলামে দাসত্বের আলোচনা : এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করে দেয়ার ব্যাপারে তো ফেকাহবিদগণের মধ্যে কিছু না কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু হত্যা করা ও গোলাম বানানোর বৈধতার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। এ ক্ষেত্রে সবাই একমত যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করা উভয় ব্যবস্থাই জায়েয। এমতাবস্থায় কোরআন পাকে এই ব্যবস্থাদুয়ের উল্লেখ করা হয়নি কেন? শুধু মুক্ত করে দেয়ার দুই ব্যবস্থাই কেন উল্লেখ করা হল? ইমাম রায়ী (রহঃ) তফসীরে কবীরে এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এখানে কেবল এমন দুইটি ব্যবস্থার কথা আলোচনা

করা হয়েছে যা সর্বত্র ও সর্বদা বৈধ। দাসে পরিণত করার কথা উল্লেখ না করার কারণ এই যে, আরবের যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি নেই এবং পশু ইত্যাদি লোকের হত্যার জায়েয নয়। এতদ্ব্যতীত হত্যার কথা পূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে। — (তফসীরে-কবীর, ৭ম খণ্ড, ৫০৮ পৃঃ)

দ্বিতীয় কথা এই যে, হত্যা করা ও দাসে পরিণত করার বৈধতা সুবিদিত ও সুপরিজ্ঞাত ছিল। সবাই জানত যে, এই উভয় ব্যবস্থাই বৈধ। এর বিপরীতে মুক্ত করে দেয়ার বিষয়টি বদর যুদ্ধের সময় রহিত করে দেয়া হয়েছিল। এখন এস্থলে মুক্ত ছেড়ে দেয়ার অনুমতি দান করাই উদ্দেশ্য ছিল। তাই এরই দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুক্তিপণ ব্যতিরেকে ছেড়ে দেয়া এবং মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া। যেসব ব্যবস্থা পূর্বে থেকেই বৈধ ছিল সেগুলোকে এস্থলে বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল না। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কাজেই এসব আয়াতদুটো একথা বলা কিছুতেই ঠিক নয় যে, এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হত্যা অথবা দাসে পরিণত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে। যদি দাসে পরিণত করার বিধান রহিতই হয়ে যেত, তবে কোরআন ও হাদীসের এক না এক জায়গায় এর নিষেধাজ্ঞা উল্লেখিত হত। যদি আলোচ্য আয়াতই নিষেধাজ্ঞার স্থলাভিষিক্ত হত তবে রসুলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর পর কোরআন ও হাদীসের অকৃত্রিম অনুসারী সাহাবায়ে কোরাম অসংখ্য যুদ্ধবন্দীদের কেন দাসে পরিণত করেছেন? হাদীস ও ইতিহাসে দাসে পরিণত করার কথা এত অধিক পরিমাণে ও পরস্পরায় সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, তা অস্বীকার করা ধৃত্য তাই কিছুই নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, ইসলাম মানবাধিকারের সর্ববৃহৎ হয়ে দাসত্বের অনুমতি কিরূপে দিল? প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বৈধকৃত দাসত্বকে জগতে অন্যান্য ধর্ম ও জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করে নেয়ার কারণেই এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অথচ ইসলাম দাসদেরকে যেসব অধিকার দান করেছে এবং সমাজে তাদেরকে যে মর্যাদা দিয়েছে এরপর তারা কেবল নামেই দাস রয়ে গেছে। নতুবা তারা প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে। বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলে দেখা যায় যে, অনেক অবস্থায় যুদ্ধবন্দীদের সাথে এর চাইতে উত্তম ব্যবহার সম্ভবপর নয়। পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা প্রাচ্য শিক্ষাবিশারদ মসিও গোস্তাও লিবান তদীয় “আরবের তমদুন” গ্রন্থে লিখেনঃ

“বিগত ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে লিখিত আমেরিকার বই-পুস্তক পাঠে অভ্যস্ত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির সামনে যদি ‘দাস’ শব্দটি উচ্চারণ করা হয় তবে তার মানসপটে এমন অসহায় একদল মানুষের চিত্র ভেসে উঠে যাদেরকে শিকল দ্বারা আটপেঁপে বঁধে রাখা হয়েছে, গলায় বেড়ি পরানো হয়েছে এবং তেত মেরে মেরে হাঁকানো হচ্ছে। তাদের খোরাক প্রাণটি কোমলপুষ্ট দেহে আটকে রাখার জন্যেও যথেষ্ট নয়। বসবাসের জন্য অন্ধকারময় কক্ষ ছাড়া তারা আর কিছুই পায় না। আমি এখানে এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না যে, এই চিত্র কতটুকু সঠিক এবং ইংরেজরা বিগত বছরগুলোতে আমেরিকায় যা কিছু করেছে তা এই চিত্রের অনুরূপ কি না। — কিন্তু এটা নিশ্চিত সত্য যে, মুসলমানদের কাছে দাসের যে চিত্র তা খৃষ্টানদের চিত্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। (ফেরীদ ওয়াজদী প্রণীত দায়েরাতুল-মা’আরেফ থেকে উদ্ধৃত। ৪র্থ খণ্ড, ১৭৯ পৃঃ)

প্রকৃত সত্য এই যে, অনেক অবস্থায় বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার চাইতে উত্তম কোন পথ থাকে না। কেননা দাসে পরিণত না করা হলে যৌক্তিক দিক দিয়ে তিন অবস্থাই সম্ভবপর — হয় হত্যা করা হবে, না হয়

মুক্ত ছেড়ে দেয়া হবে, না হয় যাবজ্জীবন বন্দী করে রাখা হবে। প্রায়ই এই তিন অবস্থা উপযোগিতার পরিপন্থী হয়। কোন কোন বন্দী উন্নত প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকে, এ কারণে হত্যা করা সমীচীন হয় না। মুক্ত ছেড়ে দিলে অনেক ক্ষেত্রেই এমন আশংকা থাকে যে, স্বদেশে পৌঁছে সে মুসলমানদের জন্য পুনরায় বিপদ হয়ে দাঁড়াবে। এখন এই দুই অবস্থাই অবশিষ্ট থাকে — হয় তাকে যাবজ্জীবন বন্দী রেখে আত্মকালকার মত কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আটক রাখা, না হয় তাকে দাসে পরিণত করে তার প্রতিভাকে কাজে লাগানো এবং তার মানবিক অধিকারগুলোরও পুরোপুরি প্রদান করা। চিন্তা করলে প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে, এতদুভয়ের মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা কোনটি? বিশেষতঃ দাসদের সম্পর্কে ইসলামের যে দৃষ্টিভঙ্গি তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা বোঝা আরও সহজ। দাসদের সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি রসূল করীম (সঃ) নিম্নরূপ ভাষায় ব্যক্ত করেছেনঃ

তোমাদের দাসেরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। অতএব, যার ভাই তার অধীনস্থ হয়, সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়, তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে এবং তাকে যেন এমন কাজের ভার না দেয় যা তার জন্য অসহনীয় হয়। যদি এমন কাজের ভার দিতেই হয়, তবে যেন সে নিজেও তাকে সাহায্য করে। — (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিক দিয়ে ইসলাম দাসদেরকে যে মর্যাদা দান করেছে তা স্বাধীন ও মুক্ত মানুষের মর্যাদার প্রায় কাছাকাছি। সেমতে অন্যান্য জাতির বিপরীতে ইসলাম দাসদেরকে শুধু বিবাহ করার অনুমতিই দেয়নি; বরং মালিকদেরকে **وَالْحُكْمُ لِلرَّائِي** আয়াতের মাধ্যমে জোর তাকীদও করেছে। এমনকি তারা স্বাধীন মুক্ত নারীদেরকেও বিবাহ করতে পারে। তারা জেহাদেও অংশগ্রহণ করতে পারে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তাদের অংশ স্বাধীন মুজাহিদের সমান। শত্রুকে যে কোন ধরনের নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে তাদের উক্তিও তেমনি ধর্তব্য যেমন স্বাধীন ব্যক্তিবর্গের উক্তি। কোরআন ও হাদীসে তাদের সাথে সদ্যবহারের নির্দেশাবলী এত অধিক বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলোকে একত্রে সন্নিবেশিত করলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়ে যেতে পারে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, দু’জাহানের সরদার হযরত রসূল মকবুল (সঃ) —এর পবিত্র মুখে যে কথাগুলো জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উচ্চারিত হচ্ছিল এবং যারপর তিনি পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান তা ছিল এইঃ **الصلوة الصلوة** অর্থাৎ, নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখ, নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তোমাদের অধীনস্থ দাসদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। — (আবু দাউদ)

ইসলাম দাসদেরকে শিক্ষাদীক্ষা অর্জনেরও যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। খলীফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আমলে ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রায় সকল প্রদেশেই জ্ঞান-গরিমায় যারা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন দাসদের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রাচীণ ক্রমে বিলীন করা অথবা হ্রাস করার জন্যে দাসদেরকে মুক্ত করার ফযীলত কোরআন ও হাদীসে ভূরি ভূরি বর্ণিত হয়েছে, যাতে মনে হয় যেন অন্য কোন সংকর্ম এর সমকক্ষ হতে পারেনা। ফেকাহুর বিভিন্ন বিধি-বিধানে দাসদেরকে মুক্ত করার জন্যে বাহ্যনা তালাশ করা হয়েছে। রোযার কাফ্ফারা, হত্যার কাফ্ফারা, যেহাদের কাফ্ফারা ও কসমের কাফ্ফারার মধ্যে দাস মুক্ত করাকে সর্বপ্রথম বিধান রাখা হয়েছে। এমনকি হাদীসে একথাও বলা হয়েছে যে, কেউ যদি দাসকে অন্যান্যভাবে চপেটাঘাত করে, তবে এর কাফ্ফারা হচ্ছে দাসকে মুক্ত করে দেয়া। — (মুসলিম) সাহাবায়ে

কেরামের অভ্যাস ছিল তাঁরা অকাতরে প্রচুর সংখ্যক দাস মুক্ত করতেন। “আল্লাহ্‌র মূল ওয়াহাজ্জ” – এর গ্রন্থকার কোন কোন সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন :

হযরত আয়েশা (রাঃ) – ৬৯, হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) – ১০০, হযরত ওসমান গণী (রাঃ) – ২০, হযরত আব্বাস (রাঃ) – ৭০, হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রাঃ) – ১০০০, হযরত যুল কা’লা হিমইয়ারী (রাঃ) – ৮০০০ (মাত্র একদিনে), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) – ৩০,০০০ – (ফতুল্ল আল্লাম, টীকা বুলুগুল মারাম নবাব সিদ্দীক হাসান খান প্রণীত, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃঃ) এ থেকে জানা যায় যে, মাত্র সাত জন সাহাবী, ৩৯,২৫৯ জন দাসকে মুক্ত করেছেন। বলাবাহুল্য, অন্য আরও হাজারো সাহাবীর মুক্ত করা দাসদের সংখ্যা এর চাইতে অনেক বেশী হবে। মোটকথা, ইসলাম দাসত্বের ব্যবস্থায় সর্বব্যাপী সংস্কার সাধন করেছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখবে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবে যে, ইসলামের দাসত্বকে অন্যান্য জাতির দাসত্বের অনুরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এসব সংস্কার সাধনের পর যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার অনুমতি তাদের প্রতি একটি বিরাট অনুগ্রহের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এখানে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করার বিধান কেবল বৈধতা পর্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ, ইসলামী রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত বিবেচনা করে, তবে তাদেরকে দাসে পরিণত করতে পারে। এরূপ করা মোস্তাহাব অথবা ওয়াজিব নয়। বরং কোরআন ও হাদীসের সমষ্টিগত বাণী থেকে মুক্ত করাই উত্তম বোঝা যায়। দাসে পরিণত করার এই অনুমতিও ততক্ষণ, যতক্ষণ শত্রুপক্ষের সাথে এর বিপরীত কোন চুক্তি না থাকে। যদি শত্রুপক্ষের সাথে চুক্তি হয়ে যায় যে, তারা আমাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করবে না এবং আমরাও তাদের বন্দীদেরকে দাসে পরিণত করব না, তবে এই চুক্তি মেনে চলা অপরিহার্য হবে। বর্তমান যুগে বিশ্বের অনেক দেশ এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ আছে। কাজেই যেসব মুসলিম দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তাদের জন্যে চুক্তি বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত কোন বন্দীকে দাসে পরিণত করা বৈধ হবে না।

জেহাদ সিদ্ধ হওয়ার একটি রহস্য : **وَلَا يَزَالُ لِلْإِسْلَامِ عُقْدَةٌ**

এ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জেহাদের সিদ্ধতা প্রকৃতপক্ষে একটি রহস্য। কেননা, জেহাদকে আসমানী আযাবের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ, কুফর, শিরক ও খোদাদ্রোহিতার শাস্তি পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে আসমান ও হামীর আযাব দ্বারা দেয়া হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যেও এরূপ হতে পারত, কিন্তু রাহমাতুল্লিল-আলামীনের কল্যাণে এই উম্মতকে এ ধরনের আযাব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এর স্থলে জেহাদ সিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এতে ব্যাপক আযাবের তুলনায় অনেক নমনীয়তা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। প্রথম এই যে, ব্যাপক আযাবে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সমগ্র জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে জেহাদে নারী ও শিশুরা তো নিরাপদ থাকেই, পরন্তু পুরুষও তারাই আক্রান্ত হয়, যারা আল্লাহ্‌র দ্বীনের হেফাজতকারীদের মোকাবেলায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে। তাদের মধ্যেও সবাই নিহত হয় না; বরং অনেকের ইসলাম গ্রহণ করার তওফীক হয়ে যায়। জেহাদের দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে উভয়পক্ষের অর্থাৎ, মুসলমান ও কাফেরদের পরীক্ষা হয়ে যায় যে, কে আল্লাহ্‌র নির্দেশে নিজের জ্ঞান ও মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয় এবং কে অব্যাহতা

ও কুফরে অটল থাকে কিংবা ইসলামের উজ্জ্বল প্রমাণাদি দেখে ইসলাম কবুল করে।

وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مَالٌ সূরার প্রারম্ভে বলা

হয়েছে যে, যারা কুফরী ও শিরক করে এবং অপরকেও ইসলাম থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের সংকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দিবেন; অর্থাৎ, তারা যেসব সদকা-খয়রাত ও জনহিতকর কাজ করে, শিরক ও কুফরের কারণে সেগুলোর কোন সওয়াব তারা পাবে না। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয় তাদের কর্ম বিনষ্ট হয় না; অর্থাৎ, তারা কিছু গোনাহ করলেও সেই গোনাহের কারণে তাদের সংকর্ম হ্রাস পায় না। বরং অনেক সময় তাদের সংকর্ম তাদের গোনাহর কাফ্যারা হয়ে যায়।

سَيُؤْتِيهِمْ أَجْرًا جَدِيدًا এতে শহীদের জন্য দু’টি নেয়ামতের কথা

বর্ণিত হয়েছে। (এক) আল্লাহ্‌ তাকে হেদায়েত করবেন, (দুই) তার সমস্ত অবস্থা ভাল করে দেবেন। অবস্থা বলে দুনিয়া ও আখেরাত – উভয় জাহানের অবস্থা বোঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে এই যে, যে ব্যক্তি জেহাদে যোগদান করে, সে শহীদ না হলেও শহীদের সওয়াবের অধিকারী হবে। আখেরাতে এই যে, সে কবরের আযাব থেকে এবং হাশরের পেরেশানী থেকে মুক্তি পাবে। কিছু লোকের হক তার মিস্‌মায় থেকে গেলে আল্লাহ্‌ তাআলা হকদারদেরকে তার প্রতি রাশী করিয়ে তাকে মুক্ত করে দেবেন। — (মাযহারী) শহীদ হওয়ার পর হেদায়েত করার অর্থ এই যে, তাদেরকে ‘মনযিলে-মকসূদ’ অর্থাৎ, জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবেন; যেমন কোরআনে জান্নাতীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে পৌঁছে একথা বলবে :

أَحْسَنُ لِمَا أَتَيْنَا مِنْكُمْ هَذَا يَوْمًا অর্থাৎ, আল্লাহ্‌রই সমস্ত প্রশংসা, যিনি

আমাদিগকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

وَلَا يَزَالُ لِلْإِسْلَامِ عُقْدَةٌ এ হচ্ছে একটি তৃতীয় নেয়ামত। অর্থাৎ,

তাদেরকে কেবল জান্নাতেই পৌঁছানো হবে না; বরং তাদের অন্তরে আপনা-আপনি জান্নাতে নিজ নিজ স্থান ও জান্নাতের নেয়ামত তথা মুর ও গেলমানের এমন পরিচয় সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেমন তারা চিরকাল তাদের মধ্যে বসবাস করত এবং তাদের সাথে পরিচিত ছিল। এরূপ না হলে অসুবিধা ছিল। কারণ, জান্নাত ছিল একটি নতুন জগৎ। সেখানে নিজ নিজ স্থান খুঁজে নেয়ার মধ্যে ও সেখানকার বস্তুসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার মধ্যে সময় লাগত এবং বেশ কিছুকাল পর্যন্ত অপরিচিতির অনুভূতির কারণে মন অশান্ত থাকত।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা; রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেন : সেই আল্লাহ্‌র কসম, যিনি আমাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তোমরা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের স্ত্রী ও গৃহকে চিন, তার চাইতেও বেশী জান্নাতে তোমাদের স্থান ও স্ত্রীদেরকে চিনবে এবং তাদের সাথে অন্তরঙ্গ হবে। — (মাযহারী) কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেক জান্নাতীর জন্যে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। সে জান্নাতে তার স্থান বলে দেবে এবং সেখানকার সঙ্গিনীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে।

وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مَالٌ এখানে মক্কার কাফেরদেরকে ভয় প্রদর্শন করা

উদ্দেশ্য যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যেমন আযাব এসেছে, তেমনি তোমাদের উপরও আসতে পারে। কাজেই তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো না।

শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত - مَوْلَى وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ

হয়। এক অর্থ অভিভাবক। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর আরেক অর্থ মালিক। কোরআনের অন্যত্র কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : **لَهُمْ فِيهَا مَالُهُمْ مُتَمَرِّغِينَ** — এতে আল্লাহ তাআলাকে কাফেরদেরও মাওলা বলা হয়েছে। কারণ, এখানে মাওলা শব্দের অর্থ মালিক। আল্লাহ তাআলা সবাইই মালিক। মুমিন-কাফের কেউ এই মালিকানার বাইরে নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুনিয়ার পানির রক্ত, গন্ধ ও স্বাদ কোন কোন সময় পরিবর্তিত হয়ে যায়। দুনিয়ার দুখও তেমনি বাসি হয়ে যায়। দুনিয়ার শরাব বিষাদ ও তিক্ত হয়ে থাকে। তবে সাময়িক নেশার কারণে তা পান করা হয় ; যেমন তামাক কড়া হওয়া সত্ত্বেও সেবন করা হয় এবং খেতে অভ্যাস হয়ে যায়। জ্ঞানাতের পানি, দুধ ও শরাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এগুলো সবই পরিবর্তন ও বিষাদ থেকে মুক্ত। জ্ঞানাত অন্যান্য অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু থেকেও মুক্ত, একথা সূরা সাফফাতের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে : **لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ** এমনভাবে দুনিয়ার মধুর মধ্যে মোম ও আবর্জনা মিশ্রিত থাকে। এর বিপরীতে বলা হয়েছে যে, জ্ঞানাতের মধু পরিশোধিত হবে। বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, জ্ঞানাতে আক্ষরিক অর্থেই পানি, দুধ, শরাব ও মধুর চারি প্রকার নহর রয়েছে। এখানে রূপক অর্থ নেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। তবে এটা পরিষ্কার যে, জ্ঞানাতের বস্তুসমূহকে দুনিয়ার বস্তুসমূহের অনুরূপ মনে করা যায় না। সেখানকার প্রত্যেক বস্তুর স্বাদ ও আনন্দ ভিন্নরূপ হবে, যার নথীর পৃথিবীতে নেই।

শব্দের অর্থ আলামত বা লক্ষণ। খাতামুনাবীয়ায় (সাঃ) —এর আবির্ভাবই কেয়ামতের প্রাথমিক একটি আলামত। কেননা, খতমে-নবুওয়তও কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার লক্ষণ। এমনভাবে চন্দ্র দ্বিশুভিত করার যোজ্যাকে কোরআনে اَتْرَكِي السَّاعَةَ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটাও কেয়ামতের অন্যতম লক্ষণ। এসব প্রাথমিক আলামত কোরআন অবতরণের সময় প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যান্য আলামত সহীহ হাদীসসমূহে উল্লেখিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হাদীস হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ) —এর কাছে শুনেছেন — নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কেয়ামতের সুস্পষ্ট আলামত : অঙ্গানচর্চা উঠে যাবে। অঙ্গানতা বেড়ে যাবে। ব্যতিচারের প্রসার হবে। মদ্যপান বেড়ে যাবে। পুরুষেরা সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে ; এমন কি, পক্ষাঙ্গ জন নারীর ভরণ-পোষণ একজন পুরুষে করবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, এলেম হ্রাস পাবে এবং মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে। — (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হেয়ায়্যার (রাঃ) বর্ণনা ; রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যখন যুদ্ধবন্দ্য মালিকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে এবং আমানতকে যুদ্ধবন্দ্য মাল সাব্যস্ত করা হবে (অর্থাৎ, হালাল মনে করে খেয়ে ফেলবে।) যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে (অর্থাৎ, আদায় করতে কুষ্ঠিত হবে।) এলুম্ব-দ্বীন পার্শ্ব স্বার্থের জন্যে অর্জন করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য ও জননীর অবাধ্যতা করতে শুরু করবে এবং বন্ধুকে নিকটে রাখবে ও পিতাকে দূরে সরিয়ে দেবে, মসজিদসমূহে হটগোল শুরু হবে, পাপাচারী ব্যক্তি কওমের নেতা হয়ে যাবে ; হীনতম ব্যক্তি জাতির

(২৫) যারা বিশ্বাস করে ও সংকল্প করে, আল্লাহ তাদেরকে জন্মাতো দাখিল করবেন, যার নিম্নদেশে নিখারিগীসমূহ প্রবাহিত হয়। আর যারা কাফের, তারা ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকে এবং চতুশদ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। (১৩) যে জনপদ আপনাকে বহিস্কার করেছে, তদপেক্ষা কত শক্তিশালী জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, অতঃপর তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিল না। (১৪) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত নিদর্শন অনুসরণ করে, সে কি তার সমান, যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করা হয়েছে এবং যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। (১৫) পরহেযগারদেরকে যে জন্মাতো ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরূপ : তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্যে সুখাদ্য শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর। তথায় তাদের জন্যে আছে রকমারি ফল-মূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। পরহেযগাররা কি তাদের সমান, যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি অতঃপর তা তাদের নাড়িভূঁড়ি হিঁচুি হিঁচুনি করে দেবে? (১৬) তাদের মধ্যে কতক আপনার দিকে কান পাতে, অতঃপর যখন আপনার কাছ থেকে বাইরে যায়, তখন যারা শিক্ষিত, তাদেরকে বলে : এইযার তিনি কি বললেন? এদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। (১৭) যারা সংপঞ্চাশ হয়েছে, তাদের সংপঞ্চাশটি আরও বেড়ে যায় এবং আল্লাহ তাদেরকে তাকওয়া দান করেন। (১৮) তারা শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, কোয়ামত অকস্মাৎ তাদের কাছে এসে পড়ুক। বস্তুতঃ কোয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। সুতরাং কোয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?

فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ وَلِإِثْمِ الَّذِينَ
 آمَنُوا بِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ مُنْقَلَبَكُمْ وَمَوَاقِعَكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ
 آمَنُوا لَا تَزِلَّ زُنُتُكُمْ سُورَةٌ فَأَنزِلْ سُورَةً مُحْكَمَةً وَذَكِّرْهُمْ بِمَا
 أَقْبَلُ الْإِنشَاءَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ
 الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ ظُلْمَةٌ وَكَلَامٌ مَعْرُوفٌ
 فَأَذْخَرَهُ الْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ فَهَلْ
 عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَعَمَّهُمْ وَاعْمَى أَبْصَارَهُمْ ۖ أَفَلَا
 يَتَذَكَّرُونَ ۚ الْقُرْآنُ أَمْرٌ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَالُهَا ۖ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا
 عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ
 وَأَمْلَ لَهُمْ ۖ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَبِّحْنَاهُ
 فِي بُحُسٍّ الْأَمْرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۖ وَلَكَيْفَ إِذَا تَوَلَّيْتُمْ
 الْمَلَائِكَةَ يَصْرُخُونَ وَيُوحِيهِمْ وَأَذْرَاهُمْ ۖ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا
 مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ وَخَابَتْ أَعْيُنُهُمْ ۖ أَمْ حَسِبَ
 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخَوِّرَهُ اللَّهُ أَصْفَانَهُمْ ۖ

(১৯) জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ক্রমাধিকারনা করুন, আপনার ক্রটির জন্যে এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের জন্যে। আল্লাহ্ তোমাদের গতিবিধি ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত। (২০) যারা মুমিন, তারা বলে : একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জেহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যুভয়ে মুছপ্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সূতরাং ধ্বংস তাদের জন্যে। (২১) তাদের অনুগত্য ও মিষ্ট বাক্য জানা আছে। অতএব, জেহাদের শিক্ষান্ত হলে যদি তারা আল্লাহ্র প্রতি প্রদত্ত অংগীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্যে তা মঙ্গলজনক হবে। (২২) ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (২৩) এদের প্রতিই আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদেরকে বন্দি ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। (২৪) তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না। না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (২৫) নিশ্চয় যারা সোচ্চার পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। (২৬) এটা এজন্যে যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহ্র অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করে : আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ্ তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন। (২৭) ফেরেশতা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে? (২৮) এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহ্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন। (২৯) যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরের বিদ্যে প্রকাশ করে দেবেন না?

প্রতিনিধিত্ব করবে, অত্যাচারের ভয়ে দৃষ্ট লোকদের সম্মান করা হবে, গায়িকা নারীদের গান-বাদ্য ব্যাপক হয়ে যাবে, বাদ্যযন্ত্রের প্রসার ঘটবে, মদ্যপান করা হবে এবং উষ্মতের সর্বশেষ লোকেরা তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে, তখন তোমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অপেক্ষা করো : একটি রক্তিম ঝড়ের, ভূমিকম্পের, মানুষের মাটিতে প্রোথিত হয়ে যাওয়ার, আকার-আকৃতি বিকৃতি হয়ে যাওয়ার, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণের এবং কেয়ামতের অন্যান্য আলামতের, যেগুলো একের পর এক এভাবে প্রকাশ পাবে, যেমন মোতির মালা ছিড়ে গেলে দানাগুলো একটি একটি করে মাটিতে খসে পড়ে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এবাদতের যোগ্য নয়। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানও একথা জানে, পয়গম্বরকুল শিরোমণি একথা জানবেন না কেন? এমতাবস্থায় এই জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দানের অর্থ হয় এর উপর দৃঢ় ও অটল থাকা, না হয় তদনুযায়ী আমল করা। কুরতুবী বর্ণনা করেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে এলমের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন : ভূমি কি কোরআনের এই বাণী শ্রবণ করনি -

فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ
 وَإِثْمِ الْكَافِرِينَ ۚ
 سَابِقُوا إِلَى مَعْرِفَةِ رَبِّكُمْ
 وَعَلِمُوا أَلْبَابَ أَمْوَالِكُمْ وَأُولَئِكَ مَوْفِقُونَ
 আরও বলা হয়েছে :
 وَأَعْلَمُوا أَلْبَابَ أَمْوَالِكُمْ وَأُولَئِكَ مَوْفِقُونَ

এরপর বলা হয়েছে : فَاحْذَرُوهُمْ ۚ এসব জায়গায় প্রথমে এলম অতঃপর তদনুযায়ী আমল করার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতেও রসূলুল্লাহ (সাঃ) যদিও পূর্ব থেকে একথা জানতেন, কিন্তু উদ্দেশ্য তদনুযায়ী আমল করা। এ কারণেই এরপর وَاسْتَغْفِرُوا ৷ অর্থঃ, এস্তেগফারের আদেশ দান করা হয়েছে। পয়গম্বরসুলভ পবিত্রতার কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে যদিও এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু পয়গম্বরগণ গোনাহ থেকে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও স্থলবিশেষে ইজ্তিহাদী ভুল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। শরীয়তের আইনে ইজ্তিহাদী ভুল গোনাহ নয়; বরং এই ভুলেরও সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু পয়গম্বরগণকে এই ভুল সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করে দেয়া হয় এবং তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিশ্রেক্ষিত্তে এই ভুলকে, ذَنْبٌ তথা গোনাহ শব্দের মাধ্যমেও ব্যক্ত করা হয়; যেমন সূরা আবাব্বায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে অবতীর্ণ কঠোর সতর্কবাণী এই ইজ্তিহাদী ভুলেরই একটি দৃষ্টান্ত। সূরা আবাব্বায় এর বিস্তারিত বিবরণ আসবে যে, সেই ইজ্তিহাদী ভুল যদিও গোনাহ ছিল না; বরং এরও এক সওয়াব পাওয়ার ওয়াদা ছিল; কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উচ্চমর্যাদার পরিশ্রেক্ষিত্তে সেই ভুলকে পছন্দ করা হয়নি। আলোচ্য আয়াতে এমনি ধরনের গোনাহ বোঝা যেতে পারে।

জ্ঞাতব্য : হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর রেওয়াজেতে আছে : রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : তোমরা বেশী পরিমাণে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠ কর এবং এস্তেগফার তথা ক্ষমপ্রার্থনা কর। ইবলীস বলে : আমি মানুষকে গোনাহে লিপ্ত করে ধ্বংস করেছে, প্রত্যুত্তরে তারা আমাকে কালেমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পাঠ করে ধ্বংস করেছে। এই অবস্থা দেখে আমি তাদেরকে এমন অসার কল্পনার অনুসারী করে দিয়েছি, যা তারা

সৎকাজ মনে করে সম্পন্ন করে (যেমন সাধারণ বেদআতসমূহের অবস্থা তদ্রূপই) এতে করে তাদের তওবা করারও তওফীক হয় না।

مُتَغَلِّبٌ এর শাব্দিক অর্থ ওলট-পালট হওয়া এবং **مُتَغَلِّبٌ** শব্দের অর্থ অবস্থানস্থল। তফসীরবিদগণ এই শব্দদ্বয়ের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সবগুলোর অর্থই এখানে উদ্দিষ্ট। কেননা, প্রত্যেক মানুষের উপর দুবিধ অবস্থা আসে। (এক) যে অবস্থার সাথে সে সাময়িক ও অস্থায়ীভাবে জড়িত হয় এবং (দুই) যে অবস্থাকে সে স্থায়ী বস্তু মনে করে। এমনভাবে কোন কোন গৃহে মানুষ অস্থায়ীভাবে অবস্থান করে এবং কোন কোন গৃহে স্থায়ীভাবে। আয়াতে অস্থায়ীকে **مُتَغَلِّبٌ** শব্দ দ্বারা এবং স্থায়ীকে **مُتَغَلِّبٌ** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবে আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষের যাবতীয় অবস্থার খবর রাখেন।

مُتَغَلِّبٌ এর শাব্দিক অর্থ মজবুত ও অনড়। এই আভিধানিক অর্থে কোরআনের প্রত্যেক সূরাই **مُتَغَلِّبٌ** কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় **مُتَغَلِّبٌ** শব্দটি **مُنَسَّرٌ** তথা রহিতের বিপরীতে ব্যবহৃত হয়। এখানে সূরার সাথে “মাহকামাহ” সংযুক্ত করার তাৎপর্য এই যে, সূরা মনসুখ ও রহিত না হলেই আমলের সাধ পূর্ণ হতে পারে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : যেসব সূরায় যুদ্ধ ও জেহাদের বিধানাবলী বিধৃত হয়েছে, সেগুলো সব “মাহকামাহ” তথা অরহিত। এখানে আসল উদ্দেশ্য জেহাদের নির্দেশ ও তা বাস্তবায়ন। তাই সূরার সাথে মোহকামাহ শব্দ যুক্ত করে জেহাদের আলোচনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। — (কুরতুবী)

قَارِبَهُ مَا يَهْلِكُهُ আসমায়ীর উক্তি অনুযায়ী এর অর্থ **قَارِبَهُ** অর্থাৎ, তার ধ্বংসের কারণসমূহ আসন্ন। — (কুরতুবী)

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْتُلُوا رِجَالَكُمْ

আভিধানিক দিক দিয়ে **تَوَلَّى** শব্দের দুই অর্থ সম্ভবপর। (এক) মুখ ফিরিয়ে নেয়া ও (দুই) কোন দলের উপর শাসনক্ষমতা লাভ করা। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ প্রথম অর্থ নিয়েছেন, যা উপরে তফসীরের সার-সংক্ষেপে লিখিত হয়েছে। আবু হাইয়ান (রহঃ) বাহুর-মুহীতে এই অর্থকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যদি তোমরা শরীয়তের বিধানাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও—(জেহাদের বিধানও এর অন্তর্ভুক্ত), তবে এর প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, তোমরা মূর্থতা যুগের প্রাচীন পদ্ধতির অনুসারী হয়ে যাবে, যার অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি হচ্ছে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা। মূর্থতা যুগের প্রত্যেকটি কাজে এই পরিণতি প্রত্যক্ষ করা হত। এক গোত্র অন্য গোত্রের উপর হানা দিত এবং হত্যা ও লুটতরাজ করত। সন্তানদেরকে স্বহস্তে জীবন্ত কবরস্থ করত। ইসলাম মূর্থতা যুগের এসব কুপ্রথা মেটানোর জন্যে জেহাদের নির্দেশ জারি করেছে। এটা যদিও বাহ্যতঃ রক্তপাত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সারমর্ম হচ্ছে পচা, গলিত অন্ধকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, যাতে অবশিষ্ট দেহ নিরাময় ও সুস্থ থাকে। জেহাদের মাধ্যমে ন্যায়, সুবিচার এবং আত্মীয়তার বন্ধন সম্মানিত ও সুসংহত হয়। রুহুল মা’আনী, কুরতুবী ইত্যাদি গ্রন্থে **تَوَلَّى** শব্দের অর্থনেয়া হয়েছে “রাজত্ব ও শাসনক্ষমতা লাভ করা।” এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য হবে এই যে, তোমাদের মনোবাহিন্যা পূর্ণ হলে অর্থাৎ, দেশ ও জাতির শাসনক্ষমতা লাভ করলে এর পরিণতি এ ছাড়া কিছুই হবে

না যে, তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।

আত্মীয়তা বজায় রাখার কঠোর তাকীদ : **أَرْحَامُ** শব্দটি **رَحِمٌ** এর বহুবচন। এর অর্থ জননীর গর্ভাশয়। সাধারণ সম্পর্ক ও আত্মীয়তার ভিত্তি সেখান থেকেই সূচিত হয়, তাই বাকপদ্ধতিতে **رَحِمٌ** শব্দটি আত্মীয়তা ও সম্পর্কের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এস্থলে তফসীরে রুহুল মা’আনীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, **أَرْحَامُ** ও **ذَوَى الْأَرْحَامِ** শব্দ কোন কোন আত্মীয়তাতে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম আত্মীয়তার হক আদায় করার জন্যে খুবই তাকীদ করেছে। বোখারীতে হযরত আবু হোরাযরা (রাঃ) ও অন্য দু’জন সাহাবী থেকে এই বিষয়বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বজায় রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাকে নৈকট্য দান করবেন এবং যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে ছিন্ন করবেন। এ থেকে জানা গেল যে, আত্মীয় ও সম্পর্কশীলদের সাথে কথায়, কর্মে ও অর্থ ব্যয়ে সহায়দ্য ব্যবহার করার জোর নির্দেশ আছে। উপরোক্ত হাদীসে হযরত আবু হোরাযরা (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের বরাত দিয়েছেন যে, ইচ্ছা করলে কোরআনের এই আয়াতটি দেখে নাও। অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা যেসব গোনাহের শাস্তি ইহকালেও দেন এবং পরকালেও দেন, সেগুলোর মধ্যে নিশীড়ন ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সমান কোন গোনাহ নেই। — (আবু দাউদ, তিরমিযী) হযরত সওবানের বর্ণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ও রুহী-রোযগারে বরকত কামনা করে সে যেন আত্মীয়তার সাথে সহায়দ্য ব্যবহার করে। সহীহ হাদীসসমূহে আরও বলা হয়েছে যে, আত্মীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে অপরপক্ষ থেকে সদ্যবহার আশা করা উচিত নয়। যদি অপরপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন ও অসৌজন্যমূলক ব্যবহারও করে, তবুও তার সাথে তোমার সদ্যবহার করা উচিত। সহীহ বোখারীতে আছে :

ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সদ্যবহারকারী নয়, যে কেবল প্রতিদানের সমান সদ্যবহার করে ; বরং সেই সদ্যবহারকারী, যে অপরপক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সদ্যবহার অব্যাহত রাখে। — (ইবনে কাসীর)

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ অর্থাৎ, যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে

এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেন। অর্থাৎ, তাদেরকে রহমত থেকে দূরে রাখেন। হযরত ফারাক্কে আযম (রাঃ) এই আয়াত দুটোই উম্মুল ওলাদের বিক্রয় অবৈধ সাব্যস্ত করেন। অর্থাৎ, যে মালিকানহীন বাদীর গর্ভ থেকে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে বিক্রয় করলে সন্তানের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে, যা অভিসম্পাতের কারণ। তাই এরূপ বাদী বিক্রয় করা হারাম। — (হাকেম)

أَوْ عَلَى ظَنٍّ أَوْ أَقْلًا অন্তরে তালা লেগে যাওয়ার অর্থ তাই, যা

অন্যান্য আয়াতে **ظَنٌّ** অর্থাৎ, মোহর লেগে যাওয়া বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য অন্তর এমন কঠোর ও চেতনাহীন হয়ে যাওয়া যে, তাকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করতে থাকে। এর কারণেই মানুষ সাধারণতঃ বিরামহীনভাবে গোনাহে লিপ্ত থাকে। (নাউযুল্লাহ মিনহু)

الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَأَهُمْ এতে শয়তানকে দু’টি কাজের কর্তা বলা হয়েছে। (এক) **تَسْوِيلٌ** এর সুশোভিত করা ; অর্থাৎ, মন্দ বিষয়

وَلَوْ نَشَاءُ لَآتَيْنَهُمْ قُلُوبَهُمْ بَيِّنَاتٍ وَتَنَزَّلُ الْمَوَاقِلُ فِي أَعْيُنِهِمْ
 الْقَوْلُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۝ وَلَيَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمَ الْمُجِدِّينَ
 مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَيَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَاءَ فُؤَادُ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا
 تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۖ لَئِنْ يُفْتَرُوا لِلَّهِ شَيْئٌ وَرَبِّي حَظِيظٌ أَعْمَالَكُمْ ۝
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَاطِّيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا
 أَعْمَالَكُمْ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ
 مَا تَوَّابُوا هُمْ فَكُلَّ اللَّهُ لَهُمْ ۖ فَلَا تَهْتَبُوا وَتَدْعُوا إِلَىٰ
 السَّلَاحِ ۖ وَأَتُوا الْعِلْمَ ۖ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَبْدِلَ أَعْمَالَكُمْ
 إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لِبَهِلَةٍ وَأَنْتُمْ عَنْهَا مُتَخَفُونَ ۖ وَلَئِنْ كُنْتُمْ
 تُحِبُّونَ ۖ فَلَا تَكُونُوا لِلْآمِنِينَ ۖ إِنَّ يَسْتَلْزِمُهُمُ الْبَيْعُ ۖ وَتَحْلُوا
 وَغَيْرِهِمْ ۖ أَضْعَافَكُمْ ۖ هَلْ لَكُمْ مِنْهُ لَوْ دَعَا عَنْ لِقَائِهِمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ ۖ فَيَمْنَعُ مِنْكُمْ بَيْعٌ ۖ وَمَنْ يَبْعِلْ ۖ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ عَنْ نَفْسِهِ
 وَاللَّهُ الْعَزِيزُ ۖ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا
 غَيْرَكُمْ فَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝

(৩০) আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের সাথে পরিচিত করে দিতাম। তখন আপনি তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন এবং আপনি অবশ্যই কথার ভিত্তিতে তাদেরকে চিনতে পারতেন। আল্লাহ্ তোমাদের কর্মসমূহের স্বর রাখেন। (৩১) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পবিত্র না হৃদয়ে তুলি তোমাদের জেহাদকারীদেরকে এবং সর্বকারীদেরকে এক স্বতন্ত্র না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি। (৩২) নিচয় যারা কাকের এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এক নিজেদের জন্যে সংগঠিত হওয়ার পর রসুলের (সাঃ) বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং তিনি ব্যর্থ করে দিবেন তাদের কর্মসমূহকে। (৩৩) হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর অনুগত কর, রসুলের (সাঃ) অনুগত কর এবং নিজেদের কর্ম ফিট করে না। (৩৪) নিচয় যারা কাকের এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে অজ্ঞের কাকের অবস্থায় যারা যায়, আল্লাহ্ কখনই তাদেরকে কমা করবেন না। (৩৫) অতএব, তোমরা হীনবল হয়ে না এক সন্ধির আহ্বান জানিও না, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহ্ই তোমাদের সাথে আছে। তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না। (৩৬) পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, যদি তোমরা বিশ্রামী হও এবং স্বপ্ন অকলম কর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না। (৩৭) তিনি তোমাদের কাছে ধন-সম্পদ চাইলে অজ্ঞের তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্পণ্য করবে এক তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দেবেন। (৩৮) তখন, তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অজ্ঞের তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ্ অজবমুক্ত এক তোমরা অভাবমুক্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিতে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।

অথবা মন্দ কর্মকে কারও দৃষ্টিতে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেয়া। (দুই) ৷ এরা এর অর্থ অবকাশ দেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, শত্রুতান প্রথমে তো তাদের মন্দকর্মসমূহকে তাদের দৃষ্টিতে ভাল ও শোভন করে দেখিয়েছে, এরপর তাদেরকে এমন দীর্ঘ আশায় জড়িত করে দিয়েছে, যা পূর্ণ হওয়ার নয়।

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخَوِّمَهُ اللَّهُ أَضْعَافَهُمْ

অথবা মন্দ কর্মকে কারও দৃষ্টিতে সুন্দর ও সুশোভিত করে দেয়া। (দুই) ৷ এরা এর অর্থ গোপন শত্রুতা ও বিদ্বেষ। মুনাফিকরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করত এবং বাহ্যিক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) - এর প্রতি মহকবত প্রকাশ করত, কিন্তু অন্তরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ গোপন করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনকে আলেমুল গায়েব জানা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে এমন নিশ্চিন্ত যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের অন্তরের গোপন ভেদ ও বিদ্বেষকে মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেবেন? ইবনে কাসীর বলেন, আল্লাহ্ তাআলা সূরা বারাতাতে তাদের ক্রিয়াকর্মের পরিচয় বলে দিয়েছেন, যদ্বারা বোঝা যায় যে, কারা মুনাফিক। এ কারণেই সূরা বারাতাতকে সূরা ফায়েহা অর্থাৎ, অপমানকারী সূরাও বলা হয়। কেননা, এই সূরা মুনাফিকদের বিশেষ বিশেষ আলামত প্রকাশ করে দিয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَوْ نَشَاءُ لَآتَيْنَهُمْ قُلُوبَهُمْ بَيِّنَاتٍ ۖ وَتَنَزَّلُ الْمَوَاقِلُ فِي أَعْيُنِهِمْ

আপনাকে নির্দিষ্ট করে মুনাফিকদের দেখিয়ে দিতে পারি এবং তাদের এমন আকার-আকৃতি বলে দিতে পারি, যদ্বারা আপনি প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারতেন। এখানে ۖ অব্যয়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। এতে ব্যাকরণিক নিয়ম অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক মুনাফিককে ব্যক্তিগতভাবে চিহ্নিত করে আপনাকে বলে দিতাম : কিন্তু রহস্য ও উপযোগিতাবশতঃ আমার সহনশীলতা গুণের কারণে তাদেরকে এভাবে লাহিত করা পছন্দ করিনি, যাতে এই বিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, প্রত্যেক বিষয়কে বাহ্যিক অর্থে বুঝতে হবে এবং অন্তরগত অবস্থা ও গোপন বিষয়াদিকে আল্লাহ্ তাআলার নিকট সোপর্দ করতে হবে। তবে আমি আপনাকে এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছি যে, আপনি মুনাফিকদেরকে তাদের কথাবার্তার ভিত্তি দ্বারা চিনে নিতে পারবেন। — (ইবনে কাসীর)

হযরত ওসমান গনী (রাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি কোন বিষয় অন্তরে গোপন করে, আল্লাহ্ তাআলা তার চেহারা ও অনিচ্ছাপ্রসূত কথা দ্বারা তা প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ, কথাবার্তার সময় তার মুখ থেকে এমন বাক্য বের হয়ে যায়, যার ফলে তার মনের ভেদ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এমন এক হাদীসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি অন্তরে কোন বিষয় গোপন করে, আল্লাহ্ তাআলা তার সন্তার উপর সেই বিষয়ের চাদর ফেলে দেন। বিষয়টি ভাল হলে তা প্রকাশ না হয়ে পারে না এবং মন্দ হলেও প্রকাশ না হয়ে পারে না। কোন কোন হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, একদল মুনাফিকের ব্যক্তিগত পরিচয়ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেয়া হয়েছিল। মসনদে-আহমদে গুরুত্ব ইবনে আমরের হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একবার এক ষোড়বার ছয়ত্রিশ জন মুনাফিকের নাম বলে তাদেরকে মজলিস থেকে উঠিয়ে দেন। হাদীসে তাদের নাম গণনা করা হয়েছে। — (ইবনে কাসীর)

حَتَّىٰ تَعْلَمَ الْمُجِدِّينَ مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۝ আল্লাহ্ তাআলা তো সৃষ্টির আদিকাল

থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সর্বব্যাপী জ্ঞান রাখেন। এখানে জানানার অর্থ প্রকাশ হওয়া। অর্থাৎ, যে বিষয়টি আল্লাহর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই ছিল, তার বাস্তবভিত্তিক ও ঘটনাভিত্তিক জ্ঞান হয়ে যাওয়া। — (ইবনে কাসীর)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّاعُنْ سَبِيلِ اللَّهِ আলোচ্য আয়াতও মুনাফিক এবং ইহুদী বনী-কোরায়যা ও বনী-নুযায়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : এই আয়াত সেসব মুনাফিকদের সম্পর্কে নাখিল হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধের সময় কোরাইশ কাফেরদেরকে সাহায্য করেছে এবং তাদের বার জন লোক সমগ্র কোরাইশ বাহিনীর পানাহারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। প্রত্যহ একজন লোক গোটা কাফের বাহিনীর পানাহারের ব্যবস্থা করত।

وَسَيُطْلَبُ عَنْكُمُ আলোচ্য আয়াতও “কর্ম বিনষ্ট” করার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেবেন না; বরং ব্যর্থ করে দেবেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই লিখিত হয়েছে। এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কুফর ও নিফাকের কারণে তাদের সংকর্মসমূহ যেমন সদকা, খয়রাত ইত্যাদি সব নিষ্ফল হয়ে যাবে — গ্রহণযোগ্য হবে না।

إِبْطَالُ কোরআন পাক এ স্থলে حط এর পরিবর্তে ابطال উল্লেখ করেছে। এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা বাতিল করা এক প্রকার কুফরের কারণে প্রকাশ পায়, যা উপরের আয়াতে حط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আসল কাফেরের কোন আমল কুফরের কারণে গ্রহণযোগ্যই হয় না। ইসলাম গ্রহণ করার পর যে ব্যক্তি ইসলামকে ত্যাগ করে মুর্তাদ তথা কাফের হয়ে যায়, তার ইসলামকালীন সংকর্ম যদিও গ্রহণযোগ্য ছিল; কিন্তু তার কুফর ও ধর্মত্যাগ সেসব কর্মকেও নিষ্ফল করে দেয়।

আমল বাতিল করার দ্বিতীয় প্রকার এই যে, কোন কোন সংকর্মের জন্যে অন্য সংকর্ম করা শর্ত। যে ব্যক্তি এই শর্ত পূরণ করে না, সে তার সংকর্মও বিনষ্ট করে দেয়। উদাহরণতঃ প্রত্যেক সংকর্ম কবুল হওয়ার শর্ত এই যে, তা ঋটিভাবে আল্লাহর জন্যে হতে হবে, তাতে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব এবং নাম যশের উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। কোরআন পাকে বলা হয়েছে : وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا لِبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَهُ الدِّينُ অন্যত্র বলা হয়েছে : إِنَّ الدِّينَ لِلَّهِ الْحَقُّ — অতএব, যে সংকর্ম রিয়া ও নাম যশের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা আল্লাহর কাছে বাতিল হয়ে যাবে। এমনভাবে সদকা-খয়রাত সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে :

لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَىٰ وَالزُّلْمِ অর্থাৎ, অনুগ্রহের বড়াই করে অথবা গরীবকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের সদকা খয়রাতকে বাতিল করো না। এতে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহের বড়াই করলে অথবা গরীবকে কষ্ট দিলে সদকা বাতিল হয়ে যায়। হযরত হাসান বসরীর উক্তি অর্থ তাই হতে পারে, যা তিনি এই আয়াতের তফসীরে বলেছেন যে, তোমরা তোমাদের সংকর্মসমূহকে গোনাহের মাধ্যমে বাতিল করো না। যেমন ইবনে জুরয়েজ বলেন : وَالسَّمْعَةُ بِالرِّبَا মুকাতিল প্রমুখ বলেন : কেননা, আহলে সুন্নত দলের ঐক্যমতে, কুফর ও শিরক ছাড়া কোন কবীরা গোনাহও এমন নাই, যা মুমিনদের সংকর্ম বাতিল করে দেয়। উদাহরণতঃ কেউ চুরি করল এবং সে নিয়মিত নামাযী ও রোযাদার। এমতাবস্থায় তাকে বলা হবে না যে, তোমার নামায-রোযা বাতিল হয়ে গেছে— এগুলোর কব্যা কর। অতএব, সেসব গোনাহ দ্বারাই সংকর্ম বাতিল হয়, যেগুলো না করা সংকর্ম কবুল

হওয়ার জন্যে শর্ত; যেমন রিয়া ও নাম-যশের উদ্দেশ্যে করা। এরূপ উদ্দেশ্যে না করা প্রত্যেক সংকর্ম কবুল হওয়ার জন্যে শর্ত। এটাও সম্ভবপর যে, হযরত হাসান বসরীর উক্তি অর্থ সংকর্মের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া হবে এবং স্বয়ং সংকর্ম বিনষ্ট হওয়া হবে না। এমতাবস্থায় এটা সকল গোনাহর ক্ষেত্রেই শর্ত হবে। যার আমলে গোনাহের প্রাধান্য থাকবে, তার অঙ্গ সংকর্মে ও আযাব থেকে রক্ষা করার মত বরকত থাকবে না; বরং সে নিয়মানুযায়ী গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে; কিন্তু পরিণামে ঈমানের বরকতে শাস্তি ভোগার পর মুক্তি পাবে।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّاعُنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ نَأْتُوا مَحْسَبَاتٍ

এমন শব্দের মাধ্যমেই একটি নির্দেশ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পুনরাবৃত্তির এক কারণ এই যে, প্রথম আয়াতে কাফেরদের পার্থিব ক্ষতি বর্ণিত হয়েছে এবং এই আয়াতে পারলৌকিক ক্ষতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই উদ্ধৃত করা হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ এরূপও হতে পারে যে, প্রথম আয়াতে সাধারণ কাফেরদের বর্ণনা ছিল, যাদের মধ্যে তারাও शामिल ছিল, যারা পরে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তারা কাফের অবস্থায় যেমন সংকর্ম করেছিল, তা সবই নিষ্ফল হয়েছে। মুসলমান হওয়ার পরও সেগুলোর সওয়াব পাবে না। আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে এমন কাফেরদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফর ও শিরককে আঁকড়ে রেখেছিল। তাদের বিধান এই যে, পরকালে কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না।

فَلَا تَهْتَفُوا بِأَن يَخْتَلِفُ السُّنَّةُ এ আয়াতে কাফেরদেরকে সন্ধির

আহ্বান জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে

وَأَن جَحْمُوكُمُ إِلَى اللَّهِ فَاجْتَمِعْ لَهُمَا অর্থাৎ, কাফেররা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে

পড়ে, তবে তোমরাও ঝুঁকে পড়। এ থেকে সন্ধি করার অনুমতি বোঝা যায়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন যে, অনুমতির আয়াতের অর্থ এই যে, কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব হলে তোমরা সন্ধি করতে পার। পক্ষান্তরে এই আয়াতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু ঋটি কথা এই যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রথমে সন্ধির প্রস্তাব করাও জায়েয, যদি এতে মুসলমানদের উপযোগিতা দেখা যায় এবং কাপুরুষতা ও বিলাসপ্রিয়তা এর কারণ না হয়। এ আয়াতের শুরুতে

فَلَا تَهْتَفُوا বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাপুরুষতা ও জেহাদ থেকে

পলায়নের মনোভাব নিয়ে যে সন্ধি করা হয়, তা নিষিদ্ধ। কাজেই এতেও কোন বিরোধ নেই। কারণ, وَأَن جَحْمُوكُمُ আয়াতের বিধানও তখনই হবে, যখন অলসতা ও কাপুরুষতার কারণে সন্ধি করা না হয়, বরং মুসলমানদের উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য করে করা হয়।

وَأَن يَخْتَلِفُ السُّنَّةُ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের কর্মসমূহের

প্রতিদান হ্রাস করবেন না। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়াতে যে কোন কষ্ট ভোগ কর, তার বিরাট প্রতিদান পরকালে পাবে। অতএব, কষ্ট করলেও মুমিন অকৃতকার্য নয়।

إِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا সংসারাসক্তিই মানুষের জন্যে জেহাদে বাধাদান-

কারী হতে পারে। এতে নিজের জীবনের প্রতি আসক্তি, পরিবার-পরিজনের আসক্তি এবং টাকা-কড়ির আসক্তি সবই দাখিল। এই আয়াতে

বলা হয়েছে যে, এসব বস্তু সর্বাবস্থায় নিঃশেষ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এগুলোকে আপাততঃ ঠাচিয়ে রাখলেও অন্য সময় এগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই এসব ধ্বংসশীল ও অস্থায়ী বস্তুর মহবতকে পরকালের স্থায়ী অক্ষয় নেয়ামতের মহবতের উপর প্রাধান্য দিও না।

وَلَا يَسْتَكْبِرُ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাছে তোমাদের ধনসম্পদ চান না। কিন্তু সমগ্র কোরআনেই যাকাত ও সদকার বিধান এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করার অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। স্বয়ং এই আয়াতের পরবর্তী আয়াতেই আল্লাহর পথে ব্যয় করার তাকীদ বর্ণিত হচ্ছে। তাই বাহ্যতঃ উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে বলে মনে হয়। এ কারণে কেউ কেউ বলেন : **وَلَا يَسْتَكْبِرُ** এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তোমাদের ধনসম্পদ তোমাদের কাছ থেকে নিজের কোন উপকারের জন্যে চান না ; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্যে চান। এই আয়াতেও **يُؤْتِيكَ مِنْ جَدِّدٍ** শব্দ দ্বারা এই উপকারের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমাদেরকে আল্লাহ পথে ব্যয় করার জন্যে বলার কারণ এই যে, পরকালে তোমরা সওয়াবের প্রতি সর্বাধিক মুখাপেক্ষী হবে। তখন এই ব্যয় তোমাদেরই কাছে লাগবে এবং সেখানে তোমাদেরকে এর প্রতিদান দেয়া হবে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই বক্তব্যই পেশ করা হয়েছে। এর নজীর হচ্ছে এই আয়াত : **مَا يَرْزُقُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ** অর্থাৎ, আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমাদের কাছে নিজের জন্যে কোন জীবনোপকরণ চাই না। আমার এর প্রয়োজনও নেই। কারও কারও মতে আলোচ্য আয়াতের অর্থ এই যে, **وَلَا يَسْتَكْبِرُ** বলে সমস্ত ধনসম্পদ চাওয়া বোঝানো হয়েছে। এটা ইবনে উরায়নার উক্তি। — (কুরতুবী) পরবর্তী আয়াত এই অর্থের প্রতি ইঙ্গিত করে, যাতে বলা হয়েছে — **إِنْ يَسْأَلْكُمْ فَيَأْتِيَكُمْ** শব্দটি **احفأ** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বাড়াবাড়ি করা এবং কোন কাজে শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। এই আয়াতের মর্ম সবার মতে এই যে, আল্লাহ তোমাদের কাছে তোমাদের সমস্ত ধনসম্পদ চাইলে তোমরা কার্পণ্য করতে এবং এই আদেশ পালন তোমাদের কাছে অপ্রিয় মনে হত। এমনকি, আদায় করার সময় মনের এই অপ্রিয় ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ত। সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে **وَلَا يَسْتَكْبِرُ** বলে তাই বোঝানো হয়েছে, যা দ্বিতীয় আয়াতে **يُؤْتِيكُمْ** সংযুক্ত করে বোঝানো হয়েছে। উভয় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি যাকাত, ওশর ইত্যাদি যেসব আর্থিক ফরয কাজ আরোপ করেছেন, প্রথমতঃ সেগুলো স্বয়ং তোমাদেরই উপকারার্থে করেছেন— আল্লাহ তাআলার কোন উপকার নাই। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তাআলা এসব ফরয কাজের ক্ষেত্রে করণাশীলতঃ অল্প পরিমাণ অংশই ফরয করেছেন। ফলে একে বোঝা মনে করা উচিত নয়। যাকাতে মজুদ অর্থের ৪০ ভাগের এক ভাগ, উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের এক অথবা ২০ ভাগের এক, ১০০ ছাগলের মধ্যে একটি ছাগল মাত্র। অতএব, বোঝা গেল যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের সমস্ত ধন-সম্পদ চাননি। সমস্ত ধন-সম্পদ চাইলে তা স্বভাবতঃই অপ্রিয় ও বোঝা মনে হতে পারত। তাই এই অল্প পরিমাণ অংশ সন্তুষ্টচিত্তে আদায় করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য।

وَيُخَوِّضُكُمْ فِي الْمَغَانِمِ শব্দটি **ضغن** এর বহুবচন। এর অর্থ গোপন বিদ্রোহ ও গোপন অপ্রিয়তা। এস্থলেও গোপন অপ্রিয়তা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করে দেয়া মানুষের কাছে স্বভাবতঃই

অপ্রিয় ঠেকে, যা সে প্রকাশ করতে না চাইলেও আদায় করার সময় টালবাহানা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ হয়েই পড়ে। আয়াতের সারমর্ম এই যে, যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদের কাছে সমস্ত ধন-সম্পদ চাইতেন, তবে তোমরা কার্পণ্য করতে। কৃপণতার কারণে যে অপ্রিয়ভাব তোমাদের অন্তরে থাকত, তা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়ত। তাই তিনি তোমাদের ধন-সম্পদের মধ্য থেকে সামান্য একটি অংশ তোমাদের উপর ফরয করেছেন। কিন্তু তোমরা তাতেও কৃপণতা শুরু করেছ। শেষ আয়াতে একথাই এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

تَذُنُّونَ لِقَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمُوتُونَ مِنْ بَيْنِكُمْ অর্থাৎ, তোমাদেরকে

তোমাদের ধন-সম্পদের কিছু অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করার দাওয়াত দেয়া হলে তোমাদের কেউ কেউ এতে কৃপণতা করে। এরপর বলা হয়েছে:

وَمَنْ يَخْلُفْكُمْ فَإِنَّمَا أَفْعَالُكُمْ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এতেও কৃপণতা

করে, সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করে না ; বরং এর মাধ্যমে সে নিজেরই ক্ষতি করে। কারণ, এতে করে সে পরকালের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হয় এবং ফরয তরক করার শাস্তির যোগ্য হয়। অতঃপর এই কথাটিই আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে : **وَاللَّهُ النَّصِيرُ وَالْفَقِيرُ** অর্থাৎ, আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। আল্লাহর পথে ব্যয় করা মানে স্বয়ং তোমাদের অভাব দূর করা। **وَأَنْ تَتَوَلَّوْا يَتَبَوَّلُوا وَفَاءً لَكُمْ**

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজের অভাবমুক্ততাকে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, তোমাদের ধন-সম্পদে আল্লাহ তাআলার কি প্রয়োজন থাকতে পারে, তিনি তো স্বয়ং তোমাদের অস্তিত্বেরও মুখাপেক্ষী নন। যদি তোমরা সবাই আমার বিধানাবলী পরিত্যাগ করে বস, তবে যতদিন আমি পৃথিবীকে এবং ইসলামকে বাকী রাখতে চাইব, ততদিন সত্যধর্মের হেফাজত এবং বিধানাবলী পালন করার জন্যে অন্য জাতি সৃষ্টি করব। তারা তোমাদের মত বিধানাবলীর প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না; বরং আমার পুরোপুরি আনুগত্য করবে। হযরত হাসান বসরী বলেন : ‘অন্য জাতি বলে অনারব জাতি বোঝানো হয়েছে।’ হযরত ইররামা বলেন : এখানে পারসিক ও রোমক জাতি বোঝানো হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (সঃ) যখন সাহাবায়ে কেরামের সামনে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, তখন তাঁরা আরব করলেন : ইয়া রসুলুল্লাহ! (সঃ), তারা কোন জাতি, যাদেরকে আমাদের স্থলে আনা হবে, অতঃপর তারা আমাদের মত শরীয়তের বিধানাবলীর প্রতি বিমুখ হবে না? রসুলুল্লাহ (সঃ) মজলিসে উপস্থিত হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ)—এর উক্তিতে হাত ঘেরে বললেন : সে এবং তাঁর জাতি। যদি সত্য ধর্ম সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্রেরও থাকত, (যেখানে মানুষ পৌঁছতে পারে না,) তবে পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক সেখানেও পৌঁছে সত্যধর্ম হাসিল করতো এবং তা মেনে চলত। — (তিরমিযী, হাকেম, মায়হারী)

শায়খ জালালুদ্দীন সুহূতী ইমাম আবু হানীফার প্রশংসায় লিখিত গ্রন্থে বলেন, আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহচরদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য সন্তান। কোন দলই জানের সেই স্তরে পৌঁছেনি, যেখানে আবু হানীফা ও তাঁর সহচরগণ পৌঁছেছেন। — (তফসীরে—মায়হারীর প্রাস্ত-টাকা)

সূরা আল-ফাতহ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ
 مَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا
 وَيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي
 قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُؤْذِنُوا لِلْإِيمَانِ أَتَمْرَأَتِهِمْ وَلِلَّهِ جُودُ
 السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيَدْخُلَ
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنَ الْجَنَّةِ الْكُنُوزِ
 فِيهَا وَبُيُوتٌ مُتَشَابِهَةٌ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ قُورًا
 عَظِيمًا وَبُيُوتٌ مُتَشَابِهَةٌ وَبُيُوتٌ مُتَشَابِهَةٌ وَ
 الْبُيُوتُ الْخَالِقِينَ بِاللَّهِ قُلْ لِلَّهِ عِلْمُ الْغُيُوبِ وَاللَّهُ
 عَزِيزٌ عَلِيمٌ وَلَعَلَّكُمْ وَاعِدَ لَكُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
 وَلِلَّهِ جُودُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
 رَبُّهُمْ وَهُمْ مُوقِنُونَ وَهُمْ مُوقِنُونَ وَهُمْ مُوقِنُونَ ①

সূরা আলফাতহ

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত ২৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহর নামে।

- (১) নিচয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট (২) যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ক্রটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (৩) এবং আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য। (৪) তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাথিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এক আল্লাহর সর্জক, প্রজাময়। (৫) ঈমান এজন্যে বেড়ে যায়, যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে জন্মাতো প্রবেশ করান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেখান তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং যাতে তিনি তাদের পাপ মোচন করেন। এটাই আল্লাহর কাছে মহাসাফল্য। (৬) এবং যাতে তিনি কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারী এবং অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদিনী নারীদেরকে শাস্তি দেন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। তাদের জন্য মন্দ পরিণাম। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাদেরকে অতিশয় করেছেন। এবং তাহাদের জন্যে জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল অত্যন্ত মন্দ। (৭) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজাময়। (৮) আমি আপনাকে জেরণ করেছি অবস্থা ব্যক্তকারীরূপে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে, (৯) যাতে তোমরা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর।

অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের মতে সূরা ফাতহ বষ্ট হিজরীতে অবতীর্ণ হয়, যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) ওমরার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে মক্কা আকরমরা তশরীফ নিয়ে যান এবং হেরেমের সন্নিহিত হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে অবস্থান গ্রহণ করেন। মক্কার কাকেররা তাঁকে মক্কা প্রবেশে বাধা দান করে। অতঃপর তারা এই শর্তে সন্ধি করতে সম্মত হয় যে, এ বছর তিনি মদীনায় ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর এই ওমরার কায্য করবেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকেই বিশেষতঃ হযরত ওমর (রাঃ) এ ধরনের সন্ধি করতে অসম্মত ছিলেন। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সাঃ) খোদায়ী ইঙ্গিতে এই সন্ধিকে পরিণামে মুসলমানদের জন্যে সাফল্যের উপায় মনে করে গ্রহণ করে নেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন ওমরার এহরাম খুলে হুদায়বিয়া থেকে ফেরত রওয়ানা হলেন, তখন পশ্চিমধ্যে এই পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর স্বপ্ন সত্য এবং অবশ্যই বাস্তবরূপ লাভ করবে। কিন্তু তার সময় এখনও হয়নি। পরে মক্কা বিজয়ের সময় এই স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করে। এই সন্ধি প্রকৃতপক্ষে মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছিল। তাই একে “প্রকাশ্য বিজয়” বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ ও অপর কয়েকজন সাহাবী বলেন : তোমরা মক্কা বিজয়কে বিজয় বলে থাক; কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বিজয় মনে করি। হযরত জাবের বলেন : আমি হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বিজয় মনে করি। হযরত বারা ইবনে আযেব বলেন : তোমরা মক্কা বিজয়কেই বিজয় মনে কর এবং নিঃসন্দেহে তা বিজয় ; কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার ঘটনায় ‘বয়াতে-রিয়ওয়ান’ কেই আসল বিজয় মনে করি। এতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) একটি বৃক্ষের নীচে উপস্থিত চৌদশত সাহাবীর কাছ থেকে জেহাদের শপথ নিয়েছিলেন। এ সূরায় বরাবরের আলোচনাও করা হয়েছে। (ইবনে কাসীর)

হুদায়বিয়া : হুদায়বিয়া মক্কার বাইরে হেরেমের সীমানার সন্নিহিত অবস্থিত একটি স্থানের নাম। আজকাল এই স্থানটিকে “শায়ীসা” বলা হয়। ঘটনাটি এই স্থানেই ঘটে।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর স্বপ্ন : আবদ ইবনে হুমায়দ, ইবনে জরীর, বায়হাকী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনার এক অংশ এই যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় স্বপ্ন দেখলেন তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ মক্কায নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে প্রবেশ করছেন এবং এহরামের কাজ সমাপ্ত করে কেউ কেউ নিয়মানুযায়ী মাথা মুণ্ডন করেছেন, কেউ কেউ চুল কাটিয়েছেন এবং তিনি বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছেন ও বায়তুল্লাহর চাবি তাঁর হস্তগত হয়েছে। এটা সূরায় বর্ণিত ঘটনার একটা অংশ। পয়গম্বরগণের স্বপ্ন ওই হয়ে থাকে। তাই স্বপ্নটি যে বাস্তবরূপ লাভ করবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এই ঘটনার কোন সন, তারিখ বা মাস নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নটি মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিফলিত হওয়ার ছিল। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন সাহাবায়ে কেরামকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনালেন, তখন তাঁরা সবাই পরম আগ্রহের সাথে মক্কা যাওয়ার প্রস্ততি শুরু করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরামের প্রস্ততি দেখে রসুলুল্লাহ (সাঃ) —ও ইচ্ছা করে ফেললেন। কেননা, স্বপ্নে কোন বিশেষ সাল অথবা মাস নির্দিষ্ট ছিল না। কাজেই এই মুহূর্তেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। — (বয়ানুল কোরআন)

সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ও আনুগত্যের আরও একটি পরীক্ষা : পূর্বেই বলা হয়েছে, সন্ধির শর্তাবলী এবং ওমরা ব্যতিরেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে দুঃসহ ছিল। অন্য সাধারণ ঈমানের বলেই তাঁরা এসব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে রসুলের (সাঃ) আনুগত্যে অটল ও অনড় থাকতে পেরেছিলেন। হৃদয়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) - 'কুরা গাযীম' নামক স্থানে পৌছেন, তখন আলোচ্য 'সূরা ফাতহ' অবতীর্ণ হয়। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে সূরাটি পাঠ করে শুনালেন। তাদের অন্তর পূর্বেই আহত ছিল। এমতাবস্থায় সূরায় একে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দেয়ায় হযরত ওমর (রাঃ) আবার প্রশ্ন করে বলেন : ইয়া রসুলুল্লাহ! এটা কি বিজয়? তিনি বললেন : যার হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার কসম, এটা প্রকাশ্য বিজয়। এই ভাষ্যের সামনেও সাহাবায়ে কেরাম মাথা নত করে নিলেন এবং গোটা পরিস্থিতিকে প্রকাশ্য বিজয় মেনে নিলেন।

হৃদয়বিয়া সন্ধির ফলাফল ও কল্যাণের বিকাশ : এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম প্রতিক্রিয়া এই প্রকাশ পায় যে, কোরাইশ ও তাদের অনেক অনুসারীদের সামনে তাদের অন্যায় জেদ ও হঠকারিতা ফুটে উঠে এবং তাদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। বুদায়েল ইবনে ওয়্যারাক এবং ওরওয়া ইবনে মসউদ আপন আপন দল নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ সাহাবায়ে কেরামের নজীরবিহীন আত্মনিবেদন ও রসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর প্রতি তাদের অনুশ্রম অনুরাগ, সম্প্রদায় ও আনুগত্য দেখে কোরাইশরা ভীত হয়ে যায় এবং সন্ধি করতে সম্মত হয়। অথচ তাদের জন্যে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার এই চাইতে উত্তম সুযোগ আর ছিল না। কেননা, তারা নিজেদের বাড়ী-ঘরে ছিল এবং মুসলমানগণ ছিলেন প্রবাসী। পানির জায়গাগুলো তাদের অধিকারে ছিল। মুসলমানগণ ছিলেন ঘাস পানিবিহীন প্রান্তরে। তাদের পূর্ণ রণশক্তি ছিল। মুসলমানদের কাছে তেমন অশস্ত্র-শস্ত্রও ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। তাদের দলের অনেক লোক রসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর সাথে সাক্ষাত ও মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে অনেকের অন্তরে ইসলাম ও ঈমান আসন করে নেয় এবং তারা মুসলমান হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ সন্ধি ও শান্তি স্থাপনের কারণে পথচাট নিরাপদ হয়ে যায় এবং ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে সকল বাধা অপসারিত হয়। আরব গোত্রসমূহের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল রসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পায়। রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম আরবের কোণে কোণে ইসলামের দাওয়াত পৌছিয়ে দেন। বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর নামে ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন বড় বড় বাদশাহ ইসলাম গ্রহণ করেন। এসব কার্যক্রমের ফল এই দাঁড়ায় যে, হৃদয়বিয়ার ঘটনায় রসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর ব্যাপক দাওয়াত ও ওমরার জন্যে বের হওয়ার তাকীদ সত্ত্বেও যেখানে দেড় হাজারের বেশী মুসলমান সঙ্গে ছিল না, সেখানে হৃদয়বিয়ার সন্ধির পর দলে দলে লোক ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এই সময়েই সপ্তম হিজরীতে খায়বর বিজিত হয়, যার ফলে বিপুল পরিমাণে সমরোপকরণ হস্তগত হয় এবং মুসলমানদের সমরশক্তি সুসংহত হয়। সন্ধির পর দুই বছর অতিক্রান্ত না হতেই মুসলমানদের সংখ্যা এত বেড়ে যায়, যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এরই ফলস্বরূপ কোরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তিভঙ্গের দরুন যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) গোপনে মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করেন, তখন সন্ধির মাত্র বিশ একুশ মাস পরে তাঁর সাথে মক্কাগমনকারী আত্মনিবেদিত মুসলমান সিপাহীদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। সর্বোদ পেয়ে কোরাইশরা উদ্ভিগ্ন হয়ে চুক্তি নবায়নের জন্যে

তড়িঘড়ি আবু সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করল। রসুলুল্লাহ (সাঃ) চুক্তি নবায়ন করলেন না এবং অবশেষে দশ হাজারের খোদায়ী লশকর সাথে নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। কোরাইশরা এত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, মক্কায় তেমন কোন যুদ্ধের প্রয়োজনই হয়নি। রসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর দূরদর্শী রাজনীতিও কিছুটা যুদ্ধ না হওয়ার পক্ষে সহায়তা করেছিল। তিনি মক্কায় ঘোষণা করে দেন যে, যে ব্যক্তি গৃহের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। এভাবে সব মানুষ নিজ নিজ চিন্তায় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধের তেমন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। এ কারণেই মক্কা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, না যুদ্ধের মাধ্যমে - এ বিষয়ে ফেকাহশাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মোটকথা, অতি সহজেই মক্কা বিজিত হয়ে যায়। রসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর স্বপ্ন বাস্তব ঘটনা হয়ে দেখা দেয়। সাহাবায়ে কেরাম নিশ্চিন্তে বায়তুল্লাহর তওয়াফ, মাথা মুগুনো ও চুল কাটেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদেরকে নিয়ে বায়তুল্লাহ প্রবেশ করেন। বায়তুল্লাহর চাবি তাঁর হস্তগত হয়। এ সময় তিনি বিশেষভাবে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবকে এবং সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে সম্ভাষণ করে বলেন : এই ঘটনাই আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম। এরপর বিদায় হজ্জের সময় রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওমরকে (রাঃ) বলেন : এই ঘটনাই আমি তোমাকে বলেছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন : নিঃসন্দেহে কোন বিজয় হৃদয়বিয়ার সন্ধির চাইতে উত্তম ও মহান নয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তো পূর্ব থেকেই একথা বলতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টি আল্লাহ ও রসুলের (সাঃ) মধ্যকার এই মীমাংসিত সত্য পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। তারা স্বপ্নের দ্রুত বাস্তবায়ন কামনা করত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বাদীদের দ্রুততা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে দ্রুততা অবলম্বন করেন না, বরং তাঁর প্রত্যেক কাজ যথার্থ সময়েই সম্পন্ন হয়। তাই 'সূরা ফাতহে' আল্লাহ তাআলা হৃদয়বিয়ার ঘটনাকে প্রকাশ্য বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। হৃদয়বিয়ার সন্ধির এসব গুরুত্বপূর্ণ অংশ জানার পর পরবর্তী আয়াতসমূহ বোঝা সহজ হবে। এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

يَسْمُوكَ اللَّهُ تَسْمُوكَ مَنْ ذَلِكُمْ وَاتَّكَاتُوا

কে لام প্রথমেই কারণ বর্ণনার জন্যে ধরা হলে এর সারমর্ম এই হবে যে, আয়াতে বর্ণিত তিনটি অবস্থা অর্জিত হওয়ার জন্যে আপনাকে প্রকাশ্য বিজয়দান করা হয়েছে। তিনটি অবস্থা এই : (এক) আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ গোনাহ মাফ করা। সূরা মুহাম্মদে প্রথমে বর্ণিত হয়েছে যে, পয়গম্বরগণ গোনাহ থেকে পবিত্র। তাঁদের বেলায় কোরআনে যেখানে সেখানে ذنب অথবা عَصِيَان (গোনাহ) শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, তা তাঁদের উচ্চমর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তমের বিপরীত কাজ করার জন্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। নবুওয়তের উচ্চ মর্যাদার দিক দিয়ে অনুত্তম কাজ করাও একটি ত্রুটি যাকে কোরআনে শাসনোত্তর ভঙ্গিতে ذنب তথা গোনাহ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। ما تقدم বলে নবুওয়তের পূর্ববর্তী ত্রুটি এবং ما تأخر বলে নবুওয়ত লাভের পরবর্তী ত্রুটি বোঝানো হয়েছে, - (মামহারী)। প্রকাশ্য বিজয় এই ক্ষমার কারণ এজন্যে যে, এক প্রকাশ্য বিজয়ের ফলে দলে দলে লোক ইসলামে দাখিল হবে। ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপক আকার লাভ করা রসুলুল্লাহ (সাঃ) -এর জীবনের মহান লক্ষ্যকে সমুন্নত করবে এবং তাঁর সওয়াব ও প্রতিদানকে বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, সওয়াব ও প্রতিদান বেড়ে যাওয়া ত্রুটি মার্জনার কারণ হয়ে থাকে। - (বয়ানুল-কোরআন)

وَهَيْبِكَ صَرَاحَاتُهَا এটা প্রকাশ্য বিজয়ের দ্বিতীয় কল্যাণ।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) তো পূর্ব থেকেই ‘সিরাত-মুস্তাকীম’ তথা সরল পথে ছিলেন এবং শুধু তিনিই নন বরং বিশ্ববাসীকে এই সরল পথের দাওয়াত দেয়াই ছিল তাঁর জীবনের মহান ভ্রত। অতএব, হিজরতের ষষ্ঠ বর্ষে প্রকাশ্য বিজয়ের মাধ্যমে সরল পথ পরিচালনা করার মানে কি? এই প্রশ্নের জওয়াব সূরা ফাতেহা’র তফসীরে হেদায়াত শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, হেদায়েত একটি ব্যাপক শব্দ। এর অসংখ্য স্তর আছে। কারণ, হেদায়েতের অর্থ অতীষ্ট মনষিলের পথ দেখানো অথবা সেখানে পৌঁছানো। প্রত্যেক মানুষের আসল অতীষ্ট মনষিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টির অসংখ্য ও অসংগত স্তর আছে। এক স্তর অর্জিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অর্জনের আবশ্যিকতা বাকী থাকে। কোন বৃহত্তম ওলী এমনকি নবী-রসূলও এই আবশ্যিকতা থেকে মুক্ত হতে পারেন না। এ কারণেই নামাযের প্রত্যেক রাকআতে **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ** বলে দোয়া করার শিক্ষা যেমন উম্মতকে দেয়া হয়েছে, তেমনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ)-কেও দেয়া হয়েছে। এর সারমর্ম হচ্ছে সিরাত-মুস্তাকীমের হেদায়েত তথা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টির স্তরসমূহে উন্নতি লাভ করা। এই প্রকাশ্য বিজয়ের কারণে আল্লাহ তাআলা এই নৈকট্য ও সন্তুষ্টিরই একটি অত্যুচ্চ স্তর রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দান করেছেন, যাকে **هَيْبِكَ** শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَيُسْرَىٰ لَكُمْ تَسْوِيرَاتُهَا এটা প্রকাশ্য বিজয়ের তৃতীয় নেয়ামত।

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার যে সাহায্য ও সমর্থন আপনি চিরকাল লাভ করে এসেছেন, এই প্রকাশ্য বিজয়ের ফলস্বরূপ তা একটি মহান স্তর আপনাকে দান করা হয়েছে।

সূরার প্রথম তিন আয়াতে এই প্রকাশ্য বিজয়ের ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রদত্ত বিশেষ নেয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। হুদাযবিয়ার সফর সঙ্গী কয়েকজন সাহাবী আরম্ভ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ! এসব নেয়ামত তো আপনার জন্যে। এগুলো আপনার জন্যে যোবারক হক, কিন্তু আমাদের জন্যে কি? এরই পরিশ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াতে সরাসরি হুদাযবিয়ার উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নেয়ামত যেহেতু ঈমান ও রসূলের (সঃ) আনুগত্যের কারণ হয়েছে, তাই এগুলোতে সব মুমিনও শামিল। কারণ, যে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের পূর্ণতা লাভ করবে, সে-ই এসব নেয়ামতের যোগ্য পাত্র হবে।

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর উম্মতকে বিশেষ করে বয়াতে রিয়ওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদেরকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এসব নেয়ামত দানকারী ছিলেন আল্লাহ এবং দানের মাধ্যম ছিলেন রসূলুল্লাহ (সঃ)। তাই এর সাথে মিল রেখে আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ ও রসূলের হক এবং তাঁদের প্রতি সম্মান ও সন্ত্রম প্রদর্শনের কথা বলা হচ্ছে। প্রথমে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সম্বোধন করে তাঁর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে — **نَذِيرٌ مَّبَشِّرٌ شَاهِدٌ**

শব্দের অর্থ সাক্ষী। এর উদ্দেশ্য তাই যা সূরা নেসার

كَذِيبَتْ إِذَا جَاءَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ نَذِيرٌ وَجِئْنَاكَ مِنْ كُلِّ قَوْمٍ بِشَهِيدٍ আয়াতের

তফসীরে দ্বিতীয় ঋণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মত সম্পর্কে সাক্ষী দিবেন যে, তিনি আল্লাহর পয়গাম তাদের কাছে পৌঁছে

দিয়েছেন। এরপর কেউ আনুগত্য করেছে এবং কেউ নাকরমানী করেছে। এমনভাবে নবী করীম (সঃ) ও তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন। সূরা নেসার আয়াতের তফসীরে কুরতুবী লিখেন : পয়গম্বরগণের এই সাক্ষ্য নিজ নিজ যমানার লোকদের সম্পর্কে হবে যে, তাঁদের দাওয়াত কে কবুল করেছে এবং কে বিরোধিতা করেছে। এমনভাবে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাক্ষ্য তাঁর আমলের লোকদের সম্পর্কে হবে। কেউ কেউ বলেন, এই সাক্ষ্য সমস্ত উম্মতের পুণ্য ও পাপকাজ সম্পর্কে হবে। কেননা, কোন কোন রেওয়াজে থেকে জানা যায় যে, উম্মতের ক্রিয়াকর্ম সকাল-সন্ধ্যায় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে পেশ করা হয়। কাজেই তিনি সমস্ত উম্মতের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে অবহিত হবেন। — (কুরতুবী)

بَشِيرٍ শব্দের অর্থ সুসংবাদদাতা এবং نَذِيرٍ শব্দের অর্থ সতর্ককারী। উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) উম্মতের আনুগত্যশীল মুমিনদেরকে জন্মান্তর সুসংবাদ দিবেন এবং কাকের পাশাচারীদেরকে আঘাবের ব্যাপারে সতর্ক করবেন। অতঃপর রসূল প্রেরণের লক্ষ্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। ঈমানের সাথে আরও তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা ঈমানদারদের মধ্যে থাকা বিষয়ে — **نُذِيرٌ مَّبَشِّرٌ** এবং **شَهِيدٌ** শব্দটি تعزیر ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সাহায্য করা। দণ্ডকেও এ কারণে تعزیر বলা হয় যে, অপরাধীকে দণ্ড দিলে প্রকৃতপক্ষে তাকে সাহায্য করা হয়। — (মুফরাদাতুল-কোরআন)

نُذِيرٌ শব্দটি تَوْفِيرٍ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সম্মান করা। **شَهِيدٌ** শব্দটি تَسْبِيح ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পবিত্রতা বর্ণনা করা। সর্বশেষ শব্দটি নিশ্চিতরূপে আল্লাহর জন্যেই হতে পারে। তাই এর সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বোঝানোর সম্ভাবনা নেই। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারাও আল্লাহকেই বুঝিয়েছেন। অর্থ এই যে, বিশ্বাস স্থাপন কর এবং আল্লাহকে অর্থাৎ, তাঁর দ্বীনকে ও রসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর ও তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর। কেউ কেউ প্রথমোক্ত দুই বাক্যের সর্বনাম দ্বারা রসূলকে বুঝিয়ে এরূপ অর্থ করেন যে, রসূলকে সাহায্য কর, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর এবং আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর। কিন্তু কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন যে, এতে সর্বনামসমূহের বিভিন্নতা জরুরী হয়ে পড়ে, যা অলংকার শাস্ত্রের নীতি বিরুদ্ধ। এরপর হুদাযবিয়ার ঘটনার দশম অংশে বর্ণিত বয়আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন : যারা রসূলুল্লাহ (সঃ) — এর হাতে বয়আত করেছে, তারা যেন স্বয়ং আল্লাহর হাতে বয়আত করেছে। কারণ, এই বয়আতের উদ্দেশ্য আল্লাহর আদেশ পালন করা ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। কাজেই তারা যখন রসূলের হাতে হাত রেখে বয়আত করল, তখন যেন আল্লাহর হাতেই বয়আত করল। আল্লাহর হাতের স্বরূপ কারও জানা নেই এবং জানার চেষ্টা করাও দূরন্ত নয়।

বয়আতের আসল অর্থ কোন বিশেষ কাজের জন্যে শপথ গ্রহণ করা। একজন অপরজনের হাতের উপর হাত রেখে শপথবাণী উচ্চারণ করা বয়আতের প্রাচীন ও মনুহীন তরিকা। তবে হাতের উপর হাত রাখা শর্ত বা জরুরী নয়। যে কাজের অঙ্গীকার করা হয়, তা পূর্ণ করা আইনভঃ ওয়াজেব এবং রিকদ্বাচরণ করা হারাম। তাই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি বয়আতের অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, সে নিজেরই কতি করবে। এতে আল্লাহ ও রসূলের কোন কতি হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন।

قُلْ لِلْمُكَلِّفِينَ مِنَ الزَّكَاةِ سُدُورٌ إِلَى قَوْمِهِمْ أُولَىٰ تَأْسِ
 شِدِيدٍ نَفَاتٍ لَّوْ تَهْمُ وَتُسَيِّمُونَ وَإِنْ يُطِيعُوا رَبَّكَ اللَّهُ أَجْرًا
 حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يَحْدِثْ لَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ①
 لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَصِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرْيُوسِ
 حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتُ الْجَنَّةِ مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ وَمِنْ تَحْتِهَا نَافُوسٌ كَثِيرَةٌ سَاطِئَاتٌ فِيهَا الْأَنْفُسُ الَّتِي
 كَانَتْ تَكْفُرُ ② فَاتَّخَذَ اللَّهُ لِكُلِّ قَوْمٍ سَبِيلًا ③ وَمَعْلَمٌ كَثِيرٌ
 يَأْخُذُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ④ وَعَدَّ اللَّهُ مَعَاصِمَ
 كَثِيرَةً تَأْخُذُ بِهَا فَحَسَلْ لَكُمْ هَذِهِ وَكَتَبَ آيَاتِ الْتَّاسِ
 عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ⑤
 وَالْآخِرَىٰ لَكُمْ تَقْدِيرٌ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ⑥ وَلَوْ قَاتَلَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كُفِّرُوا
 الْآبَارَ لَمْ يَزِدْكُمْ مِنْهُنَّ وَلَا تُصِغُوا ⑦ سَنَّةَ اللَّهِ الَّتِي
 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ⑧

(১৬) গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন : আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহূত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। আর যদি পৃষ্ঠপদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠপদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। (১৭) অন্ধের জন্যে, খঞ্ঝের জন্যে ও রুমূহুর জন্যে কোন অপরাধ নাই এবং যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করবে তাকে তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠপদর্শন করবে, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। (১৮) আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আশ্রয় নিয়ে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (১৯) এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২০) আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্যে হ্রাসিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্ধ করে দিয়েছেন – যাতে এটা মুমিনদের জন্যে এক নির্দশন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (২১) আরও একটি বিজয় রয়েছে যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি, আল্লাহ তা বেঁটন করে আছেন। আল্লাহ সববিষয়ে ক্ষমতাবান। (২২) যদি কাম্বেররা তোমাদের মোকাবিলা করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপদর্শন করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। (২৩) এটাই আল্লাহর রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না।

বোঝানো হয়েছে। এভাবে কোরআনে খয়বর বিজয় ও তার যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হ্রাসবিহীন অংশগ্রহণকারীদের পাওয়ার কথা এসে গেছে। এটাই “আল্লাহর কলাম” ও “আল্লাহর উক্তি” অর্থ হতে পারে। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, এই আয়াতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা তো আছে; কিন্তু একথা কোথাও বলা হয়নি যে, এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হ্রাসবিহীন অংশগ্রহণকারীরাই বিশেষভাবে পাবে, অন্যেরা পাবে না। এই বৈশিষ্ট্যের কথা নিঃসন্দেহে হাদীস দ্বারা জানা গেছে। অতএব, “আল্লাহর কলাম” ও আল্লাহর উক্তি বলে এখানে হাদীসই বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, “আল্লাহর কলাম” বলে সূরা তওবার এই আয়াতকে বোঝানো হয়েছেঃ

فَاسْتَأْذَنُوا لِلْمَغْرُورِ فَقُلْ مَنْ غَرَّكُمْ إِنِّي أَبَدًا وَلَنْ تَنَالُوا مَوِيَّ

عَذَابُكُمْ رَضِيحًا لِّلْمَغْرُورِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

তাদের এই উক্তি শুদ্ধ নয়। কারণ, এই আয়াতগুলো তাবুক যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যার সময়কাল খয়বর যুদ্ধের পর নবম হিজরী।—(কুরতুবী)

قُلْ لَنْ تَنَالُوا — এতে হ্রাসবিহীন থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদেরকে তাকীদ সহকারে বলা হয়েছেঃ তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। এই উক্তি বিশেষভাবে খয়বর যুদ্ধের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। ভবিষ্যতে অন্য কোন জেহাদেও শরীক হতে পারবে না— আয়াত থেকে এটা মনে করা জরুরী নয়। এ কারণেই পশ্চাতে অবস্থানকারীদের মধ্য থেকে মুযাযনা ও জোহামনা গোত্রদ্বয় পরবর্তীকালে রসুলুল্লাহ (সাঃ)–এর সঙ্গী হয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।—(রাজহ-মা’আনী)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হ্রাসবিহীন সফর থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কেউ কেউ পরে তওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল : হ্রাসবিহীন সফর থেকে যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল, তাদের সবাইকে খয়বরের জেহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল অথচ তাদের মধ্যে সবাই মুনাফিক ছিল না। কেউ কেউ মুসলমানও ছিল। কেউ কেউ যদিও তখন মুনাফিক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা সাক্ষাৎ ইমানদার হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। তাই এ ধরনের লোকদের সন্তুষ্টির জন্যে পরবর্তী আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী খয়বর যুদ্ধ হ্রাসবিহীন অংশগ্রহণকারীদের জন্যেই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যারা খাঁটি মুসলমান এবং মনে-প্রাণে জেহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যেও ভবিষ্যতে আরও সুযোগ-সুবিধা আসবে। এসব সুযোগের কথা কোরআন পাক একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে বর্ণনা করেছে, যা রসুল করীম (সাঃ)–এর ইন্তেকালের পর প্রকাশ পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ سُدُورٌ

إِلَىٰ قَوْمِهِمْ أُولَىٰ تَأْسِ, এক সময় আসবে, যখন তোমাদের—

কে জেহাদের দাওয়াত দেয়া হবে। এই জেহাদ একটি শক্তিশালী যোদ্ধাজাতির সাথে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই জেহাদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)–এর জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়নি। কেননা, প্রথমতঃ এরপর তিনি কোন যুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন বলে প্রমাণ নেই, দ্বিতীয়তঃ এরপর এমন কোন বীর যোদ্ধা জাতির সাথে মোকাবেলাও হয়নি, যাদের

বীরত্বের উল্লেখ কোরআন পাক করেছে। তাবুক যুদ্ধে যদিও যোদ্ধাজাতির সাথে মোকাবেলা ছিল; কিন্তু এই যুদ্ধে মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দেয়ার প্রমাণ নেই এবং এতে কোন যুদ্ধও সংঘটিত হয়নি। আল্লাহ তাআলা প্রতিপক্ষের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। ফলে তারা সম্পূর্ণ সমরে অবতীর্ণ হয়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কোরাম বিনা যুদ্ধে তাবুক থেকে ফিরে আসেন। হুন্য়ান যুদ্ধেও মরুবাসীদেরকে দাওয়াত দেয়ার প্রমাণ নেই এবং তখন কোন সশস্ত্র ও বীর যোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে মোকাবেলাও ছিল না। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, আয়াতে পারস্য ও রোম অর্থাৎ, কেসরা ও কায়সরের জাতিসমূহ বোঝানো হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর আমলে জেহাদ হয়েছে। — (কুরতুবী)

হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলেন : আমরা কোরআনের এই আয়াত পাঠ করতাম : কিন্তু আমাদের জানা ছিল না যে, এখানে কোন জাতিকে বোঝানো হয়েছে। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইস্তেকালের পর হযরত আবুবকর সিদ্দীকের (রাঃ) খেলাফতকালে তিনি আমাদেরকে বনী-হুন্য়াক ও মোসায়লামা কাযাবাবের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করার দাওয়াত দেন। তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, উক্ত আয়াতে এই জাতিকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এই দু'টি উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ ও পৈরিত্য নেই। পরবর্তীকালের শক্তিশালী সকল প্রতিপক্ষই এর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী এই রেওয়াজে উদ্ধৃত করার পর বলেন : হযরত সিদ্দীকে আকবর ও ফারুকে আযমের (রাঃ) খেলাফত যে সত্যের অনুকূলে ছিল, এ আয়াত তার প্রমাণ। আলোচ্য আয়াতে স্বয়ং কোরআন তাঁদের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করেছে।

حَتَّىٰ يَسْلُمُوا وَيُؤْتُوا زَكَاةً وَيَسَبِّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ فِي حُكُومِهِمْ وَأَسَاجِدِهِمْ هযরত উবাই এর কেরাআতে يَسْلُمُوا বাবা হয়েছে। তদনুযায়ী কুরতুবী বা অব্যয়কে حتى এর অর্থে ধরেছেন। অর্থাৎ, সেই জাতির সাথে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা আনুগত্যশীল হয়ে যায়, ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে।

لَيْسَ عَلَى الْكَافِرِينَ فِي حَرْبِ اللَّهِ جُنَاحٌ وَلَا عَذَابٌ هযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, উপরের আয়াতে যখন জেহাদে অংশগ্রহণ পঞ্চাশপদদের জন্যে শাস্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে, তখন সাহাবায়ে কোরামের মধ্যে কতক বিকলাঙ্গ লোক চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁরা জেহাদে অংশগ্রহণ করার যোগ্য নন। ফলে তারাও নাকি এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে অন্ধ, বধির ও রুগ্নকে জেহাদের আদেশের আওতাবহির্ভূত করে দেয়া হয়েছে। — (কুরতুবী)

لَقَدْ رَوَى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ এখানে হুদায়বিয়ার শপথ বোঝানো হয়েছে। ইতিপূর্বেও الْاِيْمَانِ يُبَايِعُونَكَ আয়াতে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতও তারই তাকিদ। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি স্বীয় সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন। এ কারণেই একে “বাইয়াতে-রিখওয়ান” তথা সন্তুষ্টির শপথও বলা হয়। এর উদ্দেশ্য শপথে অংশগ্রহণকারীদের প্রশংসা করা এবং তাদেরকে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি জোর তাকীদ করা। বোখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়ার দিনে আমাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দশত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে

বলেছিলেন — انتم خير اهل الارض অর্থাৎ, তোমরা ভূপৃষ্ঠের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সহীহ মুসলিমে উম্মে বাশার থেকে বর্ণিত আছে, من بايع تحت الشجرة لا يدخل النار অর্থাৎ, যারা এই বৃক্ষের নীচে শপথ করেছে, তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। — (মাযহারী) তাই এই শপথে অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অনুলূপ হয়ে গেছে। তাঁদের সম্পর্কে যেমন কোরআন ও হাদীসে খোদায়ী সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ বর্ণিত রয়েছে, তেমনি হুদায়বিয়ার শপথে অংশগ্রহণকারীদের জন্যেও এরূপ সুসংবাদ উল্লেখিত আছে।

এসব সুসংবাদ সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁদের সবার খাতেমা অর্থাৎ, জীবনাবসান ইমান ও পছন্দনীয় সংকর্মের উপরে হবে। কেননা, খোদায়ী সন্তুষ্টির এই ঘোষণা এ বিষয়েরই নিশ্চয়তা দেয়।

সাহাবায়ে কোরামের প্রতি দোষারোপ এবং তাঁদের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক করা এই আয়াতের পরিপন্থী : তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা যেসব সন্মানিত ব্যক্তি সম্পর্কে ক্ষমা ও মাগফিরাতের ঘোষণা দিয়েছেন, যদি তাঁদের তরফ থেকে কোন ভুল-ত্রুটি অথবা গোনাহ হয়েও যায়, তবে এই আয়াত তাঁদের ক্ষমা ঘোষণা করছে। এমতাবস্থায় তাঁদের যেসব কর্মকাণ্ড প্রশংসনীয় ও উত্তম নয়, সেগুলোকে আলোচনা ও বিতর্কের লক্ষ্যবস্তুর পরিণত করা দুর্ভাগ্যজনক এবং এই আয়াতের পরিপন্থী। রাফেযী সম্প্রদায় হযরত আবুবকর, ওমর ও অন্যান্য সাহাবীর প্রতি কুফর-নিফাকের দোষ আরোপ করে। আলোচ্য আয়াত ওদের সেসব ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করে।

রিখওয়ান বৃক্ষ : আয়াতে যে বৃক্ষের উল্লেখ আছে, সেটা ছিল একটা বাবলা বৃক্ষ। কথিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর কিছু লোক সেখানে গমন করত এবং এই বৃক্ষের নীচে নামায আদায় করত। হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) দেখলেন যে, তব্রিযাতে অজ্ঞ লোকেরা পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় এই বৃক্ষের পূজা শুরু করে দিতে পারে। এই আশঙ্কায় তিনি বৃক্ষটি কেটে ফেলেন। কিন্তু বোখারী ও মুসলিমের রেওয়াজে হযরত তারেক ইবনে আবদুর রহমান বলেন : আমি একবার হজ্জে যোগ্যর পথে এক জায়গায় কিছু সংখ্যক লোককে একত্রিত হয়ে নামায পড়তে দেখলাম। তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম : এটা কোন মসজিদ? তারা বলল : এটা সেই বৃক্ষ, যার নীচে রসূলুল্লাহ (সাঃ) রিখওয়ানের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। আমি অতঃপর সাল্লাই ইবনে মুসাইয়্যিবের কাছে উপস্থিত হয়ে এই ঘটনা বিবৃত করলাম। তিনি বললেন : আমার পিতা বয়াতে-রিখওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন : আমরা যখন পরবর্তী বছর মক্কায় উপস্থিত হই, তখন অনেক খোজাখুজির পরও বৃক্ষটির সন্ধান পাইনি। অতঃপর সাযীদ ইবনে মুসাইয়্যিব বললেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ) —এর যেসব সাহাবী এই বয়াতে শরীক ছিলেন, তাঁরা তো এই বৃক্ষের সন্ধান পাননি, আর তুমি জেনে ফেলেছ। আশ্চর্যের বিষয় বটে। তুমি কি তাঁদের চাইতে অধিক জ্ঞাত? — (রুহুল-মা'আনী)

এ থেকে জানা গেল যে, পরবর্তীকালে লোকেরা নিছক অনুমানের মাধ্যমে কোন একটি বৃক্ষ নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল এবং তার নীচে জড়ো হয়ে নামায পড়া শুরু করেছিল। হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) একথাও জানতেন যে, এটা সেই বৃক্ষ নয়। তাই অবাস্তর নয় যে, তিনি শিরকের আশংকাবোধ করে সেই বৃক্ষটিও কর্তন করে ফেলেন।

খয়বর বিজয় : খয়বর প্রকৃতপক্ষে বহু জনপদ দুর্গ ও বাগ-বাগিচা সমন্বিত একটি বিশেষ এলাকার নাম। — (মাযহারী)

وَأَتَيْنَاهُمُ الْيَوْمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ عَسَاكِرَ خِزْيَانٍ وَأَتَيْنَاهُمُ الْيَوْمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ عَسَاكِرَ خِزْيَانٍ এই আসন্ন বিজয়ের অর্থ সর্বসম্মতভাবে খয়বর বিজয়। হৃদয়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর এই বিজয় বাস্তবরূপ লাভ করে। এক রেওয়াজে অনুযায়ী হৃদয়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় দশ দিন এবং অন্য এক রেওয়াজে অনুযায়ী বিশ দিন অবস্থান করেন। এরপর খয়বরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান। ইবনে ইসহাকের রেওয়াজে অনুযায়ী তিনি মিলহজ্ব মাসে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে খয়বর গমন করেন। সফর মাসে খয়বর বিজিত হয়। ওয়াযবেদীর মাগাহী অধ্যায়ে তাই বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজারের মতে এ অভিমতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। — (মাযহারী)

মোটকথা, প্রমাণিত হল যে, খয়বর বিজয়ের ঘটনা হৃদয়বিয়ার সফরের বেশ কিছুদিন পরে সংঘটিত হয়। সূরা ফাত্হ যে হৃদয়বিয়ার সফরকালে অবতীর্ণ হয়েছে এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। হু, এ বিষয়ের মতভেদ রয়েছে যে, সম্পূর্ণ সূরা তখনই নাথিল হয়েছিল, না কিছুসংখ্যক আয়াত পরে নাথিল হয়েছে। প্রথমোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহে খয়বরের আলোচনা ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে হয়েছে এবং ঘটনাটি যে আকাট্য ও নিশ্চিত — একথা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে শেষোক্ত অবস্থা সাব্যস্ত হলে আলোচ্য আয়াতসমূহ পরে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

وَمَعَالِمُ كُنُوزِهِمْ يَوْمَئِذٍ يَعْلَمُهَا قَلِيلٌ وَكَانَ اللَّهُ مُتَوَكِّلًا عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ مُتَوَكِّلًا عَلَيْهِمْ এতে খয়বরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বোঝানো হয়েছে, যুদ্ধারা মুসলমানদের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হয়।

وَعَلَّمَ اللَّهُ مَتَاعَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ مُتَوَكِّلًا عَلَيْهِمْ — এখানে কেয়ামত পর্যন্ত যেসব ইসলামী বিজয় ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জিত হবে,

সেগুলো বোঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত সম্পদ আল্লাহর নির্দেশে হৃদয়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যে দেয়া হয়েছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত সম্পদ সবার জন্যে ব্যাপক। এ থেকেই জানা যায় যে, বিশেষজ্ঞের আদেশ এসব আয়াতে উল্লেখ করা হয়নি; বরং তা পৃথক গুহীর মাধ্যমে রসুলুল্লাহ (সাঃ) —কে বলে দেয়া হয়েছিল। তিনি তা কর্মে পরিণত করেন এবং সাহাবায়ে কেরামের কাছে ব্যক্ত করেন।

وَكُنْتُ أَيْدِي الْمُنَافِقِينَ عَذَابًا আয়াতে খয়বরবাসী কাফের সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই জেহাদে অধিক শক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দেননি। ইমাম বগতী বলেন : গাতফান গোত্র খয়বরের ইহুদীদের মিত্র ছিল। রসুলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক খয়বর আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তারা ইহুদীদের সাহায্যার্থে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা চিন্তা করতে লাগল, যদি আমরা খয়বরে চলে যাই, তবে মুসলমানদের কোন লশকর আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের বাড়ী-ঘরে চড়াও হতে পারে। এই ভেবে তাদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। — (মাযহারী)

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مَا رِزْقَهُمْ نَزْلًا مِنْ سَحَابٍ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ وَكَانَ اللَّهُ جَوَادًا غَنِيًّا সরল পথের আমল এবং হেদায়েত তো তাদের পূর্বে থেকেই অর্জিত ছিল। কিন্তু পূর্বেও বলা হয়েছে যে, হেদায়েতের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এখানে সেই স্তর বোঝানো হয়েছে, যা অর্জিত ছিল না। অর্থাৎ, আল্লাহর উপর একান্ত নির্ভরশীলতা এবং ঈমানী শক্তির বৃদ্ধি।

وَأَخْرَىٰ لَهُمْ نَزْلًا عَلَيْهِمْ قَدْ لَحِظَ اللَّهُ فِيهَا وَأَخْرَىٰ لَهُمْ نَزْلًا عَلَيْهِمْ قَدْ لَحِظَ اللَّهُ فِيهَا অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে আরও অনেক বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যা এখনও তাদের ক্ষমতাসীন নয়। এসব বিজয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম মক্কা বিজয় রয়েছে দেখে কোন কোন তফসীরবিদ আয়াতে মক্কা বিজয়কেই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু ভাষা ব্যাপক হেতু কেয়ামত পর্যন্ত আগত সব বিজয়ই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَهُوَ الَّذِي نَكُتُ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَآيِدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطَرْفِ مَكَّةَ
 مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝
 هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ السَّجْدَةِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ
 مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ عِلاَهُمْ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَبَنَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ
 لَأَكَلْتُمُوهُنَّ أَمْ تَطْلُبُوهُنَّ مُتَّحِمِينَ ۚ فَهَبْ لَهُمْ مَغْرَرًا يُغْنُوا عَنْهُمْ
 لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَرَىٰ أُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي
 كُفْرِهِمْ وَالْحَبِيبَةَ حَبِيبَةً الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّرَلَّ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
 عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّوْجَةِ كَلِمَةً التَّوْحِيدِ وَ
 كَانُوا آخِزِينَ بِهَا وَأَهْلًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝
 لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الْوَيْلَ بِالْحَقِّ لَقَدْ خَلَّيْنَا السَّجْدَةَ
 الْحَرَامَ رَأَىٰ شَاءَ اللَّهُ الْإِيمَانِ الْمُحْمِلِينَ رُؤُوسَهُمْ وَمَقْصِدِينَ
 لَأَتَّخِذُونَ قَوْلَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا
 قَرِيبًا ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

(২৪) তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারণ করেছেন তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন। (২৫) তাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে এবং অবস্থানরত কোরবানীর জন্তুদেরকে যথাস্থানে পৌঁছাতে। যদি মক্কায় কিছুসংখ্যক ইমানদার পুরুষ ও ইমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতেন না। অর্থাৎ, তাদের পিঠ হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সব কিছু চুকিয়ে দেয়া হত; কিন্তু এ কারণে চুকানো হয়নি, যাতে আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেন। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে যত্নাদায়ক শাস্তি দিতাম। (২৬) কেননা, কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্ত্যামূলের জেদ পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাখিল করলেন এবং তাদের জন্যে সংঘের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তস্ত তাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সত্যক জ্ঞাত। (২৭) আল্লাহ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মন্তকমুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কণ্ঠিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয় (২৮) তিনিই তাঁর রসূলকে হেলায়েত ও সত্য ধর্মসং প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ যথেষ্ট।

এর আসল অর্থ মক্কা শহরই; কিন্তু এখানে হুদায়বিয়ার স্থান বোঝানো হয়েছে। মক্কার সন্নিকটে অবস্থিত হুওয়ার কারণে হুদায়বিয়াকেই “বাতনে মক্কা” বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ হুদায়বিয়ার কিছু অংশকে হরমের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। এই আয়াত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। **أَنْ يَبْلُغَ عِلاَهُمْ** এ থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি এহরাম বাধার পর মক্কা প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়, কোরবানী করে এহরাম থেকে হালাল হওয়া তার পক্ষে অপরিহার্য। এতে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, এই কোরবানী বাধাপ্রাপ্তির স্থানেই হতে পারে, না অন্যত্র কোরবানীর ন্যায় এর জন্যেও হরমের অভ্যন্তরে হওয়া শর্ত? হানাফীদের মতে এর জন্যে হরমের সীমানা শর্ত। আলোচ্য আয়াত তাদের প্রমাণ। এখানে এই কোরবানীর জন্যে কোরআন একটি বিশেষ স্থান সাব্যস্ত করেছে, যেখানে পৌছাতে কাফেররা মুসলমানদেরকে বাধা দিয়েছিল। এখানে কথা থাকে যে, খোদা হানাফী আলেমগণ একথাও বলেন যে, হুদায়বিয়ার কতক অংশ হরমের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় হরমে প্রবেশে বাধাদান কিরূপে প্রমাণিত হয়? জওয়াব এই যে, যদিও এই কোরবানী হরমের যে কোন অংশে করে দেয়া যথেষ্ট; কিন্তু মীনার অভ্যন্তরে “মানহার” (কোরবানাগার) নামে যে বিশেষ স্থান রয়েছে, সেখানে কোরবানী করা উত্তম। কাফেররা তখন মুসলমানদেরকে এই উত্তম স্থানে জন্তু নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল।

فَوَيْبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَءٌ - **مَّعْرَءٌ** শব্দের অর্থ কেউ কেউ

গোনাহ্ বর্ণনা করেছেন, কেউ সাধারণ ক্ষতি এবং কেউ দোষ বর্ণনা করেছেন। এ স্থলে শেষোক্ত অর্থই বাহ্যতঃ সঙ্গত। কারণ, যদি যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত এবং অজ্ঞাতসারে মুসলমানদের হাতে মক্কায় আটক মুসলমানগণ নিহত হত, তবে এটা একটা দোষ ও লজ্জাকর ব্যাপার হত। কাফেররা মুসলমানদেরকে লজ্জা দিত যে, তোমরা তোমাদের দ্বীনী ভাইদেরকে হত্যা করেছ। এছাড়া এটা ক্ষতিকর ব্যাপারও ছিল। নিহত মুসলমানদের ক্ষতি বর্ণনা সাপেক্ষ নয়। হত্যাকারী মুসলমানগণও অনুতাপ ও আক্ষেপের অনলে দগু হত।

সাহাবায়ে কেরামকে দোষত্রুটি থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা : ইমাম কুরতুবী বলেন : অজ্ঞাতসারে এক মুসলমানের হাতে অন্য মুসলমান মারা যাওয়া গোনাহ্ তো নয়; কিন্তু দোষ, লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপের কারণ অবশ্যই, ভুলবশতঃ হত্যার কারণে রক্তপান ইত্যাদি দেয়ারও বিধান আছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলের (সাঃ) সাহাবীদেরকে এ থেকেও নিরাপদ রেখেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম যদিও পয়গম্বরগণের ন্যায় নিশাপ নন, কিন্তু সাধারণভাবে তাঁদেরকে ভুলপ্রাপ্তি ও দোষ থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাকৃতিক ব্যবস্থা হয়ে যায়। এটাই তাঁদের সাথে আল্লাহর ব্যবহার।

لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এই

ক্ষেত্রে মুসলমানদের অন্তরে সংঘম সৃষ্টি করে যুদ্ধ না হওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ, আল্লাহ জানতেন যে, ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। তাদের প্রতি এবং মক্কায় আটক মুসলমানদের প্রতি রহমত করার জন্যে এসব আয়োজন করা হয়েছে।

نَزَلَ - শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে,

মক্কায় আটক মুসলমানগণ যদি কাফেরদের থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হত এবং মুসলমানগণ তাদেরকে চিনে বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিতে পারত, তবে এই মুহূর্তেই কাফেরদেরকে মুসলমানদের হাতে শাস্তি প্রদান করা হত। কিন্তু মুশকিল এই যে, আটক দুর্বল মুসলমান পুরুষ ও নারী কাফেরদের মধ্যেই মিশ্রিত ছিল। যুদ্ধ হলে তাদেরকে বাঁচানোর উপায় ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা যুদ্ধই মওকুফ করে দিলেন।

“কলেমায়ে-
وَأَنزَلْنَاهُمْ كَلِمَةَ التَّنْثِيهِ وَكَانُوا أَحْسَنَ بِمَا ذُكِّرُوا

তাকওয়া” বলে তাকওয়া অবলম্বনকারী কলেমা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, তওহীদ ও রেসালতের কলেমা। এই কলেমাই তাকওয়ার ভিত্তি। তাই একে কলেমায়ে-তাকওয়া বলা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামকে এই কলেমার অধিক যোগ্য ও উপযুক্ত আখ্যা দিয়ে আল্লাহ তাআলা সেসব লোকের লাঞ্ছনা প্রকাশ করে দিয়েছেন, যারা তাঁদের প্রতি কুফর ও নিকাকের দোষ আরোপ করে। আল্লাহ তো তাঁদেরকে কলেমায়ে ইসলামের অধিক যোগ্য বলেন, আর এই হতভাগারা তাঁদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে।

হৃদয়বিয়ার সন্ধি চূড়ান্ত হয়ে গেলে একথা স্থির হয়ে যায় যে, এখন মক্কায় প্রবেশ এবং ওমরা পালন ব্যতিরেকেই মদীনায় ফিরে যেতে হবে। বলাবাহুল্য, সাহাবায়ে কেরাম ওমরা পালনের সংকল্প রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি স্বপ্নের ভিত্তিতে করেছিলেন, যা এক প্রকার ওহী ছিল। এখন বাহ্যতঃ এর বিপরীত হতে দেখে কারও কারও অন্তরে এই সন্দেহ মাখাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল যে, (নাউযবিল্লাহ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর স্বপ্ন সত্য হল না। অপরদিকে কাফের-মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে বিদ্রূপ করল যে, তোমাদের রসূলের স্বপ্ন সত্য নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। — (বায়হাকী)

كُذِبَ شَدَّادٌ - لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ

বিপরীতে কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়। যে কথা বাস্তবের অনুরূপ, তাকে صدق এবং যে কথা অনুরূপ নয়, তাকে كُذِبَ বলা হয়। মাঝে মাঝে কাজকর্মের জন্যেও এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। তখন এর অর্থ হয় কোন কাজকে বাস্তবায়িত করা; যেমন কোরআনে আছে — رَجُلًا صَدَقُوا أَرْثَاهُ, তারা তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছে।

এ সময় صدق শব্দের দু'টি مفعول থাকে; যেমন আলোচ্য আয়াতে প্রথম مفعول হচ্ছে رسوله এবং দ্বিতীয় مفعول হচ্ছে رؤيا আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে স্বপ্নের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেখিয়েছেন। — (বায়যাতী) যদিও এই সাক্ষ্য দেখানোর ঘটনা ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার ছিল; কিন্তু একে অতীত পদ বাচ্য ব্যক্ত করে এর নিশ্চিত ও অকাটা হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেমতে পরবর্তী বাক্যে ভবিষ্যৎ পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে— لَقَدْ خُلِيَ السَّجْدَ الْحَرَامُ অর্থাৎ, মসজিদে-হরামে প্রবেশ সঞ্জেস্ত আপনার স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে; কিন্তু এ বছর নয়—এ বছরের পরে। স্বপ্নে মসজিদে-হরামে প্রবেশের সময় নির্দিষ্ট ছিল না। পরম ঔৎসুক্যবশতঃ সাহাবায়ে কেরাম এ বছরই সফরের সংকল্প করে ফেললেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও তাঁদের সাথে যোগ দিলেন। এতে আল্লাহ তাআলার বিরাত রহস্য নিহিত ছিল, যা হৃদয়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। সেমতে ছিদ্দিকে আকবর (রাঃ) প্রথমেই হযরত ওমর (রাঃ)-এর জওয়াবে বলেছিলেনঃ আপনার সন্দেহ

করা উচিত নয়, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বপ্ন কোন সময় ও বছর নির্দিষ্ট ছিল না। এখন না হলে পরে হবে — (কুরতুবী)

ভবিষ্যৎ কাজের জন্য “ইনশাআল্লাহ” বলার তাকীদঃ এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মসজিদে-হরামে প্রবেশের সাথে যা ভবিষ্যতে হওয়ার ছিল— “ইনশাআল্লাহ” শব্দ ব্যবহার করেছেন। অথচ আল্লাহ নিজের চাওয়া সম্পর্কে নিজেই জ্ঞাত। তাঁর এরূপ বলার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু স্বীয় রসূল ও বন্দাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে এখানে আল্লাহ তাআলাও “ইনশাআল্লাহ” শব্দ ব্যবহার করেছেন। — (কুরতুবী)

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ سَهِيْهُ বোখারীতে আছে, পরবর্তী বছর

কাযা ওমরায় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর পবিত্র কেশ কাঁচি দ্বারা কর্তন করেছিলেন। এটা কাযা ওমরারই ঘটনা। কেননা, বিদায় হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মস্তক মুণ্ডিত করেছিলেন। — (কুরতুবী)

فَوَلَّوْا لِرَسُولِهِ অর্থাৎ, এ বছরই তোমাদেরকে মসজিদে-হরামে

প্রবেশ এবং ওমরাহ করিয়ে দিতে আল্লাহ তাআলা সক্ষম ছিলেন। পরবর্তী বছর পর্যন্ত বিলম্বিত করার মধ্যে বড় বড় রহস্য নিহিত ছিল, যা আল্লাহ জানতেন— তোমরা জানতে না। তন্মধ্যে এক রহস্য এটাও ছিল যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছিল খয়বর বিজিত হয়ে মুসলমানদের শক্তি ও সাজ-সরঞ্জাম বর্ধিত হোক এবং তারা পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি সহকারে ওমরা পালন করুক। এ কারণেই বলা হয়েছেঃ مَجْعَلٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ অর্থাৎ, স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করার আগে খয়বরের আসন্ন

বিজয় মুসলমানগণ লাভ করুক। কেউ কেউ বলেন এই আসন্ন বিজয় বলে খোদ হৃদয়বিয়ার সন্ধি বোঝানো হয়েছে। কারণ, এটা মক্কা বিজয় ও অন্যান্য সব বিজয়ের ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে সকল সাহাবাই একে বৃহত্তম বিজয় আখ্যা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ বছর তোমাদের সফরের সংকল্প করার পর ওমরা পালনে ব্যর্থতা ও সন্ধি সম্পাদনের মধ্যে যেসব রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা তোমাদের জানা ছিল না কিন্তু আল্লাহ তাআলা সব জানতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, এই স্বপ্নের ঘটনার আগে হৃদয়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তোমাদেরকে একটা আসন্ন বিজয় দান করবেন। এই আসন্ন বিজয়ের ফলাফল সবাই প্রত্যক্ষ করেছে যে, হৃদয়বিয়ার সফরে মুসলমানদের সংখ্যা দেড় হাজারের বেশী ছিল না। সন্ধির পর তাদের সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত হয়ে গেল। — (কুরতুবী)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে

বিজয়, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা এবং বিশেষভাবে হৃদয়বিয়ার অংশগ্রহণকারী সাহাবী ও সাধারণভাবে সকল সাহাবীর গুণাবলী ও সুসংবাদ উল্লেখিত হয়েছে। এখন সূরার উপসংহারে সেসব বিষয়বস্তুর সারমর্ম বর্ণনা করা হচ্ছে। এসব নেয়ামত ও সুসংবাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনুগত্য ও সত্যায়নের কারণেই প্রদত্ত হয়েছে। তাই এই সত্যায়ন ও আনুগত্যের উপর জোর দেয়ার জন্যে, রেসালত অঙ্গীকারকারীদের যুক্তি খণ্ডন করার লক্ষ্যে এবং হৃদয়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের অন্তরে যেসব সন্দেহ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, সেগুলো দূরীকরণের জন্যে আলোচ্য আয়াতসমূহে রেসালত সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং জগতের সব ধর্মের উপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর দীনকে জয়যুক্ত করার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمًا بِنِعْمِهِ
تَرَاهُمْ رُكُوعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي
وُجُوهِهِمْ مِنْ أَشْرَ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمِثْلَهُمْ فِي
الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى
عَلَى سَوْقِهِ يُغِيبُ الرِّزَّاءَ لِيُعْطِيَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٥
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْصِرُوا بِيَدِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ
اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا
صَوَاهِرَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥ إِنَّ
الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
أَمْتَقَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّبِيِّ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٥ إِنَّ
الَّذِينَ يَسَادُونَكَ مِنَ زُرَّاءِ الْحُجْرَةِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٥

(২৯) মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাকেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহনভূতিগণ। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুক্ষ ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তওরাতের তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইজিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাতোর উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে— চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে— যাতে আল্লাহ তাদের দূরী কাকেরদের অন্তর্ভুক্তি সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশৃঙ্খল স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন।

সূরা আল-হুজুরাত

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ১৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালব আল্লাহর নামে—

(১) মুমিনগণ। তোমরা আল্লাহ ও রসূলের সামনে অগ্রণী হয়ে না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনে ও জানেন। (২) মুমিনগণ। তোমরা নবীর কঠোর উপর তোমাদের কঠোর উচ্চ করা না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চ করে কথা বল, তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চ করে কথা বলা না। এতে তোমাদের কর্ম নিশ্চল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না। (৩) যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের কঠোর নীচু করে, আল্লাহ তাদের অন্তরকে শিষ্টাচারের জন্যে পোষিত করেছেন। তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (৪) যারা এটিচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উচ্চ করে ডাকে, তাদের অধিকাংশই অবুধ।

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ সমগ্র কোরআনে শেষনবী (সাঃ) এর নাম উল্লেখ

করার পরিবর্তে সাধারণতঃ গুণাবলী ও পদবীর মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছেঃ বিশেষতঃ আহ্বানের স্থলে - يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

ইত্যাদি বলা হয়েছে। এর বিপরীতে অপরাপর পয়গম্বরকে নাম সহকারে আহ্বান করা হয়েছেঃ যেমন—

يُيُوسَى - يُوسَى - يُوحَى - يُوحَى - يُوحَى

তাঁর নাম ‘মুহাম্মদ’ উল্লেখ করা হয়েছে। এসব স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করার মধ্যে উপযোগিতা এই যে, হৃদয়বিয়ার সন্ধিপত্রে হযরত আলী (রাঃ) যখন তাঁর নাম ‘মুহাম্মদ-রসূলুল্লাহ’ লিপিবদ্ধ করেন, তখন কাকেররা এটা মিটিয়ে ‘মুহাম্মদ ইবনে-আবদুল্লাহ’ লিপিবদ্ধ করতে পীড়ানীড়ি করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর আদেশে তাই মেনে নেন। পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা এ স্থলে বিশেষভাবে তাঁর নামের সাথে ‘রসূলুল্লাহ’ শব্দ কোরআনে উল্লেখ করে একে চিরস্থায়ী করে দিলেন, যা কয়ামত পর্যন্ত লিখিত ও পঠিত হবে।

وَالَّذِينَ مَعَهُ এখান থেকে সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছে।

যদিও এতে সর্বপ্রথম হৃদয়বিয়া ও বয়ান্তে-রিয়ওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে ; কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার দরুন সকল সাহাবীই এতে দাখিল আছেন। কেননা, সবাই তাঁর সহচর ও সঙ্গী ছিলেন।

সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি :—এস্থলে আল্লাহ তাআলা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর রেসালত ও তাঁর দ্বীনকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার কথা বর্ণনা করে সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী, শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ লক্ষণাদি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এতে একদিকে হৃদয়বিয়ার সন্ধির সময় গৃহিত তাঁদের কঠোর পরীক্ষার পুরস্কার আছে। কেননা, অন্তরগত বিশৃঙ্খল ও প্রেরণার বিরুদ্ধে সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার ফলে ওমরা পালনে ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁদের এতটুকু পদস্থলন হয়নি বরং তাঁরা নজিরবিহীন আনুগত্য ও ঈমানী শক্তির পরিচয় দেন। এছাড়া সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বিস্তারিত বর্ণনা করার মধ্যে এ রহস্য নিহিত থাকার বিচিত্র নয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পর দুনিয়াতে আর কোন নবী-রসূল প্রেরিত হবেন না। তিনি উম্মতের জন্যে কোরআনের সাথে সাহাবীদেরকে নমুনা হিসেবে ছেড়ে যাবেন এবং তাঁদের অনুসরণ করার আদেশ দেবেন। তাই কোরআনও তাঁদের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে তাঁদের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ স্থলে সাহাবায়ে কেরামের সর্বপ্রথম যে গুণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই যে, তাঁরা কাকেরদের যোকবেলায় তাঁদের কঠোরতা সর্বক্ষেত্রেই প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা ইসলামের জন্যে বংশগত সম্পর্ক বিসর্জন দিয়েছেন। হৃদয়বিয়ার ঘটনায় বিশেষভাবে এর বিকাশ ঘটেছে। সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক সহনভূতি ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তখন প্রকাশ পেয়েছে, যখন মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে শ্রাত্ত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আনসাররা তাঁদের সবকিছুতে মুহাজিরদেরকে অস্বীকার করার আহ্বান জানায়। কোরআন সাহাবায়ে কেরামের এই গুণটি সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছে। কেননা, এর সারমর্ম এই যে, তাঁদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, ভালবাসা

অথবা হিংসাপরায়ণতা কোন কিছুই নিজের জন্যে নয়; বরং সব আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুলের জন্যে হয়ে থাকে। এটাই পূর্ণ ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আছে **مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَابْغَضَ لَهُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ** অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার ভালবাসা ও শত্রুতা উভয়কে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী করে দেয়, সে তার ঈমানকে পূর্ণতা দান করে। এ থেকেই আরও প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের মোকাবেলায় কঠোর ছিলেন— একথার অর্থ এরূপ নয় যে, তাঁরা কোন সময় কোন কাফেরের প্রতি দয়া করেন না; বরং অর্থ এই যে, যে স্থলে আল্লাহ ও রসুলের পক্ষ থেকে কাফেরদের প্রতি কঠোরতা করার আদেশ হয়, সেই স্থলে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি সম্পর্ক একাজে অন্তরায় হয় না। পক্ষান্তরে দয়া-দাক্ষিণ্যের ব্যাপারে তো স্বয়ং কোরআনের ফয়সালা এই যে,

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأَنْ تَرَوْهُمُو فَتَرْهُمُوهُمُ ۚ وَأَنْ تَرَوْهُمُو فَتَرْهُمُوهُمُ ۚ অর্থাৎ, যেসব

কাফের মুসলমানদের বিপক্ষে কার্যতঃ যুদ্ধরত নয়, তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করতে আল্লাহ তাআলা নিষেধ করেন না। রসুলে করীম (সঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামের অসংখ্য ঘটনা এমন পাওয়া যায়, সেগুলোতে দুর্বল, অক্ষম অথবা অভাবগ্রস্ত কাফেরদের সাথে দয়া-দাক্ষিণ্যমূলক ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারের মানদণ্ডও প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপক আদেশ রয়েছে। এমনকি, রণাঙ্গনেও ন্যায় ও ইনসাফের পরিপন্থী কোন কার্যক্রম ইসলামে বৈধ নয়।

সাহাবায়ে কেরামের দ্বিতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা সাধারণতঃ রু-সেজদা ও নামায়ে মশগুল থাকেন। তাঁদেরকে অধিকাংশ সময় এ কাজেই লিপ্ত পাওয়া যায়। প্রথম গুণটি পূর্ণ ঈমানের আলামত এবং দ্বিতীয় গুণটি পূর্ণ আমলের পরিচায়ক। কারণ, আমলসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে নামায।

নামায তাঁদের জীবনের এমন ব্রত হয়ে গেছে যে, নামাযে ও সেজদার বিশেষ চিহ্ন তাঁদের মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত হয়। এখানে “সেজদার চিহ্ন” বলে সেই নূরের আভা বোঝানো হয়েছে, যা দাসত্ব এবং বিনয় ও নম্রতার প্রভাবে প্রত্যেক এবাদতকারীর মুখমণ্ডল প্রত্যক্ষ করা হয়। কপালে সেজদার কাল দাগ বোঝানো হয়নি। বিশেষতঃ তাহাজ্জুদ নামাযের ফলে উপরোক্ত চিহ্ন খুব বেশী ফুটে উঠে। ইবনে মাজার এক রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন : **مَنْ كَثَرَ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسَنَ وَجْهِهِ بِالنَّهَارِ** অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাতে বেশী নামায পড়ে, দিনের বেলায় তার চেহারা সুন্দর আলোকোজ্জ্বল হয়। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : এর অর্থ নামাযীদের মুখমণ্ডলের সেই নূর, যা কেয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে।

ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فِي التَّوْبَةِ وَمَثَلُ مَنْ فِي الْإِسْلَامِ ۚ كَذَلِكَ أَعْرَضَ سَطْرًا

উপরে সাহাবায়ে কেরামের সেজদা ও নামাযের যে আলামত বর্ণনা করা হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, তাঁদের এই দৃষ্টান্তও তওরাতে বর্ণনা করা হয়েছে, এরপর বলা হয়েছে যে, ইঞ্জিলে তাঁদের আরও একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হয়েছে। তা এই যে, তাঁরা এমন, যেমন কোন কৃষক মাটিতে বীজ বপন করে। প্রথমে এই বীজ একটি ক্ষুদ্র সূঁচের আকারে নির্গত হয়। এরপর তা থেকে ডালপালা অঙ্কুরিত হয়। অতঃপর তা আরও মজবুত ও শক্ত হয় এবং অবশেষে শক্ত কাণ্ড হয়ে যায়। এমনভাবে নবী করীম (সঃ)—এর সাহাবীগণ শুরুতে খুবই নগণ্যসংখ্যক ছিলেন। এক সময়ে রসুলুল্লাহ (সঃ) ব্যতীত মাত্র তিন জন মুসলমান

ছিলেন— পুরুষদের মধ্যে হযরত আবুবকর(রাঃ), নারীদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রাঃ) ও বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রাঃ)। এরপর আস্তে আস্তে তাঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এমনকি, বিদায় হজ্জের সময় রসুলুল্লাহ (সঃ)—এর সাথে হজ্জ্বে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের সংখ্যা দেড় লক্ষের কাছাকাছি বর্ণনা করা হয়।

আলোচ্য আয়াতে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে : (এক) **فِي التَّوْبَةِ** এ পাঠ-বিরতি করা এবং মুখমণ্ডলের নূরের দৃষ্টান্ত তওরাতের বরাতে দিয়ে বর্ণনা করা। এরপর **وَمَثَلُ مَنْ فِي الْإِسْلَامِ** এ পাঠবিরতি না করা। তখন অর্থ এই হবে যে, সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত সেই চারা গাছের ন্যায়, যা শুরুতে খুবই দুর্বল হয়। এরপর আস্তে আস্তে শক্তকাণ্ড বিশিষ্ট হয়ে যায়।

(দুই) **فِي التَّوْبَةِ** এ পাঠবিরতি না করা বরং **فِي الْإِسْلَامِ** এ পাঠবিরতি করা। অর্থ এই হবে যে, মুখমণ্ডলের নূরের দৃষ্টান্ত তওরাতের রয়েছে, ইঞ্জিলেও রয়েছে। অতঃপর **كَذَلِكَ** কে একটি আলাদা দৃষ্টান্ত সাব্যস্ত করা। (তিন) **فِي التَّوْبَةِ** এ বাক্য না করা এবং **فِي الْإِسْلَامِ** এও শেষ না করা। অতঃপর **كَذَلِكَ** কে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের দিকে ইঙ্গিত সাব্যস্ত করা। এর অর্থ এই যে, তওরাত ও ইঞ্জিল আসল আকারে বিদ্যমান থাকলে সেগুলো দেখলেই কোরআনের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এগুলোতে বহু বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তাই কোন নিশ্চিত ফয়সালা সম্ভবপর নয়। কিন্তু অধিকাংশ তফসীরবিদ প্রথম সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন, যা থেকে জানা যায় যে, প্রথম দৃষ্টান্ত তওরাতে এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ইঞ্জিলে আছে। ইমাম বগভী (রহঃ) বলেন : ইঞ্জিলে সাহাবায়ে কেরামের এই দৃষ্টান্ত আছে যে, তাঁরা শুরুতে নগণ্য সংখ্যক হবেন, এরপর তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং শক্তি অর্জিত হবে। হযরত কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : সাহাবায়ে কেরামের এই দৃষ্টান্ত ইঞ্জিলে লিখিত আছে যে, এমন একটি জাতির অভ্যুদয় হবে, যারা চারা গাছের অনুরূপ বেড়ে যাবে। তারা সংকাজের আদেশ এবং অসংকাজে বাধা প্রদান করবে। (মায়হারী) বর্তমান যুগের তওরাত ও ইঞ্জিলেও অসংখ্য পরিবর্তন সত্ত্বেও নিম্নরূপ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান রয়েছে :

খোদাওন্দ সিনা থেকে আগমন করলেন এবং শায়ীর থেকে তাদের কাছে যাহির হলেন। তিনি ফারান পর্বত থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং দশ হাজার পবিত্র লোক তাঁর সাথে আসলেন। তাঁর হাতে তাদের জন্যে একটি অগ্নিদীপ্ত শরীয়ত ছিল তিনি নিজের লোকদেরকে খুব ভালবাসতেন। তাঁর সব পবিত্র লোক তোমার হাতে আছে এবং তোমার চরণের কাছে উপবিষ্ট আছে। তারা তোমার কথা মানবে। — (তওরাত : বাবে এস্তেব্রা)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের সময় সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। তাঁরা ফারান থেকে উদ্ভিত দীপ্তিময় মহাপুরুষের সাথে “খলীলুল্লাহ” শহরে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর হাতে অগ্নিদীপ্ত শরীয়ত থাকবে বলে **إِنِّي أَرَىٰ النَّبِيَّ** এর প্রতি ইঙ্গিত বোঝা যায়। তিনি নিজের লোকদেরকে ভালবাসবেন — কথা থেকে **وَيُحِبُّهُمْ** এর বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। এযাহরুল-হক, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম অধ্যায়ে এর পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই গ্রন্থটি মওলানা রহমতুল্লাহ কিরানভী (রহঃ) খ্রীষ্টান মতবাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করার জন্যে ফিল্ডার নামক পাদ্রীর জওয়াবে লিখেছিলেন। এই গ্রন্থে ইঞ্জিলে বর্ণিত দৃষ্টান্ত এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে : সে তাদের সামনে আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করে

বলল, আকাশের রাজত্ব সরিষার দানার মত, যাকে কেউ ক্ষেতে বপন করে। এটা ক্ষুদ্রতম বীজ হলেও যখন বেড়ে যায়, তখন সব সম্ভারি চাইতে বড় এমন এক বৃক্ষ হয়ে যায়, যার ডালে পাখী বসে বাসা বাঁধে। (ইব্রীল : মাতা) ইব্রীল মরকাসের ভাষা কোরআনের ভাষার অধিক নিকটবর্তী। তাতে আছে : সে বলল, খোদার রাজত্ব এমন, যেমন কোন ব্যক্তি মাটিতে বীজ বপন করে এবং রাত্রিতে নিদ্রা যায় ও দিনে জাগ্রত থাকে। বীজটি এমনভাবে অঙ্কুরিত হয় ও বেড়ে যায় যে, মনে হয় মাটি নিজেই বৃষ্টি ফলদান করে। প্রথমে পাতা, এরপর শীষ, এরপর শীষে তৈরী দানা। অবশেষে যখন শস্য পেকে যায়, তখন সে অনতিবিলম্বে কাঁচি লাগায়। কেননা, কাটার সময় এসে গেছে। — (এযহরুল্ল-হক, ৩য় খণ্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা) আকাশের রাজত্ব বলে যে শেষ নবীর অভ্যুদয় বোঝানো হয়েছে, তা তওরাতের একাধিক জায়গা থেকে বোঝা যায়।

لِيُخَيِّطَ لَهُمُ الْكُفَّارَ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামকে উল্লেখিত গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তাঁদেরকে দুর্বলতার পর শক্তি এবং সংখ্যাল্পতার পর সংখ্যাধিক্য দান করেছেন, যাতে এগুলো দেখে কাফেরদের অন্তর্জ্বালা হয় এবং তারা হিংসার অনলে দগ্ধ হয়। হয়রত আবু ওরওয়া যুবায়রী (রহঃ) বলেন : একবার আমরা ইমাম মালেক (রহঃ) এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি কোন একজন সাহাবীকে হয়ে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য কিছু বক্তব্য রাখল। তখন ইমাম মালেক (রহঃ) উপরোক্ত আয়াতটি পূর্ণ তেলাওয়াত করতঃ যখন لِيُخَيِّطَ لَهُمُ الْكُفَّارَ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন বললেন : যার অন্তরে কোন একজন সাহাবীর প্রতি ক্রোধ আছে, সে এই আয়াতের শাস্তি লাভ করবে। — (কুরতুবী) ইমাম মালেক (রহঃ) একথা বলেননি যে, সে কাফের হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন যে, সে-ও এই শাস্তি লাভ করবে। উদ্দেশ্য এই যে, তার কাজটি কাফেরদের কাজের অনুরূপ হবে।

وَعَلَّمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَهُمْ قَلِيلٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا অর্থাৎ, এই যে, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ম করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। এ থেকে প্রথমতঃ জানা গেল যে, সব সাহাবায়ে কেরামই বিশ্বাস স্থাপন করতেন ও সংকর্ম করতেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁদের সবাইকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। এই বর্ণনামূলক মন এর ব্যবহার কোরআনে প্রচুর; যেমন مِنَ الرِّجْسِ এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে وَهُمْ বলে مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। রাক্ষসী সম্প্রদায় এহলে মন কে “কতক” — এর অর্থে ধরেছে এবং আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছে যে, সাহাবীগণের মধ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী যারা ইমানদার ও সংকর্মী, তাঁদেরকে এই ওয়াদা দেয়া হয়েছে। এটা পূর্বাপর বর্ণনা এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের পরিষ্কার পরিপন্থী। কেননা, যেসব সাহাবী হুদায়বিয়ার সফর ও বয়াতে-রিয়ওয়ানে শরীক ছিলেন, তাঁরা তো নিঃসন্দেহে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং আয়াতের প্রথম উদ্দিষ্ট বলে তাঁদের সবার সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্বীয় সন্তুষ্টির এই ঘোষণা করেছেন :

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ সন্তুষ্টির

এই ঘোষণা নিশ্চয়তা দেয় যে, তাঁরা সবাই মৃত্যু পর্যন্ত ইমান ও সংকর্মের উপর কায়ম থাকবেন। কারণ, আল্লাহ আলীম ও খবীর তথা সর্বজ্ঞ। যদি

কারও সম্পর্কে তাঁর জানা থাকে যে, সে ইমান থেকে কোন না কোন সময় মুখ ফিরিয়ে নেবে, তবে তার প্রতি আল্লাহ স্বীয় সন্তুষ্টি ঘোষণা করতে পারেন না। ইবনে আবদুল বার (রহঃ) এস্তিয়াবের ভূমিকায় এই আয়াত উদ্ধৃত করে লিখেন : وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمْ يَسْخَطْ عَلَيْهِ أَبَدًا, আল্লাহ যার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তার প্রতি এরপর কখনও অসন্তুষ্ট হন না। এই আয়াতের ভিত্তিতেই রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : বয়াতে-রিয়ওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ জাহান্নামে যাবে না। অতএব, তাঁদের জন্যেই যখন মুখ্যতঃ এই ওয়াদা করা হয়েছে, তখন তাদের মধ্যে কারও কারও বেলায় ব্যতিক্রম হওয়া নিশ্চিতই বাতিল। এ কারণেই সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবায়ে কেরাম সবাই আদেল ও সিকাহ।

সাহাবায়ে কেরাম সবাই জান্নাতী, তাঁদের পাপ মার্জনিয় এবং তাদেরকে হয়ে প্রতিপন্ন করা গোনাহ : কোরআন পাকের অনেক আয়াত এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তন্মধ্যে কতিপয় আয়াত এই সূরাতেই উল্লেখিত হয়েছে :

الَّذِينَ هُمْ كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ وَكَانُوا هَؤُلَاءِ

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ

এছাড়া আরও অনেক আয়াতে এই বিষয়বস্তু রয়েছে —

يَوْمَ لَا تُخْزِي اللَّهَ الْبَيْتَ وَالَّذِينَ آمَنُوا

وَالشَّاهِدِينَ الْأَوْلَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْأَصْلَحَ وَالَّذِينَ آمَنُوا

يَا حَسْبَ عِزِّ النَّبِيِّ اللَّهُ عَزَمَ وَوَعْدُهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتُ جَنَّاتِ الْأَنْهَارِ

সূরা হাদীদে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বলা হয়েছে : وَكَلاَّ وَعَدَ اللَّهُ : অর্থাৎ, তাঁদের সবাইকে আল্লাহ “হসনা” তথা উত্তম পরিণতির ওয়াদা দিয়েছেন। এরপর সূরা আশ্বিয়ায় হসনা সম্পর্কে বলা হয়েছে : إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ অর্থাৎ,

যাদের জন্যে আমার পক্ষ থেকে পূর্বই হসনার কয়সালা হয়ে গেছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ অর্থাৎ, সমগ্র সময়কালের মধ্যে আমার সময়কাল উত্তম। এরপর সেই সময়কালের লোক উত্তম, যাদের সময়কাল আমার সময়কালের সংলগ্ন, এরপর তারা যারা তাদের সংলগ্ন। আরও এক হাদীসে বলা হয়েছে, আমার সাহাবীগণকে মন্দ বলা না। কেননা, (স্বীমালী) শক্তির কারণে তাঁদের অবস্থা এই যে, তোমাদের কেউ যদি ওহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ ব্যয় করে, তবে তা তাঁদের ব্যয় করা এক মুদের সমানও হতে পারে না, এমনকি অর্ধ মুদেরও না। মুদ আরবের একটি ওজনের নাম যা আমাদের অর্ধ সেরের কাছাকাছি। — (বোখারী) হয়রত জাবের (রাঃ) এর হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা সারা জাহান্নানের মধ্য থেকে আমার সাহাবীগণকে পছন্দ করেছেন। এরপর আমার সাহাবীগণের মধ্য থেকে চার জনকে আমার জন্যে পছন্দ করেছেন— আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলী (রাঃ) — (বায়হার) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে :

আমার সাহাবীগণের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর তাঁদেরকে নিন্দা ও দোষারোপের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করো না। কেননা, যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসে, সে আমার ভালবাসার কারণে তাঁদেরকে ভালবাসে এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে, সে আমার

প্রতি বিদ্বেষের কারণে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে। যে তাঁদেরকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয় এবং যে আমাকে কষ্ট দেয়, সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়। যে আল্লাহকে কষ্ট দেয়, তাকে অচিরেই আল্লাহ আযাবে শ্রাফতার করবেন।— (তিরমিযী)

সূরা আল-হজরাত

সূরার ষোণসূত্র ও শানে মুম্বল : পূর্ববর্তী দুই সূরায় জেহাদের বিধান ছিল, যাদুরা বিশৃঙ্খলগতের সংশোধন উদ্দেশ্যে। আলোচ্য সূরায় আত্মসংশোধনের বিধান ও শিষ্টাচার নীতি ব্যক্ত হয়েছে। বিশেষতঃ সামাজিকতা সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতরণের ঘটনা এই যে, একবার বনী তামিম গোত্রের কিছু লোক রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। এই গোত্রের শাসনকর্তা কাকে নিযুক্ত করা হবে তখন এ বিষয়েই আলোচনা চলছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) কা' কা' ইবনে হাকিমের নাম প্রস্তাব করলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) আকরা' ইবনে হাবসের নাম প্রস্তাব করলেন এবং হযরত আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে মজলিসেই কথাবার্তা হল এবং ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটিতে উন্নীত হয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে গেল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়—(বোখারী)

আলোচ্য আয়াতসমূহের অবতরণ সম্পর্কে কুরতুবীর ভাষ্য অনুযায়ী ছয়টি ঘটনা বর্ণিত আছে। কাযী আবু বকর ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন : সব ঘটনা নির্ভুল। কেননা, সবগুলোই আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে একটি ঘটনা বোখারীর বর্ণনামতে প্রথমেই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর আসল অর্থ **بين اليمين** -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْبَلُوا مَوَائِينَ يَدِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ

দুই হাতের মধ্যস্থল। এর উদ্দেশ্য সামনের দিক। অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে অগ্রবর্তী হওয়া না। কি বিষয়ে অগ্রণী হতে নিষেধ করা হয়েছে কোরআন পাক তা উল্লেখ করেনি। এতে ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ, যে কোন কথায় অথবা কাজে রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে অগ্রণী হওয়া না। বরং তাঁর জওয়াবের অপেক্ষা কর। তবে তিনি যদি কাউকে জওয়াবদানের আদেশ করেন, তবে সে জওয়াব দিতে পারে। এমনভাবে যদি তিনি পথ চলেন তবে কেউ যেন তাঁর অগ্রে না চলে। খাওয়ার মজলিসে কেউ যেন তাঁর আগে খাওয়া শুরু না করে। তবে তাঁর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বর্ণনা অথবা শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে, তিনি কাউকে অগ্রে প্রেরণ করতে চান তবে তা ভিন্ন কথা; যেমন সফর ও যুদ্ধের বেলায় কিছুসংখ্যক লোককে অগ্রে যেতে আদেশ করা হত।

আলেম ও ধর্মীয় নেতাদের সাথেও এই আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত : কেউ কেউ বলেন, ধর্মের আলেম ও মাশায়েখের বেলায়ও এই বিধান কার্যকর। কেননা, তাঁরা পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী। নিম্নোক্ত ঘটনা এর প্রমাণ। একদিন রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবুদারদা (রাঃ)-কে আবু বকর (রাঃ)-এর অগ্রে অগ্রে চলতে দেখে সতর্ক করলেন এবং বললেন : তুমি কি এমন ব্যক্তির অগ্রে চল, যিনি ইহকাল ও পরকালে

তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? তিনি আরও বললেন : দুনিয়াতে এমন কোন ব্যক্তির উপর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়নি যে পয়গম্বরগণের পর হযরত আবু বকর থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।—(রুহুল-বয়ান) তাই আলেমগণ বলেন যে, ওস্তাদ ও পীরের সাথে একই ধরনের আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

لَتَرْضُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ নবী করীম (সাঃ)-এর

মজলিসের এটা দ্বিতীয় আদব। অর্থাৎ, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে কণ্ঠস্বরকে তাঁর কণ্ঠস্বরের চাইতে অধিক উচু করা অথবা তাঁর সাথে উচুস্বরে কথা বলা—যেমন, পরস্পরে বিনা দ্বিধায় করা হয়, এক প্রকার বে-আদাবী ও ধৃষ্টতা। সেমতে এই আয়াত অবতরণের পর সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা পাল্টে যায়। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরম্ভ করেন : ইয়া রসুলুল্লাহ্ (সাঃ), আল্লাহ্র কসম ! এখন মৃত্যু পর্যন্ত আপনার সাথে কানাকানির অনুরূপ কথাবার্তা বলব।—(বায়হাকী) হযরত ওমর (রাঃ) এরপর থেকে এত আস্তে কথা বলতেন যে, প্রায়ই পুনরায় জিজ্ঞাসা করতে হত।—(সেহাহ) হযরত সাবেত ইবনে কায়সের কণ্ঠস্বর স্বভাবগতভাবেই উচু ছিল। এই আয়াত শুনে তিনি ভয়ে সংযত হলেন এবং কণ্ঠস্বর নিচু করলেন।—(দুররে-মনসুর)

রওখা যোবারকের সামনেও বেশী উঁচুস্বরে সালাম ও কালাম করা নিষিদ্ধ : কাযী আবু বকর ইবনে-আরাযী (রহঃ) বলেন : রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সম্মান ও আদব তাঁর ওফাতের পরও জীবদ্দশার ন্যায় ওয়াজিব। তাই কোন কোন আলেম বলেন : তাঁর পবিত্র কবরের সামনেও বেশী উঁচুস্বরে সালাম ও কালাম করা আদবের খেলাফ। অনুরূপ যে মজলিসে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীস পাঠ অথবা বর্ণনা করা হয়, তাতেও হট্টগোল করা বে-আদবী। কেননা, তাঁর কথা যখন তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হত তখন সবার জন্যে চুপ করে শোনা ওয়াজিব ও জরুরী ছিল। এমনিভাবে ওফাতের পর যে মজলিসে সেসব বাক্যাবলী শুনানো হয়, সেখানে হট্টগোল করাও বে-আদবী।

মাসআলা : পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে পয়গম্বরের আগে ইটা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞার আওতায় যেমন আলেমগণও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন, তেমনিভাবে আওয়াজ উচ্চ করারও বিধান তাই। আলেমগণের মজলিসে এত উচ্চস্বরে কথা বলবে না, যাতে তাঁদের আওয়াজ চাপা পড়ে যায়।—(করতবী)

أَنْ تَحْبِطَ أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ অর্থাৎ, তোমাদের কষ্টস্বরকে

নবীর কষ্টস্বর থেকে উদ্ধার করে না এই আশংকার কারণে যে, কোথাও তোমাদের সমস্ত আমল নিষ্ফল হয়ে যায় এবং তোমরা টেরও পাপও না। এখানে শরীয়তের স্বীকৃত মূলনীতির দিক দিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দেয় : (এক) আহলে সুন্যত ওয়াল জমাআতের ঐকমত্যে একমাত্র কুফরীই সংকর্মসমূহ বিনষ্ট করে দেয়। কোন গোনাহের কারণে কোন সংকর্ম বিনষ্ট হয় না। এখানে মুমিন তথা সাহাবায়ে কোরামকে সম্মোহন করা হয়েছে এবং لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ শব্দযোগে সম্মোহন করা হয়েছে। এতে বোঝা

এবং **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** শব্দযোগে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, কাজটি কুফরী নয়। অতএব, আমলসমূহ বিনষ্ট হবে কিরূপে? (দুই) ঈমান একটি ইচ্ছাধীন কাজ। যে পর্যন্ত কেউ স্বেচ্ছায় ঈমান গ্রহণ না করে, মুমিন হয় না। এমনভাবে কুফরও একটি ইচ্ছাধীন কাজ। স্বেচ্ছায় কুফরী অবলম্বন না করা পর্যন্ত কেউ কাফের হতে পারে না। এখানে আয়াতের শেষাংশে **وَأَنذَرْتُكُمْ رُجُومَ** বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা টেরও পাবে না। অতএব, এখানে খাটি কুফরীর শাস্তি সমস্ত

নেক-আমল নিষ্কল হওয়া কিরূপে প্রযোজ্য হতে পারে।

মাগলানা আশরাফ আলী খানভী (রহঃ) বয়ানুল-কোরআনে এর এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যদ্বারা সব প্রশ্ন দূর হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, আয়াতের অর্থ এই যে, মুসলমানসন। তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কঠোর থেকে নিজেদের কঠোরকে উচু করা এবং উচ্চতরকে কথা বলা থেকে বিরত থেকো। কারণ, এতে তোমাদের সমস্ত আমল বিনষ্ট ও নিষ্কল হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। আশংকার কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে অগ্রণী হওয়া অথবা তাঁর কঠোরের উপর নিজেদের কঠোর উচু করার মাধ্যমে তাঁর শানে ষ্টুতা ও বে-আদবী হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, যা রসূলকে কষ্টদানের কারণ। রসূলের কষ্টের কারণ হয়, এরূপ কোন কাজ সাহায্যে করায় ইচ্ছাকৃতভাবে করবেন, যদিও এরূপ কল্পনা করা যায় না, কিন্তু অগ্রণী হওয়া ও কঠোর উচু করার মত কাজ কষ্টদানের ইচ্ছায় না হলেও তদ্বারা কষ্ট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই এই জাতীয় কাজ সর্ববিস্থায় নিষিদ্ধ ও পোনাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কোন পোনাহর বৈশিষ্ট্য এই যে, যারা এই পোনাহে অহনিশি মগ্ন হয়ে পরিণামে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যা সমস্ত নেক আমল নিষ্কল হওয়ার কারণ। ধর্মীয় নেতা, গুস্তাদ অথবা পীরকে কষ্ট দেয়া এমন পোনাহ যদ্বারা তওকীক হিনিয়ে নেয়ার আশংকা আছে। এভাবে নবীর সামনে অগ্রণী হওয়া এবং কঠোর উচু করা দ্বারাও তওকীক হিনিয়ে নেয়ার এবং অবশেষে কুফরী পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার আশংকা থাকে। ফলে সমস্ত সংকর্ম নিষ্কল হয়ে যেতে পারে। যারা এহেন কাজ করে, তারা যেহেতু কষ্ট দেয়ার ইচ্ছায় করে না, তাই সে টেরও পাবে না যে, এই কুফর ও সংকর্ম নিষ্কল হওয়ার আসল কারণ কি ছিল। কোন কোন আলেম বলেন : বুর্খ পীরের সাথে ষ্টুতা ও বে-আদবীও মাঝে মাঝে তওকীক হিনিয়ে নেয়ার কারণ হয়ে যায়, যা পরিণামে ঈমানের সম্পদও বিনষ্ট করে দেয়।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَكَ مِنْ ذَكَرِ الْحَقِّ وَالْحَقِّ لَا يَخْلُفُونَ

- এই আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি তৃতীয় আদব শেখানো হয়েছে। অর্থাৎ, তিনি যখন নিজ বাসগৃহে তশরীক রাখেন, তখন বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকা, বিশেষতঃ পোয়াতুমি সহকারে নাম নিয়ে আহবান করা বে-আদবী। এটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। حجرات শব্দটি حجرة এর বহুবচন। অভিধানে প্রাচীর চতুষ্টয় দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে حجرة বলা হয়, যাতে কিছু বারান্দা ও ছাদ থাকে। নবী করীম (সাঃ)-এর নয় জন বিবি ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের জন্যে পৃথক পৃথক হজরা তথা কক্ষ ছিল।

তিনি পালাক্রমে এসব হজরায় তশরীক রাখতেন।

ইবনে সা'দ আতা খোরাসানীর রেওয়ায়েতক্রমে লিখেন : এসব হজরা খবুর শাখা দ্বারা নির্মিত ছিল এবং দরজায় মোটা কাল পশমী পর্দা খুলানো থাকত। ইমাম বোখারী (রহঃ) 'আদাবুল-মুফরাদ' গ্রন্থে এবং বায়হাকী দাউদ ইবনে কাযসের উক্তি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি এসব হজরার ঘিয়ারত করেছি। আমার ধারণা এই যে, হজরার দরজা থেকে ছাদবিশিষ্ট কক্ষ পর্যন্ত ছয় সাত হাতের ব্যবধান ছিল। কক্ষ দশ হাত এবং ছাদের উচ্চতা সাত-আট হাত ছিল। ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের রাজত্বকালে তাঁরই নির্দেশে এসব হজরা মসজিদে নব্বীর অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়। মল্লীনার লোকগণ সেদিন অশ্রু রাশ করতে পারেননি।

শানে নুশুল : ইমাম বগভী (রহঃ) কাতাদাহ্ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন, বনু-তামীমের লোকগণ দুপুরের সময় মদিনায় উপস্থিত হয়েছিল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন এক হজরায় বিশ্রামরত ছিলেন। তারা ছিল বেদুঈন এবং সামাজিকতার রীতি-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। কাজেই তারা হজরার বাইরে থেকেই ডাকাডাকি শুরু করল : اخرج الينا يا محمد এর পরিশ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে এভাবে ডাকাডাকি করতে নিষেধ করা হয় এবং অপেক্ষা করার আদেশ দেয়া হয়। মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী ইত্যাদি গ্রন্থে এ রেওয়ায়েত বিভিন্ন শব্দযোগে বর্ণিত হয়েছে।—(মামহারী)

সাহাবী ও তাবয়ীগণ তাঁদের আলেম ও মাশায়েখের সাথেও এই আদব ব্যবহার করেছেন। সহীহ্ বোখারী ও অন্যান্য কিতাবে হযরত ইবনে আক্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—আমি যখন কোন আলেম সাহাবীর কাছ থেকে কোন হাদীস লাভ করতে চাইতাম, তখন তাঁর গৃহে পৌঁছে ডাকাডাকি অথবা দরজার কড়া নাড়া থেকে বিরত থাকতাম এবং দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করতাম। তিনি যখন নিজেই বাইরে আগমন করতেন, তখন আমি তাঁর কাছে হাদীস জিজ্ঞেস করতাম। তিনি আমাকে দেখে বলতেন : হে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চাচাত ভাই। আপনি দরজার কড়া নেড়ে আমাকে সংবাদ দিলেন না কেন? হযরত ইবনে আক্বাস (রাঃ) উত্তরে বলতেন : আলেম কোন জাতির জন্যে পয়গম্বর সদৃশ। আল্লাহ্ তাআলা পয়গম্বর সম্পর্কে আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁর বাইরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

হযরত আবু ওবায়দা (রহঃ) বলেন : আমি কোন দিন কোন আলেমের দরজায় যেয়ে কড়া নাড়া দেইনি; বরং অপেক্ষা করেছি যে, তিনি নিজেই বাইরে আসলে সাক্ষাত করব।—(রুহুল-মা'আনী)

অনুযায়ী বনিল-মুআলিক গোত্র পৌছেন। গোত্রের লোকেরা পূর্বেই জানত যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দূত অমুক তারিখে আগমন করবে। তাই তারা অভ্যর্থনার উদ্দেশে বস্ত্র থেকে বের হয়ে আসে। ওলীদ সন্দেহ করলেন যে, তারা বোম্ব হই পুরাতন শত্রুর কারণে তাঁকে হত্যা করতে এসিয়ে আসছে। সেমতে তিনি সেখান থেকেই ফিরে আসেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে নিজ ধারণা অনুযায়ী আরব করলেন যে, তারা যাকাত দিতে সম্মত নহ; বরং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)-কে ধারণা করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) রাত্রি বেলায় বস্ত্রের নিকটে পৌছে গোপনে কয়েকজন গুপ্তচর পাঠিয়ে দিলেন। তারা ফিরে এসে সংবাদ দিল যে, তারা সবাই ইসলাম ও ঈমানের উপর কায়ম রয়েছে এবং যাকাত দিতে প্রস্তুত আছে। তাদের মধ্যে ইসলামের বিপরীত কোন কিছু নেই। খালেদ (রাঃ) ফিরে এসে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। এর পরিত্রেকিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন দুষ্ট ও পাপাচারী ব্যক্তি যদি কোন লোক কিংবা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে, তবে যথোপযুক্ত তদন্ত ব্যতিরেকে তার সংবাদ অথবা সাক্ষ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়।

আয়াত সম্পর্কিত বিধান ও মাসআলা : ইমাম জাসসাস আহকামুল-কোরআনে বলেন : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ফাসেক ও পাপাচারীর খবর কবুল করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়, যে পর্যন্ত না অন্যায় উপায়ে তদন্ত করে তার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা, এই আয়াতে এক কোরাআত হচ্ছে **فَتَشْتَبِهُوا** অর্থাৎ, তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ভড়িভড়ি করোনা; বরং অন্য উপায়ে এর সত্যতা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত দৃঢ়পদ থাক। ফাসেকের খবর কবুল করা যখন না জায়েয তখন সাক্ষ্য কবুল করা আরও উত্তমরূপে নাজায়েয হবে। কেননা, সাক্ষ্য এমন একটি খবর, যাকে শপথ ও কসম দ্বারা জোরালো করা হয়। একারণেই অবিকাল আলোমের মতে ফাসেকের খবর অথবা সাক্ষ্য শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কোন কোন ব্যাপারে ফাসেকের খবর ও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সেটা এই বিধানের ব্যতিক্রম। কেননা, আয়াতে এই বিধানের একটি বিশেষ কারণ **أَنْ تُؤَيِّدُوا** বর্ণনা করা রয়েছে। অতএব, যেসব ব্যাপারে এই কারণ অনুপস্থিত, সেগুলো আয়াতের বিধানে দাখিল নয়। অথবা এর ব্যতিক্রম। উদাহরণতঃ কোন ফাসেক বরং কাকেরও যদি কোন বস্তু এনে বলে যে, অমুক ব্যক্তি আপনাকে এটা হাদিয়া দিয়েছে, তবে তার এই খবর সত্য বলে মেনে নেয়া জায়েয। কেবাহ গ্রন্থে এর আরও বিবরণ পাওয়া যাবে।

সাহাবীদের আদালত সম্পর্কে একটি গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্ন ও জওয়াবঃ বিভিন্ন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, এই আয়াতটি ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ) সম্পর্কে নাখিল হয়েছে। আয়াতে তাকে ফাসেক বলা হয়েছে। এ থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, সাহাবীগণের মধ্যে কেউ ফাসেকও হতে পারে। এটা **الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدْلٌ** এই স্বীকৃত ও সর্বসম্মত মূলনীতির পরিপন্থী। অর্থাৎ, সকল সাহাবীই সিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য। তাদের কোন খবর ও সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ আলমী (রহঃ) রুহুল মা'আনীতে বলেন : অমিকাল আলোম এ সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট অভিমত পোষণ করেন তাই সত্য ও নির্ভুল। তাঁরা বলেন : সাহাবায়ে

কোরাম নিশাপ নন, তাঁদের দ্বারা কবীরা গোনাহও সংঘটিত হতে পারে, যা ফিসক তথা পাপাচার। এক্সপ গোনাহ হলে তাঁদের বেলায় শরীয়তসম্মত শাস্তি প্রযোজ্য হবে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত হলে তাঁদের খবর এবং সাক্ষ্যও প্রত্যাখ্যান করা হবে। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহর বর্ণনাদৃষ্টে আহলে-সুন্নাত ওয়াল-জামাতের আকীদা এই যে, সাহাবী গোনাহ করতে পারেন, কিন্তু এমন কোন সাহাবী নেই, যিনি গোনাহ থেকে তওবা করে পবিত্র হননি।

কোরআন পাক **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ** বলে সর্বাবস্থায় তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছে। গোনাহ ক্ষমা করা ব্যতীত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি হয় না। কাবী আবু ইয়াল (রহঃ) বলেন : সন্তুষ্টি আল্লাহ তাআলার একটি চিরায়ত গুণ। তিনি সেসব লোকের জন্যেই সন্তুষ্টি ঘোষণা করেন, যাদের সম্পর্কে জানেন যে, সন্তুষ্টির কারণাদির উপরই তাদের ওফাত হবে।

সারকথা এই যে, সাহাবায়ে কোরামের বিরাট দলের মধ্য থেকে গুণাগুণিত কয়েকজন দ্বারা কখনও কোন গোনাহ হয়ে থাকলেও তাঁরা তাত্ক্ষণিক তওবা করার সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। রসূল করীম (সঃ)-এর সংসর্গের বরকতে শরীয়ত তাঁদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ অথবা গোনাহ তাঁদের পক্ষ থেকে খুবই দুর্লভ ছিল। তাঁদের অসংখ্য সংকর্ম ছিল। নবী করীম (সঃ) ও ইসলামের জন্যে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসূলের অনুসরণকে তাঁরা জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এ জন্যে এমন সাধনা করেছিলেন, যার নজীর অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুস্কর। এসব গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বের মোকাল্য সারাজীবনে কোন গোনাহ হয়ে গেলেও তা স্বভাবতঃই ধ্বংস হয়। এছাড়া আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল (সঃ)-এর মাহাত্ম্য ও মহব্বতে তাঁদের অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। সামান্য গোনাহ হয়ে গেলেও তাঁরা আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন এবং তাত্ক্ষণিক তওবা করতেন; বরং নিজে থেকে শাস্তির জন্যে নিজেই পেশ করে দিতেন। কোথাও নিজেই নিজে থেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন। এসব ঘটনা হাদীসে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি গোনাহ থেকে তওবা করে, সে এমন হয়ে যায় যেন গোনাহ করেন। তৃতীয়তঃ কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী পুণ্যকাজ নিজেও গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। বলা হয়েছে: **إِنَّ السَّيِّئَاتِ يُدْوِينَ السَّيِّئَاتِ** বিশেষতঃ সাহাবায়ে কোরামের পুণ্যকাজ গোনাহের কাফফারা হবেই। কারণ, তাঁদের পুণ্যকাজ সাধারণ লোকদের মত ছিল না। তাঁদের অবস্থা আবু দাউদ ও তিরমিযী হযরত সায়ীদ ইবনে যয়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন-

وَاللَّهُ لَشَهِدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْفِرُ فِيهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ

- “আল্লাহর কসম তাঁদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তির নবী করীম (সঃ)-এর সাথে জেহাদে শরীক হওয়া-যাতে তাঁর মুখমণ্ডল গুলি ধূসরিত হয়ে যায়-তোমাদের সারা জীবনের এবাদত থেকে উত্তম, যদিও তোমাদেরকে নূহ (আঃ)-এর আযুকাল দান করা হয়।” অতএব, গোনাহ হয়ে গেলে যদিও তাঁদেরকে নির্ধারিত শাস্তিই দেয়া হয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কোন পরবর্তী ব্যক্তির জন্যে তাঁদের কাউকে ফাসেক সাব্যস্ত করা জায়েয নয়। তাই রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর যুগে কোন সাহাবী দ্বারা ফিসক হওয়ার কারণে তাঁকে ফাসেক বলা হলেও এর কারণে তাঁকে (নাউযবিল্লাহু) পরবর্তীকালেও সর্বদা ফাসেক বলা বৈধ নয়।-(রুহুল-মা'আনী)

আলোচ্য আয়াত অবতরণের কারণ ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ)-এর

ঘটনা হলেও আয়াতে তাঁকে ফাসেক বলা হয়েছে—একথা অকাট্যরূপে জরুরী নয়। কারণ, এই ঘটনার পূর্বে ফাসেক বলার মত কোন কাজ তিনি করেননি। এই ঘটনাও নিজ ধারণা অনুযায়ী সত্য মনে করেই তিনি মোস্তালিক গোত্র সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত সংবাদ দিয়েছিলেন। এই আয়াত ফাসেকের খবর অগ্রহণীয় হওয়া সম্পর্কে একটি সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করেছে এবং সর্বেশ্চেষ্ট ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ আয়াত অবতরণের ফলে বিষয়টি এভাবে আরও জোরদার হয়েছে যে, ওলীদ ইবনে ওকবা (রাঃ) ফাসেক না হলেও তাঁর খবর শক্তিশালী ইঙ্গিত দ্বারা অগ্রহণীয় মনে হয়েছে। তাই রসুলুল্লাহ (সাঃ) কেবল তাঁর খবরের ভিত্তিতেই ব্যবস্থা গ্রহণ না করে খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)—কে তদন্তের আদেশ দেন। সুতরাং একজন সৎ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির খবরের ইঙ্গিতের ভিত্তিতে সন্দেহ হওয়ার কারণে যখন তদন্ত না করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল না, তখন ফাসেকের খবর কবুল না করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা আরও সুস্পষ্ট। সাহাবীগণের ‘আদালত’ সম্পর্কিত আলোচনার কিছু অংশ পরবর্তী **وَلَنْ يَكْفُرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** আয়াতেও বর্ণিত হবে।

এর আগের আয়াতে ওলীদ ইবনে ওকবা মুস্তালিক গোত্র সম্পর্কে খবর দিয়েছিল যে, তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে এবং যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে। এতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও উত্তেজনা দেখা দেয়। তাঁদের মত ছিল যে, মুস্তালিক গোত্রের বিপক্ষে যুদ্ধাভিযান করা হোক। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সাঃ) ওলীদ ইবনে ওকবার খবরকে শক্তিশালী ইঙ্গিতের খেলাফ মনে করে কবুল করেননি এবং তদন্তের জন্যে খালেদ ইবনে ওলীদকে আদেশ করেন। আগের আয়াতে কোরআন এ বিষয়কে আইনের রূপ দান করেছে যে, যে ব্যক্তির খবরে শক্তিশালী ইঙ্গিতের মাধ্যমে সন্দেহ দেখা দেয়, তদন্তের পূর্বে তার খবর অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতে সাহাবায়ে কেরামকে আরও একটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যদিও বনী-মুস্তালিক সম্পর্কিত খবর শুনে তোমাদের উত্তেজনা ধর্মীয় মর্যাদাবোধের কারণে ছিল; কিন্তু তোমাদের মতামত নির্ভুল ছিল না। রসুলের অবলম্বিত পন্থাই উত্তম ছিল।—(মায়হারী) উদ্দেশ্য এই যে, পরামর্শ সাপেক্ষ ব্যাপারাদিতে কোন মত পেশ করা তো দুরন্ত; কিন্তু এরূপ চেষ্টা করা যে, রসূল (সাঃ) এই মত অনুযায়ীই কাজ করুন, এটা দুরন্ত নয়। কেননা, সাংসারিক ব্যাপারাদিতে যদিও খুব কমই রসুলের মতামত উপযোগিতার বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা নবুওয়তের পরিপন্থী নয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলকে যে দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন, তা তোমাদের নেই। তাই রসূল যদি তোমাদের মতামত মেনে চলেন, তবে অনেক ব্যাপারে তোমাদের কষ্ট ও বিপদ হবে। যদি কুতূপি কোথাও তোমাদের মতামতের মধ্যেই উপযোগিতা নিহিত থাকে এবং তোমরা রসুলের আনুগত্যের খাতির নিজেদের মতামত পরিত্যাগ কর, যাতে তোমাদের সাংসারিক ক্ষতিও হয়ে যায়, তবে তাতে ততটুকু ক্ষতি নেই, যতটুকু তোমাদের মতামত মেনে চলার মধ্যে আছে। কেননা, এমতাবস্থায় কিছু সাংসারিক ক্ষতি হয়ে গেলেও রসুলের আনুগত্যের পুরস্কার ও সওয়াব এর চমৎকার বিকল্প বিদ্যমান আছে। **عَنْتُمْ** শব্দটি **عَنْتُمْ** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ গোনাহ্ ও হয় এবং কোন বিপদে পতিত হওয়াও হয়। এখানে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে।—(কুরতুবী)

শানে-নুযল : এসব আয়াতের শানে-নুযল সম্পর্কে তফসীরবিদগণ একাধিক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এসব ঘটনায় খোদা মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে স্বেচ্ছাচারে বিষয়বস্তু আছে। এখন সকল ঘটনার সমষ্টি আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ হতে পারে অথবা কোন একটি ঘটনার

পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে এবং অন্য ঘটনাগুলোকে অনুরূপ দৃষ্টে সেগুলোকেও অবতরণের কারণের মধ্যে শরীক করে দেখা হয়েছে। এই আয়াতে আসলে যুদ্ধ ও জেহাদের সরঞ্জাম ও উপকরণের অধিকারী রাজন্যবর্গকে সন্মোদন করা হয়েছে।—(বাহর, রুহুল মা’আনী) পরোক্ষভাবে সকল মুসলমানকেও সন্মোদন করা হয়েছে যে, তারা এ ব্যাপারে রাজন্যবর্গের সাথে সহযোগিতা করবে। যেখানে কোন ইমাম, আমীর, সরদার, অথবা বাদশাহ্ নেই, সেখানে যতদূর সম্ভব বিবদমান উভয়পক্ষকে উপদেশ নিয়ে যুদ্ধ বিরতিতে সন্মত করতে হবে। যদি উভয়ই সন্মত না হয়, তবে তাদের থেকে পৃথক থাকতে হবে। কারণ বিরোধিতা এবং কারণ পক্ষ অবলম্বন করা যাবে না।—(বয়ানুল-কোরআন)

মাসায়েল : মুসলমানদের দুই দলের যুদ্ধ কয়েক প্রকার হতে পারে। বিবদমান উভয় দল ইমামের শাসনাধীন হবে কিংবা উভয়দল শাসনাধীন হবে না কিংবা একদল শাসনাধীন হবে এবং অন্যদল শাসন বহির্ভূত হবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে উপদেশের মাধ্যমে উভয়দলকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখা। যদি উপদেশে বিরত না হয়, তবে ইমামের পক্ষ থেকে বীমাংসা করা গুনাহ্‌জব। যদি ইসলামী সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে উভয়পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করে, তবে কেসাস ও রক্তবিনিময়ের বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় উভয়পক্ষের সাথে বিদ্রোহীরা ব্যবহার করা হবে। এক পক্ষ যুদ্ধ থেকে বিরত হলে এবং অপর পক্ষ জলুম ও নির্যাতন অব্যাহত রাখলে দ্বিতীয় পক্ষকে বিদ্রোহী মনে করা হবে এবং প্রথম পক্ষকে আদেল বলা হবে। বিদ্রোহীদের প্রতি প্রযোজ্য বিস্তারিত বিধান ফেকাহ গ্রন্থে দৃষ্টব্য। সংক্ষেপে বিধান এই যে, যুদ্ধের আগে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং তাদেরকে গ্রেফতার করে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা হবে। যুদ্ধরত অবস্থায় কিংবা যুদ্ধের পর তাদের সম্মান-সম্মতিকে গোলাম অথবা বাদী করা হবে না এবং তাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ বলে গণ্য হবে না। তবে তওবা না করা পর্যন্ত ধন-সম্পদ আটক রাখা হবে। তওবার পর প্রত্যাপন করা হবে। আয়াতে বলা হয়েছে :

وَلَنْ يَكْفُرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ, যদি বিদ্রোহী দল

বিদ্রোহ ও যুদ্ধ থেকে বিরত হয় তবে শুধু যুদ্ধ বিরতিই যথেষ্ট হবে না; বরং যুদ্ধের কারণ ও পারস্পরিক অভিযোগ দূর করার চেষ্টা কর, যাতে কোন পক্ষের মনে বিদ্বেষ ও শত্রুতা অবশিষ্ট না থাকে এবং স্থায়ী শত্রুত্বের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তারা যেহেতু ইমামের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছে, তাই তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি ইনছাফ না হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই কোরআন পাক উভয় পক্ষের অধিকারের ব্যাপারে ইনছাফের তাকীদ করেছে।—(বয়ানুল-কোরআন)

মাসআলা : যদি মুসলমানদের কোন শক্তিশালী দল ইমামের বশ্যতা অস্বীকার করে, তবে ইমামের কর্তব্য হবে সর্বপ্রথম তাদের অভিযোগ শ্রবণ করা, তাদের কোন সন্দেহ কিংবা ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা দূর করা। তারা যদি তাদের বিরোধিতার শরীয়তসম্মত বৈধ কারণ উপস্থিত করে, যদ্বারা খোদা ইমামের অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়ন প্রমাণিত হয়, তবে সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে এই দলের সাহায্য ও সমর্থন করা, যাতে ইমাম যুলুম থেকে বিরত হয়। এক্ষেত্রে ইমামের যুলুম নিশ্চিত ও সন্দেহহীনরূপে প্রমাণিত হওয়া শর্ত।—(মায়হারী)

পক্ষান্তরে যদি তারা তাদের বিদ্রোহ ও আনুগত্য বর্জনের পক্ষে কোন সুস্পষ্ট ও সঙ্গত কারণ পেশ করতে না পারে এবং ইমামের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদের যুদ্ধে লিপ্ত

হওয়া হুলাল। ইমাম শাফেরী (রহঃ) বলেন, তারা যুদ্ধ শুরু না করা পর্যন্ত মুসলমানদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু করা জায়েয হবে না।—(মায়হারী)

এই বিধান তখন, যখন এই দেশের বিদ্রোহী ও অত্যাচারী হওয়া নিশ্চিতরূপে জানা যায়। যদি উভয় পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণ রাখে এবং কে বিদ্রোহী ও কে আদেল, তা নির্দিষ্ট করা কঠিন হয়, তবে প্রত্যেক মুসলমানই নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী যে পক্ষকে আদেল মনে করবে সেই পক্ষকে সাহায্য ও সমর্থন করতে পারে। যার এরূপ কোন প্রবল ধারণা নেই, সে নিরপেক্ষ থাকবে, যেমন জমল ও হিফফীন যুদ্ধে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ : ইমাম আবুবকর ইবনে আরাবী (রহঃ) বলেন : এই আয়াত মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের যাবতীয় প্রকারের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে। সেসব দ্বন্দ্ব-কলহও এই আয়াতের মধ্যে দাখিল, যাতে উভয় পক্ষ কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণের ভিত্তিতে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরামের বাদানুবাদ এই প্রকারের মধ্যে পড়ে। কুরতুবী ইবনে আরাবীর এই উক্তি উদ্ধৃত করে এ স্থলে সাহাবায়ে-কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদ তথা জঙ্গ-জমল ও সিকফীনের আসল স্বরূপ বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে পরবর্তী যুগের মুসলমানদের কর্মপন্থার প্রতি অভুলি নির্দেশ করেছেন। এখানে কুরতুবীর বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার উল্লেখ করা হচ্ছে :

কোন সাহাবীকে অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে ভ্রান্ত বলা জায়েয নয়। কারণ, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমেই নিজ নিজ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছিলেন। সবার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ। তাঁরা সবাই আমাদের নেতা। আমাদের প্রতি নির্দেশ এই যে, আমরা যেন তাঁদের পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকি এবং সর্বদা উভয় পন্থায় তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করি। কেননা, সাহাবী হওয়া বড়ই সম্মানের বিষয়। নবী করীম (সাঃ) তাঁদেরকে মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট আছেন। এছাড়া বিভিন্ন সনদে এই হাদীস প্রমাণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত তালহা (রাঃ) সম্পর্কে বলেছেন : **ان طلحة شهيد يمشی على وجه الارض** - অর্থাৎ, তালহা ভূপৃষ্ঠে চলাফেরাকারী শহীদ।

এখন হযরত আলীর বিরুদ্ধে হযরত তালহার যুদ্ধের জন্যে বের হওয়া প্রকাশ্য গোনাহ ও নাকরমানী হলে এ যুদ্ধে শহীদ হয়ে তিনি কিছুতেই শাহাদতের মর্যাদা লাভ করতে পারতেন না। এমনভাবে হযরত তালহার এই কাজকে ভ্রান্ত এবং কর্তব্য পালনে ত্রুটি সাব্যস্ত করা সম্ভব হলেও তাঁর জন্যে শাহাদতের মর্যাদা অর্জিত হত না। কারণ, শাহাদত একমাত্র তখনই অর্জিত হয়, যখন কেউ আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে প্রাণ বিসর্জন দেয়। কাজেই তাঁদের ব্যাপারে পূর্ববর্ণিত বিশ্বাস পোষণ করাই জরুরী।

এ ব্যাপারে খোদ হযরত আলী থেকে বর্ণিত সহীহ ও মশহুর হাদীস দ্বিতীয় প্রমাণ। তাতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন : যুযায়রের হত্যাকারী জাহান্নামে আছে।

হযরত আলী বলেন : আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা বলতে শুনেছি, সফিয়া-তনয়ের হত্যাকারীকে জাহান্নামের খবর দিয়ে দাও। অতএব, প্রমাণিত হল যে, হযরত তালহা ও হযরত যুযায়র এই যুদ্ধের কারণে পাপী ও গোনাহ্গার ছিলেন না। এরূপ হলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত তালহাকে শহীদ বলতেন না এবং যুযায়রের হত্যাকারী সম্পর্কে জাহান্নামের

ভবিষ্যদ্বাণী করতেন না। এছাড়া তিনি ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জন সাহাবীর অন্যতম। তাঁদের জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য প্রায় সর্ববাদিসম্মত।

এমনিভাবে সাহাবীদের মধ্যে ঝাড়া এসব যুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিলেন, তাঁদেরকেও ভ্রান্ত বলা যায় না। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ইজতিহাদের মাধ্যমে এ মতের উপরই কায়ম রেখেছেন—এদিক দিয়ে তাঁদের কর্মপন্থাও সঠিক ছিল। সুতরাং এ কারণে তাঁদেরকে ভরৎসনা করা, তাঁদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তাঁদেরকে ফাসেক সাব্যস্ত করা এবং তাদের ফযীলত, সাধনা ও মহান ধর্মীয় মর্যাদা অস্বীকার করা কিছুতেই দুরস্ত নয়। জনৈক আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হয় : সাহাবায়ে-কেরামের পারস্পরিক বাদানুবাদের ফলস্বরূপ যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি ? তিনি জওয়াবে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِبُّوا إِلَهُمَا مَا كَانَتْ لَكُمُ الْكَيْبُوتُ لِمَ كَانُوا يَمُوتُونَ

عَمَّا لَا تُلَاحِظُونَ

অর্থাৎ, সেই উম্মত অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাদের কাজকর্ম তাদের জন্যে এবং তোমাদের কাজকর্ম তোমাদের জন্যে। তারা কি করত না করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

একই প্রশ্নের জওয়াবে অন্য একজন বুয়ূর্গ বলেন : এটা এমন রক্ত যে, আল্লাহ এর দ্বারা আমার হাতকে রঞ্জিত করেননি। এখন আমি আমার জিহবাকে এর সাথে জড়িত করতে চাই না। উদ্দেশ্য এই যে, আমি কোন এক পক্ষকে কোন ব্যাপারে নিশ্চিত ভ্রান্ত সাব্যস্ত করার ভুলে লিপ্ত হতে চাই না।

আল্লামা ইবনে ফওর বলেন : আমাদের একজন সহযোগী বলেছেন যে, সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যবর্তী বাদানুবাদ ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলীর অনুরূপ। তাঁরা পারস্পরিক বিরোধ সত্ত্বেও বেলায়েত ও নবুওয়তের গণ্ডি থেকে খরিজ হয়ে যাননি। সাহাবায়ে-কেরামের পারস্পরিক ঘটনাবলীর ব্যাপারটিও হুবহু তাই।

হযরত মুহাসেবী বলেন : সাহাবায়ে-কেরামের পারস্পরিক রক্তপাতের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কিছু মন্তব্য করা সুকঠিন। কেননা, এ ব্যাপারে খোদ সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ ছিল। হযরত হাসান বহরী সাহাবীদের পারস্পরিক যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বলেন : এসব যুদ্ধে সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আমরা অনুপস্থিত। তাঁরা সম্পূর্ণ অবস্থা জানতেন। আমরা জানি না। যে ব্যাপারে সব সাহাবী একমত আমরা তাতে তাঁদের অনুসরণ করব এবং যে ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে, সেই ব্যাপারে আমরা নিশ্চূপ থাকব।

হযরত মুহাসেবী (রহঃ) বলেন : আমিও তাই বলি, যা হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন। আমি জানি তাঁরা যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছেন, সে ব্যাপারে তাঁরা আমাদের চাইতে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাই তাঁদের সর্বসম্মত বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করা এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে নিশ্চূপ থাকাই আমাদের কাজ। আমাদের তরফ থেকে নতুন কোন পথ আবিষ্কার করা অনুচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁরা সবাই ইজতিহাদের মাধ্যমে কাজ করেছিলেন এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করেছিলেন। তাই ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁরা সবাই সন্দেশ ও সংশয়ের উর্ধ্বে।

সূরা হুজুরাতের শুরুতে নবী করীম (সাঃ)—এর হক ও আদব, অতঃপর সাধারণ মুসলমানদের পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতি-নীতি বর্ণিত

হয়েছে। এর পূর্ববর্তী দুই আয়াতে মুসলমানদের দলগত সংশোধনের বিধান উল্লেখিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক হক, আদব ও সামাজিক রীতি-নীতি বিবৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (এক) কোন মুসলমানকে ঠাট্টা ও উপহাস করা, (দুই) কাউকে দোষারোপ করা এবং (তিন) কাউকে অপমানকর অথবা গীড়ানায়ক নামে ডাকা।

কুরতুবী বলেন : কোন ব্যক্তিকে হেয় ও অপমান করার জন্যে তার কোন দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা, যাতে শ্রোতার হাসতে থাকে, তাকে *سخرية - تمسخر - استهزاء* বলা হয়। এটা যেমন মুখে সম্পন্ন হয়, তেমনি হস্তদ্বারা ইত্যাদি দ্বারা ব্যক্ত অথবা ইজিতের মাধ্যমেও সম্পন্ন হয়ে থাকে। কারণ ও কথা শুনে অপমানের ভঙ্গিতে বিদ্রূপ করার মাধ্যমেও হতে পারে। কেউ কেউ বলেন : শ্রোতাদের হাসির উদ্দেশ্য করে, এমনভাবে কারণও সম্পর্কে আলোচনা করাকে *سخرية* ও *تمسخر* বলা হয়। কোরআনের কর্না মতে এগুলো সব হারাম।

কোরআন পাক এত গুরুত্ব সহকারে *سخرية* তথা উপহাস নিষিদ্ধ করেছে যে, এক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী জাতীকে পৃথকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। পুরুষদের জন্যে কওম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, অভিধানে এ শব্দটি পুরুষদের জন্যেই বিধারিত, যদিও রূপকভঙ্গিতে নারীদেরকেও শামিল করা হয়ে থাকে। কোরআন পাক সাধারণতঃ পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যে কওম শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু কোরআন এখানে কওম শব্দটি বিশেষভাবে পুরুষদের জন্যে ব্যবহার করেছে এবং এর বিপরীতে *نساء* শব্দের মাধ্যমে নারীদের কথা উল্লেখ করেছে। উভয়কে বলা হয়েছে যে, যে পুরুষ অপর পুরুষকে উপহাস করে, সে আল্লাহর কাছে উপহাসকারিণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। কোরআনে পুরুষ পুরুষকে এবং নারী নারীকে উপহাস করা ও তা হারাম হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে ; অথচ কোন পুরুষ নারীকে এবং কোন নারী পুরুষকে উপহাস করলে তা-ও হারাম। কিন্তু একথা উল্লেখ না করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নারী ও পুরুষের মেলামেশা ই শরীয়তে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। মেলামেশা না হলে উপহাসের প্রশ্নই উঠে না। আয়াতের সারমর্ম এই যে, কোন ব্যক্তির দেহ, আকার-আকৃতিতে অথবা গঠনপ্রকৃতিতে কোন দোষ দৃষ্টিগোচর হলে তা নিয়ে কারণও হাসাহাসি অথবা উপহাস করা উচিত নয়। কেননা, তার জানা নেই যে, সম্ভবতঃ এই ব্যক্তি সততা, আন্তরিকতা ইত্যাদির কারণে আল্লাহর কাছে তার চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। এ আয়াতে পূর্ববর্তী বুয়ুর্গ ও মনীষীদের অন্তরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমার ইবনে শোরাহবিল (রাঃ) বলেন : কোন ব্যক্তিকে বকরীর স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ পান করতে দেখে যদি আমার হাসির উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি আশংকা করতে থাকি যে, কোথাও আমিও এরূপই না হয়ে যাই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন : কোন কুকুরকেও উপহাস করতে আমার ভয় লাগে, আমিও নাকি কুকুর হয়ে যাই।—(কুরতুবী)

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হোরাযরা (রাঃ) এর রেওয়াজেতক্রমে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের আকার-আকৃতি ও ধন-দৌলতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না; বরং তাদের অন্তর ও কাজকর্ম দেখেন। কুরতুবী বলেন : এই হাদীস থেকে এই বিধি ও মূলনীতি জানা যায় যে, কোন ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা দেখে তাকে নিশ্চিতরূপে ভাল অথবা মন্দ বলে দেয়া জায়েয নয়। কারণ, যে ব্যক্তির বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মকে আমরা খুব ভাল মনে করছি, সে আল্লাহর কাছে নিন্দনীয় হতে পারে।

কেননা, আল্লাহ তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা ও ক্রিয়াকর্ম মন্দ, তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অন্তরগত গুণাগুণ তার কুর্কর্মে কাকফারা হয়ে যেতে পারে। তাই যে ব্যক্তিকে মন্দ অবস্থা ও কুর্কর্মে লিপ্ত দেখে, তার এই অবস্থাকে মন্দ মনে করে, কিন্তু তাকে হেয় ও লালিত মনে করার অনুমতি নেই। আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে *لمز*—এর অর্থ কারণও দোষ বের করা, দোষ প্রকাশ করা এবং দোষের কারণে ভর্সনা করা, এরশাদ হয়েছে—*وَلَا تَنْفَرُوا النَّسَبَ* অর্থাৎ, তোমরা নিজেদের দোষ বের করো না। এই বাক্যটি *وَلَا تَنْفَرُوا النَّسَبَ*—এর মতই, যার অর্থ তোমরা পরস্পরে একে অন্যকে হত্যা করো না এবং নিজেদের দোষ বের করার অর্থ এই যে, একে অন্যের দোষ বের করো না। এরূপ ভঙ্গিতে দোষ ব্যক্ত করার রহস্য একথা বলা যে, অপরকে হত্যা করা একদিক দিয়ে নিজেকেই হত্যা করার শামিল। কেননা, শ্রাব্যই তো এরূপ হয়েছে যার যে, একজন অন্যজনকে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তির সম্বন্ধকরা তাকেও হত্যা করে। এটা না হলেও প্রকৃত সত্য এই যে, মুসলমান সব ভাই ভাই। তাইকে হত্যা করা যেন নিজেকে হত্যা করা এক হস্তগত বিধিই করে দেয়া—*وَلَا تَنْفَرُوا النَّسَبَ*—এর অর্থ তা-ই। অর্থাৎ, তোমরা অন্যের দোষ বের করলে, সেও তোমাদের দোষ বের করবে। কারণ, দোষ থেকে কোন মানুষ মুক্ত নয়। জ্ঞানেক আলেম বলেন *وَالنَّاسُ أَعْيُنُ* অর্থাৎ, তোমার মধ্যও দোষ আছে এবং মানুষের চক্ষু আছে। তারা দোষ দেখে। তুমি কারও দোষ বের করলে সেও তোমার দোষ বের করবে। যদি সে সবর করে, তবে সে কথাই বলতে হবে যে, মুসলমান তাইয়ের দুর্নিয় নিজেই দুর্নিয়।

আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, অপরকে মন্দ নামে ডাকা, যদ্বন্ধন সে অসম্মত হয়। উদাহরণতঃ কাউকে বক্ক, ঘোড়া অথবা অস্ত্র বলে ডাকা অথবা অপমানজনক নামে সম্বোধন করা। হযরত আবু জুযায়ের আনসারী (রাঃ) বলেন : এই আয়াত আমাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায আসন্ন করেন, তখন আমাদের অমিকশ লোকের দুই তিনটি করে নাম ব্যাখ্যাত ছিল। অনুযায়ী কোন কোন নাম সঞ্চিত ব্যক্তিকে লঙ্ঘা দেয়া ও লালিত করার জন্য লোকেরা ব্যাখ্যাত করেছিল। রসূলুল্লাহ (সঃ) তা জানতেন না। তাই মাঝে মাঝে সেই মন্দ নাম ধরে তিনিও সম্বোধন করতেন। তখন সাহাবায়ে কোরাম বলতেন : ইয়া রসূলুল্লাহ, সে এই নাম শুনে অসম্মত হয়। এই ঘটনার পরিশ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হযরত ইবনে আক্বাস (রাঃ) বলেন : *وَلَا تَنْفَرُوا النَّسَبَ* এর অর্থ হচ্ছে কেউ কোন গোনাহ অথবা মন্দকাজ করে তওবা করার পরও তাকে সেই মন্দকাজের নামে ডাকা। উদাহরণতঃ চোর, ব্যক্তির অথবা শরণী বলে সম্বোধন করা। যে ব্যক্তি চুরি, ঘেনা, শরণ ইত্যাদি থেকে তওবা করে নেয়, তাকে অতীত কুর্কর্ম দ্বারা লঙ্ঘা দেয়া ও হেয় করা হারাম। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন গোনাহ দ্বারা লঙ্ঘা দেয়, যা থেকে সে তওবা করেছে, তাকে সেই গোনাহে লিপ্ত করে ইহকাল ও পরকালে লালিত করার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করেন।—(কুরতুবী)

কোন কোন নামের ব্যতিক্রমঃ কোন কোন লোকের এমন নাম ব্যাখ্যাত হয়ে যায়, যা আসলে মন্দ, কিন্তু এই নাম ব্যতীত কেউ তাকে চেনে না। এমনভাবেই সঞ্চিত ব্যক্তিকে হেয় লালিত করার ইচ্ছা না থাকলে তাকে এই নামে ডাকা জায়েয। এ ব্যাপারে আলমগণ একমত। যেমন, কোন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثْمٌ وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّ الْقِيَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَيْفَ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ
لِخَمِّ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٠﴾
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ الْكُفْرَ عِنْدَ اللَّهِ أَفْشَرُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٥١﴾
قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ إِنَّهُمْ تَوَّابُونَ وَلَكِنْ قُتِلُوا وَاسْتَلَمُوا وَلَمْ يَكُنْ
لَهُمْ دِينَارٌ وَلَا أُنْثَىٰ يَوْمَئِذٍ وَكَانُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ
سُوءَ الرَّبِّ أَلَا نَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٥٢﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجْهَهُدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ
الْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِمِيزَانٍ ﴿٥٤﴾ يَتَذَكَّرُ عَلَيْكُمْ أَن
أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُمُ الْغَيْبُ وَإِنَّمَا هُمْ
فِتْنَةٌ أَكْثَرٌ يُغْتَابُونَ ۖ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاللَّهُ بَصِيرٌ ﴿٥٥﴾

প্রতি কুখারণা বোঝানো হয়েছে। যেসব কাজের কোন এক দিককে আমলে আনা আইনতঃ জরুরী এবং সে সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই, সেখানে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব; যেমন পারম্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ ও মোকদ্দমার ফয়সালায় নির্ভরযোগ্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফয়সালা দেয়া। কারণ, যে বিচারকের আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়, তার জন্যে ফয়সালা দেয়া জরুরী ও ওয়াজিব এবং এই বিশেষ ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে কোন বর্ণনা নেই। এমতাবস্থায় নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য অনুযায়ী আমল করা বিচারকের জন্যে জরুরী। এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিরও মিথ্যা বলার সম্ভাবনা থাকে। তার সত্যবাদিতা নিছক একটা প্রবল ধারণা মাত্র। সেমতে এই ধারণা অনুযায়ী আমল করাই ওয়াজিব। এমনভাবে যে জায়গায় কেবলার দিক অজ্ঞাত থাকে এবং জেনে নেয়ার মত কোন লোকও না থাকে, সেখানে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তির উপর কোন বস্তুর ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব হলে সেই বস্তুর মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারেও প্রবল ধারণা অনুযায়ীই আমল করা ওয়াজিব। জায়েয ধারণা এমন, যেমন নামাযের রাকআত সম্পর্কে সন্দেহ হল যে, তিন রাকআত পড়া হয়েছে, না চার রাকআত। এমতাবস্থায় প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করা জায়েয। যদি সে প্রবল ধারণা বাদ দিয়ে নিশ্চিত বিষয় অর্থাৎ, তিন রাকআত সাব্যস্ত করে চতুর্থ রাকআত পড়ে নেয়, তবে তাও জায়েয। প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সুধারণা পোষণ করা মুস্তাহাব। এর জন্যে সওয়াবও পাওয়া যায়।—(জাসাস)

কুরতুবী বলেন : কোরআনে বলা হয়েছে :

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ أَنَّهُ مَقْرِبَةٌ

এতে মুমিনদের প্রতি সুধারণা পোষণ করার তাগিদ আছে। অপর পক্ষে একটি সুবিদিত বাক্য আছে অর্থাৎ, প্রত্যেকের প্রতি কুধারণা পোষণ করাই সাবধানতা। এর উদ্দেশ্য এই যে, কুধারণার বশবর্তী হয়ে যেরূপ ব্যবহার করা হয়, প্রত্যেকের সাথে সেইরূপ ব্যবহার করবে। অর্থাৎ, আস্থা ব্যতিরেকে নিজের জিনিস কাউকে সোপর্দ করবে না। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অপরকে চোর মনে করে লাল্হিত করবে। মোটকথা, কোন ব্যক্তিকে চোর অথবা বিশাসঘাতক মনে না করে নিজের ব্যাপারে সতর্ক হবে।

আয়াতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে **تَحْسِبُ** অর্থাৎ, কারও দোষ সন্ধান করা। এই শব্দ দু'টি কেরাআত আছে। (এক) **لَتَحْسِبُوا** জীম সহকারে এবং (দুই) **لَا تَحْسِبُوا** হা সহকারে। আবু হোরাযরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে এই দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে **لَا تَحْسِبُوا** উভয় শব্দের অর্থ কাছাকাছি। আশফাশ উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, জীম সহকারে **تَحْسِبُ** এর অর্থ কোন গোপন বিষয় সন্ধান করা এবং হা-সহকারে **تَحْسِبُ** এর অর্থ সাধারণ সন্ধান করা। সূরা ইউসুফে **فَتَحْسَبُوا مِن يُّوسُفَ وَأَخِيهِ** আয়াতে

এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে দোষ তোমার সামনে আছে, তা ধরতে পার, কিন্তু কোন মুসলমানের যে দোষ প্রকাশ্য নয়, তা সন্ধান করা জায়েয নয়। এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন :

لَتَتَنَابَرُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّ مِنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ

يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ

মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না।

কেননা, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ্ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ্ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্বর্গহেও লাল্হিত করে দেন।—(কুরতুবী)

বয়ানুল-কোরআনে আছে, গোপনে অথবা নিদ্রার ভান করে কারও কথাবার্তা শোনাও নিষিদ্ধ, **تَحْسِبُ** এর অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি ক্ষতির আশংকা থাকে কিংবা নিজের অথবা অন্য মুসলমানের হেফযতের উদ্দেশ্য থাকে, তবে ক্ষতিকারী গোপন ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি অনুসন্ধান জায়েয। আয়াতে নিষিদ্ধ তৃতীয় বিষয় হচ্ছে গীবত। অর্থাৎ, কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে কষ্টকর কথাবার্তা বলা, যদিও তা সত্যকথা হয়। কেননা, মিথ্যা হলে সেটা অপবাদ, যা কোরআনের অন্য আয়াত দ্বারা হারাম। এখানে “অনুপস্থিতিতে” কথা থেকে এরূপ বোঝা সম্ভব নয় যে, উপস্থিতিতে কষ্টকর কথা বলা জায়েয হবে। কেননা, এটা গীবত নয়, কিন্তু **لَمْ** তথা দোষ বের করার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ববর্তী আয়াতে এর নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে।

أَكْبَرُ أَكْبَرُ لِمَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا - এই আয়াত কোন

মুসলমানের বেইজ্জতী ও অপমানকে তার গোশত খাওয়ার সমতুল্য সাব্যস্ত করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত থাকলে এই বেইজ্জতী জীবিত মানুষের গোশত টেনে ভক্ষণ করার সমতুল্য হবে। **لَمْ** শব্দের মাধ্যমে কোরআন একে হারাম সাব্যস্ত করেছে ; যেমন বলা হয়েছে, **وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ** এবং আরও পরে এক আয়াত আসবে

وَلَا تَلْمِزْ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لَمْزَةً - সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সামনে উপস্থিত না থাকলে তার

পশ্চাতে কষ্টদায়ক কথাবার্তা বলা মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য। মৃত মানুষের গোশত ভক্ষণ করলে যেমন তার কোন কষ্ট হয় না, তেমনি অনুপস্থিত ব্যক্তি যে পর্যন্ত গীবতের কথা না জানে, তারও কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু কোন মৃত মুসলমানের গোশত খাওয়া যেমন হারাম ও চূড়ান্ত নীচতা, তেমনি গীবত করাও হারাম এবং নীচতা। কারণ, অসাক্ষাতে কাউকে মন্দ বলা কোন বীরত্বের কাজ নয়।

এই আয়াতে তিনটি বিষয় নিষিদ্ধ করতে গিয়ে গীবতের নিষিদ্ধতাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং একে মৃত মুসলমানের মাংস ভক্ষণের সমতুল্য প্রকাশ করে এর নিষিদ্ধতা ও নীচতা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, কারও উপস্থিতিতে তার দোষ প্রকাশ করা গীড়াধানের কারণে হারাম, কিন্তু তার প্রতিরোধ সে নিজেও করতে পারে। প্রতিরোধের আশংকায় প্রত্যেকেরই এরূপ দোষ প্রকাশ করার সাহসও হয় না এবং এটা স্বভাবতঃই বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। পক্ষান্তরে গীবতের মধ্যে কোন প্রতিরোধকারী থাকে না। নীচ থেকে নীচতর ব্যক্তি কোন উচ্চতর ব্যক্তির গীবত অনায়াসে করতে পারে। প্রতিরোধ না থাকার কারণে এর ধারা সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়ে থাকে এবং এতে মানুষ লিপ্তও হয় বেশী। এসব কারণে গীবতের নিষিদ্ধতার উপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য করা হয়েছে যে, কেউ গীবত শুনে তার অনুপস্থিত ভাইয়ের পক্ষ থেকে সাধ্যানুযায়ী প্রতিরোধ করবে। প্রতিরোধের শক্তি না থাকলে কমপক্ষে তা শ্রবণ থেকে বিরত থাকবে। কেননা, ইচ্ছাকৃতভাবে গীবত শোনাও নিজে গীবত করার মতই।

হযরত মায়মুন (রাঃ) বলেন : একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম, জনৈক সঙ্গী ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে আছে এবং একব্যক্তি আমাকে বলছে একে ভক্ষণ কর। আমি বললাম আমি একে কেন ভক্ষণ করব? সে বলল :

কারণ, তুমি অমুক ব্যক্তির সঙ্গী গোলামের গীবত করছে। আমি বললাম : আল্লাহর কসম, আমি তো তার সম্পর্কে কখনও কোন ভালমন্দ কথা বলিনি। সে বলল : হাঁ, একথা ঠিক, কিন্তু তুমি তার গীবত শুনেছ এবং এতে সম্মত রয়েছ। এই ঘটনার পর হযরত মায়মুন (রাঃ) নিজে কখনও কারও গীবত করেননি এবং তাঁর মজলিসে কারও গীবত করতে দেননি।

হযরত হাসান ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত শবে যে'রাজের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : আমাকে নিয়ে যাওয়া হলে আমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম যাদের নখ ছিল তামার। তারা তাদের মুখমণ্ডল ও দেহের মাংসে আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম এরা কারা? তিনি বললেন : এরা তাদের ভাইয়ের গীবত করত এবং তাদের ইজ্জতহানি করত।—(মায়হারী)

হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ) ও জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, الغيبة اشد من الزنا অর্থাৎ, গীবত ব্যাভিচারের চাইতেও মারাত্মক গোনাহ। সাহাবায়ে কেয়াম আরম্ভ করলেন, এটা কিরূপে? তিনি বললেন, একব্যক্তি ব্যাভিচার করার পর তওবা করলে তার গোনাহ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু যে গীবত করে, তার গোনাহ প্রতিপক্ষের মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হয় না।—(মায়হারী)

এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, গীবতের মাধ্যমে আল্লাহর হুক ও বন্দার হুক উভয়ই নষ্ট করা হয়। তাই যার গীবত করা হয়, তার কাছ থেকে মাফ নেয়া জরুরী। কোন কোন আলেম বলেন : যার গীবত করা হয়, গীবতের সংবাদ তার কাছে না পৌঁছা পর্যন্ত বন্দার হুক হয় না। তাই তার কাছ থেকে ক্ষমা নেয়া জরুরী নয়।—(রুহুল-মা'আনী) কিন্তু বয়ানুল-কোরআনে একথা উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে : এমনতাবস্থায় যদিও তার কাছে ক্ষমা চাওয়া জরুরী নয়, কিন্তু যার সামনে গীবত করা হয়, তার সামনে নিজেকে মিথ্যাবাদী বলা এবং নিজ গোনাহ স্বীকার করা জরুরী। যদি সেই ব্যক্তি মারা যায়, কিংবা লাপাত্তা হয়ে যায়, তবে তার কাফফারা এই যে, যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্যে আল্লাহর কাছে মাগফেরাতের দোয়া করবে এবং এরূপ বলবে : হে আল্লাহ, আমার ও তার গোনাহ মাফ কর। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাই বলেছেন।

মাসআলা : শিশু, উনমাদ এবং কাফের যিশ্মীর গীবতও হারাম। কেননা, তাদেরকে পীড়া দেয়াও হারাম। হরবী কাফেরকে পীড়া দেয়া হারাম না হলেও নিজের সময় নষ্ট করার কারণে তার গীবতও মাকরুহ।

মাসআলা : গীবত যেমন কথা দ্বারা হয়, তেমনি কর্ম ও ইশারা দ্বারাও হয়। উদাহরণতঃ খঞ্জেকে হেয় করার উদ্দেশ্যে তারমত হেঁটে দেখানো।

মাসআলা : কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে সব গীবতকেই হারাম করা হয়নি এবং কতক গীবতের অনুমতি আছে। উদাহরণতঃ কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে কারও দোষ বর্ণনা করা জরুরী হলে তা গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, তবে প্রয়োজন ও উপকারিতাটি শরীয়তসম্মত হতে হবে। উদাহরণতঃ কোন অত্যাচারীর অত্যাচার কাহিনী এমন ব্যক্তির সামনে বর্ণনা করা, যে তার অত্যাচার দূর করতে সক্ষম। কারও সন্তান ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার পিতা ও স্বামীর কাছে অভিযোগ করা, কোন ঘটনা সম্পর্কে ফতওয়া গ্রহণ করার জন্যে ঘটনার বিবরণ দান করা, মুসলমানদেরকে কোন ব্যক্তির সাংসারিক অথবা পারলৌকিক অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্যে তার অবস্থা বর্ণনা করা, কোন ব্যাপারে পরামর্শ নেয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গোনাহ করে এবং নিজের পাপাচারকে নিজেই প্রকাশ

করে, তার কুকর্ম আলোচনা করাও গীবতের মধ্যে দাখিল নয়, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে নিজের সময় নষ্ট করার কারণে মাকরুহ।—(বয়ানুল-কোরআন, রুহুল মা'আনী) এসব মাসআলায় অভিন্ন বিষয় এই যে, কারও দোষ আলোচনা করার উদ্দেশ্য তাকে হেয় করা না হওয়া চাই; বরং প্রয়োজনবশতই আলোচনা হওয়া চাই।

উপরের আয়াতসমূহে মানবিক ও ইসলামী অধিকার এবং সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে ছয়টি বিষয়কে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের কারণ হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে মানবিক সাম্যের একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা রয়েছে যে, কোন মানুষ অপর মানুষকে যেন নীচ ও ঘৃণ্য মনে না করে বরং নিজের বংশগত মর্যাদা, পরিবার, অথবা ধন-সম্পদ ইত্যাদির ভিত্তিতে গর্ব না করে। কেননা, এগুলো প্রকৃতপক্ষে গর্বের বিষয় নয়। এই গর্বের কারণে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাই বলা হয়েছে : সব মানুষ একই পিতা-মাতার সন্তান হওয়ার দিক দিয়ে ভাই ভাই এবং পরিবার, গোত্র, অথবা ধন-দৌলতের দিক দিয়ে যে প্রভেদ আল্লাহ তাআলা রেখেছেন, তা গর্বের জন্মে নয়, পারস্পরিক পরিচয়ের জন্যে।

শানে নুযুল : এই আয়াত মক্কা বিজয়ের সময় তখন নাযিল হয়, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত বেলাল হাবশী (রাঃ)-কে মুয়াযযিন নিযুক্ত করেন। এতে মক্কার অমুসলমান কোরাইশদের একজন বলল : আল্লাহকে ধন্যবাদ যে, আমার পিতা পূর্বেই মারা গেছেন। তাকে এই কুদিন দেখতে হয়নি। হারেস ইবনে হেশাম বলল : মুহাম্মদ (সাঃ) মসজিদে হারামে আযান দেয়ার জন্যে এক কাল কাক ব্যতীত অন্য কোন মানুষ পেলেন না? আবু সুফিয়ান বলল : আমি কিছুই বলব না; কারণ, আমার আশংকা হয় যে, আমি কিছু বললেই আকাশের মালিক তার (মুহাম্মদের) কাছে তা পৌঁছিয়ে দেবেন। এসব কথাবার্তার পর জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তাদের সব কথাবার্তা বলে দিলেন। তিনি তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমরা কি বলেছিলে? অগত্যা তাদেরকে স্বীকার করতে হল। এর পরিশ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, গর্ব ও ইজ্জতের বিষয় প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও তাকওয়া, যা তোমাদের মধ্যে নেই এবং হযরত বেলাল (রাঃ)-এর মধ্যে আছে। তাই তিনি তোমাদের চাইতে উত্তম ও সম্প্রাস্ত।—(মায়হারী) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বীয় উষ্টীর পিঠে সওয়ার হয়ে তওয়াফ করেন। (যাতে সবাই তাঁকে দেখতে পারে।) তওয়াফ শেষে তিনি এই ভাষণ দেন :

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি অন্ধকার যুগের গর্ব ও অহংকার তোমাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন। এখন সব মানুষ মাত্র দুই ভাগে বিভক্ত : (এক) সং, পরহেযগার ও আল্লাহর কাছে সম্প্রাস্ত, (দুই) পাপাচারী, হতভাগা ও আল্লাহর কাছে লাঞ্চিত ও অপমানিত। অতঃপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।—(তিরমিযী)

হযরত ইবনে আকবাস (রাঃ) বলেন : দুনিয়ার মানুষের কাছে ইজ্জত হচ্ছে ধনসম্পদের নাম এবং আল্লাহর কাছে ইজ্জত পরহেযগারীর নাম।

شُورًا وَكِبَالًا - شعوب এর বহুবচন। এর অর্থ এক মূল থেকে উদ্ভূত বিরাট দল, যার মধ্যে বিভিন্ন গোত্র ও পরিবার থাকে। বড়

পরিবার এবং তার বিভিন্ন অংশের জন্যেও আলাদা আলাদা নাম আছে। সর্ববৃহৎ অংশকে **শেব** এবং ক্ষুদ্রতম অংশকে **শেবী** বলা হয়। আবু রওযাক বলেন : অনারব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত নেই। তাদেরকে **শেব** বলা হয় এবং আরব জাতিসমূহের বংশ পরিচয় সংরক্ষিত আছে, তাদেরকে **ক্বাবল** বলা হয়। **اسباط** শব্দটি বনী ইসরাঈলের জন্যে ব্যবহৃত হয়।

বংশগত, দেশগত, অথবা ভাষাগত পার্থক্যের তাৎপর্য পারস্পরিক পরিচয় : কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে ফুটিয়ে তুলেছে যে, যদিও আল্লাহ তাআলা সব মানুষকে একই পিতা-মাতা থেকে সৃষ্টি করে ভাই ভাই করে দিয়েছেন, কিন্তু তিনিই তাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করে দিয়েছেন, যাতে মানুষের পরিচিতি ও সনাক্তকরণ সহজ হয়। উদাহরণতঃ একনামের দুই ব্যক্তি থাকলে পরিবারের পার্থক্য দ্বারা তাদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। মোটকথা, বংশগত পার্থক্যকে পরিচিতির জন্যে ব্যবহার করা—গর্ব নয়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার কাছে সম্মান ও আভিজাত্যের মাপকাঠি হচ্ছে পরহেযগারী। এই পরহেযগারী একটি অপ্রকাশ্য বিষয় যা আল্লাহ তাআলাই জানেন। কোন ব্যক্তির পক্ষেই নিজের পবিত্রতার দাবী করা বৈধ নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে যে, ইমানের আসল ভিত্তি হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে শুধু মুখে নিজেই মুমিন বলা ঠিক নয়। সমগ্র সূরার প্রথমে নবী করীম (সাঃ)-এর হক, অতঃপর পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। উপসংহারে বলা হচ্ছে যে, আন্তরিক বিশ্বাস এবং আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্যের উপরই পরকালে সংকর্ম গ্রহণীয় হওয়ার ভিত্তি স্থাপিত।

শানে-নুযূল : ইমাম বগভীর (রহঃ)-বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতটি অবতরণের ঘটনা এই যে, বনী-আসাদের কতিপয় ব্যক্তি নিদারুণ দুভিক্ষের সময় মদীনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তারা অন্তরগতভাবে মুমিন ছিল না। শুধু সদকা-খয়রাত লাভের জন্যে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করছিল। বাস্তবে মুমিন না হওয়ার কারণে ইসলামী বিধি-বিধান ও রীতিনীতি সম্পর্কে তারা অজ্ঞ ও বেখবর ছিল। মদীনায় পথে-ঘাটে তারা মলমূত্র ও আবর্জনা ছড়িয়ে দিল এবং বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বাড়িয়ে দিল। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে একে তো ইমানের মিথ্যা দাবী করল, দ্বিতীয়ত : তাঁকে ধোকা দিতে চাইল এবং তৃতীয়ত : মুসলমান হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ধন্য করেছে বলে প্রকাশ করল। তারা বলল : অন্যান্য লোক দীর্ঘকাল পর্যন্ত আপনার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে, অনেক যুদ্ধ করেছে, এরপর মুসলমান হয়েছে। কিন্তু আমরা কোনরূপ যুদ্ধ ছাড়াই আপনার কাছে উপস্থিত হয়ে মুসলমান হয়েছি। কাজেই আমাদের সদিচ্ছাকে মূল্য দেয়া দরকার। এটা ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শানে এক প্রকার ধৃষ্টতা। কারণ, এই মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করার পেছনে মুসলমানের সদকা-খয়রাত আকর্ষণ

করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যদি তারা বাস্তবিকই ঈমান মুসলমান হয়ে যেত, তবে এতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নয়—স্বয়ং তাদেরই উপকার ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ নাখিল হয় এবং তাদের মিথ্যা দাবী ও অনুগ্রহ প্রকাশের মুখোশ উন্মোচন করা হয়।

وَلَكِنْ تَوَلَّوْا سَكِينًا - তাদের অন্তরে ইমান ছিল না, শুধু বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে তারা মিথ্যা দাবী করছিল। তাই কোরআন তাদের ইমান না থাকা এবং ইমানের দাবী মিথ্যা হওয়ার কথা বর্ণনা করে বলেছে : তোমাদের “ইমান এনেছি” বলা মিথ্যা। তোমরা বড় জোর **سَكِينًا** “ইসলাম কবুল করেছি” বলতে পার। কেননা, ইসলামের শাসনিক অর্থ বাহ্যিক কাজকর্মে আনুগত্য করা। তারা তাদের ইমানের দাবী সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যে কিছু কাজকর্ম মুসলমানদের মত করতে শুরু করেছিল। তাই আক্ষরিক দিক দিয়ে এক প্রকার আনুগত্য হয়ে গিয়েছিল। অতএব, আভিধানিক অর্থে **سَكِينًا** বলা শুদ্ধ ছিল।

ইসলাম ও ইমানের মধ্যে সম্পর্ক : উপরের বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, আয়াতে ইসলামের আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে—পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হয়নি। তাই আয়াতে এ বিষয়ের প্রমাণ হতে পারে না যে, ইসলাম ও ইমানের মধ্যে পরিভাষাগত পার্থক্য আছে। পারিভাষিক ইমান ও পারিভাষিক ইসলাম অর্থের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। শরীয়তের পরিভাষায় অন্তরগত বিশ্বাসকে ইমান বলা হয়, অর্থাৎ, অন্তর দ্বারা আল্লাহর একত্ব ও রসুলের রেসালাতকে সত্য জানা। পক্ষান্তরে বাহ্যিক কাজকর্ম আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্যকে ইসলাম বলা হয়। কিন্তু শরীয়তে অন্তরগত বিশ্বাস ততক্ষণ ধর্ম্য নয়, যতক্ষণ তার প্রভাব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজকর্মে প্রতিফলিত না হয়। এর সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে মুখে কালমার স্বীকারোক্তি করা। এমনিভাবে ইসলাম বাহ্যিক কাজ-কর্মের নাম হলেও শরীয়তে ততক্ষণ ধর্ম্য নয়, যতক্ষণ অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি না হয়। অন্তরে বিশ্বাস না থাকলে সেটা হবে ‘নেফাক’ তথা মুনাফেকী। এভাবে ইসলাম ও ইমান সূচনা ও শেষ প্রান্তের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা। ইমান অন্তর থেকে শুরু হয়ে বাহ্যিক কাজকর্ম পর্যন্ত পৌঁছে এবং ইসলাম বাহ্যিক কাজকর্ম থেকে শুরু হয়ে অন্তরের বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছে। কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ইসলাম ও ইমান একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইমান ইসলাম ব্যতীত ধর্ম্য নয় এবং ইসলামও ইমান ব্যতি শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। শরীয়তে এটা অসম্ভব যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে মুমিন হবে না এবং মুমিন হবে—মুসলিম হবে না। এটা পারিভাষিক ইসলামের ও ইমানের বেলায়ই প্রযোজ্য। আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে এটা সম্ভব যে, এক ব্যক্তি মুসলিম হবে—মুমিন হবে না; যেমন মুনাফিকদের অবস্থা তাই ছিল। বাহ্যিক আনুগত্যের কারণে তাদেরকে মুসলিম বলা হত, কিন্তু অন্তরে ইমান না থাকার কারণে তারা মুমিন ছিল না।

সূরা আল-হুজুরাত সমাপ্ত

সন্নিবেশিত রয়েছে কোনটি খাদ্যের আকারে এবং কোনটি ওষধের আকারে সন্নিবেশিত হয়ে বর্তমান মানবদেহ গঠিত হয়েছে। এমতাহায় পুনর্বীর এসব উপাদানকে বিশ্লেষণ করে দেয়ার পর আবার এক জায়গায় একত্রিত করা আল্লাহ্‌র পক্ষে কঠিন হবে কি? মৃত্যুর পর এবং মৃত্তিকায় পরিণত হওয়ার পর আল্লাহ্‌ তাআলা মানবদেহের এসব উপাদান সমুদ্রে জ্ঞাত আছেন, শুধু তাই নয়, বরং মানব-সৃষ্টির পূর্বেই তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পরিবর্তন এবং মৃত্যু-পরবর্তী প্রতিটি অবস্থা আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে ‘লওহে-মাহফুযে’ লিখিত আকারে বিদ্যমান আছে।

অতএব, এমন সর্বজ্ঞানী, সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ সম্পর্কে উপরোক্ত বিস্ময় প্রকাশ করা স্বয়ং বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। **مَنْعُصُ** **الْأَرْضِ** আয়াতের এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), ও অধিকাংশ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।—(বাহরে-মুহীত)

مَنْعُصُ অভিধানে **مَنْعُصُ** শব্দের অর্থ মিশ্র, যাতে বিভিন্ন প্রকার বস্তুর মিশ্র থাকে এবং যার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। এরূপ বস্তু সাধারণতঃ ফাসেদ ও দুশিত হয়ে থাকে। এ কারণেই হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) **مَنْعُصُ** শব্দের অনুবাদ করেছে ফাসেদ ও দুষ্ট। যাহ্যাক, কাতাদাহ, হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখ এর অনুবাদ করেছে মিশ্র ও জটিল। উদ্দেশ্য এই যে, কাফেররা নবুওয়ত অস্বীকার করার ব্যাপারেও এক কথার উপর অটল থাকে না। রসুলকে কখনও যাদুকর, কখনও কবি, কখনও অতীন্দ্রিয়বাদী এবং কখনও জ্যোতিষী বলে। তাদের কথাবার্তা স্বয়ং মিশ্র ও দুষ্ট। অতএব, কোন্‌ কথার জওয়াব দেয়া যায়।

এরপর নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বিশালকায় বস্তুসমূহ সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলার সর্বসময় শক্তি বিধৃত করা হয়েছে। নভোমণ্ডল সম্পর্কে বলা হয়েছে : **وَمَا لَهُمْ فَوْزٌ** - **فَوْزٌ** শব্দটি **فَج** এর বহুবচন। এর অর্থ ফাটল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তাআলা আকাশের এই বিশালকায় গোলক সৃষ্টি করেছেন। এটি মানুষের হাতে নির্মিত হলে এতে হাজারো জোড়াতালি ও ফাটলের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হত। কিন্তু তোমরা আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, এতে না কোন তালি আছে এবং না কোথাও ভগ্নাংশ বা সেলাইয়ের চিহ্ন আছে। আকাশগাত্রে নির্মিত দরজা এর পরিপন্থী নয়। কারণ, দরজাকে ফাটল বলা হয় না।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের রেসালত ও পরকাল প্রত্যাখ্যানের বিষয় বর্ণিত হয়েছিল। এটা যে, রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)—এর জন্যে মর্মপিড়ার কারণ ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর সান্ত্বনার জন্যে অতীত যুগের পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা বর্ণনা করে বলেছেন : প্রত্যেক পয়গম্বরের সাথেই কাফেররা পীড়াদায়ক আচরণ করেছে। এটা পয়গম্বরগণের চিরন্তন প্রাপ্য। এতে আপনি মনক্ষুন্ন হবেন না। নূহ (আঃ)—এর সম্প্রদায়ের কাহিনী কোরআনে বার বার বর্ণিত হয়েছে। তিনি বাড়ে নয়’শ বছর পর্যন্ত তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রচেষ্টা চালাল। কিন্তু তারা শুধু তাঁকে প্রত্যাখ্যানই করেনি; বরং নানাভাবে উৎপীড়নও করেছে।

وَأَصْحَابُ الرَّيِّسِ কারা? : **رَس** শব্দটি আরবী ভাষায় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থে ইট, পাথর ইত্যাদি দ্বারা পাকা করা হয় না এরূপ কাঁচা কুপকে **رَس** বলা হয়। **وَأَصْحَابُ الرَّيِّسِ** বলে আযাবের পর সামুদ গোত্রের অবশিষ্ট লোকদেরকে বোঝানো হয়। যাহ্যাক (রহঃ) প্রমুখ তফসীরকারকের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের কাহিনী এই যে, সালেহ্‌

(আঃ)—এর সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব নাযিল হয়, তখন তাদের মধ্য থেকে চার হাজার ঈমানদার ব্যক্তি এই আযাব থেকে নিরাপদ থাকে। আযাবের পর তারা এই স্থান ত্যাগ করে হাযরা মাউতে বসতি স্থাপন করে। হযরত সালেহ্‌ (আঃ)—ও তাদের সাথে ছিলেন। তারা একটি কূপের আশেপাশে বসবাস করতে থাকে। অতঃপর হযরত সালেহ্‌ (আঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ কারণেই এই স্থানের নাম **حَضْرَمُوت** (হাযরা-মাউত অর্থাৎ, মৃত্যু হাযির হল) হয়ে যায়। তারা এখানেই থেকে যায় এবং পরবর্তীকালে তাদের বংশধরদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। তাদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেন। তারা তাঁকে হত্যা করে। ফলে আযাবে পতিত হয় এবং তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কূপটি অকেজো হয়ে যায় ও দালান-কোঠা শূণ্যে পরিণত হয়। কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে একথাই উল্লেখিত হয়েছে : **وَأَرْسَلْنَا قَوْمَكَ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ يُسْكِنُونَ** অর্থাৎ, তাদের অকেজো কূয়া এবং মজবুত জনশূন্য দালান-কোঠা শিক্ষা গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট।

نُوحٌ হযরত সালেহ্‌ (আঃ)—এর উম্মত। তাদের কাহিনী কোরআনে বার বার উল্লেখিত হয়েছে।

عَادٌ—বিশালবপু এবং শক্তি ও বীরত্বে আদ জাতি প্রবাদ বাক্যের ন্যায় খ্যাত ছিল। হযরত হুদ (আঃ) তাদের প্রতি প্রেরিত হন। তারা নাফরমানী করে এবং তাঁর উপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে ঝঞ্ঝার আযাবে সব ফনা হয়ে যায়।

وَأَنفُسُ لُوطٍ—হযরত লূত (আঃ)—এর সম্প্রদায়। তাদের কাহিনী পূর্বে কয়েকবার বর্ণিত হয়েছে।

وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ—ঘন জঙ্গল ও বনকে **أَيْكَة** বলা হয়। তারা এরূপ জায়গাতেই বসবাস করত। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা অবধ্যতা করে এবং আযাবে পতিত হয়ে নিস্তানাবুদ হয়ে যায়।

وَقَوْمُ يُسُفٍ ইয়ামনের জনৈক সম্রাটের উপাধি ছিল তোবকা। সপ্তম খণ্ডের সূরা দোখানে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে।

যারা হাশর ও নশর অস্বীকার করত এবং মৃতদের জীবিত হওয়াকে অবিশ্বাস্য যুক্তিবহির্ভূত বলত, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তাদের সন্দেহ এভাবে নিরসন করা হয়েছিল যে, তোমরা আল্লাহ্‌ তাআলার জ্ঞানকে নিজেদের জ্ঞানের মাপকাঠিতে পরিমাপ করে রেখেছ। তাই এই খটকা দেখা দিয়েছে যে, মৃতের দেহ-উপাদান মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে বিশ্লেষণ করে দেয়ার পর এগুলোকে কিভাবে একত্রিত করা সম্ভব হবে? কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন : সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু আমার জ্ঞানের আওতায় রয়েছে। এগুলোকে যখন ইচ্ছা একত্রিত করে দেয়া আমার জন্যে মোটেই কঠিন নয়। আলোচ্য আয়াতসমূহও খোদায়ী জ্ঞানের বিস্তৃতি ও সর্বব্যাপকতা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে : মানুষের বিক্ষিপ্ত দেহ-উপাদান সম্পর্কে জ্ঞানী হওয়ার চাইতে বড় বিষয় এই যে, আমি প্রত্যেক মানুষের মনের নিভৃত জাগরিত কল্পনাসমূহকেও সর্বদা ও সর্বাবস্থা জানি। দ্বিতীয় আয়াতে এর কারণ বর্ণনা হয়েছে যে, আমি গ্রীবাস্থিত ধর্মী অপেক্ষাও মানুষের অধিক নিকটবর্তী। যে ধর্মীর উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল, তাও তার এতটুকু নিকটবর্তী নয়, যতটুকু আমি নিকটবর্তী। তাই তার হাল-অবস্থা স্বয়ং তার চাইতে আমি বেশী জানি।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوْسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
 إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝ اذْهَبْ إِلَى الْيَمِينِ وَعَنِ
 الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝ لَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلِي إِلَّا دَنْيٌ وَرَيْبٌ عَيْنِي ۝ وَ
 جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ فَكَانَتْ مِنْهُ تَعْيِيْدٌ ۝ وَقُوْعٌ
 فِي الصُّوْرِ ذَلِكُمْ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ۝ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِرٌ
 وَشَهِيدٌ ۝ لَقَدْ كُنْتُمْ فِي عَفْوٍ ۝ مِنْ هَذَا فَكُشِفْنَا عَنْكُمْ غَطَاةٌ ۝ وَ
 قِصْرٌ ۝ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ۝ وَقَالَ قَرْنِيْهُ هَذَا مَا لَدَى عَيْنِيْدِ ۝
 أَفَلْيَاْنِيْ جَهَنَّمُ كُلُّ قَوْمٍ لِّعَيْنِيْدٍ ۝ مِّمَّا لَعَنُوا مُعَذِّبٌ مُّرِيْبٌ ۝
 وَلَدَىْ جَهَنَّمُ كُلُّ قَوْمٍ لِّعَيْنِيْدٍ ۝ مِّمَّا لَعَنُوا مُعَذِّبٌ مُّرِيْبٌ ۝
 قَالَ قَرْنِيْهُ رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتَهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيْدٍ ۝ قَالَ
 لَا تَحْصُوْهُمُ اللَّوَاْنِيْ وَقَدْ فَدَا مَتَّ الْيَوْمَ بِالْوَعِيْدِ ۝ لِيَبْلُوَ الْقَوْلَ
 لَدَىْ مَا أُنْزِلَ لِمِ الْوَعِيْدِ ۝ يَوْمَ نَقُولُ لِيَوْمَ هَٰذَا كُنْتُمْ
 وَقَوْلُ هَٰذَا مِنْ قَرْنِيْدٍ ۝ وَأَرْزَلْنَا السَّمَاءَ لَدُنَّ عَذِيْبِيْدٍ ۝
 هَٰذَا نُنَادِيْكُمْ وَلَكِنْ أَصْرَابٌ حَفِيْدٌ ۝ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنََ الْغَيْْبَ
 وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ۝ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ ذَلِكُمْ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ۝

(১৬) আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভতে যে কুচিন্তা করে, সে সমৃদ্ধও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রীবাঙ্ঘিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী। (১৭) যখন দুই ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে। (১৮) সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই গ্রহণ করার জন্যে তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (১৯) মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে। (২০) এবং শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেয়া হবে। এটা হবে ভয় প্রদর্শনের দিন। (২১) প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে। তার সাথে থাকবে চালক ও কর্মের সাক্ষী। (২২) তুমি তো এই দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার কাছে থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দুটি সূতীক্ষ্ম। (২৩) তার সঙ্গী ফেরেশতা বলবে : আমার কাছে যে আমলনামা ছিল, তা এই। (২৪) তোমরা উভয়েই নিক্ষেপ কর জাহান্নামে প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ বিরুদ্ধবাদীকে, (২৫) যে বাধা দিত মঙ্গলজনক কাজে, সীমালঙ্ঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারীকে। (২৬) যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য গ্রহণ করত, তাকে তোমরা কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর। (২৭) তার সঙ্গী শয়তান বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাম্ব্যতায় লিপ্ত করিনি। বস্তস্ত সে নিজেই ছিল সুদূর পথভ্রান্তিতে লিপ্ত। (২৮) আল্লাহ বলবেন : আমার সামনে বাকবিতণ্ডা করো না। আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেছিলাম। (২৯) আমার কাছে কথা রদবদল হয় না এবং আমি বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নই। (৩০) যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করব : তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবে : আরও আছে কি? (৩১) জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে খোদাতীকদের অদূরে। (৩২) তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও সুরণকারীকে এরই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল; (৩৩) যে না দেখে দয়াময় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হত। (৩৪) তোমরা এতে শান্তিতে প্রবেশ কর। এটাই অনন্তকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন।

আল্লাহ গ্রীবাঙ্ঘিত ধমনীর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী-একথার তাৎপর্য : وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ - অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এই আয়াতে জ্ঞানগত নৈকট্য বোঝানো হয়েছে, স্থানগত নৈকট্য উদ্দেশ্য নয়।

আরবী ভাষায় ورید শব্দের অর্থ প্রত্যেক প্রাণীর সেই সমস্ত শিরা-উপশিরা যেগুলো দিয়ে সারাদেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এ জাতীয় শিরা-উপশিরাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। (এক) যা কলিজা থেকে উদ্ভূত হয়ে সারা দেহে খাঁটি রক্ত পৌছে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই প্রকার শিরাকেই ورید বলা হয়। (দুই) যা হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত হয়ে রক্তের সূক্ষ্ম বাষ্প সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে রক্তের এই সূক্ষ্ম বাষ্পকে রুহ বলা হয়। প্রথম প্রকার শিরা মোটা এবং দ্বিতীয় প্রকার শিরা চিকন হয়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে চিকিৎসাশাস্ত্রের পরিভাষা অনুযায়ী ورید শব্দটি কলিজা থেকে উদ্ভূত শিরার অর্থে নেয়াই জরুরী নয়। বরং হৃৎপিণ্ড থেকে উদ্ভূত ধমনীকেও আভিধানিক দিক দিয়ে ورید বলা যায়। কেননা, এতেও এক প্রকার রক্তই সঞ্চালিত হয়। এস্থলে আয়াতের উদ্দেশ্য মানুষের হৃদয়গত অবস্থা ও চিন্তাধারা অবগত হওয়া। তাই এ অর্থই অধিক উপযুক্ত। মোটকথা, উল্লেখিত দুই অর্থের মধ্যে যে কোন অর্থই নেয়া হোক সর্বাবস্থায় প্রাণীর জীবন এর উপর নির্ভরশীল। এসব শিরা কেটে দিলে প্রাণীর আত্মা বের হয়ে যায়। অতএব, সারকথা এই দাঁড়াল যে, যে ধমনীর উপর মানবজীবন নির্ভরশীল, আমি সে ধমনীর চাইতেও অধিক তার নিকটবর্তী। অর্থাৎ, তার সবকিছুই আমি জানি।

সূফী বুয়ুর্গগণের মতে, আয়াতে কেবল জ্ঞানগত নৈকট্যই উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে বিশেষ এক ধরনের সলগ্নুতা বোঝানো হয়েছে, যার স্বরূপ ও গুণাগুণ তো কারও জানা নেই, কিন্তু এই সলগ্নুতার অস্তিত্ব অবশ্যই বিদ্যমান আছে। কোরআন পাকের একাধিক আয়াত এবং অনেক সহীহ হাদীস এ তথ্যের সাক্ষ্য দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন : وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝ অর্থাৎ, সেজদা কর এবং আমার নৈকট্যশীল হয়ে যাও। হিজরতের ঘটনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বলেছিলেন : اللَّهُ مَعَنَا ۝ অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের সংগে আছেন। হযরত মুসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেন : إِنِّي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۝ অর্থাৎ, আমার পালনকর্তা আমার সঙ্গে আছেন। হাদীসে আছে, মানুষ আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক নিকটবর্তী তখন হয়, যখন সে সেজদায় থাকে। হাদীসে আরও আছে, আল্লাহ বলেন : আমার বান্দা নফল এবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করে।

এবাদতের মাধ্যমে এবং মানুষের নিজের কর্মফলস্বরূপ অর্জিত এই নৈকট্য বিশেষভাবে মুমিনের জন্যে নির্দিষ্ট। এরূপ মুমিন “আল্লাহর ওলী” বলে অভিহিত হন। এই নৈকট্য সেই নৈকট্য নয়, যা প্রত্যেক মুমিন ও কাফেরের প্রাণের সাথে আল্লাহ তাআলার সমভাবে রয়েছে। মোটকথা, উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ তাআলার সাথে মানুষের এক বিশেষ প্রকার সলগ্নুতা আছে, যদিও আমরা এর স্বরূপ ও গুণাগুণ উপলব্ধি করতে সক্ষম নই।

এই নৈকট্য ও স্নেহগুণা চোখে দেখা যায় না; বরং ঈমানী দূরদর্শিতা দ্বারা জানা যায়। তফসীরে মাযহারীতে এই নৈকট্য ও স্নেহগুণাকেই আয়াতের মর্ম সাব্যস্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের উক্তি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এখানে জ্ঞানগত স্নেহগুণা বোঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর এই দুই অর্থ থেকে আলাদা এক তৃতীয় তফসীর এই বর্ণনা করেছেন যে, আয়াতে **عَنْ** শব্দ দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার সত্তা বোঝানো হয়নি। বরং তাঁর ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে। ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা মানুষের সাথে সাথে থাকে। তারা মানুষের প্রাণ সম্বন্ধে এতটুকু ওয়াকিফহাল, যতটুকু খোদা মানুষ তার প্রাণ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল নয়।

প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন ফেরেশতা আছে : **إِذْ نَسُفُكُنِي** অর্থ, তাদের একজন ডান দিকে থাকে এবং সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। অপরজন বাম দিকে থাকে এবং অসৎকর্ম লিপিবদ্ধ করে। **عَنْ** শব্দটি **فَاعِل** (উপবিষ্ট) অর্থে একবচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। **عَنْ** এর অর্থ **فَاعِل** হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, **فَاعِل** শুধু উপবিষ্ট অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু **عَنْ** শব্দটি ব্যাপক। যে ব্যক্তি কারও সংগে থাকে, তাকে **عَنْ** বলা হয় - উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক অথবা চলাফেরা রত হোক। উপরোক্ত ফেরাশতাদুয়ের অবস্থার তাই। তারা সর্বদা-সর্বাবস্থায় মানুষের সংগে থাকে - সে উপবিষ্ট হোক, দণ্ডায়মান হোক, চলাফেরা রত হোক অথবা নিদ্রিত হোক। কেবল প্রস্রাব-পায়খানা অথবা স্ত্রী সহবাসের প্রয়োজনে যখন সে গুপ্তাঙ্গ খোলে তখন ফেরেশতাদুয় সরে যায়। কিন্তু তদবস্থায়ও সে কোন গোনাহ করলে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি বলে তারা তা জানতে পারে।

ইবনে কাসীর আহ্নাক ইবনে কায়সের (রহঃ) বর্ণনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন : এই ফেরেশতাদুয়ের মধ্যে ডানদিকের ফেরেশতা নেক আমল লিপিবদ্ধ করে এবং বাম দিকের ফেরেশতারও দেখা-শুনা করে। মানুষ যদি কোন গোনাহ করে, তবে ডানদিকের ফেরেশতা বামদিকের ফেরেশতাকে বলে : এখনি এটা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করো না। তাকে সময় দাও। যদি সে তওবা করে তবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। অন্যথায় আমলনামায় লিপিবদ্ধ কর। - (ইবনে-আবী হাতেম)

মানুষের প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করা হয় : **مَا يَكُونُ مِنْ قَوْلٍ** অর্থ, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তাই পরিদর্শক ফেরেশতা রেকর্ড করে নেয়। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) ও কাতাদাহ বলেন : এই ফেরেশতা মানুষের প্রতিটি বাক্য রেকর্ড করে। তাতে কোন গোনাহ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : কেবল সেসব বাক্য লিখিত হয়, যেগুলো সওয়াব অথবা শাস্তিযোগ্য। ইবনে কাসীর উভয় উক্তি উদ্ধৃত করার পর বলেন : আয়াতের ব্যাপকতা দৃষ্টে প্রথমোক্ত উক্তি অগ্রগণ্য মনে হয়। এরপর তিনি হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকেই আলী-ইবনে আবী তালহার (রাঃ) এক রেওয়াজে উদ্ধৃত করেছেন, যদ্বারা উভয় উক্তির মধ্যে সমন্বয়

সাধিত হয়। এই রেওয়াজে আছে, প্রথমে তো প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়, তাতে কোন গোনাহ অথবা সওয়াব থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু সপ্তাহের বৃহস্পতিবার দিনে ফেরেশতা লিখিত বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করে এবং যেসব উক্তি সওয়াব অথবা শাস্তিযোগ্য এবং ভাল অথবা মন্দ সেগুলো রেখে বাকীগুলো মিটিয়ে দেয়।

মৃত্যু যন্ত্রণা : **وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ نَافِثَتُهُ**

نَافِثَتُهُ - **سَكْرَةُ الْمَوْتِ** এর অর্থ মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর সময় মুর্ছা যাওয়া। আবু বকর ইবনে আম্বারী (রহঃ) হযরত মসরুক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর মধ্যে যখন মৃত্যুর ক্রিয়া শুরু হয়, তখন তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে কাছে ডাকলেন। পিতার অবস্থা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখ থেকে এই কবিতাংশ উচ্চারিত হয়ে যায় : **إِذَا حُشِرْتُ يَوْمَ رِضَاقِهَا بِالْصَّرِّ** অর্থাৎ, আত্মা একদিন অস্থির হবে এবং বন্ধ সংকুচিত হয়ে যাবে। হযরত আবুবকর (রাঃ) শুনে বললেনঃ তুমি বৃথাই এই কবিতা পাঠ করছ। এর পরিবর্তে এই আয়াত পাঠ করলে না কেন ? **وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ نَافِثَتُهُ**

ওফাতের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে এই অবস্থা দেখা দিলে তিনি হাত ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে মালিশ করতেন এবং বলতেন : **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** হাত ভিজিয়ে মুখমণ্ডলে মালিশ করতেন এবং বলতেন : **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** অর্থাৎ, কালেমা তাইয়েবা পাঠ করে বলতেন : মৃত্যুযন্ত্রণা বড় সাধাতিক।

بِالْحَقِّ - এখানে **بِ** অব্যয়টি **تَعْدِي** অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই যে, মৃত্যুযন্ত্রণা সত্য বিষয়কে নিয়ে এল। অর্থাৎ, মৃত্যুযন্ত্রণা এমন বিষয়কে সামনে উপস্থিত করেছে, যা সত্য ও প্রতিষ্ঠিত এবং যা থেকে পলায়নের অবকাশ নেই। - (মাযহারী)।

نَافِثَتُهُ - **وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ** শব্দটি **حَد** থেকে উদ্ভূত। অর্থ সরে যাওয়া, পলায়ন করা। আয়াতের অর্থ এই যে, এই মৃত্যু থেকেই তুমি পলায়ন করতে।

বাহ্যতঃ সাধারণ মানুষকে এই সম্মোহন করা হয়েছে। মৃত্যু থেকে পলায়নী মনোবৃত্তি স্বভাবগতভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই জীবনকে কাম্য এবং মৃত্যুকে আপদ মনে করে এ থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে গোনাহ নয়। কিন্তু আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের এই স্বভাব ও প্রকৃতিগত বাসনা পুরোপুরিভাবে কিছুতেই পূর্ণ হতে পারে না। একদিন না একদিন মৃত্যু আসবেই; তুমি যতই পলায়ন কর না কেন।

মানুষকে হাশরের ময়দানে উপস্থিতকারী ফেরেশতাদুয় : **وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ** - এই আয়াতের পূর্বে কায়ামত কায়াম হওয়ার কথা আছে। আলোচ্য আয়াতে হাশরের ময়দানে মানুষের হাযির হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। হাশরের ময়দানে প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন **سَائِرٍ** থাকবে। **سَائِرٍ** সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে জন্তুদের অথবা কোন দলের পেছনে থেকে তাকে কোন বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দেয়। **سَائِرٍ** এর অর্থ সাক্ষী। **سَائِرٍ** যে ফেরেশতা হবে এব্যাপারে সব রেওয়াজেই একমত। **سَائِرٍ** সম্পর্কে তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কারও কারও মতে সে-ও একজন ফেরেশতাই হবে। এভাবে প্রত্যেকের সাথে দুই জন ফেরেশতা থাকবে। একজন তাকে হাশরের ময়দানে পৌঁছাবে এবং অপরজন তার কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। এই ফেরেশতাদুয় ডান ও বামে বসে আমল লিপিবদ্ধকারী কেরামুন-কাতেবীন

ফেরেশতাও হতে পারে এবং অন্য দুই ফেরেশতাও হতে পারে।

سَمِّعُكُمْ সম্পর্কে কেউ বলেন : সে হবে মানুষের আমল এবং কেউ খোদ মানুষ কেউ سَمِّعُكُمْ বলেছেন। ইবনে কাসীর বলেন : ফেরেশতা হওয়াই আয়াতের বাহ্যিক অর্থ বোঝা যায়। হযরত ওসমান গনী (রাঃ) খোতবায় এই আয়াত তেলাওয়াত করে এই তফসীরই করেছেন। হযরত মুজাহিদ, কাতাাদাহ ও ইবনে-যায়েদ (রাঃ) থেকেও তাই- বর্ণিত আছে।

মৃত্যুর পর মানুষ এমন সবকিছু দেখবে, যা জীবিতাবস্থায় দেখতে পেরে না : كُشِفَتْ عَنْكَ غُطْرَانُكَ وَفَصَّرَكَ الْيَوْمَ حَبِيبُ অর্থাৎ, আমি তোমাদের সামনে থেকে যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমাদের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ। এখানে কাকে সম্বোধন করা হয়েছে, এ সম্পর্কেও তফসীরবিদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে জরীর (রহঃ) ইবনে-কাসীর প্রমুখের মতে মুমিন, কাকের, মুত্তাকী ও ফাসেক নির্বিশেষে সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া স্বপ্নজগত সদৃশ এবং পরকাল জাগরণ সদৃশ। স্বপ্নে যেমন মানুষের চক্ষুদৃশ বন্ধ থাকে এবং কিছুই দেখে না, এমনভাবে পরগত সম্পর্কিত বিষয়বলী দুনিয়াতে চর্মচক্ষে দেখে না। কিন্তু এই চর্মচক্ষু বন্ধ হওয়া মাত্রই স্বপ্নজগত খতম হয়ে জাগরণের জগত শুরু হয়ে যায়। এ জগতে পরকাল সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সামনে এসে যায়। এ কারণেই কোন কোন আলেম বলেন : الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا অর্থাৎ, আজিকার পার্থিব জীবনে সব মানুষ নিদ্রিত। যখন তারা মরে যাবে, তখন জাগ্রত হবে।

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ خَيْرٌ — এখানে সংগী অর্থ সেই ফেরেশতা, যে ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্যে মানুষের সাথে থাকত। পূর্বেই জানা গেছে যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা দুইজন। কিন্তু কেয়ামতে উপস্থিত হওয়ার সময় একজনকে চালক ও অপরজনকে সাক্ষী। এর আগের আয়াতে বলা হয়েছে। তাই পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, ক্রিয়াকর্ম লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা দুয়কে হাশরের ময়দানে উপস্থিতির সময় দু'টি কাজ সোপর্দ করা হয়েছে। একজনকে পক্ষাতে থেকে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে পৌছানার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আয়াতে তাকেই سَائِرُ তথা চালক বলা হয়েছে। অপরজনের দায়িত্বে তার আমলনামা দেয়া হয়েছে। তাকে سَمِّعُكُمْ তথা সাক্ষী নামে ব্যক্ত করা হয়েছে। হাশরের ময়দানে পৌছার পর আমলনামার ফেরেশতা আরম্ভ করবে : هَذَا مَا لَدَىٰ خَيْرٌ — অর্থাৎ, তাঁর লিখিত আমলনামা আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। ইবনে জরীর বলেন : এখানে قَرِينُ শব্দটি দ্বারা উভয় ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে।

الْقِيَامُ - الْقِيَامُ শব্দটি দ্বিবাচক পদ। আয়াতে কোন ফেরেশতা দুয়কে সম্বোধন করা হয়েছে? বাহ্যতঃ পূর্বোক্ত চালক ও সাক্ষী ফেরেশতা দুয়কে সম্বোধন করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ অন্য কথাও বলেছেন।—(ইবনে কাসীর)।

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ خَيْرٌ - وَقَرِينُ - শব্দের দ্বারা আসলে সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যে অন্তরঙ্গভাবে সংগে থাকে। এই অর্থের দিক দিয়ে আগের আয়াতে এর দ্বারা আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা বোঝানো হয়েছিল। উপরোক্ত ফেরেশতা দুয় যেমন মানুষের সংগী হয়ে থাকে, তেমনি শয়তানও মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে অবস্থান করে এবং মানুষকে পথভ্রষ্টতা ও পাপের দিকে প্ররোচিত করে। আলাচ্য আয়াতে وَقَرِينُ বলে এই শয়তানই বোঝানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ

করার আদেশ হয়ে যাবে; তখন এই শয়তান বলবে : পরওয়ারদেগার, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি; বরং সে নিজেই পথভ্রষ্টতা অবলম্বন করত এবং সদুপদেশে কর্পপাত করত না। বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এর আগে জাহান্নামী ব্যক্তি নিজেই এই অজুহাত পেশ করবে যে, আমাকে এই শয়তান বিভ্রান্ত করেছিল। নতুবা আমি সংকাজ করতাম। এর জওয়াবে শয়তান পূর্বোক্ত কথা বলবে। উভয়ের বাকবিতণ্ডার জওয়াবে আল্লাহ তাআলা বলবেন :

قَالَ لَكَ حَقُّكَ الْكَذِبُ وَقَدْ مَنَّ الْيَوْمَ عَلَىٰ عِبْدِي — অর্থাৎ, আমার

সামনে বাকবিতণ্ডা করা না। আমি তো পূর্বেই পয়গম্বরগণের মাধ্যমে তোমাদের অসার ওয়রের জওয়াব দিয়েছি এবং ঐশীগ্রন্থের মাধ্যমে প্রমাণাদি সুস্পষ্ট করে দিয়েছি। আজ এই অনর্থক তর্কবিতর্ক কোন উপকারে আসবে না।

بَلَيْسَ الْقَوْلُ لَدَىٰ وَمَا أَكْبَرُ الظَّالِمِينَ — আমার কথা রদবদল

হয় না। যা ফয়সালা করেছে, তা কার্যকর হবেই। আমি কারও প্রতি জুলুম করিনি। ইনসাফের ফয়সালা করেছে।

إِنِّي أَنَا خَفِيطٌ — অর্থাৎ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রত্যেক إِنِّي أَنَا خَفِيطٌ এর জন্যে রয়েছে। إِنِّي أَنَا এর অর্থ অনুরাগী। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি গোনাহ থেকে সরে গিয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি অনুরক্ত হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, শা'বী ও মুজাহিদ (রাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি নির্জনতায় গোনাহ স্মরণ ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, সেই إِنِّي أَنَا হযরত ওবায়দ ইবনে ওমর বলেন : إِنِّي أَنَا এমন ব্যক্তি, যে প্রত্যেক উঠাবসায় আল্লাহ তাআলার কাছে গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তিনি আরও বলেন : আমাকে বলা হয়েছে যে, إِنِّي أَنَا ও خَفِيطٌ এমন ব্যক্তি, যে প্রত্যেক মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا أَصَبْتُ مِنْ مَجْلِسِي هَذَا

আল্লাহ তাআলা পবিত্র ও তাঁরই প্রশংসা। হে আল্লাহ, আমি, এই মজলিসে যেসব গোনাহ আমার উপর এসে আপতিত হয়েছে, সেগুলো থেকে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি মজলিস থেকে উঠার সময় এই দোয়া পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার এই মজলিসে কৃত সব গোনাহ মাফ করে দেন। দোয়া এই :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং প্রশংসা তোমারই। তোমা ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন : خَفِيطٌ এমন ব্যক্তি, যে নিজ গোনাহসমূহ স্মরণ রাখে, যাতে সেগুলো মোচন করিয়ে নেয়। ইবনে আব্বাসের অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে خَفِيطٌ এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলার বিবিধ-বিধান স্মরণ রাখে। হযরত আবু হোরায়ারা বর্ণিত হাদীসের রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে (এশরাকের) চার রাকআত নামায পড়ে, সে إِنِّي أَنَا ও خَفِيطٌ — (কুরতুবী)।

وَمَا يَكْفُرُ الْيَتِيمَ — আবু বকর ওয়ারাক বলেন : وَمَا يَكْفُرُ الْيَتِيمَ (বিনীত)

এর আলামত এই যে, সে আল্লাহ তাআলার আদবকে সর্বদা চিন্তায়

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ
 مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ مِنْ خَرَابٍ ۝
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ
 شَهِيدٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ
 أَيَّامٍ ۚ وَمَا مَسْنَاهُمْ لُتُوبٍ ۚ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ
 بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۚ وَمِنَ اللَّيْلِ
 فَسَبِّحْهُ ۚ وَأَدْبَارَ النُّجُودِ ۚ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ
 قَرِيبٍ ۚ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ ۝
 إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ۚ وَاللَّيْلُ الْمُبِينُ ۚ يَوْمَ يُشَقُّ الْأَرْضُ شَقًّا
 يُسَاءِلُكَ ذَلِكَ فَاسْتَسْمِعْ ۚ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ وَمَا
 أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَارٍ ۚ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدَ ۝
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالذُّرَيْتِ دَرًا ۚ فَالْحَبْلُ وَقَرًا ۚ فَالْيَرِيبُ يُبْرًا ۚ فَالْقَلْبُ يَمِينُ
 أَمْرًا ۚ إِنَّمَا نُوَدِّعُكَ وَلَصَادِقًا ۚ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ ۝

(৩৫) তারা তথায় যা চাইবে, তাই পাবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক। (৩৬) আমি তাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, তারা এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং দেশ-বিদেশে বিচরণ করে ফিরত। তাদের কোন পলায়ন স্থান ছিল না। (৩৭) এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার অনুযায়ণ করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিস্ট মনে শ্রবণ করে। (৩৮) আমি নিভামগল, ভূমগল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। (৩৯) অতএব, তারা যা কিছু বলে, তজ্জনে আপনি ছবর করুন এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন, (৪০) রাত্রির কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং নামাযের পক্ষান্তেও। (৪১) শুন, যে দিন এক আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান করবে, (৪২) যেদিন মানুষ নিশ্চিত সেই ভয়াবহ আগুয়াজ্বলন্তে পাবে, সেদিনই পুনরুত্থান দিবস। (৪৩) আমি জীবন দান করি, মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। (৪৪) যেদিন ভূমগল বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটছুটি করে বের হয়ে আসবে। এটা এমন সমবেত করা, যা আমার জন্যে অতি সহজ। (৪৫) তারা যা বলে, তা আমি সম্যক অবগত আছি। আপনি তাদের উপর জোরজবরকারী নন। অতএব, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন।

সূরা আয-যারিয়াত

মকায় অবতীর্ণ: আয়াত ৬০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালব আল্লাহর নামে—

- (১) কসম ঝঞ্ঝাবায়ুর, (২) অতঃপর বোঝা বহনকারী মেঘের, (৩) অতঃপর যুগু চলমান জলযানের, (৪) অতঃপর কর্ম বটনকারী ফেরেশতাগণের, (৫) তোমাদের প্রদত্ত ওয়াদা অবশ্যই সত্য। (৬) ইনসাফ অবশ্যজ্ঞাবী।

উপস্থিত রাখবে, তাঁর সামনে বিনীত ও নম্র হয়ে থাকবে এবং মনের কুবাসনা পরিত্যাগ করবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا — অর্থাৎ, জান্নাতীরা জান্নাতে যা চাইবে, তাই পাবে। অর্থাৎ, চাওয়া মাত্রই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। বিলম্ব ও অপেক্ষার বিভ্রম্বনা সহিত হবে না। হযরত আবু সায়ীদ খুদরীর বাচনিক রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : জান্নাতে কারও সম্ভানের বাসনা হলে গর্তধারণ, প্রসব ও সম্ভানের কার্যিক বৃদ্ধি এগুলো সব এক মুহূর্তের মধ্যে নিশ্পন্ন হয়ে যাবে। — (ইবনে-কাসীর)।

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ — অর্থাৎ, আমার কাছে এমন নেয়ামতও আছে, যার কম্পনাও মানুষ করতে পারে না। ফলে তারা এগুলোর আকাঙ্ক্ষাও করতে পারবে না। হযরত আনাস ও জাবের (রাঃ) বলেন : এই বাড়তি নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহ তাআলার দীদার তথা সাক্ষাত, যা জান্নাতীরা লাভ করবে।

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخَيْرَ وَكَثُرًا — আয়াতের তফসীরে এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, জান্নাতীরা প্রতি শুক্রবার আল্লাহ তাআলার সাক্ষাত লাভ করবে। — (কুরতুবী)।

فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ مِنْ خَرَابٍ — শব্দটি তফসীর থেকে উদ্ধৃত। এর আসল অর্থ ছিদ্র করা, বিদীর্ণ করা। বাক-পদ্ধতিতে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ — এর অর্থ আশ্রয়স্থল। আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা তোমাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল এবং যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত। কিন্তু দেখে পরিণামে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। কোন ভুখণ্ড অথবা গৃহ তাদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে আশ্রয় দিতে পারল না।

لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ : — হযরত ইবনে আব্বাস বলেন : এখানে ‘কলব’ বলে বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। বোধশক্তির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে কলব তথা অন্তঃকরণ। তাই একে কলব বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এখানে কলব বলে হায়াত তথা জীবন বোঝানো হয়েছে। কারণ, কলবের উপরই হায়াত ভিত্তিশীল। আয়াতের অর্থ এই যে, এই সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু দ্বারা সেই ব্যক্তিই উপদেশ ও শিক্ষার উপকার লাভ করতে পারে, যার বোধশক্তি অথবা হায়াত আছে। বোধশক্তিহীন অথবা মৃত ব্যক্তি এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ — এর অর্থ কোন কথা কান লাগিয়ে শোনা এবং শহীদ এর অর্থ উপস্থিত। উদ্দেশ্য এই যে, দুই ব্যক্তি উল্লেখিত আয়াতসমূহের দ্বারা উপকার লাভ করে। (এক) যে স্বীয় বোধশক্তি দ্বারা সব বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে (দুই) অথবা সে আয়াতসমূহকে নিবিস্ট মনে শ্রবণ করে ; অন্তরকে অনুপস্থিত রেখে শুধু কানে শুনে না। তফসীরে-মায়হরীতে বলা হয়েছে : কামেল বুয়ুগগণ প্রথমোক্ত প্রকারের মধ্যে এবং তাঁদের অনুসারী ও মুরিদগণ দ্বিতীয়

প্রকারের মধ্যে দাখিল।

شَكَاتِي - وَسَيَتِمُّ حُجَّتُكَ قَبْلَ الْوَعْدِ الْخَيْرِ وَالْخَيْرِ تَسْبِيح শব্দটি থেকে উদ্ভূত। অর্থ আল্লাহ তাআলার তসবীহ (পবিত্রতা বর্ণনা) করা। মুখে হোক কিংবা নামাযের মাধ্যমে হোক। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন : সূর্যোদয়ের পূর্বে তসবীহ করার অর্থ ফজরের নামায এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তসবীহ করার মানে আছরের নামায। হযরত জরীর ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন :

চেষ্টা কর, যাতে তোমার সূর্যোদয়ের পূর্বের এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামাযগুলো ফণ্ডত না হয়ে যায়, অর্থাৎ, ফজর ও আছরের নামায। এর প্রমাণ হিসেবে জরীর উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করেন।—(কুরতুবী)।

সেসব তসবীহও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো সকাল-বিকাল পাঠ করার প্রতি সন্থী হাদীসসমূহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হোরায়রার বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশত বার করে ‘সোবহানালাহি ওয়া বেহামদিহী’ পাঠ করে, তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশী হয়।—(মায়হারী)।

وَأَذِیَارُ الْحُجَّةِ - হযরত মুজাহিদ বলেন : সজদ বলে ফরয নামায বোঝানো হয়েছে এবং পশ্চাতে বলে সেইসব তসবীহ বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর ফযীলত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর হাদীসে বর্ণিত আছে। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়াজেতে : রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার সোবহানালাহি ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহ আকবার এবং এক বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ্ লা শারীকা লাহ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর’ পাঠ করবে, তার গোনাহ মাফ করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান হয়।—(বোখারী-মুসলিম) ফরয নামাযের পরে যেসব সন্নত নামায পড়ার কথা সন্থী হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে, وَأَذِیَارُ الْحُجَّةِ বলে সেগুলোও বোঝানো যেতে পারে।—(মায়হারী)।

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ - অর্থাৎ, যেদিন আছানকারী ফেরেশতা নিকট থেকেই আছান করবে। ইবনে-আসাকির জায়েদ ইবনে-জাবের থেকে বর্ণনা করেন, এই ফেরেশতা আর কেউ নয়—স্বয়ং ইসরাফীল। তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসের সন্ধ্যায় দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বের মৃতদেরকে এই বলে সস্খান করবেন : হে পচাগলা চামড়াসমূহ, চূর্ণ-বিচূর্ণ অস্থিসমূহ এবং বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ! শুন, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে হিসাবের জন্যে সমবেত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন।—(মায়হারী)।

আয়াতে কেয়ামতের দ্বিতীয় ফুঁৎকার বর্ণিত হয়েছে, যাদুারা বিশ্বজগতকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। নিকটবর্তী স্থানের অর্থ এই যে, তখন এই আওয়াযটি নিকটের ও দূরের সবাই এমনভাবে শুনবে, যেন কানের কাছ থেকেই বলা হচ্ছে। হযরত ইকরিমা (রাঃ) বলেন : আওয়াযটি এমনভাবে শোনা যাবে, যেন কেউ আমাদের কানেই বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেন : নিকটবর্তী স্থানের অর্থ বায়তুল মোকাদ্দাসের সন্ধ্যা। এটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল। চতুর্দিক থেকে এর দূরত্ব সমান।—(কুরতুবী)।

يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ عَنَاقًا - অর্থাৎ, যখন পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে

সব মৃত বের হয়ে আসবে এবং ছুটছুটি করবে। হাদীস থেকে জানা যায়, সবাই শাম দেশের দিকে দৌড়তে থাকবে। সেখানে বায়তুল মোকাদ্দাসের সন্ধ্যায় ইসরাফীল (আঃ) সবাইকে আহ্বান করবেন।

তিরমিযীতে মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) শাম দেশের দিকে ইশারা করে বলেন :

من ههنا الى ههنا تحشرون ركبانا ومشاة وتجرون على وجوهكم يوم القيامة

এখান থেকে সেই পর্যন্ত তোমরা উষিত হবে। কেউ সওয়ার হয়ে, কেউ পদব্রজে এবং কেউ উপুড় হয়ে কেয়ামতের ময়দানে নীত হবে।

فَكَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ مِنْ يَخَافُ وَيَعِيبُ - অর্থাৎ, “যে ব্যক্তি আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে আপনি কোরআনের মাধ্যমে উপদেশ দিন।” উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রচারকার্য ব্যাপক হলেও একমাত্র তরাই এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হবে, যারা আমার শাস্তিকে ভয় করে।

হযরত কাতাদাহ (রহঃ) এই আয়াত পাঠ করে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তেন :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ يَخَافُ وَعِيدِكَ وَبِرَجْوِ مَوْعِدِكَ يَا بَرَّ يَا رَحِيمَ

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার শাস্তিকে ভয় করে এবং আপনার ওয়াদার আশা করে। হে ওয়াদাপূরণকারী, হে দয়াময়।

সূরা আয-যারিয়াত

সূরা যারিয়াতেও পূর্বকার সূরা ক্বাফ-এর ন্যায় বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু পরকাল, কেয়ামত, মৃতদের পুনরুজ্জীবন, হিসাব-নিকাশ এবং সওয়ার ও আযাব সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে।

প্রথমোক্ত কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা কতিপয় বস্তুর কসম খেয়ে বলেছেন যে, তোমাদেরকে প্রদত্ত কেয়ামত সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি সত্য। মোট চারটি বস্তুর কসম খাওয়া হয়েছে। (এক) وَالْكَوْبَرُ وَالْكَوْبَرُ (দুই) فَالْجَبَرُ وَالْجَبَرُ (তিন) فَالْجَبَرُ وَالْجَبَرُ (চার) فَالْجَبَرُ وَالْجَبَرُ

ইবনে-কাসীরের মতে অগ্ন্যাহ একটি হাদীস এবং হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ও আলী মোর্তাযা (রাঃ)-এর উক্তিতে এই বস্তু চূড়ান্তের তফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে :

ذَارِيَاتٍ বলে গুলিকণা বিশিষ্ট ঝঞ্ঝাবায়ু বোঝানো হয়েছে। وَأَمَّا حَامِلَاتُ الْوَرَى -এর শাব্দিক অর্থ বোঝাবাহী ; অর্থাৎ, যে মেঘমালা বৃষ্টির বোঝা বহন করে। جَارِيَاتٍ বলে পানিতে স্বচ্ছলগতিতে চলমান জলযান বোঝানো হয়েছে। وَمِنْ مَقْسَمَاتِ أَمْرٍ এর অর্থ সেইসব ফেরেশতা, যারা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সৃষ্টজীবের মধ্যে বিধিলিপি অনুযায়ী রিমিক, বৃষ্টির পানি এবং কষ্ট ও সুখ বন্টন করে।—(ইবনে কাসীর, কুরতুবী, দুররে-মনসুর)।

ইবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ্, মুজাহিদ (রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন : এখানে ৯ শব্দটি 'না' বোধক অর্থ দেয় এবং আয়াতের অর্থ এই যে, তারা রাত্রির অংশ অংশে নিদ্রা যায় না এবং সেই অংশ অংশে নামায ইত্যাদি এবাদতে অতিবাহিত করে। এই অর্থের দিক দিয়ে যে ব্যক্তি রাত্রির শুরুতে অথবা শেষে অথবা মধ্যস্থলে যে কোন অংশে এবাদত করে নেয় সে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই যে ব্যক্তি মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে নামায পড়ে, হযরত আনাস ও আবুল আলিয়া (রাঃ)-এর মতে সে-ও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু জাফর বাকের (রাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি এশার নামাযের পূর্বে নিদ্রা যায় না, আয়াতে তাকেও বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে কাসীর)।

রাত্রির শেষ প্রহরে কমা প্রার্থনার বরকত ও ফযীলত :
وَالْأَسْفَلُ فَهُوَ مَسْجُودٌ — অর্থাৎ, মুমিন পরহেযগারগণ রাত্রির শেষপ্রহরে গোনাহের কারণে কমাপ্রার্থনা করে। سحر শব্দটি এর বহুবচন। এর অর্থ রাত্রির ষষ্ঠপ্রহর। এই প্রহরে কমাপ্রার্থনা করার ফযীলত অন্য এক আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে : وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَرِ — সহীহ্ হাদীসের সব কয়টি কিতাবেই এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে বিরাজমান হন। (কিভাবে বিরাজমান হন, তার স্বরূপ কেউ জানে না।) তিনি ঘোষণা করেন : কোন তওবাকারী আছে কি, যার তওবা আমি কবুল করব? কোন কমাপ্রার্থনাকারী আছে কি, যাকে আমি কমা করব?—(ইবনে-কাসীর)।

এখানে প্রাধান্যযোগ্য বিষয় এই যে, শেষপ্রহরে কমাপ্রার্থনার আয়াতে সেইসব পরহেযগারের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাদের অবস্থা পূর্ববর্তী আয়াতে বিবৃত করা হয়েছে যে, তারা রাত্রিতে আল্লাহ্ তাআলার এবাদতে মশগুল থাকে এবং খুব কম নিদ্রা যায়। এমতাবস্থায় কমাপ্রার্থনা করার বাহ্যতঃ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ, গোনাহের কারণে কমাপ্রার্থনা করা হয়। যারা সমগ্র রাত্রি এবাদতে অতিবাহিত করে, তারা শেষ রাতে কোন গোনাহের কারণে কমাপ্রার্থনা করে?

জওয়াব এই যে, তাঁরা আল্লাহ্ তাআলার আধ্যাত্মজ্ঞানে জ্ঞানী এবং আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তাঁরা তাঁদের এবাদতকে আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্যের পক্ষে যথোপযুক্ত মনে করেন না। তাই এই ক্রটিও অবহেলার কারণে কমাপ্রার্থনা করেন।—(মাহযারী)।

সদকা-খয়রাতকারীদের প্রতি বিশেষ নির্দেশ :
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ — বলে এমন দরিদ্র অভাবগ্রস্তকে বোঝানো হয়েছে, যে নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত সম্মান রক্ষার্থে নিজের অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না। ফলে মানুষের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে। আয়াতে মুমিন-মুতাকীদের এই গুণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তাআলার পথে ব্যয় করার সময় কেবল ভিক্ষুক অর্থাৎ, স্বীয় অভাব প্রকাশকারীদেরকেই দান করে না; বরং যারা স্বীয় অভাব কারও কাছে প্রকাশ করে না, তাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে এবং তাদের ষোঁজ-খবর নেয়।

বলাবাহুল্য, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন-মুতাকীগণ কেবল দৈহিক এবাদত তথা নামায ও রাত্রি জাগরণ করেই সন্তুষ্ট হয় না; বরং আর্থিক এবাদতও অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ভিক্ষুকদের ছাড়া তারা এমন লোকদের প্রতিও দৃষ্টি রাখে, যারা ভদ্রতা রক্ষার্থে নিজের অভাব কাউকে জানায় না। কিন্তু কোরআন পাক এই আর্থিক এবাদত
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ — বলে উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ, তারা যেসব ফকীর ও মিসকীনকে দান করে,

তাদের কাছে নিজের অনুগ্রহ প্রকাশ করে বেড়ায় না; বরং এরূপ মনে করে দান করে যে, তাদের ধন-সম্পদে এই ফকীরদেরও অংশ ও হক আছে এবং হকদারকে তার হক দেয়া কোন অনুগ্রহ হতে পারে না; বরং এতে স্বীয় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করার সুখ রয়েছে।

বিস্বচরাচর ও ব্যক্তিসত্তা উভয়ের মধ্যে কুদরতের নিদর্শনাবলী রয়েছে :
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ — অর্থাৎ, বিশ্বাসকারীদের

জন্যে পৃথিবীতে কুদরতের অনেক নিদর্শন আছে। (পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে কাকেরদের অবস্থা ও অন্তত পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর মুমিন পরহেযগারদের অবস্থা, গুণাবলী ও উচ্চ মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আবার কাকের ও কেশামত অবিশ্বাসকারীদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার এবং আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের নিদর্শনাবলী তাদের দৃষ্টিতে উপস্থিত করে অস্বীকারে বিরত হওয়ার নির্দেশ দান করা হচ্ছে। অতএব, এই বাক্যের সম্পূর্ণ পূর্বোক্তিতে
إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِقَوْلِ تَحْتِ بْنِ
বাক্যের সাথে রয়েছে, যাতে কোরআন ও রসুলকে অস্বীকার করার কথা বর্ণিত হয়েছে।

তফসীর-মাহযারীতে একেও মুমিন-মুতাকীদেরই গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে এবং مؤمنين —এর অর্থ আগের مؤمنين —ই করা হয়েছে। এতে তাদের এই অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা পৃথিবী ও আকাশের দিগন্তে বিস্তৃত আল্লাহ্ তাআলার নিদর্শনাবলীতে চিন্তা-ভাবনা করে। ফলে তাদের ঈমান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়; যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

পৃথিবীতে কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। উদ্ভিদ, বৃক্ষ ও বাগ-বাগিচাই দেখুন, এদের বিভিন্ন প্রকারের বর্ণ ও গন্ধ, এক একটি পত্রের নিখুঁত সৌন্দর্য এবং প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়ার হাজারো বৈচিত্র্য রয়েছে। এমনভাবে ভূপৃষ্ঠে নদীনালা কূপ ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠে সুউচ্চ পাহাড় ও গিরিশৃঙ্গ রয়েছে। মৃতিকায় জন্মগ্রহণকারী অসংখ্য প্রকার জীবজন্তু ও তাদের বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের মানবমণ্ডলীর বিভিন্ন গোত্র, জাতি এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে বর্ণ ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য, চরিত্র ও অভ্যাসের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা করলে প্রত্যেকটির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার কুদরত ও হিকমতের এত বিকাশ দৃষ্টিগোচর হবে, যা গণনা করাও সুকঠিন।

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ — এস্থলে নিদর্শনাবলীর বর্ণনায় আকাশ ও শূন্য জগতের সৃষ্টবস্তুর কথা বাদ দিয়ে কেবল ভূপৃষ্ঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা মানুষের খুব নিকটবর্তী এবং মানুষ এর উপর বসবাস ও চলাফেরা করে। আলোচ্য আয়াতে এর চাইতেও অধিক নিকটবর্তী খোদ মানুষের ব্যক্তিসত্তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে : ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূপৃষ্ঠের সৃষ্টবস্তুও বাদ দাও, খোদ তোমাদের অস্তিত্ব, তোমাদের দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেই চিন্তা-ভাবনা করলে এক একটি অঙ্গকে আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের এক একটি পুস্তক দেখতে পাবে। তোমরা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হবে যে, সমগ্র বিশ্বে কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেসবই যেন মানুষের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের মধ্যে সংকুচিত হয়ে বিদ্যমান হয়েছে। একারণেই মানুষের অস্তিত্বকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টান্ত মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। মানুষ যদি তার জন্মগত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অবস্থা পর্যালোচনা করে, তবে আল্লাহ্ তাআলাকে যেন সে দৃষ্টির সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে।

কিভাবে এককোটা বীর্ষ বিভিন্ন ভূখণ্ডের স্বাদ্য ও বিশ্বময় ছড়ানো সুস্থ উপাদানের নির্ধারিত হয়ে গর্ভাশয়ে স্থিতিশীল হয়? অতঃপর কিভাবে বীর্ষ থেকে একটি জমাট রক্ত তৈরী হয় এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড প্রস্তুত হয়? এরপর কিভাবে তাতে অস্থি তৈরী করা হয় এবং অস্থিকে মাংসে পরানো হয়? অতঃপর কিভাবে এই নিখাদ পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হয় এবং পূর্ণাকারে সৃষ্টি করে তাকে দুনিয়ার আলো বাতাসে আনয়ন করা হয়? এরপর কিভাবে ক্রমোদ্ভূতির মাধ্যমে এই জ্ঞানহীন ও চেতনাহীন শিশুকে একজন সুখী ও কর্মঠ মানুষে পরিণত করা হয় এবং কিভাবে মানুষের আকার-আকৃতিতে বিভিন্নরূপ দান করা হয়েছে যে, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজনের চেহারা অন্যজনের চেহারা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিগোচর হয়? এই কয়েক ইফির পরিধির মধ্যে এমন এমন স্বাতন্ত্র্য রাখার সাধ্য আর কার আছে? এরপর মানুষের মন ও যেকারের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের একত্ব সেই আল্লাহ তাআলার কুতরতের লীলা, যিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম। ﴿قَوْلُ اللَّهِ الْحَسَنُ الْخَالِقُونَ﴾

এসব বিষয় প্রত্যেক মানুষ বাইরে ও দূরে নয়—স্বয়ং তার অস্তিত্বের মাধ্যমে দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে। এরপরও যদি সে আল্লাহ তাআলাকে সর্বশক্তিমান স্বীকার না করে তবে, তাকে অন্ধ ও অজ্ঞান বলা ছাড়া উপায় নেই। একারণেই আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : ﴿أَلَّا يَتَذَكَّرُونَ﴾ অর্থাৎ,

তোমরা কি দেখ না? এতে ইঙ্গিত আছে যে, এ ব্যাপারে তোমরা বেশী জ্ঞানবুদ্ধি দরকার হয় না, দৃষ্টিশক্তি ঠিক থাকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

﴿وَلِلَّهِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ অর্থাৎ, আকাশে তোমাদের রিয়িক ও প্রতিশ্রুত বিষয় রয়েছে। এর নির্মল ও সরাসরি তফসীর এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, আকাশে থাকার অর্থ “লগুহে-মাহফুযে” লিপিবদ্ধ থাকা। বলাবাহুল্য প্রত্যেক মানুষের রিয়িক, প্রতিশ্রুত বিষয় এবং পরিণাম সবই লগুহে-মাহফুযে লিপিবদ্ধ আছে।

﴿لَا يَسْمَعُ سِرًّا وَلَا يَخْفَىٰ﴾ অর্থাৎ, তোমরা যেমন নিজেদের কথাবার্তা বলার মাধ্যমে কোন সন্দেহ কর না, কেয়ামতের আগমনও তোমনি সুস্পষ্ট ও সন্দেহমুক্ত এতে সন্দেহ ও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। দেখাশোনা, আশ্বাদন করা, স্পর্শ করা ও ঘ্রাণ লগুয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্য থেকে এখানে বিশেষভাবে কথা বলাকে মনোনীত করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, উপরোক্ত অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে মাঝে মাঝে রোগ-ব্যাদি ইত্যাদির কারণে ধোঁকা হয়ে যায়। দেখা ও শোনার মধ্যে পার্থক্য হওয়া সুবিদিত। অসুস্থ অবস্থায় মাঝে মাঝে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে মিষ্ট বস্তুও তিক্ত লাগে, কিন্তু বাকশক্তিতে কখনও কোন ধোঁকা ও ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই।—(কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াত থেকে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর সান্ত্বনার জন্যে অতীত যুগের কয়েকজন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ﴾ ফেরেশতাগণ বলেছিল ইবরাহীম

(আঃ) জওয়াবে বললেন ﴿سُبْحَانَكَ﴾ কেননা, এতে সার্বক্ষণিক শাস্তির অর্থ নিহিত রয়েছে। কোরআন পাকে নির্দেশ আছে, সালামের জওয়াব সালামকারী ভাষা অপেক্ষা উত্তম ভাষায় দাও। ইবরাহীম (আঃ) এভাবে সেই নির্দেশ পালন করলেন।

﴿وَمَنْ مِّنكُمْ﴾ শব্দের অর্থ অপরিচিত। ইসলামে গোনাহের

কাজ ও অপরিচিত হয়ে থাকে। তাই গোনাহকেও ﴿مَنْ مِّنكُمْ﴾ বলা হয়। বাক্যের অর্থ এই যে, ফেরেশতাগণ মানব আকৃতিতে আগমন করেছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদেরকে চিনতে পারেননি। তাই মনে মনে বললেন : এরা তো অপরিচিত লোক! এটাও সম্ভবপর যে, জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে মেহমানদেরকে শুনিয়েই একথা বলেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করা।

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِ﴾ শব্দটি رَوَّع থেকে উদ্ভূত। অর্থ গোপনে চলে

যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আঃ) মেহমানদের খানাপিনার ব্যবস্থা করার জন্যে এভাবে গৃহে থেকে চলে গেলেন যে, মেহমানরা তা টের পায়নি। নতুবা তারা একাজে বাধা দিত।

﴿فَأَنزَلْنَاهُ﴾ অর্থাৎ, ইবরাহীম (আঃ) তাদের না খাওয়ার কারণে

তাদের ব্যাপারে শংকাবোধ করতে লাগলেন। কেননা, তখন ভদ্র সমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, আহার্য পেশ করলে মেহমান কিছু না, কিছু আহার্য গ্রহণ করত। কোন মেহমান এরূপ না করলে তাকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে আগমনকারী শত্রু বলে আশংকা করা হত। সেই যুগের চোর-ডাকাতদেরও এতটুকু ভদ্রতা জ্ঞান ছিল যে, তারা যার বাড়ীতে কিছু খানা খেত, তার ক্ষতিসাধন করত না। তাই না খাওয়া বিপদাশংকার কারণ ছিল।

﴿فَأَنزَلْنَاهُ﴾ এর অর্থ অসাধারণ আওয়াজ। কলসের

শব্দকে صرير বলা হয়। হযরত সারা যখন শুনলেন যে, ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে পুত্র-সন্তান জন্মের সুসংবাদ দিতেছে, আর একথা বলাই বাহুল্য যে, সন্তান স্ত্রীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করে; তখন তিনি বুঝলেন যে, এই সুসংবাদ আমার স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্যে। ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর মুখ থেকে কিছু আশ্চর্য ও বিস্ময়ের বাক্য উচ্চারিত হয়ে গেল। তিনি বললেন : ﴿عَجُوبٌ عَجُوبٌ﴾ অর্থাৎ, প্রথমতঃ আমি বৃদ্ধা, এরপর বন্ধ্যা। যৌবনেও আমি সন্তান ধারণের যোগ্য ছিলাম না। এখন বার্ধক্যে এটা কিরূপে সম্ভব হবে? জওয়াবে ফেরেশতাগণ বলল : ﴿كُنْ﴾ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সবকিছু করতে পারেন। এ কাজও এমনভাবেই হবে। এই সুসংবাদ অনুযায়ী যখন হযরত ইসহাক (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন, তখন হযরত সারার বয়স নিরানব্বই বছর এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর বয়স একশত বছর ছিল।—(কুরতুবী)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالُوا إِنَّا
 أُنْزِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۖ لَنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارََةً مِّنْ طِينٍ ۚ مَثْوًى
 عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 فَمَا يَجِدُ تَابًا فَيَغَايِرُ بَيْنَ يَدَيْنِ الْمُسْلِمِينَ ۚ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً
 لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۚ وَفِي مَثْوًى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ
 فِرْعَوْنَ سُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۖ فَتَوَلَّىٰ وَرُكْبَةً ۖ وَقَالَ لِحُجْرَتَيْنِ
 فَخَذْنَاهُ وَجُوهًا قَهْرًا فَهَمَّ بِفِي الْغَيْبِ وَهُوَ يُخْلِي ۚ وَفِي عَادٍ
 إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيلَ ۖ مَا تَذَرُ مِمَّنْ شِئْنَا أَن تَأْتِ
 عَلَيْهِ ۖ أَأَجْعَلُكَ كَالَّذِينَ تَدْعُو ۚ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَسْعُوا
 حَتَّىٰ جِبْنٍ ۖ فَعَتَوْنَ غَمْرًا فَذُوقُوا الْعَذَابَ ۚ فَذُوقُوا الصُّعْقَةَ ۚ وَ
 هُمْ يَنْظُرُونَ ۚ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ۚ
 وَتَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۚ وَاللَّهُ
 السَّمَاءَ بَيْنَهُمَا يَابَسُومًا ۚ وَرَأَىٰ الْمَوْسُونَ ۚ وَالْأَرْضَ قَرْشَةً
 فَنَجَّىٰ الْهَارُونَ ۚ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا وَجِئْنَا لَمَكَدٍ
 تَذَكَّرُونَ ۚ فَوَرَأَىٰ إِلَىٰ اللَّهِ إِنِّي لَمُؤْمِنٌ ذُنُوبٍ مُّبِينٍ ۚ

(৩১) ইবরাহীম বলল : হে প্রেরিত ফেরেশতাগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি ?
 (৩২) তারা বলল : আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি,
 (৩৩) যাতে তাদের উপর মাটির ঢিলা নিক্ষেপ করি। (৩৪) যা
 সীমাতিক্রমকারীদের জন্যে আপনার পালনকর্তার কাছে চিহ্নিত আছে।
 (৩৫) অতঃপর সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার
 করলাম। (৩৬) এবং সেখানে একটি গৃহ ব্যতীত কোন মুসলমান আমি
 পাইনি। (৩৭) যারা যত্নশালীভাবে শান্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্যে
 সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি। (৩৮) এবং নিদর্শন রয়েছে মূসার বৃত্তান্তে;
 যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলাম।
 (৩৯) অতঃপর সে শক্তিবলে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল : সে হয়
 যাদুকর, না হয় পাগল। (৪০) অতঃপর আমি তাকে ও তার
 সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম।
 সে ছিল অভিযুক্ত। (৪১) এবং নিদর্শন রয়েছে তাদের কাহিনীতে; যখন
 আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অশুভ বায়ু। (৪২) এই বায়ু যার
 উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল : তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। (৪৩)
 আরও নিদর্শন রয়েছে সামুদ্রিক ঘটনায়; যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল,
 কিছুকাল মজা লুটে নাও। (৪৪) অতঃপর তারা তাদের পালনকর্তার
 আদেশ অমান্য করল এবং তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এমনভাবে যার
 যে, তারা তা দেখছিল। (৪৫) অতঃপর তারা দাঁড়াতে সক্ষম হল না এবং কোন
 প্রতিকারও করতে পারল না। (৪৬) আমি ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে
 ধ্বংস করেছি। নিশ্চিতই তারা ছিল পাপাচারী সম্প্রদায়। (৪৭) আমি স্বীয়
 ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমি অবশ্যই ব্যাপক
 ক্ষমতালালী। (৪৮) আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবেই না
 বিছাতে সক্ষম। (৪৯) আমি প্রত্যেক বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি,
 যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম কর। (৫০) অতঃপর, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও।
 আমি তাঁর তরফ থেকে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

এই কথোপকথনের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) জানতে পারলেন
 যে, আগন্তুক মেহমানগণ আল্লাহর ফেরেশতা। অতঃপর, তিনি জিজ্ঞাসা
 করলেন, আপনারা কি অভিযানে আগমন করেছেন? তারা লুত
 (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রস্তর বর্ষণের আযাব নাযিল করার কথা
 বলল। এই প্রস্তর বর্ষণ বড় বড় পাথর দ্বারা নয়—মাটি নির্মিত কংকর দ্বারা
 হবে। **مَثْوًى عِنْدَ رَبِّكَ** অর্থাৎ, কংকরগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ
 চিহ্নযুক্ত হবে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, প্রত্যেক কংকরের গায়ে
 সেই ব্যক্তির নাম লিখিত ছিল, যাকে ধ্বংস করার জন্যে কংকরটি প্রেরিত
 হয়েছিল। সে যেদিকে পলায়ন করেছে, কংকরও তার পশ্চাদ্ধাবন
 করেছে। অন্যান্য আয়াতে কওমে-লুতের উপর আপতিত আযাবের বর্ণনা
 প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, জিবরাঈল (আঃ) গোটা জনপদকে উপরে তুলে
 উল্টিয়ে দেন। অর্থাৎ, প্রথমে তাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল এবং
 পরে সমগ্র ভূখণ্ড উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিল।

কওমে-লুতের পর মুসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়, ফেরাউন এবং তার
 অনুসারীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরাউনকে যখন মুসা (আঃ)
 সত্যের পয়গাম দেন, তখন বলা হয়েছে : **فَتَوَلَّىٰ** অর্থাৎ, ফেরাউন
 মুসা (আঃ)-এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে স্বীয় শক্তি, সেনাবাহিনী ও
 পারিষদবর্গের উপর ভরসা করে। **رُكْبَةٍ** এর শাব্দিক অর্থ শক্তি। হযরত
 লুত (আঃ)-এর বাক্যে **رُكْبَةً** এই অর্থে ব্যবহৃত
 হয়েছে।

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কেয়ামত ও পরকালের বর্ণনা এবং
 অস্বীকারকারীদের শাস্তির কথা আলোচিত হয়েছিল। আলোচ্য
 আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলার সর্বময় শক্তি বর্ণিত হয়েছে। এতে করে
 কেয়ামত ও কেয়ামতে মৃতদের পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে অবিশ্বাসীদের
 পক্ষ থেকে যে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, তার নিরসন হয়ে যায়। এছাড়া
 আয়াতসমূহে তওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে এবং রেসালতে বিশ্বাস
 স্থাপনের তাকীদ হয়েছে।

يَبْسُومًا - **يَد** - **يَبْسُومًا** শব্দের অর্থ শক্তি ও সামর্থ্য। এ

স্থলে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ তফসীরই করেছেন।

فَوَرَأَىٰ إِلَى اللَّهِ অর্থাৎ, আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। হযরত ইবনে-

আব্বাস (রাঃ) বলেন : উদ্দেশ্য এই যে, তওবা করে গোনাহ থেকে ছুটে
 পলাও। আবুবকর ওয়ারাক ও জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) বলেন : প্রবৃত্তি
 ও শয়তান মানুষকে গোনাহের দিকে দাওয়াত ও প্ররোচনা দেয়। তোমরা
 এগুলো থেকে ছুটে আল্লাহর শরণাপন্ন হও। তিনি তোমাদেরকে এদের
 অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। — (কুরত্বী)

মানবের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা এবাদত করার যোগ্যতা ও প্রতিভা রেখেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াব এই যে, এবাদতের জন্যে কাউকে সৃষ্টি করা তার কাছ থেকে অন্যান্য উপকারিতা অর্জিত হওয়ার পরিপন্থী নয়।

مَالِكُ يَوْمَئِذٍ زَكِيٌّ

অর্থঃ আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করে

সাধারণ মানুষের অভ্যাস অনুযায়ী কোন উপকার চাই না যে, তারা রিযিক সৃষ্টি করবে আমার জন্যে অথবা নিজেদের জন্যে অথবা আমার অন্যান্য সৃষ্টিকৃষের জন্যে। আমি এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহ্ব্য যোগাবে। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুযায়ী এই কথাগুলো বলা হয়েছে। কেননা, যত বড়লোকই হোক না কেন - কেউ যদি কোন গোলাম ক্রয় করে এবং তার পিছনে অর্থ-কড়ি ব্যয় করে, তবে তার উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, গোলাম তার কাজকর্মের প্রয়োজন মেটাতে এবং রুখী-রোযগার করে মালিকের হাতে সমর্পন করবে। আল্লাহ্ তাআলা এসব উদ্দেশ্য থেকে পবিত্র ও উদ্ধেহ। তাই বলেছেন যে, জিন ও মানবকে সৃষ্টি করার পক্ষাতে আমার কোন উপকার উদ্দেশ্য নয়।

ذُوْا ۝ শব্দের আসল অর্থ কুয়া থেকে পানি তোলার বড় বালতি। জনগণের সুবিধার্থে জনপদের সাধারণ কুয়াগুলোতে পানি তোলার পালা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালা অনুযায়ী পানি তোলে। তাই এখানে ذُوْ ۝ শব্দের অর্থ করা হয়েছে পালা ও প্রাপ্য অংশ। উদ্দেশ্য এই যে, পূর্ববর্তী উস্মতদেরকে নিজ নিজ সময়ে আমল করার সুযোগ ও পালা দেয়া হয়েছে। যারা নিজেদের পালায় কাজ করেনি, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে বর্তমান মুশরিকদের জন্যেও পালা ও সময় নির্ধারিত আছে। যদি তারা এ সময়ের মধ্যে কুফর থেকে বিরত না হয়, তবে আল্লাহ্র আযাব তাদেরকে দুনিয়াতে না হয় পরকালে অবশ্যই পাকড়াও করবে। তাই তাদেরকে বলে দিন, তারা যেন ত্বরিত আযাব চাওয়া থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ, কাফেররা অস্বীকারের ভঙ্গিতে বলে থাকে যে, আমরা বাস্তবিক অপরাধী হলে আপনার কথা অনুযায়ী আমাদের উপর আযাব আসে না কেন? এর জওয়াব এই যে, আযাব নির্দিষ্ট সময় ও পালা অনুযায়ী আগমন করবে। তোমাদের পালাও এল বলে। কাজেই তাড়াহুড়া করো না।

সূরা আত্ব-তুর

وَالْقُوْر ۝ - হিব্রু ভাষায় এর অর্থ পাহাড়, যাতে লতাপাতা ও বৃক্ষ উদগত হয়। এখানে তুর বলে মাদইয়ানে অবস্থিত তুরেসিনীন বোঝানো হয়েছে। এই পাহাড়ের উপর হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ্ তাআলার সাথে বাক্যলাপ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, দুনিয়াতে জন্মানোর চারটি পাহাড় আছে। তন্মধ্যে তুর একটি—(কুরতুবী) তুরের কসম খাওয়ার মধ্যে উপরোক্ত বিশেষ সম্মান ও সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দাদের জন্যে কিছু কালাম ও আহকাম আগমন করেছে। এগুলো মেনে চলা ফরয।

رَبِّ ۝ - শব্দের আসল অর্থ

লেখার জন্যে কাগজের স্থলে ব্যবহৃত পাতলা চামড়া। তাই এর অনুবাদ করা হয় পত্র। লিখিত কিতাব বলে মানুষের আমলনামা বোঝানো হয়েছে, না হয় কোন কোন তফসীরবিদের মতে কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে।

وَالْيَبِيتِ الْمَعُوْر ۝ - আকাশস্থিত ফেরেশতাদের কা'বাকে বায়তুল

মামুর বলা হয়। এটা দুনিয়ার কা'বার ঠিক উপরে অবস্থিত। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের প্রমাণিত আছে যে, মেরাজের রাত্রিতে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বায়তুল মামুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা এবাদতের জন্যে প্রবেশ করে। এরপর তাদের পুনরায় এতে প্রবেশ করার পালা আসে না। প্রত্যহ নতুন ফেরেশতাদের নম্বর আসে।—(ইবনে কাসীর)

সপ্তম আকাশে বসবাসকারী ফেরেশতাদের কা'বা হচ্ছে বায়তুল মামুর। এ কারণেই মেরাজের রাত্রিতে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এখানে পৌছে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বায়তুল মামুরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পান। তিনি ছিলেন দুনিয়ার কা'বার প্রতিষ্ঠাতা। আল্লাহ্ তাআলা এর প্রতিদানে আকাশের কা'বার সাথেও তাঁর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করে দেন।—(ইবনে কাসীর)

وَالْمِيسْجِر ۝ - مسجور শব্দটি سجر থেকে উদ্ভূত। এটা একাধিক

অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক অর্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা। কোন কোন তফসীরবিদের মতে এখানে এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আয়াতের অর্থ এইঃ সমুদ্রের কসম, যাকে অগ্নিতে পরিণত করা হবে। এথেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিয়ামতের দিন সকল সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। অন্য এক আয়াতে আছেঃ

وَالْمِيسْجِر ۝ - অর্থাৎ, চতুর্দিকের সমুদ্র অগ্নি হয়ে হাশরের

ময়দানে একত্রিত মানুষকে ঘিরে রাখবে। এই তফসীরই হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব, আলী, ইবনে-আব্বাস, মুজাহিদ ও ওয়ায়দুল্লাহ্ ইবনে-উমায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।—(ইবনে কাসীর)

হযরত আলী (রাঃ)-কে জনৈক ইহুদী প্রশ্ন করলঃ জাহান্নাম কোথায়? তিনি বললেনঃ সমুদ্রই জাহান্নাম। পূর্ববর্তী ঐশীগ্রহে অভিজ্ঞ ইহুদী এই উত্তর সমর্থন করল।—(কুরতুবী) হযরত কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ مسجور - এর অর্থ করেছেন পানিতে পরিপূর্ণ। ইবনে জরীর (রহঃ) এই অর্থই পছন্দ করেছেন।—(ইবনে কাসীর)

إِنَّا عَٰلَمُكَ لِرَبِّكَ ۝ إِنَّا عَٰلَمُكَ لِرَبِّكَ ۝ - আপনার পালনকর্তার

আযাব অবশ্যস্বাবী। একে কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। এটা পূর্বোল্লিখিত কসমসমূহের জওয়াব।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) সূরা তুর পাঠ করে যখন এই আয়াতে পৌছেন, তখন একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বিশ দিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকেন। তাঁর রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা কারও ছিল না।—(ইবনে কাসীর)

হযরত জুবায়ের ইবনে মুত'এম বলেনঃ মুসলমান হওয়ার পূর্বে আমি একবার বদরের যুদ্ধে বন্দীদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশে মদীনা পৌছেছিলাম। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন মাগরিবের নামাযে সূরা তুর পাঠ করছিলেন। মসজিদের বাইরে থেকে আওয়ায শোনা যাচ্ছিল। তিনি যখন إِنَّا عَٰلَمُكَ لِرَبِّكَ ۝ إِنَّا عَٰلَمُكَ لِرَبِّكَ ۝ পাঠ করলেন, তখন হঠাৎ আমার মনে হল যেন অন্তর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করলাম। তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই আমি আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাব।—(কুরতুবী)

يَوْمَ تَوَدُّ أَنْ تَرْجُوَ ۝ - অভিধানে অস্থির নড়াচড়া

বলা হয়। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন আকাশ অস্থিরভাবে নড়াচড়া করবে।

أَفَسِحْرُهُذَا أَمْ أَنْتُمْ لَأَنْبِيَائُونَ ۖ صَلَواتُهَا قَامِرَةٌ أَوْ لَا تَصِيرُ ۚ
 سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَمْ تُنَادَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّ
 الَّذِينَ فِي جَنَّتٍ وَعِيقٍ ۖ فَوَكَّيْنُمْ بِمَا أَنْتُمْ رِبُّهُمْ وَوَعَا
 رِبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۖ كَلُوا وَأَشْرَبُوا هَذِهِ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝
 مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُوفٍ مَصُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ۖ وَالَّذِينَ
 أَنْتُمْ أَزْوَاجُكُمْ هُمْ زَوَّجْنَاهُمْ بِأَمْثَلِ أَمْثَلِهِمْ ۖ وَزَوَّجْنَاهُمْ
 أَنْتُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ۝
 وَأَمَّا زَنْجُكَ فَجَارُكَ ۖ وَحَمِيمَا يَشْتَرُونَ ۖ يَتَذَكَّرُونَ فِيهَا
 كَأَسَى الْأَعْرَافِ ۖ هَا وَكَانَ آيَتُهُمْ ۖ وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ خِلَالَهُمْ
 كَأَنَّهُمْ لَوُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ۖ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 يَتَسَاءَلُونَ ۖ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۖ فَمَنَّ
 اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ وَوَفَّقَنَا عَذَابَ الشُّوْرِ ۖ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ
 نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَاقِي ۖ فَذَكَّرْنَاهُ أَنْتَ بَعَثْتَ رِبَّكَ
 بِكَاهِنٍ ۖ وَلَا مَجْنُونٍ ۖ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ مَتَّبِعْ رِيسَ يَه
 رِبَّي السُّنُونِ ۖ قُلْ رَفَعُوا أَعْيُنَكُمْ مِنَ الْمُرْجُونَ ۖ

(১৫) এটা কি জাদু, না তোমরা চোখ দেখছ না? (১৬) এতে প্রবেশ কর অতঃপর তোমরা সবর কর অথবা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে। (১৭) নিশ্চয়ই খোদাভীরু ধাক্কা দেয়া জ্ঞানতে ও নেয়ামতে (১৮) তারা উপভোগ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদের দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করবেন। (১৯) তাদেরকে বলা হবে : তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরূপ তোমরা ভুগ হয়ে পানাহার কর। (২০) তারা শ্রেণীবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব। (২১) যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিদ্যুতের হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী। (২২) আমি তাদেরকে দেব ফল-মূল এবং মাংস যা তারা চাইবে। (২৩) সেখানে তারা একে অপরের পানপাত্র দেবে; যাতে অসার বকাবকি নেই এবং পাপকর্মও নেই। (২৪) সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোরীরা তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। (২৫) তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। (২৬) তারা বলবে : আমরা ইতিপূর্বে নিজেদের বাসগৃহে ভীত-কম্পিত ছিলাম। (২৭) অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্বনের শান্তি থেকে রক্ষা করেছেন। (২৮) আমরা পূর্বেও আল্লাহকে ডাকতাম। তিনি সৌজন্যশীল, পরম দয়ালু। (২৯) অতএব, আপনি উপদেশ দান করুন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় আপনি অতীন্দ্রিয়বাদী নন এবং উন্মাদও নন। (৩০) তারা কি বলতে চায় : সে একজন কবি আমরা তার মৃত্যু-দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছি। (৩১) বলুন : তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারত আছি।

ঈমান থাকলে বুয়ুগদের সাথে বংশগত সম্পর্ক পরকালেও উপকারে আসবে : **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ** — অর্থাৎ, যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানগণও ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদের সন্তানদেরকে জন্মতে তাদের সাথে মিলিত করে দেব। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা সংকর্মপরায়ণ মুমিনদের সন্তান-সন্ততিকেও তাদের বুয়ুগ পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌছিয়ে দেবেন, যদিও তারা কর্মের দিক দিয়ে সেই মর্তবার যোগ্য না হয়—যাতে বুয়ুগদের চক্ষু শীতল হয়।—(মায়হারী)

সায়ীদ ইবনে-জুযায়ের (রহঃ) বলেন : হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এরই উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, জন্মাতী ব্যক্তি জন্মতে প্রবেশ করে তার পিতামাতা, শ্রী ও সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যে, তারা কোথায় আছে? জওয়াবে বলা হবে যে, তারা তোমার মর্তবা পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। তাই তারা জন্মতে আলাদা জায়গায় আছে। এই ব্যক্তি আরব করবে : পরওয়ারদেগার, দুনিয়াতে নিজের জন্যে ও তাদের সবার জন্যে আমল করেছিলাম। তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আদেশ হবে : তাদেরকেও জন্মতের এই স্তরে একসাথে রাখা হোক।—(ইবনে-কাসীর)

ইবনে-কাসীর এসব রেওয়াজেতে উদ্ধৃত করে বলেন : এসব রেওয়াজেতে থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে সংকর্মপরায়ণ পিতৃপুরুষ দ্বারা তাদের সন্তানরা উপকৃত হবে এবং আমলে তাদের মর্তবা কম হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে পিতৃপুরুষদের মর্তবায় পৌছিয়ে দেয়া হবে। অপরদিকে সংকর্মপরায়ণ সন্তান-সন্ততি দ্বারা তাদের পিতা-মাতার উপকৃত হওয়াও হাদীসে প্রমাণিত আছে। মসনদে-আহমদে বর্ণিত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)—এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা কোন কোন নেকবান্দার মর্তবা তার আমলের তুলনায় অনেক উচ্চ করে দেবেন। সে প্রশ্ন করবে : পরওয়ারদেগার, আমাকে এই মর্তবা কিরূপে দেয়া হল? আমার আমল তো এই পর্যায়ের ছিল না। উত্তর হবে : তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা ও দেয়া করেছে। এটা তারই ফল।

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ — এয়াত ও আলাত এর শাব্দিক অর্থ হ্রাস করা।—(কুরতুবী) আয়াতের অর্থ এই : সন্তান-সন্ততিকে তাদের বুয়ুগ পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করার জন্যে এই পন্থা অবলম্বন করা হবে না যে, বুয়ুগদের আমল কিছু হ্রাস করে সন্তানদের আমল পূর্ণ করা হবে। বরং আল্লাহ তাআলা নিজ কৃপায় তাদেরকে সমান করে দেবেন।

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ — অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তি তার আমলের জন্যে দায়ী হবে। অপরের গোনাহের বোঝা তার মাথায় চাপানো হবে না। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী আয়াতে নেককর্মের বেলায় সংকর্মশীল পিতৃপুরুষদের খাতিরে সন্তান-সন্ততির আমল বাড়িয়ে দেয়ার কথা আছে। কিন্তু গোনাহের বেলায় এরূপ করা হবে না। একের গোনাহের প্রতিক্রিয়া অপরের উপর প্রতিফলিত হবে না।—(ইবনে-কাসীর)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَنَّكَ بِأَعْيُنِنَا — শত্রুদের শত্রুতা-বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাহাবুনা দেওয়ার জন্যে সুরার উপসংহারে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আপনি আমার দৃষ্টিতে আছেন। অর্থাৎ, আমার হেফযতে আছেন। আমি আপনাকে তাদের প্রত্যেক অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখব। আপনি তাদের পরওয়া করবেন না। অন্য এক আয়াতে আছে وَاللَّهُ يَوْمُكَ مِنْ الْأَعْيُنِ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মানুষের অনিষ্ট থেকে আপনার হেফযত করবেন।

এরপর আল্লাহ্ তাআলার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণায় আত্মনিয়োগ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যা মানবজীবনের আসল লক্ষ্য এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে বেঁচে থাকার প্রতিকারও। বলা হয়েছে : **وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ** অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি দণ্ডায়মান হন। এর এক অর্থ নিন্দা থেকে গাতোঁথান করা। ইবনে-জরীর (রহঃ) তাই বলেন। এক হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ (শঃ) বলেন : যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, সে যে দোয়াই করে, তাই কবুল হয়। বাক্যগুলো এই :

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير - سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله

এরপর যদি সে ওয়ু করে নামায পড়ে, তবে তার নামায কবুল করা হবে।—(ইবনে-কাসীর)

মজলিসের কাফ্ফারা : মুজাহিদ ও আবুল আহওয়াস (রহঃ) প্রমুখ তফসীলবিদ বলেন, “যখন দণ্ডায়মান হন”—এর অর্থ এই যে, যখন কেউ মজলিস থেকে উঠে, তখন এই বাক্য পাঠ করবে—

এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহঃ) বলেন : তুমি যখন মজলিস থেকে উঠ, তখন তসবীহ ও তাহমীদ কর। তুমি এই মজলিসে কোন সংকাজ করে থাকলে তার পুণ্য অনেক বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে কোন পাপ কাজ করে থাকলে এই বাক্য তার কাফ্যফারা হয়ে যাবে।

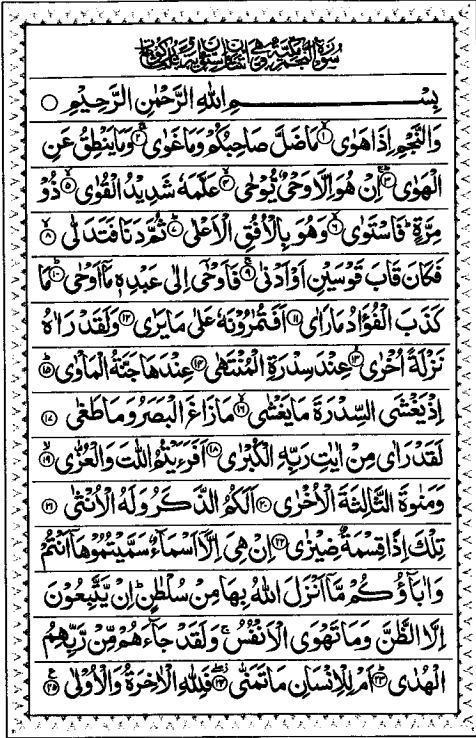
হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি এমন মজলিসে বসে, যেখানে ভাল-মন্দ কথা-বার্তা হয়, সে যদি মসলিস ত্যাগ করার পূর্বে এই বাক্যগুলো পাঠ করে, তবে আল্লাহ তাআলা এই মজলিসের যেসব গোনাহ হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করেন। বাক্যগুলো এই :

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
(তিরমিযী—ইবনে কাসীর)।

وَمَنْ أَلِيَّ مَقِيْمُهُ — অর্থ৭, রাতে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। মাগরেব ও এশার নামায এবং সাধারণ তসবীহ পাঠ সবই এর অন্তর্ভুক্ত।
وَادَارَ الْجُحُومِ — অর্থ৮, তারকা অস্তমিত হওয়ার পর। এখানে ফজরের নামায ও তখনকার তসবীহ পাঠ বোঝানো হয়েছে।—(ইবনে-কাসীর)।

সূরা আত্ব-তুর সমাপ্ত

(৩২) তাদের বুদ্ধি কি এ বিষয়ে তাদেরকে আদেশ করে, না তারা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়? (৩৩) না তারা বলে: এই কোরআন সে নিজে রচনা করেছে? বরং তারা অবিশ্বাসী। (৩৪) যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে এর অনুরূপ কোন রচনা উপস্থিত করুক। (৩৫) তারা কি আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? (৩৬) না তারা নাভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না। (৩৭) তাদের কাছে কি আপনার পালনকর্তার ভাণ্ডার রয়েছে, না তারাই সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক? (৩৮) না তাদের কোন সিঁড়ি আছে, যাতে আরোহণ করে তারা শ্রবণ করে? থাকলে তাদের শ্রোতা সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করুক। (৩৯) না তার কন্যা-সন্তান আছে আর তোমাদের আছে পুত্রসন্তান? (৪০) না আপনি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চান যে, তাদের উপর জরিমানার বোঝা ঢেপে বসে? (৪১) না তাদের কাছে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিপিবদ্ধ করে? (৪২) না তারা চক্রান্ত করতে চায়? অতএব যারা কাকের, তারাই চক্রান্তের শিকার হবে। (৪৩) না তাদের আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোন উপাস্য আছে? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তাআলা তা থেকে পবিত্র। (৪৪) তারা যদি আকাশের কোন খণ্ডকে পতিত হতে দেখে, তবে বলে: এটা তো পৃথ্বীভূত মেঘ। (৪৫) তাদেরকে ছেড়ে দিন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের উপর বজ্রাঘাত পতিত হবে। (৪৬) সেদিন তাদের চক্রান্ত তাদের কোন উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (৪৭) গোনাহগারদের জন্যে এছাড়া আরও শাস্তি রয়েছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (৪৮) আপনি আপনার পালনকর্তার নির্দেশের অপেক্ষায় সবর করুন। আপনি আমার দূতীর সামনে আছেন এবং আপনি আপনার পালনকর্তার সম্মুখীন পবিত্রতা ঘোষণা করুন যখন আপনি গোত্রোচ্চন করেন। (৪৯) এবং রাব্বির কিছু অংশে এবং তারকা অন্তর্গত হওয়ার সময় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন।



সূরা আন-নায্ম

মকায় অবতীর্ণ: আয়াত ৬২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

- (১) নক্ষত্রের কসম, যখন অন্তর্মিত হয়। (২) তোমাদের সংগী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। (৩) এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। (৪) কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়। (৫) তাঁকে শিক্ষা দান করে এক শক্তিশালী ফেরেশতা, (৬) সহজাত শক্তিসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল (৭) উর্ষ দিগন্তে, (৮) অতঃপর নিকটবর্তী হল ও খুলে গেল। (৯) তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম। (১০) তখন আল্লাহ তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার, তা প্রত্যাদেশ করলেন। (১১) রসুলের অন্তর মিথ্যা বলেনি যা সে দেখেছে। (১২) তোমরা কি বিষয়ে বিতর্ক করবে যা সে দেখেছে? (১৩) নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল, (১৪) সিন্দরুলমুস্তাহার নিকটে, (১৫) যার কাছে অবস্থিত বসবাসের জন্মাত। (১৬) যখন বৃষ্টি দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার, তদ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। (১৭) তাঁর দৃষ্টিবিষম হয়নি এবং সীমানলঘনও করেনি। (১৮) নিশ্চয় সে তার পালনকর্তার মহান নিদর্শনাবলী অবলোকন করেছে। (১৯) তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাভ ও ওষা সম্পর্কে (২০) এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্পর্কে? (২১) পুত্র-সন্তান কি তোমাদের জন্যে এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্যে? (২২) এমতাবস্থায় এটা তো হবে খুবই অসংগত বটন। (২৩) এগুলো কতগুলো নাম বৈ নয়, যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের রেখেছ। এর সম্বন্ধে আল্লাহ কোন দলীল নাযিল করেননি। তারা অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পথনির্দেশ এসেছে। (২৪) মানুষ যা চায়, তাই কি পায়? (২৫) অতএব, পরবর্তী ও পূর্ববর্তী সব মঙ্গলই আল্লাহর হাতে।

সূরা নজমের বৈশিষ্ট্য : সূরা নজম প্রথম সূরা, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) মকায় ঘোষণা করেন—(কুরতুবী) এই সূরাতেই সর্বপ্রথম সেজদার আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) তেলাওয়াতের সেজদা করেন। মুসলমান ও কাকের সবাই এই সেজদায় শরীক হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় মজলিসে যত কাকের ও মুশরিক উপস্থিত ছিল, সবাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সাথে সেজদায় আত্মী নত হয়ে যায়। কেবল এক অহংকারী ব্যক্তি যার নাম সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে, সে সেজদা করেনি। কিন্তু সে এক মুষ্টি মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বলল : ব্যস এতটুকুই যথেষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন : আমি সেই ব্যক্তিকে কাকের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি।—(ইবনে-কাসীর)।

এই সূরার শুরুতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সত্য নবী হওয়া এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ না থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে।

نجوم إذا هوى — নক্ষত্রমাত্রকেই নজম বলা হয় এবং বহুবচন نجوم কখনও এই শব্দটি কয়েকটি নক্ষত্রের সমষ্টি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই আয়াতেও কেউ কেউ নজমের তফসীর “সূরাইয়া” অর্থাৎ, সপ্তর্ষিমণ্ডল দ্বারা করেছেন। কারারা ও হযরত হাসান বসরী (রহঃ) প্রথম তফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।—(কুরতুবী)। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তা—ই অবলম্বন করা হয়েছে। هوى শব্দটি পতিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। নক্ষত্রের পতিত হওয়ার মানে অন্তর্মিত হওয়া। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নক্ষত্রের কসম খেয়ে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর ওহী সত্য, বিশুদ্ধ ও সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। সূরা সাফফাতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, বিশেষ উপযোগিতা ও তাৎপর্যের কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ বিশেষ সৃষ্টবস্তুর কসম খেতে পারেন। কিন্তু অন্য কারও জন্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর কসম খাওয়ার অনুমতি নেই। এখানে নক্ষত্রের কসম খাওয়ার এক তাৎপর্য এই যে, অন্ধকার রাত্রে দিক ও রাস্তা নির্ণয়ের কাজে নক্ষত্র ব্যবহৃত হয়, তেমনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর মাধ্যমেও আল্লাহর পথের দিকে হেদায়েত অর্জিত হয়।

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ — এই বিষয়বস্তুর কারণেই কসম খাওয়া হয়েছে। এর অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে পথের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেন; তাই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিলাভের বিশুদ্ধ পথ। তিনি পথ ভুলে যাননি এবং বিপথগামীও হননি।

রসুলের পরিবর্তে সংগী বলার রহস্য : এ স্থলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর নাম অথবা নবী শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে “তোমাদের সংগী” বলে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) বাইরে থেকে আগত কোন অপরিচিত ব্যক্তি নন, যার সত্যবাদিকতায় তোমরা সন্দিগ্ধ হবে। বরং তিনি তোমাদের সার্বক্ষণিক সংগী। তোমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানেই শৈশব অতিবাহিত করে যৌবনে-পদার্পণ করেছেন। তাঁর জীবনের কোন দিক তোমাদের কাছে গোপন নয়। তোমরা পরীক্ষা করে দেখেছ যে, তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না। তোমরা তাঁকে শৈশবেও কোন মন্দকাজে লিপ্ত দেখনি। তাঁর চরিত্র, অভ্যাস, সত্যতা ও বিশ্বস্ততার

প্রতি তোমাদের এতটুকু আস্থা ছিল যে, সমগ্র মক্কাবাসী তাঁকে 'আল-আমীন' বলে সম্বোধন করত। এখন নবুওয়ত দাবী করায় তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে শুরু করছে। সর্বনাশের কথা এই যে, যিনি মানুষের ব্যাপারে কখনও মিথ্যা বলেননি, তিনি আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে মিথ্যা বলছেন বলে তোমরা তাঁকে অভিযুক্ত করছ। তাই অতঃপর বলা হয়েছে :

وَلَا يُلْقِي عَنِ الْهُدَىٰ إِن هُوَ إِلَّا هُدًى يُّؤْتِي — অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্

(সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কথা তৈরী করে আল্লাহ তাআলার দিকে সম্প্রদায়িত্ব করেন না। এর কোন সম্ভাবনাই নেই। বরং তিনি যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে প্রত্যাদেশ হয়। বোখারীর বিভিন্ন হাদীসে ওহীর অনেক প্রকার বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে (এক) যার অর্থ ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, এর নাম কোরআন। (দুই) যার কেবল অর্থ আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই অর্থ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন, এর নাম হাদীস ও সুন্নাহ। এরপর হাদীসে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে বিষয়বস্তু বিধৃত হয়, কখনও তা কোন ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ফয়সালা তথা বিধান হয়ে থাকে এবং কখনও কেবল সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়। এই নীতির মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইজ্তিহাদ করে বিধানাবলী বের করেন। এই ইজ্তিহাদে ভ্রান্তি হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তথা পয়গম্বরকূলের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইজ্তিহাদের মাধ্যমে যেসব বিধান বর্ণনা করেন, সেগুলোতে ভুল হয়ে গেলে তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীর সাহায্যে শুধরিয়ে দেয়া হয়। তাঁরা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য মুজ্তাহিদ আলেম ইজ্তিহাদে ভুল করলে তারা তার উপর কায়ম থাকতে পারেন। তাদের এই ভুলও আল্লাহ তাআলার কাছে কেবল ক্ষমাই নয়; বরং ধর্মীয় বিধান হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে তাঁরা যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন, তজ্জন্যে তাঁরা কিঞ্চিৎ সওয়াবেরও অধিকারী হন।

এই বক্তব্য দ্বারা আলোচ্য আয়াত সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জওয়াবও হয়ে গেছে। প্রশ্ন এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর সব কথাই যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী হয়ে থাকে, তখন জরুরী হয়ে পড়ে যে, তিনি নিজ মতামত ও ইজ্তিহাদ দ্বারা কোন কিছু বলেন না। অথচ সহীহ হাদীসসমূহে একাধিক ঘটনা এমন বর্ণিত আছে যে, প্রথমে তিনি এক নির্দেশ দেন, অতঃপর ওহীর আলোকে সেই নির্দেশ পরিবর্তন করেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রথম নির্দেশটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ছিল না; বরং তিনি স্বীয় মতামত ও ইজ্তিহাদের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছিলেন। এর জওয়াব পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, ওহী কখনও সামগ্রিক নীতির আকারে হয়, যদ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইজ্তিহাদ করে বিধানাবলী বের করেন। এই ইজ্তিহাদে ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে।

عَلَّمَ شَرِيكَ الْقَوْلِ — এখান থেকে অষ্টাদশতম আয়াত

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ رَّبِّهِ الْغَوِي — পর্যন্ত সব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর ওহীতে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহর কলাম তাঁকে এভাবে দান করা হয়েছে যে, এতে কোনরূপ ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকতে পারে না।

এই আয়াতসমূহের তফসীরে তফসীরবিদদের মতভেদ : এসব আয়াতের ব্যাপারে দু'প্রকার তফসীর বর্ণিত রয়েছে। (এক) আনাস ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তফসীরের সারমর্ম এই যে, এসব

আয়াতে মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষালাভ ও আল্লাহর দর্শন ও নৈকট্যালভের কথা আলোচিত হয়েছে। মহাশক্তিশালী, সহজাত শক্তিসম্পন্ন, دَاتَمَدُّنِی এবং دَاتَمَدُّنِی এগুলো সব আল্লাহ তাআলার বিশেষণ ও কর্ম। তফসীরে মহহারীতে এই তফসীর অবলম্বিত হয়েছে। (দুই) অন্যান্য অনেক সাহাবী, তাবয়ী ও তফসীরবিদের মতে এসব আয়াতে জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে এবং মহাশক্তিশালী ইত্যাদি শব্দ জিবরাঈলের বিশেষণ। এই তফসীরের পক্ষে অনেক সঙ্গত কারণ রয়েছে। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও সূরা নজম সম্পূর্ণ প্রাথমিক সূরাসমূহের অন্যতম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কায় সর্বপ্রথম যে সূরা প্রকাশ্যে পাঠ করেন তা সূরা নজম। বাহ্যতঃ মে'রাজের ঘটনা এরপরে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়টি তর্কাতীত নয়। আসল কারণ এই যে, হাদীসে বরং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এসব আয়াতের যে তফসীর করেছেন, তাতে জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখিত আছে। মুসনাদে-আহমদে বর্ণিত হাদীসের বক্তব্য এরূপ :

শা'বী হযরত মসরূক থেকে বর্ণনা করেন—তিনি একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ)—এর কাছে ছিলেন এবং আল্লাহ তাআলাকে দেখা সম্পর্কে আলোচনা চলছিল। মসরূক বলেন : আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা বলেছেন : وَلَقَدْ رَأَىٰ نَزْلَةَ الْخُبْرَىٰ — وَلَقَدْ رَأَىٰ بِالْأَنْفِ الْمُبِينِ হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন : মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন : আয়াতে যাকে দেখার কথা বলা হয়েছে, সে জিবরাঈল (আঃ)। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে মাত্র দু'বার আসল আকৃতিতে দেখেছেন। আয়াতে বর্ণিত দেখার অর্থ এই যে, তিনি জিবরাঈলকে আকাশ থেকে ভূমির দিকে অবতরণ করতে দেখেছেন। তার দেহাকৃতি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল — (ইবনে-কাসীর)।

সহীহ মুসলিমেরও এই রেওয়ায়েত প্রায় একই ভাষায় বর্ণিত আছে। হাফেয ইবনে হাজার ফতহুলবারী গ্রন্থে ইবনে মরদুওয়াইহ (রহঃ) থেকে এই রেওয়ায়েত একই সনদে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে হযরত আয়েশার (রাঃ) বক্তব্য এরূপ :

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন : এই আয়াত সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, আপনি আপনার পালনকর্তাকে দেখেছেন কি? তিনি বললেনঃ না, বরং আমি জিবরাঈলকে নীচে অবতরণ করতে দেখেছি। — (ফতহুল-বারী ৮ম খণ্ড ৪৯৩ পৃঃ)।

সহীহ বোরখারীতে শায়বানী বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত যরকে এই আয়াতে অর্থ জিজ্ঞাসা করেন :

فَكَانَ ثَابِتُ بْنُ قَابُوسٍ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ إِلَى عَيْدِهِ مَا وَجَّه — তিনি জওয়াবে বলেন : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিবরাঈলকে ছয়শত বাহ্যবিশিষ্ট দেখেছেন। ইবনে জরীর (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবনে-মসউদ (রাঃ) থেকে مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিবরাঈলকে রফরফের পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তাঁর অস্তিত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যমণ্ডলকে ভরে রেখেছিল।

ইবনে কাসীরের বক্তব্য : ইবনে-কাসীর স্বীয় তফসীরে এসব রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর বলেন : সূরা নজমের উল্লেখিত আয়াতসমূহ

দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বলে জিবরাঈলকে দেখা ও নিকটবর্তী হওয়া বোঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা, আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ, আবুযর গফারী, আবু হোরায়রা প্রমুখ সাহাবীরা এই উক্তি। তাই ইবনে-কাসীর আয়াতসমূহের তফসীরে বলেন :

ঃ আয়াতসমূহে উল্লেখিত দেখা ও নিকটবর্তী হওয়ার অর্থ জিবরাঈলকে দেখা ও জিবরাঈলের নিকটবর্তী হওয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখেছিলেন এবং দ্বিতীয়বার মে'রাজের রাত্রিতে সিনদরাতুল-মুস্তাহার নিকটে দেখেছিলেন। প্রথমবারে দেখা নবুওয়তের সম্পূর্ণ প্রাথমিক যমানায় হয়েছিল। তখন জিবরাঈল সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতসমূহের প্রত্যাদেশ নিয়ে প্রথমবার আগমন করেছিলেন। এরপর ওহীতে বিরতি ঘটে, যদ্বন্ধন রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনার মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন। পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করার ধারণা বারবার তাঁর মনে জাগ্রত হত থাকে। কিন্তু যখনই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হত, তখনই জিবরাঈল (আঃ) দৃষ্টির অন্তরালে থেকে আওয়াজ দিতেন : হে মুহাম্মদ, (সাঃ) আপনি আল্লাহ তাআলার সত্য নবী, আর আমি জিবরাঈল। এই আওয়াজ শুনে তাঁর মনের ব্যাকুলতা দূর হয়ে যেত। যখনই মনে বিরূপ কল্পনা দেখা দিত, তখনই জিবরাঈল (আঃ) অদৃশ্য থেকে এই আওয়াজের মাধ্যমে তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। অবশেষে একদিন জিবরাঈল (আঃ) মক্কার উম্মুক্ত ময়দানে তাঁর আসল আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর ছয়শত বাহ ছিল এবং তিনি গোটা দিগন্তকে ঘিরে রেখেছিলেন। এরপর তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট আসেন এবং তাঁকে ওহী পৌছান। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে জিবরাঈলের মহাত্মা এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার স্বরূপ ফুটে উঠে।—(ইবনে-কাসীর)

সারকথা এই যে, ইমাম ইবনে কাসীরের মতে উল্লেখিত আয়াতসমূহের তফসীর তাই যা উপরে বর্ণনা করা হল। এই প্রথম দেখা এ জগতেই মক্কার দিগন্তে হয়েছিল। কোন কোন রেওয়াজেতে আরও বলা হয়েছে যে, জিবরাঈলকে প্রথমবার আসল আকৃতিতে দেখে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অতঃপর জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাঁর নিকটে আসেন এবং খুবই নিকটে আসেন।

দ্বিতীয়বার দেখার কথা وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى — আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। মে'রাজের রাত্রিতে এই দেখা হয়। উল্লেখিত কারণসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ তফসীরবিদ এই তফসীরকেই গ্রহণ করেছেন। ইবনে-কাসীর, কুতুবী, আবু হাইয়ান, ইমাম রাযী প্রমুখ এই তফসীরকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তফসীরের সার-সংক্ষেপে মওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহঃ)ও এই তফসীরই অবলম্বন করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, সূরা নজমের শুরুভাগের আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলাকে দেখার কথা আলোচিত হয়নি; বরং জিবরাঈলকে দেখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নবতী মুসলিম শরীফের টীকায় এবং হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল-বারী গ্রন্থেও এই তফসীর অবলম্বন করেছেন।

دُرُوءَةُ فَاسْتَوَىٰ وَهَوَّيَا لِأُفْرِ الْأَعْلَىٰ — مُرَّة শব্দের অর্থ শক্তি।

জিবরাঈলের অধিক শক্তি বর্ণনা করার জন্যে এটাও তাঁরই বিশেষণ। এতেকরে এই ধারণার অবকাশ থাকে না, ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাছে কোন শয়তান প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কারণ, জিবরাঈল এতই শক্তিশালী যে, শয়তান তাঁর কাছেও ঘেঁষতে পারে না।

فَاسْتَوَىٰ এর অর্থ সোজা হয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য এই যে, জিবরাঈলকে যখন প্রথম দেখেন, তখন তিনি আকাশ থেকে नीচে অবতরণ করছিলেন। অবতরণের পর তিনি উর্ধ্ব দিগন্তে সোজা হয়ে বসে যান। দিগন্তের সাথে উর্ধ্ব সংযুক্ত করার রহস্য এই যে, ভূমির সাথে মিলিত যে দিগন্ত তা সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই জিবরাঈলকে উর্ধ্ব দিগন্তে দেখানো হয়েছে।

ثَوْدًا فَتَدَلَّى — ثَوْدًا শব্দের অর্থ নিকটবর্তী হল এবং تَدَلَّى শব্দের অর্থ ঝুলে গেল। অর্থাৎ, ঝুঁকে পড়ে নিকটবর্তী হল। فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ধনুকের কাঠ এবং এর বিপরীতে ধনুকের সূতার মধ্যবর্তী ব্যবধানকে قَاب বলা হয়। এই ব্যবধান আনুমানিক একহাত হয়ে থাকে। قَابَ قَوْسَيْنِ দুই ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধান বলার কারণ আরবদের একটি বিশেষ অভ্যাস। দুই ব্যক্তি পরস্পরে শান্তিচুক্তি ও সখ্যতা স্থাপন করতে চাইলে এর এক প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত আলামত ছিল হাতের উপর হাত মারা। অপর একটি আলামত ছিল এই যে, উভয়েই আপন আপন ধনুকের কাঠ নিজের দিকে এবং ধনুকের সূতা অপরের দিকে রাখত। এভাবে উভয় ধনুকের সূতা পরস্পরে মিলিত হয়ে যাওয়ায় সম্প্রীতি ও সখ্যতার ঘোষণা মনে করা হত। এসময় উভয় ব্যক্তির মাঝখানে দুই ধনুকের 'কাবের' ব্যবধান থেকে যেত অর্থাৎ, প্রায় দুই হাত বা একগজ। এরপর قَابَ قَوْسَيْنِ বলে আরও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই মিলন সাধারণতঃ প্রথাগত মিলনের অনুরূপ ছিল; বরং এর চাইতেও গভীর ছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে জিবরাঈল (আঃ)-এর অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করার কারণ এদিকে ইঙ্গিত করা যে, তিনি যে ওহী পৌছিয়েছেন তা শ্রবণে কোন সন্দেহ ও সন্দেহের অবকাশ নেই। এই নৈকট্য ও মিলনের কারণে জিবরাঈল (আঃ)-কে না চেনা এবং শয়তানের হস্তক্ষেপ করার সম্ভাবনাও বাতিল হয়ে যায়।

فَاَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ — এখানে اَوْحَى ক্রিয়াপদের কর্তা স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এবং عَبْدِهِ-এর সর্বনাম দ্বারা তাঁকেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, জিবরাঈল (আঃ)-কে শিক্ষক হিসেবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সন্নিহিতে প্রেরণ করে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করলেন।

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ رَأَىٰ — مَا كَذَّبَ শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ। উদ্দেশ্য এই যে, চক্ষু যা কিছু দেখেছে, অন্তঃকরণও তা যথাযথ উপলব্ধি করতে কোন ভুল করেনি। এই ভুল ও ত্রুটিকেই আয়াতে كَذَّبَ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে; অর্থাৎ, দেখা বস্তু উপলব্ধি করার ব্যাপারে অন্তঃকরণ মিথ্যা বলেনি। رَأَى শব্দের অর্থ যা কিছু দেখেছে। কি দেখেছে, কোরআনে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এ ব্যাপারে সাহাবী, তাবয়ী ও তফসীরবিদগণের উক্তি দ্বিবিধ। কারও কারও মতে স্বয়ং আল্লাহ তাআলাকে দেখেছে এবং কারও কারও মতে জিবরাঈল (আঃ)-কে আসল আকৃতিতে দেখেছে। এই তফসীর অনুযায়ী رَأَى শব্দটি আক্ষরিক অর্থে (চর্মচক্ষে দেখার অর্থে) ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে অন্তঃকক্ষ দ্বারা দেখার অর্থ নেয়ার প্রয়োজন নেই।

আয়াতে অন্তঃকরণকে উপলব্ধি করার কর্তা করা হয়েছে। অথচ খ্যাতনামা দার্শনিকদের মতে উপলব্ধি করা বোধশক্তি কাজ। এই প্রশ্নের জওয়াব এই যে, কোরআন পাকের অনেক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, উপলব্ধির আসল কেন্দ্র অন্তঃকরণ। তাই কখনও বোধশক্তিকেও কল্ব (অন্তঃকরণ) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে দেয়া হয়; যেমন لَيْسَ كَلَمًا لَّهِ لَقَدْ (অন্তঃকরণ) আয়াতে কল্ব বলে বিবেক ও বোধশক্তি বোঝানো হয়েছে। কোরআন

পাকের لَهُمْ قُتُوبٌ لَا يُلَاقُونَ بِهَا ইত্যাদি আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

تَزَلَّةُ الْخُرَى — وَلَقَدْ رَآهُ تَزَلَّةُ الْخُرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى এর অর্থ দ্বিতীয়বারের অবতরণ। এই অবতরণও জিবরাঈল (আঃ)-কে প্রথম দেখার স্থান যেমন মক্কার উর্ধ্ব দিগন্ত বলা হয়েছিল, তেমনি দ্বিতীয়বার দেখার স্থান সপ্তম আকাশের 'সিদরাতুল-মুস্তাহা' বলা হয়েছে। কলাবাঙ্কল, যে 'রাজের রাত্রিতেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) সপ্তম আকাশে গমন করেছিলেন। এতে করে দ্বিতীয়বার দেখার সময়ও মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। অভিধানে 'সিদরাহ' শব্দের অর্থ বদরিকা বৃক্ষ। মুস্তাহা শব্দের অর্থ শেক্ষপাত্র। সপ্তম আকাশে আরশের নীচে এই বদরিকা বৃক্ষ অবস্থিত। মুসলিমের রেওয়াজেতে একে ষষ্ঠ আকাশে বলা হয়েছে। উভয় রেওয়াজেতের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, এই বৃক্ষের মূল শিকড় ষষ্ঠ আকাশে এবং শাখা প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।—(কুরত্বী) সাধারণ ফেরেশতাগণের গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। তাই একে মুস্তাহা বলা হয়। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী প্রথমে 'সিদরাতুল-মুস্তাহা' নামিল হয় এবং এখান থেকে সন্নিহিত ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়। পৃথিবী থেকে আকাশগামী আমলনামা ইত্যাদিও ফেরেশতাগণ এখানে পৌছায় এবং এখান থেকে অন্য কোন পন্থায় আল্লাহ তাআলার দরবারে পেশ করা হয়। মসনদে-আহমদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে একথা বর্ণিত আছে।—(ইবনে-কাসীর)।

عِنْدَ مَا جَاءَ الْمَوَى — مَاوী শব্দের অর্থ ঠিকানা, বিশ্রামস্থল। জান্নাতকে مَاوী বলার কারণ এই যে, এটাই মানুষের আসল ঠিকানা। আদম (আঃ) এখানেই সৃজিত হন, এখান থেকেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয় এবং এখানেই জান্নাতীরা বসবাস করবে।

জান্নাত ও জাহান্নামের বর্তমান অবস্থান : এই আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, জান্নাত এখনও বিদ্যমান রয়েছে। অধিকাংশ উস্মাতের বিশ্বাস তাই যে, জান্নাত ও জাহান্নাম কেয়ামতের পর সৃজিত হবে না। এখনও এগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এই আয়াত থেকে একথাও জানা গেল যে, জান্নাত সপ্তম আকাশের উপর আরশের নীচে অবস্থিত। সপ্তম আকাশ যেন জান্নাতের ভূমি এবং আরশ তার ছাদ। কোরআনের কোন আয়াতে অথবা হাদীসের কোন রেওয়াজেতে জাহান্নামের অবস্থানস্থল পরিস্কারভাবে বর্ণিত হয়নি। সূরা ত্বরের আয়াত وَالْبَصْرُ السَّجُور থেকে কোন কোন তফসীরবিদ এই তথ্য উদ্ধার করেছেন যে, জাহান্নাম সমুদ্রের নিম্নদেশে পৃথিবীর অতল গভীরে অবস্থিত। বর্তমানে তার উপর কোন ভারী ও শক্ত আচ্ছাদন রেখে দেয়া হয়েছে। কেয়ামতের দিন এই আচ্ছাদন বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং জাহান্নামের অগ্নি বিস্তৃত হয়ে সমুদ্রকে অগ্নিতে রূপান্তরিত করে দেবে।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের অনেক বিশেষজ্ঞ মৃত্তিকা খনন করে ভূগর্ভের অপর প্রান্তে যাওয়ার প্রচেষ্টা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত রেখেছে। তারা বিপ্লবায়তন যন্ত্রপাতি এ কাজের জন্যে আবিষ্কার করেছে। যে দল একাজে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছে, তারা মেশিনের সাহায্যে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে ছয় মাইল গভীর পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয়েছে। এরপর শক্ত পাথরের এমন একটা স্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে যার কারণে তাদের খননকার্য এগুতে পারেনি। তারা অন্য জায়গায় খনন আরম্ভ করেছে, কিন্তু এখানেও ছয় মাইলের পর তারা শক্ত পাথরের সম্মুখীন হয়েছে। এভাবে একাধিক জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তারা এই

সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ছয় মাইলের পর সমগ্র ভূগর্ভের উপর এমন একটি কঠিন শীলার আবরণ রয়েছে, যাতে কোন মেশিন কাজ করতে সক্ষম নয়। বলাবাহুল্য, পৃথিবীর ব্যাস হাজার হাজার মাইল। তন্মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগ বিজ্ঞান মাত্র ছয় মাইল পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর প্রস্তাবরণের অন্তিম স্বীকার করে প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে হয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে : সমগ্র ভূগর্ভকে কোন প্রস্তাবরণ দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। যদি কোন সহীহ রেওয়াজেতে দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জাহান্নাম এই প্রস্তাবরণের নীচে অবস্থিত, তবে তা মোটেই অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে না।

إِذْ يُخَوِّلُ السَّيِّدَةَ مَا طَلَبَتْ — অর্থাৎ, যখন বদরিকা বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আচ্ছন্নকারী বস্তু। মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তখন বদরিকা বৃক্ষের উপর স্বর্ণ নির্মিত প্রজাপতি চতুর্দিক থেকে এসে পতিত হচ্ছিল। মনে হয়, আগন্তুক মেহমান রসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্মানার্থে সেদিন বদরিকা বৃক্ষকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হয়েছিল।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى — مَا زَاغَ শব্দটি زَغ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বক্র হওয়া, বিপদগামী হওয়া। طَغَى শব্দটি طَغْيَان থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমালংঘন করা। উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যা কিছু দেখেছেন, তাতে দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি। এতে সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, মাঝে মাঝে মানুষেরও দৃষ্টিতে বিভ্রম করে; বিশেষ করে যখন সে কোন বিস্ময়কর অসাধারণ বস্তু দেখে। এর জওয়াবে কোরআন দুটি শব্দ ব্যবহার করেছে। কেননা, দুই কারণে দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে—(এক) দৃষ্টি দেখার বস্তু থেকে সরে গিয়ে অন্যদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেলে। مَا زَاغَ বলে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, রসূলের দৃষ্টি অন্য বস্তুর উপর নয়; বরং যা তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, তার উপরই পতিত হয়েছে। (দুই) দৃষ্টি উদ্ভিষ্ট বস্তুর উপর পতিত হয়, কিন্তু সাথে সাথে এদিক-সেদিক অন্য বস্তুও দেখতে থাকে। এতেও মাঝে মাঝে বিভ্রম হওয়ার আশংকা থাকে। এ ধরনের দৃষ্টিবিভ্রমের জওয়াবে وَمَا طَغَى বলা হয়েছে।

যারা উল্লেখিত আয়াতসমূহের তফসীরে জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখার কথা বলেন, তাদের মতে এই আয়াতেরও অর্থ এই যে, জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখার ব্যাপারে দৃষ্টি ভুল করেনি। এই বর্ণনার প্রয়োজন এজন্যে দেখা দিয়েছে যে, জিবরাঈল (আঃ) হলেন ওহীর মাধ্যমে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যদি তাঁকে উত্তমরূপে না দেখেন এবং না চেনেন, তবে ওহী সন্দেহমুক্ত থাকে না।

পক্ষান্তরে যারা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীরে আল্লাহ তাআলাকে দেখার কথা বলেন, তারা এখানেও বলেন যে, আল্লাহর দীদারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৃষ্টি কোন ভুল করেনি; বরং ঠিক ঠিক দেখেছে। তবে এই আয়াত চর্মাচর্মে দেখার বিষয়টিকে আরও অধিক ফুটিয়ে তুলেছে।

আল্লাহর দীদার : সকল সাহাবী, তাবয়ী এবং অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, পরকালে জান্নাতীগণ তথা সর্বশ্রেণীর মুমিনগণ আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ করবেন। সহীহ হাদীসসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর দীদার কোন অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার নয়। তবে দুনিয়াতে এই দীদারকে সহ্য করার মত শক্তি মানুষের দৃষ্টিতে নেই। তাই দুনিয়াতে কেউ এই দীদার লাভ করতে পারে না। পরকালের ব্যাপারে খোদ কোরআন বলে :

عَلَّامُ الْغُيُوبِ — অর্থাৎ, পরকালে মানুষের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ ও

শক্তিশালী করে দেয়া হবে এবং যবনিকা সরিয়ে নেয়া হবে। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন : দুনিয়াতে কোন মানুষ আল্লাহকে দেখতে পারে না। কেননা, মানুষের দৃষ্টি ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ তাআলা অক্ষয়। পরকালে যখন মানুষকে অক্ষয় দৃষ্টি দান করা হবে, তখন আল্লাহর দীদারে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। কাযী আযায় (রহঃ) থেকেও প্রায় এমন ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে এবং সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে একথা প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে। হাদীসের ভাষা এরূপ : **واعلموا انكم لن**

تروا ربكم حتى تموتوا এ থেকে এ বিষয়ের সম্ভাবনাও বোঝা যায় যে, দুনিয়াতেও কোন সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর দৃষ্টিতে বিশেষভাবে সেই শক্তি দান করা যেতে পারে, যদ্বারা তিনি আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু মে'রাজের রাত্রিতে যখন সপ্ত আকাশ, জন্মাত, জাহান্নাম ও আল্লাহর বিশেষ নির্দর্শনাবলী অবলোকন করার জন্যেই তিনি স্বতন্ত্রভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন আল্লাহ তাআলার দীদারের ব্যাপারটি দুনিয়ার সাধারণ বিষি থেকেও ব্যতিক্রম ছিল। কারণ, তখন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন না। সম্ভাবনা প্রমাণিত হওয়ার পর প্রশ্ন থেকে যায় যে, দীদার বাস্তবে হয়েছে কি না? এ ব্যাপারে হাদীসের রেওয়ায়েত বিভিন্নরূপ এবং কোরআনের আয়াত সম্ভাবনা ও অবকাশ যুক্ত। এ কারণেই এ বিষয়ে সাহাবী, তাবয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণের পূর্ণাঙ্গ মতভেদ চলে আসছে। ইবনে কাসীর এসব আয়াতের তফসীরে বলেন : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-আব্বাস (রাঃ)—এর মতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ তাআলার দীদার লাভ করেছেন। কিন্তু সাহাবী ও তাবয়ীগণের একটি বিরাট দল এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। ইবনে-কাসীর অতঃপর উভয় দলের প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন।

হাফেয ইবনে-হাজার আসকালানী (রহঃ) ফতহুল-বারী গ্রন্থে সাহাবী ও তাবয়ীগণের এই মতবিরোধ উল্লেখ করার পর কিছু উক্তি এমনও উদ্ধৃত করেছেন, যদ্বারা উপরোক্ত বিরোধের নিশ্চিহ্ন হতে পারে। তিনি আরও

বলেছেন : কুরতুবীর মতে এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা না করা এবং নিশ্চূপ থাকাই শ্রেয়ঃ। কেননা, এ বিষয়টির সঙ্গে কোন 'আমল' জড়িত নয়; বরং এটা বিশ্বাসগত প্রশ্ন। এতে অকাট্য প্রমাণাদির অনুপস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভবপর নয়। কোন বিষয় অকাট্যরূপে না জানা পর্যন্ত সে সম্পর্কে নিশ্চূপ থাকাই বিধান। আমার মতে এটাই নিরাপদ ও সাবধানতার পথ। তাই এ প্রশ্নের দ্বি-পাক্ষিক যুক্তি-প্রমাণ উল্লেখ করা হলো না।

০ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর নবুওয়ত, রেসালত ও তাঁর ওহী সংরক্ষিত হওয়ার প্রমাণাদি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয়েছে। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা কোন দলীল ব্যতিরেকেই বিভিন্ন প্রতিমাকে উপাস্য ও কার্যনির্বাহী সাব্যস্ত করে রয়েছে এবং ফেরেশতাকুলকে আল্লাহর কন্যা আখ্যায়িত করেছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, তারা প্রতিমাদেরকেও আল্লাহর কন্যা বলত।

আরবের মুশরিকরা অসংখ্য প্রতিমার পূজা করত। তন্মধ্যে তিনটি প্রতিমা ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। আরবের বড় বড় গোত্র এগুলোর এবাদতে আত্মনিয়োগ করেছিল। প্রতিমাত্রয়ের নাম ছিল লাত, ওযযা ও মানাত। লাত তায়েফের অধিবাসী সকাফ গোত্রের, ওযযা কোরাইশ গোত্রের এবং মানাত বনী-হেলালের প্রতিমা ছিল। এসব প্রতিমার অবস্থানস্থলে মুশরিকরা বড় বড় জাঁকজমকপূর্ণ গৃহ নির্মাণ করে রেখেছিল। এসব গৃহকে কা'বার অনুরূপ মর্যাদা দান করা হত। মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এসব গৃহ ভূমিসং করে দেন।—(কুরতুবী)

وَسَبَّحُوا بُحْرَىٰ — وَسَبَّحُوا শব্দটি **حُزْرَىٰ** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জুলুম করা, অধিকার খর্ব করা। এ কারণেই হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) **وَسَبَّحُوا** এর অর্থ করেছেন নিপীড়নমূলক বটন।

وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُرِزُوا
بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِبَنِّائِهِ لِيُخْرِجُوهُمْ ۚ وَإِنْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأُنثَىٰ ۚ وَلِلَّهِمْ مِنْ
عِلْمِهِ أَنْ يَكُونُوا إِلَّا طَائِفَةٌ لَافِتَةٌ مِنَ الْحَقِّ
شَيْئًا ۚ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ وَرُونَا ۚ وَلَمْ يَرِدْ إِلَّا الْغِيَاةُ
الَّذِي شَاءَ ۚ إِنَّكَ بِعَيْنِنَا ۚ إِنَّ الْغَالِثِينَ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَىٰ ۚ وَلَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَا يُجْزَى الَّذِينَ آسَأُوا بِمَا عَمِلُوا
وَيُجْزَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَقِّ ۚ الَّذِينَ يَخْتَبِتُونَ كِبِيرَ الْأَمْرِ
وَالْقَوَاعِشِ إِلَّا لِلْمُتَرَاتِنِ رَبُّكَ وَسِعَ الْعَفْوَ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ ۚ
أَنْتُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَإِذَا أَنْتُمْ رَحْمَةٌ فِي بَطُونِ أُمَمِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَتَىٰ ۚ أَقْرَبَتْ الَّذِينَ تَوَلَّىٰ ۚ وَأَعْلَىٰ
قَلِيلًا ذَلِكُمُ ۚ أَعْنَدُ الْعِلْمَ الْقَيْدِ فَهُوَ يَرَىٰ ۚ أَمْ لَمْ يَنْبَأْ
بِبَنِي صُفْيٍ مُؤْمِلِينَ ۚ وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ۚ أَلَا تَزِرُ
وَارِدَةً وَزَرَ أَخُو ۚ وَإِنْ كَيْسَ لِلْإِنْسَانِ الْأَمَّا سَعَىٰ ۚ

(২৬) আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন। (২৭) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তারাই ফেরেশতাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। (২৮) অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসূ নয়। (২৯) অতএব যে আমার স্মরণে বিশ্বাস এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে তার তরফ থেকে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। (৩০) তাদের জ্ঞানের পরিধি এ পর্যন্তই। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ভাল জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন কে সুপঞ্চপাণ্ডু হয়েছে। (৩১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্‌র। যাতে তিনি মন্দকর্মীদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দেন এবং সংকর্মীদেরকে দেন ভাল ফল, (৩২) যারা বড় বড় গোনাহ ও অশ্লীলকার্য থেকে বেঁচে থাকে ছোটখাট অপরাধ করলেও নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত। তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভাল জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যুক্তিগত থেকে এবং যখন তোমরা মাৎসর্গে কচি শিশু ছিলে। অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনি ভাল জানেন কে সংযমী? (৩৩) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (৩৪) এবং দেয় সামান্যই ও পাষণ্ড হয়ে যায়। (৩৫) তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে দেখে? (৩৬) তাকে কি জানানো হয়নি যা আছে মুসার কিতাবে, (৩৭) এবং ইব্রাহীমের কিতাবে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছিল? (৩৮) কিতাবে এই আছে যে, কোন ব্যক্তি কারও গোনাহ চিহ্নে বহন করবে না, (৩৯) এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে,

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

ধারণার বিভিন্ন প্রকার ও বিধান : وَإِنَّ الْكَلِمَةَ لَآتِيَةٌ مِنَ الْحَقِّ

আরবী ভাষায় ظن শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। (এক) অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। আয়াতে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এটাই মুশরিকদের প্রতিমাপূজার কারণ ছিল। (দুই) এমন ধারণা যা দৃঢ় বিশ্বাসের বিপরীতে আসে। “একীন” তথা দৃঢ়বিশ্বাস সেই বাস্তবসম্মত অকাট্য জ্ঞানকে বলা হয়, যাতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই; যেমন কোরআন পাক অথবা হাদীসে-মুতাওয়াতির থেকে অর্জিত জ্ঞান। এর বিপরীতে “যন” তথা ধারণা সেই জ্ঞানকে বলা হয়, যা ভিত্তিহীন কল্পনা তো নয়, বরং দলীলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে এই দলীল অকাট্য নয়, যাতে অন্য কোন সম্ভাবনাই না থাকে; যেমন সাধারণ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিশ্ব-বিধান। প্রথম প্রকারকে “একিনিয়াত” তথা দৃঢ়বিশ্বাসপ্রসূত বিধানাবলী এবং দ্বিতীয় প্রকারকে ‘যনীয়াত’ তথা ধারণাপ্রসূত বিধানাবলী বলা হয়ে থাকে। এই প্রকার ধারণা শরীয়তে ধর্তব্য। এর পক্ষে কোরআন ও হাদীসে সাক্ষ্য - প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এই ধারণাপ্রসূত বিধান অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব - এ বিষয়ে সবাই একমত। আলোচ্য আয়াতে যে ধারণাকে নাকচ করা হয়েছে, তার অর্থ অমূলক ও ভিত্তিহীন কল্পনা। তাই কোন খটকা নেই।

অর্থাৎ, যারা আমার স্মরণে বিশ্বাস এবং একমাত্র পার্থিব জীবনই কামনা করে, আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জ্ঞানের দোঁড় পার্থিব জীবন পর্যন্তই।

কোরআন পাক পরকালে ও কয়ামতে অবিশ্বাসীদের এই অবস্থা বর্ণনা করেছে। পরিতাপের বিষয়, ধর্মীয় জ্ঞানের সাথে সম্পর্কহীন শিক্ষা এবং পার্থিব লোভ-লালসা আজকাল মুসলমানদের অবস্থা তাই করে দিয়েছে। আজকাল আমাদের সকল জ্ঞান-গরিমা ও শিক্ষাগত উন্নতির প্রচেষ্টা কেবল অর্থনীতিকেই কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে। ভুলেও আমরা পরকালীন বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করি না। আমরা রসুলে পাক (সাঃ) - এর নাম উচ্চারণ করি এবং তাঁর সুপারিশ আশা করি; কিন্তু আমাদের অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসুলকে এহেন অবস্থাসম্পন্নদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ দেন। নাউযুবিল্লাহে মিনহা।

الَّذِينَ يَخْتَبِتُونَ كِبِيرَ الْأَمْرِ وَالْقَوَاعِشِ إِلَّا لِلْمُتَرَاتِنِ

এই আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ পালনকারী সংকর্মীদের প্রশংসাসূচক আলোচনা করে তাদের পরিচয় এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা সাধারণভাবে কবীরা তথা বড় বড় গোনাহ থেকে এবং বিশেষভাবে নির্লজ্জ কাজকর্ম থেকে দূরে থাকে। এতে কর্মের মাধ্যমে ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রমের সারমর্ম উপরে তফসীরের সারসংক্ষেপে লিখিত হয়েছে যে, ছোটখাট গোনাহে লিপ্ত হওয়া তাদেরকে সংকর্মীর উপাধি থেকে বঞ্চিত করে না।

শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবয়ীগণের কাছ থেকে দু’রকম উক্তি বর্ণিত আছে। (এক) এর অর্থ সগীরা অর্থাৎ, ছোটখাট গোনাহ। সূরা নেসার আয়াতে একে سینাত বলা হয়েছে।

إِنْ يَنْتَهِبُوا كِبِيرًا تَنْتَهِبُونَ عَنْهُ تَنْكَرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ

এই উক্তি হযরত ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে ইবনে-কাসীর বর্ণনা করেছেন। (দুই) এর অর্থ সেসব গোনাহ, যা কদাচিৎ সংঘটিত হয়, অতঃপর তা

থেকে তওবা করতঃ চিরতরে বর্জন করা হয়। এই উক্তিও ইবনে-কাসীর প্রথমে হযরত মুজাহিদ থেকে এবং পরে হযরত ইবনে আব্বাস ও আবু হোরায়ারা (রাঃ) থেকেও বর্ণনা করেছেন। এর সারমর্মও এই যে, কোন সংলোক দ্বারা ঘটনাচক্রে কবীরা গোনাহ হয়ে গেলে যদি সে তওবা করে, তবে সে-ও সংকামী ও মুতাকীদের তালিকা থেকে বাদ পড়বে না।

مَوَاعِظِكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لَنَكُونَنَّكُمْ مِنْكُمْ
শব্দটি جَنِينَ এর বহুবচন। এর অর্থ গর্ভস্থিত জ্ঞ। আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, মানুষ তার নিজের সম্পর্কে ততটুকু জ্ঞান রাখে না, যতটুকু তার স্রষ্টা রাখেন। কেননা, মাতৃগর্ভে সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় তার কোন জ্ঞান ও চেতনা থাকে না, কিন্তু তার স্রষ্টা বিজ্ঞসুলভ সৃষ্টিকুশলতায় তাকে গড়ে তোলেন। আয়াতে মানুষের অক্ষমতা ও অজ্ঞানতা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে যে, মানুষ যে কোন ভাল ও সংকাজ করে, সেটা তার ব্যক্তিগত পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ। কারণ, কাজ করার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনি তৈরী করেছেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তিনি গতিশীল করেছেন। অন্তরে সংকাজের প্রেরণা ও সংকল্প তাঁরই তওফীক দ্বারা হয়। অতএব, মানুষ যতবড় সংকামী, মুতাকী ও পরহেযগারই হোক না কেন, নিজ কর্মের জন্যে গর্ব করার অধিকার তার নেই। এছাড়া ভাল-মন্দ সব সমাপ্তি ও পরিণামের উপর নির্ভরশীল। সমাপ্তি ভাল হবে কি মন্দ হবে, তা এখনও জানা নেই। অতএব, গর্ব ও অহংকার কিসের উপর? পরবর্তী আয়াতে একথাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

لَا تَكُونُوا أَكْثَرَكُمْ مَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ — অর্থাৎ, তোমরা
নিজেদের পবিত্রতা দাবী করো না। কারণ, আল্লাহ তাআলাই ভাল জ্ঞানের কে কতটুকু পানির মাছ। শ্রেষ্ঠত্ব খোদাভীতির উপর নির্ভরশীল—বাহ্যিক কাজ-কর্মের উপর নয়। খোদাভীতিও তা-ই ধর্তব্য, যা মৃত্যু পর্যন্ত কায়েম থাকে।

হযরত যয়নব বিনতে আবু সালমা (রাঃ)—এর পিতামাতা তাঁর নাম রেখেছিলেন ‘বাররা’ যার অর্থ সংকর্মপরায়ণ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আলোচ্য مَوَاعِظِكُمْ আয়াত তেলাওয়াত করতঃ এই নাম রাখতে নিষেধ করেন। কারণ, এতে সং হওয়ার দাবী রয়েছে। অতঃপর তাঁর নাম পরিবর্তন করে যয়নব রাখা হয়।—(ইবনে-কাসীর)

ইমাম আহমদ (রাঃ) আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সামনে অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি নিষেধ করে বললেন : তুমি যদি কারও প্রশংসা করভেই চাও, তবে একথা বলে কর : আমার জ্ঞান মতে এই ব্যক্তি সং, খোদাভীর। সে আল্লাহর কাছেও পাক পবিত্র কিনা আমি জানি না।

শানে নুযল : দূররে-মনসুরে ইবনে-জরীর (রহঃ)—এর এক রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তার বন্ধু এই বলে তাকে তিরস্কার করল যে, তুমি পৈতৃক ধর্ম কেন ছেড়ে দিলে? সে বলল : আমি আল্লাহর শান্তিকে ভয় করি। বন্ধু বলল : তুমি আমাকে কিছু অর্থকড়ি দিলে আমি তোমার শান্তি নিজের কাঁধে নিয়ে নেব। ফলে তুমি বেঁচে যাবে। সেমতে সে বন্ধুকে কিছু অর্থকড়ি দিল। বন্ধু আরও চাইলে সে সামান্য ইতস্তস্ত করার পর আরও দিল এবং অবশিষ্ট অর্থের একটি দলিল লিখে দিল। রুহুল মা’আনীতে এই ব্যক্তির নাম ওলীদ ইবনে-মুগীরা লিখিত আছে। সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং

তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করে শান্তির দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছিল।

أَوْرَثَ الْوَلَدَيْنِ مَوْلًى — এর শাব্দিক অর্থ মুখ ফেরানো। উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার আনুগত্য থেকে মুখ ফেরানো।

أَوْرَثَ — শব্দটি كَدِيَّة থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সেই প্রস্তরখণ্ড, যা কূপ অথবা ভিত্তি খনন করার সময় মৃত্তিকা গর্ভ থেকে বের হয় এবং খননকার্যে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এখানে أَوْرَثَ এর অর্থ এই যে, প্রথমে কিছু দিল, এরপর হাত গুটিয়ে নিল। উপরে আয়াতের শানে-নুযলে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় করে অতঃপর তা পরিত্যাগ করে অথবা শুরুতে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে কিছু আকৃষ্ট হয়, অতঃপর আনুগত্য বর্জন করে বসে। এই তফসীর হযরত মুজাহিদ, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, কাতাদাহ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।—(ইবনে-কাসীর)

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَؤُلَاءِ — শানে নুযলের ঘটনা অনুযায়ী আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি কোন এক বন্ধুর এই কথায় ইসলাম ত্যাগ করল যে, তোমার পরকালীন আযাব আমি মাথা পেতে নেব, সেই নির্বোধ লোকটি বন্ধুর এই কথায় কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করল? তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যদ্বারা সে দেখতে পাচ্ছে যে, এই বন্ধু তার শাস্তি মাথা পেতে নেবে এবং তাকে বাঁচিয়ে দেবে? বলাবাহুল্য, এটা নিরোঁট প্রতারণা। তার কাছে কোন অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং অন্য কেউ তার পরকালীন শাস্তি নিজে ভোগ করে তাকে বাঁচাতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি শানে নুযলের ঘটনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ এই হবে যে, দানকার্য শুরু করে তা বন্ধ করে দেয়ার কারণ এই ধারণা হতে পারে যে, উপস্থিত সম্পদ ব্যয় করে দিলে আবার কোথা থেকে আসবে? এই ধারণা খণ্ডন করার জন্যে বলা হয়েছে, তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যাদ্বারা সে যেমন দেখতে পাচ্ছে যে, এই সম্পদ খতম হয়ে যাবে এবং তদন্তুলে অন্য সম্পদ সে লাভ করতে পারবে না? এটা ভুল। তার কাছে অদৃশ্যের জ্ঞান নেই এবং তার এই ধারণাও সঠিক নয়।

أَمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ وَابْرِهِمُ الْوَلَدَيْنِ مَوْلًى — এই আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)—এর একটি বিশেষগুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে وَلَدَيْنِ বলা হয়েছে। وفاء শব্দের অর্থ ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূর্ণ করা।

ইবরাহীম (আঃ) এর বিশেষগুণ, অঙ্গীকার পূরণের কিক্ষিপ্ত বিবরণ : উদ্দেশ্য এই যে, ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ তাআলার কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তিনি আল্লাহর আনুগত্য করবেন এবং মানুষের কাছে তাঁর পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবেন। তিনি এই অঙ্গীকার সকল দিক দিয়েই পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। এতে তাঁকে অনেক অগ্নিপরীক্ষায়ও অবতীর্ণ হতে হয়েছে। وَلَدَيْنِ শব্দের এই তফসীর ইবনে-কাসীর, ইবনে-জরীর প্রমুখের মতে।

কোন কোন হাদীসে ইবরাহীম (আঃ)—এর বিশেষ বিশেষ কর্মকাণ্ড বোঝানোর জন্য وَلَدَيْنِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা উপরোক্ত তফসীরের পরিপন্থী নয়। কেননা, অঙ্গীকার পালন শব্দটি আসলে ব্যাপক। এতে নিজস্ব কর্মকাণ্ডসহ খোদায়ী বিধানাবলী প্রতিপালন এবং আল্লাহর আনুগত্যও দাখিল আছে। এছাড়া রেসালতের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের সংশোধনও এর পর্যায়ভুক্ত। হাদীসে বর্ণিত কর্মকাণ্ডও এগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণতঃ আবু ওসামা (রাঃ)-এর রেওয়াজেতে আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) **وَأَرْسَلَهُ إِلَى قَوْمِي** আয়াত তেলাওয়াত করে তাঁকে বললেন : তুমি জান এর মতলব কি? আবু ওসামা (রাঃ) আরম্ভ করলেন : আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাঃ)-ই ভাল জানেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন : অর্থ এই যে, **وَفِي عَمَلٍ يَوْمَهُ بَارِعٍ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ** অর্থাৎ, তিনি দিনের কাজ এভাবে পূর্ণ করে দেন, দিনের শুরুতে (এশরাকের) চার রাকআত নামায পড়ে নেন।—(ইবনে-কাসীর)

তিরমিযীতে আবু যর (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীস দ্বারাও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন :

ابن ادم اركع لى اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره .

অর্থাৎ, আল্লাহ্ বলেন : হে বনী আদম, দিনের শুরুতে আমার জন্যে চার রাকআত নামায পড়, আমি দিনের শেষ পর্যন্ত তোমার সব কাজের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাব।

মুয়ায ইবনে আনাস (রাঃ) এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন : আমি তোমাদেরকে বলছি, আল্লাহ্ তাআলা ইবরাহীম (আঃ)-কে **وَأَرْسَلَهُ إِلَى قَوْمِي** স্বেতাব কেন দিলেন। কারণ এই যে, তিনি প্রত্যহ সকাল-বিকাল এই আয়াত পাঠ করতেন :

فَسَبِّحْ لِلَّهِ الَّذِي تُسَبِّحُونَ وَحِينَ تَقُومُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ

(ইবনে-কাসীর)

মুসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফার বিশেষ নির্দেশ ও শিক্ষাঃ কোরআন পাক পূর্ববর্তী কোন পয়গম্বরের উক্তি অথবা শিক্ষা উদ্ধৃত করার মানে এই যে, এই উম্মতের জন্যেও সেটা অবশ্য পালনীয়। তবে এর বিপক্ষে কোন আয়াত অথবা হাদীস থাকলে সেটা ভিন্নকথা। পরবর্তী আঠার আয়াতে সেইসব বিশেষ শিক্ষা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো মুসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফায় ছিল। তন্মধ্যে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত কর্মগত বিধান মাত্র দুটি। অবশিষ্ট শিক্ষা, উপদেশ ও আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শনাবলীর সাথে সম্পৃক্ত। কর্মগত বিধানদ্বয় এই :

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا سَبْرٌ وَهُدًى وَأَنْزَلْنَاهُ رُزْقًا حَرًى

— শব্দের আসল অর্থ বোঝা। প্রথম আয়াতের অর্থ এই যে, কোন বোঝা বহনকারী নিজের ছাড়া অপরের বোঝা বহন করবে না। এখানে বোঝা অর্থ পাশ ও শাস্তির বোঝা। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তির শাস্তি অপরের ঘাড়ে চাপানো হবে না এবং অপরের শাস্তি নিজে বরশ করার ক্ষমতাও কারও হবে না।

وَأَنْ تَدْعُ مِسْكًا إِلَى مِسْكٍ

অর্থাৎ, কোন শক্তি যদি পাপের বোঝায় ভারাক্রান্ত হয়ে অপরকে অনুরোধ করে যে, আমার কিছু বোঝা তুমি বহন কর, তবে তার বোঝার কিয়দংশও বহন করার সাধ্য কারও হবে না।

একের গোনাহে অপরকে ষ্ট করা হবে না : এই আয়াতের শানে নুূলে বর্ণিত ব্যক্তির ধারণাও অসার প্রমাণিত হয়েছে। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল অথবা ইসলাম গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল। তার বন্ধু তাকে তিরস্কার করল এবং নিশ্চয়তা দিল যে, কেয়ামতে কোন আযাব হলে সে নিজে তা গ্রহণ করে তাকে ঝাটিয়ে দেবে। আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ্র দরবারে গোনাহে অপরকে ষ্ট করার কোন সম্ভাবনা নেই।

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে **وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا الْمَاسِي** এর সারমর্ম এই

যে, অপরের আযাব যেমন কেউ নিজে গ্রহণ করতে পারে না, তেমনি অপরের কাজ নিজে করার অধিকারও কারও নেই। এতে করে সে অপরকে কাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে পারে না। উদাহরণতঃ : এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ফরয নামায আদায় করতে পারে না এবং ফরয রোযা রাখতে পারে না। এভাবে যে, অপর ব্যক্তি এই ফরয নামায ও রোযা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। অথবা এক ব্যক্তি অপরের পক্ষ থেকে ইমান কবুল করতে পারে না, যার ফলে অপরকে মুমিন সাব্যস্ত করা যায়।

উপরে মুসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফার বরাতে দিয়ে যে দু'টি বিধান বর্ণিত হল, এগুলো অন্যান্য পয়গম্বরের শরীয়তেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বিশেষভাবে হযরত মুসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাঁদের আমলে এই মূর্ততাসুলভ প্রথা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল যে, পিতার পরিবর্তে পুত্রকে এবং পুত্রের পরিবর্তে পিতাকে অথবা ভ্রাতা-ভগ্নীকে হত্যা করা হত। তাঁদের শরীয়ত এই কুপ্রথা বিলীন করেছিল।

وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سُدًى ۖ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ إِلَىٰ
رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ إِلَىٰ
أَحْيَا ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ إِلَىٰ
إِذَا تَمَتَّقَ ۖ وَأَنَّ عَلَيْهِ الشَّعْرَىٰ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ إِلَىٰ
أَفْتَىٰ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ إِلَىٰ
وَنُودُوا أَفَّا بَئِذَا ۖ وَقَوْمُهُمْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ إِلَىٰ
وَاطَّاعُوا ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ إِلَىٰ
رَبِّكَ تَسْلَىٰ ۖ هَذَا الَّذِي رَجَعْتَ إِلَىٰ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ إِلَىٰ
الْأَرْضِ ۖ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۖ فَإِنْ هَذَا
الْحَدِيثُ فَجَبٌ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ إِلَىٰ
سُودُونَ ۖ فَاسْجُدْ وَاعْبُدْ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ إِلَىٰ
يَسْمَعُ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ إِلَىٰ
إِقْرَبِ السَّمَاءَ وَاتَّقِ الْفَقْرَ ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ إِلَىٰ
يَحْرُسُونَ ۖ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ ۖ وَأَنَّ إِلَىٰ

(৪০) তার কর্ম শূন্যই দেখা হবে। (৪১) অতঃপর তাকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। (৪২) তোমার পালনকর্তার কাছে সবকিছুর সমাপ্তি, (৪৩) এবং তিনিই হাসান ও কাঁদান (৪৪) এবং তিনিই মারেন ও বাঁচান, (৪৫) এবং তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল-পুরুষ ও নারী। (৪৬) একবিন্দু বীর্ষ থেকে যখন স্খলিত করা হয়। (৪৭) পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই, (৪৮) এবং তিনিই ধনবান করেন ও সম্পদ দান করেন। (৪৯) এবং তিনিই শি'রা নক্ষত্রের মালিক। (৫০) তিনিই প্রথম আদ সপ্তদায়কে ধ্বংস করেছেন, (৫১) এবং সামুদকেও; অতঃপর কাঁটকে অব্যাহতি দেননি। (৫২) এবং তাদের পূর্বে নূহের সপ্তদায়কে, তারা ছিল আরও জালেম ও অবাধ্য। (৫৩) তিনিই জনপদকে শূন্য উল্টোলন করে নিক্ষেপ করেছেন। (৫৪) অতঃপর তাকে আচ্ছন্ন করে নেয় যা আচ্ছন্ন করার। (৫৫) অতঃপর তুমি তোমার পালনকর্তার কেন অনুগ্রহকে মিথ্যা বলবে? (৫৬) অতীতের সতর্ককারীদের মধ্যে সে-ও একজন সতর্ককারী। (৫৭) কেয়ামত নিকটে এসে গেছে। (৫৮) আল্লাহ ব্যতীত কেউ একে প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। (৫৯) তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? (৬০) এবং হাসছ-ক্রন্দন করছ না? (৬১) তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছ, (৬২) অতএব আল্লাহকে সেজদা কর এবং তাঁর এবাদত কর।

সূরাআল-ক্বামার

মকায় অবতীর্ণ: আয়াত ৫৫

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। (২) তারা যদি কেন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত জাদু। (৩) তারা মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। প্রত্যেক কাজ স্বাস্থ্যময়ে স্থিতিশীল হয়।

وَأَنَّ سَعْيَكُمْ سُدًى — অর্থাৎ, কেবল বাহ্যিক প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। আল্লাহ তাআলার দরবারে প্রত্যেকের প্রচেষ্টার আসল স্বরূপও দেখা হবে যে, তা একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে করা হয়েছে, না অন্যান্য জাগতিক স্বার্থও এতে शामिल আছে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন: **الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** অর্থাৎ, কেবল দৃশ্যতঃ কর্মই যথেষ্ট নয়। কর্মে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও আদেশ পালনের ঠাঁটি নিয়ত থাকা জরুরী।

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى — উদ্দেশ্য এই যে, অবশেষে সবাইকে আল্লাহ তাআলার দিকেই ফিরে যেতে হবে এবং কর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে।

কোন কোন তফসীরবিদ এই বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, মানুষের চিন্তা-ভাবনার গতিধারা আল্লাহ তাআলার সন্তায় পৌঁছে নিঃশেষ হয়ে যায়। তাঁর সন্তা ও গুণাবলীর স্বরূপ চিন্তাভাবনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না এবং এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনায় অনুমতিও নেই; যেমন কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, আল্লাহ তাআলার অবদান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর; তাঁর সন্তা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো না। এটা তোমাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার। কাজেই বিষয়টিকে আল্লাহর জ্ঞানে সোপর্দ কর।

وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ — অর্থাৎ, মানবজাতির মধ্যে আনন্দ ও

শোক এবং এর পরিণতিতে হাসি ও কান্না প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করে এবং এতদুভয়েকে তাদের বাহ্যিক কারণাদির সাথে সম্পৃক্ত করে ব্যাপার শেষ করে দেয়। অথচ ব্যাপারটি চিন্তা-ভাবনা সাপেক্ষ। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায় যে, কারও আনন্দ অথবা শোক এবং হাসি ও কান্না স্বয়ং তার কিংবা অন্য কারও করায়ত্ত নয়। এগুলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসে। তিনিই কারণ সৃষ্টি করেন এবং তিনিই কারণাদিকে ক্রিয়াশক্তি দান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে ক্রন্দনকারীদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন এবং হাস্যরতদেরকে এক মিনিটের মধ্যে কাঁদিয়ে দিতে পারেন।

وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ — **اغناء** শব্দের অর্থ ধনাঢ্যতা এবং **اغناء** শব্দের অর্থ অপরকে ধনাঢ্য করা। **أَفْتَى** শব্দটি **قَنِيَة** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংরক্ষিত ও রিজার্ভ সম্পদ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলাই মানুষকে ধনবান ও অভাবমুক্ত করেন এবং তিনিই যাকে ইচ্ছা সম্পদ দান করেন যাতে সে তা সংরক্ষিত করে।

وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ — **شعري** একটি নক্ষত্রের নাম। আরবের কোন কোন সপ্তদায় এই নক্ষত্রের পূজা করত। তাই বিশেষভাবে এর নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এই নক্ষত্রের মালিক ও পালনকর্তা আল্লাহ তাআলাই; যদিও সমস্ত নক্ষত্র, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা, মালিক ও পালনকর্তা তিনি।

وَأَنَّ هُوَ أَصْحَابُ الْأُفُقِ — 'আদ জাতি ছিল পৃথিবীর শক্তিশালী দূর্বর্ষতম জাতি। তাদের দু'টি শাখা পর পর প্রথম ও দ্বিতীয় নামে পরিচিত। তাদের প্রতি হযরত হুদ (আঃ)-কে রসূলরূপে প্রেরণ করা হয়। অবাধ্যতার কারণে ঝঞ্ঝা বায়ুর আঘাব আসে। ফলে সমগ্র জাতি নিস্তানাবুদ হয়ে যায়। কণ্ঠমে-নূহের পর তারাই সর্বপ্রথম আঘাব দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (মাযহারী) সামুদ সপ্তদায়ও তাদের অপর

স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তখন মুশরিকরা তাঁর কাছে নবুওয়তের নিদর্শন চাইল। তখন ছিল চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রি। আল্লাহ্ তাআলা এই সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে একখণ্ড পূর্বদিকে ও অপরখণ্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উপস্থিত সবাইকে বললেন : দেখ এবং সাক্ষ্য দাও। সবাই যখন পরিস্কাররূপে এই মো'জেযা দেখে নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় একত্রিত হয়ে গেল। কোন চক্ষুমান ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পষ্ট মো'জেযা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু মুশরিকরা বলতে লাগল : মুহাম্মদ সারা বিশুর মানুষকে জাদু করতে পারবে না। অতএব, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের অপেক্ষা কর। তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগন্তুক মুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করল।

কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, মক্কায় এই মো'জেযা দুইবার সংঘটিত হয়। কিন্তু সহীহ রেওয়াজেতে সমূহে একবারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।—(বয়ানুল-কোরআন) এ সম্পর্কিত কয়েকটি রেওয়াজেতে ইবনে-কাসীর থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন :

: মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর কাছে নবুওয়তের কোন নিদর্শন দেখতে চাইলে আল্লাহ্ তাআলা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখিয়ে দিলেন। তারা হেরা পর্বতকে উভয় খণ্ডের মাঝখানে দেখতে পেল।—(বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন :

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর আমলে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে গেল। সবাই এই ঘটনা অবলোকন করল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন : তোমরা সাক্ষ্য দাও।

ইবনে-জরীর (রহঃ) ও নিজ সনদে এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আরও উল্লেখিত আছে : আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমি মিনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং একখণ্ড পাহাড়ের পশ্চাতে চলে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন : সাক্ষ্য দাও, সাক্ষ্য দাও।

আবু দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়াজেতে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন : মক্কায় (অবস্থানকালে) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে যায়। কোরাইশ কাফেররা বলতে থাকে, এটা জাদু, মুহাম্মদ তোমাদেরকে জাদু করেছে। অতএব, তোমরা বহির্দেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের অপেক্ষা কর। যদি তারাও চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে মুহাম্মদের দাবী সত্য। পক্ষান্তরে তারা এরূপ দেখে না থাকলে এটা জাদু ব্যতীত কিছু নয়। এরপর বহির্দেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করে।—(ইবনে-কাসীর)

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও জওয়াব : গ্রীক দর্শনের নীতি এই যে, আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের পক্ষে বিদীর্ণ হওয়া ও

সংযুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই নীতির ভিত্তিতে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব। জওয়াব এই যে, দার্শনিকদের এই নীতি নিছক একটি দাবী মাত্র। এর পক্ষে যত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, সবগুলো অসার ও ভিত্তিহীন। আচ্ছ পর্বত কোন যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব বলে প্রমাণ করা যায়নি। তবে অজ্ঞ জনসাধারণ প্রত্যেক সুকঠিন বিষয়কে অসম্ভব বলে ধারণা করে থাকে। বলাবাহুল্য, মো'জেযা বলাই হয় এমন কাক্সকে, যা সাধারণ অভ্যাস বিরুদ্ধ ও সাধারণের সাধ্যাতীত এবং বিস্ময়কর হয়ে থাকে। সচরাচর ঘটে এরূপ যামূলী ঘটনাকে কেউ মো'জেযা বলবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এরূপ বিরাট ঘটনা ঘটে থাকলে বিশ্বের ইতিহাসে তা স্থান পেত। কিন্তু এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, ঘটনাটি মক্কায় রাত্রিকালে ঘটেছিল। তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল। সুতরাং সেসব দেশে এই ঘটনা দেবার প্রশ্নই উঠে না। কোন কোন দেশে অর্ধ রাত্রি এবং কোন কোন দেশে শেষরাত্রি ছিল। তখন সাধারণতঃ সবাই নিদ্রামগ্ন থাকে। যারা জাগ্রত থাকে, তারাও তো সর্বক্ষণ চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে না। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলে তার আলোকরশ্মিতে তেমন কোন প্রভেদ হয় না যে, এই প্রভেদ দেখে মানুষ চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হবে। এছাড়া এটা ছিল স্বপ্নাক্ষণের ঘটনা। আচ্ছকাল দেখা যায় যে, কোন দেশে চন্দ্রগ্রহণ হলে পূর্বেই পত্র-পত্রিকা ও বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করে দেয়া হয়। এতদসত্ত্বেও হাজারো লাখে মানুষ চন্দ্রগ্রহণের কোন খবর রাখে না। তারা টেরই পায় না। জিজ্ঞাসা করি, এটা চন্দ্রগ্রহণ আদৌ না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে? অতএব, পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসে উল্লেখিত না হওয়ার কারণ এই ঘটনাকে মিথ্যা বলা যায় না।

এতদ্ব্যতীত ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য “তালীফ-ফেরেশত” গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। মালাবারের জনৈক মহারাজা এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁর রোজ-নামচায় তা লিপিবদ্ধও করেছিলেন। এই ঘটনাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল। উপরে আবু দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়াজেতে দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মক্কায় মুশরিকরা বহিরাগত লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারাও ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কথা স্বীকার করে।

وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مَنْ يَكْفُرُ — وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مَنْ يَكْفُرُ

প্রচলিত অর্থ দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু আরবী ভাষায় কোন সময়ে مر استمر চলে যাওয়া ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অর্থেও আসে। তফসীরবিদ মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রহঃ) এস্থলে এই অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা স্বপ্নাক্ষণস্থায়ী জাদুর প্রতিক্রিয়া, যা আপনা আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবে। وَلَمْ يَكُنْ শব্দের এক অর্থ শক্ত ও কঠোর হয়। আবুল আলীয়া ও যাহ্যক (রাঃ) এই তফসীরই করেছেন। অর্থাৎ, এটা বড় শক্ত জাদু।

মক্কাবাসীরা যখন চাক্ষুষ দেখাকে মিথ্যা বলতে পারল না, তখন জাদু ও শক্ত জাদু বলে নিজেদেরকে প্রবোধ দিল।

وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مَنْ يَكْفُرُ — استقرار এর শাব্দিক অর্থ স্থির হওয়া। অর্থ এই যে, প্রত্যেক কক্ষ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে পরিস্কার হয়ে যায়। সত্যের উপর যে জালিয়াতির পর্দা ফেলে রাখা হয়, তা পরিণামে উন্মুক্ত হয়েই যায় এবং সত্য সত্যরূপে এক মিথ্যা মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়ে যায়।

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْآبَاءِ آيَاتُهُمْ مُزَيَّرَةٌ ۖ فَكَيْفَ بَالَهُمْ فَمَا
 تَعْنِي النَّذْرُ ۚ فَمَقُولُ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ تُكْرَهُ
 حُمُومًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ
 ۖ فَهُمْ طُعِينٌ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَمِيرٍ ۚ كَذَبَتْ
 قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ۖ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدَجَرُوا ۚ
 فَنَذَرْنَا كَذِبًا مَكْلُوبًا ۖ فَاتَّخَذُوا فَتْنَةً أَلْوَابِ السَّمَاءِ ۖ وَجَاءُ
 مُهْمِبِينَ ۖ وَخَرْنَا الْأَرْضَ عَيْوَنًا فَالْقَى الْمَاءُ عَلَى إِمْرٍ قَدِيدٍ ۖ
 وَصَلَّاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوْبَارِ وَاسْتَوَى ۖ وَخَرْنِي يَا عَيْنِينَ ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ
 لَكَفِيرٌ ۖ وَلَقَدْ تَكْرَمْنَا أَنَّى ۖ فَهَلْ مِنْ مَتَدْرٍ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي
 وَنَذْرِي ۖ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ۖ فَهَلْ مِنْ مُتَدْرٍ ۖ كَذَبَتْ
 عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنَذْرِي ۖ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَحْصَرَ
 فِي يَوْمٍ نَحْصِ مُمْسِرٍ ۖ تَتَرَى الْإِنْسَانَ كَأَنَّهُمْ أَجْعَانُ زَنَحِلٌ
 مِّنْجَعٍ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عَدَابِي وَنَذْرِي ۖ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
 الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ۖ فَهَلْ مِنْ مُتَدْرٍ ۖ كَذَبَتْ تَمُودُ بِالنَّذْرِ ۖ
 فَقَالُوا ابْتِرَأْ مِنَّا وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۖ

(৪) তাদের কাছে এমন সংবাদ এসে গেছে, যাতে সাবধানবাণী রয়েছে।
 (৫) এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে সতর্ককারীগণ তাদের কোন উপকারে আসে না। (৬) অতএব, আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে, (৭) তারা তখন অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পংগপাল সদৃশ। (৮) তারা আহ্বানকারীর দিকে দৌড়াতে থাকবে। কাকেররা বলবে : এটা কঠিন দিন।
 (৯) তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল। তারা মিথ্যারোপ করেছিল আমার বান্দা নূহের প্রতি এবং বলেছিল : এ তো উন্মাদ। তারা তাঁকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল। (১০) অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল : আমি অক্ষম, অতএব, তুমি প্রতিবিধান কর। (১১) তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার এবং বারিবর্ষণের মাধ্যমে। (১২) এবং তুমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রাব। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে। (১৩) আমি নূহকে আরোহণ করলাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে। (১৪) যা চলত আমার দৃষ্টির সামনে। এটা তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যক্ষা করা হয়েছিল। (১৫) আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি ?
 (১৬) কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (১৭) আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্যে। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি ? (১৮) আদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (১৯) আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম বজ্রবায়ু এক চিরচরিত অন্তত দিনে। (২০) তা মানুষকে উৎখাত করছিল, যেন তারা উৎপাটিত স্বর্ষের বৃক্ষের কাণ্ড। (২১) অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (২২) আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি ? (২৩) সামুদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (২৪) তারা বলেছিল : আমরা কি আমাদেরই একজনের অনুসরণ করব ? তবে তো আমরা বিপথগামী ও বিকারগ্রস্তরূপে গণ্য হব।

مُطْعِنِينَ إِلَى الدَّاعِ এর শাস্তিক অর্থ মাথা তোলা, আয়াতের অর্থ এই যে, আহ্বানকারীর প্রতি তাকিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটেতে থাকবে। আগের আয়াতে দৃষ্টি অবনমিত থাকার কথা বলা হয়েছে। উভয় বক্তব্যে মিল এভাবে যে, হাশরে বিভিন্ন স্থান হবে। কোন কোন স্থানে মস্তক অবনমিতও থাকবে।

يَجْعُونَ وَازْدَجَرُوا — এর শাস্তিক অর্থ হুমকি প্রদর্শন করা হল।

উদ্দেশ্য এই যে, তারা নূহ (আঃ)-কে পাগলও বলল এবং তাঁকে হুমকি প্রদর্শন করে রেসালতের কর্তব্য পালন থেকে বিরতও রাখতে চাইল। অন্য এক আয়াতে আছে যে, তারা নূহ (আঃ)-কে হুমকি প্রদর্শন করে বলল : যদি আপনি প্রচার ও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত না হন, তবে আমরা আপনাকে প্রস্তর বর্ষণ করে মেরে ফেলব।

আবদ ইবনে হুমায়দ (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত করেন, নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কিছু লোক তাঁকে পথে-ঘাটে কোথাও পেলে গলা টিপে ধরত। ফলে তিনি বেইশ হয়ে যেতেন এরপর ইশ ফিরে এলে তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন : আল্লাহ্, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। তারা অজ্ঞ। সাড়ে নয়শ' বছর পর্যন্ত সম্প্রদায়ের এহেন নির্যাতনের জওয়াব দোয়ার মাধ্যম দিয়ে অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি বদদোয়া করেন, যার ফলে সমগ্র জাতি মহাপ্রাণে নিমজ্জিত হয়।

فَالْقَى الْمَاءُ عَلَى إِمْرٍ قَدِيدٍ — অর্থাৎ, ভূমি থেকে স্ফীত পানি এবং আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এভাবে পরস্পরে মিলিত হয়ে গেল যে, সমগ্র জাতিতে ডুবিয়ে মারার যে পরিকল্পনা আল্লাহ্ তাআলা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়ে গেল। ফলে পাহাড়ের চূড়ায়ও কেউ আশ্রয় পেল না।

ذَاتِ الْأَوْبَارِ — শব্দটি لوح এর বহুবচন। অর্থ কাঠের তক্তা শব্দটি دسار এর বহুবচন। অর্থ পেরেক, কীলক, যার সাহায্যে তক্তাকে সংযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য নৌকা।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ۖ فَهَلْ مِنْ مُتَدْرٍ — এর অর্থ দ্বিবিধ (এক) মুখস্থ করা এবং (দুই) উপদেশ ও শিক্ষা অর্জন করা। এখানে উভয় অর্থ বোঝানো যেতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা কোরআনকে মুখস্থ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অন্য কোন ঐশীগ্রন্থ গ্রন্থ ছিল না। তওরাত, ইঞ্জিল ও যবুর মানুষের মুখস্থ ছিল না। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে সহজকরণের ফলশ্রুতিতেই কচি কচি বালক বালিকারাও সমগ্র কোরআন মুখস্থ করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাতে একটি ঘের-ঘবরের পার্থক্যও হয় না। চৌদ্দশ' বছর ধরে প্রতি স্তরে প্রতি ভূখণ্ডে হাজারো লাখে হাফেযের বুক আল্লাহর কিতাব কোরআন সংরক্ষিত আছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এছাড়া কোরআন পাক তার উপদেশ ও শিক্ষার বিষয়বস্তুকে খুবই সহজ করে বর্ণনা করেছে। ফলে বড় বড় আলেম, বিশেষজ্ঞ ও দার্শনিক যেমন এর দ্বারা উপকৃত হয়, তেমনি গণমুখ্য ব্যক্তিরাও এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

ইজতিহাদ তথা বিধানাবলী চয়ন করার জন্যে কোরআনকে সহজ করা হয়নি : আলোচ্য আয়াতে يَسَّرْنَا এর সাথে لِلذِّكْرِ সংযুক্ত করে আরও বলা হয়েছে যে, মুখস্থ করা ও উপদেশ গ্রহণ করার সীমা

۞ اَلَّذِي كُنَّا عَلَيْنَا مِنْ بَيْنَا لَيْلٍ مَوْلَاكِ ابْنِ اِسْمَاعِيلَ ۝
 ۞ عَدَا اَمِنْ الْكَذَّابِ الْاَشْمُ ۝ اَنَا مَرْسِلُ الْاَتَا ۝ فَتَنَّا لَهُمْ
 ۞ فَارْتَبِعْهُمْ وَاصْطِرْ ۝ وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ
 ۞ كُلٌّ يَشْرِبُ مَحْتَصِرٌ ۝ فَتَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ۝
 ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي ۝ اِنَّا ارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً
 ۞ وَاحِدَةً فَمَا كَانُوا يَسْمَعُونَهَا ۝ وَلَقَدْ يَتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلْاُنْزِلِ
 ۞ قَوْلَ مَنْ شَكَرَ ۝ هَكَذَا بَقِيَتْ قَوْمٌ لَوْ بِالنُّذُرِ ۝ اِنَّا ارْسَلْنَا
 ۞ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا ۝ اَلَا لَوْ اِطَاعُوا نَجِيَّتَهُمْ بِحَقِّ قِسْمَةٍ ۝ مِنْ عِنْدِنَا
 ۞ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ۝ وَلَقَدْ اَنْذَرْنَاهُمْ كَذِبَتَا فِتْنَارَا
 ۝ اِلَّا اَلَّذِي ۝ وَلَقَدْ نَادَوُا عَنْ صَفِيْفَةٍ ۝ فَطَسَّاسًا اَعْيَاهُمْ ۝ وَنَدَوُا
 ۝ عَنَّا ۝ وَنَذِرُو ۝ وَلَقَدْ مَنَعْنَاهُمْ مَلَكَةً ۝ عَدَا ۝ اَبْنِ ۝ فَتَدَوُا
 ۝ عَنَّا ۝ وَنَذِرُو ۝ وَلَقَدْ يَتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلْاُنْزِلِ ۝ قَوْلَ مَنْ
 ۝ مُنْكَرٌ ۝ وَلَقَدْ جَاءَ اَلْاَنْزِلُ ۝ اَلَّذِي ۝ هَكَذَا ۝ اَبْنِ ۝ اَلَّذِي ۝
 ۝ فَاَخَذْنَاهُمْ اَحْذَرٌ ۝ وَنَبِّئْهُمْ ۝ اَلَّذِي ۝ اَلَّذِي ۝ اَلَّذِي ۝
 ۝ اَمْرُكُمْ ۝ بَرَاءَةٌ ۝ فِي ۝ الرُّبُوحِ ۝ اَمْرُكُمْ ۝ اَمْرُكُمْ ۝ اَمْرُكُمْ ۝

(২৫) আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি উপদেশ নাহিল করা হয়েছে? বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাষ্টিক। (২৬) এখন আগামীকন্যাই তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী, দাষ্টিক। (২৭) আমি তাদের পরীক্ষার জন্য এক উল্লী প্রেরণ করব, অতএব, তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবার কর (২৮) এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানির পাত্রা নির্ধারিত হয়েছে এবং পাত্রাফ্রেম উপস্থিত হতে হবে। (২৯) অতঃপর তারা তাদের সমীকে ডাকল। সে তাকে ধরল এবং বধ করল। (৩০) অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (৩১) আমি তাদের প্রতি একচিহ্নের নিনাদ প্রেরণ করেছিলাম। এতেই তারা হয়ে গেল শুষ্ক শাখাপল্লব নির্ধিত দলিত খোয়াড়ের ন্যায়। (৩২) আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৩৩) লূত-সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (৩৪) আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম প্রত্যেক বর্ষকারী প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়; কিন্তু লূত-পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে হাতের শেষপ্রহরে উদ্ধার করেছিলাম। (৩৫) আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ। যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, আমি তাদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। (৩৬) লূত তাদেরকে আমার প্রচণ্ড পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। অতঃপর তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বাকবিত্ততা করেছিল। (৩৭) তারা লূতের (আঃ) কাছে গিয়ে যেহয়ানদেরকে দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের চক্ষু লোপ করে দিলাম। অতএব, আশ্বাসন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (৩৮) তাদেরকে প্রত্যহে নির্ধারিত শাস্তি আঘাত হেনেছিল। (৩৯) অতএব, আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী আশ্বাসন কর। (৪০) আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৪১) ফেরাউন সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারীগণ আগমন করেছিল। (৪২) তারা আমার সকল নিদর্শনের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর আমি পরাভূতকারী, পরাক্রমশালীর ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (৪৩) তোমাদের মধ্যকার কাফেররা কি তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ? না তোমাদের মুক্তির সমন্বয় রয়েছে কিভাবেসমূহ? (৪৪) না তারা বলে যে, আমরা এক অপরাধের দল?

পর্যন্ত কোরআনকে সহজ করা হয়েছে। ফলে প্রত্যেক আলেম ও জাহেল, ছোট ও বড় সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এতে জরুরী হয় না যে, কোরআন পাক থেকে বিধানাবলী চয়ন করাও তেমন সহজ হবে। বলাবাহুল্য, এটা একটা স্বতন্ত্র ও কঠিন শাস্ত্র। যেসব প্রগাঢ় জ্ঞানী আলেম এই শাস্ত্রের গবেষণায় জীবনপাত করেন, কেবল তারা এই শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন। এটা প্রত্যেকের বিচরণক্ষেত্র নয়।

কোন কোন মুসলমান উপরোক্ত আয়াতকে সম্প্রদায় করে কোরআনের মূলনীতি ও ধারাসমূহ পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করেই মুজতাহিদ হতে চায় এবং বিধানাবলী চয়ন করতে চায়। উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে। বলাবাহুল্য, এটা পরীক্ষার পথভ্রষ্টতা।

কতক শব্দার্থের ব্যাখ্যা : وَسُعِرُ : শব্দটি দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে সামুদ গোত্রের আলোচনায় তাদেরই উক্তি। এখানে এর অর্থ পাগলামি। দ্বিতীয় وَسُعِرُ বাক্যাংশে। এখানে وَسُعِرُ এ অর্থ জাহান্নামের অগ্নি। অভিধানে এই শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ نَادَوُا عَنْ صَفِيْفَةٍ — ولَقَدْ نَادَوُا শব্দের অর্থ কাম প্রবৃতি চরিতার্থ করার জন্যে কাউকে ফুসলানো। কওমে লূত বালকদের সাথে অপকর্মে অভিযুক্ত ছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের পরীক্ষার জন্যেই কয়েকজন ফেরেশতাকে সুপ্রী বালকের বেশে প্রেরণ করেন। দুর্বৃত্তরা তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্যে লূত (আঃ)—এর গৃহে উপস্থিত হয়। লূত (আঃ) দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে অথবা প্রাচীর টপকিয়ে ভিতরে আসতে থাকে। লূত (আঃ) বিব্রতবোধ করলে ফেরেশতাগণ তাদের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন : আপনি চিন্তিত হবেন না। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমরা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যেই আগমন করেছি।

সূরা ক্বামার কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, যাতে দুনিয়ার লোভ-লালসায় পতিত এবং পরকাল বিমুখ কাকেরদের চৈতন্য ফিরে আসে। প্রথমে কেয়ামতের আযাব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তাদের পার্শ্বি মন্দ পরিণাম ব্যক্ত করার জন্যে পাঁচটি বিশৃঙ্খলিত সম্প্রদায়ের অবস্থা, পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে তাদের অন্তঃ পরিণতি ও ইহকালেও নানা আযাবে পতিত হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

সর্বপ্রথম নূহ (আঃ)—এর সম্প্রদায়ের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, তারাই বিশৃঙ্খল সর্বপ্রথম জাতি, যাদেরকে আল্লাহর আযাব ধ্বংস করে দেয়। এই কাহিনী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে 'আদ, সামুদ, কওমে-লূত ও কওমে ফেরাউন এই চার সম্প্রদায়ের আলোচনা রয়েছে। তাদের ঘটনাবলী কোরআন পাকের কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পাঁচটি জাতি ছিল বিশৃঙ্খল শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত জনগোষ্ঠী। কোন শক্তির কাছে তারা মাথা নত করত না। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের উপর আল্লাহর আযাব আগমনের চিত্র অংকন করা হয়েছে। প্রত্যেক জাতির বর্ণনা শেষে কোরআন পাক এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করেছে :

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِي

سَيَهْوِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّفُونَ الذِّبْرَ ۖ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةُ
 أَذْيَمُ ۚ وَأَمَّا إِنَّ الْفُجُورِينَ فِي صُلَىٰ وَسَعَىٰ ۖ يَوْمَ يُصْعِقُونَ
 فِي النَّارِ كُلِّ وَجْهٍ لَّهُمُ دُؤْلٌ وَمِنْ نَحْوِ ۚ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ
 بِقَدَرٍ ۚ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ۚ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا
 أَشْيَاءَكُمْ فَهُمْ مِنْ مُنْكَرٍ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ قَعْلُوهُ فِي الزُّبُرِ ۚ وَ
 كُلُّ صَبِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ۚ إِنَّ الْإِثْمِينَ فِي جَذْبٍ وَنَهْرٍ ۚ
 فِي مَقْعَدِ صَدِيقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ۚ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 الرَّحْمَنُ ۚ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۚ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۚ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۚ
 الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يُحْسِبَانِ ۚ دُؤْلُ الْجَمْعِ وَالْفُجُورِ يُجْعِلَانِ ۚ وَالسَّمَاءُ
 رَفَعَهَا ۚ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۚ ۝ لَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ وَأَقِيمُوا
 الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۚ وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا
 لِلْأَنَامِ ۚ فِيهَا فَالِكِهْ ۚ وَالْخُلُوفُ ذَاتُ الْكُفْلِ ۚ وَالْحَبْ
 ذُ وَالْعَصْفُ وَالرَّيْحَانُ ۚ فَبِأَنَّىٰ يُكَذِّبُوكَ ۚ

(৪৫) এ দল তো সত্ত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপদর্শন করবে। (৪৬) বরং কেয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কেয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর। (৪৭) নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত। (৪৮) যেদিন তাদেরকে মুখ ফিটেছে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবে : অগ্নির খাদ্য আবাদন কর। (৪৯) আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। (৫০) আমার কাজ তো এক মুহুর্তে চোখের পলকের মত। (৫১) আমি তোমাদের সমন্বয় লোকদেরকে ধ্বংস করেছি, অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৫২) তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে। (৫৩) ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ। (৫৪) খোদাতীকুরা থাকবে জ্ঞানতে ও নিবারণিতে। (৫৫) যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।

সূরা আর রহমান

মদীনা অবতীর্ণ : আয়াত ৭৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) করুণাময় আল্লাহ (২) শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন, (৩) সৃষ্টি করেছেন মানুষ (৪) তাকে শিখিয়েছেন বর্ণনা। (৫) সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমত চলে (৬) এবং তৃপ্ততা ও বৃষ্টি সেজদারত আছে। (৭) তিনি আকাশকে করেছেন সমুদ্রত এবং স্থাপন করেছেন তুলাদণ্ড, (৮) যাতে তোমরা সীমালব্ধন না কর তুলাদণ্ডে। (৯) তোমরা ন্যায্য ওজন কায়ম কর এবং ওজনে কম দিয়ে না। (১০) তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টজীবের জন্যে। (১১) এতে আছে ফলমূল এবং বহিরাবরণবিশিষ্ট খজুর বৃক্ষ। (১২) আর আছে খোসাবিশিষ্ট শস্য ও সুগন্ধি ফুল। (১৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

উপর যখন আল্লাহর আযাব নেমে এল, তখন দেখ, তারা কিভাবে মশা-মাছির ন্যায় নিপাত হয়ে গেল। এতদসঙ্গে মুমিন ও কাফেরদের উপদেশের জন্যে এই বাক্যটিও বার বার উল্লেখ করা হয়েছে :

وَلَقَدْ يَكْرُمُ الْقُرْآنَ لِلَّذِي كَرِهَ مِنْ مُنْكَرٍ — অর্থাৎ, আল্লাহর এই

মহা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হচ্ছে কোরআন। উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের সীমা পর্যন্ত আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি। কাজেই সেই ব্যক্তি চরম হতভাগা ও বঞ্চিত, যে কোরআন দ্বারা উপকৃত হয় না। পরে উল্লেখিত আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সঃ) —এর আমলে বিন্যাস লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যুগের কাফেররা ধন-সম্পদ, জনসংখ্যা এবং শক্তি সাহসে 'আদ, সামুদ ও ফেরাউন সম্প্রদায়ের চাইতে বেশী নয়। এমনভাবে তারা কিরূপে নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে।

কয়েকটি শব্দার্থের ব্যাখ্যা : زبر শব্দটি زور এর বহুবচন। অভিধানে প্রত্যেক লিখিত কিতাবকে زور বলা হয়। হযরত দাউদ (আঃ) —এর প্রতি অবতীর্ণ আসমানী কিতাবের নামও যবুর। كُفِيَ এর অর্থ অত্যধিক ভয়াবহ এবং كُفِيَ শব্দের অর্থ তিক্ততর। এটা مر থেকে উদ্ভূত। কঠোর ও কষ্টকর বিষয়কেও امر و امر বলা হয়। وَسَعَى শব্দের অর্থ এখানে জাহান্নামের অগ্নি। اشياء শব্দটি شعبة এর বহুবচন। এর অর্থ অনুসারী ; অর্থাৎ যারা তাদের অনুসারী ও সমমনা مُعْتَقٍ এ অর্থ মজলিস, বসার জায়গা এবং صَدِيق এ অর্থ সত্য। উদ্দেশ্য এই যে, এই মসলিসে মহতী হবে। এতে কোন অসার ও বাজে কথাবার্তা হবে না।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَذَرِ — إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিমাপ করা, কোন বস্তু উপযোগিতা অনুসারে পরিমিতরূপে তৈরী করা। আয়াতে এ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা বিশু জাহানের সকল শ্রেণীর বস্তু বিজ্ঞসুলভ পরিমাপ সহকারে ছোট বড় ও বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে তৈরী করেছেন। অসুস্থিসমূহ একইরূপ তৈরী করেননি —দৈর্ঘ্য পার্থক্য রেখেছেন। হাত পায়ে দৈর্ঘ্য প্রস্থ রেখেছেন, খোলা বন্ধ হওয়া এবং সংকেচন ও সম্প্রসারণের জন্য শিথিল সংযোজিত করেছেন। এক এক অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহর কুদরত ও হিকমতের বিস্ময়কর দূর উন্মোচিত হতে দেখা যাবে।

শরীয়তের পরিভাষায় 'কদর' শব্দটি খোদায়ী তকদীর তথা বিধিলিপির অর্থও ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ কোন কোন হাদীসের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই নিয়েছেন।

মুসনাদে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবু হোরাযরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, কোরাইশ কাফেররা একবার রসূলুল্লাহ (সঃ) —এর সাথে তকদীর সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু তকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ, আদিকালে সৃজিত বস্তু, তার পরিমাণ, সময়কাল, হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপ বিশু অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই লিখে দেয়া হয়েছিল। এখন বিশ্বের যা কিছু সৃষ্টি লাভ করে, তা এই আদিকালীন তকদীর অনুযায়ীই সৃষ্টি লাভ করে।

তকদীর ইসলামের একটি অকাট্য ধর্মবিশ্বাস। যে একে সরাসরি অস্বীকার করে, সে কাফের। আর যারা দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার

করে, তারা ফাসেক। আহমদ, আবু-দাউদ ও তিবরানী বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের (রাঃ) বর্ণনাঃ রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ প্রত্যেক উম্মতে কিছুলোক মজুসী (অগ্নিপূজারী কাফের) থাকে। আমার উম্মতের মজুসী তারা, যারা তকদীর মানে না। এরা অসুস্থ হলে এদের খবর নিও না এবং মরে গেলে কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করো না। (রুহুল-মা'আনী)

সূরা আরারাহমান

সূরার ষোড়শত্র এবং ১৫০ আয়াত। বাক্যটি বার বার উল্লেখ করার তাৎপর্যঃ পূর্ববর্তী সূরা ক্বামারের অধিকাংশ বিষয়বস্তু অব্যাহত জাতিসমূহের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছিল। তাই প্রত্যেক শাস্তির পর মানুষকে হুশিয়ার করার জন্য ১৫০ আয়াত বাক্যটি বার বার ব্যবহার করা হয়েছে। এর সাথে ঈমান ও আনুগত্যে উৎসাহিত করার জন্য দ্বিতীয় বাক্য ১৫০ আয়াত বাক্যটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

এর বিপরীতে সূরা রহমানের বেশীর ভাগ বিষয়বস্তু আল্লাহ তাআলার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অনুগ্রহ দানসমূহের বর্ণনা সম্পর্কিত। তাই যখন কোন বিশেষ অবদান উল্লেখ করা হয়েছে, তখনই মানুষকে সতর্ক ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারে উৎসাহিত করার জন্যে ১৫০ আয়াত বাক্যটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। সমগ্র সূরায় এ বাক্য একত্রিশ বার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রত্যেক বার বাক্যটি নতুন নতুন বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে এটা অলংকার শাস্ত্রের পরিপন্থী নয়। আল্লাম্বা সুযুতী এ ধরনের পুনরাবৃত্তির নাম রেখেছেন তরদীদ। এটা বিশুদ্ধভাষী আরবদের গদ্য ও পদ্য রচনায় বহুল ব্যবহৃত ও প্রশংসিত। শুধু আরবী ভাষাই নয়, ফারসী, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় সর্বজন স্বীকৃত কবিদের কাব্যের এর নথীর পাওয়া যায়। এসব নথীর উদ্ধৃত করার স্থান এটা নয়। তফসীর রুহুল-মা'আনীতে এখানে কয়েকটি নথীর উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা আর রহমান মক্কায় অবতীর্ণ, না মদীনায় অবতীর্ণ এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কুরতুবী কতিপয় হাদীসের ভিত্তিতে মক্কায় অবতীর্ণ হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিরমিযীতে হযরত জাবের বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) কয়েকজন লোকের সামনে সমগ্র সূরা আর রহমান তেলাওয়াত করেন। তাঁরা শুনে নিশ্চুপ থাকলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আমি 'লায়লাতুল জিনে' (জিন-রজনীতে) জিনদের সামনে এই সূরা তেলাওয়াত করেছিলাম। প্রভাবান্বিত হওয়ার দিক দিয়ে তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম ছিল। কারণ, আমি যখনই সূরার ১৫০ আয়াতটি তেলাওয়াত করতাম তখনই তারা সমস্তর বলে উঠতঃ رَنَا لَا نَكْذِبُ ১৫০ আয়াত, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আপনার কোন অবদানকেই অস্বীকার করব না। আপনার জন্যেই সমস্ত প্রশংসা। এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। কেননা, 'জিন-রজনীর' ঘটনা মক্কায় সংঘটিত হয়েছিল। এই রজনীতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) জিনদের কাছে ইসলাম প্রচার করেছিলেন এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দান করেছিলেন।

কুরতুবী এ ধরনের আরও কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। সব হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ।

সূরাটিকে 'রহমান' শব্দ দ্বারা শুরু করার তাৎপর্য এই যে, মক্কায় কাফেররা আল্লাহ তাআলার এই নাম সম্পর্কে অবগত ছিল না। তাই

মুসলমানদের মুখে রহমান নাম শুনে ওরা বলাবলি করতঃ وَمَا الرَّحْمَنُ ১৫০ রহমান আবার কি? তাদেরকে অবহিত করার জন্য এখানে এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, পরের আয়াতে কোরআন শিক্ষা দেয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই রহমান শব্দটি ব্যবহার করে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই কোরআন শিক্ষা দেয়ার কার্যকরী কারণ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তাআলার রহমত ও করুণা। নতুবা তাঁর দায়িত্বে কোন কাজ ওয়াজিব বা জরুরী নয় এবং তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।

এরপর সমগ্র সূরায় আল্লাহ তাআলার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক অবদানসমূহের অব্যাহত বর্ণনা হয়েছে। وَمَا الرَّحْمَنُ বলে সর্ববৃহৎ অবদান দ্বারা শুরু করা হয়েছে। কোরআন সর্ববৃহৎ অবদান। কেননা, এতে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় প্রকার কল্যাণ রয়েছে। সাহায্যে কেয়াম কোরআনকে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরকালীন উচ্চ মর্যাদা ও নেয়ামত দ্বারা গৌরবান্বিত করেছেন এবং দুনিয়াতেও এমন উচ্চ আসন দান করেছেন, যা রাজা-বাদশাহ্রাও হাসিল করতে পারে না।

ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী وَمَا الرَّحْمَنُ ক্রিয়াপদের দু'টি কর্ম থাকে— 'এক' যা শিক্ষা দেয়া হয় এবং 'দুই' যাকে শিক্ষা দেয়া হয়। আয়াতে প্রথম কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ কোরআন। কিন্তু দ্বিতীয় কর্ম অর্থাৎ, কাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তার উল্লেখ নেই। কোন কোন তফসীরবিদ বলেনঃ এখানে রসুলুল্লাহ (সাঃ) উদ্দেশ্য। কেননা, আল্লাহ তাআলা প্রত্যক্ষভাবে তাঁকেই শিক্ষা দিয়েছেন। অতঃপর তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র সৃষ্টজীব এতে দাখিল রয়েছে। এরূপও হতে পারে যে, কোআন নাখিল করার লক্ষ্য সমগ্র সৃষ্টজগতকে পথপ্রদর্শন করা ও তাদেরকে নৈতিক চরিত্র ও সংকর্ম শিক্ষা দেয়া। এই ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যেই আয়াতে বিশেষ কোন কর্ম উল্লেখ করা হয়নি।

وَمَا الرَّحْمَنُ ১৫০ মানবসৃষ্টি আল্লাহ তাআলার একটি বড় অবদান। স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে এটাই সর্বাপেক্ষা। কোরআন শিক্ষা দেয়ার অবদানটি মানব সৃষ্টির পরেই হতে পারে। কিন্তু কোরআন পাক এই অবদান অগ্রা এবং মানব সৃষ্টির কথা পরে উল্লেখ করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানব সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই হচ্ছে কোরআন শিক্ষা এবং কোরআন নির্দেশিত পথে চলা। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ

وَمَا الرَّحْمَنُ ১৫০ অর্থাৎ, আমি জিন ও মানবকে

শুধু আমার এবাদত করার জন্যে সৃষ্টি করেছি। বলাবাহুল্য, খোদায়ী শিক্ষা ব্যতীত এবাদত হতে পারে না। কোরআন এই শিক্ষার উপায়। অতএব, এই দিক দিয়ে কোরআন শিক্ষা মানব সৃষ্টির অগ্রা স্থান লাভ করেছেন।

মানবসৃষ্টির পর অসংখ্য অবদান মানবকে দান করা হয়েছে। তন্মধ্যে এখানে বিশেষভাবে বর্ণনা শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মনে হয় এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের ক্রমবিকাশ, অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের সাথে যেসব অবদান সম্পর্কযুক্ত, যেমন পানাহার, শীত ও গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষার উপকরণ, বসবাসের ব্যবস্থা ইত্যাদিতে বিশেষভাবে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর মধ্যে প্রথমে কোরআন শিক্ষা ও পরে বর্ণনা শিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, কোরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া বর্ণনাশক্তির উপরই নির্ভরশীল।

এখানে বর্ণনার অর্থ ব্যাপক। মৌখিক বর্ণনা, লেখা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে বর্ণনা এবং অপরকে বোঝানোর যত উপায় আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন ভূখণ্ড ও বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ও বাকপদ্ধতি সবই এই বর্ণনা শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ এবং এটা কার্যতঃ وَعَلَّمَكَ ادْمًا اَلْاَكْسَاةَ ۝

আয়াতের তফসীরও।

اَلْاَكْسَاةَ وَالْقُرْءَانَ ۝ আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে ভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে অসংখ্য অবদান সৃষ্টি করেছেন। এই আয়াতে নভোমণ্ডলীয় অবদানসমূহের মধ্য থেকে বিশেষভাবে সূর্য ও চন্দ্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, বিশৃঙ্খলার গোটা ব্যবস্থাপনা এই দু'টি গ্রহের গতি ও কিরণ-রশ্মির সাথে গভীরভাবে জড়িত রয়েছে। حساب শব্দটি কারও কারও মতে ধাতু। এর অর্থ হিসাব। কেউ কেউ বলেন যে, এটা حساب শব্দের বহুবচন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সূর্য ও চন্দ্রের গতি এবং কক্ষপথে বিচরণের অটল ব্যবস্থা একটি বিশেষ হিসাব ও পরিমাপ অনুযায়ী চালু রয়েছে। সূর্য ও চন্দ্রের গতির উপরই মানব জীবনের সমস্ত কাজ-কারবার নির্ভর করে। এর মাধ্যমেই দিবারাত্রির পার্থক্য, ঋতু পরিবর্তন এবং মাস ও বছর নির্ধারিত হয়। حساب শব্দটিকে حساب এর বহুবচন ধরা হলে অর্থ এই হবে যে, সূর্য ও চন্দ্র প্রত্যেকের পরিক্রমণের আলাদা আলাদা হিসাব আছে। বিভিন্ন ধরনের হিসাবে উপর সৌর ও চন্দ্র ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এসব হিসাবও এমন অটল ও অনড় যে, লাখে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এতে এক মিনিট বা এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয়নি।

وَالْاَكْسَاةَ وَالْقُرْءَانَ ۝ — কাণ্ডবিহীন লতানো গাছকে نجم এবং কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষকে شجر বলা হয়। অর্থাৎ, সর্বপ্রকার লতা-পাতা ও বৃক্ষ, আল্লাহ তাআলার সামনে সেজদা করে। সেজদা চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ও আনুগত্যের লক্ষণ। তাই এখানে উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বৃক্ষ, লতা-পাতা, ফল ও ফুলকে যে যে বিশেষ কাজ ও মানুষের উপকারের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তারা অনবরত সে কাজ করে যাচ্ছে এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে মানুষের উপকার সাধন করে যাচ্ছে। এই সৃষ্টিজগত ও বাধ্যতামূলক আনুগত্যকেই আয়াতে সেজদা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। — (রুহুল-মা'আনী, মায়হারী)।

وَالْاَكْسَاةَ وَالْقُرْءَانَ ۝ رفع ও وضع দু'টি বিপরীত শব্দ। رفع শব্দের অর্থ সম্মুত করা এবং وضع শব্দের নীচে রাখা। আয়াতে প্রথমে আকাশকে সম্মুত করার কথা বলা হয়েছে। স্থানগত উচ্চতা ও মর্যাদাগত উচ্চতা উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আকাশের মর্যাদা পৃথিবীর তুলনায় উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী আকাশের বিপরীত গণ্য হয়। সমগ্র কোরআনে এই বৈপরীত্য সহকারেই আকাশ ও পৃথিবীর উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে আকাশকে সম্মুত করার কথা বলার পর মীযান স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে, যা আকাশের বিপরীতে আসে না। চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এখানেও প্রকৃতপক্ষে আকাশের বিপরীতে পৃথিবীকে আনা হয়েছে। তিন আয়াতের পর বলা হয়েছে وَالْاَكْسَاةَ ۝ কাজেই আসলে আকাশ ও পৃথিবীর বৈপরীতাই ফুটানো হয়েছে। কিন্তু বিশেষ রহস্যের কারণে উভয়ের মাঝখানে তৃতীয় একটি বিষয় অর্থাৎ, মীযান স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। মনে হয় এতে রহস্য এই যে, মীযান স্থাপন এবং পরবর্তী তিন আয়াতে বর্ণিত মীযানকে যথাযথ ব্যবহার করার নির্দেশ, এতদুভয়ের সারমর্ম হচ্ছে ন্যায্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং আত্মসাৎ ও নিপীড়ন থেকে রক্ষা করা। এখানে আকাশকে

সম্মুতকরণ ও পৃথিবী স্থাপনের মাঝখানে মীযানের কথা উল্লেখ করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য ন্যায্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। পৃথিবী শান্তি ও ন্যায্য এবং ইনসাফের মাধ্যমেই কায়ম থাকতে পারে। নতুবা অন্যথই হবে।

হযরত কাতাদাহ মুজাহিদ, সুদী প্রমুখ 'মীযান' শব্দের তফসীর করেছেন ন্যায্য বিচার। কেননা, মীযান তথা দাঁড়িপাল্লার আসল লক্ষ্য ন্যায্য বিচারই। তবে মীযানের প্রচলিত অর্থ হচ্ছে দাঁড়িপাল্লা। কোন কোন তফসীরবিদ মীযানকে এই অর্থেই নিয়েছেন। এর সারমর্মও পারস্পরিক লেন-দেনে ন্যায্য ও ইনসাফ কায়ম করা। এখানে মীযানের অর্থে এমন যন্ত্র দাখিল আছে, যদ্বারা কোন বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়; তা দুই পাল্লাবিশিষ্ট হোক কিংবা কোন আধুনিক পরিমাপযন্ত্র হোক।

اَلْاَكْسَاةَ وَالْقُرْءَانَ ۝ এই আয়াতে দাঁড়িপাল্লা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করেছেন, যাতে তোমরা ওজনে কম-বেশী করে জুলুম ও অত্যাচারে লিপ্ত না হও।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ۝ অর্থাৎ, ইনসাফ সহকারে ন্যায্য ওজনে কায়ম কর। قسط এর শাব্দিক অর্থ ইনসাফ।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ۝ বাক্যে যে বিষয়টি ধনাত্মক ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়েছে, এই বাক্যে তাই ঋণাত্মক ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, ওজনে কম দেয়া হারাম।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ۝ ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক প্রাণীকে انام বলা হয়। — (কামুস)

বায়যাতী বলেন : যার আত্মা আছে, সেই انام আয়াতে انام বলে বাহ্যতঃ মানব ও জিনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, যাদের আত্মা আছে, তাদের মধ্যে এই দুই শ্রেণীই শরীয়তের বিধি-বিধানের আওতাভুক্ত। এই সূরায় فَيَأْتِي الْاَكْسَاةَ ۝ বলে তাদেরকে বার বার সন্মোদনও করা হয়েছে।

فَاَكْمَهُ ۝ এমন ফলমূলকে বলা হয়, যা আহারের পর স্বভাবতঃ মুখের স্বাদ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে খাওয়া।

وَالْاَكْسَاةَ وَالْقُرْءَانَ ۝ اَكْم শব্দটি كم এর বহুবচন। এর অর্থ সেই বহিরাবরণ, যা খজুর ইত্যাদি ফলগুলোর উপরে থাকে।

وَالْاَكْسَاةَ وَالْقُرْءَانَ ۝ حب এর অর্থ শস্য; যেমন গম, বুট, ধান, মাষ, মসুর ইত্যাদি। عصف সেই খোসাকে বলে, যার ভিতরে আল্লাহর কুদরতে মোড়কবিশিষ্ট অবস্থায় শস্যের দানা সৃষ্টি করা হয়। এই খোসার আবরণে মোড়কবিশিষ্ট হওয়ার কারণে শস্যের দানা দূষিত আবহাওয়া ও পোকামাকড় ইত্যাদি থেকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। শস্যের দানার সাথে 'খোসাবিশিষ্ট' কথাটি যোগ করে বুদ্ধিমান মানুষের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে যে, তোমরা যে রুটি, ডাল ইত্যাদি প্রত্যহ কয়েকবার আহার কর, এর এক একটি দানাকে সৃষ্টিকর্তা কিরূপ সুকৌশলে মুক্তিকা ও পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। এরপর কিভাবে একে কীট-পতঙ্গ থেকে নিরাপদ রাখার জন্যে আবরণ দ্বারা আবৃত করেছেন এত কিছু পরই সেই দানা তোমাদের মুখের গ্রাসে পরিণত হয়েছে। এর সাথে সম্ভবতঃ আরও একটি অবদানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই খোসা তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর খোরাক হয়, যাদের দুধ তোমরা পান কর এবং যাদেরকে বোঝা বহনের কাজে নিয়োজিত কর।

وَالرَّحْمٰنُ এর প্রসিদ্ধ অর্থ সুগন্ধি। ইবনে যায়েদ (রহঃ) আয়াতের এই

অর্থই বুঝিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা যুগ্মিকা থেকে উৎপন্ন বৃক্ষ থেকে নানা রকমের ও সুগন্ধি এবং সুগন্ধ্যযুক্ত ফল সৃষ্টি করেছেন। ریحان শব্দটি কোন কোন সময় নির্ধাস ও রিষিকের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বলা হয় ریحان الله خرجت لاطلب ریحان অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র রিষিক অনুবশে বের হলাম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আয়াতে ریحان এর ও তফসীরই করেছেন।

فِي آيِ الْاَوَّلِ كَذِبِي - শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ অবদান।

আয়াতে জিন ও মানবকে সম্বোধন করা হয়েছে। সূরা আর-রহমানের একাধিক আয়াতে জিনদের আলোচনা থেকে একথা বোঝা যায়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এখানে বলে সরাসরি خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

মস্তিকা থেকে সৃষ্ট আদম (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। مَصْلَال এর অর্থ পানি মিশ্রিত শুষ্ক মাটি। فُخَار এর অর্থ পোড়া মাটি। অর্থাৎ মানুষকে পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মস্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন।

مَالِجٌ | এর অর্থ জিন জাতি। جان - وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّالِجٍ مِّنْ نَّارٍ

এর অর্থ অগ্নিশিখা। জিন সৃষ্টির প্রধান উপাদান অগ্নিশিখা, যেমন মানব সৃষ্টির প্রধান উপাদান মৃত্তিকা।

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ শীত ও গ্রীষ্মকালে সূর্যের উদয়াচল ও

অস্ত্রাচল পারিবর্তীত হয়। গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে **مشرق** অর্থাৎ উদয়াচল এবং **مغرب** অর্থাৎ অস্ত্রাচল ভিন্ন ভিন্ন জায়গা হয়। আয়াতে সমুসরের এই দুই উদয়াচল ও দুই অস্ত্রাচলকে **مشرقین** ও **مغربین** বলে ব্যাক্ত করা হয়েছে।

مرج البحرین - مرج এর আভিধানিক অর্থ স্বাধীন ও মুক্ত ছেড়ে

দেয়া بحرین বলে মিঠা ও লোনা দুই দরিয়া বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে উভয় প্রকার দরিয়া সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন স্থানে উভয় দরিয়া একত্রে মিলিত হয়ে যায়, যার নথীর পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু যে স্থানে মিঠা ও লোনা উভয় প্রকার দরিয়া পাশাপাশি প্রবাহিত হয়, সেখানে বেশ দূর পর্যন্ত উভয়ের পানি আলাদা ও স্বতন্ত্র থাকে। একদিকে থাকে মিঠা পানি এবং অপরদিকে লোনা পানি। কোথাও কোথাও এই মিঠা ও লোনা পানি উপরে-নীচেও প্রবাহিত হয়। পানি তরল ও স্ফুল্ভ পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরে মিশ্রিত হয় না। আল্লাহ তাআলার এই অপার শক্তি প্রকাশ করার জন্যেই বলা হয়েছে :
مَرَجَ الْيَمِينَ

يَلْتَوِيْنَ بَيْنَهُمَا زُجْرٌ لَا يَخْفَىٰ
অর্থাৎ, উভয় দরিয়া পরস্পরে মিলিত

হয়; কিন্তু উভয়ের মাঝখানে আল্লাহর কুদরতের একটি অন্তরাল থাকে, যা দূর পর্যন্ত তাদেরক মিশ্রিত হতে দেয় না।

يُخْرِجُ مِنْهُمَا التُّلُوءَ وَالْمَرْجَانَ - লুলু - শব্দের অর্থ মোতি এবং

মরজান এর অর্থ প্রবাল। এটাও মূল্যবান মনিমুক্তা। এতে বৃক্ষের ন্যায় শাখা ময়। এই মোতি ও প্রবাল সমুদ্র থেকে বের হয় কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে জাতি ও মনিমুক্তা লোনা সমুদ্র থেকে বের হয়-মিঠা পানি থেকে নয়। আয়াতে উভয় প্রকার পানি থেকে বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর জগুয়াব এই যে, মোতি উভয় প্রকার সমুদ্রেই উপলব্ধ হয়। কিন্তু মিঠা পানির স্রোতধারা

(১৫) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে (১৫) এবং জ্বিনকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে (১৬) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (১৭) তিনি দুই উদ্‌যাচল ও দুই অস্ত্রাচলের মালিক। (১৮) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (১৯) তিনি পাশাপাশি দুই দরিয়া প্রবাহিত করেছেন। (২০) উভয়ের মাঝখানে রয়েছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। (২১) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (২২) উভয় দরিয়া থেকে উপলব্ধ হয় মাটি ও প্রবাল। (২৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৪) দরিয়ায় বিচরণশীল পর্বতদ্ভৃৎ জাহাজসমূহ তাঁরই (নিয়ন্ত্রণাধীন)। (২৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৬) ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। (২৭) একমাত্র আপনার মহিমায় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা ছাড়া। (২৮) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (২৯) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবাই তাঁর কাছে প্রার্থী। তিনি সর্বদাই কোননা কোন কাছে রত আছেন। (৩০) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩১) যে জিন ও মানব। আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্যে কর্মমুখ্ত হয়ে যাব। (৩২) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদান অস্বীকার করবে। (৩৩) যে জিন ও মানবকুল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে ক্লান্ত, তবে অতিক্রম করা ছিদ্দাপ্রবৃত্তি তোমারা তা অতিক্রম করতে পারবে না। (৩৪) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৩৫) ছাড়া হবে তোমাদের প্রতি অগ্নি-ফুল্জি ও ধূমকুণ্ড তখন তোমরা সেন্সব প্রতিহত করতে পারবে না। (৩৬) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে। (৩৭) যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে তখন সেটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত চামড়ার মত হয়ে যাবে। (৩৮) অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে?

প্রবাহমান হওয়ার কারণে তা থেকে মোতি বের করা সহজসাধ্য নয়। মিঠা পানির স্রোত প্রবাহিত হয়ে লোনা সমুদ্রে পতিত হয় এবং সেখানে থেকেই মোতি বের করা হয়। এ কারণেই লোনা সমুদ্রকে মোতির উৎস বলা হয়ে থাকে।

جارية جوارى . وَكَالْجَوَارِ الْتَسْكَاتِ فِي الْحُكُومِ الْاَزْكَارِ

এর বহুবচন। এর এক অর্থ নৌকা বা জাহাজ। এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। 'جارية' শব্দটি 'نشا' থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ভেসে উঠা, উঠু হওয়া অর্থে এখানে নৌকার পাল বুঝানো হয়েছে, যা পতাকার ন্যায় উঠু হয়। আয়াতে নৌকার নির্মাণ-কৌশল এবং সেটি পানির উপর বিচরণ করার রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে।

— كُلُّ مَنْ عَلَىهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ وَالْجَمَلِ وَالْاَزْكَارِ

এর অর্থ এই যে, ভূপৃষ্ঠে যত জিন ও মানব আছে, তারা সবাই ধ্বংসশীল। এই সূরায় জিন ও মানবকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাই আলাচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের প্রসঙ্গই উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, আকাশ ও আকাশস্থিত সৃষ্ট বস্তু ধ্বংসশীল নয়। কেননা অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয়টিও ব্যক্ত করেছেন। বলা হয়েছে :

كُلُّ مَنْ مَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে 'وَجْه' আল্লাহ তাআলা সত্তা এবং শব্দের 'رَبِّكَ' সম্বোধন সর্বনাশ দ্বারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। এটা সাইয়েদুল আশ্বিয়া মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি বিশেষ সন্মান। প্রশংসার স্থলে কোথাও তাঁকে 'عَبْدُهُ' এবং কোথাও 'رَبِّكَ' বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রসিদ্ধ তফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, জিন ও মানবসহ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। অক্ষয় হয়ে থাকবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সত্তা।

ধ্বংসশীল হওয়ার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, এসব বস্তু এখনও সত্তাগতভাবে ধ্বংসশীল। এগুলোর মধ্যে চিরস্থায়ী হওয়ার যোগ্যতাই নেই। আরেক অর্থ এরূপ হতে পারে যে, কিয়ামতের দিন এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।

কোন তফসীরবিদ 'وَجْهَ رَبِّكَ' এর তফসীর এরূপ করেছেন যে, সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে একমাত্র সেই বস্তুই স্থায়ী যা আল্লাহ তাআলার দিকে আছে। এতে शामिल আছে আল্লাহ তাআলার সত্তা এবং মানুষের সেই সব কর্ম ও অবস্থা, যা আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর সারমর্ম এই যে, মানব জিন ও ফেরেশতা যে কাজ আল্লাহর জন্যে করে, সেই কাজও চিরস্থায়ী, অক্ষয়। তা কোন সময় ধ্বংস হবে না।—(মায়হারী, কুরতুবী, রুহুল মা'আনী)

কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায় :

مَعِزُّكُمْ يُفَعِّلُ مَا عِنْدَ اللَّهِ وَيَاقِي — অর্থাৎ, তোমাদের কাছে যা কিছু অর্থ সম্পদ শক্তি-সামর্থ্য, সুখ-কষ্ট অথবা ভালবাসা ও শত্রুতা আছে, সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে, তা অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের যেসব কর্ম ও অবস্থা আছে, সেগুলো ধ্বংস হবে না।

وَالْجَمَلِ وَالْاَزْكَارِ — অর্থাৎ, সেই পালকর্তা মহিমামণ্ডিত এবং মহানুভবও। মহানুভব হওয়ার এক অর্থ যে, প্রকৃতপক্ষে সন্মান বলতে যা

কিছু আছে, এ সবেরই যোগ্য একমাত্র তিনিই। আরেক অর্থ এই যে, তিনি মহিমাময় হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মত নন যে, অন্যের বিশেষতঃ দরিদ্রের প্রতি ক্রক্ষেপও করবেন না ; বরং তিনি অকল্পনীয় সন্মান ও শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সৃষ্ট জীবেরও সন্মান বর্ধন করেন। তাদেরকে অস্তিত্ব দানের পর নানাবিধ অবদান দ্বারা ভূষিত করেন এবং তাদের প্রার্থনা ও দোয়া শুনেন। পরবর্তী আয়াত এই দ্বিতীয় অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

وَالْجَمَلِ وَالْاَزْكَارِ — বাক্যটি আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণাবলীর অন্যতম। এই শব্দগুলো উল্লেখ করে যে দোয়াই করা হয়, কবুল হয় তিরমিযী, নাসায়ী ও মসনদে-আহমদের রেওয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

তোমরা 'ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' বলে দোয়া করো। (কারণ, এটা কবুল হওয়ার পক্ষে সহায়ক।)—মায়হারী।

يَسْتَلِمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ مَنْ هُوَ مُوقِنٌ شَأْنِ — অর্থাৎ,

আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টবস্তু আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী এবং তাঁর কাছেই প্রয়োজনাদি যাক্ষা করে। পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের রিমিক, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা সুখ-শান্তি, পরকালে ক্ষমা, রহমত ও জ্ঞানাত প্রার্থনা করে এবং আকাশের অধিবাসীরা যদিও পানাহার করে না ; কিন্তু আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপার তারাও মুখাপেক্ষী। 'يَسْتَلِمْ' শব্দটি 'يَسْتَلِمْ' বাক্যর 'ظرف' অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের এই যাক্ষা ও প্রার্থনা প্রতিনিয়তই অব্যাহত থাকে। এর সারমর্ম এই যে, সমগ্র সৃষ্টবস্তু বিভিন্ন ভূখণ্ডে ও বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কাছে নিজেদের অভাব-অনটন সর্বক্ষণ পেশ করতে থাকে। বলাবাহুল্য, পৃথিবীস্থ ও আকাশস্থ সমগ্র সৃষ্টজীব ও তাদের প্রত্যেকের অসংখ্য অভাব-অনটন আছে। তাও আবার প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি পলে পেশ করা হচ্ছে। এগুলো এই মহিমাময় ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ ব্যতীত আর কে শুনতে পারে এবং পূর্ণ করতে পারে? তাই 'يَسْتَلِمْ' এর সাথে 'هُوَ شَأْنِ' ও বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সর্বদা ও সর্বক্ষণ আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ শান ও অবস্থা থাকে। কাউকে জীবনদান করেন, কারও মৃত্যু ঘটান, কাউকে সম্মানিত করেন। কাউকে লাক্ষিত করেন, কোন সুস্থকে অসুস্থ, কোন অসুস্থকে সুস্থ করেন। কোন বিপদগ্রস্তকে বিপদ থেকে মুক্তি দেন, কোন ব্যথিত ও ত্রুণদকারীর মুখে হাসি ফুটান, কোন প্রার্থনাকারীকে প্রার্থিত বস্তু দান করেন। কারও পাপ মার্জনা করে তাকে জ্ঞানাতের যোগ্য করে দেন। কোন জাতিকে সমুন্নত ও ক্ষমতায় আসীন করে দেন এবং কোন জাতিকে অধঃপতিত ও লাক্ষিত করেন দেন। মোটকথা, প্রতিমুহূর্তে, প্রতি পলে আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ শান থাকে।

سَمْعُكُمْ اِنَّ الشَّقْلَانِ — 'ثقل' শব্দটি 'ثقلان' এর দ্বি-বচন। যে বস্তুর ওজন ও মূল্যমান সুবিদিত, আরবী ভাষায় তাকে বলা হয়। এখানে মানব ও জিন জাতিদ্বয় বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

اِنَّ تَارَكَ نِيَكُمُ الثَّقَلَيْنِ — অর্থাৎ, আমি দু'টি ওজনবিশিষ্ট ও সম্মানার্থ বিষয় ছেড়ে যাচ্ছি। এগুলো তোমাদের জন্যে সৎপথের দিশারী হয়ে থাকবে। কোন কোন রেওয়াতে 'وَعَتَرْتَنِي' বলে এবং কোন কোন রেওয়াতে 'وَسَتَنِي' বলে উল্লেখিত বিষয় দু'টি বর্ণিত হচ্ছে। উভয়ের সারমর্ম এক। কেননা, 'وَعَتَرْتَنِي' বলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বংশগত ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার সন্তান-সন্ততি বুঝানো হয়েছে। কাজেই সাহাবায়ে কেলামও এর অন্তর্ভুক্ত। হাদীসের অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর দু'টি বিষয় মুসলমানদের হেদায়াত ও

সংশোধনের উপায় হবে—একটি আল্লাহর কিতাব কোরআন ও অপরটি সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের কর্মপতি। যে হাদীসে সুনত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার সারমর্ম হচ্ছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর শিক্ষা, যা সাহাবায়ে—কেরামের মাধ্যমে মুসলমানদের কাছে পৌঁছেছে।

মোটকথা; এই হাদীসে ثَلَاثِينَ বলে দু'টি ওজন বিশিষ্ট ও সম্মানার্থ বিষয় বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে জিন ও মানব জাতিকে এই অর্থের দিকে দিয়েই ثَلَاثِينَ বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে যত প্রাণী বসবাস করে, তাদের মধ্যে জিন ও মানব সর্বাধিক ওজন বিশিষ্ট ও সম্মানার্থ سَفَرُ শব্দটি فَرَاغ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কর্মমুক্ত হওয়া। অভিধানে فَرَاغ বিপরীত শব্দ হচ্ছে شُغْل অর্থাৎ, কর্মব্যস্ততা। فَرَاغ শব্দ থেকে দু'টি বিষয় বুঝা যায়—(এক) পূর্বে কোন কাজে ব্যস্ত থাকা এবং (দুই) এখন সেই কাজ সমাপ্ত করে কর্মমুক্ত হওয়া। উভয় বিষয় সৃষ্টজীবের মধ্যে প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। মানুষ কোন সময় এক কাজে ব্যস্ত থাকে এরপর তা থেকে মুক্ত হয়ে অবসর লাভ করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা উভয় বিষয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁর এক কাজ অন্য কাজের জন্যে বাধা হয় না এবং তিনি মানুষের ন্যায় কাজ থেকে অবসর লাভ করেন না।

তাই আয়াতে سَفَرُ শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী একথা বলা হয়েছে। কোন কাজের গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্যে বলা হয়; আমি এই কাজের জন্যে অবসর লাভ করছি; অর্থাৎ, এখন একাজেই পুরাপুর মনোনিবেশ করব। কোন কাজে পূর্ণ মনোযোগ ব্যয় করাকে বাক পদ্ধতিতে এভাবে প্রকাশ করা হয়; তার তো এছাড়া কোন কাজ নেই।

এর আগের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি সৃষ্টজীব আল্লাহর কাছে তাদের অভাব-অনটন পেশ করে এবং আল্লাহ তাআলা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করার ব্যাপারে সর্বদাই এক বিশেষ শানে থাকেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আবেদন ও আবেদন মঞ্জুর করা সম্পর্কিত সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন কাজ কেবল একটি থাকবে এবং শানও একটি হবে; অর্থাৎ, হিসাব-নিকাশ ও ইনছাফ সহকারে ফয়সালা প্রদান।—(রজল-মা'আনী)

يَعْتَمِرُ الْجَنَّةُ وَالْأَرْضُ إِنَّ اسْتَطَعُوا أَنْ تَعُدُّوا مِنْ أَقْفَالِ

الْكَوْبِ وَالْأَرْضُ فَانْقَدَتْ وَأَلَمْ تَعُدُّوا إِلَّا سُلْطَانِ

পূর্ববর্তী আয়াতে জিন ও মানবকে ثَلَاثِينَ শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে বলা হয়েছিল যে, কিয়ামতের দিন একটিই কাজ হবে; অর্থাৎ, সকল জিন

ও মানবের কাজকর্ম পরীক্ষা হবে এবং প্রতিটি কাজের প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে একথা বলা উদ্দেশ্য যে, প্রতিদান দিবসের উপস্থিতি এবং হিসাব-নিকাশ থেকে পলায়ন করতে পারবে না। মৃত্যুর কবল থেকে অবশ্য কিয়ামতের হিসাব থেকে গা বাঁচিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই। এই আয়াতে ثَلَاثِينَ এর পরিবর্তে জিন ও মানবের প্রকাশ্য নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং জিনকে অগ্নে রাখা হয়েছে। এতে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করতে হলে বিরাট শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন জাতিকে আল্লাহ তাআলা ও ধরনের কাজের শক্তি মানুষের চাইতে বেশী দিয়েছেন। তাই জিনকে অগ্নে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই; হে জিন ও মানবকুল, তোমরা যদি মনে কর যে, তোমরা কোথাও পালিয়ে গিয়ে মলাকুল-মণ্ডতের কবল থেকে গা বাঁচিয়ে যাবে অবশ্য হাশরের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে হিসাব-নিকাশের কামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, তবে এস, শক্তি পরীক্ষা করে দেখ। যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করার সামর্থ্য তোমাদের থাকে, তবে অতিক্রম করে দেখাও। এটা সহজ কাজ নয়। এর জন্যে অসাধারণ শক্তি ও সামর্থ্য দরকার। জিন ও মানব কারও এরূপ শক্তি নেই। এখানে আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করার সম্ভাব্যতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নেয়ার পর্যায়ে তাদের অক্ষমতা ব্যক্ত করা লক্ষ্য।

يُرْسِلُ عَلَيْكَ شَوَاطِينَ لَوُؤْلُوعًا وَحَامًا فَلَا تَنصُرِينَ —হযরত

ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন; ধূম্রবিহীন অগ্নিস্কুলিক হবে شَوَاطٍ এবং অগ্নিবিহীন ধূম্রকুলকে نَحَاس বলা হয় এই আয়াতেও জিন ও মানবকে সম্বোধন করে তাদের প্রতি অগ্নিস্কুলিক ও ধূম্রকুল ছাড়ার কথা বর্ণনা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, হিসাব-নিকাশের পর জাহান্নামের অপরার্থীদেরকে দুই প্রকার আযাব দেয়া হবে। কোথাও অগ্নিস্কুলিক হবে এবং কোথাও অগ্নিবিহীন ধূম্রকুল হবে। কোন কোন তফসীরবিদ ধূম্রবিহীন এই আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতের পরিশিষ্ট ধরে নিয়ে এরূপ অর্থ করেছেন যে, হে জিন ও মানব! আকাশের সীমানা অতিক্রম করার সাধ্য তোমাদের নেই। তোমরা যদি এরূপ করতেও চাও, তবে যেদিকেই পালাতে চাইবে, সেদিকেই অগ্নিস্কুলিক ও ধূম্রকুল তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে।—(ইবনে-কাসীর) ॥

وَلَا تَنصُرِينَ —এটা انصار থেকে উদ্ভূত। অর্থ কাউকে সাহায্য করে বিপদ থেকে উদ্ধার করা। অর্থাৎ, আল্লাহর আযাব থেকে আত্মরক্ষার জন্যে জিন ও মানবের মধ্যে থেকে কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না।

فَيَوْمَئِذٍ لَا تُعْلَمُ عَنْ دُيُّهَا أَشْيَاءٌ وَلَا عَنِ

মানব অথবা জিনকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। এর এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে কিয়ামতে এই প্রশ্ন করা হবে না যে, তোমরা অমুক গোনাহ করেছ কি না? এ কথা তো ফেরেশতাদের লিখিত আমলনামায় এবং আল্লাহ তাআলার আদি জ্ঞানে পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে। বরং প্রশ্ন এই হবে যে, তোমরা অমুক গোনাহ কেন করবে? হয়রত ইবনে আব্বাস এই তফসীর করেছেন মুজাহিদ বলেন : অপরাধীদের শাস্তিদানে আদিষ্ট ফেরেশতাগণ অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে না যে, তোমরা এই গোনাহ করেছ কিনা? এর প্রয়োজনই হবে না কেননা, প্রত্যেক গোনাহের একটি বিশেষ চিহ্ন অপরাধীদের চেহারায ফুটে উঠবে। ফেরেশতাগণ এই চিহ্ন দেখে তাদেরকে জাহান্নামে ঠেলে দেবে। পরবর্তী **يَعْرِتُ الشُّعْرُونَ** আয়াতে এই বিষয়বস্তু বিধৃত হয়েছে উপরোক্ত উভয় তফসীরের সারমর্ম এই যে, হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশের পর অপরাধীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার ফয়সালার পর এই ঘটনা ঘটবে। সুতরাং তখন তাদের গোনাহ সম্পর্কে কোন আলোচনা হবে না। তারা তালামত দূরা চিহ্নিত হয়েই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

হয়রত কাতাদাহ বলেন : এটা তখনকার অবস্থা যখন একবার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে যাবে এবং অপরাধীরা অস্বীকার করবে ও কসম খাবে। তখন তাদের মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে এবং হস্তপদের সাক্ষ্য নেয়া হবে। ইবনে কাসীর বর্ণিত এই তিনটি তফসীর কাছাকাছি। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

سِيمَا - يَعْرِتُ الشُّعْرُونَ بِسِيمِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالْوِاقِ وَالْأَقْدَامِ

শব্দের অর্থ আলামত চিহ্ন। হয়রত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : সেদিন অপরাধীদের আলামত হবে এই যে, তাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষু নীলাভ হবে। দুঃখ ও কষ্টের কারণে চেহারা বিমণ্ডল হবে। এই আলামতের সাহায্যে ফেরেশতারা তাদেরকে পাকড়াও করবে।

نَاصِيَةِ شَاكِلِ نَاصِيَةِ এর বহুবচন। অর্থ কপালের চুল। কেশাগ্র ও পা ধরার এক অর্থ এই যে, কারও কেশাগ্র ধরে এবং কারও পা ধরে টানা হবে অথবা এক সময় এভাবে এবং অন্য সময় অন্যভাবে টানা হবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, কেশাগ্র ও পা এক সাথে বেঁধে দেয়া হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা ছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতসমূহে সংকর্মপরায়ণ মুমিনদের উত্তম প্রতিদান ও অবদান বর্ণনা করা হচ্ছে। তন্মধ্যে জ্ঞানীদের প্রথমোক্ত দুই উদ্যান ও তার অবদানসমূহ এবং শেষোক্ত দুই উদ্যান ও তাতে সরবরাহকৃত অবদানসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

وَلَمْ يَخَفْ مَقَلَرَبِّهِ

আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, তারা এই দুই উদ্যানের অধিকারী হবে, যারা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হওয়ার ও হিসাব-নিকাশ দেয়ার ভয়ে ভীত থাকে। ফলে তারা কোন পাপকর্মের কাছেও যায় না। বলাবাহুল্য, এ ধরনের লোক বিশেষ নৈকট্যীগণই হতে পারে।

فَيَوْمَئِذٍ لَا تُعْلَمُ عَنْ دُيُّهَا أَشْيَاءٌ وَلَا عَنِ
تُكْذِبِينَ ۚ يَعْرِتُ الشُّعْرُونَ بِسِيمِهِمْ فَيُؤْخَذُ
الْأَقْدَامُ ۚ فَيَأْتَى الْأَرْضَ رِيكًا تَكْذِبِينَ ۚ هَذَا
بِهِمُ الْمُعْرِتُونَ ۚ يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ
رِيكُمَا تَكْذِبِينَ ۚ لَمْ يَخَفْ مَقَلَرَبِّهِ جَنَّتِينَ
رِيكًا تَكْذِبِينَ ۚ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ۚ فَيَأْتَى الْأَرْضَ
عَيْنِينَ تَجْرِي ۚ فَيَأْتَى الْأَرْضَ رِيكًا تَكْذِبِينَ ۚ
فَالْهَوَّةُ زَوْجَيْنِ ۚ فَيَأْتَى الْأَرْضَ رِيكًا تَكْذِبِينَ ۚ
بَطَانَتُهُمْ لَمْ يَسْتَرْحِقُوا جَنَّاتِنِ ۚ فَيَأْتَى الْأَرْضَ
تَكْذِبِينَ ۚ فَيُحَرِّثُونَ الْأَرْضَ لَمْ يَطْمِئْنُوا ۚ
جَانِّ ۚ فَيَأْتَى الْأَرْضَ رِيكًا تَكْذِبِينَ ۚ
فَيَأْتَى الْأَرْضَ رِيكًا تَكْذِبِينَ ۚ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا
الْإِحْسَانُ ۚ فَيَأْتَى الْأَرْضَ رِيكًا تَكْذِبِينَ ۚ
جَنَّتَيْنِ ۚ فَيَأْتَى الْأَرْضَ رِيكًا تَكْذِبِينَ ۚ هَذَا
فَيَأْتَى الْأَرْضَ رِيكًا تَكْذِبِينَ ۚ فَيُؤْخَذُ عَيْنِينَ

(৩৯) সেদিন মানুষ না তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, না জিন।
(৪০) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪১) অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকে; অতঃপর তাদের কপালের চুল ও পা ধরে টেনে নেয়া হবে। (৪২) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৩) এটাই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলত। (৪৪) তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে প্রদক্ষিণ করবে। (৪৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৬) যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান। (৪৭) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৪৮) উভয় উদ্যানই ঘন শাখা-পল্লববিশিষ্ট। (৪৯) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫০) উভয় উদ্যানে আছে বহমান দুই প্রবন। (৫১) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫২) উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল বিভিন্ন রকমের হবে। (৫৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৪) তারা তথায় রেশমের আন্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকটে ঝুলবে। (৫৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৬) তথায় থাকবে আনতনয়ন রমনীগণ, কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে ব্যবহার করেনি। (৫৭) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৫৮) প্রবাল ও পদ্মরাগ সঙ্গ রমনীগণ। (৫৯) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬০) সংকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? (৬১) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬২) এই দু'টি ছাড়া আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে। (৬৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৪) কালোমত ঘন সবুজ। (৬৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৬) তথায় আছে উদ্ভুলিত দুই প্রবন।

শেষোক্ত দুই উদ্যানের অধিকারী কারা হবে, এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতসমূহে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, এই দুই উদ্যান প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের হবে।

وَمِنْ ذُنُوبِهِمْ جَعَلْنٰ اٰرَافُ ۙ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ جَعَلْنٰ اٰرَافُ ۙ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ جَعَلْنٰ اٰرَافُ ۙ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ جَعَلْنٰ اٰرَافُ ۙ

অর্থাৎ, পূর্বোক্ত দুই উদ্যানের তুলনায় নিম্নস্তরের আরও দু'টি উদ্যান রয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এই উদ্যানদুয়ের অধিকারী হবে সাধারণ মুমিনগণ, যারা মর্যাদায় নৈকট্যশীলদের চেয়ে কম।

প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত উদ্যানদুয়ের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ আরও অনেক উক্তি করেছেন। কিন্তু হাদীসের আলোকে উপরোক্ত তফসীরই অগ্রগণ্য মনে হয়। কেননা, দূররে-মনসুরের বরাত দিয়ে বয়ানুল-কোরআনে এই হাদীস বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)

وَمِنْ ذُنُوبِهِمْ جَعَلْنٰ اٰرَافُ ۙ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ جَعَلْنٰ اٰরَافُ ۙ

আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন :

অর্থাৎ, স্বর্ণনির্মিত দুই উদ্যান নৈকট্যশীলদের জন্যে এবং রৌপ্য নির্মিত দুই উদ্যান সাধারণ সৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের জন্যে। এছাড়া 'দূররে-মনসুরে' হযরত বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত আছে — অর্থাৎ, প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের দুই প্রস্রবণ, যাদের সম্পর্কে تَجْرِيْنِ তথা বহমান বলা হয়েছে, শেষোক্ত দুই উদ্যানের প্রস্রবণ থেকে উত্তম, যাদের সম্পর্কে تَنْفُلُغْنِ তথা উত্তাল বলা হয়েছে। কেননা, প্রস্রবণ মাত্রই উত্তাল হয়ে থাকে। কিন্তু যে প্রস্রবণ সম্পর্কে বহমান বলা হয়েছে, তার মধ্যে উত্তাল হওয়া ছাড়াও দূর পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার গুণটি অতিরিক্ত।

এ হচ্ছে প্রস্রবণ চতুস্তয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, যেগুলো জন্মাতীগণ লাভ করবে। এখন আয়াতের ভাষা ও অর্থ দেখুন :

مَقَامُ رَبِّ ۚ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ جَعَلْنٰ اٰرَافُ ۙ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ جَعَلْنٰ اٰرَافُ ۙ وَكَانَ مِنْ ذُنُوبِهِمْ جَعَلْنٰ اٰرَافُ ۙ

অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে مقام رب বলে কৈয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সামনে হিসাবের জন্যে উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। এই উপস্থিতির ভয় রাখার অর্থ এই যে, জনসমক্ষে ও নির্জনে, প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় এই ধ্যান থাকা যে, আমাকে একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং ক্রিয়াকর্মের হিসাব দিতে হবে। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তির সদাসর্বদা এরূপ ধ্যান থাকবে, সে পাপকর্মের কাছে যাবে না।

কুরতুবী প্রমুখ কোন কোন তফসীরবিদ مقام এর এরূপ তফসীরও করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কথা, কাজ এবং গোপন ও

প্রকাশ্য কর্ম দেখাশুনা করেন। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ তাঁর দৃষ্টির সামনে। আল্লাহ তাআলার এই ধ্যানও মানুষকে পাপকর্ম থেকে বাঁচিয়ে দেবে।

وَمِنْ ذُنُوبِهِمْ جَعَلْنٰ اٰرَافُ ۙ —এটা প্রথমোক্ত দুই উদ্যানের বিশেষণ। অর্থাৎ, উদ্যানদুয় ঘন শাখাপল্লববিশিষ্ট হবে। এর অবশ্যস্বাভাবী ফল এই যে, এগুলোর ছায়াও ঘন ও সুনিবিড় হবে এবং ফলও বেশী হবে। পরবর্তীতে উল্লেখিত উদ্যানদুয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি। ফলে সেগুলোর মধ্যে এ বিষয়ের অভাব বোঝা যায়।

فِيْهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ ۙ —প্রথমোক্ত উদ্যানদুয়ের বিশেষণে مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এগুলোতে সর্বপ্রকার ফল থাকবে। এর বিপরীতে শেষোক্ত উদ্যানদুয়ের বর্ণনায় শুধু ثَمَرٌ বলা হয়েছে। — এর অর্থ এই যে, প্রত্যেক ফলের দুটি করে প্রকার হবে — শুষ্ক ও আর্দ্র। অথবা সাধারণ স্বাদযুক্ত ও অসাধারণ স্বাদযুক্ত। — (মাযাহারী)

لَا يَمَسُّهُنَّ اِنَّسٌ وَّلَا جَانٌّ ط — শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ হয়েযের রক্ত। যে নারীর হয়েষ হয়, তাকে طام্ট বলা হয়। কুমারী বালিকার সাথে সহবাসকেও طম্ট বলা হয়। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। (এক) যেসব রমণী মানুষের জন্যে নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ এবং যেসব রমণী জিনদের জন্যে নির্ধারিত তাদেরকে ইতিপূর্বে কোন জিন স্পর্শ করেনি। (দুই) দুনিয়াতে যেমন মাঝে মাঝে মানব নারীদের উপর জিন ভর করে বসে, জন্মতে এরূপ কোন সম্ভাবনা নেই।

مَنْ جَزَاؤُهُ الْاِنْسَانُ اِلَّا الْاِحْسَانُ — নৈকট্যশীলদের উদ্যানদুয়ের কিছু বিবরণ পেশ করার পর এরশাদ হয়েছে যে, সৎকর্মের প্রতিদান উত্তম পুরস্কারই হতে পারে, এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনা নেই। তারা সর্বদা সৎকর্ম পালন করেছে, কাজেই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেও তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেয়া উচিত ছিল যা দেয়া হয়েছে।

مِنْهَا ثَمَرٌ ۙ — ঘন সবুজের কারণে যে কাল রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তাকে ادھام বলা হয়। অর্থাৎ, এই উদ্যানদুয়ের ঘন সবুজতা এদের কালোমত হওয়ার কারণ হবে। প্রথমোক্ত উদ্যানদুয়ের ক্ষেত্রে এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়নি বটে, কিন্তু وَمِنْ ذُنُوبِهِمْ — বিশেষণ এই বিশেষণও শামিল আছে।

فَيَأْتِي الْآدِرَ بِكُمْ كَتَدْبِينَ ۚ فِيهَا ذَاكُمَا وَقَعْتُمْ وَرُؤُوسَ ۚ
 فَيَأْتِي الْآدِرَ بِكُمْ كَتَدْبِينَ ۚ فَيَقُولُ خَيْرٌ حَسَنٌ ۚ فَيَأْتِي الْآدِرَ
 بِكُمْ كَتَدْبِينَ ۚ فَيَقُولُ خَيْرٌ حَسَنٌ ۚ فَيَأْتِي الْآدِرَ بِكُمْ
 كَتَدْبِينَ ۚ فَيَقُولُ خَيْرٌ حَسَنٌ ۚ فَيَأْتِي الْآدِرَ بِكُمْ
 كَتَدْبِينَ ۚ فَيَقُولُ خَيْرٌ حَسَنٌ ۚ فَيَأْتِي الْآدِرَ بِكُمْ
 كَتَدْبِينَ ۚ فَيَقُولُ خَيْرٌ حَسَنٌ ۚ فَيَأْتِي الْآدِرَ بِكُمْ
 كَتَدْبِينَ ۚ فَيَقُولُ خَيْرٌ حَسَنٌ ৷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ لَيْسَ لِمَنْ يُلْقِعُهَا كِتَابٌ ۚ خَافِضَةٌ
 رَافِعَةٌ ۚ إِذَا رَجَبَتِ الْأَرْضُ رَجْبًا ۚ وَتَوَسَّيَتِ الْجِبَالُ يَبْسًا ۚ
 مَكَانَتْ هَبَاءً مُتَّبِعَةً ۚ وَتُكُونُ الْأَوْدَاغُ مَلَايِقًا ۚ فَاَصْبَحُ الْيَمِينُ
 مَا أَصْبَحُ الْيَمِينُ ۚ وَأَصْبَحُ الْمَشْأَمُ ۚ مَا أَصْبَحُ الْمَشْأَمُ ۚ
 وَالشُّعُورُ الشُّعُورُ ۚ وَلَيْكَ الْفُتُورُ ۚ فِي جَدَّتِ
 الْعُجُورُ ۚ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۚ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۚ
 عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ ۚ مُتَّحِكِينَ عَلَيْهَا مُتَقِطِعِينَ ۚ

(৬৭) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৬৮) তথ্য আছে ফল-মূল, খজুর ও আনার। (৬৯) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭০) সেখানে থাকবে সচরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ। (৭১) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭২) তাঁরুতে অবস্থানকারিণী হ্রগণ। (৭৩) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৪) কোন জিন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি। (৭৫) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৬) তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে। (৭৭) অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অবদানকে অস্বীকার করবে? (৭৮) কত পূণ্যময় আপনার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমাময় ও মহনুভব।

সূরা আল-ওয়াক্বিয়া

মদিনায় অবতীর্ণ : আয়াত ৯৬

(১) যখন ক্যোমতের ঘটনা ঘটবে, (২) যার বাস্তবতায় কোন সংশয় নেই। (৩) এটা নীচু করে দেবে, সমুন্নত করে দেবে। (৪) যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী (৫) এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে ছুরমার হয়ে যাবে (৬) অতঃপর তা হয়ে যাবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা (৭) এবং তোমরা তিনভাবে বিভক্ত হয়ে পড়বে। (৮) যারা ডান দিকে, কত ভাগ্যবান তারা। (৯) এবং যারা বামদিকে, কত হতভাগা তারা। (১০) অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। (১১) তারা ই নৈকট্যলীল, (১২) অবদানের উদ্যানসমূহে, (১৩) তারা একদল পূর্ববর্তীদের মধ্যে থেকে (১৪) এবং অল্পসংখ্যক পরবর্তীদের মধ্যে থেকে, (১৫) স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে। (১৬) তারা তাতে হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে।

مُتَّحِكِينَ عَلَى رُؤُوسِ خُفَرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حَسَنٍ

সবুজ রঙের রেশমী বস্ত্র। - (কামুস) এর দ্বারা বিছানা, বালিশ ও অন্যান্য বিলাস সামগ্রী তৈরী করা হয়। সিহাফ গ্রন্থে আছে, এর উপর বৃক্ষ ও ফুলের কারুকার্য করা হয়। عِبْقَرِيٍّ অর্থ সুশ্রী ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র।

تَبَارَكَ اسْمُكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ — সূরা আর-রাহমানে বেশীর

ভাগ আল্লাহ্ তাআলার অবদান ও মানুষের প্রতি অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে। উপসংহারে সার-সংক্ষেপ হিসেবে বলা হয়েছে : আল্লাহর পবিত্র সত্তা অনন্য। তাঁর নামও খুব পূণ্যময়। তাঁর নামের সাথেই এসব অবদান কায়ম ও প্রতিষ্ঠিত আছে।

সূরা ওয়াক্বিয়ার বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব : অন্তিম রোগশয্যায় আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) -এর শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন : ইবনে-কাসীর ইবনে আসাকিরের বরাত দিয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-মাসউদ যখন অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন আমিরুল মুমেনীন হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁকে দেখতে যান। তখন তাঁদের মধ্যে শিক্ষাপ্রদ কথোপকথন হয়, তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

হযরত ওসমান — مَا تَشْتَكِي — আপনার অসুখটা কি ?

হযরত ইবনে মাসউদ — ذُنُوبِي — আমার পাপসমূহই আমার অসুখ।

ওসমান গণী — مَا تَشْتَكِي — আপনার বাসনা কি ?

ইবনে মাসউদ — رَحْمَةُ رَبِّي — আমার পালনকর্তার রহমত কামনা করি।

ওসমান গণী — آمِي — আমি আপনার জন্যে কোন চিকিৎসক ডাকব কি ?

ইবনে মাসউদ — الطَّبِيبُ امْرُؤُنِي — চিকিৎসকই আমাকে রোগাক্রান্ত করেছেন।

ওসমান গণী — آمِي — আমি আপনার জন্যে সরকারী বায়তুল মাল থেকে কোন উপটোকন পাঠিয়ে দেব কি ?

ইবনে মাসউদ — لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا — এর কোন প্রয়োজন নেই।

ওসমান গণী — উপটোকন গ্রহণ করুন। তা আপনার পর আপনার কন্যাদের উপকারে আসবে।

ইবনে মাসউদ — আপনি চিন্তা করছেন যে, আমার কন্যারা দারিদ্র্য ও উপবাসে পতিত হবে। কিন্তু আমি এরূপ চিন্তা করি না। কারণ, আমি কন্যাদেরকে জোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছি যে, তারা যেন প্রতিরাতে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করে। আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْوَاقِعَةِ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تَصِبْهُ فَاقَةُ ابْدَا

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করবে, সে কখনও উপবাস

করবে না। ইবনে-কাসীর এই রেওয়াজে উদ্ধৃত করার পর অন্যান্য সনদ ও কিতাব থেকেও এর সমর্থন পেশ করেছেন।

إِذَا وَكَبِيتُ الرَّأْسَ — ইবনে কাসীর বলেন : ওয়াক্খিয়া কেয়ামতের অন্যতম নাম। কেননা, এর বাস্তবতায় কোনরূপ সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

لَيْسَ لَوْعَتِهَا كَأُورٍ — عاقبة শব্দটি কাউর — এর ন্যায় একটি শাটু। অর্থ এই যে, কেয়ামতের বাস্তবতা মিথ্যা হতে পারে না।

خَافِضَةُ رَأْسٍ — হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) — এর মতে এই বাক্যের তফসীর এই যে, কেয়ামতের ঘটনা অনেক উচ্চ মর্যাদাশীল জাতি ও ব্যক্তিকে নীচ করে দেবে এবং অনেক নীচ ও হেয় জাতি ও ব্যক্তিকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করে দেবে। উদ্দেশ্য এই যে, কেয়ামত ভয়াবহ হবে এবং এতে অভিনব বিপ্লব সংঘটিত হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বিপ্লব সাধিত হলে দেখা যায় যে, উপরের লোক নীচে এবং নীচের লোক উপরে উঠে যায় এবং নিম্ন শ্রমবান আর ধনবান নিঃশব্দ হয়ে যায়। — (রুহুল-মা'আনী)।

هَاشِرَةِ الْمَرْبُوعَةِ — হাশরের ময়দানে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে : **ثَلَاثَةٌ** ইবনে-কাসীর বলেন : কেয়ামতের দিন সব মানুষ তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এক দল আরশের ডানপার্শ্বে থাকবে। তারা আদম (আঃ) — এর ডানপার্শ্বে থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে। তারা সবাই জান্নাতী।

দ্বিতীয় দল আরশের বামদিকে একত্রিত হবে। তারা আদম (আঃ) — এর বামপার্শ্বে থেকে পয়দা হয়েছিল এবং তাদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দেয়া হবে। তারা সবাই জাহান্নামী।

তৃতীয় দল হবে অগ্রবর্তীদের দল। তারা আশাখিপতির সামনে বিশেষ স্বাভাব্য ও নৈকট্যের আসনে থাকবে। তারা হবেন নবী, রসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও গুলীগণ। তাঁদের সংখ্যা প্রথমোক্ত দলের তুলনায় কম হবে।

وَالْمُتَّقِينَ — ইমাম আহমদ (রহঃ) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন : তোমরা জান কি, কেয়ামতের দিন আল্লাহর ছায়ার দিকে কারা অগ্রবর্তী হবে? সাহাবায়ে কেরাম আরম্ভ করলেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন : তারাই অগ্রবর্তী হবে, যাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিলে কবুল করে, যারা প্রাপ্য চাইলে পরিশোধ করে এবং অন্যের ব্যাপারে তাই ফয়সালা করে যা নিজের ব্যাপারে করে।

মুজাহিদ বলেন : سابقين তথা অগ্রবর্তীগণ বলেন পয়গম্বরগণকে বোঝানো হয়েছে। ইবনে-সিরীন (রহঃ) — এর মতে যারা বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ উভয় কেবলার দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছে, তারা অগ্রবর্তীগণ। হযরত হাসান ও কাতাাদাহ (রাঃ) বলেন : প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী।

এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর ইবনে-কাসীর বলেন : এসব উক্ত স্ব স্ব স্থানে সঠিক ও বিশুদ্ধ। এগুলোর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ, দুনিয়াতে যারা সংকাজে অন্যের চাইতে অগ্র, পরকালেও তারা অগ্রবর্তীরূপে গণ্য হবে। কেননা, পরকালের প্রতিদান দুনিয়ার কর্মের ভিত্তিতে দেয়া হবে।

ثَلَاثَةٌ — শব্দের অর্থ দল।

যমখশরীর মতে বড় দল। — রুহুল-মা'আনী)।

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কারা : আলোচ্য আয়াতসমূহে দু'জায়গায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর বিভাগ উল্লেখিত হয়েছে — নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায়। নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় জায়গায় **ثَلَاثَةٌ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সাধারণ মুমিনদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে এবং একটি বড় দল পরবর্তীদের মধ্য থেকেও হবে।

এখন চিন্তা সাপেক্ষ বিষয় এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণ দু'রকম উক্তি করেছেন। (এক) হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে রসূলুল্লাহ (সঃ) — এর পূর্ব পর্যন্ত সব মানুষ পূর্ববর্তী এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত সব মানুষ পরবর্তী মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে জরীর (রহঃ) প্রমুখ এই তফসীর করেছেন। তফসীরের সার সংক্ষেপেও তাই নেয়া হয়েছে। হযরত জাবের এর বর্ণিত একটি হাদীস এই তফসীরের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে বলা হয়েছে যখন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সম্পর্কে প্রথম আয়াত **ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَكَانَ مِنَ الْآخِرِينَ** নাখিল হল, তখন হযরত ওমর (রাঃ) বিস্ময় সহকারে আরম্ভ করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ (সঃ) পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা বেশী এবং আমাদের মধ্যে কম হবে কি? অতঃপর এক বছর পর্যন্ত পরবর্তী আয়াত নাখিল হয়নি। এক বছর পরে যখন **ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَكَانَ مِنَ الْأَوَّلِينَ** নাখিল হল, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ

اسمع يا عمر ما قد انزل الله ثلثة من الاولين وثلثة من الاخرين الا وان من ادم الى ثلثة وامتى ثلثة .

শোন হে ওমর, আল্লাহ নাখিল করেছেন — পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকেও এক বড় দল হবে। মনে রেখ, আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আমি পর্যন্ত এক বড় দল এবং আমার উম্মত অপর বড় দল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীস থেকেও এই বিষয়বস্তুর সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন **ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَكَانَ مِنَ الْآخِرِينَ** আয়াতখানি যখন নাখিল হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম ব্যাখ্যাত হন যে আমরা পূর্ববর্তী উম্মতদের তুলনায় কমসংখ্যক হব। তখন **ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَكَانَ مِنَ الْأَوَّلِينَ** আয়াতখানি নাখিল হয়। তখন রসূল করীম (সঃ) বললেন : আমি আশা করি যে, তোমরা (অর্থাৎ, উম্মতে মুহাম্মদী) জান্নাতে সমগ্র উম্মতের মোকাবেলায় এক চতুর্থাংশ, এক তৃতীয়াংশ বরং অর্ধেক হবে। বাকী অর্ধেকের মধ্যেও তোমাদের কিছু অংশ থাকবে — (ইবনে-কাসীর)। এর ফলশ্রুতি এই যে, সমষ্টিগতভাবে জান্নাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী হবে সংখ্যাগরিষ্ট। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসদ্বয়কে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা নির্ভেজাল নয়। কেননা, প্রথম আয়াত **وَكَانَ مِنَ الْأَوَّلِينَ** অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের বর্ণনায় এবং দ্বিতীয় আয়াত **ثَلَاثَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ** তাদের বর্ণনায় নয়; বরং সাধারণ মুমিনদের বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়েছে।

এর জওয়াবে রুহুল-মা'আনী গ্রন্থে বলা হয়েছে : প্রথম আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেলাম ও হযরত ওমর (রাঃ) দুঃখিত হওয়ার কারণ এরূপ হতে পারে যে, তাঁরা মনে করেছেন অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের মধ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের যে হার সাধারণ মুমিনদের মধ্যেও সেই হার অব্যাহত থাকবে। ফলে সমগ্র জ্ঞানাতবাসীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম হবে। কিন্তু পরের আয়াতে সাধারণ মুমিনদের বর্ণনা যখন **لَا يَذْكُرُونَ** (বড়দল) শব্দটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হল, তখন তাঁদের সন্দেহ দূর হয়ে গেল এবং তাঁরা বুঝলেন যে, সমষ্টিগতভাবে জ্ঞানাতীদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদী সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। তবে অগ্রবর্তীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা কম হবে। এর বিশেষ কারণ এই যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে পয়গম্বরই রয়েছেন বিপুলসংখ্যক। কাজেই তাঁদের মোকাবেলায় উম্মতে মুহাম্মদী কম হলেও সেটা দুঃখের বিষয় নয়।

(দুই) তফসীরবিদগণের দ্বিতীয় উক্তি এই যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বলে এই উম্মতেরই দু'টি স্তর বোঝানো হয়েছে। পূর্ববর্তী বলে কুরুনে-উলা তথা সাহাবী, তাবয়ী প্রমুখদের যুগকে এবং পরবর্তী বলে তাঁদের পরবর্তী ক্রোয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমান সমগ্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। ইবনে-কাসীর, আবু হাইয়ান, কুরতুবী, রুহুল মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদি তফসীরগ্রন্থে এই দ্বিতীয় উক্তিকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

প্রথম উক্তির সমর্থনে হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইবনে কাসীর বলেন যে, এর সনদ অগ্রাহ্য। দ্বিতীয় উক্তির প্রমাণ হিসেবে তিনি কোরআন পাকের সেসব আয়াত পেশ করেছেন, যেগুলোতে বলা হয়েছে যে, উম্মতে মুহাম্মদী শ্রেষ্ঠতম উম্মত; যেমন **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ** ইত্যাদি আয়াত। তিনি আরও বলেছেন যে, অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই শ্রেষ্ঠতম উম্মতে কম হবে — একথা যেনে নেয়া যায় না। তাই একথাই অধিক সঙ্গত যে, পূর্ববর্তীগণের অর্থ এই উম্মতের প্রথম যুগের মনীষীগণ এবং পরবর্তীগণের অর্থ তাঁদের পরবর্তী লোকগণ। তাদের মধ্যে নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে।

এর সমর্থনে ইবনে-কাসীর হাসান বসরী (রহঃ) — এ উক্তি পেশ করেছেন। তিনি বলেন : পূর্ববর্তীগণ তো আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে সাধারণ মুমিন তথা আসহাবুল-ইয়ামানের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। অন্য এক রেওয়াজে অনুযায়ী তিনি পূর্ববর্তীগণের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন : **من مضي من هذه الامة** — অর্থাৎ, পূর্ববর্তীগণ হচ্ছেন এই উম্মতেরই পূর্ববর্তী লোকগণ।

এমনিভাবে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন (রহঃ) বলেন : আলেমগণ বলেন এবং আশা রাখেন যে, এই উম্মতের মধ্য থেকেই পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণ হোক। (ইবনে-কাসীর)

রুহুল-মা'আনীতে দ্বিতীয় তফসীরের সমর্থনে হযরত আবু বাকরা (রাঃ) —এর রেওয়াজক্রমে নিম্নোক্ত হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে :

: একদল পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে আল্লাহ তাআলার এই উক্তির তফসীর প্রসঙ্গে নবী করীম (সাঃ) বলেন : তারা সবাই এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে।

এই তফসীর অনুযায়ী শুরুতে **وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ** এই আয়াতে উম্মতে মুহাম্মদীকেই সম্বোধন করা হয়েছে এবং প্রকারত্ব উম্মতে মোহাম্মদী হবে। — (রুহুল-মা'আনী)

তফসীরে মাযহারীতে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, কোরআন পাক থেকে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়, উম্মতে মুহাম্মদী পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বলাবাহুল্য, কোন উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব তার ভিতরকার উচ্চস্তরের লোকদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা ই হয়েছে থাকে। তাই শ্রেষ্ঠতম উম্মতের মধ্যে অগ্রবর্তী নৈকট্যশীলদের সংখ্যা কম হবে — এটা সুদূর পরাহত। যেসব আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়, সেগুলো এই : **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ** এবং

يَكُونُوا أَهْلًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ النَّاسُ عَلَى كُفْرِهِمْ

এক হাদীসে বলা হয়েছে :

انتم تسمون سبعة امة انتم اخيرها وكرمها على الله تعالى

— তোমরা সত্তরটি উম্মতের পরিশিষ্ট হবে। তোমরা সর্বশেষে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ হবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) — এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : তোমরা জ্ঞানাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে — এতে তোমরা সন্তুষ্ট আছ কি? আমরা বললাম : নিশ্চয় আমরা এতে সন্তুষ্ট। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন **هل نصف اهل الجنة** — যে সত্তার করায়ত্ত আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, আমি আশা করি তোমরা জ্ঞানাতের অর্ধেক হবে। — (বোখারী-মাযহারী)

জ্ঞানাতীগণ মোট একশ বিশ' কাতারে থাকবে তন্মধ্যে আশি কাতার এই উম্মতের মধ্য থেকে হবে এবং অবশিষ্ট চল্লিশ কাতারে সমগ্র উম্মত শরীক হবে।

উপরোক্ত রেওয়াজেতেসমূহে অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই উম্মতের জ্ঞানাতীদের পরিমাণ কোথাও এক চতুর্থাংশ, কোথাও অর্ধেক এবং শেষ রেওয়াজেতে দুই তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। এতে কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ, এগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ) —এর অনুমান মাত্র। অনুমান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ হয়েই থাকে।

عَلَى مَرُوضُونَ — ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম, বাযহাকী

প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, **مَرُوضُونَ** —এর অর্থ স্বর্ণখচিত বস্ত্র।

প্রীতকালে হয় এবং মওসুম শেষ হয়ে গেলে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার কোন ফল শীতকালে হয় এবং শীতকাল শেষ হয়ে গেলে ফলের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু জন্মান্তের প্রত্যেক ফল চিরস্থায়ী হবে—কোন মওসুমের মধ্যে সীমিত থাকবে না। এমনভাবে দুনিয়াতে বাগানের পাহারাদাররা ফল ছিড়তে নিষেধ করে কিন্তু জন্মান্তের ফল ছিড়তে কোন বাধা থাকবে না।

فَرَّاشٌ شَدَّاتٍ فَرَشَ —এর বহুবচন। অর্থ বিছানা,

ফরশ। উচ্চস্থানে বিছানো থাকবে বিধায় জন্মান্তের শয্যা সমুন্নত হবে। দ্বিতীয়তঃ এই বিছানা মাটিতে নয়, পালঙ্কের উপর থাকবে। তৃতীয়তঃ স্বয়ং বিছানাও খুব পুরু হবে। কারণ কারণ মতে এখানে বিছানা বলে শয্যাশায়িনী নারী বোঝানো হয়েছে। কেননা, নারীকেও বিছানা বলে ব্যক্ত করা হয়। হাদীসে আছে **الولد للفراش** —পরবর্তী আয়াতসমূহে জন্মান্তী নারীদের আলাচনাও এরই ইঙ্গিত—(মাযহারী) এই অর্থ অনুযায়ী **مَرْوُوءَةٌ** এর অর্থ হবে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত।

لَا تَكْفُرُ أَفْئِدَتُهُنَّ بِمَا كُنَّ يَكْفُرْنَ শব্দের অর্থ সৃষ্টি করা। **هن** সর্বনাম দ্বারা জন্মান্তের নারীদেরকে বোঝানো হয়েছে। পূর্বাঙ্ক আয়াতে **فَرَّاش** এর অর্থ জন্মান্তে নারী হলে তার স্থলেই এই সর্বনাম ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া শয্যা, বিছানা ইত্যাদি ভোগবিলাসের বস্তু উল্লেখ করায় নারীও তার অন্তর্ভুক্ত আছে বলা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি জন্মান্তের নারীদেরকে এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছি। জন্মান্তী স্রদের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রক্রিয়া এই যে, তাদেরকে জন্মান্তেই প্রজননক্রিয়া ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার যেসব নারী জন্মান্তে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষভঙ্গি এই যে, যারা দুনিয়াতে কুশী, কৃষ্ণাঙ্গী অথবা বৃদ্ধা ছিল; জন্মান্তে তাদেরকে সুখী যুবতী ও লাক্ষ্যময়ী করে দেয়া হবে। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যেসব নারী দুনিয়াতে বৃদ্ধা, শ্বেতকেশিনী ও কদাকার ছিল, এই নতুন সৃষ্টি তাদেরকে সুন্দর, যৌবনী যুবতী করে দেবে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন : একদিন রসুলুল্লাহ (সাঃ) গৃহে আগমন করলেন। তখন এক বৃদ্ধা আমার কাছে বসে ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এ কে? আমি আরয

করলাম : সে সম্পর্কে আমার খালা হয়। রসুলুল্লাহ (সাঃ) রসচ্ছলে বললেন : لا يدخل الجنة عجوز —অর্থাৎ, জন্মান্তে কোন বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। একথা শুনে বৃদ্ধা বিষণ্ণ হয়ে গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে কাদতে লাগল। তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং স্বীয় উস্তির অর্থ এই বর্ণনা করলেন যে, বৃদ্ধারা যখন জন্মান্তে যাবে, তখন বৃদ্ধা থাকবে না ; বরং যুবতী হয়ে প্রবেশ করবে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে শোনালেন।—(মাযহারী)

بَكْرًا —এটা **بكر** এর বহুবচন। অর্থ কুমারী বালিকা। উদ্দেশ্য এই যে, জন্মান্তের নারীদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হবে যে, প্রত্যেক সঙ্গম-সহবাসের পর তারা আবার কুমারী হয়ে যাবে।

عُرْيًا —এটা **عروية** —এর বহুবচন। অর্থ স্বামী সোহাগিনী ও প্রেমিকা নারী।

تَرَبًّا —এটা **ترب** —এর বহুবচন। অর্থ সমবয়স্ক। জন্মান্তে পুরুষ ও নারী সব এক বয়সের হবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, প্রত্যেকের বয়স তেত্রিশ বছর হবে।—(মাযহারী)

وَأُولَئِكَ مِنَ الْغَاثِينَ শব্দের অর্থ এবং **أُولَئِكَ** —এর তফসীর

—এর তফসীর পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। যদি **أُولَئِكَ** তথা পূর্ববর্তীগণ বলে হযরত আদম (আঃ) থেকে রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর পূর্ব পর্যন্ত লোকগণ এবং **أَخْرَجْنَاهُم مِّنَ الْجَنَّةِ** তথা পরবর্তীগণ বলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কেয়ামত পর্যন্ত লোকগণ বোঝানো হয়, তবে এই আয়াতের সারমর্ম এই হবে যে, ‘আসহাবুল-ইয়ামীন’ তথা মুমিন-মুত্তাকীগণ পূর্ববর্তী সমগ্র উম্মতের মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে এবং একা উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্য থেকে একটি বড় দল হবে। এমতাবস্থায় এটা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্যে কম গৌরবের বিষয় নয় যে, তারা পূর্ববর্তী লক্ষ লক্ষ পয়গম্বরের উম্মতের সমান হয়ে যাবে ; অথচ তাদের সময়কাল খুবই সর্ধক্ষিপ্ত। এছাড়া **هَٰؤُلَاءِ** শব্দের মধ্যে এরূপ অবকাশও আছে যে, পরবর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যা পূর্ববর্তীদের বড় দলের লোকসংখ্যার চেয়ে বেশী হবে।

দুনিয়াতে থেকে থাকলে সে কেন বোঝে না যে, কোন স্রষ্টা ব্যতীত মানুষের অত্যাশ্চর্য ও অভাবনীয় সত্তা আপন-আপনি তৈরী হয়ে যায়নি। কে সেই স্রষ্টা? পিতা-মাতা তো জানেও না যে, কি তৈরী হল, কিভাবে হল? প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত তারা অনুমানও করতে পারে না যে, গর্ভ, জন্ম ছেলে না মেয়ে? তবে কে সেই শক্তি, যেন উদর, গর্ভাশয় ও জন্মের উপরস্থ ঝিল্লি—এই তিন অঙ্গকার প্রকোষ্ঠে এমন সুন্দর-সুশ্রী শ্রবণকারী, দর্শনকারী ও অনুধাবনকারী সত্তা তৈরী করে দিয়েছেন? এরূপ স্থলে যে ব্যক্তি **فَتَذَكَّرُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ** —(সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ্ মহান) বলে উঠে না, সে জ্ঞান-বুদ্ধির শত্রু।

এরপরের আয়াতসমূহে একথাও বলা হয়েছে যে, হে মানব, তোমাদের জন্মগ্রহণ ও বিচরণশীল কর্মত মানুষ হয়ে যাওয়ার পরও অস্তিত্ব, স্থায়িত্ব ও সকল কাজকারবারে তোমরা আমারই মুখাপেক্ষী। আমি তোমাদের মৃত্যুরও একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছি। এই নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তোমাদের যে আয়ুষ্কাল রয়েছে, তাতে তোমরা নিজেদেরকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বীরূপে পেয়ে থাকে। এটাও তোমাদের বিভ্রান্তি বৈ নয়। আমি এই মুহূর্তেই তোমাদেরকে নাস্ত-নাবুদ করে তোমাদের, স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করতে সক্ষম। অথবা তোমাদেরকে ধ্বংস না করে অন্যকোন জীবের কিংবা জড় পদার্থের আকারে পরিবর্তিত করে দিতেও সক্ষম। নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের স্থায়িত্বের ব্যাপারে স্বাধীন ও স্বৈচ্ছাচারী নও; বরং তোমাদের স্থায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে এক বিশেষ শক্তি, সামর্থ্য ও জ্ঞান-বুদ্ধির বাহক করেছেন। এগুলোকে কাজে লাগিয়ে তোমরা অনেক কিছু করতে পার **وَمَّا عَنِ يَسْرُونَ** এর সারমর্ম এই যে, কেউ আমার ইচ্ছাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। আমি এই মুহূর্তেও যা চাই, তাই করতে পারি, **عَلَىٰ أَنْ يَبْدُلَ أَمْرًا** অর্থাৎ, তোমাদের স্থলে তোমাদেরই মত অন্য কোন জাতি নিয়ে আসতে পারে। **وَنُفِثْكَ فِي مَالِكَيْنِ** এবং তোমাদের এমন আকৃতি করে দিতে পারি, যা তোমরা জান না। অর্থাৎ, মৃত্যুর পর মাটি হয়ে যেতে পার অথবা অন্য কোন জন্তুর আকারেও পরিবর্তিত হয়ে যেতে পার; যেমন বিগত উম্মতের মধ্যে আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে বানর ও শূকরে পরিণত হওয়ার আযাব এসে গেছে। তোমাদেরকে প্রস্তর ও জড়পদার্থের আকারেও পরিণত করে দেয়া যেতে পারে।

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّحْمَ খাদ্য মানুষের জীবন ধারণের প্রধান ভিত্তি। মানব সৃষ্টির গুঢ়তত্ত্ব উদঘাটিত করার পর এখন এই খাদ্যে স্বরূপ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখা হয়েছে; তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? এই বীজ থেকে অঙ্কুর বের করার ব্যাপারে তোমাদের কাজের কতটুকু দখল আছে? চিন্তা করলে এছাড়া জওয়াব নেই, কৃষক ক্ষেতে লাঙ্গল

চালিয়ে, সার দিয়ে মাটি নরম করেছে মাত্র, যাতে দুর্বল অঙ্কুর মাটি ভেদ করে সহজেই গজিয়ে উঠতে পারে। বীজ বপনকারী কৃষকের সমগ্র প্রচেষ্টা এই এক বিন্দুতেই সীমাবদ্ধ। চারা গজিয়ে উঠার পর সে তার হেফাযতে লেগে যায়। কিন্তু একটি বীজের মধ্য থেকে চারা বের করে আনার সাধ্য তার নেই। সে চারাটি তৈরী করেছে বলে দাবীও করতে পারে না। কাজেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, সুবিশাল মাটির স্থূপে পতিত বীজের মধ্য থেকে এই সুন্দর ও মহোপকারী বৃক্ষ কে তৈরী করল? জওয়াব এটাই যে, সেই পরম প্রভু অপর শক্তিশ্বর আল্লাহ্ তাআলার অত্যাশ্চর্য কারিগরিই এর প্রস্তুতকারক।

এরপর যে পানির অপর নাম জীবন এবং যে অগ্নি দ্বারা মানুষ রান্না-বান্না করে ও শিল্পকারখানা পরিচালনা করে, সেগুলোর সৃষ্টি সম্পর্কে একই ধরনের প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহারে সবগুলোর সার-সংক্ষেপ এরূপ বর্ণিত হয়েছে—

এক থেকে **فَعَنْ جَعَلْنَا تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ** শব্দটি থেকে এবং **فَوَى** শব্দটির অর্থ হবে মরুবাসী। এখানে মুসাফির বোঝানো হয়েছে যে, প্রান্তরে অবস্থান করে খানাপিনার ব্যবস্থাপনায় রত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সৃষ্টি আমার শক্তি-সামর্থ্যের ফসল।

فَسَيَرُ يَوْمَئِذٍ الْعَظِيمِ —এর অবশ্যজ্ঞাবী ও যুক্তিভিত্তিক পরিণতি এই যে, মানুষ আল্লাহ্ তাআলার অপর শক্তি ও তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করবে। এটাই তাঁর অবদানসমূহের কৃতজ্ঞতা।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলার অপর শক্তি ও পার্থিব সৃষ্টির মাধ্যমে কেয়ামতে পুনরুজ্জীবনের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর ইতিহাসভিত্তিক প্রমাণ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে শপথ সহকারে পেশ করা হচ্ছে।

فَلَا أُفْسِدُ يَوْمَئِذٍ الصُّلُوحَ —এর শুরুতে অতিরিক্ত পদের ব্যবহার একটি সাধারণ বাকপদ্ধতি। যেমন বলা হয় **وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ** কসমে **لَا** সুবিদিত। কেউ কেউ বলেন যে, এরূপ স্থলে **لَا** সমোখিত ব্যক্তির ধারণা খণ্ডনের জন্যে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, তোমার ধারণা ঠিক নয়; বরং এরপর শপথ করে যা বলা হচ্ছে তাই সত্য। **مَوْعِدٍ** শব্দটি **مَوْعِدٍ** এর বহুবচন। এর অর্থ নক্ষত্রের অন্ত্যচল অথবা অন্তের সময়। এ আয়াতে নক্ষত্রের অন্ত যাওয়ার সময়ের শপথ করা হয়েছে; যেমন সূরা নজমেও **وَالْجُودِ** বলে তাই করা হয়েছে। এর রহস্য এই যে, অন্ত প্রত্যক্ষ করা হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, নক্ষত্র চিরন্তন নয়; বরং আল্লাহ্ তাআলার কুদরতের মুখাপেক্ষী।

পরবর্তী অবস্থা এবং হয়েয ও নেফাসের অবস্থাকে ‘হদসে-আকবর’ বলা হয়। এই হদস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যে গোসল করা জরুরী। এই তফসীর হযরত আতা, তাউস, সালেম ও বাকের (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে।—(রুহুল-মা’আনী)।

এমতাবস্থায় **لَيْسَ** এই সংবাদসূচক বাক্যটির অর্থ হবে নিষেধসূচক। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পবিত্রতা ব্যতীত কোরআনের কপি স্পর্শ করা জায়েয নয়। পবিত্রতার অর্থ হবে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হওয়া, বেগু না হওয়া এবং বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থা না হওয়া। কুরতুবী এই তফসীরকেই অধিক স্পষ্ট বলেছেন এবং তফসীরে-মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি ভগ্নি ফাতেমাকে কোরআন পাঠরতা অবস্থায় পেয়ে কোরআনের পাতা দেখতে চান। ভগ্নি আলাচ্য আয়াত পাঠ করে কোরআনের পাতা তাঁর হাতে দিতে অস্বীকার করেন। অগত্যা তিনি গোসল করতঃ পাতাগুলো হাতে নিয়ে পাঠ করেন। এই ঘটনা থেকেও শেষোক্ত তফসীরের অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। যেসব হাদীসে অপবিত্র অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোকেও কেউ কেউ এই তফসীরের সমর্থনে পেশ করেছেন।

যেহেতু এই প্রশ্নে হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী মতভেদ করেছেন; তাই অনেক তফসীরবিদ অপবিত্র অবস্থায় কোরআন পাক স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞা সপ্রমাণ করার জন্যে এই আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন না। তাঁরা এর প্রমাণ হিসেবে কয়েকটি হাদীস পেশ করেন মাত্র। হাদীসগুলো এইঃ

হযরত আমর ইবনে হামের নামে লিখিত রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর একখানি পত্র ইমাম মালেক (রহঃ) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে একটি বাক্য এরূপও আছে **لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ** অর্থাৎ, অপবিত্র ব্যক্তি যেন কোরআনকে স্পর্শ না করে।—(ইবনে-কাসীর)

রুহুল-মা’আনীতে এই রেওয়ায়েত মুসনাদে আবদুর রায়যাক, ইবনে আবী দাউদ ও ইবনুল মুনিযির থেকেও বর্ণিত আছে। তিবরানী ও ইবনে-মরদুয়ইহি বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন **لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ**—(রুহুল-মা’আনী)

মাসআলা : উল্লেখিত রেওয়ায়েতসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ উস্মত এবং ইমাম চতুর্থীয় এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাক স্পর্শ করার জন্যে পবিত্রতা শর্ত। এর খেলাফ করা গোনাহ্। পূর্ববর্ণিত সকল পবিত্রতাই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী, ইবনে মসউদ, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, সায়ীদ ইবনে যায়দ, আতা, যুহরী, নাখরী, হাকাম, হাম্মাদ, ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবু হানীফা প্রমুখ সবাই এই ব্যাপারে একমত। উপরে যে মতভেদ বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল মাসআলার দলীলে, আসল মাসআলায় নয়। কেউ কেউ কোরআনের আয়াত এবং উল্লেখিত হাদীসের সমষ্টি দ্বারা এই মাসআলাটি সপ্রমাণ করেছেন এবং কেউ কেউ শুধু হাদীসকেই দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। সাহাবীদের মতভেদের কারণে তাঁরা আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করা থেকে বিরত রয়েছেন।

মাসআলা : কোরআন পাকের যে গিলাফ মলাটের সাথে সেলাই করা, তাও ওয়ু ব্যতীত স্পর্শ করা সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয। তবে আলাদা কাপড়ের গিলাফে কোরআন পাক বন্ধ থাকলে ওয়ু ব্যতীত তাতে

হাত লাগানো ইমাম আবু হানীফার মতে জায়েয। ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (রহঃ)-এর মতে তাও না-জায়েয।—(মাযহারী)

মাসআলা : বে-ওয়ু অবস্থায় পরিধেয় কাপড়ের আন্তিন অথবা আঁচল দ্বারা কোরআন পাক স্পর্শ করাও জায়েয নয়, রুমাল দ্বারা স্পর্শ করা যায়।

মাসআলা : আলেমগণ বলেন : এই আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থায় এবং হয়েয ও নেফাসের অবস্থায় কোরআন পাক তেলাওয়াত করাও জায়েয নয়। গোসল করার পর জায়েয হবে। কারণ, কপিতে লিখিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব হলে মুখে উচ্চারিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আরও বেশী ওয়াজিব হওয়া দরকার। কাজেই বে-ওয়ু অবস্থায়ও তেলাওয়াত নাজায়েয হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে-আব্বাসের হাদীস এবং মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হযরত আলীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) বে-ওয়ু অবস্থায় তেলাওয়াত করেছেন। এ কারণে ফেকাহবিদগণ এর অনুমতি দিয়েছেন।—(মাযহারী)

أَفْهَمْنَا الْحَدِيثَ أَنْتُمْ تَدْرُسُونَ - ادهان শব্দটি থেকে উদ্ধৃত।

এর আভিধানিক অর্থ তেল মালিশ করা। তেল মালিশ করলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নরম ও শিথিল হয়। তাই এই শব্দটি অবৈধ ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করা ও কপটতা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলাচ্য আয়াতে এই শব্দটি কোরআনী আয়াতের ব্যাপারে কপটতা ও মিথ্যারোপ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قُلُوبُكُمْ أَكَلَتْ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ كُنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ
مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ قُلُوبُكُمْ أَنْتُمْ عَنْ حَقِّكُمْ تَصْغَرُونَ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি দ্বারা ও পরে নক্ষত্রাদির কসম করে দু’টি বিষয় সপ্রমাণ করা হয়েছে। (এক) কোরআন আল্লাহর কলাম। এতে কোন শয়তান বা জিনের প্রভাব থাকতে পারে না। এর বিষয়বস্তু সত্য। (দুই) কোয়ামত সংঘটিত হবে এবং সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে আল্লাহর সামনে নীত হবে। পরিশেষে এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের অস্বীকৃতি সম্প্রদায় আলোচনা করা হয়েছে।

কোয়ামত ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকৃতি কাফেরদের পক্ষ থেকে যেন এ বিষয়ের দাবী যে, তাদের প্রাণ ও আত্মা তাদেরই করায়ত্ত। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্যে আলাচ্য আয়াতসমূহে একজন মরনোশ্মুখ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, যখন তার আত্মা কঠাগত হয় আর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অসহায়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তারা কামনা করে যে, তার আত্মা বের না হোক, তখন আমি জ্ঞান ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি। নিকটে থাকার অর্থ এই যে, তার আত্মাত্তরীয় ও বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ও সক্ষম থাকি। কিন্তু তোমরা আমার নৈকট্য ও মরনোশ্মুখ ব্যক্তি যে আমার করায়ত্ত এ বিষয়টি চর্চাক্ষে দেখ না। সারকথা এই যে, তোমরা সবাই মিলে তার জীবন ও আত্মার হেফাজত করতে চাও, কিন্তু তোমাদের মাঝে কল্যাণ না। তার আত্মার নির্গমন কেউ রোধ করতে পারে

না। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বলা হয়েছে : যদি তোমরা মনে কর যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবিত করা যাবে না এবং তোমরা এমন শক্তিশালী ও বীরপুরুষ যে আল্লাহর নাগালের বাইরে চলে গেছে, তবে এখানেই স্বীয় শক্তিমত্তা ও বীরত্ব পরীক্ষা করে দেখ এবং এই মরনোন্মুখ ব্যক্তির আত্মার নির্গমন রোধ কর কিংবা নির্গমনের পর তাকে পুনরায় দেহে ফিরিয়ে আন। তোমরা যখন এতটুকুও করতে পার না, তখন নিজেদেরকে আল্লাহর নাগালের বাইরে মনে করা এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার করা কতটুকু নিবুজ্জিতার পরিচায়ক।

فَاِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হয় কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে এবং হিসাবের পর প্রতিদান ও শাস্তি সুনিশ্চিত। সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, প্রতিদান ও শাস্তির পর সবাই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেকের প্রতিদান আলাদা আলাদা হবে। আলোচ্য আয়াতে তাই আবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর এই ব্যক্তি নৈকট্যশীলদের একজন হলে সুখই সুখ এবং আরামই আরাম ভোগ করবে। আর যদি ‘আসহাবুল-ইয়ামীন’ তথা সাধারণ মুমিনদের একজন হয়, তবে সেও জান্নাতের অবদান লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি আসহাবে শিমাল’ তথা কাকের ও মুরিকদের একজন হয়, তবে জাহান্নামের অগ্নি ও উত্তপ্ত পানি দ্বারা তাকে অপ্যাযন করা হবে। পরিশেষে বলা হয়েছে :

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَوْمِ — অর্থাৎ উল্লেখিত প্রতিদান ও শাস্তি দ্রুত সত্য। এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

مَسْجِدٌ بِأَمْرِكَ الْظَلِيمِ — সূরার উপসংহারে রসুল করীম (সাঃ)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। এতে নামাযের ভিতরে ও বাইরের সব তসবীহ দাখিল রয়েছে। খোদা নামাযকেও মাঝে মাঝে তসবীহ বলে ব্যক্ত করা হয়। এমতাবস্থায় এটা নামাযের প্রতি গুরুত্বদানেরও আদেশ হয়ে যাবে।

সূরা আল-হাদীদ

সূরা হাদীদে কতিপয় বৈশিষ্ট্য : যে পাঁচটি সূরার শুরুতে সূর অথবা আচ্ছ, সেগুলোকে হাদীসে مسبحات তথা তসবীহ যুক্ত সূরা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরা হাদীদ তন্মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয় হাশর, তৃতীয় ছফ, চতুর্থ জুমুআ এবং পঞ্চম তাগাবুন। আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর রেওয়ায়েতে হযরত ইরবায় ইবনে সারিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) রাতে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এসব সূরা পাঠ করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এসব সূরায় একটি আয়াত এমন আছে, যা হাজার আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবনে-কাসীর বলেন : সেই শ্রেষ্ঠ আয়াতটি হচ্ছে

সূরা হাদীদে এই আয়াত :

هُوَ الْكَافِرُ وَالظَّالِمُ وَالْبَاطِلُ وَهُوَ الْحَقُّ الْقَائِمُ

এই পাঁচটি সূরার মধ্য থেকে তিনটিতে অর্থাৎ, হাদীদ, হাশর ও ছফে সূর অতীত পদবাচ্য সহকারে এবং জুমুআ ও তাগাবুনে সূর ভবিষ্যত পদবাচ্য সহকারে বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ তাআলার তসবীহ ও যিকর অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্বকালেই অব্যাহত থাকা বিধেয়। —(মাহহারী)

শয়তানী কুমন্ত্রণার প্রতিকার : হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : কোন সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ তাআলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী কুমন্ত্রণা দেখা দিলে هُوَ الْكَافِرُ وَالظَّالِمُ আয়াতখানি আন্তে পাঠ করে নাও। —(ইবনে-কাসীর)

এই আয়াতের তফসীর এবং আউয়াল, আখের, যাহের ও বাতেনের অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দশটিরও অধিক উক্তি বর্ণিত আছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন বেপরিচয় নেই — সবগুলোরই অবকাশ আছে। আউয়াল শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট; অর্থাৎ, অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টজগতের অগ্র ও আদি। কারণ, তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁরই সৃজিত। তাই তিনি সবার আদি। কারণ ও কারও মতে আখেরের অর্থ এই যে, সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। যেমন,

هُوَ الْكَافِرُ وَالظَّالِمُ আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে। বিলীনতা দুই প্রকার। (এক) যা কার্যতঃ বিলীন হয়ে যায়; যেমন, কৈয়ামতের দিন সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে। (দুই) যা কার্যতঃ বিলীন হয় না, কিন্তু সত্যগতভাবে বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত নয়। এরূপ বস্তুকে বিদ্যমান অবস্থায়ও ধ্বংসশীল বলা যায়। এর উদাহরণ জান্নাত ও দোখখ এবং এগুলোতে প্রবেশকারী ভাল-মন্দ মানুষ। তাদের অস্তিত্ব বিলীন হবে না; কিন্তু বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্তও হবে না। একমাত্র আল্লাহর সত্তাই এমন যে, পূর্বেও বিলীন ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কখনও বিলীন হবে না। তাই তিনি সবার অন্ত।

ইমাম গায়যালী (রহঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলার মারেকফত সবার শেষে হয়। এই দিক দিয়ে তিনি আখের তথা অন্ত। মানুষ জ্ঞান ও মারেকফতে ক্রমান্বিত লাভ করতে থাকে। কিন্তু মানুষের অর্জিত এসব স্তর আল্লাহর পথের বিভিন্ন মনযিল বৈ নয়। এর চূড়ান্ত ও শেষ সীমা হচ্ছে আল্লাহর মারেকফত। —(রুদ্দল-মা’আনী)

‘যাহের’ বলে সেই সত্তা বোঝানো হয়েছে, যেসব বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশমান। প্রকাশমান হওয়া অস্তিত্বের একটি শাখা। অতএব, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব যখন সবার উপরে ও অগ্র, তখন তাঁর আত্মপ্রকাশও সবার উপরে হবে। জগতে তাঁর চাহিতে অধিক কোন বস্তু প্রকাশমান নয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তিসামর্থ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বিশুর প্রতিটি কণায় কণায় দেদীপ্যমান।

আমরা একটি ছাগল যবাই করে তার অধিকাংশ গোশত বণ্টন করে দিলাম, শুধু একটি হাত নিজেদের জন্যে রাখলাম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন : বণ্টনের পর এই ছাগলের গোশত কতটুকু রয়ে গেছে? আমি আরম্ভ করলাম : শুধু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি বললেন : গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই রয়ে যায়নি। কেননা, গোটা ছাগলই আল্লাহর পথে ব্যয় হয়েছে। এটা আল্লাহর কাছে তোমার জন্যে থেকে যাবে। যে হাতটি নিজের খাওয়ার জন্যে রেখেছ, পরকালে এর কোন প্রতিদান পাবে না। কেননা, এটা এখানেই বিলীন হয়ে যাবে।—(মায়হারী)

আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেয়ার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যা কিছু যে কোন সময় ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যাবে ; কিন্তু ইমান, আন্তরিকতা ও অগ্রগামিতার পার্থক্যবশতঃ সওয়াবেও পার্থক্য হবে। বলা হয়েছে : **لَا يَتَوَيَّئُ مَنَّهُ** **مَنْ آتَقَىٰ مِن بَيْنِ الْفَقْرِ وَكَانَ** — অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (এক) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে।

(দুই) যারা মক্কাবিজয়ের পর মুমিন হয়ে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ। এই দুই শ্রেণীর লোক আল্লাহর কাছে সমান নয়; বরং মর্যাদায় একশ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে শ্রেষ্ঠ। মক্কাবিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জেহাদকারী ও ব্যয়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণী অপেক্ষা বেশী।

মক্কা বিজয়কে সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদাভেদের মাপকাঠি করার রহস্যঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে-কেরামকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। (এক) যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়ে ইসলামী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং (দুই) যারা মক্কাবিজয়ের পর একাজে শরীক হয়েছেন। আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রথমেই সাহাবীগণের মর্যাদা আল্লাহ তাআলার কাছে শেষোক্ত সাহাবীগণের তুলনায় বেশী।

সকল সাহাবীর জন্যে মাগফেরাত ও রহমতের সুসংবাদ এবং অবিশিষ্ট উম্মত থেকে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য : উল্লেখিত আয়াতসমূহে সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদার পারস্পরিক তারতম্য উল্লেখ করে শেষে বলা হয়েছে : **وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْخُسْلَىٰ** — অর্থাৎ, পারস্পরিক তারতম্য সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা কল্যাণ অর্থাৎ, জ্ঞানাত ও মাগফেরাতের ওয়াদা

সবার জন্যেই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে-কেরামের সেই শ্রেণীদ্বয়ের জন্যে, যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে-কেরামের প্রায় সমগ্র দলই शामिल আছে। কেননা, তাঁদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি খুবই দুর্লভ, যিনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পথে কিছুই ব্যয় করেননি এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় অংশগ্রহণ করেননি। তাই মাগফেরাত ও রহমতের এই কোরআনী ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে शामिल করেছে।

সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদা কোরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায় ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা নয় : সারকথা এই যে, সাহাবায়ে-কেরাম সাধারণ উম্মতের ন্যায় নন। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও উম্মতের মাঝখানে আল্লাহর তৈরী সেতু। তাঁদের মাধ্যম ব্যতীত উম্মতের কাছে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর শিক্ষা পৌঁছার কোন পথ নেই। তাই ইসলামে তাঁদের বিশেষ একটি মর্যাদা রয়েছে। তাঁদের এই মর্যাদা ইতিহাস গ্রন্থের সত্যমিথ্যা বর্ণনা দ্বারা নয় ; বরং কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়।

তাঁদের দ্বারা কোন পদসম্মলন বা ভাস্তিমূলক কোন কিছু হয়ে থাকলে তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইজতিহাদী ভুল। যে কারণে সেগুলোকে গোনাহের মধ্যে গণ্য করা যায় না। বরং সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তদ্বারা তাঁরা একটি সওয়াব পাওয়ার অধিকারী। যদি বাস্তবে কোন গোনাহ হয়েই যায়, তবে প্রথমতঃ তা তাঁদের সারা জীবনের সংকর্ম এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও ইসলামের সাহায্য ও সেবার মোকাবেলায় শূন্যের কোঠায় থাকে। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ছিলেন অসাধারণ খোদাতীক। সামান্য গোনাহের কারণেও তাঁদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। তাঁরা তাত্ক্ষণিকভাবে তওবা করতেন এবং নিজের উপর গোনাহের শাস্তি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হতেন। কেউ নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন এবং তওবা কবুল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তদবস্থায়ই দণ্ডায়মান থাকতেন। এছাড়া তাঁদের প্রত্যেকের পুণ্য এত অধিক ছিল যে, সেগুলো দ্বারা গোনাহের কাফ্ফরা হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি আল্লাহ তাআলা তাঁদের মাগফেরাতের ব্যাপক ঘোষণা আলাচ্য আয়াতে এবং অন্য আয়াতেও করে দিয়েছেন। শুধু মাগফেরাতই নয় ; **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ**

বলে তাঁর সন্তুষ্টিরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁদের পরম্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে কাউকে মন্দ বলা অথবা দোষারোপ করা নিশ্চিতরূপে হারাম, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর উক্তি অনুযায়ী অতিশয় হওয়ার কারণ এবং নিজের ইমানকে বিপন্ন করার शामिल।

إِنَّ الْمَصْدُوقِينَ وَالْمَصْدُوقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لِيُضَعِفَ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۝ وَالشُّهَدَاءُ أَعْمَدُونَ ۝ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝ عَلِمُوا أَنَّ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ ۝ وَهُمْ وَرَبُّهُمْ وَتَفَاعُلُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُنِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ الْفُكَّارِ بَيْنَهُ ثُمَّ يَهْبِجُ قَدَرَهُ مَصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۝ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۝ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ ۝ الْعُرُورُ ۝ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرٍ ۝ وَمَن رَّبُّكُمْ وَجَعَلَهُ عَرَضًا تَعْرِضُ السَّاعَةِ ۝ وَالْأَرْضُ أُمِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن يَبْرَأَهَا ۝ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ لَّيْلًا لَّسَاعَةً عَلَىٰ مَقَاتٍ ۝ وَلَا تَنفَعُ حَوَافِدُ النَّاسِ ۝ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَتَّالٍ فَخُورٍ ۝ وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ وِثْرَتَهُ النَّاسِ بِالْأَنْفُسِ ۝ وَمَن يَتَوَلَّىٰ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَنِيُّ الْحَقِيمُ ۝

(১৮) নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহকে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। (১৯) আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারাি তাদের পালনকর্তার কাছে সিদ্দীক ও শহীদ বলে বিবেচিত। তাদের জন্যে রয়েছে পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কাফের ও আমার নিদর্শন অস্বীকারকারী তারাি জাহান্নামের অধিবাসী হবে। (২০) তোমরা জেনে রাখ, পার্শ্ববর্তী জীবন কীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রার্থ্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে গীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা শুষ্কটুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্শ্ববর্তী জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়। (২১) তোমরা অশ্রু বাধিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জ্ঞানাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসুলগণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদের জন্যে। এটা আল্লাহর কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী। (২২) পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিভাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (২৩) এটা একজনো বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না, (২৪) যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

(রাঃ) বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হুশিয়ার করা হয়।

মোটকথা, এই হুশিয়ারীর সারমর্ম হচ্ছে মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নম্রতা ও সং কর্মের জন্যে তৎপর থাকার শিক্ষা দেয়া এবং একথা ব্যক্ত যে, আন্তরিক নম্রতাই সংকর্মের ভিত্তি।

হযরত শাদাদ ইবনে আউসের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : মানুষের অন্তর থেকে সর্বপ্রথম নম্রতা উঠিয়ে নেয়া হবে। — (ইবনে-কাসীর)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রত্যেক মুমিনই কি সিদ্দীক ও শহীদ? **وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۝ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۝ وَالشُّهَدَاءُ** এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ভিত্তিতে হযরত কাতাদাহ ও আমার ইবনে মায়মুন (রাঃ) বলেন, যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই সিদ্দিক ও শহীদ।

হযরত বারা ইবনে আযেবের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : **مؤمنوا امتي شهداء** অর্থাৎ আমার উম্মতের সব মুমিন শহীদ। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। — (ইবনে-জরীর)

একদিন হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) কাছে কিছুসংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন : **كلكم صديق وشهيد** অর্থাৎ, আপনারা প্রত্যেকেই সিদ্দীক ও শহীদ। সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন : আবু হুরায়রা, আপনি এ কি বলছেন? তিনি জওয়াবে বললেনঃ আমার কথা বিশ্বাস না করলে কোরআনের এই আয়াত পাঠ করুন

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۝ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۝ وَالشُّهَدَاءُ

কিন্তু কোরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মুমিন সিদ্দীক ও শহীদ নয়; বরং মুমিনদের একটি উচ্চ শ্রেণীকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা হয়। আয়াতটি এই :

فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

وَالشُّهَدَاءَ وَالضَّالِّينَ

এই আয়াতে পয়গম্বরগণের সাথে মুমিনদের তিনটি শ্রেণী বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে যথা, সিদ্দীক, শহীদ ও ছালেহ। বাহ্যতঃ এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। নতুবা ভিন্ন ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন : সিদ্দীক ও শহীদ প্রকৃতপক্ষে মুমিনদের বিশেষ উচ্চশ্রেণীর লোকগণকে বলা হয়, যারা মহান গুণগরিমার অধিকারী। তবে আলোচ্য আয়াতে সব মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মুমিনকেও কোন না কোন দিক দিয়ে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং তাঁদের কাতারভুক্ত মনে করা হবে।

রুহুল-মা'আনীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে কামেল ও এবাদতকারী মুমিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত। নতুবা যেসব মুমিন অসাবধান ও খেয়ালখুশীতে মগ্ন তাদেরকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায় না। এক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : **اللعائن لا يكونون شهداء** অর্থাৎ, যারা মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করে তারা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একবার উপস্থিত জনতাকে বললেন :

যে, দুনিয়া একটি প্রভারণার স্থল। এখনকার সম্পদ-প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহুর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর পরকালের আযাব ও সওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি একরূপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে পরকালের চিন্তা বেশী করবে। পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

سَابِقُوا إِلَىٰ مَعْوَرَةٍ مِّنْ دُونِ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ مِّنَ النَّارِ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

—অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জ্ঞানাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর প্রস্থের সমান।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার এক অর্থ এই যে, জীবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্যের কোন ভরসা নেই; অতএব, সংকাজে শৈথিল্য ও টালবাহানা করো না। একরূপ করলে কোন রোগ অথবা ওযর তোমার সংকাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে কিংবা তোমার মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে। অতএব এর সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সংকাজের পূঁজি সগ্রহ করে নাও, যাতে জ্ঞানাতে পৌছতে পার।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সংকাজে অপরের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর উপদেশাবলীতে বলেন : তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমনকারী এবং সর্বশেষ নির্গমনকারী হও। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ বলেন : জেহাদে সর্বপ্রথম কাতারে থাকার জন্যে অগ্রসর হও। হযরত আনাস বলেন : জামাতের নামায়ের প্রথম তকবীরে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর। —(কহুল-মা'আনী)

জ্ঞানাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সূরা আল-এমরানে এই বিষয়বস্তুর আয়াতে سموات বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একত্রিত করলে জ্ঞানাতের প্রস্থ হবে। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশী হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞানাতের বিস্তৃতি সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতে বেশী عرض শব্দটি কোন সময় কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জ্ঞানাতের বিশাল বিস্তৃতিই বোঝা যায়।

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤَيِّدُ مَنِ شَاءَ وَهُوَ أَلَدُّ الْفِئَةِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنِ يَشَاءُ لِنُورِهِ

পূর্বের

আয়াতে জ্ঞানাত ও তার নেয়ামতসমূহের দিকে অগ্রণী হওয়ার আদেশ ছিল। এতে কেউ ধারণা করতে পারত যে, জ্ঞানাত ও তার অক্ষয় নেয়ামতরাজি মানুষের কর্মের ফল এবং মানুষের কর্মই এর জন্যে যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন যে, তোমাদের ক্রিয়াকর্ম জ্ঞানাত লাভের পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয় যে, ক্রিয়াকর্মের ফলেই জ্ঞানাত অবশ্যজ্ঞাবী হয়ে পড়বে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব নেয়ামত লাভ করেছে, তার সারাজীবনের সংকর্ম এগুলোর বিনিময়ও হতে পারে না, জ্ঞানাতের অক্ষয় নেয়ামতরাজির মূল্য তো হওয়া দূরের কথা। অতএব আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই মানুষ জ্ঞানাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম ও বোখারী বর্ণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না।

সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেন : আপনিও কি তদ্রূপ ? তিনি বলেন : হ্যাঁ, আমিও আমার আমল দ্বারা জ্ঞানাত লাভ করতে পারি না— আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুকম্পা হলেই লাভ করতে পারি। — (মাযহারী)

দু'টি পার্থিব বিষয় মানুষকে আল্লাহর সুরণ ও পরকালের চিন্তা থেকে গাফেল করে দেয়। (এক) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, যাতে লিপ্ত হয়ে মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়। এ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। (দুই) বিপদাপদ, এতে জড়িত হয়েও মানুষ মাঝে মাঝে নিরাশ ও আল্লাহর সুরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

مَّا صَبَرْنَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْسَّمَاءِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

—অর্থাৎ, পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে

তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিভাবে অর্থাৎ, লওহে-মাহফুযে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। পৃথিবীর বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

لِيَكُونَ تَأْسُؤًا لِّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَلَا تَفْخَرُوا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

—আয়াতের

উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ তাআলা লওহে-মাহফুযে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এজ্ঞানে দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার তাল-মন্দ অবস্থা নিয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা না কর। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লাসিত ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহর সুরণ ও পরকাল সম্পর্কে গাফেল হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোন কোন বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোন কোন বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে সবার করে পরকালের পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও সওয়াব হাসিল করতে হবে। (কহুল-মা'আনী)

পরবর্তী আয়াতে সুখ ও ধন-সম্পদের কারণে উদ্ধত ও অহংকারীদের

নিন্দা করা হয়েছে : وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ الْخَوَالِصِ

—অর্থাৎ, আল্লাহর উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নেয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহর কাছে কৃপার। কিন্তু পছন্দ করেন না, বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, বুদ্ধিমান ও পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হল প্রত্যেক কাজে আল্লাহর পছন্দ ও অপছন্দের চিন্তা। তাই এখানে অপছন্দ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا بِالْبَيْتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْإِذْنَ لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ
بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا
إِذْ هُوَ وَجَلَّى قَوْمَهُمَا الْبَيْتَ وَالْكِتَابَ فِيمَا هُمْ مُهْتَدُونَ
وَكَيْفَ رَمَوْهُمْ فَيُسْقُونَ ۝ ثُمَّ قَعَبْنَا عَلَى آثَارِهِمْ رُسُلَنَا وَفَعَلْنَا
بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا لِقُلُوبِ الَّذِينَ
اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۝
فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرُسُلِهِ يُؤْخِذْكُمْ
مِنْ فَتْنِهِمْ وَيُجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيُغْفَرْ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ لَمَّا عَلِمَ أَهْلُ الْكِتَابِ الْآيَاتِ يُقَدِّرُونَ
عَلَى شَيْءٍ مِنَ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

(২৫) আমি আমার রসুলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসুলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিশ্বর, পরাক্রমশালী। (২৬) আমি নূহ ও ইবরাহীমকে রসুলরূপে প্রেরণ করেছি এবং তাদের বংশধরের মধ্যে নবুওয়ত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি। অতঃপর তাদের কতক সংপৃক্তপ্রাপ্ত হয়েছে এবং অধিকাংশই হয়েছে পাপাচারী। (২৭) অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি আমার রসুলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছি মরিয়ম তনয় ঈসাকে ও তাকে দিয়েছি ইঞ্জিল। আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; আমি এটা তাদের উপর ফরয করিনি; কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা বিশাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দিয়েছি। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (২৮) মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসুলের প্রতি বিশাস স্থাপন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দিবেন, তোমাদেরকে দিবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২৯) যাতে কিতাবধারীরা জানে যে, আল্লাহর সামান্য অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন ক্ষমতা নেই, দয়া আল্লাহরই হাতে; তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

ঐশী কিতাব ও পয়গম্বরের প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا بِالْبَيْتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْإِذْنَ لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ

শব্দের আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট বিষয়। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বিধানাবলীও হতে পারে; যেমন তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এর উদ্দেশ্য মোজেনা এবং রেসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও হতে পারে। —(ইবনে-কাসীর) পরবর্তী বাক্যে কিতাব নাযিলের আলাদা উল্লেখ বাহ্যতঃ শেষোক্ত তফসীরের সমর্থক। অর্থাৎ, بينات বলে মোজেনা ও প্রমাণাদি বোঝানো হয়েছে এবং বিধানাবলীর জন্যে কিতাব নাযিল করার কথা বলা হয়েছে।

কিতাবের সাথে ‘মীযান’ নাযিল করারও উল্লেখ আছে। মীযানের আসল অর্থ পরিমাপযন্ত্র। প্রচলিত দাঁড়িপাল্লা ছাড়া বিভিন্ন বস্তু ওজন করার জন্যে নবাবিস্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও ‘মীযান’—এর অর্থে শামিল আছে; যেমন আজকাল আলো, উত্তাপ ইত্যাদির পরিমাপযন্ত্র প্রচলিত আছে।

আয়াতে কিতাবের ন্যায় মীযানের বেলায়ও নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। কিতাব নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গম্বরের পথপ্ৰদর্শন পৌছা সুবিধিত। কিন্তু মীযান নাযিল করার অর্থ কি? এ সম্পর্কে তফসীরে রুহুল-মা’আনী, মাযহারী ইত্যাদিতে বলা হয়েছে যে, মীযান নাযিল করার মানে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলী নাযিল করা। কুরতুবী বলেনঃ প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিস্কারকে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আরবদের বাকপদ্ধতিতে এর নজীর বিদ্যমান আছে। কাজেই আয়াতের অর্থ যেন এরূপ الميزان ووضعنا الكتاب وآنزلنا, আমি কিতাব নাযিল করেছি ও দাঁড়িপাল্লা উদ্ভাবন করেছি। সূরা আর-রহমানের

وَالشَّامُ رَفَعَهَا وَوَضَعْنَا الْمِيزَانَ

আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে ميزان শব্দের সাথে وضع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, নূহ (আঃ)—এর প্রতি আক্ষরিক অর্থে আকাশ থেকে দাঁড়িপাল্লা নাযিল করা হয়েছিল এবং আদেশ করা হয়েছিল যে, এর সাহায্যেও ওজন করে দায়-দেনা পূর্ণ করতে হবে।

কিতাব ও মীযানের পর লৌহ নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাযিল করার মানে সৃষ্টি করা। কোরআন পাকের এক আয়াতে চতুশদ জন্তুদের বেলায়ও নাযিল করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ চতুশদ জন্তু আসমান থেকে নাযিল হয় না—পৃথিবীতে জন্মালাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাযিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহুপূর্বেই লওহে-মাহফুযে লিখিত ছিল—এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ। —(রুহুল-মা’আনী)

আয়াতে লৌহ নাযিল করার দু’টি রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) এর ফলে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে

খোদায়ী বিধান ও ন্যায়নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। (দুই) এতে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকল্লা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোন শিল্প চলতে পারে না।

এখানে আরও একটি প্রশ্নবিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ এবং ন্যায়নীতির দাঁড়িপাল্লা আবিষ্কার ও ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : **لِقَوْمٍ يَاقُضُونَ** অর্থাৎ, মানুষ যাতে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর লৌহ সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, পয়গম্বরগণও আসমানী কিতাবসমূহ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেন এবং যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে না, তাদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় দেখান। মীযান ইনসাফের সীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু যারা অবাধ্য ও হঠকারী, তারা কোন প্রমাণ মানে না এবং ন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হয় না। তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কয়েম করা সুদূরপরাহত। তাদেরকে বশে আনা লৌহ ও তরবারির কাজ, যা শাসকবর্গ অবশেষে বেগতিক হয়ে ব্যবহার করে।

এখানে আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক ইনসাফ ও সুবিচার দেনা-পাওনা পরিশোধ ও তাতে হ্রাসবৃদ্ধির নিষেধাজ্ঞা জানা যায় এবং মীযান দ্বারা অপরের দেনা-পাওনায় অংশ নির্ধারিত হয়। এই বস্তুদ্বয় নাযিল করার লক্ষ্যই হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এরপর শেষের দিকে লৌহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকাল্পে লৌহের ব্যবহার বেগতিক অবস্থায় করতে হবে। এটা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার আসল উপায় নয়।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃতপক্ষে চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। রাষ্ট্রের তরফ থেকে জোর-জবরদস্তি প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্যে নয় ; বরং পথের বাধা দূর করার জন্যে বেগতিক অবস্থায় হয়ে থাকে। চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষা-দীক্ষাই আসল বিষয়।

وَلْيَعْلَمِ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ রাহুল-মা'আনীতে আছে এখানে অব্যয়টি এই বাক্যকে একটি উহা বাক্যের সাথে সংযুক্ত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে ; অর্থাৎ **لِيَنْفَعَهُمْ** -আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌহ সৃষ্টি করছি, যাতে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয়, মানুষ এর দ্বারা শিল্পকাজে উপকৃত হয় এবং আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে আল্লাহ জেনে নেন কে লৌহের সমরাস্ত্র দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলগণকে সাহায্য করে ও ধর্মের জন্যে জিহাদ করে। আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে বলার কারণ এই যে, আল্লাহ তাআলা ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু পূর্বেই জানেন। কিন্তু মানুষ কাজ করার পর তা আমলনামায় লিখিত হয়। এর মাধ্যমেই কাজটি আইনগত প্রকাশ লাভ করে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পার্শ্ব হেদায়েত ও পৃথিবীতে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পয়গম্বর প্রেরণ এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও মীযান অবতারণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাঁদের মধ্য থেকে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ (আঃ)-এর এবং পরে পয়গম্বরগণের

শ্রদ্ধাভাজন ও মানবমণ্ডলীর ইমাম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত পয়গম্বর ও ঐশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তাঁরা সব এঁদেরই বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ, নূহ (আঃ)-এর সেই শাখাকে এই গৌরব অর্জনের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যাতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন এবং যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা সব ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর।

এই বিশেষ আলোচনার পর পয়গম্বরগণের সমগ্র পরম্পরাকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে : **تَوَفَّيْنَا عَلَى الْكَلَامِ** অর্থাৎ, এরপর তাঁদের পশ্চাতে একের পর এক আমি আমার পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী-ইসরাঈলের সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আঃ)-এর উল্লেখ করে শেষবনী মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর শরীয়ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হাওয়ায়ীরগণের বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : **وَجَعَلْنَا لِقُلُوبِ الَّذِينَ آمَنُوا رِافَةً وَرَحْمَةً**

—অর্থাৎ, যারা হযরত ঈসা (আঃ) অথবা ইঞ্জিলের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে স্নেহ ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও করুণাশীল কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি তারা অনুগ্রহশীল। **رافة** ও **رحمة** শব্দদ্বয়কে সমার্থবোধক মনে করা হয়। এখানে ভিন্নমুখী করে উল্লেখ করায় কেউ কেউ বলেন : **رافة** এর অর্থ অতি দয়া। সাধারণ দয়ার চাইতে এতে যেন আতিশয্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : কারও প্রতি দয়া করার দু'টি অভ্যাসগত কারণ থাকে। এক, সে কষ্টে পতিত থাকলে তার কষ্ট দূর করে দেয়া। একে **رافة** বলা হয়। দুই, কোন বস্তুর প্রয়োজন থাকলে তাকে দান করা। একে **رحمة** বলা হয়। মোটকথা **رافة** এর সম্পর্ক ক্ষতি দূর করার সাথে এবং **رحمة** এর সম্পর্ক উপকার অর্জনের সাথে। ক্ষতি দূর করাকে সবদিক দিয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তাই এই শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হলে **رافة** কে অগ্রে আনা হয়।

এখানে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাহাবী তথা হাওয়ায়ীরগণের দু'টি বিশেষ গুণ **رافة** ও **رحمة** উল্লেখ করা হয়েছে ; যেমন রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবায়ে-কেরামের কয়েকটি বিশেষ গুণ সূরা ফাতহ-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে **رَحْمَةً** কিন্তু এর আগে সাহাবায়ে-কেরামের আরও একটি বিশেষ গুণ **أَيْدِيهِمْ لِنُكْتَرِ** ও বর্ণিত হয়েছে ; অর্থাৎ, তাঁরা কাফেরদের প্রতি বজ্রকঠোর। পার্থক্যের কারণ এই যে, ঈসা (আঃ)-এর শরীয়তে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের বিধান ছিল না। তাই কাফেরদের বিপক্ষে কঠোরতা প্রকাশ করার কোন স্থানই সেখানে ছিল না।

সন্ধ্যাসবাদের অর্থ : **رَهْبَانِيَّة - وَرَهْبَانِيَّةٌ لِّأَيَّدُ عُمُومًا** শব্দটি **رهبان** - এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। **رهبان** ও **راهب** - এর অর্থ যে ভয় করে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর বনী-ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপককারে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষতঃ রাজন্যবর্গ ও শাসকশ্রেণী ইঞ্জিলের বিধানাবলীর প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী-ইসরাঈলের মধ্যে কিছুসংখ্যক খাঁটি আলেম ও সং কর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা এই ধর্মবিমুখতাকে রুখে দাঁড়ালে তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। যে কয়েকজন প্রাণে বেঁচে গেলেন তারা দেখলেন যে, মোকাবেলার শক্তি তাঁদের নেই ;

কিন্তু এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাঁদের দ্বীন-ইমান বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা স্বতঃপ্রসঙ্গিত হয়ে নিজেদের জন্যে জরুরী করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দিবেন, বিবাহ করবেন না, ঋণগ্রহণ-পরা এবং ভোগ্যবস্তু সঞ্ছদ করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্যে গৃহ নির্মাণে যত্নবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের জীবন অতিবাহিত করবেন অথবা যাত্রাবরদের ন্যায় ব্রহ্মণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দিবেন যাতে ধর্মের বিশি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে পালন করা যায়। তারা আল্লাহর ভয়ে এই কর্ম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন; তাই তাঁরা رَاهِبٌ অথবা رَهْبَانٍ তথা সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হল এবং তাঁদের উচ্ছাবিত মতবাদ رَهْبَانِيَّة নামে খ্যাতি লাভ করেন।

তাদের এই মতবাদ পরিস্থিতির চাপে অপারক হয়ে নিজেদের ধর্মের হেফাজতের জন্যে ছিল। তাই এটা মূলতঃ নিন্দনীয় ছিল না। তবে কোন বিষয়কে আল্লাহর জন্যে নিজেদের উপর অপরিস্রব করে নেয়ার পর তাতে ক্রটি ও বিরুদ্ধাচরণ করা গুরুতর পাপ। উদাহরণতঃ মানত আসলে কারও উপর গুয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কোন ব্যক্তি নিজে কোন বস্তুকে মানত করতঃ নিজের উপর হারাম অথবা গুয়াজিব করে নিলে শরীয়তের আইনে তা পালন করা গুয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা গোনাহ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কতক লোক সন্ন্যাসবাদের নামের আড়ালে দুনিয়া উপার্জন ও ভোগ বিলাসে মগ্ন হয়ে পড়ে। কেননা, জনসাধারণ তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং হাদিয়া ও নযর-নিয়ায আগমন করতে থাকে। তাদের চারপাশে নারী-পুরুষের ভিড় জমতে থাকে। ফলে বেহায়াপনাও যথাসাধ্য দিয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাক এ বিষয়েই তাদের সমালোচনা করেছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ভোগ বিলাস বিসর্জন দেয়া অপরিহার্য করে নিয়েছিল—আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরয করা হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের উচিত ছিল এটা পালন করা, কিন্তু তারা তাও ঠিকমত পালন করতে পারেনি।

তাদের এই কর্মপন্থা মূলতঃ নিন্দনীয় ছিল না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)—এর হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে-কাসীর বর্ণিত এই হাদীসে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন : বনী-ইসরাঈল বাহ্যগত দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি দল আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রথম দলটি হযরত ইদ্রাস (আঃ)—এর পর অত্যাচারী রাজন্যবর্গ ও ঐশ্বর্যশালী পাপাচারীদেরকে পূর্ণ শক্তি সহকারে রুখে দাঁড়ায়, সত্যের বাণী সর্বোচ্চে তুলে ধরে এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু অশুভ শক্তির মোকাবেলায় পরাজিত হয়ে তারা নিহত হয়। তাদের স্থলে অপর একদল দাওয়াতমান হয়। তাদের মোকাবেলা করার এতটুকুও শক্তি ছিল না, কিন্তু তারা জীবনশপন করে মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেয়। পরিশেষে তাদেরকেও হত্যা করা হয়। কতককে কুরাত দুরা চিরা হয় এবং কতককে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় বিপদাপদে সবার করে। এই দলটিও মুক্তি পেয়েছে, এরপর তৃতীয় দল তাদের জায়গায় আসে। তাদের মধ্যে মোকাবেলায়ও শক্তি ছিল না এবং পাপাচারীদের সাথে থেকে নিজেদের ধর্ম বরবাদ করারও তারা পক্ষপাতী ছিল না। তাই তারা জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ বেছে নেয় এক সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আল্লাহ জাহালা رَهْبَانِيَّة لِابْنِ عَدُوْمَا مَا كَتَبَ لَهَا عَلَيْهِمْ আয়াতে তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা সন্ন্যাসবাদ অবলম্বন করে তা যথাযথভাবে পালন করেছে এবং বিপদাপদে সবার করেছে, তারাও মুক্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতের এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, যে ধরনের সন্ন্যাসবাদ প্রথমে তারা অবলম্বন করেছিল, তা নিন্দনীয় ও মন্দ ছিল না। তবে সেটা শরীয়তের বিধানও ছিল না। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের উপর তা জরুরী করে নিয়েছিল। কিন্তু জরুরী করার পর কেউ কেউ একে যথাযথভাবে পালন করেনি। এখান থেকেই এর নিন্দনীয় ও মন্দ দিক শুরু হয়। যারা পালন করেনি, তাদের সংখ্যাই বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাই অধিকাংশের কাছকে সবার কাছ ধরে নিয়ে কোরআন গোটা বনী-ইসরাঈল সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, তারা যে সন্ন্যাসবাদকে নিজেদের উপর জরুরী করে নিয়েছিল, তা যথাযথ পালন করেনি

فَاَعْوِهُمُ احْسِنْ رِءَايَهُمَا

এ থেকে আরও জানা গেল যে, اَبْدَعُوا শব্দটি থেকে উদ্ভূত হলেও এস্থলে এর আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, উদ্ভাবন করা। এখানে পারিভাষিক বিদ্যাত বোঝানো হয়নি, যে সম্পর্কে হাদীসে আছে اَبْدَعُوا كُلُّ اَرْفَاةٍ, প্রত্যেক বিদ্যাতই পঞ্চবটতা।

কোরআন পাকের কর্নাচিঙ্গ প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত ব্যাখ্যায় সত্যতা ফুটে উঠে। সর্বপ্রথম এই বাক্যের প্রতিই লক্ষ্য করুন :

وَصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ اِنَّ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

এখানে আল্লাহ তাআলা স্বীয় নেয়ামত প্রকাশ করার জায়গায় বলেছেন আমি তাদের অন্তরে স্নেহ, দয়া ও সন্ন্যাসবাদ সৃষ্টি করেছি। এ থেকে বোঝা যায় যে, স্নেহ ও দয়া যেমন নিন্দনীয় নয়, তেমনি তাদের অবলম্বিত সন্ন্যাসবাদও সঙ্গতভাবে নিন্দনীয় ছিল না। নতুবা এ স্থলে একে স্নেহ ও দয়ার সাথে উল্লেখ করার কোন কারণ ছিল না। এ কারণেই যারা সন্ন্যাসবাদকে সর্বাবস্থায় দৃষ্ণীয় মনে করেন, তাদেরকে এ স্থলে বাক্যের সাথে رَهْبَانِيَّة শব্দটির সংযুক্তির ব্যাপারে অনাবশ্যক ব্যাকরণিক হেরফেরের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তারা বলেন যে, এখানে رَهْبَانِيَّة শব্দের আসে اَبْدَعُوا বাক্যটি উহা আছে। ইমাম কুরতুবী তাই বলেছেন। কিন্তু উপরোক্ত তফসীর অনুযায়ী এই হেরফেরের কোন প্রয়োজন থাকে না। এরপরও কোরআন পাক তাদের এই উদ্ভাবনের কোনরূপ বিরূপ সমালোচনা করেনি; বরং সমালোচনা এ বিষয়ের কারণে করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের উচ্ছাবিত এই সন্ন্যাসবাদ যথাযথ পালন করেনি। এটাও اَبْدَعُوا শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে নিলেই সম্ভবপর। পারিভাষিক অর্থে হলে কোরআন স্বয়ং এর বিরূপে সমালোচনা করত। কেননা, পারিভাষিক বিদ্যাতও একটি পঞ্চবটতা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)—এর পূর্বোক্ত হাদীসেও সন্ন্যাসবাদ অবলম্বনকারী দলকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল গণ্য করা হয়েছে। তারা যদি পারিভাষিক বিদ্যাতের অপরায় অপরায়ী হত, তবে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়—পঞ্চবটদের মধ্যে গণ্য হত।

সন্ন্যাসবাদ সর্বাবস্থায়ই কি নিন্দনীয় ও অবৈধ : বিশুদ্ধ কথা এই যে, رَهْبَانِيَّة শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে, ভোগ-বিলাস বিসর্জন ও অবৈধ কাজ-কর্ম বর্জন। এর কয়েকটি স্তর আছে। (এক) কোন অনুমোদিত ও হলাল বস্তুকে বিন্যাসগতভাবে অথবা কার্যতঃ হারাম সাব্যস্ত করা। এই অর্থে সন্ন্যাসবাদ নিশ্চিত হারাম। কারণ, এটা ধর্মের পরিবর্তন ও বিকৃতি।

কোরআন পাকের **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْمِلُوا وِثْرَتَكُمْ مَأْكَلِ اللَّهِ** আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়েই নিষেধাজ্ঞা ও অবৈধতা বিধৃত হয়েছে। এই আয়াতে **لَا تَحْمِلُوا** শব্দটিই ব্যক্ত করছে যে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে আল্লাহর হালালকৃত বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যতঃ হারাম সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহর বিধানাবলী পরিবর্তন ও বিকৃত করার নামান্তর।

(দুই) অনুমোদিত কাজকর্মকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যতঃ হারাম সাব্যস্ত করে না, কিন্তু কোন কোন পার্শ্বি কিংবা ধর্মীয় প্রয়োজনের খাতিরে অনুমোদিত কাজ বর্জন করে। পার্শ্বি প্রয়োজন যেমন কোন রোগব্যাবির আশংকা করে কোন অনুমোদিত বস্তু ভক্ষণে বিরত থাকা এবং ধর্মীয় প্রয়োজন—যেমন, পরিণামে কোন গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকায় কোন বৈধ কাজ বর্জন করা। উদাহরণতঃ মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ মানুষের সাথে মেলামেশাই বর্জন করে; কিংবা কোন কুশভাবের প্রতিকারার্থে কিছুদিন পর্যন্ত কোন কোন বৈধ কাজ বর্জন করতঃ তা ততদিন অব্যাহত রাখা, যতদিন কুশভাব সম্পূর্ণ দূর না হয়ে যায়। সূফী বুয়ুগগণ মূরীদকে কম আহার, কম নিদ্রা ও কম মেলামেশার জোর আদেশ দেন। কারণ, এটা প্রবৃত্তি বশীভূত হয়ে গেলে এবং অবৈধতায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা দূর হয়ে গেলে এই সাধনা ত্যাগ করা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে সন্যাসবাদ নয়; বরং তাকওয়া, যা ধর্মপরায়ণদের কাম্য এবং সাহাবী, তাবয়ী ও ইমামগণ থেকে প্রমাণিত।

(তিন) কোন অবৈধ বিষয়কে যেভাবে ব্যবহার করা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত আছে সেইরূপ ব্যবহার বর্জন করা এবং একেই সওয়াব ও উত্তম মনে করা। এটা এক প্রকার বাড়াবাড়ি, যা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর অনেক হাদীসে নিষিদ্ধ। এক হাদীসে আছে **لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ** অর্থাৎ, ইসলামে সন্ন্যাসবাদ নেই। এতে এই তৃতীয় স্তরের বর্জনই বোঝানো হয়েছে। বনী-ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে যে সন্ন্যাসবাদের গোড়াপত্তন হয়, তা ধর্মের হেফাজতের প্রয়োজনে হলে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ, তাকওয়ার মধ্যে দাখিল। কিন্তু কিতাবধারীদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি ছিল। এই বাড়াবাড়ির ফলে তারা প্রথম স্তর অর্থাৎ, হালালকে হারাম করা পর্যন্ত পৌঁছে থাকলে তারা হারাম কাজ করেছে। আর তৃতীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছে থাকলেও এক নিন্দনীয় কাজের অপরাধী হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَأَمْلُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ

نَحْوِهِ — এই আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)—এর প্রতি বিশ্বাসী কিতাবধারী মুমিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** বলে কেবল মুসলমানগণকে সম্বোধন করাই কোরআন পাকের সাধারণ রীতি। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বেলায় ‘আহলে কিতাব’ শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেননা, রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু মুসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)—এর প্রতি তাদের বিশ্বাস যথেষ্ট ও ধর্তব্য নয়। কাজেই তারা **الَّذِينَ آمَنُوا** কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এই সাধারণ রীতির বিপরীতে খ্রীষ্টানদের জন্য **الَّذِينَ آمَنُوا** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এর রহস্য এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, এটাই হযরত ঈসা (আঃ)—এর প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের দাবী। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরোক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে যাবে।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও সওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে। এক সওয়াব হযরত মুসা (আঃ) অথবা ঈসা (আঃ)—এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ও তাঁদের শরীয়ত পালন করার এবং দ্বিতীয় সওয়াব শেখনবী (সাঃ)—এর প্রতি ঈমান ও তাঁর শরীয়ত পালন করার এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত আছে যে, ইহুদী-ও খ্রীষ্টানরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কাফের ছিল এবং কাফেরদের কোন এবাদত গ্রহণীয় নয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বিগত শরীয়তানুযায়ী তাদের সব কাজকর্ম নিষ্ফল হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, কাফের মুসলমান হয়ে গেলে তার কাফের অবস্থায় কৃত সব সংকর্ম বহাল করে দেয়া হয়। ফলে সে দুই সওয়াবের অধিকারী হয়।

لَا يَحْمِلُونَ وِثْرَتَكُمْ এখানে لا অতিরিক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উল্লেখিত বিধানাবলী এজন্যে বর্ণনা করা হল, যাতে কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, তারা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে কেবল ঈসা (আঃ)—এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেই আল্লাহ তাআলার কৃপা লাভের যোগ্য নয়। যদি তারা নিজেদের বর্তমান অস্থি পরিবর্তন করে এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে, তবেই তারা আল্লাহর কৃপালাভে সমর্থ হবে।

সূরা হাদীদ সমাপ্ত।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا
تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ مَا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ رَسُولِهِ
الَّذِينَ يَظْهَرُونَ مُتَنَبِّهِينَ وَإِنَّمَا تَأْمَنُ بِغُلَامَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
إِلَّا إِلَهِكَ وَلَوْ أَنَّكَ لَتَكْفُلُونَ كُفْرًا لَمَنْ تَدَّعَى
إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ تَحْتِ يَدَيْهِمْ ثُمَّ
يُعَادُونَ لِمَا قَالُوا فَتَعْرِضُ رَوَافِدَهُمْ قُلْ لِيَ تَكْفُلَ
وَعَفْوَنَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَحْدِثْ فَمَنْ
شَهِدَ مِنْ مَتَابِعَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَقَ لَمْ يَكُنْ بِطَائِفَةٍ
بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُنَّ ذَلِكَ لَكُمْ وَمَوْلَاهُ وَمَوْلَى ذَلِكَ حَدُّهُ وَاللَّهُ
وَالَّذِينَ عَادَ الْيَهُودَ الَّذِينَ يُجَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
كَيْفَ لَكُمْ أَنْتُمْ مِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ آيَاتُ
لِلَّذِينَ عَادَ الْيَهُودَ الَّذِينَ يُجَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
بِمَا عَمِلُوا وَأَخْصَا اللَّهُ لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

সূরা আল-মুজাদালাহ
মদীনার অবতীর্ণ : আয়াত ২২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহর দরবারে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ আপনাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনে। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু শুনে, সবকিছু দেখে। (২) তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীকে মাতা বলে ফেলে, তাদের স্ত্রীশিশু তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা কেবল তারা, যারা তাদেরকে অনুদান করেছে। তারা তো অসমীচীন ও ভিত্তিহীন কথাই বলে। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্রমশীল। (৩) যারা তাদের স্ত্রীকে মাতা বলে ফেলে, অতঃপর নিজেদের উক্তি প্রত্যাখ্যার করে, তাদের কাকুলতা এই : একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে। এটা তোমাদের জন্যে উপদেশ হবে। আল্লাহ খবর রাখেন তোমরা যা কর। (৪) যার এ সমর্থন নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একাধিকমুহ দুই মাস রোযা রাখবে। যে এতেও অক্ষম, সে যাক্ত জন মিসকীনকে আহার করবে। এটা এজন্যে, যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিবিশ্বাস স্থাপন কর। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি। আর কাকুলদের জন্যে রয়েছে যত্নানাদায়ক আজাব (৫) যারা আল্লাহর তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা অপদহ হয়েছেন, যেমন অপদহ হয়েছে তাদের পূর্বপুরুষ। আমি স্পষ্ট আয়াতসমূহ নাখিল করেছি। আর কাকুলদের জন্যে রয়েছে অশমনজনক শাস্তি। (৬) সেদিন সূরীয় ; যেদিন আল্লাহ তাদের সর্বককে পুনরুজ্জীবিত করবেন, অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তারা করত। আল্লাহ তার হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহর সামনে উপস্থিত আছে সব বস্তু।

শানে-নুযল : একটি বিশেষ ঘটনা এই সূরার প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত অবতরণের হেতু। হযরত আওস ইবনে সামেত (রাঃ) একবার তাঁর স্ত্রী খাওলাকে বলে দিলেন : **أنت على كظهم أمي** অর্থাৎ তুমি আমার পক্ষে আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের ন্যায়; মানে হারাম। ইসলাম-পূর্বকালে এই বাক্যটি স্ত্রীকে চিরতরে হারাম করার জন্যে বলা হত, যা ছিল চূড়ান্ত তালাক অপেক্ষাও কঠোরতর। এই ঘটনার পর হযরত খাওলা (রাঃ)-এর শরীয়তসম্মত বিধান জানার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন পর্যন্ত এই বিষয় সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি কোন ওহী অবতীর্ণ হয়নি। তাই তিনি পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী খাওলাকে বলে দিলেন : **ما اراك الا تاحرمت عليه** অর্থাৎ, আমার মতে তুমি তোমার স্বামীর জন্যে হারাম হয়ে গেছ। খাওলা একথা শুনে বিলাপ শুরু করে দিলেন এবং বললেন : আমি আমার যৌবন তার কাছে নিঃশেষ করেছে। এখন বার্ষিক সে আমার সাথে এই ব্যবহার করল। আমি কোথায় যাব। আমার ও আমার বাচ্চাদের ভরণ-পোষণ কিরূপে হবে। এক রেওয়ায়েতে খাওলায় এ উক্তিও বর্ণিত আছে **ما ذكره** অর্থাৎ, আমার স্বামী তো তালাক উচ্চারণ করেনি। এমনভাবেই তালাক কিরূপে হয়ে গেল? অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, খাওলা আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করলেন : **اللهم اني اشكو اليك** অর্থাৎ, আল্লাহ আমি তোমার কাছে অভিযোগ করছি। এক রেওয়ায়েতে আছে **ما امرت في شأنك بشئ** অর্থাৎ, তোমার মাসআলা সম্পর্কে আমার প্রতি এখন পর্যন্ত কোন বিধান অবতীর্ণ হয়নি (এসব রেওয়ায়েতে কোন বৈপরীত্য নেই। সবগুলোই সঠিক হতে পারে।) এই ঘটনার পরিলক্ষিত্রে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে।—(দূররে-মনসুর, ইবনে-কাসীর)

ফেকাহুর পরিভাষায় এই বিশেষ মাসালাটিকে 'মিহার' বলা হয়। এই সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহে মিহারের শরীয়তসম্মত বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এতে আল্লাহ তাআলা হযরত খাওলায় (রাঃ) ফরিয়াদ শুনে তার জন্যে তার সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন। তার খাতিরে আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে এসব আয়াত নাখিল করেছেন। তাই সাহাবায়ে কেয়াম এই মহিলার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতেন। একদিন খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) একদল লোকের সাথে গমনরত ছিলেন। পতিমধ্যে এই মহিলা সামনে এসে দণ্ডায়মান হলে তিনি দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা শুনলেন। কেউ কেউ বলল : আপনি এই বৃদ্ধার খাতিরে এতবড় দলকে পথে আটকিয়ে রাখলেন। খলীফা বললেন : জান ইনি কে? এ সেই মহিলা, যার কথা আল্লাহ তাআলা সপ্ত আকাশের উপরে শুনেছেন। অতএব, আমি কি তাঁর কথা এড়িয়ে যেতে পারি? আল্লাহর কসম, তিনি যদি খেচ্ছায় প্রস্থান না করতেন, তবে আমি রাত্রি পর্যন্ত তার সাথে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতাম।—(ইবনে-কাসীর)

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ—পূর্ববর্তি বর্ণিত হয়েছে যে, এসব আয়াতে উল্লেখিত নারী হলেন হযরত আওস ইবনে সামেত (রাঃ)-এর স্ত্রী খাওলা বিনতে সা'লাবা। তাঁর স্বামী তাঁর সাথে মিহার করেছিলেন। তিনি এই অভিযোগ নিয়ে রসূল করীম (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে সম্মান দান করে জওয়াবে এসব আয়াত

নাখিল করলেন। আল্লাহ্ তাআলা এসব আয়াতে কেবল যিহাদের শরীয়তসম্মত বিধান বর্ণনা এবং তাঁর কষ্ট দূর করার ব্যবস্থাই করেননি; বরং তাঁর মনোরঞ্জননের জন্যে শুক্রতই বলে দিলেন : যে নারী তার স্বামীর ব্যাপারে আশনার সাথে বাদানুবাদ করছিল, আমি তার কথা শুনেছি। একবার জগুয়াব দেয়া সত্ত্বেও মহিলা বার বার নিজের কষ্ট বর্ণনা করে রসুলুল্লাহ্ (সঃ)—এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আয়াতে একেই *مَجَادِلَةٌ* বলা হয়েছে। কতক রেওয়াজে আরও আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সঃ) জগুয়াবে খাওলাকে বললেন : তোমার ব্যাপারে আমার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার কোন বিধান নাখিল হয়নি। তখন দুঃখিনীর মুখে একথা উচ্চারিত হল : আশনার প্রতি তো প্রত্যেক ব্যাপারে বিধান নাখিল হয়। আমার ব্যাপারে কি হল যে, ওইও বন্ধ হয়ে গেল।—(কুরতুবী) এরপর খাওলা আল্লাহুর কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলেন। এর প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাখিল হয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন : সেই সস্তা পবিত্র, যিনি সব আওয়ায ও প্রত্যেকের ফরিয়াদ শুনে, খাওলা বিনতে সালাবা যখন রসুলুল্লাহ্ (সঃ)—এর কাছে তার স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছিল, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমি তার কোন কোন কথা শুনে পারিনি। অথচ আল্লাহ্ তাআলা সব শুনেছেন এবং বলেছেন : *قَدْ سَمِعَ اللَّهُ* (বোখারী, ইবনে-কাসীর)

ظَهَرَ শব্দটি *ظَهَرَ* - *الَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْكُمْ* শব্দটি থেকে উদ্ভূত। স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করে নেয়ার বিশেষ একটি পদ্ধতিকে *ظَهَرَ* বলা হয়। এটা ইসলাম-পূর্বকালে প্রচলিত ছিল। পদ্ধতিটি এই : স্বামী স্ত্রীকে বলে দিবে—*انت على كظهر امي* অর্থাৎ, তুমি আমার উপর আমার মাতার পৃষ্ঠদেশের মত হারাম। এখানে পেটই আসল উদ্দেশ্য, কিন্তু রূপকভঙ্গিতে পৃষ্ঠদেশের উল্লেখ করা হয়েছে।—(কুরতুবী)

আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে ইসলামী শরীয়ত এই প্রথার দ্বিধা সৎস্কার সাধন করেছে। প্রথমতঃ স্বয়ং যিহাদের প্রত্যেকেই অবৈধ ও পোনাহ্ স্যাবস্ত করেছে এবং বলেছে যে, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ কাম্য হলে তার বৈধ পন্থা হচ্ছে তলাক। সেটা অবলম্বন করা দরকার। যিহারকে একাঙ্গের জন্যে ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা স্ত্রীকে মাতা বলে দেয়া একটা অসার ও মিথ্যা বাক্য। কোরআন পাকে বলা হয়েছে : *تِلْكَ* অর্থাৎ, তাদের এই অসার উক্তি কারণে স্ত্রী মাতা হয়ে যায় না। মাতা তো সে-ই যার পেট থেকে ভূমিষ্ট হয়েছে : এরপর বলেছে : *وَالَّذِينَ يَمْنُونُ بِمَا قَالُوا* অর্থাৎ, তাদের এই উক্তি মিথ্যা এবং পাপও। কারণ, বাস্তব ঘটনার বিপরীতে স্ত্রীকে মাতা বলছে।

দ্বিতীয় সৎস্কার এই করেছে যে, যদি কোন মূর্খ অবাচীন ব্যক্তি এরূপ করেই বসে, তবে এই বাক্যের কারণে ইসলামী শরীয়তে স্ত্রী চিরতরে হারাম হবে না। কিন্তু এই বাক্য বলার পর স্ত্রীকে পূর্ববৎ ভোগ করার অধিকারও তাকে দেয়া হবে না। বরং তাকে জরিমানাধরূপ কাফ্কা আদায় করতে হবে। সে যদি এই উক্তি প্রত্যাহার করতে চায় এবং পূর্বের ন্যায় স্ত্রীকে ব্যবহার করতে চায়, তবে কাফ্কা আদায় করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। কাফ্কা আদায় না করলে স্ত্রী হালাল হবে না।

وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْكُمْ শব্দটি *يُؤَدُّونَ لِمَا قَالُوا* আয়াতের

অর্থ তাই। এখানে *يُؤَدُّونَ* শব্দের অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা আপন উক্তি প্রত্যাহার করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) *يُؤَدُّونَ* শব্দের অর্থ করেন *يُتْلَمُونَ* অর্থাৎ একথা বলার পর তারা অনুতপ্ত হয় এবং স্ত্রীর সাথে মেলাবেশ করত চায়।—(মাযহরী)

এই আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, স্ত্রীর সাথে মেলাবেশ হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই কাফ্কা ওয়াজিব হয়েছে। বোধ যিহার কাফ্কার কারণ নয়। বরং যিহার করা এমন পোনাহ্, যার কাফ্কা হচ্ছে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। আয়াত শেষে *وَاللَّهُ لَكَوْ غَفُورٌ* বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই কোন ব্যক্তি যদি যিহার করার পর স্ত্রীর সাথে মেলাবেশ করতে না চায়, তবে কেন কাফ্কা দিতে হবে না। তবে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ণ করা না জায়েয। স্ত্রী দাবী করলে কাফ্কা আদায় করে মেলাবেশ করা অথবা তলাক দিয়ে মুক্ত করা ওয়াজিব। স্বামী স্বেচ্ছায় এরূপ না করলে স্ত্রী আদালতে রুজু হয়ে স্বামীকে এরূপ করতে বাধ্য করতে পারে।

فَقَرَّبَ رُفْقًا - অর্থাৎ, যিহারের কাফ্কা এই যে, একজন দাস

অথবা দাসীকে মুক্ত করবে। এরূপ করতে সক্ষম না হলে একাদিক্রমে দুই মাস রোযা রাখবে। রোযা-ব্যাহি কিংবা দুর্বলতাবশত এতগুলো রোযা রাখতেও সক্ষম না হলে ষাট জন মিসকীনকে দু'কোনা পেট ভরে আহার করাবে। আহার করানোর পরিবর্তে ষাট জন মিসকীনকে জনপ্রতি একজনের ফেত্রা পরিমাণ গম কিংবা তার মূল্য দিলেও চলবে। আমাদের প্রচলিত গজনে একজনের ফেত্রার পরিমাণ হচ্ছে পোনে দু'সের গম।

لَكُمْ فِي مَالِكِكُمْ وَفِي مَالِكِكُمْ وَفِي مَالِكِكُمْ

أَكْثَرُ - এই আয়াতে ইয়ান বলে শরীয়ত ও বিধানাবলী পালন বোঝানো হয়েছে। বলা হয়েছে : কাফ্কা ইত্যাদির বিধান আল্লাহুর নির্ধারিত সীমা। এই সীমা ভিত্তিমা হারাম। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইসলাম বিবাহ, তলাক, যিহার ও অন্যান্য সব ব্যাপারে মূর্ততা যুগ্মের প্রথা-পদ্ধতি বিলোপ করে সুময় ও বিত্তপদ্ধতি শিকা দিয়েছে। তোমরা এগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত থাক। যারা এসব সীমা মানে না তথা কাকের, তাদের জন্যে যন্ত্রপাদায়ক শাস্তি আছে।

إِنَّ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ كُفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَمَا أُتُوا بِهِ

—পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহুর সীমা ও ইসলামের বিধানাবলী পালন করার তাকীদ ছিল। এই আয়াতে বিরুদ্ধাচরণকারীদের প্রতি শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এতে পার্শ্বি লাঞ্ছনা ও উদ্দেশ্যে ব্যর্থতা এবং পরকালে কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

أَحْصَا اللَّهُ أَعْيُنَهُ - এতে হশিয়ায় করা হয়েছে যে, মানুষ

দুনিয়াতে পাগাচার করে যায় এক তা তার সুরূপও থাকে না। সুরূপ না থাকার কারণ হচ্ছে একে মোটেই গুরুত্ব না দেয়া। কিন্তু তার সব পাগাচার আল্লাহুর কাছে লিখিত আছে। আল্লাহ্ তাআলার সব সুরূপ আছে। এজন্যে আশাব হবে।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ
 نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ سَامِعٌ بَصِيرٌ ۚ وَلَا تَحْسَبُ الْأُمُورَ إِلَّا بِحُكْمِ اللَّهِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ هُوَ أَعْنَى
 الْجَوَىٰ فَيُوعِدُونَ لِمَا هُوَ عَنْهُمْ وَيَنْبَغُونَ بِالْأَمْرِ وَالْعُدْوَانِ
 وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ۖ وَإِذْ أَجَاءَ وَكَذَّبُوا بِمَا هُمْ يُحْيِيكَ بِهِ اللَّهُ
 يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَعْمَلُ ۚ هَٰؤُلَاءِ
 يَصُولُوا فَيُشْسِ الصِّدْقَ ۖ يَأْتِيهِمُ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَوْا
 فَلَا تَنَاجَوْا إِلَّا بِالْأَمْرِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا
 بِالْبُيُوتِ وَالْمَقَاتِلِ وَأَتَوْا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۚ إِنَّهُ الْعَاجِزُ
 مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَرْبِهِمْ شَيْئًا إِلَّا
 بِإِذْنِ اللَّهِ وَكُلَّ اللَّهُ فَعَلِيكَوَلِّ الْمُؤْمِنُونَ ۖ يَأْتِيهِمُ الَّذِينَ
 آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَقَسَّعُوا فِي الْمَجْلِسِ فَانْقَسَحُوا ۖ فَسِحَرَ اللَّهُ
 لَهُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فَاسْتَرُوا فَأَنْشَرُوا ۖ وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
 مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَرَحِمَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۚ

(৭) আপনি কি ভেবে দেখেননি যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন, তারা যা করে, তিনি কেয়ামতের দিন তা তাদেরকে জানিয়ে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সত্যক জ্ঞাত। (৮) আপনি কি ভেবে দেখেননি, যাদেরকে কানাঘুসা করতে নিষেধ করা হয়েছিল অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালংঘন এবং রসুলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাঘুসা করে। তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে, যদ্বারা আল্লাহ্ আপনাকে সালাম করেননি। তারা মনে মনে বলে : আমরা যা বলি, তজ্জন্যে আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন ? জাহান্নামই তাদের জন্যে যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। কতই না নিকট সেই জায়গা। (৯) মুমিনগণ, তোমরা যখন কানাকানি কর, তখন পাপাচার, সীমালংঘন ও রসুলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না বরং অনুগ্রহ ও খোদাতীতির ব্যাপারে কানাকানি করো। আল্লাহকে ভয় কর, যার কাছে তোমরা একত্রিত হবে। (১০) এই কানাঘুসা তো শয়তানের কাজ ; মুমিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্যে। তবে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। মুমিনদের উচিত আল্লাহর উপর ভরসা করা। (১১) মুমিনগণ, যখন তোমাদেরকে বলা হয় : মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও। আল্লাহ তোমাদের জন্যে প্রশস্ত করে দিবেন। যখন বলা হয় : উঠে যাও, তখন উঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত, আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন। আল্লাহ খবর রাখেন যা কিছু তোমরা কর।

শানে-নুযুল : উপরোক্ত আয়াতসমূহ অবতরণের কারণ কয়েকটি ঘটনা। (এক) ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে শান্তিচুক্তি ছিল। কিন্তু ইহুদীরা যখন কোন মুসলমানকে দেখত, তখন তার চিন্তাধারাকে বিকিণ্ড করার উদ্দেশ্যে পরস্পরে কানাকানি শুরু করে দিত। মুসলমান ব্যক্তি মনে করত যে, তার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করা হচ্ছে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) ইহুদীদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা বিরত হল না। এর পরিশ্রেক্ষিতে

... ۖ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

(দুই) মুনাফিকরাও এমনভাবে পরস্পরে কানাকানি করত। এর পরিশ্রেক্ষিতে إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا আয়াত নাযিল হল। (তিন) ইহুদীরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলে দুইমির ছলে ইসলাম শব্দের অর্থ মুতু। (চার) মুনাফিকরাও এমনভাবে বলত। উভয় ঘটনার পরিশ্রেক্ষিতে إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجَوْا আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইবনে-কাসীর ইমাম আহমদ (রহঃ) থেকে আরও বর্ণনা করেন যে, ইহুদীরা এভাবে সালাম করে চুপিসারে বলত :

لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَعْمَلُ - অর্থাৎ, আমাদের এই গোনাহের কারণে

আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন ? (পাঁচ) একবার রসুলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে সুফ্‌ফায় অবস্থানরত ছিলেন। মসজিদে অনেক লোক সমাগম ছিল। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কয়েকজন সাহাবী সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থান পেলেন না। মজলিসের লোকজনও চোপে চোপে বসে স্থান করে দিল না। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এই নির্বিকার দৃশ্য দেখে কয়েকজন লোককে মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আদেশ দিলেন। মুনাফিকরা 'এটা কেমন ইনসাফ' বলে আপত্তি জানাল। রসুলুল্লাহ (সাঃ) আরও বললেন : আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন, যে আপন ভাইয়ের জন্যে জায়গা খালি করে দেয়। এরপর লোকেরা জায়গা খালি করে দিল। এর পরিশ্রেক্ষিতে يَأْتِيهِمُ الَّذِينَ

... ۖ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

রেওয়াজেতের সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রথমে জায়গা খালি করে দেয়ার কথা বলে থাকতেন। কেউ কেউ খালি করে দিল, যা পর্যাপ্ত ছিল না এবং কেউ কেউ খালি করল না। তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে উঠে যেতে বলেছেন, যা মুনাফিকদের মনঃপূত হয়নি। (ছয়) কোন কোন বিভ্রাণী লোক রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কানকথা বলত। ফলে নিঃশব্দ মুসলমানগণ কথাবার্তা বলে উপকৃত হওয়ার সময় কম পেত। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছেও ধনীদেব দীর্ঘক্ষণ বসে কানকথা অপছন্দনীয় ছিল। এর পরিশ্রেক্ষিতে إِذَا تَنَاجَيْتُمْ

... ۖ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

ও মুনাফিকরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অনাবশ্যক কানকথা বলত। মুসলমানগণ কোন ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে কানকথা হচ্ছে ধারণা করে তা পছন্দ করত না। ফলে তাদেরকে নিষেধ করা হয়, যা هُوَ أَعْنَى বাক্যে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু যখন তারা বিরত হল না, তখন

... ۖ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

থেকে বিরত হয়। কারণ, অর্থ প্রীতির কারণে সদকা প্রদান করা তাদের জন্যে কষ্টকর ছিল।

(সাত) যখন রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে কানকথা বলায় পূর্বে সদকা প্রদান করার আদেশ হল, তখন অনেকে জরুরী কথাও বন্ধ করে দিল। এর পরিশ্রেক্ষিতে **لَمَّا أَتَاهَا** আয়াত নাখিল হল। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ধানভী (রঃ) বলেন : সদকা প্রদান করার আদেশে পূর্ব থেকেও **وَلَمَّا أَتَاهَا** আয়াতে অসমর্থ লোকদের কোলাহল শিথিল করা হয়েছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক সম্পূর্ণ অসমর্থও ছিল না এবং পুরোপুরি বিভ্রাণীও ছিল না। কম সামর্থ্য এবং অক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহের কারণে সম্ভবতঃ তাদের জন্যেই সদকা প্রদান করা কষ্টকর হয়েছিল। তাই তারা সদকা প্রদান করতে পারেনি এবং নিজেদেরকে আদেশের আওতা বহির্ভূতও মনে করেনি। আর কানকথা বলা এবাদতও ছিল না যে, এটা ত্যাগ করলে নিদার পাথ হয়ে যাবে। তাই তার কানকথা বলা বন্ধ করেছিল। —(সবগুলো রেওয়াজেতেই দূর-মনসুরে বর্ণিত আছে।) অবতরণের এসব হেতু জনার ফলে আয়াতসমূহের তফসীর বোঝা সহজ হবে। —(বয়ানুল-কোরআন)

* আলোচ্য আয়াতসমূহ শানে-নুযুলে বর্ণিত বিশেষ ঘটনাকীর পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হলেও কোরআনী নির্দেশসমূহ ব্যাপক হয়ে থাকে। এগুলোতে আকায়েদ, এবাদত, পারস্পরিক লেন-দেন ও সামাজিকতার যাবতীয় বিধি-বিধান বিদ্যমান থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহও পারস্পরিক কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে এমন ধরনের কতিপয় বিধান আছে।

গোপন পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ : গোপন পরামর্শ সাধারণতঃ বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে হয়ে থাকে, যাদের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তারা এই গোপন রহস্য কারও কাছে প্রকাশ করবে না। তাই এরূপ ক্ষেত্রে কারও প্রতি জলুম করা, কাউকে হত্যা করা, কারও বিষয়-সম্পত্তি অধিকার করা ইত্যাদি বিষয়েরও পরিকল্পনা করা হয়। আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলেছেন যে, আল্লাহর জ্ঞান সমস্ত বিশুদ্ধগতকে পরিবেষ্টিত। তোমরা যেখানে যত আত্মগোপন করেই পরামর্শ কর, আল্লাহ তাআলা তাঁর জ্ঞান, শ্রবণ ও দৃষ্টির দিক দিয়ে তোমাদের কাছে থাকেন এবং তোমাদের প্রত্যেক কথা শুনে, দেখেন ও জানেন। যদি তাতে কোন পাপ কাজ কর, তবে শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবে না। এতে বলা উদ্দেশ্য তো এই যে, তোমরা যতই কম বা বেশী মানুষে পরামর্শ ও কানাকানি কর না কেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন। উদারহরণস্বরূপ তিন ও পাঁচের সংখ্যা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা তিন জনে পরামর্শ কর, তবে বোঝে নাও যে, চতুর্থজন আল্লাহ তাআলা সেখানে বিদ্যমান আছেন। আর যদি পাঁচ জনে পরামর্শ কর, তবে ষষ্ঠ জন আল্লাহ তাআলা বিদ্যমান আছেন। তিন ও পাঁচের সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত আছে যে, দলের জন্যে আল্লাহর কাছে বেজোড় সংখ্যা পছন্দনীয়।

لَمَّا أَتَاهَا আয়াতের সারমর্ম তাই।

কানাকানি ও পরামর্শ সম্পর্কে একটি নির্দেশ : **الْوَعْلَى الَّذِينَ** **هُوَ** **الْبُيُوتِ** শানে নুযুলের ঘটনায় বলা হয়েছে, ইহুদী ও রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মধ্যে শাস্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন তৎপরতা চালাতে পারত না। কিন্তু ইসলাম ও

মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্তর্নিহিত জিয়াংসা চরিতার্থ করার এক পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করেছিল। তা এই যে, তারা যখন সাহাবীগণের মধ্য থেকে কাউকে কাছে আসতে দেখত, তখন পারস্পরিক কানাকানি ও গোপন পরামর্শের আকারে জটলা সৃষ্টি করত এবং আগন্তুক মুসলমানের দিকে কিছু ইশারা-ইঙ্গিত করত। ফলে আগন্তুক ধারণা করত যে, তার বিরুদ্ধেই কোন ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এতে সে উদ্ভিন্ন না হয়ে পারত না। রসূলুল্লাহ (সঃ) ইহুদীদেরকে এরূপ কানাকানি করতে নিষেধ করে দেন। **هُوَ** **الْبُيُوتِ** বাক্যে এই নিষেধাজ্ঞাই বর্ণিত হয়েছে।

এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মুসলমানদের জন্যেও আইন হয়ে যায় যে, তারাও পরস্পরে এমনভাবে কানাকানি ও পরামর্শ করবে না, যদ্বারা অন্য মুসলমান মানসিক কষ্ট পেতে পারে।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে-মসউদ (রাঃ)-এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন :

অর্থাৎ, যেখানে তোমরা তিন জন একত্রিত সেখানে দুই জন তৃতীয় জনকে ছেড়ে পরস্পরে কানাকানি ও গোপন কথাবার্তা বলবে না, যে পর্যন্ত আরও লোক না এসে যায়। কারণ, এতে সে মনঃক্ষুব্ধ হবে, সে নিজেই পর বলে ভাবে এবং তার বিরুদ্ধেই কথাবার্তা হচ্ছে বলে সে সন্দেহ করবে। —(মাহহরী)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَجَلَّيْتُمْ فَلَا تَكُنُوا لِبِائِثٍ وَالْمُتَوَلِّينَ

وَمَوَاصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَكُنُوا لِلْبِائِثِ وَالْمُتَوَلِّينَ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাকেরদেরকে অবৈধ কানাকানির কারণে হুসিয়ায় করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সব অবস্থা ও কথাবার্তা জানেন, তারা যেন তাদের কানাকানি ও পরামর্শের মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে। এই লক্ষ্য রাখার সাথে তারা যেন চোঁটা করে যাতে তাদের পরামর্শ ও কানকথার মধ্যে পাপাচার, জলুম অথবা শরীয়ত বিরুদ্ধ কোন প্রসঙ্গ না থাকে; বরং সংকাজের জন্যেই যেন তারা পরস্পরে পরামর্শ করে।

মজলিসের কতিপয় শিষ্টাচার : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ**

سَمِعُوا فِي الْمَلِكِ فَاتَّقُوا মুসলমানদের সাধারণ মজলিসসমূহের

বিধান এই যে, কিছু লোক পরে আগমন করলে উপবিষ্টরা তাদের বসার জায়গা করে দিবে এবং চেপে চেপে বসবে। এরূপ করলে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্যে প্রশস্ততা সৃষ্টি করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এই প্রশস্ততা পরকালে তো প্রকাশ্যই, সাংসারিক জীবিকায় এই প্রশস্ততা হলেও তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

এই আয়াতে মজলিসের শিষ্টাচার সম্পর্কিত দ্বিতীয় নির্দেশ এই :

وَأَقْبِلْ أَمْرًا وَتَكُنْ لَكُمْ —অর্থাৎ, যখন তোমাদের কাউকে

মজলিস থেকে উঠে যেতে বলা হয়, তখন গুটে যাও। আয়াতে কে বলবে, তার উল্লেখ নেই। তবে সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, স্বয়ং আগন্তুক ব্যক্তি নিজের জন্যে জায়গা করার উদ্দেশ্যে কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিলে তা জায়েয হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ الرُّسُولَ فَقَدْ تَوَلَّيْتُمْ يَدَيَّ
 نَجْوَاكُمْ صَدَقَ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ وَأَطَعُوا وَإِن تَوَلَّيْتُمُ اللَّهَ
 عَفْوٌ وَرَحِيمَةٌ ۖ أَسْفَعْتُكُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ
 صَدَقْتُ فَإِذَا كُنْتُمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
 آتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ جَبَّارٌ عَلَيْهِمُ الْعُقُوبَةُ ۖ
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا مَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ بِنَجْوَى وَلَا
 مِنْهُمْ وَهُمْ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا
 شَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ رَفَعْنَا أَعْيُنَهُمْ فَجَاءَهُ
 فَصْدٌ وَاعْنٌ سَبِيلَ اللَّهِ فَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۚ لَنْ نَغْنِي عَنْهُمْ
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَكُلْهُمْ وَرَنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ يَوْمَ يَبْعَهُمُ اللَّهُ جُوعًا يَنْفُلُونَ لَهُ
 كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
 الْكَذِبُونَ ۚ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ
 ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۚ
 إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۚ

(১২) মুমিনগণ, তোমরা রসূলের কাছে কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদকা প্রদান করবে। এটা তোমাদের জন্যে শ্রেয় ও পবিত্র হওয়ার ভাল উপায়। যদি তাতে সক্ষম না হও, তবে আল্লাহ্ কমাণীল, পরম দয়ালু। (১৩) তোমরা কি কানকথা বলার পূর্বে সদকা প্রদান করতে ভীত হয়ে গেলে? অতঃপর তোমরা যখন সদকা দিতে পারলে না এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে মাফ করে দিলেন তখন তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য কর। আল্লাহ্ খবর রাখেন তোমরা যা কর। (১৪) আপনি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেননি, যারা আল্লাহ্র গযবে নিপতিত সখাদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে? তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয় এবং তাদেরও দলভুক্ত নয়। তারা জেনেগুনে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। (১৫) আল্লাহ্ তাদের জন্যে কঠোর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করে, খুবই মন্দ। (১৬) তারা তাদের শপথকে ঢাল করে রেখেছেন, অতঃপর তারা আল্লাহ্র পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করে। অতঃপর, তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (১৭) আল্লাহ্র কবল থেকে তাদের ধন-সম্পদ ও সজান-সজ্জিত তাদেরকে মোটেই বাঁচাতে পারবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (১৮) যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুজ্জিত করবেন। অতঃপর তারা আল্লাহ্র সামনে শপথ করবে, যেমন তোমাদের সামনে শপথ করে। তারা মনে করবে যে, তারা কিছু সংপথে আছে। সাবধান, তারাই তো আসল মিথ্যাবাদী। (১৯) শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহ্র সুরা ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। (২০) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারাই লালিত্তদের দলভুক্ত।

(সাঃ) বলেন :

অর্থাৎ, একজন অপরজনকে দাঁড় করিয়ে তার জায়গায় বসবে না। বরং তোমরা চেপে বসে আগন্তকের জন্যে জায়গা করে দাও।— (বোখারী, মুসলিম, মুসনাদে-আহমদ, ইবনে-কাসীর)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ الرُّسُولَ - রসূল্লাহ্ (সাঃ) জনশিক্ষা

ও জন-সংস্কারের কাজে দিবারাত্র মশগুল থাকতেন। সাধারণ মজলিসসমূহে উপস্থিত লোকজন তাঁর অমিয়বাণী শুনে উপকৃত হত। এই সুবাদে কিছু লোক তাঁর সাথে আলাদাভাবে গোপন কথাবার্তা বলতে চাইলে তিনি সময় দিতেন। বলাবাহুল্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদা সময় দেয়া যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি কষ্টকর ব্যাপার। এতে মুনাফিকদের কিছু দুষ্টামিও শামিল হয়ে গিয়েছিল। তারা ষাটি মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশে রসূল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে একান্তে গমন ও গোপন কথা বলার সময় চাইত এবং দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা বলত। কিছু অজ্ঞ মুসলমানও স্বভাবগত কারণে কথা লম্বা করে মজলিসকে দীর্ঘায়িত করত। রসূল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই বোঝা হালকা করার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে এই আদেশ অবতীর্ণ করলেন যে, যারা রসূলের সাথে একান্তে কানকথা বলতে চায়, তারা প্রথমে কিছু সদকা প্রদান করবে। কোরআনে এই সদকার পরিমাণ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু আয়াত নাইল হওয়ার পর হযরত আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম একে বাস্তবায়িত করেন। তিনি এক দীনার সদকা প্রদান করে রসূল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ থেকে একান্তে কথা বলার সময় নেন।

একমাত্র হযরত আলীই আদেশটি বাস্তবায়িত করেন, এরপর তা রহিত হয়ে যায় এবং আর কেউ বাস্তবায়নের সুযোগ পাননি : আশ্চর্যের বিষয়, আদেশটি জারি করার পর খুব শীঘ্রই রহিত করে দেয়া হয়। কারণ, এর ফলে সাহাবয়ে-কেরামের মধ্যে অনেকেই অসুবিধার সন্মুখীন হন। হযরত আলী প্রায়ই বলতেন : কোরআনে একটি আয়াত এমন আছে, যা আমাকে ছাড়া কেউ বাস্তবায়ন করেনি—আমার পূর্বেও না এবং আমার পরেও কেউ করবে না। পূর্বে বাস্তবায়ন না করার কারণ তো জানা। পরে বাস্তবায়ন না করার কারণ এই যে, আয়াতটি রহিত হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, আগে সদকা প্রদান করার আলাচ্য আয়াতই সেই আয়াত।—(ইবনে-কাসীর)

আদেশটি রহিত হয়ে গেছে ঠিক ; কিন্তু এর ইঙ্গিত লক্ষ্য এভাবে অর্জিত হয়েছে যে, মুসলমানগণ তো আন্তরিক মহকবতের তাগিদেই এরূপ মজলিস দীর্ঘায়িত করা থেকে বিরত হয়ে গেল এবং মুনাফিকরা যখন দেখল যে, সাধারণ মুসলমানদের কর্মপন্থার বিপরীতে এরূপ করলে তারা চিহ্নিত হয়ে যাবে এবং মুনাফেকী ধরা পড়বে, তখন তারা এ থেকে বিরত হয়ে গেল।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا مَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ এসব আয়াতে

আল্লাহ্ তাআলা সেসব লোকের দূর্বস্থা ও পরিণামে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন, যারা আল্লাহ্র শত্রু কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে। মুশরিক, ইহুদী, খ্রীষ্টান অথবা অন্য যে কোন প্রকার কাফেরের সাথে কোন মুসলমানের বন্ধুত্ব রাখা জায়েয নয়। এটা মুক্তিগতভাবে সম্ভবপরও নয়। কেননা, মুমিনের আসল সম্পদ হচ্ছে আল্লাহ্র মহকবত। কাফের আল্লাহ্র

الحشر

৫২৭

قصة محمد الله ৩৮



(২১) আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন : আমি এবং আমার রসুলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিশ্বর, পরাক্রমশালী। (২২) যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ্ ইমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদ্ব্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জ্ঞান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। তাই আল্লাহ্র দল। জেনে রাখ, আল্লাহ্র দলই সফলকাম হবে।

সূরা আল-হাশর

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ২৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু।

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী। (২) তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে প্রথমবার একত্রিত করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিস্কার করেছেন। তোমরা খারগাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গুণ্ডো তাদেরকে আল্লাহ্র কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ্র শান্তি তাদের উপর এমনদিক থেকে আসল, যার কশ্মনাও তারা করেনি। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতঃপর, যে চক্ষুমান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৩) আল্লাহ্ যদি তাদের জন্যে নির্বাসন অবধারিত না করতেন, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে শান্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব।

দুশমন। যার অন্তরে কারও প্রতি সত্যিকার মহব্বত ও বন্ধুত্ব আছে, তার শত্রুর প্রতিও মহব্বত ও বন্ধুত্ব রাখা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এ কারণেই কোরআন পাকের অনেক আয়াতে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে এবং যে মুসলমান কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখে, তাকে কাফেরদেরই দলভুক্ত মনে করার শাস্তিবাদী উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু এসব বিধি-বিধান আন্তরিক বন্ধুত্বের সাথে সম্পৃক্ত।

কাফেরদের সাথে সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি, শুভেচ্ছা, অনুগ্রহ, বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান করা বন্ধুত্বের অর্থের মধ্যে দাখিল নয়। এগুলো কাফেরদের সাথেও করা জায়েয। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের প্রকাশ্য কাজ-কারবার এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে এসব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা জরুরী যে, এগুলো যেন নিজ ধর্মের জন্যে ক্ষতিকর না হয়, ইমান ও আমলে শৈথিল্য সৃষ্টি না করে এবং অন্যান্য মুসলমানদের জন্যেও ক্ষতিকর না হয়।

وَيَخِفُونَ كُلَّ الذِّكْرِ - কোন কোন রেওয়াজে আছে, এই

আয়াত আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ও আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবতাল মুনাফিক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের সাথে বসা ছিলেন, এমন সময় তিনি বললেন : এখন তোমাদের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করবে। তার অন্তর নিষ্ঠুর এবং সে শয়তানের চোখে দেখে। এর কিছুক্ষণ পরই আবদুল্লাহ্ ইবনে নাবতাল আগমন করল। তার চক্ষু ছিল নীলাভ ; দেহবয়ব বেটে গোম্ব বর্ণ এবং সে ছিল হালকা শূশ্রমণ্ডিত। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে বললেন : তুমি এবং তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দেয় কেন? সে শপথ করে বলল : আমি এরূপ করিনি। এরপর সে তার সঙ্গীদেরকেও ওকে আনল এবং তারাও মিছেমিছি শপথ করল। আল্লাহ্ তাআলা এই আয়াতে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ করে দিয়েছেন।-(তুরত্বী)

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুসলমানের আন্তরিক বন্ধুত্ব কাফেরের সাথে হতে পারে না :

لَا تُؤْمِنُ أُولَئِكَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَذْكُرُونَ مَن حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ প্রথম আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বকারীদের প্রতি আল্লাহ্র গণ্য ও কঠোর শাস্তির বর্ণনা ছিল। এই আয়াতে তাদের বিপরীতে ঋণী মুসলমানদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র শত্রু অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক রাখে না, যদিও সেই কাফের তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা নিকটাত্মীয়ও হয়।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) সবারই এই অবস্থা ছিল। এস্থলে তফসীরবিদগণ অনেক সাহাবীর এমন ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যাতে পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রমুখের মুখ থেকে ইসলাম অথবা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর বিরুদ্ধে কোন কথা শুনে সব সম্পর্ক ছেদ করে দিয়েছেন, তাদেরকে শান্তি দিয়েছেন এবং কতককে হত্যাও করেছেন।

মাসআলা : পাশাপাশি ফাসেক-ফাজের ও কার্হতঃ ধর্মবিমুখ মুসলমানদের বেলায়ও অনেক ফেকাহবিদ এই বিধান রেখেছেন যে, তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব রাখা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয হতে পারে না। কাজকর্মের প্রয়োজনে সহযোগিতা অথবা প্রয়োজন মফিক সাহচর্য ভিন্ন কথা, যার মধ্যে ফিস্ক তথা পাশাপাশির বীজানু বিদ্যমান

আছে, একমাত্র তার অন্তরেই কোন ফাসেক ও পাপাসক্তের প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকতে পারে। তাই রসুলে খোদা (সাঃ) তাঁর দোয়ায় বলতেন : لا تجعل لفاجر على يدك অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ আমাকে কোন পাপাসক্ত ব্যক্তির কাছে স্বীকৃত না। অর্থাৎ, তার কোন অনুগ্রহ যেন আমার উপর না থাকে। কেননা, সম্ভ্রান্ত মানুষ স্বভাবগত গুণের কারণে অনুগ্রহকারীর প্রতি বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখতে বাধ্য হয়। কাজেই ফাসেকদের অনুগ্রহ কবুল করা তাদের প্রতি মহকবতের সেতু। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এই সেতু নির্মাণ থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।—(কুরতুবী)

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا فِي الْأَرْحَامِ—এখানে কেউ কেউ রাহ-এর তফসীর করেছেন

নূর, যা মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়। এই নূরই তার সংকর্ম ও আন্তরিক প্রশান্তির উপায় হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এই প্রশান্তি একটি বিরাট শক্তি। আবার কেউ কেউ রাহ-এর তফসীর করেছেন কোরআন ও কোরআনের প্রমাণাদি। কারণ, এটাই মুমিনের আসল শক্তি।—(কুরতুবী)

সূরা আল-হাশর

ষোড়শ ও শানে নুযুল : পূর্ববর্তী সূরায় মুনাফিক ও ইহুদীদের বন্ধুত্বের নিন্দা করা হয়েছিল। এই সূরায় ইহুদীদের দুনিয়াতে নির্বাসনদণ্ড ও পরকালে জাহান্নামের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইহুদীদের বৃত্তান্ত এই যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় আগমন করার পর ইহুদীদের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। ইহুদীদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে এক গোত্র ছিল বনু-নুযায়ের। তারাও শান্তিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মদীনা থেকে দু'মাইল দূরে বসবাস করত। একবার আযর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী এর রক্ত বিনিময় আদায় করা মুসলমান-ইহুদী সকলেরই কর্তব্য ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুললেন। অতঃপর চুক্তি অনুযায়ী ইহুদীদের কাছ থেকেও রক্ত বিনিময়ের অর্থ গ্রহণ করার ইচ্ছা করলেন। সেমতে তিনি বনু-নুযায়ের গোত্রের কাছে গমন করলেন। তারা দেখল যে, পয়গম্বরকে হত্যা করার এটাই প্রকৃষ্ট সুযোগ। তাই তারা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বলল : আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমরা রক্ত বিনিময়ের অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছি। এরপর তারা গোপনে পরামর্শ করে স্থির করল যে, তিনি যে প্রাচীরের নীচে উপবিষ্ট আছেন, এক ব্যক্তি সেই প্রাচীরের উপরে উঠে একটি বিরাট ও ভারী পাথর তাঁর উপর ছেড়ে দিবে, যাতে তাঁর ভবলীলা সাজ হয়ে যায়। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তৎক্ষণাৎ ওহীর মাধ্যমে এই

চক্রান্তের বিষয় অবগত হয়ে গেলেন। তিনি সেস্থান ত্যাগ করে চলে এলেন এবং ইহুদীদেরকে বলে পাঠালেন : তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চুক্তি লঙ্ঘন করেছ। অতএব, তোমাদেরকে দশ দিনের সময় দেওয়া হল। এই সময়ের মধ্যে তোমরা যেখানে ইচ্ছা চলে যাও। এই সময়ের পর কেউ এখানে দৃষ্টিগোচর হলে তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। বনু-নুযায়ের মদীনা ত্যাগ করে চলে যেতে সম্মত হলে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক তাদেরকে বাধা দিয়ে বলল : তোমরা এখানেই থাক। অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমার অধীনে দুই হাজার যোদ্ধার একটি বাহিনী আছে। তারা প্রাণ দিবে, কিন্তু তোমাদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দিবে না। রুহুল-মা'আনীতে আছে, এ ব্যাপারে ওদিয়া ইবনে-মালেক, মুয়ায়েদ এবং

রায়েসও আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই-এর সাথে শরীক ছিল। বনু-নুযায়ের তাদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সদর্পে বলে পাঠাল : আমরা কোথাও যাব না। আপনি যা করতে পারেন, করেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে বনু-নুযায়ের গোত্রকে আক্রমণ করলেন। বনু-নুযায়ের দুর্গের ফটক বন্ধ করে বসে রইল এবং মুনাফিকরাও আত্মগোপন করল। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে চতুর্দিক থেকে অবরোধ করলেন এবং তাদের খজুর বৃক্ষে আশ্রয় দিলেন এবং কিছু কর্তন করিয়ে দিলেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তারা নির্বাসনদণ্ড মেনে নিল। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এই অবস্থায়ও তাদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে আদেশ দিলেন, আসবাবপত্র যে পরিমাণ সঙ্গে নিয়ে যেতে পার, নিয়ে যাও। তবে কোন অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে নিতে পারবেনা। এগুলো বাজেয়াপ্ত করা হবে। সে মতে বনু-নুযায়েরের কিছু লোক সিরিয়ায় এবং কিছু লোক খয়বরে চলে গেল। সংসারের প্রতি অসাধারণ মোহের কারণে তারা গৃহের কড়ি-কাঠ, তক্তা ও কপাট পর্যন্ত উপড়িয়ে নিয়ে গেল। ওহুদ যুদ্ধের পর চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে তাদেরকে পুনরায় অন্যান্য ইহুদীর সাথে খয়বর থেকে সিরিয়ায় নির্বাসিত করেন। এই নির্বাসনদুয়ই 'প্রথম সমাবেশ' ও 'দ্বিতীয় সমাবেশ' নামে অভিহিত।—(যাদুল মা'আদ)

সূরা হাশরের বৈশিষ্ট্য ও বনু-নুযায়ের গোত্রের ইতিহাস : সমগ্র সূরা হাশর ইহুদী বনু-নুযায়ের গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।—(ইবনে-ইসহাক) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই সূরার নামই 'সূরা বনু-নুযায়ের' বলতেন।—(ইবনে কাসীর) বনু-নুযায়ের হযরত হারুন (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে একটি ইহুদী গোত্র। তাদের পিতৃপুরুষগণ তওরাতের পণ্ডিত ছিলেন। তওরাতে খাতামুল আবিযা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সংবাদ, আকার-অবয়ব ও আলামত বর্ণিত আছে এবং তাঁর মদীনায় হিজরতের কথাও উল্লেখিত আছে। এই পরিবার শেখনবী (সাঃ)-এর সাহচর্যে থাকার আশায় সিরিয়া থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাদের বর্তমান লোকদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক তওরাতের পণ্ডিত ছিল এবং রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মদীনায় আগমনের পর তাঁকে আলামত দেখে চিনেও নিয়েছিল যে, ইনিই শেখনবী (সাঃ) কিন্তু তাদের ধারণা ছিল যে, শেখনবী হযরত হারুন (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে তাদের পরিবার থেকে আবির্ভূত হবেন। তা না হয়ে শেখনবী প্রেরিত হয়েছেন বনী-ইসরাঈলের পরিবর্তে বনী-ইসমাইলের বংশে। এই প্রতিহিংসা তাদেরকে বিশৃঙ্খল স্থাপনে বাধা দিল। এতদসত্ত্বেও তাদের অধিকাংশ লোক মনে মনে জানত এবং চিনত যে, ইনিই শেখনবী। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিস্ময়কর বিজয় এবং মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় দেখে তাদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর স্বীকারোক্তি তাদের মুখে শোনাও গিয়েছিল, কিন্তু এই বাহ্যিক জয়-পরাজয়কে সত্য ও মিথ্যা চিনার মাপকাঠি করাটাই ছিল অসার ও দুর্বলভিত্তি। ফলে ওহুদ যুদ্ধের প্রথমদিকে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় দেখা দিল এবং কিছু সাহাবী শহীদ হলেন, তখন তাদের বিশ্বাস টলটলান হয়ে গেল। এরপরই তারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করে দিল।

এর আগে ঘটনা এই হয়েছিল যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনা পৌঁছে রাজনৈতিক দুরদশিতার কারণে সর্বপ্রথম মদীনায় ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইহুদী গোত্রসমূহের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না এবং কোন আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা

আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে সাহায্য করবে। শাস্তিচুক্তিতে আরও অনেক ধারা ছিল। 'সীরত ইবনে-হেশামে' এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এমনিভাবে বনু-নুযায়েরসহ ইহুদীদের সকল গোত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে বনু-নুযায়েরের বসতি, দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং বাগ-বাগিচা ছিল।

ওহদ যুদ্ধ পর্যন্ত তাদেরকে বাহ্যতঃ এই শাস্তিচুক্তির অনুসারী দেখা যায়। কিন্তু ওহদ যুদ্ধের পর তারা বিশৃঙ্খলতা ও গোপন দূরভিসন্ধি শুরু করে দেয়। এই বিশৃঙ্খলতার সূচনা এভাবে হয় যে, বনু-নুযায়েরের জনৈক সর্দার কা'ব ইবনে-আশরাফ ওহদ যুদ্ধের পর আরও চল্লিশ জন ইহুদীকে সাথে নিয়ে মক্কা পৌঁছে এবং ওহদ যুদ্ধ ফেরত কোরায়শী কাফেরদের সাথে সাক্ষাত করে। দীর্ঘ আলোচনার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত হয়। চুক্তিটি পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে কা'ব ইবনে আশরাফ চল্লিশ জন ইহুদীসহ এবং প্রতিপক্ষের আবু সুফিয়ান চল্লিশ জন কোরায়শী নেতাসহ কাবা গৃহে প্রবেশ করে এবং বায়তুল্লাহর গোলাফ স্পর্শকরতঃ পারস্পরিক সহযোগিতা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করে।

চুক্তি সম্পাদনের পর কা'ব ইবনে-আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আদ্যোপাশ্চ ঘটনা এবং চুক্তির বিবরণ বলে দেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যার আদেশ জারি করেন এবং মুহাম্মদ ইবনে-মাসলামা (রাঃ) সাহাবী তাকে হত্যা করেন।

এরপর বনু-নুযায়েরের আরও অনেক চক্রান্ত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অবহিত হতে থাকেন। তন্মধ্যে একটি উপরে শানে-নুযুলে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)-কে হত্যার চক্রান্ত করে। যদি ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাত্ক্ষনিকভাবে এই চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত না হতেন, তবে তারা হত্যার এই ষড়যন্ত্রে সফলকাম হয়ে যেত। কেননা, যে গৃহের নীচে তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বসিয়েছিল, তার ছাদে চড়ে একটি প্রকাণ্ড ভারী পাথর তাঁর মাথায় ছেড়ে দেয়ার পরিকল্পনা প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে ব্যক্তি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছিল, তার নাম ওমর ইবনে-জাহ্‌শ, আল্লাহ তাআলার হেফাযতের কারণে এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর ঘটনা : শানে-নুযুলের ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমর ইবনে উমাইয়া যমরীর হাতে দু'টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই হত্যাকাণ্ডের রক্ত বিনিময় সপ্তাহের চেষ্টা করেছিলেন। এ ব্যাপারেই বনু-নুযায়েরের চাঁদা লাভ করার জন্যে তিনি তাদের জনপদে গমন করেছিলেন। এর পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে ইবনে-কাসীর লিখেন : মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের ষড়যন্ত্র ও উৎপীড়নের কাহিনী অতিদীর্ঘ। তন্মধ্যে বীরে-মাউনার ঘটনাটি ইসলামের

ইতিহাসে সুবিদিত। একবার কিছু সংখ্যক মুনাফিক ও কাফের তাদের জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে একদল সাহাবী প্রেরণ করার আবেদন করে। তিনি সন্তর জন সাহাবীর একটি দল তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু পরে জানা যায় যে, এটা নিছক একটা চক্রান্ত ছিল। কাফেরেরা মুসলমানগণকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং এতে তারা সফলও হয়ে যায়। সাহাবীগণের মধ্যে একমাত্র আমর ইবনে যমীর কোনরূপে পলায়ন করতে সক্ষম হন। যিনি এইমাত্র কাফেরদের বিশৃঙ্খলতা এবং তাঁর উনসন্তর জন সঙ্গীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন, কাফেরদের মোকাবেলায় তাঁর মনোবৃত্তি কি হবে, তা অনুমান করা কারও পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। ঘটনাক্রমে মদীনায় ফিরে আসার সময় পশ্চিমদিকে তিনি দুইজন কাফেরের মুখোমুখি হন। তিনি কালবিলম্ব না করে উভয়কে হত্যাকরেন। পরে জানা যায় যে, তারা ছিল বনী-আমের গোত্রের লোক, যাদের সাথে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শাস্তিচুক্তি ছিল।

لَاؤُلُ الْحَرِّ - বনু-নুযায়েরের এই নির্বাসনকে কোরআন পাক

'আউয়ালে হাশর' তথা প্রথম সমাবেশ আখ্যা দিয়েছে। এর এক কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রাচীনকাল থেকে তারা একজায়গায় বসবাস করত। স্থানান্তর ও নির্বাসনের ঘটনা তাদের জীবনে এই প্রথমবার সংঘটিত হয়েছিল। এর আরও একটি কারণ এই যে, ইসলামের ভবিষ্যৎ প্রকৃত নির্দেশ ছিল আরব উপদ্বীপকে অমুসলিমদের থেকে মুক্ত করতে হবে, যাতে এটা ইসলামের এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়। এর ফলে নির্বাসনের আকারে দ্বিতীয় সমাবেশ হওয়া অবশ্যস্বাভাবিক ছিল। এটা হযরত ফারাকে আযম (রাঃ)-এর খেলাফতকালে বাস্তবরূপে পরিগ্রহ করে এবং নির্বাসিত হয়ে যারা খয়বরে বসতি স্থাপন করেছিল তাদেরকে আরব উপদ্বীপ ছেড়ে বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এদিক দিয়ে বনু-নুযায়েরের এই নির্বাসন, প্রথম সমাবেশ এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে সংঘটিত নির্বাসন, দ্বিতীয় সমাবেশ নামে অভিহিত হয়।

فَأَنبَأَ اللَّهُ مَرْحَبًا لِّرُحْمَتِهِمْ - এর শাব্দিক অর্থ এই যে,

আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে এমনভাবে আগমন করলেন, যা তারা কল্পনাও করেনি। বলাবাহুল্য, আল্লাহর আগমন করার অর্থ তাঁর নির্দেশ ও নির্দেশবাহক ফেরেশতা আগমন করা।

يُحْرِبُونَ يَوْمَ تَذُومُ نَارُهُ فَيُضْمَرُونَ - গৃহের দরজা, কপাট

ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার জন্যে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের গৃহ ধ্বংস করছিল। পক্ষান্তরে তারা যখন দুর্গের অভ্যন্তরে ছিল, তখন তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্যে মুসলমানগণ তাদের গৃহ ও গাছপালা ধ্বংস করছিল।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ أَوَلَمْ يَنْقُطْ عَنْ لَيْلَىٰ وَأَوَلَمْ يَكُنْ لَهَا فُتْرَةٌ
أُصُولُهَا فَيُؤَدِّنُ اللَّهُ وَلِيَّ خَيْرٍ مِنَ الْفَاسِقِينَ ۝ مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى
رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْحَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ۝ وَلَكِنَّ
اللَّهَ يُسَيِّرُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
وَلِلْأَهْلِ الْقُرَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ ۝ لَا
يَكُونُ ذَوُّهُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَمَنْعَهُ وَمَا أَتَاهُ الرِّسَالُ فَتَذَوُّهُ
مَا أَهْلَكُمْ عَنْهُ فَإِنَّ هَٰؤُلَاءِ أَتَوْا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيُؤْتُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَبُوءُ بِوَدَاعِ الْإِيمَانِ مِنْ
قَبْلِهِمْ يَمْشُونَ مَنْ هَٰجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَفِّ شَرْعًا نَفْسِهِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

(৪) এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (৫) তোমরা যে কিছু কিছু খজুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশে এবং যাতে তিনি অব্যাহতদেরকে লালিত্ব করেন। (৬) আল্লাহ বনু-বনুযায়েরের কাছ থেকে তাঁর রসুলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা, তাঁর রসুলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৭) আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রসুলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, রসুলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অবাগবন্তদের এবং মুসাক্ষিরদের জন্যে, যাতে ধনেশ্বর কেবল তোমাদের বিস্তৃশালীদের মধ্যেই পুঞ্জীভূত না হয়। রসুল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (৮) এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অনুরোধে এবং আল্লাহ তাঁর রসুলের সাহায্যার্থে নিজদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী। (৯) যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনাতে বসবাস করেছিল এবং বিশ্রাম স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষান্বিত করে না এবং নিজেরা অবাগবন্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।

مَا تَقْطَعُونَ مِنْ لَيْلَىٰ وَأَوَلَمْ يَكُنْ لَهَا فُتْرَةٌ عَلَىٰ أَصُولِهَا فَيُؤَدِّنُ اللَّهُ

লিলাই শব্দের অর্থ খজুর বৃক্ষ। বনু-নুযায়েরের খজুর বাগান ছিল। তারা যখন দুর্গের ভিতরে অবস্থান গ্রহণ করল, তখন কিছু কিছু মুসলমান তাদেরকে উত্তেজিত ও ভীত করার জন্যে তাদের কিছু খজুর বৃক্ষ কতন করে অথবা অগ্নিসংযোগ করে খতম করে দিলেন। অপর কিছু সংখ্যক সাহাবী মনে করলেন, ইনশাআল্লাহ বিজয় তাদের হবে এবং পনিণামে এসব বাগ-বাগিচা মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হবে। এই মনে করে তারা বৃক্ষ কতনে বিরত রইলেন। এটা ছিল মতের গরমিল। পরে যখন তাদের মধ্যে কথাবার্তা হল, তখন বৃক্ষ কতনকারীরা এই মনে করে চিন্তিত হলেন যে, যে বৃক্ষ পরিণামে মুসলমানদের হবে, তা কতন করে তারা অন্যায় করেছেন। এর পরিশ্রুতিতে আলোচ্য আয়াতে অবতীর্ণ হল। এতে উভয়দলের কার্যক্রমকে আল্লাহর ইচ্ছার অনুকূলে প্রকাশ করা হয়েছে।

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ - শব্দটি ফী থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। দুপুরের পরবর্তী পূর্বদিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছায়াকেও ফী বলা হয়। কাফেরদের কাছ থেকে যুদ্ধব্রত সম্পদের স্বরূপ এই যে, কাফেররা বিদ্রোহী হওয়ার কারণে তাদের ধন-সম্পদ সরকারের পক্ষে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় এবং তাদের মালিকানা থেকে বের হয়ে প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে যায়। তাই এগুলো অর্জনকে শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ তো এই ছিল যে, কাফেরদের কাছ থেকে অর্জিত সকল প্রকার ধন-সম্পদকেই ফী বলা হত। কিন্তু যুদ্ধ ও জেহাদের মাধ্যমে যে ধন-সম্পদ অর্জিত হয়, তাতে মানুষের কর্ম ও অধ্যবসায়েরও এক প্রকার দখল থাকে। তাই এই প্রকার ধন-সম্পদকে 'গনীমত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে এক আয়াতে বলা হয়েছে :

وَأَعْلَمُوا الْأَمَّا غَنِيمَتُهُمْ شَيْءٌ - কিন্তু যে ধন-সম্পদ অর্জন যুদ্ধ ও জেহাদের প্রয়োজন পড়ে না, তাকে ফী শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, যে ধন-সম্পদ যুদ্ধ ও জেহাদ ব্যতিরেকে অর্জিত হয়েছে, তা মুজাহিদ ও যোদ্ধাদের মধ্যে যুদ্ধব্রত সম্পদের আইনানুযায়ী বন্টন করা হবে না। বরং তা পুরোপুরিভাবে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর এখতিয়ারে থাকবে। তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা করবেন দেবেন, অথবা নিজের জন্যে রাখবেন। তবে যে কয়েক প্রকার হকদার নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই এই সম্পদের বন্টন সীমিত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে :

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى - এখানে

বলে বনু-নুযায়ের এবং তাদের মত বনু-কোরায়যা ইত্যাদি গোত্র বাখানো হয়েছে, যাদের ধন-সম্পদ যুদ্ধ ব্যতিরেকেই অর্জিত হয়েছিল। এরপর পাঁচ প্রকার হকদারদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে।

এসব আয়াতে উপরোক্ত প্রকার ধন-সম্পদের বিধান, হকদার ও হকদারদের মধ্যে বন্টন করার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা আনফালের শুরুতে গনীমতের মাল ও ফায়-এর মালের মধ্যে যে পার্থক্য, তা সম্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জেহাদের ফলশ্রুতিতে যে ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়, তাই গনীমতের মাল

এবং যুদ্ধ ও জেহাদ ব্যতিরেকে যা অর্জিত হয়, তা ফায়-এর মাল। কাফেররা যে ধন-সম্পদ রেখে পলায়ন করে কিংবা যা সম্পত্তিক্রমে জিযিয়া, খারাজ কিংবা বাণিজ্যিক ট্যাক্সের আকারে প্রদান করে, সবই ফায়-এর অন্তর্ভুক্ত।

كَانَ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الرَّسُولِ وَبَيْنَهُ — যে সম্পদ পরস্পরে আদান-প্রদান হয়, তাকে **دَوْلَة** বলা হয়।—(কুরত্বী) আয়াতের অর্থ এই যে, উপরোক্ত ধন-সম্পদের হকদার নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, যাতে এই সম্পদ কেবল তোমাদের ধনী ও বিত্তশালীদের মধ্যকার পুঞ্জীভূত সম্পদ না হয়ে যায়। এতে মুখ্যতঃ প্রাচ্যের একটি কুপ্রথা মুলাংপাতনের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কু-প্রথা ছিল এই যে, এ ধরনের সকল ধন-সম্পদ কেবল বিত্তশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত এবং এতে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কোন অংশ থাকত না।

وَالَّذِينَ الرَّسُولُ مَعَهُ دَوْلَةً فَأَنَّهُمْ كَمِثْلِهِمْ وَأَنَّهُمْ كَمِثْلِهِمْ

—এই আয়াত ফায়-এর মাল বটন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর উপযুক্ত অর্থ এই যে, ফায় এর মাল সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা হকদারদের শ্রেণী বর্ণনা করেছেন ঠিক, কিন্তু তাদের মধ্যে কাকে কতটুকু দেয়া হবে, তা নির্ধারণ করা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর সুবিবেচনার উপর রেখে দিয়েছেন। তাই এই আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তিনি যাকে যে পরিমাণ দেন, তা সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ কর এবং যা দেন না, তা পেতে চেষ্টা করো না। অতঃপর **وَالَّذِينَ الرَّسُولُ مَعَهُ** বলে এই নির্দেশকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ ব্যাপারে ভ্রান্ত ছলচাতুরীর মাধ্যমে অতিরিক্ত আদায় করে নিলেও আল্লাহ তাআলা সব খবর রাখেন। তিনি এজন্যে শাস্তি দেবেন।

রসুলের নির্দেশ কোরআনের নির্দেশের ন্যায় অবশ্য পালনীয় : কিন্তু আয়াতের ভাষা ধন-সম্পদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং শরীয়তের বিধি-বিধানও এতে দাখিল আছে। তাই ব্যাপকভঙ্গিতে আয়াতের এই যে, যে কোন নির্দেশ অথবা ধন-সম্পদ অথবা অন্য কোন বস্তু তিনি কাউকে দেন, তা তার গ্রহণ করা উচিত এবং তদনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে তিনি যে বিষয় নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকা দরকার।

অনেক সাহাবায়ে কোরাম আয়াতের এই ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রত্যেক নির্দেশকে কোরআনের নির্দেশের অনুরূপ অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করেছেন। কুরত্বী বলেন : আয়াতে **يُنَى** শব্দে বিপরীতে **يُنَى** শব্দ ব্যবহার করায় বোঝা যায় যে, এখানে **يُنَى** শব্দের অর্থ **أَمْر** অর্থাৎ, যা আদেশ করেন। কারণ এটাই **يُنَى** এর বিশুদ্ধ বিপরীত শব্দ। তবে কোরআন পাক এর পরিবর্তে **يُنَى** শব্দ এজন্যে ব্যবহার করেছে যাতে 'ফায়' এর মাল বটন সম্পর্কিত বিষয়বস্তুও এতে शामिल থাকে। কারণ, এ প্রসঙ্গে আয়াতটি আনা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে এহরাম অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে দেখে তা খুলে ফেলতে আদেশ করেন। লোকটি বলল : আপনি এ সম্পর্কে কোরআনের কোন আয়াত বলতে পারেন কি যাতে সেলাই করা কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, এ সম্পর্কে আয়াত আছে অতঃপর তিনি **وَالَّذِينَ الرَّسُولُ مَعَهُ** আয়াতটি পাঠ করে দিলেন। ইমাম শাফেয়ী একবার উপস্থিত লোকজনকে বললেন : আমি তোমাদের প্রত্যেক প্রশ্নের জওয়াব কোরআন থেকে দিতে পারি। জিজ্ঞাসা কর, যা জিজ্ঞাসা

করতে চাও। এক ব্যক্তি আরম্ভ করল : এক ব্যক্তি এহরাম অবস্থায় প্রজ্ঞাপতি মেরে ফেলল, এর বিধান কি? ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করে হাদীস থেকে এর বিধান বর্ণনা করে দিলেন।—(কুরত্বী)।

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ فِي الدِّينِ

—রুকু শেষ পর্যন্ত এই কয়েকটি আয়াতে দরিদ্র মুহাজির, আনসার ও তাঁদের পরবর্তী সাধারণ উম্মত সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাকরণিক দিক দিয়ে **لِلْفُقَرَاءِ** শব্দটি **الْفُقَرَاءِ** থেকে **بَل** হয়েছে, যা পূর্বের আয়াতে আছে।—(মাযহারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পূর্বের আয়াতে সাধারণতঃ এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরগণকে অভাবগ্রস্ততার কারণে ফায়-এর মালের হকদার গণ্য করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, যদিও সকল দরিদ্র ও মিসকীন এই মালের হকদার, কিন্তু তাদের মধ্যে দরিদ্র মুহাজির ও আনসারগণ অগ্রগণ্য। কারণ, তাঁদের ধর্মীয় খেদমত এবং ব্যক্তিগত গুণ-গরিমা সুবিদিত।

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ এতে মুহাজিরগণের প্রথম গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁরা স্বদেশ ও সহায়সম্পত্তি থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর সমর্থক ও সাহায্যকারী শুধু এই অপরাধে মক্কার কাফেররা তাঁদের উপর অকণ্ঠ্য নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাতৃভূমি, ধন-সম্পদ ও বাস্তু-ভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাঁদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বেঁধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীত বস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে তাতে শীতের দাগট থেকে আত্মরক্ষা করতেন।—(মাযহারী, কুরত্বী)।

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

অর্থাৎ, তাঁরা কোন জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং হিজরত করে মাতৃভূমি ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করেননি; কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিই তাঁদের কাম্য ছিল। এ থেকে তাঁদের পূর্ণ আন্তরিকতা বোঝা যায়। **فَضْلٌ** শব্দটি প্রায়শঃ পার্থিব নেয়ামতের জন্যে এবং **رِضْوَانٌ** শব্দটি পারলৌকিক নেয়ামতের জন্যে ব্যবহৃত হয়। কাজেই অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁরা তাঁদের সাবেক ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে এখন ইসলামের ছায়াতলে সাংসারিক প্রয়োজন এবং পরকালের নেয়ামত কামনা করছেন।

وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

অর্থাৎ, আল্লাহ ও রসুলকে সাহায্য করার জন্যে তাঁর উপরোক্ত সবকিছু করেছেন। আল্লাহ তাআলাকে সাহায্য করার অর্থ তাঁর দীনকে সাহায্য করা। এ ক্ষেত্রে তাঁদের ত্যাগ ও তিতীক্ষা বিস্ময়কর।

أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ — অর্থাৎ, তাঁরাই

কথা ও কাজে সত্যবাদী। ইসলামের কলেমা পাঠ করে তাঁরা আল্লাহ তাআলা ও রসুলের সাথে যে অস্বীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এই আয়াত সকল মুহাজির সাহাবী সত্যবাদী বলে দৃষ্টকর্তে ঘোষণা করেছে। অতএব যে ব্যক্তি তাঁদের কাউকে মিথ্যাবাদী বলে, সে এই আয়াত অস্বীকার করার কারণে মুসলমান হতে

পারে না। নাউযবিলাহ্! রাফেবী সম্প্রদায় তাঁদেরকে মুনাফিক আখ্যা দেয়। এটা এই আয়াতের সুস্পষ্ট লক্ষণ। রসুল করীম (সাঃ) এই ফকীর মুহাজিরগণের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার কাছে দোয়া করতেন। এতেই বোঝা যায় যে, হযুরের কাছে তাঁদের কি মর্যাদা ছিল।—(মাযহারী)।

আনসারগণের শ্রেষ্ঠত্ব : **وَالَّذِينَ يَبُوءُونَ بِالدِّينِ وَالْإِيمَانِ مِنْكُمْ** **وَالَّذِينَ يَبُوءُونَ** শব্দের অর্থ অবস্থান গ্রহণ করা। **দার** বলে হিজরতের স্থান তথা মদীনা তাইয়েবা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) মদীনাকে দুনিয়ার সকল শহর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলতেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, দুনিয়ার যেসব শহরে ইসলাম পৌছেছে ও প্রসার লাভ করেছে, সেগুলো জেহাদের মাধ্যমে বিজিত হয়েছে; এমনকি, মক্কা মোকাররমাও। একমাত্র মদীনা শহরই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইমান ও ইসলামকে বৃক ধারণ করেছে।—(কুরতুবী)।

আয়াতে **يُؤْتُونَ** ক্রিয়াপদের পর **দার** এর সাথে ইমানও উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ অবস্থান গ্রহণ কোন স্থান বা জায়গাতেই শুধু হতে পারে। ইমান কোন জায়গা নয় যে, এতে অবস্থান গ্রহণ করা হবে। তাই কেউ কেউ বলেন : এখানে **حَلَصُوا** অথবা **تَكُونُوا** ক্রিয়াপদ উহা আছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা মদীনায় অবস্থান গ্রহণ করেছেন, ইমানে ঝাঁটি ও পাকাপোক্ত হয়েছেন। এখানে এরূপও হতে পারে যে, ইমানকে রূপক ভঙ্গিতে জায়গা ধরে নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। **مِنْ قِبَلِهِمْ** অর্থাৎ, মুহাজিরগণের পূর্বে। এতে আনসারগণের একটি শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। তা এই যে, যে শহর আল্লাহ্ তাআলার কাছে 'দারুল-হিজরত' ও দারুল ইমান' হওয়ার ছিল, তাতে তাঁদের অবস্থান ও বসতি মুহাজিরগণের পূর্বেই ছিল। মুহাজিরগণের এখানে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্বেই তাঁরা ইমান কবুল করে পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আনসারগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : **يُؤْتُونَ مِنْ خَيْرِ مَا يُؤْتُونَ** অর্থাৎ, তাঁরা তাদেরকে ভালবাসে, যারা হিজরত করে তাদের শহরে আগমন করেছেন। এটা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের রুচির পরিপন্থী। সাধারণতঃ লোকেরা এহেন ভিত্তি-মাটিহীন দুর্গত মানুষকে স্থান দেয়া পছন্দ করে না। সর্বত্রই দেশী ও ভিনদেশীর প্রশ্ন উঠে। কিন্তু আনসারগণ কেবল তাঁদেরকে স্থানই দেননি, বরং নিজ নিজ গৃহে আবাদ করেছেন, নিজেদের ধন-সম্পদে অশ্বীদার করেছেন এবং অভাবনীয় ইয়যত ও সম্প্রদায়ের সাথে তাঁদেরকে ঝাগত জানিয়েছেন। এক একজন মুহাজিরকে জায়গা দেয়ার জন্যে এক সাথে কয়েকজন আনসারী আবেদন করেছেন। ফলে শেষ পর্যন্ত লটারীর মাধ্যমে এর নিশ্চিতি করতে হয়েছে।—(মাযহারী)।

তাঁদের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে : **وَالَّذِينَ يَبُوءُونَ بِالدِّينِ وَالْإِيمَانِ مِنْكُمْ** **حَاجَةً** এই বাক্যের সম্পর্ক একটি বিশেষ ঘটনার সাথে, যা বনু-নুবায়েরের নির্বাসন এবং তাদের বাগান ও গৃহের উপর মুসলমানদের

দখল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় সংঘটিত হয়েছিল।

উল্লেখিত আয়াতে **حَاجَةً** বলে প্রয়োজনের বস্তু এবং **يَبُوءُونَ**—এর সর্বনাম দ্বারা মুহাজিরগণকে বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, এই বটনে যা কিছু মুহাজিরগণকে দেয়া হল, মদীনার আনসারগণ সানন্দে তা গ্রহণ করে নিলেন; যেন তাঁদের এসব জিনিসের কোন প্রয়োজন ছিল না। মুহাজিরগণকে দেয়াকে খারাপ মনে করা অথবা অভিযোগ করার তো সামান্যতম কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এর মোকবেলায় যখন বাহরাইন বিজিত হল, তখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রাপ্ত ধন-সম্পদ সম্পূর্ণই আনসারগণের মধ্যে বিলি-বন্টন করে দিতে চাইলেন; কিন্তু তাঁরা তাতে রাযী হলেন না, বরং বললেন : আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মুহাজির ভাইগণকেও এই ধন-সম্পদ থেকে অংশ না দেয়া হয়।—(বোখারী, ইবনে-কাসীর)।

আনসারগণের চতুর্থ গুণ এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে : **وَالَّذِينَ يَبُوءُونَ** **حَصَامَةً** শব্দের অর্থ দারিদ্র্য ও উপবাস। **إِثَار** এর অর্থ অপরের বাসনা ও প্রয়োজনকে নিজেদের বাসনা ও প্রয়োজনের অগ্রে রাখা। আয়াতের অর্থ এই যে, আনসারগণ নিজেদের উপর মুহাজিরগণকে অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর আগে তাঁদের প্রয়োজন মেটাতেন; যদিও নিজেরাও অভাবগ্রস্ত ও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ছিলেন।

আনসারগণের **وَمَنْ يُؤْتِ شَيْئًا فَاذْكُكُمُ الثَّغْلِيُونَ** আত্মত্যাগ ও আল্লাহ্ তাআলার পথে সবকিছু বিসর্জন দেয়ার কথা বর্ণনা করার পর সাধারণ বিধি হিসেবে বলা হয়েছে যে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, তাঁরাই আল্লাহ্ তাআলার কাছে সফলকাম। **يُخِلُّ** শব্দদ্বয় প্রায় সমঅর্থবোধক। তবে **يُخِلُّ** শব্দের মধ্যে কিঞ্চিৎ আতিশয্য আছে। ফলে এর অর্থ অতিশয় কৃপণতা। যাকাত, ফিতরা, গুশর, কোরবানী ইত্যাদি আল্লাহ্ তাআলার ওয়াজেব হক আদায়ের অথবা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ অভাবগ্রস্ত পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বাদদার ওয়াজিব হক আদায়ের কৃপণতা করা হলে তা নিশ্চিতরূপে হারাম। যে কৃপণতা মুস্তাহাব বিষয় ও দান স্বরূপের ফযীলত অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়, তা মকরহ ও নিন্দনীয় এবং যা প্রথাগত কাছের প্রতিবন্ধক হয়, তা শরীয়তের আইনে কৃপণতা নয়।

কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা খুবই নিন্দনীয় অভ্যাস। কোরআন ও হাদীসে জোরালো ভাষায় এসবের নিন্দা করা হয়েছে এবং যারা এসব বিষয় থেকে মুক্ত, তাদের জন্যে সুসংবাদ বর্ণনা করা হয়েছে। উপরে আনসারগণের যে গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে, তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তাঁরা কার্পণ্য ও পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذَا ۖ
 الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ
 آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۖ أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ تَوَفَّوْا
 يُقُولُونَ لِأَخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ
 أَخْرَجْتُمُنَا مِنْ هَٰذَا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مَعَهُمْ وَلَا نُظِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا ۖ وَإِن
 قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُمُ الْكَذِبُونَ ۖ لَئِنْ أُخْرِجُوا
 لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ
 لَيُؤْتِيَنَّ الْأَرَابُ كَثُورًا يَنْصُرُونَهُ ۚ لَا تَأْمُرُ أَسَدًا رَهْبَةً
 فِي صُدُورِهِمْ إِنَّ اللَّهَ ذَٰلِكُمْ يَأْتِيهِمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝
 لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَىٰ مُخْتَصِصَةٍ ۚ وَمِنْ وَرَاءِ
 جُدُرِ بَأْسِهِمُ بِئِهِمْ شُرَكَاءُ تُخِيسُهِمْ جَمِيعًا ۚ وَفَوْقَ رُءُوسِهِمْ
 سَبْعُ ثَمَاطٍ يَأْتِيهِمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۝ كَسَمَلِ الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَفَاوًا بَالِ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ۝ كَسَمَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اقْمُرْ فَلَمَّا كَمَرَ
 قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝

(১০) আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমান অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম কক্রময়। (১১) আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাকের ভাইদেরকে বলে : তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। (১২) যদি তারা বহিস্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপোষক করে পলায়ন করবে। এরপর কাকেররা কোন সাহায্য পাবে না। (১৩) নিশ্চয় তোমরা তাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। এটা এ কারণে যে, তারা এক নির্বেশ সম্প্রদায়। (১৪) তারা সশ্রবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। তারা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়ালে থেকে। তাদের পারস্পরিক যুদ্ধই প্রচণ্ড হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন ; কিন্তু তাদের অন্তর শতখাষিষ্টি। এটা এ কারণে যে, তারা এক কাওজানহীন সম্প্রদায়। (১৫) তারা সেই লোকদের মত, যারা তাদের নিকট অতীতে নিজেদের কর্মের শাস্তিভোগ করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৬) তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাকের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাকের হয়, তখন শয়তান বলে : তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি।

মুহাজির ও আনসারগণের পর উম্মতের সাধারণ মুসলমান :
 وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ—এই আয়াতের بعد অর্থে সাহাবায়ে কেরাম মুহাজির ও আনসারগণের পরে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান শামিল আছে এবং এই আয়াত তাদের সবাইকে ‘ফায়’-এর মালে হকদার সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ইরাক, সিরিয়া, মিসর ইত্যাদি বড় বড় শহর অধিকার করার পর এদের সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করেননি ; বরং এগুলো ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সাধারণ গুয়াকফ হিসেবে রেখে দিয়েছেন, যাতে এসব সম্পত্তির আমদানি ইসলামী বায়তুল-মালে জমা হয় এবং তা দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মুসলমানগণ উপকৃত হয়। কোন কোন সাহাবী তাঁর কাছে বিজিত সম্পত্তি বন্টন করে দেয়ার আবেদন করলে তিনি এই আয়াতের বরাত দিয়ে জওয়াব দেন যে, আমার সামনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রশ্ন না থাকলে আমি যে দেশই অধিকার করতাম, তার সম্পত্তি যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম, যেমন রসুলুল্লাহ (সাঃ) খয়বরের সম্পত্তি বন্টন করে দিয়েছিলেন। এসব সম্পত্তি বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ মুসলমানদের জন্যে কি অবশিষ্ট থাকবে?—(মালেক-কুরতুবী)।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালবাসা ও মাহাত্ম্য অন্তরে পোষণ করা মুসলমানদের সত্যপন্থী হওয়ার পরিচায়ক ; এস্থলে আল্লাহ তাআলা সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—মুহাজির, আনসার ও অবশিষ্ট সাধারণ মুসলমান। মুহাজির ও আনসারগণের বিশেষ গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বও এস্থলে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলীর মধ্য থেকে মাত্র একটি বিষয় এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা সাহাবায়ে কেরামের ঈমান অগ্রগামিতা এবং তাদের কাছে ঈমান পৌছানোর মাধ্যম হওয়ার গুণটিকে সম্যক বুঝে এবং সবার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে। এছাড়া নিজেদের জন্যেও এরূপ দোয়া করে ; আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না।

এ থেকে জানা গেল যে, সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানদের ঈমান ও ইসলাম কবুল হওয়ার শর্ত হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের মাহাত্ম্য ও ভালবাসা অন্তরে পোষণ করা এবং তাঁদের জন্যে দোয়া করা। যার মধ্যে এই শর্ত অনুপস্থিত, সে মুসলমান কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। এ কারণেই হযরত মুসাব ইবনে সা'দ (রাঃ) বললেন : উম্মতের সকল মুসলমান তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে দুই শ্রেণী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ; অর্থাৎ, মুহাজির ও আনসার। এখন সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত পোষণকারী এক শ্রেণী বাকী রয়ে গেছে। তোমরা যদি উম্মতের মধ্যে কোন আসন কামনা কর, তবে এই তৃতীয় শ্রেণীতে দাখিল হয়ে যাও।

হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে (তাঁর শাহাদতের ঘটনা সঞ্চিত হওয়ার পর) প্রশ্ন করেছিল। তিনি পাণ্টা প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি কি মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত? সে নেতিবাচক উত্তর দিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তবে কি আনসারগণের একজন? সে বলল : না। হযরত হুসাইন (রাঃ) বললেন : এখন তৃতীয় আয়াত وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ বাকী রয়ে গেছে। তুমি যদি হযরত ওসমান গনী (রাঃ) সম্পর্কে জনমনে সন্দেহ ও

সংশয় সৃষ্টি করতে চাও, তবে এই তৃতীয় শ্রেণী থেকেও খারিজ হয়ে যাবে।

কুরতুবী বলেন : এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালবাসা রাখা আমাদের জন্যে ওয়াজেব। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন : যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে মন্দ বলে অথবা তাঁর সম্পর্কে মন্দ বিশ্বাস রাখে, মুসলমানদের ‘ফায়’—এর মালে তার কোন অংশ নেই। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি আলোচ্য আয়াত পেশ করেন। যেহেতু ফায়—এর মালে প্রত্যেক মুসলমানের অংশ আছে, তাই যার অংশ বাদ পড়বে তার ইসলাম ও ঈমানই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : আল্লাহ্ তাআলা সকল মুসলমানকে সাহাবায়ে—কেরামের জন্যে এস্তেগফার ও দোয়া করার আদেশ দিয়েছেন। অথচ আল্লাহ্ তাআলা জানতেন যে, তাঁদের পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহও হবে। তাই তাঁদের পারস্পরিক বাদানুবাদের কারণে তাঁদের মধ্য থেকে কারও প্রতি কুখারণা পোষণ করা কোন মুসলমানের জন্যে জায়েয নয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন : আমি তোমাদের নবী (সাঃ)—এর মুখে শুনেছি : এই উম্মত ততদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, যতদিন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদেরকে অভিশাপ ও ভৎসনা না করে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন : তুমি যদি কাউকে দেখ যে, কেউ কোন সাহাবীকে মন্দ বলছে, তবে তাকে বল : যে তোমাদের মধ্য থেকে অধিক মন্দ, তার উপর আল্লাহ্ তাআলার লানত হোক। বলাবাহুল্য, অধিক মন্দ সাহাবী হতে পারেন না—যে তাঁকে মন্দ বলে সে-ই হবে। সারকথা এই যে, সাহাবীদের মধ্য থেকে কাউকে মন্দ বলা লানতের কারণ।

আওয়াম ইবনে হাওশব বলেন : এই উম্মতের পূর্ববর্তীগণ মানুষকে সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী বর্ণনা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন, যাতে মানুষের অন্তরে তাঁদের ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আমি এ ব্যাপারে তাঁদেরকে একনিষ্ঠভাবে ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করতে দেখেছি। তাঁরা আরও বলতেন : সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে মতবিরোধ ও বাদানুবাদ সংঘটিত হয়েছে সেগুলো বর্ণনা করো না ; করলে মানুষের ধৃষ্টতা বেড়ে যাবে—(কুরতুবী)।

—كَمَثَلَ الَّذِينَ مِنَ قَوْمِهِمْ قَوْمًا... —এটা বনু-নুযায়রের দৃষ্টান্ত
 الْقَائِلُ كَارًا? এ সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : এরা হচ্ছে বদরের কাফের যোদ্ধা এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : এরা ইহুদী বনু-কায়নুকা। উভয়েরই অন্তর্ভুক্ত পরিগণিত তথা নিহত, পরাজিত ও লালিত হওয়ার ঘটনা তখন জন সমক্ষে ফুটে উঠেছিল। কেননা, বনু-নুযায়রের নির্বাসনের ঘটনা বদর ও ওহদ যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় এবং বনু-কায়নুকায় ঘটনাও বদরের পরে সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। বদরে মুশরিকদের সত্তর জন নেতা নিহত হয় এবং অবশিষ্টরা চরম লালিত অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। অতএব, হযরত মুজাহিদ (রহঃ)—এর উক্তি অনুযায়ী —ذَوُو أَيْمَانَ مَرْهُمُ —বাক্যের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট যে, তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আন্বদন করেছে। এটা পরকালের আগে দুনিয়াতেই তারা ভোগ করেছে। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর উক্তি অনুযায়ী আয়াতের অর্থ ইহুদী বনু-কায়নুকা হলে তাদের ঘটনাও তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

বনু কায়নুকার নির্বাসন : রসুলে করীম (সাঃ) মদীনায়া আগমন করার পর মদীনার পার্শ্ববর্তী সবগুলো ইহুদী গোত্রের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। এর এক শর্ত ছিল এই যে, তারা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুসলমানদের কোন শত্রুকে সাহায্য করবে না। বনু-কায়নুকাও এই শান্তিচুক্তির অধীনে ছিল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই তারা চুক্তির বিপরীত কাজকর্ম শুরু করে দেয়। বদর যুদ্ধের সময় মক্কার কাফেরদের সাথে তাদের গোপন যোগসাজশ ও সাহায্যের কিছু ঘটনাও সামনে আসে। তখন কোরআন পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় قَوْمُ خِيَانَةٍ وَمَا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ

অর্থাৎ, চুক্তি সম্পাদনের পর যদি কোন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা দেখা দেয়, তবে আপনি তাদের শান্তিচুক্তি ভঙুল করে দিতে পারেন। বনু-কায়নুকা নিজেরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে এই চুক্তি ভঙ্গ করে দিয়েছিল। তাই রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন এবং হযরত হামযা (রাঃ)—এর হাতে পতাকা দিলেন। মদীনা শহরে হযরত আবুল লুবাবা (রাঃ)—কে স্থলাভিষিক্ত করে তিনি নিজেও জেহাদে রওয়ানা হলেন। মুসলমান সৈন্যবাহিনী দেখে বনু-কায়নুকা দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করল। রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) দুর্গ অবরোধ করে নিলেন। পনের দিন অবরুদ্ধ থাকার পর আল্লাহ্ তাআলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন, তাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, মোকাবেলা ফলশ্রু হতে হবে না। অগত্যা তারা দুর্গের ফটক খুলে দিয়ে বলল : আমাদের সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) যে সিদ্ধান্ত নিবেন, আমরা তাতেই সম্মত আছি।

রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের পুরুষকুলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেন ; কিন্তু আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক বাধ সাধল। সে চূড়ান্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে তাদের প্রাণভিকার আবেদন জানাল। অবশেষে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) ঘোষণা করলেন : তারা বসতি ত্যাগ করে চলে যাবে এবং তাদের ধন-সম্পত্তি যুদ্ধলব্ধ সম্পদরূপে পরিগণিত হবে। এই মীমাংসা অনুযায়ী বনু-কায়নুকা মদীনা ত্যাগ করে সিরিয়ার আমরুয়াত এলাকায় চলে গেল। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অধ্যাদেশ অনুযায়ী রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের ধন-সম্পত্তি বন্টনকরতঃ একভাগ বায়তুলমালে এবং অবশিষ্ট চার ভাগ যোদ্ধাদের মধ্যে বিলি করে দিলেন।

বদর যুদ্ধের পর এই প্রথম বায়তুলমালে গণীমতের পাঁচ ভাগের একভাগ জমা হল। এই ঘটনা হিজরতের বিশ মাস পর ১৫ই শাওয়াল তারিখে সংঘটিত হয়।

—كَمَثَلَ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ —এটা মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত,

যারা বনু-নুযায়রকে নির্বাসনের আদেশ অমান্য করতে এবং রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তাদেরকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু মুসলমানগণ যখন তাদেরকে অবরোধ করে নেয়, তখন কোন মুনাফিক সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়নি। কোরআন পাক শয়তানের একটি ঘটনা দ্বারা তাদের দৃষ্টান্ত দিয়েছে। শয়তান মানুষকে কুফর করতে প্ররোচিত করেছিল এবং তার সাথে নানারকম ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু মানুষ যখন কুফরে লিপ্ত হল, তখন সে ওয়াদা ভঙ্গ করল।

আল্লাহ্ তাআলা জানেন শয়তানের এ ধরনের ঘটনা কত হয়ে থাকবে। তন্মধ্যে একটি ঘটনা তো স্বয়ং কোরআনে সূরা আনফালের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে :

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ
 جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝ يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَنْتَقَرُّ
 نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
 بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ سَوَّاهُ اللَّهُ فَأَسْلَمُوا
 أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ
 النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْمَكْرُومُونَ ۝
 لَوْ أَنَّنَا لَهَذَا الْفُرْقَانِ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْنَا خَاشِعًا
 مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُظَرَّ بِهَا
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝
 هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ
 الْمُؤْمِنُ الْمُحْيِي الْعَزِيزُ أَعْبَادُ الْمَلَائِكَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
 الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(১৭) অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা জাহান্নামে যাবে এবং চিরকাল তথায় বসবাস করবে। এটাই জালমদের শাস্তি। (১৮) মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন। (১৯) তোমরা তাদের মত হওয়া না, যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই অব্যাহা। (২০) জাহান্নামের অধিবাসী এবং জাহান্নামের অধিবাসী সমান হতে পারে না। যারা জাহান্নামের অধিবাসী, তারা ই সফলকাম। (২১) যদি আমি এই কোরআন পাছড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাছড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে দীর্ঘ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (২৩) তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপান্বিত, মহাত্মাশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। (২৪) তিনিই আল্লাহ তা'আলা, প্রজ্ঞা, উদ্ভাবক, রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

وَأَذِّنْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ
 وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَ آتِ الْوَيْثِينَ نَكَسَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ

এটা বদর যুদ্ধের ঘটনা। এতে শয়তান অন্তরে কুমন্ত্রণার মাধ্যমে অথবা মানবাকৃতিতে সামনে এসে মুশরিকদের মুসলমানদেরকে মোকাবেলায় উৎসাহিত করে এবং সাহায্যের আশ্বাস দেয়। কিন্তু যখন বাস্তবিকই মোকাবেলা শুরু হয়, তখন সাহায্য করতে পরিষ্কার অস্বীকৃতি জানায়। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে যদি এই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে, তখন আপত্তি দেখা দেয় যে, এই ঘটনায় শয়তান বাহ্যতঃ কুফর করার আদেশ দেয়নি। তারা তো পূর্ব থেকেই কাফের ছিল। শয়তান কেবল তাদেরকে মোকাবেলায় একত্রিত হতে বলেছিল। এই আপত্তির জওয়াব এই যে, কুফরে অটল থাকতে বলা এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলাও কুফর করতে বলায়ই অনুরূপ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা হাশরে শুরু থেকে কিতাবী, কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের অবস্থা, কাজ-কারবার ও তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শাস্তি বর্ণনা করার পর, সূরার শেষ পর্যন্ত মুমিনদেরকে হুঁশিয়ারী ও সংকর্ম পরায়ণতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উল্লেখিত প্রথম আয়াতে বলিষ্ঠভঙ্গিতে পরকালের চিন্তা ও তজ্ঞন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ আছে। বলা হয়েছে : **يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** অর্থাৎ, মুমিনগণ, আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত পরকালের জন্যে কি প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রশ্নবিধানযোগ্য। এ আয়াতে কেয়ামত বোঝাতে গিয়ে **يَوْمَ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ আগামীকাল। এতে তিনটি ইঙ্গিত রয়েছে। প্রথম, সমগ্র ইহকাল পরকালে মোকাবেলায় স্বল্প ও সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ, এক দিনের সমান। হিসাব করলে একদিনের সমান হওয়াও কঠিন। কেননা, পরকাল চিরন্তন, যার কোন শেষ ও অন্ত নেই। মানব বিশ্বের বয়স তো কয়েক হাজার বছরই বলা হয়। যদি আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি থেকে হিসাব করা হয়, তবে কয়েক লাখ বছর হয়ে যাবে। তবুও এটা সীমিত সময়কাল। অসীম ও অশেষ সময়কালের সাথে এর কোন তুলনাই হয় না।

এক হাদীসে আছে —সারা দুনিয়া একদিন এবং এই দিনে আমাদের রোযা আছে। মানব সৃষ্টি থেকে শুরু করা হোক কিংবা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি থেকে, চিন্তা করলে উভয়টিই মানুষের জন্যে গুরুত্ববহ নয়; বরং প্রত্যেক ব্যক্তির দুনিয়া তার বয়সের বছর ও দিনগুলোই। এই বছর ও দিনগুলো পরকালের তুলনায় কত যে তুচ্ছ ও নগণ্য, তা প্রত্যেকেই অনুমান করতে পারে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এই যে, কেয়ামত সুনিশ্চিত; যেমন আজকের পর আগামীকালের আগমন সুনিশ্চিত। কেউ এতে সন্দেহ করতে পারে না। এমনিভাবে দুনিয়ার পরে কেয়ামত ও পরকালের আগমনে কোন সন্দেহ নেই।

তৃতীয় ইঙ্গিত এই যে, কিয়ামত অতি নিকটবর্তী। আজকের পর আগামীকাল যেমন দূরে নয়—খুব নিকটবর্তী, তেমনি দুনিয়ার পর কিয়ামতও খুব নিকটবর্তী।

কিয়ামত দুই প্রকার—সমগ্র বিশ্বের কিয়ামত ও ব্যক্তি বিশেষের কিয়ামত। প্রথমোক্ত কিয়ামতের অর্থ, আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধ্বংসপ্রাপ্তি। এটা লাখে বছর পরে হলেও পারলৌকিক সময়কালের তুলনায় নিকটবর্তীই। শেষোক্ত কিয়ামত, ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যুর সাথে সাথে সংঘটিত হয়। তাই বলা হয়েছে : **مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ** অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মারা যায়, তার কিয়ামত তখনই কায়েম হয়ে যায়। কারণ, কবর থেকেই পরজগতের ক্রিয়াকর্ম শুরু হয়ে যায় এবং আযাব ও সওয়াবের নমুনা সামনে এসে যায়। কবরজগৎ যার অপর নাম বরযখ, এটা দুনিয়ার “ওয়েটিং রুম” (বিশ্রামাগার) সদৃশ। “ওয়েটিং রুম” ফাশ্ট ক্লাস থেকে নিয়ে থার্ড ক্লাসের যাত্রীদের জন্যে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। অপরাধীদের ওয়েটিং রুম হচ্ছে হাজত ও জেলখানা। এই বিশ্রামাগার থেকেই প্রত্যেক ব্যক্তি তার স্তর ও মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে। তাই মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রত্যেকের নিজস্ব কিয়ামত এসে যায়। আল্লাহ তাআলা মানুষের মৃত্যুকে একটি ধাঁধার রূপ দিয়ে রেখেছেন। ফলে বড় বড় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণও এর নিশ্চিত সময় নিরূপণ করতে পারে না, বরং প্রতিটি মুহূর্তেই মানুষ আশংকা করতে থাকে যে, পরের ঘটটি তার জীবদ্দশায় অতিবাহিত নাও হতে পারে, বিশেষতঃ বর্তমান বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনাবলী একে নিত্যনিমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত করে দিয়েছে।

সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতকে আগামীকাল বলে উদাসীন মানুষকে সাবধান করা হয়েছে যে, কিয়ামতকে বেশী দূরে মনে করো না। কিয়ামত আগামীকালের মত নিকটবর্তী ; এমনকি আগামীকালের পূর্বেও এসে খাওয়া সম্ভবপর।

مَّا قَدَّمْتُ لَكُمْ — বলে সং ও অসং উভয় প্রকার কর্ম বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি সংকর্ম প্রেরণ করে, সে সওয়াবের আকারে পরকালের মুদ্রা পেয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে অসংকর্ম প্রেরণ করে, সে সেখানে অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হবে। এরপর **وَأَتَقُوا** বাক্যটি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এর এক কারণ তাকীদ করা এবং অপর সম্ভাব্য কারণ তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া এটাও সম্ভবপর যে, প্রথম **وَأَتَقُوا** বলে খোদায়ী নির্দেশাবলী পালন করে পরকালের জন্যে সম্বল প্রেরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয়বার **وَأَتَقُوا** বলে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যে সম্বল প্রেরণ কর, তা কৃত্রিম ও পরকালে অচল কি না, তা দেখে নাও। পরকালে অচল সম্বল তাই, যা দৃশ্যতঃ সংকর্ম, কিন্তু তা ঋটিভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে করা হয় না ; বরং নাম-যশ অথবা কোন মানসিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে করা হয় অথবা সেই আমল, যা দৃশ্যতঃ এবাদত হলেও ধর্মের তার কোন প্রমাণ না থাকার কারণে বেদআত ও পন্থভ্রষ্টতা। অতএব, দ্বিতীয় **وَأَتَقُوا** বাক্যের সারমর্ম এই যে, পরকালের জন্যে কেবল দৃশ্যতঃ সম্বল যথেষ্ট নয় ; বরং তা অচল কিনা তা দেখে প্রেরণ কর।

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا — অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তাআলাকে ভুলে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেরাই আত্মভোলা হয়ে গেছে। ফলে ভাল-মন্দের জ্ঞান

হারিয়ে ফেলেছে।

لَوْ أَنزَلْنَاهُ الْفُتْرَانَ عَلَىٰ جِبِلٍّ — এটা একটা দৃষ্টান্ত ; অর্থাৎ, যদি কোরআন পাহাড়ের ন্যায় কঠিন ও ভারী জিনিসের উপর অবতীর্ণ করা হত এবং পাহাড়কে মানুষের ন্যায় জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা দেয়া হত, তবে পাহাড়ও কোরআনের মাহাত্ম্যের সামনে নত—বরং ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কিন্তু মানুষ খেয়াল-খুশী ও স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে তার স্বভাবজাত চেতনা হারিয়ে ফেলেছে। সে কোরআন দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। অতএব, এটা যেন এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। কারণ, বাস্তবে পাহাড়ের মধ্যে চেতনা নেই। কেউ কেউ বলেন : পাহাড়, বৃক্ষ ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি বিদ্যমান আছে। কাজেই এটা কাল্পনিক নয়—বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টান্ত।—(মায়হারী)।

পরকালের চিন্তা ও কোরআনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর উপসংহারে আল্লাহ তাআলার কতিপয় পূর্ণত্ববোধক গুণ উল্লেখ করে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

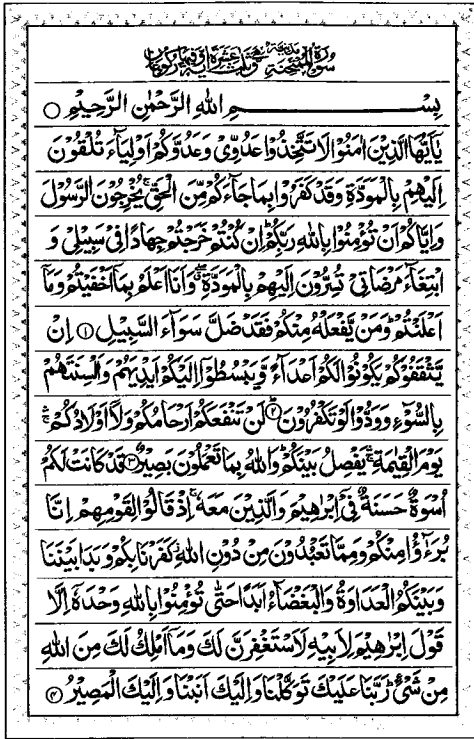
عَلَّمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দৃশ্য-অদৃশ্য ও উপস্থিত-অনুপস্থিত বিষয় পুরোপুরি জ্ঞানেন। **الْقُدُّوسِ** —এমনি সত্তা, যিনি প্রত্যেক দোষ থেকে মুক্ত এবং অশালীন বিষয়াদি থেকে পবিত্র। **الْمُؤْمِنِ** —এই শব্দটি মানুষের জন্যে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় আল্লাহ ও রসুলে বিশ্বাসী। আল্লাহ তাআলার জন্যে ব্যবহার করলে অর্থ হয় নিরাপত্তা বিধায়ক অর্থাৎ, তিনি ইমানদারগণকে সর্বপ্রকার আযাব ও বিপদ থেকে শান্তি এবং নিরাপত্তা দান করেন।

الْمُهَيَّمِ —এর অর্থ দেখাশোনাকারী। হয়রত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ ও কাতাদাহ (রহঃ) তাই বলেছেন।—(মায়হারী, কামুস)।

الْحَبِطِ —প্রতাপশালী মহান। এই শব্দটি **جبر** থেকেও উদ্ভূত হতে পারে, যার অর্থ ভাঙা হাড় ইত্যাদি সংযোগ করা। এ কারণেই ভাঙা হাড় জোড়া দেয়ার পর যে পট্টি বাঁধা হয়, তাকে **جبر** বলা হয়। অতএব, অর্থ এই যে, তিনি প্রত্যেক ভাঙা ও অকেজো বস্তুর সম্প্রসারক।—(মায়হারী)।

الْمُنِيرِ —এটা **تكبر** ও **كبرياء** থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বড়ত্ব, প্রত্যেক বড়ত্ব প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার জন্যে নির্দিষ্ট। তিনি কোন বিষয়ে কারও মুখাপেক্ষী নন। যে মুখাপেক্ষী, সে বড় হতে পারে না। তাই আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের জন্যে এই শব্দটি দোষ ও গোনাহ। কারণ, সত্যিকার বড় না হয়ে বড়ত্ব দাবী করা মিথ্যা এবং আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণে শরীক হওয়ার দাবী। তাই এটা আল্লাহ তাআলার জন্যে পূর্ণত্বের গুণ এবং অন্যের জন্যে মিথ্যা দাবী।

الْمُؤَوِّرِ —অর্থাৎ, রূপদানকারী। উদ্দেশ্য এই যে, সমগ্র সৃষ্টবস্তুকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ বিশেষ আকার ও আকৃতি দান করেছেন, যদ্বন্ধন এক বস্তু অপর বস্তু থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র হয়েছে। আকাশশৃংখ ও পৃথিবীশৃংখ সকল সৃষ্টবস্তু বিশেষ আকারের মাধ্যমেই পরিচিত হয়। সৃষ্টবস্তুর অসংখ্য প্রকারের আলাদা আলাদা আকার-আকৃতি, মানুষের একই শ্রেণীর মধ্যে পুরুষ ও নারীর আকার-আকৃতিতে পার্থক্য, কোটি কোটি নারী ও পুরুষের চেহারা এমন স্বতন্ত্র যে, একজনের মুখাবয়ব অন্যজনের সাথে মিলে না—এটা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই অপর শক্তির কারসাজি। এতে অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়। বড়ত্ব যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্যের



সূরা আল-মুমতাহিনা

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত ১৩

পরম করুণাময় ও অসীম দাতা আল্লাহর নামে শুরু।

(১) মুমিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রসুলকে ও তোমাদেরকে বহিষ্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সজ্ঞাটিনাভের জন্যে এবং আমার পথে জেহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (২) তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহ ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফের হয়ে যাও। (৩) তোমাদের স্বজন-পরিজন ও সম্মান-সম্মতি কিয়ামতের দিন কোন উপকারে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। (৪) তোমাদের জন্যে ইবরাহীম ও তাঁর সংসীদগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল : তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানিনি। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে। কিন্তু ইবরাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে এই আদর্শের ব্যক্তিক্রম। তিনি বলেছিলেন : আমি অবশ্যই তোমার জন্য কমাধারনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা। আমরা তোমারই উপর ভরসা করছি, তোমারই দিকে মুখ করছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।

জন্যে বৈধ নয় এবং এটা একমাত্র তাঁরই গুণ, তেমনি চিত্র ও আকার-আকৃতি নির্মাণ অন্যের জন্যে বৈধ নয়। এটাও আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণে তাঁর সাথে অংশীদারিত্ব দাবী করার নামান্তর।

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার উত্তম উত্তম নাম

আছে। কোরআন পাকে এসব নামের সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। সহীহ হাদীসসমূহে ১৯টি নাম বর্ণিত আছে। তিরমিযীর এক হাদীসে সবগুলোই উল্লেখিত হয়েছে।

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ — এই পবিত্রতা ও মহিমা

ঘোষণা অবস্থার মাধ্যমে হলে তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয় ; কেননা, সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও করা অন্তর্নিহিত কারিগরি এবং আকার-আকৃতি নিজ নিজ অবস্থার মাধ্যমে অহর্নিশ স্রষ্টার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনে মশগুল আছে। সত্যিকার উক্তির মাধ্যমে তসবীহ পাঠও হতে পারে। কেননা, সূচিভিত্তি অভিমত এই যে, প্রত্যেক বস্তুই নিজ নিজ সীমায় চেতনা ও অনভূতি সম্পন্ন। জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার সর্বপ্রথম দাবী হচ্ছে স্রষ্টাকে চেনা ও তাঁর কৃতজ্ঞ হওয়া। অতএব, প্রত্যেক বস্তুর সত্যিকার তসবীহ পাঠ করা অসম্ভব নয়। তবে আমরা নিজ কানে তা শুনি না। একারণেই কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে : وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ

— অর্থাৎ, তোমরা তাদের তসবীহ শোন না, বুঝ না।

সূরা হাশরের সর্বশেষ আয়াতসমূহের উপকারিতা ও কল্যাণ : তিরমিযীতে হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ)—এর বর্ণিত রেওয়াযেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি সকালে তিন বার **أَعُوذُ بِاللَّهِ الْكَذِيِّ** থেকে শেষপর্যন্ত সর্বশেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্যে রহমতের দোয়া করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মত হাঙ্গল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সে-ও এই মর্তবা লাভ করবে। —(মাহহারী)।

সূরা আল-মুমতাহিনা

এই সূরার শুরুভাগে কাফের ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই অংশ অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে মুমুল : তফসীর কুরতুবীতে কুশায়রী ও সা'লাবীর বরাতে দিয়ে বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধের পর মক্কাবিজয়ের পূর্বে মক্কার সারা নাস্ত্রী একজন গায়িকা নারী প্রথমে মদীনায় আগমন করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি কি হিজরত করে মদীনায় এসেছ? সে বলল : না। আবার জিজ্ঞাসা করা হল : তবে কি তুমি মুসলমান হয়ে এসেছ? সে এরও নেতিবাচক উত্তর দিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তা হলে কি উদ্দেশ্যে আগমন করেছ? সে বলল : আপনারা মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক ছিলেন। আপনাদের মধ্য থেকে আমি জীবিকা নির্বাহ করতাম। এখন মক্কার বড় বড় সরদাররা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে এবং আপনারা এখানে চলে এসেছেন। ফলে আমার জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে গেছে।

আমি ষের বিপদে পড়ে ও অভাবগ্রস্ত হয়ে আপনাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন : ভূমি মক্কার পেশাদার গায়িকা। মক্কার সেই যুবকরা কোথায় গেল, যারা তোমার গানে মুগ্ধ হয়ে টাকা-পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করত? সে বলল : বদর যুদ্ধের পর তাদের উৎসবপর্ব ও গান-বাজনার জৌলুস খতম হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত তারা কেউ আমাকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবদুল মুত্তালিব বংশের লোকগণকে তাকে সাহায্য করার জন্যে উৎসাহ দিলেন। তারা তাকে নগদ টাকা-পয়সা, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি দিয়ে বিদায় দিল।

এটা তখনকার কথা, যখন মক্কার কাকেররা হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কাকেরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ইচ্ছায় গোপনে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, এই গোপন তথ্য পূর্বাঙ্কে মক্কাবাসীদের কাছে ফাঁস না হোক। এদিকে সর্বপ্রথম হিজরতকারীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন হাতেব ইবনে আবী বালতায়্যা (রাঃ)। তিনি ছিলেন ইয়ামেনী বংশোদ্ভূত এবং মক্কায় এসে বসবাস অবলম্বন করেছিলেন। মক্কায় তাঁর স্বগোত্র বলতে কেউ ছিল না। মক্কায় বসবাসকালেই মুসলমান হয়ে মদীনায হিজরত করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও সন্তানগণ তখনও মক্কায় ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও অনেক সাহাবীর হিজরতের পর মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানদের উপর কাকেররা নির্ধাতন চালাত এবং তাদেরকে উত্যক্ত করত। যেসব মুহাজিরের আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল, তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা কোনরূপে নিরাপদে ছিল। হাতেব চিন্তা করলেন যে, তাঁর সন্তান-সন্ততিকে শত্রুর নির্ধাতন থেকে বাঁচিয়ে রাখার কেউ নেই। অতএব, মক্কাবাসীদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করলে তারা হয়তো তাঁর সন্তানদের উপর জুলুম করবে না। তাই গায়িকার মক্কা গমনকে তিনি একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন।

হাতেব স্বস্থানে নিশ্চিত বিশ্বাসী ছিলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা বিজয় দান করবেন। এই তথ্য ফাঁস করে দিলে তাঁর কিবো ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না। তিনি ভাবলেন, আমি যদি পত্র লিখে মক্কার কাকেরদেরকে জানিয়ে দেই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমার ছেলে-পোলেদের হেফাযত হয়ে যাবে। সুতরাং হাতেব এই ভুলটি করে ফেললেন এবং মক্কাবাসীদের নামে একটি পত্র লিখে গায়িকা সারার হাতে সোপর্দ করলেন।—(কুরতুবী, মাযহারী)

এদিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে ব্যাপারটি জানিয়ে দিলেন। তিনি আরও জ্ঞানতে পারলেন যে, মহিলাটি এসময়ে রঙবায়ে খাক নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

বোখারী ও মুসলিমে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে, আবু মুরসাদকে ও যুবায়র ইবনে আওসামকে আদেশ দিলেন, অশ্লু আরোহণ করে সেই মহিলার পশ্চাদ্ধাবন কর। তোমরা তাকে রঙবায়ে খাকে পাবে। তার সাথে মক্কাবাসীদের নামে হাতেব ইবনে আবী বালতায়্যার পত্র আছে। তাকে পাকড়াও করে পত্রটি ফিরিয়ে নিয়ে আস। হযরত আলী (রাঃ) বলেন : আমরা নির্দেশমত দ্রুতগতিতে তার পশ্চাদ্ধাবন করলাম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেস্থানের কথা বলেছিলেন, ঠিক সেস্থানেই আমরা তাকে উটে সওয়ার হয়ে যেতে দেখলাম এবং তাকে পাকড়াও করলাম। আমরা বললাম পত্রটি বের কর। সে বলল : আমার কাছে কায়ও কোন পত্র নেই। আমরা তার উটকে বসিয়ে দিলাম। এরপর তালশ করে কোন চিঠি পেলাম না। আমরা মনে মনে বললাম : রসূলুল্লাহ্

(সাঃ)-এর সংবাদ ভ্রান্ত হতে পারে না। নিশ্চয়ই সে পত্রটি কোথাও গোপন করেছে। এবার আমরা তাকে বললাম : হয় পত্র বের কর, না হয় আমরা তোমাকে বিবশ্র করে দিব।

অগত্যা সে নিরুপায় হয়ে পায়জামার ভিতর থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে চলে এলাম। হযরত ওমর (রাঃ) ঘটনা শুনা মাত্রই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরব করলেন : এই ব্যক্তি আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও সকল মুসলমানের সাথে বিশৃঙ্খলচরিতা করেছে। সে আমাদের গোপন তথ্য কাকেরদের কাছে লিখে পাঠিয়েছে। অতএব, অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেন : তোমাকে এই কাণ্ড করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? হাতেব আরব করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ্, আমার ইমানে এখনও কোন তফাৎ হয়নি। ব্যাপার এই যে, আমি ভাবলাম, আমি যদি মক্কাবাসীদের প্রতি একটু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি তবে তারা আমার বাচ্চা-কাচ্চাদের কোন ক্ষতি করবে না। আমি ব্যতীত অন্য কোন মুহাজির এরূপ নেই, যার স্বগোত্রের লোক মক্কায় বিদ্যমান নেই। তাদের স্বগোত্রীয়া তাদের পরিবার-পরিজনের হেফাযত করে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হাতেবের জবাববন্দী শুনে বললেন : সে সত্য বলেছে। অতএব, তার ব্যাপারে তোমরা ভাল ছাড়া মন্দ বলো না। হযরত ওমর (রাঃ) ইমানের জোশে নিজ বাক্যের পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাঁকে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন : সে কি বদর যোদ্ধাদের একজন নয়? আল্লাহ্ তাআলা বদর যোদ্ধাদেরকে ক্ষমা করার ও তাদের জন্যে জান্নাতের ঘোষণা দিয়েছেন। একথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে আরব করলেন : আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলই আসল সত্য জানেন।—(ইবনে-কাসীর) কোন কোন রেওয়াজে হাতেবের এই উক্তিও বর্ণিত আছে যে : আমি একাজ ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যে করিনি। কেননা, আমার দৃষ্টিশ্রু ছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-ই বিজয়ী হবেন। মক্কাবাসীরা ছেনে পেলেও তাতে কোন ক্ষতি হবে না।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা মুমতাহিনার শুরুভাগের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এসব আয়াত উপরোক্ত ঘটনার জন্যে হুশিয়ার করা হয় এবং কাকেরদের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা হারাম সাব্যস্ত করা হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ وَتَكُونُوا مِنَ الْمُخَلَّفِينَ

অর্থঃ, মুমিনগণ, তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে

বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে, তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করবে। এতে উল্লিখিত ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থঃ, এ ধরনের পত্র কাকেরদেরকে লিখা বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করারই নামান্তর। আয়াতে কাকের শব্দ বাদ দিয়ে ‘আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রু বলে প্রথমতঃ এই নির্দেশের কারণ ও দলীল ব্যক্ত করা হয়েছে যে, নিজেদের ও আল্লাহ্ শত্রু কাছে বন্ধুত্ব আশা করা আত্মত্যাগবোধ বৈ নয়। অতএব, এ থেকে বিরত থাক। দ্বিতীয়তঃ এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাকের যে পর্যন্ত কাকের থাকবে, সে কোন মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। সে আল্লাহ্ দূশমন। অতএব, যে মুসলমান আল্লাহ্ মহব্বত দাবী করে, তার সাথে কাকেরের বন্ধুত্ব ক্রিয়াক্রমে সম্ভবপর?

وَقَدْ كَرَّمُوا بَنِي مَرْثَانَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ لِيَكُونَ لَهُمْ مَوَدَّةً وَسُلَاطَةً

এখানে حق বলে কোরআন অথবা ইসলাম বোঝানো হয়েছে। এই আয়াতে তাদের শত্রুতার আসল কারণ কুফর বর্ণনা করার পর তাদের বাহ্যিক শত্রুতাও প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা তোমাদেরকে এবং তোমাদের রসূলকে প্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহিস্কার করেছেন। এই বহিস্কারের কারণ কোন পার্শ্ব বিষয় নয়। বরং একমাত্র তোমাদের ইমানই এর কারণ ছিল। অতএব, একথা আর গোপন রইল না যে, তোমরা যে পর্যন্ত মুমিন থাকবে তারা তোমাদের বন্ধু হতে পারে না। হাতেব মনে করেছিল যে, তাদের প্রতি একটু অনুগ্রহ করলে তারা তা পরিবার-পরিজনদের হেফাজত করবে। তার এই ধারণা বাস্তব। কারণ, ইমানের কারণে তারা তোমাদের শত্রু। খোদা না করুন, তোমাদের ইমান বিলুপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে বন্ধুত্বের আশা করা ঠোকা বৈ নয়।

إِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَهُمْ فَاذْكُرُوا أَنَّهُمْ أُخِصُوا لَكُمْ وَآيَةُكُمْ فِيهِمْ أَن

ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের হিজরত যদি বাস্তবিকই আল্লাহর জন্যে ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে ছিল, তবে আল্লাহর শত্রু করেদের কাছে এই আশা কিরূপে রাখা যায় যে, তারা তোমাদের খাতির করবে।

تُؤْتِنَهُمُ الْيَوْمَ بِالْوَدْعَةِ وَأَنَّا عَلِيمُونَ بِمَا تُخْفُونَ مِنَ الْعَمَلِ

এতেও আরও বলা হয়েছে যে, যারা কাফেরদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব রাখে তারা যেন মনে না করে যে, তাদের এই কার্যকলাপ গোপন থেকে যাবে। আল্লাহ তাআলা তাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কাজকর্মের খবর রাখেন; যেখন উল্লেখিত ঘটনায় তিনি তাঁর রসূলকে ওহীর মাধ্যমে অবগত করে চক্রান্ত ধরিয়ে দিয়েছেন।

إِنْ يَتَّبِعْتُمُ يُكُونُوا أَكْثَرًا وَأَن تَوَاسَّوْا الْيَوْمَ لَيْسَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا

অর্থাৎ, স্বযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তোমাদের সাথে উদার ব্যবহার করবে, তাদের কাছে এরূপ প্রত্যাশা করা দূরাশা মাত্র। তারা যখনই তোমাদের উপর প্রাধান্য হাসিল করবে, তখনই তাদের বাহ ও রসনা তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া কোন দিকে প্রসারিত হবে না।

وَوَدَّاعُوا لَكُمْ وَتُؤْتِنَهُمْ

এতে ইঙ্গিত আছে যে, যখন তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে, তখন তাদের বন্ধুত্ব কেবল তোমাদের ইমানের বিনিময়ে লাভ করতে পারবে। তোমরা কুফরে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না।

لَنْ تَقْعُدُوا عَنْ مَأْكُلِكُمْ وَلَا تَرْكَبُوا فِيهَا وَلَا تَتَحَلَّلَ بِهَا لَكُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا

بِمَا تَعْمَلُونَ فِيهِمْ

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়তা ও তোমাদের সম্ভান-সম্মতি তোমাদের উপকারে আসবে না। আল্লাহ তাআলা সেদিন

এসব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবেন। সম্ভানরা পিতা-মাতার কাছ থেকে ও পিতা-মাতারা সম্ভানদের কাছ থেকে পলায়ন করবে। এতে হযরত হাতেবের ওঘর খণ্ডন করা হয়েছে যে, যে সম্ভানদের মহব্বতে তুমি একাজ করেছিলে, মনে রেখ, কিয়ামতের দিন তারা তোমার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহর কাছে কোন কিছু গোপন নয়।

পরবর্তী আয়াতসমূহে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর সমস্ত জ্ঞাতিগোষ্ঠী মুশরিক ছিল। তিনি সবার সাথে শুধু সম্পর্কচ্ছেদই নয়—শত্রুতাও ঘোষণা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যে পর্যন্ত তোমরা বিশৃঙ্খল স্থাপন না করবে এবং শিরক থেকে বিরত না হবে, সেই পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতার প্রাচীর অন্তরায় হয়ে থাকবে।

حَقٌّ تُوْمِتُوا بِاللّٰهِ وَحَدَّاهُ خَلَقَ كَانَتْ لَكُمْ اٰمُوَّةٌ حَسَنَةٌ

একটি সন্দেহের জগুয়াব : উপরের আয়াতে মুসলমানদেরকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উত্তম আদর্শ ও সুনত অনুসরণ করার জোর আদেশ দেয়া হয়েছে। ইবরাহীম (আঃ) তার মুশরিক পিতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন বলেও প্রমাণিত আছে। সূরা তওবায় এর উল্লেখ আছে। অতএব, সন্দেহ হতে পারত যে, মুশরিক পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্যেও মাগফেরাতের দোয়া করা ইবরাহীমী আদর্শের অন্তর্ভুক্ত এবং এটা জায়েয হওয়া উচিত। তাই ইবরাহীমী আদর্শের অনুসরণ থেকে একে ব্যতিক্রম প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, অন্যসব বিষয়ে ইবরাহীমী আদর্শের অনুসরণ জরুরী, কিন্তু তাঁর এই কাজটির অনুসরণ মুসলমানদের জন্যে জায়েয নয়।

اَلَا قَوْلُ الرَّحْمٰنِ لَا يَنْبَغِيْهُ اٰمُوَّةٌ

কোন কোন তফসীরবিদ اَلَا قَوْلُ الرَّحْمٰنِ কে বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, ইবরাহীম (আঃ) যে, পিতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করেছিলেন, এটা তাঁর আদর্শের পরিপন্থী নয়। কেননা, তিনি পিতা মুসলমান হয়ে গেছে—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে দোয়া করেছিলেন। এরপর যখন তিনি আসল সত্য জ্ঞানতে পারেন, তখন দোয়া ছেড়ে দেন এবং সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন। এরূপ করা এখনও জায়েয। কোন কাফের সম্পর্কে যদি কারও প্রবল ধারণা থাকে যে, সে মুসলমান, তবে তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করায় কোন দোষ নেই।—(কুরতুবী)

মুসলমানদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কারে অংশগ্রহণ করে। তাদের সম্পর্ক বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন। এতে অনুগ্রহমূলক কাজ কারবার করতে নিষেধ করা হয়নি; বরং শুধু আন্তরিক বন্ধুত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ কেবল যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেই নয়; বরং যিশী ও চুক্তিবদ্ধ কাকেরদের সাথেও জায়েয নয়। এ থেকে তফসীরে-মাযহরীতে মাসআলা তের করা হয়েছে যে, যুদ্ধরত কাকেরদের সাথে ন্যায় ও সুবিচার করা তো জরুরীই; নিষিদ্ধ নয়। এথেকে বোঝা গেল যে, অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার যুদ্ধরত শত্রুদের সাথেও জায়েয। তবে অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে এর জন্যে শর্ত এই যে, তাদের সাথে অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহারের কারণে মুসলমানদের কোনরূপ ক্ষতি হওয়ার আশংকা যেন না থাকে। আশংকা থাকলে জায়েয নয়। তবে ন্যায় ও সুবিচার প্রত্যেকের সাথে সর্বাবস্থায় জরুরী ও ওয়াজিব।

শানে-নুফুলের ঘটনা : আলোচ্য আয়াতগুলোও একটি বিশেষ ঘটনা অর্থাৎ, হোদায়বিয়ার সন্ধির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সূরা ফাতহের শুরুতেই এই সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই সন্ধির যেসব শর্ত ছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি কাকেরদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দেয়া হবে না, পরন্তু কাকেরদের মধ্য থেকে যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে চলে যায়, তবে তাকে ফেরত দিতে হবে। সেমতে কিছু মুসলমান পুরুষ কাকেরদের মধ্য থেকে আগমন করে এবং তাদেরকে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর কয়েকজন নারী মুসলমান হয়ে আগমন করে। তাদের কাকের আত্মীয়রা তাদেরকে প্রত্যাগমনের আবেদন জানায়। এর পরিশ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতগুলো হোদায়বিয়ায় অবতীর্ণ হয়। এতে নারীদেরকে ফেরত পাঠাতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সন্ধিপত্রের ব্যাপকতা সংকুচিত ও রহিত হয়ে গেছে। এ ধরনের নারীদের ব্যাপারে কিছু বিশেষ বিধানও নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর সাথে এমন নারীদের ব্যাপারেও কিছু বিধান বর্ণিত হয়েছে, যারা প্রথমে মুসলমানদের বিবাহিতা ছিল; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং মক্কাতেই থেকে যায়। মুসলমান হওয়াই এই নারীদের বেলায় আসল ভিত্তি বিধায় তাদের ঈমান পরীক্ষা করার পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সঃ) ও মক্কাবাসীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়ার বিখ্যাত শান্তিচুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল এই যে, মক্কা থেকে কোন ব্যক্তি মদিনায় চলে গেলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিবেন যদিও সে মুসলমান হয়। কিন্তু মদীনা থেকে কেউ মক্কায় চলে গেলে কোরাইশরা তাকে ফেরত পাঠাবে না। এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই বাহ্যতঃ অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ, কোন মুসলমান পুরুষ অথবা নারী মক্কা থেকে মদীনায় চলে গেলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে ফেরত পাঠাবেন।

এই চুক্তি সম্পাদন শেষে রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন হোদায়বিয়াতেই অবস্থানরত ছিলেন তখন মুসলমানদের জন্যে অগ্নি পরীক্ষাভূত্যা একাধিক ঘটনা সংঘটিত হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি ঘটনা হযরত আবু জন্দল (রাঃ)-এর। কোরাইশরা তাকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল। তিনি কোন রকমে সেখান থেকে পালিয়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ভীষণ উদ্বেগ দেখা দিল যে, চুক্তির শর্তনুযায়ী তাকে ফেরত পাঠানো উচিত কিন্তু আমরা আমাদের একজন

নির্ধাতিত ভাইকে যালেমদের হাতে পুনরায় তুলে দিব এটা কিরূপে সম্ভব?

কিন্তু রসূলুল্লাহ (সঃ) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি শরীয়তের নীতিমালার হেফাযত ও তৎপ্রতি দৃঢ়তা এক ব্যক্তির কারণে বিসর্জন দিতে পারতেন না। এর সাথে সাথে তাঁর দূরদর্শী অন্তর্দৃষ্টি সত্ত্বরই এই নির্ধাতিতদের বিজয়ীমূলত মুক্তিও যেন প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছিল। স্বভাবগত কারণেই তিনিও আবু জন্দল (রাঃ)-কে ফেরত প্রত্যাগর্ষে দূষিত হয়ে থাকবেন, কিন্তু চুক্তি পালনের স্বাভিহে তাঁকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বিদায় করে দিলেন।

এর সাথে সাথেই দ্বিতীয় একটি ঘটনা সংঘটিত হল। মুসলমান সাঈদা বিনতে হারেস (রাঃ) কাকের সাযকী ইবনে আনসারের পত্নী ছিলেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে সাযকীর নাম মুসাফির মখযুমী বলা হয়েছে। তখন পর্যন্ত মুসলমান ও কাকেরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হারাম ছিল না। এই মুসলমান মহিলা মক্কা থেকে পালিয়ে হোদায়বিয়ায় রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। সাথে সাথে স্বামীও হাযির। সে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে দাবী জানাল যে, আমার স্ত্রীকে আমার কাছে প্রত্যাগণ করা হোক। কেননা, আপনি এই শর্ত যেনে নিয়েছেন এবং চুক্তিপত্রের কালি এখনও শুকায়নি।

এই ঘটনার পরিশ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে প্রকৃতপক্ষে মুসলমান ও কাকেরদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ ও হারাম করা হয়েছে। এর পরিণতিতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, কোন মুসলমান নারী হিজরত করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছে গেলে তাকে কাকেরদের হাতে ফেরত দেয়া হবে না—সে পূর্ব থেকেই মুসলমান হোক; যেমন উল্লেখিত সাঈদা অথবা হিজরতের পর তার মুসলমানত্ব প্রমাণিত হোক। তাকে ফেরত না দেয়ার কারণ এই যে, সে তার কাকের স্বামীর জন্যে হালাল নয়। তফসীরে কুরতুবীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এই ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

মোটকথা উল্লেখিত আয়াতসমূহ অবতরণের ফলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, চুক্তিপত্রের উপরোক্ত শর্তটি ব্যাপক অর্থে প্রযোজ্য নয় যে, পুরুষ অথবা নারী যে কোন মুসলমান আগমন করুক, তাকে ফেরত দিতে হবে। বরং এই শর্তটির ব্যাপকতা কেবল পুরুষদের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়—নারীদের ক্ষেত্রে নয়। নারীদের ব্যাপারে শুধু এতটুকু বলা যায় যে, যে নারী মুসলমান হয়ে হিজরত করে, তার কাকের স্বামী মোহরানার আকারে যা কিছু তার পিছনে ব্যয় করেছে, তা তাকে ফেরত দেয়া হবে। এসব আয়াতের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ (সঃ) চুক্তিপত্রের উল্লেখিত এই শর্তের সঠিক মর্ম ব্যাখ্যা করেন এবং তদনুযায়ী সাঈদা (রাঃ)-কে কাকেরদের কাছে ফেরত প্রেরণে বিরত থাকেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম বিনতে-ওতবা মক্কা থেকে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়। তার পরিবারের লোকেরা শর্তের ভিত্তিতে তাকে ফেরৎ দানের দাবী জানায়। এর পরিশ্রেক্ষিতে আয়াতসমূহ নাযিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, উম্মে কুলসুম আমার ইবনে-আস (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। স্বামী তখনও মুসলমান ছিল না। উম্মে-কুলসুম ও তাঁর দুই ভাই মক্কা থেকে পলায়ন করে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে চলে যান। সাথে সাথেই তাঁদেরকে ফেরত পাঠানোর দাবী উঠে। রসূলুল্লাহ (সঃ) শর্ত অনুযায়ী আমারা ও ওলীদ ভ্রাতৃত্বকে ফেরত পাঠিয়ে দেন; কিন্তু উম্মে কুলসুমকে ফেরত দেননি। তিনি বললেন : এই

শর্ত পুরুষদের জন্যে, নারীদের জন্যে নয়। এর পরিত্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সত্যায়নে আলোচ্য আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

এমনি ধরনের আরও কয়েকজন নারীর ঘটনা রেওয়াজে বর্ণিত আছে। বলাবাহুল্য এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। সবগুলো ঘটনাই সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কুরতুবীর উল্লেখিত রেওয়াজে থেকে জানা গেল যে, চুক্তির উপরোক্ত ধারার ভাষা যদিও ব্যাপক ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মতে তাতে নারীরা शामिल ছিল না। তাই তিনি হোদায়বিয়াতেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দেন এবং এরই সত্যায়নে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

সারকথা এই যে, এই শর্তের ভাষা ছিল ব্যাপক। নারীরা এর অন্তর্ভুক্ত না থাকার বিষয়টি পূর্ব থেকেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে ছিল; কিংবা আয়াত নাখিল হওয়ার পর তিনি নারীদেরকে শর্ত থেকে খারিজ করে দেন। উভয় অবস্থাতেই কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে এই চুক্তি এরপরও পূর্ণাঙ্গরূপে বলবৎ ছিল এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা পালিত হয়। কাজেই এক ব্যাখ্যাকে চুক্তিভঙ্গকরণ অথবা খতমকরণ রূপে গণ্য করা যায় না। অতঃপর ভাষাদৃষ্টে আয়াতসমূহের অর্থ অনুধাবন করুন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِنَ الْكُفَرَاءِ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ لَا يَحْكُمْنَ إِلَّا لِمَا يَشَاءُ اللَّهُ

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নারীদের মুসলমান ও মুমিন হওয়াই সন্ধির শর্ত থেকে তাদের ব্যতিক্রমভুক্ত হওয়ার কারণ। মক্কা থেকে মদীনায় আগমনকারিণী নারীদের ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনাও ছিল যে, তাদের কেউ ইসলাম ও ঈমানের খাতিরে নয়, বরং স্বামীর সাথে ঝগড়া করে অথবা মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে বা অন্য কোন পার্শ্ব স্বার্থের কারণে হিজরত করেছে। এরূপ নারী আত্মাহুঁর কাছে এই শর্তের ব্যতিক্রমভুক্ত নয়; বরং সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাকে ফেরত পাঠানো জরুরী। তাই মুসলমানগণকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেসব নারী হিজরত করে মদীনায় আসে, তাদের ঈমান পরীক্ষা করে নাও। এর সাথেই বলা হয়েছে: اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَهُنَّ এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যিকার ও আসল ঈমানের সম্পর্ক তো অন্তরের সাথে, যার খবর আত্মাহুঁ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না। তবে মৌখিক স্বীকারোক্তি ও লক্ষণাদিষ্টে ঈমান সম্পর্কে অনুমান করা যায়। সুতরাং মুসলমানগণকে এ বিষয়েরই আদেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেন : মুহাজির নারীকে শপথ করানো হত যে, সে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার কারণে আগমন করেনি, মদীনার কোন ব্যক্তির প্রেমে পড়ে আসেনি এবং অন্য কোন পার্শ্ব স্বার্থের বশবর্তী হয়ে হিজরত করেনি; বরং একান্তভাবে আত্মাহুঁ ও তার রসূলের ভালবাসা ও সন্তুষ্ট লাভের জন্যে আগমন করেছে। যে নারী এই শপথ করত, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে মদীনায় বসবাসের অনুমতি দিতেন এবং সে তার স্বামীর কাছ থেকে যে মোহরানা ইত্যাদি আদায় করেছিল, তা তার স্বামীকে ফেরত দিয়ে দিতেন।—(কুরতুবী)

তিরমিযীতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়াজেও বলা হয়েছে : নারীদের পরীক্ষার পদ্ধতি ছিল সেই আনুগত্যের শপথ, যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ, إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِنَ الْكُفَرَاءِ মুহাজির নারীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে আয়াতে বর্ণিত

বিষয়সমূহের শপথ করত। এটাও অসম্ভব নয় যে, প্রথমে তাদেরকে সেসব বাক্যও উচ্চারণ করানো হত, যেগুলো হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়াজে উল্লেখিত হয়েছে। এরপর আয়াতে বর্ণিত শপথ দ্বারা তা পূর্ণ করা হত।

وَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا يَحْكُمْنَ إِلَّا لِمَا يَشَاءُ اللَّهُ ۚ

অর্থাৎ, পরীক্ষার পর যদি তারা মুমিন প্রতিপন্ন হয়, তবে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠানো বৈধ নয়।

لَا يَحْكُمْنَ إِلَّا لِمَا يَشَاءُ اللَّهُ ۚ

অর্থাৎ, এই নারীরা কাফের পুরুষদের জন্যে হালাল নয় এবং কাফের পুরুষরাও তাদের জন্যে হালাল নয় যে, তাদেরকে পুনবিবাহ করবে।

এই আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, যে নারী কোন কাফেরের বিবাহধীন ছিল, এরপর সে মুসলমান হয়ে গেছে, তার বিবাহ কাফেরের সাথে আপনা-আপনি ভঙ্গ হয়ে গেছে, তারা একে অপরের জন্যে হারাম। নারীদেরকে সন্ধির শর্ত থেকে ব্যতিক্রমভুক্ত রাখার কারণ এটাই।

وَالْمُؤْمِنَاتُ

অর্থাৎ, মুহাজির মুসলমান নারীর কাফের স্বামী বিবাহের মোহরানা ইত্যাদি বাবত যা ব্যয় করেছে, তা সবই তার স্বামীকে ফেরত দাও। কেননা, নারীকে ফেরত দেয়াই কেবল সন্ধি-শর্তের ব্যতিক্রমভুক্ত ছিল, যা হারাম হওয়ার কারণে সম্ভবপর নয়, কিন্তু স্বামীর প্রদত্ত ধন-সম্পদ শর্ত অনুযায়ী ফেরত দেয়া উচিত। মুহাজির নারীকে সরাসরি এই ধন-সম্পদ ফেরত দিতে বলা হয়নি; বরং সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ফেরত দাও। কারণ, স্বামী প্রদত্ত ধন-সম্পদ খতম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। ফলে নারীদের কাছ থেকে ফেরত দেয়ানো সম্ভবপর নয় বিধায় বিষয়টি সাধারণ মুসলমানদের দায়িত্বে দেয়া হয়েছে। যদি বায়তুলমাল থেকে দেয়া সম্ভবপর হয়, তবে সেখান থেকে, নতুবা মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা ভুলে দেয়া হবে।—(কুরতুবী)

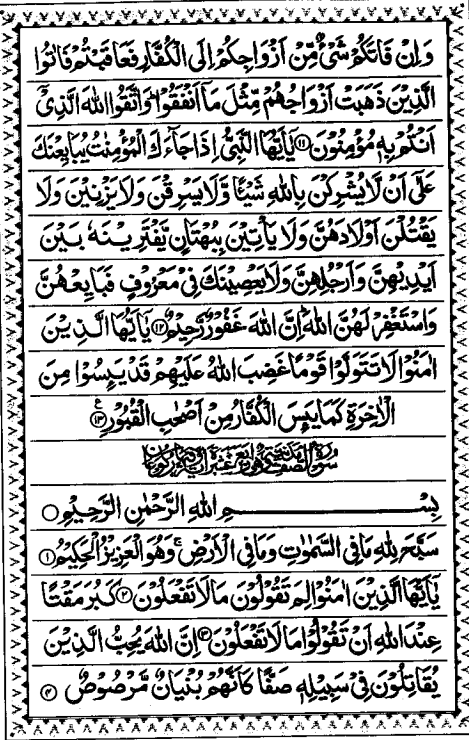
وَالْحَيْمَاتُ عَلَيْهِنَّ يَكْفِيَنَّ ذَلِكَ اثْبَتَهُنَّ أَنْوَاعُ

পূর্বের আয়াত থেকে বোঝা গেছে যে, মুহাজির মুসলমান নারীর বিবাহ তার কাফের স্বামীর সাথে ভঙ্গ হয়ে গেছে। এই আয়াতে তারই পরিশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে, এখন মুসলমান পুরুষের সাথে তার বিবাহ হতে পারে; যদিও প্রাক্তন কাফের স্বামী জীবিত থাকে এবং তালাকও না দেয়।

আলোচ্য আয়াতে إِذَا اثْبَتَهُنَّ أَنْوَاعُ বাক্যটি শর্তরূপে উল্লেখিত হয়েছে; অর্থাৎ, তোমরা এই নারীদেরকে মোহরানা দিয়ে দেয়ার শর্তে বিবাহ করতে পার। এটা প্রকৃতপক্ষে বিবাহের শর্ত নয়। কেননা, সবার মতেই বিবাহ মোহরানা আদায় করার উপর নির্ভরশীল নয়, তবে বিবাহের কারণে মোহরানা আদায় করা ওয়াজিব অবশ্যই। এখানে একে শর্তরূপে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এই মাত্র এক মোহরানা কাফের স্বামীকে ফেরত দেয়ানো হয়েছে। কাজেই বিবাহকারী মুসলমান মনে করতে পারে যে, নতুন মোহরানা দেয়ার আর আবশ্যকতা নেই। এই ভ্রান্তি দূর করার জন্যে বলা হয়েছে যে, বিগত মোহরানার সম্পর্ক বিগত বিবাহের সাথে ছিল। এটা নতুন বিবাহ; কাজেই এর জন্যে নতুন মোহরানা অপরিহার্য।

وَأَشْهُدُكُمْ عَلَى الْكَافِرِ

عصمة শব্দটি عصمة এর বহুবচন। এর



(১১) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফেরদের কাছে থেকে যায়, অতঃপর তোমরা সুযোগ পাপ, তখন যাদের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশাস রাখ। (১২) হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাস্থ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (১৩) মুমিনগণ, আল্লাহ যে জাতির প্রতি রুষ্ট, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। তারা পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে যেমন কবরস্থ কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে।

সূরা আছ-ছফ

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ১৪

পরম করশাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) নভেমগলে ও ভূমগলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাবান। (২) মুমিনগণ। তোমরা যা কর না, তা কেন বল? (৩) তোমরা যা করনা, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক। (৪) আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাগুলানো প্রাচীর।

আসল অর্থ সংরক্ষণ ও সংহতি। এখানে বিবাহবন্ধন ইত্যাদি সংরক্ষণযোগ্য বিষয় বোঝানো হয়েছে।

করা শব্দটি ১৩৬৫ এর বহুবচন। এখানে মুশরিক রমণী বোঝানো হয়েছে। কেননা, কিতাবী কাফের রমণীকে বিবাহ করা কোরআনে সিদ্ধ রাখা হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এ পর্যন্ত মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে যে বৈবাহিক সম্পর্ক বৈধ ছিল, তা খতম করে দেয়া হল। এখন কোন মুসলমানের বিবাহ মুশরিক নারীর সাথে বৈধ নয়। পূর্বে যে বিবাহ হয়েছে, তাও খতম হয়ে গেছে। এখনও কোন-মুশরিক নারীকে বিবাহে আবদ্ধ রাখা হলাল নয়।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার সময় যে সাহাবীর কোন মুশরিক স্ত্রী ছিল, তিনি তাকে ছেড়ে দেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর বিবাহে দুইজন মুশরিক নারী ছিল। হিজরতের সময় তারা মক্কায় রয়ে গিয়েছিল। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি তাদেরকে তালাক দিয়ে দেন।—(মাযহারী) এখানে তালাকের অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ করা। পারিতোষিক তালাকের এখানে প্রয়োজনই নেই। কেননা, আয়াত বলেই তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যায়।

অর্থঃ, যখন মুসলমান

নারীকে মক্কায় ফেরত পাঠানো হবে না এবং তার মোহরানা স্বামীকে ফেরত দেয়া হবে, এমনভাবে যদি কোন মুসলমান নারী ধর্মত্যাগী হয়ে মক্কায় চলে যায় অথবা পূর্ব থেকেই কাফের থাকার কারণে মুসলমান স্বামীর হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মুসলমান স্বামীকে তার মোহরানা ফেরত দেয়া কাফেরদের দায়িত্ব হয়, তখন পারস্পরিক সমঝোতা ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে এসব লেন-দেনের মীমাংসা করে নেয়া কর্তব্য। উভয়পক্ষ যে মোহরানা ইত্যাদি দিয়েছে তা জিহ্বাসা করে ছেদে নিয়ে তদনুযায়ী লেন-দেন করে নেয়া উচিত।

وَلَنْ قَاتِلُوهُمْ قَاتِلُوا إِلَى الْكُفْرِ مَا فَاتَهُمُ الْقَاتِلُ

শব্দটি ১৩৬৫ থেকে উদ্ধৃত। এর অর্থ প্রতিশোধ নেয়াও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থও হতে পারে। (কুরতুবী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদের কিছুসংখ্যক স্ত্রীলোক যদি কাফেরদের হাতে থেকে যায়, তবে তাদের মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ইত্যাদি ফেরত দেয়া কাফেরদের জন্যে জরুরী ছিল, যেমন মুসলমানদের পক্ষ থেকে মুহাজির নারীদের কাফের স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দেয়া হয়েছে। কিন্তু কাফেররা গ্রহণ করল না এবং মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা ফেরত দিল না। এখন তোমরা যদি এর প্রতিশোধ নাও এবং কাফেরদের প্রাপ্য মোহরানা তোমাদের প্রাপ্য পরিমাণে আটক কর, তবে এর বিধান এই যে,

وَلَنْ قَاتِلُوهُمْ قَاتِلُوا إِلَى الْكُفْرِ مَا فَاتَهُمُ الْقَاتِلُ

অর্থঃ, তোমরা মুহাজির নারীদের দেয়া আটককৃত মোহরানা থেকে সেই মুসলমান স্বামীদেরকে তাদের ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণে দিয়ে দাও, যাদের স্ত্রী কাফেরদের হাতে রয়ে গেছে।

এর অপর অর্থ যুদ্ধে সম্পদ হারানো হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যেসব মুসলমানের স্ত্রী কাফেরদের হাতে চলে গেছে এবং শর্ত অনুযায়ী কাফেররা মুসলমান স্বামীদেরকে মোহরানা দেয়নি, এরপর মুসলমানেরা যুদ্ধবন্দী সম্পদ লাভ করেছে, এই যুদ্ধবন্দী সম্পদ থেকেই মুসলমান স্বামীদের প্রাপ্য দিতে হবে।—(কুরতুবী)

নারীদের আনুগত্যের শপথ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ

এ আয়াতে মুসলমান নারীদের কাছ থেকে একটি বিস্তারিত আনুগত্যের শপথ নেয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ঈমান ও আকায়দসহ শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করারও অঙ্গীকার রয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ে যদিও এই শপথ মুহাজির নারীদের ঈমান পরীক্ষার পরিশিষ্ট হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু ভাষার ব্যাপকতার কারণে এটা শুধু তাদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়। বরং সব মুসলমান নারীর জন্যে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বাস্তব ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। এ ব্যাপারে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে শুধু মুহাজির নারীরাই নয়, অন্যান্য নারীরাও শপথ করেছে। সহীহ বোখারীতে রেণুয়েতে হযরত ওমায়মা বর্ণনা করেন : আমি আরও কয়েকজন মহিলাসহ রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে শপথ করেছি। তিনি আমাদের কাছ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের অঙ্গীকার নেন এবং সাথে সাথে এই বাক্যও উচ্চারণ করান فَمَا اسْتَطَعْتَنَ وَاطَقْتَنَ অর্থাৎ, আমরা এসব বিষয় পালনে অঙ্গীকার করি যে পর্যন্ত আমাদের সাথে কলায়। ওমায়মা এরপর বলেন : এ থেকে জানা গেল যে, আমাদের প্রতি রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর স্নেহ-মমতা আমাদের নিজেদের চাইতেও বেশী ছিল। আমরা তো নিঃশর্ত অঙ্গীকারই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে শর্তযুক্ত অঙ্গীকার শিক্ষা দিলেন। ফলে অপারগ অবস্থায় বিরুদ্ধাচরণ হয়ে গেলে তা অঙ্গীকার ভঙ্গের শামিল হবে না—(মায়হারী)

সহীহ বোখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) এই শপথ সম্পর্কে বলেন : মহিলাদের এই শপথ কেবল কথাবার্তার মাধ্যমে হয়েছে—হাতের উপর হাত রেখে শপথ হয়নি, যা পুরুষদের ক্ষেত্রে হত। বস্তুতঃ রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর হাত কখনও কোন গায়ের মাহরাম নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি।—(মায়হারী)

হাদীস থেকে প্রমাণিত আছে যে, এই শপথ কেবল হোদায়বিয়ার ঘটনার পরেই নয় ; বরং বারবার হয়েছে। এমনকি, মক্কাবিজয়ের দিনও রসুলুল্লাহ (সাঃ) পুরুষদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করে সাফা পর্বতের উপর নারীদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন। পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে হযরত ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর বাক্যাবলী নীচে সমবেত মহিলাদের কাছে পৌছিয়ে দিতেন।

তখন যারা আনুগত্যের শপথ করেছিল, তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও ছিল। সে প্রথমে লজ্জাবশতঃ নিজেকে গোপন রাখতে চেয়েছিল, এরপর শপথের কিছু বিবরণ জিজ্ঞাসা করে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সে একাধিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।—(মায়হারী)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنْ لَا تُحِبُّوا وَلَا تُبْغِزُوا مَحِلَّةَ الْأَسْرَىٰ وَلَا تَبْغِزُوا الَّذِينَ بَدَلُوا دِيَارَهُمْ وَلَا دِيَارَهُمْ بَدَلُوا وَلَا يَسِرُّوا وَلَا يَكُونُوا فِي أَرْحَامِكُمْ أُولَٰئِكَ يَكُونُونَ فِيكُمْ وَلَا تُزْجَرُوا فِي الْأَسْرِ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْ الْأَسْرِ وَلَا تُبْغِزُوا الَّذِينَ يَبْغِزُونَ

মহিলাদের জন্য শপথের প্রথম বিষয় ছিল ঈমান অবলম্বন করা এবং শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা। এটা সাধারণ পুরুষদের শপথও ছিল। দ্বিতীয় বিষয় চুরি না করা। অনেক নারীই স্বামীর ধন-সম্পদ চুরি করতে অভ্যস্ত ছিল। তাই এটা উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বিষয় ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকা। এতে নারীরা পাকাপোক্ত হলে পুরুষদের জন্যও আত্মরক্ষা করা সহজ হয়ে যায়। চতুর্থ বিষয় নিজ সন্তানকে হত্যা না করা।

মুর্খতামুগে কন্যাসন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করার প্রচলন ছিল। আয়াতে একে রোধ করা হয়েছে। পঞ্চম বিষয় মিথ্যা অপবাদ ও কলংক আরোপ না করা। এই নিষেধাজ্ঞার সাথে একথাও আছে যে, يَنْهَىٰ عَنْ الْبَغْيِ وَالتَّجَسُّسِ وَالتَّكْلِيفِ وَالتَّكْلِيفِ وَالتَّكْلِيفِ

অর্থাৎ, নিজের হাত ও পায়ের মাঝখানে যেন অপবাদ আরোপ

না করে। এর কারণ এই যে, কেয়ামতের দিন মানুষের হস্ত-পা-ই তার ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ধরনের পাপকর্ম করার সময় লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আমি চারজন সাক্ষীর মাঝখানে এই কাজ করছি। এরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে।

ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে একটি সাধারণ বিধি। তা এই যে, وَلَا تُحِبُّوا وَلَا تُبْغِزُوا অর্থাৎ, তারা ভাল কাজে আপনার আদেশ অমান্য করবে না। রসুলুল্লাহ (সাঃ) যে কোন কাজের আদেশ দিবেন, তা ভাল না হয়ে পারে না। এর ব্যতিক্রম নিশ্চিত অসম্ভব। এমতাবস্থায় ‘ভালকাজে’ কথাটি যুক্ত করার কারণ কি? এর এক কারণ তো এই যে, মূলমানরা যেন ভাল করে বোঝে নেয় যে, আল্লাহর আদেশের বিপরীতে কোন মানুষের আনুগত্য করা জায়েয নয় ; এমনকি, সেই মানুষটি যদি রসূলও হন, তবুও নয়। তাই রসূলের আনুগত্যের সাথেও এই শর্তটি যুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, এখানে ব্যাপার নারীদের। তারা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর কোন আদেশেরই খেলাফ করবে না, এরূপ ব্যাপক আনুগত্যের কারণে শয়তান কারও মনে পথভ্রষ্টতার কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারত। এই পথ বন্ধ করার জন্যে শর্তটি যুক্ত করা হয়েছে।

সূরা আছ-ছফ্

শানে-নুযুল : তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : একদল সাহাবায়ে কোরাম পরস্পরে আলোচনা করলেন যে, আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল কোনটি আমরা যদি তা জানতে পারতাম, তবে তা বাস্তবায়িত করতাম। বগভী (রহঃ) এ প্রশ্নে আরও বর্ণনা করেছেন যে, তারা কেউ কেউ একথাও বললেন যে, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমলটি জানতে পারলে আমরা তজ্ঞন্যে জান ও মাল সব বিসর্জন করতাম।—(মায়হারী)

ইবনে-কাসীর মুসনাদে আহমদের বরাতে দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা একত্রিত হয়ে পরস্পরে এই আলোচনা করার পর একজনকে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্যে প্রেরণ করতে চাইলেন, কিন্তু কারও সাহস হল না। ইতিমধ্যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে নামে নামে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। (ফলে বোঝা যায় যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে তাঁদের সমাবেশ ও আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।) তাঁরা দরবারে উপস্থিত হলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদেরকে সমগ্র সূরা ছফ্ পাঠ করে শুনিতে দিলেন, যা তখনই নাথিল হয়েছিল।

এই সূরা থেকে জানা গেল যে, তাঁরা সর্বাধিক প্রিয় যে আমলটির সন্ধানে ছিলেন, সেটি হচ্ছে আল্লাহর পথে জেহাদ। তাঁরা এ সম্পর্কে যেসব বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিলেন এবং জীবনপণ করার দাবী উচ্চারণ করেছিলেন, সে সম্পর্কেও সূরায় সাথে সাথে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোন মুমিনের জন্যে এ ধরনের বুলি আওড়ানো দূরস্ত নয়। কারণ, যথাসময়ে সে তার সংকল্প পূর্ণ করতে পারবে কি না, তা তার জানা নেই। সংকল্প পূর্ণ করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া এবং বাধা অপসারিত হওয়া তার ক্ষমতাসীল নয়। এছাড়া স্বয়ং তার হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি আন্তরিক সংকল্পও তার ক্ষমায় নয়। এ কারণেই কোরআন পাকে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কেও শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে,

স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, কিন্তু তার অধিকাংশ বিধি-বিধান মুসা (আঃ)-এর শরীয়ত ও তওরাতের অনুরূপ। স্বল্পসংখ্যক বিধানই পরিবর্তন করা হয়েছে মাত্র।

হযরত ঈসা (আঃ) দ্বিতীয় বিষয় এই উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁর পরে আগমণকারী রসুলের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাঁর দিক নির্দেশও তদনুরূপ হবে। তাই তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাও বুদ্ধি এবং সততার দাবী।

সাথে সাথে তিনি বনী ইসরাঈলকে পরে আগমণকারী রসুলের নাম-ঠিকানাও ইঞ্জীলে বলে দিয়েছেন। এভাবে বনী-ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যখন আগমন করবেন, তখন তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর আনুগত্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য হবে। وَمَنْ يُؤْمَرْ بِشَيْءٍ مِنْهُ

بِأَيِّ شَيْءٍ يُعَذِّبُ اللَّهُ أَهْلَهُ

বাক্যে তাই বর্ণিত হয়েছে। এতে সেই রসুলের নাম বলা হয়েছে আহমদ। আমাদের প্রিয় শেখনবী (সাঃ)-এর মুহাম্মদ, আহমদ এবং আরও কয়েকটি নাম ছিল। কিন্তু ইঞ্জীলে তাঁর নাম আহমদ উল্লেখ করার উপযোগিতা সম্ভবতঃ এই যে, আরবে প্রাচীনকাল থেকেই মুহাম্মদ নাম রাখার প্রচলন ছিল। ফলে এই নামের আরও লোক আরবে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আহমদ নাম আরবে প্রচলিত ও সুবিদিত ছিল না। এটা একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরই বিশেষ নাম ছিল।

وَمَنْ يُؤْمَرْ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ بِهِ السُّورَةَ

এই আয়াতে ঈমান এবং ধন-সম্পদ ও জীবনপণ করে জেহাদ করাকে বাণিজ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে। কারণ, বাণিজ্যে যেমন কিছু ধন-সম্পদ ও শ্রম ব্যয় করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয়, তেমন ঈমান সহকারে আল্লাহর পথে জ্ঞান ও মাল ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী নেয়ামত অর্জিত হয়। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে যে, যে এই বাণিজ্য অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা তার গোনাহ মাফ করবেন এবং জাহান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসগৃহ দান করবেন। এসব বাসগৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস-ব্যসনের সরঞ্জাম থাকবে। অতঃপর পরকালীন

নেয়ামতের সাথে কিছু ইহকালীন নেয়ামতেরও ওয়াদা করা হয়েছেঃ

يَسْتَكْفِرُ الْغَنَى وَالْفَقْرُ وَالْغَنَى وَالْفَقْرُ وَالْغَنَى وَالْفَقْرُ

এর বিশেষণ। অর্থ এই যে, পরকালীন নেয়ামত ও বাসগৃহ তো পাওয়া যাবেই; ইহকালেও একটি নগদ নেয়ামত পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অর্থাৎ, শত্রুদের বিজিত হওয়া। এখানে الْغَنَى শব্দটি পরকালের বিপরীতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যদি প্রচলিত الْغَنَى ধরা হয়, তবে এর প্রথম অর্থ হবে খয়বর বিজয় এবং এরপর মক্কা বিজয়। الْغَنَى অর্থাৎ, তোমরা এই নগদ নেয়ামত খুব পছন্দ কর। কারণ মানুষ স্বভাবগতভাবে নগদকে পছন্দ করে। কোরআনে বলা হয়েছে। وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا অর্থাৎ, মানুষ তড়িঘড়ি পছন্দ করে। এর অর্থ এই নয় যে, পরকালীন নেয়ামত তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, পরকালের নেয়ামত তো তাদের প্রিয় কামাই, কিন্তু স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নেয়ামতও তারা দুনিয়াতে চায়। তাও দেয়া হবে।

كَفَالِ عَيْتِ ابْنِ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَلُوا إِلَى اللَّهِ

حَوَارِي শব্দটি হারী এর বহুবচন। এর অর্থ আন্তরিক বদ্ধ। যারা ঈসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তাদেরকে হারী বলা হত। সূরা আল-ইমরানে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল বার জন। এই আয়াতে ঈসা (আঃ)-এর আমলের একটি ঘটনা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে দ্বীনের সাহায্যের জন্যে তৈরী হতে উৎসাহিত করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ) শত্রুদের উৎসীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেনঃ

مَنْ أَنْصَلُوا إِلَى اللَّهِ

অর্থাৎ, আল্লাহর দ্বীন প্রচারে কে আমার সাহায্যকারী হবে? প্রত্যুত্তরে বার জন লোক আনুগত্যের শপথ করে এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। অতএব মুসলমানদেরকেও আল্লাহর দ্বীন প্রচারে সাহায্যকারী হওয়া উচিত।

তার পবিত্রতা পাঠ। নির্ভুল সত্য এই যে, প্রত্যেক বস্তু তার নিজস্ব ভঙ্গিতে আক্ষরিক অর্থেও পবিত্রতা পাঠ করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জড় ও অজড় পদার্থের মধ্যে তার সাধ্যানুযায়ী চেতনা ও অনুভূতি রেখেছেন। এই চেতনা ও অনুভূতির অপরিহার্য দাবী হচ্ছে পবিত্রতা পাঠ। কিন্তু এসব বস্তুর পবিত্রতা পাঠ মানুষ শ্রবণ করে না। তাই কোরআনে বলা হয়েছে **وَلَا تَسْمَعُونَ نَسِيحَتَهُمْ** অধিকাংশ সূরার শুরুতে অতীত পদবাচ্যে **سَمِعَ** বলা হয়েছে। কেবল সূরা জুমআ ও সূরা তাগাবুনে ভবিষ্যৎ পদবাচ্যে **سَمِعَ** ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ভাষাগত অলংকার এই যে, অতীত পদবাচ্য নিশ্চয়তা বোঝায়। এ কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাই ব্যবহৃত হয়েছে। ভবিষ্যৎ পদবাচ্য সদাসর্বদা হওয়া বোঝায়। এই অর্থ বোঝাবার জন্যে দুই জায়গায় এই পদ ব্যবহার করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِي يَشْفَعُ لَكُمْ فِي الْأَرْحَامِ سَوَاءٌ এর **اميين** শব্দটি এমি এর বহুবচন। এর অর্থ নিরক্ষর। আরবরা এই পদবীতে সুবিদিত। কারণ, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। লেখাপড়া জানা লোক খুব কম ছিল। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলার মহাশক্তি প্রকাশ করার জন্যে বিশেষভাবে আরবদের জন্যে এই পদবী অবলম্বন করা হয়েছে এবং একথাও বলা হয়েছে যে, প্রেরিত রসুলও তাদেরই একজন অর্থাৎ, নিরক্ষর। কাজেই এটা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, গোটা জাতি নিরক্ষর এবং তাদের কাছে যে রসুল প্রেরিত হয়েছেন, তিনিও নিরক্ষর। অথচ যেসব কর্তব্য এই রসুলকে সোপান করা হয়েছে, সেগুলো সবই এমন শিক্ষামূলক ও সৎকারমূলক যে, কোন নিরক্ষর ব্যক্তি এগুলো শিক্ষা দিতে পারে না এবং কোন নিরক্ষর জাতি এগুলো শিখার যোগ্য নয়।

একে একমাত্র আল্লাহ তাআলার অপার শক্তিবলে রসুলে করীম (সাঃ)-এর অলৌকিক ক্ষমতাই আখ্যা দেয়া যায় যে, তিনি যখন শিক্ষা ও সৎকারের কাজ শুরু করেন, তখন এই নিরক্ষরদের মধ্যেই এমন সুশিক্ষিত ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটল, যাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ও কুশলতা এবং উৎকৃষ্ট কর্মপ্রতিভা সারিবিশ্বের স্বীকৃতি ও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

পয়গম্বর প্রেরণের তিন উদ্দেশ্য : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَالْحَقِّ** এই আয়াতে আল্লাহ তাআলার নেয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে : (এক) কোরআনের আয়াত ডেলাওয়াত, (দুই) উম্মতকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা, (তিন) কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়া।

এই তিনটি বিষয়ই উম্মতের জন্যে যেমন আল্লাহ তাআলার নেয়ামত, তেমনি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যেরও অন্তর্ভুক্ত।

ثَلَاثٌ এর আসল অর্থ অনুসরণ করা। পরিভাষায় শব্দটি আল্লাহর কলাম পাট করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। **آيَات** বলে কোরআনের আয়াত বোঝানো হয়েছে। **ثَلَاثٌ** শব্দে বলা হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রেরণ করার এক উদ্দেশ্য এই যে, তিনি মানুষকে কোরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য **ثَلَاثٌ** এটা **تَرْكِه** থেকে উদ্ভূত। অর্থ পবিত্র করা। আভ্যন্তরীণ দোষ থেকে পবিত্র করার অর্থে অধিকতর ব্যবহৃত হয় ; অর্থাৎ, কুফর, শিরক ও কূচরিত্রতা থেকে পবিত্র করা। কোন সময় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার পবিত্রতার জন্যেও ব্যবহৃত হয়। এখানে

এই ব্যাপক অর্থই উদ্দেশ্য।

তৃতীয় উদ্দেশ্য **وَالْحَقِّ وَالْحَقِّ** ‘কিতাব’ বলে কোরআন পাক এবং ‘হিকমত’ বলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত উক্তিগত ও কর্মগত শিক্ষাসমূহ বোঝানো হয়েছে। তাই অনেক তফসীরকারক এখানে হিকমতের তফসীর করেছেন সূনাহ।

وَالْحَقِّ এর শাস্তিক অন্য লোক। **وَالْحَقِّ** এর অর্থ যারা এখন পর্যন্ত তাদের অর্থাৎ, নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে বোঝানো হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কেয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানকে প্রথম কাতারের মুমিন অর্থাৎ, সাহাবায়ে-করামের সাথে সংযুক্ত মনে করা হবে। এটা নিঃসন্দেহে পরবর্তী মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ।—(সাহল-মা’আনী)

কেউ কেউ **وَالْحَقِّ** শব্দটিকে **اميين** এর উপর **عطف** করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রসুলকে নিরক্ষরদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে প্রেরণ করেছেন, যারা এখনও নিরক্ষরদের সাথে মিলিত হয়নি। এখানে প্রশ্ন হয় যে, উপস্থিত লোকদের মধ্যে রসুল প্রেরণ করার বিষয়টি বোধগম্য, কিন্তু যারা এখনও দুনিয়াতে আগমনই করেনি, তাদের মধ্যে রসুল প্রেরণ করার মানে কি? বয়ানুল কোরআনে বলা হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রেরণ করার অর্থ তাদের জন্যে প্রেরণ করা, **فِي** শব্দটি আরবী ভাষায় এই অর্থেও আসে।

কেউ কেউ **وَالْحَقِّ** শব্দের **عطف** মেনেছেন **وَالْحَقِّ** এর সর্বনামের উপর। এর অর্থ এই হবে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) শিক্ষা দেন নিরক্ষরদেরকে এবং তাদেরকে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।—(মাহহারী)

সহীহ বাখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হোরাযরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম, এমনতাবস্থায় সূরা জুমআ অবতীর্ণ হয়। তিনি আমাদেরকে তা পাঠ করে শুনান। তিনি **وَالْحَقِّ**

وَالْحَقِّ পাঠ করলে আমরা আরয করলাম : ইয়া রসুলুল্লাহ, এরা কারা? তিনি নিরুত্তর রইলেন। দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার প্রশ্ন করার পর তিনি পার্শ্ব উপবিষ্ট সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর গায়ে হাত রাখলেন এবং বললেন : যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের সমান উচ্চতায়ও থাকে, তবে তার সম্প্রদায়ের কিছুলোক সেখান থেকেও ঈমানকে নিয়ে আসবে।—(মাহহারী)

এই রেওয়াজেতেও পারস্যবাসীদের কোন বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত হয় না ; বরং এতটুকু বোঝা যায় যে, তারাও **وَالْحَقِّ** অর্থাৎ, অন্য লোকদের সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত। এই হাদীসে অনারবদের যথেষ্ট ফযীলত ব্যক্ত হয়েছে।—(মাহহারী)

مَثَلُ الَّذِينَ خُمِلُوا الصَّالَةَ لَيُنْفَعْنَ صَوْلَاتُهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْعُرُونَ

اسفار শব্দটি **سفر** এর বহুবচন। এর অর্থ বড় পুস্তক। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নিরক্ষর লোকদের মধ্যে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাব ও নবুওয়ত এবং তাঁকে প্রেরণ করার তিনটি উদ্দেশ্য যে ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, তওরাতের তা প্রায় একই ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখামাত্রই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ইহুদীদের

المنفقون ১৩

৫৫৫

قِسْمُ الرَّحْمَةِ ১৮

وَلَا يَمْنُونَ بِآلِ إِبْرَاهِيمَ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ الظِّلْمِينَ ①
 قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَتَوَارَوْنَ مِنْهُ وَانَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ
 إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْفِقُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ② يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُعُوا لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ
 ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ③ وَإِذَا
 قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
 وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ④ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً
 أَوْ مَهْرًا فَاجْزَوْا بِهَا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْفَهْرِ
 وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ الرَّزِيقِينَ ⑤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ⑥

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَرُسُلُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَخْتَصِمَانِ الْمُنْفِقِينَ لَكِنَّهُمْ قَالُوا
 لَا نَأْتِيكُمْ حُجَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑦
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ⑧

(৭) তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ্ জ্বালমদের সম্পর্কে সত্যক অবগত আছেন। (৮) বনুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পলায়ন কর, সেই মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের মুখামুখি হবে, অতঃপর তোমরা অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে। তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন সেসব কর্ম, যা তোমরা করতে। (৯) মুমিনগণ, জুমআর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর সুরশের পানে দ্রুত কর এবং বোচােকনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ। (১০) অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ লাগল কর ও আল্লাহকে অধিক সুরশ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (১১) তারা যখন কোন ব্যবসায়ের সুযোগ অথবা ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বনুন : আল্লাহর কাছে যা আছে, তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

সূরা মুনাফিকুন

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত ১১

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) মুনাফিকরা আপনকে বলে এসে বলে : আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিকটই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ্ জানেন যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (২) তারা তাদের শপথসমূহকে চালরূপে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তারা যা করছে, তা খুবই মন্দ। (৩) এটা এজন্য যে, তারা বিশাস করার পর পুনরায় কাকের হয়েছিল। ফলে তাদের অন্তরে মোহর মেহর দেখা হয়েছে। এতএব তারা বুঝে না।

উচিত ছিল। কিন্তু পার্শ্বি জাঁকজমক ও ধনৈশ্বর্ষ তাদেরকে তত্ত্বাত থেকে বিমূষ করে রেখেছে। ফলে তারা তত্ত্বাতের পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তত্ত্বাতের নির্দেশালী বাস্তবায়নের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ মূর্খ ও অনভিজ্ঞের পর্যায়ে চলে এসেছে। আলোচ্য আয়াতে তাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, যাদেরকে তত্ত্বাতের বাহক করা হয়েছিল, অর্থাৎ, অযাচিতভাবে আল্লাহর এই নেয়ামত দান করা হয়েছিল, তারা ষাযাযভাবে একত্রে বহন করেনি ; অর্থাৎ, তারা তত্ত্বাতের নির্দেশালীর পরওয়া করেনি। ফলে তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গর্দভ, যার পিঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃহদাকার গ্রন্থ চাপিয়ে দেয়া হয়। এই গর্দভ সেই বোঝা বহন তো করে, কিন্তু তার বিষয়বস্তুর কোন স্বর রাখে না এবং তাতে তার কোন উপকার হয় না। ইহুদীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তারা পার্শ্বি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের জন্যে তত্ত্বাতকে বহন করে এবং এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জাঁকজমক ও প্রতিপত্তি লাভ করতে চায়, কিন্তু এর দিকনির্দেশ দ্বারা কোন উপকার লাভ করে না।

তফসীরবিদগণ বলেন : যে আলেম তার এলম অনুযায়ী আমল করে না, তার দৃষ্টান্তও ইহুদীদের অনুরূপ।

ইহুদীরা তাদের কুফর, শিরক ও চরিত্রহীনতা সত্ত্বেও দাবী করত যে, عَنْ آيَاتِ اللَّهِ وَآيَاتِ رَسُولِهِ ... إِنَّ كُنْتُمْ مُدْرِكِينَ অর্থাৎ, আমরা তো আল্লাহর সন্তান সন্ততি ও শ্রিয়জন। তারা নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে জ্ঞানাতের যোগ্য অধিকারী মনে করত না ; বরং তাদের বক্তব্য ছিল :

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا অর্থাৎ, ইহুদী না হয়ে কেউ জন্মাত দাখিল হতে পারবে না। তারা যেন নিজেদেরকে পরকালের শান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মনে করত এবং জন্মাতের নেয়ামতসমূহকে তাদের ব্যক্তিগত জায়গীর মনে করত। কলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি বিশৃঙ্খল করে যে, পরকালের নেয়ামতসমূহ ইহকালের নেয়ামত অপেক্ষা হাজারো গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সে আরও বিশৃঙ্খল করে যে, মৃত্যুর পরই সে এসব মহান ও চিরন্তন নেয়ামত অবশ্যই লাভ করবে, তার মধ্যে সামান্যতম বিবেক-বুদ্ধি থাকলে সে অবশ্যই মনে-প্রাণে মৃত্যু কামনা করবে। তার আন্তরিক বাসনা হবে যে, মৃত্যু শীঘ্রই আসুক, যাতে সে দুনিয়ার মলিন ও দুঃখ-বিষাদের পূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে অকৃত্রিম সুখ ও শান্তির চিরকালীন জীবনে প্রবেশ করতে পারে।

তাই আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে : আপনি ইহুদীদের বনুন, যদি তোমরা দাবী কর যে, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একমাত্র তোমরাই আল্লাহর বন্ধু ও শ্রিয়প্রাপ্ত এবং পরকালের আযাব সম্পর্কে তোমরা মোটেই কোন আশংকা না কর, তবে জ্ঞান-বুদ্ধির দাবী এই যে, তোমরা মৃত্যু কামনা কর এবং মৃত্যুর জন্যে আগ্রহান্বিত থাক।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এরপর কোরআন নিজেই বলে : وَلَا يَمْنُونَ بِآلِ إِبْرَاهِيمَ قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ অর্থাৎ, তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। কারণ, তারা পরকালের জন্যে কুফর, শিরক ও কুর্ষ ব্যতীত আর কিছুই পায়নি। অতএব তারা ভালরূপে জানে যে, পরকালে তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিই অব্যাহারিত রয়েছে। তারা আল্লাহর শ্রিয়জন হওয়ার যে দাবী করে, তা

সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা স্বয়ং তাদের অজানা নেই। তবে দুনিয়ার উপকারিতা লাভ করার জন্যে তারা এ ধরনের দাবী করে। তারা আরও জানে যে, যদি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কথায় তারা মৃত্যু কামনা করে তবে তা অবশ্যই কবুল হবে এবং তারা মরে যাবে। তাই বলা হয়েছে, ইহুদীরা মৃত্যু কামনা করতেই পারে না।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যদি সে সময় তাদের কেউ মৃত্যু কামনা করত, তবে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হত।—(রুহুল-মা'আনী)

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَشْرُونَ مِنْهُ لَكَايَ ۖ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ ۖ أَرْبَابُكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ
অর্থাৎ, ইহুদীরা উপরোক্ত দাবী সত্ত্বেও মৃত্যু কামনা থেকে বিরত থাকত। এর সারমর্ম মৃত্যু থেকে পলায়ন করা বৈ নয়। অতএব আপনি তাদেরকে বলে দিন : যে মৃত্যু থেকে তোমরা পলায়নপর, তা অবশ্যই আসবে। আজ নয় তো কিছুদিন পর। সুতরাং মৃত্যু থেকে পলায়ন সম্পূর্ণতঃ কারও সাধ্য নেই।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّوْا لِلْمُحْرِمَاتِ مِنَ الْأَمْثَلِ ۖ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ
এই দিনটি মুসলমানদের সমাবেশের দিন। তাই এই দিনকে ‘ইয়াওমুল জুমআ’ বলা হয়। আল্লাহ তাআলা নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও সমস্ত জগতকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। এই ছয়দিনের শেষদিন ছিল জুমআর দিন। এই দিনেই আদম (আঃ) সৃষ্টি হন, এই দিনেই তাঁকে জন্মাতে দাখিল করা হয় এবং এই দিনেই জন্মাত থেকে পৃথিবীতে নামানো হয়। কেয়ামত এই দিনেই সংঘটিত হবে। এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আসে, যাতে মানুষ যে দোয়াই করে, তাই কবুল হয়। এসব বিষয় সহীহ হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে—(ইবনে-কাসীর)

আল্লাহ তাআলা প্রতি সপ্তাহে মানবজাতির সমাবেশ ও ঈদের জন্যে এই দিন রেখেছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তী উম্মতরা তা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ইহুদীরা ‘ইয়াওমুস সাবত’ তথা শনিবারকে নিজেদের সমাবেশের দিন নির্ধারিত করে নেয় এবং খ্রীষ্টানরা রবিবারকে। আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকেই তওফীক দিয়েছেন যে, তারা শুক্রবারকে মনোনীত করেছে।—(ইবনে-কাসীর) মুহূর্তভাষ্যে শুক্রবারকে ‘ইয়াওমে আরবাব’ বলা হত। আরবে কা’ব ইবনে লুয়াই সর্বপ্রথম এর নাম ‘ইয়াওমুল জুমআ’ রাখেন। এই দিনে কোরাইশদের সমাবেশ হত এবং কাব ইবনে লুয়াই ভাষণ দিতেন। এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর আবির্ভাবের পাঁচশত ষাট বছর পূর্বের ঘটনা।

কা’ব ইবনে লুয়াই রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর পূর্বপুরুষদের অন্যতম। আল্লাহ তাআলা মুহূর্তভাষ্যেও তাকে প্রতিমা পূজা থেকে রক্ষা করেন এবং একত্ববাদের বিশ্বাস রাখার তওফীক দান করেন। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর আবির্ভাবের সুসংবাদও মানুষকে শুনিয়েছিলেন। কোরাইশ গোত্র তাঁকে একজন মহান ব্যক্তি হিসেবে সম্মান করত। ফলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুওয়ত লাভের পাঁচশত ষাট বছর পূর্বে যেদিন তাঁর মৃত্যু হয়, সেদিন থেকেই কোরাইশরা তাদের বছর গণনা শুরু করে। শুরুতে কা’ব গৃহের ভিত্তি স্থাপন থেকে আরবদের বছর গণনা আরম্ভ করা হত। কা’ব ইবনে লুয়াই—এর মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্যুদিবস থেকেই বছর গণনা প্রচলিত হয়ে যায়। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর জন্মের বছর যখন হস্তিবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়, তখন এদিন থেকেই তারিখ গণনা আরম্ভ হয়। সারকথা এই যে, ইসলাম পূর্বকালেও কা’ব ইবনে লুয়াই—এর আমলে

শুক্রবার দিনকে গুরুত্ব দান করা হত। তিনিই এই দিনের নাম জুমআর দিন রেখেছিলেন।—(মায়হারী)

نَدَاءُ صَلَوةٍ - تَوْبَىٰ لِلصَّلَاةِ مِنْ تَوْبَىٰ الْجَمْعَةِ

বোঝানো হয়েছে। সে শব্দের এক অর্থ দৌড়া এবং অপর অর্থ কোন কাজ গুরুত্ব সহকারে করা। এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য। কারণ, নামাযের জন্যে দৌড়ে আসতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : শান্তি ও গাভীর সহকারে নামাযের জন্যে গমন কর। আয়াতের অর্থ এই যে, জুমআর দিনে জুমআর আযান দেয়া হলে আল্লাহর যিকরের দিকে দ্রুত কর। অর্থাৎ নামায ও খোতবার জন্যে মসজিদে যেতে যত্নবান হও। যে ব্যক্তি দৌড় দেয়, সে অন্য কোন কাজের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তোমরাও তেমনি আযানের পর নামায ও খোতবা ব্যতীত অন্য কাজের দিকে মনোযোগ দিও না।—(ইবনে-কাসীর) ذِكْرُ اللَّهِ বলে জুমআর নামায এবং এই নামাযের অন্যতম শর্ত খোতবাবোঝানো হয়েছে।—(মায়হারী)

وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ অর্থাৎ, বেচাকেনা ছেড়ে দাও। এতে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, জুমআর আযানের পর বেচাকেনা হারাম করা হয়েছে। এই আদেশ পালন করা বিক্রোতা ও ক্রেতা সবার উপর ফরয। বলাবাহুল্য, দোকানপাট বন্ধ করে দিলেই ক্রয়-বিক্রয় আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

وَأَذْكُرُوا الصَّلَاةَ فَاتَّقُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْوَاهُمْ فَفَضَّلَ اللَّهُ

পূর্বের আয়াতসমূহে জুমআর আযানের পর বেচাকেনা ইত্যাদি পার্শ্বিক কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই আয়াতে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, জুমআর নামায সমাপ্ত হলে ব্যবসায়িক কাজকর্ম এবং রিষিক হাসিলের চেষ্টা সবাই করতে পারে।

وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۚ এই আয়াতে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে,

যারা জুমআর খোতবা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়িক কাজ—কারবারে মনোযোগ দিয়েছিল। ইবনে-কাসীর বলেন : এই ঘটনা তখনকার, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমআর নামাযের পর জুমআর খোতবা পাঠ করতেন। দুই ঈদের নামাযে অদ্যাবদি এই নিয়ম প্রচলিত আছে। এক জুমআর দিনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযান্তে খোতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একটি বাণিজ্যিক কাফেলা মদীনার বাজারে উপস্থিত হয় এবং ঢোল ইত্যাদি পিটিয়ে তা ঘোষণা করা হয়। ফলে অনেক মুসল্লী খোতবা ছেড়ে বাজারে চলে যায় এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বল্পসংখ্যক সাহাবীসহ মসজিদে থেকে যান। তাদের সংখ্যা বার জন বর্ণিত আছে।—(আবু দাউদ) কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই ঘটনার পরিস্থিতিতে বললেন : যদি তোমরা সবাই চলে যেতে, তবে মদীনার উপত্যকা আযাবের অগ্নিতে পূর্ণ হয়ে যেত।—(ইবনে-কাসীর)

তফসীরবিদ মুকাতিল বর্ণনা করেন, এই বাণিজ্যিক কাফেলাটি ছিল দেহইয়া ইবনে খলফ কলবীর। সে সিরিয়া থেকে মাল-সম্ভার নিয়ে এসেছিল। তার কাফেলায় সাধারণতঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় সবকিছু থাকত। তার আগমনের সংবাদ পেলে মদীনার নারী-পুরুষ সবাই দৌড়ে কাফেলার কাছে যেত। দেহইয়া ইবনে খলফ তখন পর্যন্ত মুসলমান ছিল না ; পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

হাসান বসরী ও আবু মালেক (রহঃ) বলেন : এই কাফেলার আগমনের

সময় মদীনায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুশ্চাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল।—(মায়হারী) এসব কারণেই বিপুলসংখ্যক সাহাবায়ে কেরাম বাণিজ্যিক কাফেলার আওয়ায শুনে মসজিদ থেকে বের হয়ে যান। ফরয নামায শেষ হয়ে গিয়েছিল। জানা ছিল না যে, এটা শ্রবণ করা অপরিহার্য। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্রিমূল্য এবং তৃতীয়তঃ বাণিজ্যিক কাফেলার উপর সবার ঝাপিয়ে পড়া—এসব কারণে তাঁরা মনে করেছিলেন যে, দেৱীতে গেলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য—সামগ্রী পাওয়া যাবে না।

এসব কারণেই সাহাবায়ে কেরামের পদস্খলন হয় এবং উল্লেখিত হাদীসে তাঁদের প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়। এ ব্যাপারে তাদেরকে লজ্জা দেয়া ও হুশিয়ার করার জন্যে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই ঘটনার কারণেই রসুলুল্লাহ (সাঃ) নিয়ম পরিবর্তন করে জুমআর নামাযের পূর্বে খোতবা দেয়া শুরু করেন। বর্তমান তাই সুনত —(ইবনে-কাসীর)

আয়াতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে একথা বলে দিতে আদেশ করা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে যে সওয়াব আছে, তা এই বাণিজ্য থেকে উত্তম। এটাও অবাস্তব নয় যে, যারা নামায ও খোতবার খাতিরে বাবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেয়, তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতেও বিশেষ বরকত নাযিল হবে।

সূরা আল-মুনাক্কিন

সূরা মুনাক্কিন অবতরণের বিস্তারিত ঘটনা : এই ঘটনা মুহাম্মদ ইবনে-ইসহাক (রহঃ)—এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ষষ্ঠ হিজরীতে এবং কাতাদাহ ও গুরওয়া (রহঃ)—এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী পঞ্চম হিজরীতে ‘বনিল-মুস্তালিক’ যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়।—(মায়হারী) ঘটনা এই : রসুলুল্লাহ (সাঃ) সংবাদ পান যে, ‘মুস্তালিক’ গোত্রের সরদার হারেস ইবনে যেরার তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই হারেস ইবনে যেরার হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ)—এর পিতা, যিনি পরে ইসলাম গ্রহণ করে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর বিবিদের অন্তর্ভুক্ত হন। হারেস ইবনে যেরারও পরে মুসলমান হয়ে যায়।

সংবাদ পেয়ে রসুলে করীম (রাঃ) একদল মুজাহিদসহ তাদের মোকাবেলা করার জন্যে বের হন। এই জেহাদে গমনকারী মুসলমানদের সঙ্গে অনেক মুনাক্কিনও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের অংশীদার হওয়ার লোভে রওয়ানা হয়। কারণ, তারা অন্তরে কাফের হলেও বিশ্বাস করত যে, আল্লাহর সাহায্যে তিনি এই যুদ্ধে বিজয়ী হবেন।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন মুস্তালিক গোত্রে পৌছিলেন, তখন ‘মুরাইসী’ নামে খ্যাত একটি কূপের কাছে হারেস ইবনে যেরারের বাহিনীর সম্মুখীন হলেন। এ কারণেই এই যুদ্ধকে মুরাইসী যুদ্ধও বলা হয়। উভয়পক্ষ সারিবদ্ধ হয়ে তীর বর্ষণের মাধ্যমে মোকাবেলা হল। মুস্তালিক গোত্রের বহুলোক হতাহত হল এবং অবশিষ্টরা পলায়ন করতে লাগল। আল্লাহ তাআলা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে বিজয় দান করলেন। প্রতিপক্ষের কিছু ধন-সম্পদ এবং কয়েকজন পুরুষ ও নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। এভাবে এই জেহাদের সমাপ্তি ঘটল।

এরপর যখন মুসলমান মুজাহিদ বাহিনী মুরাইসী কূপের কাছেই সমবেত ছিল, তখন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। একজন মুহাজির ও একজন আনসারীর মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে হাতাহাতির সীমা অতিক্রম

করে পারস্পরিক সংঘর্ষের পর্যায়ে পৌছে গেল। মুহাজির ব্যক্তি সাহায্যের জন্যে মুহাজিরগণকে এবং আনসারী ব্যক্তি আনসার সম্প্রদায়কে ডাক দিল। উভয়ের সাহায্যার্থে কিছু লোক তৎপরও হয়ে উঠল। এভাবে ব্যাপারটি মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘর্ষের কাছাকাছি পৌছে গেল। রসুলুল্লাহ (সাঃ) সংবাদ পেয়ে অনতিবিলম্বে অকুস্থলে পৌছে গেলেন এবং ভীষণ রুষ্ট হয়ে বললেন : *ما بال دعوى الجاهلية* অর্থাৎ, এ কি মূর্খতায়ুগের আহবান। দেশ ও বংশগত জাতীয়তাকে ভিত্তি করে সাহায্য ও সহযোগিতার আয়োজন হচ্ছে কেন? তিনি আরও বললেন : *متنة دعواها فانها منتنة* এই শ্লোগান বন্ধ কর। এটা দুর্গন্ধময় শ্লোগান। তিনি বললেন : প্রত্যেক মুসলমানের উচিত অপর মুসলমানের সাহায্য করা—সে যালেম হোক অথবা ময়লুম। ময়লুমকে সাহায্য করার অর্থ তো জানাই যে, তাকে যলুম থেকে রক্ষা করা। জালেমকে সাহায্য করার অর্থ তাকে জলুম থেকে নিবৃত্ত করা। এটাই তার প্রকৃত সাহায্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যাপারে দেখা উচিত কে যালেম ও কে ময়লুম। এরপর মুহাজির, আনসারী, গোত্র ও বংশ নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য মজলুমকে জলুম থেকে রক্ষা করা এবং জালেমের হাত চেষ্টে ধরা—সে আপন সহোদর ভাই হোক অথবা পিতা হোক। এই দেশ ও বংশগত জাতীয়তা একটা মূর্খতাসূলভ দুর্গন্ধময় শ্লোগান। এর ফল জঞ্জাল বাড়ানো ছাড়া কিছুই হয় না।

রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর এই উপদেশবাণী শোনামাত্রই ঝগড়া মিটে গেল। এ ব্যাপারে মুহাজির জাহজাহের বাড়াবাড়ি প্রমাণিত হল। তার হাতে সিনান ইবনে ওবরা আনসারী (রাঃ) আহত হয়েছিলেন। হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মাফ করিয়ে নিলেন। ফলে ঝগড়াকারী জালেম ও মজলুম উভয়ই পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেল।

মুনাক্কিনদের যে দলটি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের লালসায় মুসলমানদের সাথে আগমন করেছিল। তাদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন মুহাজির ও আনসারীর পারস্পরিক সংঘর্ষের খবর পেল, তখন সে একে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নিল। সে মুনাক্কিনদের এক মজলিসে, যাতে মুমিনদের মধ্যে কেবল যায়েদ ইবনে আরকাম উপস্থিত ছিলেন, আনসারকে মুহাজিরগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে বলল : তোমরা মুহাজিরদেরকে দেশে ডেকে এনে মাখায় চড়িয়েছ, নিজেদের ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি তাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছ। তারা তোমাদের রুটি খেয়ে লালিত হয়ে এখন তোমাদেরই ঘাড় মটকাচ্ছে। যদি তোমাদের এখনও জ্ঞান ফিরে না আসে, তবে পরিণামে এরা তোমাদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলবে। কাজেই তোমরা ভবিষ্যতে টাকা-পয়সা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো না। এতে তারা আপন-আপনি ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যাবে। এখন তোমাদের কর্তব্য এই যে, মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্মানীরা বহিরাগত এসব বাজে লোকদের বহিষ্কার করে দিবে।

সম্মানী বলে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দল ও আনসার এবং বাজে লোক বলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরাম। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) একথা শোনা মাত্রই বলে উঠলেন : আল্লাহর কসম, তুই-ই বাজেলোক লঙ্ঘিত ও ঘৃণিত। পক্ষান্তরে রসুলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিবলে এবং মুসলমানদের ভালবাসার জোরে মহাসম্মানী।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ইচ্ছা ছিল যে, বিপদ দেখলে সে, তার কপটতার উপর পর্দা ফেলে দিবে। তাই সে সম্প্রতিভাষা ব্যবহার করেনি। কিন্তু যায়েদ ইবনে আরকামের ক্রোধ দেখে তার সম্বিৎ ফিরে এল। পাছে তার কুফর প্রকাশ হয়ে পড়ে, এই আশংকায় সে হযরত যায়েদের কাছে

ওযর পেশ করে বলল : আমি তো একখাটি হাসির ছলে বলেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর বিরুদ্ধে কিছু করা ছিল না।

যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) মজলিস থেকে উঠে সোজা রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছে গেলেন এবং আদ্যোপান্ত ঘটনা তাঁকে বলে শোনালেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছে সংবাদটি খুবই গুরুতর মনে হল। মুখমণ্ডলে পরিবর্তনের রেখা ফুটে উঠল। যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) অশ্রুবন্যক সাহাবী ছিলেন রসূল (সঃ) তাকে বললেন : বৎস দেখ, তুমি মিথ্যা বলছ না তো? যায়েদ কসম খেয়ে বললেন : না, আমি নিজ কানে এসব কথা শুনেছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) আবার বললেন : তোমার কোনরূপ বিভ্রান্তি হয়নি তো? যায়েদ উত্তরে পূর্বের কথাই বললেন। এরপর মুনাফিক সরদারের এই কথা গোটা মুসলমান বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে এছাড়া আর কোন আলোচনাই রইল না। এদিকে সব আনসার যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)—কে তিরস্কার করতে লাগলেন যে, তুমি সম্প্রদায়ের নেতার বিরুদ্ধে অশ্রবাদ আরোপ করছে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে। যায়েদ (রাঃ) বললেন : আল্লাহর কসম, সমগ্র খাযরাজ গোত্রের মধ্যে আমার কাছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অপেক্ষা অধিক প্রিয় কেউ নেই। কিন্তু যখন সে রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর বিরুদ্ধে এসব কথাবার্তা বলেছে, তখন আমি সহ্য করতে পারিনি। যদি আমার পিতাও এমন কথা বলত তবে আমি তাও রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর গোচরীভূত করতাম।

অপরদিকে হযরত ওমর (রাঃ) এসে আরম্ভ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমাকে অনুমতি দিন আমি এই মুনাফিকের গর্দন উড়িয়ে দেই। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে হযরত ওমর (রাঃ) এ কথা বলেছিলেন : আপনি ওবাদা ইবনে বিশরকে আদেশ করুন, সে তার মন্তক কেটে আপনার সামনে উপস্থিত করুক।

রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : ওমর, এর কি প্রতিকার যে, মানুষের মধ্যে খ্যাত হয়ে যাবে আমি আমার সাহাবীকে হত্যা করি। অতঃপর তিনি ইবনে উবাইকে হত্যা করতে বারণ করে দিলেন। হযরত ওমর (রাঃ)—এর এই কথা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর পুত্র জানতে পারলেন। তাঁর নামও আবদুল্লাহ ছিল। তিনি ঋগি মুসলমান ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করলেন : যদি আপনি আমার পিতাকে এসব কথাবার্তার কারণে হত্যা করবার ইচ্ছা রাখেন, তবে আমাকে আদেশ করুন, আমি তার মন্তক কেটে আপনার কাছে এই মজলিস ত্যাগ করার পূর্বে হাযির করব। তিনি আরও আরম্ভ করলেন : সমগ্র খাযরাজ গোত্র সাক্ষী, তাদের মধ্যে কেউ আমা অপেক্ষা অধিক পিতামতর সেবা ও আনুগত্যকারী নেই। কিন্তু আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে তাদেরও কোন বিষয় সহ্য করতে পারব না। আমার আশংকা যে, আপনি যদি অন্য কাউকে আমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ দান এবং সে তাকে হত্যা করে, তবে আমি আমার পিতৃহত্যাকে চোখের সামনে চলা-ফেরা করতে দেখে হযরত আতুসমুরন করতে পারবনা। এটা আমার জন্য আশাবের কারণ হবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং আমি কাউকে এ বিষয়ে আদেশও করিনি।

এই ঘটনার পর রসূলুল্লাহ (সঃ) সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে অসময়ের সফর শুরু করার কথা ঘোষণা করে দিলেন এবং নিজে ‘কসওয়া’ উষ্ট্রের শিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সাহাবায়ে কোরাম রওয়ানা হয়ে গেলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে এনে বললেন : তুমি কি বাস্তবিকই এরূপ কথা বলেছ? সে অনেক কসম খেয়ে বলল : আমি কখনও এরূপ কথা বলিনি। এই বালক (যায়েদ

ইবনে আরকাম) মিথ্যাবাদী। স্বগোত্র আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তারা সবাই স্থির করল যে, সম্ভবত : যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) ভুল বুঝেছে। আসলে ইবনে উবাই একথা বলেনি।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ (সঃ) ইবনে উবাইয়ের কসম ও ওযর কবুল করে নিলেন। এদিকে জনগণের মধ্যে যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)—এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও তিরস্কার আরও তীব্র হয়ে গেল। তিনি এই অপমানের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে লাগলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ) সমগ্র মুজাহিদ বাহিনীসহ সারাদিন ও সারারাত সফর করলেন এবং পরের দিন সকালেও সফর অব্যাহত রাখলেন। অবশেষে যখন সূর্যকিরণ প্রখর হতে লাগল, তখন তিনি কাক্ফলাকে একজায়গায় থামিয়ে দিলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফরের ফলে ক্লাস্ত-পরিশ্রান্ত সাহাবায়ে কোরাম মনষিলে অবস্থানের সাথে সাথে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

রাবী (বর্ণনাকারী) বলেন : সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে তাত্ক্ষণিক ও অসময়ে সফর করা এবং সুদীর্ঘকাল সফর অব্যাহত রাখার পিছনে রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর উদ্দেশ্য ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ঘটনা থেকে উদ্ধৃত জল্পনা-কল্পনা হতে মুজাহিদদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেয়া, যাতে এ সম্পর্কিত চর্চার অবসান ঘটে।

এরপর রসূলুল্লাহ (সঃ) পুনরায় সফর শুরু করলেন। ইতিমধ্যে ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে উপদেশচ্ছলে বললেন : তুমি এক কাজ কর। রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছে উপস্থিত হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নাও। তিনি তোমার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। এতে তোমরা মুক্তি হয়ে যেতে পারে। ইবনে উবাই এই উপদেশ শুনে মাথা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। হযরত ওবাদা (রাঃ) তখনই বললেন : আমার মনে হয়, তোমার এই বিমুখতা সম্পর্কে অবশ্যই কোরআনের আয়াত নাযিল হবে।

এদিকে সফর চলাকালে যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বার বার রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছে আসতেন। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এই মুনাফিক লোকটি আমাকে মিথ্যাবাদী বলে গোটা সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। অতএব আমার সত্যায়ন ও এই ব্যক্তির মিথ্যার মুখোপ উন্মোচন সম্পর্কে অবশ্যই কোরআন নাযিল হবে। ইঠাৎ যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) দেখলেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর মধ্যে ওহী অবতরণকালীন লক্ষণাদি ফুটে উঠছে। তাঁর শ্বাস ফুলে উঠছে, কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তাঁর উষ্ট্রী বোঝার বারে নুয়ে পড়ছে। যায়েদ (রাঃ) আশাবাদী হলেন যে, এখন এ সম্পর্কে কোন ওহী নাযিল হবে। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সঃ)—এই অবস্থা দূর হয়ে গেল। যায়েদ (রাঃ) বললেন : আমার সওয়ারী রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর কাছ থেকেই যাচ্ছিল। তিনি নিজের সওয়ারীর উপর থেকেই আমার কান ধরলেন এবং বললেন :

يا غلام صدق الله حديثك ونزلت سورة المنافقين في ابن ابي من اولها الى اخرها .

অর্থাৎ, হে বালক, আল্লাহ তাআলা তোমরা কথার সত্যায়ন করেছে এবং সম্পূর্ণ সূরা মুনাফিকুন ইবনে উবাইয়ের ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

এই রেওয়াজেতে থেকে জানা গেল যে, সূরা মুনাফিকুন সফরের মধ্যেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু বগদী (রহঃ)—এর রেওয়াজেতে আছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) যখন মদীনায় পৌঁছে যান এবং যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) অপমানের ভয়ে গৃহে আত্মগোপন করেন, তখন এই সূরা নাযিল

وَأَذَانًا يَوْمَ يُنْفَخُ أَصْنَافُهُمْ ذُرُوفُهُمْ يُقْرَأُ وَهُمْ عَلَى الْعَذَابِ وَقَدْ خَلَتْ
فَاتَهُمُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْوَقْعِ ۖ وَأَذَانًا يَوْمَ يُنْفَخُ أَصْنَافُهُمْ ذُرُوفُهُمْ يُقْرَأُ وَهُمْ عَلَى الْعَذَابِ وَقَدْ خَلَتْ
اللَّهُ لَوْ أَنَّ رَأَوْهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يُصَدِّقُونَ وَهُمْ مُسْتَلِيمُونَ ۖ سَوَاءٌ
عَلَيْهِمْ أَسْتَفْتَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُسْتَفْتَرْ لَهُمْ لَنْ يَقُولُوا اللَّهُ أَمْرٌ ۚ إِنَّا
لَللَّهُ لَكَاغِدُونَ ۚ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ۚ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا
عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۚ وَفِيهِمْ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۚ يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا
إِلَى الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّ فِيهَا فَيَمُوتَ قَوْمُنَا وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَتْلُوا كُتُبَ اللَّهِ وَلَا أَوْلَادَكُمُ عَنْ دَرْ أَلْفِهِ وَمَنْ يَقْعِلْ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَائِبُونَ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَابُونَ ۚ فَهُمْ
يَأْتِي أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ
قَرِيبٍ ۚ فَأَصْدَقَ وَكُن مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ وَلَنْ يُوَفَّى اللَّهُ
نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ نَبِيمٌ ۚ تَعْمَلُونَ ۝

(৪) আপনি যখন তাদেরকে দেখেন, তখন তাদের দেহাবয়ব আপনাকে কাছে দ্রষ্টিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শুনে। তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ। প্রত্যেক শোরগোলকে তারা নিজদের বিরুদ্ধে মনে করে। তারাই শক, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হোন। ধ্বংস করুন আল্লাহ তাদেরকে। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? (৫) যখন তাদেরকে বলা হয় : তোমরা এস, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমপ্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং আপনি তাদেরকে দেখেন যে, তারা অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) আপনি তাদের জন্যে ক্ষমপ্রার্থনা করুন অথবা না করুন, উভয়ই সমান। আল্লাহ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে পঞ্চদশদর্শন করেন না। (৭) তারাই বলে : আল্লাহর রসূলের সাহচর্যে যারা আছে তাদের জন্যে ব্যয় করো না। পরিশেষে তারা আপন-আপনি সেরে যাবে। ভূ ও নভোমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহরই কিন্তু মুনাফিকরা তা বোঝে না। (৮) তারা বলে : আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করি তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিস্কৃত করবে। শক্তি তো আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদেরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। (৯) মুমিনগণ। তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর সুরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (১০) আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে মৃত্যু আসার আগেই ব্যয় কর। অন্যথায় সে বলবে : হে আমার পালনকর্তা, আমাকে আরও কিছুকাল অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি সদকা করতাম এবং সংকর্মীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (১১) প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ কাউকে অবকাশ দেবেন না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।

হয়েছে।

এক রেওয়াজেতে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মদীনার নিকটবর্তী আকীক উপত্যকায় পৌঁছেন, তখন ইবনে উবাইয়ের মুমিন পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং খুঁজতে খুঁজতে পিতা ইবনে উবাইয়ের কাছে পৌঁছে তার উষ্ট্রকে বসিয়ে দেন। তিনি উষ্ট্রের হাঁটুতে পা রেখে পিতাকে বললেন : আল্লাহর কসম, তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত সম্মানী বাজে লোককে বহিস্কৃত করবে—এ কথা ব্যাখ্যা না কর। এই বাক্যে সম্মানী কে?— রসূলুল্লাহ (সাঃ), না তুমি? পুত্র পিতার পথ রুদ্ধ করে দাড়িয়েছিল এবং যারা এ পথ অতিক্রম করছিল তারা পুত্র আবদুল্লাহকে তিরস্কার করছিল যে, পিতার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করছ কেন? অবশেষে যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর উষ্ট্রী তাদের কাছে আসল, তখন তিনি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। লোকেরা বলল : আবদুল্লাহ এই বলে তার পিতার পথ রুদ্ধ করে রেখেছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তুমি মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দেখলেন যে, মুনাফিক ইবনে উবাই বেগতিক হয়ে পুত্রের কাছে বলে যাচ্ছে : আমি তো ছেলেপিলে ও নারীদের চাইতেও অধিক লালিত। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পুত্রকে বললেন : তার পথ ছেড়ে দাও, তাকে মদীনায় যেতে দাও।

আনুযমিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মুনাফিকুন অবতরণের পটভূমি এতটুকুই। এই কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে একথাও বলা হয়েছে যে, বনিল-মুস্তালিক যুদ্ধের জন্যে আসলে উনুল মুমিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ)—এর পিতা হারেস ইবনে যেরার দায়ী ছিলেন। পরবর্তীকালে আল্লাহ তাআলা হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ)—কে ইসলাম গ্রহণ এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর পত্নী হওয়ার গৌরব দান করেন। তাঁর পিতা হারেসও পরে মুসলমান হয়ে যান।

এ ঘটনা মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ ইত্যাদি কিতাবে এভাবে বর্ণিত আছে যে, মুস্তালিক গোত্র পরাজিত হলে তাদের কিছুসংখ্যক যুদ্ধবন্দীও মুসলমানদের করতলগত হয়। ইসলামী আইন অনুযায়ী সব কয়েদী ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। কয়েদীদের মধ্যে হারেস ইবনে যেরারের কন্যা জুয়ায়রিয়াও ছিলেন। তিনি সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ)—এর ভাগে পড়েন। সাবেত (রাঃ) জুয়ায়রিয়াকে কিতাবতের প্রথায় মুক্ত করে দিতে চাইলেন। এর অর্থ এই যে, দাস অথবা দাসী মেহনত-মজুরী করে অথবা ব্যবসায়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে মালিককে দিলে সে মুক্ত হয়ে যেত।

জুয়ায়রিয়ার যিম্মায় মোটা অংকের অর্থ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা পরিশোধ করা সহজসাধ্য ছিল না। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন : আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ এক তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং আপনি আল্লাহর রসূল। অতঃপর নিজের ঘটনা শুনালেন যে, সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ) আমার সাথে কিতাবতের চুক্তি করেছে। কিন্তু কিতাবতের অর্থ পরিশোধ করার সাধ্য আমার নেই। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু সাহায্য করুন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং সাথে সাথে তাকে মুক্ত করে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। জুয়ায়রিয়ার জন্যে এর চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারত। তিনি সানন্দে প্রস্তাব মেনে নিলেন।

এইভাবে তিনি পৃথময়ী বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। উম্মুল-মুমিনীন হযরত জুয়ায়রিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন : ‘রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বনিল-মুখালিক যুদ্ধে গমনের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, ইয়াসরিবের (মদীনার) দিক থেকে চাঁদ রওয়ানা হয়ে আমার কোলে এসে লুটিয়ে পড়েছেন। তখন আমি এই স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করিনি। কিন্তু এখন তার ব্যাখ্যা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

তিনি ছিলেন গোত্রপতির কন্যা। তিনি যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পৃথময়ী বিবিদের কাতারে শামিল হয়ে গেলেন, তখন এর শুভ প্রতিক্রিয়া তাঁর গোত্রের উপরও প্রতিফলিত হয়। তাঁর সাথে বন্দিনী অন্যান্য নারীরাও এই শুভবিবাহের উপকারিতা লাভ করল। কেননা এই বিবাহের কথা জনাভান হওয়ার পর যে যে মুসলমানের কাছে তাঁর আত্মীয় কোন বন্দিনী ছিল, তারা সবাই তাদেরকে মুক্ত করে দিল। এভাবে একশ’ বন্দিনী তাঁর সাথে মুক্ত হয়ে গেল। এপর তাঁর পিতাও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি মোজোবা দেখে মুসলমান হয়ে গেলেন।

وَأَقْبَلَ لَهُمْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

মুনাক্কি সরদার

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে সূরা মুনাক্কিন নাখিল হয়েছে। এতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার কসম সবই মিথ্যা। এই মুনাক্কি সরদারের হিতাকাঙ্ক্ষায় কেউ কেউ তাকে বলল : তুই জানিস কোরআনে তোর সম্পর্কে কি নাখিল হয়েছে? এখনও সময় আছে, তুই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে হাথির হয়ে অপরাধ স্বীকার করে নে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তোর জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। সে উত্তরে বলল : তোমরা আমাকে বিশ্রাস স্থাপন করতে বলেছিলে, আমি বিশ্রাস স্থাপন করেছি। এরপর তোমরা আমাকে অর্ধ-সম্পদের যাকাত দিতে বলেছিলে, আমি তাও দিতেছি। এখন আর কি বাকী রইল? আমি কি মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সেক্ষমা করব? এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যখন তার অন্তরে ঈমানই নেই, তখন তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা উপকারী হতে পারে না।

এই ঘটনার পর ইবনে উবাই মদীনায় পৌছে বেশীদিন জীবিত থাকেনি—শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।—(যামহুরী)

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُقَاتِلُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَفْضَحُوا

জাহজাহ মুহাজির ও সিনান আনসারীর বগড়ার সময় ইবনে উবাই-ই একথা বলেছিল। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, নির্বোধরা মনে করে মুহাজিরগণ তাদের দান-খয়রাতের মুখোশাফী এবং গুরাই তাদের অনু যোগায়। অথচ সমগ্র নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ধন-ভাণ্ডার আল্লাহর হাতে। তিনি ইচ্ছা করলে মুহাজিরগণকে তোমাদের কোন সাহায্য ছাড়াই সবকিছু দিতে পারেন। ইবনে উবাইয়ের এরূপ মনে করা নিবুদ্ধিতা ও বোকামীর পরিচায়ক। তাই কোরআন পাক এখানে لَا تُقَاتِلُوا বলে ব্যক্ত করেছে যে, যে এরূপ মনে করে, সে বেওক্বফ ও নির্বোধ।

يَقُولُونَ لَئِنْ رَأَيْنَاكَ مِنَ الْأَكْثَرِيَّةِ لَيُغْرِبَنَّكَ اللَّهُ بِحَرْبٍ

এটাও ইবনে উবাইয়ের উক্তি। এই উক্তির ভাষা অস্পষ্ট হলেও উদ্দেশ্য অস্পষ্ট ছিল না যে, সে নিজেকে এবং মদীনার আনসারগণকে শক্তিশালী ও ইয়যতদার এবং এর বিপরীতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুহাজির সাহায্যে-কোরামকে দুর্বল ও হেয় বলে প্রকাশ করেছিল। সে মদীনায়

আনসারগণকে উত্তেজিত করেছিল, যাতে তারা এই দুর্বল ও ‘হেয়’ লোকদেরকে মদীনা থেকে বহিস্কৃত করে দেয়। আল্লাহ্ তাআলা এর জওয়াবে তার কথা তারই দিকে উল্টে দিয়েছেন যে, যদি ইয়যতওয়ালারা ‘হেয়’ লোকদেরকে বের করেই দেয়, তবে এর কুফল তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। কেননা, ইয়যত তো আল্লাহর, তাঁর রসূলের এবং মুমিনদের প্রাপ্য। কিন্তু মুহতার কারণে তোমরা এ সম্পর্কে বে-খবর। এখানে কোরআন لَا تُقَاتِلُوا এবং এর আগে لَا تُقَاتِلُوا শব্দ ব্যবহার করেছে। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, কোন মানুষ নিজেকে অন্যের রিযিকদাতা মনে করলে এটা নিরোক্ত জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপন্থী এবং নিবুদ্ধিতার আলামত। পক্ষান্তরে ইয়যত ও অপমান দুনিয়াতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনে লাভ করে। তাই এতে বিব্রাঙ্কি হলে সেটা বোধবর ও অনভিজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ। তাই এখানে لَا تُقَاتِلُوا বলা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّورَةَ

এই সূরার প্রথম রুকুতে

মুনাক্কিদের মিথ্যা শপথ ও চক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছিল। দুনিয়ার মহব্বতে পরাভূত হওয়াই ছিল এসব কিছু সারমর্ম। এ কারণেই তারা একদিকে মুসলমানদের কবল থেকে আত্মরক্ষা এবং অপরদিকে যুদ্ধবু সম্পদ ভাগ বসাবার উদ্দেশ্যে বাহ্যিক নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত। মুহাজির সাহাবীদের পিছনে ব্যয় করার ধারা বন্ধ করার যে চক্রান্ত তারা করেছিল, এর পচাতোও এ কারণই নিহিত ছিল। এই দ্বিতীয় রুকুতে খাটি মুমিনদেরকে সম্মোদন করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা মুনাক্কিদের ন্যায় দুনিয়ার মহব্বতে মগ্ন হয়ে যেয়ো না। যেসব বিষয় মানুষকে দুনিয়াতে আল্লাহ থেকে গাফেল করে, তন্মধ্যে দু’টি সর্ববৃহৎ-ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি। তাই এই দু’টির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা দুনিয়ার যাবতীয় ভোগ-সম্ভারই উদ্দেশ্য। আয়াতের সারমর্ম এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত সর্বাবস্থায় নিন্দনীয় নয়। বরং এগুলো নিয়ে ব্যাপৃত থাকা এক পর্যায়ে কেবল জায়েযই নয়—ওয়াজিবও হয়ে যায়। কিন্তু সর্বদা এই সীমানার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এসব বস্তু যেন মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে দেয়। এখানে ‘আল্লাহর স্মরণের’ অর্থ কোন কোন তফসীরবিদের মতে পাঞ্জোয়ানা নামায, কারও মতে হজ্জ ও যাকাত এবং কারও মতে কোরআন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : স্মরণের অর্থ এখানে যাবতীয় আনুগত্য ও এবাদত। এই অর্থ সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত—(কুরতুবী)

وَأَنْتُمْ لَكُمْ مَزِيدٌ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

এই আয়াতে

মৃত্যু আসার অর্থ মৃত্যুর লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর লক্ষণাদি সামনে আসার আগেই স্বাস্থ্য ও শক্তি জটুট থাকা অবস্থায় তোমাদের ধনসম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে পরকালের পুঞ্জি করে নাও। নতুবা মৃত্যুর পর এই ধন-সম্পদ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘আল্লাহর স্মরণের’ অর্থ যাবতীয় এবাদত ও শরীয়তের আদেশ-নিষেধ পালন করা। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করাও এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর এখানে অর্থ ব্যয় করাকে পৃথকভাবে বর্ণনা করার দু’টি কারণ হতে পারে। (এক) আল্লাহ ও তাঁর আদেশ নিষেধ পালনে মানুষকে গাফেলকারী সর্ববৃহৎ বস্তু হচ্ছে ধন-সম্পদ। তাই যাকাত, গণর, হজ্জ ইত্যাদি আর্থিক এবাদত স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। (দুই) মৃত্যুর লক্ষণাদি দৃষ্টির সামনে আসার সময় কারও সাধ্য নেই এবং কেউ কল্পনাও করতে পারে না যে, কাযা নামাযগুলো পড়ে নেবে, কাযা হজ্জ



সূরাআত্-তাগাবুন

মদীনায় অবতীর্ণ: আয়াত ১৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। (৩) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করেছেন এক তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন। (৪) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তিনি তা জানেন। তিনি আরও জানেন তোমরা যা গোপনে কর এবং যা প্রকাশ্যে কর। আল্লাহ অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সত্যক জ্ঞাত। (৫) তোমাদের পূর্বে যারা কাফের ছিল, তাদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি? তারা তাদের কর্মের শাস্তি আন্বাদন করেছে এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬) এটা এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলীসহ আগমন করলে তারা বলত: মানুষই কি আমাদেরকে পঞ্চাদর্শন করবে? অতঃপর তারা কাফের হয়ে গেল এবং মুখ ক্রিয়ণে নিল। এতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী প্রশংসাহ। (৭) কাফেররা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুৎপত্তি হবে না। কখন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয় পুনরুৎপত্তি হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করত। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (৮) অতঃপর তোমরা আল্লাহ তাঁর রসূল এক অবতীর্ণ নূরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সত্যক অবগত।

আদায় করবে অথবা কাযা রোযা রাখবে, কিন্তু ধন-সম্পদ সামনে থাকে এবং এ বিশ্বাস হয়েই যায় যে, এখন এই ধন তার হাত থেকে চলে যাবে। তখনও তাড়াতাড়ি ধন-সম্পদ ব্যয় করে আর্থিক এবাদতের ক্রটি থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া দান-খয়রাত যাবতীয় আপদ-বিপদ দূর করার ব্যাপারেও কার্যকর।

সহীহ বোখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল: কোন সদকায় সর্বাধিক সওয়াব পাওয়া যায়? তিনি বললেন: যে সদকা সুস্থ অবস্থায় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে—অর্থ ব্যয় করে ফেললে নিজেই দরিদ্র হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে অবস্থায় করা হয়। তিনি আরও বললেন: আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে সেই সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করো না যখন আত্মা তোমার কঠিনালীতে এসে যায় এবং তুমি মরতে থাক আর বল: এই পরিমাণ অর্থ অমুককে দিয়ে দাও, এই পরিমাণ অর্থ অমুক কাছে ব্যয় কর।

يَقُولُ رَبِّ لَوْلَا اُخْرُفْتُ إِلَىٰ اَجَلٍ قَرِيبٍ

(রাঃ) এই আয়াতের তফসীরে বলেন, যে ব্যক্তির শিশুমায় যাকাত ফরয ছিল; কিন্তু আদায় করেনি অথবা হজ্জ ফরয ছিল কিন্তু আদায় করেনি, সে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে বাসনা প্রকাশ করে বলবে: আমি আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাই; অর্থাৎ, মৃত্যু আরও কিছু বিলম্ব আসুক, যাতে আমি সদকা-খয়রাত করে নেই এবং ফরয কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যাই। অর্থাৎ, কিছু অবকাশ পেলে এমন সংকল্প করে নেব, যদ্বারা সংকল্প পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। যেসব ফরয বাদ পড়েছে, সেগুলো পূর্ণ করে নেব এবং যেসব হারাম ও মকরুহ কাজ করেছে, সেগুলো থেকে তওবা করে নেব। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন যে, মৃত্যু আসার পর কাউকে অবকাশ দেয়া হয় না। সুতরাং এই বাসনা নিরর্থক।

সূরা আত্-তাগাবুন

خَلَقَكُمْ فَيَنفَرَكَةٍ مِّنكُمْ ثُمَّ وَضَعُوا لَكُمُ الصُّلُوكَ

— অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন হয়ে গেছে। এখানে فَيَنفَرَكَةٍ এর অর্থ আলাপন করে যে, প্রথমে সৃষ্টি করার সময় কোন কাফের ছিল না। এই কাফের ও মুমিনের বিভেদ পরে সেই ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীনে হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষকে দান করেছেন। এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার কারণেই মানুষের উপর গোনাহ ও সওয়াব আরোপিত হয়। এক হাদীসেও এই অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন: كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه — অর্থাৎ, প্রত্যেক সন্তান নির্মল স্বভাবধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। (যার ফলে তার মুমিন হওয়া স্বাভাবিক ছিল।) কিন্তু এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, খ্রীষ্টান ইত্যাদিতে পরিণত করে। — (কুরতুবী)

وَصَوَّرَكُمْ فَحَسَنُ صُورِكُمْ

— তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন। আকৃতি তৈরী করা প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধতার বিশেষ গুণ। এজন্যেই আল্লাহর নামসমূহের



(৯) সেদিন অর্থাৎ, সমাবেশের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সমবেত করবেন। এ দিন হায়-জিতের দিন। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সংকল্প সম্পাদন করে, আল্লাহ তার পাপসমূহ মাফন করবেন এবং তাকে জ্ঞানতে দাখিল করবেন। যার ভলদেশে নিবিরগীসমূহ প্রবাহিত হবে, তারা তথায় চিরকাল বসবাস করবে। এটাই মহাসাক্ষ্য। (১০) আর যারা কাকের এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তথায় অনন্তকাল থাকবে। কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল এটা। (১১) আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন বিপদ আসে না এবং যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সংপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সববিষয়ে সাক্ষ্য পরিজ্ঞাত। (১২) তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলুল্লাহর আনুগত্য কর। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রসূলের দায়িত্ব কেবল খোলাখুলি পৌঁছে দেয়া। (১৩) আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। অতএব মুমিনগণ আল্লাহর উপর ভরসা করুক। (১৪) হে মুমিনগণ, তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দূশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। যদি মার্কনা কর, উপেক্ষা কর, এবং ক্ষমা কর, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। (১৫) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাধরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। (১৬) অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, ওন, আনুগত্য কর এবং ব্যয় কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। যারা মনের কার্প্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (১৭) যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, সহনশীল। (১৮) তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।

মধ্যে مصور অর্থাৎ, আকৃতিদাতা বর্ণিত আছে। চিন্তা করুন, সৃষ্টজগতে কত বিভিন্ন জাতি রয়েছে, প্রত্যেক জাতিতে কত বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীতে লাখে বিভিন্ন ব্যক্তি রয়েছে। তাদের একজনের আকৃতি অপরজনের আকৃতির সাথে খাপ খায় না। একই মানব শ্রেণীর মধ্যে দেশ ও ভূখণ্ডের বিভিন্নতার কারণে এবং বংশ ও জাতির বিভিন্নতার কারণে আকৃতিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তদুপরি তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির মুখাবয়ব অন্য সবার থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। এই বিস্ময়কর কারিগরি ও ভাস্কর্য দেখে জ্ঞানবুদ্ধি দিশেহারা হয়ে পড়ে। মানুষের চেহারা ছয়-সাত বর্গ ইঞ্চির অধিক নয়। কোটি কোটি মানুষের একই ধরনের চেহারা সত্ত্বেও একজনের আকার অন্যজনের সাথে পুরোপুরি মিলে না যে, চেনা কঠিন হয়। আলোচ্য আয়াতে আকার নির্মাণের নেয়ামত উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে: فَكُنْ صُورًا অর্থাৎ, তিনি মানবাকৃতিকে সমগ্র সৃষ্টজগত ও সৃষ্টজীবের আকৃতি অপেক্ষা অধিক সুন্দর ও সুস্বয়ম করেছেন। কোন মানুষ তার দলের মধ্যে যতই কুৎসিত ও কদাকার হোক না কেন, অবশিষ্ট সকল জীবজন্তুর আকৃতির তুলনায় সে-ও সুশ্রী।

فَكُنْ صُورًا بِشَرٍّ — فَكُنْ صُورًا بِشَرٍّ

অর্থ দেয়। তাই বহুবচন ক্রিয়াপদ তার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। মানবত্বকে নবুওয়ত ও রেসালতের পরিপন্থী মনে করাও কাকেরদের একটি অলীক ধারণা ছিল। কোরআনে স্থানে স্থানে এই ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। পরিতাপের বিষয়, এখন মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ এমন দেখা যায়, যারা নবী করীম (সাঃ)-এর মানবত্ব অস্বীকার করে। তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারা কোনপথে অগ্রসর হচ্ছে? মানব হওয়া নবুওয়তেরও পরিপন্থী নয় এবং রেসালতের উচ্চমর্যাদারও প্রতিকূল নয়। রসূল (সাঃ) নূর হলেও মানব হতে পারেন। তিনি নূরও এবং মানবও। তাঁর নূরকে প্রদীপ, সূর্য ও চন্দ্রের নূরের নিরীখে বিচার করা ভুল।

فَأَمَّا آيَاتُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّطْبُوعٍ

আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং সেই নূরের প্রতি, যা আমি নাযিল করেছি।) এখানে নূর বলে কোরআন বোঝানো হয়েছে। কারণ, নূরের স্বরূপ এই যে, সে নিজেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল এবং অপরকেও দেদীপ্যমান ও উজ্জ্বল করে। কোরআন স্বকীয় অলৌকিকতার কারণে নিজে যে উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কারণাদি, বিধি-বিধান, শরীয়ত এবং পরজগতের সঠিক তথ্যাবলী উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এগুলো জানা মানুষের জন্যে জরুরী।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কেয়ামতকে লোকসানের দিন বলার কারণ : يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّطْبُوعٍ

যেদিন আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন একত্রিত করার দিবসে। এই দিনটি হবে লোকসানের। يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ একত্রিত হওয়ার দিবস ও يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ লোকসানের দিবস—এই উভয়টি কেয়ামতের নাম। একত্রিত হওয়ার দিন একারণে যে, সেদিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জিন এবং মানবকে হিসাব-নিকাশের জন্যে একত্রিত করা হবে। পক্ষান্তরে تَغَابُن শব্দটি غِبْن থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ লোকসান। আর্থিক লোকসান এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান উভয়কে غِبْن বলা হয়।

ইমাম রাগিব ইম্পাহানী মুফরাদাতুল কোরআনে বলেন : আর্থিক লোকসান জ্ঞাপন করার জন্যে এই শব্দটি صَيْفَةً مَجْهُولَةً ব্যবহৃত হয় এবং মত ও বুদ্ধির লোকসান জ্ঞাপন করার জন্যে سَمْعُ بَاب থেকে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি আভিধানিক দিক দিয়ে দুই তরফা কাজের জন্যে বলা হয়, অর্থাৎ, একজন অন্যজনের এবং অন্যজন তার লোকসান করবে, অথবা তার লোকসান প্রকাশ করবে।

বোখারীর এক রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তির কাছে কারও কোন পাণ্ডা থাকে, তার উচিত দুনিয়াতেই তা পরিশোধ করে অথবা মাফ করিয়ে নিয়ে মুক্ত হয়ে যাওয়া। নতুবা কেয়ামতের দিন দিরহাম ও দীনার থাকবে না। কারও কোন দাবী থাকলে তা সে ব্যক্তির সংকর্ম দিয়ে পরিশোধ করা হবে। সংকর্ম শেষ হয়ে গেলে পাণ্ডাদারের গোনাহ প্রাপ্য পরিমাণে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।—(মাযহারী)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য তফসীরবিদ কেয়ামতকে লোকসানের দিবস বলার উপরোক্ত কারণই বর্ণনা করেছেন। আবার অনেকের মতে সেদিন কেবল কাকের, পাপাচারী ও হতভাগাই লোকসান অনুভব করবে না ; বরং সংকর্মপরায়ণ মুমিনগণও এভাবে লোকসান অনুভব করবে যে, হয়। আমরা যদি আরও বেশী সংকর্ম করতাম, তবে জ্ঞানভারের সুউচ্চ মর্তবা লাভ করতাম। সেদিন প্রত্যেকেই জীবনের সেই সময়ের জন্যে পরিতাপ করবে, যা অযথা ব্যয় করেছে। হাদীসে আছে : من جلس مجلساً لم يذكر الله فيه كان عليه حسرة يوم القيامة যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে এবং সমগ্র মজলিসে আল্লাহকে স্মরণ না করে, কেয়ামতের দিন সেই মজলিস তার জন্য পরিতাপের কারণ হবে।

কুরতুবীতে আছে, প্রত্যেক মুমিনও সেদিন সংকর্ম ক্রটির কারণে স্বীয় লোকসান অনুভব করবে। সূরা মরিয়ম কেয়ামতের নাম يَوْمَ الْحِسْرَةِ পরিতাপ দিবস বলে বর্ণিত হয়েছে। তারই অনুরূপ এখানে লোকসান দিবস নাম রাখা হয়েছে।

مَنْ سَابَّ مِنْ مُبِيعَةِ الْإِلَاحِ وَاللَّهُ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

— অর্থাৎ, আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কারও উপর কোন বিপদ আসে না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, আল্লাহ তার অন্তরকে সংগে প্রদর্শন করেন। এটা অনবীকার্য সত্য যে, আল্লাহ তাআলার অনুমতি ও ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোথাও সামান্যতম বস্তু নড়াচড়া করতে পারে না। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কারও কোন ক্ষতি এবং উপকার করতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তকদীরে বিশ্বাসী নয়, বিপদ মুহুর্তে তার জন্যে কোন স্থিরতা ও শান্তির উপকরণ থাকে না। সে বিপদ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে হা-হাতা ও হটফট করতে থাকে। এর বিপরীতে তকদীরে বিশ্বাসী মুমিনের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাসী করে দেন যে, যা কিছু হয়েছে, আল্লাহ তাআলার অনুমতি ও ইচ্ছাক্রমে হয়েছে। যে বিপদ তাকে স্পর্শ করেছে, তা অবধারিত ছিল, কেউ একে টলাতে পারত না এবং যে বিপদ থেকে সে মুক্ত রয়েছে, তা থেকে মুক্ত থাকাই অবধারিত ছিল। তাকে এই বিপদে জড়িত থাকার সাধ্য কারও ছিল না। এই ইমান ও বিশ্বাসের ফলে পরকালের সওয়াবের ওয়াদাও তার

সামনে থাকে, যদ্বারা দুনিয়ার বিপদও সহজ হয়ে যায়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَوْرَاقِهِمْ وَأَوْدَاقِهِمْ وَأَوْدَاقِهِمْ وَأَوْدَاقِهِمْ

— অর্থাৎ, মুসলমানগণ, তোমাদের কতক স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের শত্রু। তাদের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা কর। তিরমিযী, হাকেম প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, এই আয়াত সেই মুসলমানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা হিজরতের পর মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে হিজরত করে চলে যেতে মনস্থ করে, কিন্তু তাদের পরিবার-পরিজনরা তাদেরকে হিজরত করতে বাধা দেয়।—(রুহুল-মা'আনী)

لَنْ تَقُوتُوا وَتَصْعَدُوا وَتَقُوتُوا وَتَقُوتُوا وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - পূর্ববর্তী

আয়াতে যাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে শত্রু আখ্যা দেয়া হয়েছে, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে কঠোর ব্যবহার করার ইচ্ছা করল। এর পরিশ্রেক্ষিতে আয়াতের এই অংশে বলা হয়েছে : যদিও এই স্ত্রী ও সন্তানরা তোমাদের জন্যে শত্রু ন্যায় কাজ করেছে এবং তোমাদেরকে ক্রয় পালনে বাধা দিয়েছে, কিন্তু এতদসঙ্গেও তাদের সাথে কঠোর ও নির্দয় ব্যবহার করো না ; বরং মার্জনা, উপেক্ষা ও ক্ষমার ব্যবহার কর। এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। কেননা, আল্লাহ তাআলার অভ্যাসও ক্ষমা এবং দয়া প্রদর্শন করা।

গোনাহগার স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা ও বিদ্বেষ রাখা অনুচিত : আলেমগণ আলোচ্য আয়াতদুট্টে বলেছেন যে, পরিবার-পরিজনের কেউ কোন শরীয়ত বিরোধী কাজ করে ফেললেও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তার প্রতি বিদ্বেষ রাখা ও তার জন্যে বদদেয়া করা উচিত নয়।—(রুহুল-মা'আনী)

إِنَّمَا أَوْلَاؤُكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الَّتِي يَشَاءُ - শত্রুর অর্থ পরীক্ষা। আয়াতের

উদ্দেশ্য এই যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষের পরীক্ষা নেন যে, এসবের মহকুতে লিপ্ত হয়ে সে আল্লাহর বিধানাবলীকে উপেক্ষা করে, না মহকুতকে যথাসীমায় রেখে স্বীয় কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হয়।

فَاتَّقُوا اللَّهَ الْمَاسِيَةً - অর্থাৎ, যথাসাধ্য তাকওয়া ও বোদাতীতি

অবলম্বন কর। এর আগে কোরআন পাকে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল اَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে এমন ভয় কর, যেমন ভয় করা তাঁর প্রাপ্য। এই আয়াত সাহাবায়ে-কেরামের কাছে খুবই দুঃসাধ্য ও কঠিন মনে হয়। কারণ, আল্লাহর প্রাপ্য অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করার সাধ্য কার আছে? এর পরিশ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে কোনকিছু করার আদেশ করেন না। কাজেই তাকওয়াও সাধ্যানুযায়ী ওয়াজিব বোঝাতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, তাকওয়া অর্জনে কেউ তার পূর্ণ শক্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত করলেই আল্লাহর প্রাপ্য আদায় হয়ে যাবে।—(রুহুল-মা'আনী - সংক্ষেপিত)

سُورَةُ الطَّلَاقِ مَكِّيَّةٌ ١٥ آيَاتٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ بَيِّنَةٍ وَلَا حِصْوا

الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ الَّذِي تَخْشَوْنَ مِنْهُ وَلَا تَرْجِعْن

إِلَى أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِحَاشَةٍ مِنْ يَدَيْهِ وَلَا تَحْسَبُوا عِدَّةَ

حُدُودِ اللَّهِ قَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ أَنْ تَذَرُوا لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ

أَمْرًا ○ كَذَلِكَ لَكُمْ أَحْلَاهُ قَالَسُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ قَارِئِهِنَّ

بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ وَشَكَرُوا فِيمَا اللَّهُ سَاءَ لِلَّهِ ذِكْرُهُ

يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ تَشَقَّقْ لِلَّهِ

يَجْعَلْ لَهُ عِجْرًا ○ وَبَرُّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبْ وَمَنْ يُؤْكَلْ عَلَى

اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ○ إِنَّ اللَّهَ بِالْأُمْرِ ذُو فَتْلٍ ○ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

وَالَّذِي يُمَسِّنُ مِنَ الْمُحْضِنِ مِنْ نِسَائِهِمْ إِنْ ارْتَضَى عَدَّتُهُمْ

ثَلَاثَ أَشْهُرٍ ○ وَالَّذِي لَمْ يَحْضِنْ وَلَا رَأَى لِكَوْنِ أَحْلَاهُ لَنْ يَقْسَمَ

سَلَامَةً ○ وَمَنْ تَشَقَّقْ لِلَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُهْرًا ○ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ

أَنْزَلَ الْكِتَابَ وَالْمِيقَاتِ ○ وَاللَّهُ يَخْفَى عَنِ السَّيِّئِينَ ○ وَيُعِظُهُ لَكَ آخِرًا ○

সূরা আত্-তালাক

মদীনায় অবতীর্ণ : আয়াত ১২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে তালাক দিয়ে ইদতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিস্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন মুস্পষ্ট নির্দিষ্ট কাছের লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালংঘন করে, সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দেবেন। (২) অতঃপর তারা যখন তাদের ইদতকালে পৌঁছে, তখন তাদেরকে যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিবে। এতদ্বারা যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেবেন। (৩) এবং তাকে তার ধারণাভিত্তিক জায়গা থেকে রিযিক দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্যে একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (৪) তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যাদের স্বত্ববৃত্তি হওয়ার আশা নেই, তাদের ব্যাপারে সন্দেহ হলে তাদের ইদত হবে তিন মাস। আর যারা এখনও স্বত্বের বয়সে পৌঁছেন, তাদেরও অনুরূপ ইদতকাল হবে। গর্ভবতী নারীদের ইদতকাল সন্তানপ্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন। (৫) এটা আল্লাহর নির্দেশ, যা তিনি তোমাদের প্রতি নাবিল করেছেন। যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

— বাক্যের দাবী ছিল এই যে, এরপরেও একবচনে বিধান বর্ণনা করা হত। কিন্তু এখানে বহুবচন ব্যবহার করে বলা হয়েছে। এতে প্রত্যক্ষভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু বহুবচনে সম্বোধন করার মধ্যে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আছে এবং এদিকে ইঙ্গিতও রয়েছে যে, এই বিধান বিশেষভাবে আপনার জন্যে নয়—সমগ্র উম্মতের জন্যে।

কেউ কেউ এস্থলে বাক্য উহা সাব্যস্ত করে এরূপ তফসীর করেছেন যে, হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন যে, তারা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়, তখন যেন পরে বর্ণিত আইন পালন করে। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে। অতঃপর তালাকের কতিপয় বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বিধান,

فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ بَيِّنَةٍ — এর শাব্দিক অর্থ গণনা করা। শরীয়তের পরিভাষায় সেই সময়কালকে ইদত বলা হয়, যাতে স্ত্রী এক স্বামীর বিবাহ বের হওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাধীন থাকে। কোন স্বামীর বিবাহ থেকে বের হওয়ার উপায় দু'টি। (এক) স্বামীর ইত্তেকাল হয়ে গেলে। এই ইদতকে “ইদতে-ওফাত” বলা হয়। গর্ভবতী নয়—এমন মহিলাদের জন্যে এই ইদত চার মাস দশদিন। (দুই) বিবাহ থেকে বের হওয়ার দ্বিতীয় উপায় তালাক। গর্ভবতী নয়—এমন মহিলাদের জন্যে তালাকের ইদত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে পূর্ণ তিন হয়ে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে তালাকের ইদত তিন তোহর (পবিত্রতাকাল)। সারকথা, এর জন্যে কোন দিন ও মাস নির্ধারিত নেই; বরং যত মাসে তিন হয়ে যাবে অথবা তিন তোহর পূর্ণ হয়, তাই তালাকের ইদত। যেসব নারীর বয়সের স্বল্পতা হেতু এখনও হয়েছে হয় না অথবা বেশী বয়স হওয়ার কারণে হয়েছে আসা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদের বিধান পরে আলাদাভাবে বর্ণিত হচ্ছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদতও পরে বর্ণিত হচ্ছে। এতে ওফাতের ইদত ও তালাকের ইদত একইরূপ। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ بَيِّنَةٍ আয়াতকে قبل عدتهن পাঠ করেছেন।

হয়রত ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর এক রেওয়াজেতে হয়রত ফী قبل عدتهن ও এক রেওয়াজেতে قبل عدتهن — (ক্বত্বল-মা'আনী)

বোখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হয়েছে অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। হয়রত ওমর (রাঃ) একথা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর গোচরীভূত করলে তিনি খুব নারায় হয়ে বললেন :

ঃ তার উচিত হয়েছে অবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করে নেয়া এবং স্ত্রীকে বিবাহে রেখে দেয়া। এই হয়েছে থেকে পবিত্র হওয়ার পর আবার যখন স্ত্রীর হয়েছে হবে এবং তা থেকে পবিত্র হবে, তখন যদি তালাক দিতেই চায়, তবে সহবাসের পূর্বে পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে। এই ইদতের আদেশই আল্লাহ তাআলা (আলোচ্য) আয়াতে দিয়েছেন।

এই হাদীস দ্বারা কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয় — (এক) হয়েছে অবস্থায় তালাক দেয়া হারাম। (দুই) কেউ এমনভাবে তালাক দিলে সেই

তালাক প্রত্যাহার করে নেয়া ওয়াজিব (যদি প্রত্যাহারযোগ্য তালাক হয়। ইবনে ওমর (রাঃ)-এর ঘটনায় তদ্রূপই ছিল।) (তিন) যে তোহ্মের তালাক দিবে, সেই তোহ্মের স্ত্রীর সাথে সহবাস না হওয়াই চাই। (চার) **فَطَوَّافُ لِبَدْنِهَا** আয়াতের তফসীর তাই।

উপরোক্ত কেরাতদুয় এবং হাদীসদুটে আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে যে, কোন স্ত্রীকে তালাক দিতে হলে ইদত শুরু হওয়ার পূর্বে তালাক দিতে হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে হয়েছে থেকে, ইদত শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে তোহ্মের তালাক দেয়ার ইচ্ছা থাকে সেই তোহ্মের সহবাস করবে না এবং তোহ্মের শেষ ভাগে হয়েছে আসার পূর্বে তালাক দিবে। ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের মতে ইদত তোহ্মের থেকে শুরু হয়। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তোহ্মের শুরুতেই তালাক দিবে।

দ্বিতীয় বিধান হচ্ছে : **وَاحْضُوا الْوَدَّعَةَ** - **احْصَاء** শব্দের অর্থ গণনা করা। আয়াতের অর্থ এই যে, ইদতের দিনগুলো সম্বন্ধে স্মরণ রেখো এবং ইদত শেষ হওয়ার আগেই শেষ মনে করে নেয়ার মত ভুল করো না। ইদতের দিনগুলো স্মরণে রাখার এই দায়িত্ব পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের। কিন্তু আয়াতে পুরুষবাচক পদ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, সাধারণভাবে সেসব বিধান পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে অভিন্ন, সেগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পুরুষবাচক পদই ব্যবহার করা হয়; স্ত্রীরা প্রসঙ্গতঃ তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই বিশেষক্ষেত্রে তফসীরের সার-সংক্ষেপে বর্ণিত বিশেষ রহস্যও থাকতে পারে যে, স্ত্রীরা অধিক আনমনা, তাই সরাসরি পুরুষদেরকেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় বিধান হচ্ছে : **لَا تُزْنُوا مِنْ زِينَتِكُمْ وَلَا تَبْسُتُوا** অর্থাৎ, স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করো না। এখানে তাদের গৃহ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত তাদের বসবাসের হক পুরুষের দায়িত্বে থাকে, সেই পর্যন্ত গৃহে তাদের অধিকার আছে। তাতে তাদের বসবাস বহাল রাখা কোন কৃপা নয়; বরং প্রাপ্য আদায়। বসবাসের হকও স্ত্রীর অন্যতম হক। আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, এই হক কেবল তালাক দিলেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। বরং ইদতের দিনগুলোতে এই গৃহে বসবাস করার অধিকার স্ত্রীর আছে। ইদত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জুলুম ও হারাম। এমনভাবে স্ত্রীর স্বেচ্ছায় বের হয়ে যাওয়াও হারাম; যদিও স্বামী এর অনুমতি দেয়। কেননা, এই গৃহেই ইদত অতিবাহিত করা স্বামীরই হক নয় আল্লাহরও হক, যা ইদত পালনকারিণীর উপর ওয়াজিব। হানাফী মাযহাব তাই।

চতুর্থ বিধান হচ্ছে : **إِذَا كَانَ لِرَأْسِهَا بِِلَا حُكْمٍ يُبَيِّنُ** অর্থাৎ, ইদত পালনকারিণী স্ত্রী কোন প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়লে তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করা হারাম নয়। এটা তৃতীয় বিধানের ব্যতিক্রম। প্রকাশ্য নির্লজ্জ কাজ বলে কি বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তিন প্রকার উক্তি বর্ণিত আছে।

(এক) নির্লজ্জ কাজ বলে খোদ গৃহ থেকে বের হয়ে যাওয়াই বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় এটা দৃশ্যতঃ ব্যতিক্রম, যার উদ্দেশ্য গৃহ থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া নয়; বরং নিষেধাজ্ঞাকে আরও ত্বোরদার করা। উদাহরণতঃ এরূপ বলা যে, এই কাজ করা কারও উচিত নয় সেই ব্যক্তি বাতীত, যে মনুষ্যই বিসর্জন দেয় অথবা তুমি তোমার জননীকে গালি দিও না এটা ব্যতীত যে, তুমি জননীর সম্পূর্ণই অব্যাহত হয়ে যাও। বলাবাহুল্য,

প্রথম দৃষ্টান্তে ব্যতিক্রম দ্বারা সেই কাজের বৈধতা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য নয় এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে জননীর অব্যাহতার বৈধতা প্রমাণ করা লক্ষ্য নয়; বরং বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তার আরও বেশী অবৈধতা ও মন্দ হওয়া বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অতএব, আয়াতের বিষয়বস্তুর সার-সংক্ষেপ এই হল যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরা তাদের স্বামীর গৃহ থেকে বের হবে না, কিন্তু যদি তারা অলীলতায়ই যেতে উঠে ও বের হয়ে গেছে। সুতরাং এর অর্থ বের হয়ে যাওয়ার বৈধতা নয়; বরং আরও বেশী নিন্দা ও নিষিদ্ধতা প্রমাণ করা। নির্লজ্জ কাজের এই তফসীর হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সুদী, ইবনে মায়েব, নাখরী (রহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) এই তফসীরই গ্রহণ করেছেন। — (রুহুল-মা'আনী)

(দুই) নির্লজ্জ কাজ বলে ব্যভিচার বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যতিক্রম যথার্থ অর্থেই বুঝতে হবে। অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ব্যভিচার করলে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার প্রতি শরীয়তের শাস্তি প্রয়োগ করার জন্যে অবশ্যই তাকে ইদতের গৃহ থেকে বের করা হবে। এই তফসীর হয়রত কাতাদাহ, হাসান বসরী, শা'বী যাহেদ ইবনে আসলাম, যাহহাক, ইকরিমা (রহঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইউসুফ এই তফসীরই গ্রহণ করেছেন।

(তিন) নির্লজ্জ কাজ বলে কটু কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি তারা কটুভাষিণী ও ঝগড়াটে হয় এবং স্বামীর আপনজনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, তবে তাদেরকে ইদতের গৃহ থেকে বহিষ্কার করা যাবে। এই তফসীর হয়রত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একাধিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। আলোচ্য আয়াতে হয়রত উবাই ইবনে কা'ব ও আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর কেরাত এরূপ : **لَا أَنْ يَفْحَشْنَ** এই শব্দের বাহ্যিক অর্থ অলীল কথাবার্তা বলা। এই কেরাত থেকেও সর্বশেষ তফসীরের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়। — (রুহুল-মা'আনী) এই অবস্থায়ও ব্যতিক্রম আক্ষরিক অর্থে থাকবে।

وَرَأَيْكَ حُدُودَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَعَذَّ اللَّهُ حُدُودَ اللَّهِ فَتَذَكَّرْ لِقَاءَ رَبِّكَ শরীয়তের নির্ধারিত আইনকানুন বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো লঙ্ঘন করে অর্থাৎ, আইন-কানুনের বিরোধিতা করে, সে নিজের উপর জুলুম করে; অর্থাৎ, আল্লাহ অথবা শরীয়তের কোন ক্ষতি করে না, নিজেরই ক্ষতিসাধন করে। এই ক্ষতি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়ই হতে পারে। পারলৌকিক ক্ষতি তো শরীয়ত বিরোধী কাজের গোনাহ ও পরকালের শাস্তি এবং ইহলৌকিক ক্ষতি এই যে, যে ব্যক্তি শরীয়তের নির্দেশাবলীর তোয়াক্কা না করে স্ত্রীকে তালাক দেয়, সে অধিকাংশ সময় তিন তালাক পর্যন্ত পৌছে ক্ষান্ত হয়, যার পর পারস্পরিক প্রত্যাহার অথবা পুনর্বিবাহও হতে পারে না। মানুষ প্রায়ই তালাক দিয়ে অনুতাপ করে এবং বিপদের সম্মুখীন হয়; বিশেষ করে সন্তান-সন্ততি থাকলে। অতএব, তালাকের বিপদ দুনিয়াতেই তার ঘাড়ে চেপে বসে। অনেকেই স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার নিয়তে অন্যায়ভাবে তালাক দেয়। এরূপ তালাকের কষ্ট স্ত্রীও ভোগ করে। কিন্তু পুরুষের জন্যে এটা জুলুমের উপর জুলুম এবং দৃষ্টাংশ শাস্তির কারণ হয়ে যায়। (এক) আল্লাহর নির্ধারিত আইন-কানুন লঙ্ঘন করার শাস্তি এবং (দুই) স্ত্রীর উপর জুলুম করার শাস্তি।

لَا تُزْنُوا مِنْ زِينَتِكُمْ وَلَا تَبْسُتُوا — অর্থাৎ, তুমি জ্ঞান না সম্ভবতঃ আল্লাহ তাআলা এই রাগ-গোষার পর অন্য কোন অবস্থা সৃষ্টি

করে দিবেন। অর্থাৎ, শ্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত আরাম, সম্ভানের লালন-পালন এবং গৃহের সহজ ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করে ভূমি তাকে পুনরায় বিবাহে রাখার ইচ্ছা করতে পার। এমন অবস্থায় আবার বিবাহে থাকা তখন সম্ভবপর হবে, যখন ভূমি তালাক দেয়ার সময় শরীয়তের আইন-কানূনের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং অহেতুক বাইন তালাক না দিয়ে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দাও। এরূপ তালাক দেয়ার পর প্রত্যাহার করে নিলে পূর্ববিবাহ যথারীতি বহাল থাকে। ভূমি তিন পর্যন্ত পৌছিয়ে তালাক দিও না, যার প্রত্যাহারের অধিকার থাকে না এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতি সত্ত্বেও পরস্পরে পুনর্বিবাহও হলাল হয় না।

وَاِذَا بَلَغَ الْاِمْلَاقُ اِمْلَاقًا يَمْزُوْنُ بِمَرْوِيٍّ اَوْ اَرْثُوْنُ بِمَرْوِيٍّ

— এখানে اِمْلَاقُ শব্দের অর্থ ইন্দ্রত এবং اِمْلَاقُ পর্যন্ত পৌছার অর্থ ইন্দ্রত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হওয়া।

তালাক সম্পর্কে পঞ্চম বিধান : এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন ইন্দ্রত শেষ হওয়ার কাছাকাছি হয়, তখন স্থির মস্তিষ্কে পুনরায় চিন্তা করে দেখে যে, বিবাহ বহাল রাখা উত্তম না সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করে দেয়া ভাল। এ চিন্তার জন্যে এ সময়টি উত্তম। কারণ, ততদিনে পুরুষের সাময়িক রাগ-গোষা দমিত হয়ে যায়। যদি স্ত্রীকে বিবাহে রাখা স্থির হয়, তবে রেখে দাও। পরবর্তী আয়াতের ইঙ্গিত এবং হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী এর সূন্যতসম্মত পন্থা এই যে, মুখে বলে দাও আমি তালাক প্রত্যাহার করলাম। অতঃপর এর জন্যে দু'জন সাক্ষী রাখ।

পক্ষান্তরে যদি বিবাহ ভেঙ্গে দেয়াই সিদ্ধান্ত হয়, তবে স্ত্রীকে সুন্দর পন্থায় মুক্ত করে দাও। অর্থাৎ, ইন্দ্রত শেষ হতে দাও। ইন্দ্রত শেষ হয়ে গেলেই স্ত্রী মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যায়।

ষষ্ঠ বিধান : ইন্দ্রত সমাপ্ত হলে স্ত্রীকে রাখার সিদ্ধান্ত হোক অথবা মুক্ত করে দেয়ার, উভয় অবস্থাতে কোরআন পাক তা মারুফ অর্থাৎ, যথাগম্যুক্ত পন্থায় সম্পন্ন করতে বলেছে। 'মারুফ' শব্দের অর্থ পরিচিত পন্থা। উদ্দেশ্য এই যে, যে পন্থা শরীয়ত ও সূন্যত দ্বারা প্রমাণিত এবং মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে ব্য্যত, সেই পন্থা অবলম্বন কর। তা এই যে, বিবাহে রাখা এবং তালাক প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত হলে স্ত্রীকে মুখে অথবা কাছের কর্মে কষ্ট দিও না, তার উপর অনুগ্রহ রেখো না এবং তার যে কর্মগত ও চরিত্রগত দুর্বলতা তালাকের কারণ হচ্ছিল, অতঃপর নিজেও তজ্জন্যে সবার করার সংকল্প কর, যাতে পুনরায় সেই তিস্ততা সৃষ্টি না হয়। পক্ষান্তরে মুক্ত করা সিদ্ধান্ত হলে তার বিদিত ও সূন্যতসম্মত পন্থা এই যে, তাকে লাক্ষিত ও হেয় করে অথবা গালমন্দ দিয়ে গৃহ থেকে বহিস্কার করো না; বরং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বিদায় কর। কোরআনের অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, তাকে কোন বশ্চোড়ো দিয়ে বিদায় করা কমপক্ষে মোস্তাহাব এবং কোন কোন অবস্থায় ওয়াজিবও। ফেকাহুর কিতাবাদিতে এর বিবরণ পাওয়া যাবে।

সপ্তম বিধান : আলোচ্য আয়াতে বিবাহে রাখা অথবা মুক্ত করে দেয়ার দ্বিবিধ ক্ষমতা দেয়া থাকে এবং পূর্ববর্তী **لَمَّا بَلَغَ الْاِمْلَاقُ** আয়াত থেকে প্রসঙ্গক্রমে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তালাক যদি দিতেই হয়, তবে এমন তালাক দিবে, যাতে প্রত্যাহার করার অধিকার থাকে। এর সূন্যতসম্মত পন্থা এই যে, পরিষ্কার ভাষায় কেবল এক তালাক দিবে এবং সাথে সাথে রাগ-গোষা প্রকাশার্থে এমন কোন বাক্য বলবে না, যা বিবাহকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করার অর্থ জ্ঞাপন করে।

وَاِذَا بَلَغَ الْاِمْلَاقُ اِمْلَاقًا يَمْزُوْنُ بِمَرْوِيٍّ اَوْ اَرْثُوْنُ بِمَرْوِيٍّ — অর্থাৎ,

মুসলমানদের মধ্য থেকে দুজনকে সাক্ষী করে নাও এবং তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সঠিক সাক্ষ্য কাম্যে মকর।

অষ্টম বিধান : এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, ইন্দ্রত সমাপ্ত হওয়ার সময় প্রত্যাহার করা সিদ্ধান্ত হোক কিংবা মুক্ত করা, উভয় অবস্থাতে এই কাজের জন্যে দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখতে হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে এই বিধানটি মোস্তাহাব, এর উপর প্রত্যাহার নির্ভরশীল নয়। প্রত্যাহারের অবস্থায় সাক্ষী করার তাৎপর্য এই যে, পরবর্তীকালে স্ত্রী যাতে প্রত্যাহার অধীকার করে বিবাহ চূড়ান্তরূপে ভঙ্গ হওয়ার দাবী না করে বসে। মুক্ত করার অবস্থায় এ জন্যে সাক্ষী করতে হবে, যাতে পরবর্তীকালে স্বয়ং স্বামীই দুইমিচ্ছলে অথবা স্ত্রীর ভালবাসায় পরাভূত হয়ে দাবী না করে বসে যে, সে ইন্দ্রত শেষ হওয়ার আগেই প্রত্যাহার করেছিল। সাক্ষীদ্বয়ের জন্যে **دُعَى عَدْلٍ** বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, শরীয়তের পরিভাষা অনুযায়ী সাক্ষীদ্বয়ের নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরী। অন্যথায় তাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী কোন বিচারক ফয়সালা দিবে না।

ওয়েবসাইট বাক্যে সাধারণ মুসলমানদেরকে সন্তোষিত করে বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোন প্রত্যাহার কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনায় সাক্ষী হও এবং বিচারকের এজলাসে সাক্ষ্য দেয়ার প্রয়োজন হয় তবে কারও মুখ চেয়ে অথবা বিরোধিতা ও শত্রুতার কারণে সত্য সাক্ষ্য দিতে বিন্দুমাত্রও কুস্তি হয়ো না।

وَاِذَا بَلَغَ الْاِمْلَاقُ اِمْلَاقًا يَمْزُوْنُ بِمَرْوِيٍّ اَوْ اَرْثُوْنُ بِمَرْوِيٍّ — অর্থাৎ,

উপরোক্ত বিষয়বস্তু দ্বারা সে ব্যক্তিকে উপদেশ দান করা হচ্ছে, যে আল্লাহ ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এতে বিশেষভাবে পরকালে উল্লেখ করার কারণ এই যে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার আদায় খোদাতীতি ও পরকাল চিন্তা ব্যতীত সুস্থভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

وَمَنْ رَّشَقَ لِلَّهِ يَحْلِلْ لَهُ مَخْرَاجًا وَزَوْجًا مِمَّنْ حَيْثُ ارْتَضَىٰ

— অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে প্রত্যেক সংকট ও বিপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত রিযিক দান করেন।

تَقْوَى শব্দের আসল অর্থ আত্মরক্ষা করা। শরীয়তের পরিভাষায় গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করার অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্তযুক্ত হলে এর অনুবাদ করা হয় আল্লাহকে ভয় করা। উদ্দেশ্য আল্লাহ্র অবধ্যতা ও গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা ও ভয় করা।

আলোচ্য আয়াতে **تَقْوَى** তথা খোদাতীতির দু'টি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে — (এক) খোদাতীতি অবলম্বনকারীর জন্যে আল্লাহ তাআলা নিষ্কৃতির পথ করে দেন। কি থেকে নিষ্কৃতি? এ সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, দুনিয়ার যাবতীয় সংকট ও বিপদ থেকে এবং পরকালের সব বিপদাপদ থেকে নিষ্কৃতি। (দুই) তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান করেন, যা কম্পনায়ও থাকে না। এখানে রিযিকের অর্থও ইহকাল এবং পরকালের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু। এই আয়াতে মুমিন-মুশাকীর জন্যে আল্লাহ তাআলার এই ওয়াদা ব্যক্ত হয়েছে যে, তিনি তার প্রত্যেক সমস্যাও সহজসাধ্য করেন এবং তার অভাব-অনটন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে এমন পথে তার প্রয়োজনাদি সরবরাহ করেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না।—(রুহুল-মা'আনী)

স্থানের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে কোন কোন তফসীরবিদ এই

আয়াতের তফসীরে বলেছেন : তালাকদাতা স্বামী ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী উভয়ই অথবা তাদের মধ্যে যে কেউ খোদাভীতি অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী সকল সংকট ও কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দান করবেন। পুরুষকে তার যোগ্য স্ত্রী এবং স্ত্রীকে তার উপযুক্ত স্বামী দান করবেন। বলাবাহুল্য, আয়াতের যে আসল অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এই অর্থও তাতে শামিল আছে।—(রহুল-মা'আনী)

وَمَنْ يَتَزَوَّجْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِ الْأُمُورِ قَدِيرٌ

অর্থঃ, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার মুশকিল কাজের জন্যে যথেষ্ট। কেননা, আল্লাহ তার কাজ যেভাবে ইচ্ছা পূর্ণ করে ছাড়েন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। তদনুযায়ী সব কাজ সম্পন্ন হয়। তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত হযরত ওমর (রাঃ) - এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْفُوا خِمَاصًا وَتَرَوُحَ بَطْنًا

যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথাযথ ভরসা করতে, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে পশু-পক্ষীর ন্যায় রিযিক দান করতেন। পশু-পক্ষী সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় উদরপূর্তি করে ফিরে আসে।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) -এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আমার উম্মত থেকে সন্তর হাজার লোক বিনাহিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের অন্যতম গুণ এই যে, তারা আল্লাহর উপর ভরসা করবে।—(মায়হারী)

وَالَّذِينَ يَتَزَوَّجُونَ أَنْ يَفْسَحَ مَخْلُوقًا

স্ত্রীদের ইচ্ছার আরও বিবরণ আছে। এতে ইচ্ছার সাধারণ বিধি থেকে ভিন্ন তিন প্রকার স্ত্রীদের ইচ্ছার বিধান বর্ণিত হয়েছে।

তালাকের ইচ্ছত সম্পর্কিত নবম বিধান : সাধারণ অবস্থায় তালাকের ইচ্ছত পূর্ণ তিন হয়েয। কিন্তু যেসব মহিলার বয়োঃবৃদ্ধি অথবা কোন রোগ ইত্যাদির কারণে হয়েয আসা বন্ধ হয়ে গেছে, এমনভাবে যেসব মহিলার বয়স না হওয়ার কারণে এখনও হয়েয আসা শুরু হয়নি তাদের ইচ্ছত আলোচ্য আয়াতে তিন হয়েযের পরিবর্তে তিন মাস নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং গর্ভবতী স্ত্রীদের ইচ্ছত সন্তানপ্রসব সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা যতদিনেই হোক।

— অর্থঃ, যদি তোমাদের সন্দেহ হয়। সাধারণ ইচ্ছত হয়েয দূরা গণনা করা হয়, কিন্তু এসব মহিলার হয়েয বন্ধ ; অতএব, তাদের ইচ্ছত কিভাবে গণনা করা হবে—এই কংকর্তব্যবিমুঢ় অবস্থাকেই আয়াতে সন্দেহ বলা হয়েছে।

অতঃপর আবার খোদাভীতির ফযীলত ও বরকত বর্ণনা করা হচ্ছে :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ ذَرَأَةً
অর্থঃ, যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়া ও পরকালের কাজ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। এরপর আবার তালাক ও ইচ্ছতের বর্ণিত বিধানাবলী পালন করার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে :

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتْلُوا آيَاتِ الْكِتَابِ
— এটা আল্লাহর বিধান, যা তোমাদের প্রতি নাখিল করা হয়েছে। এরপর তাকওয়ার আরও একটি ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ ذَرَأَةً
— অর্থঃ, যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করেন এবং তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন।

المطالع ৭০

৪৭০

تدسم الله ৭০

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়



(৬) তোমরা তোমাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্যে সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তানসব পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্যদান করে, তবে তাদেরকে প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেবে এবং এ সম্পর্কে পরস্পর সংযতভাবে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি পরস্পর ক্ষেদ কর, তবে অন্য নারী স্তন্যদান করবে। (৭) নিষ্পালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ থাকে যা দিয়েছেন, তদপেক্ষা বেশী ব্যয় করার আদেশ কাউকে করেন না। আল্লাহ্ কষ্টের পর সুখ দেবেন। (৮) অনেক জনপদ তাদের পালনকর্তা ও তাঁর রসূলগণের আদেশ অমান্য করেছিল, অতঃপর আমি তাদেরকে কঠোর হিযাবে হৃত করেছিলাম এবং তাদেরকে ভীষণ শাস্তি দিয়েছিলাম। (৯) অতঃপর তাদের কর্মের শাস্তি আধাদন করল এবং তাদের কর্মের পরিণাম কতিই ছিল। (১০) আল্লাহ্ তাদের জন্যে যন্ত্রাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। অতএব, হে বৃদ্ধিমানস, যারা ইমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি উপদেশ নাযিল করেছেন, (১১) একজন রসূল, যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করেন, যাতে বিশ্বাসী ও সংকর্ষপরায়ণদের অধিকার থেকে আলোতে আনয়ন করেন। যে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকর্ষ সম্পাদন করে, তিনি তাকে দাখিল করবেন জন্ম্রাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তথায় তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাকে উত্তম রিযিক দেবেন। (১২) আল্লাহ্ সৎপাকশ সৃষ্টি করেছেন এক পৃথিবীও সেই পরিমাণে, এসবের মধ্যে তাঁর আদেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু তাঁর গোচ্যীভূত।

খোদাতীতির পাঁচটি কল্যাণ : পূর্বোক্ত আয়াতসমূহে খোদাতীতির পাঁচটি কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে—(১) আল্লাহ্ তাআলা খোদাতীরদের জন্যে ইহকাল ও পরকালের বিপদাদপ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন। (২) তার জন্যে রিযিকের এমন দার খুলে দেন যা কল্পনায়ও থাকে না। (৩) তার সব কাজ সহজ করে দেন। (৪) তার পাপসমূহ মোচন করে দেন। (৫) তার পুরস্কার বাড়িয়ে দেন। অন্য এক জায়গায় খোদাতীতির এই কল্যাণও বর্ণিত হয়েছে যে, এর কারণে খোদাতীর পক্ষে সত্য ও মিথ্যার পরিচয় সহজ হয়ে যায়। আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর আবার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদের ইচ্ছত, তাদের ভরণ-পোষণ এবং সাধারণ স্ত্রীদের অধিকার আদায়ের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

اَمْكُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ دُجْدِمْ وَلَا تَصْرُوهُنَّ اَوْفِيَهُنَّ

— এই আয়াত উপরে বর্ণিত প্রথম বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত যে, তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিস্কার করো না। এই আয়াতে তার ইতিবাচক দিক উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইচ্ছত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী বসবাসের জায়গা দাও। তোমরা যে গৃহে থাক, সেই গৃহের কোন অংশে তাদেরকে রাখ। প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে থাকলে কোন প্রকার পর্দা করারও প্রয়োজন নেই। ‘বাইন তালাক’ অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে অবশ্য বিবাহ ছিন্ন হওয়ার কারণে তালাকদাতা স্বামীর কাছে পর্দা সহকারে সেই গৃহে বাস করতে হবে।

দশম বিধান : তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীদেরকে ইচ্ছতকালে উতাক্ত

করো না : وَلَا تَصْرُوهُنَّ এর অর্থ এই যে, তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীরা যখন ইচ্ছতকালে তোমাদের সাথে থাকবে, তখন তিরস্কার করে অথবা তার অভাবপূরণে কৃপণতা করে তাকে উতাক্ত করো না, যাতে সে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়।

وَاِنْ كُنْ اُولَاكِ رَجُلًا فَانْفِقْ عَلَيْهَا حَتَّى يَضَعُ حِمْلَهَا

অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীরা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব তাদের ব্যয়ভার বহন করবে।

একাদশ বিধান : তালাকপ্রাপ্তদের ইচ্ছতকালীন ভরণপোষণ : এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী গর্ভবতী হলে তার ভরণ-পোষণ সন্তান প্রসব পর্যন্ত স্বামীর উপর ওয়াজিব। এ কারণেই এ ব্যাপারে সমগ্র উম্মত একমত। তবে যে স্ত্রী গর্ভবতী নয়, তাকে প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দিয়ে থাকলে তার ইচ্ছতকালীন ভরণ-পোষণ ও উম্মতের ইজমা দ্বারা স্বামীর উপর ওয়াজিব। পক্ষান্তরে তাকে ‘বাইন তালাক’ অথবা তিন তালাক দিয়ে থাকলে, অথবা সে খোলা ইত্যাদির মাধ্যমে বিবাহ ভঙ্গ করিয়ে থাকলে, তার ভরণ-পোষণ ইমাম শাফেয়ী, আহমদ (রহঃ) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে স্বামীর উপর ওয়াজিব নয়। ইমাম আযম (রহঃ)—এর মতে তার ভরণ-পোষণ তখনও স্বামীর উপর ওয়াজিব। তিনি বলেন : বসবাসের অধিকার যেমন সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর প্রাপ্য, তেমনি ভরণ-পোষণ ও সর্বপ্রকার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর প্রাপ্য, যা তালাকদাতা স্বামী আদায় করবে। তাঁর দলীল পূর্বোক্ত এই আয়াত : اَمْكُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ কেননা, এই আয়াতে হয়রত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)—এর কেরাত এরূপ :

— اسكنوهن من حيث سكنتم وانفقوا عليهن من وجدهم

সাধারণতঃ এ কেরাত অন্য কেরাতের তফসীর করে। অতএব, প্রসিদ্ধ কেরাতে যদিও انفقوا শব্দটি উল্লিখিত নেই, কিন্তু তা উহ্য আছে। প্রসিদ্ধ কেরাত যেভাবে বসবাসের অধিকার স্বামীদের উপর ওয়াজিব করেছে, তেমনি ইদতকালীন ভরণ-পোষণও স্বামীদের হিম্মায় অপরিহার্য করে দিয়েছে। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ও অন্য কয়েকজন সাহাবীর এক উক্তি থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ফাতেমা বিনতে কায়েস (রাঃ)-কে তার স্বামী তিন তালাক দিয়েছিল। তিনি হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে বলেছিলেন যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) তার ভরণ-পোষণ তার স্বামীর উপর ওয়াজিব করেননি। হযরত ওমর (রাঃ) ও কয়েকজন সাহাবী ফাতেমার এই কথা খণ্ডন করে বলেছিলেন : আমরা এই বর্ণনার ভিত্তিতে আল্লাহর কিতাব ও রসুলের সুনতকে বন্ধন করতে পারি না। এতে আল্লাহর কিতাব বলে বাহ্যতঃ এই আয়াতকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, হযরত ওমর (রাঃ)-এর মতে ভরণ-পোষণ ও আয়াতের মধ্যে দাখিল। রসুলের সুনত বলে তাহাজী, দারে-কুতনী ও তিবরানী বর্ণিত সেই হাদীসকে বোঝানো হয়েছে, যাতে স্বয়ং হযরত ওমর (রাঃ) বলেন : আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে শুনেছি, তিনি তিন তালাকপ্রাপ্তদের জন্যেও ভরণ-পোষণ এবং বসবাসের অধিকার স্বামীর উপর ওয়াজিব করেছেন।

সারকথা এই যে, গর্ভবতী স্ত্রীদের ইদতকালীন ভরণ-পোষণ এই আয়াত পরিষ্কারভাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে। এ কারণেই এ সম্পর্কে উস্মতের ইজমা আছে। এমনিভাবে প্রত্যাহারযোগ্য তালাকপ্রাপ্তার বিবাহ ভঙ্গ না হওয়ার কারণে তার ভরণ-পোষণও সবার মতে ওয়াজিব। 'বাইন তালাক' অথবা তিন তালাকপ্রাপ্তদের ব্যাপারে ফেকাহুদিগপ মতভেদ করেছেন। ইমাম আযম (রহঃ)-এর মতে তাদের ভরণ-পোষণও ওয়াজিব। এর পূর্ণ বিবরণ তফসীরে মাহহারীতে দেখুন।

— وَأَنْ أَصْنَعَنَّ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْ زِينَةٍ وَأَنْ يَسْكُنَ فِي الْبَيْتِ مَعَكَ

গর্ভবতী হলে এবং সন্তানগ্রসব হয়ে গেলে তার ইদত পূর্ণ হয়ে যায়। তাই তার ভরণ-পোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব থাকে না। কিন্তু প্রসূত সন্তানকে যদি তালাকপ্রাপ্তা মা সন্তানদান করে, তবে সন্তানদানের বিনিময় নেয়া জায়েয।

দ্বাদশ বিধান : সন্তানদানের পারিশ্রমিক : যে পর্যন্ত স্ত্রী স্বামীর বিবাহাধীন থাকে, সে পর্যন্ত সন্তানদেরকে সন্তানদান করা স্বয়ং জননীর হিম্মায় কোরআনের আদেশ বলে ওয়াজিব। বলা হয়েছে وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ - যে কাজ কারও দায়িত্বে এমনিতেই ওয়াজিব, সেই কাজের জন্যে পারিশ্রমিক নেয়া ঘুষের শামিল, যা নেয়া উভয়ই নাজায়েয। এ ব্যাপারে ইদতকালও বিবাহের মধ্যে গণ্য। কেননা, বিবাহ অবস্থায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণ যেমন স্বামীর উপর ওয়াজিব, ইদতকালও তেমনি ওয়াজিব। তবে সন্তান গ্রসবের পর যখন ইদত খতম হয়ে যায়, তখন তার ভরণ-পোষণও স্বামীর উপর ওয়াজিব হয়ে থাকে না। এখন যদি সে প্রসূত সন্তানকে সন্তানদান করে, তবে আলোচ্য আয়াত এর পারিশ্রমিক নেয়া ও দেয়া জায়েয সাব্যস্ত করেছে।

ত্রয়োদশ বিধান : انتصار - وَالْيَتِيمَ الْيَرْبِئُهُ رَبُّهُ - এর শাদিক অর্থ পরামর্শ করা এবং একজন অন্যজনের কথা মেনে নেয়া। উদ্দেশ্য এই যে, সন্তানদানের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীকে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যেন সাধারণ পারিশ্রমিক অপেক্ষা বেশী না চায় এবং স্বামী সাধারণ পারিশ্রমিক দিতে

যেন অসম্মত না হয় এবং এ ব্যাপারে তারা যেন একে অপরের সাথে উদার ব্যবহার করে।

চতুর্দশ বিধান : وَلَنْ تَجْعَلَ لِمَوْلَاكَ مِثْلَ مَوْلَاكَ

করার ব্যাপারটি যদি পারস্পরিক পরামর্শক্রমে মীমাংসা না হয়, অথবা স্ত্রী যদি তার সন্তানকে পারিশ্রমিক নিয়েও সন্তানদান করতে অস্বীকার করে, তবে আইনতঃ তাকে বাধ্য করা যাবে না, বরং মনে করতে হবে যে, সন্তানের প্রতি জননীর সর্বাধিক মায়ামমতা সত্ত্বেও যখন অস্বীকার করছে, তখন কোন বাস্তব ওয়র আছে। কিন্তু যদি বাস্তবে ওয়র না থাকে, কেবল রাগ-গোশ্বার কারণে অস্বীকার করে, তবে আল্লাহর কাছে সে গোনাহ্গার হবে। তবে বিচারক তাকে সন্তানদান করতে বাধ্য করবে না।

পঞ্চদশ বিধান : স্ত্রীর ভরণ-পোষণের পরিমাণ নির্ধারণে স্বামীর আর্থিক সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

لِيُفِيقَ دُوسَعَةً مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسِقْ فِي رَأْسِهِ اللَّهُ

— অর্থঃ, বিস্তালা ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার রিয়িক সীমিত, সে আমদানি ব্যয় করবে। এ থেকে জানা গেল যে, স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যাপারে স্ত্রীর অবস্থা গর্ভবতী হবে না; বরং স্বামীর আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী ভরণ-পোষণ দেয়া ওয়াজিব হবে। স্বামী বিস্তান হলে বিস্তানসুলভ ভরণ-পোষণ দেয়া ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিস্তালা নী না হয়; বরং দরিদ্র ও ফকীর হয়। স্বামী দরিদ্র হলে দরিদ্রসুলভ ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে, যদিও স্ত্রী বিস্তালা নী হয়। ইমাম আযম (রাঃ)-এর মাহহাব তাই। কোন কোন ফেকাহীদের উক্তি এর বিপরীত। (মাহহারী)

لَا يَحِلُّ لِلَّهِ نَفْسًا إِلَّا رَأْسًا وَنَبِيًّا يُجْعَلُ اللَّهُ يَدًا عَزِيزًا

— এটা আগের বাক্যেরই ব্যাখ্যা। অর্থঃ, আল্লাহ তাআলা কাউকে তার সামর্থ্যের বাইরে কাজের দায়িত্ব দেন না। তাই দরিদ্র ও নিঃস্বামী উপর তারই অবস্থা অনুযায়ী ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে। এরপর স্ত্রীকে দরিদ্রসুলভ ভরণ-পোষণ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার ও সবার করার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে : سَيَجْعَلُ اللَّهُ يَدًا عَزِيزًا অর্থঃ, কারও এরূপ মনে করা উচিত নয়, বর্তমান দারিদ্র-চিরকাল বজায় থাকবে; বরং দারিদ্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য আল্লাহর হাতে। তিনি দারিদ্র্যের পর স্বাচ্ছন্দ্য দান করতে পারেন।

জ্ঞাতব্য : এই আয়াতে সেই স্বামীর আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করবে বলে ইঙ্গিত আছে, যারা যথাসাধ্য স্ত্রীদের ওয়াজিব ভরণ-পোষণ আদায় করতে সচেষ্ট থাকে এবং স্ত্রীকে কষ্টে রাখার মনোবৃত্তি পোষণ না করে।—রুহুল মা'আনী)

— عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ جَنَابًا مُّذُنًّا وَعَدَتْهُمَا عَادًا أَبَا ثَكْلَا

উল্লিখিত এসব জাতির হিসাব ও আযাব পরকালে হবে, কিন্তু এখানে একে অতীত পদবাচ্যে ব্যক্ত করার কারণ এর নিশ্চিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা, যেন হয়েই গেছে।—(রুহুল-মা'আনী) আর এরূপ হতে পারে যে, এখানে হিসাবের অর্থ জিজ্ঞাসাবাদ নয়; বরং শাস্তি নির্ধারণ করা। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থই নেয়া হয়েছে। এটাও হতে পারে যে, কঠোর হিসাব যদিও পরকালে হবে, কিন্তু আমলনামায় তা লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এবং হচ্ছে। একেই হিসাব করা হয়েছে বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আযাবের অর্থ ইহকালীন আযাব, যা অনেক পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের উপর নাযিল হয়েছে। এমতাবস্থায় পরবর্তী عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ جَنَابًا مُّذُنًّا বাক্যে বর্ণিত

আযাব কেবল পরকালে হবে।

مَّا أَزْلَمَ اللَّهُ إِلَهُكَ زُلْمًا سَوِيًّا এই আয়াতের সহজ ব্যাখ্যা এই যে, اَزْلَمَ শব্দ উহ্য মেনে এই অর্থ করা যে, নাথিল করেছেন কোরআন এবং প্রেরণ করেছেন রসূল (সাঃ)। তফসীরের সার-সংক্ষেপে তাই করা হয়েছে। অন্যরা অন্য ব্যাখ্যাও লিখেছেন। উদাহরণতঃ ‘যিকর’ এর অর্থ স্বয়ং রসূল (সাঃ) এবং অধিক যিকরের কারণে তিনি নিজেই যেন যিকর হয়ে গেছেন। — (রুহুল-মা‘আনী)

সপ্ত পৃথিবী কোথায় কোথায় কিভাবে আছে : اَلَّذِي خَلَقَ

سَبْعَ مَقَابِلٍ وَفِي الْأَرْضِ وَمِنْهَا سَبْعٌ مِثْلُ مُدٍ এই আয়াত থেকে এতটুকু বিষয় পরিকারভাবে বোঝা যায় যে, আকাশ যেমন সাতটি পৃথিবীও তেমনি সাতটি। এখন এই সপ্ত পৃথিবী কোথায় ও কি আকারে আছে, উপরে নীচে স্তরে স্তরে আছে, না প্রত্যেক পৃথিবীর স্থান ভিন্ন ভিন্ন? যদি উপরে নীচে স্তরে স্তরে থাকে, তবে সপ্ত আকাশের মধ্যে আলাদা আলাদা ফেরেশতা আছে, তেমনি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মাঝখানেও ব্যবধান, বায়ুমণ্ডল, শূন্যমণ্ডল ইত্যাদি আছে কি না, তাতে কোন সৃষ্টজীব আছে কি না অথবা সপ্ত পৃথিবী পরস্পরে গ্রথিত কি না? এসব প্রশ্নের ব্যাপারে কোরআন পাক নীরব। এ সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত রয়েছে, সেসব হাদীসের অধিকাংশ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ এগুলোকে বিস্তৃত বলেছেন এবং কেউ জ্বাল এবং মনগড়া পর্যন্ত বলে দিয়েছেন। উপরে যেসব সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তির নিরীখে সবগুলোই সম্ভবপর। বলতে কি, এসব তথ্যানুসন্ধানের উপর আমাদের কোন ধর্মীয় অথবা পার্শ্ব প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। কবরে অথবা হাশরে আমাদেরকে এ সম্পর্কে প্রশ্নও করা হবে না। তাই নিরাপদ পন্থা এই যে, আমরা ঈমান আনব এবং বিশ্বাস

করব আকাশের ন্যায় পৃথিবীও সাতটিই। সবগুলোকে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অপার শক্তি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। কোরআনের বর্ণনা এতটুকুই যে বিষয় বর্ণনা করা কোরআন জরুরী মনে করেনি, আমরাও তার পেছনে পড়ব না। এ জাতীয় বিষয়াদিতে পূর্ববর্তী মনীষীগণের কর্মপন্থা তাই ছিল। তাঁরা বলেছেন : ايهو ما ايهو الله অর্থাৎ, যে বিষয়কে আল্লাহ্ তাআলা অস্পষ্ট রেখেছেন, তোমরাও তাকে অস্পষ্ট থাকতে দাও। বিশেষতঃ বহমান তফসীর সর্বসাধারণের জন্য লিখিত হয়েছে। জনসাধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় নয়—এমন বিরোধপূর্ণ আলোচনা এতে সন্নিবেশিত করা হয়নি।

يَتَنَزَّلُ الْمُرْسَلُونَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার আদেশ সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পৃথিবীর মাঝখানে অবতীর্ণ হতে থাকে। আল্লাহ্ তাআলার আদেশ দ্বিবিধ। — (আইনগত, যা আল্লাহ্ তাআলার আদেশ বন্দাদের জন্যে ওহী ও পয়গম্বরগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীতে মানব ও জিনের জন্যে আকাশ থেকে ফেরেশতাগণ এই আইনগত আদেশ পয়গম্বরগণের কাছে নিয়ে আসে। এতে আকায়েদ, এবাদত, চরিত্র, পারস্পরিক লেন-দেন, সামাজিক বিধি ইত্যাদি থাকে এগুলো মেনে চললে সওয়াব এবং অমান্য করলে আযাব হয়।) (২) দ্বিতীয় প্রকার আদেশ সৃষ্টিগত। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার তকদীর প্রয়োগ সম্পর্কিত বিধি-বিধান। এতে জগত সৃষ্টি, জগতের ক্রমোন্নতি, হ্রাসবৃদ্ধি এবং জীবন ও মরণ দাখিল আছে। এসব বিধি-বিধান সমস্ত সৃষ্ট বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। তাই যদি প্রত্যেক দুই পৃথিবীর মাঝখানে শূন্যমণ্ডল, ব্যবধান এবং তাতে কোন সৃষ্টজীবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে সেই সৃষ্টজীব শরীয়তের বিধি-বিধানের অধীন না হলেও তার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার আদেশ অবতীর্ণ হতে পারে। কারণ, আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টিগত আদেশ তাতেও ব্যাপ্ত।

সূরা তালাক সমাপ্ত

সূরা আত্-তাহরীম

শানে নুযূল : সহীহ বোখারী ইত্যাদি কিতাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসরের পর দাঁড়ানো অবস্থায়ই সকল বিবির কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্যে গমন করতেন। একদিন হযরত যয়নব (রাঃ)-এর কাছে একটু বেশী সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈর্ষা মাখাচাড়া দিয়ে উঠল এবং আমি হযরত হাফসা (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছে আসবেন, সেই বলবে : আপনি “মাগাফীর” পান করেছেন। (মাগাফীর এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আঠাকে বলা হয়।) সেমতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : না, আমি তো মধু পান করেছি। সেই বিবি বললেন : সম্ভবত : কোন যোমাছি ‘মাগাফীর’ বৃক্ষে বসে তার রস চুষেছিল। এ কারণেই মধু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে সযত্নে বেঁচে থাকতেন। তাই অতঃপর মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন। হযরত যয়নব (রাঃ) মনঃস্থল হবেন চিন্তা করে তিনি বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যেও বলে দিলেন। কিন্তু সেই বিবি বিষয়টি অন্য বিবির গোচরীভূত করে দিল। কোন কোন রেওয়াজে আছে, হযরত হাফসা (রাঃ) মধু পান করেছিলেন এবং হযরত আয়েশা, সওদা ও সফিয়া (রাঃ) পরামর্শ করেছিলেন। কতক রেওয়াজে ঘটনাটি অন্যভাবেও বর্ণিত হয়েছে। অতএব এটা অমূলক নয় যে, একাধিক ঘটনার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। — (বয়ানুল-কোরআন)

আয়াতসমূহের সার-সংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি হালাল বস্তু অর্থাৎ, মধুকে কসমের মাধ্যমে নিজের জন্যে হারাম করে নিয়েছিলেন। এ কাজ কোন প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে হলে জায়েয; গোনাহ নয়, কিন্তু আলোচ্য ঘটনায় এমন কোন প্রয়োজন ছিল না যে, এর কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কষ্ট স্বীকার করে নিবেন এবং একটি হালাল বস্তু বর্জন করবেন। কেননা, একাজ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কেবল বিবিগণকে খুশী করার জন্যে করেছিলেন। এরূপ ব্যাপারে বিবিগণকে খুশী করা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে অপরিহার্য ছিল না। তাই আল্লাহ তাআলা সহানুভূতিস্থলে বলেছেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَيَّنَ لَكَ مَرْصَاتُكَ أَذْوَاجُكَ

— এই আয়াতেও কোরআন পাকের সাধারণ রীতি অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম নিয়ে সম্বোধন না করে ‘হে নবী’ বলা হয়েছে। এটা তাঁর বিশেষ সম্মান ও সম্ভ্রম। এরপর বলা হয়েছে যে, স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে আপনি নিজের জন্যে একটি হালাল বস্তুকে হারাম করেছেন কেন? বাক্যটি যদিও সহানুভূতিস্থলে বলা হয়েছে, কিন্তু দৃশ্যতঃ এতে জওয়াব তলব করা হয়েছে। এ থেকে ধারণা হতে পারত যে, সম্ভবতঃ তিনি খুব বড় ভুল করে ফেলেছেন। তাই সাথে সাথে বলা হয়েছে

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ অর্থাৎ, গোনাহ হলেও আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

উল্লেখিত ঘটনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) কসম খেয়েছিলেন। আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি এই কসম ভঙ্গ করেন এবং কাফফারা আদায় করেন। দূর-ব-মনসূরের রেওয়াজেও বর্ণিত আছে যে, তিনি কাফফারা হিসাবে

সূরা আত্-তাহরীম

মদীনায় অবতীর্ণ। : আয়াত ১২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করেছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২) আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৩) যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেন : কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন : যিনি সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন। (৪) তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখ আল্লাহ, জিবরাঈল এবং সংকর্মপরাগণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী। (৫) যদি নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন, তবে সম্ভবতঃ তাঁর পালনকর্তা তাঁকে পরিবর্তে দিবে তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী, যারা হবে আজ্জাবহ, ঈমানদার, নামাযী তওবারকারী, এবাদতকারী, রোযাদার, অকুমারী ও কুমারী। (৬) মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাখা হাদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে।

একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দেন। — (বয়ানুল-কোরআন)

فَدَرَضَ اللَّهُ لَكُمُ الْفِتْرَةَ ۖ أَرَبًا ۚ أَرَبًا ۚ أَرَبًا ۚ অর্থাৎ, যে ক্ষেত্রে কসম ভঙ্গ করা জরুরী অথবা উত্তম বিবেচিত হয়, আল্লাহ তাআলা সেক্ষেত্রে তোমাদের কসম ভঙ্গ করে কাফকারা আদায় করার পথ করে দিয়েছেন। অন্যান্য আয়াতে এর বিশদ বর্ণনা আছে।

وَأَذِ اسْرَ الْبَيْتِ الْبَيْتِ ۖ وَبِئْسَ الْأَوْدَاجُ ۖ حَدِيثًا — অর্থাৎ, নবী যখন তাঁর কোন এক বিবির কাছে গোপন কথা বললেন। সহীহ ও অধিকাংশ রেওয়ায়েতদৃষ্টে এই গোপন কথা ছিল এই যে, হযরত যযনব (রাঃ)—এর কাছে মধু পান করার কারণে অন্য বিবিগণ যখন মনঃক্ষুব্ধ হলেন, তখন তাদেরকে খুশী করার জন্য তিনি মধু পান না করার কসম খেলেন এবং বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্যে বলে দিলেন, যাতে যযনব (রাঃ) মনে মনে কষ্ট না পান। কিন্তু সেই বিবি এই গোপন কথা ফাঁস করে দিলেন। এই গোপন কথা প্রসঙ্গে অন্যান্য রেওয়ায়েতে আরও কতিপয় বিষয় বর্ণিত আছে। কিন্তু অধিকাংশ ও সহীহ রেওয়ায়েতসমূহে তাই আছে, যা লিখিত হল।

فَلَمَّا بَيَّنَّاتُ لَهُ وَأَخْبَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَعْرَضَ عَنْ — অর্থাৎ, সেই বিবি যখন গোপন কথাটি অন্য বিবির গোচরীভূত করে দিলেন এবং আল্লাহর রসূল (সাঃ)—কে এ সম্পর্কে অবহিত করে দিলেন, তখন তিনি সেই বিবির কাছে গোপন কথা ফাঁস করে দেয়ার অভিযোগ তো করলেন, কিন্তু পূর্ণ কথা বললেন, না। এটা ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর ভদ্রতা। তিনি দেখলেন সম্পূর্ণ কথা বললে সে অধিক লজ্জিত হবে। কোন বিবির কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল এবং কার কাছে ফাঁস করা হয়েছিল, কোরআন পাক তা বর্ণনা করেনি। অধিকাংশ রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত হাফসা (রাঃ)—এর কাছে গোপন কথা বলা হয়েছিল। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)—এর কাছে তা ফাঁস করে দেন। এ সম্পর্কে সহীহ বোখারী হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর বর্ণনা পরে উল্লেখ করা হবে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে গোপন কথা ফাঁস করে দেয়ার কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাফসা (রাঃ)—কে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করেন ; কিন্তু আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল (আঃ)—কে প্রেরণ করে তাঁকে তালাক থেকে বিরত রাখেন এবং বলে দেন যে, হাফসা (রাঃ) অনেক নামায পড়ে অনেক রোযা রাখে। তার নাম জন্মতে আপনার বিবিগণের তালিকায় লিখিত আছে।—(মায়হারী)।

إِنْ تَوَلَّيْتُ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَدَقْتُ قَوْلِي — উপরোক্ত ঘটনার পশ্চাতে যে দু'জন বিবি সক্রিয় ছিলেন, তাঁরা কে, এসম্পর্কে সহীহ বোখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এতে তিনি বলেন : যে দু'জন নারী সম্পর্কে কোরআন পাকে اللَّهُ إِنْ تَوَلَّيْتُ إِلَى اللَّهِ বলা হয়েছে, তাঁদের ব্যাপারে হযরত ওমর (রাঃ)—কে প্রশ্ন করার ইচ্ছা বেশ কিছুকাল আমার মনে ছিল। অবশেষে একবার তিনি হুজুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে সুযোগ বোঝে আমিও সফরসঙ্গী হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে একদিন যখন তিনি ওয়ু করছিলেন এবং আমি পানি ঢেলে দিছিলাম, তখন প্রশ্ন করলাম : কোরআনে যে দু'জন নারী সম্পর্কে اللَّهُ إِنْ تَوَلَّيْتُ إِلَى اللَّهِ বলা হয়েছে, তাঁরা কে ? হযরত ওমর (রাঃ) বললেন : আশ্চর্যের বিষয়, আপনি জ্ঞানেন না, ঐরা দু'জন হলেন হাফসা ও আয়েশা (রাঃ)। অতঃপর এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি নিজের একটি দীর্ঘ কাহিনী বিবৃত

করলেন। এতে এই ঘটনার পূর্ববর্তী কিছু অবস্থাও বর্ণনা করলেন। তফসীরে—মায়হারীতে এর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

وَلِنْ تَطَهَّرَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ اللَّهُ مَوْلَا — এতে বলা হয়েছে : যদি তোমরা তওবা করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে খুশী না কর, তবে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল ও সমস্ত নেক মুসলমান তাঁর সহায়। সকল ফেরেশতা তাঁর সেবায় নিয়োজিত। অতএব, তাঁর ক্ষতি করার সাধ্য কার ? ক্ষতি যা হবার, তোমাদেরই হবে। অতঃপর তাঁদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে :

عَنْ رَبِّكَ إِنْ كُنْتُمْ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُمْ — এতে বিবিগণের এই ধারণার জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তালাক দিয়ে দিলে তাদের মত স্ত্রী সম্ভবতঃ তিনি পাবেন না। জওয়াবের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তাআলার সামর্থ্যের বাইরে কোন কিছু নেই। তিনি তোমাদেরকে তালাক দিয়ে দিলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের মতই নয় ; বরং তোমাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর নারী তাঁকে দান করবেন। এতে জরুরী হয় না যে, তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট নারী তখন বিদ্যমান ছিল। হতে পারে যে, তখন ছিল না, কিন্তু প্রয়োজনে আল্লাহ তাআলা অন্য নারীদেরকে তাঁদের চাইতে উৎকৃষ্ট করে দিতে পারেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর বিবিগণের কর্ম ও চরিত্রের সংশোধন এবং তাদের শিক্ষাদীক্ষার বর্ণনা আছে। অতঃপর সাধারণ মুমিনগণকেও এ ব্যাপারে আদেশ করা হচ্ছে।

فَوَالَّذِينَ سَمِعُوا مَوْلَا — এই আয়াতে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে : তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা কর। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নির ভয়াবহতা উল্লেখ করে অবশেষে একথাও বলা হয়েছে যে, যারা জাহান্নামের যোগ্য পাত্র হবে, তারা কোন শক্তি, দলবল, খোশামোদ অথবা ঘুষের মাধ্যমে জাহান্নামে নিয়োজিত কঠোরপ্রাণ ফেরেশতাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে না। এই ফেরেশতাদের নাম 'যাবানিয়া'।

أَقْبَلِي — শব্দের মধ্যে পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, চাকর-নওকর সবই দাখিল আছে। এক রেওয়ায়েতে আছে, এই আয়াত নাখিল হলে পর হযরত ওমর (রাঃ) আরয করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ, নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটি তো বোঝে আসে (যে, আমরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকব এবং খোদায়ী বিধি-বিধান পালন করব), কিন্তু পরিবার-পরিজনকে আমরা কিভাবে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করব ? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এর উপায় এই যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমার তাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ কর এবং যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করতে আদেশ কর। এই কর্মপন্থা তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করতে পারবে।—(রুহুল-ম'আনী)।

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য : ফেকাহবিদগণ বলেন : স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ফরয কর্মসমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলী শিক্ষা দেয়া এবং তা পালন করানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। একথা আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে বলে : হে আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি ! তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা, তোমাদের যাকাত,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ تَعْمَلُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوَنُّوْا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۚ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُغْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُوْرُهُمْ يَسْلُوْنَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْبَصِيرَةُ ۚ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْأَمْرَاتِ ۚ وَالْأَمْرَاتِ لَوْ طُغِيَ كُنَّ أَهْلًا لِّبُيُوتٍ مِّنْ عِبَادٍ تَابَ صَالِحِينَ فَخَانَتْهُمَا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۚ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا الْأَمْرَاتِ فَرَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِّيْ عِنْدَكَ بَيْتًا لِّبَيْتِي الْبَيْتَ وَخُذْ مِنِّي فِرْعَوْنَ وَحَمْلَهُ وَخُذْ مِنِّي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ وَمَرِيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَدَتْ فَرجَهَا فَفُتِحَتْ وَلَيْسَ مِنْ رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ عَبْدَ رَبِّهَا ذُنُوبَهَا وَكَانَتْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۚ

(৭) হে কাকের সম্প্রদায়, তোমরা আজ ওয়র পেশ করা না। তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হবে, যা তোমরা করতে। (৮) মুমিনগণ। তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা কর—আন্তরিক তওবা। আশা করা যায়, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কর্মসমূহ মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জন্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ নবী এবং তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদহ করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে। তারা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের নূরকে পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (৯) হে নবী। কাকের ও মুনাক্কিদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকট স্থান। (১০) আল্লাহ তাআলা কাকেরদের জন্যে নূহ-পত্নী ও লূত-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা ছিল আমার দুই ধর্মপ্রাণ বান্দার গৃহে। অতঃপর তারা তাদের সাথে বিশৃঙ্খলিততা করল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ তাআলার কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল : জাহান্নামীদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও। (১১) আল্লাহ তাআলা মুমিনদের জন্যে ফেরাউন-পত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। সে বলল : হে আমার পালনকর্তা। আপনার সন্নিহিত জন্নাতে আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন, আমাকে ফেরাউন ও তার দুশ্মর থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন। (১২) আর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন এমনরা-তনয়া যরিয়মের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে জীবন ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং সে তার পালনকর্তার বাণী ও কিতাবকে সত্যে পরিণত করেছিল। সে ছিল বিনয় প্রকাশকারী নীদের একজন।

তোমাদের এতীম, তোমাদের মিসকীন, তোমাদের প্রতিবেশী, আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা সবাইকে তোমাদের সাথে জন্নাতে সমবেত করবেন। “তোমাদের নামায, তোমাদের রোযা” ইত্যাদি বলার উদ্দেশ্য এই যে, এগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখ, এতে শৈথিল্য না হওয়া উচিত। “তোমাদের মিসকীন, তোমাদের এতীম” ইত্যাদি বলার অর্থ এই যে, তোমাদের প্রাপ্য খুশী মনে আদায় কর। জনৈক বুয়ূর্গ বলেন : সেই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন সর্বাধিক আযাবে থাকবে, যার পরিবার-পরিজন ধর্ম সম্পর্কে মূর্খ ও উদাসীন হবে—(রুহুল-মা’আনী)।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মুমিনদেরকে উপদেশ দানের পর **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا** আয়াতে কাকেরদেরকে বলা হয়েছে : এখন তোমাদের কৃতকর্ম তোমাদের সামনে আসছে। এখন তোমাদের কোন ওয়র কবুল করা হবে না।

তওবার শাস্তিক অর্থ ফিরে আসা।

উদ্দেশ্য গোনাহ থেকে ফিরে আসা। কোরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় তওবার অর্থ বিগত গোনাহের জন্যে অনুতাপ হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার ধারে-কাছে না যাওয়ার দৃঢ়সংকল্প করা। **نَصَحَةٌ** শব্দটিকে যদি **نَصَحَةٌ** থেকে উদ্ভূত ধরা হয়, তবে এর অর্থ ষাটি করা। আর যদি **نَصَاحَةٌ** থেকে ব্যুৎপন্ন ধরা হয়, তবে এর অর্থ বশ্র সেলাই করা ও তালি দেয়া। প্রথম অর্থের দিক দিয়ে **تَوْبَةٌ نَّصُوحًا**—এর অর্থ এমন তওবা, যা রিয়্যা ও নাম-যশ থেকে ষাটি—কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে এবং গোনাহের কারণে অনুতাপ হয়ে গোনাহ পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে **نَصُوح** শব্দটি এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার জন্যে হবে যে, তওবা গোনাহের কারণে সংকর্মের হ্রিবস্বেত তালি সংযুক্ত করে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : বিগত কর্মের জন্যে অনুতাপ হওয়া এবং ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি না করার পাকাপোক্ত ইচ্ছা করাই **تَوْبَةٌ نَّصُوحٌ**—কলবী (রহঃ) বলেন : **تَوْبَةٌ نَّصُوحٌ** হল মুখে ক্ষমপ্রার্থনা করা, অন্তরে অনুশোচনা করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে ভবিষ্যতে সেই গোনাহ থেকে দূরে রাখা।

হযরত আলী (রাঃ)—কে জিজ্ঞাসা করা হল; তওবা কি? তিনি বললেন : ছয়টি বিষয়ের একত্র সমাবেশ হলে তওবা হবে—(১) অতীত মন্দকর্মের জন্যে অনুতাপ (২) যেসব ফরয ও ওয়াজিব কর্ম তরক করা হয়েছে, সেগুলোর কাযা করা, (৩) কারও ধন-সম্পদ ইত্যাদি অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে থাকলে তা প্রত্যাপণ করা, (৪) কাউকে হাতে অথবা মুখে কষ্ট দিয়ে থাকলে তজ্জন্যে ক্ষমা নেয়া, (৫) ভবিষ্যতে সেই গোনাহের কাছে না যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হওয়া এবং (৬) নিজেকে যেমন আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করতে দেখেছিল, তেমনি এখন আনুগত্য করতে দেখা—(মায়হারী)।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত তওবার উপরোক্ত শর্তসমূহ সবার কাছে স্বীকৃত। তবে কেউ সংক্ষেপে এবং কেউ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُغْفِرَ عَنْكُمْ

শব্দের অর্থ আশা আছে, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য ওয়াদা। ওয়াদাকে আশা বলে ব্যক্ত করে ইস্তিত করা হয়েছে যে, মানুষের তওবা অথবা অন্য কোন সংকর্ম হোক, কোনটিই জন্নাতে ও মাগফেরাতের মূল্য হতে পারে না। নতুবা ইনসাফের দৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলার জন্যে জরুরী হয়ে পড়ে যে, যে ব্যক্তি সংকর্ম করবে, তাকে অবশ্যই জন্নাতে দাখিল করতে হবে। সংকর্মের এক প্রতিদান তো

প্রত্যেক মানুষ পার্শ্বি জীবনে প্রাপ্ত নেয়ামতের আকারে পেয়ে যায়। এর বিনিময় অধিনের দৃষ্টিতে জন্মাত পাওয়া জরুরী নয়। এটা কেবল আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ও অনুগ্রহের উপরই নির্ভরশীল। বোঝারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : তোমাদের কাউকে শুধু তার সংকর্ম মুক্তি দিতে পারে না যে পর্বস্ত আল্লাহ্ তাআলা কৃপা ও রহমতের ব্যবহার না করেন। সাহায্যে কেয়াম আরম্ভ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ, আপনাকেও মুক্তি দিতে পারে না? তিনি বললেন : হু আমাকেও — (মায়হরী)।

فَرَبَّ اللَّهِ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ سُرَّارَ الشَّيْطَانِ تُورَةُ — সূরার শেষভাগে আল্লাহ্ তাআলা চার জন নারীর দৃষ্টান্ত কর্তব্য করেছেন। প্রথম দুই নারী দুই জন পয়গম্বরের পত্নী। তারা ধর্মের ব্যাপারে আপন আপন স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং পোপনে কাকের ও মুরেকদেরকে সাহায্য করেছিল। ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। আল্লাহ্ তাআলার শ্রিয় পয়গম্বরেরগণের বৈবাহিক সাহচর্য ও তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাদের একজন হযরত নুহ (আঃ) —এর পত্নী, তার নাম 'ওয়ালেলা' বর্ণিত আছে। অপরজন লূত (আঃ) পত্নী, তার নাম 'ওয়ালেহা' কথিত আছে।—(কুরত্বী) তৃতীয়জন সর্ববৃহৎ কাকের, খোদায়ী দাবীদার ফেরাউনের পত্নী ছিলেন, কিন্তু হযরত মুসা (আঃ) —এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে মহান মর্যাদা দান করেছেন এবং দুনিয়াতেই তাঁকে জাহান্নামের আসন দেখিয়ে দিয়েছেন। স্বামীর ফেরাউনী আচরণ তাঁর পাখে মোটেই প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। চতুর্থ জন হযরত মরিয়ম। তিনি কারও পত্নী নন, কিন্তু ঈমান ও সংকর্মের বদৌলতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে নবুওয়তের গুণাবলী দান করেছেন, যদিও অধিকাংশ আলমের মতে তিনি নবী নন।

এসব দৃষ্টান্ত দ্বারা কৃটিয়ে তোলা হয়েছে যে, একজন মুমিনের ঈমান তার কোন কাকের স্বজন ও আত্মীয়ের উপকারে আসতে পারে না। তাই নবী ও গুলীশের পত্নীরা যেন নিশ্চিন্ত না হয় যে, তারা তাদের স্বামীদের কারণে মুক্তি পেয়েই যাবে এবং কোন কাকের পাপাচারীর পত্নী যেন দৃষ্টান্তপ্রাপ্ত না হয় যে, স্বামীর কুফরী ও পাপাচার তার জন্যে ক্ষতিকর

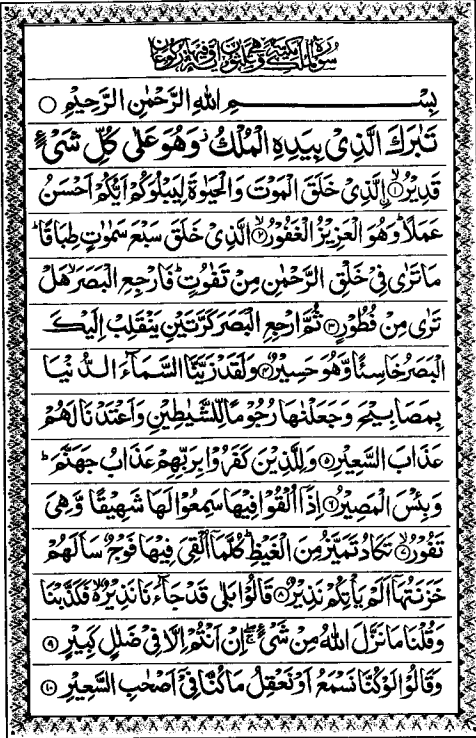
হবে; বরং প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে নিজেই নিজের ঈমান ও সংকর্মের চিন্তা করা উচিত।

وَصَرَفَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّ سُرَّارَ الشَّيْطَانِ تُورَةُ — এটা ফেরাউন-পত্নী হযরত আসিয়া বিনতে মুযাহিমের দৃষ্টান্ত। মুসা (আঃ) যখন যাদুকরদের মোকাবেলায় সফল হন এবং যাদুকররা মুসলমান হয়ে যায়, তখন বিবি আসিয়া তাঁর ঈমান প্রকাশ করেন। ফেরাউন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ভীষণ শাস্তি দিতে চাইল। কতক রেওয়াজেতে আছে, ফেরাউন তাঁর চার হাত পায়ে পেরেক মেরে বুকের উপর ভারী পাথর রেখে দিল, যাতে তিনি নড়াচড়া পর্বস্ত করতে না পারেন। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহ্ তাআলার কাছে আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দোয়া করেন। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, ফেরাউন উপর থেকে একটি ভারী পাথর তাঁর মাথার উপর ফেলে দিতে মনস্ত করলে তিনি এই দোয়া করেন। ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর আত্মা কবজ করে নেন এবং পাথরটি নিষ্কাশ দেহের উপর পতিত হয়। তিনি দোয়ায় বলেন : হে আমার পালনকর্তা, আপনি নিজের সান্নিধ্যে জন্মাত আমার জন্যে একটি গৃহ নির্মাণ করুন। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াতেই তাঁকে জাহান্নামের গৃহ দেখিয়ে দেন।—(মায়হরী)।

وَصَلَّاتُكَ بِحَبْلٍ وَرَبِّكَ وَرَبِّكَ — কলমাত রব্বা বলে পয়গম্বরেরগণের প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্ তাআলার সহীকা বোঝানো হয়েছে এবং কলম বলে প্রসিদ্ধ ঐশীগ্রহ ইব্রীল, যবুর ও তওরাৎ বোঝানো হয়েছে।

وَكُلَّتْ مِنَ الْفَيْزِ — ফান্ট শব্দটি ফান্টিন —এর বহুবচন। এর অর্থ নিয়মিত এবাদতকারী, এটা হযরত মরিয়মের পরিচিতি। হযরত আবু মুসা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামেল ও সিদ্ধপুরুষ হয়েছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল ফেরাউন-পত্নী আসিয়া, এমরান তনয়া মরিয়ম সিদ্ধিলাভ করেছেন।—(মায়হরী) বাহযতঃ এখানে নবুওয়তের গুণাবলী বোঝানো হয়েছে, যা নারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অর্জন করেছেন।—(মায়হরী)।

সূরা তাহরীম সমাপ্ত



সূরা আল-মুলক

মকায় অবতীর্ণ : আয়াত ৩০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

- (১) পূণ্যময় তিনি, যার হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।
- (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।
- (৩) তিনি সত্তা আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিফ্রিও ; কোন ফাটল দেখতে পাও কি? (৪) অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ—তোমার দৃষ্টি বার্ষ ও পরিশুদ্ধ হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।
- (৫) আমি সর্বনিম্ন আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি ; সেগুলোকে শয়তানদের জন্যে ক্ষেপণাস্রবৎ করেছি এবং প্রস্তুত করে রেখেছি তাদের জন্যে জ্বলন্ত আগ্নির শাস্তি। (৬) যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটা কতই না নিকট স্থান। (৭) যখন তারা তথ্য নিষ্কিপ্ত হবে, তখন তার উৎকৃষ্ট গর্জন শুনতে পাবে। (৮) ক্রোধে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন সম্প্রদায় নিষ্কিপ্ত হবে তখন তাদেরকে তার সিপাহীরা জিজ্ঞাসা করবে। তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আগমন করেনি? (৯) তারা বলবে : হাঁ আমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছিল, অতঃপর আমরা মিথ্যারোপ করেছিলাম এবং বলেছিলাম : আল্লাহ তাআলা কোন কিছু নাহিল করেননি। তোমরা মহাবিজ্ঞান্ডিতে পড়ে রয়েছ। (১০) তারা আরও বলবে : যদি আমরা শুনতাম অথবা বুদ্ধি খাটাতাম, তবে আমরা জাহান্নামবাসীদের মধ্যে থাকতাম না।

সূরা আল-মুলক

সূরা মুলকের কথ্যলত : এই সূরাকে হাদীসে ওয়াকিয়া ও মুনজিয়া বলা হয়েছে। ওয়াকিয়া শব্দের অর্থ রক্ষাকারী এবং মুনজিয়া শব্দের অর্থ মুক্তিদানকারী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : **هُوَ الْمَانِعَةُ النَّجِيَّةُ تَنْجِيهِ مَنْ** (হে রক্ষাকারী, এই সূরা আযাব রোধ করে এবং আযাব থেকে মুক্তি দেয়। যে এ সূরা পাঠ করে, তাকে এ সূরা কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে।—(কুরত্বী)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর রেওয়ায়েত ; রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, সূরা মুলক প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে গ্রথিত থাকুক। হযরত আবু হোরায়রার (রাঃ) রেওয়ায়েত ; রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলার কিতাবে একটি সূরা আছে, যার আয়াত তো মাত্র ত্রিশটি কিন্তু কেয়ামতের দিন এই সূরা এক এক ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে দাখিল করবে ; সেটা সূরা মুলক।—(কুরত্বী)।

تَبَارَكَ - تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 —থেকে জুত। এর শাস্কি অর্থ বেশী হওয়া। এই শব্দটি আল্লাহ তাআলার শানে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সর্বোচ্চ ও মহান। **بِيَدِهِ الْمُلْكُ** —আল্লাহ তাআলার হাতে রয়েছে রাজত্ব। কোরআন পাকের স্থানে স্থানে আল্লাহ তাআলার জন্যে হাত অর্থে **يَد** শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বহু উর্ধে। তাই এটা একটা **مُشَابَه** শব্দ। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। কিন্তু এর অবস্থা ও স্বরূপ কারও জ্ঞানার বিষয় নয়। এর রহস্য উদ্ঘাটনে ব্রতী হওয়া অবৈধ। রাজত্ব বলে আকাশ ও পৃথিবী এবং ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কর্তৃত্ব বোঝানো হয়েছে। আয়াতে আল্লাহ তাআলার জন্যে চারিটি গুণ দাবী করা হয়েছে। (এক) তিনি বিদ্যমান আছেন। (দুই) তিনি চরম পূর্ণত্ব গুণের অধিকারী এবং সবার উর্ধে। (তিন) তাঁর রাজত্ব আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত এবং (চার) তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। পরবর্তী আয়াতসমূহে এ দাবীর যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টজীবের মধ্যে চিন্তা-ভাবনা করলেই ফুটে উঠে। তাই পরে আয়াতসমূহে সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও সৃষ্টবস্তুর বিভিন্ন প্রকার দ্বারা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তওহীদ এবং তাঁর জ্ঞান ও শক্তিমত্তা সপ্রমাণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টির সেরা মানুষের অস্তিত্বে খোদায়ী কুদরতের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি করে বলা হয়েছে : **خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ** —এরপর কয়েক আয়াতে আকাশ সৃষ্টিতে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে প্রমাণ এনে বলা হয়েছে, **هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا** —এরপর

থেকে দুই আয়াতে পৃথিবী সৃজন ও তার উপকারিতা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা বর্ণিত হয়েছে। অবশেষে শূন্যমণ্ডলে বসবাসরকারী সৃষ্টজীব পক্ষীদের উল্লেখ করে **أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الظُّلُمِ** বলা হয়েছে। মোটকথা, সমগ্র সূরার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, জ্ঞান-গরিমা ও শক্তি-সামর্থ্যের পক্ষে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা। প্রসঙ্গক্রমে কাফেরদের শাস্তি, মুমিনদের প্রতিদান ইত্যাদি বিষয়বস্তুও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলার পূর্ণ জ্ঞান ও শক্তির যেসব প্রমাণ মানুষের মধ্যে রয়েছে দু'টি শব্দের মাধ্যমে সেগুলো নির্দেশ করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের স্বরূপ : خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَالْحَيَاةَ অর্থাৎ, তিনি মরণ ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। মানুষের অবস্থাসমূহের মধ্যে এখানে কেবল মরণ ও জীবন এই দু'টি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, এই দু'টি অবস্থাই মানব জীবনের যাবতীয় হাল ও ক্রিয়াকর্মে পরিব্যাপ্ত। জীবন একটি অস্তিত্বাচক বিষয় বিধায় এর জন্যে সৃষ্টি শব্দ যথার্থই প্রযোজ্য। কিন্তু মৃত্যু বাহ্যতঃ নাস্তিবাচক বিষয়। অতএব, একে সৃষ্টি করার মানে কি? এই প্রশ্নের জগুয়াবে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক স্পষ্ট উক্তি এই যে, মৃত্যু নির্যেট নাস্তিকে বলা হয় না; বরং মৃত্যুর সংজ্ঞা হচ্ছে আত্মা ও দেহের সম্পর্ক ছিন্ন করে আত্মাকে অন্যত্র স্থানান্তর করা। এটা অস্তিত্বাচক বিষয়। ঘোটকখা, জীবন যেমন দেহের একটি অবস্থার নাম, মৃত্যুও তেমনি একটি অবস্থা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্য কয়েকজন তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, মরণ ও জীবন দু'টি শরীরী সৃষ্টি। মরণ একটি ভেড়ার আকারে এবং জীবন একটি ঘোটকীর আকারে বিদ্যমান। বাহ্যতঃ একটি সহীহ হাদীসের সাথে সুর মিলিয়ে এই উক্তি করা হয়েছে। হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন যখন জন্মান্তরী জন্মাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে দাখিল হয়ে যাবে, তখন মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকারে উপস্থিত করা হবে এবং পুলসিরাতেও সন্নিবিষ্ট যবাই করে ঘোষণা করা হবে : এখন যে যে অবস্থায় আছে অনন্তকাল সেই অবস্থায়ই থাকবে। এখন থেকে কারও মৃত্যু হবে না। কিন্তু এই হাদীস থেকে দুনিয়াতে মৃত্যুর শরীরী হওয়া জরুরী হয় না; বরং এর অর্থ এই যে, দুনিয়ার অনেক অবস্থা ও কর্ম যেমন কেয়ামতের দিন শরীরী ও সাকার হয়ে যাবে, যা অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি মানুষের মৃত্যুরূপী অবস্থাও কেয়ামতে শরীরী হয়ে ভেড়ার আকার ধারণ করবে এবং তাকে যবাই করা হবে।—(কুরতুবী)।

তফসীরে-মাযহরীতে বলা হয়েছে, মৃত্যু নাস্তি হলেও নিছক নাস্তি নয়; বরং এমন বস্তুর নাস্তি, যা কোন সময় অস্তিত্ব লাভ করবে। এ ধরনের সকল নাস্তিবাচক বিষয়ের আকার জড়-অস্তিত্ব লাভের পূর্বে 'আলমে-মিছালে' (সাদৃশ জগতে) বিদ্যমান থাকে। এগুলোকে 'আ'য়ানে-সাবেতা' তথা প্রতিষ্ঠিত বস্তুরূপে বলা হয়। এসব আকারের কারণে এগুলোর অস্তিত্বাভাবের পূর্বেও এক প্রকার অস্তিত্ব আছে। এরপর তফসীরে-মাযহরীতে 'আলমে-মিছাল' প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে অনেক হাদীস থেকে প্রমাণাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

মরণ ও জীবনের বিভিন্ন স্তর : তফসীরে-মাযহরীতে আছে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় অপার শক্তি ও প্রজ্ঞা দ্বারা সৃষ্টিকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে প্রত্যেককে এক প্রকার জীবন দান করেছেন। সর্বাধিক পরিপূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন মানবকে দান করা হয়েছে। এতে একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয় লাভ করার যোগ্যতাও নিহিত রেখেছেন। এই পরিচয়ই মানুষকে খোদারী আদেশ-নিষেধের অধীন করার ভিত্তি এবং এই পরিচয়ই সেই আমানতের গুরুভার, যা বহন করতে আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা অক্ষমতা প্রকাশ করে কিন্তু মানুষ খোদা প্রদত্ত যোগ্যতার কারণে তা বহন করতে সক্ষম হয়। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে :

أَوَمِنْ كَانَ مِتًّا فَكَاخِرَةٍ — অর্থাৎ, কাকেরক মৃত এবং মুখিককে জীবিত আখ্যা দেয়া হয়েছে। কারণ, কাকের তার উপরোক্ত পরিচয় বিনষ্ট করে দিয়েছে। সৃষ্টির কোন কোন প্রকারের মধ্যে জীবনের এই স্তর নেই, কিন্তু চেতনা ও গতিশীলতা বিদ্যমান আছে। এই জীবনের বিপরীতে আসে

সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ নিম্নোক্ত আয়াতে আছে,

وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَحَيَّاهُ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ — এখানে জীবনের অর্থ অনুভূতি ও গতিশীলতা এবং মৃত্যুর অর্থ তা নিশ্চেষ্ট হয়ে যাওয়া। কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে এই অনুভূতি ও গতিশীলতাও নেই, কেবল বুদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা আছে; যেমন সাধারণ বৃক ও উদ্ভিদ এ ধরনের জীবনের অধিকারী। এই জীবনের বিপরীতে আসে সেই মৃত্যু, যার উল্লেখ وَتُؤْتِي الْأَرْضَ بِرَدِّ مَوْتٍ আয়াতে আছে। এই তিন প্রকার জীবন মানব, জন্তু-জানোয়ার ও উদ্ভিদের মধ্যে সীমিত। এগুলো ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর মধ্যে এই ধরনের জীবন নেই। তাই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নির্মিত প্রতিমা সম্পর্কে বলেছেন : أَمْوَاتٌ غَيْرُ حَيَاتٍ — কিন্তু এতদসত্ত্বেও জড়পদার্থের মধ্যেও অস্তিত্ব জন্যে অপরিহার্য বিশেষ এক প্রকার জীবন বিদ্যমান আছে। এই জীবনের প্রত্যাবর্তি কোরআন পাকে ব্যক্ত হয়েছে :

لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ — অর্থাৎ, এমন কোন বস্তু নেই, যা আল্লাহ তাআলার প্রণাস-কীর্জন করে না। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে আয়াতে মৃত্যুকে অস্ত্র উল্লেখ করার কারণও কৃটে উঠেছে। মূলতঃ মৃত্যুই অস্ত্র। অস্তিত্বলাভ করে—এমন প্রত্যেক বস্তুই পূর্বে মৃত্যুজগতে থাকে। পরে তাকে জীবন দান করা হয়। একথাও বলা যায় যে, পরবর্তী لَيُؤْتِيهِمْ أَجْرًا لِّئَلَّا يَحْزَنُوا আয়াতে মরণ ও জীবন সৃষ্টি করার কারণ মানুষের পরীক্ষা নির্ণয় করা হয়েছে। এই পরীক্ষা জীবনের ভূনায় মৃত্যুর মধ্যে অধিক। কেননা, যে ব্যক্তি নিজের মৃত্যুকে উপস্থিত জ্ঞান করবে, সে নিয়মিত সংকর্ষ সম্পাদনে অধিকতর সচেষ্ট হবে। জীবনের মধ্যেও এই পরীক্ষা আছে। কারণ, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মানুষ এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে যে, সে নিজে অক্ষম এক আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান। এ অভিজ্ঞতা মানুষকে সংকর্ষে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু মৃত্যুজগতে কর্ম সংশোধন ও সংকর্ষ সম্পাদনের সর্বাধিক কার্যকর।

হযরত আশ্শার ইবনে ইয়াসীর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : كُنْ بِالْمَوْتِ وَاعْظَا وَكُنْ بِالْحَيَاتِ غَنِي — অর্থাৎ, মৃত্যু উপদেশের জন্যে এবং বিশ্বাসই ধনাত্ম্যতার জন্যে যথেষ্ট।—(তিবয়ানী) উদ্দেশ্য এই যে, বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনদের মৃত্যু প্রত্যাক্করণ সবচাইতে বড় উপদেশদাতা। যারা এই দৃশ্য দেখে প্রভাবান্বিত হয় না, অন্য কোন কিছু দ্বারা তাদের হওয়া সুদূর পরাহত। আল্লাহ তাআলা যাকে ইমান ও বিশ্বাসরূপী ধন দান করেছেন, তার সমতুল্য কোন ধনাত্ম্য ও অনুধাপেকী নেই। রবী ইবনে আস (রাঃ) বলেন : মৃত্যু মানুষকে সংসারের সাথে সম্পর্কহীন করা ও পরকালের প্রতি আহ্বানিত করার জন্যে যথেষ্ট।

أَمْسَنْ عَمَلًا এখানে লক্ষ্যীয় বিষয় এই যে, মরণ ও জীবনের সাথে জড়িত মানুষের পরীক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন : আমি দেখতে চাই, তোমাদের মধ্যে কার কর্ম ভাল। একথা বলেননি যে, কার কর্ম বেশী। এ থেকে বোঝা যায় যে, কারও কর্মের পরিমাণ বেশী হওয়া আল্লাহ তাআলার কাছে আকর্ষণীয় ব্যাপার নয়; বরং কয়টি ভাল, নির্ভুল ও মকবুল হওয়াই বর্তব্য। এ কারণেই কেয়ামতের দিন মানুষের কর্ম পণ্য করা হবে না; বরং গুণন করা হবে। এতে কোন কোন একটি কর্মের গুণনই হাজারো কর্ম অপেক্ষা বেশী হবে।

ভাল কর্ম কি : হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াতে তোলাওয়াত করতঃ أَمْسَنْ عَمَلًا পর্যন্ত পৌঁছে বলতেন : সেই ব্যক্তি ভাল কর্মী, যে আল্লাহ তাআলার হায়াকৃত বিষয়াদি থেকে

فَاعْرِضْ لَهُمْ آيَاتِكُمْ فَسَيَعْلَمُ أَهْلَ الْغَيْبِ الصَّغِيرِ إِنَّ الَّذِينَ
يَخْتَفُونَ لَهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَعْرُوفٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَمَّا زُ
قُولُكُمْ وَأَنْتُمْ بِالْغَيْبِ أَنْتُمْ عَلَيْهِ يَذُوبُ السُّدُودُ وَالْأَعْيُنُ
مَنْ خَلَقَ ذَٰلِكُمْ وَاللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشَوْا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهَا وَإِلَيْهِ
الْمُشُورُ ؕ أَمْ أَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخِفَّ بِكُمْ
الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تَنُورُ ؕ أَمْ أَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ
يُنْزِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ؕ وَلَقَدْ
كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ؕ وَأَلَمْ يَرَوْا
إِلَى الظُّلُمِ فَوْقَهُمْ سُبُطٌ وَيَقَظْنَ مَا يَكْسِبُونَ إِلَّا الَّذِينَ
إِنَّهُ يَجْلُ سُبُطٌ يُبَصِّرُ ؕ أَمْ هَذَا الَّذِينَ هُوَ جَعَلَ لَكُمُ
يَمْعُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكُفْرَ الْإِنْفِي عَرُودٌ
أَمْ هَذَا الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنْهُمْ لَنْ يَكُونُوا فِي عَذَابٍ
أَهْدَى أَمِنْ يَتَّبِعُونَ سُبُطًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

(১১) অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। কাহিনীয়ায় দূর থেকে। (১২) নিশ্চয় তারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে কক্ষ ও মহাপুরকার। (১৩) তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কে সত্যক অবগত। (১৪) যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সত্যক জ্ঞাত। (১৫) তিনি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে সুখ করেছে, অতএব, তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এক তাঁর দেয়া রিষিক আহ্বার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে। (১৬) তোমরা কি অকস্মাত হরে সেই যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে ভূমিতে ক্লীন করে দেন, অতঃপর তা কাঁপতে থাকবে। (১৭) না তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে সেই যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষা করবেন, অতঃপর তোমরা জনতে পারবে কেমন ছিল আবার সতর্কবাণী। (১৮) তাদের পূর্ববর্তীরা বিশ্বাসঘোষণা করেছিল, অতঃপর কত কঠোর হয়েছিল আবার স্বীকৃতি। (১৯) তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার উপর উদ্ভূত পক্ষীকুলের প্রতি—পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ্—ই তাদেরকে হির রাখেন। তিনি সর্ব-বিষয় দেন। (২০) রহমান আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত তোমাদের কোন সৈন্য আছে কি, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাকেরা বিব্রাঙ্কিতই পতিত আছে। (২১) তিনি যদি রিষিক বন্ধ করে দেন, তবে কে আছে, যে তোমাদেরকে রিষিক দিবে বরং তারা অব্যাহতা ও নিশ্চয়তা ভুবে রয়েছে। (২২) যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভয় দিয়ে চলে, সে-ই কি সৎ পথে চলে, না সে ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরলপথে চলে?

সর্বাধিক বেঁচে থাকে এবং আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য করার জন্যে সদাসর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে।—(কুরত্বী)।

فَاعْرِضْ لَهُمْ آيَاتِكُمْ فَسَيَعْلَمُ — এই আয়াত থেকে বাহ্যতঃ জানা যায় যে, দুনিয়ার মানুষ আকাশকে চোখে দেখতে পারে এবং উপরে যে নীলাভ শূন্যমণ্ডল পরিদৃষ্ট হয়, তাই আকাশ হবে, এটা জরুরী নয়। বরং এটা সম্ভবপর যে, আকাশ আরও অনেক অনেক উপরে অবস্থিত হবে। উপরে যে নীলাভ রঙ দেখা যায়, এটা বায়ু ও শূন্যমণ্ডলের রঙ। দার্শনিকগণ তাই বলে থাকেন। কিন্তু এ থেকে এটা ও জরুরী হয় না যে, আকাশ মানুষের দৃষ্টিগোচরই হবে না। এটা সম্ভবপর যে, এই নীলাভ শূন্যমণ্ডল কাঁচের মত স্বচ্ছ হওয়ার কারণে বহু উপরে অবস্থিত আকাশ দেবার পাশে অন্তরায় নয়। যদি একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় আকাশকে চোখে দেখা যেতে পারে না, তবে এই আয়াতে দেবার অর্থ হবে চিন্তা-ভাবনা করা।—(বয়ানুল-কোরাআন)।

وَلَقَدْ رَئَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَكَانَ زُورًا كَالْظُلُمِ

وَلَقَدْ رَئَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ — বলে নক্ষত্রাঙ্কি বোঝানো হয়েছে। নিম্নতম আকাশকে নক্ষত্রাঙ্কির দ্বারা সুশোভিত করার জন্যে এটা জরুরী নয় যে, নক্ষত্রাঙ্কি আকাশের গায়ে অথবা তার উপরে সংযুক্ত থাকবে; বরং নক্ষত্রাঙ্কি আকাশের বহু নিম্নে মহাশূন্যে থাকা অবস্থায়ও এই আলোকসম্ভা হতে পারে। আধুনিক গবেষণায় এটাই প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে। নক্ষত্রাঙ্কিকে শয়তান বিভ্রাট করার জন্যে অস্বাভাবিক করে দেয়ার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, নক্ষত্রাঙ্কি থেকে কোন অগ্নেয় উপাদান শয়তানদের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং নক্ষত্রাঙ্কি স্বস্থানেই থেকে যায়। সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে এই অগ্নিস্কুলিঙ্গ নক্ষত্রের ন্যায় গতিশীল দেখা যায়। তাই একে তারকা খসে যাওয়া এবং আরবীতে الكوكب انتفاض الكوكب বলে দেয়া হয়।—(কুরত্বী)।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, ঐশী সংবাদাদি চুরি করার জন্যে শয়তানরা যখন উর্বরগণ্যে আরোহণ করে, তখন তাদেরকে নক্ষত্রাঙ্কি পর্যন্ত পৌঁছার আগেই বিভ্রাট করে দেয়া হয়।—(কুরত্বী) এ পর্যন্ত বিভিন্ন সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ শক্তির প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর وَالَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ থেকে সাত আয়াত পর্যন্ত কাকেরদের শাস্তি ও অনুগত মুমিনদের সওয়াব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর পুনরায় জ্ঞান ও শক্তির বর্ণনা রয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا — এর শাসনিক অর্থ বাধ্য ও অনুগত। যে জন্তু আরোহণের সময় উদ্ভূত প্রদর্শন করে না, তাকে ذُلُول বলা হয়। مِنْكَ শব্দটি مِنْكَ —এর বহুবচন। এর অর্থ কাঁধ। যে কোন জন্তুর কাঁধ আরোহণের স্থান নয়; বরং কোমড় অথবা ঘাড় আরোহণের জায়গা হয়ে থাকে। যে জন্তু আরোহীর জন্যে নিজের কাঁধও পেশ করে দেয়, সে খুবই বাধ্য, অনুগত ও বশীভূত হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে, আমি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্যে এমন বশীভূত করে দিয়েছি যে, তোমরা তার কাঁধে চরে অবাদে বিচরণ করতে পার। আল্লাহ্ তাআলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুখম করেছেন যে, এটা পানির ন্যায় তরলও নয় এবং রুটি ও কর্দের ন্যায় চাপ সহযোগে নীচেও নেমে যায় না। ভূপৃষ্ঠ এরূপ হলে

তার উপর মানুষের বসবাস সম্ভবপর হত না। এমনভাবে ভূপৃষ্ঠকে লৌহ ও প্রস্তরের ন্যায় শক্তও করা হয়নি। এরূপ হলে তাতে বৃক্ষ ও শস্য বপন করা যেত না, কৃপ ও খাল খনন করা যেত না এবং খনন করে সুউচ্চ অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করা যেত না। এর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা ভূপৃষ্ঠকে স্থিরতা দান করেছেন, যাতে এর উপর দালান-কোঠা স্থির থাকে এবং চলাচলকারীরা হেঁচট না খায়।

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ آلِ الْكَافُرِ — আল্লাহ তাআলা প্রথমে ভূপৃষ্ঠের আনাচে-কানাচে বিবরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, এরপর বলেছেন আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত রিযিক আহার কর। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ভ্রমণ এবং পণ্যব্রব্যের আমদানি-রফতানি আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত রিযিক হাসিল করার দরজা। وَاللَّهُ الشَّكُورُ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে পানাহার ও বসবাসের উপকারিতা লাভ করার অনুমতি আছে, কিন্তু মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে যেয়ো না, পরিণামে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। ভূপৃষ্ঠে থাকা অবস্থায় পরকালের প্রস্তুতিতে লেগে থাকে। পরবর্তী আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, পৃথিবীতে বসবাসরত অবস্থায়ও আল্লাহ তাআলার আযাব আসতে পারে। এরশাদ হয়েছে :

أَمْ أَمْتَمْتُمْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُعْصِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْغُبُورَ — তোমরা কি এ বিষয়ে ভাবনামুক্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন এবং ভূগর্ভ তোমাদেরকে গিলে ফেলবে? অর্থাৎ, যদিও আল্লাহ তাআলা ভূপৃষ্ঠকে এমন সুস্বয় করেছেন যে, খনন ব্যতীত কেউ এর অভ্যন্তরে যেতে পারে না, কিন্তু তিনি একে এক্সপোজ করে দিতে সক্ষম যে, এই ভূপৃষ্ঠই তার উপরে বসবাসকারীদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। পরের আয়াতে অন্য এক প্রকার আযাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

أَمْ أَمْتَمْتُمْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَلْمِزُونَهُ — অর্থাৎ, তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন? তখন তোমরা এই সতর্কবাণীর পরিণতি জানতে পারবে। কিন্তু তখন জানা নিশ্চল হবে। আজ সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় এ বিষয়ে চিন্তা কর। এরপর দুনিয়াতে আযাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ঘটনাবলীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمُكِنَّا —

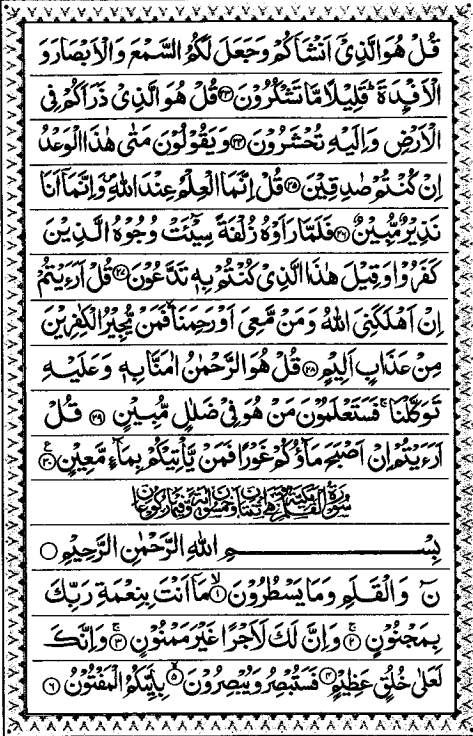
আয়াতের মর্মার্থ তাই। অতঃপর সূরার মূল বিষয়বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে সৃষ্টির হাল-অবস্থা থেকে আল্লাহ তাআলার তওহীদ, জ্ঞান

ও শক্তির পক্ষে প্রমাণ আনা হয়েছে। স্বয়ং মানবসত্তা, আকাশ, নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদির অবস্থা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর শূন্য পরিমণ্ডলে উদ্ভূত পক্ষীকুলের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে :

أَلَمْ يُرَوِّدْ إِلَى الْكَافِرِ — অর্থাৎ, তারা কি পক্ষীকুলকে মাখার উপর উড়তে দেখে না, যারা কখনও পাখা বিস্তার করে এবং কখনও সংকুচিত করে। এদের ব্যাপারে চিন্তা কর, এরা ভারী দেহবিশিষ্ট। সাধারণ নিয়মদৃষ্টি ভারীবস্তু উপরে ছাড়া হলে তা মাটিতে পড়ে যাওয়া উচিত। বায়ু সাধারণভাবে তা আটকাতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা পক্ষীকুলকে বায়ুমণ্ডলে স্থির থাকার মত করে সৃষ্টি করেছেন। বাতাসে ভর দেয়া এবং তাতে সম্ভরণ করে বিচরণ করার জন্যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পাখা বিস্তার ও সংকোচনের মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করা নৈপুণ্য শিক্ষা দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, বায়ুর মধ্যে এই যোগ্যতা সৃষ্টি করা যেরূপ পাখা তৈরী করা এবং পাখার মাধ্যমে বায়ু নিয়ন্ত্রণ করার নৈপুণ্য শিক্ষা দেয়া—এগুলো সব আল্লাহ তাআলার অপর শক্তিরই ফলশ্রুতি।

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَهُمْ لَا يَمُرُّونَ إِلَّا فِي عُرُوزٍ — এরপর সতর্ক করা হয়েছে যে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং ভূমি থেকে শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ তাআলার যে রিযিক পাচ্ছ, এটা তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয় ; বরং আল্লাহ তাআলার দান ও বশিষ। তিনি তা বন্ডও করে দিতে পারেন। أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرِيكَ فُكْرًا أَنْ أَمْسَكَ رِيْقَهُ — আয়াতের উদ্দেশ্য তাই। অতঃপর কাকেরদের জন্যে পরিতাপ করা হয়েছে, যারা নিজেরাও আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং বর্ণনাকারীর বর্ণনাও শুনে না। بَلْ لَّجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ — অর্থাৎ, তারা অবাধ্যতা ও সত্যবিমুখতায় বেড়েই চলেছে। অতঃপর কেয়ামতের মাঠে কাকের ও মুমিনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের মাঠে কাকেররা উপুড় হয়ে মস্তকের উপর ভর দিয়ে চলবে। বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে যে, সাহাবায়ে কেয়ামত জিজ্ঞাসা করলেন, কাকেররা মুখে ভর দিয়ে কিরূপে চলবে? রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পায়ের ভর দিয়ে চালান করেছেন, তিনি কি মুখমণ্ডল ও মস্তকের উপর ভর দিয়ে চালাতে সক্ষম নন? নিম্নোক্ত আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

أَمَّنْ يَمُتُّ عَلَىٰ مَكْبَلٍ ذَهَبٍ أَمْ يَكُنِ السَّيْفُ عَلَىٰ سَوْءٍ — অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুখমণ্ডলে ভর দিয়ে চলে, সে বেশী হেদায়েতপ্রাপ্ত, না যে সোজা চলে? শেবোক্ত ব্যক্তিই মুমিন। সে-ই হেদায়েত পেতে পারে।



(২৩) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর। তোমরা অস্পষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (২৪) বলুন, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন এবং তাঁরই কাছে তোমরা সমবেত হবে? (২৫) কাকেররা বলে : এই প্রতিশ্রুতি কবে হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (২৬) বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহ তাআলার কাছেই আছে। আমি তো কেবল প্রকাশ্য সতর্ককারী। (২৭) যখন তারা সেই প্রতিশ্রুতিকে আসন্ন দেখবে তখন কাকেরদের মুখমণ্ডল মলিন হয়ে পড়বে এবং বলা হবে : এটাই তো তোমরা চাইতে। (২৮) বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ—যদি আল্লাহ তাআলা আমাদের ও আমার সংগীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, তবে কাকেরদেরকে কে যত্নশাদায়ক শান্তি থেকে রক্ষা করবে? (২৯) বলুন, তিনি পরম করুণাময়, আমরা তাতে বিশ্বাস রাখি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। সম্বরই তোমরা জানতে পারবে, কে প্রকাশ্য পঞ্চ-ঐতায় আছে। (৩০) বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতথারা।

সূরা আল-কলম

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে

- (১) নূন—শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে, (২) আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উদ্ধাদ নন। (৩) আপনার জন্যে অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরুস্কার। (৪) আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (৫) সম্বরই আপনি দেখে নিবেন এবং তারাও দেখে নিবে। (৬) কে তোমাদের মধ্যে নিকারগ্রস্ত।

অতঃপর আবার মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলার শক্তি ও জ্ঞানের কতিপয় বিকাশ বর্ণনা করা হয়েছেঃ

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ الْاُفُؤدَةَ قَلِيلًا لَمَّا تَشْكُرُونَ — অর্থাৎ, আপনি বলুন, আল্লাহ তাআলাই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর বানিয়েছেন, কিন্তু তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না।

কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরের বৈশিষ্ট্য : আয়াতে মানুষের অঙ্গসমূহের মধ্যে তিন অঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর উপর জ্ঞান, অনুভূতি ও চেতনা নির্ভরশীল। দার্শনিকগণ জ্ঞান ও অনুভূতির পাঁচটি উপায় বর্ণনা করেছেন। এগুলোকে পঞ্চইন্দ্রিয় বলা হয়। এগুলো হচ্ছে শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, আবাদন ও স্পর্শ। ঘ্রাণের জন্যে নাক আবাদনের জন্যে ঘ্রিহা তৈরী করা হয়েছে এবং স্পর্শশক্তি সমস্ত দেহে নিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা শ্রবণ করার জন্যে কর্ণ এবং ঘ্রাণের জন্যে চক্ষু সৃষ্টি করেছেন। এখানে আল্লাহ তাআলা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ার মধ্যে থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করেছেন—কর্ণ ও চক্ষু। কারণ এই যে, ঘ্রাণ, আবাদন ও স্পর্শের মাধ্যমে খুব কম বিষয়ের জ্ঞান মানুষ অর্জন করতে পারে। মানুষের জন্যে বিষয়সমূহের বিরাট অংশ শ্রবণ ও দর্শনের মধ্যে সীমিত। এতদুভয়ের মধ্যেও শ্রবণকে অগ্রাে জ্ঞান হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, মানুষ সারাজীবনে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করে, তন্মধ্যে শোনা বিষয়সমূহের সংখ্যা দেখা বিষয়সমূহের তুলনায় বহুগুণ বেশী। অতএব, মানুষের অধিকাংশ জ্ঞান বিষয় এই দুই পথে অর্জিত হয় বিধায় এখানে পঞ্চইন্দ্রিয়ার মধ্যে থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় বস্তু অন্তর হচ্ছে আসল ভিত্তি ও জ্ঞানের কেন্দ্র। কানে শোনা ও চোখে দেখা বিষয়সমূহের জ্ঞানও অন্তরের উপর নির্ভরশীল। অন্তর যে জ্ঞানের কেন্দ্রে এর পক্ষে কোরআন পাকের অনেক আয়াত সাক্ষ্য দেয়। এর বিপরীতে দার্শনিকগণ মস্তিষ্ককে জ্ঞানের কেন্দ্র মনে করেন।

এরপর আবার কাকেরদের প্রতি হুশিয়ারী ও শাস্তিবাদী বর্ণিত হয়েছে। সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে : তোমরা যারা পৃথিবীতে বসবাস কর, ভূপৃষ্ঠকে খনন করে কূপ তৈরী কর এবং সেই পানি দ্বারা নিজেদের পান ও শস্য উৎপাদনের কাজ কর, তোমরা ভুলে যেয়ো না যে, এগুলো তোমাদের ব্যক্তিগত জায়গীর নয়, আল্লাহ তাআলার দান। তিনিই পানি বর্ষণ করেছেন এবং সেই পানিকে বরফের সাগরে পরিশ্রিত করে পান গ্রহণ করার জন্যে পর্বতশৃঙ্গে রেখে দিয়েছেন। অতঃপর এই বরফকে আস্তে আস্তে গলিয়ে পর্বতের শিরা উপশিয়ার পথে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে নামিয়ে দিয়েছেন। এরপর কোন পাইপলাইনের সাহায্য ব্যতিরেকে সেই পানিকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তোমরা যেখা ইচ্ছা মাটি খনন করে পানি বের করতে পার। তিনি এই পানি সৃষ্টিকার উপরের স্তরেই রেখে দিয়েছেন যা কয়েক ফুট মাটি খনন করেই বের করা যায়। এটা স্পষ্টর দান। তিনি ইচ্ছা করলে একে নিম্নের স্তরে তোমাদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে পারেন।

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ

অর্থাৎ, তারা ভেবে দেখুক, তারা যে পানি কূপের মাধ্যমে অনায়াসে বের করে পান করছে, তা যদি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কোন শক্তি পানির এই স্রোতথারাকে কিরিয়ে আনতে পারবে? হাদীসে আছে,

এই আয়াত তেলাওয়াত করার পর বলা উচিত অর্থাৎ, বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহ তাআলাই পুনরায় এই পানি আনতে পারেন—আমাদের শক্তি নেই।

সূরা আল কলম

সূরা মূলক সৃষ্টজগতের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব, তওহীদ, জ্ঞান ও শক্তির প্রমাণাদি বিবৃত হয়েছে। সূরা কলমে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি কাফেরদের দোষারোপের জওয়াব দেয়া হয়েছে। তাদের সর্বপ্রথম দোষারোপ ছিল এই যে, তারা আল্লাহ প্রেরিত পূর্ণ বুদ্ধিমান, পূর্ণজ্ঞানী ও সর্বগুণে গুণান্বিত রসূলকে (নাউম্বিল্লাহ) উন্মাদ ও পাগল বলত। এর কারণ হয় এই ছিল যে, ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ ওহীর সময় তার প্রতিক্রিয়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর পবিত্র অঙ্গে ফুটে উঠত। এরপর তিনি ওহী থেকে প্রাপ্ত আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাতেন। এই গোটা ব্যাপারটি কাফেরদের জ্ঞান ও অনুভূতির উর্ধ্বে ছিল। তাই তারা একে পাগলামী আখ্যা দিত। না হয় এর কারণ ছিল এই যে, তিনি স্বজাতি ও সারা বিশ্বে বিদ্যমান ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপরীতে এই দাবী করেন যে, আরাদনার যোগ্য আল্লাহ ব্যতীত কেউ নেই। তারা যেসব স্বহস্ত নির্মিত প্রতিমাকে খোদা মনে করত, সেগুলো যে জ্ঞান ও চেতনা থেকে মুক্ত এবং কারও উপকার বা ক্ষতি করতে অক্ষম, একথা তিনি প্রকাশ্যে বর্ণনা করেন। এই নতুন ধর্মবিশ্বাসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কোন সাথী ছিল না। তিনি একাই এই দাবী নিয়ে আত্মরক্ষার বাহ্যিক সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই সারা বিশ্বের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যান। বাহ্যদন্দীদের দৃষ্টিতে এই উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাই এরূপ দাবী নিয়ে দণ্ডায়মান হওয়াকে পাগলামী মনে করা হয়েছে। এছাড়া দোষারোপের উদ্দেশ্যেও তো দোষারোপ হতে পারে। এমতাবস্থায় কোন কারণ ছাড়াই কাফেররা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে পাগল বলত। সূরার প্রথম আয়াতসমূহে তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা শপথ সহকারে খণ্ডন করা হয়েছে।

وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمُنْجُوں নূন অক্ষরটি একটি ঋণবর্ণ। কোরআন পাকের অনেক সূরার প্রারম্ভে এ ধরনের ঋণবর্ণ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ ও রসূল ব্যতীত এগুলোর অর্থ কারও জ্ঞান নেই। এ সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করতে উন্মতকে নিষেধ করা হয়েছে।

কলমের অর্থ এবং কলমের ক্ষমালত : এখানে কলমের অর্থ সাধারণ কলমও হতে পারে। এতে ভাগ্যলিপির কলম এবং ফেরেশতা ও মানবের লেখার কলম অন্তর্ভুক্ত। এখানে বিশেষতঃ ভাগ্যলিপির কলমও বোঝানো যেতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর উক্তি তাই। এই বিশেষ কলম সম্পর্কে হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার আদেশ করেন। কলম আরম্ভ করল : কি লিখবে? তখন খোদায়ী তকদীর লিপিবদ্ধ করতে আদেশ করা হল। কলম আশে অনুযায়ী অনন্তকাল পর্যন্ত সম্ভাব্য সকল ঘটনা ও অবস্থা লিখে দিল। সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টির তকদীর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখে দিয়েছিলেন।

হযরত কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : কলম আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড়

নেয়ামত। কেউ কেউ বলেছেন : আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম তকদীরের কলম সৃষ্টি করেছেন। এই কলম সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও সৃষ্টির তকদীর লিপিবদ্ধ করেছে। এরপর দ্বিতীয় কলম সৃষ্টি করেছেন। এই কলম দ্বারা পৃথিবীর অধিবাসীরা লিখে এবং লিখবে। সূরা ইকরার عَمْرٍاء আয়াতেও এই কলমের উল্লেখ আছে।

সারকথা, আয়াতে কলম এবং কলম দ্বারা যা কিছু লেখা হয়, তার শপথ করে আল্লাহ তাআলা কাফেরদের দোষারোপ খণ্ডন করে বলেছেন : مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمُنْجُوں অর্থাৎ, আপনি আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহ ও কৃপায় কখনও পাগল নন। এখানে بِنِعْمَةِ رَبِّكَ যোগ করে দাবীর স্বপক্ষে দলীলও দেয়া হয়েছে যে, যার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, সে কিরূপে পাগল হতে পারে? তাকে যে পাগল বলে, সে নিজেই পাগল।

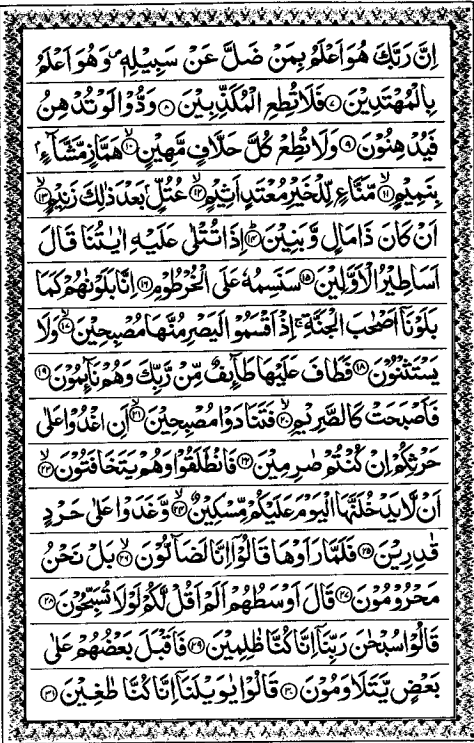
আলেমগণ বলেন : কোরআন পাকে আল্লাহ তাআলা যে বস্তুর শপথ করেন, তা শপথের বিষয়বস্তুর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ হয়ে থাকে। এখানে وَمَا يَسْطُرُونَ বলে বিশু-ইতিহাসের যা কিছু লিখা হয়েছে এবং লিখা হচ্ছে, তাকে সাক্ষ্য-প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিশু-ইতিহাসের পাতা খুলে দেখ, এমন মহান চরিত্র ও কর্মের অধিকারী ব্যক্তি পাগল হতে পারে কি? এরূপ ব্যক্তি তো অপরের জ্ঞান-বুদ্ধির সম্প্রসারক হয়ে থাকে। অতঃপর উপরোক্ত বিষয়বস্তুর সমর্থনে বলা হয়েছে :

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَسْهُونٍ অর্থাৎ, আপনার জন্যে অশেষ পুরস্কার রয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার যে কাজকে তারা পাগলামী বলছে, সেটা আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় কাজ। এর জন্যে আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে। পুরস্কারও এমন, যা কখনও নিঃশেষ হবে না—চিরন্তন। জিজ্ঞাসা করি, কোন পাগলকে তার কর্মের জন্যে পুরস্কৃত করা হয় কি? অতঃপর আরেকটি বাক্য দ্বারা এই বিষয়বস্তুর আরও সমর্থন করা হয়েছে :

وَإِنَّكَ لَكُلِّ خَلْقٍ عَظِيمٍ এতে রসূলে করীম (সাঃ)—এর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে : জ্ঞানপাগীরা, তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ, দুনিয়াতে যারা পাগল ও উন্মাদ, তাদের চরিত্র ও কর্ম কি এরূপ হয়ে থাকে?

রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর মহৎ চরিত্র : হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : মহৎ চরিত্রের অর্থ মহৎ ধর্ম। কেননা, আল্লাহ তাআলার কাছে ইসলাম ধর্ম অপেক্ষা অধিক প্রিয় কোন ধর্ম নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন : স্বয়ং কোরআন রসূলে করীম (সাঃ)—এর মহৎ চরিত্র। অর্থাৎ, কোরআন পাক যেসব উত্তম কর্ম ও চরিত্র শিক্ষা দেয়, তিনি সেসবের বাস্তব নমুনা। হযরত আলী (রাঃ) বলেন : মহৎ চরিত্র বলে কোরআনের শিষ্টাচার বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, যেসব শিষ্টাচার কোরআন শিক্ষা দিয়েছে। সব উত্তির সারমর্ম প্রায় এক। রসূলে করীম (সাঃ)—এর সমস্তই আল্লাহ তাআলা যাবতীয় উত্তম চরিত্র পূর্ণমাত্রায় সন্নিবেশিত করে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেন : بِمَثَلِ مَا كَرَّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ অর্থাৎ, আমি উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্যেই প্রেরিত হয়েছি। — (আবু হাইয়ান)

فَتَبِعُوا وَبِئْسَ رُؤُوسٌ يَكْفُرُونَ শীঘ্রই আপনিও দেখে নিবেন



(৭) আপনার পালনকর্তা সম্যক জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি জানেন যারা সপঞ্চাশ। (৮) অতএব, আপনি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করবেন না। (৯) তারা চায় যদি আপনি নমনীয় হন, তবে তারাও নমনীয় হবে। (১০) যে অধিক শপথ করে, যে লাঞ্চিত, আপনি তার আনুগত্য করবেন না, (১১) যে পাহাচর নিন্দা করে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে, (১২) যে ভাল কাজে বাধা দেয়, সে সীমালঙ্ঘন করে, সে পাণ্ডিত্য, (১৩) কঠোর স্বভাব, তদুপরি কুখ্যাত ; (১৪) এ কারণে যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। (১৫) তার কাছে আমার আয়াত পাঠ করা হলে সে বলে : সেবালের উপকথা। (১৬) আমি তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। (১৭) আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেমন পরীক্ষা করেছি উদ্যানওয়ালাদের, যখন তারা শপথ করেছিল যে, সকলে বাগানের ফল আহরণ করবে, (১৮) 'ইনশাআল্লাহ' না বলে (১৯) অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে বাগানে এক বিপদ এসে পতিত হলো। যখন তারা নিদ্রিত ছিল। (২০) ফলে সকাল পর্যন্ত হয়ে গেল ছিন্নিচ্ছিন্ন তৃণসম। (২১) সকালে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, (২২) তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও, তবে সকাল সকাল ক্ষেতে চল। (২৩) অতঃপর তারা চলল ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে, (২৪) অন্ধ্যা যেন কোন মিসকীন ব্যক্তি তোমাদের কাছে বাগানে প্রবেশ করতে না পারে। (২৫) তারা সকলে লাক্ষিয়ে লাক্ষিয়ে সজোরে রওযানা হল। (২৬) অতঃপর যখন তারা বাগান দেখল, তখন বলল : আমরা তো পথ ভুলে গেছি। (২৭) বরং আমরা তো কপালপোড়া, (২৮) তাদের উত্তম ব্যক্তি বলল : আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহ্ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করছো না কেন? (২৯) তারা বলল : আমরা আমাদের পালনকর্তার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চিতই আমরা সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম। (৩০) অতঃপর তারা একে অপরকে ভৎসনা করতে লাগল। (৩১) তারা বলল : হায়! দুর্ভাগ্য আমাদের আমরা ছিলাম সীমাতিক্রমকারী।

এবং কাফেররাও দেখে নিবে যে, কে বিকারগ্রস্ত। مفتون শব্দের অর্থ এখানে বিকারগ্রস্ত পাগল। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি পাগল বলে দোষারোপকারীদের উক্তি প্রমাণাদি দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছিল। এই আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, অদূর ভবিষ্যতেই এ তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) পাগল ছিলেন, না যারা তাঁকে পাগল বলত, তারাই পাগল ছিল। সেমতে অশ্মদিনের মধ্যেই বিষয়টি বাস্তব সত্য হয়ে বিশ্ববাসীর চোখের সামনে এসে যায় এবং পাগল আখ্যাদানকারীদের মধ্য থেকেই হাজার হাজার লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়ে রসূলে করীম (সাঃ)-এর অনুসরণ ও মহব্বতকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতে থাকে। অপরদিকে তওফীক থেকে বঞ্চিত অনেক হতভাগা দুনিয়াতেও লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়ে যায়।

আনুশঙ্গিক স্মার্তব্য বিষয়

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَذُوا الْوَيْثَانِ فَيَذَرُوكَ ۝ অর্থাৎ, আপনি মিথ্যারোপকারীদের কথা মানবেন না। তারা তো চায় যে, আপনি প্রচারকার্যে কিছুটা নমনীয় হলে এবং শিরক ও প্রতিমা পূজায় তাদেরকে বাধা না দিলে তারাও নমনীয় হয়ে যাবে এবং আপনার প্রতি বিদ্রপ, দোষারোপ ও নির্ধাতন ত্যাগ করবে। — (কুরত্বী)

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ يَنْفِي مَتَاعَهُ لَخَيَرَتِ رَبِّهِ ۝ — আপনি আনুগত্য করবেন না এমন ব্যক্তির, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্চিত, যে দোষারোপ করে, যে পশ্চাতে নিন্দা করে, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়, যে সংকাজে বাধাদান করে, যে সীমালঙ্ঘন করে, যে অত্যধিক পাপাচার করে, যে কঠোর স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত। زعيم শব্দের অর্থ পিতৃ পরিচয়হীন জারজ। আয়াতে যে ব্যক্তির এসব বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে, সে জারজই ছিল।

পূর্ববর্তী আয়াতে সাধারণ কাফেরদের আনুগত্য না করার এবং ধর্মের ব্যাপারে কোনরূপ নমনীয়তা অবলম্বন না করার ব্যাপক আদেশ ছিল। এই আয়াতে বিশেষ করে দুইমতি কাফের ওলীদ ইবনে-মুগীরার কুস্বভাব বর্ণনা করে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ও তার আনুগত্য না করার বিশেষ আদেশ দেয়া হয়েছে। এরপরও কয়েক আয়াতে এই ব্যক্তির মন্দ চরিত্র ও অব্যাহতা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে: سَتَسِمُ عَلَى الْخَوَاطِرِ

অর্থাৎ, আমি কেয়ামতের দিন তার নাসিকা দাগিয়ে দিব। ফলে পূর্ববর্তী সব লোকের সামনে তার লাঞ্ছনা ফুটে উঠবে। خرطوم শব্দটি বিশেষভাবে হাতী অথবা শূকরের ঠোঁড়ের অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখানে ওলীদের নাসিকাকে ঘৃণা প্রকাশার্থে خرطوم শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে।

إِنَّا لَنُفَعِّمُهُمْ كَمَا يَكُونُ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۝ অর্থাৎ, আমি মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছি, যেমন উদ্যানের মালিকদের পরীক্ষায় ফেলেছিলাম। পূর্বের আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি মক্কাবাসী কাফেরদের দোষারোপের জওযাব ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা বিগত যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করেছেন। মক্কাবাসীদেরকে পরীক্ষায় ফেলার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, বর্ণিতব্য কাহিনীতে উদ্যানের মালিকদেরকে যেমন আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় নেয়ামতরাজি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন, তারা কৃতঘ্নতা করেছিল। ফলে

তাদের উপর আযাব পতিত হয়েছিল এবং নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল, তেমনি আল্লাহ তাআলা মক্কাবাসীদেরকেও নেয়ামতরাজি দান করেছেন। তাদের সর্ববৃহৎ নেয়ামত তো এই যে, রসূলল্লাহ (সাঃ)-কে তাদের মধ্যেই পয়দা করেছেন। এছাড়া তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দান করেছেন এবং তাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছেন। এসব নেয়ামত মক্কাবাসীদের জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ দেখতে চান যে, তারা এসব নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে কি না এবং আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কি না। যদি তারা কুফর ও অবাধ্যতায় অটল থাকে, তবে উদ্যানের মালিকদের কাহিনী থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

উদ্যানের মালিকদের কাহিনী : হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখের ভাষা অনুযায়ী এই উদ্যান এয়ামনে অবস্থিত ছিল। হযরত য়ায়েদ ইবনে জুযায়ের-এর এক রেওয়াজেতে আছে যে, এয়ামনের রাজধানী ও প্রসিদ্ধ শহর “সান আ” থেকে ছয় মাইল দূরে এই উদ্যান অবস্থিত ছিল। কারও কারও মতে এটা আবিসিনিয়ায় ছিল। — (ইবনে-কাসীর) উদ্যানের মালিকরা ছিল আহলে — কিতাব। ঈসা (আঃ)-এর আকাশে উথিত হওয়ার কিছুকাল পরে এই ঘটনা ঘটে। — (কুরতুবী)

একজন সংকর্মপরায়ন ব্যক্তি এই উদ্যানটি তৈরী করেছিলেন। তিনি ফসল কাটার সময় কিছু ফসল ফকীর-মিসকীনদের জন্যে রেখে দিতেন। তারা সেখান থেকে খাদ্য-শস্য আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। এমনভাবে ফসল মাড়ানোর সময় যেসব দানা ভূমির মধ্যে থেকে যেত, সেগুলোও ফকীর-মিসকীনদের জন্যে রেখে দিতেন। এই নিয়ম অনুযায়ী উদ্যানের বৃক্ষ থেকে ফল আহরণ করার সময় যেসব ফল নীচে পড়ে যেত, সেগুলোও ফকীর-মিসকীনদের জন্যে রেখে দিতেন এ কারণেই ফসল কাটা ও ফল আহরণের সময় বিপুল সংখ্যক ফকীর-মিসকীন সেখানে সমবেত হত। এই সাধু ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র উদ্যান ও ক্ষেতের উত্তরাধিকারী হল। তারা পরস্পরে বলাবলি করল : আমাদের পারিবারিক-পরিজন বেড়ে গেছে। সেই তুলনায় ফসলের উৎপাদন কম। তাই এখন ফকীর-মিসকীনদের জন্য এত শস্য ও ফল রেখে দেয়ার সাধ্য আমাদের নেই। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, পুত্রত্রয় উচ্ছ্বল যুবকদের ন্যায় বলল : আমাদের পিতা বেওকুফ ছিল তাই বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য ও ফল মিসকীনদের জন্যে রেখে দিত। অতএব, আমাদের কর্তব্য এই প্রথা বন্ধ করে দেয়া। অতঃপর তাদের কাহিনী স্বয়ং কোরআনের ভাষায় নিম্নরূপ :

إِذْ أَقْسَمُوا لِبَصَرِ الْمُصْطَفَيْنِ لَا يَشْكُرُونَ

অর্থাৎ, তারা পরস্পরে শপথ করে বলল : এবার আমরা সকাল-সকালেই যেয়ে ক্ষেতের ফসল কেটে আনব, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের না পায় এবং পিছনে পিছনে না চলে। এই পরিকল্পনার প্রতি তাদের এতটুকু দৃঢ় আস্থা ছিল যে, ইনশাআল্লাহ বলারও প্রয়োজন মনে করল না। আগামীকালের কোন কাজ করার কথা বলার সময় “ইনশাআল্লাহ আগামীকাল একাজ করব” বলা সুলভ। তারা এই সুলভের পরওয়া করল না। কোন কোন তফসীরবিদ لَا يَشْكُرُونَ এর এরূপ অর্থ করেছেন যে, আমরা সম্পূর্ণ খাদ্যশস্য ও ফল নিয়ে আসব এবং ফকীর-মিসকীনদের অংশ বাদ দিব না। — (মায়হারী)

فَكَفَّ عَنْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ

অতঃপর আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে এই ক্ষেতে ও উদ্যানে একটি বিপদ হানা দিল। কোন কোন

রেওয়াজেতে আছে যে, একটি অগ্নি এসে সমস্ত তৈরী ফসলকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। وَفُتِنُوا ۚ অর্থাৎ, এই আযাব রাত্রিবেলায় তখন অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন তারা সবাই নিদ্রাগ্ন। فَاصْبَحَ لَا يَذْكُرُ ۚ অর্থাৎ, এর অর্থ কতিত। উদ্দেশ্য এই যে, ফসল কেটে নেয়ার পর ক্ষেত যেমন সাফ ময়দান হয়ে যায়, অগ্নি এসে ক্ষেতকে সেইরূপ করে দিল। وَفُتِنُوا ৷ অর্থাৎ, এর অর্থ কালো রাত্রিও হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, ফসলও কালো রাত্রির ন্যায় কালো ভস্ম হয়ে গেল। — (মায়হারী)

فَتَذَكَّرْنَا آلَهُنَّ ۚ অর্থাৎ, যারা অতি প্রত্যুষেই একে অপরকে ডেকে বলতে লাগল : যদি ফসল কাটেতে চাও, তবে সকাল-সকালই ক্ষেতে চল। وَفُتِنُوا ৷ অর্থাৎ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় তারা চুপিসারে কথাবার্তা বলতেছিল, যাতে ফকীর-মিসকীনরা টের পেয়ে সাথে না চলে।

وَعَذَّابُنَا لَهُمْ عَذَابٌ ۖ وَدَعَا عَلَىٰ حَرْوٰهُ قُرَيْشٌ ۚ وَدَعَا عَلَىٰ صَبَإٍ ۚ অর্থাৎ শব্দের অর্থ নিষেধ করা ও রাগা, গোষা দেখানো। উদ্দেশ্য এই যে, তারা ফকীর-মিসকীনকে কিছু না দিতে সক্ষম, এরূপ ধারণা নিয়ে রওয়ানা হল। যদি কোন ফকীর এসেও যায়, তবে তাকে হটিয়ে দিবে।

فَتَذَكَّرْنَا آلَهُنَّ ۚ যখন গম্ভব্যস্থলে পৌঁছে ক্ষেত-বাগান কিছুই দেখতে পেল না, তখন প্রথমে বলল : আমরা পথ ভুলে অন্যত্র এসে গেছি। কিন্তু পরে নিকটবর্তী স্থান ও আলামত দেখে বুঝতে পারল যে, গম্ভব্যস্থলেই এসেছি; কিন্তু ক্ষেত পুড়ে নিকিহ হয়ে গেছে। তখন তারা বলল : بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ — আমরা এই ফসল থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছি।

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَتِلْكُمْ وَلَا تَنسَوْنَ ۚ তাদের মধ্যে যে মাঝারী ব্যক্তি ছিল, অর্থাৎ, পিতার ন্যায় সংকর্মপরায়ন এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে আনন্দ লাভকারী ছিল, সে বলল : আমি কি পূর্বেই তোমাদেরকে বলিনি যে, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর না কেন? অর্থাৎ, তোমরা মনে কর যে, ফকীর-মিসকীনকে ধন-সম্পদ দিয়ে দিলে আল্লাহ তাআলা এর পরিবর্তে ধন-সম্পদ দিবেন না, অথচ আল্লাহ তাআলা এ বিষয় থেকে পবিত্র। যারা তাঁর পথে ব্যয় করে, তিনি নিজের কাছ থেকে তাদেরকে আরও বেশী দিয়ে দেন। — (মায়হারী)

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ তখন এই ব্যক্তির কথা কেউ না শুনলেও এখন সবাই স্বীকার করল যে, আল্লাহ তাআলা সকল ত্রুটি ও অভাব থেকে পবিত্র এবং তারা নিজেরাই জালেম। কারণ, তারা ফকীর-মিসকীনের অংশও হজম করতে চেয়েছিল।

এই মধ্যপন্থী ব্যক্তি সত্য কথা বলেছিল এবং সে অন্যদের চেয়ে ভাল ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দুইদেহ সঙ্গী হয়ে তাদেরই মতানুসারে কাজ করতে সক্ষম হয়ে গিয়েছিল। তাই তার দশাও তাদের মতই হয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি অন্যদেরকে পাপকাজে নিষেধ করে, অতঃপর তাদেরকে বিরত না হতে দেখে নিজেও তাদের সাথে শরীক হয়ে যায়, সে-ও তাদের অনুরূপ। তার উচিত নিজেকে পাপ কাজ থেকে বাচিয়ে রাখা।

فَأَجْبَلْهُمْ عَلَىٰ بُعْثٍ يَّتَذَكَّرُونَ

অর্থাৎ, তারা নিজেদের

ازلاق يزلقون - وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ

থেকে উদ্ধৃত। এর অর্থ হুট চোখ, ভূপাতিত করা। — (রাগিব)

উদ্দেশ্য এই যে, কাফেররা আপনাকে জুহু ও তির্যক দৃষ্টিতে দেখে এবং আপনাকে স্বস্থান থেকে সরিয়ে দিতে চায়। আল্লাহর কলাম শ্রবণ করার সময় তাদের এই অবস্থা হয়। তারা বলে : এতো পাগল ওমাফু। অর্থ এই কলাম বিশ্বাসীদের জন্যে উপদেশ এবং তাদের সংশোধন ও সাফল্য প্রতিশ্রুত। এরূপ কালামের অধিকারী ব্যক্তি কখনও পাগল হতে পারে কি? সূরার শুরুতে কাফেরদের যে দোষারোপের জওয়াব দেয়া হয়েছিল, উপসংহারে অন্য ভঙ্গিতে তারই জওয়াব দেয়া হয়েছে।

ইমাম বগভী প্রমুখ তফসীরবিদ এসব আয়াতের সাথে সম্পর্কিত একটি বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মক্কায় জনৈক ব্যক্তি নযর লাগানোর কাজে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। সে উট ইত্যাদি জন্তু-জানোয়ারকে নযর লাগালে তৎক্ষণাৎ সেটি মরে যেত। মক্কার কাফেররা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যা করার জন্যে সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করত। তারা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে নযর লাগানোর উদ্দেশ্যে সে ব্যক্তিকে ডেকে আনল। সে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নযর লাগানোর চেষ্টা করল; কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বীয় পয়গম্বরের হেফাজত করলেন। ফলে তাঁর কোন ক্ষতি হল না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং

إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ

নযর লাগা একটি বাস্তব সত্য। ছহীহ হাদীসসমূহে এর সত্যতা সমর্থিত হয়েছে। আরবেও এটা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : নযর লাগা ব্যক্তির গায়ে থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফুঁ দিলে নযর লাগার অন্তত প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়। — (মাযহারী)

সূরা আল-হাক্কাহ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫২

পরম করুণাময় ও অসীম দয়বান আল্লাহর নামে শুরু

(১) সুনিশ্চিত বিষয়। (২) সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৩) আপনি কি কিছু জানেন, সেই সুনিশ্চিত বিষয় কি? (৪) 'আদ ও সামুদ গোত্র মহাশয়লয়কে মিথ্যা বলেছিল। (৫) অতঃপর সামুদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলয়ংকর বিপর্যয় দ্বারা (৬) এবং আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝড়বায়ু, (৭) যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের উপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। আপনি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা অসার ঝড়ুর কাণ্ডের ন্যায় ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। (৮) আপনি তাদের কোন অভিজ্ঞ দেখতেন পান কি? (৯) ফেরাউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে যাওয়া বস্তিবাসীরা গুরুতর পাপ করেছিল। (১০) তারা তাদের পালনকর্তার রসূলকে অমান্য করেছিল। ফলে তিনি তাদেরকে কঠোরহস্তে পাকড়াও করলেন। (১১) যখন জলোচ্ছাস হয়েছিল, তখন আমি তোমাদেরকে চলন্ত নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম, (১২) যাতে এ ঘটনা তোমাদের জন্যে স্মৃতির বিষয় এবং কান এটাকে উপদেশ গ্রহণের উপযোগী রূপে গ্রহণ করে।

সূরা আল-হাক্কাহ

এই সূরায় কেয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী ও পাপাচারীদের শাস্তি এবং মুমিন খোদাতীরদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। কোরআন পাকে কেয়ামতকে হাক্কা কারেয়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে।

حاقة শব্দের এক অর্থ সত্য এবং দ্বিতীয় অর্থ অপরাপার বিষয়কে সত্য প্রতিপন্নকারী। কেয়ামতের জন্যে এই শব্দটি উভয় অর্থে খাটে। কেননা, কেয়ামত নিজেও সত্য, এর বাস্তবতা প্রমাণিত ও নিশ্চিত এবং কেয়ামত মুমিনদের জন্যে জান্নাত এবং কাফেরদের জন্যে জাহান্নাম প্রতিপন্ন করে। এখানে কেয়ামতের এই নাম উল্লেখ করে বার বার প্রশ্ন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কেয়ামত সকল প্রকার অনুমানের উর্ধ্বে এবং বিস্ময়কররূপে ভয়াবহ।

قارعة শব্দের অর্থ খট খট শব্দকারী। কেয়ামত যেহেতু সব মানুষকে অস্থির ও ব্যাকুল করে দিবে এবং সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে ছিন্নবিছিন্ন করে দিবে তাই একে قارعة বলা হয়েছে।

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۖ وَخُسِفَتِ الْأَرْضُ وَ
الْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۖ يَوْمَ يُدْعَى الْأَوَاغَةُ ۖ
وَأُشْقِيَتِ السَّمَاءُ فَفِي يَوْمِئِذٍ وَاهِيَةٌ ۖ وَالْمَلِكُ عَلَى أَجْنَابٍ
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمِئِذٍ ثَنِيَّةٌ ۖ يَوْمَ يُدْعَى
تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۖ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ
كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَيَقُولُ هَذَا مَا أَرْسَلْتُ وَأُخْبِيَةٌ ۖ إِنَّ
ظَنَنْتُ أَنِّي مَلَكٌ ۖ حَسْبَ يَوْمِئِذٍ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ
فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۖ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۖ كُنَّا إِذَا شَاءُونا
هَبْنَاهُآ إِنَّمَا سَلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۖ وَأَمَّا مَنْ
أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ لَا يَقُولُ يَلَيِّنُنِي لَوْ أَنِّي كُنْتُ نَبِيًّا ۖ
وَلَمْ أَدرِ مَا حَسَابُ يَوْمِئِذٍ ۖ يَلَيِّنُهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ۖ مَا
أَعْنَى عَنِّي مَالِي ۖ هَكَذَا عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ۖ خُذُوهُ
فَعَلُوهُ ۖ ثُمَّ الْحَبِيمَ صَلَّوهُ ۖ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۖ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ
بِآيَاتِ الْعَظِيمِ ۖ وَلَا يَخْضُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۖ

(১৩) যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে—একটি মাত্র ফুৎকার (১৪) এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, (১৫) সেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে। (১৬) সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে ও বিক্ষিপ্ত হবে (১৭) এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আট জন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের উর্ধ্বে বহন করবে। (১৮) সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন কিছু গোপন থাকবে না। (১৯) অতঃপর যার আমলনামা জান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে : নাও, তোমরাও আমলনামা পড়ে দেখ। (২০) আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। (২১) অতঃপর সে সুখী জীবন-যাপন করবে, (২২) সুউচ্চ জান্নাতে। (২৩) তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে। (২৪) বিগতদিনে তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে, তার প্রতিদানে তোমরা ঋণ ও পান কর তৃপ্তি সহকারে। (২৫) যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে : হায় আমার যদি আমার আমলনামা না দেয়া হতো ! (২৬) আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। (২৭) হায়, আমার মৃত্যুই যদি শেষ হত। (২৮) আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসল না। (২৯) আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। (৩০) ফেরেশতাদেরকে বলা হবে : ধর একে, গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও, (৩১) অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। (৩২) অতঃপর তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে। (৩৩) নিশ্চয় সে মহান আল্লাহুতে বিশ্বাসী ছিল না। (৩৪) এবং মিসকীনকে আহ্ব্য দিতে উৎসাহিত করত না।

পাণি শব্দটি থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সীমালংঘন করা।

উদ্দেশ্য এমন কঠোর শব্দ, যা সারা দুনিয়ার শব্দসমূহের সীমার বাইরে ও বেশী। মানুষের মন ও মস্তিষ্ক এই শব্দ বরদাশত করতে পারে না। সামুদ্রিক গোত্রের অবাধ্যতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে তাদের উপর এই শব্দের আকারেই আযাব এসেছিল। এতে সারা বিশ্বের বহুজনিদা ও সারা বিশ্বের শব্দসমূহের সমষ্টি সন্নিবেশিত ছিল। ফলে তাদের হৃদপিণ্ড ফেটে গিয়েছিল।

এর অর্থ অত্যধিক শৈত্যসম্পন্ন প্রচণ্ড বাতাস।

এক রেওয়াজে বর্ণিত আছে, বুধবারের সন্ধ্যা থেকে এই অজ্ঞাবায়ুর আযাব শুরু হয়ে পরবর্তী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এভাবে দিন আটটি ও রাত্রি সাতটি হয়ে ছিল।

এর অর্থ মূলোৎপাটন করে দেয়া।

এর অর্থ পরস্পরের মিশ্রিত ও মিলিত। হযরত লুত (আঃ)—এর সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহকে বলা হয়েছে। এর এক কারণ এই যে, তাদের বস্তিগুলো পরস্পরে মিলিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আযাব আসার পর তাদের বস্তিগুলো তছনছ হয়ে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

তিরমিযীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের রেওয়াজেতে আছে صور শিং—এর আকারে কোন বস্তুকে বলা হয়। কেয়ামতের দিন এতে ফুৎকার দেয়া হবে। وَاحِدَةٌ এর অর্থ হঠাৎ একযোগে এই শিংগার আওয়াজ শুরু হবে এবং সবার মৃত্যু পর্যন্ত একটানা আওয়াজ অব্যাহত থাকবে। কোরআন ও হাদীস দ্বারা কেয়ামতে শিংগার দুইটি ফুৎকার প্রমাণিত আছে। প্রথম ফুৎকারকে فَصَوْعٌ مِّنْ فِي النَّفْخَةِ বলা হয়। এসম্পর্কে কোরআনে আছে وَفِي الْأَرْضِ অর্থাৎ এই ফুৎকারের ফলে আকাশের অধিবাসী ফেরেশতা এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী মানব, জিন ও সমস্ত জীব-জন্তু অজ্ঞান হয়ে যাবে। (অতঃপর এই অজ্ঞান অবস্থায় সবার মৃত্যু ঘটবে।) দ্বিতীয় ফুৎকারকে نَفْخَةٌ بَعَثَ বলা হয়। শব্দের بَعَثَ অর্থ উঠা। এই ফুৎকারের মাধ্যমে সকল মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এ সম্পর্কে কোরআনে আছে، ثُمَّ يُدْعَى الْأَوَاغَةُ وَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَتَخَفُونَ অর্থাৎ, পুনরায় শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। ফলে অকস্মাৎ সব মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং দেখতে থাকবে।

কোন কোন রেওয়াজেতে এই দুই ফুৎকারের পূর্বে তৃতীয় একটি ফুৎকারের উল্লেখ আছে। এর নাম نَفْخَةٌ فَزَع কিন্তু রেওয়াজেতের সমষ্টিতে চিন্তা করলে জানা যায় যে, এটা প্রথম ফুৎকারই। শুরুতে একে نَفْخَةٌ فَزَع বলা হয়েছে এবং পরিণামে এটাই نَفْخَةٌ فَزَع হয়ে যাবে।—(মায়হারী)।

এর অর্থ, কেয়ামতের দিন وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمِئِذٍ ثَنِيَّةٌ আট জন ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার আরশকে বহন করবে। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে যে, কেয়ামতের পূর্বে চার জন ফেরেশতা এই দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। কেয়ামতের দিন তাদের সাথে আরও চার জন মিলিত হবে।

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ۖ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَمِيلٍ ۖ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۖ فَلَا أُفْسِرُ بِمَا يُبْصِرُونَ ۖ وَمَا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۖ وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا تَوَمَّنُونَ ۖ وَلَا يَقُولُ كَا هِینَ قَلِيلًا مَّا تَنْزِيلُ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ وَلَوْ تَوَمَّلْ عَلَيْنَا نَعْصُ الْأَقَاوِيلِ ۖ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۖ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۖ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۖ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لِلْهَاتِنِينَ ۖ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ۖ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۖ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۖ
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ۖ وَرَبِّكَ الْأَكْبَرُ ۖ
يَسْأَلُ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۖ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۖ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ۖ تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَرُؤُوسُ الَّذِينَ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُ أَحْسَنِ أَلْفِ سَنَةٍ ۖ

(৩৫) অতএব, আজকের দিন এখানে তার কোন সুহৃদ নাই। (৩৬) এবং কোন খাদ্য নাই, ক্ষত-নিঃসৃত পুঞ্জ ব্যতীত। (৩৭) গোনাহ্গার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না। (৩৮) তোমরা যা দেখ, আমি তার শপথ করছি (৩৯) এবং যা তোমরা দেখ না, তার—(৪০) নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের আনীত। (৪১) এবং এটা কোন কবির কালাম নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস কর। (৪২) এবং এটা কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা নয়; তোমরা কমই অনুশ্রবণ কর। (৪৩) এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ। (৪৪) সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, (৪৫) তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, (৪৬) অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা। (৪৭) তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না। (৪৮) এটা খোদাতীকদের জন্যে অবশ্যই একটি উপদেশ। (৪৯) আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যারোপ করবে। (৫০) নিশ্চয় এটা কাক্ষেরদের জন্যে অনুপ্রাণের কারণ। (৫১) নিশ্চয় এটা নিশ্চিত সত্য। (৫২) অতএব, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

সূরা আল-মআরিজ

মকায় অবতীর্ণ: আয়াত ৪৪

পরম কক্ষাময় ও অসীম দয়ালব আল্লাহর নামে শুরু

(১) একব্যক্তি চাইল, সেই আযাব সংঘটিত হোক যা অবধারিত—(২) কাক্ষেরদের জন্যে, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই। (৩) তা আসবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, যিনি সমুদ্র মর্তবার অধিকারী। (৪) ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ তাআলার দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।

আল্লাহ তাআলার আরশ কি? এর স্বরূপ ও প্রকৃত আকার-আকৃতি কি? ফেরেশতারা কিভাবে একে বহন করছে? এসব প্রশ্নের সমাধান মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি দিতে পারে না এবং এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করার অনুমতি নেই। এ ধরনের যাবতীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাহাবী ও তাবয়ীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এসব বিষয়ে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য সত্য এবং স্বরূপ অজ্ঞাত বলে বিশ্বাস করতে হবে।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ — অর্থাৎ, সেদিন সবাই পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হবে। কোন আত্মগোপনকারী আত্মগোপন করতে পারবে না। আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে আজ দুনিয়াতেও কেউ আত্মগোপন করতে পারে না। সেই দিনের বিশেষত্ব সম্ভবতঃ এই যে, হাশরের ময়াদানে সমস্ত ভূপৃষ্ঠ সবটি সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হবে। গর্ত, পাহাড়, ঘর-বাড়ী, বৃক্ষ ইত্যাদি আড়াল বলতে কিছুই থাকবে না। দুনিয়াতে এসব বস্তুর পশ্চাতে আত্মগোপনকারীরা আত্মগোপন করে। কিন্তু সেখানে কিছুই থাকবে না। ফলে কেউ আত্মগোপন করার জায়গা পাবে না।

هَآؤُمْ - হাউম - শব্দের অর্থ না। উদ্দেশ্য এই যে, যার আমলনামা ডানহাতে আসবে, সে আহলাদে আটখানা হয়ে আশেপাশের লোকজনকে বলবে: নাও, আমার আমলনামা পাঠ করে দেখ।

هَآؤُمْ - হাউম - শব্দের অর্থ ক্ষমতা ও আধিপত্য।

তাই রাষ্ট্রকে সুলতানাত এবং রাষ্ট্রনায়ককে সুলতান বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে অন্যদের উপর আমার ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিল। আমি সবার বড় একজন। আজ সেই রাজত্ব ও প্রাধান্য কোন কাজে আসল না। সুলতান—এর অপর অর্থ প্রমাণ, সনদও হতে পারে। তখন অর্থ হবে, হয়! আজ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার হাতে কোন সনদ নেই।

خُذُوْهُ فَعُوهُ — অর্থাৎ, ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবে: এই অপরাধীকে ধর এবং তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, এই আদেশ উচ্চারিত হলে সব প্রাচীর ইত্যাদি সব বস্তু তাকে ধরার জন্যে দৌড় দিবে।

ثَوْرِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ — অতঃপর তাকে সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে গ্রথিত করে দাও। শৃঙ্খলিত করার অর্থও রূপকভাবে নেয়া যায়। কিন্তু এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে মোতি অথবা তসবীহর দানা গ্রথিত করার ন্যায় শিকল দেহে বিদ্ধ করে অপর দিক থেকে বের করে দেয়া। কোন কোন হাদীসে এই আক্ষরিক অর্থেরও সমর্থন আছে।—(যাযহরী)।

আনুভূতিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ۖ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَمِيلٍ — এই অর্থ সুহৃদ। সেই পানি, যদ্বারা জাহান্নামীদের ক্ষতের পুঞ্জ ইত্যাদি ধৌত করা হবে। আয়াতের অর্থ এই যে, আজ তার কোন সুহৃদ তাকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারবে না এবং আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার খাদ্য জাহান্নামীদের ক্ষতধৌত নোংরা পানি ব্যতীত কিছু

হবে না। “কিছু হবে না” এর অর্থ তফসীরের সারসংক্ষেপে এই বলা হয়েছে যে, কোন সুখা হব না। ক্ষতযৌত পানির অনুরূপ অন্য কোন নোত্রো খাফ্য হতে পারবে; যেমন অন্য আয়াতে জাহান্নামীদের খাদ্য যাকুম উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতে কোন বৈপরিত্য নেই।

فَلَا أَمْسِرُ بِمَا يُصْرُونَ وَمَا لَا يُصْرُونَ — অর্থাৎ, সেইসব বস্তুর শপথ, যা তোমরা দেখ অথবা দেখতে পার এবং যা তোমরা দেখনা ও দেখতে পার না। এতে সমগ্র সৃষ্টি এসে গেছে। কেউ কেউ বলেন : ‘যা দেখনা’ বলে আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : যা দেখ বলে দুনিয়ার বস্তুসমূহ এবং ‘যা দেখ না’ বলে পরকালের বিষয়সমূহ বোঝানো হয়েছে।—(মায়হারী)।

وَتَيْن — শব্দের অর্থ কথা রচনা করা। হৃদয় থেকে নির্গত সেই শিরাকে বলা হয়, যার মাধ্যমে আত্মা মানবদেহে বিস্তার লাভ করে। এই শিরা কেটে দিলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়ে যায়।

কাফেরদের কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে কবি এবং তাঁর কালামকে কবিতা, কেউ

فَسَيَرُ بِأَمْرِيكَ الْعَظِيمُ —এর আগে আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু বলেন না। তিনি আল্লাহর কালামই বলেন। এই কালাম খোদাতীরুদের জন্যে উপদেশ। কিন্তু আমি একথাও জানি যে, এসব অকাট্য ও নিশ্চিত বিষয়াদি জানা সম্ভবে অনেক লোক মিথ্যারোপ করতে থাকবে। এর পরিণাম হবে পরকালে তাদের অনুশাচনা ও সার্বক্ষণিক আযাব। অবশেষে বলা হয়েছে: وَكَذَلِكَ لَعَنَ الْيَقِينُ — অর্থাৎ, এটা পুরোপুরি সত্য ও নিশ্চিত। এতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে: فَيَسِيرُ بِأَمْرِيكَ الْعَظِيمُ —এতে ইঙ্গিত আছে যে, আপনি এই হঠকারী কাফেরদের কথার দিকে জাক্ষেপ করবেন না এবং দুঃখিতও হবেন না; বরং আপনার মহান পালনকর্তার পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণায় নিজেকে নিয়োজিত করুন। এটাই সব দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়। অন্য এক আয়াতে এর অনুরূপ বলা হয়েছে :

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَيَسِيرُ بِأَمْرِيكَ وَكَذَلِكَ لَعَنَ الشَّجِدِينَ — অর্থাৎ, আমি জানি আপনি কাফেরদের অর্থহীন কথাবার্তায় মনঃক্ষুব্ধ হন। এর প্রতিকার এই যে, আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসায় মশগুল হয়ে যান এবং সেজদাকারীদের দলভুক্ত হয়ে যান। কাফেরদের কথার দিকে জাক্ষেপ করবেন না।

আবু দাউদ হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহানী বর্ণনা করেন, যখন فَيَسِيرُ بِأَمْرِيكَ الْعَظِيمُ আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এতে তোমাদের রুকুতে রাখ। অতঃপর যখন فَيَسِيرُ بِأَمْرِيكَ الْعَظِيمُ আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন তিনি বললেন : একে তোমাদের সেজদায় রাখ। এ কারণেই সর্বসম্মতভাবে রুকু ও সেজদায় এই দু’টি তসবীহ পাঠ করা হয়। অধিকাংশ ইমামের মতে এগুলো তিন বার পাঠ করা সুন্নত। কেউ কেউ ওয়াজেবও বলেছেন।

সূরা হাক্কাকাহ সমাপ্ত

সূরা আল-মারিজ

سَأَلَ سَائِلٌ — শব্দটি কখনও তখ্যানুসন্ধানের অর্থে আসে। তখন আরবী ভাষায় এর সাথে عَنْ অব্যয় ব্যবহৃত হয় এবং কখনও আবেদন ও কোন কিছু চাওয়ার অর্থে আসে। আয়াতে এই অর্থে আসার কারণে এর সাথে بِ- অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি আযাব চাইল। নাসায়ীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নযর ইবনে হারেজ এই আযাব চেয়েছিল। সে কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি মিথ্যারোপ করতে যেয়ে ধৃষ্টতাসহকারে বলেছিল وَإِذْ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِي فَاطْمَئِنُوا بِمَا كُنْتُمْ تُجَارِئُونَ ه — আল্লাহ্। যদি এই কোরআনই আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রেরণ করুন।—(মায়হারী) আল্লাহ তাআলা তাকে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে শাস্তি দেন।—(মায়হারী) সে আল্লাহ তাআলার কাছে যে আযাব চেয়েছিল, অতঃপর তার কিছু স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এই আযাব কাফেরদের জন্যে দুনিয়াতে কিংবা পরকালে কিংবা উভয় জাহানে অবধারিত। একে প্রতিহত করার সাধ্য কারও নেই। এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, যিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই শেষ বাক্যটি প্রথম বাক্যের প্রমাণ। কারণ, যে আযাব মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আসে, তাকে প্রতিহত করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।*

مَعَارِج —এর বহুবচন। এটা عُرُوج থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ উর্ধ্বারোহণ করা। معراج ও معرج সেই সিঁড়িকে বলা হয়, যাতে নীচে থেকে উপরে আরোহণ করার জন্যে অনেকগুলো স্তর থাকে। আয়াতে আল্লাহ তাআলার বিশেষণ ذِي الْمَعَارِجِ এই অর্থে আনা হয়েছে যে, তিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই সুউচ্চ মর্তবা হচ্ছে উপরে-নীচে সপ্ত আকাশ। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) ذِي الْمَعَارِجِ এর অর্থ করেছেন আকাশসমূহের মালিক।

تَعْرِيرَ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّؤُوسِ — অর্থাৎ, উপরে নীচে স্তরে স্তরে সাজানো এই মর্তবাসমূহের মধ্যে ফেরেশতাগণ ও ‘রুহুল-আমীন’ অর্থাৎ, জিবরাঈল আরোহণ করেন। জিবরাঈল ফেরেশতাগণেরই একজন। কিন্তু তার বিশেষ সম্প্রদায়ের কারণে তাঁর পৃথক নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

فِي يَوْمٍ كَانَ وَعْدُ الْوَعْدِ عَشْرِينَ أَلْفَ سَنَةٍ — অর্থাৎ, উল্লেখিত আযাব সেই দিন সংঘটিত হবে, যে দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। হযরত আবু হাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে এই দিনের ধৈর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : আমার প্রাণ যে সত্তার করায়ত্ত, তাঁর শপথ করে বলছি—এই দিনটি মুমিনের জন্যে একটি ফরয নামায পড়ার সময়ের চেয়েও কম হবে।—(মায়হারী)।

যহরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে, يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَمَقْدَارِ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ — অর্থাৎ, এই দিনটি মুমিনদের জন্যে যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ের মত হবে।—(মায়হারী)।

এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, পঞ্চাশ হাজার বছর হওয়া একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। অর্থাৎ, কাফেরদের জন্যে এতটুকু দীর্ঘ এবং

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَدِيدًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَرَأَتْهُ
قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ
كَالْعُفْرِ ۖ وَلَا تَسْأَلْ حِمِيمٌ حِمِيمًا يَبْقَرُونَ لَهُمْ يَوْمَ
الْمُجُورِ يُقَفِّتُنِي مِنْ عَذَابٍ يُومِسُونَ بِكَ يَوْمَ ۖ وَ
صَاحِبِهِ وَأَخِيهِ ۖ وَقَصَيْدَهُ الَّتِي نَزَّاهُ ۖ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۖ كَلَّا إِنَّهَا الْغَلَى ۖ نَزَّاعَةً
لِلْسُلَى ۖ تَنَزَّاعُ مَنْ أَذْبَرَ وَتَوَلَّى ۖ وَجَمْعٌ كَذَابٍ ۖ إِنَّ
الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ
الْحَيْرُ مُمُوعًا ۖ إِلَّا الصَّالِينَ ۖ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
دَائِمُونَ ۖ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۖ
لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۖ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيْعَ الْبَيْنِ ۖ
وَالَّذِينَ هُمْ مِنَ عَذَابٍ رَئِيهِمْ مُشْفِقُونَ ۖ إِنَّ عَذَابَ
رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرْجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ
إِلَّا أَعْلَىٰ أَرْجَاهُمْ ۖ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غُرُ
وَالْمُؤْمِنِينَ ۖ فَمِنْ رَءَاؤِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۖ

(৫) অতএব, আপনি উত্তম সবার করুন। (৬) তারা এই আযাবকে সুদূরপর্যায় মনে করে, (৭) আর আমি একে আসন্ন দেখছি। (৮) সেদিন আকাশ হবে গলিত আমার মত। (৯) এবং পর্বতসমূহ হবে রসিন পশমের মত (১০) বন্ধু বন্ধুর স্ববর নিবে না। (১১) যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহগার ব্যক্তি পশুস্বরূপ দিতে চাইবে তার সম্মান-সম্মতিকে, (১২) তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, (১৩) তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত (১৪) এবং পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। (১৫) কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি, (১৬) যা চামড়া তুলে দিবে। (১৭) সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল, (১৮) সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতঃপর আগলিয়ে রেখেছিল। (১৯) মানুষ তো সৃষ্টি হয়েছে ভীকরূপে। (২০) যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হ-হাশা করে। (২১) আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। (২২) তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায়কারী। (২৩) যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে। (২৪) এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে (২৫) যাহ্ণাকারী ও বঞ্চিতের (২৬) এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। (২৭) এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তির সম্পর্কে ভীত-কম্পিত। (২৮) নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাকে যায় না। (২৯) এবং যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে, (৩০) কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না, (৩১) অতএব, যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তাইই সীমালঙ্ঘনকারী।

মুমিনদের জন্যে এতটুকু খাট হবে।

কেয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য এক হাজার বছর, না পঞ্চাশ হাজার বছর? আলোচ্য আয়াতে কেয়ামত দিবসের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর এবং সূরা তানযীলের আয়াতে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। আয়াতটি এই:

يَذَرُ الْأَكْمَرُونَ السَّمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ

আল্লাহ্ তাআলার কাজ কর্ম

পরিচালনা করে আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত, অতঃপর তাঁর দিকে উর্ধ্বগমন করেন এমন এক দিনে যা তোমাদের হিসাব অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান। বাহ্যতঃ উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরিত্য আছে। উপরোক্ত হাদীস দৃষ্টে এর জওয়াব হয়ে গেছে যে, সেই দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন দলের দিক দিয়ে বিভিন্ন রূপ হবে। কাকেরদের জন্যে পঞ্চাশ হাজার বছর এবং মুমিনদের জন্যে এক নামাযের ওয়াক্তের সমান হবে। তাদের মাঝখানে কাকেরদের বিভিন্ন দল থাকবে। সম্ভবতঃ কোন কোন দলের জন্যে এক হাজার বছরের সমান থাকবে। অস্থিরতা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সময় দীর্ঘ ও খাট হওয়া প্রসিদ্ধ ও সুবিধিত। অস্থিরতা ও কষ্টের এক ঘণ্টা মাঝে মাঝে মানুষের কাছে এক দিন বরং এক সপ্তাহের চেয়েও বেশী মনে হয় এবং সুখ ও আরামের দীর্ঘতর সময়ও সংক্ষিপ্ত অনুভূত হয়।

যে আয়াতে এক হাজার বছরের কথা আছে, সেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরে-মাযহরীতে বলা হয়েছে, এই আয়াতে পার্শ্ববর্তী একদিন বোঝানো হয়েছে। এই দিনে জিবরাঈল ও ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী থেকে আকাশে যাতায়াত করে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন, যা মানুষে অতিক্রম করলে এক হাজার বছর লাগত। কেননা, সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত পাঁচশত বছরের ব্যবধান আছে। অতএব, পাঁচশত বছর নীচে আসার এবং পাঁচশত বছর উর্ধ্ব গমনের ফলে মোট এক হাজার বছর মানুষের গতির দিক দিয়ে হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ এই দূরত্ব খুবই সর্বেশ্বপ সময়ে অতিক্রম করেন। সুতরাং সূরা তানযীলের আয়াতে পার্শ্ববর্তী হিসাবেই ‘একদিন’ বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা-মা’আরিজে কেয়ামতের দিন বিধৃত হয়েছে, যা পার্শ্ববর্তী দিন অপেক্ষা অনেক বড়। এর দৈর্ঘ্য ও সর্বেশ্বপতা বিভিন্ন লোকের জন্যে তাদের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্নরূপ অনুভূত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

— إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَرَأَتْهُ قَرِيبًا — এখানে স্থান ও কালের দিক দিয়ে দূর ও নিকট বোঝানো হয়নি; বরং সম্ভাব্যতার ও বাস্তবতার দূরবর্তীতা বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা কেয়ামতের বাস্তবতা—বরং সম্ভাব্যতাকেও সুদূর পরায়ত মনে করে আর আমি দেখছি যে, এটা নিশ্চিত।

— وَلَا تَسْأَلْ حِمِيمٌ حِمِيمًا يَبْقَرُونَ لَهُمْ — শব্দের অর্থ ঘনিষ্ঠ ও

অকৃত্রিম বন্ধু। কেয়ামতের দিন কোন বন্ধু বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না—সাহায্য করা দূরের কথা। জিজ্ঞাসা না করার কারণ সামনে না থাকা নয়; বরং আল্লাহ তাআলার কুদরতে তাদের সবাইকে একে অপরের সামনেও করে দিবে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকবে

যে, কেউ অপরের কষ্ট ও সুখের প্রতি আক্ষেপ করতে পারবে না।

كَلَّا إِنَّهَا لَنَفْسٍ لَّكُفَى — কল্লা শব্দের অর্থ অগ্নির লেলিহান শিখা। كَلَّا শব্দটি نَزَاعَةً لِلشَّوَى এর বহুবচন। অর্থ মাথা ও হাত-পায়ের চামড়া। অর্থাৎ, জাহান্নামের অগ্নি একটি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা হবে, মস্তিষ্ক অথবা হাত-পায়ের চামড়া খুলে ফেলবে।

نَدَّ عَوَاسِنْ أَذْبَرَوْتُوْلى وَجَمْعَ فَاوْلى এই অগ্নি নিজে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে; বিমুখ হয় এবং ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে তা আগলিয়ে রাখে। পুঞ্জীভূত করার অর্থ অবৈধ পন্থায় পুঞ্জীভূত করা এবং আগলিয়ে রাখার অর্থ ফরয ও ওয়াজেব হক আদায় না করা। সহীহ হাদীসে তাই অর্থ করা হয়েছে।

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلُقٌ هَلُوعٌ — এর শাব্দিক অর্থ লোভী, অধৈর্য ভীরা ব্যক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : এখানে অর্থ সেই ব্যক্তি, যে হারাম ধন-সম্পদের লোভ করে। সাইদ ইবনে জুবায়র (রাঃ) বলেন : এর অর্থ কৃপণ এবং মুকাতিল বলেন : এর অর্থ সংকীর্ণমনা ঐহীকান ব্যক্তি। এসব অর্থ কাছাকাছি। স্বয়ং কোরআনের ভাষায় হলুে শব্দের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দোষযুক্ত অবস্থায়, তখন তাকে অপরাধী কেন সাব্যস্ত করা হয়? জওয়াব এই যে, এখানে মানব-স্বভাবে নিহিত প্রতিভা ও উপকরণ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানব-স্বভাবে সংকাজের প্রতিভাও নিহিত রেখেছেন, তাকে জ্ঞান-গরিমাও দান করেছেন। কিতাব এবং রসুলের মাধ্যমে প্রত্যেক ভাল-মন্দ কাজের পরিণতিও বলে দিয়েছেন। মানুষ স্বেচ্ছায় জন্মলগ্নে গচ্ছিত মন্দ উপকরণের কারণে অপরাধী হয় না। হলুে শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোরআন পাক স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়াকর্মই উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে

إِذَا مَسَّهُ الشُّرُوءُ وَإِذَا مَسَّهُ الْحَزَرُ مَرُوءًا অর্থাৎ, মানুষ এত

ভীরা ও বে-সবর যে, যখন সে কোন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন হা-ছত্যা শুরু করে দেয়। পক্ষান্তরে যখন কোন সুখ-শান্তি ও আরাম লাভ করে, তখন কৃপণ হয়ে যায়। এখানে শরীয়তের সীমার বাইরে হা-ছত্যা বোঝানো হয়েছে। এমনিভাবে কৃপণতা বলে ফরয ও ওয়াজেব

কর্তব্য পালনে ত্রুটি বোঝানো হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মানুষের এই বদ-অভ্যাস থেকে সংকামী মুমিনদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করে তাদের সং ক্রিয়াকর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রম إِلَّا الْمُصْلِينَ থেকে শুরু করে عَلَى صَلَاتِهِمْ يُظَنُّونَ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এখানে مُصْلِينَ শব্দ বলে মুমিনে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামায মুমিনের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ আলামত। যারা নামাযী, তারাই মুমিন বলার যোগ্য হতে পারে।

অতঃপর তাদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُظَنُّونَ — অর্থাৎ, যে নামাযী তার সমগ্র নামাযের নামাযে দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে; এদিক সেদিক তাকায় না। ইমাম বগভী (রহঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে আবুল খায়র বলেন : আমি সাহাবী হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াতের অর্থ কি এই যে, যারা সর্বক্ষণ নামায পড়ে? তিনি বললেন : না, এই অর্থ নয়; বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাযের দিকেই নিবিষ্ট থাকে এবং ডানে-বামে ও আগে-পিছে তাকায় না। অতঃপর وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُظَنُّونَ

বাক্যে নামায ও নামাযের আদবসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই বিষয়বস্তুতে পুনরাবৃত্তি নেই। এর পরে উল্লেখিত মুমিনদের গুণাবলী প্রায় তাই, যা সূরা মুমিনুনে বর্ণিত হয়েছে।

যাকাতের পরিমাণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, তা হ্রাসবৃদ্ধি করার ক্ষমতা কারও নেই — وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا لَعَنُوا — এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যাকাতের পরিমাণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে। তাই যাকাতের নেসাব ও পরিমাণ উভয়টি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে স্থিরীকৃত। কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে এগুলো পরিবর্তিত হতে পারে না।

فَمِنْ ابْنِى وَرَاةَ ذَلِكَ فَذَلِكَ لِمَ الدُّنْيَا — এর পূর্বের আয়াতে

যৌনকামনা চরিতার্থ করার বৈধ পাত্র বিবাহিতা স্ত্রী ও মালিকানাধীন বাদী উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতে এগুলো ছাড়া যৌনকামনা চরিতার্থ করার প্রত্যেক প্রকারকে নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُغُونَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ
بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۖ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ
يَحَاطُظُونَ ۖ أُولَٰئِكَ فِي حَبَدِّ مُكَرَّمُونَ ۖ قَبَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا قَاتِلَكَ مُهْطِعِينَ ۖ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ
عِزِّينَ ۖ يُنَظَّمُ كُلُّ أَمْرٍ مِنْهُمْ أَنْ يَدْخَلَ حِجَّةً
نَعِيمٍ ۖ كَلَّا إِنَّهَا خَلَقَتْهُمْ مَتَّاعَيْنَ كَمَا أَفْسِمُ
بِرَبِّ الْمَسْطَرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۖ إِنَّا لَقَائِدُونَ ۖ عَلَىٰ أَنْ تَبْدِلَ
خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۖ ذَذَرْنَاهُمْ يَوْمَهُمْ
وَلْيَعْبُرُوا حَتَّىٰ يُلْقُوا أَوْ مُهْمُ الَّذِينَ يُوعَدُونَ ۖ يَوْمَ يُخْرَجُونَ
مِنَ الْأَحْدَاثِ سِرَاجًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِصُونَ ۖ خَالِصَةً
أَبْصَارُهُمْ رَهْمَهُمْ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُوعَدُونَ ۖ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ قَالَ يَكُونُوا لِي كَذِبٌ مُبِينٌ ۖ

(৩২) এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে (৩৩) এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল-নিষ্ঠাবান (৩৪) এবং যারা তাদের নামাযে যত্নবান, (৩৫) তারা ইচ্ছাতে সন্তানিত হবে। (৩৬) অতএব, কাফেরদের কি হল যে, তারা আপনার দিকে উর্ধ্বাঙ্গে ছুটে আসছে। (৩৭) ডান ও বামদিক থেকে দলে দলে। (৩৮) তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তাকে নেয়ামতের জন্মদাতা দাখিল করা হবে? (৩৯) কখনই নয়, আমি তাদেরকে এমন বস্ত্র দ্বারা সৃষ্টি করেছি, যা তারা জানে। (৪০) আমি শপথ করছি উদয়াচল ও অস্তাচলসমূহের পালনকর্তার। নিশ্চয়ই আমি সক্ষম। (৪১) তাদের পরিবর্তে উৎকৃষ্টতর মানুষ সৃষ্টি করতে এবং এটা আমার সাথের অতীত নয়। (৪২) অতএব, আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন, তারা বাকবিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করুক সেই দিবসের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত, যে দিবসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হচ্ছে। (৪৩) সেদিন তারা কবর থেকে দ্রুতবেগে বের হবে—যেন তারা কোন এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। (৪৪) তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত; তারা হবে হীনতাপ্রাপ্ত। এটাই সেইদিন, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হত।

সূরানুহ

মকায় অবতীর্ণ: আয়াত ২৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহর নামে শুরু

(১) আমি নূহকে ধারণ করেছিলাম তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি একথা বলে: তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, তাদের প্রতি মর্মভূত শাস্তি আসার আগে। (২) সে বলল: হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্যে স্পষ্ট সতর্ককারী।

আল্লাহর হুক ও সব বান্দার হুক আমানতের অন্তর্ভুক্ত :
—এই আয়াতে আমানত শব্দটি

বহুবচনে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্য এক আয়াতেও তদ্রূপ করা হয়েছে।

আয়াতটি এই : **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا**

—উভয় আয়াতে বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমানত কেবল সে অর্থকেই বলে না, যা কেউ আপনার হাতে সোপর্দ করে; বরং যেসব ওয়াজেব হুক আদায় করা আপনার দায়িত্বে ফরয, সেগুলো সবই আমানত। এগুলোতে ত্রুটি করা বিধানত। এতে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি আল্লাহ তাআলার হুকও দাখিল আছে এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দার যেসব হুক আপনার উপর ওয়াজেব করা হয়েছে অথবা কোন লেনদেন ও চুক্তির মাধ্যমে আপনি যেসব হুক নিজের উপর ওয়াজেব করে নিয়েছেন, সেগুলোও দাখিল আছে। এগুলো আদায় করা ফরয এবং এতে ত্রুটি করা বিধানতের অন্তর্ভুক্ত।—(মাযহারী)।

—এখানেও শাহাদত শব্দটিকে বহুবচন

আনার কারণে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ‘শাহাদত’ তথা সাক্ষ্যের অনেক প্রকার আছে এবং প্রত্যেক প্রকার সাক্ষ্য কায়েম রাখা ওয়াজেব। এতে ঈমান, তওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্যও দাখিল এবং রমযানের চাঁদ, শরীয়তের বিচার-আচার ও পারস্পরিক লেনদেনের সাক্ষ্যও দাখিল আছে। এসব সাক্ষ্য গোপন করা ও এতে কম বেশী করা হারাম। বিস্তৃতভাবে এগুলোকে কায়েম করা আয়াত দৃষ্টে ফরয।—(মাযহারী)

সূরা আ'আরিল্ল সমাপ্ত

اِنْ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيعُوْا ۙ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ
 اِنْ اَجَلُكُمْ وَاَوْجُرُكُمْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ
 دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَنَهَارًا ۙ فَلَمْ یَزِدْهُمْ عِلْمًا ۙ
 فَرَارًا ۙ وَاِنِّیْ اَتْلُوْا اَنْزِلَ عَلَیْهِمْ وَاسْتَعْسَوْا ثِیَابَهُمْ وَاصْرَوْا وَاسْتَكْبَرُوْا
 اَسْتَكْبَرُوْا ۙ ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۙ فَتَرَدَّدُوْا ۙ اَعَلَيْتُمْ
 لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اَسْرَارًا ۙ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبِّكُمْ
 اِنَّهٗ كَانَ عَفُوًّا رَّحِيْمًا ۙ یُرْسِلُ السَّمَآءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَارًا ۙ
 وَیُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَیَجْعَلَ لَكُمْ جُلُوْثًا
 وَیَجْعَلَ لَكُمْ اَنْهَارًا ۙ فَاَلَمْ تَرَوْا كَیْفَ خَلَقَ اللَّهُ
 سَبْعَ سَمُوٰتٍ طِبَاقًا ۙ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیْهِنَّ نُوْرًا
 وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۙ وَاللَّهُ اَنْتَبِهُكُمْ مِنْ
 الْاَرْضِ نَبَاتًا ۙ ثُمَّ یُعِیْدُكُمْ فِیْهَا وَیُخْرِجُكُمْ اَحْرَاجًا ۙ

(৩) এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার এবাদত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (৪) আল্লাহ তাআলা তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নির্দিষ্টকাল যখন হবে, তখন অবকাশ দেয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে! (৫) সে বলল : হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার সম্প্রদায়কে দিব্যরাশি দাওয়াত দিয়েছি; (৬) কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের পলায়নকেই বৃদ্ধি করেছে। (৭) আমি যতবারই তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, ততবারই তারা কানে অঙ্গুলি দিয়েছে, মুখমণ্ডল বশ্ণাবৃত করেছে, জেদ করেছে এবং খুব ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। (৮) অতঃপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি। (৯) অতঃপর আমি ঘোষণা সহকারে প্রচার করেছি এবং গোপনে চুপিসারে বলেছি। (১০) অতঃপর বলেছি : তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (১১) তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা ছেড়ে দিবেন, (১২) তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদীনালা প্রবাহিত করবেন। (১৩) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার প্রেরিত্ব আশা করছ না! (১৪) অথচ তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন রকমে সৃষ্টি করেছেন। (১৫) তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ কিভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন (১৬) এবং সেখানে চন্দ্রকে রেখেছেন আলোরাশে এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরাশে। (১৭) আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে মৃত্যিকা থেকে উদ্ধৃত করেছেন। (১৮) অতঃপর তাতে ফিরিয়ে নিবেন এবং আবার পুনরুৎপাদিত করবেন।

یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ — من — অব্যয়টি প্রায়শঃ কতক অর্থ জ্ঞাপন

করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের কতক গোনাহ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার হক সম্পর্কিত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। কেননা, বান্দার হক মাফ হওয়ার জন্যে ঈমান আনার পরও একটি শর্ত আছে। তা এই যে, হকটি আদায়যোগ্য হলে তা আদায় করতে হবে; যেমন আর্থিক দায়-দেনা এবং আদায়যোগ্য না হলে তা মাফ নিতে হবে; যেমন মুখে কিংবা হাতে কাউকে কষ্ট দেয়া।

হাদীসে বলা হয়েছে, ঈমান আনলে পূর্ববর্তী সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়। এতেও বান্দার হক আদায় করা, অথবা মাফ নেয়া শর্ত। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : আয়াতে من অব্যয়টি অতিরিক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান আনলে তোমাদের সব গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ দৃষ্টে শর্তটি অপরিহার্য।

اَجَلٍ مُّسَمًّى — এর অর্থ নির্দিষ্ট মেয়াদ।

উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। অর্থাৎ, বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে তোমাদেরকে কোন পার্থিব আয়াবে ধ্বংস করবেন না। এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় এই যে, ঈমান না আনলে নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বেই তোমাদেরকে আয়াবে ধ্বংস করে দেয়ারও সম্ভাবনা আছে। বয়সের নির্দিষ্ট মেয়াদের মাঝে মাঝে এরূপ শর্ত থাকে যে, সে অমুক কাজ করলে উদাহরণতঃ তার বয়স আশি বছর হবে এবং না করলে ষাট বছর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এমনভাবে অকৃতজ্ঞতার কাজে বয়স হ্রাস পাওয়া এবং কৃতজ্ঞতার কাজে বয়স বেড়ে যাওয়াও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

মানুষের বয়স হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত আলোচনা : তফসীরে-মাযহারাতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : তকদীর দুই প্রকার—(১) চূড়ান্ত অকাট্য এবং (২) শর্তযুক্ত। অর্থাৎ, লওহে-মাহফুযে এভাবে লিখা হয় যে, অমুক ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করলে তার বয়স উদাহরণতঃ ষাট বছর হবে এবং আনুগত্য না করলে পঞ্চাশ বছর বয়সে খতম করে দেয়া হবে। দ্বিতীয় প্রকার তকদীরে শর্তের অনুপস্থিতি পরিবর্তন হতে পারে। উভয় প্রকার তকদীর কোরআন পাকের এই আয়াতে উল্লেখিত আছে।

یَمْحُ اللَّهُ الذَّنْبَ عَنْكَ وَیُثَبِّتُ ۖ وَیُحْدِثُ ۖ وَیُعَذِّبُكَ ۖ وَیُعَذِّبُكَ ۖ وَیُعَذِّبُكَ ۖ — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা লওহে-মাহফুযে —পরিবর্তন পরিবর্তন করে থাকেন এবং তাঁর কাছে রয়েছে আসল কিতাব। “আসল কিতাব” বলে সেই কিতাব বোঝানো হয়েছে, যাতে অকাট্য তকদীর আছে। কেননা, শর্তযুক্ত তকদীরে লিখিত শর্ত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ ব্যক্তি শর্তপূর্ণ করবে কি করবে না। তাই চূড়ান্ত তকদীরে অকাট্য ফাসয়লা লিখা হয়।

হয়রত সালমান ফারেসীর হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন—

اَرْبَآءُ لَا یُرَدُّ الْقَضَاءُ اِلَّا الدَّعَاءُ وَلَا یَزِیْدُ فِی الْعَمْرِ اِلَّا الْبِرُّ

দেয়া ব্যতীত কোন কিছু আল্লাহ তাআলার ফয়সালা রোধ করতে পারে না এবং পিতা-মাতার বাধ্যতা ব্যতীত কোন কিছু বয়স বৃদ্ধি করতে পারে না। এই হাদীসের মতলব এটাই যে, শর্তযুক্ত তকদীরে এসব কর্মের কারণে পরিবর্তন হতে পারে। সারকথা, আয়াতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ

দেয়াকে তাদের ঈমান আনার উপর নির্ভরশীল করে তাদের বয়স সম্পর্কে শর্তযুক্ত তকদীর বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)-কে এ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে থাকবেন। এ কারণে তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বলে দিলেন, তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে যে আসল বয়স নির্ধারণ করেছেন, সেই পর্যন্ত তোমরা অবকাশ পাবে এবং কোন পার্শ্বি আঘাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে যদি তোমরা ঈমান না আন, তবে এই আসল বয়সের পূর্বেই আল্লাহ তাআলার আঘাব তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে। এমনতাবস্থায় পরকালের আঘাবে ভিন্ন হবে। অতঃপর আরও বলে দিলেন যে, ঈমান আনলেও চিরতরে মৃত্যু থেকে রক্ষা পাবে না। বরং অকাট্য তকদীরে তোমাদের যে বয়স লিখিত আছে, সেই বয়সে মৃত্যু আসা অপরিহার্য। কারণ, আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহস্য বলে এই বিশ্ব-চরাচরকে চিরস্থায়ী করেননি। এখনকার প্রত্যেক বস্তু অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এতে ঈমান ও আনুগত্য এবং কুফর ও গোনাহের কারণে কোন পার্থক্য হয় না। **إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ** আয়াতে তাই বিধৃত হয়েছে। অতঃপর স্বজাতির সংশোধন ও ঈমানের জন্যে নূহ (আঃ)-এর বিভিন্ন প্রচেষ্টায় বিরামহীনভাবে নিয়োজিত থাকা এবং সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধিতা করার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পরিশেষে নিরাশ হয়ে বদদোয়া করা এবং সমগ্র জাতির নিমজ্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে : নূহ (আঃ) চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়ত লাভ করেন এবং কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর হয়েছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কখনও চেষ্টায় ক্লান্ত হননি এবং কোন দিন নিরাশও হননি। সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নানাবিধ নির্ঘাতনের সম্মুখীন হয়েও তিনি সবর করেন।

যাহূযক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : তাঁর সম্প্রদায়ের প্রহারের চোটে তিনি অচেতন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তেন। এরপর তারা তাঁকে একটি কম্বলে জড়িয়ে গৃহে রেখে যেত। তারা মনে করত, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু পরবর্তী দিন যখন চৈতন্য ফিরে আসত, তখন আবার সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলার দিকে দাওয়ায় দিতেন এবং প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করতেন। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক ওবায়দ ইবনে আসেরশী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এই সংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁর গলা টিপে দিত। ফলে তিনি চেতনা হারিয়ে ফেলতেন : **رب اغفر لقومي** : পুনরায় চেতনা ফিরে এলে তিনি এই দোয়া করতেন : **أَنَّهُمْ لَاعِلَمُونَ** অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন ; কারণ, ওরা অবুঝ। তাদের এক পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে তিনি দ্বিতীয় পুরুষের ঈমানের ব্যাপারে আশাবাদী হতেন। দ্বিতীয় পুরুষের পর তৃতীয় পুরুষের ব্যাপারেও এমনি আশাবাদী হয়ে তিনি কর্তব্যপালনে লিপ্ত থাকতেন। কারণ, তাদের পুরুষানুক্রমিক বয়স হযরত

নূহ (আঃ)-এর বয়সের ন্যায় দীর্ঘ ছিল না। তিনি মু'জেযা হিসাবে দীর্ঘ বয়স প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যখন সম্প্রদায়ের একের পর এক পুরুষ অতিক্রান্ত হতে থাকে এবং প্রত্যেক ভবিষ্যৎ পুরুষ বিগত পুরুষ অপেক্ষা অধিক দূর্ভাগ্য প্রমণিত হতে থাকে, তখন হযরত নূহ (আঃ) সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার দরবারে অভিযোগ পেশ করলেন এবং বললেন : আমি ওদেরকে দিবারাত্রি, দলবদ্ধভাবে ও পৃথক পৃথকভাবে, প্রকাশ্যে ও সংগোপনে—সারকথা, সর্বতোভাবে পথে আনার চেষ্টা করেছি। কখনও আঘাবের ভয় প্রদর্শন করেছি, কখনও জল্পনাতে নেয়ামতরাজির লোভ দেখিয়েছি। আরও বলেছি—ঈমান ও সংকল্পের বরকতে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দুনিয়াতেও সুখ ও স্বাস্থ্যদান করবেন এবং কখনও আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিশ্চিনাবনী পেশ করে বুঝিয়েছি, কিন্তু তারা কিছুতেই কর্পণাত করল না। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা হযরত নূহ (আঃ)-কে বলে দিলেন : আপনার সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে, তাদের ছাড়া নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। **أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ أَحَدٌ** আয়াতের মতলব তাই। এমনি

নৈরাশ্যের পর্যায়ে পৌছে হযরত নূহ (আঃ)-এর মুখে বদদোয়া উচ্চারিত হল। ফলে সমগ্র সম্প্রদায় নিমজ্জিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। তবে মুমিনগণ রক্ষা পেল। তাদেরকে একটি জলযানে তুলে নেয়া হয়েছিল।

সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতে যেয়ে নূহ (আঃ) তাদেরকে আল্লাহ তাআলার কাছে এস্তেগফার অর্থাৎ, ঈমান এনে বিগত গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার দাওয়ায় দেন এবং এর পার্শ্বি উপকার এই বর্ণনা করেন যে,

— **يُؤْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُسْهِرُ لَكُمْ بِالْمُؤَالِ وَيَبِينُ** অর্থিক আলম বললেন যে, গোনাহ থেকে তওবা ও এস্তেগফার করলে আল্লাহ তাআলা যথাস্থানে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, দুর্ভিক্ষ হতে দেন না এবং ঘন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্পত্তিতে বরকত হয়। কোথাও কোন রহস্যের কারণে শ্বেলাফও হয় ; কিন্তু তওবা এস্তেগফারের ফলে পার্শ্বি বিপদাপদ দূর হয়ে যাওয়াই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার প্রচলিত রীতি। হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।

أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَا الْفَيَافُونَ —এই আয়াতে তওহীদ ও কুদরতের প্রমাণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সাজানোর কথা এবং তাতে চন্দ্রের আলোকোজ্জ্বল হওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে **فَيَافُونَ** বলায় বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, চন্দ্র আকাশগর্বে অবস্থিত। কিন্তু আধুনিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে এর বিপরীতে জানা যায় যে, চন্দ্র আকাশের অনেক নীচে মহাশূন্যে অবস্থিত। এ সম্পর্কে সূরা ফোরকানের **جَلَّ فِي السَّمَاءِ بِرُؤُوسًا** আয়াতের তফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।



(১৯) আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্যে ভূমিকে করেছেন বিছনা (২০) যাতে তোমরা চলাফেরা কর প্রশস্ত পথে। (২১) নূহ বলল : হে আমার পালনকর্তা, আমার সম্ভ্রাদায় আমাকে অমান্য করেছে আর অনুসরণ করেছে এমন লোককে, যার ধর্ম-সম্পদ ও সম্মান-সম্পত্তি কেবল তার ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে। (২২) আর তারা ভয়ানক চক্রান্ত করেছে। (২৩) তারা বলছে : তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এক ত্যাগ করো না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুদ, ইয়াউক ও নসরকে। (২৪) অতঃপর তাদেরকে পঞ্চবটতাই বাড়িয়ে দিল। (২৫) তাদের পোনাহসমুহের দরুন তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর দাবিল করা হয়েছে জাহান্নামে। অতঃপর তারা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কাউকে সাহায্যকারী পায়নি। (২৬) নূহ আরও বলল : হে আমার পালনকর্তা, আপনি পৃথিবীতে কেন কাকের পৃথবাসীকে রেখেই দিবে না। (২৭) যদি আপনি তাদেরকে রেখেই দেন, তবে তারা আপনায় বান্দাদেরকে পঞ্চবট করবে এক জর দিতে থাকবে কেবল পাগাচারী, কাকের। (২৮) হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহ প্রবেশ করে—তাদেরকে এক মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কমা করুন এক জাহান্নামের কেবল ধ্বংসই বৃদ্ধি করুন।

সূরা আন-জিন

মকায় অবতীর্ণ : আয়াত ২৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহর নামে শুরু

(১) বলুন : আমার প্রতি ওহী নাফিল করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল কোরআন প্রকাশ করেছে, অতঃপর তারা বলেছে : আমরা বিস্ময়কর কোরআন প্রকাশ করেছি;

সম্ভ্রাদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে গিয়ে নূহ (আঃ) আরও বললেনঃ وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا — অর্থাৎ, তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে। তারা নিজেদের উৎসাহিত করতই, উপরন্তু জনপদের গুণা ও দুই লোকদেরকেও নূহ (আঃ) এর পিছনে লেলিয়ে দিত। তারা পরস্পরে এই চুক্তিতেও উপনীত হয়েছিল যে, وَلَا تَنْدَرُونَ وَلَا تُسَارِعُونَ وَلَا يَخُوفُونَ — অর্থাৎ, আমরা আমাদের দেব-দেবী বিশেষতঃ এই পাচ জনের উপাসনা পরিত্যাগ করব না। আয়াতে উল্লেখিত শব্দগুলো পাঁচটি প্রতিমার নাম।

ইমাম বগদী বর্ণনা করেন, এই পাঁচ জন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার নেক ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দা ছিলেন। তাদের সময়কাল ছিল হযরত আদম ও নূহ (আঃ) এর আমলের মাঝামাঝি। তাঁদেরও নেক তত্ত্ব ও অনুসারী ছিল। তাঁদের ওফাতের পর ভক্তরা সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ তাআলার এবাদত ও বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য অব্যাহত রাখে। কিছুদিন পর শয়তান তাদেরকে এই বলে প্ররোচিত করল : তোমরা যেসব মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে উপাসনা কর, যদি তাদের মূর্তি তৈরী করে সামনে রেখে লও, তবে তোমাদের উপাসনা পূর্ত্য লাভ করবে এবং বিনয় ও একাগ্রতা অর্জিত হবে। তারা শয়তানের ঝোঁক বোঝতে না পেয়ে মহাপুরুষদের প্রতিভূতি তৈরী করে উপাসনালয়ে স্থাপন করল এবং তাদের স্মৃতি জ্ঞাপরিত করে এবাদতে বিশেষ পূলক অনুভব করতে লাগল। এমতাবস্থায়ই তাদের সবাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বংশধর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল। এবার শয়তান এসে তাদেরকে বোঝাল : তোমাদের পূর্বপুরুষদের বোদা ও উপাস্য মূর্তিই ছিল। তারা এই মূর্তিগুলোরই উপাসনা করত। এখান থেকে প্রতিযাপজার সূচনা হয়ে গেল। উপরোক্ত পাঁচটি মূর্তির মাহাত্ম্য তাদের অন্তরে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ছিল বিধায় পারস্পরিক চুক্তিতে তাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا — অর্থাৎ, এই জালেমদের পঞ্চবটতা

আরও বাড়িয়ে দিল। এখানে প্রশ্ন হয় যে, জাতিকে সংপথ প্রদর্শন করা পয়গম্বরগণের কর্তব্য। নূহ (আঃ) তাদের পঞ্চবটতার দোষা করলেন কিভাবে? জওয়াব এই যে, প্রকৃতপক্ষে নূহ (আঃ) কে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এখন তাদের মধ্যে কেউ মুসলমান হবে না। সেমতে পঞ্চবটতা ও কুফরের উপর তাদের মতাবরণ নিশ্চিত ছিল। নূহ (আঃ) তাদের পঞ্চবটতা বাড়িয়ে দেয়ার দোষা করলেন, যাতে সত্ত্বরই তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

وَمَا خَلَقْنَاهُمْ أَفْرَادًا ۖ وَأَوَّلًا ذَكَرْنَاكُمْ فِي الْأَقْدَامِ — অর্থাৎ, তারা তাদের পোনাহ

অর্থাৎ, কুফর ও শিরকের কারণে পানিতে নিমজ্জিত হয়েছে এবং অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়েছে। পানিতে ডুবা ও অগ্নিতে প্রবেশ করা বাহ্যতঃ পরস্পর বিরোধী আযাব হলেও আল্লাহ তাআলার কুদরতের পক্ষে অবাস্তব নয়। বলাবাহুল্য, এখানে জাহান্নামের অগ্নি বোঝানো হয়নি। কেননা, তাতে কোয়ামতের হিসাব-নিকাশের পর প্রবেশ করবে; বরং এটা বরষা অগ্নি। কোরআন পাক এই বরষা অগ্নিতে প্রবেশ করার শব্দ দিয়েছে।

সূরা নূহ সমাপ্ত

সূরা আল-জিন

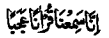
ذُرِّيَّتٍ نُّفْر - নফর শব্দটি তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা জ্ঞাপন করে। বর্ণিত আছে যে, আয়াতে আলোচিত জিনদের সংখ্যা নয় ছিল। তারা ছিল নহীবাইনের অধিবাসী।

জিনদের স্বরূপ : জিন আল্লাহ তাআলার এক প্রকার শরীরী, আত্মাধারী ও মানুষের ন্যায় জ্ঞান এবং চেতনাশীল সৃষ্টিজীব। তারা মানুষের দৃষ্টিগোচর নয়। এ কারণেই তাদেরকে জিন বলা হয়। জিন এর শাব্দিক অর্থ গুপ্ত। মানবসৃষ্টির প্রধান উপকরণ যেমন মৃত্তিকা, তেমনি জিন সৃষ্টির প্রধান উপকরণ অগ্নি। এই জাতির মধ্যেও মানুষের ন্যায় নর ও নারী আছে এবং সম্ভান প্রজননের ধারা বিদ্যমান আছে। কোরআন পাকে যাদেরকে শয়তান বলা হয়েছে, বাহ্যতঃ তারাও জিনদের দুষ্ট শ্রেণীর নাম। জিন ও ফেরেশতাদের অস্তিত্ব কোরআন ও সুন্নাহর অকাটা বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এটা অস্বীকার করা কুফর।—(মাহহারী)

فِي زُجُجٍ - থেকে জানা গেল যে, এখানে বর্ণিত ঘটনায় রসুলুল্লাহ (সাঃ) জিনদেরকে স্বচক্ষে দেখেননি। আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে অবহিত করেছেন।

সূরা জিন অবতরণের ঘটনা : সহীহ বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এই ঘটনায় রসুলুল্লাহ (সাঃ) জিনদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোরআন শোনাননি এবং তিনি তাদেরকে দর্শনও করেননি। এই ঘটনা তখনকার, যখন শয়তানদেরকে আকাশের খবর শোনা থেকে উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহত করা হয়েছিল। এ সময়ে জিনরা পরস্পরে পরামর্শ করল যে, আকাশের খবরাদি শোনার ব্যাপারে বাধাদানের এই ব্যাপারটি কোন আকস্মিক ঘটনা মনে হয় না। পৃথিবীতে অবশ্যই কোন নতুন ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে। অতঃপর তারা স্থির করল যে, পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ও আনাচে-কানাচে জিনদের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে হবে। যথাযথ ঋজাখুজি করে এই নতুন ব্যাপারটি কি, তা জেনে আসবে। হেজায়ে প্রেরিত তাদের প্রতিনিধিদল যখন ‘নাখাল’ নামক স্থানে উপস্থিত হল, তখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন।

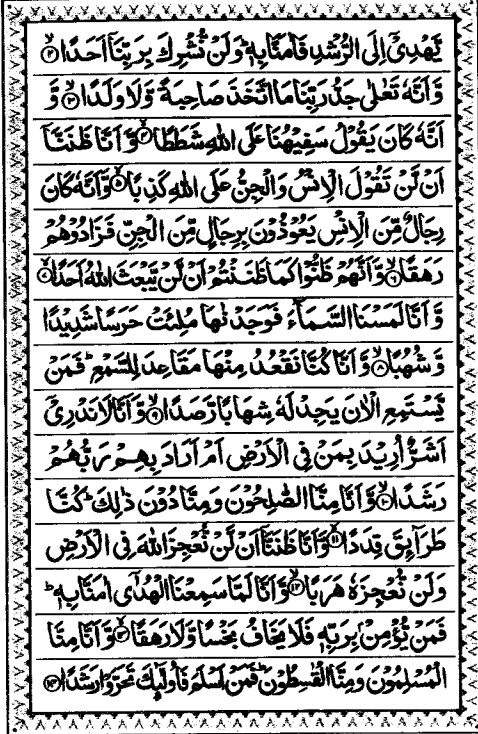
জিনদের এই প্রতিনিধিদল নামাযে কোরআন পাঠ শুনে পরস্পরে শপথ করে বলতে লাগল : এই কালামই আমাদের ও আকাশের খবরাদির

মধ্যে অন্তরায় হয়েছে। তারা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বজাতির কাছে ঘটনা বিবৃত করল এবং বলল :  আল্লাহ তাআলা এসব আয়াতে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তাঁর রসুলকে অবহিত করেছেন।

হযরত আবু তালেবের ইন্তেকালের পর আল্লাহর রসুল তায়েফবাসীদের নিকট দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওরা তাঁর কথা শোনার পরিবর্তে তাঁকে নির্মমভাবে অত্যাচার করেছিল ফলে নিরাশ হয়ে রসুলুল্লাহ (সাঃ) মক্কাভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ফেরার পথে তিনি ‘নাখলা’ নামক স্থানে অবস্থান করে শেষরাতে তাহাজ্জুদের নামায শুরু করেন। ইয়ামনের নহীবাইন শহরের জিনদের এক প্রতিনিধি দলও তখন সেখানে অবস্থানরত ছিল। তারা কোরআন পাঠ শুনল এবং শুনে বিশ্বাসস্থাপন করল। অতঃপর তারা স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তাআলা তারই আলোচনা করেছেন।—(মাহহারী)

জনৈক সাহাবীঃ জিনের ঘটনা : ইবনে জওযী (রহঃ) “আহ-ছফওয়া” গ্রন্থে হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এক জায়গায় জনৈক বৃদ্ধ জিনকে বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখেন। সে পশমের জোকা পরিহিত ছিল। হযরত সহল (রাঃ) বলেন : নামায সমাপনান্তে আমি তাকে সালাম করলে সে জওয়াব দিল ও বলল : তুমি এই জোব্বার চাকচিক্য দেখে বিস্মিত হচ্ছ? জোব্বাটি সাতশ’ বছর ধরে আমার গায়ে আছে। এই জোব্বা পরিধান করেই আমি ঈসা (আঃ)—এর সাথে সাক্ষাত করেছি। অতঃপর এই জোব্বা গায়েই আমি মুহাম্মদ (সাঃ)—এর দর্শন লাভ করেছি। যেসব জিন সম্পর্কে ‘সূরা জিন’ অবতীর্ণ হয়েছে, আমি তাদেরই একজন।—(মাহহারী)

হাদীসে বর্ণিত লায়লাতুল-জিনের ঘটনায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)—কে সাথে নিয়ে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর ইচ্ছাকৃতভাবে জিনদের কাছে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মক্কার অদূরে জঙ্গলে যাওয়া এবং কোরআন শোনানো উল্লেখিত আছে। এটা বাহ্যতঃ সূরায় বর্ণিত কাহিনীর পরবর্তী ঘটনা। আল্লামা খাফকাযী বর্ণনা করেন, নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, জিনদের প্রতিনিধিদল রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে একবার দু’বার নয়—ছয় বার আগমন করেছিল। অতএব, সূরার বর্ণনা ও হাদীসের বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপর্য্য নেই।



(২) যা সম্পর্ক প্রদর্শন করে। কলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না (৩) এবং আরও বিশ্বাস করি যে, আমাদের পালনকর্তার মহান মর্যাদা সবার উর্ধ্বে। তিনি কেন পল্লী গ্রহণ করেননি এক তাঁর কেন সন্তান নেই। (৪) আমাদের মধ্যে নির্বোধেরা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে বাড়াবাড়ির কথাবার্তা বলত। (৫) অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ ও জিন কখনও আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না। (৬) অনেক মানুষ অনেক জিনের আশ্রয় নিত, কলে তারা জিনদের আশ্রয়ভিত্তি বাড়িয়ে দিত। (৭) তারা ধারণা করত, যেমন তোমরা যখনও যাত্রা কর যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলা কখনও কাউকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। (৮) আমরা আকাশ পর্যবেক্ষণ করছি, অজ্ঞপ্তর দেখতে পেরছি যে, কঠোর গ্রহণী ও উল্কাপিণ্ড দু'রা আকাশ পরিপূর্ণ। (৯) আমরা আকাশের বিভিন্ন ধাঁচতে সংবাদ প্রচারে বসতাম। এখন কেউ সংবাদ শুনে চাইলে সে জলন্ত উল্কাপিণ্ডকে ঠেঁ পেতে থাকতে দেখে। (১০) আমরা জানি না পৃথিবীয়াসীদের অমলক সাধন করা অতীত, না তাদের পালনকর্তা তাদের মলক সাধন করার ইচ্ছা রাখেন। (১১) আমাদের কেউ কেউ সংকল্পগ্রাসন এবং কেউ কেউ প্ররশন নয়। আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথে বিতস্ত। (১২) আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলাকে পরাস্ত করতে পারব না এবং পরাস্ত করেও তাঁকে অপরক করতে পারব না। (১৩) আমরা যখন সুপথের নির্দেশ শুনলাম, তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। অতএব, যে তার পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস করে, সে লোকসান ও ক্ষয়-জবরনের আশঙ্কা করে না। (১৪) আমাদের কিছুসংখ্যক আত্মবহ এবং কিছুসংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আত্মবহ হয়, তারা সম্পূর্ণ বেছে নিচ্ছে।

وَإِنَّهُ تَعَلَّىٰ جَدُّ رَبِّنَا - وَإِنَّ শব্দের অর্থ শান, অবস্থা। আল্লাহ

তাআলার জন্যে বলা হয় —تَعَلَّىٰ جَدُّ— অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার শান উর্ধ্বে। এখানে সর্বনামের পরিবর্তে رَب শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। এতে শান উর্ধ্বে হওয়ার প্রমাণও এসে গেছে। কেননা, যিনি সৃষ্টির পালনকর্তা, তাঁর শানে যে উর্ধ্বে, তা বলাই বাহুল্য।

وَإِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ سَوِيحًا عَلَى الْمَوْشَطِ ۚ وَأَنَّهُ كَانَ تَعْلُ

وَإِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ سَوِيحًا عَلَى الْمَوْشَطِ ۚ - الش - শব্দের অর্থ অবাস্তর কথা,

অন্যায় ও জুলুম। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিন জিনরা এ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকার অজুহাত বর্ণনা করে বলেছে : আমাদের সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা আল্লাহ তাআলার শানে অবাস্তর কথাবার্তা বলত। অথচ আমরা মনে করতাম না যে, কোন মানব অথবা জিন আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলতে পারে। তাই বোকাদের কথায় আমরা আচ্ছ পর্যন্ত কুফর ও শিরকে লিপ্ত ছিলাম। এখন কোরআন শুনে আমাদের চক্ষু খুলেছে।

وَإِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ سَوِيحًا عَلَى الْمَوْشَطِ ۚ وَأَنَّهُ كَانَ تَعْلُ

—এই আয়াতে মুমিন জিনরা বলেছে : মূর্খতায়ুগে মানুষ যখন কোন

বিজ্ঞ প্রাপ্তরে অবস্থান করত, তখন প্রাপ্তরের জিনদের আশ্রয়গ্রহণ করত। এতে জিনরা মনে করে বসল আমরা মানবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মানবও আমাদের আশ্রয়গ্রহণ করে। এতে জিনদের পথভ্রষ্টতা আরও বেড়ে যায়।

وَإِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ سَوِيحًا عَلَى الْمَوْشَطِ ۚ وَأَنَّهُ كَانَ تَعْلُ

অভিধানে —سَاء— শব্দের অর্থ যেমন আকাশ, তেমনি মেঘমালা অর্থেও এর ব্যবহার ব্যাপক ও সুবিদিত। এখানে বাহ্যতঃ এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।

জিনরা আকাশের সংবাদ শোনার জন্যে মেঘমালা পর্যন্ত গমন করতো—আকাশ পর্যন্ত নয় : জিন ও শয়তানরা আকাশের সংবাদ শোনার জন্যে আকাশ পর্যন্ত যাওয়ার অর্থ মেঘমালা পর্যন্ত যাওয়া। এর প্রমাণ বোখারীতে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রাঃ)—এর এই হাদীস :

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে বলতে শুনেছি—ফেরেশতারা ‘ইনান’ অর্থাৎ, মেঘমালা পর্যন্ত অবতরণ করে। সেখানে আল্লাহ তাআলার জারিকৃত সিদ্ধান্তসমূহ পরস্পরে আলোচনা করে। শয়তানরা এখান থেকে এগুলো চুরি করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌছিয়ে দেয় এবং তাতে নিজেদের পক্ষ থেকে শত শত মিথ্যা বিষয় সংযোজন করে দেয়।—(মায়হারী)

বোখারীতেই আবু হুরায়রা (রাঃ)—এর এবং মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, এই ঘটনা আসল আকাশে সংঘটিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন আকাশে কোন হুকুম জারি করেন, তখন সব ফেরেশতা আনুগত্যসূচক পাখা নাড়া দেয়। এরপর তারা পরস্পরে সে বিষয়ে আলোচনা করে। খবরচোর শয়তানরা এই আলোচনা শুনে নেয় এবং তাতে অনেক মিথ্যা সংযোজন করে অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে পৌছিয়ে দেয়।

এই বিষয়বস্তু হযরত আয়েশা (রাঃ)—এর হাদীসের পরিপন্থী নয়। কেননা, এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে, শয়তানরা আসল আকাশে পৌছে খবর চুরি করে। বরং এটা সম্ভবপর যে, এসব খবর পর্যায়ক্রমে আকাশের

وَأَمَّا الْفٰسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۚ وَإِنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا
 عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً عَذًّا ۚ وَلَنَفْتَنَهُمْ فِيهِ
 وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۚ
 وَإِنَّ السَّجْدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۚ وَآيَةٌ
 لِّكَآفَا مَعَهُ اللَّهُ يَذَرُ عَصَاكَ كَاؤًا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًا ۚ
 قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۚ قُلْ إِنِّي لَا
 أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۚ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيبَنِي مِنَ
 اللَّهِ أَحَدٌ ۚ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ وَرِسَالَتُهُ ۚ وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَاتِلْ
 لَهُ تَارَجَهُمْ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا
 يُوعَدُونَ سَمِعُوا مَنْ أَمَرَ ۚ أَصَفَتْ نَاصِرًا وَاقِلٌ عَدُوَّهُ
 قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مِمَّا نُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ
 لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۚ عَلَيْهِ الْقَيْدُ فَلَا يَظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ
 أَحَدًا ۚ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ
 يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۚ

(১৫) আর যারা অন্যায়কারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন। (১৬) আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্যপথে কায়ম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম (১৭) যাতে এ ব্যাপারে তাদেরকে পরীক্ষা করি। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সুরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে উদীয়মান আঘাবে পরিচালিত করবেন। (১৮) এবং এই ওহীও করা হয়েছে যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ তাআলাকে সুরণ করার জন্য। অতএব, তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে ডেকো না। (১৯) আর যখন আল্লাহ তাআলার বান্দা তাকে ডাকার জন্যে দণ্ডায়মান হল, তখন অনেক জিন তার কাছে ভিড় জমাল। (২০) বলুন : আমি তো আমার পালনকর্তাকেই ডাকি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীরক করি না। (২১) বলুন : আমি তোমাদের কতি সাধন করার ও সুপথে আনয়ন করার মালিক নই। (২২) বলুন : আল্লাহ তাআলার কবল থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। (২৩) কিন্তু আল্লাহ তাআলার বাণী পৌছানো ও তাঁর পয়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করে, তার জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগ্নি। তথায় তারা চিরকাল থাকবে। (২৪) এমনকি যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি দেখতে পাবে, তখন তারা জানতে পারবে, কার সাহায্যকারী দুর্বল এবং কার সংখ্যা কম। (২৫) বলুন : আমি জানি না তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয় আসন্ন না আমার পালনকর্তা এর জন্যে কোন মেয়াদ স্থির করে রেখেছেন। (২৬) তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না। (২৭) তাঁর মনোনীত রসুল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে গ্রহণী নিযুক্ত করেন,

ফেরেশতাগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ফেরেশতাগণ মেঘমালা পর্যন্ত এসে সে সম্পর্কে আলোচনা করে। এখান থেকে শয়তানরা তা চুরি করে। পূর্বোক্ত হাদীসে তাই বলা হয়েছে।—(মাহহারী)

সারকথা, রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর নবুওয়ত লাভের পূর্বে আকাশের খবর চুরি ধারা বিনা বাধায় অব্যাহত ছিল। শয়তানরা নিবিঘ্নে মেঘমালা পর্যন্ত পৌছে ফেরেশতাগণের কাছে শুনে নিত। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর নবুওয়ত লাভের সময় তাঁর ওহীর হেফাযতের উদ্দেশে চুরির সুযোগ বন্ধ করে দেয়া হল এবং কোন শয়তান খবর চুরির নিয়তে উপরে গেলে তাকে লক্ষ্য করে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডে নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। চোর বিতাড়নের এই নতুন উদ্যোগ দেখেই শয়তান ও জিনরা চিন্তিত হয়ে পড়ে, কারণ অনুসন্ধানের জন্যে পৃথিবীর কোণে কোণে সন্ধানকারী দল খেরণ করেছিল। অতঃপর ‘নাখলা’ নামক স্থানে একদল জিন রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে কোরআন শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, যা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

উল্কাপিণ্ড পূর্বেও ছিল, কিন্তু রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর আমল থেকে একে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার হচ্ছে : প্রচলিত ভাষায় শাহাব নাকব বলা হয় তারকা বিচ্যুতিকে। আরবীতে এর জন্যে انقراض الكوكب শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই তারকা-বিচ্যুতির ধারা প্রাচীনকাল থেকেই অব্যাহত আছে। অথচ আয়াত থেকে জানা যায় যে, এটা রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর আমলের বৈশিষ্ট্য। এর জওয়াব এই যে, উল্কাপিণ্ডের অস্তিত্ব পূর্ব থেকেই ছিল। এর স্বরূপ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের ভাষা এই যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে কিছু আগ্নেয় পদার্থ শূন্যমণ্ডলে পৌছে এবং এক সময়ে তা প্রজ্বলিত হয়ে যায়। এটাও সম্ভবপর যে, কোন তারকা অথবা গ্রহ থেকে এই আগ্নেয় পদার্থ নির্গত হয়। যাই হোক না কেন, জগতের আদিকাল থেকেই এর অস্তিত্ব বিদ্যমান। তবে এই আগ্নেয় পদার্থকে শয়তান বিতাড়নের কাজে ব্যবহার রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর নবুওয়ত লাভের সময় থেকে শুরু হয়েছে। দৃষ্ট সব উল্কাপিণ্ডকে একাজে ব্যবহার করাও জরুরী নয়। সূরা হিজরে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

وَأَنَّا لَنَبْزِيَنَّ أَشْدُّا رِيْدَ يَمْنَنَ فِي الْأَرْضِ مَرَدًا يَوْمَ تُرْجَعُ رُشَدًا

—অর্থাৎ, খবর চুরি বন্ধ করার কারণ দ্বিবিধ হতে পারে—(১) পৃথিবীবাসীকে শাস্তি দেয়া, যাতে তারা আকাশের খবরাদি না পায়, (২) তাদের হেদায়েতের ব্যবস্থা করা, যাতে জিন ও শয়তান খোদায়ী ওহীতে কোনরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে না পারে।

فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَلْحَاقُ بِهِ خُشَا وَلَا رَهَقًا

অপেক্ষা কম দেয়া এবং رَهَق শব্দের অর্থ লাল্হনা ও অপমান। উদ্দেশ্য এই যে, মুমিনের প্রতিদান কম দেয়া হবে না এবং পরকালে তার কোন লাল্হনা হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَأَنَّ السَّجْدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

এর বহুবচন। এর এক অর্থ উপাসনালয় হতে পারে। আয়াতের অর্থ এই যে, মসজিদসমূহ কেবল আল্লাহ তাআলার এবাদতের জন্যে নির্মিত হয়েছে। অতএব, তোমরা মসজিদে যেয়ে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে সাহায্যের জন্যে ডেকো না; যেমন ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা তাদের

উপাসনালয়সমূহে এ ধরনের শেরেকী করে থাকে। সুতরাং আয়াতের সারমর্ম এই যে, মসজিদসমূহকে আশ্রয় বিশ্বাস ও মিথ্যা কর্মকাণ্ড থেকে পবিত্র রাখতে হবে।

এছাড়া مسجد শব্দটি এখানে مصدر ميمى হয়ে সেজদার অর্থেও হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, সকল সেজদা আল্লাহ্ তাআলার জন্যেই নির্দিষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অপরকে সাহায্যের জন্যে ডাকে, সে যেন তাকে সেজদা করে। অতএব অপরকে সেজদা করা থেকে বিরত থাক।

উস্মতের ইজমা তথা ঐকমত্যে আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত অপরকে সেজদা করা হারাম এবং কোন কোন আলোমের মতে কুফর।

قُلْ إِنِ ادْعَاؤُكُمْ أَقْرَبُ مِمَّا مَوْعُودُونَ أَوْ يَجْعَلَ لَهُ إِلَهًا—এখানে প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা রসূলকে আদেশ করেছেন, যেসব অবিশ্বাসী আপনাকে কেয়ামতের নির্দিষ্ট দিন-তারিখ বলে দেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করে, তাদেরকে বলে দিন : কেয়ামতের আগমন ও হিসাব-নিকাশ নিশ্চিত ; কিন্তু তার নির্দিষ্ট দিন-তারিখ আল্লাহ্ তাআলা কাউকে বলেননি। তাই আমি জানি না কেয়ামতের দিন আসন্ন না আমার পালনকর্তা এর জন্য দীর্ঘ মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিবেন। দ্বিতীয় আয়াতে এর দলীল বর্ণনা করা হয়েছে যে,

—অর্থাৎ আমার না জানার কারণ এই যে, আমি ‘আলেমুল-গায়ব’ নই ; বরং আলেমুল গায়ব বিশেষণটি একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণ। আর তিনি এ ব্যাপারে কাউকে অবহিত করেন না।

এখানে কোন নির্বোধ ব্যক্তির মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন কোন গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেন না, তখন তিনি রসূল হলে কীভাবে? কেননা, রসূলের কাছে আল্লাহ্ তাআলা হাজারো গায়বের বিষয় ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেন। যার কাছে ওহী আসে না, সে নবী ও রসূল হতে পারে না। এই প্রশ্নের জওয়াবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে পরবর্তী আয়াতে ব্যতিক্রম বর্ণনা করা হয়েছে।

গায়ব ও গায়বের খবরের মধ্যে পার্থক্য : الْأَمِّنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَكُنَا لَكَ يَتَكَلَّمُ وَمَنْ يُكَلِّمُهُ وَلَوْ كَانَ مِنْكُمْ رَسَدًا — উপরোক্ত বোকাসুলভ প্রশ্নের জওয়াব এই ব্যতিক্রমের الْأَمِّنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ। অর্থাৎ, রসূল গায়ব জানেন না—এ কথার অর্থ যে কোন গায়ব জানেন না নয়। বরং রেসালতের জন্যে যে পরিমাণ গায়বের ও খবর অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান কোন রসূলকে দেয়া অপরিহার্য, সেই পরিমাণ গায়বের খবর ওহীর মাধ্যমে রসূলকে দান করা হয়েছে এবং তার খুবই

সংরক্ষিত পাথে দান করা হয়েছে। যখন রসূলের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তার চতুর্দিকে ফেরেশতাগণের প্রহরা থাকে, যাতে শয়তান কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম না হয়। এখানে রসূল শব্দ দ্বারা প্রথমে রসূল ও নবীকে প্রদত্ত গায়বের প্রকার নির্ধারণ করা হয়েছে যে, তা হচ্ছে শরীয়ত ও বিধি-বিধানের জ্ঞান এবং সমযোপযোগী গায়বের খবর। এরপর পরবর্তী বাক্যে আরও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, এসব খবর ফেরেশতাগণের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার চূতশার্শে অন্যান্য ফেরেশতাগণের প্রহরা নিয়োগ করা হয়। এথেকে বোঝা গেল যে, এই ব্যতিক্রমের মাধ্যমে নবী ও রসূলের রেসালতের জন্যে প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রকারের গায়ব সপ্রমাণ করা হয়েছে।

অতএব, পরিভাষায় এই ব্যতিক্রমকে استثناء منقطع বলা হয়। অর্থাৎ, যে গায়ব সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কেউ জানে না, ব্যতিক্রমের মাধ্যমে সেই গায়ব প্রমাণ করা হয়নি ; বরং বিশেষ ধরনের ‘এলমে-গায়ব’ প্রমাণ করা হয়েছে। কোরআনের স্থানে স্থানে একে كُنَّا الشَّيْءِ الْعَلِيِّ শব্দের অভিহিত করা হয়েছে। এক আয়াতে আছে—

مِنْ كُنَّا الشَّيْءِ الْعَلِيِّ نُوْحِي إِلَيْكَ

কোন কোন অজ্ঞ লোক গায়ব ও গায়বের খবরের মধ্যে পার্থক্য বোঝে না। তারা পয়গম্বরগণের জন্যে বিশেষতঃ শেষ নবী (সাঃ)—এর জন্যে সর্বপ্রকার এলমে-গায়ব সপ্রমাণ করার প্রয়াস পায় এবং তাঁকে আল্লাহ্ তাআলার অনুরূপ আলেমুল-গায়ব তথা সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞানবান মনে করে। এটা পরীক্ষার শিরক এবং রসূলকে আল্লাহ্ তাআলার আসনে আসীন করার অপপ্রয়াস বৈ নয়।—(নাউয়বিল্লাহ) যদি কোন ব্যক্তি তার ভেদ তার বন্ধুকে বলে দেয়, এতে দুনিয়ার কেউ বন্ধুকে আলেমুল-গায়ব আখ্যা দিতে পারে না। এমননিভাবে পয়গম্বরগণকে ওহীর মাধ্যমে হাজারো গায়বের বিষয় বলে দেয়ার কারণ তাঁর আলেমুল-গায়ব হয়ে যাবেন না। অতএব, বিষয়টি উত্তমরূপে বোঝে নেয়া দরকার।

এক শ্রেণীর সাধারণ মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করে না। ফলে তাদের কাছে যখন বলা হয় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ‘আলেমুল-গায়ব’ নন, তখন তারা এই অর্থ বোঝে যে, নাউয়বিল্লাহ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোন গায়বের খবর রাখেন না। অথচ দুনিয়াতে কেউ এর প্রবক্তা নয় এবং হতে পারে না। কেননা, এরূপ হলে খোদা নবুওয়ত ও রেসালতই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তাই কোন মুমিনের পক্ষেই এরূপ বিশ্বাস করা সম্ভবপর নয়।



সূরা মুযায্মিল

মকায় অবতীর্ণ : আয়াত ২০

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) হে বশ্রাবৃত, (২) রাত্রিতে দণ্ডায়মান হোন কিছু অংশ বাদ দিয়ে, (৩) অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম (৪) অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কোরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে। (৫) আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। (৬) নিশ্চয় এবাদতের জন্যে রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উদ্ভারণের অনুকূল। (৭) নিশ্চয় দিবাভাগে রয়েছে আপনার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। (৮) আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন। (৯) তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব, তাঁকেই গ্রহণ করুন কর্মবিধায়করূপে। (১০) কাফেররা যা বলে, তজ্জন্মে আপনি সবার করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন। (১১) বিস্তৃত বৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দিন এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দিন। (১২) নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড। (১৩) গলগ্রহ হয়ে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৪) যেদিন পৃথিবী পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে বহমান বায়ুসূচক। (১৫) আমি তোমাদের কাছে একজন রসূলকে তোমাদের জন্যে সাক্ষী করে প্রেরণ করেছি, যেমন প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউনের কাছে একজন রসূল।

সূরার উপসংহারে বলা হয়েছে— অর্থাৎ,

প্রত্যেক বস্তুর পরিসংখ্যান আল্লাহ তাআলারই গোচরীভূত। পাহাড়ের অভ্যন্তরে কি পরিমাণ অণু-পরমাণু রয়েছে, সারা বিশ্বের জলধিসমূহের মধ্যে কি পরিমাণ জলবিন্দু আছে, প্রত্যেক বৃষ্টিতে কতসংখ্যক ফোঁটা বর্ষিত হয় এবং সারা জাহানের বৃক্ষসমূহের পাতের সঠিক পরিসংখ্যান তাঁর জানা আছে। সমস্ত এলমে গায়ব যে আল্লাহ তাআলারই বিশেষ গুণ, আয়াতে একথা আবার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যাতে উপরোক্ত ব্যতিক্রম দেখে ভুল বোঝাবুঝিতে পতিত না হয়।

এলমে-গায়বের অর্থ ও তার বিস্তারিত বিধি-বিধান সূরা নমলের
فَلْيَعْلَمَنَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ
তফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা জিন সমাপ্ত

সূরা মুযায্মিল

শব্দদুয়ের মদثر পরবর্তী সূরায় ব্যবহৃত মজল -

يَا أَيُّهَا الْمَرْمُومُ - অর্থ প্রায় এক, অর্থাৎ, বশ্রাবৃত। উভয় সূরায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একটি সাময়িক অবস্থা ও বিশেষ গুণ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) ভীষণ ভয় ও উদ্বেগের কারণে তীব্র শীত অনুভব করছিলেন এবং বশ্রাবৃত হয়েছিলেন। সহীহ বোখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে, সর্ব প্রথম হেরা গিরি গুহায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ফেরেশতা জিবরাঈল আগমন করে ইকরা সূরায় প্রাথমিক আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান। ফেরেশতার এই অবতরণ ও ওহীর তীব্রতা প্রথম পর্যায়ে ছিল। ফলে এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর নিকট গমন করলেন এবং তীব্র শীত অনুভব করার কারণে বললেন, زملوني অর্থাৎ, আমাকে বশ্রাবৃত করে দাও, আমাকে বশ্রাবৃত করে দাও।' এরপর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ওহীর আগমন বন্ধ থাকে। বিরতির এই সময়কালকে “ফতরাতেল ওহী” বলা হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাদীসে এই সময়কালের উল্লেখ করে বলেন : একদিন আমি পথ চলা অবস্থায় হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, হেরা গিরিগুহার সেই ফেরেশতা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একজায়গায় একটি বুলন্ত চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁকে এই আকৃতিতে দেখে আমি প্রথম সাক্ষাতের ন্যায় আবার ভয়ে ও আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি গৃহে ফিরে এলাম এবং গৃহের লোকজনকে বললাম : আমাকে বশ্রাবৃত করে দাও। এই ঘটনার পরিশ্রেক্ষিতে يَا أَيُّهَا الْمَرْمُومُ আয়াত নাযিল হল।

এই হাদীসে কেবল এই আয়াতের কথাই বলা হয়েছে। এটা সম্ভবপর যে, একই অবস্থা বর্ণনা করার জন্যে يَا أَيُّهَا الْمَرْمُومُ বলেও সম্বোধন করা হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপের বর্ণনামুযায়ী এই আয়াতের ঘটনা পৃথকও হতে পারে। এভাবে সম্বোধন করার মধ্যে বিশেষ এক করুণা ও

অনুগ্রহ আছে। নিছক করুণা প্রকাশার্থে স্নেহ ও ভালবাসায় আশ্রিত হয়ে সাময়িক অবস্থার দ্বারাও কাউকে সম্বেদন করা হয়ে থাকে।—(রুহুল-মা'আনী) এই বিশেষভঙ্গিতে সম্বেদন করে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—কে তাহাজ্জুদের আদেশ করা হয়েছে এবং এর কিছু বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

তাহাজ্জুদ নামায়ের বিধানাবলী : **مُذْتَرٌ وَمُزْمَلٌ** শব্দদ্বয় থেকেই বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহ ইসলামের শুরুতে এবং কোরআন অবতরণের প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন পর্যন্ত পাঞ্জেরানা নামায় ফরয ছিল না। পাঞ্জেরানা নামায় যে'রাজের রাত্রিতে ফরয হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখের হাদীসদ্বয়ে বগভী (রহঃ) বলেন : এই আয়াতের আলোকে তাহাজ্জুদ অর্থাৎ, রাত্রির নামায় রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও সমগ্র উম্মতের উপর ফরয ছিল। এটা পাঞ্জেরানা নামায় ফরয হওয়ার পূর্বের কথা।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের নামায় কেবল ফরযই করা হয়নি; বরং তাতে রাত্রির কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ মশগুল থাকাও ফরয করা হয়েছে। কারণ, আয়াতের মূল আদেশ হচ্ছে কিছু অংশ বাদে সমস্ত রাত্রি নামায়ে মশগুল থাকা। কিছু অংশ বাদ দেয়ার বিবরণ পরে উল্লেখ করা হবে।

ইমাম বগভী (রহঃ) বলেন, এই আদেশ পালনার্থে রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ রাত্রি তাহাজ্জুদের নামায়ে ব্যয় করতেন। ফলে তাঁদের পদদ্বয় ফুলে যায় এবং আদেশটি বেশ কষ্টসাধ্য প্রতীয়মান হয়। পূর্ণ এক বছর পর এই সূরার শেষাংশ **فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ** অবতীর্ণ হলে দীর্ঘক্ষণ নামায়ে দণ্ডায়মান থাকার বাধ্যবাধকতা রহিত করে দেয়া হয় এবং বিষয়টি ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যস্ত করা হয় যে, যতক্ষণ নামায় পড়া সহজ মনে হয়, ততক্ষণ নামায় পড়াই তাহাজ্জুদের জন্যে যথেষ্ট। এই বিষয়বস্তু আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : যে'রাজের রাত্রিতে পাঞ্জেরানা নামায় ফরয হওয়ার আদেশ অবতীর্ণ হলে তাহাজ্জুদের আদেশ রহিত হয়ে যায়। তবে এরপরও তাহাজ্জুদ সুনাত থেকে যায়। কারণ, রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের নামায় পড়তেন।—(মায়হারী)

الْأَيُّ الْاَوَّلَى শব্দে সাথে আলিফ ও লাম সংযুক্ত হওয়ায় অর্থ হয়েছে সমস্ত রাত্রি নামায়ে মশগুল থাকুন। অর্থাৎ, আপনি সমস্ত রাত্রি নামায়ে মশগুল থাকুন কিছু অংশ বাদ দিয়ে। অতঃপর এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে : **رُفُفَةً أَوْ تَفَضُّلاً وَمِنْهُ لَكُمُ الْوُزْرُ عَلَيْهِ** অর্থ এখন আপনি অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম অথবা কিছু বেশী নামায়ে মশগুল হোন। এটা **الْأَيُّ الْاَوَّلَى** ব্যতিক্রমের বর্ণনা। তাই প্রশ্ন হয় যে, অর্ধেক রাত্রি তো কিছু অংশ হতে পারে না। জওয়াব এই যে, রাত্রির প্রাথমিক অংশ তো মাগরিব ও এশার নামায় ইত্যাদিতে অতিবাহিতই হয়ে যায়। এখন অর্ধেকের অর্থ হবে অবশিষ্ট রাত্রির অর্ধেক। সেটা সারা রাত্রির তুলনায় কিছু অংশ। আয়াতে অর্ধরাত্রির কমেও অনুমতি আছে, বেশীও আছে। তাই সমষ্টিগতভাবে এর সারমর্ম এই যে, কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ রাত্রির চেয়ে কিছু বেশী নামায়ে মশগুল থাকা ফরয।

ফরয এর অর্থ : **ترتيل** এর শাব্দিক অর্থ সহজ ও সঠিকভাবে বাক্য উচ্চারণ করা।—(মুফরাদাত) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দ্রুত কোরআন তেলাওয়াত করবেন না; বরং সহজভাবে এবং অস্তুনিহিত অর্থ সম্পর্কে চিন্তা বাবনা করে উচ্চারণ করবেন।—(কুরতুবী) **وَرَتَّلِي** বলে রাত্রির

নামায়ে করণীয় কি, তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, তাহাজ্জুদের নামায় কেরাআত, তসবীহ, রুকু, সেজদা ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত হলেও তাতে আসল উদ্দেশ্য কোরআন পাঠ। একারণেই সহীহ হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) তাহাজ্জুদের নামায় অনেক লম্বা করে আদায় করতেন। সাহাবী ও তাবয়ীগণেরও এই অভ্যাস ছিল।

এ থেকে আরও জানা গেল যে, কেবল কোরআন পাঠই কাম্য নয় বরং তরতীল তথা সহজ ও সঠিকভাবে পাঠ কাম্য। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এভাবেই পাঠ করতেন। রাত্রির নামায়ে তিনি কিরণে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, এই প্রশ্নের জওয়াবে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর কেরাআত অনুকরণ করে শোনান তাতে প্রত্যেকটি হরফ স্পষ্ট ছিল।—(মায়হারী)

যথাসম্ভব সুললিত স্বরে তেলাওয়াত করাও তরতীলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)—এর বর্ণিত হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে, নবী সশব্দে সুললিত স্বরে তেলাওয়াত করেন, তাঁর কেরাআতের মত অন্য কারও কেরাআত আল্লাহ তাআলা শুনে না।—(মায়হারী)

হযরত আলকামা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে সুমধুর স্বরে তেলাওয়াত করতে দেখে বললেন : **لَقَدْ رَتَلَ الْقُرْآنَ فِدَاءَ أَبِي وَامِي** সে কোরআনে তরতীল করেছে; আমার পিতামাতা তার জন্যে উৎসর্গ হোন।—(কুরতুবী)

তবে পরিস্কার ও বিশুদ্ধ উচ্চারণসহ শব্দের অস্তুনিহিত অর্থ চিন্তা করে তদুদ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়াই আসল তরতীল। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করে রুন্দন করতে দেখে বলেছিলেন : আল্লাহ তাআলা **وَرَتَّلِي الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا** আয়াতের যে তরতীলের আদেশ করেছেন, এটাই সেই তরতীল।—(কুরতুবী)

قَوْلُ تَبِيل - اِنَّا سَنُلْقِيكَ قَوْلًا تَفَتِيلًا (ভারী কালাম) বলে

কোরআন পাক বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআনে বর্ণিত হালাল, হারাম, জায়েয ও নাজায়েযের সীমা স্থায়ীভাবে মেনে চলা স্বভাবতঃ ভারী ও কঠিন। তবে যার জন্যে আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেন, তার কথা স্বতন্ত্র। কোরআনকে ভারী বলার আরেক কারণ এই যে, কোরআন নাখিল হওয়ার সময় রসুলুল্লাহ (সাঃ) বিশেষ ওজ্ঞন ও তীব্রতা অনুভব করতেন। ফলে প্রচণ্ড শীতেও তাঁর মস্তক ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। তিনি তখন কোন উটের উপর সওয়ার থাকলে বোঝার কারণে উট নুয়ে পড়ত।—(বুখারী)

এই আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষকে কষ্টে অভ্যস্ত করার জন্যে তাহাজ্জুদের আদেশ দেয়া হয়েছে। রাত্রিকালে নিদ্রার প্রাবল্য এবং মানসিক সুখের বিরুদ্ধে এটা একটা জেহাদ। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে কোরআনে অবতীর্ণ কষ্টসাধ্য ও ভারী বিধি-বিধান সহ্য করা সহজ হয়ে যাবে।

اِنْ تَاشَاءُ الْاَيُّ الْاَوَّلَى শব্দটি ধাতু। এর অর্থ রাত্রির নামায়ের জন্যে দণ্ডায়মান হওয়া। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন : এর অর্থ রাত্রিতে নিদ্রার পর নামায়ের জন্যে গাত্রোথান করা। তাই এর অর্থ হয়ে গেছে তাহাজ্জুদ। কারণ, এর শাব্দিক অর্থও রাত্রিতে নিদ্রার পর উঠে নামায় পড়া। ইবনে কায়সান (রহঃ) বলেন : শেষরাতে গাত্রোথান করাকে **اَيُّ الْاَوَّلَى** বলা হয়। ইবনে যায়দ (রহঃ) বলেন : রাত্রির যে অংশে কোন নামায় পড়া হয়, তা **اَيُّ الْاَوَّلَى** এর অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আবী মুলায়কা (রহঃ) এক

প্রশ্নের জওয়াবে হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে যু'বায়র (রহঃ)ও তাই বলেছেন।—(মায়হারী)

এসব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে রাত্রির যে কোন অংশে যে নামায পড়া হয়, বিশেষতঃ এশার পর যে নামায পড়া হয়, তাই **قِيَامُ اللَّيْلِ** এর মধ্যে দাখিল, যেমন হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ), সাহাবায়ে কেরাম, তাবয়ীন ও যুগুগণ সর্বদাই এই নামায নিদ্রার পর শেষরাতে জাগ্রত হয়ে পড়তেন। তাই এটা উত্তম, ও অধিক বরকতের কারণ। তবে এশার নামাযের পর যে কোন নফল নামায পড়া যায়, তাতে তাহাজ্জুদের সুন্নত আদায় হয়ে যায়।

وَإِذَا شَأْنُكَ - **وَإِذَا** শব্দে দু'রকম কেরাআত আছে। প্রসিদ্ধ

কেরাআতে ওয়াও এর উপর যবর এবং হ্রোয়া সাকিন করে অর্থ দলন করা, পিষ্ট করা। আয়াতের অর্থ এই যে রাত্রির নামায প্রবৃতিদলনে খুবই সহায়ক; অর্থাৎ, এতে করে প্রবৃত্তিকে বশে রাখা এবং অবৈধ বাসনা থেকে বিরত রাখার কাজে সাহায্য পাওয়া যায়। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই কেরাআত অবলম্বন করা হয়েছে। দ্বিতীয় কেরাআত হচ্ছে **كُتِبَ** এর ওজনে **وَإِذَا** এমতাবস্থায় এটা অনুকূল হওয়ার অর্থে ধাতু। **وَإِذَا** আয়াতেও শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে য়ায়েদ (রাঃ) থেকে এই অর্থই বর্ণিত আছে। ইবনে য়ায়েদ (রাঃ) বলেন : উদ্দেশ্য এই যে, রাত্রিতে নামাযের জন্যে গাত্রোখান করা অন্তর, দৃষ্টি, কর্ণ ও জিহবার মধ্যে পারস্পরিক একাত্মতা সৃষ্টিতে খুবই কার্যকর।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : **وَإِذَا** এর অর্থ এই যে, কর্ণ ও অন্তরের মধ্যে তখন অধিকতর একাত্মতা থাকে। কারণ, রাত্রিবেলায় সাধারণতঃ কাজকর্ম ও হট্টগোল থাকে না। তখন মুখ থেকে যে বাক্য উচ্চারিত হয়, কর্ণও তা শুনে ও অন্তরও উপস্থিত থাকে।

وَإِذَا শব্দের অর্থ অধিক সঠিক। অর্থাৎ, রাত্রিবেলায় কোরআন তেলাওয়াত অধিক শুদ্ধতা ও স্থিরতা সহকারে হতে পারে। কারণ, তখন বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি ও হট্টগোল দ্বারা অন্তর ও মস্তিষ্ক ব্যাকুল হয় না।

পূর্ববর্তী আয়াতের ন্যায় এই আয়াতেও তাহাজ্জুদের রহস্য ও বর্ণিত হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী **وَإِذَا** আয়াতে বর্ণিত রহস্যটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর নিজ সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং এই আয়াতে বর্ণিত রহস্যটি সমস্ত উম্মতের জন্যে ব্যাপক।

وَإِذَا শব্দের অর্থ প্রবাহিত হওয়া ও ঘোরাকোলা করা। এ কারণেই সীতার কাটাকেও **سَبَحَ** ও **سَبَّحَ** বলা হয়। এখানে এর অর্থ দিনমানের কর্মব্যস্ততা, শিক্ষা দেয়া, প্রচার করা, মানবজাতির সংশোধনের নিমিত্ত অথবা নিজের জীবিকার আন্বেষণে ঘোরাকোলা করা ইত্যাদি সবই এতে দাখিল।

এই আয়াতে তাহাজ্জুদের তৃতীয় রহস্য ও উপযোগিতা বর্ণিত হয়েছে। এটাও সবার জন্যে ব্যাপক। রহস্য এই যে, দিবাভাগে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও অন্যান্য সবাইকে অনেক কর্মব্যস্ততায় থাকতে হয়। ফলে একাগ্রচিন্তে এবাদতে মনোনিবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই রাত্রি একাজের জন্যে থাকা উচিত যে, প্রয়োজন মাফিক নিদ্রা ও আরাম এবং তাহাজ্জুদের এবাদতও হয়ে যায়।

জ্ঞাতব্য : ফেকাহবিদগণ বলেন : যেসব আলেম ও মাশায়েখ জনগণের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন, এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাদেরও এ কাজ দিবাভাগে সীমিত রেখে রাত্রিতে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিতি ও এবাদতে মগ্ন হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলেমগণের কর্মপদ্ধতি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তবে যদি কোন সময় রাত্রিবেলায়ও উপরোক্ত দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তা ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে প্রয়োজনমাফিক ব্যতিক্রম হতে পারে। এর সাক্ষ্যও অনেক আলেম ও ফেকাহবিদের কর্ম থেকে পাওয়া যায়।

وَإِذَا شَأْنُكَ - **وَإِذَا** এর শাব্দিক অর্থ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ তাআলার এবাদতে মগ্ন হওয়া। পূর্ববর্তী আয়াতে তাহাজ্জুদের নামাযের আদেশ দেয়ার পর এই আয়াতে এমন এক এবাদতের আদেশ দেয়া হয়েছে, যা রাত্রি অথবা দিনের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়; বরং সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অব্যাহত থাকে। তা হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করা। এখানে সদাসর্বদা অব্যাহত রাখার অর্থে আল্লাহকে স্মরণ করার আদেশ করা হয়েছে। কেননা, একথা কল্পনাও করা যায় না যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন সময় আল্লাহকে স্মরণ করতেন না, তাই এ আদেশ করা হয়েছে।—(মায়হারী) আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে দিবারাত্রি সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে; এতে কোন সময় অবহেলা ও অবনবধানতাকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। এটা তখনই হতে পারে, যখন স্মরণ করার অর্থ ব্যাপক নেয়া হয়; অর্থাৎ, মুখে, অন্তরে অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যাপ্ত রেখে ইত্যাদি যে কোন প্রকারে স্মরণ করা। এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন : **كَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حِينٍ** অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করতেন। এটাও উপরোক্ত ব্যাপক অর্থে শুদ্ধ হতে পারে। কেননা, প্রস্রাব-পায়খানার সময় তিনি যে মুখে আল্লাহকে স্মরণ করতেন না, একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তবে আন্তরিক স্মরণ সর্বাবস্থায় হতে পারে। আন্তরিক স্মরণ দুই প্রকার। - (১) শব্দ কল্পনা করে স্মরণ করা এবং (২) আল্লাহর গুণাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।—(মাওলানা থানভী)

আলোচ্য আয়াতের দ্বিতীয় আদেশ **وَإِذَا شَأْنُكَ** অর্থাৎ, আপনি সমগ্র সৃষ্টি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিবিধানে ও এবাদতে মগ্ন হোন। এর সাধারণ অর্থে এবাদতে শিরক না করাও দাখিল এবং নিজের সমস্ত কর্মকাণ্ডে তথা উঠাবসায়, চলাফেরায় দৃষ্টি ও ভরসা আল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ রাখা এবং অপরকে লাভ-লোকসান ও বিপদাপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে না করাও দাখিল। হযরত ইবনে য়ায়েদ (রাঃ) বলেন : **وَإِذَا** এর অর্থ দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুকে পরিত্যাগ করা এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করা।—(মায়হারী) কিন্তু এই **وَإِذَا** তথা দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ সেই **رَهْبَانِيَّة** তথা বৈরাগ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে এবং হাদীসে **الاسلام** বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। কেননা, শরীয়তের পরিভাষায় **رَهْبَانِيَّة** এর অর্থ দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং ভোগ সামগ্রী ও হালাল বস্তুসমূহকে এবাদতের নিয়তে পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ, এরূপ বিশ্বাস থাকা যে, এসব হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হতে পারে না, অথবা ওয়াজিব হকে ত্রুটি করে কার্যতঃ সম্পর্কচ্ছেদ করা। আর এখানে যে সম্পর্কচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে, তা এই যে, বিশৃঙ্খলভাবে অথবা কার্যগতভাবে আল্লাহর সম্পর্কের উপর

কোন সৃষ্টির সম্পর্কে প্রবল হতে না দেয়া। এ ধরণের সম্পর্কচ্ছেদ বিবাহ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি যাবতীয় সাংসারিক কাজ-কারবারের পরিপন্থী নয়; বরং এগুলোর সাথে জড়িত থেকেও এটা সম্ভবপর। পয়গম্বুরগণের সন্নত; বিশেষতঃ পয়গম্বুরকুল শিরোমণি মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর সমগ্র জীবন ও আচারাতি এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আয়াতে تَبٰلٍ শব্দ দ্বারা যে অর্থ ব্যক্ত করা হয়েছে, পূর্ববর্তী বুয়ুগানে-দ্বীনের ভাষায় এরই অপর নাম 'ইখলাস'।—(মাহহারী)

জ্ঞাতব্য : অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং সাংসারিক সম্পর্ক ত্যাগ করার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সুফী বুয়ুগগণ সবার অগ্রণী ছিলেন। তাঁরা বলেন : আমরা যে দূরত্ব অতিক্রম করার কাজে দিবারাত্রি মশগুল আছি, প্রকৃতপক্ষে তার দু'টি স্তর আছে— প্রথম স্তর সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয় স্তর আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা। উভয় স্তর পরস্পরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আলোচ্য আয়াতে এ দু'টি স্তরই পর পর দুই বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। (১) وَتَبٰلٍ اِلَيْهِ (২) وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ (৩) تَبٰلٍ

এখানে আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ সার্বজনিকভাবে স্মরণ করা, যাতে কখনও ক্রটি ও শৈথল্য দেখা না দেয়। এই স্তরকেই সুফী-বুয়ুগগণের পরিভাষায় الوصول الى الله আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা বলা হয়। এভাবে প্রথম বাক্যে শেষ স্তর এবং শেষ বাক্যে প্রথম স্তর উল্লেখিত হয়েছে। এই ক্রম পরিবর্তনের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, দ্বিতীয় স্তরই আল্লাহর পথের পথিকের আসল উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য। তাই এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত করার জন্যে স্বাভাবিক ক্রম পরিবর্তন করা হয়েছে। শেখ সাদী (রহঃ) উপরোক্ত দু'টি স্তর চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেনঃ—

ইসমে যাভের যিকর অর্থাৎ, বার বার 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলাও এবাদত : আয়াতে ইসম শব্দ উল্লেখ করে وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ বলা হয়েছে এবং وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ইসমে যাত অর্থাৎ, আল্লাহ বার বার উচ্চারণ করাও আদিষ্ট বিষয় ও কাম্য। — (মাহহারী) কোন কোন আলেম একে বিদআত বলেছেন। আয়াত থেকে জানা গেল যে, তাদের এই উক্তি ঠিক নয়।

رَبِّ الشُّرَى وَالْمَغْرِبِ اِلَالَهُ الْاَوَّلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ وَكَوْنُكَ যাকে কোন কাজ সোপান করা হয়, অভিধানে তাকে وكيل বলা হয়। কাজেই وَكَوْنُكَ বাক্যের অর্থ এই যে, নিজের সব কাজ-কারবার ও অবস্থা আল্লাহর কাছে সোপান কর। পরিভাষায় একেই তাওয়াক্কুল বলা হয়। এই সূরায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রদত্ত নির্দেশাবলীর মধ্যে এটা পঞ্চম নির্দেশ। ইমাম ইয়াকুব কারবী (রহঃ) বলেন : সূরার শুরু থেকে এই আয়াত পর্যন্ত সলুক তথা আল্লাহর পথে চলার পাঁচটি স্তরের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে (১) রাত্রিবেলায় আল্লাহর এবাদতের জন্যে নির্জনে গমন, (২) কোরআন পাকে মশগুল হওয়া, (৩) সদা-সর্বদা আল্লাহর স্মরণ (৪) সৃষ্টির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং (৫) তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুলের সর্বশেষ নির্দেশ দেয়ার পূর্বে আল্লাহ তাআলার গুণ رَبِّ الشُّرَى وَالْمَغْرِبِ বর্ণনা করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে পবিত্র সত্তা পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা জাহানের পালনকর্তা এবং সারা জাহানের প্রয়োজনাদি আগা গোড়া পূর্ণ করার যিস্মাদার, একমাত্র তিনিই তাওয়াক্কুল ও ভরসা করার যোগ্য হতে পারেন

এবং তাঁর যে ব্যক্তি ভরসা করবে, সে কখনও বঞ্চিত হবে না।

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَفْعُلُونَ ইমাম কারবী (রহঃ)-এর উক্তিমাতে এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রদত্ত স্বত্ব নির্দেশ। অর্থাৎ, মানুষের উৎপীড়ন ও গালিগালাজে সবর করা। এটা আল্লাহর পথের পথিকের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। উদ্দেশ্য এই যে, যাদের শুভেচ্ছায় ও সহানুভূতিতে সাধক তার সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও জীবন নিয়োজিত করে, প্রতিদিনে তাদের পক্ষ থেকেই নির্যাতন ও গালি-গালাজ শুনে উত্তম সবর করবে এবং প্রতিশোধ গ্রহণের কল্পনাও করবে না। সুফীগণের পরিভাষায় এই সর্বোচ্চ স্তর নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করা ব্যতীত অর্জিত হয় না।

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَفْعُلُونَ এর শাব্দিক অর্থ বিষণ্ণ ও দুঃখিত মনে কোনকিছুকৈ ত্যাগ করা। অর্থাৎ, মিথ্যারোপকারী কাকেররা আপনাকে যেসব গীড়াদায়ক কথাবার্তা বলে, আপনি সেসবের প্রতিশোধ নিবেন না ঠিক, কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্কও রাখবেন না। সম্পর্ক ত্যাগ করার সময় মানুষের অভ্যাস এই যে, যার সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করা হয়, তাকে গালমন্দ দেয়। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্পর্ক ত্যাগের আদেশ দিতে যেয়ে فَصَحْرًا جَبِينًا শব্দ যোগ করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, আপনার উচ্চ পদমর্যাদার খাতিরে আপনি কাকেরদের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করবেন এবং মুখও তাদেরকে মন্দ বলবেন না।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : পরবর্তীতে অবতীর্ণ জেহাদের আদেশ সম্বলিত আয়াত দ্বারা এই আয়াতের নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু চিন্তা করলে এরূপ বলার প্রয়োজন নেই। কেননা, আলোচ্য আয়াতে কাকেরদের উৎপীড়নের কারণে সবর ও সম্পর্ক ত্যাগ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এটা হুমকি, শাস্তি ও জেহাদের পরিপন্থী নয়। এই আয়াতের নির্দেশ সর্বদা ও সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য এবং জেহাদে যে শান্তির হুমকি আছে তার আদেশ বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রযোজ্য। এছাড়া ইসলামী জেহাদ কোন প্রতিশোধ স্পৃহা ও ক্রোধবশতঃ করা হয় না, যা সবর ও উত্তম সম্পর্ক ত্যাগের পরিপন্থী হবে। বরং জেহাদ বিশেষ খোদায়ী আদেশ প্রতিপালন মাত্র। সাধারণ অবস্থায় সবর ও সম্পর্ক ত্যাগও তেমনি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সান্নাতির জন্যে কাকেরদের পরকালীন আযাব বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী অত্যাচার-অবিচারের কারণে আপনি দুঃখিত হবেন না। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন। তবে বিশেষ রহস্যের তাগিদে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। পরবর্তী আয়াত وَدَعْنِي وَالْكَافِرِينَ اُولَى النَّفْسَةِ وَهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ এর মর্ম তাই।

এতে কাকেরদেরকে اُولَى النَّفْسَةِ বলা হয়েছে। نفعة শব্দের অর্থ ভোগ-বিলাস, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রাচুর্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও ভোগ-বিলাস মত্ত হয়ে যাওয়া পরকাল অবিশ্বাসীরই কাজ হতে পারে। মুমিনও মাঝে মাঝে এগুলো প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে তাতে মত্ত হয়ে পড়ে না। দুনিয়ার আরাম-আয়েশের মধ্যে থেকেও তার অন্তর পরকাল চিন্তা থেকে মুক্ত হয় না।

অতঃপর পরকালের কঠিনতম শাস্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে انكال শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ আটকাবস্থা ও শিকল। এরপর জাহান্নামের উল্লেখ করে জাহান্নামীদের ভয়াবহ খাদ্যের কথা আছে وَكَطَامًا ذَاغْمَةً এর অর্থ গলগ্রহ খাদ্য। অর্থাৎ, যে খাদ্য গলায় এমনভাবে আটকে যায় যে, গলম্বঃকরণও করা যায় না এবং উদগীরণও করা যায় না। জাহান্নামীদের খাদ্য যরী ও যাক্কুমের অবস্থা তাই হবে।

المزمل ৮

৫৮

تَبٰرَكَ الَّذِي ١٩

فَقَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ۝
 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ
 شِيبًا ۚ إِنَّ السَّمَاءَ مُنْقَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝
 إِنَّ هَٰذَا مِن ذِكْرِهِ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝
 إِن زَكَاةً يُعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلَاثِي الْآيِلِ وَ
 نِصْفَهُ وَثُلَاثُهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ
 يُقَدِّرُ الْآيِلَ وَالنَّهَارَ عَلِيمًا ۚ إِنَّ تَحْصُوهُ فَتَابَ
 عَلَيْكُمْ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِيمًا ۚ
 سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
 يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَارِبُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُغْنِي
 لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ مِن خَيْرٍ ۚ نَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
 وَأَعَظَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ۝

(১৬) অতঃপর ফেরাউন সেই রসুলকে অমান্য করল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছি। (১৭) অতএব, তোমরা কিরূপে আত্মরক্ষা করবে যদি তোমরা সেদিনকে অস্বীকার কর, যেদিন বালককে করে দিবে বৃদ্ধ? (১৮) সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে। তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (১৯) এটা উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার দিকে পথ অবলম্বন করুক। (২০) আপনার পালনকর্তা জানেন, আপনি এবাদতের জন্যে দণ্ডায়মান হন রাত্রির প্রায় দু তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও দণ্ডায়মান হয়। আল্লাহ দিবা ও রাত্রি পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমপারায়ণ হয়েছেন। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশে-বিদেশে যাবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে জেহাদে লিপ্ত হবে। কাজেই কোরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। তোমরা নামায কয়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। তোমরা নিজেদের জন্যে যা কিছু অগ্রে পাঠাবে, তা আল্লাহর কাছে উত্তম আকারে এবং পুরস্কার হিসেবে বর্ধিতরূপে পাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমপ্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমশীল, দয়ালু।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : তাতে আগুনের কাঁটা থাকবে ; যা গলায় আটকে যাবে। - (নাউয়িব্লাহ্ মিনহ) শেষে বলা হয়েছে : وَعَدَايَايَا নিদ্রিষ্ট আযাব উল্লেখ করার পর একথা বলে এর আরও অধিক কঠোরতা ও অকম্পনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অতঃপর কেয়ামতের কিছু ভয়াবহ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে : يَوْمَ تَرْجَبُ এরপর কাকেরদের ফেরাউন ও হযরত মুসার কাহিনী শুনিবে সতর্ক করা হয়েছে যে, ফেরাউন পয়গম্বর মুসা (আঃ)-কে মিথ্যারোপ করে আযাবে গ্রেফতার হয়েছে, তোমরাও মিথ্যারোপ অব্যাহত রাখলে তোমাদের উপরও দুনিয়াতে এমন ধরনের আযাব আসতে পারে। শেষে বলা হয়েছে, দুনিয়াতে এরূপ আযাব না আসলেও কেয়ামতের সেই দিনের আযাবকে ঠেকাতে পারবে না, যেদিন ভয়াবহ ও দীর্ঘ হওয়ার কারণে বালককে বৃদ্ধে পরিণত করে দিবে। বাহ্যতঃ এতে কেয়ামতের ভয়াবহতা ও কঠোরতা বিবৃত হয়েছে। সেদিন এমন ভীতি ও ত্রাস দেখা দিবে যে, বালকও বৃদ্ধ হয়ে যাবে। কেউ কেউ একে উপমা বলেছেন এবং কারও মতে এটা বাস্তব সত্য। দিনটি এত দীর্ঘ হবে যে, বালক ও বৃদ্ধ বয়সে পৌছে যাবে।—(কুরতুবী, রুহুল-মা'আনী)

আনবঞ্চিক জাতব্য বিষয়

তাহাজ্জুদ আর ফরয নয় : সূরার শুরুতে ثُمَّ الْآيِل বলে রসুল্লাহ (সাঃ) ও সকল মুসলমানের উপর তাহাজ্জুদ ফরয করা হয়েছিল এবং এই নামায অর্ধরাত্রির কিছু কম অথবা কিছু বেশী এবং কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়াও ফরয ছিল। রসুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর একদল সাহাবী প্রায়ই রাত্রির অধিকাংশ সময় নামাযে অতিবাহিত করে এই ফরয আদায় করতেন। প্রতি রাত্রিতেই এই এবাদত এবং দিনের বেলায় দ্বীনের দাওয়াত ও প্রচারকার্য, তদুপরি ব্যক্তিগত প্রয়োজনাদি নির্বাহ করা নিঃসন্দেহে এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। এছাড়া সাহাবায়ে কোরামের অধিকাংশই মেহনত মজুরী অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। নিয়মিতভাবে এই দীর্ঘ নামায আদায় করতে করতে রসুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কোরামের পদমুগল ফুলে যায়। তাঁদের এই কষ্ট ও শ্রম আল্লাহ তাআলার অগোচরে ছিল না। কিন্তু তাঁর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল যে, এই পরিশ্রম ও মেহনতের এবাদত ক্ষণস্থায়ী হবে, যাতে তাঁরা পরিশ্রম ও সাধনায় অভ্যস্ত হয়ে যান। এর প্রতি اِنَّا سَنُلْقِيْكَ ذُرِّيًّا مَّثِيًّا আয়াতেও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এর চেয়ে ভারী ও গুরুত্বপূর্ণ বাণী কোরআনের দায়িত্ব আপনাকে সোপর্দ করা হবে, তাই আপনাকে এই কষ্ট ও পরিশ্রমে নিয়োজিত করা হয়েছে। সারকথা, আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী যখন এই সাধনা ও পরিশ্রমে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তাহাজ্জুদের ফরয রহিত করে দেয়া হল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর বর্ণনা অনুযায়ী এটাও হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াত দ্বারা কেবল দীর্ঘ নামায রহিত হয়েছে এবং আসল তাহাজ্জুদের নামায পূর্ববৎ ফরয রয়ে গেছে। অতঃপর যে'রাজের রাত্রিতে যখন পাঞ্জেশা নামায ফরয করা হল, তখন তাহাজ্জুদের নামায আর ফরয রইল না।

عَلِمَ أَنَّ كُنْ تَحْصُوهُ - শব্দের অর্থ গণনা করা। অর্থাৎ, আল্লাহ

তাআলা জানেন যে, তোমরা এর গণনা কররত পারবে না। কোন কোন তফসীরবিদের মতে উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদের নামাযে আল্লাহ তাআলা

রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এই নামাযে মশগুল থাকা অবস্থায় রাত্র কতটুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন ছিল। কেননা, তখনকার দিনে সময় জানার যন্ত্র ঘড়ি ইত্যাদি ছিল না। থাকলেও নামাযে মশগুল হয়ে বার বার ঘড়ির দিকে তাকানো তাঁদের অবস্থা ও খুশ-খুশুর পরিপ্রেক্ষিতে সহজ ছিল না। আবার কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এখানে احصاء শব্দের অর্থ দীর্ঘ সময় এবং নিদ্রার সময়ে প্রত্যহ যথারীতি নামায পড়তে সক্ষম না হওয়া। শব্দটি এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়; যেমন হাদীসে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, **مِنْ احْصَاها دَخَلَ الْجَنَّةَ** অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামসমূহকে কর্মের ভিতর দিয়ে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলে সে জন্মভূতে দাখিল হবে। সূরা ইবরাহীমের তফসীরেও এ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

فَتَابَ عَلَيْهِ تَوْبَةً - শব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহের তওবাকেও এ কারণে তওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। এখানে কেবল প্রত্যাহার বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ফরয তাহাজ্জুদের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অবশেষে বলা হয়েছে : **فَأَرْوُوا مَا تَبَيَّرْتُمُوهَا** অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের নামায, যা এখন ফরযের পরিবর্তে মোস্তাহাব অথবা সন্নত রয়ে গেছে, তাতে যে যতটুকু কোরআন সহজে পাঠ করতে পারে, পাঠ করুক। এর জন্যে নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই।

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ এখানে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে ফরয নামায বোঝানো হয়েছে। বলাবাহুল্য, ফরয নামায পাঁচটি যা মে'রাজের রাত্রিতে ফরয হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায এক বছর পর্যন্ত ফরয থাকে কালেই মে'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এরপর পূর্বোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ফরয তাহাজ্জুদ রহিত হয়েছে। সুতরাং সূরার শেষের **وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ** আয়াতে পাঞ্জগানা ফরয নামায বোঝানো যেতে পারে।—(ইবনে-কাসীর, কুরতুবী, বাহরে-মুহীত)

এমনিভাবে **وَإِذَا الزَّكَاةَ** বা ক্বো ফরয যাকাত বোঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ এই যে, যাকাত হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ফরয হয়েছে এবং এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে কোন কোন তফসীরবিদ বিশেষভাবে এই আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কিন্তু ইবনে-কাসীর বলেন : যাকাত মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ফরয হয়েছিল, কিন্তু তার নেসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও ফরয যাকাত বোঝানো যেতে পারে।— রুহুল-মা'আনীও তাই বলেছে।

وَإِذَا زُكِّيْتُمْ مَالَكُمْ আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে

ব্যক্ত করা হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছে। এতে তার অবস্থার প্রতি কৃপা প্রদর্শনের দিকেও ইঙ্গিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা ধনীদেবের সেরা ধনী; তাঁকে দেয়া ঋণ কখনও মারা যাবে না—অবশ্যই পরিশোধিত হবে। ফরয যাকাতের আদেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এখানে নফল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে; যেমন আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনকে কিছু দেয়া, মেহমানদের জন্যে ব্যয় করা, আলেম ও সাধু-পুরুষদের সেবায়ত্ত্ব করা ইত্যাদি। কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, যাকাত ছাড়াও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে; যেমন পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। কাজেই **وَإِذَا زُكِّيْتُمْ** বা ক্বো এসব ওয়াজিব পাওনা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَالَّذِينَ إِذَا لَفُتُمْ بِهِمْ অর্থাৎ, তোমরা জীবদ্দশায় যে

যে কাজ সম্পাদন কর, তা মৃত্যুর সময় সেই কাজের ওসীয়াত করে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। কারণ, মৃত্যুর পর ওয়াজিরা স্বাধীন ; তারা ওসীয়াত পূর্ণ করতেও পারে, না-ও করতে পারে। এতে আর্থিক এবাদত, সদকা-খয়রাতসহ নামায-রোযা ইত্যাদিও দাখিল।

সূরা আল-মুদাসসির

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۖ قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۖ وَيَتَذَكَّرْ ۚ
فَظْهَرْ ۚ وَالْأُخْرَىٰ فَاهْجُرْ ۚ وَلَا تَمَنَّ أَنْ تَنْتَكِبْتَ ۚ وَ
لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۚ وَآذَانُ فِي السَّمْعِ ۚ فَذَلِكَ يَوْمُ
يَوْمٍ غَيْرٍ ۚ عَلَى الْغَيْرِ ۚ غَيْرُ يُسِيرُ ۚ ذُرِّي وَمَنْ
خَلَقْتَ وَحِيدًا ۚ وَجَعَلْتَ لَهُ مَا لَا تُحْسِبُ ۚ وَبَيْنَ
شُهُودًا ۚ وَهَدَيْتَ لَهُ تَبْوِيدًا ۚ ثُمَّ يَنْطَعِرُ ۚ أَنْ
أَرْبَدَ ۚ كَلَّا إِنَّكَ كَانِ لِلْإِنْسَانِ عَيْنِي ۚ سَاءَ رُفِيقُهُ
صَعُودًا ۚ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۚ فَقِيلَ يَكَيْفَ قَدَّرَ ۚ ثُمَّ
قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۚ ثُمَّ نَظَرَ ۚ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۚ
ثُمَّ أَدْبَرَ ۚ وَاسْتَكْبَرَ ۚ فَفَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ ۚ
يُؤْثَرُ ۚ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۚ سَاءَ صَاحِبُ
سَقَرٍ ۚ وَمَا أَزْدُرُكَ مَا سَقَرُ ۚ لَا تُبْقِي وَ
لَا تَذَرُ ۚ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ ۚ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرِ ۚ

সূরা আল-মুদাসসির

মকায় অবতীর্ণ: আয়াত ৫৬।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

- (১) হে চাদরাবৃত, (২) উঠুন, সতর্ক করুন, (৩) আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন, (৪) আপন পোশাক পবিত্র করুন (৫) এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন। (৬) অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দিবেন না। (৭) এবং আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সবার করুন। (৮) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে; (৯) সেদিন হবে কঠিন দিন, (১০) কাকেরদের জন্যে এটা সহজ নয়। (১১) যাকে আমি অনা করে সৃষ্টি করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। (১২) আমি তাকে বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছি। (১৩) এবং সাদা সংগী পুত্রবর্গ দিয়েছি, (১৪) এবং তাকে খুব সচ্ছলতা দিয়েছি। (১৫) এরপরও সে আশা করে যে, আমি তাকে আরও বেশী দেই (১৬) কখনই নয়। সে আমার নির্দর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণকারী। (১৭) আমি সত্যই তাকে শান্তির পাহাড়ে আরোহণ করাব। (১৮) সে চিন্তা করেছে এবং মনঃস্থির করেছে, (১৯) ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনঃস্থির করেছে, (২০) আবার ধ্বংস হোক সে, কিরূপে সে মনঃস্থির করেছে। (২১) সে আবার দৃষ্টিপাত করেছে, (২২) অতঃপর সে প্রকৃষ্টি করেছে ও মুখ বিকৃত করেছে, (২৩) অতঃপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে ও অহংকার করেছে। (২৪) এরপর বলছে: এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু বৈ নয়, (২৫) এতো মানুষের উক্তি বৈ নয়। (২৬) আমি তাকে দাখিল করব অগ্নিতে। (২৭) আপনি কি বোঝলেন অগ্নি কি? (২৮) এটা অক্ষত রাখবে না এবং ছাড়বেও না (২৯) মানুষকে দগ্ধ করবে। (৩০) এর উপর নিয়োজিত আছে উনিশ জন ফেরেশতা।

সূরা মুদাসসির সম্পূর্ণ প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। এ কারণেই কেউ কেউ একে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরাও বলেছেন। সহীহ রেওয়াজে অনুযায়ী সর্বপ্রথম সূরা ইকরার প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এরপর কোরআন অবতরণ বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকে। এই বিরতির শেষভাগে একদিন রসুলুল্লাহ (সাঃ) মকায় পথ চলাকালে উপর দিক থেকে কিছু আওয়াজ শুনতে পান। তিনি উপরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখতে পান যে, সেই হেরা গিরিগুহায় আগমনকারী ফেরেশতা শূন্য মণ্ডলে একটি ক্লান্ত আসনে উপবিষ্ট আছেন। ফেরেশতাকে এমতাবস্থায় দেখে হেরা গিরিগুহার অনুরূপ তিনি আবার ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কনকনে শীত ও কস্পন অনুভব করে তিনি গৃহে ফিরে গেলেন এবং বললেন: زملوني زملوني আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর। অতঃপর তিনি বস্ত্রাবৃত হয়ে শুয়ে পড়লেন। এর পরিস্থিতিতে সূরা মুদাসসিরের প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হয়। তাই আয়াতে তাঁকে يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ‘হে বস্ত্রাবৃত’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই শব্দটি ذثار থেকে উদ্ভূত। অর্থ শীত ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সাধারণ পোশাকের উপর ব্যবহৃত অতিরিক্ত বস্ত্র। زممل শব্দের অর্থ এর কাছাকাছি। রুহুল-মা’ আনীতে জাবের ইবনে যায়েদ তাবেয়ীর উক্তি বর্ণিত আছে যে, সূরা মুদাসসির সূরা মুযামমিলের পরে অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ হয়রত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও এই রেওয়াজে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু উপরে বর্ণিত বোখারী ও মুসলিমের রেওয়াজেতে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যে, সর্বপ্রথম সূরা মুদাসসির অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, ওই বিরতির পর সর্বপ্রথম এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

সূরা মুদাসসিরে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রদত্ত সর্বপ্রথম নির্দেশ এই: قُمْ فَأَنْذِرْ অর্থাৎ, উঠুন। এর আক্ষরিক অর্থ ‘দাঁড়ান’ ও হতে পারে। অর্থাৎ, আপনি বস্ত্রাচ্ছাদন পরিত্যাগ করে দণ্ডায়মান হোন। এখানে কাজের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার অর্থ নেয়াও অবাস্তব নয়। উদ্দেশ্য এই যে এখন আপনি সাহস করে জনসঙ্কীর দায়িত্ব পালনে ব্রতী হোন। اَنْذِرْ শব্দটি উদ্ভূত থেকে উদ্ভূত। অর্থ সতর্ক করা, কিন্তু এমন সতর্ক করা, যা স্নেহ ও ভালবাসার উপর ভিত্তিশীল, যেমন পিতা তার সন্তানকে সাপ-বিছা ইত্যাদি থেকে সতর্ক করে। পয়গম্বরগণ এরূপই করে থাকেন। তাই তাঁরা نَذِيرٌ و بشيرٌ উপাধিতে ভূষিত হন। نَذِيرٌ—এর অর্থ স্নেহ ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে সতর্ককারী এবং بشيرٌ—এর অর্থ সুসংবাদদাতা। রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এরও এই উভয় উপাধি কোরআনের স্থানে স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু এস্থলে শুধু সতর্ক করার কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, তখন পর্যন্ত মুমিন-মুসলমান গুণাগুণিত কয়েকজনই ছিল। অবশিষ্ট সবাই ছিল অবিশ্বাসী কাকের, যারা সুসংবাদের নয়—সতর্ক করারই যোগ্য পাত্র ছিল।

দ্বিতীয় নির্দেশ এই: وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ অর্থাৎ, শুধু আপন পালনকর্তার মহত্ব বর্ণনা করুন কথায় ও কাজে। এখানে رَبِّ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, এটাই এই নির্দেশের মূল কারণ। যিনি সারাজাহানের পালনকর্তা, একমাত্র তিনিই সর্বপ্রকার মহত্ব বর্ণনার যোগ্য। তকবীরের শাব্দিক অর্থ আল্লাহ আকবার বলা হয়ে থাকে। এতে নামাযের তকবীরে তাহরীমাসহ অন্যান্য তকবীরও দাখিল আছে। এই নির্দেশকে নামাযের তকবীরে

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ الْأَمْلَكَةَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ
إِلَّا الْآفَنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَالْيَسْتَيْقِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَيَزِدُّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَزِيدُ الَّذِينَ تَابَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَيَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا امْتِلَاكَ كُنَّا لَكَ يُضِلُّ
اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ
رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلنَّبِيِّينَ وَلَا وَالْقَمَرِ
وَاللَّيْلِ إِذَا دَرَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا اسْفَرَّ إِنَّهَا لَإِذْنٌ
لِلْكَافِرِينَ نَذِيرٌ لِلنَّبِيِّينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِدَكُمْ
أَوْ يَتَأَخَّرَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً إِلَّا أَصْحَابَ
الْيَمِينِ فِي جَنَّتِ يَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا
سَلَكْنَاهُمْ فِي سَفَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَكِنْ
نَاكُ نُطْعِمُ الْمُسْكِينِ وَكُنَّا نَحْمِلُ غَلَّابِينَ وَمَا
كُنَّا لَنَكْذِبَ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينَ لَمَّا تَفَعَّلُوا
شَقَاعَهُ الشُّفْعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرِ مُعْزِضِينَ

(৩১) আমি জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাই রেখেছি। আমি কাকেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যেই তার এই সংখ্যা করেছি—যাতে কিতাবীরা দৃঢ়বিশ্বাসী হয়, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবীরা ও মুমিনগণ সন্দেহ পোষণ না করে এবং যাতে যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা এবং কাকেররা বলে যে, আল্লাহ এর দ্বারা কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমনভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সংপথে চালান। আপনাদের পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো মানুষের জন্যে উপদেশ বৈ নয়। (৩২) কখনই নয়। চন্দ্রের শপথ, (৩৩) শপথ রাত্রির যখন তার অবসান হয়, (৩৪) শপথ প্রত্যেককালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়, (৩৫) নিত্য জাহান্নাম গুরুতর বিপদসমূহের অন্যতম, (৩৬) মানুষের জন্যে সতর্ককারী (৩৭) তোমাদের মধ্যে যে সামনে অগ্রসর হয় অথবা পশ্চাতে থাকে। (৩৮) প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী; (৩৯) কিন্তু ডানদিকের, (৪০) তারা থাকবে জন্মতে এবং পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে (৪১) অপরাধীদের সম্পর্কে (৪২) বলবে : তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নীত করেছে? (৪৩) তারা বলবে : আমরা নামায পড়তাম না, (৪৪) অভাবগ্রস্তকে আহার্য দিতাম না, (৪৫) আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনা করতাম (৪৬) এবং আমরা প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করতাম (৪৭) আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত। (৪৮) অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না। (৪৯) তাদের কি হল যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়?

সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা একটি নেয়ামত : ওলীদ ইবনে মুগীরাকে আল্লাহ তাআলা যেসব নেয়ামত দান করেছিলেন তন্মধ্যে একটি ছিল **يَبِينُ شُؤْدًا** অর্থাৎ, সন্তান-সন্ততি কাছে থাকা। এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করা ও জীবিত থাকা যেমন নেয়ামত, তেমনিভাবে সন্তান-সন্ততি কাছে উপস্থিত থাকাও আল্লাহ তাআলার একটি বড় নেয়ামত।

وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ তফসীরবিদ মুকাতিল বলেন : এটা

আবু জাহলের উক্তি জওয়ান। সে যখন কোরআনের এই বক্তব্য শুনেল যে, জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক উনিশ জন ফেরেশতা, তখন কোরায়শ যুবকদেরকে সম্মোহন করে বলল : মুহাম্মদের সহচর তো মাত্র উনিশ জন। অতএব, তার সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। সুদী বলেন : উপরোক্ত মর্মে আয়াত নাযিল হলে পর জনৈক নস্যা কোরায়শ কাকের বলে উঠল : হে কোরায়শ গোত্র, কোন চিন্তা নেই। এই উনিশ জনের জন্যে আমি একাই যথেষ্ট, আমি ডান বাহু দ্বারা দশ জনকে এবং বাম বাহু দ্বারা নয় জনকে দূর করে দিয়ে উনিশের কিসসা চুকিয়ে দেব। এর পরিস্রোক্ত আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় : আহাম্মকের স্বর্ণে বসবাসকারীরা জেনে রাখ, প্রথমতঃ ফেরেশতা একজনও তোমাদের সবার জন্যে যথেষ্ট। এখানে যে উনিশ জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সবাই প্রধান ও দায়িত্বশীল ফেরেশতা। তাদের প্রত্যেকের অধীনে কর্তব্য পালন ও কাকেরদেরকে আশ্রয় দেয়ার জন্যে অসংখ্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছে, যাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। অতঃপর কেয়ামত ও তার ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে : **كَبِيرٍ - إِنَّهَا لَإِذْنٌ كَبِيرٌ** - এর বহুবচন। উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে যে জাহান্নামে দাখিল করা হবে, সেটি অবশ্যই গুরুতর বিপদ। এ ছাড়া তাতে রয়েছে আরো নানারকম আশাব।

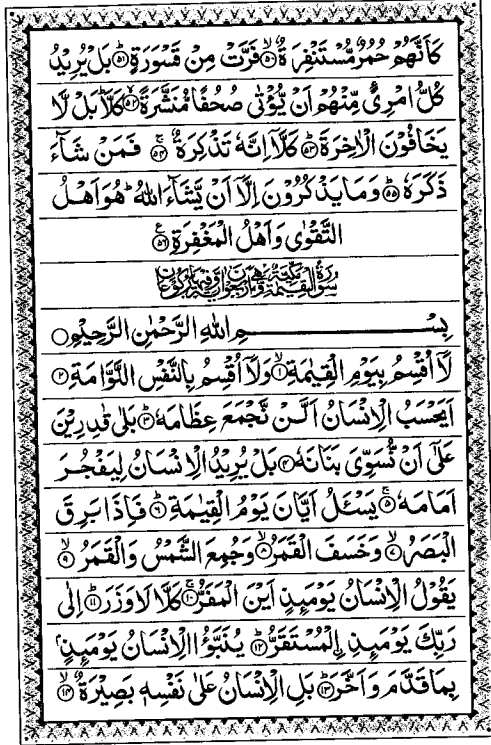
إِلْمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِدَكُمْ أَوْ يَتَأَخَّرَ এখানে অস্ত্রে যাওয়ার অর্থ ঈমান ও আনুগত্যের দিকে অগ্রণী হওয়া এবং পশ্চাতে থাকার অর্থ ঈমান ও আনুগত্য থেকে পশ্চাতে থাকা। উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে সতর্ক করা সব মানুষের জন্যে ব্যাপক। অতঃপর এই সতর্কবাণী শুনে কেউ ঈমান ও আনুগত্যের প্রতি অগ্রণী হয় এবং কোন কোন হতভাগ্য এরপরও পশ্চাতে থেকে যায়।

وَهِينَةٍ - كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ - এর অর্থ

এখানে প্রত্যেকের আটক ও বন্দী হওয়া। স্বপ্নের পরিবর্তে বন্ধকী দ্রব্য যেমন মহাজনের হাতে আটক থাকে—মালিক তাকে কোন কাজে লাগাতে পারে না, তেমনি কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার সোনারের বিনিময়ে আটক ও বন্দী থাকবে। কিন্তু, আসহাবুল-ইয়াসীন' তথা ডানদিকের সংলোকগণ এ থেকে মুক্ত থাকবে।

فَمَا تَفَعَّلُوا شَقَاعَهُ الشُّفْعِينَ এখানে **م** সর্বনাম দ্বারা সেসব

অপরাধীকে বোঝানো হয়েছে, পূর্বের আয়াতে যারা তাদের চারটি অপরাধ স্বীকার করেছে—(১) তারা নামায পড়ত না, (২) তারা কোন অভাবগ্রস্ত ফকীরকে আহার্য দিত না; অর্থাৎ, দরিদ্রদের প্রয়োজনে ব্যয় করত না, (৩) বাস্তব লোকেরা ইসলাম ও ইমানের বিরুদ্ধে যেসব কথাবার্তা বলত



(৫০) যেন তারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গর্দভ (৫১) ইষ্টগোলের কারণে পলায়নপর। (৫২) বরং তাদের প্রত্যেকেই চায় তাদের প্রত্যেককে একটি উনুস্ত গ্রহ দিয়া হোক। (৫৩) কখনও না, বরং তারা পরকালকে ভয় করে না। (৫৪) কখনও না, এটা তো উপদেশমাত্র। (৫৫) অতএব, যার ইচ্ছা, সে একে স্মরণ করুক। (৫৬) তারা স্মরণ করবে না, কিন্তু যদি আল্লাহ চান। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।

সূরা আল-ক্বুরআমাহ

মকায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৪০।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

- (১) আমি শপথ করি কেয়ামত দিবসের, (২) আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ষ্ঠিকার দেয়—(৩) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না? (৪) পরন্তু আমি তার অংশগুলিগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। (৫) বরং মানুষ তার ভবিষ্যত জীবনেও ধৃষ্টতা করতে চায়; (৬) সে প্রশ্ন করে—কেয়ামত দিবস কবে? (৭) যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, (৮) চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। (৯) এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে—(১০) সে দিন মানুষ বলবেঃ পলায়নের জায়গা কোথায়? (১১) না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। (১২) আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাই হবে। (১৩) সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে যে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে। (১৪) বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে চক্ষুমান,

অথবা গোনাহ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হত, তারাও তাদের সাথে তাতে লিপ্ত হত এবং সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করত না, (৪) তারা কেয়ামত অস্বীকার করত।

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যেসব অপরাধী এসব গোনাহ করে এবং কেয়ামত অস্বীকার করার মত কুফরী করে, তাদের জন্যে কারও সুপারিশ উপকারী হবে না। কেননা, তারা কাফের। কাফেরের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেয়া হবে না। কেউ করলে গ্রহণীয় হবে না। যদি সব সুপারিশকারী একত্রিত হয়ে জেরেসোরে সুপারিশ করে, তাতেও উপকারী হবে না। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যেই شَاءَهُ الشَّعَائِرُ বলা হয়েছে।

কাফেরের জন্য কারও সুপারিশ উপকারী হবে না : এই আয়াত থেকে আরও বোঝা যায় যে, মুসলমান গোনাহগার হলেও তার জন্যে সুপারিশ উপকারী হবে। অনেক সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, নবীগণ, ওলীগণ, সৎকর্মপরায়ণগণ—এমন কি সাধারণ মুমিনগণও অপরের জন্যে সুপারিশ করবেন এবং তা কবুল হবে। তবে কাফেরের জন্য কারও কোন সুপারিশ কাজে আসবে না।

এখানে تذكرة তথা উপদেশ বলে কোরআন মজীদ বোঝানো হয়েছে। কেননা, এর শাস্তিক অর্থ স্মারক। কোরআন পাক আল্লাহ তাআলার গুণাবলী, রহমত, গয়ব সওয়াব ও আযাবের অদ্বিতীয় স্মারক।

আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শেষে বলা হয়েছে كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ অর্থাৎ, নিক্তিহই কোরআন উপদেশ, যা তোমরা বজ্ঞন করে রেখেছ।—قِسْرَةٌ—এর অর্থ সিংহ এবং তীরন্দাজ শিকারী। এ স্থলে সাহাবায়ে—কোরাম থেকে উভয় অর্থ বর্ণিত আছে।

এই اهل تتوى হোয়াহল التتوى واهل المغفرة আল্লাহ তাআলা অর্থে যে, একমাত্র তিনিই ভয় করার ও তাঁর নাক্ষরমালী থেকে বেঁচে থাকার যোগ্য। اهل مغفرة হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তিনিই বড় অপরাধী গোনাহগারের অপরাধ ও গোনাহ যখন ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। অন্য কেউ এরূপ উচ্চমনা হতে পারে না।

সূরা আল-ক্বুরআমাহ

এখানে لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْكَاثِمَةِ অতিরিক্ত। কারও বিরোধী মনোভাব খণ্ডন করার জন্যে শপথ করা হলে শপথের পূর্বে অতিরিক্ত لَا ব্যবহৃত হয়। আরবী বাক-পদ্ধতিতে এই ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। আমাদের ভাষায়ও মাঝে মাঝে তাকীদযোগ্য বিষয়বস্তু বর্ণনা করার পূর্বে বলা হয় ‘না’, এরপর স্বীয় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়। এ সূরায় কেয়ামত ও পরকাল অবিশ্বাসীদেরকে হুশিয়ার ও তাদের সন্দেহ-সংশয়ের জওয়াব দান করা হয়েছে। প্রথমে কেয়ামত দিবস পরে ‘নফসে-লাওয়ায়া’ তথা ষ্ঠিকারকারী মনের শপথ করে সূরা শুরু করা

হয়েছে। শপথের জগুয়াব স্থানের ইঙ্গিতে উহ্য আছে। অর্থাৎ, কেয়ামত অবশ্যজ্ঞাবী। কেয়ামতের শপথ যে স্থানোপযোগী হয়েছে, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। এমনভাবে নকসে-লাওয়ামার শপথও তার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। নকস শব্দের অর্থ প্রাপ ও আত্মা সুবিদিত। **لَوَامَهُ** শব্দটি **لَوْ** থেকে উদ্ভূত। অর্থ তিরস্কার ও ঝিকার দেয়া। ‘নকসে লাওয়ামা’ বলে এমন নকস বোঝানো হয়েছে, যে নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ঝিকার দেয়। অর্থাৎ, কৃত গোনাহ্ অথবা গুয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে নিজেকে ভৎসনা করে যে, তুই এমন করলি কেন? সংকর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরস্কার করে যে, আরও বেশী সংকাজ সম্পাদন করে উচ্চমর্যাদা লাভ করলে না কেন? সারকথা, কাম্ফে মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই তার প্রত্যেক সং ও অসং কাজের জন্যে নিজেকে তিরস্কারই করে। গোনাহ্ অথবা গুয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে তিরস্কার করার হেতু বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। সংকাজে তিরস্কার করার কারণ এই যে, নকস ইচ্ছা করলে আরও বেশী সংকাজ করতে পারত। সে বেশী সংকাজ করল না কেন? এই তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে।— (ইবনে-কাসীর) এই অর্থের ভিত্তিতেই হযরত হাসান বসরী (রহঃ) নকসে-লাওয়ামার তফসীর করেছেন ‘নকসে-মুমিনা।’ তিনি বলেছেন : আল্লাহর কসম, মুমিন তো সর্বদা সর্বাবস্থায় নিজেকে ঝিকারই দেয়। সংকর্মসমূহেও সে আল্লাহর শানের মোকাবেলায় আপন কর্মে অভাব ও ত্রুটি অনুভব করে। কেননা, আল্লাহর হক পুরোপুরি আদায় করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। ফলে তার দৃষ্টিতে ত্রুটি থাকে এবং তজ্জন্মে নিজেকে ঝিকার দেয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাসান বসরী (রহঃ) প্রমুখের এই তফসীর অনুযায়ী নকসে-লাওয়ামার শপথ করার উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুমিন ব্যক্তিদের সম্মান ও সম্মত প্রকাশ করা, যারা নিজেদের কাজকর্ম হিসাব করে ত্রুটির জন্যে অনুতপ্ত হয় ও নিজেদেরকে তিরস্কার করে।

নকসে-লাওয়ামার এই তফসীরে ‘নকসে-মুতমায়িনাও’ দাখিল আছে। এগুলো ‘নকসে-মুতাকীরই’ উপাধি।

নকসে আশ্বারা, লাওয়ামা ও মুতমায়িনা : সূরী বুর্গুসণ বলেন : নকস মজ্জাগত ও স্বতাবগতভাবে **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** হয়ে থাকে। অর্থাৎ, সে মানুষকে মদ কাজে লিপ্ত হতে জোরদার আদেশ করে। কিন্তু ঈমান, সংকর্ম ও সামনার বলে সে নকসে-লাওয়ামা হয়ে যায় এবং মদ কাজ ও ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হতে শুরু করে। কিন্তু মদ কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। অতঃপর সংকর্মে উন্নতি ও খোদারী নেকটালোতে চেষ্টা করতে করতে যখন শরীয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতি স্বতাবগত কৃপা অনুভব করতে থাকে, তখন এই নকসই মুতমায়িনা উপাধিপ্রাপ্ত হয়।

অতঃপর কেয়ামত অবিশ্বাসীদের একটি সাধারণ প্রশ্নের জগুয়াব আছে। প্রশ্ন এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ মাটিতে পরিণত হবে। তার অহিসমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। এমনাবস্থায় সেগুলোকে পুনরায় একত্রিত করে কিরূপে জীবিত করা হবে? জগুয়াবে বলা হয়েছে :

يَلْقَىٰ قَوْمَهُ يَوْمَ يَنفُخُ فِي الصُّورِ —এর সারমর্ম এই যে, চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত অহিসমূহকে একত্রিত করে পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে তোমরা বিস্মিত হচ্ছ : অথচ এ বিষয়টি পূর্বে একবার প্রত্যক্ষ করেছে যে,

দুনিয়াতে পালিত ও বর্ষিত প্রত্যেক মানুষ বিশেষ বিভিন্ন ভূখণ্ডের বিভিন্ন অংশ ও কণা নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে। অতএব, যে ক্ষমতালালী সত্তা প্রথমবার সারাবিশ্বে বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একজন মানুষের অস্তিত্বে একত্রিত করেছেন, এখন পুনরায় সেগুলোকে একত্রিত করা তার পক্ষে কিরূপে কঠিন হবে? তিনি পূর্বে যেমন তার কাঠামোতে আত্মা রেখে তাকে জীবিত করেছেন, পুনরায় এরূপ করলে তা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে কেন?

لِيُنْفِخَ أَمَامَهُ —শব্দের অর্থ সম্মুখ ও ভবিষ্যত। আয়াতের অর্থ এই যে, কাকের ও গাকের মানুষ আল্লাহ তাআলার কুদরতের এসব চাক্ষুষ বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, যাতে অতীতের অস্বীকারের দরুন অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যত ঠিক করে নিতে পারে ; বরং ভবিষ্যতেও সে কুফর, শেরক, অস্বীকার ও মিথ্যারোপে অটল থাকতে চায়।

فَإِذَا تَرَىٰ الْبَصَرَ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمُوعُ الشُّعُرِ وَالْقَمَرُ এখানে কেয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। **بَرَقَ** অর্থ চক্ষুতে ধাধা লেগে গেল এবং দেখতে পারল না। কেয়ামতের দিন সবার দৃষ্টিতে ধাধা লেগে যাবে। ফলে চক্ষু স্থির কোন বস্তু দেখতে পারবে না। **خَسَفَ** শব্দটি **خُفِيَ** থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ, চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। **وَجُمُوعُ الشُّعُرِ وَالْقَمَرُ** এতে বলা হয়েছে যে, শুধু চন্দ্রই জ্যোতিহীন হবে না ; বরং সূর্যের দশাও তাই হবে। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, আসল আলো সূর্যের মধ্যে নিহিত। চন্দ্রও সূর্যের কিরণ থেকে আলো লাভ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন : কেয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে একই অবস্থায় একত্রিত করা হবে এবং উভয়ের জ্যোতি হারিয়ে ফেলবে। কেউ কেউ বলেন, চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রিত করার অর্থ এই যে, সেদিন উভয়েই একই উদয়াচল থেকে উদ্ভিত হবে। কোন কোন রেওয়াজেতে তাই বর্ণিত আছে।

يُنْفِخُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ يُفَاكَّهُمُ وَآخِرُ —অর্থাৎ, মানুষকে সেদিন অবহিত করা হবে যা সে আগে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : মানুষ মৃত্যুর পূর্বে যে সংকাজ করে নেয়, তা সে আগ্রে প্রেরণ করে এবং যে সং অথবা অসং, উপকারী অথবা অপকারী কাজ ও প্রথা এমন ছেড়ে যায়, যা তার মৃত্যুর পর মানুষ বাস্তবায়িত করে, তা সে পশ্চাতে রেখে আসে। (এর সওয়াব অথবা শাস্তি সে পেতে থাকবে।) হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন : **مَا قَدِمَ** বলে এমন সংকাজ বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ জীবদ্দশায় করে নেয় এবং **مَا آخَرَ** বলে এমন সংকাজ বোঝানো হয়েছে, যা সে করতে পারত, কিন্তু করেনি এবং সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে।

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَنَّهُ لَرَأَىٰ مَا يُخَيَّرُ —এর অর্থ চক্ষুমান। এর অপর অর্থ প্রমাণও হয়ে থাকে। কোরআনে আছে— **فَلَا جُنْدًا لَهُمْ إِلَّا رُحُومٌ رَّحِيمٌ** এখানে **بَصَائِرُ** শব্দটি **بَصِيرَةٌ** এর বহুবচন। অর্থ প্রমাণ। **مَعَادِيرُ** শব্দটি ওযর অর্থে প্রমাণ এর বহুবচন। আয়াতের অর্থ এই যে, যদিও ন্যায়বিচারের বিধি অনুযায়ী মানুষকে তার প্রত্যেকটি কর্ম সম্পর্কে হাশরের মাঠে অবহিত করা হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রয়োজন নেই। কেননা, মানুষ তার কর্ম সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। সে কি করেছে, তা সে নিজেই জানে। এছাড়া হাশরের মাঠে প্রত্যেকে তার সং অসং কর্ম স্বাক্ষর দেখতেও পাবে। অন্য আয়াতে আছে **وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا** অর্থাৎ, দুনিয়াতে মানুষ যা করেছে, হাশরের

وَلَوْ أَنِّي مَعَاذَ رَبِّكَ لَا يُخْرِكُ يَهْلَسَانِكَ لَتَعَجَّلَ
 بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ
 قُرْآنَهُ فَتُكْرَرُ عَلَيْنَا بَيِّنَاتُهُ كَلَّا بَلْ تُخَيَّبُونَ
 الْمَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْأَجْرَةَ وَوَجْهَ يَوْمِيذٍ تَافِرَةً
 إِلَى رَيْبِهَا نَاطِرَةً وَوَجْهَ يَوْمِيذٍ بَاسِرَةً تَطْنُ
 أَنْ تَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاقِي
 وَقِيلَ لَهَا مَن ذِيكَ وَطَنَ أَتَتْهُ الْفِرَاقِي وَالطَّعَنُ
 الشَّائِي بِالسَّاقِي إِلَى رَيْكِ يَوْمِيذٍ الْإِسْأِي
 فَلَا صَدَقَ وَلَا صُلِيَ وَلَوْلَا كُنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى
 ثُمَّ وَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوَّلِي لَكَ فَأَوَّلِي
 ثُمَّ أَوَّلِي لَكَ فَأَوَّلِي يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ
 يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ نَفْعَةً مِّنْ مِّمَّنِي يُمْنِي
 ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ فَعْلَى فَبُيِّنَ فَجَعَلَ مِنَ الرِّجْبَيْنِ
 الذِّكْرَ وَالْأَثْنَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقُدِيرٍ عَلَّ أَنْ
 يُخَيَّبَ الْمَوْتَى

(১৫) যদিও সে তার অভ্যুত্থান পেশ করতে চাইবে। (১৬) তাড়াতাড়ি শিবে
 নেয়ার জন্যে আপনি দ্রুত ওই আশুতি করবেন না। (১৭) এর সংরক্ষণ ও
 পাঠ আমারই দায়িত্ব। (১৮) অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন
 আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন। (১৯) এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই
 দায়িত্ব। (২০) কখনও না, বরং তোমার পার্শ্ববর্তী জীবনকে ভালবাস (২১)
 এবং পরকালকে উপেক্ষা কর। (২২) সেদিন অনেক মুখমণ্ডল উজ্জ্বল
 হবে। (২৩) তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। (২৪) আর
 অনেক মুখমণ্ডল সেদিন উদাস হয়ে পড়বে। (২৫) তারা ধারণা করবে যে,
 তাদের সাথে কোমর-ভাঙ্গা আচরণ করা হবে। (২৬) কখনও না, যখন
 প্রাণ কঠোরগত হবে। (২৭) এবং বলা হবে, কে কাড়বে (২৮) এবং সে মনে
 করবে যে, বিনায়েতের ক্ষণ এসে গেছে (২৯) এবং গোছ গোছের সাথে
 জড়িত হয়ে যাবে। (৩০) সেদিন, আপনার পালনকর্তার নিকট সবকিছু
 নীত হবে। (৩১) সে বিশ্বাস করেনি এবং নামায পড়েনি; (৩২) পরন্তু
 মিথ্যারোপ করেছে ও পুণ্ড্র প্রদর্শন করেছে। (৩৩) অতঃপর সে দম্ভভরে
 পরিবার-পরিজনদের নিকট ফিরে গিয়েছে। (৩৪) তোমার দুর্ভোগের উপর
 দুর্ভোগ! (৩৫) অতঃপর তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (৩৬) মানুষ
 কি মনে করে যে, তাকে এমন ছেড়ে দেয়া হবে? (৩৭) সে কি স্থূলিত
 বীর ছিল না? (৩৮) অতঃপর সে ছিল রক্তপিপে, অতঃপর আল্লাহ তাকে
 সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিস্তৃত করেছেন। (৩৯) অতঃপর তা থেকে সৃষ্টি
 করেছেন যুগল-নর ও নারী। (৪০) তবুও কি সেই আল্লাহ মৃতদেরকে
 জীবিত করতে সক্ষম ন?

মাঠে তাকে উপস্থিত পাবে এবং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। এখানে মানুষকে
 নিজের সম্পর্কে চক্ষুশান বলার অর্থ তাই।

পক্ষান্তরে **يَبَيِّنُهُ**—এর অর্থ প্রমাণ হলে আয়াতের অর্থ হবে এই যে,
 মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে প্রমাণ স্বরূপ হবে। সে অস্বীকার করলেও
 তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে। কিন্তু মানুষ তার অপরাধ ও
 ত্রুটি-বিচ্ছাদিত জানা সত্ত্বেও বাহ্যাবলি ত্যাগ করবে না। সে তার
 কৃতকর্মের অভ্যুত্থান পেশ করতেই থাকবে। **وَلَوْ أَنِّي مَعَاذَ رَبِّكَ** বাক্যের
 অর্থ তাই।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ পর্যন্ত কোরআনের পরিস্থিতি ও ভয়াবহতা আলোচিত হল। পরেও
 এই আলোচনা আসবে। মাঝখানে চার আয়াতে রসূলুল্লাহ (সঃ)—কে
 একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা ওই নাবিল হুগয়ার সময় অবতীর্ণ
 আয়াতগুলো সম্পর্কিত। নির্দেশ এই যে, যখন জিবরাঈল (আঃ)
 কোরআনের কিছু আয়াত নিয়ে আসমন্ন করতেন, তখন তা পাঠ করার
 সময় রসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিবিধ চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়তেন। (এক) কোথাও
 এর শ্রবণ ও তদনুযায়ী পাঠে কোন পার্থক্য না হয়ে যায়। (দুই) কোথাও
 এর কোন অংশ, কোন বাক্য স্মৃতি থেকে উঠাও না হয়ে যায়। এই চিন্তায়
 কারণে যখন জিবরাঈল (আঃ) কোন আয়াত শোনাতেন, তখন রসূলুল্লাহ
 (সঃ) সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহ্বা নেড়ে দ্রুত আবৃত্তি করতেন,
 যাতে বার বার পড়ে তা মুখস্থ করে নেন। রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর এই পরিশ্রম
 ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য চার আয়াতে আল্লাহ তাআলা
 কোরআন বিশুদ্ধ পাঠ করানো, মুখস্থ করানো ও মুসলমানদের কাছে
 হ-বহ পেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং রসূলুল্লাহ
 (সঃ)—কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি এই উদ্দেশ্যে জিহ্বাকে দ্রুত নাড়া
 দেয়ার কষ্ট করবেন না। **لَا تُخْرِكُ يَهْلَسَانِكَ لَتَعَجَّلَ بِهِ** বাক্যের অর্থ
 তাই। এরপর বলেছেন, **إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ** অর্থাৎ, আয়াতসমূহকে
 আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং হ-বহ আপনার দ্বারা পাঠ করিয়ে
 দেয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি এ চিন্তা পরিত্যাগ করুন। এরপর
 বলা হয়েছে, **فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ** এখানে কোরআনের অর্থ পাঠ। অর্থ
 এই যে, যখন আমি অর্থাৎ, আমার পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আঃ)
 কোরআন পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না; বরং চুপ
 করে শুনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। এখানে কোরআন
 অনুসরণ করার মানে চুপ করে জিবরাঈলের পাঠ শ্রবণ করা। সকল
 তফসীরবিদই এতে একমত।

অবশেষে বলা হয়েছে **إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتُهُ** অর্থাৎ, আপনি এ চিন্তাও
 করবেন না যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? এটা
 বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। আমি কোরআনের প্রতিটি শব্দ ও তার
 উদ্দেশ্য আপনার কাছে ফুটিয়ে তুলব।

وَوَجْهَ يَوْمِيذٍ تَافِرَةً إِلَى رَيْبِهَا نَاطِرَةً অর্থাৎ, সেদিন কিছু মুখমণ্ডল

হাসি-খুসী ও সজীব হবে এবং তারা তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে
 থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে জল্লাতীশ চর্চকে আল্লাহ

তাআলার দীদার (দর্শন) লাভ করবে। আহলে সুন্নত-ওয়াল-জামাআতের সকল আলেম ও ফেকাহুদ্বি এ বিষয়ে একমত। বিভিন্ন হাদীসে এই বিষয়বস্তুটি আরও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে। তবে এই দীদার ও সাক্ষাতে জন্মান্তীর্ণের বিভিন্ন স্তর থাকবে। কেউ সপ্তাহে একবার অর্থাৎ, শুক্রবারে এই সাক্ষাৎ লাভ করবে, কেউ দৈনিক সকাল-বিকাল লাভ করবে এবং কেউ সারাক্ষণ সাক্ষাতেই থাকবে।— (মায়হারী)

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الْمُرَاةَ وَفُتِيَ مَنِّ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۖ
আয়াসমূহে কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং জন্মান্তী ও জাহান্নামীদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই আয়াতে মৃত্যুর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যাতে সে মৃত্যুর পূর্বেই পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ঈমান ও সৎকর্মের দিকে ধাবিত হয়। আয়াতে মৃত্যুর চিত্র অংকন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, গাফেল মানুষ যখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে থাকে, তখন তার মাথার উপর মৃত্যু এসে দণ্ডায়মান হয় এবং আত্মা কণ্ঠনালীতে এসে ঠেকে। পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে যায়। এটাই আল্লাহর কাছে যাওয়ার সময়। এ সময়ে কোন তওবা কবুল হয় না এবং কোন আমলও করা যায় না। কাজেই বুদ্ধিমানের উচিত এর আগেই সংশোধনের চেষ্টা করা। وَالْمَكِثِ السَّائِ بِالسَّائِ—এর প্রসিদ্ধ অর্থ পায়ের গোছা। গোছার সাথে জড়িয়ে পড়ার এক অর্থ এই যে, তখন অস্থিরতার কারণে এক গোছা দূরা অন্য গোছার উপর আঘাত করবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দুর্বলতার আতিশয্যে এক পা অপর পায়ের উপর থাকলে তা সরাতে চাইলেও সক্ষম হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : এখানে দুই গোছা বলে দুই জগৎ—ইহকাল ও পরকাল বোঝানো হয়েছে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে,

তখন হবে ইহকালের শেষ দিন এবং পরকালের প্রথম দিনের সম্মিলন। তাই মানুষ ইহকালের বিরহ-বেদনা এবং পরকালে কি হবে না হবে তার চিন্তায় গ্রেফতার থাকবে।

أَوَّلِي لَكَ فَأَوَّلِي شَعْرَ أَوَّلِي لَكَ فَأَوَّلِي ۖ
এর শব্দটি **أَوَّلِي** - **أَوَّلِي** লব্ধি, দুর্ভাগ। যে ব্যক্তি কুফর ও মিথ্যারোপকেই আঁকড়ে থাকে এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদে মত্ত থাকে ও তদবস্থায় মারা যায়, তার জন্যে এখানে চারবার **أَوَّلِي** তথা দুর্ভাগ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, মৃত্যুর সময়, মৃত্যুর পর কবরে, হাশরে সমবেত হওয়ার সময় এবং অবশেষে জাহান্নামে প্রবেশের সময় বিপর্যয় ও দুর্ভাগই তোমার প্রাপ্য।

أَلَيْسَ ذَلِكَ يَبْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ
সারা বিশু যে সত্তার করতলগত, তিনি কি মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নন। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কেয়ামার এই আয়াত পাঠ করে, তার বলা উচিত **أَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الشَّاهِدِينَ** অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে তিনি সক্ষম এবং আমিও এর একজন সাক্ষী। সূরা স্বীনের শেষ আয়াত **أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ الْخَافِينَ** পাঠ করার সময়ও একথা বলার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এই হাদীসে আরও বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি সূরা মুরসালাতের **فَيَأْتِي حَلِيدًا بَعْدَ أَنْ يُؤْمِنُونَ** আয়াত পাঠ করে তার বলা উচিত **أَمِنَّا بِاللَّهِ**

সূরা আল-কেয়ামাহ সমাপ্ত

পিত্ত—এই শারীরিক উপাদান চতুষ্টয় বোঝানো হয়েছে। এগুলো দিয়ে বীৰ্য গঠিত হয়।

প্রত্যেক মানুষের সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের উপাদান ও কণা शामिल আছেঃ চিন্তা করলে দেখা যায়, উপরোক্ত শারীরিক উপাদান চতুষ্টয়ও বিভিন্ন প্রকার খাদ্য থেকে অর্জিত হয়। প্রত্যেক মানুষের খাদ্য সম্পর্কে চিন্তা করলেও দেখা যায়, এতে দূর-দূরান্ত দেশ ও ভূখণ্ডের উপাদান পানি, বায়ু ইত্যাদির মাধ্যমে शामिल হয়। এভাবে একজন মানুষের বর্তমান শরীর বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে যে, এটা এমন উপাদান ও কণাসমূহের সমষ্টি, যা বিশ্বের অনাচে-কানাচে বিক্ষিপ্ত ছিল। সর্বশক্তিমানের অভাবনীয় ব্যবস্থা সেগুলোকে বিস্ময়করভাবে তার শরীরে একত্রিত করেছে।

نَبِّئُوْهُ -এটা ابتلاء থেকে উদ্ভূত। অর্থ পরীক্ষা করা। এই বাক্যে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও রহস্য বিধৃত হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য তাকে পরীক্ষা করা, পরের আয়াতে তা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমি পয়গম্বর ও এশী গ্রন্থের মাধ্যমে তাকে পথ বলে দিয়েছি যে, এই পথ জালালের দিকে এবং এই পথ জাহান্নামের দিকে যায়। এরপর তাকে ক্ষমতা দিয়েছি যে কোন পথ অবলম্বন করায়। সেমতে তারা দু'দল বিভক্ত হয়ে যায়। (مَّا شَاكُرُوا وَاِمَّا كَفُورًا) অর্থাৎ, একদল তো তাদের স্রষ্টা ও নেয়ামতদাতাকে চিনে তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছে ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, কিন্তু অপরদল অকৃতজ্ঞ হয়ে কাফের হয়ে গেছে। অতঃপর উভয়দলের প্রতিফল ও পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেরদের জন্যে রয়েছে শিকল, বেড়ি ও জাহান্নাম। আর ঈমান ও এবাদত পালনকারীদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত নেয়ামত। সর্বপ্রথম পানীয় বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে এমন শরাবের পাত্র দেয়া হবে, যাতে কাফুরের মিশ্রণ থাকবে। কোন কোন তফসীরকারক বলেনঃ কাফুর জালালের একটি ঝরণার নাম। এই শরাবের স্বাদ ও গুণ বৃদ্ধি করার জন্যে তাতে এই ঝরণার পানি মিলানো হবে। যদি কাফুরের প্রসিদ্ধ অর্থ নেয়া

হয়, তবে জরুরী নয় যে, জালালের কাফুর দুনিয়ার কাফুরের ন্যায় অখাদ্য হবে। বরং সেই কাফুরের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হবে।

ও بدل এর- كافورا شدة - عَيْنَا رَبِّهِمَا عَادِلًا

হতে পারে। এমতাবস্থায় এটা নির্দিষ্ট যে, আয়াতে কাফুর বলে জালালের ঝরণাই বোঝানো হয়েছে। عَادِلًا বলে আলাহুর সেসব নেক বন্দাকেই বোঝানো হয়েছে, ইতিপূর্বে যাদেরকে ابرار বলা হয়েছিল। পক্ষান্তরে যদি عَيْنَا শব্দটি من كاس এর- بدل হয়, তবে এটা অন্য কোন ঝরণা ও পানির বর্ণনা হবে। এমতাবস্থায় عَادِلًا এর অর্থ হবে ابرار থেকে নিম্নস্তরের অন্য কোন দল।

يُؤْتُوْنَ يَالْتَدْرُ এতে বিধৃত হয়েছে যে, সংকমশীল বন্দাগণকে এসব

নেয়ামত কিসের ভিত্তিতে দেয়া হবে। অর্থাৎ, তারা আলাহুর ওয়াস্তে যে কাজের মানত করে, তা পূর্ণ করে। نَزَر -এর শাসনিক অর্থ নিজের জন্যে এমন কোন কাজ ওয়াজিব করে নেয়া, যা শরীয়তের তরফ থেকে তার দায়িত্বে ওয়াজিব নয়। ঐকপ মানত পূর্ণ করা শরীয়তের আইনে ওয়াজিব। এখানে মানত পূর্ণ করাকে জালাতীদের মহান প্রতিদান ও অফুরন্ত নেয়ামত লাভের কারণ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مَلَكُوتُهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَسْرَارُهُمْ

জালাতীদের এসব নেয়ামত এ কারণেও যে, তারা দুনিয়াতে অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীদেরকে আহার্য দান করত। عَلَى مِثْلِهِ -এর মর্ষার্থ এই যে, তারা শুধু নিজদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার্যই দরিদ্রদেরকে দান করে না; বরং নিজদের প্রয়োজন সন্তুষ্ট ও দান করে। দরিদ্র ও এতীমদেরকে আহার্য দেয়া যে এবাদত, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। বন্দী বলে এমন বন্দী বোঝানো হয়েছে, যাকে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী বন্দী করা হয়েছে—সে কাফের হোক অথবা মুসলমান অপরাধী।

قَوَارِيرَ مِنْ قِصَّةٍ وَالْأَوَّلُ كَانَ تَقْوَارِيرًا ۝

আয়নার মত স্বচ্ছ হয় না। পক্ষান্তরে কাঁচ নির্মিত পাত্র রৌপ্যের মত শুভ হয় না। উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্য আছে, কিন্তু জন্মান্তের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানকার রৌপ্য আয়নার মত স্বচ্ছ হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : জন্মান্তের সব বস্তুর নজীর দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। তবে দুনিয়ার রৌপ্য নির্মিত গ্লাস ও পাত্র জন্মান্তের পাত্রের ন্যায় স্বচ্ছ নয়।

زنجبیل - এর প্রসিদ্ধ

অর্থ শুকনা আদা। আরবরা শরাবে এর মিশ্রণ পছন্দ করত। তাই জন্মান্তেও একে পছন্দ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : জন্মান্তের বস্তু ও দুনিয়ার বস্তু নামেই কেবল অভিন্ন। বৈশিষ্ট্যে উভয়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান। তাই দুনিয়ার আদার আলোকে জন্মান্তের আদাকে বোঝার উপায় নেই।

سوار - এর বহুবচন। سَوَارٍ - وَخُلُوْا السَّوَارِ مِنْ قِصَّةٍ

কংকণ যা হাতে পরিধান করার অলংকারবিশেষ। এই আয়াতে রূপার কংকণ এবং অন্য এক আয়াতে স্বর্ণের কংকণ উল্লেখ করা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ নেই। কেননা, কোন সময় রূপার এবং কোন সময় স্বর্ণের কংকণ ব্যবহৃত হতে পারে, অথবা কেউ রূপার এবং কেউ স্বর্ণের ব্যবহার করতে পারে।

إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا

যখন জন্মান্তে পৌঁছে যাবে, তখন আল্লাহর তরফ থেকে বলা হবে : জন্মান্তের এসব বিস্ময়কর অবদানসমূহ তোমাদের দুনিয়াতে কৃতকর্মসমূহের প্রতিদান এবং তোমাদের প্রচেষ্টা আল্লাহর কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে।

পরিশেষে কাফেরদের হঠকারিতার এই কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই মুখুরা পার্শ্বি ধ্বংসলীল ভোগ-বিলাসে মগ্ন হয়ে পরিণাম অর্থাৎ পরকাল বিস্মৃত হয়ে বসেছে। অথচ আমি দুনিয়াতেও খোদ তাদের অস্তিত্বে এমন উপকরণ রেখেছিলাম, যে সম্পর্কে চিন্তা করলে তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে চিনতে পারত। বলা হয়েছে, عَنْ خَلْقِهِ তাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিককে চিনতে পারত। বলা হয়েছে, وَشَدَدْنَا سُرْمَهُمْ অর্থাৎ, আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন প্রকৃতি মজবুত ও সুদৃঢ় করেছি।

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَيِّمَةٍ مِنْ قِصَّةٍ وَالْأَوَّلُ كَانَ تَقْوَارِيرًا ۝
قَوَارِيرَ مِنْ قِصَّةٍ وَكَانَ رُوحًا نَقِيدًا ۝ وَيَسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا
كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝ عَنَّا فِيهَا شَلْبَانٌ سَلْسِلًا ۝ وَيُطَوُّونَ
عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُخَلَّدُونَ ۝ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا
مَّنْثُورًا ۝ وَإِذَا رَأَيْتَ سُورَاتِنَا لَعْنَةً وَمُلْكًا كَبِيرًا ۝
عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَرَأْسُهُمْ شِتَا طَهُورٌ ۝ إِنَّ هَذَا كَانَ
لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۝ إِنْ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً
وَكُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آيَاتًا
أَوْ كُفُورًا ۝ وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ
فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝ إِنَّ هُوَ أَعْيُنَ الْمُحْسِنِينَ
الْمَاجِلَةُ وَيَكْذُرُونَ ۝ وَرَأَى هُمْ يَوْمًا لَّيْلًا ۝ عَنْ خَلْقِهِمْ
وَشَدَدْنَا سُرْمَهُمْ ۝ وَإِذْ أَشْتَاكَ لَنَا أَمَّا لَهُمْ بُدْبُلًا ۝
إِنْ هَذِهِ بَدْبُلَةٌ ۝ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ وَمَا
تُكْفَرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

(১৫) তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রূপার পাত্রে এবং স্ফটিকের মত পানপাত্রে (১৬) রূপালী স্ফটিক পাত্রে—পরিবেশনকারীরা তা পরিগ্রহ করে পূর্ণ করবে। (১৭) তাদেরকে সেখানে পান করানো হবে ‘যানজাবীল’ মিশ্রিত পানপাত্র। (১৮) এটা জন্মান্তস্থিত ‘সালসাবীল’ নামক একটি ঝরণা। (১৯) তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিকশিত মণি-মুক্তা। (২০) আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নেয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। (২১) তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদের তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকণ এবং তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন ‘শরাবান-তছরা। (২২) এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে। (২৩) আমি আপনার প্রতি পর্যায়ক্রমে কোরআন নাযিল করেছি। (২৪) অতএব, আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের জন্যে ঐশ্বর্য সহকারে অপেক্ষা করুন এবং ওদের মধ্যকার কোন পাপিষ্ঠ ও কাফেরের অনুগত্য করবেন না। (২৫) এবং সকাল-সন্ধ্যায় আপন পালনকর্তার নাম সুরণ করুন। (২৬) রাত্রির কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশে সেজদা করুন এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন। (২৭) নিকুয় এরা পার্শ্বি জীবনকে ভালবাসে এবং এক কঠিন দিবসকে পশ্চাতে ফেলে রাখে। (২৮) আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং মজবুত করেছি তাদের গঠন। আমি যখন ইচ্ছা করব, তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ লোক আনব। (২৯) এটা উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা হয় সে তার পালনকর্তার পথ অবলম্বন করুক। (৩০) আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।

সূরা আল-মুরসালাত

সহীহ বোখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-মসউদ (রাঃ) বলেন : আমরা মিনার এক গুহায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে সূরা মুরসালাত অবতীর্ণ হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সূরাটি আবৃত্তি করতেন আর আমি তা শুনে মুখস্থ করতাম। সূরার মিস্তাতয় তাঁর মুখমণ্ডল সতেজ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ একটি সর্প আমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। আমরা সর্পের দিকে অগ্রসর হলাম, কিন্তু সেটি পালিয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : তোমরা যেমন তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রয়েছ, তেমনি সেও তোমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে।—(ইবনে-কাসীর)

এই সূরায় আল্লাহ তাআলা কয়েকটি বস্তুর শপথ করে কেয়ামতের নিশ্চিত আগমনের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই বস্তুগুলোর নাম কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তবে সেগুলোর স্থলে এ পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে—**عاصفات - مرسلات - ملقيات الذكر - فارقات - ناشرات**। এই গুলো কার বিশেষণ, কোন হাদীসে তা পুরোপুরি নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই এ সম্পর্কে সাহাবী ও তাবয়ীগণ থেকে বিভিন্নরূপ তফসীর বর্ণিত আছে।

কারও কারও মতে এগুলো সব ফেরেশতাগণের বিশেষণ। সম্ভবতঃ ফেরেশতাগণের বিভিন্ন দল এসব বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত। কেউ কেউ এগুলোকে বায়ুর বিশেষণ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, বায়ু বিভিন্ন প্রকার ও গুণের হয়ে থাকে। ফলে বায়ুরও এসব বিভিন্ন বিশেষণ হতে পারে। কেউ কেউ স্বয়ং পয়গম্বরগণকে এসব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। এ কারণেই ইবনে-জরীর এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকাকে অধিকতর নিরাপদ ঘোষণা করে বলেছেন : সবই হতে পারে, কিন্তু আমরা কোনকিছু নির্দিষ্ট করি না।

عُذْرًا يُذَكَّرُ—এই আয়াত **ذَكَرَ** শব্দটি **ملقيات**—এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ **ذَكَرَ** তথা ওহী পয়গম্বরগণের কাছে নাযিল করা হয়, যাতে তা মুমিনদের জন্যে ত্রুটি-বিচ্ছৃতি থেকে গুহরখাহীর কারণ হয় এবং কাফেরদের জন্যে সতর্ককারী হয়ে যায়।

বায়ু, ফেরেশতা অথবা উভয়ের শপথ করে আল্লাহ বলেন : **إِنَّمَا تُعْذِرُونَ لَوَاغٍ** অর্থাৎ, তোমাদেরকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে কেয়ামত, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও শাস্তির যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর বাস্তবায়ন মুহূর্তের কতিপয় অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমে সব নক্ষত্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে অথবা জ্যোতিহীন অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। ফলে সমগ্র বিশৃঙ্খলিত অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তৃতীয় অবস্থা এই যে, পর্বতসমূহ তুষারের ন্যায় উড়তে থাকবে। চতুর্থ অবস্থা এই : **وَإِذَا السُّنُّلُ أَتَتْ** শব্দটি **تَوَقَّت** থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ সময় নির্ধারণ করা। আল্লামা যমখশরী বলেন : এর অর্থ কোন সময় নির্দিষ্ট সময়ে পৌছাও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থই উপযুক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গম্বরগণের জন্যে উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হওয়ার যে সময় নিরাপিত হয়েছিল, তাঁরা যখন সে সময়ে পৌছে যাবেন এবং তাঁদের উপস্থিতির মেয়াদ এসে যাবে। তাই তফসীরে এর অর্থ করা হয়েছে যখন

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا وَالْعَصْفِ عَصْفًا وَالتُّشْرِبِ
تَشْرِبًا وَالْفَرْقِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ
نُذْرًا أَلَمْ تُؤْعِدُونَهُ لَوَاغٍ فَاذْكُرُوا الْيَوْمَ النَّهْمَ طِبْسَةً وَ
إِذَا السَّمَاءُ فُرْجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ وَإِذَا الضُّلُ
أُفَّتْ لَأَيَّ يَوْمٍ أُحِلَّتْ لَيَوْمِ الْقَضِ وَمَا ذَرَكْ
مَا يَوْمِ الْقَضِ وَيَلَّيْ يَوْمِ الْمُنْكَدِ بَيْنَ أَلَمْ
تُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نَعْتَهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ
تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيَلَّيْ يَوْمِ الْمُنْكَدِ بَيْنَ أَلَمْ
تَخْلَقْنَاهُ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدَرُونَ وَيَلَّيْ
يَوْمِ الْمُنْكَدِ بَيْنَ أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا

(৩১) তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতে দাখিল করেন। আর যালেমদের জন্যে তো প্রস্তুত রেখেছেন মর্মভঙ্গ শাস্তি।

সূরা আল-মুরসালাত

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৫০।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) কল্যাণের জন্যে প্রেরিত বায়ুর শপথ, (২) সজোরে প্রবাহিত বাটিকার শপথ, (৩) মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ, (৪) মেঘপুঞ্জ বিতরণকারী বায়ুর শপথ এবং (৫) ওহী নিয়ে অবতরণকারী ফেরেশতাগণের শপথ—(৬) গুহর-আপত্তির অবকাশ না রাখার জন্যে অথবা সতর্ক করার জন্যে (৭) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে। (৮) অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নির্বাণিত হবে, (৯) যখন আকাশ ছিন্নযুক্ত হবে, (১০) যখন পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেয়া হবে এবং (১১) যখন রসূলগণের একত্রিত হওয়ার সময় নিরাপিত হবে, (১২) এসব বিষয় কোন দিবসের জন্যে স্থগিত রাখা হয়েছে? (১৩) বিচার দিবসের জন্যে। (১৪) আপনি জানেন বিচার দিবস কি? (১৫) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (১৬) আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি? (১৭) অতঃপর তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করব পরবর্তীদেরকে। (১৮) অপরাধীদের সাথে আমি একত্রই করে থাকি। (১৯) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (২০) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? (২১) অতঃপর আমি তা রেখেছি এক সংরক্ষিত আধারে, (২২) এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, (২৩) অতঃপর আমি পরিমিত আকারে সৃষ্টি করেছি, আমি কত সক্ষম স্রষ্টা? (২৪) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (২৫) আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারিণীরূপে,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ
فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۖ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۖ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۖ اَلَمْ
تَجْعَلِ الْاَرْضَ مَهْدًا ۙ وَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ وَ خَلَقْتَ كُلَّ
اَزْوَاجٍ ۙ وَ جَعَلْنَا لَكُمْ سُبُلًا ۙ وَ جَعَلْنَا الْاَيْلَ لِيَاسًا ۙ
وَ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۙ وَ بَيْنَا وَ قَوْمُكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ وَ
جَعَلْنَا سِرَاجًا وَ هَاجًا ۙ وَ اَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً
ثَبَّاجًا ۙ لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَ نَبَاتًا ۙ وَ جَذِبَ الْاَلْفَا ۙ اِنْ
يَوْمَ الْقَضٰى كَانَ مِيقَاتًا ۙ يَوْمَ يُنْفَعُ فِي الصُّورِ
مَتَاتُونَ ۙ اَفَاَوْجَاهُ ۙ وَ فُجِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۙ وَ
سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۙ اِنْ جَهَنَّمَ كَانَتْ
مِرْصَادًا ۙ لِلظَّالِمِيْنَ مَا يَأْتِيهِمْ فَيَقْبَلُوْنَ ۚ فَفِيهَا اَحْقَابًا ۙ
لَا يَذْكُرُوْنَ فِيْهَا اَيَّامًا ۙ اَوْ اَشْرَآ ۙ اِلَّا اَصْحَامًا ۙ وَ عَسَا ۙ
جَزَاءً وَ قَاتًا ۙ اِنْهُمْ كَانُوْا اِلَّا يَزْجُوْنَ حِسَابًا ۙ

সূরা আন-নাবা

মকায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৪০।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

- (১) তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? (২) মহা সংবাদ সম্পর্কে, (৩) যে সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে। (৪) না, সত্ত্বরই তারা জানতে পারবে, (৫) অতঃপর না, সত্ত্বর তারা জানতে পারবে। (৬) আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা (৭) এবং পর্বতমালাকে পেরেক? (৮) আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি, (৯) তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লাস্তি দূরকারী, (১০) রাত্তিকে করেছি আবরণ (১১) দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়, (১২) নির্মাণ করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত সপ্ত-আকাশ (১৩) এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। (১৪) আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি, (১৫) যাতে তদ্দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ। (১৬) ও পাতাঘন উদ্যান। (১৭) নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে। (১৮) যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে, (১৯) আকাশ বিদীর্ণ হয়ে; তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে (২০) এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে। (২১) নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে, (২২) সীমালঙ্ঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে। (২৩) তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে। (২৪) তথায় তারা কোন শীতল এবং পানীয় আশ্বাদন করবে না; (২৫) কিন্তু ফুটন্ত পানি ও গুঁড় পাবে। (২৬) পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে। (২৭) নিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশ আশা করত না।

আরাম-আয়েশের পর তোমাদের কপালে আযাবই আযাব রয়েছে।—
(আবু হাইয়ান)

এখানে অধিকাংশ

তফসীরবিদের মতে রুক্কুর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে যখন তাদেরকে খোদায়ী বিধানাবলী মেনে চলতে বলা হত, তখন তারা মেনে চলত না। কেউ কেউ রুক্কুর পারিভাষিক অর্থও নিয়েছেন। আয়াতে উদ্দেশ্য এই যে, যখন তাদেরকে নামাযের দিকে আহ্বান করা হত, তখন তারা নামায পড়ত না। কাজেই আয়াতে রুক্কু বলে পুরো নামায বোঝানো হয়েছে।—(রুহুল-মা'আনী)

فَيَأْتِي حَبِيبًا بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ অর্থাৎ, তারা যখন কোরআনের মত

অপূর্ব, অলংকারপূর্ণ, তত্ত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিমণ্ডিত কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করল না, তখন এরপর আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? এখানে উদ্দেশ্য তাদের ঈমানের ব্যাপারে নৈরাশ্য ব্যক্ত করা। হাদীসে আছে, যখন এই সূরা তেলাওয়াতকারী এই আয়াত পাঠ করে তখন তার মাথা ঝুঁকি বলা উচিত। অর্থাৎ, আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নামাযের বাইরে ও নফল নামাযের মধ্যে এই বাক্য বলা উচিত। ফরয ও সুন্নত নামাযে এ থেকে বিরত থাকা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

সূরা আন-নাবা

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ অর্থাৎ, তারা কি বিষয়ে পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?

অতঃপর আল্লাহ নিজেই উত্তর দিয়েছেন عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ শব্দের অর্থ মহাখবর। এখানে মহাখবর বলে কেয়ামত বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, মক্কাবাসী কাফেররা কেয়ামত সম্পর্কে সওয়াল-জওয়াব করছে, যে সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কোরআনের অবতরণ শুরু হলে মক্কার কাফেররা তাদের বৈঠকে বসে এ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করত। কোরআনে কেয়ামতের আলোচনাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে; অথচ এটা তাদের মতে একেবারেই অসম্ভব ছিল। তাই এ সম্পর্কে অধিক পরিমাণ আলোচনা চলত। কেউ একে সত্য মনে করত এবং কেউ অস্বীকার করত। তাই আলোচ্য সূরার শুরুতে কাফেরদের অবস্থা উল্লেখ করে কেয়ামতের সম্ভাব্যতা আলোচনা করা হয়েছে। কেয়ামত সম্পর্কে কাফেররা যেসব ঝটকা ও আপত্তি উত্থাপন করত, সেগুলোর জওয়াব দেয়া হয়েছে। কোন কোন তফসীরকারক বলেন যে, কাফেরদের এই সওয়াল ও জওয়াব তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে নয়, বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে ছিল। কোরআন পাক এর জওয়াবে একই বাক্যকে তাকীদের জন্যে দু'বার উল্লেখ করেছে كَلَّا سَيَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, কেয়ামতের বিষয়টি সওয়াল-জওয়াব, আলোচনা ও গবেষণার মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম হবে না; বরং এটা যখন সামনে উপস্থিত হবে, তখনই এর স্বরূপ জানা যাবে। এ নিশ্চিত বিষয়ে বিতর্ক, প্রশ্ন ও অস্বীকারের অবকাশ নেই। অতি সত্ত্বর অর্থাৎ, মৃত্যুর পর পরজগতের বস্তুসমূহ দৃষ্টিতে ভেসে উঠবে এবং সেখানকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলী দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে। তখন কেয়ামতের স্বরূপ খুলে যাবে। এরপর আল্লাহ

তাআলার স্বীয় অপার শক্তি, প্রজ্ঞা ও কারিগরীর কয়েকটি দৃশ্য উল্লেখ করেছেন, যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি সমগ্র বিশ্বকে একবার ধ্বংস করে পুনরায় তদ্রূপই সৃষ্টি করতে সক্ষম। এ সম্পর্কে ভূমি ও পর্বতমালা সৃষ্টি এবং নর ও নারীর যুগলের আকারে মানব সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর মানুষের সুখ, স্বাস্থ্য ও কাজ-কারবারের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে একটি বাক্য এই যে, **وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا**। এর অর্থ কমানো, কর্তন করা।

নিদ্রা মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে কর্তন করে তার অন্তর ও মস্তিষ্ককে এমন স্বস্তি ও শান্তি দান করে, যার বিকল্প দুনিয়ার কোন শান্তি হতে পারে না। এ কারণেই কেউ কেউ **سبات**—এর অর্থ করেছেন সুখ, আরাম।

وَجَعَلْنَا آيَاتٍ لِلنَّاسِ অর্থাৎ, আমি রাত্রিকে করেছে আবরণ। এতে

ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, স্বভাবতঃ মানুষের নিদ্রা তখন আসে, যখন আলো অধিক না থাকে, চতুর্দিকে নীরবতা বিরাজ করে এবং হঠাৎগেল না থাকে। আল্লাহ তাআলা রাত্রিকে আবরণ বলে ইশারা করেছেন যে, তিনি তোমাদেরকে কেবল নিদ্রাই দেননি; বরং সারা বিশ্বে নিদ্রার উপযুক্ত পরিবেশও সৃষ্টি করেছেন।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنَاسِكَ—মানুষের সুখ ও শান্তির জন্যে প্রয়োজনীয়

আহার্য দ্রব্যাদির সরবরাহও নিত্য জরুরী। নতুবা নিদ্রা সাক্ষাত মৃত্যু হয়ে যাবে। যদি সারাক্ষণ রাত্রিই থাকত এবং মানুষ কেবল নিদ্রাই যেত, তবে এসব দ্রব্য কিরূপে অর্জিত হত। এর জন্যে চেষ্টা, পরিশ্রম ও দৌড়োদৌড়ি জরুরী, যা আলোকোজ্জ্বল পরিবেশে সম্ভবপর। তাই বলা হয়েছে : তোমাদের সুখকে পূর্ণতা দান করার জন্যে আমি কেবল রাত্রি ও তার অন্ধকার সৃষ্টি করিনি; বরং একটি আলোকোজ্জ্বল দিনও দিয়েছি, যাতে তোমরা কাজ-কারবার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পার। অজ্ঞপ্তর মানুষের সুখের সেই উপকরণ উল্লেখ করা হয়েছে, যা আকাশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ উপকারী বস্তু হচ্ছে সূর্যের আলো। বলা হয়েছে : **وَجَعَلْنَا سِرَاجًا زَاكِيًا** অর্থাৎ, আমি একটি প্রোজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি। এরপর মানুষের সুখের প্রয়োজনে আকাশের নীচে সৃজিত বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু মেঘমালায় কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا—এর

বহুবচন। এর অর্থ জলে পরিপূর্ণ মেঘমালা। এ থেকে জানা গেল যে, মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। কোন কোন আঘাতে আকাশ থেকে বর্ষিত হওয়ার কথা আছে। তাতে আকাশের অর্থ আকাশের শূন্যমণ্ডল। এই অর্থে **سما** শব্দের ব্যবহার কোরআনে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এছাড়া এ কথাও বলা যায় যে, কোন সময় সরাসরি আকাশ থেকেও বৃষ্টি বর্ষিত হতে পারে। এটা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। এসব কারিগরি ও নেয়ামত উল্লেখ করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু কয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

إِن يَوْرَ الْقَضَىٰ كَانَ وَبِقَاتٍ অর্থাৎ, বিচারের দিন যানে কয়ামত

নির্দিষ্ট সময়ে আসবে। তখন এই বিশ্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং শিগায় ফুৎকার দেয়া হবে। অন্যান্য আঘাত থেকে জানা যায় যে, দু'বার শিগায়

ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম ফুৎকারের সাথে সাথে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সাথে পুনরায় জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এ সময় বিশ্বের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ দলে দলে আল্লাহ সকাশে উপস্থিত হবে।

وَسَيَرَىٰ الْجِبَالُ كَافَّةً سَرَابًا অর্থাৎ, যে পাহাড়কে আজ অটল ও

অনড় হওয়ার ব্যাপারে দৃষ্টান্তস্বরূপ পেশ করা হয়, সেই পাহাড় স্বহসন থেকে বিচ্যুত হয়ে ভুলার ন্যায় উড়তে থাকবে। **سراب**—এর শাব্দিক অর্থ চলে যাওয়া। মরুভূমির যে বালুকাস্থ দূর থেকে পানির ন্যায় কলমল করতে থাকে, তাকেও **سراب** এ কারণে বলা হয় যে, কাছে গেলেই তা অদৃশ্য হয়ে যায়।—(সেহাহ, রাসিবি)

إِن جَعَلْنَا كَذِبًا وَمُؤَدَّا—যে স্থানে বসে কারও দেশাশোনা অবস্থা

অশেপ্কা করা হয়, তাকে **مرصاد** বলা হয়। এখানে জাহান্নামের অর্থ জাহান্নামের পুল তথা পুলসেরাত। সওয়াবদাতা ও শাস্তিদাতা উভয় প্রকার কেরেশতা এখানে অশেপ্কা করবে। জাহান্নামীদেরকে শাস্তিদাতা কেরেশতারা পাকড়াও করবে এবং জন্নাতীদেরকে সওয়াবদাতা কেরেশতা তাদের গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাবে।—(মাযহরী)

إِن جَعَلْنَا كَذِبًا وَمُؤَدَّا—এর দ্বিতীয় **خير** উভয়

বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক সং ও অসংকে জাহান্নামের পুলের উপর দিয়ে যেতে হবে এবং জাহান্নাম সীমালংঘনকারীদের আবাসস্থল। **طاعين** শব্দটি **طاعى**—এর বহুবচন এবং **طغیان** থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ, অবাব্যতা করা। **طاعى** এমন লোককে বলা হয়, যে অবাব্যতায় সীমা ছাড়িয়ে যায়। ইমান না থাকলেও এটা হতে পারে। তাই এখানে **طاعى** অর্থ কাকের। কুবিসী, পবনট মুসলমানদের সেই দলও অর্থ হতে পারে, যারা কোরআন ও সুন্নাহর সীমা ডিক্রিয়ে যায়। যদিও প্রকাশ্যভাবে কুফর অবলম্বন করে না, যেমন রাফেযী, হারোজী ও মুতাযেলা সম্প্রদায়।—(মাযহরী)

لَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ جَدَّتْ أَخْفَابًا—এর বহুবচন। অর্থ

অবস্থানকারী। **خفاب** শব্দটি **خف**—এর বহুবচন। অর্থ সুদীর্ঘ সময়। ইবনে-জরীর হযরত আলী (রাঃ) থেকে এর পরিমাণ আশি বছর বর্ণনা করেছেন, যার প্রত্যেক বছর বার মাসের, প্রত্যেক মাস ত্রিশ দিনের এবং প্রত্যেক দিন এক হাজার বছরের। এভাবে প্রায় দুই কোটি আটশি বছরে এক **خف** হয়। অপর কয়েকজন সাহাবী এর পরিমাণ আশির পরিবর্তে সত্তর বছর বলেছেন। অবশিষ্ট হিসাব পূর্বের ন্যায়।—(ইবনে-কাসীর) কিন্তু মুসনাতে বাযযারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (শঃ) বলেন : তোমাদের যাকে গোনাহের সাজায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তাকে কয়েক হুকা জাহান্নামে অবস্থান না করা পর্যন্ত বের করা হবে না। এক হুকা আশি বছরের কিছু বেশী এবং এক বছর তোমাদের বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ৩৬০ দিনের হবে।—(মাযহরী)

جَزَاءُ وَفَاتٍ অর্থাৎ, জাহান্নামে তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে, তা ন্যায়

ও ইনসাকের দৃষ্টিতে তাদের বাতিল বিশ্বাস ও কুকর্মের অনুরূপ হবে। এতে কোন বাড়াবাড়ি হবে না।

আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَذُوُوا أَفْئِدَةً تَبْذُرُونَ الْأَعْدَاءَ ۝ অর্থঃ, তোমরা দুনিয়াতে যেমন কৃকর ও অস্বীকারে কেবল বেড়েই চলেছ—বাধাতামূলক মৃত্যুর সম্মুখীন না হলে আরও বেড়েই চলেতে, তেমনিভাবে আচ্ছ আদ্বাহ তাআলা তোমাদের আঘাব কেবল বৃদ্ধিই করবেন। অতঃপর কাকেরদের বিপরীতে মুমিন, মুত্তাকীদের সওয়াব ও জ্ঞানাতের নেয়ামত বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নেয়ামত বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

جَزَاءُ مَنْ رَبَّكَ عَطَاءُ حَسَابًا ۝ অর্থঃ, জাহান্নাতের এসব নেয়ামত মুমিনদের প্রতিদান এবং আপনাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত দান। এখানে জ্ঞানাতের নেয়ামতসমূহকে প্রথমে কর্মের প্রতিদান ও পরে খোদায়ী দান বলা হয়েছে।

لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝ এই বাক্য পূর্বের جَزَاءُ مَنْ رَبَّكَ عَطَاءُ হাক্যর সাথেও সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। অর্থ এই হবে যে, আদ্বাহ তাআলা যাকে যেরূপ সওয়াব দান করবেন, তাতে কারও কথা বলার সাথে হবে না যে, অমুককে কম এবং অমুককে বেশী কেন দেয়া হল? যদি একে আলাদা বাক্য সাব্যস্ত করা হয়; তবে উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে আদ্বাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কারও ভাষণ দেয়ার ক্ষমতা হবে না। এই অনুমতি কোন কোন স্থানে হবে এবং কোন কোন স্থানে হবে না।

يَوْمَ يَقُومُ الرُّؤُوسُ وَالْمُلُوكُ صَفًّا ۝ কোন কোন তফসীরকারকের মতে রুহ বলে এখানে জিবরাঈল (আঃ) কে বোঝানো হয়েছে। তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ করার সাধারণ উদ্দেশ্যে ফেরেশতগণের পূর্বে তাঁর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, রুহ আদ্বাহ তাআলার এক বিরাট বাহিনী, যারা ফেরেশতা নয়। তাদের মাথা ও হস্তপদ আছে। এই তফসীর অনুযায়ী দুটি সারি হবে—একটি রুহের ও অপরটি ফেরেশতগণের।

يَوْمَ يَقُومُ الرُّؤُوسُ وَالْمُلُوكُ صَفًّا ۝ বাহ্যতঃ এই দিন হচ্ছে কেয়ামতের দিন। হাশরে প্রত্যেকেই তার কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখতে পাবে—হয় আমলনামা হাতে আসার ফলে দেখবে, না হয় কাজকর্ম সব শরীরী হয়ে সামনে এসে যাবে। কোন কোন হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত আছে। এদিন মৃত্যুর দিনও হতে পারে। এমনতাবস্থায় স্বীয় কাজকর্ম দেখা কবরে ও বরষা হতে পারে।—(মাহাহারী)

وَيَقُولُ الْكَافِرُ لِلْكَافِرِينَ كُنْتُمْ شُرَكَاءَ ۝ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন সমগ্র ভূপৃষ্ঠ এক সমতল ভূমি হয়ে যাবে। এতে মানব, জিন, গৃহপালিত জন্তু ও বন্য জন্তু সবাইকে একত্রিত করা হবে। জন্তুদের মধ্যে কেউ দুনিয়াতে অন্য জন্তুর উপর জুলুম করে থাকলে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। এমন কি কোন শিবিশিষ্ট ছাগল কোন শিববিশীন ছাগলকে মেরে থাকলে সেদিন তারও প্রতিশোধ নেয়া হবে। এই কর্ম সমাপ্ত হলে সব জন্তুকে আদেশ করা হবে : মাটি হয়ে যাও। তখন সব মাটি হয়ে যাবে। এই দৃশ্য দেখে কাকেররা আকাঙ্ক্ষা করবে—হায়! আমরাও যদি মাটি হয়ে যেতাম। এরূপ হলে আমরা হিসাব-নিকাশ ও জাহান্নামের আঘাব থেকে বেঁচে যেতাম।

সূরা আন-নাযা সমাপ্ত

الشُّرُطُ

৪৮৮

২২

وَكَذَّبُوا بِالْآيَاتِ الَّتِي كُنَتْ آيَاتِهِمْ ۝ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝
فَذُوُوا أَفْئِدَةً تَبْذُرُونَ الْأَعْدَاءَ ۝ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَقَارًا ۝
حَدَاقًا ۝ وَأَعْنَابًا ۝ وَوَعَابَ ۝ أَرْبَابًا ۝ وَكَاسِدًا ۝ هَامَاتًا ۝
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدًّا ۝ إِنَّ جَزَاءَ مَنْ رَبَّكَ عَطَاءٌ
حَسَابًا ۝ حَزَبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِمَّا بَيْنَهُمَا الرِّحْنُ ۝
لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝ يَوْمَ يَقُومُ الرُّؤُوسُ وَالْمُلُوكُ
صَفًّا ۝ لَا يَتَكَبَّرُونَ إِلَّا مَنْ أَدْرَكَ لَهُ الرِّحْنُ ۝ وَقَالَ صَوَابًا ۝
ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ ۝ قَمِنَ شَيْءٌ أَتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَالًا ۝ إِنَّكَ
أَنْذَرْتَهُمْ عَذَابًا ۝ أَقْرَبًا ۝ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ
وَيَقُولُ الْكَافِرُ لِلْكَافِرِينَ كُنْتُمْ شُرَكَاءَ ۝
وَقَالَ الْكَافِرُ لِلْكَافِرِينَ كُنْتُمْ شُرَكَاءَ ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
وَالزُّرْعُ عَرَقًا ۝ وَالشُّيْطُ نَسْطًا ۝ وَالشُّجْبُ سَيْمًا ۝
فَالشُّيْطُ سَيْمًا ۝ فَالْمُدَّ بَرَبَ ۝ أَمْرًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ
الرُّجُفُ ۝ تَتَّبِعُهَا الرُّادَةُ ۝ فَتُؤَبُّ ۝ يَوْمَ ۝ وَاجِعًا ۝

(২৮) এবং আমার আয়াতসমূহে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত। (২৯) আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি। (৩০) অতএব, তোমরা আশ্বাদন কর, আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করব। (৩১) পরহেয়গারদের জন্যে রয়েছে সাক্ষ্য (৩২) উদ্যান, আবুদ (৩৩) সমবয়স্কা, পূর্ণবোবনা তরুণী। (৩৪) এবং পূর্ণ পানপাত্র। (৩৫) তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনে না। (৩৬) এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে যথোচিত দান, (৩৭) যিনি নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়, কেউ তাঁর সাথে কথার অধিকারী হবে না। (৩৮) যেদিন রুহ ও ফেরেশতগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আদ্বাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে। (৩৯) এই দিবস সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক। (৪০) আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যাক করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাকের বলবে : হায়, আফসোস—আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।

সূরা আন-নাযিআত

মক্কার অবতীর্ণ : আয়াত ৪৬-১১।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আদ্বাহর নামে শুরু—

- (১) শপথ সেই ফেরেশতগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে, (২) শপথ তাদের, যারা আত্মার ঝিলে খুলে দেয় মৃত্যুতাবে; (৩) শপথ তাদের, যারা সন্তরণ করে দ্রুতগতিতে, (৪) শপথ তাদের, যারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং (৫) শপথ তাদের যারা সকল কর্মনির্বাহ করে—কেয়ামত অবশ্যই হবে। (৬) যেদিন প্রকল্পিত করবে প্রকল্পিতকারী, (৭) অতঃপর পচাত্তো আসবে পচাত্তোয়ামী; (৮) সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-বিহবল হবে।

সূরা আন-নাযিআত

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ - وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ

কিছুকে উপাটন করা। اغراق -এর অর্থ কোন কাজ নির্মমভাবে করা। বাকপদ্ধতিতে বলা হয়- اغرق النازع في النفس অর্থাৎ তীর নিক্ষেপকারী ধনুকে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করেছে। সূরার শুরুতে ফেরেশতাগণের কতিপয় গুণ ও অবস্থা বর্ণনা করে তাদের শপথ করা হয়েছে। শপথের জওয়াব উহ্য রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, কেয়ামত ও হাশর-নশর অবশ্যই হবে। ফেরেশতাগণ এখনও সারা বিশ্বের কাজকর্ম ও শৃংখলা বিধান নিয়োজিত রয়েছে, কিন্তু কেয়ামতের দিন যখন বস্তুনিষ্ঠ কারণাদি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে এবং অসাধারণ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তখন ফেরেশতাগণই যাবতীয় কর্মনির্বাহ করবে। এ সম্পর্কের কারণে সূরায় তাদের শপথ করা হয়েছে।

এস্থলে ফেরেশতাগণের পাঁচটি বিশেষণ বর্ণিত হয়েছে। এগুলো মানুষের মৃত্যু ও আত্মা বের করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। উদ্দেশ্য কেয়ামতের সত্যতা বর্ণনা করা। মানুষের মৃত্যু দূরা এই বর্ণনা শুরু করা হয়েছে। কেননা, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু তার জন্যে আংশিক কেয়ামত হয়ে থাকে। কেয়ামতের বিশ্লেষণে এর প্রভাব অসাধারণ। প্রথম বিশেষণ- وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ অর্থাৎ, নির্মমভাবে টেনে আত্মা নির্গতকারী। এখানে আঘাবের, সেসব ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে, যারা কাকেরের আত্মা নির্মমভাবে বের করে। যেহেতু এই নির্মমতা আত্মিক হয়ে থাকে, তাই দর্শকদেরও এটা অনুভব করা জরুরী নয়। এ কারণেই কাকেরদের আত্মা প্রায়ই সহজে বের হতে দেখা যায়, কিন্তু এটা কেবল আমাদের দেখার মতোই। তার আত্মার উপর যে নির্মম কাণ্ড সঞ্চারিত হয়, তা কে দেখতে পারে। এটা তো আল্লাহর উক্তি থেকেই জানা যায়। তাই আলোচ্য আয়াতে খবর দেয়া হয়েছে যে, কাকেরদের আত্মা টেনে টেনে নির্মমভাবে বের করা হয়।

দ্বিতীয় বিশেষণ- وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ অর্থাৎ, নির্মমভাবে বের করা হয়। কোন কিছুতে পানি অথবা বাতাস ভর্তি

থাকলে যদি তার ঝাঁপন খুলে দেয়া হয়, তবে সেই পানি বা বাতাস সহজে বের হয়ে যায়। এতে মুমিনের আত্মা বের করাকে এর সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, যে ফেরেশতা মুমিনের রুহ কবজ করার কাজে নিয়োজিত আছে, সে অনায়াসে রুহ কবজ করে-কঠোরতা করে না। এখানেও বিষয়টি আত্মিক বিষায় কোন মুসলমান বরং সংকল্পপরায়ণ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় আত্মা বের হতে বিলম্ব হলে একথা বলা যায় না যে, তার প্রতি নির্মমতা করা হচ্ছে-যদিও শারীরিকভাবে নির্মমতা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত কারণ এই যে, কাকেরের আত্মা বের করার সময় থেকেই বরষাধর আঘাব সামনে এসে যায়। এতে তার আত্মা অস্থির হয়ে দেহে আত্মগোপন করতে চায়। ফেরেশতা জোরে-জবরে টানা-হেঁচড়া করে তাকে বের করে। পক্ষান্তরে মুমিনের রুহের সামনে বরষাধর সওয়াব, নেয়ামত ও সুসংবাদ ভেসে উঠে। ফলে সে দ্রুতবেগে সেদিকে যেতে চায়।

তৃতীয় বিশেষণ- وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ -এর আভিধানিক অর্থ সম্ভরণ করা। এখানে উদ্দেশ্য দ্রুতবেগে চলা। নদীপথে কোন বাধাবিলম্ব থাকে না। সম্ভরণকারী ব্যক্তি অথবা নৌকারোহী সোজা গন্তব্য স্থানের দিকে ধাবিত হয়। এই সম্ভরণকারী বিশেষণটিও মৃত্যুর ফেরেশতাগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। মানুষের রুহ কবজ করার পর তারা দ্রুতগতিতে আকাশের দিকে নিয়ে যায়।

চতুর্থ বিশেষণ- وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ উদ্দেশ্য এই যে, যে আত্মা ফেরেশতাগণের হস্তগত হয়, তাকে ভাল অথবা মন্দ ঠিকানায় পৌছানোর কাজে তারা দ্রুততায় একে অপরকে ডিনিয়ে যায়। তারা মুমিনের আত্মাকে জন্মান্তরের আবহাওয়ায় ও নেয়ামতের জায়গায় এবং কাকেরের আত্মাকে জাহান্নামের আবহাওয়ায় ও আঘাবের জায়গায় পৌছিয়ে দেয়।

পঞ্চম বিশেষণ- وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ মৃত্যুর ফেরেশতাগণের সর্বশেষ কাজ এই যে, যে আত্মাকে সওয়াব ও আরাম দেয়ার আদেশ হয়, তারা তার জন্যে সওয়াব ও আরামের ব্যবস্থা করে এবং যাকে আঘাব ও কষ্টে রাখার আদেশ হয়, তারা তার জন্যে আঘাব ও কষ্টের ব্যবস্থা করে।

فَإِنَّ الْحَجْمَ فِي الْمَأْوَىٰ هُوَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ
نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَوَاقٍ الْحِجَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۚ فِيمَ أَنتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۚ
إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۚ إِنَّهَا تَأْتِي مُنْذُرًا مِّنْ يَحْشَاهَا ۚ كَانَتْ
يَوْمَ يَرْوُفُهُمْ أَتَىٰ بَعْضُهُم أَلْعَشِيَّةَ ۖ وَأُضْهِبَهَا ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۖ إِنَّ جَاءَهُ الْأَعْنَىٰ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ
يَكُونُ ۖ أَوْ يُنْفَعُ الْكَرَىٰ ۖ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۖ
فَأَنَّىٰ لَهُ كَيْدُ ۖ وَمَا عَلَيْكَ الْاَلْيُ ۖ وَوَأَمَّا مَنْ
جَاءَهُ يَسْئُرُ ۖ وَهُوَ يَخْشَىٰ ۖ فَأَنَّىٰ عَنْهُ تُكَلَّىٰ ۖ كَلَّا
ۖ إِنَّهَا تَذْكُرَةٌ ۖ فَمِنْ شَاءَ ذَكَرَهُ ۖ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۖ
مُرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۖ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۖ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۖ
فَقُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُ ۚ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ
مِنْ تُفْعَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۖ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ۖ

(৩৯) তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (৪০) পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে, (৪১) তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (৪২) তারা আপনারকে জিজ্ঞাসা করে, কয়ামত কখন হবে? (৪৩) এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? (৪৪) এর চরম জ্ঞান আপনার পালনকর্তার কাছে। (৪৫) যে একে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবেন। (৪৬) যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।

সূরা আবাসা

মকায় অবতীর্ণ: আয়াত ৪২।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) তিনি অকুণ্ঠিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। (২) কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল। (৩) আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিত্যক্ত হত, (৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশে তার উপকার হত। (৫) পরন্তু যে বেপরোয়া, (৬) আপনি তার চিন্তায় মশগুল। (৭) সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই। (৮) যে আপনার কাছে দোড়ে আসতো (৯) এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে, (১০) আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন। (১১) কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশবানী। (১২) অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ করবে। (১৩—১৪) এটা লিখিত আছে সম্মানিত, উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে, (১৫) লিপিকারের হস্তে, (১৬) যারা মহৎ, পূত চরিত্র। (১৭) মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ। (১৮) তিনি তাকে কি বস্ত্র থেকে সৃষ্টি করেছেন? (১৯) শুরু থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুপরিমিত করেছেন। (২০) অতঃপর তার পশ্চ সহজ করেছেন,

এরপর জান্নাতীদেরও দু'টি বিশেষ আলামত বর্ণনা করা হয়েছে, (এক) দুনিয়াতে

প্রত্যেক কাজের সময় এরূপ ভয় করা যে, একদিন আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হয়ে এ কাজের হিসাব দিতে হবে। (দুই) অবৈধ খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এই দু'টি গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়, কোরআন পাক তাকে সুসংবাদ দেয় **فَإِنَّ الْحِجَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ** অর্থাৎ, জান্নাতই তার ঠিকানা।

সূরা আবাসা

শানে নুযুলে বর্ণিত অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উশ্ম-মকতুম (রাঃ)—এর ঘটনায় ইমাম বগভী (রহঃ) রেওয়াজেত করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) অন্ধ হওয়ার কারণে একথা জানতে পারেননি যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্যের সাথে আলোচনারত আছেন। তিনি মজলিসে প্রবেশ করেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে আওয়াজ দিতে শুরু করেন এবং বার বার আওয়াজ দেন।—(মায়হারী) ইবনে-কাসীরের এক রেওয়াজেতে আরও আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে কোরআনের একটি আয়াতের পাঠ জিজ্ঞেস করেন এবং সাথে সাথে জওয়াব দিতে পীড়াপীড়ি করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন মক্কার কাফের নেতৃবর্গকে উপদেশদানে মশগুল ছিলেন। এই নেতৃবর্গ ছিলেন ওতবা ইবনে রবীয়া, আবু জাহ্ল ইবনে-হেশাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর পিতৃব্য অম্বাস। তিনি তখনও মুসলমান হননি। এরূপ ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে-উশ্ম মকতুম (রাঃ)—এর এভাবে কথা বলা এবং আয়াতের ভাষা ঠিক করার মামুলী প্রশ্ন রেখে তাৎক্ষণিক জওয়াবের জন্য পীড়াপীড়ি করা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে বিরক্তিকর ঠেকে। এই বিরক্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, আবদুল্লাহ (রাঃ) পাক মুসলমান ছিলেন এবং সদাসর্বদা মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। তিনি এই প্রশ্ন অন্য সময়ও রাখতে পারতেন। তাঁর জওয়াব বিলম্বিত করার মধ্যে কোন ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা ছিল না।

عَبَسَ وَتَوَلَّى প্রথম শব্দের অর্থ রুটতা অবলম্বন করা এবং চোখ—

মুখে বিরক্তি প্রকাশ করা। দ্বিতীয় শব্দের অর্থ মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এটা মুখোমুখি সম্মোদন করে উপস্থিত পদবাচ্য দ্বারা এসব কথা বলার স্থান ছিল। কিন্তু তা না করে কোরআন পাক অনুপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করেছে। এতে ভর্ৎসনার স্থলেও রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে এবং ধারণা দেয়া হয়েছে যে, কাজটি যেন অন্য কেউ করেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এরূপ করা আপনার পক্ষে সমীচীন হয়নি। পরবর্তী **وَمَا يُدْرِيكَ** (আপনি কি জানেন?) বাক্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর ওয়বের দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, আপনার মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ হয়নি যে, সাহাবীর জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উপকারিতা নিশ্চিত এবং কাফেরদের সাথে আলোচনার উপকারিতা অনিশ্চিত। এ বাক্যে অনুপস্থিত পদবাচ্যের পরিবর্তে উপস্থিত পদবাচ্য অবলম্বন করার মধ্যেও রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে। কেননা, যদি কোথাও উপস্থিত পদবাচ্য বাবহার করা না হত, তবে সন্দেহ হতে পারত যে, এই

কর্মশক্তি অপছন্দ করার কারণেই মুখোমুখি সম্মুখন বর্জন করা হয়েছে। এটা রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর জন্যে অসহনীয় কষ্টের কারণ হত। সুতরাং প্রথম বাক্যে অনুস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা এবং দ্বিতীয় বাক্যে উপস্থিত পদবাচ্য ব্যবহার করা—উভয়টির মধ্যে রসূলুল্লাহ (সঃ)—এর সম্মান ও মনোরঞ্জন রয়েছে।

لَمَّا يَدْعُوْا يَوْتِيْهِمْ اٰتٰى سَرِيْعًا - অর্থাৎ আপনি কি জানেন,

এই সাহাবী যা জিজ্ঞেস করছিল, তা তাকে শিক্ষা দিলে সে তদ্বারা পরিশুদ্ধ হতে পারত, কিংবা কমপক্ষে আল্লাহকে স্মরণ করে প্রাথমিক উপকার লাভ করতে পারত। ذَكْرَى শব্দের অর্থ আল্লাহকে বহল পরিমাণে স্মরণকরা।—(সেহাহ)

اٰتٰىنِ اسْتَعْنٰى فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدَّقُ - অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনার ও

আপনার ধর্মের প্রতি বেশরওয়া ভাব প্রদর্শন করছে, আপনি তার চিন্তায় মশগুল আছেন যে, সে কোনরূপে মুসলমান হোক। অথচ এটা আপনার দায়িত্ব নয়। সে মুসলমান না হলে আপনাকে অভিযুক্ত করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ধর্মের জ্ঞান অন্বেষণে দৌড়ে আপনার কাছে আসে এবং সে আল্লাহকে ভয়ও করে, আপনি তার দিকে মনোযোগ দেন না। এতে সুস্পষ্টভাবে রসূলুল্লাহ (সঃ)—কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, শিক্ষা, সংশোধন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে পাকাপোক্ত মুসলমান করা অমুসলমানকে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা করা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী। এর চিন্তা অধিক করা উচিত। অতঃপর কোরআন যে উপদেশবাহী এবং উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন, তা বর্ণনা করা হয়েছে।

فِيْ مَّحْفِلٍ مُّكْرَمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ - অর্থাৎ লওহে-মাহফূয

বোঝানো হয়েছে। এটা যদিও এক বস্তু, কিন্তু সমস্ত ঐশী সইফা এতে লিখিত আছে বলে একে বহুবচনে প্রকাশ করা হয়েছে। مَرْفُوعَةٍ বলে এর উচ্চমর্যাদা বোঝানো হয়েছে এবং مُّطَهَّرَةٍ বলে বোঝানো হয়েছে যে, নাপাক মানুষ, হায়েয ও নেকাসওয়ালী নারী এবং গুনাহীন ব্যক্তি একে স্পর্শ করতে পারে না।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰتٰى سَفَرًا - এর বহুবচন হতে পারে। অর্থ হবে লিপিকার। এমতাবস্থায় এই শব্দ দ্বারা ফেরেশতা কেরামুন-কাতেবীন অথবা পয়গম্বরগণ এবং তাঁদের ওহী লেখকগণকে বোঝানো হবে। এটা হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) ও মুজাহিদ (রহঃ)—এর তফসীল।

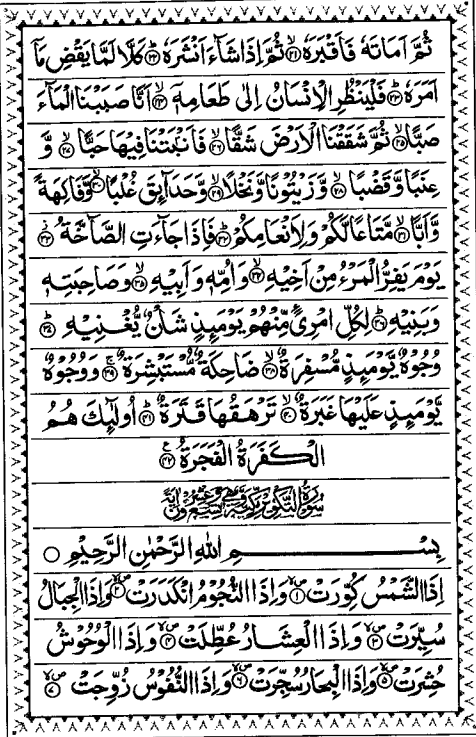
سَفِيرٍ - এর বহুবচনও হতে পারে। অর্থ দূত।

এমতাবস্থায় এর দ্বারা দূত ফেরেশতা, পয়গম্বরগণ এবং ওহী লেখক সাহাবায়ে কেরামকে বোঝানো হয়েছে। আলেমগণও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কেননা, তাঁরাও রসূলুল্লাহ (সঃ) ও উম্মতের মধ্যবর্তী দূত। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : কেরাআতে বিশেষজ্ঞ কোরআন পাঠকও এই আয়াতে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। আর যে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ নয় ; কিন্তু কষ্টে-স্ট্রে কেরাআত শুদ্ধ করে নেয়, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে, কেরাআতের সওয়াব ও কষ্ট করার সওয়াব। এ থেকে জানা গেল যে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অনেক সওয়াব পাবে।—(মায়হারী)

অতঃপর মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেসব নেয়ামত ভোগ করে, সেসব নেয়ামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো বস্তুনিষ্ঠ ও অনুভূত বিষয়। সামান্য চেতনাশীল ব্যক্তিও এগুলো বুঝতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রথমে مِنْ اٰتٰى شَيْءٌ خَلَقَهُ বলে প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, হে মানুষ, চিন্তা কর, আল্লাহ তোমাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? এই প্রশ্নের জওয়াব নির্দিষ্ট—অন্য কোন জওয়াব হতেই পারে না। তাই নিজেই জওয়াব দিয়েছেন-مِنْ تُطْفَؤُ - অর্থাৎ, মানুষকে বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ অর্থাৎ, কেবল বীর্ষ থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেননি ; বরং তাকে সুপরিমিতও করেছেন। তার গঠন প্রকৃতি, আকার-আকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, গ্রন্থি, চক্ষু, নাক, কান ইত্যাদি এমন সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, একটু এদিক-সেদিক হলে মানুষের আকৃতিই বিগড়ে যেত এবং কাজকর্ম দূরত্ব হয়ে যেত।

- শব্দের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, মানুষ যখন মাতৃগর্ভে সৃষ্টি হতে থাকে, তখন আল্লাহ তাআলা তার চারটি বিষয়ের পরিমাণ লিখে দেন—(১) সে কি কাজ করবে এবং কিরূপে করবে, (২) তার বয়স কত হবে, (৩) কি পরিমাণ রিযিক পাবে এবং (৪) পরিণামে ভাগ্যবান হবে, না হতভাগা হবে।—(বোখারী-মুসলিম,)

ثُمَّ السَّيْلُ يَنْتَرُهُ - অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বীয রহস্য-বলে মাতৃগর্ভের তিন অঙ্ককার প্রকোষ্ঠে এবং সংরক্ষিত জায়গায় মানুষকে সৃষ্টি করেন। যার গর্ভে এই সৃষ্টিকর্ম চলে, সে নিজেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানে না। এরপর আল্লাহ তাআলার অপার শক্তিই এই জীবিত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষের মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে আসার পথ সহজ করে দেয়। চার পাঁচ পাউণ্ড ওজনের দেহটি সইফ-সালামতে বাইরে চলে আসে এবং মায়েরও এতে তেমন কোন দৈহিক ক্ষতি হয় না।



(২১) অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন তাকে। (২২) এরপর যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (২৩) সে কখনও কৃতজ্ঞ হয়নি, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি। (২৪) মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক, (২৫) আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি, (২৬) এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি। (২৭) অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, (২৮) আঙ্গুর, শাক-সব্জী (২৯) যয়তুন, খজুর, (৩০) ঘন উদ্যান, (৩১) ফল এবং ঘাস (৩২) তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের উপকারার্থে। (৩৩) অতঃপর যেদিন কণ্ঠবিদারক নাদ আসবে, (৩৪) সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে (৩৫) তার মাতা, তার পিতা, (৩৬) তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। (৩৭) সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। (৩৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, (৩৯) সহস্য ও প্রফুল্ল। (৪০) এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে মূলি ধূসরিত। (৪১) তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। (৪২) তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল।

সূরা আত-তাক্বীর

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ২৯ ॥

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

- (১) যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, (২) যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে, (৩) যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে, (৪) যখন দশ মাসের গর্ভবতী উট্টীসমূহ উপেক্ষিত হবে; (৫) যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে, (৬) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (৭) যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে,

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ثُمَّ أَمَانَةٌ — নেয়ামত বর্ণনা প্রসঙ্গে মানবসৃষ্টির সূচনা বর্ণনা করার পর পরিণতি অর্থাৎ, মৃত্যু ও কবরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের মৃত্যু প্রকৃতপক্ষে কোন বিপদ নয়—নেয়ামত। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : تحفة المؤمن الموت — মৃত্যু মুমিনের জন্য উপঢৌকন-স্বরূপ। এর মধ্যে অনেক রহস্য নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ, অতঃপর তাকে কবরস্থ করেছেন। বলাবাহুল্য, এটাও এক নেয়ামত। কেননা, আল্লাহ তাআলা মানুষকে সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় যেখানে মরে সেখানেই পচে-গলে যেতে দেননি; বরং তাকে গোসল দিয়ে পাক-সাঁফ কাপড় পরিয়ে সম্মান সহকারে কবরে দাফন করে দেয়া হয়। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, মৃত মানুষকে দাফন করা ওয়াজিব।

كَلَّا لَمَّا يُبْقِضُ مَا أَمْرُهُ — এতে অবিশ্বাসী মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, উপরোক্ত খোদায়ী নিদর্শনাবলী ও নেয়ামতরাজির পরিশ্রেক্ষিতে মানুষের উচিত ছিল এগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর বিধানাবলী পালন করা। কিন্তু হতভাগ্য মানুষ তা করেনি। অতঃপর মানবসৃষ্টির সূচনা ও পরিসমাপ্তির মাঝখানে যেসব নেয়ামত মানুষ ভোগ করে, সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষের রিযিক কিভাবে সৃষ্টি করা হয়? কিভাবে আকাশ থেকে পানি বর্ষিত হয়ে মাটির নীচে চাপাপড়া বীজকে সজীব ও সতেজ করে তোলে। ফলে একটি সরু ও ক্ষীণকায় অঙ্কুর মাটি ভেদ করে উপরে উঠে। অতঃপর তা থেকে হরেক রকমের শস্য, ফল-মূল ও বাগ-বাগিচা সৃষ্টি হয়। এসব নেয়ামত সম্পর্কে মানুষকে বার বার অবহিত করার পর পরিশেষে আবার কেয়ামতের প্রসঙ্গ আনা হয়েছে।

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاعَةُ — এমন কঠোর নাদ; যার ফলে মানুষ শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলে। এখানে কেয়ামতের ইটগোল তথা শিংগার ফুঁক বোঝানো হয়েছে।

يَوْمَ يُفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ — এখানে হাশরের ময়দানে সকলের সমাবেশের দিন বোঝানো হয়েছে। সেদিন প্রত্যেক মানুষ আপন চিন্তায় বিভোর হবে। দুনিয়াতে যেসব আত্মীয়তা ও সম্পর্কের কারণে মানুষ একে অপরের জন্যে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে কুষ্ঠিত হয় না, হাশরে তারাই নিজ নিজ চিন্তায় এমন নিমগ্ন হবে যে, কেউ কারও খবর নিতে পারবে না; বরং সামনে দেখলেও মুখ লুকাবে। প্রত্যেক মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে এবং পিতা, মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে ফিরবে। দুনিয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা ভ্রাতাদের মধ্যে হয়। এর চেয়ে বেশী পিতা-মাতাকে সাহায্য করার চিন্তা করা হয় এবং স্বভাবগত কারণে এর চেয়েও বেশী স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আয়াতে নীচ থেকে উপরের সম্পর্ক যথাক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর হাশরের ময়দানে মুমিন ও কাফেরের পরিণতি বর্ণনা করে সূরার ইতি টানা হয়েছে।

সূরা আত-তাক্বীর

تَكْوِيرٌ — এর এক অর্থ জ্যোতিহীন হওয়া। হাসান বসরী (রহঃ) এই তফসীরই করেছেন। এর অপর অর্থ নিক্ষেপ

করাও হয়ে থাকে। রবী ইবনে ঝায়সাম (রহঃ) এই তফসীর করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, সূর্যকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে এবং সূর্যের উত্তাপে সারা সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হবে। এই দুই তফসীরের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা, এটা সম্ভবপর যে, প্রথমে সূর্যকে জ্যোতিহীন করে দেয়া হবে, অতঃপর সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। সহীহ বোখারীতে আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন চন্দ্র-সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। মুসনাদে আহমদে আছে, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। এই আয়াত প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সূর্য, চন্দ্র ও সমস্ত নক্ষত্রকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবেন, অতঃপর এর উপর প্রবল বাতাস প্রবাহিত হবে। ফলে সারা সমুদ্র অগ্নি হয়ে যাবে। এভাবে চন্দ্র, সূর্য সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে—এ উভয় কথাই ঠিক হয়ে যায়। কেননা, সারা সমুদ্র তখন জাহান্নাম হয়ে যাবে। — (মায়হারী, কুরতুবী)

وَالْجُودُ الْكَدْرُ - এর অর্থ পতিত হওয়া। পূর্ববর্তীগণ থেকে এই তফসীর বর্ণিত রয়েছে। আকাশের সব নক্ষত্র সমুদ্রে পতিত হবে। পূর্বাঙ্গ রেওয়ায়েতসমূহ এর বিবরণ রয়েছে।

وَالْإِنْسَانُ عُظْلًا - আরবের রীতি অনুযায়ী দৃষ্টান্তস্বরূপ একথা বলা হয়েছে। কেননা, কোরআনে আরবদেরকেই প্রথমে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের কাছে দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী বিরাট ধনরূপে গণ্য হত। তারা এর দুগ্ধ ও বাচ্চার অপেক্ষা করত। ফলে একে দৃষ্টির আড়াল হতে দিত না এবং কখনও স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিত না।

وَالْإِنْسَانُ سَجِيرٌ - এর অর্থ অগ্নিসংযোগ করা ও প্রজ্জ্বলিত করা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই অর্থই নিয়েছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন মিশ্রিত করা। এতদুভয়ের মধ্যে

কোন বিরোধ নেই। প্রথমে লোনা সমুদ্র ও মিঠা সমুদ্র একাকার করা হবে। মাঝখানের অন্তরায় শেষ করে দেয়া হবে। ফলে উভয় প্রকার সমুদ্রের পানি মিশ্রিত হয়ে যাবে। অতঃপর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে এতে নিক্ষেপ করে সমস্ত পানিকে অগ্নি তথা জাহান্নামে পরিণত করা হবে। — (মায়হারী)

وَالْأَنفُسُ نُوحٌ - অর্থাৎ, যখন হাশরে সমবেত লোকদেরকে বিভিন্ন দলে দলবদ্ধ করে দেয়া হবে। এই দলবদ্ধকরণ ঈমান ও কর্মের দিক দিয়ে করা হবে। কাকের এক জায়গায় ও মুমিন এক জায়গায়। কাকের এবং মুমিনের মধ্যেও কর্ম এবং অভ্যাসের পার্থক্য থাকে। এদিক দিয়ে কাকেরদেরও বিভিন্ন প্রকার দল হবে আর মুমিনদেরও বিশ্বাস এবং কর্মের ভিত্তিতে দল হবে। বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন, যারা ভাল হোক মন্দ হোক একই প্রকার কর্ম করবে, তাদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। উদাহরণতঃ আলেমগণ এক জায়গায়, এবাদতকারী সৎসারবিমুখগণ এক জায়গায়, জেহাদকারী গায়ীগণ এক জায়গায় এবং সৎকা-খয়রাতে বৈশিষ্ট্যের অধিকারীগণ এক জায়গায় সমবেত হবে। এমনভাবে মন্দ লোকদের মধ্যে চোর-ডাকাতকে এক জায়গায়, ব্যতিচারীকে এক জায়গায় এবং অন্যান্য বিশেষ গোনাহে অংশগ্রহণকারীদেরকে এক জায়গায় জড়ো করা হবে। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন : হাশরে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বজাতির সাথে থাকবে (কিন্তু এই জাতীয়তা বংশ অথবা দেশভিত্তিক হবে না, বরং কর্ম ও বিশ্বাসভিত্তিক হবে।) তিনি এর প্রমাণস্বরূপ

وَالْأَنفُسُ نُوحٌ আয়াতখানি পেশ করেন। অর্থাৎ, হাশরে লোকদের

তিনটি প্রধান দল হবে — (১) পূর্ববর্তী সংকর্মী লোকদের, (২) আসহাবুল ইয়ামীনের এবং (৩) আসহাবুল-শিমালের দল। প্রথমোক্ত দুই দল মুক্তি পাবে এবং তৃতীয় দলটি হবে কাকের পাগাচারীদের। তারা মুক্তি পাবে না।



(৮) যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, (৯) কি অপরাধে তাকে হত্যা করা করা হল? (১০) যখন আমলনামা খোলা হবে, (১১) যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে, (১২) যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হবে (১৩) এবং যখন জাহান্নাত সন্নিকটবর্তী হবে, (১৪) তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে। (১৫) আমি শপথ করি যে সব নক্ষত্রগুলো পচাতে সেরে যায়, (১৬) চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়, (১৭) শপথ নিশাবাসন ও (১৮) প্রভাত আগমন কালের, (১৯) নিচয় কোরআন সম্মানিত রসূলের অনীত বানী, (২০) যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাপালী, (২১) সবার মান্যবর, সেখানকার বিশৃঙ্খলিত। (২২) এবং তোমাদের সাথী পাগল নন। (২৩) তিনি সেই কেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। (২৪) তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপণতা করেন না। (২৫) এটা বিতাড়িত শরতনের উক্তি নয়। (২৬) অতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছে? (২৭) এটা তো কেবল বিশ্বাসীদের জন্যে উপদেশ, (২৮) তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সোচ্ছা চলে চায়। (২৯) তোমরা আদ্রাহ রাক্বুল আলাখানের অতিথাদের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।

সূরা আন-ইনকিতার

মকায় অবতীর্ণ। আয়াত ১১।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) যখন নক্ষত্রসমূহ করে পড়বে, (৩) যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে, (৪) এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে, (৫) তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কি আশ্রয় প্রেরণ করেছে এবং কি পচাতে ছেড়ে এসেছে।

وَلَا الْمَوْدَّةُ سُئِلَتْ —এর অর্থ জীবন্ত প্রোথিত কন্যা।

জাহেলিয়াত যুগের আরবরা কন্যা-সন্তানকে নষ্টাকর মনে করত এবং জীবন্তই মাটিতে প্রোথিত করে দিত। ইসলাম এই কুখ্যার মূলোৎপাটন করে।

وَلَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ —কশট —এর আভিধানিক অর্থ জন্তুর চামড়া

বসানো। বাহ্যতঃ এটা প্রথম কৃকের সময়কার অবস্থা, যা এই দুনিয়াতেই ঘটবে। আকাশের সৌন্দর্য সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহ জ্যোতির্হীন হয়ে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। আকাশের বর্তমান আকার-আকৃতি বদলে যাবে। এই অবস্থাকে কশট শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ লিখেছেন শুষ্ক হয়ে নেয়া। আদ্রাহের অর্থ এই যে, মাখার উপর ছাদের ন্যায় বিস্তৃত এই আকাশকে শুষ্ক হয়ে নেয়া হবে।

وَعِلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ —অর্থাৎ, কেয়ামতের উপরোক্ত পরিস্থিতিতে প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ, সংকর্য কিংবা অসংকর্য — সব তার দৃষ্টির সামনে এসে যাবে — আমলনামায় লিখিত অবস্থায় অথবা অন্য কোন বিশেষ পন্থায়। হাদীস থেকে এরূপই জানা যায়।

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ —অর্থাৎ, এই কোরআন একজন সম্মানিত দূতের অনীত কলাম। তিনি শক্তিশালী, আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাপালী, কেরেশতাসনের মান্যবর এবং আদ্রাহর বিশৃঙ্খলিত। পরমায় আনা-নেয়ার কাছে তার তরফ থেকে বিশৃঙ্খলিত ও কম-বেশী করার সম্ভাবনা নেই। এখানে রসূল ক্রিম বলে বাহ্যতঃ জিবরাঈল (আঃ)-কে বোঝানো হয়েছে। পরময়রূপের ন্যায় কেরেশতাসনের বেলায়ও রসূল শব্দ ব্যবহৃত হয়। উল্লেখিত সবগুলো বিশেষ জিবরাঈল (আঃ)-এর জন্যে বিনা দ্বিধায় প্রযোজ্য। তিনি যে শক্তিশালী, সূরা নজমে তার পরিষ্কার উল্লেখ আছে عَلَيْهِ سَيِّدُنَا الْقُرَى তিনি যে, আরশ ও আকাশবাসী কেরেশতাসনের মান্যবর, তা মেরাজের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। তিনি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সাথে নিয়ে আকাশে পৌঁছলে তাঁর আদেশে কেরেশতারা আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়। তিনি যে আমিন — তথা বিশৃঙ্খলিত, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কোন কোন তফসীরবিদ রসূল আমিন —এর অর্থ নিয়েছেন মুহাম্মদ (সঃ)। তাঁরা উল্লেখিত বিশেষণগুলোকে কিছু কিছু সর্দর্ভ করে তাঁর জন্যে প্রযোজ্য করেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মাহাত্ম্য এবং কাফেরদের অলীক অভিযোগের জগুয়াব দেখা হয়েছে।

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ —যারা রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে উম্মাদ বলত, এতে তাদেরকে জগুয়াব দেখা হয়েছে।

وَلَقَدْ رَأَى بِالْأَيْ الْغُبُورِ —অর্থাৎ, তিনি জিবরাঈল (আঃ)-কে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন। সূরা নজমে আছে تَأْتِيهِمْ وَهُمْ بِالْأَيْ الْغُبُورِ এই দেখার কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি ওহী নিয়ে আগমনকারী জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে পরিচিত ছিলেন, তাঁকে আসল আকার-আকৃতিতেও দেখেছিলেন। তাই এই ওহীতে কোনরূপ সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

সূরা তাক্বীর সমাপ্ত

সূরা আল-ইনফিতার

عَلَيْكَ نَفْسٌ مَأْمُونَةٌ وَأَكْرَمَتْ
সমূহ করে পড়া, মিঠা ও লোনা সমুদ্র একাকার হয়ে যাওয়া, কবর থেকে
মৃতদের বের হয়ে আসা ইত্যাকার কেয়ামতের ঘটনা যখন ঘটে যাবে,
তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি অগ্রে শ্রেণণ করেছে এবং কি পশ্চাতে
ছেড়েছে। অগ্রে শ্রেণণ করার এক অর্থ কাজ করা এবং পশ্চাতে ছাড়ার
অর্থ কাজ না করা। সূত্রাৎ কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে
সৎ অসৎ কি কর্ম করেছে এবং সৎ অসৎ কি কর্ম করেনি। দ্বিতীয় অর্থ
এরূপও হতে পারে যে, অগ্রে শ্রেণণ করেছে মানে যে কর্ম সে নিজে
করেছে এবং পশ্চাতে ছেড়েছে মানে যে কর্ম সে নিজে তো করেনি, কিন্তু
তার ভিত্তি ও প্রথা স্থাপন করে এসেছে। কাজটি সৎ হলে তার সওয়াব সে
পেতে থাকবে এবং অসৎ হলে তার গোনাহ আমলনামায় লিখিত হতে
থাকবে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম সুন্নত ও নিয়ম
চালু করে, সে তার সওয়াব সব সময় পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি
কোন কুপ্রথা অথবা পাপ কাজ চালু করে, যতদিন মানুষ এই পাপ কাজ
করবে, ততদিন তার আমলনামায় এর গোনাহ লিখিত হতে থাকবে।

আনুসঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَاكَ — পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কেয়ামতের

ভয়াবহ কাজ-কারবার উল্লেখিত হয়েছে। এই আয়াতে মানুষের সৃষ্টির
প্রারম্ভিক পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো নিয়ে সামান্য চিন্তা-ভাবনা
করলে মানুষ আল্লাহ ও রসূল (সাঃ)—এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত
এবং তাঁদের নির্দেশাবলীর চুল পরিমাণও বিরুদ্ধাচরণ করত না। কিন্তু মানুষ
ভুল-ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। তাই সাবধান করার উদ্দেশে প্রশ্ন করা হয়েছে :
হে মানুষ, তোমার সূচনা ও পরিণামের এসব অবস্থা সামনে থাকা সত্ত্বেও
তোমাকে কিসে বিভ্রান্ত করল যে, আল্লাহর নাক্ষত্রমণী শুরু করেছে?

এখানে মানুষ সৃষ্টির প্রারম্ভিক পর্যায় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে —
عَلَيْكَ نَفْسٌ مَأْمُونَةٌ অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, তদুপরি তোমার
সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুবিন্যস্ত করেছেন। এরপর বলা হয়েছে—
فَعَزَّكَ অর্থাৎ, তোমার অস্তিত্বকে বিশেষ সমতা দান করেছেন, যা অন্য প্রাণীর
মধ্যে নেই। মানব সৃষ্টিতে যদিও রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল, পিত্ত ইত্যাদি
পরস্পরবিরোধী উপকরণ শামিল রয়েছে, কিন্তু খোদায়ী রহস্য এগুলোর
সমন্বয়ে একটি সুমম মেজাজ তৈরি করে দিয়েছে। এরপর তৃতীয় পর্যায়ে
উল্লেখ করা হয়েছে—

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَاكَ نَفْسٌ مَأْمُونَةٌ

একই আকার-আকৃতিতে সৃষ্টি করেননি। এরূপ করলে পারস্পরিক
স্বাতন্ত্র্য থাকত না। বরং তিনি কোটি কোটি মানুষের আকার-আকৃতি
এমনভাবে গঠন করেছেন যে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য
সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

সৃষ্টির এসব প্রারম্ভিক পর্যায় বর্ণনার পর বলা হয়েছে
يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَاكَ نَفْسٌ مَأْمُونَةٌ হে অনবধান মানব, যে পালনকর্তা তোমার মধ্যে
এতসব গুণ গচ্ছিত রেখেছেন, তাঁর ব্যাপারে তুমি কিরূপে ধোকা খেলে

(৬) হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে
বিভ্রান্ত করল? (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে
সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুমম করেছেন। (৮) তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত
আকৃতিতে গঠন করেছেন। (৯) কখনও বিভ্রান্ত হয়ো না; বরং তোমরা
দান-প্রতিদানকে মিথ্যা মনে কর। (১০) অবশ্যই তোমাদের উপর
তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে। (১১) সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ। (১২) তারা
জানেন যা তোমরা কর। (১৩) সংকল্পশীলগণ থাকবে জ্ঞাত্ব। (১৪) এবং
দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে; (১৫) তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ
করবে। (১৬) তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না। (১৭) আপনি জানেন,
বিচার দিবস কি? (১৮) অতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস কি? (১৯)
যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব
কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর।

সূরা আত্-তাফ্বীফ

মক্কা অবতীর্ণ। আয়াত ৩৬।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ, (২) যারা লোকের কাছ
থেকে যখন মাপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় (৩) এবং যখন
লোকদেরকে মাপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়।
(৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুজ্জীবিত হবে। (৫) সেই
মহাদিবসে, (৬) যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে। (৭) এটা
কিছুতেই উচিত নয়, নিচয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে।
(৮) আপনি জানেন, সিজ্জীন কি? (৯) এটা লিপিবদ্ধ খাতা। (১০) সেদিন
দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের,

যে, তাঁকে ভুলে গেছ এবং তাঁর নির্দেশাবলী অমান্য করছ? তোমার দেহের প্রতিটি গ্রন্থিই তো তোমাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট ছিল। এমনভাবেই এই বিবাস্তি কিরণে হল? এখানে কَرِيم শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের ধোঁকায় পড়ার কারণ এই যে, আল্লাহ্ মহানুভব। তিনি দয়া ও কৃপার কারণে মানুষের গোনাহের তাত্ক্ষণিক শাস্তি দেন না, এমন কি তার রিযিক, স্বাস্থ্য ও পার্শ্বি সুখ-শান্তিতেও কোন বিঘ্ন ঘটান না। এতেই মানুষ ধোঁকা খেয়ে গেছে। অথচ সামান্য বুদ্ধি ঝাটালে এই দয়া ও কৃপা বিভ্রান্তির কারণ হওয়ার পরিবর্তে পালনকর্তার অনুগ্রহের কাছে ঋণী হয়ে আরও বেশী আনুগত্যের কারণ হওয়া উচিত ছিল।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : **كَمِ مَنْ مَرَّوَرٍ تَحْتَ السُّتُرِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ** অর্থাৎ, অনেক মানুষের দোষ-ক্রটি ও গোনাহের উপর আল্লাহ্ তাআলা পর্দা ফেলে রেখেছেন, তাদেরকে লাক্ষিত করেননি। ফলে তারা আরও বেশী ধোঁকায় পড়ে গেছে।

عَلِمَتْ نَفْسُ الرَّكَازِ لَيْفِي نَفْسِهِ وَإِنَّ الْفَجَارَ لَيْفِي حَجِيمِهِ আয়াতে যে কর্ম সামনে আসার কথা বলা হয়েছিল, আলোচ্য আয়াতে তারই শাস্তি ও প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যারা সংকর্ম করত, তারা নেয়ামতে তথা জন্নাতে থাকবে এবং অবশ্য ও নাফরমানরা জাহান্নামে থাকবে।

وَمَا مَرَّوَرٍ عَنَّا بِبَاقِيَةٍ অর্থাৎ, জাহান্নামীরা কোন সময় জাহান্নাম থেকে পৃথক হবে না। কারণ, তাদের জন্যে চিরকালীন আযাবের নির্দেশ আছে। **لَا تَلْبِكَ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا** অর্থাৎ, হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় অন্যের কোন উপকার করতে পারবে না এবং কারও কষ্ট লাঘবও করতে পারবে না। এতে সুপারিশ করবে না, এরূপ বোঝা যায় না। কেননা, কারও সুপারিশ করা নিজ ইচ্ছায় হবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ কাউকে কারও সুপারিশ করার অনুমতি না দেন। তাই আল্লাহ্ তাআলাই আসল আদেশের মালিক। তিনি স্বীয় কৃপায় কাউকে সুপারিশের অনুমতি দিলে এবং তা কবুল করলে তাও তাঁরই আদেশ হবে।

সূরা আত-তাত্ফীক

সূরা তাত্ফীফ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর মতে মকায় অবতীর্ণ এবং হযরত ইবনে-আব্বাস, কাতাদাহ (রাঃ), মুকাতিল ও যাহহাক (রহঃ)-এর মতে মদীনায় অবতীর্ণ, কিন্তু মাত্র আটটি আয়াত মকায় অবতীর্ণ। ইমাম নাসাঈ (রহঃ) হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মদীনায় তশরীফ আনেন, তখন মদীনাবাসীদের সাধারণ কাজ-কারবার 'কায়ল' তথা মাপের মাধ্যমে সম্পন্ন হত। তারা এ ব্যাপারে চুরি করা ও কম মাপায় খুবই অভ্যস্ত ছিল। এর পরিত্রাণিত সূরা তাত্ফীফ অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) আরও বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় পৌঁছার পর সর্ধশ্রম এই সূরা অবতীর্ণ হয়। কারণ, মদীনাবাসীদের মধ্যে তখন এ বিষয়ের

ব্যাপক প্রচলন ছিল যে, তারা নিজেরা কারও কাছ থেকে সওয়া নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করত এবং অন্যের কাছে বিক্রি করার সময় মাপে কম দিত। এই সূরা নাখিল হওয়ার পর তারা এই বদ-অভ্যাস থেকে বিরত হয় এবং এমন বিরত হয় যে, আজ পর্যন্ত তাদের সুখ্যাতি সর্বজনবিদিত। — (মায়হারী)

وَلِلظَّالِمِينَ এর অর্থ মাপে কম করা। যে এরূপ করে, তাকে বলা হয় **مُظَنِّف** কোরআনের এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মাপে কম দেয়া হারাম।

تَنْظِيف কেবল মাপে কম করার মধ্যেই সীমিত নয়; বরং যে কোন ব্যাপারে প্রাপককে প্রাপ্য থেকে কম দেয়াও **تَنْظِيف** এর অন্তর্ভুক্ত; কোরআন ও হাদীসে মাপ ও ওজনকে কম করাকে হারাম করা হয়েছে। সাধারণভাবে কাজ-কারবারে লেন-দেন এরই দুই উপায়েই সম্পন্ন হয় এবং প্রাপকের প্রাপ্য আদায় হল কি না, তা এই দুই উপায়েই নির্ণীত হয়। প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য পূর্ণমাত্রায় দেয়াই যে এর উদ্দেশ্য, একথা কলিই বাহ্যিক। অতএব বোঝা গেল যে, এটা শুধু মাপ ও ওজনের মধ্যেই সীমিত থাকবে না; বরং মাপ ও ওজনের মাধ্যমে হোক, পণ্যের মাধ্যমে হোক অথবা অন্য যে কোন পন্থায় প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা **تَنْظِيف** এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

মুয়াত্তা ইমাম মালেক আছে, হযরত ওমর (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে নামাযের রুকু-সেজদা ইত্যাদি ঠিকমত করে না এবং দ্রুত নামায শেষ করে দেয়। তিনি তাকে বললেন : **لَقَدْ ظَنَنْتُ** তুমি আল্লাহর প্রাপ্য আদায়ে **تَنْظِيف** করছ। এই উক্তি উদ্ধৃত করে হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন : **وَفَاءٌ وَتَنْظِيفٌ** অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় দেয়া ও কম করা আছে, এমনকি, নামায ও গম্বুর মধ্যেও। এমনভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর অন্যান্য হক ও এবাদতে একে কদার নির্দিষ্ট হকে ক্রটি ও কম করে, সেও **تَنْظِيف** এর অপরাধে অপরাধী। মজ্বুর, কর্মচারী ও যতটুকু সময় কাজ করার চুক্তি করে, তাতে কম করাও অন্যায এবং প্রচলিত নিয়মের বরক্কাফ, কাজে অলসতা করাও নাজায়েয।

سَجَنَ - كَلَّا إِنَّ رَبَّ الْفَجَارِ لَيْفِي سَجِينٍ : **سَجِين** -এর অর্থ অর্ধ সেকের জায়গায় বন্দী করা। কাসুসে আছে — **سَجِين** -এর অর্থ চিরস্থায়ী কয়েদ। হাদীস ও রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, **سَجِين** একটি বিশেষ স্থানের নাম। এখানে কাকেরদের রুহ অবস্থান করে এবং এখানেই তাদের আমলনামা থাকে। এখানে এটাও সম্ভবপর যে, এখানে এমন কোন ঝাতা আছে, যাতে সারা বিশ্বের কাকেরদের কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়।

وَكَيْتُ مَرْوُومٌ -এহলে **مَرْوُوم** (মোহরকত)। ইমাম বগভী ও ইবনে-কাসীর (রহঃ) বলেন : এটা সিঙ্জীনের তফসীর নয়; বরং পূর্ববর্তী **كَيْتُ الْفَجَارِ** -এর বর্ণনা। অর্থ এই যে, কাকের ও পাগাচারীদের আমলনামা মোহর লাগিয়ে সংরক্ষিত করা হবে। ফলে এতে হ্রাস-বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকবে না। এই সংরক্ষণের স্থান হবে সিঙ্জীন। এখানেই কাকেরদের রুহ জমা করা হবে।

رَبِّكَ يَكْذِبُونَ بِبُيُوتِ الدِّينِ ۖ وَمَا يَكْدِبُ بِهِ إِلَّا كَلٌّ
مُعْتَدٍ أَشْيُوهُ ۖ إِذَا شِئْنَا عَلَيْهِ الْيَتَامَا قَالَ أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ۖ كَلَّا بَلْ عَصَرَانِ عَلَى قُلُوبِهِمْ تَاكَانُوا كَايِبُونَ ۝

থেকে উদ্ধৃত। অর্থ মরিচা ও ময়লা। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অন্তরে পাপের মরিচা পড়ে গেছে। মরিচা যেমন লোহাকে খেয়ে মাটিতে পরিণত করে দেয়, তেমনি তাদের পাপের মরিচা তাদের অন্তরের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দিয়েছে। ফলে তারা ভাল ও মন্দে পার্থক্য বোঝে না।

إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ — অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন এই

কাফেররা তাদের পালনকর্তার যেয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং পর্দার আড়ালে অবস্থান করবে। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রহঃ) বলেন : এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, সেদিন মুমিন ও গুলীগণ আল্লাহ তাআলার যেয়ারত লাভ করবে। নতুবা কাফেরদেরকে পর্দার অন্তরালে রাখার কোন উপকারিতা নেই।

إِنْ كُنَّ لِرَبِّ الْأَرْزَاقِ لَيْفٌ عَلَيْهِمْ — কারও কারও মতে

এর বহুবচন। উদ্দেশ্য উচ্চতা। ফাররা (রহঃ) এর মতে এটা এক জায়গার নাম— বহুবচন নয়। পূর্বোল্লিখিত বারী ইবনে আযেব (রাঃ) এর হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইল্লিয়ীনে সপ্তম আকাশে আরশের নীচে এক স্থানের নাম। এতে মুমিনদের রহ ও আমলনামা রাখা হয়। পরবর্তী كُنْزُكَرُومُ বাক্যটিও ইল্লিয়ীনের তফসীর নয় — সংলোকদের আমলনামার বর্ণনা। উপরে إِنْ كُنَّ لِرَبِّ الْأَرْزَاقِ বাক্যে এই আমলনামার উল্লেখ আছে।

يَشْهَدُ الشُّهُدَاءُ — শহীদ শব্দটি

থেকে উদ্ধৃত। অর্থ উপস্থিত হওয়া, প্রত্যক্ষ করা। কোন কোন তফসীরকারকের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সংকমশীলদের আমলনামা নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণ দেখবে অর্থাৎ, তত্ত্বাবধান ও হেফাজত করবে। — (কুরতুবী) شُهُود — এর অর্থ উপস্থিত হওয়া নেয়া হলে يشهد — এর সর্বনাম দ্বারা ইল্লিয়ীনে বোঝানো হবে। আয়াতের অর্থ হবে এই যে, নৈকট্যশীলগণের রহ এই ইল্লিয়ীনে নামক স্থানে উপস্থিত হবে। কারণ, এটাই তাদের আবাসস্থল ; যেমন সিচ্ছীন কাফেরদের রূহের আবাসস্থল। সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এর বর্ণিত একটি হাদীস এর প্রমাণ। এই হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : শহীদগণের রূহ আল্লাহর সান্নিধ্যে সবুজ পাখীদের মধ্যে থাকবে এবং জন্মাতের বাগ-বাগিচা ও নহরসমূহে ভ্রমণ করবে। তাদের বাসস্থানে আরশের নীচে বুলন্ত প্রদীপ থাকবে। এ থেকে বোঝা গেল যে, শহীদগণের রূহ আরশের নীচে থাকবে এবং জন্মাতে ভ্রমণ করতে পারবে।

عَنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَ مَا جَاءَتْ الْمَوْدَى — এ থেকে পরিষ্কার জানা

যায় যে, জন্মাত সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিবিষ্ট। সিদরাতুল মুনতাহা যে সপ্তম আকাশে, একথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই আত্মার স্থান ইল্লিয়ীনে জন্মাতের সংলগ্ন এবং আত্মাসমূহ জন্মাতের বাগিচায় ভ্রমণ করে। অতএব, আত্মার স্থান জন্মাতও বলা যায়।

وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ — এর অর্থ কোন বিশেষ

পছন্দনীয় জিনিস অর্জন করার জন্যে কয়েকজনের ধাবিত হওয়া ও দৌড়া, যাতে অপরের আগে সে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এখানে জন্মাতের নিয়ামতরাজি উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাআলা গাফেল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন : আজ তোমরা যেসব বস্তুকে প্রিয় ও

الَّذِينَ يَكْذِبُونَ بِبُيُوتِ الدِّينِ ۖ وَمَا يَكْدِبُ بِهِ إِلَّا كَلٌّ
مُعْتَدٍ أَشْيُوهُ ۖ إِذَا شِئْنَا عَلَيْهِ الْيَتَامَا قَالَ أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ۖ كَلَّا بَلْ عَصَرَانِ عَلَى قُلُوبِهِمْ تَاكَانُوا كَايِبُونَ ۝
كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ ۖ ثُمَّ إِنَّهُمْ
لَصَالُوا الْجَحِيمِ ۖ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِكُمْ تَكْذِبُونَ ۖ
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَرْزَاقِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۖ وَمَا أَزْكُرُكُمْ إِلَّا بِكَلِمَاتٍ
أُتِيَ الْوَعْدُ ۖ إِنَّ الْكِتَابَ لَفِي كِتَابٍ مُرْقُومٍ ۖ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۖ إِنَّ الْأَرْزَاقَ لَفِي
تَعْوِينٍ ۖ عَلَى الْأَرْزَاقِ يَنْظُرُونَ ۖ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ
نُصْرَةَ اللَّهِ وَالتَّعْلِيمَ ۖ يَسْئَلُونَ مَنْ رَحِمَ فِي خُتُمِهِ خُتْمَهُ
مُسْكَ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۖ وَ
مِرْآةُ مَنْ سَنِينَهُ ۖ عَيْنَا يُشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۖ
إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۖ
وَإِذَا آمَنُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۖ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى
أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۖ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ
هَؤُلَاءِ لَصَالَتُونَ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۖ

(১১) যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যারোপ করে। (১২) প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী পাপিষ্ঠই কেবল একে মিথ্যারোপ করে। (১৩) তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে : পুরাকালের উপকথা। (১৪) কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে। (১৫) কখনও না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে। (১৬) অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৭) এরপর বলা হবে : একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে। (১৮) কখনও না, নিচয় সংলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়ীনে। (১৯) আপনি জানেন ইল্লিয়ীনে কি? (২০) এটা নিপিবদ্ধ খাতা। (২১) আল্লাহর নৈকট্যাপ্ত ফেরেশতাগণ একে প্রত্যক্ষ করে। (২২) নিচয় সংলোকগণ থাকবে পরম আরামে, (২৩) সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে। (২৪) আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন। (২৫) তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। (২৬) তার মোহর হবে কস্তুরী। এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। (২৭) তার মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি। (২৮) এটা একটা ঝরনা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ। (২৯) যারা অপরার্থী, তারা বিশৃঙ্গীদেরকে উপহাস করত। (৩০) এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত। (৩১) তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত। (৩২) আর যখন তারা বিশৃঙ্গীদেরকে দেখত, তখন বলত : নিচয় এরা বিদ্বান। (৩৩) অথচ তারা বিশৃঙ্গীদেরকে তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি।



(৩৪) আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদেরকে উপহাস করছে। (৩৫) সিংহাসনে বসে তাদেরকে অবলোকন করছে, (৩৬) কাফেররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো ?

সূরা আল-ইনশিকাক

মকায় অবতীর্ণ : আয়াত ২৫ ।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, (২) ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত (৩) এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে (৪) এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে (৫) এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং পৃথিবী এরই উপযুক্ত। (৬) হে মানুষ, তোমাকে তোমার পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছেতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে। (৭) যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, (৮) তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে (৯) এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হুটুটিয়ে ফিরে যাবে (১০) এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পচ্ছাদিক থেকে দেয়া হবে, (১১) সে মৃত্যুকে আহবান করবে, (১২) এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৩) সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল। (১৪) সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না। (১৫) কেন যাবে না, তার পালনকর্তা তো তাকে দেখতেন। (১৬) আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার (১৭) এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে (১৮) এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে, (১৯) নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে। (২০) অতএব, তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না ? (২১) যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন সেজদা করেন না।

কাম্য মনে কর সেগুলো অর্জন করার জন্যে অগ্রে চলে যাওয়ার চেষ্টায় রত আছে, সেগুলো অসম্পূর্ণ ও ধ্বংসশীল নেয়ামত। এসব নেয়ামত প্রতিযোগিতার যোগ্য নয়। এসব ক্ষণস্থায়ী সুখের সামগ্রী হাতছাড়া হয়ে গেলেও তেমন দুঃখের কারণ নয়। হী, জ্ঞানাতের নেয়ামতরাজির জন্যই প্রতিযোগিতা করা উচিত। এগুলো সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ চিরস্থায়ী।

সূরা আল-ইনশিকাক

এ সূরায় কেয়ামতের অবস্থা, হিসাব-নিকাশ এবং সং ও অসং কর্মের প্রতিদান ও শাস্তির বর্ণনা আছে। অতঃপর গাফেল মানুষকে তার সত্তা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং তদ্বারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত পৌঁছার নির্দেশ আছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অতঃপর পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে যে, তার গর্ভে যেসব গুপ্ত ভাগুর অথবা মানুষের মৃতদেহ আছে, সব সেদিন বাইরে উদগিরণ করে দেবে এবং হাশরের জন্যে এক নতুন পৃথিবী তৈরী হবে। তাতে না থাকবে কোন পাহাড়-পর্বত এবং না থাকবে কোন দালান-কোঠা ও বৃক্ষলতা—পরিষ্কার একটি সমতল ভূমি হবে। একে আরও সম্প্রসারিত করা হবে, যাতে করে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষ তাতে সমবেত হতে পারে। অন্যান্য সূরায়ও এই বর্ণনা বিভিন্ন ভঙ্গিতে এসেছে। এখানে নতুন সংযোজন এই যে, কেয়ামতের দিন আকাশ ও পৃথিবীর উপর আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে— **وَإِذْ بُعِثَ رٰوِیْهَا وَحَقَّتْ** —এর অর্থ শুনেছে অর্থাৎ, আদেশ পালন করেছে। **حَقَّتْ** —এর অর্থ আদেশ পালন করাই তার ওয়াজিব কর্তব্য ছিল।

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ —এর অর্থ টেনে লম্বা করা। হয়রত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)—এর বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন পৃথিবীকে চামড়ার (অথবা রবারের) ন্যায় টেনে সম্প্রসারিত করা হবে। এতদসঙ্গেও পৃথিবীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ একত্রিত হওয়ার ফলে এক একজনের ভাগে কেবল পা রাখার স্থান পড়বে। — (মায়হারী)

وَإِذْ بُعِثَ رٰوِیْهَا وَحَقَّتْ — অর্থাৎ, পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু উদগিরণ করে একেবারে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। পৃথিবীর গর্ভে গুপ্ত ধন-ভাগুর, খনি এবং সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মৃত মানুষের দেহকশা ইত্যাদি রয়েছে। প্রবল ভূকম্পনের মাধ্যমে পৃথিবী এসব বস্তু গর্ভ থেকে বাইরে নিক্ষেপ করবে।

کَذٰلَکَ فُتِنٰکَ —এর অর্থ কোন কাজে পূর্ণ চেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা। **اِنَّکَ اِلٰی رَّبِّکَ** অর্থাৎ, মানুষের প্রত্যেক চেষ্টা ও অধ্যবসায় আল্লাহর দিকে চূড়ান্ত হবে।

فَمَلِّیْهِ —এর সর্বনাম দ্বারা **کَذٰلَکَ** ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ হবে এই যে, মানুষ এখানে যে চেষ্টা-চরিত্র করছে, পরিশেষে তার পালনকর্তার কাছে পৌঁছে এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে এবং এর শুভ অথবা অনশুভ পরিণতি সামনে এসে যাবে। এই সর্বনাম দ্বারা **وَبِیْنَ** ও বোঝানো যেতে পারে। অর্থ এই যে, প্রত্যেক মানুষ পরকালে তার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং হিসাবের জন্যে তার সামনে উপস্থিত হবে।

فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كِتَابَهُ بِمِيزَانٍ فَتَوَفَّيْحَسَبِ حِسَابِكُمْ يُرَىٰ

وَيُنْقَلَبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا — এতে মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের আমলনামা ডান হাতে আসবে এবং তাদের সহজ হিসাব নিয়ে জন্মভূতের সুসংবাদ দান করা হবে। তারা তাদের পরিবার-পরিজনদের কাছে হুটটিন্তে ফিরে যাবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন :
عَبْدٌ مِنْ حَوْسَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَذِبٌ — অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, সে আযাব থেকে রক্ষা পাবে না। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রশ্ন করলেন : কোরআনে কি يُحَسَبُ حِسَابُكُمْ বলা হয়নি? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন : এই আয়াতে যাকে সহজ হিসাব বলা হয়েছে, সেটা প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ হিসাব নক্স বরং কেবল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে উপস্থিতি। যে ব্যক্তির কাছ থেকে তার কাজকর্মের পুরোপুরি হিসাব নেয়া হবে, সে আযাব থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবে না। — (বোখারী)

إِنَّكَ كَانَتْ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا — অর্থাৎ, যার আমলনামা তার গিঠের দিক থেকে বাম হাতে আসবে, সে মরে মাটি হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে, যাতে আযাব থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু সেখানে তা সম্ভবপর হবে না। তাকে জাহান্নামে দাখিল করা হবে। এর এক কারণ এই বলা হয়েছে যে, সে দুনিয়াতে তার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে আনন্দ-উল্লাসে দিন যাপন করত।

فَلَا أَقْرَبُ يَأْكُفُّ — এখানে আল্লাহ তাআলা চারটি বস্তুর শপথ করে মানুষকে আবার إِنَّكَ كَانَتْ فِي أَهْلِهِ আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করেছেন। শপথের জগুয়াবে বলা হয়েছে যে, মানুষ এক অবস্থার উপর স্থিতিশীল থাকে না এবং তার অবস্থা প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত

হতে থাকে।

وَالْقُرْآنُ إِذَا تَنَسَّقَ — এটাও স্তর থেকে উদ্ধৃত, যার অর্থ একত্রিত করা। চন্দ্রের একত্রিত করার অর্থ তার আলোকে একত্রিত করা। এটা চৌদ্দ তারিখের রাত্রিতে হয়, যখন চন্দ্র ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে যায়। এখানে চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। চন্দ্র প্রথমে খুবই সরু ধনুকের মত দেখা যায়। এরপর প্রত্যহ এর আলো বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে যায়। অবিরাম ও উপর্যুপরি পরিবর্তনের সাক্ষ্যদাতা চারটি বস্তুর শপথ করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন : لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا مِّنْ طَبَقٍ উপরে নীচে স্তরে স্তরে সাজানো জিনিসপত্রের এক একটি স্তরকে طَبَقٍ বলা হয়। رُكُوب — এর অর্থ আরোহণ করা। অর্থ এই যে, হে মানুষ, তোমরা সর্বদাই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্বন্ত কোন সময় এক অবস্থায় স্থির থাকে না, বরং তার উপর পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আসতে থাকে।

وَأَذْكُرُ لَكُمْ الْفُرْقَانَ لَا يُخْلَدُونَ — অর্থাৎ, যখন তাদের সামনে সুস্পষ্ট হেদায়েত পরিপূর্ণ কোরআন পাঠ করা হয়, তখনও তারা আল্লাহর দিকে নত হয় না।

سُجُودٌ وَ سَجْدَةٌ — এর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া। এর মাধ্যমে আনুগত্য ও ফরযাবদারী বোঝানো হয়। বলাবাহুল্য, এখানে পারিভাষিক সেক্সদা উদ্দেশ্য নক্স বরং আল্লাহর সামনে আনুগত্য সহকারে নত হওয়া তথা বিনীত হওয়া উদ্দেশ্য।

সূরা আল-বুরাজ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ — এর বহুবচন। অর্থ বড়

প্রাসাদ ও দুর্গ। অন্য আয়াতে আছে, وَكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مَبْنُوتَةٍ এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে। এর মূলশব্দ بُرُج — এর আভিধানিক অর্থ যাহির হওয়া। — এর অর্থ বেপদা খোলাখুলি চলাফেরা করা। এক আয়াতে আছে وَلَا تَرَىٰ فِي بُرُوجِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আলোচ্য আয়াতে بُرُج — এর অর্থ বড় বড় গ্রহ-নক্ষত্র। কয়েকজন তফসীরবিদ এস্থলে অর্থ নিয়েছেন প্রাসাদ। অর্থাৎ, সেসব গৃহ, যা আকাশে গ্রহী ও তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্যে নির্ধারিত। পরবর্তী কোন কোন তফসীরবিদ দার্শনিকদের পরিভাষায় বলেছেন যে, সমগ্র আকাশমণ্ডলী বার ভাগে বিভক্ত। এর প্রত্যেক ভাগকে بُرُج বলা হয়। তাদের ধারণা এই যে, স্থিতিশীল নক্ষত্রসমূহ এসব بُرُজ — এর মধ্যেই অবস্থান করে। গ্রহসমূহ আকাশের গতিতে গতিশীল হয়ে এসব بُরুজ — এর মধ্যে অবতরণ করে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। কোরআন পাক গ্রহসমূহকে আকাশে প্রোথিত বলে না যে, এগুলো আকাশের গতিতে গতিশীল হবে; বরং কোরআনের মতে প্রত্যেক গ্রহ নিজস্ব গতিতে গতিশীল। সূরা ইয়াসীনে আছে وَكُلُّ نَفْسٍ بِرَبِّكَ يُنَبِّئُكَ عَنِ هَوَاجِهَا يُخْفَىٰ — এর অর্থ আকাশ নক্ষত্র গ্রহের কক্ষপথ, যেখানে সে বিচরণ করে।

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَلَّوْدِ — তিরমিযীর হাদীসের বরাতে

দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত দিনের অর্থ কেয়ামতের দিন। شاهد — এর অর্থ শুক্রবার দিন এবং مشهود — এর অর্থ আরাফার দিন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা চারটি বস্তুর শপথ করেছেন। (এক) বুরাজবিশিষ্ট আকাশের; (দুই) কেয়ামত দিবসের; (তিন) শুক্রবারের এবং (চার) আরাফার দিনের। এসব শপথের সম্পর্ক এই যে, এগুলো আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ শক্তি, কেয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও প্রতিদানের দলীল। শুক্রবার ও আরাফার দিন মুসলমানদের জন্যে পরকালের গুঁজি সংগ্রহের পবিত্র দিন। অতঃপর শপথের জওয়াবে সেই কাফেরদেরকে অভিযাচন করা হয়েছে, যারা মুসলমানদেরকে ইমানের কারণে অগ্নিতে পুড়িয়ে মেরেছে। এরপর মুমিনদের পরকালীন মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

إِنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا النَّفْسَ الْوَارِثَةَ — এখানে অত্যাচারী কাফেরদের শাস্তি

বর্ণিত হয়েছে, যারা মুমিনদেরকে কেবল ইমানের কারণে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। শাস্তি প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে — (এক) وَكَانَ عَذَابُ الْحَرِيقِ অর্থাৎ, তাদের জন্যে পরকালে জাহান্নামের আযাব রয়েছে। (দুই) وَكَانَ عَذَابُ الْحَرِيقِ অর্থাৎ, তাদের জন্যে দহন যন্ত্রণা রয়েছে। এখানে দ্বিতীয়টি প্রথমটিরই বর্ণনা ও তাকীদ হতে পারে। অর্থাৎ, জাহান্নামে যেখানে তারা চিরকাল দহন যন্ত্রণা ভোগ করবে। এটাও সম্ভবপর যে, দ্বিতীয় বাক্যে দুনিয়ার শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন রেওয়াজেতে আছে যে, মুমিনদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পর অগ্নি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তাঁদের রহু কবছ করে নেন। এভাবে তিনি তাদেরকে দহন যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করেন। ফলে তাদের মৃতদেহই কেবল

(২২) বরং কাফেররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে। (২৩) তারা যা সংরক্ষণ করে, আল্লাহ তা জানেন। (২৪) অতএব, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সূত্রবদ্ধ দিন। (২৫) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সংকল্প করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

সূরা আল-বুরাজ

মকায় অবতীর্ণ। আয়াত ২২।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু —

- (১) শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের, (২) এবং প্রতিশ্রুত দিবসের, (৩) এবং সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয় (৪-৫) অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা অর্থাৎ, অনেক ইচ্ছনের অগ্নিসংযোগকারীরা; (৬) যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল (৭) এবং তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করেছিল, তা নিরীক্ষণ করছিল। (৮) তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরকাল জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, (৯) যিনি নাভামণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহর সামনে রয়েছে সবকিছু। (১০) যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা। (১১) যারা ইমান আনে ও সংকল্প করে তাদের জন্যে আছে জাহান্নাম, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নিরিরীষীসমূহ। এটাই মহাসাফল্য। (১২) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন। (১৩) তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন।

وَهُوَ الْقَفُورُ الْذُوْدُ ذُو الْعَرْشِ الْغَنِيُّ ۖ فَعَلَّامٌ لِّمَا

يُرِيدُ ۖ هَلْ أَتَاكَ خَبِيرٌ الْجَنُّونُ ۖ فِرْعَوْنُ وَشِمُودُ ۖ

بَلِ الْآدَمِيِّينَ كَفَرُوا بِكَ ذُنُوبُهُمْ ۖ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۖ

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۖ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۖ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۖ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۖ

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۖ إِنَّ مِنْ نَفْسٍ ثَنَاءٍ عَلَيْهَا ۖ فَافْطَنُ ۖ

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۖ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ ذَافِقٍ ۖ

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۖ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ

لَقَادِرٌ ۖ يَوْمَ يُنْفَخُ السُّرُورُ ۖ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا

تَأْوِيلٍ ۖ وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الرَّجْعِ ۖ وَالْأَرْضُ ذَاتِ

الْصُّدُورِ ۖ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۖ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۖ إِنَّهُمْ

يَكِيدُونَ كَيْدًا ۖ أَفَاكَيْدًا أَتَى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

أَمْ لَهُمْ رُؤْيَا

(১৪) তিনি কমানীল, প্রেমময় (১৫) মহান আরশের অধিকারী। (১৬) তিনি যা চান, তাই করেন। (১৭) আপনাকে কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌছেছে কি? (১৮) ফেরাউনের এক সামুদ্রিক? (১৯) বরং যারা কাকের, তারা শিয়্যারোপে রত আছে। (২০) আল্লাহ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। (২১) বরং এটি মহান কোরআন, (২২) লগ্নাহ মাহফুযে লিপিবদ্ধ।

সূরা আত্-তারেক

যাকার অবতীর্ণ। আয়াত ১৭।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) শপথ আকাশের এক রাত্রিতে আগমনকারী। (২) আপনি জানেন, যে রাত্রিতে আসে, সেটা কি? (৩) সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। (৪) প্রত্যেকের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে। (৫) অতএব, মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে সে সৃষ্টি হয়েছে। (৬) সে সৃষ্টি হয়েছে সবচেয়ে শব্দিত পানি থেকে। (৭) এটা নির্ভর হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাঙ্করের মধ্য থেকে। (৮) নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম। (৯) যেদিন গোশন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে, (১০) সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না। (১১) শপথ চক্ৰাঙ্গীল আকাশের (১২) এক বিদারনলী পৃথিবীর। (১৩) নিশ্চয় কোরআন সত্য-বিদ্যার কয়লা (১৪) এক এটা উপহাস নয়। (১৫) তারা ভীষণ চক্ৰাঙ্গ করে, (১৬) আর আমিও কৌশল করি। (১৭) অতএব, কাকেরদেহকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন—কিছু দিনের জন্যে।

অগ্নিতে দগ্ধ হয়। অতঃপর এই অগ্নি আরও বেশী প্রজ্বলিত হয়ে তার লেলিহান শিখা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যারা মুসলমানদের অগ্নিদগ্ধ হওয়ার তামাশা দেখছিল, তারাও এই আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। কেবল বাদশাহ 'ইউসুফ যুনুয়াস' পালিয়ে যায়। সে অগ্নি থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সেখানেই সলিল সমাধি লাভ করে। — (মাহহারী)

কাকেরদের জাহান্নামের আযাব ও দহন যন্ত্রণার খবর দেয়ার সাথে সাথে কোরআন বলেছে— **ثُمَّ لَمْ يَذُوقُوا** অর্থাৎ, এই আযাব তাদের উপর পতিত হবে, যারা এই দুষ্কর্মের কারণে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেন। এতে তাদেরকে তওবার দাওয়াত দেয়া হয়েছে। হয়রত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : বাস্তবিকই আল্লাহর অনুগ্রহ ও কৃপার কোন পারাপার নেই। তারা তো আল্লাহর গুণীগণকে জীবিত দগ্ধ করে তামাশা দেখেছে, আল্লাহ তাআলা এরপরও তাদেরকে তওবা ও মাগফেরাতের দাওয়াত দিচ্ছেন। — (ইবনে-কাসীর)

সূরা আত্-তারেক

এই সূরায় আল্লাহ তাআলা আকাশ ও নক্ষত্রের শপথ করে বলেছেন : প্রত্যেক মানুষের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। সে তার সমস্ত কাজ কর্ম ও নড়াচড়া দেখে, জানে। এর পরিশ্রমিক্তে মানুষের চিন্তা করা উচিত যে, সে দুনিয়াতে যাকিছু করছে, তা সবই কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্যে আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। তাই কোন সময় পরকাল ও কেয়ামতের চিন্তা থেকে গাফেল হওয়া অনুচিত। এরপর পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে শয়তান মানুষের মনে যে অসম্ভাব্যতার সন্দেহ সৃষ্টি করে, তার জওয়াব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : মানুষ লক্ষ্য করুক যে, সে কিভাবে বিভিন্ন অনু-কথা ও বিভিন্ন উপকরণ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যিনি প্রথম সৃষ্টিতে সারা বিশ্বের কশাসমূহ একত্রিত করে একজন জীবিত, শ্রোতা ও ম্রষ্টা মানব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তিনি তাকে মৃত্যুর পর পুনরায় তদ্রূপ সৃষ্টি করতেও সক্ষম। এরপর কেয়ামতের কিছু অবস্থা বর্ণনা করে আবার আকাশ ও পৃথিবীর শপথ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মানুষকে পরকাল চিন্তার যে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সে যেন তাকে হাসি-তামাশা মনে না করে। এটা এক বাস্তব সত্য, যা অবশ্যই সৎঘটিত হবে। অবশেষে দুনিয়াতেই কোন আযাব আসে না — কাকেরদের এই প্রশ্নের জওয়াবের মাধ্যমে সূরা সমাপ্ত করা হয়েছে।

প্রথম শপথে আকাশের সাথে **طَارِقٌ** শব্দ যোগ করা হয়েছে। এর অর্থ রাত্রিতে আগমনকারী। নক্ষত্র দিনের বেলায় লুকায়িত থাকে এবং রাতে প্রকাশ পায়, এজন্যে নক্ষত্রকে **طَارِقٌ** বলা হয়েছে। কোরআন এ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখে নিচ্ছেই জওয়াব দিয়েছে **النَّجْمُ الثَّاقِبُ** — অর্থাৎ, উজ্জ্বল নক্ষত্র। আয়াতে কোন নক্ষত্রকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই যে কোন নক্ষত্রকে বোঝানো যায়। কোন কোন তফসীরবিদ এর অর্থ নিয়েছেন বিশেষ করে নক্ষত্র 'সূরাইয়া' যা সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ দ্বিতীয় নক্ষত্র কিংবা 'শনি গ্রহ' অর্থ নিয়েছেন। আরবী ভাষায় সূরাইয়া ও শনি গ্রহকে **لَحْمٌ** বলা হয়ে থাকে।

إِنْ مِنْ نَفْسٍ ثَنَاءٍ عَلَيْهَا حَافِظٌ — এটা শপথের জওয়াব। অর্থাৎ,

প্রত্যেক মানুষের উপর তত্ত্বাবধায়ক অর্থাৎ, আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। এখানে **حَافِظٌ** শব্দ একবচনে উল্লেখ করা হলেও

তারা যে একাধিক তা অন্য আয়াত থেকে জানা যায়। অন্য আয়াতে আছে

وَأَنۢ عَلِمُوا۟ لَظُفَرًاۙ كَذَابِينَ ﴿١٠١﴾

حافظ -এর অপর অর্থ আপদ-বিপদ থেকে হেফাযতকারীও হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের হেফাযতের জন্যে ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তারা দিন-রাত মানুষের হেফাযতে নিয়োজিত থাকে। তবে আল্লাহ তাআলা যার জন্যে যে বিপদ অবধারিত করে দিয়েছেন, তারা সে বিপদ থেকে হেফাযত করে না। অন্য এক আয়াতে একথা পরীক্ষারভাবে বর্ণিত হয়েছে : لَمَّا مَعَقَاتُ الْغَمَامِ كَذَبُوا۟ وَكُنَّا ذُنُوبًاۙ كَثِيرًاۙ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَمَنَعُوا۟ الْغَمَامَ ﴿١٠٢﴾ অর্থাৎ, মানুষের জন্যে পালাক্রমে আগমনকারী পাহারাদার ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা আল্লাহ্র আদেশে সামনে ও পেছনে থেকে তার হেফাযত করে।

حُجَّتٍ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِمْ অর্থাৎ, মানুষ সজ্জিত হয়েছে এক সবেগে স্থলিত পানি থেকে, যা পৃষ্ঠ ও বক্ষের অস্থিপিঞ্জরের মধ্য থেকে নির্গত হয়। সাধারণভাবে তফসীরবিদগণ এর এই অর্থ করেছেন যে, বীর্ষ পুরুষের পৃষ্ঠদেশ এবং নারীর বক্ষদেশ থেকে নির্গত হয়। কিন্তু মানবদেহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের সূচিভিত্তি অভিমত ও অভিজ্ঞতা এই যে, বীর্ষ প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রত্যেক অঙ্গ থেকে নির্গত হয় এবং সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গ নারী ও পুরুষের সেই অঙ্গ থেকে নির্গত বীর্ষ দ্বারা গঠিত হয়। তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী প্রভাব থাকে মস্তিস্কের। এ কারণেই সাধারণতঃ দেখা যায়, যারা অতিরিক্ত স্ত্রীমৈথুন করে, তারা প্রায়ই মস্তিস্কের দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়। তাদের আরও সূচিভিত্তি অভিমত এই যে, বীর্ষ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে স্থলিত হয়ে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে অণুকোষে জমা হয় এবং সেখান থেকে নির্গত হয়।

رَجَعِ - اِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ -এর অর্থ ফিরিয়ে দেয়া। উদ্দেশ্য

এই যে, যে বিশুদ্ধতা প্রথমবার মানুষকে বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে অর্থাৎ, মৃত্যুর পর জীবিত করতে আরও ভালরূপে সক্ষম।

سُبُلَى - اِنَّهُ سُبُلَى السَّرَّارِ -এর শাব্দিক অর্থ পরীক্ষা করা, যাচাই করা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের যেসব বিশ্বাস, চিন্তাধারা, মনন ও সংকল্প অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, দুনিয়াতে কেউ জানত না এবং যেসব কাজকর্ম সে গোপনে করেছিল, কেয়ামতের দিন সে সবগুলোই পরীক্ষিত হবে। অর্থাৎ, প্রকাশ করে দেয়া হবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন : কেয়ামতের দিন মানুষের সব গোপন ভেদ খুলে যাবে। প্রত্যেক ভাল-মন্দ বিশ্বাস ও কর্মের আলামত হয় মানুষের মুখমণ্ডলে শোভা পাবে, না হয় অন্ধকার ও কাল রঙের আকারে প্রকাশ করে দেয়া হবে। — (কুরতুবী)

الرَّجْعِ - وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ -এর অর্থ পর পর বর্ণিত বৃষ্টি। একবার বৃষ্টি হয়ে শেষ হয়ে যায়, আবার হয়।

اِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ অর্থাৎ, কোরআন সত্য ও মিথ্যার ফয়সালা করে; এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন : আমি রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে কোরআন সম্পর্কে বলতে শুনেছি —

অর্থাৎ, এই কিতাবে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের সংবাদ এবং তোমাদের পরে আগমনকারীদের জন্যে বিধি-বিধান রয়েছে। এটা চূড়ান্ত উক্তি; আমার মুখের কথা নয়।

সূরা আত্-তারেকু সমাপ্ত

সূরা আল-আলা

سُبْحَانَكَ يَا أَلَهْمَ الْغَايَةِ : নামাযের বাইরে
সেই অসম্ভব আল্লাহর নামে সবার মুখোমুখি। সাহাবায়ে
কেরাম এই সূরা তেলাওয়াত শুরু করলে এরূপ বলতেন। — (কুরতুবী)

ওকবা ইবনে-আমের জোহানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন সূরা আলা
নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : **اجعلوها فى سجودكم** :
অর্থাৎ, তোমরা **سبحان ربي الاعلى** সেজদায় পাঠ কর।

سُبْحَانَكَ : সবার পবিত্র রাখা, পবিত্রতা বর্ণনা করা।
—এর অর্থ এই যে, আপন পালনকর্তার নাম পবিত্র রাখুন। অর্থাৎ,
পালনকর্তার নামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। আল্লাহর নাম উচ্চারণ
করার সময় বিনয়, নম্রতা ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। তাঁর উপযুক্ত নয়
— এমন যাবতীয় বিষয় থেকে তাঁর নামকে পবিত্র রাখুন। এর এক অর্থ
এরূপও হতে পারে যে, আল্লাহ স্বয়ং নিজের যেসব নাম বর্ণনা করেছেন,
তাঁকে কেবল সেসব নামের মাধ্যমেই ডাকুন। অন্য কোন নামে তাঁকে
ডাকা জায়েয নয়।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে কালেমাটি
নামাযের সেজদায় পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন, সেটি **سبحان اسم ربك**
الاعلى নয়; বরং **سبحان ربي الاعلى** — এ থেকেও জানা যায় যে, এ
ক্ষেত্রে নাম উদ্দেশ্য নয়; বরং স্বয়ং সত্তা উদ্দেশ্য। — (কুরতুবী)

الَّذِي خَلَقَ قَسْوَى وَالَّذِي تَكَرَّرَ فَهْدَى : বিশ্ব সৃষ্টির নিগূঢ় তাৎপর্য :

— এগুলো সব জগত সৃষ্টিতে আল্লাহর অপার রহস্য ও শক্তি সম্পর্কিত
গুণাবলী। প্রথম গুণ **خلق** —এর অর্থ কেবল সৃষ্টি করাই নয়; বরং কোন
পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকে কোন কিছুকে নাস্তি থেকে আন্তিতে আনয়ন করে।
কোন সৃষ্টির একাজ করার সাধ্য নেই; একমাত্র আল্লাহ তাআলার অপার
কুদরতই কোন পূর্ব-নমুনা ব্যতিরেকে যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা নাস্তি থেকে
আন্তিতে আনয়ন করে। দ্বিতীয় গুণ **قَسْوَى** —এটা **تَسْوِية** থেকে উদ্ভূত।
অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ। উদ্দেশ্য এই যে, তিনি প্রত্যেক বস্তুর দৈহিক গঠন,
আকার-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিশেষ মিল রেখে তাকে অস্তিত্ব
দান করেছেন। মানুষ ও প্রত্যেক জীব-জানোয়ারকে তার প্রয়োজনের
সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন। হস্তপদ ও অঙ্গসমূহের মধ্যে
এমন জোড়া ও প্রাকৃতিক শিষ্টাংগ সংযুক্ত করেছেন, যার ফলে এগুলোকে
চতুর্দিকে ঘোরানো-মোড়ানো যায়। এই বিশ্বময়কর মিল সৃষ্টির রহস্য ও
শক্তি-সামর্থ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যে যথেষ্ট।

তৃতীয় গুণ **تَكَرَّرَ** —তদ্বির —এর অর্থ কোন বস্তুকে বিশেষ পরিমাণ
সহকারে সৃষ্টি করা। শব্দটি ফয়সালা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, প্রত্যেক
বস্তু সম্পর্কে আল্লাহর ফয়সালা। এখানে এই অর্থই বোঝানো হয়েছে।
উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার বস্তুসমূহকে সৃষ্টি করেই ছেড়ে
দেননি; প্রত্যেক বস্তুকে বিশেষ কাজের জন্যে সৃষ্টি করে সে কাজের
উপযুক্ত সম্পদ দিয়ে তাকে সে কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। চিন্তা
করলে দেখা যায় যে, এটা কোন বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টির মধ্যে সীমিত নয়—
সমগ্র সৃষ্ট জগত ও সৃষ্টিকেই আল্লাহ তাআলা বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে

সূরা আল-আলা

মক্কা অবতীর্ণ। আয়াত ১৯।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

- (১) আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন, (২) যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিনাস্ত করেছেন। (৩) এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন (৪) এবং যিনি তুগাদি উপদ্রুত করেছেন, (৫) অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবজনা। (৬) আমি আপনাকে পাঠ করাতো থাকব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না — (৭) আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়। (৮) আমি আপনার জন্যে সহজ শরীয়াত সহজতর করে দেবো। (৯) উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন, (১০) যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে, (১১) আর যে হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে, (১২) সে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (১৩) অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না। (১৪) নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় (১৫) এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে। (১৬) বস্ত্রভূষা তোমরা পার্শ্ব জীবনকে অগ্রাহ্যকার দাও, (১৭) অখচ পরকারের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (১৮) এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে; (১৯) ইবরাহীম ও মুসা কিতাবসমূহে।

সূরা আল-গাশিয়াহ

মক্কা অবতীর্ণ। আয়াত ২৬।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

- (১) আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত পৌছেছে কি? (২) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে লাল্বিত, (৩) ক্রিষ্ট, ক্রান্ত। (৪) তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে। (৫) তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে। (৬) কন্টকপূর্ণ বাধা ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই। (৭) এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধায়ও উপকার করবে না।

সৃষ্টি করেছেন এবং সে কাজেই নিয়োজিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তু তার পালনকর্তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

চতুর্থ গুণ : **عَلَىٰ** অর্থাৎ, স্রষ্টা যে কাজের জন্যে যাকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে সে কাজের পথনির্দেশও দিয়েছেন। সত্যিকারভাবে এ পথনির্দেশে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টিই অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা, এক বিশেষ ধরনের বুদ্ধি ও চেতনা আল্লাহ তাআলা সবাইকে দিয়েছেন, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা থেকে নিম্নস্তরের। অন্য আয়াতে আছে

أَعْلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ فَهُوَ الْهَدَىٰ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুকে

সৃষ্টি করে এক অস্তিত্ব দিয়েছেন, অতঃপর তার সংশ্লিষ্ট কাজের পথনির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ এ পথনির্দেশের প্রভাবে আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী সৃষ্টির আদি থেকে যে কাজের জন্যে আদিষ্ট হয়েছে, সে কাজ হুবহু তেমনিভাবে কোনরূপ ত্রুটি ও অলসতা ব্যতিরেকে সম্পাদন করে চলেছে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ শব্দের অর্থ

পশু-চারণ ভূমি এবং **غَشَا** শব্দের অর্থ আবর্জনা, যা বন্যার পানির উপর ভাসমান থাকে। **أَحْوَىٰ** শব্দের অর্থ কক্ষাভ গাঢ় সবুজ রং। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা উদ্ভিদ সম্পর্কিত স্বীয় কুদরত ও হেকমত বর্ণনা করেছেন। তিনি ভূমি থেকে সবুজ-শ্যামল ঘাস উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর একে শুকিয়ে কাল রং-এ পরিণত করেছেন এবং সবুজতা বিলীন করে দিয়েছেন। এতে মানুষের পরিণতির দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দেহের এ সজীবতা, সৌন্দর্য, স্ফূর্তি ও চাতুর্য আল্লাহ তাআলারই দান। কিন্তু পরিশেষে এসবই নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

سَمِعْتَ لَكَ فَلَا تَسْأَلُ اللَّهَ -পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ

তাআলা স্বীয় কুদরত ও হেকমতের কতিপয় বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করার পর এস্থলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নবুওয়তের কর্তব্য সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ দানের পূর্বে তাঁর কাজ সহজ করে দেয়ার সুসবাদ দিয়েছেন। প্রথমদিকে যখন জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কোরআনের কোন আয়াত শোনাতেন, তখন তিনি আয়াতের শব্দাবলী বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার আশংকায় জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে সাথে তা পাঠ করতেন। আলাচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা কোরআন মুখস্থ করানোর দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন যে, জিবরাঈল (আঃ)-এর চলে যাওয়ার পর কোরআনের আয়াতসমূহ বিশুদ্ধরূপে পাঠ করানো এবং স্মৃতিতে সংরক্ষিত করা আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি চিন্তিত হবেন না। এর ফলে **فَلَا تَسْأَلُ اللَّهَ** অর্থাৎ, আপনি কোন বিষয় বিস্মৃত হবেন না সে অংশ ব্যতীত, যা কোন উপযোগিতার কারণে আল্লাহ তাআলা স্মৃতি থেকে মুছে দিতে চাইবেন। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনের কিছু আয়াত রহিত করার এক সুবিদিত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম আদেশের বিপরীতে পরিস্কার দ্বিতীয় আদেশ নাথিল করা। এর আর একটি পদ্ধতি হলো সংশ্লিষ্ট আয়াতটিই রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সকল মুসলমানের স্মৃতি থেকে মুছে দেয়া। এ সম্পর্কে এক আয়াতে আছে

مَنْ سَمِعَ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِنَا অর্থাৎ, আমি কোন আয়াত রহিত করি অথবা

আপনার স্মৃতি থেকে উধাও করে দেই। কেউ কেউ **فَلَا تَسْأَلُ اللَّهَ** -এর অর্থ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা কোন উপযোগিতাবশতঃ কোন আয়াত সাময়িকভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্মৃতি থেকে মুছে দিয়ে পরবর্তীকালে তা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন, এটা সম্ভবপর। হাদীসে আছে, একদিন

রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন একটি সূরা তেলাওয়াত করলেন এবং মাঝখান থেকে একটি আয়াত বাদ পড়ল। ওহী লেখক উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) মনে করলেন যে, আয়াতটি বোধ হয় মনসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসার জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ মনসূখ হয়নি, আমিই ভুলক্রমে পাঠ করিনি।—(কুরতুবী) অতএব, উল্লেখিত ব্যতিক্রমের সারমর্ম এই যে, সাময়িকভাবে কোন আয়াত ভুলে যাওয়া অতঃপর তা স্মরণে আসা বর্ণিত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী নয়।

وَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْيَوْمَ -এর আক্ষরিক তরজমা এই যে, আমি আপনাকে

সহজ করে দেব সহজ পদ্ধতির জন্যে। সহজ পদ্ধতি বলে ইসলামী শরীয়ত বোঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, এ পদ্ধতি ও শরীয়তকে আপনার জন্যে সহজ করে দেব। কিন্তু এর পরিবর্তে কোরআন বলেছে, আপনাকে এই শরীয়তের জন্যে সহজ করে দেব। এর তাৎপর্য একথা ব্যক্ত করা যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে এরূপ করে দেবেন যে, শরীয়ত আপনার মজ্জা ও স্বভাবে পরিণত হবে এবং আপনি তার ছাঁচে গঠিত হয়ে যাবেন।

فَذَكِّرْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرَوْنَ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে নবুওয়তের কর্তব্য

পালনে খোদা প্রদত্ত সুবিধাদির বর্ণনা ছিল।

এই আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কর্তব্য পালনের আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, উপদেশ ফলপ্রসূ হলে আপনি মানুষকে উপদেশ দিন। এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয়; বরং আদেশকে জোরদার করাই উদ্দেশ্য। আমাদের পরিভাষায় এর দৃষ্টান্ত কাউকে এরূপ বলা যে, যদি তুমি মানুষ হও তবে তোমাকে কাজ করতে হবে। অথবা তুমি যদি অমুকের ছেলে হও তবে একাজ করা উচিত। বলাবাহুল্য, এখানে উদ্দেশ্য শর্ত নয়; বরং কাজটি যে অপরিহার্য, তা প্রকাশ করাই লক্ষ্য। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উপদেশ ও প্রচার যে ফলপ্রসূ, একথা নিশ্চিত, তাই এই উপকারী উপদেশ আপনি কোন সময় পরিত্যাগ করবেন না।

زَكَاةً - এর আসল অর্থ শুদ্ধ করা। ধন-

সম্পদের যাকাতকেও এ কারণে যাকাত বলা হয় যে, তা ধন-সম্পদকে শুদ্ধ করে। এখানে **زَكَاةً** শব্দের অর্থ ব্যাপক। এতে ঈমানগত ও চরিত্রগত শুদ্ধি এবং আর্থিক যাকাত প্রদান সবই অন্তর্ভুক্ত।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ অর্থাৎ, তারা পালনকর্তার নাম স্মরণ করে

এবং নামায আদায় করে। বাহ্যতঃ এতে ফরয ও নফল সবরকম নামায অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ ঈদের নামায দ্বারা এর তফসীর করেছেন। তাও এতে শামিল। **بَيْنَ زُكُوفِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** -হযরত আবদুল্লাহ ইবনে

মসউদ (রাঃ) বলেনঃ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর কারণ এই যে, ইহকালের নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উপস্থিত এবং পরকালের নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দৃষ্টি দৃষ্টি থেকে উধাও ও অনুপস্থিত। তাই অপরিণামদর্শী লোকেরা উপস্থিতকে অনুপস্থিতের উপর প্রাধান্য দিয়ে বসে, যা তাদের জন্যে চিরস্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। এ ক্ষতির কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যেই আল্লাহ তাআলা খোদায়ী কিতাব ও রসূলগণের মাধ্যমে পরকালের নেয়ামত ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যেন সেগুলো উপস্থিত ও বিদ্যমান। একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে নগদ মনে করে অবলম্বন কর, তা আসলে কৃত্রিম, অসম্পূর্ণ ও দ্রুত ধ্বংসশীল। এরূপ

বস্তুতে মজ্জা যাওয়া ও তার জন্যে স্বীয় শক্তি ব্যয় করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ সত্যকেই ফুটিয়ে তোলার জন্যে অতঃপর বলা হয়েছে : وَالْجُرَّةُ : অর্থাৎ, তোমরা যারা দুনিয়াকে পরকালের উপর প্রাধান্য দাও, একটু চিন্তা কর যে, তোমরা কি বস্তু ছেড়ে কি বস্তু অবলম্বন করছ। যে দুনিয়ার জন্যে তোমরা পাগলপারা, প্রথমতঃ তার বৃহত্তম সুখ ও আনন্দ, দুঃখ, কষ্ট ও পরিশ্রমের মিশ্রণ থেকে মুক্ত নয়, দ্বিতীয়তঃ তার কোন স্থিরতা ও স্থায়িত্ব নেই। আজ যে বাদশাহ, কাল সে পথের ভিখারী। আজকের যুবক ও বীর্যবান, আগামী কাল দুর্বল ও অক্ষম। এটা দিব্যরাত্রি চোখের সামনে ঘটছে। এর বিপরীতে পরকাল এসব দোষ থেকে মুক্ত। পরকালের প্রত্যেক নেয়ামত ও সুখ উৎকৃষ্টই উৎকৃষ্ট — দুনিয়ার কোন নেয়ামত ও সুখের সাথে তার কোন তুলনা হয় না। তদুপর তা ابْنُیْ অর্থাৎ, চিরস্থায়ী। মানুষ চিন্তা করুক, যদি তাকে বলা হয় — তোমার সামনে দুটি গৃহ আছে। একটি সুউচ্চ প্রাসাদ, যা যাবতীয় বিলাসসামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত এবং অপরটি মামুলী কুঁড়েঘর, যাতে কোন সাজ-সরঞ্জামও নেই। এখন হয় তুমি এই প্রাসাদোপম বাগানো গ্রহণ কর; কিন্তু কেবল এক দু'মাসের জন্যে, এরপর একে খালি করে দিতে হবে; না হয় এই কুঁড়েঘর গ্রহণ কর, যা তোমার চিরস্থায়ী মালিকানায থাকবে। এখন প্রশ্ন এই যে, বুদ্ধিমান মানুষ এতদুভয়ের মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেবে? এর পরিশ্রেক্ষিতে পরকালের নেয়ামত যদি অসম্পূর্ণ ও নিম্নস্তরেরও হত, তবুও চিরস্থায়ী হওয়ার কারণে তাই অগ্রাধিকারের যোগ্য ছিল। অথচ বাস্তবে যখন এই নেয়ামত দুনিয়ার নেয়ামতের মোকাবেলায় উৎকৃষ্ট, উত্তম ও চিরস্থায়ীও, তখন কোন বোকারাম হতভাগাই এ নেয়ামত পরিত্যাগ করে দুনিয়ার নেয়ামতকে প্রাধান্য দিতে পারে।

إِنَّ هَذَا الَّذِي الضُّعْفُ الرَّؤُولِي ضَعْفُ الْإِبْرَاهِيمِ وَمُؤْنَى - অর্থাৎ, এই

সূরার সব বিষয়বস্তু অথবা সর্বশেষ বিষয়বস্তু (অর্থাৎ, পরকাল উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী হওয়া) পূর্ববর্তী সহীফাসমূহেও লিখিত আছে। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম ও মুসা (আঃ) — এর সহীফাসমূহে। হযরত মুসা (আঃ) — কে তওরাতের পূর্বে কিছু সহীফাও দেয়া হয়েছিল। এখানে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে, অথবা তওরাতও বোঝানো যেতে পারে।

ইবরাহীমী সহীফার বিষয়বস্তু : হযরত আবু যর গফারী (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) — কে প্রশ্ন করেছিলেন, ইবরাহীম (সাঃ) — এর সহীফা কিরূপ ছিল? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এসব সহীফায় শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছিল। তন্মধ্যে এক দৃষ্টান্তে অত্যাচারী বাদশাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : হে ভুঁইফোড় গর্বিত বাদশাহ, আমি তোমাকে ধনেশ্বর স্তুপীকৃত করার জন্যে রাজত্ব দান করিনি ; বরং আমি তোমাকে এজন্যে শাসনক্ষমতা অর্পণ করেছি, যাতে তুমি উৎপীড়িতের বদদোয়া আমা পর্যন্ত পৌছাতে না দাও। কেননা, আমার আইন এই যে, আমি উৎপীড়িতের দোয়া প্রত্যাখ্যান করি না, যদিও তা কাফেরের মুখ থেকে হয়।

অপর এক দৃষ্টান্তে সাধারণ মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : বুদ্ধিমানের কাজ হল, নিজের সময়কে তিন ভাগে বিভক্ত করা। এক ভাগ তার পালনকর্তার এবাদত ও তাঁর সাথে মোনাজ্বাতের, এক ভাগ আত্মসামালোচনার ও আল্লাহর মহাশক্তি এবং কারিগরি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার এবং এক ভাগ জীবিকা উপার্জনের ও স্বাভাবিক প্রয়োজনাদি মেটানোর।

আরও বলা হয়েছে : বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্যে অপরিহার্য এই যে, সে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকবে, উদ্দিষ্ট কাজে

নিয়োজিত থাকবে এবং জিহ্বার হেফায়ত করবে। যে ব্যক্তি নিজের কথাকেও নিজের কর্ম বলে মনে করবে, তার কথা খুবই কম হবে এবং কেবল জরুরী বিষয়ে সীমিত থাকবে।

মুসা (আঃ) — এর সহীফার বিষয়বস্তু : হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন : অতঃপর আমি মুসা (আঃ) — এর সহীফা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : এসব সহীফায় কেবল শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুই ছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি বাক্য নিম্নরূপ :

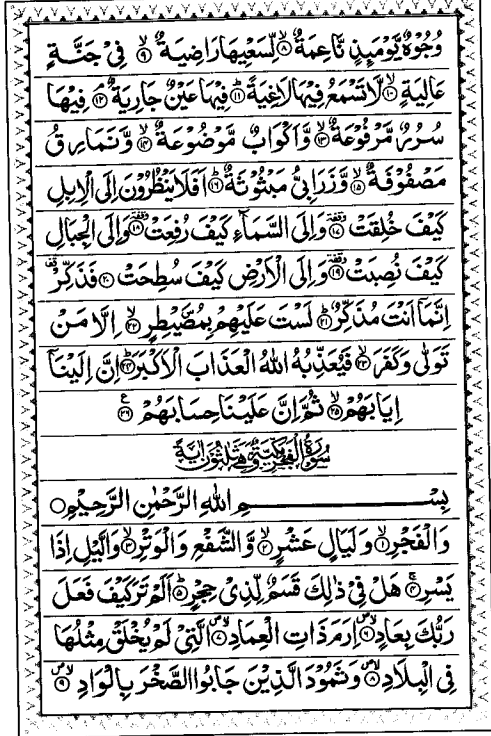
আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করি, যে মৃত্যুর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, অতঃপর সে কিরূপে আনন্দিত থাকে! আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে বিধিলিপি বিশ্বাস করে, অতঃপর সে কিরূপে অপারক, হতাদ্যম ও চিন্তাযুক্ত হয়! আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে দুনিয়া, দুনিয়ার পরিবর্তনাদি ও মানুষের উত্থান-পতন দেখে, সে কিরূপে দুনিয়া নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে। আমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে পরকালের হিসাব-নিকাশে বিশ্বাসী। অতঃপর সে কিরূপে কর্ম পরিত্যাগ করে বসে থাকে? হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন : অতঃপর আমি প্রশ্ন করলাম : এসব সহীফার কোন বিষয়বস্তু আপনার কাছে আগত ওহীর মধ্যেও আছে কি? তিনি বললেন : হে আবু যর, এ আয়াতগুলো সূরার শেষ পর্যন্ত পাঠ কর — قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (কুরত্বী)

সূরা আল-গাশিয়াহ

وَجُودٌ وَمُؤْمِنٌ حَاشِيَةٌ عَالِمَةٌ نَاصِبَةٌ কেয়ামতে মুমিন ও কাফের আলাদা আলাদা বিভক্ত দু'দল হবে এবং মুখমণ্ডল দ্বারা পৃথকভাবে পরিচিত হবে। এই আয়াতে কাফেরদের মুখমণ্ডলের এক অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, তা غَائِبَةٌ অর্থাৎ, হেয় হবে। خُشُوع শব্দের অর্থ নত হওয়া ও লাক্ষিত হওয়া। নামাযে খুশুর অর্থ আল্লাহর সামনে নত হওয়া, হেয় হওয়া। যারা দুনিয়াতে আল্লাহর সামনে খুশু অবলম্বন করেনি, কেয়ামতে এর শাস্তিস্বরূপ তাদের মুখমণ্ডল লাক্ষিত ও অপমানিত হবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থা হবে عَالِمَةٌ - বাকপদ্ধতিতে অবিরাম কর্মের কারণে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে عَالِمَةٌ এবং ক্লাস্ত ও ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হয় عَالِمَةٌ বলাবাহুল্য, কাফেরদের এ দুরবস্থা দুনিয়াতেই হবে। কেননা, পরকালে কোন কর্ম ও মেহনত নেই। তাই কুরত্বী প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন : প্রথম অবস্থা অর্থাৎ, মুখমণ্ডল লাক্ষিত হওয়া তো পরকালে হবে এবং পরবর্তী দুরবস্থা কাফেরদের দুনিয়াতেই হয়। কেননা, অনেক কাফের দুনিয়াতে মুশরিকসুলভ এবাদত এবং বাতিল পন্থায় অধাবসায় ও সাধনা করে থাকে। হিন্দু যোগী ও খ্রীষ্টান পাদ্রী অনেক এমন আছে, যারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহ তাআলারই সন্তুষ্টির জন্যে দুনিয়াতে এবাদত ও সাধনা করে থাকে এবং এতে অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করে। কিন্তু এসব এবাদত মুশরিকসুলভ ও বাতিল পন্থায় হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে সওয়াব ও পুরস্কার লাভের যোগ্য হয় না। অতএব, তাদের মুখমণ্ডল দুনিয়াতেও ক্লাস্ত-পরিশ্রান্ত রইল এবং পরকালে তাদেরকে লাক্ষনা ও অপমানের অঙ্ককার আচ্ছন্ন করে রাখবে।

হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, খলীফা হযরত ওমর ফারুক



(৮) অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে সজীব, (৯) তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট। (১০) তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে। (১১) তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা। (১২) তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরনা। (১৩) তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন। (১৪) এবং সংরক্ষিত পানপাত্র (১৫) এবং সারি সারি গালিচা (১৬) এবং বিস্তৃত বিছানো কাপেট। (১৭) তারা কি উম্মের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা (১৮) এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে? (১৯) এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে? (২০) এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে? (২১) অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা, (২২) আপনি তাদের শাসক নন, (২৩) কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফের হয়ে যায়, (২৪) আল্লাহ্ তাকে মহা আযাব দেন। (২৫) নিচয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট, (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্ব।

সূরা আল-ফজর

মকায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৩০।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) শপথ ফজরের, (২) শপথ দশ রাত্রির, শপথ তার, (৩) যা জোড় ও যা বিজোড় (৪) এবং শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে (৫) এর মধ্যে আছে শপথ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে। (৬) আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন, (৭) যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও ঝুঁটি ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং (৮) যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সজ্জিত হয়নি (৯) এবং সামুদ্র গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাখর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল।

(রাঃ) যখন শাম দেশের সফরে গমন করেন, তখন জনৈক খ্রীষ্টান বৃদ্ধ পাদ্রী তাঁর কাছে আগমন করে। সে তার ধর্মীয় এবাদত, সাধনা ও মোজাহাদায় এত বেশী আত্মনিয়োগ করেছিল যে, অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে চেহারা বিকৃত এবং দেহ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তার পোশাকের মধ্যেও কোন শ্রী ছিল না। খলীফা তাকে দেখে অশ্রু স্বেরণ করতে পারলেন না। ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেন : এই বৃদ্ধের করণ অবস্থা দেখে আমি ক্রন্দন করতে বাধ্য হয়েছি। বেচারী স্বীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্যে জীবনপণ পরিশ্রম ও সাধনা করেছে, কিন্তু সে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেনি। وَجُودُ يَوْمِيْنَ غَالِيَةٍ ۖ عَالِيَةٍ ۖ

অতঃপর খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) আয়াত তেলাওয়াত করলেন। — (কুরত্বী)

عَالِيَةٍ - শব্দের অর্থ গরম, উত্তপ্ত। অগ্নি স্বভাবতই উত্তপ্ত। এর সাথে উত্তপ্ত বিশেষণ যুক্ত করা একথা বলার জন্যে যে, এই অগ্নির উত্তাপ দুনিয়ার অগ্নির ন্যায় কোন সময় কম অথবা নিঃশেষ হয় না; বরং এটা চিরন্তন উত্তপ্ত।

لَنْ يَكُونَ مَعَهُ لَاحِدٌ ۖ يَرَىٰ - অর্থাৎ, যরী ব্যতীত জাহান্নামীরা

কোন খাদ্য পাবে না। যরী পৃথিবীর এক প্রকার কষ্টকবিশিষ্ট ঘাস, যা মাটিতেই ছড়ায়। দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত কাঁটার কারণে জন্তু-জানোয়ার এর ধারের কাছেও যায় না।

لَا يَمُوتُ وَلَا يَأْمُتُ ۖ يَرَىٰ - জাহান্নামীদের খাদ্য হবে যরী—একথা

শুনে কোন কোন কাফের বলতে থাকে যে, আমাদের উট তো যরী খেয়ে খুব মোটা-তাজা হয়ে যায়। এর জগুয়াবে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার যরী দূরা জাহান্নামের যরীকে বোঝার চেষ্টা করো না। জাহান্নামের যরী খেয়ে কেউ মোটা তাজা হবে না এবং এতে ক্ষুধা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

আনুমানিক স্খাতব্য বিষয়

لَأَسْمَعُ فِيهَا الْخَبِيرَ - অর্থাৎ, জান্নাতে জান্নাতীরা কোন অসার ও

মর্মভঙ্গ কথাবার্তা শুনতে পাবে না। মিথ্যা, কুফরী কথাবার্তা, গালি-গালাজ, অপবাদ ও পীড়াদায়ক কথাবার্তা সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

لَا يَمُوتُ وَلَا يَأْمُتُ ۖ يَرَىٰ - অর্থাৎ, তারা জান্নাতে কোন

অনর্থক ও দোষারোপের কথা শুনবে না। আরও কতিপয় আয়াতে এ বিষয়বস্তু উল্লেখিত হয়েছে।

এ থেকে জানা গেল যে, দোষারোপ ও অশালীন কথাবার্তা খুবই পীড়াদায়ক। তাই জান্নাতীদের অবস্থায় একে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

কতিপয় সামাজিক রীতি-নীতি : وَكَوَابٌ مَّرُوضَةٌ : অর্থাৎ, কোব

এর বহুবচন। অর্থ পানপাত্র, যথা গ্লাস ইত্যাদি। وَكَوَابٌ - অর্থাৎ, নির্দিষ্ট জায়গায় পানির সল্লিকটে রক্ষিত থাকবে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, পানপাত্র পানির কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা উচিত। যদি এদিক সেদিক থাকে এবং পানি পান করার সময় তালাশ করতে হয়, তবে এটা কষ্টকর ব্যাপার। তাই সব ব্যবহারের

وَقَرَعُونَ ذِي الْرُؤَادِ الَّذِينَ طَعَوْنِي بِالْإِلَادِ
فَاذْكُرُوا فِيهَا الْقِسَادَ قَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوَاطِ
عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَیْلُ الْمُرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا
ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّيَ الْكَرَمَنُ
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رُزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّيَ
أَمَانٌ ۖ كَلَّا بَلْ لَّا تَكْذِبُونَ الْيَمِينَ ۖ وَلَا تَحْضُونَ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۖ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاكِ أَكْلًا لَبًّا ۖ
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۖ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا
دَكًّا ۖ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالسَّكُّ صَمًّا صَمًّا ۖ وَجَاءَ
يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۖ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ
الذِّكْرَىٰ ۖ يَقُولُ لِيَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ الْحَيَاتِ ۖ فَيَوْمَئِذٍ
لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَ أَحَدٍ وَلَا يُؤْتِي وَثَاقَةً
أَحَدٌ ۖ يَأْتِيهَا الثَّقَلُ الْمُنْطَبِقَةُ ۖ إِنَّ أَرْجَىٰ إِلَىٰ
رَبِّكَ رَافِعَةً مَّرْفُوعَةً ۖ فَادْخُلْ فِي عِبْدِي ۖ
وَادْخُلْ جَنَّتِي ۖ

(১০) এক বহু কীলকের অমিষতি ফেরাউনের সাথে (১১) যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল। (১২) অতঃপর সেখানে বিস্তারিত অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। (১৩) অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কশাঘাত করলেন। (১৪) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা সত্যক দৃষ্টি রাখেন। (১৫) মানুষ প্রায় যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সন্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে : আমার পালনকর্তা আমাকে সন্মান দান করেছেন। (১৬) এক যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিষিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলে : আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন। (১৭) এটা অমূলক, বরং তোমরা এতীমকে সন্মান কর না। (১৮) এক বিসর্জনকে অনুদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। (১৯) এবং তোমরা মৃতের তাক্ষ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল। (২০) এবং তোমরা ধন-সম্পদকে গ্রামভরে ভালবাস। (২১) এটা অনুচিত। যখন পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে (২২) এক আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন, (২৩) এক সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ সূর্য্য করবে, কিন্তু এই সূর্য্য তার কি কাজে আসবে? (২৪) সে বলবে : হায়, এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু অশ্রু প্রেরণ করতাম। (২৫) সেদিন তার শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিবে না। (২৬) এক তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিবে না। (২৭) হে প্রশান্ত ঘন, (২৮) তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। (২৯) অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও (৩০) এবং আমার জন্মাতে প্রবেশ কর।

বস্ত — যেমন, বদনা, গ্লাস, তোয়ালে ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গায় থাকা এবং ব্যবহারের পর সেখানেই রেখে দেয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই যত্নবান হওয়া উচিত, যাতে অন্যদের কষ্ট না হয়। জ্ঞানুভীদে পানপাত্র পানির কাছে রক্ষিত থাকবে — একথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

— أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

মুমিন ও কাফেরের প্রতিদান এবং শাস্তি বর্ণনা করার পর কেয়ামতে অবিশ্বাসী হঠকারীদের পথ প্রদর্শনের জন্যে আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের কয়েকটি নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার কথা বলেছেন। আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন আকাশ ও পৃথিবীতে অসংখ্য। এখানে মরচাচারী আরবদের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল চারটি নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। আরবরা উটে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তের সফর করে। তখন তাদের সর্বাধিক নিকটে থাকে উট, উপরে আকাশ, নীচে ভূপৃষ্ঠ এবং অগ্র-পশ্চাতে সারি সারি পর্বতমালা। এই চারটি বস্তু সম্পর্কেই তাদেরকে চিন্তা-ভাবনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, অন্যান্য নিদর্শন বাদ দিয়ে যদি এ চারটি বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হয়, তবে আল্লাহর অপার কুদরত চাক্ষুষ দেখা যাবে।

সূরার উপসংহারে রসুল্লাহ (সাঃ) — এর সান্ত্বনার জন্যে বলা হয়েছে :

لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِمُضَيِّطٍ অর্থাৎ, আপনি তাদের শাসক নন যে, তাদেরকে

মুমিন করতেই হবে। আপনার কাজ শুধু প্রচার করা ও উপদেশ দেয়া। এতটুকু করেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তাদের হিসাব-নিকাশ, শাস্তি ও প্রতিদান আমার কাজ।

সূরা আল-ফজর

এ সূরায় পাঁচটি বস্তুর শপথ করে **إِنَّ رَبَّكَ لَیْلُ الْمُرْصَادِ** আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুকে জোরদার করা হয়েছে। অর্থাৎ, এ দুনিয়াতে তোমরা যাকিছু করছ, তার শাস্তি ও প্রতিদান অপরিহার্য ও নিশ্চিত। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের যাবতীয় কাজকর্মের প্রতি সত্যক দৃষ্টি রাখছেন।

শপথের পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে ফজর অর্থাৎ, সোবহে-সাদেকের সময়। এখানে প্রত্যেক দিনের প্রভাতকালও উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ, প্রভাতকাল বিশেষ এক মহাবিপ্লব আনয়ন করে এবং আল্লাহ তাআলার অপার কুদরতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। এখানে বিশেষ দিনের প্রভাতকালও বোঝানো যেতে পারে। তফসীরবিদ সাহাবী হযরত আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে যুবার (রাঃ) থেকে প্রথম অর্থ এবং ইবনে আব্বাসের এক রেওয়ায়েতে ও হযরত কাতাদা (রাঃ) থেকে দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ, মহররম মাসের প্রথম তারিখের প্রভাতকাল বর্ণিত হয়েছে। এ দিনটি ইসলামী চন্দ্র বছরের সূচনা।

কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন, যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখের প্রভাতকাল। মুহাজ্জিদ (রহঃ) ও ইকরিমা (রাঃ) — এর উক্তি তাই। বিশেষ করে এদিনের শপথ করার কারণ এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দিনের সাথে একটি রাত্রি সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যা ইসলামী নিয়মানুযায়ী পূর্বে থাকে। একমাত্র 'ইয়াওমুনহর, তথা যিলহজ্জের দশম তারিখ এমন একটি দিন, যার সাথে কোন রাত্রি নেই। কারণ, এর পূর্বের রাত্রি এ দিনের রাত্রি নয় ; বরং আইনতঃ তা আরাফারই রাত্রি। এ কারণেই কোন হাজ্জী যদি 'ইয়াওমে-আরাফা' তথা নবম তারিখে দিনের বেলায় আরাফার

ময়দানে পৌছতে না পারে এবং রাত্রিতে সেবাহে সাদেকের পূর্বে কোন সময় পৌছে যায়, তবে তার আরাফাতে অবস্থান সিদ্ধ ও হজ্জ শুদ্ধ হয়ে যায়। এ থেকে জানা গেল যে, আরাফা দিবসের রাত্রি দু'টি—একটি পূর্বে ও একটি পরে এবং ‘ইয়াওমুনহর’ তথা দশম তারিখের কোন রাত্রি নেই। এদিক দিয়ে এ দিনটি সব দিনের তুলনায় বিশেষ শানের অধিকারী—(কুরতুবী)

শপথের দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে দশ রাত্রি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদা ও মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদদের মতে এতে মিলহজ্জের দশ দিন সর্বোত্তম দিন। এর প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান এবং এতে প্রত্যেক রাত্রির এবাদত শবে কদরের এবাদতের সমতুল্য।—(মাহহারী) হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বয়ং وَالْعَشْرُ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ—এর তফসীর করেছেন। মিলহজ্জের দশ দিন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : হযরত মুসা (আঃ)—এর কাহিনীতে وَأَتَمَّمْنَا بِعَشْرِ বলে এই দশ রাত্রিকেই বোঝানো হয়েছে। কুরতুবী বলেন, হযরত জাবের (রাঃ)—এর হাদীস থেকে জানা গেল যে, মিলহজ্জের দশ দিন সর্বোত্তম দিন এবং এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, মুসা (আঃ)—এর জন্যেও এ দশ দিনই নির্ধারিত করা হয়েছিল।

وَالْعَشْرُ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ—এ দু'টি শব্দের আভিধানিক অর্থ যথাক্রমে ‘জোড়’ ও ‘বিজোড়’। এই জোড় ও বিজোড় বলে আসলে কি বোঝানো হয়েছে, আয়াত থেকে নির্দিষ্টভাবে তা জানা যায় না। তাই এ ব্যাপারে তফসীরকারগণের উক্তি অসংখ্য। কিন্তু হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر—অর্থ৷, ওত্র—এর অর্থ আরাফা দিবস, (মিলহজ্জের নবম তারিখ) এবং এর ইয়াওমুনহর (মিলহজ্জের দশম তারিখ)।

কুরতুবী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন : এটা সনদের দিক দিয়ে এমনরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বর্ণিত হাদীস অপেক্ষা অধিক সহীহ, যাতে জোড় ও বিজোড় নামাযের কথা আছে। তাই হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরিমা (রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত তফসীরই অবলম্বন করেছেন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : জোড় বলে সমগ্র সৃষ্টজগত বোঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টিকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন : وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ—অর্থ৷, আমি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। যথা কুফর ও ইমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, আলো ও অন্ধকার, রাত্রি ও দিন, শীত-গ্রীষ্ম, আকাশ ও পৃথিবী, জিন ও মানব এবং নর ও নারী। এগুলোর বিপরীতে বিজোড় একমাত্র আল্লাহ তাআলার সমস্ত الصمد الاحد

وَالْاٰخِرِ—এর অর্থ রাত্রিতে চলা। অর্থ৷, রাত্রির শপথ, যখন সে চলতে থাকে তথা খতম হতে থাকে। এ পাঁচটি শপথ উল্লেখ করার পর আল্লাহ তাআলা গাফেল মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে বলেছেন : هَلْ فِيْ ذٰلِكَ فَسْرٌ لِّذٰى يَخْتَرِ—এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেয়া। মানুষের বিবেক মানুষকে মন্দ ও ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে বাধাদান করে। তাই يَخْتَرِ—এর অর্থ বিবেকও হয়ে থাকে। এখানে তাই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, বিবেকবানের জন্যে এসব শপথও যথেষ্ট

কিনা? এই প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে মানুষকে গাফলত থেকে জাগ্রত করার একটি কৌশল। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে, তাঁর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করা সম্পর্কে এবং শপথের বিষয়সমূহের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে যে বিষয়ের জন্যে শপথ করা হয়, তার নিশ্চয়তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। এখানে যে বিষয়ের জন্যে শপথ করা হয়েছে, তা এই যে, মানুষের প্রত্যেক কর্মের পরকালে হিসাব হওয়া এবং তার শাস্তি ও প্রতিদান হওয়া সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। শপথের এই জগুয়াব পরিস্কারভাবে উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু পূর্বপর বর্ণনা থেকে তা বোঝা যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে কাকেরদের উপর আযাব আসার কথা বর্ণনা করেও একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহের শাস্তি পরকালে হওয়া তো স্থিরীকৃত বিষয়ই। মাঝে মাঝে দুনিয়াতেও তাদের প্রতি আযাব প্রেরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে তিনটি জাতির আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—(এক) আ'দ বংশ, (দুই) সামুদ গোত্র এবং (তিন) ফেরাউন সম্প্রদায়। আ'দ ও সামুদ জাতিদ্বয়ের বংশতালিকা উপরের দিকে ইরামে গিয়ে এক হয়ে যায়। এভাবে ইরাম শব্দটি আ'দ ও সামুদ উভয়ের বেলায় প্রযোজ্য।

اٰرَمَ ذٰاتِ الْاَوْمَادِ—এখানে ইরাম শব্দ ব্যবহার করে আ'দ-গোত্রের পূর্ববর্তী বংশধর তথা প্রথম আ'দকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তারা দ্বিতীয় আ'দের তুলনায় আ'দের পূর্বপুরুষ ইরামের নিকটতম বিধায় তাদেরকে আ'দে-ইরাম শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদেরকেই এখানে ارم عاد শব্দ দ্বারা এবং সূরা নজমে عَادًا اٰلَ اٰدَمِ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে তাদের বিশেষণে বলা হয়েছে ذٰاتِ الْاَوْمَادِ—عمود و عماد শব্দের অর্থ স্তম্ভ। তারা অত্যন্ত দীর্ঘকায় জাতি ছিল বিধায় তাদের ذٰاتِ الْاَوْمَادِ বলা হয়েছে। এই আ'দ জাতি দৈহিক গঠন ও শক্তি-সাহসে অন্য সব জাতি থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কোরআন পাক তাদের স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছে : لَوْ يُخَلِّقُ مِثْلَهُنَّ اٰلِ الْاٰدَمِ—অর্থ৷, এমন দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী জাতি ইতিপূর্বে পৃথিবীতে সৃজিত হয়নি। এতদসত্ত্বেও কোরআন তাদের দেহের মাপ অনাবশ্যক বিবেচনা করে উল্লেখ করেনি। ইসরাঈলী রেওয়াজেতসমূহে তাদের দৈহিক গঠন ও শক্তি সম্পর্কে অদ্ভুত ধরনের কথাবার্তা বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও মুকাতিল (রহঃ) থেকে তাদের উচ্চতা বার হাত তথা ১৮ ফুট বর্ণিত আছে।

বলাবাহুল্য, তাঁরা ইসরাঈলী রেওয়াজেত দৃষ্টেই একথা বলেছেন।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : ইরাম আ'দ তনয় শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের নাম। এরই বিশেষণ ذٰاتِ الْاَوْمَادِ কেননা, এই অনুপম প্রাসাদটি বহু স্তরের উপর দণ্ডায়মান এবং স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণিমুক্তা দ্বারা নির্মিত ছিল, যাতে মানুষ পরকালের বেহেশতের পরিবর্তে এ নগদ বেহেশতকে পছন্দ করে নেয়। কিন্তু এই বিরাট প্রাসাদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর যখন শাদ্দাদ সভাসদ সমভিব্যাহারে এ বেহেশতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করল, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব নাযিল হল। ফলে সবাই ধ্বংস এবং কৃত্রিম বেহেশতও ধূলিসাৎ হয়ে গেল।—(কুরতুবী) এ তফসীরের দিক দিয়ে আয়াতে আ'দ গোত্রের একটি বিশেষ আযাব বর্ণিত হয়েছে, যা শাদ্দাদ নির্মিত বেহেশতের উপর নাযিল হয়েছে। প্রথম তফসীর অনুযায়ী এতে আ'দ গোত্রের সমস্ত আযাবের কথাই বর্ণিত হয়েছে।

وَفَرَعُونَ فِي الْأَوْدَادِ - وتد শব্দটি -এর বহুবচন। এর অর্থ কীলক। ফেরাউনকে কীলকওয়ালা বলার বিভিন্ন কারণ তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেছেন। অন্য এক তফসীরের বর্ণিত রয়েছে যে, এই শব্দের মধ্যে তার জুলুম-নিপীড়ন ও শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এ কারণই প্রসিদ্ধ। ফেরাউন যার প্রতি কুপিত হত, তার হস্তপদ চারটি কীলকে বেঁধে অথবা চার হাত-পায়ে কীলক মেরে রৌদ্রে শুইয়ে দিত এবং তার দেহে সর্প বিছুর ছেড়ে দিত। কোন কোন তফসীরবিদ এ প্রসঙ্গে ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়ায় ইমান প্রকাশ করা এবং ফেরাউন কর্তৃক তাঁকে এ ধরনের শাস্তি দেয়ার দীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করেছেন।—(মাযহরী)

قَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سِدْرًا - আ'দ, সামুদ ও ফেরাউন গোত্রের অপকীর্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে তাদের আযাবকে কশাঘাতের শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কশাঘাত যেমন দেহের বিভিন্ন অঙ্গে হয়, তেমনি তাদের উপরও বিভিন্ন প্রকার আযাব নাযিল করা হয়।

إِنْ تَكُنْ لِيَ الْيُوسُفَ - مرصد ও مرصد শব্দের অর্থ সতর্ক দৃষ্টি রাখার ঋতি, যা কোন উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়ে থাকে। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি লোকের প্রতিটি ক্রিয়া-কর্ম ও গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখছেন এবং সবাইকে প্রতিদান ও শাস্তি দেবেন। কোন কোন তফসীরবিদ এ বাক্যটিকে পূর্বোক্ত শপথ বাক্যসমূহের জওয়াব সাব্যস্ত করেছেন।

দুনিয়াতে জীবনোপকরণের বাহ্যিক ও স্বল্পতা আল্লাহর কাছে প্রিয়তম ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আলামত নয়: تَأْتِي الْإِنْسَانَ - আয়াতে আসলে কাকের ইনসান বোঝানো হয়েছে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সেসব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা নিম্নরূপ ধারণায় লিপ্ত থাকে।

আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে জীবনোপকরণে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-সম্পদ ও সুখাশ্ব্য দান করেন, তখন শয়তান তাকে দু'টি ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত করে দেয়—(এক) সে মনে করতে থাকে যে, এটা আমার ব্যক্তিগত প্রতিভা, গুণ-গরিমা ও কর্ম প্রচেষ্টারই অবশ্যস্বার্থী ফলফ্রুতি, যা আমার লাভ করাই সম্ভব। আমি এর যোগ্য পাত্র। (দুই) আমি আল্লাহর কাছেও প্রিয় পাত্র। যদি প্রত্যাখ্যাত হতাম, তবে তিনি আমাকে এসব নেয়ামত দান করতেন না। এমনিভাবে কেউ অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হলে একে আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলীল মনে করে এবং তাঁর প্রতি এ কারণে ক্রুদ্ধ হয় যে, সে অনুগ্রহ ও সম্মানের পাত্র ছিল, কিন্তু তাকে অহেতুক লাঞ্চিত ও হেয় করা হয়েছে। কাকের ও মুশরেকদের মধ্যে এ ধরনের ধারণা বিদ্যমান ছিল এবং কোরআন পাক কয়েক জায়গায় তা উল্লেখও করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকাল মুসলমানও এ বিভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের লোকদের অবস্থাই উল্লেখ করেছেন: - অর্থাৎ, তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। দুনিয়াতে জীবনোপকরণের স্বাচ্ছন্দ্য সং ও আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার আলামত নয়, তেমনি অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্চিত হওয়ার দলীল নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে থাকে। ষোদায়া দাবী করা সত্ত্বেও ফেরাউনের কোনদিন মাথা ব্যথাও হয়নি, অপরপক্ষে কোন কোন পয়গম্বরকে শত্রুরা ক্রুরা দিয়ে চিরে দিখণ্ডিত করে দিয়েছে। রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন, মুহাজিরগণের মধ্যে যারা দরিদ্র ও নিঃশেষ ছিল, তারা ধনী মুহাজিরগণ অপেক্ষা চন্নিশ বছর আগে জন্মতে যাবে।—(মাযহরী) অন্য এক হাদীসে

আছে, আল্লাহ তাআলা যে বান্দাকে ভালবাসেন, তাকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে ঝিচিয়ে রাখেন, যেমন তোমরা রোগীকে পানি থেকে ঝিচিয়ে রাখ।—মাযহরী)

এতীমের জন্যে ব্যয় করাই যথেষ্ট নয়, তাকে সম্মান করাই জরুরী : এরপর কাকেরদের কয়েকটি মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করা হয়েছে لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ - অর্থাৎ, তোমরা এতীমকে সম্মান কর না। এখানে আসলে বলার উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা এতীমদের প্রাপ্য আদায় কর না এবং তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন কর না। কিন্তু 'সম্মান কর না' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এতীমদের প্রাপ্য আদায় এবং তাদের ব্যয়ভার বহন করলেই তোমাদের যৌক্তিক, মানবিক ও আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদের কৃতজ্ঞতা সম্পর্কিত দায়িত্ব পালিত হয়ে যায় না, বরং তাদেরকে সম্মানও করতে হবে; নিজেদের সম্ভানদের মোকাবেলায় তাদেরকে হেয় মনে করা যাবে না। কাকেররা যে দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে সম্মান এবং অভাব-অনটনকে অপমান মনে করত, এটা বাহ্যিক তারই জওয়াব। এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা কোন সময় অভাব-অনটনের সম্মুখীন হলে তা এ কারণে হয় যে, তোমরা এতীমের ন্যায় দয়ার যোগ্য বালক-বালিকাদের প্রাপ্যও আদায় কর না। তাদের দ্বিতীয় মন্দ অভ্যাস হল— وَلَا تَحْضُونَهُ عَلَىٰ طَعَامِ الْيَتِيمِ - অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা তো গরীব-মিসকীনকে অনুদান করই না, পরন্তু অপরকেও এ কাজে উৎসাহিত কর না। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধনী ও বিত্তশালীদের উপর যেমন গরীব-মিসকীনের হক আছে, তেমনি যারা দান করার সামর্থ্য রাখে না, তাদের উপরও হক আছে যে, তারা অপরকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করবে।

তৃতীয় মন্দ অভ্যাস এই যে, وَلَا تَكُونُوا لِلدِّينَارِ الْكَلْبَاسِ - অর্থাৎ, তোমরা হালল ও সব রকম ওয়ারিসী সম্পত্তি একত্রিত করে খেয়ে ফেল এবং নিজের অংশের সাথে অপরকে অংশও ছিনিয়ে নাও। সব রকম হালল ও হারাম ধন-সম্পদ একত্রিত করা নাজায়েয, কিন্তু এখানে বিশেষভাবে ওয়ারিসী সম্পত্তির কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ওয়ারিসী সম্পত্তির দিকে বেশী দৃষ্টি রাখা ও তার পেছনে লেগে থাকা, ভীষণতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ। এ ধরনের লোক মৃতভোজী জন্তুদের মতই তাকিয়ে থাকে, কবে মালিক মরবে এবং তারা সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবার সুযোগ পাবে। যারা কৃতী পুরুষ, তারা নিজেদের উপার্জনই সম্ভট থাকে এবং মৃতদের সম্পত্তির প্রতি লালপু দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না।

চতুর্থ মন্দ অভ্যাস হচ্ছে, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّ الْيَتَامَى - অর্থাৎ, তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালবাস। অত্যধিক বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ধন-সম্পদের ভালবাসা এক পর্যায়ে নিন্দনীয় নয়, বরং মানুষের জন্মগত তাগিদ। তবে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া এবং তাতে মজে যাওয়া নিন্দনীয়। কাকেরদের এসব মন্দ অভ্যাস বর্ণনা করার পর আবার আসল বিষয়বস্তু পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে কেয়ামত আগমনের কথা বলা হয়েছে।

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا - এর শাস্তিক অর্থ কোন বস্তুকে আঘাত করে ভেঙ্গে দেয়া। এখানে কেয়ামতের ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে, যা পর্বতমালাকে ভেঙ্গে চূরমার করে দেবে। ۝۱ ۝۲ বার বার কল্যাণ ইঙ্গিত হয়েছে যে, কেয়ামতের ভূকম্পন একের পর এক অব্যাহত থাকবে।

وَحَاجَّةُ رَبِّكَ وَالنَّكَاحُ صَاحِبًا — অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাপন সারিবদ্ধভাবে হাশরের ময়দানে আগমন করবেন। আল্লাহ তাআলা কিভাবে আগমন করবেন, তা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না।
يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى يُؤْمِنُ بِآيَاتِهِ يَوْمَئِذٍ — অর্থাৎ, সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে অর্থাৎ, সামনে উপস্থিত করা হবে। এর উদ্দেশ্য কি এবং কিভাবে জাহান্নামকে হাশরের ময়দানে আনা হবে, তার স্বরূপ আল্লাহ তাআলাই জানেন। তবে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, সপ্তম পৃথিবীর গভীরে অবস্থিত জাহান্নাম তখন দাঁট দাঁট করে জ্বলে উঠবে এবং সব সমুদ্র অগ্নিময় হয়ে তাতে শামিল হয়ে যাবে। এভাবে জাহান্নাম হাশরের আভিনায় সবার সামনে এসে যাবে।

تَذَكَّرُ — এর অর্থ এখানে বুঝে আসা। অর্থাৎ, কাকের মানুষ সেদিন বুঝতে পারবে যে, দুনিয়াতে তার কি করা উচিত ছিল আর সে কি করেছে। কিন্তু তখন এই বুঝে আসা নিষ্ফল হবে। কেননা, পরকাল কর্মজগত নয়—প্রতিদান জগত। অতঃপর সে يَلَيْسَ لِي فِي قَدَمَتَيْ رَبِّي — বলে আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবে যে, হায়! আমি যদি দুনিয়াতে কিছু সংকল্প করতাম। কিন্তু কুফর ও শিরকের শাস্তি সামনে এসে যাওয়ার পর এ আকাঙ্ক্ষায় কোন লাভ নেই। এখন আযাব ও পাকড়াওয়ার সময়। আল্লাহ তাআলার পাকড়াওয়ার মত কঠিন পাকড়াও কারও হতে পারে না। অতঃপর মুমিনদের সওয়াব ও জান্নাতে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে।

نَفْسٌ مَطْمَئِنَّةٌ لِّلْإِنْسَانِ — এখানে মুমিনদের রহকে **نَفْسٌ مَطْمَئِنَّةٌ** (প্রশান্ত আত্মা) বলে সম্বেদন করা হয়েছে। অর্থাৎ, সে আত্মা, যে আল্লাহর সুরণ ও আনুভূত্যের দ্বারা প্রশান্তি লাভ করে এবং তা না করলে অশান্তি ভোগ করে। সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে মন্দ স্বভাব ও হীনমন্যতা দূর করেই এই স্তর অর্জন করা যায়। আল্লাহর আনুগত্য, বিকর ও শরীয়ত এরূপ ব্যক্তির মজ্জার সাথে একাকার হয়ে যায়। সম্বেদন করে বলা হয়েছে — **أَنزِلْنَاهُ إِلَى رَجُلٍ** — অর্থাৎ, নিজের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাও। ফিরে যাওয়া বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে,

তার প্রথম বাসস্থানও পালনকর্তার কাছে ছিল। সেখানেই ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। এতে সে হাদীসের সমর্থন রয়েছে যাতে বলা হয়েছে যে, মুমিনগণের আত্মা তাদের আমলানামাসহ সপ্তম আকাশে আরশের ছায়াতলে অবস্থিত ইল্লিয়্যানে থাকবে। সমস্ত আত্মার আসল বাসস্থান সেখানেই। সেখান থেকে এনে মানব দেহে প্রবিশ্ট করানো হয় এবং মৃত্যুর পর সেখানেই ফিরে যায়।

رَاضِيَةً مَّرْضُوعَةً — অর্থাৎ, এ আত্মা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট। কেননা, বন্দার সন্তুষ্টির দ্বারাই বোঝা যায় যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ বন্দার প্রতি সন্তুষ্ট না হলে বন্দা আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট হওয়ার তওফীকই পায় না। এমনি আত্মা মৃত্যুকালে মৃত্যুতেও সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়।

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي — প্রশান্ত আত্মাকে সম্বেদন করে বলা হবে, আমার বিশেষ বন্দাদের কাতারভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জন্মতে প্রবেশ কর। এ আদেশ হতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জন্মতে প্রবেশ করা ধর্মপরায়ণ সং বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাদের সাথেই জন্মতে প্রবেশ করা যাবে। এ থেকে জানা যায় যে, যারা দুনিয়াতে ধার্মিক ও সংকল্পপরায়ণ লোকদের সঙ্গ ও সংসর্গ অবলম্বন করে, তারা যে তাদের সাথে জন্মতে যাবে, এটা তারই আলামত। এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আঃ) দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন : **وَأَدْخُلْنِي بِرَحْمَتِكَ** : **عِبَادَكَ الطَّيِّبِينَ** এবং ইউসুফ (আঃ) দোয়া করতে গিয়ে বলেছিলেন : **وَأَدْخُلْنِي بِالطَّيِّبِينَ** — এতে বোঝা গেল, সংসর্গে একটি মহানোয়াবত, যা পয়গম্বরগণও উপেক্ষা করতে পারেন না।

وَأَدْخُلِي جَنَّاتٍ — এতে আল্লাহ তাআলা জন্মাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ‘আমার জন্মাত’ বলেছেন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জন্মাত কেবল চিরন্তন সুখ-শান্তির আবাসস্থলই নয়, বরং সর্বোপরি এটা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির স্থান।

সূরা আল-ফজর সমাপ্ত

সূরা আল-বালাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَا أُقِيمُ يَهْدًا الْبَلَدُ وَأَنْتَ حِلُّ يَهْدٍ الْبَلَدُ وَالْوَالِدُ مَا
وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَيْسَبُ أَنْ نَنْقُذَ
عَلَيْهِ أَحَدًا يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا بَلَدًا أَيْسَبُ أَنْ كُنْ سِرَّةَ
أَحَدٍ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَرِسَالًا وَتَفْقِئَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ
الْجَنَّةَيْنِ فَلَا أَفْخَمَ الْعُقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ فَكُنْ
رَقِيقَةً أَوْ أَطْعَمُنِي يَوْمَ ذِي سَعْيَةٍ لَيْسَ بِأَدْمُغْرِبَةٍ
أَوْ مَسْكِينَةٍ أَدْمُغْرِبَةٍ فَكُنْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَصَّوْا
بِالصَّبْرِ وَتَوَصَّوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمِيمَنَةِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِيَّاكَ يَتْلَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَةِ عَلَيْهِمُ الرِّسَالَةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالشَّيْنِ وَضَعْنَاهُ وَالْقَبْرَ إِذَا سَلَّمَهَا وَالنَّهَارَ إِذَا
جَلَّهَا وَالْأَيْلَ إِذَا يَفْشَمَهَا وَالسَّاءَ وَمَا بَدَّهَا

সূরা আল-বালাদ

মকায় অবতীর্ণ। আয়াত ২০।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

- (১) আমি এই নগরীর শপথ করি (২) এবং এই নগরীতে আপনার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। (৩) শপথ জনকের ও যা জন্য দেয়। (৪) নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি। (৫) সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না? (৬) সে বলে : আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। (৭) সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি? (৮) আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়, (৯) জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয়? (১০) বস্ত্রতঃ আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি। (১১) অতঃপর সে যথেষ্ট ধাঁটিতে প্রবেশ করেনি। (১২) আপনি জানেন, সে ধাঁটি কি? (১৩) তা হচ্ছে দাসমুক্তি (১৪) অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অনুদান (১৫) এতীম অত্মীয়কে (১৬) অথবা খুলি-মুসরিত মিসকীনকে (১৭) অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ইমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার। (১৮) তারাই সৌভাগ্যশালী। (১৯) আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হতভাগা। (২০) তারা আগ্নেয়গিরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।

সূরা আশ-শায়স

মকায় অবতীর্ণ। আয়াত ১৫।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

- (১) শপথ সূর্যের ও তার কিরণের, (২) শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে, (৩) শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রথরভাবে প্রকাশ করে, (৪) শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে, (৫) শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর।

لَا أَقِيمُ يَهْدًا الْبَلَدُ — এখানে لا অক্ষরটি অতিরিক্ত এবং আরবী বাকপদ্ধতিতে এর অতিরিক্ত ব্যবহার সুবিদিত। অধিক বিশুদ্ধ উক্তি এই যে, প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার জন্যে এই لا শপথ বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত হয়। উদ্দেশ্য এই যে, এটা কেবল তোমার ধারণা নয় ; বরং আমি শপথ সহকারে যা বলছি, তাই বাস্তব সত্য। البلد (নগরী) বলে এখানে মক্কা নগরীকে বোঝানো হয়েছে। সূরা জীনেও এমনভাবে মক্কা নগরীর শপথ করা হয়েছে এবং তদপক্ষে امين বিশেষণও উল্লেখ করা হয়েছে।

وَأَنْتَ حِلُّ يَهْدٍ الْبَلَدُ — (এক) এটা শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে— (এক) এটা অর্থ কোন কিছুতে অবস্থান নেয়া, থাকা ও অবতরণ করা। অতএব, حل এর অর্থ হবে অবস্থানকারী, বসবাসকারী। আয়াতের মর্মার্থ এই যে, মক্কা নগরী নিজেও সম্মানিত ও পবিত্র, বিশেষতঃ আপনিও এ নগরীতে বসবাস করেন। বসবাসকারীর শ্রেষ্ঠত্বের দরুন বসবাসস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে যায়। কাজেই আপনার বসবাসের কারণে এ নগরীর মাহাত্ম্য ও সম্মান দ্বিগুণ হয়ে গেছে। (দুই) এটা حلت থেকে উদ্ভূত। অর্থ হালাল হওয়া। এদিক দিয়ে এক অর্থ এই যে, আপনাকে মক্কার কাফেররা হালাল মনে করে রেখেছে এবং আপনাকে হত্যা করার ফিকিরে রয়েছে ; অথচ তারা নিজেরাও মক্কা নগরীতে কোন শিকারকেই হালাল মনে করে না। এমতাবস্থায় তাদের জুলুম ও অবাধ্যতা কতটুকু যে, তারা আল্লাহর রসুলের হত্যাকে হালাল মনে করে নিয়েছে। অপর অর্থ এই যে, আপনার জন্যে মক্কার হরমে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল করে দেওয়া হবে। বস্তুতঃ মক্কা বিজয়ের সময় একদিনের জন্যেই তাই করা হয়েছিল। তফসীরের সার-সংক্ষেপে এ অর্থ অবলম্বনেই তফসীর করা হয়েছে। মায়হারীতে সম্ভাব্য তিনটি অর্থই উল্লেখ করা হয়েছে।

وَالْوَالِدُ مَا وَلَدَ — এখানে والد বলে মানব পিতা হযরত আদম (আঃ),

আর ماولد বলে বনী-আদমকে বোঝানো হয়েছে। এভাবে এতে হযরত আদম ও দুনিয়ার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব বনী-আদমের শপথ করা হয়েছে। অতঃপর শপথের জওয়াবে বলা হয়েছে—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ — এর শাব্দিক অর্থ শ্রম ও কষ্ট।

অর্থাৎ, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে আজীবন শ্রম ও কষ্টের মধ্যে থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : মানুষ গর্ভাশয়ে আবদ্ধ থাকে, জনুলগ্নে শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে, এরপর আসে জননীর দুগ্ধ পান করার ও তা ছাড়ানোর শ্রম। অতঃপর জীবিকা ও জীবনোপকরণ সত্ত্বাহের কষ্ট, বার্ষিক্যের কষ্ট, মৃত্যু, কবর ও হাশর এবং তাতে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি, প্রতিদান ও শাস্তি—এ সমুদয় শ্রমের বিভিন্ন পর্যায়, যা মানুষের উপর দিয়ে অভিহিত হয়। এ শ্রম ও কষ্ট শুধু মানুষেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়, অন্যান্য জীব-জানোয়ারও এতে শরীক রয়েছে। কিন্তু এখানে মানুষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, প্রথমতঃ সব মানুষ জীব-জানোয়ার অপেক্ষা অধিক চেতনা ও উপলব্ধির অধিকারী। পরিশ্রমের কষ্ট চেতনাভেদে কম-বেশী হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ শ্রম হচ্ছে হাশরের মাঠে পুনরুজ্জীবিত হয়ে সারা জীবনের

কাজকর্মের হিসাব দেয়া। এটা অন্য জীব-জানোয়ারের বেলায় নেই।

إِسْبَابُ أَنْ مَوْرِدَ أَحَدٍ - অর্থাৎ, এই বোকা কি মনে করে যে, তার দুর্কর্মসমূহ কেউ দেখেনি? তার জানা উচিত যে, তার স্রষ্টা সবকিছুই দেখছেন।

চক্ষু ও জিহ্বা সৃষ্টির কয়েকটি রহস্য : الْقَوَائِمُ لَهُ عَيْنَيْنِ - এ-এর দ্বিবাচন।
وَلِسَانًا وَتَفْطِنُ وَهَدْيُهُ الْتَجْدِيدِ - এ-এর দ্বিবাচন।
এর শাব্দিক অর্থ উর্ধ্বগামী পথ। এখানে প্রকাশ্য পথ বোঝানো হয়েছে। এপথ দু'টির একটি হচ্ছে সৌভাগ্য ও সাফল্যের পথ এবং অপরটি হচ্ছে অনিশ্চয় ও ধ্বংসের পথ।

عقبة - فَلَا أَفْهَمَ الْعُقَبَةَ وَأَكْذَرُكَ نَالِ الْعُقَبَةِ ذِكْرُ رَبِّكَ
পাহাড়ের বিরাট প্রান্তর খণ্ডকে এবং দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ তথা মাটিকে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কাজে এ মাটি মানুষকে সহায়তা করে। পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করে আত্মরক্ষা করা যায় অথবা মাটিতে প্রবেশ করে অন্যত্র চলে যাওয়া যায়। এস্থলে আল্লাহর এবাদতকে একটি মাটি রূপে ব্যক্ত করা হয়েছে। মাটি যেমন শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়, সংকর্মও তেমনি পরকালের আঘাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এসব সংকর্মের মধ্যে প্রথমে رقية অর্থাৎ, দাস মুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। এটা খুব বড় এবাদত এবং একজন মানুষের জীবন সুসংহত করার নামান্তর। দ্বিতীয় সংকর্ম হচ্ছে ক্ষুধার্তকে অনুদান। যে কাউকে অনুদান করা সওয়াবমুক্ত নয়, কিন্তু কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর লোককে অনুদান করলে তা আরও বিরাট সওয়াবের কাজ হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে :

يَتَبَيَّنُ أَمْثَلُ مَرْقِيَةٍ أَوْ مَرْقِيَةٍ أَوْ مَرْقِيَةٍ - অর্থাৎ, বিশেষভাবে যদি আত্মীয় এতীমকে অনুদান করা হয়, তবে তাতে দ্বিগুণ সওয়াব হয়।—(এক) ক্ষুধার্তের ক্ষুধা দূর করার সওয়াব এবং (দুই) আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ও তার হক আদায় করার সওয়াব।
-অর্থাৎ, বিশেষভাবে ক্ষুধার দিনে তাকে অনুদান করা অধিক সওয়াবের কারণ হয়ে যায়। এমনিভাবে ধূলায় লুপ্ত মিসকীন অর্থাৎ, নিরতিশয় নিঃস্ব ব্যক্তিকে অনুদান করাও অধিক সওয়াবের কাজ। এরূপ ব্যক্তি যত বেশী অভাবী হবে, অনুদাতার সওয়াবও ততই বৃদ্ধি পাবে।

অপরেরও সংকাজের নির্দেশ দেয়া ঈমানের দাবী : ذُكِّرَ أَنْ يَنْ -
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَّأَوْا بِالْقَصْرِ وَكَوْا بِالْمَرْصَةِ - এ আয়াতে ঈমানের পর মুমিনের এই কর্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সে অপরাপর মুসলমান ভাইকে সবার ও অনুসঙ্গার উপদেশ দেবে। সবারের অর্থ নিজেকে মন্দ কাজ থেকে ঝাটিয়ে রাখা ও সংকর্ম সম্পাদন করা। -مرحمة- এর অর্থ অপরের প্রতি দয়ার্প হওয়া। অপরের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করে তাকে কষ্টদান ও জুলুম করা থেকে বিরত হওয়া। এতে দুইনের প্রায় সব নির্দেশই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সূরা আশ-শামস

এই সূরার শুরুতে সাতটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির

সাথে তার পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর উদ্দেশ্যে কিছু বিশেষণ যোগ করা হয়েছে। প্রথম শপথ وَالْقَمِينَ وَخُفْيَا - এখানে ضعی শব্দটি অবসন্নভাবে শمس -এর বিশেষণ। অর্থাৎ, শপথ সূর্যের যখন তা উর্ধ্বগমনে থাকে। সূর্য উদয়ের পর যখন কিছু উর্ধ্ব উঠে যায় এবং পৃথিবীতে তার কিরণ ছড়িয়ে পড়ে, সে সময়কে ضعی বলা হয়। তখন সূর্য কাছেই দৃষ্টিগোচর হয় এবং তেমন প্রখরতা না থাকার কারণে তা পূর্ণরূপে দেখাও যায়।

দ্বিতীয় শপথ وَالْقَمِينَ إِذَا كُنَّا أَكْثَرًا - অর্থাৎ, চন্দ্রের শপথ যখন তা সূর্যের পেছনে আসে এবং এর এক অর্ধ এই যে, যখন চন্দ্র সূর্যাস্তের পরেই উদ্ভিত হয়। মাসের মধ্যভাগে এরূপ হয়। তখন চন্দ্র প্রায় পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। পেছনে আসার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কিছুটা উর্ধ্বগমনে থাকার সময় সূর্য যেমন পুরোপুরি দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি পরিপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে চন্দ্র সূর্যের অনুগামী হয়। তৃতীয় শপথ إِذَا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ - এখানে جَاءَهُمُ এর সর্বনাম দ্বারা পৃথিবী অথবা দুনিয়াও বোঝানো যেতে পারে। অর্থাৎ, শপথ দিবসের দুনিয়া অথবা পৃথিবীর—যাকে দিন আলোকিত করে। এতেও ইঙ্গিত আছে যে, পূর্ণরূপে আলোকিত দিবসের শপথ করা হয়েছে। কিন্তু বাক্যের বাহ্যিক অবস্থা এই যে, এখানে সর্বনাম দ্বারা সূর্য বোঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, শপথ দিবসের, যখন সে সূর্যকে আলোকিত করে। অর্থাৎ, যখন দিন শুরু হওয়ার কারণে সূর্য উজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হয়।

চতুর্থ শপথ وَالْأَيْلُ إِذَا يَنْطَبَها - অর্থাৎ, শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে। মানে সূর্যের কিরণকে ঢেকে দেয়।

পঞ্চম শপথ وَالْمَاءَ إِذَا يَنْطَبَها - অর্থাৎ, মা অব্যয়কে ধরে এই এই অর্থ নেয়া সুস্পষ্ট যে, সে শপথ আকাশের ও তা নির্মাণের। কোরআনের অন্য এক আয়াতে এর নজির আছে يَنْتَقِطُ الرِّيقُ এমনিভাবে ষষ্ঠ শপথ وَالْأَرْضَ إِذَا يَنْطَبَها বাক্যের অর্থ এরূপ হবে যে শপথ পৃথিবীর ও তাকে বিস্তৃত করার। এখানে আকাশের সাথে নির্মাণের এবং পৃথিবীর সাথে বিস্তৃত করার উল্লেখও এতদুভয়ের পরিপূর্ণ অবস্থা বোঝানোর জন্যে। এই তফসীর হযরত কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে। কাশশাক, বায়যাবী ও কুরতুবী একেই পছন্দ করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ এস্থলে ما অব্যয়কে من এর অর্থে ধরে এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার সত্তা বুঝিয়েছেন। কাজেই উপরোক্ত বাক্যদ্বয়ের অর্থ হবে শপথ আকাশের ও ভূমি, যিনি একে নির্মাণ করেছেন। শপথ পৃথিবীর ও ভূমি, যিনি একে বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু এখানে সবগুলো শপথই সৃষ্ট বস্তুর শপথ। যাক্বানে স্রষ্টার শপথ এসে যাওয়া ধারাবাহিকতার খেলাফ মনে হয়। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ী এ আপত্তিও দেখা দেয় না যে, সৃষ্টবস্তুর শপথ স্রষ্টার শপথের অঙ্গ্রে বর্ণিত হল কেন?

সপ্তম শপথ : وَالنَّجْمَ إِذَا يَنْطَبَها - এখানেও দু'রকম অর্থ হতে পারে—(এক) শপথ মানুষের প্রাণের এবং তাকে সুস্থিত করার এবং (দুই) শপথ নক্ষত্রের এবং ভূমি, যিনি সেটাকে সুস্থিত করেছেন।

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَبَهَا ۖ وَفَيْسَ وَمَا سَوَّاهَا ۚ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وَتَقْوَاهَا ۚ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۚ
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۚ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ۚ فَقَالَ لَهُمْ
رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۚ فَكَذَّبُوهُ فَفَعَوْهَا فَاخْذِمْنَا
عَلَيْهِمْ زُلْجَمًا ۖ يَمُوتُ بَيْنَهُمْ فَسَوْهَا ۚ وَلَا تُخَافُ عَقْبَاهَا ۚ

وَالْأَنْبِيَاءُ رُسُلُهُمْ فَجِئْنَاهُمْ
بِأَنبِيَاءٍ مُّزَكَّاتٍ ۖ وَجِئْنَاهُمْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْأَيْلِ إِذِ الْيَغْثَى ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۚ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ
وَالْأُنْثَى ۚ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ۚ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۚ
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ۚ فَسَنِيسُورُ الْيُسْرَى ۚ وَأَمَّا مَنْ
بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۚ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۚ فَسَنِيسُورُ
لِلْعُسْرَى ۚ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۚ إِنَّ عَلَيْنَا
لَلْهُدَى ۚ وَإِنَّ لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى ۚ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا
تَلَظَّى ۚ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۚ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۚ
وَسَيَحْبَبُهَا الْاَشْقَى ۚ الَّذِي يُوَفِّي مَالَهُ يَغْرَبُ ۚ

(৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তাঁর, (৭) শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর (৮) অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সংকর্মের জ্ঞান দান করেছেন, (৯) যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। (১০) এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (১১) সামুদ্র স্রোতদায় অবশ্যতাবশতঃ মিথ্যারোপ করেছিল (১২) যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল, (১৩) অতঃপর আল্লাহর রসূল তাদেরকে বলেছিলেন : আল্লাহর উদ্দী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক। (১৪) অতঃপর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং উদ্দীর পা কর্তন করেছিল। তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে একাকার করে দিলেন। (১৫) আল্লাহ তাআলা এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না।

সূরা আল-লায়ল

মক্কা অবতীর্ণ। আয়াত ২১।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে, (২) শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয় (৩) এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন, (৪) নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। (৫) অতএব, যে দান করে এবং খোদাভীরূ হয়, (৬) এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে, (৭) আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (৮) আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয় (৯) এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, (১০) আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব। (১১) যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না। (১২) আমার দায়িত্ব পঞ্চপ্রদর্শন করা। (১৩) আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের। (১৪) অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রদুল্লিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। (১৫) এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, (১৬) যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৭) এ থেকে দূরে রাখা হবে খোদাভীরূ ব্যক্তিকে, (১৮) যে আত্মশুদ্ধির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান করে।

فَجُور -এর অর্থ নিক্ষেপ করা এবং

শব্দের অর্থ প্রকাশ্য গোনাহ। এই বাক্য সপ্তম শপথের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মানুষের নফস সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর অন্তরে অসৎকর্ম ও সংকর্ম উভয়ের প্রেরণা জাগ্রত করেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, মানব সৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলা গোনাহ ও এবাদত উভয় কর্মের যোগ্যতা রেখেছেন, অতঃপর তাকে বিশেষ এক প্রকার ক্ষমতা দিয়েছেন, যাতে সে স্বেচ্ছায় গোনাহের পথ অবলম্বন করে অথবা এবাদতের পথ। যখন সে নিজ ইচ্ছায় ও ক্ষমতায় এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন এক পথ অবলম্বন করে, তখন এই ইচ্ছা ও ক্ষমতার ভিত্তিতেই সে সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হয়। এই তফসীর অনুযায়ী এরূপ প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই যে, মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই যখন পাপ ও এবাদত নিহিত আছে, তখন সে তা করতে বাধ্য। এর জন্যে সে কোন সওয়াব অথবা আযাবের যোগ্য হবে না। একটি হাদীস থেকে এই তফসীর গৃহীত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে আছে যে, তকদীর সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে গোনাহ ও এবাদতের যোগ্যতা গচ্ছিত রেখেছেন, কিন্তু তাকে কোন একটি করতে বাধ্য করেননি; বরং তাকে উভয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি করার ক্ষমতা দান করেছেন।

হযরত আবু হেরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতেন—

اللَّهُمَّ اِنَّ نَفْسِي تَقْوَاهَا اِنَّتَ وَلِيهَا وَمَوْلَاهَا وَاِنَّتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমাকে তাকওয়ার তওফীক দান কর, তুমিই আমার মুরব্বী ও পৃষ্ঠপোষক।

সপ্তম শপথের পর জওয়াবে বলা হয়েছে وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۚ অর্থাৎ, সে ব্যক্তি সফলকাম, যে নিজের নফসকে শুদ্ধ করে। تَزَكِيَة শব্দের প্রকৃত অর্থ আভ্যন্তরীণ শুদ্ধতা। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিগ্রহা অর্জন করে, সে সফলকাম। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি ব্যর্থ যে নিজের নফসকে পাপের পক্ষে নিমজ্জিত করে দেয়। دَسَّ -এর অর্থ মাটিতে প্রোথিত করা; যেমন এক আয়াতে আছে اَمْ يَكُنْ فِي الْاُتْرَاقِ -কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতের অর্থ করেছেন, সে ব্যক্তি সফলকাম হয়; যাকে আল্লাহ শুদ্ধ করেন এবং সে ব্যক্তি ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ তাআলা গোনাহে ডুবিয়ে দেন। এ আয়াত সমগ্র মানবকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে, সফলকাম ও ব্যর্থ। অতঃপর দ্বিতীয় প্রকার মানুষের একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করে তাদের অন্তত পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সামুদ্র গোত্রের ঘটনার প্রতি সংক্ষেপে ইঙ্গিত করে তাদের এই শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছেঃ

فَدَمَّرْنَا عَلَيْهِمْ زُلْجَمًا يَدُورُ ۖ فَسَوْهَا

ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, যা বার বার কোন ব্যক্তি অথবা জাতির উপর পতিত হয়ে তাকে সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ করে দেয়। سَوْهَا -এর উদ্দেশ্য এই যে, এ আযাব জাতির আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবাইকে বেষ্টন করে নেয়। وَلا يُخَافُ عَقْبَاهَا -অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার শাস্তিদান ও কোন জাতিকে

নির্মূল করে দেয়ার ব্যাপারকে দুনিয়ার ব্যাপারের মত মনে করো না। দুনিয়াতে কোন রাজাধিরাজ ও প্রবল পরাক্রান্ত শাসকও কোন জাতির বিরুদ্ধে ধ্বংসাভিযান পরিচালনা করলে সে জাতির অবশিষ্ট লোক অথবা তাদের সমর্থকদের প্রতিশোধমূলক কার্যক্রম ও গণবিদ্রোহের আশংকা করতে থাকে। এখানে যারা অপরকে হত্যা করে, তারা নিজেরাও হত্যার আশংকা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। যারা অপরকে আক্রমণ করে তারা নিজেরাও আক্রান্ত হওয়ার ভয় রাখে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এরূপ নন। কারও পক্ষ থেকে কোন সময় তাঁর কোন বিপদাশঙ্কা নেই।

সূরা আল-লায়ল

إِنَّكَ كَادِرٌ ۖ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ —এ বাক্যটি সূরা ইনশিকাকের إِنَّكَ كَادِرٌ ۖ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ বাক্যের অনুরূপ, যার তফসীর সে সূরায় বর্ণিত হয়ে গেছে। মর্মার্থ এই যে, মানুষ সৃষ্টিগতভাবে কোন না কোন কাজের জন্যে প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ে অভ্যস্ত, কিন্তু কোন কোন লোক তার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা চিরস্থায়ী সুখের ব্যবস্থা করে নেয়, আর কেউ কেউ এই পরিশ্রম দ্বারাই অনন্ত আযাব ক্রয় করে। হাদীসে আছে, প্রত্যেক মানুষ সকাল বেলায় গাত্ৰোত্থান করে নিজেকে ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে। অতঃপর কেউ এই ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করে এবং নিজেকে পরকালের আযাব থেকে মুক্ত করে। পক্ষান্তরে কারও শ্রম ও প্রচেষ্টাই তার ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হল প্রথমে নিজের প্রচেষ্টা ও কর্মের পরিণতি চিন্তা করা এবং যে কর্মের পরিণতি সাময়িক সুখ ও আনন্দ হয়, তার কাছেও না যাওয়া।

কর্মপ্রচেষ্টার দিক দিয়ে মানুষের দু'দল : অতঃপর কোরআন পাক কর্ম প্রচেষ্টার ভিত্তিতে মানুষকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে এবং প্রত্যেকের তিনটি করে বিশেষণ বর্ণনা করেছে—প্রথমে সফলকাম দলের তিনটি বিশেষণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে : قَائِمًا مِّنْ أَعْمَالٍ وَأَتَقَىٰ الرَّحْمَنَ —অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করে, আল্লাহকে ভয় করে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তাঁর অনুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বেঁচে থাকে এবং সে উত্তম কলমাকে সত্য মনে করে। এখানে 'উত্তম কলমা' বলে কলমায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বোঝানো হয়েছে।—(হিবনে-আব্বাস, যাহুহাক)

দ্বিতীয় দলেরও তিনটি কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে بِحُلٍّ ۖ وَاسْتَعْتَبَ وَكَدَّ ۖ بِالْحَسَنَىٰ —অর্থাৎ, যে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কৃপণতা করে তথা যাকাত ও গুনাহের সদকাও দেয় না, আল্লাহকে ভয় করার পরিবর্তে তাঁর প্রতি বিমুখ হয় এবং উত্তম কলমা তথা ঈমানের কলমাকে মিথ্যা মনে করে। এতদূষের প্রথম দল সম্পর্কে বলা হয়েছে فَسَنِيْرُ الْيُسْرَىٰ —এর শাস্তি অর্থ সহজ ও আরামদায়ক বিষয়, যাতে কোন কষ্ট নেই। এখানে জান্নাত বোঝানো

হয়েছে। দ্বিতীয় দল সম্পর্কে বলা হয়েছে : فَسَنِيْرُ الْيُسْرَىٰ —এর শাস্তি অর্থ কঠিন ও কষ্টদায়ক বিষয়। এখানে জাহান্নাম বোঝানো হয়েছে। উভয় বাক্যের অর্থ এই যে, যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রম প্রথমোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, (অর্থাৎ, আল্লাহর পথে ব্যয় করা, আল্লাহকে ভয় করা এবং ঈমানকে সত্য মনে করা) তাদেরকে আমি জান্নাতের কাজের জন্যে সহজ করে দেই। পক্ষান্তরে যারা তাদের প্রচেষ্টা ও শ্রমকে শেষোক্ত তিন কাজে নিয়োজিত করে, আমি তাদেরকে জাহান্নামের কাজের জন্যে সহজ করে দেই। এখানে বাহ্যতঃ এরূপ বলা সঙ্গত ছিল যে, আমি তাদের জন্যে জান্নাতের অথবা জাহান্নামের কাজ সহজ করে দেই। কেননা, কাজকর্মই সহজ অথবা কঠিন হয়ে থাকে—ব্যক্তি সহজ অথবা কঠিন হয় না। কিন্তু কোরআন পাক এভাবে ব্যক্ত করেছে যে, স্বয়ং তাদের সন্তোকে এসব কাজের জন্যে সহজ করে দেয়া হবে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রথম দলের জন্যে জান্নাতের কাজকর্ম তাদের মজ্জায় পরিণত হবে। আর এর বিপরীত কাজ করতে তারা কষ্ট অনুভব করবে। এমনিভাবে দ্বিতীয় দলের জন্যে জাহান্নামের কাজকর্ম মজ্জায় পরিণত করে দেয়া হবে। ফলে তারা এ জাতীয় কাজই পছন্দ করবে এবং এতেই শাস্তি পাবে। উভয় দলের মজ্জায় এ অবস্থা সৃষ্টি করে দেয়াকেই একথা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, স্বয়ং তাদেরকে এসব কাজের জন্যে সহজ করে দেয়া হবে।

وَمَا يُؤْمِنُ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ —অর্থাৎ, যে ধন-সম্পদের খাতিরে

এ হতভাগ্য গুনাহি হক দিতেও কৃপণতা করত, সে ধন-সম্পদ আযাব আসার সময় তার কোন কাজে আসবে না। تَرَدَّىٰ —এর শাস্তি অর্থ গর্তে পতিত হওয়া ও ধ্বংস হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, মৃত্যুর পরে কবরে অতঃপর কেয়ামতে যখন সে জাহান্নামের গর্তে পতিত হবে, তখন এই ধন-সম্পদ কোন উপকারে আসবে না।

لَا يَصْلُهُ إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ —অর্থাৎ, এই জাহান্নামে

নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই দাখিল হবে, যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাঁদের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বলাবাহুল্য, এরূপ মিথ্যা আরোপকারী কাফেরই হতে পারে। এ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, পাপী মুমিন যে মিথ্যারোপের অপরাধে অপরাধী নয়, সে জাহান্নামে দাখিল হবে না। অথচ কোরআনের অনেক আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, মুমিন ব্যক্তি গোনাহ করার পর যদি তওবা না করে অথবা কারও সুপারিশের বলে কিংবা বিশেষ রহমতে যদি তাকে ক্ষমা করা না হয়, তবে সেও জাহান্নামে যাবে এবং গোনাহের শাস্তি ভোগ করা পর্যন্ত জাহান্নামে থাকবে। অবশ্য শাস্তি ভোগ করার পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে ঈমানের কল্যাণে তাকে জান্নাতে দাখিল করা হবে।

وَسَيَصْبَحُ مِنَ الْأَشْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ —এতে সৌভাগ্যশালী

খোদাতীরুদের প্রতিদান বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে অভ্যস্ত এবং একমাত্র গোনাহ থেকে শুদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাকে জাহান্নামের আগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে।

وَمَا لَاحِدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۖ إِلَّا أَتَيْنَا وَجْهَ
رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۖ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
وَالصُّحُفِ ۖ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۖ مَا وَدَّكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۖ وَلَسَوْفَ نُعْطِيكَ رَبُّكَ
فَتَرْضَىٰ ۖ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا
فَهَدَىٰ ۖ وَوَجَدَكَ عَالِمًا فَلَأَعْنِي ۖ فَآتَاكَ نِعَمَةً فَلَا تَكْفُرُ ۝
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۖ وَأَمَّا يُنِيعُهُ رَبُّكَ فَحَدِّثْ ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
أَلَمْ نُشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ ۖ
الَّذِي أَقْنَصَ ظَهْرَكَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۖ فَإِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فُتِحَتْ فَأَنْصَبْ ۖ
وَأِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

(১৯) এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না। (২০) তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অবশ্যই ব্যতীত। (২১) সে সন্তুহই সন্তুষ্টি লাভ করবে।

সূরা আদ্ব-দোহা

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ১১।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু —

- (১) শপথ পূর্বাহ্নের, (২) শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়, (৩) আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি।
- (৪) আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়। (৫) আপনার পালনকর্তা সন্তুহই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।
- (৬) তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। (৭) তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন। (৮) তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃশ্র, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। (৯) সূতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না; (১০) সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না (১১) এবং আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।

সূর আল- ইনশিরাহ

মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ৮।।

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু —

- (১) আমি কি আপনার বন্ধ উন্মুক্ত করে দেইনি? (২) আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, (৩) যা ছিল আপনার জন্যে অতিশয় দুঃসহ। (৪) আমি আপনার আলোচনাকে সমুদ্র করেছি। (৫) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৬) নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। (৭) অতএব, যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন। (৮) এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

এর সাথেই সম্পর্কশীল আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে وَمَا لَاحِدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ — অর্থাৎ, যেসব গোলামকে হয়রত আবুবকর (রাঃ) প্রচুর অর্থ দিয়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন, তাদের কোন সাবেক অনুগ্রহও তাঁর উপর ছিল না, যার প্রতিদানে এরূপ করা যেত; বরং — তাঁর লক্ষ্য মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অনুেষণ ব্যতীত কিছুই ছিল না।

মুত্তাদরাক হাকিমে হয়রত যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হয়রত আবু বকর (রাঃ)—এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন মুসলমানকে কাফের মালিকের হাতে বন্দী দেখলে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতেন। এ ধরনের মুসলমান সাধারণঃ দুর্বল ও শক্তিহীন হত। একদিন তাঁর পিতা হয়রত আবু কোহাফা বললেন : তুমি যখন গোলামদেরকে মুক্তই করে দাও, তখন শক্তিশালী ও সাহসী গোলাম দেখে মুক্ত করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে সে শত্রুর হাত থেকে তোমাকে হেফায়ত করতে পারে। হয়রত আবুবকর (রাঃ) বললেন : কোন মুক্ত করা মুসলমান দ্বারা উপকার লাভ করা আমার লক্ষ্য নয়। আমি তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই তাদেরকে মুক্ত করি। — (মায়হারী)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই তার ধন-সম্পদ ব্যয় করেছে এবং পার্থিব উপকার চায়নি, আল্লাহ তাআলাও পরকালে তাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং জান্নাতের মহা নেয়ামত তাকে দান করবেন। এই শেষ বাক্যটি হয়রত আবুবকর (রাঃ)—এর জন্যে একটি বিরাট সুসংবাদ। আল্লাহ তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন—এ সংবাদ দুনিয়াতেই তাঁকে শোনানো হয়েছে।

সূরা আদ্ব-দোহা

এই সূরা অবতরণের কারণ সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হয়রত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর একটি অংগুলীতে আঘাত লেগে রক্ত বের হয়ে পড়লে বললেন :

অর্থাৎ, তুমি তো একটি অংগুলীই; যা রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তুমি যে কষ্ট পেয়েছ, তা আল্লাহর পথেই পেয়েছ। (কাজেই দুঃখ কিসের!) এ ঘটনার পর কিছু দিন জিবরাঈল ওহী নিয়ে আগমন করলেন না। এতে মুশরিকরা বলতে শুরু করে যে, মুহাম্মদকে তার আল্লাহ পরিত্যাগ করেছেন ও তার প্রতি রুষ্ট হয়েছেন। এরই প্রেক্ষিতে সূরা আদ্ব-দোহা অবতীর্ণ হয়। বুখারীতে বর্ণিত জুনদুব (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতে দু'এক রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্যে না উঠার কথা আছে—ওহী বিলম্বিত হওয়ার কথা নেই। তিরমিযীতে তাহাজ্জুদের জন্যে না উঠার উল্লেখ নেই, শুধু ওহী বিলম্বিত হওয়ার উল্লেখ আছে। বলাবাহুল্য, উভয় ঘটনাই স্বেচ্ছাচিত হতে পারে বিধায় উভয় রেওয়ায়েতে কোন বিরোধ নেই। বর্ণনাকারী হয়তো এক সময়ে এক ঘটনা এবং অন্য সময়ে অন্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য রেওয়ায়েতে আছে যে, আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার চালিয়েছিল। ওহী বিলম্বিত হওয়ার

ঘটনা কয়েকবার সংঘটিত হয়েছিল। একবার কোরআন অবতরণের প্রথমভাগে যাকে ‘ফাতরাতে-ওহী’র কাল বলা হয়। এটিই ছিল বেশী দিনের বিলম্ব। দ্বিতীয়বার তখন বিলম্বিত হয়েছিল, যখন মুশরিকরা অথবা ইহুদীরা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে রাহের স্বরণ সম্পর্কে প্রশ্ন রেখেছিল এবং তিনি পরে জওয়াব দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন ‘ইলশাঅল্লাহ্’ না বলার কারণে ওহীর আগমন বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। এতে মুশরিকরা বলাবলি শুরু করল যে, মুহাম্মদের আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে পরিত্যাগ করেছেন। যে ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা দোহা অবতীর্ণ হয়, সেটাও এমনি ধরনের। সবগুলো ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত হওয়া জরুরী নয়; বরং আগে-পিছেও হতে পারে।

وَاللَّائِيْنَ خَيْرٌ مِنْكَ مِنَ الْاُولٰٓئِ —এখানে اخرى اولی শব্দদ্বয়ের প্রসিদ্ধ

অর্থ পরকাল ও ইহকাল নেয়া হলে এর ব্যাখ্যা হবে যে, মুশরিকরা আপনার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছে, এর অসারতা তো তারা ইহকালে দেখে নেবেই, অধিকন্তু আমি আপনাকে পরকালে নেয়ামত দান করারও ওয়াদা দিচ্ছি। সেখানে আপনাকে ইহকাল অপেক্ষা অনেক বেশী নেয়ামত দান করা হবে। এখানে اخرى —কে শাস্তিক অর্থে নেয়াও অসম্ভব নয়। অতএব, এর অর্থ পরবর্তী অবস্থা; যেমন اولی শব্দের অর্থ প্রথম অবস্থা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনার প্রতি আল্লাহ্র নেয়ামত দিন দিন বেড়েই যাবে এবং প্রত্যেক প্রথম অবস্থা থেকে পরবর্তী অবস্থা উত্তম ও শ্রেয় হবে। এতে জ্ঞানগরিমা ও খোদায়ী নৈকট্যে উন্নতিলাভসহ জীবিকা এবং পার্শ্বি প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব অবস্থাই অন্তর্ভুক্ত।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰی —অর্থাৎ, আপনার পালনকর্তা

আপনাকে এত প্রার্থ্য দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এতে কি দিবেন, তা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কাম্যবস্তুর প্রচুর পরিমাণে দেবেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাম্যবস্ত্রসমূহের মধ্যে ছিল ইসলামের উন্নতি, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রসার, উম্মতের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর বিজয়লাভ, শত্রুদেশে ইসলামের কল্যাণ সমুন্নত করা ইত্যাদি। হাদীসে আছে, এ আয়াত নাখিল হলে পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তাহলে আমি ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ আমার উম্মতের একটি লোকও জাহান্নামে থাকবে।—(ফুরতুবী) হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : আল্লাহ্ তাআলা আমার উম্মত সম্পর্কে আমার সুপারিশ কবুল করবেন এবং অবশেষে তিনি বলবেন, رَضِيتُ بِمُحَمَّدٍ هُوَ مُوَحَّدٌ, এখন আপনি সন্তুষ্ট হয়েছেন কি? আমি আরয় করব? رَضِيتُ هُوَ আমার পণ্ডয়ারদেগার, আমি সন্তুষ্ট। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আমার ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেন : একদিন রসুলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কিত এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন فَمَنْ يُّشِيقْهُ فَإِنَّكَ غَوْرٌ خَبِيرٌ —অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর উক্তি সম্বলিত অপর একটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন—

إِنْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ —এরপর তিনি দুহাত তুলে কান্না বিজড়িত

কণ্ঠে বারবার বলতে লাগলেন اللهم امتى امتى আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করতে প্রেরণ করলেন : (এবং বললেন, অবশ্য আমি সব জানি।) জিবরাঈলের জওয়াবে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) বললেন : আমি আমার উম্মতের মাগফেরাত চাই। আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলকে বললেন : যাও, গিয়ে বল যে, আল্লাহ্ তাআলা উম্মতের

ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন এবং আপনাকে দুঃখিত করবেন না।

উপরে কাকেরদের বলাবলির জওয়াবে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি ইহকালে ও পরকালে খোদায়ী নেয়ামতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল। অতঃপর তিনটি বিশেষ নেয়ামত উল্লেখ করে এর কিস্তি বিবরণ দেয়া হয়েছে—

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَآوٰى —এটা প্রথম নেয়ামত। অর্থাৎ, আমি আপনাকে

পিতৃহীন পেয়েছি। আপনার জন্মের পূর্বেই পিতা ইন্তেকাল করেছিল। পিতা কোন বিষয়-আশয়ও ছেড়ে যাননি, যদ্বারা আপনার লালন-পালন হতে পারত। অতঃপর আমি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। অর্থাৎ, প্রথমে পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের ও পরে পিতৃব্য আবু তালেবের অন্তরে আপনার প্রতি আগাধ স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। ফলে তাঁরা ঔরসজাত সন্তান অপেক্ষা অধিক যত্নসহকারে আপনাকে লালন-পালন করতেন।

দ্বিতীয় নেয়ামত : وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى —শব্দের অর্থ পথভ্রষ্টও

হয় এবং অনভিজ্ঞ, বেখবরও হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। নবুওয়ত লাভের পূর্বে তিনি খোদায়ী বিধি-বিধান সম্পর্কে বেখবর ছিলেন। অতঃপর নবুওয়তের পদ দান করে তাঁকে পথনির্দেশ দেয়া হয়।

তৃতীয় নেয়ামত : وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنٰى —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা

আপনাকে নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত পেয়েছেন। অতঃপর আপনাকে ধনশালী করেছেন। হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর ধন-সম্পদ দ্বারা অংশীদারী কারবার করার মাধ্যমে এর সূচনা হয়, অতঃপর খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহ করার ফলে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রসুলুল্লাহ (রাঃ)-এর জন্য উৎসর্গিত হয়ে যায়।

এ তিনটি নেয়ামত উল্লেখ করার পর রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে তিনটি

ফের —فَاتَا النَّبِيَّ وَلَا تَقْرَ —প্রথম নির্দেশ

শব্দের অর্থ জবরদস্তিমূলকভাবে অধিকারভুক্ত করা। উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কোন পিতৃহীনকে অসহায় ও বেওয়ারিশ মনে করে তার ধন-সম্পদ জবরদস্তিমূলকভাবে নিজ অধিকারভুক্ত করে নেবেন না। এ কারণেই রসুলুল্লাহ (সাঃ) এতীমের সাথে সহদয় ব্যবহার করার জোর আদেশ দিয়েছেন এবং বেদনাদায়ক ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন : মুসলমানদের সে গৃহই সর্বোত্তম যাতে কোন এতীম রয়েছে এবং তার সাথে সদ্যুবহার করা হয়। আর সে গৃহ সর্বাধিক মন্দ, যাতে কোন এতীম রয়েছে, কিন্তু তার সাথে অসদ্যুবহার করা হয়।—(মাহহারী)

দ্বিতীয় নির্দেশ : وَأَمَّا السَّائِلُ فَكَلِمَتُهُ نَهْر —শব্দের অর্থ ধমক দেয়া

এবং সائل —এর অর্থ সাহায্যপ্রার্থী। অর্থগত ও জ্ঞানগত উভয় প্রকার সাহায্যপ্রার্থী এর অন্তর্ভুক্ত। উভয়কে ধমক দিতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিষেধ করা হয়েছে। সাহায্য প্রার্থীকে কিছু দিয়ে বিদায় করা এবং দিতে না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উত্তম। এমনভাবে যে ব্যক্তি কোন শিক্ষণীয় বিষয় জানতে চায় তার জওয়াবেও কঠোরতা ও দুর্ব্যবহার করা নিষেধ। তবে যদি কোন সাহায্যপ্রার্থী নাছোড়বান্দা হয়ে যায় তবে প্রয়োজনে তাকে ধমক দেয়াও জায়েয।

তৃতীয় নির্দেশ : وَأَمَّا يَتِيمٌ فَكَلِمَتُهُ نَهْر —শব্দের অর্থ কথা

বলা। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের সামনে আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করুন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটাও এক পন্থা। এমনকি একজন অন্যজনের প্রতি যে অনুগ্রহ করে, তারও শোকর আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি অপরের অনুগ্রহের শোকর আদায় করে না, সে

আল্লাহ্ তাআলারও শোকর আদায় করে না।—(মায়হারী)

সূরা দ্বোহা থেকে কোরআনের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার সাথে তকবীর বলা সন্নত। শায়েখ সালেহ মিসরীর মতে, এই তকবীর হল
 لا اله الا الله والله اكبر —(মায়হারী)

ইবনে কাসীর প্রত্যেক সূরা শেষে এবং বগভী (রহঃ) প্রত্যেক সূরার শুরুতে তকবীর বলা সন্নত বলেছেন।—(মায়হারী) উভয়ের মধ্যে যাই করা হবে, তাতে সন্নত আদায় হয়ে যাবে।

সূরা দ্বোহা থেকে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সূরায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর প্রতি আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নেয়ামত ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং কয়েকটি সূরায় কেয়ামত ও তার অবস্থাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন মহান এবং যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে। এই বিষয়বস্তু দ্বারাই কোরআন পাক শুরু করা হয়েছে এবং সেই সত্তার মাহাত্ম্য বর্ণনা দ্বারা শেষ করা হয়েছে, যার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরা আল-ইনশিরাহ

সূরা যোহার শেষে বর্ণিত হয়েছে যে, সূরা যোহা থেকে শেষ পর্যন্ত বাইশটি সূরায় বেশীর ভাগ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর প্রতি নেয়ামত ও তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। মাত্র কয়েকটি সূরায় কেয়ামতের অবস্থা ও অন্যান্য বিষয় আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য সূরা ইনশিরাহেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—কে প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ বর্ণিত হয়েছে এবং এ কর্নায়েও সূরা যোহার ন্যায় জিজ্ঞাসাবোধক ভঙ্গি অবলম্বন করা হয়েছে।

الْمُتَشَرِّكَ لَكَ صَدْرُكَ - شرح শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা। জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্যে বক্ষকে প্রশস্ত করে দেয়ার অর্থে বক্ষ উন্মুক্ত করা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্য এক আয়াতে আছে لَمَن يُرِدِ اللَّهُ فَعَلْهُ وَفَعَلْنَا لَكَ صَدْرُكَ - আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞান, তত্ত্বকথা ও উত্তম চরিত্রের জন্যে এমন বিস্তৃত করে দিয়েছিলেন যে, বিশ্ববিখ্যাত কোন পণ্ডিত-দার্শনিকও তাঁর জ্ঞান-গরিমার ধারে কাছে পৌছতে পারেনি। এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টির প্রতি তাঁর মনোনিবেশ আল্লাহ্ তাআলার প্রতি মনোনিবেশে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করত না। কোন কোন সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, ফেরেশতাগণ আল্লাহ্র আদেশে বাহ্যতঃ ও তাঁর বক্ষ বিদারণ করে পরিষ্কার করেছিল। কোন কোন তফসীরবিদ এস্থলে বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ সে বক্ষ বিদারণই নিয়েছেন।—(ইবনে-কাসীর)

وَرَزَّ وَوَضَعْنَاكَ وَرَزَّكَ الْإِنِّي أَنْفَضُ ظَهْرَكَ - এর শাস্তিক অর্থ বোঝা আর নফ্‌স ظَهْر - এর শাস্তিক অর্থ কোমর ভেঙ্গে দেয়া। অর্থাৎ, কোমরকে নুইয়ে দেয়া। কোন বড় বোঝা কারও মাথায় তুলে দিলে যেমন তার কোমর নুয়ে পড়ে, তেমনি আয়াতে বলা হয়েছে যে, যে বোঝা আপনার কোমরকে নুইয়ে দিয়েছিল, আমি তাকে আপনার উপর থেকে অপসারিত করে দিয়েছি। সে বোঝা কি ছিল, তার ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, নবুওয়তের প্রথমদিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর উপর ওহীর প্রতিক্রিয়াও গুরুতররূপে দেখা দিত। তদুপরি সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার করা এবং কুফর ও শিরকের বিলোপ সাধন করে সমগ্র মানব জাতিতে তওহীদ একত্রিত করার দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল।

এসব ব্যাপারে আদেশ ছিল فَاسْتَوِيْكُمْ كَمَا أُوْتِرْتُمْ - অর্থাৎ, আপনি

আল্লাহ্র আদেশ অনুযায়ী সরল পথে অটল থাকুন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই গুরুভার তিলে তিলে অনুভব করতেন। এক হাদীসে আছে, তাঁর দাঁড়ির কতক চুল সাদা হয়ে গেলে তিনি বললেন : فَاسْتَوِيْكُمْ كَمَا أُوْتِرْتُمْ - এই আয়াত আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে।

এই বোঝাকেই তাঁর অন্তর থেকে সরিয়ে দেয়ার সুসংবাদ এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। একে সরানোর পশ্চাৎ পরের আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আপনার প্রত্যেক কষ্টের পর স্বস্তি আসবে। আল্লাহ্ তাআলা বক্ষ উন্মুক্ত করার মাধ্যমে তাঁর মনোবল আকাশচুম্বী করে দেন। ফলে প্রত্যেক কঠিন কাজই তাঁর কাছে সহজ মনে হতে থাকে এবং কোন বোঝাই আর বোঝা থাকেনি।

وَوَفَّكَ لَكَ وَكَرَّكَ - রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর আলোচনা উন্নত করা এই যে, ইসলামের বৈশিষ্ট্যমূলক কর্মসমূহে আল্লাহ্র নামের সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়। সারা বিশ্বের মসজিদসমূহের মিনারে ও মিম্বরে আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-র সাথে সাথে ‘আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্’ বলা হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশ্বের কোন জ্ঞানী মানুষ তাঁর নাম সম্মান প্রদর্শন ব্যতীত উচ্চারণ করে না, যদিও সে অমুসলমান হয়।

এখানে তিনটি নেয়ামত উল্লেখ করা হয়েছে—شرح صدر (বক্ষ উন্মোচন) وضع وزر (বোঝা লাঘবকরণ) ও رفع ذكر (আলোচনা উন্নতকরণ)। এগুলোকে তিনটি বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বাক্যে কর্তা ও কর্মের মাঝখানে لك অথবা عنك ব্যবহার করা হয়েছে। এতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ মাহাত্ম্যের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব কাজ আপনার খাতিরেই করা হয়েছে।

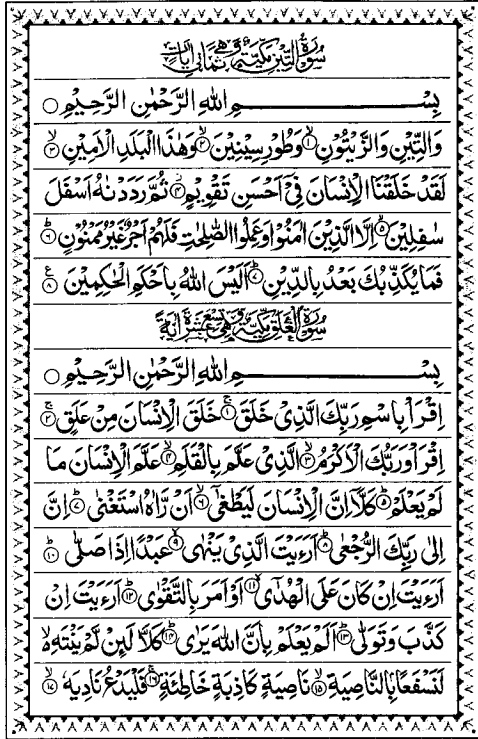
وَإِن مَّعَ الشُّرُكِيِّ إِنْ مَّعَ الشُّرُكِيِّ - আরবী ভাষার একটি নীতি এই যে, আলিফ ও লামযুক্ত শব্দকে যদি পুনরায় আলিফ ও লাম সহকারে উল্লেখ করা হয়, তবে উভয় জায়গায় একই বস্তুসত্তা অর্থ হয়ে থাকে এবং আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে পুনরায় উল্লেখ করা হলে উভয় জায়গায় পৃথক পৃথক বস্তুসত্তা বোঝানো হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে الشُّرُকِيِّ শব্দটি যখন পুনরায় الشُّرُكِيِّ উল্লেখিত হয়েছে, তখন বোঝা গেল যে, উভয় জায়গায় একই عسر অর্থাৎ, কষ্ট বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে الشُّرُকِيِّ শব্দটি উভয় জায়গায় আলিফ ও লাম ব্যতিরেকে উল্লেখিত হয়েছে এতে নিয়মানুযায়ী বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় عسر তথা স্বস্তি প্রথম عسر তথা স্বস্তি থেকে ভিন্ন। এতএব আয়াতে إِنْ مَّعَ الشُّرُكِيِّ - এর পুনরুল্লেখ থেকে জানা গেল যে, একই কষ্টের জন্যে দু’টি স্বস্তির ওয়াদা করা হয়েছে। দু’এর উদ্দেশ্যও এখানে বিশেষ দু’এর সংখ্যা নয়; বরং উদ্দেশ্য অনেক। অতএব সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর একটি কষ্টের সাথে তাঁকে অনেক স্বস্তি দান করা হবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন : আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবায়ে কেয়ামকে এই আয়াত থেকে দু’টি সুসংবাদ শুনিয়েছেন এবং বলেছেন, عسر يسرين, এক কষ্ট দুই স্বস্তির উপর প্রবল হতে পারে না। সেমতে মুসলমান অমুসলমানদের লিখিত সব ইতিহাস ও সীরাতে গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, যে কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর বরং সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হত, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)—এর জন্যে সে কাজ সহজতর হয়ে গিয়েছিল।

التين ٩٥- العلق ٩٦

٩٥

عشر



সূরা ত্বীন

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

- (১) শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের, (২) এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বতের, (৩) এবং এই নিরাপদ নগরীর। (৪) আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে (৫) অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে (৬) কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অশেষ পুরস্কার। (৭) অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ কেয়ামতকে? (৮) আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?

সূরা আলাক

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ১৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

- (১) পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন (২) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাত রক্ত থেকে। (৩) পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু। (৪) যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, (৫) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (৬) সত্যি সত্যি মানুষ সীমালঙ্ঘন করে, (৭) এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। (৮) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে। (৯) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে (১০) এক বন্দাকে যখন সে নামায পড়ে? (১১) আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎপথে থাকে (১২) অথবা খোদাতীতি শিক্ষা দেয়। (১৩) আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (১৪) সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন? (১৫) কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মন্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই—(১৬) মিথ্যাচারী, পাণীরা কেশগুচ্ছ। (১৭) অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহ্বান করুক।

শিক্ষা ও প্রচারকার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্যে একান্তে যিকর ও আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা জরুরী : **وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَلِمْ يَدَكَ وَارْكَعْ**—অর্থাৎ, আপনি যখন দাওয়াত ও তবলীগের কাজ থেকে অবসর পান, তখন অন্য কাজের জন্যে তৈরী হয়ে যান। আর তা হল এই যে, আল্লাহর যিকর, দোয়া ও এস্তেগফারে আত্মনিয়োগ করুন। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ তফসীরই করেছেন। কেউ কেউ অন্য তফসীরও করেছেন, কিন্তু এটাই অধিকতর বোধগম্য তফসীর। এর সারমর্ম এই যে, দাওয়াত, তবলীগ, মানুষকে পথপ্রদর্শন করা এবং তাদের সংশোধনের চিন্তা করা—এসবই ছিল রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সর্ববৃহৎ এবাদত। কিন্তু এটা সৃষ্টজীবের মধ্যস্থতায় এবাদত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আপনি কেবল এ জাতীয় পরোক্ষ এবাদত করে ক্ষান্ত হবেন না বরং যখনই এ এবাদত থেকে অবসর পাবেন, তখন একান্তে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করুন। তাঁর কাছেই প্রত্যেক কাজে সাফল্য লাভের দোয়া করুন। আল্লাহর যিকর ও প্রত্যক্ষ এবাদতই তো আসল উদ্দেশ্য। এর জন্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্ভবতঃ এ কারণেই পরোক্ষ এবাদত থেকে অবসর পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা এক প্রয়োজনের এবাদত। এ থেকে অবসর পাওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রত্যক্ষ এবাদত তথা আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা এমন বিষয়, যা থেকে মুমিন ব্যক্তি কখনও অবসর পেতে পারে না, বরং তার জীবন ও সর্বশক্তি এতে ব্যয় করতে হবে।

এ থেকে জানা গেল যে, আলেম সমাজ, যারা শিক্ষা, প্রচার ও জনসংশোধনের কাজে নিয়োজিত থাকেন, তাদের কিছু সময় আল্লাহর যিকর ও আল্লাহর দিকে মনোনিবেশে ব্যয়িত হওয়া উচিত। পূর্ববর্তী আলেমগণ এরূপই ছিলেন। এছাড়া শিক্ষা এবং প্রচারকার্যও কার্যকর হয় না এবং তাতে বরকতও হয় না। **فَالصَّبْرُ** শব্দটি **نَصَبٌ** থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ পরিশ্রম ও ক্লান্তি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এবাদত ও যিকর এতদূর করা উচিত যে, তাতে কিছু কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভূত হয়—আরাম পর্যন্তই সীমিত রাখা উচিত নয়। কোন ওয়িলা কিংবা নিয়াম মেনে চলাও এক প্রকার কষ্ট ও ক্লান্তি, যদিও কাজ সামান্যই হয়।

সূরা ত্বীন

—এ সূরায় চারটি বস্তুর শপথ করা হয়েছে। (এক)

তীন অর্থাৎ, আঞ্জীর তথা ডুমুর বৃক্ষ। (দুই) যয়তুন বৃক্ষ। (তিন) সিনাই প্রান্তরস্থ তুর পর্বত। (চার) মক্কা মোকাররমা। এই বিশেষ শপথের কারণ এই হতে পারে যে, তুর পর্বত ও মক্কা নগরীর ন্যায় ডুমুর ও যয়তুন বৃক্ষও বিপুল উপকারী বস্তু। এটাও সম্ভবপর যে, এখানে তীন ও যয়তুন উল্লেখ করে সে স্থানকে বোঝানো হয়েছে, যেখানে এ বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আর সে স্থান হচ্ছে শাম দেশ, যা অগণিত পয়গম্বরগণের আবাসভূমি। হযরত ইবরাহীম (আঃ) সে দেশে অবস্থান করতেন। তাঁকে সেখান থেকে হিজরত করিয়ে মক্কা মোকাররমা আনা হয়েছিল। এভাবে উপরোক্ত শপথসমূহে সেসব ভূমি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরগণ জন্মগ্রহণ করেছেন ও জেরিত হয়েছেন। শাম দেশ অধিকাংশ পয়গম্বরগণের আবাসভূমি। তুর পর্বত মুসা (আঃ)—এর আল্লাহর সাথে বাক্যলাপের স্থান। সিনীন অথবা সীনা তুর পর্বতের অবস্থানস্থলের নাম। নিরাপদ শহর শেখনবী (সাঃ)—এর জন্মস্থান ও বাসস্থান।

শপথের পর বলা হয়েছে : **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ**

—এর শাস্তিক অর্থ কোন কিছুই অবয়ব ও ভিত্তিকে ঠিক করা।

أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ—এর উদ্দেশ্য এই যে, তার মজ্জা ও স্বভাবকেও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের তুলনায় উত্তম করা হয়েছে এবং তার দৈহিক অবয়ব এবং আকার-আকৃতিকেও দুনিয়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করা হয়েছে।

সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর : মানুষকে আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করেছেন। ইবনে আরাবী বলেন : আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ অপেক্ষা সুন্দর কেউ নেই। কেননা, আল্লাহ তাআলা তাকে জ্ঞানী, শক্তিবান, বক্তা, শ্রোতা, দ্রষ্টা, কুশলী এবং প্রজ্ঞাবান করেছেন। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার গুণাবলী। সমতে বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে **ان الله خلق آدم**—অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ)—কে নিজের আকারে সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এটিই হতে পারে যে, আল্লাহ তাআলার কতিপয় গুণাবলী কোন কোন পর্যায়ে তাকেও দেয়া হয়েছে। নতুবা আল্লাহ তাআলার কোন আকার নেই।—(কুরতুবী)

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ—পূর্বের আয়াতে মানুষকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সুন্দরতম সৃষ্টি করার বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে তার বিপরীতে বলা হয়েছে যে, সে যৌবনের প্রারম্ভে যেমন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ ছিল, তেমনি পরিশেষে সে নিকট থেকে নিকটতর এবং মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, এই উৎকৃষ্টতা ও নিকটতা তার বাহ্যিক ও শারীরিক অবস্থার দিক দিয়ে বলা হয়েছে। যৌবন অশ্রুতিমিত হয়ে গেলে তার আকার-আকৃতি বদলে যায়। বার্ষিক এসে তাকে সম্পূর্ণ পাণ্টে দেয়। সে কুশী দৃষ্টিগোচর হতে থাকে এবং কর্মক্ষমতা হারিয়ে অপরের উপর বোঝা হয়ে যায়। কারও কোন উপকারে আসে না। অন্যান্য জীব জন্তু এর বিপরীত। সেগুলি শেষ পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকে। মানুষ ওসরের কাছ থেকে দুগ্ধ, বোঝা বহন এবং অন্যান্য বহু রকম কাজ নেয়। জবাই করা হলে অথবা মারা গেলেও সেগুলির চামড়া, পশম অস্থি মানুষের কাজে আসে। কিন্তু মানুষ যখন বার্ষিকো অক্ষম হয়ে যায়, তখন সে সাংসারিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ বেকার হয়ে যায়। মৃত্যুর পরও তার কোন অংশ দ্বারা কোন মানুষ অথবা জন্তুর উপকার হয় না। সারকথা, মানুষ যে নিকটদের মধ্যে নিকটতম, এর অর্থ তার বৈষয়িক ও শারীরিক অবস্থা। হযরত যাহ্যাক প্রমুখ থেকে এ তফসীরই বর্ণিত রয়েছে—(কুরতুবী)

এ তফসীর অনুযায়ী পরের আয়াতে মুমিন সৎকর্মশীলগণ এর ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মুমিন সৎকর্মী বার্ষিকো অক্ষম ও অপারগ হয় না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, তাদের দৈহিক বেকারত্ব ও বৈষয়িক অকর্মণ্যতার ক্ষতি তাদের হয় না, বরং ক্ষতি কেবল তাদের হয় যারা নিজেদের সমগ্র চিন্তা ও যোগ্যতা বৈষয়িক উন্নতিতেই ব্যয় করেছিল। এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিন্তু মুমিন সৎকর্মীর পুরস্কার ও সওয়াব কোন সময়ই নিঃশেষ হয় না। দুনিয়াতে বার্ষিক্যের বেকারত্ব ও অপারগতার সম্মুখীন হলেও পরকালে তার জন্য উচ্চ মর্যাদা ও সুখ বিদ্যমান থাকে। বার্ষিক্যজনিত বেকারত্ব ও কর্ম হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও তাদের আমলানামায় সেসব কর্ম লিখিত হয়, যা তারা শক্তিমান অবস্থায় করত। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কোন মুসলমান অসুস্থ হয়ে পড়লে আল্লাহ তাআলা আমল লেখক ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন,

সুস্থ অবস্থায় সে যেসব সৎকর্ম করত, সেগুলো তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করতে থাকে। (বোখারী) এছাড়া এস্থলে মুমিন সৎকর্মীর প্রতিদান জ্ঞানাত ও তার নেয়ামত বর্ণনা করার পরিবর্তে বলা হয়েছে **لَكُمْ أَجْرٌ عَزِيزٌ مُمْتَنٍ**—অর্থাৎ, তাদের পুরস্কার কখনও বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত হবে না। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তাদের এই পুরস্কার দুনিয়ার বৈষয়িক জীবন থেকেই শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তার প্রিয় বন্দাদের জন্যে বার্ষিকো এমন খাটি সহচর জুটিয়ে দেন, যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে আত্মিক উপকারিতা লাভ করতে থাকেন এবং তাদের সর্বপ্রকার সেবায়ত্ত করেন। এভাবে বার্ষিক্যের যে স্তরে মানুষ বৈষয়িক ও দৈহিক দিক দিয়ে অকেজো, বেকার ও অপরের উপর বোঝারূপে গণ্য হয়, সে স্তরেও আল্লাহর প্রিয় বন্দাগণ বেকার থাকেন না। কোন কোন তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এরূপ তফসীর করেছেন যে,

رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ সাধারণ মানুষের জন্যে নয়; বরং কাকের ও পাপাচারীদের জন্যে বলা হয়েছে, যারা খোদা প্রদত্ত সুন্দর অবয়ব, গুণগত উৎকর্ষ ও বিবেককে বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পেছনে বরবাদ করে দেয়। এই অকৃতজ্ঞতার শাস্তি হিসেবে তাদেরকে হীনতম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া হবে। এমতাবস্থায় **أَلَّا يَذِيقُوا مَوْتَهُ** বাক্যের ব্যতিক্রম বাহ্যিক অর্থেই বহাল থাকে। অর্থাৎ, যারা মুমিন ও সৎকর্মী, তাদেরকে নিকটতম পর্যায়ে পৌঁছানো হবে না। কেননা, তাদের পুরস্কার সব সময়ই অব্যাহত থাকবে।—(মায়হারী)

فَمَا يَذِيقُكَ بَعْدَ الْمَوْتِ—এতে কেয়ামতে অবিশ্বাসীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, খোদায়ী কুদরতের উপরোক্ত দৃশ্য ও পরিবর্তন দেখার পরও তোমাদের জন্যে পরকাল ও কেয়ামতকে মিথ্যা মনে করার কি অবকাশ থাকতে পারে। আল্লাহ তাআলা কি সব বিচারকের মহাবিচারক নন?

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি সূরা তীনের **أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ الْخٰكِيْنَ** পর্যন্ত পাঠ করে, তার উচ্চি **ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهَدِيْنَ** বলা। ফোকাহবিদগণের মতে এই বাক্যটি পাঠ করা মোস্তাহাব।

সূরা আলাক

ওহীর সূচনা ও সর্বপ্রথম ওহী : বোখারী, মুসলিম ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতে থেকে প্রমাণিত রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত যে, সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত **مَّا لَئِيْلَهُ** পর্যন্ত) সর্ব প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। কেউ কেউ সূরা মুদাসসিরকে প্রথম সূরা এবং কেউ সূরা ফাতেহাকে সর্বপ্রথম সূরা বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম বগভী অধিকাংশ আলেমের মতকেই বিশুদ্ধ বলেছেন। সূরা মুদাসসিরকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, সূরা আলাকের পাঁচ আয়াত নাযিল হওয়ার পর দীর্ঘকাল কোরআন অবতরণ বন্ধ থাকে, যাকে ওহীর বিরতিকাল বলা হয়ে থাকে—এই বিরতির কারণে রসুলুল্লাহ (সাঃ) ভীষণ মর্মবেদনা ও মানসিক অশান্তির সম্মুখীন হন। এরপর একদিন হঠাৎ জিবরাঈল (আঃ) সামনে আসেন এবং সূরা মুদাসসির অবতীর্ণ হয়। এ সময়ও ওহী অবতরণ এবং জিবরাঈলের সাথে সাক্ষাতের দরুন রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর মধ্যে সে পূর্বের

মতই ভাবান্তর দেখা দেয়, যা সূরা আলাক অবতীর্ণ হওয়ার সময় দেখা দিয়েছিল। এভাবে বিরতিকালের পর সর্বপ্রথম সূরা মুকাসসিরের প্রাথমিক আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। ফলে একেও প্রথম সূরা আখ্যা দেয়া যায়। সূরা ফাতেহাকে প্রথম সূরা বলার কারণ এই যে, পূর্ণ সূরা হিসাবে একত্রে সূরা ফাতেহাই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। এর আগে কয়েকটি সূরার আংশবিশেষই অবতীর্ণ হয়েছিল।—(মাহহারী)

إِنَّا بِأَشْيُوْرِكَ الْاٰزِمِيْنَ حَقًّا —এখানে اسم শব্দ যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখনই কোরআন পড়বেন, আল্লাহর নাম অর্থাৎ, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম দ্বারা শুরু করবেন। এতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর পেশকৃত ওয়েরে জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনি যদিও বর্তমান অবস্থায় উম্মী; লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু আপনার পালনকর্তা উম্মী ব্যক্তিকে উচ্চতর শিক্ষা, বাক-নৈপুণ্য, বিশুদ্ধ ভাষাজ্ঞান ও প্রাঞ্জলতার এমন পরাকাষ্ঠা দান করতে পারেন, যার সামনে বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও স্বীয় অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পরবর্তীকালে তাই প্রকাশ পেয়েছিল।—(মাহহারী) এস্থলে বিশেষভাবে আল্লাহর ‘রব’ নামটি উল্লেখ করায় এ বিষয়বস্তু আরও জোরদার হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলাই আপনার পালনকর্তা। তিনি সর্বতোভাবে আপনাকে পালন করেন। তিনি উম্মী হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে পাঠ করাতে সক্ষম। আল্লাহর গুণাবলীর মধ্য থেকে এস্থলে বিশেষভাবে সৃষ্টিগুণ উল্লেখ করার মধ্যে সম্ভবতঃ রহস্য এই যে, সৃষ্টি তথা অস্তিত্ব দান করাই সৃষ্টির প্রতি আল্লাহ তাআলার সর্বপ্রথম অনুগ্রহ। এস্থলে ব্যাপকতার দিকে ইঙ্গিত করার জন্যে خلق ক্রিয়াপদের কর্ম উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ, সমগ্র বিশৃঙ্খলিত এই সৃষ্টি কর্মের ফল।

حَقَّقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ —পূর্বের আয়াতে সমগ্র বিশৃঙ্খলিত সৃষ্টির বর্ণনা ছিল। এ আয়াতে সেরা সৃষ্টি মানব সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, সমগ্র বিশৃঙ্খলিত সার-নির্ধাস হচ্ছে মানুষ। জগতে যা কিছু আছে তার প্রত্যেকটির নথীর মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। তাই মানুষকে ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়। বিশেষভাবে মানুষের উল্লেখ করার এক কারণ এরূপ হতে পারে যে, নবুওয়ত রেসালত ও কোরআন নাযিল করার লক্ষ্য খোদায়ী আদেশ-নিষেধ পালন করানো। এটা বিশেষভাবে মানুষেরই কাজ; خلق শব্দের অর্থ জন্মট রক্ত। মানুষ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রান্ত হয়। মৃত্তিকা ও উপাদান চতুষ্টয় দ্বারা এর সূচনা হয়, এরপর বীর্ষ ও এরপর জন্মট রক্তের পালা আসে। অতঃপর মাংসপিণ্ড ও অস্থি ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এসবের মধ্যে জন্মট রক্ত হচ্ছে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা। এর উল্লেখ করায় এর পূর্বাগর অবস্থাসমূহের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে।

إِنَّا وَزَّيْنٰكَ الْاَزْوَْر —এখানে إِنَّا আদেশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ এরূপও হতে পারে যে, স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর পাঠ করার জন্যে প্রথম إِنَّا বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় إِنَّا তবলীগ, দাওয়াত ও অপরকে পাঠ করানোর জন্যে বলা হয়েছে। اكرم বিশেষণে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জগৎ সৃষ্টি ও মানব সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআলার নিজের কোন স্বার্থ ও লাভ নেই; বরং এগুলো সব দানশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে। ফলে তিনি অযাচিতভাবে সৃষ্টজগৎকে অস্তিত্বের মহান নেয়ামত দান করেছেন।

اَلَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ —মানব সৃষ্টির পর মানুষের শিক্ষার প্রসঙ্গটি উল্লেখিত হয়েছে। কারণ, শিক্ষাই মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে স্বতন্ত্র

এবং সৃষ্টির সেরা রূপে চিহ্নিত করে। শিক্ষার পদ্ধতি সাধারণতঃ দ্বিবিধ। (এক)—মৌখিক শিক্ষা এবং (দুই) কলম ও লেখার মাধ্যমে শিক্ষা। সূরার শুরুতে قُرْا শব্দের মধ্যে মৌখিক শিক্ষা রয়েছে। কিন্তু এ আয়াতে শিক্ষাদান সম্পর্কিত বর্ণনায় কলমের সাহায্যে শিক্ষাকেই অগ্রা বর্ণনা করা হয়েছে।

শিক্ষার সর্ব প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় কলম ও লিখন : হযরত আবু হারায়রা (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতক্রমে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা যখন আদিকালে সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। হাদীসে আরও বলা হয়েছেঃ আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমতে কলম কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে। এ কিতাব আল্লাহর কাছে আরশে রক্ষিত আছে।—(কুরতুবী)

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم —পূর্বের আয়াতে ছিল কলমের সাহায্যে শিক্ষা দানের বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ তাআলা। তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে অসংখ্য, অগণিত—শুধু কলমের মধ্যেই সীমিত নয়। তাই বলা হয়েছেঃ আল্লাহ তাআলা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে পূর্বে জানত না। এতে কলম অথবা অন্য কোন উপায় উল্লেখ না করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার এ শিক্ষা মানুষের জন্মগত থেকে অব্যাহত রয়েছে

كَذٰلِكَ الْاِنْسَانَ كَذَلٰكَ اَنَّا زَاٰهَلًا —আয়াতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)—এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারী আবু জাহলকে লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা হলেও ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের একটি নৈতিক দুর্বলতা বিধৃত হয়েছে। মানুষ যতদিন অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে, ততদিন সোজা হয়ে চলে। কিন্তু যখন সে মনে করতে থাকে যে, সে কারও মুখাপেক্ষী নয়, তখন তার মধ্যে অব্যাহতা এবং অপরের উপর জুলুম ও নির্যাতনের প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। সাধারণতঃ বিত্তশালী, শাসনক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবর্গ এবং ধনজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সমর্থনপুষ্ট এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই প্রবণতা বহুল পরিমাণে প্রত্যক্ষ করা যায়। তারা ধনাঢ্যতা ও দলবলের শক্তিতে মদমত্ত হয়ে অপরকে পরওয়াই করে না। আবু জাহলের অবস্থাও ছিল তেঁথবচ। সে ছিল মক্কার বিত্তশালীদের অন্যতম। তার গোত্র এমনকি সমগ্র শহরের লোক তাকে সহীহ করত। সে এমনকি অহংকারে মত্ত হয়ে পয়গম্বরকুল শিরোমণি ও সৃষ্টির সেরা মানব রসুলে কবরী (সাঃ)—এর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বসল। পরের আয়াতে এমনি ধরনের অব্যাহতা লোকদের অন্তত পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْوَسْعٰی, অর্থাৎ, সবাইকে তাদের পালনকর্তার কাছে ফিরে যেতে হবে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, মৃত্যুর পর সবাই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে এবং ভাল-মন্দ কর্মের হিসাব নেবে। অব্যাহতার কুপরিণাম স্বচক্ষে দেখে নেবে।

اَرٰىكَ الْاٰزِمِيْنَ عِبْدَ الْاٰصَلِ —এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত একটি ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নামাযের আদেশ লাভ করার পর যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ) নামায পড়া শুরু করেন, তখন আবু জাহল তাঁকে নামায পড়তে বারণ করে এবং হুমকি দেয় যে, ভবিষ্যতে নামায পড়লে ও

القدر - البينة ৭০

৭০

৭০

سَدَّ الرِّبَابِيَّةَ ۖ كَلَّا لَا تُطَعُّهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۖ وَإِنَّا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۖ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَدْرُ مِائَةِ سَهْرٍ ۖ نَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالزُّوْرُ فِيهَا بِأَذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۖ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يُتْلَىٰ أَحْصَا أَطْفَعُ ۖ فِيهَا كُتُبٌ وَحِمْيَرٌ ۖ وَمَا تَقْرَأُ الَّذِينَ أَتَوْا الْكِتَابَ إِلَّا حِينَ بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَأَحْضَاءُ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي تَارِكِهِمْ خُلِدُوا فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

(১৮) আমিও আহবান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে (১৯) কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সেজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন।

সূরা কদর

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে। (২) শবে-কদর সমুদ্রে আপনি কি জানেন? (৩) শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। (৪) এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। (৫) এটা নিরাপত্তা যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

সূরা বাইয়্যিনাহ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৮

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) আহ্লে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করত না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। (২) অর্থাৎ, আল্লাহর একজন রসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা, (৩) যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্তু। (৪) অপর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিভ্রান্ত হয়েছে তা হয়েছে, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই। (৫) তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, নামায কয়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম। (৬) আহ্লে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তাইই সৃষ্টির অধম।

সেজদা করলে সে তাঁর ঘাড় পদতলে পিষ্ট করে দেবে। এর জওয়াবে আলোচ্য আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। বলা হয়েছেঃ **أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ** অর্থাৎ, সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন? কি দেখছেন, এখানে তার উল্লেখ নেই। অতএব ব্যাপক অর্থে তিনি নামায প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষকেও দেখছেন এবং বাহাদানকারী হতভাগাকেও দেখছেন। দেখার পর কি হবে, তা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সেই ভয়াবহ পরিণতি কল্পনাও করা যায় না।

نَاصِيَةٍ এত অর্থ কঠোরভাবে হেঁচড়ানো।

শব্দের অর্থ কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছ। যার এই কেশগুচ্ছ অন্যের মুঠোর ভেতরে চলে যায়, সে তার করতলগত হয়ে পড়ে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

كَلَّا لَا تُطَعُّهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ এতে নবী করীম (সাঃ)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আবু জাহলের কথায় কর্পণাত করবেন না এবং সেজদা ও নামাযে মশগুল থাকুন। কারণ, এটাই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের উপায়।

সেজদায় দোয়া কবুল হয় : আবু দাউদে হযরত আবু হোরয়রা (রাঃ) —এর রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : বন্দা যখন সেজদায় থাকে, তখন তার পালনকর্তার অধিক নিকটবর্তী হয়। তাই তোমরা সেজদায় বেশী পরিমাণে দোয়া কর। অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে—সেজদার অবস্থায় কৃত দোয়া কবুল হওয়ার যোগ্য।

নফল নামাযের সেজদায় দোয়া করার প্রমাণ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এর বিশেষ দোয়াও বর্ণিত আছে। বর্ণিত সে দোয়া পাঠ করাই উত্তম। ফরয নামাযসমূহে এ ধরনের দোয়া পাঠ করার প্রমাণ নেই। কারণ, ফরয নামায সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আলোচ্য আয়াত যে পাঠ করে এবং যে শুনে, সবার উপর সেজদা করা ওয়াজিব। সহীহ মুসলিমে আবু হোরায়রা (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করে সেজদা করেছেন।

সূরা কদর

শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম (রাঃ)—এর রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার বনী-ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। সে এক হাজার মাস পর্যন্ত অবিরাম জেহাদে মশগুল থাকে এবং কখনও অশ্রু সংবরণ করেনি। মুসলমানগণ একথা শুনে বিস্মিত হলে এ সূরা কদর অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্যে শুধু এক রাত্রির ইবাদতই সে মুজাহিদের এক হাজার মাসের এবাদত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইবনে জরীর (রহঃ) অপর একটি ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী-ইসরাঈলের জনৈক এবাদতকারী ব্যক্তি সমস্ত রাক্তি এবাদতের মশগুল থাকত ও সকাল হতেই জেহাদের জন্যে বের হয়ে যেত এবং সারাদিন জেহাদে লিপ্ত থাকত। সে এক হাজার মাস

এভাবে কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা সূরা-কদর নামিল করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। এ থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, শবে-কদর উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য।—(মাযহারী)

লায়লাতুল কদরের অর্থ : কদরের এক অর্থ মাহাত্ম্য ও সম্মান। কেউ কেউ এছলে এ অর্থই নিয়েছেন। এর মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে একে ‘লায়লাতুল-কদর’ তথা মহিমামানিত রাত বলা হয়। আবু বকর ওয়ারাক বলেন : এ রাতিকে লায়লাতুল-কদর বলার কারণ এই যে, আমল না করার কারণে এর পূর্বে যার কোন সম্মান ও মূল্য মহিমামানিত থাকে না, সে এ রাতিতে তওবা-এস্তেগফার ও এবাদতের মাধ্যমে সম্মানিতও হয়ে যায়।

কদরের আরেক অর্থ তকদীর এবং আদেশও হয়ে থাকে। এ রাতিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিবিধান ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফেরেশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, যুগ্ম, রিমিক, বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফেরেশতাগণকে লিখে দেয়া হয়, এমনকি, এ বছর কে হজ্জ করবে, তাও লিখে দেয়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর উক্তি অনুযায়ী চার জন ফেরেশতাকে এসব কাজ সোপর্দ করা হয়। তারা হলেন ইসরাফীল, মীকাদীল, আযরাদীল ও জিবরাঈল (আঃ)।—(কুতুবী)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, পবিত্র রাত্রে তকদীর সংক্রান্ত সব ফয়সালা লিপিবদ্ধ করা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে **لَيْلَةِ الْقَدْرِ** এর অর্থ শবে-কদরই। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন মধ্য শাবানের রাত্রি অর্থাৎ, শবে-বরাত। তাঁরা বলেন যে, তকদীরসংক্রান্ত বিষয়াদির প্রাথমিক ও সংরক্ষিত ফয়সালা শবেবরাতেই হয়ে যায়। অতঃপর তার বিশদ বিবরণ শবে-কদরে লিপিবদ্ধ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)—এর উক্তিতে এর সমর্থন পাওয়া যায়। বগতীর রেওয়ায়েতে তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা সারা বছরের তকদীরসংক্রান্ত বিষয়াদির ফয়সালা শবে-বরাতে সম্পন্ন করেন; অতঃপর শবে-কদরে এসব ফয়সালা সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়।—(মাযহারী) পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই রাত্তিকে তকদীরসংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পন্ন হওয়ার অর্থ এ বছর যেসব বিষয় প্রয়োগ করা হবে, সেগুলো লওহে মাহফুয থেকে নকল করে ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা। নতুবা আসল বিধি-লিপি আদিকালেই লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

শবে-কদর কোন রাত্রি : কোরআন পাকের সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শবে-কদর রমযান মাসে। কিন্তু সঠিক তারিখ সম্পর্কে আলোচনায় বিভিন্ন উক্তি রয়েছে যা সংখ্যায় চল্লিশ পর্যন্ত পৌছে। তফসীরে মাযহারীতে আছে, এসব উক্তির নির্ভুল তথ্য এই যে, শবে-কদর রমযান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে আসে; কিন্তু এরও কোন তারিখ নির্দিষ্ট নেই; বরং যে কোন রাত্তিতে হতে পারে। প্রত্যেক রমযানে তা পরিবর্তিতও হয়। সহীহ হাদীসদৃষ্টে এই দশ দিনের বেজোড় রাত্তিগুলোতে শবে-কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। যদি শবে-কদরকে রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্তিগুলোতে ঘূর্ণায়মান এবং প্রতি রমযানে পরিবর্তনশীল মেনে নেয়া যায়, তবে শবে-কদরের দিন-তারিখ সম্পর্কিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। তাই অধিকাংশ ইমাম এ মতই পোষণ করেন। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)—এর

এক উক্তি এই যে, শবে-কদর নির্দিষ্ট দিনেই হয়ে থাকে।—(ইবনে-কাসীর)

সহীহ বোখারীর এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : **تَحْرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ** অর্থাৎ, রমযানের শেষ দশকে শবে-কদর অনুেষণ কর। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে—**فَاطْلِبُوهَا فِي الْوَتْرِ مِنْهَا** অর্থাৎ, শেষ দশকের বেজোড় রাত্তিগুলোতে তালাশ কর।—(মাযহারী)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কোরআন পাক শবে-কদরে অবতীর্ণ হয়েছে। এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, সমগ্র কোরআন লওহে মাহফুয থেকে শবে-কদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর জিবরাঈল একে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে পৌছাতে থাকেন। দ্বিতীয় এই হতে পারে যে, এ রাত্রে কয়েকটি আয়াত অবতরণের মাধ্যমে কোরআন অবতরণের ধারাবাহিকতা সূচনা হয়ে যায়। এরপর অবশিষ্ট কোরআন পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়।

সমস্ত ঐশী কিতাব রমযানেই অবতীর্ণ হয়েছে : হযরত আবু যর গফারী (রাঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : ইবরাহীম (আঃ)—এর সহীফাসমূহ ৩রা রমযানে, তওরাতে ৬ই রমযানে, ইনজীল ১৩ই রমযানে এবং যবুর ১৮ই রমযানে অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআন পাক ২০শে রমযানুল-মোবারকে নামিল হয়েছে।—(মাযহারী)

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ - **روح** বলে জিবরাঈলকে বোঝানো হয়েছে। হাদীসে আছে, শবে-কদরে জিবরাঈল ফেরেশতাদের বিরাট এক দল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং যত নারী-পুরুষ নামায অথবা যিকরে মশগুল থাকে, তাদের জন্যে রহমতের দোয়া করেন।—(মাযহারী)

وَمِنْ كُلِّ أُمَّةٍ - অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ শবে-কদরে সারা বছরের অবধারিত ঘটনাবলী নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। কোন কোন তফসীরবিদ একে **سَلَامٌ** এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এ অর্থ করেছেন যে, এ রাত্তিটি যাবতীয় অনিষ্ট ও বিপদাপদ থেকে শান্তিস্বরূপ।—(ইবনে-কাসীর)

سَلَامٌ অর্থাৎ, এ রাত্তি শান্তিই শান্তি, মঙ্গলই মঙ্গল। এতে অনিষ্টের নামও নেই।—(কুতুবী) কেউ কেউ একে **وَمِنْ كُلِّ أُمَّةٍ** এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন—ফেরেশতাগণ প্রত্যেক শান্তি ও কল্যাণকর বিষয় নিয়ে আগমন করে।—(মাযহারী)

فِي كُلِّ مَطْلَعِ الْقَدْرِ অর্থাৎ, শবে-কদরের এই বরকত রাত্রির কোন বিশেষ অংশে সীমিত নয়; বরং ফজরের উদয় পর্যন্ত বিস্তৃত।

সূরা বাইয়্যিনাহ

প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়াতে কুফর, শিরক ও মূর্ত্যার ঘোর অন্ধকারের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এহেন সর্বগ্রাসী অন্ধকার দূর করার জন্যে একজন পারদর্শী সম্প্রচারক প্রেরণ করা ছিল অপরিহার্য। রোগ যেমন জটিল ও বিষুব্যাপী, তার প্রতিকারের জন্যে চিকিৎসকও তেমনি সুনিপুণ ও বিচক্ষণ হওয়া

দরকার। অন্যথায় গ্রোশ নিরাময়ের আশা সুদূর পরাহত হতে বাধ্য। অতঃপর সেই বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকের গুণাগুণ উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁর অস্তিত্ব একটি ‘বাইয়্যিনাহ’ অর্থাৎ, কুফর ও শেরককে অসার প্রতিপন্ন করার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরপর বলা হয়েছে যে, এই চিকিৎসক হলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত একজন রসূল, যিনি কোরআনের সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে আগমন করেছেন। এ পর্যন্ত আয়াত থেকে দু’টি বিষয় জানা গেল—(এক) পরমেশ্বর প্রেরণের পূর্বে দুনিয়াতে বিরাট অনর্থ এবং মূর্খতার অন্ধকার বিরাজমান ছিল এক (দুই) রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহান মর্যাদার অধিকারী। অতঃপর কোরআনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

ثَلَاثَ آيَاتٍ - يَتْلُو - يَتْلُو آيَاتُكَ وَمَا تُبَيِّنُ

উদ্ধৃত। এর অর্থ পাঠ করা। তবে যে কোন পাঠকেই তেলাওয়াত বলা যায় না, বরং যে পাঠ পাঠদানকারীর প্রদত্ত অনুশীলনের সুস্পষ্ট অনুরূপ হবে তাকেই ‘তেলাওয়াত’ বলা হয়। তাই পরিভাষায় সাধারণতঃ কোরআন পাঠ করার ক্ষেত্রে তেলাওয়াত শব্দ ব্যবহৃত হয়। صحيفة শব্দটি এর বহুবচন। যেসব কসমে কোন বিষয়বস্তু লিখিত থাকে সেগুলোকেই বলা হয় সহীফা। كتاب শব্দটি এর বহুবচন। এর অর্থ লিখিত বস্তু। এদিক দিয়ে কিতাব ও সহীফা সমার্থবোধক। কিতাব অর্থ কোন সময় আদেশও হয়ে থাকে। যেমন, এক আয়াতে আছে لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ এখানেও এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। অন্যথায় فيها বলার কোন মানে থাকে না।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, মুশরিক ও আহলে-কিতাবদের পঞ্চদশতম চরমে পৌঁছে দিয়েছিল। ফলে তাদের বাস্তব বিশ্বাস থেকে সরে আসা সম্ভবপর ছিল না। যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আল্লাহ্র কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের কাছে রসূলকে সুস্পষ্ট প্রমাণরূপে প্রেরণ করেন। তাঁর কর্তব্য ছিল তাদেরকে পবিত্র সহীফা তেলাওয়াত করে শুনানো। অর্থাৎ, তিনি সেসব বিধান শুনাতেন, যা পরে সহীফার মাধ্যমে সন্নিবেশিত করা হয়। কেননা, প্রথমে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন সহীফা থেকে নয় স্মৃতি থেকে পাঠ করে শুনাতেন। এসব সহীফায় ন্যায় ও ইনসাক সহকারে প্রদত্ত ও চিরস্থান-বিবিধাঙ্গ লিখিত ছিল।

وَمَا تَقْرَأُ مِنَ الْكِتَابِ إِلَّا نُزُلًا مُبِينًا

—এর অর্থ এখানে বিরোধী ও অস্বীকার করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জ্ঞান ও আবির্ভাবের পূর্বে আহলে-কিতাবরা তাঁর নবুওয়তের ব্যাপারে একমত্য পোষণ করত। কেননা, তাদের ঐশীগ্রহ তওরাত ও ইঞ্জীলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নবুওয়ত, তাঁর বিশেষ বিশেষ গুণাবলী ও তাঁর প্রতি কোরআন অবতরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা ছিল। তাই ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন বিরোধ ছিল না যে, শেষ যমানায় মোহাম্মদী মোশতফা

(সাঃ) আগমন করবেন, তাঁর প্রতি কোরআন নাহিল হবে এবং তাঁর অনুসরণ সবার জন্যে অপরিহার্য হবে। কোরআন পাকেও তাদের এই একমত্যের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ عَلَى الْآيَاتِ كُفْرًا

অর্থাৎ, আহলে কিতাবরা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ছিল এবং যখন মুশরেকদের সাথে তাদের মোকাবেলা হত, তখনই তাঁর মধ্যস্থতায় আল্লাহ তাআলার কাছে বিজয় কামনা করে দোয়া করত যে, শেষ নবীর বরকতে আমাদেরকে সাফল্য দান করা হোক। অথবা তারা মুশরেকদেরকে বলত : তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষা করছ বটে, কিন্তু সত্ত্বাই একজন রসূল আসবেন, যিনি তোমাদেরকে পদানত করবেন। আমরা তাঁর সাথে থাকব, ফলে আমাদেরই বিজয় হবে।

সারকথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আগমনের পূর্বে আহলে-কিতাবরা সবাই তাঁর নবুওয়ত সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করত, কিন্তু যখন তিনি আগমন করলেন, তখন তারা অস্বীকার করতে লাগল। কোরআনেরও অন্য এক আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ نَكَرُوهُ

অর্থাৎ, তাদের কাছে যখন পরিচিত রসূল, সত্যধর্ম অথবা কোরআন আগমন করল, তখন তারা কুফর করতে লাগল। আলাচ্য আয়াতে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আশ্চর্যের বিষয়, রসূলের আগমন ও তাঁকে দেখার পূর্বে তো তাদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে কোন মতবিরোধ ছিল না; সবাই তাঁর নবুওয়ত সম্পর্কে একমত্য ছিল, কিন্তু যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ অর্থাৎ, শেষনবী আগমন করলেন, তখন তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল। কেউ তো বিশৃঙ্খল স্থান করে মুমিন হল এবং অনেকেই কাফের হয়ে গেল।

এ ব্যাপারটি কেবল আহলে-কিতাবদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে—মুশরেকদের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু প্রথম ব্যাপারে উভয় দলই শরীক ছিল, তাই প্রথম আয়াতে উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে

لَمَّا يَأْتِيَ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

وَذَلِكَ مِنْ الْقِسْمَةِ

অর্থাৎ, আহলে-কিতাবদেরকে তাদের কিতাবে আদেশ করা হয়েছিল ঋণীত মনে ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র এবাদত করতে, নামায কয়েম করতে ও যাকাত দিতে। এরপর বলা হয়েছে, এটা কেবল তাদেরই বৈশিষ্ট্য নয়, প্রত্যেক সঠিক মিল্লাতের অথবা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সমস্ত কিতাবের তরীকাও তাই। বলাবাহুল্য قيمة শব্দটি কেব—এর বিশেষণ হলে এর উদ্দেশ্য কোরআনী বিশ্বি-বিধান হবে এবং আয়াতের মতলব হবে এই যে, মোহাম্মদী শরীয়ত প্রদত্ত বিশ্বি-বিধানও হুবহু তাই, যা তাদের কিতাব তাদেরকে পূর্বে দিয়েছিল। ভিন্ন বিশ্বি-বিধান হলে অবশ্য তারা বিরোধিতার বাহানা পেত। কিন্তু এখন সে সুযোগ নেই।

তথা হিসাব-নিকাশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।—(মাহহরী)

وَأَرْحَبَ الْأَرْضِ أَنَّهَا — এই ভূসম্পদ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সঃ)

বলেন : পৃথিবী তার কলিছার টুকরা বিশালাকার স্বর্ণ খণ্ডের আকারে উদ্দীর্ণ করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের জন্যে কাউকে হত্যা করেছিল, সে তা দেখে কলবে, এর জন্যেই কি আমি এতবড় অপরাধ করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, সে কলবে, এর জন্যেই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম? চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল, সে কলবে, এর জন্যেই কি আমি নিজের হাত হারিয়েছিলাম? অতঃপর কেউ এসব স্বর্ণখণ্ডের প্রতি লক্ষ্যপণ্ড করবে না।—(মুসলিমঃ)

فَمَنْ يَمُنَّ بِمَا نَزَّلَ مُحَمَّدٌ رَزَقَتْهُ — আয়াতে খির বলে শরীয়তসম্মত

সংকর্ম বোঝানো হয়েছে ; যা ইমানের সাথে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কেননা, ইমান ব্যতীত কোন সংকর্মই আল্লাহর কাছে সংকর্ম নয়। কৃষক অবস্থায় কৃত সংকর্ম পরকালে ফলপ্রসূ হবে না যদিও দুনিয়াতে তার প্রতিদান দেয়া হয়। তাই এ আয়াতকে এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ পেশ করা হয় যে, যার মধ্যে অশু পরিমাণ ইমান থাকবে, তাকে অবশেষে জাহান্নাম থেকে বের করে নেয়া হবে। কেননা, এ আয়াতের ওয়াদা অনুযায়ী প্রত্যেকের সংকর্মের ফল পরকালে পাওয়া জরুরী। কোন সংকর্ম না থাকলেও স্বয়ং ইমানই একটি বিরাট সংকর্ম বলে বিবেচিত হবে। ফলে মুমিন ব্যক্তি যতবড় পোনাহুয়াই হোক, চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। কিন্তু কাকের ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন সংকর্ম করে থাকলে ইমানের অভাবে তা পশুশয় মাত্র। তাই পরকালে তার কোন সংকাজই থাকবে না।

وَمَنْ يَمُنَّ بِمَا نَزَّلَ مُحَمَّدٌ رَزَقَتْهُ — জীবনদশায় তওবা করেনি, এখানে

এমন অসংকর্ম বোঝানো হয়েছে। কেননা, কোরআন ও হাদীসের অকাটা প্রমাণ আছে যে, তওবা করলে পোনাহু যাক হয়ে যায়। তবে যে পোনাহু থেকে তওবা করেনি, তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক— পরকালে অবশ্যই আসনে আসবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, দেখ, এমন পোনাহু থেকেও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হও, যাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা হয়। কেননা, এর জন্যেও আল্লাহর পক্ষ থেকে পাকড়াও করা হবে।—(নাসায়ী,ইবনে-মাযা)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন : কোরআনের এ আয়াতটি সর্বমুখি অটল ও ব্যাপক অর্থবোধক। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতকে : একক, অনন্য ও সর্বব্যাপক বলে অভিহিত করেছেন।

হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সঃ) সূরা খিলখালকে কোরআনের অর্থক, সূরা একলাসকে কোরআনের এক ভূতীতাল্প এবং সূরা কাকিক্রাকে কোরআনের এক চতুর্ভাল্প বলেছেন।—(মাহহরী)

সূরা আদিয়াত

০ হযরত ইবনে মাসউদ, জাবের, হাসান বসরী, ইকরিয়া ও আতা (রাঃ) প্রমুখের মতে ‘সূরা আদিয়াত’ মকায় অবতীর্ণ এবং ইবনে আব্বাস, আনাস (রাঃ), ইয়াম যালেক ও কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখের মতে মদীনায় অবতীর্ণ।—(কুরত্বী)

এ সূরায় আল্লাহ তাআলা সামরিক আশুর কতিপয় বিশেষ অবস্থা বর্ণনা করেছেন এবং তাদের শপথ করে বলেছেন যে, মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। একথা বার বার বর্ণিত আছে যে,

আল্লাহ তাআলা তার সৃষ্টির মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর শপথ করে বিশেষ ঘটনাকালী ও বিধানকালী বর্ণনা করেন। এটা আল্লাহ তাআলারই বৈশিষ্ট্য। মানুষের জন্যে কোন সৃষ্টবস্তুর শপথ করা বৈধ নয়। শপথ করার লক্ষ্য নিজের বক্তব্যকে বাস্তবসম্মত ও নিশ্চিত প্রকাশ করা। কোরআন পাক যে বস্তুর শপথ করে কোন বিষয় বর্ণনা করে, বর্ণিত বিষয় সপ্রমাণ সে বস্তুর গভীর প্রভাব থাকে। এমনকি, সে বস্তু যেন সে বিষয়ের পক্ষে সাক্ষাদান করে। এখানে সামরিক আশুর কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার উল্লেখ যেন মানুষের অকৃতজ্ঞতার সাক্ষ্যস্বরূপ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, অশু বিশেষতঃ সামরিক অশু যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষের আদেশ ও ইঙ্গিতের অনুসারী হয়ে কত কঠোর বেদমতই না আনজাম দিয়ে থাকে। অতঃপর অশু মানুষ সৃষ্টি করেনি। তাদেরকে যে ঘাস-পানি মানুষ দেয়, তাও তার সৃষ্টি নয়। আল্লাহর সৃষ্টি করা জীবনোপকরণকে মানুষ তাদের কাছে পৌঁছে দেয় মাত্র। এখন অশুকে দেখুন, সে মানুষের এতটুকু অনুগ্রহকে কিভাবে চিনে এবং স্বীকার করে। তার সামান্য ইশারায় সে তার জীবনকে সাক্ষ্য বিপদের মুখে ঝেঁলে দেয়, কঠোরতর কষ্ট সহ্য করে। পক্ষান্তরে মানুষের প্রতি লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তাআলা তাকে এক ফাঁটা তুচ্ছ বীর্ষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন কাজের শক্তি দিয়েছেন, বুদ্ধি ও চেতনা দান করেছেন, তার পানাহারের সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য করে তার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু সে এতসব উত্তমেরেব অনুগ্রহেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। এবার শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য করুন — عَادِيَاتٍ শব্দটি علو থেকে উদ্ভূত। অর্থ দৌড়ানো। مَبِيئًا ঘোড়ার দৌড় দেয়ার সময় তার বক্ষ থেকে নির্গত আগ্নেয়জ্বলে বলা হয়। اِيرا থেকে উদ্ভূত। অর্থ অগ্নি নির্গত করা। যেমন চকমকি পাথর ঘষে অথবা দিয়াশলাই ঘষা দিয়ে অগ্নি নির্গত করা হয়। فَرَح এর অর্থ ক্ষুরঘাত করা। লৌহনাল পরিহিত অবস্থায় ঘোড়া যখন প্রস্তরময় মাটিতে ক্ষুরঘাত করে দৌড় দেয় তখন অগ্নিশৃঙ্খল নির্গত হয়। اِغَارَةَ শব্দটি مغيرات থেকে উদ্ভূত। অর্থ হামলা করা, হানা দেয়া। اِثْرُن শব্দটি اثاره আরবদের অভ্যাস হিসেবে প্রভাতকালের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বীরত্ববশতঃ রাত্রির অন্ধকারে হানা দেয়া দোষশীল মনে করত। তাই তারা ভোর হওয়ার পর একাজ করত। اِثْرُن শব্দটি اثاره থেকে উৎপন্ন। অর্থ ধূলি উড়ানো। نَع ধূলিকে বলা হয়। অর্থাৎ, অশুসমূহ যুদ্ধক্ষেত্রে এত দ্রুত ধাবমান হয় যে, তাদের ক্ষুর থেকে ধূলি উড়ে চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে ফেলে। বিশেষতঃ প্রভাতকালে ধূলি উড়া অধিক দ্রুতগতির ইঙ্গিত বহন করে। কারণ, স্বভাবতঃ এটা ধূলি উড়িত হওয়ার সময় নয়। ভীষণ দৌড় দুরাই ধূলি উড়তে পারে।

وَسَطْنَ لِجَنَّتَيْهِمَا — অর্থাৎ, এসব অশু শত্রুদলের অভ্যন্তরে নির্ভয়ে ঢুক পড়ে। لِكُؤُتِ হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ সে ব্যক্তি, যে বিপদ স্মরণ রাখে এবং নেয়ামত ভুলে যায়।

আবু বকর ওয়াসেতী (রহঃ) বলেন : যে ব্যক্তি, আল্লাহর নেয়ামতসমূহকে পোনাহের কাছে ব্যয় করে, তাকে لِكُؤُت বলা হয়। তিরমিযীর মতে এর অর্থ যে নেয়ামত দেখে, কিন্তু নেয়ামতদাতাকে দেখে না। এসব উত্তির সারমর্ম নেয়ামতের নাশোকরী করা।

وَأَرْحَبَ الْأَرْضِ أَنَّهَا — খির এর শাব্দিক অর্থ মঙ্গল। আরবে

ধন-সম্পদকেও খির বলে ব্যক্ত করা হয়; যেন ধন-সম্পদ মঙ্গলই মঙ্গল এক উপকারই উপকার। প্রকৃতপক্ষে কোন কোন ধন-সম্পদ মানুষকে হাজারো বিপদেও জড়িত করে দেয়। পরকালে তো হারাম ধন-সম্পদের পরিণতি তাই হবে, দুনিয়াতেও তা মানুষের জন্যে বিপদ হয়ে যায়। কিন্তু আরবের বাকপদ্ধতি অনুযায়ী এ আয়াতে ধন-সম্পদকে খির বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে আছে اِنَّ رَزَقَكَ خَيْرٌ —

অবৈধ পন্থায় সম্পদ সঞ্গ্রহ করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করা।— (কুরতুবী)

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ — এখানে কবরস্থান ঘেয়ারত করার অর্থ মরে কবরে পৌছা। এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, **حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ** — (ইবনে-কাসীর) অতএব, আয়াতের মর্মার্থ এই যে, ধন-সম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধন-সম্পদ, সম্ভান-সম্ভতি ও বংশ-গোত্রের বড়াই তোমাদেরকে গাফেল ও উদাসীন করে রাখে, নিজেদের পরিণতি ও পরকালের হিসাব-নিকাশের কোন চিন্তা তোমরা কর না এবং এমনি অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু এসে যায় আর মৃত্যুর পর তোমরা আঘাবে গ্রেফতার হও। একথা বাহ্যতঃ সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছে, যারা ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতির ভালবাসার অথবা অপরের সাথে বড়াই করায় এমন মত্ত হয়ে পড়ে যে, পরিণাম চিন্তা করার ফুরসতই পায় না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে শিখীর (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর নিকট পৌছে দেখলাম, তিনি **أَلْهَمَهُ اللَّهُ الْكَافِرُ** তেলাওয়াত করে বলছিলেনঃ

“মানুষ বলে, আমার ধন, আমার ধন, অথচ তোমার অংশ তো ততটুকুই যতটুকু তুমি খেয়ে শেষ করে ফেল অথবা পরিধান করে ছিন করে দাও অথবা সদকা করে সম্মুখে পাঠিয়ে দাও। এছাড়া যা আছে, তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে — তুমি অপরের জন্যে তা ছেড়ে যাবে— (ইবনে-কাসীর, তিরমিযী, আহমদ)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

“আদম সন্তানের যদি স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটি উপত্যকা থাকে, তবে সে (তাতেই) সন্তুষ্ট হবে না; বরং দুটি উপত্যকা কামনা করবে। তার মুখ তো (কবরের) মাটি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ভর্তি করা সম্ভব নয়। যে আল্লাহর দিকে রুদ্ধ করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।— (বোখারী)

হযরত উবাই ইবনে ক'ব (রাঃ) বলেন : আমরা সূরা তাকাছুর নাযিল হওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত হাদীসকে কোরআন মনে করতাম। মনে হয়, রসুলুল্লাহ (সাঃ) **أَلْهَمَهُ اللَّهُ الْكَافِرُ** পাঠ করে তার ব্যাখ্যা উপরোক্ত উক্তিটি করেছিলেন। এতে কোন কোন সাহাবী তাঁর উক্তিকেও কোরআনের ভাষা মনে করলেন। পরে যখন সম্পূর্ণ সূরা সামনে আসে, তখন তাতে এসব বাক্য ছিল না। ফলে প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠে যে,

এগুলো ছিল তফসীরের বাক্য।

لَوْ تَقَوَّلَ عَلٰمٌ مِّثْلَ هٰذَا - لو এর জওয়াব এস্থলে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, **لَا الْهَٰكِمُ التَّكَاثُرُ** — উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা যদি কেয়ামতের হিসাব-নিকাশে নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে, তবে কখনও প্রাচুর্যের বড়াই করতে না এবং উদাসীন হতে না।

ثُمَّ لَنُرَٰهُمْ عَذَابَ الْيَقِيْنِ — উপরে বলা হয়েছে **عَنِ الْيَقِيْنِ** এর অর্থ সে প্রত্যয়, যা চাক্ষুষ দর্শন থেকে অর্জিত হয়। এটা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তর। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : মুসা (আঃ) যখন তুর পর্বতে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্প্রদায় গোবৎসের পূজা করতে শুরু করেছিল, তখন আল্লাহ তাআলা তুর পর্বতেই তাঁকে অবহিত করেছিলেন যে, বনী ইসরাঈলরা গোবৎসের পূজায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু মুসা (আঃ) এর মধ্যে এর তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি, যেমন ফিরে আসার পর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার ফলে দেখা দিয়েছিল। তিনি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তওরাতের তক্তিশুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। — (মাযহারী)

ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّهُ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّؤُوءِ অর্থাৎ, তোমরা সবাই কেয়ামতের দিন আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সেগুলোর শোকর আদায় করেছ কি না এবং পাপকাজে ব্যয় করেছ কি না? তন্মধ্যে কিছুসংখ্যক নেয়ামতের সুস্পষ্ট উল্লেখ কোরআনের অন্য আয়াতে এভাবে করা হয়েছে **إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُورٌ**

এতে মানুষের শ্রবণশক্তি দৃষ্টিশক্তি ও হৃদয় সম্পর্কিত লাতো নেয়ামত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যেগুলো সে প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করে।

সূরা তাকাছুরের বিশেষ ফযীলত : রসূলে করীম (সাঃ) একবার সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন তোমাদের মধ্যে কারও এমন ক্ষমতা নেই যে, এক হাজার আয়াত পাঠ করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন : হাঁ, এক হাজার আয়াত পাঠ করার শক্তি কয়জনের আছে। তিনি বললেন : তোমাদের কেউ কি সূরা তাকাছুর পাঠ করতে পারবে না? উল্লেখ্য এই যে, দৈনিক এই সূরা পাঠ করা এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান।— (মাযহারী)

القصص: ১-২৫: القصص: ১-২৫

৭-৮

২০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَسْأَلُكَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا تَنْصُرُوا الْقِيَامَةَ عَلَى الْكُفْرِ الْمَظْهُورِ
وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَاسِرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَانُوا صَوَابًا صَابِرِينَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَسْأَلُكَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا تَنْصُرُوا الْقِيَامَةَ عَلَى الْكُفْرِ الْمَظْهُورِ
وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَاسِرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَانُوا صَوَابًا صَابِرِينَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَسْأَلُكَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا تَنْصُرُوا الْقِيَامَةَ عَلَى الْكُفْرِ الْمَظْهُورِ
وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَاسِرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَانُوا صَوَابًا صَابِرِينَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَسْأَلُكَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا تَنْصُرُوا الْقِيَامَةَ عَلَى الْكُفْرِ الْمَظْهُورِ
وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَاسِرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَكَانُوا صَوَابًا صَابِرِينَ

সূরা আছর

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) কসম যুগের, (২) নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; (৩) কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে আকীদ করে সত্যের এবং আকীদ করে সবরের।

সূরা হুমাম

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) প্রত্যেক পদক্ষেপে ও সম্মুখে পরনিদাকারীর দুর্ভাগ্য, (২) যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে (৩) সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে। (৪) কখনও না, সে অবশ্যই নিশ্চিত হবে শিষ্টকারীর মধ্যে। (৫) আপনি কি জানেন, শিষ্টকারী কি? (৬) এটা আল্লাহর প্রজ্ঞালিত অগ্নি, (৭) যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাবে। (৮) এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে, (৯) লম্বালম্বাশুটিতে।

সূরা ফীল

মক্কায় অবতীর্ণ: আয়াত ৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? (৩) তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী, (৪) যারা তাদের উপর পাখরের কংকর নিক্ষেপ করছিল। (৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্তিত উপদেশ করে দেন।

সূরা আছর

সূরা আছরের বিশেষ ফযীলত : হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে হিশম (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাহাবীগণের মধ্যে দু' ব্যক্তি ছিল, তারা পরস্পর ঘিলে একজন অন্যজনকে সূরা আছর পাঠ করে না শুনানো পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতেন না। — (তিবরানী) ইমাম শাকেরী (রহঃ) বলেন : যদি মানুষ কেবল এ সূরাটি চিন্তা করত, তবে এটাই তাদের জন্যে যথেষ্ট ছিল। — (ইবনে-কাসীর)

সূরা আছর কোরআন পাকের একটি সক্ষিপ্ত সূরা, কিন্তু এমন অর্থপূর্ণ সূরা যে, ইমাম শাকেরী (রহঃ)-এর ভাষায় মানুষ এ সূরাটিকেই চিন্তা ভাবনা সহকারে পাঠ করলে তাদের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়। এ সূরায় আল্লাহ তাআলা যুগের কসম করে বলেছেন যে, মানবজাতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত এবং এই ক্ষতির কবল থেকে কেবল তারাই মুক্ত, যারা চারটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে পালন করে—ইমান, সৎকর্ম, অপরাধকে সত্যের উপদেশ এবং সবরের উপদেশদান। হীন ও দুনিয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মহা উপকার লাভ করার চার বিষয় সম্পর্কিত এ ব্যবস্থাপত্রের প্রথম দুটি বিষয় আত্মসংশোধন সম্পর্কিত এবং দ্বিতীয় দুটি বিষয় মুসলমানদের হেদায়েত ও সংশোধন সম্পর্কিত।

প্রথম প্রতিধানযোগ্য বিষয় এই যে, বিষয়বস্তুর সাথে যুগের কি সম্পর্ক, যার কসম করা হয়েছে? কসম ও কসমের জওয়াবেও মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন : মানুষের সব কর্ম, গতিবিধি, উঠাবসা ইত্যাদি সব যুগের মধ্যেই সঞ্চিত হয়। সূরায় যেসব কর্মের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোও এই যুগ-কালেরই দিবা-রাত্রিতে সঞ্চিত হবে। এরই প্রেক্ষিতে যুগের শপথ করা হয়েছে।

মানবজাতির ক্ষতিগ্রস্ততায় যুগ ও কালের প্রভাব কি? চিন্তা করলে দেখা যায়, আয়ুষ্কালের সাল, মাস, সপ্তাহ নিবারণে বহু ঘটনা ও মিনিটই মানুষের একমাত্র পুঁজি, যার সাহায্যে সে ইহকাল ও পরকালের বিরাট এবং বিস্ময়কর মুনাকাও অর্জন করতে পারে এবং বাস্তবপথে চললে এটাই তার জন্যে বিপজ্জনকও হয়ে যেতে পারে।

অতঃপর এই চারটি বিষয়ের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করুন। ইমান ও সৎকর্ম—আত্ম-সংশোধন সম্পর্কিত এ দু'টি বিষয়ের ব্যাখ্যা নিশ্চয়োজ্ঞান। তবে সত্যের উপদেশ ও সবরের উপদেশ এ দু'টি বিষয়ের উদ্দেশ্য কি, তা অবশ্যই প্রমিতানযোগ্য। تَوَاصَى শব্দটি থেকে উদ্ভূত। কাউকে বলিষ্ঠ ভক্তিতে উপদেশ দেয়া ও সৎকাজের জোর অকীদ করার নাম ওসীয়াত। এ কারণেই মরণোশ্মক ব্যক্তি পরবর্তীকালের জন্যে যেসব নির্দেশ দেয়, তাকেও ওসীয়াত বলা হয়।

উপরোক্ত দু'রকম উপদেশ প্রকৃতপক্ষে এই ওসীয়াতেরই দু'টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় সত্যের উপদেশ এবং দ্বিতীয় অধ্যায় সবরের উপদেশ। এখন এ দু'টি শব্দের কয়েক রকম অর্থ হতে পারে—(এক) সত্যের অর্থ বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও সৎকর্মের সমষ্টি। আর সবরের অর্থ যাবতীয় গোনাহের কাছ থেকে বেঁচে থাকা। অতএব প্রথম শব্দের সারমর্ম হল 'আমর বিন মারফ তথা সৎকাজের আদেশ করা এবং দ্বিতীয় শব্দের সারমর্ম হল 'নাহী আনিল মুনকার' তথা মন্দ কাজে নিষেধ করা। এখন সমষ্টির সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, নিজে যে ইমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করেছে, অপরাধকেও তার উপদেশ দেয়া। (দুই) সত্যের অর্থ বিশুদ্ধ

বিশ্বাস এবং সবরের অর্থ সংকাজ করা এবং মন্দকাজ থেকে বঁচে থাকা। কেননা, সবরের আক্ষরিক অর্থ নিজেকে বাধা দেয়া ও অনুবর্তী করা। এ অনুবর্তী করার মধ্যে সংকর্ম সম্পাদন এবং গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা উভয়ই शामिल।

মুক্তির জন্যে নিজের কর্ম সংশোধিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, অপরের চিন্তাও জরুরী : এ সূরায় মুসলমানদের প্রতি একটি বড় নির্দেশ এই যে, নিজেদের ধর্মকে কোরআন ও সুন্নাহর অনুসারী করে নেয়া যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী, ততটুকুই জরুরী অন্য মুসলমানদেরকেও ঈমান ও সংকর্মের প্রতি আহ্বান করার সাধ্যমত চেষ্টা করা। নতুবা কেবল নিজেদের আমল মুক্তির জন্যে যথেষ্ট হবে না, বিশেষতঃ আপন পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কুকর্ম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা আপন মুক্তির পথ বন্ধ করার নামাস্তর, যদিও নিজে পুরোপুরি সংকর্মপরায়ণ হয়। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সাধ্যমত সংকাজের আদেশ ও অসংকাজের নিষেধ ফরয করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলমান এমনকি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত উদাসীনতায় লিপ্ত রয়েছে। তারা নিজেদের আমলকেই যথেষ্ট মনে করে বসে আছে, সন্তান-সন্ততি কি করছে, সেদিকে জ্ঞেপও নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এ আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করার তওফীক দান করুন। আমীন।

সূরা হুমাযাহ

এ সূরায় তিনটি জঘন্য গোনাহে শাস্তি ও তার তীব্রতা বর্ণিত হয়েছে। গোনাহ তিনটি হচ্ছে **جمع مال و لئز -** অর্থ প্রথমেস্ত শব্দদ্বয় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসীরকারের মতে **جمع مال** -এর অর্থ গীবত অর্থাৎ, পশ্চাতে পরনিন্দা করা এবং **لئز** -এর অর্থ সামনাসামনি দোষারোপ করা ও মন্দ বলা। এ দু'টি কাজই জঘন্য গোনাহ। পশ্চাতে পরনিন্দার শাস্তির কথা কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এর কারণ এরূপ হতে পারে যে, এ গোনাহে মশগুল হওয়ার পথে সামনে কোন বাধা থাকে না। যে এতে মশগুল হয়, সে কেবল এগিয়েই চলে। ফলে গোনাহ বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ও অধিকতর হতে থাকে। সম্মুখের নিন্দা এরূপ নয়। এতে প্রতিপক্ষও বাধা দিতে প্রস্তুত থাকে। ফলে গোনাহ দীর্ঘ হয় না। এছাড়া কারণও পশ্চাতে নিন্দা করা এ কারণেও বড় অন্যায্য যে, প্রদ্রষ্ট ব্যক্তি জানতেও পারে না যে, তার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে। ফলে সে সাফাই পেশ করার সুযোগ পায় না।

একদিক দিয়ে **لئز** তথা সম্মুখের নিন্দা গুরুতর। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয়, তাকে অপমানিত ও লাঞ্চিত করা হয়। এর কষ্টও বেশী, ফলে শাস্তিও গুরুতর। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ

شَرَّ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُشَاوِنَ بِالنِّمِةِ الْمَفْرُوقِ بَيْنِ
الْأَحِبِّ الْبَاغُونَ لِلرَّءَاءِ الْعَنْتِ .

অর্থাৎ, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরস্পর নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।

যেসব বদভ্যাসের কারণে আয়াতে শাস্তির কথা উচ্চারণ করা হয়েছে,

তন্মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে অর্থলিপ্সা। আয়াতে একে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে—অর্থলিপ্সার কারণে সে তা বার বার গণনা করে। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস সাক্ষ্য দেয় যে, অর্থ সঞ্চয় করা সর্বাবস্থায় হারাম ও গোনাহ নয়। তাই এখানেও উদ্দেশ্য সেই সঞ্চয় হবে, যাতে জরুরী হক আদায় করা হয় না, কিংবা গর্ব ও অহমিকা লক্ষ্য হয় কিংবা লালসার কারণে দ্বীনের জরুরী কাজ বিঘ্নিত হয়।

أَتَى تَكْلِيَهُ عَلَى الْإِقْدَدَةِ অর্থাৎ, জাহান্নামের এই অগ্নি হৃদয়কে পর্যন্ত গ্রাস করবে। প্রত্যেক অগ্নির এটাই বৈশিষ্ট্য। যা কিছু তাতে পতিত হয়, তার সকল অংশ জ্বল-পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। মানুষ তাতে নিক্ষিপ্ত হলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসহ হৃদয়ও জ্বল যাবে। এখানে জাহান্নামের অগ্নির এই বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার কারণ এই যে, দুনিয়ার অগ্নি মানুষের দেহে লাগলে হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার আগেই মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। কাজেই জীবিত অবস্থাতেই হৃদয় পর্যন্ত অগ্নি পৌঁছবে এবং হৃদয়-দহনের তীব্র যন্ত্রণা জীবদ্দশাতেই মানুষ অনুভব করবে।

সূরা ফীল

এ সূরায় হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। তারা কা'বা গৃহকে ভূমিসাৎ করার উদ্দেশ্যে হস্তীবাহিনী নিয়ে মক্কায় অভিযান পরিচালনা করেছিল। আল্লাহ তাআলা নগণ্য পক্ষীকুলের মাধ্যমে তাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তাদের কুমতলবকে ধুলায় মিশিয়ে করে দেন।

রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মের বছর এ ঘটনা ঘটেছিল : মক্কা মোকাররমায় খাতামুল-আম্বিয়া (সাঃ)-এর জন্মের বছর হস্তীবাহিনীর ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কতক রেওয়াযেতে দু'রাও এটা সমর্থিত এবং এটাই প্রসিদ্ধ উক্তি —(ইবনে-কাসীর) হাদীসবিদগণ এ ঘটনাকে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর এক প্রকার মো'জ্জোয়ারূপে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু মো'জ্জোয়ায় নবুওয়ত দাবীর সাথে নবীর সমর্থনের প্রকাশ করা হয়। নবুওয়ত দাবীর পূর্বে বরং নবীর জন্মেরও পূর্বে আল্লাহ তাআলা মাঝে মাঝে দুনিয়াতে এমন ঘটনা ও নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা অলৌকিকতায় মো'জ্জোর অনুরূপ হয়ে থাকে। এ ধরনের নিদর্শনাবলীকে হাদীসবিদগণের পরিভাষায় 'আরহাসাত' বলা হয়। 'রাহস' এর অর্থ ভিত্তি ও ভূমিকা। এসব নিদর্শন নবীর নবুওয়ত প্রমাণের ভিত্তি ও ভূমিকা হয় বিধায় এগুলোকে 'আরহাসাত' বলা হয়ে থাকে। নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়ত এমনকি জন্মেরও পূর্বে এ ধরনের কয়েক প্রকার 'আরহাসাত' প্রকাশ পেয়েছে। হস্তী-বাহিনীকে আসমানী আযাব দ্বারা প্রতিহত করাও এসবের অন্যতম।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ — এখানে 'আপনি কি দেখেননি' বলা হয়েছে; অথচ এটা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মের কিছুদিন পূর্বকার ঘটনা। কাজেই দেখার কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যে ঘটনা এরূপ নিশ্চিত যে, তা ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ করা হয়, সে ঘটনার জ্ঞানকেও 'দেখা' বলে ব্যক্ত করা হয়; যেন এটা চাক্ষুষ ঘটনা। এক পর্যায়ে দেখাও প্রমাণিত আছে; যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা ও আসমা (রাঃ) দু'জন হস্তীচালককে অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও ভিক্ষুকরূপে দেখেছিলেন।

তাই আল্লাহ তাআলা তাদের শত্রু হস্তীবাহিনীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে মানুষের অন্তরে তাদের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তারা যে কোন দেশে গমন করে, সকলেই তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

وَحَلَّةَ الشَّعْءِ وَالصَّيْفِ — একথা সুবিদিত যে, মক্কা শহর যে স্থলে অবস্থিত, সেখানে কোন চাষাবাদ হয় না, বাগবাগিচাও নেই; যা থেকে ফল মূল পাওয়া যেতে পারে। এ জন্যেই কা' বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলীলুল্লাহ (আঃ) দোয়া করেছিলেন وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرِ — অর্থাৎ, হে আল্লাহ, এতে বসবাস-কারীদেরকে ফলমূলের রিমিক দান করুন। আরও বলেছিলেন يُجِبِّي إِلَيْنَا ثَمَرَهُ كُلَّ شَيْءٍ — অর্থাৎ, বাইরে থেকেও যেন এখানে ফলমূল আনার ব্যবস্থা হয়। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সফর ও বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপারকণ সংগ্রহ করার উপরই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মক্কাবাসীরা খুব দারিদ্র্য ও কষ্টে দিনাতিপাত করত। অবশেষে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রপিতামহ হাশেম কোরায়েশকে ভিনদেশে যেয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে উদ্বুদ্ধ করেন। সিরিয়া ছিল ঠাণ্ডা দেশ। তাই গ্রীষ্মকালে তারা সিরিয়া সফর করত। পক্ষান্তরে ইয়ামেন গরম দেশ ছিল বিধায় তারা শীতকালে সেখানে বাণিজ্যিক সফর করত এবং মুনাফা অর্জন করত। বায়তুল্লাহর খাদমে হওয়ার কারণে সমগ্র আরবে তারা ছিল সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। ফলে পথের বিপদাপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা মক্কাবাসীদের প্রতি এসব অনুগ্রহ ও নেয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

فَلْيَبْذُرُوا ذُرِّيَّتَهُمْ هَٰذَا الْيَوْمَ — নেয়ামত উল্লেখ করার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে কোরায়েশকে আদেশ করা হয়েছে যে, তোমরা এই গৃহের মালিকের এবাদত কর। এই গৃহই যেহেতু তাদের সব শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণের উৎস ছিল, তাই বিশেষভাবে এই গৃহের মৌলিক গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে।

الَّذِينَ أَطْعَمْتُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنْتُمْ مِنْ حَوْيٍ — সুখী জীবনের জন্যে যা যা দরকার তা সমস্তই এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কোরায়েশকে এগুলো দান করেছিলেন। أَطْعَمْتُمْ مِنْ جُوعٍ বলে পানাহারের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম বোঝানো হয়েছে এবং وَآمَنْتُمْ مِنْ حَوْيٍ বাক্যে দস্যু ও শত্রুদের থেকে নিরাপত্তা এবং পরকালীন আযাব থেকে নিষ্কৃতি এ উভয় মর্মই বোঝানো হয়েছে।

আবুল হাসান কাযবিনী (রহঃ) বলেন : যে ব্যক্তি শত্রু অথবা বিপদের আশঙ্কা করে তার জন্যে সূরা কোরায়েশের তেলাওয়াত নিরাপত্তার রক্ষাকবচ। একথা উদ্ধৃত করে ইমাম জযরী (রহঃ) বলেন—এটা পরীক্ষিত আমল। কাযী সানাউল্লাহ তফসীরে-মায়হারীতে বলেন : আমাকে আমার মুর্শিদ 'মির্থা মায়হার জান্ জানান' বিপদাপদের সময় এই সূরা তেলাওয়াত করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন : সব ধরনের বালামুসিবত দূর করার জন্যে এটা পরীক্ষিত ও অব্যর্থ। কাযী সানাউল্লাহ (রহঃ) আরও বলেন : আমি বারবার এটা পরীক্ষা করেছি।

সূরা কোরাইশ সমাপ্ত

সূরা মাউন

এ সূরায় কাফের ও মুনাফিকদের কণিয় দুষ্কর্ম উল্লেখ করে তজ্জন্য জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। মুমিন ব্যক্তি বিচার দিবস অস্বীকার করে না। সুতরাং কোন মুমিন যদি এসব দুষ্কর্ম করে, তবে তা শরীয়ত মতে কঠোর গোনাহ ও নিন্দনীয় অপরাধ হলেও বর্ণিত শাস্তির বিধান তার জন্যে প্রযোজ্য নয়। এ কারণেই প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে বিচারদিবস তথা কেয়ামত অস্বীকার করে। এতে অবশ্যই ইঙ্গিত আছে যে, বর্ণিত দুষ্কর্ম কোন মুমিন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। তবে এসব কোন অবিশ্বাসী কাফেরই করতে পারে। বর্ণিত দুষ্কর্ম এই : এতীমের সাথে দুর্ব্যবহার, শক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীনকে খাদ্য না দেয়া এবং অপরকেও দিতে উৎসাহ না দেয়া, লোক দেখানো নামায পড়া এবং যাকত না দেয়া। এসব কর্ম এমনিতেও নিন্দনীয় এবং কঠোর গোনাহ। আর যদি কুফর বশতঃ কেউ এসব কর্ম করে, তবে তার শাস্তি চিরকাল দোষখবাস। সূরায় وِيل (দুর্ভোগ) শব্দের মাধ্যমে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

এটা মুনাফিকদের অবস্থা। তারা লোক দেখানোর জন্যে এবং মুসলমানিত্বের দাবী সপ্রমাণ করার জন্য নামায পাড়ে। কিন্তু নামায যে ফরয, এ বিষয়ে তারা বিশ্বাসী নয়। ফলে সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না এবং আসল নামাযেরও খেয়াল রাখে না। লোক দেখানোর জায়গা হলে পাড়ে, নতুবা ছেড়ে দেয়। আসল নামাযের প্রতিই লক্ষ্যে না করা মুনাফিকদের অভ্যাস এবং عَنْ صَلَاتِهِمْ শব্দের আসল অর্থ তাই। নামাযের মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার কথা এখানে বোঝানো হয়নি। কেননা, এজন্যে জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে না। এটা উদ্দেশ্য হলে عَنْ صَلَاتِهِمْ —এর পরিবর্তে فِي صَلَاتِهِمْ বলা হত। সহীহ হাদীসমূহে প্রমাণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনেও একাধিকবার নামাযের মধ্যে ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল।

وَيَسْتَكْبِرُونَ الْكَافِرُونَ — মাকোন শব্দের আসল অর্থ যৎকিঞ্চিৎ ও তুচ্ছ

বস্তু। এমন ব্যবহার্য বস্তুসমূহকেও মাকোন বলা হয়, যা স্বভাবতঃ একে অপরকে ধার দেয় এবং যেগুলোর পারস্পরিক লেন-দেন সাধারণ মানবতারূপে গণ্য হয়; যথা কুড়াল, কোদাল অথবা রান্না-বান্নার পাত্র। প্রয়োজনে এসব জিনিস প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে নেয়া দোষনীয় মনে করা হয় না। কেউ এগুলো দিতে অস্বীকৃত হলে তাকে বড় কৃপণ ও নীচ মনে করা হয়। কারও কারও মতে আলোচ্য আয়াতে মাকোন বলে যাকাত বোঝানো হয়েছে। যাকাতকে মাকোন বলার কারণ এই যে, যাকাত পরিমাণে আসল অর্থের তুলনায় খুবই কম—অর্থাৎ, চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে। হযরত আলী ও ইবনে ওমর (রাঃ) এবং হাসান বসরী, কাতাদাহ ও যাহ্যাক (রহঃ) প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ এখানে এ তফসীরই করেছেন।—(মায়হারী) বলাবাক্স, বর্ণিত শাস্তি জাহান্নাম ফরয কাজ তরক করার কারণেই হতে পারে। ব্যবহার্য জিনিসপত্র অপরকে দেয়া খুব সওয়াবের কাজ এবং মানবতার দিক দিয়ে জরুরী, কিন্তু ফরয বা ওয়াজিব নয়, যা না দিলে জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে। কোন কোন হাদীসে মাকোন —এর তফসীর ব্যবহার্য জিনিস করা হয়েছে। এর মর্মার্থ তাদের চরম নীচতাকে ফুটিয়ে তোলা যে, তারা যাকাত কি দেবে, ব্যবহার্য জিনিস দেয়ার মধ্যে কোন খরচ নেই — এতেও তারা কৃপণতা করে।

অতএব শাস্তির বিধান কেবল ব্যবহার্য জিনিস না দেয়ার কারণেই নয় ; বরং ফরয যাকাত না দেয়াসহ চরম কৃপণতার কারণে।

সূরা কাওসার

শানে নুযল : মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হোসাইন থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির পুত্রসন্তান মারা যায়, আরবে তাকে **إبر** নির্বংশ বলা হয়। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহীম যখন শৈশবেই মারা গেলেন, তখন কাফেররা তাঁকে নির্বংশ বলে উপহাস করতে লাগল। ওদের মধ্যে ‘আস ইবনে ওয়ায়েলের’ নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সামনে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন আলোচনা হলে সে বলতঃ আরে তার কথা বাদ দাও, সে তো কোন চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ, সে নির্বংশ। তার মৃত্যু হয়ে গেলে তার নাম উচ্চারণ করারও কেউ থাকবে না। এর পরিশ্রেক্ষিতে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়।—(ইবনে-কাসীর, মাযহারী)

সরাকথা, পুত্রসন্তান না থাকার কারণে কাফেররা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দোষারোপ করত অথবা অন্যান্য কারণে তাঁর প্রতি ষ্টুতা প্রদর্শন করত। এরই প্রেক্ষাপটে সূরা কাউসার অবতীর্ণ হয়। এতে দোষারোপের জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, শুধু পুত্রসন্তান না থাকার কারণে যারা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে নির্বংশ বলে, তারা তাঁর প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে বে-খবর। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যদিও তা কন্যা-সন্তানের তরফ থেকে হয়। অনন্তর নবীর আধ্যাত্মিক সন্তান অর্থাৎ, উম্মত তো এত অধিকসংখ্যক হবে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর উম্মতের সমষ্টি অপেক্ষাও বেশী হবে। এছাড়া এ সূরায় রসুলুল্লাহ (সাঃ) যে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয় ও সম্মানিত তাও তৃতীয় আয়াতে বিবৃত হয়েছে।

إِنَّا عِظَمْنَا لَكَ الْكَوْثُرَ — হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বলেন :

‘কাউসার’ সেই অজস্র কল্যাণ যা আল্লাহ তাআলা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে দান করেছেন। কাউসার জ্ঞানাতের একটি প্রসবনের নাম—কারও কারও এই উক্তি সম্পর্কে সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : একথা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তির পরিপন্থী নয়। কাউসার নামক প্রসবণটিও এই অজস্র কল্যাণের একটি। তাই মুজাহিদ কাউসারের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন : এটা উভয় জাহানের অফুরন্ত কল্যাণ। এতে জ্ঞানাতের বিশেষ কাউসার প্রসবণও অন্তর্ভুক্ত।

হাউযে কাউসার : হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত : একদিন রসুলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তাঁর মধ্যে তন্দ্রা অথবা এক প্রকার অচেনতার ভাব দেখা দিল। অতঃপর তিনি হাসিমুখে মন্তক উত্তোলন করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম : ইয়া রসুলুল্লাহ, আপনার হাসির কারণ কি ? তিনি বললেন : এই মুহূর্তে আমার নিকট একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ্‌সহ সূরা কাউসার পাঠ করলেন এবং বললেন : তোমরা জান, কাউসার কি ? আমরা বললাম : আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন : এটা জ্ঞানাতের একটি নহয়। আমার পালনকর্তা আমাকে এটা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। এতে অজস্র কল্যাণ আছে এবং এই হাউযে কেয়ামতের

দিন আমার উম্মত পানি পান করতে যাবে। এর পানি পান করার পাত্র সংখ্যা আকাশের তারকাসম হবে। তখন কতক লোককে ফেরেশতাগণ হাউয থেকে হটিয়ে দেবে। আমি বলব : পরওয়ারদেগার, সে তো আমার উম্মত। আল্লাহ তাআলা বলবেন : আপনি জানেন না, আপনার পরে সে কি নতুন মত ও পথ অবলম্বন করেছিল।—(বোখারী, মুসলিম, আবু-দাউদ, নাসায়ী)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ — শব্দের অর্থ উট কোরবানী করা। এর প্রচলিত

পদ্ধতি হচ্ছে হাত-পা বেঁধে কঠনালীতে বশ্য অথবা ছুরি দিয়ে আঘাত করা এবং রক্ত বের করে দেয়া। গরু-ছাগল ইত্যাদির কোরবানীর পদ্ধতি যবাই করা। অর্থাৎ, জন্তকে শুইয়ে কঠনালীতে ছুরিকাঘাত করা। আরবে সাধারণতঃ উট কোরবানী করা হত। তাই কোরবানী বোঝাবার জন্যে এখানে **انحر** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মাঝে মাঝে এ শব্দটি যে কোন কোরবানীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সূরার প্রথম আয়াতে কাফেরদের মিথ্যা ধারণার বিপরীতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-ক কাউসার (অর্থাৎ, ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কল্যাণ, তাও অজস্র পরিমাণে দেয়ার সুসংবাদ শুনানোর পর এর কৃতজ্ঞতাশ্রুণ তাকে দু’টি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে — নামায ও কোরবানী। নামায শারীরিক এবাদতসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবাদত এবং কোরবানী আর্থিক এবাদতসমূহের মধ্যে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও গুরুত্বের অধিকারী। কেননা, আল্লাহ তাআলার নামে কোরবানী করা প্রতিমা পূজারীদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে একটি জেহাদ বটে। তারা প্রতিমাদের নামে কোরবানী করত। এ কারণেই অন্য এক আয়াতেও নামাযের সাথে কোরবানীর উল্লেখ আছে—

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ — আলোচ্য আয়াতে

— এর অর্থ যে কোরবানী, একথা হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ), আতা, মুজাহিদ, হাসান বসরী (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।

إِنَّ صَلَاتِي وَمُؤَاتَاتِي — এর অর্থ শত্রুতাপোষণকারী, দোষারোপকারী।

যেসব কাফের রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে নির্বংশ বলে দোষারোপ করত, এ আয়াত তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে অধিকাংশ রেওয়ায়েত মতে ‘আস ইবনে ওয়ায়েল, কোন কোন রেওয়ায়েত মতে ওকবা এবং কোন কোন রেওয়ায়েত মতে কা’ব ইবনে আশরাফকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তাআলা রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে কাউসার অর্থাৎ, অজস্র কল্যাণ দান করেছেন। এর মধ্যে সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যও অন্তর্ভুক্ত। তাঁর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কম নয়। এছাড়া পয়গম্বর উম্মতের পিতা এবং উম্মত তাঁর আধ্যাত্মিক সন্তান। রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর উম্মত পূর্ববর্তী সকল পয়গম্বরের উম্মত অপেক্ষা অধিক হবে। সুতরাং একদিকে শত্রুদের উক্তি নস্যাত করে দেয়া হয়েছে এবং অপরদিকে আরও বলা হয়েছে যে, যারা আপনাকে নির্বংশ বলে প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বংশ।

সূরা কাফিরুন

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরার ক্ষয়ীলত ও বৈশিষ্ট্য : হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : ফজরের সুনত নামাযে পাঠ করার জন্যে দু’টি সূরা উত্তম — সূরা কাফিরুন ও এখলাস।—(মাযহারী) তফসীর

ইবনে-কাসীরে কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ফজরের সন্মতে এবং মাগরিব পরবর্তী সন্মতে এ দু'টি সূরা অধিক পরিমাণে পাঠ করতে শুনেছেন। জনৈক সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরয় করলেন : আমাকে নিদ্রার পূর্বে পাঠ করার জন্যে কোন দোয়া বলে দিন। তিনি সূরা কফিরুন পাঠ করতে আদেশ দিলেন এবং বললেন এটা শিরক থেকে মুক্তিপত্র। জুবায়ের ইবনে মুত'ইম (রাঃ) বলেন : একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে বললেন : তুমি কি চাও যে, সফরে গেলে সঙ্গীদের চেয়ে অধিক সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাক এবং তোমার আসবাবপত্র বেশী হোক? আমি জওয়াব দিলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমি অবশ্যই এরূপ চাই। তিনি বললেন : কোরআনের শেষ দিককার পাঁচটি সূরা—সূরা কাফিরুন, নছর, এখলাস, ফালাক, ও নাস পাঠ কর এবং প্রত্যেক সূরা বিস্মিল্লাহ্ বলে শুরু কর ও বিস্মিল্লাহ্ বলে শেষ কর। হযরত জুবায়ের (রাঃ) বলেন, ইতিপূর্বে আমার অবস্থা ছিল এই যে, সফরে আমার পাথেয় কম এবং সঙ্গীদের তুলনায় আমি দুর্দশাগ্রস্ত হতাম। কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এই শিক্ষা অনুসরণ করলাম, তখন থেকে আমি সফরে সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল হয়ে থাকি। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন : একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিচ্ছু দংশন করলে তিনি পানির সাথে লবণ মিশ্রিত করলেন এবং সূরা কাফিরুন, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতে করতে ক্ষতস্থানে পানি লাগালেন।—(মায়হারী)

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মোস্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খলফ প্রমুখ মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কয়েকজন একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল : আসুন, আমরা পরস্পরের মধ্যে

এই শান্তিচুক্তি করি যে, একবছর আপনি আমাদের উপাস্যদের এবাদত করবেন এবং একবছর আমরা আপনার উপাস্যের এবাদত করব।—(কুরতুবী) তিবরানীর রেওয়ায়েতে ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, কাকফেররা প্রথমে পারস্পরিক শান্তির স্বার্থে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে এই প্রস্তাব রাখল যে, আমরা আপনাকে বিপুল পরিমাণে ধনৈশ্বর্য দেব, ফলে আপনি মক্কার সর্বাধিক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে যাবেন। আপনি যে মহিলাকে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবেন। বিনিময়ে আপনি শুধু আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না। যদি আপনি এটাও মেনে না নেন, তবে একবছর আমরা আপনার উপাস্যের এবাদত করব এবং একবছর আপনি আমাদের উপাস্যদের এবাদত করবেন।—(মায়হারী)

আবু সালেহ্-এর রেওয়ায়েতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : মক্কার কাকফেররা পারস্পরিক শান্তির লক্ষ্যে এই প্রস্তাব দিল যে, আপনি আমাদের কোন প্রতিমার গায়ে কেবল হাত লাগিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সত্য বলব। এর পরিশ্রেক্ষিতে জিবরাঈল সূরা কাফিরুন নিয়ে আগমন করলেন। এতে কাকফেরদের ক্রিয়াকর্মের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং আল্লাহ তাআলার অকৃত্রিম এবাদতের আদেশ আছে।

لَا أُعْبُدُ سِوَاكَ — এ সূরায় কয়েকটি বাক্য পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত হওয়ায় স্বভাবতঃ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। এ ধরনের আপত্তি দূর করার জন্যে বোখারী অনেক তফসীরবিদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একই বাক্য একবার বর্তমানকালের জন্যে এবং একবার ভবিষ্যৎকালের জন্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি এক্ষণে কার্যতঃ তোমাদের উপাস্যদের এবাদত করি না এবং তোমরা আমার উপাস্যের এবাদত কর না এবং ভবিষ্যতেও এরূপ হতে পারে না।

সে সময় যেমন বৈধ ছিল, আজও তেমনি বৈধ আছে। বৈধতা ও অবৈধতার আসল কারণ হচ্ছে স্থান-কাল-পাত্র এবং সন্ধির শর্তাবলী। এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ফয়সালা দিতে গিয়ে বলেছেন—
 لا يصلح احل حراما او حرم حلالا — অর্থাৎ, সে সন্ধি অবৈধ, যা কোন হারামকে হালাল কিংবা হালালকে হারাম করে। এখন চিন্তা করুন, কাকফরদের প্রস্তাবিত চুক্তি মেনে নিলে শিরক করা জরুরী হয়ে পড়ে। কাজেই সূরা কাফিরান এ ধরনের সন্ধি নিষিদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে ইসলামের মূলনীতিবিরুদ্ধ কোন বিষয় ছিল না। উদারতা, সদ্যবহার ও শান্তি অনুযায় ইসলামের সাথে কোন ধর্মের তুলনা হয় না। কিন্তু শান্তিচুক্তি মানবিক অধিকারের ব্যাপারে হয়ে থাকে—আল্লাহ তাআলার আইন ও ধর্মের মূলনীতিতে কোন প্রকার দরকষাকষির অবকাশ নেই।

সূরা নহর

এ সূরা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ এবং এর অপর নাম সূরা ‘তাওদী’। ‘তাওদী’ শব্দের অর্থ বিদায় করা। এ সূরায় রসুল করীম (সাঃ) এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার ইঙ্গিত আছে বিধায় এর নাম ‘তাওদী’ হয়েছে।

কোরআন পাকের সর্বশেষ সূরা ও সর্বশেষ আয়াত : হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সূরা নহর কোরআনের সর্বশেষ সূরা। অর্থাৎ, এরপর কোন সম্পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ হয়নি। কতক রেওয়াজেতে কোন কোন আয়াত নাযিল হওয়ার যে কথা আছে, তা এর পরিপন্থী নয়। সূরা ফাতেহাকে এই অর্থেই কোরআনের সর্বপ্রথম সূরা বলা হয়। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ সূরা রূপে সূরা ফাতেহাই সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে। সুতরাং সূরা আলাক, মুদাসসির ইত্যাদির কোন কোন আয়াত পূর্বে নাযিল হলে তা এর পরিপন্থী নয়।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন : সূরা নহর বিদায় হচ্ছে অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর **أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর রসুলুল্লাহ (সাঃ) মাত্র আশি দিন জীবিত ছিলেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনের যখন মাত্র পঞ্চাশ দিন বাকী ছিল, তখন কালারার আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর পঁয়ত্রিশ দিন বাকী থাকার সময় **لَقَدْ جَاءَكُمْ** আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একশ দিন বাকী থাকার সময় **وَأَنفُوا بِمَا نَزَّلْنَا** আয়াত অবতীর্ণ হয়।
 —(কুরতুবী)

এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, প্রথম আয়াতে বিজয় বলে মক্কাবিজয় বোঝানো হয়েছে। তবে সূরাটি মক্কাবিজয়ের পূর্বে নাযিল হয়েছে, না পরে, এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। **إِذَا جَاءَ** ভাষাদৃষ্টে পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বাহ্যতঃ মনে হয়। রুহুল-মা’আনীতে এর অনুকূলে একটি রেওয়াজেও বর্ণিত আছে, যাতে বলা হয়েছে যে, খয়বর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। খয়বর বিজয় যে মক্কাবিজয়ের পূর্বে হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। রুহুল-মা’আনীতে হযরত কাতাদাহ (রাঃ) এর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) দু’ বছর জীবিত ছিলেন। যেসব রেওয়াজে থেকে জানা

যায় যে, সূরাটি মক্কা বিজয়ের দিন অথবা বিদায় হচ্ছে নাযিল হয়েছে, সেগুলোর মর্মার্থ এরূপ হতে পারে যে, এস্থলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) সূরাটি পাঠ করে থাকবেন। ফলে সবাই ধারণা করেছে যে, এটা একশুণি নাযিল হয়েছে।

একাধিক হাদীস ও সাহাবীর উক্তিতে আছে যে, এ সূরায় রসুলে করীম (সাঃ) এর ওফাত নিকটবর্তী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বলা হয়েছে যে, আপনার দুনিয়াতে অবস্থান করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তসবীহ ও এস্তেগফারে মনোনিবেশ করুন। মুকাতিল (রহঃ) এর রেওয়াজেতে আছে, রসুলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের এক সমাবেশে সূরাটি তেলাওয়াত করলে সবাই আনন্দিত হলেন যে, এতে মক্কাবিজয়ের সুসংবাদ আছে। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সূরাটি শুনে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রসুলুল্লাহ (সাঃ) ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : এতে আপনার ওফাতের সংবাদ লুক্কায়িত আছে। অতঃপর রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও এর সত্যতা স্বীকার করলেন। বোখারী হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে তাই রেওয়াজেতে করেছেন। তাতে আরও আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) একথা শুনে বললেন : এ সূরার মর্ম থেকে আমিও তাই বুঝি। — (কুরতুবী)

وَرَأَيْتُ النَّاسَ — মক্কাবিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল, যারা রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর রেসালত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কোরাইশদের ভয়ে অথবা অন্য কোন কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত ছিল। মক্কাবিজয় তাদের সেই বাধা দূর করে দেয়। সেমতে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। ইয়ামেন থেকে সাত শ’ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে পথিমধ্যে আযান দিতে দিতে ও কোরআন পাঠ করতে করতে মদীনায় উপস্থিত হয়। সাধারণ আরবরাও এমনভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়।

মৃত্যু নিকটবর্তী মনে হলে বেশী পরিমাণে তসবীহ ও এস্তেগফার করা উচিত : **فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ** — হযরত আয়েশা বলেন : এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যেক নামাযের পর এই দোয়া পাঠ করতেন **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي** — (বোখারী)

হযরত উস্মে সালাম (রাঃ) বলেন : এই সূরা নাযিল হওয়ার পর তিনি **سُبْحَانَ اللَّهِ** উঠা-বসা, চলাফেরা তথা সর্বাবস্থায় এই দোয়া পাঠ করতেন **سُبْحَانَ اللَّهِ وَحَمْدُهُ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ** তিনি বলতেন : আমাকে এর আদেশ করা হয়েছে। অতঃপর প্রথমশরুপ সূরাটি তেলাওয়াত করতেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন : এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (সাঃ) আত্মপা চেষ্টা সহকারে এবাদতে মনোনিবেশ করেন। ফলে তাঁর পদযুগল ফুলে যায়। — (কুরতুবী)

সূরা লাহাব

আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল ওয্হা। সে ছিল আবদুল মোত্তালিবের অন্যতম সন্তান। গৌরবর্ণের কারণে তার ডাক নাম হয়ে যায় আবু লাহাব। কোরআন পাক তার আসল নাম বর্জন করেছে। কারণ,

সেটা মুশরিকসুলভ। এছাড়া আবু লাহাব ডাক নামের মধ্যে জাহান্নামের সাথে বেশ মিলও রয়েছে। সে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর কটর শত্রু ও ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিল। সে নানাভাবে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়ার প্রয়াস পেত। তিনি যখন মানুষকে ঈমানের দাওয়াত দিতেন, তখন সে সাথে সাথে যেয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে প্রচার করত। — (ইবনে-কাসীর)

শানে-নুযুল : বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে **وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ** আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে রসুলুল্লাহ (সাঃ) সাফা পর্বতে আরোহণ করে কোরাইশ গোত্রের উদ্দেশ্যে **يَا صَبَاحَ** বলে অথবা আবদে মানাফ ও আবদুল মোত্তালিব ইত্যাদি নাম সহকারে ডাক দিলেন। (এভাবে ডাক দেয়া তখন আরবে বিপদাশংকার লক্ষণরূপে বিবেচিত হত।) ডাক শুনে কোরাইশ গোত্র পর্বতের পাদদেশে একত্রিত হল। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : যদি আমি বলি যে, একটি শত্রুদল ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে এবং সকাল বিকাল যে কোন সময় তোমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি? সবাই একবাক্যে বলে উঠল : হ্যাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর তিনি বললেন : আমি (শিরক ও কুফরের কারণে) আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত) এক ভীষণ আযাব সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি। একথা শুনে আবু লাহাব বলল : **تَبَا لَكَ الْهَٰؤُلَاءِ** ধ্বংস হও তুমি, এজন্যেই কি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? অতঃপর সে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে পাথর মারতে উদ্যত হল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সূরা লাহাব অবতীর্ণ হয়।

نَكَثَ يَدَايَٰنِٰى لَّهٖ وَتَنَبَّأ শব্দের অর্থ হাত। মানুষের সব কাজে হাতের প্রভাবই বেশী, তাই কোন ব্যক্তির সন্তানকে হাত বলেই ব্যক্ত করে দেয়া হয়; যেমন কোরআনে **يُمَٰلِكُ مَتَّٰلِكُ** বলা হয়েছে। হয়রত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আবু লাহাব একদিন বলতে লাগল : মুহাম্মদ বলে যে, মৃত্যুর পর এটা হবে, সেটা হবে। পরপর সে তার হাতের দিকে ইশারা করে বলল : এই হাতে সেগুলোর মধ্যে থেকে একটিও আসেনি। অতঃপর সে তার হাতকে লক্ষ্য করে বলল : **تَبَا لَكُمْ مَارِى** — অর্থাৎ, তোমরা ধ্বংস হও, মুহাম্মদ যেসব বিষয় সংঘটিত হওয়ার কথা বলে আমি সেগুলোর মধ্যে একটিও তোমাদের মধ্যে দেখিনি। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন আবু লাহাবের হৃদয় ধ্বংস হোক বলেছে।

تَبَا এর অর্থ ধ্বংস ও বরবাদ হওয়া। আয়াতে বদদোয়ার অর্থে **تَبَا** বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আবু লাহাব ধ্বংস হোক। দ্বিতীয় বাক্যে **وَتَنَبَّأ** এ বদদোয়া কবুল হওয়ার খবর দেয়া হয়েছে যে, আবু লাহাব ধ্বংস হয়ে গেছে। মুসলমানদের ক্রোধ দমনের উদ্দেশ্যে বদদোয়ার বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, আবু লাহাব যখন রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে **تَبَا** বলেছিল, তখন মুসলমানদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তাঁরাও ওর জন্যে বদদোয়া করবেন। আল্লাহ তাআলা যেন তাঁদের মনের কথা নিজেই বলে দিলেন। সাথে সাথে এ খবরও দিয়ে দিলেন যে, এ বদদোয়ার ফলে সে ধ্বংসও হয়ে গেছে। আবু লাহাবের ধ্বংসপ্রাপ্তির এই পূর্ব সংবাদের প্রভাবে বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার গলায় প্লেগের ফোঁড়া দেখা দেয়। সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে বিজন জায়গায় ছেড়ে আসে। শেষ পর্যন্ত এই অসহায় অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। তিন দিন পর্যন্ত তার মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করেনি। পাঁচতে শুরু করলে চাকর-বাকরদের দ্বারা মাটিতে পুতে

ফেলা হয়। — (বয়ানুল-কোরআন)

مَا كَسَبَ - مَا كَسَبَ এর অর্থ ধন-সম্পদ দ্বারা অর্জিত মুনাফা ইত্যাদি। এর অর্থ সন্তান-সন্ততিও হতে পারে। কেননা, সন্তান-সন্ততিকেও মানুষের উপার্জন বলা হয়। হয়রত আয়েশা (রাঃ) বলেন : **ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه** অর্থাৎ, মানুষ যা খায়, তন্মধ্যে তার উপার্জিত বস্তুই সর্বাধিক হালাল ও পবিত্র এবং তার সন্তান সন্ততিও তার উপার্জিত বস্তুর মধ্যে দাখিল। অর্থাৎ, সন্তানের উপার্জন খাওয়াও নিজের উপার্জন খাওয়ারই নামান্তর।

— (কুরতুবী) এ কারণে কয়েকজন তফসীরবিদ এস্থলে **مَا كَسَبَ** এর অর্থ করেছেন সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ তাআলা আবু লাহাবকে যেমন দিয়েছিলেন অগাধ ধন-সম্পদ, তেমনি দিয়েছিলেন অনেক সন্তান-সন্ততি। অকৃতজ্ঞতার কারণে এ'দুটি বস্তুই তার গর্ব, অহমিকা ও শান্তির কারণ হয়ে যায়। হয়রত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : রসুলুল্লাহ (সাঃ) যখন স্বগোত্রকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেন, তখন আবু লাহাব একথাও বলেছিল, আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা যদি সত্যই হয়ে যায়, তবে আমার কাছে ঢের অর্থবল ও লোকবল আছে। আমি এগুলোর বিনিময়ে আত্মরক্ষা করব। এর প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, আল্লাহর আযাব যখন তাকে পাকড়াও করল, তখন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার কোন কাজে আসল না। অতঃপর পরকালের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ অর্থাৎ, কেয়ামতে অথবা মৃত্যুর পর কবরেই সে এক লেলিহান অগ্নিতে প্রবেশ করবে। তার নামের সাথে মিল রেখে অগ্নির বিশেষণ **ذَاتَ لَهَبٍ** বলার মধ্যে বিশেষ অলংকার রয়েছে।

وَأَمْرًاؤُهُ حِمْلًا আবু লাহাবের ন্যায় তার স্ত্রীও রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। সে এ ব্যাপারে তার স্বামীর সাহায্য করত। সে ছিল আবু সুফিয়ানের ভগিনী ও হরব ইবনে উমাইয়্যার কন্যা। তাকে উস্ম জামীল বলা হত। আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এই হতভাগিনীও তার স্বামীর সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে **حِمْلًا** বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ শুষ্ককাঠ বহনকারিণী। আরবের বাকপদ্ধতিতে পশ্চাতে নির্দাকারীকে **حِمْلًا** (খড়িবাহক) বলা হত। শুষ্ককাঠ একত্রিত করে যেমন কেউ অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থা করে, পরোক্ষে নির্দাকারীও তেমনি। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিবর্গ ও পরিবারের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। রসুলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কোরামকে কষ্ট দেয়ার জন্যে আবু লাহাব পত্নী পরোক্ষে নির্দাকারীর সাথেও জড়িত ছিল। হয়রত ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইকরিমা ও মুজাহিদ (রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে **حِمْلًا** এর এ তফসীরই করেছেন। অপরপক্ষে ইবনে যায়দ ও যাহ্যাক (রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণ একে আক্ষরিক অর্থেই রেখেছেন এবং কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে, এই নারী বন থেকে কন্টকযুক্ত লাকড়ি চয়ন করে আনত এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে কষ্ট দেয়ার জন্যে তাঁর পাখে বিছিয়ে রাখত। তার এই নীচ ও হীন কাণ্ডকে কোরআন **حِمْلًا** বলে ব্যক্ত করেছে। — (কুরতুবী, ইবনে-কাসীর) কেউ কেউ বলেন যে, তার এই অবস্থাটি হবে জাহান্নামে। সে জাহান্নামে যাকুম ইত্যাদি বৃক্ষ থেকে লাকড়ি এনে জাহান্নামে তার স্বামীর উপর নিক্ষেপ করবে, যাতে অগ্নি আরও প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে, যেমন দুনিয়াতেও সে স্বামীর সাহায্য করে তার কুফর ও

জুম্ব বাড়িয়ে দিত।— (ইবনে-কাসীর)

فِي حَيْثُ مَا حَبِلَ مِنْ نَسَبٍ - শব্দটি সীন-এর উপর সাকিনযোগে ধাতু। অর্থ রশি পাকানো, রশি মজবুত করা এবং সীন-এর উপর যবরযোগে সর্বপ্রকার মজবুত রশিকে বলা হয়।— (কামুস) কেউ কেউ আরবের রীতি অনুযায়ী এর অনুবাদ করেছেন খজুরের রশি। কিন্তু ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অনুবাদ করেছেন লোহার তার পাকানো মোটা দড়ি। জাহান্নামে তার গলায় লোহার তার পাকানো বেড়ী পরানো হবে। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) ও তাই তফসীর করেছেন।— (মাযহারী)

সূরা এখলাস

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নুযুল : তিরমিযী ও হাকেম প্রমুখের রেওয়ায়েতে আছে, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আল্লাহ তাআলার বংশপরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জওয়াবে এই সূরা নাখিল হয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, মদীনার ইহুদীরা এ প্রশ্ন করেছিল। এ কারণে যাহ্যাক (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদের মতে সূরাটি মদীনায অবতীর্ণ।— (কুরতুবী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, মুশরিকরা আরও প্রশ্ন করেছিল—আল্লাহ তাআলা কিসের তৈরী, স্বর্ণরৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? এর জওয়াবে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরার ফযীলত : হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে আরয করল : আমি এই সূরাটি খুব ভালবাসি। তিনি বললেন : এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে দাখিল করবে।—(ইবনে-কাসীর)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে যাও। আমি তোমাদেরকে কোরআনের এক তৃতীয়াংশ শুনাব। অতঃপর যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, তারা একত্রিত হয়ে গেলেন তিনি আগমন করলেন এবং সূরা এখলাস পাঠ করে শুনালেন। তিনি আরও বললেন : এই সূরাটি কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।— (মুসলিম, তিরমিযী) আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : যে ব্যক্তি

সকাল-বিকাল সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস পাঠ করে তা তাকে বলা-মুসীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট হয়।—(ইবনে-কাসীর)

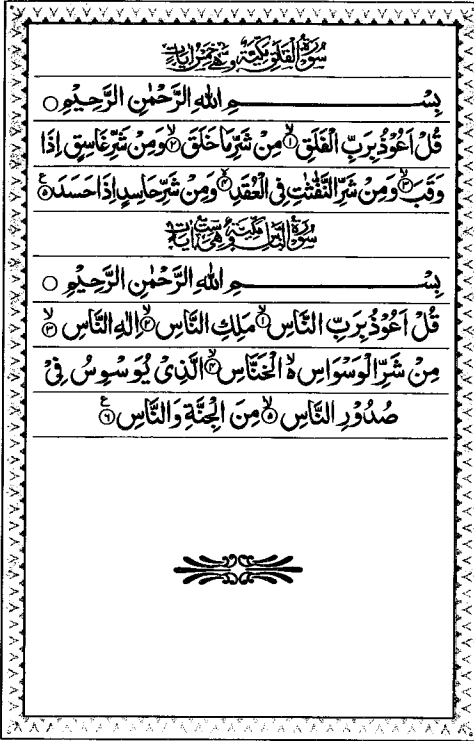
ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : আমি তোমাদেরকে এমন তিনটি সূরা বলছি, যা তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ও কোরআনসহ সব কিতাবেই রয়েছে। রাত্রিতে তোমরা ততক্ষণ নিদ্রা যেয়োনা, যতক্ষণ সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস না পাঠ কর। ওকবা (রাঃ) বলেন : সেদিন থেকে আমি কখনও এই আমল ছাড়িনি।—(ইবনে কাসীর)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - 'বলুন' কথার মধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রেসালতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে পথ প্রদর্শনের আদেশ রয়েছে। আল্লাহ শব্দটি এমন এক সত্তার নাম, যিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সর্বগুণের আধার ও সর্বদোষ থেকে পবিত্র। احد ও واحد উভয়ের অর্থ এক। কিন্তু احد শব্দের অর্থে এটাও শামিল যে, তিনি কোন এক অথবা একাধিক উপাদান দ্বারা তৈরী নন, তাঁর মধ্যে একাধিকত্বের কোন সম্ভাবনা নেই এবং তিনি কারও তুল্য নন। এটা তাদের সেই প্রশ্নের জওয়াব, যাতে বলা হয়েছিল, আল্লাহ কিসের তৈরী? এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কিত সকল আলোচনা এসে গেছে এবং قل শব্দের মধ্যে নবুওয়তের কথা এসে গেছে। অথচ এসব আলোচনা বিরাটকায় পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

أَلَّهُ الْوَاحِدُ - الله শব্দের অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের অনেক উক্তি আছে। তিবরানী এসব উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন : এগুলো সবই নির্ভুল। এতে আমাদের পালনকর্তার গুণাবলীই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু صمد এর আসল অর্থ সেই সত্তা, যার কাছে মানুষ আপন অভাব ও প্রয়োজন পেশ করে এবং যার সমান মহান কেউ নয়। সারকথা এই যে, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন।— (ইবনে-কাসীর)

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - যারা আল্লাহর বংশ পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, এটা তাদের জওয়াব। সন্তান প্রজনন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য — প্রট্টার নয়। অতএব, তিনি কারও সন্তান নন এবং তাঁর কোন সন্তান নেই।

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَفْسٌ أَحَدٌ - অর্থাৎ, কেউ তাঁর সমতুল্য নয় এবং আকার-আকৃতিতে কেউ তাঁর সাথে সামঞ্জস্য রাখে না।



সূরা ফালাক

মদীনায় অবতীর্ণ: আয়াত ৫

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

- (১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার, (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে, (৩) অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়, (৪) গ্রহিতে ফুৎকার দিয়ে জাদুকারিগীদের অনিষ্ট থেকে (৫) এবং হিংস্রদের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস

মদীনায় অবতীর্ণ: আয়াত ৬

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

- (১) বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার (২) মানুষের অধিপতির, (৩) মানুষের মা'বুদের (৪) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে, (৫) যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (৬) জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

সূরা ফালাক ও পরবর্তী সূরা নাস একই সাথে একই ঘটনায় অবতীর্ণ হয়েছে। হাফেয ইবনে কাইয়্যাম (রহঃ) উভয় সূরার তফসীর একত্রে লিখেছেন। তাতে বলেছেন যে, এ সূরাদ্বয়ের উপকারিতা ও কল্যাণ অপরিমিত এবং মানুষের জন্যে এ দু'টি সূরার প্রয়োজন অত্যধিক। বদনজর এবং সমস্ত দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট দূর করায় এ সূরাদ্বয়ের কার্যকারিতা অনেক। বলতে গেলে মানুষের জন্যে শ্বাস-প্রশ্বাস, পানাহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ যতটুকু প্রয়োজনীয়, এ সূরাদ্বয় তার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়।

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, জৈনক ইহুদী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর জাদু করেছিল। ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিবরাঈল আগমন করে সংবাদ দিলেন যে, জৈনক ইহুদী জাদু করেছে এবং যে জিনিসে জাদু করা হয়েছে, তা অমুক কূপের মধ্যে আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) লোক পাঠিয়ে সেই জিনিস কূপ থেকে উদ্ধার করে আনলেন। তাতে কয়েকটি গ্রহি ছিল। তিনি গ্রহিগুলো খুলে দেয়ার সাথে সাথে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে শয্যা ত্যাগ করেন। জিবরাঈল ইহুদীর নাম বলে দিয়েছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে চিনতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারও কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার অভ্যাস তাঁর কোন দিনই ছিল না। তাই আজীবন এই ইহুদীকে কিছু বলেননি এবং তার উপস্থিতিতে মুখমণ্ডলে কোনরূপ অভিযোগের চিহ্নও প্রকাশ করেননি। কপটবিশ্বাসী হওয়ার কারণে ইহুদী রীতিমত দরবারে হাবির হত।

সহীহ বোখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর জৈনক ইহুদী জাদু করলে তার প্রভাবে তিনি মাঝে মাঝে দিশেহারা হয়ে পড়তেন এবং যে কাজটি করেননি, তাও করেছেন বলে অনুভব করতেন। একদিন তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন : আমার রোগটা কি, আল্লাহ তাআলা তা আমাকে বলে দিয়েছেন। (স্বপ্নে) দূর্ব্যক্তি আমার কাছে আসল এবং একজন শিয়রের কাছে ও অন্যজন পায়ের কাছে বসে গেল। শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তি অন্য জনকে বলল, তাঁর অসুখটা কি? অন্যজন বলল : ইনি জাদুগ্রস্ত। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল : কে জাদু করল? উত্তর হল, ইহুদীদের মিত্র মুনাফিক লবীদ ইবনে আ'সাম জাদু করেছে। আবার প্রশ্ন হল : কি বস্তুতে জাদু করেছে? উত্তর হল, একটি চিরুনীতে। আবার প্রশ্ন হল, চিরুনীটি কোথায়? উত্তর হল, খেজুর ফলের আবরণীতে 'বির যরওয়ান' কূপে একটি পাথরের নীচে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সে কূপে গেলেন এবং বললেন : স্বপ্নে আমাকে এই কূপই দেখানো হয়েছে। অতঃপর চিরুনীটি সেখান থেকে বের করে আনলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন : আপনি ঘোষণা করলেন না কেন (যে, অমুক ব্যক্তি আমার উপর জাদু করেছে)? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন : আল্লাহ তাআলা আমাকে রোগমুক্ত করেছেন। আমি কারও জন্যে কষ্টের কারণ হতে চাই না। (উদ্দেশ্য, একথা ঘোষণা করলে মুসলমানরা তাকে হত্যা করত অথবা কষ্ট দিত।)

মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই অসুখ ছয় মাস স্থায়ী হয়েছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আরও আছে যে,

কতক সাহায্যে কেরাম জানতে পেরেছিলেন যে, এ দুষ্কর্মের হোতা লাবীদ ইবনে আ'সাম। তাঁরা একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এসে আরম্ভ করলেন : আমরা এই পাপিষ্ঠকে হত্যা করব না কেন? তিনি তাঁদেরকে সে উত্তরই দিলেন, যা হযরত আয়েশা (রাঃ)—কে দিয়েছিলেন। ইমাম সা'লাবী (রহঃ)—এর রেওয়ায়েতে আছে, জনৈক বালক রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাজকর্ম করত। ইহুদী তার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর চিরুণী হস্তগত করতে সক্ষম হয়। অতঃপর একটি তাঁতের সূতায় এগারটি গ্রহি লাগিয়ে প্রত্যেক গ্রহিতে একটি করে সুঁই সংযুক্ত করে। চিরুণীসহ সেই তার খেজুর ফলের আবরণীতে রেখে অতঃপর একটি কূপে প্রস্তরখণ্ডের নীচে রেখে দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা এগার আয়াত বিশিষ্ট এ দুটি সূরা নাখিল করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যেক গ্রহিতে এক আয়াত পাঠ করে তা খুলতে লাগলেন। গ্রহি খোলা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তিনি অনুভব করলেন যেন একটি বোঝা নিজের উপর থেকে সরে গেছে। — (ইবনে-কাসীর)

জাদুগ্রন্থ হওয়া নবুওয়তের পরিপন্থী নয় : যারা জাদুর স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, তারা বিম্মিত হয় যে, আল্লাহর রসূলের উপর জাদু ক্রুরূপে ক্রিয়াশীল হতে পারে। জাদুর স্বরূপ ও তার বিশদ বিবরণ সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে এতটুকু জানা জরুরী যে, জাদুর ক্রিয়াও অগ্নি, পানি ইত্যাদি স্বাভাবিক কার্যাদির ক্রিয়ার ন্যায়। অগ্নি দহন করে অথবা উত্তপ্ত করে, পানি ঠাণ্ডা করে এবং কোন কোন কারণের পরিশ্রেক্ষিতে জ্বর আসে। এগুলো সবই স্বাভাবিক ব্যাপার। পয়গম্বরগণ এগুলোর উদ্দেশ্য নয়। জাদুর প্রতিক্রিয়াও এমন ধরনের একটি ব্যাপার। কাজেই তাঁদের জাদুগ্রন্থ হওয়া অবাস্তব নয়।

সূরা ফালাক ও সূরা নাস—এর ফযীলতঃ প্রত্যেক মুমিনের বিশ্বাস এই যে, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত লাভ-লোকসান আল্লাহ তাআলার করায়ত্ত। তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ কারও অণু পরিমাণ লাভ অথবা লোকসান করতে পারে না। অতএব, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজেকে আল্লাহর আশ্রয়ে দিয়ে দেয়া এবং কাজে কর্মে নিজেকে তাঁর আশ্রয়ে যাওয়ার যোগ্য করতে সচেষ্ট হওয়া। সূরা ফালাকে ইহলৌকিক বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহে উভয় সূরার অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত আছে। সহীহ মুসলিমে ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, অদ্য রাত্রিতে আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি এমন আয়াত নাখিল করেছেন, যার সমতুল্য আয়াত দেখা যায় না; অর্থাৎ, **قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْاَلَمِّ** ও **قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ** আয়াতসমূহ। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর এবং কোরআনেও অনুরূপ অন্য কোন সূরা নেই। এক সফরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওকবা ইবনে আমের (রাঃ) কে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করালেন, অতঃপর মাগরিবের নামাযে এ সূরাদুই তেলাওয়াত করে বললেন : এই সূরাদুই নিদ্রা যাওয়ার সময় এবং নিদ্রা থেকে গাভোথানের সময়ও পাঠ করো। অন্য হাদীসে তিনি প্রত্যেক নামাযের পর সূরাদুই পাঠ করার আদেশ করেছেন।—(আবু দাউদ, নাসায়ী)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন রোগে আক্রান্ত

হলে এই সূরাদুই পাঠ করে হাতে ফুঁদিয়ে সর্বাক্কে বুলিয়ে দিতেন। ইন্তেকালের পূর্বে যখন তাঁর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়, তখন আমি এই সূরাদুই পাঠ করে তাঁর হাতে ফুঁক দিতাম। অতঃপর তিনি নিজে তা সর্বাক্কে বুলিয়ে নতেন। আমার হাত তাঁর পবিত্র হাতের বিকল্প হতে পারত না। তাই আমি এরূপ করতাম। — (ইবনে-কাসীর) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হাবীব (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক রাত্রিতে বৃষ্টি ও ভীষণ অন্ধকার ছিল। আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে ঝুঁজতে বের হলাম। যখন তাঁকে পেলাম, তখন প্রথমেই তিনি বললেন : বল। আমি আরম্ভ করলাম, কি বলব? তিনি বললেন : সূরা এখলাস ও কূল আউযু সূরা দুই। সকাল-সন্ধ্যায় এগুলো তিন বার পাঠ করলে তুমি প্রত্যেক কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।— (মাযহারী)

সারকথা এই যে, যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহায্যে কেরাম এই সূরাদুয়ের আমল করতেন। অতঃপর আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন—

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْاَلَمِّ —এর শাব্দিক অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। এখানে উদ্দেশ্য নিশি শেষে ভোর হওয়া। অন্য এক আয়াতে আল্লাহর গুণ **اَللّٰهُ اَكْبَرُ** বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আল্লাহর সমস্ত গুণের মধ্য থেকে একে অবলম্বন করার রহস্য এই হতে পারে যে, রাত্রির অন্ধকার প্রায়ই অনিষ্ট ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে এবং ভোরের আলো সেই বিপদাপদের আশংকা দূর করে দেয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যে তাঁর কাছে আশ্রয় চাইবে, তিনি তার সকল মুসীবত দূর করে দেবেন। — (মাযহারী)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ — আল্লামা ইবনে কাইয়াম (রহঃ) লিখেন : **شر** শব্দটি দু'প্রকার বিষয়বস্তুকে শামিল করে — (এক) প্রত্যক্ষ অনিষ্ট ও বিপদ, যদ্বারা মানুষ সরাসরি কষ্ট পায়, (দুই) যা মুসীবত ও বিপদাপদের কারণ হয়ে থাকে; যেমন কুফর, ও শিরক। কোরআন ও হাদীসে যেসব বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কথা আছে, সেগুলো এই প্রকারদুয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেগুলো হয় নিজেই বিপদ, না হয় কোন বিপদের কারণ।

আয়াতের ভাষায় সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্টই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজেই আশ্রয় গ্রহণের জন্যে এ বাক্যটিই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এস্থলে আরও তিনটি বিষয় আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রায়ই বিপদ ও মুসীবতের কারণ হয়ে থাকে। প্রথমে বলা হয়েছে, **وَمِنْ مَّوَدِّعِهِمْ اِذَا رَوَّوْا** শব্দের অর্থ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান ও মুজাহিদ (রহঃ) **وَمِنْ مَّوَدِّعِهِمْ** এর অর্থ নিয়েছেন রাত্রি। **وَقُوب** —এর অর্থ অন্ধকার পূর্ণরূপে বৃদ্ধি পাওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই রাত্রি থেকে যখন তার অন্ধকার গভীর হয়। রাত্রিবেলায় জিন, শয়তান, ইতরপ্রাণী কীট-পতঙ্গ ও চোর-ডাকাত বিচরণ করে এবং শত্রু আক্রমণ করে। যাদুর ক্রিয়াও রাত্রিতে বেশী হয়। তাই বিশেষভাবে রাত্রি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় এই : **مِنْ غَمٍّ**

—এর অর্থ ফুঁ দেয়া। **عَنْدَ** শব্দটি **عَنْدَ** এর বহুবচন। অর্থ গ্রহি। যারা জাদু করে, তারা ডোর ইত্যাদিতে গিরা লাগিয়ে তাতে জাদুর মন্ত্র পড়ে ফুঁ দেয়। এখানে **نَفَاثَاتٍ** শব্দীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। এটা **نَفْث** এরও বিশেষণ হতে পারে, যাতে পুরুষ ও নারী উভয়ই দাখিল আছে। বাহ্যতঃ

এটা নারীর বিশেষণ। জাদুর কাজ সাধারণতঃ নারীরাই করে এবং জন্মগতভাবে এর সাথে তাদের সম্পর্কই বেশী। এছাড়া রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর উপর জাদুর ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরাদুয় অবতীর্ণ হয়েছে। সেই ঘটনায় ওলীদের কন্যারাই পিতার আদেশে রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর উপর জাদু করেছিল। জাদু থেকে আশ্রয় চাওয়ার কারণ এটাও হতে পারে যে, এর অনিষ্ট সর্বাধিক। কারণ, মানুষ জাদুর কথা জানতে পারে না। অজ্ঞতার কারণে তা দূর করতে সচেষ্ট হয় না। রোগ মনে করে চিকিৎসা করতে থাকে। ফলে কষ্ট বেড়ে যায়।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে **وَمِنْ شُرَكَائِهِ إِذَا حَنَّكَ** — অর্থাৎ, হিংসুক ও হিংসা। হিংসার কারণেই রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর উপর জাদু করা হয়েছিল। ইহুদী ও মুনাফিকরা মুসলমানদের উন্নতি দেখে হিংসার অনলে দগ্ধ হত। তারা সম্মুখযুদ্ধে জয়লাভ করতে না পেরে জাদুর মাধ্যমে হিংসার দাবানল নির্বাপিত করার প্রয়াস পায়। রসুলুল্লাহ (সাঃ) —এর প্রতি হিংসা পোষণকারীর সংখ্যা জগতে অনেক। এ কারণেও বিশেষভাবে হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

حَنَّكَ শব্দের অর্থ কারও নেয়ামত ও সুখ দেখে দগ্ধ হওয়া ও তার অবসান কামনা করা। এই হিংসা হারাম ও মহাপাপ। এটাই আকাশে কৃত সর্বপ্রথম গোনাহ্ এবং এটাই পৃথিবীতে কৃত সর্বপ্রথম গোনাহ। আকাশে ইবলীস আদম (আঃ) —এর প্রতি এবং পৃথিবীতে আদমপুত্র কাবীল তদীয় ভ্রাতা হাবীলের প্রতি হিংসা করেছে — (কুরত্বী) **حَنَّكَ** তথা হিংসার কাছাকাছি হচ্ছে **غِيْطَ** তথা ঈর্ষা। এর সারমর্ম হচ্ছে কারও নেয়ামত ও সুখ দেখে নিজের জন্যেও তদ্রূপ নেয়ামত ও সুখ কামনা করা। এটা জায়েয, বরং উত্তম।

এখানে তিনটি বিষয় থেকে বিশেষ আশ্রয় প্রার্থনার কথা আছে। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথা যুক্ত করা হয়েছে — **عَالِيكَ** এর সাথে **حَلِيْبِكَ** এবং **إِذَا وَكَبَ** —এর সাথে **إِذَا حَنَّكَ** সংযুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় **نَفَاثَاتِ** এর সাথে কোন কিছু সংযুক্ত করা হয়নি। কারণ এই যে, জাদুর ক্ষতি ব্যাপক। কিন্তু রাত্রিতে ক্ষতি ব্যাপক নয়; বরং রাত্রি যখন গভীর হয়, তখনই ক্ষতির আশংকা দেখা দেয়। এমনভাবে হিংসুক ব্যক্তি যে পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে প্রবৃত্ত না হয়, সেই পর্যন্ত হিংসার ক্ষতি তার নিজের মধ্যেই সীমিত থাকে। তবে সে যদি হিংসায় উত্তেজিত হয়ে প্রতিপক্ষের ক্ষতিসাধনে সচেষ্ট হয়, তবেই প্রতিপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই প্রথম ও তৃতীয় বিষয়ের সাথে বাড়তি কথাগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে।

সূরা নাস

০ সূরা ফালাকে জাগতিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা রয়েছে। আলোচ্য সূরা নাসে পারলৌকিক আপদ ও মুসীবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। যেহেতু পরকালীন ক্ষতি গুরুতর, তাই এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে কোরআন পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।

قُلْ أَغْوَىٰ رَبِّي الْكَافِرِينَ — এখানে **نَاسٍ** —এর দিকে এবং পূর্ববর্তী সূরায় **فُلُقٍ** —এর দিকে **رَبِّ** —এর সম্বন্ধ করা হয়েছে। কারণ এই যে, পূর্ববর্তী সূরায় বাহ্যিক ও দৈহিক বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য এবং

সেটা মানুষের মধ্যে সীমিত নয়। জন্তু-জানোয়ারও দৈহিক বিপদাপদ এবং মুসীবতে পতিত হয়। কিন্তু সূরায় শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে। এটা মানুষের মধ্যে সীমিত এবং জিন জাতিও প্রসঙ্গতঃ শামিল আছে। তাই এখানে **رَبِّ** শব্দের সম্বন্ধ **نَاسٍ** —এর দিকে করা হয়েছে। — (বায়যাতী)

مَلِكِ الْكَافِرِينَ — মানুষের অধিপতি **الْكَافِرِينَ** — মানুষের মাবুদ। এ দুটি গুণ সংযুক্ত করার কারণ এই যে, **رَبِّ** শব্দটি কোন বিশেষ বস্তুর দিকে সম্বন্ধ হলে আল্লাহ ব্যতীত অপরের জন্যেও ব্যবহৃত হয়; যথা **رَبِّ الدَّارِ** গৃহের মালিক। প্রত্যেক মালিকই অধিপতি হয় না। তাই **الْكَافِرِينَ** বলা হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক অধিপতিই মাবুদ হয় না। তাই **مَلِكِ الْكَافِرِينَ** বলতে হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ মালিক, অধিপতি, মাবুদ সবই। এই তিনটি গুণ একত্রিত করার রহস্য এই যে, এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি গুণ হেফাযত ও সংরক্ষণ দাবী করে। কেননা, প্রত্যেক মালিক তার মালিকানাধীন বস্তুর, প্রত্যেক রাজা তার প্রজার এবং প্রত্যেক উপাস্য তার উপাসকদের হেফাযত করে। এই গুণত্রয় একমাত্র আল্লাহ তাআলার মধ্যে একত্রিত আছে। তিনি ব্যতীত কেউ এই গুণত্রয়ের সমষ্টি নন। তাই আল্লাহ তাআলার আশ্রয় সর্বাধিক বড় আশ্রয়। হে আল্লাহ্, আপনিই এসব গুণের আধার এবং আমরা কেবল আপনার কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি — এভাবে দোয়া করলে তা কবুল হওয়ার নিকটবর্তী হবে। এখানে প্রথমে **يَرْبِّي الْكَافِرِينَ** বলার পর ব্যাকরণিক নীতি অনুযায়ী সর্বনাম ব্যবহার করে **مَلِكِهِم** বলাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু দোয়া ও প্রশংসার স্থল হওয়ার কারণে এই শব্দকে বার বার উল্লেখ করাই উত্তম বিবেচিত হয়েছে। কেউ কেউ **نَاسٍ** শব্দটি বার বার উল্লেখ করার ব্যাপারে একটি রসালো তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন : এ সূরায় **نَاسٍ** শব্দ পাঁচ বার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম **نَاسٍ** বলে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই এর আগে **رَبِّ** অর্থাৎ, পালনকর্তা শব্দ আনা হয়েছে। কেননা, অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারাই প্রতিপালনের অধিক মুখাপেক্ষী। দ্বিতীয় **نَاسٍ** দ্বারা যুবকশ্রেণী বোঝানো হয়েছে। **مَلِكِ** (রাজা, শাসক) শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শাসন যুবকদের জন্যে উপযুক্ত। তৃতীয় **نَاسٍ** বলে সংসারত্যাগী, এবাদতে মশগুল বুড়োশ্রেণীকে বোঝানো হয়েছে। এবাদতের অর্থবাহী ইলাহ শব্দ তাদের জন্যে উপযুক্ত। চতুর্থ **نَاسٍ** বলে আল্লাহ্র সংকর্মপরায়ণ বান্দা বোঝানো হয়েছে। **رُسُوْسَةٍ** শব্দ এর ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, শয়তান সংকর্মপরায়ণদের শত্রু। তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করাই তার কাজ। পঞ্চম **نَاسٍ** বলে দুষ্কৃতকারী লোক বোঝানো হয়েছে। কেননা, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ — যে বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা উদ্দেশ্য অত্র আয়াতে সেই বিষয় বর্ণিত হয়েছে। **وَسْوَاسٍ** শব্দটি ধাতু। এর অর্থ কুমন্ত্রণা। এখানে অতিরঞ্জনের নিয়মে শয়তানকে কুমন্ত্রণা বলে দেয়া হয়েছে; সে যেন আপাদমস্তক কুমন্ত্রণা। আওয়াজহীন গোপন বাক্যের মাধ্যমে শয়তান মানুষকে তার অনুগত্যের আহবান করে। মানুষ এই বাক্যের অর্থ অনুভব করে, কিন্তু কোন আওয়াজ শুনে না। শয়তানের এরূপ আহবানকে কুমন্ত্রণা বলা হয়। — (কুরত্বী) **خَنَّاسٍ** শব্দটি **خَنَّاسٍ** থেকে উৎপন্ন। অর্থ পশ্চাতে সরে যাওয়া। মানুষ আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করলে পেছনে সরে যাওয়াই শয়তানের অভ্যাস। মানুষ গাফেল হলে

শয়তান আবার অগ্রসর হয়। অতঃপর হুশিয়ার হয়ে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে শয়তান আবার পশ্চাতে সরে যায়। এ কার্যধারাই অবিরাম অব্যাহত থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দু'টি গৃহ আছে। একটিতে ফেরেশতা ও অপরটিতে শয়তান বাস করে। (ফেরেশতা সংকাজে এবং শয়তান অসংকাজে মানুষকে উদ্ভুদ্ধ করে।) মানুষ যখন আল্লাহর যিকর করে, তখন শয়তান পেছনে সরে যায় এবং যখন যিকিরে থাকে না, তখন তার চক্ষু মানুষের অন্তরে স্থাপন করে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। — (মায়হারী)

مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ — অর্থাৎ, কুমন্ত্রণাদাতা জিনের মধ্য থেকেও হয় এবং মানুষের মধ্য থেকেও হয়। অতএব সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তাআলা রসূলকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন জিন-শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং মানুষ-শয়তানের অনিষ্ট থেকে। এখন জিন-শয়তানের কুমন্ত্রণা বুঝতে অসুবিধা হয় না; কারণ তারা অলক্ষ্যে থেকে মানুষের অন্তরে কোন কথা রাখতে পারে। কিন্তু মানুষ-শয়তান প্রকাশ্যে সামনে এসে কথা বলে। এটা কুমন্ত্রণা কিরূপে হল? জওয়াব এই যে, মানুষ-শয়তানও কারও সামনে এমন কথা বলে, যা থেকে সেই ব্যক্তির মনে কোন ব্যাপার সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এই সন্দেহ ও সংশয়ের বিষয় সে পরিষ্কার বলে না। শায়খ ইযযুদ্দীন (রহঃ)

তদীয় গ্রন্থে বলেন : মানুষ-শয়তানের অনিষ্ট বলে নফসের (মনের) কুমন্ত্রণা বোঝানো হয়েছে। কেননা, জিন-শয়তান যেমন মানুষের অন্তরে কু কাজের আগ্রহ সৃষ্টি করে তেমনি স্বয়ং মানুষের নফসও মন্দ কাজেরই আদেশ করে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন নফসের অনিষ্ট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়েছেন। হাদীসে আছে اللهم انى اعوذ بك من شر النفس ومن شر الشيطان وشره. অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমি আপনার আশ্রয় চাই, আমার নফসের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং শিরক থেকেও।

কোরআনের সূচনা ও সমাপ্তির মিল : আল্লাহ তাআলা সূরা ফাতেহা মাধ্যমে কোরআন পাক শুরু করেছেন, যার সারমর্ম আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তনের পর তাঁর সাহায্য ও সরলপথে চলার তওফীক প্রার্থনা করা। আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও সরলপথের মধ্যেই মানুষের যাবতীয় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কামিয়াবী নিহিত। কিন্তু এ দুটি বিষয় অর্জনে এবং অর্জনের পর তা ব্যবহারে প্রতি পদক্ষেপে অভিশপ্ত শয়তানের চক্রান্ত ও কুমন্ত্রণার জাল বিছানো থাকে। তাই এ জাল ছিন্ন করার কার্যকর পন্থা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ দ্বারা কোরআন পাক সমাপ্ত করা হয়েছে।